ঐতিহাসিক উর্দু শরাহ কামালাইন ও জামালাইনের অনুকরণে

তাফসীরে জালালাইন

আরবি-বাংলা

تفسير الجلالين

ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা

http://islamiboi.wordpress.com

আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল মহল্লী (র.)
[৭৯১–৮৬৪ হি. ১৩৮৯–১৪৫৯ খ্রি.]
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতী (র.)
[৮৪৯–৯১১ হি. ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.]

তাফসীরে জালালাইন

লেখকবৃন্দ

মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী
উস্তাদ, জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ

মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী
সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, জামিয়া হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম
[বড় কাটারা মাদরাসা] বড় কাটারা, ঢাকা

মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী
উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম পাটলি মাদরাসা, সুনামগঞ্জ

ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

http://islamiboi.wordpress.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ওহী ও আসমানি কিতাব	৯
আল কুরআনে ওহী শব্দের ব্যবহার	১০
ওহীর গুরুত্ব	১১
ওহীর প্রয়োজনীয়তা ও শ্রেণিবিভাগ	১২
অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির দিক থেকে ওহীর শ্রেণিবিভাগ	১৩
ওহী, কাশফ ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য	১৫
আসমানি কিতাবসমূহ	১৬
বাইবেল কি আসমানি কিতাব?	১৭
কুরআন পরিচিতি	১৯
কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস	২০
কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস	২২
পবিত্র কুরআনের বিরাম চিহ্নসমূহ	২৯
কুরআনের আয়াত ও সূরা সমূহের তারতীব ও ধারাবাহিকতা	৩০
তাফসীর পরিচিতি	৩১
তাফসীরের উৎস	৩৩
তাফসীরের শর্ত	৩৫
মক্কী মাদানী সূরা ও আয়াত	৩৭
তাফসীরশাস্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ	৪৬
প্রসিদ্ধ মুফাসসিরীনে কেরাম	৪৯
তাফসীরে জালালাইন	৫০
প্রথমার্ধের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর জীবনী	৫২
দ্বিতীয়ার্ধের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর জীবনী	৫৩

الجزء الأول : প্রথম পারা
[৫৮—৩৩৪]

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা বাকারা	৫৮
সূরা বাকারার নামকরণের কারণ	৫৮
সূরা বাকারার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য	৫৯
তা'আউয ও তাসমিয়ার হুকুম	৬২
بسم الله -এর ফজিলতসমূহ	৬৪
বিসমিল্লাহ সম্পর্কে শরিয়তের হুকুম	৬৭
হুরূফে মুকাত্তা'আতের তাৎপর্য	৬৮
কুরআনের আত্ম পরিচয়	৭৪
ঈমানের সংজ্ঞা	৭৭
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য	৭৭
ট্যাক্স কঠিন না জাকাত কঠিন?	৮৩
কুফরের প্রকার	৮৯
মোহরাঙ্কিত ও পর্দাবৃতকরণের তাৎপর্য	৯৩
নিফাক-এর প্রকারসমূহের ব্যাখ্যা	৯৭
মুনাফিকরা সাহাবায়ে কেরামকে কোন দৃষ্টিতে আহমক বলত?	১০৩
সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি	১০৪
তাওহীদই ইবাদতের উৎস	১১৭
জমিন গোল না চেপ্টা	১১৯
হযরত আম্বিয়া (আ.)-এর অলৌকিক ঘটনাবলি	১২৩
জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তবতা	১২৮
জগতের চার অবস্থা	১৩৭
হযরত আদম (আ.) ও জগতের সৃষ্টি	১৩৮
ফেরেশতার পরিচয়	১৪০
মাটির কান্না	১৪২
আদম নামকরণের কারণ	১৪৫
সিজদার হুকুম কি জিনদের প্রতিও ছিল	১৪৮

http://islamiboi.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
শয়তানি যুক্তি ও ফিকহ সম্বন্ধীয় যুক্তির পার্থক্য	১৪৯
বোকাদের বেহেশত	১৫৪
বনী ইসরাঈলের ঐতিহাসিক পরিচয়	১৬০
ঈসালে ছওয়াবের উপলক্ষে খতমে কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নেই	১৬২
কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ	১৬২
বনী ইসরাঈলের ঐতিহাসিক যাত্রা	১৭৩
হযরত মূসা (আ.)-এর তাওরাত প্রাপ্তি ও তাঁর অনুসারীদের ভ্রষ্টতা	১৭৫
তীহ প্রান্তরের ঘটনা	১৮১
ইহুদিদের লাঞ্ছনা	১৮৯
আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা	১৯৭
শরিয়তের দৃষ্টিতে হীলা	১৯৯
পাথরের শ্রেণিবিন্যাস ও ক্রিয়া	২১২
আখিরাতে নাজাত লাভের মূলনীতি	২২৫
মৃত্যু কামনা করার শরয়ী বিধান	২৪৮
যাদুবিদ্যা ও ইহুদি সম্প্রদায়	২৬০
যাদুবিদ্যা ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য	২৬৫
ঔষধের ব্যবস্থাপত্রের ন্যায় বিধানাবলির মধ্যেও পরিবর্তন আবশ্যক	২৭৯
বর্তমান মুসলমানদের কাদা ছুড়াছুড়ি অবস্থা	২৮৮
মসজিদে তালা লাগানো	২৯১
কিবলা নিয়ে বিতর্ক	২৯৩
কা'বা পূজা ও মূর্তি পূজার মধ্যে পার্থক্য	২৯৫
হিংসুটে লোকদের অযথা বিতর্ক	৩০২
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরীক্ষা	৩১০
পয়গম্বরগণ (আ.)-এর ইসমত বা নিষ্পাপতা	৩১০
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং এর সত্যায়ন	৩১৯
কা'বা নির্মাণের ইতিহাস	৩২০

الجزء الثاني : দ্বিতীয় পারা
[৩৩৫-৫২৮]

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিবলা পরিবর্তন ও অমুসলিমদের আপত্তি	৩৩৬
কিবলা পরিবর্তনের ইতিহাস	৩৪১
ইবাদত ও কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করা উচিত	৩৫০
জিকিরের তাৎপর্য	৩৫৫
ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার	৩৫৬
আলমে বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত	৩৫৮
ওমরার বিধান	৩৬৫
লা'নতের বিধান	৩৬৯
হালাল আহারের গুরুত্ব	৩৮১
দিক পূজার রহস্য	৩৯২
কিসাস জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে	৪০২
সিয়ামের বিধান	৪০৮
চাঁদ দেখার মাসআলা	৪১২
শরিয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর হিসেবের গুরুত্ব	৪২৩
বিদ'আতের মূল ভিত্তি	৪২৪
হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করার বিধান	৪৩৮
হজ আদ্যপান্ত আত্মার পরিশুদ্ধির অপূর্ব ব্যবস্থা	৪৪৬
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন	৪৫৭
জিহাদের বিধান	৪৭৩
মদ ও জুয়া দ্বারা সামাজিক ক্ষতি	৪৭৮
এতিমের সম্পদ ব্যয় নির্বাহের পদ্ধতি	৪৮০
বিধর্মী ও মুশরিক নারী-পুরুষকে বিবাহ সম্পর্কীয় বিধান	৪৮২
হায়েজের বিধান	৪৮৩
ঈলার বিধান	৪৮৮
বিভিন্ন ধর্মে তালাক	৪৮৯
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা	৪৯৩

http://islamiboi.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তালাক প্রদান পদ্ধতি	৪৯৮
হিল্লা বিয়ের বিধান	৫০১
সন্তানদের স্তন্য দানের বিধান	৫০৬
বিধবার ইদ্দত কাল	৫০৮
ইসলামে বিধবা নারীর মর্যাদা	৫১৬
الجزء الثالث : তৃতীয় পারা [৫২৯-৬৭২]	
নবীগণের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য	৫৩০
আয়াতুল কুরসীর ফজিলত	৫৩৬
হযরত উযাইর (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা	৫৪৫
উশরী ভূমির বিধান	৫৫৯
মানতের বিধান	৫৬১
সুদের আলোচনা	৫৬৭
ব্যবসা ও সুদের নীতিগত পার্থক্য	৫৬৯
সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি	৫৭০
সুদের শাস্তি	৫৭৪
সূরা আলে ইমরান	৫৮৭
তাওরাত ও ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক পটভূমি	৫৯০
মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ আয়াত এবং নাজরান খ্রিস্টান দল	৫৯৪
কাফের সম্প্রদায় জাহান্নামের ইন্ধন : ধনসম্পদ সেদিন কাজে আসবে না	৫৯৮
ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থেরও অনুসরণ করে না	৬১০
মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইবরাহীমী বংশধারার ইতিবৃত্ত	৬১৮
বিবি মরিয়মের লালনপালন এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী	৬২১
বিবি মরিয়মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব	৬২৫
নবীগণের জ্ঞানের মূল উৎস ওহী	৬২৭
হযরত ঈসা মসীহের গুণাবলি	৬৩০
হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযা	৬৩৪
হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র	৬৩৮
হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সান্ত্বনা	৬৪০
হযরত ঈসা (আ.) জীবিত না মৃত	৬৪৩
ইহুদি জাতির প্রতি দুনিয়ার শাস্তি	৬৪৫
মুবাহালার পটভূমি	৬৪৮
দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি	৬৫১
অঙ্গীকার যেখানে গ্রহণ করা হয়েছিল	৬৭০
মুরতাদের তওবা গ্রহণযোগ্য	৬৭১
الجزء الرابع : চতুর্থ পারা [৬৭৩-৭৯৪]	
বেকার ও নিজের অপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করার মধ্যেও ছওয়াব রয়েছে	৬৭৬
عرق النسا বা সাইটিকা রোগের চিকিৎসা	৬৭৮
বায়তুল্লাহ নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৬৮২
কা'বা শরীফের ফজিলত	৬৮৩
তাকওয়ার হক পালন কি রহিত?	৬৯২
আল্লাহর রশির ব্যাখ্যা	৬৯৩
কালো চেহারা ও সাদা চেহারাবিশিষ্ট কারা হবে?	৬৯৯
ওহুদ যুদ্ধ	৭১১
বদর যুদ্ধের সারমর্ম ও এর গুরুত্ব	৭১৫
সুদের চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক অনিষ্ট	৭২০
কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ	৭৩২
গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা	৭৪৪

http://islamiboi.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা	৭৪৬
আসমান ও জমিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৭৫৮
ছবরের অর্থ ও প্রকারভেদ	৭৬২
সূরা নিসা	৭৬৩
এতিমদের বিয়ে করার ব্যাপারে হুকুম	৭৬৭
বহু বিবাহ ও পবিত্র ইসলাম	৭৬৮
এক মহিলার একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ	৭৬৯
বিশ্বনবী ও বহু বিবাহ	৭৭০
উত্তরাধিকার বিধান	৭৭৭
স্বামী স্ত্রীর ওয়ারিশী স্বত্ব	৭৮১
সমকামিতার বিধান	৭৮৫
দুধ পানের সময়সীমা	৭৯২
الجزء الخامس : পঞ্চম পারা [৭৯৫-৯২০]	
বিবাহের শর্তাবলি	৭৯৮
নিকাহে মুতা বা সাময়িক বিবাহ হারাম হওয়ার কারণ	৭৯৯
মুতা ও শিয়া সম্প্রদায়	৮০০
কবীরা ও সগীরা গুনাহের সংজ্ঞা	৮০৭
কবীরা গুনাহের সংখ্যা	৮০৮
একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক নির্দেশনা	৮১০
নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব	৮১৩
ইসলামে নারীর অধিকার	৮১৩
অবাধ্য স্ত্রী ও তার সংশোধনের পদ্ধতি	৮১৪
তায়াম্মুমের বিধান ও এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য	৮২১
ইহুদিদের গুমরাহীর ব্যাখ্যা	৮২৩
জিবত ও তাগুতের ব্যাখ্যা	৮৩০
ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রমাণ	৮৩৭
আল্লাহ ও রাসূলের অনুগতরা নবী সিদ্দীকের সঙ্গী হওয়ার মর্ম	৮৪৪
উড়ো কথা প্রচার করা মারাত্মক গুনাহ ও ফেতনার কারণ	৮৫৫
হত্যার প্রকার ও তার শরয়ী বিধান	৮৬৫
দিয়ত কি?	৮৬৭
কতলের কাফফারায় মু'মিন গোলাম আজাদ করার রহস্য	৮৬৮
রক্তপণের ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব	৮৬৯
ঘটনা তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয়	৮৭৩
কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য	৮৭৪
দীন ও ঈমান বাঁচানোর জন্য হিজরত করা ফরজ	৮৭৮
বর্তমানে হিজরতের বিধান	৮৭৮
কসরের বিধান	৮৮০
শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে সালাতের নিয়ম	৮৮৩
সালাতুল খাওফের বিভিন্ন পদ্ধতি	৮৮৩
তওবার তাৎপর্য	৮৯১
কুরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য	৮৯২
ইজমা মানা ফরজ	৮৯৪
শিরক মানুষকে চরম গুমরাহীতে ফেলে দেয়	৮৯৬
এতিম মেয়েদের বিধান	৯০২
প্রাক ইসলামি আরবে নারী, শিশু ও এতিম	৯০৩
দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ	৯০৫
খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি	৯১১
মুনাফিকী করে মুক্তি পাওয়া যাবে না	৯১৪
কুফরির প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরি	৯১৫
মুনাফিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন মুনাফিকী	৯১৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা

الجزء السادس : ষষ্ঠ পারা
[৯-১৭৮]

ইহুদিরাও জঘন্য মুনাফিক ১১
ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করণ ১৯
সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ২২
হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের আকীদা অপরিবহার্য, এটা অস্বীকারকারী কাফের ২৫
কিয়ামতে হযরত ঈসা (আ.) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন ২৬
বনী ইসরাঈলগণ সবই এক ধরনের ছিল না ২৬
কুরআনে উল্লিখিত নবী রাসূলের নাম ৩১
সকল নবী রাসূলের মোট সংখ্যা ৩১
ওহী প্রত্যাখ্যান মূলত কুফরি ৩১
ওহী বিভিন্ন প্রকার তাতে ঈমান রাখা ফরজ ৩২
নবী রাসূল পাঠানোর কারণ ৩২
নবী ও রাসূলগণকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা ফরজ এবং দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সরাসরি কুফরি ৩৩
ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম ৩৪
সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা ৩৫
ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ৩৬
নবীগণ শ্রেষ্ঠ নাকি ফেরেশতাগণ ৪১
মহান আল্লাহর বান্দা হওয়াই উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের বিষয় ৪২
কালালার বিধান ৪৩
আল্লাহর নির্দেশ না মানার পরিণতি পথভ্রষ্টতা ৪৪
সূরা মায়িদা ৪৬
ইহরাম অবস্থায় শিকার ৫১
বছরের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত ৫৩
জাতীয় ও কুরআনী শিক্ষা ৫৭
ঈদ ও উৎসবপর্ব উদযাপনের ইসলামি মূলনীতি ৬৬
ইসলাম পুরিপূর্ণ দীন-জীবন ব্যবস্থা ৬৮
শিকার ও শিকারী জন্তুর বিধান ৬৯
আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহ করার বিধান ৬৯
আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহ করার বিধান ৭৩
ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব ৭৬
নামাজের জন্য অজু অপরিহার্য ৭৯
তায়াম্মুমের বিধান ৮১
আল্লাহরর রবূবিয়াতের অঙ্গীকার ৮২
তাকওয়ার অর্থ ও অর্জনের উপায় ৮৩
পরীক্ষার নম্বর, সনদ, সার্টিফেকেট ও নির্বাচনে ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ৮৪
ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ ৯১
মহান আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার তাৎপর্য ৯২
অসমানি সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার পরিণাম ৯৫
মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁর মতো মনে করার অসারতা ৯৬
ইহুদি -খ্রিষ্টানরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র নয় ৯৭
শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত ৯৯
বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা ১০২
ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য ১০৯
হাবিল ও কাবিলের ঘটনা ও আনুষঙ্গিক তাৎপর্য ১১১
হত্যাকারীর পরিণতি ১১২
লাশ মাটিতে দাফনের প্রচলন ১১২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
এক ব্যক্তিকে হত্যা সকলকে হত্যার সমতুল্য	১১৩
আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে শাস্তি ভঙ্গ করাই হলো সীমালজ্ঘন	১১৪
শরিয়তের শাস্তি তিন প্রকার	১১৫
ডাকাতের চারটি অবস্থা হতে পারে	১১৯
অপরাধ থেকে তওবা করা	১২১
আখেরাত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা	১২৬
চোরের শাস্তি ও তার যৌক্তিকতা	১২৭
কুরআন হলো তাওরাতও ইঞ্জীলের সংরক্ষক	১৪১
জাহেলী যুগের রীতিনিতি কাম্য নয়	১৪৬
ইহুদি, নাসরা ও ও মুশরিকরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করতো	১৬০
মহান আল্লাহ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের ধৃষ্ঠতাপূর্ণ উক্তি এবং এর পরিণতি	১৬২
পার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণ পরীক্ষা এবং অবকাশ	১৬৩
প্রচার কার্যের তাগিদ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা	১৬৯
আল্লাহ তা'আলার কাছে সাফল্য অর্জন সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল	১৭০
রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই	১৭১
বনী ইসরাঈলের পয়গাম্বর ছিলেন নাকি ওলী	১৭৩
আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার পথ	১৭৪
শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ির নয়	১৭৪
বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম	১৭৭
নাসারাদের ইসলাম প্রীতি	১৭৮

الجزء السابع : সপ্তম পারা
১৭৯-২৯৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মদ্যপানের নিষিদ্ধতা	১৮৫
মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার কারণ	১৮৬
ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য	১৯১
ঈসা ইবনে মরিয়মের কতিপয় স্পষ্ট মু'জিযা	২০৮
অস্বভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করা উচিত নয়	২০৯
সূরা আ'নআম	২১৪
সূরা আন'আমের বৈশিষ্ট্য	২১৭
একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ	২১৮
মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা	২৩১
সৃষ্টজীবের পাওনার গুরুত্ব	২৩৯
কুরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর	২৫২
বিপদাপদের আসল প্রতিকার	২৬০
বাতিল পন্থিদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ	২৬২
বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান	২৬৯
দীন প্রচারের জন্য কয়েকটি নির্দেশ	২৭১
রাত্রিকে সৃষ্টজীবের আরামের জন্য প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক নির্ধারণ একটি বিরাট নিয়ামত	২৮৪
স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা	২৯১
কোনো পাপের কারণ হওয়াও পাপ	২৯৫

الجزء الثامن : অষ্টম পারা
২৯৭-৪২৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা
হক ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে	৩০২
শয়তান হলো মানুষের শত্রু	৩০২
আখেরাতের প্রতি ঈমান হলো বক্ষা কবচ	৩০৩
বিসমিল্লাহ বিনে জবাইকৃত জন্তুর বিধান	৩০৬
মু'মিন জীবিত আর কাফের মৃত	৩১০
ঈমান আলো আর কুফর অন্ধকার	৩১২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
নবুয়ত সাধনা লব্ধ বিষয় নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান পদ	৩১৩
সাহাবায়ে কেরাম দীনের ব্যাপারে উন্মুক্ত অন্তর ছিলেন	৩১৪
সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা	৩১৫
জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন	৩২১
আল্লাহ যে কোনো মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য	৩২২
কাফেরদের হুশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা	৩২৪
ক্ষেতের ওশর	৩২৯
শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ	৩৩৯
ধর্মে বিদআত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী	৩৫২
একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না	৩৫৪
সূরা আ'রাফ	৩৫৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্কে	৩৫৯
আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর	৩৬১
আমলের ওজন কিভাবে হবে?	৩৬২
কাফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে কি?	৩৬৯
পোশাকের উপকারিতা	৩৭২
ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা	৩৭৩
বাহ্যিক পোশাকের আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা	৩৭৩
নামাজের জন্য উত্তম পোশাক	৩৭৬
যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার ফরজ	৩৭৭
উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয়	৩৮১
খোরাক ও পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত	৩৮২
জান্নাতিদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে	৩৮৯
হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর	৩৮৯
আ'রাফবাসী কারা	৩৯০
আ'রাফ কি?	৩৯০
দোযখীদের আবেদন	৩৯৪
নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয়দিনে সৃষ্টিকরার কারণ	৪০০
ভূ-পৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম	৪০৩
আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৪১১
الجزء التاسع নবম পারা ৪২৭-৫৭৪	
হযরত মূসা (আ.) এর যুগের ফেরাউন	৪৪১
মু'জিযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য	৪৪৪
জাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আ.)-এর বিরাট মু'জিযা	৪৪৯
জটিলতা ও বিপদ মুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা	৪৫০
রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্রনায়ক শ্রেণির জন্য পরীক্ষা স্বরূপ	৪৫১
আত্মশুদ্ধিতে ৪০দিনের বিশেষ তাৎপর্য	৪৬৬
হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে আল্লাহর কালাম বা বাক্য বিনিময়	৪৬৮
কোনো কোনো পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায়	৪৭৬
সত্তরজন বনী ইসরাঈল নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা	৪৭৭
তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুণ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন	৪৮০
কুরআনের সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরজ	৪৮৩
মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য	৪৮৮
হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল	৪৮৯
ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃতমর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর	৫০০
الست সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ	৫০৬
বায়আত গ্রহণের তাৎপর্য	৫০৭
আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	৫০৯

বিবরণ	পৃষ্ঠা
বনী ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার নিদর্শনমূলক ঘটনা	৫১১
দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা	৫১৪
কুরআনি চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামা	৫২৭
বিস্ময়কর উপকারিতা	৫২৯
সেজদার কতিপয় ফজিলত ও আহকাম	৫৩২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সূরা আল-আনফাল	৫৩৩
সূরার বিষয়বস্তু	৫৩৭
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৫৩৭
মুমিনের বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য	৫৩৯
বদর যুদ্ধের ঘটনা	৫৪২

الجزء العاشر দশম পারা
৫৭৫-৭১৭

বিবরণ	পৃষ্ঠা
উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ	৫৭৭
মালে গনিমতের তাৎপর্য	৫৭৮
বদর যুদ্ধের দিনটিই ইয়াওমুল ফুরকান	৬৭১
যুদ্ধ জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কুরআনের হেদায়েত	৫৮২
শয়তানের ধোঁকা প্রতারণা এবং তা থেকে বাঁচার উপায়	৫৮৬
ইসলামি রাজনীতির প্রথম ধাপ : ইসলামি জাতীয়তা	৫৯৩
দ্বিতীয় ধাপ : ইহুদিদের সাথে মৈত্রীচুক্তি	৫৯৪
সন্ধিচুক্তি বাতিল করার উপায়	৫৯৫
চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা	৫৯৫
জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ফরজ	৫৯৮
সূরা তওবা	৬১৬
এই সূরার নাম	৬১৯
এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই কেন?	৬২০
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৬২১
সূরা তওবার বৈশিষ্ট্য	৬২১
মক্কা বিজয়কালের উদারতা	৬২৩
মক্কা বিজয় কালে মুশরিকদের চার শ্রেণি ও তাদের ব্যাপারে হুকুম আহকাম	৬২৪
মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় দেওয়ার উদারনীতি	৬২৪
ক্ষমা করার অর্থ নিরাপত্তাবিহীনতা হওয়া নয়	৬২৫
ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা আলেমদের কর্তব্য	৬৩০
ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না	৬৩১
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব লাভের তিন শর্ত	৬৩২
জিম্মিদের বিদ্রূপ অসহ্য	৬৩২
নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুটি আলামত	৬৩৭
অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েজ নয়	৬৩৭
আল্লাহর জিকির জিহাদের চেয়ে পুণ্যকাম	৬৪০
জিযিয়া ও খেরাজ	৬৫৩
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৬৫৪
হযরত ওযায়ের (আ.) সম্পর্কে ইহুদিদের বাতিল আকিদার ইতিহাস	৬৬০
দুনিয়ার মোহ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল	৬৭১
ইসলামি আকিদার মৌলিক তিনটি বিষয়	৬৭১
উম্মে মা'বাদের ঘটনা	৬৭৪
গ্রহণযোগ্য ওজর ও জিহাদের বাহানার পার্থক্য	৬৮৩
খারেজী পরিচিতি ও তাদের মতবাদ	৬৮৫
সিফফীনের যুদ্ধ	৬৮৫
জাকাতের পাত্র বা ক্ষেত্র আটটি	৬৯০
জাকাত উসুলকারীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে	৬৯১
জাকাত প্রদানের ব্যাপারে প্রাধান্য কার	৬৯৩
প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর আল-আওলাদের জন্য জাকাত সদকা হারাম	৬৯৫
মুমিনের বৈশিষ্ট্য	৭০০
জিহাদে অংশগ্রহণ করতে না পেরে সাহাবায়ে কেরামের ক্রন্দন	৭১৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الحادى عشر : এগারোতম পারা

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতি ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ২০
সদাসৎ মিশ্রিত আমল কি? ২১
মুসলমানদের সদকা-জাকাত আদায় করে তা যথাযথ খাতে ব্যয় করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ২২
জাকাত সরকারি কর নয়; বরং ইবাদত ২৩
জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত ৩১
সহীহ হাদীসের আলোকে ঘটনার বিবরণ ৩৫
দীনি ইলমের ফজিলত ৪৩
দীনি ইলম ফরজে আইন অথবা ফরজে কিফায়া হওয়ার বিবরণ ৪৪
ইলমে তাসাউফও ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত ৪৫
ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ৪৬
সূরা ইউনুস ৫১
নামকরণ ৫৫
কাফের ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি-বর্ণ ও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীনতা ৬৭
প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা ৮৫
আল্লাহ তা'আলার এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দুটি উদ্দেশ্য ৯৪
হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান কোথায় হয়েছে- ১০৩
যারা রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা ১০৪
হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনের অবশিষ্ট্য নিদর্শনাবলি ১০৪
হযরত ইউনুস (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা ১১৯
সূরা হূদ ১২৫

الجزء الثانى عشر : বারোতম পারা

রিজিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ১৩২
রিজিক পৌছাবার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা ১৩৩
হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান ১৫৯
হযরত নূহ (আ.)-এর তরীর বিবরণ ১৫৯
প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে ১৬০
যানবাহনে আরোহণের আদব ১৬২
প্রতিটি যানবাহনের গতি স্থিতি আল্লাহর কুদরতের অধীন ১৬২
জুদী পাহাড়টি কোথায়? ১৬৪
কাফের ও জালিমের জন্য দোয়া করা জায়েজ নয় ১৬৫
মুমিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না ১৬৫
ওয়াজ-নসিহত ও দীনি দাওয়াতের পারিশ্রমিক ১৭০
আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য ১৭১
আল্লাহ পাকের নাফরমানির পরিণাম ভয়াবহ ১৭২
হযরত সালেহ (আ.)-এর বংশসূত্র ১৭৫
সালামের সুন্নত ১৮৩
মেহমান দারির কতিপয় মূলনীতি ১৮৩
আহকাম ও মাসায়েল : মাপে কম দেওয়া ১৯৩
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী ১৯৯
ভাগ্যবান ও হতভাগাদের কথা ২০০
ভাগ্যবানদের বৈশিষ্ট্য : ভাগ্যবানদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ২০০
ইস্তিকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল ২০৫
রাসূলে পাক ﷺ -এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত ২০৮
মতবিরোধ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক ২১১

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ইউসুফ	২১২
সূরায়ে ইউসুফ প্রসঙ্গে	২১৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২১৪
স্বপ্নের তাৎপর্য, স্তর ও প্রকারভেদ	২১৭
স্বপ্ন নবুয়তের অংশ এর অর্থ ও ব্যাখ্যা	২১৮
কাদিয়ানি দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন	২১৮
কোনো সময় কাফের ও ফাসেক ব্যক্তির স্বপ্ন ও সত্য হতে পারে	২১৮
গুনাহ থেকে বাচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা	২৩৭
একটি আশ্চর্য ঘটনা	২৫১
পয়গাম্বর সুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত	২৫৩

الجزء الثالث عشر : তেরোতম পারা

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা দূরস্ত নয়, কিন্তু বিশেষ অবস্থায়	২৬৫
মানব তিন প্রকার	২৬৫
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল	২৬৮
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করা আল্লাহ তা'আলার আদেশের কারণে ছিল	২৭৫
সন্তান ভুলত্রুটি করলে সম্পর্কচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধনের চিন্তা করাই একান্ত বিধেয়	২৭৭
তদবীর ও তকদীর	২৭৯
নির্দেশ ও মাসআলা	২৮৫
বিধান ও মাসআলা	২৯৫
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর গভীর মহব্বতের কারণ	২৯৭
অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য	৩১৬
সূরা আর-রা'দ	৩২০
সূরায়ে রা'দ প্রসঙ্গে	৩২৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩২৫
হাদীসও কুরআনের মতো আল্লাহ তা'আলার ওহী	৩২৫
আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি?	৩২৬
প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলা; মানবীয় পরিচালনা নামে মাত্র	৩২৬
মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ	৩২৮
প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দেশে পয়গাম্বর আসা কি জরুরি?	৩৩০
সূরা ইবরাহীম	৩৬৮
সূরা ও তার বিষয়বস্তু	৩৭০
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৭০
হেদায়েত শুধু আল্লাহ তা'আলার কাজ	৩৭১
কুরআন পাকের তেলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য	৩৭২
কুরআন বুঝার ব্যাপারে কোনো কোনো ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ	৩৭৩
একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব	৩৭৪
কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম	৩৭৯
কিয়ামতের দিন কাফেরদের আস্ফালন	৩৮৭
কাফেরদের দৃষ্টান্ত	৩৯৫
ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া	৩৯৬
কবরের শাস্তিও শান্তি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত	৩৯৬
সূরা আল-হিজর	৪১৭
সূরা হিজর প্রসঙ্গে	৪১৮

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الجزء الرابع عشر : চৌদ্দতম পারা

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মামুনের দরবারে একটি ঘটনা	৪২২	কুরআন বুঝার জন্য হাদীস জরুরি, হাদীস অস্বীকার কুরআন অস্বীকারের নামান্তর	৪৮০
হাদীস সংরক্ষণও কুরআন সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত	৪২৩	কুরআন বুঝার জন্য কেবল আরবি জানা যথেষ্ট নয়	৪৮১
আল্লাহর রহমত জীবিকার প্রয়োজনাদিতে সম্বল ও সামঞ্জস্য	৪২৭	দুনিয়ার আজাবও এক প্রকার রহমত	৪৮১
সব সৃষ্টজীবনে পানি সরবরাহ করার অভিনব ব্যবস্থা	৪২৮	জীবিকার শ্রেণি-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ	৫০৩
সংক্ষেপে একত্রিত হওয়া ও বিস্তৃত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য	৪২৯	গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তি	৫০৯
মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাহ করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৪৩২	তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা	৫১৯
রূহ ও নফস সম্পর্কে কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি (র.)-এর তথ্যানুসন্ধান	৪৩৩	ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে	৫২১
আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাগণ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ	৪৩৪	ঘুষ নেওয়া কঠোর হারাম এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা	৫২১
জাহান্নামের সাত দরজা	৪৩৪	ঘুষের সংজ্ঞা	৫২২
বেহেশতের বিবরণ	৪৩৭	হায়াতে তাইয়েবা কি?	৫২২
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ সম্মান	৪৪১	আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ	৫২৪
আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া	৪৪১	নবুয়ত সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহের তিরস্কারপূর্ণ জবাব	৫২৮
যেসব বস্তির উপর আজাব এসেছে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত	৪৪২	জোর জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা	৫৩১
এসব ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য	৪৪২	দোজখ কোথা থেকে আনা হবে	৫৩৫
মাছানী নামকরণের তাৎপর্য	৪৪৬	আখেরাতের আলোচনা	৫৩৬
হাশরের ময়দানে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে	৪৪৭	যে গুনাহ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গুনাহ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে	৫৩৬
শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার	৪৪৭	হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গুণাবলি	৫৪০
সূরা আন-নাহল	৪৪৮	দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম	৫৪১
সূরা নাহল -এর নামকরণ	৪৫১	দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার	৫৪২
কুরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ	৪৫৩	দাওয়াত দাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েজ কিন্তু সবর করা উত্তম	৫৪৩
নমরূদের ঘটনা	৪৬৬	আয়াতের শানে নুযূল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন	৫৪৩
সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	৪৬৭		
উপমহাদেশেও অন্যের কোনো রসূল আগমন করেছেন কি	৪৭০		
হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয়	৪৭৫		
দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান	৪৭৬		
মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অজ্ঞদের উপর ওয়াজিব	৪৭৮		

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা

الجزء الخامس عشر : পনেরোতম পারা

সূরা আল-ইসরা ৫৪৫
কুরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মিরাজের প্রমাণাদি ও ইজমা ৫৫৩
মিরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ৫৫৪
মিরাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য ৫৫৪
ইসরা ও মি'রাজের তারিখ ৫৫৫
মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা ৫৫৬
মসজিদে আকসা ও সিরিয়ার বরকত ৫৫৬
বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ, বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা, এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ ৫৫৯
কাফেররা আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় ৫৬০
পবিত্র কুরআন বিশ্ব গ্রন্থ ৫৬১
আমলনামা গলার হার হওয়ার অর্থ ৫৬৬
পয়গাম্বর প্রেরণ ব্যতীত আজাব না হওয়ার ব্যাখ্যা ৫৬৬
মুশরিক সন্তানসন্ততির আজাব হবে না ৫৬৬
ধনীদের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ৫৬৭
বিদ'আত ও মনগড়া আমল যতই ভালো দেখা যাক গ্রহণযোগ্য নয় ৫৬৭
পিতামাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব ৫৭২
পিতামাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় ৫৭২
পিতামাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাদের মুসলমান হওয়া জরুরি নয় ৫৭৩
পিতামাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষত বার্ধক্যে ৫৭৩
একটি আশ্চর্য ঘটনা ৫৭৪
সকল আত্মীয়দের হক দিতে হবে ৫৭৫
খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ৫৭৬
বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ ৫৭৭
অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা ৫৮১
কিসাস নেওয়ার অধিকার ৫৮১
এতিমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা ৫৮২
অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকর করার নির্দেশ ৫৮২
কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা ৫৮৩
কান, চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ ৫৮৪
জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তাসবীহ পাঠ করার অর্থ ৫৮৯
হাশরে কাফেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে ৫৯১
কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয় ৫৯৭
মানব সৃষ্টির ইতিকথা ৬০২
অধিকাংশ সৃষ্টিজীবের উপর আদম সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন ৬০৩
মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা ৬০৪
শত্রুদের দূরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাজ ৬১২
পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ ৬১২
তাহাজ্জুদ নামাজের সময় ও বিধানাবলি ৬১৩
তাহাজ্জুদ ফরজ না নফল ৬১৪
তাহাজ্জুদ নফল না সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ ৬১৪
তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা ৬১৫
পয়গাম্বর ও সৎলোকদের শাফায়াত গ্রহণীয় হবে ৬১৫
শাফায়াতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাজের বিশেষ প্রভাব আছে ৬১৬
গুরত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া ৬১৭
শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব ৬১৭
রূহ বলে কি বুঝানো হয়েছে ৬২১
প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি নয়, প্রশ্নকারীর ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য ৬২৩
রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারে কি-না? ৬২৩
রূহের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য ৬২৪
রূহের গন্তব্যস্থল ৬২৭
কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পন্থা ৬৩৫
নামাজে প্রিয়নবী ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের অবস্থা ৬৪৮

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সূরা কাহ্ফ	৯

সূরা কাহ্ফের ফজিলত	১২
সূরা কাহফের আমল	১২
পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত	১৪
আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রাকীম	২২
আসহাবে কাহফের ঘটনা	২৩
আসহাবে কাহফ এখানো জীবিত আছে কি?	২৮
আসহাবে কাহফের কুকুর	৩৬
আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ	৪৩
আসহাবে কাহফের সংখ্যা	৪৩
জান্নাতীদের অলঙ্কার	৫০
অহংকার পতনের মূল	৫৮
কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা	৬৬
সকল অন্যায়ের উৎস হলো অহংকার	৭২
ইবলীসের ইতিকথা	৭৩
হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) -এর কাহিনী	৮৪
কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয়	৮৮
ইলম হাসিল করার আদব	৯৩

الجزء السادس عشر : ষষ্ঠদশ পারা

[৯৯–২৭৮]

পয়গম্বর সুলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত	১০৬
জুলকারনাইন-এর পরিচিতি	১১০
জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন?	১১১
ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত?	১১৮
জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বর্ণনা	১২২
প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য	১২৩
জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখানো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে	১২৫
রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্য হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী	১৩৮
সূরা মারইয়াম	১৪০
নামকরণ	১৪২
গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে	১৪৩
ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ	১৪৯
হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য	১৫০
মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা	১৫৬
মৃত্যু কামনার বিধান	১৫৭
মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হয়ে গেছে	১৫৭
পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয়	১৫৭
মহিলা নবী হতে পারে কি?	১৫৭
হযরত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ	১৬৫
বড়দের নসিহত করার পন্থা ও আদব	১৭২
ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মরতবা	১৭৮
রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক	১৭৯
কুরআন তেলাওয়াতের সময় অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত	১৮০
নামাজ অসময়ে অথবা জামাত ছাড়া নামাজ নষ্ট করার শামিল ও বড় গুনাহ	১৮০

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সূরা ত্বা-হা	২০০
হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন	২০৬
সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব	২০৭
নবী রাসূল নয় এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি?	২১৮
প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে।	২৩১
জাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরিয়তগত বিধি-বিধান	২৩২
ত্বরা করা সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.) কে প্রশ্ন ও তার রহস্য	২৪৫
সামেরী কে ছিল?	২৪৬
কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল?	২৪৯
সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক	২৫৮
স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব	২৭০
মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে	২৭১
কাফের ও পাপাচারীদের জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার কারণ	২৭২
শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া	২৭৬
পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদের নামাজের আদেশ ও তার রহস্য	২৭৭
الجزء السابع عشر : সপ্তদশ পারা [২৭৯- ৪১৩]	
সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য	২৮২
এ সূরার আমল	২৮৩
কুরআন আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু	২৮৪
মৃত্যু কি	৩০১
সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ হচ্ছে পরীক্ষা স্বরূপ	৩০১
কিয়ামতে আমলের ওজন ও দাড়িপাল্লা	৩০৫
হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ	৩১৪
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকাণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ	৩১৬
রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি?	৩২৬
কারো জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত	৩২৭
পর্বত ও পক্ষীকুলের তাসবীহ	৩২৭
বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হযরত দাউদ (আ.) কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল	৩২৮
সুলায়মান (আ.)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূত করণ	৩২৯
হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কাহিনী	৩৩৫
যুল কিফল নবী ছিলেন নাকি ওলী? তার বিস্ময়কর কাহিনী	৩৩৬
সূরা হাজ্জ	৩৪৯
সূরায়ে হাজ্জ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য	৩৫৩
সূরা হাজ্জের ফজিলত	৩৫৪
কিয়ামতের ভূ-কম্পন কবে হবে	৩৫৫
মাতৃ গর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা	৩৫৬
সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ	৩৬৪
জান্নাতীদের কংকণ পরিধান করানোর রহস্য	৩৬৭
রেশমী পোষাক পুরুষদের জন্য হারাম	৩৬৮
মক্কার হেরেম সব মুসলমানদের সমান অধিকারের তাৎপর্য	৩৬৯
বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা	৩৭৫
হজের ক্রিয়া কর্মে ক্রম ধারার গুরুত্ব	৩৭৭
ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য।	৩৭৮
কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ	৩৮৯
শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য	৩৯০
পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য	৩৯১
প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ	৪০৭
একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা	৪১০

বিবরণ	পৃষ্ঠা
الجزء الثامن عشر : অষ্টাদশ পারা [৪১৪– ৫৮৬]	
সূরা মু'মিনূন	৪১৪
সূরার নামকরণ	৪১৯
আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ	৪২১
মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা	৪২৫
মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা	৪২৬
ইশার পর কিসসা কাহিনী বলা নিষিদ্ধ	৪৫০
মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়ায় তা দূর হওয়া	৪৫১
হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থায় পার্থক্য	৪৬৭
সূরা নূর	৪৭০
সূরা নূরের গুরুত্ব তাৎপর্য	৪৭৫
ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শাস্তি সর্ববৃহঃ রাখা হয়েছে	৪৭৬
মুহাসিনাত কারা	৪৮৪
মিথ্যা অপবাদের কাহিনী	৪৯৪
হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য	৪৯৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারী	৪৯৮
সাহাবায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে	৫০৩
অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা	৫১২
অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরিকা	৫১৩
টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাস'আলা	৫১৪
পর্দা প্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়	৫১৫
বেগানাকে দেখা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ	৫১৬
পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম	৫১৭
নারীর আওয়াজের বিধান	৫২০
সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ	৫২০
বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ	৫২১
অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা	৫২৪
যয়তুন তৈলের বৈশিষ্ট্য	৫৩১
মসজিদের গুরুত্ব	৫৩৩
নারীর পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরো একটি ব্যতিক্রম বিধান	৫৬৩
সূরা ফুরকান	৫৭৪
সূরা ফুরকানের তাৎপর্য ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্কে	৫৭৭
প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ রহস্য	৫৭৮
মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল	৫৮৬
الجزء التاسع عشر : উনবিংশ পারা [৫৮৭–৭৩০]	
কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ	৫৯৩
কাফেররা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম	৬০০
সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলির সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন	৬০৭
কুরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ	৬১০
সৃষ্ট জগতের স্বরূপ ও কুরআন	৬১৫
কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদ সমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি	৬১৭
আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত	৬২৬
সূরা শু'আরা	৬৩২
সূরার নামকরণ	৬৩৪
পয়গম্বর সুলভ বিতর্কের একটি নমুনা বিতর্কের কার্যকারী রীতিনীতি	৬৪৩
হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার তাৎপর্য	৬৪৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা
খ্যাতি-যশ প্রীতি নিন্দনীয় কিন্তু শর্তসাপেক্ষ বৈধ	৬৬০
মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয়	৬৬১
অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে	৬৬২
সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান	৬৬৫
বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয়	৬৭০
আসহাবুল আয়কা	৬৮০
নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ	৬৮৮
ইসলামি শরিয়তে কাব্যচর্চার মান ও অবস্থান	৬৮৯
যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয় তা নিন্দনীয়	৬৯০
সূরা নামল	৬৯২
সূরা নামলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৬৯৬
সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম	৬৯৭
পয়গম্বরগণের সম্পদে উত্তরাধিকার হয় না	৭০১
বিহঙ্গকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান	৭০২
যে জন্তু কাজে অলসতা করে তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েজ	৭০৪
পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়েব নন	৭০৮
জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি?	৭০৮
নারীর জন্য বাদশাহ হওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কি না	৭০৯
চিঠি পত্রে বিসমিল্লাহ লেখার বিধান	৭১১
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত	৭১৫
কোনো কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ, কি না?	৭১৬
হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি	৭১৭
মুজেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য	৭২১
হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি?	৭২২
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উষ্ট্রীর ঘটনার বিবরণ	৭২৮
হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী	৭২৯

الجزء العشرون : বিংশতিতম পারা
[৭৩১ – ৮৬০]

বিবরণ	পৃষ্ঠা
তাওহীদের প্রমাণ	৭৩৫
অসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয়	৭৩৬
মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা	৭৪৫
সূরা কাসাস	৭৫৬
সূরা কাসাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৭৬১
একটি বিস্ময়কর ঘটনা	৭৬৩
কার্যগত চুক্তির স্বরূপ	৭৭১
কোনো চাকুরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত হলো দু'টি	৭৮১
তিনজন বুদ্ধিমান	৭৮২
হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির ইতিকথা	৭৮২
হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভ	৭৮৭
প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ	৮০০
তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি	৮০৭
মক্কার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন	৮১০
একবস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্বদানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা	৮১৭
ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কারূনের সম্পদ প্রোথিত হওয়া	৮২৫
গুনাহের দৃঢ় সংকল্প গুনাহ	৮২৯
কুরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাছিলের উপায়	৮৩০
সূরা আনকাবূত	**৮৩১**
সূরার নামকরণ	৮৩৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৮৩৫
যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয় সেও পাপী	৮৩৮
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	৮৪৭
আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম	৮৪৮
দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত	৮৫০
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নিয়ামত	৮৫০
আল্লাহর কাছে আলেম কে?	৮৬০

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الحادى والعشرون : একবিংশতম পারা

মানব সংশোধনের সংরক্ষিত ও পূর্ণ ব্যবস্থা ১২
নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও বড় মোজেজা ১৪
হিজরতের বিধিবিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন ১৮
হিজরত কখন ফরজ অথবা ওয়াজিব হয় ১৯
ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে ২৩
সূরা আররূম ২৪
সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী ২৭
পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় ৩০
বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি এর জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতি জরুরি ৩৭
নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ সংসার বিমুখতা নয় এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় ৩৯
ফিৎরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে ৪৪
বাতিলপন্থিদের সংঘর্ষ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরজ ৪৫
দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গুনাহের কারণে আসে ৫১
বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আজাবের মধ্যে পার্থক্য ৫৩
হাশরে আল্লাহ তা'আলার সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? ২৭
সূরা লোকমান ৫৮
এ সূরার নামকরণ ৬২
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৬২
নাফরমানির শাস্তি দুনিয়াতেও হয় ৬৪
ক্রীড়া কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান ৬৫
খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ৬৬
গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান ৬৭
বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় ৬৮
প্রাচীন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মতে হযরত লোকমান কোনো নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন ৭২
হযরত লোকমান (আ.)-কে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? ৭৩
ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি ৭৪
লোকমান হাকীমের আরো কিছু উপদেশ ৭৬
وإذا غشيهم موج كالظلل আয়াতের শানে নুযূল ৮৭
সূরা আস সাজদাহ ৮৯
কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য ৯৪
আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মাউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ ৯৬
মুমিনদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য ১০০
কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বেই ইহকালে হয়ে যায় ১০১
কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক নেতা হওয়ার দুটি শর্ত ১০৪
ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা ১০৫
সূরা আল আহযাব ১০৬
নামকরণ ১১০
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১১১
নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ ১১৬
আহযাব যুদ্ধের বিবরণ ১২২
একটি বিশেষ মোজেজা ১২৪
মুনাফিকদের কটাক্ষপাত ১২৫
হযরত জাবের (রা.)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মোজেজা ১২৬
রাসূল ﷺ -এর একটি যুদ্ধ কৌশল ১২৭
আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মা'আজের দোয়া ১২৮
সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূত্র সমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনা ১২৯
হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর শত্রু সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনা ১৩০
আগামীতে কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার সুসংবাদ ১৩১
বনূ কুরায়জার যুদ্ধ ১৩২
অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দুটি অনন্য ও বিস্ময়কর উদাহরণ ১৩৩

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الثاني والعشرون : বাইশতম পারা

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়েত ১৪২
গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় ১৪৩
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে [জংগে জমল] তার ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীগের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য ১৪৪
আয়াতে আহলে বায়তের মর্ম কি? ১৪৭
কুরআনে পাক সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য ১৫৩
অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য ১৫৪
বিয়ে শাদীতে কুফু বা সমতা রক্ষা করা জরুরি ১৫৫
একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ় তত্ত্ব ১৫৬
আল্লাহর জিকিরে এমন এক ইবাদত যা সর্বাবস্থায় ফরজ এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে ১৬২
ইসলামে সদাচারের নজিরবিহীন শিক্ষা ১৬৬
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসার বিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ ১৭১
দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা ১৭৬
তৃতীয় বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর কারো সাথে তার পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয় ১৭৮
পর্দার বিধানাবলি অশ্লীলতা দমনে ইসলামি ব্যবস্থা ১৭৯
অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান ১৮০
পর্দার হুকুম প্রসঙ্গ ১৮১
গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য ১৮২
দ্বিতীয় স্তর : বোরকার মাধ্যমে পর্দা ১৮৫
দরুদ ও সালামের পদ্ধতি ১৮৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে কোনো প্রকারে কষ্ট দেওয়া কুফরি ১৯৩
কুরআনি বিধানসমূহের সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব ১৯৭
মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের ফরজ ঠিক করে দেয় ১৯৮
আমানত কিরূপে পেশ করা হবে ১৯৯
আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? ২০০
সূরা সাবা ২০২
নামকরণ ২০৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ২০৬
শিল্পজীবি মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ ২১৩
হযরত দাউদ (আ.) -কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্য ২১৪
জিন অধীন করা কিরূপ? ২১৫
মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান ২১৬
হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা ২১৭
সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতরাজি ২২৩
ইবনে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস ২২৪
বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা ২৩১
ধনবল বা জনবল বড় কথা নয় ২৩৬
নৈকট্য ধৈন্য হবার মাধ্যম ২৩৭
পার্থিব ধনসম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলিল মনে করা ধোকা ২৩৮
যে ব্যয় শরিয়তসম্মত নয় তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই ২৪৪
মক্কার কাফেরদের প্রতি দাওয়াত ২৪৮
সূরায়ে ফাতির ২৫২
নামকরণ ২৫৪
আল্লাহর উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ২৫৬
সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে ২৭৭
উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার ২৭৮
উম্মতে মুহাম্মদীর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ২৭৯
সূরা ইয়াসীন ২৯০
নামকরণের কারণ ২৯০
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ২৯০
সূরা সারসংক্ষেপ ২৯১
সূরা ইয়াসীনের ফজিলত ২৯১
ঐতিহাসিক পটভূমি ২৯২
يس শব্দের বিশ্লেষণ ২৯৫
يس দ্বারা কারো নাম রাখা বৈধ কিনা? ২৯৬
অস্বীকারকারীদের জন্য শপথের ফায়দা ২৯৭
শপথের মাধ্যমে রিসালাত সাব্যস্তকরণ পদ্ধতি ২৯৮
আল্লাহর বাণী القول দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ২৯৯
সিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ৩০০
অত্র আয়াতে কাফেরদের পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপনের হিকমত ৩০৫
আয়াতে ডানে ও বামে উল্লেখ না করে তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীরের কথা কেন উল্লেখ করা হলো? ৩০৬
আল্লাহকে না দেখে ভয় করার পদ্ধতি? ৩০৯
আমল লেখার পূর্বে পুনরুত্থানের উল্লেখের কারণ ৩১০
কাফেরদের নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পদ্ধতি ৩১৫
تطير -এর অর্থ ও تطير এবং تفاؤل -এর মধ্যকার পার্থক্য ৩১৯
শহরের সীমান্ত হতে আগত ব্যক্তির ঘটনা ৩২০
নববী দাওয়াত ও সংশোধন পদ্ধতি এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য বিশেষ হেদায়েত ৩২৩
হাবীবে নাজ্জারের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ৩২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

الجزء الثالث والعشرون : তেইশতম পারা

ইবাদতের অর্থ ও আবিদের শ্রেণিবিভাগ ৩২৭
হাবীবে নাজ্জারকে কখন বলা হলো যে, "তুমি বেহেশতে প্রবেশ করো" ... ৩২৮
কিভাবে মৃত্যুর পর উল্লিখিত ব্যক্তি তার জাতির ব্যাপারে কথা বলল ৩২৯
ঐশী বাণী পাঠানোর হিকমত ও বিশেষ ঘটনার সাথে এটা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ ৩৩১
সকল ফলের মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরকে খাস করার কারণ ৩৩৮
চন্দ্র ও সূর্যের মঞ্জিলসমূহের বিবরণ ৩৪২
একদলকে অপরের মাধ্যমে রিজিক দানের হিকমত ৩৪৮
মুসলিমগণ কাফেরদেরকে ব্যয় করতে বলার কারণ ৩৪৯
কিয়ামতের ব্যাপারে কাফেররা প্রশ্ন করল কেন? ৩৫২
দু ফুৎকারের মধ্যবর্তী ব্যবধান ও ফুৎকারের সংখ্যা ৩৫৫
কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর তাদের কবর কোথায় হবে? ৩৫৬
ইবাদত অনুগত্য হওয়া হিসেবে নবী রাসূলগণের জন্য ইবাদত জায়েজ হবে কিনা? ৩৬২
শয়তানের উপাসনার বিভিন্ন ধাপ ৩৬২
হাতের জন্য কথা বলা ও পায়ের জন্য সাক্ষ্য নির্ধারণের হিকমত ৩৬৮
আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ কে কবিতা শিক্ষা না দেওয়ার কারণ ৩৭৪
পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান ৩৮২
সূরা আস-সাফফাত ৩৮৭
নামকরণের কারণ ৩৮৭
পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র ৩৮৭
সূরার বিষয়বস্তু ৩৮৭
নামাজে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব ৩৯১
ফেরেশতাগণের শপথ করার তাৎপর্য ৩৯২
আকাশে ফেরেশতাদের বাক্যালাপ শোনার জন্য যে সকল শয়তানরা চেষ্টা করে তাদের অবস্থাদির বিবরণ ৩৯৮
শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট, তবে তাকে কিভাবে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে? ৪০০
মানুষকে আঠালো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার মর্মার্থ কি? ৪০১
আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হওয়ার নিসবত করা যায় কি-না? ৪০৪
প্রমাণ উপস্থাপনের পর কিয়ামত ও হাশরের প্রসঙ্গে কাফের মুশরিকদের অবস্থা ৪০৫
মোজেজা ও নিদর্শনাদি নিয়ে মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো কেন? ৪০৬
রাসূলে কারীম ﷺ -এর মোজেজার সত্যতা প্রমাণ এবং তা অস্বীকার কারীদের অভিমত খণ্ডন ৪০৭
মূর্তিকে বিনা অপরাধে কিভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? ৪১০
যে সকল কারণে ডান দিককে বাম দিকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় ৪১৩
হাশরের ময়দানে মুশরিক নেতা ও তাদের অনুগামীদের মধ্যকার কথোপকথন ৪১৪
এক জান্নাতি ও তার কাফের সঙ্গী ৪২৩
অসৎ সঙ্গ বর্জনের তাকিদ ৪২৪
যাক্কুমের হাকীকত ৪২৭
জাহান্নামে কিভাবে বৃক্ষ জন্মাবে অথচ অগ্নি বৃক্ষকে জ্বালিয়ে দেয় ৪২৮
জাহান্নামীদের যাক্কুম খাওয়ার কারণ ৪৩১
হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী ৪৩৫
হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির মধ্যে প্রতিমা পূজা অনুপ্রবেশের পদ্ধতি ৪৩৬
হযরত ইবরাহীম (আ.) নক্ষত্রের প্রতি তাকালেন কেন? ৪৪০
শরিয়তে জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্থান ৪৪১
ইসলামি শরিয়তে তাওরিয়ার হুকুম ৪৪৩
স্বপ্ন যোগে কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেন? ৪৫৩
ওহীয়ে গায়রে মাতলূ -এর দলিল ৪৫৫
যবীহ -এর ব্যাপারে মতপার্থক্য এবং অগ্রগণ্য মাযহাব ৪৫৮
হযরত ইলয়াস (আ.)-এর কাহিনী ৪৬৭
হযরত ইউনুস (আ.)-এর দাওয়াত ৪৭৬
রাসূলগণের বিজয়ী হওয়ার অর্থ ৪৯১
সূরা সোয়াদ ৪৯৭
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৫০২
ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর ৫০৪
চাশতের নামাজ ৫১২
স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থি নয় ৫১৫
ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামি রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য ৫১৭
বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক ৫১৮
সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী ৫২৫
রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া ৫২৭
শরিয়তের দৃষ্টিতে কৌশল ৫৩৩
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম ৫৩৪
লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা ৫৪০
সূরা আয-যুমার ৫৪৩
নামকরণ ৫৪৮
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৫৪৮
চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল ৫৫০
হাশরের আদালতে মজলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ৫৬৫

Free @ www.eilm.weebly.com

বিবরণ — পৃষ্ঠা

الجزء الرابع والعشرون : চব্বিশতম পারা

মৃত্যু এবং ঘুমের রূহ কবজ করা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ৫৭৫
আল্লাহ তা'আলার দয়া মায়ার একটি দৃষ্টান্ত ৫৮৬
প্রকৃত বান্দার কর্তব্য ৫৯২
সূরা আল-মুমিন [গাফির]
নামকরণের কারণ ৬০৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র ৬০৩
সূরাটির বিষয়বস্তু ৬০৪
চরিত্র সংশোধনের অত্র সূরার ভূমিকা ৬০৬
তওবা এবং মাগফিরাতের মধ্যকার পার্থক্য ৬১২
কাফের মুশরিকদের তওবার স্বরূপ কি? ৬১৩
দীনের রাহে আহ্বানকারীদের জন্য হেদায়েত ৬১৪
আল কুরআনের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি ধ্বংসের নামান্তর ৬১৬
কাফেররা কিভাবে কুরআনে বিতর্কের উত্থাপন করে? ৬১৭
আহযাব তথা দলসমূহ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে ৬১৯
ফেরেশতাকুল হতে একটি সন্দেহ নিরসন ৬২৩
আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের অবস্থা ৬২৫
ফেরেশতা কি মানুষ হতে উত্তম ৬২৬
জান্নাতিগণের আপনজনদেরকে একত্রিত করা হবে ৬২৯
কিয়ামত দিবসে কাফেরদের নিজেদের উপর ক্রোধ প্রকাশের বিভিন্ন দিক ৬৩৫
জীবন মৃত্যু দু' দুবার হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ৬৩৭
মোলাকাতের দিনের তাৎপর্য ৬৪১
হযরত মূসা (আ.) কে প্রদত্ত মোজেজাসমূহ ৬৫৭
হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউনীয়রা যেসব কষ্ট দিয়েছে ৬৬০
ফেরাউনের বংশের ঈমানদার ব্যক্তিটি কে? ৬৬২
আত্মবিস্মৃতিই ধ্বংসের কারণ হয় ৬৭৬
কবরের আজাব সম্পর্কিত একটি অভিযোগ ও এর জবাব ৬৮৬
মানব জীবনের স্তরসমূহ ৭১১
হামীম কি জাহান্নামের অভ্যন্তরে না বাইরে ৭১৬
কাফেরদের জন্য আজাবের প্রতীক্ষায় থাকা ৭১৯
সূরা ফুসসিলাত [হা-মীম সাজদাহ] ৭২৯
নামকরণ ৭৩১
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৭৩১
কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কিনা? ৭৩৪
নীরবতার সাথে কুরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব হৈ হুল্লোর করা কাফেরদের অভ্যাস ৭৫৫
আজানের ফজিলত ও মাহাত্ম্য ৭৬৫
বর্তমান যুগে কুফর ও ইলহাদের ব্যাপকতা ৭৭০

الجزء الخامس والعشرون : পঁচিশতম পারা

মুমিন ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য ৭৭৭
সূরা শূরা ৭৭৮
সূরার নামকরণ ৭৮১
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৭৮১
নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত ৭৯৬
তওবার স্বরূপ ৭৯৭
দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ ৭৯৮
পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা ৮০৭
ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা ৮০৮
সূরা যুখরুফ ৮১৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৮২০
প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় ৮২১
জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ৮৩২
সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য ৮৩৩
ইসলামি সাম্যের অর্থ ৮৩৪
আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ ৮৩৮
প্রকৃত বন্ধু তা-ই যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয় ৮৪৭
সূরা দুখান ৮৫৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৮৫৯
তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা ৮৬৬
সূরা জাছিয়া ৮৭২
সূরার নামকরণ ৮৭৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৮৭৫
পূর্ববর্তী উম্মতদের শরিয়তের বিধান আমাদের জন্য কি? ৮৮১
পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য ৮৮৩
দাহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় ৮৮৫
কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা ৮৮৯

Free@www.e-ilmweebly.com

الجزء السادس والعشرون : ২৬তম পারা
[৯ – ২২২]

▮ সূরা আহকাফ : ৯
সূরার মূল আলোচ্য বিষয় ১৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ১৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব ১৫
মাতার হক পিতার অপেক্ষা বেশি ২২
গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকহবিদদের মতভেদ ২২
দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী, ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা ২৪
আহকাফের পরিচিতি ২৮
রাসূল ﷺ-এর দরবারে জিনদের উপস্থিতি ৩৬
জিনেরা জান্নাতে যাবে না ৩৭
▮ সূরা কিতাল [মুহাম্মদ] : ৩৯
নামকরণ ৪৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৪৩
সূরার মূল বক্তব্য ৪৩
ইসলামে দাসত্বের আলোচনা ৪৬
জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য ৪৮
মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য ৫৪
আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাগিদ ৬১
▮ সূরা ফাতহ : ৬৯
সূরার নামকরণের কারণ ৬৯
সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল ৬৯
ঐতিহাসিক পটভূমি ৭০
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৭৮
উল্লিখিত আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা হুদায়বিয়ার কাহিনী ৭৯
হুদায়বিয়ার সন্ধি কিরূপে সুস্পষ্ট বিজয় হতে পারে? ৮৩
বিজয় কিভাবে মাগফেরাতের সবব হতে পারে? ৮৫
মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে নাকি সন্ধির মাধ্যমে ৮৬
ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ কি? ৮৮
আয়াতে ঈমানদার মহিলাদের উল্লেখের কারণ ৯১
মুনাফিকদেরকে মুশরিকদের পূর্বে উল্লেখের কারণ ৯৩
বাইয়াতের তাৎপর্য ৯৭
يد الله বা আল্লাহর হাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? ৯৮
আমাদের দেশে প্রচলিত বাইয়াতের স্থান ৯৮
বাইয়াতে রিদওয়ানের ঘটনা ৯৯
মুখাল্লাফূন [পশ্চাদপদ অবলম্বনকারী] কারা? তারা কি ওজর পেশ করেছিল? ১০৩
মুখাল্লাফূনের ওজর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ ১০৩
হুদায়বিয়ায় যারা অংশগ্রহণ করেনি, এখানে তাদের উল্লেখের কারণ ১০৪
উল্লিখিত আয়াতে كلام الله -এর দ্বারা উদ্দেশ্য ১০৮
যে বৃক্ষের নিচে বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১১৪
হুদায়বিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যার ব্যাপারে মতবিরোধ ১১৫
খায়বর কখন বিজিত হয় ১১৬
কাফেরদের সাথে যদি ঈমানদারগণ মিশে থাকে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ হবে কিনা? ১২৪
ওমরাতুল কাযার ঘটনা ১৩০
হজ ও ওমরায় হলক এবং কসরের হুকুম কি? এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? ১৩১
সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি ১৩৫
সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতী : তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা গুনাহ ১৩৮
▮ সূরা হুজুরাত : ১৩৯
সূরার নামকরণের কারণ ১৩৯
সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়কাল ১৩৯
সূরার আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য ১৪০
দীনি নেতা তথা আলেমগণের সাথেও উক্ত আদব জরুরি ১৪৫
নাফরমানি [গুনাহ]-এর দরুন নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায় কি না? ১৪৬
সাহাবায়ে কেরামের উপর অত্র আয়াতের প্রভাব ১৪৭
মুসলিমদের উন্নতি নবী করীম ﷺ -এর মহব্বত ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল ১৫২
ভিত্তিহীন সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা অনেক অকল্যাণের কারণ ১৫৩
খবরের সত্যতা যাচাই কখন জরুরি ১৫৪
কুফর, ফিসক ও ইসয়ানের মধ্যকার পার্থক্য ১৫৫

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ	১৫৮
ভালো উপাধীতে সম্বোধন করা সুন্নত	১৬৪
ধারণার শ্রেণিবিভাগ এবং সেগুলোর হুকুম	১৬৫
ছিদ্রান্বেষণ হতে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	১৬৬
গিবত সম্পর্কীয় বিবিধ মাসআলা	১৬৭
বংশগত, দেশগত, ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য হচ্ছে পারস্পরিক পরিচয়	১৭১
ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক	১৭৪
▮ সূরা ক্বাফ :	১৭৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	১৭৫
সূরার আলোচ্য বিষয়	১৭৫
সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়	১৭৫
ق-এর ব্যাখ্যায় আলেমগণের বিভিন্ন মতামত	১৮০
আসহাবুর রাস কারা	১৮৬
কথাবার্তায় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি	১৯১
ফেরেশতারা কিভাবে মানুষের কাজকর্ম রেকর্ড করেন	১৯২
এখানে সঙ্গী দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে	১৯৭
যেসব অপরাধ মানুষকে জাহান্নামী করে	১৯৬
জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করার অর্থ কি?	২০২
নামাজের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে	২০৫
▮ সূরা যারিয়াত :	২১০
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২১৪
সদকা খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ	২১৭
মেহমানদারীর উত্তম রীতিনীতি	২২২

الجزء السابع والعشرون : ২৭তম পারা

[২২৩ – ৪০০]

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈমানী শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী	২২৮
▮ সূরা তূর :	২৩৬
নামকরণ	২৪০
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২৪০
বায়তুল মামুরের অবস্থান	২৪১
ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে	২৪৩
শপথের তাৎপর্য	২৪৩
মজলিসের কাফফারা	২৫০
▮ সূরা নাজম :	২৫১
সূরার নামকরণের কারণ	২৫১
পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র	২৫১
নাজিল হওয়ার সময়কাল	২৫১
সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি	২৫১
বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	২৫২
والنجم উক্তি দ্বারা শপথ করার রহস্য	২৫৬
তোমাদের নবী বা রাসূল না বলে সাথী বলার কারণ	২৫৭
জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান	২৬৭
মানাত পরিচিতি	২৬৯
ধারণার প্রকার ও তার বিধান	২৬৯
মুশরিকরা কেন ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলিঙ্গে ডাকত	২৭২
মৃত্যুর পর উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা	২৮০
একের গুনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না	২৮৩
ঈসালে ছওয়াব তথা মৃতকে ছওয়াব পৌছানো	২৮৩
▮ সূরা কামার :	২৯২
সূরা কামার প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য	২৯৭
মূল বক্তব্য	২৯৮
চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা	২৯৮
চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজেযা	২৯৯
চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব	৩০০
আদ জাতির ঘটনা	৩০১
লূত সম্প্রদায়ের ঘটনা	৩০৭
প্রিয়নবী ﷺ কে সান্ত্বনা	৩১৩
▮ সূরা রাহমান :	৩১৬
সূরার নামকরণের কারণ	৩১৬
সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	৩১৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩১৬
সূরার মূল বক্তব্য	৩১৭
বিজ্ঞান ও আল্লাহর বিধানের মধ্যে পার্থক্য	৩২৩
কুরআন মাজীদে মানুষ সৃষ্টির উপাদান	৩২৭
মানুষকে মাটির দিকে এবং জিনকে আগুনের দিকে সম্বোধন করা হলো কেন?	৩২৭
জিন ও মানুষকে ثقلين বলার কারণ	৩৩২
প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত জান্নাতদ্বয়ের অধিকারী কারা?	৩৩৯
পরকালীন উদ্যান দুনিয়ার উদ্যান হতে ভিন্নতর	৩৪০

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
নারীদের সৌন্দর্যের পূর্বে তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য	৩৪১
জান্নাতী নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনাকারী হাদীসসমূহের কয়েকটি	৩৪৪
পরবর্তী জান্নাতদ্বয়ের গুণাগুণ	৩৪৬
আয়াতে হুবদের বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ	৩৪৬
▮ সূরা ওয়াকি'আ :	৩৪৮
নামকরণ	৩৫২
মূল বক্তব্য	৩৫২
সূরা ওয়াকি'আর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব	৩৫৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৫৩
হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে	৩৫৪
▮ সূরা হাদীদ :	৩৭২
নামকরণ	৩৭৫
মূল বক্তব্য	৩৭৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৭৬
শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার	৩৭৬
মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্য	৩৭৮
সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস	৩৭৯
আল্লাহর রাহে দান করার মাহাত্ম্য	৩৮৪
হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে	৩৮৫
প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ?	৩৮৭
ঐশী কিতাব ও পয়গাম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা	৩৯৩
সন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ	৩৯৯

الجزء الثامن والعشرون : ২৮তম পারা
[৪০১ – ৬২৮]

বিষয়	পৃষ্ঠা
▮ সূরা আল-মুজাদালাহ :	৪০১
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪০১
অবতীর্ণের সময়কাল	৪০১
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৪০১
হযরত খাওলা (রা)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা)-এর ব্যবহার	৪০৪
যিহার কি তালাকের ন্যায় বৈধ, না হারাম?	৪০৭
ইসলামে যিহারের হুকুম	৪০৮
যিহার করার ফলে কি কি হারাম হয়?	৪০৯
কাফফারা আদায় করার পূর্বে স্পর্শ করলে কাফফারা কি বৃদ্ধি পাবে?	৪১০
কোন কার্য দ্বারা যিহার ভঙ্গ হবে?	৪১১
নেশাগ্রস্ত লোকের যিহার বর্তিত হবে কি?	৪১২
আয়াতে মজলিস দ্বারা কি উদ্দেশ্য	৪২২
কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিজয়ী হবেন	৪৩১
প্রথমে পিতা, তারপর পুত্র, তারপর ভ্রাতা অতঃপর গোত্র দ্বারা আরম্ভ করার কারণ	৪৩২
▮ সূরা আল-হাশর :	৪৩৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৩৩
সূরা নাজিল হওয়ার সময়কাল	৪৩৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৪৩৩
সূরাটির বিষয়বস্তু	৪৩৪
ঐতিহাসিক পটভূমি	৪৩৬
বনূ নাযীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৪৩৮
হাশর মোট কয়বার হয়েছিল?	৪৩৯
হাশরের ময়দান কোথায় হবে?	৪৩৯
এ আয়াত কিয়াস হুজ্জত হওয়ার কারণ	৪৪১
কয়টি গাছ কাটা হয়েছিল	৪৪৪
গনিমত ও ফাই-এর মধ্যে পার্থক্য	৪৪৬
হকদারদের সাথে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করার তাৎপর্য	৪৫০
আত্মীয়-স্বজনদের অংশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত	৪৫১
শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালামাল সম্বন্ধে আলোচনা	৪৫২
এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা	৪৫৯
মুসলমানদের সম্পদের উপর কাফেরগণের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা	৪৬০
কিয়ামত দিবসকে الغد নামকরণের কারণ	৪৬৯
আল্লাহকে এমন নামে ডাকা জায়েজ হবে কি না যা তিনি ও তার রাসূল বলেননি	৪৭৬
▮ সূরা আল-মুমতাহিনাহ :	৪৭৭
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৭৭
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৪৭৭
সূরাটির বিষয়বস্তু	৪৭৭
সূরাটির শানে নুযূল	৪৭৮
কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের হুকুম	৪৮১
হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতার জন্য দোয়া করার কারণ	৪৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুমিনগণ কাফেরদের জন্য কিভাবে ফেতনার কারণ হবে?	৪৮৮
মুশরিক ও কাফেরদের হাদিয়া গ্রহণের হুকুম	৪৯১
হোদায়বিয়ার ঘটনা	৪৯৩
মহিলারাও পুরুষদের সাথে সন্ধিচুক্তির শর্তের মধ্যে শামিল কি না?	৪৯৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ মুমিন মুহাজির মহিলাদের কিভাবে পরীক্ষা করতেন?	৪৯৫
মুসলিম রমণী কি মুরতাদ হয়েছে, আর তারা কতজন?	৪৯৯
বাইয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি	৫০২
▮ সূরা আস-সাফ :	**৫০৫**
সূরাটির নামকরণের কারণ	৫০৫
সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	৫০৫
সূরাটির বিষয়বস্তু	৫০৫
বনী ইসরাঈল কিভাবে হযরত মূসা (আ)-কে কষ্ট দান করত?	৫০৯
আয়াতে আল্লাহর নূরের অর্থ	৫১৬
ঈমানদার লোকদের ঈমান আনার নির্দেশ দানের হেতু কি?	৫২০
তাশবীহ দানের জন্য হযরত ঈসা (আ)-এর কথা কেন উল্লেখ করা হলো?	৫২৩
▮ সূরা আল-জুমুআহ :	**৫২৪**
সূরাটির নামকরণের কারণ	৫২৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৫২৪
অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	৫২৪
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৫২৫
রাসূল ﷺ কে উম্মীরূপে প্রেরণ করার হিকমত	৫২৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতার দলিল	৫২৯
অন্যান্য প্রাণীদের বাদ দিয়ে গর্দভকে নির্দিষ্ট করার হিকমত	৫৩৩
মৃত্যু কামনার হুকুম	৫৩৫
জুমার নামাজ কখন ফরজ হয়?	৫৩৮
যিকরুল্লাহ বলতে কোন যিকির উদ্দেশ্য	৫৩৯
জুমা ও জোহরের নামাজের মধ্যে পার্থক্য	৫৪২
দোয়া কবুলের বিশেষ সময়	৫৪৩
▮ সূরা আল মুনাফিকূন :	**৫৪৪**
সূরাটির নামকরণের কারণ	৫৪৪
সূরাটির বিষয়বস্তু	৫৪৪
সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা	৫৪৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৫৪৬
মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডকে নিকৃষ্ট বলার কারণ	৫৫০
মুনাফিকদেরকে هداية হতে বঞ্চিত রাখার কারণ	৫৫৪
অন্যান্য বস্তু বাদ দিয়ে ধনসম্পদ আর সন্তানাদির আলোচনার কারণ	৫৫৭
▮ সূরা আত্-তাগাবুন :	**৫৫৯**
সূরাটির নামকরণের কারণ	৫৫৯
সূরাটির অবতীর্ণ কাল	৫৫৯
সূরাটির বিষয়বস্তু	৫৫৯
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৫৫৯
মানুষদেরকে সৃষ্টি করার উপর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি	৫৬১
নবুয়ত ও বাশারিয়্যতে মধ্যে পার্থক্য	৫৬৫
মানুষদের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি মহা ফিতনা স্বরূপ	৫৭৩
সূরা আত্-তালাক :	**৫৭৭**
সূরাটির নামকরণের কারণ	৫৭৭
সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	৫৭৭
সূরাটির বিষয়বস্তু	৫৭৭
পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র	৫৭৭
সুন্নতের পরিপন্থি তালাক কি পতিত হয়	৫৮০
ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা কি নিজ প্রয়োজনে বাড়ি হতে বের হতে পারে?	৫৮১
রাজয়াত এবং বিচ্ছিন্নকরণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বানানোর হুকুম	৫৮৫
তাওয়াক্কুল-এর অর্থ	৫৮৬
কোন সময় থেকে ইদ্দত পালন করবে?	৫৮৯
মৃত্যুর ইদ্দতের সাথে গর্ভবর্তী থাকলে হুকুম	৫৯০
নফকাহ-এর অর্থ এবং তার হুকুম	৫৯৫
▮ সূরা আত-তাহরীম :	**৬০৩**
সূরাটির নামকরণের কারণ	৬০৩
সূরাটির শানে নুযূল	৬০৩
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৬০৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৬০৪
তওবায়ে নাসূহা-এর সংজ্ঞা	৬২৩
চারজন মহিলার পরিপূর্ণতা	৬২৮

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الجزء التاسع والعشرون : ২৯তম পারা

[৯ – ২৫২]

▮ **সূরা আল মূলক**	৯
সূরাটির নামকরণের কারণ	৯
সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল।	৯
সূরাটির ফজিলত।	৯
সূরাটির বিষয়বস্তু	৯
সূরা তাহরীমের সাথে সূরা মুলকের যোগসূত্র	১০
জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি তত্ত্ব	১২
হায়াত ও মউতের অবস্থান বিভিন্নতর	১২
মৃত্যু হওয়া সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের মতামত	১৩
কি বস্তু দ্বারা সাত আসমান তৈরি করা হয়েছে	১৫
তারকাগুলোকে مصابيح -এর সাথে তাশবীহ দান ও তারকারাজি দ্বারা আসমানকে সুশোভিত করার হেকমত	১৭
কুফরের তাৎপর্য	২১
আজাবের কয়েকটি বিশেষণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা	২০
এটা একটি উপদেশ ও সতর্কবাণী স্বরূপ	২৪
الاكل বলার পর النشور বলার কারণ	২৭
আল্লাহর অবস্থান	২৮
ঈমান থেকে কাফেরদের বিরত থাকার কারণ এবং তা খণ্ডনের পদ্ধতি	৩১
▮ **সূরা আল ক্বালাম**	৩৬
সূরাটির নাম করণের কারণ	৩৬
বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৩৬
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৬
কলম ও ما يسطرون -এর নামে শপথ করার কারণ	৩৯
কাফেরদের উক্তির খণ্ডন	৪০
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর خلق عظيم সম্পর্কে আলোচনা	৪০
বাগানের ঘটনা	৪৭
বিভ্রান্তির দশা অপসারিত	৫০
তওবার প্রতিদান	৫১
মধ্যম ব্যক্তি কি করে উত্তম হতে পারে	৫১
ধ্বংসের অজ্ঞাত শপথ	৫৯
আল্লাহর আনুগত্যের উপর বিনিময় চাওয়া জায়েজ হবে কি?	৬০
সাহেবে হুতের ঘটনা	৬২
হযরত ইউনুস (আ.) গুনাহ করেছেন কি না?	৬৩
▮ **সূরা আল হাক্কাহ**	৬৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	৬৫
নাজিল হওয়ার সময়কাল	৬৫
বিষয়বস্তু ও সারকথা	৬৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৬৬
অন্যান্য মিথ্যারোপকারীদের কথা উল্লেখ না করে ছামূদ ও আদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করার কারণ	৬৮
আদ জাতিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহের সাথে উপমা দেওয়ার কারণ	৭০
مؤتفكات বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?	৭২
শিঙ্গায় ফুকদানকারী কে হবেন?	৭৪
আকাশের পার্শ্বদেশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের আকৃতির বর্ণনা	৭৫
গুনাহগারদেরকে শিকল দ্বারা বাধার কারণ	৮০
কসম নেওয়ার কারণ	৮৩
গণক বা কাহিন কাকে বলে?	৮৪
▮ **সূরা আল-মা'আরিজ**	৮৮
সূরাটির নামকরণের কারণ	৮৮
নাজিল হওয়ার সময়কাল	৮৮
শাস্তি প্রার্থনাকারী	৯০
শাস্তির দিনের পরিমাণ	৯১
একহাজার বছর এবং পঞ্চাশ হাজার বছর -এর সামঞ্জস্য বিধান	৯২
পাহাড়কে পশমের সাথে তুলনা করার কারণ	৯৪
জাহান্নামের ডাক	৯৫
জাহান্নামের ডাকার পদ্ধতি	৯৫
নামাজ সর্বদা কায়েম করা ও সংরক্ষণ করার তাৎপর্য	১০০
কাফেরগণ রাসূলের দরবারে দৌড়ে আসার কারণ	১০১
মানব সৃষ্টির তাৎপর্য এবং জান্নাতে প্রবেশের মাপকাঠি	১০১
▮ **সূরা নূহ**	১০৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	১০৫
অবতীর্ণের সময়কাল	১০৫
বিষয়বস্তু ও সারমর্ম	১০৫
সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা	১০৭
হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন? কওমে নূহ কারা	১০৮

Free @ www.e-ilm.we

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত নূহ (আ.)-এর আনুগত্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ	১০৯
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দাওয়াত পেশ করার হেকমত	১১৩
হযরত হাসান বসরী (রা.)-এর ঘটনা	১১৪
নূর ও সিরাজ -এর মধ্যকার পার্থক্য	১১৫
কোন আকাশে চন্দ্র ও সূর্য অবস্থিত রয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ কি?	১১৬
মানব সৃষ্টিকে উদ্ভিদ সৃষ্টির সাথে তুলনা করার কারণ	১১৬
হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নাফরমানি কি ছিল?	১১৮
মানুষের মাঝে মূর্তি পূজার প্রচলন কিভাবে শুরু হয়?	১১৮
উদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসর এর তাফসীর	১১৯
■ সূরা আল-জিন	**১১২**
সূরাটির নামকরণের কারণ	১২২
অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	১২২
বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	১২২
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১২৩
জিন এর পরিচয়	১২৫
রাসূল ﷺ কি জিনদের দেখেছিলেন না দেখেননি?	১২৫
ঈমানদার জিনদের জান্নাতের প্রবেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য	১২৫
একজন জিন সাহাবীর ঘটনা	১২৮
শয়তানগণ কোন আকাশে বসত অথচ সকল আসমান রক্ষিবাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল	১৩২
যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা অমান্য করলেই কি চিরদিন জাহান্নামে জ্বলবে	১৩৯
■ সূরা আল-মুযযাম্মিল	**১৪৩**
সূরাটির নাম করণের কারণ	১৪৩
অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল	১৪৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১৪৪
সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ	১৪৬
কিয়ামুল লাইল কি রাসূল ﷺ-এর উপর ফরজ ছিল?	১৪৭
কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারতীল ওয়াজিব না সুন্নত?	১৪৯
গান করে এবং লাহান করে কুরআন পড়া সম্বন্ধে ফিকহবিদের মাযহাব	১৪৯
তাহাজ্জুদের নামাজের হুকুম দেওয়ার কারণ	১৫১
বিশেষত হযরত মূসা (আ.) এবং ফেরাউনের উল্লেখ করার কারণ	১৫৮
তাহাজ্জুদ -এর হুকুম প্রদানের হেকমত	১৬২
তাহাজ্জুদের فرضيت রহিত করার মধ্যে হেকমত	১৬৫
■ সূরা আল-মুদ্দাছছির	**১৬৬**
সূরাটির নামকরণের কারণ	১৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতীর্ণের সময়কাল	১৬৬
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	১৬৬
অত্র সূরার শানে নুযূল	১৬৮
দাঈদের পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দান	১৭১
রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ধৈর্যধারণ করতে বলার কারণ	১৭২
আবূ জাহল এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ -এর মাঝে কথোপকথন	১৭৪
জাহান্নামের কর্মচারী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখের কারণ	১৮৩
সকাল বেলা, রাত্রি ও চন্দ্রের শপথ করার কারণ	১৮৮
شفاعة অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ	১৯০
সত্যকে শ্রবণ করা হতে পলায়ন করার কারণ	১৯২
■ সূরা আল কিয়ামাহ	**১৯৫**
সূরাটির নামকরণের কারণ	১৯৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১৯৫
আয়াতকে শপথের সাথে নেওয়ার হেকমত	১৯৮
কিয়ামত ও পরকালে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণ	১৯৯
ওহীকে গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়া করার কারণ	২০৫
কিয়ামত দিবসে আল্লাহকে দেখার প্রমাণ	২০৬
নামাজের গুরুত্ব এবং তা ঈমানের দাবি হওয়া	২০৯
■ সূরা আল-ইনসান/আদ্দাহর	**২১৩**
সূরাটির নামকরণের কারণ	২১৩
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	২১৩
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২১৪
মানুষের কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা	২১৮
ইসলামের দৃষ্টিকে ধৈর্যের তাৎপর্য	২২৪
জান্নাতে সূর্য থাকবে না কিভাবে ছায়া পাওয়া যাবে?	২২৭
বালকসমূহের মণি-মুক্তার সাথে তুলনা করার কারণ	২২৯
শারাবান তাহূরান -এর তাৎপর্য	২৩০
■ সূরা আল-মুরসালাত	**২৩৫**
সূরাটির নামকরণের কারণ	২৩৫
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২৩৫
সূরায় যেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে তা অস্পষ্ট রাখার কারণ	২৩৮
এটাতো হবে দুনিয়াতে আর পরকালে?	২৪৩
ভূ-পৃষ্ঠের উপর পাহাড়সমূহকে উঁচু উঁচু করে স্থাপনের কারণ ও হিকমত	২৪৪
জাহান্নামের ধোয়া তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়ার কারণ	২৪৬
ওজর পেশ করতে না দেওয়া ইনসাফের খেলাফ	২৪৯

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
الجزء الثلاثون : ৩০তম পারা [২৫৩ – ৬৩৬]	
▮ সূরা আন নাবা	২৫৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	২৫৩
সূরাটির মূল কথা ও আলোচ্য বিষয়	২৫৩
সূরা আল মুরসালাতের সাথে সূরা আন নাবার যোগসূত্র	২৫৫
কিয়ামতের ব্যাপারে কারা মতবিরোধ করত?	২৫৭
পাহাড় কখন সৃষ্টি করা হয়েছে	২৬১
ঘুমের জন্য سبات এবং দিনের জন্য معاش উল্লেখ করার কারণ	২৬৩
সূর্য সৃষ্টির রহস্য	২৭৪
শিঙ্গায় ফুঁকের সংখ্যা	২৬৮
কিয়ামত কখন এবং কোথায় সংঘটিত হবে	২৬৯
পূর্ণ আকাশ দরজাময় হয়ে যাওয়ার কারণ	২৭০
পুলসিরাতের স্বরূপ	২৭৫
জান্নাতবাসী জাহান্নাম অতিক্রম করার কারণ	২৭৫
শুধু হিসাবকে উল্লেখ করার কারণ	২৭৯
কিভাবে একই বস্তুকে প্রতিফল এবং পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত করা হলো	২৮৪
روح -এর অর্থ নিয়ে মতভেদ	২৮৭
▮ সূরা আন - নাযিআত	২৯৩
ফেরেশতাদেরকে ناشطات -এর সাথে তুলনা করার কারণ	২৯৪
আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত ফেরেশতাগণের শপথ কেন করেছেন?	২৯৬
হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা কি?	৩০৪
পথ প্রদর্শক ছাড়া আল্লাহকে চিনার উপায় আছে কি?	৩০৫
হযরত মূসা (আ.) কিভাবে পিছিয়ে গেলেন এবং কি চেষ্টা করলেন?	৩০৭
ফেরাউনের ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয়	৩০৯
কিয়ামতের যৌক্তিকতা	৩১১
রাত্রকে আকাশের দিকে সম্বোধন করার কারণ	৩১২
পাহাড় স্থাপন ও পানি এবং গাছপালা সৃষ্টির অর্থ ও রহস্য	৩১৩
হাশরের ময়দানের অবস্থা	৩১৭
আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখার গুরুত্ব	৩১৯
তাদের সকাল-সন্ধ্যা উল্লেখের কারণ	৩২০
▮ সূরা আবাসা	৩২১
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩২১
নাজিল হওয়ার সময়কাল	৩২১
ঐতিহাসিক পটভূমি ও সূরাটির বিষয়বস্তু	৩২১
পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র	৩২২
ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) কিসের ভয় করতেন?	৩২৭
কুরআন নিজেই সম্মানিত	৩৩০
মানুষের তিনটি ধাপ	৩৩৩
পানি বর্ষণের প্রতি লক্ষ্য করার কারণ	৩৩৭
এখানে আটটি বস্তুর উল্লেখের উদ্দেশ্য কি?	৩৩৯
নির্দিষ্ট কয়েকজনের কথা উল্লেখের কারণ	৩৪২
▮ সূরা আত্‌তাকভীর	৩৪৪
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩৪৪
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	৩৪৪
عشار -এর অর্থ এবং এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৪৮
কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিতকরণের ঐতিহাসিক তথ্য	৩৫২
সন্তান হত্যার বিধান	৩৫২
হাশরে দোজখের উত্তপ্ততা এবং বেহেশতের নৈকট্য দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	৩৫৩
কুরআনকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বাণী বলার কারণ	৩৫৭
হযরত জিবরাঈল (আ.) শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ	৩৫৮
গায়েব বিষয়ে কার্পণ্য কেন করেননি?	৩৬১
▮ সূরা আল ইনফিতার	৩৬৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩৬৩
আকাশ বিদীর্ণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৬৫
মানুষ যখন তার কৃতকর্ম জানতে পারবে	৩৬৬
কে কেন এবং কিভাবে ধোকা দেয়	৩৬৮
মানুষের দেহে আল্লাহর আশ্চর্যজনক কুদরত	৩৬৯
কাফেরদের সাথে সংরক্ষক আছে কি না?	৩৭১
আমল লিপিবদ্ধ করার হিকমত	৩৭২
সূরা আল মুতাফফিফীন	৩৭৬
সূরাটির নামকরণ	৩৭৬
সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য	৩৭৬
কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা	৩৮০
কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহকে দেখতে পাবে কিনা?	৩৮৪
তাসনীম দ্বারা উদ্দেশ্য	৩৮৮
পরকালে কাফেরদেরকে উপহাস করবে	৩৯০
▮ সূরা আল ইনশিকাক	৩৯২
সূরাটির নামকরণের কারণ	৩৯২
সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলকথা	৩৯২
আকাশ তার প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করার অর্থ কি?	৩৯৪
সহজ ও কঠোর হিসাবের পর্যালোচনা	৩৯৮
কাফেরদের আমলনামা কিভাবে দেওয়া হবে?	৩৯৯
তারা কেন অস্বীকার করত?	৪০৪

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
▮ সূরা আল বুরূজ	৪০৫
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৯৫
সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য	৪০৫
আকাশকে ذات البروج বলা হয়েছে কেন?	৪০৮
প্রতিশ্রুতি দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য	৪০৮
আসহাবে উখদূদের ঘটনা	৪০৯
আসহাবে উখদূদ মুমিনগণকে কেন আজাব দিয়েছিল?	৪১৪
ফেরাউন ও ছামূদের উল্লেখ করার হেতু কি?	৪১৮
لوح কোথায় অবস্থিত?	৪২০
▮ সূরা আত্ তারিক	৪২১
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪২১
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৪২১
বর্তমান সূরার সাথে পূর্বের সূরার যোগসূত্র	৪২৩
নারী পুরুষ উভয়ের থেকে বীর্য গ্রহণ করার কারণ	৪২৬
কেন এবং কিভাবে ষড়যন্ত্র করেছেন?	৪৩০
সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী আল কুরআন	৪৩১
▮ সূরা আল আ'লা	৪৩২
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৩২
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	৪৩২
ভারসাম্য রক্ষা করার তাৎপর্য	৪৩৫
মহা অগ্নি দ্বারা উদ্দেশ্য	৪৪০
দুনিয়া থেকে পরকাল উত্তম হওয়ার কারণ	৪৪২
▮ সূরা আল গাশিয়াহ	৪৪৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৪৩
সূরার বিষয়বস্তু ও মূলকথা	৪৪৩
কিয়ামতকে غاشية বলা হয়েছে কেন?	৪৪৫
অগ্নিতে [জাহান্নামে] কিভাবে ঘাস জন্মিবে?	৪৪৬
বিশেষভাবে উষ্ট্রকে উল্লেখ করার কারণ	৪৫০
▮ সূরা আল ফাজর	৪৫৩
সূরাটির নামকরণের কারণ	৪৫৩
সূরার আলোচ্য বিষয়	৪৫৩
জোর-বেজোড়ের তাৎপর্য	৪৫৫
আদ জাতির ঘটনা	৪৫৭
ছামূদ জাতির ঘটনা	৪৫৮
ফেরাউন যেসব মহিলাকে পেরেক দ্বারা শাস্তি প্রদান করেছিল?	৪৬০
রিজিকের প্রশস্ততা ও সীমাবদ্ধতাকে পরীক্ষা বলার কারণ	৪৬৩
এতিমকে সম্মান না দেওয়ার অর্থ	৪৬৪
নফসের শ্রেণি বিভাগ	৪৬৮
▮ সূরা আল-বালাদ	৪৬৯
সূরাটির নাম করণের কারণ	৪৬৯
সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা	৪৬৯
দাসমুক্ত করা উত্তম না সদকা করা উত্তম	৪৭৭
▮ সূরা আশ্-শামস	৪৭৯
সূরাটির নাম করণের কারণ	৪৭৯
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল কথা	৪৭৯
এখানে ছামূদ সম্প্রদায়ের উল্লেখের তাৎপর্য	৪৮৪
কে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছে	৪৮৫
▮ সূরা আল-লাইল	৪৮৬
সূরাটির নাম করণের কারণ	৪৮৬
সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য	৪৮৬
হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য	৪৯৪
▮ সূরা আদ্ব -দুহা	৪৯৫
▮ সূরা আলাম নাশরাহ	৫০৪
▮ সূরা আত্ব-তীন	৫১০
▮ সূরা আল আলাক	৫১৬
▮ সূরা আল ক্বদর	৫২৭
▮ সূরা আল - বাইয়্যিনাহ	৫৩৩
▮ সূরা আয্-যিলযাল	৫৪১
▮ সূরা আল-আদিয়াত	৫৪৬
▮ সূরা আল-ক্বারিয়াহ	৫৫২
▮ সূরা আত-তাকাছুর	৫৫৬
▮ সূরা আল আসর	৫৬১
▮ সূরা আল হুমাযাহ	৫৬৫
▮ সূরা আল-ফীল	৫৭০
▮ সূরা আল-কুরাইশ	৫৭৭
▮ সূরা আল-মাউন	৫৮৩
▮ সূরা আল-কাউছার	৫৮৯
▮ সূরা আল-কাফিরূন	৫৯৪
▮ সূরা আন-নাসর	৫৯৯
▮ সূরা আল-লাহাব	৬০৪
▮ সূরা আল -ইখলাস	৬১০
▮ সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস	৬১৬
▮ সূরা আল-ফাতিহা	৬২৭

অনুবাদকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ـ

হেরা থেকে বিচ্ছুরিত বিশ্বব্যাপী আলোকজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা আল-কুরআন। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। এর অনুপম বিধান সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। বিশ্ব মানবতার এক চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য সংবিধান আল-কুরআন। যে মহাগ্রন্থের আবির্ভাবে রহিত হয়ে গেছে পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থ। যার অধ্যয়ন, অনুধাবন এবং বাস্তবায়নের মাঝে রয়েছে গোটা মানবজাতির কল্যাণ এবং সার্বিক সফলতার নিদর্শন। মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক সকল দিক ও বিভাগের পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণ আলোচনার একমাত্র আধার হচ্ছে আল-কুরআন।

ইসলামি মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যার সফল ও সার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে বিশ্ববরেণ্য নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে। নবুয়তের তেইশ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর উপর অবতীর্ণ হয় এ মহান ঐশীগ্রন্থ। ফলে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের বাস্তব নমুনা।

তাঁর পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাই ছিল কুরআন তাফসীরের অন্যতম অবলম্বন। তাঁদের পরবর্তী স্তরে তাবেয়ীগণ কর্তৃক প্রণীত ব্যাখ্যা ছিল গ্রহণযোগ্যতার শীর্ষে। এর পরে ক্রমান্বয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে অদ্যাবধি এ শাশ্বত গ্রন্থের তাফসীর চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত 'তাফসীরে জালালাইন' গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায়, যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায় সেখানে। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য তাফসীরে জালালাইন-এর একটি নাতিদীর্ঘ বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে উপলব্ধি করছিলেন সচেতন পাঠক সমাজ। তাই যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশে এ কিতাব খানার বঙ্গানুবাদ এখন সময়ের দাবি। সারা দেশের পাঠকবর্গের চাহিদা মিটাতে ইসলামিয়া কুতবখানা, ঢাকা-এর শিক্ষানুরাগী স্বনামধন্য স্বত্বাধিকারী আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাহেব [দা.বা.] জালালাইন শরীফের একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে 'পনের পারার সূরা কাহফ থেকে বিশ পারার শেষ পর্যন্ত' [৪র্থ খণ্ডটির] অনুবাদ কর্ম সম্পাদন করার জন্য মনোনীত করেন। আমি এটাকে মহাগনিমত মনে করে নিজের পরকালীন জখীরা হিসেবে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ৪র্থ খণ্ডের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হই।

আমি মূল কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের সাথে মিল রেখেই অনুবাদ করেছি এবং তাহকীক ও তারকীবের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উর্দু ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইনের অনুকরণ করি। প্রাসঙ্গিক আলোচনার ক্ষেত্রে মা'আরিফুল কুরআন [মুফতি শফী (র.)], মা'আরিফুল কুরআন [আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে মাযহারী সহ বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছি। তবে বাংলাদেশের খ্যাতিমান পুরুষ, বিদগ্ধ আলেম ও গবেষক মরহুম আল্লামা আমীনুল ইসলাম (র.) রচিত তাফসীরে নূরুল কুরআন আমার বড় বড় তাফসীরের কিতাব অধ্যয়নকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এতে প্রায় সকল তাফসীরের সারনির্যাস উল্লেখ করা হয়েছে। আমি সেখান থেকেও সিংহভাগ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিরোনামের বেশ কিছু তত্ত্ব কামালাইন থেকেও চয়ন করেছি। সর্বোপরি কুরআনের তাফসীরে অংশগ্রহণ খুবই দুঃসাহসিক ব্যাপার। কারণ এতে যেমনি পুণ্যের নিশ্চয়তা রয়েছে তেমনি পদস্খলনেরও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; কাজেই আমার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও লা-ইলমির কারণে যদি কোনো পদস্খলন ঘটেই যায় তবে সুধী পাঠক ও ওলামা হযরতের কাছে তা শুধরে দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

পরিশেষে দরবারে ইলাহীতে মিনতি জানাই আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকসহ সকলের পরকালীন নাজাতের জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আমীন, ছুম্মা আমীন!

বিনয়াবনত

মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

লেখক ও সম্পাদক

ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

http://islamiboi.wordpress.com

উপক্রমণিকা

الحمد لاهله والصلاة لاهلها اما بعد

পবিত্র কুরআনের তাফসীর জানার ক্ষেত্রে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রণীত তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থটি একটি প্রাথমিক ও পূর্ণাঙ্গ বাহন। রচনাকাল থেকেই সকল ধারার মাদরাসা ও কুরআন গবেষণাকেন্দ্রে এ মূল্যবান তাফসীরটি সমভাবে সমাদৃত। কারণ বাহ্যিক বিচারে এটি অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর হলেও গভীর দৃষ্টিতে এটি সকল তাফসীরের সারনির্যাস। হাজার হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী রচিত কোনো তাফসীর গ্রন্থের অনেক পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করে অতি কষ্টে যে তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়, তাফসীরে জালালাইনের আয়াতের ফাঁকে ফাঁকে স্থান পাওয়া এক-দুই শব্দেই তা মিলে যায় যেন মহাসমুদ্রকে ক্ষুদ্র পেয়ালায় ভরে দেওয়া হয়েছে। একাধিক সম্ভাবনাময় ব্যাখ্যার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাটি কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই অনায়াসে পাওয়া যায়। তাফসীর গ্রন্থসমূহের ব্যাপক অধ্যয়ন করলে এ সত্যটি সহজে অনুধাবন করা যাবে।

ছাত্রজীবন থেকেই তাফসীরে জালালাইনের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগের খ্যাতিমান উস্তাদ, মুহাক্কিক আলেম মাওলানা আহমদ মায়মূন সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনায় জালালাইনের সর্ববৃহৎ আরবি শরাহ আল্লামা সুলাইমান জামাল প্রণীত الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية ওরফে 'হাশিয়াতুল জামাল' মুতালার সুযোগ হয়েছিল। একটু আধটু যাই বুঝেছিলাম তাতে এ অনুভূতি হয়েছিল যে, উর্দু কামালাইন আর আরবি হাশিয়াতুল জামাল কিছুতেই একটি অপরটির বিকল্প হতে পারে না। দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। কিতাব 'হল' করতে হলে হাশিয়াতুল জামালের কোনো তুলনা হয় না। ফারাগাতের কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে বাংলাদেশের প্রাচীনতম দীনি শিক্ষাকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মাদরাসা দেওভোগে দরসী খেদমতের সুযোগ হয়। প্রথম বছরই আমার দায়িত্বে আসে সেই প্রিয় কিতাব তাফসীরে জালালাইনের প্রথম খণ্ড। আরবি-উর্দু শরাহ ও নানা তাফসীর গ্রন্থের সাহায্যে এক বছর যথাসম্ভব শ্রম দিয়ে পড়ালাম। পরের বছর চিন্তায় এলো সহায়ক গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তগুলো যদি সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করে রাখা যায় তাহলে ভবিষ্যতে মুতালা করতে সহজ হবে। এ চিন্তা থেকেই প্রথমে উলূমুল কুরআন তথা কুরআন ও তাফসীর সংক্রান্ত একটি ভূমিকা তৈরি করি, যা 'মুকাদ্দামায়ে জালালাইন' নামে ভিন্নভাবে ছাপা হয়েছে। তারপর মূল কিতাবের ব্যাখ্যা ও তাকরীর লিখতে শুরু করি। হাশিয়াতুল জামাল, হাশিয়াতুস সাবী, কামালাইন, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন [–মুফতী শফী (র.)] ও মা'আরিফুল কুরআন –[আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)] ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ ধারাবাহিক অধ্যয়নের মাধ্যমে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে অল্প বিস্তর করে লেখা চলতে থাকল। কিছুদিন পর বাজারে এলো আরেকটি উর্দু শরাহ জামালাইন। তাও সংগ্রহ করলাম। যেহেতু কোনো একটি উর্দু শরাহ অনুবাদ করে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার ছিল না, তাই সবগুলো শরাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে যে কথা ও বিশ্লেষণগুলো যথার্থ পরিচ্ছন্ন ও ছাত্রদের জন্য উপযোগী এবং জরুরি মনে হয়েছে, সেগুলোই কেবল সযত্নে সহজে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এভাবে দীর্ঘ তিন বছরে তিলে তিলে সম্পন্ন হয় প্রথম তিন পারার ব্যাখ্যা।

http://islamiboi.wordpress.com

এ বিষয়ে বাংলাবাজারস্থ স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী মাওলানা মোস্তফা সাহেবের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর জানতে পারলাম যে, তিনি একাধিক লেখকের যৌথ প্রয়াসে তাফসীরুল জালালাইনের বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাপার উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছেন।

ইতোমধ্যে তাঁর উদ্যোগে ঢাকাস্থ বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী [দা. বা.] প্রথম পারার এবং দারুল উলূম পাটলি মাদরাসা, সুনামগঞ্জ -এর মুহাদ্দিস, মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী [দা. বা.] চতুর্থ পারা ও পঞ্চম পারার অর্ধাংশের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। এদিকে আমি প্রথম তিন পারার পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলাম। আর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা হচ্ছে প্রথম পাঁচ পারা একত্রে এক ভলিয়মে প্রকাশ করা। সেক্ষেত্রে আমাদের তিনজনের পাণ্ডুলিপি একত্রে মিলালে সাড়ে চার পারা হয়ে যায়। অবশিষ্ট রইল পঞ্চম পারার বাকি অর্ধাংশের কাজ। অবশেষে ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারীর অনুরোধে পঞ্চম পারার অসমাপ্ত কাজটুকু আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়েছে।

এরপর আমাদের তিনজনের লেখা পাণ্ডুলিপিকে ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদের সুদক্ষ সম্পাদক মণ্ডলীর কাছে অর্পণ করা হয়। তাঁরা এতে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন ও সংশোধন করে কিতাবটিকে যথাসাধ্য সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার শেষ চেষ্টাটুকু করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদের বিচক্ষণতাপূর্ণ দূরদৃষ্টি, বিজ্ঞতাসুলভ পদক্ষেপ ও সুন্দর পরামর্শের জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন!

আশা করি কিতাবটি ছাত্র-শিক্ষক উভয়েরই যথেষ্ট উপকারে আসবে। কিতাবটিকে নিখুঁত ও নির্ভুল করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি তথ্যগত কোনো ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদেরকে অবগতির বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে দেব ইনশাআল্লাহ!

কিতাবটি প্রকাশনার এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সেসব উস্তাদগণের কথা, যাঁদের কাছে আমি 'তাফসীরে জালালাইন' পড়েছি। আল্লাহ আসাতোযায়ে কেরামকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন!

আল্লাহ এ কিতাবটিকে কবুল করুন! কিতাবটিকে এর লেখকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ও প্রকাশকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করে নিন! আমীন!

বিনীত
লেখকদের পক্ষে
আব্দুল গাফফার শাহপুরী

http://islamiboi.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ওহী ও আসমানি কিতাব

জ্ঞান লাভের তিনটি মাধ্যম : জীবনযাত্রার অপরিহার্য জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনটি সূত্র ও উপায় প্রাপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে বাহ্যিক ও প্রাথমিক সূত্র হচ্ছে اَلْحَوَاسُّ الْخَمْسَةُ বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়। দ্বিতীয় সূত্র اَلْعَقْلُ বা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা গবেষণা ও বিচার বিবেচনা। তৃতীয় সূত্র اَلْوَحْيُ ওহী।

ইন্দ্রিয় শক্তি হলো ৫টি। যথা– চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ত্বক ও নাসিকা। এগুলো দ্বারা মানুষ নিকটস্থ ধরা-ছোঁয়া ব্যাপারগুলো অনুভব করে। ইন্দ্রিয়ের আওতা বহির্ভূত জিনিস সম্পর্কে জানতে হলে তাকে বিবেক ব্যবহার করতে হয়। এ বিবেকও নির্ধারিত একটি সীমানা পর্যন্ত কাজ দেয়। সেই সীমানার ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনো তথ্য জানার কাজে বিবেক ব্যর্থ। ইন্দ্রিয় ও বিবেক যেখানে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ, সেখানে মানুষকে নিশ্চিত ধারণা প্রদান করে ওহী।

মোটকথা, জ্ঞান আহরণের উপরিউক্ত তিনটি মাধ্যম যেমন পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত, তেমনি নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সীমিত।

যেমন– কারো সম্মুখে যদি একজন লোক উপবিষ্ট থাকে, তবে তাকে দেখে সে দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে লোকটির আকৃতি, গঠন, রং, রূপ ইত্যাদি বলে দিতে পারে। ইন্দ্রিয় শক্তির ব্যবহারই এখানে যথেষ্ট। কিন্তু নিশ্চয় লোকটির একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে, সৃষ্টিকারী ব্যতিরেকে কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব হতে পারে না; এ জাতীয় তথ্য সে ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা জানতে সক্ষম নয়; বরং তা বিবেকের দ্বারা উপলব্ধি করে। আবার তার সেই সৃষ্টিকর্তা তাকে কেন, কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার নিকট থেকে কোন কাজ পছন্দ করেন আর কোনটি পছন্দ করেন না; এ সকল প্রশ্নের সঠিক জবাব বিবেক দ্বারাও অর্জন করা যায় না। অথচ মানুষ নিজের জীবনকে সফল ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এসব প্রশ্নের সদুত্তর জানা এবং সে মুতাবেক জিন্দেগী পরিচালনা করা আবশ্যক। কোনো সন্দেহ নেই, ওহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চতম মাধ্যম, যা মানুষের এ অনিবার্য প্রয়োজনকে পূরণ করে এবং বিবেকের সীমানা থেকে ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রশ্নাবলির সুষ্ঠু সমাধান দিয়ে থাকে।

একদিকে যেমন ইন্দ্রিয় এবং বিবেক নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে সীমিত, অপরদিকে জ্ঞানের এ সূত্রদ্বয় সর্বদা নির্ভুল ও অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম। অনেক সময় এরা মানুষকে নিতান্ত ভুল ও অবাস্তব তথ্য পরিবেশন করে কখনো প্রতারিতও করে। যেমন- রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখে স্বাদের বস্তু বিস্বাদ মনে হয়। এমনিভাবে দ্রুত গতিশীল গাড়ির আরোহীর দৃষ্টি প্রতারিত হয়। ফলে দুই পার্শ্বের স্থায়ী দণ্ডায়মান দৃশ্যাবলি দুরন্ত গতিতে ধাবমান বলে অনুভূত হয়। আর চলন্ত জাহাজ মনে হয় স্থির দণ্ডায়মান। এখানে মানুষের ইন্দ্রিয় তাকে প্রতারিত করছে। বিবেকের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। তাইতো আধুনিক দার্শনিক চিন্তাধারা ও মতাদর্শ এক্ষেত্রে চরমভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। এর কারণ হলো সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে মানবীয় বিবেকের ত্রুটিগ্রস্ততা। কাজেই জীবনের সর্বাঙ্গীন সফলতা ও কল্যাণে ইন্দ্রিয় ও বিবেকের ঊর্ধ্বে আরো এমন একটি জ্ঞানসূত্র আবশ্যক যা মানুষকে নিশ্চিত ধারণা প্রদান করবে। বলা বাহুল্য, বিবেকের চেয়েও উচ্চশক্তি সম্পন্ন এবং নিশ্চিত জ্ঞান প্রদানকারী সেই মাধ্যমটি হলো ওহী। ওহীর আলোকে মানুষ জীবনে সফলতার প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে থাকে।

ওহী শব্দের বিশ্লেষণ :

ওহীর আভিধানিক অর্থ : وَحْيٌ [ওহী] শব্দটি আভিধানিকভাবে বিভিন্ন অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইঙ্গিত করা, লিখন, পৌছানো, কারো মনে কোনো কথা জাগ্রত করে দেওয়া, নিঃশব্দে কথা বলা এবং অন্যকে কোনো কথা বলা ও নির্দেশ করা ইত্যাদি সবই ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। –[আল মু'জামুল ওয়াসীত : ১০১৮]

আল্লামা কিসায়ী (র.) আরবদের একটি প্রবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন–

يُقَالُ وَحَيْتُ إِلَيْهِ بِالْكَلَامِ إِذَا تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ تُخْفِيْهِ مِنْ غَيْرِهِ.

অর্থাৎ وَحَيْتُ إِلَيْهِ بِالْكَلَامِ বাক্যটি তখন বলা হবে, যখন তুমি কারো সাথে এমনভাবে কথা বল যে, এটি তুমি অন্যদের থেকে গোপন করে পেশ করছ।

http://islamiboi.wordpress.com

অভিধান বিশারদ আবূ ইসহাক বলেন -ওহী শব্দের সকল প্রয়োগের মধ্যে মৌলিকভাবে যে অর্থটি বিদ্যমান, তাহলো- إِعْلَامٌ فِيْ خَفَاءٍ অর্থাৎ অন্যদের শোনা থেকে গোপন রেখে কাউকে কোনো কিছু বলে দেওয়া।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) ওহী শব্দের সারনির্যাস ব্যাখ্যা করে বলেন- অভিধানে ওহী শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো اَلْإِعْلَامُ الْخَفِيُّ অর্থাৎ গোপনভাবে জানানো।

এ অর্থের সাথে আরো একটি বিশেষণ যুক্ত করে ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন هُوَ الْإِعْلَامُ الْخَفِيُّ السَّرِيْعُ অর্থাৎ ওহীর অর্থ হলো গোপনভাবে দ্রুত কোনো কিছু জানানো

এতে বুঝা গেল আভিধানিকভাবে ওহী শব্দের অর্থের মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক : ১. ইঙ্গিত ২. দ্রুতগতি ও ৩. গোপনীয়তা।

ইঙ্গিত অর্থ কোনো জিনিসকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেওয়া। এটি কখনো বিচ্ছিন্ন এক বা একাধিক অক্ষরের প্রয়োগে হতে পারে। যেমন- বি. এ. এম. এ. ইত্যাদি বলে দীর্ঘ কথা বুঝানো হয়। তেমনি হাত, চোখ ঠোঁট ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশেষ ব্যবহার দ্বারাও হতে পারে। নবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত লাভ করেন এবং সে ইঙ্গিতের সঠিক অর্থ উপলব্ধি করে তা কথা ও কাজ বাস্তবায়ন করেন।

ওহী শব্দের আবশ্যকীয় দ্বিতীয় গুণ হলো দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়া। এ থেকে নবীগণের ওহীর তাৎপর্য অনুমান করা যায়। কারণ তাদের ওহীগুলো দ্রুতগতিতে অবতীর্ণ হতো।

হযরত শায়খ আকবর (র.) বলেন- নবী-রাসূলগণের উপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তারা একই সময়ে ওহী মুখস্থকরণ, পূর্ণ উপলব্ধি-হৃদয়ঙ্গমকরণ এবং তা অন্যকে বুঝানোর উপযুক্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবকিছু একত্রে লাভ করতেন

ওহীর অর্থের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য গোপনীয়তা। অর্থাৎ একটি ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকবে, তবে তা অন্যদের দৃষ্টির আওতায় আসবে। নবীগণের ওহীতে এ বিশেষত্ব রয়েছে। কারণ ওহীর ব্যাপারটি কেবল নবী রাসূলগণই শুনতেন বা দেখতেন। অথচ পাশে বসা অন্য কেউ নবীর উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে বলে অনুভব করলেও বাস্তবে তিনি কিছুই শুনতেন না বা দেখতেন না। -[ফজলুলবারী, শরহে সহীহ বুখারী, খ. ১ম, পৃ. ১২৯]

আল কুরআনে ওহী শব্দের ব্যবহার : পবিত্র কুরআন وَحْيٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা-

১. [প্রাকৃতিক] নির্দেশ অর্থে যেমন يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا অর্থাৎ সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ তোমার প্রভু তাকে আদেশ [ওহী] করবেন। -[সূরা যিলযাল : ৪-৫]

২. মনের অভ্যন্তরে কোনো কথা জাগ্রত করে দেওয়ার অর্থে। যেমন-

اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ আরো স্মরণ কর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে এ প্রেরণা [ওহী] দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তারা বলেছিল- আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসম্পর্ণকারী। -[সূরা মায়েদা : ১১১]

৩. জানিয়ে দেওয়ার অর্থে যেমন-

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.

অর্থাৎ স্মরণ যখন কর তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে [ওহী] দেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং মুমিনগণকে অবিচলিত রাখ, যারা কুফরী করে আমি তাদের মনে ভীতির সঞ্চার করব। সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর।

৪. কোনো জিনিসের প্রতি দ্রুত ইঙ্গিত করার অর্থে। যেমন-

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا.

অর্থাৎ অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট [illegible] সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে। -[সূরা মারইয়াম : ১১]

http://islamiboi.wordpress.com

৫. চুপিসারে কথা বলা ও প্ররোচনাদানের অর্থে। যেমন–

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۔

অর্থাৎ এভাবে আমি মানুষ ও জিনদের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি। প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চকমপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত [ওহী] করে। –[সূরা আনআম : ১১২]

ওহী শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহারের ব্যাপকতা : ওহী শব্দটি প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপকতা লক্ষণীয় ।

১. আভিধানিকভাবে ওহী শব্দটির প্রয়োগ শয়তানের জন্যও করা হয়েছে । যেমন–

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۔

অর্থাৎ শয়তান তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা [ওহী] দেয়। যদি তোমরা তাদের কথমত চল, তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে। –[সূরা আন আম : ১২১]

২. শরিয়তের দৃষ্টিতে গায়রে মুকাল্লাফ বা যার উপর শরিয়ত কার্যকর নয়, এমন প্রাণীর দিকেও ওহী শব্দের নিসবত করা হয়েছে। যেমন- وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে [যা একটি গায়রে মুকাল্লাফ প্রাণী] তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দেন যে, তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ের বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। –[সূরা নাহল : ৬৮]

৩. কখনো কখনো এমন ব্যক্তি যে শরিয়তের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ তবে নবী নয়, তার দিকেও ওহী শব্দের নিসবত করা হয়েছে। যেমন– اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰى অর্থাৎ যখন আমি তোমার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা নির্দেশ করার। –[সূরা ত্বাহা : ৩৮]

৪. কখনো শুধুমাত্র নবীদের জন্য ওহী শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন– وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ অর্থাৎ মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে বা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে বা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাঁরই অনুমতিক্রমে, তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। –[সূরা শূরা : ৫১]

মোটকথা, অর্থ ও প্রয়োগ উভয় দিক থেকে ওহী শব্দের মধ্যে ব্যাপকতা আছে। কিন্তু অভিধান বিষয়ের পণ্ডিতগণ বলেন, এগুলোর মধ্যে মূল অর্থটি হলো অন্যের অলক্ষ্যে চুপিসারে কোনো কথা বলা।

–[উলুমুল কুরআন : আল্লামা ইসহাক ফরিদী সম্পাদিত পৃ. ৫৮, ৫৯]

ওহীর পরিভাষিক অর্থ : هُوَ كَلَامُ اللّٰهِ الْمُنَزَّلُ عَلٰى نَبِيٍّ مِنْ اَنْبِيَائِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সেই কালামকে ওহী বলে যা তার নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। –[উমদাতুলকারী লি শরহি সহীহ আল বুখারী, খ. ১ পৃ. ১৮]

আল্লামা তকী উসমানী [দা. বা.] ওহীর সংজ্ঞাকে আরো স্পষ্ট করে বলেন, ওহী মানুষের জন্য জ্ঞান আহরণের সেই সর্বোচ্চ মাধ্যম যা দ্বারা মানুষ এমন জিনিসের জ্ঞান লাভ করতে পারে যা তার ইন্দ্রিয় শক্তি ও বিবেকের দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। যে মাধ্যম, একমাত্র নবী-রাসূলগণই সরাসরি লাভ করেন। আর উম্মত নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তা থেকে জ্ঞান অর্জন করে থাকে। –[উলুমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী পৃ. ২৭]

এক কথায় আল্লাহ ও তার বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান বিষয়ক একটি পবিত্র শিক্ষা মাধ্যমকে ওহী বলা হয়।

ওহীর গুরুত্ব : শরিয়তের দৃষ্টিতে যে কথাটি ওহী হিসেবে সাব্যস্ত রয়েছে তার উপর বিশ্বাস করা ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য। ওহীর বাণী অবিশ্বাস করা বা তাতে অহেতুক সন্দেহ পোষণ করা স্পষ্ট কুফুরি। এ কারণে পবিত্র কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে– الٓمٓ ۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ আলিফ লাম মীম। এটি সেই কিতাব, যেখানে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীগণের জন্য পথ প্রদর্শক। –[সূরা বাকারা– ১-২] এখানে كِتَابٌ বলে ওহীকে নির্দেশ করা হয়েছে। ওহীর সত্যতাকে বিশ্বাস করার আদেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۔

অর্থাৎ হে মানুষ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রাসূল সত্যসহ/ওহী আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। –[সূরা নিসা : ১৭০]

http://islamiboi.wordpress.com

একই আয়াতে ওহীর অস্বীকার যে মূলত কুফরি হয় সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .

অর্থাৎ আর তোমরা ওহীকে অস্বীকারপূর্বক কুফরীর পথ অবলম্বন করলে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই; ক্ষতি তোমাদেরই তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, আসমান জমিনে যা আছে সব আল্লাহরই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

–[সূরা নিসা :১৭০]

মক্কাবাসীদের কাছে রাসূল ﷺ ওহীর পয়গাম পেশ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারাও ওহীকে অস্বীকার করেছিল। তখন তাদের অস্বীকারের ভয়াবহ পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ .

অর্থাৎ হে নবী! আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ওহী প্রেরণ করেছিলাম হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট। –[সূরা নিসা ১৬৩]

মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ আয়াতে প্রিয় নবীর ﷺ ওহীকে হযরত নূহ (আ.)-এর ওহীর সঙ্গে তুলনা করে একথা বুঝানো হয়েছে, ওহী অস্বীকার মানবজাতির জন্য প্রচণ্ড গজবের কারণ হয়ে থাকে। পূর্ববর্তীকালে হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মতগণ তাঁর ওহীকে অস্বীকার করেছিল বিধায় তাদের উপর মহাপ্লাবনের গজব আরোপিত হয়েছিল।

সুতরাং বুঝা গেল, নবীকে বিশ্বাস করা যেমন আবশ্যক তেমনি তার ওহীকেও বিশ্বাস করা আবশ্যক। এ কারণে ইসলামি শরিয়ত মতে কোনো মানুষ মুমিন হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যেমন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর নাজিলকৃত ওহীর সত্যতা বিশ্বাস করতে হয়, তেমনি তার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাজিলকৃত ওহীকেও সত্যবাণী হিসেবে মেনে নেওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتٰبِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيدًا .

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উপর তার রাসূলের উপর, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের কাছে অবতীর্ণ করেছেন তার উপর এবং যে কিতাব তিনি ইতোপূর্বে [অন্যান্য নবীগণের কাছে] অবতীর্ণ করেছেন তার উপর ঈমান আন। কেউ যদি আল্লাহকে বা তাঁর ফেরেশতাগণকে বা তাঁর কিতাবসমূহকে তাঁর রাসূলগণকে বা পরকালকে অস্বীকার করে, তবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। –[সূরা নিসা : ১৩৬]

ওহীর প্রয়োজনীয়তা : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কেন কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনি তার কোন কোন কাজ পছন্দ করেন, কোনটি পছন্দ করেন না? মানুষের নিজের জীবনকে সফল ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানা এবং সে মোতাবেক জিন্দেগী পরিচালনা করা আবশ্যক। কোনো সন্দেহ নেই, ওহী হলো জ্ঞানার্জনের সেই উচ্চতম মাধ্যম যা মানুষের এ অনিবার্য প্রয়োজনকে পূরণ করে এবং বুদ্ধির সীমানা থেকে ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রশ্নাবলির সমাধান দিয়ে থাকে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওহীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ওহী প্রেরণে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য : ওহী প্রেরণে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য মানুষকে তার রূহ জগতে স্বীকারোক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাকে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে সুসংবাদ ও অবাধ্যতা অবলম্বনের কারণে সাবধানবাণী শুনিয়ে অজুহাত উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দেওয়া। যেন কিয়ামতের বিচার দিবসে কোনো মানুষ এমন অজুহাত পেশ করতে না পারে যে, হে আল্লাহ! পৃথিবীতে এ কথাটি কেউ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়নি। পবিত্র কুরআনে নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণের হিকমত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

অর্থাৎ আমি সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি যেন রাসূল আসার পর আল্লাহর কাছে মানুষের কোনো অভিযোগ করার কিছু না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। –সূরা নিসা–১৬৫]

এ হিকমতকে সামনে রেখেই প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী ও আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন

–[illegible]

ওহীর শ্রেণি বিভাগ : ওহী প্রথমত দু প্রকার–

১. وَحْيٌ تَكْوِينِي ওহীয়ে তাকবীনী

২. وَحْيٌ تَشْرِيعِي ওহীয়ে তাশরীঈ

http://islamiboi.wordpress.com

وَحْيٌ تَكْوِيْنِي বলতে বুঝানো হয় প্রাকৃতিক সাধারণ বিষয় সম্পর্কিত ওহীকে আর وَحْيٌ تَشْرِيْعِي বলতে বুঝানো হয় ধর্মীয়ভাবে মানুষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে।

হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্বপর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি ওহী নাজিল হয়েছিল তাতে وَحْيٌ تَكْوِيْنِي-ই ছিল বেশির ভাগ। তৎকালের تَكْوِيْن তথা জগতকে গড়ে তোলা বিষয়ক ওহীর প্রয়োজনও ছিল বেশি। জগতে মানব বসতির সূচনাকারী হিসেবে যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এসেছিলেন তাই তাকে দুনিয়ায় পদার্পণের পূর্বেই জগতের সকল বস্তুর নাম গুণাগুণ ইত্যাদির তালীম দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়েছে- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا অর্থাৎ আর তিনি আদমকে যাবতীয় বস্তুজগতের পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। -[সূরা বাকারা-৩১]

অন্যদিকে হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্বকালে মানুষ স্বাভাবিক নিয়মেই আল্লাহকে বিশ্বাস করে চলত। কুফর, শিরক, খাহেশাতের অনুকরণ ও দুনিয়ার মোহ মানুষের মধ্যে তখনও প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করেনি। তাই তৎকালে تَشْرِيْعِي [তাশরীয়ী] ওহীর প্রয়োজন কম ছিল। -[ফজলুল বারী, খ. ১, পৃ. ১৩৫]

হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে কুফর শিরকের প্রাদুর্ভাব সূচিত হয়। শুরু হয় وَحْيٌ تَشْرِيْعِي [ওহীয়ে তাশরীঈ] -এর ধারা। তাঁর আমল পর্যন্ত জগতে মানুষ বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল জাগতিক জ্ঞানের দরকার ছিল, তা ক্রমে ক্রমে মান প্রদান সম্পন্ন হয়ে হয়ে গিয়েছিল। সেগুলোর ভিত্তিমূলে মানুষ জ্ঞানচর্চা করেই পরবর্তী জাগতিক উন্নতি উত্তরোত্তর সম্পন্ন করতে পারে। এ উন্নতি বিধানের জন্য অতিরিক্ত ওহীর প্রয়োজন নেই। কেননা দুনিয়ার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত মোহ ও আকর্ষণই তাদেরকে জাগতিক উন্নতি বিধানের প্রতি উৎসাহিত করা অব্যাহত রাখবে। তবে তখন থেকে কুফর শিরকের সূচনা ঘটার কারণে শরিয়ত বিষয়ক সর্ব প্রথম রাসূল রূপে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.)। হযরত নূহ (আ.) থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত ওহীর ধারা একই রকমের ছিল। অর্থাৎ এ অধ্যায়ে তাকবীনী ওহীর তুলনায় তাশরীয়ী ওহীর পরিমাণ অধিক ছিল।

تَكْوِيْن [তাকবীন] বিষয়ক ওহী যা মোটেও ছিল না, তা নয়। স্বয়ং হযরত নূহ (আ.)-এর কাছে তাকবীন বিষয়ক ওহী নাজিল করা হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا অর্থাৎ হে নূহ! তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। -[সূরা হূদ : ৩৭]

হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে- وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ অর্থাৎ আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যেন তা দ্বারা তোমরা যুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? -[সূরা আম্বিয়া : ৮০]

তাকবীনী ও তাশরীয়ী ওহীর উপরিউক্ত বিভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু হযরত নূহ (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত নবীগণের কাছে প্রেরিত ওহী একই ধারা ও একই শ্রেণিভুক্ত সেহেতু পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে মহানবী ﷺ -এর নিকট প্রেরিত ওহীর প্রকৃতি নির্দেশ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ـ

অর্থাৎ আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ওহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ ও তৎপরবর্তী নবীগণের নিকট। আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন এবং সুলাইমানের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যবুর দিয়েছিলাম। -[সূরা নিসা : ১৬৩]

অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির দিক থেকে ওহীর শ্রেণি বিভাগ : নবীগণের কাছে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতির দিক থেকে চিন্তা করেও ওহীর শ্রেণি বিভাগ করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ওহী মোট তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. وَحْيٌ قَلْبِي **ওহীয়ে কালবী** : ওহীয়ে কলবী হলো এমন ওহী যা কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরিভাবে নবীর হৃদয়পটে এসে স্থান নেয়। এ পদ্ধতির ওহীর মধ্যে কোনো ফেরেশতা বা নবীর কোনো ইন্দ্রিয় শক্তির মধ্যস্থতা থাকে না। নবীর মনে কথাটি উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে। এ পদ্ধতির ওহী নবীগণের জাগ্রত বা নিদ্রিত উভয় অবস্থায় অবতীর্ণ হতো। সে কারণে নবীগণের স্বপ্নও ওহী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

২. وَحْيِ كَلَامِي **ওহীয়ে কালামী :** ওহীয়ে কালামী হলো এমন ওহী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে সরাসরি প্রদান করা হয়। এখানে ফেরেশতার কোনো মধ্যস্থতা থাকে না। তবে নবী আল্লাহর কুদরতি কালামের ধ্বনি শুনে থাকেন।[১]

৩. وَحْيِ مَلَكِي **ওহীয়ে মালাকী :** ওহীয়ে মালাকী হলো এমন ওহী যা কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মধ্যে ওহীকে উপরিউক্ত বিবিধ প্রকারে বিভক্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ

অর্থাৎ মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে বা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত বা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাঁরই অনুমতিক্রমে, তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করেন। -[সূরা শূরা : ৫১]

উপরিউক্ত আয়াতে وَحْيًا শব্দ দ্বারা ওহীয়ে কালবীকে বুঝানো হয়েছে। তারপর مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ দ্বারা কালামে ইলাহীকে এবং يُرْسِلَ رَسُوْلًا দ্বারা ওহীয়ে মালাকীকে বুঝানো হয়েছে। -[উলূমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী, ৩১-৩২]

ওহীয়ে মাতলূ ও গায়রে মাতলূ : প্রিয়নবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে ওহী লাভ করেছেন সেটি দু'টি শাখায় বিভক্ত। ওহীয়ে মাতলূ এবং ওহীয়ে গায়র মাতলূ। ওহীয়ে মাতলূ এমন ওহী যার শব্দ, বাক্য অর্থ ও মর্ম সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে আগত। পরিভাষায় এটি আল-কুরআন নামে পরিচিত। আর ওহীয়ে গায়র মাতলূ এমন ওহী যার অর্থ ও মর্ম আল্লাহ প্রেরিত, তবে শব্দ ও বাক্য প্রিয়নবী ﷺ -এর ইসলামের পরিভাষায় এ প্রকারের ওহী হাদীসও সুন্নাহ নামে অভিহিত।

উম্মতের কাছে উভয়বিধ ওহীই সংরক্ষিত অবস্থায় আছে এবং কুরআনে ব্যক্ত আল্লাহর নিজ দায়িত্ব সংরক্ষণের অঙ্গীকার বাণীর মধ্যে উভয়বিধ ওহী-ই অন্তর্ভুক্ত। এ দুপ্রকারের ওহীর মধ্যে মানগত পার্থক্য থাকলেও ওহী তথা আল্লাহর বাণী হওয়ার মধ্যে উভয়ের কোনো তফাৎ নেই। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى আর সে [মুহাম্মদ ﷺ] মনগড়া কোনো কথা বলে না; বরং তিনি যা বলেন, তাও ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

-[সূরা নাজম : ৩ ও ৪]

প্রিয়নবী ﷺ -এর হাদীসেও এর সমর্থন বিদ্যমান। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- اُوْتِيْتُ الْقُرْاٰنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

অর্থাৎ আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং কুরআনের সাথে অনুরূপ আরেকটি [অর্থাৎ হাদীস]।

-[উলূমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী ৪০ ও ৪১]

রাসূল ﷺ -এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ওহী বিভিন্ন পদ্ধতিতে নাজিল হতো। আলেমগণের মতে প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট সাধারণত ৬টি পদ্ধতিতে ওহী অবতীর্ণ হতো। যেমন-

---

১. কালামের এ ধ্বনি কোন ধরনের তা নবী ব্যতীত অন্যদের পক্ষে নির্ণয় করা সুকঠিন। এতটুকু নিশ্চিত যে, এ ধ্বনি কোনো জীব-জন্তু বা সৃষ্ট বস্তুর ধ্বনির মতো নয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (র.) বলেন, বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে ওহীর এ পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ।। কেননা এ পদ্ধতির মধ্যে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথনের ব্যবস্থা থাকে। এ কারণে নবীগণকে ওহীর নিয়ামত প্রদানের আলোচনায় আল্লাহ তা'আলা ওহীয়ে কালামীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ. অর্থাৎ এ রাসূলগণের মধ্যে আমি কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও আছে যার সাথে আল্লাহ [সরাসরি] কথা বলেছেন। -[সূরা বাকারা : ২৫৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا আর মূসার সাথে আল্লাহর সাক্ষাত বাক্যালাপ করে ছিলেন। -[সূরা নিসা-১৬৪]

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন- ওহীয়ে কালামীর এ পদ্ধতির মধ্যে নবীর শ্রবণেন্দ্রিয় ওহীর ধ্বনি শ্রবণের স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু চাক্ষুষভাবে তিনি কোনো কিছু দেখতে পান না। তুর পর্বতে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে যে বাক্যালাপ করেছেন, সে মুহূর্তে তিনি আল্লাহকে চাক্ষুষভাবে দেখেননি। এ কারণেই তিনি পুনর্বার আল্লাহকে দেখার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَمَّا جَاۤءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ.

অর্থাৎ মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তাঁর প্রভু তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি দেখতে পাবে না। -[সূরা আরাফ : ১৪৩]

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের এ নিয়ামত মিরাজ রজনীতে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজেও লাভ করেন। -[ফজলুল বারী খ. ২ পৃ. ১৩০]

http://islamiboi.wordpress.com

১. **এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন ঘন্টাধ্বনি :** ওহী নাজিল হওয়ার মুহূর্তে প্রিয়নবী ﷺ নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় এক ধরনের আওয়াজ শুনতেন। হাদীসে এ ধ্বনিকে বুঝানোর জন্য مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ [নিরবচ্ছিন্ন ঘণ্টা ধ্বনির মতো] كَسِلْسِلَةٍ عَلٰى صَفْوَانٍ [পাথরের উপর লোহার শিকল ফেলার ধ্বনির মতো] كَدَوِيِّ النَّحْلِ [মৌমাছির গুণগুণ ধ্বনির মতো] এ তিনটি বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিবিধ উপমার মূল বক্তব্য অভিন্ন। অর্থাৎ তিনি একটি ধ্বনি শুনতেন যার অগ্র-পশ্চাৎ অনুমান করা যেত না, যা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকত।[১]

২. **ফেরেশতার মানবাকৃতিতে আগমন :** হযরত জিবরীল (আ.) কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে হযরত জিবরীল (আ.) সাধারণত সাহাবী হযরত দাহইয়ায়ে কালবী (রা.)-এর আকৃতি বেশি গ্রহণ করতেন। আল্লামা আইনী (র.) বলেন, কোনো কোনো সময় অন্য মানুষের আকৃতিতে আসার বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। হযরত আবূ আওয়ানা (র.) বলেন, এ পদ্ধতির ওহী ছিল সর্বাপেক্ষা সহজ পদ্ধতির ওহী।

৩. **ফেরেশতার নিজ আকৃতিতে আগমন :** কখনো কখনো হযরত জিবরীল (আ.) ফিরিশতার আকৃতিতেই ওহী নিয়ে অবতরণ করতেন। প্রিয়নবী ﷺ -এর জীবনে এ ধরনের ওহীর ঘটনা মাত্র তিনবার ঘটেছে।

৪. **সত্য স্বপ্ন :** প্রিয়নবী ﷺ কখনো স্বপ্নের মাধ্যমেও ওহী লাভ করতেন। নবীগণের স্বপ্নও ওহী। নবীগণের ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের চোখ বন্ধ থাকত; কিন্তু হৃদয় থাকত সম্পূর্ণ জাগ্রত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট ওহীর সূচনাও হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। ঐ সময় তিনি রাতে যা স্বপ্ন দেখতেন পরদিন তারই বাস্তব প্রতিপালন প্রত্যক্ষ করতেন। মদীনা শরীফে ইহুদিরা তাঁর শরীরের উপর যে যাদুক্রিয়া চালিয়েছিল, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এ যাদুর বিষক্রিয়া দূরীকরণের বিষয়গুলোও তিনি এ স্বপ্নের মাধ্যমেই লাভ করেছিলেন।

৫. **আল্লাহর সরাসরি বাক্যালাপ :** হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় প্রিয়নবী ﷺ আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করেন। বিশেষ মর্যাদা জাগ্রত অবস্থায় তিনি মি'রাজের সময় লাভ করেন। আর একবার স্বপ্নেও আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর বাক্যালাপ ঘটেছিল।

৬. **মানসপটে ওহী ফুঁকে দেওয়া :** কখনো কখনো হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো ফেরেশতা বা কোনো মানুষের আকার অবলম্বন না করেই অদৃশ্য থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর পবিত্র হৃদয়ে ওহী ফুঁকে দিতেন। যেমন একখানা হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেছেন- إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رُوْعِىْ الخ অর্থাৎ রূহুল কুদুস আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ তার জন্য বরাদ্ধ রিজিক সম্পূর্ণ ভোগ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে না। –[প্রাগুক্ত পৃ. ৩২-৪০]

ওহী কাশফ ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য : ওহীর সম্পর্ক শুধুমাত্র নবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নবী ব্যতীত অন্যকোনো মানুষ আধ্যাত্মিক পথে যত উন্নত মর্যদার অধিকারীই হোক না কেন তার কাছে ওহী আসতে পারে না।

তবে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে কখনো আধ্যাত্মিকভাবে কিছু বিশেষ জ্ঞান দান করে থাকেন। পরিভাষায় এগুলোকে কাশফ ও ইলহাম বলে।

কাশফ ও ইলহাম মৌলিকভাবে একই শ্রেণিভুক্ত হলেও হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য করেছেন, তার মতে কাশফের সম্পর্ক হলো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জিনিসের সাথে। অর্থাৎ কাশফের দ্বারা কোনো বস্তুর হাকীকত বা কোনো ঘটনার প্রকৃত রূপ ব্যক্তির নজরে ভেসে উঠে। পক্ষান্তরে ইলমের সম্পর্ক হলো মানুষিক অনুভূতির সাথে। অর্থাৎ ইলহামের ক্ষেত্রে কোনো জিনিস নজরে ভেসে উঠে না, তবে অন্তরের মধ্যে সে বিষয়টি সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি হয়। কাশফ ও ইলহামের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ইলহাম কাশফ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর বিশুদ্ধ হয়ে থাকে।

ইলহাম নবী ও সাধারণ মানুষ উভয়ের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। নবীর ব্যাপারে যেমন এক হাদীসে প্রিয়নবী স্বয়ং দোয়া করে বলেছেন- اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ "আল্লাহ আমাকে সৎপথে ইলহাম দান কর।"

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا অর্থাৎ "অতঃপর তিনি মানুষকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের ইলহাম দান করেছেন।"

---

১. এ আওয়াজ কিসের ছিল, তা নিয়ে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। কারো মতে এটি কালামে ইলাহীর নিজস্ব আওয়াজ। কেউ কেউ এটিকে ফেরেশতা বা তাদের পাখার আওয়াজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) বলেন, এটি বাইরের কোনো ধ্বনি নয়; বরং ওহী অবতরণের মুহূর্তে যেহেতু বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে জাগতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র ওহীর দিকেই মনোযোগী করে দেওয়া হতো, আর মানুষের বাহ্য ইন্দ্রিয় যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়কে এভাবে বিচ্ছিন্ন করা হলে আপনা থেকেই তখন এ ধরনের ধ্বনি শ্রুত হয়ে থাকে। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর মতে এটি বস্তুত কালামে রাব্বানীর নিজস্ব আওয়াজ। –[উলূমুল কুরআন : ৩৩]

http://islamiboi.wordpress.com

এখান থেকে বুঝা যায়, ইলহাম নবীর জন্য একান্ত কোনো ব্যাপার নয়, ওলীদের জন্যও হতে পারে। তবে উভয়ের ইলহামের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, নবীগণের ইলহাম ওহীরই অন্তর্ভুক্ত, এটি নিশ্চিত ও ভ্রান্তিমুক্ত। কিন্তু ওলীদের ইলহাম ওহীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নিশ্চিত ও ভ্রান্তিমুক্ত বলেও দাবি করা যায় না। কারণ শয়তানের পক্ষ থেকে হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ওলীগণের প্রাপ্ত ইলহামের মধ্যে কোনো ফেরেশতার মধ্যস্থতা থাকে কিনা? এব্যাপারে জ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম গাজালী (র.)-এর মতে এখানে ফেরেশতার কোনো মধ্যস্থতা নেই। কিন্তু ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) তার ফুতহাত গ্রন্থে বলেন, ইমাম গাজালী (র.)-এর আভিমত সঠিক নয়। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এখানে ফেরেশতার মধ্যস্থতা আছে । তিনি বলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আরো জানা গেছে যে, ওলীর কাছে ইলহাম নিয়ে যে ফেরেশতা আগমন করেন, ওলী তাকে নিজ চোখে দেখেন না, তবে একজন ফেরেশতা যে তাঁর মনে কথাগুলো ঢেলে দিচ্ছেন, তিনি সেটি অনুধাবন করেন।

শায়খ আকবর আরো লিখেছেন আমার জানা মতে আরো কতিপয় আলেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যে, ইলহাম নিয়ে ফেরেশতা এসে থাকেন। তবে এ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) নন, অন্য কোনো ফেরেশতা। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন কেবল নবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনুরূপভাবে ওলী কখনো ফেরেশতার দর্শন লাভ করেন না। ফেরেশতা দর্শনের ব্যাপারটিও একমাত্র নবীগণের জন্য প্রযোজ্য। যেহেতু ওলীগণ ইলহাম প্রদানকারীকে নিজ চোখে দেখেন না, সেহেতু তাদের ইলহাম নিশ্চিত ধারণা দিতে পারে না। কেননা এখানে ফেরেশতা না হয়ে কোনো শয়তান বা জিনের পক্ষ থেকে হওয়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান থাকে।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে সার বক্তব্য হলো–

১. ওলীগণের ইলহামের মধ্যে বস্তুত আল্লাহর সাথে বাক্যালাপ ঘটে না। ইবনুল কাইয়্যিম (র.) এ কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
২. তাতে কোনো ফেরেশতার মধ্যস্থতাও সাধারণত থাকে না। যেমন ইমাম গাযালী (র.) তা তুলে ধরেছেন।
৩. আর কখনো ফেরেশতার মধ্যস্থতা থাকলেও ওলী সে ফেরেশতার দর্শন ও বাণী শ্রবণ একই সঙ্গে লাভ করেন না। এটি শায়খ আকবর স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে নবীগণের ইলহামের মধ্যে উপরিউক্ত সবগুলো বিশেষণ একই সময়ে বিদ্যমান থাকে। –[প্রাগুক্ত ৩৯ ও ৪০]

আসমানি কিতাবসমূহ

পৃথিবীতে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত বহু নবী আগমন করেছেন। কুরআনের বর্ণনা মতে বিগত কালের এমন কোনো কওম বা জনপদ নেই, যাদের কাছে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েতের বাণী দিয়ে নবী প্রেরণ করেননি। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। –[সূরা নাহল : ৩৬]

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ـ অর্থাৎ এমন কোনো সম্প্রায় নেই যার নিকট সতর্ককারী রাসূল প্রেরিত হয়নি।

–[সূরা ফাতির–২৪]

একখানা হাদীসে তাদের সংখ্যা ১লক্ষ ২৫ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাসূলগণের প্রত্যেকের সঙ্গেই ওহীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা উম্মতকে হেদায়েত করার মতো বহু সহীফা ও ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছেন। এসব সহীফা ও ধর্মগ্রন্থকেই মূলত আসমানি কিতাব বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা সর্বমোট একশত চারখানা কিতাব নাজিল করেছেন। তন্মধ্যে চার খানা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যথা–১. তাওরাত ২. ইনজীল ৩. যাবূর ও ৪. কুরআন।

তাওরাত হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি, ইনজিল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি, যাবূর হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি এবং কুরআন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি নাজিল করা হয়েছে।

এছাড়া বাকিগুলো হলো সহীফা। সহীফাগুলোর দশ খানা হযরত আদম (আ.) -এর উপর, পঞ্চাশ খানা হযরত শীস (আ.) -এর উপর, ত্রিশ খানা হযরত ইদরীস (আ.)-এর উপর এবং দশ খানা হযরত ইবরাহীম (আ.) উপর নাজিল করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

আসমানি কিতাবসমূহের নাম এবং কোনটি কোন নবীর উপর নাজিল হয়েছিল এবং কোনটির ভাষা কি? মনে রাখার সুবিধার্থে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো- فعم - تعم - اسعى - زيد

প্রথম অক্ষর কিতাবের নাম, দ্বিতীয় অক্ষর ভাষার নাম এবং তৃতীয় অক্ষর নবীর নাম।

যেমন-

فعم : ف : فُرْقَان ، ع : عَرَبِي ، م : مُحَمَّد

تعم : ت : تَوْرَات ، ع : عِبْرَانِي ، م : مُوْسٰى

اسعى : ا : اِنْجِيْل ، س : سُرْيَانِي ، عي : عِيْسٰى

زيد : ز : زَبُوْر ، ي : يُوْنَانِي ، د : داود

[সূত্র : মিফতাহুত তাফসীর, শাইখুল হাদীস আল্লামা আলতাফ হুসাইন]

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃত ও রহিত : একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে কুরআন মাজীদের আগে যেসব কিতাব নাজিল হয়েছিল. সেগুলো সবই মানসূখ এবং রহিত হয়ে গেছে। অধিকন্তু বর্তমানে এগুলো বিকৃত এবং অনির্ভরযোগ্যও বটে।

বাইবেল কি আসমানী কিতাব?: বর্তমানে 'বাইবেল শরীফ' বলে যে কিতাবটি প্রচার করা হচ্ছে তা আসমানি কিতাব নয়। তাতে রয়েছে তাওরাত, যাবূর ও ইনজিল এই তিনটি কিতাব। উক্ত কিতাবত্রয়ের সমন্বয়ে সংকলিত বাইবেলের দুটি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অংশ ওল্ড টেস্টমেন্ট নামে পরিচিত।

আটত্রিশ খণ্ডে সংকলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ওল্ড টেস্টমেন্ট-এর অন্তর্ভুক্ত। তাওরাত সম্বন্ধে গবেষকদের অভিমত এই যে, যখন বাবেল সম্রাট "বুখতে নাসর" বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করে হাজার হাজার নারী পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং বন্দী করে নিয়ে যায় অসংখ্য নিরাপরাধ ব্যক্তিকে, তখন তারা আল্লাহর ঘর মসজিদে আকাসায়ও হামলা করে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাব তাওরাতসহ মসজিদে রক্ষিত যাবতীয় গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, এ ঘটনার দীর্ঘদিন পর তাওরাতের একটি কপি তাদের হস্তগত হয়। এর পর পুনঃ পুনঃ তারা রোমী এবং গ্রীকদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং এতে তাওরাতের শেষ কপিটিও জ্বলে ছারখার হয়ে যায়।

তখন থেকে বাইবেল পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা জনশ্রুতি তথা মানুষের স্মৃতিনির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র। লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী নয়শত বছরেরও বেশি সময় লাগিয়ে তা পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বাইবেলের পুস্তকসমূহ বহুবার লিখন ও সংশোধনের পরে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কিতাবটিকে মূল ভাষায় লিপিবদ্ধ না করে লেখকগণ এর অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। এতে তারা তাহরীফ ও বিকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন খুব বেশি। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে নিজস্ব যুগের এবং পরিবেশের প্রয়োজনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক অদল-বদল এমনকি সংযোজন ঘটাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত সমস্ত বাইবেলে-ই এ বিভ্রান্তকর কর্মকাণ্ড বিদ্যমান।

কুরআন মজীদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তারা মূল হতে কিছু অংশ বাদ দিয়ে মূলে কিছু সংযোজন করে, মূলের অংশ বিশেষের স্থলে নিজেরা কিছু লিখে, উচ্চারণের বিকৃতি যোগে ভুল বুঝিয়ে এবং ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তাহরীফ সাধন করেছে। -[ইজহারে হক : মাওলানা রহমত উল্লাহ কিরানভী (র.), বাইবেল ছোো কুরআন তক : মুফতি তকী উসমানী সূত্রে উলুমুল কুরআন, আল্লামা ইসহাক ফরিদী (র.) পৃ. ২০-২২]

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

أَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা বিকৃত করে, অথচ তারা জানে। -[সূরা বাকারা-৭৫]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ـ

অর্থাৎ সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত। তাদের হাত যা রচনা করেছে, তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তির তাদের। -[সূরা বাকরা- ৭৯]

http://islamiboi.wordpress.com

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهٖ .

অর্থাৎ তারা শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করতো এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছিল

–[সূরা মায়েদা : ১৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে– يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا

অর্থাৎ তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে। তারা বলে, এই প্রকার বিধান দিলে তা গ্রহণ করবে এবং তা না দিলে বর্জন করবে। –[সূরা মায়েদা : ৪১]

ড: মরিস বুকাইলী বলেন, বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সব পুস্তকই বেশ কয়েকবার করে সংশোধন ও সম্পাদনা করা হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্জিত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে; ওই সব বাড়তি বিষয় সম্ভবত পরবর্তী সময়ের সংযোজন।

বস্তুত বাইবেলের কোথাও রয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তি; কোথাও পুনরাবৃত্তির দোষ, কোথাও কাহিনীগত গড়মিল এবং কোথাও রচনাগত তারতম্য। এক কথায় ইহুদিদের গির্জার যেমন বিভিন্নতা রয়েছে, তেমনি গির্জা ভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বাইবেল। কেননা বাইবেল সম্পর্কে একেক গির্জার ধারণা একেক রকম। আর পারস্পরিক ভিন্ন ধারণার কারণেই অন্য ভাষায় বাইবেল তরজমা করতে গিয়েও তাদের পক্ষে এক মতে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত রয়েছে। –[বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান : ড. মরিস বুকাইলী]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অর্থাৎ ওল্ড টেস্টমেন্টে তাওরাত ছাড়াও বিভিন্ন নবীর শিক্ষা সম্পর্কিত আরো কয়েকটি কিতাব এবং আরো কিছু ঐতিহাসিক পুস্তক স্থান লাভ করেছে। এগুলোর অবস্থানও তাওরাত এবং যবূরের অনুরূপই।

বাইবেলের অপর অংশকে নিউ টেস্টমেন্ট [নতুন নিয়ম] বলা হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নিকট এটি ইঞ্জিল শরীফ হিসেবে পরিচিত। হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার সত্তর বছর পর নিউ টেস্টমেন্টের সুসমাচারসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ঐশী বাণীসমূহ জনশ্রুতি এবং মানুষের স্মৃতিনির্ভর কাহিনী ছিল মাত্র।

নিউ টেস্টমেন্টের এ সুসমাচারসমূহ কিভাবে লিপিবদ্ধ হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে ইকুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল এর অনুবাদকগণ এ অভিমত ব্যক্ত করছেন যে, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের তাগিদে ধর্মপ্রচারকগণ যেসব কাহিনী ও বিবরণ পেশ করতেন তাই লোক মুখে প্রচারিত হতো। আবার লোকমুখে এসব কাহিনী সংকলন করে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো। বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলো এমন ধরনেরই সংকলন। এভাবে অসংখ্য ধর্মপ্রচারক অসংখ্য বাইবেল সংকলন করে নেয়।

এগুলোর কোনটি বিশুদ্ধ, তা নিরূপণের জন্য পূর্বরোমের ফিলিস শহরে ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রীদের এক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিন শতাধিক পাদ্রী অংশ গ্রহণ করে। পাদ্রীগণ এ যাবত যত সুসমাচার লেখা হয়েছে, তা একত্র করে একটি স্তূপ দেয়। তারপর সর্বজন মান্য এক পাদ্রী সিজদাবনত অবস্থায় এ বলে মন্ত্র আওড়াতে থাকে যে, যেটি সত্য তা যেন পড়ে যায়। এভাবে বলতে বলতে চারটি সুসমাচার ব্যতীত বাকি সবকটি মাটিতে পড়ে যায়। আর এ চারটি হলো মার্ক, মথি, লুক ও যোহনের সুসমাচারসমূহ। অভিজ্ঞ লেখকদের মতে এই চারটি সুসমাচার প্রণয়ন শুরুর সময় ধরা হয়েছে ৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে।

বস্তুত এসব সুসমাচার হচ্ছে সেসব রচনার সমাহার, যেসব দ্বারা বিভিন্ন মহলকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানো হয়েছে, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা বক্তব্যের সমাধান দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের উত্থাপিত নানা অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং প্রচলিত ধর্মীয় ভুল-ত্রুটিসমূহের সংশোধন পেশ করা হয়েছে। সুসমাচারের লেখকগণ স্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লোক নিয়ে নিজ নিজ পুস্তক সংকলন ও প্রণয়ন করেছেন।

এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এসব সুসমাচার হচ্ছে বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার এলোমেলো এক সাহিত্য কর্ম মাত্র বটেই, সে সাথে এগুলোতে রয়েছে অসংখ্য বৈপরীত্যেরও বিপুল সমাহার। এ মন্তব্য আমাদের নয়। এ মন্তব্য করেছেন ইকুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অবদি বাইবেলের শতাধিক বিজ্ঞ ভাষ্যকার। তারা বলেন, যেসব বাইবেল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, এর সবগুলোর রচনা ও বক্তব্য এক নয়; বরং একটির সাথে আরেকটির পার্থক্য সুস্পষ্ট। প্রাপ্ত বিভিন্ন বাইবেলের মধ্যে এই যে ভিন্নতা, তাও বিভিন্ন ধরনের। সংখ্যার দিক থেকেও সে পার্থক্য কম নয়; বরং প্রচুর। কোনো কোনো বাইবেলের মধ্যে ব্যাকরণ সংক্রান্ত ও ভাষাগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শব্দ চয়নে কিংবা শব্দের অবস্থানের ভিন্নতাও কম নয়। কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এমন ধরনের পার্থক্যও বিদ্যমান যার ফলে দুটি বাইবেলের গোটা একটা অনুচ্ছেদের অর্থ পুরোপুরি ভিন্ন রকমের হয়ে দাঁড়ায়। এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত বাইবেলের সুসমাচারসমূহ মূলত মানুষের রচনা। আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল কৃত ঐশীবাণী নয় এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণীসমূহের হুবহু বর্ণনাও নয়

–[বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান সূত্রে উলূমুল কুরআন আল্লামা ইসহাক ফরিদী– ২৩-২৫]

http://islamiboi.wordpress.com

কুরআন পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআন শব্দের আভিধানিক অর্থ : আরবি কুরআন (قُرْآنٌ) শব্দটি قَرَءَ يَقْرَأُ ক্রিয়ার শব্দমূল (مَصْدَرٌ)। সে হিসেবে قُرْآنٌ অর্থ পাঠ করা। শব্দটি তথা مَقْرُوْءٌ مَفْعُوْل [পঠিত] অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কুরআন মজীদ নামক গ্রন্থটিও পাঠ করা হয় বা পঠিত হয়, তাই একে কুরআন (قُرْآنٌ) বলে নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআনের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় কুরআনের সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ–

اَلْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

অর্থাৎ কুরআন ঐ কিতাবকে বলা হয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নাজিল করা হয়েছিল এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর যা সন্দেহাতীত "তাওয়াতুর" (تواتر) -এর সাথে বর্ণিত হয়ে আসছে। –[নুরুল আনওয়ার, পৃ. ৯ ও ১০]

ফাওয়ায়েদে কুয়ূদ : উক্ত সংজ্ঞায় "যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নাজিল করা হয়েছে" বলে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ থেকে কুরআনকে আলাদা করা হয়েছে এবং "যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে" বলে যা গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ নেই, সেগুলো থেকেও কুরআন মাজীদকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে । যেমন-ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলোর বিধান বলবৎ আছে; কিন্তু তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। আর যা সন্দেহাতীতভাবে তাওয়াতুর -এর সাথে বর্ণিত হয়ে আসছে" বলে যা এই প্রক্রিয়ায় বর্ণিত নেই সেগুলো থেকে কুরআন মাজীদকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে গোটা কুরআনই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত এবং মাসহাফে উসমানীতে যা আছে, তা পুরোটাই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত। কুরআনের কোনো অংশই মাসহাফে উসমানী থেকে বাদ পড়ে যায়নি। এটাই গোটা মুসলিম উম্মাহর আকিদা ও অকাট্য সত্য। কাজেই শীয়া ইসমিয়্যা সম্প্রদায়ের বক্তব্য– "এই কুরআন আসল কুরআন নয়, আসল কুরআন আমাদের দ্বাদশ ইমামের নিকট রক্ষিত আছে" একান্তই মিথ্যা ও বানোয়াট। সর্বোপরি তাদের এ বক্তব্য কুরআন হেফাজতের ব্যাপারে ইলাহী প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এক চ্যালেঞ্জ বটে। যারা এ আকীদায় বিশ্বাসী, তারা যে কাফের এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কুরআন মাজীদের নামসমূহ : ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের চারটি নাম আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. আল কুরআন : ইরশাদ হয়েছে– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের আরো ৬৫ স্থানে এই قُرْآنٌ কুরআন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. আল ফুরকান : ইরশাদ হয়েছে– تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

৩. আল কিতাব : ইরশাদ হয়েছে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

৪. আয যিকর : ইরশাদ হয়েছে– اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

এছাড়াও গুণবাচক বহুনাম কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন–

اَلتُّقَاءُ ـ اَلْهُدٰى ـ اَلنُّوْرُ ـ كَلَامُ اللّٰهِ ـ اَلْمَجِيْدُ ـ حَبْلُ اللّٰهِ ـ اَلْمُهَيْمِنُ ـ اَلْحَكِيْمُ ـ اَلْحِكْمَةُ ـ اَلْبَلَاغُ ـ اَلتَّبْصِرَةُ ـ **اَلْبُرْهَانُ** ـ اَلْمُتَافِىْ ـ بَشِيْرٌ وَ نَذِيْرٌ ـ اَلرُّوْحُ ـ اَلْمُتَشَابِهُ ـ اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ ـ اَلْمُبِيْنُ ـ اَلْمَوْعِظَةُ ـ اَلْحَقُّ ـ اَلْكَرِيْمُ ـ **اَلْقَوْلُ** اَلْفَصْلُ ـ اَلْعُلٰى ـ اَلْبِنَاءُ ـ اَلْعَجَبُ ـ اَلْوَحْىُ ـ اَلْعَزِيْزُ ـ اَلْبَيَانُ ـ اَلتَّذْكِرَةُ ـ اَلْاَمْرُ ـ اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى ـ اَلْبَصَائِرُ ـ **اَلْعِلْمُ** ـ اَلْبُشْرٰى ـ اَلْكَرِيْمُ ـ مُبَارَكٌ ـ اَلْبَيِّنَةُ ـ اَلْهَادِىْ ـ اَلرَّحْمَةُ ـ اَلزَّبُوْرُ ـ اَحْسَنُ الْقَصَصِ ـ اَلْعَرَبِىُّ ـ اَلصِّدْقُ وَالْعِلَلُ ـ **اَلْعَظِيْمُ** اَلْمَرْفُوْعَةُ ـ اَلصُّحُفُ ـ اَلتَّنْزِيْلُ ـ

[**বিস্তারিত জানার** জন্য দেখুন উলুমূল কুরআন : আল্লামা ইসহাক ফরিদী পৃ. ৩৭-৫০]

http://islamiboi.wordpress.com

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য : ইমামুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য তিনটি- تَهْذِيْبُ النُّفُوْسِ الْبَشَرِيَّةِ وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَنَفْىُ الْاَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ
আত্মার সংশোধন, বাতিল আকীদার মূলোৎপাটন এবং ভ্রান্ত আমলের মূলোচ্ছেদ'। -[আল ফাউজুল কাবীর]

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

الٓرٰ ـ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ

এই কিতাব, আমি এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকে তার পথে যিনি পরাক্রমশালী প্রশংসাময়। -[সূরা ইবরাহীম : ১]

কুরআন নাজিলের ইতিহাস : সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল কুরআন লাওহে মাহ্ফূযে সুরক্ষিত রয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ
অর্থাৎ বরং তা [সেই] কুরআন [যা] লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত রয়েছে। -[সূরা বুরুজ : ২১ ও ২২]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ অর্থাৎ এটা তো রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে [লাওহে মাহফূজে]; এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ। -[সূরা যুখরুফ : ৪]

অতঃপর লাওহে মাহ্ফূয থেকে দুই পর্যায়ে কুরআন নাজিল হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সম্পূর্ণ কুরআন একই সঙ্গে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানের 'বায়তুল ইযযাতে' নাজিল করা হয়।

'বায়তুল ইযযা'-কে বায়তুল মামূরও বলা হয়। এটি কা'বা শরীফের বরাবর উপরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে ফেরেশতাগণের ইবাদতগাহ্। এখানে পবিত্র কুরআন একসাথে লাইলাতুল ক্বদরে নাজিল করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি প্রয়োজন সাপেক্ষে অল্প অল্প করে দীর্ঘ তেইশ বছরে নাজিল হয়।[১]

প্রথম অবতীর্ণ আয়াত : নির্ভরযোগ্যে বর্ণনা মতে রাসূল ﷺ -এর প্রতি সর্ব প্রথম যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, সেগুলো ছিল সূরা আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত। ইমাম বুখারী হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি প্রথম ওহী নাজিল হয়েছিল হেরা গুহায়। তিনি নির্জনে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাতের পর রাত হেরা গুহায় কাটিয়ে দিতেন। এ অবস্থাতেই এক রজনীতে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হেরা গুহায় তাঁর নিকট এসে বলেন, اِقْرَأْ [পড়ুন] রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, আমি পড়তে জানি না। এ উত্তর শুনে হযরত জীব্রাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -কে বুকে চেপে ধরেন। অতঃপর ছেড়ে দিয়ে আবারো বলেন اِقْرَأْ [পড়ুন]। রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, আমি পড়তে জানি না। তিন বারের পর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি পড়ব? নাজিল হলো-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। -[সূরা আলাক : ১-৩]

এই ছিল তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কয়েকটি আয়াত। এর পর তিন বছর ওহী নাজিলের ধারা বন্ধ থাকে। এ সময়কে ফাতরাতুল ওহী'র কাল বলা হয়। তিন বছর পর পুনরায় রাসূল ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে দেখতে পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে সূরা মুদ্দাসসির -এর কয়েকটি আয়াত শোনালেন। এরপর থেকেই নিয়মিত ওহী নাজিলের ধারা শুরু হয়। -[বুখারী শরীফ খ. ১ম, পৃ. ২-৩; উলূমুল কুরআন : ৫৬]

কুরআন নাজিলের পরিসমাপ্তি ও কুরআনের শেষ আয়াত : একাদশ হিজরিতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের একাশি দিন মতান্তরে নয় দিন পূর্বে কুরআন নাজিল সমাপ্ত হয়। শেষ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের মাত্র ৯ দিন পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়

---

১. ওহীর এ উভয়বিধ অবতরণের ভাবকে কুরআনুল কারীম দুটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। একটি হলো ইনযাল অপরটি হলো তানযীল। ইনযাল শব্দের অর্থ- কোনো বস্তু বা বিষয়কে সম্পূর্ণ এক দফায় নাজিল করা। তানযীল শব্দের অর্থ- কোনো বস্তু বা বিষয়কে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে নাজিল করা। সুতরাং কুরআনের যেখানে ইনযাল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সাধারণত লাওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে। আর যেখানের তানযীল শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে হুজুর ﷺ -এর প্রতি ধীরে ধীরে অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। তারপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার হবে না। –[সূরা বাকারা : ২৮১]

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ৯ দিন পর রাসূলে কারীম ﷺ ইহলোক ত্যাগ করেন। তবে শেষ আয়াত সম্পর্কে সাধারণভাবে জানা যায় যে, সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতের অংশটুকু অবতীর্ণ হয় সর্বশেষে

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। –[সূরা মায়িদা : ৩]

উল্লেখ্য, এ আয়াতটি নাজিল হয়েছিল দশম হিজরির জিলহজ মাসে আরাফাতের ময়দানে এবং একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসের দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, এরপরও কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তবে যেহেতু উল্লিখিত আয়াতটি নাজিলের পর শরিয়তের বিধান সম্বলিত অন্য কোনো আয়াত নাজিল হয়নি, এ জন্যই অনেকে ধারণা করেছেন যে, এটাই হচ্ছে কুরআনের নাজিলকৃত শেষ আয়াত। –[উম্মুল কুরআন, আল্লামা ইসহাক ফরিদী : ১১৩]

আল-কুরআনুল কারীম এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাজিল করা এবং পরে পর্যায়ক্রমে নাজিল করার তাৎপর্য : আল-কুরআনুল করীম এক সাথে দুনিয়ার আসমানে নাজিল করার তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম আবূ শামাহ (র.) বলেন, এর দ্বারা আল-কুরআনের উচ্চতম মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। তাছাড়া ফেরেশতাগণকেও এ তথ্য অবগত করানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এটিই আল্লাহর শেষ কিতাব যা দুনিয়ার মানুষের হেদায়েতের জন্য নাজিল করা হয়েছে। শায়খ যুরকানী (র.) বলেন, এভাবে দুই বারে নাজিল করে একথাও বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এই কিতাব সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে। তদুপরি রাসূল ﷺ -এর পবিত্র বক্ষদেশ ছাড়াও আরো দু'জায়গায় তা সুরক্ষিত রয়েছে। লাওহে মাহফুয এবং বায়তুল মা'মূরে। রাসূল ﷺ -এর বয়স ৪০ বছরে পৌঁছলে রমজান মাসে লাইলাতুর কদরে কুরআন নাজিল শুরু হয়।

–[প্রাগুক্ত : ১১১]

কুরআনুল কারীম পর্যায়ক্রমে নাজিল হলো কেন? : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কুরআন একবারে নাজিল হয়নি, হয়েছে ধীরে ধীরে, পর্যাক্রমে; সুদীর্ঘ তেইশ বছরে। অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ তথা তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ আকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কুরআন নাজিল হয়েছে ধীরে ধীরে। কখনো এক আয়াত, কখনো দু'তিন আয়াত, আবার কখনো এক সূরা।

কুরআনের সর্বাপেক্ষা ছোট যে আয়াতের অংশ নাজিল হয়েছে তা ছিল সূরা নিসার ৯৫নং আয়াতের অংশ বিশেষ তথা– غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ অথচ অপরদিক সমগ্র সূরা আন'আম একই সঙ্গে নাজিল করা হয়েছে।

কুরআন শরীফকে একবারে নাজিল না করে অল্প অল্প করে নাজিল কেন করা হলো? এ প্রশ্ন আরবের মুশরিকরাও রাসূল ﷺ -কে করেছিল। এর উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا

"এবং কাফেররা বলে, কুরআন তাঁর প্রতি একবারে কেন নাজিল করা হলো না? এভাবে [ধীরে ধীরে আমি পর্যায়ক্রমে নাজিল করেছি] যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়মূল করে দেওয়া যায় এবং আমি তা ধীরে ধীরে পাঠ করেছি। তাছাড়া এরা এমন কোনো প্রশ্ন উথাপন করতে পারবে না যার [মোকাবিলায় আমি যথার্থ সত্য এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পেশ করবো না।"

–[সূরা ফুরকান : ৩২]

ইমাম তবারী (র.) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কুরআন শরীফ পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার যে তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, তাই এখানে হুবহু তুলে ধরা হচ্ছে। তিনি লিখেছেন–

http://islamiboi.wordpress.com

১. রাসূল ﷺ উম্মি ছিলেন। লেখাপড়া চর্চা করতেন না। এমতাবস্থায় কুরআন যদি একই সাথে একবারে নাজিল হতো, তবে তা স্মরণ রাখা বা অন্য কোনো পন্থায় সংরক্ষণ করা হয়তো তাঁর পক্ষে কঠিন হতো। অপরপক্ষে হযরত মূসা (আ.) যেহেতু লেখাপড়া জানতেন, সে জন্য তার প্রতি 'তাওরাত' একই সঙ্গে নাজিল করা হয়েছিল। কারণ তিনি লিপিবদ্ধ আকারে তাওরাত সংরক্ষণে সমর্থ ছিলেন।

২. কুরআনের প্রধান অংশ বিধান সম্বলিত। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে নাজিল করা হয়েছে, যেন বিধানের উপর আমল সহজ হয়ে যায়। এক সাথে নাজিল হলে সকল বিধানের উপর আমল করা দুষ্কর ছিল।

৩. বারবার ঘন ঘন হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর আগমন রাসূল ﷺ -এর মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ছিল।

৪. কুরআন শরীফের উল্লেখযোগ্য অংশ বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে। এমতাবস্থায় সে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার পর এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে সে সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এতে একাধারে যেমন মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় তেমনি সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অগ্রিম সংবাদ প্রদানের ফলে কুরআনের অভ্রান্ততা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ হয়। -[প্রাগুক্ত : ১১২, ১১৩]

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস

নবী যুগে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ :

- **হিফয বা মুখস্থকরণ :** কুরআনে কারীম যেহেতু একত্রে অবতীর্ণ হয়নি; বরং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে অল্প অল্প করে নাজিল হয়েছে। এ কারণে মহানবী ﷺ -এর যুগে কুরআনে কারীম গ্রন্থাকারে একত্রে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল না। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আসমানি কিতাবের মোকাবিলায় পবিত্র কুরআনের স্বতন্ত্র মর্যাদা রেখেছেন। আর তা হলো কাগজ কলমের তুলনায় তাঁর অধিক হেফাজত হাফেজগণের সীনার মাধ্যমে করবেন। মুসলিম শরীফে আছে- আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে বলেছেন- وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ

অর্থাৎ আমি তোমার উপর এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করব, যা পানি ধুয়ে মুছে ফেলতে সক্ষম হবে না।

এ কথার ভাবার্থ এই যে, পৃথিবীর সাধারণ কিতাবপত্রের অবস্থা হলো দুনিয়াবী আপদ-বিপদের কারণে তা নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু কুরআনে কারীমকে সীনার মাধ্যমে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। এ কারণে প্রথমত কুরআন হেফাজতের জন্য মুখস্থ করণের প্রতি সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছিল।

ওহী অবতীর্ণের প্রাথমিক জামানায় মহানবী ﷺ ওহীর শব্দাবলি সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত উচ্চারণ করতেন যেন তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কিয়ামার এ আয়াত অবতীর্ণ হলো-

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

"তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এ সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব"।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে আশ্বাস দিচ্ছেন যে, কুরআন কণ্ঠস্থ করার জন্য ওহী অবতীর্ণ অবস্থায় শব্দাবলি সাথে সাথে উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আপনার মধ্যে এমন প্রখর স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দিবে যে, একবার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর আপনি তা কখনও ভুলবেন না। এ কারণে ওহী নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই তা মহানবী ﷺ -এর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত। এভাবেই রাসূল ﷺ -এর সীনা মুবারক পবিত্র কুরআনের এমন এক সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয়ে গেল যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ ও ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কাটুকুও বিদ্যমান ছিল না। এতদসত্ত্বেও মহানবী ﷺ অধিক সতর্কতার জন্য প্রতি রমজানে জীবরাঈল (আ.)-কে নাজিলকৃত ওহীর অংশ তেলাওয়াত করে শুনাতেন এবং হযরত জীবরাঈল (আ.)-এর নিকট হতেও তেলাওয়াত শুনতেন। তিরোধানের বছর মহানবী ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে সমগ্র কুরআন দু'বার শুনিয়েছেন এবং তার কাছ থেকে শুনেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমত সাহাবায়ে কেরামকে অবতীর্ণ ওহীর আয়াতগুলো মুখস্থ করাতেন, অতঃপর তার মর্মার্থ শিক্ষা দিতেন। নবীন সাহাবীদের মধ্যে কুরআন মুখস্থকরণ ও তার মর্মার্থ শিক্ষা করার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এমন কি অনেক মহিলা সাহাবী পাত্রের প্রতি বিবাহের পর কুরআন শিক্ষা দেওয়ার শর্ত জুড়ে দিতেন।

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেন যে, পুণ্যভূমি মক্কা ছেড়ে কেউ হিজরত করে মদীনায় এলে কুরআন শিক্ষার জন্য তাকে একজন আনসারীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হতো। মসজিদে নববীতে অতি উচ্চকণ্ঠে কুরআন শরীফের শিক্ষা ও তেলাওয়াত হতো। অবশেষে রাসূল ﷺ নমনীয় করে তেলাওয়াতের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

নিয়মিত অসাধারণ অধ্যাবসায় ও সীমাহীন আগ্রহ-উদ্দীপনার ফলে খুব সামান্য সময়ের ব্যবধানে নবীন সাহাবীগণের মধ্য হতে হাফেজে কুরআনের একটি দল প্রস্তুত হয়ে গেল। উক্ত জামাতের মধ্যে ৪ জন খলীফা ছাড়াও হযরত তালহা, সাআদ ইবনে মাসঊদ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, সালিম ইবনে উবাইদ, আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আমর ইবনুল আস, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, মুআবিয়া, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর,আব্দুল্লাহ ইবনে সায়িব, আয়েশা, হাফসা ও উম্মে সালমা (রা.) প্রমুখ সাহাবাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সারকথা, নবুয়তের প্রাথমিক যুগে কুরআন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থ করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো। কারণ সে যুগে একদিক থেকে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অপরদিকে বই পুস্তক প্রকাশের উপযোগী উপকরণের অস্তিত্বই ছিল না বলা চলে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি ওহী শুধু লেখার উপর নির্ভর করা হতো, তাহলে কুরআন সংরক্ষণ ও ব্যাপক প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতো। বিধায় কুরআন মুখস্থকরণের প্রতি অধিক পরিমাণ গুরুত্বই দেওয়া হয়েছিল। ফলে ওহী মুখস্থকরণের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। -[উলূমুল কুরআন : তকী উসমানী ১৭৩ ও১৭৪]

- **কিতাবত বা লিপিবদ্ধকরণ :** মহানবী ﷺ কুরআনে কারীম মুখস্থ করানোর সাথে সাথে লিপিবদ্ধ আকারে রাখারও সুব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন লেখাপড়া জানা সাহাবীকে এ গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হলে ওহী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবীকে ডেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতখানা কোন সূরার কোন আয়াতের আগে বা পরে সংযোজন করতে হবে তা বলে দিতেন। ফলে সেভাবেই তা লিখা হতো।

ওহী লিখে রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন–

كُنْتُ اَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اَخَذَتْهُ بُرَحَاءُ شَدِيْدَةٌ وَعَرَقٌ مِثْلَ الْجُمَانِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَكُنْتُ اَدْخُلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْكَتِفِ اَوْ كِسْرَةٍ فَاَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِيْ عَلَيَّ فَمَا فَرَغَ حَتّٰى تَكَادُ رِجْلِيْ تَنْكَسِرُ مِنْ ثِقْلِ الْقُرْاٰنِ حَتّٰى اَقُوْلَ لَا اَمْشِيْ عَلٰى رِجْلِيْ اَبَدًا فَاِذَا فَرَغْتُ قَالَ اِقْرَأْ فَاَقْرَأُهُ فَاِنْ كَانَ فِيْهِ سِقْطٌ اَقَامَهُ ثُمَّ اَخْرُجُ بِهِ اِلَى النَّاسِ.

"আমি ওহী লিখে রাখার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। যখন মহানবী ﷺ -এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো তখন তার সর্ব শরীরে মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে যেত। এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর আমি দুম্বার চামড়া, হাড় অথবা লিখে রাখার উপযোগী কোনো কিছু নিয়ে উপস্থিত হতাম। লেখা সমাপ্ত করার পর আমার শরীরে কুরআনের এমন ওজন অনুভূত হতো, যেন আমার পা ভেঙ্গে গেছে। আমি যেন চলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। লেখা শেষ হলেই মহানবী ﷺ বলতেন, আমাকে পড়ে শুনাও। আমি পড়ে শুনাতাম। কোথাও কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা ঠিক করে দিতেন। এবং সংশ্লিষ্ট ওহীর অংশটুকু অন্যদের সামনে পাঠ করতেন। -[তাবারানী সূত্রে উম্মুল কুরআন : তাকী উসমানী : ১৭৮]

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) ছাড়াও প্রথম চার খলিফাসহ আরো কিছু সংখ্যক অন্যতম সাহাবী ওহী লিখে রাখার গুরুদায়িত্ব লাভ করেছিলেন। -[প্রাগুক্ত : ১৭৮]

যেসব বস্তুতে ওহী লিপিবদ্ধ করা হত : সে যুগে আরব দেশে কাগজ দুষ্প্রাপ্য ছিল বিধায় কুরআনের আয়াত প্রথমত : পাথর শিলা, শুকনো চামড়া, খেজুরের ডাল, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা ও পশুর হাড়ে লিখা হতো। ওহী লিপিবদ্ধকরণ কাজে কখনও কাগজের টুকরাও ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। -[প্রাগুক্ত : ১৭৯]

লিখিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান : লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহের মধ্যে এমন একখানা পাণ্ডুলিপি ছিল, যা মহানবী ﷺ তার বিশেষ তত্ত্বাবধানে একান্ত নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। যা পরিপূর্ণ কিতাব আকারে ছিল না, বরং পাথর শিলা, চামড়া ও সে যুগের লিখন সামগ্রীর সমষ্টিরূপে সংরক্ষিত ছিল। ওহীর নির্ধারিত লেখকমণ্ডলী ছাড়াও সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কিছু সংখ্যক আয়াত ও কোনো কোনো সূরা লিখে রাখতেন এবং এ ব্যক্তিগত লিখনের প্রচলন ইসলামের প্রাথমিক যুগ [illegible] সূত্র [illegible]–

http://islamiboi.wordpress.com

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ إِلٰى أَرْضِ الْعَدُوِّ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনে কারীম সঙ্গে করে শত্রুদেশে গমন করতে নিষেধ করেছেন।

অন্যত্র মহানবী ﷺ বলেছেন–

قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِيْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِى الْمُصْحَفِ يُضَاعِفُ عَلٰى ذٰلِكَ اَلْفَىْ دَرَجَةٍ .

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কুরআনে কারীম না দেখে পড়লে এক হাজার গুণ ছওয়াব পাবে। আর দেখে পড়লে দু'হাজার গুণ। উল্লিখিত দুটি বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ-এর যুগেই সাহাবীদের কাছে কুরআনের ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি ছিল। যদি তা-ই না হতো তবে কুরআনে কারীম দেখে পড়া ও শত্রুদেশে তা নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসতো না।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তার বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রা.) ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর হাতে সূরা তোয়াহার কতিপয় আয়াত সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, যা হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) পাঠ করেছিলেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকালে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ : যেহেতু মহানবী ﷺ-এর যুগে চামড়া হাড়, পাথর শিলা, গাছের পাতা ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ কুরআনে কারীমের পাণ্ডুলিপি পরিপূর্ণ কিতাব আকারে সংকলিত ছিল না এবং সাহাবীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের নুসখাও ছিল অপূর্ণাঙ্গ। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তাফসীরও লিখে রেখেছিলেন। তাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সকল বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলো একত্র করে পরিপূর্ণ নুসখা প্রস্তুতকরণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং কুরআনে কারীমকে একত্রে সংকলন ও সংরক্ষণের প্রশংসনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করেন।

কি কারণে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কুরআন শরীফের একটি পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংকলন ও সংরক্ষণের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং উক্ত গুরু দায়িত্ব কাদের দ্বারা কিভাবে সম্পাদিত হলো, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন,

ইয়ামামার যুদ্ধের পরপরই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আমাকে জরুরি ভিত্তিতে আহবান করলেন। আমি সেখানে পৌঁছে হযরত ওমর (রা.)-কে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) বললেন, হযরত ওমর (রা.) এসে আমাকে বলছেন যে, ইয়ামামর যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফিজে কুরআন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। এভাবে বিভিন্ন যুদ্ধে হাফিজ সাহাবী শহীদ হলে কুরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং আমি অভিমত ব্যক্ত করছি যে, আপনি জরুরি নির্দেশের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে একত্রে সংকলনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করুন!

এ মর্মে আমি হযরত ওমর (রা.)-কে বলছি, যে কাজ মাহনবী ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় সম্পাদন করেননি, তা আমার জন্য করা সমীচীন হবে কিনা, তা ভাবছি। হযরত ওমর (রা.) উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ! এ কাজ অতি উত্তম। একথা তিনি বারংবার বলতে থাকায় আমার অন্তরে উক্ত কাজের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) আমাকে [যায়েদ ইবনে সাবিত] বললেন, তুমি একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন উদ্যমী যুবক। তোমার সততা, সাধুতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। এতদ্ভিন্ন তুমি মহানবী ﷺ -এর যুগে ওহী লিপিবদ্ধকরণ কাজে নিয়োজিত ছিলে। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন সাহাবীর নিকট হতে বিক্ষিপ্ত সূরা ও বিভিন্ন আয়াতসমূহ একত্র করত লিপিবদ্ধ করতে থাক।

হযরত যয়েদ ইবনে সাবিত (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! তাঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড়কে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতেন তাতেও আমার কাছে এতটুকু বোঝা মনে হতো না, যতটা কঠিন মনে হচ্ছে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি বললাম, আপনি এ কাজ কিভাবে করতে চান? যা মহানবী ﷺ নিজে করেননি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উত্তর দিলেন। এ কাজ অতি উত্তম এ কথা তিনি বারংবার বলতে লাগলেন। এমনকি অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর অভিমতের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। তাই আমি খেজুরের ডাল, পাথর শিলা, চামড়া ও পশুর হাড় ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ বিচ্ছিন্ন সূরা ও আয়াতসমূহ একত্র করতে লাগলাম। সাহাবীদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কুরআনের সাথে যাচাই বাছাই করে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে সংকলনের কাজ শেষ করলাম। –[প্রাগুক্ত : ১৮১ ও ১৮২]

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর পক্ষ হতে কুরআনে কারীম একত্রে লিপিবদ্ধ ও সংকলনের ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রম : এখানে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর পক্ষ হতে কুরআনে কারীম একত্রে লিপিবদ্ধ ও সংকলনের ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) একজন হাফেজে কুরআন সাহাবী ছিলেন। সুতরাং নিজের স্মৃতি থেকে পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম ছিলেন। তাছাড়াও বহু হাফেজে কুরআন সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। যাদেরকে সমবেত করে সমগ্র কুরআন একত্র করে লিপিবদ্ধ করা মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। বিশেষ করে মহানবী ﷺ -এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তা থেকেও তিনি লিখে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে অধিকতর সতর্কতার জন্য তিনি সবগুলো উপকরণকে একত্র করে উক্ত সংকলনের কাজ সম্পাদন করেন। প্রত্যেকটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি লিখিত নুসখা এবং অন্যান্য হাফেজদের তেলাওয়াত সবগুলোর সাথে যাচাই-বাছাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। মহানবী ﷺ -এর দরবারে যাঁরা কাতিবে ওহীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে তাঁদের নিকট হতে সবগুলো নুসখা সংগ্রহ করত হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) -এর নিকট উপস্থিত করা হয়। কাতিবীনে ওহী সাহাবীদের নিকট হতে সংগ্রহকৃত পাণ্ডুলিপিসমূহ নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতিতে যাচাই করা হয়–

১. হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) সর্বপ্রথম তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে উক্ত পাণ্ডুলিপি যাচাই করতেন।
২. হযরত ওমর (রা.) ও হাফেজে কুরআন ছিলেন। ফলে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁকেও হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর সাথে উক্ত কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তারা দু'জন যৌথভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপিসমূহ গ্রহণপূর্বক একজনের পর আরেকজন নিজ নিজ স্মৃতির সাথে যাচাই করতেন।
৩. কমপক্ষে দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গহণ করতেন, তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিত যে, এই আয়াতগুলো মহানবী ﷺ -এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দু'জনের সাক্ষ্য ব্যতীত কোনো আয়াত গ্রহণ করতেন না।
৪. অতঃপর লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে সঠিকভাবে যাচাই করে মূল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত করা হতো।

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) অত্যন্ত সাবধানতার সাথে কুরআনে কারীমের পরিপূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করত ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।

কিন্তু যেহেতু প্রত্যেকটি সূরা আলাদা করে লেখা হয়েছিল। এ কারণে তা অনেকগুলো সহীফায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কালের পরিভাষায় উক্ত সহীফাগুলোকে "উম্ম" বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হতো।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর উদ্যোগে সংকলিত এ পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তা হযরত ওমর (রা.) তার নিজের হেফাজতে রেখে দেন। হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর নুসখাটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।

অবশেষে হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক সূরাসমূহের তারতীব অনুসারে লিখন পদ্ধতিসহ পবিত্র কুরআনের শুদ্ধতম পাণ্ডুলিপি তৈরি করে চারিদিকে বিতরণের পর হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট রক্ষিত নুসখাটি নষ্ট করে ফেলা হয়। কেননা সর্বসম্মত লিখন পদ্ধতিবিহীন ও সূরার তরতীববিহীন পাণ্ডুলিপি কারো কাছে অবশিষ্ট থাকলে সাধারণ মানুষ এতে বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা ছিল। –[প্রাগুক্ত : ১৮২–১৮৪]

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ : হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলাম আরব ভূমির সীমানা পেরিয়ে রোম, ইরান ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি নতুন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম মুজাহিদ ও বণিকদের নিকট হতে কুরআনে কারীম শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। আমরা জানি, কুরআনে কারীম সাতটি কেরাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। সাহাবীগণও বিভিন্ন কেরাতে মহানবী ﷺ -এর নিকট হতে তেলাওয়াত শিক্ষা করে তদনুযায়ী লোকদেরকে শিখাচ্ছিলেন। এভাবে শুধু আরবেই নয়; বরং দূর দেশেরও বিভিন্ন কেরাতে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করা হচ্ছিল। এতে করে মানুষের মধ্যে কোথাও কোথাও কেরাতের ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবিরোধ এমকি ঝগড়া বিবাদ পর্যন্ত শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কেরাত পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ ও অপর পদ্ধতিকে ভুল বলে আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করে। ফলে পারস্পরিক মতবিরোধ ও ভুল বুঝা-বুঝির অবসান ঘটানো ও আল্লাহর নবীর সমর্থিত কেরাত পদ্ধতিকে ভুল বলে অবহিত করার মতো মারাত্মক পাপ থেকে মানুষকে রক্ষা করা একটি জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পবিত্র মদিনায় রক্ষিত হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কর্তৃক লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কোনো

http://islamiboi.wordpress.com

নির্ভরযোগ্য নুসখা ছিল না। উক্ত সমস্যার সমাধানের একটিই মাত্র পন্থা ছিল তা হলো এমন একটি লিপি পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনে কারীমকে লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছাড়িয়ে দেওয়া, যে লিপি পদ্ধতির মাধ্যমে সাত কেরাতের তেলাওয়াত সম্ভবপর হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখা দিলে উক্ত পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে সে সমস্যার সঠিক সামাধান দেবে। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) তাঁর খেলাফতকালে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করেছেন।[১]

এ উদ্দেশ্য হযরত উসমান (রা.) সর্বপ্রথম নবী পত্নী হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকটে রক্ষিত হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক লিপিবদ্ধ পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিলেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে সূরাসমূহের তারতীব ও বিশুদ্ধতম নুস্খা তৈরির উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড গঠন করে তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন। সদস্যগণ হলেন, সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত,আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনুল আস এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা.)। হযরত উসমান (রা.) উক্ত কমিটিকে নির্দেশ দিলেন যে, হযরত আবূ বকর (রা.) কর্তৃক সংকলিত নুস্খাকেই শুধুমাত্র এমন একটি সর্বসম্মত লিখন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করুন, যার সাহায্যে প্রত্যেকটি নুস্খা শুদ্ধ কেরাত পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠ করা সম্ভব হয়।

উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন সহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে সবিত (রা.) ছিলেন আনসার। আর বাকি তিনজন ছিলেন কুরাইশী। হযরত উসমান (রা.) বললেন, যদি লিখন পদ্ধতি নিয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর সাথে অন্যান্যদের মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কুরাইশদের লিখন পদ্ধতিই অনুসরণ করবে। কেননা পবিত্র কুরআন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি হলেন কুরাইশী এবং কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষাই কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে উক্ত চারজনকে নুস্খা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হলেও আরো অনেকেই বিভিন্নভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করছেন। তারা কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলো সম্পাদন করেন।

১. হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উদ্যোগে লিখিত পাণ্ডুলিপিতে সূরাসমূহ ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে পৃথক পৃথক নুস্খায় লিখা হয়েছিল। আর উক্ত কমিটি সমস্ত সূরা ক্রমানুসারে একই মাসহাফে বিন্যস্ত করেন।

২. আয়াতসমূহ এমন এক লিখন পদ্ধতির অনুসরণে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা দ্বারা সবগুলো বিশুদ্ধ কেরাত পদ্ধতিতে তেলাওয়াত সম্ভব হয়। এ কারণে অক্ষরসমূহে নুকতা, যবর, যের ও পেশ দেওয়া হয়নি।

৩. তখন পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের নির্ভরযোগ্য ও সর্বসম্মত একটি মাত্র নুস্খা ছিল। উক্ত কমিটি একাধিক নুস্খা প্রস্তুত করেন। বর্ণনা অনুযায়ী হযরত উসমান (রা.) পাঁচটি নুস্খা তৈরি করান আবূ হাতেম সাজেস্তানীর মতে হযরত উসমান (রা.) সাতটি নুস্খা তৈরি করান। নুসখাগুলো মক্কা, সিরিয়া, বসরা ও কূফায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং একটি নুসখা অত্যন্ত যত্নসহকারে পবিত্র মদীনায় সংরক্ষণ করা হয়।

---

১. **হাদীস** গ্রন্থসমূহে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনপূর্বক বিরাজিত সমস্যার সমাধানের পটভূমি এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) আযারবাইজান ও আর্মেনিয়া এলাকায় জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ, ঝগড়া-বিবাদ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি পবিত্র মদীনায় ফিরেই সর্বপ্রথম হযরত উসমান (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহর কিতাব নিয়ে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মতো মতবিরোধে লিপ্ত হওয়ার আগে আপনি এর সুষ্ঠু সমাধানের ব্যবস্থা করুন।

হযরত উসমান (রা.) হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) থেকে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানতে চান হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পৃথক পৃথক কেরাত পদ্ধতির অনুসরণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ, একে অন্যকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা পর্যন্ত গড়িয়েছে। তিনি বিস্তারিত জানার পর সঠিক সমাধানের জন্য বিশিষ্ট সাহাবীদের জামায়েত করে পরামর্শ চান। সাহাবীগণ ঘটনা জানার পর হযরত উসমান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ ব্যাপারে কি চিন্তা করেছেন? তিনি বললেন, আমার অভিমত হলো সকল বিশুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটি সর্বসম্মত পাণ্ডুলিপি তৈরি করা, যাতে কেরাত পদ্ধতির মধ্যে কোনো প্রকার মতানৈক্যের অবকাশ না থাকে। উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা.)-এর অভিমতটি সমর্থন করেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন।

হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের পর সর্বস্তরের জনসাধারণকে একত্র করে এ মর্মে এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আপনারা মদীনায় আমার অতি নিকটে অবস্থান করেও কুরআনে কারীম নিয়ে মতবিরোধ করছেন, একে অন্যকে দোষারোপ করছেন এতেই প্রতীয়মান হয় দূরদেশে অবস্থানকারীরা আরো অধিক মতবিরোধ ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত রয়েছে। সুতরাং আসুন আমরা সবাই মিলে কুরআনে কারীমের এমন একটি নুসখা তৈরি করি, যে পাণ্ডুলিপিতে কারো পক্ষেই কোনো মতবিরোধ করার সুযোগ থাকবে না এবং সবার জন্য সেটি অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

৪. লেখার সময় হযরত আবূ বকর (রা.) -এর জমানায় লিখিত নুস্খার অনুসরণের সাথে তার জমানার পদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়। মহানবী ﷺ-এর যুগে সাহাবাদের কাছে যে সকল লিখিত অনুলিপি রক্ষিত ছিল, সেগুলো মূল নুস্খার সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হয়।

৫. কুরআনে কারীমের এই সর্বসম্মত ও নির্ভরযোগ্য চূড়ান্ত নুসখা প্রস্তুত হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) পূর্বেকার বিক্ষিপ্ত সকল নুসখা সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে হযরত উসমান (রা.)-এর কুরআন সংকলনের কাজকে সমর্থনপূর্বক সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। ফলে মুসলিম উম্মাহ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর এ কাজকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত আলী মুরতাজা (রা.) বলেছেন–

لَا تَقُوْلُوْا فِيْ عُثْمَانَ اِلَّا خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا فَعَلَ الَّذِيْ فَعَلَ فِي الْمَصَاحِفِ اِلَّا عَنْ مَلَاٍ مِّنَّا .

অর্থাৎ "হযরত উসমান গনী (রা.) সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই বলো না। কারণ আল্লাহর শপথ! তিনি কুরআন সংকলনের ব্যাপারে যা কিছু করেছেন, তা আমাদের সামনে আমাদের পরামর্শেই করেছেন।" –[প্রাগুক্ত : ১৮৭–১৯২]

তেলাওয়াত সহজীকরণ প্রচেষ্টা : হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক মাসহাফ তৈরির কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর দুনিয়ার সর্বত্র তার অনুলিপির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যেহেতু মূল উসমানী নুসখায় নুকতা এবং হরকত ছিল না, সে জন্য অনারবদের পক্ষে এ মাসহাফের তেলাওয়াত অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টকর ছিল। ইসলাম দ্রুত আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উসমানী অনুলিপিতে নুকতা এবং হরকত সংযোজন করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে শুরু থাকে। সর্ব সাধারণের জন্য তেলাওয়াত সহজতর করার লক্ষ্যে মূল উসমানী মাসহাফে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন ও সহজিকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। সংক্ষেপে সেই প্রক্রিয়াগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ–

نقطه নুকতা : আরবি ভাষাভাষীদের মাঝে হরফে নুকতা লাগানোর রীতি ছিল না। তাই লিখকগণ নুকতাবিহীন লেখায় অভ্যস্থ ছিলেন এবং পাঠকগণও এই নিয়মে পড়ায় এতই পারদর্শী ছিলেন যে, নুকতা ব্যতীত হরফ পড়তে কোনো ধরনের অসুবিধা হতো না।

শব্দের পূর্বাপরের সাহায্যে একই ধরনের বিভিন্ন হরফের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অনায়াসেই করতে পারতেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে তারা এতই অভিজ্ঞ ছিলেন যে, কখনো কখনো কেউ যদি তার লেখায় নুকতা দিতেন, তাহলে তাকে অনভিজ্ঞ বলে অভিহিত করা হতো।

সুতরাং মাসহাফে উসমানীও নুকতাবিহীন ছিল। তাছাড়া কুরআনে নুকতা না দেওয়ার আরো একটি কারণ হলো, যেন সকল কেরাতকেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরবর্তীতে আনারবী ও আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কে অনবহিতদের সুবিধার্থে কুরআনে নুকতা দেওয়া হয়।

তবে সর্বপ্রথম কে কুরআনে নুকতা দিয়েছেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক বর্ণনা মতে সর্বপ্রথম এ কাজ আঞ্জাম দেন আবুল আসওয়াদ দুওয়ায়লী (র.)। কেউ বলেছেন, এ কার্যাদি আবুল আসওয়াদ দুওয়ায়লী হযরত আলী (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করেছেন। ঐতিহাসিক আবুল ফরয বলেন, কূফার গভর্নর তার দ্বারা এই কাজ করিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, এ কাজ হাসান বসরী, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও নাদর ইবনে আছিম (র.)-এর দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ করিয়েছেন।

এক বর্ণনা মতে আরবি রুসমুলখত্ব -এর প্রবর্তক হলেন বোলান গোত্রের মুরারা ইবনে মুররাহ আসলাম ও আমির ইবনে হাররাহ। মুরারাহ হলেন হরফের আকৃতির প্রবর্তক, আসলাম সংযুক্ত ও বিচ্ছিন্নকরণের নিয়ম-নীতির প্রবর্তক এবং আমির হলেন নুকতার প্রবর্তক।

অন্য এক বর্ণনা মতে নুকতার সর্বপ্রথম প্রচলন হয় হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব -এর দাদা আবূ সুফিয়া ইবনে উমাইয়া থেকে। তিনি শিখেছেন হিরার অধিবাসীদের থেকে।

حركات হারাকাত বা যবর যের পেশ : নুকতার মতো কুরআনুল কারীমে হরকতের [যবর, যের, পেশ] প্রচলনও প্রথম জামানায় ছিল না। সর্বপ্রথম কে পবিত্র কুরআনে হরকত লাগিয়েছেন, এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী হরকত সংযোজন করেন। কেউ কেউ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও নসির ইবনে আসেম লাইসী দ্বারা হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ এ কাজ করিয়েছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

সকল রেওয়ায়েতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ কথাই বুঝে আসে যে, হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী সর্বপ্রথম হরকত প্রবর্তন করেন।

তবে তৎকালের হরকত আর বর্তমান সময়ের হরকতের মাঝে রয়েছে যথেষ্ট পার্থক্য। তৎকালে যবরের জন্য হরফের উপর এক নুকতা, যেরের জন্য হরফের নীচে এক নুকতা, এবং পেশের জন্য তদ্রূপ হরফের সামনে এক নুকতা এবং তানবীনের জন্য দুই নুকতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীতে খলীল আহমদ (র.) হামজা ও তাশদীদ-এর আলামত প্রবর্তন করেন এবং কিছু দিন পরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুরা, নাসির ইবনে আসম লাইসী ও হাসান বসরী (র.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে একই সময়ে নুকতা এবং হারাকাত লাগানোর নির্দেশ দেন। তখন হরকত প্রকাশের জন্য নুকতার পরিবর্তে বর্তমানের যবর, যের পেশ নির্ধারণ করা হয়। যাতে হরফের নুকতার সাথে এর সংমিশ্রণ না হয়।

حِزْبٌ وَمَنْزِلٌ **মানযিল বা হিযব :** সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এবং তাবেয়ীগণ সপ্তাহে কমপক্ষে একবার কুরআর মাজীদ খতম [শেষ] করতেন। আর এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দৈনন্দিন তেলাওয়াতের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন, যাকে মানযিল বা হিযব বলা হয়। তাই তাঁরা পাঠের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৭ মানযিলে বিভক্ত করেছেন–

প্রথম মানযিল : সূরা ফাতিহা হতে সূরা আননিসা -এর শেষ পর্যন্ত

দ্বিতীয় মানযিল : সূরা মায়িদা হতে সূরা আত তাওবা -এর শেষ পর্যন্ত

তৃতীয় মানযিল : সূরা ইউনূস হতে সূরা আন নাহল -এর শেষ পর্যন্ত

চতুর্থ মানযিল : সূরা বনী ইসরাঈল হতে সূরা আল ফুরকান -এর শেষ পর্যন্ত

পঞ্চম মানযিল : সূরা আশ-শুআরা হতে সূরা ইয়াসীন -এর শেষ পর্যন্ত

ষষ্ঠ মানযিল : সূরা আস্‌সাফফাত হতে সূরা আল হুজরাত -এর শেষ পর্যন্ত

সপ্তম মানযিল : সূরা কাফ হতে শেষ সূরা পর্যন্ত।

جزء **বা পারা :** পবিত্র কুরআনে ত্রিশটি অংশে বিভক্ত যাকে ত্রিশ পারা বলা হয়। পারার এই বিভক্তি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে **করা** হয়নি; বরং পড়তে যাতে সহজ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সমান অংশে কুরআনে কারীমকে বিভক্ত করা হয়েছে। **নিশ্চিতভাবে** বলা কঠিন যে, ত্রিশ পারার এই বিভক্তি সর্বপ্রথম কে করেছেন? তবে কারো কারো ধারণা এটা নবী জামাতা **হযরত** উসমান (রা.) মাসহাফ অনুকপি করানোর সময় পৃথক পৃথক ত্রিশটি পারায় [সহীফায়] লিপিবদ্ধ করিয়েছেন। কিন্তু **আল্লামা** তকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের কিতাবে আমি -এর কোন দলিল এ পর্যন্ত পাইনি

আল্লামা বদরুদ্দীন যারকাশী (র.) বলেন, কুরআনের ত্রিশ পারার এই নিয়ম প্রসিদ্ধভাবে ধারাবাহিকতার সাথে চলে আসছে **এবং মাদরাসাসমূহের** কুরআনী নুসখায়ও এটা প্রচলিত রয়েছে। বাহ্যত মনে হয় যেন এই বণ্টনধারা সাহাবা পরবর্তী যুগে **শিক্ষাদানের** সুবিধার্থে করা হয়েছে।

أَخْمَاسٌ وَأَعْشَارٌ **খুমুস এবং আ'শার :** প্রথম যুগের কুরআনি নুসখায় আরেকটি প্রচলন ছিল, তা হলে– পাঁচ আয়াতের **পরে হাশিয়াতে** খামছ বা خ এবং দশ আয়াত শেষে আ'শার বা ع লেখা হতো

প্রথম প্রকারের চিহ্নকে أَخْمَاس এবং দ্বিতীয় প্রকারের চিহ্নকে أَعْشَار বলে। –[মানাহিলুল ইরফান, খ. ১ম, পৃ. ৪০৩]

পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এই আলামতগুলো জায়েজ, আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো মাকরূহ। –[আল ইতকান, খ. ২য়, পৃ. ১/১৭]

কারণ মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা মতে, সাহাবা যুগ থেকেই এগুলোর প্রচলন শুরু হয়.

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيْرَ فِى الْمُصْحَفِ.

অর্থাৎ হযরত মাসরূক (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) পাণ্ডুলিপির মাঝে أَعْشَار সংযোজন করাকে অপছন্দ করতেন। –[মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা,খ. ২য়, পৃ. ৪৯৭]-এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আশার সাহাবা যুগে প্রচলিত ছিল।

رُكُوْعٌ **রুকূ' :** আরেকটি চিহ্ন হচ্ছে রুকূ'। যার প্রবর্তন পরবর্তীকালে করা হয়েছে এবং এ যাবত প্রচলিত হয়েছে। রুকূ' গঠনে সাধারণত আলোচ্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এক ধরনের আলোচনা শেষ হয়, সেখানেই হাশিয়াতে রুকূ' এর চিহ্ন দেওয়া হয় আর তার সংকেত হচ্ছে (ع)। উলূমুল কুরআনের প্রণেতা হযরত মাওলানা তাকী

http://islamiboi.wordpress.com

ওসমানী [দা.] বলেন, আমি যথেষ্ট খোজাখুঁজি করেও নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারিনি যে, কে কবে রুকুর সূচনা করেন। [তারিখুল কুরআন, পৃ. ৮১] কারো কারো ধারণা হচ্ছে, হযরত ওসমান (রা.)-এর সময়েই রুকূ' নির্ধারণ করা হয়। মাওলানা তাকী উসমানী [দা.বা.] বলেন, রেওয়ায়েতে এর কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

অবশ্য একথা প্রায় নিশ্চিত যে, এই আলামতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াতের এমন একটি পরিমাণ নির্ণয় করা যা নামাজের এক রাকাতে পাঠ করা যায়। এই চিহ্নগুলোকে রুকূ' এই জন্য বলা হয় যে, নামাজে এই স্থানে পৌঁছে রুকূ' করা হয়।

رُمُوْز وَ أَوْقَاف বিরাম চিহ্ন : কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদের সহজকরণের নিমিত্তে আরেকটি উপকারী কাজ এটা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন বাক্যের শেষে এমন কিছু চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা বুঝা যাবে যে, এই স্থানে ওয়াকফ করাটা কেমন? এই চিহ্নগুলোকে রুমূয ও আওকাফ বলে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একজন অনারবী ব্যক্তি যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করবে, তখন যেন সে যথাস্থানে ওয়াক্ফ করতে পারে এবং ভুল স্থানে শ্বাস ত্যাগ করার কারণেও যেন অর্থের মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। এ ধরনের অধিকাংশ চিহ্নের প্রণেতা হলেন আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর সাজাওয়ান্দী (র.)।

পবিত্র কুরআনের বিরামচিহ্নসমূহ নিম্নরূপ :

۝ : বাক্যের শেষে এই চিহ্ন থাকে এটা ওয়াকফ তাম -এর সংক্ষেপ। বিরতির চিহ্ন। একটি আয়াতের সমাপ্তি বুঝায়। কিন্তু এর উপরে অন্য কোনো চিহ্ন থাকলে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

ط : এটা ওয়াকফ মুতলাকের সংক্ষিপ্তরূপ। এর উদ্দেশ্য হলো এখানে ধারাবাহিক আলোচনা বা কথার মিল সমাপ্ত হয়েছে। তাই এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি করা উত্তম।

ج : এটা ওয়াকফ জায়িজ -এর চিহ্ন। এ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়েরই অনুমতি আছে। তবে থামাই ভালো।

ز : ওয়াকফে মুযাওয়াযের ইহা সংক্ষিপ্তরূপ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা না থামা উভয়ই অনুমতি আছে । তবে এখানে না থামাই ভালো।

ص : এটা ওয়াকফে মুলাখখাসের চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়া ভালো। তবে যেহেতু বাক্য দীর্ঘকার বা প্রলম্বিত হয়েছে সেহেতু নিঃশ্বাস রাখা সম্ভব না হলে বিরতি করা যায়।

م : এটা ওয়াক্ফে লাযেম -এর সংকেত। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওয়াকফ করা না হয়, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ বিকৃত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। সুতরাং এ স্থানে বিরতি করা [ওয়াকফ্ করা] অতি উত্তম। কেউ কেউ একে ওয়াকফ ওয়াজিব নামেও অভিহিত করেছেন।

তবে এখানে ওয়াজিব বলতে পারিভাষিক ওয়াজিব বুঝানো হয়নি, যা না করলে গুনাহ হয়; বরং এখানে ওয়াজিব বলতে বুঝানো হয় যে, মাঝে মাঝে এই স্থানে ওয়াক্ফ করা অধিক উত্তম।

لا : এটা لَا تَقِفْ-এর সংক্ষেপ। অর্থ এখানে থেমো না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এখানে ওয়াক্ফ করা নাজায়েজ; বরং এর অনেক স্থান এমন আছে, যেখানে ওয়াক্ফ করলে কোনো অসুবিধা নেই। এরূপ চিহ্নিত স্থানে যদি ওয়াক্ফ করতে হয় তবে উত্তম হলো একে পুনরায় মিলিয়ে পড়া। উপরোল্লিখিত বিরাম চিহ্নসমূহ সম্পর্কে বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এর প্রবর্তনকারী হলেন আল্লামা সাজাওয়ান্দী (রা.)

سَكْتَة : এটা সাকতার চিহ্ন। এ স্থানে পড়া ক্ষান্ত করে কিঞ্চিত থামতে হয়; কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়া যায় না। এটা সাধারণত এমন স্থানে আনা হয়, যেখানে মিলিয়ে পড়লে অর্থের মাঝে ভুল হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। কুরআনের ৪ স্থানে এটা আছে।

قف : এ ধরনের চিহ্নিত স্থানে সাকতার থেকে সামান্য দীর্ঘ বিরতি করতে হয়। এ ধরনের স্থানে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা যাবে না।

ق : এটা قِيْلَ عَلَيْهِ -এর সংক্ষেপ। এখানে থামার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে কারো কারো মতে এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি হবে, আর অন্যান্যদের মতে বিরতি হবে না

قف : এর অর্থ থেমে যাও। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা উচিত

http://islamiboi.wordpress.com

صل : এটা [قَدْ يُوْصَلُ] কাদইউসালু -এর সংক্ষেপ। এরূপ স্থানে থামা না থামা উভয়টাই সঠিক তবে থামাই ভালো।

صلى : এটা اَلْوَصْلُ اَوْلٰى -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া উত্তম এই অর্থ প্রকাশ করে।

مُعَانَقَة ـ مع এটা মু'আনাকা নামে অভিহিত। আয়াতের বা শব্দের ডানে বা বামে উক্ত তিন বিন্দু অথবা مع -এর চিহ্ন থাকে অথবা বলা হয় এক আয়াতের দুটো তাফসীর যেখানে সম্ভব, সেখানে এই চিহ্ন লেখা হয়েছে। এক তাফসীর অনুযায়ী এক স্থানে ওয়াক্‌ফ হবে এবং অন্য তাফসীর অনুযায়ী অন্য স্থানে ওয়াক্‌ফ হবে।

তবে এ দুয়ের মাঝে যেকোনো এক স্থানেও ওয়াক্‌ফ করতে পারে; কিন্তু যদি এক স্থানে বিরতি করে তাহলে অন্য স্থানে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই -[উলূমুল কুরআন, পৃ.২০০] একে مُقَابَلَه নামেও অভিহিত করা হয়।

وَقْفُ النَّبِى : কোনো কোনো রেওয়ায়েত মুতাবিক হযরত মুহাম্মদ ﷺ এখানে ওয়াক্‌ফ করেছিলেন।

وَقْفُ جِبْرَئِيْل : এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামলে বরকত লাভ হয় বলে বর্ণিত আছে।

وَقْف غُفْرَان : এর চিহ্নিত স্থানে ওয়াকফ করলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

الربع : এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার এক চতুর্থাংশ।

النصف : অর্ধাংশ অর্থাৎ পারার অর্ধাংশ।

الثلث : তিন চতুর্থাংশ অর্থাৎ পারার তিন চতুর্থাংশ। -[প্রাগুক্ত : ১৯৩-২০১]

কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব ও ধারাবাহিকতা : কুরআন শরীফের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াত ও সূরা যে তারতীবে আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে, মূলত সেটাই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র তরতিব। হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মারফত রাসূল ﷺ -এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে তিনি কুরআনের এই ধারাক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকেও এই তরতিবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কুরআনে বর্তমান তরতিব একান্তই ওহীগত একটি বিষয়। এ বিষয়ে আল্লামা সুয়ূতী (র.) মুসলিম উম্মাহর ইজমা উল্লেখ করে লিখেন- تَرْتِيْبُ الْاٰيَاتِ فِى السُّوَرِ بِتَوْقِيْفِيَّةٍ ﷺ اَمْرُهٗ غَيْرُ خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ "কুরআনের প্রত্যেক সূরা আয়াতসমূহের তারতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ কে অবগত করানোর পর সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। -[হাশিয়াতুল জামাল, খ. ১. পৃ. ১২]

কুরআনের প্রথম ৭টি সূরা বড়। পরিভাষায় এগুলোকে سَبْع طِوَال বলা হয়। সূরা বাকারা হতে তওবা পর্যন্ত। তার পর কম বেশি একশত আয়াত সম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রয়েছে। পরিভাষায় এগুলোকে مِئِيْن [মিঈন] বলা হয়। এরূপ সূরা -সূরা ইয়াসীন থেকে সূরা কাফ পর্যন্ত ২৪টি। তারপর রয়েছে শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাসমূহ এসব বলা হয় مَثَانِى [মাছানী] এ সূরাগুলোতে ঘটনাবলি ও উপদেশসমূহের পুনরুক্তি রয়েছে, তাই এগুলোকে মাছানী বলে নামকরণ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে ছোট সূরাগুলো- এগুলোকে বলা হয় مُفَصَّل মুফাসসাল। সূরা হুজরাত থেকে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলোকে মুফাসসাল বলে।

মুফসসাল সূরাগুলো আবার তিনভাগে বিভক্ত :

১. طِوَال مُفَصَّل : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ৩০টি সূরা রয়েছে।

২. اَوْسَط مُفَصَّل : সূরা বুরুজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ [সূরা লাম ইয়াকুন] পর্যন্ত সূরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয় এতে মোট ১৩টি সূরা রয়েছে।

৩. قِصَار مُفَصَّل : সূরা বায়্যিনাহ [লাম ইয়াকুন] থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়। এতে মোট ১৭টি সূরা রয়েছে। -[তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি : ই. ফা. বা]

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীর পরিচিতি

তাফসীর শব্দের আভিধানিক অর্থ : [تَفْسِيْر] তাফসীর শব্দটি একবচন, বহুবচনে [تَفَاسِيْر] তাফাসীর। এর অর্থ- ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা ভাষ্য। ইসলামে তাফসীর শব্দটি এক বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাফসীর শব্দটি দ্বারা কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকেই বুঝায়।

তাফসীর শব্দটি تَفْسِيْر بَاب تَفْعِيْل-এর مَصْدَر শব্দমূল فَسَّرَ থেকে গঠিত। অর্থ প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা, প্রসারিত করা। সাধারণ অর্থে কোনো কথা বা বাক্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর বলে।

কারো কারো মতে سَفَرٌ শব্দ থেকে উল্টিয়ে فَسَّرَ গঠন করা হয়েছে। সকালের আলো উদ্ভাসিত হলে আরবের লোকেরা বলে اَسْفَرَ الصُّبْحُ

আরো বলা হয়- سَفَرَتِ الْمَرْأَةُ سُفُوْرًا অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি তার মুখমণ্ডল থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। -[আল মুনজিদ : ৬৩৩]

তাফসীর শব্দের পারিভাষিক অর্থ : আল্লামা যারকাশী (র.) লিখেন-

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهٖ وَحِكَمِهٖ.

অর্থাৎ তাফসীর হলো, এমন শাস্ত্র যা দ্বারা কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা, তার আহকামও হিকমতসমূহের উদঘাটন করা যায়। -[আল বুরহান খ.১, পৃ. ১৩]

নবুয়ত যুগের নিকটবর্তীতা এবং বিষয়ভিত্তিক শাস্ত্রগত রূপ পরিগ্রহ না করায় তাফসীর শাস্ত্রেরও কোনো শাখা-প্রশাখা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন তাফসীরশাস্ত্র একটি বিধিবদ্ধ শাস্ত্রের রূপ ধারণ করে এবং এর বিভিন্ন দিকের প্রতি অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকে তখন এই শাস্ত্র অসংখ্য শাখা- প্রশাখায় সুবিস্তৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সময়ের প্রয়োজনুপাতে এতে আরো অধিকতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজিত হয়ে ব্যাপকতর হতে থাকে। এ সমুদয় বিষয়াবলির প্রেক্ষাপটে তাফসীরশাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

اَلتَّفْسِيْرُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَدْلُوْلَاتِهَا وَاَحْكَامِهَا الْاِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيْبِيَّةِ وَمَعَانِيْهَا الَّتِيْ تُحْمَلُ عَلَيْهِ حَالَةُ التَّرْكِيْبِ وَتَتِمَّاتٌ لِذٰلِكَ

তাফসীর এমন এক বিদ্যা, যার মাঝে কুরআনের শব্দাবলির গঠন পদ্ধতি, এর প্রকৃত অর্থ ও নির্দেশাবলি, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস এবং এর মর্মার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। -[রূহুল মাআনী খ. ১, পৃ. ৪]

এই সংজ্ঞার আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তাফসীর শাস্ত্রের অন্তর্গত হয়েছে-

১. **কুরআনের শব্দাবলি উচ্চারণ পদ্ধতি :** অর্থাৎ কুরআনের শব্দাবলিকে কোন নিয়ম ও পদ্ধতিতে পড়া যাবে এ সম্পর্কিত আলোচনা। এই বিষয়টি আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য আরবিভাষী প্রাচীন তাফসীরকারগণ স্ব স্ব তাফসীরগ্রন্থে প্রতিটি আয়াতের সাথে এর গঠনরীতি ও উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতেন। এ উদ্দেশ্যে ইলমে কিরাত নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রও বিদ্যমান রয়েছে।

২. **কুরআনের শব্দার্থ :** অর্থাৎ কুরআনের শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ পরিজ্ঞাত হয়েছে এ জন্য অভিধানশাস্ত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান অপরিহার্য। মূলত এ কারণেই তাফসীর- গ্রন্থসমূহে অভিধান বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও আরবি সাহিত্যের অধিকতর দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

৩. **শব্দের স্বতন্ত্র ও নিজস্ব বিধান :** অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে অবগত হওয়া যে, শব্দটির মূলধাতু কি? বর্তমান গঠন আকৃতিতে কিভাবে আসলো? এর কাঠামোগত ধরন কি? আর এই ধরনের অর্থ ও বৈশিষ্ট্যই বা কি? এ বিষয়গুলো জানার জন্য সরফশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৪. **শব্দের বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি :** অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ সম্পর্কে অবগত হওয়া যে, শব্দটি অপর শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে কোন অর্থটি প্রকাশ করছে? এর নাহুশাস্ত্রগত বিন্যাস কোন পদ্ধতির? শব্দটির উপর বর্তমান হরকতটি কেন আসলো এবং কোন অর্থটির প্রতি ইঙ্গিত করছে? এ বিষয়গুলার জন্য ইলমে নাহু ও ইলমে মা'আনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

৫. **বিন্যস্ত অবস্থায় শব্দগুলোর সামষ্টিক অর্থ :** অর্থাৎ পুরো আয়াতটি তার পূর্বাপর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কোন অর্থটি প্রকাশ করছে। এ উদ্দেশ্যে আয়াতের বিষয়বস্তুর নিরিখে বিভিন্ন শাস্ত্র হতে সাহায্য গ্রহণ করা হয়। উপরোল্লিখিত শাস্ত্র ও

http://islamiboi.wordpress.com

বিষয়বস্তু ছাড়াও কোনো কোনো সময় আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইলমে হাদীস আবার কোনো কোনো সময় উসূলে ফিকহের শরণাপন্ন হতে হয়।

৬. **অর্থসমূহের পরিশিষ্ট :** অর্থাৎ কুরআনি আয়াতের প্রেক্ষাপট এবং কুরআনে যে আয়াতটি সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা। এ উদ্দেশ্যে অধিকতর ক্ষেত্রে ইলমে হাদীসের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিষয়টি এতো ব্যাপক যে, এতে দুনিয়ার সমগ্র জ্ঞানও অভিজ্ঞতাই নিয়োজিত করা যায়। কেননা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে অতি সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য ইরশাদ হয়েছে; কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের এক অসীম জাহান তার মধ্যে গুপ্ত রয়ে গেছে। যেমন– কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- وَفِىٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ "আর তোমরা নিজেদের মধ্যে চিন্তা কর; তোমরা কি অনুধাবন কর না"।

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট অংশ এসে যাবে। এতদসত্ত্বে ও এ কথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাঁর বৈচিত্র্যময় নিপুণ সৃষ্টির যে তত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সুতরাং তাফসীরের এই দিকটিতে বুদ্ধি-জ্ঞান,অভিজ্ঞতা ও প্রামাণ্য তথ্যের মাধ্যমে বিস্ময়কর বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হবে। –[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ৩২৪-৩২৫]

তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যে পার্থক্য : প্রাথমিক যুগে তাফসীর অর্থে তাবীল শব্দটি সমভাবে ব্যবহৃত হতো। স্বয়ং কুরআনুল কারীম তাঁর তাফসীর অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করেছে– وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ

ইমাম আবূ উবাইদ (র.)-সহ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো দুটি শব্দই অভিন্ন অর্থবোধক। তবে অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। কিন্তু পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেছেন। সবগুলো অভিমত এখানে সন্নিবেশিত করা কঠিন ব্যাপার। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি অভিমত তুলে ধরা হলো-

১. ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেকটি শব্দের ব্যাখ্যা হলো তাফসীর। আর বাক্যের সমষ্টিগত ব্যাখ্যার নাম হলো তাবীল।
২. শব্দের বাহ্যিক অর্থ বর্ণনাকে বলা হয় তাফসীর। মূল উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা হলো তাবীল।
৩. যেসব আয়াতের একাধিক অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেসব আয়াতেরই শুধুমাত্র তাফসীর হয়। তা'বীলের অর্থ হলো আয়াতের যেসব ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব, এর মধ্যে কোনো একটিকে দলিল প্রমাণের দ্বারা গ্রহণ করা।
৪. প্রত্যয়ের সাথে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর বলা হয়। আর তা'বীল বলা হয় বিষয়বস্তু হতে নির্গত শিক্ষা ও ফলাফলের ব্যাখ্যাকে।

সারকথা, এ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রকৃত প্রস্তাবে আবূ উবাইদা (রা.)-এর অভিমতটিই সঠিক বলে অনুমিত হয় তাঁর মতে তাফসীর ও তাবীল শব্দ দু'টির মধ্যে ব্যবহারিক দিক থেকে প্রকৃত কোনো ব্যবধান নেই। যে সকল গবেষকগণ পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন, তাদের পরস্পর মতের ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এটি কোনো সুনির্দিষ্ট মতৈক্যে প্রতিষ্ঠিত পরিভাষা হতে পারে না। উভয় শব্দের মধ্যে সত্যিই কোনো পার্থক্য থাকলে বিশেষজ্ঞদের মতানৈক্যের কোনো অর্থ হয় না। বিষয়টি এমন মনে হয় যে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ তাফসীর ও তা'বীল শব্দদ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা হিসেবে মর্যাদা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে পরস্পর বিরোধী এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কোনোটিই তার সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। তাই দেখা যায় প্রথম থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল তাফসীর বিশারদ তাফসীর ও তাবীল শব্দ দু'টিকে একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকেনি। –[প্রাগুক্ত : ৩২৫ ও ৩২৬]

তাফসীরের আলোচ্য বিষয় : اٰيَاتُ الْقُرْاٰنِ مِنْ حَيْثُ فَهْمِ مَعَانِيْهِ অর্থাৎ মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার দিক থেকে আল কুরআনের আয়াতসমূহ তাফসীরের আলোচ্য বিষয়। –[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ৪]

ইলমে তাফসীরের শরয়ী হুকুম : اَلْوَاجِبُ الْكِفَائِيُّ অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোকের উপর ফরজে কেফায়া। কেউ না শিখলে সকলে গুনাহগার হবে।

তাফসীরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য : اَلْفَوْزُ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ - اَمَّا لِدُنْيَا فَبِامْتِثَالِ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِىْ، وَاَمَّا فِى الْاٰخِرَةِ فَبِالْجَنَّةِ وَنَعِيْمِهَا -

অর্থাৎ উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হওয়া। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালন করতে এবং আখিরাতে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি লাভে। –[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ৪]

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীরের উৎস

তাফসীরের উৎস বলতে বুঝায় যার মাধ্যমে কোনো আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানা যায়। তাফসীরের উৎসসমূহ নিম্নরূপ–

১. **আল কুরআনুল কারীম :** তাফসীর শাস্ত্রের উৎস স্বয়ং কুরআনুল কারীম অর্থাৎ কুরআনের কোনো কোনো আয়াত কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি আরেকটির ব্যাখ্যা প্রদান করে। এক স্থানে একটি কথা অস্পষ্টভাবে বলা হলো এবং অন্য স্থানে এই অস্পষ্টতাকে দূর করে স্পষ্ট করে দেওয়া হলো। যেমন সূরা ফাতেহায় ইরশাদ হয়েছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ

উক্ত আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা? এ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু অন্যত্র বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে ইরশাদ হয়েছে– اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

এমনিভাবে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

কিন্তু সেই কালেমা বা বাক্যগুলো কি ছিল? একথা বলা হয়নি; অন্যত্র এই কালেমা বা বাক্যগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

২. **আল হাদীস :** রাসূল ﷺ -এর জীবন কুরআন শরীফের বাস্তব ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম কোনো আয়াতের মর্ম উদ্ধারে জটিলতা অনুভব করলে তার নিকট যেতেন। তিনি সকল সমস্যা, সংশয় ও জটিলতার সমাধান করতেন। কারণ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রাসূল ﷺ -এর দায়িত্বের অন্যতম । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

অতএব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ -এর শিক্ষা ও আদর্শ হচ্ছে কুরআন তাফসীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৩. **اَقْوَالُ الصَّحَابِىْ বা সাহাবায়ে কেরামের উক্তি :** সাহাবায়ে কেরাম হলেন নবী করীম ﷺ -এর নিকট সরাসরি কুরআনের তা'লীম প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান পূত পবিত্র ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ছিলেন কুরআনের ভাষাভাষী। কুরআন অবতরণ ও সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। এ জন্য তাদের উক্তি ও অভিমত তাফসীরের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ধর্তব্য। তাই সাহাবীগণ থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া গেলে তা মারফূ' হাদীস সমতুল্য হবে। তাঁদের বর্ণনাকে ব্যক্তিগত অভিমত বলে পরিত্যাগ করা যাবে না। কেননা তাঁরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার গোপন রহস্য, বর্ণনাভঙ্গি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁরা কুরআন নাজিলের প্রকৃত অবস্থা ও পরিস্থিতি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অসাধারণ স্মরণশক্তি ও মেধা দান করেছিলেন।

৪. **اَقْوَالُ التَّابِعِىْ তাবেয়ীগণের বক্তব্য :** যেসব মহৎ ব্যক্তিবর্গ সাহাবায়ে কেরামের মুখ থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা শুনার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই হলেন তাবেয়ী। এ কারণে তাবেয়ীগণের বক্তব্যও তাফসীরশাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, তাবেয়ী কোনো সাহাবী হতে তাফসীর উদ্ধৃত করলে তা সাহাবায়ে কেরামের তাফসীরেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তাবেয়ী তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করলে দেখা হবে, অন্যকোনো তাবেয়ীর অভিমত তাঁর বিরোধী কিনা? যদি কোনো অভিমত তার অভিমতের বিরোধী হয়, তবে তাবেয়ীর উক্তি বা অভিমত হুজ্জত হিসেবে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় আয়াতের তাফসীরের জন্য কুরআনুল কারীম, আরবি অভিধান, হাদীসে নববী, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও অন্যান্য শরয়ী দলিল প্রমাণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। আর তাবেয়ীগণের মধ্যে মতানৈক্য না হলে নিঃসন্দেহে তাঁর তাফসীর হুজ্জত হবে। এই তাফসীরের অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে।

৫. **আরবি অভিধান :** কুরআনের যেসব আয়াতের বিষয়বস্তু এতই সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য যে, যার আলোচ্য বিষয়ে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা নেই এবং বুঝার জন্য ঐতিহাসিক যোগসূত্রতা জানার প্রয়োজন নেই, সেখানে তাফসীরের জন্য আরবি অভিধান-ই একমাত্র উৎস। কিন্তু যেখানে কোনো অস্পষ্টতা ও সংক্ষিপ্ততা দেখা যায় বা যে আয়াত কোনো সংঘটিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বা এর দ্বারা কোনো ফিকহী বিধান উদঘাটন করা হয়, সেখানে কেবল অভিধানের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত উৎসগুলোই মূল ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

৬. **عَقْل سَلِيْم বা শান্ত ও পরিশুদ্ধ বিবেক বুদ্ধি :** দুনিয়ার প্রতিটি কাজে কর্মেই শান্ত, পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। পূর্বোক্ত উৎসগুলোর দ্বারা উপকৃত হতে হলেও এই গুণটি ব্যতীত তা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও এটিকে একটি স্বতন্ত্র উৎস হিসেবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো কুরআন শরীফ একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিপুণ ও বৈচিত্র্যময় তথ্য ও তত্ত্বের অতলান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায়। উপরোল্লিখিত পঞ্চ উৎসের মাধ্যমে প্রয়োজনানুযায়ী এর বিষয়বস্তু জানা যাবে; কিন্তু এর তথ্য ও তত্ত্ব, হিকমত ও দর্শনের বিষয়ে কোনো যুগেই একথা বলা যাবে না যে, এর প্রান্তসীমা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এ সম্পর্কে আর অধিক বলা বা আবিষ্কারের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রকৃত ও বাস্তব সত্য হলো কুরআনের তথ্য ও তত্ত্বের অনুসন্ধান, চিন্তা ও গবেষণার দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত উম্মুক্ত থাকবে। মহান আল্লাহ যাকে ইলম, জ্ঞান, বুদ্ধি ভয় ভীতি ও সান্নিধ্যের দৌলতে সৌভাগ্যশীল করবেন, তিনি এই উম্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করে নব বৈচিত্র্যময় দিগন্ত উন্মোচিত করতে সচেষ্ট হবেন। এভাবেই তাফসীরকারগণ যুগে যুগে নিজেদের আকণ্ঠ নিমগ্ন সাধনায় মানবজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন। এটি এমন এক মহাভাণ্ডার, যার জন্য আল্লাহর পেয়ারা হাবীব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অনুকূলে দোয়া করেছেন- اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ التَّاوِيْلَ وَفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! একে তাফসীরের জ্ঞান ও দীনের প্রজ্ঞা দান করুন।

স্মরণ রাখতে হবে সমঝ, আকল ও বুদ্ধির উদঘাটিত যেসব তথ্য তত্ত্ব গ্রহণীয় হবে, সেগুলো যেন শরিয়তের অন্যান্য মৌলনীতি ও উপরোল্লিখিত পঞ্চ উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। শরিয়তে মৌলনীতির উপর আঘাত করে যত তথ্য ও তত্ত্বই বর্ণনা করা হোক ইসলামে এর কোনোই মূল্য নেই। -[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ৩২৭-৩৪৩]

তাফসীরের অগ্রহণযোগ্য উৎসসমূহ :

- **ইসরাঈলী রেওয়ায়েত :** যে সকল রেওয়ায়েত ইহুদি বা খ্রিস্টানদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলোকে বলা হয় اِسْرَائِيْلِيَّاتٌ [ইসরাঈলী বর্ণনা] এই বর্ণনাগুলোর কিছু সরাসরি বাইবেল বা তালমুদ নামক গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে। কিছু অংশ এসেছে মুসনা বা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ হতে। কিছু বর্ণনা রয়েছে মৌখিক। আহলে কিতাবদের মাঝে কাল পরম্পরায় এগুলো বর্ণিত ও শ্রুত হয়ে আসছে। আরবের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মাঝে এগুলো ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থসমূহে বিপুল পরিমাণে এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দেখা যায়। সুবিখ্যাত গবেষক ও তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতগুলোর হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন- এই ধরনের রেওয়ায়েত তিন প্রকারে বিভক্ত এবং প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। যথা-

১. নির্ভরযোগ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা যেসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সত্যায়িত হয়েছে। যেমন- ফেরাউনের নদী বক্ষে নিমজ্জিত হওয়া, হযরত মূসা (আ.)-এর তূর পাহাড়ে গমন, যাদুকরদের সাথে তাঁর মোকাবেলা হওয়ার ঘটনা। এ সকল বর্ণনা এ জন্যেই গ্রহণযোগ্য হবে যে, কুরআনুল কারীম বা সহীহ হাদীস এগুলোর সত্যায়ন করেছে।

২. নির্ভরযোগ্য দলিলাদির দ্বারা যেসব ইসরাঈলী বর্ণনা মিথ্যা হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন হযরত সুলাইমান (আ.) জীবনের শেষপ্রান্তে এসে [মাআযাল্লাহু] মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েন [বাইবেল: কিতাব সালাতীন: ১/ ১১-১৩]

কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এই বর্ণনার প্রতিবাদ করেছে। সুতরাং এ ধরনের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

৩. নির্ভযোগ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা যেসব ইসরাঈলী বর্ণনার সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কোনোটাই প্রমাণিত হয় না। যেমন তাওরাতের বিধানসমূহ। এমন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَا تُصَدِّقُوْهَا وَلَا تُكَذِّبُوْهَا অর্থাৎ "এগুলোকে সত্যও বলো না, মিথ্যাও বলো না"।

এই প্রকারের রেওয়ায়েত বর্ণনা করা জায়েজ আছে বটে, কিন্তু এগুলোর উপর কোনো শরয়ী বিষয়ের ভিত্তি করা যায় না, তেমনি এগুলো বয়ান করার দ্বারা বিশেষ কোনো উপকারও নেই।

- **সুফিয়ায়ে কেরামের তাফসীর :** কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের অধীনে সুফিয়ায়ে কেরামের কিছু এমন কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো বাহ্যত তাফসীর'ই মনে হয়; কিন্তু তা আয়াতের বাহ্যিক ও বর্ণিত অর্থের পরিপন্থি হয়ে থাকে। যেমন কুরআনের ইরশাদ হয়েছে- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ অর্থাৎ "তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর।"

এই আয়াতের অধীনে কোনো কোনো সূফী সাধক বলেছেন- قَاتِلُوا النَّفْسَ فَاِنَّهَا تَلِىَ الْاِنْسَانَ অর্থাৎ "তোমরা নফসের সাথে যুদ্ধ কর কেননা, এটা মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী।"

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীর বির রায় : এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে।

তাফসীরের শর্ত : তাফসীরের শর্ত বলতে মুফাসসির -এর শর্তকেই বুঝায়। অর্থাৎ যিনি তাফসীর করবেন তার কি কি জিনিস জানা থাকতে হবে? যা ছাড়া তাফসীর করলে তা তাফসীর বিররায় তথা নিজস্ব মনগড়া তাফসীর হিসেবে গণ্য হবে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শরিয়তের ইলম, আরবি সাহিত্য, ফিক্হ, নাহু, বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান দান করেছেন, তারাই কেবল তাফসীর করার ক্ষমতা রাখেন।

পরবর্তী যুগের ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, ১৫ টি বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে কেউ মুফাসসির হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. ইলমে লুগাহ তথা ভাষা জ্ঞান। এর দ্বারা কুরআনের একক শব্দসমূহের অর্থ জানা যায়।
২. ইলমে নাহু তথা আরবি বাক্য প্রকরণ শাস্ত্র। কেননা যের-যবরের ও পেশের পরিবর্তনে বাক্যের অর্থও পাল্টে যায়।
৩. ইলমে তাসরীফ তথা আরবি শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র। কেননা শব্দ গঠন প্রণালীর বিভিন্নতার কারণে অর্থও ভিন্ন হয়ে যায়। আল্লামা যমখশরী (র.) তাঁর রচিত 'উজুবাতে তাফসীর'। কিতাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি ইলমে সরফ না জানার কারণে কুরআনের আয়াত– يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ (بَنِىْ اِسْرَائِيْل . ٧١) অর্থাৎ যে দিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ইমাম ও নেতাদের সাথে আহ্বান করব– এর তাফসীর করল– যে দিন আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার মায়ের সাথে ডাকব এখানে সে اِمَامٌ শব্দটিকে اُم [মা]-এর বহুবচন মনে করেছে। যদি সে ইলমে সরফ ভাল করে জানত তবে সে বুঝতে পারত যে, اُم -এর বহুবচন اِمَامٌ আসে না।
৪. ইলমে ইশতেক্বাক তথা শব্দসমূহের উৎস জ্ঞান। কেননা কোনো শব্দ যখন দুটি ধাতু হতে নির্গত হয়ে আসে, তখন তার অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন– مَسِيْحٌ একটি শব্দ। এটা مَسْحٌ ধাতু হতে নির্গত হলে অর্থ হবে স্পর্শ করা এবং কোনো কিছুর উপর ভিজা হাত বুলানো। আর مَسَاحَةٌ হতে নির্গত হলে এর অর্থ হবে পরিমাপ করা।
৫. ইলমে মা'আনী তথা শব্দসমূহের নিগূঢ় ভাব ও অর্থ জ্ঞান। এ ইলম দ্বারা অর্থ হিসেবে বাক্যের পরস্পর সম্পর্ক জানা যায়।
৬. ইলমে বয়ান তথা আরবি অলঙ্কার শাস্ত্র। এই ইলম দ্বারা বাক্যের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা এবং তুলনা ও ইশারা-ইঙ্গিত জানা যায়।
৭. ইলমে বদী তথা আরবি অলঙ্কার শাস্ত্র। এই শাস্ত্র দ্বারা ভাব-প্রকাশে বাক্যের সৌন্দর্য জানা যায়। মাআনী, বয়ান ও বদী এই তিনটিকে একত্রে ইলমে বালাগাত বলা হয়। কুরআন তাফসীরের জন্য এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ কুরআন মাজিদ হলো সম্পূর্ণরূপে অলৌকিক গ্রন্থ। আর এ তিন শাস্ত্রের মাধ্যমে তার অলৌকিকত্ব জানা যায়।
৮. ইলমে কেরাত তথা কেরাতের বিভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান। বিভিন্ন কেরাত দ্বারা বিভিন্ন অর্থ এবং এক অর্থের উপর অন্য অর্থের প্রাধান্য জানা যায়।
৯. ইলমে উসূলে দীন তথা দীনের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান। কুরআনে অনেক আয়াত এমন আছে, যেগুলোর জাহেরী অর্থ আল্লাহ পাকের শানে ব্যবহার করা ঠিক হয় না। তাই এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ –[সূরা ফাতাহ : ১০]
১০. ইলমে উসূলে ফিকহ তথা ফিকহ বা ইসলামি আইন শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ। এই শাস্ত্রদ্বারা দলিল প্রমাণের প্রয়োগ ও বিধি-বিধান আহরণের কারণসমূহ জানা যায়।
১১. শানে নুযূল বা কুরআন নাজিলের কারণ ও প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত জ্ঞান। শানে নুযূলের দ্বারা আয়াতের অর্থ– অধিক সুস্পষ্ট হয়।
১২. নাসিখ ও মানসূখ সম্পর্কিত জ্ঞান।
১৩. ইলমে ফিকহ তথা ইসলামি আইন শাস্ত্র। এই শাস্ত্র দ্বারা শাখাগত বিধানসমূহ আহরণ করা যায়।
১৪. আহাদীসে মানি'য়্যাহ। অর্থাৎ ঐ সকল হাদীস জানাও আবশ্যক, যেগুলো কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।
১৫. ইলমে মাউহুবী তথা ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান, খাস বান্দাদেরই এই ইলম দান করা হয়। নিচের হাদীস শরীফে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জানা বিষয়ের উপর আমল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে অজানা বিষয়ের ইলেম দান করেন।

http://islamiboi.wordpress.com

উপরে বর্ণিত শাস্ত্রগুলো একজন মুফাসসিরের জন্য হাতিয়ার স্বরূপ। এগুলো জানা ব্যতীত কেউ কুরআনের তাফসীর করলে তা তাফসীর বিররায় [মনগড়া তাফসীর] বলে গণ্য হবে, যা নিষেধ করা হয়েছে। –[ফাজায়েলে কুরআন শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া (র.) পৃ. ২৫, ২৬, ২৭]

তাফসীরের কতিপয় পরিভাষা :

مُحْكَمٌ মুহকাম : অর্থ স্পষ্ট অর্থাৎ যার ভাষা এত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী যে, আরবি ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত শ্রোতার কাছে তার অর্থ, মর্ম ও দাবি অস্পষ্ট থাকে না। অনেক সময় এত স্পষ্ট থাকে যে, চিন্তা ছাড়াই বুঝে আসে। যেমন কুরআনের কারীমের আয়াত- قُلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ বলুন, তোমরা এসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শুনাই।

আবার কখনো সামান্য চিন্তা ও অনুসন্ধান করলেই বুঝে আসে। শারে' [বিধানদাতা]-এর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا অর্থাৎ পুরুষ ও নারী চোর, তোমরা তাদের হাত কেটে দাও।

এই আয়াতে একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পকেটমারও এর অন্তর্ভুক্ত। এ হিসেবে উসূলে ফিকহ এর পরিভাষায় যাহির, নস, মুফাসসার, মুহকাম, খফী ও মুশকিল এগুলো মুহকামের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুহকামের এই ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ব্যাখ্যা হতেই সংগৃহীত।

হযরত জাফর ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, মুহকাম ঐ আয়াতকে বলে, যা একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কেউ কেউ বলেন, যার অর্থ প্রসিদ্ধ আর সুস্পষ্ট দলিল হতে পারে এবং তার স্পষ্ট দলিল রয়েছে তাই মুহকাম।

–[তাফসীরে মাযহারী : খ. ১]

مُتَشَابِهٌ মুতাশাবিহ : مُتَشَابِهٌ শব্দটি بَابُ مُفَاعَلَةٌ এর مَصْدَرٌ [শব্দমূল]। অর্থ– একে অন্যের মতো হওয়া। شِبْهٌ [সাদৃশ্য পূর্ণ] হওয়া থেকে উদগত। তার বহুবচন مُشَابِهَةٌ ؛ شُبُهَاتٌ – شِبْهٌ অর্থ ব্যাপক। অর্থাৎ আরবি ভাষা সম্পর্কে পারদর্শী শ্রোতার কাছে যার মর্ম অনুসন্ধান করে চিন্তা-ভাবনার পরও অস্পষ্ট থাকে। যদি শারে' [বিধানদাতা]-এর পক্ষ হতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ পাওয়া যায় এবং তার দ্বারা সে আয়াতের মর্ম স্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন উসূলবিদগণের পরিভাষায় এটাকে মুজমাল বলে। যেমন– সালাত ও জাকাত। যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না পাওয়া যায়, তাহলে পরিভাষায় এটাকে মুতাশাবিহ বলা হয়। এই ধরনের অস্পষ্টতা শুধু ঐ সকল আয়াতেই হতে পা,রে যা ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়। যাতে তা অসাধ্য সাধনের নির্দেশ সাব্যস্ত না করে। যেমন– সূরার শুরুতে حُرُوفُ مُقَطَّعَاتٌ [বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ] অনুরূপ আয়াত– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর" ইত্যাদি। [প্রাগুক্ত]

نَسْخٌ নাসখ : পরিভাষায় نَسْخٌ বলা হয় رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ কোনো হুকমে শরইকে কোনো শরয়ী দলিলের মাধ্যমে রহিত করে দেওয়া। উর্দ্দেশ্য এই যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো সময় কোনো কালের অবস্থার প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত এক শরয়ী আদেশকে জারি করেন। অতঃপর আরেক সময় স্বীয় হেকমতপূর্ণ দৃষ্টিতে বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এ নির্দেশকে রহিত করে তদস্থলে কোনো নতুন নির্দেশ নিয়ে আসেন। এ আমলকে نَسْخٌ বলে। আর যে পুরাতন হুকুমকে বিলুপ্ত করেছেন তাকে مَنْسُوْخٌ বলে এবং যে নতুন নির্দেশ এসেছে তাকে نَاسِخٌ বলা হয়।

বস্তুত আল্লাহর কিতাবে নাসখ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে কোনো আয়াত তেলাওয়াতের দিক থেকে রহিত হওয়া এবং বর্ণনা করা বিধান বহাল থাকা। যেমন– আয়াতে রজমের বিধান বহাল রয়েছে এবং এর তেলাওয়াত রহিত হয়েছে কিংবা শুধু বিধানের শেষ সীমা বর্ণনা করা এবং তেলাওয়াত বহাল থাকা। যেমন– নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করার আয়াত এবং আয়াতে ওফাতের ইদ্দত এক বছর বলা হয়েছে। অথবা তেলাওয়াত ও বিধান উভয়টির শেষ সীমা বর্ণনা করা। যেমন– বলা হয়ে থাকে যে, দুটোই রহিত হয়েছে।

যে আয়াতের বিধান রহিত বা مَنْسُوْخٌ হয় তা দুই প্রকার–

১. রহিত বিধানের স্থলে অন্য কোনো বিধান থাকা। যেমন– নিকটাত্মীয়কে অসিয়ত করার বিধান মিরাস- এর আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে।

২. অন্য কোনো বিধান না থাকা। যেমন– স্ত্রীদের পরীক্ষা করার বিধান প্রথমে চালু ছিল পরে তা রহিত হয়ে গেছে। نَسْخٌ বা রহিত হওয়া আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সংবাদের ক্ষেত্রে নয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ-১]

http://islamiboi.wordpress.com

سَبْعَةُ أَحْرُفٍ সাত কেরাত : উম্মতের সর্বশ্রেণির লোকের জন্য তেলাওয়াতে কুরআন সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামের কিছু সংখ্যক শব্দকে বিভিন্ন উচ্চারণে পাঠ করার সুযোগ দান করেছেন। অনেকের জন্য বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে অক্ষর বিশেষের সঠিক উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের পক্ষে সহজ পাঠ্য কোনো উচ্চারণে কুরআন তেলাওয়াত করলে তা শুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে। রাসূল ﷺ বর্ণনা করেন–

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

অর্থাৎ এই কুরআন সাত হরফে নাজিল করা হয়েছে, তোমাদের যার পক্ষে যে হরফে তেলাওয়াত করা সহজ হয়, সে ভাবেই তেলাওয়াত কর। –[বুখারী, ফাজাইলে কুরআন অধ্যায়]

উক্ত হাদীস শরীফে উল্লিখিত 'সাত হরফ' শব্দটির অর্থ কি? এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তন্মধ্যে তত্ত্বদর্শী ও মুহাক্কিক ওলামার মতে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন যে নির্দিষ্ট কেরাতের মাধ্যমে নাজিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ– পার্থক্য সর্বাধিক সাত ধরনের হতে পারে। কেরাত যদিও সাতের অধিক রয়েছে। কিন্তু কেরাতসমূহের মধ্যে যে ভিন্নতা তা সাত ধরনের অনুমোদিত, সেই সাতটি ধরন নিম্নলিখিত ভিত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব–

১. বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন– এক কেরাত وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ আয়াতে 'কালিমাতু' শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেরাতে এই শব্দটি বহুবচন উচ্চারিত হয়ে وَتَمَّتْ كَلِمٰتُ رَبِّكَ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন– প্রচলিত কেরাতে رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে এবং এ আয়াতই অন্য কেরাতে رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে।

৩. রীতি অনুযায়ী হরকত বা যের-যবর পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে কেরাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন لَا يُضَارَ -এর স্থলে কেউ কেউ لَا يُضَارُّ তেলাওয়াত করেছেন। এমনিভাবে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ -এর স্থলে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ তেলাওয়াত করেছেন।

৪. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের হ্রাস বৃদ্ধিও হয়েছে। যেমন– تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ -এর স্থলে تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ তেলাওয়াত করা হয়েছে।

৫. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের পূর্বাপরও হয়েছে। যেমন– وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ -এর স্থলে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ পড়া হয়েছে।

৬. শব্দের পার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ এক কেরাতে এক শব্দ এবং অন্য কেরাতে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন– فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং فِيْ ضَعْفٍ -এর স্থলে فِيْ ضُعْفٍ পঠিত হয়েছে।

৭. উচ্চারণে পার্থক্য। যেমন কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গিতে লম্বা, খাটো, হালকা, শক্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে মূল শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন مُوْسٰى শব্দটি কোনো কোনো উচ্চারণে مُوْسِيْ রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

মোটকথা সাত কেরাতের উচ্চারণের সুবিধার্থে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণি– গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত কেরাত পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। –[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ১০৬-১০৯]

মক্কী মদনী সূরা বা আয়াত : অধিকাংশ মুফাসসিরীনের পরিভাষায় মক্কী সূরা বা আয়াত বলতে বুঝায় যেসব সূরা বা আয়াত হুযূর ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে নাজিল হয়েছে এবং মদনী সূরা বা আয়াত বলতে বুঝায়, যেগুলো মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর নাজিল হয়েছে।

কোনো কোনো লোক মক্কী আয়াত বলতে যেগুলো মক্কা শহরে নাজিল হয়েছে এবং মদনী আয়াত বলতে যেগুলো মদীনা শহরে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকে বুঝে থাকেন। বস্তুত অধিকাংশ মুফাসসিরীনের উপরিউক্ত পরিভাষা অনুযায়ী এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা কতিপয় আয়াত এমন রয়েছে যেগুলো মক্কা শহরে নাজিল হয়নি; তবুও হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়ার

http://islamiboi.wordpress.com

কারণে সেগুলোকে মক্কী বলা হয়। এমনিভাবে যেসব আয়াত মিনা, আরাফাত ইত্যাদি জায়গায় অথবা মে'রাজের সফরে নাজিল হয়েছে. এমনকি হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করার পর মদীনায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত পথে পথে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকেও মক্কী বলা হয়।

অনুরূপ অনেক আয়াত এমনও রয়েছে যেগুলো মদীনা শহরে নাজিল হয়নি; অথচ সেগুলোকে মদনী বলা হয়। হিজরতের পর হুযূর ﷺ অনেক সময় সফরে বের হতেন। তখন মদীনা থেকে শত শত মাইল দূরেও চলে যেতেন। এসব স্থানে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকেও মদনী বলা হয়। এমনকি যেসব আয়াত মক্কা বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রভৃতি সময়ে খোদ মক্কা শহরের ভিতরে অথবা তার আশ পাশে নাজিল হয়েছে, সেগুলোকেও মদনী নামে আখ্যায়িত করা হয়।

মক্কী মদনী সূরার কতিপয় পরিচয় : মুফাসসিরীনে কেরাম মক্ক মদনী সূরাসমূহের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন যার মাধ্যমে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোন সূরা মক্কী আর কোনটি মদনী।

মক্কী সূরার কতিপয় পরিচয় :

১. যে সূরায় সিজদার আয়াত রয়েছে সেটা মক্কী।

২. যে সূরায় 'كلا' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেটা মক্কী।

৩. সম্বোধনের উদ্দেশ্যে কেবল মাত্র يَاَيُّهَا النَّاسُ ব্যবহার করা। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ব্যবহার করা মদনী সূরার একটি অন্যতম পরিচিতি। সুতরাং সূরা হজ ব্যতীত অন্য কোনো মক্কী সূরায় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়নি।

৪. সূরা বাকারা ব্যতীত যেসব সূরায় আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাদের উম্মতগণের বর্ণনা এবং হযরত আদম (আ.) ও শয়তানের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা মক্কী।

৫. মক্কী সূরার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এসব সূরাতেই তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে।

মদনী সূরার কতিপয় পরিচিতি :

১. জিহাদের অনুমতি প্রদান বা জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা মাদানী সূরা সমূহের একটি অন্যতম পরিচিতি।

২. একমাত্র মদনী সূরাসমূহের মধ্যেই ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে।

৩. শরয়ী বিধানের হিকমত বর্ণনাও মদনী সূরার একটি বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র মদনী সূরাগুলোতেই মুনাফিকদের আচার-আচরণ, অভ্যাস-চরিত্র , চাল-চলন ও রীতিনীতি ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

৪. কেবল মাত্র মদনী সূরাগুলোতেই উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৫. মদনী সূরাসমূহ অধিক দীর্ঘ। -[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ৫৯-৬৪]

কুরআনের আয়াতসমূহের স্থান ও কালভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ : কুরআনুল করীমের আয়াত ও সূরাসমূহকে মক্কী ও মদনী ছাড়াও মুফাসসিরগণ আরো কয়েক প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যেমন-

১. حَضَرِىْ ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলো হুজুর ﷺ -এর বাসস্থানে অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে।

২. سَفَرِىْ যেগুলো হুজুর ﷺ -এর সফরকালে নাজিল করা হয়েছে।

৩. نَهَارِىْ যেগুলো দিনের বেলায় নাজিল করা হয়েছে।

৪. لَيْلِىْ যেগুলো রাত্রিতে নাজিল করা হয়েছে।

৫. صَيْفِىْ যেগুলো গ্রীষ্মকালে নাজিল করা হয়েছে।

৬. شِتَائِىْ যেগুলো শীতকালে নাজিল করা হয়েছে।

৭. فِرَاشِىْ যেগুলো বিছানায় অবস্থানকালে নাজিল করা হয়েছে।

৮. نَوْمِىْ যেগুলো নিদ্রা অবস্থায় নাজিল করা হয়েছে।

৯. سَمَاوِىْ যেগুলো মে'রাজের সময় আকাশে অবস্থানকালে নাজিল করা হয়েছে।

১০. فَضَائِىْ. শূন্যে অবতীর্ণ আয়াত। -[প্রাগুক্ত ৬৪-৬৬]

http://islamiboi.wordpress.com

চিত্রে পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের পরিসংখ্যান

সূরা	১১৪	যবর	৫৩২৪২
রুকূ'	৫৪০	যের	৩৯৫৮২
মদনী আয়াত	৬২১৪	পেশ	৮৮০৪
মক্কী আয়াত	৬২২১	মাদ্দ	১৭৭১
বসরী আয়াত	৬২২৫	তাশদীদ	১২৫২
শামী আয়াত	৬২২৬	নোক্তা	১৫৬৮৪
মোট শব্দ	৭৭,৪৩৯	হরফ	৩,৬৪,২১৯

أَسْبَابُ النُّزُوْلِ শানে নুযূল : অবতরণের দিক দিয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ দুপ্রকার। শানে নুযূলবিহীন আয়াত ও শানে নুযূল বিশিষ্ট আয়াত। কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতই এমন, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজেই বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ কোনো ঘটনার বিবরণ কিংবা কোনো সমস্যার সমাধান এসব আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য আয়াতসমূহ এরূপ যেগুলো কোনো সমস্যার সমাধান বা কোনো প্রশ্নের জবাব প্রদান কিংবা বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে। মূলত আয়াত নাজিলের পটভূমির এসব সমস্যা, উত্থাপিত প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিকে তাফসীর শাস্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় শানে নুযূল।

تَفْسِيْرٌ بِالرَّاْىِ [চিন্তাপ্রসূত তাফসীর] : তাফসীর বির্ রায় [تَفْسِيْرٌ بِالرَّاْىِ] -এর অর্থ হলো, কোনো আয়াতের ব্যাখ্যায় নিজের অনুমান ও মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া। এর বৈধতা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ ঢালাওভাবে এরূপ তাফসীরকে নাজায়েজ বলেন। আবার কেউ কেউ শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ বলেন। তবে এ মতপার্থক্যের সারকথা এই যে, تَفْسِيْرٌ بِالرَّاْىِ [ব্যক্তিগত অভিমত বা বুদ্ধিভিত্তিক তাফসীর] ঐ সময় হারাম বা নিষিদ্ধ হবে যখন তাফসীরকার সঠিক প্রমাণ ব্যতীত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, আয়াতের অর্থ এটাই, কিংবা যখন তাফসীরকার ভাষাগত মৌলনীতি ও শরিয়তের মৌলিক বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাফসীর করার ধৃষ্টতা দেখায়। অথবা যখন তাফসীরকার বিদ'আতের সপক্ষে কুরআনের আয়াত বিকৃতরূপে পেশ করে।

যারা তাফসীর বির রায়কে নাজায়েজ বলেন তাদের প্রমাণ : যারা মস্তিষ্ক, প্রসূত তাফসীরকে শর্তহীনভাবে নাজায়েজ বলেন, তাদের দলিল নিম্নরূপ−

প্রথম দলিল : ইজতিহাদ ও রায়ের দ্বারা তাফসীর করা ঠিক নয়। কারণ মুজতাহিদ নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে বলতে পারেন না যে, এটাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর এমনভাবে না জেনে ধারণা করে আল্লাহর উপর কোনো কথা বলা জায়েজ নেই। কুরআনে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে−

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (اعراف : ٣٣)

দলিল খণ্ডন : তাফসীর বির রায় আল্লাহ সম্বন্ধে কিছু না জেনে বলার নামান্তর− একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোনো বিষয়ে যদি সুস্পষ্ট দলিল না পাওয়া যায়, তাহলে শরিয়ত সম্মত ইজতিহাদের ভিত্তিতেই ফয়সালা দিবে। সে ক্ষেত্রে তাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে বলার নামান্তর হবে না। কারণ মানুষ তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের জন্য বাধ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন− لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ সাধ্য বহির্ভূত কোনো কিছুর মুকাল্লাফ কাউকে বনান না।"

http://islamiboi.wordpress.com

হাদীসও এর সমর্থন করে। নবী কারীম ﷺ বলেছেন- مَنِ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ لَهُ أَجْرٌ وَمَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ অর্থাৎ "যে ইজতিহাদ করবে এবং ভুল করে ফেলবে সেও একটি ছওয়াব পাবে। আর যদি ঠিক করে, তাহলে সে দু'টি ছওয়াবের অধিকারী হবে।"

এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইজতিহাদের দ্বারা তাফসীর করা আল্লাহ সম্বন্ধে কিছু না জেনে বলা নয়। তাই উক্ত আয়াত তাফসীর বির রায়ের বিপক্ষে নয়।

দ্বিতীয় দলিল : তারা নাজায়েজ হওয়ার উপর দু'টি হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। যথা-

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَلَيَّ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

٢. وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَاَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ - رواه ابوداؤد

দলিল খণ্ডন : প্রথম হাদীসের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. যে ব্যক্তি কুরআনের দুর্বোধ্য স্থানের ব্যাখ্যা করে, যা সে জানে না, তবে সে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে।
–[খাযিন, রূহুল মা'আনী]

২. যে ব্যক্তি নিজের মতাদর্শ প্রমাণ করার জন্য কুরআনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জেনে-শুনে ভুল ব্যাখ্যা দেয়, সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়। –[রূহুল মা'আনী]

দ্বিতীয় হাদীসটি সহীহ নয়। 'আল মাদখাল' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে হাদীসটির ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে। তার সনদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে মেনে নিলেও এর বিভিন্ন অর্থ করা যায়।

এক সে ভুল করার অর্থ হলো যে, সে তাফসীরের পদ্ধতি ভুল করেছে। কারণ একক শব্দের ব্যাখ্যার পদ্ধতি হচ্ছে ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের অনুসরণ করা। তাদের উক্তি খোঁজ করা। আর নাসেখ মানসূখের তাফসীর করার পদ্ধতি হলো ইতিহাস তালাশ করা এবং আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার জন্য আবশ্যক হলো বিধানদাতার কথার প্রতি লক্ষ্য করা। অথবা এখানে ভুল বলতে বুঝানো হয়েছে- যে ব্যক্তি নিজের মাযহাবের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তার সমর্থনে তাফসীরকে কাজে লাগায় এবং মাযহাবকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে- তার তাফসীর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা একেবারে প্রত্যাখ্যাত হবে। অতএব সে ভুল করেছে। অথবা, ভুল করার অর্থ হলো যে এমন দ্বি-অর্থবোধক আয়াতের তাফসীর করে ইজতিহাদ দ্বারা, যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। তাহলে সে ভুল করেছে অথবা হাদীসের উদ্দেশ্য হলো দলিল ব্যতীত নিশ্চিত কোনো ফায়সালা দেওয়া।

তৃতীয় দলিল : সাহাবাগণের কথা ও কাজ এবং তাবেয়ীনদের কথা দ্বারাও বুঝা যায় যে, তাফসীর বির্ রায় নাজায়েজ। যেমন- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.), শা'বী (র.) -এর কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্ণিত আছে- হযরত আবূ বকর (রা.)-কে কোনো এক আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রতিউত্তরে বলেছেন- أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي ؟ وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي ؟ إِذَا قُلْتُ فِي الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِي أَوْ بِمَا لَمْ أَعْلَمْ অর্থাৎ "না জেনে বা মনমতো কুরআন সম্পর্কে যদি কিছু বলি, তাহলে কোন অন্তরীক্ষ আশ্রয় দিবে আমায়? কোন ধারিত্রীতে হবে আমার ঠাঁই?"

অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (র.) বলেছেন- أَنَا لَا أَقُوْلُ فِي الْقُرْاٰنِ شَيْئًا অর্থাৎ "আমি কুরআন সম্বন্ধে কিছুই বলি না।"

তদ্রূপ শা'বী (র.) বলেছেন, তিনটি জিনিস সম্পর্কে আমি মৃত্যু পর্যন্ত কিছু বলব না। কুরআন, রূহ এবং স্বপ্ন।
–[মানাহিলুল ইরফান]

দলিল খণ্ডন : উল্লিখিত উক্তিসমূহের বিভিন্নভাবে উত্তর দেওয়া যায়-

১. সাহাবী ও তাবেয়ী হলেন পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ উম্মত। খওফে ইলাহির তাড়নায় প্রকম্পিত ছিলেন তারা সবচে' বেশি। সবক্ষেত্রে সতর্কতাও অবলম্বন করেছেন বেশি। তাঁদের সতর্কতামূলকভাবে কুরআনের কোনো আয়াত সম্পর্কে মতামত না দেওয়ার সাথে তাফসীর বির রায়ের বৈধতার সাথে কোনো বিরোধ নেই।

২. এও বলা যায় যে, যে সকল আয়াতের ক্ষেত্রে তাদের সঠিক ব্যাখ্যা জানা ছিল না, সে ক্ষেত্রে তাঁরা এ উক্তি করেছেন। তাই বলে যার ব্যাখ্যা জানা ছিল তার তাফসীর করতে পিছপা হননি। যেমন- হযরত আবূ বকর (রা.)-কে যখন সূরা নিসার এক আয়াতে উল্লিখিত اَلْكَلَالَةُ শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমি কালালাহ

http://islamiboi.wordpress.com

সম্বন্ধে আমার রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। যদি সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি ভুল হয়, তবে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। (اَلْكَلَالَةُ كَذَا وَكَذَا) এমনিভাবে হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের থেকেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং তাদের উক্তি নাজায়েজ হওয়ার কোনো দলিল হতে পারে না। -[প্রাগুক্ত]

৩. অথবা বলা যায় বিনা প্রয়োজনে তাঁরা কোনো তাফসীর করতেন না, প্রয়োজন হলে করতেন। তাদের এ সকল উক্তি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তাফসীরের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়- কথাটির অর্থ হলো আল্লাহর ভয় রাখা অবশ্য কর্তব্য। -[সূত্র : উলূমুল কুরআন ফরিদী ২১৯-২২২]

তাফসীর বির রায় জায়েজ হওয়ার পক্ষে দলিলসমূহ : কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে তাফসীর বির-রায়ের বৈধতা প্রমাণিত আছে। ধারাবাহিকভাবে এর দলিলগুলো পেশ করা হলো-

প্রথম দলিল : কুরআনের অনেক আয়াত তাফসীর বিররায় বৈধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। নিম্নে এমন কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হলো-

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا : محمد ـ ٢٤

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন- كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ (ص : ٢٩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ (النساء : ٨٣)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদেরকে কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ফিকির এবং গবেষণা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং পরোক্ষভাবে এর মাঝে কুরআনের অর্থ ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের আদেশও রয়েছে। যাতে কুরআনের ই'জায [অলৌকিকতা] প্রকাশ পায়। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইজতিহাদ এবং গবেষণা করে অর্থ ও ব্যাখ্যা করা শুধু জায়েজ-ই নয়; বরং প্রয়োজনীয়ও বটে।

দ্বিতীয় দলিল : হাদীস ও আছারে সাহাবা দ্বারা তাফসীর বির রায়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- اَلْقُرْاٰنُ ذَلُوْلٌ ذُوْ وُجُوْهٍ فَاحْمِلُوْا عَلٰى اَحْسَنِ وُجُوْهِهٖ কুরআন, অতিসহজ ও বিভিন্ন ধরনের অর্থ সম্বলিত। সুতরাং তোমরা সবচেয়ে উত্তম অর্থের উপর প্রয়োগ কর। -[রূহুল মা'আনী]

২. রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য দোয়া করেছেন- اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاْوِيْلَ হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনাদেরকে বিশেভাবে কিছু বলে গেছেন, যা অন্যদেরকে বলেননি? তিনি উত্তরে বললেন, আমাদের নিকট এই সহীফা তথা কুরআনে যা আছে, তা ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। হ্যাঁ, তবে কুরআনের গভীর জ্ঞান ও বুঝার শক্তি যা আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে দান করে থাকেন।

-[মিশকাত শরীফ খ. ২]

এ সকল সাহাবাগণের কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাফসীর বির রায় জায়েজ।

তৃতীয় দলিল : যুক্তির আলোকেও তাফসীর বির রায়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেননা নবী করীম ﷺ সকল আয়াতের তাফসীর করে যাননি। অথচ অনেক আয়াত বিধান সম্বলিত, যার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। যদি ইজতিহাদ দ্বারা তাফসীর করা নাজায়েজ হয়, তাহলে ঐ আয়াতের বিধি বিধানগুলো পাওয়া যেত না। এ জন্য রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنِ اجْتَهَدَ فَلَهٗ اَجْرٌ وَاِنْ اَصَابَ فَلَهٗ اَجْرَانِ ـ

অর্থাৎ "মুজাতাহিদ যদি ভুল করে, তাহলে এক ছওয়াব, আর ঠিক করলে দ্বিগুণ ছওয়াব।"

আমরা উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ, হাদীস, আছারে সাহাবা এবং যুক্তির আলোকে এ কথার সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, যে ব্যক্তি শর্তানুযায়ী ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখে, সে তাফসীরের যোগ্যতাও রাখে।

ই'জাযুল কুরআন [কুরআনের অলৌকিকতা] : اِعْجَازٌ [ই'জাযুন] শব্দের অর্থ অক্ষম করে দেওয়া, মুজিযা, অলৌকিক কাণ্ড। ই'জায বা মুজিযা সেই সকল কাজকে বলা হয় যার দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের চ্যালেঞ্জকে নিষ্ক্রীয় করে দেওয়া হয়।

কুরআন নাজিলের পর কাফেররা বিদ্রূপের সুরে বলতো, কুরআন মুহাম্মদের নিজস্ব রচনা। আমরাও এমন একটি তৈরি করতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়েন এবং নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে সক্ষম হবে না। ইরশাদ হচ্ছে-

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ (هود : ١٣)

http://islamiboi.wordpress.com

কুরআনের এ চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ দশটি সূরা উপস্থাপন করতে যখন তারা ব্যর্থ হলো, তখন ইরশাদ হলো–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ . (البقرة : ٢٣)

তাফসীর বিশারদদের মতে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, তোমরা কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা [কাউসার] -এর ন্যায় একটি সূরা এনে পেশ কর। তারা সকলে একত্র হয়ে সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালিয়েও কাউসারের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র সূরা বানাতে পারল না। তখন তারা সকলে এক বাক্যে ঘোষণা আকারে কাবার দেয়ালে লটকিয়ে দিয়েছিল– لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ অর্থাৎ এটি মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয়।

ভাষা ও অলংকার শাস্ত্রবিদ খ্যাতনামা আরব্য কবি ও পণ্ডিতরাও যখন কুরআনের অনুরূপ একটি সূরাও রচনা করতে ব্যর্থ হলো, তখন ইরশাদ হলো– قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا . (بنى اسرائيل : ٨٨)

অনুরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কুরআন বিরোধীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন, তারা যেন কুরআনের অনুরূপ অন্তত একটি সূরা রচনা করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা অনুরূপ একটি আয়াত রচনাও সক্ষম হয়নি।

ই'জাযের প্রকৃতি : কি কারণে এবং কিসের ভিত্তিতে পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন্ত ও অনন্য মু'জিযা হিসেবে স্বীকৃত? আর কেনইবা কুরআন সর্বযুগে অপরাজেয় এবং সমগ্র বিশ্ববাসী কেন এর নজির পেশ করতে সক্ষম হয়নি? পৃথিবীর কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী ভাষাবিদ, গবেষক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা কেন হতবাক হয়েছেন এবং থমকে গেছেন কুরআনের সুদীপ্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায়? প্রাচীনকাল থেকে কুরআনের ভাষ্যকার, বিশেষজ্ঞগণ নিরন্তর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং শত শত গ্রন্থ রচনা করে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। আর তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব রুচি ও বর্ণনাভঙ্গিতে এর বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিয়েছেন। বস্তুত কুরআনের মু'জিযার সকল প্রকৃতি [বৈশিষ্ট্য] বা প্রকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তারপরও গবেষণার আলোকে নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হলো–

শব্দ ও শব্দ প্রয়োগের অলৌকিকত্ব : গদ্য, পদ্য এবং ভাষা সম্পর্কে যার সাধারণ ধারণা আছে, তারই এ সত্যটা জানা আছে যে, পৃথিবীর কোনো ভাষারই কোনো সাহিত্যিক কিংবা কবি এমন দাবি করার জোর রাখে না যে, তার রচনার কোথাও কোনো অশুদ্ধ কিংবা অমার্জিত অথবা অশোভন শব্দের একটি ব্যবহারও হয়নি। এটা সম্ভব নয়। কারণ মনের ভাব ফোটাতে গিয়ে বাধ্য হয়েও কখনো কখনো এমনটা করতে হয়। ভাবটা ঠিকই ফুটে উঠে, সঙ্গে থেকে যায় শব্দের অশুদ্ধতা কিংবা অশোভনত্বের দোষ। এ ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে ব্যতিক্রম হচ্ছে আল কুরআন। শুধু অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগমুক্তই নয়; বরং আলহামদু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শুদ্ধ শব্দেরই প্রয়োগ উপযোগিতার ও অলঙ্কারের দিক থেকে এমনই লাগসই, যুৎসই ও অনিবার্য যে, তার কোনো সফল বিকল্প ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই। পৃথিবীর জীবন্ত ও সর্বোচ্চ বিত্তবান ভাষাসমূহের একটি আরবি ভাষা। যেই আরবি ভাষার বিপুল শব্দের ভাণ্ডার থেকে নিজস্ব মর্ম ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশের জন্য কুরআনে করীম সেই শব্দটিই নির্বাচন করেছে, যা পূর্বাপর ধারাবাহিকতা, অর্থের পূর্ণাঙ্গতা ও নির্দিষ্টতা এবং ভাষাশৈলীর প্রাঞ্জলতা ও গতিময়তার দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে উপযোগী ও সর্বোচ্চ যথাযথ। শব্দগত এই অলৌকিকত্বের কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে–

১. মৃত্যু বা মরণ এর অর্থ দেওয়ার জন্য জাহেলী যুগে প্রায় চব্বিশ পঁচিশটি শব্দ ব্যবহৃত হতো। যেমন–

هَلَاكٌ . مَوْتٌ . سَامٌ . مَنُوْنٌ . حِمَامٌ . حَتْفٌ . فَنَاءٌ . شَعُوْبٌ . قَاضِيَةٌ . هَمْغٌ . يَنْطٌ . فَوْدٌ . مِقْدَارٌ . جَبَازٌ . قَتِيْمٌ . حَلَّاقٌ . طَلَاطِلٌ . طَلَاطِلَةٌ . عَوْلٌ . ذَامٌ . كَفْتٌ . جَرَاعٌ . جَزَرَةٌ . خَالِجٌ .

সকল শব্দের অধিকাংশের প্রয়োগ যেই মৃত্যুকে বুঝানো হতো, সেই মৃত্যু হলো দ্বিতীয়বার উত্থান ও জীবন লাভের সম্ভাবনা রহিত একটি সর্বাত্মক নাশ বা ধ্বংস। জাহেলী যুগের আরবদের প্রাচীন পরকালহীনতার বিশ্বাস সে সব শব্দে ফুটে উঠতো। মৃত্যুকে বুঝানোর জন্য কুরআনে কারীমেই প্রথম একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক ও যথাযথ অর্থবোধক শব্দ উপহার দিয়েছে। সেই শব্দটি হলো تَوَفِّيْ বা وَفَاةٌ [ওফাত] যার অর্থ কোনো বস্তুর পূর্ণাঙ্গ পরিশোধ ও উসূল করে নেওয়া। এর দ্বারা ইসলামের পরকালবাদী বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং মৃত্যুর মূল স্বরূপ তুলে নেওয়া হয়েছে। ইহকালীন জীবনের পাঠ পূর্ণ করাই হচ্ছে ওফাত। এরপরই মানুষের পরকালীন জীবনের যাত্রা শুরু হয়। পবিত্র কুরআনের আগে মৃত্যুকে বুঝানোর জন্য এই শব্দটির প্রয়োগের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায়নি।

http://islamiboi.wordpress.com

২. সকল ভাষাতেই কিছু শব্দ এমন থাকে, যেগুলো শ্রুতিমধুর হয় না, স্বর ও ধ্বনির দিক থেকে শুদ্ধ ও শোভন হয় না। কিন্তু বিকল্প শব্দের অভাবে প্রতিশব্দের অনুপস্থিতিতে বাধ্য হয়েই উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে গিয়ে সেই শব্দের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম এমনই আকর্ষণীয় অভিব্যক্তি ও বর্ণনা উপহার দেয়, যা সাহিত্য ও উপলব্ধির সুরুচির কাছে তাক লাগানো ও কাঙ্ক্ষিত দিগন্তের সন্ধান লাভের আনন্দ দান করে। যেমন ভবন নির্মাণের জন্য যে পাকা ইটের দরকার হয়, সেই ইটের অর্থ দানকারী আরবি শব্দগুলোর প্রায় সবকটিকেই ভারি, দুরূহ অপছন্দযোগ্য মনে করা হয়ে থাকে। যেমন- قرمد . طوب . آجر : কিন্তু কুরআনে কারীমের বর্ণনায় ফেরাউন কর্তৃক তার উজির হামানকে প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দানের বিষয়টি এসেছে এমনভাবে যে, মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ তাতে ইটের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। শ্রুতিকটু শব্দের প্রয়োগ থেকে মুক্ত থাকার পাশাপাশি উন্নত ভাষাশৈলীর ব্যবহার সেখানে পাঠককে বিমোহিত করে ফেলে- فَاَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا

অর্থাৎ অতএব, হে হামান! কাদামাটির উপর আগুন প্রজ্জ্বলিত করো এবং আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করো।

৩. আরবি ভাষায় এমন কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো একবচনে শুদ্ধ, শোভন ও প্রাঞ্জল হলেও বহুবচনে সেটি ভারি ও দুরূহ শব্দের অন্তর্ভুক্ত أَرْض জমিন। শব্দটির বহুবচন হলো أَرَاضِيْ একবচনে أَرْض শব্দটি সাবলীলও প্রাঞ্জল হলেও বহুবচনবোধক উভয় শব্দই কঠিন শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। কথার প্রাঞ্জলতা বাঁধাগ্রস্ত হয় এগুলো দ্বারা। বহুবচনের অর্থ প্রকাশ যেখানে জরুরি, সেখানে অনিবার্যভাবেই আরব সাহিত্যগণ বাধ্য হন এইসব শব্দ প্রয়োগে। কিন্তু কুরআনে কারীমের উপস্থাপনা ও অভিব্যক্তির ধারা এ ক্ষেত্রে ভিন্ন। سَمٰوٰتُ বহুবচনের সাথে أَرْض একবচনের শব্দের প্রয়োগ হয়েছে বহু স্থানে। একটিমাত্র অনিবার্য ও বিকল্পহীন ক্ষেত্র ব্যতীত কোথাও أَرْض -এর বহুবচনের ব্যবহার আসেনি। বরং أَرْض -এর বহুবচনের প্রয়োগ জরুরি- এমন স্থানে পবিত্র কুরআনের চমৎকার উপস্থাপনা শৈলী হলো-

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ .

অর্থাৎ আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সেই সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনের মধ্যে থেকে তত সংখ্যক।

পবিত্র কুরআনের শব্দ প্রয়োগ ও শব্দের ব্যবহারের ভাষা ও অলংকারের বুৎপত্তি নিয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আকর্ষণীয় চমৎকার, অত্যুজ্জল ও যুৎসই শব্দ ব্যবহারের এক অনির্বাচনীয় স্বাদ ও রুচির দিগন্ত উন্মোচিত হতে বাধ্য। বিশেষত বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে শ্রুতিকটু ও ভারি হিসেবে গণ্য কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও উপযোগিতায় এতই আকর্ষণীয়ভাবে পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, সে স্থানে কোনো শব্দেরই বিকল্প প্রয়োগ ব্যর্থ হতো।

তারকীব বা বাক্যের অলৌকিকত্ব : শব্দের পরে আসে বাক্য, বাক্যের গঠন প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের কথা। বাক্যের ব্যবহার ও তার সৌন্দর্য ও মিষ্টতার ক্ষেত্রেও কুরআন মাজীদের অবস্থান সাহিত্য ও নান্দনিকতার চূড়া। পবিত্র কুরআনের বাক্যসমূহের প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা মধুরতা, অর্থের ব্যাপকতা এবং রূপ-সৌন্দর্যের কোনো বিকল্প নজির পেশ করা সম্ভব নয়। কুরআন মাজীদ থেকে শুধু একটি মাত্র উদাহরণ আমরা দেখতে পারি। হত্যাকারীর হত্যার বদলা গ্রহণ করা আরবদের মাঝে ছিল অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য বিষয়। তাই হত্যার বদলা গ্রহণের উপকারিতার কথা উল্লেখ করে আরবিতে একাধিক বাগধারা ও কথা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। যেমন-

اَلْقَتْلُ اِحْيَاءٌ لِلْجَمِيْعِ [হত্যা সমাজের জন্য জীবন স্বরূপ]

اَلْقَتْلُ اَنْفٰى لِلْقَتْلِ [হত্যা হত্যাকে থামায়]

اَكْثِرُوا الْقَتْلَ لِيَقِلَّ الْقَتْلُ [অধিক হত্যাকাণ্ড করো, যেন হত্যা কমে যায়]

আবরদের মাঝে এই বাক্যগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এত বেশি যে, মানুষের মুখে মুখে এগুলোর প্রচলন ছিল এবং এই বাক্যগুলোকে অলঙ্কারপূর্ণও মনে করা হতো। কিন্তু এ বিষয়টাকেই কুরআনে কারীম উপস্থাপন করেছে অপরূপ সুন্দর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থের ধারক এবং অলঙ্কার ও শিল্পের চূড়ান্ত অবস্থানকারী একটি বাক্যে। সেটি হলো- وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ অর্থাৎ আর কিসাস বা হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ডের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।

এই বাক্যে সংক্ষিপ্ততা, ব্যাপকতা, সাবলীলতা এবং সৌন্দর্যই যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে ফুটে উঠেছে, তাই নয়; বরং এতে হত্যার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বাস্তবায়নে মানব জীবনের যে কল্যাণ নিহিত ও সংরক্ষিত আছে, তাও কুরআনের নিজস্ব ধারা ও বিশ্লেষণে ফুঠে উঠেছে। হত্যাকারীর শাস্তি হিসেবে হত্যাকারীকে বধ করায় কোনো প্রতিশোধ চেতনা কিংবা রিপুতাড়িত প্রবণতাকে উস্কে না দিয়ে এখানে বৃহত্তর মানব সমাজের জীবনের সংরক্ষণ ও স্থিতির সুন্দর লক্ষ্যের কথাই উদ্ভাসিত হয়েছে। হত্যার বদলা সম্পর্কিত যেসব বাক্য আরবি ভাষায় চালু আছে সেগুলোর সকল বাক্যই এই একটি বাক্যের সৌন্দর্য ও সুষমার সামনে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

http://islamiboi.wordpress.com

ভাষাগত শৈলীর অলৌকিকত্ব : কুরআনে করীমের ভাষাগত অলৌকিকত্বের সবচেয়ে প্রধান ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কুরআনের গদ্যশৈলী, বর্ণনার স্টাইল ও রীতি। পবিত্র কুরআনের ভাষাগত মাধুর্যের এই একটি দিক এমন যে, সে সম্পর্কে প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর অনুধাবন ও অনুভব করতে সক্ষম হয়। এমনকি কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনে এই মাধুর্যের পরশ তার হৃদয়ে অনুভব করতে পারে। পবিত্র কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলী, স্টাইল ও গদ্যরীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি হলো–

ক. পবিত্র কুরআন মূলত এমন একটি গদ্য বর্ণনার সমষ্টি, ব্যাকরণসিদ্ধ আরবি, কবিতা ও কাব্যের কোনো নিয়ম-নীতির সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিবেচনা ও অবলম্বন না থাকলেও যার মাঝে বিরাজ করছে এমনই স্বাদ, মিষ্টি দ্যোতনা, যা কবিতার চেয়েও অধিক, কবিতার চেয়েও উর্ধ্বে। ভাষার যাবতীয় রূপ ও প্রকাশের মধ্য থেকে একমাত্র কবিতাই হচ্ছে এমন যার মাঝে দ্যোতনা ও হৃদয়ের গুরুত্ব সর্বোচ্চ, তার সঙ্গে থাকে আবার নানা মিল ও ওযনের বাধ্যবাধকতা। দেশ, রুচি, ও অঞ্চল ভেদে কবিতার ক্ষেত্রে নানা ধরনের নিয়ম ও ওযনের বাধ্য বাধকতা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে আরবি-ফার্সি কবিতায় আটো সাটো ও সমৃদ্ধি ব্যাকরণ সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। কিন্তু সকল ভাষার কবিতারই মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাতে শব্দসমূহের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে এমন একটি স্বর ও ধ্বনি দ্যোতনার উপস্থিতি থাকবে যে, মানুষ তা পাঠ ও শ্রবণ করার পর তার রুচির স্নিগ্ধতা ও কোমলতায় তা বিশেষভাবে বরণযোগ্য, অনুভবযোগ্য হয়ে উঠবে। কবিতার এই অনিবার্য বৈশিষ্ট্যটিকে অবলম্বন করার জন্য প্রচলিত, বিরাজমান, স্বীকৃত কাব্যবিধি অনুসরণ করা কবিদের পক্ষে জরুরি হয়ে যায়। কবিতার জন্য এই সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনের গদ্যে বর্ণাঢ্য ও অতুলনীয় ভঙ্গিতে কবিতার এই মূল বৈশিষ্ট্যটির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কোনো ভাষার কোনো কাব্যবিধির নিয়ন্ত্রক ও সীমাবদ্ধতা অনুচিত না হওয়া সত্ত্বেও। এটি পবিত্র কুরানের গদ্যশৈলীর এক অনির্বচনীয় ব্যাপক সৌন্দর্য, যা শুধু আরবরাই নয়; বরং দুনিয়ার যে কোনো ভাষাভাষী মানুষই কিছু না কিছু অনুভব করতে সক্ষম হন এবং পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ মাত্রই অসাধারণ এক স্বাদ ও প্রভাব অনুভব করেন।

খ. অলংকারবিদগণ গদ্যশৈলীর তিনটি প্রকার নির্ধারণ করেছেন। প্রকার তিনটি হলো, বক্তৃতামূলক, সাহিত্যমূলক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যমূলক গদ্যের এই তিনটি শৈলীর প্রতিটিরই ক্ষেত্রে পরিধি ও চরিত্র আলাদা। একই গদ্যে তিনটি রীতির সমন্বয় সম্ভব নয়। কিন্তু কুরআনে কারীমের অলৌকিকত্ব হলো এই তিনটি শৈলীরই অপূর্ব সমন্বয় ও সমাবেশ তাতে সফলভাবে বিদ্যমান। একটি গদ্যেই বক্তৃতার জোর, সাহিত্যের সৌরভ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভারত্ব একই সঙ্গে সচল থাকে এবং কোনটাতেই কোন ধরনের ত্রুটি বা অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় না।

গ. কুরআন মাজীদের সম্বোধিত শ্রেণি হচ্ছে গোটা মানব জাতির সকল শ্রেণি। অশিক্ষিত, গ্রাম্য, শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ও নানা বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতদের সকলেই পবিত্র কুরআনের সম্বোধিত শ্রেণি। পবিত্র কুরআনের একটি শৈলী একই সঙ্গে সকল শ্রেণির মানুষকেই বিমোহিত করে থাকে, প্রভাবিত করে থাকে। এ দিকে অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষ কুরআন মাজীদের মাঝে সরল ও সাদা বাস্তবতা খুঁজে পায় এবং ভাবে যে, কুরআন আমার জন্যই নাজিল হয়েছে। অপরদিকে জ্ঞানী ও গবেষক শ্রেণি যখন গভীর মনোযোগ ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কুরআন শরীফ পাঠ করেন, তখন তারা তার মাঝে বহু প্রজ্ঞাদীপ্ত সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধান লাভ করেন এবং ভাবেন যে, এই গ্রন্থ খাস ইলম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন সব সূক্ষ্ম তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ যে, মামুলি শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে কেউ কুরআন শরীফ বুঝতেই পারবে না।

ঘ. একটি বিষয়কেই বারবার উল্লেখ করা এবং তাতে পূর্ণ আকর্ষণ বজায় রাখা একজন সর্বোচ্চ সাহিত্য প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও কঠিন। শ্রোতা বা পাঠকের বিরক্তি কিংবা অনীহা এক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠে। বক্তব্যের শক্তি ভেঙ্গে যায়। প্রভাব ও ক্রিয়া কমে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের মুআমালা হলো এই যে, তাতে একই বিষয়, একই প্রসঙ্গ, এই কাহিনী বারবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশবার পর্যন্ত পুনরোল্লেখ হয়েছে; কিন্তু প্রতিবারই কুরআন নতুন ধরন, নতুন স্বাদ এং নতুন প্রভাব ও ক্রিয়া উপস্থাপন করেছে।

ঙ. কোনো কথা ও সত্যের শক্তি ও প্রাচুর্য এবং সূক্ষ্মতা ও মিষ্টতা ভিন্ন দুটি বৈশিষ্ট্য। দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন স্টাইল ও শৈলী অবলম্বন করতে হয়। এই উভয় বৈশিষ্ট্যকে একটি মাত্র গদ্যে একত্র ও একীভূত করা মানবীয় শক্তি বহির্ভূত কাজ। কিন্তু শুধুমাত্র কুরআনিক গদ্যশৈলীর অলৌকিক অনন্যতা যে, কুরআনের মাঝে এই উভয় গুণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চমৎকারভাব বিদ্যমান।

চ. কিছু কিছু বিষয় ও প্রসঙ্গ এমন রয়েছে যে, যেগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে হাজার চেষ্টা করলেও কোনো মানবীয় মেধা ও মস্তিষ্ক সাহিত্যের স্বাদযুক্ত করতে সক্ষম হয় না। পবিত্র কুরআন এ ধরনের বিষয় নিয়েও সাহিত্য ও অলঙ্কারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনকানুনের কথা বলা যেতে পারে। এটি একটি মামুলি পর্যায়ের

http://islamiboi.wordpress.com

শুষ্ক ও শক্ত বিষয়। দুনিয়ার সকল সাহিত্যিক ও কবি ঐক্যবদ্ধ হয়েও বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো সাহিত্য কিংবা সৌন্দর্য ও শিল্পের সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু আপনি কুরআন শরীফের সূরা নিসায় يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِىٓ أَوْلَادِكُمْ থেকে একটি রুকু' তেলাওয়াত করুন; যেখানে উত্তরাধিকার আইন কানুনের সবিস্তার আলোচনা রয়েছে; আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্বগতোক্তি করে উঠবেন, এতো এক বিস্ময়কর কালাম, অসাধারণ ও অলৌকিক কালাম! কারণ এই রুকু'তে উত্তরাধিকারের বিধি-বিধানের সাথে সৌন্দর্য ও শিল্পের এমনই চমৎকার সংমিশ্রিত পরিবেশনা রয়েছে যে, সাহিত্য ও উপলব্ধির সুস্থ ও স্নিগ্ধ রুচি সেখানে স্বাদ ও সুখের দিগন্ত আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করে।

ছ. প্রত্যেক কবি ও সাহিত্যকের জন্য উপযোগিতা ও অলংকারের একটি নির্দিষ্ট ময়দান বা অঙ্গন থাকে। সেই অঙ্গনে শিল্প ও সাহিত্যিক কারুকাজে পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রাখতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কেউ রোমান্টিক কাব্যে, কেউ কথা সহিত্যির সাধারণ বিষয়ে, কেউ জীবন গঠনমূলক সাহিত্যে, কেউ বা ইতিহাস ঐতিহ্য বিষয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আরবি সাহিত্যেও ইমরুল কায়েস, নাবেগা, আ'শা, যুহায়েরের কাব্যে এই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গন ও বিষয় চিহ্নিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কুরআন কারীমের মাঝে এ পরিমাণ বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যা গণনা ও আয়ত্ত করা দারুণ দুরূহ; কিন্তু সকল বিষয় ও প্রসঙ্গেই কুরআন কারীমের বর্ণনা অলংকার ও ভাষা শিল্পের উচ্চমান ও মাপের বাহক হয়ে আছে।

জ. সংক্ষিপ্ততা এবং বাহুল্য বর্জন কুরআন শরীফের স্টাইল ও শৈলীর অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যে কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংক্ষিপ্ত এক একটি বাক্যে সুবিস্তৃত বিষয় ও বক্তব্য এতো চমৎকারভাবে ধারণ করেছে যে, সকল যুগ ও কালের মানুষই সেখান থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারে। কুরআন মজীদ ইতিহাসগ্রন্থ নয়; কিন্তু ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য উৎস; রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-বিধানের গ্রন্থ নয়, কিন্তু কুরআন মাজীদের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে রাষ্ট্রনীতি ও জগৎ গড়ার এমন সব নীতিমালা উপস্থাপিত হয়েছে, যা দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত মানুষকে রাহনুমায়ী করে যাবে। কুরআন মাজীদ দর্শন এবং বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, কিন্তু তার মাঝে দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থি উন্মোচিত হয়েছে। কুরআন মাজীদ অর্থনীতি ও জীবন-জীবিকার কোনো গ্রন্থ নয়, কিন্তু উভয় বিষয়েই সংক্ষিপ্তভাবে এমন ব্যাপক ও সম্পূর্ণ হেদায়েত তাতে উপস্থিত যে, পৃথিবী সহস্র বছর ঘুরেও পর তত্ত্ব সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে। এছাড়াও আরো বহু বিষয় ও প্রসঙ্গ কুরআন মাজীদে রয়েছে পৃথিবীর মানুষের জন্য সংক্ষেপে [illegible] মীমাংসাকারী হিসেবে। অথচ এর সবই এসেছে [illegible] ছোট-ছোট সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র বাক্যে।

ধারাবাহিকতা ও পরম্পর অলৌকিকত্ব : পবিত্র কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য ও গভীর অলৌকিকত্বের দিক হলো, কুরআনের আয়াতসমূহের মাঝে পারস্পরিক সামঞ্জস্য, সম্বন্ধ, ধারাবাহিকতা, পরম্পরা এবং পূর্বাপর বিন্যাস। ভাসা ভাসা চোখে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে যেতে থাকলে দৃশ্যত মনে হতে থাকবে প্রতিটি আয়াতই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও বক্তব্যের বাহক, প্রতিটি আয়াতই স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ব ও পরের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আবার গভীরভাবে, সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আয়াতসমূহের মাঝে গভীর সূক্ষ্ম ও কোমল একটি সম্বন্ধ বিদ্যমান। বিদ্যমান চমৎকার ধারাবাহিকতা, পরম্পরা ও বিন্যাস। একই সাথে প্রত্যেক আয়াতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, পূর্বাপরের প্রতি অনির্ভরতা এবং পরম্পরা ও ধারাবাহিকতার এই অনন্য বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের এমনই অলৌকিক বিশেষত্ব যা মানবীয় সামর্থ্যের বহু উর্ধ্বের বিষয়।

ভবিষ্যত সংবাদ প্রদান : কুরআনে কারীম ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে যেভাবে সংবাদ দিয়েছে, ঠিক সেভাবেই তা যথাসময়ে সংঘটিত হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছেও বর্তমানে কেউ ভবিষ্যতের সঠিক সংবাদ দিতে পারছে না। এটি একমাত্র কুরআনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীরাও তা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন রোমকদের বিজয় সংবাদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হেফাজতের ওয়াদা, বদর যুদ্ধে জয়লাভের সুসংবাদ ইত্যাদি।

বিগত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত : কুরআনে কারীম অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে এমন নির্ভুল তথ্য দিয়েছে, যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। যেমন– আসহাবে কাহাফ, হযরত ইউসূফ (আ.), যুল কারনাইন, লুকমান (আ.) ও খিজির (আ.)-এর বিবরণ তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

প্রভাব বিস্তার ক্ষমতা : কুরআনের তেলাওয়াত বা শ্রবণ পাঠক-শ্রোতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যা পৃথিবীর কোনো গদ্যের কিংবা পদ্যের গ্রন্থে এহেন স্থায়ী প্রভাব ও আকর্ষণীয় শক্তি, মাধুর্য ও মহত্ত্ব নেই।

পুনঃ পুনঃ পাঠের স্বাদ : কারো কোনো রচনা যতই অলঙ্কার ও সাহিত্যমণ্ডিত হোক না কেন, মানুষ তা দু' এক বার পড়া বা শোনার পর আর পড়ে না বা শুনতে চায় না; বরং তার প্রতি এক ধরনের বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু কুরআনে কারীম একমাত্র গ্রন্থ, যা যা বারবার পাঠে বা শ্রবণে নতুন স্বাদ অনুভব করা যায়। পড়ার প্রতি সমান আগ্রহ বিরাজ করে

স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা : আলকুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা চিরকাল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকবে। অন্যান্য আসমানি কিতাবও এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারেনি। ইরশাদ হয়েছে– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। –[সূরা হিজর : ৯] সূত্র : –[উলূমুল কুরআন : তাকী উসমানী ২৪৮-২৫২]

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

কুরআন নাজিলের সময় থেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে স্বীয় বাণী দ্বারা কুরআনে কারীমের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এভাবে সাহাবায়ে কেরাম নবুয়তে মুহাম্মদি ও নূরে রিসালাতের আলোকে কুরআনের তাফসীর করেছেন তাবেয়ীগণের যুগে তাফসীরের মধ্যে আরো সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এভাবে প্রতিটি যুগে তার পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও তথ্য কুরআন থেকে উদঘাটিত হতে থাকে। এ অফুরন্ত অমূল্য রতন থেকে লাভবান হওয়ার জন্য সকল শ্রেণির জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতবর্গ দিবানিশি প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সে ধারা আজ পর্যন্ত চলছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত অনবরত চলতেই থাকবে। কারণ এই নিখিল ধারার সকল মানুষ ও সমগ্র জাতি একত্র হয়েও যদি কুরআন ব্যাখ্যায় আপন আপন জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তবুও তার ব্যাখ্যা অপূর্ণই থেকে যাবে। এ কথার প্রতিই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিত করে বলেন - لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ [কুরআনের ব্যাখ্যা ও আশ্চর্য প্রকাশের কোনো পরিধি নেই]

তাফসীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

রাসূল ﷺ-এর যুগে তাফসীর : পবিত্র কুরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে। কুরআন অবতরণের যুগে সাহাবায়ে কেরাম আয়াতের অর্থ ও মর্ম অতি সহজেই অনুমান করে নিতেন। কোথাও কোনো অস্পষ্টতা থাকলে কিংবা অবোধগম্য হলে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জেনে নিতেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে কুরআনের ধারক বাহক হিসেবে প্রেরণ করার সাথে সাথে এ কথাও রাসূল ﷺ -কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের কাছে কুরআনকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিন।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাফসীর : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর পর খেলাফাতে রাশেদার যুগে যখন চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় শুরু হলো আর সাহাবায়ে কেরাম বিশ্ব মানবের কাছে ইসলামের বাণী নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন, তখন ইসলামি সভ্যতা ও কৃষ্টি কালচারের ক্ষেত্র ও পরিধি বাড়তে থাকল। তখন দ্রুতগতিতে দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অনুপ্রবেশ করতে লাগল। দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। নতুন নতুন সমস্যার সমাধানকালে সাহাবায়ে কেরাম কুরআনে কারীমের আহকাম সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মাঝে গবেষণা করার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন এবং রাসূল ﷺ -এর হাদীসের আলোকে তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। হাদীসে পাওয়া না গেলে ইলমে নববীর আলোয় উদ্ভাসিত ইজাতিহাদ দ্বারা ব্যাখ্যা দেন।

সে যুগে দশজন সাহাবা এমন ছিলেন যাঁরা এ বিষয়ে পারদর্শী ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন। বিশেষভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন এ ময়দানের অগ্রগামী, অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। রাসূল ﷺ তাঁকে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন [দীনি ইলমে পাণ্ডিত্য] হাসিলের জন্য দোয়া করেন। তাই তাঁকে বলা হয় রঈসুল মুফাসসিরীন। তিনি খোদাপ্রদত্ত বিজ্ঞতা, দক্ষতা ও তথ্যবহুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাফসীর বিষয়ে তাঁর কথাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাধারণত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু তখনো কিতাব আকৃতিতে কোনো তাফসীর লিপিবদ্ধ হয়নি; বরং তা সাহাবায়ে কেরামের নিকট বিভিন্ন উপায়ে সংরক্ষিত ছিল। ধীরে ধীরে যখন তাফসীরের মধ্যে সম্প্রসারণ ঘটতে লাগল, তখন বিশেষভাবে তা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তাবেয়ীগণের যুগে তাফসীর : যাঁরা রাসূল ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেননি, তবে রাসূলের সাহাবীগণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিছু সাহাবীদের সংশ্রবে থেকে ইলমে ওহীর শারানান তাহুরায় পরিশোধিত করেছেন নিজেদের। অর্জন করেছেন ইলমে নববীর পাণ্ডিত্য। তাঁদের মধ্যেও বিশেষ কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁরা তাফসীরের ক্ষেত্রে পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন। যেমন- আতা ইবনে আবী রাবাহ, ইকরামা , সাঈদ ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী ও আবুল আলিয়াহ প্রমুখ। খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান সাঈদ ইবনে যুবাইর -এর নিকট একখানা তাফসীরগ্রন্থ লিখার দরখাস্ত করলে তিনি তার ফরমায়িশ রক্ষার্থে একখানা তাফসীরগ্রন্থ খলীফার কাছে পাঠিয়ে দেন। সেটা ছিল তাফসীরে আতা ইবনে দিনার। এটি ঐতিহাসিক একখানা তাফসীরগ্রন্থ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এটাই তাফসীর সম্পর্কে প্রণীত প্রথম কিতাব।

তাফসীর সংকলনের যুগ : এ যুগ ছিল ঐ যুগ, যে যুগে সত্যিকারার্থেই তাফসীরের ক্ষেত্রে বিশেষ গবেষণা ও তাফসীরের প্রসারের ব্যাপকতা লাভ করে। আর এ যুগটা খেলাফতে উমাইয়ার শেষলগ্ন থেকে খেলাফতে আব্বাসিয়ার শুরু পর্যন্ত। তাফসীর প্রথমে হাদীস শাস্ত্রেরই একটি শাখা ছিল। পরবর্তীতে এ বিষয়ের ব্যাপকতা সৃষ্টি হলে এবং বিষয়বস্তুর বিস্তার ঘটলে সে যুগের বিজ্ঞ মনীষীগণ তাফসীরশাস্ত্রকে হাদীসশাস্ত্র থেকে আলাদা করে অন্য একটি আলাদা ও ভিন্ন শাস্ত্রের রূপ দেন। অনেকেই গ্রন্থ আকারে তাফসীর লিখেছেন । যেমন- তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী। যা একটি উল্লেখযোগ্য, প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় তাফসীরগ্রন্থ।

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীর উদ্ভাবনের পরবর্তী যুগ : এখান থেকে তাফসীরের পঞ্চম যুগ শুরু হয়। আর তা খেলাফতে আব্বাসিয়ার শুরুলগ্ন থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলে আসছে। এর আগের যুগে তাফসীর শুধুমাত্র রেওয়ায়েত, আছার এবং আহাদীসের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ যুগে তার সাথে ইজতিহাদ, আকল ও ব্যক্তি মতামতের সৃষ্টি হয়। তার সাথে সাথে অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ের সংমিশ্রণ হয়। যেমন- নাহু, সরফ, লুগাত, দর্শন, হিকমত ও ইতিহাস ইত্যাদি।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর দীন ইসলামের মাঝে বিভিন্ন ফেতনা ও বিপর্যয় দেখা দেয় এবং হক বাতিলের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আবিষ্কার হতে থাকে নানা দৃষ্টিকোণ। শুরু হয় মুসলমানদের মাঝে অযাচিত লড়াই। এ ধারা ক্রমপর্যায়ে খিলাফতে আব্বাসিয়ার যুগে আরো চাঙ্গা হয়ে উঠে। তখন দলগত গোড়ামি এবং স্বজনপ্রীতি চরম আকার ধারণ করে। প্রত্যেকেই কুরআনী ব্যাখ্যা দ্বারা নিজ নিজ মতবাদ ও দৃষ্টিকোণ এবং আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে প্রতিটি শাস্ত্রে গবেষক ও পণ্ডিতগণ কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার শাস্ত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। মুহাদ্দিসগণ তাদের প্রণীত তাফসীরগ্রন্থে শুধুমাত্র হাদীস সংক্রান্ত তাফসীর সন্নিবিষ্ট করেছেন যেমন- তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে ইমাম বুখারী ইত্যাদি ফকীহগণ তাদের বর্ণিত তাফসীরগ্রন্থে ফিকহী মাসায়েল তুলে ধরেছেন এবং নাহুবিদগণ যে সমস্ত তাফসীরগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তাতে নাহুর মাসায়েল তুলে ধরেছেন অনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন যেমন প্রসিদ্ধ নাহুবিদ যুজাজ তার কিতাবে আর ওয়াহেদী তার কিতাব বসীত-এর মধ্যে আবূ হাইয়ান তার কিতাব আল বাহরুল মুহীতে নাহুর কায়েদা কানুন ও তথ্যাবলি পেশ করেছেন আর যারা উলূমে আফলিয়্যাহ ও যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী, তারা তাদের তাফসীরগ্রন্থে যুক্তির নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন দক্ষ হাতে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর কিতাব এ ধারার একটি বিশেষ নমুনা তাতে তিনি আকলী-নকলী সকল প্রকারের দলিল পেশ করেছেন

সূফীগণ তাঁদের প্রণীত তাফসীরগ্রন্থে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমাহার ঘটিয়েছেন যেমন- ইসলামের নামধারী বাতিল মতাদর্শীরাও তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও দৃষ্টিকোণকে প্রমাণ করতে গিয়ে তাফসীর লিখেছে, যাতে একমাত্র তাদেরই মতাদর্শ স্থান পেয়েছে যেমন- শীয়ারা তাদের গ্রন্থাদিতে শীয়া মতবাদকে জায়গা দিয়েছে মু'তাজিলারা তাদের মতাদর্শকে সামনে রেখে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। আবুল আলা মওদুদী সাহেবও এ ধারারই একজন নিজের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করার জন্য কুরআনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি

তাফসীরগ্রন্থের শ্রেণি বিন্যাস : তাফসীরগ্রন্থসমূহ মূলত দু ভাগে বিভক্ত । যথা–

১. তাফসীর বিল মাসূর অর্থাৎ ঐ সকল তাফসীরগ্রন্থ যাতে শুধু কুরআন হাদীসের আলোকে তাফসীর করা হয়েছে; সেখানে রায়, কিয়াসের দখল নেই
২. তাফসীর বিল মাকূল অর্থাৎ যাতে শুধু দেরায়াত ও আকলিয়াতের উপর নির্ভর করা হয়েছে।
৩. রেওয়ায়েত এবং দেরায়াত উভয়টির সমন্বিত তাফসীর। [এটি সবচেয়ে বেশি উচ্চ স্তরের]

তাফসীর গ্রন্থের আরো একটি শ্রেণি বিন্যাস : তাফসীরের কিতাবসমূহ তিন রকমের হয়ে থাকে। যথা–

১. مُخْتَصَر وَ اَوْجَز অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর। যেমন– জালালাইন শরীফ। এর মতন এবং তাফসীরের শব্দসমূহ সমান সমান।
২. اَوْسَط মধ্যম স্তরের তাফসীর। যেমন– তাফসীরে বায়যাবী, মাদারেক, কাশশাফ, তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি।
৩. مَبْسُوط وَ مُفَصَّل অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর, যেমন ইমাম রাযী (র.)-এর তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থসমূহ

তাফসীর বিল মাসূর সম্পর্কে কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি :

١. جَامِعُ الْبَيَانِ فِى تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ ـ اِبْنُ جَرِيْر طَبَرِىْ (رح)
٢. بَحْرُ الْعُلُوْمِ ـ اَبُو اللَّيْثِ سَمَرْقَنْدِىْ (رح)
٣. اَلْكَشْفُ وَالْبَيَانُ عَنْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ ـ اَبُوْا سْحَاقَ تَغْلَبِىْ (رح)
٤. مَعَالِمُ التَّنْزِيْلِ ـ اَبُوْ اِسْحَاقْ حُسَيْن بَغْوِىْ (رح)
٥. اَلْمُحَرَّرُ الْوَجِيْزُ فِىْ تَفْسِيْرِ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ ـ اِبْنُ عَطِيَّه اَنْدُلُسِىْ (رح)
٦. تَفْسِيْرُ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ـ حَافِظ اِبْنُ كَثِيْر (رح)
٧. اَلْجَوْهَرُ الْحَسَّانُ فِيْ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ ـ عَبْدُ الرَّحْمٰن ثَعْلَبِىْ (رح)
٨. اَلدُّرُّ الْمَنْثُوْرُ فِى التَّفْسِيْرِ الْمَاثُوْرِ ـ جَلَالُ الدِّيْنِ سُيُوْطِىْ (رح)

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীর বিবরায় সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ :

١. مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ - اَلْاِمَامُ فَخْرُ الدِّيْنِ رَازِىْ (رح) -
٢. اَنْوَارُ التَّنْزِيْلِ - بَيْضَاوِىْ (رح)
٣. مَدَارِكُ التَّنْزِيْلِ وَحَقَائِقُ التَّاوِيْلِ - اِمَامُ نَسَفِىْ (رح)
٤. لُبَابُ التَّاوِيْلِ فِىْ مَعَانِى التَّنْزِيْلِ - خَازِنْ (رح)
٥. اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ - اَبُوْ حَيَّانْ (رح)
٦. غَرَائِبُ الْقُرْاٰنِ وَرَغَائِبُ الْفُرْقَانِ - نِيْسَابُوْرِىْ (رح)
٧. تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْنِ - جَلَالُ الدِّيْنِ مَحَلِّىْ وَجَلَالُ الدِّيْنِ سُيُوْطِىْ (رح)
٨. اَلسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ - اَلْخَطِيْبُ الشَّرْبِيْنِىْ (رح)
٩. اِرْشَادُ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ اِلٰى مَزَايَا الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ - اَبُو السَّعُوْدِ (رح) -
١٠. رُوْحُ الْمَعَانِىْ - اَلُوْسِىْ (رح) -

সুফিয়ায়ে কেরামের তাফসীর : সুফিয়ায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে কম যাননি। তারাও তাফসীরের ক্ষেত্রে কলম ধরে তাসাউফের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনেকের তাফসীর পড়লে তো মনে হবে কুরআনে তাসাউফ বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে তাদের কিছু কিতাবের তালিকা দেওয়া হলো–

১. عَرَائِسُ الْبَيَانِ فِىْ حَقَائِقِ الْقُرْاٰنِ রচয়িতা : আবূ মুহাম্মদ রোযাবাহান ইবনে আবূ জাফর নসর বাকৃলী সিরাজী সূফী (র.)। তিনি ৩০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. اَلتَّاوِيْلَاتُ النَّجْمِيَّةُ এই তাফসীর গ্রন্থটি দু'জনের রচিত, নাজমুদ্দীন দায়াহ (র.) এর রচনা আরম্ভ করেন। তার মৃত্যুর পর আলাউদ্দীন রাযী তা পরিপূর্ণ করেন। শায়েখ নাজমুদ্দীন আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আসাদী রাযী দায়ার উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৬৫৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। আলাউদ্দীন হলো অপর জনের উপাধি। নাম মুহাম্মদ আহমান. নিসবত শামস। তিনি ৬৫৯ হিজরিতে জন্মলাভ করেন এবং৭৩৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ফুকাহায়ে কেরামের তাফসীর : কুরআনের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে আহকামের আয়াত তথা উম্মতে মুহাম্মদীকে দেওয়া বিধি বিধান। এগুলোই হলো কুরআনের মূল অংশ। ফুকাহায়ে কেরাম এ আয়াতগুলোর আলোকে মাসআলা ইসতিম্বাত করেছেন। এ আয়াতগুলোর উপর রচিত হয়েছে আলাদা তাফসীরগ্রন্থ। এর কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো–

১. اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ [আহকামুল কুরআন] লিখক : আবূ বকল আহমদ ইবনে আলী রাযী। তিনি ৩০৫ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ আহকামুল কুরআন] লিখক : ইমামুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে তাবারী (র.)। তিনি ৪৫০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৫০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৩. اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ [আহকামুল কুরআন] লিখক : আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল আরবি (র.) । তিনি ৪৬৮হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন।

৪. اَلْجَامِعُ لِاَحْكَامِ الْقُرْاٰنِ লিখক : আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আনসারী খায়রদী কুরতূবী মালেকী (র.)। তিনি ৬৭১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. كَنْزُ الْعِرْفَانِ فِىْ فِقْهِ الْقُرْاٰنِ লিখক : মিকদাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস্‌সুয়ূতী (র.)।

৬. اَلْقَوْلُ الْوَجِيْزُ فِىْ اَحْكَامِ الْقُرْاٰنِ الْعَزِيْزِ লিখক : শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইউসুফ হালিবী। তিনি ৭৫৬ হিজরির মৃত্যুবরণ করেন।

৭. اَحْكَامُ الْكِتَابِ الْمُبِيْنِ [আহকামুল কিতাবিল মুবীন] লিখক : আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ শানকফী (র.)।

৮. اَلْاِكْلِيْلُ فِي اِسْتِنْبَاطِ التَّنْزِيْلِ লিখক: আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী। তিনি ৯১১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রখ্যাত মুফাসসিরীনে কেরাম

১. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস** (রা.) : তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ এবং তিনি মতান্তরে ৬৮/৭০/৭১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

২. **হযরত আলী** (রা.) : চতুর্থ খলিফা। কুরআনের তাফসীর বিষয়ে তার মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু। প্রথম তিন খলিফার ইন্তেকাল হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। এ জন্য তাদের থেকে তাফসীর সম্পর্কিত রেওয়ায়েত খুবই কম বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরি ৪০ সনের ১৮ই রমজান শুক্রবার ফজর নামাজে যাত্রাপথে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক খারিজী ঘাতকের তলোয়ারের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিন দিন পর তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

৩. **হযরত আয়েশা** (রা.) : তিনি মতান্তরে ৫৭/ ৫৮ হিজরিতে ৬৬ / ৬৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ** (রা.) : সাহাবী

৫. **হযরত উবাই ইবনে কা'ব** (রা.) : সাহাবী

৬. **হযরত মুজাহিদ (র.) : তাবেয়ী। জন্ম ২১ হিজরি.** মৃত্য ১০৩ হিজরি। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর **বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন।**

৭. **হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) : প্রসিদ্ধ** তাবেয়ী। মৃত্যু ৯৪ হিজরি। তিনি খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান -এর অনুরোধে একটি তাফসীর লিখেছিলেন।

৮. **হযরত ইকরিমা** (র.) তাবেয়ী।

৯. **হযরত তাউস** (র.) ইয়েমেনের অধিবাসী।

১০. **হযরত আতা ইবনে রাবা** (র.) : জন্ম হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের শেষ পর্যায়ে, ইন্তেকাল ১১৪ হিজরি।

১১. **হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব** (র.) : তাবেয়ী।

১২. **হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন** (র.) : বসরার অধিবাসী । তিনি তাবেয়ী ছিলেন। ১১০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

১৩. **হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম** (র.) : তাবেয়ী।

১৪. **হযরত আবুল আলীয়া** (র.) : বসরার অধিবাসী, জাহেলী যুগে জন্ম গ্রহণ করেছেন কিন্তু রাসূল ﷺ -এর ওফাতের দু বছর পর মুসলমান হয়েছেন।

১৫. **হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর** (র.) : তাবেয়ী।

১৬. **হযরত কাতাদা** (র.) : হাসান বসরী (র.) তাবেয়ী। মৃত্যু ১১৮ হিজরি।

১৭. **হযরত আলকামা** (র.) : মক্কার অধিবাসী, তাবেয়ী।

১৮. **হযরত নাফে** (র.) : তাবেয়ী। নিশাপুরের অধিকারী তিনি ১১৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯. **হযরত শা'বী** (র.) : তাবেয়ী। তিনি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর উস্তাদ ছিলেন।

২০. **হযরত আবী মুলাইকা** (র.) : মক্কাবাসী। তাবেয়ী। ইন্তেকাল ১১৭ হিজরি।

২১. **হযরত ইবনে জুরাইজ** (র.) : তাবেয়ী।

২২. **হযরত যাহহাক** (র.) : খেরাসানের অধিবাসী। মৃত ১০২ হিজরি এবং ১০৬ হিজরির মধ্যবর্তী সময়ে।

২৩. **কাযী আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বায়যাবী** (র.) : তিনি পারস্যের বায়যা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ৬৮২ হিজরি মতান্তরে ৬৮৫ হিজরিতে তিবরিজ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

২৪. **হাফিয ইবনে কাছীর** (র.) : তিনি ৭০০ হিজরি মুতাবিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭৪ হিজরি মুতাবিক ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে শাবান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন।

http://islamiboi.wordpress.com

২৫. **ইমাম তাবারী (র.) :** তিনি ২২৪/ ২২৫ হিজরি মুতাবিক ৮৩৮/ ৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহর শাসনামলে ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী পাহাড় ঘেরা তাবারিস্তানের আমুল শহরে এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩১০ হিজরি মুতাবিক ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলীফা আল মুকতাদির বিল্লাহ্‌র আমলে ইন্তেকাল করেন।

২৬. **আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) :** তিনি ৭১৯ হিজরি শাওয়াল মাসে মিশরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৬৪ হিজরির রমজান মাসের ১৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন

২৭. **আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র.) :** তিনি মিশরের নীল নদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত খাযিরিয়া নামক গ্রামে ১লা রজব ৮৪৯ হিজরি সনে মাগরিব নামাজের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ৯১১ হিজরি সনের ১৯ শে জুমাদাল উলায় ইন্তেকাল করেন।

২৮. **হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.) :** তিনি ১৭০৩ ইং সনে উত্তর ভারতে অবস্থিত [illegible] নগর [illegible] মুযাফফর নগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ১১৭৬ হিজরির ৯ই মুহররম যোহরের সময় দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন।

২৯. **শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান (র.) :** তিনি তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ -এর লেখক

৩০. **হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (র.) :** তিনি বয়ানুল কুরআনের লেখক জন্ম ১২৮[illegible] হি

৩১. **আল্লামা ছানাউল্লাহ পানীপতী (র.) :** তিনি তাফসীরে মাজহারীর লেখক।

৩২. **আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) :** তিনি তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের লেখক।

৩৩. **মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) :** তিনি তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের লেখক। জন্ম ১৩৫৩ হি.

তাফসীরে জালালাইন

তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থ পরিচিতি : এ কিতাবের লিখক দু'জন. দু'জনের নামই জালালুদ্দীন। একজন জালালুদ্দীন মহল্লী। অপরজন হলেন জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)। তাঁদের নামের প্রথম অংশ হচ্ছে– জালাল, আর আরবিতে জালাল-এর দ্বিবচন হলো জালালান। যেহেতু তাদের দু'জনের প্রতি তাফসীরকে إِضَافَتْ করা হয়েছে তাই مُضَافْ إِلَيْهِ হিসেবে মাজরুর হয়ে তা جَلَالَيْنِ হয়েছে। জালাল নামক দু'জন ব্যক্তি লিখা বিধায় তাকে تَفْسِيْرُ الْجَلَالَيْنِ বলা হয়। জালালুদ্দীন মহল্লী [৭৯১-৮৮৪] সূরা কাহাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত শেষ অর্ধেকের তাফসীর করেছেন। অতঃপর সূরা ফাতেহা থেকে শুরু করার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের ছয় বছর পর তারই বিশিষ্ট শাগরিদ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী তারই নীতি ও পদ্ধতিতে সূরা বাকারা থেকে সূরা কাহাফ পর্যন্ত প্রথম অংশের তাফসীর রচনা করে উস্তাদের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য যে, সূরা ফাতেহার তাফসীর যেহেতু আল্লামা মহল্লী -এর লেখা তাই তা শেষাংশের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

উভয় তাফসীরের মাঝে অনেক মিল পরিলক্ষিত হয়। পাঠকের কাছে উভয় অংশের তাফসীর একজনের লেখাই মনে হবে। তবে এ তাফসীরের মাঝে কিছু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও অনির্ভরযোগ্য ঘটনার উল্লেখ রয়েছে

তাফসীরে জালালাইন -এর স্তর : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাফসীরের কিতাবসমূহ তিন রকমের হয়ে থাকে–

১. مُخْتَصَر وَ اَوْجَزْ অতি সংক্ষিপ্ত তাফসীর।

২. اَوْسَطْ মধ্যম স্তরের তাফসীর।

৩. مَبْسُوط وَمُفَصَّل অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর।

যে স্তরের তাফসীর : উপরিউক্ত স্তরসমূহের মধ্যে তাফসীরে জালালাইন প্রথম স্তরের তাফসীর। এর মতন এবং তাফসীরের শব্দসমূহ সমান সমান সংক্ষিপ্ত।

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীরের কিতাবের আরো একটি শ্রেণি বিন্যাস রয়েছে :

১. শুধুমাত্র রেওয়ায়েত ও নকলিয়াত নির্ভর।

২. শুধুমাত্র দেরায়াত ও আকলিয়াত নির্ভর।

৩. রেওয়ায়েত ও দেরায়াত উভয়টির সমন্বিত। [এটি সবচেয়ে উচ্চস্তরের]

যে স্তরের তাফসীর : উপরিউক্ত স্তরসমূহের মধ্যে জালালাইনকে তৃতীয় প্রকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

তাফসীরে জালালাইনের বৈশিষ্ট্য : কুরআন মাজীদের ভাষা, শব্দগঠন, বাক্যগঠন রীতি ইত্যাদি ভাষাগত এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কারগত বিষয়াবলির ক্ষেত্রে জালালাইন -এর সহজ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণেই আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব দীনি মাদরাসার পাঠ্যসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে তা সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। নিম্নে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল–

ক. কুরআন মাজীদে মোট যত শব্দ প্রায় তত শব্দেই তাফসীরটি সমাপ্ত হয়েছে।

খ. একাধিক অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানে কোন অর্থ প্রযোজ্য হবে তৎবোধক সমার্থসূচক শব্দ উল্লেখ করে তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ. কেরাত বা পঠনরীতি উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. সরফ বা শব্দ প্রকরণতত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে।

ঙ. নাহু বা শব্দ গঠন ব্যবচ্ছেদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চ. বালাগত বা আলঙ্কারিক বিশ্লেষণও এতে রয়েছে।

ছ. আরবি ভাষা রীতি অনুসারে কুরআনের যে স্থানে যে শব্দ বা বাক্য উহ্য রয়েছে, তা যথাযথ স্থানে উল্লেখ করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

জ. প্রয়োজনীয় স্থানে নুযূল বা আয়াত ও সূরা সংশ্লিষ্ট ঘটনাও অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঝ. প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইলেরও ইঙ্গিত রয়েছে।

জালালাইনের উৎস : শায়খ মুওয়াফফাকুদ্দীন আহমাদ ইবনে ইউসূফ (র.) রচিত তাফসীরে সীগার হলো জালালাইন -এর উৎস। এর উপর নির্ভর করে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তাঁর অংশটির তাফসীর লিখেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-ও প্রধানত এটিরই অনুসরণ করেছেন।

জালালাইন -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ :

১. جَمَالَيْن লেখক- মোল্লা নূরুদ্দীন আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ আল হারাবী ওরফে মোল্লা আলী কারী (র.)। মৃত্যু ১০১৪ হিজরি। রচনাসাল-১০০৪ হিজরী।

২. قَبَسُ النَّيِّرَيْن লেখক : শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলকামী (র.) রচন সাল ৯৫৩ হিজরি।

৩. مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ وَمَطْلَعُ الْبَدْرَيْنِ লেখক : জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল কারখী (র.)।

৪. اَلْفُتُوحَاتُ الْاِلٰهِيَّةُ بِتَوْضِيحِ تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ لِلدَّقَائِقِ الْخَفِيَّةِ লেখক : শায়খ সুলাইমান আল জামাল। মৃত্যু ১২০৪ হিজরি।

৫. كَمَالَيْن লেখক : শায়খ সালামুল্লাহ ইবনে শায়খুল ইসলাম ইবনে আব্দুস সামাদ ফখরুদ্দীন আল হানাফী। মৃত্যু ১২২৯ হিজরি। তিনি আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-এর সুযোগ্য নাতী ছিলেন।

৬. حَاشِيَةُ الصَّاوِىْ লেখক : আল্লামা শায়খ আহমদ মুহাম্মদ আস সাবী [১১৭৫-১২৪১]।

৭. تَعْلِيْل بَرَ جَلَالَيْن লেখক : মৌলভী অছী আলী ইবনে হাকীম মুহাম্মদ ইউসূফ মালিহাবাদী।

৮. كَمَالَيْن (اُرْدُوْ شَرْح) লেখক : মাওলানা নাঈম সাহেব। উস্তাদ, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

৯. جَمَالَيْن (اُرْدُوْ شَرْح) লেখক : মাওলানা জামালউদ্দীন, উস্তাদ, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীরে জালালাইনের লেখক পরিচিতি

প্রথমার্ধের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর জীবনী :

নাম ও বংশ : তাঁর আসল নাম আব্দুর রহমান, উপাধি জালালুদ্দীন, উপনাম আবুল ফজল। তবে জালালুদ্দীন সুয়ূতী নামেই তিনি বিশ্বে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম কামাল আবূ বকর/আবূ বকর মুহাম্মদ কামালুদ্দীন সুয়ূতী। সুয়ূত মিশরের নীল দরিয়ার পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি শহর। এদিকে নিসবত করে তাকে সুয়ূতী বলা হয়। তিনি এ শহরের একটি মহল্লায় [যা مَحَلَّةُ خِضْرِيَّةِ বা سُوْق خِضْرِيَّةِ নামে প্রসিদ্ধ] ৮৪৯ হিজরি সনের ১লা রজব জন্ম গ্রহণ করেন।

বিদ্যার্জন : পাঁচ বছর সাত মাস বয়সে তথা ৮৫৫ হিজরিতে তার পিতা আবূ বকর মুহাম্মদ কামালুদ্দীন তাকে এতিম করে পরপাড়ে পাড়ি জমান। পিতার ইন্তেকালের পর পূর্ব অসিয়ত মোতাবেক পিতার সাথী-সঙ্গীগণ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)-এর পড়ালেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম হানাফী তার প্রতি সার্বিকভাবে দৃষ্টি রাখেন। আট বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। অতঃপর বালাগাত, ফিকহ, ফারায়েজ, হাদীস, তাফসীর, তাসাউফ, আকাইদ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, আমি হজের সময় এ নিয়তে জমজম কূপের পানি পান করেছি যে, ফিকহ শাস্ত্রে শায়খ সিরাজুদ্দীন বালকিনীর পর্যায়ে, হাদীস শাস্ত্রে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর পর্যায়ে পৌছতে পারি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সাতটি শাস্ত্রে তথা তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, নাহু, মা'আনী, বয়ান এবং বদী' শাস্ত্রে বুৎপত্তি দান করেছেন।

তিনি প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। ইলমে হাদীসের জগতে তৎকালীন জমানার সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আমার দুলাখ হাদীস মুখস্থ আছে যদি এর চেয়েও অধিক হাদীস আমি পেতাম, তাও মুখস্থ করতাম। সম্ভবত তখন এর চেয়ে বেশি সংখ্যক হাদীস বিদ্যমান ছিল না।

ইলম শেখার জন্য তিনি বহুদেশ ও অঞ্চল সফর করেছেন। বহু উস্তাদের সান্নিধ্য ও সংশ্রব গ্রহণ করেছেন। তিনি পাঁচশত উস্তাদ ও শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে কামাল ইবনে হুমাম, শামস শাইরামী, শামস মিরজাবানী আল হানাফী, সাইফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, আল্লামা তকী শামনী, শায়খ শিহাবুদ্দীন শারমসাহী, শরফুদ্দীন মানাবী এবং মহিউদ্দীন কাফিজী (র.) প্রমুখগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, তিন বছর বয়সে তার পিতা তাকে ইবনে হাজার (র.)-এর মজলিসেও উপস্থিত করেছিলেন।

একটি ভুল ধারণা নিরসন : কোনো কোনো জীবনী লেখক লিখেছেন যে, আল্লামা সুয়ূতী হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর শিষ্য ছিলেন, তবে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এ মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ৮৫২ সনে ইন্তেকাল করেছেন। আর আল্লামা সুয়ূতী (র.) জন্মলাভ করেছেন ৮৪৯ হিজরি সনে। কাজেই মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল মাত্র ৩ বছর। আর এ বয়সে আল্লামা ইবনে হাজরের ছাত্র হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না।

অধ্যায়ন, অধ্যাপনা ও ফতোয়া প্রদান : আল্লামা সুয়ূতী (র.) ছাত্রজীবন শেষ করার পর ৮৭০ সনে ফতওয়া দেওয়ার কাজ শুরু করেন এবং ৮৭২ সন থেকে ফতওয়া ইত্যাদি লেখার কাজে নিয়োজিত হন। ৪০ বছর বয়সে তিনি বিচার ও ফতওয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি লাভ করে নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং রিয়াজত ও মুজাহাদা এবং ইবাদত ও হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরহেজগারিতাও অল্পে তুষ্টির ক্ষেত্রে তার অবস্থা এই ছিল যে, বিভিন্ন আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ তার খেদমতে আসতেন এবং অতি মূল্যবান হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করতেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। সুলতান ঘোরী এক নপুংশক গোলাম এবং এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দেন এবং গোলামকে আজাদ করে তাকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হুজরা মোবারকের খাদিম হিসেবে মনোনীত করেন।

যেমন ছিল তার মেধা শক্তি তেমন ছিল লিখনী শক্তি। খুব দ্রুত লিখতে পারতেন। জ্ঞানের প্রায় সব শাখায় তিনি কলম ধরেছেন। এভাবে তিনি প্রায় পাঁচশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তার কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম পেশ করা হলো–

১. تفسير جلالين نصف اول
২. الاتقان في علوم القرآن
৩. الدر المنثور في التفسير المأثور
৪. [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

একই সঙ্গে তিনি একজন বড় মাপের কবিও ছিলেন। তার রচিত বহু কবিতা রয়েছে। অধিকাংশ কবিতা فَوَائِدْ عِلْمِيَّه ও اَحْكَامُ شَرْعِيَّة সংক্রান্ত।

সর্বোপরি তিনি আল্লাহর বড়মাপের একজন ওলী ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। অধিক সংখ্যকবার [৭০ বার] তিনি স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ -এর জেয়ারত লাভে ধন্য হয়েছেন।

তিনি নিজে এবং অন্যান্য লোকজন একাধিকবার স্বপ্নে দেখেছেন যে, রাসূল ﷺ তাঁকে يَا شَيْخَ السُّنَّةِ বা يَا شَيْخَ الْحَدِيْث বলে সম্বোধন করেন।

এছাড়া তাঁর একটি কেরামত প্রসিদ্ধ রয়েছে। তাঁর বিশেষ খাদেম মুহাম্মদ ইবনে আলী হাব্বাক বর্ণনা করেন, একদিন দুপুরে খাবারের পর তিনি বললেন, যদি তুমি আমার মৃত্যুর পূর্বে কারো নিকট এ রহস্যের কথা ব্যক্ত না কর, তাহলে আজ আসরের নামাজ তোমাকে মক্কা শরীফে পড়ার ব্যবস্থা করব। সে বলল, ঠিক আছে। তিনি বললেন চোখ বন্ধ কর। তিনি আমার হাত ধরে প্রায় ২৭ কদম সামনে অগ্রসর হওয়ার পর বললেন: চোখ খোল। চোখ খুলে দেখি আমরা বাবে মুয়াল্লায় দণ্ডায়মান। অতঃপর হেরেম শরীফ পৌঁছে তওয়াফ করলাম, জমজমের পানি পান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমাদের জন্য জমিন সংকুচিত হয়ে গেছে। এতে আশ্চর্যবোধ কর না; বরং হরমের আশে পাশে আমাদের পরিচিত মিসরের বহু লোক রয়েছে। তারা আমাদেরকে চিনতে পারেনি। তারপর তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে চলো, অন্যথায় হাজীদের সঙ্গে চলে এসো! আমি বললাম, আপনার সঙ্গেই যাব। আমরা রওয়ানা হলাম। বাবে মুয়াল্লা পর্যন্ত যাওয়ার পর বললেন, চোখ বন্ধ কর। চোখ বন্ধ অবস্থায় মাত্র সাত কদম সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, এবার চোখ খোল! চোখ খুলে দেখি আমরা মিসরে পৌঁছে গেছি ।

ইন্তেকাল : হাতের মাঝে ফোঁড়া হয়ে ৯১১ হিজরি সনের ১৯ শে জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার এ ক্ষণজন্মা মণীষী ইন্তেকাল করেন। –[যাফরুল মুহাসসিলীন, মাওলানা হানীফ গাঙ্গুহী (র.)]

দ্বিতীয়ার্ধের লেখক আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর জীবন :

নাম : নাম মুহাম্মদ উপাধি জালালুদ্দীন; পিতার নাম আহমদ।

বংশ : মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে হাশিম ইবনে শিহাব ইবনে কামাল আল-আনসারী মহল্লী।

পশ্চিম মিসরের সুপ্রসিদ্ধ শহর মহল্লা কুবরা-র সাথে সম্পর্কিত করে তাকে মহল্লী বলা হয়। তিনি তার উপাধি জালালুদ্দীন নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জন্ম : তিনি শাওয়াল ৭৯১ হিজরি সনে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানার্জন : কুরআন মাজীদ হিফজয করার পর তৎকালীন রীতি অনুসারে ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলাদা আলাদা উস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনে জামআ, ওয়ালী ইরাকী ও আল্লামা বিজুরী (র.)। ইলমে নাহব অধ্যয়ন করেন শিহাব আজমী ও শামস শাতকুনী -এর নিকট এবং ইলমে ফরায়েজ ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাসির উদ্দিন ইবনে আনাস মিশরী হানাফী -এর নিকট। মানতেক, তর্কশাস্ত্র, মাআনী, বয়ান ও উরুজ বদর মাহমূদ আকসেরায়ী এর নিকট এবং উসূলে ফিকহ ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন আল্লামা শামস বিসাতি (র.) প্রমুখের নিকট । এছাড়াও আরও বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

কর্ম জীবন : শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি কিছুদিন কাপড়ের ব্যবসা করেন। কাজি বা বিচারক পদের প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেননি। তিনি বহুগ্রন্থ ও ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে জামউল জাওয়ামি, মিনহাজ, ওয়াফায়ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইন্তেকাল : ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৫ ই রমজান ৮৬৪ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। বাবে নাসর -এ জানাযার পর কুজানের নিকট নির্মিত কবরস্থানে পূর্ব পুরুষদের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। –[প্রাগুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا مُوَافِيًا لِنِعَمِهِ، مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَجُنُوْدِهِ. اَمَّا بَعْدُ فَهٰذَا مَا اشْتَدَّتْ اِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِيْنَ فِىْ تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ اَلَّفَهُ الْاِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ جَلَالُ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَحَلِّىُّ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَتَتْمِيْمِ مَا فَاتَهُ وَهُوَ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ اِلٰى اٰخِرِ الْاِسْرَاءِ بِتَتِمَّةٍ عَلٰى نَمَطِهِ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِعْتِمَادِ عَلٰى اَرْجَحِ الْاَقْوَالِ وَاِعْرَابِ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ وَتَنْبِيْهٍ عَلَى الْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَةِ عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ بِذِكْرِ اَقْوَالٍ غَيْرِ مَرْضِيَّةٍ وَاَعَارِيْبَ مَحَلُّهَا كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ، وَاللّٰهَ اَسْاَلُ النَّفْعَ بِهِ فِى الدُّنْيَا وَاَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِى الْعُقْبٰى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ.

অনুবাদ : সব ধরনের সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। আমরা তার এমন প্রশংসা করি, যা তাঁর প্রদানকৃত নিয়ামতরাজির সমপরিমাণ হয়। আমরা তার এমন প্রশংসা করি, যা তাঁর প্রদানকৃত অতিরিক্ত অনুগ্রহসমূহের জন্যও যথেষ্ট হয়। প্রিয়নবী সায়্যিদুনা মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবার, পরিজন, সাহাবী ও তাঁর অনুগত অনুসারীদের উপর দরূদ ও সালাম।

হামদ ও সালাতের পর আরজ এই যে, এটা সেই কিতাব, যার প্রতি আগ্রহীদের প্রয়োজন তীব্রতর হয়েছিল। তা হলো কুরআনে কারীমের ঐ তাফসীরের পরিপূর্ণতার প্রতি, যা সূক্ষ্মদর্শী গবেষক ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ মহল্লী শাফেয়ী (র.) রচনা করেছেন এবং এটা সে অংশের পূর্ণতা যা মহল্লী (র.) অপূর্ণ রেখে গেছেন। তথা সূরা বাকারা হতে সূরা ইসরার শেষ পর্যন্ত। [তা পরিপূর্ণ করা হয়েছে] একটি পরিশিষ্ট সহ। যা তাঁরই অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়েছে।

[সারকথা, সূক্ষ্মদর্শী গবেষক আল্লামা জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মহল্লী আশ শাফেয়ী কুরআনে কারীমের যে তাফসীর রচনা শুরু করেছিলেন তা সমাপ্ত করার এবং সূরা আল বাকারা হতে সূরা আল ইসরার শেষ পর্যন্ত যে অংশটুকুর তাফসীর তিনি করে যেতে পারেননি, সেই অংশটি তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করার জন্য লোকদের মাঝে যে অত্যন্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে এ হলো সেই কিতাব।] আল্লামা মহল্লী তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে যে রীতি অবলম্বন করেছেন, তা হলো যতটুকু বিষয় উল্লেখ করলে আল্লাহ তা'আলার কালাম বুঝা সম্ভব, ততটুকু বিষয়ের জন্য সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মতামতের উল্লেখ করা। প্রয়োজনীয় ই'রাব [ব্যাকরণিক বিবরণ] ও প্রসিদ্ধ কেরাত বা পঠনরীতির দিকে ইঙ্গিত করা সূক্ষ্মভাবে এবং সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়। এর সঙ্গে অপছন্দনীয় মতামত এবং বিস্তারিত ব্যাকরণিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ উল্লেখপূর্বক আলোচনা দীর্ঘায়িত না করা। কেননা বিরাট বিরাট আরবি ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ হলো বিস্তারিত ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করি তিনি যেন অনুগ্রহ ও মেহেরবানি করে এর দ্বারা আমাদেরকে জাগতিক জীবনেও উপকৃত করেন এবং পরকালীন জীবনেও এর উত্তম বদলা দান করেন। আমীন!

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا الخ : আল্লামা সুয়ূতী (র.) "হামদ" বা প্রশংসা জ্ঞাপনের অন্যান্য পদ্ধতি ও ধরন বাদ দিয়ে উক্ত পদ্ধতি ও বাক্যে হামদ প্রকাশ করার কারণ হলো, 'হামদ' -এর উক্ত বাক্যটিকে হাদীস শরীফে اَفْضَلُ الْمَحَامِدِ বা সর্বোত্তম 'হামদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেন এ বাক্যটি নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ থেকে চয়ন করা হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِىْ نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيْدَهُ.

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, কেউ যদি মান্নত করে যে, সে সর্বোত্তম হামদ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবে অথবা কসম করে যে, সে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রকার প্রশংসা করবে, তাহলে তার মান্নত ও কসম পূরণের পদ্ধতি হলো, সে বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِىْ نِعَمَهُ وَيُكَافِىْ مَزِيْدَهُ এতে তার মান্নত ও কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। –[হাশিয়াতুল জামাল : খ. ১, পৃ. ৮]

প্রশ্ন : মান্যবর মুফাসসির (র.) হাদীসের শব্দে تَصَرُّفٌ বা কম বেশি করেছেন। এটা সঠিক হয়েছে কিনা?

উত্তর : মুফাসসির (র.)-এর এ বাক্যটি হাদীস নয়; বরং এতে হাদীস থেকে اِقْتِبَاسٌ বা শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে মাত্র। আর এতে প্রয়োজনানুপাতে পরিবর্তন জায়েজ আছে। –[প্রাগুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

مُوَافِيًا لِنِعَمِهِ : أَيْ مُلَاقِيًا لِنِعَمِهِ وَمُقَابِلًا لَهَا অর্থাৎ এমন 'হামদ' যা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহের অনুযায়ী হয়। এভাবে যে, বর্তমান নিয়ামতের মধ্য থেকে কোনো নিয়ামত হামদ বিহীন না থাকে। যেন এ হামদটি আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নিয়ামতের মোকাবেলায় হয়ে যায়। বস্তুত এমনটি মোবালাগা স্বরূপ বলা হয়েছে। অন্যথায় প্রত্যেক নিয়ামতের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন হামদের প্রয়োজন রয়েছে। -[প্রাগুক্ত]

مُكَافِيًا لِمَزِيْدِهِ : أَيْ مُمَاثِلًا وَمُسَاوِيًا لَهُ অর্থাৎ আগামীতে যেসব নিয়ামত প্রদান করা হবে সেগুলোরও বরাবর ও সমপরিমাণ হয়।

قَوْلُهُ مَزِيْد : এটি مَصْدَرٌ مِيْمِيٌّ বা বৃদ্ধি হওয়া। اَلنُّمُوُّ -অর্থ اَلزِّيَادَةُ . زَادَهُ اللّٰهُ الْخَيْرَ . زَادَهُ اللّٰهُ النِّعَمَ বলা হয়- শব্দটি لَازِمٌ এবং مُتَعَدِّيٌ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- زَادَ الشَّيْئُ [বস্তুটি বৃদ্ধি পেয়েছে], زَادَ غَيْرَهُ [অপর বস্তুকে বৃদ্ধি করেছে] مُتَعَدِّيٌ হলে দুটি মাফউল দাবি করে। -[প্রাগুক্ত]

মোটকথা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যটি যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রাপ্য সকল নিয়ামতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ سَيِّدِنَا : কোনো কোনো 'নোসখায়' এ শব্দটি নেই। আমাদের নোসখায় রয়েছে। যে নোসখাসমূহে سَيِّدِنَا শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে وَاٰلِهِ এবং তার পরবর্তী বাক্যের عَطْف হবে سَيِّدِنَا -এর সাথে। مُحَمَّد -এর সাথে হবে না। অন্যথায় অন্যান্য مَعْطُوف গুলো سَيِّدِنَا হওয়া লাজেম আসবে। কেননা سَيِّدِنَا হলো بَدَل আর مُحَمَّد হলো مُبْدَلٌ مِنْهُ এখন مُحَمَّد -এর উপর عَطْف করলে পরবর্তীগুলোও سَيِّد -এর مُبْدَلٌ مِنْهُ হয়ে سَيِّد হওয়া লাজেম আসে। অথচ প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ -ই হলেন سَيِّد; অন্যরা নন। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَجُنُوْدِهِ : جُنْد -এর বহুবচন অর্থ সৈন্য। جُنْد -এর আরো একটি অর্থ সাহায্যকারীও রয়েছে। جُنْد যেমন جِنْس যার একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে يَاء দ্বারা পার্থক্য করা হয়ে থাকে। عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ; সুতরাং يَاء সহ হলে একবচন এবং يَاء ছাড়া হলে বহুবচন হবে। যেমন جُنْد অর্থ- সৈন্য এবং جُنْدِيٌّ অর্থ- একজন সৈন্য। একই বিধান يَهُوْد এবং يَهُوْدِيٌّ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। يَهُوْد অর্থ- ইহুদি সম্প্রদায় আর يَهُوْدِيٌّ অর্থ- একজন ইহুদি।

جُنْدِهِ ﷺ দ্বারা দীনের সাহায্যকারীদের বোঝানো হয়েছে। নবী যুগ থেকে অদ্যাবধি যারা অস্ত্র, ইলম, কলম, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে দীনের হেফাজত ও সংরক্ষণ করছেন তারা সকলেই এতে শামিল। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ : কোনো কোনো নোসখায় اَمَّا بَعْدُ নেই। সেখানে هٰذَا ইসমুল ইশারাটি اَمَّا بَعْدُ -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যে নোসখায় اَمَّا بَعْدُ লেখা আছে, সেখানে اَمَّا হবে حَرْفُ شَرْط আর فَهٰذَا তার جَزَاء হবে।

فَهٰذَا : বিজ্ঞ মুফাসসির هٰذَا ইসমুল ইশারাহ দ্বারা ঐ ظَنِّيْ ইবারতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা মহল্লীর তাফসীরের পূর্ণতার জন্য তার যেহেনে مُسْتَحْضَر ছিল। (حَاشِيَةُ جَلَالَيْن ٤)

هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ যা খুবই নিকটবর্তী। আর তা হলো সূরা বাকারা থেকে শেষ পর্যন্ত।

قَوْلُهُ مَا اشْتَدَّتْ : এখানে مَا দ্বারাও مَعْهُوْدٌ ذِهْنِيٌّ উদ্দেশ্য। আর دَعَتْ না বলে اِشْتَدَّتْ বলার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তাকমিলার প্রতি তাদের প্রয়োজনটা শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। কেননা শেষার্ধের বর্ণনাধারা তাফসীরে মহল্লীর বর্জিত লক্ষ্যভেদী বক্তব্যের মতো করে কেউ লিখতে সক্ষম হচ্ছিল না।

قَوْلُهُ رَاغِبِيْنَ : رَاغِبِيْنَ অর্থ আগ্রহী এবং অন্বেষু। অর্থাৎ আল্লামা মহল্লীর তাফসীরের পূর্ণতা দানের প্রতি অন্বেষু এবং আগ্রহীদের প্রয়োজন তীব্র হয়েছে, رَغْبَة শব্দটি কোনো صِلَة ছাড়া এবং صِلَة সহ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়। অতঃপর কোনো বস্তুর প্রতি আসক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে صِلَة হিসেবে فِيْ আসে আর অনাসক্তি ও ঘৃণাপ্রকাশ করতে عَنْ ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ تَكْمِلَة : শব্দটি একবচন; বহুবচনে تَكْمِلَات অর্থ- نِهَايَة শেষ সীমা। বলা হয়- غَدًا نَقْرَأُ تَكْمِلَةَ الْقِصَّةِ (مُعْجَمِى الْحَىّ) [আমরা আগামীকাল ঘটনার শেষ অংশ পড়ব]

اَلتَّكْمِلَةُ مَا يَتِمُّ بِهِ الشَّيْئُ অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো বস্তু পরিপূর্ণ করা হয় তাকে তাকমিলা বলা হয়। -[মু'জামুল ওয়াসীত]

قَوْلُهُ الْاِمَامُ : আভিধানিক অর্থ اَلْمُقَدَّمُ অগ্রে পেশকৃত, অগ্রভাগ।

পরিভাষায় ইমাম বলা হয়- مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ اَهْلِ الْفَضْلِ অর্থাৎ যিনি কোনো ব্যাপারে মর্যাদাপূর্ণ স্তরে পৌঁছেছেন।

قَوْلُهُ الْعَلَّامَةُ : مُبَالَغَةٌ فِى الْعِلْمِ، وَمَعْنَاهُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْمَعْقُوْلِ وَالْمَنْقُوْلِ بِاَبْلَغِ وَجْهٍ (حَاشِيَةُ الصَّاوِى ص٧ ج١)

অর্থাৎ যিনি অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ الْمُحَقِّقُ : أَيِ الْآتِي بِأَدِلَّةٍ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ (حَاشِيَةُ الصَّاوِي ص٧ ج١) যিনি সঠিক পন্থায় দলিল-প্রমাণ পেশ করেন।

قَوْلُهُ جَلَالُ الدِّيْنِ : এটি তার উপাধি। জালাল অর্থ– মহিমা, বড়ত্ব, সম্মান।

مَعْنَاهُ ذُوْ جَلَالَةٍ فِي الدِّيْنِ أَوْ مُجِلٌّ وَمُعَظِّمٌ لَهُ لِأَنَّهُ شَيَّدَهُ وَأَظْهَرَ قَوَاعِدَهُ (حَاشِيَةُ الصَّاوِي ص٧ ج١)

قَوْلُهُ مُحَمَّدُ : এটা তার নাম। أَحْمَدُ এটা তার পিতার নাম। (بِفَتْحِ الْحَاءِ) الْمَحَلِّيُّ মিশরের الْمَحَلَّةُ الْكُبْرٰى নামক শহরের দিকে নিসবত করা হয়েছে। জন্ম ৭১৯ হিজরি মৃত্যু ৮৬৪ হিজরি। الشَّافِعِيُّ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস শাফেয়ী (র.)-এর প্রতি নিসবত।

قَوْلُهُ وَتَتْمِيْمُ مَا فَاتَهُ مَا اشْتَدَّتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِيْنَ : تَتْمِيْمُ শব্দে رَفْع এবং جَرّ উভয়টি হতে পারে। رَفْع অবস্থায় مَا -এর উপর عَطْف হবে। আর جَرّ অবস্থায় فِيْ تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ -এর উপর عَطْف হবে এবং فِيْ -এর পরে হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হবে।

জ্ঞাতব্য : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য وَتَتْمِيْمُ مَافَاتَهُ الْمَحَلِّيُّ বাক্যে تَتْمِيْمُ শব্দ ব্যবহারে তাসামুহ পরিলক্ষিত হয়। কেননা আল্লামা সুয়ূতী (র.) مَافَاتَ الْمَحَلِّيُّ অর্থাৎ মহল্লী (র.) যা ছেড়ে দিয়েছেন তার **পরিশিষ্ট লিখেননি; বরং** مَا أَتٰى بِهِ الْمَحَلِّيُّ অর্থাৎ মহল্লী (র.) যা রেখে গেছেন তার পরিশিষ্ট লিখেছেন।

মোটকথা ইমাম মহল্লী (র.) যা রচনা করেছেন পরিপূর্ণ করেছেন, যা লিখেননি তা পরিপূর্ণ করেননি। কারণ تَتِمَّةُ বা পরিশিষ্ট مَالَهُ التَّتِمَّةُ -এর অংশ হয়ে থাকে। আর আল্লামা সুয়ূতীর পরিশিষ্ট অর্থাৎ প্রথম অর্ধেক مَا فَاتَ الْمَحَلِّيُّ -এর অংশ নয়: বরং مَا أَتٰى بِهِ অর্থাৎ শেষ অর্ধেকের পরিশিষ্ট। –[হাশিয়াতুস সাবী, খ. ১, পৃ. ৭]

قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ : هُوَ জমীর مَا فَاتَهُ বা تَتْمِيْمُ -এর দিকে ফিরেছে। উভয়টির মেসদাক একই। তাহলো সুয়ূতীর তাফসীর। –[হাশিয়াতুল জামাল খ. ১, পৃ. ১০]

قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ : সূরা ফাতিহার তাফসীর আল্লামা মহল্লী (র.) করেছেন। তাই আল্লামা সুয়ূতী (র.) তা শেষাংশের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং তিনি সূরা বাকারা থেকে রচনা শুরু করেন।

উল্লেখ্য সূরা ইসরার শেষে মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ অংশের তাফসীর সম্পন্ন করেছেন مِقْدَارُ مِيْعَادِ الْكَلِيْمِ তথা ৪০ দিনে। তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২২ বছর। এটিই তাঁর প্রথম তাফসীর। তিনি ৮৭০ হিজরির রমজানের প্রথম তারিখ বুধবার এর রচনা শুরু করেন এবং ১০ শাওয়াল সমাপ্ত করেন। ইমাম মহল্লীর ইন্তেকালের ছয় বছর পর এ কিতাব রচনা করেন। –[হাশিয়াতুল জামাল খ. ১, পৃ. ১০]

قَوْلُهُ بِتَتِمَّةٍ : এটা تَتْمِيْمُ -এর مُتَعَلِّقْ আর بَاءٌ হরফটি مَعَ -এর অর্থে।

أَيْ هٰذَا التَّتْمِيْمُ الَّذِيْ أَتٰى بِهِ السُّيُوْطِيُّ تَفْسِيْرًا لِلنِّصْفِ الْأَوَّلِ مُصَاحِبٌ لِتَتِمَّةٍ (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ ص١ ج١)

আর تَتِمَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরা ইসরার শেষে তিনি هٰذَا اٰخِرُ مَا كَمُلَتْ بِهِ تَفْسِيْرُ الْقُرْآنِ الخ বলে যে আলোচনা করেছেন, সে অংশটুকু। –[প্রাগুক্ত]

عَلٰى نَمَطِهِ : এটা تَتْمِيْمُ থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ এ অবস্থায় পরিপূর্ণ হয়েছে যে, সেটি আল্লামা মহল্লীর পদ্ধতি অনুযায়ী হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللّٰهِ : এটা نَمَط -এর بَيَانٌ হয়েছে। এখান থেকে আল্লামা মহল্লীর তাফসীরের পদ্ধতিও নীতিমালা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা আল্লামা সুয়ূতী (র.) অনুসরণ করেছেন। আর সে পদ্ধতি হচ্ছে ৪টি। যা সামনের ইবারতে রয়েছে। (ج) أَنْمَاطٌ نَمَطٌ অর্থ– اَلطَّرِيْقَةُ বা পদ্ধতি ও ধরন।

قَوْلُهُ الْاِعْتِمَادُ : এটা ذِكْرِ مَا يُفْهَمُ -এর উপর عَطْف হয়েছে এবং مِنْ -এর পর হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে।

قَوْلُهُ إِعْرَابُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ : এটি এবং تَنْبِيْهٌ عَلَى الْقِرَاءَةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمَشْهُوْرَةِ এ উভয় জুমলার عَطْف ও হয়েছে ذِكْر -এর উপর।

قَوْلُهُ وَتَنْبِيْهٌ ـ وَالْإِعْرَابُ ـ وَالْاِعْتِمَادُ : এসবগুলোর عَطْف হয়েছে ذِكْر -এর সাথে। আর এ তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি বাদ দিয়ে تَنْبِيْهٌ শব্দটিকে نَكِرَة হিসেবে ব্যবহার করার কারণ হলো قِلَّتْ বা স্বল্পতা বুঝানো। অর্থাৎ তিনি সকল কেরাতের প্রতি تَنْبِيْه করেননি। সামান্য কিছু কেরাতের প্রতি সতর্ক করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

উল্লেখ্য এখানে مَشْهُوْر দ্বারা উসূলে হাদীস ও ফিকহের পারিভাষিক مَشْهُوْر উদ্দেশ্য নয়; বরং আভিধানিক অর্থ [প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট] উদ্দেশ্য। কারণ মাসহাফে লিখিত সকল কেরাতই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত।

قَوْلُهُ اَلْقِرَاءَةُ الْمُخْتَلِفَةُ : **কেরাতের ভিন্নতার তাৎপর্য :** আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন যে নির্দিষ্ট কেরাতের মাধ্যমে নাজিল করেছেন, তার মধ্যে পারস্পরিক উচ্চারণ পার্থক্য সর্বাধিক সাত ধরনের হতে পারে। অনুমোদিত সেই সাতটি ধরন নিম্নলিখিত ভিত্তিতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব-

১. বিশেষ্যের উচ্চারণে তারতম্য। এতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতির ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে। যেমন, এক কেরাতে وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ -এর কালিমাতু শব্দটি একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেরাতে এই শব্দটি বহুবচন উচ্চারিত হয়ে وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ক্রিয়াপদে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের বিভিন্নতা অবলম্বিত হয়েছে। যেমন প্রচলিত কেরাতে رَبَّنَا بَاعِدْنَا بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে এবং এ আয়াতই অন্য কেরাতে رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا পঠিত হয়েছে। অথবা যেমন- এক কিরাতে পঠিত হয়েছে- وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ পক্ষান্তরে অপর কেরাতে وَاتَّخَذُوْا রয়েছে।

৩. রীতি অনুযায়ী হরকত বা যের-যবর, পেশ ইত্যাদি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মত পার্থক্যের কারণে কেরাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- لَا يُضَارَّ -এর স্থলে কেউ কেউ لَا يُضَارُّ তেলাওয়াত করেছেন। এমনিভাবে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ -এর স্থলে ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ তেলাওয়াত করেছেন।

৪. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের হ্রাস-বৃদ্ধিও হয়েছে। যেমন- تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -এর স্থলে تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ তেলাওয়াত করা হয়েছে।

৫. কোনো কোনো কেরাতে শব্দের আগ-পরও হয়েছে। যেমন- وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ -এর স্থলে وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ পড়া হয়েছে।

৬. শব্দের পার্থক্য হয়েছে। অর্থাৎ এক কেরাতে এক শব্দ এবং অন্য কেরাতে অন্য শব্দ পঠিত হয়েছে। যেমন- فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا এবং فِىْ طَلْعٍ -এর স্থলে فِىْ طَلْحٍ পঠিত হয়েছে।

৭. উচ্চারণ পার্থক্য : যেমন কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গিতে লম্বা খাটো হালকা, শক্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে মূল শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি, শুধু উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- مُوْسٰى শব্দটি কোনো কোনো উচ্চারণে مُوْسٰى রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য সাত কেরাতের মাধ্যমে উচ্চারণের সুবিধার্থে যেসব পার্থক্য অনুমোদন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অর্থের কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। বিভিন্ন এলাকা ও শ্রেণি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ-ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই সাত কেরাত পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। -[উলূমুল কুরআন : মুফতি তকী উসমানী : ১০৬-১০৯]

قَوْلُهُ عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ : পূর্বোক্ত চারটি মাসদারের সাথে এর সম্পর্ক। لَطِيْف দ্বারা এখানে قَصِيْر বা সংক্ষিপ্ত বুঝানো হয়েছে। (ك) لَطُفَ الشَّيْئُ - ছোট হওয়া, সূক্ষ্ম হওয়া। এটি ضَخَامَةٌ -এর বিপরীত।

قَوْلُهُ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ : এটি عَطْف تَفْسِيْر হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ : এর عَطْف হয়েছে وَجْهٍ لَطِيْفٍ -এর উপর এবং এটি عَطْف تَفْسِيْرِىْ হিসেবে ব্যবহৃত। এভাবে যে, مَعْطُوْف عَلَيْه তথা عَلٰى وَجْهٍ لَطِيْفٍ وَتَعْبِيْرٍ وَجِيْزٍ -এর মাঝে যে বিষয়টি সংক্ষেপে এবং ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে সে বিষয়টি مَعْطُوْف তথা وَتَرْكِ التَّطْوِيْلِ -এর মাঝে বিস্তারিত এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা কোনো বস্তু সংক্ষিপ্ত হওয়া মানে দীর্ঘ না হওয়া।

قَوْلُهُ بِذِكْرِ اَقْوَالٍ : -এর সম্পর্ক হলো تَطْوِيْل -এর সাথে সাথে।

قَوْلُهُ غَيْرَ مَرْضِيَّةٍ : اَىْ عِنْدَ الْمُفَسِّرِيْنَ

قَوْلُهُ وَاَعَارِيْبَ مَحَلُّهَا : এটি اَقْوَال -এর সাথে عَطْف হয়েছে। হিন্দুস্তানী নোসখাগুলোতে مَحَالُّهَا লিখা রয়েছে। অথচ আরবি সকল নোসখাতেই مَحَلُّهَا রয়েছে এবং এটাই সঠিক।

قَوْلُهُ كُتُبُ الْعَرَبِيَّةِ : অর্থাৎ নাহব বালাগাত ইত্যাদি শাস্ত্রের কিতাবসমূহ।

قَوْلُهُ وَاللّٰهَ اَسْاَلُ النَّفْعَ بِهٖ : بِهٖ -এর যমীর আলোচিত تَتْمِيْم -এর দিকে ফিরেছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রথম পারা

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ مِائَتَانِ وَسِتٌّ اَوْ سَبْعٌ وَثَمَانُوْنَ اٰيَةً .

সূরা বাকারা মাদানী, যার মধ্যে ২৮৬ অথবা ২৮৭ আয়াত রয়েছে

তাহকীক ও তারকীব

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ মুবতাদা, مَدَنِيَّةٌ খবরে আউয়াল এবং مِائَتَانِ খবরে ছানী।

سُوْرَة ও اٰيَة-এর তাহকীক : سُوْرَة-এর وَاو টি মূল হরফ হলে এটি سُوْرُ الْمَدِيْنَةِ বা سُوْرُ الْبَلَدِ [নগর-প্রাচীর] থেকে উদ্ভূত। নগর-প্রাচীর যেমন পুরো শহরকে বেষ্টিত করে রাখে, তেমনি কুরআনের এক একটি সূরা কুরআনের একটি অংশকে বা সংশ্লিষ্ট সূরার অভ্যন্তরস্থ বিষয়বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। আর যদি مَهْمُوْزُ الْاَصْلِ হয় এবং هَمْزَة-কে وَاو দ্বারা পরিবর্তন করে নেওয়া হয়, তাহলে অর্থ হবে بَقِيَّةُ الشَّيْءِ وَقِطْعَتُهٗ বস্তুর অবশিষ্ট অংশ বা খণ্ড। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ سُوْرَة : সূরার আরেকটি অর্থ-উচ্চতা। اَلسُّوْرَةُ اَلرِّفْعَةُ (لِسَان) যেন কুরআনের প্রতিটি অধ্যায় স্বতন্ত্র মর্যাদার উঁচু স্থানে অধিষ্ঠিত। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭]

পরিভাষায় সূরার সংজ্ঞা : পরিভাষায় সূরা বলা হয়- ١. هِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ لَهَا اَوَّلٌ وَاٰخِرٌ (جمل. ج١ ص٢)

٢. قَالَ الْجَعْبَرِيُّ : حَدُّ السُّوْرَةِ قُرْاٰنٌ يَشْتَمِلُ عَلٰى اٰيٍ ذِيْ فَاتِحَةٍ وَخَاتِمَةٍ وَاَقَلُّهَا ثَلَاثُ اٰيَاتٍ . (حَاشِيَةُ جَلَالَيْن)

অর্থাৎ সূরা হলো পবিত্র কুরআনের বিশেষ অংশ যার শুরু ও শেষ রয়েছে এবং যার মধ্যে কমপক্ষে তিনটি আয়াত রয়েছে।

قَوْلُهُ الْبَقَرَة : সূরা বাকারার নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম بَقَرَة [বাকারা] এ জন্য হয়েছে যে, এর এক স্থানে بَقَرَة বা গাভীর আলোচনা এসেছে। এটা আরবি কায়দা تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ الْجُزْءِ [তথা অংশ বিশেষের নামে পূর্ণ বস্তুর নামকরণ] হিসেবে হয়েছে। এটা বিষয়ভিত্তিক নাম নয়; বরং প্রতীকি নাম। কুরআনের প্রতিটি সূরায় এ পরিমাণ ব্যাপক ও অধিক বিষয়সমূহ বর্ণিত হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সে সূরার জন্য সমৃদ্ধ কোনো শিরোনাম নির্ধারণ করা যায় না। এটা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। তাই রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় অধিকাংশ সূরা জন্য শিরোনামের বদলে নাম নির্ধারণ করেছেন। যা কেবল আলামত ও নিদর্শনের কাজ দেয়। এ সূরাকে সূরা বাকারা বলে নামকরণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এখানে গাভীর বিধান স্বরূপ, উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে; বরং তার উদ্দেশ্য হলো এটা ঐ সূরা যেখানে গাভী শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী, জালালাইন খ. ১, পৃ. ৩৮]

ফায়দা : সূরার নাম ও বিন্যাস : বিশুদ্ধ মতে সূরার নাম ও পারস্পরিক বিন্যাস تَوْقِيْفِي ব্যাপার। অর্থাৎ স্বয়ং রাসূল ﷺ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইঙ্গিতে সাব্যস্ত। যখন কোনো সূরা শেষ হতো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজী ﷺ-কে বলতেন- اِجْعَلْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ عَقِبَ سُوْرَةِ كَذَا وَقَبْلَ سُوْرَةِ كَذَا অর্থাৎ এ সূরাটি অমুক সূরার পরে কিংবা পূর্বে স্থাপন করুন! এমনিভাবে আয়াতের তারতীব বা ক্রমবিন্যাসও توقيفى হযরত জিবরাঈল (আ.) নবীজী ﷺ-কে বলতেন- اِجْعَلْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَقِبَ اٰيَةِ كَذَا وَقَبْلَ اٰيَةِ كَذَا এ আয়াতটিও অমুক আয়াতের পরে কিংবা পূর্বে স্থাপন করুন!

উল্লেখ্য, আয়াত এবং সূরার তারতীব তাওকীফী হওয়ার বিষয়টি راجح বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতের ভিত্তিতে, অন্যথায় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- কেউ কেউ বলেছেন, সূরা ও আয়াতের তারতীব সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদে নির্ধারিত হয়েছে। তবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর কুরআনের নুসখায় সূরার নাম লেখা ছিল না। পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তা লিখেছেন। যেমনিভাবে সে কুরআনকে سُبْع . رُبْع . عُشْر ইত্যাদিতে বিভক্ত করেছে। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২]

http://islamiboi.wordpress.com

উল্লেখ্য, সূরার নামসমূহ تَوْقِيْفِى বলতে প্রসিদ্ধ নামটি। অন্যথায় সাহাবা এবং তাবেঈনের এক জামাত নিজেদের পক্ষ থেকে কতিপয় সূরার নাম দিয়েছিলেন। যেমন হুযায়ফা (রা.) সূরা তওবার নাম রেখেছেন– اَلْفَاضِحَةُ এবং سُوْرَةُ الْعَذَابِ হযরত খালেদ ইবনে মা'দান সূরা বাকারার নাম فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ রেখেছেন।

আবার কিছু সূরার একাধিক নামও রয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহার নামসমূহ নিম্নরূপ–

اُمُّ الْقُرْاٰنِ ـ اُمُّ الْكِتَابِ ـ سُوْرَةُ الْحَمْدِ ـ سُوْرَةُ الصَّلَاةِ ـ اَلشِّفَاءُ ـ اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ ـ اَلرُّقْيَةُ ـ اَلنُّوْرُ ـ اَلدُّعَاءُ ـ اَلْمُنَاجَاةُ ـ اَلشَّافِيَةُ ـ اَلْكَافِيَةُ ـ اَلْكَنْزُ ـ اَلْاَسَاسُ ـ

সূরা তাওবার নাম اَلْفَاضِحَةُ এবং سُوْرَةُ الْعَذَابِ এবং সূরা ইউনূস -এর নাম اَلسَّابِعَةُ ; কেননা এটি طِوَال مُفَصَّل -এর সাতটি সূরার সপ্তম সূরা। সূরা ইসরার নাম بَنِى اِسْرَائِيْل। সূরা সাজদার নাম المضاجع। সূরা ফাতিরের নাম اَلْمَلَائِكَةُ সূরা মু'মিনের নাম اَلْغَافِرُ সূরা জাছিয়ার নাম اَلشَّرِيْعَةُ ইত্যাদি।

আবার কখনো কয়েকটি সূরার সমন্বিত নামও রয়েছে। যেমন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান -এর নাম الزهراوين এবং সূরা বাকারা থেকে আ'রাফ পর্যন্ত সাতটি সূরার নাম اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ ইত্যাদি। –[হাশিয়াতে জামাল : খ. ১, পৃ. ১৩]

কুরআন শরীফের তরতিব : পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের তরতিব দু'প্রকার–

১. **সংকলনের, অর্থাৎ** সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস **পর্যন্ত** যে তরতিব পবিত্র কুরআন বর্তমানে আমাদের সামনে বিদ্যমান **আছে। এ তরতিবও সঠিক বর্ণনা মতে এবং হযরত জিবরাঈল** (আ.) ও নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশ অনুসারে।

২. **অবতরণের, অর্থাৎ** যে তরতিবে **বাস্তবে আয়াত** ও সূরাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, তা হচ্ছে– সূরা 'আলাক, কলম, মুযযাম্মিল, **মুদ্দাছ্ছির, লাহাব,** কুওভিরাত, আ'লা, ওয়াল লাইল, ওয়াল ফাজর, ওয়াদ দুহা, আলাম নাশরাহ, ওয়াল 'আছর, ওয়াল আদিয়াত, **কাওছার,** তাকাছুর, মাউন, কাফিরুন, ফীল, ইখলাস, নাজম, 'আবাসা, কদর, বুরূজ, তীন, কুরাইশ, কারিয়াহ, **মুরসালাত, কাফ, কিয়ামাহ,** বালাদ, তারিক, কামার, সোয়াদ, আ'রাফ, জিন, ইয়াসীন, ফুরকান, ফাতির, মারইয়াম, তাহা, **ওয়াকিআহ, শু'আরা, নামল,** কাসাস, বনী ইসরাঈল, ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, হিজর, আন'আম, ওয়াস সাফফাত, লুকমান, **সাবা, যুমার, মু'মিন,** হামীম সিজদা, হামীম 'আঈন-সীন-কাফ, যুখরুফ, দুখান, জাছিয়া, মু'মিনূন, তানযীল, আসসিজদা, **তূর, মুলক, হাক্কাহ,** মা'আরিজ, নাবা, নাযি'আত, ইনফিতার, ইনশিকাক, রূম, মুতাফফিফীন ও 'আনকাবূত। উক্ত ৮৩ টি **সূরা মক্কী। হযরত** আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কী সূরাগুলোর মধ্যে সর্বশেষ সূরা 'আনকাবূতকে বলেছেন, আর হযরত **যাহহাক** (র.) ও হযরত 'আতা (র.) সর্বশেষ সূরা সূরা মু'মিনূনকে বলেছেন।

মাদানী সূরাগুলো অবতীর্ণের তারতীব হচ্ছে– সূরা বাকারা, আনফাল, আলে ইমরান, আহযাব, মুমতাহিনা, নিসা, যিলযাল, **হাদীদ, মুহাম্মদ,** রা'দ, রাহমান, দাহর, তালাক, বাইয়্যিনাহ, হাশর, ফালাক, নাস, নছর, নূর, হজ, মুনাফিকূন, মুজাদালাহ, **হুজুরাত,** তাহরীম, ছাফ, জুমু'আহ, তাগাবুন, ফাতহ, তওবা, মায়িদা কেউ কেউ সূরা মায়িদাকে সূরা তাওবার পূর্বে উল্লেখ করেছেন। সূরা ফাতিহার অবতরণ মক্কা ও মদীনা দু'স্থানে হয়েছে বিধায়– তাকে মক্কীও বলা যায় এবং মাদানীও বলা যায়, আর কিছু সংখ্যক সূরা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। –[কামালাইন, খ. ১, পৃ. ১০]

সূরা বাকারা নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটির অধিকাংশ আয়াতই নাজিল হয়েছে রাসূল ﷺ -এর মদীনা শরীফে হিজরতের প্রথম দিকে। অবশ্য এর কিছু অংশ পরবর্তীকালে নাজিল হলেও বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে তা এই সূরার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন– সূদ নিষিদ্ধ করে যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, সেগুলোও তার মাঝে শামিল করা হয়েছে। অথচ সে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে রাসূল ﷺ -এর জীবনের একবারে শেষের দিকে। সূরার উপসংহারে যে কয়টি আয়াত সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেগুলো নাজিল হয়েছিল হিজরতের পূর্বে মক্কায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে সে আয়াতগুলোও এই সূরার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৭]

সূরা বাকারার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য : কুরআনের প্রতিটি সূরা স্বতন্ত্র মর্যাদা ও ফজিলতের অধিকারী হলেও আলোচ্য সূরাটি হলো শীর্ষ মর্যাদার সূরাগুলোর অন্যতম। আকীদা-বিশ্বাস ও আমল-কর্ম উভয় ক্ষেত্রে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহের বলতে গেলে সবটুকুই সূরা বাকারাতে এসে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এ সূরার বড় ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন– اِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهَا سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ
   অর্থাৎ যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে। –[মুসলিম, তিরমিযী]
   কেননা শয়তান হলো আঁধার আর সূরা বাকারা হলো 'নূর'। আর বলাই বাহুল্য নূর ও আঁধার একত্র হতে পারে না।

http://islamiboi.wordpress.com

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ . (مُسْلِمٌ بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَلٰوةِ النَّافِلَةِ فِىْ بَيْتِهٖ)

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের ঘরকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়, তাতে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে আরও বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের একটি চূড়া থাকে, কুরআনের চূড়া হলো সূরা বাকারা।

৪. হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (রা.) বর্ণনা করেন–

اِقْرَؤُوْا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ وَهِىَ فُسْطَاطُ الْقُرْاٰنِ .

অর্থাৎ তোমরা সূরা বাকারা তেলাওয়াত করো! কেননা তা গ্রহণে বরকত, আর বর্জনে হাসারাত-অনুতাপ। অকর্মরা এটা বহনে সক্ষম নয়। এটা কুরআনের শামিয়ানা। –[দারিমী]

৫. অপর একটি বর্ণনায় আছে– سَيِّدَةُ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ اٰيَةُ الْكُرْسِىِّ অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের সরদার হলো আয়াতুল কুরসী। বালাবাহুল্য, এটি সূরা বাকারারই অন্যতম আয়াত। -[তিরমিযী]

৬. বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাকারা সমগ্র কুরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। ইবনে আরাবী (র.) বলেন–

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا اَلْفُ اَمْرٍ وَاَلْفُ نَهْيٍ وَاَلْفُ حِكَمٍ وَاَلْفُ خَبَرٍ أَخْذُهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ لَا تَسْتَطِيْعُ الْبَطَلَةُ وَهُمُ السَّحَرَةُ سُمُّوْا بِذَالِكَ لِمَجِيْئِهِمْ بِالْبَاطِلِ . اِذَا قُرِأَتْ فِىْ بَيْتٍ لَمْ تَدْخُلْهُ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ . (جمل: ص۱۳ج۱)

অর্থাৎ এ সূরায় এক হাজার (اَمْر) আদেশ এক হাজার (نَهِى) নিষেধ, এক হাজার হেকমত, এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তা গ্রহণে বরকত এবং বর্জনে অনুতাপ। জাদুকররা তা বহন করতে পারে না। কোনো ঘরে তা পাঠ করা হলে, শয়তান সেখানে তিনদিন পর্যন্ত প্রবেশ করে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এ সূরার মর্ম আয়ত্ত ও অনুধাবন করতে আট বছর সময় ব্যয় করেছেন। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৩]

৭. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত যে, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) রাতে সূরা বাকারা পড়ছিলেন, হঠাৎ তাঁর কাছে বাঁধা অশ্বটি ভয়ে ছটফট আরম্ভ করল, তখন তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে দিলেন, আর অশ্বটিও শান্ত হয়ে গেল, পরে যখন আবার তিনি তেলাওয়াত আরম্ভ করলেন, তখন অশ্বও ভয়ে ছটফট আরম্ভ করল এবং নিকটেই তাঁর ছেলে ইয়াহ্ইয়া নিদ্রাবস্থায় ছিল। তিনি চিন্তা করলেন যে, তাঁর ছেলের কোনো অসুবিধা হয় কিনা, তাই তিনি তেলাওয়াত বন্ধ করে উপরের দিকে দৃষ্টি করলে একটি উজ্জ্বল ছায়ানীড় দেখতে পেলেন, যার মধ্যে আলো দানকারী চেরাগ ছিল, তিনি এ দৃশ্য দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে আসলে পরে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সকালে এ ঘটনা রাসূল ﷺ-এর দরবারে বললেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, ফেরেশতা তোমার তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে এসেছিল, যদি তুমি তেলাওয়াত করতে থাকতে– তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকতেন এবং লোকেরা তাঁদেরকে স্বচক্ষে-বাস্তবে দেখতে পারতো। সুতরাং তুমি নিয়মিত সূরা বাকারা পড়তে থাক!

৮. মুসলিম শরীফ হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারাহ ও আলে-ইমরান নিজ পাঠকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন সায়েবানের কাজে আসবে, সূরা বাকারা পড়তে থাক, এটা পাঠ করার মধ্যে বরকত এবং তেলাওয়াত ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে আফসোস রয়েছে। এর বরকতে প্রতারকের ধোঁকা চলতে পারে না।

مَدَنِيَّةٌ : সূরার বেশির ভাগ বরং প্রায় সবগুলো আয়াতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত পরবর্তী মদনী জীবনে অবতীর্ণ। সুতরাং এক দুটি মক্কী আয়াতের অন্তর্ভুক্তি সূরাটি মাদানী হওয়ার অন্তরায় নয়।

এক নজরে পবিত্র কুরআনের পরিচিতি : পবিত্র কুরআনের সমস্ত সূরাগুলো নাসিখ-মানসূখ অর্থাৎ রহিতকারী ও রহিত হওয়ার দৃষ্টিতে চার প্রকার। যথা–

প্রথম প্রকার : যে সূরাগুলোতে শুধু (نَاسِخٌ) রহিতকারী আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা ৬টি। যথা– সূরা ফাতহ, হাশর, মুনাফিকূন, তাগাবুন, ত্বলাক ও আ'লা।

http://islamiboi.wordpress.com

দ্বিতীয় প্রকার : যে সূরাগুলোতে নাসিখ মানসূখ উভয় প্রকার আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা– ২৫টি। যথা– সূরা আল বাকারা, আল আল ইমরান, আন নিসা, আল মায়েদা, আল আনফাল, আত তওবা, ইব্রাহীম, মারয়াম, আল আম্বিয়া, আল হজ, আন নূর, আল ফোরকান, আশ শু'আরা, আল আহযাব, আস সাবা, আল মু'মিন, আয যারিয়াত, আততূর, আল মুজাদালা, আল ওয়াকিআহ, আল মুযযাম্মিল, আল মুদ্দাসসির, আত তাকভীর ও আল আছর।

তৃতীয় প্রকার : যে সূরাগুলোতে শুধু মানসূখ আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরার সংখ্যা ৪০টি। যথা– সূরায়ে আন'আম, আ'রাফ, ইউনুস, হুদ, রা'আদ, হিজর, নহল, ইসরা, কাহফ, তাহা, মু'মিনূন, নামল, কাছাছ, 'আনকাবূত, রোম, লুকমান, আলিফ লাম মীম সিজদা, ফাতির, সাফফাত, সোয়াদ, যুমার, হামীম সিজদা, শূরা, যুখরুফ, দুখান, জাকিয়া, আহকাফ, মুহাম্মদ, ক্বাফ, নাজম, কামার, মুমতাহিনা, মা'আরিজ, কিয়ামাহ, ইনসান, 'আবাসা, তারিক, গাশিয়াহ, তীন, কাফিরূন।

চতুর্থ প্রকার : যে সূরাগুলোতে মানসূখ আয়াতও নেই এবং নাসিখ আয়াতও নেই, এমন সূরার সংখ্যা ৪৩টি। যথা– সূরা ফাতিহা, ইউসুফ, ইয়াসীন, হুজরাত, রাহমান, হাদীদ, সাফ, জুমু'আহ, তাহরীম, মুলক, হাক্কা, নূহ, জিন, মুরসালাত, নাবা, নাযি'আত, ইনফিতার, মুতাফফিফীন, ইনশিকাক, বুরূজ, ফাজর, বালাদ, শামস, লাইল, দুহা, আলাম নাশরাহ, কালাম, ক্বাদর, বাইয়িনাহ, যিলযাল, 'আদিয়াত, কারিআহ, তাকাছুর, হুমাযাহ, ফীল, কুরাইশ, মাউন, কাউছার, নাসর, লাহাব, ইখলাস, ফালাক নাস। পবিত্র কুরআনে সর্বমোট সূরা ১১৪টি।

সূরাসমূহের বিশ্লেষণ :

প্রথমত সূরাসমূহকে সময় ও স্থান হিসেবে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– যে সূরাসমূহে মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মক্কী, আর যে সূরাসমূহে মদীনাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মাদানী।

দ্বিতীয়ত যে সূরাগুলো মক্কা ও তার আশেপাশে যেমন– মীনা ইত্যাদি স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মক্কী, আর যে সূরাগুলো সূরা মদীনা ও তার আশেপাশে অবতীর্ণ হয়েছে– ঐ সূরাগুলো মদনী।

তৃতীয়ত যা সবচেয়ে অধিক বিশুদ্ধ, তা হচ্ছে নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে যতগুলো সূরা অবতীর্ণ হয়েছে– ঐ সবগুলো মক্কী, আর তার হিজরতের পর যতগুলো সূরা নাজিল হয়েছে– যদিও তা মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে– ঐ সবগুলো মাদানী।

জালালাইন-এর সিদ্ধান্ত : জালালাইন-এর বর্ণনা মোতাবেক ২০টি সূরা নিঃসন্দেহে মাদানী, আর ৭৭টি সূরা নিঃসন্দেহে মক্কী এবং ১৭টি সূরা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে।

সূরাসমূহের নাম : যেমনভাবে বড় আকারের বই ও কিতাবাদিকে সহজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অধ্যায় ও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয় এবং বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়। যাতে করে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং পাঠকদের বুঝতে ও আয়ত্তে আনতে সুবিধা হয়। তদ্রূপ অবস্থাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের, আর এ সূরাসমূহকে পরস্পর পৃথক করার লক্ষ্যে পৃথক পৃথক নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং এ নামকরণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। কোথাও প্রথম শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন– সূরা ইয়াসীন, সোয়াদ, নূন, যাকে আরবিতে বলা হয় تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ اَوَّلِ الْجُزْءِ আর কোথাও সূরাতে উল্লিখিত বিশেষ কোনো শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে ঐ শব্দের দ্বারাই সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন– সূরা মুহাম্মদ, সূরা ইব্রাহীম ইত্যাদি, যাকে আরবিতে বলা হয় تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ اَشْهَرِ الْجُزْءِ - আর কোথাও সূরাতে উল্লিখিত কোনো ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে ঐ সূরার নাম রাখা হয়েছে। যেমন– সূরা বাকারা।

قَوْلُهُ وَسِتٌّ اَوْ سَبْعٌ الخ : এখানে আয়াত সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ মতভেদের উৎস হলো– কোনো কোনো আয়াতের শুরুভাগে মাসহাফে কূফী ও অপরাপর মাসহাফের ভিন্নতা।

اٰيَةٌ : আয়াত অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন। পথিকদের চলার সুবিধার্থে রাস্তার পার্শ্বে যে চিহ্ন প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাকে আয়াত বলা হয়। পরিভাষায় اٰيَةٌ বলা হয়– طَائِفَةٌ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْاٰنِ مُتَمَيِّزَةٌ بِفَصْلٍ [কয়েকটি শব্দের সমষ্টিকে আয়াতে কুরআনী বলা হয়] কখনো একটি কালিমাও আয়াত হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যেমন– مُدْهَامَّتَانِ - وَالْفَجْرِ . وَالضُّحٰى . وَالْعَصْرِ . الٓمّٓ . طٰهٰ . يٰسٓ ইত্যাদি। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১. পৃ. ১৪]

http://islamiboi.wordpress.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ : পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তা'আওউয ও তাসমিয়া-এর হুকুম : পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে تَعَوُّذ পড়া উচিত। যার অর্থ হলো আমি বিতাড়িত শয়তানের ফেতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে আসার আহ্বান করছি। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ [অর্থ- অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। -[সূরা নাহল : ৯৮] আল্লাহর এ নির্দেশের কারণে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াতের শুরু তা'আউয দ্বারা হতে হবে, চাই কোনো সূরার প্রথম থেকে তেলাওয়াত শুরু হোক কিংবা না-ই হোক, পবিত্র কুরআনের যে স্থান থেকেই তেলাওয়াত আরম্ভ করতে চাইলে তা'আউয দ্বারা শুরু করতে হবে। কেননা এ اِسْتِعَاذَة হলো শয়তানের ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ ـ (الاَعْرَاف : ٢٠١-٢٠٠)

জমহুরের মতে নামাজে تَعَوُّذ পড়া সুন্নত। ইচ্ছাকৃত বা ভুলে না পড়া হলে নামাজ নষ্ট হবে না। আর নামাজের বাহিরে تعوذ পড়া মোস্তাহাব। হযরত আতা (র.) বলেন, নামাজের ভেতর এবং বাহিরে উভয় জায়গায়ই ওয়াজিব। হযরত ইবনে সীরীন (র.) বলেন, জীবনে একবার পাঠ করলেও ওয়াজিব আদায় হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৪]

تَعَوُّذ পড়ার সময় : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে নামাজের ভেতরে কিংবা বাহিরে সর্বত্র কেরাতের পূর্বে تَعَوُّذ পড়বে। তবে আয়াতের বাহ্যিক বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম নাখঈ ও দাঊদ (র.) কেরাতের শেষে تَعَوُّذ পড়ার মত দিয়েছেন।

-[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১৪]

تَعَوُّذ -এর বাক্য কি হবে? : এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তা'আউয -এর শব্দগুলো হচ্ছে- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

২. আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলা উত্তম হবে। কেননা এর দ্বারা تَعَوُّذ -এর নির্দেশনামূলক দুটি আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়। আয়াতদ্বয় হলো-

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (النَّحْل : ٩٨) এবং وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (فُصِّلَتْ : ٣٦)

৩. ইমাম আওযায়ী (র.) ও ইমাম ছাওরী (র.)-এর মতে, উত্তম হচ্ছে এভাবে বলা-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

اَلتَّعَوُّذُ -এর মর্ম ও বিশ্লেষণ :

قَوْلُهٗ اَعُوْذُ : عَاذَ يَعُوْذُ থেকে নির্গত। قَالَ يَقُوْلُ -এর ওজনে। عَاذَ بِهٖ (ن) عِيَاذًا وَمَعَاذًا আশ্রয় গ্রহণ করল, আশ্রয় নিল।

قَوْلُهٗ اَلشَّيْطَانِ : شَيْطٰن শব্দটির মূল ধাতু হলো شَطَنٌ যার অর্থ হলো রহমত থেকে দূরে সরে গেছে। কেউ বলে মূল ধাতু হলো شاط يشيط -ধ্বংস হওয়া বা ভস্ম হওয়া।

পরিভাষায় শয়তানের সংজ্ঞা হলো- ١ ج١ اَلشَّيْطَانُ اِسْمٌ لِكُلِّ عَاتٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ حَاشِيَةُ الصَّاوِىْ ص ١٠ [মানব এবং জিন জাতির মধ্যে প্রত্যেক দাম্ভিক ও সীমা অতিক্রমকারীকে শয়তান বলে]

قَوْلُهٗ اَلرَّجِيْمِ : এটি فَعِيْلٌ -এর ওজনে فَاعِل -এর অর্থে। اَىْ يَرْجُمُ بِالْوَسْوَسَةِ وَالشَّرِّ মানব মনে অসওয়াসা ও অনিষ্ট ঢেলে দেয়।

http://islamiboi.wordpress.com

কেউ বলেন- **مَفْعُول** -এর অর্থে- أَيْ مَرْجُوْمٌ بِالشُّهُبِ عِنْدَ اِسْتِرَاقِ السَّمْعِ অর্থাৎ আকাশ থেকে চুরি করে কথা শোনার সময় উল্কা দিয়ে যাকে আঘাত করা হয়।

কেউ বলেন- **مَرْجُوْمٌ بِالْعَذَابِ** অজাব দ্বারা আক্রান্ত।

কেউ বলেন- **مَرْجُوْمٌ بِمَعْنَى مَطْرُوْدٍ عَنِ الرَّحْمَةِ وَعَنِ الْخَيْرَاتِ وَعَنْ مَنَازِلِ الْمَلَإِ الْأَعْلٰى** রহমত ও সকল কল্যাণ এবং ফেরেশতাদের সমাজ থেকে বিতাড়িত। -[হাশিয়ায়ে সাবী খ.১, পৃ. ১০]

اِسْتِعَاذَة -কে تَسْمِيَة -এর পূর্বে আনার কারণ : বস্তুত: اِسْتِعَاذَة হলো শয়তানের ধোঁকার জালে আটকে পড়া থেকে বেঁচে থাকা; আর বিসমিল্লাহ -এর হাকীকত হলো বান্দা আল্লাহ তা'আলার রহমতে দাখিল হয়ে যাওয়া। এ জন্য اِسْتِعَاذَة কে বিসমিল্লাহ -এর আগে আনা হয়েছে। কেননা কায়দা আছে- **دَفْع مُضَرَّت مُقَدَّم از جَلْب مَنْفَعَت** অর্থাৎ লাভ অর্জনের চেয়ে ক্ষতি রোধ করা অগ্রগণ্য]।

এছাড়াও কুরআনে কারীম হলো আল্লাহ তা'আলার কালাম। তা তেলাওয়াতের পূর্বে জবান এবং কলবের পবিত্রতা আবশ্যক। তাই কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে اِسْتِعَاذَة -এর হুকুম দেওয়া হয়েছে, যাতে জবান এবং কলব পবিত্র হয়ে যায়।

-[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৬]

تَعَوُّذ পাঠের তাৎপর্য : আল্লামা সুলায়মান জামাল (র.) বলেন-

وَمِنْ لَطَائِفِ الْاِسْتِعَاذَةِ اَنَّ قَوْلَهٗ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اِقْرَارٌ بِالْعَجْزِ وَالضُّعْفِ وَاعْتِرَافٌ مِنَ الْعَبْدِ بِقُدْرَةِ الْبَارِئ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنَّهُ الْغَنِيُّ الْقَادِرُ عَلٰى دَفْعِ جَمِيْعِ الْمُضَرَّاتِ وَالْاٰفَاتِ وَاعْتِرَافٌ مِنَ الْعَبْدِ اَيْضًا بِاَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ فَفِى الْاِسْتِعَاذَةِ اللَّجَأُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الْقَادِرِ عَلٰى دَفْعِ وَسْوَسَةِ الشَّيْطٰنِ الْغَوِيِّ الْفَاجِرِ وَاَنَّهٗ لَا يَقْدِرُ عَلٰى دَفْعِهٖ عَلَى الْعَبْدِ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى . (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ ١/١٤)

আল্লামা শায়খ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাবী আরো সংক্ষেপে এভাবে বলেন-

فَحِكْمَةُ الْاِسْتِعَاذَةِ تَطْهِيْرُ الْقَلْبِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَشْغَلُ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى، فَاِنَّ فِىْ تَعَوُّذِ الْعَبْدِ بِاللّٰهِ اِقْرَارًا بِالْعَجْزِ وَالضُّعْفِ وَاعْتِرَافًا بِقُدْرَةِ الْبَارِئ وَاَنَّهُ الْغَنِيُّ الْقَادِرُ عَلٰى دَفْعِ الْمُضَرَّاتِ وَاَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ وَقَدْ دَخَلَ مِنْهُ فِى الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ . (حَاشِيَةُ الصَّاوِىْ ص١٠ ج١)

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে আউযু বিল্লাহ পড়ার তাৎপর্য ও হেকমত হলো, বান্দার অন্তরকে গাইরুল্লাহ থেকে পবিত্র করা। কেননা تَعَوُّذ -এর মধ্যে বান্দার পক্ষ থেকে অক্ষমতা প্রকাশ এবং আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার স্বীকারোক্তি রয়েছে। সেই সাথে বান্দা এটাও স্বীকার করে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা করতে পারেন।

قَوْلُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

তারকীব : بِسْمِ اللّٰهِ -এর مُتَعَلِّق মাহযূফ রয়েছে। তা **فِعْل عَامّ** -ও হতে পারে অথবা **فِعْل خَاصّ** -ও হতে পারে, مُقَدَّم -ও হতে পারে অথবা مُؤَخَّر -ও হতে পারে। উক্ত চারটি পদ্ধতি مُتَعَلِّق -এর সহীহ ও বিশুদ্ধ সূরত। জুমলায়ে **فِعْلِيَّه** ও হতে পারে অথবা জুমলায়ে اِسْمِيَّة ও হতে পারে। মোট আটটি পদ্ধতিই হয়, কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে- **فِعْل** 'আম হওয়া এবং শেষে مُقَدَّر মানা, তাতে اَللّٰه مُقَدَّم থাকবে এবং তাঁর বড়ত্বও ঠিক থাকবে এবং সর্বকাজের সাথেই তাঁকে সংযুক্ত করা যাবে। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২]

বিসমিল্লাহ -এর পূর্বে উহ্য থাকা শব্দের ضَمِيْر [সর্বনাম] সম্পর্কে : আরবি ভাষার নিয়মে যে বাক্যের শুরুতে ب অক্ষরটি রয়েছে, তা কোনো একটি ক্রিয়া পদের সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তা উহ্য হোক বা প্রকাশমান। উহ্য হলে ক্রিয়া পদের সর্বননাম (ضَمِيْر) এখানে দু'টি অবস্থার যে কোনো একটি হতে হবে। হয় কাজের সংবাদদান পর্যায়ের হবে, না হয় হবে কাজের আদেশ। সংবাদদান পর্যায়ের হলে বাক্যটি হবে : اَبْدَأُ بِسْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি ... আর কাজের আদেশ প্রদান পর্যায়ের হলে বাক্যটি হবে : اِبْدَؤُوْا بِسْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ শুরু কর আল্লাহ তা'আলার নামে

http://islamiboi.wordpress.com

এ দু'টি সম্ভাবনার যে কোনো একটি হতে পারে। সূরা পাঠ করার নিয়মানুসারে মনে হয় এখানে আদেশসূচক শব্দই উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে পড়াশুনা কর। যেমন সূরা ফাতিহার শব্দ إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ হে আল্লাহ আমরা কেবলমাত্র তোমারই দাসত্ব করছি। এর পূর্বে 'তোমরা বল' উহ্য ধরা হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ' বাক্যেও এই সম্বোধন উহ্য আছে বলা যায়। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এই আদেশ স্পষ্ট ভাষায় উদ্ধৃত রয়েছে। যেমন اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ পড় তোমার রব -এর নামে। এখানে পাঠ শুরু করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। অপর এক আয়াতে কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করতে অর্থাৎ আ'উযু বিল্লাহ বলতে আদেশ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি সংবাদদানের তাৎপর্য অনুযায়ী 'আমি পড়া শুরু করছি' এই কথা উহ্য ধরা হয়, তাহলেও তাতে আদেশ নিহিত রয়েছে মনে করা যায়। কেননা যখন জানা যাবে যে, আল্লাহ নিজেই আল্লাহর নামে পড়া শুরু করেছেন, তখনই সেই আল্লাহর নামে শুরু করার জন্য আমাদের প্রতি আদেশ করা হচ্ছে বোঝা যাবে। কেননা তাঁর নাম করে পাঠ শুরু করলে তাতে বরকত হবে। আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমরাও যেন তাই করি।

উপরিউক্ত দুটি তাৎপর্যের উভয়ই এখানে বৈধ মনে করাও সমীচীন নয়। অর্থাৎ এখানে যেমন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তেমনি তা করার আদেশও করা হচ্ছে। শব্দের গঠন প্রণালিতে এই দু'টিরই সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান।

–[আহকামুল কুরআন, জাসসাস খ. ১, পৃ. ১৫]

بِسْمِ اللّٰهِ -এর ফজিলতসমূহ :

১. মুসলিম শরীফে বর্ণিত, যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ পড়া না হয়, সে খাদ্যে শয়তানের অংশ থাকে।

২. আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ -এর খানার মজলিসে জনৈক সাহাবী (রা.) বিসমিল্লাহ ব্যতীত খানা খাওয়া আরম্ভ করেছেন, পরে যখন স্মরণ হয়েছে, তখন বলেছেন "বিসমিল্লাহি মিন্ আউয়ালিহী ওয়া আখিরিহী" তখন রাসূল ﷺ এ অবস্থা দেখে হাসতে লাগলেন এবং বললেন যে, শয়তান যা কিছু খেয়েছিল তিনি [সাহাবী] বিসমিল্লাহ পড়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে সব বমি করে দিয়েছে।

৩. তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। পায়খানায় প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ পড়লে জিন জাতিও শয়তানদের দৃষ্টি তার গুপ্তাঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

৪. ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-এর বিপক্ষে শত্রু যুদ্ধের ময়দানে অপেক্ষা করছিল এবং বিষে ভরা একটি শিশি দিয়ে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের ধর্মের সততার পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) শিশির সম্পূর্ণ বিষ বিসমিল্লাহ পড়ে পান করেছেন; কিন্তু বিসমিল্লাহ -এর বরকতে বিষের বিন্দুমাত্র প্রভাবও তাঁর উপর হয়নি।

কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের ঘটনা বাস্তবে দেখা যায় না বলে উল্লিখিত ঘটনাটি যে কাল্পনিক, তা নয়, বরং তা সঠিক চিন্তার মাধ্যমে বুঝতে হবে যে, কোনো বস্তুর ক্রিয়া পেতে হলে অবশ্যই ঐ বস্তুর জন্য কিছু শর্ত ও উপকরণাদি থাকে এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হয়। যেমন– রোগ দূর করা ও সুস্থতা লাভ করার জন্য শুধু ঔষধ কখনো কার্যকরী হতে পারে না– যতক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য ক্ষতিকারক উপকরণাদি থেকে বিরত না থাকবে। ঠিক এ স্থানেও বিসমিল্লাহ কার্যকর হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে– খালেছ নিয়ত, সুদৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক এবং পরিপূর্ণ ঈমান। আর লোক দেখানো, কু-ধারণা, কল্পনা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ সব জিনিসই শর্ত সাপেক্ষে কাজ করে, তদ্রূপ উল্লিখিত ঘটনায় বিসমিল্লাহ কার্যকর হওয়ার জন্য যা কিছু থাকার প্রয়োজন এবং যা কিছু থেকে বিরত থাকা দরকার, ঐসব বিষয় হযরত খালিদ (রা.)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যার কারণে উক্ত ঘটনা সত্য ও বাস্তব হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

৫. আহমদ ইবনে মূসা ইবনে মারদুয়াওয়াইহ নিজ তাফসীর গ্রন্থ 'মারদুওয়াই' হতে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বিসমিল্লাহ যখন অবতরণ হয়েছে– তখন মেঘমালা দ্রুত গতিতে পূর্বদিকে দৌড়তে ছিল, সাগরগুলো উত্তাল অবস্থায় ছিল সকল প্রাণী নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে শুনতে ছিল, শয়তানকে দূরে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলা নিজ ইজ্জত ও জালালিয়াতের কসম খেয়ে বলেছেন, যে জিনিসের উপর বিসমিল্লাহ পড়া হবে, ঐ জিনিসে অবশ্যই বরকত দান করবো। লেখার ক্ষেত্রে যদি কোনোস্থানে "বিসমিল্লাহ" লিখলে বে-আদবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ স্থানে ওলামায়ে সলফের অনুকরণ করে আবজাদের হিসাব অনুযায়ী বিসমিল্লাহ এর অক্ষরসমূহের মান– সংখ্যা ৭৮৬ লিখে দেওয়াটাও বরকতের উৎস। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২]

http://islamiboi.wordpress.com

বিসমিল্লাহ নাজিল হওয়ার পূর্বের কথা : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) সর্বপ্রথম কুরআন নিয়ে যখন নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রথমে বললেন– اِقْرَأْ 'পড়'। রাসূল ﷺ বললেন– مَا اَنَا بِقَارِئٍ অর্থাৎ আমি তো পড়তে সক্ষম নই। পরে বললেন– اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ অর্থাৎ পড় তোমার সেই রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

নবী করীম ﷺ চিঠিসমূহের শুরুতে প্রথমে লিখতেন– بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নাম করে [শুরু করছি]।

পরে এ আয়াত নাজিল হয়– بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا (هود : ٤١) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে [নৌকায় আরোহণ কর], যিনি নৌকাকে চালু রাখবেন এবং শক্ত করে উঁচু করে ধারণ করবেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ লিখতে শুরু করেন। পরে নাজিল হলো قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ অর্থাৎ বল! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ডাক কিংবা ডাক রাহমানকে।

পরে তিনি চিঠির উপর আল্লাহ তা'আলার পর 'রহমান'-ও লিখতে থাকেন। পরে সূরা নামলের আয়াত وَاِنَّهٗ بِاسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যখন নাজিল হলো তখন তিনি পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখতে শুরু করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে তাঁর ও সুহাইল ইবনে আমর -এর মধ্যকার চুক্তিপত্র রচনার সময় হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) কে বললেন, প্রথমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখ। সুহাইল বললো, না, بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ অর্থাৎ "হে আল্লাহ তোমার নামে" লিখতে হবে। কেননা আমরা রহমানকে চিনি না। নবী করীম ﷺ সুহাইলের কথা মেনে নিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি পূর্বে কুরআনে নাজিল হয়নি। পরে সূরা আন-নামল নাজিল হওয়ার পরই তা ব্যবহৃত হতে থাকে। উল্লেখ্য, সূরা নামল মক্কায় হিজরতের পূর্বে নাজিল হওয়ার কথা সর্বসম্মত।

–[আহকামুল কুরআন, জাসসাস, খ. ১, পৃ. ১৮]

মুশরিকদের বিসমিল্লাহ : আরবের মুশরিকরা নিজেদের মনগড়া মাবুদগুলোর নামে بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى বলে সর্বপ্রকার কাজ আরম্ভ করত।

বিসমিল্লাহর ক্ষেত্রে কি নবী করীম ﷺ অন্যান্য ধর্মের অনুকরণ করেছেন? : জড়বাদী ধর্মাবলম্বীদের ও অগ্নিপূজকদের কিতাবের প্রতিটি লিখনীতেও এমন ধরনের [বিসমিল্লাহ'র মতো] কিছু শব্দ আছে। যেমন– بنام ایزد بخشاننده - بخشائشگر - مهربان داد گر ইত্যাদি এবং বর্তমান ইঞ্জীলের কোনো কোনো গ্রন্থের প্রাথমিক শব্দগুলোতেও কিছু এমন শব্দাবলি [বিসমিল্লাহ'র ন্যায়] রয়েছে, যদ্দারা সন্দেহ হতে পারে যে, রাসূল ﷺ ইঞ্জীল অথবা পারসিকদের কিতাব থেকে হয়তো উপকার লাভ করেছেন এবং বিসমিল্লাহ দ্বারা পবিত্র কুরআন আরম্ভ করার মাধ্যমে হয়তো তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু প্রথমত মনে রাখতে হবে যে, ইঞ্জীলের অতি পুরাতন গ্রন্থগুলো এ ধরনের নয়, যদ্দারা উল্টো প্রমাণিত হয় যে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের দেখাদেখি পবিত্র কুরআনের অনুকরণ করেছে। হ্যাঁ, পারস্যবাসীদের কিতাব সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়– তা হচ্ছে নবী করীম ﷺ কখনো ইরান যাননি এবং তৎকালে অগ্নিপুজক কোনো আলেম বা পণ্ডিত আরবে বসবাসও করেনি, তৎকালে তাদের কোনো লাইব্রেরী বা কোনো পাঠশালার নাম-নিশানও আরবে ছিল না।

ঐ কালে তো অগ্নিপূজকদের কিতাবাদির প্রচারের প্রথা ও রেওয়াজ তাদের দেশের মধ্যে এবং তাদের জাতির মধ্যেও ছিল না। বিশেষ বিশেষ লোকেরা অন্যান্য লোকদের দৃষ্টি থেকে নিজ ধর্মীয় কিতাবাদিকে লুকিয়ে রাখত, যাতে করে অন্য কেউ দেখতে পর্যন্ত না পারে, আরব দেশ পর্যন্ত তাদের কিতাব পৌছা তো অনেক দূরের কথা।

তারপর স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজ ভাষায় পড়তে ও লিখতে পারতেন না। এখন একটি বিষয়ই রয়েছে– তা হচ্ছে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর ব্যাপারটি? তিনি তো ছিলেন ক্রীতদাস, কোনো ধর্মীয় আলেম ছিলেন না। এমতাবস্থায় যদি স্বয়ং রাসূল ﷺ তার থেকে উপকার লাভ করতেন, তবে উল্টো সালমান ফারসী কেন রাসূল ﷺ -এর ভক্ত হয়েছেন? এবং নিজ মালিকের পক্ষ থেকে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে থাকাকে কেন গৌরবের উৎস মনে করেছেন?

তাছাড়া রাসূল ﷺ যদি অন্যদের অনুকরণে এমন করেও থাকেন, তবে এর দ্বারা রাসূল ﷺ -এর গুণাবলি আরও বৃদ্ধি হয়েছে। আর এ অনুকরণের দ্বারা নবী করীম ﷺ -এর ন্যায়পরায়ণতার অন্তরের প্রশস্ততার উঁচু চিন্তাধারার আন্দাজ করা যায় যে, তিনি অন্যান্য লোকদের উত্তম গুণাবলি থেকে দূরে থাকতেন না; বরং সেগুলোকে নিজের মধ্যে স্থাপন করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং মনে প্রাণে ঐ গুণাবলিকে গ্রহণ করে অন্যদেরকেও সেগুলো গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন। একজন গোঁয়ার,

http://islamiboi.wordpress.com

উগ্রবাদী, হিংসুটে ব্যক্তি দ্বারা কখনো এ ধরনের উচু আদর্শের আশা করা যায় না। আর ইসলাম কখনো নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন বলে ঘোষণা করেনি, পুরানো ও ঐতিহ্যবাহী হওয়ার কারণে গৌরব করেছে। অর্থাৎ ইসলামের সমস্ত বিধানবলি পুরাতন যেগুলোর তাবলীগও প্রচার সর্বদাই হযরত আম্বিয়া (আ.) করে আসছেন এবং নতুন কোনো কথা এর মধ্যে নেই। হ্যাঁ, অতীতের বর্বর লোকেরা যে বিধানগুলোকে গোপন করে রেখেছিলো, ইসলাম সেগুলোকে প্রকাশ করে দিয়েছে এবং প্রকৃত বাস্তবতাকে উজ্জ্বল করেছে।

সুতরাং হতে পারে যে, পূর্বের জমানায় অতীতের ধর্মগুলোতে শুরু বা আরম্ভ আল্লাহর নামেই হতো, তারপর উক্ত লোকেরা এ বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নামে শুরুকে রহিত করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইসলাম এসে অতীতের সেই আসল বিধানের [আল্লাহর নামে আরম্ভ করা বা বিসমিল্লাহর সাথে শুরু করার] অনুকরণ করেছেন! এতে প্রতিবাদের বা আপত্তির কি আছে? কিছুই নেই। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩-১৪]

বিশ্লেষণ : সকল সৃষ্টি ও মানুষের তিনটি অবস্থা, প্রথমত সৃষ্টির পূর্বে না থাকার অবস্থা। দ্বিতীয়ত দুনিয়াবী জীবনে থাকার অবস্থা। তৃতীয়ত পরকালের চিরস্থায়ী অবস্থা। বিসমিল্লাহি.........-এর তিনটি শব্দ দ্বারা ঐ তিনটি অবস্থার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। اَللّٰهُ শব্দের মধ্যে প্রথম অবস্থার দিকে ইঙ্গিত। অর্থাৎ তিনিই সকল বিদ্যমানকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি অস্তিত্ব দান না করলে কিছুই হত না।

দ্বিতীয়ত اَلرَّحْمٰنِ এটাও মুবালাগার সীগাহ, এর মধ্যে اَلرَّحِيْمِ -এর তুলনায় অক্ষর ও অর্থ- উভয়টিই বেশি। সুতরাং এর مِصْدَاق দুনিয়াতে মুসলমান, কাফের, বাধ্যগত ও অবাধ্য সবই, তাই দুনিয়াতে দয়া ও রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি। তৃতীয়ত اَلرَّحِيْمِ এটাও মুবালাগার সীগাহ, এর মধ্যে اَلرَّحْمٰنِ -এর তুলনায় অক্ষরও কম এবং অর্থও কম। সুতরাং পরকালের নিয়ামত যদিও বেশি ও বড় হবে, কিন্তু দয়া ও রহমত পাওয়ার পাত্র কম হবে, শুধু মু'মিন ব্যক্তিগণ হবেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি এবং পরকালে রহমত থেকে বঞ্চিতদের সংখ্যা বেশি হবে। এ জন্যই يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ رَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ বলা হয়। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৪]

দু'সূরার মাঝে বিসমিল্লাহ পড়ার সূরত : দু'সূরার মাঝে বিসমিল্লাহি .... পড়া/ না পড়ার মধ্যে চারটি প্রকার হতে পারে, ১. وَصْلُ كُلٍّ ২. فَصْلُ كُلٍّ ৩. فَصْلُ اَوَّلْ وَصْلُ ثَانِى উক্ত তিনটি প্রকার জায়েজ। আর চতুর্থ প্রকার- অর্থাৎ ৪. وَصْلُ اَوَّلْ فَصْلُ ثَانِى নাজায়েজ।

বিসমিল্লাহ কি সূরা ফাতিহাসহ অন্যান্য সূরার অংশ : 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কুরআনের একটি আয়াত- এই বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। সূরা আন-নামলে পূর্ণ আয়াত এইভাবে উদ্ধৃত রয়েছে-

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (النمل : ٣٠)

'এই চিঠি সুলায়মানের নিকট থেকে এসেছে এবং তা দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করা হয়েছে। কিন্তু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সূরা ফাতিহাসহ অন্যান্য সূরার অংশ কিনা? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

মাযহাব : ১. ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং মদীনা, বসরা ও শামের ফুকাহায়ে কেরামের মতে بِسْمِ اللّٰهِ সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ নয়। শুধু বরকত লাভের ও দু'সূরার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য নাজিল করা হয়েছে। তবে এটি সূরা নামলের আয়াত এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

দলিল :

১. তাবারানী ইবনে খুযাইমা এবং আবূ দাউদ (র.)-এর বর্ণনা হতে প্রমাণিত হুজুর ﷺ নামাজে بِسْمِ اللّٰهِ আস্তে আস্তে পাঠ করতেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সশব্দে পড়তেন। এ থেকে জানা গেল بِسْمِ اللّٰهِ সূরা ফাতিহা কিংবা অন্যান্য সূরার অংশ নয়। যদি সূরার অংশ হতো, তাহলে সূরার কিছু অংশ সশব্দে এবং কিছু নিঃশব্দে কেন পড়তেন? অথচ এভাবে পড়া কারো মতেই শুদ্ধ নয়। এজন্য এ মতটি অধিকতর শক্তিশালী।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন- নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সালাত আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দুইভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তার অর্ধেক আমার জন্য আর অপর অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তা-ই আছে, যা সে চেয়েছে। সে যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

http://islamiboi.wordpress.com

আমার বান্দা আমার হামদ [প্রশংসা] করেছে। যখন সে বলে- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমাকে মর্যাদাবান করেছে বা আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। যখন সে বলে- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার নিকট সবকিছু সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই কথাটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চেয়েছে তা-ই সে পাবে। এরপর বান্দা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সূরার শেষ পর্যন্ত পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চেয়েছে।

বিসমিল্লাহ ....যদি সূরা ফাতিহার একটি আয়াত হতো, তাহলে সূরাটির আয়াতসমূহের উল্লেখ করলে সেটিও উল্লেখ হতো। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিসমিল্লাহ ....সূরা ফাতিহার অংশ নয়। আর একথা তো সকলেরই জানা যে, উপরোল্লিখিত হাদীসে 'সালাত' বা নামাজকে দুই ভাগে ভাগ করার কথা বলে সূরা ফাতিহা-ই বুঝিয়েছেন। আর তাকেই দুই ভাগ করার কথা বলেছেন। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' যে সূরা ফাহিতহার অংশ নয় এবং তা তার মধ্যকার কোনো আয়াত নয়, তা এ প্রেক্ষিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো। মোটকথা, দুটি দিক দিয়ে কথাটির ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত উক্ত বিভক্তিতে তা উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত তা এই বিভক্তিতে থাকলে তা দু'ভাগে বিভক্ত হতো না। কেননা তাতে বান্দার অংশের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার অংশ অনেক বড়। এই বিসমিল্লাহ ....আল্লাহ তা'আলার গুণ বর্ণনা সম্বলিত। তাতে বান্দার কোনো অংশ নেই

৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -এর এই কথাটি বর্ণনা করেছেন-

سُوْرَةٌ فِي الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ .

অর্থাৎ কুরআনে ত্রিশটি আয়াত সম্বলিত সূরা তার পাঠকের জন্য শাফাআত করবে। শেষ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যের কর্তা আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন।

কুরআনের সব কারীই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যে ত্রিশটি আয়াতের কথা বলা হয়েছে, তাতে নিশ্চয় বিসমিল্লাহ .... গণ্য নয়। যদি তা গণ্য হতো, তাহলে তো ত্রিশটি নয়- একত্রিশটি আয়াত হয়ে যাবে। তাহলে তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথার বিপরীত হয়ে যাবে। উপরন্তু সমস্ত দেশ ও নগরের কারী এবং ফিকহবিদ একমত হয়ে বলেছেন, সূরা আল-কাওছার তিন আয়াতবিশিষ্ট, সূরা ইখলাসের মাত্র চারটি আয়াত। বিসমিল্লাহ .... যদি সূরার আয়াত গণ্য হতো, তাহলে এ দুটি সূরার আয়াত সংখ্যা একটি করে বেশি ধরতে হতো, অথচ তা ধরা হয়নি। -[আহকামুল কুরআন, জাসসাস : খ. ১, পৃ. ১৯-২২-২৩]

মাযহাব : ২. ইমাম শাফেয়ী, আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক এবং মক্কা ও কুফার কারীগণের অভিমত হলো بِسْمِ اللّٰهِ সূরা ফাতিহাসহ অন্যান্য সূরার অংশ। এজন্য তারা নামাজে সশব্দে بِسْمِ اللّٰهِ পড়তেন। তাদের কাছেও দলিল ও প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু রাসূল ﷺ এবং চার খলীফার কারো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই।

অতঃপর যারা بِسْمِ اللّٰهِ -কে সূরা ফাতিহার অংশ মনে করেন, তাদের মধ্যে কারো মত হলো بِسْمِ اللّٰهِ স্বতন্ত্র আয়াত। আর কারো মত হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর সঙ্গে মিলে পূর্ণ আয়াত।

বিসমিল্লাহ সম্পর্কে শরিয়তের হুকুম : বিসমিল্লাহ.......পড়ে সব কাজ শুরু করাই শরিয়তের হুকুম। তা বরকতের জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। পশু-পাখি জবাই করাকালে তা বলা দীন-ই ইসলামের বিশেষত্ব ও মর্যাদাসম্পন্ন নিয়ম, তা দ্বারা শয়তান তাড়ানো হয়। নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, খাওয়ার সময় বান্দা যদি আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করে, তাহলে শয়তান তার সাথে খেতে বসতে পারে না, তাঁর নাম উচ্চারণ না করা হলে শয়তান অবশ্যই খাওয়ায় শরিক হবে। মুশরিকরা তাদের কাজ-কর্ম শুরু করে তাদের দেব-দেবী মূর্তির নামে, যাদের ওরা পূজা করে। ওদের বিরোধিতা করা হবে যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কাজ শুরু করা হয়, তা ভীতুকে সাহসী বানায়, তা উচ্চারণ করলে বান্দা একান্তভাবে আল্লাহমুখী হয়ে যেতে পারে। তাঁর নিয়ামতের স্বীকৃতি হয়, তাঁর নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোনো বরকত থাকে না। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ বলবে। কোনো কিছু খেতে, পানি পান করতে, উজু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশ কুরআন-হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

-[কুরতুবী সূত্রে মাআরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

http://islamiboi.wordpress.com

١. الٓمّٓ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : ১. আলিফ লাম মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা-ই অধিক অবহিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা ফাতিহার সাথে সূরা বাকারার বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। তাহলো সূরা ফাতিহাতে যে হেদায়েতের জন্য দরখাস্ত করা হয়েছিল, সূরা বাকারাতে এর মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে অথবা এমনও বলা যায় যে, এ সূরার তৃতীয় রুকূ থেকে আল্লাহ তা'আলার জাহিরী ও বাতিনী, সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামতসমূহের যে ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ঐসব اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর সাথে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতাসমূহ, শাস্তি ও তওবার বর্ণনা, ইবাদত, বন্দিগী ও শরয়ী বিধানাবলির বর্ণনা এসবই হচ্ছে– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -এর ব্যাখ্যা। ভালো ও মন্দ লোকদের যে ইতিহাস বা পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো মূলত–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ

–এর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বর্ণনা।

শানে নুযূল : মক্কী জীবনে রাসূল ﷺ -এর দু'ধরনের লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিল। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসারী অথবা সম্পূর্ণ বিরোধী, অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপনে সর্বাবস্থায় তাঁর অনুসরণকারী অথবা সর্বাবস্থায় বিরোধী ও শত্রু। কিন্তু হিজরত করে যখন তিনি পবিত্র মদীনায় আগমন করলেন, তখন সেখানে নতুন ও নিকৃষ্ট তৃতীয় একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা হলো মুনাফিক সম্প্রদায়, যাদের অধিকাংশ ইহুদিদের মধ্যে গণ্য ছিল, আর তাদের নেতা ছিল 'আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, সে পূর্ব থেকেই নিজ ক্ষমতা ও নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতেছিল।

কিন্তু রাসূল ﷺ মদীনায় আগমনের কারণে যখন তার [আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর] আশার গুড়ে বালি পড়ে গেল, তখন সে অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। অবশেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষমতা না পেয়ে আড়ালে বিরোধিতায় মেতে উঠল। এ সূরাতে যে যে স্থানে মু'মিন ও কাফেরদের আলোচনা করা হয়েছে, ঐসব স্থানে এ খারাপ অন্তর, ইসলামের শত্রু, তৃতীয় দলটির গোপন ষড়যন্ত্রের পর্দাও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ সূরার প্রথম রুকূ'তে মু'মিন ও কাফের উভয় দলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে এবং দ্বিতীয় রুকু থেকে ১৩টি আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে।

(الٓمّٓ) হরুফে মুকাত্তা'আত প্রসঙ্গ : কুরআনে কারীমের ২৯টি সূরার শুরুভাগে কতগুলো বিচ্ছিন্ন হরফ উল্লিখিত হয়েছে। যথা– الٓمّٓ ـ صٓ ـ حٰمٓ ـ الٓمّٓصٓ এগুলোকে কুরআনের পরিভাষায় حُرُوْف مُقَطَّعَات বলা হয়। এ হরফগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়, একত্রে যুক্ত অবস্থায় লেখা হলেও। যথা– اَلِفْ ـ لَامْ ـ مِيْمْ –[মাআফিল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

এগুলোকে حُرُوْف تَهَجِّي -এর মতো পৃথক পৃথকভাবে পড়া হয় বিধায় مُقَطَّعَات বলা হয়।

–[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) : খ. ১, পৃ. ২৯]

এগুলো মোট ১৪টি হরফ। যা আরবি বর্ণমালার অর্ধেক। কতক সূরার শুরুতে একটি হরফ রয়েছে। যেমন– قٓ ـ نٓ এটিকে اُحَادِي বলা হয়। কতক সূরার শুরুতে দুটি হরফ রয়েছে। যেমন– حٰمٓ এটিকে ثُنَائِي বলা হয়। কতক সূরার শুরুতে তিনটি হরফ রয়েছে। যেমন الٓمّٓ এটিকে ثُلَاثِي বলা হয়। এভাবে رُبَاعِي এবং خُمَاسِي। এর চেয়ে বেশি হয় না। কেননা আরবি ভাষায় পাঁচ হরফের বেশি কোনো শব্দ নেই। –[জামালাইন খ.১, পৃ. ২৯]

হুরুফে মুকাত্তাআতের তাৎপর্য :

قَوْلُهُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ : এ বাক্যটি দ্বারা মুফাসসির (র.) حُرُوْف مُقَطَّعَات সম্পর্কে সর্বাধিক رَاجِح قَوْل বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলো এই সমস্ত হরফ مُتَشَابِه শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যার মর্ম সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। নিম্নোক্ত উক্তিসমূহে এর সমর্থন পাওয়া যায়–

http://islamiboi.wordpress.com

قَالَ الشَّعْبِيُّ وَجَمَاعَةٌ : الٓمٓ وَسَائِرُ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ فِيْ اَوَائِلِ السُّوَرِ مِنَ الْمُتَشَابِهِ الَّذِيْ اِسْتَأْثَرَهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهٖ وَهُوَ سِرُّ الْقُرْاٰنِ فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِظَاهِرِهَا وَنَتَّكِلُ الْعِلْمَ فِيْهَا اِلَى اللّٰهِ .

قَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ (رضـ) : فِيْ كُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَسِرُّ اللّٰهِ فِى الْقُرْاٰنِ اَوَائِلُ السُّوَرِ .

وَقَالَ عَلِيٌّ (رضـ) : اِنَّ لِكُلِّ كِتَابٍ صَفْوَةً وَصَفْوَةُ هٰذِهِ الْكِتَابِ حُرُوْفُ التَّهَجِّيْ .

قَالَ دَاوُدُ ابْنُ اَبِيْ هِنْدٍ : كُنْتُ اَسْأَلُ الشَّعْبِيَّ عَنْ فَوَاتِحِ السُّوَرِ فَقَالَ يَا دَاوُدُ لِكُلِّ كِتَابٍ سِرٌّ وَاَنَّ سِرَّ الْقُرْاٰنِ فَوَاتِحُ السُّوَرِ فَدَعْهَا وَسَلْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ . (حَاشِيَةُ جَلَالَيْنِ عَلٰى صَفْحَةِ (رقم : ٤)

মোটকথা, জমহুরের মতে এগুলো প্রথম স্তরের মুতাশাবিহ -এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ উদঘাটন অন্যদের সাধ্যের বাহিরে, বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এক গোপন রহস্য, যা কোনো সঠিক কল্যাণ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়নি। -[তাফসীরে উসমানী, পৃ. ৩]

আরো কিছু মতামত :

১. কোনো কোনো আহলে ইলম এ মুক্বাত্তাআতকে ঐ সমস্ত সূরার নাম হিসেবে গণ্য করেন- যে সূরাসমূহের শুরুতে এ অক্ষরগুলো এসেছে।

২. কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নাম, বরকতের জন্য সূরার শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- বর্ণিত আছে যে, দোয়ার শুরুতে হযরত আলী (রা.) يا كهيعص - حمعسق বলতেন।

৩. কোনো কোনো আলেমের মতে, এগুলো আল্লাহর নামের অংশ, যেমন- হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেছেন যে, الٓرٰ - حٰمٓ - نٓ এগুলোর সমষ্টি হলো اَلرَّحْمٰنُ।

৪. কিছু সংখ্যক আলেমের মন্তব্য হচ্ছে যে, এসব পবিত্র কুরআনের নাম, হযরত মক্কী (র.) সাদ্দী (র.) ও কাতাদাহ (র.) এ মন্তব্য করেছেন।

৫. কিছু সংখ্যক আলেমদের ধারণা যে, উক্ত পৃথক পৃথক হরফগুলোর দ্বারা বাক্যসমূহের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে। যেমন- حَرْف مُقَطَّعَات -এর উপরিউক্ত জমহুরের মত ছাড়াও মুফাসসিরীনে কেরামের আরো কিছু মতামত রয়েছে। সেগুলোও জানা আবশ্যক। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, الٓمٓ -এর اَلِف দ্বারা اٰلَاءُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ উদ্দেশ্য, আর لَام দ্বারা لُطْف অর্থাৎ দয়া বা অনুগ্রহ উদ্দেশ্য এবং مِيْم দ্বারা مُلْك রাজত্ব, অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্বের সকল নিয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ ও মহত্ত্বের দান। তিনি আরোও বলেন- الٓمٓ মূলত اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ [আমি আল্লাহ সর্বজ্ঞানী] -এর সারসংক্ষেপ। -[তাফসীরে মাজেদী : খ. ১, পৃ. ২৭] অনুরূপভাবে كهيعص সম্পর্কে তিনি বলেন- كَاف দ্বারা كَافِى এবং هَاء দ্বারা هَادِى এবং يَاء দ্বারা حَلِيْم এবং عَيْن দ্বারা عَلِيْم এবং صَاد দ্বারা صَادِق উদ্দেশ্য। -[হাশিয়া জালালাইন]

অথবা اَلِف দ্বারা আল্লাহ لَام দ্বারা জিবরাঈল (আ.) এবং مِيْم দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য হতে পারে, অর্থাৎ আল্লাহর কালাম হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর নাজিল হয়েছে।

৬. কুতরুব (র.)-এর মত হচ্ছে যে, একটি বিষয়ের আলাপ শেষ করে অন্য বিষয়ে আলাপ আরম্ভকালে শ্রোতাদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আরববাসী উক্ত হরফগুলো ব্যবহার করতেন।

৭. আবুল আলিয়া (র.) বলেন, اَبْجَدْ [আবজাদ]-এর হিসেব মতে- উক্ত হরফগুলোতে [হুরূফে মুক্বাত্তাআতে] জাতি ও ধর্মসমূহের ইতিহাস, তাদের উত্থান ও পতনের কাহিনী লুক্কায়িত রয়েছে। যেমন- কোনো ইহুদি যখন রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছে এবং তিনি তাদের সামনে الٓمٓ পড়েছেন, তখন তারা বলতে লাগলো যে, যে ধর্মের স্থিতিকাল মাত্র ৭১ বছর সে ধর্ম আমরা কিভাবে গ্রহণ করবো? এ কথা শুনে তিনি মুচকি হাসি দিলেন। তারপর যখন তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করা হলো, তখন তিনি المص ও المر পড়ে শুনালেন, তখন তারা বলতে লাগলো যে, এ হরফগুলোর সংখ্যা ১৬১ ও ২৭২ এবং প্রথমটির চেয়ে বেশি, তাই ব্যাপারটি এখন আমাদের উপর জটিল হয়ে গেল। অতএব, এখন আমরা এর কোনো ফয়সালা করতে পারছি না। -[কামালাইন : খ. ১, পৃ. ১৬]

http://islamiboi.wordpress.com

৮. কেউ কেউ মনে করেন, যখন কুরআনে কারীম নাজিল হয়েছে, সে যুগের বর্ণনাধারায় এ ধরনের বিচ্ছিন্ন হরফের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বক্তা এবং কবিগণও এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করত। তাই তো এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত জাহিলী যুগের কবিতায় তার নমুনা পাওয়া যায়। যেমন জনৈক কবি বলেন– قُلْتُ لَهَا قِفِى فَقَالَتْ قِ اَىْ وَقَفْتُ

হাদীস শরীফেও এরূপ ব্যবহার রয়েছে। যেমন– مَنْ اَعَانَ عَلٰى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ অর্থ কেউ কাউকে হত্যার ব্যাপারে اُقْتُلْ বলার পরিবর্তে اُقْ বলল। এটাও হত্যায় সহযোগিতা বলে ধর্তব্য হবে। এ থেকে জানা গেল যে, حُرُوْف مُقَطَّعَات অভূতপূর্ব কোনো বস্তু নয় যে, বক্তা ছাড়া তা কেউ বুঝবে না, বরং শ্রোতারা অনায়াসেই তার মর্ম বুঝতে সক্ষম হতেন। আর এ কারণেই নবী যুগের কুরআন বিদ্বেষীদের কেউ এমন আপত্তি তোলেনি যে, তোমার কুরআনে এ অর্থহীন শব্দ কেন ব্যবহৃত হয়েছে। একই কারণে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এ মর্মে কোনো বর্ণনা নেই যে, তারা নবী করীম ﷺ -এর কাছে এগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছেন। আর হুজুর ﷺ থেকেও এগুলোর কোনো তাফসীর বর্ণিত হয়নি। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আরবি ভাষা থেকে এ পদ্ধতি বাদ পড়তে থাকে। এ সুবাদেই মুফাসসিরদের নিকট সেগুলোর অর্থ নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। –[জামালাইন : খ. ১, পৃ. ৩৯]

৯. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) বলেন, আমার ধারণা মতে এ সকল মন্তব্য ও মতামত যথাস্থানে প্রতিটিই সঠিক। আরবি ভাষার দিক দিয়ে এগুলো حُرُوْف تَهَجِّى -এর নাম। আর শরিয়তের বাহ্যিক বিধানানুসারে এগুলো مُتَشَابِهَاتٌ এবং আল্লাহর গোপন রহস্য, যার মর্ম সম্পর্কে সাধারণভাবে মানুষকে অবহিত করা হয়নি। আর না তাদের মাঝে সে যোগ্যতা আছে। এ জন্য এগুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক। এগুলো মর্ম অনুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করা নিষেধ।

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন খ. ১, পৃ. ৩১]

মান্যবর মুফাসসির জালালুদ্দীন (র.) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। যেহেতু এর মর্ম না জানলে দীনের মৌলিক বিষয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। এজন্য কোনো আপত্তি করা ও এর মর্ম উদ্ধারে লেগে থাকা সমীচীন নয়। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭]

১০. কেউ কেউ বলেন– এগুলো সংশ্লিষ্ট সূরার বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ। –[মাআরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী : খ. ১, পৃ. ৩১]

১১. কেউ কেউ বলেন, এগুলো দ্বারা اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের কতিপয় সূরা বিচ্ছিন্ন হরফ দ্বারা শুরু করার মাঝে কুরআনের অলৌকিকতার প্রমাণ রয়েছে। যেন কাফেরদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে– এই কুরআন মাজীদ, যেটি আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ কর, সেটি এমন কিছু হরফের সমন্বয়েই রচিত, যেসব হরফ দিয়ে তোমরা নিজেদের কথা ও বাক্য গঠন করে থাক। সুতরাং যদি এ কুরআন আল্লাহর কালাম না হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর অনুরূপ আয়াত বা সূরা রচনা করতে অক্ষম কেন? তাছাড়া এটাও লক্ষ্য করে দেখ যে, যিনি এ حُرُوْف مُقَطَّعَات সম্বলিত কুরআনের বাহক, তিনি তো একজন নিতান্তই উম্মী মানুষ। যিনি কোনো দিন কোনো পাঠশালায় গমন করেননি কিংবা কোনো শিক্ষক-গুরু বা লেখক ও কবি সাহিত্যিকদের কাছে কিছু পড়াশুনাও করেননি। অথচ তোমরা হলে সুসাহিত্যিক বাগ্মী ও সুপণ্ডিত। নিরক্ষর উম্মী নবী যেসব হরফ পেশ করেছেন সেগুলোর মাঝে এমন এমন তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেগুলোর প্রতি বড় বড় ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও পণ্ডিতরাও লক্ষ্য রাখে না। –[মাআরিফুল কুরআন, ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ৩০]

আল্লামা সুলায়মান জামাল (র.) উক্ত কথাটিই খুব সংক্ষেপে বলেছেন–

وَاَنَّ فَائِدَتَهَا اِعْلَامُهُمْ بِاَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مُنْتَظِمٌ مِنْ جِنْسِ مَا تَنْتَظِمُوْنَ مِنْهُ كَلَامَكُمْ وَلٰكِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ.
(حَاشِيَةُ الْجَمَلِ صـ١ جـ١)

একটি সংশয় ও নিরসন : যদি এ সংশয় জাগে যে, حُرُوْف مُقَطَّعَات -কে আল্লাহ তা'আলার গোপন রহস্য মনে করা হলে তো কুরআন مَفْهُوْمُ الْمَعْنٰى থাকল না। কুরআন যেহেতু আমাদের উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ, সেহেতু এ হরফগুলোও আমাদের বোধগম্য হওয়া অপরিহার্য। এগুলোর অর্থ অজ্ঞাত থাকলে এগুলো নাজিল করার দ্বারা ফায়দা কি?

জবাব : কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য শুধু অর্থ বুঝার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআনের বহু স্থান এমন আছে, যেগুলোতে শুধু বান্দার ঈমান আনাই উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে حُرُوْف مُقَطَّعَات নাজিল করার উদ্দেশ্য ও হলো মানুষ এগুলোর উপর ঈমান আনবে এবং এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হওয়ার কথা একীন করবে। যাতে বান্দার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পায়।

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী– খ. ১, পৃ. ৩১]

http://islamiboi.wordpress.com

٢. ذٰلِكَ اَىْ هٰذَا الْكِتٰبُ الَّذِىْ يَقْرَأُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَجُمْلَةُ النَّفْيِ خَبَرُ مُبْتَدَأُهُ ذٰلِكَ وَالْاِشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيْمِ . هُدًى خَبَرٌ ثَانٍ هَادٍ لِلْمُتَّقِيْنَ . اَلصَّائِرِيْنَ اِلَى التَّقْوٰى بِاِمْتِثَالِ الْاَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِىْ لِاِتِّقَائِهِمْ بِذٰلِكَ النَّارَ .

অনুবাদ :

২. এই ذٰلِكَ শব্দটি এইস্থানে هٰذَا অর্থে ব্যবহৃত। কিতাব যা মুহাম্মদ ﷺ পাঠ করেন কোনো সন্দেহ সংশয় নেই এতে এ ব্যাপারে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এই আয়াতটিতে لَا رَيْبَ নাবাচক বাক্যটি خَبَر -এর مُبْتَدَأ হলো ذٰلِكَ এই ذٰلِكَ শব্দটি আরবি ভাষায় দূরবর্তী ইঙ্গিতের জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে আল-কুরআনের সম্মানার্থে এই স্থানে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। পথ নির্দেশক هُدًى শব্দটি উক্ত مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় خَبَر এটা مَصْدَر বটে, তবে এই স্থানে اِسْم فَاعِل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য هَادٍ পথ নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুত্তাকীদের জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ পালন করে এবং নিষেধসমূহ হতে বিরত থেকে যারা তাকওয়ার অধিকারী হতে যাচ্ছে তাদের জন্য। কেননা এই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমেই তারা জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْكِتٰبُ : মূলত اَلْكِتٰبُ শব্দটি মাসদার, যেমন কুরআনে রয়েছে- كِتَابُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ কখনো এর দ্বারা مَكْتُوْبٌ বা লিখিত বস্তু বুঝানো হয়। كَتْبٌ ধাতুর প্রকৃত অর্থ একত্র করা। এ থেকে كُتَيْبَةُ الْجَيْشِ -এর ব্যবহার হয়। আর পরিভাষায় كِتَابَة অর্থ হলো- ضَمُّ بَعْضِ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ اِلٰى بَعْضٍ -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১৪]

قَوْلُهُ لَا رَيْبَ : رَيْب -এর আভিধানিক অর্থ : اَلشَّكُّ مَعَ التُّهْمَةِ অপবাদসহ সন্দেহ করা, সংশয় করা। পরিভাষায় رَيْبَ বলা হয়- هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيْضِ لَا تَرْجِيْحَ لِاَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ عِنْدَ الشَّكِّ

আল্লামা জমখশরীর মতে رَيْب হলো- قَلَقُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا । এ অর্থেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ .

কেউ বলেন- رَيْب -এর মাঝে তিনটি অর্থ রয়েছে- ১. اَلشَّكُّ ২. اَلتُّهْمَةُ ৩. اَلْقَلَقُ وَالْاِضْطِرَابُ [হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৬]

উল্লেখ্য رَيْب এবং شَكّ সমার্থক নয়; বরং তা شَكّ থেকে খাছ। উভয়ের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص -এর সম্পর্ক।

قَوْلُهُ لَا رَيْبَ فِيْهِ : উদ্দেশ্য যেহেতু সন্দেহ প্রকাশ অনুচিত হওয়ার বিষয়টি জোরদার করা, এ কারণে বাক্য বিন্যাসে لَا فِيْهِ رَيْبَ না বলে لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা হয়েছে। কেননা দ্বিতীয় বাক্য বিন্যাসটি অধিকতর দৃঢ়তা জ্ঞাপক, অনেক শক্তিশালী।

الٓمّٓ মুবতাদা, ذٰلِكَ খবর মউসূফ, اَلْكِتَابُ -এর সিফত অথবা الٓمّٓ মুবতাদা মাহযূফ (اَلْمُؤَلَّفُ مِنْ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ)-এর খবরে আউয়াল, আর ذٰلِكَ খবরে ছানী কিংবা বদল এবং اَلْكِتَابُ -এর সিফত। لَا নফিয়ে জিনস, رَيْبَ -এর اِسْم এবং فِيْهِ খবর, অথবা رَيْبَ মউসূফ এবং فِيْهِ সিফত, দু'টো মিলে اِسْم আর لِلْمُتَّقِيْنَ খবর এবং هُدًى হাল, কিংবা رَيْبَ মউসূফ, فِيْهِ সিফত এবং খবর মাহযূফ, তবে এমতাবস্থায় فِيْهِ খবরে মুকাদ্দাম হয়ে যাবে هُدًى -এর, অথবা বলা যায় যে, ذَالِكَ الْكِتٰبُ মুবতাদা, لَا رَيْبَ فِيْهِ জুমলা হয়ে খবরে اَوَّل এবং هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ জুমলা হয়ে খবরে ثَانِىْ এগুলো ব্যতীত আরও সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম তরকীব এটা যে, উক্ত চারটি বাক্যকে [জুমলাকে] যদি পৃথক পৃথক করা হয়, তবে

http://islamiboi.wordpress.com

পরের প্রত্যেকটি জুমলাকে দলিল বলা যাবে। অর্থাৎ الٓمّٓ প্রথম জুমলা ও সর্বপ্রথম দাবি যে, এ অতুলনীয় কালাম হচ্ছে- الٓمّٓ, আর ذٰلِكَ الْكِتٰبُ দ্বিতীয় জুমলা, এর চ্যালেঞ্জ করার দলিল বা প্রমাণ এবং স্বয়ং দাবিও বটে। لَا رَيْبَ فِيْهِ তৃতীয় জুমলা উক্ত দলিলের দলিল, অর্থাৎ সকল কিতাবের দাবির দলিল, শর্ত হচ্ছে প্রকৃতি যদি ন্যায়-পরায়ণ হয় এবং রুচি যদি যথার্থ ও সাদাসিধে হয়। কুৎসা, পক্ষপাতিত্ব ও হিংসার কথা ভিন্ন।

قَوْلُهُ هُدًى : এটি يَهْدِيْ (ض) هَدٰى -এর মাসদার। শব্দটি অধিকাংশই مُذَكَّر সাব্যস্ত করেছেন। আর কেউ কেউ مُؤَنَّث -ও সাব্যস্ত করেছেন। وَفِى السَّمِيْنِ : أَنَّهُ يُذَكَّرُ وَهُوَ الْكَثِيْرُ وَبَعْضُهُمْ يُؤَنِّثُ فَيَقُوْلُ هٰذِهٖ هُدًى

قَوْلُهُ خَبَرٌ ثَانٍ : এর দ্বারা আয়াতের তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ হলো مُبْتَدَأ আর لَا رَيْبَ فِيْهِ হলো خَبَر اَوَّل এবং هُدًى হলো তার خَبَر ثَانِى

قَوْلُهُ اَىْ هَادٍ : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) বোঝাতে চাচ্ছেন যে, هُدًى মাসদারটি هَادٍ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত। আর هَادٍ اِسْم فَاعِل -এর স্থলে هُدًى মাসদার ব্যবহার করা হয়েছে مُبَالَغَة হিসেবে। যেমন زَيْدٌ عَادِلٌ -এর স্থলে কখনো زَيْدٌ عَدْلٌ -ও ব্যবহার করা হয়। مُبَالَغَة ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো এ কিতাব وَصْف هِدَايَت -এর মাঝে এমন উত্তীর্ণ যে, যদি এটাকে مُجَسَّم هِدَايَت মনে করা হয়, তাহলেও অসম্ভব কিছু নয়। -[কামালাইন : খ. ১, পৃ. ১৮]

قَوْلُهُ لِلْمُتَّقِيْنَ : এটি مُتَّقِىْ -এর বহুবচন। مُتَّقِىْ শব্দটি اَلْوِقَايَةُ [রক্ষা করা] মাসদার থেকে ইসমে ফায়েল। যেহেতু মুত্তাকি ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাই তাকে মুত্তাকি বলা হয়।

مُتَّقِيْنَ শব্দটি মূলত مُتَّقِيِيْنَ ছিল। তাতে দুইটি يَاء রয়েছে। একটি يَاء লাম কালিমা তথা মূল হরফ। আর অপরটি বহুবচনের আলামত। লাম কালিমায় তথা প্রথম يَاء-এর মাঝে كَسْرَة পড়া কঠিন বিধায় কাসরাকে হযফ করা হয়েছে। অতঃপর দুই সাকিন একত্র হওয়ায় একটিকে [প্রথমটিকে] হযফ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহারের তাৎপর্য :

قَوْلُهُ ذٰلِكَ . اَىْ هٰذَا الْكِتٰبُ : সাধারণত কোনো দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়। এ সর্বনামের বাংলা অর্থ- ঐ। এখানে الْكِتٰبُ দ্বারা কুরআনে কারীমকে বোঝানো হয়েছে। এটি বাহ্যত দূরবর্তী ইশারার স্থান নয়। কারণ ইশারা কুরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে। যা মানুষের সামনেই রয়েছে। তাহলে দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করা হলো কেন? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বক্তব্য হলো-

১. ذٰلِكَ মূলত দূরবর্তী ইঙ্গিতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দূরবর্তীতা শুধু স্থান ও কালের পরিমণ্ডলেই আবর্তিত হয় না, মর্যাদাগত দূরত্বও এক প্রকার দূরত্ব। এ স্থানেও কুরআনের সম্মানার্থে নিকটবর্তী নির্দেশবাচক সর্বনাম هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের বাকপ্রণালীতে ذٰلِكَ ও هٰذَا একটির স্থলে অন্যটিকে ব্যবহার করার যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) বলেন- وَ الْاِشَارَةُ لِلتَّعْظِيْمِ সুতরাং এর অনুবাদ হবে- এই পবিত্র ও সম্মানিত কিতাব। (تَنْزِيْلًا لِبُعْدِ الرُّتْبَةِ مَنْزِلَةَ بُعْدِ الْمَكَانِ وَالْمَعْقُوْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمَحْسُوْسِ)

২. اِسْم اِشَارَة قَرِيْب -এর স্থলে ذٰلِكَ اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করার কারণ হলো, এ কিতাব স্বীয় অতুলনীয় প্রভাবসহ دَقَائِق وَلَطَائِف . اَسْرَار وَ غَوَامِض . حَقَائِق وَمَعَارِف সম্বলিত হওয়ার কারণে দৃষ্টি ও চিন্তার সীমানার থেকে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে যদিও কুরআনে কারীম আমাদের দৃষ্টির সামনে ও নিকটে রয়েছে; কিন্তু اَسْرَار وَحَقَائِق -এর দিক থেকে তা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে অনেক দূরে। এজন্য هٰذَا -এর স্থলে ذٰلِكَ اِسْم اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করা হয়েছে। -[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৩২]

৩. দূরবর্তী ইশারার শব্দ ذٰلِكَ ব্যবহার করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, সূরাতুল ফাতিহাতে যে সীরাতুল মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কুরআন শরীফ সে প্রার্থনারই জবাব এবং এটি সীরাতুল মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থাৎ

http://islamiboi.wordpress.com

আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের **উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র** কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব **অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।** –[মাআরিফুল কুরআন মুফতি শফী (র.)]

৪. ইমাম ফাররা বলেন– كَانَ اللّٰهُ قَدْ وَعَدَ نَبِيَّهُ ﷺ اَنْ يُنْزِلَ عَلَيْهِ كِتَابًا لَا يَمْحُوْهُ الْمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ فَلَمَّا اَنْزَلَ الْقُرْاٰنَ قَالَ هٰذَا ذٰلِكَ الْكِتَابُ الَّذِىْ وَعَدْتُكَ . (حَاشِيَةُ جَلَالَيْن)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় **নবীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে,** তাঁর প্রতি তিনি এমন কিতাব নাজিল করবেন, যাকে পানি মুছে ফেলতে **সক্ষম হবে না এবং যা অধিক হাত বদল** ও ব্যবহারের কারণে পুরাতন হবে না। কুরআন নাজিল হওয়ার পর **আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, এটি সেই কিতাব,** যা নাজিলের ওয়াদা আপনাকে করেছিলাম।

৫. **সূরা বাকারা মদনী। এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ** হয়েছে। আর মদীনায় অধিকহারে ইহুদিদের বসবাস ছিল। যাদের ধর্মগ্রন্থ **তাওরাতে কুরআন শরীফ নাজিল** হওয়ার সংবাদ প্রদত্ত হয়েছিল। যা বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। সেই প্রতিশ্রুত **কিতাবের দিকে ইঙ্গিত করার** জন্য ذٰلِكَ اِسْمِ اِشَارَةِ بَعِيْد ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় هٰذَا ব্যবহার করা উচিত ছিল। –[কামালাইন, খ. ১, পৃ. ১৭]

৬. **অথবা এটাও বলা যায় যে,** ذٰلِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো সূরা বাকারার পূর্বে নাজিলকৃত সূরাসমূহ যেগুলোকে কাফেররা **অস্বীকার করেছে,** মিথ্যা বলেছে। এখানে তাদের জন্য বলা হচ্ছে, সে সকল সূরা বা আয়াত সন্দেহাতীত। –[প্রাগুক্ত]

৭. ذٰلِكَ **দ্বারা** সূরা বাকরার প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে। তখন ইসমে ইশারা মুজাক্কার আনাটা كِتَاب শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে হবে। –[প্রাগুক্ত]

কুরআন সুসংরক্ষিত গ্রন্থ :

قَوْلُهُ اَلْكِتَابُ : কুরআন মাজীদ নিছক মৌখিক বর্ণনা কিংবা স্মৃতিচারণের সমষ্টি নয়; বরং তা সুবিন্যস্ত ও সুরক্ষিত গ্রন্থ, লিখিত আকারেও মুখস্থ আকারেও। অন্যান্য ধর্মের ইলহামী গ্রন্থের মতো নয় যে, ধর্ম প্রবর্তকের স্মৃতিতে শুধু বিষয় ও ভাব সংরক্ষিত ছিল আর তাদের কাছ থেকে একেক বর্ণনাকারী একেক অংশ একেক রকম বর্ণনা করেছে। এমনকি কয়েক শতাব্দী পরে সংকলন ও গ্রন্থনার পালা শুরু হলে ভাষা ও শব্দগত বিশুদ্ধতা তো দূরের কথা, স্বয়ং ভাব ও বিষয়বস্তুই বিকৃতির শিকার হয় এবং আসমানি কিতাবের নাম ধারণ করলেও তার বিন্যাস ও রচনায় কত শত মানুষের লেখনী ও মস্তিষ্ক কাজ করছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৮]

اَلَّذِىْ يَقْرَأُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ : এর দ্বারা অন্যান্য আসমানি কিতাবকে খারিজ করা হয়েছে। যথা– তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীল।

اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : এটি لَا رَيْبَ فِيْهِ-এর فِيْهِ যমীর থেকে بَدْل হয়েছে। অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

সংশয় নিরসন :

প্রশ্ন : উক্ত আয়াতে কুরআনকে সন্দেহাতীত বলা হয়েছে অথচ প্রতি যুগেই কিছু কিছু মানুষ এতে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছে। যদি সন্দেহ না থাকত, তাহলে তো সকল মানুষই মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

১. সম্মানিত মুফাসসির (র.) এই সংশয় অপনোদনের লক্ষ্যেই اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ লিখেছেন। এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, সন্দেহ নেই দ্বারা ব্যাপকভাবে সন্দেহকে নাকচের দাবি করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কথার দাবি করা হচ্ছে যে, এটা কালামে ইলাহী হওয়াটা সন্দেহাতীত। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়ার মাঝে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। –[জালালাইন পৃ. ৪]

২. ব্যাপকভাবে সকল প্রকার সন্দেহকেই নাকচ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কুরআনে কারীমের সকল কথাই সত্য, সঠিক, সন্দেহমুক্ত। দুনিয়ার মানুষ তাতে সন্দেহ করলে সেটা তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হবে। মূলত কুরআন সন্দেহের বস্তু নয়। তারপরও যদি কোনো দুর্ভাগা তাতে অন্য কিছু দেখে, তবে দোষ সূর্যালোকের নয়, দোষ তীর্যক দৃষ্টির বাঁদুড়ের দৃষ্টি শক্তির। এজন্যই একথা বলা হয়নি যে, এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিধা-সন্দেহ হবে না; বরং শুধু বলা হয়েছে যে, খোদ এ মহান কিতাব ও তার বিষয়বস্তু সকল সংশয়-সন্দেহের ঊর্ধ্বে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৯; কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৮]

http://islamiboi.wordpress.com

এ উত্তরটি তাফসীরে উসমানীতে এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো কথার মধ্যে সন্দেহ হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। এক. হয়তো সে কথার মধ্যেই কোনো ভ্রান্তি বা ত্রুটি নিহিত আছে। দুই. অথবা শ্রোতার বোধশক্তিতে ত্রুটি আছে, বুঝের ভুলেই কোনো বর্ণনা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। প্রথম অবস্থায় বর্ণনা-ই সন্দেহের ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রোতার বোধশক্তি-ই সন্দেহের উৎস। একটি সন্দেহাতীত বর্ণনাকে সে নিজের বুদ্ধির দোষে-ই সন্দেহ করছে। উক্ত আয়াতে সন্দেহের প্রথম কারণ নিরসনেই ঘোষণা করা হয়েছে- لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং তার প্রত্যেকটি বর্ণনা যথার্থ, বাস্তব এবং ধ্রুবসত্য, সর্ব প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে, সন্দেহের অবকাশ মাত্র তাতে নেই। এতদসত্ত্বেও যদি কাফেররা তাতে সন্দেহ করে, তবে তাতে কুরআনের উল্লিখিত ঘোষণা আহত হয় না। কেননা এহেন সন্দেহের মূলে পবিত্র কুরআন ও তার বর্ণনা নয়; বরং কাফেরদের নিজেদের বুদ্ধির গলদ-ই এই সন্দেহের উৎস। তাদের নিজেদের এই নির্লজ্জ-কলঙ্ক উল্লিখিত মহান ঘোষণাকে স্পর্শ মাত্র করতে পারে না। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৩, টীকা. ২]

কুরআনের আত্মপরিচয় :

هُدًى لِّلنَّاسِ : কুরআনের এই প্রথম আত্মপরিচয় থেকেই কুরআন অধ্যায়নকারীকে বুঝে নিতে হবে যে, এটা কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নয় যে, তাতে সন-তারিখসহ অতীত ঘটনাবলির সুবিন্যস্ত বিবরণ পরিবেশিত হবে। নয় কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ যে, তার পাতায় পাতায় পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা এবং গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান তালাশ করা হবে। নয় কোনো দর্শনগ্রন্থ যে, গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন কল্প তত্ত্বের জটিলতায় ঘোরপাক খেতে হবে। তদ্রূপ নয় কোনো গল্প ও প্রবন্ধ সঞ্চয়ন যে, তা পাঠককে চিত্তবিনোদনের খোরাক যোগাবে; বরং কুরআনের মৌলিক পরিচয় কেবল এই যে, তা হেদায়েতের আলোকে প্রোজ্জ্বল ও পূর্ণাঙ্গ এক জীবন বিধান। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩০]

تَقْوٰى-এর পরিচয় ও স্তর : تَقْوٰى-এর আভিধানিক অর্থ বেঁচে থাকা, রক্ষণাবেক্ষণ করা। পরিভাষায় ঐ সকল বস্তু থেকে বেঁচে থাকাকে তাকওয়া বলা হয়। যেগুলো আখিরাতের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর হয়। চাই সেটা আকাঈদ ও আখলাক সংক্রান্ত হোক কিংবা কথা, কাজ ও অবস্থা সংক্রান্ত হোক। আর ক্ষতির যেমন বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সে হিসেবে তাকওয়ার ও বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

প্রথম স্তর : প্রথম স্তর হলো কুফর থেকে তওবা করে ইসলামে প্রবেশ করা এবং নিজেকে চিরস্থায়ী আজাবের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এটাই কুরআনের বাণী وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى-এর মর্ম।

দ্বিতীয় স্তর : দ্বিতীয় স্তর হলো নফসকে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং ছগীরা গুনাহের উপর إِصْرَار করার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا শরিয়তের পরিভাষায় تَقْوٰى শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে এটাকেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কাছে তাকওয়ার হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি কখনো কাটাযুক্ত পথ দিয়ে হেঁটেছেন? তিনি বললেন, অবশ্যই হেঁটেছি। হযরত উবাই (রা.) শুধালেন চলার পথে আপনি কি কি করেছেন? বললেন, আমি গায়ের কাপড় গুটিয়ে সতর্কভাবে কদম ফেলেছি। কাঁটার আঘাত থেকে বাঁচার জন্য আমার পূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করেছি। হযরত উবাই (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এটাই হলো তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থেকে বাঁচার জন্য নিজের সম্পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে দেওয়ার নাম হলো তাকওয়া। আর 'আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার জন্য।' শর্তটুকু আরোপ করে বুঝানো হয়েছে যে, পার্থিব লাঞ্ছনার ভয়ে কোনো বর্জন করাকে তাকওয়া বলা হবে না।

তৃতীয় স্তর : তাকওয়ার তৃতীয় স্তর হলো কলবকে ঐ সকল বস্তু থেকে বাঁচিয়ে রাখা, যেগুলো আল্লাহ তা'আলার স্বরণ থেকে গাফিল করে দেয়। কুরআনের আয়াত- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর মাঝে এ স্তরের তাকওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

বস্তুত খওফে ইলাহীই হলো হেদায়েদের পূর্বশর্ত এবং সর্বপ্রকার কল্যাণের উৎসধারা। তাই তো হযরত নূহ (আ.), হুদ (আ.), সালেহ (আ.), লূত (আ.) এবং শোয়াইব (আ.) প্রমুখ নবীগণ নিজেদের কওমকে সর্বপ্রথম নসিহত করে বলেছেন- أَلَا تَتَّقُوْنَ [অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো না?] فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলার ভয় ছাড়া নসিহত কার্যকরী হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, সেই নসিহত গ্রহণ করবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -এর স্থলে هُدًى لِّلنَّاسِ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, যে মুত্তাকী নয় প্রকৃত পক্ষে সে মানুষই নয়। মানবতার দাবীই হলো নিজের সৃষ্টিকর্তা এবং মালিককে ভয় করা। আর যে আহকামুল হাকিমীনকে ভয় করে না, সে মানুষ নয়; বরং চতুষ্পদ পশু। এমনকি চতুষ্পদ পশু থেকেও নিকৃষ্ট। ইরশাদ হয়েছে– أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ইদরীস কান্দলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৩৪-৩৬]

সংশয় নিরসণ :

قَوْلُهُ الصَّائِرِيْنَ إِلَى التَّقْوٰى :

প্রশ্ন : আয়াতে বলা হলো এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতকারী। আর বলাই বাহুল্য যে, হেদায়েতপ্রাপ্তদেরকেই মুত্তাকী **বলা হয়। এভাবে হেদায়েতপ্রাপ্তদের জন্য** কুরআনকে হেদায়েতকারী বলা নিরর্থক। এতে تَحْصِيْلِ حَاصِلِ লাজেম **আসে। কুরআন একজন পথহারা** ব্যক্তির জন্য হেদায়েতের কারণ হতে পারে; কিন্তু تَقْوٰى -এর স্তরে পৌছার পর হেদায়েত **লাভের অর্থ কি?**

১. মুফাসসির (র.) উক্ত সংশয়টি নিরসন কল্পেই লিখেছেন– اَلصَّائِرِيْنَ إِلَى التَّقْوٰى بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِيْ الخ অর্থাৎ এখানে مُتَّقِيْنَ দ্বারা مُتَّقِي بِالْفِعْلِ -কে বুঝানো হয়নি; বরং مُتَّقِي بِالْقُوَّةِ -কে বুঝানো হয়েছে। যাদের মাঝে تَقْوٰى -এর যোগ্যতা ও ঝোঁক বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন তাদের সে যোগ্যতা ও ঝোঁককে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে مُتَّقِي بِالْفِعْلِ বানিয়ে দিবে। যেন তাদেরকে تَفَاؤُل বা নেকফালি স্বরূপ مَجَاز বা রূপক অর্থে প্রথম থেকেই مُتَّقِي বলা হয়েছে।

২. জবাবে এ কথাও বলা যায় যে, হেদায়েত ও তাকওয়া উভয়টিরই বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যথা– أَعْلٰى ـ أَوْسَط ـ أَدْنٰى সুতরাং কুরআনের কারণে প্রত্যেকে যখন নিম্নস্তর থেকে উঁচু স্তরে উপনীত হবে, তখন কুরআনকে মুত্তাকীদের জন্য هُدًى বলাটা সঠিক হবে। অর্থাৎ নিম্ন স্তরটি হিসেবেই সে মুত্তাকী এবং উঁচু স্তরটির হিসেবে সে হেদায়াত পেয়েছে।

–[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৮]

৩. এ হেদায়েত গ্রন্থ থেকে কেবল তারাই উপকৃত হবে, যাদের অন্তরে আল্লাহভীতি বিদ্যমান। যদিও এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ এবং গোটা মানবজাতিকে লক্ষ্য করেই তার উদাত্ত আহ্বান। কিন্তু কার্যত তা থেকে লাভবান কেবল তারাই হবে, যাদের হৃদয়ে আছে সত্যের অনুসন্ধিৎসা। নইলে প্রভাতী সূর্যের কাঁচা আলো যত ঝলমলেই হোক, চোখের আলো যাদের নিভে গেছে, তাদের জন্য তা অর্থহীন। ভূমি যদি অনুর্বর হয় বৃষ্টিপাত যেমনই হোক, তাতে তো আর সবুজ বাগিচা সৃষ্টি হতে পারে না। হজম শক্তি বিপর্যস্ত হলে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার তাদের জন্য অর্থহীন, এমনকি ক্ষতিকারকও হতে পারে।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩০]

৪. যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এ কিতাব তাদের জন্য নূর ও হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হেদায়াতের পথ দৃষ্টিগোচর হবে না। এজন্য আল্লাহকে ভয়কারীরাই হেদায়েত পাবে। –[মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) : খ. ১, পৃ. ৩৪]

قَوْلُهُ لِاتِّقَائِهِمْ بِذٰلِكَ النَّارَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুত্তাকীকে মুত্তাকী বলার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু মুত্তাকীকে তার নেক আমলের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে, এ জন্য তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

قَوْلُهُ بِذٰلِكَ : أَيْ بِالْاِمْتِثَالِ وَالْاِجْتِنَابِ অর্থাৎ ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হলো اِمْتِثَالُ الْأُمُوْرِ এবং اِجْتِنَابُ التَّوَاهِيْ

قَوْلُهُ النَّارَ : এ শব্দের উল্লেখ থেকে বুঝা যায় اَلْمُتَّقِيْنَ -এর مَفْعُوْل بِهٖ টি উহ্য রয়েছে। ইবারতের মূলরূপ এমন হবে– هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ النَّارَ অর্থাৎ এ কিতাব ঐ সকল মানুষের জন্য হেদায়েত, যারা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে।

http://islamiboi.wordpress.com

৩. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِالْغَيْبِ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ اَىْ يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ.

অনুবাদ :

৩. যারা বিশ্বাস করে সত্য বলে প্রত্যয় স্থাপন করে অদৃশ্যে [সেই সকল বিষয়ে] যে সকল জিনিস আজ তাদের থেকে অদৃশ্যমান, অর্থাৎ পুনরুত্থানে, জান্নাতে, জাহান্নামে সালাত কায়েম করে অর্থাৎ সকল প্রকার আহকাম-আরকান ও আদাবসহ যথাযথভাবে তা সম্পাদন করে এবং তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি প্রদান করেছি, তা হতে ব্যয় করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ : এই ইবারতটুকুর এরাব কয়েকভাবে হতে পারে। যথা–

১. مُتَّقِيْنَ-এর صِفَت হিসেবে جَرّ

২. فِعْل مَحْذُوف-এর مَفْعُوْل হিসেবে نَصْب ـ بِتَقْدِيْرِ اَعْنِىْ

৩. مُسْتَانِفَة مُبْتَدَأ হিসেবে رَفْع - بِتَقْدِيْرِهِمْ

এটি جُمْلَة مُسْتَانِفَة হিসেবে মুবতাদাও হতে পারে। তখন তার خَبَر হবে أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى الخ

يُقِيْمُوْنَ : إِقَامَت -এর অর্থ শুধু নামাজ পড়া নয়; বরং নামাজকে সার্বিকভাবে শুদ্ধ করার নাম হলো ইকামত। আল্লামা বায়জাবী (র.) إِقَامَت-এর চারটি অর্থ করেছেন–

١. تَعْدِيْل اَرْكَان ٢. اَلْمُوَاظَبَة ٣. اَلتَّشَمُّرُ لِاَدَاءِ الصَّلٰوةِ ٤. اَدَاءُ الصَّلٰوةِ مُطْلَقًا .

১. প্রথম অর্থের মূল কথা হলো يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ يَعْدِلُوْنَ اَرْكَانَ الصَّلٰوةِ আর تَعْدِيْل اَرْكَان এর মর্ম হলো নামাজের রোকনসমূহ এমন সঠিকভাবে আদায় করা, যাতে তার মাঝে কোনো রকমের কম বেশি না পাওয়া যায়। আর إِقَامَت-এর অর্থটি اَقَامَ الْعُوْدَ بِمَعْنٰى قَوَّمَهُ থেকে নির্গত। اَقَامَ الْعُوْدَ ঐ সময় বলা হয়, যখন কাঠকে সমান করা হয় এবং তার বক্রতা দূর করা হয়। مُشْتَقّ مِنْهُ ও مُشْتَقّ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য হলো– যেভাবে تَقْوِيْم عُوْد -এর সময় যেমনভাবে কাঠ বা খুঁটি সোজা হয়ে যায়, এমনিভাবে تَعْدِيْل اَرْكَان -এর মাঝেও নামাজের ক্রিয়াসমূহ সঠিক হয়ে যায়।

২. مُوَاظَبَت -এর অর্থটি اَقَمْتُ السُّوْقَ থেকে নির্গত। এটি ঐ সময় বলা হয়, যখন কেউ বাজারকে চালু করে আর চালু করা বা প্রচলিত বস্তু প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে বস্তু নিয়মিত করা হয়, তাও আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

৩. يُقِيْمُوْنَ -এর তৃতীয় অর্থ হলো تَشَمُّر لِلْاَدَاءِ তথা কোনো প্রকার অলসতা ও উদাসীনতা ছাড়া নামাজ আদায় করা। এ অর্থটি قَامَ بِالْاَمْرِ وَاَقَامَهُ থেকে নির্গত। একথাটি আরবরা ঐ সময় বলে থাকে, যখন কেউ কোনো কাজ শক্তির সাথে সম্পাদন করে থাকে। তার বিপরীত قَعَدَ عَنِ الْاَمْرِ ঐ সময় বলা হয়, যখন কেউ অলসতা প্রদর্শন করে কোন কাজ করে।

৪. চতুর্থ অর্থ আদায় করা। অর্থাৎ إِقَامَت দ্বারা اَدَاءُ صَلٰوة উদ্দেশ্য। এভাবে যে, يُقِيْمُوْنَ -এর هَمْزَة টি تَسْعِيْر -এর জন্য। يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ -এর অর্থ হলো নামাজকে قِيَام সম্বলিত করা। আর قِيَام বলে এখানে সকল রোকনের পরিপূর্ণ আদায় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ جُز বলে كُل বুঝানো হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনের وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -এর মাঝেও করা হয়েছে। –[দরসে জালালাইন খ. ১, পৃ. ৩২]

http://islamiboi.wordpress.com

اَلصَّلٰوةُ : এটি হয়ত আভিধানিক صَلٰوة [তথা দোয়া] থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা নামাজ তো দোয়ারই সমষ্টি। **অথবা** وَصْلَة থেকে নির্গত। قَلْب مَكَانِي হয়ে صَلٰوة হয়েছে। আর নামাজকে صِلٰوة এজন্য বলা হয় যে, এটি বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে সেতুবন্ধন। আর وَصْلَة হলো صِلَة [সম্পর্ক]-এর অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ الخ : এখান থেকে মুত্তাকীদের পরিচয় প্রদান করা হচ্ছে সূরায়ে ফাতেহার মাঝে বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয়েছিল। সূরা বাকারাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিন বান্দাদের প্রশংসা করা হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ নিজেই স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে বান্দাকে ঈমান এবং তাকওয়া প্রদান করেছেন এবং নিজেই তার স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৩৪]

ঈমানের সংজ্ঞা : إِيْمَان শব্দটি بَاب إِفْعَال -এর মাসদার। أَمْنٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ- নিরাপদ ও আশ্বস্ত হওয়া। যেমন কুরআনে রয়েছে- أَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ [তারা কি আল্লাহ তা'আলার কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে?] যখন এ শব্দটি بَاب إِفْعَال থেকে ব্যবহৃত হয়েছে, তখন এটি مُتَعَدِّي হয়ে গেছে। এখন অর্থ হবে- নিরাপদ করা বা নিরাপত্তায় প্রবেশ করা।

শরিয়তের পরিভাষায় বিভিন্নরূপে ঈমানের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সবগুলোর সারনির্যাস প্রায় একই। তা হলো-

اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ اِعْتِمَادًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তা তাঁর প্রতি আস্থা রেখে বিশ্বাস করা। -[দরসে মিশকাত, পৃ. ৩৭, খ. ১]

আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে সামঞ্জস্য : যে ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনল, সে হুজুরকে মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া থেকে নিরাপদ করে দিল এবং নিজেকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করল। -[প্রাগুক্ত]

অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোনো বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস করার নাম ঈমান নয় : মু'মিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আয়াতে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ ঈমান এবং গায়ব। এ থেকে বোঝা গেল, অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান কোনো বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোনো প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রাসূল ﷺ -এর কোনো সংবাদ কেবলমাত্র রাসূল ﷺ -এর উপর বিশ্বাসবশত মেনে নেওয়াকেই শরিয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে।

-[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য : অভিধানে কোনো বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ঈমান এবং কারো অনুগত হওয়াকে ইসলাম বলে। ঈমানের আধার হলো অন্তর, আর ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরিয়তে ঈমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাবেদারী প্রকাশ করা না হয়।

মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন-হাদীসে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরিয়ত ঈমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ঈমান অনুমোদন করে না।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কুরআনের ভাষায় একে নিফাক বলে। নিফাককে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে- إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।

অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কুরআনের ভাষায় একেও কুফরি বলা হয়। বলা হয়েছে- يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ অর্থাৎ কাফেররা রাসূল ﷺ এবং তার নবুওয়তের যথার্থতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সন্তানদেরকে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا অর্থাৎ তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকারপ্রসূত।

http://islamiboi.wordpress.com

ঈমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, ঈমান যেমন অন্তর থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ্য আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য আমল পর্যন্ত না পৌঁছলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছলে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গাজালী এবং ঈমান সুবকী (র.)-ও এ মত পোষণ করেছেন। –[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

জ্ঞাতব্য : ত্বাকওয়ার দু'টি অংশ। একটি হচ্ছে– ভালো কাজগুলো করা। আরেকটি হচ্ছে– মন্দ কাজগুলো থেকে বিরত থাকা। আর কোনো কোনো আদেশাবলির সম্পর্ক অঙ্গসমূহের রাজা তথা ক্বলবের সাথে এবং কোনো কোনোটির সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। প্রথম প্রকারকে ঈমান বলা হয়। অর্থাৎ আকিদা, চিন্তা-ভাবনা ও আন্তরিক বিশ্বাস সম্পর্কীয় আদেশাবলির সম্পর্ক ক্বলবের সাথে হয়। إِنَّ فِى الْجَسَدِ..... হাদীস পাকে এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর যেগুলোর সম্পর্ক শারীরিক ইবাদতের সাথে কিংবা আর্থিক ইবাদতের সাথে, ঐ কার্যাবলি কে বলা হয় আমল يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ দ্বারা শারীরিক ইবাদতসমূহ এবং مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ দ্বারা আর্থিক ইবাদতসমূহ উদ্দেশ্য।

এমনিভাবে যারা (مُتَّقِيْنَ) মুত্তাকীন তারা চিন্তাশক্তি ও আমল শক্তি উভয়টিকে পরিপূর্ণ করেন। 'আক্বিদা বা বিশ্বাসসমূহকে সংশোধন করার নাম عِلْمُ الْكَلَامِ অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব এবং আমলসমূহকে সংশোধন করার অধ্যায়কে فِقْه ফিকহশাস্ত্র বলা হয়। অন্তরকে পবিত্রকরণ ও আভ্যন্তরকে পরিষ্কারকরণে عِلْمُ الْاَخْلَاقِ চারিত্রিক তত্ত্ব. যাকে تَصَوُّف ও اِحْسَان বলা হয়। উচ্চস্তরের মুত্তাকী উক্ত তিনটিরই পরিপূরক। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৯]

অদৃশ্যের উপর ঈমান : ঈমান দু'প্রকার– তন্মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে– اِيْمَان اِجْمَالِى অর্থাৎ সংক্ষেপে বিশ্বাস করা, যেমন উপরিউক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী করীম ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন– ঐ সবগুলোকে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে– اِيْمَان تَفْصِيْلِى বিশদভাবে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ সকল আনুষঙ্গিক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির উপর পৃথক পৃথক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা। সুতরাং ঈমান শুধু সত্য জানার নাম নয়; বরং সত্য মানা ও সত্য বুঝাকে ঈমান বলা হয়। ঈমান একটি পৃথক বিষয়, আর আমল আরেকটি পৃথক বিষয়। আর اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ [অদৃশ্যের প্রতি ঈমান] হচ্ছে– জ্ঞান ও অনুভূতির মাধ্যমে অদৃশ্য ও গোপন বিষয়াদিকে শুধু আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নির্দেশের কারণে সত্য ও সঠিক হিসেবে মেনে নেওয়া গায়েব বা অদৃশ্যের এক অর্থ অন্তরও আসে, কেননা অন্তর তো অদৃশ্য। –[প্রাগুক্ত]

يُصَدِّقُوْنَ : অভিধানের ভিত্তিতে اِيْمَان-এর ব্যবহার تَصْدِيْق এবং وُثُوْق দুটি অর্থের ক্ষেত্রেই হয়। মুফাসসির (র.) يُصَدِّقُوْنَ বলে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখানে تَصْدِيْق অর্থটি প্রযোজ্য। কেননা يُؤْمِنُوْنَ-এর صِلَه হিসেবে بَاء এসেছে। আর যখন يُؤْمِنُوْنَ-এর صِلَه হিসেবে بَاء আসে, তখন সর্বসম্মতিক্রমে تَصْدِيْق-এর অর্থে হয়।

এছাড়াও ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। জমহুর মুতাকাল্লিমীনের মতে ঈমান কেবল تَصْدِيْق قَلْبِى-কে বলা হয়। আর জমহুর মুহাদ্দিসীনের মুতাজিলা ও খারেজীদের মতে ঈমান হলো তিন জিনিসের সমষ্টির নাম। সেগুলো হলো– تَصْدِيْق قَلْبِى ـ اِقْرَار بِاللِّسَانِ ـ عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ মুফাসসির (র.) يُصَدِّقُوْنَ শব্দ উল্লেখ্য করে এ দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখানে ঈমান বলতে শুধু تَصْدِيْق قَلْبِى উদ্দেশ্য; اِقْرَار বা عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ উদ্দেশ্য নয়।

–[দরসে জালালাইন : ৩০]

গায়েবের সংজ্ঞা ও পরিচিতি : 'গায়েব'-এর আভিধানিক অর্থ অজ্ঞাত, অদৃশ্য ও গোপন। কুরআনে غَيْب শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংবাদ রাসূল ﷺ দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম।

নিম্নে এ মর্মে ওলামায়ে কেরাম প্রদত্ত কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

http://islamiboi.wordpress.com

তাফসীরে ইবনে কাছীরে উল্লেখ রয়েছে–

أَمَّا الْغَيْبُ : فَمَا غِيْبَ عَنِ الْعِبَادِ مِنْ أَمْرِ الْجَنَّةِ وَأَمْرِ النَّارِ وَمَا ذُكِرَ فِى الْقُرْاٰنِ . (تَفْسِيْر اِبْن كَثِيْر)

অর্থাৎ গায়েব বলা হয় ঐ জিনিসকে, যা বান্দা থেকে গোপন রয়েছে। যেমন– জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থাসমূহ এবং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বিষয়াবলি।

হাশিয়ায়ে জালালাইনে উল্লেখ রয়েছে–

اَىْ مَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيْبَةً كَامِلَةً بِحَيْثُ لَا يُدْرَكُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اِبْتِدَاءَ الْبَدَاهَةِ . حَاشِيَة جَلَالَيْن .

আল্লামা কাজী বায়যবী (র.) লিখেন– اَلْمُرَادُ بِهِ (اَىِ الْغَيْبِ) اَلْخَفِىُّ الَّذِىْ لَا يُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَا يَقْتَضِيْهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ

অর্থাৎ মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তি এবং মেধা শক্তি দ্বারা যা কিছু জানার উপায় নেই, তাকে গায়েব বলে। –[বায়জাবী পৃ. ১৮]

সুবিখ্যাত গ্রন্থ শরহে আকাঈদ নাসাফীর ভাষ্যগ্রন্থ -নেবরাসে উল্লেখ রয়েছে–

وَالتَّحْقِيْقُ اَنَّ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِ الْحَوَاسِّ وَالْعِلْمِ الضَّرُوْرِيِّ وَالْعِلْمِ الْاِسْتِدْلَالِىْ وَاَمَّا مَا عُلِمَ بِحَاسَّةٍ اَوْ ضَرُوْرَةٍ اَوْ دَلِيْلٍ فَلَيْسَ بِغَيْبٍ (نِبْرَاس : ٥٧٥)

অর্থাৎ যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় বা অন্য কোনো দলিল ব্যতীত সাধারণতভাবে জানা যায় না, তাকে গায়েব বলা হয়। আর যা কোনো ইন্দ্রিয় বা দলিল দ্বারা জানা যায়, তা গায়েব নয়। –[নিবরাস : ৫৭৫]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে মাদারেকে বলা হয়েছে–

اَلْغَيْبُ هُوَ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَلَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ مَخْلُوْقٌ .

অর্থাৎ ঐ জিনিসকে গায়েব বলা হয়, যার উপর কোনো দলিল বিদ্যমান নেই এবং কোনো মাখলুক সে বিষয়ে অবগত নয়।

মোটকথা, কোনো দলিল প্রমাণ ও মাধ্যম ছাড়া যা জানা যায়, তাকেই গায়েব বলা হয়। কোনো সূত্রে বা দলিল প্রমাণ ও নিদর্শনের মাধ্যমে জানা গেলে তা আর গায়েব থাকে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজ ওহীর মাধ্যমে হুজুর ﷺ-কে গায়েবের খবর জানিয়েছেন। ওহী হলো জানার একটি দলিল। আর দলির দ্বারা যা জানা যায় তা গায়েব নয়। যেমন কবরের অবস্থা আমাদের জন্য গায়েব ছিল। আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ কে কবর সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। হুজুর ﷺ বলেছেন, কবরে মুনকার নাকীর নামে দু'জন ফেরেশতা এসে মৃত ব্যক্তিকে জিন্দা করার পর জিজ্ঞেস করবে– তোমার রব কে? তুমি কোন ধর্মের অনুসারী ছিলে? এবং হুজুর ﷺ -কে দেখিয়ে বলবে ইনি কে? একথাগুলো একদিন গায়েব ছিল। দুনিয়ার মুসলমানরা জেনে যাওয়ার পর আর তা গায়েব থাকেনি। তবে প্রত্যেকের কবরে প্রতি মুহূর্তে কি হচ্ছে এটা এখনো গায়েব হিসেবেই রয়েছে।

গায়েবের প্রকার : গায়েব দু'প্রকার। ১. غَيْبٌ مُطْلَقٌ বা নিরঙ্কুশ গায়েব। ২. غَيْبٌ اِضَافِى বা আপেক্ষিক গায়েব।

নিরঙ্কুশ গায়েব বলতে বুঝায় তা, যা কস্মিনকালেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। যা বস্তুগত যন্ত্রপাতি বা উপায়-উপকরণ দ্বারাও প্রত্যক্ষ করা যায় না। যা কোনোক্রমেই ইন্দ্রিয়ের আওতাধীন হওয়ার নয়। হওয়া সম্ভবপরও নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার সত্তা, তাঁর পবিত্রতা ইত্যাদি।

আর আপেক্ষিক গায়েব বলতে বুঝায়, একটি জিনিস কোনো কোনো সূত্রে ও পরিবেশে গায়েব হলেও অন্য ক্ষেত্রে ও পরিবেশে তা 'গায়েব' নাও হতে পারে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির জন্য যা গায়েব, অন্য ব্যক্তির জন্য তা গায়েব নাও হতে পারে। যেমন শুক্রকিট, অতীতে তা 'গায়েব' অদৃশ্য যা অগোচরীভূত ছিল। বর্তমানে তা নয়। কেননা তা যতই সূক্ষ্ম হোক বর্তমানে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। বর্তমান বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিতে তা আর 'গায়েব' থাকেনি। ইন্দ্রয়গ্রাহ্য জিনিসে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে সৌরলোকের নানা স্থানে অবস্থিত অনেক অবয়ব এবং পৃথিবীরও অনেক সূক্ষ্ম জিনিস কেবল অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রেই ধরা পড়ে, তার বাইরে এখনও তা গায়েবই রয়ে গেছে। কেননা সাধরণ খোলা চোখে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

পক্ষান্তরে নিরঙ্কুশভাবে 'গায়েব' যা এই দুনিয়ায় কখনো প্রচ্ছন্নতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে না। তার এই 'গায়েব' হওয়া অবস্থার মধ্যে কখনোই কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না। ক্ষেত্র ও অবস্থানে যতই পার্থক্য হোক না কেন। এই পর্যায়ের জিনিসসমূহের প্রতি মানুষকে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে। যদি তার অস্তিত্ব ও অবস্থিতি পর্যায়ে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা তা কখনই এই দুনিয়ায় প্রত্যক্ষ হবে না। এ দুনিয়ায় তার সত্যতা ও বাস্তবতা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা সম্ভব নয়। কেননা এই জিনিসসমূহ বস্তু-অতীত আর মানুষ বস্তুগত আবরণে পরিবেষ্টিত। এ আচরণ দীর্ণ না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের পক্ষে তা গায়েবই থেকে যাবে, কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না। সে আবরণ দীর্ণ হওয়ার প্রথম পর্যায় হচ্ছে মৃত্যু তথা বস্তুগত দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ –[আল কুরআনে নবুয়ত ও রিসালাত : পৃ. ১৯৫, ১৯৬ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম]

http://islamiboi.wordpress.com

জালালাইনের হাশিয়াতে আরেকটি ভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিম্নে ইবারতটুকু বিবৃত হলো–

وَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِىْ اُرِيْدَ بِقَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهٖ وَالنُّبُوَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْاَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَحْوَالِهٖ مِنَ الْبَعْثِ وَالنُّوْرِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ وَهُوَ الْمُرَادُ هٰهُنَا ـ (رُوْحُ الْبَيَانِ؛ حَاشِيَة جَلَالَيْن)

উল্লেখ্য কোনো কিছু গায়েব হওয়ার ব্যাপাটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আল্লাহর ক্ষেত্রে গায়েব-অদৃশ্য বা অজ্ঞাত বলতে কিছুই নেই। কোনো বস্তু থাকতে পারে না তাঁর অগোচরে। এ কারণেই তাঁর পরিচিতিতে বলা হয়– عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ "তিনি গায়েব ও উপস্থিত, অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান সর্ববিষয়ে অবহিত।"

সন্দেহ নিরসন :

এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি ও বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত রিপোর্ট ইলমে গায়েব নয়? অনেকে গায়েব শব্দটি আভিধানিক অর্থে বুঝে নিয়ে যেসব বস্তু আমাদের জ্ঞান দৃষ্টির অন্তরালে তাকে 'গায়েব' বলে অভিহিত করে। ফলে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন রোগীর শরীর দেখে, এক্স-রে করে বা আল্ট্রাসনোগ্রাফী করে রোগী সম্পর্কে বিভিন্ন খবর বা আবহাওয়াবিদদের প্রদত্ত ঝড়-বৃষ্টির সংবাদ শুনে অনেকে মনে করেছে যে, গায়েবের ইলম আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে; অথচ এখন তা মানুষও জানে। এসব প্রশ্নের উত্তর হলো, পূর্বে বলা হয়েছে 'ইলমে গায়েব' বলা হয়, যা জানার জন্য কোনো দলিল নেই। বৃষ্টির খবর আবহাওয়াবিদরা দলিল দ্বারা জেনে বলে থাকে অথবা অনুমানের ভিত্তিতে বলে। অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টির নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়ার পর তারা ঝড়-বৃষ্টির খবর দেয়। তাদের এ খবর নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে। নিদর্শন বৃষ্টির দলিল। গায়েব বলা হয়, যা জানার জন্যে কোনো দলিল নেই। সুতরাং তাদের বৃষ্টি সম্পর্কিত এ সংবাদ 'ইলমে গায়েব' নয়। ঝড়-বৃষ্টির নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, কখন বৃষ্টি হবে। এটা হলো 'ইলমে গায়েব'। এ ইলম আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস।

অনুরূপভাবে এক্সরে ইত্যাদির মাধ্যমে গর্ভজাত সন্তানটি ছেলে মেয়ে বা হওয়ার সংবাদ জানা ইলমে গায়েব নয়; কারণ ডাক্তারগণ এ সংবাদ দিতে পারে সন্তানের দেহে রূহ দেওয়ার পর। রূহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সুতরাং তখন ফেরেশতারা জানতে পারে এ গর্ভের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে। ইলমে গায়েব তো আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস। যখন ফেরেশতা জেনে ফেলে তখন আর গর্ভের সন্তানের খবরটি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে খাস রইল না। তাহলে কুরআনে বর্ণিত وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ এর অর্থ কি? অর্থ হলো ফেরেশতাদের জানার পূর্বে রূহ প্রদানের আগে একমাত্র আল্লাহই জানেন যে, গর্ভের সন্তানটি ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে। রূহ প্রদানের সময় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে রূহ না দিলে তারা জানত না। মোটকথা, যখন ফেরেশতারা জানল, তখন অন্যরাও জানতে পারে। কারণ তখন এটা গায়েবের অন্তর্গত রইল না। রূহ প্রদানের পূর্বে গায়েব ছিল। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে জানানোর কারণে এটা আর গায়েব রইল না।

সার কথা হলো, আবহাওয়া বিভাগের খবর, শিরা দেখে বা এক্স-রে করে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেওয়া, গর্ভের সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে, তা নির্ণয় করা ইত্যাদি হলো উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অর্জিত ইলম। এটা ইলমে গায়েব নয়। আবহাওয়া বিভাগের কর্মকর্তা ও হাসপাতালের ডাক্তাররা এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায় যখন এসবের উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে তখন ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। শুধু বিশেষজ্ঞরা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে জানতে পারে। কিন্তু স্থুল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ লোকের নিকট এগুলো অজানা থাকে। অতঃপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়, তখন সকলের দৃষ্টিতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু উপকরণ ও লক্ষণাদি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তার খবর দেওয়া যায় না। সেটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হেদায়েত এবং শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া। তবে শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রাসূল ﷺ-এর শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহলে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ঈমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। 'আকিদাতুত-তাহাবী' ও 'আকায়েদে-নসফী' -তে এ সংজ্ঞা মেনে নেওয়াকেই ঈমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু জানার নামই ঈমান নয়। কেননা খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রাসূল ﷺ -এর নবুয়তকে সত্য বলে আন্তরিকভাবে জানতো, কিন্তু না মানার কারণে তারা ঈমানদারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

http://islamiboi.wordpress.com

এখানে يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ দ্বারা ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও সত্তা, সিফাত বা গুণাবলি এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোজখের অবস্থা কিয়ামত এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানি কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত, যা সূরা বাকারার اٰمَنَ الرَّسُوْلُ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَا غَابَ عَنْهُمْ : এ অংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, غَيْبٌ শব্দটি مَصْدَر بِمَعْنٰى اِسْم فَاعِل আর এখানে غَائِبَة ইসমে ফায়েলের স্থলে غَيْب মাসদারকে مُبَالَغَة স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ-এর শ্রেষ্ঠত্ব : কোনো কিছুকে দেখার পর কিংবা বুঝার পর বিশ্বাস করা বা মেনে নেওয়া এত বেশি প্রসংশনীয় কাজ নয়, যত বেশি প্রসংশনীয় কাজ হচ্ছে- শুধু কেউ বলার কারণে মেনে নেওয়া বা বিশ্বাস করা। কেননা- প্রথম পদ্ধতিতে তো নিজ চক্ষু ও বিবেকের উপর ভরসা করা হলো। নবী করীম ﷺ -এর উপর প্রকৃত ঈমান আনার অর্থ এটাই যে, শুধু তিনি বলার কারণে বিশ্বাস করে নেওয়া এবং অন্য কোনো প্রমাণাদির অপেক্ষা না করা।

اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হলো–

১. ত্বাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সফরে যাত্রীদলের জন্য পান করার পানিও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তালাশ করে শুধু একটি ভাণ্ডে সামান্য পানি পাওয়া গেল। রাসূল ﷺ সে পানির পাত্রে নিজ হাতের অঙ্গুলী রেখেছিলেন, যাঁর বরকতে ঐ পানি ফোয়ারার ন্যায় উদ্বেলিত হতে লাগলো এবং সকলের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো, যাদের সংখ্যা ছিল শত শত।

   রাসূল ﷺ সাহাবা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন যে, কাদের ঈমান সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর? তাঁরা বললেন, ফেরেশতাদের। তিনি বললেন, ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকেন, তাঁর আদেশাবলি পালনে লিপ্ত থাকেন, তারা ঈমান কেন আনবে না? সাহাবাগণ (রা.) আরজ করলেন যে, তাহলে আপনার সহচরদের ঈমান অধিক বিস্ময়কর। তিনি বললেন যে, আমার সাথীগণও শত শত মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলি দেখতেছে, তাদের ঈমান আনার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে? তারপর তিনি নিজেই ইরশাদ করলেন যে, বিস্ময়কর ঈমান তাদের হবে, যারা আমাকে দেখেনি, আমার পরে আগমন করবে; কিন্তু আমার নাম শুনে সত্য অন্তরে আমার উপর ঈমান আনবে, তারা আমার ভাই এবং তোমরা আমার সাথী। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২০]

২. হারিছ ইবনে কায়স নামী এক তাবেয়ী একজন সাহাবী (রা.)-এর নিকট আরজ করলেন যে, আফসোস, আমরা রাসূল ﷺ -এর দর্শন থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বললেন, এটা সত্য যে, তোমরা ঐ বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত রয়েছ; কিন্তু তোমরা এই একটি বড় নিয়ামত পেয়েছ যে, তোমরা রাসূল ﷺ -কে দেখা ব্যতীত তাঁর উপর ঈমান এনেছ। যে তাঁকে দেখেছে তার কাছে হাজার প্রমাণাদি দ্বারা তাঁর নবুয়ত উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তারপরও যদি সে ঈমান না আনে, তবে সে আর কি করবে? ঈমান হচ্ছে– তোমাদের, কেননা তোমরা তাঁকে না দেখে ঈমান এনেছ। –[প্রাগুক্ত]

৩. আবূ দাউদ (র.)-এর বর্ণনা যে, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো যে, আপনি কি রাসূল ﷺ -কে স্বচক্ষে দেখেছেন? স্বয়ং তাঁর সাথে কথা বলেছেন? এবং নিজ হাত দ্বারা তাঁর বরকতময় হাত ধরে বায়'আত হয়েছেন? তিনি সব ক'টি প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলেছেন। প্রশ্নকারী একথা শুনে অতিশয় কাঁদতে লাগলেন এবং তার উপর এক আবেগের অবস্থা প্রকাশ হলো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাচ্ছি, যা রাসূল ﷺ থেকে আমি শুনেছি, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখে ঈমান গ্রহণ করলো তার জন্য সুসংবাদ, আর যে আমাকে না দেখে ঈমান আনলো তার জন্য অনেক বেশি সুসংবাদ। উল্লিখিত হাদীস ও বর্ণনাগুলো দ্বারা বুঝা গেল যে, اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ-এর বড় মর্যাদা ও মূল্য অধিক। –[প্রাগুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ : ঈমান বিল গায়েবকে মুত্তাকীদের প্রথম পরিচয় রূপে তুলে ধরার পর দ্বিতীয় পরিচয় হিসাবে বলা হয়েছে যে, বাস্তবজীবনে সালাতের প্রতি তারা নিষ্ঠাবান। إِقَامَةٌ বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামাজ আদায় করা নয়; বরং নামাজকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। ইকামত অর্থে নামাজের সকল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মোস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা– সবই বুঝায়। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল নামাজের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাজে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরিয়তের নিয়ম মতো আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথার্থভাবে পালন করাই ইকামতে সালাত। মুফাসসির (র.) يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَأْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) এ দুটি মাত্র শব্দে ইকামতে সালাতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নামাজের দু ধরনের হক রয়েছে। যথা–

১. জাহেরী বা বাহ্যিক হক। যেমন– নামাজের শর্ত, আদাব ও রোকনসমূহ।

২. বাতেনী বা আভ্যন্তরীণ হক। যেমন– খুশু, খুজূ ও ইখলাস ইত্যাদি। এ সব ধরনের হক আদায় করে নামাজ পড়াকেই إِقَامَةُ الصَّلٰوةِ বলা হয়।

اَىْ بِحُقُوْقِهَا الظَّاهِرَةِ كَالشُّرُوْطِ وَالْاٰدَابِ وَالْاَرْكَانِ وَالْبَاطِنَةِ كَالْخُشُوْعِ وَالْخُضُوْعِ وَالْاِخْلَاصِ . (صَاوِى ص١٢ ج١)

প্রকৃত নামাজ : আমলের ক্ষেত্রে يُؤَدُّوْنَ الصَّلٰوةَ -এর স্থলে يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ বলা হয়েছে, মুফাসসির জালাল (র.) এ সূক্ষ্মতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শুধু নামাজ আদায়ই উদ্দেশ্য নয়; বরং সকল জাহিরী শর্ত ও বাতিনী নিয়মাবলির সাথে নামাজ আদায় করাই উদ্দেশ্য, যার মধ্যে সুন্নত ও মোস্তাহাবসমূহের পরিপূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ, বাতিনী নিয়মাবলি, নম্রতা ও শিষ্টতা আন্তরিকতা সবই থাকবে, যে নামাজ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -এর সত্যায়ন হবে। মূল তত্ত্ববিহীন ও আত্মাবিহীন নামাজ, যাকে মূলত নামাজের বাহ্যিক আকৃতি বলা হয়– সে নামাজ উদ্দেশ্য নয়, যে নামাজের ব্যাপারে فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ -এর শাস্তির প্রতিজ্ঞা বা ধমকি রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ : মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ বাহ্যিক ও আত্মিক যত নিয়ামতই তাদের দিয়েছেন, তারা সেগুলোকে আল্লাহরই দীনের জন্য, সত্যের পথে ব্যয় করে; আল্লাহর নাফরমানিতে গর্হিত কাজে ব্যয় করে না।

قَوْلُهُ يُنْفِقُوْنَ : আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরজ, ওয়াজিব এবং নফল দান-খায়রাত প্রভৃতি যা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা হয়, সে সবকিছুই বোঝানো হয়েছে। কুরআনে সাধারণত اِنْفَاق শব্দ নফল দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরজ জাকাত উদ্দেশ্য সেসব ক্ষেত্রে زَكٰوة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য এ আয়াতে مِمَّا শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়, বরং কিয়দংশ ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে। –[তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

قَوْلُهُ رَزَقْنٰهُمْ : رِزْق -এর আভিধানিক অর্থ অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (الواقعة : ٨٢) আর এই নিয়ামতে তোমরা নিজেদের এই অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্যা মনে করছ, অবিশ্বাস করছ?

رِزْق শব্দটি আরবি ভাষায় এত ব্যাপক যে, বাহ্যত ও আত্মিক সর্ব প্রকার দান ও নিয়ামত এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বাহ্যিক ও বস্তুগত সম্পদ, স্বাস্থ্য, সন্তান এবং আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক যেমন– জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশুদ্ধ বোধ ইত্যাদি। এমনকি সে নিয়ামত দুনিয়ারও হতে পারে, আখিরাতেরও হতে পারে।

ফায়দা : রিজিককে নিজ সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বলে দিলেন, যত প্রকারের এবং যত পরিমাণের নিয়ামতই মানুষ পেয়ে থাকে, সবই আল্লাহ তা'আলার দান ও করুণার ফল, মানুষের নিজস্ব কিছুই নেই। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৩]

আরো চিন্তার বিষয় হলো, এখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিজিক থেকে। এ থেকে বোঝা যায়, 'রিজিক' নাম হতে পারে শুধু মুবাহ [অ-নিষিদ্ধ] রিজিকের। নিষিদ্ধ রিজিক এই পর্যায়ে গণ্য নয়। যা অপহরণ করা হয়েছে এবং যা অন্যের উপর জুলুম করে নেওয়া হয়েছে, তা রিজিক গণ্য হতে পারে না। কেননা তা আল্লাহ তাকে রিজিক হিসেবে দেননি। তার রিজিক হলে তা ব্যয় করাও জায়েজ হবে। অন্যকে দান হিসেবে দেওয়া সঙ্গত হবে। তা দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশা করাও অসমীচীন হবে না। কিন্তু মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, অপহরণকারীর অপহৃত

http://islamiboi.wordpress.com

মাল-সম্পদ সদকা করা হারাম। নবী করীম ﷺ তাই বলেছেন– لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ অর্থাৎ "অপহৃত ধন-মালের সদকা কবুল হয় না।" –[আহকামুল কুরআন সূত্রে মাআরিফুল কুরআন : মুফতী শফী (র.)]

মুফাসসির (র.)-এর اَعْطَيْنَاهُمْ শব্দেও এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হাশিয়ায়ে জামালে اَعْطَيْنَاهُمْ -এর অর্থ مَلَّكْنَاهُمْ করা হয়েছে।

জাকাতের তত্ত্ব : মানুষ যেহেতু স্বভাবগত দিক দিয়ে কৃপণ হয়, নিজ রক্ত ও ঘর্মসিক্ত পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জিত একটি পয়সাও কাউকে দেওয়া সহ্য করতে পারে না, চামড়া ছিলে যাক তবু অর্থের উপর আঘাত না আসুক। তাই আল্লাহ তা'আলা অর্থ ব্যয়ের এমন চিত্তাকর্ষক শিরোনাম রেখেছেন, যদ্দারা এ ত্যাগ সহজ হয়. অর্থাৎ এগুলো আমারই দেওয়া সম্পদ. যেগুলোকে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ দেহ শূন্য হাতে আসে. তারপরও যদি সম্পদ উপার্জনের উপর অহংকার থাকে, তবে স্মরণ রাখা উচিত যে. উপার্জনের ক্ষমতা তো আমারই দেওয়া। তারপরও এ ধারণা বা অহংকার কেন? আমি যদি সমস্ত উপার্জন তলব করতাম. তাও তো ঠিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল।

شعر : جان دی، دی ہوئی اسکی تھی ۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا ۔

অর্থ : প্রাণ দিয়েছি. প্রাণ তো তারই দেওয়াছিল, সত্য ও সঠিক এটা যে. হক্ব [প্রাপ্য] আদায় [পরিশোধ] হয়নি।

–[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২১]

ট্যাক্স কঠিন না কি জাকাত কঠিন? : সর্বপ্রকার সম্পদের উপর জাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, শুধু এক বিশেষ প্রকার, অর্থাৎ সেসব সম্পদে জাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে. সকল প্রয়োজন থেকে পূর্ণ এক বছর [বেশি] উদ্বৃত্ত থাকে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের পর শতকরা আড়াই টাকা নেয়. যা সরকারের ধার্যকৃত ট্যাক্সসমূহের মোকাবিলায় অতি নগণ্য একটি পরিমাণ।

মোটকথা জাকাতের সূচনায় সহজ করাও লক্ষ্য, আর খরচের মিতাচারের শিক্ষা দেওয়াও লক্ষ্য, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– সৎকাজে ব্যয় করো. অতিরিক্ত ও নাম ছড়ানোর স্থানে ব্যয় করো না এবং এত অধিক ব্যয় করো না যে, আগামীতে তুমি স্বয়ং মুখাপেক্ষী হয়ে অন্যের কাছে হাত বাড়াতে যাও। উপরিউক্ত দু'টি সূক্ষ্মতা مِنْ তাবঈযিয়্যাহ দ্বারা বুঝে আসলো।

সাধারণ মু'মিনগণ চল্লিশ টাকা থেকে শুধু একটি টাকা জাকাত দেয়, আর বিশেষ মু'মিনগণ চল্লিশ টাকা থেকে এক টাকা স্বয়ং রাখেন, আর অবশিষ্ট ঊনচল্লিশ টাকা দান করে দেন। কিন্তু বিশিষ্টতর লোকেরা জানমাল সব আল্লাহর পথে দান করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে مِنْ তাবঈযিয়্যাহ নয়; বরং বয়ানিয়াহ। –[প্রাগুক্ত]

বিদ্যার জাকাত : এমনইভাবে مَا رَزَقْنٰهُمْ -এর ব্যাপকতার মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন ইলমের উপকার পৌঁছানোও গণ্য, অর্থাৎ একজন আলেম ও শায়খের উপরও ইলমের দৌলত এবং বাতিন থেকে শিক্ষার্থীদেরকে দান করা অতীব জরুরি। –[প্রাগুক্ত]

فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ : এখানে فِيْ হরফটি تَعْلِيْل বা কারণ বর্ণনা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে–

أَيْ يُنْفِقُوْنَ مِنْ اَجْلِ طَاعَةِ اللّٰهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً ـ

জ্ঞাতব্য : আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে اِيْمَانٌ بِالْغَيْبِ-এর আলোচনা করেছেন। তারপর اِقَامَتُ صَلٰوة তারপর اِنْفَاقٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর আলোচনা করেছেন। প্রথমত ঈমানের আলোচনা এসেছে اَصْلُ الْاُصُوْلِ হিসেবে। কেননা এটি সকল আমলের মূলভিত্তি। তারপর আমলের আলোচনা এসেছে কারণ তাকওয়া এবং পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য আমলেরও প্রয়োজন রয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, তাহলো আমলের পরিধি তো অনেক দীর্ঘ। ফরজ ওয়াজিব ইত্যাদির সংখ্যা অধিক। এতদসত্ত্বেও আমলসমূহের মধ্যে শুধু দুটি আমল তথা নামাজ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের কথা বলে ক্ষান্ত করার কারণ কি?

উত্তর : মানুষের জিম্মায় যতগুলো আমল ওয়াজিব বা ফরজ হিসেবে আরোপিত রয়েছে, সেগুলোর সম্পর্ক হয়ত মানুষের 'যত' তথা শরীর ও সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ। আর্থিক ইবাদতের সকল শাখা-প্রশাখা اِنْفَاق শব্দের মাঝে নিহিত রয়েছে। তাই দু'টি আমলের কথা উল্লিখিত হলেও সমস্ত আমলই তাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে এই মুত্তাকী ঐসকল লোক, যাদের ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি আমলও পরিপূর্ণ। আর ঈমান-আমলের সমষ্টিই হলো ইসলাম। যেন এ আয়াতে ঈমানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত মর্মের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

৪. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَيِ الْقُرْاٰنِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ أَيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَغَيْرِهِمَا وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ يَعْلَمُوْنَ .

৫. أُولٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُوْنَ مِنَ النَّارِ .

অনুবাদ :

৪. এবং যারা বিশ্বাস করে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে [তাতে] অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি আসমানি কিতাবসমূহে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী অর্থাৎ নিশ্চিত বলে প্রত্যয় করে।

৫. তারাই অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলিতে গুণান্বিতরা তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে অধিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম জান্নাত অর্জন করে সফলকাম ও জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভকারী।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ দ্বিতীয় মউসূল, مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ মা'তূফ আলাইহি, مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ মা'তূফ, উভয়টি মিলে يُؤْمِنُوْنَ -এর মাফউল হয়েছে, এটা পুরো জুমলা হয়ে সেলা হয়েছে এবং প্রথম اَلَّذِيْنَ -এর উপর আতফ হয়েছে। أُولٰئِكَ মুবতাদা এবং عَلٰى هُدًى مِنْ رَّبِّهِمْ জরফে লাগ্ব খবর, এমনিভাবে দ্বিতীয় أُولٰئِكَ মুবতাদা হলো, هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তার খবর, দুটি জুমলা মা'তূফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ :

যোগসূত্র : এ অংশটুকু প্রথম اَلَّذِيْنَ -এর সাথে عَطْف হয়েছে। এরা হলো মুত্তাকীদের দ্বিতীয় প্রকার। এ আয়াত তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিল এবং আখেরী নবী ﷺ -কে পেয়ে তাঁর প্রতিও ঈমান এনেছিল। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আম্মার ইবনে ইয়াসার, সালমান ফারসী ও নাজ্জাসী প্রমুখ। আর প্রথম প্রকার হলো আরবের মুশরিকরা। যাদের কাছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত কোনো নবী আগমন করেনি। প্রথম আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। –[ছাবী খ. ১, পৃ.১৩]

قَوْلُهُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ : **প্রশ্ন :** এখানে أُنْزِلَ তথা মাজির সীগা ব্যবহার করা হলো কেন? অথচ তখন পূর্ণ কুরআন নাজিল হয়নি; বরং কিছু অংশ নাজিলের অপেক্ষায় ছিল।

উত্তর : এর জবাবে আল্লামা ছাবী বলেন– نُزِلَ الْمُسْتَقْبِلُ مَنْزِلَةَ الْمَاضِىْ لِتَحَقُّقِ الْوُقُوْعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَمَّ نُزُوْلُهُ .(صَاوِى) অর্থাৎ যেগুলো এখনো অবতীর্ণ হয়নি, সেগুলো অবতরণ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেই مُسْتَقْبِلْ -কে মাজির স্থলে রাখা হয়েছে। –[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১৩]

আল্লামা সুলায়মান আল জামাল (র.) বলেন–

وَالتَّعْبِيْرُ عَنْ إِنْزَالِهِ بِالْمَاضِىْ مَعَ كَوْنِ بَعْضِهِ مُتَرَقِّبًا حِيْنَئِذٍ لِتَغْلِيْبِ الْمُحَقَّقِ عَلَى الْمُقَدَّرِ

অর্থাৎ আরবি নিয়ম تَغْلِيْب হিসেবে এমনটি করা হয়েছে। অর্থাৎ নাজিলকৃত আয়াতসমূহকে নাজিল করা হয়নি এমন আয়াতের উপর প্রাধান্য দিয়ে এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে জিনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে– إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى (اَلْأَحْقَافُ : ٣٠) অথচ জিনেরা তখন পূর্ণ কুরআন শ্রবণ করেনি এমনকি তখন পূর্ণ কুরআন নাজিলও হয়নি। সেখানে একই নিয়মে বলা হয়েছে। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৯]

ফায়দা : এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে মৌলিক বিষয়ে মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে হুজুর ﷺ -ই শেষনবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা কুরআনের পরে যদি কোনো আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তবে পরবর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল

http://islamiboi.wordpress.com

বেশি। কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলসহ বিভিন্ন আসমানি কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কম-বেশি সবাই অবগতও ছিল। তাই হুজুর ﷺ-এর পরেও যদি ওহী ও নবুয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির মতো পরবর্তী কিতাবও নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কুরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবীগণের এবং তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোনো কিতাবের উল্লেখ নেই। কুরআন মজীদে এ বিষয়টি অন্যূন পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরত ﷺ -এর পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোনো একটি আয়াতেও পরবর্তী কোনো ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোনো ইশারা-ইঙ্গিতও দেখা যায় না।

–[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ : অর্থাৎ অন্যান্য নবীদের উপর, তারা যে দেশের যে জাতির এবং যে সময়েরই হোন। এখানে কুরআন এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, খোদায়ী বাণী তথা হেদায়েত ও তাবলীগের এ ধারা নতুন অনুলাভ করা কিছু নয়; বরং পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম পদচারণা থেকেই তার সূচনা। পৃথিবীতে মানুষের নিবাস যত প্রাচীন, ওহী খোদায়ী বাণীর বয়সও তত প্রাচীন। সুতরাং শুধু আখেরী নবীর প্রতি ঈমানই মু'মিনের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এক কথায় হলেও সকল নবী-রাসূলের উপরও ঈমান আনতে হবে। সুতরাং মুত্তাকীদের পঞ্চম পরিচয় হলো, ইহুদি-খ্রিস্টান জাতির বিপরীতে অন্যান্য নবী-রাসূলের বাণী এবং শিক্ষায়ও তারা ঈমান পোষণ করে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৩]

قَوْلُهُ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : اَلْاٰخِرَةُ অর্থ দারুল আখিরাত বা আলমে আখিরাত তথা পরকাল বা পরজগৎ, যা বর্তমান জীবনধারার অবসানের পর শুরু হবে। তাকে আখিরাত বলা হয় শুধু এজন্য যে, এই জড় জীবনের অবসানের পর তার সূচনা হবে। শাস্তি ও পুরস্কারের জন্য স্বতন্ত্র একটি দিবস সমাগত, এটা ঈমান ও বিশুদ্ধ দীনের অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে ঐসব বাতিল ধর্মকে খণ্ডন করা হয়েছে, যেগুলো নামে ধর্ম হলেও কর্মে ও প্রতিদানেই বিশ্বাসী নয়। অথবা বিশ্বাসী হলেও এই পৃথিবীকেই তার প্রতিদানক্ষেত্র মনে করে। নব্য বাতিলপন্থি দল কাদিয়ানীরা এর তরজমা করেছে শেষ যুগের ওহী বলে, যাতে তাদের মনগড়া নবুয়তের লাইসেন্স কুরআন থেকেই সংগ্রহ করা যায়। এটা আরবি ভাষার সাথে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৪]

قَوْلُهُ يُوْقِنُوْنَ : يُوْقِنُوْنَ শব্দটি اِيْقَانٌ থেকে নির্গত। يَقِيْن বলা হয়– اِتْقَانُ الْعِلْمِ بِنَفْيِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ عَنْهُ نَظَرًا وَاسْتِدْلَالًا অর্থাৎ সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দলিল প্রমাণের মাধ্যমে ইলমকে সুদৃঢ় করা, اِيْقَان বা يَقِيْن -এর অর্থ কোনো বিষয় নিছক যুক্তিতর্কে ধরাশায়ী হয়ে মেনে নেওয়া কিংবা অগভীর ও ভাসা ভাসাভাবে মগজ থেকে শুধু শব্দসর্বস্ব স্বীকৃতি দেওয়া নয়, যেমনটি প্রায়শ ঘটে দার্শনিক বাদ-মতবাদের ক্ষেত্রে; বরং এ একীন অর্থ হলো– মনে-প্রাণে এমনভাবে বিশ্বাস করা যে, ইচ্ছা, অনুভূতি ও মস্তিষ্ক সব কিছু তাতে বিস্তার লাভ করবে। মোটকথা সন্দেহাতীত জ্ঞানকে একীন বলা হয়।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৪]

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : একীন এমনিতেই নিছক জ্ঞানের তুলনায় বলীয়ান। তার স্থান জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে তদুপরি এখানে جَارّ- مَجْرُوْر -কে -এর আগে আনা হয়েছে حَصْر -এর জন্য। সেই সাথে هُمْ -এর সংযোজন তা আরো কয়েক গুণ বর্ধিত করে দিয়েছে। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায়, মুত্তাকী মু'মিনদের কাছে আখিরাত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐ একটি বিষয়েই যেন তারা ঈমান পোষণ করে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৪]

আর বাক্যটি جُمْلَةِ اِسْمِيَّة রূপে ব্যবহার করার কারণ এই যে, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস اِنْفَاق থেকেও উচ্চতর।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ : সূরা ফাতিহায় বান্দার ভাষায় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলে সিরাতুল মুস্তাকীম লাভের প্রার্থনা করা হয়েছিল। বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করে আল্লাহ নাজিল করলেন হেদায়েতগ্রন্থ আল-কুরআন। ইরশাদ করলেন– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ তারপর বলে দেওয়া হলো যাদের মাঝে ৬টি গুণ বা আলামত পাওয়া যাবে, তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত।

قَوْلُهُ يَعْلَمُوْنَ : يُوْقِنُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় মুফাসসির (র.) يَعْلَمُوْنَ শব্দ উল্লেখ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেটি হলো– يَقِيْن তিন প্রকার। ১. عِلْمُ الْيَقِيْنِ ২. عَيْنُ الْيَقِيْنِ ৩. حَقُّ الْيَقِيْنِ একটি উদাহরণের মাধ্যমে প্রত্যেকটির পরিচয় ও স্বরূপ ফুটে উঠবে। যেমন কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে জানল যে, আগুন বস্তুকে পুড়িয়ে দেয়। এ বস্তুর বিশ্বাসকে বলে عِلْمُ الْيَقِيْنِ তারপর বস্তুকে আগুনে জ্বলে যেতে দেখল

http://islamiboi.wordpress.com

এ অবস্থার বিশ্বাসকে বলে عَيْنُ الْيَقِيْنِ বলে। তারপর সে নিজেই নিজের আঙ্গুল আগুনে দিয়ে দেখল যে, বাস্তবেই আগুন পুড়িয়ে দেয়। এ অবস্থার বিশ্বাসকে বলে حَقُّ الْيَقِيْنِ

এ পর্যায়ের একীন ও বিশ্বাস সকলের দ্বারা সম্ভব হবে না। কেবল নবীগণই এমন একীনের অধিকারী হতে পারেন। এ সমস্যার কারণে মুফাসসির (র.) يَعْلَمُوْنَ শব্দ উদ্দেশ্য করে বুঝিয়ে দিলেন যে, শরিয়তের উসূলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে يَقِيْن-এর তিনটি স্তর থেকে এখানে প্রথম স্তর তথা عِلْمُ الْيَقِيْنِ -ই উদ্দেশ্য।

–[শায়খুল হাদীস মাওলানা আলতাফ হুসাইন [দা. বা.]-এর মুখনিঃসৃত]

عَلٰى هُدًى : عَلٰى হরফে জর। اِسْتِعْلَاء-এর অর্থে গঠিত। যেমন বলা হয়– زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ যায়েদ ছাদের উপর। কিন্তু এখানে عَلٰى তার হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়। কেননা هُدًى বা هِدَايَتْ একটি مَعْنَوِي বস্তু। এটি কোন حِسِّي তথা অনুভব করার বা ধরা ছোঁয়ার জিনিস নয়। অথচ اِسْتِعْلَاء حَقِيْقِي-এর জন্য مُسْتَعْلٰى عَلَيْهِ টা حِسِّي হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বুঝা গেল এখানে عَلٰى-এর ব্যবহার حَقِيْقِي অর্থে হয়নি; বরং اِسْتِعَارَةْ تَبْعِيَّةْ হিসেবে হয়েছে। এভাবে যে, মুত্তাকীকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো সওয়ারীর উপর রয়েছে। এভাবে তাশবীহ দিয়ে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো যে কোনো مَعْقُلِي বস্তুকে مَحْسُوْسِي বস্তুর আকৃতিতে পেশ করা হলে হৃদয়পটে অধিক পরিমাণে রেখাপাত করে; আর এখানে عَلٰى ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ সকল লোক হেদায়েতকে পরিবেষ্টন করে আছে এবং হেদায়েতের উপর মজবুতভাবে স্থির আছে। –[মাআরিফুল কুরআন : ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৫]

هُدًى : এখানে هُدًى শব্দটিকে نَكِرَه ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো হেদায়েতের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো

قَوْلُهُ مِنْ رَبِّهِمْ : جَارٌ এবং مَجْرُوْر মিলে ظَرْف مُسْتَقَرّ হয়ে هُدًى-এর সিফত।

প্রশ্ন: مِنْ رَبِّهِمْ থেকে বুঝা গেল যে, হেদায়েত দ্বারা আল্লাহর হেদায়েত উদ্দেশ্য এবং হেদায়েতদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা। অথচ একথাটি مِنْ رَبِّهِمْ উল্লেখ না করলেও বুঝে আসে। কেননা কুরআনের আয়াত اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ الخ-এর মাঝে অন্যের থেকে হেদায়েতকে নাচক করা হয়েছে এবং وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ-এর মাঝে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। যা দ্বারা বুঝা যায় হেদায়েত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে পাওয়া যায় না। অধিকন্তু এখানে هُدًى-কে نَكِرَه ব্যবহার করে বড় ধরনের হেদায়েতকে বুঝানো হয়েছে। যা অন্য কারো কাছে পাওয়া যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব এখানে مِنْ رَبِّهِمْ বলার প্রয়োজন বা হেকমত কি?

উত্তর : এখানে مِنْ رَبِّهِمْ শব্দটি تَعْيِيْن هَادِي বা হেদায়েতকারীকে নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং هُدًى-এর মাঝে نَكِرَه হিসেবে যে تَعْظِيْم বা সম্মান ও বড়ত্বের অর্থ রয়েছে, তাকে আরো জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা এভাবে যে এ হেদায়েতের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে। তিনিই তা প্রদানকারী। আর যে জিনিস আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, তা খুবই মর্যাদাপূর্ণ।

قَوْلُهُ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : مُفْلِح ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে স্বীয় লক্ষ্যে ভালোভাবে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং এতে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও ত্রুটি দেখা দেয় না।

اَلْمُفْلِحُوْنَ-এর পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা কঠিন। আরবি অভিধান শাস্ত্রের ইমাম যুবায়দীর মতে আরবি ভাষায় সমগ্র কল্যাণ বোঝানোর জন্য فَلَاح-এর চেয়ে উত্তম ও সমৃদ্ধ কোনো শব্দ নেই। –[তাফসীর মাজেদী : খ. ১, পৃ. ৩৫]

هُمْ শব্দটি এখানে একদিকে পার্থক্যকারী ভূমিকা পালন করেছে। [যাতে اَلْمُفْلِحُوْنَ খবরটি صِفَةْ বলে ভ্রম না হয়] অপরদিকে নিসবত বা বাক্যসংযোগকে জোরদার করেছে এবং اَلْمُفْلِحُوْنَ মুসনাদটি اُولٰئِكَ মুসনাদ ইলাইহির সাথে সম্পৃক্ত, এ কথা বুঝিয়ে দেয়।

ফায়দা : اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ-এর মাঝে ঈমান এবং তাকওয়ার পার্থিব ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে। আর اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-এর মাঝে তার পরকালীন ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে। –[মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ৪৭]

আম্বিয়া (আ.) -এর সত্যায়নের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, চাই সেটা ওহীয়ে مَتْلُو [কুরআন] হোক কিংবা ওহীয়ে غَيْر مَتْلُو [হাদীস] হোক অথবা সেগুলো থেকে উদ্ভাবনকৃত ফিকৃহী ও শরয়ী বিধানাবলি হোক, একজন মুসলমানের জন্য যেমনভাবে সেসবকে মানা অত্যাবশ্যক, তেমনিভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক যে, নিজ নিজ যুগে যে সকল পয়গাম্বর (আ.) হেদায়েত ও শিক্ষাসমূহ নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাঁরা সকলে নিজ নিজ স্থানে সত্য ও সঠিক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে লোকেরা যা কিছু এর মধ্যে ভেজাল করেছে– সেগুলো নিঃসন্দেহে ভুল ও নাজায়েজ।

http://islamiboi.wordpress.com

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সাময়িক, অস্থায়ী ও সীমিত বিধানাবলিকে খতম করে একটি বলিষ্ঠ ও স্থায়ী; বরং আন্তর্জাতিক বিধান [কুরআন] দিয়ে নবী করীম ﷺ -কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে শুধু তাঁর অনুকরণ, ও বাধ্যগত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এ হচ্ছে ইসলামি তা'লীমের [শিক্ষার] সারমর্ম।

সুতরাং ইসলামে **প্রবেশ হওয়ার জন্য যেমনিভাবে নবী করীম** ﷺ -এর সত্যায়ন অত্যাবশ্যক, তেমনিভাবে অতীতের সকল ধর্ম ও সকল নবী **(আ.)-এর সত্যায়ন অপরিহার্য**। কেননা সকল পয়গাম্বর (আ.)-এর নবুয়ত একই ছিল, তাই এক নবীকে মিথ্যাবাদী **বলা অন্যান্য সকল নবী** কে মিথ্যাবাদী বলার সমতুল্য, যা বাস্তবের পরিপন্থি। এটি ইসলাম ধর্মের একটি পৃথক সৌন্দর্য **যে, এর ভিত্তি হচ্ছে সকল পয়গাম্বর** (আ.)-কে মেনে নেওয়ার উপর, কাউকে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যান করার উপর নয়; لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ - **ইহুদি**-নাসারাদের বিপরীত, এজন্য যে, ওরা পরস্পর একে অপরকে যে, শুধু মিথ্যাবাদী বলে ও **প্রত্যাখ্যান করে তা-ই নয়;** বরং একে অপরের ধর্মকে অস্বীকার করে হয়তো ইহুদি হয় বা খ্রিস্টান হয় وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ الخ। অর্থ- ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনো ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো **ভিত্তির উপরেই নয়**। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২২]

দু'টি সূক্ষ্মবিষয় : কিন্তু এ স্থানে দু'টি সূক্ষ্মতা সামনে রাখা উচিত। একটি হচ্ছে যে, অতীতের কিতাবগুলোকে সত্যায়ন দ্বারা **উদ্দেশ্য** প্রকৃত কিতাবগুলো, বিকৃতগুলো নয়। রদ, পরিবর্তন ও বিকৃত করার পর তো সেগুলো মূলত কালামে এলাহীই থাকেনি।

আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, অতীতের আসমানি কিতাবগুলো বিকৃত হওয়ার পূর্বে হক্ব ও সত্য ছিল- বিশ্বাস পোষণকে এতটুকু **পর্যন্ত** সীমিত রাখা উদ্দেশ্য। সেগুলোকে আমলে বাস্তবায়ন করা অথবা অনুকরণ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা অনুকরণের ব্যাপারটি শুধু রাসূল ﷺ -এর সাথেই নির্দিষ্ট ও খাছ।

উক্ত ধারা মোতাবেক ফিকহী মাসায়েল ও আধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে অতীত ধর্মগুলোর বুযুর্গ ও পীরমাশায়েখ এবং হেদায়েতের **ইমামগণকেও সঠিক** ও সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে তাঁরা যদি তাঁদের নবী (আ.)-এর সুন্নত ও **ইখলাছের উপর থাকেন**। এটা চির সত্য যে, অনুকরণ ও আনুগত্য শুধু নিজ ইমাম ও শায়খেরই হওয়া উচিত। হ্যাঁ, যদি শায়খ **ও ইমামগণ মনের পূজারী** ও বিদ'আতী কার্যাবলিতে লিপ্ত হয়, তবে তাদেরকে সত্যায়নও করা যাবে না, তারা সত্যবাদী বলে **বিশ্বাস**ও করা যাবে না **এবং** তাদের **অনুসরণ**ও করা যাবে না। উপরিউক্ত সমস্ত মন্তব্যগুলোর বিশুদ্ধতার প্রমাণ হচ্ছে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর তওরাত কিতাব পাঠের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২২]

মুত্তাকীদের প্রকাশ্য পরিচয় : ত্বাকওয়ার নযরী, ইলমী ও جَامِعٌ مَانِعٌ সংজ্ঞা ছাড়া মুফাসসির আল্লাম (র.) সহজ ও পরিষ্কার পন্থা এটা অবলম্বন করেছেন যে, এর সত্যায়ন ও প্রমাণাদি বলে দিয়েছেন এবং একে অনুভবযোগ্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যাদের মধ্যে এসব গুণাবলি পাওয়া যায়, তাঁরাই মুত্তাকী। তাছাড়া عَلٰى শব্দ দ্বারা তাঁদের হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং সরল-সোজা হওয়াকে বলে **দিয়েছেন যে**, যেমনিভাবে আরোহী সওয়ারীর উপর ক্ষমতাশীল ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্রূপ মুত্তাকীগণ হেদায়েতকে সওয়ারির ন্যায় করে নিয়েছেন। এ সংজ্ঞার মধ্যে তাঁদের স্বনির্ভরতা, সঠিক হওয়া ও দৃঢ় হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ হেদায়েতের অনুকরণ করতে করতে তাঁরা এখন হক্ব ও সত্যের কেন্দ্র এবং হেদায়েতের মাপকাঠি হয়ে গেছেন, হেদায়েতের লাগাম যেদিকে তাঁরা ফেরান, হক্ব ঐ দিকে চলে। -[প্রাগুক্ত]

ফেরকায়ে মু'তাযিলাকে খণ্ডন : بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ এবং هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -এর মধ্যে فِعْل -এর জমীর দ্বারা পরিপূর্ণ হেদায়েত ও পরিপূর্ণ কল্যাণের সীমাকে বুঝানো হয়েছে। সাধারণ হেদায়েত ও কল্যাণকে নয়, অর্থাৎ এ হচ্ছে বিশ্বাস ও কল্যাণের পরিপূর্ণতা। তাই এ শব্দগুলো দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নিজ কর্ম পন্থার উপর দলিল পেশ করা যথাযথ। এজন্য যে, কল্যাণ ও হেদায়েত শুধু ঐ ধরনের ব্যক্তিবর্গের জন্যই খাছ। পাপী মু'মিন অথবা গুনাহগার এর থেকে বহিষ্কৃত ও দোজখের যোগ্য।

মূলকথা হচ্ছে, এখানে সাধারণ কল্যাণের সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, যার দু'টি তালিকা হবে, একটি কামেল [মু'মিন পাপী নয়], অপরটি নাকেস [মু'মিন পাপী], বরং কল্যাণের পরিপূর্ণতার সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, পাপী মু'মিন কল্যাণের পরিপূর্ণতা থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত ও বঞ্চিত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ কল্যাণের নগণ্য একজন হিসেবে থেকে যাবে, এ মতই হচ্ছে আহলে সুন্নতের। -[প্রাগুক্ত]

اَلنَّاجُوْنَ مِنَ النَّارِ : এখানে نَجَات দ্বারা اِبْتِدَاء এবং اِنْتِهَاء উভয় প্রকার নাজাত ও মুক্তি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুত্তাকীরা শুরু থেকেই অনাদি অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকবে। পক্ষান্তরে পাপী মুমিনগণ শুরুতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারপর পবিত্র হয়ে তা থেকে মুক্তি পাবে।

http://islamiboi.wordpress.com

٦. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَأَبِيْ جَهْلٍ وَأَبِيْ لَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا وَتَسْهِيلِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرَى وَتَرْكِهِ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ لِعِلْمِ اللّٰهِ مِنْهُمْ ذٰلِكَ فَلَا تَطْمَعْ فِيْ إِيْمَانِهِمْ وَالْإِنْذَارُ إِعْلَامٌ مَعَ تَخْوِيفٍ.

অনুবাদ :

৬. যারা কুফরি করেছে যেমন আবূ জাহেল, আবূ লাহাব ও তাদের মতো অন্যান্যরা তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তুমি তাদেরকে সতর্ক কর أَأَنْذَرْتَهُمْ -এ ব্যবহৃত হামজাদ্বয়কে অলদ অলদ স্পষ্টভাবে বা দ্বিতীয়টিকে আলিফ -এ রূপান্তরিত করে বা তাকে তাসহীলসহ বা তাসহীলকৃত ও তার পরবর্তী হরফটির মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে বা তাসহীল পরিত্যাগ করে পাঠ করা যায়। বা তাদেরকে সতর্ক না কর, তারা ঈমান আনবে না। যেহেতু এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন। সুতরাং তাদের ঈমান আনয়নের আর আশা করো না। اَلْإِنْذَارُ অর্থ হুমকি বা ভয় প্রদর্শনসহ কাউকে কোনো বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা।

তাহকীক ও তারকীব

إِنَّ হরূফে মুশাব্বাহ بِالْفِعْلِ، اَلَّذِيْنَ মউসূল, كَفَرُوْا সেলাহ, উভয়টি মিলে إِسْم، سَوَاءٌ শব্দটি اِسْتِوَاء-এর অর্থে মাসদার, তারপর মরফূ' فَاعِل, এসব মিলে إِنَّ-এর খবর। মূল বাক্য এমন হবে إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُسْتَوٰى عَلَيْهِمْ إِنْذَارُكَ وَعَدَمُهٗ এবং لَا يُؤْمِنُوْنَ বয়ান, আর وَ إِدْخَال-এর শুরুতে وَاو টি مَعَ-এর অর্থে। অর্থাৎ تَوَسُّط أَلِف-এর تَسْهِيلِ هَمْزَةٍ ثَانِيَةٍ مَعَ ...... -وَتَرْكِهِ ه -এর যমীরের مَرْجِع . تَسْهِيل-এর দিকে رَاجِع অর্থাৎ تَرْك تَسْهِيل করা।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ : سَوَاء মূলত اِسْتِوَاء-এর অর্থে মাসদার। এখানে মাসদার হলেও إِسْم فَاعِل-এর অর্থে أَيْ مُسْتَوٍ عَلَيْهِ - سَوَاء-এর مَحَلِّ إِعْرَاب তিনটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে–

১. سَوَاء খবরে মুকাদ্দাম এবং أَنْذَرْتَهُمْ الخ হলো খবর।

২. سَوَاءٌ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى إِسْم فَاعِل এবং أَنْذَرْتَهُمْ তার ফায়েল।

৩. سَوَاء মুবতাদা মাহযুফের খবর أَيِ الْأَمْرَانِ سَوَاءٌ এবং أَنْذَرْتَهُمْ - سَوَاء-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

أَأَنْذَرْتَهُمْ -এর প্রথম হামজাটি اِسْتِفْهَام تَسْوِيَة-এর জন্য এসেছে। أَأَنْذَرْتَهُمْ মুবতাদা এবং سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ খবরে মুকাদ্দম। এভাবেও হতে পারে যে, سواء মাসদারের স্থলাভিষিক্ত এবং أَأَنْذَرْتَهُمْ -এর ফায়েল। উভয়টি মিলে জুমলা হয়ে إن -এর خَبَر

إِنْذَار শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেওয়া, যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর إِبْشَار এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে إِنْذَار বলতে ভয় প্রদর্শন করা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে ইনজার বলা হয় না; বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিচ্ছু এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। 'নাজির' বা ভীতি প্রদর্শনকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এ জন্যই নবী রাসূলগণের বিশেষভাবে نَذِيْر বলা হয়। কেননা তাঁরা দয়া ও সর্তকতার ভিত্তিতে অবশ্যম্ভাবী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য نَذِيْر শব্দ ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা তাবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের কর্তব্য হচ্ছে– সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ, মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা।

http://islamiboi.wordpress.com

إِنْذَار এবং إِخْبَارٌ بِالْعَذَابِ -এর মাঝে পার্থক্য :

إِنْذَار ঐ সময়ে ভীতি প্রদর্শনকে বলা হয়, যখন أَمْر مُخَوَّف مِنْه [ভয়ংকর বস্তু] থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়। অন্যথায় তাকে إِخْبَارٌ بِالْعَذَابِ বলা হবে। -[হাশিয়ায়ে সাবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : **যোগসূত্র :** সূরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হেদায়েত গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাদেরকে মু'মিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এবং পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর এখান থেকে পনেরটি আয়াতে এ সমস্ত লোকের কথা আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচারণ করেছে।

রাসূল ﷺ তীব্রভাবে কামনা করতেন যেন সকল মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। এ হিসেবে তিনি চেষ্টাও চালিয়ে যেতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলে দেন যে, ঈমান তাদের নসীব হবে না।

কুফর ও কাফেরের পরিচয় : كُفْر -এর শাব্দিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরী বা অকৃতজ্ঞতাকেও কুফর বলা হয়। কেননা এতে ইহসানকারীর ইহসান গোপন করা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়, إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالضَّرُوْرَةِ مَجِيْئُ الرَّسُوْلِ بِهِ যে সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ, এর যে কোনোটিকে অস্বীকার করা। যথা- ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং সত্য বলে জানা। কোনো ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোনো একটিকে হক বলে না মানে, তাহলে তাকে কাফের বলা যেতে পারে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ৪৯]

কুফরের প্রকার : ওলামায়ে কেরাম কুফরের পাঁচটি প্রকার বর্ণনা করেছেন-

১. كُفْر تَكْذِيْب অর্থাৎ নবী রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ . إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ .

২. كُفْر إِسْتِكْبَار অর্থাৎ অহংকারের কারণে আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুম অমান্য করা ও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো। যেমন- ইরশাদ হয়েছে- أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

৩. كُفْر إِعْرَاض অর্থাৎ পয়গাম্বরদেরকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোটাই না বলা; বরং উপেক্ষা করা ও মনযোগ না দেওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا أُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ . قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ

এ আয়াতে উপেক্ষকারীদেরকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৪. كُفْر إِرْتِيَاب অর্থাৎ পয়গাম্বরদের ব্যাপারে সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী কোনোটাই বিশ্বাস না করা; বরং সন্দেহ ও সংশয় করা। এটাও কুফর। তাই তো কুরআনে وَقَدْ كَفَرَ رَبَّهُ -এর কারণ বর্ণনা করেছে এভাবে- إِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُرِيْبٍ

৫. كُفْر نِفَاق অর্থাৎ মুখে ঈমানের কথা স্বীকার করা এবং অন্তরে অস্বীকার করা। ইরশাদ হয়েছে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ .

এ আয়াত থেকে ১৩টি আয়াত পর্যন্ত এ কুফরে নেফাক সম্পর্কেই আলোচনা হবে।

-[মা'আরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্ধলভী : ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯-৫০]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ كَاَبِىْ جَهْلٍ وَاَبِىْ لَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا :

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরের ব্যাখ্যা : মুফাসসির জালাল (র.) كَاَبِىْ جَهْلٍ الخ বলে একটি সন্দেহের উত্তর দিতে চাচ্ছেন। সন্দেহটি হচ্ছে এই যে, আমরা দেখছি যে, দীনের তাবলীগের পর অনেক কাফের ঈমান গ্রহণ করেছে; বরং সকল সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ -এর তাবলীগের পরই ঈমান গ্রহণ করেছেন। তারপর আল্লাহ পাকের এ কথা বলা "আপনি সতর্ক করুন কিংবা না করুন এরা ঈমান আনবে না" কিভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে, এর দ্বারা 'সাধারণ কাফের' উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ প্রতিশ্রুত ঐ সকল কাফের উদ্দেশ্য, যাদের জন্য আল্লাহর ইলমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করবে না; বরং কুফরের উপরই অটল থাকবে। যেমন– আবূ জহল ও আবূ লাহাব প্রমুখ। তাছাড়া سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, এখন আর তাদেরকে দীনের বিধানাবলি শুনানোর এবং তাদের কাছে তাবগীলের প্রয়োজন নেই। কেননা এ তাবলীগ তো রাসূল ﷺ -এর উপর মর্যাদাশীল ফরজ। সুতরাং তারপরও তিনি তাবলীগ বন্ধ করেননি। মুফাসসির (র.) উক্ত সন্দেহকেই দূর করার দিকে فَلَا تَطْمَعْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ তাবলীগ ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের থেকে [ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে] বিশ্বাস ও আশা না রাখার কথা বলা হচ্ছে। কেননা আশার বিপরীত ফল দ্বারা দুঃখ ও বেদনার সম্মুখীন হতে হয়।

আম্বিয়া (আ.)-এর অন্তর যেহেতু স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ থাকে, তাঁরা যদি অধিক মহব্বত ও স্নেহ করে থাকেন, ঈমানের আশা পোষণ করেন, তারপর এর বিপরীত হলে কত বড় ও অসহনীয় দুঃখ তাঁদের মনে আসতে পারে! তাই এ স্থলে তাবলীগের ব্যাপারে সংযমী হওয়ার তা'লীম দেওয়া হয়েছে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২৩]

قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا : অর্থাৎ আবূ জেহেল ও আবু লাহাবের মত ঐসব লোকও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ঈমান না আনার বিষয়টি আল্লাহর ইলমে রয়েছে।

তাবলীগের উপকারিতা : কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এখন তাদের কাছে রাসূল ﷺ আর তাবলীগও করবেন না এবং তার জন্য তাবলীগ করা অযথা ও অর্থহীন কাজ। কেননা অর্থহীন কাজ ঐ সময় বলা হয়– যখন এর মধ্যে কোনো প্রকার উপকার না থাকে, অথচ তার জন্য এ কাজের বিনিময় ও ছওয়াব সদা–সর্বদার জন্যই রয়েছে। তাই سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ বলা হয়েছে سَوَاءٌ عَلَيْكَ বলা হয়নি। সারকথা হচ্ছে, তাবলীগ রাসূল ﷺ -এর নিজের জন্য উপকারী। কিন্তু আবূ [illegible] লোকদের জন্য নিষ্ফল। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ الخ : এখানে أَأَنْذَرْتَهُمْ -এর কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

এখানে মোট পাঁচটি কেরাত রয়েছে। যথা–

* উভয় হামজা স্পষ্ট করে পড়বে। এ সূরতে দু'টি কেরাত হবে। এক. দুই হামজার মাঝে আলিফ দাখেল করে পড়বে। দুই. হামজা দাখেল না করে পড়বে।
* দ্বিতীয় হামজা তাসহীল করে পড়বে। এ সূরতেও দু'টি কেরাত। এক. আলিফ দাখেল করে। দুই. আলিফ দাখেল না করে। এ হলো চারটি কেরাত।
* তাসহীল না করে দ্বিতীয় হামজাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে।

উপরিউক্ত পাঁচটি কেরাতকে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত তারতীবে বর্ণনা করেছেন–

١. بِتَحْقِيْقِ [illegible] تَحْقِيْقَ مَحْضٍ بِلَا اِدْخَالٍ

٢. اِبْدَالُ الثَّانِيَةِ [illegible]

٣. تَسْهِيْلُ [illegible]

٤. تَسْهِيْلُ [illegible]

٥. تَحْقِيْقُ [illegible] فِىْ تَرْكِ التَّسْهِيْلِ مَعَ اِبْقَاءِ الْاَلِفِ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ.

http://islamiboi.wordpress.com

أَيْ مَعَ مَدٍّ بَيْنَهُمَا مَدًّا طَبْعِيًّا : تَحْقِيْقُ الْهَمْزَةِ

تَسْهِيْل : بِأَنْ تَكُوْنَ بَيْنَ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ অর্থাৎ তাসহীল বলা হয় হামজার উচ্চারণ হামজা এবং هَا -এর মাঝামাঝি করা।

অধার্মিকতার অভিযোগ আল্লাহর উপর নয়, বান্দাদের উপর : لَا يُؤْمِنُوْنَ -এর ব্যাপারে এ সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, যখন আল্লাহ স্বয়ং তাদের ঈমান গ্রহণ না করার কথা বলেছেন, তার সংবাদের বিপরীত হওয়া যেহেতু অসম্ভব, তাই ঈমান গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে এখন তাদেরকে অপারগ মনে করতে হবে এবং তাদের উপর কোনো ধরনের অভিযোগ নেই।

অথচ প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা لَا يُؤْمِنُوْنَ [তারা ঈমান গ্রহণ করাবে না] একথা বলা এমনই, যেমন কোনো ডাক্তার কোনো বিপদসঙ্কুল রোগীকে দেখে তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করে দেয় এবং সে রোগী ডাক্তারের কথানুযায়ী ঐ সময় সত্যিই মরে যায়। তবে এ কারণে ডাক্তারের উপর কোনো অভিযোগ আসবে না। এ কথা বলা যাবে না যে, ডাক্তারের বলার কারণে রোগী মরে গেছে, যদি ডাক্তার না বলতো, তবে মরতো না; বরং এটাই বলা হবে যে, স্বয়ং ডাক্তারের এ কথা বলা "এ সময়ের মধ্যে মরে যাবে" রোগীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ছিল, যা সঠিক হয়েছে। এমনিভাবে এস্থানে আল্লাহর জানা ও সংবাদকে তাদের অধর্মিকতা ও দুরবস্থার কারণ বলা যাবে না; বরং স্বয়ং তাদের অন্যায় আচরণ, অপকর্ম ও অধার্মিকতাকে আল্লাহর সংবাদের কারণ সাব্যস্ত করা হবে। অর্থাৎ তাদের দুরবস্থার উপর ভিত্তি করে আল্লাহর এ সংবাদ দিয়েছেন, যা সঠিক হয়েছে। -[কামালাইন খ. ১. পৃ. ২৪]

فَلَا تَطْمَعْ فِيْ إِيْمَانِهِمْ : এ ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে রাসূল ﷺ-কে কাফেরদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ করছেন। প্রশ্ন জাগে যখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা বা না করা উভয়টি সমান হলো তাহলে ভীতি প্রদর্শনের উপকারিতা কি?

উত্তর : এর উপকারিতা হলো إِلْزَام حُجَّتْ বা তারা যেন কিয়ামতের দিন কোনো অনুজাত পেশ করতে না পারে। দ্বিতীয় জবাব হলো ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা কাফেরদের উপকার না হলেও ভীতির উপকার তাতে নিহিত রয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিদান তিনি প্রাপ্ত হবেন। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা আয়াতে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ বলেছেন سَوَاءٌ عَلَيْكَ বলেননি।

অধিকাংশ মুফাসসির لَا يُؤْمِنُوْنَ বাক্যকে পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যা ও তাকীদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য ভিন্ন একটি তারকীব করেছেন। তা হলো- لَا يُؤْمِنُوْنَ অংশটি إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا মুবতাদার খবর। আর উভয় বাক্যাংশের মাঝে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ অংশটি جُمْلَة مُعْتَرِضَة বা একটি স্বতন্ত্র ও মধ্যস্থিত বাক্য। অবশ্য মূল বক্তব্যের বিচারে উভয় বিন্যাসই অভিন্ন। -[বায়জাভী পৃ. ২৩]

وَالْإِنْذَارُ إِعْلَامٌ مَعَ تَخْوِيْفٍ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) إِنْذَار -এর অর্থ বর্ণনা করেছেন। إِنْذَار শব্দটি بَاب إِفْعَال -এর মাসদার। অর্থ কাউকে বস্তুকে ভয় দেখানো। পরিভাষায় إِنْذَار বলা হয় আল্লাহর বিধিবিধান সম্পর্কে সতর্ক করা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা।

প্রশ্ন ও উত্তর :

প্রশ্ন : রাসূল ﷺ -এর গুণাবলির মধ্যে بَشِيْر ও نَزِيْر উভয়টি রয়েছে। এখানে إِنْذَار -এর সাথে تَبْشِيْر -ও উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে কেবল একটির উপরই ক্ষান্ত করা হলো কেন?

উত্তর : إِنْذَار এবং تَبْشِيْر এর মধ্যে إِنْذَار টি হৃদয়ের মধ্যে অধিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। কেননা إِنْذَار দ্বারা دَفْع مَضَرَّت উদ্দেশ্য। যা جَلْب مَنْفَعَت -এর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং অধিক গুরুত্বপূর্ণটি যখন কাজে আসবে না, তখন تَبْشِيْر -ও কাজে আসবে না। তাই إِنْذَار -এর কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

٧. خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْثَقَ فَلَا يَدْخُلُهَا خَيْرٌ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط اَيْ مَوْضِعِهٖ فَلَا يَنْتَفِعُوْنَ بِمَا يَسْمَعُوْنَهٗ مِنَ الْحَقِّ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ غِطَاءٌ فَلَا يُبْصِرُوْنَ الْحَقَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ قَوِيٌّ دَائِمٌ ـ

অনুবাদ :

৭. আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন ছাপ মেরে দিয়েছেন, সুদৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং এতে কল্যাণকর কিছু প্রবেশ করতে পারছে না এবং তাদের কর্ণে অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ে। ফলে সত্য সম্পর্কে তারা যা কিছু শুনে তা দ্বারা কোনো উপকার লাভ করতে পারছে না এবং তাদের চক্ষুর উপর আবরণ আচ্ছাদন [বিদ্যমান] ফলে তারা সত্য অবলোকন করতে পারে না আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি যা কঠোর ও চিরস্থায়ী।

তাহকীক ও তারকীব

خَتَمَ ফেয়েল اللّٰهُ ফায়েল عَلٰى قُلُوْبِهِمْ মা'তূফ আলাইহি, عَلٰى سَمْعِهِمْ প্রথম মা'তূফ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ দ্বিতীয় মা'তূফ مَعْطُوْف عَلَيْهِ তার মা'তূফদ্বয় মিলে মাজরূর جَار مَجْرُوْر মিলে خَتَمَ ফেয়েলের সাথে مُتَعَلِّق পুরো جُمْلَه ফেলিয়া হয়েছে; غِشَاوَةٌ মুবতাদায়ে مُؤَخَّر - لَهُمْ খবরে مُقَدَّم উভয়টি মিলে جُمْلَه ইস্‌মিয়্যাহ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : এখানে কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কুফর ও নাফরমানিতে সদা-সর্বদা লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অন্তরসমূহ হক গ্রহণের যোগ্যতাশূন্য হয়ে পড়েছিল, তাদের কানসমূহ হক কথা শ্রবণ করতে উদ্বুদ্ধ ছিল না এবং তাদের দৃষ্টিসমূহ পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অবলোকন করতে অক্ষম, সেহেতু তারা কিভাবে ঈমান আনতে পারে? ঈমানতো ঐ সকল লোকদের অর্জন হতে পারে যারা আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতাসমূহের সঠিক ব্যবহার করে থাকে। মোটকথা خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এবং এর পরবর্তী বাক্য পূর্বের ইল্লত বা কারণ হিসেবে বিবেচ্য, অর্থাৎ এ সকল লোক ঈমান না আনার কারণ তাদের অন্তরে মোহর অঙ্কিত করা হয়েছে।

خَتَم -এর প্রকৃত অর্থ হলো ضَرْبُ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর মোহর বা সীল দিয়ে সেটিকে নির্ভরযোগ্য বানানো। خَتَم -এর দ্বিতীয় অর্থ হলো শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছানো। অর্থাৎ কোনো বস্তু পূর্ণাঙ্গ হওয়া এবং শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছার ক্ষেত্রেও মাজাযী বা রূপক অর্থে خَتَم শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– خَتَمْتُ الْقُرْاٰنَ

قَوْلُهٗ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : قُلُوْبٌ শব্দটি قَلْبٌ -এর বহুবচন। আর قَلْب হলো عِلْم -এর মহল বা ক্ষেত্র, যা একটি মাংসপিণ্ড। কখনো قَلْب দ্বারা বিবেক ও মারেফাত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রয়েছে–

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ الخ ـ

প্রশ্ন : মোহর লাগানো বলতে কি বোঝানো হয়েছে? আজ পর্যন্ত তো কোনো কাফেরের অন্তরই মোহর অঙ্কিত দেখা যায়নি। কেননা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অনেকের অন্তরই দেখা গেছে।

উত্তর : এখানে কলব দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় হৃদপিণ্ড উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে কলব মানে সেই হৃদয়, যা অনুভূতি, জ্ঞান ও ইচ্ছার উৎস। যেমন আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) উল্লেখ করেছেন–

فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْجِسْمُ الصَّنَوْبَرِيُّ الشَّكْلِ بَلِ الْمُرَادُ بِالْقُلُوْبِ الْعُقُوْلُ وَهِيَ اللَّطِيْفَةُ الرَّبَّانِيَّةُ الْقَائِمَةُ بِالشَّكْلِ الصَّنَوْبَرِيِّ قِيَامُ الْعَرَضِ بِالْجَوْهَرِ اَوْ قِيَامُ حَرَارَةِ النَّارِ بِالْفَحْمِ ـ (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ ص٢٢ ج١)

[illegible] : হযরত গ্রন্থকার মুসান্নিফ (র.) خَتَم -এর আসল অর্থ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কোনো বস্তুতে মোহর [illegible] কিন্তু এখানে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং اِسْتِعَارَة হিসেবে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। আর সেটি হলো [illegible] তাদের অন্তরে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তাদেরকে কুফর ও [illegible] প্রতি বিতৃষ্ণ করে দিয়েছে এবং সে অবস্থাটিকে [illegible]

[illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

আল্লামা সুলাইমান জমল (র.) বলেন-

هٰذَا بَيَانٌ لِمَعْنَى الْخَتَمِ فِى الْأَصْلِ وَهُوَ وَضْعُ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ وَضَبْعُهُ بِهِ صِيَانَةً لِمَا فِيهِ . وَلَيْسَ هٰذَا الْمَعْنٰى مُرَادًا هُنَا بَلِ الْمُرَادُ بِالْخَتَمِ عَدَمُ وُصُوْلِ الْحَقِّ إِلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَدَمُ نُفُوْذِهِ وَاسْتِقْرَارِهِ فِيْهَا . فَشُبِّهَ هٰذَا الْمَعْنٰى بِضَرْبِ الْخَاتَمِ عَلَى الشَّيْءِ تَشْبِيْهُ مَعْقُوْلٍ بِمَحْسُوْسٍ وَالْجَامِعُ اِنْتِفَاءُ الْقَبُوْلِ لِمَانِعٍ مِنْهُ وَكَذَا يُقَالُ فِى الْخَتَمِ عَلَى الْإِسْمَاعِ وَجَعْلِ الْغِشَاوَةِ عَلَى الْأَبْصَارِ . (جَمَل . ص٢٢ ج١)

মোহরাঙ্কিত ও পর্দাবৃতকরণের তাৎপর্য :

- জমহুর উলামা, মুফাসসিরীন ও মুতাকাল্লিমীন বলেন, আয়াতে বর্ণিত خَتَم এবং غِشَاوَة-এর মর্ম এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা বস্তুতেই অন্তর ও কানে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর কোনো পর্দা দিয়েছেন; বরং এর মর্ম হলো, এ সকল অহংকারী বিদ্বেষী প্রবৃত্তিপূজারী ও হক-হেদায়েতের দুশমনরা নিজের প্রকৃতিগত ও স্বভাবজাত বক্রতার কারণে এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, মন্দ স্বভাবসমূহ তাদের অন্তরে মজবুত স্থির হয়ে গেছে। ফলে প্রত্যেক অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যকলাপ তাদের কাছে ভালোও সুন্দর মনে হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি মজাদার মনে হয়। তাদের অবস্থা নাপাকির মাঝে বসবাসকারী পোকার মতো। দুর্গন্ধের সাথে যার প্রকৃতিগত আকর্ষণ ও আসক্তি রয়েছে এবং সুঘ্রাণের সাথে রয়েছে প্রকৃতিগত ঘৃণা। অনেক সময় তো এই পোকা আতরের তীব্র ঘ্রাণ সইতে না পেরে মরে যায়। অনুরূপ অবস্থা সেসব কাফেরের। কুফুরির নাপাকিতে আসক্ত এবং হক-হেদায়েতের খুশবুর প্রতি অনাসক্ত। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এই অবস্থাটি اِسْتِعَارَة স্বরূপ خَتَم এবং غِشَاوَة দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম হলো মোহর এবং পর্দা যেভাবে বাইরের বস্তুর ভিতরে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে তেমনি তাদের এ অবস্থা ও অন্তরে ঈমান ও হেদায়েত প্রবেশ করতে দেয় না এবং ভেতরের কুফরিও বাইরে আসতে দেয় না। এমনিভাবে তাদের কান হক কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। চোখ কোনো হক দেখতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এমন লোকদের ভীতি প্রদর্শন করা না করা সমান।
- ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন, আয়াতে উল্লিখিত خَتَم এবং غِشَاوَة বাহ্যিক ও বাস্তবের উপর ধর্তব্য। কাফেরদের অন্তর ও কানে বস্তুতেই একটি মোহর রয়েছে এবং চোখে বাস্তবেই পর্দা দেওয়া হয়েছে, যার আকৃতি অজ্ঞাত এবং যা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। আল্লাহর ফেরেশতারা সে মোহর এবং পর্দা দর্শন করেন এবং তা দেখে তারা বুঝে ফেলেন যে, এ কাফের কখনো ঈমান আনবে না। তাই তারা তার প্রতি অভিসম্পাত করেন। যেমনিভাবে তারা মু'মিনের অন্তকরণে ঈমানের চিত্র অঙ্কিত দেখে তার জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- أُولٰئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ সুতরাং মু'মিনের অন্তরে ঈমান লিপিবদ্ধ করা ও অঙ্কিত করার বিষয়টি যেমন বাস্তব, অনুরূপভাবে কাফেরদের অন্তরে মোহর ও চোখে পর্দার বিষয়টিও বাস্তব। كِتَابَتِ إِيْمَان-এর মতো كِتَابَتِ كُفْر وَخَتَم-এর ধরনও অজ্ঞাত। ফেরেশতারা যেমনিভাবে حِسًّا وَعِيَانًا মু'মিনদের অন্তরে ঈমানের চিত্র দর্শন করে অনুরূপভাবে তারা কাফেরদের অন্তরের মোহর এবং পর্দাও বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেন।

ইমাম বায়হাকী (র.) শোআবুল ঈমানের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মোহর অঙ্কনকারী ফেরেশতা আরশের খুঁটি ধরে দণ্ডায়মান থাকেন। যখন কেউ আল্লাহর হুকুমের অমর্যাদা করে, প্রকাশ্যে তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হয় ও তাঁরি সাথে বেয়াদবি ও দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে, তখন আল্লাহ তা'আলা দুঃসাহসী কাফেরের অন্তরে মোহর অঙ্কন করে দেওয়ার নির্দেশ করেন। যার ফলে সে কোনো হক গ্রহণ করতে পারে না। [অবশ্য ইমাম বায়হাকী (র.) এ হাদীসটির সনদ জয়ীফ বলে আখ্যা দিয়েছেন]।

সহীহ হাদীসসমূহেও এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মু'মিন যখন কোনো গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। পরবর্তীতে সে তওবা করলে এবং গুনাহ থেকে ফিরে এলে তা মুছে যায় এবং আরো কোনো গুনাহ করলে সে দাগ বাড়তে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তা তার পুরো অন্তরটিকে ঘিরে ফেলে। আর এটিই হলো সেই মরিচা যার কথা নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -[তিরমিযী]

আমরা যেভাবে বাহ্যিক কৃষ্ণতা ও মরিচা নিজেদের চোখে অবলোকন করি, তেমনিভাবে ফেরেশতারা আমাদের চেয়েও অধিক পরিমাণে বনী আদমের অন্তরের শুভ্রতা-কৃষ্ণতা ও মরিচা প্রত্যক্ষ করে থাকেন। ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন, رَيْن [মরিচা] -এর স্তর خَتَم এবং طَبْع -এর নিম্নে। خَتَم এবং طَبْع -এর স্তর اَقْفَال -এর নীচে আর اَقْفَال হলো অধিকতর কঠোর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- أَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন তার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতারা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়। -[তিরমিযী]

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা এক সফরে রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ একটি দুর্গন্ধ ভেসে এলো। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা জান এটা কিসের দুর্গন্ধ? অতঃপর বললেন, এ দুর্গন্ধ ঐ সকল লোকদের মুখ থেকে আসছে, যারা এ মুহূর্তে মুসলমানদের গিবত করছে। অর্থাৎ মুনাফিকদের মুখ থেকে। –[মুসনাদে আহমদ]

আমরা যদিও আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে মিথ্যা এবং গিবতের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারি না; কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতা ও নবী রাসূলগণ তা পরিপূর্ণভাবেই অনুভব করতে পারতেন। অনুরূপভাবে আমরা আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে কাফেরদের অন্তর মোহরাঙ্কিত দেখতে না পেলেও ফেরেশতারা তা দেখতে পান।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (র.). খ. ১, পৃ. ৫২]

কাফেরদের অন্তর কি প্রথম থেকেই মোহরাঙ্কিত ছিল? : প্রথম থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদের অন্তর মোহরাঙ্কিত ও চোখ পর্দাবৃত ছিল না; বরং এটি তাদের উপক্ষো-অহংকার ও অস্বীকৃতির শাস্তি স্বরূপ ছিল। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে :

১. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا .

২. فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ .

৩. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

বর্ণিত আয়াতসমূহের সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তরের মোহর ও চোখের পর্দা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, নবী হত্যা এবং অন্তরের বক্রতার শাস্তিস্বরূপ ছিল। তাদের প্রকাশ্য নাফরমানি এবং দুঃসাহসিকতার ফলে তাদেরকে চিরদিনের জন্য হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে এবং অন্তরে মোহর লাগিয়ে হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতাই বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে, মারেফাত এবং হেদায়াতের সকল পথ তাদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা সত্য শুনতেও পায় না, অনুভবও করতে পারে না এবং দেখতেও পারে না। এজন্য এখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা না করা উভয়টাই বরাবর।

এটা কি জুলুম হবে? : যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুরু থেকে কারো অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং স্বীয় তৌফিক এবং হেদায়েত থেকে মাহরুম করে দিয়েছেন তবুও তা বিন্দু পরিমাণ জুলুম হবে না। যেমন হযরত আতা ইবনে রাবাহ (র.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল, আল্লাহ তা'আলা যদি আমার জন্য হেদায়েত বন্ধ করে দেন এবং আমার ভাগ্যে গোমরাহী লিপিবদ্ধ করে দেন, তবে কি এটা জুলুম হবে না? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তোমার অধিকারভুক্ত কোনো বস্তু নিয়ে নেন, তাহলে এটা জুলুম হবে। আর যদি তিনি নিজের অধিকারভুক্ত বস্তুকে নিয়ে নেন, তাতে কোনো জুলুম হবে না। কারণ সেটা তার অধিকারভুক্ত। যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ . قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অনুরূপ হেদায়েতও আল্লাহ তা'আলার অধিকারভুক্ত বস্তু। তিনি তা অনুগতদেরকে প্রদান করেন এবং অহংকারী ও নাফরমানদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী (র.) : খ. ১, পৃ. ৫৩]

قُلُوْب এটা قَلْب -এর বহুবচন, অর্থ– বহুরূপী হওয়া, অন্তরও যেহেতু পরিবর্তন হয় এবং গতিসম্পন্ন থাকে, তাই অন্তরের অর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ قَلْب দ্বারা এ স্থানে গোশতের টুকরা ও দেহের অংশ উদ্দেশ্য নয়। কেননা ওটা তো সকল প্রাণীর মধ্যেই হয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত সূক্ষ্ম বোধশক্তি সম্পন্ন ক্ষমতা উদ্দেশ্য, যা গোশ্‌তের টুকরার সাথে এমনভাবে সংযুক্ত, যেমনভাবে আগুন কয়লার সাথে।

কাফেরদের قُلُوْب -কে সীলমোহরকৃত বস্তুর সাথে তাশ্‌বীহ দেওয়ার দ্বারা اِسْتِعَارَه بِالْكِنَايَة হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ عَلٰى سَمْعِهِمْ -এর অর্থ : মুফাস্‌সির জালাল (র.) اَيْ مَوَاضِعِهٖ এ অংশটি বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, خَتَم -এর সম্পর্ক سَمْع -এর দিকে মুযাফ مُقَدَّر -এর মাধ্যমে অর্থাৎ مَوْضِع سَمْع -এর দিকে, যদিও سَمْع -এর অর্থ শ্রবণ ও কর্ণ দুটির জন্য আসে। হ্যাঁ, قُلُوْب ও اَبْصَار -কে বহুবচন এবং سَمْع -কে একবচন আনার কয়েকটি নির্দেশনা হতে পারে, একটি নির্দেশনাতো এটা, যার দিকে মুফাস্‌সির জালাল (র.) مَوَاضِعِهٖ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করছেন। অর্থাৎ سَمْع মাসদার وَالْمَصْدَرُ لَا يُثَنّٰى وَلَا يُجْمَعُ [যা দু'বচন ও বহুবচন হয় না] এবং মুযাফ উহ্য আছে غِشَاوَة اَيْ مَوَاضِعِ السَّمْعِ -এর মধ্যেও রূপক ও اِسْتِعَارَه অবলম্বন করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ : عَذَاب বলা হয় اِيْصَالُ الْأَلَمِ اِلٰى حَيٍّ هَوَانًا وَذِلًّا অর্থাৎ কোনো প্রাণীকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করার জন্য কষ্ট দেওয়া, তাই অবুঝ শিশু ও পশুর কষ্টে লিপ্ত হওয়াকে আজাব বলা হয় না। কেননা তাতে হেয় করা বা লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য থাকে না। –[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ২২]

عَظِيْم অবস্থার কঠোরতার জন্য আসে বা ব্যবহার হয়, এর বিপরীত হচ্ছে حَقِيْر [তুচ্ছ, হীন, নগণ্য] আর পরিমাণের আধিক্যের জন্য كَبِيْر ও صَغِيْر পরস্পর আসে। কিন্তু عَظِيْم -এর মধ্যে كَبِيْر থেকে অধিক مُبَالَغَه রয়েছে। যেমন صَغِيْر -এর তুলনায় حَقِيْر -এর মধ্যে অধিক مُبَالَغَه হয়েছে। –[প্রাগুক্ত]

عَظِيْمٌ هُوَ ضِدُّ الْحَقِيْرِ وَاَصْلُهُ اَنْ تُوْصَفَ بِهِ الْاَجْرَامُ وَقَدْ تُوْصَفُ بِهِ الْمَعَانِيْ كَمَا هُنَا وَ لِهٰذَا قَالَ الشَّارِحُ قَوِيٌّ دَائِمٌ (جَمَل)

عَظِيْم শব্দটি যদিও اَجْرَام -এর সিফত কিন্তু কখনো مَعَانِي -এর জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং এখানে সে হিসেবেই হয়েছে।

قَوْلُهُ قَوِيٌّ : অর্থাৎ তাদের আযাব খুবই বড় ও ভয়ানক হবে। জাহান্নামের আজাব বড় এবং সেখানকার আযাবসমূহ দুনিয়া ও বরযখের আজাবের তুলনায় বড়। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার আজাব তুচ্ছ ও ছোট।

دَائِمٌ : অর্থাৎ তাদের আযাব চিরস্থায়ী হবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের আযাব হবে অল্প দিনের জন্য।

তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করা হলো কেন? আল্লামা সুলায়মান জামাল (র.) বলেন–

وَاِنَّمَا خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاَعْضَاءَ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهَا طُرُقُ الْعِلْمِ بِاللّٰهِ فَالْقَلْبُ مَحَلُّ الْعِلْمِ وَطَرِيْقُهُ اِمَّا السَّمْعُ وَاِمَّا الرُّؤْيَةُ (جَمَل ص۲۳ ج۱)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি অঙ্গকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ তিনটি অঙ্গ হলো জ্ঞান লাভের মাধ্যম ও উপায়। অন্তর হলো ইলমের মহল বা স্থান। আর এ ইলম অর্জিত হয় দুভাবে– ১. কানে শুনে, ২. চোখে দেখে।

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২২]

অন্তর এবং কানে মোহর আর চোখে পর্দা দেওয়া হলো কেন?

জালালাইন শরীফের হাশিয়াতে এর জবাব এভাবে রয়েছে–

وَلَمَّا اشْتَرَكَ السَّمْعُ وَالْقَلْبُ فِى الْاِدْرَاكِ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ جُعِلَ مَا يَمْنَعُهَا مِنْ خَاصِّ فِعْلِهِمَا الْخَتْمُ الَّذِىْ يَمْنَعُ مِنْ جَمِيْعِ الْجِهَاتِ وَاِدْرَاكُ الْاَبْصَارِ لَمَّا اخْتَصَّ بِجِهَةِ الْمُقَابَلَةِ جُعِلَ الْمَانِعُ مِنْهَا عَنْ فِعْلِهَا الْغِشَاوَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِتِلْكَ الْجِهَةِ. (ص٥ حاشية ٣)

অর্থাৎ অন্তর এবং শ্রবনেন্দ্রিয় সকল দিক থেকে জ্ঞান লাভ করে থাকে। তাই তা বন্ধ করার জন্য এমন প্রতিবন্ধক বস্তু আনা হয়েছে। যেটা আনা হয়েছে, সেটা চতুর্দিক থেকেই বারণকারী হয়। আর তা হলো خَتَم কোনো বস্তুতে মোহর লাগানো হলে তাতে আর কিছু প্রবেশের সুযোগ থাকে না। আর চোখ কেবল এক দিক থেকে তথা সম্মুখ দিক থেকে অনুভব করে থাকে বিধায় তার জন্য غِشَاوَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এক দিক বন্ধ করতে হলে পর্দাই যথেষ্ট।

কল্যাণ ও অনিষ্টের দর্শন : ঔষধ ও পথ্যসমূহের ন্যায় নেকী ও বদির প্রতিক্রিয়া হয়, যা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরা আধ্যাত্মিক চোখে দেখেন ও অনুভব করেন। যেহেতু সব জিনিসের স্রষ্টা আল্লাহ তাই خَتَم -এর সংযোগও নিজের দিকে করেছেন; কিন্তু এ কারণে বান্দা কোনোভাবেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ তো হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা এবং এর উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং বান্দাকে পার্থক্য করার ক্ষমতা দিয়েছেন। বান্দা নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছায় যে পথকে অবলম্বন করবে, সে ওটারই জিম্মাদার হবে।

পশুর মধ্যে কিংবা ছোট শিশু ও স্বল্পবুদ্ধির লোকদের মধ্যে যেহেতু এতটুকু উপলব্ধি বা অন্তর্দৃষ্টি থাকে না, যা দ্বারা এদের উপর ভার অর্পণ করা যায়। তাই এরা এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

এখন এ প্রশ্ন করা যে, যেমনিভাবে কোনো মন্দকাজ করা মন্দ ও অন্যায়, এমনিভাবে মন্দকে সৃষ্টি করাও মন্দ এবং অন্যায় হওয়া উচিত। এ প্রশ্ন সঠিক নয়। কেননা মন্দকাজ করার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাস্তব কোনো মঙ্গল নেই। পক্ষান্তরে অনিষ্টতার সৃষ্টির মধ্যে অজস্র কল্যাণ রয়েছে যেগুলো যদিও আমাদের জানা নেই। কিন্তু যখন অনিষ্টতার স্রষ্টাকে আমরা সাধারণত প্রজ্ঞাবান হিসেবে বিশ্বাস করি, আর فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ [প্রজ্ঞাবানের কোনো কর্ম বিচক্ষণতা থেকে খালি নয়] স্বীকৃত বিধান রয়েছে, তবে একই বস্তুকে সৃষ্টি করা উত্তম কাজ এবং এর ব্যবহার অবশ্য মন্দ বুঝা যায়। যেমনিভাবে মধু ও বিষের প্রতিশেধককে সৃষ্টি করা জরুরি, এমনিভাবে সর্প, বিচ্ছু ও বিষাক্ত প্রাণীর সৃষ্টি গোটা জগতের জন্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু সর্প, বিচ্ছু ও বিষকে অস্থানে ব্যবহার দ্বারা যে ধ্বংস পতিত হবে, ওটাকে কোনো বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তি ভাল বলবে না।

–[কামালাইন– খ.১, পৃ. ২৫]

http://islamiboi.wordpress.com

٨. وَنَزَلَ فِى الْمُنَافِقِيْنَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِاَنَّهٗ اٰخِرُ الْاَيَّامِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ رُوْعِىَ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ وَفِىْ ضَمِيْرِ يَقُوْلُ لَفْظُهَا.

٩. يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاِظْهَارِ خِلَافِ مَا اَبْطَنُوْهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ اَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ لِاَنَّ وَبَالَ خِدَاعِهِمْ رَاجِعٌ اِلَيْهِمْ فَيَفْتَضِحُوْنَ فِى الدُّنْيَا بِاِطِّلَاعِ اللّٰهِ نَبِيَّهٗ عَلٰى مَا اَبْطَنُوْهُ وَيُعَاقَبُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَا يَشْعُرُوْنَ. يَعْلَمُوْنَ اَنَّ خِدَاعَهُمْ لِاَنْفُسِهِمْ وَالْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ كَعَاقَبْتُ اللِّصَّ وَذِكْرُ اللّٰهِ فِيْهَا تَحْسِيْنٌ وَفِيْ قِرَاۤءَةٍ وَمَا يَخْدَعُوْنَ.

অনুবাদ :

৮. মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মানুষের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহ ও শেষ দিবসে অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে। কেননা এটাই সর্বশেষ দিন অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা বিশ্বাসী নয় এখানে مَنْ শব্দটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। [তাই مُؤْمِنِيْنَ শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে] তাই পূর্বে يَقُوْلُ ক্রিয়া পদটি একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

৯. তারা প্রতারিত করতে চায় আল্লাহ ও বিশ্বাসীগণকে স্বীয় মনের প্রকৃত বিশ্বাস কুফরির বিপরীত বিষয় ঈমান প্রকাশ করে, তাদের [কাফেরদের] সম্পর্কে ইসলামের জাগতিক বিধান [হত্যা যুদ্ধ ইত্যাদি] বিষয়সমূহ নিজেদের হতে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে ছাড়া কাউকেও প্রতারিত করছে না কেননা এই প্রতারণার অশুভ পরিণাম তাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হবে। অনন্তর তারা এই পৃথিবীতেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে আর পরকালে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে অথচ এটা তারা বুঝতে পারছে না। অর্থাৎ নিজেদের সাথেই যে মূলত এই প্রতারণা করছে তা তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। اَلْمُخَادَعَةُ [অর্থ পরস্পর প্রবঞ্চনা করা; তবে] -এ স্থানে এটা এক পক্ষ হতে প্রবঞ্চনা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন عَاقَبْتُ اللِّصَّ চোরকে শাস্তি প্রদান করেছি, অর্থ পরস্পর শাস্তি প্রদান নয়। يُخَادِعُوْنَ -এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটির উল্লেখ تَحْسِيْن অর্থাৎ আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। يُخَادِعُوْنَ ক্রিয়াটি অপর এক কেরাত অনুসারে وَمَا يَخْدَعُوْنَ -রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

تَقْدِيْر। -এর مَنْ মুতা'আল্লিক হয়ে রফা দানকারী হয়েছে وَمِنَ النَّاسِ জুমলা হয়ে সিফত يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ মউসূফ, مَنْ اِنَّ [বাক্যের নিরূপণ] এমন وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ পূর্ণ জুমলা হয়ে পূর্বের জুমলা اَلَّذِيْنَ -এর উপর عَطْف হয়েছে কিংবা كَلَام اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর উপর عَطْف হয়েছে এবং مَنْ মউসূলও হতে পারে। مَا -এর ইসম هُمْ আর بِمُؤْمِنِيْنَ তার খবর।

خِدَاع -এর অর্থ : গোপনের বিপরীতকে প্রকাশ করা। আরববাসীরা বলেন– ضَبٌّ خَادِعٌ যখন গুইসাপ এক গর্ত দিয়ে ঢুকে অন্য গর্ত দিয়ে বের হয়। مَخْدَعَان গর্দানের বিশেষ গোপন শিরাগুলোকে বলে। مَخْدَعُ الْبَيْتِ অর্থ– ঘরের কামরা।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اَلنَّاسِ : কেউ বলেন, اَلنَّاسِ হলো বহুবচন ইসিম। শব্দগতভাবে এর কোনো একবচন নেই। أُنَاسٌ হলো তার সমার্থক শব্দ। যা বহুবচন। এর এক বচন হলো اِنْسَانٌ বা اَنْسِيٌّ কেউ বলেন, এটি মূলত أُنَاسٌ ছিল। تَخْفِيْف করণার্থে هَمْزَة-কে হজফ করা হয়েছে। সূরা ইসরাতে এই মূল ব্যবহারটি লক্ষণীয়- يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ইমাম সিবওয়াই ও ফাররা (র.)-এর মতে- أُنَاسٌ-এর মূলধাতু হলো هَمْزَة . نُوْن . سِيْن আর ইমাম কিসাই (র.)-এর মতে نُوْن . وَاو . سِيْن অর্থাৎ اَلنَّوْسُ থেকে নির্গত। যার অর্থ নড়াচড়া করা। نَاسَ يَنُوْسُ نَوْسًا নড়াচড়া করা। -[লুগাতুল কুরআন] وَاو মুতাহাররিক তার পূর্বে ফাতাহ হওয়ায় وَاو-কে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর يَاء-কে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

اَللِّصُّ ব-ব لُصُوْصٌ অর্থ- দস্যু, অপহরণকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত কুরআনে দু'ধরনের মানুষের আলোচনা করা হয়েছে।

১. আল্লাহর বিধানের অনুগত, ফরমাবরদার মু'মিন।

২. নাফরমান কাফের, তথা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। এখান থেকে তৃতীয় প্রকার লোকদের বর্ণনা, যাদের প্রকাশ্য রূপ ছিল ভিন্ন এবং গোপন রূপ ছিল ভিন্ন। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও মা'তাব ইবনে কোশাইর প্রমুখ। যাদেরকে মুনাফিকীন বলা হয়। এখানে থেকে মুনাফিকদের কতিপয় ইতর স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে خِدَاع বা ধোঁকার কথা বলা হয়েছে।

নিফাক -এর প্রকারসমূহের ব্যাখ্যা : নিফাক দু'প্রকার হয়। যথা-

প্রথম প্রকার হচ্ছে- نِفَاقٌ فِى الْعَمَلِ [কাজ বা কার্যক্ষেত্রে নিফাক] যার বাস্তবতা বা সংগঠন বর্তমানে অনেক।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে- نِفَاقٌ فِى الْاِعْتِقَادِ [বিশ্বাস পোষণে নিফাক] এর তিনটি আকৃতি বা রূপ। একটি হচ্ছে- মুহাম্মদ ﷺ সত্য পয়গাম্বর হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে একেবারেই বিশ্বাস ছিল না; বরং অস্বীকারকারী ছিল। কিন্তু দুনিয়াবী কোনো কোনো কল্যাণকে সামনে রেখে হৃদয়ের ঐ আবেগের বিপরীত প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অন্তরের দ্বিধা, এমন যে মুসলমানদের ভালো অবস্থা দেখে কোনো কোনো সময় অন্তর তাদের দিকে ধাবিত হয়ে যায়, কিন্তু দুরবস্থাসমূহ সামনে আসলে পরে পুনরায় মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা এসে যায়।

তৃতীয়টি হচ্ছে- অন্তরে রাসূল ﷺ -এর সততার কিছুটা আলো তো আছে কিন্তু দুনিয়াবী স্বার্থ পুনরায় প্রবল হয় এবং তাকে ইসলামের বিরোধিতার উপর আগে বাড়িয়ে দেয়। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২৭]

নিফাকের সূচনা ও উৎপত্তিস্থল : সূরা বাকারা হচ্ছে মাদানী সূরা। মদীনায় বিস্তর মুনাফিক ছিল। রাসূল-বিদ্বেষ ও ইসলাম বৈরিতায় এরা প্রকাশ্য কাফেরদের চেয়ে মোটেই পিছিয়ে ছিল না; বরং এক ধাপ এগিয়েই ছিল। নিফাক তথা ইসলামের মিথ্যা দাবি মক্কায় ছিল না। সেখানে বরং অবস্থা এই ছিল যে, মু'মিনরাও ঈমান গোপন রেখে কাফেরদের মাঝে মিশে থাকত। নিফাকের সূচনা হয় মদীনায়। আর তাও বদর যুদ্ধের পরে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে কিছু সুযোগসন্ধানী লোক নিছক ছলনাবশত নিজেদেরকে মু'মিন ও মুসলিম বলে পরিচয় দিত। ঈমান ও বিশ্বাসের কোনো বালাই ছিল না তাদের। এ দলটির নটবর ছিল খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। প্রতিপক্ষ গোত্রেও তার অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সে ছিল সমসাময়িক আরবদের এক সফল নেতা। গোটা জনপদ তার নেতৃত্বের অনুগত ছিল এমনকি তাকে বাদশাহ ঘোষণা করার আয়োজনও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখতে দেখতে মদীনায় ইসলাম দৃঢ়মূল হলো। নিজের সাজানো বাগান লণ্ডভণ্ড হতে দেখে নিজ অনুসারীদের কানে সে মন্ত্রণা দিল অন্তরে নিজস্ব আকীদা বদ্ধমূল রেখে মুখে ইসলামের কালিমা গেয়ে বেড়াও। আওস-খাজরাজের বাইরে ইহুদিদের একদল বিবেক-বেচা গাদ্দার স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাব্বাইক বলে এ আন্দোলনে যোগ দিল। তবে মক্কার কোনো মুহাজির এতে ছিল না।

http://islamiboi.wordpress.com

ইসলামের নিকৃষ্ট শত্রু : এ তিন প্রকার লোক রাসূল এর কল্যাণময় যুগে বিদ্যমান ছিল এবং এ লোকগুলো ইসলামের নিকৃষ্ট শত্রু ও আস্তীনের সর্প প্রমাণিত হয়েছিল। এ পর্দার আড়ালের শত্রু দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, প্রকাশ্য শত্রুদের দ্বারা ততটুকু ক্ষতি হয়নি। তাই সূরা মূনাফিকূন, সূরা তওবা ও সূরা বাকারার পূর্ণ এক রুকু এবং অন্যান্য অনেক আয়াতের মধ্যে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে. আর يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ এবং اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ আয়াতে কঠোরতর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রাণ উৎসর্গকারী ও একনিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম এ নির্দেশ শুনে এত অধিক ভীত হয়ে পড়লেন যে, প্রকাশ্যে ও গোপনের বিন্দু পরিমাণ বিরোধিতার উপর তাদের নিজেদের মধ্যে নিফাক্বের সন্দেহ হতে লাগলো।

সুতরাং হযরত হানজালা (রা.) একদা এ অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে نَافَقَ حَنْظَلَةُ বলে চিৎকার আরম্ভ করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) নিজ অবস্থার উপর ধ্যান করেছেন তখন তার নিজের ব্যাপারে ঐ সন্দেহ হয়েছে। অবশেষে এ সমস্যা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে পেশ করা হলে রাসূল ﷺ তাকে পূর্ণ সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি সর্বদা তোমাদের এ অবস্থাই থাকে- যা আমার মজলিসে হয়, তবে যে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় উপস্থিত হয়ে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতে শুরু করবেন, কিন্তু কখনো এ রকম হবে, কখনো ও রকম হবে। অর্থাৎ ইসলামের জন্য কখনো অন্তর পূর্ণ ধাবিত থাকবে, আবার কখনো পূর্ণ ধাবিত থাকবে না। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ২৭]

مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : **মুনাফিকদের প্রথম চরিত্র :**

قَوْلُهُ اَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ : এই ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে বলে দেওয়া হয়েছে যে. يَوْمُ الْاٰخِرَةِ দ্বারা يَوْمُ الْقِيَامَةِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হিসাব কিতাব এবং আমলের প্রতিদানের দিন। আর এই দিনের প্রতি ঈমান রাখা দীনের অপরিহার্য বিষয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اٰخِرُ الْاَيَّامِ : এ ইবারত দ্বারা يَوْمُ الْاٰخِرَةِ -এর নামকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ رُوْعِىَ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ وَفِىْ ضَمِيْرِ يَقُوْلُ لَفْظُهَا : এখানে একটি ইশকালের জবাব দিয়েছেন। **ইশকালটি হলো-** আয়াতের শুরুতে يَقُوْلُ -কে একবচন আনা হয়েছে এবং শেষে وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -কে বহুবচন আনা হলো কেন?

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) উক্ত ইবারতটি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এখানে من শব্দটির অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। [তাই مُؤْمِنِيْنَ শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে]। আর يَقُوْلُ ক্রিয়া পদটির সর্বনামে তার [مَنْ শব্দটির] শাব্দিক আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, [তাই পূর্বে يَقُوْلُ ক্রিয়া পদটি একবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এখানে মুনাফিকদের দ্বিতীয় পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা হলো ধোঁকা দেওয়া। يُخَادِعُوْنَ বাবে مُفَاعَلَة -এর اَلْمُخَادَعَةُ মাসদার থেকে جَمْع مُذَكَّر غَائِب -এর সীগা। অর্থ– তারা পরস্পরে ধোঁকা দেয়।

قَوْلُهُ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ اَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ : তাদের [কাফেরদের সম্পর্কে কুফরের জাগতিক বিধান তথা হত্যা, যুদ্ধ. জিযইয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ] নিজেদের হতে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهُ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ : অর্থাৎ তারা মুনাফিকি করে কারো ক্ষতি করে না; বরং নিজেদেরই ক্ষতি করে। একপটতার পরিণাম তাদের উপরই বর্তাবে। আর সে ক্ষতি হলো আখেরাতের আজাব এবং দুনিয়াতে লজ্জিত হওয়া ইত্যাদি।

এখানে يَعْلَمُوْنَ না বলে يَشْعُرُوْنَ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে. মুনাফিকদের এই প্রতারণা ও ধোঁকাবাজিতে যে ক্ষতি হচ্ছে, তা বস্তুগত হওয়ার পাশাপাশি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ব্যাপার। কিন্তু এই নির্বোধরা গাফলতির আধিক্যতায় এটাও অনুভব করে না। –[কাশশাফ সূত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ৪০]

عُبِّرَ بِالشُّعُوْرِ دُوْنَ الْعِلْمِ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّهُمْ لَمْ يَصِلُوْا اِلٰى رُتْبَةِ الْبَهَائِمِ فَاِنَّ الْبَهَائِمَ يَمْتَنِعُ عَنِ الْمَضَارِّ فَلَا تَقْرَبُهَا لِشُعُوْرِهَا بِخِلَافِ هٰؤُلَاءِ. (صَاوِى)

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ : ইন্দ্রিয় জ্ঞানকে আরবিতে شُعُوْر বলে। এটাকেই আমরা অনুভূতি বলি।

قَوْلُهُ اَلْمُخَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ : এই অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : يُخَادِعُوْنَ ক্রিয়া بَاب مُفَاعَلَة শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণির বৈশিষ্ট্য হলো مُشَارَكَة বা দু'পক্ষ থেকে ক্রিয়া বিনিময়। মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ধোঁকা প্রতারণার বিষয়টি তো বুঝে আসে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি এই মন্দ স্বভাবের নিসবত করাটি বুঝে আসে না। কেননা ধোঁকা ও প্রতারণা হলো ইতর স্বভারের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

উত্তর : بَاب مُفَاعَلَة যদিও উভয় দিক থেকে অংশগ্রহণ দাবি করে; কিন্তু এটা قَاعِدَة كُلِّيَّة নয়। কারণ তার একটি বৈশিষ্ট্য مُوَافَقَت مُجَرَّد তথা ثُلَاثِى مُجَرَّد -এর অর্থ প্রদানও রয়েছে। যেমন عَاقَبْتُ اللِّصَّ وَسَافَرَ بِمَعْنٰى سَفَرَ সুতরাং এখানে خَادَعَ ক্রিয়াটিও خَدَعَ -এর অর্থে ধর্তব্য হবে। আর مُفَاعَلَة শ্রেণির ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে নিছক জোর প্রদান করার উদ্দেশ্যে।

اَلْمُفَاعَلَةُ لِإِفَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِى الْكَيْفِيَّةِ (اَبُو السُّعُوْدِ)

قَوْلُهُ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ :

প্রশ্ন : উপরের জবাব থেকে তো বোঝা গেল, আল্লাহ ধোঁকা দেন না। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হলো আল্লাহ তা'আলা তো হলেন অন্তর্যামী, তাঁর কাছে কোনো বিষয়-ই গোপন থাকে না। তাহলে মুনাফিকরা তাঁকে কিভাবে ধোঁকা দেয়?

উত্তর :

১. **সত্যের অব্যাহত বিরুদ্ধাচারণ এবং সত্যকে** অস্বীকার করার ঔদ্ধত্য তাদের এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, নিজেদের **আত্মপ্রসাদ আর ধারণা মতে** আল্লাহ তা'আলাকে পর্যন্ত তারা প্রতারিত করেছে। তাই মূল তরজমা হবে- তারা প্রতারিত করতে চায়। (اِجْتَرَءُوْا عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى ظَنُّوْا يَخْدَعُوْنَ اللّٰهَ (اِبْنُ جَرِيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

২. এমন অর্থও হতে পারে যে, রাসূল ﷺ -এর সাথে প্রতারণার অপচেষ্টাকে কুরআন খোদ আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা বলে ধরে নিয়েছে। এর আরো দৃষ্টান্ত কুরআনে আছে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো কর্মটির জঘন্যতা প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ وَ ذِكْرُ اللّٰهِ فِيْهَا تَحْسِيْنٌ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা উল্লিখিত ইশকালেরই জবাব দিতে চাচ্ছেন এভাবে যে, يُخَادِعُوْنَ -এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটির উল্লেখ تَحْسِيْن অর্থাৎ আলঙ্ককারিক সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মূলত ইবারতটি এভাবে হবে- يُخَادِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

এছাড়াও এর আরো জবাব এই যে, এখানে বালাগাতের নিয়ম اِسْتِعَارَة تَمْثِيْلِيَّة হয়েছে مُشَبَّه بِه -কে مُشَبَّه -এর জন্য مُسْتَعَار নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে মুনাফিকদের আচরণটি ঐ ব্যক্তির অবস্থার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যে স্বীয় সঙ্গীর সাথে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক আচরণ করে। অথবা مَجَاز عَقْلِى হিসেবে আল্লাহর দিকে ধোঁকার নিসবত করা হয়েছে। যেমন- فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى -এর মধ্যে اِسْنَاد টি مَجَازِى বা রূপক অর্থে হয়েছে। অথবা مُشَاكَلَة রূপে خِدَع -এর নিসবত আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আয়াত جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মাঝে হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠. فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ شَكٌّ وَنِفَاقٌ فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوْبَهُمْ اَىْ يُضْعِفُهَا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج بِمَا اَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ لِكُفْرِهِمْ بِهٖ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ اَيْ نَبِيَّ اللّٰهِ وَبِالتَّخْفِيْفِ اَيْ فِيْ قَوْلِهِمْ اٰمَنَّا ـ

১০. তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি সন্দেহ ও কপটতা, ফলে এ ব্যাধি তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত অর্থাৎ দুর্বল করে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করেছেন কুরআনের যে অংশ [নতুন নতুন] নাজিল করেছেন তার দ্বারা, কেননা [যতবারই নতুন বিধান ও আয়াত নাজিল হয়েছে] তারা সেটাকে অস্বীকার করেছে। [এই অস্বীকৃতি ও কুফরির দরুন তাদের ঐ ব্যাধি বৃদ্ধি পেয়ে চলছে] ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক যন্ত্রণাকর শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। يَكْذِبُوْنَ ক্রিয়াটির ذ হরফটি] তাশদীদসহ। بَاب تَفْعِيْل হতে গঠিত ক্রিয়ারূপ] পঠিত হলে এর মর্ম হবে আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করার দরুন তাদের এই পরিণতি আর ذ হরফটি তাখফীফ অর্থাৎ তাশদীদ ব্যতিরেকে লঘু আকারে [بَاب ضَرَبَ হতে গঠিত ক্রিয়ারূপ] পঠিত হলে এর মর্ম হবে ঈমান এনেছে বলে তাদের মিথ্যা ভাষণের দরুন।

١١. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَيْ لِهٰؤُلَاءِ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ لِلْكُفْرِ وَالتَّعْوِيْقِ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ ـ

১১. যখন তাদেরকে বলা হয় উক্ত লোকদেরকে অশান্তি সৃষ্টি করো না পৃথিবীতে, সত্য প্রত্যাখ্যান এবং ঈমান হতে লোকজনকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে তারা বলে, আমরা তো সংশোধনবাদী মাত্র। আমরা যে কাজ করছি সেটা বিশৃঙ্খলা নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেন।

١٢. اَلَآ لِلتَّنْبِيْهِ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ بِذَالِكَ

১২. সাবধান! اَلَا শব্দটি সতর্কবাচক অব্যয়। তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না।

١٣. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط الْجُهَّالُ اَيْ لَا نَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ـ

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরাও বিশ্বাস কর অপরাপর লোকদের মতো রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণের মতো, তারা বলে নির্বোধগণ অজ্ঞ, মূর্খগণ যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেইরূপ বিশ্বাস করব? অর্থাৎ আমরা তাদের ন্যায় কাজ করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদে ইরশাদ করেন– সাবধান! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা তা জানে না।

তাহকীক ও তারকীব

فِيْ قُلُوْبِهِمْ খবরে মুকাদ্দাম এবং مَرَضٌ মুবতাদায়ে মুআখখার : [illegible]
[illegible] يَكْذِبُوْنَ [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

لَهُمْ খবর. مَرَضٌ [ব্যাধি] শরীরের অস্বাভাবিক ও অসামঞ্জস্য অবস্থা। مَجَازًا [রূপকার্থে] আত্মিক বদ অভ্যাসগুলোকেও বলে। এ স্থানে এটাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ شَكٌّ وَنِفَاقٌ : মুফাসসির (র.) مَرَضٌ -এর ব্যাখ্যায় এ দুটি শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَرَضٌ দ্বারা রূহানী ব্যাধি উদ্দেশ্য।

بِمَا اَنْزَلَهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ لِكُفْرِهِمْ بِهٖ : এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে زِيَادَتْ مَرَضٌ বা রোগ বৃদ্ধি দ্বারা কুফর উদ্দেশ্য। এভাবে যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিধি-বিধানের মুকাল্লাফ বালাচ্ছেন আর তারা তা অস্বীকার করছে। রাসূল ﷺ-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে আর তারা অস্বীকার করছে। এভাবে যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের রূহানী রোগ-ব্যাধিতে বৃদ্ধি ঘটেছে।

زَادَ -এর সম্পর্ক خَتَمَ -এর মতো আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে করেছেন। তাই মু'তাযিলাদের জন্য দলিল পেশ করার সুযোগ নেই। اَلِيْمٌ - فَعِيْلٌ -এর ওজনে। জালাল মুফাস্সির (র.) এরপরে مُؤْلِمٌ বের করে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এটাকে ইস্‌মে ফায়েলের অর্থেও নেওয়া যায়। عَذَابٌ কষ্টদায়ক হয় এবং অর্থের দিক দিয়ে ইসমে মাফউলও নেওয়া যায়, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে مُبَالَغَة এত ভয়াবহ শাস্তি হবে যে. عَذَابٌ স্বয়ং কষ্টে পড়বে كَالنَّارِ اِذَا اشْتَدَّتْ يَاْكُلُ بَعْضُهُ بَعْضًا

بِالتَّشْدِيْدِ : অর্থাৎ يُكَذِّبُوْنَ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে. একটি হলো তাশদীদসহ অপরটি তাশদীদ ছাড়া। প্রথম কেরাতটি [তাশদীদসহ] بَابُ تَفْعِيْلٌ -এর মাসদার تَكْذِيْبٌ [তাশদীদসহ] بَابُ تَفْعِيْلٌ -এর এটি تَكْذِيْبٌ [মিথ্যা প্রতিপন্ন করা] থেকে। এ সূরতে এটি مُتَعَدِّىْ হবে এজন্য মুফাস্সির (র.) اَىْ نَبِيَّ اللّٰهِ উল্লেখ্য করে তার মাফউলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন

وَبِالتَّخْفِيْفِ : এটি ইমাম আসেম এবং কিসাঈ (র.)-এর কেরাত। এ সূরতে অর্থ হতে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। শাস্তি এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলে।

اَىْ فِىْ قَوْلِهِمْ اٰمَنَّا : অর্থাৎ تَخْفِيْف -এর কেরাত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে তারা নিজেদের বক্তব্য اٰمَنَّا بِاللّٰهِ -এর মাঝে মিথ্যুক।

اِذَا - শর্তিয়াহ, قِيْلَ -এর নায়েবে ফায়েল হলো لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ; لَهُمْ মুতা'আল্লিক্ব قَالُوْا ফেয়েল বা-ফায়েল, জুমলা হয়ে মুবতাদা, اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ জুমলা হয়ে খবর হয়ে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। اَلَا হরফে তাম্বীহ বাক্যের প্রথমে আনা হয়, اِنَّ -এর اِسْم যমীরে هُمْ , هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ জুমলা اِنَّ -এর খবর لٰكِنْ ইস্তিদরাকিয়াহ্। فَسَاد সামঞ্জস্যতার সীমা থেকে বের হয়ে যাওয়া। এর বিপরীত হচ্ছে اِصْلَاح - قِيْلَ -এর নায়েবে فَاعِل হয়ত মু'মিনীন তা না হয় রাসূল ﷺ। অথবা আল্লাহ তা'আলা। হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান এবং কাতাদাহ্ (রা.)-এর মতে এখানে فَسَاد দ্বারা উদ্দেশ্য গুনাহ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ, যেগুলোর কারণে জাহেরী ও বাতেনী সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ ـ

قَوْلُهُ التَّعْوِيْقُ : بَابُ تَفْعِيْلٌ -এর মাসদার। অর্থ– বাঁধা দেওয়া, বিরত রাখা, কোনো কাজে প্রতিবন্ধক হওয়া। এখানে অর্থ হলো– تَعْوِيْقُ الْغَيْرِ عَنِ الْاِيْمَانِ [কাউকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে রাখা]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ : اَلَمَ (س) اَلَمًا -ব্যথা অনুভব করা। اَلِيْمٌ ইসমে ফায়েলের অর্থ হলো ব্যথা অনুভবকারী।

প্রশ্ন : عَذَابٌ -এর সিফত হিসেবে اَلِيْمٌ আনা শুদ্ধ নয়। কেননা আজাব দ্বারা তো যাকে আজাব দেওয়া হবে, সে কষ্ট পাবে, আজাব কষ্ট পাবে না।

উত্তর : এ সংশয় নিরসনকল্পেই বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) مُؤْلِمٌ শব্দটি বৃদ্ধি করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মূলত শব্দটি اِيْلَامٌ [ব্যথা দেওয়া] থেকেই কিন্তু মোবালাগা স্বরূপ এখানে اَلِيْمٌ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন কঠিন শাস্তি, যার প্রচণ্ডতার কারণে স্বয়ং আজাবও কষ্ট অনুভব করে।

وَوَجْهُ الْمُبَالَغَةِ اَنَّ اِفَادَةَ الْاَلَمِ بَلَغَ الْغَايَةَ حَتّٰى سَرٰى مِنَ الْمُعَذَّبِ اِلَى الْعَذَابِ [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

ফায়দা : পূর্বে ৭নং আয়াতে কাফেরদের ব্যাপারে যে আজাবের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার সিফত عَظِيْم ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে মুনাফিকদের যে আজাবের ধমকি দেওয়া হচ্ছে, তার সিফত اَلِيْم ব্যবহার করা হয়েছে। আর اَلِيْم অর্থ বেদনাদায়ক শাস্তি। যেন তার মাঝে শাস্তির দিকটা অধিক। এর কারণ এই যে, যারা মুনাফিক, তারাও কাফের। কিন্তু তাদের অপরাধ অনেক জঘন্য ও সাংঘাতিক। কেননা তারা কুফরির পাশাপাশি ধোঁকা, প্রতারণা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়ে বলেছেন : اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে থাকবে। -[সূরা নিসা : ১৪৫]

বাস্তবের বিপরীত কথাকে كِذْب বলে এবং কারো কারো দৃষ্টিতে বিশ্বাসের বিপরীত, আর কারো কারো দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও বাস্তবের বিপরীত উভয়টি (كِذْب) মিথ্যার জন্য শর্ত। এমনিভাবে এর বিপরীত صِدْق -এর মধ্যেও তিনটি ব্যাখ্যা হবে। কাজী বায়যাবী (র.) ও আল্লামা যমখ্শারী (র.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, এর দ্বারা (كِذْب) মিথ্যা ব্যাপকভাবে ও সাধারণভাবে হারাম হওয়া বুঝা গেল। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এটা যে, (كِذْب) মিথ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, কোনোটি হারাম, কোনোটি মাকরূহ, কোনোটি মুবাহ। কোনোটি মনদূব, কোনোটি ওয়াজিব, ব্যবহারের স্থান বিশেষে পার্থক্য হবে। যেমনটি ফেকহর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

يُكَذِّبُوْنَ যদি مُشَدَّد ক্বেরাত হয়। তবে বাবে تَفْعِيْل থেকে মুফাস্সির আল্লাম (র.) মাফউলকে حَذْف -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। اَىْ نَبِيَّ اللّٰهِ এবং যদি بِالتَّخْفِيْفِ হয়, তবে ছুলাছী মুজাররাদ থেকে।

قَوْلُهُ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ : এখানে بَاء হরফটি سَبَبِيَّه বা কারণ দর্শানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থ তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলত। এখানে মিথ্যা বলা ক্রিয়া পদের দ্বারা ইসলাম গ্রহণের দাবি অর্থাৎ মহান আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি তাদের ঈমানের মিথ্যা দাবির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মর্মন্তুদ শাস্তি বাস্তবিক পক্ষে তাদের কপটতার জন্য; সাধারণভাবে মিথ্যা বলার জন্য নয়। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৪, টীকা. ৮]

قَوْلُهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ : মুনাফিকদের কতিপয় গর্হিত স্বভাব ও কর্মের কথা তুলে ধরা হলো। পূর্বের আয়াতে ধোঁকার কথা বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় স্বভাবটি উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো নিজেরা সন্ত্রাসী হওয়া সত্ত্বেও অপরকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেওয়া।

قَوْلُهُ قِيْلَ لَهُمْ : قِيْلَ মাজহুলের সীগাহ। অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়, এখন কথা হলো قَائِل বা বক্তা কে? এ ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. আল্লাহ তা'আলা ২. রাসূল ﷺ ৩. কতিপয় মু'মিন।

قَوْلُهُ لِهٰؤُلَا : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতের মেসদাক ঐ সকল মুনাফিক, যারা পূর্বের আয়াতের মেসদাক ছিল এবং لَهُمْ -এর জমিতে মুত্তাসিল, তাদের দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ : فَسَاد অর্থ- خُرُوْجُ الشَّىْءِ عَنِ الْحَالَةِ اللَّائِقَةِ (صَاوِى) خُرُوْجُ النَّبِيِّ عَنِ الْاِعْتِدَالِ (جَمَل) আয়াতে মুনাফিকদেরকে যে বিশৃঙ্খলা থেকে বারণ করা হচ্ছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরি ও অন্যের ঈমান গ্রহণে প্রতিবন্ধক হওয়া। কেননা কুফর এবং নাফরমানির কারণে জমিনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ছড়ায়। পক্ষান্তরে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা শান্তি-নিরাপত্তা ও স্বস্তি বিস্তার করে। এমনিভাবে মু'মিনদের গোপন খবরা-খবর কাফেরদের নিকট প্রকাশ করে দেয় এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাও فَسَاد -এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) বলেন-

وَالْمُرَادُ بِمَا نُهُوْا عَنْهُ مَا يُؤَدِّىْ اِلٰى ذٰلِكَ مِنْ اِفْشَاءِ اَسْرَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى الْكُفَّارِ وَاِغْرَائِهِمْ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ فُنُوْنِ الشُّرُوْرِ ـ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ : لَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ بِيَدِكَ وَلَا تُلْقِ نَفْسَكَ فِى النَّارِ (جَمَل صـ٢٤ جـ١) ـ

قَوْلُهُ بِالْكُفْرِ وَالتَّعْوِيْقِ : মুনাফিকরা কয়েকভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। তন্মধ্যে হতে দুটি পদ্ধতির কথা মুসান্নিফ (র.) উল্লেখ করেছেন।

১. **কুফর :** মুনাফিকদের কুফর ছিল বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা। কুফরীর কারণে তারা কাফেরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত এবং কাফেরদের কাছে মুসলমানদের খবরা-খবর ফাঁস করে দিত। কাফেরদের আপত্তিসমূহ মুসলমানদের সামনে উল্লেখ করত, যাতে তাদের ঈমানে দুর্বলতা আসে।

২. **ঈমানের পথে অন্তরায় হওয়া :** অর্থাৎ মুনাফিকরা অন্যদেরকে ঈমান গ্রহণ থেকে বারণ করত। যা বিশৃঙ্খলার কারণ ছিল। কেননা কুফরের কারণে বিশ্বের শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটে। এ ছাড়াও মুনাফিকী বা দ্বিমুখী স্বভাব দীনি এবং দুনিয়াবী সকল ক্ষেত্রেই বিশৃংখলার কারণ।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ : প্রত্যেক যুগের ধর্মবিদ্বেষী ও মুনাফিকদের চরিত্রই হলো নিজেরা বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিমূলক কর্মকাণ্ড করেও শান্তি ও উন্নতির দাবি করা। তারা যেন মদের বোতলে শরবতের লেবেল দিয়ে দেয়। মদীনার মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। যখন তাদেরকে কেউ বলত, মুনাফেকি করে জমিনে বিশৃঙ্খলা করো না, তখন তারা অকুণ্ঠভাবে জবাব দিত- إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ আমরাই তো একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ তা'আলাও বড় বলিষ্ঠতাপূর্ণ ও অধিক তাকীদ সম্বলিত বাক্যে তাদের জবাব দিয়ে বলেন- أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ শুনে রাখ! ওরাই একমাত্র বিশৃঙ্খলাকারী; কিন্তু তাদের অনুভূতি নেই যে, তারাই বিশৃঙ্খলাকারী। তাদের বিবেক বুদ্ধি এ পরিমাণ লোপ পেয়েছে যে, তারা বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলা এবং অশান্তিকে শান্তি মনে করছে। যেমন কুরআনের অন্যত্র এসেছে–

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا (فَاطِر : ٨)

এর কারণ এই ছিল যে, কিছু বিষয় তো এমন রয়েছে যেগুলোকে প্রত্যেক মানুষ-ই মনে করে যে, এগুলো ফিতনা ও ফ্যাসাদ। যেমন, হত্যা রাহাজানী, চুরি, ডাকাতি, জুলুম, অন্যায়, ধোঁকা, প্রতারণা ইত্যাদি। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতেই এগুলোকে খারাপ ও ফেতনা ফ্যাসাদ মনে করে। প্রত্যেক ভদ্র মানুষ এগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। আর কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে ফেতনা ফ্যাসাদ নয়: কিন্তু সেগুলোর কারণে মানুষের আখলাক চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সব রকমের ফেতনা ফ্যাসাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। মুনাফিকদের অবস্থা অনুরূপ ছিল। তারা চুরি-ডাকাতি, অন্যায়-অবিচারসহ অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকত এবং সেগুলোকে দূষণীয় মনে করত। তাইতো তারা বেশ জোর দিয়েই নিজেদের বিশৃঙ্খলাকারী হওয়াকে অস্বীকার করেছে। বস্তুত যখন মানুষ চরিত্রগত বিপর্যয়ের শিকার হয়, তখন নিজের মনুষ্যবোধকে হারিয়ে ফেলে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬]

قَوْلُهُ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ : মুনাফিকরা তাদের বক্তব্যটি إِنَّمَا (كَلِمَة حَصْر) এবং جُمْلَة إِسْمِيَّة দ্বারা তাকীদরূপে পেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের জবাবে এমন جُمْلَة ব্যবহার করেছেন, যা চারটি তাকিদ সম্বলিত। আর তা হলো–

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ

١. أَلَا حَرْفُ التَّنْبِيْهِ . ٢. إِنَّ حَرْفُ الْمُشَبَّهِ بِالْفِعْلِ . ٣. هُمْ ضَمِيْرُ الْفَصْلِ . ٤. تَعْرِيْفُ الْخَبَرِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ . (أَيِ الْمُفْسِدُوْنَ)

لِلتَّنْبِيْهِ : أَيْ تَنْبِيْهُ الْمُخَاطَبِ لِلْحُكْمِ الَّذِيْ يُلْقَى بَعْدَهَا

أَلَا حَرْفُ تَنْبِيْهٍ وَاسْتِفْتَاحٍ وَلَيْسَتْ مُرَكَّبَةً مِنْ هَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ وَلَا النَّافِيَةِ بَلْ هِيَ بَسِيْطَةٌ: وَلٰكِنَّهَا لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّنْبِيْهِ وَالْاِسْتِفْتَاحِ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ إِسْمِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً (جَمَل بِحَوَالَةِ السَّمِيْن)

أَيْ بِأَنَّهُمْ مُفْسِدُوْنَ أَوْ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَطَّلِعُ نَبِيَّهُ عَلٰى فَسَادِهِمْ (جَمَل) : بِذٰلِكَ

قَوْلُهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ : মুফাসসির (র.) اَلنَّاسُ -এর ব্যাখ্যায় أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلنَّاسُ -এর মাঝে أَلِف - لَام টি عَهْد ذِهْنِي । আর তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)।

قَوْلُهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ : এতে মুনাফিকদের বুদ্ধিমত্তার বাতিল দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। আয়াতে চারটি তাকিদ ব্যবহার করে মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতার কথা জোরালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা এ পরিমাণ বেকুব যে, নিজেদের লাভ ক্ষতিও পরখ করতে পারে না।

মুনাফিকরা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -কে কোন দৃষ্টিতে আহমক বলত? : মুনাফিকরা সাহাবায়ে কেরামকে নির্বোধ মনে করার কারণ হলো কেবল ইসলামের খাতিরে গোটা দেশের মানুষকে দুশমন বানানো তাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই বোকামির কাজ ছিল। তারা বুদ্ধিমত্তা বলতে মনে করতো হক– বাতিলের আলোচনা না করা এবং শুধু নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

قَوْلُهُ أَنُؤْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ : এটা ছিলো যুগের পাক্কা ও সাচ্চা মুসলমানদের প্রতি, রাসূলের সাহাবীদের প্রতি কটাক্ষ। এই রীতি আজো বহাল আছে। প্রগতিবাদী ও নব্যপন্থিদের দরবার থেকে স্থবির, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে চিন্তাধারা, মৌলবাদী ইত্যাদি কত কিসিমের কিতাবই না বিতরণ করা হয় নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি ঈমানদারদের প্রতি। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৪৫]

اَلْجُهَّالُ : এটি سُفَهَاء -এর তাফসীর। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন– وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ তাই মুফাসসির (র.) এখানে اَلْجُهَّالُ দ্বারা اَلسُّفَهَاءُ -এর তাফসীর করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

فَسَّرَ السَّفَهُ بِالْجَهْلِ أَخْذًا مِنْ مُقَابَلَتِهِ بِالْعِلْمِ وَفَسَّرَ غَيْرُهُ بِنَقْصِ الْعَقْلِ لِأَنَّ السَّفَهَ خِفَّةٌ وَسَخَافَةُ رَأْيٍ يَقْتَضِيهِمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالْحِلْمِ يُقَابِلُهُ ـ (جَمَل :٢٩١)

اَلسُّفَهَاءُ : এটি سَفِيْهٌ-এর বহুবচন। سَفَهٌ থেকে নির্গত। سَفَهٌ-এর অর্থ বুদ্ধি স্বল্প হওয়া।

قَالَ ابْنُ جَرِيْرٍ اَلسَّفِيْهُ الْجَاهِلُ ضَعِيْفُ الرَّأْيِ قَلِيْلُ الْمَعْرِفَةِ [অর্থাৎ سَفِيْه বলা হয় সে নির্বোধকে, যে নিজের ভালোমন্দ পুরো মাত্রায় বুঝতে অক্ষম।

قَوْلُهُ لَا نَفْعَلُ كَفِعْلِهِمْ : এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, أَنُؤْمِنُ-এর হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হিসেবে ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ : তাদের বোকামি আর নির্বুদ্ধিতা লক্ষণীয়। আগে তো অরাজকতাকে সংশোধন বলেছিল · এবার নিবুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখাল আকল ও বুদ্ধিমত্তাকে বুদ্ধিহীনতা আখ্যা দিয়ে।

ফায়দা : এখানে একটি ইশকাল হয় যে, পূর্বের আয়াতে لَا يَشْعُرُوْنَ বলা হয়েছে এবং এখানে لَا يَعْلَمُوْنَ বলা হলো কেন?

জবাব : এ আয়াতে سَفَاهَتْ বা নির্বুদ্ধিতার আলোচনা হয়েছে আর سَفَاهَتْ বা নির্বুদ্ধতা عَدَم عِلْم তথা না জানাকে আবশ্যক করে। তাই এখানে- لَا يَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। আর পূর্বের আয়াতে اِفْسَاد বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কথা আলোচিত হয়েছে। আর اِفْسَاد হলো مَحْسُوْس বা অনুভব করার মত বিষয়। তাই সেখানে لَا يَشْعُرُوْنَ বলে اِحْسَاس বা অনুভবকে নাকচ করা করা হয়েছে।

আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) বলেন-

عُبِّرَ هُنَا بِنَفْيِ الْعِلْمِ، وَثَمَّ بِنَفْيِ الشُّعُوْرِ، لِأَنَّ الْمُثْبَتَ لَهُمْ هُنَاكَ هُوَ الْإِفْسَادُ وَهُوَ مِمَّا يُدْرَكُ بِأَدْنٰى تَأَمُّلٍ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَحْسُوْسَاتِ الَّتِيْ لَا تَحْتَاجُ إِلٰى فِكْرٍ كَبِيْرٍ ـ فَنُفِيَ عَنْهُمْ مَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ مُبَالَغَةً فِيْ تَجْهِيْلِهِمْ وَهُوَ أَنَّ الشُّعُوْرَ الَّذِيْ قَدْ ثَبَتَ لِلْبَهَائِمِ مَنْفِيٌّ عَنْهُمْ وَالْمُثْبَتُ هُنَا هُوَ السَّفَهُ وَالْمَصْدَرُ بِهِ هُوَ الْأَمْرُ بِالْإِيْمَانِ وَ ذٰلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلٰى إِمْعَانِ فِكْرٍ وَ نَظَرٍ تَامٍّ يُفْضِىْ إِلَى الْإِيْمَانِ وَالتَّصْدِيْقِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمُ الْمَأْمُوْرُ بِهِ وَهُوَ الْإِيْمَانُ فَنَاسَبَ ذٰلِكَ نَفْيَ الْعِلْمِ عَنْهُمْ ـ (جَمَل)

ذٰلِكَ : أَىْ أَنَّهُمْ سُفَهَاءُ অর্থাৎ ذٰلِكَ-এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হলো তাদের নির্বুদ্ধিতা।

ফায়দা : মুনাফিকরদেরকে দুভাবে নসিহত করা হয়েছে-

১. أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ পদ্ধতিতে। তা হলো ঈমান গ্রহণের দাওয়াত প্রদান।

২. نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ পদ্ধতিতে। তা হলো-বিশৃঙ্খলা না করা।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সত্যের মাপকাঠি : ১৩ নং আয়াতে তথা اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ-এর মাঝে সঠিক ঈমানের একটি মাপকাঠি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মতো ঈমান আন। এতে জানা গেল, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান অন্যদের জন্য একটি মাপকাঠি। সঠিক এবং অসঠিক ঈমানকে যাচাই করার এক কষ্টিপাথর। বর্তমান যুগের মুনাফিকরা তো এ প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে যে, [নাউযুবিল্লাহ] সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের সম্পদ থেকে মাহরুম ছিলেন। এটা শিয়াদের আকীদা।

সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কে? : কু-জন্মা ব্যক্তি দ্বারা সর্বদা সন্ত্রাস হওয়াই সম্ভাব্য; কিন্তু যদি হিতাকাঙ্ক্ষী লোক আবেগে বাধ্য হয়ে এ কু-জন্মা লোকদের মঙ্গলের চিন্তা করে তাদেরকে বুঝায় যে, তোমাদের এ অসৎ কার্যাবলির কারণে জমিনে অশান্তি ও সন্ত্রাস বিস্তার হচ্ছে। তাই তোমরা ফিরে এসো! তখন এরা চূড়ান্ত বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নিজেদের দোষগুলোকে গুণ হিসেবে প্রকাশ করে বড় জোরে শোরে উত্তর দেয় যে, আমাদের কাজ তো শুধু সংশোধন করা; সন্ত্রাস নয়। এ জেহলে মুরাক্কাব ও ধ্বংসের অপেক্ষাকারীর কি চিকিৎসা? যে, অজ্ঞতাকে জ্ঞান, সন্ত্রাসকে সংশোধন, তিক্তকে মিষ্টি এবং কালোকে সাদা বুঝতেছে।

شعر : ہر کس کہ نداند وبداند کہ بداند ـ در جہل مرکب ابد الدہر بماند

অর্থ : যে ব্যক্তি স্বয়ং অজ্ঞ এবং নিজকে মনে করে যে সে পণ্ডিত, সে অজ্ঞতা চিরকাল মিশ্রিতাবস্থায় থেকে যাবে। এ চিকিৎসাহীন রোগ থেকে বাঁচার ও বের হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

١٤. وَإِذَا لَقُوا أَصْلُهُ لَقِيُوا حُذِفَتِ
الضَّمَّةُ لِلِاسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ
لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ
رَجَعُوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ. رُؤَسَائِهِمْ
قَالُوْٓا إِنَّا مَعَكُمْ فِي الدِّيْنِ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُوْنَ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيْمَانِ

অনুবাদ :

১৪. যখন তারা সাক্ষাৎ করে لَقُوا ক্রিয়াটি মূলত لَقِيُوْا রূপে ছিল। ى -এর মাঝে পেশ উচ্চারণে কঠিন বিধায় তাকে বিদূরিত করে দেওয়া হয়, অতঃপর وَاو সাকিনের সাথে তার একত্র হওয়ায় দুই সাকিন একসঙ্গে উচ্চারণ হয় না বলে তাকেও বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বাসীগণের সাথে, তখন বলে 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি' আর যখন পৃথক হয় বিশ্বাসীগণ হতে এবং প্রত্যাবর্তন করে তাদের শয়তানের নিকট অর্থাৎ তাদের দলপতিগণের নিকট তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি ধর্ম বিশ্বাসে। তাদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টা-তামাশা করছি বাহ্যত ঈমানের কথা প্রকাশ করে।

١٥. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ يُجَازِيْهِمْ
بِاسْتِهْزَائِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ يُمْهِلُهُمْ فِيْ
طُغْيَانِهِمْ تَجَاوُزِهِمُ الْحَدَّ بِالْكُفْرِ
يَعْمَهُوْنَ. يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا حَالٌ

১৫. আল্লাহ তাদের পরিহাস করেন অর্থাৎ তিনি তাদের এই তামাশার শাস্তি দান করবেন আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় অর্থাৎ কুফরি করে সীমালঙ্ঘন করার মধ্যে অবকাশ ঢিল দিয়ে রেখেছেন আর তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে অর্থাৎ হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। يَعْمَهُوْنَ [তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে] এই বাক্যটি حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।

١٦. أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰى. اِسْتَبْدَلُوْهَا بِهٖ فَمَا رَبِحَتْ
تِجَارَتُهُمْ أَيْ مَا رَبِحُوْا فِيْهَا بَلْ خَسِرُوْا
لِمَصِيْرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ.
وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ. فِيْمَا فَعَلُوْا.

১৬. তারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। অর্থাৎ হেদায়েতকে গুমরাহী দ্বারা পরিবর্তিত করে নিয়েছে সুতরাং তাদের এই ব্যবসা লাভজনক হয়নি অর্থাৎ এতে তারা লাভবান হয়নি; বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ তার দরুন তারা সদা-সর্বদার জন্য জাহান্নামে নিপতিত হতে যাচ্ছে এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত নয় তাদের এই কর্মে।

তাহকীক ও তরকীব

قَوْلُهُ لَقُوا : لَقُوا -এর মধ্যে تَعْلِيْل হয়েছে আসলে لَقِيُوْا ছিল, يَاى مَضْمُوْم -এর পূর্বে مَكْسُوْر কঠিনের কারণে ضَمَّه হযফ করে দিয়েছে এখন يَاء এবং وَاو দুটি سَاكِن হয়েছে, يَاء -কে হযফ করে দিয়েছে, لَقُوْا হয়েছে, জুমলায়ে শর্তিয়া। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - لَقُوا -এর মাফউল قَالُوْا اٰمَنَّا জাযা, إِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ জুমলা শর্ত قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ মুয়াক্কাদ অথবা مُبْدَل مِنْهُ - إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ বদল কিংবা তাকিদ, উভয় মিলে জাওয়াবে শর্ত اَللّٰهُ মুবতাদা يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ জুমলা খবর, মা'তূফ 'আলাইহি وَاو আতেফাহ يَمُدُّهُمْ জুমলা-খবর মা'তূফ, فِيْ طُغْيَانِهِمْ -এর মুতাআল্লিক, يَعْمَهُوْنَ হাল।

http://islamiboi.wordpress.com

طُغْيَان - ضَمَّه ও كَسْرَه-এর সাথে অর্থ- সীমা অতিক্রম করা।

شَيْطَان : এ ব্যাপারে ভাষাবিদগণের দুটি মন্তব্য, একটি হচ্ছে شَيْطَان - فَيْعَال-এর ওজনে, অর্থ بَعُدَ অর্থাৎ ن আসল অক্ষর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে ن অতিরিক্ত شَاطَ অর্থ بَاطِل [অকেজো-অসত্য] এ নামে নামকরণের কারণ স্পষ্ট। আহলে সুন্নতের দৃষ্টিতে সে হচ্ছে আবুল জিন [জিন জাতির পিতা]

يَمُدُّهُمْ-এর মধ্যে إِسْنَاد حَقِيْقِي মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিপরীত। عَمْي ও عَمَهٌ-এর মধ্যে এমনই পার্থক্য যেমন بَصِيْرَت [মনোচক্ষু] ও بصارت [বাহ্যিক চক্ষু] এর মধ্যে একটি প্রকাশ্য, অপরটি গোপন। إِشْتِرَاء ও بَيْع উভয়টি ক্রয় ও বিক্রয়, বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে مَجَازًا সাধারণ পরিবর্তন করার অর্থে। هِدَايَت দ্বারা উদ্দেশ্য এ স্থানে স্বভাবগত হেদায়েত فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا এবং كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الخ-এর হিসেবে।

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ-এর মধ্যে إِسْتِبْدَال اِسْتِعَارَه تَرْشِيْحِيَه তাই تِجَارَت মুশাব্বাহ্ বিহীর সম্পৃক্ততার কারণে মুশাব্বিহ-এর জন্য প্রমাণ করা হয়েছে। মুফাস্সির জালাল (র.) اَيْ فَمَا رَبِحُوْا বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, إِسْنَاد মাজাযী হচ্ছে। অর্থাৎ رِبْح-এর সম্পর্ক تِجَارَت-এর পরিবর্তে ব্যবসায়ীদের দিকে হওয়া উচিত ছিল

قَوْلُهُ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ : اَلْمَدُّ بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ : مَدَّ-এর ব্যবহার অকল্যাণমূলক স্থানে হয়ে থাকে। যেমনটা এখানে হয়েছে। এমনিভাবে সূরা মারইয়ামে রয়েছে। (مَرْيَم : ٧٩) وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا আর إِمْدَاد-এর ব্যবহার কল্যাণকর স্থানে হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَاَمْدَدْنَا بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ (اَلطُّوْر : ٢١) . اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اٰلَافٍ (اٰلِ عِمْرَان : ١٢٤)

اَلطُّغْيَانُ : এটি طَغَى يَطْغَى طُغْيَانًا وَطِغْيَانًا-এর মাসদার। কেউ বলেন- يَاء-এর লাম কালিমা হলো طُغْيٌ আবার কেউ বলেন- وَاو যেমন বলা হয়- طَغَيْتُ - طَغَوْتُ আর اَلطُّغْيَانُ অর্থ- সীমালঙ্ঘন করা।

اَلطُّغْيَانُ مَصْدَرُ طَغَى يَطْغَى طُغْيَانًا وَطِغْيَانًا بِكَسْرِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا وَلَامُطْغَى قِيْلَ يَاءٌ وَقِيْلَ وَاوٌ

«يَعْمَهُوْنَ» : (مُضَارِع جَمْع مُذَكَّر غَائِب) عَمَهًا (س ـ ف) عَمِهَ পেরেশান হয়ে ছোটাছুটি করা। عَمَهٌ বলা হয়, মানুষ রাস্তা না পেয়ে অন্ধের মতো ছোটাছুটি করাকে।

আল্লামা কুরতুবী লিখেন- اَلْعَمٰى فِى الْعَيْنِ وَالْعَمَهُ فِى الْقَلْبِ আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) লিখেন-

وَالْعَمَهُ اَلتَّرَدُّدُ وَالتَّحَيُّرُ وَهُوَ قَرِيْبٌ مِنَ الْعَمٰى . اِلَّا اَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُوْمًا وَ خُصُوْصًا . لِاَنَّ الْعَمٰى يُطْلَقُ عَلٰى ذَهَابِ ضُوْءِ الْعَيْنِ وَعَلَى الْخَطَاِ فِى الرَّاْيِ . وَالْعَمَهُ لَا يُطْلَقُ اِلَّا عَلَى الْخَطَاِ فِى الرَّاْيِ .

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ يَعْمَهُوْنَ জুমলাটি يَمُدُّهُمْ-এর যমীর هُمْ কিংবা طُغْيَانِهِمْ-এর যমীর هُمْ থেকে হয়েছে

قَوْلُهُ يَتَرَدَّدُوْنَ : اَيْ فِى الْبَقَاءِ عَلَى الْبَقَاءِ عَلَى الْكُفْرِ وَتَرْكِهِ اِلَى الْاِيْمَانِ অর্থাৎ কুফরীর উপর অটল থাকা কিংবা তা বর্জন করে ঈমান আনার ব্যাপারে কিংকর্তব্য বিমূঢ়।

قَوْلُهُ تَحَيُّرًا : এটি لِيَتَرَدَّدُوْنَ-এর حَال مُؤَكِّدَة কিংবা مَفْعُوْل لَهُ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدٰى : اَيِ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا اِلٰى هُنَا

অর্থাৎ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ اٰمَنَّا-এর মাঝে যাদের বিবরণ এসেছে তারাই হলো اُولٰئِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْه

اَلْمُؤَبَّدَةُ : (وَاحِدٌ مُؤَنَّث : اِسْم مَفْعُوْل) (تَفْعِيْل) تَابِيْدًا اَبَّدَ يُؤَبِّدُ চিরস্থায়ী করে দেওয়া। اَلْمُؤَبَّدَةُ عَلَيْهِمْ যা তাদের উপর চিরস্থায়ী করে দেওয়া হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় : মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে কি আচরণ করত এবং কাফেরদের সাথে কি আচরণ করত এখানে তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। আর আলোচনার শুরু তথা وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا الخ -এর মাঝে তাদের নিফাকী মতবাদ ও তার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং আলোচনায় তাকরার বা দ্বিরুক্তি নেই।

قَوْلُهُ وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ الخ : শানে নুযুল : হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রা.) একবার মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে সালূল ও তার সহচরদেরকে নসিহত করার জন্য গেলেন। সাক্ষাৎ করে বললেন, হে উবাই! তুমি এবং তোমার সাথীরা আমাদের সাথে খাঁটি ঈমান নিয়ে বসবাস কর। তখন ইবনে সালূল হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল- مَرْحَبًا بِالشَّيْخِ وَالصِّدِّيْقِ হযরত ওমর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল مَرْحَبًا بِالْفَارُوْقِ الْقَوِيِّ فِىْ دِيْنِهٖ এবং হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলল مَرْحَبًا بِابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ তখন হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُنَافِقْ অর্থাৎ মুনাফিকী না করে আল্লাহকে ভয় কর। জবাবে ইবনে সালুল বলল, আমার ঈমান তোমাদের ঈমানের মতোই এবং আমি যা বলেছি, অন্তর থেকেই বলেছি। অতঃপর সে তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, যখন তোমরা মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমার মতো বাক্যালাপ করবে। তখন তারা বলল, তুমি যত দিন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে, ততদিন আমরা কল্যাণের মাঝে থাকবো। -[খাজিনের সূত্রে হাশিয়ায়ে ছাবি : খ. ১, ১৭, জামাল : খ. ১, পৃ. ২৮]

قَوْلُهُ لَقُوْا : মুফাসসির (র.) শব্দটির পূর্ণ তালীল করেননি। পূর্ণ তালীল এভাবে- لَقُوْا মূলত لَقِيُوْا ছিল, شَرِبُوْا -এর ওজনে। يَاء -এর উপর ضَمَّه কঠিন মনে করে সহজ করণার্থে হজফ করে দেওয়া হয়েছে। এখন يَاء এবং وَاو -এর মাঝে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় একটিকে [তথা يَاء কে] ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর وَاو -এর মুনাসাবাতে قَاف -এর কাসরাকে জুম্মা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। لَقُوْا হয়েছে।

قَوْلُهُ خَلَوْا مِنْهُمْ وَرَجَعُوْا : এখানে مِنْهُمْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَلَوْا ফেয়েলের مُتَعَلِّق উহ্য রয়েছে। আর خَلَوْا -এর ব্যাখ্যায় رَجَعُوْا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَلَوْا -এর মাঝে رَجَعُوْا -এর অর্থ নিহিত রয়েছে। যাতে তার صِلَة হিসেবে اِلٰى আনা সহীহ হয়। خَلَوْا মূলত خَلَوُوْا ছিল। প্রথম وَاو টি লামকালিমা [মূল হরফ] আর দ্বিতীয় وَاو টি বহুবচনের আলামত। وَاو মুতাহাররিকের পূর্বে مَفْتُوْح বিধায় প্রথম وَاو টিকে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন اَلِف এবং দ্বিতীয় وَاو -এর মাঝে দুই সাকিন একত্র হয়েছে। اَلِف বিলুপ্ত হয়ে গেছে। اَلِف পড়ে যাওয়ার নিদর্শন স্বরূপ فَتْحَة অবশিষ্ট রয়ে গেছে। خَلَوْا হয়েছে।

قَوْلُهُ شَيٰطِيْنِهِمْ : شَيْطَانٌ শব্দটির মূলধাতু হলো شَطَنٌ অর্থ- হক এবং কল্যাণ থেকে দূরে থাকা। আরবি ভাষায় شَيْطَان শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। كُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالدَّوَابِّ شَيْطَانٌ অর্থাৎ প্রত্যেক অবাধ্য ঔদ্ধত্যকে شَيْطَان বলা হয়। জিন ইনসান এমনকি জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে। হাদীস শরীফে একাকী সফরকারীকেও শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ رُؤَسَائِهِمْ : অর্থাৎ এ আয়াতে শয়তান বলে ইহুদি-মুশরিক ও মুনাফিকদের নেতৃবৃন্দকে বুঝানো হয়েছে, যাদের ইঙ্গিতে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত।

আর এদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো-

১. তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে শয়তান রয়েছে, যে তাকে প্ররোচিত করে ও ষড়যন্ত্র-প্রতারণা শিক্ষা দেয়।

২. কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো তারা মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে শয়তানের মতো। আর সে যুগে এ সকল নেতৃবৃন্দ ছিল পাঁচজন: মদীনায় কা'ব ইবনুল আশরাফ, জুহাইনা গোত্রে আব্দুদ দার, বনী আসলামে আবু বুরদাহ, বনী আসাদে আউফ ইবনে আমের, আর শামে আব্দুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ।

-[হাশিয়ায়ে সাবী- খ. ১, পৃ.১৭; জামালাইন- খ. ১, পৃ. ১৮]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ : اِسْتِهْزَاء অর্থ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করা। অর্থাৎ সাধারণ মুনাফিকরা যখন স্বীয় সর্দারদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হতো, তখন বলত, আমরা মনেপ্রাণে আপনাদের সঙ্গেই আছি। তবে মুসলমানদেরকে বোকা বানানোর জন্য তাদের সঙ্গে তাদের পছন্দ অনুযায়ী কথা বলে থাকি।

قَوْلُهُ يُجَازِيْهِمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ : এ ইবারতটুকু মূলত একটি প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা কিভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন? ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাতো আল্লাহর শানের খেলাফ। মুফাসসিরীনে কেরাম এর জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, এখানে مُشَاكَلَةٌ فِى اللَّفْظِ। তথা কথার জওয়াব অনুরূপ কথা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও তার আসল অর্থে নয় তার আসল অর্থ হবে, يُجَازِيْهِمْ তিনি তাদেরকে এভাবে শাস্তি দিবেন।

অন্যত্র রয়েছে- فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ "যে লোক তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তার উপর সীমালঙ্ঘন কর [করতে পার], যেমন সে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। -[সূরা বাকারা : ১৯৩] সীমালঙ্ঘনের এই দ্বিতীয় কথাটি মূলত সীমালঙ্ঘন নয়, অনুরূপ কথা।

আরো ইরশাদ হয়েছে- فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ অর্থাৎ তোমরা যদি প্রতিশোধ লও, তাহলে প্রতিশোধ নেবে ততটা, যতটা তোমরা নিপীড়িত হয়েছে।

এখানে প্রথম প্রতিশোধ কথাটি কিন্তু মূলত পীড়নের প্রতিশোধ, আসলে প্রতিশোধ নয়। প্রতিশোধ শব্দের মোকাবিলায়ই তা বলা হয়েছে। আরবরা বলে থাকে اَلْجَزَاءُ بِالْجَزَاءِ অর্থাৎ প্রতিফল প্রতিফলের দ্বারা। প্রথমটা কিন্তু প্রতিফল নয়। নিম্নের কবিতা ছত্রটিও অনুরূপ। اَلَا لَا يَجْهَلَنْ اَحَدٌ عَلَيْنَا * فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَا সাবধান : কেউ যেন আমাদের উপর মূর্খতা না করে। তাহলে আমরাও আমাদের মূর্খদের মূর্খতার উপরের মূর্খতা করব।

১. এ কথা জানাই আছে যে, কবি মূলতই মূর্খতাচ্ছন্ন হননি। কিন্তু কথার সাথে মিল রেখে জওয়াবী কথা বলাই আবরদের অভ্যাস বিধায় এরূপ বলা হয়েছে।

২. কারো কারো মতে, ঠাট্টা-বিদ্রূপের অশুভ ফল যেহেতু তাদেরই ভোগ করতে হবে, তখন বলা যেতে পারে যে, তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপই করা হয়েছে

৩. এর জবাবে এও বলা হয়েছে যে, ওরা যখন দুনিয়াতে যথেষ্ট সময় অবকাশ পেয়ে গেছে, খুব দ্রুত ও তাৎক্ষণিকভাবে আজাবে লিপ্ত হয়নি, অন্যান্য মুশরিকের ন্যায় হত্যার সম্মুখীন হয়নি, তাদের শাস্তি বিলম্বিত হয়েছে, তবে এতে ধোঁকায় পড়ে গেছে, ফলে তাদের সাথেও যেন ঠাট্টা-বিদ্রূপই করা হয়েছে, এমনই হয়ে গেল। -[মাআরিফুল কুরআন : ২/১/৭ ৫১-৫২]

ফায়দা : وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ : এ অংশটুকু মূলত يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ -এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যেমন তারা মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তেমনি আল্লাহও তাদের সাথে এক ধরনের উপহাসমূলক আচরণ করেন। তবে তা হলো তাদেরকে অপরাধ ও অবাধ্যতার অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের নাফরমানি পূর্ণ হয়ে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা তাকবীনী বিধান অনুসারে মাখলুককে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়েছেন, তাতে তিনি সহসা হস্তক্ষেপ করেন না। সাপের দংশন করা বিষের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু এবং আগুনের দাহ্য ক্ষমতা সেই তাকবীনী বিধান অনুসারেই

قَوْلُهُ اِسْتَبْدَلُوْهَا بِهٖ : এ অংশটি বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এখানে شِرَاء -এর মাজাযী বা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে شِرَاء দ্বারা اِسْتِبْدَال [পরিবর্তন] উদ্দেশ্য। যা شِرَاء -এর জন্য লাজেম বা অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এখানে مَلْزُوْم বলে لَازِم কে বুঝানো হয়েছে। আরবরা যে কোনো রকম বিনিময়ের জন্য شِرَاء শব্দ ব্যবহার করে। তবে شِرَاء দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ হেদায়েত এবং গোমরাহী উভয়টির পথ তাদের সম্মুখে খোলা ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মর্জি মোতাবেক গোমরাহীকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : বর্ণনাধারায় বোঝা যায়, তাদের কাছে পূর্ব থেকেই হেদায়েত ছিল। পরে তারা তা বাদ দিয়ে গোমরাহী গ্রহণ করেছে। বিষয়টি কি এমন?

উত্তর :

১. এর একটি উত্তর তো এক্ষুণি প্রদান করা হলো যে, হেদায়েত এবং গোমরাহী উভয়টির পথ তাদের সম্মুখে খোলা ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের মর্জি মোতাবেক গোমরাহীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

২. আরেকটি জবাব হলো, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتّٰى يُهَوِّدَانِهِ اَبَوَاهُ অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ইসলামের উপর জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত করে।

৩. তাছাড়াও রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলা যখন বলেছিলেন- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের প্রভু নই?] তখন সকলেই সাড়া দিয়ে বলেছিল- بَلٰى [হ্যাঁ, আপনিই আমাদের প্রভু।] এখানে হেদায়েত দ্বারা সেই স্বীকারোক্তি উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে কোনো প্রশ্নও থাকে না।

قَوْلُهُ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ اَىْ مَا رَبِحُوْا فِيْهَا :

প্রশ্ন : এখানে تِجَارَتْ বা ব্যবসায় প্রতি رِبْحٌ তথা লাভের নিসবত করা হয়েছে। অথচ লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যবসায়ীর গুণ, ব্যবসার নয়। এর জবাব কি?

উত্তর : এখানে مَجَاز عَقْلِى হিসেবে ব্যবসার প্রতি লাভের নিসকত করা হয়েছে। যেমনটি اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ-এর মাঝে হয়েছে। আরবদের মাঝে এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে। তারা বলেন- رَبِحَ بَيْعُكَ وَخَسِرَتْ صَفْقَتُكَ উক্ত সংশয়টি নিরসনকল্পেই মুফাসসির (র.) ব্যাখ্যায় বলেন, اَىْ مَا رَبِحُوْا فِيْهَا অর্থাৎ মুনাফিকরা খাঁটি ঈমানের প্রকৃত মূল্য মেকী ঈমান দ্বারা আদায় করার দুঃস্বপ্ন দেখে ব্যবসা মাটি করল। অধিকন্তু তাদের ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে প্রকাশ হওয়ার কারণে অপদস্থও হলো। সত্যিকার ঈমান আনলে কিন্তু তারা আল্লাহর কাছে, মানুষের কাছে দুনিয়াতে ও আখিরাতে লাভবান হতো। তাদের একুল ওকুল উভয়টি-ই রক্ষা হতো।

মোটকথা এখানে سَبَب বলে مُسَبَّب মুরাদ নেওয়া হয়েছে। কেননা ব্যবসা হলো লাভ-ক্ষতির কারণ।

قَوْلُهُ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ : এটি হলো লাভবান না হওয়ার ইল্লত বা কারণ, অর্থাৎ তারা তো মুনাফিকী করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ দুনিয়াতে যতই সুবিধা ভোগ করুক না কেন, পরকালে তো জাহান্নামই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। এটাতো কোনো লাভের লক্ষণ নয়।

قَوْلُهُ «وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ» فِيْمَا فَعَلُوْا : অর্থাৎ তারা ব্যবসায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, তাতে নিশ্চিত ঠক আর ক্ষতিগ্রস্ততাই রয়েছে। অর্থাৎ লাভ এবং মূল পুঁজি উভয়টাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কেননা ব্যবসার উদ্দেশ্য হলো পুঁজি এবং মুনাফা উভয়টির সংরক্ষণ। এসব মুনাফিকরা উভয়টিই হারিয়েছে। কেননা তাদের পুঁজি হলো সুস্থ ফিতরত এবং বিবেক। যখন তারা নানা গোমরাহীতে বিশ্বাসী হয়েছে, তখন তাদের বিবেক লোপ পেয়েছে। যেন তাদের পুঁজি নিঃশেষ হয়েগেছে। আর পুঁজি হারালে লাভের তো প্রশ্নই উঠে না। হক গ্রহণে পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েগেছে।

اَىْ لِطُرُقِ التِّجَارَةِ، فَاِنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنْهَا سَلَامَةُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ، وَهٰؤُلَاءِ قَدْ اَضَاعُوا الطَّلْبَتَيْنِ لِاَنَّ رَأْسَ مَالِهِمُ الْفِطْرَةُ السَّلِيْمَةُ وَالْعَقْلُ الصِّرْفُ، فَمَا اِعْتَقَدُوْا هٰذِهِ الضَّلَالَاتِ بَطَلَ اِسْتِعْدَادُهُمْ وَاخْتَلَّ عَقْلُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَتَوَصَّلُوْنَ بِهٖ اِلَى اِدْرَاكِ الْحَقِّ وَنَيْلِ الْكَمَالِ، فَبَقُوْا خَاسِرِيْنَ اٰيِسِيْنَ مِنَ الرِّبْحِ فَاقِدِيْنَ الْاَصْلَ.
(بَيْضَاوِى، جَمَل : ج١، ص٣)

قَوْلُهُ فِيْمَا فَعَلُوْا : اَىْ مِنَ الْاِسْتِبْدَالِ الْمَذْكُوْرِ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে তাকরার রয়েছে। কেননা اِشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ দ্বারাও হেদায়েত না থাকা বুঝা যায় এবং وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ দ্বারাও বুঝা যায়।

উত্তর : এখানে হেদায়েতে দ্বারা দীনি হেদায়েত উদ্দেশ্য ছিল, আর এখানে ব্যবসার পদ্ধতি সংক্রান্ত হেদায়েত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ব্যবসার পুঁজি কিভাবে সংরক্ষিত থাকবে সেটাও তারা বুঝতে না। সুতরাং কোন তাকরার নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১৭. مَثَلُهُمْ صِفَتُهُمْ فِيْ نِفَاقِهِمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ اَوْقَدَ نَارًا فِي ظُلْمَةٍ فَلَمَّا اَضَاءَتْ اَنَارَتْ مَا حَوْلَهُ فَاَبْصَرَ وَاسْتَدْفَأَ وَاَمِنَ مِمَّا يَخَافُهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ اَطْفَأَهُ وَجَمْعُ الضَّمِيْرِ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى الَّذِى وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُوْنَ مَا حَوْلَهُمْ مُتَحَيِّرِيْنَ عَنِ الطَّرِيْقِ خَائِفِيْنَ فَكَذَالِكَ هٰؤُلَاءِ اٰمَنُوْا بِاِظْهَارِ كَلِمَةِ الْاِيْمَانِ فَاِذَا مَاتُوْا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ

১৭. তাদের উপমা সে মুনাফিকীতে তাদের দৃষ্টান্ত হলো যেমন এক ব্যক্তি অন্ধকারে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে চাইল অর্থাৎ আগুন জ্বালাল যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল ফলে সে চারিদিক দেখতে পেল, তা হতে উষ্ণতা লাভ করল এবং ভীতি হতে নিরাপদ হলো আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন অর্থাৎ নির্বাপিত করে দিলেন। اَلَّذِىْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে بِنُوْرِهِمْ -এর هُمْ [তাদের] সর্বনামটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না তাদের চতুষ্পার্শ্বের পথ সম্পর্কে তারা বিভ্রান্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত। তেমনি তারাও মুনাফিকগণ বাহ্যত কালিমা উচ্চারণ করে ঈমান আনয়ন করেছে বলে প্রদর্শন করছে; কিন্তু যখন তারা মারা যাবে ভীতি ও শাস্তি তাদের উপর এসে আপতিত হবে।

১৮. هُمْ صُمٌّ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ سَمَاعَ قَبُوْلٍ بُكْمٌ خُرْسٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَقُوْلُوْنَهُ عُمْىٌ عَنْ طَرِيْقِ الْهُدٰي فَلَا يَرَوْنَهُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ عَنِ الضَّلَالَةِ ـ

১৮. তারা সত্য সম্পর্কে বধির গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তা শ্রবণ করে না, মুক কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে অতএব তারা তা উচ্চারণ করে না, অন্ধ হেদায়েতের পথ সম্পর্কে, ফলে তারা তা দর্শন করে না সুতরাং তারা ফিরবে না পথভ্রষ্টতা হতে।

তাহকীক ও তরকীব

مَثَل ـ مِثْل ـ مَثِيْل -এ শব্দগুলো شَبَه ـ شِبْه ـ شَبِيْه -এর ন্যায় তিন পদ্ধতিতে আসে, تَشْبِيْه -এর অর্থের মধ্যে পরে উপমা এবং কোনো আশ্চর্যময় ও বিরল প্রসিদ্ধ ঘটনাবলির সাথে তুলনা দেওয়ার জন্য ব্যবহার হতে লাগলো। ইলমে বালাগাতে পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে مَثَل শুধু كَلَام مُرَكَّب -এ এবং تَشْبِيْه মুফরাদ ও মুরাক্কাব উভয়টির জন্য ব্যবহার হয়। এর দ্বারা একটি কাল্পনিক ও অনুভবযোগ্য নয় এমন বস্তুও অনুভবযোগ্য হয়ে সামনে এসে যায়। তাই [ভাষার] অলঙ্কার শাস্ত্রবিদগণ এর বাক্যে এবং অতীতের [আসমানি] কিতাবগুলোতেও পবিত্র কুরআনের মত অনেক উপমা পাওয়া যায়। মুফাস্সির (র.) مَثَل -এর পরে صِفَة এনে এর অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন اِسْتَوْقَدَ -এর পরে اَوْقَدَ লিখে বলে দিয়েছেন যে, এর মধ্যে س ও ت - طَلَب -এর জন্য নয়। نُوْر نَار থেকে মুশতাক হয়েছে। اَضَاءَتْ -এর পরে اَنَارَتْ বলে মুফাস্সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, اَضَاءَتْ ফেয়লে মুতাআদ্দী যমীর ফায়েল। مَا حَوْلَهُ -এর মধ্যে مَا মউসূলা অর্থাৎ مَكَان মাফউল। صُمٌّ শব্দ থেকে পূর্বে هُمْ বের করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা মুবতাদা মাহ্যূফ عَنِ الضَّلَالَةِ বের করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَا يَرْجِعُوْنَ

http://islamiboi.wordpress.com

ফেয়েল লাযিম, আর কেউ কেউ مُتَعَدِّيْ বলেন مَفْعُوْل মাহযূফ ذَهَبَ اَىْ لَا يَرْجِعُوْنَ قَوْلًا; -এর সম্পর্ক এখানেও আল্লাহর দিকে حَقِيْقِي তাই মু'তাযিলাদের উপর রদ হয়ে গেল مَثَلُهُمْ মুবতাদা مَا بَعْد খবর, اَضَاءَتْ ফে'লে মুতাআদ্দী ت যমীর ফায়েল এবং مَا حَوْلَهُ মাফ্‌উল নতুবা مَا حَوْلَ ফায়েল اَضَاءَتْ -কে مؤنث আনা হয়েছে مَا -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। উদ্দেশ্য اَشْيَاء ও اَمْكِنَه ' مَا মউসূলাও হতে পারে এবং মাউসূফা কিংবা زَائِدَه -ও হতে পারে।

এসব মিলে শর্ত। ذَهَبَ اللّٰهُ হতে দুটি জুমলাই মা'তুফ মা'তূফ আলাই হয়ে জওয়াবে لَمَّا ; صُمٌّ মুবতাদা মাহযূফ هُمْ -এর খবর এবং فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ জুমলায়ে মুস্তানিফাহ্।

صُمٌّ : এটি اَصَمُّ -এর বহুবচন। অর্থ– বধির। স্ত্রীলিঙ্গ - صَمَّاءُ। صَمَمًا (س) صَمَّتِ ـ الْاُذُنُ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হলো।

بُكْمٌ : এটি اَبْكَمُ -এর বহুবচন। অর্থ- মুক, বোবা। بَكِمَ (س) يَبْكَمُ ـ اَخْرَس - বোবা হলো।

عُمْىٌ : এটি اَعْمٰى -এর বহুবচন। অর্থ– অন্ধ। স্ত্রী লিঙ্গ- عَمْيَاء বহুবচন- عُمْيَان ও আসে। عَمِىَ يَعْمٰى عُمْيًا অন্ধ হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَثَلُهُمْ : এখান থেকে দুটি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পূর্বের আয়াতে মুনাফিকদের পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। যার দ্বারা عَقْلِي ভাবে মুনাফিকদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হয়েছে। যেহেতু عَقْل -এর তুলনায় اِحْسَاس -এর সাথে মানুষের সম্পর্ক বেশি। এজন্য উপমা ও দৃষ্টান্ত দিয়ে পুনরায় তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণির লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দুটি উপমা পেশ করা হয়েছে। প্রথম উদাহরণটি ঐ শ্রেণির লোকদের বেলায় প্রযোজ্য যারা কুফরিতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছ থেকে আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করত। আর দ্বিতীয় উদাহরণটি ঐ শ্রেণির মুনাফিকদের সম্পর্কে যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মু'মিন হওয়ার ইচ্ছা করতো; কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো।

প্রথম উপমার বিশ্লেষণ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনার আলোকে প্রথম উদাহরণের মর্ম এই যে, রাসূল ﷺ হিজরত করে মদীনায় আগমনের পর কুফর শিরক ও জুলুমের আঁধার কাটতে শুরু হয়। ফলে সত্য-মিথ্যা হেদায়েত-গোমরাহীর মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। চক্ষুষ্মানের সামনে সকল বাস্তবতা পরিস্কার হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু মুশরিকরা অন্ধের মতো আত্মপূজার মাঝে ডুবে থাকে। এ উজ্জ্বল আলোর মাঝে তারা কিছুই দেখতে পেল না। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক মুসলমান হয়ে আবার দ্রুত মুরতাদ ও মুনাফিক হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে নিপতিত ছিল। ইতোমধ্যে সে অগ্নি প্রজ্বলিত করল ফলে আশপাশ আলোকিত হলো। উপকারী ও ক্ষতিকর জিনিসসমূহ তার সামনে উদ্ভাসিত হলো। অতঃপর হঠাৎ করে সে আলোক রশ্মি নিভে গেলে সে,. প্রচণ্ড অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। মুনাফিকদের অবস্থাও হুবহু অনুরূপ ছিল। প্রথমে তারা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ল। যখন মুসলমান হয় তখন যেন আলোতে প্রবেশ করল। সে আলোতে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দের পরিচয় লাভ করল। অতঃপর আবার কুফর ও নিফাকের দিকে ফিরে গেল। যেন পুনরায় সকল আলো দূর হয়ে গেল। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬৪, ৬৫]

فَقَدْ أَمِنُوْا مِنَ الْقَتْلِ والسَّبْىِ وَانْتَفَعُوْا بِأَخْذِ الْغَنَائِمِ وَالزَّكَاةِ فَإِذَا مَاتُوا فَقَدْ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ فَلَمْ يَأْمَنُوْا مِنَ النَّارِ وَلَمْ يَنْتَفِعُوْا بِالْجَنَّةِ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلَاثٍ : ظُلْمَةِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالْقَبْرِ (صَاوِى ـ ١٩.١)

قَوْلُهُ «مَثَلُهُمْ» صِفَتُهُمْ فِىْ نِفَاقِهِمْ : এখানে مَثَلُهُمْ -এর বদলে صِفَتُهُمْ শব্দ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَثَل দ্বারা প্রচলিত مَثَل উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের হাল অবস্থা উদ্দেশ্য

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اِسْتَوْقَدَ اَوْقَدَ : اِسْتَوْقَدَ-এর ব্যাখ্যায় اَوْقَدَ উল্লেখ করে এ কথা বুঝালেন যে, اِسْتَوْقَدَ-এর মাঝে س এবং تَاء হরফ দুটি طَلَب -এর অর্থ প্রকাশের জন্য নেওয়া হয়নি; বরং এগুলো زَائِدَة বা অতিরিক্ত। এ রকম ব্যবহার আরবিতে করা হয়।

قَوْلُهُ «اَضَاءَتْ» اَنَارَتْ : اَضَاءَتْ-এর ব্যাখ্যায় اَنَارَتْ উল্লেখ করে فِعْل টির مُتَعَدِّى হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ সূরতে فَاعِل হবে ضَمِير مُسْتَتِر আর مَا حَوْلَهُ জুমলা হয়ে مَفْعُول بِهٖ আর مَا ইসমে মাওসূলটি مَكَان অর্থে ব্যবহৃত اَىْ اَضَاءَتِ النَّارُ الْمَكَانَ الَّذِىْ حَوْلَهُ

তাফসীরে আবুস সাউদ -এ উল্লেখ আছে- اَلْاِضَاءَةُ فَرْطُ الْاِنَارَةِ অর্থাৎ اَلْاِضَاءَةُ অর্থ- অধিক আলোকিত করা। কুরআনের আয়াতেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا (يُوْنُس : ٥)

আর اَضَاءَتْ শব্দটিকে مُؤَنَّثْ ব্যবহার করা হয়েছে نَار কে ফায়েল সাব্যস্ত করে। اَىْ اَضَاءَتِ النَّارُ نَفْسَهَا অথবা اَمَاكِنْ وَاَشْيَاءُ-কে ফায়েল সাব্যস্ত করে। اَىْ اَضَاءَتِ الْاَشْيَاءُ وَالْاَمَاكِنْ

قَوْلُهُ اِسْتَدْفَأَ : উপকার লাভ করল, উষ্ণতা লাভ করল। يَدْفَأُ (س) دَفِئَ الْبَيْتُ থেকে নির্গত। অভিধানে دَفِئَ বলা হয় উটের শাবক, দুধ ও তা থেকে আরো যা যা উপকার লাভ করা হয়। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-(اَلنَّحْل :٥) لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ

قَوْلُهُ وَاَمِنَ مِمَّا يَخَافُهُ : اَىْ مِنْ عَدُوٍّ وَسِبَاعٍ وَحَيَّاتٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يَضُرُّ

قَوْلُهُ وَ جَمْعُ الضَّمِيْرِ مُرَاعَاةً الْمَعْنٰى يَخَافُهُ : অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে مَثَلُه একবচন শব্দ ব্যবহার করে শেষে بِنُوْرِهِمْ-এর মাঝে هُمْ সর্বনামটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে اَلَّذِىْ-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ فِىْ ظُلُمَاتٍ : ظُلُمَاتٌ - ظُلْمَةٌ -এর বহুবচন অর্থ অন্ধকার। এখানে ইশকাল হয় ظُلُمَاتٌ বহুবচন ব্যবহারের দ্বারা বুঝা যায় সেখানে অনেকগুলো অন্ধকার ছিল। সেগুলো কি?

উত্তর: এর উত্তরে নিম্নোক্ত জবাব দেওয়া হয়- ١. بِاعْتِبَارِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ تَرَاكُمِ الْغَمَامِ وَظُلْمَةِ انْطِفَاءِ النَّارِ .

٢. وَفِى الْبَيْضَاوِىْ : وَظُلُمَاتُهُمْ ظُلْمَةُ الْكُفْرِ وَ ظُلْمَةُ النِّفَاقِ وَظُلْمَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ نُوْرٌ . قَالَ تَعَالٰى . يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ .

٣. اَوْ ظُلْمَةُ الضَّلَالِ وَظُلْمَةُ سَخَطِ اللّٰهِ وَظُلْمَةُ الْعِقَابِ السَّرْمَدِىْ .

٤. اَوْ ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ كَاَنَّهَا ظُلُمَاتٌ مُتَرَاكِمَةٌ . (جَمَل : ص٣٢ ج١)

قَوْلُهُ لَا يُبْصِرُوْنَ : এটি ظُلْمًا -এর حَال مُؤَكِّدَه হয়েছে।

قَوْلُهُ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ : صُمٌّ হলো مُبْتَدَا مَحْذُوْف-এর خَبَر এবং جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة আর بُكْمٌ হলো خَبَر ثَانِى এবং عُمْىٌ হলো خَبَر ثَالِثْ উপরিউক্ত তিনটি خَبَر যদিও শব্দের দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু অর্থ ও মর্মের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। আর তা হলো শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরও সত্য গ্রহণ না করা। সুতরাং এর দ্বারা তাদের বাহ্যিক অনুভূতির নাকচ করা উদ্দেশ্য নয়। যেমনটি মুফাসসির (র.) عَنْ - صِلَه উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১৯. أَوْ مَثَلُهُمْ كَصَيِّبٍ أَيْ كَأَصْحَابِ مَطَرٍ وَأَصْلُهُ صَيْوِبٌ مِنْ صَابَ يَصُوبُ أَيْ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ أَيِ السَّحَابِ فِيهِ أَيِ السَّحَابِ ظُلُمَاتٌ مُتَكَاثِفَةٌ وَرَعْدٌ هُوَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ وَقِيلَ صَوْتُهُ وَبَرْقٌ لَمَعَانُ سَوْطِهِ الَّذِي يَزْجُرُهُ بِهِ يَجْعَلُونَ أَيْ أَصْحَابُ الصَّيِّبِ أَصَابِعَهُمْ أَيْ أَنَامِلَهَا فِي آذَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ الصَّوَاعِقِ شِدَّةِ صَوْتِ الرَّعْدِ لِئَلَّا يَسْمَعُوهَا حَذَرَ خَوْفَ الْمَوْتِ مِنْ سِمَاعِهَا كَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ إِذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَفِيهِ ذِكْرُ الْكُفْرِ الْمُشَبَّهِ بِالظُّلُمَاتِ وَالْوَعِيدِ عَلَيْهِ الْمُشَبَّهِ بِالرَّعْدِ وَالْحُجَجِ الْبَيِّنَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْبَرْقِ يَسُدُّونَ آذَانَهُمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوهُ فَيَمِيلُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَتَرْكِ دِينِهِمْ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مَوْتٌ وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ عِلْمًا وَقُدْرَةً فَلَا يَفُوتُونَهُ

১৯. কিংবা তাদের উপমা যেমন মুষলধারে বৃষ্টি অর্থাৎ বৃষ্টির মাঝে নিপতিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় صَيِّبٌ [মুষলধারে বৃষ্টি] শব্দটি মূলত صَيْوِبٌ ছিল। এটি صَابَ - يَصُوبُ [নামা, অবতরণ করা] ক্রিয়াপদ হতে উদগত শব্দ। অর্থাৎ যা বর্ষিত হচ্ছে। আকাশ অর্থাৎ মেঘমালা হতে; তাতে অর্থাৎ ঐ মেঘে রয়েছে নিবিড় অন্ধকার, রা'দ রা'দ হলো মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। কেউ কেউ বলেন, তার ধ্বনি ও বিদ্যুৎ অর্থাৎ যে বেত্রদণ্ড দ্বারা ঐ ফেরেশতা মেঘ হাঁকিয়ে নিয়ে যান তার ছটা। তারা অর্থাৎ বৃষ্টির মাঝে নিপতিত ব্যক্তিরা অঙ্গুলি প্রবেশ করায় অর্থাৎ আঙ্গুলের অগ্রভাগ তাদের কর্ণে বজ্রধ্বনিতে রা'দের প্রচণ্ড নিনাদের কারণে যেন তা আর তাদেরকে শুনতে না হয়। মৃত্যু ভয়ে মৃত্যুর আশঙ্কায় তা শুনে। তদ্রূপ তারাও [মুনাফিকরা] যখন কুরআন [আয়াত] নাজিল হয় আর এতে রয়েছে কুফরের আলোচনা যার উপমা হলো ঘোর অন্ধকার, এতদসম্পর্কে হুমকির -যার উপমা হলো রা'দ [বজ্রধ্বনি] আরো রয়েছে সুস্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণাদির বর্ণনা যেগুলোর উপমা হলো 'বারক' [বিদ্যুৎ প্রভা] তখন তারা নিজেদের কান বন্ধ করে ফেলে যেন তা শুনতে না পায় এবং ঈমান আনয়নের প্রতি কোনোরূপ অনুরাগের সৃষ্টি না হয়। আর এটা [অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগ করা] তাদের নিকট মৃত্যুর শামিল। আল্লাহ তা'আলা সত্য- প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন জ্ঞান ও শক্তি উভয়বিদভাবে। সুতরাং তারা তাঁকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না।

২০. يَكَادُ يَقْرُبُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ـ يَأْخُذُهَا بِسُرْعَةٍ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ـ أَيْ فِي ضَوْئِهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَقَفُوا تَمْثِيلٌ لِإِزْعَاجِ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْحُجَجِ قُلُوبَهُمْ وَتَصْدِيقِهِمْ بِمَا سَمِعُوا فِيهِ مِمَّا يُحِبُّونَ وَوُقُوفِهِمْ عَمَّا يَكْرَهُونَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِمَعْنَى أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمُ الظَّاهِرَةِ كَمَا ذَهَبَ بِالْبَاطِنَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَاءَهُ قَدِيرٌ ـ وَمِنْهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ ـ

২০. বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে লয় অর্থাৎ দ্রুত যেন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের বস্তু উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই চলে অর্থাৎ এর আলোকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন থমকে দাঁড়ায় থেমে পড়ে। কুরআনে বর্ণিত প্রমাণসমূহ তাদের হৃদয় আন্দোলিত করে তোলে, এতে নিজেদের পছন্দনীয় বিষয়াবলির বর্ণনা শুনে তৎপ্রতি তাদের যে বিশ্বাস এবং তাদের নিকট অনভিপ্রেত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের যে বিরতি এস্থানে তাদের ঐ অবস্থারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের বাহ্যিক শ্রবণ শক্তি অর্থাৎ শ্রবন্দ্রিয়সমূহ ও দৃষ্টি হরণ করে নিতেন। যেমন তিনি তাদের অন্তর-চক্ষু হরণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে যাতে তিনি চান সর্বশক্তিমান তন্মধ্য হতে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহের বিনাশও অন্যতম।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তরকীব

أَوْ -এর ব্যাপারে ৫টি মন্তব্য রয়েছে কিন্তু উত্তম এটা যে, أَوْ সন্দেহের জন্য নয়, বরং সাধারণত দুটি বস্তুর মধ্যে সমকক্ষতার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন جَالِسِ الْحَسَنَ أَوِ ابْنَ سِيْرِيْنَ

صَيِّبٌ এটা فَيْعِلٌ -এর ওজনে صَوْبٌ অর্থ- نُزُوْلٌ থেকে বের হয়েছে। বৃষ্টি মেঘকে বলা হয়। মুফাস্‌সির জালাল (র.) كَأَصْحَابِ مَطَرٍ প্রকাশ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُضَاف মাহ্‌যূফ এবং صَيِّب অর্থ মেঘ নয়, বরং বৃষ্টি। মূলে صَيْوُوْبٌ ছিল, يَاء - وَاو এক শব্দে একত্র হয়েছে এবং وَاو মাক্‌সূর তাই يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে إِدْغَام করা হয়েছে।

اَلسَّمَاءُ -এর কয়েকটি অর্থ- أُفُقٌ [দিগন্ত সুদূর প্রান্ত] بَادِل [মেঘ] اَسْمَان এমন প্রতিটি বস্তু যা উপরে হয় বা থাকে। এ স্থানে উক্ত তিনটি অর্থই যথাযথ। মুফাস্‌সির (র.) بَادِل [মেঘ] -এর অর্থ ব্যক্ত করেছেন। رَعْدٌ - মেঘের গর্জন যা বায়ু চলার ও পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা জন্মে। بَرْقٌ -মেঘের ঘর্ষণে যে চমক বিদ্যুৎ জন্মে। فِيْهِ যমীরের مَرْجِع মুফাস্‌সির (র.) ظَاهِر -এর বিপরীত سَحَاب -কে বলেছেন, কিন্তু অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ (র.) صَيِّب -কে বলেছেন فِيْ বমা'না مَعَ ; اَلسَّمَاءُ শব্দটি مُذَكَّر -ও ব্যবহৃত হয়। যেমন - اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ এবং مُؤَنَّث ও যেমন- إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ - رَعْد -এর পরে مَرْفُوْعًا মুফাস্‌সির (র.) اَلْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ উল্লেখ করেছে, যেমন- ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাও করেছেন। এমনিভাবে بَرْقٌ -এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। أَصَابِعَهُمْ -এর ব্যাখ্যা أَنَامِلُ -এর দ্বারা এ জন্য করেছেন, যাতে مَجَاز نَقْلِي হিসেবে مُبَالَغَه -এর জন্য جُزْء -এর উপর كُلّ -এর প্রয়োগ বুঝে আসে। كَذٰلِكَ هٰؤُلَاءِ দ্বারা মুফাস্‌সির (র.) مُشَبَّه [মুশাব্বাহ] -এর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যাতে مُفْرَد -এর সাথে مُفْرَد -এর উদাহরণ বুঝা যায় এবং কাজী বায়যাবী (র.) এ উদাহরণকে تَشْبِيْه মুফরাদ মুরাক্কাব উভয়ের উপর প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন। مُحِيْط এটা প্রকৃত পক্ষে مُحْوِط ছিল। خَاطَ - يَحُوْطُ থেকে। وَاو -এর কাসরা পরিবর্তন করে حَاء -কে দিয়েছে এবং وَاو -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করেছে, مُحِيْط হয়ে গেছে।

لَا يَفُوْتُوْنَهُ বের করে এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, এ আয়াতে اِسْتِعَارَه تَمْثِيْلِيَّة হচ্ছে شَاء -এর মাফঊল মাহযূফ, যার উপর لَوْ এর উত্তর নির্দেশনা করছে لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ أَيْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَذْهَبَ [যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যেতে তবে অবশ্যই নিয়ে যেতেন।]

شَيْئٍ এর পরে شَاءَ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, شَيْءٌ শব্দটি [যা ইস্‌মে] এটা ইস্‌মে مَفْعُوْل -এর অর্থে, আর এর দ্বারা সমস্ত أَشْيَاء এমনভাবে উদ্দেশ্য নয় যে, আল্লাহ তা'আলার জাতও এর মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে। বরং আল্লাহর জাতিকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল বস্তু (أَشْيَاء) উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ আল্লাহ নিজ সত্ত্বাকে ব্যতীত সকল বস্তুসমূহের উপর ক্ষমতা রাখেন। সত্ত্বা ও গুণাবলির মধ্যে পরিবর্তন যেহেতু দোষ ত্রুটিকে অবধারিত করে। তাই সেটা ক্ষমতা থেকে বাহিরে থাকবে।

كَأَنْ : أَوْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ أَصْحَابِ صَيِّبٍ মুবতাদা মাহ্‌যূফ, كَصَيِّبٍ -এর খবর। বাক্যটির প্রকৃত রূপ এমন হবে مَثَلُهُمْ রফার স্থানে مِنَ السَّمَاءِ - كَائِنٌ মুক্বাদ্দারের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে صَيِّب -এর সিফত। ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ মুবতাদা مُؤَخَّر - فِيْهِ খবরে মুক্বাদ্দাম। জুমলা মিলে জরফ مِنَ الصَّوَاعِقِ - يَجْعَلُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّق এবং حَذَرَ الْمَوْتِ -এর মাফঊলে লাহু, এটা জুমলায়ে مُسْتَأْنِفَه হয়েছে এবং فِيْهِ -এর যমীর থেকে حَال - ও হতে পারে। وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ জুমলায়ে مُعْتَرِضَه

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরআনের উপমাসমূহের সম্পর্ক ও ব্যাখ্যা : এ উপমা দ্বিতীয় প্রকারের মুনাফিকদের সম্পর্কে যারা প্রকাশ্যভাবে তো ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে সন্দিহান। যখনই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো সৌন্দর্য ও বিজয় দেখতো তখন অন্তর কিছু কিছু ইসলামের দিকে ধাবিত হতে লাগতো। পরে যখন স্বার্থের বিরোধিতার প্রকটতা কিংবা কষ্ট ও বিপদসমূহের সম্মুখীন হতো, তখন ঐ অগ্রসরতা অস্বীকারের রূপ নিত। সুতরাং যেমনিভাবে কেউ তুফান ও ঝড়ে পড়ে গেলে কখনো সুযোগ পেলে বিদ্যুৎ চমকিলে আগে বাড়তে থাকে। আবার কখনো অন্ধকারে গর্জনে ভীতু হয়ে চলা থেকে বিরত থাকে, ঠিক এ অবস্থাই এ মুনাফিকদের। কেননা যখনই এরা ইসলামের আলোর উজ্জ্বলতা দেখতে পায়, তখন সত্যের দিকে আগে বাড়তে থাকে। কিন্তু হীনস্বার্থ ও মনের চাহিদার অন্ধকারে পড়ে পুনরায় সত্য থেকে ফিরে যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ الخ ধমক এজন্য যে, যদি ফিরে না আসে। তবে স্মরণ রাখো আমার ক্ষমতার বাইরে যেতে পারবে না।

اَلْاَسْبَابُ التَّكْوِيْنِيُّ وَالتَّشْرِيْعِيُّ **[সৃষ্টিগত ও আইনগত সূত্রসমূহ]** : এস্থানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ ও দার্শনিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী সূর্যের তাপ যখন পানি ও জমিনে পড়ে, তখন বায়ুগুলো আকাশে উঠে যায়। এ পানির বাষ্পগুলো যদি সূক্ষ্ম ও মিহীন হয়ে তীব্র ঠাণ্ডার মঞ্জিলে অনেক উপরে চলে যায়। তখন সেখানকার ঠাণ্ডার সাথে মিশ্রিত হয়ে মেঘ হয়ে যায়। ওগুলো থেকে যে ফোটাগুলো পড়ে সেগুলোকে বৃষ্টি বলে। এ সেগুলো যদি ঠাণ্ডার কারণে জমে যায়। তবে শিলা ও বরফের রূপ ধারণ করে। কিন্তু যদি জল বাষ্পগুলো তীব্র ঠাণ্ডার স্তর থেকে নীচে রয়ে যায়, তবে এগুলোর দ্বারা শিশির তৈরি হয়। এমনিভাবে ঐ বাষ্পগুলোর সাথে যদি ধোয়ার অংশসমূহও মিলে যায় তখন সেটা মেঘকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উপরে বের হওয়ার চেষ্টা করে, যার থেকে رَعْد - بَرْق ও صَاعِقَة জন্মে। মোদ্দাকথা, কুরআনের বর্ণনা "বৃষ্টি আকাশ থেকে আসে" প্রকাশ্যভাবে ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিজ্ঞানীদের বর্ণনার বিপরীত। অর্থাৎ বৃষ্টি মেঘ থেকে বের হয় এবং মেঘ জমিন ও পানির অংশ থেকে তৈরি হয়। "আকাশ থেকে বৃষ্টি আসে না"। এমনভাবে উপরে উল্লিখিত صَاعِقَة - بَرْق - رَعْد সূত্র ও উপকরণসমূহ থেকে তৈরি হয়।" "ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতার আওয়াজও ফেরেশ্‌তার চাবুককে বলা হয় না।" এর কয়েকটি উত্তর দেওয়া যায়—

১. উভয় মন্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন। আর তা হচ্ছে উভয় মন্তব্যই সঠিক। অর্থাৎ আমাদের সামনে অনুভব হয় বৃষ্টি মেঘ থেকে আসছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং মেঘসমূহের মধ্যে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে। গর্শন করা নিকটের প্রকাশ্য সূত্রসমূহকে বর্ণনা করছে। আর পবিত্র কুরআন ও শরিয়ত দূরের প্রকৃত সূত্রসমূহকে বর্ণনা করছে।

২. বৃষ্টি কখনো মেঘ থেকে বর্ষিত হয়। আবার কখনো আকাশ থেকে। এক প্রকারকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সূত্রগুলোকে দর্শন শাস্ত্র বর্ণনা করছে, আর অন্য প্রকারকে অর্থাৎ মৌলিক সূত্রসমূহকে শরিয়ত বর্ণনা করছে এবং সূত্রসমূহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা হয় না। কেননা এক বস্তুর বিভিন্ন সূত্র ও উপকরণসমূহ হতে পারে। বৃষ্টির সূত্রগুলোও বিভিন্ন ও অনেক। এক প্রকার শরিয়ত বর্ণনা করেছে। অন্য প্রকারকে বিজ্ঞান বর্ণনা করেছে। প্রথম নির্দেশনার উপর সূত্র ও সূত্রের কথা বলা যায় এবং দ্বিতীয় নির্দেশনার উপর দুটি সমকক্ষের সূত্র মেনে নেওয়া যায়। অথবা এমন বলা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুর দুটি দিক থাকে। একটি প্রকাশ্য অপরটি গোপন। বৃষ্টির প্রকাশ্য ও বাহ্যিক সূত্রকে দর্শন বর্ণনা করছে এবং পবিত্র কুরআন মূল ও প্রকৃত সূত্রকে বর্ণনা করছে।

৩. বৃষ্টি শুধু মেঘ থেকে আসে। যেমনটি দেখা যায়। আর মেঘের জন্য আকাশের অর্থ লওয়া যায় এবং আভিধানিকভাবে এর সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রত্যেক উপরের বস্তুকে আকাশ বলা হয়।

একটি সন্দেহ এবং তার উত্তর : এ সন্দেহটি রয়ে গেল যে, আধুনিক বিজ্ঞান তো আকাশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং কুরআন দ্বারা আকাশ বরং আকাশসমূহের অস্তিত্ব ও সংখ্যাধিক্যতা বুঝা যায়। সুতরাং উত্তরে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট। هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ [যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ : এটি جُمْلَة مُعْتَرِضَة হয়েছে। مُحِيْطٌ শব্দটি মূলত مُحْوِطٌ ছিল। وَاو مُتَحَرِّك তার পূর্বে হরফে সহীহ সাকিন বিধায় وَاو -এর কাসরাকে পূর্বাক্ষর দিয়ে وَاو-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করার পর مُحِيْطٌ হয়েছে। অর্থাৎ কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার নাগালের বাইরে নয়। সব সময় সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাদের ধ্বংস করতে পারেন।

قَوْلُهُ شَاءَ : شَيْءٌ -এর ব্যাখ্যায় شَاءَ উল্লেখ করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: شَيْءٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় জাত ও সিফাতসহ বিদ্যমান আছেন। এখন প্রশ্ন উঠে আল্লাহ তা'আলা اَشْيَاء -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা। যদি না থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা لَا شَيْءٌ হওয়ার লাজিম আসে। যা স্পষ্টই বাতিল। কারণ তিনি তো বিদ্যমান আছেন। আর তিনি شَيْءٌ -এর মাঝে দাখিল হলেও প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ এ মূলনীতির আলোকে আল্লাহ তা'আলাও هَالِكٌ বা ধ্বংসশীল হওয়া লাজিম আসে।

উত্তর: বস্তুর شَيْءٌ দ্বারা ঐ شَيْءٌ -কে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার مَشِيَّتٌ বা ইচ্ছার অধীন। আর আল্লাহ তা'আলার জাত তাঁর مَشِيَّتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা যে বস্তু مَشِيَّتٌ বা ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে সেটা حَادِث নশ্বর হবে আর আল্লাহ তা'আলা হলেন কাদীম ও অবিনশ্বর।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢١. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَيْ اَهْلَ مَكَّةَ اعْبُدُوْا وَحِّدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ اَنْشَاَكُمْ وَلَمْ تَكُوْنُوْا شَيْئًا وَ خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ بِعِبَادَتِهٖ عِقَابَهٗ وَلَعَلَّ فِى الْاَصْلِ لِلتَّرَجِّيْ وَفِيْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى لِلتَّحْقِيْقِ

২১. হে মানুষ অর্থাৎ হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা ইবাদত কর এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস স্থাপন কর তোমাদের সেই প্রতিপালকের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে তোমাদের উদ্ভব ঘটিয়েছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই ছিলে না। এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পার তাঁর ইবাদত করে তাঁর শাস্তি হতে। এ স্থানে لَعَلَّ মূলত تَرَجِّيْ [আশাব্যঞ্জক] অর্থবোধক শব্দ। তবে অল্লাহ তা'আলার কালামে তা নিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

٢٢. اَلَّذِيْ جَعَلَ خَلَقَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا حَالٌ بِسَاطًا يُفْتَرَشُ لَا غَايَةَ لَهَا فِى الصَّلَابَةِ اَوِ اللُّيُوْنَةِ فَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا وَالسَّمَاۤءَ بِنَاۤءً سَقْفًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ اَنْوَاعِ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ تَاْكُلُوْنَهٗ وَتَعْلِفُوْنَهٗ بِهٖ دَوَابَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا شُرَكَاۤءَ فِي الْعِبَادَةِ وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْخَالِقُ وَلَا يَخْلُقُوْنَ وَلَا يَكُوْنُ اِلٰهًا اِلَّا مَنْ يَّخْلُقُ ـ

২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা فِرَاشًا শব্দটি حَالٌ [ভাব ও অবস্থাবাচক পদ]। অর্থাৎ উপযোগী শয্যারূপে বিছিয়ে দিয়েছেন। অতি কঠিন নয়, কোমলও নয় যাতে তঅবস্থান করা অসম্ভব। এবং আকাশকে ছাদরূপে গঠন করেছেন এ স্থানে بِنَاۤءً অর্থ ছাদ। এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অনন্তর তা দ্বারা তোমাদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল উৎপাদন করেন তোমরা যা নিজেরাও আহার কর এবং তোমাদের পশুদেরও তৃণরূপে আহার দান কর। সুতরাং কাউকেও তার সমকক্ষ দাঁড় করো না। উপাসনায় শরিকরূপে, অথচ তোমরা জান যে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা আর এগুলো দেব-দেবী কিছুই সৃষ্টি করে না। আর একমাত্র তিনিই আল্লাহ তা'আলা হতে পারেন, যিনি সৃষ্টি করেন [তিনি ব্যতীত আর কেউ ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না।]

তাহকীক ও তারকীব

يَا হরফে নেদা, اَيُّهَا النَّاسُ মুনাদা اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ জুমলা মাউসূফ, اَلَّذِيْ মাউসূল, خَلَقَكُمْ সেলাহ. জুমলায়ে فِعْلِيَه হয়ে رَبَّكُمْ মা'তুফ আলাইহি। اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ . اَيِ الَّذِيْنَ مَنْ خَلَقَهُمْ مِنْ قَبْلِ خَلْقِكُمْ এ জুমলাটি মা'তূফ, উভয় জুমলা رَبَّكُمْ -এর সিফত হয়েছে। لَعَلَّ টি مُشَبَّه بِالْفِعْلِ , كُمْ ইস্‌ম, تَتَّقُوْنَ খবর। اَلَّذِيْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত মাউসূল- সেলার মিলে দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। لَعَلَّ দ্বিধা ও সন্দেহ, দোদুল্যতা ও আকাঙ্ক্ষার স্থানসমূহে আসে। اَنْدَادٌ বহুবচন نِدٌّ এর , যার অর্থ -সমকক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী। بِنَاءٌ মাসদার, উঁচুস্থান, তাঁবু। اَلَّذِيْ নসবের স্থান- সিফতের উপর ভিত্তি করে এবং মহল্লে رَفْع ও হতে পারে মুবতাদাকে মাহযূফ নির্ধারণের মাধ্যমে।

http://islamiboi.wordpress.com

يَأَيُّهَا النَّاسُ : يَا، হলো حَرْف نِدَاء ; কুরআনে কারীমে نِدَاء -এর জন্য একমাত্র يَا، হরফটিই ব্যবহৃত হয়েছে। **খালেক** মাখলুক নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই এটি ব্যবহৃত হয়েছে। أَيُّ মুনাদাটি শব্দগত দিক দিয়ে ضَمَّة -এর উপর **মবনী। আর** ই'রাবের ক্ষেত্রে نَصْب -এর স্থলে। আর هَا، হরফটি تَنْبِيه বা সতর্কতা স্বরূপ আর اَلنَّاسُ হলো أَيُّ -এর صِفَت বা بَدَل

اَلنَّاسُ শব্দটির মূল হলো أُنَاسٌ 'ফা' কালিমার হামজাটি হযফ করে তার বদলে اَل আনা হয়েছে। হামজা এবং আলিফ লাম -এর যে কোনো একটি ব্যবহৃত হবে। উভয়টি একত্র হবে না।

فَائِدَةٌ : إِنَّ النِّدَاءَ عَلٰى سَبْعَةِ مَرَاتِبَ : نِدَاءُ مَدْحٍ وَ نِدَاءُ ذَمٍّ، تَنْبِيهٍ، وَنِدَاءُ إِضَافَةٍ، وَ نِدَاءُ نِسْبَةٍ، وَ نِدَاءُ تَسْمِيَةٍ، وَ نِدَاءُ تَعْنِيفٍ . فَالْأَوَّلُ كَقَوْلِهٖ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، وَالثَّانِي : كَقَوْلِهٖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَالثَّالِثُ : كَقَوْلِهٖ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالرَّابِعُ كَقَوْلِهٖ يَا عِبَادِيْ وَالْخَامِسُ: كَقَوْلِهٖ يَا بَنِيْ أٰدَمَ، يَا بَنِيْ إِسْرَائِيلَ، وَالسَّادِسُ : كَقَوْلِهٖ يَا دَاوُدُ يَا إِبْرَاهِيمُ، وَالسَّابِعُ : كَقَوْلِهٖ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ . (جَمَل : ٣٧)

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে يَأَيُّهَا النَّاسُ বলে মক্কাবাসীকে এবং يَأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا বলে মদীনাবাসীকে সম্বোধন করে থাকে। সূরা বাকারা হলো মাদানী সূরা। যাতে মদীনাবাসীকে সম্বোধন করে يَأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল। অথচ يَأَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এমনটি কেন করা হলো?

উত্তর : উক্ত কায়দাটি يَأَيُّهَا النَّاسُ তথা অধিকাংশের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। كُلِّيٌّ বা সামগ্রিক দৃষ্টিতে নয়।

أَهْل : এর মাঝে رَفْع এবং نَصْب উভয় ই'রাব হতে পারে। نَصْب এ হিসেবে যে, এটি بِاعْتِبَارِ مَحَلّ বা স্থান বিচারে اَلنَّاسُ -এর ব্যাখ্যা। আর اَلنَّاسُ শব্দটি স্থান বিচারে أَيُّ -এর সিফত হিসেবে নসবের স্থলে রয়েছে। তাই তার ব্যাখ্যা তথা أَهْل -ও মানসূব হবে। আর رَفْع এ হিসেবে হবে যে, এটি শব্দগত দিক দিয়ে اَلنَّاسُ -এর তাফসীর। আর اَلنَّاسُ শব্দগত দিক দিয়ে مَرْفُوْع তাই أَهْل -ও مَرْفُوْع হবে। –[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৩৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : প্রথমে তিনটি দলের অবস্থা পৃথক পৃথক বর্ণনা করার পর এখন ঐ সবগুলোকে **সম্মিলিতভাবে** সম্বোধনের সাথে ইসলামের দুটি মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ একত্ববাদ ও রিসালাতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।

আল্লাহর ইবাদত ও অনুগ্রহসমূহের ব্যাখ্যা : প্রথম তাওহীদের আলোচনা, যা স্বাভাবিক ও পরিষ্কার মর্মস্পর্শী ভাব-ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মহৎ লোক স্বভাবত ও স্বাভাবিকভাবে অনুগ্রহকারীর দিকে ধাবিত হয় এবং অনুগ্রহকারীও তিনিই যিনি অস্তিত্বের ন্যায় বিরাট দৌলত দান করেছেন যে, এটা ব্যতীত সকল নিয়ামত তুচ্ছ এবং তারপর অস্তিত্বের টিকে থাকার সকল সামানাদি দান করেছেন। চাই ঐ নিয়ামতগুলো প্রকাশ্য ও শারীরিক হোক, যেমন– পানাহারের বস্তুসমূহ অথবা আধ্যাত্মিক ও বাতেনী আহারাদি হোক, অর্থাৎ আহকামে শরিয়ত, যেগুলো রিসালাত ও নুবয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যখন একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, স্রষ্টা শুধু আল্লাহ। তবে মা'বূদ ও শুধু আল্লাহই হওয়া চাই। মা'বূদ হওয়া শুধু স্রষ্টার জন্য খাছ, আর দাস হওয়া সৃষ্টির অবস্থারযোগ্য।

اَلنَّاسُ -এর ব্যাখ্যা মক্কাবাসী দ্বারা করা সূরা বাক্বারার বিপরীত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর যে রেওয়ায়েত হাকিম (র.) পেশ করেছেন যে, اَلنَّاسُ দ্বারা সম্বোধন মক্কাবাসীকে এবং اَلَّذِينَ اٰمَنُوا দ্বারা সম্বোধন মদীনাবাসীকে সম্বোধন করা হয়। এর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ সংবিধান নয়; বরং অধিকাংশ রীতিনীতি উদ্দেশ্য হয়। তাই এ রেওয়ায়েতটিও উক্ত ব্যাখ্যার বিপরীত নয়।

তাওহীদই [একত্ববাদই] ইবাদতের উৎস : اُعْبُدُوا -এর ব্যাখ্যা وَحِّدُوا -এর দ্বারা এ জন্য করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইরশাদ করেন كُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْاٰنِ مِنَ الْعِبَادَةِ فَمَعْنَاهُ التَّوْحِيدُ কুরআনে যে কোনোস্থানে عِبَادَت শব্দটি এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাওহীদ। কেননা কোনো ইবাদত তাওহীদ ব্যতীত সম্ভব নয়। তাওহীদই ইবাদতের উৎস। তাই তাওহীদকে عِبَادَت -এর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা মাজায হয়েছে অথবা এ অর্থ লওয়া যায় যে, শুধু এক এর ইবাদত কর, অন্যকে এর মধ্যে অংশীদার করবে না এবং ইবদতের অর্থ শুধু উপাসনা নয়; বরং আনুগত্য ও ভক্তি। যার মধ্যে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতও এসে গেছে, এবং বিয়ে, ত্বালাক্ব, আদান-প্রদান, ক্রয়- বিক্রয় ইত্যাদি সকল বিধানাবলি এসে গেছে।

রাজকীয় পরিভাষাসমূহ : لَعَلَّ যেহেতু সন্দেহ ও সংশয়ের জন্য রচিত, তাই কালামে এলাহীর মধ্যে এর ব্যবহার আপত্তির কারণ, মুফাসসির আল্লাম (র.) لِلتَّحْقِيقِ -এর নির্দেশনার দ্বারা -এর অপসারণ করেছেন। অর্থাৎ কুরআন কারীমে এটাকে إِنَّ تَحْقِيقِيَّة -এর সমর্থবোধক বুঝতে হবে. অর্থাৎ সন্দেহের জন্য নয়; বরং 'নিশ্চিত' এর জন্য, কিন্তু মুফাসসির (র.) -এর এ বর্ণনা অধিকাংশের হিসেবে তো বিশুদ্ধ; কিন্তু অকাট্যের উপকারী নয়। তাই কেউ কেউ এ নির্দেশনা দিয়েছেন যে,

http://islamiboi.wordpress.com

لَعَلَّ কুরআন কারীমে كَيْ তা'লীলিয়্যার অর্থে। আবার কেউ لَعَلَّ-কে আসল তারাজ্জী ও আশার অর্থেই মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তিদের আস্থা ও বিবেচনা হিসেবে। অর্থাৎ কালামে এলাহী যেহেতু মানুষের স্বভাব ও রীতিনীতির উপর যেমনভাবে খবর, إنْشَاء ـ مَاضِي ـ حَال ـ مُسْتَقْبِل ইত্যাদি। হুকুমাবলি মানুষের কালামের পদ্ধতিতে প্রচলিত। এমনিভাবে لَعَلَّ ـ كَادَ ইত্যাদি শব্দগুলোও ঐ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে আল্লাহর কালামে পাওয়া যাচ্ছে। আর কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ لَعَلَّ (تَعَرَّضَ شَيْءٍ) কোনো কিছুকে ফিরানোর জন্য। অর্থাৎ ইবারত এরূপ ছিল اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ مُعْتَرِضِيْنَ لِأَنْ تَتَّقُوْا কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা এটা যে, এটাকে রাজকীয় পরিভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া। যেমন- বলা হয় যে, আমরা ভাগ্যের উপর ভরসা করে এ আশা রাখি যে, তোমরা আমাদের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকবে। এমনিভাবে বিস্ময়কর নয়" এটাও রাজকীয় পরিভাষা হতে পারে। বড়দের সামান্য আশার ঝলকও আলো দেখিয়ে দেওয়া ও অন্যান্যদের হাজার নিশ্চয়তা থেকে অনেক বেশি মূল্যায়ন যে, كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ [বাদশাগণের কথা হলো কথার বাদশা।]

قَوْلُهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا : এ আয়াতাংশের মুল প্রাণ হচ্ছে جَعَلَ لَكُمْ এখানে কোন পর্যায়েই আকাশ ও পৃথিবীর আকৃতি বর্ণনা করা বা নভোমণ্ডলীয় ও ভূমণ্ডলীয় রহস্য-প্রকৃতি বর্ণনা কর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আকাশ বা পৃথিবী কারো জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ। কোনো কিছু নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং সেই সর্বসময় ক্ষমতাবানেরই অধীনে। সুতরাং যে আসমান জমীন আল্লাহর নির্দেশে মানুষের খেদমতে নিয়োজিত সেই সেবকের সামনেই মাথানত করা এবং তাকে ইলাহর মর্যাদায় পূজা করা কেমন ভীষণ বোকামী, তা বুলার অপেক্ষা রাখে না। -[মাজেদী]

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ فِرَاشًا শব্দটি الْاَرْضَ থেকে حَال হয়েছে। তবে ঐ সূরতে যখন جَعَلَ ফে'লটি خَلَقَ-এর অর্থে এক মাফউলের দিকে مُتَعَدِّيْ হবে। যেমন মুফাসসির (র.) جَعَلَ-এর ব্যাখ্যায় خَلَقَ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছেন। আর جَعَلَ بِمَعْنٰى صَيَّرَ হলে مُتَعَدِّيْ بَدُو مَفْعُوْل হবে। এ সূরতে الْاَرْضَ হবে مَفْعُوْل اَوَّل আর فِرَاشًا হবে مَفْعُوْل ثَانِيْ -[জামাল]

بِسَاطًا يَفْتَرِشُ الخ : ভূমি হলো আমাদের বিছানা বা এমন সমতল স্থান, যাতে আমরা পা রাখতে পারি, চলাফেরা করতে পারি। এমন অসমতল বা খাড়াভাবে তা সৃষ্টি করা হয়নি যেখানে পা রাখা বা চলাফেরা করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। পৃথিবী গোলাকার বা ডিম্বাকার যাই হোক, মানুষ ও মানবতার আবাসভূমি হিসেবে তার এর চেয়ে সুন্দর আর কোনো পরিচয় হতে পারে না যে, পৃথিবী মানুষের জন্য একটা বিছানা। তদ্রূপ আসমান উপর থেকে আমাদের ঢেকে রেখেছে এবং মানুষের সেবায় আল্লাহই তাকে নিয়োজিত করেছেন।

ফায়দা : এ আয়াতে জমীনকে فِرَاش [চাদর] বলা হয়েছে। আর চাদর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই فِرَاش শব্দের ব্যবহারে এ কথা আবশ্যক হবে না যে, জমীন গোলাকার নয়। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের এ বিশাল আয়তন গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও দেখতে বিস্তৃত (مُسَطَّح) মনে হয়। আর কুরআনের বর্ণনাধারার আকর্ষণীয় পদ্ধতি এই যে, কুরআন প্রত্যেক বস্তুর ঐ অবস্থাটি বর্ণনা করে, থাকে যা আলেম-জাহিল নির্বিশেষে সকলেই অনুভব করতে সক্ষম হয়। মোটকথা, জমীনের আয়তন বড় হওয়ায় গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃত ও ছড়ানোই মনে হবে। এ হিসেবে জমীনকে গোলাকার এবং مُسَطَّح বা বিস্তৃতও বলা যাবে। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ سَقْفًا : অন্য আয়াতে এ শব্দ এসেছে। আর এখানে بِنَاءً এসেছে-

وَالْبِنَاءُ مَصْدَرٌ بُنِيَتْ وَاِنَّمَا قُلِبَتِ الْيَاءُ هَمْزَةً لِتَطَرُّفِهَا بَعْدَ اَلِفٍ زَائِدَةٍ.

قَوْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ : এখানে سَمَاء দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ فَوْقَ বা উর্ধ্বলোক। যেমন বলা হয়- مَا عَلَاكَ وَاَظَلَّكَ فَهُوَ سَمَاءٌ আর سَحَاب তথা মেঘমালাও যেহেতু উপরেই অবস্থিত তাই سَمَاء দ্বারা سَحَاب বা মেঘমালা উদ্দেশ্য। সুতরাং এ আপত্তি দূর হয়ে গেল যে, বৃষ্টি তো মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, আসমান থেকে নয়।

تَعْلِفُوْنَ بِهٖ دَوَابَّكُمْ : عَلَفَ الدَّابَّةَ (ض) عَلْفًا [পশুকে ঘাস খাওয়ানো] اَعْلَافٌ (ج) عَلُوْفَةٌ، عَلَفٌ ঘাস, গবাদি পশুর খাদ্য, তৃণ। এ বাক্যটুকু উল্লেখ্য করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلثَّمَرَاتُ দ্বারা জমীনের সব ধরনের উদ্ভিদ ও উৎপন্ন বস্তু বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا : এ বাক্যের সম্পর্ক পূর্বে উল্লিখিত اُعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ-এর সাথে। এখানে جَعَلَ ফে'লটি صَيَّرَ-এর অর্থে। আবুল বাকা (র.) سَمّٰى অর্থেরও অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। যাহোক, جَعَلَ দুটি মাফউলের দিকে মুতআদ্দী হবে। প্রথমটি হলো اَنْدَادًا আর দ্বিতীয়টি তার পূর্বের جَار ও مَجْرُوْر এখানে দ্বিতীয় মাফউলটি প্রথমটির পূর্বে হওয়া ওয়াজিব।

http://islamiboi.wordpress.com

أَنْدَادًا : এটা نِدٌّ -এর বহুবচন। অর্থ- সমান সমান, প্রতিদ্বন্দ্বী, শরীক। যাত বা সত্তাগত অংশিদারীত্বকে نِدٌّ বলা হয় আর সব ধরনের সাধারণ অংশিদারিত্বকে مِثْل বলা হয়।

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْخَالِقُ : এটি فَلَا تَجْعَلُوْا -এর জমীর থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ স্বভাবসুলভ ইলহাম এবং সাধারণ মানবীয় অনুভূতির মাধ্যমেই তোমাদের এটা জানা যে, সকলের সৃষ্টিকর্তা (خَالِق) এবং সকলের শাসকর্তা (حَاكِم) তিনিই। প্রতিটি মানবহৃদয়ে এতটুকু বিচার ও বোধশক্তি গচ্ছিত রাখা হয়েছে, যা তাকে তাওহীদ পর্যন্ত পৌছাতে পারে যদি না ভুল শিক্ষা ও দূষিত পরিবেশ মুল স্বভাবকেই বিকৃত করে না ফেলে। -[মাজেদী]

প্রত্যেক বস্তুর আসল হচ্ছে হালাল হওয়া : لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا -এর মধ্যে আলেমগণ দুটি সূক্ষ্মতা বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, লামে نَفْع দ্বারা ইঙ্গিত এ দিকে যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে হালাল ও বৈধ হওয়া। হারাম হওয়া আকস্মিক ও দলিলের মুখাপেক্ষী।

আল্লামা যমখশারী ও মাদাররিক গ্রন্থকার (র.) এটাকে আবূ বকর রাযী (র.) এবং মু'তাযিলাদের দলিল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম (র.) বিরোধিতার আলোচনায় বলেছেন যে, হালাল ও হারামের বিষয়টি যখন পরস্পর বিরোধ হয়ে যায়। তখন হারাম, পশ্চদ্ভাগ ও রহিতকারী মনে করে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং "হালাল" মূল হওয়ার কারণে অগ্রবর্তী ও রহিত হবে। নতুবা "হারাম" কে মূল ধরলে দু'বার নসখ [রহিত করা] স্বীকার করতে হবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য مَبْسُوْطَات কিতাবসমূহ মুতালা'আহ করা দরকার।

জমিন গোল না চেপ্টা : আর দ্বিতীয় সূক্ষ্মতাটি হচ্ছে, فِرَاش শব্দ দ্বারা জমিনের আকৃতি গোল হওয়া কিংবা সমতল হওয়া জরুরি হয় না। আর এ فِرَاش হওয়াটা ঐগুলো থেকে কোনোটির বিপরীত নয়। জমিন فِرَاش -এর রূপে হওয়া আর এর উপর উঠা, বসা, শোয়া উক্ত দুটি রূপে সাধন হতে পারে। যে পৃষ্ঠের পুরত্ব অনেক ছোট হয়, ওটার فِرَاش মুশকিলের কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন বিরাট আকারের পৃষ্ঠ হয়। তখন এর উপর অগণিত সৃষ্টি সুবিধা মতো থাকতে পারে। সুতরাং সাগরের পৃষ্ঠদেশ থেকে উঁচু জমিনের একটি বিরাট অংশ বিষুব রেখা থেকে উত্তর দিকে এবং সামান্য অংশ দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। যার মধ্যে সকল সৃষ্টি বসবাস করছে। এ জমিন মূলত গোল বানানো হয়ে ছিল, কিন্তু বোঝা-চাপা ও জলোচ্ছ্বাসের আকস্মিক ঘটনাবলির কারণে জমিনের মধ্যে উঁচুতা ও নীচুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং প্রকৃত গোল আকৃতি স্ব অবস্থায় রয়নি।

পৃথিবীর বিস্তৃতি : পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুমান নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা করা যেতে পারে। পূর্ব-পশ্চিমে এর ব্যাস হলো ১২৭৫২ কিঃ মিঃ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২৭০৯কিঃমিঃ। এর আয়তন প্রায় ১৯ কোটি ২০ লক্ষ বর্গমাইল বা ৪৯৭২৬০৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ এর পরিধি হলো ২৫০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস এত বিশাল হওয়ায় দর্শকের নজরে তা সমতল অনুভব হয়। এ কারণেই পৃথিবীকে গোল এবং সমতল উভয় বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً : উদ্দেশ্য হলো এ বাস্তব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যে, আসমান, জমিন, প্রাণী, সবই এক আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। এ সকলের সৃষ্টিতে না কোনো দেব-দেবীর দখল আছে, আর না কোনো পীর বা পয়গাম্বরের। যখন এ বিষয়টি প্রমাণিত ও স্বীকৃত যা তোমরা নিজেরাও স্বীকার কর, তাহলে তোমাদের ইবাদত-বন্দেগী তার জন্যই হওয়া উচিত। অন্য কেউ এর হকদার হতে পারে না। তোমরা তার উপাসনা করবে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরিক বা তার সমকক্ষ স্থির করবে। আল্লাহ তা'আলার খলিফা যখন তার নিজ স্থান ও মর্যাদা বিচ্যুত হয়ে অধঃপতনের শিকার হয়েছেন, তখন সে লাঞ্ছনার ও অবনতির সমস্ত সীমা পার হয়ে গিয়েছে। সে তার সেজদার বস্তু বানিয়েছিল কখনও চন্দ্র-সূর্যকে, কখনও নদ-নদীকে, কখনও আকাশ ও মাটিতে, কখনও বৃক্ষরাজিকে, কখনও পশু ও নির্জীব বস্তুকে, কখনও সাপও আগুনকে। মোটকথা তারা নদ-নদীকেও ছাড়েনি, এমনকি লজ্জাস্থানকেও ছাড়েনি। কুরআন সমস্ত বোকামী ও মনগড়া বিষয়াদির ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেছে।

কুরআনের আলোচ্য বিষয় : কিন্তু এসব তদন্তের ময়দান ভূগোল ও দর্শন হতে পারে। জমিন গোল কিংবা সমতল। জমিন চলমান কিংবা স্থির। আকাশের অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই। সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও নক্ষত্রসমূহের চলন এবং পরিমাপের সমস্যাবলি। মোটকথা যে সকল বিষয়টি কুরআনের আলোচ্য বিষয় থেকে বহির্ভূত, ঐগুলোর জন্য কুরআনকে আসল বানানো কোথাকার ইনসাফ? এ অনুসন্ধান তো দৈনন্দিন পরিবর্তন হতে থাকে। সঠিক কথা অশুদ্ধ এবং অশুদ্ধ কথা শুদ্ধ হচ্ছে। তবে কি! আল্লাহর কালামও এমনি ধরনের যে, যখন ইচ্ছা করবে ও যতটুকু ইচ্ছা টেনে লম্বা করবে এবং যখন ইচ্ছা কুঞ্চিত করবে

مِنْ اَنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ দ্বারা জালাল মুফাস্সির (র.) مِنْ বয়ানিয়া হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ব্যাপক বস্তুসমূহ উদ্দেশ্য। চাই মানুষের খোরাকের হোক কিংবা পশুর আহার হোক। আর কারো কারো দৃষ্টিতে مِنْ তাবয়ীযিয়া, এবং কোনো কোনো ফল

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٣. وَإِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ شَكٍّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ أَيِ الْمُنَزَّلِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ أَيْ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النَّظْمِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ وَالسُّوْرَةُ قِطْعَةٌ لَهَا أَوَّلٌ وَاٰخِرٌ وَأَقَلُّهَا ثَلٰثُ اٰيَاتٍ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ اٰلِهَتَكُمُ الَّتِىْ تَعْبُدُوْنَهَا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَىْ غَيْرِهِ لِتُعِيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّوْنَ فُصَحَاءُ مِثْلُهُ.

২৩. যদি তোমাদের সন্দেহ সংশয় হয়, আমি আমার বান্দার মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে অর্থাৎ আল-কুরআন সম্পর্কে। এ মর্মে যে এটা আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে অবতীর্ণ, তাহলে তোমরা তার অনুরূপ সূরা আনয়ন কর অর্থাৎ অবতীর্ণ কুরআনের মতো। مِنْ শব্দটি بَيَان বা বিবরণমূলক। অর্থাৎ সেটি [অস্বীকারকারীগণ রচিত সূরা] ভাষালংকার, বাক্যের মনোহর বিন্যাস এবং অজানা ও গায়েব সম্পর্কে সত্য সংবাদ দানে তার [আল-কুরআনের] অনুরূপ হবে। سُوْرَة আল কুরআনের একটি খণ্ডিত অংশের নাম; যার সুনির্দিষ্ট শুরু ও শেষ রয়েছে। ন্যূনতমপক্ষে তা তিন আয়াত বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তোমরা আহ্বান কর তোমাদের সকল সাক্ষীকে তোমাদের ইলাহগণকে যাদের তোমরা উপাসনা করে থাক, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে, তোমাদের সাহায্য করার জন্য তোমরা যদি সত্যবাদী হও এই কথায় যে, মুহাম্মদ ﷺ নিজে রচনা করে এই কথা বলেছেন তাহলে তোমরাও তা করে দেখাও। কারণ তোমরাও তো তাঁর মতো আরবি ভাষা-ভাষী এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রবিজ্ঞ।

٢٤. وَلَمَّا عَجَزُوْا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا مَا ذُكِرَ لِعَجْزِكُمْ وَلَنْ تَفْعَلُوْا ذٰلِكَ أَبَدًا لِظُهُوْرِ إِعْجَازِهِ اعْتِرَاضٌ فَاتَّقُوْا بِالْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ الْكُفَّارُ وَالْحِجَارَةُ كَأَصْنَامِهِمْ مِنْهَا يَعْنِي أَنَّهَا مُفْرِطَةُ الْحَرَارَةِ تَتَّقِدُ بِمَا ذُكِرَ لَا كَنَارِ الدُّنْيَا تَتَّقِدُ بِالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ أُعِدَّتْ هُيِّئَتْ لِلْكٰفِرِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ بِهَا جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ أَوْ حَالٌ لَازِمَةٌ.

২৪. [শত চেষ্টার পরও] যখন তারা তা হতে [এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে] অপারগ হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা এতদসম্পর্কে ইরশাদ করেন, যদি তোমরা তা আনয়ন না কর উল্লিখিত অপারগতার দরুন আর কখনই তোমরা করতে পারবে না তা কোনো কালেই সম্ভব নয় কুরআনের ইজায প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায়। وَلَنْ تَفْعَلُوْا বাক্যটি এই স্থানে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ বা বিচ্ছিন্ন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এবং কুরআন যে মানব রচিত না এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক সেই আগুন হতে আত্মরক্ষা কর, মানুষ অর্থাৎ সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীগণ ও পাথর অর্থাৎ পাথর নির্মিত তাদের প্রতিমাসমূহ যার ইন্ধন অর্থাৎ এই অগ্নি সীমাতিরিক্ত উষ্ণ হবে। তা দুনিয়ার আগুনের মতো কাষ্ঠ ইত্যাদি দ্বারা প্রজ্বলিত করা হবে না; বরং উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ হলো তার ইন্ধন। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে। أُعِدَّتْ অর্থ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এই বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ নবগঠিত বাক্য বা حَالٌ لَازِمَةٌ [এমন ভাবও অবস্থাবাচক বাক্য, যে অবস্থা তাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী।]

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

فِي رَيْبٍ -এর মধ্যে فِيْ জরফিয়া, যা মুবালাগার জন্য। অর্থাৎ সন্দেহ বেষ্টন করে রেখেছে। مِنْ مِثْلِهِ -এর যমীর যদি مَا نَزَّلْنَا -এর দিকে ফিরে যা দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন, তবে مِنْ -এর তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। আখফাশের রায় অনুযায়ী। بَيَانِيَّة কিংবা তাব্‌য়ীযিয়্যা অথবা যায়েদাহ। দ্বিতীয় সূরত হলো যমীর عَبْد -এর দিকে ফিরবে। যা দ্বারা উদ্দেশ্য নবী করীম ﷺ -এর সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। এমতাবস্থায় مِنْ এব্‌তেদাইয়া হবে অথবা فَأْتُوا -এর সেলাহ্ হবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেহেতু غَيْر أُمِّي থেকে কুরআনের প্রকাশনার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই প্রথম পদ্ধতিটি উত্তম।

قَوْلُهُ وَإِنْ كُنْتُمْ : كُنْتُمْ শব্দগতভাবে মাজির সীগা হলেও অর্থ হবে ভবিষ্যৎ কালের।

قَوْلُهُ فِي رَيْبٍ : এখানে رَيْب -কে মাজাযীভাবে ظَرْف বানানো হয়েছে। যেহেতু কাফেরদের পক্ষ থেকে অধিক পরিমাণে সন্দেহ প্রকাশ পেত তাই رَيْب -কে بِمَنْزِلَةِ مَكَانٍ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেন সন্দেহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে। -[জামাল]

قَوْلُهُ مِمَّا نَزَّلْنَا : مِنْ এখানে سَبَبِيَّه বা اِبْتِدَاءُ الْغَايَةِ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এটাকে تَبْعِيْضِيَّة ধরা যাবে না। أَيْ اِرْتَبْتُمْ لِأَجْلِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই পবিত্র কালামে [কুরআনে] সন্দেহের কারণ হয়ত এ হতে পারত যে, খোদ এ বাণীর **মধ্যেই কোনো সন্দেহপূর্ণ কথা থেকে থাকবে, যা দূরীভূত করার জন্য** لَا رَيْبَ فِيْهِ বলা হয়েছে। অথবা তার কারণ এ হতে **পারত যে, কারও অন্তরে বীয় উপলব্ধির ত্রুটির কারণে অথবা তীব্র বিদ্বেষ ও শত্রুতার** কারণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এ **আয়াতে শেষোক্ত কারণটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেহেতু এটা সম্ভবপর, বরং** এটা বাস্তবেই বিদ্যমান ছিল, তাই তা দূর করার **একটি সহজ ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে যে,** তোমাদের ধারণায় এ কুরআন আল্লাহ তা'আলা বাণী না হলে অবশ্যই **তা মানব রচিত হবে। আর একজন মানুষের পক্ষে যখন** এমন রচনা সম্ভব, তখন অন্যদের পক্ষেও তা সম্ভব হবে নিঃসন্দেহে। **আর সেখানে জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞায় শ্রেষ্ঠ মানব** দলের সমাবেশ হলে তো কথাই নেই। সুতরাং তোমরাও এরূপ বিশুদ্ধ ও **সাহিত্যালংকার পূর্ণ অন্তত তিন আয়াত সম্বলিত একটি** সূরা রচনা কর তো দেখি! তোমরা ভাষা ও সাহিত্যালংকারে সুদক্ষ হওয়া সত্ত্বেও যখন একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, তখন হৃদয়াঙ্গম কর যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কোনো মানুষের রচনা নয়। -[তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে মাজেদী]

শানে নুযূল : তাওহীদের পর এখান থেকে নবুয়ত ও রিসালাতের মাসআলা আরম্ভ হচ্ছে। নবুয়তের উজ্জ্বল প্রমাণ যেহেতু মু'জিযা হয়। অন্যান্য আম্বিয়া (আ.)-কে নিজ নিজ কালের উপযোগী যেমনিভাবে হাজার হাজার মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। যেগুলো তাদের জন্য নবুয়তের দলিল হয়েছে। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ -কে অসংখ্য মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় ইলমী মু'জিযা হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা তাঁর নবুয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, পবিত্র কুরআন দলিল হওয়ার ব্যাপারে বিরোধীদের যেহেতু এ সন্দেহ ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ সাধারণ রচনাকারীদের ন্যায় কুরআনকে নিজেই অল্প অল্প করে রচনা করেছেন। যে কারণে পবিত্র কুরআন কালামে ইলাহী ও মুজিযা হওয়ার বিষয়টি সন্দেহ এবং সমালোচনার পাত্র হয়ে গেছে। তাই নবুয়তের দলিলই ধরতে গেলে সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে। এ আয়াতে ঐ সন্দেহকে দলিল থেকে উৎখাত করছেন। যাতে নবুয়তের দলিল পরিষ্কার হয়ে যায়।

إِنْزَال ও تَنْزِيْل -এর পার্থক্য : إِنْزَال বলা হয় -সম্মিলিতভাবে একবার অবতীর্ণ করাকে। আর تَنْزِيْل বলা হয় প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করাকে। পবিত্র কুরআনের উক্ত দু'টি গুণই রয়েছে। এর অবতরণ প্রথম লওহে মাহ্ফুয থেকে দুনিয়ার আকাশে সমষ্টিগত ও পরিপূর্ণভাবে একবারেই হয়েছে। তাই কোনো কোনো স্থানে তাকে إِنْزَال দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর তাবলীগ ও নবুয়ত পূর্ণ সময়ে অর্থাৎ ২৩ বৎসরে অল্প অল্প করে অবতরণ হতে রয়েছে। তাই তাকে تَنْزِيْل দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। সন্দেহের উৎস ও উদ্দেশ্য তাদের জন্য এমনই হয়েছে যে, যেমনিভাবে কবিগণ তাদের কাব্যগ্রন্থ, গজল, দীর্ঘ কবিতাসমূহকে অল্প অল্প করে পূর্ণ করেন। হযরত রাসূল ﷺ -ও যেহেতু এমনি করছেন, তাই কাফেররা মনে করেছে যে, এটা মুহাম্মদ ﷺ -এর কালাম। কালামে ইলাহী যদি হতো, তবে এটাকে পূর্ণ অবতীর্ণ করার উপর

http://islamiboi.wordpress.com

ক্ষমতাও আছে এবং তাঁর অভ্যাসও এটাই। যেমন-তাওরাত একবারই লিখে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, তারা বলতো لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً [কেন নবী করীম ﷺ -এর উপর কুরআন শুধু একবারে অবতীর্ণ করা হয়নি?] চ্যালেঞ্জেরে মধ্যে এ সন্দেহটাকেই দূর করা উদ্দেশ্য, أَنْزَلْنَا -এর স্থানে نَزَّلْنَا বলা হয়েছে। عَبْدِنَا -এর মধ্যে রাসূল ﷺ -এর ব্যক্তিত্বকে عَبْد দ্বারা ব্যক্ত করে এবং এটাকে যমীর مُتَكَلِّم -এর দিকে مُضَاف করে রাসূল ﷺ -এর সম্মান, মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের সামঞ্জস্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ মা'বূদিয়াতের স্থানে নন; বরং আব্দিয়াতের [গোলামিয়াতের] স্থানে আছেন। যা সকল স্থানের মধ্যে সর্বোচ্চতর স্থান এবং আমার বিশেষ বান্দা বা গোলাম। আল্লাহ যাকে আপন আখ্যায়িত করেন। তার উপাসনার ব্যাপারে আর কি প্রশ্ন করার থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الْقُرْآنِ : এটি مَا -এর بَيَان

قَوْلُهُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : (جمل : ٤٠) أَيْ فِيْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ أَوْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ

قَوْلُهُ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ : এটি পূর্বোক্ত শর্তের জওয়াব

مِنْ مِّثْلِهِ : **সমতুল্যতার ভিত্তি :** এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের মতামত সাধারণভাবে অলংকার ও সুবিন্যাসের মাঝেই নিবদ্ধ বটে, কিন্তু কুরআনের ভাব ও মর্মগত দিকটাও তার সর্বজনীন চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত; বরং এটাই মূল, এছাড়া অন্য সবকিছু তার আনুষঙ্গিক রূপ মাত্র। কেননা কুরআন শুরুতেই নিজের কেন্দ্রীয় পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -এ এক হেদায়েতগ্রন্থ। তাই এখানেও নিজের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি তুলে ধরেই উদাত্ত ভাষায় ঘোষণা করছে- আমার এক একটি সূরায় সত্যের যে আলোক বিচ্ছুরণ আছে, সম্মিলিত প্রচেষ্টাযোগেও যদি তোমরা তার সমতুল্য কিছু পেশ করতে পার, তাহলে কর দেখি। কুরআনের আরেকটি আয়াত থেকেও সমতুল্যতার ভিত্তি সম্পর্কে জানা যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ أَهْدٰى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . (قصص : ٤٩) [মাজেদী থেকে সংকলিত]

قَوْلُهُ شُهَدَائَكُمْ اٰلِهَتَكُمْ : উপাস্যদেরকে شُهَدَاء বলার কারণ হলো কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণা মতে এরা আল্লাহ তা'আলার সামনে তাদের ইবাদত বিশুদ্ধতার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে

وَفِي الْبَيْضَاوِيْ : اَلشُّهَدَاءُ جَمْعُ شَهِيْدٍ بِمَعْنَى الْحَاضِرِ أَوِ الْقَائِمِ بِالشَّهَادَةِ أَوِ النَّاصِرِ أَوِ الْإِمَامِ وَكَأَنَّهُ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَحْضُرُ الْمَجَالِسَ وَتُبْرَمُ بِمَحْضَرِهِ الْأُمُوْرُ .

مَعْنَى الْآيَةِ : وَادْعُوْا إِلَى مُعَارَضَتِهِ مَنْ حَضَرَكُمْ أَوْ رَجَوْتُمْ مَعُوْنَتَهُ مِنْ إِنْسِكُمْ وَجِنِّكُمْ وَاٰلِهَتِكُمْ غَيْرَ اللّٰهِ أَوْ اُدْعُوا الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى زَعْمِكُمْ . (جمل)

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : এটি শর্ত। তার জবাব মাহযূফ আছে। তাহলো- فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা اُدْعُوْا কিংবা شُهَدَاء -এর সাথে সংযুক্ত। এ আদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য অক্ষম করা। فَافْعَلُوْا ذٰلِكَ সম্পর্কে মুফাস্‌সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ শর্তের জবাবে মাহযূফ। وَقُوْد অধিকাংশের নিকটে وَاو -এর ফাতহার সাথে পঠন, অর্থাৎ ইন্ধন [কাঠ] এবং অন্য এক পঠনে وَاو -এর জমার সাথে- অর্থ আগুন জ্বালানো। যেমন وَضُوْء শব্দে ও وُضُوْء -এর মধ্যে পার্থক্য হুবহু ঐ পার্থক্য।

قَوْلُهُ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا -এর মধ্যে إِنْ -এর উল্লেখ করা উপহাস করা হিসেবে অথবা মানুষের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে কেননা চিন্তা-ভাবনার পূর্বে তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়নি। নতুবা প্রকৃত পক্ষে কালামে ইলাহীর মধ্যে এ ধরনের সন্দেহের শব্দ আসা প্রশ্নের কারণ হবে। اَلنَّارُ সূরায়ে বাকারাহ যেহেতু মাদানী, তাই এ স্থানে مَعْرِفَه আনাটা বিশুদ্ধ। আর সূরায়ে তাহরীম মক্কী। সেখানে প্রথমবার نَار উল্লেখ করা হয়েছে, তাই نَكِرَة -এর সাথে উল্লেখ করেছে। مُعَرَّف بِاللَّام আনার কোনো প্রশ্নই আসে না।

فَاتَّقُوْا -এর পরে জালাল (র.) যে عِبَارَتْ প্রকাশ করেছেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়ার মাধ্যমে যে ঈমানকে নির্দেশ করা হয়েছে। সেটার মু'মানবিহী [যার সাথে ঈমান আনতে হবে] দুটি, একটি হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে- কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া এবং মানুষের অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর কালাম না হওয়া। وَاَحَدُ لَازِمَةٌ এ এবারতের সারাংশ

http://islamiboi.wordpress.com

[illegible]- وَقُوْدُهَا এর যমীর থেকে এটাকে حَال বানানো যাবে না। কেননা যমীর মুযাফ ইলাইহি এবং মুযাফ ইসমে جَامِد [illegible] عَامِل হতে পারে না। اِنْ كُنْتُمْ শর্ত, فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ জাযা, مِمَّا نَزَّلْنَا যমীরকে হযফ করার সাথে جَرَّ -এর [illegible] رَيْبٍ -এর সিফত مَا মাউসূলা, مِنْ مِثْلِهِ সিফত وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اَىْ بِسُوْرَةٍ كَائِنَةٍ مِثْلَهُ জুমলায়ে اِنْشَائِيَّه মা'তূফ فَأْتُوا -এর উপর مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা شُهَدَاءَ থেকে حَال -এর স্থানে اَىْ شُهَدَاءَكُمْ مُتَفَرِّدِيْنَ عَنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ শর্তের জওয়াব মাহযূফ। فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا শর্ত আর فَاتَّقُوْا জাযা. لَنْ تَفْعَلُوْا জুমলায় مُعْتَرِضَه আর اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ - اَلنَّار থেকে حَال এর স্থানে এবং এর আমেল হলো- فَاتَّقُوْا

আল্লাহপ্রদত্ত চ্যালেঞ্জ এবং শত্রুদের পরাজয় স্বীকার -এর ব্যাখ্যা : এ চ্যালেঞ্জ বিভিন্নস্থানে বার বার করা হয়েছে। অবতীর্ণ করার ধারায় যার ধারাবাহিকতা এরূপ যে, প্রথম আয়াত قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا দ্বারা পূর্ণ কুরআনের ন্যায়ের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর কোনো তৎপরতা হয়নি। তখন আহ্বানে সহজ করে বলা হয়েছে فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ এর উপরও যখন কেউ পারলো না। তখন এ আয়াত فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ বলে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা দেওয়া হলো; কিন্তু তারপরও কিছুই উত্তর বের হলো না। তখন فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ বলে আহ্বান শেষ করেছে।

অতঃপর রাসূল ﷺ পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে ছোট আয়াত বিশিষ্ট সূরা কাউছার লিপিবদ্ধ করিয়ে আরবের প্রথানুযায়ী পবিত্র কা'বার দু-দরজায় লটকিয়ে দিলেন। অনেকদিন অনবরত লট্‌কানো ছিলো। কিন্তু কারো কোনো উত্তর নেই। মনে হয় সকলকে বিষধর সাপে ছোবল দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছে। অবশেষে কোনো এক বাগ্মী কবি একটি বাক্য لَيْسَ هٰذَا مِنْ طَاقَةِ الْبَشَرِ বৃদ্ধি করে নিজ অক্ষমতা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করেছে।

وَلَنْ تَفْعَلُوْا -এর মধ্যে যেহেতু অদৃশ্যের সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাই এটা পৃথক পরাজয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। পরে বারংবার তাদেরকে ডাকা হয়েছে। উত্ত্যক্ত করা হয়েছে। লজ্জা দেওয়া হয়েছে। অপমান করা হয়েছে এবং এসব শুনেও তাদের মধ্যে কিছু মাত্র উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়নি।

প্রাণ ও সম্পদের সীমাহীন উৎসর্গকারী জাতি- যারা অতি স্নেহের যুবক সন্তান ও অতি মূল্যবান সম্পদসমূহ মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতায় লেলিয়ে দিয়েছে। আর যারা এ ধরনের সুবর্ণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা আল্লাহপ্রদত্ত চ্যালেঞ্জের কোনো মোকাবিলাই করতে পারল না।

হযরত আম্বিয়া (আ.)-এর আলৌকিক ঘটনাবলি : প্রত্যেক যুগের পয়গাম্বরগণ (আ.) ঐ সকল বিষয় দ্বারাই নিজ নিজ উম্মতকে পরাজিত করেছেন যে, বিষয়ের উপর উম্মতগণ পরিপূর্ণ পারদর্শী ও প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত দাঊদ (আ.)-এর যুগে লোহার কারুকার্য সফলতার চূড়ান্ত সীমায় ছিল। কিন্তু وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ দ্বারা এ ব্যাপারে তার সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ যুগের গোটা পৃথিবী তাঁর লোহার কারুকার্যের সামনে হার মেনেছে।

হযরত মূসা (রা.) যুগে যাদু ও যাদুকরদের বিস্ময়কর কার্যকলাপ চালু ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এর يَدِ بَيْضَةٍ ও عَصٰى -এর সামনে وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ -এর বিকাশ জগদ্বাসী দেখেছে।

হযরত ঈসা (আ.) এর যুগ- ডাক্তারী, চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁকের উর্ধ্বগমনের যুগ ছিল। কিন্তু যে রুগীদের কোনো চিকিৎসা ছিল না [যে রুগীদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে জগদ্বাসী অক্ষম ছিল]। হযরত ঈসা (আ.) কোনো ঔষধ ও পথ্য ব্যতীত ঐ রুগীদেরকে শুধু সুস্থই করেননি; বরং মৃতদেরকে পর্যন্ত জীবিত করে সমস্ত বাহ্যিক চিকিৎসার রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। হ্যাঁ এসব আমলী কার্যাবলি ছিল। যা নির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত ছিল, বিশেষ লোকেরা দেখেছেন। পরবর্তী সময়ে এগুলো ইতিহাস হিসেবে রয়ে গেছে।

আল্লাহর শত্রুদের মধ্যে ব্যাকুলতা : কিন্তু রাসূল ﷺ -এর কল্যাণময় যুগ, তিনি যে দেশে ও যে গোত্রে ভূমিষ্ট হয়েছেন তাদের বাক-শক্তি ও জ্বালাময়ী ভাষণের এ অবস্থা ছিল যে, তারা নিজেদের মোকাবিলায় সমস্ত জগদ্বাসীকে বোবা ও নির্বাক মনে করতো এবং বলতো তাদের যুবক ও বৃদ্ধ পুরুষরা তো ছিলই। অপর দিকে তাদের সমাজের নারীরাও অগ্নিবর্ষি বক্তা ও কবি ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

কিন্তু রাসূল ﷺ -এর অবস্থা এই ছিল যে, শিক্ষা-দীক্ষা তো দূরের কথা এর প্রকাশ্য উপকরণ থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। না মাতা, না পিতা, না বোন, না ভাই, দাদা এবং চাচাও তার পক্ষে ছিলেন না। তারাও বিরোধীই ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সাহিত্যের ও দর্শনের নজিরবিহীন মু'জিযা পেশ করেছেন। যা নিঃসন্দেহে তিনি তার নবুয়তের দলিলকে পরিপূর্ণকারী ও প্রমাণকে শক্তিশালী কারী হিসেবে গণ্য হবেন যে, সকলে তার এ চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে বসে আছে। এটা অকাট্য দলিল পবিত্র মুকাবিলায় কেউ কিছু লিখে ছিল এবং ওটা বিনষ্ট হয়ে গেছে। কেননা বর্তমানের ন্যায় সর্বযুগেই পবিত্র কুরআনের হেফাজতকারীর সংখ্যা কম ও বিরোধী বেশি রয়েছে। তবে কুরআন এর হেফাজতকারী কম হওয়া সত্ত্বেও যখন কুরআন সংরক্ষিতাবস্থায় চলে আসছে? তবে যে বিরোধী লেখার হেফাজতকারী অধিক এটা বিনষ্ট হয় কিভাবে? তাই এ সম্ভাবনা অনর্থক ও অযথা। আর যার মনে চায় আজও পরীক্ষা করতে পারে; বরং নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারে। আর যারা পরীক্ষা করেছে, তাদের মুখে দাগ পড়েছে।

কাক চলেছে হাসের চলনে : সুতরাং ইয়ামামার এক ব্যক্তি মুসাইলামা কায্যাব কুরআনের ধারায় কিছু আয়াত পেশ করার অশুভ প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যেমন–

১. وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوْجِ . ২. اَلْفِيْلُ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْفِيْلُ ذَنَبُهٗ قَلِيْلٌ وَخُرْطُوْمُهٗ طَوِيْلٌ وَاِنَّهٗ مِنْ خِلْقَةِ رَبِّكَ لَقَلِيْلٌ

তখন তার উপর তার এলাকাবাসী লোকেরাই ঠাট্টা করেছে। কারণ এতে কোথাও কালামে নবী ﷺ এবং কোথাও কালামে মুতানাব্বী রয়েছে।

এমনিভাবে শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো কোনো আলেম সূরা ফাতেমা ও সূরা হাসানাইন তৈরি করে পবিত্র কুরআনে সংযোজন করার অশুভ চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইলম ও আদবের জগৎ থেকে তাদের চেহারা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো বুদ্ধিহীন লোকেরা মাক্বামাতে হারীরীর ন্যায় সাহিত্যের পুস্তকগুলোকে কুরআনের সমকক্ষ হিসেবে রাখার পরামর্শ দিয়েছে। যে পরামর্শের মূল্য مدعى چست وگواه چست থেকে অধিক নয়। বাস্তব ও সত্য এটা যে, আল্লাহ তাআলার কার্যাবলি যেমনভাবে অতুলনীয়। তার কালামও নজিরবিহীন। আমরা কাগজ ইত্যাদি দ্বারা গোলাপ বানাতে পারি এবং অনেক সুন্দর বানাতে পারি বটে, কিন্তু পানির একটি ফোঁটা যদ্দারা খোদায়ী কুদরতী গোলাপের উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্যতা ফুটে উঠে– আমাদের কাগজের তৈরি গোলাপের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ কাগজের গোলাপে এক ফোঁটা শিশির পড়লে তা কুঞ্চিত হয়ে যায়। আর কুদরতী গোলাপের লাল বর্ণ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সুঘ্রাণ আরো ছড়িয়ে পড়ে। এর দ্বারা আসল ও নকলের পার্থক্য প্রকাশ হয়ে সামনে আসে। এ অবস্থাই কালামে ইলাহীর كَلَامُ الْمُلُوْكِ مُلُوْكُ الْكَلَامِ

কুরআনের নবীন বাহার : পবিত্র কুরআনের এ মু'জিযা অন্যান্য সাময়িক ও মামুলী মু'জিযাসমূহের ন্যায় নয়; বরং এটি একটি ব্যাপক ও চিরস্থায়ী মু'জিযা। এর সুন্দর বাহার, যা প্রথম দিন ছিল তা আজো আছে।

اُعِدَّتْ মাজির সীগা, এর প্রকৃত অর্থের হিসেবে প্রমাণ করেছে যে, বেহেশত ও দোজখ উভয়টিই সৃষ্টি হয়ে গেছে অতঃপর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের এটা বলা যে, পুরস্কার ও শাস্তির সময়ের পূর্বে এগুলোকে সৃষ্টি করা অযথা ও নিষ্প্রয়োজন। আর নিষ্প্রয়োজন কাজ করা থেকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত। তাদের এ দলিল পেশ করা একেবারে বাতিল ও অবৈধ

আর পূর্ব থেকে সৃষ্টি করে রাখা অযথাও নয়। এটা কি কম উপকার যে, মানুষকে উৎসাহিত করার ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের কাজ নেওয়া হচ্ছে। যেমন বাদশাহ নিজ রাষ্ট্র শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই জেলখানা তৈরি করান। ঐ সময় তো কেউ সন্দেহ ও আপত্তি করে না যে, যখন কেউ চুরি করবে, তখন জেলখানা তৈরি করা হবে। যখন কেউ বিদ্রোহ করবে, তখন ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলানো হবে।

اِعْتِرَاضٌ : অর্থাৎ وَلَنْ تَفْعَلُوْا জুমলাটি شَرْط এবং جَزَاء-এর মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة রূপে এসেছে। এর وَاو টা عَطْف -এর জন্য নয়, বরং اِسْتِيْنَاف-এর জন্য। অনুরূপভাবে এটি وَاو حَالِيَه-ও হতে পারবে না। কেননা وَاو الْحَال জুমলায়ে মুস্তানিফা'র শুরুতে আসতে পারে না। আর جُمْلَة مُعْتَرِضَة সাধারণ তাকীদ-এর জন্য আসে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্য কারণেও আসে –[জামাল : ৪২]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا : এটি পূর্বোক্ত শর্তের জওয়াব। এখানে اِتِّقَاءُ النَّارِ দ্বারা اِحْتِرَازٌ مِنَ الْفَسَادِ উদ্দেশ্য। কেননা ফেতনা-ফাসাদ ইত্যাদি জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। ف হরফটি পরিণতি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ কুরআনের দাবি ও প্রমাণ খণ্ডন করতে এবং নিজেদের দাবির সপক্ষে প্রমাণ তুলে ধরতে যেহেতু ব্যর্থ হলে, সেহেতু এখনো সত্যকে অস্বীকার করা থেকে বিরত থাক। আর যদি বিরত না থাক, তাহলে এ বিদ্বেষপ্রসূত সত্য প্রত্যাখ্যানের স্বাভাবিক অনিবার্য শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কি হতে পারে। –[তাফসীরে আবুস সাউদ]

قَوْلُهُ وَقُوْدُهَا : وَاو হরফে ফাতহাযুক্ত অবস্থায় অর্থ مَا تُوْقَدُ بِهٖ অর্থাৎ ইন্ধন। আর وَاو -এ যম্মাযুক্ত অবস্থায় এটি মাসদার। এ ওজনে আসা সকল ছিগাগুলোরই এই দুই সূরত হয়ে থাকে। যেমন– طُهُوْر ـ سُحُوْر ـ وُضُوْء ইত্যাদি। আর কায়দা হলো فَعُوْل -এর ওজনে আসা প্রত্যেক শব্দ ফাতহাযুক্ত হলে اله -এর অর্থ হবে। আর যাম্মাযুক্ত হলে মাসদার হবে। কেউ কেউ বলেন, একটি অপরটির স্থানেও ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ : حِجَارَة পাথর। حَجَرَةٌ -এর বহুবচন। আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে পাথর দ্বারা ঐ সকল মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে, কাফেররা যেগুলোকে পূঁজা করত। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে–

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ .

জাহান্নামের আসল খোরাক তো হবে খোদ কাফের-মুশরিকরাই। শাস্তি ভোগও করতে হবে তাদেরই। তবে শাস্তির প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির এটাও একটি উপায় যে, তাদের ঠাকুর মূর্তিগুলোকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে, নাও! দুনিয়াতে যাদের পূজা করেছো, তাদের বলো এখান থেকে উদ্ধার করতে। –[মাজেদী]

قَوْلُهُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ : এটি جُمْلَه مُسْتَانِفَة আর প্রত্যেক جُمْلَة مُسْتَانِفَة সর্বদা কোন سُوَال مُقَدَّر -এর জবাবে হয়ে থাকে। তাহলে জানা যাক এখানে কোনো প্রশ্নের জবাবে হয়েছে।

যেন প্রশ্ন করা হয়েছে– لِمَنْ اُعِدَّتْ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ؟ তার জবাবে বলা গয়েছে–

اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ .

قَوْلُهُ اَوْ حَالٌ : অর্থাৎ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ বাক্যটি اَلنَّارُ শব্দ থেকে حَال হয়েছে। وَقُوْدُهَا -এর জমীর থেকে حَال হওয়া সহীহ নয়। কেননা مُضَاف তথা هَاضَمِيْر হলো مُضَاف اِلَيْه আর مُضَاعف اِلَيْه কোন مَقْصُوْد বা উদ্দিষ্ট হয় না। অথবা وَقُوْدُهَا بِمَعْنٰى حَطَب হলো عين যা جامد আমেল হতে পারে না। –[সামীন সূত্রে জামাল : ৪৩]

قَوْلُهُ لَازِمَةٌ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি সংশয়ের অবসান করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের আর চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদিও তারা ফাসেক-ফাজের হোক না কেন।

উত্তর, حَال لَازِمَة মূলত ذُو الْحَالِ -এর জন্য بِمَنْزِلَه صِفَت হয়ে থাকে এবং ذُو الْحَالِ থেকে পৃথক হয় না। যেমন اَبُوْكَ عَطُوْفًا-এর মাঝে পিতার স্নেহকে ছেলের জন্য আবশ্যক কিন্তু খাস নয় যে, ছেলে ছাড়া অন্য কারো প্রতি পিতার স্নেহ-মমতা নিষিদ্ধ হবে।

অনুরূপভাবে জাহান্নামের আগুন কাফেরদের জন্য লাজেম কিন্তু খাস নয়। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন তো دَوَامًا ও اِصَالَةً কাফেরদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে, তথাপিও عَرضِى ভাবে পরিশুদ্ধ করার জন্য ফাসিক-ফাজি মুমিনদেরকেও তাতে প্রবেশ করানোটা তার প্রতিবন্ধক নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

যেমন রূহুল মাআনীতেও উল্লেখ আছে– وَكَوْنُ الْاِعْدَادِ لِلْكَافِرِيْنَ لَا يُنَافِيْ دُخُوْلُ غَيْرِهِمْ فِيْهِ عَلٰى جِهَةِ التَّطَفُّلِ

উত্তর : اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ -এর মাঝে কাফের দ্বারা সাধারণ কাফের তথা আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয়টি ধরা হলে কোনো আপত্তিই থাকে না। পারিভাষিক কাফেরের প্রবেশটা স্থায়ী হবে আর আভিধানিক কাফের তথা অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানের প্রবেশটা হবে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করণার্থে সাময়িকভাবে

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٥. وَبَشِّرِ اَخْبِرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَدَّقُوْا بِاللّٰهِ وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ مِنَ الْفُرُوْضِ وَالنَّوَافِلِ اَنَّ اَيْ بِاَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ حَدَائِقَ ذَاتَ شَجَرٍ وَمَسَاكِنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اَيْ تَحْتَ اَشْجَارِهَا وَقُصُوْرِهَا الْاَنْهَارُ اَيِ الْمِيَاهُ فِيْهَا وَالنَّهْرُ الْمَوْضِعُ الَّذِيْ يَجْرِيْ فِيْهِ الْمَاءُ لِاَنَّ الْمَاءَ يَنْهَرُهُ اَيْ يَحْفِرُهُ وَاِسْنَادُ الْجَرْيِ اِلَيْهِ مَجَازٌ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا اُطْعِمُوْا مِنْ تِلْكَ الْجَنَّاتِ مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ اَيْ مِثْلُ مَا رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ اَيْ قَبْلَهُ فِي الْجَنَّةِ لِتَشَابُهِ ثِمَارِهَا بِقَرِيْنَةِ وَاُتُوْا بِهٖ جِيْئُوْا بِالرِّزْقِ مُتَشَابِهًا يُشْبِهُ بَعْضُهٗ بَعْضًا لَوْنًا وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا مُّطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قَذَرٍ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ . مَاكِثُوْنَ اَبَدًا لَا يَفْنُوْنَ وَلَا يَخْرُجُوْنَ .

২৫. আর সুসংবাদ দাও তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে [ও] ফরজ, নফল সব ধরনের সৎকর্ম করেছে أَنَّ শব্দটি এস্থানে মূলত بِأَنَّ অর্থে ব্যবহৃত এ সুসংবাদ যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত সৌধমালা ও বৃক্ষরাজি সুশোভিত উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে প্রবাহিত অর্থাৎ তার সৌধ ও বৃক্ষরাজির তলদেশে নদী তার বারিরাশি। যে স্থান দিয়ে নদীর পানি প্রবাহিত হয় সেই স্থানটিকে 'নহর' বলে। কারণ পানি এই স্থানটিকে 'নাহারা' অর্থাৎ খুঁড়িয়ে ফেলে। এখানে "প্রবাহিত হওয়া" ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাহরের দিকে মাজায বা রূপকার্থে করা হয়েছে। কেননা মূলত প্রবাহিত হয় পানি, নহর নয়।

যখনই তাদেরকে উক্ত উদ্যানরাজির ফলমূল আহার করতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে ইতোঃপূর্বে জান্নাতে জীবিকারূপে যা দেওয়া হয়েছে তা তো এটাই অর্থাৎ এরই অনুরূপ ছিল। কেননা বেহেশত-উদ্যানের ফলসমূহ দেখতে একটি আরেকটির ন্যায় হবে। বস্তুত তাদের নিকট আনা হবে অর্থাৎ তাদেরকে জীবিকারূপে প্রদান করা হবে একই ধরনের ফল এইগুলোর রঙ হবে একটি আরেকটির মতো, তবে স্বাদ হবে বিভিন্ন ধরনের। এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে ঋতুস্রাব এবং সকল প্রকার আবিলতা হতে সুপবিত্রা সঙ্গিনী হুর ইত্যাদি; তারা সেখানে স্থায়ী হবে সর্বদা তারা সেখানে অবস্থান করবে। ধ্বংস হবে না তাদের এবং সে স্থান হতে তারা কখনো বহিষ্কৃতও হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

بَشِّرْ : بَشَارَةٌ (اَمْر : وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر) সুসংবাদ প্রদান করুন। اَلْبِشَارَةُ শব্দ থেকে নির্গত। بِشَارَة এমন গুণবাচক বিশেষ সংবাদ যা ব্যক্তিকে আনন্দ ও সুখ দেয়। প্রথম আনন্দদায়ক সংবাদকে بِشَارَة বলার কারণ এই যে, সে সুংবাদের প্রভাবটি بَشَرَة তথা চেহারার মাঝে প্রকাশ পায়। সু-সংবাদের ফলশ্রুতিতে শ্রোতার মুখমণ্ডলে আনন্দ ও মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অবশ্য কখনও সাধারণ সংবাদের অর্থেও তা ব্যবহৃত হয়, শর্তাধীন হয়ে। যেমন- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

http://islamiboi.wordpress.com

ই'রাবুল কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- اَلْبِشَارَةُ : اَلْخَبَرُ الْاَوَّلُ السَّارُّ الَّذِىْ يَظْهَرُ بِهٖ اَثَرُ السُّرُوْرِ فِى الْبَشَرَةِ

بِشَارَةٌ -এর বিপরীত শব্দ إِنْذَارٌ

بَشِّرْ এর পরে أَخْبِرْ বলে প্রশ্নকে প্রতিহত করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন بِشَارَتْ খুশির সংবাদকে বলা হয়। এ স্থানে তো এর কেন্দ্র শুদ্ধ ও বস্তব কিন্তু فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ -এর মতো স্থানে মজায হিসেবে أَخْبِرْ -এর অর্থে নিতে হবে কিংবা পরিহাস ও ঠাট্টা উদ্দেশ্য হবে

أَنَّ -এর পূর্বে بِأَنَّ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, بَشِّرْ -এর মা'মূল হরফে জার মুকাদ্দারের সাথে- যখন হরফ حَذْف হয়ে গেছে তখন فِعْل -এর আমল সরাসরি হয়ে গেছে

بَشِّرْ ফেয়েল ও ফায়েল الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا জুমলা এর মাফউল جَنّٰتٍ মাউসূফ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ জুমলা এর ছিফতে أَنَّ মিলে أَنَّ এর ইসম এবং لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম, জুমলা بِأَنَّ মুকাদ্দাম মানার সাথে بَشِّرْ -এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। كُلَّمَا رُزِقُوْا الخ জুমলায়ে শর্তিয়া দ্বিতীয় ছিফত কিংবা মুবতাদায়ে মাহযূফের খবর অথবা জুমলায়ে وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا - مُسْتَاْنِفَةٌ জুমলায়ে مُعْتَرِضَةٌ - أَزْوَاجٌ মাউছূফ। مُطَهَّرَةٌ ছিফত মিলে মুবতাদা لَهُمْ খবরে مُقَدَّمٌ জুমলায়ে مُسْتَاْنِفَهْ হয়েছে। هُمْ মুবতাদা خٰلِدُوْنَ খবর فِيْهَا এর مُتَعَلِّقٌ জুমালায়ে مُسْتَاْنِفَهْ কিংবা لَهُمْ থেকে حَال।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

جَنّٰت -এর মূল হরফ ج ـ ن যেখানেই হবে -এর মধ্যে গোপনের অর্থ অবশ্যই থাকবে। সুতরাং جَنَّة অর্থ ও দৃষ্টি থেকে লুকানো। বাগ কিংবা বাগান বৃক্ষরাজি দ্বারা ঠাসা থাকে। জিন জাতিকেও মানুষের তুলনায় লুকানো [গোপন] মনে করা হয়। جُنَّة ঢাল ও গোপনকারী-আড়ালকারী হয়। جِنَانٌ কুলব, অন্তর, جَنَاح বাজু, সম্পর্ক, স্পষ্ট।

تَحْتِهَا এর পরে أَشْجَارِهَا وَقُصُوْرِهَا বের করে [প্রকাশ করে] জালাল (র.) একটি সন্দেহকে প্রতিহত করতে চাচ্ছেন যে, বাগান থেকে নীচে নহর প্রবাহিত হওয়া এত অধিক সৌন্দর্য ও আনন্দদায়ক হয় না, যতটুকু চিত্তাকর্ষক বাগানের ভিতর নহর প্রবাহিত হলে হয়। প্রতিরোধের কারণ স্পষ্ট যে, এবারতটি মুযাফ مُقَدَّر -এর সাথে, অর্থাৎ বাগানের ভিতর বৃক্ষরাজি ও বালাখানাসমূহের নীচে প্রবাহিত হওয়া উদ্দেশ্য الْاَنْهَار -এর পরে أَلْمِيَاهُ -এর عِبَارَت দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত যে, নহর প্রবাহের মধ্যে মাজাযে عَقْل -ইসনাদে مَجَازِى রয়েছে অর্থাৎ উদ্দেশ্য নহরের পানি প্রবাহিত। সামনে নহরের নামকরণের কারণ বলছেন যে, যেহেতু নহর -এর অর্থ খনন করা, পানি অনবরত চলার ও উঠা নামার দ্বারা কাঁচা মাটির মধ্যে গর্ত হতেই থাকে, তাই নহরকে "নহর" বলা হয়েছে

أَىْ مِثْلُ مِنْ تِلْكَ الْجَنّٰتِ এ জন্য বলেছেন, যাতে مِنْهَا -এর মধ্যে مِنْ ইবতেদাইয়্যা হওয়া বুঝা যায়। هٰذَا -এর পরে দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, তাই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, هٰذَا শব্দ দ্বারা উভয় খাবার হুবহু এক হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। যা বাস্তবের পরিপন্থি। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো সাদৃশ্য। أَىْ قَبْلَهُ فِى الْجَنَّةِ বলে জালাল (র.) এটা বলতে চান যে, قَبْلِيَت দ্বারা উদ্দেশ্য قَبْلِيَت فِى الْجَنَّة দুনিয়াবী ক্বাবলিয়্যাত উদ্দেশ্য নয়। যেমন অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণের রায় ব্যাপক ও সাধারণ রাখার। চাই বেহেশ্‌তের পূর্বে দুনিয়াতে হওয়া উদ্দেশ্য হোক কিংবা স্বয়ং বেহেশতে হোক। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এটা যে, মুফাস্‌সির (র.) পূর্বে নিজ দলিলে যে নিদর্শন أُتُوْا بِهٖ শব্দ দ্বারা পেশ করছেন। এটাই সাধারণ কিংবা ব্যাপক" দাবিকারীগণের দলিলও হতে পারে।

مُتَشَابِهًا -এর একটি পদ্ধতি তো এটা যে, স্বাদ ও আকৃতি একই হবে। এটা এত অধিক আশ্চর্যময় নয়, যতটুকু আশ্চর্যতা রয়েছে রং এক রকম হওয়া এবং স্বাদ ভিন্ন হওয়ার মধ্যে। مُطَهَّرَةٌ -কে আম বা ব্যাপক রাখা উত্তম, যা সর্বপ্রকার অপবিত্রতা

http://islamiboi.wordpress.com

ও নাপাকী থেকে। প্রকাশ্য পবিত্রতা হোক কিংবা অসৎ চরিত্রসমূহ থেকে পাক পবিত্র হোক। কেননা উভয়টিই দোষের মধ্যে গণ্য। বিশেষভাবে মহিলাদের মধ্যে চারিত্রিক অবনতি কষ্ট ও বিপদের কারণ হয়।

যোগসূত্র ও শানে নুযূল : পূর্বের আয়াতে অস্বীকারকারীদের জন্য দোজখের ভীতিপ্রদর্শনের বর্ণনা ছিল। উক্ত আয়াতে স্বীকারকারীদের জন্য বেহেশতে সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, যাতে وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ এর রীতি-নীতি দ্বারা কথার উভয়দিক পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর যাতে করে রাব্বুল আলামীন থেকে বাধ্যগত বান্দাগণ কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিরক্ত না হয়ে যায়। তাই পবিত্র কুরআনের সাধারণ অভ্যাস যে, কুরআন তরগীবও তারহীব উভয়টিকে সমপর্যায়ে রাখে। যাতে আল্লাহর উভয় শান জালালী ও জামালী প্রকাশ হতে থাকে।

প্রত্যেক শুরুর শেষ আছে। সুতরাং এ জগতের যখন শুরু আছে, তবে এর শেষ ও অবশ্যই হবে। যাকে শরিয়তে আলমে আখিরাত বলা হয়।

জগতে ভালো ও মন্দ এর ব্যাখ্যা : এ জগতে যে পরিমাণ ভালো ও মন্দ অথবা নিয়ামত ও মসিবত এর সংখ্যা রয়েছে– সবই একটি অপরটির প্রভাবের সাথে সংযুক্ত। একটি জিনিস এক হিসেবে ভালো, তবে অন্য হিসেবে ওটাই মন্দও হয়। অথবা যে বস্তুটি এক হিসেবে মন্দ ও বিপদের কারণ। ঐ বস্তুটিই অন্য হিসেবে নিয়ামত এবং ভালোও হয়। কোনো বস্তু নিজ সত্ত্বার দিক দিয়ে একেবারে শুধু ভালোও না এবং একেবারে শুধু মন্দও না।

তাই অতি জরুরি যে, এগুলোর জন্য এমন কিছু উৎস থাকা যেখানে ভালোই থাকবে। ওখানে মন্দের নাম-নিশানা ও যেন না থাকে। এমনইভাবে যেখানে মন্দ-থাকবে, সেখানে ভালোই কখানো না থাকে। উক্ত দুটি কেন্দ্রকে শরিয়তের পরিভাষায় জান্নাত ও জাহান্নাম বলা হয়। এ জান্নাত ও জাহান্নাম দার্শনিক ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ব্যানানো শুধু কাল্পনিক ও আধ্যাত্মিক নয়; বরং প্রাকৃতিক ও সত্তাগত। এ জগতের মূল ও আকৃতির স্থায়িত্ব নেই এবং এগুলো ঘটমান ও নতুন হওয়ার কারণে পরিবর্তন ও ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু ঐ চিরস্থায়ী জগতের প্রতিটি বস্তু স্থায়ী। ঐ জগৎকে এ জগতের উপর অনুমান করাটা قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ

জান্নাত ও জাহান্নামের বাস্তবতা : জান্নাতে সকল সুস্বাদু, শান্তি ও নিয়ামতের সমাপ্তি হবে। আর জাহান্নামের সকল কঠোরতা ও বিপদের সমাপ্তি ঘটবে। হাদীস مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا عَلٰي قَلْبِ بَشَرٍ خَطَرَتْ اَوْ كَمَا قَالَ এবং আয়াতে কারীমা وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهُ الْاَنْفُسُ জীবনযাত্রার সামগ্রীসমূহের সংবাদ দিচ্ছে। এ আয়াতে পানাহারের স্বাদ, বাগান, আনন্দ এবং সুন্দর ও সুদর্শন স্ত্রীগণের মহাসমাগমের সুসংবাদ শুনানো হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের ফল-ফলাদি যেগুলোর রং একই হবে। যেগুলোকে দেখে সন্দেহ হবে যে, ইতিপূর্বে এখানে কিংবা দুনিয়াতে আমরা খেয়েছি। এখন এগুলোকে খাওয়ার মধ্যে শুধু মিষ্টি দ্বিতীয়বার খাওয়ার স্বাদ পাওয়া যাবে। কিন্তু ইহজগতে খাওয়ার পর যখন নতুন জগত সামনে আসবে, তখন স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মজা ও আনন্দের এক নতুন অবস্থা সৃষ্টি হবে।

দুনিয়াদার কিংবা মূর্খ সাধক : মানুষ দুনিয়াদার হওয়ার কারণে অথবা নির্বোধ সাধক হওয়ার কারণে জান্নাত কিংবা জান্নাতের সুস্বাদু নিয়ামতসমূহ থেকে নাসিকা ও ভ্রুকুঞ্চন করার সঠিক কোনো ভিত্তি নেই। হ্যাঁ, যে সকল সুভাগ্যবান ব্যক্তিদের গায়ে খাঁটি আধ্যাত্মিকতার বাতাস লেঘে যায়, তারা এ দুনিয়ায় থেকেও জ্ঞান ও গুণসমূহের দ্বারা জান্নাতের বালাখানার স্বাদ আস্বাদন করতেন। কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা তা মনে হয় যে, জান্নাত একটি খালি মাঠ, দুনিয়ার আমলসমূহ জান্নাতের নিয়ামতসমূহের রূপ ধারণ করবে। এটার এ উদ্দেশ্য নয় যে, জান্নাতে বাস্তবে শূন্য; বরং উদ্দেশ্য এটা যে, আমলকারীর ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমল না করবে, শূন্য অবস্থায় থাকবে। সে নিজের জন্য আমল করেও জান্নাত সুসজ্জিত করতে পারবে।

সূরার শুরুতে ও ঈমানের আলোচনা এসেছিল, কিন্তু প্রসঙ্গত ও সংক্ষিপ্তভাবে এসেছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের ফজিলত ও মর্যাদা এবং হেদায়েতের পরিপূর্ণতা বর্ণনা করা। কিন্তু এ স্থানে ঈমানের ফজিলত ও ফলাফলের বর্ণনাই মূল উদ্দেশ্য। তাই প্রকৃত পক্ষে পুনরুক্তিতে গণ্য নয়। হ্যাঁ, ঈমান শুধু আন্তরিক সত্যায়ন, বিশ্বাস ও বশবর্তী হওয়ার নাম। মুখ দ্বারা স্বীকার করা- মূলত আল্লাহর নিকট ঈমানের জন্য তো শর্ত নয়। হ্যাঁ, প্রকাশ্য ঈমানের জন্য শর্ত। আর নেক আমলসমূহ করা একটি পৃথক বিষয়। এগুলোকে ঈমানের জন্য পরিপূরক বলা যায়। কিন্তু এগুলোকে শর্ত অথবা ঈমানের শর্ত বলা যাবে না। ঈমান ও ইসলাম -এর পার্থক্য এবং ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটার আলোচনা অন্যকোনো স্থানে ইন্‌শা-আল্লাহ আসবে।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٦. وَنَزَلَ رَدًّ الْقَوْلِ الْيَهُوْدِ لَمَّا ضَرَبَ
اللّٰهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى
وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنْكَبُوْتَ
فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ مَا
اَرَادَ اللّٰهُ بِذِكْرِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ الْخَسِيْسَةِ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّضْرِبَ يَجْعَلَ
مَثَلًا مَفْعُوْلٌ اَوَّلُ مَا نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ
بِمَا بَعْدَهَا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَيْ اَيَّ مَثَلٍ كَانَ
اَوْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ الْخِسَّةِ فَمَا بَعْدَهَا
الْمَفْعُوْلُ الثَّانِيْ بَعُوْضَةً مُفْرَدُ
الْبَعُوْضِ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ فَمَا فَوْقَهَا
اَيْ اَكْبَرَ مِنْهَا اَيْ لَا يَتْرُكُ بَيَانَهُ لِمَا
فِيْهِ مِنَ الْحِكَمِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَيِ الْمَثَلُ الْحَقُّ الثَّابِتُ
الْوَاقِعُ مَوْقِعَهُ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا
مَثَلًا ـ تَمْيِيْزٌ اَيْ بِهٰذَا الْمَثَلِ وَمَا
اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ مُبْتَدَأٌ وَذَا بِمَعْنَى
الَّذِيْ بِصِلَتِهٖ خَبَرُهُ اَيْ اَيُّ فَائِدَةٍ فِيْهِ
قَالَ تَعَالٰى فِيْ جَوَابِهِمْ يُضِلُّ بِهٖ اَيْ
بِهٰذَا الْمَثَلِ كَثِيْرًا عَنِ الْحَقِّ لِكُفْرِهِمْ
بِهٖ وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
لِتَصْدِيْقِهِمْ بِهٖ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا
الْفَاسِقِيْنَ ـ الْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهٖ

অনুবাদ :

২৬. এবং নাজিল হয়েছে ইহুদিদের ঐ শ্লেষের প্রতিবাদে যখন আল্লাহ তা'আলা [বিভিন্ন আয়াতে কতিপয় বিষয়কে] মাছির সাথে যেমন .... وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا তাদের প্রতিমাদের নিকট হতে মাছি যদি কিছু নিয়ে চলে যায় তবে তারা এত অসহায় ও অক্ষম যে, তাও তারা তার নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। [সূরা হজ্জ : ৭৩] এবং মাকড়সার সাথে যেমন كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ [যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, সে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত। [সূরা আনকাবূত: ৪১] এসব উপমা দিয়েছেন। ইহুদীগণ [শ্লেষভরে] বলত এই ধরনের হীন বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কি বুঝাতে চাচ্ছেন? [ইহুদিদের এই শ্লেষের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক নাজিল করেন] আল্লাহ মশা কিংবা তার উচ্চপর্যায়ের অর্থাৎ তা হতে বড় যে কোনো বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। অর্থাৎ এ সকল উপমায় যেহেতু শিক্ষা ও তাৎপর্য বিদ্যমান তাই আল্লাহ তা'আলা এই সকল বিষয়েরও উপমা প্রদান পরিত্যাগ করেন না। اَنْ يَّضْرِبَ বা مَفْعُوْلٌ اَوَّلُ -এর مَثَلًا শব্দটি اَنْ يَّضْرِبَ ক্রিয়ার مَثَلًا বা প্রথম কর্ম। مَا শব্দটি نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্টবাচক শব্দ। তা তৎপরবর্তী বিশ্লেষণ (بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا) -এর সহিতযুক্ত হয়ে উক্ত ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ ثَانِيْ বা দ্বিতীয় কর্ম। অর্থাৎ মশা বা তদূর্ধ্ব যে কোনো উপমা হোক না কেন? অথবা مَا শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। বস্তুটির তুচ্ছতার تَاكِيْد [জোর ও নিশ্চয়তা] বুঝানোর জন্য এই স্থানে এর ব্যবহার করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী শব্দ (بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا) উক্ত ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِيْ বা ক্রিয়ারূপে গণ্য হবে। যে بَعُوْضَةً শব্দটি بَعُوْض -এর একবচন; ছোট কীট, মশক। সুতরাং যারা বিশ্বাস করে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই এটা অর্থাৎ এই উপমা সত্য, অর্থাৎ সঠিক ও যথার্থস্থানে ব্যবহৃত তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে; কিন্তু যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা বলে যে, এই উপমা দানে আল্লাহ তা'আলা কি অভিপ্রায় রাখেন? بِهٰذَا مَثَلًا -এর مَثَلًا শব্দটি تَمْيِيْز বা বিশেষাত্মক পদ। مَاذَا -এর مَا শব্দটি اِسْتِفْهَامِ اِنْكَار বা অসম্মতি সূচক প্রশ্নবোধক শব্দ। এটা এস্থানে مُبْتَدَا বা উদ্দেশ্য। ذَا শব্দটি اَلَّذِيْ [সংযোগ বাচক সর্বনাম] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তার صِلَه বা সংযোজনীয় ক্রিয়া (اَرَادَ) -এর সাথে যুক্ত হয়ে উক্ত مُبْتَدَا [উদ্দেশ্যের] -এর خَبَر বা বিধেয়। অর্থাৎ এ ধরনের উপমা প্রদানে কি আর উপকারিতা নিহিত রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে ইরশাদ করেন, এটা এই উপমা দ্বারা এতদ্বিষয় অস্বীকার করার কারণে অনেককেই তিনি সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে মু'মিনদেরকে এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের দরুন সৎ পথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি সত্য-পথ পরিত্যাগকারীরা অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগত্যের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে, তাঁরা ব্যতীত আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٧. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مَا عَهِدَهُ اِلَيْهِمْ فِى الْكِتَابِ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ ـ تَوْكِيْدِهِ عَلَيْهِمْ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُّوْصَلَ مِنَ الْاِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَالِكَ اَنْ بَدْلٌ مِنْ ضَمِيْرِ بِهِ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ـ بِالْمَعَاصِىْ وَالتَّعْوِيْقِ عَنِ الْاِيْمَانِ اُولٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ـ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ـ

২৭. যারা اَلَّذِيْنَ শব্দটি [পূর্ববর্তী اَلْفَاسِقِيْنَ -এর] বিশেষণ ভঙ্গ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাদের নিকট হতে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার পরও জোরদার করার পরও এবং ছিন্ন করে যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন, তা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান আনা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইত্যাদি। এ স্থানে اَنْ শব্দটি يُّوْصَلَ -এর بِهِ -এর ضَمِيْر [সর্বনাম] হতে بَدْل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় পাপকর্ম করে ও ঈমান হতে বাধা প্রদানের মাধ্যমে তারাই উল্লিখিত বিশেষণে যুক্ত ব্যক্তিগণই ক্ষতিগ্রস্ত। চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনের দিকে প্রত্যার্পিত হওয়ায়।

তাহকীক ও তারকীব

ضَرْبُ الْخَاتَمِ ـ ضَرْبُ اللَّبِنِ ـ ضَرْبُ الْمَثَلِ আরবিতে বলে থাকে -এর মূল হচ্ছে একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর উপর সংঘটিত করা। (حَيَاءٌ) লজ্জা -মানুষের ঐ মিতাচারী অভ্যাস কে বলা হয়, যার মাধ্যমে দুর্নাম ও মন্দের ভয়ে বরং ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। خَجَالَتْ অনুতপ্ত হওয়া এর চেয়ে নিম্নস্তরের এবং وَقَاحَتْ ধৃষ্টতা -এর চেয়ে উপরের বিশেষণ যে, মানুষ মন্দকাজের উপর দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার শানে এর ব্যবহার প্রকৃত পক্ষে জায়েজ নেই। তাই মুফাস্‌সির (র.) لَا يَتْرُكُ بَيَانَهُ দ্বারা এর অনুবাদ করেছেন। বলা যায় যে, مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

بَعُوْضَةً নির্গত হয়েছে بَعْضٌ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে قَطْعٌ এটা মূলে মাফউলের ওজনে সিফতের অর্থে ছিল। অর্থাৎ قُطُوْعٌ পরবর্তীতে এর মধ্যে اِسْمِيَّتْ গালেব এসেছে। تَاء এর মধ্যে ওয়াহ্‌দাতের। اَنْ يَضْرِبَ ব-তাক্‌দীরে مِنْ মাজরূর, খলীল ও সীবওয়াই (র.)-এর দৃষ্টিতে مَنْصُوْب - مَا এব্‌হামিয়্যাহ অথবা অতিরিক্ত। بَعُوْض মাছালান -এর আত্‌ফে বয়ান। مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ -এর মধ্যে مَا এস্তেফ্‌হামিয়া মুব্‌তাদা এবং ذَا বমা'না اَلَّذِيْ ছেলার সাথে মিলে খবর مَثَلًا মান্‌সূব তাময়ীয হিসেবে। فِسْقٌ ـ فَاسِقِيْنَ বের হওয়াকে বলা হয়। فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا খেজুর নিজ ছিলকা [আবরণ] থেকে বের হয়েছে فَاسِق যেহেতু আল্লাহর অনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। মুফাস্‌সির (র.) اَلْخَارِجِيْنَ বলে নামকরণের কারণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর তিনটি স্তর হয়। যথা–

১. تَغَالِى অর্থাৎ মন্দ জানা সত্ত্বেও গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া।

২. اِنْهِمَاك অর্থাৎ গুনাহ করার অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া এবং কোনো ভ্রূক্ষেপ না করা।

http://islamiboi.wordpress.com

৩. جُحُوْد অর্থাৎ গুনাহের মন্দতা অন্তর থেকে দূর হয়ে যাওয়া এবং এর সৌন্দর্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া। এ তৃতীয় স্তরটি কুফর -এর সাথে সংযুক্ত।

أَمَّا الَّذِيْنَ এটা نَفِي-কে অন্তর্ভুক্তকারী শর্তের জন্য, তাই খবরের উপর ফায়ে জাযাইয়া নেওয়া অত্যাবশ্যক। يُضِلُّ ও يَهْدِي -এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্তকরণ বাস্তব ও সঠিক, মাজাযী নয়। তাই ফেরকায়ে মু'তাযিলার উপর খণ্ডন করা হতে পারে। عَهْد সংরক্ষণযোগ্য ও হেফাজতযোগ্য বস্তু। তাই আরববাসী تَارِيْخ ـ وَصِيَّت ـ قَسَم ـ مَكَان সব অর্থসমূহে عَهْد শব্দ ব্যবহার করে। نَقْض রশির মোচড় [পেঁচ] খোলার জন্য ব্যবহার করা হয়, এখানে اِسْتِعَارَة تَخْيِيْلِيَّة হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র ও শানে নুযূল : পূর্বে উল্লিখিত আয়াতে পবিত্র কুরআন কালামে এলাহী হওয়া দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। দাবিদারের দায়িত্ব দাবিকে প্রমাণিত করার জন্য যেমনভাবে দলিল পেশ করা জরুরি, তেমনিভাবে প্রতিপক্ষের সন্দেহগুলোর উত্তর দেওয়া জরুরি। অতএব কোনো কোনো প্রতিপক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করতো যে, যদি এ কুরআন কালামে ইলাহী হয়, তবে এর পবিত্রতা , শোভা ও প্রাঞ্জলতা এ বিষয়ের দাবিদার হবে যে, এর মধ্যে হীন ও তুচ্ছ বিষয়াদির আলোচনা মোটেই না আসা চাই। মশা ইত্যাদির উপমা বর্ণনা করতে আল্লাহ তা'আলার লজ্জা লাগলো না? সুতরাং এ স্থানের চাহিদা এটা যে, নিজ দলিল পেশ করে প্রতিপক্ষের ঐ আপত্তিকর দলিলের উত্তর দেওয়া হোক। অতএব এর জন্য উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

উপমার প্রকৃত অবস্থা ও এর উপকারিতার ব্যাখ্যা : স্পষ্ট কথা হচ্ছে, উপমা দ্বারা উদ্দেশ্য ও চাহিদার বিশ্লেষণ করা জরুরি। এ জন্য উপমার মধ্যে ঐ বস্তুর সাথে সম্পর্ক তালাশ করতে হবে। যে বস্তুর জন্য এ উপমা, উপমা পেশকারীর সাথে উপমার সম্পর্ক হওয়া জরুরি নয়। যেমন যখন কারো দুর্বলতার কথা বর্ণনা করতে হয় তখন আরশ, কুরসি, আকাশ-জমিন, বাঘ-হাতি উপমার মধ্যে আনা যাবে না; বরং পিপীলিকা ও মশার আলোচনা করা সুন্দর বাচনভঙ্গি ও বাগ্মিতা হবে। সুতরাং পবিত্র কুরআন ও মূর্তিগুলোর অসহায় হওয়া এবং মূর্তিপূজা অথর্ব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য মাকড়সা ও তার বিস্তৃত করা জালের বর্ণনা করতে হবে।

সকল আম্বিয়া (আ.) এবং সকল বিজ্ঞ ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিদগণের কথাবার্তায় এ ধরনের উপমাসমূহ ভরপুর রয়েছে এবং أَنَّهُ الْحَقُّ -এর অর্থ এটাই যার দিকে মুসান্নেফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন। যেমনিভাবে أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এরপরে فَيَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। أَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর পরে فَلَا يَعْلَمُوْنَ বলা উচিত ছিল। যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুদ্ধ হয়। কিন্তু এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা فَيَقُوْلُوْنَ বলেছেন, যাতে এর দ্বারা ওদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা প্রকাশ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি : প্রতিশ্রুতি দ্বারা উদ্দেশ্যব্যাপক নেওয়া যায়। যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে যে عَهْد اَلَسْتُ হয়েছে তাও এসে যাবে এবং অতীতের পয়গাম্বরগণ (আ.) থেকে যে অঙ্গীকার রাসূল ﷺ-কে সমর্থন ও সাহায্যের ব্যাপারে নেওয়া হয়েছিল তাও শামিল হয়ে যায়। অথবা পরস্পর বান্দাদের মধ্যে চাই শরীয়া হোক, যেমন আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি, কিংবা ব্যক্তিগত হোক, যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া, ঋণ ইত্যাদি আদান-প্রদানের মাঝে যে চুক্তি হয়।

সম্বোধিত ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের অনুসন্ধানী হয়, তবে উত্তর জ্ঞানীসুলভ হওয়া সময় উপযোগী হয়। কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি যদি গোঁয়াড়-হিংসুটে ও দুষ্ট হয়, তবে তার জন্য জ্ঞানীসুলভ উত্তর যথেষ্ট ও উপকারী হয় না। এস্থানেও সম্বন্ধ ও ইতিহাস এ ধরনের লোকদের সাথেই হয়েছে। তাই উত্তরের পদ্ধতি পরিবর্তন করে বিদ্রূপ বচন ও বাক-ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, তোমরা জেনে বুঝে এটা জিজ্ঞেস করছ, এ উপমা বর্ণনা করা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি হতে পারে। অতঃপর শুন! আমার উদ্দেশ্য এর দ্বারা এটা يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا الخ উত্তরের তিক্ততা বলার জন্য ক্ষতির দিকটিকে উপকারের দিকের পূর্বে আনা

http://islamiboi.wordpress.com

হয়েছে। যাতে স্থানটির অপছন্দনীয়তা প্রকাশ হয়ে যায়। এটা এমনই- যেমন কোনো বিবেকহীনকে বারংবার বুঝানোর পর বলে দেওয়া হয় যে, এ বস্তুটি আমি অমুক অমুক উপকারের জন্য তৈরি করেছি। কিন্তু তারপরও একগুঁয়েমীর কারণে ফিরে না আসলে এটাই বলে দেওয়া হবে যে, তোমার মাথায় আঘাত করার জন্য আমি এ বস্তু বানিয়েছি। উক্ত আয়াতই সূফীগণের ঐ অভ্যাসের মূল যে, তারা ঐ উপমা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেন না।

قَوْلُهُ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا : -এর অর্থ শুধু এতটুকুই যে, বান্দা যখন স্বেচ্ছায় ভ্রান্তপথের পথিক হতে চায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপকরণ যুগিয়ে দেন। –[তাফসীরে মাজেদী]

بِهٖ -এর সর্বনামের উদ্দেশ্য مَثَلًا শব্দটি। অর্থাৎ এর দ্বারা এবং এ ধরনের অন্যান্য কুরআনী উদাহরণ দ্বারা অনেককে গোমরাহ করেন এবং অনেককে হেদায়েত করেন।

بِهٖ -এর হরফটি ب এর سَبَبِيَّة বা হেতু প্রকাশক। এখন কথা হলো এ জুমলাদ্বয়ের مَحَلّ إِعْرَاب কি? কেউ বলেন, কোনো مَحَلّ إِعْرَاب নেই। কেননা উভয়টি পূর্বের أَمَّا দ্বারা শুরুকৃত বাক্যের বয়ান হয়েছে এবং এ দুটি আল্লাহ তা'আলার কথা বলে গণ্য হবে। কেউ বলেন, জুমলাদ্বয়ের مَحَلّ إِعْرَاب হলো নসব। কেননা তা مَثَلًا -এর সিফত হয়েছে। اَيْ مَثَلًا يَفْتَرِقُ النَّاسُ بِهٖ مَا اِلٰى ضَالِّيْنَ وَمُهْتَدِيْنَ তখন তা কাফেরদের কথা বিবেচ্য হবে। আল্লামা আবুল বাকা (র.) বলেন, الله শব্দ থেকে حَال হওয়ারও অবকাশ আছে- اَيْ مُضِلًّا بِهٖ كَثِيْرًا وَهَادِيًا بِهٖ

قَوْلُهُ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ : আয়াত নিজেই পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, গোমরাহী শুধু তাদেরই ললাটে লিখেন, যারা নিজেরাই গোমরাহ থাকতে চায়' নিজের থেকে আল্লাহ তা'আলা কারো উপর গোমরাহী চাপিয়ে দেন না। অব্যাহতভাবে স্বেচ্ছাকৃত অব্যাধ্যতার পরিণতিতে অন্তরের আলো নিভে যায় এবং স্বভাব থেকে সত্যের অনুসন্ধিৎসা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি বিপরীতগামী হয়ে তাতে মিথ্যা ও অসত্য জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং কুফরির পর্যায়ে তার পরিণতি ঘটে।

–[তাফসীরে মাজেদী]

ই'রাব : اَلْفٰسِقِيْنَ শব্দটি لِيُضِلَّ -এর মাফউল এবং এটি اِسْتِثْنَاء مُفَرَّغ হয়েছে। ইমাম ফাররার মতে এটি اِسْتِثْنَاء হিসেবে মানসূব হতে পারে। তখন مُسْتَثْنٰى مِنْهُ উহ্য থাকবে। তাকদীরী ইবারত হবে- وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اَحَدًا اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ –[হাশিয়ায়ে জামাল : ১/৪৯]

قَوْلُهُ اَلْخَارِجِيْنَ عَنِ الطَّاعَةِ : অংশটুকু اَلْفٰسِقِيْنَ -এর ব্যাখ্যা। এ থেকে فَاسِق -এর সংজ্ঞাও জানা গেল। অর্থাৎ فَاسِق বলা হয় আনুগত্যের পরিধি বারবার যে লঙ্ঘন করে সেই হলো ফাসিক। আর আয়াতে মুনাফিকও কাফেরকে ফাসেক বলার কারণ হলো এরা তাদের রবের অনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেছে। –[ইবনে জারীর সূত্রে তাফসীরে মাজেদী]

উল্লেখ্য যে, ফাসেকের তিনটি স্তর রয়েছে–

১. কখনো কখনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। তবে তা খারাপ ও গুনাহ মনে করেই।

২. বেপরওয়াভাবে তাতে মগ্ন হয়।

৩. হঠকারিতার সাথে কাজটি সঠিক মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। এ স্তরের ফাসিক হলো কাফের। আয়াতে এদের কথাই বলা হচ্ছে। যেমন জামালাইনে উল্লেখ আছে- এখানে فَاسِق দ্বারা فَاسِق كَامِل উদ্দেশ্য। আর فَاسِق كَامِل হলো কাফের মুশরিকরা। গুনাহগার মু'মিন ফাসিকে কামিল নয়। অর্থাৎ এখানে فِسْق -এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ নয়। যেমন কুরআনের অপর আয়াত اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -এর মাঝে মুনাফিককে ফাসিক বলা হয়েছে। অথচ মুনাফিকরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূত।

قوله الذين نعت : অর্থাৎ الفاسقين -এর সিফত বা বিশেষণ। এ হিসেবে এটা নসবের স্থলে হবে। কেননা الفسقين শব্দটি يُضِلُّ -এর মাফউল হিসেবে নসবযুক্ত।

http://islamiboi.wordpress.com

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ الخ : মুফাসসিরীনে কেরাম এ আয়াতে বর্ণিত عَهْد -এর বিভিন্ন মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। যেমন عَهْد মানে ঐ সকল অসিয়ত যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আদেশ পালন ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার জন্য নবীগণের মাধ্যমে মাখলুকের সাথে করেছেন। দ্বিতীয়ত ঐ অঙ্গীকার যা তাওরাত কিতাবে আহলে কিতাবীদের থেকে নেওয়া হয়েছিল যে, আখেরী জমানার নবীর আগমনের পর তাঁকে সত্য বলে মানা ও তাঁর নবুয়তে বিশ্বাসী হওয়া তোমাদের উপর আবশ্যক হবে। তৃতীয়ত অঙ্গীকার বলতে عَهْد اَلَسْتُ বা রূহ জগতের ঐ অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে, যা হযরত আদম (আ.) -এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের হওয়ার পর সকল আদম সন্তানদের থেকে নেওয়া হয়েছে। যার আলোচনা নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বলতে অঙ্গীকারের প্রতি পরওয়া না করা।

বাদশাহ তাঁর অধিনস্ত এবং প্রজাদের প্রতি যে হুকুম জারি করেন আরবি ভাষায় তাকে عَهْد শব্দে ব্যক্ত করা হয়। আর তা পালন করা প্রজাদের উপর আবশ্যক হয়ে থাকে। এখানে عَهْد এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার বলতে তার ঐ সকল স্বতন্ত্র ফরমানকে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর আলোকে তাবৎ মানবজাতি কেবল তাঁরই বন্দেগি করার প্রতি আদিষ্ট।

قَوْلُهٗ مِنَ الْاِيْمَانِ بِالنَّبِىِّ ﷺ : এ অংশটুকু مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ -এর مَا -এর بَيَان [বিবরণ]। অর্থাৎ তারা ঐ বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে, যেটা জুড়ে দেওয়ার হুকুম করা হয়েছিল। আর তা হলো নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা।

قَوْلُهٗ وَاَنْ يُّوْصَلَ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيْرِ بِهٖ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ يُّوْصَلَ বাক্যটি بِهٖ -এর যমীর থেকে بَدَل হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে। مَا থেকে بَدَل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب নয়।

قَوْلُهٗ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ : এটি يَنْقُضُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। অর্থ- মজবুত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও। مِيْثَاقِهٖ -এর যমীর عَهْد -এর দিকেও ফিরতে পারে এবং اَللّٰه লফজের দিকেও। প্রথম সূরতে এটি মাসদার হবে এবং মাফউলের দিকে اِضَافَت হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে فَاعِل -এর দিকে اِضَافَت হবে।

يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ تَوْكِيْدِهٖ عَلَيْهِمْ এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাব দেওয়া হয়েছে। তা হলো بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ -এ আয়াতে عَهْد এবং مِيْثَاق শব্দ দুটির অর্থ একই। অর্থ এভাবে হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের পর। বলাবাহুল্য এ কথার কোনো মর্ম হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে- এখানে সমার্থবোধক দুটি শব্দ একত্রে আনার হেতু কি?

উত্তর : এখানে مِيْثَاق অর্থ তাকিদ এবং মজবুতী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারকে মজবুত করার পর ভঙ্গ করে দেয়। আর এ অর্থটি সঠিক ও যথার্থ। এ প্রসঙ্গে হাশিয়ায়ে জামালে উল্লেখ রয়েছে-

وَالْمِيْثَاقُ اِسْمٌ لِمَا تَقَعُ بِهِ الْوَثَاقَةُ وَهِىَ الْاَحْكَامُ وَالْمُرَادُ بِهٖ مَا وَثَّقَ اللّٰهُ بِهٖ اَىْ قَوّٰى بِهٖ عَهْدَهٗ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْكُتُبِ اَوْمَا وَثَّقُوْهُ بِهٖ مِنَ الْاِلْتِزَامِ وَالْقَبُوْلِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ (جَمَل)

قَوْلُهٗ وَغَيْرِ ذٰلِكَ : যেমন মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, সত্যায়নের ক্ষেত্রে আসমানি কিতাব ও রাসূলগণের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি না করা।

قَوْلُهٗ اَلْخٰسِرُوْنَ : خَاسِر বলা হয় সম্পদ, শরীর এবং আকল এ তিনটির যে কোনো একটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে। এরা আকলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। خُسْرٌ অর্থ- ত্রুটি, অপূর্ণতা। -[জামাল]

قَوْلُهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ : অর্থাৎ তাদের এসব তৎপরতায় তাদেরই ক্ষতি। ইসলামের সুনাম কিংবা উম্মতের পুণ্যতা অর্জনের মর্যাদা নষ্ট হবে না। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٨. كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ بِاللّٰهِ وَقَدْ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا نُطْفًا فِى الْاَصْلَابِ فَاَحْيَاكُمْ ـ فِى الْاَرْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْكُمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ وَالتَّوْبِيْخِ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ اٰجَالِكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُرَدُّوْنَ بَعْدَ الْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ ـ

২৮. হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন অর্থাৎ পিতার পৃষ্ঠদেশে শুক্রাকারে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে মাতার গর্ভথলিতে এবং এই পৃথিবীতে জীবন দান করেছেন। সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরও তাদের কুফরি ও অস্বীকৃতির উপর বিস্ময় ও ভর্ৎসনা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এস্থানে প্রশ্নবোধক كَيْفَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার তোমাদের নির্দিষ্ট বয়সসীমা শেষ হওয়ার পর মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর পুনরুত্থানের মাধ্যমে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন, অতঃপর পুনরুত্থানের পর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে প্রত্যার্পিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন।

٢٩. وَقَالَ تَعَالٰى دَلِيْلاً عَلَى الْبَعْثِ كَمَا اَنْكَرُوْهُ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ اَيِ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهَا جَمِيْعًا ـ لِتَنْتَفِعُوْا بِهٖ وَتَعْتَبِرُوْا ثُمَّ اسْتَوٰٓى بَعْدَ خَلْقِ الْاَرْضِ اَيْ قَصَدَ اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰهُنَّ اَلضَّمِيْرُ يَرْجِعُ اِلَى السَّمَاءِ لِاَنَّهَا فِى الْجَمْعِ الْاٰئِلَةِ اِلَيْهِ اَىْ صَيَّرَهَا كَمَا فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ـ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ مُجْمَلاً وَمُفَصَّلاً اَفَلَا تَعْتَبِرُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى خَلْقِ ذٰلِكَ اِبْتِدَاءً وَهُوَ اَعْظَمُ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلٰى اِعَادَتِكُمْ ـ

২৯. এবং আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের প্রমাণ স্বরূপ ইরশাদ করেন যখন তারা তা অস্বীকার করেছে। তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে অর্থাৎ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু বিদ্যমান যাবতীয় সবকিছু যেন এগুলোর মাধ্যমে তোমরা উপকৃত হতে পার এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। তারপর পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দেন অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টির অভিপ্রায় করলেন। তারপর তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করলেন অর্থাৎ গঠন করলেন। যেমন, অন্য একটি আয়াতে উল্লেখ রয়েছে فَقَضٰهُنَّ [অনন্তর তিনি তৈরি করলেন] هُنَّ [তাদেরকে] সর্বনামটি এ স্থানে اَلسَّمَاۤءِ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلسَّمَاۤءِ শব্দটি যদিও একবচন তবুও আগত অবস্থা হিসেবে তাকে বহুবচন অর্থে গণ্য করা হয়েছে। আর তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত সকল বিষয়ে। এই বিষয়টি কি তোমরা লক্ষ্য কর না যে, তোমাদের অপেক্ষা বৃহৎ এই সকল কিছু যিনি শুরুতে সৃষ্টি করতে সক্ষম ও ক্ষমতাশীল তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম?

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

وَكُنْتُمْ-এর মধ্যে জালাল (র.) قَدْ শব্দ মুক্বাদ্দার রেখে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন حَال এবং এর নিয়ম নীতির প্রতি যে, مَاضِي তা যখন حَال হয়, তখন قَدْ শব্দ আনা অত্যাবশ্যক। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন। اَلرُّوْحُ-এর تَعَلُّق শুধু اَلْاَرْحَامُ-এর সাথে, وَالدُّنْيَا-এর সাথে নয়। اِسْتَوٰى অর্থের দিক দিয়ে اِعْتِدَال ও اِسْتِقَامَة আরবরা اِسْتَوَى الْعُوْدُ বলে থাকে। اِسْتَوٰى اِلَيْهِ كَالسَّهْمِ الْمُرْسَلِ অর্থাৎ সেরা প্রকৃতি ইত্যাদি ফেলে সোজা করা হোক, فَسَوّٰهُنَّ-এর অর্থও এটাই যে, টেরা কিংবা ভাঙ্গা ফাটা ফেলে ঠিক করে দিয়েছেন। যেমন যমীর বহুবচন এবং মারজা, [ফেরার স্থান] اَلسَّمَاءُ একবচন। মুফাস্সির (র.) এর নির্দেশনা করছেন যার সারাংশ হচ্ছে– এটা শব্দ হিসেবে যদিও একবচন; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য সমন্বিত সত্যায়নের হিসেবে যা অর্থগত দিক দিয়ে বহুবচন, অর্থাৎ সপ্তাকাশ। যেমন অন্য আয়াতকে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃতি দিতে যেয়ে পেশ করেছেন। كَيْفَ হামযায়ে اِسْتِفْهَام-এর অর্থে اَیْ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ اَيْ اَتَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَمَعَكُمْ مَا يُصْرِفُ عَنِ الْكُفْرِ। এটা এমনই, যেমন– اَتَطِيْرُ بِغَيْرِ جَنَاحٍ وَكَيْفَ تَطِيْرُ بِغَيْرِ جَنَاحٍ

فَاَحْيَاكُمْ শুধু এক স্থানে فَ এবং তিন স্থানে ثُمَّ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, যাতে বুঝা যায় যে, প্রথম عَدَم ও وُجُوْد-এর মাঝে সংযুক্ত ও সম্পর্ক রয়েছে এবং অন্যান্য অবস্থাগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু দূরত্ব ও বিরতি হবে। كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ জুমলায়ে اِسْتِفْهَامِيَّة। যমীর اَنْتُمْ জুমলাহ এবং তার পরের জুমলা حَال

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তাওহীদ এবং রেসালাতের সুস্পষ্ট দলিলসমূহ এবং অস্বীকারকারীদের ভ্রান্ত চিন্তাধারার খণ্ডন সম্পর্কিত আলোচনা ছিল। এ দুটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইহসান এবং অনুগ্রহসমূহের আলোচনা করে এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, এতসব অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েও এরা কিরূপে কুফর এবং অস্বীকারের দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে? সেই সঙ্গে এ ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি দলিল প্রমাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না হয়, তাহলে কমপক্ষে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ স্বীকার করা, তবে সম্মান ও আনুগত্য করাও তো প্রত্যেক ভদ্রতাও সুস্থ মস্তিষ্কের দাবি। এমনকি একটি বিবেকহীন প্রাণীও তার অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাকে। কিন্তু এ সকল মানুষ আকল ও বুদ্ধির দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় প্রকৃত অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ অস্বীকার করার দুঃসাহকিতা কিভাবে করে?

قَوْلُهُ كَيْفَ : كَيْفَ প্রশ্নসূচক হরফ। অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কুরআনে অস্বীকার ও দুঃসাহসিকতার উপর বিস্ময় প্রকাশের জন্য এর অধিকতর ব্যবহার হয়েছে।

فَكَاَنَّهُ قَالَ : لَا يَنْبَغِيْ اَنْ تُوْجَدَ فِيْكُمُ الصِّفَاتُ الَّتِيْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْكُفْرُ فَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَصْدُرَ مِنْكُمُ الْكُفْرُ (جَمَل : ٥٠)

قَوْلُهُ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا : আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা এ নিষ্প্রাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে যা আংশিকভাবে জড় বস্তুর আকৃতিতে আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে জুড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ তা'আলা সেসব বিক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ অণূকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এ হলো মানব সৃষ্টির সূচনা পূর্বের কথা। অতঃপর তিনি তাদের নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন দেহের নিষ্প্রাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন। প্রথম মৃত্যু হলো সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের নিষ্প্রাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদের জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হলো মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুত তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন। –[তাফসীরে মা'আরিফুর কুরআন : মুফতী শফী (র.)]

وَقَدْ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا : এখানে শুরুর وَاو টি حَالِيَه আর كُنْتُمْ اَمْوَاتًا হলো تَكْفُرُوْنَ-এর যমীর থেকে حَال বা অবস্থা ও ভাববাচক এই দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এই স্থানে قَدْ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞ মুফাসসির قَدْ শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি سُؤَال مُقَدَّر-এর জবাব দিয়েছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : فِعْل مَاضِى -কে حَال বানাতে হলে قَدْ যোগ করতে হয়। قَدْ ছাড়া فِعْل مَاضِى হাল হওয়া সঠিক নয়। এখানে কিভাবে হলো?

উত্তর : قَدْ শব্দগতভাবে থাকা জরুরি নয়। উহ্য থেকেও حَال হতে পারে। এখানে قَدْ উহ্য রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) قَدْ উল্লেখ করেছেন। আরেকটি জবাব এটাও হতে পারে যে, قَدْ উহ্য থাকা ব্যতিরেকেও حَال হওয়া সঠিক আছে। কারণ এখানে শুধু كُنْتُمْ اَمْوَاتًا বাক্যটিই হাল নয়; বরং তার পরবর্তী বাক্য تُرْجَعُوْنَ পর্যন্ত জুমলা হয় حَال হয়েছে। যেন বলা হয়েছে كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَ قِصَّتُكُمْ هٰذِهٖ -[ফতহুল কাদীর সূত্রে জামালাইন]

اَمْوَاتًا : لَا بُدَّ مِنَ التَّاوِيْلِ عَلٰى مَا فَسَّرَهٗ اَىْ وَكَانَتْ مَوَادُّ اَبْدَانِكُمْ اَوْ اَجْزَائِهَا اَمْوَاتًا وَالظَّاهِرُ الْحَمْلُ عَلَى التَّشْبِيْهِ فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى كُنْتُمْ كَالْاَمْوَاتِ ـ فَلَا يَرِدُ السُّؤَالُ كَيْفَ قِيْلَ اَمْوَاتًا فِىْ حَالِ كَوْنِهِمْ جَمَادًا اِنَّمَا يُقَالُ مَيِّتٌ فِيْمَا تَصِحُّ فِيْهِ الْحَيَاةُ مِنَ الْبِنْيَةِ ـ (جَمَل : ٥١)

قَوْلُهٗ نُطَفًا فِى الْاَصْلَابِ : نُطَفًا এটি نُطْفٌ -এর বহুবচন। অর্থ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি। এমন বস্তু যা টপকে পড়ে। এখানে نُطْفَة مَنِى বা বীর্য বুঝানো হয়েছে। نُطْفَة -এর সাথে عَلَق এবং مُضْغَة -ও শামিল আছে।

قَوْلُهٗ فَاَحْيَاكُمْ : এটি مَحْذُوْف -এর উপর مُرَتَّبٌ হয়েছে। তাকদীরী ইবারত এরূপ وَكُنْتُمْ عَلَقَةً فَمُضْغَةً فَاَحْيَاكُمْ এভাবে তাকদীরী ইবারত উল্লেখ করার প্রয়োজন ও কারণে দেখা দিয়েছে যে, বীর্য তৎক্ষণাৎ জীবন প্রাপ্ত হয় না; বরং মাতৃগর্ভে ১২০ দিন সময়ের পরিসরে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর জীবন লাভ করে থাকে।

قَوْلُهٗ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ وَلِلتَّوْبِيْخِ : অর্থাৎ এতসব নিয়ামত পাওয়ার পরও কুফরি বা অকৃতজ্ঞতা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করা বিস্ময়ের ব্যাপার। অথবা استفهام টি توبيخ বা ধমক ও ভর্ৎসনার জন্য এসেছে। কারণ বিস্ময় তো ঐসব স্থানে প্রকাশ করা হয় যেখানে اَسْبَاب বা কারণসমূহ লুকায়িত থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে তো কোনো বস্তুর কারণ গোপন নেই। সুতরাং এখানে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন।

قَوْلُهٗ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ : এটিই হলো مَنْشَاُ التَّعَجُّبِ বা বিস্ময়ের মূল কারণ। কেননা আল্লাহ তা'আলার এককত্বের দলিল প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও কুফর বা তার সাথে শরিক করা বিস্ময়ের ব্যাপার। আর بُرْهَان দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর বাণী- وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا الخ অর্থাৎ যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেছেন, একমাত্র তিনিই ইলাহ হওয়ার যোগ্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউ বা কোনো মূর্তি ইলাহ হতে পারে না। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৫১]

قَوْلُهٗ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ : **প্রশ্ন :** আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশ্নোত্তর এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত- এখানে তার কোনো উল্লেখ নেই কেন?

উত্তর : উক্ত প্রশ্নের জবাব আয়াতের শব্দের মাঝেই নিহিত আছে। একটু চিন্তা করলেই উত্তর বেরিয়ে আসবে। অবশ্য আয়াতে সে জীবনের কথা সরাসরি না বলে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এভাবে যে, فَاَحْيَاكُمْ -এর পর বলা হয়েছে- ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ আর ثُمَّ এ কথার দালালত করে যে, রূহ প্রদান ও মৃত্যু প্রদানের মাঝে সময়ের একটি পরিসর অতীত হয়েছে। আর তা হলো দুনিয়ার জীবন। এমনিভাবে ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ -এর ثُمَّ থেকেও এ কথা বোঝা যায় যে, মৃত্যু এবং তারপর পুনরায় জীবন লাভের মাঝে একটি সময় ছিল। আর তাহলো বরজখী বা কবরের জীবন। অনুরূপভাবে ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -এর মাঝেও আরেকটি সময়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো হাশর-নাশর ও হিসাব কিতাব। সুতরাং আর ইশকাল থাকল না। তবে সে সময়গুলোর উল্লেখ ভিন্নভাবে করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণগুলোর উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে।

وَقَالَ دَلِيْلًا عَلَى الْبَعْثِ : অর্থাৎ পূর্বে প্রদত্ত দলিল যেহেতু ভূমিকা স্বরূপও সংক্ষিপ্ত ছিল তাই সেটা কাফেরদের পছন্দ হয়নি। বিধায় এখানে সে বিষয়টি বিশদভাবে দলিল দ্বারা প্রমাণিত করা হয়েছে। আর دَلِيْلًا শব্দটি مَفْعُوْل بِهٖ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। اَىْ لِاَجْلِ الدَّلِيْلِ اَوِ الْاِسْتِدْلَالِ

এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণীজগত সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহ লাভ করেছে বা করতে পারে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঔষধপত্র, বসবাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ ও মাটি থেকেই উৎপন্ন ও সংগৃহীত হয়ে থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ : لَكُمْ এটি خَلَقَ -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর لَامْ টি হলো تَعْلِيْل -এর অর্থে। اَىْ لِاَجْلِكُمْ কেউ বলেন, এটি تَمْلِيْك وَالْاِبَاحَة -এর জন্য। অবশ্য تَمْلِيْك টি শুধু উপকার লাভযোগ্য বস্তুর সাথেই খাস হবে। আর কেউ বলেন, اِخْتِصَاص -এর অর্থে।

مَا : এটি مَا مَوْصُوْلَة এবং তার صِلَه হলো فِى الْاَرْضِ আর مَا فِى الْاَرْضِ হলো خَلَقَ -এর مَفْعُوْل بِه

جَمِيْعًا : এটি مَفْعُوْل তথা مَا فِى الْاَرْضِ থেকে حَال হয়েছে এবং এটি كُلّ -এর অর্থে। কেউ বলেন, এটি حَال مُؤَكِّدَة হয়েছে। কেননা مَا فِى الْاَرْضِ বাক্যটাই ব্যাপক।

জগতের চার অবস্থা : যেমন একটি দলিল এটা যে, মানুষের চারটি অবস্থা, দুটি অনস্তিত্ববান আর দু'টি অস্তিত্ববান। এটা দুনিয়াবী অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে সীমিত। তারপর পরজগতের অস্তিত্ব স্থায়ী হবে, এর উপর অনস্তিত্বের আবরণ আসতে পারবে না। এ বিভিন্ন অবস্থাদির উপরে মানুষকে লক্ষ্য করতে হবে যে, কে এ পরিবর্তন করছে? সে মালিক ও খালিক্বকে চিনো! আচ্ছা আর যদি ঐ প্রমাণাদির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে না পারো, কেননা এগুলো মধ্যে বিবেক শক্তি ব্যয় করতে হয়। আর অত মেহ্নতের কাজ কে করে। ভাল কথা, তবে অবদান কারীর অধিকারকে স্বীকার করা তো প্রাকৃতিক বিধান। শুধু এটা ভেবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়ে যাও!

সামনে সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে, জগতে বিদ্যমান সকল বস্তু কোনো না কোনো উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্য থেকে অধিকাংশের মেনে নেওয়া যায় যে, কোনো বস্তুর উপকারিতা জানাও না যায়। তবে এর দ্বারা ঐ বস্তুটির উপকার থেকে খালি হওয়া তো অপরিহার্য হয়ে পড়ে না। জানা না থাকাবস্থায়ই এর দ্বারা উপকার হচ্ছে, হ্যাঁ সকল বস্তুর উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন। خَلَقَ لَكُمْ -এর "লাম" উপকারের জন্য, এর দ্বারা আলেমগণ এটা বুঝেছেন যে, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে (اِبَاحَتْ) বৈধ ঘোষণা হচ্ছে আসল। আর নিষিদ্ধতা আসল নয়। অর্থাৎ শরিয়ত যে বস্তুকে ক্ষতিকারক বুঝবে, সেটাকে নিষেধ করে দেবে।

একটি সন্দেহ এবং এর উত্তর : এক্ষেত্রে কেউ এ সন্দেহ করবে না যে, যখন সকল বস্তুই উপকারী, তবে সকল বস্তুই হালাল হওয়া উচিত। মূল কথা হচ্ছে এটা যে, কোনো বস্তুউপকারী হলে ওটা ব্যবহারযোগ্য হওয়া জরুরি নয়। সর্বশেষ বিষ ইত্যাদির মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতা অবশ্যই আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এর অপকারিতা অধিক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে এর ব্যবহার থেকে বাধা দেওয়া হয়। এ অবস্থাই শরয়ী দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের। এগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু উপকারিতাও রয়েছে বটে। কিন্তু ক্ষতি অধিক হয়। তাই ওগুলোকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে যেমনিভাবে চিকিৎসক অথবা ডাক্তারের জানা যথেষ্ট মনে করা হয়, তদ্রূপ শুধু বিধানকর্তার জানাই যথেষ্ট, সাধারণদের অবগত হওয়া জরুরি নয়।

قَوْلُهُ أَىِ الْاَرْضِ وَمَا فِيْهَا : জমীন দ্বারা উদ্দেশ্য ভূ-পৃষ্ঠ। আর مَا فِيْهَا দ্বারা জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَتَعْتَبِرُوْا : এখানে خَاصّ -কে عَامّ -এর সাথে عَطْف করা হয়েছে। কেননা اِنْتِفَاع -এর মাঝে দুনিয়াবী ও পরকালীন সকল انتفاع -ই শামিল আছে। সে হিসেবে اِعْتِبَار -ও তাতে অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ : প্রশ্ন: ثُمَّ -এর মূল অর্থে تَرَاخِى زَمَان দাবি করে। অথচ তখন কোনো জমানা বা কাল ছিল না।

উত্তর : নিম্নের আরবি ইবারত দ্রষ্টব্য–

১. قِيْلَ : هِىَ اِشَارَةُ التَّرَاخِىْ بَيْنَ رُتْبَتَىْ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ .

২. وَقِيْلَ : لَمَّا كَانَ بَيْنَ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ اَعْمَالٌ اُخَرُ مِنْ جَعْلِ الْجِبَالِ رَوَاسِىَ وَتَقْدِيْرِ الْاَقْوَاتِ . كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرٰى . عَطَفَ بِثُمَّ، اِذْ بَيْنَ خَلْقِ الْاَرْضِ وَالْاِسْتِوَاءِ اِلَى السَّمَاءِ تَرَاخٍ .

২. قَالَ الْقُرْطُبِىُّ ثُمَّ اسْتَوٰى لِلتَّرْتِيْبِ الْاِخْبَارِىْ لَا الزَّمَانِىْ، وَذٰلِكَ لِاَنَّ خَلْقَ مَا فِى الْاَرْضِ مُتَاَخِّرٌ عَنْ خَلْقِ السَّمَاءِ . (جَمَل)

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اِسْتَوٰى : استوى-এর আভিধানিক অর্থ- اِسْتَقَامَ وَاعْتَدَلَ [সমান হলো, ভারসাম্য পূর্ণ হলো]। বলা হয়- اِسْتَوَى الْعُوْدُ [কাঠ সমান হলো]। কেউ বলেন, عَلَا وَارْتَفَعَ [উঁচু হলো]। যেমন কুরআনের বাণী-

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ (مُؤْمِنُوْن : ٢٨) لِتَسْتَوُا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ (اَلزُّخْرُف : ١٣)

এখানে اِسْتَوٰى-এর অর্থ عَمَدَ وَقَصَدَ [ইচ্ছা করলেন]। আর তার ফায়েল হলো এমন জমীর, যা আল্লাহর দিকে ফিরবে। আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে ইচ্ছার অর্থ- تَعَلُّقُ اِرَادَتِهِ التَّنْجِيْزِيِّ اِلَى الْحَادِثِ

اَيْ ثُمَّ تَعَلَّقَتْ اِرَادَتُهٗ تَعَلُّقُهَا حَادِثًا بِخَلْقِ السَّمٰوَاتِ اَيْ بِتَرْجِيْحِ وُجُوْدِهَا عَلٰى عَدَمِهَا فَتَعَلَّقَتِ الْقُدْرَةُ بِاِيْجَادِهَا .

قَوْلُهُ بَعْدَ خَلْقِ الْاَرْضِ : এখানে শুধু خَلْقِ الْاَرْضِ বলা হয়েছে। وَمَا فِيْهَا বলা হয়নি। যেমনটি পূর্বের আয়াতে রয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, জমীনের মধ্যস্থিত বস্তুগুলো আসমান সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি হয়নি; বরং তার পরে হয়েছে।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'আলার দু'দিনে জমীনের অবয়ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর দু'দিনে আসমান সৃষ্টি করেছেন। তারপর দু'দিনে জমীনের মধ্যস্থিত সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। যেমনটা সূরা আম্বিয়ার আয়াত থেকে বোঝা যায়। ইরশাদ হয়েছে-

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (اَلْاَنْبِيَاء : ٢١)

[এ ব্যাপারে আরো ইশকাল জবাবের জন্য দ্রষ্টব্য হাশিয়ায়ে জামাল : ৫৩]

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا فِيْ مَعْنَى الْجَمْعِ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ-এর هُنَّ জমীরটি اَلسَّمَاءِ এর দিকে ফিরেছে اَلسَّمَاءِ শব্দটি একবচন। কিন্তু জমীর ব্যবহৃত হয়েছে বহুবচনের। সুতরাং مَرْجِعٌ এবং ضَمِيْرٌ-এর মাঝে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর: اَلسَّمَاءِ শব্দটি مَا يَؤُوْلُ হিসেবে বহুবচন। কেননা اِسْتَوٰى-এরপর সাত আসমান অস্তিত্ব লাভ করে। অন্যত্র বলা হয়েছে- فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ

আরেকটি জবাব এও হতে পারে যে, اَلسَّمَاءِ-এর اَلِف لَام جِنْسِي টি তাই বহুবচনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত আছে।

قَوْلُهُ اَيْ صَيَّرَهَا : এটি فَسَوّٰهُنَّ-এর অর্থ- عَلٰى خَلْقِ ذٰلِكَ : اَيْ مُذَكَّرٌ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا بَعْدَهَا

হযরত আদম (আ.) ও জগতের সৃষ্টি : অধিকাংশ আয়াত দ্বারা আকাশ ও জমিন এবং জগতের সৃষ্টি ছয়দিনে হয়েছে বুঝা যায়। মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সপ্তমদিন শুক্রবার আছর ও মাগরিব এর মধ্যবর্তী সময়ে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। য দ্বারা জগতের সৃষ্টি সাত দিনে পরিপূর্ণ হওয়া বুঝা যায়

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ জটিলতার সমাধান এভাবে করেছেন যে, এ শুক্রবার যার মধ্যে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি বাস্তবায়িত হয়েছে, জরুরি নয় যে, ঐ ছয় দিনের সাথে ঐ শুক্রবারটি সংযুক্ত হবে, বরং হতে পারে যে, অনেক কাল পরে কোনো এক শুক্রবার হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং জগতের সৃষ্টির জন্য ছয় দিনই সীমিত থাকবে। এ বিশ্লেষণ দ্বারা আরো একটি সন্দেহকেও দূর করা হয়ে গেল যে, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বে এবং জমিন ও আকাশের সৃষ্টি পরে জিন জাতির দীর্ঘকাল পর্যন্ত জমিনে বসবাস করার বিষয়ে মারাত্মক সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন বলা যাবে যে, জমিন ও আকাশের সৃষ্টির পর জিন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। এবং এর হাজার হাজার বছর পর তখন কোনো এক শুক্রবারে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আকাশও জমিনের সৃষ্টির ধারাবাহিকতার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে তিনটি স্থানে এসেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে উক্ত আয়াতে। দ্বিতীয়টি حٰمٓ السَّجْدَة-তে এবং তৃতীয়টি وَالنّٰزِعَاتِ-তে। এ আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে কিছুটা বোধগম্যের বিপরীত ও বুঝা যায়। কোনো কোনো আলেম এর উত্তম নির্দেশনা এ দিয়েছেন যে, সর্বপ্রথম জমিনের উৎসগিরি তৈরি করা হয়েছে। তারপর আকাশের উৎসগিরি যা ধোঁয়ার আকৃতিতে ছিল তৈরি করা হয়েছে। তারপর জমিনের উৎসগিরি দ্বারা বর্তমান আকৃতির উপর বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এর পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর ঐ বহমান উৎসগিরি দ্বারা সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। অবশিষ্ট সৃষ্টিগুলোর প্রাথমিক অবস্থাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা শরিয়ত এ জন্য বর্ণনা করেনি যে, এগুলো প্রয়োজন ছিল না।

http://islamiboi.wordpress.com

٣٠. وَ اذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ـ يَخْلُفُنِيْ فِيْ تَنْفِيْذِ اَحْكَامِيْ فِيْهَا وَهُوَ اٰدَمُ قَالُوْٓا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا بِالْمَعَاصِيْ وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ـ يُرِيْقُهَا بِالْقَتْلِ كَمَا فَعَلَ بَنُو الْجَانِّ وَكَانُوْا فِيْهَا فَلَمَّا اَفْسَدُوْا اَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ فَطَرَدُوْهُمْ اِلَى الْجَزَائِرِ وَالْجِبَالِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ مُتَلَبِّسِيْنَ بِحَمْدِكَ اَيْ نَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَنُقَدِّسُ لَكَ ـ نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ اَيْ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْاِسْتِخْلَافِ قَالَ تَعَالٰى اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي اسْتِخْلَافِ اٰدَمَ وَاَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ فِيْهِمُ الْمُطِيْعُ وَالْعَاصِيْ فَيَظْهَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوْا لَنْ يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا اَعْلَمَ لِسَبْقِنَا لَهٗ وَرُؤْيَتِنَا مَا لَمْ يَرَهُ فَخَلَقَ تَعَالٰى اٰدَمَ مِنْ اَدِيْمِ الْاَرْضِ اَيْ وَجْهِهَا بِاَنْ قَبَضَ مِنْهَا قَبْضَةً مِنْ جَمِيْعِ اَلْوَانِهَا وَعُجِنَتْ بِالْمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ فَصَارَ حَيَوَانًا حَسَّاسًا بَعْدَ اَنْ كَانَ جَمَادًا ـ

অনুবাদ :

৩০. আর স্মরণ কর হে মুহাম্মদ! যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি যেজন এতে বিধি-বিধানসমূহ কার্যকরী করার বিষয়ে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। আর তিনিই হলেন হযরত আদম। তারা বলল, আপনি কি এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে অবাধ্যচার করবে ও রক্তপাত ঘটবে হত্যা করবে রক্ত প্রবাহিত করবে? ইতিপূর্বে যেমন জিন সন্তানরা তা করেছিল। পূর্বে জিনেরা এই জনপদসমূহে বাস করত। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে দ্বীপপুঞ্জ ও পাহাড়-পর্বতের দিকে বিতাড়িত করেন। আমরাইতো আপনার হামদসহ তাসবীহ [স্তুতি] পাঠ করি অর্থাৎ আমরা "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করি ও আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি। অর্থাৎ যা আপনার উপর আরোপ করা ঠিক নয়, সেই সমস্ত জিনিস হতে আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। وَنَحْنُ -এই বাক্যটি حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য। وَنُقَدِّسُ لَكَ -এর ل অক্ষরটি অতিরিক্ত। মোটকথা আমরাই আপনার প্রতিনিধিত্ব করার অধিক যোগ্যতার অধিকারী। তিনি [আল্লাহ তা'আলা] বললেন, নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না। অর্থাৎ আদমকে প্রতিনিধি করার পিছনে কি কল্যাণ ও রহস্য বিদ্যমান, তা কেবল আমিই জানি। আদম-সন্তানের মধ্যে বাধ্য- অবাধ্য উভয় ধরনের ব্যক্তি থাকবে। সুতরাং তাদের মাঝেই আমার 'আদল ও ন্যায়ের প্রকাশ ঘটবে। যা হোক, ফেরেশতাগণ বলাবলি করলো, প্রভু কখনো আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক জ্ঞানের অধিকারী কোনো মাখলুক সৃষ্টি করবেন না। কারণ আমাদেরকে পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এমনসব জিনিস আমরা অবলোকন করেছি, যা অন্য কেউ করেনি। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর উপরিভাগের [স্তরের] মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করলেন। সকল প্রকার মাটি হতে এক মুঠ মাটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পানির সাহায্যে মণ্ড [খামীরা] তৈরি করা হলো। তাকে সুগঠিত করে তাতে তিনি প্রাণ ফুৎকার করলেন। ফলে তা নিষ্প্রাণ অবস্থা হতে অনুভূতিশীল এক প্রাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

إِذْ শব্দে পূর্বে أُذْكُرْ নিয়তি হিসেবে মানা এ জন্য জরুরি যে, إِذْ নসবের স্থানে রয়েছে এবং أُذْكُرْ-এর فَاعِل আর কেউ কেউ এটাকে মুবতাদায়ে মাহযূফের খবর বলেছেন– أَيْ اِبْتِدَاءُ خَلْقِيْ إِذْ قَالَ الخ-এবং কারো দৃষ্টিতে অতিরিক্ত। আর قَالُوا-এর কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। مَلَائِكَة হলো مَلْأَكٌ-এর বহুবচন। যেমন شَمَائِل বহুবচন شَمْأَلٌ-এর এবং تَاءُ تَانِيْث বহুবচনের জন্য। যদি এটাকে مَلَكٌ তথা شِدَّة থেকে নির্গত মানা হয়। তবে হাম্‌যা" অতিরিক্ত হবে। আর যদি الوكة তথা رِسَالَة থেকে নির্গত করা হয়, তবে مَالِك ছিল। পরে এটার পরিবর্তন করা হয়েছে।

آدَم তিনি أَبُو الْبَشَر এবং একজন ব্যক্তি, বস্তুবাদীদের ন্যায় তার মানবজাতির নাম বলা শুদ্ধ নয়। তার বয়স ৯৬০ বছর হয়েছে এবং নিজের এক লক্ষ সন্তান দেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন। قَالَ ফেয়েল رَبُّكَ ফায়েল إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ জুমলা মাকূলাহ অর্থাৎ মাফঊল جَاعِلٌ অর্থ خَالِقٌ হলে তবে এক مَفْعُوْل চাবে - তা হচ্ছে خَلِيْفَةً আর অর্থ مُصَيِّر ও হতে পারে। فِي الْأَرْضِ দ্বিতীয় مَفْعُوْل হবে। قَالُوا-এর মাকূলাহ أَتَجْعَلُ فِيْهَا الخ - تَسْبِيْح ও تَقْدِيْس-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য এটা যে, تَسْبِيْح আনুগত্য ও আমল -এর ক্ষেত্রে হয় এবং تَقْدِيْس ই'তেকাদের ক্ষেত্রে। সবগুলোর সারাংশ মুখ, অন্তর এবং অঙ্গসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে সত্তাগত ও সাধারণ নিয়ামতসমূহের বর্ণনা ছিল। এখান থেকে মৌলিক নিয়ামতসমূহের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে ইলম এবং বুযুর্গী দান করেছেন। তাকে ফেরেশতাগণের সেজ্‌দার স্থান বানিয়ে সম্মানি করেছেন এবং তোমাদেরকে তার সন্তান হওয়ার গৌরব দান করেছেন।

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গ : এবারে একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা সমগ্র মানব জাতিকে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সংঘটন। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ : وَاو হরফটি اِسْتِيْنَافِيَه আর إِذْ হলো أُذْكُرْ উহ্য ফেলের مَفْعُوْل بِهِ কুরআনে কারীমের বর্ণিত ঘটনাসমূহের শুরুতে এই তারকীবই অধিক প্রযোজ্য।

اَلْمَلَائِكَةُ : এটি مَلَكٌ-এর বহুবচন। মূলত مَفْعَلٌ-এর ওজনে مَأْلَكٌ ছিল। সহজকরণার্থে هَمْزَة-কে হজফ করে مَلَكٌ করা হয়েছে। এ শব্দটি الوكة থেকে নির্গত। الوكة অর্থ পয়গাম্বরী, রিসালাত। তাহলে مَلَائِكَة-এর আভিধানিক অর্থ বার্তাবাহক। ফেরেশতারাও আল্লাহ তা'আলার পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত এবং সৃষ্টির মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ দেয় এই হিসেবে তাদেরকে مَلَائِكَة বলা হয়। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

ফেরেশতার পরিচয় : ইসলামি পরিভাষায় ফেরেশতার পরিচিতি হলো– جِسْمٌ نُوْرَانِيٌّ مُتَشَكِّلٌ بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ অর্থাৎ এমন নূরানী মাখলুক যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা কখনো আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করেন না; বরং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনে রত থাকেন।

–[কাওয়াইদুল ফিকহ : ৫০৪]

বস্তুত ফেরেশতা নূর বা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি। তাঁরা সাধারণত অদৃশ্য, তাঁদের কোনো আকার নেই। তবে তাঁরা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারেন। তাঁরা আমাদের মতো রক্ত-মাংসের সৃষ্টি নন। তাঁদের কামনা-বাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা-তন্দ্রা কিছুই নেই। তাঁরা সবসময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকেন। আল্লাহ তা'আলা যখন যা হুকুম করেন, তাঁরা তাই পালন করেন। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত অথবা শাস্তি যা কিছু নাজিল হয়, তা এই ফেরেশতাগণের মাধ্যমে নাজিল করা হয়। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণের প্রতি যেসব কিতাব নাজিল করেছেন, তা তাঁদের মাধ্যমে করেছেন। তাঁরা বান্দার আমল লিপিবদ্ধ করেন এবং জান কবজ করেন। বিচার দিনে তাঁরা বান্দার ভালো-মন্দ আমলের সাক্ষ্য দিবেন।

ফেরেশতাদের সংখ্যা ও নাম : ফেরেশতাগণের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন। ইরশাদ হয়েছে– وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।

–[সূরা মুদ্দাসসির : ৩১]

চারজন বড় বড় ফেরেশতাসহ কতিপয় ফেরেশতার নাম আমরা জানি। যেমন–

১. হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁকে রূহ বা রুহুল আমীনও বলা হয়।

২. হযরত মীকাঈল (আ.)। তিনি সকল জীবের জীবিকা বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত।

http://islamiboi.wordpress.com

৩. হযরত আজরাঈল (আ.), তিনি সকল জীবের জীবন বা রূহ কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত।
৪. হযরত ইসরাফীল (আ.), তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সাথে সাথে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এরপর কিয়ামত কায়েম হবে।

উপরে বর্ণিত চারজন ফেরেশতা ছাড়াও আরো কতিপয় ফেরেশতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন- কিরামান কাতিবীন, যারা মানুষের ভালো-মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করেন। মুনকার ও নাকীর : তাঁরা মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করেন। জাহান্নামের রক্ষক ফেরেশতার নাম মালিক এবং জান্নাতের জিম্মাদার ফেরেশতার নাম রিজওয়ান। এমনিভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার অগণিত ফেরেশতা রয়েছেন।

خَلِيْفَةً : وَالْخَلِيْفَةُ مَنْ يَخْلُفُ غَيْرَهُ وَيَنُوْبُ مَنَابَهُ فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى فَاعِلٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ অর্থাৎ যে কারো স্থলাভিষিক্ত হয়, তাকে খলীফা বলা হয়।

এ স্থলাভিষিক্ত হওয়া বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে- ১. অনুপস্থিতি ২. মারা যাওয়া ৩. অক্ষম হওয়া এবং ৪. مُسْتَخْلِفٌ -এর সম্মান প্রকাশ করা। ইমাম রাগিব (র.) -এর ভাষায়-

اَلْخِلَافَةُ النِّيَابَةُ مِنَ الْغَيْرِ إِمَّا لِغَيْبَةِ الْمَنُوْبِ عَنْهُ وَإِمَّا لِمَوْتِهِ وَإِمَّا لِعَجْزِهِ إِمَّا التَّشْرِيْفُ الْمُسْتَخْلِفُ . (رَاغِب)

এখানে শেষোক্তটি উদ্দেশ্য। সসীম বান্দার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অসীম সত্তার কাছ থেকে উলূম ও আহকাম সরাসরি লাভ করার যোগ্যতা না থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেছেন। রুটি যেমন সরাসরি আগুনে দিলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় এবং সঠিক উপায়ে রুটি ভাজার জন্য মধ্যখানে তাওয়া বা কড়াইয়ের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়; অনুরূপভাবে বান্দারও সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নূর তথা উলূম আহকাম লাভে অক্ষম বিধায় নবী-রাসূলদেরকে মধ্যস্থতা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ الخ : **ফেরেশতাদের আপত্তির রহস্য :** ফেরেশতাদের এ উক্তিটি আপত্তি বা গোস্তাখীমূলক ছিল না। যেমনটি কেউ কেউ মনে করেছেন। কারণ ফেরেশতারা গোস্তাখী করতেই পারে না; বরং ফেরেশতা এ উক্তিতে পরিপূর্ণ সমর্পন, আত্মত্যাগ ও ওয়াফাদারীর পরিচয় ছিল। জনৈক মুহাক্কিক আলেম বলেন-

لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاِعْتِرَاضِ عَلَى اللّٰهِ وَلَا عَلٰى وَجْهِ الْحَسَدِ لِبَنِيْ اٰدَمَ كَمَا قَدْ يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ . (اِبْنِ كَثِيْر)

এ প্রসঙ্গে অধিকতর সুন্দর জবাব দিয়েছেন হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী (র.)। তিনি লিখেন, কেউ না কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও খুনাখুনিকারী হবে। খেলাফতের দায়িত্ব আমাদেরকে দেওয়া হলে আমরা সর্বাত্মকভাবে তা আঞ্জাম দিব। আর মানবজাতির সকলে তা আঞ্জাম দিবে না; বরং যারা অনুগত হবে তারাই কেবল মনে প্রাণে দায়িত্ব পালন করবে; কিন্তু যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও জালেম হবে, তাদের থেকে সে দায়িত্ব পালনের কি আশা করা যায়। সারকথা, যখন দায়িত্ব পালন করার মতো একটি দল বিদ্যমান রয়েছে, তখন একটি নতুন মাখলুক- যাদের কেউ দায়িত্ব পালন করবে কেউ করবে না- এ দায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন রয়েছে? এটা আপত্তি স্বরূপ বা নিজেদের অগ্রাধিকার দাবি স্বরূপ ছিল না; বরং বিষয়টি এমন যেমন কোনো হাকেম নতুন একটি প্রকল্প করে তার জন্য স্বতন্ত্র আমলা নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরাতন আমলাদের সামনে ব্যক্ত করলেন, তখন তারা স্বীয় আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নিবেদন করল- জাহাপনা! এ কাজের জন্য যাদেরকে নিযুক্ত করছেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কোনো সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তন্মধ্যে কতিপয় ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করবে আর কতিপয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এতে জাহাপনা মন অপ্রসন্ন হবে। এ সবের কি দরকার। আমরাইতো আছি। সর্বদা জাহাপনার জন্য জান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। যে কোনো কাজই হোক না কেন তা পালনে আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বসমূহ পালনসহ নতুন যে কোনো কাজ আমরা সানন্দে পালন করব। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭০]

قَوْلُهُ يُفْسِدُ فِى الْاَرْضِ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ : অর্থাৎ قُوَّتْ شَهْوَاتِيَّة -এর চাহিদায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং قُوَّتْ غَضَبِيَّة -এর চাহিদানুযায়ী খুনাখুনি করবে। প্রতিটি মানুষের মাঝে তিনটি শক্তি রয়েছে। তাহলো شَهْوَاتِيَّه . غَضَبِيَّه . عَقْلِيَّه প্রথম দুটির মাধ্যমে মানুষ نَقْص বা অপরাধমূলক কাজ করে আর শেষোক্তটি দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ কাজ করে। ফেরেশতারা প্রথম দুটির চাহিদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে এবং শেষোক্তটির চাহিদার কথা ভুলে বসেছিল। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৫৫]

قَوْلُهُ كَمَا فَعَلَ بَنُوْ الْجَانِّ الخ : **প্রশ্ন :** ফেরেশতারা আদমের ব্যাপারে যে বনী সকল মন্তব্য করেছিল, এটা কি তারা গায়েব জানার ভিত্তিতে বলেছিল?

উত্তর : ফেরেশতারা গায়েব জানে না। তারা গায়েবের ভিত্তিতে এ কথা বলেননি; বরং মানবজাতির পূর্বে পৃথিবীতে জিনদের বসবাস ছিল। তারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের অন্যায় অবিচার ও বিশৃঙ্খলামূলক কাজ করেছিল। জিনদের কর্মকাণ্ডের প্রতি কিয়াস বা ধারণা করেই তারা এ মন্তব্য করেছিল। আল্লামা সুয়ূতী (র.) كَمَا فَعَلَ بَنُوْ الْجَانِّ الخ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাফসীরে মা'আলিমুত তানজীলে এসেছে- كَمَا فَعَلَ بَنُوا الْجَانِّ فَقَاسُوا الشَّاهِدَ عَلَى الْغَائِبِ

ইবনে কাসীরে এসেছে- وَاِنَّهُمْ قَاسُوْهُمْ عَلٰى مَنْ سَبَقَ

http://islamiboi.wordpress.com

بَنُو الْجَانِّ : মানুষের মাঝে আদমের অবস্থান যেমন, জিনদের মাঝে جَانٌّ -এর অবস্থানও তেমন। সে জিনদের আদি পিতা। যেমন হযরত আদম (আ.) মানবজাতির আদি পিতা। কেউ বলেন, তাদের আদি পিতা হলো ইবলীস। আর ইবলীসেরই আরেক নাম হলো শয়তান। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৫৬]

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য : একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করণ না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করানো?

একথা সুস্পষ্ট যে কোনো বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে; নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জানার উদ্দেশ্য পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দুটোর কোনোটাই এ ক্ষেত্রে প্রযোজন্য নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দুশমনি ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তার পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে।

অনুরূপভাবে এখানে এমনও হয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত- যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমাধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ পাকই সবকিছুর স্রষ্টাও মালিক। ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তার আয়ত্তাধীন। তাঁর কোনোকাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আল্লাহ পাকের কাজ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যান্য সবাইকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীত হতে হবে।

সারকথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোনো আবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেওয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন কুরআন পাকে রাসূলে কারীম ﷺ -কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেওয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেওয়া হয়েছে। –[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ مُتَلَبِّسِيْنَ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এদিকে যে, بِحَمْدِكَ বাক্যটি نُسَبِّحُ -এর যমীর থেকে حَال مُتَدَاخِلَه হয়েছে। কেননা এটি حَال -এর حَال হয়েছে। আর بَاء হরফটি مُلَابَسَت বা সহ অর্থ বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে প্রশংসার সদা সঙ্গতা প্রকাশের জন্য (أَيْ تَسْبِيْحًا مُقَيَّدٌ بِحَمْدِكَ وَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ)

قَوْلُهُ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ : أَيْ وَالْكَافُ مَفْعُوْلُ نُقَدِّسُ

وَالْجُمْلَةُ حَالٌ : অর্থাৎ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ বাক্যটি أَتَجْعَلُ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে। আর نُقَدِّسُ-এর عَطْف হয়েছে نُسَبِّحُ -এর উপর। مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه মিলে جُمْلَة فِعْلِيَّة হয়ে نَحْنُ মুবতাদার খবর হয়েছে।

نُسَبِّحُ ও نُقَدِّسُ -এর মাঝে পার্থক্য : تَسْبِيْح হলো জবান দ্বারা তাসবীহ পড়া আর تَقْدِيْس হলো অন্তরে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাত সম্পর্কে পবিত্রতার বিশ্বাস রাখা।

وَفَائِدَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَرَادُفَهُمَا أَنَّ التَّسْبِيْحَ بِالطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ، وَالتَّقْدِيْسِ بِالْمَعَارِفِ فِيْ ذَاتِ اللّٰهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ أَيِ التَّفَكُّرِ فِيْ ذٰلِكَ . (جَمَل ٥٦)

قَوْلُهُ لِيَسْبِقَنَا لَهُ : এ অংশটুকুর সম্পর্ক হলো أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنَّا -এর সাথে। আর وَرُؤْيَتِنَا مَا لَمْ يَرَهُ -এর সম্পর্ক بِأَنْ

قَبْضَةً وَلَا مِنْهُ قَبَضَ : অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করলেন।

মাটির কান্না : হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন মাটিকে অবহিত করে বললেন, হে মাটি! আমি তোমার থেকে এমন এক জাতি সৃষ্টি করবো, যাদের মধ্যে আমার অনুগত ও নাফরমান উভয় ধরনের লোক হবে। যে আমার আনুগত্য করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে আমার নাফরমানি করবে, তাকে জাহান্নামে দিব। তখন মাটি বলল, হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বারা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ। তখন মাটি কাঁদতে শুরু করে। তার কান্নার অশ্রুধারা থেকেই পৃথিবীতে ঝর্ণাসমূহ বয়ে চলছে। –[তাফসীরে খাজিনের সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৫৬]

http://islamiboi.wordpress.com

٣١. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاۤءَ اَيْ اَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ
كُلَّهَا حَتَّى الْقَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ وَالْفَسْوَةَ
وَالْفُسَيْةَ وَالْمِغْرَفَةَ بِاَنْ اَلْقٰى فِيْ قَلْبِهِ
عِلْمَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ اَيِ الْمُسَمَّيَاتِ وَفِيْهِ
تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ عَلَى الْمَلٰۤئِكَةِ فَقَالَ لَهُمْ
تَبْكِيْتًا اَنْۢبِئُوْنِيْ اَخْبِرُوْنِيْ بِاَسْمَاۤءِ
هٰۤؤُلَاۤءِ الْمُسَمَّيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. فِيْ
اَنِّيْ لَا اَخْلُقُ اَعْلَمَ مِنْكُمْ اَوْ اَنَّكُمْ اَحَقُّ
بِالْخِلَافَةِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ.

অনুবাদ :

৩১. এবং তিনি আদমকে যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা দিলেন এমন কি বড় ছোট পেয়ালা, চামচ ও বাতকর্মের শব্দ সম্পর্কে পর্যন্ত তিনি শিক্ষা দিলেন। অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ে এগুলোর বোধ ও জ্ঞান সঞ্চার করলেন। তৎপর প্রকাশ করলেন সে সমুদয় অর্থাৎ এ বিষয়সমূহ। এ স্থানে عَرَضَهُمْ-এর هُمْ সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে- تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ বা বোধসম্পন্ন প্রাণীসমূহের প্রাধান্য প্রদান করে। ফেরেশতাদের সম্মুখে এবং তাদেরকে নিশ্চুপ ও লাজা-ওয়াব করার উদ্দেশ্যে বললেন, এই সমুদয় বিষয়সমূহের নাম আমাকে বলে দাও আমাকে অবহিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও যে, তোমাদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনো মাখলুক আমি সৃষ্টি করব না বা তোমরাই প্রতিনিধিত্ব করার অধিক যোগ্যতা রাখ।

اِنْ كُنْتُمْ-এই আয়াতে শর্তবাচক اِنْ-এর জবাবের উপর পূর্ববর্তী বাক্য اَنْۢبِئُوْنِيْ ইঙ্গিতবহ। সুতরাং পুনর্বার সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

٣٢. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ
الْاِعْتِرَاضِ عَلَيْكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
اِيَّاهُ اِنَّكَ اَنْتَ تَاكِيْدٌ لِلْكَافِ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ
الَّذِيْ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ.

৩২. তারা বলল, আপনি মহান। আপনার কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতে আপনি পবিত্র! আমাদেরকে যা যে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনিই জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। কোনো বিষয়ই তার জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার বাইরে নয়। اِنَّكَ-এর اَنْتَ শব্দটি اِنَّكَ-এর দ্বিতীয় পুরুষবাচক সর্বনাম ك-এর تَاكِيْد বা জোর বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

٣٣. قَالَ تَعَالٰى يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ اَيِ الْمَلٰۤئِكَةَ
بِاَسْمَاۤئِهِمْ اَيِ الْمُسَمَّيَاتِ فَسَمّٰى كُلَّ
شَيْءٍ بِاسْمِهِ وَذَكَرَ حِكْمَتَهُ الَّتِيْ خُلِقَ لَهَا
فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَاۤئِهِمْ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ
مُوَبِّخًا اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَاَعْلَمُ مَا
تُبْدُوْنَ تُظْهِرُوْنَ مِنْ قَوْلِكُمْ اَتَجْعَلُ فِيْهَا
الخ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ. تُسِرُّوْنَ مِنْ قَوْلِكُمْ
لَنْ يَخْلُقَ رَبُّنَا خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا اَعْلَمَ

৩৩. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তাঁদেরকে ফেরেশতাদেরকে এগুলোর [এই বিষয়সমূহের] নাম বলে দাও। অনন্তর তিনি প্রতিটি জিনিসের নাম এবং তা সৃষ্টির তাৎপর্য বর্ণনা করে দিলেন। [যখন সে ফেরেশতাদেরকে সমস্ত বস্তুসমূহের নাম বলে দিলেন, তিনি [আল্লাহ তা'আলা] ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু অর্থাৎ এতদোভয়ের মাঝে যা কিছু অগোচর সেই সম্বন্ধে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর অর্থাৎ আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে' এই যে কথা তোমরা প্রকাশ করেছিলে তা এবং যা তোমরা গোপন কর লুকিয়ে রাখ, যেমন, তোমাদের এই ধারণা করা যে, আমাদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও জ্ঞানী কোনো কিছু আমাদের প্রভু সৃষ্টি করবেন না। তাও নিশ্চিতভাবে আমি জানি।

http://islamiboi.wordpress.com

٣٤. وَ اذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ . هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰئِكَةِ اَبٰى اِمْتَنَعَ مِنَ السُّجُوْدِ وَاسْتَكْبَرَ تَكَبَّرَ عَنْهُ وَقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৩৪. আর স্মরণ কর যখন ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সেজদা কর মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মানসূচক সেজদা কর। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সেজদা করল; সে জিন সম্প্রদায়ের আদি পিতা। ফেরেশতাদের মাঝে বসবাসরত ছিল। সে অমান্য করল সেজদা করতে অস্বীকার করল ও অহংকার করল আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করল এবং বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব হতেই সে কাফেরদের অন্তরর্ভুক্ত ছিল।

তারকীব ও তাহকীক

تَبْكِيْتًا : اَىْ تَوْبِيْخًا وَاِسْكَاتًا يُقَالُ بَكَّتَهُ بِكَذَا وَ بَكَّتَهُ عَلَيْهِ اَىْ قَرَّعَهُ عَلَيْهِ . وَاَلْزَمَهُ حَتّٰى عَجَزَ مِنَ الْجَوَابِ (جَمَل)

قَوْلُهُ اَنْبِئُوْنِىْ : نَبَأٌ অর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। আর خَبَر অর্থ সাধারণ সংবাদ।

قَوْلُهُ تَحِيَّةٍ : এটি حَىَّ يُحَىِّ -এর মাসদার। অর্থ সালাম বা অভিবাদন জ্ঞাপন করা। বলা হয় حَيَّاكَ اللّٰهُ

قَوْلُهُ اِبْلِيْسَ : এ শব্দটি مُشْتَق এবং غَيْر مُشْتَق হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক মত হলো এটি অনারবি শব্দ। عُجْمَة এবং عَلَم হওয়ার কারণে غَيْر مُنْصَرِف আর যদি اِبْلَاس [নৈরাশ্য ও হতাশা] থেকে নির্গত হয়ে থাকে, তাহলে مُنْصَرِف হবে।

وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ : عَلَى الْحَذْفِ - دَال অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-এর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। আর দাল বা উহ্য থাকার প্রতি দালালতকারী বাক্যটি হলো পূর্বের اَنْبِئُوْنِىْ ফেয়েল। ইবারতটি হবে এভাবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اَنْبِئُوْنِىْ আর ইমাম সিবওয়াই -এর মতে যেহেতু شَرْط কে مُقَدَّم করা জায়েজ আছে সেহেতু جَوَابُ الشَّرْطِ -কে মাহজুফ ধরার প্রয়োজন নেই; বরং পূর্বে বর্ণিত اَنْبِئُوْنِىْ -ই তার جَوَابُ الشَّرْطِ হবে। মুসান্নিফ (র.) وَجَوَابُ الشَّرْطِ الخ বলে মূলত শেষোক্ত মতের খণ্ডন করেছেন।

اِسْتَكْبَرَ : শব্দটির عَطْف হয়েছে اَبٰى -এর সাথে। এটি عَطْفُ الْعِلَّةِ عَلَى الْمَعْلُوْلِ -এর মূলনীতির আলোকে হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتَكْبَرَ হলো ইল্লত আর اَبٰى হলো مَعْلُوْل

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে ভূ-পৃষ্ঠের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করলেন। এ শেখানোটা ছিল কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি ইলহামের মাধ্যমে।

اٰدَم : এটি অনারবি নাম। তার থেকে কোনো শব্দ নির্গত হয় না এবং গায়রে মুনসারিফ।

হযরত আদম (আ.)-এর পরিচয় : হযরত আদম (আ.) প্রথম মানব। এজন্য তাঁকে বলা হয় আবুল বাশার [মানবের পিতা]। খলীফাতুল্লাহ উপাধির প্রথম ধারক এই প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন করলেন, তখন সম্ভবত দাজলা-ফুরাত বিধৌত অঞ্চলে বসবাস করেন, বর্তমানে যাকে ইরাক বলা হয়। তাওরাতে হাবীল, কাবীল ও শীছ তাঁর এই তিন সন্তানের নাম পাওয়া যায়। একই সূত্র মতে তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল ৯৩০ বছর। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭২]

http://islamiboi.wordpress.com

আদম নামকরণের কারণ : আরবি ভাষায় প্রথম মানবের নামের সার্থকতা কি? কেউ বলেন, ভূ-ত্বক তথা أَدِيْم থেকে সৃষ্ট বলেই তিনি আদম। আর কারো কারো মতে দেহের পিংগল বর্ণের (أُدُوْمَة) কারণে। −[প্রাগুক্ত]

اَلْاَسْمَاءُ দ্বারা কেবল বস্তুর নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং তার তারা উদ্দেশ্য أَشْخَاص وَمُسَمَّيَات তথা ব্যক্তি বা বস্তুর নাম, গুণাগুণ, উপকারিতা ইত্যাদি। অর্থাৎ নামের সঙ্গে সঙ্গে গুণাগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে। কেননা শুধু নামতো একটি ধ্বনিমাত্র। এ ধ্বনি শ্রবণে মনের মাঝে কোনো আকৃতি উদয় হয় না। আল্লামা রাগিব (র.) এ বিষয়টিই এভাবে বলেছেন− إِنَّ مَعْرِفَةَ الْاَسْمَاءِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْمُسَمّٰى وَحُصُوْلِ صُوْرَتِهٖ فِى الضَّمِيْرِ .

আর নামের সঙ্গে বস্তুর আকৃতি ও লক্ষ্যণাদি শেখানোর ফলেই তো হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর নাম বলতে সক্ষম হয়েছেন। −[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهٗ اَسْمَاءَ الْمُسَمَّيَاتِ : এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْاَسْمَاءُ-এর اَلِف لَامْ টি مُضَاف إِلَيْه-এর عِوَض হিসেবে। আর مُضَاف إِلَيْه টি হলো اَلْمُسَمَّيَاتِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

হাশিয়ায়ে জামালে উল্লেখ আছে, আল্লামা সুলায়মান (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর সকল ভাষাও শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার সন্তানরা তাতে ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। কেউ আরবি ভাষাকে গ্রহণ করেছে এবং বাকিগুলো ভুলে গেছে। কেউ তুর্কী ভাষা গ্রহণ করেছে এবং বাকিগুলো বর্জন করেছে।

حَتَّى الْقَصْعَةَ : كُلَّهَا এটি اَسْمَاء -এর তাকীদ। সকল বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত না করার সন্দেহকে দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা কারো সংশয় হতে পারত যে, সম্ভবত সম্মানিত ও বড় বড় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন, তুচ্ছ ও ছোট ছোট বস্তুর ইলম তাকে দেননি। এই সংশয় নিরসনের জন্যই كُلَّهَا বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। মুফাসসির (র.)-ও حَتَّى الْقَصْعَةَ الخ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

حَتَّى الْقَصْعَةَ الخ : أَىْ حَتَّى الْوَضِيْعِ وَالْحَقِيْرِ وَحَتَّى الذَّوَاتِ وَالْمَعَانِىْ .

قَصْعَة অর্থ বড় পাত্র, আর قُصَيْعَة অর্থ− ছোট পাত্র।

اَلْفَسْوَةُ : وَفِى الْمِصْبَاحِ : فَسَا يَفْسُوْ مِنْ بَابِ عَدَا يَعْدُوْ
وَالْاِسْمُ الْفُسَاءُ وَهُوَ رِيْحٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ . (جَمَل : ص٥٧ ج١)

اَلْمِغْرَفَة এটি اِسْمُ اٰلَه-এর সীগাহ অর্থ− চামচ।

قَوْلُهٗ ثُمَّ عَرَضَهُمْ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ :

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা عَرَضَهُمْ বললেন কেন? এতে তো মনে হয় নামের জিনিসগুলো ذَوِى الْعُقُوْل বা বিবেকবান জাতীয়। কেননা هُمْ শব্দটি তাদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়, বিবেক-বুদ্ধিহীন জিনিস সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় না।

উত্তর : মূলত বিবেকবান ও বিবেক-বুদ্ধিহীন সব জিনিসকেই তাতে শামিল করা হয়েছে। আরবি নিয়মে একে তাগলীব তথা একটির উপর অপরটির প্রাধান্য দান বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী−

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ . وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ (اَلنُّوْر : ٤٥)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জীব-জন্তুকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরে তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কেউ দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, আবার কেউ চলে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে।

এতে বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয় শ্রেণির সৃষ্টিই শামিল রয়েছে; কিন্তু সকলকেই বিবেকবান পর্যায়ের ধরা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ ثُمَّ عَرَضَهُمْ :

বস্তুসমূহ কিভাবে পেশ করা হয়েছিল? : হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বস্তুগুলোকে পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্রাকারে পেশ করেছিলেন। ذَات বা বাহ্যিক অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে তো পদ্ধতিটা সুস্পষ্ট। কিন্তু যেগুলো مَعَانِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আনন্দ, জ্ঞান, অজ্ঞতা, শক্তি ইচ্ছা− সেগুলো পেশ করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর মনে সেগুলোর ধরন ও প্রকৃতি প্রক্ষেপন করেছিলেন। ফলে তিনি তা অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا : হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়ে এবং তার মুখে সেগুলোর নাম উচ্চারণ করিয়ে ফেরেশতাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছেন। অপর দিকে পৃথিবী পরিচালনার জন্য ইলমের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যখন ফেরেশতাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য ও ইলমের গুরুত্ব উদ্ভাসিত হলো তখন তারা নিজেদের জ্ঞান ও অনুভবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করে নিল।

سُبْحَانَكَ : এটি মাসদার। এটি সবর্দা مُضَاف এবং مَنْصُوْب হয়ে ব্যবহৃত।

سُبْحَانَكَ : وَسُبْحَانَ مَصْدَرٌ كَغُفْرَانَ وَلَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ اِلَّا مُضَافًا مَنْصُوْبًا بِاِضْمَارِ فِعْلِهِ . كَمَعَاذَ اللّٰهِ وَتَصْدِيْرُ الْكَلَامِ بِهِ اِعْتِذَارٌ عَنِ الْاِسْتِفْسَارِ وَالْجَهْلِ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ . وَلِذٰلِكَ جُعِلَ مِفْتَاحُ التَّوْبَةِ . فَقَالَ مُوْسٰى صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ . «سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ» (اَلْاَعْرَاف : ١٤٣) وَقَالَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . «سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ» (اَلْاَنْبِيَاء : ٨٧) جَمَل . بِحَوَالَةِ الْبَيْضَاوِىْ .

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ : **যোগসূত্র** : পূর্বের আয়াতে ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর হযরত আদম (আ.)-এর ইলমি বা জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমলী দিক দিয়েও হযরত আদম (আ.)-এর ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করার জন্য ফেরেশতা ও জিনদের মাধ্যমে তার বিশেষ ধরনের সম্মান দেখিয়েছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.) উভয়দিক দিয়েই কামিল মুকাম্মাল। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.)-এর আমলি সম্মান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

سُجُوْدُ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ : অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর সেজদার তাৎপর্য : সেজদার ব্যাখ্যায় اِنْحِنَاء শব্দ উল্লেখ করে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে سَجْدَة-এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। তা হলো تَذَلُّلٌ مَعَ تَطَامُنٍ বা নত হওয়া। قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو : سَجَدَ اِذَا طَأْطَأَ نَفْسَهُ

এমনিভাবে হযরত ইউসূফ (আ.)-এর ভাই ও পরিবারবর্গ হযরত ইউসুফ (র.) প্রতি যে সেজদা করেছিল, তা ও এই পর্যায়েরই কাজ ছিল। সেজদার আভিধানিক অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। কেননা ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের জন্য জায়েজ নেই। তবে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন জায়েজ। নত হয়ে সম্মান করা পূর্ববর্তী জাতির মাঝে প্রচলন ছিল। উম্মতে মুহাম্মদিয়াতে তা জায়েজ নেই। হাদীস দ্বারা তা মানসূখ হয়ে গেছে। এ উম্মতের সম্মান প্রদর্শন ও অভিবাদন হলো সালাম-মোসাফাহা।

নবী করীম ﷺ বলেছেন– مَا يَنْبَغِىْ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا .

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা। এক ব্যক্তির তারই মতো অপর ব্যক্তিকে সিজদা করা যদি ন্যায়সঙ্গত হতো, তাহলে আমি নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করার জন্য। কেননা স্ত্রীর উপর স্বামীর তো অনেক অধিকার রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এখানে সেজদা দ্বারা শরয়ী অর্থ তথা– وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ উদ্দেশ্য। তখন لِاٰدَمَ-এর মধ্যে لَا টি اِلٰى-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ সেজদা তো আল্লাহ তা'আলার জন্যই করা হয়েছিল, হযরত আদম (আ.) ছিলেন তাদের জন্য কিবলা স্বরূপ। যেমন বায়তুল্লাহর দিকে অভিমুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ অভিমতটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা তাহলে তাতে হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় না। অথচ এখানে হযরত আদম (আ.)-এর সম্মান প্রদর্শনই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এ জন্যই তো ইবলীস বলেছিল–

ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا . قَالَ اَرَئَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ (اَلْاِسْرَاء : ٦١ - ٦٢) অর্থাৎ আমি কি সিজদা করবো তাকে যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো? তুমি কি লক্ষ্য করনি, এতে করে তুমি আমার উপর তাকে বেশি সম্মানিত করে দেবে।

একথা বলে ইবলীস জানিয়ে দিয়েছে যে, সে যে সিজদা করা থেকে বিরত থাকছে তার কারণ হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে অধিক মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হবে।

হযরত আদম (আ.)-কে কেবলার স্থানে দাঁড় করিয়ে সেজদাকারীদেরকে সেজদা করার আদেশ করা হলে, তাতে হযরত আদম (আ.)-এর কোনো ব্যাপার থাকতো না, মর্যাদা দানের ব্যাপারও হতো না, যাতে করে ইবলীসের হিংসা হওয়ার কারণ হতো। যেমন– কাবাকে কিবলা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার প্রতি মুখ করেই তো নামাজ পড়া ও সিজদা দেওয়া হয়। তাতে কাবার কোনো মর্যাদা হয় না

http://islamiboi.wordpress.com

ফায়দা : সেজদার নির্দেশ প্রদানের পর সর্বপ্রথম সেজদা করেছিলেন যথাক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মিকাঈল (আ.), হযরত ইসরাফীল (আ.) ও হযরত আজরাঈল (আ.)। তারপর নিকটতম ফেরেশতা ও অন্যান্যরা। আর সেজদা প্রদানের দিনটি ছিল শুক্রবার দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত। −[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৫৯]

هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝালেন যে, اِلَّا اِبْلِيْسَ হলো مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِع অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতাগণের জিনস বা গোত্রভুক্ত ছিল না; বরং ফেরেশতাদের মাঝে বসবাস করত। تَغْلِيْبًا তাকে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞ মুফাসসির كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির যেমন বাগভী, ওয়াহেদী ও কাজি বায়জাভী প্রমুখ বলেন− اِسْتِثْنَاء টি اِسْتِثْنَاء مُتَّصِل হবে। অর্থাৎ ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যথায় ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশিত সিজদার বিধান তাকে শামিল করত না এবং তাদের থেকে ইসতিসনা করাও সহীহ হতো না। অবশ্য সূরা কাহাফে যে اِلَّا اِبْلِيْسَ বলা হয়েছে তার জবাবে তারা বলেন, এর দ্বারা এ ব্যাখ্যার অবকাশ আছে যে, সে কর্মের দিক দিয়ে জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর نَوْع বা ধরনের দিক দিয়ে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা এর আরেকটি জবাব প্রদান করলেন যে, আভিধানিক অর্থে ফেরেশতাদেরকেও জিন বলা হয়; কেননা তারাও গোপন থাকেন। −[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৬০]

ফেরেশতাদের মাঝে ইবলীসের বসবাস ও তার ঔদ্ধত্যের কারণ : তার এ ঔদ্ধত্যের কারণ এই ছিল যে, পৃথিবীতে জিন জাতির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসমানেও তাদের যাতায়াত ছিল। অবশেষে তারা ক্রমে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও রক্তারক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাদের কতককে নিপাত করে এবং কতককে মরুভূমি, পাহাড় ও দ্বীপাঞ্চলে তাড়িয়ে দেয়। তাদের মধ্যে ইবলীস ছিল শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ইবাদতগুজার। সে নিজে জিনদের অন্যায়-অনাচারে জড়িত ছিল না বলে প্রকাশ করল। ফলে ফেরেশতাগণ তার জন্য সুপারিশ করল। সে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। এরপর থেকে সে ফেরেশতাদের মাঝেই থাকতে লাগল। এবারে সমস্ত জিনের স্থলে সে একাই হবে পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এ লালসায় সে নিরলস পরিশ্রমে ইবাদত-বন্দেগী করে যেতে লাগল এবং পৃথিবীর খেলাফতের স্বপ্ন দেখতে থাকল। অবশেষে যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) সম্বন্ধে খেলাফতের ফরমান ঘোষণা করলেন, তখন সে নিরাশ হয়ে গেল এবং তার লোক দেখানো ইবাদত নিষ্ফল হওয়ার কারণে হিংসায় ও ক্ষোভে যা করার করল ও অভিশপ্ত হলো। −[উসমানী পৃ. ৮, টীকা−৫]

قَوْلُهُ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ : اَبٰى আদেশ মান্য করতে অস্বীকৃতি জানাল। وَاسْتَكْبَرَ শব্দটি স্পষ্ট করে দিল যে, আদেশ অমান্যকরণের ভিত্তি কোনো ভুল ধারণা কিংবা দ্বিধা-সংশয় নয়; বরং আত্ম-অহংকারই ছিলো এর ভিত্তি। শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকেই এসে ছিল এ অস্বীকৃতি। −[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৮]

প্রশ্ন : নিয়ম অনুযায়ী عِلَّتْ টি مَعْلُوْل-এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। বিপরীতটি হয় না। এখানে اِبَاء-কে আগে এবং اِسْتِكْبَار-কে পরে এনে তারতীবের খেলাফ করা হয়েছে। কেননা অহংকার আগে করা হয় তারপর অস্বীকার করা হয়।

উত্তর : এখানে مَعْلُوْل তথা অস্বীকৃতি হলো প্রকাশ্য এবং অনুভূত বিষয় আর عِلَّتْ তথা تَكَبُّر হলো مَعْنَوِى এবং غَيْر مَحْسُوْس বিষয়। এ জন্য مَحْسُوْس-কে غَيْر مَحْسُوْس-এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে। −[হাশিয়ায়ে জামাল]

تَكَبُّرَ : اِسْتَكْبَرَ-এর ব্যাখ্যায় تَكَبُّرَ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে بَاب اِسْتِفْعَال-এর খাসিয়াত অনুযায়ী অর্থ হবে না; বরং তা مُبَالَغَة স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। −[হাশিয়ায়ে জামাল]

وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ :

প্রশ্ন : আমরা জানি ইবলীস তো প্রথমে বড় আবেদ ছিল। অথচ এখানে বলা হচ্ছে সে কাফের ছিল। সমাধান কি?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে সে পূর্ব থেকেই কাফের ছিল, যদিও অন্যদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে এই ক্ষণে। আর কেউ কেউ বলেন− كَانَ بِمَعْنٰى صَارَ অর্থাৎ প্রথম থেকেই সে কাফের ছিল এমনটি নয়; বরং নাফরমানি ও আল্লাহ তা'আলার আদেশের অস্বীকৃতি তাকে এখন কাফেরদের দলভুক্ত করে দিয়েছে। নিছক আমল [সিজদা] তরক করার কারণে নয়; বরং অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের কারণেই ইবলীসকে কাফের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা আমল তরক করার কাজ যতই গুরুতর হোক, ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে কুফরির গণ্ডিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে যথেষ্ট নয়।

−[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৮, টীকা. ৬; তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ.৭৮]

http://islamiboi.wordpress.com

সিজদার হুকুম কি জিনদের প্রতিও ছিল? : এ আয়াত যদিও ফেরেশতাদের প্রতি সেজদার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় কিন্তু إِسْتَثْنَاء দ্বারা জানা যায় যে, এ নির্দেশ জিনদের প্রতিও ছিল। তবে ফেরেশতাদের কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কারণ ফেরেশতারা তখন জিনদের থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ছিল। আর যখন উত্তমকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অনুত্তম এমনিতেই উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যোগ্যতার মাপকাঠি : সারকথা এটা যে, পরিচালক ও সংশোধনকারীর জন্য ঐ কাজের তত্ত্ব এবং এর উত্থান ও পতন সম্পর্কে অবগত থাকা একটি জরুরি বিষয়। এ ছাড়া পরিপূর্ণভাবে পরিচালনা করা ও সংশোধন করা আদৌ সম্ভব নয়।

এমনিভাবে শরিয়তকে পরিচালনা করার জন্য হালাল ও হারাম, বস্তু -সামগ্রীর অপকারিতা, উপকারিতা, বিশিষ্টতা ও প্রভাব সমূহের অধ্যয়ন, বিভিন্ন পরিভাষা ও ভাষাসমূহ সম্পর্কে অবগতি -এ সমস্ত ব্যাপারে মানুষ যতদূর পর্যন্ত অবগত হতে পারে জিন কিংবা ফেরেশ্তা এর সংবাদও রাখতে পারে না। ফেরেশ্তাগণের মধ্যে তো ঐ পরিবর্তনসমূহই নেই। যা দ্বারা বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। ফেরেশ্তাদের না ক্ষুধা লাগে, না কামভাব হয়। তারা তো ঐ সমস্ত স্বভাবসমূহ থেকে একেবারে অজ্ঞাত।

জিনদের মধ্যে অবশ্যই ঐ সমস্ত পরিবর্তন রয়েছে বটে; কিন্তু এদের স্বভাব মন্দের দিকে অত অধিক ধাবিত যে, মানুষের মতো ভালো দিকে অনুরাগ ও আকর্ষণ থেকে অনেক দূর।

আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্বের যোগ্য মানুষ, ফেরেশ্তা নয় : তাই আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের বিরাট মর্যাদার যোগ্য এ অতিশয় জালিম ও অতিশয় অজ্ঞ মানুষই সাব্যস্ত হয়। এর উপর এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, ফেরেশতাগণের মধ্যে যখন এ ধরনের যোগ্যতাই নেই, তখন ওহীর বহন করা যা সংশোধনের ভিত্তি, তাদের কাছে কিভাবে অর্পিত হলো?

উত্তর হচ্ছে যে, ফেরেশ্তাদের এ ব্যাপারে শুধু বার্তা বহনেরই যোগ্যতা রয়েছে যার জন্য কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম যাদের দায়িত্বে সংশোধন ও দাওয়াতের কাজ অর্পণ করা হয়। তাদের জন্য যোগ্যতা ও দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পর পূর্ণ অবগতি অত্যাবশ্যক এবং ঐসব তাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে।

এমনিভাবে এ সন্দেহও করা যাবে না যে, যেমনিভাবে রুচিবোধ ভিন্ন হওয়ার কারণে জিনরা মানুষের সংশোধন করতে পারে না, মানুষও জিনদের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট ও দরকারি হতে পারে না?

উত্তর এটা যে, এতদসত্ত্বেও মানুষ ও জিনের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে যে পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়, তা জিনদের মধ্যে নেই। তাই মানুষ জিনদেরকে সংশোধন করতে পারে। জিন মানুষকে সংশোধন করতে পারে না। যেমন মন্দের শক্তি তো উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত আছে বটে; কিন্তু ভালোর গুণে জিন থেকে মানুষ আগে বেড়ে গেছে। অতএব জিনদের মন্দ সমূহের ব্যাপারে মানুষ অবগত। তাই এর সংশোধন ও পরিচর্যা করতে পারে। হ্যাঁ, কারো এ খটকা হয় যে, যেমনিভাবে হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বহু জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছেন। এমনিভাবে ফেরেশ্তাগণকেও যদি শিক্ষা দেওয়া হতো তবে তারাও হযরত আদম (আ.)-এর মোকাবিলায় সফলকাম হতে পারতেন এবং প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব বহন করতে পারতেন?

এর উত্তর হচ্ছে যে, ঐ ইলমের জন্য যে বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। তা মানুষের মধ্যে তো সৃষ্টি করা হয়েছে; কিন্তু ফেরেশ্তাদের ভাগ্যে জুটেনি। তাই আল্লাহর রীতি নীতি অনুযায়ী পরিপূর্ণ যোগ্যতাকেও তো দেখতে হবে, যা সবচেয়ে বড় শর্ত। এ জন্য আল্লাহর উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং হযরত আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণও প্রমাণিত হয়ে গেল

সন্দেহসমূহের নিরসন : এর উপর এ সন্দেহ করা যে, ঐ বিশেষ ক্ষমতা ও যোগ্যতা যা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের উৎস হয়েছে। ফেরেশ্তাদের মধ্যে কেন সৃষ্টি করা হয়নি? উত্তরে বলা যায় যে, ঐ যোগ্যতাটিও মানুষের বৈশিষ্ট্য। যেমন– অনুভূতি ও নড়া-চড়া জীব-এর বৈশিষ্ট্য। যদি ফেরেশতাদের মধ্যে সেটা সৃষ্টি করে দেওয়া হতো, তবে ফেরেশতা আর ফেরেশতা থাকতো না, বরং মানুষ হয়ে যেত। যেমন-প্রাণহীন বস্তুসমূহের মধ্যে অনুভূতি ও নড়া-চড়ার ক্ষমতা সৃষ্টি করে দিলে সেগুলো প্রাণহীন বস্তুর স্থলে প্রাণী হয়ে যেত। সারকথা হলো– আল্লাহ তা'আলা এ ফেরেশ্তাদেরকে মানুষ কেন বানাননি? এটা একটি অযথা প্রশ্ন। কেননা ফেরেশ্তাদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে তাৎপর্য ও যুক্তিসিদ্ধতা রয়েছে। তা এমতাবস্থায় নিষ্ফল হয়ে যেত। ঐ অযোগ্যতার ও অক্ষমতার কারণে হযরত আদম (আ.)-এর মতো ফেরেশতাদের কাছে ঐ নামগুলো পেশ করা সত্ত্বেও তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য রয়েছে। আর তারা স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেছে যে, [হে প্রতিপালক!] আপনার উপর কোনো অভিযোগ নেই; বরং আমাদের মধ্যে সৃষ্টিগত যোগ্যতা যতটুকু রয়েছে সে অনুযায়ী জ্ঞান প্রদান করুন। আপনার কাছে সর্বপ্রকারের ইলম রয়েছে আপনি প্রজ্ঞাময় যে যে কাজের যোগ্য, তাকে তা-ই দিয়েছেন

http://islamiboi.wordpress.com

أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ -এর ব্যাপারে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, ফেরেশ্তাদের মধ্যে যখন ঐ বিশেষ জ্ঞানের যোগ্যতা ও ক্ষমতাই নেই, তারপর তাদেরকে বলে দেওয়ার দ্বারা কি উপকারিতা রয়েছে? আর যদি উপকারিতা থাকে তবে অসঙ্গতের দাবি ভুল। মূলকথা হচ্ছে যে, কোনো সময় মানুষ কোনো বিষয়কে নিজে তো বুঝে না। কিন্তু ইঙ্গিতসমূহ ও হাবভাব দ্বারা অন্যের ব্যাপারে বিশ্বাস দ্বারা এটা বুঝে আসে যে, সে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ এবং সে ভালোভাবে বুঝে গেছে। অতঃপর বলে দাও যে, এখানে এ অর্থ নয় যে, হে আদম (আ.)! ফেরেশ্তাদেরকে বুঝিয়ে দাও কিংবা শিখিয়ে দাও; বরং অর্থ এটা যে, এদের সামনে এটা প্রকাশ করো। যাতে তোমার পাণ্ডিত্ব অতি স্পষ্টভাবে তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। কমপক্ষে তারা এতটুকু বুঝে যায় যে, হযরত আদম.(আ.) এ বিদ্যায় পণ্ডিত এবং আমরা অক্ষম।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মাদরাসা শিক্ষক ও ছাত্র : আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষক হওয়া. হযরত আদম (আ.) সর্ব প্রথম ছাত্র হওয়াটা, ভাষাতত্ত্ব সর্ব প্রথম ইল্‌ম হওয়া জানা গেল। এমনিভাবে জ্ঞানসংক্রান্ত পরীক্ষায় হযরত আদম (আ.)-এর সফলকাম এবং ফেরেশ্তাগণের বিফলকাম হওয়া জানা গেল যে, এটা হচ্ছে এ ব্যাপারে প্রমাণ যে, প্রতিনিধিত্বের পরিধি হচ্ছে বিদ্যা ও বুদ্ধি এ শর্তের সাথে যে, এর সাথে অপকর্ম মিশ্রণ হতে পারবে না। আমলী সাধনা ও প্রচেষ্টাসমূহ প্রতিনিধিত্ব লাভের পরিধি নয়। ত্বরীক্বতের মুরব্বীগণ খলীফা বানানোর ক্ষেত্রে এর প্রতিই অধিক লক্ষ্য রাখেন।

পুরস্কার বিতরণ কিংবা পাগড়ি বিতরণ উপলক্ষে জলসা : যখন এ সফলতার উপর হযরত আদম (আ.)-এর জন্য দস্তার নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন পুরস্কার বিতরণী জলসা হওয়া জরুরি। যার মধ্যে হযরত আদম (আ.)-এর আমলী উঁচু মর্যাদার প্রকাশ হয়। তাই প্রতিনিধিত্বের আসনে বসার পূর্বে একটি দস্তারবন্দির জলসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মধ্যে ফেরেশতাদেরকে সরাসরি এবং কোনো কোনো বর্ণনা মোতাবেক জিনদেরকেও পরোক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ রাজকীয় নিয়মাবলি পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ইবলীসকে ব্যতীত। সকলেই কর্মক্ষেত্রে হযরত আদম (আ.)-এর নেতৃত্ব ও সরদারি মেনে নিয়েছে। সাধারণ জিনদের আলোচনা পবিত্র কুরআনে সম্ভবত এজন্য করা হয়নি যে, জ্ঞানীরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, ফেরেশ্তাদের উত্তম জামাতকে এ নির্দেশ [সিজদা করার হুকুম] দেওয়া হয়েছে, তবে জিন জাতি যারা ফেরেশতাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়। তারা তো পরিপূর্ণরূপে এ নির্দেশের মধ্যে গণ্য হবে। পরিষ্কার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। শয়তান হুকুম অমান্য করেছে। এ জন্য বিশেষভাবে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে; বরং এটা হচ্ছে জিন জাতি এ নির্দেশে গণ্য থাকার নিদর্শন। এমতাবস্থায় এস্তেস্না مُتَّصِلٌ হবে। শয়তান যেহেতু আল্লাহর হুকুমের মোকাবিলা অহংকার দ্বারা করেছে, তাই সে চির বিতারিত হয়েছে। এর দ্বারা অহংকারের বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি হওয়া বরং সমস্ত গুনাহের মূল হওয়া বুঝা গেল। এখনো যদি কেউ শরিয়তের হুকুমের বিরোধিতা ও অস্বীকার করে তাকেও কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৩]

শয়তানি যুক্তি ও ফিকহ সম্বন্ধীয় যুক্তির পার্থক্য : এর ব্যাখ্যা অহংকার সম্বন্ধীয় অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহর ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে বিচক্ষণতা ও যুক্তিসিদ্ধতা হওয়া ফুটে উঠে। যার সারাংশ কয়েকটি প্রস্তাবনা দ্বারা মিশ্রিত ক্বিয়াস।

১. প্রথম প্রস্তাবনা এটা যে, خَلَقْتَنِيْ مِنَ النَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ আমাকে আগুন দ্বারা এবং হযরত আদম (আ.) কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছ।
২. দ্বিতীয় প্রস্তাবনা এটা যে, আগুন মাটি থেকে উত্তম।
৩. উৎকৃষ্টের শাখা উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টের শাখা নিকৃষ্ট হয়।
৪. উৎকৃষ্ট দ্বারা নিকৃষ্টের সম্মান করানো জ্ঞান ও বিচক্ষণতার পরিপন্থি।

ফলাফল এটা যে, আমাকে হযরত আদম (আ.)-এর সামনে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া বিচক্ষণতার খেলাফ। বিচক্ষণতার দাবি এটা যে, হুকুম এর বিপরীত হতো, অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে আমার সম্মান করার জন্য হুকুম দেওয়া উচিত ছিল।

অথচ এ যুক্তির প্রথম প্রস্তাবনা ব্যতীত সমস্ত প্রস্তাবনা বাতিল। তাই ক্বিয়াসটি অযৌক্তিক। তারপর ফলাফল কিভাবে বিশুদ্ধ বের হতে পারে? ঐ শয়তানী ভ্রান্ত ক্বিয়াস দ্বারা বিশুদ্ধ ও ফিক্‌হ সম্বন্ধীয় যুক্তিকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে প্রমাণ পেশ করা সম্পূর্ণরূপে ভুল ও অশুদ্ধ। -[প্রাগুক্ত : ৫৫]

http://islamiboi.wordpress.com

٣٥. وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ تَاكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ وَ زَوْجُكَ حَوَّاءُ بِالْمَدِّ وَكَانَ خَلَقَهَا مِنْ ضِلْعِهِ [redacted] وَكُلَا مِنْهَا اَكْلًا رَغَدًا وَاسِعًا لَا حَجْرَ فِيْهِ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ بِالْاَكْلِ مِنْهَا وَهِيَ الْحِنْطَةُ اَوِ الْكَرْمُ اَوْ غَيْرُهُمَا فَتَكُوْنَا فَتَصِيْرَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ الْعَاصِيْنَ .

অনুবাদ :

৩৫. এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী হাওয়া, এটা মদ্দ ও দীর্ঘালয়ে পড়া হয়। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় হতে সৃষ্টি করেছিলেন। জান্নাতে বসবাস কর এবং তার যেথা ইচ্ছা প্রচুর ও বাধাহীন আহার কর। اُسْكُنْ اَنْتَ -এই আয়াতটিতে اَنْتَ যমীর বা সর্বনামটি اُسْكُنْ নির্দেশক ক্রিয়া পদটিতে উহ্য اَنْتَ যমীর বা সর্বনামের تَاكِيْد [জোর সৃষ্টির জন্য] রূপে পরবর্তী শব্দ زَوْجُكَ -কে তার সহিত عَطْف বা অন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। رَغَدًا শব্দটি মূলত كُلَا ক্রিয়াপদের উহ্য مَفْعُوْل مُطْلَق বা সমধাতুজ কর্ম -اَكْلًا এর বিশেষণ। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার رَغَدًا শব্দটির পূর্বে اَكْلًا -এর উল্লেখ করেছেন। আর আহার করতে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। এটা গম বা আঙ্গুর বা অন্য কোনো বৃক্ষ ছিল নিকটবর্তী হলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٣٦. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ اِبْلِيْسُ اَذْهَبَهُمَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَاَزَالَهُمَا نَحَّاهُمَا عَنْهَا اَيِ الْجَنَّةِ بِاَنْ قَالَ لَهُمَا هَلْ اَدُلُّكُمَا عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَقَاسَمَهُمَا بِاللّٰهِ اَنَّهُ لَهُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ فَاَكَلَا مِنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ - مِنَ النَّعِيْمِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا اِلَى الْاَرْضِ اَيْ اَنْتُمَا بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا بَعْضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ - مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَوْضِعُ قَرَارٍ وَّمَتَاعٌ مَا تَمَتَّعُوْنَ بِهٖ مِنْ نَبَاتِهَا اِلٰى حِيْنٍ وَقْتَ اِنْقِضَاءِ اٰجَالِكُمْ .

৩৬. কিন্তু শয়তান অর্থাৎ ইবলীস তা হতে অর্থাৎ জান্নাত হতে তাদের পদস্খলন ঘটাল অর্থাৎ তাদের উভয়কে সরিয়ে দিল। اَزَلَّهُمَا ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে فَاَزَالَهُمَا রূপে পঠিত হয়েছে এর অর্থ হলো উভয়কে সরিয়ে নিয়ে গেল. তাদেরকে প্রতারণা করে ইবলীস বলেছিল. আমি কি তোমাদেরকে স্থায়ী করার বৃক্ষ প্রদর্শন করব? সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, নিশ্চয় আমি তোমাদের হিতকামীদের একজন। ফলে তারা উভয়ে এই বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করল। এবং তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দের আবাসে ছিল সেখান হতে তাদেরকে বহিস্কৃত করল। আমি বললাম, পৃথিবীর দিকে তোমরা তোমাদের অনাগত সন্তান-সন্ততিসহ নেমে যাও একজন অপরজনের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করার কারণে একে অন্যের বংশধরদের একজন অপরজনের শত্রুরূপে এবং পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস অবস্থানস্থল ও জীবিকা রইল অর্থাৎ তার উপর উদগত বৃক্ষলতা ও শস্যাদি যা তোমরা উপভোগ করবে তা কিছু কালের জন্য অর্থাৎ তোমাদের নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قُلْنَا ফে'ল ও ফায়েল يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ জুমলা মা'তুফ আলাইহি وَكُلَا জুমলা মা'তুফ। رَغَدًا মাসদার মাহযূফের সিফত হওয়ার প্রতি মুফাস্সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। حَيْثُ যরফ। كُلَا আমিল এবং সম্ভাবনা রয়েছে جَنَّتَ থেকে بَدَل হয়ে مَفْعُوْل بِه হতে পারে।

وَلَا تَقْرَبَ জুমলা هٰذِهِ মউসূফ اَلشَّجَرَةَ সিফত উভয়ে মিলে مَفْعُوْل بِه - فَتَكُوْنَ জওয়াবে নাহী -এর نُوْن জযম -এর কারণে পড়ে গেছে। اَزَلَّ - زَلَّتَ অর্থ পদস্খলন কেউ কেউ زَوَالٌ থেকে মেনেছেন। هُمَا মাফ্উলে বিহী اَلشَّيْطٰنُ ফায়েল عَنْهَا -এর যমীর اَلشَّجَرَةَ -এর দিকে رَاجِع - اَىْ مُسَبَّبَ الشَّجَرَةِ এবং মুফাস্সির (র.) جَنَّت -এর দিকে رَاجِع করেছেন।

فَاَخْرَجَهُمَا জুমলায়ে مَعْطُوْفَه - مِمَّا অর্থ اَلَّذِىْ - اَىْ مِنْ نَعِيْمٍ - اِهْبِطُوْا - هُبُوْط অর্থ نُزُوْل যদি শয়তানের বহিষ্কার করা এখনো বেহেশ্ত থেকে হয়েছিল না। তবে বহুবচনের যমীর দ্বারা আদম, হাওয়া ও শয়তান উদ্দেশ্য। নতুবা আদম ও হাওয়া এবং তাদের সন্তানাদি উদ্দেশ্য হবে। بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ জুমলা হালের স্থানে اِهْبِطُوْا থেকে, اَىْ اِهْبِطُوْا مُتَعَادِيْنَ এ জুমলা মুব্তাদা -খবরও হতে পারে। আর عَدُوٌّ -কে একবচন আনা হয়েছে হয়তো بَعْض শব্দের কারণে– কিংবা مَصَادِر -এর ওজনে হওয়ার কারণে। যেমন "قَبُوْل" এবং مَصَادِر দু'বচন বা বহুবচন হয় না। مُسْتَقَر মাসদারে مِيْمِى এবং ظَرْف উভয়ভাবে হতে পারে। حِيْن অর্থ– সময়, মৃত্যু।

قَوْلُهُ وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ : এ জুমলাটি পূর্বের জুমলা اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ الخ -এর উপর عَطْف হয়েছে। শুধু قُلْنَ ফে'লের উপর নয়। কেননা উভয়টির সময়-কাল এক ছিল না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْفِعْلِ তথা قُلْنَ -কে اِذْ -এর উপরও عَطْف করা সহীহ আছে। اِخْتِلَافُ زَمَان বা সময়ের ভিন্নতা তার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কেননা اِذْ হলো فِعْل مَحْذُوْف -এর মাফউলে বিহী। তাকদীরী ইবারত হবে নিম্নরূপ–

وَاذْكُرْ وَقْتَ قَوْلِنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا وَقَوْلِنَا لِاٰدَمَ اسْكُنْ اَىْ اُذْكُرِ الْوَقْتَيْنِ وَمَا وَقَعَ فِيْهِمَا (جَمَل : ٦١)

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর مَحَلِّ اِعْرَاب সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে।

১. حَال হিসেবে মনসূব اَىْ اِهْبِطُوْا مُتَعَادِيْنَ

২. جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة হিসেবে কোনো مَحَلِّ اِعْرَاب নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْتَ تَاكِيْدٌ بِضَمِيْرٍ مُسْتَتِرٍ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ :

প্রশ্ন : اُسْكُنْ -এর পর اَنْتَ যমীর আনা হলো কেন?

উত্তর : عَطْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه -এর মাঝে সামঞ্জস্য জরুরি। এ জন্য اُسْكُنْ ফে'লের পরে وَزَوْجُكَ -এর পূর্বে তাকিদ স্বরূপ ইসমে জমীর ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে ইসমের عَطْف ইসমের সঙ্গে হয়।

قَوْلُهُ اُسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ : মাসআলা : اَنْتَ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, হযরত আদম (আ.)-ই ছিলেন মূল সম্বোধিত হযরত হাওয়া (আ.)-এর অবস্থান ছিল تَبَع বা অনুবর্তিনীর। উক্ত আয়াতে জান্নাত হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) উভয়ের বসবাসের স্থান হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাকে অনায়াসে সংক্ষেপে اُسْكُنَا الْجَنَّةَ বলা যেতো। যেমন وَكُلَا এবং لَا تَقْرَبَا ফে'লদ্বয়ের মাঝে উভয়কে একই শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে তা না করে اَنْتَ وَ زَوْجُكَ শব্দ ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধিত সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এ শব্দেই বলা হয়েছে যে, তোমার স্ত্রীও তোমার সাথে জান্নাতে থাকবে। এ থেকে নিম্নোক্ত দুটি মাসআলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়–

http://islamiboi.wordpress.com

দুটি মাসআলা :

১. স্ত্রীর বসবাসের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব।

২. এই বসবাসের মাঝে স্ত্রী স্বামীর অনুবর্তিনীয়। যে ঘরে স্বামী থাকবে, স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকা উচিত। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ الْجَنَّةَ : এর শাব্দিক অর্থ এমন যে কোনো বাগান, যার গাছগাছালি মাটি ঢেকে ফেলে।

كُلُّ بُسْتَانٍ ذِىْ شَجَرٍ يَسْتُرُ بِاَشْجَارِهِ الْاَرْضَ . (راغب)

শরিয়তের পরিভাষায় জান্নাত হলো অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ সেই সুমহান উদ্যান, যা পরকালে পুণ্যবানদের জন্য নির্ধারিত, তবে ইহজগতে আমাদের দৃষ্টি থেকে আচ্ছাদিত। জান্নাত নামকরণ হয়ত এজন্য হয়েছে যে, দূরতম হলেও পৃথিবীর উদ্যানের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে। কিংবা হয়ত এজন্য যে, জান্নাতের নিয়ামতরাজি আমাদের দৃষ্টি থেকে এখন আচ্ছাদিত আছে। ইমাম রাগিবের ভাষায়-

سُمِّيَتِ الْجَنَّةُ اِمَّا تَشْبِيْهًا بِالْجَنَّةِ فِى الْاَرْضِ وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَاِمَّا لِسَتْرِ نِعَمِهَا عَنَّا -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ مِنْ ضِلْعِهِ الْاَيْسَرِ : এজন্যই প্রতিটি পুরুষের বাম পাঁজরের একটি হার কম। প্রত্যেকের ডান পাশে ১৮টি হাড় থাকে এবং বাম পাশে থাকে ১৭টি। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৬১]

হযরত হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টি যেভাবে হলো : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর চোখে গভীর ঘুম দিয়ে দিলেন। তারপর বাম পাঁজর থেকে একটি হাড় খুলে নেন। সে হাড় থেকে সৃষ্টি করেন হযরত হাওয়া (আ.)-কে। আর হযরত আদম (আ.)-এর সে হাড়ের জায়গাটি গোশত দিয়ে ভরাট করে দেন। -[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ৬১]

قَوْلُهُ بِالْاَكْلِ مِنْهَا : বিজ্ঞ মুফাসসির এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, لَا تَقْرَبَا -এর মাঝে قُرْبِ مَكَانِى থেকে নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য নয়; বরং ভক্ষণ না করার অর্থকে জোরালো করা উদ্দেশ্য। মূলত ফল খাওয়াটাই ছিল নিষিদ্ধ কিন্তু সতর্কতা স্বরূপ বৃক্ষের কাছে ঘেষা থেকে বারণ করা হয়েছিল। যেমনটি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا -এর মাঝে। এজন্যই মাশায়েখে এজাম কখনো কখনো বৈধ বিষয় থেকে বারণ করে থাকেন, যাতে অসতর্কতাবশত অবৈধতার সীমায় প্রবেশ না ঘটে।

قَوْلُهُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ : অর্থাৎ তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আল্লাহর হুকুমকে অপাত্রে রেখেছে। ظُلْم -এর মূল অর্থ হলো- وَضْعُ الشَّيْئِ فِىْ غَيْرِ مَحَلِّهِ কোনো বস্তুকে তার নির্ধারিত স্থানে না রাখাই হলো জুলুম।

এই স্পষ্ট ঘোষণা থেকে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এখনকার মতো তখন জান্নাত পুরস্কার বা অমরত্ব লাভের নিবাস ছিল না, বরং সেখানে আহকাম ও আদেশ-নির্দেশ ছিল। এই যখন ছিল জান্নাতের সে সময়ের স্বরূপ, তখন জান্নাতে শয়তানের প্ররোচনার অনুপ্রবেশ কিংবা আদমের সেখান থেকে বহিষ্কার ইত্যাদির কারণে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ নেই।

-[তাফসীর মাজেদী : খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ اَزَلَّهُمَا : ক্রিয়াটি زَلَّةٌ থেকে নির্গত। অর্থ স্থানচ্যুত করল, পদস্খলন ঘটাল। অবাধ্যতা কিংবা ইচ্ছাকৃত আদেশ লঙ্ঘনের অর্থ তাতে নেই। পিচ্ছিল পথে অনিচ্ছাকৃত পদস্খলনের মতোই এটা।

اَذْهَبَهُمَا وَاَزَالَهُمَا : এ উভয়টি শব্দ বৃদ্ধি করে اَزَلَّهُمَا -এর দুটি অর্থের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে-

১. পদস্খলন ঘটানো।

২. বের করে দেওয়া।

قَوْلُهُ زَلَّةٌ : অর্থ- পদস্খলন, হোঁচট। اِزْلَال অর্থ পদস্খলন ঘটানো। আয়াতের অর্থ হলো- শয়তান হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর পদস্খলন ঘটিয়েছে। কুরআনে কারীমের এ শব্দ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর এ বিরুদ্ধাচারণটি সাধারণ পাপীদের মতো ছিল না; বরং শয়তানের প্ররোচনায় কোনো ধোঁকায় লিপ্ত হয়েই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেন।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন ও জবাব : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শয়তান তো হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা না করার পরিণতিতে পূর্ব থেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্ররোচিত করার জন্য কিভাবে জান্নাতে পৌঁছল?

উত্তর : যদিও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে তাদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে, নাকি ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্ররোচিত করেছে, তবুও প্ররোচিত করার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

১. সাক্ষাৎ করা ছাড়াই তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

২. শয়তান তার নিজস্ব আকৃতি পরিবর্তন করে জান্নাতের কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে [কারো মতে ময়ূর ও সাপের সাথে যোগসাজস করে] প্রবেশ করেছে এবং তাঁদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে। আর قَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ। দ্বারাও বাহ্যত এটি বুঝে আসে যে, শয়তান শুধু ওয়াসওয়াসা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি এবং মৌখিক কথাবার্তা বলে এবং কসম খেয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

৩. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে পায়চারি করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হন। আর শয়তান বাহির থেকে জান্নাতের দরজার কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে প্ররোচিত করে। –[হাশিয়ায়ে জামাল– খ. ১, পৃ. ৬২]

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন উঠে, হযরত আদম (আ.) তো মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন?

উত্তর :

১. তিনি মনে করেছিলেন, نَهِى টা ছিল نَهِى تَنْزِيْهِى তাহরীমী নয়।

২. তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

৩. ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তা'আলার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ.১, পৃ. ৬৩]

قَوْلُهُ اَلشَّيْطَانُ : শয়তানের পরিচয় : শয়তান হলো সেই দুষ্ট সত্তা, যে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে দূরে সরে গেছে।

شَيْطَنٌ اَىْ تَبَاعِدٌ (رَاغِب) اَلشَّيْطَانُ فَيْعَالٌ مِنْ شَطْنٍ اَىْ بَعُدَ سُمِّىَ بِهٖ لِبُعْدِهٖ عَنِ الْخَيْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ (مَعَالِم)

পূর্বোক্ত ইবলীসকেই এখানে গুণবাচক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। নাফরমানির কারণে জান্নাত থেকে সে বহিষ্কৃত হয়েছে। মানবের প্রতি রয়েছে তার সুতীব্র বিদ্বেষ। এখন তার নাম হয়েছে শয়তান। পৃথক কোনো ক্ষমতা নেই তার। মানুষকে সে বিন্দুমাত্র মজবুর বা বাধ্য করতে সক্ষম নয়। তবে প্রচারণা ও প্ররোচনা শিল্পের সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পাপকর্মে মানুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অসুন্দরকে সুন্দরের মোড়কে তুলে ধরার কাজে সে অত্যন্ত সুনিপুণ। ওয়াসওয়াসা ও চিত্তবিক্ষেপ ঘটানোর ক্ষমতা তার তীব্র। দূর ও নিকট যে কোনো স্থান থেকেই উদ্দেশ্য সাধনে সে পারঙ্গম। দূরত্ব ও ব্যবধান তার জন্য কোনো সমস্যাই নয় এবং স্থূল প্রতিবন্ধকতা যে কোনো ধরনেরই হোক, তার উদ্দেশ্যের পথে তা অন্তরায় হতে পারে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ عَنْهَا : এর মাঝে عَنْ হরফটি سَبَب বা হেতু জ্ঞাপক, অর্থ হলো– তার কারণে। আর هَا সর্বনামটি شَجَرَة -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সেই গাছের কারণে এবং মাধ্যমে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পদস্খলনে নিমজ্জিত করেছে।

কেউ কেউ هَا সর্বনামের উদ্দেশ্য জান্নাতও ধরেছেন। তখন অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বিচ্যুত করল।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ وَقَاسَمَهُمَا : أَىْ قَسَمَ لَهُمَا فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلٰى بَابِهَا لِلْمُبَالَغَةِ

قَوْلُهُ مِمَّا كَانَا فِيْهِ : এর দু'ধরনের অনুবাদ হতে পারে, যে নিয়ামতের মাঝে তাঁরা ছিলেন, তা থেকে কিংবা যে মর্যাদায় তারা ছিলেন, তা থেকে। উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে এবং তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। اَىْ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ (كَشَّاف) –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اِهْبِطُوْا : দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করে যেন বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, এ সম্বোধনের পাত্র এখন একা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-ই নন; বরং তাদের অনাগত বংশধরও সম্বোধনের আওতাভুক্ত।

قَوْلُهُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ : পরস্পরে শত্রুতার মর্ম এও হতে পারে যে, শয়তান এবং বনী আদম পরস্পরে একে অপরের শত্রু হবে। আর এও হতে পারে যে, বনী আদম-ই পরস্পরে শত্রুতা ও দুশমনি রাখবে। -[জামালাইন, খ. ১, পৃ. ১০১]

হযরত আদম (আ.) যে অঞ্চলে অবতরণ করেছেন : হযরত আদম এবং হাওয়া (আ.) পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে অবতরণ করেছেন? এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

অধিকাংশ বর্ণনা ভারত ভূখণ্ডের ব্যাপারে পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো-

১. ইবনে আবী হাতেম ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম (আ.)-কে সাফা পাহাড়ে এবং হযরত হাওয়া (আ.) মারওয়া পাহাড়ে অবতরণ করানো হয়েছিল।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণ ভারত ভূখণ্ডে হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, শাওকানী]

৩. অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইবনে আবী হাতেম থেকে বর্ণিত, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত আদম (আ.)-এর অবতরণ হয়েছে।

৪. আর ইবনে আবী সা'য়াদ এবং ইবনে আসাকির (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে হযরত আদম (আ.) ভারতে অবতরণ করেছেন এবং হযরত হাওয়া (আ.) জিদ্দায় অবতরণ করেছেন। পরবর্তীতে হযরত আদম (আ.) হাওয়া (আ.)-এর খোঁজে জিদ্দায় আগমণ করেন।

৫. তাফসীরে খাজিনে আছে হযরত আদম (আ.) ভারতের সরন্দীপ এ এবং হযরত হাওয়া (আ.) জিদ্দায় অবতরণ করেন। আর ইবলিস অবতরণ করে বসরার আয়লা নামক স্থানে। -[তাফসীরে খাজিন খ. ১, পৃ. ৫]

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও আরো অনেক পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করাও সম্ভব। এ কথা স্পষ্ট যে, প্রকৃত অবতরণ এক-ই জায়গায় হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছেন বিধায় জায়গার কথা বলেছেন। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০২]

বোকাদের বেহেশত : মু'তাযিলা সম্প্রদায় ও বস্তুবাদী সম্প্রদায় বেহেশতকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণায় তো আদন বলতে সিরিয়া ও মিশরের কোনো বাগান উদ্দেশ্য। যেখানের আনন্দ থেকে এ দু'জনকে বের করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা বেহেশত থেকে তাদের অবতরণ করাকে স্বীকার করে তারপর তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করে যে, সর্বপ্রথম কোথায় অবতরণ করেছেন? কেউ বলে ইরান, কেউ বলে মিশর এবং অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ হিন্দুস্তানের ভূ-খণ্ড সরন্দীপের কথা বলেন। তারপরও আরাফাতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই এ স্থানকে আরাফাত বলা হয়। আর ওখানেই কোনো স্থানে হযরত হাওয়া (আ.)-এর ওফাত হয়েছে "জিদ্দাহ" তে তার কবরের চিহ্ন আছে। বলা হয় এ শহর এর নামকরণের কারণও এটাই। এ ব্যাপারে এটা একটি নিদর্শন যে, হযরত আদম (আ.)-ও হেজাযেই কোথাও হয়তো অবস্থান করেছেন এবং ইন্তেকালও করেছেন।

সীমানার সংরক্ষণ : وَلَا تَقْرَبَا الخ আয়াত দ্বারা প্রকৃত শায়খগণের ঐ অভ্যাসের মূলনীতি বের হয়ে আসে যে, কোনো কোনো সময় তারা শরিয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদিত কার্যাবলি থেকেও বিরত থাকেন। যাতে করে অনুমতিবিহীন কাজের দিকে ধাবিত না হয়ে যায়। যেমন উল্লিখিত বৃক্ষের নিকটে যাওয়া সরাসরি কোনো প্রকার মন্দ কাজ ছিল না; বরং বৈধ ছিল। কিন্তু খাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য এটাকেও নিষেধ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ الخ : আয়াতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, যাকে নিষেধ করা হয়েছে সেও যেন নিজেকে শয়তানি ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ মনে না করে

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٣٧. فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ اَلْهَمَهُ اِيَّاهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ اٰدَمَ وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ اَيْ جَاءَتْهُ وَهِىَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (اَلْاٰيَة) فَدَعَا بِهَا فَتَابَ عَلَيْهِ ط قَبِلَ تَوْبَتَهُ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ عَلٰى عِبَادِهٖ الرَّحِيْمُ بِهِمْ ـ

৩৭. অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। অর্থাৎ এই বাণীসমূহ আল্লাহ তা'আলা তার উপর ইলহাম করেন। অপর এক কেরাতে اٰدَمُ শব্দটি نَصْب এবং كَلِمَات শব্দটি رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। এতদনুসারে এর মর্ম হলো হযরত আদম (আ.) -এর নিকট কিছু বাণী আসল। উক্ত বাণীসমূহ হলো رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তাহলে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অনন্তর হযরত আদম (আ.) এই বাণীসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন অর্থাৎ তিনি তাঁর দোয়া কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমা পরবশ এবং তাদের সাথে পরম দয়ালু।

٣٨. قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيْعًا كَرَّرَهٗ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الْمَزِيْدَةِ يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى كِتَابٌ وَرَسُوْلٌ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَاٰمَنَ بِيْ وَعَمِلَ بِطَاعَتِيْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ بِاَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ـ

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান অর্থাৎ জান্নাত হতে নেমে যাও। قُلْنَا পরবর্তী বাক্যটিকে এর সাথে عَطْف করার উদ্দেশ্যে এই বাক্যটির تَكْرَار বা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অনন্তর যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোনো নির্দেশ কিতাবও রাসূল আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে অর্থাৎ আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আমার আনুগত্য অবলম্বন করবে পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না অর্থাৎ তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। اِمَّا শব্দটি শর্তবাচক শব্দ اِنْ -এর ن অক্ষরটিকে مَا زَائِدَة বা অতিরিক্ত مَا -এর م -এ اِدْغَام বা সন্ধি করা হয়েছে।

٣٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا كُتُبِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ مَاكِثُوْنَ اَبَدًا لَا يَفْنُوْنَ وَلَا يَخْرُجُوْنَ ـ

৩৯. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও আমার নির্দেশসমূহকে আমার কিতাবসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অনন্তকাল সেখানে তারা অবস্থান করবে। তাদের বিনাশও হবে না এবং তারা বের হতেও পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

تَتَلَقّٰى ফেয়েল اٰدَمُ ফায়েল كَلِمَاتٍ মাফউল মাউসূফ مِنْ رَّبِّهٖ সিফত। কিন্তু مُقَدَّم হওয়ার কারণে حَال এবং مَنْصُوْب
اَلتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ইসম। مُتَّصِل فَصْل তাকীদ যমীরে اِنَّهٗ هُوَ -এর মধ্যে জুমলা فَتَابَ عَلَيْهِ -এর স্থানে রয়েছে

http://islamiboi.wordpress.com

মউসূফ সিফত খবর। قُلْنَا এর مَقُوْلَه হচ্ছে اِهْبِطُوْا। كَرَّرَهُ দ্বারা জালাল (র.) এ বাক্যটিকে দ্বিতীয়বার আনার কারণ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ জুমলার عَطْف বিশুদ্ধ হওয়া বলছেন। আর এটাও হতে পারে যে, প্রথমটি হুকুম ছিল এবং এর উপর কার্যকর ব্যবস্থাও প্রয়োগ করানো হচ্ছে। কেননা দয়াশীল মনিব যখন কাউকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন, তখন সাথে সাথেই বিছানা-পাটি বাহিরে নিক্ষেপ করান না। অথবা শুধু হুকুমের তাকিদের জন্য দ্বিতীয়বার এনেছেন, কিংবা هُبُوْط اَوَّل দ্বারা উদ্দেশ্য বেহেশ্‌ত থেকে দুনিয়ার [নিম্নের] আকাশে অবতরণ এবং দ্বিতীয় هُبُوْط দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়ার আকাশ থেকে জমিনে নেমে আসা। فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ এর মধ্যে اِنْ শর্তিয়ার তাকিদের জন্য مَا এসে এর মধ্যে সংযুক্ত হয়ে গেছে। ফেয়েল فَاعِل ও মাফউল এবং مُتَعَلِّق জুমলায়ে শর্তিয়াহ। فَمَنْ تَبِعَ মুবতাদা مُتَضَمِّن শর্ত ও জাযা فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ -এর জওয়াব। এসব মিলে مَا -এর জওয়াব হয়েছে। وَالَّذِيْنَ জুমলা فَمَنْ تَبِعَ -এর উপর عَطْف হয়েছে।

خَوْف ও حُزْن -এর ব্যাখ্যা :

اَلْخَوْفُ غَمٌّ يَلْحَقُ الْاِنْسَانَ مِنْ تَوَقُّعِ أَمْرٍ فِى الْمُسْتَقْبِلِ وَالْحُزْنُ غَمٌّ يَلْحَقُهُ مِنْ فَوْتٍ فِى الْمَاضِىْ (جَمَل)

কোনো বিপদ আপতিত হওয়ার আগে তজ্জন্য যে কষ্ট ও আশঙ্কা হয়, তার নাম خَوْف আর আপতিত হওয়ার পর যে দুঃখ হয় তাকে বলা হয় حُزْن যেমন- কোনো রুগ্ন ব্যক্তির মরে যাওয়ার কল্পনায় যে কষ্ট অনুভূত হয়, সেটা خَوْف; আর মরে যাওয়ার পর যে বেদনা সঞ্চার হয় তাকে حُزْن বলা হয়। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৯, টীকা. ৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمَاتٍ : **আদম (আ.)-এর তওবা :** হযরত আদম (আ.) যখন লজ্জিত হয়ে দুনিয়াতে আগমন করলেন, তখন তিনি তওবা ইস্তিগফারে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সে সময়েও আল্লাহ তা'আলা তাকে পথ-নির্দেশ দিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَهِىَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا الخ : এটি বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী। কেউ বলেন, সে বাক্যটি ছিল নিম্নরূপ-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ . (بَيْضَاوِى)

قَوْلُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ : পূর্বে বর্ণিত কোনো এক কারণে যদিও হযরত আদম (আ.)-এর জন্য নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়াটা গুনাহ **ছিল না;** কিন্তু তা তার জন্য অনুমতি ছিল। তাই বাহ্যত সেটাকে مَعْصِيَت বা গুনাহ বলেই অভিহিত করা হয়েছে এবং **জান্নাত** থেকে বের করে দিয়ে সেই গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মূলত এটি حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ এ **মূলনীতির** আলোকে বিবেচ্য।

কেউ বলেন, হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে অবতরণ করার পর ৩০০ বৎসর পর্যন্ত লজ্জায় আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করেননি। কেউ **বলেন,** গোটা জমিনবাসীর চোখের অশ্রু একত্র করা হলেও হযরত দাউদ (আ.)-এর চোখের অশ্রু অধিক হবে। আর হযরত দাউদ (আ.)-সহ সকল মানুষের অশ্রু একত্র করা হলে হযরত আদম (আ.)-এর অশ্রু বেশি হবে

-[তাফসীরে খাযিন সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৬৪]

মানবজাতির আবাসস্থল দুনিয়া : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর তাওবা কবুল করলেন, কিন্তু তখনই জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন না; বরং দুনিয়াতে বসবাস করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বহাল রাখলেন। কেননা এটাই তার প্রজ্ঞা ও সার্বিক কল্যাণের অনুকূল ছিল। বলাবাহুল্য, তাঁকে পৃথিবীর জন্য খলিফা বানানো হয়েছিল, জান্নাতের জন্য নয়

-[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

[illegible] দুজন। কিন্তু দোয়ার মাঝে তওবা ইস্তেগফারকে একজন তথা হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি [redacted]কে

[redacted] অনুগামী হয়ে থাকে। আর مَتْبُوْع-এর আলোচনায় تَابِع এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই হযরত আদম (আ.)-এর কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। তবে সূরা আ'রাফের আয়াতে উভয়ের কথাই বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (اَلْاَعْرَاف ٢٣)

قَوْلُهُ كَرَّرَهُ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ : এ বাক্যে একটি দ্বারা سُؤَال مُقَدَّر-এর জবাব প্রদান করা করেছেন। প্রশ্নের ভূমিকা : আয়াতে قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا-কে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম هُبُوْط দ্বারা মেহনত ও চেষ্টা সাধনার ক্ষেত্র দুনিয়ার দিকে অবতরণকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য বহু মেহনত করতে হবে। পরস্পরে একে অপরের লড়াই-ঝগড়া হবে। আর এ هُبُوْط টি হবে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য। আর দ্বিতীয় هُبُوْط টি দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ অস্থায়ী ও সাময়িক অবস্থানের মাঝে মানুষ শরিয়তের বিধি-বিধানের ও মুকাল্লাফ হবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, দুবার অবতরণের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন।

প্রশ্ন : উভয় মাকসাদকে একই هُبُوْط দ্বারা সম্পৃক্ত করা হলো কেন?

উত্তর : এমনকি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু মধ্যখানে فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ জুমলায়ে মু'তারিজাটি এসেছে বিধায় هُبُوْط-কে তাকরার করা হয়েছে। যাতে দ্বিতীয় মাকসাদটি দ্বিতীয়টির সাথে এবং প্রথম মাকসাদটি প্রথমটির সাথে মিলিত হয়। এ উদ্দেশ্যের দিকে ইঙ্গিত করেই মুফাসসির (র.) لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন। এখানে عَطْف শব্দ দ্বারা পারিভাষিক عَطْف উদ্দেশ্য নয়; বরং عَطْف দ্বারা اِتِّصَال [সংযোগ] বুঝানো উদ্দেশ্য।

আর কেউ বলেন, প্রথম অবতরণের নির্দেশ ছিল জান্নাত থেকে দুনিয়ার আকাশে আর দ্বিতীয় অবতরণের নির্দেশ ছিল সেখান থেকে জমিনে।

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ : যেন বলা হচ্ছে– আমি তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেও তোমাদেরকে আমার এমন হেদায়েত দান করব, যা তোমাদেরকে পুনরায় জান্নাতে পৌছাবে। আর সে পৌছানোটা হবে চিরস্থায়ী।

–[খাজিন সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল]

اِمَّا মূলত اِنْ مَا ছিল। اِنْ হলো شَرْطِيَّة আর مَا অতিরিক্ত। তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। আর এ কারণেই পরের ফে'লকেও তাকিদসহ আনা হয়েছে।

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ : এ বাক্যটি جُمْلَة شَرْطِيَّة جَزَائِيَّة হয়ে اِنْ شَرْطِيَّة-এর جَوَاب হয়েছে।

بِاَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ : এর সম্পর্ক হলো فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-এর সাথে

وَالَّذِيْنَ-এর عَطْف হয়েছে فَمَنْ تَبِعَ الخ-এর সাথে। যেন বলা হয়েছে– وَمَنْ لَّمْ يَتَّبِعْ بَلْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِهٖ

http://islamiboi.wordpress.com

٤٠. يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ اَوْلَادَ يَعْقُوْبَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اَىْ عَلٰى اٰبَائِكُمْ مِنَ الْاِنْجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَفَلْقِ الْبَحْرِ وَتَظْلِيْلِ الْغَمَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ بِاَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِىْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ الَّذِىْ عَهِدْتُهٗ اِلَيْكُمْ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ الَّذِىْ عَهِدْتُهٗ اِلَيْكُمْ مِنَ الثَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ خَافُوْنِ فِىْ تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهٖ دُوْنَ غَيْرِىْ ـ

অনুবাদ :

৪০. হে বনী ইসরাঈল! অর্থাৎ ইয়া'কুব সন্তানগণ আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যা দ্বারা আমি অনুগ্রহ করেছি তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে। যেমন– ফিরআউনের অত্যাচার হতে মুক্তি প্রদান, সমুদ্র বিদীর্ণ, মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি, অর্থাৎ আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ কর মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন সম্পর্কে আমার সাথে তোমাদের যে অঙ্গীকার হয়েছিল আমিও তোমাদের সাথে এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করানোর যে অঙ্গীকার করেছিলাম সেই অঙ্গীকার পূরণ করব, এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। অঙ্গীকার প্রতিপালন না করার বিষয়ে আমাকেই ভয় কর, অন্য কাউকে নয়।

٤١. وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنَ التَّوْرٰةِ بِمُوَافَقَتِهٖ لَهٗ فِى التَّوْحِيْدِ وَالنُّبُوَّةِ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لِاَنَّ خَلْفَكُمْ تَبَعٌ لَّكُمْ فَاِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَشْتَرُوْا تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيٰتِىْ الَّتِىْ فِىْ كِتَابِكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثَمَنًا قَلِيْلًا ـ عِوَضًا يَسِيْرًا مِنَ الدُّنْيَا اَىْ لَا تَكْتُمُوْهَا خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَأْخُذُوْنَهٗ مِنْ سُفْلَتِكُمْ وَاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ خَافُوْنِ فِىْ ذٰلِكَ دُوْنَ غَيْرِىْ ـ

৪১. আর ঈমান আনয়ন কর তার প্রতি, যা আমি অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ আল কুরআন সমর্থকরূপে যা তোমাদের নিকট আছে তার অর্থাৎ তাওরাতের ' কারণ তাওহীদ ও নবুয়ত সম্পর্কে এই দুই কিতাব একটি আর একটির অনুরূপ। আর কিতাবীদের মধ্যে তোমরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না কেননা তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের অনুগত ও অনুবর্তী সুতরাং তাদের পাপ তোমাদের উপরই বর্তাবে এবং তোমরা আয়াতের অর্থাৎ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে যে প্রশংসা ও বিবরণ রয়েছে তার বিনিময় ক্রয় কর না অর্থাৎ এর পরিবর্তে গ্রহণ করো না তুচ্ছ মূল্য জগতের এই অতি সামান্য বিনিময়। অর্থাৎ ভক্ত ও অনুবর্তীগণের নিকট হতে যে উপঢৌকন পাও, তা হারাবার ভয়ে ঐ সমস্ত আয়াত গোপন করো না। তোমরা শুধু আমাকে ভয় কর অর্থাৎ এই বিষয়ে কেবল আমাকেই ভয় কর, অন্য কাউকে নয়।

٤٢. وَلَا تَلْبِسُوا تَخْلِطُوْا الْحَقَّ الَّذِىْ اَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّذِىْ تَفْتَرُوْنَهٗ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ نَعْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

৪২. তোমরা সত্যকে যা আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি, তা মিথ্যার সাথে যা তোমরা নিজেরা গড়, মিশ্রিত করো না অর্থাৎ তার সংমিশ্রণ করো না এবং সত্য অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশংসা ও বিবরণসমূহ গোপন করো না, অথচ তোমরা জান যে, তা সত্য।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

بَنِي إِسْرَائِيل : তারকীবে মুনাদা। صَبِيٌّ ... জুমলা মা'তূফ আলাইহি اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ
জুমলায়ে শর্তিয়ে মা'তূফ أُوفِ মাজযুম হওয়ার কারণে يَ পড়ে গেছে يَّايَ মানসূব. فَارْهَبُونِ মাহযূফ থেকে إِرْهَبُوا
অমর جَمْعُ مُذَكَّرٍ حَاضِرٍ -এর সীগাহ, বেকায়ায়ে ইয়ায়ে مُتَكَلِّم মাফউল ছিল। وَقْف -এর কারণে يَا পড়ে গেছে। نِ
-এর নীচে যের يَ -এর চিহ্ন হিসেবে বাকি রয়েছে। উক্ত تَعْلِيْل ই فَاتَّقُوْنِ -এর মধ্যে হবে এবং উভয় স্থানে مَا التَّقَدُّمُ
يُفِيْدُ التَّخْصِيْصَ حَقُّهُ التَّأْخِيْرُ -এর বিধান অনুযায়ী حَصْر হবে। اٰمِنُوْا মা'তূফ হচ্ছে أَوْفُوْا -এর উপর। مَا أَنْزَلْتُ أَيْ
মাউসূল সেলা মিলে مَقُوْلٌ - مُصَدِّقًا হলো مُؤَكِّد مَعَكُمْ - মানসূব عَلَى الظَّرْفِ এর মধ্যে فَاعِل হচ্ছে مَا أَنْزَلْتُهُ
اٰمِنُوْا ও لَا تَكُوْنُوْا - إِسْتِقْرَاء -এর উপর মা'তূফ। أَوَّلَ সীবওয়াই -এর দৃষ্টিতে عَيْن কালিমায় وَاو -এর দ্বারা কোনো
فِعْل হয় না। এর مُؤَنَّث হচ্ছে أُوْلٰى - بِكَافِرٍ শব্দ হিসেবে একবচন অর্থ হিসেবে বহুবচন। لَا تَلْبِسُوْا ফেয়েল ও ফায়েল,
الْحَقَّ মাফউল জুমলা مَاقَبْل -এর উপর عَطْف - تَكْتُمُوْا মাজযূম ও মা'তূফ تَلْبِسُوْا -এর উপর। তাই জালাল (র.)
لَا نَهِي প্রথমে مُقَدَّر নিয়েছেন। حَقّ বলা হয় বাস্তব ও مُحْكٰى عَنْهُ বর্ণনার মুওয়াফেক হওয়া। এটা بَاطِل -এর বিপরীত।
আর صِدْق বলা হয় বর্ণনাটি مُحْكٰى عَنْهُ -এর মুতাবেক এটা كِذْب -এর বিপরীত। মোটকথা حَقّ ও صِدْق - بَاطِل ও
كِذْب -এর মধ্যে বিবেচনার ভিত্তিতে পার্থক্য রয়েছে। وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ জুমলা হবে حَال।

يٰبَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ : অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তান ইবরানী বা হিব্রু ভাষায় ইয়াকূব (আ.)-এর নাম ইসরাঈল। إِسْرَائِيْل শব্দটি আরবি, না আজমি: এ নিয়ে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মতে শব্দটি আজমি বা অনারবি। এটি عَلَم এবং عُجْمَة হওয়ার কারণে غَيْر مُنْصَرِف হয়েছে। إِسْرَائِيْل শব্দটি মুরাক্কাবে এজাফী বা দুটি শব্দের আরবি অর্থ– عَبْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরগণ যারা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বংশোদ্ভূত, তাদেরকে তার ইবরানী নামানুসারে বনি ইসরাইল বলা হয়

أَوْفُوْا : তোমরা পূর্ণ কর। এ শব্দটি إِيْفَاء মাসদার থেকে أَمْر -এর جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِر -এর সীগাহ।

أُوْفِ : আমি পূর্ণ করব। এটিও إِيْفَاء মাসদার থেকে مُضَارِع وَاحِد مُتَكَلِّم -এর সীগাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র :

১. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا -এর সম্বোধন ছিল ব্যাপক, তার অধীনে সেই সব নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছিল, যা সমগ্র মানব জাতির প্রতি ব্যাপক ছিল, যেমন পৃথিবী, আকাশ এবং অপরাপর বস্তু নিচয়ের সৃষ্টি। তারপর হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে খলীফারূপে মনোনয়ন ও জান্নাতে ঠাঁই দান প্রভৃতি। এবারে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন সময়ে পুরুষানুক্রমে তাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয় এবং তারা যে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে, তা বিশদভাবে উল্লেখ করা হলো। কেননা মানব সন্তানের সকল শাখা-প্রশাখার মাঝে বনী ইসরাঈলকেই সবচেয়ে মর্যাদাবান জ্ঞান ও কিতাবের অধিকারী, নবুয়ত লাভকারী এবং আম্বিয়া (আ.) সম্পর্কে বেশি জানাশুনা সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হতো। হযরত ইয়াকুব (আ.) হতে হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত প্রায় চার হাজার নবীর আবির্ভাব কেবল তাদের মধ্যেই হয়েছিল। আরব জাহানের দৃষ্টি তাদের দিকেই নিবদ্ধ ছিল যে, তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, না তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণেই তাদের প্রতি বর্ষিত অনুগ্রহরাজি ও তাদের দোষত্রুটি বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা লজ্জিত হয়ে ঈমান আনে, আর না হলে অন্যান্য লোক তাদের চরিত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের কথার গুরুত্ব না দেয়। –[তাফসীরে উসমানী]

২. মু'মিন কাফের নির্বিশেষে সাধারণভাবে সকল মানব জাতিকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত প্রদান ও তাদের আদি উৎস সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখানে বিশেষভাবে বনি ইসরাঈল তথা ইহুদিদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। এখান থেকে দ্বিতীয় পারা পর্যন্ত তাদের আলোচনাই চলবে। কখনো তাদেরকে নম্রভাবে এবং তাদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃত অনুগ্রহসমূহ স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। কখনো ভয় দেখিয়ে, কখনো তাদের মন্দ কর্মের কারণে ধমক দিয়ে এবং তাদের শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রথম রুকুতে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানবজাতি দু'ভাগে বিভক্ত– ১. নেক ও মু'মিন ২. মন্দ ও কাফের। নেক ও মু'মিন তারাই, যারা কুরআনে কারীমকে জীবন পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বাস করে। আর যারা তা অস্বীকার করে, তারাই হলো বদ ও কাফের। দ্বিতীয় রুকুতে কাফেরদেরই একটি বিশেষ শ্রেণির আলোচনা ছিল, যাদেরকে মুনাফিক বলা হয়। তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এ সকল লোকও ঈমান এবং মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে। তৃতীয় রুকু'তে তাবৎ মানব গোষ্ঠীকে সম্বোধন করে কুরআন মাজীদের আসল পয়গাম তথা তাওহীদ রেসালাতের আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ রুকু'তে মানব

http://islamiboi.wordpress.com

সৃষ্টির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন এবং তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সামান্য অসতর্কতা ও উদাসীনতার সুযোগে মানবকে তার চিরশত্রু শয়তান পরাস্ত করতে পারে, সত্যের পথ থেকে অসত্যের পথে এবং আলোর রাজ্য থেকে অন্ধকারের রাজ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে সামান্যতম মনোবল ও মনোযোগও যদি মানুষ নিবদ্ধ করে এবং নবী রাসূলদের প্রদর্শিত সিরাতুল মুস্তাকীমের সহজ সরল পথে অবিচল থাকতে সচেষ্ট হয়, তাহলে সেই হবে আল্লাহ তা'আলার মদদ পুষ্ট ও বিজয়ী। এখন পঞ্চম রুকূ' থেকে ধারাবাহিক কয়েকটি রুকূ'তে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যে, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে আল্লাহ তা'আলার এক প্রিয় ও মাকবুল বান্দার সন্তানাদির এক বিশেষ জনগোষ্ঠীকে তাওহীদের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি তাদের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। তাদেরকে বরাবর সুযোগ দেওয়ার পরও তারা সে নিয়ামতকে হাতছাড়া করেছে। এমনকি তাদের বংশধারার সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতায় চরমভাবে তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। দীর্ঘ ও ধারাবাহিক শৈথিল্য প্রদর্শন ও সুযোগ দানের পর আল্লাহ তা'আলার বিধান এক নতুন পন্থা গ্রহণ করে এবং অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ও অপরাধজীবী এ জাতিকে তাদের দায়িত্ব ও মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের নিকট থেকে উক্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে এক ইসমাঈলী পয়গাম্বরের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর জন্য তা সার্বজনীন করে দেওয়া হয়। -[মাজেদী খ. ১, পৃ. ৮৫-৮৭]

বনী ইসরাঈলের ঐতিহাসিক পরিচয় : সুপ্রসিদ্ধ নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বসবাস ছিল যথাক্রমে ইরাক, সিরিয়া ও হিজাযে [২১৬০-১৯৮৫ খ্রিস্টপূর্ব]। তার ঔরস থেকে সুপ্রসিদ্ধ দুটি বংশধারা নেমে এসেছে। প্রথমটি মিসরীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। এ বংশধারা বনূ ইসমাঈল নামে পরিচিত।

পরবর্তীতে তারই একটি শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে কুরাইশ। তাদের অধিবাস ছিল আরবে। দ্বিতীয়টি ইরাকী স্ত্রী সারার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসহাকের পুত্র হযরত ইয়াকুব ওরফে হযরত ইসরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে। এটি বনূ ইসরাঈল নামে পরিচিত। এ বংশের অধিবাস ছিলো সিরিয়া। প্রাচীন ভূগোলে ফিলিস্তীন নামে স্বতন্ত্র কোনো দেশের অস্তিত্ব ছিলো না, সিরিয়ারই অংশ ছিল তা। তৃতীয় একটি বংশধারাও নেমে এসেছিল তৃতীয় স্ত্রী কাতুরা -এর মাধ্যমে। তবে বনূ কাতুরা নামে পরিচিত এ বংশধারা ইতিহাসে তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৈত্রিক জন্মভূমি ছিল ইরাক। তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ছেলে ইউসুফ (আ.) কুদরতিভাবে মিসর গমন করেন। এক পর্যায়ে তিনি মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মিসরের দুঃসময়ের সফল শাসক হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশে। হযরত ইউসুফ (আ.) পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে মিসরে নিয়ে আসেন। সে সুবাদে বনী ইসরাঈলরা মিসরে অবস্থান করতে থাকে। সুদীর্ঘ চারশত বছর বনী ইসরাঈলরা মিসরের শাসনকার্য পরিচালনা করে। পরবর্তীতে শাসন ক্ষমতা চলে যায় ফিরআউনদের হাতে। ফিরআউন নামক মিসরের শাসকরা জালেম ছিল। বনী ইসরাঈলদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন চালাতো নিয়মিত। একদা ফিরআউন নামধারী সর্বশেষ শাসক একটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী করণীয় ঠিক করতে হুকুম হয়, বনী ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে। বনী ইসরাঈলের কোনো পুত্র সন্তান জন্মালে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। কারণ সে বিশ্বাস করত বনী ইসরাঈলের কোনো সাহসী সন্তানের হাতে তার পতন ঘটবে। এ অনিবার্য পতন ঠেকানোর জন্যই ছিল তার এমনি পাশবিক ঘোষণা। কিন্তু কুদরতের কারিশমা বোঝা বড় দায়। যার হাতে ফেরআউনের পতন হবে, তিনি ফিরআউনের হাতেই লালিত-পালিত হলেন।

সময়ের চাকা ঘুরে এক সময় হযরত মূসা (আ.) মুখোমুখী হন ফেরআউনের। নিপীড়িত বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। সংগঠিত করেন অবহেলিত ইসরাঈলীদের। ফেরাউনের কবল থেকে তাদেরকে নিয়ে তিনি হিজরত করেন। খবর পেয়ে সেনা বাহিনীসহ ফিরআউন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু নেয়। সামনে পড়ে লোহিত সাগর। হতোদ্যম হয় বনী ইসরাঈল। সাহস হারালেন না হযরত মূসা (আ.)। আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে অগ্রসর হলেন সম্মুখ পানে। তিনি আল্লাহ তা'আলার করুণায় সমুদ্রের উপর দিয়ে মুহূর্তে রাস্তা হয়ে গেলেন। ঐ রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিল বনী ইসরাঈলরা। একই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে সর্বস্ব হারাল ফেরাউন। নির্মমভাবে নিমজ্জিত হলো দলবলসহ সমূদ্রে।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিনাই অঞ্চলে আশ্রয় নিল বনী ইসরাঈল। সিনাই মিসরেরই একটি দ্বীপাঞ্চল। এখানেই শুরু বনী ইসরাঈল -এর কাল যাপন।

মোটকথা বনী ইসরাঈলের উত্থান বহু শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল এবং এ জাতিই পৃথিবীতে তাওহীদের পতাকাবাহী ছিল। একে একে বহু নবী-রাসূল তাদের মাঝে প্রেরিত হয়েছেন। বড় বড় আবিদ-জাহিদের আবির্ভাব যেমন হয়েছে, তেমনি নামী-দামী বাদশাহ এবং সেনাপতিও বরাবর জন্ম নিয়েছেন। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা ইরাক ও মিসর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের কোনো কোনো গোত্র হিজায ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষত ইয়াছরিব [পরবর্তীতে মদীনা] ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে এসে আবাদ হয়েছিল। বনী ইসরাঈল ছিল তাদের জাতীয়ও বংশীয় পরিচয়। ধর্মত তারা ছিলো ইহুদী ও কিতাবী। বিকৃত আকারে হলেও তাওরাত কিতাব তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলো। ওহী ও নবুয়তের ধারা এবং শাস্তি-পুরস্কার সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাসে কোনো না কোনোভাবে তারা বিশ্বাসী ছিল। নবী-ওলীদের জ্ঞান ও ইলমের ধারা তাদের মাঝে

http://islamiboi.wordpress.com

অব্যাহত ছিলো। মহাজনি কারবারের অধিকারী সম্পদশালী সম্প্রদায়রূপে পরিচিত হলো। সেই সাথে জাদুটোনা ও অন্যান্য নীচ কর্মে পটু ছিলো। ব্যবসাকর্মে ও তাদের বেশ দক্ষতা ছিলো। এই ধর্মীয় ও পার্থিব শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হিজায অঞ্চলে সে সময় তাদের গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সাধারণ অধিবাসীরা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজক। তারা একদিকে যেমন ইহুদিদের ধর্মজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রায়শ তাদের কাছে ঋণ আবদ্ধ থাকতো। ফলে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রের বেশির ভাগ প্রয়োজনে তাদেরকেই তারা শেষ ভরসা মনে করতো। তাছাড়া সুসংগঠিত ও শক্তিশালী জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা দুর্বল ও অসংগঠিত জাতিসমূহ প্রভাবিত হবে, এটাই হচ্ছে সাধারণ রীতি। আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ও ইসরাঈলী রীতি, চরিত্র, ধর্ম ও বিশ্বাস দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল এবং বহু ক্ষেত্রে তাদেরকেই আদর্শ বিবেচনা করতো। সর্বোপরি ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ এবং পবিত্র লোক কাহিনীগুলোতে এক সমাগত নবীর সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল এবং তারা তার আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ছিল। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِيْ : এ বাক্যটির সম্পর্ক হলো اُذْكُرُوْا -এর সাথে। এখানে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ দ্বারা শুধু নিয়ামতসমূহ গণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং সেসব নিয়ামতরাজির শুকরিয়া আদায় করা। অন্যথায় গণনা ও আলোচনা তো সকলেই করতে পারে। এমনকি কাফের মুশরিকরাও পারে।

এখানে এ প্রশ্নের জবাব হয়ে গেল যে, ইহুদিরা তো সর্বদাই এ সকল নিয়ামত স্মরণ করে আসছে। সুতরাং যে জিনিস তারা ভুলেনি, তা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য কি ছিল? জবাবে মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতটুকু উল্লেখ করেছেন। উত্তরের সারকথা হলো, এখানে নিয়ামত স্মরণ করার দ্বারা তার শোকর আদায় করা উদ্দেশ্য। কেননা তারা তার যথাযথ শোকর আদায় করেনি। যেন তারা তা ভুলেই গিয়েছিল। এজন্য তাদেরকে স্মরণ থাকা সত্ত্বেও বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى اٰبَائِكُمْ : এ অংশটি বৃদ্ধি করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ দ্বারা রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ বাক্যের ব্যাখ্যায় যে সকল নিয়ামতসমূহকে গণনা করা হয়েছে সেগুলো হতে একটিও নবী যুগের ইহুদিদের মাঝে বিদ্যমান ছিল না। এর পরও নবী যুগের ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ বলা কেমন করে শুদ্ধ হবে?

উত্তর : এখানে مُضَاف -কে حَذْف করা হয়েছে। মূল ইবারত এভাবে হবে- اَنْعَمْتُ عَلٰى اٰبَائِكُمْ সুতরাং এখন কোনো প্রশ্ন বাকি রইল না।

قَوْلُهُ دُوْنَ غَيْرِيْ : এখানে ঐ حَصْر -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ -এর মাঝে মাফঊলকে মুকাদ্দম করার দ্বারা বুঝে আসে।

وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ : 'কুফর' প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থায় অত্যন্ত বীভৎস। সব মানুষকেই তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রথম দিকে যারা কুফরি করে, পরবর্তী লোকেরা তারই অনুসরণ করে। এ কারণে প্রথম কুফরিকারীর অপরাধ সর্বাধিক বেশি। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ (اَلْعَنْكَبُوْت) এবং তারা অবশ্যই তাদের বোঝাসমূহ বহন করবে, বহন করবে তাদের বোঝার সাথে আরও অনেক বোঝা।

-[আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৪]

قَوْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : এ অংশটি বৃদ্ধি করে একটি سُوَال مُقَدَّر -এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটেছে মক্কায় এবং তিনি সর্বপ্রথম মক্কায়ই নবুয়তের দাওয়াত দিয়েছেন। কুফফারে মক্কা তাঁর দাওয়াত অস্বীকার করেছে, এ হিসেবে তো সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হলো কুফফারে মক্কা মদীনার ইহুদিগণ নয় ইহুদীগণ নয়।

উত্তর : এখানে প্রথম অস্বীকারকারী দ্বারা আহলে কিতাবগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না।

قَوْلُهُ «وَلَا تَشْتَرُوْا» تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا : এখানে لَا تَشْتَرُوْا -এর তাফসীরে تَسْتَبْدِلُوْا উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, এখানে বেচা-কেনার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ بَاء হরফটি ثَمَن -এর উপর দাখেল হয়। এখানে দাখেল হয়েছে اٰيَاتِيْ -এর উপর। সুতরাং اٰيَاتِيْ ছামান হবে এবং ثَمَنًا 'মবী' হবে। অর্থাৎ আয়াতের বিনিময়ে ছামান খরিদ করো না। আর এটা বাস্তবে অসম্ভব। সুতরাং اِشْتِرَاء দ্বারা রূপক অর্থে اِسْتِبْدَال বা পরিবর্তন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا : পার্থিব ও বস্তুগত স্বার্থের বিনিময়ে সত্যকে বিসর্জন দেওয়া এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতকে দুনিয়ার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। তবে এর অর্থ এ নয় যে, অধিক মূল্যে তা বিক্রয় করা যাবে। কেননা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদও আখিরাতের মোকাবিলায় কিছু নয়। -[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ خَوْفَ فَوَاتِ مَا تَأْخُذُوْنَهُ : কা'ব ইবনে আশরাফসহ ইহুদি আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সাধারণ জনগণ ও অশিক্ষিতদের থেকে বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা গ্রহণ করত। প্রতি বছর তারা তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসল, ফলফলাদি ও নগদ অর্থ গ্রহণ করত। তাই তারা আশঙ্কা করল যে, যদি আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রকৃত গুণাবলি তাদেরকে বলে দিই তাহলে উক্ত পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। ফলে তারা তাওরাতে তাঁর গুণাবলি বিকৃত করে লিখে রাখে। তাদের কাছে কেউ মুহাম্মদ ﷺ -এর বর্ণনা ও বিবরণ জানতে চাইলে তারা প্রকৃতরূপ গোপন করে বিকৃতভাবে বলে দিত। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৬৮]

ঈসালে ছওয়াব উপলক্ষে খতমে কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নেই : পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোয়াকালাম ও অজিফা পড়ানো হারাম। কারণ এর উপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। আর কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরিয়তের বিধান-ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এসব বিশেষ প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।

এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম। সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে। বস্তুত পারিশ্রমিকের আশায় যে পড়ছে, সেই যখন কোনো ছওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেঈন এবং প্রথম যুগের উম্মতের কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদআত। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

কুরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ : কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ কুরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কুরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবন-যাপনের ব্যয়ভার ইসলামি বায়তুল মাল বা ইসলামি ধন-ভাণ্ডার হতে নির্বাহ হতো। কিন্তু বর্তমানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তারা জীবিকার অন্বেষণে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলে– মেয়েদের কুরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমামতি, আজান, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যেসব কাজের উপর দীন ও শরিয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেগুলোকেও কুরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজন মতো এগুলোর বিনিময়েও বেতন গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। –[দুররে মুখতার ও শামীর সূত্রে তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ : اَللَّبْسُ শব্দের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুকে ঢেকে ফেলা। (اَللَّبْسُ سَتْرُ الشَّيْءِ (رَاغِب)) রূপক অর্থ হলো, অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট কথা বলা, যাতে বক্তব্য ও উদ্দেশ্য বিগড়ে যায়। কিংবা মিথ্যাকে শব্দের চাকচিক্যে সত্য বলে চালিয়ে দেওয়া, যা অনেক সময় নির্ভেজাল মিথ্যার চেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে বর্তমানের পরিভাষায় প্রোপাগাণ্ডা বা অপপ্রচার বলা হয়। আজকের ফিরিংগী জাতির মতো ইহুদিরাও এই অপপ্রচারণা শিল্পের নিপুণ শিল্পী ছিল। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৮৯]

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। অনুরূপভাবে কোনো ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।
–[মা'আরিফুল কুরআন]

অঙ্গীকার পূর্ণ করা : অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বান্দার পক্ষ থেকে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে কালিমায়ে শাহাদাত এর স্বীকারোক্তি করা। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জান ও মালের হেফাজত করা। বান্দাদের পক্ষ থেকে সর্বশেষ [সর্বোচ্চ] স্তর হচ্ছে নিজকে আল্লাহর পথে নিঃশেষ করে দেওয়া। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার সিফাত ও আসমার আলো দ্বারা বান্দাকে সুসজ্জিত করা। আর অন্যান্য স্তরগুলো মধ্য পর্যায়ের। অথবা এটা বলা যায় যে, বান্দাদের পক্ষ থেকে প্রথম স্তর হচ্ছে আমলসমূহ দ্বারা তাওহীদকে [আল্লাহর একত্ববাদকে] প্রমাণ করা। আর মধ্যম স্তর হচ্ছে গুণাবলি দ্বারা তাওহীদকে প্রকাশ করা। আর সর্বশেষ স্তর হচ্ছে সত্তার একত্ববাদ।

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ পরিচয় ও আচরণ যা প্রতিটি স্তরের জন্য সামঞ্জস্যময়, তা ঐ স্তরের বান্দার উপর বর্ষণ করা।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤٣. وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرِبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ اُثْبُتُوا عَلٰى دِينِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَقٌّ .

৪৩. তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও এবং যারা অবনত হয় তাদের সাথে অবনত হও। মুসল্লিগণের সাথে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে সালাত আদায় কর। তাদের সমাজের পুরোহিত ও আলেমদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়। তারা নিজেদের মুসলিম আত্মীয়বর্গকে বলত, মুহাম্মদের ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাক। কারণ তা সত্য ধর্ম।

٤٤. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ بِالْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ تَتْرُكُونَهَا فَلَا تَأْمُرُونَهَا بِهِ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ط التَّوْرٰةَ وَفِيهَا الْوَعِيدُ عَلٰى مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سُوْءَ فِعْلِكُمْ فَتَرْجِعُونَ فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ .

৪৪. কি আশ্চর্য! তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের আর নিজেরা বিস্মৃত হও অর্থাৎ নিজেরা তা পরিত্যাগ কর, নিজেদেরকে এতদ সম্পর্কে নির্দেশ দাও না অথচ তোমরা কিতাব অর্থাৎ তাওরাত অধ্যয়ন কর তাতে কথার সাথে কাজের বৈপরীত্যের শাস্তির হুমকি রয়েছে। তোমরা কি তোমাদের এই কাজ মন্দ হওয়া সম্পর্কে বুঝ না? বুঝলে তোমরা ফিরে আসতে। নিজেদের বিস্মৃত হওয়ার বিষয়টিই এই আয়াতে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِي অর্থাৎ অসম্মতিসূচক প্রশ্নের অবতারণার মূল স্থান।

٤٥. وَاسْتَعِينُوا اُطْلُبُوا الْمَعُونَةَ عَلٰى أُمُورِكُمْ بِالصَّبْرِ الْحَبْسِ لِلنَّفْسِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ وَالصَّلٰوةِ ط أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهَا وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَقِيلَ الْخِطَابُ لِلْيَهُودِ لَمَّا عَاقَهُمْ عَنِ الْإِيمَانِ الشَّرَهُ وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ وَهُوَ الصَّوْمُ لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ وَالصَّلٰوةِ لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ وَتَنْفِي الْكِبْرَ وَإِنَّهَا أَيِ الصَّلٰوةُ لَكَبِيرَةٌ ثَقِيلَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ السَّاكِنِينَ إِلَى الطَّاعَةِ .

৪৫. তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর অর্থাৎ তোমাদের বিষয়াদিতে সাহায্য চাও। সবর অর্থাৎ নাফসের নিকট অনভিপ্রেত বিষয়সমূহের উপর নিজেকে স্থির রেখে ও সালাতের মাধ্যমে। সালাতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাবার জন্য এই স্থানে আলাদাভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল ﷺ যখনই কোনো সমস্যায় পড়তেন শীঘ্র সালাতের প্রতি ধাবিত হতেন। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতে মূলত ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। লোভ ও ক্ষমতার স্পৃহা ছিল তাদের ঈমানের পথে অন্তরায়। ফলে তোমাদেরকে সবর অর্থাৎ সওমের নির্দেশ দেওয়া হয়। কেননা সওমের মাধ্যমে লোভ প্রশমিত হয়। আর সালাতেরও নির্দেশ প্রদান করা হয়। কেননা এটা মানুষের মধ্যে বিনয়ের জন্ম দেয় এবং অহংকার বিদূরিত করে। এবং বিনয়ীগণ অর্থাৎ ইবাদতের প্রতি যারা আনুগত্য ও অনুরাগ রাখে, তারা ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এটা সালাত কঠিন ভারি বোঝা।

٤٦. الَّذِينَ يَظُنُّونَ يُوقِنُونَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فِي الْآخِرَةِ فَيُجَازِيهِمْ .

৪৬. তারাই যারা ধারণা করে বিশ্বাস করে যে, পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে এবং পরকালে তার দিকেই তারা ফিরে যাবে। অনন্তর তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করবে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ জুমলায়ে ইন্‌শাইয়াহ মা'তূফ আলাইহি। اِقَامَةُ শব্দ পরিপূর্ণ সংশোধনের জন্য বলা হয়। اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিধানাবলি ও শর্তাবলি, সুন্নত, ওয়াজিব ও ফরজ সবকিছুর লক্ষ্য ও সময়ের বাধ্যবাধকতা এবং নিরবচ্ছিন্নতার সাথে নামাজ আদায় করা। اٰتُوا الزَّكٰوةَ জুমলায়ে ইনশা-ইয়া মা'তূফ-আলাইহি। اِرْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ জুমলায়ে ইন্‌শা-ইয়া মা'তুফ, রুকূ' এর অর্থ– অবনত হওয়া। মুফাস্‌সির (র.) صَلُّوْا -এর সাথে অর্থ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ হয়েছে। আর যেহেতু ইহুদিদের নামাজ রুকূ ও সিজদা ছাড়া ছিল তাই বলেছেন যে, মুসলমানদের ন্যায় নামাজ পড়। আর জানাযার নামাজে রুকূ' ও সিজদা নেই তাই সেটা ফরজে কিফায়াহ্‌। زَكٰوة [জাকাত] এর অর্থ অধিক হওয়া ও বৃদ্ধি হওয়া। যেমন বলা হয়– زَكَى الزَّرْعُ [শস্য বৃদ্ধি হয়েছে]। আর কারো কারো মতে زَكٰوة তাহারাত [পবিত্রতা] এর অর্থ থেকে নির্গত হয়েছে। জাকাত এর মধ্যে বরকত ও পবিত্র করা দুটি গুণ পাওয়া যায়। تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ জুমলা মা'তূফ আলাইহি। وَتَنْسَوْنَ যা হাম্‌যার মাদখূল, মা'তুফ। وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ জুমলা حَال; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ জুমলায়ে মু'তারিযা। اِسْتَعِيْنُوْا আত্‌ফ হয়েছে اُذْكُرُوْا -এর উপর। وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ জুমলা মুস্তাসনা মিনহু اِلَّا হরফে এস্তেস্‌না। عَلَى الْخَاشِعِيْنَ মাউসূফ, اَلَّذِيْنَ মউসূল ও সেলাহ মিলে সিফত, এসব মিলে تَنْسَوْنَ -এর মুস্তাসনা। মুফাস্‌সির (র.) تَتْرُكُوْنَهَا দ্বারা অর্থ করছেন مَلْزُوْم বলে لَازِم -এর ইচ্ছা করে। خَاشِعِيْنَ -এর অর্থ سَاكِنِيْنَ - خُشُوْع -এর মূল অর্থ سُكُوْن অর্থাৎ নীরব হওয়া। শান্তি পাওয়া وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ اَيْ سَكَنَتْ এজন্যই خُشُوْع দ্বারা جَوَارِح অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সিফত নেওয়া হয় এবং خُضُوْع দ্বারা قَلْب -এর সিফত নেওয়া হয়। يُوْقِنُوْنَ -এর ব্যাখ্যা يَظُنُّوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ظَنّ এ স্থানে يَقِيْن -এর অর্থে এবং এটা এ অর্থে অধিক ব্যবহার হয়। অন্য ক্বেরাতে যে, يَعْلَمُوْنَ রয়েছে, এ অর্থ ঐ অর্থের পক্ষে। এ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করার মধ্যে সূক্ষ্মতা হচ্ছে এটা যে, পরকালের ظَنِّي عِلْم ও যখন তাদের মধ্যে خُشُوْع সৃষ্টি করতে পারে, তখন عِلْم يَقِيْن ও جزم তো আরো উত্তমভাবে নামাজ সহজ হওয়ার উৎস হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত ঈমানের মূল মন্ত্রের আহ্বান ও কুফর থেকে বিরত থাকার উপদেশ ছিল, যেটাকে এক হিসেবে **উসূলই বলা যায়**। এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে করে সমষ্টির পরিপূর্ণ ঈমান হওয়া বুঝা যায়

ইবাদত ও পুণ্যবানদের মহব্বতের গুরুত্বের ব্যাখ্যা : শাখা-প্রশাখার বিধানাবলি দু'প্রকার। কোনো কোনো আমল প্রকাশ্য এবং কোনো কোনো আমল অপ্রকাশ্য। তারপর প্রকাশ্য আমাল ও দু'প্রকার, শারীরিক ইবাদত কিংবা আর্থিক ইবাদত উক্ত তিনটি মৌলিক ইবাদতের মধ্য থেকে এক একটি আনুষঙ্গিকভাবে এ স্থানে উল্লেখ করেছেন। নামাজ শারীরিক ইবাদত। জাকাত আর্থিক বা মালী ইবাদত। خُشُوْع এবং خُضُوْع আধ্যাত্মিক ও ক্বলবী ইবাদত। যেহেতু আধ্যাত্মিক পন্থিদেরকে সংজ্ঞাই এ ব্যাপারে কার্যকর ও খাঁটি স্বর্ণের মর্যাদা রাখে। তাই ওটাকেও হুকুমের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

ইকামাতে সালাতের অর্থ : اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ : কুরআনে কারীমে যতবার নামাজের তাকিদ দেওয়া হয়েছে, সাধারণত اِقَامَت শব্দের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছে। নামাজ পড়ার কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য اِقَامَت صَلٰوة [নামাজ কায়েম করা] -এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। اِقَامَت -এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী করা। সাধারণত যেসব খুঁটি কোনো দেওয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এজন্য اِقَامَت স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় إِقَامَتُ الصَّلٰوةِ অর্থ- নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলি রক্ষা করে নামাজ আদায় করা, শুধু নামাজ পড়াকে إِقَامَتُ الصَّلٰوةِ বলা হয় না। নামাজের যত গুণাবলি, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কুরআন হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই إِقَامَتُ الصَّلٰوةِ [অর্থাৎ নামাজ কায়েম করা] -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন- কুরআনে কারীমে আছে- إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ নিশ্চয় নামাজ মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।]

নামাজের এ ফল ও ক্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামাজ উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাজিকে অশ্লীল ও ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা তারা নামাজ পড়েছে বটে; কিন্তু তা কায়েম করেনি।

صَلٰوة -এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরিয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ ইবাদত, যাকে নামাজ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : আভিধানিকভাবে জাকাতের অর্থ দু'রকম- পবিত্র করা বর্ধিত করা। শরিয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে জাকাত বের করা হয় এবং শরিয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়। যদিও এখানে সমসাময়িক বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামাজ ও জাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী-ইসরাঈলদের উপরই ফরজ ছিল। কিন্তু সূরা মায়েদার আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইসরাঈলের উপর নামাজও জাকাত ফরজ ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ الخ : অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ পাক বললেন, যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর এবং জাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। -[সূরা মায়েদা : ১২]

قَوْلُهُ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ : رُكُوْع -এর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা নত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সিজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকূ' বলা হয়, যা নামাজের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে রুকূ'কারীগণের সাথে রুকূ' কর।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাজের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকূ'কে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো?

উত্তর এই যে, এখানে নামাজের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদের এক জায়গায় وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ [ফজর নামাজের কুরআন পাঠ।] বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সিজদা' শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকাত বা গোটা নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাজিগণের মাঝে সাথে নামাজ পড়। কিন্তু এরপরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাজের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকূ'র উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর : পূর্বের কোনো শরিয়তে জামাতের সাথে সালাতের বিধান ছিল না। আর ইহুদিদের নামাজে সিজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকূ' ছিল না। রুকূ' মুসলমানদের নামাজের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য رَاكِعِيْنَ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকূ'ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজিগণের সাথে নামাজ আদায় কর। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামাজ আদায় কর। -[তাফসীরে উসমানী]

নামাজের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলি : নামাজের হুকুম এবং তা ফরজ হওয়া তো وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে مَعَ الرَّاكِعِيْنَ [রুকূ'কারীদের সাথে] শব্দের দ্বারা নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রা.), তাবেয়ীন এবং ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে একদল নামাজের জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোনো কোনো সাহাবা (রা.) তো শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত জামাতহীন নামাজ জায়েজ নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাদের দলিল।

http://islamiboi.wordpress.com

অধিকাংশ আলেম, ফকিহ, সাহাবা ও তাবেয়ীনের মতে জামাত হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী। -[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ : এখানে ইহুদীদেরকে-ই সম্বোধন করা হচ্ছে। আহলে কিতাব হওয়ার সুবাদে ইহুদী আলেম ও ধর্মনেতারা ছিলো আরব মুশরিকদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং অনুকরণীয় আদর্শ। ইয়াছরিবের [মদিনার] অধিবাসীরা প্রায়শ তাদের খিদমতে রাসূল ও তার নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো এবং তাঁকে তারা গ্রহণ করবে কি করবে না, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইতো। এ ধরনের ক্ষেত্রে ইহুদি আলেমরা অনেক সময় এমন পরামর্শ দিয়ে ফেলতো যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আলামতগুলো তাঁর মাঝে পাওয়া তো যাচ্ছে, সুতরাং তোমরা তাঁর অনুগামী হও। এ ধরনের গোপন পরামর্শ দান প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

এ আয়াতে ইহুদি পণ্ডিতদের একটি বিভ্রান্তি নিরসন করা হয়েছে। তারা মনে করতো আমাদের দিক নির্দেশনায় যখন বহু লোক শরিয়ত মেনে চলছে বা ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ [ভাল কাজের পথ নির্দেশক ভাল কাজের কর্তা তুল্য] -এ নিয়ম অনুসারে তা আমাদের-ই কাজ বলে গণ্য হবে। এ আয়াতে তাদের এ বিভ্রান্তি নিরসন করা হয়েছে।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.) বলেন, 'আয়াতের মর্ম হলো উপদেশদাতার নিজকে তার উপদেশ অনুযায়ী কাজ অবশ্যই করতে হবে। পক্ষান্তরে এর অর্থ এ নয় যে, পাপী ব্যক্তি উপদেশ দিতে পারবে না। -[তাফসীরে উসমানী]

اَلْبِرُّ : اَلْبِرُّ-এর শাব্দিক অর্থ- পুণ্য। অর্থাৎ সকল প্রকার উত্তম আমল ও সৎকর্ম।

اَيِ التَّوَسُّعُ فِى الْخَيْرِ الْكَامِلِ (رَاغِب) هُوَ اِسْمٌ جَامِعٌ لِاَعْمَالِ الْخَيْرِ (كَبِيْر) يَتَنَاوَلُ جَمِيْعَ اَصْنَافِ الْخَيْرَاتِ. (اِبْنُ مَسْعُوْد)

এখানে اَلْبِرُّ বলতে উদ্দেশ্য হলো ইসলাম গ্রহণ এবং মুহাম্মাদী নবুয়তে বিশ্বাস স্থাপন। -[তাফসীরে উসমানী]

فَجُمْلَةُ النِّسْيَانِ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ : এ বাক্যের অর্থ হলো অস্বীকৃতির সম্পর্কটা تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ-এর সাথে; تَأْمُرُوْنَ النَّاسَ-এর সাথে নয়। কারণ আমল না করেও সৎ কাজের আদেশ দান শরিয়তের কাম্য।

সম্মানের লোভ ও সম্পদের লোভের অতুলনীয় চিকিৎসা : নামাজ দ্বারা সম্মানের লোভ, জাকাত দ্বারা সম্পদের লোভ এবং বিনয় দ্বারা অহংকার ও ঈর্ষা [যা সকল অনিষ্টের মূল] হ্রাস পায়। তাই উক্ত বিধানাবলি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও পরিমিত হয়েছে। কেননা তাদের অসুস্থার মূলে এ দুটি রোগই ছিল। অর্থাৎ সম্মানের লোভ এবং সম্পদের লোভ। এগুলোর কারণেই হিংসা ও অহংকার জন্মেছে যে, যখন আমরা রাসূল ﷺ -এর অনুকরণ ও আনুগত্য করবো। তখন এসব উপঢৌকন ও কৃতজ্ঞতা বখশিশ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ধৈর্য ও নামাজ দ্বারা উক্ত রোগ দুটির চিকিৎসা করা হয়েছে। صَبْر [ধৈর্য] দ্বারা সম্পদের মহব্বত এবং নামাজ দ্বারা সম্মানের মহব্বত হ্রাস পাবে। আর যখন এর অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন সম্মানের মহব্বত [যা সমস্ত ঝগড়া ও অশান্তির মূল] কেটে যাবে। সবরের মধ্যে আরও অনেক কাজ করতে হয়। আর বুদ্ধিভিত্তিক নীতি হচ্ছে যে, কাজ করার তুলনায় কাজ ছেড়ে দেওয়া সহজ। তাই নামাজকে কঠিনতম মনে করা হয়েছে এবং এ কঠিনকে সহজ করার ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ : এটি একটি سُؤَال مُقَدَّر-এর জবাব।

প্রশ্ন : ইবাদতের মধ্যে শুধু নামাজকে পৃথকভাবে কেন উল্লেখ করা হলো?

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন- اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيْمًا لِشَانِهَا অর্থাৎ নামাজের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাশিয়ায়ে জামালে আরো বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে-

لِاَنَّهَا جَامِعَةٌ لِاَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ صَرْفِ الْمَالِ فِيْهِمَا وَالتَّوَجُّهِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَالْعُكُوْفِ فِى الْعِبَادَةِ وَاِظْهَارِ الْخُشُوْعِ بِالْجَوَارِحِ وَاِخْلَاصِ النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ وَمُجَاهَدَةِ الشَّيْطَانِ وَمُنَاجَاةِ الْحَقِّ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَالتَّكَلُّمِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَكَفِّ النَّفْسِ عَنْ شَهْوَتَيِ الْفَرْجِ وَالْبَطْنِ (جَمَل - ص١٨ ج١)

http://islamiboi.wordpress.com

নামাজের কথা ভিন্নভাবে উল্লেখের কারণ হলো এটি বিভিন্ন রকমের ইবাদতের সমন্বয়কারী। তার মাঝে আত্মিক এবং শারীরিক ইবাদত তথা তাহারাত ও সতর আবৃত করা, সম্পদ ব্যয় করার অভিমুখী হওয়া, ইবাদতের জন্য অবস্থান করা, বিনয় নম্রতা, নিয়তের ইখলাস, শয়তানের সাথে লড়াই, কুরআন তেলাওয়াত, কালেমা পাঠ এবং নফসকে গুপ্তাঙ্গ এবং পেটের কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি আমল রয়েছে।

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ : **নামাজ কঠিন হওয়ার কারণ :** নামাজ কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামাজ এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ কষ্ট বোধ করতে থাকে।

সারকথা, নামাজের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অবাধ বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে। خُشُوْع বা বিনয়ের অর্থ মূলত سُكُوْن قَلْب বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামাজ সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন কথা হলো, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও কল্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা অসম্ভব; বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেওয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে। এজন্য خُشُوْع বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কল্পনা পদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামাজ অনায়াসলব্ধ হবে এবং নামাজের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাজের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহঙ্কার এবং যশ-খ্যাতি মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

আয়াতগুলোর সূক্ষ্ম বিষয়াদি : নামাজ ও জাকাত আবশ্যিক হওয়া এ ধরনের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও এগুলোর সময় এবং শর্তসমূহ, জাকাতের পরিমাণ ও শর্তাবলির বর্ণনা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের মধ্যে এসেছে। হ্যাঁ, وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ দ্বারা কাজি বায়জাবী (র.) জামাতের সাথে নামাজ পড়া ফরজ হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন। হানাফীদের দৃষ্টিতে যেহেতু জামাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা তবে ওয়াজিবের নিকটবর্তী অথবা বলা হবে যে আয়াত দ্বারা তো ওয়াজিবই মানা হয়; কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারে অপরের উপর নির্ভর হতে হয়। অর্থাৎ জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইমাম ও মুক্তাদির মুখাপেক্ষী হতে হয়। তাই কিতাবের বাহ্যিক ওয়াজিবকে ছেড়ে দিতে হবে। জুমার নামাজে যদিও অপরের উপর নির্ভর করতে হয়; কিন্তু জুমা সংঘটিত হওয়ার শর্তগুলোর মধ্য থেকে জামাত পাওয়া যাওয়াও ১টি শর্ত রয়েছে। তাই এটাকে ফরজ এবং ওয়াজিব বলা যায়।

ক্বাজী বায়জাবী (র.) স্বীয় শাফেয়ী মাযহাব মতে উক্ত আয়াত দ্বারা কাফেররা শরয়ী আহকাম ও ফুরূ' -এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করেছেন। যেমন– নামাজ, জাকাত ইত্যাদি ইবাদতের নির্দেশ আহলে কিতাব তথা কাফেরদেরকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হানাফিয়্যাদের পক্ষ থেকে সাহেবে মাদারিক (র.) বলেছেন যে, উক্ত আয়াতের পূর্বের আয়াত وَآمِنُوْا بِمَا أَنْزَلْتُ -এর মধ্যে ঈমান গ্রহণ করার আহ্বান উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তাক্বদীরী ইবারত এমন যে أَسْلِمُوْا وَاعْمَلُوْا عَمَلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ অর্থাৎ কাফেররা পরকালের ধর-পাকড়ের হিসেবে তো উসূল ও ফুরূ' এর মুকাল্লাফ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু দুনিয়াতে শুধু মু'আমালাত [আদান-প্রদান] শাস্তির বিধানসমূহ এবং দুনিয়াবী শৃঙ্খলার মূলনীতিগুলোর দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইবাদতের মুকাল্লাফ তারা নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান গ্রহণ না করবে। –[কামালাইন খ. ১. পৃ. ৬৩]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤٧. يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتِى وَاَنِّى فَضَّلْتُكُمْ اَىْ عَلٰى اٰبَاءِكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ عَالَمِى زَمَانِهِمْ .

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে বিশ্বে অর্থাৎ তাদের সময়কার পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

٤٨. وَاتَّقُوْا خَافُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ فِيْهِ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُقْبَلُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اَىْ لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلُ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ فِدَاءٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ .

৪৮. তোমরা সেদিন সম্পর্কে সাবধান হও অর্থাৎ ভয় কর যেদিন কোনো প্রাণী কোনো প্রাণীর কাজে আসবে না অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এবং কারও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না তাদের পক্ষে কোনো সুপারিশই হবে না গৃহীত তো দূরের কথা। لَا يُقْبَلُ ক্রিয়া পদটি ى **অর্থাৎ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ** ও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ **স্ত্রীলিঙ্গ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে।** অন্য এক আয়াতে **রয়েছে যে, তারা বলবে** فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ **[হায়! আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই]** এবং কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ মুক্তিপণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সাহায্য পাবে না। আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে তাদেরকে রক্ষা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : বনী ইসরাঈল, যাদের মধ্যে প্রায় ৭০ হাজার পয়গাম্বর হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ে পাঠানো হয়েছে এবং অসংখ্য বাদশাহ এ এক গোত্রেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। পূর্বের রুকু'তে এ খান্দানের উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছিল। এখান থেকে ঐ নিয়ামতগুলোরই বিস্তারিত তালিকা আরম্ভ করা হচ্ছে। তৃতীয় يٰبَنِىٓ পর্যন্ত প্রায় ৪০টি ঘটনা উল্লেখ করা হবে। যেগুলোর মধ্যে একদিকে আল্লাহর প্রতিদানের দৃষ্টিকোণ থাকবে এবং অপরদিকে তাদের অযোগ্যতাসমূহতের দৃষ্টিকোণ থাকবে।

সেই সাথে তাদেরকে কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করানো হচ্ছে। যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না। বস্তুত বনী ইসরাঈলীদের বিপর্যয়ের বড় একটি কারণ এই ছিল যে, পরকাল সম্পর্কে তাদের আকিদা-বিশ্বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারা এমন চিন্তায় নিমজ্জিত ছিল যে, আমরা বিশিষ্ট নবীদের সন্তান, বড় বড় ওলী ও নেক বান্দাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক। তাঁদের অসিলাতেই আমাদের ক্ষমা হয়ে যাবে এবং কোনো শাস্তি হবে না। তাদের এহেন ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ উল্লেখ করার পর বলেন–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ .

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ عَالَمِى زَمَانِهِمْ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, বনী ইসরাঈলের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই যে, বনী ইসরাঈলের জাতীয় সত্তার সূচনা হতে এ আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত তারাই ছিল সকল জাতির সেরা। অন্য কোনো সম্প্রদায় তাদের সম পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু তারা যখন শেষ নবী ﷺ ও কুরআনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো, তখন তাদের সে শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটল এবং তাদেরকে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট উপাধি প্রদান করা হলো। অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারীগণ ভূষিত হলো خَيْرِ اُمَّةٍ তথা শ্রেষ্ঠ উম্মতের মহামূল্য ভূষণে। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১০, টীকা. ৪]

قَوْلُهُ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ الخ : বলা বাহুল্য, এখানে কিয়ামত দিবসের কথাই বলা হয়েছে। খুবই উপযুক্ত সময়ে কিয়ামতের কথা স্মরণ করানো হয়েছে। বিচার দিবসের শাস্তি-পুরস্কারের বিশ্বাসই হলো মানুষের মনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টির একমাত্র নিয়ামক। কিন্তু ইসরাঈলীদের হৃদয় থেকেই শুধু নয়, বলা উচিত যে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল এ বিশ্বাস। সামনে কিয়ামত দিবসের যে সকল বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে কোনো না কোনো ইসরাঈলী আকিদা ও বিশ্বাস খণ্ডন করাই হলো উদ্দেশ্য। لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ অংশটুকু দ্বারা সেই আকিদা ও বিশ্বাসকে আঘাত করা হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত ইহুদিদের বিশ্বকোষে এভাবে লিখে আসা হচ্ছে। অনেকে তাদের পূর্ববর্তীদের আর অনেকে তাদের পরবর্তীদের পুণ্যকর্মের সুবাদে পরিত্রাণ লাভ করবে।

-[ইহুদি ধর্মের বিশ্বকোষ খ. ৬ পৃ. ২১ -এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ لَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ : এ অংশে এই আকিদা নাকচ করা হয়েছে যে, আমল ও আকিদা যেমনই হোক, পুণ্যাত্মা পূর্ববর্তীরা সুপারিশ করে তাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। সুপারিশের এই অতিরঞ্জিত ধারণাই খ্রিস্টধর্মে এসে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এভাবে পাপ মোচনের ন্যায় সুপারিশের ধারণার উপরই তৈরি হয়েছে গোটা খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি।

قَوْلُهُ لَيْسَ لَهَا شَفَاعَةٌ : অর্থ نَفْسٍ كَافِرٍ -এর জন্য মূলত কোনো শাফায়াতের অধিকারই নেই। কবুল হওয়া তো দূরের কথা। এর ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, نَفْسٍ مُؤْمِنٍ কোনো কাফেরকে সুপারিশ করতে পারে না। -[হাশিয়ায়ে জামাল]

আর হাদীসে যে রয়েছে- اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ যে যাকে ভালোবাসবে সে তার সাথে থাকবে- এর অর্থ হলো যাকে ভালোবাসবে, সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে একত্রে থাকবে, অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ : এখানে মূলত ইহুদী ধর্ম ও খৃস্টধর্মের পাপ মোচন সংক্রান্ত আকিদাকেই আঘাত করা হয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মের পাপ মোচন আকিদার গুরুত্ব তো বলাই বাহুল্য। এমনকি ইহুদিদেরও একটা বিরাট অংশ উপরিউক্ত ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। -[ইহুদি ধর্মের বিশ্বকোষ খ.২ পৃ. ২৭৮-এর সূত্রে তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ : যাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়নি, তারা কোনো দিক থেকেই সাহায্য পাবে না, যাতে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে, পুনঃ পরিত্রাণ তো দূরের কথা।

আয়াতের সারকথা : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিপদে পড়ে, তখন তার বন্ধু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই করে যে, বন্ধু হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায়ে সচেষ্ট হয়। এটা নিষ্ফল হলে সুপারিশ দ্বারা তাকে রক্ষা করার তদবির করে। এটাও যদি ব্যর্থ হয়, তখন ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। শেষ পর্যন্ত যদি এতেও কাজ না হয়, তখন তার সাহায্যকারীদের একত্র করে বাহুবলে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে। আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে এসবের উল্লেখ করে ঘোষণা করেন, কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার যতই নিকটতম হোক না কেন, উপরিউক্ত চার পদ্ধতির কোনো পদ্ধতিতেই মহান আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কোনো কাফেরের উপকার করতে পারবে না। বনী ইসরাঈলরা বলত, আমরা যত পাপই করি, আমাদের শাস্তি হবে না। আমাদের পূর্বপুরুষ নবী-রাসূলগণ আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তোমাদের সে ধারণা ভ্রান্ত। তবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যে শাফাআতের কথা বলেন, এ আয়াত দ্বারা তা রদ হয় না। কারণ অন্যান্য আয়াতেও তার উল্লেখ আছে। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১০, টীকা. ৫]

http://islamiboi.wordpress.com

বনী ইসরাঈলকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের বিবরণ : পৃথিবীতে এমনটা খুব কমই ঘটে যে, দীন ও দুনিয়ার নেতৃত্ব উভয়টি কোনো এক স্থানে একত্র হয়ে যায়। এমনটি একেবারেই বিরল যে, উভয়টির মধ্যে এমন ধারাবাহিকতা হবে যে, কয়েক পুরুষ ও বংশ পরম্পরায় চলতে থাকবে। কিন্তু বনী ইসরাঈলের শত শত বৎসরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এ জাতিকে এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত গর্বিত করে রেখেছেন যে, এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত সম্ভবত ঐ গর্ব পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে জুটেনি। আর এটাও সম্ভবত তাদেরই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য যে, যত বড় অপরাধী ও অবাধ্য এরা হয়েছে, সকল গোত্রের ইতিহাস এর তুলনা বা দৃষ্টান্ত পেশ করতেও অক্ষম রয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে এত অধিক গর্বের পাত্র হওয়াটাই হয়তো এ জাতির ধ্বংসের কারণ হতে পারে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এ সত্যকে পবিত্র কুরআন অভিযোগের স্বরে ব্যক্ত করছে যে, إِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ [আমি তোমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর]।

বিপদ থেকে মুক্তির চারটি পন্থা : প্রথম আয়াতে উৎসাহ প্রদানকারী বক্তব্য রয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, দুনিয়াতে কোনো বিপদ থেকে রক্ষার চারটি পন্থা হতে পারে। যথা– ১. আবেদন ২. প্রতিদান ৩. সুপারিশ এবং ৪. সাহায্য। কিন্তু পরকালে ঈমান না থাকলে তোমাদের জন্য এ সব রাস্তা বন্ধ থাকবে। তাই এখন থেকে এর চিন্তা ও ব্যবস্থা করে নাও। কেননা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান অবস্থা দ্বারা তাদেরকে নিরাশ ও হতাশা করা।

সুপারিশকে অস্বীকার এবং এর উত্তর : উপরিউক্ত বক্তব্যের পর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের জন্য উক্ত আয়াত দ্বারা এবং مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ আয়াত দ্বারা শাফায়াতকে অস্বীকার করার উপর দলিল পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। যেমন মুফাসসির (র.)-ও এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা উক্ত আয়াতে তো স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, ব্যাপক সুপারিশের আলোচনা নয়; বরং বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য সুপারিশ না হওয়া কিংবা কবুল না হওয়া বর্ণনা করা হয়েছে। আর অন্য আয়াত أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ -এর মধ্যে গুনাহগার মুমিনদের জন্য সুপারিশের সত্যায়ন করা হচ্ছে। এমনিভাবে شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي হাদীসও দাবির প্রমাণকারী। আর আয়াতুলকুরসীর যতটুকু সম্পর্ক এ ব্যাপারে রয়েছে, তা হচ্ছে অনুমতি ছাড়া সুপারিশকে নিষেধ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে সুপারিশকে নিষেধ করা হয়নি। কিংবা অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশকে নিষেধ করা হয়নি।

আর বুদ্ধিভিত্তিকভাবেও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের সুপারিশকে [শাফাআতকে] ইনসাফের পরিপন্থি বলা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার হক বা অধিকার হলো– স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন এবং নিজ হককে ক্ষমা করা জুলুম নয়। আর একে জুলুম বলা হয় না; বরং দান ও বখশিশ এবং মুক্ত করা বলা হয়। হ্যাঁ, বান্দার হক তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না; বরং হক্বদারকে এ পরিমাণ খুশি করে দেবেন যে, সে স্বয়ং সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দচিত্তে ক্ষমা করে দেবে। এর মধ্যে মুতাযিলাদের কি ক্ষতি হচ্ছে?

মূল অসন্তুষ্টির শিকড় ও ভিত্তি : অতঃপর যখন ইহুদিদের মন-মানসিকতার মধ্যে সাহেবযাদাহ ও নবীযাদাহর গন্ধ ছিল। তাই বাতিল আশা সমূহের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমান ব্যতীত কোনো ভরসা কাজে আসবে না। হ্যাঁ, ঈমানদার ও নেককার হলে। তবে অল্প কিছু ত্রুটি ক্ষমা হতে পারে। ঈমান ও আমল ব্যতীত শুধু বংশের উপর অহংকারকারী পীরযাদাহদের উক্ত আয়াত থেকে সবক নেওয়া উচিত। তাই শাফায়াতকে এ আয়াতে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এবং শেষ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ আয়াতে শাফায়াতকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে সেই অহংকারের একেবারে মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤٩. وَ اذْكُرُوا اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ اَىْ اٰبَاءَكُمْ وَالْخِطَابُ بِهٖ وَمَا بَعْدَهٗ الْمَوْجُودِيْنَ فِيْ زَمَنِ نَبِيِّنَا ﷺ اُخْبِرُوْا بِمَا اَنْعَمَ عَلٰى اٰبَائِهِمْ تَذْكِيْرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُؤْمِنُوْا مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ يُذِيْقُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ اَشَدَّهٗ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ نَجَّيْنٰكُمْ يُذَبِّحُوْنَ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهٗ اَبْنَآءَكُمُ الْمَوْلُوْدِيْنَ وَيَسْتَحْيُوْنَ يَسْتَبْقُوْنَ نِسَآءَكُمْ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهٗ اَنَّ مَوْلُوْدًا يُوْلَدُ فِيْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ يَكُوْنُ سَبَبًا لِذَهَابِ مُلْكِكَ وَفِىْ ذٰلِكُمُ الْعَذَابِ اَوِ الْاِنْجَاءِ بَلَاۤءٌ اِبْتِلَاءٌ وَاِنْعَامٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ.

49. আর স্মরণ কর যখন আমি নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের পিতৃ-পুরুষকে এখানে এবং পরবর্তীস্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কালে জীবিত ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদের উপর যে অনুগ্রহ হয়েছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ঈমান আনে। ফেরাউন সম্প্রদায় হতে, তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত ভোগ করাত। يَسُوْمُوْنَكُمْ বাক্যটি نَجَّيْنٰكُمْ -এর كُمْ সর্বনাম হতে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে জবাই করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত ছেড়ে দিত। يُذَبِّحُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য يَسُوْمُوْنَكُمْ -এর বিবরণ। জনৈক গণকের কথায়। [গণক ফেরাউনকে বলেছিল] বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে যে তোমার সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ হবে। এবং তাতে উক্ত উৎপীড়ন বা উক্ত নিষ্কৃতিদানে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাসংকট পরীক্ষা বা অনুগ্রহ ছিল।

٥٠. وَ اذْكُرُوْا اِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ بِسَبَبِكُمُ الْبَحْرَ حَتّٰى دَخَلْتُمُوْهُ هَارِبِيْنَ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَاَنْجَيْنٰكُمْ مِّنَ الْغَرَقِ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ قَوْمَهٗ مَعَهٗ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى اِنْطِبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ.

50. আর স্মরণ কর যখন তোমাদের জন্য তোমাদের কারণে সাগরকে বিদীর্ণ করেছিলাম দ্বিধা বিভক্ত করেছিলাম। আর শত্রু-ভয়ে পলায়নপর অবস্থায় তোমরা তাতে প্রবেশ করলে অনন্তর তোমাদেরকে ডুবে যাওয়া হতে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ করেছিলাম আর তোমরা তাদের সমুদ্রের দ্বারা আবৃত হওয়া প্রত্যক্ষ করছিলে।

٥١. وَاِذْ وٰعَدْنَا بِالْاَلِفِ وَدُوْنِهَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً نُعْطِيْهِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرٰةَ لِتَعْمَلُوْا بِهَا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ الَّذِىْ صَاغَهٗ لَكُمُ السَّامِرِيُّ اِلٰهًا مِنْ بَعْدِهٖ اَيْ بَعْدَ ذَهَابِهٖ اِلٰى مِيْعَادِنَا وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ بِاتِّخَاذِهٖ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِىْ غَيْرِ مَحَلِّهَا.

51. যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করেছিলাম যে, এই সময়সীমার শেষে তাকে তাওরাত প্রদান করব, যেন এতদনুসারে তোমরা আমল করতে পার। তারপর অর্থাৎ আমার নির্ধারিত সময় পুরণার্থে মূসার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে সামিরী যা তোমাদের জন্য গড়েছিল, তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করায় তোমরা হলে জালিম, সীমালঙ্ঘনকারী কারণ আল্লাহ তা'আলার জন্য যে ইবাদত তা তোমরা মাখলুকের জন্য নির্ধারণ করেছিলে।

এই আয়াতে وَعَدْنَا ক্রিয়াটি وَاو-এর পর اَلِف সহ وَاعَدْنَا (اَلْمُفَاعَلَةُ) এবং اَلِف ব্যতীত (مُجَرَّد ـ بَاب ضَرَبَ) উভয়রূপেই পাঠ করা যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

৫২. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مَحَوْنَا ذُنُوْبَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ الْاِتِّخَاذِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعْمَتَنَا عَلَيْكُمْ .

৫২. এরপরও অর্থাৎ তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি তোমাদের পাপসমূহ বিলীন করে দিয়েছি। যাতে তোমরা তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৫৩. وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ وَالْفُرْقَانَ عَطْفُ تَفْسِيْرٍ اَيِ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ بِهٖ مِنَ الضَّلَالِ .

৫৩. যখন আমি মূসাকে দান করেছিলাম কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ও ফুরকান اَلْفُرْقَانُ শব্দটি عَطْف تَفْسِيْر বা বিবরণমূলক অব্যয়। অর্থাৎ এমন এক গ্রন্থ, যা সত্য ও অসত্য এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। যাতে তোমরা তার মাধ্যমে গুমরাহী হতে হেদায়েত লাভ করতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

بَلَاءٌ : اِسْتِحْيَاءٌ-এর অর্থ : দাসী বানানো অথবা লজ্জার পর্দা উঠানো. حَيَا যের এর সাথে মহিলার লজ্জাস্থানের অর্থে। بَلَاءٌ আসলে اِخْتِيَار [বাছাই] এর অর্থে আসে। পরীক্ষা কখনো নিয়ামতের মধ্যে হয় এবং কখনো মসিবতের মধ্যে। وَاعَدْنَا বাবে مُفَاعَلَة থেকে যদি হয়, তবে উভয় পক্ষ থেকে অঙ্গীকার উদ্দেশ্য হবে। হযরত মূসা (আ.) উপস্থিতির অঙ্গীকার করেছেন, এবং আল্লাহ তা'আলা কিতাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আর যদি وَعَدْنَا ছুলাছী মুজাররাদ থেকে হয়, তবে শুধু এক পক্ষ থেকে অঙ্গীকার উদ্দেশ্য হবে।

مُوْسٰى এটা ইবরানী ভাষার শব্দ مُوْ অর্থ পানি, سٰى অর্থ– বৃক্ষ হযরত মূসা (আ.) ইমরানের ছেলে এবং قَهَات -এর নাতি ছিলেন। যিনি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নাতি ছিলেন। ইরানের বাদশা মনূচেহের-এর জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর ১৫৭১ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

نَجَّيْنٰكُمْ জুমলা مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ -এর মুতা'আল্লাক। يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ জুমলা হয়ে حَال হয়েছে اٰلِ فِرْعَوْنَ অথবা نَجَّيْنٰكُمْ থেকে কিংবা উভয় থেকে يُذَبِّحُوْنَ এবং يَسْتَحْيُوْنَ উভয় জুমলা বয়ান হচ্ছে يَسُوْمُوْنَكُمْ এর, তাই وَاو عَاطِفَة আনা হয়নি। فِيْ ذٰلِكُمْ খবরে مُقَدَّم بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ মুবতাদায়ে مُؤَخَّر আর فَرَقْنَا ফেয়েল ও ফায়েল بِكُمْ মাফ'উলে ছানী। اَلْبَحْرَ মাফউলে আউওয়াল আর فَاَنْجَيْنٰكُمْ মা'তূফ আলাইহি وَاَغْرَقْنَا মা'তূফ। اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً মাফ'উলে ছানী। اَلْعِجْلَ মাফ'উলে আউয়াল হচ্ছে اِتَّخَذْتُمْ ফেয়েলের। اِلٰهًا মাফ'উলে ছানী মাহযূফ। اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ জুমলা حَال ফায়েল। مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ মুতা'আল্লিক্ব হচ্ছে عَفَوْنَا ফেয়েলের সাথে। مُوْسٰى মাফউলে আউয়াল اٰتَيْنَا ফেয়েলের। আর اَلْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে মাফউলে ছানী।

قَوْلُهٗ نَجَّيْنَا : ক্রিয়াটি بَاب تَفْعِيْل -এর ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। পর্যায়ক্রমে হওয়া হলো تَفْعِيْل -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কতিপয় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সকল ইসরাঈলী মিসর থেকে একসাথে বের হয়নি; বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছিলো। সবার শেষে সবচেয়ে বড় দলটি বের হয়েছিলো হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে এবং পথ ভুলে তারা নদী পথে পার হয়েছিল।

قَوْلُهٗ اٰلِ فِرْعَوْنَ : اٰل ও اَهْل শব্দ দুটি আভিধানিকভাবে সমার্থক; পরিবার-পরিজন, অনুগত জন, স্বগোত্রীয় জন, কিংবা একই ধর্মমতের অনুসারী : اَهْلُ الرَّجُلِ عَالَةٌ وَاَتْبَاعُهٗ وَاَوْلِيَائُهٗ তবে ব্যবহারগত পার্থক্য এই যে, لَا يُسْتَعْمَلُ الْاٰلُ اِلَّا مَا فِيْهِ شَرَفٌ غَالِبًا অর্থাৎ اهل শব্দটি সর্বত্র প্রযোজ্য; পক্ষান্তরে ال শব্দটি অভিজাত ও বিশিষ্ট জনদের বেলায়ই শুধু প্রযোজ্য হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ يَسُوْمُوْنَكُمْ : এটি (ن) سَوْمٌ থেকে مُضَارِع جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। এর দু'টি অর্থ রয়েছে-

১. اَلطَّلَبُ অর্থাৎ কামনা করা, অন্বেষণ করা। এ থেকেই سَامَ السِّلْعَةَ اِذَا طَلَبَهَا -এর ব্যবহার রয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে- يَبْغُوْنَ اَىْ يَطْلُبُوْنَ تَعْذِيْبَكُمْ

২. اَلدَّوَامُ অর্থাৎ স্থায়িত্ব এ থেকেই سَائِمَةُ الْعَذَابِ আয়াতের অর্থ হবে- يُدِيْمُوْنَ تَعْذِيْبَكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় : পূর্বের আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলীদের প্রতি যেসব নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, এখান থেকে ধারাবাহিকভাবে কয়েক রুকূ' পর্যন্ত তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

বনী ইসরাঈলের ঐতিহাসিক যাত্রা : ফেরাউন ও মিসরীয় প্রশাসনের উৎপীড়ন-নিপীড়ন বছরের পর বছর ভোগ করার পর অবশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে গোটা ইসরাঈলী সম্প্রদায় মিসর ত্যাগ করে পিতৃভূমি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে নৈশকালে যাত্রা শুরু করল। তখনকার যুগে বর্তমান কালের মতো নিয়মিত সড়ক পথ ও ল্যাম্প পোস্টের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে রাতের আঁধারে ইসরাঈলীরা পথ ভুল করলো এবং উত্তর দিকে আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে নিজেদের ডানে পূর্ব দিকে মোড় নেওয়ার পরিবর্তে প্রথমেই এদিকে মোড় নিয়ে বসলো। অন্যদিকে খবর পাওয়া মাত্র ফেরাউন স্বয়ং বাহিনী পরিচালনাপূর্বক প্রচণ্ড বেগে পিছু ধাওয়া করে এসে উপনীত হলো। এখন ইসরাঈলীদের সামনে অর্থাৎ পূর্ব দিকে সমুদ্র ছিলো, ডানে ও বামে তথা উত্তরে ও দক্ষিণে ছিলো পর্বতশ্রেণী এবং পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে ছিলো মিসরীয় বাহিনী। উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে উক্ত আয়াতে। তাওরাতে এটাকে ইসরাঈলীদের যাত্রা বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিশ্চিত করে যাত্রার সময় ও কাল নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার। আধুনিক গবেষণার আলোকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ সাহস করে সন-বছরও উল্লেখপূর্বক এটাকে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৪৭ সালের ঘটনা বলেছেন। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৯৭-৯৮]

قَوْلُهُ فِرْعَوْنَ : [ফেরাউন] নির্দিষ্ট কোনো বাদশার ব্যক্তিগত নাম নয়; বরং এটা প্রাচীন মিসর অধিপতিদের উপাধি বিশেষ যেমন আমাদের যুগে এই সেদিনও জার্মান অধিপতিকে সিজার এবং রুশ অধিপতিকে জার বলা হতো। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের ধারণায় একজন নয়, বরং পরপর দু'জন বাদশা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সমসাময়িক।

হযরত মূসা (আ.)-এর সমকালীন ফেরাউনের নাম : আহলে কিতাবদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সমকালীন ফেরাউনের নাম ছিল قَابُوْس [কাবুস]। ওয়াহাব বলেন, তার নাম ছিল وَلِيْدُ بْنُ مَصْعَبِ ابْنِ رَيَّانَ [ওলীদ ইবনে মাসআব ইবনে রাইয়ান]।

قَوْلُهُ اَشَدَّهُ سُوْءَ الْعَذَابِ : এর ব্যাখ্যায় اَشَدَّهُ উল্লেখ করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আজাবতো পুরোটাই মন্দ। এর তো কোনো ভালো দিক নেই। তাহলে سُوْءَ الْعَذَابِ -এর অর্থ কি?
জবাবে মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছে سُوْءَ الْعَذَابِ দ্বারা اَشَدَّ الْعَذَابِ উদ্দেশ্য।

لِاَنَّهُ اَقْبَحُهُ بِالْاِضَافَةِ اِلَى سَائِرِهِ

قَوْلُهُ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ : অর্থাৎ এটি পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এখানে بَيَان দ্বারা নাহু শাস্ত্রের بيان উদ্দেশ্য নয়। এখানকার বিবরণটি পরিপূর্ণ নয়, আংশিক। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, ফেরাউনের কর্মচারী হিসেবে বনী ইসরাঈলরা বিভিন্নভাগে বিভক্ত ছিল। যারা শক্তিশালী ও কর্মক্ষম ছিল তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে রেখেছিল। কেউ পাহাড় থেকে পাথর কেটে আনত। কেউ ফেরাউনের প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পাথর ও মাটি বহন করে আনত। কেউ ইট তৈরি করত। কেউ কাঠ মিস্ত্রি ও কামারের কাজ করত। আর যারা ছিল দুর্বল তাদের উপর আরোপ করা হয়েছিল বিভিন্ন কর ও ট্যাক্স। মহিলারা নিয়োজিত ছিল সূতাকাটা ও কাপড় বুনার কাজে। সুতরাং মুফাসসির (র.)-এর বক্তব্য بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهُ -এর মর্ম হলো بَعْضُ بَيَانٍ لِمَا قَبْلَهُ অর্থাৎ তন্মধ্যে হতে কিছু বর্ণনা।

قَوْلُهُ لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ : **ফেরাউনের স্বপ্ন :** একবার ফেরাউন একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে একটি আগুনের কুণ্ডলি বের হয়ে গোটা মিসরকে ঘিরে ফেলেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো সে আগুন কেবল মিসরের আদি অধিবাসী কিবতিদেরকেই জ্বালিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু বনী ইসরাঈলের কাউকে স্পর্শ করছে না। গণকরা ভবিষ্যদ্বাণী করল যে,

http://islamiboi.wordpress.com

ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলে জন্ম হবে যে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফেরাউন নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোনো রকম আশঙ্কা ছিল, না তাই তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইল। এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলরা সে নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্ণিত আয়াতে সে অনুগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ بَلَاءٌ : اِبْتِلَاءٌ وَاِنْعَامٌ : بَلَاءٌ -এর বিভিন্ন অর্থ আছে। ذَٰلِكُمْ দ্বারা জবাই -এর দিকে ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে বিপদ আর উদ্ধার করার প্রতি ইঙ্গিত হলে এর অর্থ হবে অনুগ্রহ। আর উভয়ের সমষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হলে অর্থ নেওয়া হবে পরীক্ষা। –[তাফসীরে উসমানী]

বনী-ইসরাঈলের দাসত্বের যুগ : উক্ত তিনটি আয়াতে তিনটি ঘটনার দিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। প্রথম ঘটনা তো হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে কঠিন পরীক্ষার ছিল। যার মধ্যে পুরো জাতি আক্রান্ত ছিল। বনী-ইসরাঈলের গোত্র দাসত্বের জিঞ্জিরে পূর্ব থেকেই কষে বাঁধা ছিল। এর মধ্যে যা কিছু ত্রুটি ছিল, তা ঐ কঠোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। যা হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাবের আশঙ্কাকে রোধ করার ব্যাপারে ফেরাউনের লোকজনের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের উপর আপতিত হয়েছিল। অজস্র নিষ্পাপ ও নিরপরাধ শিশুদেরকে শুধু হযরত মূসা (আ.) হতে পারেন– এ সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল।

আকবর এলাহাবাদী (র.) বুদ্ধিমত্তার ভাষায় বলেন– یوں تو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون نے کالج کی نہ سوجھا ۔

অর্থ : এভাবে শিশুদের হত্যার কারণে যত অধিক দুর্ণাম তার হয়েছে, ততো অধিক দুর্নাম তার হতো না। আফসোস যে, ফেরআউন বর্তমান পাশ্চাত্যের ন্যায় কলেজ স্থাপন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চিন্তা করেনি।

অর্থাৎ মূসা (আ.) ভূমিষ্ট হলে মানুষ হেদায়েতের পথে চলে আসবে। আর ফেরাউনের জুলুম ও কুফরের রাজত্ব ধ্বংস হবে। তাই ফেরাউন দেশবাসীকে পথভ্রষ্টতার ধোঁকার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) নামের সেই শিশুটি যাতে জন্ম না হতে পারে, সে পরিকল্পনা নিয়ে অসংখ্য শিশুকে হত্যা করে অনেক দুর্নামের ভাগী হয়েছে। তাই আল্লামা আকবর এলাহাবাদী (র.) আক্ষেপ করে বলেছেন যে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ও পথভ্রষ্টতায় রাখার জন্য ফেরাউনের অসংখ্য শিশুকে হত্যা করার প্রয়োজন ছিল না; বরং বর্তমানে পাশ্চাত্যের ন্যায় কলেজ স্থাপন করেও দেশবাসীকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো। যদি ফেরাউনের কলেজ স্থাপনের পদ্ধতি জানা থাকতো। শুধু তাই নয়; বরং দাসত্বের জিঞ্জিরগুলোকে আরো অধিক কষাণোর জন্য এবং নিজেদের কামনা-বাসনাসমূহের শিকার বানানোর জন্য মেয়েদেরকে জীবিতাবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হতো। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সূত্র ও অস্ত্রগুলোকে অধিক শক্তিশালী করা। আর এটাও যে, যে সকল ঈর্ষান্বিত লোকদের ধমনীতে গরম রক্ত হবে। তাদের কোমর ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সামানাদি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।

দাসত্ব থেকে মুক্তি : মোটকথা আল্লাহ তা'আলা ঐ নিকৃষ্ট বিপদ থেকে বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে সে দ্বিতীয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তাদের পৈত্রিক জন্মভূমি সিরিয়ার অন্তর্গত কেনআনের দিকে [যা মিশর থেকে ৪০ দিনের পথ [দূরত্ব] উত্তর দিকে ছিল [ভ্রমণ করতেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) -এর বরকতময় লাশের বাক্সও সাথে ছিল। এমতাবস্থায় লোহিত সাগর সামনে পড়ল এবং ফেরাউনের বিরাট সৈন্যদল পেছন থেকে সসৈন্যে তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য চলে আসতেছিল। কঠোর হতবুদ্ধিতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার বরকতে ও তার লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের মাঝে বারটি খান্দানের জন্য বারটি শুষ্ক রাস্তা খুলে দেওয়া হলো। যেগুলোর দ্বারা বনী-ইসরাঈল তো নিরাপদে পার হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউনের বিরাট সৈন্য বাহিনী ডুবে মারা গেল। خس کم شد جہاں پاك شد অর্থ– খড়কুটু আবর্জনা কমেছে জগৎ পবিত্র হয়েছে] জালেম ও শত্রুদের ধ্বংসকে এমনভাবে নিজ নয়নে দর্শন করা দ্বিগুণ নিয়ামত।

قَوْلُهُ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ : হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে বনী ইসরাঈল মিসর ত্যাগ করে যাওয়ার সময় ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিমধ্যে পড়ে সাগর। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছায় সাগর দ্বিধাবিভক্ত হয়। মধ্যখানে সৃষ্টি হয় শুষ্ক রাস্তা। বনি ইসরাঈল পার হয়ে যায় আর ফেরাউন সে পথ ধরে পার হতে চাইলে দলবলসহ ডুবে মরে।

بِكُمْ : তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের [রক্ষার] জন্য। তোমাদের পথ করে দেওয়ার জন্য।

فَرَقْنَا الْبَحْرَ . اَىْ فَرَقْنَا لَكُمْ (مَعَالِم) اَىْ فَرَقْنَا بِسَبَبِكُمْ وَبِسَبَبِ اِنْجَائِكُمْ . (كَشَّاف)

সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার তাৎপর্য : এখানে فَرْقُ الْبَحْرِ বা সমুদ্রকে বিভক্ত করার যে কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা সমুদ্রের বিভক্ত হওয়া এবং মধ্যখানে শুষ্ক পথ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য।

http://islamiboi.wordpress.com

আল্লামা আব্দুল মাজেদ (র.) বলেন– এটা এমন খুব একটা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঘটনা নয়, যার দৃষ্টান্ত দূর ও নিকট অতীতে কোথাও পাওয়া যায় না। সামুদ্রিক ভূমিকম্পের [সুনামি] সময় এ ধরনের অবস্থা প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারীতে [রমজান ১৩৫২ হিজরি] ভারতের বিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিলো, তখন প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর পাটনায় দিনে দুপুরে প্রায় আড়াইটার সময় এক বিরাট জনসমষ্টি স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিল যে, গঙ্গার মত সুবিশাল নদীর পানি চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে শুষ্ক তলদেশ বেরিয়ে এলো এবং কয়েক সেকেন্ড নয়; বরং চার থেকে পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়েছিলো এ অস্বাভাবিক ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অবশেষে একই রকম অবিশ্বাস্য গতিতে তলদেশ থেকে পানি বেরিয়ে এলো এবং নদী স্বাভাবিকভাবে পুনঃ প্রবাহিত হতে লাগল।

[লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পাইওনিয়ার ১৯৩৪ সালের ২০ জানুয়ারী সংখ্যায় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হয়েছে।] –[তাফসীরে মাজেদী খ.১, পৃ. ৯৮-৯৯]

قَوْلُهُ الْبَحْرَ : **বনী ইসরাঈল কোন নদী পাড়ি দিয়েছিল :** বাহর দ্বারা এখানে নীল নদের কথা বুঝানো হয়নি; বরং লোহিত সাগরের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ইসরাঈলীদের আবাসভূমির পশ্চিমে ছিল নীলনদের অবস্থান। পক্ষান্তরে ইসরাঈলীদের সিরিয়া অভিমুখী পথ ছিল পূর্ব দিকে। নীলনদের সাথে সে পথের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিলো না। মিসর থেকে সিরিয়া অভিমুখী পথের নিকটেই ছিল লোহিত সাগর। এর সংকীর্ণ উত্তর মাথার প্রতিই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মিসরের পূর্বাংশে যেখানে বর্তমানে 'সুয়েজ খাল' খনন করা হয়েছে, তার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের মানচিত্রে সমুদ্র দুই ত্রিভুজের আকারে বিভক্ত দেখা যায়। উক্ত ত্রিভুজদ্বয়ের পশ্চিম ত্রিভুজটিই এখানে উদ্দেশ্য। ইসরাঈলীরা সেটা পার হয়েই সিনাই উপদ্বীপে উপনীত হয়েছিলো। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : এ অংশটি উদ্দেশ্যহীন নয় কিংবা নিছক ছন্দ রক্ষার উদ্দেশ্য নয়; রবং অত্যন্ত জোরদারভাবে এ সত্য তুলে ধরা উদ্দেশ্য যে, এমন অমিত বিক্রম শত্রুবাহিনীর ধ্বংসলীলার দুর্লভ দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মদদ ছাড়া সম্ভব নয়। অথচ নিজের চোখেই তোমরা তা দেখছো।

হযরত মূসা (আ.)-এর তাওরাত প্রাপ্তি ও তাঁর অনুসারীদের ভ্রষ্টতা : এ ঘটনা ঐ সময়ের যখন ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিসরে ফিরে এসেছিল। আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল তখন হযরত মূসা (আ.)-এর খেদমতে বনী ইসরাঈলরা আরজ করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যদি আমাদের জন্য কোনো শরিয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসেবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো। হযরত মূসা (আ.)-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তুমি তূর-পর্বতে অবস্থান করে একমাস পর্যন্ত আমার আরাধনা ও অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে একটি কিতাব দান করবো। হযরত মূসা (আ.) তাই করলেন, ফলে তাওরাত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশ দিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকার নির্দেশ দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.) একমাস রোজা রাখার পর ইফতার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে রোজাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় বিধায় হযরত মূসা (আ.)-কে আরো দশদিন রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো হযরত মূসা (আ.) তো ওদিকে তূর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গো-বৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরি করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনি ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে আরম্ভ করে দিল। –[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ مُوْسٰى : মূসা ইবনে ইমরান হলেন ইসরাঈলী সিলসিলার সর্বাধিক খ্যাত ও মর্যাদার অধিকারী পয়গাম্বর। তাওরাত মতে একশ বিশ বছর বয়স পেয়েছিলেন তিনি। ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান মতে হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কাল ছিলো খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী। জন্ম ও মৃত্যু সম্ভবত যথাক্রমে খ্রিস্টপূর্ব ১৫২০ ও ১৪০০ সালে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً : অর্থাৎ দিবারাত্রি চল্লিশ দিন। কোনো কোনো তাফসীরকারের বর্ণনা মতে অবস্থানের সময়টা ছিল জিলকদের পূর্ণমাস এবং জিলহজের প্রথম দশদিন। হাকীমুল উম্মত থানভী (র.) বলেন, সুফী-সাধকদের সুপরিচিত চিল্লার উৎসমূল এটাই।

قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ : **বনী ইসরাঈলের মাঝে গো-বৎস পূজা যেভাবে এলো :** এ গুমরাহীর অনুপ্রবেশ ইসরাঈলীদের মধ্যে ঘটলো কিভাবে? এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে।এক বর্ণনা মতে মিসরীয়দের গো-পূজারই প্রতিবিম্ব ছিলো এটা। অন্যমতে এটা ছিল কেনানী [ফিলিস্তিনী] মুশরিক সম্প্রদায়ের প্রতিবেশি হওয়ার প্রভাব। তৃতীয় মতে গো-বৎস মূলত চন্দ্র দেবতার প্রতিমূর্তি ছিল এবং গো-বৎস পূজা চন্দ্র পূজারই সমার্থক ছিলো। অনুপ্রবেশের উৎস যাই হোক, কুরআন এটাকে জঘন্য শিরক বলেই আখ্যায়িত করেছে, হোক না তা [নাউযুবিল্লাহ] এক আল্লাহর কল্পিত মূর্তিরূপেই নির্মিত।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : [তোমাদের তওবা-ইসতিগফার এবং তোমাদের একটি বিশেষ দলের সাজা ভোগের পর] গো-বৎস পূজা ও শিরকের মতো জঘন্যতম অপরাধের শাস্তি তো গোটা সম্প্রদায়েরই পাওয়া উচিত ছিল। কেননা একদলের অপরাধ ছিল শিরক করা, পক্ষান্তরে অন্যদের অপরাধ ছিল দর্শকের ভূমিকা পালনপূর্বক অপরাধের সহযোগিতা করা। অথচ বাস্তবে নির্দিষ্ট একটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্টরা তওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে নিস্তার লাভ করেছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ . التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ : কিতাব তো ছিল তাওরাত, আর ফুরকান [সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী] দ্বারা সেই শরয়ী বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা বৈধ-অবৈধের জ্ঞান লাভ হয়। কিংবা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজিজাসমূহকে ফুরকান বলা হয়েছে, যার দ্বারা সত্যবাদী মিথ্যাবাদী ও কাফের-মু'মিনের পার্থক্য বুঝা যায়। কিংবা তাওরাতকেই ফুরকান বলা হয়েছে। তাওরাত যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তেমনি তার দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যও হয়ে যায়। –[তাফসীর উসমানী]

قَوْلُهُ الْفُرْقَانَ : শব্দার্থের দিক থেকে ফুরকান মানে এমন যে কোনো বিষয়, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করা যেতে পারে, (لِسَان) كُلُّ مَا فُرِّقَ بِهٖ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهُوَ فُرْقَانٌ কুরআনেরও অপর নাম হচ্ছে ফোরকান। হক-বাতিল তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী যে কোনো আসমানি গ্রন্থকেই ফোরকান বলা যেতে পারে। [রাগিব]। এখানে اَلْفُرْقَانُ-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। اَلْكِتٰبُ ও اَلْفُرْقَانُ উভয়ের মাঝে عَطْفِ تَفْسِيْر-এর সম্পর্ক এবং উভয় শব্দেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওরাত। আর তাওরাতের দুটি গুণগত দিক। প্রথমত তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হিসেবে আল-কিতাব, দ্বিতীয়ত তো সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হিসেবে আল-ফুরকান।

কওমের দুজন মূসা, যাদের নাম এক এবং কর্ম ভিন্ন : পরের আয়াতে একটি তৃতীয় ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে যে, লোহিত সাগর থেকে মুক্তি ও শত্রুদের ধ্বংসের পর গোত্রের লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে একটি আসমানি কিতাবের আবদার করেছে। অতঃপর তাদের আবদার গৃহীত হয়েছে এবং হযরত মুসা (আ.) চল্লিশ দিন পর্যন্ত তূর পর্বতে ভূষিত হয়ে তাওরাত কিতাব নিয়ে ফিরে এসেছেন। তখন [এ ৪০ দিনের মধ্যেও হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে] মূসা সামিরী যার নাম হযরত মূসা (আ.)-এর নামের সাথে মিল ছিল। সে একটি গো-বৎসের প্রতিমূর্তি তৈরি করে দিল এবং বনী ইসরাঈলরা তার পূজা করতে লাগল।

قَوْلُهُ السَّامِرِيُّ : সামিরীর আমল নাম মূসা। সে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের মুনাফিক। জন্মগতভাবে সে ছিল জারজ সন্তান। বংশগতভাবে ইসরাঈলী ছিল। তার মা লজ্জা এবং দুর্নামের ভয়ে তাকে পাহাড়ের গুহায় প্রসব করে সেখানেই ফেলে আসে। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে লালন-পালন করেছিলেন এবং সে স্বর্ণকার ছিল। জাতিকে একটি নতুন হাঙ্গামায় লিপ্ত করে দিল। অর্থাৎ স্বর্ণ–রৌপ্য দ্বারা একটি গো-বৎস তৈরি করে জাতিকে এর উপাসনায় লাগিয়ে দিল। যা দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত তাওহীদের ভিত্তি কম্পিত হয়ে গেল। সুতরাং ফিরে আসার পর হযরত মূসা (আ.) যখন এ দৃশ্য দেখেছেন, তখন অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এবং অসন্তুষ্টির কারণে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বুঝানোর পর গোত্রের লোকেরা তওবাকারী হয়েছে।

লক্ষ্য করুণ! কওমের মধ্যে একই নামের দু'জন মূসা, কিন্তু উভয়ের মাঝে জমিন ও আকাশের পার্থক্য রয়েছে। একজন আল্লাহর পুণ্যবান ও উচ্চ-মর্যাদাশীল পয়গাম্বর, অপরজন– কুচক্রী ও হারামজাদা। একজন তার শত্রু ফেরাউনের হাতে লালিত–পালিত এবং শত্রুর পাহারাদারীতে তাঁকে নিরাপদে রাখা হচ্ছে আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা ও ফেরাউনের ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু মূসা সামিরীর লালন-পালন হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.)-এর মতো সম্মানিত ফেরেশতা করেছেন। তারপরও সে হতভাগা রয়ে যায়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, পরিচর্যা ও শিক্ষাদান ঐ সময়ই কার্যকর হয় যখন মাণিক্য যোগ্যতা সম্পন্ন প্রকৃতিতে আমানত রাখা হয়। اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِىَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ [হতভাগা সেই হয়, যে নিজ মায়ের উদরে হতভাগা থাকে]

تہی دستان قسمت را چہ سود از رہبر کامل [যোগ্য পথ প্রদর্শক দ্বারা শূন্য কিস্‌সমত ওয়ালার কি উপকার হবে?]

اِذِ الْمَرْءُ لَمْ يَخْلُقْ سَعِيْدًا مِنَ الْاَزَلِ * فَقَدْ خَابَ مَنْ رَبِّىْ وَخَابَ الْمُؤَمِّلُ

অর্থ: যখন সে মানুষটিকে অবিনশ্বর এর পক্ষ থেকে সৌভাগ্যবান করে সৃষ্টি না করা হবে, তখন অবশ্যই ব্যর্থ হবে লালন পালনকারী এবং নিরাশ হবে আশার পাত্র।

فَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ .

অতএব ঐ মূসা যাকে লালন-পালন করেছেন হযরত জিব্রাঈল (আ.), সে হয়েছে কাফের আর ঐ মূসা (আ.) যাকে লালন-পালন করেছে ফেরাউন, তিনি হয়েছেন পয়গাম্বর।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٥٤. وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ الَّذِيْنَ عَبَدُوا الْعِجْلَ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ إِلٰهًا فَتُوْبُوْٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ خَالِقِكُمْ مِنْ عِبَادَتِهِ فَاقْتُلُوْٓا أَنْفُسَكُمْ اَىْ لِيَقْتُلَ الْبَرِئُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ ذٰلِكُمْ الْقَتْلُ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ . فَوَفَّقَكُمْ لِفِعْلِ ذٰلِكَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ سَحَابَةً سَوْدَاءَ لِئَلَّا يَنْصُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمَهُ حَتّٰى قُتِلَ مِنْكُمْ نَحْوُ سَبْعِيْنَ أَلْفًا فَتَابَ عَلَيْكُمْ . قَبِلَ تَوْبَتَكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

৫৪. যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের সেই লোকদেরকে বলল, যারা গো-বৎসের উপাসনা করেছিল হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তাওবা কর তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদের স্রষ্টার নিকট এর উপাসনা হতে এবং নিজেদেরকে তোমরা হত্যা কর অর্থাৎ তোমাদের নির্দোষজন দোষীজনকে যেন হত্যা করে। এটাই অর্থাৎ উক্তরূপে হত্যা করাই তোমাদের স্রষ্টার নিকট শ্রেয়। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এই কাজ করার তৌফিক দিলেন। হত্যা করার সময় একজন অপরজনকে দেখে যেন কোনোরূপ দয়ার উদ্রেক না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ঘনকাল একখণ্ড মেঘ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর প্রেরণ করেন। ফলে প্রায় সত্তর হাজার লোক তখন তোমাদের নিহত হয়। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন অর্থাৎ তোমাদের তওবা কবুল করলেন তিনি অত্যন্ত ক্ষমা পরবশ, পরম দয়ালু।

٥٥. وَإِذْ قُلْتُمْ وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوْسٰى لِتَعْتَذِرُوْا إِلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً عِيَانًا فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ الصَّيْحَةُ فَمُتُّمْ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ مَا حَلَّ بِكُمْ .

৫৫. যখন তোমরা বলেছিলে আর তখন তোমরা গো-বৎস উপাসনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নিকট ওজর ও কৈফিয়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে মূসার সঙ্গে বের হয়েছিলে এবং আল্লাহ তা'আলার কালামও শুনতে সক্ষম হয়েছিলে। হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে সামনাসামনি দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করবো না। অনন্তর তোমাদেরকে বজ্র মহা হুঙ্কার গ্রাস করল। ফলে তোমরা মারা গেলে আর তোমাদের উপর কি আপতিত হলো তা তোমরা নিজেরাই দেখছিলে।

٥٦. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ أَحْيَيْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعْمَتَنَا بِذٰلِكَ .

৫৬. মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করলাম জীবন দান করলাম যাতে তোমরা আমার এ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

http://islamiboi.wordpress.com

٥٧. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيْقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِى التِّيْهِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ فِيْهِ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ هُمَا التُّرَنْجَبِيْنُ وَالطَّيْرُ السُّمَّانِى بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ـ وَلَا تَدَّخِرُوْا فَكَفَرُوا النِّعْمَةَ وَادَّخَرُوْا فَقُطِعَ مِنْهُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا بِذٰلِكَ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ لِاَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ ـ

৫৭. আমি ছায়া বিস্তার করলাম তোমাদের উপর মেঘ দ্বারা তীহ ময়দানে সূর্য-তাপ হতে রক্ষা করার জন্য হালকা একখণ্ড মেঘ দ্বারা তোমাদের ঢেকে রেখেছিলাম, এবং তোমাদের নিকট সেখানে মানন্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম এই দুইটি হলো তুরানজবীন [বরফের ন্যায় সাদা মধুর মতো এক প্রকার দ্রব্য] এবং সুনামী পক্ষি [কবুতর হতে কিছুটা ছোট পাখি বিশেষ] اَلسُّمَّانِىْ শব্দটির ـ অক্ষর تَخْفِيْف লঘুভাবে এবং اَلِف অক্ষর قَصْر হ্রস্ব স্বরে পঠিত হয়। আর বলেছিলাম, তোমাদেরকে জীবনোপকরণরূপে যা দান করেছি, তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর আর তা সঞ্চয় করে রেখ না। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি অকৃজ্ঞতা প্রদর্শন করল এবং তা সঞ্চয় করে রাখল। ফলে তা বন্ধ হয়ে গেল। যাই হোক, তাদের এই কর্ম দ্বারা তারা আমার উপর কোনো জুলুম করেনি; বরং তারা নিজেদের প্রতিই অন্যায় করেছিল। কেননা তাদের এই আচরণের মন্দ পরিণাম তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে।

তাহকীক ও তারকীব

فَاقْتُلُوْا -এর মধ্যে فَاء সববিয়া এবং فَتُوْبُوْا থেকে বোধগম্য হচ্ছে। فَاقْتُلُوْا যা قَتْل হচ্ছে مُشَارٌ اِلَيْهِ -এর ذٰلِكُمْ -এর فَاء তাকীবিয়া। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, قَتْل তওবার পারিপূরক এবং فَتَابَ -এর মধ্যে فَاء মাহযূফের সাথে সম্পর্কিত اَىْ فَفَعَلْتُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ। لَكَ -এর মধ্যে لَام তা'লীলিয়া, তা'দিয়ার জন্য নয় তাই সন্দেহ করা যাবে না যে, ঈমান মুতাআদ্দী بِنَفْسِهٖ হয় بَاء -এর মাধ্যমে। لَام -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয় না। صَٰعِقَة অর্থাৎ জিবরাঈলী বজ্র এবং কেউ কেউ আসমানি বিজ্‌লী কিংবা বজ্র উদ্দেশ্য বলেছেন। تِيْه সিরিয়া ও মিশরের মাঝে ৯ মাইল এলাকা জুড়ে একটি বিরাট ময়দান যাতে ঘাস-দানা-পানির চিহ্ন ছিল না, যা হযরত মূসা (আ.) কেনআন যাওয়া পথে পড়তো। تُرَنْجَبِيْن বিশেষ এক প্রকার হালকা মিষ্টি খামির কে বলা হয়। سَلْوٰى কবুতরের চেয়ে ছোট চড়ূই-এর চেয়ে বড় এক প্রকার পাখী, যাকে بَٹیر বলা হয়। যা তিতির পাখী জাতীয়। এ পাখী বিনা কষ্টে ধরে তারা নিজেরা ভক্ষণ করত। অথবা পাকানো বা ভুনা করা অবস্থায় পেয়ে থাকত। قَالَ এর ফায়েল মূসা, لِقَوْمِهٖ মুতা'আল্লিক, يَا قَوْمِ অর্থাৎ يَا قَوْمِىْ - يَاء -কে تَخْفِيْفًا মুনাদার স্থানে হযফ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে مَقُوْلَه শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট তরকীব পরিষ্কার। قُلْتُمْ ফেয়েল বা ফায়েল يٰمُوْسٰى الخ مَقُوْلَه ـ

ظَلَّلْنَا লَكَ اَىْ لِاَجْلِكَ جَهْرَةً মাফউলে مُطْلَق -ও হতে পারে এবং فَاعِل অথবা مَفْعُوْل থেকে حَال -ও হতে পারে। ফেয়েল বা ফায়েল। اَلْغَمَامَ মাফউল, غَمَامٌ জিন্‌স, একবচনের জন্য।

غَمَامَ ـ كُلُوْا -এর মাফউল شَيْئًا মাহযূফ। এর বয়ান مِنْ طَيِّبَاتِ - طَيِّبَاتِ الخ মুযাফ, مَا رَزَقْنٰكُمْ মুযাফ ইলাইহি। اَنْفُسَهُمْ হলো يَظْلِمُوْنَ ফেয়েলের মাফউল।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উক্ত আয়াতগুলোতে **পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম**, অষ্টম ও নবম নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ : এখানে কওম দ্বারা বিশেষভাবে সেই লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা বাছুরকে পূজা করেছিল। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ فَتُوبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ : بَارِئ অর্থ خَالِق সৃষ্টিকারী। বলা হয় بَرَأَ اللّٰهُ الْخَلْقَ اَىْ خَلَقَهُمْ কেউ কেউ اَلْبَارِئُ এবং خَالِق -এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন- بَارِئ অর্থ اَلْمُبْدِعُ الْمُحْدِثُ আর خَالِق অর্থ اَلْمُقَدِّرُ النَّاقِلُ مِنْ حَالٍ بَرِئٍ মূলে একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তু পৃথক হওয়ার অর্থ রয়েছে। যখন রোগী সুস্থ হয়, তখন বলা হয়– بَرِئَ الْمَرِيْضُ مِنْ مَرَضِهٖ আবার ঋণগ্রস্ত যখন ঋণ থেকে মুক্ত হয় তখন বলা হয় بَرِئَ الْمَدْيُوْنُ مِنَ الدَّيْنِ এ থেকেই আল্লাহ তা'আলার সিফতী নাম اَلْبَارِئُ নির্গত। কেননা তিনি সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং عَدَم থেকে পৃথক করে وُجُوْد -এ এনেছেন। আবার এ থেকেই (اَلْبَرِيَّةُ بِمَعْنَى الْخَلِيْقَةِ (الْمَخْلُوْقِ -এর ব্যবহার রয়েছে। কেননা মাখলুক عَدَم থেকে পৃথক হয়ে وُجُوْد -এ এসেছে।

قَوْلُهُ اَىْ لِيَقْتُلَ الْبَرِئُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ : যেভাবে তওবার হত্যা সংঘটিত হয় : উক্ত তাওবার হত্যার পদ্ধতি হলো– যারা বাছুরকে পূজা করেনি, তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা করবে। উল্লেখ্য বনী ইসরাঈলে তিনদল লোক ছিল, একদল বাছুর পূজা হতে নিজেরাও বিরত থেকে ছিল অন্যদেরকেও বাধা দিয়েছিল। দ্বিতীয়দল, বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। তৃতীয় দল, নিজেরা পূজা করেনি, তবে অন্যদেরকে বাধাও দেয়নি। দ্বিতীয় দলকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তোমরা আত্মহত্যা কর। তৃতীয় দল সম্পর্কে নির্দেশ হয় যে, তাদেরকে হত্যা কর, যাতে তাদের নীরবতা অবলম্বনের তওবা হয়ে যায়। প্রথমদল এ তওবার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যেহেতু তাদের তওবার প্রয়োজন ছিল না। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তাদের তওবা গৃহীত হয়েছে এবং অপরাধীদের মধ্যে যারা নিহত হয়নি, তাদেরকে হত্যা ছাড়াই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

যখন হযরত মূসা (আ.) অপরাধীদেরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন তখন তারা বলল, আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানার ধৈর্য আমাদের নেই। তখন হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে দুই হাতে হাঁটু বেঁধে বসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যে তার বাঁধন খুলবে কিংবা হত্যাকারীর দিকে তাকাবে, সে অভিশপ্ত হবে। তার তওবা গ্রহণ করা হবে না। ফলে সকলে সেভাবে বসলো এবং হত্যাকারীরা তাদেরকে হত্যার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু আত্মীয়তার খাতিরে অন্তরের দয়া-মমতার কারণে তাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবেদন করলেন, আমরা তো এ বিধান পালন করতে পারছি না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কালো মেঘমালা দিয়ে পুরো এলাকা ঢেকে দিলেন। যাতে হত্যাকারী নিহতকে চিনতে না পারে। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার অপরাধীকে হত্যা করা হয়। সেদিন গোটা এলাকায় মাতম ও শোকের ছায়া বিরাজ করতে থাকে। এ করুণ অবস্থায় হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারুন (আ.) আল্লাহ তা'আলা কাছে কায়মনোবাক্যে তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করেন। ফলে মেঘমালা সরে যায় এবং তাদের তওবা গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আমি নিহত ও হত্যাকারী উভয়কেই জান্নাত দান করব? এরপর যারা নিহত হলো তারা শহীদ হিসেবে আখ্যা পেলেন। অবশিষ্টরা ক্ষমা লাভে ধন্য হলো।

পঞ্চম নিয়ামত : পঞ্চম নিয়ামতের সারাংশ হচ্ছে এটা যে, গো-বৎসের উপাসনার শাস্তির ব্যাপারে। সকলের নিহত হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু আমি ছয় লক্ষ থেকে শুধু ৭০ হাজার হত্যা হওয়ার পর ক্ষান্ত করেছি এবং নিহত ও আহত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছি। উক্ত আয়াত দ্বারা তাদের সে সময়ের আকিদা যে বাতিল তা বুঝা যাচ্ছে। সম্ভবত -গরু, বলদ ও বিড়ালের পূজাই মিশরীয়দের এ বিশ্বাসই ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

বনী-ইসরাঈল যেহেতু উগ্রপন্থি গোত্র ছিল এবং লাথির ভূত কথায় মান্য করত না। তাই কঠোর শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তওবার পদ্ধতি "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আমাদের শরিয়তের কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি তওবা সত্ত্বেও "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন قَتْلِ عَمْدٍ-এর শাস্তি قِصَاص আর কোনো কোনো অবস্থায় জিনার শাস্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা।

এ শাস্তির রহস্য এটা ছিল যে, শিরকে লিপ্ত হয়ে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তাই এর শাস্তি স্বরূপ নিজ দুনিয়াবী জীবনকে বিলীন করে দাও।

লাত্বায়েফ-এর মধ্যে ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ উম্মতের ওলীগণ বর্তমানেও 'মন' কে বিসর্জন এবং নফসে আম্মারাকে বিলীন করতেছেন।

ষষ্ঠ নিয়ামত : ষষ্ঠ নিয়ামত সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ম'তভেদ রয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যিনি সীরাত ও মাগাযী বিষয়ের ইমাম, তার অভিমত হচ্ছে যে, 'কতলে তওবা'র এ হুকুম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) তার উম্মত থেকে ৭০ জন ওলী নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সুদ্দী (র.) বলেন যে, 'কতলে তওবা'র হুকুম প্রয়োগের পর হযরত মূসা (আ.) ওলীগণের সে জামাতকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন এবং সকলে মিলে আল্লাহর কালাম শুনেছেন– إِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اَخْرَجْتُكُمْ مِنْ اَرْضِ مِصْرَ بِيَدٍ شَدِيْدَةٍ فَاعْبُدُوْنِيْ وَلَا تَعْبُدُوْا غَيْرِيْ এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সকলে একমত হয়ে প্রার্থনা করেছে لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً :

ওজরখাহী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবি : এটা বাছুর পূজার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে নিয়ে তার কাছে বাছুর পূজার ব্যাপারে ওজরখাহী করার জন্য। হযরত মূসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজরখাহী করার জন্য তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনে তারা সত্তরজনেই বলল, হে মূসা! আড়াল থেকে শুনা আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তুমি আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুস দেখাও। এর ফলে তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা এখানে قَائِل হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নির্বাচিত সত্তরজন ব্যক্তি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– وَاخْتَارَ مُوْسٰى سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِمِيْقَاتِنَا

قَوْلُهُ «فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ» اَلصَّيْحَةُ فَمُتُّمْ : اَلصَّيْحَةُ অর্থ ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, তারা اَلرَّجْفَةُ তথা ভূ-কম্পনে মারা গিয়েছে। উভয়টির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, হয়তো বিকট শব্দ ও ভূ-কম্পন উভয়টিই হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : অর্থাৎ বজ্র পতিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থাসমূহ দেখছিলো। কিংবা তোমরা একজন অপরজনের দিকে দেখছিলে যে, কিভাবে তার মৃত্যু হচ্ছে। এরপর তোমাদের সকলেই মারা যায়।

কেউ কেউ اَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা বেহুঁশ হওয়া মুরাদ নিয়েছেন। তারা فَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ-কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। কেননা اِفَاقَةٌ তো غَشِيٌ থেকেই হয়ে থাকে, মৃত্যু থেকে নয়। মুফাসসির (র.) اَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবং পরে উল্লিখিত ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ-কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। এটিই রাজেহ বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত

قَوْلُهُ «ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ» اَحْيَيْنَاكُمْ «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ» :

বজ্রাহতদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এই লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোনো উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানিপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন! তাই আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

http://islamiboi.wordpress.com

আল্লাহর দর্শন এবং মু'তাযিলা ও বস্তুবাদী সম্প্রদায় : মু'তাজিলারা فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ দ্বারা আল্লাহর দর্শন অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছে। অর্থাৎ যেহেতু অসম্ভবের আবদার করেছিল। তাই তাদের উপর এ বজ্র পড়েছে। কিন্তু ব্যাপার এটা নয়; বরং দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার যুক্তির নিরিখে সম্ভব। যেমন হযরত মুসা (আ.) -এর আবদার رَبِّ اَرِنِى -এর উপর প্রমাণ বহন করেছে। হ্যাঁ, দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে নেই। এ ঔদ্ধত্যের কারণে যে, নিজ ক্ষমতার চেয়ে অধিক তারা নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করেছে। তাই তারা এ শাস্তি পেয়েছে। তারপর বাস্তববাদীদের এ ব্যাখ্যা করা যে, তাদের মৃত্যু হয়নি; বরং বজ্রের আঘাতে তারা শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং সে পাহাড়টি অগ্নি বিচ্ছুরণকারী পাহাড় ছিল বলে এর থেকে সর্বদা এমন অগ্নিশিখা বের হতে থাকত। এটা আল্লাহর তাজাল্লী [ঝলক] ছিল না; এসব দৃষ্টিদানের যোগ্য কল্পনা নয়। −[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭১]

তাওয়াক্কুল এবং গুদামজাত করণ : সপ্তম ও অষ্টম নিয়ামতের সারাংশ এটা যে, এ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ময়দানে তীহ্ যেখানে কোথাও কোনো বৃক্ষ ও ছায়া ছিল না এবং পানির কোনো চিহ্ন ছিল না, সেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি হালকা মেঘকে তাদের উপর ছায়া বিস্তারকারী করে দিলেন। যার কারণে না রৌদ্রের তাপ স্পর্শ করেছিল, না অন্ধাকারের বিপদে অসুবিধায় পড়েছিল। আর ক্লেশ ব্যতীত পানাহারের এ ব্যবস্থা করেছেন যে, এক প্রকার মিষ্টি খামির ও ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। অতি মোলায়েম ও অধিক সুস্বাদু নিয়ামতের দস্তরখান হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ দুটি বস্তুই পরিমাণ ও গুণ-মানের দিক দিয়ে যেহেতু অসাধারণ ছিল তাই এটা মুজিযা হয়েছে। কিন্তু এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, গুদামজাত করা তাওয়াক্কুলের মর্যাদার পরিপন্থি। এ গায়েবী ভাণ্ডারের উপস্থিতিতে কক্ষনো এমনটি না করা চাই। এমন করলে নিয়ামতের না-শুক্‌রী হবে। কিন্তু তারা-এর কদর না করে হুকুমের বিরোধিতা করেছে। তাই আল্লাহ তাদের থেকে এসব নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন। −[প্রাগুক্ত]

তীহ প্রান্তরের ঘটনা : বনি ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সময়ে তারা মিসরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর 'আমালেকা' নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরআউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ পাক আমালেকাদের সাথে জিহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনি ইসরাঈল এতদুদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হলো। শামের সীমান্তে পৌছার পর আমালেকাদের শৌর্য-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়লো এবং জিহাদ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করলেন। তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরা আর তাদের ভাগ্যে জোটেনি। সে সময় হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় আল্লাহ তা'আলা সে প্রান্তরে সাদা সাদা মেঘমালা দ্বারা তাদেরকে ছায়া প্রদান করেন। যাতে সূর্যের তাপযন্ত্রণা লাঘব হয়। আর সেখানে তাদের আহারের জন্য মান্না-সালওয়া নাজিল করেন। সেই সঙ্গে অন্ধকার রাতে পথ চলার জন্য একটি আলোর স্তম্ভও তৈরি করে দেন।

−[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.), কওমে ইয়াহুদ আওর হ্যাম।]

قَوْلُهُ فِى التِّيْهِ : هُوَ الْاَرْضُ بَيْنَ الشَّامِ وَالْمِصْرِ وَقَدْرُهُ تِسْعُ فَرَاسِخَ অর্থাৎ তীহ প্রান্তরটি শাম ও মিসরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, তার পরিমাণ হলো নয় ফারসাখ।

قَوْلُهُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى : مَنٌّ এক প্রকার সুস্বাস্থ্যকর খাদ্য, যা ধনিয়ার সদৃশ শিশির বিন্দুর ন্যায় তাদের চারপাশে পড়ে জমে থাকতো। سَلْوٰى এক প্রকার পাখি, যাকে বটের (بٹیر) বলা হয়। সন্ধ্যাকালে তাদের চারপার্শ্বে হাজার হাজার এসে জমা হতো। অন্ধকার হলে তারা সেগুলো ধরে আনত এবং কাবাব বানিয়ে খেত। বহুদিন যাবত এটাই ছিল তাদের খাদ্য।

−[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১১, টীকা. ৭]

পাপের সাথে নিয়ামত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুযোগ দেওয়া : উপরিউক্ত আয়াত এ ব্যাপারে প্রমাণ যে, গুনাহ্‌সমূহ থাকা সত্ত্বেও নিয়ামতসমূহ চালু থাকা প্রকৃত পক্ষে সুযোগ দেওয়া। যা চিন্তা ও ভয়ের কারণ, খুশি ও শান্তির উৎস নয়। যারা গুনাহ করা সত্ত্বেও সম্পদ ও সম্মানের আধিক্যেকে গৌরবের উৎস মনে করে তারা একেবারেই নির্বোধ।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৫৮. وَإِذْ قُلْنَا لَهُمْ بَعْدَ خُرُوجِهِمْ مِنَ التِّيهِ ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَوْ أَرِيحَا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاسِعًا لَا حَجَرَ فِيهِ وَادْخُلُوا الْبَابَ أَيْ بَابَهَا سُجَّدًا مُنْحَنِيْنَ وَقُولُوا مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ أَيْ أَنْ تُحِطَّ عَنَّا خَطَايَانَا نَغْفِرْ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مَبْنِيًا لِلْمَفْعُوْلِ فِيهِمَا لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا

৫৮. আর যখন আমি তাদেরকে বললাম তীহ প্রান্তর হতে নিষ্ক্রমনের পর এই জনপদে বায়তুল মুকাদ্দাস কিংবা আরীহা প্রবেশ কর, যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে প্রচুর আহার কর এতে কোনো বাধা নেই এবং তার দ্বারে প্রবেশ কর সেজদাবনতভাবে নতশিরে এবং বল আমাদের প্রার্থনা হলো, ক্ষমা অর্থাৎ আপনি আমাদের পাপসমূহ বিদূরিত করে দিন আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং আনুগত্য প্রদর্শনের ফলশ্রুতি স্বরূপ সৎকর্ম পরায়ণ লোকদের পুণ্যফল বৃদ্ধি করব।

نَغْفِرْ ক্রিয়াটির ي নাম পুরুষ, পুংলিঙ্গ ও ت [নাম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ] সহকারে পাঠ করা হয়েছে। এই উভয় অবস্থায় ক্রিয়াটি مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পড়া হবে।

৫৯. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ وَدَخَلُوا يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ مُبَالَغَةً فِي تَقْبِيْحِ شَأْنِهِمْ رِجْزًا عَذَابًا طَاعُوْنًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ أَيْ خُرُوجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَهَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ ـ

৫৯. কিন্তু তাদের যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। তারা বলেছিল, আমাদের প্রার্থনা হলো যবের দানা। আর তারা নতশিরে প্রবেশ করার পরিবর্তে শিড়দাড়া সোজা রেখে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চেছড়িয়ে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি প্রেরণ করলাম আকাশ হতে শাস্তি আজাব অর্থাৎ প্লেগ মহামারি কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল তাদের ফিসক অর্থাৎ আনুগত্য পরিত্যাগ করার কারণে এই অবস্থা হয়েছিল। ফলে মুহূর্তের মধ্যে তাদের সত্তর হাজার বা কিছু কম সংখ্যক লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا তাদের অবস্থার হীনতার আধিক্য (مُبَالَغَة) প্রকাশার্থে এই স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করার স্থলে [অর্থাৎ عَلَيْهِمْ না বলে] اِسْم ظَاهِر বা স্পষ্টভাবে বিশেষ্যের [অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا] ব্যবহার করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

تِيْه বাবে ضَرَبَ থেকে বিভ্রান্ত হওয়া। দিশেহারা হওয়া। যেহেতু এ নির্দিষ্ট ময়দানটি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। যার কারণে দর্শক লোকেরা অস্থির ও দিশেহারা হতো তাই এ নাম (تِيْه) পড়ে গেছে। سُجَّدًا -এর পরে مُنْحَنِيْنَ বলে মুফাস্‌সির (র.) حَال হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। حِطَّةٌ শব্দটি فِعْلَةٌ -এর ওজনে। جِلْسَةٌ -এর মত حِطَّةٌ শব্দটি মুবতাদায়ে মাহ্‌যূফের খবর اَيْ مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ যবর থেকে পেশ -এর দিকে সর্বদা ও স্থায়িত্বের জন্য পরিবর্তন করা হয়েছে। এটা তাদের কালিমায়ে ইস্তেগ্‌ফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনার বাক্য ছিল] কিন্তু তারা حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ দ্বারা পাল্টে দিয়েছে অর্থাৎ গমের দানা চুলের মধ্যে রয়েছে। مِنْهُمْ দ্বারা জানা গেল যে, সকলে এমন করেনি। فَقَالُوْا দ্বারা মুফাস্‌সির (র.) বলতেছেন যে, কথায় ও কাজে উভয়ভাবে বিরোধিতা করেছে। فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ এ জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, عَلَيْهِمْ সংক্ষিপ্ত যমীরের স্থানে দীর্ঘ ইবারত اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এ জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, তাদের মন্দতা প্রকাশ হয়ে সামনে এসে যায়। رِجْزًا -এর ব্যাখ্যা طَاعُوْن দ্বারা করেছেন। طَاعُوْن অর্থ– মহামারি। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েত তাদের উপর আসমানি আগুন নাজিল হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। اُدْخُلُوْا ফেয়েল-ফায়েল। هٰذِهِ الْقَرْيَةَ মউসূফ সিফত মিলে مَفْعُوْل فِيْهِ হয়েছে اُدْخُلُوْا ফেয়েলের এবং قُلْنَ -এর مَقُوْلَه - رَغَدًا মাফঊলে مُطْلَق কিংবা حَال; سُجَّدًا - سَاجِدٌ এর বহুবচন, حَال হয়েছে اُدْخُلُوْا -এর ফায়েল থেকে اَيْ مُتَوَاضِعِيْنَ - حِطَّةٌ মুবতাদা মাহযূফের খবর। সব মিলে قُوْلُوْا -এর مَقُوْلَه - نَغْفِرْ لَكُمْ মাজযূম। اَمْر -এর জওয়াব। فَبَدَّلَ ফেয়েল। اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ফায়েল। بِالَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ মাফঊলে اَوَّل মাহ্‌যূফ, قَوْلًا মাউসূফ غَيْرَ الَّذِيْ সিফত, সবমিলে দ্বিতীয় মাফঊল - مِنَ السَّمَاءِ মুতা'আল্লিক হয়ে رِجْزًا -এর সিফত।

عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ : اَسْتَاهٌ (ج) اِسْتٌ অর্থ– নিতম্ব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহর নিয়ামতের অবমূল্যায়নের পরিণামের ব্যাখ্যা : কোনো কোনো মুফাস্‌সিরের মন্তব্যে এটাও ময়দানে তীহের ঘটনা। যখন মান্না ও সালওয়া খেতে খেতে তাদের মন নিরানন্দ ও বিরক্ত হতে লাগল, তখন তারা অভ্যাস মোতাবেক খানার জন্য আবদার করতে লাগল। তখন হুকুম হলো যে, তোমরা যে খাদ্যের আবদার করছ। সেটা নগরবাসীর খাদ্য। সেটা তো নগরেই পাওয়া সম্ভব। এ পরিষ্কার ময়দানে সে খাদ্য কোথায় পাবে? যদি তোমাদের সে খাদ্যের প্রয়োজন থাকে, তবে তোমাদের সামনে যে শহর রয়েছে, সেখানে যাও! কিন্তু প্রবেশকালে কথায় ও কাজে আদব রক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ, শহরের মধ্যে গিয়ে পানাহারের প্রশস্ত ব্যবস্থা করে নেবে। আর কোনো কোনো মুফাস্‌সির এ ঘটনাকে সে শহরের সাথে সংযুক্ত মনে করেছেন, যে শহরে জিহাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে জয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতএব ৪০ বৎসর পর্যন্ত ময়দানে তীহের মধ্যে দিশেহারা ও অস্থির অবস্থায় ঘুরতেছিল। প্রায় ছয় লক্ষের এ বিশাল বাহিনী এ ময়দানেই মরে পচে শেষ হয়ে গেল। শুধু বিশজন বেঁচে ছিল। হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর ওফাতও এখানেই হয়েছে। তাদের ওফাতের পর তাদের স্থলাভিষিক্ত হযরত ইউশা বিন নূন (আ.)-এর নেতৃত্বে এ জিহাদের গুরুদায়িত্ব সমাপ্ত হয়েছে। এবং আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান করেছেন। যেন শহরে প্রবেশের এ নির্দেশ তার মাধ্যমে হয়েছে যে, অহংকারী ও বিজয়ীরূপে কক্ষণো প্রবেশ করবে না; বরং নম্র ও বিনীতভাবে ঢুকতে হবে। এমন করলে অতীতের গুনাহ্ আমি ক্ষমা করে দেব এবং ভবিষ্যতে একাগ্রতার সাথে নেক আমলকারীদেরকে অধিক পুরস্কার দেব। কিন্তু অবাধ্যতার মন্দ পরিণাম প্লেগ ও আসমানি বালারূপে ফুটে উঠেছে।

বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাসস্থান মিসরে পৌঁছার জন্য সারা দিন চলার পর রাতে কোনো মঞ্জিলে অবস্থান করত; কিন্তু ভোরে উঠে দেখতে পেত, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ করছিল। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭২]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَادْخُلُوا الْبَابَ : الْبَابَ দ্বারা নগর প্রাচীরের প্রবেশদ্বার বুঝানো হয়েছে। প্রাচীনকালে নগরের চার পাশে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করা হতো। শহরে প্রবেশ করতে হলে সে প্রবেশদ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে হতো।

قَوْلُهُ سُجَّدًا : তাফসীরে খাজিনে উল্লেখ রয়েছে– এখানে সিজদা দ্বারা মাটিতে কপাল রাখা উদ্দেশ্য নয়; বরং রুকুর মত মাথা ঝুঁকানো উদ্দেশ্য। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ مُنْحَنِيْنَ : أَيْ مُتَوَا ضِعِيْنَ এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে বুঝানো হয়েছে যে, سُجَّدًا শব্দটি حَال হিসেবে নসব হয়েছে।

قَوْلُهُ مَسْأَلَتُنَا حِطَّةٌ : (أَيِ الَّذِيْ نَسْأَلُهُ حِطَّه) হুবহু حِطَّةٌ শব্দ বলাই উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটি আরবি শব্দ। আর বনি ইসরাঈলের ভাষা ছিল ইবরানী। حِطَّةٌ অর্থ– তওবা-ইস্তিগফার। এর তাৎপর্য এই ছিল যে, অন্তরের বিনয়ের সাথে মুখেও তওবা-ইস্তিগফার করতে করতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ হুবহু حِطَّةٌ শব্দটিই উচ্চারণ করার কথা বলেছেন। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ : زَحْفًا (ف) زَحَفَ হামাগুড়ি দিয়ে চলা। বুকে ভর করে চলা।

مُبَالَغَةً فِىْ تَقْبِيْحِ شَانِهِمْ : এ থেকে বুঝা যায় যে, وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ কোনো প্রয়োজনেই করা হয়ে থাকে। কখনো সম্মান বুঝানোর জন্য। যেমন– أُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ الخ কখনো অসম্মান ও তুচ্ছতা জ্ঞাপনের জন্য। যেমন– أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ الخ আবার কখনো ভ্রম ও সন্দেহ নিরসনের জন্য ব্যবহার করা হয়। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ «رِجْزًا» عَذَابًا طَاعُوْنًا : সাধারণভাবে সব ধরনের আজাবকে رِجْز বলা হয়।

قَوْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ : أَىْ مُقَدَّرٌ مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ আসমান থেকে বৃষ্টি বা শিলাখণ্ডের মতো পতিত হয়নি কিংবা সে মহামারি প্রাকৃতিক কোনো কারণে সৃষ্টি হয়নি; বরং তা আসমানি প্রভুর পক্ষ থেকে আপতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ : এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মহামারির প্রকৃত কারণ প্রাকৃতিক ছিল না; বরং তার কারণ ছিল রূহানী ও আখলাকী বিপর্যয় এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১১৩]

রোগ ও মহামারি ইত্যাদির প্রকৃত কারণ : মহামারী যেখানেই আসে সেখানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, প্রাকৃতিক অনেক কারণ হয়ে থাকে। সম্ভবত আল্লাহর নাফরমানি এবং গুনাহ্সমূহও এর প্রকৃত মৌলিক কারণ হতে পারে। যেমন–

১. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ فِى.

২. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ الخ

ইত্যাদি মূল সূত্রগুলো এর উপর প্রমাণ করছে এবং হাদীসের দৃষ্টিতে এ মহামারিসমূহ নেক লোকদের জন্য রহমত আর অপরাধীদের জন্য অশান্তির উৎস।

http://islamiboi.wordpress.com

٦٠. وَ اذْكُرْ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى اَيْ طَلَبَ
السُّقْيَا لِقَوْمِهٖ وَقَدْ عَطِشُوْا فِى التِّيْهِ
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط وَهُوَ
الَّذِيْ فَرَّ بِثَوْبِهٖ خَفِيْفٌ مُرَبَّعٌ كَرَأْسِ
رَجُلٍ رُخَامٌ اَوْ كَذَّانٌ فَضَرَبَهٗ فَانْفَجَرَتْ
اِنْشَقَّتْ وَسَالَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا ط بِعَدَدِ الْاَسْبَاطِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
اُنَاسٍ سِبْطٍ مِنْهُمْ مَّشْرَبَهُمْ ط مَوْضِعَ
شُرْبِهِمْ فَلَا يُشْرِكُهُمْ فِيْهِ غَيْرُهُمْ
وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ
اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ .
حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِيَ بِكَسْرِ
الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ .

অনুবাদ :

৬০. আর স্মরণ কর যখন মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি চাইলেন প্রার্থনা করলেন। তারা তীহ ময়দানে পিপাসিত হয়ে পড়েছিল। আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। এটি সেই পাথর যে পূর্বে একবার তার [মূসা (আ.)-এর] কাপড়-চোপড়সহ পলায়ন করেছিল। তা ছিল মস্তকাকৃতির পাতলা, চতুষ্কোণ একটি সাদা বা মসৃণ পাথর। অনন্তর হযরত মূসা (আ.) তাতে আঘাত করলেন। ফলে তা হতে উপগোত্রসমূহের সংখ্যা হিসেবে বারোটি ঝর্না ধারা প্রবাহিত হলো অর্থাৎ তা ফেটে গেল এবং পানি বয়ে চলল। প্রত্যেক লোক তাদের প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ স্থান পানি পান করার নির্ধারিত স্থান চিনে নিল। এতে একদল অপরদলের সাথে শরিক ছিল না। আর তাদেরকে বললাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হয়ে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।

مُفْسِدِيْنَ শব্দটি এই স্থানে তার عَامِل অর্থাৎ لَا تَعْثَوْا হতে حَال مُؤَكِّدَة বা তাকিদসূচক ভাব ও অবস্থাবাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

عَثِيَ ক্রিয়াটির মধ্যাক্ষর ث তে যের, যবর পেশ এই তিনটি হরকতেরই ব্যবহার রয়েছে। এর অর্থ, অনর্থ সৃষ্টি করা।

٦١. وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى
طَعَامٍ اَيْ نَوْعٍ مِنْهُ وَّاحِدٍ . وَهُوَ الْمَنُّ
وَالسَّلْوٰى فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
شَيْئًا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ لِلْبَيَانِ
بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا حِنْطَتِهَا
وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ط قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى
اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى اَخَسُّ .

৬১. যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই খাদ্যে অর্থাৎ একই প্রকারের খাদ্য মান্না ও সালওয়ায় [কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর! তিনি যেন আমাদের জন্য উৎপাদন করেন কিছু ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সবজি, কাঁকুর, ফুম গম মসুর ও পেয়াজ হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি উত্তম উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিম্নতর নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? অর্থাৎ তার পরিবর্তে এটা গ্রহণ করতে চাও? শেষ পর্যন্ত ইসরাঈলীগণ তাদের দাবি হতে ফিরে আসতে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। তারপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমরা নেমে যাও অবতরণ কর শহরসমূহের কোনো একটি শহরে। তোমরা যা চাও অর্থাৎ শাক-সবজি ইত্যাদি তথায় তা আছে

http://islamiboi.wordpress.com

بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ط اَشْرَفُ اَىْ تَأْخُذُوْنَهُ بَدْلَهُ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ فَاَبَوْا اَنْ يَرْجِعُوْا فَدَعَا اللّٰهَ فَقَالَ تَعَالٰى اِهْبِطُوْا اِنْزِلُوْا مِصْرًا مِنَ الْاَمْصَارِ فَاِنَّ لَكُمْ فِيْهِ مَا سَاَلْتُمْ ط مِنَ النَّبَاتِ وَضُرِبَتْ جُعِلَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ وَالْمَسْكَنَةُ اَيْ اَثَرُ الْفَقْرِ مِنَ السُّكُوْنِ وَالْخِزْيِ فَهِىَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَاِنْ كَانُوْا اَغْنِيَاءَ لُزُوْمَ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ لِسِكَّتِهِ وَبَاءُوْا رَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ اَيِ الضَّرْبُ وَالْغَضَبُ بِاَنَّهُمْ اَيْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اَيْ ظُلْمًا ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ يَتَجَاوَزُوْنَ الْحَدَّ فِى الْمَعَاصِىْ وَكَرَّرَهُ لِتَاكِيْدِ ـ

مِنْ بَقْلِهَا-এর مِنْ শব্দটি بَيَان বা বর্ণনাত্মক। أَتَسْتَبْدِلُوْنَ : এই স্থানে প্রশ্নবোধক أ [হামজাটি] اِنْكَار বা অসম্মতিসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর ছাপ মেরে দেওয়া হলো তাদের উপর লাঞ্ছনার অবমাননার ও দুর্বলতার এবং দরিদ্রের। اَلْمَسْكَنَةُ শব্দটি سُكُوْن হতে উদগত। অর্থাৎ দারিদ্র ও লাঞ্ছনার আছর তাদের উপর আপতিত থাকবে। মুদ্রার সাথে যেন তার ছাপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিচ্ছিন্ন হয় না কখনো; তেমনি তারা [বাহ্যত] সম্পদশালী হলেও এই অবস্থা [মানসিক দরিদ্রতা] সব সময় তাদের সাথে অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে. আর তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ সহকারে প্রস্থান করল ফিরল এটা অর্থাৎ তাদের উপর এই ছাপ ও ক্রোধ এই জন্য যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত অস্বীকার করত এবং নবীগণকে যেমন হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.) অন্যায়ভাবে জুলুম করে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের পাপাচারের সীমা অতিক্রম করার দরুন তাদের এই পরিণতি।

بِاَنَّهُمْ-এর ب অক্ষরটি হেতু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا এই স্থানে [ذٰ] শব্দটি تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْحَجَرَ : হতে পারে এর দ্বারা বিশেষ কোনো পাথর বোঝানো হয়েছে। এ সূরতে اَلِف ـ لَام টি হবে আলিফ লামে আহদী। আবার নির্দিষ্ট কোনো পাথর না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুরতে اَلِف ـ لَام টি আলিম লামে জিনসী। আর এমনটি হওয়াই মু'জিযার জন্য অধিক প্রযোজ্য।

আবূ ওয়াহ্যাব বলেন, এটি নির্দিষ্ট কোনো পাথর ছিল না; বরং হযরত মূসা (আ.) যে কোনো পাথরে আঘাত করলেই তা থেকে ঝর্না সৃষ্টি হতো। কেউ কেউ বলেন, সেটি নির্দিষ্ট পাথর ছিল। মূসা (আ.) সেটি তাঁর থলের ভেতর রাখতেন। পানির প্রয়োজন হলে তাতে লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন। ফলে তা থেকে পানি নির্গত হতো। প্রয়োজন শেষে ফের আঘাত করলে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেত।

قَوْلُهُ كُلُّ اُنَاسٍ : এখানে كُلّ দ্বারা كُلُّ اَفْرَادِىْ উদ্দেশ্য। اَىْ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاَسْبَاطِ

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ مَوْضِعَ شُرْبٍ : مَشْرَبَ -এর ব্যাখ্যায় مَوْضِعَ شُرْبٍ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَشْرَبَ শব্দটি ظَرْف হয়েছে, مَصْدَر مِيْمِي নয়। কেননা مَصْدَر -এর সূরতে অর্থ শুদ্ধ হয় না।

فَانْفَجَرَتْ -এর মধ্যে فَصِيْحَة فَا، তাই এর পূর্বে فَضَرَبَ بِهٖ মুক্বাদ্দার মানা হয়েছে এবং এ হযফের মধ্যে সূক্ষ্মতা হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে ضَرْب كَلِيْم [হযরত মূসা (আ.)-এর আঘাতের] কোনো দখল নেই; বরং মূলস্বত্ব ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হচ্ছে আমার নির্দেশ। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আওলাদ যেহেতু ১২ জন ছিলেন, যাদের থেকে এ বংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ পর্যন্ত বিস্তার ঘটেছে যে এ সময় ছয় লক্ষজন হয়েছে, যারা ১২ মাইল এলাকা জুড়ে তাঁবু গেড়ে ছিল। যারা বর্তমানে ব্রাহ্মণ ও নন ব্রাহ্মণ প্রশ্নে কূপ ও মন্দিরসমূহে দর্শন দিচ্ছে তারা সম্ভবত সে সংকীর্ণ সীমিত পরিবেশের ছায়াদৃশ্য হবে।

طَعَامٍ وَاحِدٍ -এর উপর যেহেতু এ আপত্তি রয়েছে যে, খাদ্য একটি ছিল না; বরং تُرَنْجَبِيْن এবং بٹیر দু' প্রকার খানা ছিল। মুফাসসির (র.) সে আপত্তিকে দূর করেছেন যে, উদ্দেশ্য হচ্ছে এক ধরন। অর্থাৎ طَعَام وَاحِد বলে স্বাদ উপভোগকারী সুখী ও ধনীদের খানা-খাদ্য উদ্দেশ্য কেননা গরিব মানুষ তো যা সহজে পায়, তার উপরই পরিতৃপ্তি করে নেয়। গরিবের কাছে রকম রকমের পোশাক ও রকমের খানা-খাদ্যের যোগান কঠিন ব্যাপার এর বিপরীত হচ্ছে ধনীদের ব্যাপার। যেমনটা কাজী বায়যাবী (র.) বলেছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, طَعَام وَاحِد দ্বারা উদ্দেশ্য, উভয় বস্তুকে মিশ্রিত করে এক প্রকার খানা তৈরি করতো। شَيْئًا শব্দ বের করে ইঙ্গিত করেছেন। مِنْ তাবঈযিয়্যাহ। فُوْم -এর অর্থ মুফাসসির (র.) গম বলেছেন। আর কোনো কোনো আভিধান বেত্তা এর দ্বারা "রসুন" এর অর্থ নিয়েছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে ثُوْم -ও এসেছে এবং তাওরাত কিতাবে "রসুন" ই উদ্দেশ্য। مِصْر দ্বারা উদ্দেশ্য যে কোনো শহর, নির্দিষ্ট মিশর দেশ উদ্দেশ্য নয়। اَرِيْحَا একটি নিম্নাঞ্চল ও সবুজ শ্যামল এলাকা, যার মধ্যে ফসলাদি অধিক হতো, হযরত ইউশা এর হাতে এর বিজয় অর্জিত হয়েছিল। তাই اِهْبِطُوْا ব্যবহার করা হয়েছে। ضُرِبَتْ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَة تَبْعِيْضَه تَصْرِيْحِيَّه অথবা اِسْتِعَارَه / لُزُوْمُ الدِّرْهَمِ -এর ইবারতটি উল্টো হয়ে গেছে। মূলে এমন ছিল لُزُوْمَ السِّكَّةِ لِلدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ মুযাফকে হযফের সাথে اَيْ مَكْنِيَّه তার ইবারতকে قَلْب করা হয়েছে। سِكَّه [মুদ্রা] যার উপর সরকারি ছাপ লাগানো হয়। বহুবচনে لُزُوْمَ اَثَرِ السِّكَّةِ سِكَكٌ যেমন سِدْرَةٌ -এর বহুবচন سِدَرٌ আসে। اِسْتَسْقٰى وَاِذِ জুমলা فَا، তারকিবিয়্যাহ قُلْنَ ফেয়েল বা ফায়েল اِضْرِبْ الخ এটা হচ্ছে مَقُوْلَه - اِنْفَجَرَتْ ফেয়েল اِثْنَتَا عَشْرَةَ ফায়েল মুমাইয়াজ, عَيْنًا তামঈয। مُفْسِدِيْنَ হালে মুয়াক্কাদাহ হচ্ছে لَا تَعْثَوْا থেকে। قُلْتُمْ ফেয়েল বা ফায়েল। يَامُوْسٰى الخ মাকূলা মিলে প্রথম জুমলার উপর আত্ফ। رَبَّكَ ফায়েল, يُخْرِجْ মাহ্যূফ। مِنْ বয়ানিয়্যাহ। مَا মাউসূলাহ্ تُنْبِتُ জুমলা সেলাহ্। مِنْ بَقْلِهَا বয়ান مَنْصُوْبُ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ উহ্য ইবারত مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ كَائِنًا مِنْ بَقْلِهَا এ সব মিলে شَيْئًا -এর বয়ান হয়েছে। يُخْرِجْ জওয়াবে اَمْر হয়েছে اُدْعُ -এর। তাই মাজযূম হয়েছে। اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الخ পুরো জুমলা مَقُوْلَه হয়েছে قَالَ ফেয়েলের। اِهْبِطُوْا জুমলায়ে ইনশা-ইয়্যাহ اِنَّ لَكُمْ - খবরে مَا سَأَلْتُمْ ইসমে اِنَّ। ضُرِبَتْ জুমলায়ে مُسْتَأْنِفَه - غَضَبٍ মউসূফ, مِنَ اللّٰهِ সিফত। بَاءُوْا بِغَضَبٍ মুব্তাদা بِاَنَّهُمْ الخ খবর بِغَيْرِ الْحَقِّ হাল হওয়ার কারণে মহল হিসেবে مَنْصُوْب - يَقْتُلُوْنَ -এর যমীর থেকে। উহ্য ইবারত হলো- يَقْتُلُوْنَهُمْ مُبْطِلِيْنَ। ذٰلِكَ মুব্তাদা بِمَا عَصَوْا খবর।

خَفِيْف : পাতলা। مُرَبَّع : চার কোনো বিশিষ্ট। চতুর্দিকে এক গজ দীর্ঘ। رُخَام : শুভ্র, সাদা। كَذَّان নরম, কোমল।

لَا تَعْثَوْا : (ن) عَثَا يَعْثُوْا এবং (س) عَثِيَ يَعْثٰى থেকে نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف -এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর صِيْغَة; অর্থ- তোমরা বিশৃঙ্খলা করো না।

http://islamiboi.wordpress.com

بَقْلِهَا : بُقُوْلٌ (ج) بَقْلٌ প্রত্যেক ঐ উদ্ভিদ, যার কাণ্ড থাকে না। قِثَّاءُ একবচন قِثَّائَةٌ অর্থ– কাকড়ি, শসা। فُوْمٌ রসুন, গম কিংবা ঐ শষ্য, যার দ্বারা রুটি বানানো যায়। عَدَسٌ : মশুরীর ডাল। بَصَلٌ পেঁয়াজ।

ضُرِبَتْ : ضُرِبَتْ হলো مَاضِى مَجْهُوْل -এর সীগাহ। اَلذِّلَّةُ হলো তার نَائِب فَاعِل

وَمَعْنَى ضُرِبَتْ اَلزَمُوْهُ وَتَحَقَّقَ عَلَيْهِمْ بِهَا .

وَالْمَسْكَنَةُ : এটি اَلسُّكُوْنُ থেকে নির্গত। এ থেকেই مِسْكِيْنٌ শব্দটি নির্গত। কেননা মিসকিনের চলাচলে চঞ্চলতা থাকে না।

بَاءُوْا : بَوْءٌ থেকে مَاضِى جَمْع مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। মাসদার اَلْبَوَاءُ بِمَعْنَى الرُّجُوْعُ অর্থ– তারা প্রত্যাবর্তন করেছে। এ থেকেই ব্যবহার রয়েছে– بَاءَ الْمَبَاءَةُ اَىْ رَجَعَ اِلَى الْمَنْزِلِ

এছাড়াও এর আরো বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন– ١. اِحْتَمَلُوْهُ . ٢. اِسْتَحَقُّوْهُ . ٣. اَقَرُّوْا بِهِ . ٤. لَازَمُوْهُ . وَهُوَ الْاَوْلٰى

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَجَر দ্বারা উদ্দেশ্য সেই নির্দিষ্ট পাথর। যার দিকে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) নিজ স্বভাবগত ও শরয়ী লজ্জার কারণে গোসল ইত্যাদির সময়ে কারো সামনে উলঙ্গ হতেন না। এদিকে মানুষ মনে করেছে যে, তার একশিরা রোগ [অণ্ডকোষ ফুলে যাওয়া] হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ ভুল ধারণাকে দূর করার জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন যে, একবার হযরত মূসা (আ.) গোসল করার জন্য কোনো প্রস্রবণে ঢুকেছেন এবং বস্ত্র-পরিধান খুলে কোনো সাধারণ পাথরের উপর কিংবা হযরত শোআইব (আ.) থেকে বরকত স্বরূপ যে পাথর তিনি পেয়েছিলেন ওটার উপর রেখেছেন। গোসল শেষ করে বাহিরে এসেছেন। আর সে পাথর বস্ত্র নিয়ে সে দিকে ত্বরিৎ চলেছে- যেখানে এলাকাবাসীর কাচারীতে লোকজন অভ্যাস অনুযায়ী সমবেত ছিল। হযরত মূসা (আ.) স্বভাবগতভাবে গরম মেযাজের ছিলেন। রাগান্বিত হয়ে পাথরের পেছনে বস্ত্রের জন্য উলঙ্গ অবস্থায় দৌড় দিয়েছেন এবং সে সভাস্থলে পৌছে গেলেন। যেখানে লোক সমবেত ছিল তারা হযরত মূসা (আ.)-কে দেখে নিজেদের অহেতুক ধারণাকে পাল্টে নিল। তারপর নির্দেশ হলো যে, এ পাথরটিকে সংরক্ষণ করে রেখে কাজে আসবে। এ পাথরটি সাদা ও নরম ছিল। এক হাত পরিমাণ চতুর্ভুজ কিংবা এর চেয়ে কিছু কম চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, প্রতি কোণে তিন তিনটি উঁচু প্রান্ত যেগুলো থেকে ১২ টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে যেতো।

অন্য একটি মন্তব্য হচ্ছে যে, সাধারণ পাথর ছিল। আর এ মন্তব্যটিও আল্লাহর কুদরতকে প্রকাশ করার জন্য অধিক ন্যায়সঙ্গত। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭৪]

قَوْلُهُ وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ : এটা সে মরুভূমির [তীহ প্রান্তরের] ঘটনা। পানির অভাবে মূসা (আ.) একটি পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। বনী ইসরাঈলের মোট গোত্র ছিল বারটি। কোনো গোত্রে লোকসংখ্যা ছিল বেশি, কোনো গোত্রে কম, এক একটি ঝর্ণা ছিল প্রত্যেক গোত্রের লোক সংখ্যা অনুযায়ী। এ কারণেই সেগুলোকে পৃথক করে চেনা সম্ভব হয়েছিল। অথবা স্থির করে দেওয়া হয়েছিল যে, পাথরের অমুক দিক হতে যে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে সেটি হবে অমুক গোত্রের।

যেসব হীনদৃষ্টি সম্পন্ন লোক এসব মু'জিযা অস্বীকার করে, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষ নয়, মানুষের খোলস মাত্র। চুম্বক যদি লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে, তাহলে পাথর কেন পানিকে আকর্ষণ করতে পারবে না? এতে আপত্তির কি আছে। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১২, টী. ২]

قَوْلُهُ بِعَصَاكَ : হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে একটি লাঠি নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে উত্তরাধিকার সূত্রে নবীগণের কাছে তা পৌছে। এক পর্যায়ে তা হযরত শুআইব (আ.)-এর হস্তগত হয়। তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে তা প্রদান করেন।

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৮৫]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ فَرَّ بِثَوْبِهِ :

اَىْ حِيْنَ رَمَوْهُ بِالْاُدْرَةِ وَكَانَ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ لَا يُبَالُوْنَ بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ فَاَرَادَ مُوْسٰى الْغُسْلَ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى ذٰلِكَ الْحَجَرِ فَفَرَّ بِذٰلِكَ الثَّوْبِ فَخَرَجَ مُوْسٰى مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ ثَوْبِى الْحَجَرَ فَنَظَرَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لِعَوْرَتِهِ فَلَمْ يَرَوْهُ كَمَا ظَنُّوْا . قَالَ تَعَالٰى فَبَرَّأَ اللّٰهُ مَا قَالُوْا .

যখন পাথরটি কাপড় নিয়ে ছুটছিল, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ পাথরটি আপনার সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন হযরত মূসা (আ.) সে পাথরটি তাঁর থলের ভেতর তুলে নেন।

قَوْلُهُ بِعَدَدِ الْاَسْبَاطِ : গোত্র সংখ্যার সমপরিমাণ আর তারা বারোটি গোত্রে বিভক্ত হওয়ার কারণ হলো হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তান ছিলো বারো জন

قَوْلُهُ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তর উপস্থাপন করা হলো–

প্রশ্ন : حَالْ তার ذُو الْحَالْ-এর মাঝে অতিরিক্ত অর্থ নির্দেশ করে থাকে। যা এখানে অনুপস্থিত। কেননা عَثِى এবং مُفْسِدِيْنَ-এর অর্থ এক ও অভিন্ন।

উত্তর : অতিরিক্ত অর্থ নির্দেশ করার বিষয়টি حَالْ مُنْتَقِلَة-এর মাঝে আবশ্যক হয়। حَالْ مُؤَكِّدَة-এর মাঝে আবশ্যক নয়। আর এটি হলো حَالْ مُؤَكِّدَة সুতরাং কোনো আপত্তি থাকলো না।

قَوْلُهُ نَوْعٍ مِنْهُ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, নিম্নে প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন : বনী ইসরাঈলের খাবার তো ছিল দুটি। যথা 'মান্না' ও 'সালওয়া'। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ কেন বললেন?

উত্তর : وَحْدَتْ দ্বারা وَحْدَتْ نَوْعِى উদ্দেশ্য; وَحْدَتْ فَرْدِى নয়। আর وَحْدَتْ نَوْعِى একাধিক হওয়ার পরিপন্থি নয়। তাই তো বলা হয়ে থাকে, খাবার খুব সুস্বাদু হয়েছে। যদিও বিভিন্ন রকমের খাবার থাকে।

قَوْلُهُ شَيْئًا : এখানে شيئا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ টি مِنْ تَبْعِيْضِيَّه অর্থাৎ بَيَانِيَه নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الْاَمْصَارِ اَىْ بَلَدٍ كَانَ مِنَ الشَّامِ : এখানে مِصْر দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট শহরকে বোঝানো হয়নি। এমনকি প্রসিদ্ধ মিসর শহরকেও বুঝানো হয়নি। এখানে উদ্দেশ্য হলো শাম দেশের যে কোনো একটি এলাকায় চলে যাও। مِصْر-এর تَنْوِيْن تَنْكِيْر-ও এদিকেই ইঙ্গিত করে।

اَلْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ : اَىْ لَا يَنْبَغِىْ مِنْكُمْ ذٰلِكَ وَلَا يَلِيْقُ

ইহুদিদের লাঞ্ছনা :

قَوْلُهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ : লাঞ্ছনা তো এই যে, তারা সর্বদা মুসলিম জাতি ও খ্রিস্টানদের অধীনস্থ প্রজা হিসেবে জীবনযাপন করছে। কারও কাছে ধনৈশ্বর্য থাকলেও রাজক্ষমতা হতে চিরদিনের জন্য তারা বঞ্চিত, অথচ সেটাই ছিল সম্মানের বিষয়। আর দারিদ্র এভাবে যে, একে তো তাদের কাছে ধন-সম্পদের প্রচণ্ড অভাব। ব্যক্তি বিশেষের কাছে কিছু থাকলেও শাসকশ্রেণিও অন্যান্যদের ভয়ে নিজেদেরকে দরিদ্র-অভাবীরূপেই প্রকাশ করে। তীব্র লালসা ও উৎকট কার্পণ্যের কারণে তাদেরকে অভাবীদের চেয়েও নিকৃষ্টতম মনে হয়। আর এটাও তো অনস্বীকার্য যে, تونگری بدل است نه بمال [ঐশ্বর্য থাকে অন্তরে, ধনে নয়।] তাই বিত্তবান হয়েও তারা ঐশ্বর্যহীন হয়েই থাকে। আর যে সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা তাদের দান করেছিলেন, তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এখন তারা তার গজব ও ক্রোধের পাত্র হয়ে গেছে।

–[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১১]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَهِىَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوْا أَغْنِيَاءَ : এজন্যই এমন কোনো ইহুদি পাওয়া যাবে না, যে মনের দিক থেকে ধনী। পৃথিবীর সকল ধর্মালম্বীদের মাঝে ইহুদিদের চেয়ে সম্পদের প্রতি অধিক লোভী কাউকে দেখা যায় না।

قَوْلُهُ لُزُوْمَ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ لِسِكَّتِهِ : এ ইবারতটুকু مَقْلُوْب তথা পরিবর্তিত। এটি অভাবে হওয়া উচিত ছিল- لُزُوْمُ أَثَرِ السِّكَّةِ لِلدِّرْهَمِ الْمَضْرُوْبِ আর سِكَّةٌ অর্থ এমন অঙ্কিত লোহা যা দ্বারা মুদ্রায় ছাপ দেওয়া হয়। سِكَّةٌ -এর বহুবচন سِكَكٌ

قَوْلُهُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ : এটি بَاءُوْا -এর فَاعِل থেকে حَال -এর স্থলে হয়েছে। আর ب হরফটি مُلَابَسَة -এর অর্থে।

أَىْ رَجَعُوْا مَغْضُوْبًا عَلَيْهِمْ ـ (جمل ٨٨) وَغَضَبُ اللّٰهِ ذَمُّهُ إِيَّاهُمْ فِى الدُّنْيَا وَعُقُوْبَتُهُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

মোদ্দাকথা ইহুদিদের লাঞ্ছনা ও অসহায়তার মধ্যে এটাও একটি যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদি অন্যায়ভাবে চিল্লা-ফাল্লা করে কোথাও জমিনের কোনো অংশ শুধু কাগজে বা পত্র-পত্রিকায় দখল করে নেয় এবং সেটাও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্যে ও উস্কানিতে রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্যের অধীনে। তবে সেটাকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাষ্ট্র বলতে পারে না। তা সত্ত্বেও জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে অপদস্থাবস্থায় থাকা ইজ্জত ও সম্মানের ক্ষেত্রে স্থান না পাওয়া যা লাঞ্ছনার মূল। তারপরও তা থেকে যাবে। সুতরাং এ ভবিষ্যদ্বাণীকে আজো পর্যন্ত ইতিহাস মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারেনি।

[ইহুদিদের জন্য চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদায়ী গজবও রোষে পতিত থাকবে। আল্লামা ইবনে কাছীরের ভাষায়: তারা যত ধন সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত থাকবে। যার সংস্পর্শে যাবে, সেই তাদেরকে অপমাণিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, ফিলিস্তীনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তর: বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা ফিলিস্তীন ইহুদিদের বর্তমান রাষ্ট্রের নিগুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালোভাবে জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে ইসরাঈলের নয়; বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ঘাঁটি ছাড়া অন্য কিছু নয়। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান শক্তি ইসলামি বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা আমেরিকা ও ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটি অনুগত আজ্ঞাবহ ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে কুরআনে পাকের কোনো আয়াত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

নবীগণ (আ.)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করা :

قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ ـ اَىْ ظُلْمًا :

প্রশ্ন : নবী হত্যা তো সর্বদাই অন্যায়। তাহলে এ কয়েদটুকু জুড়ে দেওয়ার ফায়দা কি?

উত্তর : এ কয়েদটুকু জুড়ে দিয়ে দিয়ে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা তাদের দৃষ্টিতেও অন্যায়ই ছিল। অর্থাৎ এ কাজটি নিতান্ত অন্যায় বলে নিজেরাও উপলব্ধি করত; কিন্তু হঠকারিতা, প্রতিহিংসা, পার্থিব মোহ তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল। সামনের আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে- ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

সাধারণ ও বিশেষ লোকদের পার্থক্য : আল্লাহপ্রেমিক ব্যক্তি উক্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হবে যে, যারা আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট হয় না এবং নিয়ামতের শোকর ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করে না-, কিভাবে তাদের উপর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন করে দুনিয়ার মহব্বত তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। আর এ উপদেশ গ্রহণ করতে হবে যে, আল্লাহর প্রতি ভরসাকারীদেরকে উপার্জন করতে হবে এবং উপার্জনকারীরা অকারণে উপার্জন ছেড়ে দেওয়া বস্তুত আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধানকে পরিবর্তন করা। আর এটা তাঁর অসন্তুষ্টির উৎস।

وَكَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ : অর্থাৎ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ -এর ذٰلِكَ ইসমুল ইশারাকে তাকীদের জন্য তাকরার করা হয়েছে, পূর্বেও ذٰلِكَ ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٢. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ وَالَّذِيْنَ هَادُوْا هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَوِ النَّصَارٰى مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فِيْ زَمَنِ نَبِيِّنَا وَعَمِلَ صَالِحًا بِشَرِيْعَتِهٖ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اَيْ ثَوَابُ اَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ رُوْعِيَ فِيْ ضَمِيْرِ اٰمَنَ وَعَمِلَ لَفْظُ مَنْ وَفِيْمَا بَعْدَهٗ مَعْنَاهَا.

৬২. নিশ্চয় যারা পূর্ববর্তী নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও যারা ইহুদি হয়েছে অর্থাৎ ইহুদিগণ এবং খ্রিস্টান ও সাবিয়ীগণ ইহুদি মতান্তরে খ্রিস্টানদের একটি সম্প্রদায়। মোটকথা তাদের মধ্যে যারাই আমাদের নবীর এই যুগে আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও তার শরিয়ত অনুসারে সৎকাজ করে তাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে। অর্থাৎ তাদের কর্মের পুণ্য ফল রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

এই স্থানে اٰمَنَ ও عَمِلَ ক্রিয়া দুইটিতে مَنْ শব্দটির শাব্দিক আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য করে একবচনবোধক ضَمِيْر [সর্বনাম] ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী শব্দসমূহে لَهُمْ، اَجْرُهُمْ، رَبِّهِمْ ইত্যাদি] তার মর্মের প্রতি লক্ষ্য করে ضَمِيْر [সর্বনাম] সমূহকে বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

٦٣. وَ اذْكُرُوْا اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ عَهْدَكُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوْرٰةِ وَ قَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ الْجَبَلَ اِقْتَلَعْنَاهُ مِنْ اَصْلِهٖ عَلَيْكُمْ لَمَّا اَبَيْتُمْ قَبُوْلَهَا وَقُلْنَا خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ بِالْعَمَلِ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ النَّارَ اَوِ الْمَعَاصِيَ.

৬৩. আর তোমরা স্মরণ কর যখন আমি তোমাদেরকে অঙ্গীকার করিয়েছিলাম অর্থাৎ তাওরাত অনুসারে আমল করার যে অঙ্গীকার তোমরা করেছিলে তা আর তুর পাহাড় তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম অর্থাৎ তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তখন উক্ত পাহাড়টি সমূলে উঠিয়ে আয়াস স্বীকার করে গ্রহণ কর এবং স্বীয় আমলে রূপায়িত করার মাধ্যমে তাতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে তোমরা জাহান্নামাগ্নি বা পাপকার্য হতে রক্ষা পেতে পার।

وَ رَفَعْنَا বাক্যটি এই স্থানে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার وَاو-এরপর قَدْ শব্দটির ব্যবহার করেছেন।

٦٤. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَعْرَضْتُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقِ عَنِ الطَّاعَةِ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُمْ بِالتَّوْبَةِ اَوْ تَاخِيْرِ الْعَذَابِ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ الْهَالِكِيْنَ.

৬৪. এর এই অঙ্গীকারের পরেও তোমরা এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হতে মুখ ফিরালে তা উপেক্ষা করলে। তওবা বা শাস্তি পিছিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তোমাদের সাথে তাঁর দয়া যদি না থাকত, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

وَقَدْ رَفَعْنَا -এর মধ্যে قَدْ শব্দ مُقَدَّر দ্বারা ইঙ্গিত হচ্ছে এর حَالِيَت -এর দিকে। طُور দ্বারা বিশেষ পাহাড় কিংবা সাধারণ পাহাড় উদ্দেশ্য। এর মধ্যে اَلِف لَام আহ্‌দে খারিজী কিংবা জেহনীর জন্য হতে পারে। وَقُلْنَا -এর মধ্যে ইঙ্গিত হচ্ছে যে, خُذُوْا মান্‌সূব এর মহলে হাল হিসেবে। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মাউসূল সেলাহ মিলে ইস্‌মে اِنَّ ; مَنْ শর্তিয়া মুবতাদা اٰمَنَ بِاللّٰهِ খবর। فَلَهُمْ জুমলা জওয়ার হয়ে পুনরায় এটা মিলে খবরে اِنَّ যমীরে عَائِد মাহ্‌যূফ। اَىْ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ । مَنْ -এর দুটি দিক রয়েছে لَفْظًا একবচন এবং অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। اَجْرُهُمْ মুব্‌তাদা فَلَهُمْ খবর। আখফাশের দৃষ্টিতে - اَجْرُهُمْ জার হওয়ার কারণে مَرْفُوْع এবং عِنْدَ জরফ। এর মধ্যে اِسْتِقْرَار হলো আমিল। اَخَذْنَا ফেয়েল বা-ফায়েল ও মাফউল। وَرَفَعْنَا الخ জুমলা হাল। فَضْلُ : اَىْ خُذُوْهُ عَازِمِيْنَ হাল بِقُوَّةٍ মাকূলাহ হচ্ছে قُلْنَا ফেয়েল মাহযূফের خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ اللّٰهِ মুব্‌তাদা,খবর মাহ্‌যূফ اَىْ حَاضِر কূফীগণের দৃষ্টিতে لَوْلَا -এর مَابَعْد -এর ইস্‌ম হয়।

قَوْلُهُ هَادُوْا : اَىْ دَخَلُوْا فِى الْيَهُوْدِيَّةِ এ শব্দটি ফে'লে মাযী -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ. অর্থ তারা ইহুদি মতবাদ বা ধর্ম গ্রহণ করল।

اَلَّذِيْنَ هَادُوْا : অর্থাৎ যারা ইহুদি ধর্মের অনুসারী পূর্ব থেকেই ইহুদি থাকুক, বংশগতভাবে ইহুদি হোক বা পূর্বে মুশারিক ইত্যাদি যা কিছু ছিল, আর এখন ইহুদি আকিদা ও ধর্মাচার অবলম্বন করে নিয়েছে।

هَادَ - يَهُوْدُ - هَوْدًا অর্থ– তওবা করা, বাছুর পূজা থেকে তওবা করার কারণে তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। هَوْدٌ ইহুদিদের দল।

اَلْيَهُوْدُ : শব্দটি আরবি হলে بِمَعْنَى تَابَ থেকে নির্গত অর্থ তওবা করল। যেহেতু ইহুদিরা নিজের প্রাণনাশের মাধ্যমে বাছুর পূজা থেকে তওবা করেছিল, তাই তাদেরকে ইহুদি বলা হয়। আর শব্দটি অনারবি হলে হযরত ইয়াকূ (আ.)-এর ছেলে يَهُوْذَا থেকে আরবি করা হয়েছে। আরবি বানাতে গিয়ে ذ -কে د দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা, হঠকারিতা ও অন্যায় কর্মসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে। যা দেখে পাঠক মনে করতে পারে যে, এহেন অবস্থায় যদি তারা ক্ষমা চেয়ে ঈমানও আনতে চায়, তাহলে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার নিকট তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ধারণা দূর করার জন্য এখানে একটি সূক্ষ্মনীতি বলে দেওয়া হচ্ছে- যে কোনো ব্যক্তি চাই সে মুসলমান হোক, নাসারা হোক, ইহুদি কিংবা সবয়ী হোক যদি সে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাতের উপর ঈমান আনে, দীনের আবশ্যকীয় বিষয়ে বিশ্বাস রাখে এবং শরিয়ত মোতাবেক নেক আমল করে, তাহলে সে কামিয়াব ও মুক্তিপ্রাপ্ত।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩৫]

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا الخ : **আয়াতের সারমর্ম :** ছওয়াব ও প্রতিদান বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। কেবল বিশ্বাস ও সৎকর্ম শর্ত। যার মধ্যে এ শর্ত পাওয়া যাবে, সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। এটা বলার কারণ হচ্ছে বনী ইসরাঈল এ আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত ছিল যে, আমরা নবীগণের বংশধর আমরা সর্বোতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উৎকৃষ্টতম।

–[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৩]

বনী ইসরাঈল ও ইহুদির মাঝে পার্থক্য : এ যাবৎ আলোচনা চলে আসছিল বনী ইসরাঈল নামের এক বিশেষ বংশ-গোষ্ঠী সম্পর্কে। তাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন তাদের ধর্মমত এবং আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এই প্রথমবারের মতো اَلَّذِيْنَ هَادُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাঈল একটা বংশগত নাম। একটি গোত্র-বংশ বা একটি জাতির নাম। উচ্চ বংশ মর্যাদার জন্য তারা গর্ব করতো। নিজেদের পূর্বপুরুষ সাধু-সজ্জন ছিল বলে তারা মহা আনন্দিত ছিল। ইতিহাস পুনরাবৃত্তিকালে এ বংশগত নাম নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এখন তাদের ধর্মমত ও

http://islamiboi.wordpress.com

তাদের বিশ্বাসগত অবস্থার আলোচনা শুরু করা হচ্ছে। এখন এমন নাম নেওয়া প্রয়োজন, যাতে কোনো গুণ-পরিচয় প্রকাশ পায় যাতে বংশ গোত্র পরিবারের পরিবর্তে ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় اَلَّذِيْنَ هَادُوْا সে প্রয়োজন পূরণ করছে। কুরআনে আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ অসংখ্য-অগণিত। সেগুলোর মধ্যে একটি এই যে, প্রায় কাছাকাছি কিন্তু একে অপর থেকে ভিন্ন অর্থের জন্য কুরআন মাজীদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে শব্দদ্বয়ের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখে।

আরবে এমন অনেক গোত্র ছিল, যারা জন্মগত এবং বংশগতভাবে ইহুদি ছিল না; বরং তারা ছিল আরব বা বনী ইসমাঈল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। কিন্তু ইহুদিদের সংসর্গ-সান্নিধ্যে প্রভাবিত এবং তাদের জ্ঞান-গরিমা দ্বারা চমৎকৃত হয়ে তারা প্রথমে ওদের আচার-আচরণ এবং পরে আকিদা-বিশ্বাস অবলম্বন করে নেয়। আর এভাবে ধীরে ধীরে তারাও ইহুদি জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। اَلْيَهُوْدُ না বলে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا বলার একটা সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, এতে তাদের আকিদা-বিশ্বাস যে মৌলিক নয়; বরং পরবর্তীকালে গ্রহণ করা, সে কথা ভালোভাবে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ النَّصَارٰى : বহুবচন, একবচনে نَصْرَانِيٌّ শাম দেশে বর্তমান ফিলিস্তীনে Nazareth বা নাছেরা নামে একটা গোত্র আছে। বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ৭০ মাইল উত্তরে রোম সাগরের ২০ মাইল পূর্বে গ্যালিলী অঞ্চলে। হযরত ঈসা (আ.-এর নিবাস এ অঞ্চলে অবস্থিত। এ কারণে তাকে ইয়াসূ নাছেরী বলা হয়। আরবি উচ্চারণে নাছেরাকে নাছরানও বলা হয়। এ অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নাসরানী বলা হয়।

ইমাম রাগেব (র.) বলেন– سُمُّوْا بِذٰلِكَ اِنْتِسَابًا اِلٰى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانُ (رَاغِب)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও নাসারাদের নামকরণের কারণ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা পাওয়া যায়–

سُمِّيَتِ النَّصَارٰى لِاَنَّ قَرْيَةَ عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ كَانَتْ تُسَمّٰى نَاصِرَةً وَكَانَ اَصْحَابُ يُسَمُّوْنَ النَّاصِرِيِّيْنَ (اِبْن جَرِيْر)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন–

سُمُّوْا بِذٰلِكَ الْقَرْيَةِ تُسَمّٰى نَاصِرَةً كَانَ يَنْزِلُهَا عِيْسٰى فَلَمَّا يُنْسَبُ اَصْحَابُهُ اِلَيْهِ قِيْلَ النَّصَارٰى (قُرْطُبِى)

কেউ কেউ একে আরবি শব্দ মনে করে তা نُصْرَتٌ থেকে নিষ্পন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, যেহেতু **তারা** বলেছিল– نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত উক্তিই ঠিক।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ الصَّابِئِيْنَ : সাবী-এর শাব্দিক অর্থ হলো– যে কেউ নিজের দীন ত্যাগ করে অপরের দীন গ্রহণ করে, বা অপরের দীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিভাষায় صَابِئُوْنَ [Sabians] নামে একটা ধর্মীয় ফেরকা ছিল, যারা আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ-রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল। কারণ মূলত আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে নাসারা-ই ইয়াহইয়া বলতো। যেমন এরা ছিল হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উম্মত। হযরত ওমর (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ খলিফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো সত্যসন্ধানী সাহাবীও সাবেয়ীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর হযরত ওমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ هُمْ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقَالَ عُمَرُ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ مِثْلَ ذَبَائِحِ اَهْلِ الْكَعْبَةِ (مَعَالِم)

বেশ বড় বড় কয়েকজন তাবেয়ীও তাদেরকে আহলে কিতাব বা তাওহীদবাদী মনে করতেন। যেমন ইবনে জারীর (র.) বলেন–

هُمْ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ (اِبْن جَرِيْر عَنِ السُّدِّى)

ইবনে যায়েদ (র.) তাদেরকে তাওহীদবাদী মনে করতেন। কাতাদা এবং হাসান বসরী (র.) থেকে তো এও বর্ণিত আছে যে, তারা কিতাবধারী এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতো –[ইবনে জারীর]। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিজেও ছিলেন ইরাকী। এ কারণে সাবেয়ীদের সম্পর্কে সরাসরি জানার তার সুযোগ ছিল। তার ফতোয়া এই যে, তাদের হাতে জবাই করা পশু হালাল এবং এদের নারীদের সাথে বিয়েও জায়েজ।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَلَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحِ نِسَائِهِمْ (قُرْطُبِى)

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জাত-সিফাতের উপর ঈমান এনেছে, যেমন ঈমান আনার হক রয়েছে। আর সে ঈমান হতে হবে সব ধরনের শিরকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত। আর এ ঈমান আনার অধীনে তার সকল আবশ্যকীয় বিষয় এবং তাতে যা যা অন্তর্ভুক্ত, সবই শামিল রয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার উপর শুধু ঈমান তো কোনো না কোনো রকমে প্রায় সব মানুষেরই আছে। আর ঈমানের আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু নম্বরে রয়েছে রাসূলের প্রতি ঈমান। কারণ রাসূলই আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দাদের সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন করেন, এর সেতু পথ দেখান।

قَوْلُهُ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : পরকালের প্রতি ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে পরকাল সম্পর্কিত সকল বিধানের প্রতি ঈমান আনা। একে অপরের মধ্যে লীন হওয়া এবং বারবার জন্ম নেওয়ার ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তি তো কেবল এই যে, অন্যান্য ধর্মে পরকালের প্রতি ঈমান আনার সঠিক ধারণা বর্তমান ছিল না; তারা পুরস্কার ও শাস্তির নানাবিধ রূপ ও ধরন কল্পনা করে নিয়েছিল।

–[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا : এ বাক্যটুকু বৃদ্ধি করে একটি ইশকালের জবাব দেওয়া হয়েছে। ইশকালটি হলো-উপরে বলা হয়েছে– اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এরপর আবার বলা হয়েছে مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ উভয়টি বাক্যের মর্ম তো একই। তাহলে تَخْصِيْصٌ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ -এর কি প্রয়োজন পড়ল?

উত্তর : উভয় বাক্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর مِصْدَاق হলো ঐ সকল লোক যারা فَتْرَة -এর জমানায় ঈমান আনয়ন করেছে। যেমন, ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, বোহায়রা রাহেব, সালমান ফারসি ও হাবীবে নাজ্জার প্রমুখ। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাসূল ﷺ -এর জমানাও পেয়েছেন। আর কেউ হুজুর ﷺ নবী হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য-ই আল্লামা সুয়ূতী (র.) بِالْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلُ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। আর مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শব্দ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যারা হুজুর ﷺ -এর জমানায় তাঁর উপর ঈমান এনেছে। উক্ত আলোচনায় জানা গেল উভয়টির مِصْدَاق ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তাকরার হওয়ার আপত্তি শেষ হয়ে গেল। এ ভিন্নতাটি বর্ণনা করার জন্যই আল্লামা সুয়ূতী (র.) দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا উল্লেখ করেছেন। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ رُوْعِىَ فِىْ ضَمِيْرِ مَنْ اٰمَنَ :

প্রশ্ন : مَنْ اٰمَنَ এবং مَنْ عَمِلَ উভয় জায়গায় ضَمِيْر مُفْرَدْ -এর مَرْجِع হলো مَنْ আর এক-ই ভাবে فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ -এর هُمْ যমীরের – مَرْجِع ও হলো مَنْ ; যা বিশুদ্ধ নয়

উত্তর : মুফাসসির (র.) رُوْعِىَ فِىْ ضَمِيْرِ مَنْ اٰمَنَ এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে উক্ত প্রশ্নের-ই জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথমটির মাঝে مَنْ -এর শব্দগত দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। জানা দরকার مَنْ লফজের দিক দিয়ে مُفْرَدْ -এবং مَعْنٰى -এর দিক দিয়ে বহুবচন

ইহুদিদের অধঃপতন ও প্রায়শ্চিত্ত : বলা হয় যে, তাওরাত নাজিল হলে বনী ইসরাঈল তাদের দুর্মতিবশে বলেছিল, তাওরাতের বিধান তো বেজায় কঠিন এর অনুসরণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তখন মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে একটি পাহাড় তাদের উপরে উঠে আসল। তাদের সামনে আগুন সৃষ্টি হলো। কোনো রকমের অবাধ্যতার সুযোগ থাকল না। নিরুপায় হয়ে তারা তাওরাতের বিধান স্বীকার করে নিল।

প্রশ্ন : মাথার উপর পাহাড় স্থাপন করে তাওরাত স্বীকার করিয়ে নেওয়া তো স্পষ্ট চাপিয়ে দেওয়া ও জবরদস্তি করার নামান্তর, যা কুরআনের আয়াত لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ [দীনে কোনো জবরদস্তি নেই] বিধান আরোপের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা বিধান আরোপের ভিত্তি স্বাধীন ইচ্ছার উপর; আর জবরদস্তি তো সেই ইচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে।

উত্তর : এটি জবরদস্তি দীন কবুল করানোর জন্য নয় মোটেই। বনী ইসরাঈল তো দীন পূর্বেই কবুল করে নিয়েছিল। যদ্দরুন তারা বারংবার হযরত মূসা (আ.)-কে তাগাদা দিয়ে আসছিল যে, আমাদেরকে বিধান সম্বলিত কোনো কিতাব এনে দাও! আমরা তার অনুসরণ করি। তারা এর পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখন তাওরাত দেওয়া হলো, তখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদেরকে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হতে ফেরানোই ছিল পাহাড় চাপানোর উদ্দেশ্য, দীন কবুল করানো নয়।

–[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৩]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَقَدْ رَفَعْنَا : এখানে رَفَعْنَا -এর পূর্বে قَدْ শব্দটি উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে وَاو টি وَاو حَالِيَة হয়েছে عاطفة নয় এবং رَفَعْنَا শব্দটি قَدْ মুকাদ্দার মানার সঙ্গে সঙ্গে اَخَذْنَاهُمْ থেকে حَال হয়েছে, مَعْطُوْف নয়। কারণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف -এর মাঝে تَرْتِيْب জরুরি।

اَلطُّوْرُ : وَالطُّوْرُ يُطْلَقُ عَلٰى اَىِّ جَبَلٍ كَانَ كَمَا فِى الْقَامُوْسِ وَفِىْ رُوْحِ الْبَيَانِ : اَلطُّوْرُ هُوَ الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ . (جَلَالَيْن)

قَوْلُهُ بِالْعَمَلِ : এই অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জবানের জিকির ও আলোচনা যথেষ্ট নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো– আমল করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে গণনা করা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো আমল।

قَوْلُهُ اَلنَّارَ وَالْمَعَاصِىَ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَتَّقُوْنَ -এর মাফউল اَلنَّارَ অথবা اَلْمَعَاصِىَ উহ্য রয়েছে।

ইসলামের বিধানের দৃষ্টিতে সব সমান : মোটকথা কানূনের ব্যাপকতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। মুসলমানদের কানূন ব্যাপক, চাই আমাদের অনুকূল ও আনুগত্যের বুলি বোলনে ওয়ালা হোক কিংবা বিরোধী হোক, সকলে ভালোভাবে শ্রবণ করে নাও যে, এখন মুক্তি মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুকরণের মধ্যে সীমিত। এর দ্বারা কথার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে যে, ইসলামের এ ব্যাপক ও সাধারণ বিধানে আমাদের ও তোমাদের পার্থক্য নেই। কালো ও সুন্দরের ব্যবধান নেই। ভৌগলিক কিংবা বংশের হিসেবে পৃথকতার কোনো প্রশ্ন নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সকলে সমান। কারো সাথে না ব্যক্তিগত সখ্যতা রয়েছে। আর না কারো সাথে শত্রুতা রয়েছে। যেমন কোনো বাদশা ঘোষণা করে দেয় যে, আইনের দৃষ্টিতে সব সমান, মন্ত্রী হোক কিংবা ফকির, বাধ্যগত গোলাম হোক অথবা বিরোধী শত্রু। যে কানূনের সম্মান ঠিক রাখবে, সে দয়া ও মহাব্বতের পাত্র হবে। তা না হলে শাস্তির যোগ্য হবে। উক্ত বর্ণনার পর যদি اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য খালেছ মু'মিনগণও হয়, তবুও আয়াতে কারীমার অর্থ ও উদ্দেশ্য একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৭৮]

বিপথগামী ওলামা (عُلَمَاءِ سُوْء) এবং ভুল পথের মাশায়েখ : তওরাত নাজিল হওয়ার পর বনী ইসরাঈল সত্যায়ন ও আস্থা লাভের উদ্দেশ্যে বাছাই করে উম্মতের ৭০ আউলিয়াকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু তারা কুদরতি বিভিন্ন আশ্চর্যময় বস্তু স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও জাতির সামনে এসে ভুলমিশ্রিত বক্তব্য পেশ করল যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী যদি তোমাদের দ্বারা সে মুতাবেক আমল করা সহজভাবে সম্ভব হয়, তবে কর। নতুবা আমল না করলেও চলবে। কিছু তো তাদের জন্মগত দুষ্টামি, কিছু বিধানাবলির কঠোরতা। তাই আমর থেকে পরিত্রাণের জন্য এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করল যে, আমাদের দ্বারা সে হুকুম মুতাবেক আমল করা সম্ভব নয়। এ কারণে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাগণ তাদের মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে সাবধান করেছে যে, এ মুহূর্তে বিধানকে শক্তভাবে ধর এবং সে অনুযায়ী আমল কর। –[প্রাগুক্ত]

দুনিয়াবী রাজত্বের কর্ম পদ্ধতি : যেমন– সরকারিভাবে পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু স্বইচ্ছায় যদি কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে ডিউটি আদায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে বাধ্য করা হবে। ডিউটি আদায় না করলে সে শাস্তির যোগ্য ও বরখাস্তের যোগ্য হবে এবং এ পদ্ধতিকে ইন্সাফ বলা হবে। আল্লাহর ব্যাপক রহমত থেকে দুনিয়াতে মু'মিনদের ন্যায় কাফেররাও উপকৃত হচ্ছে, কিন্তু পরকালে আল্লাহর বিশেষ রহমতের যোগ্য শুধু মু'মিনগণ হবে এবং আল্লাহর ফযল ও রহমতের সত্যায়ন নবী করীম ﷺ -ও হতে পারেন, যার অস্তিত্বের অসিলায় অঙ্গীকার ভঙ্গকারী বর্তমান ইহুদি সম্প্রদায় দুনিয়াবী আজাব থেকে নিরাপদে রয়েছে। –[প্রাগুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٥. وَلَقَدْ لَامُ قَسَمٍ عَلِمْتُمْ عَرَفْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا تَجَاوَزُوا الْحَدَّ مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ بِصَيْدِ السَّمَكِ وَقَدْ نَهَيْنَاكُمْ عَنْهُ وَهُمْ اَهْلُ اَيْلَةَ . فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ . مُبْعَدِيْنَ فَكَانُوْهَا وَهَلَكُوْا بَعْدَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার মৎস শিকার করে এই সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছিল সীমালঙ্ঘন করেছিল, অথচ আমি এই সম্পর্কে তাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম, তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে চিন। তারা ছিল আয়লার অধিবাসী। আমি তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা ঘৃণিত আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে বিতাড়িত বানর হও। ফলে তারা বানরে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং তিনদিন পর সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। لَقَدْ-এর لَامْ অক্ষরটি কসম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٦. فَجَعَلْنٰهَا اَىْ تِلْكَ الْعُقُوْبَةَ نَكَالًا عِبْرَةً مَانِعَةً مِنْ اِرْتِكَابِ مِثْلِ مَا عَمِلُوْا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا اَىْ لِلْاُمَمِ الَّتِىْ فِىْ زَمَانِهَا وَبَعْدَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ . اَللّٰهَ وَخُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ .

৬৬. আমি তা অর্থাৎ এই শাস্তি তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের অর্থাৎ যে সকল উম্মত এই সময় বর্তমান ছিল এবং পরে যারা আগমন করবে, তাদের সকলের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষামূলক, অনুরূপ কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রতিরোধক হিসেবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভয়কারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি। এই স্থানে মুত্তাকীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তা দ্বারা কেবল তারাই উপকৃত হতে পারে, অন্যরা পারে না।

তাহকীক ও তারকীব

نَكَالٌ বেড়ী ও বন্ধনকে বলা হয়, এ স্থানে উদ্দেশ্য পরিহার্য, অর্থাৎ নিষেধ করা। عَلِمْتُمْ শব্দটি عَرَفْتُمْ-এর অর্থে। ফেয়েল বা ফায়েল। قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا : এটি عَلِمْتُمْ-এর প্রথম মাফউল। اَىْ عَرَفْتُمْ اَشْخَاصَ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا

কেউ কেউ বলেন— এখানে مُضَافٌ মাহফুয আছে। اَىْ عَرَفْتُمْ اِعْتِدَاءَ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا .

কেউ কেউ বলেন— এখানে اَحْكَامٌ মুজাফ মাহযুফ আছে— اَىْ عَرَفْتُمْ اَحْكَامَ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا

مِنْكُمْ : এটি اِعْتِدَاءٌ-এর জমির থেকে حَالٌ হয়েছে। اَىْ اِعْتَدَوْا كَائِنِيْنَ مِنْكُمْ

فِى السَّبْتِ এটার মুতা'আল্লাক হচ্ছে خَاسِئِيْنَ আর خَاسِئِيْنَ নির্গত হয়েছে خَسَاءٌ থেকে, লাঞ্ছিত হওয়া। قِرَدَةً-এর সিফত অথবা খবরে ছানী কিংবা كُوْنُوْا থেকে حَالٌ আর نَكَالًا মাফউলে ছানী। مُبْعَدِيْنَ : এটি خَاسِئِيْنَ-এর তাফসীর। বলা হয় خَسَأَ الْكَلْبَ اِذَا طَرَدَهُ

فَكَانُوْهَا : এখানে كَانَ ফে'লে নাকেসটি صَارَ-এর অর্থে। আর هَا জমিরে মানসূবটি قِرَدَةً-এর দিকে ফিরেছে। اَىْ صَارُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ .

قَوْلُهُ نَكَالًا : نَكْلٌ-এর বহুবচন। অর্থ- বেড়ী। লাজেমী অর্থ— এমন কঠিন-কঠোর শাস্তি যা অন্যদের জন্যও শিক্ষনীয়। কেননা তার লাজেমী অর্থ হলো اَلْمَنْعُ বারণ করা। যেহেতু مُقَيَّدٌ বন্দী বা مَمْنُوْعٌ বারণকৃত হয়ে যায়। সেহেতু এ আজাবও অন্যদেরকেও একাজ করতে বারণ করে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اِلْخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে বনি ইসরাইলকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ না হলে তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দাবি এই ছিল যে, তৎক্ষণাৎ তোমাদেরকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হতো। এখন এ আয়াতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শরিয়তের বিধান লংঘন ও অস্বীকার করার পার্থিব ক্ষতি ও কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– পূর্ববর্তী উম্মতকে তাওরাতে শনিবার দিবসটি বন্দেগীতে কাটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা সে বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ফলে তাদেরকে মসখ বা বিকৃতির আজাব দেওয়া হয়েছিল।

قَوْلُهُ لَامُ قَسَمٍ : মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে مُقْسَمٌ بِهٖ মাহযুফ রয়েছে। اَىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

قَوْلُهُ عَرَفْتُمْ : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : عَلِمْتُمْ ফে'লটি দুটি মাফউল দাবী করে। অথচ এখানে শুধু একটি মাফউল উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর : মুফাসসির (র.) উত্তরের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَلِمْتُمْ এখানে عَرَفْتُمْ-এর অর্থে। সুতরাং এখন এক মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী হওয়া শুদ্ধ আছে।

عِلْم এবং مَعْرِفَتْ-এর মাঝে পার্থক্য :

১. مَعْرِفَتْ কেবল 'যাত' বা সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হওয়াকে বুঝায়। আর عِلْم যাত-এর সাথে সাথে তার অন্যান্য অবস্থা ও বিবরণ সম্পর্কে জানাকে বুঝায়। যেমন এর ব্যবহার এভাবে হয়– عَرَفْتُ زَيْدًا وَعَلِمْتُ زَيْدًا ضَاحِكًا.

২. مَعْرِفَتْ টি مَسْبُوْق بِالْجَهْلِ বা তার পূর্বে অজ্ঞতা আবশ্যক। পক্ষান্তরে عِلْم-এর পূর্বে অজ্ঞতা জরুরি নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে مَعْرِفَتْ-এর ব্যবহার শুদ্ধ নয়।

৩. عِلْم-এর ব্যবহার اِدْرَاكُ كُلِّيَّاتْ সম্পর্কে হয় আর مَعْرِفَتْ-এর ব্যবহার اِدْرَاكُ جُزْئِيَّاتْ সম্পর্কে হয়।

৪. عِلْم-এর ব্যবহার مُدْرَكٌ بِالْقَلْبِ বা অন্তর দিয়ে অনুভব করার ক্ষেত্রে হয় আর مَعْرِفَتْ-এর ব্যবহার مُدْرَكٌ بِالْحَوَاسِّ বা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করার ক্ষেত্রে হয়।

قَوْلُهُ فِى السَّبْتِ : এখানে اَلسَّبْتُ দ্বারা শনিবার উদ্দেশ্য। কেউ বলেছেন– اَلسَّبْتُ-এর অর্থ এখানে تَعْظِيْم বা সম্মান। اَىْ فِىْ تَعْظِيْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

কেউ বলেন– فِىْ حُكْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

এ ঘটনাটি হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলে সংঘটিত। বনী ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস শিকার করে। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে مَسْخ তথা বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণি ও অনুগত শ্রেণি। অবাধ্যদের জন্য এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نَكَال শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্য এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এ জন্য একে مَوْعِظَةً অর্থাৎ উপদেশপ্রদ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা : তাফসীরে কুরতুবীকে বলা হয়েছে, ইহুদিরা প্রথম প্রথম কলাকৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হলো না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপরভাগে সৎ ও বিজ্ঞজনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনদের চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত। –[মাআরিফুল কুরআন : মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.)]

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি : সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইহুদি সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আজাব নাজিল

http://islamiboi.wordpress.com

করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোনো সম্পর্ক নেই। [মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ : ইলম শব্দটি তাহকীক বা নিশ্চিত করে জানা অর্থে কুরআন মাজীদে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরও তার সঙ্গে জোর দেওয়ার জন্য আরো যুক্ত হয়েছে قَدْ ও لَ । যেখানে فِعْل বা ক্রিয়ার সঙ্গে لَقَدْ শব্দ যুক্ত হয়, সেখানে তাকিদের জোর দেওয়াই উদ্দেশ্য। যেন কুরআন বনী ইসরাঈলকে তাদের ইতিহাসের কোনো ঘটনা যা তাদের ভালো করেই জানা আছে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং তাদেরকে বলছে, হে বনী ইসরাইল! যে ঘটনাটি এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে তা তোমাদের ইতিহাসের খুবই পরিচিত ও স্বীকৃত ঘটনা এবং তোমরা কোনো রকম সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই সে ঘটনার কথা ভালো করেই জান। مِنْكُمْ মানে তোমাদের পূর্বসূরী বা পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে।

قَوْلُهُ فِى السَّبْتِ : অর্থাৎ শনিবারের বিধানের ব্যাপারে। سَبْت -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সপ্তাহের সপ্তম দিন শনিবার। اَلسَّبْت বা শনিবার দিনটি ইহুদিদের পরিভাষায় অতি পবিত্র দিন, যেমন খ্রিস্টানদের জন্য রবিবার। এ দিনটি কেবল আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট। এ দিন ব্যবসায়-বাণিজ্য, কায়-কারবার, চাষাবাদ, কৃষিকর্ম ও শিকার ইত্যাদি সবই ছিল নিষিদ্ধ। এ নিষেধাজ্ঞা ছিল অত্যন্ত কঠোরভাবে। এ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

قَوْلُهُ اِعْتَدَوْا : বাড়াবাড়ি করতো, শরিয়তের মুসাবীর সীমালঙ্ঘন করতো। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়ে ইলিয়া নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক ইহুদি ছিল। এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর শাসনকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১০১৪ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৩ অব্দ পর্যন্ত। ইলিয়া যদি সে স্থান হয়ে থাকে, তাওরাতে যাকে ইলাত [Elath] বলা হয়েছে [দ্বিতীয় বিবরণ ২ : ৮] তবে তা ফিলিস্তীনের দক্ষিণে আরবের ঠিক উত্তর সীমান্তে [প্রাচীন আদুম অঞ্চলে] নীল নদের পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। আধুনিক ভূগোলে এটা আকাবা নামে পরিচিত। আর আকাবা হচ্ছে আকাবা উপসাগরের প্রসিদ্ধ বন্দর। ইলার ইহুদিরা তাদের শরিয়তের বিধান অব্যাহতভাবে লঙ্ঘন করে বিশেষ চতুরতার সাথে মাছ শিকার করতো আর এটা করতো বাহ্যিক বৈধতার রূপ দিয়ে শনিবার দিনে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১২৯]

قَوْلُهُ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ : এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এখানে বানর হওয়ার কথা বলা হলো অথচ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ অর্থাৎ শূকর হওয়ার বিবরণও রয়েছে।

উত্তর :

১. اَصْحَابُ السَّبْتِ বানর হয়েছিল আর اَصْحَابُ الْمَائِدَةِ শূকর হয়েছিল।

২. اَصْحَابُ السَّبْتِ -এর মধ্যে যারা যুবক ছিল, তারা বানর হয়েছিল আর যারা বৃদ্ধ ছিল, তারা শূকর হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَهَلَكُوْا بَعْدَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, বর্তমানে যে বানর দেখা যায়, এগুলো সে বানর নয়। যেমনটি বনী ইসরাইলদের বিকৃতির ফলে হয়েছিল; বরং বর্তমান কালের বানর ভিন্ন সৃষ্টি।

فَجَعَلْنَاهَا-এর هَا সর্বনাম দ্বারা عُقُوْبَتٌ তথা শাস্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার সে আকৃতি বিকৃত উম্মতও অর্থ হতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই সারকথা এক ও অভিন্ন।

قَوْلُهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا : এখানে ইশকাল হয় যে, যখন مَا بَيْنَ يَدَيْهَا দ্বারা গ্রামবাসী বা পূর্ববর্তী উম্মত উদ্দেশ্য সেখানে مَا ব্যবহার করা হলো কেন? এটা তো غَيْر ذَوِى الْعُقُوْلِ -এর জন্য আসে।

উত্তর : এ উভয় স্থানেই مَا -কে مَنْ -এর স্থলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে مَا বলে প্রাণ ও জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, এমন অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। مَا بَيْنَ يَدَيْهَا যা তাদের সামনে আছে 'সমকালীন' অর্থে مَا خَلْفَهَا যা তাদের পেছনে আছে, 'পরে যারা আসবে, তাদের' অর্থে। অর্থাৎ শাস্তি যেন এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে, পুরুষানুক্রমে তা আলোচিত হয়েছে এবং সে আলোচনা শুনে মানুষ রীতিমতো প্রকম্পিত হয়েছে।

দীনি ব্যাপারে হীলা বাহানার তাৎপর্য : এ আয়াতে ইহুদিদের যে সীমালঙ্ঘনের কথা আলোচিত হয়েছে এবং যে কারণে তাদের উপর مَسْخ তথা বিকৃতির শাস্তি নেমে এসেছিল, বর্ণনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, সেটা শরয়ী হুকুমের সরাসরি বিরুদ্ধাচারণ ছিল না; বরং তা ছিল এমন হীলা বা কৌশল যা দ্বারা শরয়ী হুকুম অমান্য করা আবশ্যক হয়। যেমন সাপ্তাহিক ইবাদতের দিনে মাছের লেজে ডুবি বেঁধে সমুদ্রের এক কোনে ছেড়ে রাখা এবং পরের দিন অনায়াসে তা শিকার করা বা সমুদ্রের কিনারে গর্ত করে রাখা যাতে নিষিদ্ধ দিনে মাছ সেখানে ঢুকে পড়ে এবং পরের দিন তা শিকার করা যায়। এটা হচ্ছে ঐ ধরনের হীলা, যাতে শুধু শরয়ী হুকুমের লঙ্ঘনই হয় না; বরং বিদ্রূপ ও উপহাসও হয়। তাই তো এ ধরনের হীলার আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে বড় রকমের অবাধ্য ও নাফরমান আখ্যা দিয়ে তাদেরকে আজাবে নিপতিত করা হয়েছে। -[জামালাইন : ১৪০]

http://islamiboi.wordpress.com

ফিকহী হীলা : তবে উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা 'ফিকহী হীলা' হারাম প্রমাণিত হয় না। তন্মধ্যে হতে কিছু হীলা তো স্বয়ং রাসূল ﷺ -ও বাতলে দিয়েছেন। যেমন এক কেজি উত্তম দামী খেজুরের বদলায় দুই কেজি কম দামি খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ সুদ থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং রাসূল ﷺ একটি হীলা বাতলে দিয়েছেন। তা হলো জিনস -এর বিনিময়ে জিনস আদান-প্রদান না করে মূল্যের বিনিময়ে বেচা-কেনা করা। যেমন দুই কেজি কম দামি খেজুর দুই দিরহামে বিক্রি করে দুই দিরহাম দ্বারা এক কেজি উত্তম খেজুর খরিদ করা জায়েজ আছে। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হলো হুকুমে শরয়ী পালন করা, তা বাতিল ও অমান্য করা উদ্দেশ্য নয়। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৪০]

শরিয়তের দৃষ্টিতে হীলা : হীলা অর্থ- مَهَارَاتُ تَدَابِيْر বা কৌশলের দক্ষতা। হারাম ও পাপ থেকে বাঁচার জন্যে শরিয়ত সমর্থিত কোনো পথ অনুসরণকে ফকীহগণের পরিভাষায় 'হীলা' বলে। এজন্যই কেউ কেউ হারাম থেকে পলায়নের পথকে হীলা বলেছেন। اِنَّمَا هُوَ الْهَرَبُ مِنَ الْحَرَامِ .

সারকথা হলো, হারাম থেকে বাঁচার পথকে হীলা বলে। হারামের শিকার হওয়া অথবা নিজেকে কিংবা অন্য কাউকে প্রতারিত করাকে হীলা বলে না।

এটা অস্বীকার করা যাবে না, আমাদের ফিকহগ্রন্থগুলোর এমন কিছু হীলাও উল্লিখিত হয়েছে, দীনের মেজাজ ও রুচির সাথে যেগুলো খাপ খায় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, তাঁরা এগুলোকে জায়েজ বলেছেন কিংবা উৎসাহিত করেছেন; বরং এই জাতীয় হীলা গ্রন্থবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হলো যদি কোনো ব্যক্তি এমনটি করেই বসে, তাহলে তার বিধান কি হবে? কি হবে তার পরিণতি। কারো কারো আপত্তির জবাবে আল্লামা ইবনে নুজাইম (র.) একথাই লিখেছেন। ইমাম সারাখসী (র.) হীলার বৈধ-অবৈধ বিভিন্নরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শেষে সার নির্যাস হিসেবে লিখেছেন সারকথা হলো, হারাম থেকে মুক্তি ও হালাল পর্যন্ত পৌঁছার লক্ষ্যে গৃহীত হীলা উত্তম। যদি কারো হক নষ্ট করা কিংবা কোনো অন্যায় লোভে হীলার পথ গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা অপছন্দনীয়। মোটকথা দ্বিতীয় প্রকারের হীলা নাজায়েজ। আর প্রথমোক্তটি জায়েজ। যেমন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এমন 'ডেগ' রান্না না কর, যার অর্ধেক হালাল আর অর্ধেক হারাম, তাহলে তুমি তালাক। এমতাবস্থায় এই মাথা-গরম ব্যক্তির স্ত্রীকে হীলা বলে দেওয়া হয়েছে- মদের 'ডেগে' খোসাসহ ডিম রান্না করবে। খোসার কারণে ডিমের ভেতর মদ পৌঁছাতে পারবে না; ফলে তার অর্ধ হালাল আর অর্ধ হারাম 'ডেগ' রান্না করা হয়ে যাবে। তালাকের মত 'নিকৃষ্ট মুবাহ' -এর অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এই নারী; ভেঙ্গে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে তার খান্দান পরিবার।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব- ফিকাহ গ্রন্থে বর্ণিত হীলাগুলোর মূল প্রেরণা হলো হারাম থেকে রক্ষা পাওয়া, পাপের পথ বন্ধ করা এবং শরিয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে ভালো করে বুঝতে হবে, যদি কেউ হীলার অন্তরালের পাপের পথে পা বাড়ায় হীলার খোলস পরে অন্যের প্রতি জুলুম ও অবিচারের চেষ্টা করে তাহলে তা নিশ্চিত হারাম, ও জঘন্য অপরাধ; বরং এটা আল্লাহ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়ারই নামান্তর। কিন্তু আল্লাহকে কি ধোঁকা দেওয়া যায়?

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ .

তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের ধোঁকা দেয় অথচ তারা তো নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। বনী ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আজাব নিপাতিত হয়েছিল এই কারণে যে, তারা আল্লাহর দেওয়া সীমানা লংঘন করে শনিবারে মাছ শিকার করেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই দিনে মাছ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন তারা খোদার বিধান লংঙ্ঘন করে ছিল কৌশলের আড়ালে। পবিত্র কুরআনে [উক্ত আয়াতে] এই কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

প্রনিধানযোগ্য যে, হীলা বিষয়টি সাধারণতো সাধারণ আলেম সম্প্রদায়ের জন্যও অত্যন্ত নাজুক। তাই চূড়ান্ত ঠেকা ছাড়া এই প্রাঙ্গনে পা রাখা সঙ্গত নয়। স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের পূর্বসূরীগণ হীলার পথ দেখিয়ে গেছেন হারাম থেকে বাঁচার লক্ষ্যে, হীলাকে হালাল ও পবিত্র হিসেবে বরণ করার উদ্দেশ্যে নয়।

-[দেখুন, হালাল হারাম মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, পৃ. ৪৬-৪৮]

মৌলিক ও আধ্যাত্মিক বিকৃতি : আর মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে এটা যে, বাহ্যিক বিকৃতি হয়নি; বরং মৌলিক বিকৃতি উদ্দেশ্য। আহমক ও নির্বোধ ব্যক্তিকে যেমনভাবে গরু ও গাধা বলা হয়, সেটাই এখানে উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত প্রকৃত অর্থ ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানীগণ মনে করেন যে, যে ব্যক্তি শরিয়তকে প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দেয় না, তার আধ্যাত্মিক রূপ হয়ে যায় বিকৃত হয়ে যায় এবং যে প্রাণির বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে, সে প্রাণির সুরতই তার মাঝে ফুটে উঠে। এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিকৃতি।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٧. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيْلٌ لَا يُدْرٰى قَاتِلُهٗ وَسَأَلُوْهُ اَنْ يَدْعُوَ اللّٰهَ اَنْ يُبَيِّنَهٗ لَهُمْ فَدَعَاهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ط قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ط مَهْزُوًّا بِنَا حَيْثُ تُجِيْبُنَا بِمِثْلِ ذٰلِكَ قَالَ اَعُوْذُ اَمْتَنِعُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ـ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ ـ

৬৭. আর স্মরণ কর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন– আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি গরু জবাই করার আদেশ করেছেন। তাদের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। কিন্তু হত্যাকারী সম্পর্কে কারো কিছু জানা ছিল না। তখন তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট অনুরোধ জানালো যে, এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য তিনি যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেন। অনন্তর তিনি সে জন্য দোয়া করলেন তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ। আমাদেরকে উপহাসের পাত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছ? তাইতো আমাদেরকে এধরনের উত্তর প্রদান করছ। সে বলল: আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিচ্ছি আমি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে বিরত হচ্ছি। অজ্ঞদের উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া হতে।

٦٨. فَلَمَّا عَلِمُوْا اَنَّهٗ عَزْمٌ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ط اَيْ مَا سِنُّهَا قَالَ مُوْسٰى اِنَّهٗ اَيِ اللّٰهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ مُسِنَّةٌ وَلَا بِكْرٌ ط صَغِيْرَةٌ عَوَانٌ نَصَفٌ بَيْنَ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَ السِّنَّيْنِ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ـ بِهٖ مِنْ ذَبْحِهَا ـ

৬৮. **যখন তারা বুঝতে পারল যে, হযরত মূসা (আ.) সত্যসত্যই এরূপ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন তারা বলল : আমাদের খাতিরে তোমার প্রভুর নিকট বল, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তা কি? অর্থাৎ তার বয়স কি হবে? [তিনি] মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তা এমন গাভী যা বৃদ্ধও না বয়স্ক না অল্প বয়স্কও না ছোটও না মধ্য বয়সী উল্লিখিত বয়সসমূহের মাঝামাঝি সুতরাং তা জবাই করা সম্পর্কে তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ, তা কর।**

তাহকীক ও তারকীব

بَقَرَة : শব্দটি মূলত শুধু গাভী বুঝায় এবং তা ثَوْر -এর স্ত্রীলিঙ্গ। পুরুষ গরুকে ছাওর (ثور) বলা হয়। [রাগিব] তবে মুফাসসিরগণের অনেকে গাভী ও বলদ উভয়ের জন্য ব্যাপকার্থক রেখে এ স্থলে 'বলদ' অর্থ নিয়েছেন।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৩২]

اَلْجَاهِلِيْن : এখানে جَهْل আভিধানিক অজ্ঞতার অর্থে। অর্থাৎ কোনো কাজ তার যথাযথ পন্থার পরিপন্থিরূপে সম্পাদন করা। اَلْجَهْلُ فِعْلُ الشَّئِ بِخِلَافِ مَا حَقُّهٗ يَفْعَلُ (راغب) আর আল্লাহ তা'আলার বাণী রটনার দুঃসাহস সে ব্যক্তিই দেখাতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন কিংবা এমন ব্যক্তি করতে পারে, যে ধর্মীয় বিষয়ে উপহাস করার অশুভ পরিণতি ও শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয়।

عَوَانٌ : মধ্যম, মধ্যবয়সী। বহুবচন اَعْوُنٌ সহজকরণার্থে وَاو -এর ضَمَّة -কে হজফ করে দেওয়া হয়েছে।

نَصَف : بِفَتْحِ النُّوْنِ وَالصَّادِ এটি عَوَانٌ -এর ব্যাখ্যা।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ ছিল। সে সম্পর্কে আয়লার অধিবাসীদের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। এখন এ আয়াতে বনি ইসরাইলের গড়িমসি হঠকারিতার আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারা আল্লাহর ওহীর প্রতি আশ্বস্ত না হয়ে এদিক সেদিকের নানা প্রশ্ন শুরু করে দিয়েছিল।

قَوْلُهُ قَتِيْلٌ : এটি فَعِيْلٌ بِمَعْنٰى مَفْعُوْلٌ -এর ওজনে। অর্থাৎ قَتِيْلٌ অর্থ- مَقْتُوْلٌ নিহত। সেই নিহত ব্যক্তির নাম ছিল عَامِيْل [আমীল]।

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً : বনী ইসরাঈললের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকাগ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং এই পাণিপ্রার্থী কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

তাফসীরে জালালাইনের টীকায় রয়েছে, বনী ইসরাঈলের মাঝে একজন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার ভাতিজারা বর্ণনান্তরে তার চাচাতো ভাইয়েরা সে ব্যক্তির মিরাসের প্রতি লোভ করে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং শহরের প্রবেশ দ্বারে তার মরদেহ ফেলে রাখে। অতঃপর তারাই আবার তার রক্তপণের দাবি তোলে। এ ব্যাপারে বিবাদ দেখা দিলে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে মকদ্দমা পেশ করে। বিষয়টি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ঘোলাটে মনে হলে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রকৃত ঘাতকের সন্ধান লাভের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি গাভী জবাই করে তার গোশতের খণ্ড দিয়ে মরদেহে আঘাত করার নির্দেশ দেন। এ আয়াতে সে ঘটনাই আলোচিত হয়েছে।

গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের হেকমত : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, হত্যাকারীর নাম বলে দেওয়ার জন্য এ পদ্ধতি কেন গ্রহণ করা হলো? হযরত মূসা (আ.) ওহীর মাধ্যমে জেনে তাদেরকে বলে দিলেই তো পারতেন। এ পদ্ধতি কেন গ্রহণ করলেন?

উত্তর :

১. যদি হযরত মূসা (আ.) ওহীর মাধ্যমে হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দিতেন। তাহলে সম্ভাবনা ছিল তারা হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলে বসত এবং তাঁর কথা বিশ্বাস করত না; কিন্তু যখন একজন মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে সংবাদ দিতে শুরু করল, তখন মিথ্যা বলার কোনো অবকাশ নেই।

২. গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের মাঝে এ হিকমত নিহিত ছিল যে, বনী ইসরাইল বুঝতে পারবে, যে গরু এবং তার বাছুরকে তারা উপাস্য বানিয়ে ছিল তা পূজার যোগ্য নয়; বরং তা জবাই হওয়ার যোগ্য।

قَوْلُهُ اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا : ইহুদিরা গো-মাতার প্রতি ভক্তি ও মাহাত্ম্যপ্রকাশে গদগদ ছিল। তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, এমন এক সম্মানিত ও পুণ্যাত্মা প্রাণী বধ করার আদেশ দেওয়া হবে। তাই তারা মনে করল যে, হযরত মূসা (আ.) তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছেন। অথবা এর ব্যাখ্যা হলো- আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে নিহত ও ঘাতক সম্পর্কে অথচ আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন গাভী জবাই করার।

قَوْلُهُ مَهْزُوًّا : هُزُوًا -এর তাফসীরে مَهْزُوًّا উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, هُزُوًا হলো مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى اِسْمِ مَفْعُوْلٍ। এটিকে মুবালাগা স্বরূপ মাসদার হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব, অথবা একটি মুযাফ উহ্যও ধরা যায়। অর্থাৎ ذَوِىْ هُزْءٍ -[হাশিয়ায়ে জালালাইন পৃ. ১১, হাশিয়া নং ২০]

http://islamiboi.wordpress.com

মাসআলা : ফকীহ ও মুফাসসিরগণ এ আয়াত হতে এ বিধান উদ্ভাবন করেছেন যে, দীন ও দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপহাস করা 'অজ্ঞতা' ও ভয়াবহ গুনাহ রূপে সাব্যস্ত হবে এবং এরূপ আচরণকারী ব্যক্তি কঠিন হুমকির যোগ্য হবে। -[কুরতুবী]

এ সম্পর্কে তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে- يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْاِسْتِهْزَاءَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ

তবে মুফাসসিরগণ জরুরিরূপে এ বিষয়টির স্পষ্টতা বিধান করেছেন যে, পরিচ্ছন্ন কৌতুক ও নির্দোষ রসালাপের সঙ্গে উপহাস বা ঠাট্টার কোনোও সংযোগ নেই। এতদোভয়ের পার্থক্য মৌলিক খোশমেযাজী ও নির্দোষ কৌতুক তো খোদ রসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন এবং পরবর্তীতে দীনের বরেণ্যগণের মাঝেও তা বরাবর প্রচলিত ছিল -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৩২]

قَوْلُهُ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা নিম্নোক্ত سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের দিকে ইঙ্গিত করলেন-

প্রশ্ন : বনী ইসরাইল নবীর প্রতি هُزُو বা ঠাট্টার অপবাদ আরোপ করেছিল। সে হিসেবে هُزُو-কে নাকচ করা উচিত ছিল; কিন্তু তা না করে جَهَالَتٌ-এর নফী বা নাকচ কেন করা হলো?

উত্তর : এখানে نَفِى جَهَالَتْ দ্বারা মূলত نَفِى اِسْتِهْزَاءْ-ই উদ্দেশ্য। এভাবে যে, তাবলীগের ব্যাপরে هُزُو বা ঠাট্টা মূর্খতার নামান্তর। সুতরাং جَهَالَتٌ-কে নাকচ করার দ্বারা اِسْتِهْزَاءٌ-কেই নামক করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَالُوا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ : হযরত মূসা (আ.) যখন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ বলে নির্দেশের বাস্তবতার প্রতি সুদৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলেন, তখন বনী ইসরাইল মনে করল যে, এ বিধান তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং তা পালন করতে হবে। সেই সাথে তারা এটাও মনে করল যে, নিঃসন্দেহে গাভীটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী ও বিস্ময়কর গাভী হবে। তাই তারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। তা কেমন? বয়স কত? রং কি? ইত্যাদি।

قَوْلُهُ مَا سِنُّهَا : مَا هِىَ-এর ব্যাখ্যায় مَا سِنُّهَا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَا দ্বারা যদিও কোনো বস্তুর مَاهِيَتْ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, কিন্তু এটা قَاعِدَهْ كُلِّيَّهْ নয়; বরং قَاعِدَهْ اَكْثَرِيَّهْ এখানে مَا দ্বারা গাভীর গুণাগুণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। কেননা গাভীর حَقِيْقَتْ مَاهِيَتْ বা স্বরূপ সম্পর্কে তারা পূর্ব থেকেই অবগত ছিল

কেউ কেউ বলেন, বনি ইসরাইল গাভীর গোশতের স্পর্শে মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়ার সংবাদ শুনে এত অধিক বিস্মিত হয়েছিল যে, মনে করেছিল এটি কোনো সাধারণ গাভী হবে না, তাই مَجْهُوْلُ الْوَصْف কে- مَجْهُوْلُ الْجِنْس-এর পর্যায়ে রেখে مَا শব্দটির দ্বারা প্রশ্ন করেছে।

قَوْلُهُ فَارِضٌ : অর্থাৎ এত বয়স্ক ও বৃদ্ধ নয়, যার প্রজনন ক্ষমতা রহিত হয়ে গিয়েছে। একেই فَارِضٌ বলা হয়। আবার এত কম বয়সেরও নয় যে, এখন পর্যন্ত কোনো বাচ্চা জন্ম দেয়নি। একেই بِكْر বলা হয়। অবশ্য এ ব্যাখ্যা প্রতীয়মান করে যে, بَقَرَةٌ দ্বারা বলদ নয়, গাভীই উদ্দেশ্য। আর عَوَانٌ হলো [উপরিউক্ত] দুই বয়সের মধ্যবর্তী বয়সে উপনীত।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৩৩]

প্রশ্ন : فَارِضٌ শব্দটি بَقَرَةٌ-এর সিফত হয়েছে। সুতরাং শব্দটি তো فَارِضَةٌ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : মুফাসসির (র.) فَارِضٌ-এর ব্যাখ্যায় مُسِنَّةٌ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি مُسِنَّةٌ-এর নাম। بقرة-এর সিফত নয়। আর সিফত যখন اِسْم হয় তখন مُطَابَقَتْ জরুরি নয়। فَارِضْ শব্দটি فَرْض থেকে اِسْم فَاعِلْ-এর সীগাহ। অর্থ কর্তন করা। এখানে فَارِضْ দ্বারা ঐ গাভী অথবা বলদকে বুঝানো হয়েছে, যা স্বীয় যৌবনের দিনগুলোকে অতিবাহিত করে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। অথবা বয়োবৃদ্ধির কারণে তার দাঁত পড়ে গেছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٩. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ط قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا شَدِيْدُ الصُّفْرَةِ تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ - اِلَيْهَا بِحُسْنِهَا اَيْ تُعْجِبُهُمْ

৬৯. তারা বলল, তোমার প্রতিপালককে আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তার রং কি? সে বলল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সেটা হলুদবর্ণের গাভী তার রং উজ্জ্বল গাভী হলুদ বর্ণের, তার প্রতি দৃষ্টিদানকারীগণকে তার সৌন্দর্য আনন্দ দান করে তাদেরকে বিস্মিত করে।

٧٠. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ اَسَائِمَةٌ اَمْ عَامِلَةٌ اِنَّ الْبَقَرَةَ اَيْ جِنْسَهُ الْمَنْعُوْتَ بِمَا ذُكِرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا لِكَثْرَتِهِ فَلَمْ نَهْتَدِ اِلَى الْمَقْصُوْدَةِ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ - اِلَيْهَا فِي الْحَدِيْثِ لَوْ لَمْ يَسْتَثْنُوْا لِمَا بُيِّنَتْ لَهُمْ اٰخِرَ الْاَبَدِ -

৭০. তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কি? অর্থাৎ তা কি সায়িমা বা মাঠে মুক্তভাবে বিচরণকারী না আমিলা বা কার্যে নিযুক্ত ধরনের গাভী। উল্লিখিত বিশেষণযুক্ত গাভীর জাত বহুসংখ্যক থাকায় গাভীর প্রদত্ত বিবরণ আমাদেরকে সন্দেহে উপনীত করেছে। সুতরাং অভিপ্রেত গাভীটি আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা তার দিশা পাব। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা যদি ইনশাআল্লাহ না বলত, তবে কখনো আর তাদেরকে উক্ত গাভী সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলে দেওয়া হতো না।

٧١. قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُوْلٌ غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ تُثِيْرُ الْاَرْضَ تُقَلِّبُهَا لِلزِّرَاعَةِ وَ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُوْلٍ دَاخِلَةٌ فِي النَّفْيِ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ الْاَرْضَ الْمُهَيَّئَةَ لِلزَّرْعِ مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوْبِ وَاٰثَارِ الْعَمَلِ لَا شِيَةَ لَوْنَ فِيْهَا غَيْرَ لَوْنِهَا قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ط نَطَقْتَ بِالْبَيَانِ التَّامِّ فَطَلَبُوْهَا فَوَجَدُوْهَا عِنْدَ الْفَتَى الْبَارِّ بِاُمِّهِ فَاشْتَرَوْهَا بِمِلْأِ مَسْكِهَا ذَهَبًا فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوْنَ - لِغَلَاءِ ثَمَنِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ لَوْ ذَبَحُوْا اَيَّ بَقَرَةٍ كَانَتْ لَاَجْزَأَتْهُمْ وَلٰكِنْ شَدَّدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ -

৭১. সে বলল, তিনি বলেছেন, তা এমন এক গাভী যা কার্যে ব্যবহৃত নয় কাজ করিয়ে যাকে লাঞ্ছিত করা হয়নি। যা দ্বারা জমি কর্ষণ করা হয়নি চাষের উদ্দেশ্যে মাটি উলট-পালট করা হয়নি, এবং কৃষিক্ষেত্রে অর্থাৎ যে জমি কৃষির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে পানি সেচ করা হয়নি। সকল দোষ ও কাজে ব্যবহারের চিহ্নাদি হতে নিখুঁত মিশ্রণমুক্ত অর্থাৎ তার রঙ অন্য কোনো রংয়ের মিশ্রণ হতে মুক্ত।

তারা বলল, এতক্ষণে তুমি সত্যসহ এসেছ অর্থাৎ পূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছ। অনন্তর তারা অনুসন্ধান করে মাতার প্রতি বাধ্য জনৈক যুবকের নিকট ঐ ধরনের একটি গাভী পেল ও তার চামড়া ভর্তি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে তা ক্রয় করল। অতঃপর তারা তা জবাই করল যদিও অত্যধিক মূল্যের কারণে তারা তা করতে উদ্যত ছিল না। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথমে যে কোনো একটি গাভী যদি তারা জবাই করত, তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা নিজেদের উপর বিষয়টিকে [বার বার প্রশ্ন করে] কঠিন করে ফেলায় আল্লাহ তা'আলাও তাদের পক্ষে কঠিন করে দেন।

[قَوْلُهُ تُثِيْرُ الْاَرْضَ : এই বাক্যটি ذَلُوْلٌ -এর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটাও পূর্বোক্ত نَفْيٌ অর্থাৎ না অর্থব্যঞ্জক মর্মের অন্তর্ভুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

فَاقِعٌ : গাঢ় হলুদ। سَائِمَةٌ : মাঠে মুক্তভাবে বিচরণকারী। عَامِلَةٌ : কাজে নিযুক্ত ধরনের গাভী।

لَا ذَلُوْلٌ : اَیْ لَا تَذَلَّلَ لِلْحِرَاثَةِ অর্থাৎ যাকে চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা হয়নি।

لَوْ لَمْ یَسْتَثْنُوْا : اَیْ لَمْ یَقُوْلُوْا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

قَوْلُهُ شِیَةٌ : এ শব্দটি মূলত (ض) وَشْیٌ -এর মাসদার। অর্থ– এক বর্ণের প্রাণীর মাঝে অন্য বর্ণের দাগ থাকা। এখানে সরাসরি অর্থ হবে– চিহ্ন, দাগ। شِیَةٌ শব্দটি মূলত وَشْیَةٌ ছিল। وَاوٌ -কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন– زِنَةٌ ও عِدَةٌ -এর মাঝে হযফকৃত وَاوٌ -এর পরিবর্তে শেষে هَا জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বহুবচন شِیَاةٌ

مَسْكُهَا : مَسْكٌ অর্থ চামড়া। বহুবচন, مُسُوْكٌ উল্লেখ্য, সেসময় সাধারণভাবে অন্যান্য গরুর দাম ছিল ৩ দিরহাম। –[বায়জাবী]

قَوْلُهُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا : এর তারকীব সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. فَاقِعٌ হলো صِیْغَهْ صِفَتْ এবং لَوْنُهَا তার ফায়েল।

২. فَاقِعٌ হলো خَبَرْ مُقَدَّمٌ আর لَوْنُهَا হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرٌ

৩. فَاقِعٌ হলো صَفْرَاءُ -এর সিফত। আর لونها মুবতাদা এবং تَسُرُّ النّٰظِرِیْنَ খবর।

তৃতীয় সূরতে প্রশ্ন হয় যে, تَسُرُّ খবরটি مُؤَنَّثٌ হলো কিভাবে, অথচ মুবতাদা তথা لونها তো مذكر

উত্তর : যেহেতু مُضَافٌ اِلَیْهِ স্ত্রীলিঙ্গ, এ হিসেবে খবরকে مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে

আরেকটি জবাব হলো এখানে لَوْنٌ দ্বারা صُفْرَةٌ উদ্দেশ্য। এ হিসেবে مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَسُرُّ النّٰظِرِیْنَ : এটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে بَقَرَةٌ -এর সিফত হওয়ার কারণে। অথবা لَوْنُهَا এর খবর হওয়ার কারণে কেউ বলেন, এটি بَقَرَةٌ বা لَوْنُهَا -এর জমির থেকে حَالٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ بِحُسْنِهَا : بَاءٌ হরফটি سَبَبِیَّتْ -এর অর্থে। اَیْ بِسَبَبِ حُسْنِهَا

قَوْلُهُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ : পূর্বের আয়াতে গাভীর যে রঙ এবং গুণাবলি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তা অনেক গাভীর মাঝেই পাওয়া যায়। তাই তারা নির্দিষ্ট করণার্থে এবং অধিক সুস্পষ্টতার জন্য আবার প্রশ্ন করল।

قَوْلُهُ جِنْسَهُ : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করলেন।

প্রশ্ন: এখানে تَشَابَهَ শব্দটি مُذَكَّرٌ -এর সীগাহ কেন ব্যবহৃত হলো, অথচ গাভী তো হলো مُؤَنَّثٌ

উত্তর : এখানে اَلْبَقَرٌ দ্বারা جِنْسُ بَقَرٌ উদ্দেশ্য। এ হিসেবে تَشَابَهَ মুযাক্কার সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِلَی الْمَقْصُوْدَةِ : اَیْ اَلْمُرَادَةُ لِلّٰهِ اَیِ الَّتِیْ اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰی ذَبْحَهَا وَاَمَرَ بِهِ

اٰخِرَ الْاَبَدِ : এখানে اٰخِرُ الْاَبَدِ দ্বারা উদ্দেশ্য اٰخِرُ حَیَاةِ الدُّنْیَا মোবালাগা স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা اَبَدٌ -এর শেষ নেই।

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ : شَاءَ মুতাআদ্দী ফে'ল। তার মাফউল উহ্য রয়েছে। اَیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هِدَایَتَنَا لِلْبَقَرَةِ অথবা جَزَا মাহযুফ আছে اَیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ هِدَایَتَنَا اهْتَدَیْنَا

প্রশ্ন : اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -কে اِسْمُ اِنَّ এবং خَبَرُ اِنَّ -এর মাঝে কেন আনা হয়েছে?

উত্তর : رِعَایَتِ فَاصِلَةٌ বা আয়াতের শেষের শব্দের ছন্দ মিল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।

اَلْجُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُوْلٍ : অর্থাৎ تُثِیْرُ الْاَرْضَ জুমলাটি ذَلُوْلٌ -এর সিফত। তাই مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ دَاخِلَةٌ فِی النَّفْیِ : অর্থাৎ نَفْیٌ যেমনিভাবে مَوْصُوْفٌ -এর উপর আসে তেমনিভাবে صِفَتْ -এর উপরও আসে মুফাসসির (র.)-এ ইবারত দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, تُثِیْرُ الْاَرْضَ দ্বারা গাভী থেকে اِثَارَةُ الْاَرْضِ -এর نَفْیٌ করা উদ্দেশ্য, ثَابِتْ করা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَلَا تَسْقِی الْحَرْثَ : وَاوٌ عَاطِفَهْ আর لَا টি অতিরিক্ত। প্রথম لا -এর তাকীদের জন্য এসেছে আর لَا تَسْقِی الْحَرْثَ ذَلُوْلٌ -এর দ্বিতীয় সিফত।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ : পূর্বের আয়াতে গাভীর বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন ছিল এখন এ আয়াতে তার বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে প্রথমটি ছিল مَعْقُوْلِيْ আর দ্বিতীয়টি مَحْسُوْسِيْ অবস্থ

قَوْلُهُ اِلَيْهَا : اَىْ اِلَى الْبَقَرَةِ الْمَقْصُوْدَةِ اَوْ اَىِ الْقَاتِلَ . اَوْاِلَى الْحِكْمَةِ الَّتِىْ مِنْ اَجْلِهَا اَمَرَنَا তন্মধ্যে হতে প্রথমটি সুস্পষ্ট এজন্য মুফাসসির (র.) তা গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ الْاَرْض الْمُهَيَّأَةُ لِلزَّرْعِ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে حَالْ বলে مَحَلْ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ক্ষেতি বা চাষাবাদ বলে চাষাবাদের স্থান তথা ক্ষেত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ জমিন যা চাষাবাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

اَلْمُهَيَّأَةُ : اَلتَّهَيُّأ মাসদার থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ।

قَوْلُهُ غَيْر لَوْنِهَا : মুফাসসির (র.) এখানে একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব প্রদান করেছেন। প্রশ্নটি হলো যখন شِيَةٌ দ্বারা لَوْن বা রঙ উদ্দেশ্য তখন لَاشِيَةَ দ্বারা সাধারনভাবে রঙের নফী করা হচ্ছে কেন? পূর্ব থেকেই তো গাভীর মাঝে রঙ প্রমাণিত করা হয়েছে। উত্তর: মুফাসসির (র.) জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো তার নিজস্ব রঙ তথা গাঢ় হলুদ রঙ ছাড়া অন্য কোন রঙ থাকবে না।

এ ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, شِيَةٌ -এর অর্থ হলো এক রঙ অপর রঙের সাথে মিশ্রিত করা। সুতরাং সাধারণভাবে রঙকে নাকচ করা হয়নি; বরং এমন রঙকে যা অন্যের সাথে মিশ্রিত হয়।

قَوْلُهُ غَيْر مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি اِشْكَال -এর জবাব দিয়েছেন। ইশকালটি হলো– لَا ذَلُوْلٌ হলো بَقَرَةٌ -এর সিফত। অথচ হরফ সিফতও হতে পারে না এবং সিফতের جُزْء -ও হতে পারে না। সুতরাং لَا ذَلُوْلٌ শব্দটি সিফত হওয়া ঠিক নয়।

উত্তর : এখানে لَا بِمَعْنَى غَيْر আর غَيْر সিফত হতে পারে। সুতরাং কোনো আপত্তি থাকল না। এজন্যই মুসান্নিফ (র.) غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন।

اَلْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ : অর্থাৎ এখন বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিলেন।

اَلْاٰنَ : مَنْصُوْب بِجِئْتَ وَهُوَ ظَرْفُ زَمَانٍ يَقْتَضِى الْحَالَ وَهُوَ لَازِمٌ لِلظَّرْفِيَّةِ لَا يَتَصَرَّفُ غَالِبًا مُتَضَمِّنَةً مَعْنَى حَرْفِ الْاِشَارَةِ كَاَنَّكَ قُلْتَ هٰذَا الْوَقْتَ وَاخْتَلَفَ فِىْ اَلْ الَّتِىْ فِيْهِ فَقِيْلَ لِلتَّعْرِيْفِ الْحُضُوْرِىْ وَقِيْلَ زَائِدَةٌ لَازِمَةٌ (جُمَلْ ١/٩٦)

نَطَقْتَ بِالْبَيَانِ التَّامِّ : এ ইবারতটুকু দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হলো যে, حَقْ দ্বারা بَاطِلْ -এর বিপরীতার্থক حَقْ বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল না এবং তারা এটাও বুঝাতে চায়নি যে, পূর্বে দুইবার যা বলা হয়েছিল তা বাতিল ছিল; বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো, এখন আপনি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিলেন।

قَوْلُهُ فَوَجَدُوْهَا عِنْدَ الْفَتَى الْبَارِّ بِاُمِّهِ : অর্থাৎ তারা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে সেই বিরল গুণে গুণান্বিত গাভীটি একজন এমন যুবকের কাছে পেল যে তার মায়ের সাথে সদাচারণকারী ও ভক্ত।

যুবকের পরিচয় ও ঘটনা : তার পিতা ছিলেন বনী ইসরাইলের একজন সৎ মানুষ। ইন্তেকালের সময় তার কাছে একটি গাভী ছিল। ইন্তেকালের পূর্বে স্ত্রীকে অসিয়ত করে গেলেন যে, আমার শিশু সন্তানটি বড় হলে এ গাভীটি তাকে দিবে। ছেলেটি তার পিতার ইন্তেকালের পর কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করত এবং তা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করত। কাঠ বিক্রির পয়সাগুলোকে যুবক তিনভাগে ভাগ করত। এক তৃতীয়াংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করত। এক তৃতীয়াংশ তার মায়ের জন্য খরচ করত। বাকী এক তৃতীয়াংশ দান করত। অনুরূপভাবে ছেলেটি রাতকে তিনভাগে ভাগ করত। এক ভাগে ঘুমাত। একভাগে মায়ের খেদমত করত। একভাগে আল্লাহর ইবাদত করত। ছেলেটি বড় হওয়ার পর মা তাকে বললেন, তোমার বাবা তোমার জন্য মিরাস হিসেবে একটি গাভী রেখে গেছেন। সেটি অমুক মাঠে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হচ্ছে। তুমি সেখানে গিয়ে

http://islamiboi.wordpress.com

কথা বলে আওয়াজ দাও যে, হে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.)-এর প্রভু! গাভী প্রদান করুন! সেই গাভীটির নিদর্শন হলো সেটি গাঢ় হলুদ বর্ণের খুবই চমৎকার গাভী। যুবক তার মায়ের নির্দেশে মাঠে গেল এবং দেখল গাভীটি সেখানে বিচরণ করছে। মায়ের বর্ণিত নিদর্শন ও গুণাবলি তার মাঝে প্রত্যক্ষ করল। মায়ের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আহ্বান করার সাথে সাথে গাভীটি তার সামনে চলে আসে। যুবক যখন গাভীর ঘাড় ধরে টানতে লাগল, তখন গাভী বলল, হে মায়ের বাধ্য সন্তান তুমি আমার উপর আরোহণ কর! তোমার আরাম হবে। যুবক বলল, আমার জননীর নির্দেশ হলো তোমার গর্দান ধরে নিয়ে যাওয়া, আরোহণ করা নিষেধ আছে। গাভী বলল, হে যুবক তুমি যদি আমার কথামত আমার উপর সওয়ার হতে তাহলে কখনো আমি তোমার বাধ্য হতাম না। তোমার মায়ের আনুগত্যের কারণে তোমার এ মর্তবা হাসিল হয়েছে যে, পাহাড়কেও যদি নির্দেশ কর, তাহলে সেও তোমার সামনে চলতে শুরু করবে।

মোটকথা যুবক গাভীটি নিয়ে তার মায়ের কাছে পৌঁছল। মা বলল, হে ছেলে! তুমি তো খুব গরীব, দিনে কষ্ট সংগ্রহ করে ফের রাতে দাঁড়িয়ে বন্দেগী করা তোমার জন্য কষ্টকর। তাই ভাল মনে করছি তুমি এ গাভীটি বিক্রি করে ফেল। যুবক সন্তান জিজ্ঞাসা করল, কত দামে বিক্রি করব? মা বললেন, তিন দিনার মূল্যে বিক্রি কর। এটি সে সময়ের বাজার দর ছিল। সেই সঙ্গে মা বলে ছিলেন বিক্রির পূর্ব মুহূর্তে ফের আমার কাছে জেনে নিবে। যুবক মায়ের নির্দেশ মত গাভীটি বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা যুবকের মাতৃভক্তি পরীক্ষা করার জন্য একটি ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা এসে গাভীর দাম জিজ্ঞেস করল। যুবক বলল, গাভীর মূল্য তিন দিনার, তবে শর্ত হলো আমার মাকে জিজ্ঞেস করে নিব। ফেরেশতা বলল, আমার কাছ থেকে ছয় দিনার গ্রহণ কর এবং গাভীটি আমাকে দিয়ে দাও। জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। যুবক বলল, তুমি যদি গাভীর সমপরিমাণ স্বর্ণও আমাকে দান কর তবুও আমি আমার মায়ের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করব না। একথা বলে মায়ের কাছে গমন করল এবং অবস্থা বর্ণনা করল। মা বললেন, সেতো ক্রেতা নয়; বরং ফেরেশতা। সে তোমার পরীক্ষা নিতে এসেছে। তাকে বরং জিজ্ঞাসা কর যে, আমরা এ গাভীটি বিক্রি করব কিনা?

যুবক তাকে বিক্রি করার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে ফেরেশতা বলেন, এখনই তা বিক্রি কর না। হযরত মূসা (আ.)-এর কওম তোমার কাছে একটি নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে এটি খরিদ করবে। তুমি তাদের কাছে গাভীর চামড়া পরিপূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে। সুতরাং যাও, গাভী নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসো।

ঐ দিকে বনী ইসরাইলের উপর এমন একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ হলো। খুঁজতে খুঁজতে এসে যুবকের কাছ থেকে চামড়া ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে খরিদ করে এবং জবাই করে। -[হাশিয়ায়ে ছাবী খ.১, পৃ. ৫১]

وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ : অর্থাৎ তাদের এ খুঁটিনাটি প্রশ্নধারা দৃষ্টে আজ্ঞা পালন সুদূর পরাহতই বুঝা যচ্ছিল

وَفِي الْبَيْضَاوِيْ : وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ لِتَطْوِيْلِهِمْ وَكَثْرَةِ مُرَاجَعَاتِهِمْ وَلِخَوْفِ الْفَضِيْحَةِ فِيْ ظُهُوْرِ الْقَاتِلِ اَوْ لِغَلَاءِ ثَمَنِهَا .

আয়াতের মাঝে বিরোধ ও নিরসন : প্রথমে বলা হয়েছে, فَذَبَحُوْهَا অর্থাৎ বনী ইসরাঈল গাভী জবাই করেছে। পরে বলা হয়েছে وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ তারা গাভী জবাই করা তো দূরের কথা, জবাইয়ের কাছেও পৌঁছেনি। আয়াতের প্রথম ও শেষাংশে বাহ্যত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান কি?

সমাধান-১ : نَفِيْ وَاِثْبَاتٌ-এর বিষয়টি اِخْتِلَافُ اَوْقَاتٌ বা সময়ের ভিন্নতা হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে তো জবাই করার ধারে কাছেও ছিল না; বরং নানাবিধ হুজ্জতবাজি ও বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা সবকিছু পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তাদের দলিল প্রমাণ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং খোঁজ-তালাশের পর বর্ণিত গাভীরও সন্ধান পেয়ে গেছে তখন অগত্যা জবাই করতেই হয়েছে। اَيْ فَذَبَحُوْهَا فِي الزَّمَانِ الثَّانِيْ وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ فِي الزَّمَانِ الْاَوَّلِ .

সুতরাং সময়ের ভিন্নতার কারণে আর বিরোধ থাকলো না।

সমাধান-২ : نَفِيْ وَاِثْبَاتٌ-এর বিষয়টি اِخْتِلَافُ اِعْتِبَارَيْنِ হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ এক দৃষ্টিতে তারা জবাই করার উপক্রম ছিল না। অপর দৃষ্টিতে জবাই করেছে। এখন কথা হলো, কোন দৃষ্টিকোণে তারা জবাই করতে চায়নি। এর কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। যথা-

১. হয়তো তারা লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কায় জবাই করতে চায়নি। এতে প্রকৃত ঘাতকের সন্ধান মিলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল।

২. অধিক মূল্যের কারণে। কেননা তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল গাভীর চামড়া বরাবর স্বর্ণ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করার দৃষ্টিতে জবাই করতে হয়েছে। কেননা গাভীর দাম বেশি বা কম যাই হোক না কেন কিংবা লজ্জিত হতে হোক বা না হোক আল্লাহ তা'আলার হুকুম তো মানতেই হবে। সুতরাং দৃষ্টিকোণ ভিন্ন হওয়ার কারণে আর কোনো বিরোধ থাকলো না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٢. اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الدَّالِ اَيْ تَخَاصَمْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مُظْهِرٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ مِنْ اَمْرِهَا وَهٰذَا اِعْتِرَاضٌ وَهُوَ اَوَّلُ الْقِصَّةِ .

৭২. আর স্মরণ কর যখন তোমরা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে। অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়ে পরস্পরে দোষারোপ ও বিবাদ করছিলে এই বিষয়ে তোমরা যা গোপন রাখছিলে আল্লাহ তা'আলা তা উদঘাটন প্রকাশ করেছেন। এটা বক্ষমাণ ঘটনাটির শুরুর কথা। اِدّٰرَءْتُمْ শব্দটি মূলত تَدَارَءْتُمْ ছিল اَلِفْ পরবর্তী অক্ষর ت-কে دَالْ-এর মধ্যে اِدْغَامْ বা সন্ধিভূত করে দেওয়া হয়েছে। وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ এই বাক্যটি مُتَعَرِضَةٌ মু'তারিজা বা বিচ্ছিন্ন বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٣. فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ اَيِ الْقَتِيْلَ بِبَعْضِهَا فَضُرِبَ بِلِسَانِهَا اَوْ عَجْبِ ذَنَبِهَا فَحَيَّ وَقَالَ قَتَلَنِىْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ لِاَبْنَىْ عَمِّهِ وَمَاتَ فَحُرِمَا الْمِيْرَاثَ وَقُتِلَا قَالَ تَعَالٰى كَذٰلِكَ الْاِحْيَاءِ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهِ دَلَائِلَ قُدْرَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تَتَدَبَّرُوْنَ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى اِحْيَاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلٰى اِحْيَاءِ نُفُوْسٍ كَثِيْرَةٍ فَتُؤْمِنُوْنَ .

৭৩. অনন্তর আমি বললাম, এর কোনো অংশ দ্বারা তাকে নিহত ব্যক্তিটিকে আঘাত কর। অতঃপর তারা ঐ গাভীটির জিহ্বা বা লেজের গোড়ার ভাগ দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করল। এতে সে পুনরুজ্জীবিত হলো এবং বলল, অমুক অমুক জন আমাকে হত্যা করেছে। তারা দুইজন ছিল তার চাচাত ভাই। অতঃপর পুনরায় সে মারা গেল। ফলে তারা [হত্যাকারীরা] মিরাস থেকে বঞ্চিত হলো এবং উভয়কেই হত্যা করা হলো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে পুনর্জীবনদানের মতো আল্লাহ তা'আলা মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন অর্থাৎ তার কুদরতের প্রমাণাদি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার অর্থাৎ চিন্তা করতে পার এবং জানতে পার যে, যিনি একটি প্রাণের পুনরুজ্জীবনদানের ক্ষমতা রাখেন বহু প্রাণের পুনরুজ্জীবনদানেও তিনি নিশ্চয় সক্ষম। এতে তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَادّٰرَءْتُمْ : -এর মূলধাতু دَرْءٌ-এর মাঝে ঝগড়া করার অর্থ যেমন রয়েছে, তদ্রূপ প্রতিহত করা ও প্রতিরোধ করার অর্থও রয়েছে। পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা- وَيَدْرَءُ عَنْهَا الْعَذَابَ [সূরা নূর : ৮] وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ [সূরা কাসাস : ৫৪]

اِدّٰرَءْتُمْ : এখানে [اِفَّاعَلْتُمْ ওজনে] পরস্পর ঝগড়া কলহ ও একে অন্যকে দোষারূপ করার অর্থে।

فِيْهَا : اَىْ فِىْ وَاقِعَةِ قَتْلِ النَّفْسِ .

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে গাভী জবাই করার নির্দেশ ছিল। এখন এ আয়াতে গাভী জবাইয়ের নির্দেশ কেন প্রদান করা হয়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পূর্বে দীনি ব্যাপারে ইহুদীদের হঠকারিতার বিবরণ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে তা কিরূপ বাহানা করত। এ আয়াতে দুনিয়াবী ব্যাপার তাদের আচরণ কিরূপ ছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, পার্থিব সম্পদের লোভ তাদের মাঝে এ পরিমাণ প্রবল ছিল যে, সম্পদের লোভে একটি সম্মানিত প্রাণ হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। তারপর আবার এ হত্যার দায়ভার অন্যের ঘরে চাপানোর চেষ্টা করেছে।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا-এর মাঝে اذ -এর আমেল উহ্য আছে। اَىْ اُذْكُرُوْا اِذْ قَتَلْتُمْ আর قَتَلْتُمْ -এর مُخَاطَبْ বা সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো নবীযুগের ইহুদিগুণ। কিন্তু উদ্দেশ্য তাদের পূর্বপুরুষগণ।

قَوْلُهُ قَتَلْتُمْ نَفْسًا : এখানে ইশকাল হয় যে, قَاتِلْ বা হত্যাকারী তো একজনই ছিল। তারপরও এখানে বহুবচনের সীগা ব্যবহার করা হলো কেন? তার উত্তর হলো যেহেতু নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারী জানা যায়নি, সেহেতু পূর্ণাজতির প্রতিই তার নিসবত করা হয়েছে।

কেউ বলেন, হত্যাকারী দু'জন ছিল। সে হিসেবে বহুবচন আনা হয়েছে। এখানে جَمْعٌ فَوْقَ الْوَاحِدْ হয়েছে।

আবার কেউ বলেন– হত্যাকারী অনেক লোকই ছিল। কেননা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ সকলে একমত হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ছিল। তাই বহুবচন দ্বারা সকলের প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ : তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আমীলকে হত্যা করেছিল। তারপর তারা একে অন্যকে দোষারোপ করছিল। তোমরা যা গোপন রাখছিলে [অর্থাৎ নিজেদের ঈমানী দুর্বলতা অথবা হত্যাকারীর পরিচয়] আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেন।

قَوْلُهُ وَهٰذَا اعْتِرَاضْ : অর্থাৎ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ হলো مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف -এর মাঝখানে একটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ সেই সাথে এটি একটি سَوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব ৩১ আয়াতের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যখন তারা তর্ক-বিতর্ক করছিল তখন আল্লাহ তা'আলা হত্যার বিষয়টি প্রকাশকারী। অথচ প্রকাশ করার ঘটনা ঘটেছে পরে।

জবাব : ইশকাল তখন হতো, যদি وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ জুমলায়ে হাল হতো। কিন্তু এটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ তাই কোন ইশকাল নেই।

قَوْلُهُ هُوَ اَوَّلُ الْقِصَّةِ : অর্থাৎ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ থেকে ঘটনার শুরু অংশের বর্ণনা। পূর্বে اِدَّارَأْتُمْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً -এর মাঝে ঘটনার পরের অংশের বিবরণ ছিল। তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে শেষ অংশটিকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আগপিছের কারণ হলো, ইহুদিদের মন্দ কর্মসমূহ একত্রে বর্ণনা করা।

قَوْلُهُ فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে প্রাণ হত্যা এবং ঘাতকের নির্ণয় সম্পর্কে ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্কের আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘাতকের নির্ণয়ের পদ্ধতি বলে দিচ্ছেন।

قَوْلُهُ الْقَتِيْلُ : এটি اِضْرِبُوْهُ -এর ه জমিরের مَرْجِعْ মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা একটি سَوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : পূর্বে نَفْس স্ত্রীলিঙ্গে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর اِضْرِبُوْهُ -এর মাঝে مُذَكَّرْ জমির কিভাবে আনা হলো?

উত্তর : نَفْس দ্বারা যেহেতু قَتِيْل তথা নিহত ব্যক্তি উদ্দেশ্য সেহেতু قَتِيْل তথা নিহত ব্যক্তি উদ্দেশ্য সেহেতু قَتِيْل এর বিচারে এখানে مُذَكَّرْ জমির আনা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, تَذْكِيْرُ الضَّمِيْرِ لِتَذْكِيْرِ الْمَعْنٰى অর্থাৎ কায়দা আছে যখন জমির مُذَكَّرْ হয় এবং مَعْنٰى বা অর্থ مُؤَنَّثْ হয় অথবা তার উল্টো হয়, তাহলে জমিরকে مُذَكَّرْ বা مُؤَنَّثْ আনা উভয় সূরত জায়েজ।

http://islamiboi.wordpress.com

[illegible] : অর্থাৎ নিহত ব্যক্তিকে গাভীর কোন অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত [illegible] মুফাসসির (র.) তন্মধ্য হতে দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। যথা–

[illegible] দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

[illegible] বলেন, লেজের গোড়া দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। কেউ বেলছেন, যে কোনো একটি হাড্ডি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَحَىَّ : حَىَّ - بَابْ سَمِعَ থেকে অর্থাৎ তারপর সে জীবিত হলো। বর্ণিত আছে, যখন সে জীবিত হয়েছিল, তখন তার শিরা থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছিল। তারপর সে তার দুই চাচাত ভাই সম্পর্কে বলেছিল– قَتَلَنِىْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ আমাকে অমুক এবং অমুক হত্যা করেছে। একথা বলার পর সে সেখানেই ঢলে পড়ে।

জবাইকৃত প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার তাৎপর্য : এখানে প্রশ্ন হতে পারে মৃত্যু প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার হুকুম দেওয়া হলো কেন?

উত্তর: যদি জীবিত প্রাণীর অংশ দিয়ে আঘাত করার হুকুম দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো এ সংশয় হতে পারত যে, সম্ভত জীবিত প্রাণীর রূহ মৃতের মাঝে প্রবেশ করার কারণে সে জীবিত হয়েছে। তখন এটা তেমন বিস্ময় প্রকাশ করত না।

قَوْلُهُ وَقَتَلَا : এখানে ইশকাল হয় যে, শুধু নিহত ব্যক্তির বক্তব্যকে কিসাস প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট মনে করা হলো কেন? অথচ শরয়ী সাক্ষ্য ছাড়া কারো উপর قَتْل প্রমাণিত হয় না এবং কিসাসও আসে না।

উত্তর : হযরত মূসা (আ.) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সঠিকই বলবে। এজন্য এ স্থানে শুধু নিহতের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتُؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ বিবেকের দাবিতো এই যে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান নসীব হবে। সুতরাং বুঝা গেল, এরপরও যারা ঈমান আনল না, তাদের বিবেক নেই।

মুফাসসির (র.) এখানে এদিকেও ইঙ্গিত দিলেন যে, كَذٰلِكَ এর সম্বোধন মক্কার মুশরিকদেরকে করা হয়েছে। যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করত। এখানে আহলে কিতারা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা পরকাল ও পুনরুত্থান বিশ্বাস করত। এ সূরতে كَذٰلِكَ الخ জুমলায়ে মুতারিজা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবন : জীবন এবং আত্মার বাস্তবতা একটি সূক্ষ্ম বাল্বের হৃৎপিন্ড। যা ফ্লাগ বা সুইজ -এর মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। সেটা যদি ফিউজ [অকেজো] হয়ে যায়, তখন ইঞ্জিনিয়ার [আল্লাহ] পুনরায় কানেকশান ঠিক করে দিতে পারেন। উক্ত ঘটনার মধ্যে সেটার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আর এটাই মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের বাস্তবতা। এ প্রমাণকে অসম্ভব মনে করার কিছুই নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٤. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ صَلُبَتْ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ إِحْيَاءِ الْقَتِيلِ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَاتِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فِي الْقَسْوَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ط مِنْهَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ط وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الشِّينِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ط وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ يَنْزِلُ مِنْ عُلُوٍّ إِلَى سِفْلٍ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَقُلُوبُكُمْ لَا تَتَأَثَّرُ وَلَا تَلِينُ وَلَا تَخْشَعُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ.

৭৪. হে ইহুদিগণ! এরপর নিহত ব্যক্তিকে পুনঃজীবন দানের উল্লিখিত ঘটনা এবং তৎপূর্ববর্তী নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল। সত্য গ্রহণ করা সম্পর্কে তা শক্ত হয়ে পড়ল। কাঠিন্য তা পাথর কিংবা তদপেক্ষা কঠিনতর। এগুলোর মধ্যেও কতক পাথর এমন যে তা হতে নদীনালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এরূপ যে বিদীর্ণ হয়ে যায় ও পরে তা হতে পানি নির্গত হয়। আবার কতক এমন যা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ধ্বসে পড়ে উপর হতে নিচে গড়িয়ে পড়ে। আর তোমাদের হৃদয় এমন যে, এতে প্রভাবান্বিত হয় না, কোমল হয় না, বিনয়াবনত হয় না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় তিনি তোমাদের পাকড়াও করা পিছিয়ে রেখেছেন।

يَشَّقَّقُ শব্দটির আসল রূপ হলো يَتَشَقَّقُ -এর ت অক্ষরটিকে তৎপরবর্তী অক্ষর ش -এ إِدْغَامٌ বা সন্ধিভূত করে দেওয়া হয়েছে।

تَعْمَلُونَ শব্দটি অপর এক কিরাতে يَعْمَلُونَ [নাম পুরুষ, বহুবচন] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় خِطَاب অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষবাচক রূপ হতে নাম পুরুষবাচক রূপের দিকে এইস্থানে اِلْتِفَات বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

ثُمَّ এ স্থানে দীর্ঘকালের দূরত্বের জন্য নয়; বরং বর্তমানের দূরত্বের জন্য অর্থাৎ রূপকার্থে দূরে রাখতে চাওয়ার জন্য। مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ -ও ওটারই সাহায্যের জন্য। مِنْهَا অর্থাৎ قَسْوَةً - مَنْصُوبٌ তমঈয হিসেবে এবং مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ মাহযূফ। أَقْسٰى ও ইসমে تَفْضِيل কিন্তু এ স্থানে أَشَدُّ قَسْوَةً -এর মধ্যে অধিক مُبَالَغَةٌ রয়েছে মূল ও আকৃতি উভয় হিসেবে। لَمَّا -এর মধ্যে مَا মাউসূলা اَلَّذِيْ অর্থে نَصَبَ -এর স্থানে اِنْ হওয়ার কারণে এবং لَامٌ তাকিদের জন্য। أَوْ সন্দেহের জন্য আসে। আল্লাহর কালাম তো সন্দেহের উদ্দীপক নয়।

উত্তর : এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে- ১. وَاوْ -এর অর্থে, অথবা বণ্টন ও বিভক্তির জন্য। কিংবা بَلْ -এর অর্থে।

http://islamiboi.wordpress.com

هِيَ মুতা'আল্লিক্ব। مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ফায়েল قُلُوْبُكُمْ ফেয়েল قَسَتْ -কে দূরে রাখতে চাওয়ার জন্য। قَسَاوَتْ - ثُمَّ মুবতাদা كَالْحِجَارَةِ মুতা'আল্লিক্ব হয়ে খবর, অথবা এর মধ্যে كَافْ তাম্‌ছীলিয়্যাহ, পুনরায় مُتَعَلِّقْ করার প্রয়োজন নেই أَشَدُّ মা'তৃফ হয়েছে كَافْ -এর উপর أَيْ أَوْ هِيَ أَشَدُّ قَسْوَةً তমঈয, لَامْ তাকিদ, مَا মাউসূলা। ইসমে يَتَفَجَّرُ- اَنْ জুমলা-সেলাহ্। مِنَ الْحِجَارَةِ এটি ان -এর খবর। مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ মান্‌সূবুল মহল يَهْبِطُ থেকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে বনী ইসরাইলের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর বিধিবিধানে হীলা-বাহানা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করত। এখন এ আয়াতে তার কারণ ও উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। তাহলো তাদের قَسَاوَتْ قَلْبٌ বা অন্তরের রূঢ়তা। সেই সাথে এখানে তাদের উক্ত قَسَاوَتْ قَلْبْ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমরা দিন-রাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নবীর মুজিযা প্রত্যক্ষ করছ; কিন্তু তারপরও অন্তর নরম হয় না। এটা কেমন কথা!

قَوْلُهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ : অর্থাৎ এসব কিছুর পরও তথা নিহত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার পর এবং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এরূপ নিদর্শন দেওয়ার পরও তোমাদের মন বিগলিত হলো না এবং সত্য গ্রহণ করার প্রতি বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট হলো না। উল্টো তোমাদের অন্তরসমূহ পাথরের মতো কঠোর; বরং পাথরের চেয়েও কঠোর হয়ে গেল। কেননা পাথর এত শক্ত হওয়ার পরও কতক পাথর থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়, কতক পাথর ফেটে ঝর্ণা নির্গত হয়, আবার কতক পাথর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ধসে পড়ে। কিন্তু তোমাদের অন্তর এ তিন রকম পাথর অপেক্ষাও কঠিন।

প্রশ্ন : ثُمَّ অব্যয়টি تَرَاخِيْ زَمَانْ বা কালের দূরত্ব বুঝায়। যার দ্বারা বুঝা যায়, তাদের قَسَاوَتْ قَلْبْ একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হয়েছে। অথচ ইহুদিদের قَسَاوَتْ قَلْبِيْ সে সময়ই বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং মনে হচ্ছে ثُمَّ -এর ব্যবহার তার مَحَلْ বা উপযুক্ত স্থানে হয়নি।

উত্তর : এখানে ثُمَّ -এর ব্যবহার مَجَازْ হিসেবে اِسْتِبْعَادْ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ এত সব দলিল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও একজন আকেল বালেগের হৃদয়ে কাঠিন্য থাকা অসম্ভব। কেননা তার প্রত্যেকটি নিদর্শন হৃদয় বিগলিত হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র ছিল। বিশেষভাবে নিহতের জীবিত হওয়া ও ঘাতকের নাম বলা এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : [তারপরও] এটি اِسْتِبْعَادْ -এর অধিক তাকিদ বুঝানোর জন্য। কেননা ثُمَّ দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ দ্বারাও তাই বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের পাষাণত্ব আরো প্রকট হওয়াকে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করছে।

قَوْلُهُ اَلْمَذْكُوْرُ مِنْ اِحْيَاءِ الْقَتِيْلِ : মুফাসসির (র.) এখানে اَلْمَذْكُوْرُ শব্দটি উল্লেখ করে একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, পূর্বে তো অনেক নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। সেসবের প্রতি ذٰلِكَ একবচন শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হলো? উত্তর. মুফাসসির (র.) اَلْمَذْكُوْرُ শব্দ উল্লেখ করে তার জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْمَذْكُوْرُ -এর তাবীল দ্বারা مُتَعَدِّدْ বা একাধিক বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেই সাথে মুফাসসির (র.) اَلْمَذْكُوْرُ শব্দে ইঙ্গিত করেছেন যে, ثُمَّ -এর عَطْفْ পূর্বের সকল ঘটনার مَضْمُوْنْ বা বিষয়বস্তুর প্রতি হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْاٰيَاتِ : অর্থাৎ ঐ সকল নিদর্শন ও মুজিজা যেগুলোর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। যেমন সমুদ্রের পানি দুভাগে বিভক্ত হওয়া এবং ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ : এখানে ইশকাল হয় যে, هِيَ একবচনের জমির। আর اَلْحِجَارَةُ হলো حِجْر -এর বহুবচন। مُفْرَدْ -কে جَمْعٌ-এর সাথে কিভাবে তাশবীহ দেওয়া হলো?

উত্তর. هِيَ-এর مَرْجِعٌ হলো قُلُوْبٌ ; যা বহুবচন। এ হিসেবে حِجَارَةٌ বহুবচন আনা হয়েছে।

পাথরের সাথে উপমা দেওয়ার তাৎপর্য : পাথরের সাথে উপমা দেওয়া হলো কেন, লোহার সাথে দেওয়া হলো না কেন? অথচ লোহা পাথরের চেয়ে শক্ত ও কঠিন।

উত্তর : লোহা কখনো নরম হয়ে যায়, গলে যায়, যেমন পবিত্র কুরআনেই এসেছে- وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিলাম। সেজন্য পাথরের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى الْقَسْوَةِ : এটি হলো وَجْه شِبْه আর قَسَاوَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَدَمْ تَاَثُّرْ বা প্রতিক্রিয়া না হওয়া। অর্থাৎ তাদের অন্তর প্রভাব তথা নসিহত গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে পাথরের মত।

قَوْلُهُ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً : এখানে اَوْ অব্যয়টি অথবা কিংবা অর্থে নয়, بَلْ বরং অর্থে -[তাফসীরে কাবীর]। কারো কারো মতে اَوْ এখানে বৈধতাবোধক। অর্থাৎ তাদের পাথর মনে করা কিংবা তার চেয়েও কঠিন মনে করা উভয়টিই বৈধ ও সঠিক। তবে اَوْ অব্যয়টিকে تَوْزِيْع প্রকরণবোধক সাব্যস্ত করা সর্বোত্তম। তখন অর্থ হবে তাদের হৃদয়গুলো দুই প্রকারের। ক. কিছু তো পাথরের ন্যায় কঠিন এবং খ. কিছু তার চেয়েও কঠিন। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৩৮]

قَوْلُهُ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ الخ :

পাথরের শ্রেণীবিন্যাস ও ক্রিয়া : আয়াতে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ ১. পাথর থেকে বেশি পানি প্রসরণ ২. কম পানি নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। ৩. আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ পাথরের কোনোরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই। কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে, যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণত বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চেয়ে কুরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোনো অংশেই কম নয়।

এছাড়া আমরা এরূপ দাবিও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নিচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কতক পাথর বলেছেন। সুতরাং নিচে গড়িয়ে পড়ার জন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলার ভয়। -[মাআরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

ইহুদিদের অন্তর পাথরের চেয়েও বেশি কঠিন : এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণিবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা সৃষ্টজীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্টিজীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলো দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর অপেক্ষাও বেশি শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরিউক্ত রূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, খোদার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরিউক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদিদের অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত। -[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٥. اَفَتَطْمَعُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اَيِ الْيَهُوْدُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ اَحْبَارُهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ فِى التَّوْرٰةِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ يُغَيِّرُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ فَهِمُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ اَيْ لَا تَطْمَعُوْا فَلَهُمْ سَابِقَةٌ فِى الْكُفْرِ ـ

৭৫. হে ঈমানদারগণ, তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা ইহুদিগণ তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? যখন তাদের একদল এক সম্প্রদায় অর্থাৎ শিক্ষিত পুরোহিত সম্প্রদায়ে তাওরাতে আল্লাহ তা'আলার বাণী শ্রবণ করত এবং বুঝার পর হৃদয়াঙ্গম করার পরও তা বিকৃত করত পরিবর্তিত করে নিত অথচ তারা জানত যে, বিষয়ে মিথ্যা রচনাকারী।

اَفَتَطْمَعُوْنَ -এর প্রশ্নবোধক অক্ষর هَمْزَةٌ টি এই স্থানে অসম্মিতসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এটার আশা করো না। কেননা পূর্ব হতেই তারা কুফরি করে আসেছে।

٧٦. وَاِذَا لَقُوْا اَيْ مُنَافِقُوا الْيَهُوْدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ـ بِاَنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهٖ فِيْ كِتَابِنَا وَاِذَا خَلَا رَجَعَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْا اَيْ رُؤَسَاؤُهُمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُنَافِقُوْا لِمَنْ نَافَقَ اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اَيْ عَرَّفَكُمْ فِى التَّوْرٰةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ لِيُحَاجُّوْكُمْ لِيُخَاصِمُوْكُمْ وَاللَّامُ لِلصَّيْرُوْرَةِ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُقِيْمُوْا عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ فِيْ تَرْكِ اِتِّبَاعِهٖ مَعَ عِلْمِكُمْ بِصِدْقِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ اَنَّهُمْ يُحَاجُّوْنَكُمْ اِذَا حَدَّثْتُمُوْهُمْ فَتَنْتَهُوْا ـ

৭৬. তারা অর্থাৎ ইহুদি মুনাফিকরা যখন মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে আমরা বিশ্বাস করেছি যে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের পতি অবতীর্ণ গ্রন্থ তাওরাতে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর যখন নিভৃতে ফিরে যায় ও একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন তাদের ঐ নেতাগণ যারা মুনাফিকরূপেও ঈমান আনেনি, তারা এই মুনাফিকদেরকে বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ তাওরাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর যে গুণাবলি তোমাদের অবহিত করেছেন, তোমরা কি তাদেরকে মু'মিনগণকে তা বলে দাও? পরিণামে যেন তারা পরকালে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করতে পারে। তোমাদের বিরুদ্ধে বিবাদ করতে পারে এবং তাঁর [নবুয়তের] সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণ পরিত্যাগ করার বিষয়ে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এই কথা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। তোমরা কি অনুধাবন কর না যে, তাদেরকে যদি এই কথা বলে দাও, তবে তোমাদের বিরুদ্ধে তারা সেটা প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করবে? তাই তোমাদের এ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

لِيُحَاجُّوْكُمْ -এর لَامٌ টি صَيْرُوْرَتْ বা শেষ পরিণাম অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

٧٧. قَالَ تَعَالٰى اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَلْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ مَا يُخْفُوْنَ وَمَا يُظْهِرُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ فَيَرْعَوُوْا عَنْ ذٰلِكَ.

৭৭. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা কি জানে না, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ব্যক্ত করে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতভাবে তা জানেন? اَوَلَا -এর প্রশ্নসূচক هَمْزَةٌ হামজা টি এস্থানে تَقْرِيْرٌ বা বক্তব্যটির সুসাব্যস্তকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তৎপরবর্তী وَاوٌ অক্ষরটি ব্যবহৃত হয়েছে عَطْف -এর অর্থে। অর্থাৎ এই বিষয়েই হোক বা অন্য কোনো বিষয়েই হোক তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে, সবকিছুই তিনি জানেন। সুতরাং তারা যেন উক্ত কাজ হতে তারা নিবৃত্ত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

তিনটি হরুফে আতিফাহ্ فَا - وَاو এবং ثُمَّ এগুলো উপর হামযায়ে এস্তেফ্হাম প্রবেশ করে। হ্যাঁ, এর তারকীবের বেলায় মতানৈক্য রয়েছে। জমহুরের অভিমত হচ্ছে, হাম্যাহ যেহেতু صَدَارَتْ كَلَامٌ বা বাক্যের শুরুতে আসতে চায়, তাই এটাকে শুরুতে উহ্য মেনে নিতে হবে এবং অন্যকিছুকে মাহ্যূফ মানা যাবে না। মূল ইবারত এরূপ হবে- وَلَا - فَاتَطْمَعُوْنَ وَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ - يَعْلَمُوْنَ আল্লামা যমখ্শারী (র.)-এর অভিমত হচ্ছে- হামযার مَدْخُوْلٌ মাহ্যূফ হয় যার উপর سِيَاقٌ عِبَارَتْ তথা পাঠাংশের প্রসঙ্গ নির্দেশনা করছে। এস্থানে মূল পাঠাংশ এরূপ হবে اَتَسْمَعُوْنَ اَخْبَارَهُمْ فَتَطْمَعُوْنَ

تَطْمَعُوْنَ : এর ধাতুমূল طَمَعٌ -এর ব্যাপক প্রচলিত অর্থ- লোভ করা, লালায়িত হওয়া। তবে দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আশা করা এবং ভরসা রাখাও ব্যবহার্য। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তার প্রতি লোভাতুর ও লালায়িত হয়েছে এবং তাতে আশাবাদী হয়েছে। -[লিসানুল আরব]।(اِبْنَ عَبَّاسٍ) اَفَتَرْجُوْ يَا مُحَمَّدُ হে মুহাম্মদ! আপনি কি আশা পোষণ করেছেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) اُمِيْد [উম্মেদ] ও থানবী (র.) تَوَقُّعٌ -এর তরজমা করেছেন [দু'টি শব্দের অর্থ আশা-ভরসা।] -[তাফসীরে মাজেদী]

لَامْ - لَكُمْ অতিরিক্ত অথবা لَامْ اَجَلِيَّة [অর্থাৎ নির্ধারণের জন্য] لَامْ - لِيُحَاجُّوْكُمْ শেষ পরিণাম এর অর্থে। অর্থাৎ لَامْ শেষ পরিণামের। যেমন لِلْمَوْتِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لدو। আর এটা يحاجوا -এর সাথে সম্পৃক্ত এবং কাজী বায়যাবী (র.) এটাকে যমীরে بِهٖ থেকে বদল সাব্যস্ত করেছেন। تَعْقِلُوْنَ এরপরে মুফাসসির (র.) মাফউলে মাহ্যূফ বের করেছে। اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ হামযাহ্ স্বীকৃতি ও স্বীকারের জন্য, যার মধ্যে তিরস্কার উদ্দেশ্য। وَاوْ আতিফাহ্ আসলে এর পূর্বে আসা উচিত ছিল; কিন্তু শুরু কালাম হামযা হওয়ার কারণে وَاوْ -কে পরে করে দেওয়া হয়েছে। মূল পাঠাংশ এরূপ اَلَا يَتَامَّلُوْنَ وَلَا يَعْلَمُوْنَ - اَنَّ يُؤْمِنُوْا হরফ নির্ধারণের সাথে খবর اَيْ فِيْ اَنْ يُؤْمِنُوْا وَقَدْ كَانَ জুমলায়ে হালিয়াহ। مِنْهُمْ - رَفْع -এর স্থানে। فَرِيْقٌ -এর সিফত এবং يَسْمَعُوْنَ জুমলা كَانَ -এর খবর। আর فَرِيْقٌ ইস্ম। اِذَا হরফে শর্ত لَقُوْا الخ শর্ত। قَالُوْا اٰمَنَّا জওয়াবে শর্ত। আর এমনিভাবে اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ الخ শর্ত قَالُوْا الخ জওয়াবে শর্ত। بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ -এর মধ্যে مَا মাউসূলা কিংবা মউসূফা অথবা মাসদারিয়া।

قَوْلُهٗ لَكُمْ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, يُؤْمِنُوْنَ -এর صِلَةٌ হিসেবে সর্বদা بَا আসে। এখানে لَامْ কিভাবে এলো?

উত্তর : يُؤْمِنُوْنَ মূলত يَنْقَادُوْا -এর অর্থ পোষণ করে। সে হিসেবে لَامْ এসেছে।

قَوْلُهٗ طَائِفَةٌ : এটি فَرِيْقٌ -এর তাফসীর। فَرِيْقٌ শব্দটি قَوْمٌ এবং رَهْطٌ -এর মতো اِسْمُ جَمْعٍ যার শাব্দিক কোনো একবচন নেই। طَائِفَةٌ শব্দটিও অনুরূপ اِسْمُ جَمْعٍ

قَوْلُهٗ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : وَاوْ حَالِيَة -এটি عَقَلُوْهُ -এর জমির থেকে حَالٌ হয়েছে। সুতরাং এটি حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ হবে। কেউ কেউ বলেন- يُحَرِّفُوْنَهٗ -এর জমির থেকে حَالٌ হয়েছে। اَيْ يُحَرِّفُوْنَهٗ حَالَ عِلْمِهِمْ ذٰلِكَ

قَوْلُهٗ اِنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ : يَعْلَمُوْنَ ফে'লটি মুতাআদ্দী। তাই তার মাফউলের দিকে ইঙ্গিত করে। এ অংশটুকুর চুক্তি করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : উক্ত ইবরাত দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাবও প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ-এর অর্থ তো عَقَلُوْهُ দ্বারাই বুঝা যায়। তারপরও তা উল্লেখের কারণ কি?

উত্তর : উভয়টির مُتَعَلِّقْ ভিন্ন ভিন্ন।

১. عَقَلُوْهُ اَيْ عَقَلُوْا الْكَلَامَ اَوِ الْمَعْنٰى .

২. وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ مُفْتَرُوْنَ .

সুতরাং এখানে কোনো তাকরার বা দ্বিরুক্তি নেই।

«خَلَا» رَجَعَ : প্রশ্ন : خَلَا-এর صِلَةْ হিসেবে اِلٰى আসে না। অথচ اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ-এর মাঝে خَلَا-এর صِلَةْ হিসেবে اِلٰى-এর ব্যবহার হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : বস্তুত মুসান্নিফ (র.) خَلَا-এর তাফসীর رَجَعَ-এর দ্বারা করে এই আপত্তিরই জবাব দিয়েছেন যে, خَلَا শব্দের মাঝে رَجَعَ-এর অর্থ রয়েছে। তাই তার صِلَةْ হিসেবে اِلٰى অব্যয়ের ব্যবহার যথার্থ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيُخَاصِمُوْا كُمْ : এটি يُحَاجُّوْكُمْ-এর তাফসীর। مُحَاجَّةٌ (مُفَاعَلَةٌ) حَاجَّ ঝগড়া করা। এর সম্পর্ক হলো تُحَدِّثُوْنَ-এর সাথে فَتَحَ-এর সাথে নয়। আর بَابْ مُفَاعَلَةْ এখানে مُشَارَكَتْ-এর জন্য নয়; বরং مُبَالَغَه-এর জন্য। اَيْ لِيَحْتَجُّوْا بِهِ عَلَيْكُمْ .

قَوْلُهُ فَتَنْتَهُوْا : এটি جَوَابْ اِسْتِفْهَامْ হওয়ার কারণে نُوْنِ اِعْرَابِىْ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কোনো নোসখায় نُوْنِ اِعْرَابِىْ বহাল আছে। এ সূরতে এটি تعقلون-এর সাথে عَطْف হবে।

فَيَرْعَوُا : اِثْبَاتْ فِعْلْ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ-এর جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। اَلرَّعْوُ(ن) বিরত থাকা। اَيْ فَيَرْجِعُوْا عَنْ ذٰلِكَ কোনো কোনো নোসখায় فَيَرْغَبُوْا আবার কোনো নোসখায় فَيَعْرِضُوْا عَنْ ذٰلِكَ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ আয়াতের পূর্বে ইহুদিদের قَسَاوَتْ قَلْبْ বা অন্তরের রূঢ়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঐ সকল মুসলমানকে সম্বোধন করা হচ্ছে যারা দয়াপরশ হয়ে ইহুদিদেরকে উপর্যুপরি নসিহত করত এবং সদা এ চিন্তায় বিভোর থাকত যে, কোনোভাবে তারা ঈমান গ্রহণ করুক। আল্লাহ তা'আলা তাদের আশা ও কামনা বর্জন করার জন্য বলছেন– ইহুদিদের অন্তর কঠোরতা ও রূঢ়তায় চূড়ান্তে উপনীত হয়েছে। সুতরাং তাদের ঈমান গ্রহণের আশা করো না।

قَوْلُهُ اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُؤْمِنُوْا الخ : এ আয়াতে মু'মিনদের সম্বোধন করে বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে– তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথা মানবে? অথচ তাদের মধ্যে একদল এমন ছিল যারা জেনে শুনে আল্লাহর কালাম বিকৃত করত। اَفَتَطْمَعُوْنَ-এর হামযা (اَ) টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ অর্থাৎ এমন লোকদের ঈমান আনার ব্যাপারে আদৌ আশা নেই। এরপর মুফাস্সির (র.) اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ বের করে ইঙ্গিত করেছেন যে, সম্বোধিত [ব্যক্তি] রাসূল ﷺ ও মুমিনগণ। আর কারো মতে শুধু রাসূল ﷺ-ই সম্বোধিত এবং বহুবচনের সীগাহ সম্মানার্থে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ : এ দল দ্বারা সেই সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর বাণী শুনার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তূর পাহাড়ে গিয়েছিল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে বনী ইসরাঈলের কাছে এ বিকৃত বক্তব্য দেয় যে, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীর শেষ কথা আমরা শুনেছি যে, এসব বিধান তোমরা পালন করতে সক্ষম হলে পালন করবে, অন্যথায় তোমাদের পালন না করারও ইখতিয়ার আছে। কেউ বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা তাওরাত বুঝানো হয়েছে, আর বিকৃতি সাধন বলতে এর মাঝে শব্দ ও অর্থ বিকৃতি সাধন বুঝানো হয়েছে, যেটা তারা করত। কখনও তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচয় সম্পর্কিত আয়াত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৫]

এখানে كَانَ-এর দুটি অর্থ হতে পারে এবং অভিধান ও ব্যাকরণ (نَحْوْ) উভয় অর্থই অনুমোদন করে–

১. অর্থাৎ ইহুদিদের মাঝে এমন একটি দল ছিল তাহলে আলোচনা অতীত যুগ এবং সমসাময়িক ইহুদিদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত।

http://islamiboi.wordpress.com

২. অর্থাৎ তাদের মাঝে এমন একটি উপদলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তাহলে আলোচনার লক্ষ্য বর্তমান যুগ ও সমকালীন ইহুদিরা। তাফসীর সূত্রে উভয় প্রকার বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। তবে বর্ণনাধারা দ্বিতীয় অর্থের অধিক উপযোগী। কেননা সমসাময়িকদের বিপক্ষেই প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং তাদেরকেই অভিযুক্ত করা অধিক সমীচীন হবে। এখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ইহুদিরাই উদ্দেশ্য এবং এটাই সহজবোধ্য। –[তাফসীরে কবীর সূত্রে তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ كَلَامَ اللّٰهِ : অর্থাৎ ইহুদিদের কাছে মওজুদ আসমানি সহীফাসমূহ مِنْ بَعْدِ عَقَلُوْهُ অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অজ্ঞানবশত নয়, দেখে শুনে সবকিছু বুঝা ও শুনার পরে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে।

قَوْلُهُ فِى التَّوْرَاةِ : এটি كَلَامَ اللّٰهِ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ যে কালামুল্লাহ তাওরাতে আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য রজম ও মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলি সম্পর্কিত তাওরাতের বিবরণ। কেউ বলেন– এখানে কালামুল্লাহ দ্বারা তূর পর্বতেরে পাশে দ্রুত আল্লাহর বাণী। এ সূরতে فَرِيْقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সত্তর জন ইহুদি।

ইমাম কালবী বর্ণনা করেন, বনী ইসরাইল হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আল্লাহর কালাম শোনার দাবী করে। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা ভালোভাবে গোসল করে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান কর। নবীর নির্দেশে তারা তাই করল। তূর পাহাড়ের পাদদেশে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর পবিত্র কালাম শুনালেন। আল্লাহর কালাম শ্রবণের পর বাড়ি ফিরে তারা নিজেদের থেকে বলেছিল, আল্লাহ বলেছেন এ বিধানের যতটুকু সহজ লাগে পালন করুন!

কেউ কেউ বলেন, এখানে كَلَامَ اللّٰهِ দ্বারা রাসূল ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী উদ্দেশ্য। ইহুদিদের একটি গ্রুপ ওহী শ্রবণ করে গিয়ে তাতে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করত দীনের মাঝে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর জন্য।

قَوْلُهُ يُغَيِّرُوْنَهُ : এটি يُحَرِّفُوْنَهُ -এর তাফসীর। অর্থাৎ তাওরাতের মধ্যে রাসূল ﷺ -এর যে সকল গুণ ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তাতে পরিবর্তন করত। যেমন তাওরাতে রাসূল ﷺ -এর গঠন প্রকৃতির বিবরণ এসেছে– كَحْلُ الْعَيْنِ رَبْعَةٌ جَعْلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ তদস্থলে তারা طَوِيْلٌ اَزْرَقُ الْعَيْنِ سِبْطُ الشَّعْرِ লিখত।

قَوْلُهُ فَهُمْ سَابِقَةٌ بِالْكُفْرِ : অর্থাৎ কুফরীর ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এর মর্ম হলো মুহাম্মদ ﷺ -এর কুফরীর পূর্বেও তারা কুফরী করেছে।

ইহুদিদের তিনটি দলের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত দুটি আয়াতে ইহুদিদের তিনটি দলের উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম দল : مُحَرِّفِيْنَ [বিকৃতকারী দল] যারা আল্লাহর কালাম অর্থাৎ তাওরাকে আম্বিয়া (আ.) থেকে শ্রবণ করা সত্ত্বেও এর মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন এবং কাট-ছাট করেছে। চাই শাব্দিক বিকৃতি করে থাকুক অথবা অর্থের দিক দিয়ে কিংবা উভয় দিক দিয়ে বিকৃতি করে থাকুক। এমনিভাবে তূর পর্বতের উপর যে ৭০ ব্যক্তি হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে থেকে আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে এর মধ্যে সংস্কার করেছিল, তারাও এর মধ্যে গণ্য। আর যাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা এমন হয়। তাদের উত্তরাধিকারীরা কিভাবে তাদের বিরোধী হতে পারে। তাই এ সকল লোকদের সংশোধন ও হোদায়েতের কোনো আশা রাখবেন না।

দ্বিতীয় দল : দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত ইহুদি মুনাফিকদের যাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল।

তৃতীয় দল : প্রকাশ্য ইহুদি কাফেরদের যাদের কথাবার্তা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যদি কখনো তোমাদের মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত দলের কিছু লোক মুসলমানদের সামনে দু একটি সত্য কথা প্রকাশ করে দিতো, তবে ইহুদি নেতারা তাদেরকে নিন্দা ও তিরস্কার এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া ছাড়ত না। সুতরাং যাদের অবস্থা এত শীর্ণ হয়। তাদের থেকে হেদায়েতের আশা করা অযথা।

সূরার প্রথমাংশে মুনাফিকদের সে শব্দগুলো মুসলমানদের সাথে আচার-আচরণ -এর হিসেবে করা হয়েছে। আর এ স্থানে তাদের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে। যেহেতু উদ্দেশ্য বদলে গেছে। তাই পুনরুক্তির সন্দেহ করা ঠিক হবে না।

ইহুদি মুনাফিকদের প্রসঙ্গ : قَوْلُهُ وَاِذَا لَقُوْا : পূর্বে ঐসব মুনাফিকদের আলোচনা ছিল যারা ইহুদি নয়। এখান থেকে ইহুদি মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে। মদীনাবাসী ইহুদিদের একটি বড় অংশ তো প্রকাশ্যে ইসলামের দুশমন ছিল। তবে কিছু সুবিধাবাদী এমনও ছিল, যারা মুসলমানদের সামনে নিজেদের মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দিত। [অথচ অন্তরে তারা মুসলমান ছিল না] এখানে এই মুনাফিকদের আলোচনাই করা হচ্ছিল। অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে যারা মুনাফিক।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪১]

قَوْلُهُ اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ : ইহুদিদের মধ্যে যারা মুনাফিক ছিল, তারা খোশামুদি করে তাদের কিতাবে শেষ নবী সম্পর্কে যা আছে, তা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দিত। এ কারণে অন্যরা তাদের তিরস্কার করে বলত, নিজেদের

http://islamiboi.wordpress.com

কিতাবের প্রমাণ তাদের হাতে তুলে দাও কেন? তোমরা কি জান না; মুসলিমগণ তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের **দেওয়া প্রমাণ দ্বারা তোমাদের** বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে যে, তোমরা শেষ নবীর সত্যতা জেনেও তার প্রতি ঈমান আননি, **ফলে তখন তোমাদেরকে নিরুত্তর** হতে হবে? −[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৫]

ইহুদি পণ্ডিতদের জ্ঞান গভীরতা : যেন এ নির্বোধেরা মনে করছিল যে, ইসলামের রাসূল ﷺ ও ইসলামের অনুসারীরা যা **কিছু [কৃতিত্ব] জ্ঞান অর্জন** করবে, তা শুধু ইহুদিদের বলে দেওয়ার সূত্রেই হতে পারে এবং এছাড়া অন্য কোনো সূত্র তাদের জন্য **নেই। ইলম ও জ্ঞানের** এসব দরজা তাদেব জন্য রুদ্ধ। তাদের এ 'দ্বিবিধ অজ্ঞানতার অজ্ঞতা' (جَهْل مُرَكَّب) ঠিক তদ্রূপ, **যেমন বর্তমানে গোটা** ফিরিঙ্গি সমাজ [পাশ্চাত্যবাসী] অজ্ঞানতার আঁধারে নিমজ্জিত। এ বিশেষ অজ্ঞরা কুরআন শরীফ সম্পর্কে **পর্যালোচনা করতে** লাগলে প্রথমে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নেয় যে, কুরআনে যা কিছুই উল্লিখিত হয়েছে, তা ইহুদিদের **প্রচলিত তাওরাত** ও খ্রিস্টানদের প্রচলিত ইঞ্জীল এবং এ ধরনের অন্যান্য মানব রচিত সূত্র হতেই আহরিত ও উদ্ধৃত হয়েছে **এবং এতে কোনো** অদৃশ্য জাগতিক সংযোগ-সহায়তা ওহী ও ইলহাম [অন্তরে খোদায়ী বাণী উদ্ভাসন] জাতীয় কোনো কিছু **সংশ্লিষ্ট থাকার** ক্ষীণ সম্ভাবনাও নেই।

قَوْلُهُ وَاللَّامُ لِلصَّيْرُوْرَةِ : لَامْ صَيْرُوْرَتْ দ্বারা لَامْ عَاقِبَتْ উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : উক্ত ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি হলো− **ইবারাতের** বাহ্যিক রূপ থেকে বুঝা যায়, ইহুদিরা সে বিষয়টি এজন্য প্রকাশ করে যাতে মুসলমানগণ ঝগড়া করে। অথচ এ **কথা বলার** সময় তাদের মাথায় এ কথা ছিল না।

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারতের মাধ্যমে তার **উত্তরের প্রতিই** ইঙ্গিত করছেন যে, এখানে لَامْ টি تَعْلِيْل -এর জন্য **নয়;** বরং صَيْرُوْرَتْ তথা عَاقِبَتْ বা পরিণাম **বুঝানোর জন্য অর্থাৎ** এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ পাবে।

قَوْلُهُ فِى الْاٰخِرَةِ : এটি عِنْدَ رَبِّكُمْ -এর তাফসীর **অর্থাৎ** عِنْدَ رَبِّكُمْ দ্বারা يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيُحَاجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ : এর একটি **অর্থ** তো এই [সহজবোধ্য] যে এরা আখিরাত ও কিয়ামতের দিন তোমাদের **স্বীকারোক্তি** দানে বাধ্য করবে। **মুফাসসিরগণের অনেকেই** এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখানে অধিক লাগসই অর্থ হবে− **এই** দুনিয়াতেই তোমাদের **বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ দাঁড় করিয়ে** দেবে। কেননা **প্রথমত** ইহুদিরা তো আখিরাতে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসী ছিল না। দ্বিতীয়ত সেখানে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার **জন্য তো এ ধরনের** বাহ্যিক উপদানের প্রয়োজনও নেই। সেখানে তো সব তথ্য ও তত্ত্ব স্বয়ংক্রিয়রূপে উম্মোচিত হয়ে থাকবে। **এজন্যই এখানে** যেন আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব [সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য] দ্বারা প্রমাণ পেশ করাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে [**প্রতিপালকের** নিকট হতে عِنْدَ رَبِّكُمْ] দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

−[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৪২]

قَوْلُهُ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ : **যোগসূত্র : পূর্বে বলা হয়েছে।** ইহুদি মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহিতার আশংকায় মুমিনদের সম্মুখে ঈমানের কথা **স্বীকারোক্তির ব্যাপারে** একে অন্যকে ভর্ৎসনা করেছে। **যার মর্ম হলো** তাদের ধারণা এভাবে গোপন করার দ্বারা আল্লাহর নিকট **তাদের বিরুদ্ধে** কোনো দলিল প্রমাণ সাব্যস্ত হবে না। এ আয়াতে তাদের সে ধারণা সম্পর্কে ধমক দেওয়া হচ্ছে। আর اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ **-এর জমির** এর মিসদাক মুনাফিক বা অমুনাফিক **ইহুদি** নেতৃবর্গ কিংবা উভয় গ্রুপ হতে পারে।

قَوْلُهُ الْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ : **অর্থাৎ সম্বোধিত ব্যক্তিকে** স্বীকার করতে বাধ্য করার জন্য।

قَوْلُهُ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ : **অর্থাৎ** যে واو টি لَا يَعْلَمُوْنَ الخ -এর আগে এসেছে, তা عَطْف -এর জন্য এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। اَىْ اَيَعْلَمُوْنَهُمْ عَلَى التَّحْدِيْثِ بِمَا ذُكِرَ وَلَا يَعْلَمُوْنَ الخ

জমহুরের মতে এখানে কিছু উহ্য নেই; **বরং** এটি পূর্বের সাথে عَطْف হয়েছে এবং হামযাটি মূলত وَاوْ-এর পরে ছিল। قُوَّتْ اِسْتِفْهَامْ -এর জন্য আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ : **অর্থাৎ** তাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই তো মহান আল্লাহ তা'আলার জানা, তাদের **কিতাবের যা**বতীয় প্রমাণ তিনি মুসলিমগণকে অবহিত করতে পারেন এবং কার্যত কিছু কিছু জানিয়েও দিয়েছেন। রজমের **আয়াত তারা** গোপন করেছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো প্রকাশ করে দিয়ে তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। এ ছিল তাদের **পণ্ডিতদের অবস্থা,** যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও আসমানী বিদ্যার দাবিদার ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৭৮. وَمِنْهُمْ اَيِ الْيَهُوْدِ اُمِّيُّوْنَ عَوَامٌّ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ التَّوْرٰةَ اِلَّا لٰكِنْ اَمَانِيَّ اَكَاذِيْبَ تَلَقَّوْهَا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَاعْتَمَدُوْهَا وَاِنْ مَا هُمْ فِيْ جَحْدِ نُبُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِقُوْنَهُ اِلَّا يَظُنُّوْنَ . ظَنًّا وَلَا عِلْمَ لَهُمْ .

৭৮. তাদের ইহুদিদের মধ্যে কতক রয়েছে নিরক্ষর সাধারণ মানুষ কিছু মিথ্যা আশা ব্যতীত যা তাদের নিকট হতে তারা লাভ করে থাকে এবং তার প্রতি আস্থা পোষণ করে, কিতাব অর্থাৎ তাওরাত [সম্বন্ধে তাদের কোনো জানা নেই।] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করা এবং তাদের অন্যান্য মনগড়া বিষয়ে তারা কেবল মিথ্যা ধারণা করে বেড়ায়, এই বিষয়ে কোনো সঠিক জ্ঞান নেই তাদের।
اِلَّا اَمَانِيَّ : حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ তথা اِلَّا হরফটি এস্থানে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ বা ছিন্ন ও বিজাত্য ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার اِلَّا -এর তাফসীরে لٰكِنْ শব্দের উল্লেখ করেছেন।
وَاِنْ هُمْ এই স্থানে اِنْ শব্দটি مَا [না] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭৯. فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ اَيْ مُخْتَلِقًا مِنْ عِنْدِهِمْ . ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط مِنَ الدُّنْيَا وَهُمُ الْيَهُوْدُ غَيَّرُوْا صِفَةَ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّوْرٰةِ وَاٰيَةَ الرَّجْمِ وَغَيْرَهَا وَكَتَبُوْهَا عَلٰى خِلَافِ مَآ اُنْزِلَ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْمُخْتَلَقِ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ . مِنَ الرُّشٰى .

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি তাদের জন্য যারা নিজেদের তরফ হতে মিথ্যারোপ করে নিজ হস্তে কিতাব রচনা করে অতঃপর দুনিয়ার সামান্য বিনিময়ের জন্য বলে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে। তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুণাবলি এববং রাজম [বিবাহিত ব্যাভিচারী ও বিবাহিতা ব্যভিচারিণীকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান] ও এই ধরনের অন্যান্য আয়াতসমূহ তারা বিকৃত ও পরিবর্তিত করত এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ নির্দেশের বিপরীত কথা [তাওরাতে] লিখে রাখত। তাদের হাত যা যে মনগড়া বিষয় রচনা করে তার জন্য কঠিন শাস্তি তাদের এবং তারা যা অর্থাৎ যে ঘুষ ইত্যাদি উপার্জন করে তদ্দরুন কঠিন শাস্তি তাদের।

তাহকীক ও তারকীব

তাহকীক : اَمَانِيُّ এটি اُمْنِيَّةٌ-এর বহুবচন اُفْعُوْلَةٌ -এর ওজনে। মানুষ অন্তরে যা কল্পনা করে। সেগুলো মিথ্যা এবং বাস্তবের উপরও সংযোজন হয়। এ স্থানেও তওরাতে উল্লিখিত নবী করীম ﷺ-এর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিবর্তন করে দেওয়া উদ্দেশ্য। আর নিজেদেরকে اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهٗ [আল্লাহর ছেলেও তার বন্ধু] মনে করা এবং এ কল্পনা করা যে, আমরা দোজখে প্রবেশ করব না, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। আর আল্লাহ আমাদের অপরাধসমূহ ধর-পাকড় করবেন না। এসব ভিত্তিহীন কথা اَمَانِيُّ -এর অন্তর্ভুক্ত। اَلظَّنُّ -এর প্রয়োগ কখনো অকাট্য দলিল দ্বারা নিশ্চিত জানার বিপরীতও হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রমাণ ছাড়া ইল্‌মকে অথবা অশুদ্ধ দলিল দ্বারা জানাকে কিংবা অকাট্য দলিলহীন ইল্‌মকেও ظَنٌّ বলা হয়। وَيْلٌ আরবি ভাষায় এ শব্দটি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন تُفٌّ ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। ইমাম আহমদ (র.) ইমাম

http://islamiboi.wordpress.com

তিরমিযী (র.) এবং ইমাম আবূ য়ালা (র.) গং যে রেওয়ায়েত দ্বারা এটাকে দোজখের কূপ বলেছেন অথবা ইবনে জারীর (র.) দোজখের পাহাড় বলেছেন, এ সবগুলোতেই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি প্রকাশ হচ্ছে, তাই সব অর্থই শুদ্ধ।

كِتَابَ দ্বারা উদ্দেশ্য তওরাত অথবা এর লেখা কিংবা উভয় অর্থ।

তারকীব : أُمِّيُّوْنَ মুব্তাদা মাউসূফ لَا يَعْلَمُوْنَ সিফত। مِنْهُمْ খবরে মুকাদ্দাম إِلَّا أَمَانِيَّ এস্তেস্নায়ে মুনকাতি- فَوَيْلٌ- مِمَّا جُمْلَة। اَلْكِتَابَ মাফউলে বিহী। لِيَشْتَرُوْا সংযুক্ত হয়েছে يَقُوْلُوْنَ-এর সাথে। مِمَّا كَتَبَتْ এবং اَلَّذِيْنَ জুমলা। اَلْكِتَابَ মাফউলে বিহী। يَكْسِبُوْنَ মাফউলে বিহী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উপরের আয়াতগুলোতে পড়ুয়া লোকদের আলোচনা ছিল। উপরিউক্ত এ দুটি আয়াত থেকে প্রথম আয়াতে মূর্খ ও সধারণ লোকদের অবস্থার চিত্র টানা হচ্ছে। দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় তাদের আলেমদের বদ্ অভ্যাস বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ : **ইহুদি আম-জনতার চিন্তা-বিশ্বাস :** পূর্বে ইহুদিদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ছিল, তাদের আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মূর্খদের আলোচনায় বলা হচ্ছে যে, ইহুদীদের মধ্যে যারা মূর্খ ছিল, তাদের তো খবরই ছিল না তাওরাতে কি লেখা আছে না আছে? তাদের ছিল কেবল কিছু মিথ্যা আশা, যা তাদের পণ্ডিতদের কাছ থেকে তারা শুনে রেখেছিল। যেমন, জান্নাতে ইহুদি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বস্তুত এসব তাদের অমূলক কল্পনা। এর কোনো দলিল প্রমাণ নেই।

أُمِّيُّوْنَ : এটি أُمِّيٌّ-এর বহুবচন। وَهُوَ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ

কেউ কেউ বলেন- أُمُّ الْقُرٰى-এর দিকে নিসবত করে উম্মী বলা হয়। কেননা মক্কার অধিবাসীরা পড়া এবং লেখা জানত না।

عَوَامٌ : أُمِّيُّوْنَ-এর ব্যাখ্যা عَوَامٌ দ্বারা করে একিটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন : আরবে أُمِّيُّوْنَ বললে তো আরব জাতির প্রতি জেহেন চলে যায়। কেননা أُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ আরবদেরকেই বলা হয়।

উত্তর : এখানে أُمِّيُّوْنَ দ্বারা সাধারণ ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। أَحْبَارُ يَهُوْدَ বা ইহুদি পণ্ডিতদের ছাড়া সকলকেই عَوَامٌ বলা হয়। عَوَامٌ - عَامَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- সাধারণ জনতা।

قَوْلُهُ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ : **ইহুদিদের মিথ্যা আশাগুলো হলো-** আমাদের পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ আমাদের ক্ষমা করিয়ে দিবেন," আমরা তো 'খোদার বিশিষ্ট প্রিয়জনদের সন্তান, আমাদের কিসের চিন্তা! ইত্যাদি। এ ধরনের ভিত্তিহীন ও আজেবাজে ধ্যানধারণা তারা পোষণ করত। এ অবস্থা সাধারণ ইহুদিদের। এসব লোক 'পশুতুল্য' না লিখক, না পাঠক; বাপ-দাদার তালুকাদারীর ধ্বজাধারি নিজেদের কল্পনার তৈরি খোশখেয়ালী ও মনে মনে পোলাও খেতে অভ্যস্ত ও কল্পনাভিলাষে গা ভাসিয়ে দিতে আত্মহারা ছিল। ইঞ্জীলে কোথাও মাসীহ ঈসা (আ.) জবানীতে এবং কোথাও [পোপ] পল -এর মুখে ইহুদিদের এ ধরনের অলীক কল্পনামত্ততার কথা বার বার উল্লিখিত হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৪]

قَوْلُهُ لٰكِنْ : اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত করার হয়েছে। আর এটি اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ হওয়ার কারণ হলো এখানে মুসতাছনা তথা أَمَانِيَّ মুস্তাছনা মিনহু তথা কিতাবের جِنْسٌ নয়।

কেউ কেউ اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ বলেছেন। তখন অর্থ হবে- لَا يَقْرَأُوْنَ الْكِتَابَ إِلَّا قِرَاءَةً عَارِيَةً عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَعْنٰى

أَمَانِيَّ : একবচন أُمْنِيَّةٌ-এর দুটি অর্থ রয়েছে।

১. এরা শুধু তাদের মিথ্যা বাসনাগুলোকে লালন-পালন করতে থাকে। বাস্তবতা ও তথ্যনির্ভর হওয়ার সঙ্গে যেগুলোর কোনো সংযোগ নেই। -[তাফসীরে কবীর, ইবনে জারীর]

২. মিথ্যা বিবরণ, অপ্রামাণ্য ও অবাস্তব কল্প-কাহিনীতে নিমগ্ন থাকে। অধিকাংশ পূর্বসূরী হতে এ অর্থ উদ্ধৃত হয়েছে। বিভিন্ন মিথ্যা [অবাস্তব] উক্তি, যা তারা তাদের বিদ্বানদের নিকট হতে শুনে অন্ধ অনুকরণ করে তা উদ্ধৃত করছে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اَكَاذِيْبُ : اَكَاذِيْبُ এটি اُكْذُوْبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– মিথ্যা কথা। এটি اَمَانِيَّ-এর তাফসীর।

قَوْلُهُ تَلَقَّوْهَا : এটি مَاضِىْ جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থাৎ যে মিথ্যা কথাগুলো তারা তাদের নেতৃস্থানীয়দের কাছ থেকে লাভ করেছিল, তাতেই তারা ভরসা করেছে।

قَوْلُهُ مَا : এটি اِنْ-এর তাফসীর মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে اِنْ টি نَافِيَةٌ যার অর্থ مَا

قَوْلُهُ هُمْ : এটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ ইবতিদার কারণে। অথবা اِسْمٌ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ ; কেননা اِنْ শব্দটিও مَا-এর মত আমল করে।

قَوْلُهُ فِىْ جَحْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَغَيْرِه : جَحْدٌ অর্থ অস্বীকার করা।

قَوْلُهُ مِمَّا يَخْتَلِقُوْنَهُ : اِخْتِلَاقٌ অর্থ নিজের পক্ষ থেকে রচনা করা। اَىْ يَفْتَرُوْنَهُ

قَوْلُهُ اِلَّا يَظُنُّوْنَ : اِلَّا হরফে ইস্তেফহাম। এখানে اِسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ হয়েছে। আর يَظُنُّوْنَ ফে'লটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে هُمْ মুবতাদার খবর হওয়ার ভিত্তিতে।

প্রশ্ন : ظَنٌّ এবং اَمَانِىْ তো একই জিনিস। তাহলে اَمَانِىْ-এরপর ظَنٌّ উল্লেখ করার কারণ কি?

উত্তর: মুফাসসির (র.) তার জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয়টির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। اَمَانِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল বস্তু, যেগুলো তারা নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত হতো। আর ظَنٌّ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল বস্তু, যেগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকে রচনা করত।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الخ : **নেতৃস্থানীয় ইহুদিদের কর্মকাণ্ড পরিণাম :** পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ ইহুদিদের আলোচনা ছিল। এখন বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ইহুদিদের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এরা সে সব লোক, যারা তাদের মূর্খ জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে লিখে দিত এবং তা মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী বলে চালিয়ে দিত। যেমন– তাওরাতে লেখা ছিল, শেষ নবী সুদর্শন, এবং কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখ, মাঝারি গড়ন ও গৌরবর্ণের অধিকারী হবেন। তারা তদস্থলে লিখল, তিনি দীর্ঘ দেহী এবং নীল চোখ ও খাড়া চুল বিশিষ্ট হবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে জনগণ তাকে বিশ্বাস না করে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ন না হয়।

قَوْلُهُ شِدَّةُ الْعَذَابِ : এটি وَيْلٌ-এর ব্যাখ্যা, রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত রয়েছে। কোনো বর্ণনায় রয়েছে– اَلْوَيْلُ اَلْوَادِىْ فِىْ جَهَنَّمَ لَوْ سُيِّرَتْ فِيْهِ الْجِبَالُ لَانْمَاعَتْ وَلَذَابَتْ مِنْ حَرِّه

অর্থাৎ وَيْلٌ হলো জাহান্নামে একটি উপত্যকা, সেখানে পাহাড় নিক্ষেপ করা হলেও তার উষ্ণতায় তা বিগলিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ : اَلْكِتَابُ : فَعَّالٌ بِمَعْنٰى مَفْعُوْلٌ-এর মতো। এটি مَفْعُوْلٌ بِهٖ হিসেবে মানসূব।

قَوْلُهُ مُخْتَصِلَقًا مِنْ عِنْدِه :

প্রশ্ন : লেখা তো হাত দ্বারাই সম্পাদন করা হয়। তারপরও يَكْتُبُوْنَ-এর পরে بِاَيْدِيْهِمْ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করছেন بِاَيْدِيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকে মনগড়াভাবে রচনা করে।

মনগড়াভাবে লেখার পদ্ধতি : এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে–

১. তাওরাতে রাসুল ﷺ-এর যেসব গুণ ও চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, তারা তার বিপরীত রচনা করত এবং আরবে প্রচার করত এবং তাওরাতের মূল কপি গোপন করে রাখত। রাসূল ﷺ সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে তারা সে বিকৃত কপিটি বের করে বলত– هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

২. এখানে اِخْتِلَاقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ও বিকৃতি করত না; বরং ব্যাখ্যার মধ্যে তাহরীফ করত এবং সে মর্মটি আল্লাহর দিকে নিসবত করত।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ ثَمَنًا : ثَمَنٌ শব্দটি শুধু নগদ অর্থ ও বিনিময় মূল্যই বুঝায় না; বরং কোনো কিছুর বিনিময়ে যা কিছু পাওয়া যায়, তাকেও **ثَمَنٌ বলা হয়।** ইমাম রাগেব বলেন- كُلُّ مَا يَحْصُلُ عِوَضًا عَنْ شَيْءٍ فَهُوَ ثَمَنُهُ মুফাসসিরগণও শব্দটি এখানে এই ব্যাপক অর্থ তথা যে কোনো পার্থিব বিনিময় অর্থে গ্রহণ করেছেন। ثَمَنٌ দ্বারা এখানে পার্থিব উপকরণই বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ قَلِيلًا : তুচ্ছ [স্বল্প] খোদায়ী বাণীর বিকৃতি ও রদবদলের ন্যায় জঘন্য ও কঠিন অপরাধের সূত্রে যে কোনো ধরন ও পরিমাণে জাগতিক জড় উপকরণ অর্জিত হোক না কেন? বাস্তবিকই তা হবে তুচ্ছ ও মূল্যহীন।

কুরআন বেচা-কেনার মাসআলা : এখানে বাহ্যবাদী (اَهْلُ الظَّاهِرِ) কোনো কোনো অনভিজ্ঞ আলেম বাহ্য শব্দ থেকে এরূপ ফতোয়া ছেড়ে দিয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের বেচা-কেনা উভয়ই নাজায়েজ। কিন্তু যথার্থ মাযহাব অনুসারে উভয়ই বৈধ। কেননা এখানে বেচা-কেনা যাই হোক তা হয়ে থাকে কাগজ, অনুলিখন, মুদ্রণ ইত্যাদির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার আয়াত তো কেউ বেচা-কেনা করে না। তবে হ্যাঁ, এ হুমকি প্রযোজ্য হতে পারে ভুল ও মিথ্যা মাসআলা প্রদানকারী এবং জালহাদীস বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে।

مِمَّا يَكْسِبُونَ : তারা তাদের অপকর্ম দ্বারা যা অর্জন করত; তা কি জিনিস? এর দুটি জবাব দেওয়া হয়েছে এবং দুটি জবাবই স্বস্থানে সঠিক-

১. তাদের পাপের সঞ্চিত ভাণ্ডার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা তাদের কর্মতৎপরতা দ্বারা নিজেদের পাপের স্তূপ বাড়িয়ে চলছে।

২. তাদের স্বার্থান্ধতাপ্রসূত বিকৃতি ও [তাদের ভাষায়] কল্যাণপ্রসূ মিথ্যার বদৌলতে যা আর্থিক স্বার্থ [ঘুষ] হাসিল করে। সেটাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : وَيْلٌ হলো মুবতাদা আর لَهُمْ হলো তার খবর। অথচ وَيْلٌ হলো نَكِرَةٌ যা মুবতাদা হওয়া ব্যাকরণের দৃষ্টিতে শুদ্ধ নয়।

উত্তর : وَيْلٌ মূলত বদদোয়াসূচক শব্দ। মূলত هَلَكْتُ وَيْلًا ছিল। যেমন- سَلَّمْتُ سَلَامًا -এর মাঝে ফে'ল হযফ করে 'নসব' থেকে 'রফার' দিকে عُدُوْل করা হয়েছে دَوَامٌ وَ ثَبَاتٌ বুঝানোর জন্য।

স্বপ্নের বেহেশতের ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতে চতুর্থ দল। অর্থাৎ সাধারণ লোকদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ভিত্তিহীন ও অবাস্তব স্বপ্নের বেহেশতে বসবাস করছে এবং এ মন্দতাও মূলত তাদের আলেমদেরই সৃষ্টিকৃত। আর তা এভাবে যে, সঠিক ইল্‌ম এর সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত হতে দেয়নি; বরং কাল্পনিক প্রতারণার সবুজ বাগান দেখিয়ে এবং কাল্পনিক শরাব পান করিয়ে তাদেরকে এমন অজ্ঞান করে দিয়েছে যে তারা নিজেদের চতুর্দিকে বেষ্টিত জাল থেকে বের হয়ে আসতে কোনো অবস্থায়ই সচেষ্ট নয়। যার দৃষ্টান্ত বর্তমানকালে আত্মপূজারী পীরজাদাগণের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

قَوْلُهُ غَيَّرُوْا صِفَةَ النَّبِيِّ فِي التَّوْرَاةِ الخ : নবী করীম ﷺ-এর দেহ মোবারকের গঠন তওরাতে এ শব্দগুলো দ্বারা লেখা ছিল। حَسَنُ الْوَجْهِ . جَعْدُ الشَّعْرِ . كَحْلُ الْعَيْنِ . رِبْعَةٌ [সুন্দর চেহারা, কুকড়ানো চুল, সুরমা চুখ, মধ্যম দেহ] এ শব্দগুলো পরিবর্তন করে তারা লিখেছে- طِوَالٌ . اَزْرَقُ . سِبْطُ الشَّعْرِ অর্থাৎ লম্বা দেহ, নীল চোখ, সোজা চুল বিশিষ্ট। এমনিভাবে জেনার শাস্তি রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা লেখিত ছিল। এ হুকুমকে جَلْد অর্থাৎ বেত্রাঘাত দ্বারা এবং تَحْمِيم অর্থাৎ মুখ কালো করা দ্বারা পাল্টে দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَغَيْرَهُمَا : অর্থাৎ নবী ﷺ-এর গুণাবলি ও রজমের আয়াত ব্যতীত অন্যান্য আরো অনেক বিষয়। যেমন- তাদের উক্তি لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا এবং لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨٠. وَقَالُوْا لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِيُّ النَّارَ لَنْ تَمَسَّنَا تُصِيْبَنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً قَلِيْلَةً اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ اٰبَائِهِمُ الْعِجْلَ ثُمَّ تَزُوْلُ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اَتَّخَذْتُمْ حُذِفَ مِنْهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ اِسْتِغْنَاءً بِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا مِيْثَاقًا مِنْهُ بِذٰلِكَ فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ بِهِ لَا اَمْ بَلْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

৮০. রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জাহান্নামের অগ্নির ভীতি প্রদর্শন করলে তারা বলে অল্প কতকদিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না। আমাদের গায়ে তা লাগবে না। অর্থাৎ যে চল্লিশ দিন তাদের পিতৃ পুরুষরা গো-বৎসের উপাসনা করেছিল মাত্র সে কতক দিনই তা ভোগ করতে হতে পারে। পরে তা অপসৃত হয়ে যাবে। হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে এই বিষয়ে কোনো চুক্তি অঙ্গীকার নিয়েছ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না? না, বস্তুত এমন কোনো চুক্তি হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে তোমরা এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না। اَتَّخَذْتُمْ শব্দটিতে هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامْ [প্রশ্নবোধক অক্ষর হামযা] -এর উল্লেখই যথেষ্ট বলে هَمْزَةُ وَصْلٍ টি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। اَمْ تَقُوْلُوْنَ এইস্থানে اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨١. بَلٰى تَمَسُّكُمْ وَتَخْلُدُوْنَ فِيْهَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً شِرْكًا وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ اَيْ اِسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ وَاَحْدَقَتْ بِهٖ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِاَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ رُوْعِيَ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ ـ

৮১. হ্যাঁ নিশ্চয় জাহান্নামের আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং সেখানে তোমরা সর্বদা অবস্থান করবে। যে ব্যক্তি পাপ কার্য শিরক করে এবং যার পাপরাশি তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলে অর্থাৎ তা তার উপর প্রবল হয়ে যায় এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে ফেলে। অর্থাৎ মুশরিকরূপে যদি তার মৃত্যু হয় তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। خَطِيْئَةٌ শব্দটির একবচন ও বহুবচন উভয়রূপ পাঠই রয়েছে। اُولٰئِكَ ـ خَالِدُوْنَ ـ هُمْ এই শব্দগুলো مَنْ -এর মর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

٨٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

৮২. আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

তরকীব ও তাহকীক : فَلَنْ يُخْلِفَ এটা শর্তে مُقَدَّرٌ -এর উত্তর। এ – أَيْ إِنْ كُنْتُمْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا إِلَّا أَمْ بَلْ স্থানে أَمْ মুনকাতি'আহ بَلْ -এর অর্থে ব্যবহৃত এবং হামযায়ে এস্তেফহাম إِتِّخَاذٌ -কে অস্বীকার করার জন্য আর بَلْ -এর অর্থ বিরত রাখা ও স্থানান্তরের জন্য হবে। তাই মুফাস্‌সির (র.) হামযার উত্তর لَائِ نَافِيَةٌ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। যেরূপ হামযার অধীনে نَفِيْ এবং أَمْ-এর অধীনে إِثْبَاتْ রয়েছে। আর বাক্যটি খবরই রয়েছে।

قَالُوا سَيِّئَةً : মুসান্নিফ (র.) হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) এর মতে শিরক দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। ফেয়েল বা ফায়েল لَنْ تَمَسَّنَا الخ জুমলা مَفْعُوْلٌ। الْأَيَّامُ জরফিয়্যাতের কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। أَيَّامٌ মূলে أَيْوَامٌ ছিল يَوْمٌ এর বহুবচন। وَاوْ-কে يَاءْ বানিয়ে اِدْغَامْ করা হয়েছে। بَلٰى হ্যাঁ-বাচক শব্দ مَنْ মুবতাদা, أَصْحَابُ النَّارِ খবর। জুমলা জওয়াবে শর্ত। أَنْ হামযায়ে এস্তেফ্‌হামের অর্থে أَيِ الْأَمْرَيْنِ كَائِنٌ এমতাবস্থায় أَمْ মুত্তাসিলা হবে। আর তা না হয় مُنْقَطِعَةٌ অর্থে بَلْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে খুব জোরালোভাবে ইহুদিদের জন্য وَيْلٌ দোযখ প্রমাণিত করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তারা উক্ত সতর্কবাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে আরো একটি অপরাধ ও মন্দ তার বহিঃপ্রকাশ করছে।

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ : **ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত ধারণা :** ইহুদিরা এ কাল্পনিক প্রতারণা নিজেদের অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছিল যে–

১. نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاءُهُ আমরা আল্লাহর প্রিয় ও মকবুল, তাই আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে।

২. পূর্বপুরুষগণ যেহেতু নবী ও রাসূল। তাই তারা আমাদেরকে দোজখ হতে রক্ষা করবেন।

৩. ধরে নেওয়া হয় যদি দোজখে যেতেই হয়। তবে অল্প কয়েক দিনের জন্য হবে।

৪. নবুয়ত পাওয়ার যোগ্য শুধু আমাদের গোত্র। প্রকৃতপক্ষে لَنْ تَمَسَّنَا الخ এ বিশ্বাসের ভ্রান্ত ভিত্তিতে তাদের এ ধারণা ছিল যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মকে স্থায়ী ও রহিত হবে না মনে করতেছিল। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান না আনার কারণে নিজেদেরকে কাফের মনে করত না। হ্যাঁ, যদি কোনো গুনাহের শাস্তিতে দোজখে যায়ও, তবু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মুক্তি হয়ে যাবে। অথচ এ সিদ্ধান্ত তাদের বেলায় সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কাজেই হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে কাফেরই গণ্য করা হবে। আর অল্প কয়েকদিন পরে মুক্তির অঙ্গীকার আসমানি কোনো কিতাবেও তাদের জন্য নেই। তাই তাদের দাবি প্রমাণহীন; বরং দলিলের পরিপন্থি হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য।

قَالُوا لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِيُّ النَّارَ : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ যখন ইহুদিদেরকে জাহান্নামের ওয়াদা দিলেন তখন তারা বলল.....।

ইশকাল : এখানে ইশকাল হয় যে, ওয়াদা তো কল্যাণ ও ভালো কাজের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। জাহান্নামের ওয়াদা হয় না; বরং তার জন্য وَعِيْدٌ বা সতর্কবাণী হয়ে থাকে। তবে এখানে ওয়াদা কেন বলা হলো?

উত্তর :

১. وَعْدَةٌ ভালো-মন্দ সকল কাজেই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আল্লাহর বাণী–

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ الخ۔

২. এখানে وَعَدَ ফে'লটি وَعِيْدًا মাসদার থেকে নির্গত। যার অর্থ ধমকী দেওয়া। فَلَا إِشْكَالَ

http://islamiboi.wordpress.com

৩. কখনো وَعِيْد -কেও وَعْدَهْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এ কথা বুঝানোর জন্য যে, وَعِيْد বা সতর্কবাণীও وَعْدَهْ বা প্রতিশ্রুতির মতো বরখেলাফ হবে না, নিশ্চিত হবে।

قَوْلُهُ تُصِيْبَنَا : এটি تَمَسَّنَا -এর ব্যাখ্যা। মূলত مَسٌ বলা হয় কোনো বস্তুর চামড়ার সাথে এ রকমভাবে মিলিত হওয়া যে, قُوْت مَاسَّة বা স্পর্শশক্তি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর এর জন্য اِصَابَةٌ হলো লাজেমী জিনিস তাই মুফাসসির (র.) এখানে এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُوْدَةً : কেউ বলেন, সাতদিন, কেউ বলেন, চল্লিশ দিন। [যতদিন তারা বাছুর পূজা করেছিল] আবার কারো মতে চল্লিশ বছর [যে সময় তারা তীহ মরুভূমিতে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরাফেরা করেছিল]। কেউ বলেন, প্রত্যেকের ইহলোকের আয়ুষ্কাল পরিমাণ। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৫]

قَوْلُهُ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا : পরোক্ষভাবে প্রমাণকরণ ও যুক্তিতে তাকে লা-জবাব করার পন্থায় ইহুদিদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে, তোমরা যে নিজেদের সমগ্র জাতির বিশেষ প্রিয়ভাজন হওয়া, আখিরাতের আজাব হতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত হওয়ার এবং জিজ্ঞাসিত না হওয়ার ধ্যানধারণা নিজেদের অন্তরে বদ্ধমূল করে রেখেছ, তবে বল তো অবশেষে তা কি তোমাদের মনগড়া নাকি তার কোনো সনদ প্রমাণও তোমাদের পবিত্র গ্রন্থ হতে দেখাতে পার? তা না হলে এ বিষয়ে এত জোরগলা কেন?
-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৭]

قَوْلُهُ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ : قَالَ ক্রিয়া عَلٰى অব্যয় দ্বারা যুক্ত হলে তার অর্থ হয় কারো নামে কোনো কথা তৈরী করা, মিথ্যা আরোপ করা,কাউকে অপবাদ দেওয়া। যেমন- قَالَ عَلَيْهِ অর্থ اِفْتَرٰى মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, রচনা করেছে।
-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৭]

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইহুদিরা তো কেবল বলেছিল لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً এখানে তারা তো আল্লাহ তা'আলা প্রতি মিথ্যা আরোপ করেনি। তারপরও اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الخ কিভাবে বলা হলো?

উত্তর : যদিও তাদের একথা সরাসরি মিথ্যারোপ নয়; কিন্তু লাজেমীভাবে তাতে افتراء প্রমাণিত হয়। কেননা এ ধরনের নিশ্চয়তার সাথে আল্লাহর দিকে নিসবত না করে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। যেন তারা আল্লাহর দিকে নিসবত করেই বলেছে যে, তিনি আমাদেরকে কেবল এতদিন আজাব দিবেন।

قَوْلُهُ بَلٰى مَنْ كَسَبَ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের আলোচনা হয়েছে, তারা জাহান্নামে কেবল কয়েক দিন থাকবে। এখন এ আয়াতে সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হচ্ছে যে, কয়েক দিন নয়; বরং চিরদিন জাহান্নামে থাকবে।

قَوْلُهُ تَمَسُّكُمْ : بَلٰى ব্যবহৃত হয় نَفِىْ -এর জবাবে نَفِىْ -কে প্রমাণিত করার জন্য। যেহেতু لَنْ تَمَسَّنَا -এর মাঝে ইহুদিরা দীর্ঘ সময় জাহান্নামে জ্বলাকে নাকচ করে ছিল তাই এখন আল্লাহ তা'আলা بَلٰى -এর মাধ্যমে তা প্রমাণিত করছেন। মুফাসসির (র.) تَمَسُّكُمْ শব্দটি বৃদ্ধি করে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً : مَنْ مَوْصُوْلَة দ্বারা ব্যাপকভাবে সকলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি এবং অ-ইহুদি সকলেই তাতে অন্তর্ভুক্ত যেন বলা হলো- تَمَسُّكُمْ وَغَيْرَكُمْ

قَوْلُهُ شِرْكًا : মুফাসসির (র.) سَيِّئَةً-এর তাফসীর شِرْكًا দ্বারা করে একটি سُوَالُ مُقَدَّرٌ -এর জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, كَسَبَ سَيِّئَةً বা পাপ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে জ্বলতে হবে। অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে কবীরা গুনাহকারী চিরদিন জাহান্নামে থাকবে না।

উত্তর : এখানে سَيِّئَةً দ্বারা شِرْك উদ্দেশ্য; আর এটাই হলো অধিকাংশের মত।

خَطِيْئَةٌ وَسَيِّئَةٌ -এর পার্থক্য : سَيِّئَةٌ সাধারণত ঐ গুনাহের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যা করার জন্য ইচ্ছা করা হয়। আর خَطِيْئَةٌ -এর ব্যবহার অনিচ্ছার গুনাহের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন কোন প্রাণীকে উদ্দেশ্য করে তীর ছুঁড়েছে; কিন্তু মানুষের গায়ে লেগে গেছে। এ পার্থক্য অধিকাংশের ভিত্তিতে, অন্যথায় একটির স্থলে অপরটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ : অর্থাৎ خَطِيْـئَـةٌ শব্দটি এক কেরাতে বহুবচন রূপে এবং অপর কেরাতে একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

আখিরাতে নাজাত লাভের মূলনীতি : উভয় আয়াতে নাজাত ও মুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিধি সংক্ষেপে এ সারগর্ভ ভাষায় বিবৃত হয়েছে যে, বংশধারা ও জাতিত্বের সঙ্গে মুক্তির কোনো সম্বন্ধ নেই। যে কেউ স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে অমূলক ও ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অপকর্মের পথে পরিচালিত হবে, তার ঠাঁই হবে জাহান্নামে। আর যে কেউ স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে ঈমান ও সৎ কাজের পন্থা বেছে নেবে, তার মনজিল হবে জান্নাত। –[তাফসীরে মাজেদী খ.১, পৃ. ১৪৭]

اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْـئَـتُهٗ : **পাপাচারী মুমিন ক্ষমার যোগ্য :** পাপের বেষ্টন মানে স্বেচ্ছায় পাপের পথ গ্রহণ করা এবং পাপাচারে এমনভাবে সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে যাওয়া যে, ঈমানের জন্য কোনোও অবস্থান-অবকাশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর তা হতে পারে শুধু মাত্র সে সকল লোকের জন্য যারা সম্পূর্ণই বাতিলপন্থি এবং তাদের মৃত্যুও কুফরি ও ধর্মহীন অবস্থায় হবে। মু'মিন যতই পাপাচারী হোক না কেন, তারা কোনো অবস্থাই এ আয়াতের লক্ষ্য হবে না। কেননা অন্তত মুখে স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাসের স্তর তো তার থাকবেই। আহলুস সুন্নাতের সকল মনীষীই এখানে কুফল [পাপে বেষ্টিত হওয়া] -কে উদ্দেশ্য করেছেন। কোনো কোনো বাতিলপন্থি [মু'তাজিলা, খারিজী প্রভৃতি] রা যে এ আয়াত দ্বারা পাপাচারী মু'মিনের ক্ষমাযোগ্য না হওয়ার প্রমাণ গ্রহণের চেষ্টা করেছে, তা স্পষ্টতই বাতিল ও অসার। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৮]

قَوْلُهُ بِاَنْ مَاتَ مُشْتَرِكًا : এটি اِحَاطَةٌ -এর পদ্ধতি। অর্থাৎ বেষ্টন করার পদ্ধতি হলো মুশরিক অবস্থায় মারা যাওয়া। এটি মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা তার কাছে ন্যূনতম পক্ষে ঈমান থাকে।

قَوْلُهُ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ : خُلُوْد -এর আভিধানিক অর্থ সুদীর্ঘ সময়ও রয়েছে। তবে পবিত্র কুরআনের যে যে স্থানে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের ব্যাপারে এ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে তা দ্বারা স্থায়িত্ব ও অবিরামত্ব উদ্দেশ্য এবং পবিত্র কুরআনে এ অভিমতের দৃঢ়করণ ও সমর্থনে অনেক স্থানে خٰلِدِيْنَ -এর সাথে اَبَدًا [চিরকাল] ও উল্লিখিত হয়েছে। কেউ কেউ خُلُوْد -কে তার প্রথম [মূল] অর্থ– সুদীর্ঘকাল অবস্থান -এ প্রয়োগ করেছেন, তা নিতান্তই অসার। কেননা তা ভয়াবহতা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে শিথিল করে দেওয়ার নামান্তর এবং সে জান্নাতের خُلُوْد -কে চিরস্থায়ী হওয়ার অর্থে প্রয়োগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। –[রূহুল মা'আনী সূত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১, ১৪৮]

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ـ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ : **বাক্যদ্বয়ে فَاءٌ উল্লেখ ও অনুল্লেখের কারণ :** فَاُولٰٓئِكَ ও اُولٰٓئِكَ অর্থাৎ জাহান্নামীদের পরিণতি বর্ণনায় فاولئك اصحب النار 'ফা' পরিণতিবোধক অব্যয় সহকারে এবং জান্নাতীদের ক্ষেত্রে اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ 'ফা' অব্যয় ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। অথচ উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রকারের বিধান দান করা উদ্দেশ্য। এ ব্যবধান যদিও লঘু প্রকৃতির এবং তা শব্দের নয়, মাত্র একটি বর্ণের; তবুও এতটুকু পার্থক্যেরই বা কারণ কি? বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞগণ জবাবে বলেছেন যে, প্রথম [ফা যুক্ত] ক্ষেত্রটি জাহান্নামীদের জন্য হুমকির। আর হুমকির ক্ষেত্রে তার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই বিষয়টিতে [অতিরিক্ত] জোর দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্র শুধু ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির, যাতে বিপরীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ জন্য 'ফা' বিহীন শুধু اُولٰٓئِكَ -ই যথেষ্ট ছিল। আবার উক্ত জবাবের বিপরীত এরূপ দ্বিতীয় জবাবও দেওয়া হয়েছে যে, নাহব [ব্যাকরণবিদ] -দের মতে مَنْ دَخَلَ دَارِىْ اَكْرَمْهُ [যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে (যদি তা করে) তাকে সম্মান-সমাদর করব] বাক্যে ঘরে প্রবেশকারীকে সমাদর না করার সম্ভাবনাও থেকে যায়। কিন্তু مَنْ دَخَلَ دَارِىْ اَكْرَمُ [যে আমার ঘরে প্রবেশ করবে .... তাকে সমাদর করব] বাক্যে সম্মান সমাদর করা [-এর নির্দেশ] সুনিশ্চিত হয়ে যায়। সমাদর না করার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে না। এ দৃষ্টান্ত বিচারে পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত প্রাপ্তি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

–[রূহুল মা'আনী সূত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৪৯]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨٣. وَ اذْكُرْ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ فِي التَّوْرٰةِ وَقُلْنَا لَا تَعْبُدُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ اِلَّا اللّٰهَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَقُرِئَ لَا تَعْبُدُوْا وَ اَحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِرًّا وَذِي الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ عَطْفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ قَوْلًا حُسْنًا مِنَ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالصِّدْقِ فِيْ شَاْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِ السِّيْنِ مَصْدَرٌ وَصَفَ بِهِ مُبَالَغَةً وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ ـ عَنْهُ كَاٰبَائِكُمْ ـ

৮৩. আর স্মরণ কর যখন তাওরাতে ইসরাঈলী সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আর বলেছিলাম, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না আর পিতা মাতা নৈকট্যের অধিকারী আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে যেমন, সৎকাজের আদেশ দান, অসৎকাজের নিষেধ করার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যতার কথা আত্মীয় স্বজনের সাথে কোমল ব্যবহার করা ইত্যাদি। সালাত কায়েম করবে ও জাকাত দিবে তোমরা এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলে অতঃপর স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা অর্থাৎ ইহুদিদের পূর্ব পুরুষগণ মুখ ফিরিয়ে নিলে। অর্থাৎ তা পূরণ করতে অবাধ্য হলে। আর তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় এর অবাধ্যচারী। تَعْبُدُوْنَ ক্রিয়াটির [مُخَاطَبٌ ت বা দ্বিতীয় পুরুষ] ও [غَائِبٌ ي বা নাম পুরুষ] উভয়রূপেই পাঠ রয়েছে। لَا تَعْبُدُوْنَ বাক্যটি যদিও خَبَرِيَّةٌ বা সংবাদ প্রকাশ করে, এমন বাক্য; কিন্তু এ স্থানে তা نَهْيٌ বা নিষেধার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। [অর্থাৎ ইবাদত করো না।] অপর এক কেরাতে نَهْيٌ لَا تَعْبُدُوْنَ বা নিষেধার্থক] রূপেও এর পাঠ রয়েছে।

اِحْسَانًا শব্দটি এ স্থানে উহ্য অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া اَحْسِنُوْا [সদ্ব্যবহার কর]-এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্ম এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -এর পূর্বে اَحْسِنُوْا শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

ذِي الْقُرْبٰى শব্দটির اَلْوَالِدَيْنِ -এর সাথে عَطْفٌ হয়েছে।

حُسْنًا শব্দটি এ স্থানে উহ্য قَوْلًا -এর বিশেষণ আর قَوْلًا হচ্ছে অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া قُوْلُوْا -এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্ম। মাননীয় তাফসীরকার এই দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাফসীরে قَوْلًا শব্দটির উল্লেখ করেছেন।

حُسْنًا শব্দটির অন্য এক কেরাতে مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস হিসেবে ح -এ পেশ ও س -এ সাকিন (حُسْنًا) সহ পাঠ রয়েছে। এমতাবস্থায় একে বিশেষণরূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো مُبَالَغَةٌ বা অর্থে অতিশয়োক্তি বিধান।

تَوَلَّيْتُمْ ক্রিয়া পদটিতে غَيْبَةٌ বা নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। 'তোমরা' বলে এ স্থানে মূলত তাদের [ইহুদিদের] পূর্বপুরুষগণকে বুঝানো হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

لَاتَعْبُدُوْنَ -এর পূর্বে মুসান্নিফ (র.) قُلْنَا নির্ধারণ মেনে اَخَذْنَا -এর উপর عَطْفٌ এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ ব্যাপারে দুটি ক্বেরাত রয়েছে। প্রসিদ্ধ ক্বেরাত لَا تَعْبُدُوْنَ জুমলায়ে খবরিয়া لَا تَعْبُدُوْا নাহীর অর্থে এবং নাহীকে খবরের রূপে আদায় করা স্পষ্ট নাহীর চেয়ে অধিক اَبْلَغُ মনে করা হয়। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হচ্ছে যে, নাহীর উপর বস্তুর আমলের এ পরিমাণ

http://islamiboi.wordpress.com

উৎসাহ রয়েছে যে, ধরা যায় যে, বাস্তবে আমল করে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর অন্য ক্বেরাতে لَا تَعْبُدُوْا স্পষ্ট সীগায়ে নাহীর সাথে রয়েছে। কিন্তু এ কেরাতে বিরল। যার দিকে قُرِئَ রুগন্ সীগা দ্বারা মুফাস্সির (র.) ইঙ্গিত করেছেন এবং মুফাস্সির (র.)-এর অধিক অভ্যাস এটা যে, وَفِيْ قِرَاءَةٍ -কে قِرَاءَتٌ مُتَوَاتِرَةٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে থাকেন। আর قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ -কে وَقُرِئَ দ্বারা। إِحْسَانًا মুজমার -এর সাথে সম্পৃক্ত। নিয়মিত পঠন এমনভাবে تُحْسِنُوْنَ أَوْ أَحْسِنُوْا إِحْسَانًا।

مِسْكِيْن -এর ওজনে مِفْعِيْل - سُكُوْن থেকে নির্গত। ধরা যায় যে, অভাব তাকে নীরব করে দিয়েছে। حُسْنًا - حَاء এর পেশ এবং حَاء -এর যবর উভয় অবস্থায় মাসদার। مُبَالَغَة -এর পদ্ধতিতে زَيْدٌ عَدْلٌ -এর ন্যায়। تَوَلَّيْتُمْ -এর পূর্বে قَبْلْتُمْ এ জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে এর عَطْف শুদ্ধ হয়। اَلْتِفَات দ্বারা উদ্দেশ্য এটা যে, পূর্বের বাক্যের ধারাকে পরিবর্তন করে দেওয়া। যদ্দ্বারা আনন্দ ও স্বাদ জন্মে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির বিরক্তি দূর হয়ে যায়। لَا تَعْبُدُوْنَ الخ জওয়াবে ক্বসম। যা أَخَذْنَا থেকে হাসিল হয়েছে। أَيْ أَحْلَفْنَاهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ অথবা ان -কে হযফের সাথে এবং হরফে জরকে মুক্বাদ্দার মানার সাথে أَيْ عَلٰى أَنْ لَّا تَعْبُدُوْا যেমন أَلَا بِهٰذَا الزَّاجِرِ أَحْضُرَ الْوَغٰى -এর মধ্যে রয়েছে এবং নাহীর সীগাহ মানলে لَا تَعْبُدُوْا - مِيْثَاق থেকে بَدَلْ হয়ে যাবে কিংবা হরফে জরটি হযফের সাথে এর مَعْمُوْل হয়েছে। নাফি', ইবনে **আমের, আবূ আমের এবং আছিম -এর** ক্বেরাতে لَا تَعْبُدُوْنَ আছে এবং অবশিষ্ট ক্বারীগণ لَا يَعْبُدُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ : بَنِيْ শব্দটি মূলত بَنِيْنَ ছিল। (مُلْحَقٌ بِجَمْعِ مُذَكَّرٍ سَالِمٍ) مُضَافٌ إِلَيْهِ হওয়ার কারণে حَالَتْ إِضَافَتْ -এর কারণে نُوْن হযফ হয়ে গেছে। আর إِسْرَائِيْل শব্দটি عُجْمَة এবং عَلَمْ **সহ হয়েছে। يَاء نُوْن তে جَرِيْ হওয়ায় غَيْرُ مُنْصَرِفْ** হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাদেরকে অল্প কয়েক দিন না; বরং চিরদিন জাহান্নামে জলতে হবে। এখন তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে এখানে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গে দাবি হলো তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কয়েক দিন নয়; বরং চিরদিন আজাব দেওয়া হবে। বিশেষভাবে যখন এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তাদের মজ্জাগথ স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে এবং সর্বদা এ পাপে লিপ্ত থাকার নিয়ত থাকে।

قَوْلُهُ أُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) এখানে أُذْكُرْ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেনে যে, اذ হরফটি مَحَلًّا مَنْصُوْب তার আমেল উহ্য রয়েছে। আর أُذْكُرْ দ্বারা রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। أَيْ أُذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ ﷺ

কেউ কেউ বলেন– পূর্বাপরের বিচারে এখানে أُذْكُرُوْا উহ্য ধরা উচিত এবং বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করা হয়েছে।

কেউ বলেন– এখানে أُذْكُرْ দ্বারা বনী ইসরাইলকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي التَّوْرَاةِ : অর্থাৎ এখানে যে অঙ্গীকারের কথা বলা হচ্ছে, তা তাদের থেকে তাওরাতে নেওয়া হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন– এ অঙ্গীকার হযরত মূসা ও অন্যান্য নবী (আ.)-এর যবানে নেওয়া হয়েছিল।

কেউ বলেন– إِنَّهُ مِيْثَاقٌ أَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ فِيْ أَصْلَابِ أٰبَائِهِمْ كَالذَّرِّ

قُلْنَا : প্রশ্ন : মুফাসসির (র.) এখানে لَا تَسْفِكُوْنَ -এর আগে قُلْنَا বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : বক্তব্যকে পূর্বের সাথে তথা وَإِذْ أَخَذْنَا -এর সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য لَا تَسْفِكُوْنَ -এর আগে قُلْنَا বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে উভয় জায়গায় جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ -এর সীগাহ হয়ে যায়। অন্যথায় একই বক্তব্যে একই মুখাতাবের জন্য غَائِبْ এবং حَاضِرْ -এর সীগাহ ব্যবহার লাজেম আসে। কেননা بَنِيْ إِسْرَائِيْل হলো اِسْم ظَاهِرْ আর اِسْم ظَاهِرْ গায়েবের হুকুমে হয় হয়ে এরপর لَا تَعْبُدُوْنَ রয়েছে। এর মুখাতাবও হলো বনী ইসরাঈল। অথচ এটি হলো حَاضِرْ -এর সীগাহ।

http://islamiboi.wordpress.com

সুতরাং এভাবে **كَلَامٌ وَاحِدٌ**-এর মাঝে خِطَابٌ بِالْحَاضِرِ এবং خِطَابٌ بِالْغَائِبِ লাজেম আসে। এ থেকে বাঁচার জন্য মুফাসসির (র.) **قُلْنَا** বৃদ্ধি করেছেন। যাতে أَخَذْنَا এবং قُلْنَا -এর মাঝে مُطَابَقَتْ হয়ে যায়। -[জামালাইন : খ. ১, পৃ. ১৫৯]

قَوْلُهُ لَا تَعْبُدُوْنَ : এটি শব্দরূপে মুযারে [বর্তমান ভবিষ্যত জ্ঞাপক] সংবাদবোধক ক্রিয়া হলেও অর্থে তা আজ্ঞাবোধক এবং **স্পষ্ট আজ্ঞার চেয়ে এটি অধিক অর্থবহ** ও কার্যকর। কেননা এ পদ্ধতি ইঙ্গিত করে যে, যেন আদিষ্ট বিষয় প্রতিপালিত হয়ে **গিয়েছে, যেন আজ্ঞা পালনে দ্রুততা দেখানো** হয়েছে। এ পদ্ধতি স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অধিক অর্থবহ। তাফসীরে বায়জাবী শরীফে রয়েছে- **هُوَ اَبْلَغُ مِنْ صَرِيْحٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ اِيْهَامِ الْمَنْهِيِّ سَارَعَ اِلَى الْاِنْتِهَاءِ فَهُوَ يَخْبُرُ عَنْهُ**

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ : অর্থাৎ **لَا تَعْبُدُوْنَ** শব্দটি حَاضِرٌ مُذَكَّرٌ جَمْعٌ مُنْفِيٌّ مُضَارِعٌ হওয়ার কারণে **جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ** হয়েছে। এ কারণেই তার **نُوْنِ اَعْرَابِيْ** সাকেত হয়নি। কিন্তু অর্থগত দিক দিয়ে এটি **جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ** এবং **لَا تَعْبُدُوْا** -এর অর্থে।

প্রশ্ন : এখানে ইশকাল হয় যে, যখন এখানে **خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ** হয়েছে, তখন সরাসরি نَهِيْ -এর সীগাহ **আনা হলো না কেন?**

উত্তর : جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ-কে **جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ**-এর মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য এ দিকে ইঙ্গিত **করা যে, তাদের দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদত প্রকাশিত হওয়া খুবই দুষ্কর।**

قَوْلُهُ وَاَحْسِنُوْا : প্রশ্ন : এখানে اَحْسِنُوْا উহ্য ধরার ফায়দা কি?

উত্তর : এখানে এ শব্দটি উহ্য ধরে মুফাসসির (র.) একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তা হচ্ছে- **بِالْوَالِدَيْنِ [جَارٌ** এবং **مَجْرُوْرٌ] اَحْسِنُوْا**-এর **عَطْف হয়েছে** لَا تَعْبُدُوْنَ - (جَارٌ مَجْرُوْرٌ) -এর উপর। ব্যাকরণগত দিক দিয়ে যা **অশুদ্ধ। যখন উহ্য ধরা হয়েছে, তখন আপত্তি শেষ** হয়ে গিয়েছে। এছাড়া মুফাসসির (র.) اَحْسِنُوْا আমরের সীগাহ **উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَطْف** টি হয়েছে لَا تَعْبُدُوْنَ-এর অর্থের উপর, শব্দের উপর নয়।

قَوْلُهُ بِرًّا : اِحْسَانًا-এর ব্যাখ্যায় **بِرًّا** শব্দের উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِحْسَانٌ **দ্বারা শুধুমাত্র** আর্থিক اِحْسَانٌ **বুঝানো হয়নি; বরং এর দ্বারা কথা,** কাজ সাধারণভাবে সব ধরনের সদ্ব্যবহারকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ الْقَرَابَةُ : মুফাসসির (র.) **قُرْبٰى**-এর তাফসীরে اَلْقَرَابَةُ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন **যে, قُرْبٰى শব্দটি رُجْعٰى-এর মতো মাসদার, বহুবচন নয়।** اَىْ اَهْلُ الْقَرَابَةِ আর قَرَابَتْ দ্বারা رِحْمِىْ এবং صُلْبِىْ আত্মীয় **উদ্দেশ্য।**

اَلْيَتَامٰى : এটি يَتِيْمٌ-এর বহুবচন। মানুষের মধ্যে যেসব বাচ্চার পিতা মারা যায় এবং প্রাণীদের **মধ্যে যেসব বাচ্চার মা** মারা যায় তাদেরকে **يَتِيْمٌ** বলা হয়। **وَالْيَتِيْمُ مِنَ الْاٰدَمِيِّيْنَ مَنْ فَقَدَ اَبَاهُ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ فَقَدَ اُمَّهُ**
–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৫৯]

আল্লাহর ইবাদতের পর পিতা-মাতার অনুসরণ ও **খেদমতের ব্যাখ্যা** : একদিকে প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এবং অন্যদিকে **সন্তান জন্মের উপকরণ বাহ্যিকভাবে** পিতা-মাতা হন। তাই আল্লাহ তা'আলা নিজ হক -এর সাথে **পিতা-মাতার হক** [অধিকার] ও **খেদমতকেও বলে** দিয়েছেন। আল্লাহর হক-এর অগ্রাধিকার এ দিকে ইঙ্গিতকারী যে, **যদি উভয় হক -এর মধ্যে** কোনো **সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে যায়, তখন** প্রথমটিই অগ্রাধিকারযোগ্য থাকবে। এমনিভাবে اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ-এর **নীতি দ্বারা** অন্যান্য **আত্মীয় স্বজনদের অধিকারসমূহেরও** শিক্ষাদান করেছেন। এ পর্যন্ত যে, **সাধারণ লোকেরাও যেন তোমাদের সাধারণ** সহানুভূতি এবং উত্তম ব্যবহার থেকে বঞ্চিত না থাকে; কিন্তু **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর ন্যায় অনুকরণের প্রতীক** ও প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী লোকদের ছাড়া অন্যান্য **ইহুদিরা সে অঙ্গীকারের সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখেনি এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা থেকে** ফিরে গেছে। এ অঙ্গীকার যদিও বর্তমান **ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের থেকে নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু যেহেতু বর্তমান ইহুদিদের** কার্যকলাপ তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের কার্যাবলির সাথে একমত, তাই সম্বোধন ও তিরস্কারের মধ্যে তাদেরকেও **অংশীদার গণ্য** করা হয়েছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. [illegible]]

[illegible] এর ক্ষেত্রে حُسْنٌ শব্দটি মাসদার হিসেবে (بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِ السِّيْنِ) [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وُصِفَ بِهِ لِلْمُبَالَغَةِ : এর দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– মাসদার দ্বারা তো সিফত আনা শুদ্ধ নয়। মুফাসসির (র.) জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُبَالَغَةْ স্বরূপ মাসদাররের মাধ্যমে সিফত আনা হয়েছে। যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ

দ্বিতীয় জবাব হলো– এখানে مُضَافْ উহ্য রয়েছে اَىْ قَوْلاً ذَا حُسْنٍ

قَوْلُهُ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوالزَّكٰوةَ : এখানে সালাত এবং জাকাত দ্বারা বনি ইসরাইলের প্রতি ফরজকৃত সালাত ও জাকাত উদ্দেশ্য। এখানে তাদের পূর্বপুরুষদের সম্বোধন করা হচ্ছে। কেউ বলেন– এখানে সম্বোধিত গোষ্ঠি হলো নবীযুগের ইহুদীরা এবং সালাত ও জাকাত দ্বারা ইসলামি শরিয়তের সালাত ও জাকাত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : এ সূরতে প্রশ্ন হয় যে, ঈমান ব্যতীত সালাত এবং জাকাতের কোনো মূল্য নেই। ইহুদীদেরকে এ নির্দেশ কিভাবে প্রদান করা হলো?

উত্তর : এখানে সালাত ও জাকাতের নির্দেশ দ্বারা ঈমান আনয়নের নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কেউ বলেন, এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাফেররা فُرُوْعِى বিধানের মুকাল্লাফ।

قَوْلُهُ فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ : **মুফাসসির (র.)** এ অংশটুকু উহ্য ধরে একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন : ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ হলো খবর। **পূর্বের** সবগুলো বাক্য হলো اِنْشَاء-এর অন্তর্ভুক্ত। তাহলে جُمْلَةْ خَبَرِيَّةْ-এর عَطْف জুমলায়ে اِنْشَائِيَّةْ-এর সাথে কিভাবে শুদ্ধ হলো?

উত্তর : মুফাসসির (র.) সে প্রশ্নের **জবাবের** দিকে ইঙ্গিত করেছেন এভাবে যে, এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য আছে। আর তাহলো فَقَبِلْتُمْ ذٰلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

সুতরাং عَطْف সহীহ আছে।

قَوْلُهُ اَعْرَضْتُمْ عَنِ الْوَفَاءِ : এটি تَوَلَّيْتُمْ-এর তাফসীর। অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার তো গ্রহণ করেছিলে; কিন্তু তা পূর্ণ করা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেছ।

قَوْلُهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ : অর্থাৎ পূর্বে بَنِى اِسْرَائِيْل غَائِبْ ছিল। সুতরাং ثُمَّ تَوَلَّوْا বলা উচিত ছিল। কিন্তু যখন تَوَلَّيْتُمْ বলা হয়েছে। তাই বুঝা গেল এখানে غَيْبَةْ থেকে خِطَابْ-এর দিকে اِلْتِفَاتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ : অর্থাৎ যেহেতু تَوَلَّيْتُمْ-এর মধ্যে غَائِبْ থেকে خِطَابْ-এর দিকে اِلْتِفَاتْ হয়েছে, সেহেতু তার দ্বারা ইহুদীদের পূর্ব পুরুষরা উদ্দেশ্য সমসাময়িক ইহুদিরা উদ্দেশ্য নয়

কেউ বলেন, এখানে সম্বোধন ব্যাপকভাবে হয়েছে উত্তরসূরি-পূর্বসূরি সকলেই তাতে শামিল আছে।

قَوْلُهُ اِلَّا قَلِيْلاً مِنْكُمْ : اَىْ مِنْ اٰبَائِكُمْ অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা সঠিক ইহুদি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কেউ কেউ বলেন– এখানে নবীযুগের কতিপয় ইহুদি উদ্দেশ্য, যারা ঈমান এনেছিল। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথীবৃন্দ।

قَوْلُهُ كَاٰبَائِكُمْ : এর দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ এবং ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ-এর অর্থ তো একই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাকরার করা হলো কেন?

উত্তর : উভয়টির সম্বোধিত গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন। تَوَلَّيْتُمْ-এর সম্বোধন পূর্বপুরুষদের প্রতি আর وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ-এর সম্বোধন উত্তরসূরি ইহুদিদের প্রতি করা হয়েছে সুতরাং বস্তুত এখানে কোনো তাকরার নেই।

কেউ কেউ বলেন– وَاَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ হলো جُمْلَةْ مُعْتَرِضَةْ অর্থাৎ اَىْ وَاَنْتُمْ قَوْمٌ عَادَتُكُمُ الْاِعْرَاضُ

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨٤. وَاذْكُرْ إِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَقُلْنَا لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ تُرِيْقُوْنَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهِ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ قَبِلْتُمْ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقَ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ـ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ـ

৮৪. আর স্মরণ কর যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না অর্থাৎ পরস্পরকে হত্যা করে তা [রক্ত] প্রবাহিত করবে না এবং তোমাদের নিজেদেরকে স্বীয় গৃহ হতে বহিষ্কার করবে না অর্থাৎ পরস্পরকে গৃহচ্যুত করবে না অতঃপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে উক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিয়েছিলে আর নিজেদের উপর তোমরাই তার সাক্ষী।

٨٥. ثُمَّ اَنْتُمْ يَا هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَّاهَرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الظَّاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّخْفِيْفِ عَلٰى حَذْفِهَا تَتَعَاوَنُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ الْمَعْصِيَةِ وَالْعُدْوَانِ ط الظُّلْمِ وَاِنْ يَأْتُوْكُمْ اُسٰرٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَسْرٰى تُفْدُوْهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ تُفَادُوْهُمْ تُنْقِذُوْهُمْ مِنَ الْاَسْرِ بِالْمَالِ اَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مِمَّا عُهِدَ اِلَيْهِمْ وَهُوَ اَىِ الشَّاْنُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَتُخْرِجُوْنَ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ اَىْ كَمَا حُرِّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ ـ

৮৫. অতঃপর হে ব্যক্তিগণ! তোমরাই তারা, যারা নিজেদের হত্যা করছ একজন অপরজনকে হত্যা করছ এবং তোমাদের নিজেদের এক দলকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করছ। অন্যায় পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে জুলুমের মাধ্যমে [তোমরা তাদের বিরুদ্ধে পরস্পরকে সহযোগিতা করছ।] যদি তারা তোমাদের নিকট বন্দীরূপে আসে। তখন তাদের মুক্তিপণ দাও। অর্থাৎ তখন তোমরা অর্থ ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে বন্দী দশা হতে মুক্ত করে আন। এটাও তাদের উক্ত অঙ্গীকারভুক্ত একটি বিষয়। অথচ তাদের বহিষ্করণও তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল মুক্তিপণ দান পরিত্যাগ করা যেমন অবৈধ ছিল [তেমনি এটাও অবৈধ ছিল।]
تَظَّاهَرُوْنَ ক্রিয়াটি মূলত تَتَظَاهَرُوْنَ ছিল। দ্বিতীয় ت টিকে ظ অক্ষরে اِدْغَامٌ। অর্থাৎ সন্ধিভূত করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف অর্থাৎ লঘু আকারেও [تَظَاهَرُوْنَ রূপে ظ -এর তাশদীদ ব্যতীত] পঠিত রয়েছে। اَسْرٰى শব্দটির اُسٰرٰى রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। تُفَادُوْهُمْ ক্রিয়াটি অপর এক কিরাতে تُفْدُوْهُمْ রূপেও পঠিত রয়েছে। هُوَ সর্বনামটি এস্থানে ضَمِيْر شَاْن রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। وَهُوَ .... اِخْرَاجُهُمْ বাক্যটি মূলত تخرجون -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্যটি (اَنْ يَّأْتُوْكُمْ ....) হলো مُعْتَرِضَةٌ মু'তারিজা বা বিচ্ছিন্ন বাক্য। يَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ى [নামপুরুষ] ت দ্বিতীয় পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقُلْنَا : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, لَا تَسْفِكُوْنَ হলো مَحَلًّا مَنْصُوْب এবং উহ্য قُلْنَا -এর مَقُوْلَه
قَوْلُهُ وَهُوَ اَىِ الشَّاْنُ : وَيُسَمّٰى ضَمِيْرُ الْقِصَّةِ وَلَا يَرْجِعُ اِلَّا عَلٰى مَا بَعْدَهُ وَفَائِدَتُهُ الدَّلَالَةُ عَلٰى تَعْظِيْمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَتَفْخِيْمِهِ ـ
قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا الخ : وَهُوَ وَقَوْلُهُ بَيْنَهُمَا اَىْ بَيْنَ الْمَعْطُوْفِ وَهُوَ وَاِنْ يَأْتُوْكُمْ اُسَارٰى تُفْدُوْهُمْ وَالْجُمْلَةُ هِىَ قَوْلُهُ :

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَائَكُمْ : حَصَاءٌ শব্দটি دَمٌ -এর বহুবচন। دِمَاءٌ মূলে دِمَاءٌ ছিল। اَلِفْ زَائِدَةٌ -এরপর وَاوْ হওয়ার কারণে তা হামযা হয়ে গেছে। যেহেতু এ হামযাটি وَاوْ থেকে রূপান্তরিত তাই এটি غَيْرُ مُتَصَرِّفْ হবে না। পক্ষান্তরে اَصْدِقَاءُ ও عُلَمَاءُ উভয়টি শব্দই غَيْرُ مُنْصَرِفْ

قَوْلُهُ تُرِيْقُوْنَهَا : এটি تَسْفِكُوْنَ دِمَائَكُمْ -এর তাফসীর। تَسْفِكُوْنَ ফে'লটি (ض) سَفَكَ থেকে নির্গত। অর্থ প্রবাহিত করা। تُرِيْقُوْنَهَا ফে'লটি اِرَاقَةٌ . اَرَاقَ প্রবাহিত করা থেকে নির্গত

قَوْلُهُ يَا هٰؤُلَاءِ : মুফাসসির يَا উহ্য ধরে ইঙ্গিত করেছেন যে, هٰؤُلَاءِ শব্দটি মহল হিসেবে مُنَادٰى হয়ে মানসূব। তার حَرْفِ نِدَا উহ্য রয়েছে। এ সূরতে يَا مُنَادٰى -এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হবে। আর اَنْتُمْ হবে মুবতাদা এবং تَقْتُلُوْنَ হবে খবর।

قَوْلُهُ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِنْ دِيَارِهِمْ : এর عَطْف হয়েছে تَقْتُلُوْنَ -এর সাথে। আর مِنْ دِيَارِهِمْ -এর মাঝে জমিরটি فَرِيْقٌ -এর দিকে ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের একটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ ছিল। এখানে আরেকটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে তা এ কথার দাবী করে যে, তোমাদের শাস্তি অস্থায়ী নয়, স্থায়ী হওয়া উচিত।

আলোচ্য বিষয় ও শানে নুযূল : মদীনা শরিফে দুটি ইহুদি গোত্র বাস করত। একটি বনূ কুরাইজা অপরটি বনূ নাজীর। এ উভয় গোত্র পরস্পরে হানাহানি করত। মদীনা শরিফের মুশরিকরাও ছিল দু'দলে বিভক্ত। আওস ও খাজরাজ। এরাও একে অপরের শত্রু ছিল। বনূ কুরায়যা আওস গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করল এবং বনূ নাযীর মৈত্রী স্থাপন করল খাযরাজ গোাত্রের সাথে। যুদ্ধ বিগ্রহে প্রত্যেকেই সমমনা ও মিত্রের সাহায্য করত। একে অন্যের উপর জয়ী হতে পারলে দুর্বলদের নির্বাসিত করতো এবং তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিত। আবার কেউ বন্দী হলে সকলে মিলে অর্থ সংগ্রহ করত এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতো। এ আয়াতে তাদের সে মন্দ কর্মের উল্লেখ করে তা থেকে বারণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ الخ : অঙ্গীকার নেওয়া এখানেও আদেশ করা অর্থে। এখানে নবীযুগের ইহুদিদের সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের চরিত্রের বর্ণনা করা হচ্ছে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৫২]

قَوْلُهُ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا : এর দ্বারা একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : لَاتَسْفِكُوْنَ دِمَائَكُمْ -এর মর্ম তো হলো নিজের রক্ত প্রবাহিত করো না। আর বাস্তবতা হলো কেউ নিজের খুন প্রবাহিত করে না; বরং অন্যের খুন প্রবাহিত করে। তাহলে এখানে নিজের খুন প্রবাহিত করতে নিষেধ করার মর্ম কি?

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন– এখানে উদ্দেশ্য হলো একে অপরকে হত্যা করে নিজেদের রক্ত প্রবাহিত করো না।

প্রশ্ন : তারপর ইশকাল হয় যে, بَعْضٌ -এর দিকে اِضَافَتْ না করে دِمَائَكُمْ -এর দিকে কতলের اِضَافَتْ করা হলো কেন?

উত্তর : এজন্য যে, دَمُ الْاَخِ كَدَمِ النَّفْسِ অপর ভাইয়ের রক্ত যেন নিজের রক্তের মতই। কেউ বলেন– যে অন্যকে হত্যা করে তাকেও হত্যা করা হয়। এ হিসেবে كُمْ -এর দিক اِضَافَتْ হয়েছে।

প্রশ্ন : আয়াতে চুক্তি অঙ্গীকারের মধ্যে একে অপরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করার কথাও ছিল। এখানে তার আলোচনা নেই কেন?

উত্তর : এ চুক্তিটি তারা পূর্ণ করত, বিধায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ : **যোগসূত্র :** পূর্বে তাদের চুক্তিও অঙ্গীকারের স্বীকারোক্তি বর্ণনা ছিল এ আয়াতে তা ভঙ্গ করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে একটি ইশকাল হয় যে, পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ অর্থাৎ ضَمِيْرُ حَاضِرْ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে مِنْ دِيَارِهِمْ বলে ضَمِيْرُ غَائِبْ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনটি কেন হলো?

উত্তর : এখানে ضَمِيْرُ غَائِبْ ব্যবহার করার কারণ হলো যদি ضَمِيْرُ حَاضِرْ আনা হতো তাহলে এ সংশয় সৃষ্টি হতো যে, সম্ভবত তাদেরকে মোখাতাবদের বাড়ী থেকে বের করা হয়েছে, অথচ এখানে বহিষ্কৃতদেরকে নিজ ঘর থেকেই বের করা উদ্দেশ্য।

عَلٰى خَذْفِهَا : اَىْ عَلٰى حَذْفِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ .

قَوْلُهُ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : অর্থাৎ অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন সহকারে অংশটুকু বাড়িয়ে দিয়ে পবিত্র কুরআন আরো খোলাসা করে দিয়েছে যে, এসব গৃহযুদ্ধ ও পৌত্তলিক-প্রীতি কোনো প্রকার সুখ্যাতি ও সৎ উদ্দীপনা এবং সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার ভিত্তিতে ছিল না; বরং পার্থিব স্বার্থ পূজারী পেশাদার রাজনীতিকেরা সাধারণতঃ যেসব জঘন্য ও পুতিগন্ধময় নীতিহীনতায় নিমজ্জিত থাকে এরা বিশেষত মুশরিকের হাতে [illegible] ডুবে ছিল, সে সবই ছিল এ সকল হানাহানির উৎস

http://islamiboi.wordpress.com

وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُوْا الْاَوْسَ وَالنَّضِيْرُ الْخَزْرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيْقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ فَاِذَا اَسَرُوْا اَفْدَوْهُمْ وَكَانُوْا اِذَا سُئِلُوْا لِمَ تُقَاتِلُوْنَهُمْ وَتُفْدُوْنَهُمْ قَالُوْا اُمِرْنَا بِالْفِدَاءِ فَيُقَالُ فَلِمَ تُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ حَيَاءً اَنْ يَسْتَذِلَّ حُلَفَاؤُنَا قَالَ تَعَالٰى اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَهُوَ الْفِدَاءُ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ـ وَهُوَ تَرْكُ الْقَتْلِ وَالْاِخْرَاجِ وَالْمُظَاهَرَةِ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ هَوَانٌ وَذُلٌّ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَقَدْ خُزُوْا بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيْرِ اِلَى الشَّامِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ـ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ

٨٦. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ بِاَنْ اٰثَرُوْهَا عَلَيْهَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ـ يُمْنَعُوْنَ مِنْهُ ـ

অনুবাদ :

মদীনার বনূ কুরাইযা, আউস গোত্রের সাথে এবং বনূ নাযীর খাজরাজ গোত্রের সাথে পরস্পর সহযোগিতামূলক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। [বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর উভয় গোত্র ছিল ইহুদি আর অপরদিকে আউস ও খাযরাজ ছিল পরস্পর শত্রু। এদের পরস্পরে যুদ্ধ লেগেই থাকত।] এই যুদ্ধে ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযা ও বনূ নাযীর উক্ত সহযোগিতা চুক্তি অনুসারে স্ব স্ব বন্ধু গোত্রের পক্ষ নিত। প্রত্যেক দলই বিপক্ষ দলের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করত এবং তাদেরকে গৃহচ্যুত করত। আবার যখন কারো হাতে অন্য দলের কোনো বন্দী হতো উক্ত ইহুদি গোত্রদ্বয় পরস্পর মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে আনত। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, কেনই বা লড়াই করলে আর কেনই বা পণ দিয়ে মুক্ত করে আনলে? তারা বলত, আমাদের মুক্তিপণের আদেশ করা হয়েছে। যদি বলা হতো তবে এদের সাথে লড়াই বাধাও কেন? তারা বলত, আমাদের সাথে চুক্তি আবদ্ধ বন্ধুগণ লাঞ্ছিত হবে এই লজ্জায় আমরা যুদ্ধ করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে মুক্তিপণের বিধানে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে হত্যা, বহিষ্কার ও অন্যায়কর্মে সহযোগিতা বর্জন করার বিধান প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র ফল পার্থিব জীবনের হীনতা লাঞ্ছনা ও হেয়তা। তারা বাস্তবিকই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল। কুরাইযাকে করা হয়েছিল হত্যা আর বনূ নাযীরকে করা হয়েছিল শামের দিকে বহিষ্কার এবং তাদের উপর ধার্য করা হয়েছিল জিযিয়া কর। আর কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

৮৬. তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে নিয়েছে অর্থাৎ পরকালের উপর এটাকে প্রাধান্য দিয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যও পাবে না। অর্থাৎ তা হতে তাদেরকে রক্ষা করাও হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

تَظَاهَرُوْنَ ক্রিয়াটি মূলত تَتَظَاهَرُوْنَ ছিল। দ্বিতীয় ت টিকে ظ অক্ষরে اِدْغَامْ অর্থাৎ সন্ধিভূত করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف অর্থাৎ লঘু আকারেও [تَظَاهَرُوْنَ রূপে ظ -এর তাশদীদ ব্যতীত] পঠিত রয়েছে। اَسْرٰى শব্দটির اَسْرٰى রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। تفادوهم ক্রিয়াটি অপর এক কিরাতে تَفْدُوْهُمْ রূপেও পঠিত রয়েছে। هُوَ সর্বনামটি এস্থানে ضَمِيْر شَانْ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। وَهُوَ . اِخْرَاجُهُمْ বাক্যটি মূলত تُخْرِجُوْنَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্যটি (اَنْ يَأْتُوكُمْ....) হলো مُعْتَرِضَةْ মু'তারিজা বা বিচ্ছিন্ন। বাক্য। يَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ى [নামপুরুষ] এবং ت দ্বিতীয় পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের যে অঙ্গীকার পূর্বের আয়াতে আলোচনা করেছেন। এ আয়াতে সে অঙ্গীকারের পরিপূর্ণতা রয়েছে। আর তারপর তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা করেছে এবং সর্বশেষে তাদের শাস্তির চিত্র আঁকা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ : এখানে থেকে মুফাসসির (র.) ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করছেন এবং মোটামুটি পূর্ণ ঘটনাই সংক্ষেপে তুরে ধরেছেন।

قَوْلُهُ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ : বর্ণনাধারায় كِتَابٌ দ্বারা এখানে ইহুদিদেরই আসমানি কিতাব তাওরাত উদ্দেশ্য। ইহুদিদের বিপক্ষে পরোক্ষ অভিযোগ সাব্যস্ত হচ্ছে যে, কুরআনকে বিশ্বাস করার কথা তো স্বতন্ত্র ব্যাপার তোমরা তাওরাতের আনুগত্যই বা কবে করেছ? বরং তোমাদের বড় হুজুররা যেরূপ দুঃসাহসিকতায় তাওরাতের কোনো কোনো বিধান লঙ্ঘন করে আসছে, তাতে তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলা যায় যে, তোমাদের ঈমান নেই। ঈমানে তো বিভক্তি সম্ভব নয়। কাজেই কতক বিধানকে অস্বীকারকারীও পূর্ণ কাফেরই গণ্য হবে। কতক বিধানে ঈমান আনার দ্বারা ঈমান লাভ হবে না মোটেই।

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি শরিয়তের কতেক বিধান মেনে চলে এবং যেসব বিধান তার স্বভাব চরিত্র বা স্বার্থ বিরোধী হয়, তা মানতে দ্বিধা করে, তাহলে কতককে মেনে চলার দ্বারা তার কোনো উপকার লাভ হবে না।

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اِلَّا خِزْيٌ الخ : অর্থাৎ যারা এরূপ করে অর্থাৎ কতেক বিধান মানে এবং কতেক অস্বীকার করে, তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

এ ভবিষ্যদ্বাণী অল্প দিনের ব্যবধানে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। হিজাযে ইহুদি তিনটি প্রতাপশালী গোত্র বনূ নাযীর, বনূ কুরায়যা ও বনূ কায়নুকার অধিবাস ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বিদ্যা-প্রযুক্তি ও শক্তি-সম্পদ-প্রতিপত্তির অধিকারী তিন গোত্রই অল্প কয়েক বছরের সময়সীমায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হায়াতকালেই চরম ধ্বংসের শিকার হয়।

[বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের আলোকে ইহুদি সম্প্রদায় বইয়ে রয়েছে।]

প্রতিজ্ঞার অবশিষ্ট কিস্তিসমূহের ব্যাখ্যা : সারকথা হলো– সে প্রতিজ্ঞার তিনটি অতিরিক্ত কিস্তি এ ছিল–

১. পরস্পরে খুনাখুনি করবে না।

২. কাউকে দেশান্তর করবে না।

৩. যদি কেউ বন্দী হয়ে যায়, তবে আর্থিক বিনিময় দিয়ে তাকে মুক্ত করাবে। অতএব উক্ত তিনটি কিস্তির মধ্যে অতি সহজ ছিল তৃতীয় কিস্তিটি। এর উপর তো কিছু আমল করছ; কিন্তু প্রথম দুটি কিস্তি যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি ছিল। এগুলোকে একেবারে ছেড়ে দিয়েছ এবং লক্ষণীয় মনে করলে না।

সুতরাং আউস ও বনূ কুরায়যা পরস্পর বন্ধু ছিল এবং খাযরাজ ও বনূ নাযীর পরস্পর সাহায্যকারী ছিল। আউস ও খাযরাজ এর মধ্যে যখন কখনো যুদ্ধ হতো, তখন বনূ কুরায়যা আউসের এবং বনূ নযীর খাযরাজের সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়ে যেত।

http://islamiboi.wordpress.com

অতএব সে যুদ্ধগুলোর মধ্যে হত্যা ও দেশান্তর উভয় বিপদ সামনে আসত। যে কারণে সকলে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকতো। হ্যাঁ, যুদ্ধ বন্দীদেরকে বড়ই আগ্রহের সাথে আর্থিক বিনিময় দিয়ে মুক্ত করত এবং বলত যে, এটা আল্লাহর নির্দেশ। কিন্তু যদি কেউ হত্যা, লুটতরাজ ও দেশ থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে কোনো আপত্তি করত। তখন নিজ মৈত্রী ও বন্ধুদের থেকে লজ্জাকে গোপন করার চেষ্টা করতো। আল্লাহ তা'আলা সে দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করছেন যে, এমনভাবে যখন তোমরা এক গোত্রের সহানুভূতি ও সাহায্য কর, তখন অন্য গোত্রের বিরোধিতা ও ক্ষতি সাধনও তো অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এর মধ্যে আল্লাহর হুকুমকেও লঙ্ঘন করা হয় আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। এটাকেই أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আর্থিক বিনিময়ের আমলটি যদি আল্লাহর হুকুমের কারণে কর, তবে হত্যা ও দেশ থেকে বিতাড়িত না করাও তো খোদায়ী বিধান! এর উপর আমল কেন করা হচ্ছে না? হুকুমের এক অংশকে মানা এবং অন্য অংশকে অস্বীকার কেন? অবশেষে এটা কোন মনগড়া ঠাট্টা। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯৪]

সংশয় ও তার নিরসন : كُفْر দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ব্যবহারিক কুফ্র। কোনো বদ আমলকে ঘৃণা যোগ্য ও ঘৃণিত রূপে পেশ করার জন্য নিকৃষ্টতম শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত বাস্তবতা নয়; বরং রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হয় مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ-এর মধ্যে সে অর্থই উদ্দেশ্য। এ স্থানে ইহুদিদের মধ্যে যদিও বিশ্বাস পোষণে কুফরও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এ সময় উদ্দেশ্য তাদের সে বদ আমলের মন্দতা প্রকাশ করা। অতএব মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের জন্য এ আয়াত দ্বারা কবীরা গুনাহকারীকে ঈমানের সীমা থেকে বহিষ্কার করা এবং খারিজি সম্প্রদায়ের জন্য কবীরা গুনাহকারীকে কুফরে শামিল করার জন্য দলীল পেশ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা কুফ্র এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

সংশয় ও তার নিরসন : عَلٰى هٰذَا اَشَدَّ الْعَذَابِ-এর ক্ষেত্রে ইমাম রাযী (র.) এ সন্দেহ করেছেন যে ইহুদিরা বেশির চেয়ে বেশি কাফের ছিল। তাদের শাস্তিকে যখন اَشَدّ [কঠিনতম] বলা হয়েছে। তবে দাহ্‌রিয়া সম্প্রদায় যারা ইহুদিদের চেয়েও অধিক অপরাধী। কেননা তারা সরাসরি আল্লাহকেই অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি কিভাবে কম হবে?

আল্লামা আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে এর উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, اَشَدِّيَتْ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান উদ্দেশ্য নয় যে, مُفَضَّل এবং مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ-এর প্রয়োজন হবে। বরং اَشَدِّيَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য চিরস্থায়ী ও সর্বদা শাস্তি যা কাফির ও মুশরিক এবং দাহরিয়া সকলের জন্য হবে। অথবা কাফের থেকে নিম্ন শ্রেণির লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে اِضَافِىْ اَشَدِّيَتْ উদ্দেশ্য।

মোটকথা : দুনিয়াবী শাস্তি, লাঞ্ছনা ও অবমাননা ইহুদিদের উপর এভাবে হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর বরকতময় জীবদ্দশায়ই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে চতুর্থ হিজরিতে যখন রাসূল ﷺ-এর সত্তার উপর আউস ও খাযরাজ ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন হযরত সা'আদ ইবনে মুআয (রা.) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনূ কোরায়যার সাতশত যুবককে হত্যা করা হয়েছে এবং মহিলাও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়েছে। বনু নযীরকে সিরিয়ার দিকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সূরা আহ্যাব এবং সূরা হাশরের মধ্যে উল্লিখিত দুটি ঘটনার বাস্তবতা বিদ্যমান আছে। আর পরকালে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা পরকালে পতিত হবে।

-[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯৪]

http://islamiboi.wordpress.com

৮৭. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ط اَيْ اَتْبَعْنَاهُمْ رَسُوْلًا فِيْ اَثَرِ رَسُوْلٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ كَاِحْيَاءِ الْمَوْتٰى وَاِبْرَاءِ الْاَكْمَهِ وَالْاَبْرَصِ وَاَيَّدْنٰهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مِنْ اِضَافَةِ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ اَيِ الرُّوْحِ الْمُقَدَّسَةِ جِبْرَائِيْلَ لِطَهَارَتِهٖ يَسِيْرُ مَعَهٗ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ تَسْتَقِيْمُوْا اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى تُحِبُّ اَنْفُسُكُمُ مِنَ الْحَقِّ اسْتَكْبَرْتُمْ عَنْ اِتِّبَاعِهٖ جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ فَفَرِيْقًا مِنْهُمْ كَذَّبْتُمْ كَعِيْسٰى وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ـ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ اَيْ قَتَلْتُمْ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى ـ

৮৮. وَقَالُوْا لِلنَّبِيِّ اِسْتِهْزَاءً قُلُوْبُنَا غُلْفٌ جَمْعُ اَغْلَفَ اَيْ مُغَشَّاةٌ بِاَغْطِيَةٍ فَلَا نَعِيْ مَا تَقُوْلُ قَالَ تَعَالٰى بَلْ لِلْاِضْرَابِ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ اَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهٖ وَخَذَلَهُمْ عَنِ الْقَبُوْلِ بِكُفْرِهِمْ وَلَيْسَ عَدَمُ قَبُوْلِهِمْ لِخَلَلٍ فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَقَلِيْلًا مَا يُؤْمِنُوْنَ ـ مَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ الْقِلَّةِ اَيْ اِيْمَانُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا ـ

অনুবাদ :

৮৭. এবং নিশ্চয় মূসাকে কিতাব তাওরাত প্রদান করেছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি এক রাসূলের পিছনে অপর রাসূলকে প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম তনয় ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ মৃতকে জীবন দান, জন্মান্ধ ও শ্বেত-কুষ্ঠ রুগীর রোগমুক্ত করার মতো বহু মু'জিজা প্রদান করেছি। এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তার শক্তি যুগিয়েছি অর্থাৎ তাকে শক্তিশালী করেছি। رُوْحَ الْقُدُسِ অর্থ হযরত জিবরাঈল (আ.)। সাতিশয় পবিত্রতার জন্য তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যে স্থানেই হযরত ঈসা (আ.) গমন করতেন হযরত জিবরাঈল (আ.) সঙ্গে থাকতেন। যা হোক এসব কিছু সত্ত্বেও তারা [ইহুদিরা] সত্য পথে কায়েম থাকল না। তবে কি যখনই কোনো রাসূল তোমাদের নিকট সত্য ও ন্যায়ের এমন কিছু এনেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয় তোমাদের পছন্দ নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ অর্থাৎ তা অনুসরণ করা হতে অহংকার প্রদর্শন করেছ। এটা (اِسْتَكْبَرْتُمْ) পূর্বোল্লিখিত كُلَّمَا -এর জবাব। প্রশ্নতব্য বিষয়টিও এটাই। প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। এবং তাদের কতেককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে আর কতেককে হত্যা করেছে যেমন হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.) -কে।

رُوْحَ الْقُدُسِ শব্দটিতে صِفَةٌ বিশেষণ-এর প্রতি مَوْصُوْف [বিশেষিতব্য] -এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। মূলত ছিল اَلرُّوْحُ الْمُقَدَّسَةُ পবিত্র আত্মা। [اَلرُّوْحُ হলো مَوْصُوْف আর اَلْمُقَدَّسَةُ হলো صِفَةٌ বা বিশেষণ]।
تَقْتُلُوْنَ ক্রিয়াটি مُضَارِعْ বা বর্তমান কালবাচক। অতীতে সংঘটিত বিষয়টিকে বর্তমান ঘটমানরূপে চিহ্নিত করে বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে এরূপ ব্যবহার হয়েছে।

৮৮. তারা নবীকে উপহাস করে বলে আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত, সুতরাং তুমি যা বল তা সংরক্ষণ করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন বরং সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের লা'নত দিয়েছেন তাঁর রহমত হতে তাদেরকে বিতাড়িত করেছেন এবং সত্য গ্রহণ হতে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের এই প্রত্যাখ্যান হৃদয়ের গঠন-ক্রুটির জন্য নয়। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈমান অতি সামান্যই।

غُلْف শব্দটি اَغْلَف -এর বহুবচন। অর্থাৎ পর্দায় আবৃত। بَلْ لَعَنَهُمْ : এ স্থানে بَلْ শব্দটি اِضْرَابْ বা প্রসঙ্গ পরিবর্তন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قَلِيْلًا مَا -এর مَا শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। قِلَّةٌ বা সংখ্যাল্পতার تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا : وَاوْ হরফে আতফ, لَامْ উহ্য কসমের জবাবের উপর দাখিল হয়েছে এবং قَدْ হরফে تَحْقِيْق

قَفَّيْنَا : مَاضِيْ جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। تَقْفِيَةٌ (تَفْعِيْل) قَفَ পিছনে পাঠানো। قَفَ ফেয়েলটি দু'টি مَفْعُوْل দাবি করে। সাধারণত তার مَفْعُوْل -এর উপর حَرْفِ جَرّ দাখিল হয় না। যেমন- قَفَّيْتُ زَيْدًا عَمْرًوا অর্থাৎ আমি যায়েদকে ওমরের পিছনে প্রেরণ করেছি। কখনো দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর উপর بِ দাখিল। কুরআন শরীফে এরূপ ব্যবহার রয়েছে। যেমন- وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ অর্থাৎ আমি তার পরে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি।

قَوْلُهُ الْبَيِّنٰتِ : উজ্জ্বল স্পষ্ট নিদর্শন। অলৌকিক ঘটনাবলি ও মু'জিজাসমূহ সবই অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ এর দ্বারা ইঞ্জিল শরীফ ও উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ رُوْحُ الْقُدُسِ : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উপাধি। তদ্রূপ তার নাম اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ -ও। যিনি সর্বদা হযরত ঈসা (আ.) -এর সাথে থাকতেন। অথবা 'রূহুল কুদুস' দ্বারা ইসমে আযম বুঝানো হয়েছে, যার বরকতে তিনি মৃতদের জীবিত করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার জঘন্যতম অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এখানে তার চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ তথা নবীদের হত্যা করার আলোচনা এসেছে।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ : عِيْسٰى বনী ইসরাঈল নবুয়তধারার তিনি শেষ নবী। ঈসায়ী বর্ষ [ঈসাব্দ ও খ্রিস্টাব্দ] তাঁরই নামে প্রচলিত। তাঁর পরে শুধু মুহাম্মদী নবুয়তের অবশিষ্ট ছিল। শাম দেশের [বর্তমান সিরিয়া-ফিলিস্তিন] গালীল [পার্বত্য] অঞ্চলে নাসিরা নামক স্থানে ছিল তার পিতৃপুরুষের আবাস। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের এক প্রান্তে জন্মলাভ করেছিলেন।

শাম দেশে তখন রোম সম্রাজ্যের অধীন একটি আধা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ছিল। হেরোদ ছিল তখনকার শামের শাসক [রাজা]। খ্রিস্ট বর্ষপঞ্জীতে শুরু থেকেই তিন বছরের ভুল চলে আসছে। অর্থাৎ খ্রিস্ট বর্ষপঞ্জীর প্রথম বছর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম সন নয়; বরং তিন বছর পরে তার জন্ম সন। সুতরাং বলা যায় যে, ৩য় খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিশ্বাস মতে ৩৩ বছর বয়সে তিনি জীবিত অবস্থায় [আর খ্রিস্টানদের মতে তিন দিন মৃত থাকার পর] আকাশে উত্থিত হয়েছেন। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৫৫-১৫৬]

قَوْلُهُ مَرْيَمَ : মারইয়াম বিনতে ইমরান ইবনে মাশান ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি অভিজাত পরিবারের কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী, সতী ও রূপসী সুন্দরী। খ্রিস্ট বর্ণনা মতে তাঁর মৃত্যু সন ৪৮ খ্রিস্টাব্দ -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ : মারইয়ামের পুত্র দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) তার নবীসুলভ মাহাত্ম্য সত্ত্বেও একজন মানব সন্তানই ছিলেন, একজন [সাধারণ] নারীর গর্ভে তার জন্ম। সুতরাং তিনি খোদা [ঈশ্বর] বা ঈশ্বর তুল্য বা ঈশ্বর পুত্র- এ সবের কিছুই ছিলেন না।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الخ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্বের ইবারত قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ -এর মধ্যে তো হযরত ঈসা (আ.) শামিল ছিলেন। তারপর বিশেষভাবে তাঁর কথা উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর :

১. হযরত ঈসা (আ.)-এর অতিরিক্ত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে تَخْصِيْصٌ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ করা হয়েছে।

২. যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী ছিলেন তাই ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيَّدْنَاهُ : শক্তি যোগান। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) মানুষ হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং সে সাহায্য একজন ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে দেওয়া হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ : উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুফাসসির (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, জিবরাঈল (আ.) তো সকল নবীকেই শক্তি যুগিয়েছে। তাহলে এখানে বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা বলা হলো কেন?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। এখানে তা-ই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ جَوَابُ كُلَّمَا : অর্থাৎ اِسْتَكْبَرْتُمْ হলো كُلَّمَا مُتَضَمِّنْ شَرْط -এর جَوَاب

قَوْلُهُ وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ : এই আয়াতের মাঝে اِسْتَكْبَرْتُمْ. مَحَلْ اِسْتِفْهَامْ অর্থাৎ অহংকার সম্পর্কেই প্রশ্নটি হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامْ টি হলো اِسْتِفْهَامْ تَوْبِيْخِيْ কেননা জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশ্ন করাটা অসম্ভব। তাঁর প্রশ্ন করাটা ধমক বা সতর্কীকরণ স্বরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ ধমক ও ভৎর্সনা করা হচ্ছে যে, অহংকার কেন করলে?

فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ : গুরুত্ব বুঝানো বা আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাফউলকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। আর কতল গুরুত্বপূর্ণ ও জঘন্য হওয়া সত্ত্বেও تَكْذِيْب -কে আগে আনার কারণ হলো ইহুদিদের অবাধ্যতার সূচনা হয়েছে تَكْذِيْب দ্বারা। এ ছাড়াও تَكْذِيْب -এর সম্পর্ক সকল নবীর সাথেই রয়েছে। আর قَتْل বিশেষ বিশেষ নবীর সাথে।

قَوْلُهُ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ : এই ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে মূলত একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাব দিয়েছেন। যার মর্ম এই যে, تَقْتُلُوْنَ মুজারের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় ইহুদিরা এই আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ও নবীদেরকে হত্যা করছিল। অথচ এটা বাস্তবের পরিপন্থি। উচিত ছিল قَتَلْتُمْ ব্যবহার করা।

উত্তর : এখানে জঘন্যতা বুঝানোর জন্য অতীতকে مُضَارِعْ -এর স্থানের রাখা হয়েছে। যেন নবী হত্যার ঘটনা বর্তমানেও দৃষ্টির সামনে রয়েছে। এটাকেই حِكَايَتْ حَالْ مَاضِيَة বলা হয়।

قَوْلُهُ كَزَكَرِيَّا **: হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা :** ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নরের কাছে হযরত জাকারিয়া (আ.) সম্পর্কে নানা মিথ্যা কথা বলে গভর্নরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে সে হযরত জাকারিয়া (আ.)-কে ধাওয়া করে। হযরত জাকারিয়া (আ.) জঙ্গলের দিকে চলে যান এবং একটি বৃক্ষের ফাঁকে আত্মগোপন করেন ঘটনাক্রমে তাঁর চাদরের একটি কোনা বাইর থেকে দেখা যাচ্ছিল। হতভাগারা সংবাদ পেয়ে বৃক্ষসহ নবীকে চির শহীদ করে ফেলে। -[হাশিয়ায়ে ছাবী খ. ১. পৃ. ৬০]

قَوْلُهُ وَيَحْيٰى **: হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা :** এক অসৎ নারীকে তার কোনো এক মাহরাম আত্মীয় বিবাহ করতে চাইলে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তাকে বারণ করেন। ফলে সে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বর্ণনায় রয়েছে সে লোকটি বায়তুল মুকাদ্দাসের গভর্নর ছিল। -[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী নবী ও আসমানী কিতাবের সাথে ইহুদিদের আচরণের বিবরণ ছিল। এখানে রাসূল ﷺ এবং পবিত্র কুরআনের সাথে তাদের আচরণের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত আমাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না। ইহুদিরা প্রকাশ্যে ও গর্বভরে বলে বেড়াত যে, এ নতুন নবী যা কিছুই করে ফেলুক না কেন, আমরা তার কথায় পড়ছি না।

غُلْفٌ : এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে-

১. এটি غِلَافٌ [আচ্ছাদন] -এর বহুবচন। তখন অর্থ হবে, আমাদের হৃদয়গুলো জ্ঞানভাণ্ডার, যা হযরত মূসা (আ.) তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ। কাজেই নতুন কোনো তালীম গ্রহণে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই তোমার কাছে শেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে যা আছে, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

২. কেউ কেউ বেলছেন- এটি اَغْلَفُ -এর বহুবচন। অর্থ- খতনা করা হয়নি যার। -[রাগিব]

قَوْلُهُ لَا تَعِيْ : وِعَايَةً (ض) وَعْيٌ সংরক্ষণ করা تَقُوْلُهُ أَيْ لَا تَحْفَظُ مَا

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى : এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, بَلْ لَعَنَهُمُ الخ এটা আল্লাহর তা'আলার বাণী।

قَوْلُهُ لِلْاِضْرَابِ : অর্থাৎ بَلْ لَعَنَهُمُ الخ -এর মধ্যে بَلْ শব্দটি اِنْتِقَالْ বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা তাদের পূর্বের বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলাই যেহেতু তাদেরকে লানত করেছেন ফলে তারা ঈমান আনছে না। তাহলে তাদের দোষ কোথায়?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথম থেকে হক গ্রহণেরযোগ্যতা দিয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে কুফরীর কারণে আল্লাহ তা নষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ : ইহুদিদের গর্বোদ্ধত উক্তির স্পষ্ট জবাব দিয়ে পবিত্র কুরআন বলছে যে, সুরক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের এত আত্মম্ভরিতা তা বাস্তবে কোনো গর্ব-গৌরবের বিষয় নয়; বরং তা লক্ষণ হচ্ছে সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার ও ন্যায় থেকে তাদের দূরত্বে অবস্থান নেওয়ার। এটাই লানতের মূলকথা। অর্থাৎ অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকার কারণে তারা কুরআনী হেদায়েত গ্রহণ করেছেন। বিষয়টি এমন নয় এবং মূল কারণ হলো আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন।

قَوْلُهُ بِكُفْرِهِمْ : কুফরির কারণে। বলে দেওয়া হলো যে, এ অভিশাপ ও গজবের শিকার হওয়া তাদের সজ্ঞান কুফরির কারণ এবং আল্লাহ তা'আলার নবীর বিরোধিতা ও হঠকারিতায় গোয়ার্তুমির কারণে হবে। ب [বা] অব্যয়টি কারণ ও উৎসবোধক। অর্থাৎ তাদের কুফরির কারণে اَیْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ

قَوْلُهُ فَقَلِيْلًا مَا يُؤْمِنُوْنَ : [আর এ নামমাত্র অল্প ঈমান নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়।] এখানে অল্প (قَلِيْل) ঈমানের গুণবাচক; অর্থাৎ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا بِقَلِيْلٍ مِمَّا كُلِّفُوْا بِهٖ অর্থাৎ তাদের জন্য ধার্যকৃত বিষয়ের অল্পতেই তারা ঈমান রাখে।

কেউ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এখানে فَاءْ হলো سَبَبِيَّتْ বা কারণদর্শানের জন্য। অর্থাৎ আল্লাহর লানতের কারণে তারা ঈমান আনতে পারে না। তাই খুব কম সংখ্যক লোকেই ঈমান আনে যাদের অন্তর ঠিক আছে।

قَلِيْلًا : উহ্য মাসদারের সিফত। اَیْ اِيْمَانًا قَلِيْلًا

কেউ কেউ বলেন– زَمَانًا মওসুফের সিফত। اَیْ زَمَانًا قَلِيْلًا

কেউ কেউ বলেন– يُؤْمِنُوْنَ থেকে حَالْ হয়েছে। اَیْ يُؤْمِنُوْنَ حَالَ كَوْنِهِمْ جَمْعًا قَلِيْلًا

قَوْلُهُ وَمَا زَائِدَةٌ : مَا يُؤْمِنُوْنَ -এর مَا বাক্যবিন্যাসে অতিরিক্ত (زَائِدَة) অর্থে তা ঈমানের স্বল্পতাকে জোরদার করছে। অর্থাৎ খুবই অল্প ঈমান।

অবশ্য قَلِيْلًا শব্দ [يُؤْمِنُوْنَ হতে নির্গত] مُؤْمِنٌ -এর গুণবাচকও হতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়াবে– তাদের স্বল্প সংখ্যকই ঈমান গ্রহণ করে। পূর্বসূরী [মুফাসসির]-গণের অনেকে এ অর্থও ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلٌ তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।

কেউ কেউ বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে, তারা কম;ই কিন্তু আরবি বাচনভঙ্গিতে قَلِيْل শব্দের ব্যবহার সরাসরি ও সম্পূর্ণ নাস্তি বুঝাবার জন্যও হয়। স্বল্পতা নাস্তি অর্থেও হতে পারে। এ ব্যাখ্যানুসারে অর্থ হবে– ওরা সম্পূর্ণ ঈমানশূন্য।

قَوْلُهُ اِيْمَانُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا : মুফাসসির (র.) এ ইবারতের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে স্বল্পতা হলো مُؤْمَنٌ بِهٖ -এর দিক থেকে। আর সেটি হলো কিতাবের আংশিকের প্রতি তাদের ঈমান।

'আল্লাহর দেওয়া শক্তি ব্যতীত মু'জিযাসমূহও কার্যকর নয়' -এর ব্যাখ্যা : হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) এবং হাজার হাজার উচ্চমর্যাদাশীল নবী ও রাসূলগণ যে সকল দল বা জামাতে আগমন করেছেন এবং হাজার হাজার প্রমাণাদি ও মু'জিযাসমূহ আর আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছেন এবং তারপরও তারা সঠিক পথে আসতে পারেনি, তবে তাদের সংশোধনের কি আশা করা যেতে পারে?

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর সহযোগিতা বিভিন্ন সময়ে হয়েছিল ১. সর্বপ্রথম ফুঁকের মাধ্যমে মায়ের উদরে গর্ভধারণ করা। ২. ভূমিষ্টের সময় শয়তানি ক্রিয়া ও প্রভাবসমূহ থেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ৩. জীবনভর ইহুদিদের শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। ৪. অবশেষে যখন তাকে শহীদ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তখন আল্লাহর নির্দেশে জীবিত অবস্থায় নিরাপদে তাঁকে আকাশে পৌছে দেওয়া হয়েছে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ৯৬]

http://islamiboi.wordpress.com

৮৯. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرٰةِ هُوَ الْقُرْاٰنُ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ قَبْلَ مَجِيْئِهٖ يَسْتَفْتِحُوْنَ يَسْتَنْصِرُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ اٰخِرِ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بِعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ كَفَرُوْا بِهٖ حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْاُوْلٰى دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ الثَّانِيَةِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

৯০. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بَاعُوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَىْ حَظَّهَا مِنَ الثَّوَابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنٰى شَيْئًا تَمْيِيْزٌ لِفَاعِلِ بِئْسَ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ اَنْ يَّكْفُرُوْا اَىْ كُفْرُهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ بَغْيًا مَفْعُوْلٌ لَهٗ لِيَكْفُرُوْا اَىْ حَسَدًا عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ فَضْلِهٖ الْوَحْىِ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ لِلرِّسَالَةِ مِنْ عِبَادِهٖ فَبَآءُوْا رَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ بِمَا اَنْزَلَ وَالتَّنْكِيْرُ لِلتَّعْظِيْمِ عَلٰى غَضَبٍ ط اِسْتَحَقُّوْهُ مِنْ قَبْلُ بِتَضْيِيْعِ التَّوْرٰةِ وَالْكُفْرِ بِعِيْسٰى وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ. ذُوْ اِهَانَةٍ.

অনুবাদ :

৮৯. তাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহর নিকট হতে যখন তার সমর্থক কিতাব আল কুরআন এলো তার পূর্বে অর্থাৎ তা আসার পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীদের বিরুদ্ধে তারা এর অসিলায় বিজয় প্রার্থনা করত সাহায্য প্রার্থনা করত, বলত হে আল্লাহ! শেষ জমানার প্রেরিতব্য নবীজীর অসিলায় তুমি আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। [তারা] যে সত্য সম্পর্কে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রেরণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা হিংসা ও ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত।

আয়াতটির দ্বিতীয় স্থানে উল্লিখিত لَمَّا অর্থাৎ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا -এর জবাব [অর্থাৎ كَفَرُوا بِهٖ] টি প্রথমোক্ত لَمَّا [অর্থাৎ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ] -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

৯০. তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মা অর্থাৎ পুণ্যফলের স্বীয় হিস্যা বিক্রয় করেছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ কুরআন হিংসাপরায়ণ হয়ে তারা তা পরিত্যাগ করে তাদের এই পরিত্যাগ কত নিকৃষ্ট! শুধু এ কারণে যে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য হতে রেসালাতের জন্য [যাকে ইচ্ছা তার উপর স্বীয় অনুগ্রহ] অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ করেন। সুতরাং অবতীর্ণ ওহী প্রত্যাখ্যান করায় তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের উপর ক্রোধসহ ফিরল প্রত্যাবর্তন করল। অর্থাৎ তাওরাত বিনষ্ট বিকৃত করে ও হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করে তারা পূর্বে যে গজব ও ক্রোধের পাত্র হয়েছিল তার উপর বর্তমান অবতীর্ণ ওহীর অস্বীকার করায় আরো ক্রোধের পাত্র হলো। ক্রোধের বিরাটত্ব ও ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করণার্থে غَضَبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ [অনিৰ্দিষ্ট] ব্যবহার করা হয়েছে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক অবমাননাকর শাস্তি রয়েছে।

اِشْتَرٰى এইস্থানে বিক্রয় করা। بِئْسَمَا -এর مَا শব্দটি شَيْئًا [বিষয়, জিনিস] অর্থে ব্যবহৃত। এটা نَكِرَةٌ [অনিৰ্দিষ্ট সূচক শব্দ।] এটা অর্থাৎ مَا শব্দটি بِئْسَ [কত নিকৃষ্ট] ক্রিয়ার কর্তার تَمْيِيْز আর اَنْ يَكْفُرُوْا হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِّ বা নিন্দনীয় বিষয়টি।

بَغْيًا শব্দটি يَكْفُرُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل لَهٗ বা হেতুবোধক কর্ম। অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

يُنَزِّلُ ক্রিয়াটি تَخْفِيْف [তাশদীদহীন লঘুরূপে] ও تَشْدِيْد [রূঢ় بَابْ تَفْعِيْل] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اِشْتَرَى এইস্থানে বিক্রয় করা। بِئْسَمَا -এর مَا শব্দটি شَيْئًا [বিষয় জিনিস] অর্থে ব্যবহৃত। এটা نَكِرَةٌ [অনির্দিষ্টসূচক শব্দ।] এটা অর্থাৎ مَا শব্দটি بِئْس [কত নিকৃষ্ট] ক্রিয়ার কর্তার تَمْيِيْز আর اَنْ يَكْفُرُوْا হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِ বা নিন্দনীয় বিষয়টি। بَغْيًا শব্দটি يَكْفُرُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل لَهٗ বা হেতুবোধক কর্ম। অর্থাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

يُنَزِّلَ ক্রিয়াটি تخفيف [তাশদীদহীন লঘুরূপে] ও تَشْدِيْد [রূঢ় بَابُ تَفْعِيْل] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ الخ : جَاۤءَهُمْ -এর মধ্যে هُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য নবী যুগের ইহুদিগণের এবং শুরুর وَاوْ টি عَطْف -এর ওয়াও। তার عَطْف হয়েছে وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ -এর সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كِتٰبٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : كِتٰبٌ -এর تَنْكِيْر তাজীম বা গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য। আর مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ অংশটি ظَرْف مُسْتَقَرّ হয়ে كِتَاب -এর সিফত। এ সিফতটিও عَظِيْمٌ -এর জন্য আনা হয়েছে। সেই সাথে একথার প্রতি সতর্ক করার জন্য যে, এ কিতাবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা গ্রহণ ও অনুসরণের যোগ্য। কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

قَوْلُهٗ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ : এটি কিতাবের দ্বিতীয় সিফত। পবিত্র কুরআন নিজের এ গুণের কথা বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছে এবং এ কথার প্রতি জোর দিয়েছেন যে, সে নিজে যেমন সত্য, তদ্রূপ বিগত আসমান কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। আর বিগত কিতাবসমূহের মধ্যে তাওরাত সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। আর تَصْدِيْق বা সত্যায়ন করার অর্থ হলো اُصُوْل এবং অধিকাংশ فُرُوْع -এর মাঝে কুরআন তাওরাতের অনুযারী। কেউ কেউ বলেন– তাওরাতে পবিত্র কুরআনের যেসব গুণাবলি এসেছে, কুরআন সে গুণাবলি অনুযায়ীই নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ : **ঘটনার বিবরণ :** রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে মদিনার বনু কুরাইজা ও বনুনাজিরের ইহুদিরা আউস ও খাজরাজের সাথে যুদ্ধ করার সময় রাসূল ﷺ -এর অসিলা দিয়ে বিজয় প্রার্থনা করে বলত–

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوْثِ اٰخِرِ الزَّمَانِ .

এক আনসারী সাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে ইসলামপূর্ব যুগে আমরা ইহুদিদের পরাজিত করলে তারা বলত আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, অচিরেই একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে; আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাদের মেরে ঠাণ্ডা করব।

–[সীরাতে ইবনে হিশাম সূত্রে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৬০]

قَوْلُهٗ مَجِيْئَهٗ : যেহেতু قَبْلُ শব্দটি مَبْنِيّ সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে مُضَاف اِلَيْهِ টি مَحْذُوْف مَنْوِىْ ; মুফাসসির (র.) مَجِيْئَهٗ উল্লেখ করে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে কাফের বলতে মদিনার আউস এবং খাজরাজ গোত্র উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ : এটি مَا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ -এর তাফসীর। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন আসার পর। কেউ কেউ বলেন, রাসূলের মহান সত্তা। শেষ ফল একই দাঁড়াবে। অর্থাৎ ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকাদির মাধ্যমে এ শেষ নবীর নবুয়ত ও নিদর্শনাবলি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগতি লাভ করেছিল। নবীর আগমন কোনো অতর্কিত বা তাদের পূর্ব অবগতি ব্যতিরেকে হয়নি।

قَوْلُهٗ وَجَوَابُ لَمَّا الْاَوَّلِ : মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারতটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন, প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন : এখানে তো لَمَّا দুটি রয়েছে। অথচ جَوَابُ لَمَّا কেবল একটি। আরেকটির جَوَابٌ কোথায়?

উত্তর : كَفَرُوْا এটি দ্বিতীয় لَمَّا -এর جَوَابٌ আর প্রথম لَمَّا -এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। দ্বিতীয় لَمَّا -এর جَوَابٌ -ই তার প্রতি ইঙ্গিত করে।

قَوْلُهٗ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ : এখানে জমিরের স্থলে ইসমে জাহের আনা হয়েছে। এর হিকমত হলো এ কথা বুঝানো যে, তাদের প্রতি লানত হওয়ার কারণ হলো কুফর।

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে জেনে বুঝে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি কুফরের আলোচনা ছিল। এখানে তার নিন্দা করা হচ্ছে।

قَوْلُهٗ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ : অথাৎ সে ব্যবস্থা কতইনা নিকৃষ্ট, যা অবলম্বন করে তারা তাদের দাবি মতে আখিরাতের আজাব থেকে নিজেদের প্রাণগুলো রক্ষা করতে চায়। মানে কতই নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা তাদের জীবনের লাভালাভ বিক্রি করে দিল। অর্থাৎ কুফর গ্রহণ করে নিজেদের জীবনগুলো জাহান্নামের আগুনের জন্য ব্যয় করল।

http://islamiboi.wordpress.com

اِشْتَرَوْا : বিপরীত অর্থবোধক শব্দ (اَضْدَاد) কেনা ও বেচা উভয় অর্থের জন্য। এখানে বেচা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
قَوْلُهُ بَاعُوْا : মুফাসসির (র.) اِشْتَرَوْا -এর তাফসীর بَاعُوْا দ্বারা করে একটি سُوَال مُقَدَّرٌ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো−
প্রশ্ন : তাদের নফসতো পূর্ব থেকেই তাদের কাছে বিদ্যমান ছিল। এদসত্ত্বেও তা খরিদ করার কি প্রয়োজন?
উত্তর : মুফাসরি (র.) উত্তর দিচ্ছেন যে, اِشْتَرَوْا এখানে بَاعُوْا -এর অর্থে। সুতরাং কোনো ইশকাল বাকী রইল না। আর নফস যেহেতু কোনো পণ্য নয়, তাই এখানে বাস্তব কেনাবেচা উদ্দেশ্য নয়; বরং নিজের নফস বিক্রির অর্থ হলো তারা ঈমানের উপর কুফরকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাতে নিজের নফসকে ব্যয় করেছেন। যেন নফস হলো পণ্য আর কুফর হলো মূল্য।
قَوْلُهُ اَىْ حَظَّهَا : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি سُوَال مُقَدَّرٌ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাব দিয়েছেন−
প্রশ্ন : নফস তো তাদের সাথেই ছিল তাহলে তা বেচার অর্থ কি?
উত্তর : নফস বেচার অর্থ হলো যদি তারা ঈমান আনত, তাহলে তাদের নফস ঈমানের বিনিময়ে আখিরাতে যা কিছুর অধিকারী হতো, তার বিনিময়ে তা **কুফরকে গ্রহণ করেছে।**
قَوْلُهُ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْئًا : অর্থাৎ بِئْسَمَا -এর মাঝে مَا হলো نَكِرَةٌ এবং شَيْئًا -এর অর্থে। তাহলে আর مَا اَىْ بِئْسَ هُوَ شَيْئًا **হলো তমীয।** بِمَعْنَى شَيْئًا
قَوْلُهُ تَمِيْزٌ لِفَاعِلِ بِئْسَ : অর্থাৎ مَا হলো بِئْسَ -এর ضَمِيْر فَاعِلٌ -এর তমীয। এজন্য এটি মহল হিসেবে মানসূব।
قَوْلُهُ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ اَنْ يَكْفُرُوْا : অর্থাৎ اَنْ يَكْفُرُوْا মাসদারের তাবীলে مَخْصُوْص بِالذَّمِّ মূল ইবারত−
اَىْ بِئْسَ هُوَ شَيْئًا اِشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ كُفْرُهُمْ .
بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ : কুরআন বারবার এ তথ্যটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইহুদিদের কুফর ও প্রত্যাখান কোনো গবেষণামূলক **ভ্রান্তি (خَطَاءُ اِجْتِهَادٍ)** বা চিন্তাধারার প্রতারণা বা ভুল বুঝাবুঝির কারণে ছিল না; বরং তা ছিল শুধু এ ক্রোধ ও জিদের কারণে যে, নবুয়ত ইসরাঈলি বংশধারা থেকে সরে গিয়ে ইসমাঈল বংশীয় একজন কেন পেয়ে গেল? সে গোষ্ঠীতন্ত্র ও জাতীয়বাদের প্রাচীন অভিশপ্ত মানসিকতা যা আজ অবধি বিশ্বকে তছনছ করছে।
ইমাম রাজী (র.) লিখেছেন, ইহুদিরা নবুয়তকেও তাদের মিরাসী [পৈতৃক] কায়েমী অধিকার মনে করে আসছিল। তাই একজন আরবকে তার দাবিদার দেখতে পেয়ে [কায়েমী স্বার্থে আঘাতের ফলে] উল্টা এটাকে হিংসা ও বিদ্বেষের পরিণতি বানাতে লাগল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতীক্ষিত নবুয়তের এ মহান মর্যাদা তাদের সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই জুটবে, কিন্তু পরে যখন তা আরবদের মাঝে দেখতে পেল, তখন অবস্থাটি তাদের হিংসা ও জিদকে উস্কে দিল।
এ জঘন্য জিদ ও গর্হিত মনোবৃত্তির কী পরিসীমা থাকতে পারে যে, গোষ্ঠীপ্রেম এবং গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতার কারণে নবুয়তের সত্যতা পর্যন্ত তারা অস্বীকার করে ফেলল।
قَوْلُهُ بَغْيًا اَىْ حَسَدًا : بَغْيًا -এর তাফসীর করা হয়েছে حَسَدًا দ্বারা। মূলত بَغْى অর্থ অন্বেষণ, কামনা। আর কামনার বিভিন্ন ধরন আছে। তন্মধ্যে কারো নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনাকে حَسَدٌ বলে। অন্যের উপর সীমালংঘন করার কামনাকে ظُلْم বলে। طَلَبُ زِنَا -কে فُجُوْر বলে। যাহোক, এখানে بَغْيًا দ্বারা হিংসা উদ্দেশ্য।
مِنْ فَضْلِهٖ : এখানে অনুগ্রহ [ফজল] দ্বারা উদ্দেশ্য ওহীর অনুগ্রহ।
قَوْلُهُ فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ : [গজবের পর গজব ক্রোধের উপর ক্রোধ]-এর বিভিন্ন তাফসীর উদ্ধৃত হয়েছে।
১. হযরত ঈসা (আ.)-এর রিসালাত প্রত্যাখ্যান করে এ ইহুদিরা প্রথমবার 'মাগযূব' [গজবের ক্ষেত্র] হয়েছিল। এর দ্বিতীয় মাগযূব হওয়ার মূলে রয়েছে মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের অস্বীকৃতি। এটি হযরত হাসান, শা'বী, ইকরামা, আবুল আলিয়া ও কাতাদা (র.) প্রমুখের অভিমত। −[তাফসীরে কাবীর]
২. প্রথম গজবের কারণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ও অকারণে রিসালাতের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান এবং দ্বিতীয়বার গজবের কারণ তাদের হঠকারিতা বিদ্বেষ ও মনোবৃত্তি তাড়িত হওয়া। কেননা তারা সত্য নবীকে অস্বীকার করল এবং তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলো। (رُوْح، كَشَّاف، بَيْضَاوِىْ)
৩. কেউ কেউ বলেছেন, উদ্দেশ্য গজবের দ্বিরুক্তি দ্বারা পুনরাবৃত্তি নয়; বরং তাকিদ ও জোরদার করা ও প্রচণ্ডতা বুঝানো। (رُوْح، كَبِيْر)
قَوْلُهُ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ : لِلْكَافِرِيْنَ -এর লাম টি لَامُ اِخْتِصَاص -এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল শাস্তি অপমানকর নয়। মুসলমানদেরকে তাদের পাপের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হবে, তার উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে পাপ হতে পবিত্র করা; তাদেরকে অপমান করা নয়। পক্ষান্তরে কাফেরদেরকে অপমান করার জন্যই শাস্তি দেওয়া হবে।
قَوْلُهُ ذُوْ اِهَانَةٍ : এটি مُهِيْنٌ -এর তাফসীর। مُهِيْنٌ হলো আযাবের দূত বা ফেরেশতা। আযাবের দিকে তার নিসবতটা مَجَاز হিসেবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে লাঞ্ছিতকার হলেন আল্লাহ তা'আলা। আযাব হলো সবর বা কারণ। এটাকে مَجَازٌ عَقْلِىْ বলে মুফাসসির (র.) ذُوْ اِهَانَةٍ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করলেন।

http://islamiboi.wordpress.com

٩١. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِهِ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ
عَلَيْنَا اَيِ التَّوْرٰةِ قَالَ تَعَالٰى وَيَكْفُرُوْنَ

অনুবাদ :

৯১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর অর্থাৎ কুরআন ইত্যাদি। তারা বলেন, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ তাওরাত আমরা তাতে বিশ্বাস করি। আল্লাহ

[redacted]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوْا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ : বনী ইসরাঈলের আলোচনা চলছিল। এখানে তাদেরকেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে এবং তারা তাওরাতের অনুসারী বলে যে দাবি করত, তার খণ্ডন করা হয়েছে বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে। ইহুদিরা যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ইঞ্জিলের প্রতিও ঈমান রাখত না, তাই এ দাওয়াতে ইঞ্জিল এবং কুরআন উভয়টিই উদ্দেশ্য, যা بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ থেকে বুঝা আসে। −[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭৫]

قَوْلُهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ أَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ : ইহুদিদের প্রতি কুরআনের তৃতীয় জবাব, তোমরা যে তোমাদের স্বগোত্রীয় নবীগণের প্রতি ঈমানের দাবি করছ তার বাস্তবতা কতটুকু? ঈমান ও সত্য নবী মেনে নেওয়া তো দূরের কথা; তোমরা এত প্রবলভাবে তাদের অস্বীকার করেছ এবং তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতায় এত হীন পর্যায়ে নেমে এসেছ যে, তাদের হত্যা করতেও তোমাদের হাত কাঁপেনি। তোমাদের জাতীয় ইতিহাসের পাতাগুলো তো নবীগণের রক্তেই রঞ্জিত। −[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَتَلْتُمْ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে تَقْتُلُوْنَ ফেলে মুজারে قَتَلْتُمْ মাজির অর্থে। যেহেতু নবীদের হত্যা করা একটি জঘন্যতম ব্যাপার, তাই সেই অবস্থাটির স্মৃতিচারণ করত حِكَايَتْ حَالْ -এর জন্য مُضَارِعْ -এর সীগাহ আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো এ কথা বুঝানোর জন্য مُضَارِعْ -এর শব্দ আনা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অতীতকালে مُسْتَمِرْ বা অব্যাহত ছিল।

قَوْلُهُ بِمَا فَعَلَ ابَائُهُمْ : এটি مَجَازْ -এর عَلَاقَةْ -এর বর্ণনা। আর তা হলো مُلَابَسَةْ যেহেতু নবীযুগের ইহুদিরা তাদের পূর্বপুরুষদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিল, তাই হত্যার নিসবতটি তাদের দিকেই করা হয়েছে। −[জামালাইন : খ. ১, প. ১৭৩]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَائَكُمْ مُوْسٰى : এখানে ইহুদিদের অস্বীকার ও হঠকারিতার প্রমাণ স্বরূপ বলা হচ্ছে যে, যেই মূসা (আ.)-এর শরিয়তের তোমরা অনুসারী এবং যার শরিয়তের কারণে তোমরা অন্যান্য সত্য শরিয়তসমূহকে অস্বীকার কর, খোদ তিনিই তোমাদেরকে বহু প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিয়েছিলেন। যেমন লাঠি, সমুজ্জল হাত, সাগরের দ্বিধাবিভক্তি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যখন কয়েকদিনের জন্য তূর পাহাড়ে চলে গেলেন, তখন সেই ক'দিনের জন্য তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে। অথচ হযরত মূসা (আ.) তখন জীবিত এবং নবুয়তের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। সেই সময় হযরত মূসা (আ.) ও তার শরিয়তের উপর তোমাদের বিশ্বাস কোথায় ছিল? আবার এখন শেষ নবীর প্রতি আক্রোশ ও বিদ্বেষবশত হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তকে এমনভাবে আকড়ে ধরেছ যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ কর্ণপাত করছ না। নিশ্চয় তোমরাও জালিম, তোমাদের পিতৃ-পুরুষরাও জালিম। −[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৮]

قَوْلُهُ بِالْمُعْجِزَاتِ : অর্থাৎ এখানে بَيِّنَاتِ দ্বারা মুযিযা উদ্দেশ্য। যেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যায়ন করে। আর সে সকল মুজিযা ছিল নয়টি, যা وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ -এর মাঝে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَعَصَا : এ লাঠি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত এ লাঠির সাথে হযরত মূসা (আ.) পানি ও খাবার রাখতেন। এটা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে চলত। তিনি তার সাথে কথা বলতেন। তা দিয়ে জমিনে আঘাত করলে এক দিনের খাবার বেরিয়ে আসত। জমিনে পুতে রাখতে তা থেকে পানি নির্গত হতো। অতপর জমিন থেকে তুলে ফেললে পানি বন্ধ হয়ে যেত। কোনো ফল খাওয়ার ইচ্ছা করলে সেটা জমিনে পুতে রাখতেন। তারপর তা থেকে দুটি শাখা বের হয়ে একটি গাছ হয়ে যেত। তারপর সেখানে ফল ধরত। কখনো কোনো কূপ থেকে পানি উত্তোলন করতে চাইলে সেটা কূপের ভিতর ঝুলিয়ে দিতেন এবং তার থেকে দুটি শাখা দুটি বালতির মতো হয়ে যেত। রাতের বেলা সেটি আলোকবর্তিকা হত। কোনো দুশমন সামনে পড়লে মোকাবেলা করত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লাঠি ব্যবহার করা নবীদের সুন্নত। বুযুর্গদের শোভা, শত্রুর বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দুর্বলের জন্য সাহায্য। মুনাফিকদের জন্য দুশ্চিন্তা। আরো বলা হয়, কোন মুমিনের সাথে লাঠি থাকলে তার কাছ থেকে শয়তান পলায়ন করে, পাপী ও মুনাফিক তাকে ভয় করে, নামাজের সময় সুতরার কাজ দেয় এবং দুর্বল বা ক্লান্ত হয়ে গেলে শান্তি দেয়।

−[দরসে জালালাইন খ. ১, ২৯২]

قَوْلُهُ وَالْيَدِ : বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আ.) যখন ডান হাত বগলের নীচে রাখতেন এবং যখন বের করতেন, তখন সেটা উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকত আবার যখন পকেটে প্রবেশ করাতেন, তখন আগের মত স্বাভাবিক হয়ে যেত।

قَوْلُهُ وَفَلْقِ الْبَحْرِ : সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ -এর মাঝে গতি হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ : এ ইবারতে প্রশ্ন হয় যে, اِتِّخَاذْ عِجْل তথা গরুর বাছুরকে উপাস্য বানানোর আলোচনা তো পূর্বে একবার বর্ণিত হয়েছে, এখানে ফের কেন আলোচনা করা হলো?

উত্তর : এখানে তাকরার উদ্দেশ্য নয়; বরং ইহুদিদের বক্তব্য نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ -এর খণ্ডন করতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি তোমরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখতে, তাহলে গরুর বাছুরকে মাবুদ বানালে কেন?

قَوْلُهُ [illegible] : এ শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে [illegible] দুইটি মাফউলের দিকে مُتَعَدِّيْ হয়েছে। তার দ্বিতীয় মাফউলটি উহ্য ছিল

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٩٣. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ عَلَى الْعَمَلِ
بِمَا فِى التَّوْرٰةِ وَ قَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّوْرَ الْجَبَلَ حِيْنَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ
قَبُوْلِهَا لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ وَقُلْنَا خُذُوْا
مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ
وَاسْمَعُوْا ط مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهٖ سِمَاعَ قَبُوْلٍ
قَالُوْا سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا اَمْرَكَ
وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ اَىْ
خَالَطَ حُبُّهٗ قُلُوْبَهُمْ كَمَا يُخَالِطُ
الشَّرَابُ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ لَهُمْ بِئْسَمَا
شَيْئًا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ بِالتَّوْرَاةِ
عِبَادَةَ الْعِجْلِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ بِهَا
كَمَا زَعَمْتُمُ الْمَعْنٰى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
لِاَنَّ الْاِيْمَانَ لَا يَاْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ
وَالْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ اَىْ فَكَذٰلِكَ اَنْتُمْ
لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ بِالتَّوْرَاةِ وَقَدْ
كَذَّبْتُمْ مُحَمَّدًا ﷺ وَالْاِيْمَانُ بِهَا لَا
يَاْمُرُ بِتَكْذِيْبِهٖ ـ

৯৩. আর যখন তোমাদের নিকট হতে তাওরাত অনুসারে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং যখন তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তখন তূর পাহাড়কে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরলাম। যেন তোমাদের উপর তা ভেঙ্গে পড়ে। আর বললাম, যা দিলাম দৃঢ়ভাবে আয়াস ও অধ্যাবসায়সহকারে ধারণ কর এবং যে সকল বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা গ্রহণ করার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ কর। তারা বলল, আমরা শ্রবণ করলাম তোমার কথা ও অমান্য করলাম তোমার নির্দেশ। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে সিঞ্চিত হয়েছে গো-বৎসের ভালোবাসা অর্থাৎ শরাবের মিশ্রণের ন্যায় তাদের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভালোবাসা সিঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে বল, তোমাদের ধারণানুসারে তোমরা যদি বিশ্বাসী হয়ে থাক তবে তোমাদের তাওরাত সম্পর্কে এই বিশ্বাস যার নির্দেশ দেয় অর্থাৎ গো বৎসের উপাসনা তা কত নিকৃষ্ট জিনিস অর্থাৎ তারা [অর্থাৎ তোমাদের পিতৃপুরুষগণ] বিশ্বাসী নয়। কেননা, ঈমান কোনোদিন গো-বৎসের পূজার নির্দেশ দিতে পারে না। তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় মূলত তাওরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী নও। কেননা তোমরা মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার কর। তাওরাতে বিশ্বাস কখনো তাকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয় না।

[وَرَفَعْنَا এই বাক্যটি حَالْ বা অবস্থা ও ভাববাচক এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার এইস্থানে قَدْ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।]

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ : এখানে قَدْ শব্দটি উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَاضِىْ হাল হতে পারে, যদি قَدْ উহ্য ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ مَاضِىْ হাল হতে হলে قَدْ থাকা আবশ্যক, চাই لَفْظًا হোক বা تَقْدِيْرًا হোক।

قَوْلُهُ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ পূর্বেও এ আলোচনা গেছে; কিন্তু এখানে ইহুদীদের বক্তব্য نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا -এর খণ্ডন ও নতুন হয়ে গেল [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ : এটি اَنْعَمْنَا -এর عِلَّتْ বা কারণ। اَىْ رَفَعْنَا الطُّوْرَ لِاَجْلِ السُّقُوْطِ عَلَيْكُمْ اِنْ لَمْ تَمْتَثِلُوا

قَوْلُهُ قُلْنَا : ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خُذُوْا الخ হলো উহ্য قُلْنَا -এর مَقُوْلَهُ -এর তারপর قَوْل এবং مَقُوْلَه মিলে اَخْذُ مِيْثَاقٌ -এর بَيَانٌ

قَوْلُهُ مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهٖ : এর দ্বারা اِسْمَعُوْا -এর মাফউল মাহযুফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ خَالَطَ حُبُّهُ قُلُوْبَهُمْ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْعِجْلَ -এর পূর্বে حُبٌّ মুযাফ উহ্য রয়েছে। কেননা গরুর বাছুর অন্তরে সংকুলান হতে পারে না। আয়াতে মুযাফকে হযফ করে মুবালাগাহ স্বরূপ মুযাফ ইলাইহিকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عِبَادَةُ الْعِجْلِ : এটি উহ্য مَخْصُوْص بِالذَّمِّ এবং মহল হিসেবে مَرْفُوْعٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে একটি মন্দ কর্ম উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইহুদিদের نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا -এর দাবি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা। এ আয়াতে আরো একটি মন্দ কর্ম উল্লেখ করে সে দাবিকে আরো শক্তভাবে খণ্ডন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا : এই আয়াতটি ইহুদিদের কুফর এবং অস্বীকৃতির চূড়ান্ত সীমা বর্ণনা করেছে। কেননা পাহাড় তাদের মাথার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় প্রাণের ভয়ে মুখে স্বীকার করেছে سَمِعْنَا অর্থাৎ আমরা আনুগত্য করব; কিন্তু অন্তরে নিয়ত করেছে যে আমল করব না কিংবা পরবর্তীতে অস্বীকার করেছে।

قَوْلُهُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِى التَّوْرَاةِ : এখান থেকে বুঝা যায় যে اَخْذُ مِيْثَاقٌ দ্বারা ঐ সাধারণ অঙ্গীকার উদ্দেশ্য নয়, যা আজলে বা রূহ জগতে বনু আদম থেকে নেওয়া হয়েছিল।

قَوْلُهُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا اَمْرَكَ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, এমন ভয়ানক অবস্থাতেও তাদের মুখ থেকে عَصَيْنَا শব্দ বের হওয়া বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তারা পাহাড় মাথার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় তা কোনোভাবে বলেছে তাহলে পাহাড় ঝুলানোর ফায়দা কি হলো?

উত্তর : তারা তো মুখে سَمِعْنَا বলেছে, কিন্তু عَصَيْنَا মুখে বলেনি; বরং স্বীকার করার পরপরই অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় উত্তর : عَصَيْنَا শব্দটি سَمِعْنَا -এর পর বলেনি তৎক্ষণাৎ বরং কিছুক্ষণ পরে বলেছে।

قَوْلُهُ خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا : [illegible] ও বিধিবিধান হৃদয়ের কান দিয়ে শুন এবং সে মতে আমল কর [illegible] যা শুনলে তা কবুল কর।

قَوْلُهُ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا : আয়াত একথা [illegible] করে না যে, তারা মুখেও প্রত্যক্ষরূপে عَصَيْنَا [illegible] থাকবে। এমন হতে পারে যে, অর্থ হবে তারা তা শুনল এবং [illegible] তারা মুখোমুখি হলো। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বলা ভাবের ভাষায় তথা বলার রূপক অর্থে, [illegible] বলে ব্যক্ত করা যায়, যদিও সে মুখে তা বলেনি। [illegible] ভাব-ভঙ্গির ভাষায়ই তারা যেন একথা বলছিল- শুনলাম [illegible]

সাধারণভাবেও আরবি ভাষায় اَلْقَوْلُ শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক। [illegible] কুরআন অভিধানবিদ ইমাম রাগিব (র.) পবিত্র কুরআনে এ শব্দের [illegible] তিনি লিখেছেন- অবস্থার অর্থাৎ ভাবের নির্দেশনা [illegible] কোনো কিছুকে নির্দেশ করার অর্থেও اَلْقَوْلُ বলা হয়। [illegible] এবং সে [illegible] -তাফসীরে [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَكَذٰلِكَ اَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّوْرَاةِ : এই ইবারতটুকু উল্লেখ করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, পূর্বপুরুষদের অপরাধের কারণে উত্তরসূরিদের কাছে জবাবদিহিতা করা যায় না। তাই রাসূল ﷺ -এর যুগে বিদ্যমান ইহুদিদেরকে পিতৃপুরুষদের কর্মের কারণে ভর্ৎসনা করার কারণ কি?

উত্তর : এর উত্তর খুবই সুস্পষ্ট। রাসূল ﷺ -এর যুগের ইহুদিরা পূর্বসূরিদের কৃতকর্মে সন্তুষ্টও একমত ছিল এবং তারা সে কারণে লজ্জিত ও অনুশোচনাকারী ছিল না। আর অপরাধের প্রতি সন্তুষ্ট ও একমত হওয়াও অপরাধের মাঝে শামিল বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ كَمَا زَعَمْتُمْ : তাদের ধারণা বলতে তাদের পূর্বের উক্তি نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا

قَوْلُهُ اَلْمَعْنٰى لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা ইহুদিদের বক্তব্য খণ্ডনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করলেন যে, উপরিউক্ত প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে, তোমরা তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখ না, শুধু মুখে বল।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْاِيْمَانَ : এটি لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ -এর عِلَّتْ অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের দাবী এজন্য সঠিক নয় যে, তাওরাত আল্লাহর কিতাব। তা কখনো গরুর বাছুর পূজার নির্দেশ দিতে পারে না। অথচ তোমরা তার পূজা করছ। যে জিনিসের হুকুম তাতে নেই তা পালন করা কি ঈমানের লক্ষণ?

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ اٰبَائُهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে اِسْنَادْ مَجَازِىْ হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কর্মকে উত্তরসুরিদের প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ فَكَذٰلِكَ اَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ : এর দ্বারা একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : গরুর বাছুর পূজা তো ছিল ইহুদিদের পূর্বপুরষদের কর্ম। তা দ্বারা তাদের বংশধরদেরকে কেন ভর্ৎসনা করা হলো?

উত্তর : সে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তাদেরকে এভাবে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, পূর্বপুরুষদের মত তোমরাও তাওরাতে বিশ্বাসী নও। কেননা তাওরাতে যেমনিভাবে বাছুর পূজার মত শিরক নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী বলে বিশ্বাস করার নির্দেশও ছিল। যেহেতু তোমরা আখেরী নবীকে মিথ্যা বলছ, সেহেতু তোমরাও তাওরাতে বিশ্বাসী নও।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৯৪. قُلْ لَهُمْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ أَيِ الْجَنَّةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً خَاصَّةً مِنْ دُوْنِ النَّاسِ كَمَا زَعَمْتُمْ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيْهِ الشَّرْطَانِ عَلٰى أَنَّ الْاَوَّلَ قَيْدٌ فِى الثَّانِيْ أَيْ إِنْ صَدَقْتُمْ فِيْ زَعْمِكُمْ أَنَّهَا لَكُمْ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ يُؤْثِرُهَا وَ الْمُوْصِلُ إِلَيْهَا الْمَوْتُ فَتَمَنَّوْهُ -

৯৪. তাদের বল, যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অর্থাৎ জান্নাত অন্য লোক ব্যতীত কেবল বিশেষভাবে তোমাদের জন্যই হয় যেমন তোমরা ধারণা পোষণ কর তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি সত্যবাদী হও। [فَتَمَنَّوْا ক্রিয়াটি যাতে তাদের কামনা প্রকাশিত] এস্থানে দুটি শর্তের সাথে বিজড়িত, [একটি হলো إِنْ كَانَتْ لَكُمْ অপরটি হলো إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ] প্রথমটি দ্বিতীয়টির قَيْد [সম্পূরক] রূপে বিবেচ্য। অর্থাৎ পরকালের আবাস কেবলমাত্র তোমাদের– এই ধারণায় যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক আর তা [জান্নাত] যার হবে সে নিশ্চয়ই তাকেই সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিবে। সেস্থানে পৌঁছার পন্থা হচ্ছে মৃত্যুবরণ, সুতরাং তার কামনা কর [তো দেখি।]

৯৫. وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ الْمُسْتَلْزِمِ لِكَذِبِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ - الْكَافِرِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ -

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অস্বীকার করায় যা তাদের [উক্ত ধারণায়] মিথ্যাবাদী হওয়ায় পরিচায়ক; তারা কখনো তা কামনা করবে না। এবং আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্বন্ধে অবহিত। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ : **তারকীব.** এ জুমলাটি হলো شَرْط আর فَتَمَنَّوْا হলো তার جَوَاب এখানে دَارٌ হলো اِسْمِ كَانَ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জান্নাত। উত্তম হবে যদি এর পূর্বে একটি مُضَاف উহ্য ধরা হয়। যেমন– نَعِيْمُ الدَّارِ কেননা পরকাল তো মু'মিন কাফের সকলের জন্যই হবে। কিন্তু পরকালের নিয়ামত সকলের জন্য নয়। আর اَلدَّارُ ইসমে كَانَ-এর خَبَرٌ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। যথা–

১. খবর হবে خَالِصَةً তখন তার مُتَعَلِّقٌ হবে মাহযূফ এবং خَالِصَةً-কে حَالٌ হিসেবে নসব প্রদান করবে।

২. খবর হবে لَكُمْ তখন عِنْدَ টি خَالِصَةً-এর জন্য ظَرْف হবে।

৩. খবর হবে عِنْدَ তখন خَالِصَةً শব্দটি حَالٌ হবে।

قَوْلُهُ خَاصَّةً : خَالِصَةً-এর ব্যাখ্যা خَاصَّةً দ্বারা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে مَصْدَرٌ ইসমে ফায়েলের অর্থে। কেননা خَالِصَةً শব্দটি عَافِيَةٌ-এর ওজনে মাসদার। وَالْخَاصُّ لَا يَشُوْبُهُ شَيْئٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে বেশ কয়েকটি আয়াতে ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে আরেকটি দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে।

ইহুদিরা বলত, আমরা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না এবং আমাদের কোনো শাস্তি হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা যদি নিশ্চিত জান্নাতী হও, তাহলে মরতে কেন ভয় কর? –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৮]

قَوْلُهُ أَيِ الْجَنَّةُ : আখিরাতের ব্যাখ্যায় جَنَّةٌ উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– পরকাল তো ব্যাপক। তাতে জান্নাত এবং জাহান্নাম উভয়টি শামিল রয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদেরকে শুধু জান্নাতেরই অধিকারী মনে করতো।

قَوْلُهُ ... : তারা তোমরা বলে যে, ইহুদি ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيْهِ الشَّرْطَانِ : এটি একটি আপত্তির জবাব। আপত্তিটি হলো এখানে شَرْط রয়েছে দুটি। অথচ جَزَاءٌ হলো একটি। এমনটি কেন হলো?

উত্তর : মুফাসসির (র.) একটি প্রসিদ্ধ কায়দার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন– যখন দুটি শর্তের মধ্যখানে جَزَاءٌ আসে তাহলে جَزَاءٌ টি উভয় শর্তের সাথে সম্পর্ক রাখবে এবং প্রথম شَرْط দ্বিতীয় شَرْط-এর قَيْد হবে। সে হিসেবে এখানে جَزَاء হলো تَمَنَّوُا الْمَوْتَ এবং তার সাথে দুটি شَرْط-এর সম্পর্ক এভাবে যে, প্রথম শর্তটি দ্বিতীয় শর্তের মাঝে قَيْد হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ : অর্থাৎ প্রথম শর্তটি। আর তাহলো اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ

قَوْلُهُ قَيْدٌ فِى الثَّانِى : অর্থাৎ শর্তে ছানীর মাঝে, আর তা হলো– اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

প্রকৃত ইবারত হবে এভাবে– اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِىْ زَعْمِكُمْ اَنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ خَالِصَةً فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ

এভাবেও উত্তর দেওয়া যায় যে, فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ হলো দ্বিতীয় শর্তের জবাব আর প্রথমটির জবাব মাহযূফ রয়েছে। দ্বিতীয়টির জবাব তার প্রতি ইঙ্গিত করে।

بِتَمَنِّيْهِ اَىْ بِتَمَنِّى الْمَوْتِ :

قَوْلُهُ اَبَدًا : যেহেতু উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ শুধু রাসূল ﷺ-এর সমকালীন **ইহুদিদের** জন্য, তাই اَبَدًا অর্থ এদের আজীবন অর্থাৎ ওদের জীবন থাকতে ওরা মৃত্যু কামনা করবে না। اَبَدً দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তাদের জীবনের ভবিষ্যত দিনগুলো অর্থাৎ যতদিন বেঁচে আছে, মৃত্যু বাসনা করবেই না।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَتْ يُؤْثِرُهَا : كَانَتْ-এর ضَمِيْر مُسْتَتِرْ টি دَارُ الْاٰخِرَةِ-এর দিকে ফিরেছে। আর لَهُ ফিরেছে مَنْ-এর দিকে। আর يُؤْثِرُهَا-এর মধ্যে ضَمِيْر مُسْتَتِرْ ফিরেছে مَنْ-এর দিকে এবং ضَمِيْر مَنْصُوْب ফিরেছে دَارُ الْاٰخِرَةِ-এর দিকে।

অর্থাৎ পরকালের সুখ-শান্তি যাদের জন্য নির্ধারিত, তারা তো সেটিই প্রাধান্য দিবে। কেননা আখিরাত হলো চিরস্থায়ী সুখের। যার অন্তরে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, সে জান্নাতী, তাহলে সে অবশ্যই তাকে প্রাধান্য দিবে এবং সেখানে যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করবে। যেমনটি হযরত আম্মার (রা.)-এর উক্তি– غَدًا نَلْقَى الْاَحِبَّةَ مُحَمَّدَ وَصَحْبَه

অনুরূপভাবে হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اِنَّهُ يَتَمَنَّى الْمَوْتَ فَلَمَّا احْتَضَرَ قَالَ حَبِيْبٌ جَاءَ عَلٰى فَاقَةٍ

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কিভাবে মৃত্যুর কামনা করলেন। অথচ হাদীসে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهٖ وَاِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَاَمِتْنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ .

উত্তর : হাদীসে দুনিয়ার কষ্টক্লেশের কারণে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতের নাজ-নিয়মতের আশায় মৃত্যু কামনা করা নিষেধ নয়।

قَوْلُهُ وَالْمُوْصِلُ اِلَيْهَا الْمَوْتُ : এর দ্বারা একটি سُوَالُ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে شَرْط এবং جَزَا-এর মাঝে সামঞ্জস্য নেই। কেননা যদি পরকাল তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়, তাহলে পরকালের কামনা করবে। এখানে মৃত্যুর কামনা করার নির্দেশ কেন দেওয়া হলো?

উত্তর : মুফাসসির (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবের প্রতি এভাবে ইঙ্গিত করছেন যে, পরকালে পৌছার মাধ্যম হলো মৃত্যু। তা ব্যতীত সেখানে পৌছা সম্ভব নয়। এজন্য মৃত্যু কামনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যু কামনা করার শরয়ী বিধান : হাদীস শরীফে বিনা প্রয়োজনে কিংবা দুনিয়ার বিপদাপদে অতিষ্ট হয়ে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। বয়স বেশি হওয়ার দ্বারা তওবা এবং নেক আমল করার সুযোগ হওয়া বিরাট বড় নিয়ামত। হ্যাঁ, যদি অন্তরে আল্লাহর দীদারের আগ্রহ প্রবল হয়ে যায় তখন জায়েজ আছে।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর থেকে যেসব আকাংঙ্খা বর্ণিত রয়েছে, তা ঐ সময় ছিল যখন মৃত্যুর আলামত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন থেকে তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ اَيْدِيْهِمْ : اَيْدِىْ - يَدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– হাত। এখানে হাত দ্বারা নফস বুঝানো হয়েছে। কেননা অধিকাংশ কাজ হাত দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

اَلْمُسْتَلْزِمُ لِكِذْبِهِمْ : অর্থাৎ ইহুদিদের মৃত্যু কামনা না করা পরকালের সুখ নিজেদের জন্য বরাদ্দ থাকার দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

http://islamiboi.wordpress.com

٩٦. وَلَتَجِدَنَّهُمْ لَامُ قَسَمٍ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَأَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوا الْمُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ عَلَيْهَا لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَصِيْرَهُمْ إِلَى النَّارِ دُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ يَوَدُّ يَتَمَنّٰى أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ج لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى أَنْ وَهِيَ بِصِلَتِهَا فِيْ تَأْوِيْلِ مَصْدَرٍ مَفْعُوْلُ يَوَدُّ وَمَا هُوَ أَيْ أَحَدُهُمْ بِمُزَحْزِحِهِ مُبْعِدِهِ مِنَ الْعَذَابِ النَّارِ أَنْ يُعَمَّرَ ط فَاعِلُ مُزَحْزِحِهِ أَيْ تَعْمِيْرُهُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فَيُجَازِيْهِمْ.

অনুবাদ :

৯৬. তুমি তাদেরকে নিশ্চয় জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ এমন কি অংশীবাদী অপেক্ষা যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাসী না, অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। কেননা তারা জানে পরকালে তাদেরকে নিশ্চিতভাবেই জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে অংশীবাদীরা পরকালেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং এ সম্পর্কে তাদের কোনো ভয়ও নাই। তাদের এক একজন কামনা করে আকাঙ্ক্ষা করে যদি সে সহস্র বৎসর আয়ু পেত। কিন্তু দীর্ঘায়ু অর্থাৎ এই আয়ু লাভ তাকে তাদের একজনকেও শাস্তি হতেও জাহান্নামাগ্নি হতে সরিয়ে রাখতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিবেন।

لَتَجِدَنَّهُمْ -এর لَامٌ টি قَسَمٌ বা শপথ অর্থব্যঞ্জক। وَمِنَ الَّذِيْنَ -এর عَطْف বা অন্বয় হলো পূর্ববর্তী أَحْرَصَ -এর সাথে এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য মাননীয় তাফসীরকার এর পূর্বেও أَحْرَصَ শব্দটির উল্লেখ করেছেন। لَوْ يُعَمَّرُ এই আয়াতে لَوْ শব্দটি أَنْ -এর ন্যায় مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার ধাতু বা উৎস রূপ অর্থ প্রকাশ করে। এটা স্বীয় صِلَةٌ বা সংযোজক শব্দ يُعَمَّرُ সহ مَصْدَرٌ রূপে يَوَدُّ ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ বা কর্মকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। أَنْ يُعَمَّرَ এটা مُزَحْزِحِهِ -এর فَاعِلٌ বা কর্তা। يَعْمَلُوْنَ ক্রিয়াটির ت [মধ্যম পুরুষরূপে] ও ى [নাম পুরুষরূপে] উভয় সহকারেই পাঠ রয়েছে।

٩٧. وَسَأَلَ ابْنُ صُوْرِيَا النَّبِيَّ ﷺ أَوْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَمَّنْ يَأْتِيْ بِالْوَحْيِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ هُوَ عَدُوُّنَا يَأْتِيْ بِالْعَذَابِ وَلَوْ كَانَ مِيْكَائِيْلُ لَاٰمَنَّا لِأَنَّهُ يَأْتِيْ بِالْخَصْبِ وَالسِّلْمِ فَنَزَلَ قُلْ لَهُمْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَلْيَمُتْ غَيْظًا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ أَيِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ بِأَمْرِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَبُشْرٰى بِالْجَنَّةِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

৯৭. ইবনে সুরিয়া নামক জনৈক ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কোন ফেরেশতা ওহী বহন করে নিয়ে আসেন? তিনি বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। সে বলল, সে তো আমাদের শত্রু। সে আমদের উপর আল্লাহ তা'আলার আজাব নিয়ে আসে। যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী বহন করে আনতেন, তবে নিশ্চয় আমরা ঈমান আনতাম। কেননা পৃথিবীতে তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আনয়ন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তাদের বল, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু সে ক্ষোভে মরে যাক, সে তো আল্লাহর অনুমোদনে আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে তা আল কুরআন পৌঁছিয়ে দেয় বা তার সম্মুখ বিষয়ের তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য গুমরাহী হতে [হেদায়েত ও] জান্নাতের শুভ সংবাদ।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَامُ قَسَمٍ : ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে لَتَجِدَنَّهُمْ হলো جَوَابُ قَسَمٍ আর قَسَمٌ উহ্য রয়েছে-
اَىْ وَاللّٰهِ لَتَجِدَنَّهُمُ الخ

قَوْلُهُ اَحْرَصَ النَّاسِ : এটি تَجِدَنَّهُمْ -এর দ্বিতীয় মাফঊল। কেননা تَجِدُ দুটি مَفْعُوْل এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়

قَوْلُهُ عَلٰى حَيٰوةٍ : حَيَاةٌ -এর تَنْكِيْر প্রকার বা ধরন বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ এক প্রকারের হায়াত। আর তা হলো اَلْحَيٰوةُ الْمُتَطَاوِلَةُ বা দীর্ঘ জীবন। আর কেউ বলেন- এখানে مُضَافٌ মাহযূফ আছে اَىْ عَلٰى طُوْلِ حَيَاةٍ

কেউ বলেন- সিফত মাহযূফ আছে। اَىْ عَلٰى حَيٰوةٍ طَوِيْلَةٍ

قَوْلُهُ سَنَةٍ : سَنَةٌ অর্থ বছর। বহুবচন سِنُوْنَ মূলত سِنَوَةٌ ছিল। কেননা তার বহুবচন سَنَوَاتٌ -ও আসে। কেউ কেউ বলেন- سَنَةٌ -এর মূলরূপ سَنْهَةٌ ছিল। অনুরূপভাবে তার বহুবচন سَنَهَاتٌও আসে।

مُزَحْزِحِهٖ : এটি **اِسْمُ فَاعِلٍ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ** -এর সীগাহ। ثُلَاثِىْ مُجَرَّدٌ **زَحْزَحَةٌ** عَلٰى وَزْنِ فَعْلَلَةٍ [দূর করা] থেকে নির্গত। থেকেও ব্যবহার রয়েছে। যেমন- **زَحَّ (ن) زَحًّا** দূর করা।

قَوْلُهُ فَلْيَمُتْ غَيْظًا : এখানে এ বাক্যটি মাহযূফ মানার উদ্দেশ্য হলো এই যে, مَنْ كَانَ -এর মধ্যে مَنْ টি হলো مَنْ شَرْطِيَّةٌ আর فَلْيَمُتْ হলো তার جَزَاءٌ مَحْذُوْفٌ ; কেউ কেউ جَزَاءٌ مَحْذُوْفٌ হিসেবে ভিন্ন ইবারতও উল্লেখ করেছেন। যেমন- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَلَا وَجْهَ لِعَدَاوَتِهٖ

قَوْلُهُ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ : এটি পূর্বোক্ত শর্তের جَزَاءٌ নয়; বরং جَزَاءٌ -এর ইল্লত। কেননা جَزَاءٌ জুমলা হলে তার একটি عَائِدٌ হওয়া জরুরি, যা এখানে বিদ্যমান নেই।

نَزَّلَهٗ : اَىِ الْقُرْاٰنَ-এর জমীরটি হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর প্রতি ফিরার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা অশুদ্ধ বিধায় মুফাসসির (র.) **اَلْقُرْاٰنَ** উল্লেখ করে জমীরের মারজি' নির্ণয় করে দিয়েছেন। যদিও পূর্বে কুরআন উল্লেখ নেই। কিন্তু اَلْمَشْهُوْرُ كَالْمَذْكُوْرِ এ নীতিমালার আলোকে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ লাজেম আসবে না

قَوْلُهُ عَلٰى قَلْبِكَ : প্রশ্ন : এখানে **قَلْبٌ** -কে **ضَمِيْرٌ مُخَاطَبٌ** -এর দিকে ইযাফত করা হলো কেন? বাহ্যিক বিন্যাসের দাবি অনুযায়ী তো عَلٰى قَلْبِىْ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : এখানে রাসূল ﷺ **আল্লাহর কথাটিই উদ্ধৃত** করেছেন। হাশিয়ায়ে জামালে এর উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে-

اَمَّا مُرَاعَاةً لِحَالِ الْاَمْرِ بِالْقَوْلِ فَيَرِدُ لَفْظُهٗ بِالْخِطَابِ وَاَمَّا لِاَنَّ ثَمَّ قَوْلًا اٰخَرَ مُضْمَرًا بَعْدَ قُلْ وَالتَّقْدِيْرُ قُلْ يَا مُحَمَّدُ قَالَ اللّٰهُ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ . (جمل : ص١٢٣ج١)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে **ইহুদিদের** মুত্যু কামনা না করার আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে জীবন সম্পর্কে তাদের অবস্থা ও চিন্তাধারা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা জীবনের প্রতি খুবই লোভী।

قَوْلُهُ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ : ইহুদিরা এত বেশি পাপ করেছে, যার ফলে তারা মৃত্যু হতে ভীষণভাবে পালিয়ে বেড়ায়। তাদের ভয় মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা তো সুখের দেখা যায় না। এমনকি বেঁচে থাকার লোভ তাদের মুশরিকদের চেয়ে বেশি। এর দ্বারা তাদের দাবির বিভ্রান্তি অতি সুন্দরভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ১৮]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا : অর্থাৎ যে বেচারাদের কাছে আসমানি কিতাব ও নবীগণের পয়গামের অমূল্য সম্পদ নেই, অর্থাৎ মুশরিকরা তো আখিরাতের জীবনের সুখ-সম্ভোগের কথা জানেই না। সুতরাং তারা যদি সে দিকে মনোযোগ না দিয়ে এ বস্তুতান্ত্রিক জীবনকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও মনোযোগের কেন্দ্রে পরিণত করে, তবে তাতে তেমন বিস্ময়ের কিছু নেই। বিস্ময়ের চূড়ান্ত তো করে দিয়েছে এ [নবী বংশজাত] ইহুদিরা যারা আসমানি কিতাবও পয়গাম্বরী হেদায়েত সত্ত্বেও মুশরিক পৌত্তলিকদের চেয়েও অধিকহারে দুনিয়ার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার তথ্য এই যে, বয়স ও আয়ু বৃদ্ধির যেসব মতবাদ বর্তমান ইউরোপ ও পাশ্চাত্যে আবির্ভূত হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে যেসব কৌশল ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা হচ্ছে, সেগুলোতেও অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে এ দুনিয়াখোর ইহুদি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরাই। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৬৯-১৭০]

তাহলে বুঝা গেল وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا হলো تَخْصِيْص بَعْدَ التَّعْمِيْم অর্থাৎ প্রথমে ব্যাপকভাবে বলার পর বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এ বিশেষভাবে বলার কারণ হলো জীবনের প্রতি ইহুদিদের লোভের مُبَالَغَة বুঝানো। কেননা মুশরিকরা তো কেবল দুনিয়ার জীবনকেই জীবন মনে করত। পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। পক্ষান্তরে ইহুদিরা পরকালের প্রতিদানের আশাবাদী ছিল। এরপরও মুশরিকদরে চেয়ে তাদের লোভ বেশি হওয়া চূড়ান্ত লোভ ছাড়া আর কি।

قَوْلُهُ لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ مَصِيْرَهُمْ : এটি اَحْرَصَ -এর ইল্লত। এর দ্বারা একটি سُوَال مُقَدَّر [উহ্য প্রশ্ন]-এর উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : মুশরিকদের বেঁচে থাকার লোভ বেশি ছিল। এমনকি তাদের পরস্পরে অভিবাদন ছিল عِشْ اَلْفَ سَنَةٍ তুমি হাজার বছর বেঁচে থাক। তারপরও ইহুদিদেরকে লোভ তাদের তুলনায় প্রবল হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : ইহুদিরা ভালো করেই জানত যে, তাদের ঠিকানা হলো জান্নাহাম। কেননা তারা অনেক পাপ করেছে। তাই পরকাল সুখের না দেখে মৃত্যু হতে মুশরিকরা পরকাল বিশ্বাসই করত না। ফলে সেখানকার শাস্তি সম্পর্কে নাজানার কারণে এত অস্থির ছিল না।

قَوْلُهُ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ : اَيْ لِاِنْكَارِ الْمُشْرِكِيْنَ لِلْبَعْثِ

قَوْلُهُ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ : এখান থেকে ইহুদিদের অধিক লোভ হওয়ার অবস্থা তুলে ধরা হচ্ছে। এ সূরতে এটি جملة مستانفة এবং তার কোনো مَحَلّ اِعْرَاب নেই। আর যদি مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا বাক্যটি خَبَر হয় এবং اَلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ সূরতে এটি উহ্য مَوْصُوْف -এর صِفَت হবে। তখন তাকদীরী ইবারত এরূপ হবে-

اَيْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا - اُنَاسٌ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ الخ -

এ সূরতে অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য হলে এটি وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ -এর অন্তর্ভুক্তি হবে। কেননা তখন وَمِنْهُمْ اُنَاسٌ হওয়া উচিত ছিল। ইসমে জাহের ব্যবহারের উদ্দেশ্য হবে ইহুদীদের শিরককে সুস্পষ্ট করে তোলা।

قَوْلُهُ اَحَدُهُمْ : هُمْ সর্বনাম দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইহুদিদের প্রত্যেকের বাসনা। কেউ কেউ যারা শিরক করে (اَلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا) উদ্দেশ্য হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু উপস্থাপনা ধারা প্রথম মতকেই জোরদার করে।

قَوْلُهُ يَتَمَنّٰى : এটি يَوَدُّ -এর তাফসীর মূলত وُدٌّ অর্থ مُحَبَّةُ الشَّيْءِ مَعَ تَمَنِّيْهِ কোনো বস্তুকে পাওয়ার আশা করে মহব্বত করা। কখনো (مُحَبَّة) وُدٌّ এবং تَمَنِّيْ একটি অপরটির অর্থে আসে। উভয়টির মাঝে পার্থক্য হলো مُحَبَّة -এর মাফউল مُفْرَد হয় আর تَمَنِّيْ -এর মাফউল জুমলা হয়। এখানে যেহেতু لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ জুমলা হয়েছে, তাই মুফাসসির (র.)-এখানে يَوَدُّ -এর তাফসীরে يَتَمَنّٰى উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْفَ سَنَةٍ : হাজার বছর দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা অধিক বছরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى اَنْ : এর দ্বারা একটি سُوَال مُقَدَّر [উহ্য প্রশ্ন]-এর উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : يُعَمَّرُ মাসদারের তাবীল হয়ে يَوَدُّ এর মাসউল। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী أَنْ يُعَمَّرَ হওয়া উচিত ছিল। لَوْ يُعَمَّرُ কেন বলা হলো?

উত্তর : এখানে لَوْ শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ -এর অর্থে। কেননা নিয়ম আছে لَوْ যখন تَمَنِّيْ বা তার অর্থের পরে পতিত হয়, তাহলে সেটা أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ -এর অর্থ দেয়।

কেউ কেউ বলেন- এখানে لَوْ শব্দটি شَرْطِيَّةٌ এবং তার جزا উহ্য রয়েছে اَىْ لَوْ يُعَمَّرَ اَلْفَ سَنَةٍ لَسُرَّ بِذٰلِكَ

এ সূরতে يَوَدُّ -এর মাফউল মাহযুফ হবে।

قَوْلُهُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ : অর্থাৎ এই আয়ু লাভ তাদের একজনকেও জাহান্নামাগ্নি হতে সরিয়ে রাখতে দূরে রাখতে পারবে না। কেননা এত দীর্ঘ জীবন কেউ পেয়ে গেলে শেষ ফল কি দাঁড়াবে? সে সু-দীর্ঘ জীবনেরও তো একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবেই এবং তখনও সেই পরকালীন জবাবদিহির মুখোমুখি। কাজেই এহেন অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন কামনা-বাসনার মোহে পড়ে থাকা কোনো দীনদার ব্যক্তির জন্য সম্ভব হতে পারে কি করে?

যোগসূত্র : ১ পূর্বের আয়াতে ইহুদিদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হলে তারা গ্রহণ না করার জন্য نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا বলে বাহানা দিয়েছিল, আল্লাহ তাদের বাহানার খণ্ডন করেছেন। এখন এ আয়াতে ঈমান না আনার আরেকটি বাহানা উল্লেখ করে তা খণ্ডন করা হয়েছে।

যোগসূত্র : ২ পূর্বে তাদের একটি ভ্রান্ত দাবি তথা لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا -এর খণ্ডন করা হয়েছিল। এখানে, আরেকটি ভ্রান্ত দাবি খণ্ডন করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ صُوْرِيَا : প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া। ফিদাক -এর অধিবাসী। ইহুদি আলেম। -[রূহুল বয়ান, জামাল]

قَوْلُهُ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ : শানে নুযূল : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত আছে। যার প্রতি মুসান্নিফ (র.) ইঙ্গিত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত। ইহুদিদের ধর্মপণ্ডিত ইবনে মুগিরা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, হে আবুল কাসিম! আমাদের এমন কিছু প্রশ্নের জবাব দিন, যা নবী করীম ﷺ ছাড়া অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয়। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর। জিজ্ঞাসাবাদের এক ফাঁকে তারা বলল- مَنْ وَلِيُّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ তিনি বললেন وَلِيِّيْ جِبْرِيْلُ ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি সকল নবীদেরই বন্ধু। তারা বলল, আমরা আপনার কথা মানব না। যদি জিবরাঈল ছাড়া অন্য কোনো ফেরেশতা আপনার বন্ধু হতো, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। রাসূল ﷺ বললেন, কি ব্যাপার? তারা বলল, জিবরাঈল তো আমাদের দুশমন। সেই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। -[ফাতহুল কাদীর]

২. হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) যখন রাসূল ﷺ-এর শুভাগমনের সংবাদ পান সে মুহূর্তে তিনি একটি বাগানে অবস্থান করেছিলেন। সেখান থেকে তিনি নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করতে চাই, যার উত্তর নবী ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। প্রশ্নগুলো হচ্ছে-

- কিয়ামতের প্রথম আলামত কি?
- জান্নাতীদেরকে সর্বপ্রথম কি খেতে দেওয়া হবে?
- কি কারণে সন্তান পিতা-মাতার মধ্য হতে কোনো একজনের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়?

রাসূল ﷺ বললেন, এই মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে আমাকে এ ব্যাপারে বলে গেলেন। ইবনে সালাম বললেন, জিবরাঈল? তিনি বললেন, হ্যাঁ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, সে তো ইহুদিদের দুশমন। তখন নবী ﷺ তেলাওয়াত করলেন- مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ .

http://islamiboi.wordpress.com

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত ইহুদি পণ্ডিত ইবনে সুরিয়া নবী ﷺ -কে বললো, আপনার কাছে কোন ফেরেশতা আসমান থেকে ওহী নিয়ে আসে? নবীজী ﷺ বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। সে বলল, সে তো আমাদের দুশমন। তদস্থলে যদি আজরাঈল হতো, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। কেননা জিবরাঈল কেবল আজাব-দুর্ভিক্ষ নিয়ে আসে, সে আমাদের সাথে বারবার শত্রুতামূলক আচরণ করেছে। −[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৩]

হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনাটি হলো- মদীনার উঁচু অঞ্চলে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ভূমি ছিল। সেখানে ছিল ইহুদিদের বসবাস। তিনি সেখানে গেলে তাদের সাথে বসতেন এবং তাদের কথা-বার্তা শুনতেন। একদিন তারা হযরত ওমর (রা.)-কে বলল, মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে তুমিই আমাদের অধিক প্রিয়ভাজন। আমরা তোমার ব্যাপারে আশাবাদী। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এখানে তোমাদের ভালোবাসায় আসিনি আর আমি যে তোমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি, তা এজন্য নয় যে, আমি আমার ধর্মের ব্যাপারে সন্দিহান; বরং আমি তোমাদের সাথে উঠাবসা করি যাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে বসীরত বৃদ্ধি হয় এবং তোমাদের কিতাবে বর্ণিত তার নিদর্শনাবলি সম্পর্কে অবগত হতে পারি। তখন তারা জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে কোন ফেরেশতা আগমন করেন? তিনি বললেন, হযরত জিবরাঈল (আ.)। তারা বলল, সে তো আমাদের দুশমন। সে আমাদের গোপন তথ্যাবলি সম্পর্কে মুহাম্মদ ﷺ -কে অবগত করে দেয়। সে আজাব, দুর্ভীক্ষ ও কঠোরতার মালিক। আর মীকাঈল (আ.) শান্তি ও স্বচ্ছলতা নিয়ে আসেন।

−[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ لِجِبْرِيْلَ : ইসলামি পরিভাষায় এক মহান ফেরেশতার নাম। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তথা নবীগণের কাছে আল্লাহ তা'আলার ওহী পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত। ইহুদিরা ফেরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-কেও একজন বড় ফেরেশতারূপে স্বীকার করে। প্রচলিত তাওরাতেও তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত এরূপ ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, তার দায়িত্ব ওহী বহন করা নয়; বরং তার কাজ হচ্ছে আজাব নিয়ে আসা। ওহী বহনের দায়িত্ব পালন করে অন্য এক ফেরেশতা হযরত মীকাঈল (আ.)। নিজেদের এ মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমালোচনায় লিপ্ত হতো যে, এ নবুয়তের দাবিদার তো নিজের কাছে ওহী আসা সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম নিয়ে থাকেন। অথচ সে তো ওহী- বাহক নয়। এখানে ইহুদিদের এ ভ্রান্ত পথ অনুসরণের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِإِذْنِ اللّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। সুতরাং তাতে তার সঙ্গে শত্রুতা ও কুধারণা পোষণের যুক্তি ও অর্থ কি? তা তো প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গেই দুশমনী। এখানে ইহুদিদের অজ্ঞতা বিদূরিত করা হলো এবং জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম শুনেই চটে উঠার কি যুক্তি থাকতে পারে? তিনি তো আল্লাহ তা'আলার একজন নির্ভরযোগ্য দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর কাজ তো শুধু আদেশ পালন করা। অভিধানে إِذْنٌ শব্দের অর্থ যেমন অনুমতি রয়েছে, তদ্রূপ হুকুম এবং নির্দেশও রয়েছে।

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى الخ : পবিত্র কুরআন এখানে সুনির্দিষ্ট করে তার তিনটি গুণ উল্লেখ করেছে−

১. সত্যায়নকারী। বিগত সহীফাসমূহ ও পরবর্তী নবীগণকে সে সত্য বলে ঘোষণা করে অর্থাৎ তার আহ্বান কোনো অভিনব ও অভূতপূর্ব বিষয় নয়, তাওহীদেরই সে পুনরায় পাঠ, যা সব ওহীধারা সম্বলিত বাণী।

২. কুরআন নিজেই একটি হেদায়েতনামা ও পথনির্দেশিকা।

৩. ঈমানদারদের জন্য তা সুসংবাদের বাহক।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৯৮. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ بِكَسْرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا بِلَا هَمْزَةٍ وَبِهٖ بِيَاءٍ وَدُوْنَهَا وَمِيْكَلَ عَطْفٌ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ مِيْكَائِيْلَ بِهَمْزٍ وَيَاءٍ وَفِيْ اُخْرٰى بِلَا يَاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ . اَوْقَعَهٗ مَوْقِعَ لَهُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ .

৯৮. যে কেউ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফেরেশতাগণের, তার রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)-এর শত্রু। সে জেনে রাখুক আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয় সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শত্রু। جِبْرِيْل শব্দটির প্রথম অক্ষর ج -এ কাসরা বা ফাতাহ ر -এরপর হামজাসহ বা তা ব্যাতিরেকে এবং পরে ى সহ বা তা ব্যাতিরেকেও পাঠ করা যায়। مِيْكَل শব্দটির অপর এক কেরাতে مِيْكَائِيْل আলিফের পর হামযা ও ى সহ এবং অপর এক কেরাতে ى ব্যতীতও পাঠ রয়েছে। اَلْمَلٰئِكَةُ -এর সাথে مِيْكَل ও جِبْرِيْل -এর عَطْف বা অন্বয় সংঘটিত হয়েছে। এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ বা বিশেষ অর্থব্যঞ্জক শব্দের সাথে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দের অন্বয় পর্যায়ের عَطْف। اَلْكَافِرِيْنَ শব্দটি সুস্পষ্ট উল্লেখ করে তাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এই স্থানে لَهُمْ -এর স্থলে لِلْكَافِرِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে।

৯৯. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ . وَاضِحَاتٍ حَالٌ رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ صُوْرِيَا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا جِئْتَنَا بِشَيْءٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ . كَفَرُوْا بِهَا .

৯৯. হে মুহাম্মদ ﷺ! নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট পরিষ্কার নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। ইবনে সুরিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল, তুমি কিছু নিয়ে আমাদের কাছে প্রেরিত হওনি। এই আয়াতটি তার প্রতিবাদ। সত্য-ত্যাগীগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না। بَيِّنَاتٌ শব্দটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ : و [এবং/অথবা] : আভিধানিকগণ লিখেছেন যে, و [ওয়াও] অব্যয়টি সব সময়ই সংযোগরূপে ব্যবহৃত হয় না; বরং অনেক সময় তা [বিয়োজক] অথবা অর্থও দিয়ে থাকে। ওয়াও او অর্থেও ব্যবহৃত হয় –[কামূস]। এখানেও চারটি স্থানেই সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত নামগুলোর সমষ্টি উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কেউ এদের যে কোনো একটির বিরোধী হবে তাকেই বুঝানো উদ্দেশ্য। যে কেউ এদের যে কারো শত্রু হবে, সে সকলেরই শত্রু।

يَعْنِيْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِاَحَدٍ مِنْ هٰؤُلَاءِ فَاِنَّهٗ كَانَ عَدُوًّا لِجَمِيْعٍ . (مَعَالِم)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এদের যে কোনো জনের শত্রু হবে সে সকলের শত্রু। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৪]

قَوْلُهٗ عَدُوًّا لِلّٰهِ : عد বহুবচন اَعْدَاءٌ - اَلْعَدُوُّ ضِدُّ الصَّدِيْقِ وَهُوَ الَّذِيْ يُرِيْدُ اِنْزَالَ الْمَضَارَّةِ

অর্থাৎ عَدُوٌّ হলো صَدِيْق -এর বিপরীত শব্দ। عَدُوٌّ বলা হয় যে কারো ক্ষতি কামনা করে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন মহা ক্ষমতাধর। তাঁর সাথেও কি শত্রুতা করা যায়?

উত্তর : এখানে **عَدَاوَةُ اللّٰهِ** দ্বারা রূপক অর্থে আল্লাহর বিরোধিতা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উত্তর : এখানে **مُضَافٌ** উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ عَدَاوَةُ اللّٰهِ দ্বারা মাজাযীভাবে عَدَاوَةُ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ উদ্দেশ্য اَیْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْجِيْمِ وَفَتْحِهَا : جِبْرِيْلُ শব্দটির প্রথম অক্ষর ج বর্ণে কাসরা দিয়ে পাঠ করা হলে তা قِنْدِيْلُ -এর ওজনে হবে। আর ফাতহা পাঠ করা হলে شَمْوِيْلُ -এর ওজনে হবে। -[হাশিয়ায়ে জামাল]

قَوْلُهُ بِلَا هَمْزَةٍ وَبِهِ بِيَاءٍ وَدُوْنَهَا : অর্থাৎ **جِبْرِيْلُ** শব্দটির ر -এর পর হামযাসহ বা হামযা ব্যতিরেকে এবং পরে ى সহ বা **'ইয়া' ব্যাতিরেকেও** পাঠ করা যায়। بِلَا هَمْزَةٍ -এর সম্পর্ক কাসরা এবং ফাতহা উভয়টির সঙ্গে। আর وَبِهِ -এর সম্পর্ক শুধু **مَفْتُوْح -এর সাথে**। মোট কেরাত হবে চারটি। একটি হলো ج বর্ণে কাসরা অবস্থায় আর তিনটি ফাতহা অবস্থায়। তৃতীয়টি **হলো سَلْسَبِيْلُ -এর** ওজনে এবং চতুর্থটি جَحْمَرِشٌ -এর ওজনে। সবগুলোই সাত কেরাতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে ইহুদিদের শত্রুতার বিবরণ ছিল, এখন এ আয়াতে সে শত্রুতার হুকুম ও পরিণাম বর্ণনা করা **হচ্ছে**।

قَوْلُهُ مِيْكَائِيْلُ : কেউ বলেছেন, এটি مَلَكُوْتٌ থেকে নির্গত আবার কেউ বলেছেন, مِيْكَ অর্থ عَبْد বা বান্দা আর اِيْل অর্থ اَللّٰه অর্থাৎ مِيْكَائِيْل হচ্ছে- আব্দুল্লাহ

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ : অর্থাৎ مِيْكَالُ -এর মাঝে সাতটি কেরাত রয়েছে। যথা- مِيْكَائِيْلُ بِهَمْزَةٍ وَيَاءٍ وَفِيْ اُخْرٰى بِلَا يَاءٍ

১. مِيْكَالَ بِوَزْنِ مِفْعَالٌ

২. مِيْكَائِلُ

৩. مِيْكَائِيْلُ

৪. مِيْكَئِيْلُ بِوَزْنِ مِيْفَعِيْلُ

৫. مِيْكَئِلُ بِوَزْنِ مِيْفَعِلُ

৬. مِيْكَايِيْلُ

৭. مِيْكَائِلُ بِوَزْنِ اِسْرَائِلُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত جِبْرٌ অর্থ عَبْد আর مِيْكَا অর্থ عُبَيْد [তাসগীর রূপে] সুতরাং جِبْرَايِلُ অর্থ- عَبْد اللّٰه এবং مِيْكَايِلُ অর্থ عُبَيْدُ اللّٰه -[জামাল]

مِيْكَالُ : মীকাল বা মীকাঈল জিবরাঈল (আ.)-এর ন্যায় একজন মহান ফেরেশতার নাম। প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহে রয়েছে যে [illegible] জগতে খাদ্য সরবরাহ ও বৃষ্টি বর্ষণ [আবহাওয়া] তাঁর দায়িত্বে অর্পিত। অর্থাৎ শরিয়ত [ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ে [illegible] (আ.) আল্লাহ তা'আলা ও মানুষ নবীর মধ্যে] বিশেষ মাধ্যম, তদ্রূপ জাগতিক ও প্রাকৃতিক [illegible] মীকাঈল (আ.) বিশেষ মাধ্যম। প্রথম জন যেন উলুহিয়াত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ প্রদান [illegible] সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং দ্বিতীয়জন যেন আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়াত প্রতিপালন [illegible] হযরত মীকাঈল (আ.) প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

যাবতীয় সম্পর্ক জুড়ে রেখেছে এবং তাকে তাদের জাতীয় রক্ষক মনে করে। ইহুদিরা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ওহীবাহক হওয়ার কথা প্রত্যাখ্যানের সময় সঙ্গে সঙ্গে এ দুই ফেরেশতার সঙ্গে তার [যথাক্রমে] শত্রুতা ও আকর্ষণ অনুরাগের কথাও প্রকাশ করেছিল। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই কুরআনি জবাবেও দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৭২]

قَوْلُهُ عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ : এর সম্পর্ক جِبْرِيْلَ এবং مِيْكَائِيْلَ উভয়ের সাথে। কেননা তারা উভয়ে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে عَطْف করার ফায়দা হলো অন্যান্য ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের উভয়ের বিশেষ মর্যাদার প্রতি সতর্ক করা। আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, জিবরাঈল (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার ব্যাপারে ইহুদিদের শত্রুতা পোষণের দাবি খণ্ডন করার জন্য। আর তার সাথে হযরত মীকাঈল (আ.)-এর নাম জুড়ে দেওয়ার কারণ হলো তিনি রিজিকের ফেরেশতা। আর রিজিক হলো শরীরের খাদ্য। তেমনিভাবে হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন ওহী বাহক ফেরেশতা। আর ওহী হলো রূহের খোরাক। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ওহীর মর্যাদার কারণে।

–[হাশিয়ায়ে জামাল : খ. ১, পৃ. ১২৫]

قَوْلُهُ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ : অর্থাৎ এ ধরনের আচরণকারী যে কোনো ব্যক্তি কাফের বলে পরিগণিত হবে এবং তার সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে শত্রুর আচরণ' -এর ন্যায় আচরণ করা হবে। ফকীহগণ এ আয়াত সূত্রে উদঘাটন করেছেন যে, মাসূম [পাপে নিরাপত্তা প্রাপ্ত]-দের আনুগত্য হুবহু আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য এবং মাসূমদের বিরুদ্ধাচারণ সরাসরি সত্যের বিরুদ্ধাচারণ। এ কথাও বলা হয়েছে যে, খুলাফা-ই রাশেদীন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যাদের ফজিলত শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ বলা যায়, সত্যতা নিশ্চিত উপর্যুপরি বর্ণনা পরম্পরা [তাওরাতুর] -এর স্তরে উপনীত, তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধাচারণও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট ওলীগণের [আহলুল্লাহ] সঙ্গে বিরোধ-বিদ্বেষ পোষণ প্রত্যক্ষরূপে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শত্রুতার কারণ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ أَوْقَعَهُ مَوْقَعَ لَهُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ : অর্থাৎ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ বলার স্থলে عَدُوٌّ لَهُمْ বলা যথেষ্ট ছিল। এ জন্য যে, পূর্বে তার আলোচনা হয়েছে। তবে যেহেতু এখানে তাদের এ অবস্থা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– তারা ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার কারণে কাফের হয়ে গেছে, সেহেতু জমীরের স্থলে ইসমে জাহের ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইবনে সূরিয়ার একটি বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছিল। এখানে তার আরেকটি বক্তব্য খণ্ডন করা হয়েছে। সে নবী ﷺ-কে বলত مَا جِئْتَنَا بِشَيْءٍ আপনি আমাদের সামনে কোনো নির্দশন আনেননি। তার বক্তব্য খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলাও আয়াত নাজিল করেন।

رَدٌّ لِقَوْلِ ابْنِ صُوْرِيَا : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য لِجِبْرِيْلَ مَعْطُوْف عَلَيْهِ তথা مَنْ كَانَ عَدُوًّا এবং مَعْطُوْف তথা وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْكَافِرُوْنَ -এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ আনার কারণ বর্ণনা করা। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭৮]

قَوْلُهُ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ : অর্থাৎ সেসব প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল সাক্ষ্য-প্রমাণকে কোনো সুবোধ সম্পন্ন ও সুষ্ঠু বিবেকধারী ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার আইন ভঙ্গ করতে এবং রব্বানী শরিয়ত তথা স্রষ্টার দেওয়া জীবন বিধানের সঙ্গে বিদ্রোহ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কথা আলাদা। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৭৪]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٠. اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَهْدًا عَلَى الْاِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ اِنْ خَرَجَ اَوِ النَّبِيِّ اَنْ لَا يُعَاوِنُوْا عَلَيْهِ الْمُشْرِكِيْنَ نَبَذَهُ طَرَحَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِنَقْضِهِ جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيْ بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

১০০. তবে কি যখনই তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তাদের অঙ্গীকার ছিল যখন আবির্ভাব হবে, তখন তারা এই নবীর উপর ঈমান আনয়ন করবে বা মুশরিকদেরকে কোনোরূপ সাহায্য করবে না বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল তা তখন তাদের কোনো একদল তা ছুড়ে ফেলেছে ভঙ্গ করেছে। نَبَذَهُ এই বাক্যটি হলো পূর্বোক্ত শর্তবাচক শব্দ كُلَّمَا -এর জবাব। আর তা হচ্ছে اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ বা উল্লিখিত অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্নের مَحَلْ বা স্থান। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। بَلْ শব্দটি اِنْتِقَالْ বা প্রসঙ্গান্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠١. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ ﷺ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ اَيِ التَّوْرَاةَ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ اَيْ لَمْ يَعْمَلُوْا بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاِيْمَانِ بِالرَّسُوْلِ وَغَيْرِهِ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ . مَا فِيْهَا مِنْ اَنَّهُ نَبِيٌّ حَقٌّ اَوْ اَنَّهَا كِتَابُ اللّٰهِ .

১০১. যখন আল্লাহর নিকট হতে তাদের নিকট যা আছে, তার সমর্থক রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এলো, তখন যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে তাওরাতকে পশ্চাৎদেশে ছুড়ে ফেলে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়ন এবং এই জাতীয় অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় ছিল তার উপর তারা আমল করল না। যেন তারা জানে না যে তিনি সত্য নবী বা তা আল্লাহ তা'আলার [প্রেরিত] কিতাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَكَفَرُوْا بِهَا : هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ -এর পরে كَفَرُوْا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَكُلَّمَا -এর আতফ পূর্বের সাথে নয়; বরং مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে আর হামযাটি তার সাথেই সম্পৃক্ত।

قَوْلُهُ اَوَ كُلَّمَا : এখানে هَمْزَةْ টি হলো اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ আর وَاوْ টি হলো عَاطِفَةْ . مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে মূলত **ইবারতটি** এভাবে হবে- اَكَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ الْبَيِّنَاتِ আর كُلَّمَا হলো ظَرْفٌ زَمَانٌ যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيْ : অর্থাৎ اوكلما -এর اِسْتِفْهَامْ -এর মহল হলো نَبَذَ فَرِيْقٌ অর্থাৎ তাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ থেকে বারণ করা হচ্ছে। আর মুফাসসির (র.) শুরুতে كَفَرُوْا বলে যে, مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ উহ্য ধরেছেন, সেটিও اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ -এর মহল। অর্থাৎ কুফরী থেকে বারণ করা হয়েছে।

بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ : অর্থাৎ بَلْ এখানে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য; পূর্বের বক্তব্য বাতিল প্রমাণিত করার জন্য নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَمِمَّا الخ : শুরুর وَاوْ টি عَاطِفَه পূর্বের জুমলার সাথে عَطْف হয়েছে এবং এটিও পূর্বের اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ -এর অধীনে। অর্থাৎ এখানে আহলে কিতাবকে তাওরাতে বর্ণিত রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশকে পিছনে ছুড়ে ফেলা থেকে বারণ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا الخ : ইহুদিদের ইতিহাস গাদ্দারী, বিশ্বাসঘাতকতা, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের এক চলমান ইতিহাস। তাওরাতের পৃষ্ঠা, ইঞ্জীলের পৃষ্ঠা এবং প্রাচীন ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফ প্রমুখের রচনাবলি এ সবের কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। এখানে ইহুদিদের এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوِ النَّبِىُّ : এখানে এ বাক্যের عَطْف আল্লাহ শব্দের সাথে হয়েছে। আর এছাড়াও দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, যখন আখেরী জমানার নবীর আবির্ভাব ঘটবে, তখন তার প্রতি ঈমান আনবে। অথবা এর ব্যাখ্যা এই যে, রাসূল ﷺ -এর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তার বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৭৯]

قَوْلُهُ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ অঙ্গীকার রক্ষা তো পরের কথা, তাদের অনেক তো এ কথার স্বীকারোক্তিও করে না যে, তার সাথে কখনো অঙ্গীকার হয়েছিল। যেন এখানে لَا يُؤْمِنُوْنَ পারিভাষিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে– অঙ্গীকারের কথা বিশ্বাসই করে না, স্বীকারই করে না। অবশ্য لَا يُؤْمِنُوْنَ ঈমানের পারিভাষিক অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ এরা নিজেদের আসমানি কিতাবও সহীফার প্রতি ঈমান এনেছিলই বা কবে? ওরা ওদের কিতাবকেও সত্য বলে স্বীকার করে না। (مَدَارِك، كَبِيْر) উভয় অর্থের মর্ম দাঁড়ায় এই যে ওরা অঙ্গীকার রক্ষা, বিশেষত আখেরী নবীকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করার জন্য নিজেদের দায়ী মনে করেছিল কবে?

قَوْلُهُ وَمَّا جَاءَهُمْ الخ : **যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গের আলোচনা ছিল। এখানে বিশেষ একটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مُصَدِّقٌ : রাসূল ﷺ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাওরাতের সত্যায়নকারী যে, তাওরাতে তাঁর যে গুণাগুণ ও বিবরণ ছিল তিনি সেসব গুণাবলি অনুযায়ী আধিভুক্ত হয়েছেন।

কেউ বলেন– তিনি তাওরাতে বর্ণিত তাওহীদ, বিধিবিধান, পূর্ববর্তী জাতির সংবাদ উপদেশ ও হিকমতের সত্যায়ন করেন।

قَوْلُهُ نَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ : কিতাব পিঠের পেছনে ঠেলে দেওয়া দ্বারা ব্যবহারিক ভাষায় তার সঙ্গে উপেক্ষার আচরণ ও কার্যক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচারণ বুঝায়। অর্থাৎ তাতে তাদের কম গুরুত্ব প্রদানের কারণে তা ছুড়ে ফেলে দিল। যেমন কোনো জিনিস অপ্রয়োজনীয় ও কম মনোযোগের যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তা পিছনে ফেলে রাখা।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٢. وَاتَّبَعُوْا عَطْفٌ عَلٰى نَبَذَ مَا تَتْلُوا اَىْ تَلَتْ الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى عَهْدِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ مِنَ السِّحْرِ وَكَانَ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ لَمَّا نَزَعَ مُلْكَهُ اَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ وَتَضُمُّ اِلَيْهِ اَكَاذِيْبَ وَتُلْقِيْهِ اِلَى الْكَهَنَةِ فَيُدَوِّنُوْنَهُ وَفَشَا ذٰلِكَ وَشَاعَ اَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ فَجَمَعَ سُلَيْمَانُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِيْنُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسْتَخْرَجُوْهَا فَوَجَدُوْا فِيْهَا السِّحْرَ فَقَالُوْا اِنَّمَا مَلَكَكُمْ بِهٰذَا فَتَعَلَّمُوْهُ وَرَفَضُوْا كُتُبَ اَنْبِيَائِهِمْ ـ

১০২. আর তারা অনুসরণ করে সুলাইমানের রাজত্বে অর্থাৎ তার যুগে শয়তানরা যা অর্থাৎ যে যাদু সম্পর্কে আবৃত্ত করে আবৃত্ত করত। হযরত সুলাইমান (আ.) যখন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন তখন শয়তান তার সিংহাসনের তলদেশে যাদু সম্পর্কিত কিছু বিষয় পুতে রেখেছিল। অথবা শয়তান জিনরা আকাশে কান পেতে কিছু বিষয় [ফেরেশতাদের আলোচনা শুনে] জেনে নিত এবং তার সাথে বহু মিথ্যার সংমিশ্রণ করে গণকদেরকে তা অবহিত করত। তারা এগুলো সংকলন করে রাখত। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে তার খুবই প্রসার ঘটে এবং এ কথারও খুব প্রচার প্রসার হয় যে, জিনেরা গায়েবও অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) [এই বিশ্বাস ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে] ঐ যাদুটোনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ একত্র করে পুঁতে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর শয়তান মানুষজনকে ঐ লুকায়িত বিষয়সমূহের সন্ধান দেয়। তখন তারা এগুলোকে বের করে দেখতে পায় যে, এগুলোতে যাদু সম্পর্কিত কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন তারা বলতে লাগল, এই যাদুটোনার সাহায্যেই সুলাইমান তোমাদের উপর এত বড় রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। অনন্তর তারা তা শিক্ষা গ্রহণ করল এবং তার পিছনে পড়ে নবীগণের উপর প্রেরিত গ্রন্থসমূহ পরিত্যাগ করে বসল। اِتَّبَعُوْا বাক্যটির পূর্বোল্লিখিত نَبَذَ ক্রিয়ার সাথে عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى نَبَذَ : اَىْ نَبَذُوْا كِتَابَ اللّٰهِ وَاتَّبَعُوْا كُتُبَ السِّحْرِ : আল্লামা সুলাইমান জামাল (র.) বলেন, উত্তম হবে এ জুমলাটি পূর্বের জুমলার সমষ্টির সাথে عَطْف হওয়া عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ হিসেবে। কেননা نَبَذَ-এর সাথে عَطْف হলে এটি وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ-এর جَوَابٌ হওয়ার তাকাজা করে। অথচ ইহুদিদের যাদু বিদ্যার অনুসরণ রাসূলের আগমনের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং তাদের যাদুর অনুসরণ পূর্ব থেকেই চলে আসছে। −[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৭]

قَوْلُهُ مَا تَتْلُوْا : مَا হলো مَوْصُوْلَهْ তার عَائِدْ উহ্য রয়েছে। তাকদীরী ইবারত হলো تَتْلُوْهُ - এটি হয়ত تَلْوٌ থেকে নির্গত। اَىْ تَتَّبِعُ অনুসরণ করত। অথবা تِلَاوَةٌ থেকে নির্গত। اَىْ تَقْرَأُ পাঠ করত।

قَوْلُهُ مَا اَىْ تَلَتْ :

প্রশ্ন : تَتْلُوْ হলো مُضَارِعْ-এর সীগাহ যা বর্তমানকাল বুঝায়। অথচ শয়তানরা আয়াত নাজিলের সময় তা তেলাওয়াত করত না। কেননা রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পর শয়তানদের আসমানে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

উত্তর : تَتْلُوْا মুজারের সীগাহ হলেও মাজির অর্থে তা حِكَايَتْ حَالٌ مَاضِيَةٌ হিসেবে مُضَارِعٌ ব্যবহৃত হয়েছে। যেন সে বিষয়টি এ সময় দৃষ্টির সামনে সংঘটিত হচ্ছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) تَتْلُوْا-এর তাফসীরে تَلَتْ উল্লেখ করে এ জবাবটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ : হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে। عَلٰى অব্যয় শুধু উপরিস্থ হওয়া বুঝাবার অর্থেই সীমিত নয়; বরং তা কারণ ও উৎস নির্ণয়, সংযুক্তি-সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদির ন্যায় স্থান-কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। فِىْ [মধ্যে] অর্থে এর ব্যবহার ব্যাপক। ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন- وَالْعَرَبُ تَضَعُهُ فِىْ مَوْضِعِ عَلٰى وَعَلٰى فِىْ مَوْضِعِ فِىْ [আরবরা عَلٰى-এর স্থলে فِىْ এবং فِىْ-এর স্থলে عَلٰى ব্যবহার করে থাকে।

আর এরও সম্ভাবনা আছে যে, تَتْلُوْا শব্দটি تَتَقَوَّلُ [উদ্ভাবন করা] -এর অর্থে হবে। তখন عَلٰى তার স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকবে। কেননা تَتَقَوَّلُ-এর صِلَةٌ হিসেবে عَلٰى আসে এবং এ সূরতে مُتَعَلِّقٌ উহ্য থাকবে। প্রকৃত ইবারতটি এভাবে হবে- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتَقَوَّلُهُ الشَّيَاطِيْنُ عَلَى اللّٰهِ زَمَنَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদের مَرْغُوْبٌ عَنْهُ-এর আলোচনা ছিল। অর্থাৎ এ কথার বিবরণ ছিল যে, **ইহুদীরা কুরআন থেকে বিমুখ ছিল। তাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করত।** এ আয়াতে তাদের مَرْغُوْبٌ اِلَيْهِ-এর আলোচনা **করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর কিতাব থেকে বিমুখ হয়ে** যে দিক ঝুঁকে পড়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ওহীর অনুসরণ ও সত্য নবীর সত্যতা স্বীকার **করার পরিবর্তে এ ইহুদিরা অন্য একটি বিদ্যার পেছনে ছুটছে।** সে বিদ্যা কার? শয়তানের। পবিত্র কুরআন সমকালীন ইহুদিদের **গোমর ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অপরাধ তালিকায় সবিশেষ** উল্লেখযোগ্য একটি শিরোনাম সংযোজিত করছে। তা **এই যে, এরা আল্লাহ তা'আলার ওহীর অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে একটি নীতি** বিবর্জিত নিচু স্তরের বিদ্যার সাধনায় নিমগ্ন হয়েছে।

যাদু বিদ্যা ও ইহুদি সম্প্রদায় : আলোচ্য এ বিদ্যার নাম যাদু বিদ্যা। যাদু ও যাদুবিদ্যায় **ইহুদিদের পারঙ্গমতা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয়। তাদের প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠগণ সব** সময়ই এর স্বীকারোক্তি দিয়ে এসেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই **তা করেছে গর্বের সঙ্গে। পবিত্র কুরআন অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও অহেতুক কিছু বর্ণনায় সময় ক্ষেপণ না করে শুধু ইঙ্গিতে বর্ণনা প্রদান যথেষ্ট মনে করেছে। ইহুদিদের এ শখ তাদের প্রাচীন যুগের পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগেও অব্যাহত ছিল।**

আমাদের **মুফাসসিরগণ**ও যাদুপ্রেমের ক্ষেত্রে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সমকালীন ইহুদি ও মুহাম্মদ ﷺ-**এর সমকালীন ইহুদিদের সমান অংশীদার** সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর যুগের **ইহুদিরা কেউ বলেছেন** আমাদের [মুহাম্মদী] যুগের ইহুদিরা। শব্দটি সকলকে বুঝাবার জন্য ব্যাপক এবং সকলেরই সবম্ভাবনাযুক্ত। বস্তুত এদের সকলেই [দুই যুগের] এ বাতিল অথর্ব বিষয়টির পুজারী অনুগামী ছিল-

قِيْلَ يَهُوْدُ زَمَانِ سُلَيْمَانَ وَقِيْلَ يَهُوْدُ زَمَانِنَا وَاللَّفْظُ فِيْهِمْ عَامٌّ وَلِجَمِيْعِهِمْ مُحْتَمِلٌ وَقَدْ كَانَ الْكُلُّ مِنْهُمْ مُتَّبِعًا لِهٰذَا الْبَاطِلِ (ابْنُ عَرَبِىْ) -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৭৭]

قَوْلُهُ شَيَاطِيْنُ : বহুবচন হওয়ার কারণে এখানে বাহ্যত বিশেষ শয়তান অর্থাৎ ইবলীস উদ্দেশ্য হতে পারে **না। আভিধানবিদ ও শ্রেষ্ঠ** তাফসীরবিদ উভয় দলের মতে مَرَدَةُ الْجِنِّ তথা খবীছ ও উদ্ধত দুর্ধর্ষ জিনরাই যারা হযরত **সুলাইমান (আ.)-এর বশীভূত ছিল, এখানে** উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঔদ্ধত জিনরা।

জিন জাতির পরিচয় : জিন জাতির বাস্তবতা কি? জিন অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন এক ধরনের সৃষ্টি, **আগুনের তৈরি। তারা সাধারণত ও স্বভাবত মানুষের চোখে অদৃশ্য।** মানবজাতির ন্যায় এরাও শরিয়তের বিধানাধীন **(مُكَلَّفٌ) তবে অনুবিধি উপবিধির বিশদে গিয়ে তাদের শরিয়ত মানব শরিয়তই** হওয়া জরুরি নয়। এ অগুনে সৃষ্টির অস্তিত্ব **উক্তি ও যুক্তির প্রমাণে স্বতঃসিদ্ধ।** এদের অস্তিত্বের অস্বীকৃতির অনুকূলে কোনো প্রকার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত নয়। বর্ণী ও **উক্তিমূলকও নয়, যৌক্তিক প্রমাণও নয়** [একে কাল্পনিক বলাই কাল্পনিক]। কেউ কেউ এখানে মানুষ শয়তান উদ্দেশ্য বলে মত ব্যক্ত **করেছেন। অর্থাৎ সেসব অবাধ্য ও পিশাচ লোকেরা, যারা হযরত সুলাইমান** (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে **অগ্রণী ভূমিকাপালন করত এবং তার নামে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ রটাত এবং যারা যাদু ও** জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। **এটি মু'তাজিলা মুতাকাল্লিমদের অভিমত।** আহলে সুন্নত মুফাসসিরগণও উভয় অর্থের অবকাশ রেখেছেন। অর্থাৎ জিন বা মানব শয়তান কিংবা উভয় সম্প্রদায়।
(اَلشَّيَاطِيْنُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَوْ مِنْهُمَا . بَيْضَاوِىْ)

قَوْلُهُ عَهْدٌ : মুফাসসির (র.) عَهْدٌ শব্দ বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُضَافٌ উহ্য আছে। আর কেউ বলেন, এখানে مُلْكٌ দ্বারা রূপক অর্থে عَهْدٌ বা যুগ উদ্দেশ্য।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ مِنَ السِّحْرِ : এটি مَا تَتْلُوْ -এর بَيَانٌ হয়েছে। অর্থাৎ مَا تَتْلُوْ দ্বারা سِحْر উদ্দেশ্য। وَالسِّحْرُ مَا يُسْتَعَانُ فِي تَحْصِيْلِهِ بِالتَّقَرُّبِ اِلَى الشَّيَاطِيْنَ

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পরিচয় : হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.) [খ্রিস্টপূর্ব ৯৯০-৯৩০ সন] ইসরাঈলী বংশ সূত্রের একজন প্রখ্যাত নবী। তিনি পিতার ন্যায়, তবে আরো বৃহদাকার রাজত্বের অধিকারী ছিলেন। শাম ও ফিলিস্তিন [বৃহত্তর সিরিয়া] ছাড়িয়ে তার রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল পূর্বে ইরাকের ফোরাত [ইউফ্রেটিস] নদীর তীর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত। তার রাজত্বের মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্ব শত্রু মিত্র সকলের নিকট স্বীকৃত। −[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৮]

ইসলামের সম্পর্ক সকলের সাথে : এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলাম শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গেই চলতে পারে কিংবা সম্পদ প্রাচুর্যের সঙ্গে ইসলামের সুসম্পর্ক চলতে পারে না এমন ধারনা ভ্রান্তিপূর্ণ। ইসলামের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক স্তর অর্থাৎ নবুয়ত রিসালাতের সঙ্গে যেভাবে দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা সম্মিলিত হতে পারে তদ্রূপ সম্পদ, নেতৃত্ব রাষ্ট্র পরিচালনা এবং শাসন ক্ষমতাও এর অঙ্গীভূত হতে পারে। ইসলামের আল্লাহ শুধু শ্রেণিবিশেষের জন্য নন। তিনি গরিব ধনী, আমির ফকির সকলেরই আল্লাহ। তিনি নিঃস্ব, অসহায়ের যেমন আল্লাহ, তেমনি বিত্তবান প্রতাপশালীরও আল্লাহ।

এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে− যেভাবে এ ইহুদিদের পূর্বপুরুষরা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর যুগেও তন্ত্রমন্ত্রের শয়তানি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, আজও তেমনিভাবে নবী করীম ﷺ-এর হেদায়েত অনুসরণ করার পরিবর্তে সেসব নীচতায় নিমগ্ন রয়েছে। −[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৭৮-১৭৯]

قَوْلُهُ وَكَانَ دَفَنَتْهُ تَحْتَ كُرْسِيِّهِ : হযরত সুলাইমান (আ.) যখন সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন, তখন শয়তান তার সিংহাসনের তলদেশে যাদু সম্পর্কিত কিছু বিষয় পুঁতে রেখেছিল। কিন্তু তিনি জানতেন না। অথবা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্বকালে যাদুর খুবই প্রসার ঘটল এবং এ কথারও খুব প্রচার-প্রসার হলো যে, জিনেরা গায়ব ও অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) [এই বিশ্বাস ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে] ঐ যাদুটোনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ একত্র করে পুঁতে রাখেন। তার মৃত্যুর পর শয়তান মানুষজনকে ঐ লুকায়িত বিষয়সমূহের সন্ধান দেয়। তখন তারা এগুলোকে বের করে দেখতে পায় যে, এগুলোর যাদু সম্পর্কিত কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন তারা এগুলোকে বের করে দেখতে পায় যে, এগুলোতে যাদু সম্পর্কিত কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন তারা বলতে লাগল, এই যাদুটোনার সাহায্যেই সুলাইমান তোমাদের উপর এত বড় রাজত্ব চালিয়ে গেছেন। অনন্তর তারা তা শিক্ষা করল এবং তার পিছনে পড়ে নবীগণের উপর প্রেরিত গ্রন্থসমূহ পরিত্যাগ করে বসল। তারপর থেকে এ অবস্থা চলে আসছিল। এমনকি রাসূল ﷺ আগমন করলেন। তাঁর আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নির্দোষিতা বর্ণনা করে আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُهُ لَمَّا نَزَعَ مُلْكَهُ : **রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা :** হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনচ্যুত হওয়ার সময়সীমা ছিল ৪০ দিন। এর কারণ, হযরত সুলাইমান (আ.)-এর কোনো স্ত্রী ৪০ দিন মূর্তির পূজা করেছিল। কিন্তু তিনি টের পাননি। তাই আল্লাহ তা'আলা নবীর অবস্থান বিবেচনায় সমসংখ্যক দিন ভর্ৎসনা স্বরূপ সিংহাসন থেকে দূরে রেখেছেন। সিংহাসনচ্যুতের ঘটনাটি নিম্নরূপ−

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব ছিল মূলত একটি আংটির মধ্যে। সেটি ছিল জান্নাত থেকে প্রাপ্ত একটি আংটি। হযরত সুলাইমান (আ.) বাথরুমে যাওয়ার প্রাক্কালে সেটি খুলে রেখে যেতেন। একদিনের ঘটনা তিনি আংটিটি খুলে আমীনা নামে তার এক স্ত্রীর কাছে রেখে বাথরুমে গেলেন। ইত্যবসরে صَخْرُ الْمَارِدُ নামক একটি জিন হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে তার স্ত্রীর কাছে এসে বলল, আমার আংটিটি দাও তো! তিনি তাকে তা দিয়ে দিলেন। আংটি হস্তগত হওয়ার কারণে জিন ইনসান, পশু-পাখী, হাওয়া-বাতাস সবকিছুই তার অনুগত হয়ে যায়। এমনকি সে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। এদিকে হযরত সুলাইমান (আ.) বাথরুম থেকে বের হয়ে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলেন। স্ত্রী তাকে চিনতে পারছিলেন না। তাই বললেন, তুমি সুলাইমান নও। সুলাইমান তো আংটি নিয়ে গেছে। তখন হযরত সুলাইমান (আ.) বুঝলেন এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা। যাই হোক ৪০ দিন পূর্ণ হলে সে জিন সিংহাসন থেকে উড়ে যায় এবং সমুদ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আংটিটি সমুদ্রে ফেলে দেয়। একটি মাছ তা গিলে ফেলে। ঘটনাক্রমে মাছটি হযরত সুলাইমান (আ.)-এর হাতে ধরা পড়ে। তিনি মাছের পেট থেকে আংটিটি নিয়ে পরিধান করেন এবং এর ফলে তার রাজত্ব ফিরে আসে। তারপর তিনি صَخْرُ الْمَارِدُ নামক জিনকে ডেকে পাঠান। সে হাজির হলে তাকে একটি পাথরের ভিতর গর্ত করে বন্দি করেন এবং সিসা ও লোহা গলা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেন। তারপর সেটি সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষেপ করেন।

−[তাফসীরে হক্কানীর সূত্রে হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৮]

http://islamiboi.wordpress.com

এ ঘটনাটি ইসরাইলী বর্ণনা, যা ইহুদিরা রচনা করেছে। সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভ্রান্ত কাহিনী। বিবেক এবং শরিয়তের উসূল অনুযায়ী কোনোভাবেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; বরং নবীদের ব্যাপারে এমন জিনিসের বিশ্বাস করা কুফর। কেননা নবীগণ মাসূম, তাদের ইসমত অপরিহার্য বিষয়। আর নবুয়থ আল্লাহর প্রদানকৃত। এটা কিভাবে সম্ভব যে, আল্লাহ প্রদানকৃত নবুয়ত ও রাজত্ব কোনো জিন সুলায়মান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে এসে ছিনিয়ে নিয়েছে। জিনেরা তো নবীদের রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না।

রাসূল ﷺ বলেছেন- مَنْ رَآنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবুয়তের মর্যাদা এত উঁচু যে, স্বপ্নেও কোনো জিন বা শয়তান নবরি সূরত ধরে আসতে পারে না। সেখানে এটা কিভাবে সম্ভব যে, একটি দানব হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আকৃতি ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তাঁর রাজত্ব এবং নবুয়তী ছিনিয়ে নিয়েছে।

قَالَ الْقَاضِىْ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ لَا يَصِحُّ مَا نَقَلَهُ الْاَخْبَارِيُّوْنَ مِنْ تَشَبُّهِ الشَّيْطَانِ بِسُلَيْمَانَ وَتَسَلُّطِهِ عَلٰى مُلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِىْ اُمَّتِهِ بِالْجَوْرِ فِىْ حُكْمِهِ وَاَنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَا يَتَسَلَّطُوْنَ عَلٰى مِثْلِ هٰذَا اَوْ قَدْ عَصَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْاَنْبِيَاءَ مِنْ مِثْلِ هٰذَا .

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ اَنَّ مَا يُرْوٰى مِنْ حَدِيْثِ الْخَاتَمِ وَالشَّيْطَانِ وَعِبَادَةِ الْوَثَنِ فِىْ بَيْتِ سُلَيْمَانَ فَمِنْ اَبَاطِيْلِ الْيَهُوْدِ .

وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ هٰذَا كُلُّهُ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِىْ لَا نُصَدِّقُهَا وَلَا نُكَذِّبُهَا .

-[দরসে জালালাইন খ. ১, পৃ. ৩১৮]

قَوْلُهُ اَوْ كَانَتْ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ : এখানে اَوْ শব্দটি تَنْوِيْع তথা প্রকরণ বুঝানোর জন্য। مَعْنَوِىْ ভাবে এর عَطْف হয়েছে مِنَ السِّحْرِ-এর সাথে। অর্থাৎ শয়তানেরা মানুষদেরকে যাদু পড়ে পড়ে শোনাত। অথবা শয়তানরা যে সমস্ত কথা আসমানে উঠে চুরি করে শুনে আসত, তা মানুষকে শোনাত।

قَوْلُهُ تَسْتَرِقُ السَّمْعَ : تَسْتَرِقَا এটি بَابُ اِفْتِعَالٌ থেকে نَخْطَفُ السَّمْعَ আর اَلسَّمْعُ ইসমে মাফউলের অর্থে মাসদার। اَىِ الْمَسْمَعَ مِنَ الْكَلَامِ الْمَلَائِكَةِ فِيْمَا يَكُوْنُ فِى الْاَرْضِ مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ .

বর্ণিত আছে যে, শয়তানরা একজন আরেকজনের উপর আরোহণ করে আসমান পর্যন্ত পৌছে যায়। তারপর ফেরেশতাদের কথা-বার্তা চুরি করে শ্রবণ করে।

قَوْلُهُ الْكَهَنَةُ : এটি كَاهِنٌ-এর বহুবচন। অর্থ জ্যোতিষ।

قَوْلُهُ يُدَوِّنُوْنَهُ : تَدْوِيْنًا (تَفْعِيْل) دَوَّنَ সংকলন বা জমা করা।

قَوْلُهُ وَفَشَا ذٰلِكَ : অর্থাৎ যেসব মিথ্যা কথাগুলো এবং জিনরা যা চুরি করে শুনে এসেছে তা প্রচার লাভ করল।

قَوْلُهُ فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِيْنُ عَلَيْهَا النَّاسَ فَاسْتَخْرَجُوْهَا : **শয়তান যেভাবে মানুষকে অবহিত করল** : এর একটি ঘটনা রয়েছে। শয়তান মানুষের আকৃতি ধরে বনী ইসরাঈলের কিছু মানুষের কাছে এলো। এসে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন ভাণ্ডারের সন্ধান দিব, যা তোমরা কোনো দিন খেয়ে শেষ করতে পারবে না। তারা বলল, অবশ্যই। সে বলল, তোমরা সিংহাসনের নিচে গর্ত কর। তবেই সে ভাণ্ডারের সন্ধান পাবে। লোকজন খোড়ার জন্য গেল। শয়তানও তাদের সাথে গেল। শয়তান জায়গা দেখিয়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তারা বলল, তুমি কাছে এসো। সে বলল, আমি কাছে আসব না। আর আমি কাছে না আসার কারণ হলো কোনো শয়তান কুরসির নিকটবর্তী হলে জ্বলে পুরে ভষ্ম হয়ে যায়। শয়তানের কথা মতো তারা সিংহাসনের নিচে গর্ত করে ঐ সবকিছু পেল, যা হযরত সুলাইমান (আ.) পুতে রেখেছিলেন। তখন শয়তান বলল, নিশ্চয় সুলাইমান এগুলোর সাহায্যেই জিন, ইনসান, পাখি ইত্যাদি বশ করে রাজত্ব করত। একথা বলে শয়তান উধাও হয়ে গেল। এ ঘটনার পর মানুষের মাঝে প্রচারিত হলো যে, হযরত সুলাইমান (আ.) যাদুকর ছিলেন। ফলে বনী ইসরাঈলরা সেসব গ্রন্থ থেকে যাদু চর্চা শুরু করে দিল। তাই বনী ইসরাঈলের মধ্যে অধিক পরিমাণে যাদুকর দেখা যায় এক পর্যায়ে যখন রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নির্দোষ প্রমাণ করে আয়াত নাজিল করেন- وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৯]

http://islamiboi.wordpress.com

قَالَ تَعَالٰى تَبْرِئَةً لِسُلَيْمَانَ وَرَدًّا عَلَى الْيَهُوْدِ فِىْ قَوْلِهِمْ اُنْظُرُوْا اِلٰى مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ سُلَيْمَانَ فِى الْاَنْبِيَاءِ وَمَا كَانَ اِلَّا سَاحِرًا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اَىْ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ لِاَنَّهُ كُفْرٌ وَلٰكِنَّ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ كَفَرُوْا وَ يُعَلِّمُوْنَهُمْ مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اَىْ اُلْهِمَاهُ مِنَ السِّحْرِ وَقُرِئَ بِكَسْرِ اللَّامِ الْكَائِنَيْنِ بِبَابِلَ بَلَدٌ فِى سَوَادِ الْعِرَاقِ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْمَلَكَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) هُمَا سَاحِرَانِ كَانَ يُعَلِّمَانِ السِّحْرَ وَقِيْلَ مَلَكَانِ اُنْزِلَا لِتَعْلِيْمِهِ اِبْتِلَاءً مِنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ زَائِدَةٌ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا لَهُ نُصْحًا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ بَلِيَّةٌ مِنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ لِيَمْتَحِنَهُمْ بِتَعْلِيْمِهِ فَمَنْ تَعَلَّمَهُ كَفَرَ وَمَنْ تَرَكَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَكْفُرْ بِتَعَلُّمِهِ فَاِنْ اَبٰى اِلَّا التَّعَلُّمَ عَلَّمَاهُ ـ

অনুবাদ : ইহুদিরা বলত, সুলাইমান (আ.) একজন যাদুকর ছিল। আর মুহাম্মদকে দেখ, তিনি সুলাইমানকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করে তার আলোচনা করেন। তাদের এই অভিযোগের প্রতিবাদ ও হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নির্দোষিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন সুলায়মান কুফরি করেনি অর্থাৎ তিনি যাদুর আমল করেননি, কেননা তা কুফরি; বরং শয়তানরাই সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত আর যাহা বাবিলে ইরাকের একটি শহর হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ যে যাদুবিদ্যা তাদের উপর ইলহাম করা হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হারূত ও মারূত ছিল দুই যাদুকর। মানুষকে তারা যাদু শিক্ষা দিত। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো দুই ফেরেশতা। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ যাদু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কাউকে উপদেশাচ্ছলে এই কথা না বলে তারা কাউকেও শিক্ষা দিত না যে আমরা মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ তা শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষার জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে সে কাফের হয়ে যাবে, আর যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করবে না সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা গ্রহণ করে কুফরি করো না তবে কেউ কেউ যদি সকল কিছু প্রত্যাখ্যান করে শুধু তা শিক্ষা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হতো, তবে তারা তাকে তা শিক্ষা দিতেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى : সংযোজক অব্যয় ওয়াও (وَاوْ) কখনো এক বাক্যাংশকে অপর বাক্যাংশের সঙ্গে, কখনো এক শব্দকে অপর শব্দের সঙ্গে এবং কখনো বা এক বাক্যাংশকে অপর শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে। এখানে مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ -কে পূর্ববর্তী বাক্যাংশ مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ -এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং উভয় অংশ اِتَّبَعُوْا ক্রিয়ার কর্ম হয়েছে। যেমন উহ্য রূপ ছিল اِتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ، وَاتَّبَعُوْا مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ অর্থাৎ তারা অনুসরণ করল শয়তান যা আবৃত্তি করত তার এবং তারা অনুসরণ করল, যা অবতীর্ণ হয়েছিল দুই ফেরেশতার উপরে তা ....।

http://islamiboi.wordpress.com

কেউ কেউ مَا أُنْزِلَ -কে পূর্ববর্তী একক শব্দ اَلسِّحْرَ -এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। اَلسِّحْرَ -এর সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ বলেছেন مَا تَتْلُوْا -এর সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ وَاتَّبَعُوْا مَا أُنْزِلَ [কাশশাফ]। এ বিন্যাস ব্যবধানে অর্থের তেমন কোনো তারতম্য হয় না। কেননা اَلسِّحْرَ -এর সঙ্গে যুক্ত করলে অর্থ দাঁড়ায় শয়তানরা মানুষদের যাদু শেখাত এবং দুই ফেরেশতার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা শেখাত। সুতরাং লোকেরা যেমন শয়তানের শেখানো [প্রথম প্রকার] যাদুর অনুসরণ করত, তদ্রূপ [ব্যবিলনীয় প্রথার অর্থাৎ] দুই ফেরেশতাদের মাধ্যমে পাওয়া যাদুরও অনুসরণ করত। কাজেই দুই বিন্যাসের মর্ম অভিন্নই থাকছে।

قَوْلُهُ الْمَلَكَيْنِ : সৃষ্টিজগত পরিচালনা প্রক্রিয়ার অধীনে ফেরেশতাদের প্রতি মৌলিক যাদু অবতরণ তাদের পবিত্রতার বিন্দুমাত্র পরিপন্থি নয়। বিশেষত যখন তাদের প্রতি এ বিষয়টি অবতারণের [অন্তরে ঢেলে দেওয়ার] লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টির সংস্কার। অর্থাৎ মানুষদের যাদু ও জ্যোতিষী তন্ত্রমন্ত্র থেকে রক্ষা করা, এতে উদ্বুদ্ধ করা নয়। ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্মকর্তারা যে বিভিন্ন অপরাধবৃত্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন, তা কে না জানে? বলা বাহুল্য তাতে তারা অপরাধ করুক, এটা উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে নিজেদের অপরাধ দমন ও অপরাধীদের অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো।

قَوْلُهُ اَيْ اُلْهِمَاهُ : এটি أُنْزِلَ -এর তাফসীর। أُنْزِلَ -এর তাফসীরে أُلْهِمَ উল্লেখ করার কারণ এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, أُنْزِلَ দ্বারা ওহীর পদ্ধতি اِنْزَالْ উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে সাধারণ অর্থে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। কেননা ওহীর পদ্ধতি اِنْزَالْ উদ্দেশ্য হলে যাদুর সম্মান ও গুরুত্ব প্রমাণিত হবে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৮৩]

اَلْكَائِنَيْنِ : মুফাসসির (র.) এটি উহ্য ধরে ইবাদত করলেন যে, সামনের ظَرْف مُسْتَقَرّ بِبَابِلَ হয়েছে। তার مُتَعَلِّقْ উহ্য রয়েছে। بِبَابِلَ জার মাজরুর এবং مُتَعَلِّقْ মিলে اَلْمَلَكَيْنِ -এর সিফত।

قَوْلُهُ يُعَلِّمَنِ : শেখানো বা তালিমের প্রচলিত অর্থের ভিত্তিতে শুধু শব্দের দিকে লক্ষ্য করে এমন সন্দেহে পড়া সমীচীন হবে না যে, ফেরেশতাগণ যথারীতি যাদুর পাঠ ও সবক দিতেন। [আসতাগফিরুল্লাহ]! শেখানোও পাঠদান ব্যতীত তা'লীম অর্থ অবগত করা বা অবহিত করাও হয়ে থাকে। اَلتَّعْلِيْمُ অনেক সময় اَلْاِعْلَامُ [অবগত করানোর] অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং يُعَلِّمَانِ অর্থ يُعَلِّمَانِ জানাতেন, অবগত করাতেন।

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : কেউ কেউ مِنْ বিন্যাস অতিরিক্ত (زَائِدَةٌ) সর্বব্যাপকতাকে দৃঢ়করণ অর্থে অর্থাৎ কাউকেও বা কোনো একজনকেও। مِنْ জাতিকে পরিব্যাপ্ত করার দৃঢ়তা ও তাকিদের জন্য। (مِنْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ اِسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ - بَحْر)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : মুফাসসির (র.) قَالَ تَعَالٰى تَبْرِئَةً لِسُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ বলে আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

قَوْلُهُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ : অর্থাৎ সুলায়মান কুফরি করেনি। যেরূপ অপপ্রচার করে রেখেছে অকৃতজ্ঞ, কাফের ও অপবাদ রটনায় পারঙ্গমেরা]।

আয়াতের এ অংশে এসে একজন ঈমানদারের মনে এ খটকা দেখা দিতে পারে যে, কুরআন এখানে এমন কি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করল? হযরত সুলায়মান (আ.) যখন একজন সত্য নবী ছিলেন, তখন তো এটা একান্ত সুস্পষ্ট বিষয় যে, তিনি কুফরির যে কোনো প্রকার দ্বিধা, সংশয় ও সূক্ষ্ম স্পর্শ থেকে বহু দূরে অবস্থান করবেন। কোনো সত্য নবী সম্পর্কে তিনি কুফরির অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা দেওয়া তো যেন এমনই ব্যাপার হলো যে, কোনো দেশের সম্রাট বা রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা দিয়ে প্রজাসাধারণ ও নাগরিকদের জানিয়ে দিলেন যে, আমাদের নাইব-ই সালতানাত তথা যুবরাজ বা উপ-রাষ্ট্রপতি বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক নন। কিন্তু পবিত্র কুরআনও অপ্রয়োজনে ও গুরুত্বহীন বিষয়ে এ ঘোষণাও অবগতি প্রদানকে অপরিহার্য মনে করেছে কেন? কিন্তু সে প্রয়োজনের কারণ অবগত হওয়া একজন সরলমনা মুসলমানের কিভাবে হতে পারে? তার জ্ঞান রয়েছে সে মহান সত্তার, যিনি জানেন, সবকিছু দেখেন সবকিছু। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে মুসলমানদের আগেও দুটি সম্প্রদায় নবী মেনে এসেছে। এ দুটি হলো সে সনামধন্য কিতাবী দল ইহুদি ও খ্রিস্টান। কিন্তু এ দুই সম্প্রদায়ের পূর্বসূরীদের বুকের পাটা

http://islamiboi.wordpress.com

দেখুন এক দিকে এরা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর নবুয়ত ও মাহাত্ম্য স্বীকার করছে, অপর দিকে তার কর্ম তালিকায় [আমলনামায়] এমন পঙ্কিল ও জঘন্য অপবাদের কথা জুড়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ রক্ষা করুন। তার নামে কুফরি-শিরকি পর্যন্ত আরোপ করে ছেড়েছে, যার চেয়ে বড় ও জঘন্য কোনো অপরাধ এমনকি সমতুল্য মারাত্মক অপরাধের কথা কল্পনাও করা যায় না। -[তাফসীরে মাজেদী খ.১, পৃ. ১৭৯]

قَوْلُهُ لَمْ يَعْمَلِ السِّحْرَ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, ইহুদিরা তো সুলায়মান (আ.)-কে যাদুকর বলেছিল তাই وَمَا سَحَرَ سُلَيْمَانُ বলা উচিত ছিল।

উত্তর : এখানে مَا كَفَرَ দ্বারা مِمَّ يَعْمَلُ السِّحْرِ উদ্দেশ্য। সেই সাথে বুঝা গেল শুধু تَعْلِيْمُ السِّحْرِ যাদুবিদ্যা শিক্ষা কুফরি নয়; বরং عَمَلْ بِالسِّحْرِ বা সে অনুযায়ী আমল করা হলো কুফরি।

لِأَنَّهُ كُفْرٌ যাদুর শরয়ী বিধান : হযরত সুলাইমান (আ.)-এর শরিয়তে যাদু নিঃশর্তভাবে কুফরি ছিল। আর আমাদের শরিয়তে তাতে সামান্য বিশ্লেষণ আছে। তাহলো যাদু করা হালাল মনে করা কুফরি। আর যাদু বিদ্যা শিক্ষা করাকে কেউ বলেন হারাম, কেউ বলেন মাকরূহ আবার, কেউ মুবাহও বলেন। সমাধানমূলক কথা হলো যাদু করার নিয়তে শিখলে তা হারাম হবে কিন্তু কেউ আত্মরক্ষার জন্য শিখলে তা মুবাহ হবে অন্যথায় মাকরূহ। -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১২৯]

قَوْلُهُ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ : اَلسِّحْرَ যাদুর পরিচয় : গোপন অদৃশ্য উপকরণ [যথা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব, জিন শয়তানদের সহায়তা গ্রহণ ইত্যাদি ও অন্যান্য উপকরণ] কাজে লাগিয়ে অভিনব কারিশমা দেখানোকে যাদু বলা হয়। বিশেষ ধরনের সাধনা ও যোগ ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে এ বিদ্যা অর্জিত হয়ে থাকে। তা মুশরিক ও জাহিল [অ-কিতাবী] সম্প্রদায়গুলোতে প্রাচীন যুগ থেকেই বহুল পরিমাণে প্রচলন ছিল এবং এখনও রয়েছে। ইসলামি শরিয়তে এটিকে হারাম ও চরম অবৈধ ঘোষণা করেছে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮১]

قَوْلُهُ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ : [মানুষের শিক্ষা দিত] يُعَلِّمُوْنَ-এর فَاعِلْ [কর্তা] শয়তানরা হওয়াই স্বপ্রকাশ। অধিকাংশ মুফাসসির এ বিন্যাসই গ্রহণ করেছেন। এখানেও সেই বিন্যাসেরই ভাষান্তর করা হয়েছে। তবে শয়তান স্থলে ইহুদিদেরকেও কর্তা বলার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ অর্থাৎ কিতাবীদের একদল]-এর জন্য সর্বনাম ব্যবহৃত হবে। এ বিন্যাসে আয়াতের অর্থ অতীতকালীন না করে ঘটমান বর্তমান করা সাজুয্যপূর্ণ হবে। অর্থাৎ ইহুদিরা মানুষকে যাদু বিদ্যার তা'লীম দিতে থাকে। -[প্রাগুক্ত]

যাদুবিদ্যা ও মু'জিযার মাঝে পার্থক্য : পয়গাম্বরদের মু'জিজা ও ওলীদের কারামত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মানবীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলিও কারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুদ ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক কারণ না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার মতো। কোনো দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শক মাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলিও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার কারণে মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জিযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জিযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোনো হাত নেই। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন যে, ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও। কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, তাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কষ্ট অনুভূত হয়। আল্লাহ তা'আলার এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোনো কোনো লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতরে চলে যায়। এটা মু'জিযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে আলৌকিক বলে ধোঁকা খায়।

http://islamiboi.wordpress.com

স্বয়ং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মোজেযা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। বলা হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ তথা আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ তা'আলা নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ এক মুষ্টি যে সমবেত সকলের চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোনো হাত ছিল না; বরং এটা ছিলো একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এই মোজেজাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন, যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মোজেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ আর যাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মুজেযা ও যাদুর স্বরূপ বুঝার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বুঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত মোজেযা কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায় যাদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে যাদু তারাই প্রদর্শন করে যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ তা'আলার জিকির থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জেযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জেযা ও নবুয়ত দাবি করে যাদু করতে চায়, তার যাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুয়তের দাবি ছাড়া যাদু করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গাম্বরগণের উপর যাদু ক্রিয়াশীল হয় কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর হবে ইতিবাচক। কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, যাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গাম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থি নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গাম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে যাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর যাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং যাদুর প্রভাব দূরও হয়েছিল। যাদুর প্রভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রভাবান্বিত হওয়া কুরআনেই উল্লিখিত রয়েছে– يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ যাদুর কারণেই হযরত মূসা (আ.)-এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল –[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

قَوْلُهُ بَابِلَ : بَابِلَ শব্দটি فِيْ -এর অর্থে। প্রাচীন যুগের যে দেশটি বাবিল নামে পরিচিত ছিল, সেটি বর্তমান চিত্রে ও ভূগোলে আরব ইরাক [ইরাকের আরব অঞ্চল] নামে অভিহিত। রাজ্যের রাজধানীও ছিল এ নামে। বাবিল নগরী অবস্থিত ছিল ফোরাত [ইউফ্রেটি] নদীর তীরে বর্তমান বাগদাদের প্রায় ৬০ মাইল [১০০ কি. মি.] দক্ষিণে, এখনকার 'হালকা'র কাছাকাছি। শহরটি বেশ বড়, আয়তন কয়েক বর্গমাইল। উন্নতি-অগ্রগতির যুগে দেশটি বেশ সুজলা-সুফলা ছিল এবং সম্পদ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল। নদী-নালা, পানি সেচ ব্যবস্থা, ভবন ও সৌধ এবং বড় বড় দুর্গের চিহ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এতে অন্তত এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, দেশে সুদক্ষ প্রকৌশলীর অভাব ছিল না। দাজলা ও ফোরাতের ন্যায় বিখ্যাত নদী দুটি এর সমগ্র অঞ্চল বিধৌত করছিল। এ রাজ্যের সমৃদ্ধি কাল ছিল আনুমানিক ৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে। যাদু বিদ্যা, ঝাড়-ফুঁক টোনা-টোটকা ও তন্ত্রমন্ত্রের কুসংস্কারমূলক কাজের জন্য দেশটির বিশেষ খ্যাতি ছিল। এক কথায় যে বিষয়গুলোকে বর্তমান ইংরেজি পরিভাষায় [Occult Science] বা অদৃশ্য বিজ্ঞান বা মহাজাতক বিজ্ঞান বলা হয়। এ দেশটির আর একটি প্রাচীন নাম কালদীর [কালদানিয়া] ও রয়েছে। এমনকি আজও ইংরেজিতে কালডিন [কালদনী] শব্দ যাদুকর-এর সমার্থক রূপে বিবেচিত।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮৫]

فِيْ سَوَادِ الْعِرَاقِ : ইরাকের আশে পাশের অঞ্চলে।

قَوْلُهُ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ : হারূত মারূত। দুই ফেরেশতার নাম। মূল প্রকৃতিতে তারা ফেরেশতাই ছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে যখন মানব সমাজে বসবাসের জন্য পাঠানো হলো, তখন স্বভাবতই তারা আকৃতি-অবয়ব, রং-রূপ ও সাদৃশ্য মানুষেরই ধারণ করে থাকবেন এবং তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, অভ্যাস আচরণ এবং আবেগ-অনুভূতিও মানুষের ন্যায় হওয়াই স্বাভাবিক।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ : অর্থাৎ هَارُوْتَ مَارُوْتَ এ দুটি শব্দ মহল হিসেবে اَلْمَلَكَيْنِ থেকে بَدَلٌ হয়ে মাজরুর। অথবা عَطْفُ بَيَانٍ হয়েছে। আর بَدَلٌ দ্বারা بَدَلُ الْكُلِّ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُمَا سَاحِرَانِ : হারুত-মারুত কে? এ সম্পর্কে একাধিক মতামত রয়েছে। মুফাসসির (র.) তন্মধ্যে দুটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। প্রথম অভিমতটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হারুত মারুত উভয়ে দু'জন জাদুকর ছিল। মানুষকে জাদবিদ্যা শিক্ষা দিত। এ সূরতে প্রশ্ন হয় যে, তাহলে আয়াতে اَلْمَلَكَيْنِ শব্দ ব্যবহার করা হলো কেন? উত্তরে বলা হয় যেহেতু দু'জন পূর্বে সৎ ছিল। তাই পূর্বের সততার বিচারে مَلَكَيْنِ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ مَلَكَانِ : এটি দ্বিতীয় অভিমত। কেউ বলেন– হারুত মারুত মানুষ নয়; বরং দু'জন ফেরেশতা ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির পরীক্ষা স্বরূপ জাদু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নাজিল করা হয়। এ অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

হারূত-মারূত ও যুহরার ঘটনা : কোনো কোনো তাফসীরকার এখানে ইহুদিদের বর্ণিত ইরাকের নামকরা নর্তকী ও বেশ্যা যুহরার কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কথা হলো প্রথমত আয়াতের তাফসীর কোনো অংশেই এবং কোনো দিক দিয়ে সে কাহিনীর প্রতি নির্ভরশীল নয়। দ্বিতীয়ত ওলামায়ে কেরামের মাঝে এর প্রামাণ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। মুহাদ্দিসগণ সে কাহিনীর প্রামাণ্যতা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তারা পরিষ্কার লিখেছেন যে, কাহিনীটি সম্পূর্ণ বানোয়াট অলীক ও প্রত্যাখ্যাত।

–[প্রাগুক্ত]

আর একান্ত যদি ঘটনাটি সঠিক মেনেও নেওয়া হয়, তবুও কোনো বিশেষ লক্ষ্যে কোনো ফেরেশতাকে মানব আকৃতি-প্রকৃতিও আবেগ-অনুভূতি দিয়ে দেওয়ার পরে সে মূল প্রকৃতির ফেরেশতার মানবিক আবেগ-অনুভূতির শিকার হয়ে গিয়ে থাকলে তাতে অসম্ভাব্যতার কোনো দিক নেই, শরিয়তের দৃষ্টিতেও নয়, যুক্তির বিচারেও নয়। –[মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]
আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) এ ব্যাপারে বিস্তারিত ও গঠনমূলক আলোচনা করেছেন তা মুতালা করা যেতে পারে।

–[দেখুন, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ১৯০]

قَوْلُهُ ابْتِلَاءً مِنَ اللّٰهِ لِلنَّاسِ : তাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য যে, তারা এ বিদ্যা শিখে কিনা? যেমনিভাবে তালুত সম্প্রদায়কে নদীর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, মুজেজা এবং যাদুর মাঝে পার্থক্য বিধানের জন্য তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল। যাতে মানুষ তার দ্বারা প্রতারিত না হয়। কেননা সে যুগে যাদু চর্চার খুব প্রচলন ছিল। এমনকি এ যাদুর জোরে কেউ কেউ নবী দাবি করত। তাই আল্লাহ তা'আলা দুজন ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যাদুর বিভিন্ন ধরণ-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য। যাতে তারা ঐসব মিথ্যুক ও ভণ্ডদের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৩০]

قَوْلُهُ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ : অর্থাৎ যাদু ও জ্যোতিষী বিদ্যা থেকে কে কে আত্মরক্ষা করল এবং কে কে তাতে নিমগ্ন হলো, তার পরীক্ষা। فِتْنَةٌ অর্থ পরিক্ষা, নিরীক্ষণ, যাচাই বাছাই,তলিয়ে দেখা ইত্যাদি হয়ে থাকে। কখনো পরীক্ষা اَلْاِخْتِبَارُ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানেও পরীক্ষাই উদ্দেশ্য।

وَاِفْرَادُهَا مَعَ تَعَدُّدِهِمَا لِكَوْنِهِمَا مَصْدَرًا وَحَمْلُهَا عَلَيْهِمَا حَمْلَ مُوَاطَاةٍ لِلْمُبَالَغَةِ كَاَنَّهُمَا نَفْسُ الْفِتْنَةِ (جمل : ١٣٢)

আয়াতের মর্ম : আয়াতের মর্ম হলো এই যে, মানবরূপী এ ফেরেশতাগণ কারো কাছে যাদু রহস্য উম্মোচন করতেন না এবং কাউকে কোনো যাদু বাক্য বা মন্ত্র শিখিয়ে দিতেন না যতক্ষণ না তাকে [এ মর্মে] সতর্ক করে দিতেন [যে, এগুলো বর্জনীয় বিষয় এবং এগুলোর ব্যবহার আজাবের কারণ]। কিন্তু ব্যাপার এরূপ হতো যে, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হারূত মারূতকে ঘিরে ধরত এবং বারবার কাকুতি-মিনতি করে বলত, আপনারা আমাদের যাদু থেকে বিরত থাকার কথা তো বলেই যাচ্ছেন, অথচ যাদু কাকে বলে ও কিভাবে হয়? কোন কোন কাজ বা কি ধরনের উক্তিকে যাদু বলা হয়, তা তো আমাদের বলে দিচ্ছেন না। [সুতরা আমরা তা থেকে বাঁচব কি করে?] "এ বিষয়টি কাজে লাগানো কুফরি" ফেরেশতাগণ তাদের এ মর্মে সতর্ক করে দেওয়ার পরে যখন সেসব কাজ, উক্তি ও মন্ত্র নকল ও আবৃত্তি করে তাদের শোনাতেন, তখন এ দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা এ বিষয় বিষয়টি শিখে নেওয়ার স্বার্থই উদ্ধার করত। এ যেন এমন যে, আজ যদি কোনো মুফতি ফকীহের কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, ঘুষ ও সুদ কোনো কোনো ধরনের আয়কে বলা হয়? এবং তা জেনে নেওয়ার পরে সেগুলো বর্জন করার পরিবর্তে উক্ত সে পন্থাগুলোর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন শুরু করে দেয়।

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত আলী (রা.)-এর একটি বাণী হুবহু এরূপ অর্থেই বর্ণিত হয়েছে?

كَانَا يُعَلِّمَانِ تَعْلِيْمَ اِنْذَارٍ لَا تَعْلِيْمَ دُعَاءٍ اِلَيْهِ كَاَنَّهُمَا يَقُوْلَانِ لَا تَفْعَلْ كَذَا كَمَا لَوْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنْ صِفَةِ الزِّنَا وَالْقَتْلِ فَاُخْبِرَ بِصِفَتِهٖ لِيَجْتَنِبَهٗ (بحر)

অর্থাৎ তারা দুজন হুশিয়ারীমূলক [অর্থাৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে] শিক্ষা দিতেন, এ বিষয়ের প্রতি আহ্বান অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা **দিতেন না। যেন তারা বলতেন এমন** [কাজ বা কথা] কিন্তু কর না। যেমন কেউ জেনা [ব্যভিচার] বা হত্যার পরিচয় জানতে **চাইলে সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়** তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য"। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮৮]

قَوْلُهٗ فَلَا تَكْفُرْ : ফেরেশতাগণ এ বিষয়টিতে এতই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন যে, নিজেদের পক্ষ থেকে **শেখানো-বুঝানো তো পরের কথা, যারা** তা জানতে চাইত, তাদেরও প্রথমে সতর্ক করে দিতেন, তাদের **উপদেশ না দিয়ে শেখাতেন না। অর্থাৎ তারা বলতেন, আমাদের কাছে** যা শুনছ, তাকে কুফরিরর উপকরণ বা **মাধ্যম বানিয়ো না।** তা শিখে **আমল কর না।**

মাসআলা : ফকীহগণ এখান **থেকেই** এ মাসআলা আহরণ করেছেন যে, জাদু বিষয়ক কর্মকাণ্ড ও **তন্ত্রমন্ত্র বিশ্বাস** ও আদর্শের **পর্যায়ে গ্রহণ করাও কুফর। অর্থাৎ জাদুর কাজ** করে ও তার প্রতি বিশ্বাস রেখে কুফরি করো না। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, **কাজে পরিণত করলে কিংবা আকীদা বিশ্বাসের** [নীতিগত] পর্যায়ে গ্রহণ করলেও তা কুফর হবে।

যাদুর শরয়ী হুকুম : বিষয়টি নিয়ে শুরু থেকেই উম্মতের ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ চলে আসছে। অর্থাৎ যাদু মৌলিকভাবে **শুধু শেখার পর্যায়েও হারাম, নাকি তা কাজে লাগানো হারাম?** প্রথম থেকে উভয় ধরনের মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ **শেখার স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ** বৈধ **এবং কাজে পরিণত করা** তথা ব্যবহারকে হারাম বলেছেন। অন্যরা যাদু শেখাকেও হারাম **বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন,** তা কাজে **ব্যবহারের উদ্দেশ্যে** শেখবে না।

অনেকে তো **অবৈধকে এ পর্যন্ত সম্প্রসারিত** করেছেন যে, যে কোনো অবস্থা ও লক্ষ্যে এমনকি কাফের যাদুকরদের প্রতিহত **করার উদ্দেশ্য** নিয়ে **শেখাও হারাম পর্যায়ভুক্ত।** কেননা আল্লাহ তা'আলার কালামের فَلَا تَكْفُرْ অন্তর্ভুক্ত বিষয় নিঃশর্তরূপে (عَلَى الْاِطْلَاقِ) **নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায়।** আর সে বিষয়টি হচ্ছে যাদু [শেখা হোক কিংবা ব্যবহার করা হোক উভয়ই।

–[রদ্দুল মুখতার]

হাকীমুল উম্মত থানভী (র.)-এর গবেষণা ও উদ্ভাবিত তত্ত্ব ও তথ্য এ ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান। তিনি লিখেছেন, "যাদু **কুফরি ও ফাসিকী [কবিরা গুনাহ] হওয়ার ব্যাপারে** তাফসীল এই যে, যদি তাতে কুফরি বাক্য থাকে তথা শয়তানের কাছে **সাহায্য প্রার্থনা এবং গ্রহ-নক্ষত্রে শরণাপন্ন** হওয়া ইত্যাদি, তবে তা কুফর হবে, তা দিয়ে কারো ক্ষতি সাধন করা হোক **বা উপকার করা হোক। আর বাক্য ও মন্ত্রগুলো** মুবাহ [নির্দোষ] ধরনের হলে সে ক্ষেত্রে শরিয়ত অনুমোদিত নয়, এমন পন্থায় **বা ধরনে কারো ক্ষতি সাধন করা হলে কিংবা** কোনো অবৈধ ও অসৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হলে তা হবে ফাসিকী ও পাপ। **আর ক্ষতি সাধন না করা হলে কিংবা কোনো অবৈধ** উদ্দেশ্য প্রয়োগ না করা হলে তাকে প্রচলিত ভাষায় যাদু বলা হয় না, **বরং তা 'আমল' 'আজীমাত' 'তদ্বির' 'তাবীজ'** মাদুলী ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। এগুলো মুবাহ ও অনুমোদিত। আর **মন্ত্রের বাক্যগুলো দুর্বোধ্য হলে কুফর** হওয়ার **সম্ভাবনার** ক্ষেত্র বিচারে অবশ্য পরিহার্য হবে। এ ছাড়া যে কোনো নাজায়েজ কাজকেই কার্যত **কুফর** (عَمَلِىْ كُفْر) **বলার** বৈধতা রয়েছে।"– [তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ১৮৯]

http://islamiboi.wordpress.com

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط بِاَنْ يُبْغِضَ كُلًّا اِلَى الْاٰخَرِ وَمَا هُمْ اَىِ السَّحَرَةُ بِضَارِّيْنَ بِهٖ بِالسِّحْرِ مِنْ زَائِدَةٌ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِاِرَادَتِهٖ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَهُوَ السِّحْرُ وَلَقَدْ لَامُ قَسَمٍ عَلِمُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ لَمَنِ لَامُ ابْتِدَاءٍ مُعَلِّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَمَلِ وَمَنْ مَوْصُوْلَةٌ اشْتَرٰهُ اِخْتَارَهُ اَوِ اسْتَبْدَلَهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط نَصِيْبٍ فِى الْجَنَّةِ وَلَبِئْسَ مَا شَيْئًا شَرَوْا بَاعُوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَىِ الشَّارِيْنَ اَىْ حَظَّهَا مِنَ الْاٰخِرَةِ اَنْ تَعَلَّمُوْهُ حَيْثُ اَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ حَقِيْقَةَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا تَعَلَّمُوْهُ ـ

অনুবাদ : অনন্তর তারা তাদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে একজনকে অপরজনের প্রতি বিদ্বেষভাব করে তোলে। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত ইচ্ছা ব্যতীত তারা যাদুকরগণ যাদুবিদ্যা দ্বারা কারো কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর তারা শিক্ষা করে যা অর্থাৎ যাদু বিদ্যা পরকালে তাদের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনো উপকারে আসবে না। আর নিশ্চিতভাবে তারা ইহুদিরা জানে যে, যে কেউ তা ক্রয় করে গ্রহণ করে বা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বিনিময়ে এটা বদলিয়ে নেয় পরকালে তার কোনো হিস্যা জান্নাতের কোনো অংশ নেই। এখানে وَلَقَدْ-এর لَامْ টি لَامْ قَسَمْ এবং لَمَنْ-এর لَامْ টি لَامْ اِبْتِدَاءْ

তা কত নিকৃষ্ট জিনিস যার বিনিময়ে তারা নিজেদের ক্রয়কারীদের আত্মাকে অর্থাৎ পরকালে নিজের [পুণ্যের] যে অংশ ছিল তার শিক্ষা লাভ করে তা বিক্রয় করে দিয়েছে অর্থাৎ পরিণামে জাহান্নামাগ্নিকে তারা নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। যদি তারা জানত যে, বাস্তবিক কি আজাবের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে তবে আর তারা তা শিক্ষা লাভ করত না।

١٠٣. وَلَوْ اَنَّهُمْ اَىِ الْيَهُوْدَ اٰمَنُوْا بِالنَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ وَاتَّقَوْا عِقَابَ اللّٰهِ بِتَرْكِ مَعَاصِيْهِ كَالسِّحْرِ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوْفٌ اَىْ لَاُثِيْبُوْا دَلَّ عَلَيْهِ لَمَثُوْبَةٌ ثَوَابٌ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَاللَّامُ فِيْهِ لِلْقَسَمِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط خَبَرُهٗ مِمَّا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ـ اَنَّهٗ خَيْرٌ لِمَا اٰثَرُوْهُ عَلَيْهِ ـ

১০৩. যদি তারা ইহুদিরা নবী ও কুরআনের উপর বিশ্বাস করত এবং পাপাচার যেমন যাদুবিদ্যা ইত্যাদি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে ভয় করত তবে নিশ্চিতভাবে তার ছওয়াব প্রতিফল আল্লাহ তা'আলার নিকট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মা বিক্রয় করেছে তদপেক্ষা অধিক কল্যাণকর হতো। যদি তারা জানত যে, এটাই তাদের পক্ষে কল্যাণকর তবে তারা এটাকে তার উপর [আল্লাহ প্রদত্ত পূণ্যফলের উপর] প্রাধান্য দিত না। لَمَثُوْبَةٌ
لَوْ শর্তবাচক শব্দটির জবাব এস্থানে উহ্য। لَاُثِيْبُوْا শব্দটি তার প্রতি ইঙ্গিতবহ জবাবটি হলো لَمَثُوْبَةٌ-এর لَامْ টি قَسَمْ বা কসম অর্থব্যঞ্জক এবং এটা مُبْتَدَأْ বা উদ্দেশ্য। خَيْرٌ হলো তার خَبَرْ বা বিধেয়।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا : **তারকীব :** শুরু مَا টি عَاطِفَةٌ তার عَطْفٌ হয়েছে مَا يُعَلِّمَانِ -এর সাথে এবং يَتَعَلَّمُوْنَ -এর জমিরটি اَحَدٌ -এর দিকে ফিরেছে। অবশ্য প্রশ্ন হয় যে, اَحَدٌ তো একবচন, তাহলে يَتَعَلَّمُوْنَ -কে বহুবচন কেন আনা হলো? উত্তরে বলা হয় اَحَدٌ শব্দটি نَكِرَةٌ تَحْتَ النَّفْيِ হিসেবে عُمُوْم -এর জন্য। সে হিসেবে অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই يَتَعَلَّمُوْنَ বহুবচনের সীগাহ আনা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ـ

তারপর আবার প্রশ্ন হয় যে, এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ তো হলো مَنْفِيْ বা না-বাচক সে হিসেবে مَعْطُوْف ও مَنْفِيْ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : مَعْطُوْف عَلَيْهِ তথা مَا يُعَلِّمَانِ যদিও مَنْفِيْ কিন্তু অর্থগতভাবে তা مُثْبَتْ বা হ্যাঁ-বাচক। পরে لا -এর কারণে। তাহলে অর্থ দাঁড়াল– وَيُعَلِّمَانِ السِّحْرَ بَعْدَ قَوْلِهِمَا اِنَّمَا نَحْنُ الخ ـ

এখন عَطْف সঠিক হয়েছে।

কেউ বলেছেন– এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। তাহলো– يُعَلِّمَانِ সুতরাং কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ بَيْنَ الْمَرْءِ : مَرْء অর্থ পুরুষ তার مُؤَنَّثْ হলো مَرْأَةٌ

قَوْلُهُ زَوْجَهُ : زَوْجٌ অর্থ اِمْرَأَةُ الرَّجُلِ বা স্ত্রী এখানে ও হাকীকী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَامُ اِبْتِدَاءٍ مُعَلِّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الْعَمَلِ : لمن -এর মধ্যকার لَامْ টি لَامِ اِبْتِدَائِيَّةٌ এটি সাধারণ مُبْتَدَاءٌ অথবা مُضَارِعٌ -এর উপর দাখিল হয়। কিন্তু যখন মাজির উপর দাখিল হয়, তখন শব্দ অথবা অর্থগতভাবে قَدْ ব্যবহার করা জরুরি। لَمَنْ -এর لَامِ اِبْتِدَاءٌ টি পূর্বোক্ত عَلِمُوْا -কে عَمَلْ করা থেকে বিরত রেখেছে।

قَوْلُهُ اَلشَّارِيْنَ : এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْفُسَهُمْ -এর মধ্যে জমিরের مَرْجِعْ এটাই যা شَرَوْا -এর ضَمِيْر مَرْفُوْع -এর মিসদাক।

شَارِيْن -এটি اِسْمُ فَاعِلْ جَمْعُ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ মুলত شَارِيْنَ ছিল।

قَوْلُهُ اَىْ حَظُّهَا : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, اَنْفُسَهُمْ -এর শুরুতে مُضَافْ মাহযুফ আছে। اَىْ حَظُّ اَنْفُسِهِمْ

قَوْلُهُ اَنْ تَعَلَّمُوْهُ : মুফাসসির (র.) এই বাক্যটুকু উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَخْصُوْص بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। সুতরাং এ আপত্তি শেষ হয়ে যায় যে, مَا بِمَعْنَى شَيْئًا হওয়ার কারণে نَكِرَةٌ যার কারণে مَخْصُوْص بِالذَّمِّ হতে পারে না। কেননা مَخْصُوْص টা مَعْرِفَةٌ হওয়া জরুরি। মুফাসসির (র.) এর জবাবই দিয়েছেন যে, مَا শব্দটি شَيْئًا -এর অর্থে হয়ে بِئْسَ -এর মাঝে লুক্কায়িত ফায়েল-এর যমীর هُوَ -এর تَمْيِيز । আর مَخْصُوْص بِالذَّمِّ (اَنْ تَعَلَّمُوْهُ) উহ্য আছে।

قَوْلُهُ حَقِيْقَةَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : পূর্বোল্লিখিত وَلَقَدْ عَلِمُوْا দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা জানত। আর لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা জানত না। সুতরাং উভয়টির মধ্যে বৈপরীত্ব পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর : তারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের কথা জানত; কিন্তু আজাবের হাকিকত ও প্রচণ্ডতা সম্পর্কে কিছুই জানত না। সুতরাং আর কোনো বৈপরীত্ব থাকল না।

قَوْلُهُ مَا تَعَلَّمُوْهُ : এটি لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর جَوَابْ مَحْذُوْف

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ইহুদিদেরকে কুফর সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে ঈমানের প্রতি উৎসাহিত করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوْفٌ : এটিও একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ [উহ্য প্রশ্ন]-এর জবাব। **প্রশ্ন** : لَوْ -এর جَوَابْ ফেয়েলে মাযী হওয়া আবশ্যক। এখানে জবাবটি হলো لَمَثُوْبَةٌ [জুমলায়ে ইসমিয়া] যা সঠিক নয়।

উত্তর : لَوْ -এর جَوَابْ ـ لَمَثُوْبَةٌ নয়, বরং جَوَابْ টি মাহযূফ রয়েছে। আর তা হলো لَاُثِيْبُوْا আর এ উহ্য থাকার প্রতি لَمَثُوْبَةٌ দালালত করছে।

قَوْلُهُ لَمَا اٰثَرُوْهُ : এটি لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -এর جَوَابْ مَحْذُوْف

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ : [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব পরিচালনা (تَكْوِيْن) সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত; ইসলাম যেরূপে শিরক ও অংশীবাদের শিকড় কেটে চলেছে, সেদিকে লক্ষ্য করলে এখানে স্পষ্টভাবে এ কথাটি বলার প্রয়োজন ছিল। ইরশাদ হচ্ছে এ যাদুকর্ম ফুঁ-মন্তর, টোন-টোটকাগুলোকেই প্রকৃত ক্রিয়াবান মনে করে বস না। এগুলোর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না। অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে ও যে কোনো অবস্থা পরিস্থিতিতে যেরূপ আমার মর্জী আমার জগত পরিচালনা সংক্রান্ত জ্যোতির্ময় ইচ্ছাই শুধু প্রকৃত কর্তাও বাস্তব ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এখানে اِذْنِ اللّٰهِ অর্থ [আদেশ নয়] আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত [তকদীর] তার পরিচালনা মর্জি এবং তার ফায়সালা ও নির্ধারণই। এর অর্থ তার ফয়সালায়ও কুদরতেই। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৯০]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَلِمُوْا : এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে রিসালাত যুগের ইহুদিদের প্রতি। এ বক্তব্য পূর্ব আয়াত وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ رَسُوْلٌ -এর সঙ্গে সংযুক্ত। মাঝখানে সুলাইমানী যুগের ইহুদি ও তাদের যাদুচর্চা প্রসঙ্গ আলোচিত হলো। এখন পুনরায় মূল আলোচনায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ পরবর্তী প্রসঙ্গ রিসালাত যুগের সমকালীন ইহুদিদের। এ অংশ وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ -এর সঙ্গে যুক্ত, যাদু প্রসঙ্গে মধ্যবর্তী প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছিল। সুতরাং عَلِمُوْا -এর কর্তা সর্বনাম সে [প্রথমে উল্লিখিত] ইহুদিদের নির্দেশ করবে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীর ভাষ্যে লক্ষ্য করুন-

(مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَمَّا جَاۤءَهُمْ وَقِصَّةٌ مُسْتَطْرَدَةٌ فِى الْبَيْنِ فَالضَّمِيْرُ لِاُولٰئِكَ الْيَهُوْدِ . روح)

কুরআন কি রকম জোরদার দাবি করে দিল- وَلَقَدْ عَلِمُوْا বলে যে, এ ইহুদিরা ভালো করেই জানে যে, যাদু টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র কত কদাকার বিষয়। ইহুদিরা তো বলতে পারত যে, আমরা কি করে জানব? কে আমাদের অবহিত করল? আমাদের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে এসব কথা কোথায়? কিন্তু না, তারা তেমন করে বলতে পারেনি। কেননা যুগ যুগের বিকৃত, রদবদলের পরেও বর্তমান তাওরাতে এ ধরনের স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১. পৃ. ১৯১]

নাহু শাস্ত্রের পরিভাষায় تَعْلِيْق অর্থ শুধু শব্দগতভাবে আমল বাতিল করাকে বলে, মহলগতভাবে নয়। আর যখন اَفْعَالُ قُلُوْب এর পর لَامْ اِبْتِدَا বা حَرْفِ اِسْتِفْهَامْ বা حَرْفِ نَفِى আসে, তাহলে اَفْعَالُ قُلُوْب -কে আমল থেকে مُعَلَّق করে দেয়।

قَوْلُهُ اِشْتَرَاهُ : তা খরিদ করল "ه" সর্বনাম যাদু (سِحْر) বুঝায়। اِشْتَرَا এখানে হাকিকি অর্থে নয়; বরং মাজাযী অর্থে। অর্থাৎ যাদুকে গ্রহণ করল অর্থাৎ শয়তানরা যা আবৃত্তি করত; যা গ্রহণ করল অর্থাৎ শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তা গ্রহণ করল আল্লাহ তা'আলার কিতাবের বিনিময়ে এবং যাদু গ্রহণ করল আল্লাহ তা'আলার দীনের বিনিময়ে। ইহুদিদের সত্যের আহ্বানে জানানো হচ্ছিল, তাদের কাছে একত্ববাদী ধর্মের পয়গাম পৌঁছে দেওয়া হচ্ছিল; অথচ তাদের এদিকে ছিল না কোনো মনোযোগ, কোনো আগ্রহ, তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, বেপরোয়া, একান্ত অমনোযোগী ও নিশ্চিন্ত। নিজেদের যাদুটোনা ও তন্ত্রমন্ত্রে মশগুল এবং সেসব গর্হিত বিষয়কে জীবনে পূর্ণাঙ্গতা দানের স্তরে ভাববার ধান্দায় বিভোর। এদের এ বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে আয়াতের এ অংশে।

قَوْلُهُ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ : নিজেরা নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ নিজেদের জীবনকে আজাব ও ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করেছে। بِئْسَمَا شَرَوْا بِهٖ কতই নিকৃষ্ট। সে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে কুফরি ও যাদু ভেল্কী জাতীয় কাজকর্ম, যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। বান্দাদের অবস্থার প্রতি পূর্ণ আক্ষেপ ও পরিতাপের ভাষায় ইরশাদ হচ্ছে যে, সত্য দীনের ন্যায় মহা নিয়ামত উপেক্ষা করে এরা কুফরি ও যাদু গ্রহণ করে রয়েছে। যেন জাহান্নাম কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। যখন তারা যাদু ও কুফরিকে দীন ও সত্যের উপর প্রাধান্য দিল।

যাদু বিদ্যা এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় : মু'তাযিলারা যাদুর ক্রিয়া পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে; অথচ পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) ও যাদুকর কওমের ঘটনাকে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং উক্ত আয়াতগুলোতেও যাদুর ক্রিয়া ও প্রভাবকে অস্বীকার করা দুষ্কর। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ -এর উপর লবীদ নামক ইহুদির যাদু করা এবং এ বিষয়ে সূরা নাস ও সূরা ফালাক অবতীর্ণ হওয়ার কথা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোকে অস্বীকার করা কঠিন ব্যাপার। অনেকভাবে কতক লোক উক্ত আয়াতের কারণে বুঝে গেছে যে, যাদুর ক্রিয়া শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা। অন্যান্য [illegible] যাদুর ক্রিয়া নেই অথচ এটাও সঠিক নয়। কেননা উল্লেখের মাঝে কোনো একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, [illegible] বিষয়কে [illegible] করবে না; বরং কোনো বিশেষ কারণে এ স্থানে শুধু একটি বিশেষ ক্রিয়াকে উল্লেখ [illegible] হবে এর দ্বারা এটা কিভাবে বুঝা গেল যে, অন্যান্য ক্রিয়াসমূহ যাদুর মাঝে একেবারেই হয় না

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٤. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ اَمْرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَهُ ذٰلِكَ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ سَبٌّ مِنَ الرَّعُوْنَةِ فَسُرُّوْا بِذٰلِكَ وَخَاطَبُوْا بِهَا النَّبِيَّ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ عَنْهَا وَقُوْلُوْا بَدْلَهَا اُنْظُرْنَا اَيْ اُنْظُرْ اِلَيْنَا وَاسْمَعُوْا ط مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهِ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ مُؤْلِمٌ هُوَ النَّارُ ـ

১০৪. হে বিশ্বাসীগণ! নবীকে রায়িনা বলো না رَاعِنَا শব্দটি اَلْمُرَاعَاةُ হতে উদগত আজ্ঞাসূচক শব্দ। তারা এই বলে নবীকে সম্বোধন করতেন। [আরবিতে এর অর্থ আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন, সাহাবীগণ এই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার করতেন] ইহুদিদের ভাষায় ইহা ভর্ৎসনা অর্থে ব্যবহার হতো। رَعُوْنَةٌ হতে নির্গত শব্দটির অর্থ বোকা। ইহুদিগণ নবী করীম ﷺ কে সম্বোধনের বেলায় শব্দটিকে এই অর্থে ব্যবহার করে আনন্দ লাভ করত। সুতরাং মু'মিনগণকে এই শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বরং এর স্থলে উনযুরনা অর্থাৎ আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিন বলিও আর তোমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় তা গ্রহণ করার কানে শ্রবণ করিও। সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নাম।

١٠٥. مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ الْعَرَبِ عَطْفٌ عَلٰى اَهْلِ الْكِتٰبِ وَمِنْ لِلْبَيَانِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ خَيْرٍ وَحْيٍ مِنْ رَبِّكُمْ حَسَدًا لَكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نُبُوَّتِهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

১০৫. কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছে তারা এবং আরবের অংশীবাদীগণ তোমাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণতার দরুন এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ ওহী অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নিজ অনুকম্পার জন্য নবুয়তের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।
مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ-এর مِنْ টি এ স্থানে بَيَانٌ বা বিবরণমূলক। اَهْلُ الْكِتٰبِ-এর সাথে وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ-এর عَطْفٌ বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। مِنْ خَيْرٍ-এর مِنْ টি এইস্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ-এর مِنْ টি এ স্থানে بَيَانٌ বা বিবরণমূলক। اَهْلُ الْكِتٰبِ-এর সাথে وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ-এর عَطْفٌ বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। مِنْ خَبَرٍ-এর مِنْ টি এইস্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ اَمْرٌ مِنَ الْمُرَاعَاةِ : অর্থাৎ رَاعِنَا-এর মধ্যে ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِل তথা نَا শব্দটি মহল হিসেবে মানসূব। আর رَاعِ শব্দটি مُرَاعَاةٌ মাসদার থেকে اَمْر-এর সীগাহ। অর্থ আমাদের প্রতি খেয়াল রাখুন।

قَوْلُهُ مِنَ الرَّعُوْنَةِ : অর্থাৎ رَاعِنَا শব্দটি ইহুদিরে ভাষ্যমতে رَعُوْنَة [আহমক] থেকে নির্গত। ইহুদিরা কাউকে বোকা ও নির্বোধ বলতে চাইলে رَاعِنَا বলত। এর শুরুতে حَرْف نِدَاء উহ্য রয়েছে এবং শেষে اَلِف مَدَّة অতিরিক্ত।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فُسِّرُوا بِذٰلِكَ : سروا মাজহুলের সীগাহ। سِيْن-এ পেশ এবং ر-এ পেশ ও তাশদীদ। অর্থাৎ ইহুদিরা এটি শুনে খুশি হত। أَيْ يَكُوْنُوْنَ مَسْرُوْرِيْنَ لِقَوْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَاعِنَا .

قَوْلُهُ مُؤْلَمٌ : صِيْغَةُ صِفَتْ (بِفَتْحِ اللَّامِ) ইসমে মাফউলের সীগাহ। بَابْ اِفْعَالْ থেকে। মূলত এটি بَابْ سَمِعَ থেকে এবং লাজেম। এখন بَابْ اِفْعَالْ থেকে مُتَعَدِّىْ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ هُوَ النَّارُ : هُوَ-এর مَرْجِعْ হলো– عَذَابٌ اَلِيْمٌ এখানে প্রশ্ন হয় যে, هُوَ মুবদাতা এবং اَلنَّارُ খবর। মুবতাদা-খবরের মধ্যেতো مُطَابَقَتْ নেই। কেননা اَلنَّارُ হলো مُؤَنَّثْ এবং هُوَ হলো مُذَكَّرْ

উত্তর : هُوَ-এর مَرْجِعْ হলো عَذَابْ এবং مَرْجِعْ -এর সামঞ্জস্যতায় هُوَ-কে مُذَكَّرْ আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে ইহুদিদের যাদু চর্চা ও অনুসরণের বিবরণ ছিল। এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, যাদুর অনুসরণ ইহুদিদের স্বভাব প্রকৃতিতে এ পর্যায়ে মিশ্রিত ছিল যে, তাদের কথা-বার্তা এবং সম্বোধনও যাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। তাদের কথা-বার্তা বাহ্যত সম্মানজনক হলেও বাস্তবে তা ছিল তাচ্ছিল্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا **শানে নুযূল :** ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে এসে বসত এবং তাঁর কথাবার্তা শুনত। যে কথা ভালো করে শুনতে পেত না সেটা দ্বিতীয়বার শুনতে চেয়ে বলত رَاعِنَا অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। শব্দটি তাদের দেখাদেখি অনেক মুসলিমগণও উচ্চারণ করতেন। আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে নিষেধ করলেন যে, তোমরা এটা বলো না। বলতে হলে বরং اُنْظُرْنَا বলো। এরও এই একই অর্থ। আর শুরু হতেই তোমরা মনোযোগী হয়ে কথাবার্তা শুনো, যাতে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করতে না হয়। ইহুদিরা এটা অসদুদ্দেশ্যে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই উচ্চারণ করত। তারা একটু টেনে উচ্চারণ করতো رَاعِيْنَا অর্থাৎ আমাদের রাখাল। ইহুদিদের ভাষায় رَاعِنَا শব্দটি বোকা অর্থেও ব্যবহৃত হতো। যেমনটি মুফাসসির (র.) وَهِىَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ سَبٌّ مِنَ الرَّعُوْنَةِ বলে ইঙ্গিত করেছেন।

আয়াত দ্বারা স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, রিসালাতের মর্যাদা অধিকারীর প্রতি শুধু আন্তরিক আদব– ভক্তিই যথেষ্ট নয়; বরং বাহ্যিক আচরণ-উচ্চারণেও সম্মান-শ্রদ্ধা প্রকাশ অপরিহার্য। ফকীহগণ লিখেছেন, যেসব শব্দে অমর্যাদার সম্ভাব্য অর্থও বিদ্যমান থাকে, সেগুলো পরিহার করাও আবশ্যকীয়। আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) লিখেন– وَهُوَ دَلِيْلٌ عَلٰى تَجَنُّبِ الْاَلْفَاظِ الْمُحْتَمِلَةِ الَّتِىْ فِيْهَا التَّعَرُّضُ لِلتَّنْقِيْصِ অর্থাৎ এতে প্রমাণ রয়েছে দ্ব্যর্থবোধক সেসব শব্দ পরিহারের, যাতে মানহানি করার অবকাশ রয়েছে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তো এ ধরনের শব্দ ব্যবহারে হদ্দ [নির্ণীত বিশেষ দণ্ড] সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَهُ ذٰلِكَ : كَانُوْا-এর ضَمِيْرِ مَرْفُوْع-এর মিসদাক মুমিনগণ, لَهُ-এর মিসদাক রাসূল ﷺ আর ذٰلِكَ দ্বারা رَاعِنَا-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। اَىْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَقُوْلُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاعِنَا মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা আয়াতের শানে নুজুলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

وَهِىَ بِلُغَةِ الْيَهُوْدِ مُسَبٌّ : অর্থাৎ رَاعِنَا শব্দটি ইহুদিদের ভাষায় একটি গালি। মূলত মুফাসসির (র.) এ ইবাদরত দ্বারা لَا تَقُوْلُوْنَ رَاعِنَا-এর নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, যদিও رَاعِنَا-এর বাহ্যিক অর্থ খুবই ভাল; কিন্তু যেহেতু ইহুদিদের ভাষায় এটি একটি গালি তাই মুসলমানদেকে এ থেকে বারণ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ (রা.) ইহুদিদের ভাষা জানতেন। একদিন তিনি তাদেরকে এ শব্দটি বলতে শুনে বললেন–

يَا اَعْدَاءَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَئِنْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَقُوْلُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَضْرِبَنَّ عُنُقَهٗ .

অর্থাৎ হে আল্লাহর দুশমনেরা! তোদের প্রতি আল্লাহর লানত। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি– যদি তোমাদের কাউকে আর কোনোদিন এ শব্দটি রাসূল ﷺ-এর শানে বলতে শুনি, তাহলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। তখন তারা বলল তোমরাও তো বল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا : [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী প্রবচনসমূহ তার প্রতি যথাযোগ্য আদব ও সম্মান বোধের সঙ্গে শুনতে থাক] আমাদের সমকালীন কোনো কোনো ভ্রান্ত দল উপদল ঈমান ও ইসলামের জন্য রাসূল ﷺ-এর মহান ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু কুরআনের অনুসরণকেই যথেষ্ট মনে করে নিয়েছে। এ আয়াত স্পষ্টরূপে তাদের ভ্রষ্টতা ব্যক্ত করছে।

http://islamiboi.wordpress.com

ফায়দা :

১. যে শব্দের ব্যাখ্যার দ্বারা খারাপ আচরণ করার সম্ভাবনা থাকে, তা ব্যবহার না করা উচিত; যদিও বক্তার উদ্দেশ্য ভালো থাকে।

২. ইঙ্গিতেও নবী করীম ﷺ -এর অসম্মান ও তুচ্ছতা কুফর। কেননা ইহুদিরা এখানে ইঙ্গিতেই নবী করীম ﷺ -এর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ১, পৃ. ১৯৫]

قَوْلُهُ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এখানে لِلْكَافِرِيْنَ -এর اَلِفْ لَامْ হলো عَهْدْ خَارِجِيْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব ইহুদি যারা রাসুল ﷺ -কে গালি দিত, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত এবং এ অর্থে رَاعِنَا বলত। তাদের আলোচনা পূর্বে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। وَلِلْكٰفِرِيْنَ -এর স্থলে وَلَهُمْ বলা উচিত ছিল। সে হিসেবে এটি وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর এভাবে ইসমে জাহের দ্বারা বলার উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নবী ﷺ -কে হেয় ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কুফরী এবং আযাবের কারণ।

قَوْلُهُ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : **যোগসূত্র :** পূর্বে আহলে কিতাবের কুফরী এবং মন্দতার আলোচনা হয়েছে। এখন এ আয়াতে তার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তোমাদের ঈমান না আনার এবং অসৌজন্যমূলক আচরণের মূল কারণ হলো তোমরা হিংসা কর।

قَوْلُهُ مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ الخ : [অর্থাৎ ইহুদি-মুশরিক নির্বিশেষে কোনো কাফেরই তোমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াটা পছন্দ করে না; বরং ইহুদিদের কামনা হলো শেষ নবীর আবির্ভাব বনী ইসরাঈলের মাঝেই হোক। মক্কা শরীফের মুশরিকদেরও কামনা তাদের মাঝেই হোক। কিন্তু এটা তো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের ব্যাপার। তিনি নিরক্ষর সম্প্রদায়কেই এ সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। –[তাফসীরে উসমানী পৃ. ২০]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : যারা কাফের অর্থাৎ ইসলামের জীবন বিধান অস্বীকারকারীদের বড় দল দুটি–

১. **মুশরিক :** যারা তাওহীদ রিসালাত, ফেরেশতা, জিন ইত্যাদিতে মোটেই বিশ্বাসী নয়; বরং এসবের পরিবর্তে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বিভিন্ন কাল্পনিক ও অলিক বিষয় তারা তৈরি করে নিয়েছে।

২. **আহলে কিতাব :** যারা উল্লিখিত মৌলিক বিষয়গুলোকে আক্ষরিক [ও তাত্ত্বিক] পর্যায়ে বিশ্বাসী হলেও বাস্তবে ও কার্যত এগুলোর প্রতিটির বাস্তবতাকে বিকৃত করে রেখেছিল। বর্তমান বাক্যের জন্য আগত বিধেয় এর উদ্দেশ্যও اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا। অধিক স্পষ্ট করার লক্ষ্যে কাফেরদের দুই শ্রেণির খোলাখুলি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَهْلُ الْكِتَابِ : পবিত্র কুরআনে এখানেই শব্দটির প্রথম উল্লেখ হলো। কুরআনী পরিভাষায় শব্দটি মু'মিন ও মুশরিক-এর মধ্যবর্তী একটি স্তর বুঝায় এবং এটি দিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরই বুঝানো হয়ে থাকে। এরা মূলত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসী ছিল। তাদের কাছে আসমানি কিতাব সহীফাও ছিল। যদিও তা ছিল বাহ্য ভাষ্য ও বিষয়গতরূপে চরম রদবদল ও বিকৃতির শিকার। এরা কুরআন ও তার বাহক নবীকে অস্বীকার করত।

قَوْلُهُ الْمُشْرِكِيْنَ : মুশরিক-অংশীবাদী যারা তাওহীদ ও নবুয়তে মোটেই বিশ্বাসী ছিল না। তারা এক আল্লাহ তা'আলার বদলে বিভিন্ন ফেরেশতা বিভিন্ন ক্ষমতার স্বাধীন ধারক ও অধিকারী মনে করত এবং এদেরকেই বিভিন্ন দেব-দেবীর নামে আখ্যায়িত করত ও তাদের পূজা-অর্চনা করত। তারা বিভিন্ন পদার্থ ও প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাস্যের আসনে অধিষ্ঠিত করত।

قَوْلُهُ الْخَيْرِ : [কল্যাণ] দ্বারা সাধারণত ওহী ও নবুয়ত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে এ স্থানে 'খায়র' কে সব রকমের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্যের সমষ্টি মনে করা এবং এর অধীনে জ্ঞান, গায়েবি সাহায্য, রাজ্যজয় ইত্যাদি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত মনে করাই উত্তম হবে। –[রূহুল মা'আনী, বায়যাবী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ : ইহুদিদের মূল হিংসার বিষয় ছিল এই যে, নবুয়ত নিয়ামতের অধিকারী তো আমরা অর্থাৎ ইসরাঈল সন্তানেরা। এ [উম্মী] আরবীরা যারা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর, এরা এ নবুয়ত সম্পদ পেয়ে যাচ্ছে কোন সূত্রে এবং কোনো যুক্তিযোগ্যতা বলে? اَهْلُ الْكِتٰبِ দ্বারা প্রায়শ এদের প্রতিই ইঙ্গিত হয়ে থাকে। আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য হতে পাঠিয়ে আসছিলেন, পরে শেষ নবী ﷺ -কে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য হতে পাঠানো হলো তা ইহুদিদের মনঃপূত হলো না

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٦. وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ فِى النَّسْخِ وَقَالُوْا اِنَّ مُحَمَّدًا يَأْمُرُ اَصْحَابَهُ الْيَوْمَ بِاَمْرٍ وَيَنْهٰى عَنْهُ غَدًا اَنْزَلَ مَا شَرْطِيَّةٌ نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَىْ نُزِلْ حُكْمَهَا اِمَّا مَعَ لَفْظِهَا اَوْلَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ النُّوْنِ مِنْ اَنْسَخَ اَىْ نَأْمُرُكَ اَوْ جِبْرَءِيْلَ بِنَسْخِهَا اَوْ نُنْسِأْهَا نُؤَخِّرْهَا فَلَا نُزِلْ حُكْمَهَا وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا وَنُؤَخِّرُهَا فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ مِنَ النِّسْيَانِ اَىْ نُنْسِكُهَا وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَنْفَعَ لِلْعِبَادِ فِى السُّهُوْلَةِ اَوْ كَثْرَةِ الْاَجْرِ اَوْ مِثْلِهَا فِى التَّكْلِيْفِ وَالثَّوَابِ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ . وَمِنْهُ النَّسْخُ وَالتَّبْدِيْلُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ .

১০৬. কুরআনের নসখ অর্থাৎ এক আয়াতকে অপর এক আয়াতের মাধ্যমে বা এক হুকুমকে পরবর্তী অন্য এক হুকুমের মাধ্যমে রহিতকরণ সম্পর্কে কাফেররা যখন বিদ্রূপমূলক উক্তি করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাথীগণকে আজ এক ধরনের হুকুম দেয়, কাল আবার তা নিষেধ করে দেয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে নাজিল করেন : আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অর্থাৎ কোনো নির্দেশ আয়াতে বর্ণিত শব্দাবলিসহ বা কেবলমাত্র হুকুমটিকে অপসৃত করি।

نَنْسَخْ শব্দটি অপর এক কিরাতে نُوْن -এ পেশসহ অর্থাৎ اَنْسَخَ হতে গঠিত ক্রিয়ারূপ হিসেবেও পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে, আপনাকে বা জিবরাঈল (আ.)-কে যদি তা রহিতকরণের নির্দেশ দেই। বা পিছনে রেখে দিলে। অর্থাৎ এর নির্দেশ যদি অপসৃত না করি আর কেবল পাঠ [তেলাওয়াত] রহিত করে দেই বা তাকে লাওহে মাহফূজে ছেড়ে রাখি।

অপর এক কেরাতে نُنْسِهَا শব্দটি হামযা ব্যাতিরেকেও পঠিত রয়েছে। তখন এটা نِسْيَانٌ [বিস্মৃত হওয়া] ধাতু হতে গঠিত শব্দটিরূপে গণ্য হবে। অর্থ হবে তা আপনার হৃদয়পট হতে যদি বিস্মৃত করে দেই, বিলুপ্ত করে দেই। তা হতে উত্তম সহজ হওয়ায় বা ছওয়াবের সংখ্যাধিক্য হিসেবে মানুষের জন্য অধিক লাভজনক কিংবা কষ্ট ও পুণ্যফলে তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনয়ন করি। তুমি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান? নাসখ বা কোনো হুকুম রহিতকরণ ও পরিবর্তন করাও তার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত।

مَا نَنْسَخْ -এর مَا শব্দটি এই স্থানে শর্তবাচক। এর জবাব হলো نَأْتِ بِخَيْرٍ।

اَلَمْ تَعْلَمْ এইস্থানে تَقْرِيْر বা বক্তব্যটি অধিক সুসাব্যস্ত করণার্থে প্রশ্নবোধক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

١٠٧. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَفْعَلُ فِيْهِمَا مَا يَشَاءُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ مِنْ زَائِدَةٌ وَلِيٍّ يَحْفَظُكُمْ وَلَا نَصِيْرٍ . يَمْنَعُ عَذَابَهُ عَنْكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ .

১০৭. তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই? এতদুভয়ের মধ্যে যা ইচ্ছা তাই তিনি করেন। এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অর্থাৎ তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই যে তোমাদেরকে রক্ষা করবে। এবং সাহায্যকারীও নেই যে তোমাদের উপর যদি তার শাস্তি আপতিত হয় তবে তা ফিরিয়ে রাখতে পারবে।

مِنْ وَلِيٍّ -এর مِنْ টি এই স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَمَّا طَعَنَ الْكُفَّارُ الخ : এ ইবারাত দ্বারা মুফাসসির (র.) উক্ত আয়অতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা পূর্বে বর্ণিত হলো।

اَلْكُفَّارُ : এখানে اَلْكُفَّارُ দ্বারা ইহুদিরা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَا نَنْسَخْ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে এ আলোচনা ছিল যে সাহাবা (রা.) একটি সময় পর্যন্ত رَاعِنَا বলতেন। তারপর তদস্থলে اُنْظُرْنَا বলার নির্দেশ এবং এ সংক্রান্ত নিন্দা-ভর্ৎসনার জবাব প্রদান করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ نَنْسَخْ : نَسْخًا (ف) نَسَخَ বিদূরিত করা, মিটিয়ে দেওয়া, রহিত করা। نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ সূর্য ছায়া দূর করে দিয়েছে। نَسَخْتُ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি কিতাবের কপি করেছি।

আর পরিভাষায় نَسْخ বলা হয়– بَيَانُ انْتِهَاءِ التَّعَبُّدِ بِقِرَائَتِهَا اَوِ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا اَوْ بِهِمَا جَمِيْعًا

قَوْلُهُ اَىْ نَزَلَ حُكْمَهَا : মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نَسْخ-এর দুটি অর্থের رَفْعٌ وَاِزَالَةٌ [দূর করা] উদ্দেশ্য; نَقْلٌ وَتَحْوِيْلٌ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اِمَّا مَعَ لَفْظِهَا : অর্থাৎ اِزَالَةُ الْحُكْمِ বা বিধান রহিতকরণটা দুই সূরতে হতে পারে। ১. مَعَ اللَّفْظِ ২. بِغَيْرِ اللَّفْظِ প্রথমটিকে مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ مَعَ التِّلَاوَةِ বলা হয়। যেমন– عَشْرُ رَجَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ এটি তেলাওয়াতসহ মানসূখের উদাহরণ।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ نُنْسِخْ : অর্থাৎ بَابُ اِفْعَالٌ থেকে হবে। এ অবস্থায় نُنْسِخْ মুতা'আদ্দী হবে। তখন অর্থ হবে আমরা মিটিয়ে দেওয়া বা মুছে দেওয়ার নির্দেশ করি। মুফাসসির (র.) نَأْمُرُكَ اَوْ جِبْرِيْلَ উহ্য ধরে এই কেরাতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَوْ نَنْسَأْهَا : এর عَطْف হয়েছে نَنْسَخْ-এর সাথে। মুফাসসির (র.) نُؤَخِّرْهَا দ্বারা এর তাফসীর করেছেন

ফায়দা : ভারত উপমহাদেশীয় প্রায় নোসখায় এখানে نَنْسَأْهَا-এর স্থলে نُنْسِهَا রয়েছে। তা ঠিক নয়। কেননা نُؤَخِّرْهَا হলো نَنْسَأْهَا-এর ব্যাখ্যা; نُنْسِهَا-এর নয়।

قَوْلُهُ نُؤَخِّرْهَا : এটি نَنْسَأْهَا-এর তাফসীর نَنْسَأْهَا শব্দটি نَسَأَ থেকে নির্গত অর্থ تَاخِيْر বা বিলম্বিত করা। এখানে تَاخِيْر দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপার দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। যা মুফাসসির (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ فَلَا نَزَلَ حُكْمَهَا وَنَرْفَعُ تِلَاوَتَهَا : এটি تَاخِيْر-এর প্রথম সম্ভাবনা অর্থাৎ আয়াতের বিধান তুলে নিব না; বরং বাকী রাখব এবং তেলাওয়াত উঠিয়ে নিব। যেমন– اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا

এ আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে কিন্তু হুকুম রয়ে গেছে।

اَوْ نُؤَخِّرْهَا فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ : এটি تَاخِيْر-এর দ্বিতীয় সম্ভাবনা। অর্থাৎ تَاخِيْر দ্বারা উদ্দেশ্য লাওহে মাহফুজে আয়াত নাজিলহীন রেখে দেওয়া। ঐ সময় পর্যন্ত যখন আল্লাহ তা নাজিল করতে চান।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ : এ থেকে বুঝা যায়, মুফাসসির (র.)-এর সামনে কুরআনের যে নুসখাটি ছিল তাতে نَنْسَأْهَا লেখা ছিল। এ জন্যই তিনি বলেছেন بِلَا هَمْزٍ আমাদের সামনে যে নুসখা রয়েছে, তাতে শব্দটি بِلَا هَمْزٍ-ই লেখা আছে।

قَوْلُهُ نَنْسَأْهَا : এটি نَسَأَ থেকে নির্গত। অর্থ– বিলম্বিত করা, পিছনে রাখা। বলা হয় نَسَأَ اللّٰهُ فِىْ اَجَلِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত বিলম্বিত করুন। অর্থাৎ আয়ু বাড়িয়ে দিন। কুরআনের অন্য আয়াতে এসেছে اِنَّمَا النَّسِىْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ এ আয়াতে نَسِىْ অর্থ বিলম্বিত করা। মুশরিকরা আশহুরে হারামকে তার নির্ধারিত স্থান থেকে বিলম্বিত করে দিত অর্থাৎ অন্য মাসে নিয়ে যেত। এ হলো هَمْز সম্বলিত কেরাতের ব্যাখ্যা। –[লুগাতুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ : نُنْسِهَا শব্দটি نِسْيَانٌ মাসদার থেকে নির্গত হলে مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل হবে। অর্থ হবে- আমরা তা ভুলে যাই। আর اِنْسَاءٌ থেকে নির্গত হলে مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْل হবে। অর্থ হবে আমরা তোমাকে ঐ আয়াত ভুলিয়ে দিই। মুফাসসির (র.) وَنَمْحُهَا مِنْ قَلْبِكَ উল্লেখ করে এ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : ইহুদিরা তাওরাতকে 'নসখ' -এর অযোগ্য মনে করত। তারা কুরআনেরও অনেক বিধান **রহিত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছে। ভর্ৎসনা** করে বলেছে মুহাম্মদ তার অনুসারীদেরকে একবার এক হুকুম প্রদান করে **আবার তা থেকে বারণ করে। এ ধরনের কথা বলে** ইহুদিরা মুসলমানদের অন্তরে এ সন্দেহ সৃষ্টির পাঁয়তারা করত যে, **তোমরা তো বল- আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের** উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সবটুকুই 'খায়ের' বা কল্যাণকর। **যদি তাই হয়, তাহলে তা রহিত হওয়ার অর্থ কি? যদি প্রথম** হুকুমটি ভালো হয়ে থাকে, তাহলে দ্বিতীয়টি খারাপ হবে। আর **দ্বিতীয়টি ভালো হলে প্রথমটি খারাপ হবে।** অথচ **আল্লাহ তা'আলার** ওহী এবং হুকুম খারাপ হওয়া অসম্ভব। তাদের এহেন **বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা** ইরশাদ করেছেন, **আসমান জমিনের** রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনি **যা ভালো মনে করেন, যে সময় যে বিধান তাঁর হিকমত অনুযায়ী হয়,** তা-ই প্রয়োগ করেন এবং পূর্বের কোনো বিধান **রহিতও করেন। এটি তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।** -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (র.) খ. ১, পৃ. ১৯৬]

قَوْلُهُ اَوْلَا : অর্থাৎ শব্দসহ মানসূখ হবে না; বরং শুধু বিধানটি মানসূখ হবে। তেলাওয়াত **বাকী থাকবে। এটি** اِزَالَةُ الْحُكْمِ **-এর দ্বিতীয় সূরত।** একে مَنْسُوْخُ الْحُكْمِ دُوْنَ التِّلَاوَةِ বলা হয়। যেমন- وَصِيَّةً لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ **এটির তেলাওয়াত** বাকী আছে; কিন্তু বিধানটি রহিত হয়ে গেছে।

نَسْخٌ : দু'প্রকার : কুরআনে কারীমে নসখ দু'রকম হয়েছে-

১. **একটি মানসূখ** হুকুমের স্থলে অন্য বিধান নাজিল করা। যেমন- এক বছরের ইদ্দত রহিত করে চার মাস দশ দিনের বিধান দেওয়া হয়েছে।

২. **প্রথম বিধান** রহিত করে আর কোনো নতুন বিধান না দেওয়া। যেমন প্রথম দিকে মুহাজির নারীকে **পরীক্ষা করার** বিধান ছিল। **পরবর্তীতে** তা রহিত করা হয়েছে।

ফায়দা : যদি মুফাসসির (র.) وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ النُّوْنِ وَكَسْرِ السِّيْنِ -এর স্থলে وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا هَمْزٍ **বলতেন, তাহলে বক্তব্যটি অধিকতর সুস্পষ্ট** হতো। কেননা মুফাসসির (র.)-এর ইবারতে অপর একটি কেরাতেরও **সম্ভাবনা রয়েছে, যা অশুদ্ধ। আর তা হলো** نُنْسِهَا **এই** সূরতটি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই অসঠিক। শব্দগতভাবে এ জন্য যে, **এই কেরাতটি বর্ণিত নেই। আর অর্থগত**ভাবে অসঠিক এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে نِسْيَانٌ তথা ভুলে যাওয়ার **বহিঃপ্রকাশ** হতে **পারে না।** -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৯৭]

قَوْلُهُ مِنَ النِّسْيَانِ : মুফাসসির (র.) যদি مِنَ النِّسْيَانِ না বলে مِنَ الْاِنْسَاءِ বলতেন, তাহলে ভালো হতো। **কেননা শব্দটি** رُبَاعِيْ এবং তা اِنْسَاءٌ মাসদার থেকে নির্গত; نِسْيَانٌ থেকে নয়। সুতরাং বলা হবে نِسْيَانٌ মূলবর্ণ থেকে **নির্গত।**

-[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১৩৭]

تَأْمُرُكَ اَوْ جِبْرِيْلَ : উভয়ের মাঝে تَلَازُمٌ -এর সম্পর্ক। **হযরত** জিবরাঈল (আ.)-কে নসখের হুকুম দেওয়া মানে নবীজীকেই হুকুম দেওয়া। আর নবীজীকে হুকুম দেওয়া মানে **হযরত** জিবরাঈল (আ.)-কে হুকুম দেওয়া।

قَوْلُهُ اَنْفَعُ لِلْعِبَادِ : বান্দাদের জন্য অধিকতর উপকারী। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতে বর্ণিত خَيْرِيَّتْ বা উত্তম হওয়াটা বান্দাদের উপকারের ভিত্তিতে। এ ভিত্তিতে নয় যে, কুরআনের কোনো আয়াত অপর আয়াতের তুলনায় উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলার কালাম পুরোটাই কল্যাণ। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন, পৃ. ১৬]

http://islamiboi.wordpress.com

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ بِاعْتِبَارٍ تَقَعُ الْعِبَادُ وَلَا أَنَّ آيَةً خَيْرٍ مِنْ آيَةٍ لِأَنَّ كَلَامَ اللّٰهِ وَاحِدٌ وَكُلُّهُ خَيْرٌ (حَاشِيَةُ جَلَالَيْن، ح٢٧، ص١٦٠)

قَوْلُهُ فِي السُّهُوْلَةِ : সহজের ক্ষেত্রে উত্তম। যেমন ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধের বিধান এই ছিল যে, একজন মুসলমান দশজন কাফেরের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ করতে হবে; পলায়ন করা যাবে না। পরবর্তীতে এ বিধান রহিত করে সহজ বিধান দেওয়া হয়। তাহলো একজন মুসলমান দুজন কাফেরের মোকাবিলায় ধৈর্য ধারণ করে যুদ্ধ করবে। শত্রুপক্ষ দ্বিগুণের বেশি হলে রণাঙ্গণ ছেড়ে চলে আসার অনুমতি রয়েছে। প্রথম বিধানের চেয়ে এ বিধানটি অনেক সহজ।

قَوْلُهُ أَوْ كَثْرَةُ الْأَجْرِ : ছওয়াব বেশির হওয়ার দিক দিয়ে উত্তম। যেমন– প্রথম দিকে রোজা রাখা কিংবা না রেখে ফিদয়া দেওয়া উভয়টিই অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে শুধু রোজা নির্ধারিত হয়ে যায়। আর রোজা রাখার মাঝেই ছওয়াব বেশি।

قَوْلُهُ أَوْ مِثْلِهَا : সমমানের। যেমন– বায়তুল মুকাদ্দাসের অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়ার বিধান রহিত করে কা'বার অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়ার বিধান দেওয়া হয়। কেননা ছওয়াবের দিক দিয়ে উভয়টিই বরাবর।

نَسْخ -কে অস্বীকারের ব্যাখ্যা : আবূ মুসলিম ইবনে বাহর প্রমুখ আলেমগণ তো نَسْخ -কে একেবারেই অস্বীকার করেছেন। কেননা আকিদাগত বিষয় যেমন– আল্লাহর জাত ও সিফাতসমূহের মাসায়েল কিংবা ফেরেশতাগণ ও পয়গাম্বরগণ, আজাব ও ছওয়াব, কবরের জীবন, হাশর ও নশর, বেহেশত ও দোজখ ইত্যাদি বিষয়সমূহ তো স্পষ্ট রয়েছে যে, এগুলো স্থায়ী। এগুলোর ব্যাপারে কোনো نَسْخ কিংবা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আর এগুলোর মধ্যে সে সমস্ত বিধানাবলি, যেগুলো সমস্ত শরিয়তে শরয়ী ভিত্তি এবং যেগুলোর সম্পর্কে কোনো প্রকার মতানৈক্য নেই। যেমন মূর্তি পূজা, জুলুম ইত্যাদি হারাম হওয়া এবং ন্যায় নীতি, সততা ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা উত্তম হওয়া এগুলোর পরিবর্তনেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন রয়ে যাচ্ছে শুধু আংশিক বিধানাবলি; তবে আবূ মুসলিম (র.)-এর বক্তব্যে সেগুলোর মধ্যেও نَسْخ নেই। কেননা সূত্র এক হওয়া শর্ত। অথচ রহিতকারী হয় এক সূত্রে এবং রহিত হয় আরেক সূত্রে। আর উভয়টি নিজ নিজ সূত্রে সহীহ ও বিশুদ্ধ হয়। এমনিভাবে তার দৃষ্টিতে আয়াতের মধ্যে নসখ নেই। অর্থাৎ কোনো আয়াতের তেলাওয়াত রহিত নেই। কেননা আয়াতের জন্য মুতাওয়াতির হওয়া শর্ত। যে আয়াত মানসূখ [রহিত] হয়ে গেছে, সে আয়াতের বেলায় তাওয়াতুর বর্ণনাই পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলো হয়তো আখবারে আহাদ হয় অথবা মউযূ ও যঈফ কিংবা এদ্‌রাজে রাবীর প্রকার থেকে হয়। যখন রাসূল ﷺ সেগুলোকে গ্রহণই করেননি, তবে সগুলোকে আয়াত কিভাবে বলা যাবে?

আয়াতে কুরআন শুধু সেগুলোকে বলা যাবে যেগুলোকে রাসূল ﷺ সংরক্ষণ করেছেন, অন্যদেরকে হেফজ করিয়েছেন এবং লেখক দ্বারা লিখিয়েছেন। অর্থাৎ বর্তমান কুরআন যা সংরক্ষিত ও মুতাওয়াতির এর বিকৃত করার কোনো পথ নেই। রয়ে গেল এ ব্যাপারটি যে, উক্ত আয়াত দ্বারা নসখ-এর উপর দলিল পেশ করা? অতএব এটা এ জন্য সঠিক নয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তওরাত ও ইঞ্জিল-এর বিধানাবলি। অর্থাৎ সেগুলোতে পরিবর্তন হয়েছে। আর আয়াত কুরআনের শব্দের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং আহকামের উপর এর প্রয়োগ সচরাচর।

সাধারণ আলেমগণের অভিমত : সাধারণ আলেমগণ নসখ এর প্রবক্তা। কিন্তু কয়েকটি শর্তের সাথে। সুতরাং পবিত্র কুরআনে এ মাসআলা সম্পর্কে দু জায়গায় পর্যালোচনা করা হয়েছে–

১. সূরা বাকারার এ আয়াত مَا نَنْسَخْ مِنْ الخ -এর মধ্যে।

২. সূরা নাহল -এর আয়াত وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ. এর মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু, যে সূরা বাকারার আয়াতের মধ্যে نَسْخ এবং إِنْسَاء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নহল -এর আয়াতের মধ্যে تَبْدِيْل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাকি উভয় আয়াতে أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ এবং اَللّٰهُ بِمَا يُنَزِّلُ আর بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বলে একই পদ্ধতিতে نَسْخ -এর রহস্যাদির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৪]

নসখ -এর দু অর্থ : সর্বপ্রথম এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বিধানাবলির মধ্যে পরিবর্তন দু ভাবে হয়ে থাকে।

১. কোনো সময় তো এ কারণে যে, নিয়ম ও বিধানের মধ্যে প্রথমে কোনো ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। বিধায় এখন সংস্কার করে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন খোদায়ী বিধানাবলিতে অসম্ভব। কেননা এর দ্বারা নিঃসন্দেহে নির্বুদ্ধিতা ও দোষ প্রমাণিত হয়ে যায়। আপত্তিকারীরা নসখ -এর এ অর্থ বুঝেই আপত্তি করছে।

http://islamiboi.wordpress.com

২. কখনো শাসিত লোকদের অবস্থার পরিবর্তনের বিধানবাবলির মধ্যে পরিবর্তন ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

–[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৫]

ঔষধের ব্যবস্থাপত্রের ন্যায় বিধানাবলির মধ্যেও পরিবর্তন অত্যাবশ্যক : এ পরিবর্তন এমনই বিশুদ্ধ ও বৈধ; বরং অত্যাবশ্যক। যেমন– বিজ্ঞ চিকিৎসকের ঔষধের ব্যবস্থাপত্রসমূহের মধ্যে রোগী ও রোগের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যা বুদ্ধিভিত্তিক ও বর্ণনাভিত্তিক মেনে নেওয়া ওয়াজিব। এ কারণেই নির্ভরশীল আলেমগণ বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন যে, নসখ দু কারণে হয়ে থাকে–

১. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উক্ত বিধানের সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে বলে বর্ণনা করা হয়। ফলে উক্ত বিধান মানসুখ হয়ে যায়।

২. বান্দার অবস্থার পরিবর্তনের কারণে পূর্ববর্তী বিধান মানসুখ হয়ে নতুন বিধান জারী হওয়া।

অর্থাৎ বাস্তবে হুকুমের পরিবর্তন হয়নি; বরং সেটা একটি সাময়িক হুকুম ছিল, সময় শেষ হওয়ার পর হুকুম নিজে নিজেই শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, প্রথম থেকে আমাদের এ কথা জানা ছিল না, এ কারণে বাহ্যিকভাবে দেখার মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন হয়েছে। যেমন কাউকে হঠাৎ তলোয়ার দ্বারা যদি হত্যা করা হয় তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার মৃত্যু সময়ের পূর্বে বুঝা যায়। যে কারণে হত্যাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এবং খোদায়ী নির্ধারণের হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের উপরই মৃত্যুকে গণ্য করা হবে। –[প্রাগুক্ত]

نَسْخ -এর শর্তাবলি : এ কারণেই ফকীহগণ نَسْخ -এর শর্তসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, যে হুকুম নসখ -এর স্থানে পতিত হয়, সেটা স্বয়ং ওয়াজিব লিজাতিহী হতে পারে না। যেমন– ঈমান বিল্লাহ আর সেটা স্বয়ং নিষিদ্ধও হতে পারবে না। যেমন– কুফর ও শিরক; বরং স্বয়ং হওয়ার ও না হওয়ার সম্ভাবনাময় হতে হবে। এমনিভাবে সে হুকুম সাময়িক কিংবা সর্বদার জন্য হতে পারবে না। চাই সেটার স্থায়িত্ব نَصّ -এর দ্বারা হোক যেমন- خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا এর সাথে নির্ধারিত হোক। অথবা دَلَالَت দ্বারা হোক। যেমন রাসূল ﷺ -এর ওফাতের পর পবিত্র শরিয়ত আর পরিবর্তন যোগ্য না হওয়া। অর্থাৎ শরয়ী বিধানাবলিতে রদবদলের সম্ভাবনা রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় ছিল। কিন্তু তার ওফাতের পর এখন শরিয়ত স্থায়ী হয়ে গেছে। ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। সংস্কার ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সময় ও স্থান হিসেবে আংশিকভাবে ফকীহগণের ফতোয়ায় জায়েজ ও নাজায়েজ। হালাল ও হারামের দ্বন্দ্ব এবং বিধানাবলিতে সামান্য পরিবর্তনের ন্যায় যা মনে হয়। এটার কোনো সম্পৃক্ততা সেটার সাথে নেই। আর এ সামান্য দ্বন্দ্ব পবিত্র শরিয়তের স্থায়িত্বে কোনো প্রভাব ফেলে না। মোটকথা نَسْخ -এর সাথে এমন হুকুম হবে না, যা প্রথম থেকেই সাময়িক কিংবা সর্বদার জন্য হয়। কেননা যেটা সাময়িক সেটা তো সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিজে নিজেই শেষ হয়ে যায়। তাই সেটার জন্য نَسْخ অর্থহীন। এমনিভাবে হুকুম যদি স্থায়ী হয় তবে এর ক্ষেত্রে نَسْخ -এর অর্থ মিথ্যা বর্ণনা হবে। কেননা প্রথমে সেটাকে পরিবর্তনযোগ্য নয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যা এখন পরিবর্তনের পর ভুল হয়ে গেল। –[প্রাগুক্ত]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব : তাদের মতে نَاسِخ [রহিতকারী] ও مَنْسُوْخ [রহিত] উভয়ের মাঝে এতটুকু সময় থাকতে হবে [শর্ত] যে বান্দা রহিত হুকুম -এর উপর বাস্তবে আমলের সুযোগ পেয়ে যায়। তারপরে نَسْخ শুদ্ধ হবে। কিন্তু আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে রহিতের ব্যাপারে শুধু বাস্তবতার বিশ্বাসের সুযোগ পাওয়াই যথেষ্ট, বাস্তবে আমলের শর্ত নেই এবং বিশ্বাসও সরাসরি হোক কিংবা পরোক্ষভাবে স্থলাভিষিক্ততার মাধ্যমে হোক যেমন মেরাজে ৫০ ওয়াক্ত নামাজ রহিত হয়ে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত রয়ে গেছে। পূর্বের [পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের] হুকুমের উপর না বাস্তবে আমলের সুযোগ পাওয়া গেছে। আর না বাস্তবতার বিশ্বাসের সময় সুদৃঢ়ভাবে সরাসরি উম্মত পেয়েছে; হ্যাঁ, রাসূল ﷺ মৌলিকভাবে ও প্রতিনিধি হিসেবে বাস্তব এতেকাদকে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। আর সেটাই সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। –[প্রাগুক্ত ১১৭]

নসখ-এর সীমা : আয়াতে যেহেতু نَأْتِ بِخَيْرٍ -এর কথা রয়েছে, তাই পবিত্র কুরআনের জন্য قِيَاس -কে নসখকারী মানা যাবে না এবং অধিকাংশের মতে خَبَر -ও নসখকারী হতে পারে না। হ্যাঁ, পবিত্র কুরআন ও নবী করীম ﷺ -এর হাদীস হানাফীগণের দৃষ্টিতে একে অপরের জন্য রহিতকারী হতে পারে। কিন্তু শাফেয়ীগণ এ ব্যাপারে চিন্তিত যে, এতে বিরোধীরা [illegible] সুযোগ পেয়ে যায় যে, লক্ষ কর আল্লাহর বাণীকে তো সর্বপ্রথম তারই পয়গাম্বর অথবা নবীর হাদীসকে [illegible] আল্লাহ নিজেই বিনা সত্য করেছেন ও খণ্ডন করেছেন। কিন্তু হানাফীগণ এ সম্ভাবনাকে অযথা মনে করেন। [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রথমত বিরোধীদের প্রতিবাদ থেকে এ স্থানেই পরিত্রাণ কঠিন আর যেখানে কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতকে কিংবা এক **হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত** করেছে, সেখানেও তো তাদের প্রতিবাদের আরো বড় সুযোগ রয়েছে যে, স্বয়ং কুরআন নিজের **কথাকে নিজেই প্রত্যাখ্যান** ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তদ্রূপ হাদীসও। -[প্রাগুক্ত]

দ্বিতীয়ত নসখ -এর অর্থ যখন সময় সীমা বর্ণনা করে দেওয়া, তখন তো প্রতিবাদের কোনোই অবকাশ থাকে না; বরং বলা হবে যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল -এর হুকুমের শেষ সময় সীমা এবং রাসূল ﷺ আল্লাহর হুকুমের শেষ সময় সীমা বলে দিয়েছেন। আর যেহেতু نَاسِخٌ এবং مَنْسُوْخٌ -এর মধ্যে সাদৃশ্য হওয়া কিংবা সহজ ও ছওয়াবের দিক দিয়ে نَاسِخٌ টি উত্তম হওয়া। শব্দের উত্তমতা অথবা সমকক্ষতা উদ্দেশ্য নয়। তাই কুরআন ও হাদীসের শাব্দিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটি অপরটির জন্য نَاسِخٌ হওয়া আপত্তির কারণ না হওয়াই যথাযথ। এমনিভাবে نَاسِخٌ টি সমকক্ষ হওয়া কিংবা مَنْسُوْخٌ থেকে উত্তম হওয়া ও আপত্তির কারণ হতে পারে না। কেননা এ বিষয়গুলো উপকার এবং ছওয়াবের দিক দিয়ে উত্তম হওয়ার পরিপন্থি নয়। نَاسِخٌ টি مَنْسُوْخٌ -এর তুলনায় অতি সহজ হওয়া যেমন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের স্থলে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিংবা مِيْرَاثٌ بِالْقَرَابَةِ দ্বারা مِيْرَاثٌ بِالْهِجْرَةِ রহিত হওয়া অথবা দিবারাত্রির রোজার হুকুম দিনের রোজার দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া বা যুদ্ধে একজন মুসলিম সৈন্য দশজন কাফের যুদ্ধার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার হুকুম একজন মুসলিম যোদ্ধা দুজন কাফের যোদ্ধার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

আর نَاسِخٌ এবং مَنْسُوْخٌ উভয়টি সাদৃশ্য হওয়ার উপমা হলো যেমন- বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার হুকুম বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়া।

পরিবর্তন ব্যতীত নসখ -এর উপমা যেমন : فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً আর نَاسِخٌ কঠিনতম হওয়ার উপমা যেমন ক্ষমা বিষয়ের আয়াতগুলো যুদ্ধের আয়াতগুলো দ্বারা রহিত হওয়া। অথবা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রোজা রাখা/ রোজা না রেখে ফেদিয়া দেওয়ার অনুমতি রোজা রাখাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার হুকুম দ্বারা রহিত করে দেওয়া। -[প্রাগুক্ত]

নসখ -এর জন্য তারিখের পূর্বাপর হওয়া : এমনিভাবে নসখকে নির্ধারণের জন্য আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ জানা অত্যাবশ্যক। যাতে করে পরবর্তী আয়াতকে نَاسِخٌ [রহিতকারী] এবং পূর্বের আয়াতকে মনসূখ বলা যায়। তাই কোন সূরাগুলো মক্কী, কোন সূরাগুলো মদনী, কোন সূরাগুলো সফরাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন সূরাগুলো সফর ব্যতীত অন্যাবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে এ সম্পর্কে অবগতিও জরুরি। যাতে করে আয়াত পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী হওয়ার ব্যাপারে সঠিকভাবে জানা যায়।

সুতরাং যে সূরাগুলোতে শুধু نَاسِخٌ আয়াতসমূহ রয়েছে, সেগুলো সর্বমোট ৬টি সূরা, যে সূরাসমূহে نَاسِخٌ ও مَنْسُوْخٌ উভয় প্রকারের আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরা ২৫টি, যে সূরাসমূহে শুধু مَنْسُوْخٌ আয়াতসমূহ রয়েছে, এমন সূরা ৪০টি, তবে যে সমস্ত সূরা نَاسِخٌ ও مَنْسُوْخٌ উভয় প্রকার আয়াতসমূহ থেকে শূন্য এমন সূরা ৪৩টি; যেগুলোর ব্যাখ্যা পূর্বে চলে গেছে।

অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তীগণের পরিভাষাসমূহের পার্থক্য : এ বিষয়ে مُتَقَدِّمْ ও مُتَاَخِّرْ আলেমগণের পরিভাষায়ও কিছুটা ব্যবধান রয়েছে। অগ্রবর্তীগণের মতে নস্খ -এর ক্ষেত্রে এতবেশি প্রশস্ততার সাথে কাজ নেওয়া হয়েছে যে, বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তনের বেলায়ও তারা نَسْخٌ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তাই نَسْخٌ -এর পরিমাণ তাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি হবে। আর পশ্চাদ্বর্তীগণের পরিভাষার সীমা অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই তাদের মতে নসখ -এর সংখ্যাও অনেক কম। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) মোট পাঁচটি আয়াত مَنْسُوْخٌ মানেন। দ্বিতীয় হুকুম নাসিখ -এর জন্য যৌক্তিক হিসেবে যে বিষয়গুলো থাকা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা সে আয়াতগুলোতে সে বিষয়গুলোর ইঙ্গিত করেছেন-

১. এর ভিত্তি কল্যাণের উপর হওয়া।

২. নির্দেশদাতা ক্ষমতাশালী হওয়া।

৩. অন্য কেউ বিরোধিতা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা, উক্ত আয়াত সে দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যা আগন্তুক ও তরিকাপন্থির ইচ্ছা ব্যতীত ধ্বংসশীল কিংবা পরাজিত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা সেটার চেয়ে উত্তম অথবা সেটার তুল্য প্রদান করেন। ধ্বংসশীল বস্তুর ব্যাপারে বান্দার আক্ষেপ করা ঠিক নয়। -[কামালাইন খ. ১. পৃ. ১১৭]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٨. وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يُوَسِّعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا اَمْ بَلْ اَ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى اَىْ سَأَلَهُ قَوْمُهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً وَغَيْرَ ذٰلِكَ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ اَىْ يَأْخُذْ بَدْلَهُ بِتَرْكِ النَّظَرِ فِي الْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَاقْتِرَاحِ غَيْرِهَا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ـ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَالسَّوَاءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسَطُ ـ

১০৮. মক্কাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করার এবং তাদেরকে আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করার আবেদন জানালে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও যেরূপ মূসাকে করা হয়েছিল? অর্থাৎ যেরূপ তাঁকে তাঁর সম্প্রদায় করেছিল? যেমন বলেছিল, আল্লাহ তা'আলাকে আমাদের স্বচক্ষে প্রদর্শন কর, ইত্যাদি। এবং যে কেউ ঈমানের স্থলে কুফরির বিনিময় করে অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের উপর পর্যবেক্ষণ ত্যাগ করে এবং অন্য কিছুর আবদার তুলে ঈমানের পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়। সত্য পথকে ভুলে যায়।

اَمْ تُرِيْدُوْنَ এই আয়াতে اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلسَّوَاءُ -এর মূল অর্থ হলো মাঝামাঝি [পথ] মধ্য [পথ]।

١٠٩. وَدَّ كَثِيْرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مَفْعُوْلٌ لَهُ كَائِنًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ اَىْ حَمَلَتْهُمْ عَلَيْهِ اَنْفُسُهُمُ الْخَبِيْثَةُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ الْحَقُّ ـ فِىْ شَانِ النَّبِىِّ ﷺ فَاعْفُوْا عَنْهُمْ اَيْ اُتْرُكُوْهُمْ وَاصْفَحُوْا اَعْرِضُوْا فَلَا تُجَازُوْهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط فِيْهِمْ مِنَ الْقِتَالِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ ـ

১০৯. ঈর্ষামূলক মনোভাববশত তাদের নিকট তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই কামনা করে ঈমান আনয়নের পর পুনরায় তোমাদেরকে কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে। অর্থাৎ তাদের হীন মানসিকতা এরূপ বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করে। তোমরা তাদের ক্ষমা কর তাদের ছেড়ে দাও এবং উপেক্ষা কর বর্তমানে তাদের কোনো প্রতিফল দিও না যতক্ষণ না তাদের বিষয়ে আল্লাহ কোনো নির্দেশ অর্থাৎ জিহাদের নির্দেশ দেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لَوْ শব্দটি এই স্থানে مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ এর পরবর্তী ক্রিয়াটি ক্রিয়ার ধাতু অর্থে ব্যবহৃত।

حَسَدًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ لَهُ বা হেতুবোধক কর্মকারক।

مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ এটা উহ্য كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

http://islamiboi.wordpress.com

١١٠. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طَاعَةٍ كَصَلٰوةٍ وَصَدَقَةٍ تَجِدُوْهُ اَىْ ثَوَابَهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ -

১১০. তোমরা সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং উত্তম কাজের আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর কাজের যেমন- সালাত, সাদকা ইত্যাদি যা কিছু পূর্বে প্রেরণ করবে, আল্লাহর নিকট তা অর্থাৎ তা পুণ্যফল পাবে। তোমারা যা কর আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنْ يُوَسِّعَهَا : এর মর্ম হলো আমাদের নগর থেকে পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দাও, যাতে শহর প্রশস্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بَلْ : এ দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, এখানে اَمْ শব্দটি مُنْقَطِعَةٌ যা بَلْ এবং هَمْزَهِ اِسْتِفْهَامْ -এর অর্থে।

قَوْلُهُ اَنْ تَسْئَلُوْا : اَنْ نَاصِبَةٌ এবং اَنْ تَسْئَلُوْ মহল হিসেবে مَنْصُوْب তথা تُرِيْدُوْنَ ফে'লের মাফউল।

اَىْ تُرِيْدُوْنَ سُوَالَ رَسُوْلِكُمْ

قَوْلُهُ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى : এটি مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ এবং উহ্য মাসদারের সিফত

اَىْ تَسْئَلُوْا سُوَالًا مِثْلَ سُوَالِ مُوْسٰى .

কেউ কেউ বলেন, এটি حَالْ -এর ভিত্তিতে মানসূব।

اَنْ تَسْئَلُوْا মাসদার হয়ে تُرِيْدُوْنَ -এর মাফউল। সে মাফউল থেকে كَمَا سُئِلَ হাল অর كَمَا -এর মধ্যে كَافْ হরফে জার مِثْلٌ -এর অর্থে এবং مَا হলো مُقَدَّرِيَّةٌ

قَوْلُهُ وَالسَّوَاءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسَطُ : অর্থাৎ سَوَاءٌ শব্দটি وَسَطْ -এর অর্থে, কেউ বলেন سَوَاءٌ ইসমে ফায়েলের অর্থে মাসদার। اَىْ مُسْتَوِىْ - সুতরাং سَوَاءَ السَّبِيْلِ -এর অর্থ হবে- اَلطَّرِيْقُ الْمُسْتَوِىْ

قَوْلُهُ وَدَّ : مَاضِىْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। مَوَدَّةً - وُدًّا (س) وَدَّ কামনা করা, আশা করা

قَوْلُهُ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ : لَوْ - حَرْفِ مَصْدَرِىْ ফেয়েলের পরে ব্যবহৃত হলে تَمَنِّىْ বা আশা আকাঙ্ক্ষার অর্থ দেয়। মূল ইবারত হবে এভাবে- وَدَّ كَثِيْرٌ رَدَّكُمْ الخ - وَدَّ যেহেতু صَيَّرَ -এর অর্থে তাই দুটি মাফউলকে নসব দেয়। প্রথম মাফউলটি হলো كُمْ আর দ্বিতীয়টি হলো كُفَّارٌ

قَوْلُهُ كَائِنًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ : মুফাসসির (র.) كَائِنًا -কে উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ বাক্যাংশটি كَائِنًا মাহযূফের مُتَعَلِّقٌ হয়ে حَسَدًا -এর সিফত হয়েছে।

حَسَدًا : حَسَدْ অর্থ হিংসা। পরিভাষায় حَسَدْ বলা হয় اَلْحَسَدُ تَمَنِّى زَوَالِ نِعْمَةِ الْاِنْسَانِ অর্থাৎ নিয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনা করা।

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ : مِنْ بَعْدِ টি وَدَّ -এর مُتَعَلِّقٌ আর مَا হলো مَصْدَرِىْ - اَىْ بَعْدَ تَبَيُّنِ الْحَقِّ لَهُمْ

اِعْتِرَاضْ : مَنْ كَانَ هُوْدًا বাক্যের كَانَ -এর ضَمِيْرِ مُفْرَدْ টি كَانَ -এর اِسْمِ আর هُوْدًا টি كُنْ -এর خَبَرْ হয়েছে। যা বহুবচন। অথচ اِسْمِ كَانَ ও خَبَرِ كَانَ -এর মাঝে مُطَابَقَتْ হওয়া আবশ্যক।

উত্তর : এখানে كَانَ -এর ইসমে মুফরাদ আনার ক্ষেত্রে لَفْظِ مَنْ -এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। আর খবর তথা هُوْدًا বহুবচন আনার ক্ষেত্রে مِنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। এতে কোনো দোষ নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا الخ : আয়াতের যোগসূত্র : পূর্বে নসখ সম্পর্কে ইহুদি ও মুশরিকদের সমালোচনা ও আপত্তির খণ্ডন করা হয়েছে। এখন এ আয়াতে মুসলমানদেরকে রাসূল ﷺ-এর উপর ভরসা ও আস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যেন বলা হয়েছে–

لَا تَكُوْنُوْا فِيْمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِثْلَ الْيَهُوْدِ فِيْ تَرْكِ الثِّقَةِ بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَاقْتِرَاحِ غَيْرِهَا فَتَضِلُّوْا وَتَكْفُرُوْا بَعْدَ الْاِيْمَانِ -

قَوْلُهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : যোগসূত্র : পূর্বে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের স্থলে কুফর গ্রহণ করেছিল। এখন এ আয়াতে বলা হচ্ছে তারা মুসলমানদের ব্যাপারেও এ কামনা করে যে, মুসলমানরা ঈমানের পর কাফের হয়ে যাক।

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ الخ শানে নুযূল : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এবং হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) পরাজয়ের উহুদ থেকে ফেরার পথে ইহুদিদের এক জামাতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাদেরকে দেখে ইহুদিরা বলতে লাগল, আমরা কি তোমাদেরকে বলিনি যে, ইহুদি ধর্মই সঠিক? ইহুদি ধর্ম ছাড়া যা কিছু আছে সবই বাতিল। যদি মুহাম্মদ ﷺ হকের উপর থাকতেন তাহলে তার সাথী-সঙ্গীরা নিহত হতো না। অথচ মুহাম্মদ ﷺ দাবি করে যে যখন সে যুদ্ধ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন। ইহুদিদের একটানা এ কথাগুলো শুনে হযরত আম্মার (রা.) বললেন, আচ্ছা বলো দেখি, তোমাদের ধর্মে অঙ্গীকার ভঙ্গের কি বিধান? ইহুদিরা জবাব দিল, এটাতো অত্যন্ত জঘন্য কাজ। হযরত আম্মার (রা.) বললেন, আমরা তো হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে আমৃত্যু তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি। সেটা কখনো ভঙ্গ করবো না। ইহুদি বলল, আম্মার বেদীন হয়ে গেছে। তখন হযরত হুজায়ফা (রা.) জবাব দিলেন, رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا যাহোক, তাঁরা ফিরে এসে রাসূল ﷺ -এর কাছে এ ঘটনার বিবরণ দিলে রাসূল ﷺ বলেন– اَصَبْتُمَا الْخَيْرَ وَاَفْلَحْتُمَا অর্থাৎ তোমরা কল্যাণ করেছো এবং সফল হয়েছো। তারপর আয়াত নাজিল হয় ...... وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ –[ছাবীর সূত্রে জামালাইন খ. ১, পৃ. ২০২]

বর্তমানে খ্রিস্টান জগতের পক্ষ থেকে ইসলামি আকিদাসমূহের পরিপন্থি যে উন্মুক্ত সুপরিকল্পিত ও সম্প্রসারিত আকারের এবং ইহুদি বিদ্বানদের পক্ষ হতে তুলনামূলক লঘু ও গোপন রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধের যে প্রচারণা [ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যম সূত্রে] মুসলিম দেশগুলোতে অহরহ ও অবিরাম চালানো হচ্ছে, এর সবগুলোই তাদের সে সুপ্ত বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। এসব প্রচেষ্টা ও তৎপরতার শেষ লক্ষ্য থাকে এটাই যে, মুসলমানরা যদি এতটুকুও ইহুদি বা খ্রিস্টান মতবাদ [কালচার-সংস্কৃতি] গ্রহণ করে, তাতে অন্তত এতটুকু লাভ হবে যে, তারা নিজেদের ধর্মের প্রতি অবশ্যই বীতশ্রদ্ধ ও আস্থাহীন হয়ে পড়বে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২০০]

قَوْلُهُ وَنَزَلَ لَمَّا الخ : এর দ্বারা মুফাসসির (র.) اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا الخ আয়াতের শানে নুযুলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ মক্কাবাসী যখন মক্কা নগরীকে প্রশস্ত করে দেওয়া এবং সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করার দাবী করল, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ : অর্থাৎ এসব চেষ্টা-তৎপরতার পেছনে ঐকান্তিকতা ও কল্যাণ কামনা কার্যকর ছিল না। এগুলোর উৎস ছিল হিংসা ও বিদ্বেষ। ইহুদিদের স্বভাব বিদ্বেষ তো তাদের নবী ও পথ প্রদর্শকদের পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং তারা তাদেরও রেহাই দেয়নি।

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ : অর্থাৎ কিতাবীদের এ প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতার কারণ কোনো দ্বিধা-সংশয় বা যৌক্তিক বিভ্রান্তি নয়। এর কারণ শুধুই জিদ, হঠকারিতা ও অহংকার। কেননা সত্য তাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِىَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ : এখনই হে মুসলমানগণ! তাদের কোনো প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না। ইহুদিদের বিদ্বেষ ও উস্কানিমূলক তৎপরতায় মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তাই তাদের আদেশ-উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এ মুহূর্তে [ধৈর্য ধারণকর] ক্ষমা মার্জনা করে যেতে থাক, প্রতিশোধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার এখনই সূচনা করে দিয়ো না।

قَوْلُهُ وَمَا تُنْفِقُوْا لِاَنْفُسِكُمْ : لِاَنْفُسِكُمْ নিজেদের জন্য। এখানে সম্বন্ধপদ (مُضَافْ) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لِنَجَاةِ اَنْفُسِكُمْ নিজেদের কল্যাণ, নিজেদের নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ : আল্লাহ তা'আলার কাছে তা পেয়ে যাবে। অর্থাৎ ছওয়াব ও প্রতিদান পেয়ে যাবে। হুবহু সে আমলগুলো বিদ্যমান দেখা যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।

দরখাস্তকৃত এবং দরখাস্ত ছাড়া উভয় মুজিযাসমূহের পার্থক্যের বিবরণ : মক্কার কাফের ও আরবের মুশরিকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় এমন উৎসুক যুবকও ছিল, যাদের কাজ ছিল শুধু হাঙ্গামা ও বিরোধকে দমন করা। তারা বিভিন্ন রকমের দরখাস্তকৃত মুজিযাসমূহ তলব করত। যেগুলোর ব্যাখ্যা সূরা আনআমে আসবে।

প্রত্যেক কাজের রহস্য ও কল্যাণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জানেন। অন্য কারোও কর্ম নির্ধারণের অধিকার নেই। তাই এ ধরনের দরখাস্তসমূহ সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করা হতো। আর যেহেতু আবদেনকারীদের উদ্দেশ্য অধিকাংশই ভুল ছিল এবং তাদের রীতি-নীতি বৈরিতা ছিল। এ কারণে আল্লাহর বিধান ও নিয়ম এটাই ছিল যে, এধরনের আবদারসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হতো।

আর যদি দরখাস্ত পূর্ণ করা হতো। তবে এ শর্তের সাথে যে, তারপরও ঈমান গ্রহণ না করলে তা হলে প্রমাণ পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর আজাব আসা নিশ্চিত হয়ে যায়।

এ স্থানে ব্যাপারটি যেহেতু আখেরী উম্মতের, তাদেরকে হালাক ও ধ্বংস করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা নেই। আর এ দিকে বিরোধীদের ভাগ্যে ঈমান গ্রহণের তৌফিকও নেই। তাই তাদের দরখাস্তসমূহ পূর্ণ করা কল্যাণজনক হিসেবে গণ্য করা যায়নি। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৮]

যুদ্ধ ক্ষমা ও উপেক্ষা করা দেওয়া : যেহেতু মুসলমানদের সে সময়ের অবস্থার চাহিদা এটাই ছিল যে, পরিপূর্ণ ধৈর্য ধারণ এবং কঠোরতা ব্যতীত সময়কে অতিবাহিত করা, বিরোধীদের অপকর্মের শাস্তি উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ হত্যা ও ট্যাক্স -এর বিধানের মাধ্যমে করা হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সহানুভূতি এবং দেখেও না দেখার ভান করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর জাতির প্রকৃত ও ভিতরগত ক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি অন্য কিছু সম্ভব নয়। কেননা প্রতিকূল পরিবেশ ও বিস্বাদ অবস্থা সহ্য করার অভ্যাস সৃষ্টি দ্বারা চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং বড়র চেয়ে বড় কঠিন ও সংকটময় অবস্থাসমূহ হাসিমুখে সহ্য করার ট্রেনিং হয়ে যায়। প্রকৃত যুদ্ধ ও মারামারির অবস্থাতেও এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। যেগুলোর মধ্যে ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হয়। অতএব আয়াতকে সাময়িক অবস্থাদির উপর ভিত্তি করে مَنْسُوْخ [রহিত] মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা عَفْو এবং صَفْح দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু যুদ্ধ না করা নয়; বরং ব্যাপক অর্থ। যা যুদ্ধ করা ও যুদ্ধ না করা উভয় অবস্থাই গণ্য। আর যেহেতু শত্রুদের বিরোধী কার্যকলাপ দেখে উত্তেজনা আসতে পারে, তাই শুধু বসে থাকাও ন্যায়সঙ্গত নয়। এ যুক্তিসিদ্ধতা দ্বারা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক শক্তির প্রস্রবণ -এর দিকে লক্ষ্যকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাদি ইবাদতের বিধানাবলির প্রোগ্রামসমূহ বলে দিয়েছেন যে, বর্তমানে নিজেকে শারীরিক ও আর্থিক কষ্টসমূহ সহ্যের অভ্যস্ত বানাও। যাতে করে যুদ্ধের বিধানাবলি মেনে নেওয়ার জন্য নিজকে তৈরি করতে পার। নতুবা প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধের নির্দেশাবলি নিষ্ফল হয়ে থাকবে। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১১৯]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١١. وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا جَمْعُ هَائِدٍ اَوْ نَصٰرٰى قَالَ ذٰلِكَ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَنَصَارٰى نَجْرَانَ لَمَّا تَنَاظَرُوْا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ اَيْ قَالَ الْيَهُوْدُ لَنْ يَدْخُلَهَا اِلَّا الْيَهُوْدُ وَقَالَ النَّصَارٰى لَنْ يَّدْخُلَهَا اِلَّا النَّصَارٰى تِلْكَ الْمَقُوْلَةُ اَمَانِيُّهُمْ شَهَوَاتُهُمُ الْبَاطِلَةُ قُلْ لَهُمْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ حُجَّتَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فِيْهِ ـ

১১১. এবং তারা বলে ইহুদি বা খ্রিস্টান ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে একবার মদীনার ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানরা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তখন তারা এ কথা বলেছিল। ইহুদিরা বলেছিল যে, ইহুদি ব্যতীত আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর খ্রিস্টানরা বলেছিল যে, খ্রিস্টান ছাড়া জান্নাতে আর কেউ প্রবেশ করবে না। এটা এই বক্তব্য তাদের আশা মাত্র মিথ্যা কামনা মাত্র। তাদেরকে বল এতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই কথার উপর তোমাদের প্রমাণ পেশ কর هُوْدٌ শব্দটি هَائِدٌ -এর বহুবচন।

١١٢. بَلٰى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ اَيْ اِنْقَادَ لِاَمْرِهٖ وَخُصَّ الْوَجْهُ لِاَنَّهٗ اَشْرَفُ الْاَعْضَاءِ فَغَيْرُهٗ اَوْلٰى وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّدٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اَيْ ثَوَابُ عَمَلِهِ الْجَنَّةُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ فِي الْاٰخِرَةِ ـ

১১২. হ্যাঁ নিশ্চয় অন্যান্যরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে কেউ আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় চেহারা সমর্পণ করে। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে। এই আয়াতে চেহারার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো মানব শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ এটাই। সুতরাং এটা যদি অনুগত হয় তবে অন্য অঙ্গসমূহের তো কথাই নেই। আর সে হয় সৎকর্ম পরায়ণ অর্থাৎ তাওহীদপন্থি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তার ফল তাঁর কর্মের পুণ্যফল জান্নাত এবং তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না পরকালে।

তাহকীক ও তারকীব

هُوْدٌ : এটা هَائِدٌ এর বহুবচন। যেমন عَائِذٌ -এর বহুবচন عُوْذٌ ـ يَهُوْدُ ـ هَادَ তখনি বলা হয় যখন دَخَلَ فِي الْيَهُوْدِيَّةِ যখন ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত হয়। هَائِدٌ :এটা تَائِبٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ تُبْنَا اِلَيْكَ প্রকৃত পক্ষে গো-বৎস পূজা থেকে তওবাকারী হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে [illegible] মধ্যে প্রশস্ততা হয়ে গেছে এবং একটি দলের আস্থা ছিল যে, প্রতিটি বাক্যকে এর প্রবক্তা দলের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হবে। তাই উভয় বাক্যকে একমালীভাবে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছে।

نَجْرَانُ : ইয়ামানের একটি শহরের নাম। [illegible] খ্রিস্টানদের এ প্রতিনিধি দলটি রাসূল ﷺ -এর [illegible] [illegible] হয়েছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

تِلْكَ : এর مُشَارٌ اِلَيْهِ মুফরাদ ও مَقُوْلَهٗ নির্ধারণ করা হয়েছে এর খবর اَمَانِيُّ কেননা প্রকৃত পক্ষে সেটা অনেকগুলো আশাসমূহের উপর গণ্য ছিল অথবা তাবীলের সাথে مَقُوْلَةُ كُلِّ قَائِلٍ عَلَيْحِدَةٍ হতে পারে। আর তৃতীয় নির্দেশনা এটা যে, اِمْتِثَالُ تِلْكَ الْمَقُوْلَةِ اَمَانِيُّهُمْ । هَاتُوا মূলে ছিল اٰتُوْا হামযাকে هَاءٌ দ্বারা مُضَافٌ- কে مُقَدَّرٌ মেনে عِبَارَتٌ হবে অর্থাৎ পরিবর্তন করেছে। এটাকে اَمْرُ تَعْجِيْبِيْ বলা হয়। অর্থে بُرْهَانٌ / اَحْضِرُوْا . بُرْهَةٌ অর্থে قَطْعَةٌ থেকে নির্গত। অর্থাৎ বিপক্ষের কথা বা প্রমাণ এর দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যায়। কিংবা بَرْهَنَ থেকে নির্গত। অর্থ-বয়ান ও বর্ণনা। প্রথম অবস্থায় এ শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِفٍ আর দ্বিতীয় অবস্থায় مُنْصَرِفٌ হবে। بَلٰى যেহেতু নাবাচককে হ্যাঁ-বাচক করার জন্য আসে, এ কারণে মুফাস্সির (র.) يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ ইবারত নির্ধারণ করেছেন। আর এজন্যই بَلٰى -এর উপর وَقْف করা حَسَنٌ অর্থাৎ তারপর مَنْ اَسْلَمَ থেকে নতুন [পৃথক] বাক্য। وَجْه -কে اَشْرَفُ الْاَعْضَاءِ [সমস্ত অঙ্গসমূহ থেকে উৎকৃষ্ট] এ জন্য বলা হয়েছে যে,এটা সেজদার স্থান। যা সমস্ত একাগ্রতার ভিত্তি ও অনুভূতিসমূহের এবং চিন্তা ও ভাবনার খনি। فَلَهٗ যেহেতু مَنْ মুবতাদা مُتَضَمِّنْ مَعْنٰى شَرْط তাই খবরের উপর فَاءٌ জাযাইয়া আনা দুরস্ত রয়েছে। চাই مَنْ -কে شَرْطِيَّة বলা হোক অথবা مَوْصُوْلَة বলা হোক। আর একটি পদ্ধতি এটাও হতে পারে যে, مَنْ اَسْلَمَ ফেয়েলে মাহযূফের فَاعِلٌ হবে। অর্থাৎ بَلٰى يَدْخُلُهَا مَنْ اَسْلَمَ আসল عِبَارَتٌ হবে। এখন فَلَهٗ اَجْرُهٗ কালামে মাতূফ হয়ে যাবে। فِى الْاٰخِرَةِ -এর কয়েদ মুসান্নিফ (র.) এজন্য লাগিয়েছেন যে, দুনিয়াতে তো اَشَدُّ بَلَاءِ الْاَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ দৃষ্টিতে মুমিনগণ ভয়, চিন্তা দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে বেষ্টিত থাকেন। যদিও সেগুলোর প্রভাব প্রকৃতভাবে কলব পর্যন্ত পৌঁছে না।

اَمَانِيُّ : এটি اُمْنِيَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ আশা বাসনা। (م ـ ن ـ ن) [ধাতুমূল] থেকে নির্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ : ইহুদিদের এ আশা কখনো পূর্ণ হবার নয় এবং এ বক্তব্যের সমর্থনে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণও নেই, কোনো উদ্ধৃতিমূলক ও বাণীভিত্তিক প্রমাণও নেই। এখানে লক্ষণীয় শুধু বুযার্গযাদা [মহা মনীষীর সন্তান] হওয়া এবং বংশধারা ও জন্মসূত্রীয় আভিজাত্য যখন নবীগণের বংশধরদের ক্ষেত্রে কোনো সুফলদায়ক হতে পারল না, সে ক্ষেত্রে আমাদের সমকালীন পীরজাদা ও শায়খজাদাদের শুধু জন্মগত আভিজাত্যে তুষ্ট হয়ে থাকা যে কতখানি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়।

بَلٰى : অর্থাৎ মুক্তির সঠিক বিধি এই যা এখন বর্ণিত হচ্ছে। بَلٰى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়ের খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান বুঝায়। অর্থাৎ তোমাদের দাবি নিরেট ভ্রান্ত দাবি। প্রামাণ্য তা-ই যা এখনই বর্ণিত হচ্ছে।

وَجْهٌ : অর্থাৎ তার আমল এবং বাস্তব জীবনেও সে তাওহীদ মতবাদের অনুসারী হবে। যেন ঈমান ও ভালো আমল [সৎকর্ম] উভয় একত্র হবে। وَجْهٌ -এর শাব্দিক অর্থ চেহারা অবয়ব। কিন্তু ব্যবহারিক ভাষায় প্রায়শ সত্তা বা মূল অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানেও অনুরূপই উদ্দেশ্য। অনেক সময় গোটা সত্তাকে وَجْهٌ বলে ব্যক্ত করা হয়। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে রয়েছে- وَجْهٌ শব্দ হয়তো রূপক অর্থে সত্তা বুঝাবার জন্য, কিংবা পরোক্ষ অর্থে ইচ্ছা বুঝাবার জন্য।

(وَقَالُوْا وَجْه اِمَّا مُسْتَعَارٌ لِلذَّاتِ وَاِمَّا مَجَازٌ عَنِ الْقَصْدِ . رُوْحُ الْمَعَانِيْ)

قَوْلُهٗ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ : আল্লাহ তা'আলা এতে অবনমিত আত্মসমর্পিত অর্থাৎ শিরকের সংমিশ্রণ ব্যতীত পুরোপুরি তাওহীদের মতবাদ গ্রহণ করা। اَخْلَصَ نَفْسَهٗ لَا يُشْرِكُ بِهٖ غَيْرَهٗ অর্থাৎ নিজেকে একনিষ্ঠ করে তার সঙ্গে কাউকে শরিক করে না। -[কাশশাফ]। তাঁকে ছাড়া কাউকে উদ্দেশ্য [মাকসূদ] বানায় না। -[রুহুল মা'আনী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১১৩. ১১৩. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرى عَلٰى شَيْءٍ مُعْتَدٍّ بِهِ وَكَفَرَتْ بِعِيْسٰى وَقَالَتِ النَّصٰرى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ مُعْتَدٍّ بِهِ وَكَفَرَتْ بِمُوْسٰى وَهُمْ اَيِ الْفَرِيْقَانِ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَفِيْ كِتَابِ الْيَهُوْدِ تَصْدِيْقُ عِيْسٰى وَفِيْ كِتَابِ النَّصَارٰي تَصْدِيْقُ مُوْسٰى وَالْجُمْلَةُ حَالٌ كَذٰلِكَ كَمَا قَالَ هٰؤُلَاءِ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَيِ الْمُشْرِكُوْنَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ بَيَانٌ لِمَعْنٰى ذٰلِكَ اَيْ قَالُوْا لِكُلِّ ذِيْ دِيْنٍ لَيْسُوْا عَلٰى شَيْءٍ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ فَيُدْخِلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلُ النَّارَ ـ

ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর নেই আর তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর অস্বীকার করে এবং খ্রিস্টানরা বলে, ইহুদিরা কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয়ের উপর নেই আর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর অস্বীকার করে অথচ তারা উভয় দলই তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব পাঠ করে ইহুদিদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর সত্যায়ন রয়েছে আর খ্রিস্টানদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যায়ন বিদ্যমান। وَهُمْ এই বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

তারা যেরূপ তদ্রূপ যারা কিছুই জানে না তাও অর্থাৎ আরববাসী মুশরিক এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও অনুরূপ কথা বলে। مِثْلَ قَوْلِهِمْ এটা প্রথমোক্ত ذٰلِكَ -এর مَعْنٰى বা মর্মের بَيَانٌ বা ভাষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই প্রতিপক্ষকে বলে যে, তাদের ধর্মে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। সুতরাং ধর্ম সম্পর্কে যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মীমাংসা করবেন; অনন্তর সত্যপন্থিদের জান্নাতেও বাতিলপন্থিদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

তাহকীক ও তারকীব

وَهُمْ অথচ তারা। ওয়াও হরফটি حَالِيَةٌ [অবস্থা প্রকাশক] عَاطِفَةٌ [সংযোজক] নয়।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ : كَذٰلِكَ اَيْ مِثْلَ ذٰلِكَ الَّذِيْ سَمِعْتَ بِهِ : এখানে كَافٌ টি نَصَبٌ -এর স্থলে পতিত হয়েছে। অথবা مَصْدَرٌ مَحْذُوْفٌ -এর সিফত হিসেবে اِفَادَةُ حَصْرٍ -এর জন্য মুকাদ্দাম করা হয়েছে– اَيْ قَوْلًا ذٰلِكَ الْقَوْلِ بِعَيْنِهِ لَا قَوْلًا مُغَايِرًا لَهُ

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এস্থলে প্রশ্ন জাগে যে, كَذٰلِكَ বলার পর مِثْلَ قَوْلِهِمْ বলার কি প্রয়োজন ছিল? কোনো কোনো তাফসীরকার এর জবাব দিয়েছেন যে, مِثْلَ قَوْلِهِمْ হলো كَذٰلِكَ -এর ব্যাখ্যা ও শক্তিবর্ধক। যেমন আল্লামা সুয়ূতী (র.) مِثْلَ -এর পরে بَيَانٌ لِمَعْنٰى ذٰلِكَ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন– مِثْلَ قَوْلِهِمْ হলো كَذٰلِكَ قَالَ -এর বদল। قَوْلِهِمْ -এর পরে ... الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর বদল।

কেউ বলেন, এ স্থলে পৃথক দু'টি উপমা আছে। তাই দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একটি উপমা দ্বারা তো এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তাদের উক্তি ইহুদি-খ্রিস্টানদেরই অনুরূপ। অর্থাৎ তারা যেমন অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে, এরাও তেমনি

http://islamiboi.wordpress.com

নিজেদের ছাড়া অন্যদের পথভ্রষ্ট বলে। দ্বিতীয় উপমার উদ্দেশ্য এই যে, আহলে কিতাব যেমন এ দাবি কোনো রকম দলিল ছাড়া কেবল নিজেদের কু-প্রবৃত্তি ও বিদ্বেষবশত করে, তদ্রূপ পৌত্তলিকেরা ও বিনা দলিলে কেবল নিজেদের খেয়াল খুশিমতো এরূপ দাবি করে।

وَغَيْرُهُمْ : غَيْرُهُمْ -এর শেষে رَفع হবে এবং اَلْمُشْرِكُوْنَ -এর সাথে তার عَطْف হবে اَلْعَرَبُ -এর সাথে নয়। অর্থাৎ মুশরিকরা ছাড়াও অন্যান্য কাফেরদেরকেও একই বক্তব্য ছিল।

قَوْلُهُ بَيَانٌ لِمَعْنَى ذٰلِكَ : অর্থাৎ مِثْلَ قَوْلِهِمْ টা হলো كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর বদল। অর্থাৎ পূর্বের বাক্যে বর্ণিত বিষয়টিই এ বাক্যে আরও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْسُوْا : لَيْسُوْا -এর বহুবচনের যমীর অর্থগতভাবে كُلّ -এর দিকে ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتْ ..... وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ : এখানে কিতাব বলতে বনী ইসরাঈলের নবীগণের সহীফাসমূহের সমষ্টি-সংকলন উদ্দেশ্য, যা এখন বাইবেল পুরাতন নিয়ম [ওল্ড টেস্টমেন্ট] নামে পরিচিত। ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই এ সহীফাগুলো ইলহামী ও পবিত্র হওয়ার দাবিদার।

বর্তমান মুসলমানদের কাঁদা ছোড়াছুড়ি অবস্থা : আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর দেখাদেখি মুসলমানরাও তাদের অভিন্ন গ্রন্থ আল কুরআন নিয়ে দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যকে অবজ্ঞাও হেয় প্রতিপন্ন করা, এমনকি ফাসিক ও ভ্রান্ত বলতে শুরু করেছে এবং কাফের বলার পরিস্থিতিও এসেই যেতে চাচ্ছে।

قَوْلُهُ لَا يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ জানে না ওহী ও নবুয়ত সংক্রান্ত কিছু। তারাও বলতে শুরু করেছে, কিতাবীদের কেউই সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ আয়াতে ইলম (عِلْم) দ্বারা উদ্দেশ্য আসমানি কিতাবের ইলম। উল্লিখিত উক্তি কাদের ছিল? সাধারণত আরব মুশকিরদেরই এর বক্তব্য ছিল ধরে নেওয়া হয়েছে। তবে কোনো আসমানী কিতাবের উপর ভিত্তিকৃত নয়, এমন যে কোনো ধর্মের অনুসারী ও যে কোনো জাহিলী ধর্মের অনুসারীদের এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

ইলম ও জ্ঞানের পার্থক্য : পবিত্র কুরআন ইলম [ক্রিয়ামূল عِلْم] ও তার বিভিন্ন ক্রিয়ারূপ ও বিশেষ্য রূপ যথা يَعْلَمُوْنَ ইত্যাদি যেখানে যেখানে ব্যবহার করেছে তা দিয়ে প্রায়শ প্রকৃত জ্ঞান ওহী ও নবুয়তের জ্ঞানই উদ্দেশ্য করেছে। এ ধরনের আয়াত দিয়ে বর্তমানের প্রথাগত বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তালীম রূপে প্রমাণিত করা পবিত্র কুরআনের প্রতি এবং সুবুদ্ধির প্রতি কত বড় অনাচার।

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ : মীমাংসার দ্বারা এখানে কার্যত বাস্তব মীমাংসা উদ্দেশ্য। আর বিতর্ক, আলোচনা ও যুক্তি প্রমাণভিত্তিক মীমাংসা অর্থাৎ হক ও বাতিল এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে অকাট্য মীমাংসা তো এ পৃথিবীর বুকেই হয়ে রয়েছে।

قَوْلُهُ بَيْنَهُمْ : তাদের মাঝে একদল হকপন্থি ও ঈমানদার এবং অপরদল বাতিলপন্থি ও কাফের উদ্দেশ্য। হকপন্থি ও বাতিলপন্থিদের মাঝে আল্লাহ ফয়সালা করে দেবেন।

অযথা দলভুক্ত হওয়ার মন্দতার বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা এমন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও দলভুক্তি থেকে হেফাজত করুন। যাতে করে كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ -এর শিকার না হয় এবং নিজকে ছাড়া অপরের ভালো কাজগুলোকে অস্বীকার না করে। স্বজনপ্রীতির পট্টি যখন চোখে বাধে, তখন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। নিজের মন্দসমূহ ভালো হয়ে এবং অপরের ভাল কাজগুলো মন্দরূপ ধরে সামনে আসে। এ বিনাশ ও দলভুক্তির চাহিদা তো এটাই যে اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا অর্থাৎ স্বয়ং উক্ত উক্তির দ্বারাই উভয় ধর্মকে বাতিল করা হয়ে গেছে। আর রহিত হওয়ার কারণে মুসলমানদের হিসেবে এক পর্যায়ে যদিও এ কথা সঠিক যে, উক্ত দুটি ধর্ম বর্তমানে কার্যকর নয়; কিন্তু স্বয়ং তাদের উদ্দেশ্যে এ বলার দ্বারা এটা নয় যে, তাদের ধর্ম ভিত্তিহীন ছিল বা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব-এর তালীম হিসেবে বিশুদ্ধ ছিল না; কিন্তু এ ইলমি ফয়সালা যখন আহলে ইলম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে কিয়ামতের দিন বাস্তব কার্যকর ফয়সালা করে দুধ এবং পানি পৃথক করে দেওয়া হবে এবং সত্য ও মিথ্যার লড়াই সমাপ্তি করে দেওয়া হবে। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২২]

মাশায়েখে কেরামের জন্য চিন্তার সূক্ষ্মতা : যে সকল আলেম ও মাশায়েখ নিজ নিজ তরীকার উপর এত মগ্ন ও আস্থাশীল যে, অন্যের হক ও সত্যকে দোষারোপ এবং তুচ্ছ করতেও লজ্জা করেন না। তাদের উচিত উক্ত আয়নায় নিজ চিত্রকে দেখে নেওয়া।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١٤. وَمَنْ اَظْلَمُ اَيْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ بِالصَّلٰوةِ وَالتَّسْبِيْحِ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ط بِالْهَدَمِ اَوِ التَّعْطِيْلِ نَزَلَتْ اِخْبَارًا عَنِ الرُّوْمِ الَّذِيْنَ خَرَّبُوْا بَيْتَ الْمَقْدِسِ اَوْ فِى الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا صَدُّوا النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ اُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِيْنَ ـ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَيْ اَخِيْفُوْهُمْ بِالْجِهَادِ فَلَا يَدْخُلُهَا اَحَدٌ اٰمِنًا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ هَوَانٌ بِالْقَتْلِ وَالسَّبْىِ وَالْجِزْيَةِ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ هُوَ النَّارُ ـ

১১৪. যে কেউ আল্লাহর মসজিদে সালাত, তাসবীহের মাধ্যমে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে ও সেটাকে ধ্বংস করে বা রুদ্ধ করে তা ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় তদপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে? না তার চেয়ে অধিক সীমা লঙ্ঘনকারী আর কেউ নেই। রোমকরা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে অথবা মুশরিকরা যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে রাসূলে কারীম ﷺ ও তার সঙ্গীগণকে বায়তুল্লাহ জেয়ারত হতে বাধা প্রদান করেছিল তখন তাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অথচ ভয়-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। اُولٰئِكَ مَا كَانَ এই বাক্যটি যদিও خَبَرِيَّةٌ বা বার্তামূলক তবে এইস্থানে তা اَمْر বা অনুজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তোমরা জিহাদের মাধ্যমে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর। তাদের কেউ যেন নির্বিঘ্নে নিরাপদে এই স্থানে প্রবেশ করতে না পারে। পৃথিবীতে রয়েছে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ হত্যা, গ্রেফতারি, জিযিয়া আরোপের অবমাননা, আর পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মহা শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নাম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَنْ اَظْلَمُ : مَنْ হলো মুবতাদা। مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ আর اَظْلَمُ [ইসমে তাফযীল] হলো তার খবর। আর اِسْتِفْهَامٌ টি হলো اِسْتِفْهَامٌ اِنْكَارِيٌّ অর্থাৎ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِنْهُ

قَوْلُهُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ : مَسَاجِدَ হলো مَنَعَ-এর مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ এবং اَنْ يَذْكُرَ হলো مَفْعُوْل ثَانِيْ - (بِتَاوِيْل مَصْدَرْ) উচিত ছিল। কেননা যে ফে'লের مُضَارِعْ-এর আইন কালিমায় رَفْع হয় তার ظَرْف مَكَانْ হয় مَفْعَلْ-এর ওজনে : এখানে مَسْجِدْ-এর جِيْم-এ কাসরা হয়েছে خِلَافْ قِيَاسْ হিসেবে।

قَوْلُهُ مَسَاجِدَ : প্রশ্ন : مَسَاجِدْ কে বহুবচন কেন ব্যবহার করা হলো? অথচ এ আয়াতে مَسَاجِدْ দ্বারা হয়তো বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। কেননা রোমের অগ্নিপূজক রাজা বুখতে নছর একে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অথবা مَسَاجِدْ দ্বারা মসজিদে হারামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ-কে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ওমরা করতে নিষেধ করেছিল।

উত্তর : আলোচিত দুটি মসজিদই যেহেতু অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি বরকতপূর্ণ তাই এ মসজিদে ইবাদত করতে বাধা প্রদান করা এবং ও বিরান করে দেওয়া যেন সকল মসজিদকে ধ্বংস করার নামান্তর। এ জন্য مَسْجِدْ-এর স্থলে مَسَاجِدْ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ : এখানে اِعْرَابْ-এর দিক দিয়ে চারটি সূরত হতে পারে। যথা–

১. مَنَعَ-এর مَفْعُوْل ثَانِيْ হবে যেমন বলা হয় مَنَعْتُهُ كَذَا

২. مَنَعَ-এর مَفْعُوْلٌ لَهُ হবে مَنَعَ كَرَاهَةَ اَنْ يُذْكَرَ اَوْ مَنَعَ دُخُوْلَ مَسَاجِدِ اللّٰهِ

http://islamiboi.wordpress.com

৩. مَنَعَ ذِكْرَ اسْمِهِ فِيْهَا থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ অর্থাৎ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

৪. مَنَعَ مَسَاجِدَ مِنْ اَنْ يُذْكَرَ হযফ করার কারণে مَنْصُوْب অর্থাৎ حَرْفُ الْجَرِّ

اَوْ : এখানে اَوْ হরফটি تَنْوِيْع বা প্রকরণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, সন্দেহের জন্য নয়।

خَرَابِهَا : কেউ বলেছেন خَرَابْ শব্দটি تَخْرِيْب -এর অর্থে اِسْمِ مَصْدَرْ যা তার مَفْعُوْلْ -এর দিকে مُضَافْ হয়েছে। যেমন سَلَامْ শব্দটি تَسْلِيْمْ -এর ওজনে। আর কেউ বলেন, এটি خَرِبَ -এর মাসদার, যা خَرِبَ بِالْمَكَانِ থেকে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ সেটির রক্ষণাবেক্ষণ বাদ দিয়েছে। যাতে তা নিজে নিজেই বিরান এবং বরবাদ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ : অর্থাৎ এ জুমলাটি শব্দগতভাবে خَبَرِيَّة এবং অর্থগত ভাবে اِنْشَائِيَّة হবে। মূলত একটি প্রশ্নের জবাব প্রদানের জন্যই এ অংশটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রশ্ন : لَا يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَائِفِيْنَ -এর মাঝে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, বিধ্বংস ও বিরানকারী বায়তুল মুকাদ্দাসে ভীতশন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করেছে। অথচ সে অত্যন্ত নির্ভয়ে সেখানে প্রবেশ করছিল এবং এক বছরের অধিক সময় তা দখল করেছিল।

উত্তর : এখানে خَبَرْ টি اَمْرْ -এর অর্থে। অর্থাৎ তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে আল্লাহ তা'আলার ভয় নিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জামাল]

কিন্তু এ জবাবটি সুন্দর নয়। কেননা এখানে كَانَ -এর স্থলে تَعْبِيْر করা হয়েছে। আল্লামা বায়জাবী (র.) বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান থেকে বারণ করা।

(مَعْنَاهُ النَّهْىُ عَنْ تَمْكِيْنِهِمْ مِنَ الدُّخُوْلِ فِى الْمَسْجِدِ . جُمَلْ)

বি. দ্র. সুলতান সালাহুদ্দীন এর যুগে মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَظْلَمُ :

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, তাহলো, কুরআনে কারীমের মাঝে فَمَنْ اَظْلَمُ বাক্যটি বারংবার এসেছে। যেমন–

١. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى . ٢. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهِ . ٣. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ . ٤. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ .

উক্ত বাক্যসমূহের মধ্যে প্রতিটির দাবিই হলো حَصْر তথা সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ তাতে উল্লিখিত কর্ম সম্পাদনকারী থেকে বড় জালেম কেউ নেই। এ অবস্থায় দ্বিতীয় কেউ তার চেয়ে বড় জালেম কিভাবে হবে? অর্থাৎ اَظْلَمِيَّتْ বা অধিক বড় জালেম হওয়ার সঙ্গে যখন কোনো একটি দলকে বিশেষিত করা হয়েছে, তখন দ্বিতীয় কোনো দলকে اَظْلَمِيَّتْ -এর বিশেষণে বিশেষিত করা কিভাবে সঠিক হবে?

উত্তর :

১. প্রত্যেকে তার صِلَةْ -এর অর্থের দিক দিয়ে খাস। যেমন– كَاَنَّهُ قَالَ لَا اَحَدَ مِنَ الْمَانِعِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ

وَلَا اَحَدَ مِنَ الْمُفْتَرِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ .

وَلَا اَحَدَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى هٰذَا الْقِيَاسِ . (جُمَلْ)

মোটকথা اَظْلَمِيَّتْ -এর বহুদিক ও ক্ষেত্র রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দিক ও ক্ষেত্রে অমুকে বড় জালেম হবে। এতে কোনো প্রশ্নই থাকে না

২. মুফাসসিরগণ উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর এভাবেও দিয়েছেন যে, পূর্ণ কুরআন মাজীদে যেসবস্থানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন وَمَنْ اَظْلَمُ শব্দ উল্লেখ করেছেন সবগুলো কর্মই বড় ধরনের অন্যায় এবং এসব অন্যায় কর্ম যে করবে তার থেকে বড় জালেম আর হতে পারে না, অতএব মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করাও একটি বড় অন্যায় কাজ। তাই আল্লাহ وَمَنْ اَظْلَمُ শব্দ প্রয়োগ করে বলেছেন যে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? সুতরাং উক্ত প্রশ্ন করা অবান্তর বৈ আর কিছুই হতে পারে না।

শানে নুযূল : বিধর্মীরা ব্যতীত কেউ আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তার গ্রন্থ ও মসজিদ ধ্বংস করতে পারে না। খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ। তারা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করে তাওরাত পুড়ে ফেলে এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করে দেয়। অথবা এটা মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা নিছক বিদ্বেষ ও হঠকারিতার বশবর্তীতে হুদায়বিয়ার ঘটনায় মুসলিমগণকে বায়তুল্লাহ শরীফে যেতে বাধা দেয়। এ ছাড়া যে কেউ কোনো মসজিদ বিরান বা ধ্বংস করে সে এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ -এর মাঝে مَنَعَ -এর নিসবত مَسَاجِدُ -এর প্রতি কেন করা হলো অথচ প্রকৃত পক্ষে مَمْنُوْعٌ বা বারণকৃত হলো মানুষেরা। মানুষকে বন্দেগী করতে বাধা দেওয়া হয়, মসজিদকে নয়।

উত্তর : مَانِعِيْن বা বারণকারীদের কর্মকাণ্ড যেহেতু মসজিদকে ঘিরেই ছিল যেমন মসজিদে ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ বা ধ্বংস করা, তাই مَنَعَ -এর নিসবত করা হয়েছে مَسَاجِدُ -এর দিকে।

মাসআলা : ফকীহগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন জিকির করা ও প্রবেশে বাধাদান যদি কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন ও শরিয়তসম্মত স্বার্থ রক্ষার জন্য হয়, তবে তা সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবস্থা মসজিদের বিনাশসাধান ও তা অনাবাদ করা নয়; বরং তা-ই প্রত্যক্ষ সংস্কার ও আবাদ রাখার পদ্ধতিভুক্ত।

ফকীহগণ ও আয়াত প্রসঙ্গে নিম্নের মাসআলাগুলোও উল্লেখ করেছেন–

১. মসজিদের জন্য গণ-অনুমতি অর্থাৎ সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার (اِذْنٌ عَامٌ) থাকা।

২. মসজিদের দরজা ও প্রবেশপথ, কোনো ব্যক্তি মালিকানার ভূমিতে না হওয়া। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা, সত্য ধর্ম প্রচারে বিঘ্ন দাঁড় করানো ও সমস্যা উস্কে দেওয়া– এ সবই এ বিধির অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদসমূহ বিনাশের ব্যাখ্যা : মুসান্নেফ (র.) আয়াতের শানে নুযূল দ্বারা তো মসজিদে হারাম ও মসজিদে বায়তুল মাকদিস বিনাশের সূত্র বের হয়ে আসে। কিন্তু কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে ইহুদিদের ঔদ্ধত্য সন্দেহসমূহকে মিশ্রিত করে নিলে এবং সে সন্দেহগুলো স্বাভাবিকভাবে যদি মানুষের অন্তরে স্থান পেয়ে যায় তবে তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে নামাজ রোজাকেও মানুষ বিদায় দিয়ে দিত। যা দ্বারা মসজিদে নববী ও সকল মসজিদসমূহ বিনাশ হয়ে যেত। মোটকথা সে বিভিন্ন প্রকার কুচক্রের ফলাফল দ্বারা সাধারণ ও বিশেষ মসজিদসমূহ বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যেত।

মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ : অথচ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ খোদাভীরু লোকদের কাজ। অতএব কোথায় এ ইহুদিদের আহলে হক হওয়ার জোড়ালো দাবি ও ডোল পিটানো। আর কোথায় তাদের এ অপকর্মসমূহ? লজ্জা লাগে না?

মোটকথা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক সকলেরই নির্লজ্জ আচরণ সামনে এসেছে এ কারণেই দুনিয়াতে তাদের লাঞ্ছনা হয়েছে যে, সকলেই ইসলামের নির্দেশে ট্যাক্সদাতা ও মুসলমানদের প্রজা হয়েছে। আর পরকালের ভরপুর সমাবেশে কুফর ছাড়া মসজিদসমূহ বিনাশের ব্যাপারে যা কিছু লাঞ্ছনা হবে, তা তো অতিরিক্ত।

মসজিদসমূহে তালা লাগানো : মসজিদকে বিনাশ ও ধ্বংস করা এবং নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইবাদত থেকে মানুষকে বাধা দেওয়া যদিও উক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে নিষেধ ও নাজায়েজ প্রমাণিত হয়; কিন্তু মসজিদের সামানাদির হেফাজতের জন্য তালা লাগানো একটি পৃথক ব্যাপার। হ্যাঁ, মসজিদের বিনাশ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিস্তারিত বিধানাবলি মাসায়েলের কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে।

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا বাক্যটির কারণে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, কাফেরের জন্য মসজিদে প্রবেশের অনুমতি আছে। নাকি নেই?

তবে ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত হচ্ছে কোনো মসজিদেই প্রয়োজন ব্যতীত কাফের এর জন্য প্রবেশের অনুমতি নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং বায়তুল মাকদিসে সর্বাবস্থায় কাফের এর জন্য প্রবেশ করা নাজায়েজ ও নিষেধ এবং উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে মুসলমানদের অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশ করতে পারবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মসজিদসমূহের আদব ও সম্মান রক্ষা করে সকল মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে। উক্ত আয়াত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষে দলিল।

ইমাম যাহেদ (র.) اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ দ্বারা আল্লাহর নাম ও তাঁর সত্তা এক হওয়ার ব্যাপারে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দলিল পেশ করেছেন। মুতাযিলারা আল্লাহর জান ও তার (اِسْم) নাম এর মধ্যে পৃথকতার দাবি করে।

قَوْلُهٗ بِالْهَدْمِ اَوِ التَّعْطِيْلِ : هَدْم দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা অগ্নিপূজক রাজা বুখতে নছর সেটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর تَعْطِيْل দ্বারা মসজিদুল হারামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মক্কার মুশরিকরা রাসূল ﷺ -কে বাধা দিয়ে যেন মসজিদে হারামকে مُعَطَّل [বিরান] করে দিয়েছিল।

قَوْلُهٗ اَخِيْفُوْهُمْ بِالْجِهَادِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মসজিদে হারাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে কাফেরদের প্রবেশকে জিহাদের মাধ্যমে বারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। –[হাশিয়ায়ে ছাবী]

অথবা আয়াতের ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, আয়াতটি لَفْظًا وَ مَعْنًا উভয়ভাবেই جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হবে। মর্ম হবে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ এবং হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে সংঘটিতব্য অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। এ ব্যাখ্যাটিই অধিকতর কাছাকাছি মনে হয়। –[হাশিয়ায়ে ছাবী]

قَوْلُهٗ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ الخ : অর্থাৎ এ কাফিরদের জন্য তো এটাই সমীচীন ছিল যে, তারা ভীত অবনত অবস্থায় ও আদব সহকারে মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর মসজিদে প্রবেশ করবে। এর বিপরীতে তারা মসজিদের যে অমর্যাদা করেছে, এটা তাদের জঘন্যতম অপরাধ। অথবা এর অর্থ, তারা সে দেশে সম্মান ও রাজত্বসহ বাস করার উপযুক্ত নয়। কাজেই পরবর্তীতে অবস্থা তাই হয়। সিরিয়া ও মক্কা শরীফের শাসন ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের হাতে অর্পণ করেন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١٥. وَنَزَلَ لَمَّا طَعَنَ الْيَهُوْدُ فِيْ نَسْخِ الْقِبْلَةِ اَوْ فِيْ صَلٰوةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِيْ سَفَرٍ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَيِ الْاَرْضُ كُلُّهَا لِاَنَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فِي الصَّلٰوةِ بِاَمْرِهٖ فَثَمَّ هُنَاكَ وَجْهُ اللّٰهِ قِبْلَتُهُ الَّتِيْ رَضِيَهَا اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ يَسَعُ فَضْلُهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهٖ ـ

১১৫. কিবলার নসখ [বায়তুল মুকাদ্দাস হতে বায়তুল্লাহর দিকে কিবলা পরিবর্তন করা সম্পর্কে বা সফরে যানবাহনে আরোহণ করে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে নফল পড়ার অনুমতি দান প্রসঙ্গে ইহুদিরা সমালোচনা করলে তার জবাবে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, কেবল আল্লাহরই পূর্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী। [পূর্ব ও পশ্চিমে এই দুই প্রান্ত সীমার উল্লেখ করে সমস্ত পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে] কেননা পূর্ব পশ্চিম পৃথিবীর দুই প্রান্ত সুতরাং তাঁর নির্দেশানুসারে সালাতে যে দিকেই তোমরা তোমাদের মুখ ফিরাও না কেন সে দিকই সেখানেই আল্লাহর দিক অর্থাৎ সন্তুষ্টির কিবলা বর্তমান। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বব্যাপী সকল কিছুর উপর তাঁর অনুগ্রহ বিস্তৃত এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি পরিচালনা সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

١١٦. وَقَالُوْا بِوَاوٍ وَدُوْنِهَا اَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا قَالَ تَعَالٰى سُبْحٰنَهٗ ؕ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنْهُ بَلْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَالْمَلَكِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ وَعَبَّرَ بِمَا تَغْلِيْبًا لِمَا لَا يَعْقِلُ كُلٌّ لَهٗ قَانِتُوْنَ ـ مُطِيْعُوْنَ كُلٌّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ ـ

১১৬. এবং তারা ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে ধারণা করে বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি পবিত্র। এই সবকিছু থেকে আমরা তার পবিত্রতা ঘোষণা করি। বরং মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস সকলরূপেই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যা কিছু আছে সব আল্লাহর। আর মালিকানা অধিকার সন্তান হওয়ার অন্তরায়, সুতরাং তারা কেউ আল্লাহর সন্তান হতে পারে না। সবকিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। প্রতিটি বস্তুই তার বাধ্যগত যে কোনো বিষয়েই তার নিকট তলব করা হোক না কেন।

قَالُوْا ক্রিয়াটির পূর্বে وَاوْ সহ এবং তা ব্যতিরেকেও পাঠ রয়েছে।
مَا فِي السَّمٰوٰتِ এইস্থানে বোধহীন প্রাণীর প্রাধান্য প্রদান করে مَا -এর ব্যবহার করা হয়েছে।
قَانِتُوْنَ শব্দটির মধ্যে বোধ সম্পন্ন প্রাণীর প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। তাই وَاوْ ও نُوْن -এর মাধ্যমে এর বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।]
مُطِيْعُوْنَ كُلٌّ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ : অর্থাৎ প্রতিটি মাখলুক ঐ উদ্দেশ্যের অনুগত, যা তার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে। بِمَا -এর بَاء টি لَامْ -এর অর্থে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَلِلّٰهِ : لِلّٰهِ -এর লাম (ل) اَلْاِخْتِصَاص বিশিষ্টতা জ্ঞাপক। নাহু [আরবি ব্যাকরণ] এ ক্রিয়াকে বিশেষ সংযোজক লাম এসব প্রকারের অন্যতম। অর্থাৎ মাশরিক-মাগরিব, পূর্ব-পশ্চিম সবই তার। তিনিই এ সৃষ্টির খালিক ও মালিক তথা স্রষ্টা ও অধিপতি। উম্মতে মুহাম্মদী যা অচিরেই সমগ্র বিশ্বের জন্য নিরাপত্তা বিধানকারী [নিরপেক্ষ] উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছিল, তাদের কেন্দ্রীকতা কিবলারূপে স্থির হতে যাচ্ছিল এবং কিতাবীরা [তার আভাস পেয়ে] বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপনও বিরূপ সমালোচনা করে দিয়েছিল। এখানে তাদের সমালোচনা উদ্ধৃত করে তার জবাব দেওয়ার ভূমিকা তৈরি করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

বিরল তথ্য বিশ্লেষণ : كُنْ বলার দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় রূপকার্থে কোনো কাজ সত্ত্বর ও অনতিবিলম্বে হওয়া তবে তো উত্তম এতে কোনো রূপ সন্দেহ নেই এবং হবেও না। কিন্তু যদি كُنْ দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হয় যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার রীতিই হচ্ছে এটা যে, কোনো কিছুকে সৃষ্টি করার পূর্বে এ (كُنْ) শব্দ বলেন, তবে এ প্রসঙ্গে দুটি সন্দেহ হতে পারে। প্রথম সন্দেহ এটা যে, যখন সে বস্তু বা জিনিসটির অস্তিত্বই ছিল না। তখন كُنْ শব্দটি কাকে বলা হয়ে ছিল? এর উত্তর হচ্ছে আল্লাহর ইলম -এর মধ্যে সে বস্তুটি বিদ্যমান ছিল। সেটাকেই বাস্তব বা বিদ্যমান হিসেব করে সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয় সন্দেহ এটা যে, অন্যান্য বস্তুসমূহের ন্যায় স্বয়ং كُنْ শব্দটিও তো حَادِثْ [নতুন বা ঘটমান] তবে তো সে রীতি অনুসারে كُنْ -এর জন্যেও অন্য আরেকটি كُنْ -এর প্রয়োজন হবে এবং এ দ্বিতীয় كُنْ -এর জন্য তৃতীয় كُنْ -এর প্রয়োজন হবে। এমনিভাবে ক্রমানুসারে হওয়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ এক كُنْ -এর জন্য অগণিত كُنْ মেনে নিতে হবে। তা না হয় مُكَوِّنْ আদি হতে থাকা অত্যাবশ্যক হয়ে যাবে। আর এ উভয় প্রকারই অসম্ভব।

এর উত্তর দুটি হতে পারে। একটি হচ্ছে এটা যে, এসমস্ত কিছুকে كُنْ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং স্বয়ং كُنْ -কে অন্য কোনো كُنْ ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই ক্রমানুসারে হওয়া অপরিহার্য হবে না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে এটা যে, যদি শুধু এ كُنْ শব্দটিকে প্রাচীন বা সনাতন মেনে নেওয়া হয় এবং এর সম্পর্ক حَادِثْ হওয়ার কারণে এটা স্বয়ংও حَادِثْ হয়, তবে مُكَوِّنْ সনাতন হওয়া অত্যাবশ্যক হবে না। এখন রয়ে গেল সে সম্পর্কের অবস্থা বা ধরন? তবে যেহেতু সে সম্পর্ক অস্তিত্বহীন ও অবিদ্যমান তাই এ নতুন সম্পর্কের আবিষ্কারের প্রয়োজন আছে। আর না এর কারণ আবিষ্কারের ব্যাপারে কোনো আপত্তি বা প্রশ্ন আছে। কিছুই নেই। হ্যাঁ, সে সম্পর্কের জন্য আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তা অগ্রাধিকারযোগ্য হবে। তার ইচ্ছা যার শান ও গুণ প্রাধান্য এবং নির্দিষ্টকরণ এখতেয়ারী। তিনি স্বয়ং অগ্রাধিকার যোগ্য থাকবেন। তাই অন্য কোনো অগ্রাধিকার দাতা কিংবা নির্ধারণকারীর প্রশ্নই আসে না। কেননা এর দ্বারা অন্য আরেকটি শক্তিকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। যা জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও রহিত। -[বয়ানুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিবলা নিয়ে বিতর্ক : কিবলা সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা দ্বিধা-বিভক্ত। এটাও ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিতর্কিত বিষয়। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কিবলাকে শ্রেষ্ঠ বলত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তো বিশেষ কোনো দিকের নন; বরং তিনি সমগ্র স্থানও দিক হতে পবিত্র ও মুক্ত। তবে তোমরা তার নির্দেশে যে কেনো দিকেই মুখ ফেরাবে, সেদিকেই তার দৃষ্টি আছে। তিনি তোমাদের ইবাদত কবুল করে নিবেন। কেউ বলেন, এ আয়াত সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ। অথবা সফরে যখন কিবলা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : পূর্ব পশ্চিম দুই দিকই, আর শুধু এ দুই দিকই কেন, সবদিক সব অভিমুখই আল্লাহ তা'আলার জন্য সমান। তিনি সবগুলোরই সমভাবে স্রষ্টা, শাসনাধিকারী, মালিকানাধিপতি। কোনো বিশেষ দিকের পবিত্রতা, মাহাত্ম্য উপাস্য হওয়ার কোনো নামগন্ধ এবং সত্য দিক দর্শানোর কোনো বৈশিষ্ট্য মর্যাদা নেই।

দিক পূজার রহস্য : জাহেলী ধর্মমতগুলোর ইতিহাস মানুষের আহমকী নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা ও কুসংস্কার পূজার এক ধারাবাহিক ইতিহাস। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে এক সম্মিলিত ভ্রষ্টতা এরূপ প্রচলিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কোনো অবস্থানে [illegible] ও দেহধারী, সুতরাং তার অস্তিত্ব কোনো না কোনো নির্দিষ্ট দিকে ও অবস্থানে থাকা অনিবার্য এবং এ ভ্রান্ত ধারণার শিকার [illegible] সে অবস্থান ও দিকটিকেও কোনো না কোনো নির্দিষ্ট দিক ও অবস্থানে সাব্যস্ত করে সে দিকটিকেই পবিত্র ও পূজনীয় স্থির [illegible] যেহেতু দেবতাকুলে সূর্য দেবতার মর্যাদা সব পৌত্তলিক ধর্মের সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য ছিল [illegible] দিকটিকে সাধারণভাবে পবিত্র মনে করা হলো এবং দুনিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তা [illegible]

[illegible]

[illegible] ও বিশ্বাস করতে পারে না যে, দিক ও অবস্থানের ন্যায় কোনো কাল্পনিক বিষয়ও কোনো জাতি-সম্প্রদায়ের উপাস্য হতে [illegible] মুশরিকের প্রভাবই এ দিক পূজার শিরক কিতাবীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল এবং খ্রিস্টধর্ম যেহেতু আকিদা-বিশ্বাস ও

http://islamiboi.wordpress.com

ইবাদতে সমকালীন প্রভাবশালী ও প্রচলিত রোমান ধর্মের দ্বিতীয় সংস্করণ ও প্রতিচ্ছবি হয়ে দেখা দিয়েছিল, এ কারণে এ ধর্মানুসারীরাও প্রকাশ্যে 'পূর্ব দিকের' পূজায় ডুবে গেল। অন্যদিকে একত্ববাদের গর্বে গর্বিত ইহুদিরাও পুরোপুরি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো না; বরং তাদের কোনো কোনো উপদল তো পূর্ণরূপে বিপরীত সারিতে শামিল হলো। কোনো কোনো দল উপদল পূর্বের বিকল্পরূপে পশ্চিমের পবিত্রতার গীত গাইতে লাগল। তাদের মাথায় এ যুক্তি খেলা করল যে, পূর্বদিক যদি জীবনের সূত্র ও উৎস হওয়ার কারণে পবিত্রও সম্মানযোগ্য হয়ে থাকে, তবে পশ্চিম দিকই বা মৃত্যুদ্বার ও বিনাশভূমি হওয়ার কারণে শ্রদ্ধার পাত্র হবে না কেন? প্রাচ্য সম্রাট [আলোক রাজা] যদি এ দিক থেকে উদয় হচ্ছেন, তবে প্রতিদিনও দিকটিতেই তো অস্তাচলে গমন ও আত্মবিলোপ করছেন। সুতরাং ওদিকটিরও পবিত্রতায় বিশ্বাসী না হওয়ার কি যুক্তি রয়েছে? মোটকথা এ দুটি দিক বেশ পূজা পেতে লাগল। তবে তুলনা মূলকভাবে পূর্ব দিকের পূজা একটু বেশি আর পশ্চিমের পূজা একটু কম।

এক দুনিয়া যখন এহেন দিক পূজার শিরক ও পূর্বদিকের পূজা ও পশ্চিম দিকের পূজার গোমরাহীতে ভেসে যাচ্ছিল, তখনই একদিন কুরআনী তাওহীদ আত্মপ্রকাশ করে সমগ্র বিশ্বের মতবাদগুলোকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তার অংশীবাদমূলক ধ্যানধারণায় প্রচণ্ড আঘাত হেনে এ বিশাল জগতকে হতচকিত করে দিল। প্রাচীন ধর্মমতগুলো এ নতুন ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে হতভম্ব-দিশেহারা হয়ে পড়ল। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২০৮-২০৯]

قَوْلُهُ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ : অর্থাৎ সে এক আল্লাহ, যিনি স্থান-কাল পাত্রের পরিবেষ্টন ও দিক অবস্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত পবিত্র, যার পবিত্র সত্তার [অশরীরী] জ্যোতি বিকীরণ সবদিকে, চারদিকে, যে দিকেই মুখ ঘুরাবে, তুমি পাবে তারই জ্যোতির বিকীরণচ্ছটা। তার তাজাল্লী ও নূর প্রসারণকে কোনো বিশেষ দিকের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রত্যক্ষ মূর্খতাই বটে।

قَوْلُهُ وَجْهُ : শাব্দিক অর্থে চেহারা, অবয়ব, দ্বিতীয় ও পরোক্ষ অর্থে পূর্ণ সত্তা ও অস্তিত্ব। وَجْهُ اللّٰهِ যখনই উল্লিখিত হবে, সত্তাই উদ্দেশ্য হবে। এখানেও এরূপই উদ্দেশ্য। আয়াতে [স্রষ্টার] সাকারবাদ ও সাদৃশ্যবাদের পূর্ণ খণ্ডন হয়ে গিয়েছে। পূর্বসূরীগণও আয়াতটিকে এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতটি তাজসীম, স্রষ্টার দেহধারী ও শরীরী হওয়া প্রত্যাখ্যান এবং আকার সাদৃশ্যতা হতে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত করণে অন্যতম সবল প্রমাণ।

খ্রিস্টানদের ধর্মে আজও পূর্বমুখিতা [ও পূর্বগামিতা Orientation] -এর একটি ধর্মীয় পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে এবং গীর্জা ইত্যাদি পূর্বমুখীই নির্মাণ করা হচ্ছে। -[প্রাগুক্ত]

فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ : [সে দিকেই আল্লাহ] কোনো কোনো সূফী আধ্যাত্মবিদ বলেছেন, আমরাও বিশ্বজগতের যে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অনুরূপভাবে সত্য সত্তার নূরেরই ঝিলিক দেখতে পাই। যে দিকেই তাকাই তোমাকেই দেখতে পাই-

جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے -

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ : وَاسِعٌ অর্থাৎ তার অনুগ্রহ সর্বত্র ব্যাপক বিশেষ কোনো জায়গার মাঝে সীমিত নয়। অথবা তিনি নিজেই অসীম-অপরিসীম প্রশস্ততা সম্পন্ন। বড় হতেও বড় প্রসারিত তাতেই বিলীন। সুতরাং কোনো স্থান-পাত্র অবস্থা কি করে তাকে সংকুলান করতে পারে? পাত্র যতই বিশাল হোক, স্থান যতই বিস্তীর্ণ হোক, তাকে কেমনে ধারণ করতে পারে? সব দিক-দিগন্ত, অবস্থান-প্রান্ত তো তারই সৃষ্টি দাসানুদাস, তিনি অসীম নিরাকার। কোনো সসীম দিক প্রান্ত কেমনে বেষ্টিবে তাঁরে?

قَوْلُهُ عَلِيْمٌ : অর্থাৎ তিনি বান্দাদের হিতাহিত তাদের নিয়ত ও তাদের ক্রিয়াকলাপ সবকিছুই সম্যক অবগত। তাদের জন্য কোনটি উপকারী, কোনটি অপকারী তাও তিনি পূর্ণ অবগত। সে হিসেবেই তিনি বিধান দিয়ে থাকেন। এভাবেও বলা যায় যে, তিনি তার পূর্ণ জ্ঞানও পরিপূর্ণ হিকমত কুশলতায় যে কিবলা [এবং যে দিককে ইচ্ছা কিবলা] নির্ণীত করতে পারেন। তার হিকমত, মহা জ্ঞান ও কল্যাণ ও দ্রষ্টতা বেষ্টন করতে পারে কে? তিনি উম্মতের ঐক্যের জন্য যখন কিবলা স্থির করবেন, তখন যথার্থই করবেন, তাতে কোনো দিকের পবিত্র হওয়ার মূলতই কোনো দখল নেই।

قَوْلُهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا : অর্থাৎ ইহুদিরা হযরত উযায়ের (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে মহান আল্লাহ তা'আলার ছেলে বলত। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। তাঁর সত্তা এসব কিছু হতে পবিত্র। সকলেই তাঁর অধীনস্থ তাঁর অনুগত ও তাঁর সৃষ্টি।

سُبْحَانَهٗ : [তিনি পবিত্র যে কোনো ধরনের আত্মীয়তা বন্ধন থেকে যা যে কোনো অবস্থায় তার জন্য নীচতা ও হীনতার কারণ।] খ্রিস্টবাদীদের হুশিয়ারী দেওয়া হচ্ছে যে, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করার পরেও তাঁর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ন্যায় এ আত্মীয়তা সম্বন্ধের দাবি করে চলছে। আল্লাহ ও মা'বুদ হওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের ধ্যানধারণা কতই না নীচ ও গর্হিত।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ : ইচ্ছায় [illegible] সৃষ্টিগত স্বভাবে এবং বাধ্য হয়ে অবশ্য] আল্লাহ তা'আলার বিশ্ব পরিচালন সংক্রান্ত উর্ধ্ব জাগতিক বিধি [illegible] থেকে মুক্তি কারোরই নেই।

كُلٌّ : সকলেই অর্থাৎ সৃষ্টি মু'মিন ও কাফের, [illegible] ও নিষ্প্রাণ যাই হোক।

قَوْلُهُ قَانِتُوْنَ : সবই তাঁর সকাশে অবনত, অবনমিত সবই [illegible] ও নিরূপণের সঙ্গে জড়িত।

অর্থাৎ [illegible] لَا يَمْتَنِعُ شَيْءٌ مِنْهُمْ عَلَى تَكْوِيْنِهِ وَتَقْدِيْرِهِ وَمَشِيْئَتِهِ [illegible] সবই আল্লাহর অনুগত তাদের কোনো কিছুই তাঁর পরিচালন বিধি, তাঁর নিরূপণ ও মর্জি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে [illegible] –[তাফসীরে কাশশাফ]

قُنُوْتٌ : [قَانِتُوْنَ -এর মূল ধাতু] এর উত্তম অর্থ এভাবেই করা হয়েছে যে, দেহ ও [illegible] দ্বারা ও অবস্থা [ভাবের] ভাষায় আল্লাহ তা'আলার বান্দা হওয়ার ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দেবে –[ইবনে জারীর সূত্রে মাজেদী পৃ. ২১২]

আয়াতের বাস্তবতা : বড় হোক কিংবা ছোট, অনুন্নত হোক কিংবা উন্নত, কোন সৃষ্টির এমন দুঃসাহস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বানানো দিন ও রাতের চব্বিশ ঘন্টার বাইরে কোনো ঘন্টা, মিনিট সেকেণ্ড মুহূর্ত নিজের জন্য তৈরি করে নিতে পারে? দক্ষ হতে দক্ষতর কোনো বিজ্ঞানীর বুকের পাটা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সৃষ্টি পরিসীমা [illegible]-এর বাইরে এক গজ এক ফুট, এক ইঞ্চি স্থান নিজের জন্য খুঁজে নিতে পারে? এমন কে আছে, যে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত স্থান ও কালের পরিসীমা লঙ্ঘন করে তার বাইরে পদচারণা করতে পারে? এমন কেউ কি আছে, যে তার [illegible] আর্দ্রতা বিধি থেকে বেপরোয়া হয়ে থাকতে পারে? এমন কে হিম্মতওয়ালা আছে, যে তাঁর ওজন, স্তর ও মধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে? সংখ্যা, ওজন, পরিমাণ ও পরিধির যে বিধান আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এমন সাহসী পুরুষ কেউ আছে কি যে, তাতে লঙ্ঘন বা ব্যতিক্রম ঘটাবার সুযোগ বা অবকাশ খুঁজে পাবে? শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারক হোন, যত বড় প্রযুক্তিবিদ হোন, তাদের গুণের বাহার তো শুধু এতটুকুই যে, বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থার মূল বিধি ও নীতিমালার ভাব ও স্বভাব উপলব্ধিতে তিনি উল্লেখযোগ্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। [পদার্থের ধর্ম ও বিশ্বনীতির সবক তিনি কঠিনভাবে রপ্ত করেছেন]। এমন লোক তো সব কারণের মহা কারণ ও সব নীতি-বিধির প্রয়োগকর্তা নিয়ন্তার সকাশে অন্য সকলের চেয়ে অধিক পরিমাণে অনুগত ও বাধ্য দাস হয়ে থাকবে। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২১২-২১৩]

قَوْلُهُ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ : এতে সব মুশরিক ও অংশীবাদে বিশ্বাসী জাতি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে যে, তোমরা যাকে আল্লাহ তা'আলার পুত্র দেব-দেবতা অবতার মানছ, তারা আল্লাহ তা'আলার শরিক, সম অংশীদার ও সমকক্ষ সমতুল্য হওয়া তো যে কোনো বিচারে কল্পনাতীত অলীক বিষয় সকলেই বরং তাঁর আইনধারী শাসনাধীন, তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর বিশ্ব পরিচালন পরিক্রমার কোনো না কোনো দফতরের আজ্ঞাধীন ও বশীভূত। –[প্রাগুক্ত]

কাবা পূজা ও মূর্তি পূজার মধ্যে পার্থক্য : ইসলামি ইবাদতসমূহে মূল উপাসনা তো শুধু আল্লাহ তা'আলারই হয়। কোনো মসজিদ বা বায়তুল্লাহ কিংবা বায়তুল মাকদিসের উপাসনা মুসলমানগণ করেন না; বরং মসজিদ হচ্ছে ইবাদতে অন্তর ও দিমাগের একাগ্রতা সৃষ্টির জন্য যা প্রকৃত কাম্য পর্যন্ত পৌঁছতে এবং সফলতা লাভের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আর সমগ্র ইসলামি জগতে একতার অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানদেরকে একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে সমবেত করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা একটি দিককে কিবলা নির্দিষ্ট করেছেন, যা আল্লাহর একত্ববাদের যোগ্য ও দীনের কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত। এখন রয়েছে একটি বিষয় তা হচ্ছে এ দিকটিকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা যে, সেটা বিশেষভাবে পবিত্র মক্কার মসজিদে হারাম। এ রহস্যের ব্যাপারে সামনে আলোচনা আসছে

মোটকথা এ যুক্তিসিদ্ধতা ও নিপুণতার বয়ান -এর কারণে অমুসলিমদের এ আপত্তি যে, মুসলমানগণ কাবার পূজারী– এমন ধরনের সন্দেহের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। কিন্তু তারপর যদি কোনো মূর্তিপূজক উক্ত বয়ানকে নিজের পক্ষে মনে করে মূর্তিপূজাকে বৈধ করার জন্য সে ব্যাখ্যাই দিতে থাকে যে, আমরাও প্রকৃত পক্ষে পূজা আল্লাহরই করি এবং মূর্তিগুলোকে সামনে রাখি শুধু একাগ্রতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। –[কামালাইন খ. ১. পৃ. ১২৬]

মূর্তি পূজার বৈধতা এবং এর তিনটি উত্তর : প্রথমে তো এ যুক্তির দাবি সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর থেকে আপত্তি ও প্রশ্ন সর্বাবস্থায় উঠে যায়, যা এ স্থানে উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তো সাধারণ মুসলমান এবং সাধারণ মূর্তি পূজকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে এবং তাদের অবস্থাদির সার্বিক অনুসন্ধান করলে উক্ত দুটি দলের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য প্রকাশ হচ্ছে যে, মুসলমান আল্লাহর একত্ববাদের দাবিতে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য করো উপাসনা না করার মধ্যে সত্যবাদী [illegible] অন্যান্য লোকদের মিথ্যা ও ধোঁকা প্রকাশ পায় সর্বশেষ স্তরে তৃতীয় কথাটি হচ্ছে কোনো বিধান এবং এর যুক্তিসিদ্ধতাকে নির্ধারণের জন্যও কোনো ওহিত এবং চালু শরয়ী বিধান পেশ করা অপরিহার্য। [illegible] দেখা-দেখি নিজ মতে [illegible] ধর্মের দৃষ্টিতে কোনো কাজ করা বৈধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। এ হিসেবেও শুধু

http://islamiboi.wordpress.com

মুসলমানগণই নিজ ধর্মীয় বিধান পেশ করতে পারে। অন্যান্য ধর্ম বিলুপ্ত ও রহিত হয়ে গেছে। তাই তাদের বিধানাবলি চালু ও **গ্রহণযোগ্য নয়। আর কিবলা নির্ধারণের উল্লিখিত যুক্তিসিদ্ধতা** শুধু উপমাস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলার **অসংখ্য যুক্তিসিদ্ধতাকে আয়ত্ত করতে পারে কে?** –[প্রাগুক্ত]

আয়াতের নির্দেশনাসমূহ : اَيْنَمَا শব্দটিকে যদি مَفْعُوْل بِه সাব্যস্ত করা হয়। তবে এ আয়াতকে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ **দ্বারা** রহিত মানতে হবে। যেমন ইমাম যাহিদ (র.)-এর সিদ্ধান্ত যে, পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রথম এ আয়াতটি রহিত **হয়েছে।** اِتْقَانٌ -এর গ্রন্থকার এবং কাজী বায়যাবী (র.)-ও এ দিকেই ধাবিত হয়েছেন। কিংবা এ আয়াতে ব্যাখ্যা করে صَلٰوةُ النَّفْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ অথবা কিবলার দিক সম্পর্কে সন্দেহ ইত্যাদি অবস্থার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। আর যদি اَيْنَمَا **শব্দটিকে** مَفْعُوْل فِيْهِ সাব্যস্ত করা হয় মূলে। তবে এ আয়াতকে রহিত বা অন্য কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই; বরং কিবলার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হবে।

আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্তের দাবি এবং তা প্রত্যাখ্যান : আয়াত وَقَالُوْا -এর মধ্যে আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্তের ব্যাপারে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে চারটি পন্থায় বাতিল করা হয়েছে। প্রথম لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ **দ্বারা।** দ্বিতীয় كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ দ্বারা। তৃতীয় بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ দ্বারা। চতুর্থ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا দ্বারা। আর এ চারটি বিষয়ই আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট হওয়া বিরোধীদের মতেও স্বীকৃত। তাই প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে ইবনিয়াত তথা পুত্রত্বের দাবি বাতিল হয়ে গেছে।

আল্লাহর জন্য সন্তান হওয়া বিবেকের দিক দিয়েও বাতিল। কেননা সেটা দু অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো সন্তান সে একই জাতের হবে। তা না হলে ভিন্ন জাতের হবে। সন্তান পিতার জাত থেকে ভিন্ন হওয়া তো দূষণীয় অথচ আল্লাহ সমস্ত দোষ থেকে পবিত্র। তাই আল্লাহ ভিন্ন জাতের সন্তান থেকে পবিত্র। سُبْحَانَهٗ শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। আর সন্তান এক জাতের হওয়া অসম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলার সমকক্ষ কোনো জাত নেই। এজন্য যে, আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলি যা তার জাতের জন্য অবধারিত তা তার সাথে খাছ। অন্য কারো মধ্যে সে গুণাবলি পাওয়া যায় না। যেমন এখন উল্লেখ করা হয়েছে। لَازِمٌ -এর নফী مَلْزُوْمٌ -এর নফীকে চায়। অর্থাৎ সফলতার নফী সফলতা লাভকারীর নফীর প্রমাণ হবে। তাই আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ওয়াজিব [অপরিহার্য] নেই যে, তার মত বা তার সত্ত্বার অংশীদার হতে পারে। আর যখন তাঁর মতো ও তার সাদৃশ্য কিছুই নেই। তখন তাঁর সন্তানাদিও নেই। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১২৮]

আক্বীদায়ে ইব্‌নিয়াতের মূল : প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ এবং বান্দার সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য লোকেরা প্রাথমিক অবস্থায় বিভিন্ন উপমাও রূপকালঙ্কার দ্বারা কাজ নিয়ে থাকতো। কোথাও পিতা-পুত্রের সম্পর্ক দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কোথাও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সামনে ধরে মনের দাবি প্রকাশ করা হয়েছে। দর্শনপন্থিগণ প্রথম কারণ এবং প্রথম মাধ্যম বলেছেন। এ দুটি শব্দ দ্বারা প্রকৃত অর্থ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে পরবর্তী লোকেরা উক্ত শব্দগুলোকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছে এবং সে ভিত্তির উপর نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ [আমরা আল্লাহর ছেলে ও তার বন্ধু] এ বিশেষ দাবি আরম্ভ করেছে। ইসলাম সে সকল ছিদ্রকে বন্ধ করার জন্য পূর্ণ ক্ষমতা ও প্রমাণাদির শক্তির সাথে সেই বাতিলের ভিত্তি ও শিকড় এর উপর আঘাত করেছে এবং সে আকীদায়ে ইবনিয়াতের মূল শিকড় উৎপাটন করেছে।

স্বাধীনতার মাস্‌আলাসমূহ : ফকীহগণ এ মালিকানা ও সন্তানের বিরোধ থেকে মুক্ত করা ও স্বাধীনতার অনেক মাসআলা বের করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ হাদীস مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ [যে ব্যক্তি কোনো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মালিক হবে, সে তার পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে] হানাফীগণের দৃষ্টিতে মুক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সাথে মালিকানা সত্ত একত্র হওয়া। কিন্তু হাদীসে পাকে সর্বশেষ অংশ কারণ হওয়ার দরুন মুক্ত হওয়ার সম্পর্ক মালিকানা সত্তের দিকে করা হয়েছে। কেননা হুকুম নির্ভর করে সর্বশেষ অংশের উপর। সুতরাং হানাফীগণের দৃষ্টিতে আপন নিকটতম বা রক্তসম্পর্কীয় নয় যেমন– দুধ শরিক [রেজাঈ] এবং এমনিভাবে নিকটতম আত্মীয় আপন বা মাহরাম নয় যেমন– চাচাতো ভাই এ মুক্ত হওয়ার কারণ থেকে বহির্ভূত হবে। তার মালিক হওয়ার কারণে মুক্তি পাবে না। হ্যাঁ, জন্ম ও ভ্রাতৃত্বের ঘনিষ্ঠতা বা আত্মীয়তা সর্বাবস্থায় থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দৃষ্টিতে মুক্ত হওয়ার কারণ হলো শুধু আংশিকতা। অতএব পিতা-নিজ সন্তানের মালিক হলে পিতার পক্ষ থেকে সন্তান মুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্তান পিতার মালিক হলে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা মুক্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি ভাই নিজ ভাইয়ের মালিক হয় তবে আংশিকতা না থাকার কারণে ভাই মুক্ত হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١٧ ১১৭. بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُوْجِدُهُمَا لَا
عَلٰى مِثَالٍ سَبَقَ وَاِذَا قَضٰى اَرَادَ اَمْرًا اَىْ
اِيْجَادَهُ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اَىْ
فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصَبِ
جَوَابًا لِلْاَمْرِ .

তিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে এতদুভয়কে তিনি অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন তার অস্তিত্বদানের ইচ্ছা করেন শুধু বলেন হও আর তা হয়ে যায়।

يَكُوْنُ ক্রিয়াটি উহ্য مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্যের خَبَرٌ বা বিধেয়। অপর এক কেরাতে তা جَوَابُ اَمْرٍ হিসেবে نَصَبٌ সহ পঠিত রয়েছে।

١١٨ ১১৮. وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ
لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْلَا هَلَّا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ بِاَنَّكَ
رَسُوْلُهُ اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ ط مِمَّا اقْتَرَحْنَاهُ
عَلٰى صِدْقِكَ كَذٰلِكَ كَمَا قَالَ هٰؤُلَاءِ قَالَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كُفَّارِ الْاُمَمِ
الْمَاضِيَةِ لِاَنْبِيَائِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ مِنَ
التَّعَنُّتِ وَطَلَبِ الْاٰيَاتِ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ
فِى الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ
ﷺ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا اٰيَاتٌ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهَا
فَاقْتِرَاحُ اٰيَةٍ مَعَهَا تَعَنُّتٌ .

এবং যারা কিছু জানে না, তারা বলে অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? যে তুমি তাঁর রাসূল। কিংবা তোমরা সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আমরা যে ধরনের নির্দেশ চাই সেই নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? এভাবে তারা যেমন বলে তাদের পূর্ববর্তীগণও অর্থাৎ অতীত জাতিসমূহও তাদের নবীগণকে [অনুরূপ] ধৃষ্টতামূলক কথা এবং নিদর্শনও মু'জেজার দাবি সম্বলিত কথা বলতো। কুফরি ও অবাধ্যতার বিষয়ে তাদের অন্তর একই রকম। এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সান্ত্বনা স্বরূপ। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য অর্থাৎ যারা জানে যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন এবং বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য নিদর্শনাবলি স্পষ্টভাবে বিবৃত করে দিয়েছি। সুতরাং এর পরও নিদর্শনের দাবি করা অন্যায় জেদ ছাড়া কিছুই নয়।

لَوْلَا শব্দটি এই স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত।

١١٩ ১১৯. اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ
بِالْهُدٰى بَشِيْرًا مَنْ اَجَابَ اِلَيْهِ بِالْجَنَّةِ
وَنَذِيْرًا مَنْ لَمْ يُجِبْ اِلَيْهِ بِالنَّارِ وَلَا
تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ . النَّارِ اَىِ
الْكُفَّارِ مَا لَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوْا اِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِجَزْمِ تَسْئَلْ نَهْيًا .

হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি তোমাকে সত্যসহ অর্থাৎ হেদায়েতসহ যারা তা গ্রহণ করে তাদের জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদদাতা ও যারা তা গ্রহণ করে না তাদের জন্য জাহান্নামের সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। জাহীম জাহান্নাম [বাসীদের] অর্থাৎ কাফেরদের সম্বন্ধে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। কেন তারা সত্য স্বীকার করেনি, কেন ঈমান আনেনি, এই সম্পর্কে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। সত্য পৌঁছিয়ে দেওয়া কেবল আপনার দায়িত্ব। অপর এক কেরাতে لَا تُسْئَلْ ক্রিয়াটি جَزْمٌ জযমসহও পঠিত রয়েছে نَهْى বা নিষেধার্থক শব্দরূপে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ :

প্রশ্ন : فِعْل مُضَارِعْ যখন فَاءْ-এর পরে আসে এবং তার পূর্বে اَمْر বা نَهْى না থাকে, তখন তার শেষে نَصَبْ আবশ্যক হয়। অথচ এখানে فَيَكُوْنُ-এর উপর رَفْع হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে جُمْلَةْ اِسْمِيَّةْ-এর মুবতাদা উহ্য রয়েছে। মূলত ইবারতটি হবে فَهُوَ يَكُوْنُ জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে جُمْلَةْ جَوَابُ اَمْر হওয়ার কারণে نَصَبْ-এর স্থলে رَفْع হয়েছে। এখানে এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَيَكُوْن হলো مُسْتَأْنِفَهْ আর هُوَ হলো مُبْتَدَأْ مَحْذُوْف-এর خَبَر । আর অপর একটি কেরাতে فَيَكُوْنَ নসবসহও রয়েছে। সে সূরতে فَاءْ سَبَبِيَّةْ-এরপর اَن মুকাদ্দার মানতে হবে।

فِىْ قِرَاءَةٍ بِجَزْمِ تَسْئَلْ نَهْيًا : অর্থাৎ এক কিরাতে تُسْئَلُ-এর স্থলে لَا تَسْئَلْ রয়েছে। অর্থাৎ আপনি জাহান্নামীদের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তাদের অবস্থা হবে খুবই মন্দ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ : এ সূরাটি মাদানী সূরা হওয়ার পরও اَلَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-এর তাফসীরে كُفَّارُ مَكَّةَ **বলার কারণ** কয়েকটি হতে পারে–

১. পূর্ণ সূরা মদনী কিন্তু এ আয়াতটি মক্কী। কিন্তু এ জবাবটি দূরবর্তী

২. এও হতে পারে যে, মক্কার কাফেররা রাসূল ﷺ-এর কাছে মদীনার ইহুদিদের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করেছে।

قَوْلُهُ بَدِيْعُ : তিনিই যিনি কোনো অস্ত্র-যন্ত্রের মুখাপেক্ষী নন, যাঁর কোনো মাল-মসলা বা উপকরণ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না, যিনি স্থান-অবস্থান ও পরিস্থিতির নিগড়ে আবদ্ধ নন, যিনি সময় বন্ধনের উর্ধ্বে; যিনি কোনো নমুনা স্যাম্পল দেখে বানাবার প্রয়োজন অনুভব করেন না, যার কোনো উস্তাদ প্রশিক্ষকের দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। তিনি সৃজনশীল প্রকৌশলী, তিনি উপকরণ সংযোজক কারিগর নন। প্রকৃত ও বাস্তব অর্থে, আক্ষরিক অর্থে যিনি স্রষ্টা, আবিষ্কারক, অস্তিত্ব বিধায়ক। কারো সহায়তা-সহযোগিতা ছাড়াই আরো কোনোরূপ অংশগ্রহণ ব্যতীতই যিনি নাস্তিজগত থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসেন।

بَدِيْعُ শব্দের উল্লেখ সেসব মুশরিক পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনের জন্য হয়েছে, যারা আল্লাহকে শুধু কারিগর [ও মিস্ত্রি] -এর মর্যাদা দিত এবং আত্মা ও মূল উপকরণকে কোনো না স্তরে তাঁর সহযোগী সহাধ্যায়ী ভাবত। অর্থাৎ যেন মূল ধাতু ও উপকরণ আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং তা ছিল অনাদিও নিত্য। কিংবা আত্মা ও তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল অনাদি ও নিত্য। আল্লাহ তা'আলার কাজ ছিল শুধু এতটুকু যে তিনি একজন সুদক্ষ কেমিষ্ট রসায়নবিদের ন্যায় বিদ্যমান উপকরণ কেবল আত্মার সংযোজন ও বিন্যাসের কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করে নতুন নতুন রূপ ও আকৃতিতে [illegible] কেবল اِبْدَاعْ শব্দটিই মুশরিকদের কল্পিত কল্পনা খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ [illegible] গুণের অনুরূপ সত্তাগত অনাদিত্বের সাথে সাথে সময় কালগত অনাদিত্ব (تَقَدُّم) সাব্যস্ত রয়েছে। কাল বলতে [illegible] তিনি তার চেয়েও আদি অগ্রবর্তী। এমন একটি সময় [ও কাল] ছিল যখন [কাল বলতে কিছুই ছিল না এবং [illegible] সে অকালে] শুধু তিনিই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, প্রান্ত দিগন্ত, সত্তা অস্তিত্ব [জড় অজড়, দেহ, অদেহ] কিছুই ছিল না।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২১৪]

قَوْلُهُ وَاِذَا قَضَى اَرَادَ : মুফাসসির (র.) قَضَى-এর ব্যাখ্যায় اَرَادَ উল্লেখ করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : قَضَى-এর অর্থ হলো اِتْمَامُ شَيْءٍ বা কোনো বস্তুকে পরিপূর্ণ করা। চাই সেটা قَوْلًا হোক। যেমন– وَقَضَى رَبُّكَ কিংবা فِعْلًا হোক। যেমন– فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ এখন কথা হলো اِتْمَامُ شَيْءٍ-এর পরে আবার যে বস্তুর জন্য كُنْ বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু সঠিকও নয়। কেননা এতে تَحْصِيْلُ حَاصِلْ লাজেম আসে। যা নির্দিষ্ট এবং مُكَوَّنْ وَاحِدْ-এর

http://islamiboi.wordpress.com

জন্য দুটি كَوْن অথবা বলা যায় مَوْجُوْد وَاحِدْ-এর জন্য দুটি وُجُوْد হওয়া লাজেম আসে। কেননা মুখাতাব হওয়ার জন্য কোনো বস্তুর বিদ্যমান থাকা জরুরি। অন্যথায় অনুপস্থিত ও অবিদ্যমান বস্তুকে সম্বোধন করা লাজেম আসবে, যা সঠিক নয়।

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো, قَضٰى শব্দটি اَرَادَ-এর অর্থে।

কুন বলা দ্বারা শুধু এতটুকু বুঝানো উদ্দেশ্য যে, ওদিকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলো আর তৎক্ষণাৎ এদিকে কোনো মাধ্যম ও বিরতি ছাড়াই তা বাস্তবে প্রকাশমান হলো। তাফসীরে মাদারিকে আছে–

وَهٰذَا مَجَازٌ عَنْ سُرْعَةِ التَّكْوِيْنِ وَالتَّمْثِيْلِ اِذْ لَا قَوْلَ ثَمَّ

অর্থ : এটি আজ্ঞা পালন ও সৃষ্টি হওয়া এর দ্রুততা বুঝাবার রূপক। কেননা সেখানে তো আর কোনো কথা [বা বলা]-র অস্তিত্ব নেই। –[তাফসীরে মাদারিক]

قَوْلُهُ كُنْ : অর্থাৎ নিরেট অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ববান হয়ে যাও, 'না' থেকে 'হ্যাঁ' হয়ে যাও। এর অর্থ এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা **আপনার আমার** মতো এ **দুই বর্ণের 'কুন' (كُنْ)** হও শব্দটি উচ্চারণ করেন। কেননা বর্ণ এবং শব্দও তো সৃষ্ট **(حَادِثٌ) অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বপ্রাপ্ত অনিত্য]** এবং আল্লাহ পাক জিহ্বা, ওষ্ঠ ও ধমনী কোষাশ্রয়ী উচ্চারণের মুখাপেক্ষীও নন। **তবে তার সৃজন প্রক্রিয়াকে বান্দাদের বুঝ উপযোগী** ও তাদের বোধ -এর যথাসম্ভব নিকটবর্তী বর্ণনা পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গি আর **কি গ্রহণ করা যেত?**

لَهُ [তাকে] সর্বনামটি সে বিষয়ের জন্য যা এখনও বাহ্য অস্তিত্ব লাভ করেনি, তবে আল্লাহ তা'আলার ইলমে তো তা যথারীতি বিদ্যমানই রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার আদেশের অভিমুখে আদিষ্টও বিদ্যমান-এর মাঝে সময়ের বিচারে কোনো ব্যবধান নেই। যে কোনো আদিষ্ট অর্থই বিদ্যমান হওয়া এবং বিদ্যমান মানেই আদিষ্ট হওয়া।

اَمْرُهُ لِلشَّيْءِ بِكُنْ لَا يَتَقَدَّمُ الْوُجُوْدَ وَلَا يَتَاَخَّرُ عَنْهُ فَلَا يَكُوْنُ مَاْمُوْرًا بِالْوُجُوْدِ اِلَّا وَهُوَ مَوْجُوْدٌ بِالْاَمْرِ وَلَا مَوْجُوْدًا بِالْاَمْرِ اِلَّا وَهُوَ مَاْمُوْرٌ بِالْوُجُوْدِ ـ

অর্থাৎ কুন দ্বারা কোনো কিছুকে তাঁর আদেশ ঐ বিষয়ের অস্তিত্বের আগেও নয় অস্তিত্বের পরেও নয়। যা কিছু অস্তিত্ব লাভে আদিষ্ট তা আদেশ সংযোগে [আদেশ জগতে] বিদ্যমানই; এবং যা-ই আদেশে বিদ্যমান, তাই অস্তিত্ব লাভে আদিষ্ট। অর্থাৎ এখানে আদিষ্টও অস্তিত্ব সম্পন্ন বলে কোনো ভেদরেখা কার্যত টানা যায় না। –[ইবনু জারীর সূত্রে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২১৫]

قَوْلُهُ كُنْ فَيَكُوْنُ : এখানে كَانَ টি সম্পূর্ণ ক্রিয়া (تَامَّةٌ) ; অসম্পূর্ণ (نَاقِصَةٌ) নয়। অর্থাৎ হয়ে যা, অস্তিত্বে এসো– এর সমার্থক, অমুক বিষয়রূপে হয়ে যা -এর সমার্থক নয়। এটি تَامَّةٌ জাতীয় كَانَ অর্থাৎ اَحْدَثَ অস্তিত্বে আয়, হও ফলে তখনই তা অস্তিত্ববান হয়।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ : অর্থাৎ ব্যাস, তখনই ঐ বিষয়টি অস্তিত্বে এসে যায়। হয়ে যেতে কোনোও বিলম্ব হয় না এবং তার জন্য কারো সহায়তা, মাধ্যম হওয়া, অংশগ্রহণ করা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। এ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব বিধানে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অতি দ্রুত বাস্তবায়ন বুঝানো–

اَلْمُرَادُ مِنْ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ سُرْعَةُ نِفَاذِ قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ تَكْوِيْنِ الْاَشْيَاءِ ـ (كبير)

এ যেন মুশরিকদের প্রতিই সম্বোধন যে, আল্লাহ তা'আলার সৃজন প্রক্রিয়া তোমাদের বোধগম্য হলো কি? তাতে তো আল্লাহ তা'আলার ইরাদা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুরই অংশ গ্রহণের অবকাশ নেই। সুতরাং এতে তোমাদের অংশীবাদের ভিত্তিই ধ্বংস যায়।

প্রশ্ন : فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো অবিদ্যমান বস্তুকে অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করলে তাকে كُنْ বলেন। ফলে সে অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বশীল হয়ে যায়। এতে তো مَعْدُوْمٌ বস্তুকে সম্বোধন করা লাজেম আসে।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই সে অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বশীল বস্তুর হুকুমে হয়ে যায়। সুতরাং সম্বোধন করা সঠিক আছে। এ ছাড়াও كُنْ فَيَكُوْنُ দ্বারা তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্য, উদ্ভাবন উদ্দেশ্য নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢٠. وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ دِيْنَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ الْاِسْلَامَ هُوَ الْهُدٰى وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ الَّتِيْ يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهَا فَرْضًا بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الْوَحْيِ مِنَ اللّٰهِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ يَحْفَظُكَ وَلَا نَصِيْرٍ ـ يَمْنَعُكَ مِنْهُ ـ

১২০. ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তোমাদের প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতে ধর্মাদেশের অনুসারী হও। বল, আল্লাহ তা'আলার পথ-নির্দেশই অর্থাৎ ইসলামই প্রকৃত পথ-নির্দেশ। এটা ব্যতীত আর সবকিছু গুমরাহী, পথ ভ্রষ্টতা। জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ওহী আসার পর ধরে নিলাম তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশির যে দিকে তারা তোমাকে আহ্বান করছে এর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার কোনো অভিভাবক হবে না যে তোমাকে রক্ষা করবে এবং কোনো সাহায্যকারীও হবে না যে তোমাকে তাঁর আজাব হতে ফিরিয়ে রাখবে।

لَئِنْ-এর لَامْ টি এইস্থানে قِسْمَةٌ বা কসম অর্থব্যঞ্জক।

١٢١. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مُبْتَدَاٌ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ـ اَيْ يَقْرَءُوْنَهٗ كَمَا اُنْزِلَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ وَحَقَّ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْخَبَرُ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط نَزَلَتْ فِيْ جَمَاعَةٍ قَدِمُوْا مِنَ الْحَبْشَةِ وَاَسْلَمُوْا وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ اَيْ بِالْكِتَابِ الْمُؤْتِيْ بِاَنْ يُحَرِّفَهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ـ

১২১. যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তাদের যারা এটা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে যেমন অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি এটা পাঠ করে কোনোরূপ বিকৃত না করে তারাই এতে বিশ্বাস স্থাপন করে। হাবশা [আবিসিনিয়া] হতে একদল লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়। আর যারা এটা অর্থাৎ তাদের প্রদত্ত কিতাব প্রত্যাখ্যান করে যেমন এতে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করে তারাই চিরকালের জন্য জাহান্নামাগ্নিতে যাত্রার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَرٌ বা বিধেয় হলো اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ।

يَتْلُوْنَهٗ এই বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

حَقَّ শব্দটিতে مَصْدَرٌ অর্থাৎ مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্মরূপ نَصْبٌ ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَرٌ বা বিধেয় হলো اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

يَتْلُوْنَهٗ এই বাক্যটি حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক।

حَقَّ শব্দটিতে مَصْدَرٌ অর্থাৎ مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ বা সমধাতুজ কর্মরূপ نَصْبٌ ব্যবহৃত হয়েছে

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَحَقَّ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ : حَقَّ تِلَاوَتِهِ মাসদারে মাহযুফের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। মূলত ইবারতটি হবে এভাবে- يَتْلُوْنَهُ تِلَاوَةً সিফতকে আগে এনে মওসূফের দিকে إِضَافَتْ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ : আপনি তাদের যতই মন যুগিয়ে চলুন না কেন এবং তাদের সাথে সমবেদনা ও সহমর্মিতার আচরণই করুন না কেন তারা কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। কেননা তাদের অসন্তুষ্টির কারণ হলো বিদ্বেষ এবং হিংসা এর কোনো চিকিৎসা নেই। আপনি তাদের মনতুষ্টির জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের অভিমুখী হয়ে নামাজ পড়েছেন। এতে তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের সীমা বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া আর কোনো ফল হয়নি। তাদের অসন্তুষ্টির কারণ তো এটা নয় যে, তারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান করছে আর আপনি তাদের সামনে সত্য প্রকাশ করতে কৃপণতা করছেন; বরং তাদের মনোবাসনা হলো আপনিও তাদের রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে যান। আপনিও তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হোন। তবেই তারা আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সুতরাং যারা প্রকাশ্য মুশরিক এবং ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসে যাদের সঙ্গে কোনো স্তরেই সমদর্শিতা-সংযোগ নেই, তাদের তুষ্টি কামনা ও তাদের সঙ্গে আপস-মিল রক্ষা করে চলার চেষ্টা সম্পর্কে কি বিধান হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। -[জামালাইন : খ. ১. পৃ. ২১৫]

قَوْلُهُ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ : এখানে مِلَّةٌ বলতে সে ধর্মমত বুঝানো হয়েছে, যা তারা নিজেরা তৈরি করে রেখেছিল। مِلَّةٌ অর্থ মাযহাব-ধর্মমত ও জীবনবিধান। -[কামূস]

مِلَّتْ ও دِيْنٌ-এর মাঝে পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে ও উম্মতের একক ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ করে দীন ব্যবহৃত হয়। যেমন- دِيْنُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার দীন, دِيْنُ زَيْدٍ অর্থাৎ যায়েদের দীন। আর মিল্লাত ব্যবহৃত হয় নবী ও সমষ্টি [জামাত] এর সঙ্গে যুক্ত করে। যেমন- مِلَّةُ إِبْرَاهِيْمَ ইবরাহীমি মিল্লাত, ইহুদি মিল্লাত, মুসলিম মিল্লাত। -[রাগিব]

قَوْلُهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ : أَهْوَاءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব মতধারা ও ধ্যান-ধারণা যার ভিত্তি জ্ঞানও বাস্তব সত্যের পরিবর্তে প্রবৃত্তির চাহিদাও খেয়ালখুশির উপরে। আর ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য ওহীভিত্তিক ইলম, যা যে কোনো বিচারে নিশ্চয়তা ও প্রামাণ্যতা বহন করে এবং যা যে কোনো দ্বিধা-সংশয়ের উর্ধ্বে। -[বায়যাবী]

قَوْلُهُ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ : এখানে বাতিল অনুসরণের ক্ষেত্রে যে হুমকি প্রদান করা হয়েছে তার সঙ্গে আপনার কাছে বাস্তব ইলম আসার পর শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। এ শর্তের আলোকে ইমাম রাজী (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, হুমকি প্রদান সব সময়ই সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ সরবরাহ করার পরেই হতে পারবে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ : অন্তর দিয়ে তার শ্রদ্ধা-সম্মান, তার বিধানমতে জীবন গড়ে আমল করে তাকে রদবদল, সংযোজন বিয়োজন ও বিকৃতি সাধানের অবকাশ নেই না। যথাযথ তেলাওয়াত ও তেলাওয়াতের হক আদায় করার মাঝে এ সবই অন্তর্ভুক্ত। اَلْكِتَابُ দ্বারা এখানে তাওরাত উদ্দেশ্য।

وَلَنْ تَرْضَى الخ আয়াতের শানে নুযূল : وَلَنْ تَرْضَى আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে مَعَالِمُ-এর বর্ণনা হচ্ছে- লোকেরা রাসূল ﷺ -এর কাছে প্রশ্নাদি করে যেগুলোর উত্তর তিনি তো এ মনে করে দেন, যাতে করে লোকেরা ইসলামের দিকে ধাবিত হয়ে যায়। অথচ তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বয়ং রাসূল ﷺ-কে নিজেদের দিকে ধাবিত করা। অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, নবী করীম ﷺ যখন বায়তুল মাকদিসকে কিবলারূপে গ্রহণ করেছেন, তখন ইহুদি ও নাজরানের খ্রিস্টানদের এ আশা হয়েছিল যে, অবশেষে তিনি তাদের ধর্মকেই গ্রহণ করে নেবেন। কিন্তু বায়তুল্লাহ শরীফ এর দিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ হলো তখন, সে আশা নিরাশায় রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং তারা নিরাশ হয়ে গেল। রূহুল মা'আনীতে এটা লেখা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ সর্বশ্রেণির লোকদের অন্তর সংযুক্ত করতেন এ আশায় যে, হতে পারে এ লোকগুলো মুসলমান হয়ে যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে

http://islamiboi.wordpress.com

আর اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে এটা যে, একটি প্রতিনিধিদল [যার লোক সংখ্যা ৪০] রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। তন্মধ্যে ৩২ জন হাবশার ছিলেন এবং ৮ জন সিরিয়ার পাদ্রীদের মধ্য থেকে ছিলেন। এ দলটি হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালিবের নেতৃত্বে এসেছিল, যিনি রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং হযরত আলী (রা.)-এর আপন ভাই ছিলেন। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

হিংসুটে লোকদের অযথা বিতর্ক : হিংসুটে লোকদের উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলুক এবং এমনিভাবে দীনের বিধানাবলির ব্যাপারে অন্য কোনো পয়গাম্বরের মাধ্যমের প্রয়োজন না থাকে কিংবা পরবর্তীতে অবতরণের দিক দিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যায়ন আমাদের দ্বারা করানো হোক। অথবা পরবর্তীতে ওহীর মাধ্যমে কালাম ব্যতীত অন্য কোনো নিদর্শন আমাদেরকে দেখানো হোক, যা দ্বারা আমরা সান্ত্বনা পেয়ে যাই।

আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত দাবিকে দু'ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে যে, উক্ত দাবি মূর্খতার ও অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, যা তাদের পূর্বের ও পরের নির্বোধ লোকদের পক্ষ থেকে চলে আসছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে, এসব একই থলির খেলনা। তাদের অন্তর পরস্পর সংযুক্ত। সকলে এক ধরনের কথাই চিন্তা করে যে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি কথা হওয়ার সম্পর্ক। এটা তো এমন অজ্ঞতাও মূর্খতার কথা যে, উত্তরের অপেক্ষাই রাখে না। হ্যাঁ, যে স্থানে প্রমাণের প্রয়োজন সেখানে শুধু একটি প্রমাণই নিয়ে ঘুরেছে। আর তা হচ্ছে মনের সান্ত্বনা চায়। অথচ আল্লাহ পাক সান্ত্বনাদায়ক অনেক প্রমাণাদিই পেশ করেছেন; কিন্তু যদি কেউ সঠিক রাস্তাই না চায় এবং একগুয়েমী ও বিরোধিতায়ই লিপ্ত থাকে তবে সান্ত্বনা তার ভাগ্যে কোথা থেকে আসবে? তাই ইহুদি ও খ্রিস্টান আহলে ইলম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মূর্খ বলা হয়েছে। কেননা ইল্ম থাকা ও না থাকা তাদের বেলায় সমান। -[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩১]

উল্টো আচরণ : ইহুদিগণের উক্ত ৪০টি বিভৎসতা বর্ণনা করে নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, যারা এত অধিক বক্র স্বভাবের ও স্বল্প বুদ্ধির অধিকারী তারা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল ও আপনার ব্যথার মূল্যায়ন করে। আপনার কাছ থেকে হেদায়েত অর্জন করা তো দূরের কথা; বরং তাদের উচ্চাভিলাষ হচ্ছে উল্টো তাদের পথে আপনাকে পরিচালনা করার চিন্তায় তারা সর্বদা মগ্ন থাকতো এবং ইসলাম গ্রহণের আশায় বৈধ কোনো পন্থায় রাসূল ﷺ-এর নরম আচরণকে ভুল দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের মনের চাহিদা ও উদ্দেশ্য পূরণ করা সূত্র বানাতে চেষ্টা করতো। আর যেহেতু রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের অনুসরণ করাটা অসম্ভব। তাই তাদের উক্ত চিন্তা-ধারাও অসম্ভব। কেননা তাদের বর্তমান ধর্ম রহিত ও বিকৃত হওয়ার কারণে শুধু একটি অকেজোর সমষ্টি হয়ে রয়েছে। অকাট্য ইল্ম ও ওহী আগমন সত্ত্বেও রাসূল ﷺ-এর জন্য সেটার অনুকরণ করা বলা যায় যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে আহ্বান করা এবং নবী করীম ﷺ -এর জন্য এ কাজ অসম্ভব। তাই রাসূল ﷺ-এর জন্য তাদের অনুকরণ অসম্ভব। আর তাদের অনুকরণ না করলে তাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াটাও অসম্ভব। -[প্রাগুক্ত]

সংশোধন ও হেদায়েতের জন্য যোগ্য মাণিক্যের প্রয়োজন : সারকথা হচ্ছে এটা যে তাদের পক্ষ থেকে [অর্থাৎ তারা ঈমান গ্রহণ করবে এ ব্যাপারে] রাসূল ﷺ -কে একেবারে নৈরাশ হয়ে যাওয়া অপরিহার্য। হ্যাঁ, কিন্তু রাসূল ﷺ-এর মূল দায়িত্ব হচ্ছে তাবলীগ [দীনের প্রচার] ও চেষ্টা করা এর থেকে তিনি মুক্ত হতে পারবেন না। যোগ্য মাণিক্য এবং উপযুক্ত পদার্থ তার আহ্বানের দিকে আগে বেড়ে স্বয়ং লাব্বাইক বলবে। সুতরাং যে চির বঞ্চিত সে রাসূলের নিকটে থেকেও ঈমান গ্রহণ থেকে মাহরূম থাকবে। আর যে সুভাগ্যবান সে দূরে থাকা সত্ত্বেও তার কাছে চলে আসবেন।

হাফেজ শীরাজী (র.) বলেন–

حسن زبصره بلال از حبش صهيب زروم

زخاك مكه ابو جهل ايں چه بو العجبى ست

অর্থ– হযরত হাসান বসরী (র.) বসরা থেকে, হযরত বিলাল (রা.) হাবশা থেকে এবং হযরত সুহাইব (রা.) রোম থেকে এসে ঈমান গ্রহণ করেছেন। অথচ পবিত্র মক্কার জমিনে থেকে আবূ জাহেলের কি আশ্চর্যময় আচরণ। -[প্রাগুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১২২. يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.

১২২. হে ইসরাঈল সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এই ধরনের আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৩. وَاتَّقُوْا خَافُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ تُغْنِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ فِيْهِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ فِدَاءٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ. يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর সন্ত্রস্ত হও যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না কাজে আসবে না এবং কারো নিকট হতে কোনো ক্ষতিপূরণ ফিদয়া বা রক্তপণ গৃহীত হবে না এবং সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না, আর তারা কোনো সাহায্যও পাবে না, আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে তাদেরকে রক্ষা করা হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ فِيْهِ : لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ জুমলা হয়ে يَوْمًا-এর صِفَت আর صِفَت জুমলা হলে عَائِد জরুরি। এখানে فِيْهِ বৃদ্ধি করে عَائِد মাহজুফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : কুরআনের অলঙ্কারিত্ব ও পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি : ইহুদিদের নিকৃষ্টতা ও নোংরামি সম্পর্কে প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। তারপরও ৪০টি মন্দতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর সমাপ্তিতে পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে নিজ নিয়ামতসমূহ এবং উৎসাহ প্রদান ও আতঙ্কিতকরণের বিষয়ও পুনরাবৃত্তি করছেন। যাতে বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তভাবে সে সর্বসাকুল্যে সম্পূর্ণ আকারে সামনে এসে যায়। যাতে করে সেগুলোর ফলাফল ও আংশিকতাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ হয়ে যায় এবং এ আলঙ্কারিক পদ্ধতি বক্তৃতা ও ভাষণসমূহে অনেক উচু হিসেবে গণ্য করা হয়। এ জন্য যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত ২/৩ বার করে বর্ণনা করে অন্তরে বসিয়ে দেওয়া হয়। যেমন অনর্থক রাগ করা খুবই মন্দ কাজ। তারপর বলে দেওয়া হয় যে, এর মধ্যে অমুক-অমুক ক্ষতি ও মন্দতা রয়েছে এবং ক্ষতি ও অপকারিতা থেকে ১০/২০টি হিসেব করে বলে দেওয়ার পর অবশেষে পুনরায় বলে দেওয়া যে, মোটকথা অনর্থক রাগ করা খুবই মন্দ কাজ। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই উপকারে আসে। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে এর সৌন্দর্যতা ও মন্দতা অন্তরে বসে যাবে।

قَوْلُهُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ : ইহুদিদেরকে বার বার তাদের উন্নতি ও পথভ্রষ্টতার অতীত ধারা বিবরণী শুনিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য-মাহাত্ম্যের রহস্য কি ছিল? এ শ্রেষ্ঠত্বের মূল একমাত্র এটাই ছিল যে, তারা ছিল তাওহীদ ও একত্ববাদের ধারক বাহক এবং তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরপুরুষ। এখন যদি তারা আবার সে নিয়ামতের অধিকারে ধন্য হতে চায়, তবে তাদের আবার ফিরে আসতে হবে প্রথম পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনের দিকেই।

قَوْلُهُ وَاتَّقُوْا يَوْمًا : ইহুদিরা এ সময় এক দিকে তো কিয়ামতের মৌল বিশ্বাস স্মরণ থেকে মুছে ফেলেছিল, তদুপরি শাস্তি প্রতিদান যা কিছু হওয়ার, তা এ পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ মনে করে নিয়েছিল। এজন্যই প্রচলিত তাওরাতেও [বাইবেলে পুরাতন নিয়মে] যেখানে যেখানে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের প্রতিফলনের আলোচনা রয়েছে, সেখানে শুধু পার্থিব শুভাবস্থা ও দুরবস্থার কথাই রয়েছে। এজন্য প্রথমে প্রথমে তাদের আখিরাত ও কিয়ামতের দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একে একে তাদের মৌল বিশ্বাস তথা সুপারিশে মুক্তি, প্রায়শ্চিত্ত [কাফফারা] ও মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তির ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা হয়েছে। আয়াতের শব্দসমূহ এতই ব্যাপক ও অর্থবহ যে, ইহুদিবাদের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টবাদেরও শিকড় কেটে যাচ্ছে। কেননা খ্রিস্টবাদের তো মূল ভিত্তিই হচ্ছে যীশু কর্তৃক সুপারিশ, প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তিপণ নামের বাতিল ও অলীক ধ্যান-ধারণা। অর্থাৎ যীশুই তার জীবন দানের মাধ্যমে তার অনুসারীদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে দিয়েছেন

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢٤. وَ اذْكُرْ اِذِ ابْتَلٰى اخْتَبَرَ اِبْرٰهِمَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَبْرَاهَامَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ بِاَوَامِرَ وَنَوَاهٍ كَلَّفَهُ بِهَا قِيْلَ هِىَ مَنَاسِكُ الْحَجِّ وَقِيْلَ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَ فَرْقُ الرَّأْسِ وَقَلْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَالْاِسْتِنْجَاءُ فَاَتَمَّهُنَّ اَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ قَالَ تَعَالٰى لَهُ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ط قُدْوَةً فِى الدِّيْنِ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ط اولادى اجعل ائمة قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى بِالْاِمَامَةِ الظّٰلِمِيْنَ . الْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ دَلَّ عَلٰى اَنَّهُ يَنَالُهُ غَيْرُ الظَّالِمِ .

১২৪. এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে ইবরাহীম শব্দটি অপর এক কেরাতে ইবরাহাম (ابراهام) রূপে পঠিত রয়েছে। তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা অর্থাৎ কিছু আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়ে। কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছিল হজপালনের বিধি-বিধানসমূহ। কেউ কেউ বলেন, এগুলো হলো, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া, মিসওয়াক করা, গোঁফ কর্তন করা, চুলে সিথি কাটা, নখ কাটা, বগলতলার লোম উৎপাটন করা, নাভির তলদেশের লোম মুণ্ডন করা, খাতনা করা এবং শৌচ করা। পরীক্ষা করলেন যাঁচাই করলেন অনন্তর সেগুলো সে পূর্ণ করল অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে সে এগুলো আদায় করল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা ধর্মীয় পরিচালক করছি। সে বলল, আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও অর্থাৎ আমার অধঃস্তন সন্তানদেরকেও আপনি নেতা করুন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার নেতা নির্বাচনের এই প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের অর্থাৎ তাদের মধ্যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। এতে প্রমাণ হয় যে, যারা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তারা তা পেতে পারে।

١٢٥. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ مَرْجِعًا يَثُوْبُوْنَ اِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَاَمْنًا مَأْمَنًا لَهُمْ مِنَ الظُّلْمِ وَالْاِغَارَاتِ الْوَاقِعَةِ فِىْ غَيْرِهِ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقٰى قَاتِلَ اَبِيْهِ فَلَا يُهَيِّجُهُ وَاتَّخِذُوْا اَيُّهَا النَّاسُ مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِمَ هُوَ الْحَجَرُ الَّذِىْ قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ مُصَلًّى ط مَكَانَ صَلٰوةٍ بِاَنْ تُصَلُّوْا خَلْفَهُ رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ خَبَرٌ وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَمَرْنَاهُمَا اَنْ اَىْ بِاَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ مِنَ الْاَوْثَانِ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ الْمُقِيْمِيْنَ فِيْهِ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ . جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ الْمُصَلِّيْنَ .

১২৫. এবং স্মরণ কর যখন এই গৃহকে কাবাকে মানবজাতির জেয়ারতক্ষেত্র প্রত্যাবর্তনক্ষেত্র অর্থাৎ সকল দিক হতে এই দিকেই মানুষ ফিরবে ও নিরাপত্তাস্থল হিসেবে করেছিলাম। অর্থাৎ যে নিপীড়ন ও লুটতরাজ অন্যান্য শহরে পরিলক্ষিত হতো তা হতে নিরাপদ ভূমিরূপে তাকে বানিয়েছিলাম। মক্কার অবস্থা তখনো এরূপ ছিল যে, পিতার হত্যাকারীকে পেলেও সেখানে কেউ উস্কানিমূলক কিছু করত না।

হে লোকসকল! তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে যে পাথরটিতে তিনি কাবাগৃহ নির্মাণকালে দাঁড়াতেন মুছল্লারূপে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর অর্থাৎ তার পিছনে তওয়াফ শেষে দুই রাকাত নামাজ আদায় কর। اِتَّخَذُوْا শব্দটি অপর এক কেরাতে خ অক্ষরটিতে যবরসহ خَبَر বা বার্তামূলক বাক্যরূপে পঠিত রয়েছে। ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আমার গৃহ তওয়াফ ও ইতেকাফকারী অর্থাৎ তাতে অবস্থানকারী এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের অর্থাৎ সালাত কায়েমকারীদের জন্য প্রতিমা হতে পবিত্র রাখতে ওয়াদা করিয়েছিলাম। অর্থাৎ তাদের উভয়কে এজন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম।

اَنْ طَهِّر এইস্থানে اَنْ শব্দটি মূলত بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। رُكَّع এটা رَاكِع -এর বহুবচন। السُّجُوْد এটা سَاجِد -এর বহুবচন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ إِذْ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ : এখানে اُذْكُرْ মাহযূফ মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِذْ হরফটি উহ্য ফে'ল اُذْكُرْ -এর মামূল, اِبْتَلٰى -এর নয়। এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে যারা বলে এখানে اِذْ হরফটি اِبْتَلٰى -এর মামূল। কেননা এ সূরতে عَامِلْ -এর উপর مَعْمُوْلْ টা মুকাদ্দাম হওয়া লাজেম আসে।

قَوْلُهُ اِبْرَاهِيْمَ : এটি তারকীবে مَفْعُوْلْ مُقَدَّمْ হয়েছে। আর এটি হলো تَقْدِيْم وَاجِبْ কেননা কায়দা আছে- যখন فَاعِلْ -এর সাথে এমন জমীর মিলে আসে, যা মাফঊলের দিকে ফিরে তখন মাফঊলকে আগে আনা আবশ্যক। অন্যথায় اِضْمَارْ قَبْلَ الذِّكْرِ লাজেম আসবে, যা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ اِبْرَاهِيْمَ : اِبْرَاهِيْمَ অপর এক কিরাতে اِبْرَاهَامْ রূপও পঠিত হয়। সুরইয়ানী ভাষায় اِبْرَاهِيْمَ অর্থ মেহেরবান পিতা।

قَوْلُهُ بِاَوَامِرَ وَنَوَاهٍ : اَوَامِرْ এটি اَمْرَةٌ -এর বহুবচন আর نَوَاهٍ হলো نَاهِيَةٌ -এর বহুবচন। এখানে فَاعِلْ দ্বারা মাফঊলের অর্থ উদ্দেশ্য اَىْ بِمَامُوْرَاتٍ وَمَنْهِيَاتٍ - অথবা এখানে اِسْنَادْ مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে اَمْرْ আমর বা নির্দেশ দাতাতো হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর كَلِمَاتْ হলো مَامُوْرْ যেহেতু মাফঊলের দিকে ইসনাদ করা হয়েছে তাই এটি مَجَازْ عَقْلِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَثَابَةً : এটি جَعَلْنَا -এর দ্বিতীয় মাফঊল। যদি جَعَلَ بِمَعْنٰى صَيَّرَ হয়। আর যদি جَعَلَ بِمَعْنٰى خَلَقَ হয় তাহলে এটি اَلْبَيْتْ থেকে حَالْ হবে।

مَرْجِعًا : এটি مَثَابَةً -এর তাফসীর। ইঙ্গিত করলেন যে, مَثَابَةً শব্দটি اِسْم ظَرْف -এর সীগাহ। কেউ কেউ مَصْدَرْ مِيْمِىْ বলেও মত দিয়েছেন। প্রথম সূরতে প্রশ্ন হয় যে, اِسْم ظَرْف -এর সীগাহ হলে مَثَابْ হওয়ার কথা ছিল। تَاء বৃদ্ধি করা হলো কেন?

উত্তর : এখানো মোবালাগা বুঝানোর জন্য تَاء বৃদ্ধি করা হয়েছে। وَقِيْلَ لِتَانِيْثِ الْبُقْعَةِ

قَوْلُهُ اتَّخِذُوْا : এটি جَعَلْنَا -এর সাথে عَطْف হয়েছে এবং এটি قَوْل مَحْذُوْف -এর مَقُوْلَهْ -

اَىْ قُلْنَا لَهُمْ اتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى .

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْخَاءِ خَبَرٌ : এক কেরাতে اتَّخَذُوْا -এর خ হরফে ফাতহাসহ সঠিক। তখন সীগাটি اَمْرْ -এর না হয়ে مَاضِىْ -এর হবে এবং জুমলাটি সংবাদজ্ঞাপক হবে। অর্থাৎ মানুষেরা সেটিকে নিজেদের মুসাল্লা [নামাজের স্থান] বানিয়েছে।

قَوْلُهُ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ : [হে মুসলমানরা!] اِتَّخِذُوْا আমর বা অনুজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) اُذْكُرْ শব্দটি উহ্য মেনে এ দিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে রাসুল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরতে অর্থ হবে–

اَىْ اُذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ وَقْتَ ابْتِلَاءِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَتَذَكَّرُوْا مَا وَقَعَ فِيْهِ مِنَ الْاُمُوْرِ الدَّاعِيَةِ اِلَى التَّوْحِيْدِ فَيَقْبَلُوْا الْحَقَّ وَيَتْرُكُوْا مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ .

কেউ কেউ বলেন, এখানে বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরতে অর্থ হবে–

اَىْ اُذْكُرُوْا يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَقْتَ ابْتِلَاءِ اِبْرَاهِيْمَ .

আর তাদেরকে সম্বোধন দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তাদেরকে ধমক ও ভৎর্সনা করা। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মর্যাদা প্রত্যেক দলের কাছেই স্বীকৃত রয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত এমন বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন, যা মুহাম্মদ ﷺ -এর বক্তব্য মানতে বাধ্য করে। কেননা রাসুল ﷺ -এর ধর্ম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ اِخْتَبَرَ : اِبْتَلٰى -এর তাফসীর করা হয়েছে اِخْتَبَرَ দ্বারা। অর্থ পরীক্ষা করা।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : اِبْتِلَاءْ তথা পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার পরিস্থিতি তো সেখানে হয়, যেখানে পরীক্ষকের সামনে কোনো ব্যাপার গোপন থাকে। সেটি জানার জন্য যে পরীক্ষা করে থাকে। এখানে আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে তো তা অসম্ভব।

জবাব : এখানে **اِسْتِعَارَهْ تَبْعِيَّةٌ** হিসেবে اِبْتِلَاءٌ-এর ব্যবহার করা হয়েছে। **اَىْ فَعَلَ مَعَ اِبْرَاهِيْمَ فِعْلًا مِثْلَ الْمُخْتَبِرِ**

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিচয় : পবিত্র কুরআনে এ নামের প্রথম আগমন। কুরআনের প্রথম শ্রোতাদল ছিল আরববাসীরা। তাদের পরিচিতি ও বিদিত মহান ব্যক্তিদের উল্লেখ পবিত্র কুরআন অনাড়ম্বরভাবে ও অতিরিক্ত পরিচিতির প্রলেপ ছাড়াই করে দেয়। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.) তো সেই মহান ব্যক্তি যার সম্পর্কে আরব মুশরিক ব্যতীত ইহুদি-খ্রিস্টানরাও উত্তমরূপে অবহিত ছিল। সুতরাং তার আরো পরিচিতি দেওয়া অপ্রয়োজনীয় ছিল।

ইনি সে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, যিনি ইসলামি আকিদার কথা না বললেও ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস মতেও একজন পয়গাম্বর ছিলেন। তাওরাতে তার নাম রয়েছে আব্রাম ও আব্রাহাম এ দু'ভাবে। তাওরাতের [বাইবেল পুরাতন নিয়ম] বর্ণনা মতে তার ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝে দশ পুরুষের ব্যবধান ছিল অর্থাৎ তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর একাদশ অধস্তন পুরুষ। তবে কতক সবল যুক্তির ভিত্তিতে তাওরাতের ব্যাখ্যাকারদের ধারণাতেই তাওরাতের বংশসূত্র বর্ণনার মাঝ থেকে কতক পুরুষের নাম বাদ পড়ে গিয়ে থাকবে। প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ স্যার চার্লস মরিস্টন -এর সর্বশেষ গবেষণা মতে তার জন্মসন খ্রিস্টপূর্ব ২১৬০ অব্দ এবং তাওরাতে তার বয়স উল্লিখিত হয়েছে ১৭৫ বছর। এ হিসেবে ওফাতের সন হবে খ্রিস্টপূর্ব ১৯৮৫। পিতার নাম ছিল তারাহ (تَارَخ) আরবি উচ্চারণে আযার। প্রাচীন ভাষাগুলোতে এ নামটি বিভিন্ন শব্দে উচ্চারিত হয়েছে। তবে মুসলমানদের জন্য তো কুরআনে বর্ণিত আযার (اٰزَر) -ই যথেষ্ট। জন্মস্থান ব্যাবিলনের কালদানিয়া [ইংরেজি উচ্চারণে কালডিয়া] বর্তমান ভৌগলিক বিন্যাসে এটিই ইরাক নামে পরিচিত। যে নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাওরাত সেটি [টিজ] নামে উল্লেখিত হয়েছে।

ইসমাঈলী এবং ইবরাহীমী বংশধারায় এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক দিন থেকেই চলে আসছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন উভয় বংশধারার পূর্বপুরুষ। আল্লাহ তা'আলার সবিশেষ নিয়ামত অর্থাৎ তাওহীদের পতাকাবহন এখন ইসরাঈলী বংশধারার অব্যাহত নাফরমানির দণ্ডস্বরূপ ছিনিয়ে নিয়ে ইসমাঈলী বংশধারার নবীর মাধ্যমে সারা বিশ্বের জন্য ব্যাপক-বিস্তৃত হতে চলেছে। ইবরাহীমী ব্যক্তিত্ব [এবং এতদসঙ্গে ইসমাঈলী ব্যক্তিত্বের] কেন্দ্রীয় গুরুত্ব সম্পর্কে দুনিয়াকে অবহিত করা প্রয়োজনী হয়ে পড়েছিল। সে কারণে এখানে তাই করা হচ্ছে। −[তাফসীরে মাজেদ খ. ১, পৃ. ২২৪-২২৫]

قَوْلُهُ بِكَلِمَاتٍ : কয়েকটি কথায়, কয়েকটি বিষয়ে। এ বিষয়গুলো কি ছিল, তা নির্ণয়ে বিরাট মতভেদ রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) নিম্নোক্ত ইবারতে এ মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন−

قِيْلَ هِيَ مَنَاسِكُ الْحَجِّ وَقِيْلَ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَفَرْقُ الرَّأْسِ وَقَلْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَالْاِسْتِنْجَاءُ.

قَوْلُهُ فَاَتَمَّهُنَّ : অর্থাৎ তিনি সেসব পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং সেসব বিধান পালন করেছেন

قَوْلُهُ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا : এটি جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ এবং একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব। প্রশ্নটি হলো এই, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন সকল আদেশ-নিষেধ সুন্দররূপে সম্পন্ন করেন, তখন কি হলো? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তোমাকে মানুষের দীনি নেতা বানাব।

اِمَامٌ : ইমাম বলাই হয় তাকে, যার আনুগত্য করা হয় অভিধানে এবং শরিয়তের পরিভাষায় এটাই ইমামের অর্থ।

اِسْمٌ لِمَنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ لِمَنْ يَلْزَمُ اِتِّبَاعُهُ وَالْاِقْتِدَاءُ بِهِ فِىْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ اَوْ مَا فِىْ شَيْئٍ مِنْهَا (جصاص)

আয়াতের বাস্তবতা : এই দীনি নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং বিশ্বের এক বিরাট অংশের ইমামত এখন পর্যন্ত তার হিস্যায়ই চলে আসছে। ইসলাম ছাড়াও তাওহীদের সঙ্গে যেসব ধর্মের কিছুটা হলেও সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদ, তারা ইমামতের ব্যাপারে তারা একমত।

قَوْلُهُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ : বিশ্বের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব এবং ইমামতের সুসংবাদ পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অন্তর স্বাভাবিকভাবেই খুশিতে বাগবাগ হয়ে যায়। আর এই খুশির যোশে তিনি জিজ্ঞেস করেই বসেন যে, এই ইনআম ও পুরস্কারে আমার বংশ এবং আমার অধস্তন পুরুষরাও আছে কিনা?

ذُرِّيَّةٌ সন্তান-বংশপরম্পরা। গোটা বংশধারা এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই ইবরাহীমী বংশধারায় ইসরাঈলী এবং ইসমাঈলী উভয় শাখাই শামিল রয়েছে। ইসরাঈলরা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার যে দাবি করতো, এখান থেকে তার শিকড়ও উৎপাটিত হয়ে গেছে। مِنْ ذُرِّيَّتِىْ শব্দে **مِنْ تَبْعِيْضِيَّةٌ** অংশবিশেষ অর্থে। বাক্যাংশের বিন্যাস ও গঠন প্রক্রিয়া এটা স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রশ্নের ভঙ্গিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ দোয়া তার গোটা বংশধরের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, বরং তার একটা অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اَوْلَادِيْ : এটি ذُرِّيَّةٌ-এর তাফসীর। মূলত ذُرِّيَّةٌ বলা হয় نَسْلُ الرَّجُلِ তথা পুরুষের বংশ ধারাকে এবং তার মূল ব্যবহার اَوْلَادٌ صِغَارٌ বা ছোট ছোট সন্তানদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তারপর ব্যবহারে ব্যাপকতা এসেছে এবং ছোট বড় সকলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতে থাকে। মুফাসসির (র.) اَوْلَادِيْ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে মূল অর্থ তথা اَوْلَادٌ صِغَارٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ ও ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। যার মাঝে বড়রা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ جَاعِلُكَ : جَاعِلُكَ -এর ك -এর উপর (عَطْف) করা হয়েছে وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ বাক্যাংশকে। বাক্যের পূর্ণরূপ যেন এই وَجَاعِلُكَ بَعْضَ ذُرِّيَّتِيْ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আনন্দ ও নিয়ামতে নিজের সন্তানদেরকে শরিক করা কেবল স্বাভাবিক ব্যাপারই নয়; বরং এটা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সুন্নতও।

قَوْلُهُ اِجْعَلْ اَئِمَّةً : মুফাসসির (র.) এ ইবরাত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, مِنْ ذُرِّيَّتِيْ-এর عَامِلْ উহ্য রয়েছে। আর তাহলো اِجْعَلْ এবং তার مَفْعُوْل ثَانِيْ- اَيْ اِجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ اَئِمَّةً ও উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ : এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আবেদনের জবাব। তিনি তাঁর কিছু সংখ্যক সন্তানের ইসমতের আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর আবেদন কবুল করার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে কতক সন্তানকে নির্ধারণও করেছেন। অর্থাৎ বরকত ও মর্যাদার ধারা তোমার বংশেও অবশ্যই থাকার কথা; কিন্তু তা লাভ করার জন্য কেবল উত্তরাধিকার সূত্র আর বংশ-পরম্পরাই যথেষ্ট নয়; বরং এজন্য ঈমান আর নেক আমলও অর্জন করতে হবে। যেন সৎ সন্তানের পক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া কবুল হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, জালিম নয়, এমন বংশধর তা লাভ করবে। খবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বংশে উভয় ধরনের লোক হবে। কিছু লোক হবে সৎ এবং অনুগত। আর কিছু লোক হবে জালিম ও নাফরমান। সৎ লোকেরা ইমামতের সুসংবাদ লাভ করেছে আর জালিমদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। এতে এ মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, তার বংশধরদের মধ্যে জালিমও হবে। তারা ইমামত বা নেতৃত্ব পাবে না, বরং ইমামত পাবে তাদের মধ্যকার সৎ সত্যনিষ্ঠ মুত্তাকীরা। عَهْد মানে ইমামতের অঙ্গীকার।

قَوْلُهُ بِالْاِمَامَةِ : এটি একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব। প্রশ্ন : হযরত ইবরাহীম (আ.) তো আবেদন করেছিলেন اِمَامَتْ সম্পর্কে; কিন্তু জবাব দেওয়া হচ্ছে عَهْد সম্পর্কে। প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে মিল পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর : এখানে عَهْد দ্বারা اِمَامَتْ উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন : পুনরায় প্রশ্ন জাগে, যখন عَهْد দ্বারা اِمَامَتْ উদ্দেশ্য, তখন সরাসরি اِمَامَتْ শব্দই উল্লেখ করা হলো না কেন?

উত্তর : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমামত মূলত আল্লাহর পক্ষ হতে একটি আমানত ও অঙ্গীকার। তা ঐ ব্যক্তির পক্ষেই আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ عَهْد -এর তাফসীর করেছেন নবুয়ত দ্বারা। উভয়টির সারকথা একই। কেননা اِمَامَتْ দ্বারা نُبُوَّتْ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ الظَّالِمِيْنَ : এখানে জুলুমের অর্থ কুফর এবং ফিসক করা হয়েছে। কাফেররা দীনি ইমামত লাভ না করার বিষয়টি নিতান্ত স্পষ্ট এবং সর্বসম্মত। কেউ কেউ এ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য ফিসককেও যথেষ্ট মনে করেন।

قَوْلُهُ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ : যোগসূত্র : পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ইমামত ও মর্যাদার বর্ণনা ছিল। আর ইমামত তথা নবুতের অধিকারীর জন্য কেবলা হওয়া জরুরি। এজন্য এ আয়াতে ইবরাহীম (আ.)-এর কেবলার বিবরণ এসেছে। এখানে বনী ইসরাঈলকে সতর্ক করা হয়েছে যে, আখেরী যমনার নবী সেই ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ.)-এরই বংশধর। সুতরাং তাঁর ব্যাপারে সাবধানে মুখ খুলবে।

مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ : এটা বেহেশতী পাথর। যার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, নির্মাণস্থল উঁচু হলে সে অনুযায়ী উঁচু হয়ে তা যেত এবং উঁচু সিঁড়ির কাজ দিত। আর পুনরায় মানুষ নেমে গেলে পরে নীচু হয়ে যেত। এ পাথরে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, যা আজও বিদ্যমান। এ পাথরটি কা'বার দরওয়াজা ও মুলতাজিম এর সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের জমানায় পানিতে ভেসে যাওয়ার কারণে পুনরায় সে পাথরটিকে মজবুতভাবে বায়তুল্লাহ থেকে অল্প দূরে পুরাতন بَابُ السَّلَامِ ও মিম্বারে حَرَم এবং জমজম এর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। তওয়াফ শেষে দু রাকআত নামাজ পড়া হানাফিয়া ও মালিকিয়াদের মতে ওয়াজিব, আর শাফিইয়া ও হানাবিলাদের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্।

مِنْ مَقَامِ- এ শব্দটি تَبْعِيْضِيَّةٌ অর্থাৎ এর একাংশ বুঝাবার জন্য مِنْ ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ مِنْ অর্থ فِيْ করেছেন আবার কেউ কেউ مِنْ কে অতিরিক্ত বলেছেন- (روح) وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ اَوْ بِمَعْنَى فِيْ اَوْ زَائِدَةٌ وَالْاَظْهَرُ الْاَوَّلُ

قَوْلُهُ مُصَلًّى : অর্থ সালাতের স্থান বা দোয়ার স্থান। কারণ صَلَّيْتُ অর্থ আমি দোয়া করেছিও করা হয়। মূল উৎসের দিক থেকে সালাতের স্থান আর দোয়ার স্থানের মধ্যে খুব একটা তফাতও নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

কুরআনের সম্বোধন ধারা : একথা আগেও বলা হয়েছে আর এখন কথাটি আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরআন মাজীদ তার সম্বোধনধারায় মানব ইতিহাসের ক্রমিকধারা মেনে চলতে বাধ্য নয়। বহুবার আশপাশের আয়াতে বরং কখনো এক আয়াতেই অর্থের মিলের কারণে এমন দুটি ঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়, যার মধ্যে সময়ের বিচারে শত শত বছরের ব্যবধান রয়েছে। আর এতে এটাও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, অতীত ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এবং যেন তার প্রসঙ্গেই বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য কোনো স্বতন্ত্র নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এজন্য অনুজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করে তার আতফ করা হয় অতীতজ্ঞাপক শব্দের উপর। মূলত কুরআন হচ্ছে কেবল হেদায়েতের কিতাব। এ লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কুরআন কোনো মনবীয় সীমারেখা বা কোনো কৃত্রিম এবং নিজেদের গড়ে দেওয়া ধ্যানধারণার পরোয়া কখনো করে না। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩১]

قَوْلُهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে صَلٰوة দ্বারা তওয়াফের দু'রাকাত নামাজ উদ্দেশ্য। এটি শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযাহাবে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর হানাফী এবং মালেকী মাযহাবে ওয়াজিব; কিন্তু মাকামে ইবরাহীমে পড়াই আবশ্যক নয়; বরং মসজিদে হারামের যেখানে ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। তবে মাকামে ইবরাহীমে পড়ার ফজিলত বেশি। এ হিসেবে اِتَّخِذُوْا -এর নির্দেশটি اَمْر اِسْتِحْبَابِىْ

কেউ কেউ বলেন, এখানে صَلٰوة দ্বারা সাধারণ নামাজ উদ্দেশ্য। কেউ বলেন, এখানে صَلٰوة দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য এবং মাকামে ইবরাহীম দ্বারা হরম উদ্দেশ্য।

মুফাসসির (র.) رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ উদ্দেশ্য নেওয়ার قَرِيْنَة হলো আয়াতের শানে নুযূল। বর্ণিত আছ রাসুল ﷺ একদিন হযরত ওমর (রা.)-এর হাত ধরে বলতে লাগলেন- هٰذَا مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ [এটা ইবরাহীম (আ.)-এর অবস্থানস্থল। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন- اَفَلَا نَتَّخِذُهُ مُصَلًّا [তবে কি আমরা সে স্থানটি নামাজের স্থান নির্ধারণ করব না?] সুতরাং সেদিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যা দ্বারা হযরত ওমর (রা.)-এর সঠিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে।

قَوْلُهُ اَمَرْنَا هُمَا : عَهِدْنَا ফেয়েলটি اَمَرْنَا -এর অর্থে হবে। সুতরাং তখন আর কোনো প্রশ্ন থাকল না।

بِاَنْ : এ اَنْ টি اَنْ مَصْدَرِيَّة তাফসীরী নয়। এটি فِعْل اَمْر -এর শুরুতে مَامُوْر بِهٖ করার জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ اِسْمَاعِيْل : ইসমাঈল (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁর মিসরীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভজাত। তাঁর জন্মসন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০৭৪ অব্দ। আর মৃত্যু আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯২৭ অব্দ। তাওরাতের বর্ণনা মোতাবেক তিনি ১৩৭ বৎসর বয়স পেয়েছিলেন। তার ১২ জন সন্তান ছিল এবং তাদের মাধ্যমে ১২টি বংশধারায় শুরু হয়।

-[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩২]

قَوْلُهُ طَهِّرَا : সকল ধরনের শিরক এবং মূর্তিপূজার পঙ্কিলতা। 'তাহারাত' শব্দটি طَهِّرَا [পবিত্রতা] শব্দ থেকে উৎপন্ন। মূলত এখানে অর্থ হচ্ছে অর্থগত এবং বিশ্বাসগত অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক এবং তাওহীদের আলোচনা ও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত দ্বারা পরিপূর্ণ রাখ। প্রাসঙ্গিকভাবে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার নির্দেশও এসে যায়। -[প্রাগুক্ত]

هُوَ تَطْهِيْرُهٗ مِنَ الْاَصْنَامِ وَعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ فِيْهِ مِنَ الشِّرْكِ بِاللّٰهِ (اِبْنُ جَرِيْر عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَابْنِ زَيْدٍ) مِنَ الْاَوْثَانِ الْخَبَائِثِ وَالْاَنْجَاسِ كُلِّهَا (مَدَارِك) وَالتَّطْهِيْرُ الْمَامُوْرُ بِهٖ هُوَ التَّنْظِيْفُ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيْقُ بِهٖ.

طَهِّرَا : দ্বিবচনের শব্দ। হুকুম দেওয়া হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হযরত ইসমাঈল (আ.)-কেও। আর তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় তাকেও সমভাবে শরিক করা হচ্ছে। ফিকহবেত্তাগণ সম্বোধনের এ ধারার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সকলের, সে ইবরাহীমের মতো নেতা হোক বা ইসমাঈলের মতো নেতার অনুসারী। এ শব্দটিতে আধিক্যের অর্থও রয়েছে। অর্থাৎ খুব ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে। ফকীহগণ বলেছেন, মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ফরজ।

-[প্রাগুক্ত]

প্রশ্ন : এখানে তো طَهِّرَا দ্বিবচনের সীগাহ এসেছে; কিন্তু সূরা হজে এক বচনের সীগাহ এসেছে। (وَطَهِّرْ بَيْتِىَ الخ) উভয় আয়াতের মাঝে সামঞ্জস্য কিভাবে হবে?

উত্তর : সূরা হজের নির্দেশ ছিল কাবা নির্মাণের পূর্বেকার। সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়নি। কিন্তু এখানে তাঁকেও সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَيْتِىَ : আমার ঘর বলা হয়েছে সম্মানার্থে। কথাটা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। ইসলামের আল্লাহ তো কোনো দৃশ্যমান দেহধারী দেবতা নয় যে, বসবাস করা এবং চলাফেরা কিংবা উঠাবসা করার জন্য গৃহ বা স্থানের প্রয়োজন হবে। সুতরাং

http://islamiboi.wordpress.com

আমার ঘর অর্থ আমার বসবাসের ঘর তো হতেই পারে না। আমার ঘর অর্থ কেবল এই হতে পারে যে ঘর, যা আমার স্মরণ ও ইবাদতের জন্য চিহ্নিত নির্ণীত এবং নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলার ঘর বলার উদ্দেশ্য কেবল তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা।

সুতরাং আয়াতে কাবার প্রতি বিশেষ কোনো ইঙ্গিত নেই। বরং তাতে উল্লেখ করা হয়েছে بَيْتٌ -এর গুণ। ফকীহগণ এ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আল্লাহর যে কোনো ঘর অর্থাৎ মসজিদের জন্যই এই হুকুম। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ عَاكِفِيْنَ : عُكُوْف অর্থ হচ্ছে সম্মানার্থে কোনো স্থানে অবস্থান করাকে বাধ্যতামূলক করে নেওয়া। –[রাগেব]

আর শরিয়তে **إِعْتِكَاف** বলা হয়– هُوَ الْاِحْتِبَاسُ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْقُرْبَةِ (رَاغِبْ) অর্থাৎ ইবাদতের নিয়তে কোনো বিশেষ সময় মসজিদে অবস্থান বাধ্যতামূলক করাকে ই'তিকাফ বলে।

قَوْلُهُ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ : রুকূ' ও সিজদা সালাতের দুটি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত অবস্থা-আকৃতি। চারটি শব্দ ব্যবহার না করে কেবল **আবিদীন জাকিরীনও বলা** যেত। কিন্তু বিস্তারিত এবং নির্দিষ্ট করা দ্বারা একেকটি ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বতন্ত্রভাবে **প্রকাশ পেয়েছে।**

প্রশ্ন : طَائِفِيْنَ এবং عَاكِفِيْنَ -এর মাঝে একটিকে অপরটির সাথে عَطْف করে لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ বলা হলো কিন্তু **اَلرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -এর মাঝে** عَطْف -কে বর্জন করা হলো কেন?

উত্তর : তওয়াফ এবং ই'তিকাফ দুটি ভিন্ন ভিন্ন আমল, এজন্য وَاوْ عَاطِفَه -এর মাধ্যমে বলা হয়েছে। আর রুকু-সিজদা উভয়টি মিলে একটি ইবাদত। তাই একত্রে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ : অর্থাৎ رُكَّعٌ হলো رَاكِعٌ -এর বহুবচন। আর سُجُوْدٌ হলো سَاجِدٌ -এর বহুবচন। উভয়টি جَمْع تَكْسِيْر -এর শব্দ। আর পূর্বের طَائِفِيْنَ এবং عَاكِفِيْنَ উভয়টি ছিল جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ এতে تَنْوِيْع فِى الْمُضَاحَة তথা অলংকারিক সৌন্দর্য বিদ্যমান রয়েছে। অন্যথায় طَائِفِيْنَ ও عَاكِفِيْنَ -এর মতো رُكَّعٌ وَسُجُوْد-কেও رَاكِعِيْنَ ও سَاجِدِيْنَ আনা যেত।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হয় যে, দুটি جَمْعُ مُكَسَّر -কে দুই ওজনে কেন আনা হলো? উত্তর : এটিও বালাগাতের একটি ধরণ।

আরো ইশকাল হয় যে, দুটি ওজনের মধ্যে فُعُوْل -কে তথা سُجُوْد -কে পরে আনা হলো কেন?

উত্তর : প্রথম জবাব হলো রুকু আগে হয় এবং সেজদা পরে হয়। তাই سُجُوْد -কে পরে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হলো رِعَايَت فَاصِلَه তথা আয়াতের শেষ শব্দের মিল রাখতে গিয়ে এমনটি করা হয়েছে। কেননা এ আয়াতের পূর্বাপর এমন শব্দ দিয়ে শেষ হয়েছে। যার পূর্বের হরফটি মদের হরফ।

قَوْلُهُ الْمُصَلِّيْنَ : এটি اَلرُّكَّعِ السُّجُوْدِ -এর তাফসীর। মুফাসির (র.)-এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে جُزْ বলে كُلْ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং مَجَازْ مُرْسَلْ হিসেবে رُكَّعٌ سُجُوْد দ্বারা মুসল্লি উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : رُكَّعٌ سُجُوْد দ্বারা যখন মুসল্লি উদ্দেশ্য তখন সরাসরি اَلْمُصَلِّيْنَ বললেই তো হতো। অধিকন্তু এটি সংক্ষেপও হতো। তা না করে اَلرُّكَّعِ السُّجُوْدِ বলা হলো কেন?

উত্তর : এভাবে বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসল্লির ঐ নামাজই গ্রহণযোগ্য যাতে রুকু এবং সিজদা রয়েছে। ইহুদিদের মতো রুকুহীন নামাজ গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও যেহেতু রুকু এবং সিজদা নামাজের দুটি বড় রোকন তাই বিশেষভাবে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার ব্যাখ্যা : এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কখনো পরীক্ষাদাতার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা হয়ে থাকে। এটাতো আল্লাহ তা'আলার শানে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি তো সর্বজ্ঞাত ও মহাবিজ্ঞ। হ্যাঁ, পরীক্ষার অন্য একটি উদ্দেশ্য এটাও হয় যে,অন্য অনবগত ব্যক্তি এ নিয়ামত বা পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মর্যাদা ও স্তর এবং যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত হওয়া। যাতে করে তাকে যে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেটাকে লোকেরা অযথা মনে না করে। আর যার পরীক্ষা নেওয়া হয় সে যদি অযোগ্য বা অপারগ হয়। তবে সে নিজেও নিজ বিবেক দ্বারা ইনসাফ করতে পারবে এবং অন্যরাও তার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, সেটাকে অন্যায় হিসেবে গণ্য না করতে পারে।

সুতরাং এ স্থানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে যেখানেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাউকে পরীক্ষা করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এর দ্বারা এ অর্থই উদ্দেশ্য হবে। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩৫]

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পরীক্ষা : সে পরীক্ষা হয় তো উল্লিখিত বিধানাবলির ব্যাপারে ছিল যে, দেখা যাক কতটুকু পর্যন্ত এগুলোর ব্যাপারে তিনি সফলকাম হতে পারেন। অথবা মহব্বতের পরীক্ষা উদ্দেশ্য ছিল যে, জীবনের বড় কঠিন চক্কর ও দুষ্কর স্থানগুলো এসেছে। শৈশবকাল থেকেই তাওহীদের [আল্লাহর একত্ববাদের] বাসনা অন্তরে জন্মেছে তখন ঘরের লোকজন ও গোত্রের লোকদের সাথে কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তারপর বয়স বৃদ্ধির পর নবুয়ত দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। তখন জাতি ও দেশবাসীর সাথে দ্বন্দ্ব হয়েছে এবং নমরূদের অপশক্তির সাথে মোকাবিলা হয়েছে যে মোকাবিলায় প্রাণের বাজি লাগানো হয়েছে। এক সময় এখনও এসেছে যে, নিজ স্ত্রী ও সম্মানের উপর আঘাত এসেছে। তারপর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা এটা এসেছে যে, বার্ধক্যকালে নিজ প্রাণ ও সম্পদের চেয়ে অধিক প্রিয় স্নেহের সন্তান আর তাও একমাত্র এবং অতি আদরের দুলাল, যাকে জীবনের একমাত্র মূলধন বলা যায়– তাকে কুরবানির স্থানে উপঢৌকন দিতে হয়েছে। হ্যাঁ, জমানা স্বচোখে দেখেছে যে, এক একটি করে সবগুলো পরীক্ষায় আল্লাহর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ.) সফলকাম হয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিয়ে আপন চাচাতো বোন হারূন এর কন্যা হযরত সারা (আ.)-এর সাথে হয়েছে এবং মিশরের তৎকালীন বাদশাহ রাকইউন -এর কন্যা হাজেরা (আ.)-এর সাথে হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ৯২ বছর বয়সে হযরত হাজেরার উদর থেকে হযরত ইসমাঈল (রা.) ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। ১৭৫ বছর বয়সে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। হযরত সারা (আ.) এর কবরের পার্শ্বেই তাকে দাফন করা হয়েছে। –[প্রাগুক্ত]

اِمَامَتْ كُبْرٰى -এর অর্থ : এ পরীক্ষা যদি নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে হয়ে থাকে, তবে ইমামতে কুবরা দেওয়ার অর্থ নবুয়ত দ্বারা সম্মানিত করা হবে। যেমন বলা যায় যে, ইতিপূর্বে তো হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কাছে ওহী এসেছিল। কিন্তু এর তাবলীগ বা প্রচার এবং নবুয়তের দায়িত্ব পালনের আদেশ এখন এসেছে। আর যদি এ পরীক্ষা নবুয়তপ্রাপ্তির পর হয়ে থাকে, তবে ইমামতে কুবরা এর অর্থ এ হবে যে, তাঁর নবুয়তের সীমাকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তাঁর নবুয়তকে স্বীকারকারী পৃথিবীর আনাচ-কানাচের লোকেরা হবে এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও তাঁর মতাদর্শের সামনে মাথা নত করবে। –[প্রাগুক্ত]

মু'তাযিলা ও রাওয়াফিজ সম্প্রদায়ের আকিদা ও প্রমাণাদি : মু'তাযিলা সম্প্রদায় لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ বাক্য দ্বারা ফাসিক [পাপাচারী] ইমাম হওয়ার যোগ্য নয় এ ব্যাপারে দলিল পেশ করছে।

আহলে বায়ত -এর ইমামগণ নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে রাওয়াফিয ও শীয়া সম্প্রদায় উক্ত বাক্য দ্বারা দলিল পেশ করেছে।

রাওয়াফিযদের বিশ্বাস হচ্ছে ইমামতি আল্লাহ তা'আলা কার্যাবলির সিফতসমূহ থেকে। তাই তারা ইমাম নিষ্পাপ হওয়াকে অপরিহার্য মনে করে। অথচ দুটি কথাই ভুল।

اِمَامَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য যদি প্রচলিত অর্থ হয়। তবে তো ظَالِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কাফের ও মুশরিক। আর আয়াতের অর্থ হবে কোনো কাফের মুসলমানের ইমাম বা পথপ্রদর্শক ও শাসক হতে পারে না। আর اِمَامَتْ দ্বারা উদ্দেশ্য যদি اِمَامَتْ كُبْرٰى অর্থাৎ নবুয়ত ও রিসালত এর দায়িত্ব নেওয়া হয়, তবে ظَالِمْ নিজ সাধারণ অর্থে থেকে যাবে এবং এর দ্বারা عِصْمَتْ اَنْبِيَاءْ প্রমাণিত হবে, যা সর্বসম্মত। অর্থাৎ নবীর জন্য সম্ভব নয় যে, তিনি জালিম ও ফাসিক হবেন। এটা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের দলিলের উত্তর।

আর আহলে বায়ত-এর ইমামগণের নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে এটা যে, "عَهْدْ" শব্দটি যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমামতে কুবরা আল্লাহ তা'আলা -এর সম্পর্ক স্বয়ং নিজের দিকে করেছেন। বলার অবকাশ রাখে না যে, এটাই হচ্ছে নবুয়তের দায়িত্ব যা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অর্পণ করা হয়।

আর যদি এর দ্বারা শুরা কর্তৃক অর্পিত ইমামতির দায়িত্ব উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়; বরং উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টকৃত হয়। মোটকথা উক্ত আয়াত দ্বারা আম্বিয়া (আ.) নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু اِمَامَتْ صُغْرٰى [মজলিসে শুরার পক্ষ থেকে অর্পিত ইমামতির দায়িত্ব] বা اِمَامَتْ كُبْرٰى অর্থাৎ হুকুমত ও রাজত্ব [দেশের রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক] এর নিষ্পাপ হওয়া এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না।

পয়গাম্বরগণ (আ.)-এর ইসমত বা নিষ্পাপতা : আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে পয়গাম্বরগণ (আ.) নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ও পরে সর্বপ্রকার ছোট ও বড় গুনাহসমূহ থেকে [যা ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে] পবিত্র। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতের সাথে একমত পোষণ করেছে। কিন্তু নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই নবীর দ্বারা কিছু ছোট গুনাহ হয়ে যাওয়া কেউ কেউ জায়েজ মনে করেছেন। অথবা স্খলন, ত্রুটি, ভ্রান্তি এবং ইজতেহাদী পদচ্যুতিসমূহ কতক মুহাক্কিগণের মতে ওগুলোর উপর পয়গাম্বরকে স্থায়ী রাখা হয় না; বরং সাথে সাথে সতর্ক করে দিয়ে তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

কিন্তু শীয়া সম্প্রদায়ের আকিদা বা বিশ্বাসের উপর হতবুদ্ধিতা প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা এক দিকে আম্বিয়া (আ.)-কে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র মানে। আর অপর দিকে ধার্মিকতা তাদেরকে কুফরি করারও অনুমতি দেয়।

নবীগণ (আ.)-এর পবিত্রতার পরিপন্থি ঘটনাবলির তাৎপর্য : যখনি কোনো কথা প্রকাশ্যভাবে নবীগণের পবিত্রতার বিরোধী বুঝা যাবে, তখন সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে নির্দেশনা চালু করা হবে–

১. যদি সেটা খবরে ওয়াহেদ হয়। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) বিশেষ কোনো এক স্থানে নিজ স্ত্রীকে 'বোন' বলে আখ্যায়িত করা। তবে নবীগণের পবিত্রতার অকাট্য আকিদার মোকাবিলায় সে ব্যাপারটিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

২. আর যদি নকলে মুতাওয়াতিরের সাথে সে ঘটনা প্রমাণিত হয়, তবে সে অকাট্য আকিদাকে অটল রাখার জন্য সে ঘটনাকে বাহ্যিক অর্থ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৩. অথবা উক্ত কথা বা ঘটনাকে উত্তম পদ্ধতির পরিপন্থি এবং নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা বলে বিবেচিত করা হবে। যেমন– হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ঘটনা। তিনি সে নিষেধাজ্ঞাকে সহানুভূতিসুলভ নিষেধাজ্ঞা মনে করেছেন অথবা নাহীয়ে তানযীহী হিসেবে বিবেচনা করেছেন কিংবা তার দ্বারা ভুলে এমন হয়ে গিয়েছিল বা এ ঘটনা নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ছিল। এ ধরনের সকল সম্ভাব্য নির্দেশনা এতে হতে পারে।

অথবা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ এবং إِنِّي سَقِيمٌ বলাটা কোনো ক্ষেত্রে রূপক কিংবা নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

কিংবা হযরত মূসা (আ.) যে এক কিবতীকে মেরে ফেলেছিলেন, সেটাকে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে অথবা অনিচ্ছার উপর বিবেচনা করা হবে।

কিংবা হযরত দাউদ (আ.) সে মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন যাকে বিয়ে করার জন্য আওরিয়া নামক ব্যক্তি প্রস্তাব দিয়েছিল। আর এমন অন্যের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া মহিলাকে অপর যে কোনো পুরুষ বিয়ে করতে পারে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে অপর কারো জন্য বিয়ে করা জায়েজ নেই বরং হারাম।

অথবা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আছরের নামাজ ছুটে যাওয়া তিনি ভুলে গিয়েছিলেন হিসেবে বিবেচিত হবে।

হযরত ইউনুস (আ.) নিজ কওমের উপর অধিক ক্রোধ হওয়া কিংবা নবী করীম ﷺ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর প্রতি আন্তরিকভাবে ধাবিত হওয়া অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। যা ক্ষমার যোগ্য কিংবা এ ঘটনার সত্যতাকে অস্বীকার করা হবে ইত্যাদি-ইত্যাদি। –[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৩৭]

আল্লাহ তা'আলার শাহী, পবিত্র স্থান ও তার বিধানাবলি : 'মাকামে ইব্রাহীম' একটি বিশেষ পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) নির্মাণ কাজ করেছিলেন। সে স্থানকে দু' কারণে নিরাপত্তার স্থান বলা হয়েছে। এক তো হজের কার্যাবলি আদায়ের কারণে, যেগুলোর মধ্যে এ স্থানটিও গণ্য, পরকালের আজাব থেকে নিরাপদে থাকবে। দ্বিতীয়ত ইহজগতের নিরাপত্তাও উদ্দেশ্য। হেরেম এর সীমার ভিতরে কোনো বড়র চেয়ে বড় অপরাধী ও খুনী [কোনো এক মুফাস্সির (র.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী] এমন কি! নিজ পিতার হত্যাকারীও যদি প্রবেশ করে, তবে সেই শুধু জানের নিরাপত্তা পাবে এমন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সে শাহী, পবিত্র স্থানে ও আশ্রয়ের স্থানে সকল প্রাণী এবং বৃক্ষ-তরুলতারও নিরাপত্তা রয়েছে। হত্যাকারী অপরাধী থেকে হেরেম -এর সীমার ভিতরে কিসাস বা প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। এদের জন্য প্রাণের ক্ষমা রয়েছে। হ্যাঁ, তার পানাহারের পণ্য সামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে করে সে স্বয়ং সেখান থেকে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। তখন তাকে বন্দি করে কিসাস নেওয়া যাবে। অন্যান্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে বিধানাবলি ভিন্ন রয়েছে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে।

অন্যান্য ইমামগণের ভিন্ন মতামত রয়েছে। যার ব্যাখ্যা وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا আয়াতের অধীনে আসবে। আর এখানে আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য নিরাপত্তার বিধানাবলি বর্ণনা করা। এখন যদি কোনো জালিম ইনসাফকে ধ্বংস করে এবং বিধানাবলিকে ভঙ্গ করে কখনো নিরাপত্তায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে তবে এর দ্বারা বিধানাবলির কিছু আসে যায় না।

মসজিদে হারাম -এর সীমা ও বিধানসমূহের উপর কিয়াস করে কেউ কেউ হারামে মদীনার বিধান এবং সীমাসমূহ ও নির্ধারণ করেছেন। তবে এর বিধানসমূহ কালাম ও ফিকহ শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করলে জানা সম্ভব হতে পারে। –[প্রাগুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

١٢٦. وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا
الْمَكَانَ بَلَدًا اٰمِنًا ذَا اَمْنٍ وَقَدْ اَجَابَ
اللّٰهُ دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يُسْفَكُ
فِيْهِ دَمُ اِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيْهِ اَحَدٌ وَلَا
يُصَادُ صَيْدُهُ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ وَارْزُقْ
اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ
الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ اِلَيْهِ وَكَانَ اَقْفَرَ لَا
زَرْعَ فِيْهِ وَلَا مَاءَ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط بَدَلٌ مِنْ اَهْلِهِ وَخَصَّهُمْ
بِالدُّعَاءِ لَهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ لَا يَنَالُ
عَهْدِ الظّٰلِمِيْنَ قَالَ تَعَالٰى وَ ارْزُقْ مَنْ
كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ
فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ قَلِيْلًا مُدَّةَ حَيَاتِهِ
ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اُلْجِئُهُ فِي الْاٰخِرَةِ اِلٰى
عَذَابِ النَّارِ ط فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيْصًا
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ الْمَرْجِعُ هِيَ ـ

অনুবাদ :

১২৬. স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলেছিল হে আমার প্রতিপালক! এটাকে এই স্থানটিকে নিরাপদ নগরে অর্থাৎ নিরাপত্তার অধিকারী এক নগরে পরিণত কর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই দোয়া কবুল করেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি এই শহরটিকে হারাম [হত্যা ও বিশৃঙ্খলা যে স্থানে অবৈধ] রূপে নিরূপণ করেন। সুতরাং এইস্থানে কোনো মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা, কারো উপর নিগ্রহ চালানো কোনো পশু শিকার করা, সজীব ঘাস উৎপাটন করা বৈধ না। আর তার অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে তাদেরকে ফল-ফলাদি দিয়ে রিজিক প্রদান করুন আল্লাহ তা'আলা এটাও কবুল করেছিলেন। মক্কা শস্যপত্রহীন, পানিশূন্য এক অনুর্বর বিরান ভূমি ছিল। তায়িফ ভূমিতে উর্বর শাম বা সিরিয়া অঞ্চল হতে এইস্থানে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ বাক্যটি اَهْلَهُ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

পূর্বোল্লিখিত لَا يَنَالُ عَهْدِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আমার প্রতিশ্রুতি সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য না এই আয়াতের মর্মের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি [হযরত ইবরাহীম (আ.)] এই দোয়ায় কেবল মু'মিনের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আর যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করবে, তাকেও জীবনোপকরণ দান করব। অনন্তর কিছুকালের জন্য অর্থাৎ জীবনকালের জন্য দুনিয়ার রিজিক দান করত জীবনোভোগ করতে দিব। অতঃপর তাকে পরকালে জাহান্নামের শাস্তির দিকে বাধ্য করে জবরদস্তি করে নিয়ে যাব। তারা এটা হতে আর কোনো মুক্তির জায়গা পাবে না। আর এটা কত নিকৃষ্ট পরিণাম। এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তস্থল।

اُمَتِّعُهُ ক্রিয়াটির ت টি তাশদীদ বা রূঢ় ও তাখফীফ বা লঘু [তাশদীদ ব্যতিরেকে] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رَبِّ : মূলত শব্দটি يَا رَبِّىْ ছিল। শুরুতে حَرْفُ نِدَا يَاءٌ এবং শেষের يَاءُ مُتَكَلِّمْ হযফ করা হয়েছে। رَبِّ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ ذَا اَمْنٍ : এ ইবরাত দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো এখানে শহরের দিকে اَمْنٌ বা নিরাপত্তার নিসবত করা হয়েছে অথচ নিরাপত্তার অধিকারী শহর হয় না; বরং শহরের অধিবাসীরা হয়ে থাকে।

জবাব : এখানে اِسْمُ فَاعِلٍ টি صِيْغَةُ النِّسْبِىْ তথা فَاعِلٌ ذِىْ كَذَا -এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ ذَا اَمْنٍ কেউ কেউ বলেন- এখানে اِسْنَادٌ مَجَازِىْ হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَارْزُقْ : মুফাসসির (র.) এখানে وَارْزُقْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَنْ كَفَرَ এটি مَحَلًّا مَنْصُوْب এবং فِعْل مَحْذُوْف -এর মাফঊল এবং তার عَطْف হয়েছে مَنْ اٰمَنَ -এর উপর–

اَىْ وَارْزُقْ مَنْ كَفَرَ لِاَنَّ الرِّزْقَ نِعْمَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ تَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ بِخِلَافِ الْاِمَامَةِ .

অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামত তথা রিজিকে কাফেরকেও শামিল করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমামত বা নবুয়তের নিয়ামত মুমিনদের জন্যই খাস।

قَوْلُهُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ : অর্থাৎ فَاُمَتِّعُهُ -এর মাঝে দুটি কেরাত রয়েছে। একটি তাশদীদ দিয়ে, এটি জমহুরের কেরাত। অপরটি তাখফীফ করে। এটি ইবনে আমেরের কেরাত। প্রথম সূরতে بَابُ تَفْعِيْل থেকে مُضَارِعُ مُتَكَلِّم -এর সীগাহ। দ্বিতীয় সূরতে بَابُ اِفْعَال থেকে।

قَوْلُهُ اَضْطَرُّهُ : اِضْطِرَار হলো اِخْتِيَار -এর বিপরীত। اِضْطِرَار বলা হয় কারো থেকে কোনো কর্ম তার ইচ্ছা ছাড়া সংঘটিত হওয়া। যেমন ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া। অনুরূপভাবে এমন স্থানেও اِضْطِرَار ব্যবহৃত হয় যেখানে কাজটি নিজেই করে; কিন্তু তা থেকে বিরত থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করে। যেমন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত জন্তু ভক্ষণ করা।

قَوْلُهُ اَلْجِئُهُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে اِضْطِرَار মাজাযী বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَحِيْصًا : يَجِدُ -এর ضَمِيْر مُسْتَتِر - مَنْ -এর দিকে ফিরেছে এবং عَنْهَا -এর ضَمِيْر টি اَلنَّار -এর দিকে ফিরেছে। مَحِيْص ইসমে জরফের সীগাহ। অর্থ– পলায়নের স্থান।

قَوْلُهُ الْمَرْجِعُ هِىَ : মুফাসসির (র.) এখানে هِىَ মাহযুফ ধরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مَخْصُوْص بِالذَّم উহ্য রয়েছে। আর সেটি হলো اَلنَّار -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا الخ : **যোগসূত্র :** পূর্বে কা'বাগৃহের মর্যাদা-ফজিলত শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইবরাহীম (আ.)-এর ইবাদতগৃহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এখন এ আয়াতে সে শহর এবং শহরের অধিবাসীদের ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পূর্বে পরকাল সংক্রান্ত দোয়া ছিল আর এখানে পার্থিব নিয়ামত তথা রিজিকের দোয়া করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا الْمَكَان : মুফাসসির (র.) هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ণয় করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে যে দোয়া করা হয়েছে তা শহর হওয়ার পূর্বেকার। এখানে শহর আবাদ হওয়া এবং সেই সাথে নিরাপত্তার দোয়াও করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অপর আয়াতে যে اِجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا রয়েছে। সেখানে শুধু নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা হয়েছে। কেননা সেটি শহর আবাদ হওয়ার পরের দোয়া। এজন্য সেখানে هٰذَا الْبَلَد এবং এ আয়াতে هٰذَا بَلَدًا বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন দোয়া। কেউ কেউ উভয়টি একই দোয়া মনে করেছেন।

قَوْلُهُ اٰمِنًا : এখানে ইশকাল হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো পূর্বেই নিরপত্তার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا তারপরও اَمْن নিরাপত্তার জন্য দোয়া করার কারণ কি?

উত্তর : পূর্বের নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল اَلْاَمْنُ مِنَ الْاَعْدَاءِ وَالْخَسْفِ وَالْمَسْخِ তথা শত্রু, ধসে যাওয়া এবং বিকৃতি থেকে নিরাপত্তা। আর এখানে উদ্দেশ্য اَلْاَمْنُ مِنَ الْجَدْبِ وَالْقَحْطِ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন থেকে নিরাপত্তা। তাইতো বলা হয়েছে– وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ -এর অধিকারীকে ফল-ফলাদি দ্বারা রিজিকের ব্যবস্থা করুন!

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا : অর্থাৎ মক্কা শহর নিরাপদ হওয়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা সে শহরকে হরম বানিয়েছেন। যেখানে কোনো মানুষের রক্ত ঝরবে না এবং কারো উপর জুলুম হবে না। সে শহরের ঘাস কর্তন করা যাবে না। কোনো শিকার ধরা যাবে না ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لَا يَسْفِكُ فِيْهِ دَامِ اِنْسَانٍ : এক্ষেত্রে মাসআলা হলো– যদি কেউ হরমের বাইরে হত্যা করে হরমে প্রবেশ করে, তাহলে হানাফী মাযহাব মতে তাকে হত্যা করা হবে না; কিন্তু তাকে সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। খানাপিনাসহ আরাম-আয়েশের সামগ্রী বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে সে হরম থেকে বের হতে বাধ্য হয়। সে বের হলে বাইরে গিয়ে তার কিসাস সম্পন্ন করা হবে।

শাফেয়ী মাযহাব মতে বাহির থেকে হরমে কিসাস নেওয়া হবে। আর যদি হরমের ভিতরেই হত্যা করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে কিসাস গ্রহণ করা হবে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১৫৭]

قَوْلُهُ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ : صَيْد শব্দটি مَصِيْد -এর অর্থে। صَيْد দ্বারা مُوْذِى বা ক্ষতিকর জন্তু খারেজ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ক্ষতিকর প্রাণীকে মারা যাবে। যেমন– কাক, চিল, বিচ্ছু। এমনিভাবে যে প্রাণীকে মানুষ লালন পালন করে সেগুলোও খারেজ। যেমন– উট, গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। এগুলো জবাই করা জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ : অর্থাৎ তার ভিজা ঘাস কর্তন করা যাবে না। এ ব্যাপারে মাসআলা হলো আহনাফের মতে যে সকল বৃক্ষ বা লতা পাতা নিজে নিজে জন্মে সেগুলো কাটা জায়েজ নেই। যেগুলো শুকিয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায় তা কর্তন করা যাবে এবং বিশেষভাবে ইযখির ঘাস কাটার অনুমতি রয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ : অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছিল। তাই তো আল্লাহ তা'আলা তায়েফকে শাম থেকে স্থানান্তরিত করে মক্কার অদূরে এনে আবাদ করে দিয়েছেন। এতো হলো একটি ব্যবস্থা। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে ফলমূল সারা বছর মক্কায় আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ بِنَقْلِ الطَّائِفِ : বর্ণিত আছে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করে ছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ.)-কে শামের একটি অঞ্চলকে স্থানান্তরিত করে মক্কায় আনার হুকুম দিলেন। হযরত জিবরীল (আ.) শামের একটি উর্বর ভুখণ্ড তুলে এনে প্রথমে কাবা ঘরের চতুর্পার্শ্বে সাতবার তওয়াফ করালেন তারপর মক্কার অদূরে একটি স্থানে রেখে দিলেন। যাকে তায়েফ বলা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া ও তার বাস্তবতা : হযরত ইবরাহীম (আ.) এসব দোয়া বিস্ময়কর রূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রথম দোয়া ছিল মক্কা নগরীতে নিরাপত্তা সমৃদ্ধ করে দেওয়া। চারিদিকে লুটেরা ও খুনীদের অবাধ রাজত্ব, লুটতরাজ ছিনতাই ও খুন-খারাবি যেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যম একান্ত সীমিত ও বিপদসঙ্কুল; পথের কোনো নিরাপত্তা নেই, তদুপরি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হজযাত্রী ও পুণ্যার্থীদের বিরামহীন আগমন। সময়ের ব্যবধানে সেখানেই এমন আমূল পরিবর্তন হয়েছে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার মানদণ্ডে বর্তমান মক্কা ও তার পরিপার্শ্ব এলাকা নিজেই নিজের তুলনা। না আছে ডাকাতির নামগন্ধ, না আছে কাফেলা লুণ্ঠনের ঘটনা, না আছে ছটফট করা লাশের করুণ ও বিভৎস দৃশ্য। ইসলামি শরিয়তে তো শহরও শহরতলীকে হারাম ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ এ চতুঃসীমার মাঝে কোনো প্রাণীকেও শিকার করা যায় না। কোনো খুনী ব্যক্তিও কাবা ঘরে এসে আশ্রয় নিলে তাকে সেখানে হত্যা করা যায় না। মক্কা নগরী ও কাবা ঘরের এ মর্যাদা জাহেলী যুগের লোকরাও রক্ষা করে চলেছে।

দ্বিতীয় দোয়া ছিল মক্কাবাসীরা যেন ফলফলাদি খাদ্যরূপে পেতে থাকে। মক্কা এমন একটি ভূখণ্ডে অবস্থিত, যেখানকার সব ভূমি হয়ত ধু ধু বালুকাময় কিংবা কঠিন পাথুরে। বৃষ্টির পরিমাণ অতি অল্প। মোটকথা তাজা ফল ও ফলদার গাছ তো দূরের কথা, সাধারণ ফল, ফুলের গাছ বরং সবুজ ও তাজা ঘাস পর্যন্ত দেখা যায় না। এটি পানি ও আর্দ্রতাবিহীন এক ভুখণ্ড। কোথাও সমতল মরু। কোথাও পাহাড়-টীলার সারি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও যত পরিমাণ তাজা ফলমূল, তরিতরকারী ও শস্য-ফসলের চাহিদা হোক তা আপনি শহর এলাকায় খরিদ করতে পারেন।

http://islamiboi.wordpress.com

এইমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বলা হয়েছিল যে, বিশেষ মেহেরবানি ও বরকতের বিশেষ অঙ্গীকার ঈমান ও পুণ্যকর্মের সাথে শর্তযুক্ত। এ শর্ত পূরণ ব্যতীত হবে না। (ايت ١٢٤) لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ এখন পুনরায় দোয়া করার সময় নিজেই এ শর্ত জুড়ে দিলেন যে, নিরাপদ শহর আর ফলমূল দ্বারা রিজিক দানের বরকত শুধু ঈমানদার ও আনুগত্যকারীদের জন্য কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত।

মহান নবীগণের আদব ও শিষ্টাচার পালনের অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা তো শুধু এতুটুকু বলেছিলেন যে, ইমামত ও নেতৃত্ব ঈমানদার ও আনুগত্যশীলদের জন্য নির্দিষ্ট। মহান আল্লাহ এ ইঙ্গিতের মান রক্ষার্থে পার্থিব সম্মান ও উপভোগকেও ঈমানদার ও আনুগত্যশীলদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। অথচ এটির সম্পর্কে প্রতিপালন [রবুবিয়্যাত] -এর সঙ্গে, যা এ জগতে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যাপক। তাফসীরে বায়যাবীতে রয়েছে−

فَنَبَّهَ سُبْحَانَهُ عَلٰى اَنَّ الرِّزْقَ رَحْمَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ تَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ بِخِلَافِ الْاِمَامَةِ وَالتَّقَدُّمِ فِى الدِّيْنِ . অর্থাৎ মহান আল্লাহ তা'আলা বাতলে দিলেন যে, রিজিক একটি পার্থিব দয়া, সুতরাং তা মু'মিন ও কাফের সকলের জন্য পরিব্যাপ্ত। ইমামত ও ধর্মীয় অগ্রবর্তিতা এর বিপরীত। −[বায়যাবী সূত্রে তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩৫]

قَوْلُهُ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : ঈমান সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ও আখিরাতের প্রতি ঈমান। এ দুটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঈমানের অন্যান্য জরুরি অঙ্গও উল্লিখিত হয়ে গিয়েছে। যেখানেই ঈমানের উল্লেখ হবে সেখানেই তার সংশ্লিষ্ট সবকিছু স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে উল্লেখ করতে হবে− এটা মোটেই আবশ্যকীয় নয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান ঈমানযোগ্য সকল বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে, তাই এ দুটির উল্লেখেই সীমিত রাখা হয়েছে। কেননা اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ -এর মাঝে مَبْدَأٌ -এর আলোচনা রয়েছে এবং يَوْمِ اٰخِرٍ -এর সাথে مَعَادٌ -এর আলোচনা রয়েছে।

قَوْلُهُ قَلِيْلًا : কিছুদিন দ্বারা এখানে আজীবন উদ্দেশ্য। কেননা আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ায় জীবন অল্প ও নগণ্যই হয়ে থাকে। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, করুণা ঈমানদার ও হেদায়েত অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যা থেকে কাফের ও ভ্রান্তপন্থিরা বঞ্চিত থাকবে, তার সম্পর্ক ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পরকালীন কল্যাণের সঙ্গে। আর এ পার্থিব দান-দাক্ষিণ্য, লাভালাভ এবং অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি থেকে কাফের ও ঈমান অস্বীকারকারীদেরও বঞ্চিত করা হবে না। কেননা রবুবিয়্যাত ও প্রতিপালন বিধির চাহিদাই অবিকল এরূপ।

قَوْلُهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুক বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, قَلِيْلًا তরকীবে مَفْعُوْل فِيْهِ হিসেবে মানসূব হয়েছে। اَىْ زَمَانًا قَلِيْلًا وَمُدَّةَ حَيَاتِهِ

অর্থাৎ রিজিকের স্বল্পতার সূরত হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিক দুনিয়ার জীবনের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, قَلِيْلًا শব্দটি উহ্য মাসদারের সিফত হয়ে مَفْعُوْل مُطْلَق হিসেবে মানসূব হয়েছে। اَىْ مَتَاعًا قَلِيْلًا

قَوْلُهُ اَضْطَرُّهُ : জাহান্নামের মতো স্থানে কেউ তো আর সানন্দে যেতে প্রস্তুত হবে না, প্রত্যেককে টেনে-হিঁচড়েই নিতে হবে। পবিত্র কুরআন এখানে জাহান্নামীদের এ বাস্তব অবস্থার স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহতা ও বিপদ সঙ্কুলতার চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যেই।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢٧. وَ اذْكُرْ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ الْاُسُسَ اَوِ الْجُدُرَ مِنَ الْبَيْتِ يَبْنِيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَرْفَعُ وَاِسْمٰعِيْلُ عَطْفٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ يَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط بِنَاءَنَا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ ـ

১২৭. আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহের বুনিয়াদ ভিত্তি বা দেয়ালসমূহ উঠাচ্ছিল অর্থাৎ তা স্থাপন করছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! এই ভিত্তি নির্মাণ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সকল কথার, ও সর্বজ্ঞ সকল কাজ সম্পর্কে।

مِنَ الْبَيْتِ শব্দটি يَرْفَعُ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট اِبْرَاهِيْمَ শব্দটির সাথে اِسْمَاعِيْلُ -এর عَطْفٌ বা অন্বয় হয়েছে।

١٢٨. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ مُنْقَادَيْنِ لَكَ وَاجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اَوْلَادِنَا اُمَّةً جَمَاعَةً مُسْلِمَةً لَّكَ ص وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ وَاَتٰى بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ وَاَرِنَا عَلِّمْنَا مَنَاسِكَنَا شَرَائِعَ عِبَادَتِنَا اَوْ حَجِّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ سَاَلَاهُ التَّوْبَةَ مَعَ عِصْمَتِهِمَا تَوَاضُعًا وَتَعْلِيْمًا لِذُرِّيَّتِهِمَا ـ

১২৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত বাধ্যগত কর এবং আমাদের বংশধর সন্তানদের হতে তোমার অনুগত এক উম্মত জামাত গঠন করিও আর আমাদেরকে মানাসিক ইবাদতের নিয়ম কানুন হজের বিধিবিধান দেখিয়ে দাও শিখিয়ে দাও, এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হও, তুমি অতি ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। তাঁরা মাসুম ও নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশ এবং বংশধরগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এইস্থানে তওবা প্রার্থনা করছেন।

مِنْ ذُرِّيَّتِنَا -এর مِنْ শব্দটি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য না আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি অনুসারে তারা এই স্থানে ইহার مِنْ) (تَبْعِيْضِيَّةٌ ব্যবহার করেছেন।

١٢٩. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ اَيْ اَهْلِ الْبَيْتِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَقَدْ اَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ الْقُرْاٰنَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُزَكِّيْهِمْ ط يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهِ ـ

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! প্রেরণ করিও তাদের নিকট তাদের নিজেদের মধ্য হতে এক রাসূল এই পরিবারের নিকট। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রেরণ করত আল্লাহ তা'আলা তার এই দোয়া কবুল করেছিলেন। যে তোমরা আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল-কুরআন তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত আল কুরআন ও উহার মধ্যস্থিত হুকুম আহকাম এবং বিধি-বিধানসমূহ শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। শিরক হতে সুপবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী অতিপ্রবল ও কাজে ও কৌশলে প্রজ্ঞাময়।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ : এ ইবারত এর মাধ্যমে একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। সেটি হলো اِسْمٰعِيْلُ শব্দটি جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ। কেননা যদি اِسْمٰعِيْلُ শব্দটি اِبْرٰهِيْمُ -এর সাথে عَطْف হতো তাহলে اِسْمٰعِيْلُ-কে اَلْقَوَاعِدَ তথা مَفْعُوْل -এর পূর্বে আনা হতো।

উত্তর : মূলত اِسْمٰعِيْلُ -এর عَطْف . اِبْرٰهِيْمُ -এর সাথেই হয়েছে। তবে اِسْمٰعِيْلُ-কে مُؤَخَّرْ করার উদ্দেশ্যে এই যে, বস্তুত হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বার নির্মাতা ছিলেন না; বরং তিনি সহযোগী ছিলেন। নির্মাতা তো হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) যেহেতু নির্মাণ কাজে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এরও সম্পৃক্ততা ছিল তাই প্রকৃত নির্মাতার সাথে সহযোগীকে عَطْف করা হয়েছে।

رَبَّنَا : এর দ্বারা تَقَبَّلْ ফেলে মুতাআদ্দীর مَفْعُوْل بِهٖ মাহযুফ থাকার প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلَانِ : এ ফেয়েলটি বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا এ অংশটি اِبْرَاهِيْمُ ও **اِسْمَاعِيْلُ থেকে حَالٌ হয়েছে**। আর جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ কখনো حَالٌ হয় না।

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো তার পূর্বে يَقُوْلَانِ মাহযূফ আছে। যার কারণে তা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হয়ে গেছে। সুতরাং এ অবস্থায় حَالٌ হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

يَقُوْلَانِ উহ্য ধারার দ্বিতীয় কারণ এই যে যদি يقولان মাহযূফ না মানা হয়, তাহলে একই সম্বোধনে একই ব্যক্তির عَطْف ছাড়াই غَائِبْ এবং مُتَكَلِّمْ হওয়া লাজেম আসে। কেননা يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ الخ হলো غَائِبْ আর رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا **الخ হলো مُتَكَلِّمْ** সুতরাং যখন يَقُوْلَانِ মুকাদ্দার মানা হয়েছে তখন উভয় জুমলা غَائِبْ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : اَرِنَا এটি رَاٰى থেকে নির্গত। যা দুটি مَفْعُوْل দাবি করে। আর যখন بَابُ اِفْعَالٌ থেকে ব্যবহার করা হয়েছে তখন তো **তিনটি مَفْعُوْل দাবি** করছে অথচ এখানে দুটি মাফউলই উল্লেখ আছে। একটি হলো نَا আর অপরটি হলো مَنَاسِكَ

উত্তর : اَرٰى . عَلِمَ وَاَبْصَرَ-এর অর্থে যা একটি مَفْعُوْل দাবি করে। بَابُ اِفْعَالٌ থেকে ব্যবহৃত হওয়ায় দুটি মাফউল দাবি **করেছে। বলাবাহুল্য** আয়াতে দুটি মাফউল বিদ্যমান আছে।

قَوْلُهُ مَنَاسِكَنَا : অর্থাৎ সাধারণ ধর্মীয় নীতিসমূহ এবং বিশেষত হজ ও [বায়তুল্লাহ] জেয়ারতের নিয়ামবলি ও নিদর্শনাবলি। আমাদের দীনের বিধিবিধান ও হজের নিদর্শনসমূহ (اَىْ شَرَائِعَ دِيْنِنَا وَاَعْلَامَ حَجِّنَا . مَعَالِمَ)

اَرِنَا এখানে اَرَاءَةٌ [দেখানো] ক্রিয়ামূল চোখে দেখিয়ে দেওয়ার অর্থে নয়; বরং শিখিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়ার অর্থে অর্থাৎ عَلِّمْنَا وَعَرِّفْنَا আমাদের শিখিয়ে দিন ও পরিজ্ঞাত করে দিন –[মা'আলিম]। কেননা رَاٰى ক্রিয়া দুটি مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّىْ বা সম্প্রসারিত হলে তখন তার অর্থ দর্শন [দেখা-দেখানো] না হয়ে [প্রদর্শন বা] শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে।

اَهْلَ الْبَيْتِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাবে প্রদান করেছেন। প্রশ্ন : وَابْعَثْ فِيْهِمْ -এর هُمْ যমীরটি ذُرِّيَّةً -এর দিকে ফিরেছে। অথচ ذُرِّيَّةٌ হলো مُؤَنَّثٌ তাই فِيْهَا হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : এখানে ذُرِّيَّةٌ দ্বারা اَهْلُ الْبَيْتِ উদ্দেশ্য। সুতরাং কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ الخ : এখান থেকে কাবা নির্মাণের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হচ্ছে। সেই সাথে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর মর্যাদা তুলে ধরে প্রকারান্তরে রাসূল ﷺ -এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর বংশের নবী এবং উভয়ের ধর্মের মাঝেও সামঞ্জস্য রয়েছে।

يَرْفَعُ : উত্তোলন করা শব্দটি লক্ষণীয় অর্থাৎ এখানে প্রথমবার ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল না। কেননা তা তো হযরত আদম (আ.)-এর যুগেই স্থাপন করা হয়েছিল। নির্মাণ ধ্বসে যাওয়ার পর এখন নতুন পর্যায়ে তা উত্তোলন করা হচ্ছিল। উঁচু করা

http://islamiboi.wordpress.com

হচ্ছিল। আর এখানে حِكَايَاتُ حَالٍ مَاضٍ হিসেবে মুজারের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে কাবার অপূর্ব ও বিরল নির্মাণ পদ্ধতি সকলের হৃদয়পটে জাগরুক থাকে এবং মানুষ কঠিনতম ইবাদত-বন্দেগী করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে।

الْبَيْتَ তথা ঘর দ্বারা উদ্দেশ্য কা'বার ঘর এবং এতে কারো কোনো ভিন্নমত নেই। এমনিভাবে আল কিতাব বলতে যেভাবে পবিত্র কুরআন ও আন-নবী বলতে যেভাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেই বুঝায় আল বায়ত বলতেও তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার ঘর [বায়তুল্লাহ]-কেই বুঝায়।

قَوْلُهُ الْقَوَاعِدُ : এটি قَاعِدَةٌ -এর বহুবচন। قُعُود بِمَعْنَى ثُبُوْت -থেকে নির্গত। তারপর তাতে اِسْمِيَّتْ বা নাম হওয়ার অর্থ প্রবল হওয়ার কারণে মওসুফ ছাড়াই ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاُسُسُ : এটি قَوَاعِد -এর তাফসীর اُسُسٌ শব্দটি اَسَاسٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ভিত্তি।

قَوْلُهُ الْجُدُرُ : এটি قَوَاعِد -এর দ্বিতীয় তাফসীর। আর جُدُرٌ হলো جِدَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দেয়াল, প্রাচীর।

قَوَاعِدَ সম্পর্কে আরেকটি তাফসীর হলো তার দ্বারা ইট উদ্দেশ্য। কেননা প্রতিটি ইট তার উপরের ইটের জন্য ভিত্তি স্বরূপ।

প্রথম সূরতে প্রশ্ন হয় যে, ভিত্তিতো একটি ছিল। তাহলে اُسُسٌ বহুবচন শব্দ আনা হলো কেন?

উত্তর : যেহেতু ভিত্তিটি ছিল চার কোণবিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটি দেওয়াল যেন ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি। সে হিসেবে বহুবচন শব্দ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَبْنِيْهِ : এটি يَرْفَعُ -এর তাফসীর। মুফাসসির (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করলেন যে, يَرْفَعُ দ্বারা মাজাযী বা রূপক অর্থ নেওয়া হয়েছে। আসলে يَبْنِىْ উদ্দেশ্য। بِنَاءٌ [নির্মাণ] -কে رَفْعٌ [উত্তোলন] দ্বারা তাবীর করার কারণ হলো নির্মাণের পূর্বে ভিত্তিটি নীচু ছিল। নির্মাণের পর তা উঁচু হয়ে উঠে। তাই يَرْفَعُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْم : কাবা নির্মাণে হযরত ইসমাইল (আ.) পিতা ইবরাহীমের সাথে শরিক ছিলেন। কেউ কেউ বলেন– اِسْمَاعِيْل পূর্বের اِبْرَاهِيْم -এর উপর عَطْف নয়; বরং নতুন জুমলা হিসেবে মুবতাদা এবং তার খবর মাহযুফ রয়েছে। اَىْ وَاِسْمَاعِيْل يَقُوْلُ رَبَّنَا الخ কিন্তু সঠিক কথা হলো কাবা নির্মাণে উভয়েই শরিক ছিলেন। তাই মুফাসসির (র.) عَطْف বলেছেন।

قَوْلُهُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ الخ : নববী অন্তরের এ ভীতির কোনো তুলনা হয় না। নীতি চরিত্রের প্রতিকৃতি সত্যবাদিতার মূর্তপ্রতীক হওয়া সত্ত্বেও ভয় জাগে যে, নজরানা গৃহীত হবে কি হবে না?

تَقَبَّلْ ক্রিয়াটি تَفَعُّلْ বাব হতে নির্গত এবং এ বাবের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে تَكَلُّف অর্থাৎ কোনো কিছুর বাস্তবতা না থাকলেও তার ভাব দ্বারা অভিনয় করা। কোনো কিছু গ্রহণ করার লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা প্রদর্শন করা। এ কারণে কেউ কেউ এ তত্ত্ব উদঘাটন করেছেন যে, ক্ষেত্র ও পাত্র স্বকীয় অবস্থানে কবুল ও গ্রহণ করার উপযোগী নয়; বরং তা পুরোপুরি অপূর্ণাঙ্গ। গ্রহণীয়তা শুধু দয়া ও বদান্যতার কারণে হচ্ছিল, কোনো প্রকার অধিকার উপযোগিতার ভিত্তিতে নয়।

শ্রমিক ও নির্মাণ শিল্পীরা যখন নির্মাণকাজে লিপ্ত থাকে তখন তারা সাধারণত এবং অভ্যাসবশত কিছু একটা গুণ গুণ করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার ঘরের এ নির্মাতা রাজমিস্ত্রিও আল্লাহ তা'আলার ঘরের দেয়াল তুলবার সময় নীরব ছিলেন না। তিনিও [গুনগুনিয়ে] মুনাজাত করে যাচ্ছিলেন। ফকীহগণ বলেছেন, যে কোনো ভালো কাজের পরে দোয়া করা মোস্তাহাব। যেমন সালাত সমাপনান্তে দোয়া এবং সাওমের ইফতার করে দোয়াও এই শ্রেণির। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৩৮]

قَوْلُهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : سَمِيْع অর্থাৎ জিহ্বা থেকে নিসৃত শব্দ ও কথার শ্রবণকারী। عَلِيْم অন্তরের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার অবগতি লাভকারী। মুশরিক জাতিসমূহের জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও দার্শনিকবৃন্দ আল্লাহ তা'আলার ইলম গুণের ব্যাপারে অধিক ভ্রান্তির শিকার হয়েছে এবং মহান স্রষ্টার ইলমকে অপূর্ণাঙ্গ ও সীমিত মনে করেছে। পবিত্র কুরআন যে স্রষ্টার ইলম সর্বব্যাপী ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া জোরেশোরে সাব্যস্ত করে এবং বার বার আল্লাহ তা'আলার سَمِيْع ـ بَصِيْر ও عَلِيْم হওয়ার কথা উপস্থাপন করেছে, তার অন্যতম লক্ষ্য দার্শনিকদের এ অসার ধারণা খণ্ডন করা।

قَوْلُهُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ : [আরো অধিক আনুগত্যশীল করুন]। এখানে مُسْلِمَيْنِ -এর দুই ধরনের অর্থ করা হয়েছে। এক. অংশীবাদ ও অংশীদারিত্বের দ্বিধা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও একত্ববাদের স্বীকৃতি দানকারী অর্থাৎ مُوَحِّدِيْنَ مُخْلِصِيْنَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاكَ অর্থাৎ আমরা একত্ববাদী ও একনিষ্ঠ। একমাত্র আপনি ব্যতীত আমরা আর কারো ইবাদত করি না –[কাবীর]।

http://islamiboi.wordpress.com

দুই. ইসলামের সাধারণ বিধিমালা প্রতিপালনকারী قَائِمِيْنَ بِجَمِيْعِ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ ইসলামের সকল শরিয়তি বিধান বাস্তবায়নকারী −[কাবীর]। তবে অর্থদ্বয়ের একটি অন্যটির মোটেই পরিপন্থি নয়।

প্রশ্ন : দোয়া করার সময় কি তারা মুসলিম ছিলেন না?

উত্তর : এখানে مُسْلِمُوْنَ অর্থ সত্যের কাছে আত্মসমর্পণকারী ও তাতে আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকারী। দোয়া করার সময়ও তারা মুসলিম তথা আনুগত্যশীল বান্দা ছিলেন। সুতরাং এ দোয়ার অর্থ শুধু এতটুকু যে, আমাদের আনুগত্যে আরো অধিক অগ্রগতি দান করুন। অর্থাৎ আমাদের ইখলাস ও আপনার প্রতি বিশ্বাস ঐকান্তিকতা বাড়িয়ে দিন (اَىْ زِدْنَا خَلَاصًا وَاِذْعَانًا لَكَ - كَشَّاف) এখানে উদ্দেশ্য নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের আধিক্য কিংবা তাতে অবিচলতা কামনা করা।

(اَلْمُرَادُ طَلَبُ الزِّيَادَةِ فِى الْاِخْلَاصِ وَالْاِذْعَانِ اَوِ الثُّبَاتِ عَلَيْهِ - بَيْضَاوِى)

قَوْلُهُ اُمَّةً مُسْلِمَةً : এ দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি বড় প্রমাণ এই যে, আজও সেই উম্মত ঐ নামে পরিচিত হয়ে আসছে এবং তা আপন-পর শত্রু-মিত্র সকলেরই মুখে।

قَوْلُهُ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর সম্মিলিত বংশধারা। উদ্দেশ্য যেহেতু এ দুই মহান ব্যক্তি একত্রে দোয়া করছিলেন। সুতরাং এখানে বংশধর দ্বারা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানরাই হতে পারে।

قَوْلُهُ وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর مِنْ-কে تَبْعِيْضِيَّةٌ আখ্যা দেওয়ার কারণ হলো পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন− لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ যার অর্থ হলো ইমামতের এ ওয়াদা সকল সন্তানাদির ক্ষেত্রে নয়; বরং তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ও নেককার হবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি مِنْ কে تَبْعِيْضِيَّةٌ না মানা হয় তাহলে لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ এবং وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا-এর মধ্যে تَعَارُض হবে

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং এর সত্যায়ন : কাবাগৃহ নির্মাণের সময় উক্ত দুই সম্মানিত পয়গাম্বরদের ছয়টি দোয়া আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলোর মধ্য থেকে একটি দোয়া অনুর্বর উপত্যকাকে নিরাপত্তার শহর করে দেওয়ারও ছিল। যার মধ্যে মুসলিম ও কাফের বসবাস করবে এবং সকলেই রিজিক পাবে। যেহেতু কাফেররা আনুগত্যের বাইরে চলে এ বিষয়টি পূর্ব থেকেই জানা ছিল। তাই আদব রক্ষার্থে হযরত ইব্রাহীম (আ.) রিজিকের দোয়ার মধ্যে তাদেরকে গণ্য করেননি। পরবর্তী দোয়াগুলোতে কাবার ভিত্তি এবং ভিত্তি স্থাপনকারীর একাগ্রতার দোয়া এবং সর্বশেষে নবী করীম ﷺ ও তার উম্মতের জন্য বিশেষ দোয়া করেছেন। যা দ্বারা কাবার সাথে রাসূল ﷺ-এর বিশেষ সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে গেছে। কাবাগৃহের নির্মাণে অনুসারী হিসেবে হযরত ইসমাঈল (আ.)-ও শামিল ছিলেন। সময়ে তিনি নির্মাণ কাজও করতেন কিংবা শুধু গাঁথুনীর পাথর এনে দিতেন। সে দোয়াগুলোর সত্যায়ন এমন ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি উভয়ের বংশধর হওয়ার মর্যাদা রাখেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরগণের মধ্যে এ উচ্চ মর্যাদা শুধু নবী করীম ﷺ-ই লাভ করেছেন। তাই তিনিই এর সত্যায়ন হতে পারেন। সুতরাং রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমি নিজ পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়াসমূহের বহিঃপ্রকাশ। −[কামালাইন খ. ১, পৃ. ১৪০]

যোগ্য ছেলেই পিতার সম্পদের রক্ষণকারী হয় : اُمَّةً مُسْلِمَةً-এর জন্য সন্তানদেরকে নির্দিষ্ট করা। এমনিভাবে সে খান্দান থেকেই পয়গাম্বর হওয়াকে নির্দিষ্ট করার যুক্তিসিদ্ধতা হচ্ছে এটা যে, অন্য খান্দানের কোনো লোকের অবস্থা সম্পর্কে মানুষ এত অধিক অবগত থাকে না, যত অধিক অবগত থাকে নিজ খান্দানের কোনো লোকের গুণাবলির ব্যাপারে। খান্দানের লোকদের জন্য সে লোকটির অনুসরণ করতে কোনো প্রকার অপরিচিতি ও লজ্জাবোধ মনে হবে না এবং পরবর্তী সময়ে তাদের দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরা নিজ গোত্রের লোকটির প্রতি বিবেচনার ও লক্ষ্য রাখবে এবং সেটা তার অনুসরণের ক্ষেত্রে অধিক প্রচেষ্টাকারী ও অন্যদেরকে পথ প্রদর্শনের জন্য মূল উৎস হিসেবে প্রমাণিত হবে। −[প্রাগুক্ত]

اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ [নেতৃত্ব কুরাইশ থেকে] : সুতরাং তাই হয়েছে যে, সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপ কুরাইশ এবং রাসূল ﷺ-এর খান্দানের ঈমান গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল। যখনই তারা ঈমান গ্রহণ করল এবং পবিত্র মক্কা বিজয় হলো লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করল আর এটাই হচ্ছে খেলাফতের জন্য কুরাইশদের খাছ হওয়ার যুক্তিসিদ্ধতা। বস্তুত তাদের মনে দীনের জন্য যে পরিমাণ অন্তরিকতা ও ব্যথা হবে, অন্যদের এর দশভাগের একভাগও হবে না। −[প্রাগুক্ত]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ الْحِكْمَةَ : حِكْمَةً দ্বারা মুসান্নেফ (র.) কুরআনের বিধানাবলি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্দর জ্ঞান এবং সঠিক বুঝও হতে পারে। আর সঠিক জ্ঞানের অনুভূতি হচ্ছে এটা যে, গবেষণামূলক প্রয়োগ ও পাণ্ডিত্য অর্জন হওয়া যেন মূল থেকে শাখাসমূহের হুকুম বের করতে পারে। কথা থেকে কথা বের করতে পারে এবং মূল বিষয়াদিকে ঠিক রেখে এক দৃষ্টান্তকে অপর দৃষ্টান্তের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে। সুতরাং এ উম্মতের মধ্যে নবী করীম ﷺ -এর অনুসরণের অসিলায় অনেক বড় বড় আলেমগণের এ সৌভাগ্য হয়েছে। যাদের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমান-ই নয়, বরং সর্ব সাধারাণও উপকৃত হচ্ছে।

নবী করীম ﷺ -এর চারটি বৈশিষ্ট্য উক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে–

১. পবিত্র কুরআনকে তেলাওয়াত করা, যা শুরু ও প্রাথমিক স্তর।

২. পবিত্র কুরআনের অর্থ ও তাৎপর্যের শিক্ষা দেওয়া, এটা দ্বিতীয় স্তর।

৩. বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার শিক্ষা দেওয়া এবং এ জ্ঞান ও আমলের সমষ্টির পর।

৪. সর্বশেষ পরিপূর্ণ স্তর অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করা। এ হচ্ছে জীবনের **চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক**।

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا .

কা'বা নির্মাণের ইতিহাস : হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম সন্তানদের জন্য কাবাকেই সর্বপ্রথম কেবলা সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعٰلَمِينَ .

নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ তা'আলা কাবাগৃহকে চতুর্থ আসমানে তুলে নেন এবং হাজরে আসওয়াদটি জিবরীল (আ.) আবু কুবাইস পাহাড়ে লুকিয়ে রাখেন। প্লাবনের পর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত কাবার স্থানটি খালি ছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.)-কে কা'বা নির্মাণের হুকুম দিলে তিনি তার স্থানটি দেখিয়ে দেওয়ার আবদন করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কাবার স্থান দেখিয়ে দেন এবং হাজরে আসওয়াদের সংবাদও জানিয়ে দেন। আল্লাহর হুকুম পেয়ে ইবরাহীম (আ.) এবং ইসমাঈল (আ.) কাবা নির্মাণ করেন।

জ্ঞাতব্য : কা'বাগৃহ সর্বমোট দশবার নির্মিত হয়েছে–

১. ফেরেশতাদের নির্মাণ।

২. হযরত আদম (আ.)-এর নির্মাণ।

৩. হযরত শীস (আ.)-এর নির্মাণ।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণ।

৫. আমালেকা সম্প্রদায়ের নির্মাণ।

৬. জুরহাম গোত্রের নির্মাণ।

৭. কুসাই গোত্রের নির্মাণ।

৮. কুরাইশের নির্মাণ। সে নির্মাণে রাসূল ﷺ শরিক ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৫ বছর।

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের নির্মাণ।

১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণ। বর্তমনে সেভাবেই রয়েছে।

মনে রাখার সুবিধার্থে জনৈক কবির কবিতা–

بَنٰى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشْرٌ فَخُذْهُمْ
مَلٰئِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ وَآدَمُ
فَشِيثٌ فَاِبْرَاهِيمُ ثُمَّ عَمَالِقٌ * قُصَىٌّ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمُ
وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَنٰى كَذَا * بِنَاءُ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا مُتَمِّمُ

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, ১৬০]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১৩০. وَمَنْ اَيْ لَا يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ فَيَتْرُكُهَا اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط جَهِلَ اَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ لِلّٰهِ يَجِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهٗ اَوْ اِسْتَخَفَّ بِهَا وَامْتَهَنَهَا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ اِخْتَرْنَاهُ فِى الدُّنْيَا ـ بِالرِّسَالَةِ وَالْخُلَّةِ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى

১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট সুতরাং তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করা তার কর্তব্য। এই সম্পর্কে যে ব্যক্তি অজ্ঞ অথবা এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি নিজেকে নিকৃষ্ট ও হীন করে তুলেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে এবং তা ত্যাগ করে বসবে? আর কেউ এমন নেই। পৃথিবীতে তাকে আমি রিসালাত ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব দ্বারা মনোনীত করেছি গ্রহণ করে নিয়েছি। পরকালেও সে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম যাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা।

১৩১. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ انْقَدْ لِلّٰهِ وَاَخْلِصْ لَهٗ دِيْنَكَ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৩১. আর স্মরণ কর তার প্রতিপালক যখন বলেছিলেন অনুগত হও আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ কর এবং দীনকে তার জন্যই নিখাদ কর, সে বলেছিল, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

১৩২. وَوَصّٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَوْصٰى بِهَا بِالْمِلَّةِ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط بَنِيْهِ قَالَ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ نَهْىٌ عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ وَاَمْرٌ بِالثُّبَاتِ عَلَيْهِ اِلٰى مُصَادَفَةِ الْمَوْتِ ـ

১৩২. এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এই সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে অসিয়ত করে গিয়েছিল। বলেছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং মুসলিম না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। এই আয়াতটিতে আমৃত্যু ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে এবং তা পরিত্যাগ না করতে বলা হয়েছে। وَصّٰى ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে اَوْصٰى [বাবে اِفْعَالٌ হতে পঠিত ক্রিয়া] রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَنْ يَرْغَبُ : এখানে مَنْ হলো اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ এবং মুবতাদা। আর يَرْغَبُ হলো খবর। তার মধ্যকার যমীরটি مَنْ -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهٗ اَىْ لَا يَرْغَبُ : মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে مَنْ হলো اِسْمِ اِسْتِفْهَامْ এবং اِسْتِفْهَامْ টি اِنْكَارْ বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। সুতরাং এটি نَفْىْ -এর অর্থে। এজন্য তারপর لا আনা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ : وَاوْ টি عَاطِفْ তার عَطْف হয়েছে لَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ -এর সাথে। সুতরাং এটিও جَوَابْ قَسَمْ হবে। দ্বিতীয় আরেকটি সম্ভাবনা হলো وَاوْ حَالِيَّةٌ এ সূরতে لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ -এর لام টি اِبْتِدَا -এর لَام হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَيَتْرُكُهَا : رَغِبَ -এর صِلَة হিসেবে যখন عَنْ আসে, তখন تَرْك وَاِعْرَاض বা বর্জন ও বিমুখতার অর্থ দেয়। মুফাসসির (র.) فَيَتْرُكُهَا উল্লেখ করে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ : مَنْ -এর مَحَلِّ اِعْرَاب সম্পর্কে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. مَوْصُوْلَة ২. مَوْصُوْفَة

প্রথম সূরতে তার مَا بَعْدَ জুমলা হয়ে সেলাহ হওয়ার কারণে তার مَحَلِّ اِعْرَاب নেই। আর দ্বিতীয় সূরতে مَنْصُوْب বা مَرْفُوْع হবে।

قَوْلُهُ جَهِلَ اَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ لِلّٰهِ : এটি سَفِهَ -এর তাফসীর -এর দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি سُوَالِ مُقَدَّر -এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন : سَفِهَ হলো লাজেম ফে'য়েল তারপর نَفْسَهُ মানসুব হলো কিভাবে?

উত্তর : এখানে سَفِهَ শব্দটি جَهِلَ -এর অর্থ পোষণ করে। আর جَهِلَ মুতাআদ্দী ফেয়েল। তার অর্থ পোষণ করার কারণে তার পরের মাফউল হওয়া শুদ্ধ আছে।

قَوْلُهُ اَنَّهَا مَخْلُوْقَةٌ : اَنَّهَا -এর ضَمِيْر مَنْصُوْب টি نَفْس -এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ যে নিজের নফস সম্পর্কে অজ্ঞ হয় এবং এটা জানেন না যে, তার নফস একমাত্র আল্লাহর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, তার উপর আল্লাহর ইবাদত ওয়াজিব। কেননা যে পাথর, চন্দ্র, সূর্য কিংবা মূর্তির পূজা করছে, সে এগুলোর স্রষ্টাকে জানল না।

قَوْلُهُ اِسْتَخَفَّ بِهَا : এর দ্বারা দ্বিতীয় জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর সারকথা হলো سَفِهَ অন্য কোনো অর্থ পোষণ করা ছাড়াই مُتَعَدِّيْ بِنَفْسِهِ অর্থাৎ সেটি اِسْتَخَفَّ -এর অর্থে। কেননা, سَفِهَ -এর মূল অর্থে خِفَّتْ وَاِذْلَال তথা লাঞ্ছনা ও তুচ্ছতা রয়েছে। আয়াতের মর্ম হবে ইবরাহীমি ধর্ম থেকে কেবল সেই বিমুখ হতে পারে সে নিজের নসফকে লাঞ্ছিত করল।

فَاِنَّ مَنْ رَغِبَ عَمَّا يَرْغَبُ فِيْهِ فَقَدْ اَذَلَّ نَفْسَهُ .

কেননা যে প্রিয় বস্তু থেকে বিমুখ হলো যেন সে নিজের নফসকে লাঞ্ছিত করল।

قَوْلُهُ اِمْتَهَنَهَا : اَيْ اَذَلَّهَا অর্থাৎ হেয় ও তুচ্ছ করল।

قَوْلُهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ : এখান থেকে مَنْ يَرْغَبُ -এর কারণ বা প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ اِخْتَرْنَاهُ : এটি اِصْطَفَيْنَاهُ -এর তাফসীর প্রকৃত পক্ষে اصطفاء -এর অর্থ হলো اِتِّخَاذُ صَفْوَةِ الشَّيْءِ কোনো বস্তুর সার নির্যাস বা নির্বাচিত অংশ গ্রহণ করা। যেহেতু নির্ধারিত বস্তুর প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকে এবং তারা সেটি গ্রহণ করে তাই মুফাসসির (র.) اِخْتَرْنَاهُ বলে ব্যাখ্যা করেছেন– اَيْ اِخْتَرْنَاهُ بِالرِّسَالَةِ لَوِ اخْتَرْنَاهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْخَلْقِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া– وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ -এর মাঝে ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। এখন এ আয়াতে সে ধর্মের ফজিলত এবং তা অনুসরণের প্রতি তারগীব ও আগ্রহ উদ্দীপনা দেওয়া হচ্ছে। এতে ইহুদি নাসারাদেরও খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নেতা মানে কিন্তু তার ধর্মের অনুসরণ করে না। অথচ এ ধর্মের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) নিজেদের জন্য দোয়া করেছেন এবং পরবর্তী সন্তানদেরকে অসিয়ত করে গেছেন। অনুরূপভাবে হযরত ইয়াকুব (আ.)-ও নিজের সন্তানদেরকে এ ধর্মের উপর অটল অবিচল থাকার অসিয়ত করেছেন।

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তার দুই ভাতিজা সালিমা ও মুহাজিরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে বললেন তোমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে ইরশাদ করেছেন যে, বনী ইসমাঈলে একজন নবী সৃষ্টি করব যার নাম হবে আহমদ। যে ব্যক্তি তাকে নবী মানবে সে হেদায়েত পাবে। আর যে মানবে না সে অভিশপ্ত হবে। একথা শুনে সালিমা ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়।

ইসলাম ফিতরতের ধর্ম, তা থেকে বিমুখতা বোকামী : ইবরাহীমী মিল্লাত তো অবিকল ফিতরাতের দীন, স্বভাব ধর্ম। এ ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষা হুবহু সুষ্ঠু স্বভাবের মুখপাত্র। এ ধর্ম পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুধু সেই করবে, যার স্বভাব-সুষ্ঠুতা অক্ষত

http://islamiboi.wordpress.com

নেই, বরং তা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। মানুষ এ দাবির সত্যতা শুধু বিশ্বাস ও মতাদর্শের বিচারেই নয়; বরং যখন ইচ্ছা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে দেখতে পারে। ইসলাম সমাজ জীবনের জন্য যে বিধি স্থির করে রেখেছে, তাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমাজবিধি। ব্যক্তি জীবনের জন্য তার স্থিরকৃত কর্মসূচি সর্বোত্তম ব্যক্তিনীতি। যুক্তি ও আবেগ, মেধা ও প্রজ্ঞা, দেহ ও আত্মা, ব্যক্তি ও সমাজ এবং স্বাধীনতা ও অধীনতা-আনুগত্যসহ মানব জীবনের পরস্পর প্রতিকূল ও বিপরীতধর্মী মূল উপাদানসমূহের মাঝে আন্তঃসুষমা বিধানের প্রতি ইসলামি শরিয়ত যতখানি লক্ষ্য রেখেছে, পৃথিবীর কোনো আইনে কোথাও এর নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইবরাহীমি দ্বীনের সমাপ্তিলগ্নে ইবরাহীমি মিল্লাতের পরিচিতি উপস্থাপন করা হচ্ছে এভাবে যে, এটি কোনো নতুন ধর্ম নয়, এটি সেই তাওহীদী দীন, এক আল্লাহতে বিশ্বাসের ধর্ম, ইসলাম আজ যার আহ্বান পেশ করেছে এবং যা তোমরা সকলে নিজেদের অভিন্ন পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর অনুগামী হওয়ার একীভূত দাবি সত্ত্বেও বর্জন করে রয়েছে।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৪৩]

قَوْلُهُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ : পবিত্র কুরআনের অলঙ্কার ও শব্দ চয়ন মাধুর্য লক্ষণীয়। এখানে ইসলাম ধর্মের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গেও করেনি এবং সমকালীন রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গে না করে; বরং তা স্থাপন করেছে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর সঙ্গে। এখানে সম্বোধিত জনগোষ্ঠী মূলত ইহুদি-খ্রিস্টান ও আরব মুশরিকরা। এ তিনটি সম্প্রদায়ই মুসলমানদের ন্যায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিজেদের মহান পুরোধা মান্য করে। এ অভিনব বর্ণনাভঙ্গি গ্রহণ করে যেন এ উপলব্ধি স্পষ্ট করা হলো যে, কুরআন তোমাদেরকে কোনো নতুন ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে না। হুবহু ও সরাসরি তোমাদেরই সম্মানিত পূর্বপুরুষ ও মহান পুরোধা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছে। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তাকে দুনিয়াতে নির্বাচিত করেছি এবং আখিরাতে সে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এখন এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার নির্বাচনের কারণ বর্ণনা করছেন যে, আনুগত্য ও সমর্পণের গুণে তাঁর এ মর্যাদা হাসিল হয়েছে।

قَوْلُهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ : এখানে নির্দেশ ও জবাব বাস্তবতার উপর প্রযোজ্য নয়; বরং উপমা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের মর্ম হলো আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওহীদের দলিল প্রমাণের মাঝে চিন্তা করার নির্দেশ দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্তা করে সমর্পিত হয়েছেন।

قَوْلُهُ اِنْقَدْ لِلّٰهِ : ইঙ্গিত করছেন এ দিকে যে, এখানে اَسْلِمْ দ্বারা মুসলমান হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং اِنْقِيَادٌ ظَاهِرٌ তথা বাহ্যিক আনুগত্য উদ্দেশ্য। কেননা নবী ইবরাহীম তো পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলেন। কেননা নবীগণ তো কুফর থেকে মুক্ত থাকেন। কেউ কেউ বলেছেন– ইসলাম গ্রহণ বলতে এখানে ইসলামের উপর অটল থাকার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ : اَلدِّيْنَ-এর ব্যাখ্যায় دِيْنَ الْاِسْلَامِ উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, اَلدِّيْنَ-এর اَلِفْ لَامْ অর্থ বাছাই করা, মনোনীত করা, বেছে তুলে নেওয়া ও ভেজাল মিশ্রণ থেকে পবিত্র করে দেওয়া। لَكُمْ-এর (ل) নির্দিষ্টকরণ ও সীমাবদ্ধকরণ অর্থে। অর্থাৎ এ ধর্ম তোমাদের জন্য এবং তোমরা এ ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট।

পূর্বসূরীদের অনুসরণের দাবি করলেও ইসলামই মানতে হবে : হযরত ইবরাহীম (আ.) আরবজাতি ও ইহুদি জাতি সকলের মহান পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং খ্রিস্টানদেরও অনুসরণীয় পুরোধা ছিলেন। ওদিকে হযরত ইয়াকূব (আ.) যিনি ইসরাঈলী বংশধরদের মহান পিতৃপুরুষ ছিলেন, এরা দুজন তো নিজেরাই নিজেদের সন্তানদের জন্য নিজেদের পছন্দনীয় ও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম হস্তান্তর করে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন যে, ধর্মের সন্ধানে তোমাদের দিশেহারা হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। তোমাদের জন্য তো আল্লাহ তা'আলার বানানো ও শেখানো তাওহীদি ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম দিককার সম্বোধিত লোকেরা সকলেই পূর্বপুরুষের অনুকরণের ধ্বজাধারী ছিল। সুতরাং তাদের জন্য এ সম্বোধন পন্থা কতই চমৎকার যে, আচ্ছা তোমরা যখন ধর্মের ব্যাপারে পূর্বপুরুষকেই মাধ্যম সূত্র ও মানদণ্ড বানাতে চাও, তবে তাদের বক্তব্যই লক্ষ্য করে দেখ।

قَوْلُهُ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ : এ আয়াতাংশ বাহ্যত মৃত্যু থেকে বারণ ও নিষেধাজ্ঞা মনে হয়। যা বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয়। তাই মুফাসসির (র.) বলেছেন– نَهْىٌ عَنْ تَرْكِ الْاِسْلَامِ অর্থাৎ এখানে নিষেধাজ্ঞাটা মৃত্যুর ব্যাপারে নয়; বরং ইসলাম বর্জন করার ব্যাপারে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمْرٌ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ : এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, نَفْسِ اِيْمَانٍ বা মূল ঈমানটি তাদের হাসিল ছিল তাই তা হাসিল করার কোনো উদ্দেশ্য হয় না; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো ইসলামের উপর অটল থাকা।

http://islamiboi.wordpress.com

١٣٣. وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ لِلنَّبِيِّ اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنَّ يَعْقُوْبَ مَاتَ اَوْصٰى بَنِيْهِ بِالْيَهُوْدِيَّةِ نَزَلَ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ حُضُوْرًا اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ . اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ط بَعْدَ مَوْتِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ عَدُّ اِسْمَاعِيْلَ مِنَ الْاٰبَاءِ تَغْلِيْبٌ وَلِاَنَّ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الْاَبِ . اِلٰهًا وَّاحِدًا بَدَلٌ مِنْ اِلٰهَكَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ . وَاَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ اَيْ لَمْ تَحْضُرُوْهُ وَقْتَ مَوْتِهِ فَكَيْفَ تَنْسِبُوْنَ اِلَيْهِ مَا لَا يَلِيْقُ بِهِ .

١٣٤. تِلْكَ مُبْتَدَأٌ وَالْاِشَارَةُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِمَا وَاُنِّثَ لِتَانِيْثِ خَبَرِهِ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ سَلَفَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْعَمَلِ اَيْ جَزَاؤُهُ اِسْتِيْنَافٌ وَلَكُمْ اَلْخِطَابُ لِلْيَهُوْدِ مَا كَسَبْتُمْ . وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . كَمَا لَا يَسْئَلُوْنَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَالْجُمْلَةُ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا .

অনুবাদ :

১৩৩. ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল, ইয়াকুব (আ.) মারা যাওয়ার সময় তার সন্তানদেরকে ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, এই কথা আপনি কি জানেন না? [সুতরাং আমরা কি করে মুসলমান হতে পারি?] এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন সমক্ষে ছিলে, উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমার পর অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর তোমরা কিসের ইবাদত করবে? তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার আল্লাহ ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহর ইবাদত করব, যিনি এক, অদ্বিতীয় এবং আমরা তার নিকট আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় তোমরা উপস্থিত ছিলে না। সুতরাং যে কথা তার পক্ষে সমীচীন না তার প্রতি তোমরা কেমন করে সে কথার আরোপ করছ?

اِذْ قَالَ বাক্যটি পূর্বোক্ত اِذْ حَضَرَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

تَغْلِيْبٌ অর্থাৎ অধিক সংখ্যককে প্রাধান্য দেওয়া এর বিধানানুসারে এইস্থানে হযরত ইসমাঈলকেও তাদের পিতৃপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর পিতৃব্যের স্থান পিতার মতোই; সুতরাং এই হিসেবেও তাকে ইহুদিদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে গণ্য করা যায়।

اِلٰهًا وَّاحِدًا বাক্যটি اِلٰهَكَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

اَمْ كُنْتُمْ এই আয়াতে اَمْ শব্দটি অস্বীকারসূচক প্রশ্নবোধক হামযা (هَمْزَةُ اِنْكَارٍ) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩৪. এই উম্মত অর্থাৎ ইবরাহীম, ইয়াকুব ও তাদের পুত্রগণ অতিবাহিত হয়েছে অতীত হয়েছে তারা যা যে আমল অর্জন করেছে তা তাদের অর্থাৎ এর প্রতিফল তাদেরই হবে। আর তোমরা এই স্থানে ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যা অর্জন করবে তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। যেমন তোমাদের আমল সম্পর্কে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।

এই আয়াতে تِلْكَ শব্দটি مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। ইবরাহীম, ইয়াকুব ও এতদুভয়ের সন্তানদের প্রতি এটা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর خَبَرٌ বা বিধেয় (اُمَّةٌ) যেহেতু مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ সেহেতু এটাকেও স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

لَهَا مَا كَسَبَتْ এটা مُسْتَأْنِفَةٌ বা নবগঠিত বাক্য। لَا تُسْئَلُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের تَاكِيْدٌ বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

আর أَمْ শব্দটি এখানে مُنْقَطِعَةٌ তথা بَلْ هَمْزَة -এর অর্থে। আর بَلْ শব্দটি إِضْرَابٌ عَنِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অসিয়তের বিবরণ থেকে ইহুদিদের ভর্ৎসনা ও নিন্দার দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য। ইহুদির হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ব্যাপারে ইহুদিবাদের যে দাবি করচে তার খণ্ডনের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য। এ সূরতে হামযাটি اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ -এর জন্য হবে। اَىْ مَا كُنْتُمْ حَاضِرِيْنَ فَلِمَ تَدَّعُوْنَ ـ

কেউ কেউ বলেন, اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ -এর জন্য এবং সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো তাদের পূর্বপুরুষগণ।

اَىْ كَانَتْ اَوَائِلُكُمْ حَاضِرِيْنَ حِيْنَ وَصّٰى بَنِيْهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْاِسْلَامِ وَاَنْتُمْ عَالِمُوْنَ بِذٰلِكَ فَمَا لَكُمْ تَدَّعُوْنَ عَلَيْهِ خِلَافَ مَا تَعْلَمُوْنَ ـ

কেউ বলেন– সম্বোধিত গোষ্ঠী হলো মুসলমানগণ। যারা নবী যুগে হাজির ছিলেন। তখন অর্থ হবে অসিয়তের বিষয়টি তোমরা প্রত্যক্ষ করনি; বরং এ সম্পর্কে তোমরা ওহী এবং নবী ﷺ -এর সংবাদ দানের মাধ্যমে জানতে পেরেছ। সুতরাং তার অনুসরণ তোমাদের উপর আবশ্যক।

قَوْلُهُ حُضُوْرًا : মাধ্যমে করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে شُهَدَاءَ শব্দটি شَهِيْدٌ بِمَعْنٰى حَاضِرٍ থেকে নির্গত, شَاهِدٌ [সাক্ষ্যদাতা] থেকে নির্গত নয়।

قَوْلُهُ وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ : এর দ্বারা সামনের আয়াতের শানে নুজুলের দিকে ইঙ্গিত করছেন। একবার জনৈক ইহুদি এসে রাসূল ﷺ -কে বলল– اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنَّ يَعْقُوْبَ يَوْمَ مَاتَ اَوْصٰى بَنِيْهِ بِالْيَهُوْدِيَّةِ

আপনি কি জানেন না যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) ইন্তেকালের দিন তাঁর সন্তানদেরকে ইহুদি ধর্মের অনুসরণের অসিয়ত করে গেছেন। তার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এ আয়াত নাজিল হয়। সেই সাথে হযরত ইয়াকুব (আ.) মৃত্যুর সময় কি বলেছিলেন তাও বর্ণনা করে দেওয়া হয। যাতে তার মিথ্যা ও ভ্রান্ত দাবিটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ : **যোগসূত্র** : পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের যোগসূত্র এই যে, পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বীয় সন্তানদেরকে ইসলাম ধর্ম অনুসরণের অসিয়ত করেছিলেন। আর এখানে সে অসিয়তটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ : بَدَلٌ مِنْ اِلٰهَكَ : অর্থাৎ اِلٰهًا وَاحِدًا পূর্বের اِلٰهَكَ থেকে بَدَلٌ হয়েছে। এখানে بَدَلٌ উল্লেখ করার কারণ হলো পূর্বের اٰبَائِكَ দ্বারা বাহ্যত একাধিক ইলাহ হওয়ার যে সংশয় জাগে তা নিরসন করা।

اَىْ اَىَّ شَيْءٍ : قَوْلُهُ مَا تَعْبُدُوْنَ : مَا প্রশ্নজ্ঞাপক ইসিম। مَحَلًّا মানসূব হয়েছে تَعْبُدُوْنَ -এর مَفْعُوْلٌ مُقَدَّمٌ হিসেবে। কেউ কেউ বলেছেন– مَا مَوْصُوْلَةٌ মহল হিসেবে مَرْفُوْعٌ এবং تَعْبُدُوْنَ -এর عَائِدٌ মাহযুফ রয়েছে। تَعْبُدُوْنَهُ

প্রশ্ন : مَنْ শব্দটি বাদ দিয়ে مَا শব্দটিকে ব্যবহার করা হলো কেন?

উত্তর : সে সময় যত ভ্রান্ত উপাস্য ছিল সেগুলো সবই غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ ছিল। যেমন– মূর্তি, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি। এজন্য مَا দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে। আর এ ঘটনা সে সময়ের যখন ইয়াকুব (আ.) মিসরে গমন করেছিলেন এবং সেখানে অনেক মানুষকে অগুনের পূজা করতে দেখেন। তাই তিনি নিজ সন্তানদের ব্যাপারে আশংকা করে উক্ত অসিয়ত করে যান।

قَوْلُهُ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ : যেহেতু ضَمِيْرِ مَجْرُوْرِ مُتَّصِلٌ -এর উপর عَطْفٌ করতে হলে عَامِلِ جَارٍ -কে اِعَادَهْ করা আবশ্যক হয় তাই اِلٰهَ -কে দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَدْ خَلَتْ : اُمَّةٌ এর -এর সিফত। আর ফে'লটি خَلَتْ থেকে নির্গত। আর اَلْخُلُوُّ অর্থ اَلْمُضُوُّ বা অতিবাহিত হওয়া।

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهُ : تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ জুমলাটি পূর্বের জুমলা كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ -এর تَاكِيْدٌ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা তাকরার বা পুনরুক্তির ফায়দা সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হলো।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ : তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হচ্ছে এবং প্রশ্নের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন হুমকি নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে হুমকি প্রদান ও গ্লানি উদ্রেক করার অর্থে এবং অবশেষে তা নেতিবাচক অর্থে। অর্থাৎ তোমরা যে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নামে আজেবাজে ও অসার কথা সম্পৃক্ত করছ, তোমাদের অস্তিত্বই বা তখন কোথায় ছিল? প্রামাণ্য ঘটনাবলি তো তাই, কুরআন যা বিবৃত করছে।

قَوْلُهُ حَضَرَ الْمَوْتَ : অর্থাৎ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলো এবং তিনি তার আলামত অনুভব করতে লাগলেন। মৃত্যু তার উপর সওয়ার হয়ে বসল– এ অর্থ নয়। মৃত্যু দ্বারা পরোক্ষভাবে তার পূর্বলক্ষণ বুঝানো হয়েছে। কেননা খোদ মৃত্যুই এসে পড়লে মুমূর্ষ ব্যক্তি কিছুই বলতে পারে না। পবিত্র কুরআনেই অন্যত্র রয়েছে– يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ সবদিক হতে তার কাছে আসবে মৃত্যু [যাতনা] কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না।] এখানেও মৃত্যু দ্বারা তার উপকরণাদি ও মৃত্যু আহ্বানকারী পূর্ববর্তী বিষয়সমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। وَحُضُوْرُ الْمَوْتِ كِنَايَةٌ عَنْ حُضُوْرِ اَسْبَابِهِ وَمُقَدَّمَاتِهِ

قَوْلُهُ عَدُّ اِسْمَاعِيْلَ مِنَ الْاٰبَاءِ تَغْلِيْبٌ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো– ইসমাইল (আ.) তো ইয়াকুব (আ.)-এর বাবা নন; বরং চাচা ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাকে اٰبَاءٌ -এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো কেন?

উত্তর: মুফাসসির (র.) এ প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন, তা নিম্নে উপস্থাপন করো হলো–

১. হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বড় চাচা ছিলেন। ইয়াকূব সন্তানগণ নিজেদের পূর্ণাঙ্গ ভাগ্যমন্ততা ও উত্তরসূরী হওয়ার পরিচয় দিয়ে تَغْلِيْبًا তাকেও ইয়াকূব (আ.)-এর পিতৃকুলে গণনা করেছিল। যেভাবে গণ-ভাষায় বাপ-চাচাকে একই স্তরেই পরিগণিত করা হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক জবানে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর জন্যও পিতা (اب) শব্দ উচ্চারিত হয়েছে– هٰذَا بَقِيَّةُ اٰبَائِيْ অর্থাৎ আমার মুরব্বী বা প্রবীণদের [বাপকুলের] মাঝে একমাত্র তিনিই এখন অবশিষ্ট রয়েছেন।

২. চাচা পিতার সমতুল্য। এ হিসেবে ইসমাইল (আ.)-কে পিতার কাতারে শামিল করা হয়েছে। প্রশ্ন : পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, ইসহাক (আ.) ছিলেন প্রকৃতি পিতা। সে হিসেবে তাঁর কথা আগে আসা উচিত ছিল।

উত্তর : হযরতইসহাক (আ.)-এর উপর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর দুটি কারণে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। ১. ইসমাইল (আ.) ইসহাক (আ.)-এর চেয়ে বয়সে ১৪ বছর বড় ছিলেন। ২. আমাদের নবী ﷺ ইসমাইল (আ.)-এর বংশের। এ দুই কারণে ইসমাইল (আ.)-এর নাম আগে এসেছে।

قَوْلُهُ اِسْحٰقَ : এ নামটি প্রথমবারের মতো উল্লেখ হচ্ছে। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমা পত্নী হযরত সারা (আ.)-এর গর্ভজাত সন্তান। জন্মসন আনুমানিক ২০৬০ এবং ওফাত আনুমানিক ১৮৮০ খ্রিস্টপূর্ব সালে। তাওরাতে তার বয়স ১৮০ বছর উল্লিখিত হয়েছে। তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, তার জন্মকালে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৪৯]

قَوْلُهُ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ : [এবং তাদের মাহাত্ম্য-শ্রেষ্ঠত্বও তাদের সঙ্গেই বিগত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং তাদের নামের দোহাই পড়া যে, আমাদের পূর্বপুরুষ এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন বলাতে] আমাদের কি লাভ?] تِلْكَ اُمَّةٌ দ্বারা ইহুদিদের ঐ পিতৃপুরুষই উদ্দেশ্য, যারা নবীগণের জামাতে পরিগণিত। এখানে বক্তব্যের লক্ষ্য ইহুদিরা, যারা পিতৃপুরুষের গৌরব, বংশগর্ব ও পয়গাম্বর-পুত্র হওয়ার নেশায় মদমত্ত ছিল। এতে সমকালীন পীরজাদা তথাকথিত মাশায়েখজাদা ও অন্যান্য বিদআতী ভ্রান্তপন্থিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ইসলাম আমল ও কর্মের সাধনাবিহীন শুধু পূর্বপুরুষের সম্বন্ধ মাহাত্ম্য দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রবণতাকে মূল থেকেই উৎপাটিত করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ الخ :

যোগসূত্র : পূর্বে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.)-এর আলোচনা ছিল। ইহুদিরা তাঁদের নিয়ে সীমাহীনগর্ভ করে বেড়াত। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমক দিচ্ছেন যে, নবীদের সাথে তোমাদের সম্পর্ক আছে বলে তোমরাও তাদের নেক আমলের দ্বারা পার পেয়ে যাবে এ আশা করবে না। বরং তোমাদের নেক আমলই তোমাদের উপকারে আসবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٣٥. وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا اَوْ لِلتَّفْصِيْلِ وَقَائِلُ الْاَوَّلِ يَهُوْدُ الْمَدِيْنَةِ وَالثَّانِيْ نَصٰرٰى نَجْرَانَ قُلْ لَهُمْ بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرٰهِمَ حَنِيْفًا حَالٌ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ مَائِلًا عَنِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

১৩৫. আর তারা বলে, ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হও, সঠিক পথ পাবে প্রথম উক্তিটি হলো মদীনার ইহুদিদের আর দ্বিতীয় উক্তিটি হলো নাজরান অধিবাসী খ্রিস্টানদের। তাদেরকে বলো, বরং একনিষ্ঠ হয়ে সকল ধর্মাদর্শ হতে বিমুখ ও একমাত্র সঠিক ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করি। এবং সে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

اَوْ نَصٰرٰى এর اَوْ শব্দটি تَفْصِيْل কল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। حَنِيْفًا শব্দটি اِبْرَاهِيْم-এর حَال বা অবস্থা ও ভাববাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٣٦. قُوْلُوْا خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِمَ مِنَ الصُّحُفِ الْعَشْرِ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ اَوْلَادِهٖ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنَ التَّوْرَاةِ وَعِيْسٰى مِنَ الْاِنْجِيْلِ وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ مِنَ الْكُتُبِ وَالْاٰيٰتِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ .

১৩৬. তোমরা বল এই স্থানে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি অর্থাৎ আল-কুরআন, আরো যা ইবরাহীমের প্রতি অর্থাৎ তৎপ্রতি অবতীর্ণ দশটি সহিফা এবং ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও আসবাত অর্থাৎ তার বংশধরদের প্রতি ও মূসা অর্থাৎ তাওরাত ও ঈসা অর্থাৎ ইঞ্জীল এবং যা অর্থাৎ যে সকল কিতাব ও আয়াত অন্যান্য নবীগণের প্রতি তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে দেওয়া হয়েছে তাতে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো কতকজনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর কতকজনকে অস্বীকার করলাম– আমরা এমন করি না। এবং আমরা তাঁর নিকট আত্ম সমর্পণকারী।

١٣٧. فَاِنْ اٰمَنُوْا اَيِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى بِمِثْلِ مِثْلِ زَائِدَةٌ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ خِلَافٍ مَعَكُمْ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ يَا مُحَمَّدُ شِقَاقَهُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِهِمُ الْعَلِيْمُ بِاَحْوَالِهِمْ وَقَدْ كَفَاهُ اِيَّاهُمْ بِقَتْلِ قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ

১৩৭. তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ তারা অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ যদি সেরূপ বিশ্বাস করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়েতের পথ পাবে। আর যদি তারা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় তারা বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তোমাদের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত। হে মুহাম্মদ! তাদের বিরোধিতার মুখে আল্লাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তাদের সকল কথা সম্পর্কে অতি শ্রোতা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে অতি অবহিত। বনূ কুরায়যাকে হত্যা, বনূ নাজিরকে বহিষ্কার ও তাদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করে তাদের শত্রুতায় আল্লাহই যথেষ্ট এ কথা তিনি বাস্তবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

بِمِثْلِ এই স্থানে مِثْل শব্দটি অতিরিক্ত।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

حَنِيْفًا : তারকীব বা বাক্যবিন্যাসে পূর্বোক্ত মুজাফ [সম্বন্ধ পদ] اِبْرَاهِيْمَ -এর হাল [অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ] এ অভিমত অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ মুফাসসিরবর্গের। দ্বিতীয় অভিমত হলো حَنِيْفًا শব্দ اِبْرَاهِيْمَ -এর নয়; বরং مِلَّةَ-এর গুণবাচক এবং তা মুযাফ ইলাইহি -এর না হয়ে এবং মুযাফ [সম্বদ্ধ যুক্ত পদ] -এর হাল হয়েছে। [وَهُوَ حَالٌ مِنَ الْمُضَافِ بِتَاوِيْلِ الدِّيْنِ اَوْ تَشْبِيْهًا لَهُ بِفَعِيْلٍ بِمَعْنٰى مَفْعُوْلٍ] অর্থাৎ শব্দটি [حَنِيْفًا] মুযাফ [مِلَّةَ] -এর হাল হবে [এবং ملة শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হলেও তাকে পু:] الدِّيْنِ -এর অর্থে নেওয়ার ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে কিংবা فَعِيْل শব্দরূপ [وَزْن] বিশিষ্ট حَنِيْف শব্দকে مَفْعُوْل শব্দরূপী গুণবাচক বিশেষ্যের তুলনায় সাব্যস্ত করে [যাতে مَفْعُوْل ওজনের ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী সমতুল্য। –[রূহুল মা'আনী]। এক্ষেত্রে আয়াতের তরজমা হবে আমরা তো পেয়ে গেছি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্ম, যা সরল পথ। অবশ্য حَنِيْفًا অর্থ উভয় অবস্থায়ই مُسْتَقِيْمًا وَمَائِلًا اِلَى الْحَقِّ সরল পথের অবিচল অনুসারী ও সত্য ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত। সুতরাং বাক্যটির মূল রূপ হবে এভাবে بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّتَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ কিংবা نَكُوْنَ عَلٰى مِلَّتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قَوْلُهٗ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى : এ অংশটুকুর সম্পর্ক পূর্বের مَا اُنْزِلَ -এর সাথে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি কিতাব অবতীর্ণের বিষয়টি ভিন্নভাবে বলা হলো কেন, পূর্বের সাথে একত্রে বলা হলো না কেন?

উত্তর : হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত এবং হরত ঈসা (আ.)-এর উপর ইঞ্জিল সরাসরি অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় আলাদাভাবে তাদের কথা বলা হয়েছে।

তারপর আবার প্রশ্ন হয় এখানে اِيْتَاءٌ শব্দ ব্যবহার হলো কেন اَنْزَلَ ব্যবহার হলো না কেন?

উত্তর : تَكْرَارٌ صُوْرِىٌّ থেকে বাঁচার জন্য এখানে اِيْتَاءٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় জবাব হলো এখানে اِسْمُ مَوْصُوْل দ্বারা তাওরাত ইঞ্জিল এবং ঐ সকল মুজিযা উদ্দেশ্য যা উক্ত দুই নবীর হাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই عُمُوْمٌ বুঝানোর জন্য اِيْتَاءٌ ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয় জবাব হলো ইহুদি-নাসারাদের ব্যাপরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য اِيْتَاءٌ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা اِنْزَالٌ -এর তুলনায় اِيْتَاءٌ -এর মাঝে মোবালাগা বেশি রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ : এটি اٰمَنَّا -এর উপর عَطْف কিংবা لَا نُفَرِّقُ -এর উপর عَطْف হয়েছে। দ্বিতীয় সূরতে এটি اٰمَنَّا -এর দ্বিতীয় حَالٌ হবে।

مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ : এখানে مَا مَوْصُوْلَهٗ হতে পারে اَىْ بِمِثْلِ الَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ আবার مَصْدَرِيَّهٗ -ও হতে পারে-- اَىْ بِمِثْلِ اِيْمَانِكُمْ بِهٖ

قَوْلُهٗ فَقَدِ اهْتَدَوْا : এটি جَوَابُ شَرْط আয়াতের শুরুতে যেহেতু اِنْ شَرْطِيَّةٌ রয়েছে তাই এখানে شَرْط এবং جَزَا উভয়টি মাজি হওয়া সত্ত্বেও মুজারের অর্থে হবে। اَىْ اَنْ يُّؤْمِنُوْا يَهْتَدُوْا

قَوْلُهٗ فِىْ شِقَاقٍ : شِقَاقٍ -এর تَنْوِيْن টি تَفْخِيْم বা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য شَقٌّ [দিক বা পার্শ্ব] থেকে নিগর্ত।
لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَشَاقِّيْنَ لِكَوْنٍ فِىْ شَقٍّ غَيْرِشَقِّ صَاحِبِهٖ .

قَوْلُهٗ خِلَافٍ مَعَكُمْ : এটি شِقَاقٌ -এর তাফসীর। অভিধানে شِقَاقٌ নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে আসে–

١. اَلْخِلَافُ وَمِنْهُ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا .
٢. اَلْعَدَاوَةُ مِثْلُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ .
٣. اَلضَّلَالُ مِثْلُ : وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে شِقَاقٌ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى الخ : ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই নও মুসলিম ও আধা মুসলমানদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট ছিল এই বলে যে, সাফল্য ও মুক্তি পেতে চাও তো আমাদের ধর্মে ঢুকে পড়। ঐ নতুন ধর্মে তেমন কি-ই বা আছে। মুসলমানদেরও এ জবাব শিখিয়ে দেওয়া হলো যেমন তোমাদের ওখানে রদবদল ও বিকৃতি ছাড়া আর

http://islamiboi.wordpress.com

আছেই বা কি আর আমাদের ধর্ম তো কোনোক্রমেই নবজাত নয়, তা তো শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাচীন তৌহিদী ধর্ম এবং আমরাই তার প্রকৃত ও অবিকৃত রূপরেখার ধারক ও বাহক।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে কিতাবীদের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে যে, কোন মুখে তোমরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে সম্বন্ধিত করছ ? তিনি শিরক -এর ধারে কাছেও যাননি, অংশীবাদের পাশ দিয়েও ঘেষেননি। মূলত ইহুদি খ্রিস্টানরাও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিষ্কলুষ একত্ববাদ অনুসরণের কথা একবাক্যে স্বীকার করত, যদিও কার্যত তাঁরা তার পন্থা বর্জন করে রেখেছিল। আর মসীহ [যীশু] -এর অনুসারী হওয়ার দাবিদাররাও প্রকাশ্য শিরকে নিমজ্জিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, উক্ত তিনজন নবীর কারো উপরই তো কোনো কিতাব বা সহীফা অবতীর্ণ হয়নি; বরং দশটি সহীফা যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শুধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছিল। তারপরও উক্ত তিনজনের عَطْف হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে কিভাবে হলো?

উত্তর : তাঁদের কিতাব বা সহীফা নাজিল না হলেও যেহেতু এ তিনজন নবী ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার মুকাল্লাদ ছিলেন তাই ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তাঁদেরকেও আতফ করা হয়েছে। যেমন কুরআনের ব্যাপারে বলা হয়েছে– وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا অথচ আমাদের উপর কুরআন নাজিল হয়নি; বরং তা হযরত মুহাম্মদ (আ.)-এর উপর নাজিল হয়েছে। যেহেতু আমরা তার বিধানাবলির অনুসরণ করতে বাধ্য, তাই তা অবতীর্ণের নিসবত আমাদের প্রতি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানেও এমনটি হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْلَادُهٗ : এখানে اَوْلَادٌ দ্বারা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানাদি উদ্দেশ্য এবং তার اَوْلَادٌ صُلْبِيَّةٌ বা ঔরসজাত সন্তানাদি উদ্দেশ্য। কখনো ছেলের সন্তানকেও وَلَدٌ-কে বলা হয় তাই মুফাসসির (র.) اَلْاَسْبَاطُ -এর ব্যাখ্যা করেছেন اَوْلَادٌ দ্বারা।

قَوْلُهُ مِنَ الْكُتُبِ وَالْاٰيَاتِ : এটি مَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ -এর মিসদাক। অর্থাৎ অন্যান্য নবীদেরকে যে সকল কিতাব ও মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, কতক রাসূলের উপর কতক রাসূলের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনেই অন্য আয়াতে রয়েছে تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ তাহলে এখানে لَانُفَرِّقُ -এর মর্ম কি?

জবাব : মুফাসসির (র.) فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ الخ বলে ইঙ্গিত করলেন যে, এখানে تَفْرِيْقٌ দ্বারা تَفْرِيْقٌ فِى الْاِيْمَانِ উদ্দেশ্য, تَفْرِيْقٌ فِى الْاَفْضَلِيَّةِ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى : অর্থাৎ আমরা ইহুদি-নাসারাদের মত নবীদের মাঝে বিবেধ সৃষ্টি করি না। ইহুদিরা হযরত মুসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং হযরত ঈসা ও রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করেছে। আর নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছে; কিন্তু রাসূল ﷺ এবং হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করেছে।

فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ : এ সম্বোধনের লক্ষ্য রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। আর এ লোকেরা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ কিতাবী কাফের ও ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীরাই, যাদের ধারাবাহিক আলোচনা চলমান। এ আয়াতে এ মর্মে শুভ সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে যে, এতদূর একগুয়েমী হঠকারিতা সত্ত্বেও যদি এখনও তারা ঈমান গ্রহণ করে, তবে তাদের বিগত কুফরি ও হঠকারিতা তাদের পথে অন্তরায় হতে পারে না।

সাহাবাদের ঈমান হলো মাপকাঠি : আয়াতে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সব্যস্ত করে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

–[বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মাআরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.)]

قَوْلُهُ مِثْلُ زَائِدَةٌ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি اِعْتِرَاضٌ -এর জবাব দিয়েছেন। তাহলো, আয়াতে ইহুদি-নাসারাদের বলা হয়েছে যে, যদি তারা 'তার অনুরূপ' এর উপর ঈমান আনে- যার উপর ঈমান এনেছে মুসলমানগণ, তাহলে তারা হেদায়েত পাবে। কথার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলমানগণ একমাত্র আল্লাহর উপরই ঈমান এনেছে। এখন তার مِثْل -এর উপর ঈমান আনতে হলে তো আল্লাহর مِثْل হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহর কোনো مِثْل নেই।

জবাব : এখানে مِثْل শব্দটি অতিরিক্ত এ জবাবের সমর্থন ঐ কেরাত দ্বারা হয় যার মাঝে بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ -এর স্থলে بِمَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ রয়েছে। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٣٨. صِبْغَةَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِاٰمَنَّا وَنَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ صَبَغَنَا اللّٰهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِيْنُهُ الَّذِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لِظُهُوْرِ اَثَرِهٖ عَلٰى صَاحِبِهٖ كَالصَّبْغِ فِى الثَّوْبِ وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً تَمْيِيْزٌ وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ـ

১৩৮. আল্লাহর রং অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার রঙ্গে বিভূষিত করেছেন। এইস্থানে রং অর্থ আল্লাহপ্রদত্ত দীন এবং স্বভাব [যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।] রং যেমন কাপড়ের সকল স্থানে গিয়ে প্রবেশ করে তেমনি স্বভাব ধর্মের প্রভাবও তার অধিকারী জনের সর্বত্রে গিয়ে প্রকাশ পায়। [এই সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করে এই স্থানে স্বভাব ধর্মকে রং এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রঙ্গে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? না, এমন কেউ আর নেই এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।

صِبْغَةَ اللّٰهِ এটা اٰمَنَّا -এর مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ বা জোর অর্থবোধক সমধাতুজ কর্ম উহ্য ক্রিয়া صَبَغَنَا -এর কারণে, এটা مَنْصُوْبٌ [দ্রষ্টব্য ভূমিকা কতিপয় পরিভাষা] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে

١٣٩. قَالَ الْيَهُوْدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحْنُ اَهْلُ الْكِتَابِ الْاَوَّلِ وَقِبْلَتُنَا اَقْدَمُ وَلَمْ تَكُنِ الْاَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلْ لَهُمْ اَتُحَاجُّوْنَنَا تُخَاصِمُوْنَنَا فِى اللّٰهِ اَنِ اصْطَفٰى نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ فَلَهٗ اَنْ يَّصْطَفِىَ مِنْ عِبَادِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَلَنَا اَعْمَالُنَا نُجَازٰى بِهَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ تُجَازَوْنَ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ اَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْاِكْرَامَ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ـ الدِّيْنَ وَالْعَمَلَ دُوْنَكُمْ فَنَحْنُ اَوْلٰى بِالْاِصْطِفَاءِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ وَالْجُمَلُ الثَّلَاثُ اَحْوَالٌ

১৩৯. ইহুদিরা মুসলিমদেরকে বলত, আমরা প্রথম আল্লাহ প্রেরিত গ্রন্থের অধিকারী; আমাদের কেবলাও পূর্বের। আরবে পূর্বে কোনো নবী ও প্রেরিত হননি। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ যদি প্রকৃতই নবী হতেন, তবে আমাদের গোত্রেই তাঁর জন্ম হতো। এই সংশ্রবে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তাদের বলো, আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সাথে বিতর্কে বিবাদে লিপ্ত হতে চাও? যে তিনি আরব হতে একজন নবী মনোনীত করেছেন; অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক সুতরাং বান্দাদের হতে যাকে ইচ্ছা নবী হিসেবে মনোনীত করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। [আমাদের কর্ম আমাদের আমাদেরকে তারই প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের তোমরা তারই প্রতিদান পাবে। সুতরাং আমাদের কর্মের মধ্যে এমন থাকা অসম্ভব নয় যে, যা দ্বারা আমরা সম্মানের অধিকারী হতে পারি। এবং দীন ও আমলের বিষয়ে তোমরা নও; বরং আমরাই তাঁর প্রতি অকপট। সুতরাং মনোনয়নের ব্যাপারে আমরাই অধিক যোগ্য।

اَتُحَاجُّوْنَنَا এই স্থানে هَمْزَةٌ টি اِنْكَارِىْ বা অস্বীকার অর্থব্যঞ্জক।

وَهُوَ رَبُّنَا ও وَلَنَا اَعْمَالُنَا এবং وَنَحْنُ لَهٗ এই বাক্যত্রয় এই স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ دُوْنَكُمْ : دُوْنَكُمْ বলে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ-এর মাঝে مُسْنَدُ اِلَيْهِ-এর মুকাদ্দম হওয়াটা قَصْر-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ الدِّيْنَ وَالْعَمَلَ : যেহেতু مُخْلِصُوْنَ শব্দটি اِخْلَاص তথা মুতাআদ্দী মাসদার থেকে নির্গত তাই মুফাসসির (র.) তার مَفْعُوْل-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ : অর্থাৎ اَتُحَاجُّوْنَ-এর মাঝে হামযাটি হলো اِنْكَار বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য। اَىْ لَا يَنْبَغِىْ لكم ان تحاجونا এ থেকে এ সংশয়ও দূর হয়ে যায় যে, প্রশ্ন করা আল্লাহর জন্য অনুচিত। কেননা তিনি সবকিছু জানেন।

قَوْلُهُ وَالْجُمَلُ الثَّلَاثُ اَحْوَالٌ : اَحْوَالٌ শব্দটি حَالٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ তিনটি জুমলা حَالٌ হয়েছে। সে তিনটি জুমলা হলো–

১. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ . ২. وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ . ৩. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ .

এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন।

আপত্তি : وَاو-এর মাঝে মূল হলো عَطْف সুতরাং উক্ত তিনটি বাক্যেই وَاو আতফের জন্য ব্যবহৃত। তার مَعْطُوْف عَلَيْهِ হলো تُحَاجُّوْنَنَا যা جُمْلَةُ الْاِنْشَائِيَّةُ আর তিনটি বাক্যই হলো جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ তাই এখানে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ কে اِنْشَائِيَّة-এর উপর عَطْف করা লাজেম আসছে, যা সঠিক নয়।

জবাব : وَاو ঐ স্থানে عَطْف-এর জন্য মূল হয় যেখানে عَطْف হওয়ার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। আর এখানে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান আছে। তাহলো جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-কে اِنْشَائِيَّةٌ-এর উপর عَطْف করা। সুতরাং এখানে وَاو টি عَاطِفَةٌ নয়; বরং حَالِيَةٌ - اَتُحَاجُّوْنَنَا-এর জমির থেকে حال হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ঈমানের পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এখন এ আয়াতে ঈমানী তরীকার বিরুদ্ধাচারণকারীদের চক্রান্তের জবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ইহুদি নাসারাগণ প্রতিনিয়ত এ চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, তোমরাদেরকেও তাদের রঙে রঞ্জিত করে দিবে। হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদেরকে বলে দাও আমাদেরকে তো আল্লাহ নিজের রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছেন, তোমাদের রঙের কোনো প্রয়োজন নেই।

مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِاٰمَنَّا : অর্থাৎ صِبْغَةٌ হলো فِعْل مُقَدَّرٌ-এর মাসদার এবং اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ الخ-এর বিষয়বস্তুর তাকিদ স্বরূপ। কেননা উক্ত বাক্যে অন্য কোনো বিষয়বস্তুর অবকাশ নেই। এজন্য তার আমেল হযফ করা হয়েছে। صِبْغَةَ اللّٰهِ মূলত صَبَغَنَا اللّٰهُ صِبْغَةً ছিল। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– وَعْدَ اللّٰهِ وَصُنْعَ اللّٰهِ اَىْ وَعَدَ اللّٰهُ وَعْدًا وَصَنَعَ اللّٰهُ صُنْعًا

صِبْغَةَ اللّٰهِ-**এর মর্ম :** পূর্বের আয়াতে দীন ইসলামকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি নিসবত করে বলা হয়েছে- مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا এখানে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করে বলা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে দীন তো হলো আল্লাহরই। কোনো পয়গাম্বরের দিকে তা রূপক অর্থে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। আর এখানে মিল্লাত বা ধর্মকে صِبْغَةَ اللّٰهِ শব্দে প্রকাশ করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে–

১. নাসারাদের খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বড়াই করে বলতো, আমাদের এক প্রকার রং আছে, যা মুসলমানদের নেই। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের স্থিরীকৃত রং ছিল হলুদ। তাদের নিয়ম ছিল, যখন কোনো শিশুর জন্ম হতো, অথবা কেউ তাদের দীনে দীক্ষিত হতো, তখন তাকে সে রঙ্গে ডুব দেওয়ানো হতো। তারপর বলত, এবার সে খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে গেল। আল্লাহ বলে দিলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা বলে দাও, তাদের পানির রং ধুলে শেষ হয় যায়। ধোয়ার পর এর কোনো প্রভাব বাকি থাকে না। প্রকৃত রং তো হলো আল্লাহর দীন ও মিল্লাতের রং আমরা আল্লাহর দীন কবুল করেছি। এ দীনে যে প্রবেশ করে সে সর্ব প্রকার মলিনতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

২. দীনকে রং বলে এ এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রং যেরূপ চোখে অনুভব করা যায় অনুরূপ মুমিনের ঈমানেরও আলামত রয়েছে, যা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সকল কাজ-কর্মে ফুটে উঠা উচিত। صِبْغَةَ اللّٰهِ এর দুটি অনুবাদ হয়- ১. আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি; ২. তোমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করো।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِيْنَهُ :

১. আয়াতে বর্ণিত صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দীন। যাকে অন্য এক আয়াতে فِطْرَتْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে ফিতরী ধর্মের উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এখানে সে دِيْنِ فِطْرَتْ-ই উদ্দেশ্য।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা খতনাকে বুঝানো হয়েছে, যা ইবরাহীম ধর্মের বিশেষ প্রতীক।

৩. কেউ কেউ বলেন, صِبْغَةَ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য تَطْهِيْرُ اللّٰهِ বা আল্লাহর পবিত্রকরণ।

قَوْلُهُ لِظُهُوْرِ أَثَرِهِ عَلٰى صَاحِبِهِ : মুফাসসির (র.) এ ইবারত দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে اِسْتِعَارَه تَصْرِيْحِيَّة হয়েছে। এভাবে যে, আয়াতে دِيْنِ اللّٰهِ রঙ্গিন কাপড়ের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর مُشَبَّه উহ্য রয়েছে এবং مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লিখিত। আর উভয়ের মাঝে وَجْهُ شِبْهٍ হলো ظُهُوْرُ اَثَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلٰى صَاحِبِهِ তাইতো ঈমানের প্রতিক্রিয়া মু'মিনের মাঝে প্রকাশ পায় যেমন কাপড়ে রঙ ফুটে উঠে।

قَالَ الْيَهُوْدُ : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) সামনে আয়াতের শানে নুজুলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, একবার ইহুদীরা মুসলমানদেররকে বলল, আমরা আহলে কিতাবদের মধ্যে অগ্রবর্তী। আমাদের কেবলা সবার চেয়ে প্রাচীন এবং সকল নবী আমাদের মধ্য হতে, আরবের কোনো নবী নেই। যদি মুহাম্মদ নবী হতো, তাহলে আমাদের মধ্য থেকে হতো। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ اَهْلُ الْكِتَابِ الْاَوَّلِ : اَلْكِتَابُ الْاَوَّلُ-এর মিসদাক হলো তাওরাত। আপত্তি জানায় তাওরাতের পূর্বেও তো বহু কিতাব অতীত হয়েছে। তারপরও তাওরাতকে প্রথম কিভাবে বলা হলো?

জবাব : তাওরাতের اَوَّلِيَّتْ বা প্রথমে হওয়াটা কুরআন এবং ইঞ্জিলের নিসবতে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقِبْلَتُنَا اَقْدَمُ : قِبْلَتُنَا-এর মিসদাক হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। আর اَقْدَمُ শব্দটি اِسْمِ تَفْضِيْل-এর সীগাহ। এখানে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। اَىْ اَقْدَمُ مِنَ الْكَعْبَةِ

قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنِ الْاَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ : اَىْ بَلْ كَانَتْ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بَعْدَ اِسْرَائِيْلَ

قَوْلُهُ فِى اللّٰهِ : এখানে মুজাফ মাহযুফ রয়েছে- اَىْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَوْ فِىْ شَاْنِ اللّٰهِ اَوِ اصْطِفَائِهِ نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ

قَوْلُهُ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ : اَىْ اَتُجَادِلُوْنَنَا وَالْحَالُ اَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْمُجَادَلَةِ اَصْلًا لِاَنَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اَىْ مَالِكُ اَمْرِنَا وَاَمْرِكُمْ

قَوْلُهُ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ : وَاو আতফা, পূর্বের সাথে عَطْف হয়েছে। مُخْلِصُوْنَ শব্দটি اِخْلَاص থেকে নির্গত। اِخْلَاص -এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

١. رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ جِبْرِيْلَ عَنِ الْاِخْلَاصِ مَا هُوَ فَقَالَ سَاَلْتُ رَبَّ الْعِزَّةِ فَقَالَ سِرٌّ مِنْ اَسْرَارِىْ اَسْتَوْدِعُهُ قَلْبَ مَنْ اَحْبَبْتُهُ مِنْ عِبَادِىْ.

٢. وَقَالَ حُذَيْفَةُ (رض) اَنْ تَسْتَوِىَ اَفْعَالُ الْعَبْدِ فِى الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ.

٣. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ اَلْاِخْلَاصُ اَنْ لَا تُشْرِكَ فِىْ دِيْنِهِ وَلَا تُرَائِىْ اَحَدًا فِىْ عَمَلِهِ.

ইখলাসের বিপরীত বস্তু হলো رِيَاءٌ বা লোক দেখানো। তার তিনটি আলামত রয়েছে-

١. اَلْكَسَلُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِى الْوَحْدَةِ.

٢. اَلنَّشَاطُ عِنْدَ الْعِبَادَةِ فِى الْكَثْرَةِ.

٣. حُبُّ الثَّنَاءِ عَلَى الْعَمَلِ.

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٠. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى قَالَ لَهُمْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ اَىِ اللّٰهُ اَعْلَمُ وَقَدْ بَرَّاَ مِنْهُمَا اِبْرَاهِيْمَ بِقَوْلِهٖ مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَ لَا نَصْرَانِيًّا وَالْمَذْكُوْرُوْنَ مَعَهٗ تَبَعٌ لَهُمْ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ اَخْفٰى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَهٗ كَائِنَةً مِنَ اللّٰهِ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِنْهُ وَهُمُ الْيَهُوْدُ كَتَمُوْا شَهَادَةَ اللّٰهِ فِى التَّوْرٰىةِ لِاِبْرٰهِيْمَ بِالْحَنِيْفَةِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ.

১৪০. বরং তোমরা কি বল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিল। বল, তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ? নিশ্চয় আল্লাহই অধিক জানেন। আর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এতদুভয় হতে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ করেন, مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ.) ইহুদি বা খ্রিস্টান কোনো সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন না। আর এই আয়াতোক্ত অন্যান্য নবীগণ ছিলেন তাঁরই অনুসারী। [সুতরাং তাঁরাও ইহুদি ও খ্রিস্টান ছিলেন না।] আল্লাহর নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে। মানুষের নিকট লুকায় তদপেক্ষা অধিকতর সীমালঙ্ঘনকারী আর কে হতে পারে? না, আর কেউ অধিকতর সীমালঙ্ঘনকারী নেই। তারা হলো ইহুদি। হযরত ইবরাহীম (আ.) হানীফিয়্যাতের [সরল ধর্মের] অনুসারী ছিলেন বলে তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা যে সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন তারা তা গোপন করে রেখেছিল। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। এই আয়াতটি তাদের প্রতি ধমকি স্বরূপ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ এ স্থানে اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَقُوْلُوْنَ ক্রিয়াটি ت [দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى [নাম পুরুষ] উভয় অক্ষর সহকারেই পঠিত রয়েছে।

١٤١. تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ تَقَدَّمَ مِثْلُهٗ

১৪১. এই উম্মত অতীত হয়েছে তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের; তোমরা যা অর্জন করেছ, তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। পূর্বে এই ধরনের আয়াত উল্লিখিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بَلْ أَ : কোনো কোনো নোসখায় هَمْزَهٗ اِسْتِفْهَامْ উল্লেখ্য নেই। সে সময় হামযাটি উহ্য ধরা হবে। মুফাসসির (র.) এখানে اَمْ-এর পরে بَلْ أَ উল্লেখ্য করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اَمْ مُنْقَطِعَةٌ টি ام যা بَلْ এবং هَمْزَهٗ اِسْتِفْهَامْ-এর অর্থে- فَيَكُوْنُ قَدْ اِنْتَقَلَ عَنْ قَوْلِهٖ اَتُحَاجُّوْنَنَا وَاَخَذَ فِى الْاِسْتِفْهَامِ عَنْ قَضِيَّةٍ اُخْرٰى.

কেউ কেউ বলেন- اَمْ টি اَمْ مُتَّصِلَةٌ এ সময় اِسْتِفْهَامْ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে উভয়টিকে অস্বীকার করা।

اَىْ كُلٌّ مِنَ الْاَمْرَيْنِ مُنْكَرٌ لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يَكُوْنَ اِقَامَةُ الْحُجَّةِ وَلَا الْاِفْتِرَاءُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

যেহেতু اَمْ مُتَّصِلَةٌ-এর সূরতে এ সংশয় জাগে যে, সম্ভবত দুটি বাক্যের যে কোনো একটি বাক্য সংঘটিত হয়েছে এবং প্রশ্ন শুধু تَعْيِيْن বা নির্ধারণ সম্পর্কে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা উভয়টি বিষয়ই সংঘটিত হয়েছে। এজন্য মুফাসসির (র.) مُنْقَطِعَةٌ-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাতে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ تَقُوْلُوْنَ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ এবং আখেরী জমানার নবী সম্পর্কে ইহুদিদের বিতর্ক ও হঠকারিতার আলোচনা ছিল। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইসমাইল ও ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কে ইহুদিদের ভ্রান্ত দাবীর আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَوْلُهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً : আল্লাহর সাক্ষ্য এই যে, এরা সকলেই নিখুঁত ও খাঁটি একত্ববাদের অনুগামী ছিলেন। এখানে মূলত ঐ সকল ইহুদি আলেমদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, যারা একথা ভালো করেই জানত যে ইহুদি ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্ম বর্তমান বৈশিষ্ট্যাবলিসহ অনেক পরে সৃষ্টি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা হককে নিজেদের মাঝেই সীমিত মনে করত। তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াত হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) ইহুদি ছিলেন। কুরআন নাজিলের সময়কার ইহুদি আলেমদেরকে তাদের এই নির্জলা মিথ্যা দাবির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখে বলানো হচ্ছে যে, তোমরা প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে এবং সত্য-ন্যায়ের অপমৃত্যু ঘটিয়ে যা কিছু বলে যাচ্ছ, কিন্তু প্রকৃত বাস্তব ও সত্য ঘটনা তো এই যে, পূর্বোক্ত মনীষীগণ একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী ও সকলেই তাওহীদের বাণীর প্রচারক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন- مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا হযরত ইব্রাহীম (আ.) ইহুদি ছিলেন না এবং খ্রিস্টানও ছিলেন না।

قَوْلُهُ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ : এ আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের যোগসূত্র এই যে, পূর্বে আল্লাহ তা'আলা وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ দ্বারা ধমকী দিয়েছিলেন। এখন এ আয়াতে সে ধমকীর তাকীদ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের বদলা দিবেন। তাদের আমল সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অন্যদের সম্পর্কে নয়। تِلْكَ اُمَّةٌ দ্বারা ইসরাঈল জাতির পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠ মনষীবর্গ বিশেষত: তিন পুরুষ হযরত ইবরাহীম, ইসহাম ও ইয়াকূব (আ.) উদ্দেশ্য, যাদের বংশধর হওয়ার সূত্রে ইহুদিরা সীমাহীন গর্বে গর্বিত ছিল। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৫৭]

একটু পূর্বেই এরূপ একটি আয়াত আলোচিত হয়েছে; কিন্তু আহলে কিতাবদের অন্তরে যেহেতু তাদের বংশীয় আভিজাত্যবোধের কারণে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, আমাদের ক্রিয়াকলাপ যতই মন্দ হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমাদের বাপ-দাদাগণ আমাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করবেনই। তাদের এ অবান্তর ধারণা রদ করার জন্য এ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করে বক্তব্যকে আরো জোরদার করা হয়েছে। যেন পবিত্র কুরআন ইহুদিদের 'পৈত্রিক পরিত্রাণ' মতবাদের বিপক্ষে লাগাতার কঠোর আঘাত হেনে চলেছে। কিংবা বলুন, পূর্বের আয়াতে আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হয়েছিল আর এ আয়াতের সম্বোধন রাসূল ﷺ -এর উম্মতের প্রতি। তাদের বলা হয়েছে যে, এরূপ অবান্তর ধারণায় তারা যেন আহলে কিতাবের অনুসরণ না করে। নিজেদের পূর্বপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করে যে কারও মনে এরূপ ধারণা জন্ম নিতে পারে; কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ২৬]

قَوْلُهُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ : অর্থাৎ তাদের ঈমান ও পুণ্যকর্ম দ্বারা তোমাদের কোনো লাভ হবে না এবং তোমাদের কুফরি ও পাপকর্ম দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। -[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ২৫৭]

http://islamiboi.wordpress.com

اَلْجُزْءُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় পারা

অনুবাদ :

١٤٢. سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ اَلْجُهَّالُ مِنَ النَّاسِ الْيَهُوْدِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مَا وَلّٰهُمْ اَىُّ شَىْءٍ صَرَفَ النَّبِىَّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا عَلٰى اِسْتِقْبَالِهَا فِى الصَّلٰوةِ وَهِىَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ وَالْاِتْيَانُ بِالسِّيْنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْاِسْتِقْبَالِ مِنَ الْاِخْبَارِ بِالْغَيْبِ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اَىِ الْجِهَاتُ كُلُّهَا فَيَاْمُرُ بِالتَّوَجُّهِ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ شَاءَ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ هِدَايَتَهُ اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَىْ وَمِنْهُمْ اَنْتُمْ دَلَّ عَلٰى هٰذَا ـ

১৪২. নির্বোধ লোকগণ ইহুদি ও মুশরিকদের অজ্ঞলোকগণ বলবে যে, কিসে তাদেরকে বিমুখ করল? অর্থাৎ কোন জিনিস নবী ও মু'মিনগণকে ফিরিয়ে দিল? তাদের ঐ কিবলা হতে, তারা এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল অর্থাৎ সালাতের মধ্যে যাকে তারা কিবলা হিসেবে গ্রহণ করে আসছিল, আর তা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। سَيَقُوْلُ ক্রিয়াটির প্রারম্ভে ভবিষ্যতার্থক অক্ষর س ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং এটা গায়েব অজানা সম্পর্কিত সংবাদ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। বল, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই অর্থাৎ সকল দিকই তাঁর। সুতরাং তিনি যে কোনো দিক ফিরবার নির্দেশ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনোরূপ অভিযোগ তোলা যেতে পারে না। তিনি যাকে ইচ্ছা যার হেদায়েত তিনি ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথে অর্থাৎ দীন-ই ইসলামের প্রতি পরিচালিত করেন তোমরাও মুসলিমগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতটি তার ইঙ্গিতবহ।

١٤٣. وَكَذٰلِكَ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ اِلَيْهِ جَعَلْنٰكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اُمَّةً وَّسَطًا خِيَارًا عُدُوْلًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا اَنَّهُ بَلَّغَكُمْ ـ

১৪৩. এইভাবে অর্থাৎ যেমন তোমাদেরকে আমি এর প্রতি পরিচালিত করেছি তেমনিভাবে হে উম্মতে মুহাম্মদী তথা মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থি শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পন্থি জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন মানব জাতির জন্যে এ কথার সাক্ষীস্বরূপ হতে পার যে, তাদের প্রতি প্রেরিত নবীগণ তাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন এবং রাসূল তোমাদের জন্যে এ কথার সাক্ষী স্বরূপ হবেন যে, তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশসমূহ পৌঁছিয়েছেন

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلسُّفَهَاءُ : এটি سَفِيْهٌ -এর বহুবচন। অর্থ দুর্বুদ্ধি বা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন।

وَهُوَ الْجَاهِلُ الضَّعِيْفُ الرَّأْيِ، الْقَلِيْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ .

سَفِيْه বলা হয় মূর্খ ও দুর্বল সিদ্ধান্তের ব্যক্তিকে যার লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান কম। وَأَصْلُ السَّفْهِ الْخِفَّةُ وَالرِّقَّةُ বলা হয় ثَوْبٌ سَفِيْهٌ إِذَا كَانَ خَفِيْفَ النَّسْجِ

اَلْجُهَّالُ : جَاهِلٌ -এর বহুবচন ও মোবালাগাতের সীগাহ। অর্থ– মূর্খ, অজ্ঞ। مَا وَلّٰهُمْ : بَاب تَفْعِيْل হতে وَلّٰى - تَوْلِيَةً অর্থ– মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। صَرَفَ : صَرْفًا (ض) صَرَفَ অর্থ– ফিরিয়ে দিয়েছে।

اِسْتِقْبَالٌ : بَاب اِسْتِفْعَال -এর মাসদার। অর্থ– অভিমুখী হওয়া। اَلْاِتْيَانُ : اَتٰى يَاتِى اِتْيَانًا অর্থ– আনয়ন করা।

اَلدَّالَّةُ : دَلَّ (ن) دَلَالَةً ইসমে ফায়েল। অর্থ– দালালতকারী, যা বোঝায়। اَلْاِخْبَارُ : بَاب اِفْعَال -এর মাসদার। অর্থ– সংবাদ দেওয়া। اَلْمَشْرِقُ : পূর্বদিক। اَلْمَغْرِبُ : পশ্চিম দিক। اَلْجِهَاتُ : جِهَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দিক।

اَلتَّوَجُّهُ : باب تفعل -এর মাসদার। অর্থ– অভিমুখী হওয়া। اِعْتِرَاضٌ : আপত্তি।

قَوْلُهُ اَلسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : এখানে اَلنَّاسُ দ্বারা ইহুদি ও মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

مِنَ النَّاسِ : এটি سُفَهَاء থেকে حَال হওয়ায় তার مَحَلِّ اِعْرَاب হলো নসব। আমেল হলো سَيَقُوْلُ; এই حَال টির নাম حَال مُبَيِّنَة অর্থাৎ অন্যদের থেকে পৃথক করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা سَفَاهَت বা নির্বুদ্ধিতা ও বেকুবি মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী এমনকি বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ مَا وَلّٰهُمْ : مَا হলো اِسْتِفْهَامِيَه এবং مُبْتَدَأ আর وَلّٰهُمْ হলো খবর।

قَوْلُهُ قِبْلَةً : যেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা হয়। পরবর্তীতে সালাতের জন্যে অভিমুখকৃত সম্মুখবর্তী স্থানের নাম কিবলা হয়ে গিয়েছে। –[রাগিব]

قَوْلُهُ لِلّٰهِ : এর لِ অব্যয় মালিকানা ও কর্তৃত্ববোধক। মাশরিক ও মাগরিব তথা পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর মালিকানা। তাঁর সৃষ্ট ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির ন্যায় তাঁরই অনুগত আজ্ঞাবহ।

اُمَّةٌ : এর বহুবচন اُمَمٌ অর্থ– উম্মত, জাতি। وَسَطٌ : মধ্যপন্থি, মধ্যবর্তী। خَيْرٌ: خِيَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ– শ্রেষ্ঠ।

عُدُوْلٌ : ন্যায়পন্থি। شُهَدَاءُ : شَهِيْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সাক্ষী। شَهِدَ (س) شَهَادَةً অর্থ– সাক্ষ্য দেওয়া।

بَلَّغْتُمُوْهُمْ : بلغ (تفعيل) تبليغا অর্থ– প্রচার করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ **কিবলা পরিবর্তন ও অমুসলিমদের আপত্তি :** বনী ইসরাঈলের নবীগণের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও মক্কায় অবস্থানকালে সেদিকে ফিরে সালাত আদায়ের নিয়ম পালন করেন। [অর্থাৎ সালাতে এমনভাবে দাঁড়াতেন, যাতে কা'বা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস সামনের দিকে থাকে।] এমনকি মদিনায় হিজরত করার পরেও এ কিবলা অপরিবর্তিত রাখলেন। কা'বাকে সামনে রাখা আর সম্ভব হয়নি। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস [মক্কা ও] মদিনার উত্তর দিকে অবিস্থত। এ বক্তব্য তখন প্রযোজ্য হবে যখন কিবলা পরিবর্তন দুবার সাব্যস্ত হবে। আর কিবলা পরিবর্তন একবার সাব্যস্ত হলে এভাবে বলতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে এই কা'বার প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের পর ইহুদিগণের হৃদয় জয়করণার্থে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ষোলো বা সতের মাস তিনি ঐদিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন।

http://islamiboi.wordpress.com

মহানবী ﷺ -এর হৃদয়ে বারবার এ বাসনার উদ্রেক হতো যে, যদি মহান পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মিত কা'বাকে কিবলা বানাবার ইলাহী হুকুম পেয়ে যেতেন। এ মর্মে ওহীপ্রাপ্তির আশায় তিনি বারবার আকাশ পানে দৃষ্টি মেলে তাকাতেনও। অবশেষে মদিনায় আগমনের ১৬ বা ১৭ মাস পরে এ মর্মে হুকুম পাওয়া গেল যে, এখন থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে হবে। নাজিল হলো– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ; অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালিত হলো। কা'বা ঘর মদিনা থেকে সোজা দক্ষিণে অবস্থিত, ফলে মদিনায় সালাত আদায়কারীদের অভিমুখ এক মুহূর্তে উত্তর থেকে একেবারে দক্ষিণে ফিরে গেল।

অমুসলিমদের আপত্তি : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল ইহুদিদের কিবলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখেই এ কিবলা রহিত হওয়ার ঘোষণা ইহুদিদের খুবই অপছন্দ হলো। এমনিতেও তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাদের শত্রু ও তাদের ধর্মের বিনাশ সাধনকারী মনে করতে শুরু করেছিল। কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত এ ঘোষণাকে তারা ঐ ধারার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ মনে করে বসল এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন ও বিরূপ সমালোচনা করতে লাগল। কেউ বলল, তিনি ইহুদিদের সাথে বিদ্বেষবশত এরূপ করেছেন। কেউ বলল, তিনি নিজের দীন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও পেরেশান আছেন, সে কারণে তার নবী হওয়ার বিষয়টি পরিস্ফুট হচ্ছে না। ধর্মবিমুখ ও মুনাফিকদের কিছু লোকও তাদের সহযোগী হলো। এদের প্ররোচনায় পড়ে কিছু সংখ্যক নওমুসলিমের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের এসব মন্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর রাসূলকে অবহিত করে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী আয়াতে এর জবাবও জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে কোনো সংশয় বাকি না থাকে এবং উত্তর প্রদানেরও চিন্তা করতে না হয়। –[তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

سَيَقُوْلُ : একটি উক্তি মতে যেহেতু আয়াতটি কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত অধ্যাদেশের পূর্বে নয়, বরং পরেই নাজিল হয়েছিল, তাই মুফাসসিরগণের একদল এখানে অতীতকাল উদ্দেশ্য হওয়ার অভিমত গ্রহণ করেছেন। [বাংলা] ব্যবহারে যেরূপ কোনো বিগত ঘটনা সম্পর্কে এভাবে বলা হয়, আমরা তো জানতামই, এরা এ বিষয়ে অবশ্যই প্রশ্ন ও সমালোচনা করবে।

এ অভিমতের প্রায় অনুরূপ আরেকটি অভিমত হলো, কটাক্ষ ও বিরূপ সমালোচনার অবিরাম ধারা বুঝাবার জন্যে এখানে অতীতকালীন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ লোকেরা বরাবর এরূপ বলতে থাকছে। ক্রিয়াটির বিরতিহীনতা ও ঘটমান হওয়া বুঝাবার উদ্দেশ্যে অতীত ক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ ক্রিয়ারূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তবে জমহূরের মতে, ক্রিয়াটি তার বাহ্যরূপ ভবিষ্যতের অর্থেই অবিকল প্রযোজ্য এবং আয়াতটি কিবলা পরিবর্তনের হুকুম হওয়ার আগে [ভবিষ্যদ্বাণীরূপে] নাজিল হয়েছিল। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নবী ﷺ -কে এ সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের মুখ থেকে এ উক্তি প্রকাশ পাবে। মুফাসসির (র.) وَالْإِتْيَانُ بِالسِّيْنِ বলে এ মতেরই সমর্থন করেছেন।

قَوْلُهُ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে সমালোচকদের জবাবে বলা হচ্ছে বলে দিন, কোনো বিশেষ দিক বা প্রান্তে কোনো পবিত্রতা-মাহাত্ম্য নেই। আল্লাহর জন্যে সব দিকই সমতুল্য। তিনি যেদিকে মর্জি এবং যে বস্তুকে ইচ্ছা সালাতের [কিবলা] অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। আরও বলে দিন, আমরা না ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষে আর না সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি কিংবা নিজ খেয়াল-খুশির বশে কিবলা পরিবর্তন করেছি; বরং আমরা তা করেছি কেবল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে এবং সেটাই দীনের মূলকথা। প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করার নির্দেশ ছিল, আমরা তা শিরোধার্য করে নিয়েছি। এখন কা'বার দিকে ফিরতে আদেশ করা হয়েছে, এটাও আমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছি। আমাদের নিকট এর হেতু জিজ্ঞাসা করা বা এ সম্পর্কে আপত্তি তোলা শুধু নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক । সুতরাং এ বিষয়টি মূলত কোনো প্রশ্ন হওয়ারই উপযোগিতা রাখে না। –[তাফসীরে উসমানী]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব : وَسَطًا এ শব্দটি আরবি ভাষায় বিশেষ প্রশংসা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। আরবদের ভাষায় وَسَطٌ -এর অর্থ اَلْخِيَارُ তথা শ্রেষ্ঠ, সর্বোকৃষ্ট। শব্দটির অর্থ– মধ্যবর্তী এবং বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ির

http://islamiboi.wordpress.com

অতিশয়তা [অর্থাৎ গোঁড়ামি ও ঢিলামি] -এর মধ্যবর্তী সুষম ও সুসমন্বয় উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্থে রূপক ব্যবহার করা হয়েছে [বায়যাবী]। হাদীস শরীফেও وَسَطًا -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে عَدْلًا -সঙ্গত ও ন্যায়ানুগ দ্বারা। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে أُمَّةً وَسَطًا -এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে عَدْلًا দ্বারা। অভিধানবিদদের সূত্রেও অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত হওয়ার প্রমাণ : এখানে আলোচনা হওয়া দরকার যে, বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে উম্মতে মুহাম্মদী ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত হওয়ার প্রমাণ কি? এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

বিশ্বাসের ভারসাম্য : সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গাম্বরগণকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাঁদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন এক আয়াতে রয়েছে– "ইহুদিরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলেছে মসীহ আল্লাহর পুত্র।" অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গাম্বরের উপর্যুপরি মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গাম্বর যখন তাদেরকে কোনো ন্যায়যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছে- "আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।" আবার কোথাও পয়গাম্বরগণকে স্বয়ং তাঁদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জানমাল, সন্তানসন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রাসূলকে রাসূল এবং আল্লাহকে আল্লাহই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তারা আল্লাহর দাস ও রাসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে।

কর্ম ও ইবাদতের ভারসাম্য : বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও ইবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরিয়তের বিধিবিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ উৎকোচ নিয়ে আসমানি গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং ইবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, যারা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত হালাল নিয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই ছওয়াব ও ইবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদী একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধিবিধানের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বৈরিতা নেই এবং ধর্ম কেবল মসজিদ ও খানাকায় আবদ্ধ থাকার জন্যে আসেনি; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহির মাঝে ফকিরি এবং ফকিরির মাঝে বাদশাহি শিক্ষা দিয়েছেন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য : এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরোয়াও করেনি; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোনো কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ন, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হতো না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকামাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হতো। জীবহত্যাকে তো দস্তরমতো মহাপাপ বলে সব্যস্ত করা হতো। আল্লাহর হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হতো অন্যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়– যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য : এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধনসম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। এতে ব্যক্তিমালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধনসম্পদের উপাসনা, ধনসম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্যে যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরিয়ত এ ক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামি শরিয়ত একদিকে ধনসম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোনো পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি; অপরদিকে সম্পদ বণ্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোনো মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াকফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফী (র.) থেকে সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ **উম্মতে মুহাম্মদীর কিয়ামতের ময়দানে সাক্ষ্য প্রদান :** আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, সকল পয়গাম্বরের পূর্বেকার উম্মতগণের মধ্যে যারা কাফির তারা যখন তাদের নবীগণের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে– দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোনো আসমানি গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোনো পয়গাম্বরও আমাদের হেদায়েত করেননি তখন উম্মতে মুহাম্মদী পয়গাম্বরগণের পক্ষে সক্ষ্যদাতা হিসেবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গাম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে তাঁরা সাধ্যমতো চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে– আমাদের আমলে তো এ সম্প্রদায়ের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়, কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে– নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত তথ্যাবলি একজন সত্যবাদী রাসূল ও আল্লাহর গ্রন্থ কুরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলিকে চাক্ষুষ দেখার চেয়েও অধিক সত্য মনে করি; তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থাপিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন– তারা যা কিছু বলেছে, সবই সত্য। আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফী (র.) ও তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

وَمَا جَعَلْنَا صَيَّرْنَا الْقِبْلَةَ لَكَ الْآنَ الْجِهَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَوَّلًا وَهِيَ الْكَعْبَةُ وَكَانَ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهَا فَلَمَّا هَاجَرَ أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ تَأَلُّفًا لِلْيَهُوْدِ فَصَلَّى إِلَيْهِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ حُوِّلَ إِلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ فَيُصَدِّقُهُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ أَيْ يَرْجِعُ إِلَى الْكُفْرِ شَكًّا فِي الدِّيْنِ وَظَنًّا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَقَدِ ارْتَدَّ لِذٰلِكَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ أَيْ وَإِنَّهَا كَانَتْ أَيِ التَّوْلِيَةُ إِلَيْهَا لَكَبِيْرَةً شَاقَّةً عَلَى النَّاسِ إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ أَيْ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَلْ يُثِيْبُكُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا السُّؤَالُ عَمَّنْ مَاتَ قَبْلَ التَّحْوِيْلِ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَرَءُوْفٌ رَحِيْمٌ فِي عَدَمِ إِضَاعَةِ أَعْمَالِهِمْ وَالرَّأْفَةُ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ وَقُدِّمَ الْأَبْلَغُ لِلْفَاصِلَةِ.

অনুবাদ : তুমি প্রথমে যে কিবলা অনুসরণ করছিলে অর্থাৎ কা'বা শরীফ। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পূর্বে এই কা'বার প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের পর ইহুদিগণের হৃদয় জয়ার্থে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে ষোলো বা সতের মাস তিনি ঐদিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। পরে তা পরিবর্তন করে নতুন নির্দেশ জারি করেন।

বর্তমানেও সেই দিককেই তোমার জন্যে কেবল এ উদ্দেশ্যই কিবলা বানিয়েছি, যাতে প্রকাশ্যভাবে জানতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে অনন্তর তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং কে পিছনে ফিরে যায়? অর্থাৎ ইসলামের প্রতি সন্দেহ প্রবণ হয়ে এবং নবী করীম ﷺ নিজেই নিজের বিষয়ে বিভ্রান্ত– এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কে কুফরির দিকে ফিরে যায়? কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশের দরুন তখন একদল লোক মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, ইসলাম হতে ফিরে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আল্লাহ যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতীত অপরের নিকট তা অর্থাৎ তার দিকে মুখ ফিরানো নিশ্চয় কঠিন। মানুষের জন্যে এটা পালন করা কষ্টকর।

আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে আদায়কৃত তোমাদের সালাতকে বিফল করবেন। বরং তিনি তারও পুণ্যফল দান করবেন। যারা কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশের পূর্বে মারা গিয়েছিল তাদের সালাত কি হবে? এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও তাদের পুণ্য কাজসমূহ বিনষ্ট না করার বিষয়ে পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

جَعَلْنَا : অর্থ– বানিয়েছি, পরিণত করেছি। تَأَلُّفًا : হৃদয় জয় করার জন্য حُوِّلَ : تَحْوِيْلًا . حَوَّلَ অর্থ– পরিবর্তন করা হয়। يَنْقَلِبُ : (افعال) اِنْقَلَبَ অর্থ– ফিরে যাওয়া عَقِبَيْهِ : عَقِبٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ– পশ্চাৎ, পায়েরগোড়ালি। اَلتَّوْلِيَةُ : অভিমুখী হওয়া। شَاقَّةٌ : কষ্টকর। يُضِيْعُ : اِضَاعَةً . اَضَاعَ নষ্ট করা। يُثِيْبُكُمْ : اِثَابَةً (افعال) اَثَابَ অর্থ– ছওয়াব দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া।

http://islamiboi.wordpress.com

وَاِنْ كَانَتْ -এর اِنْ শব্দটি এই স্থলে مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ অর্থাৎ তাশদীদ সংবলিত রূপ হতে পরিবর্তন হয়ে তাশদীদহীন লঘুরূপে ব্যবহৃত। তার اِسْم এই স্থানে উহ্য। মূলত তার রূপ ছিল- اِنَّهُ

اَلرَّأْفَةُ : অর্থ- অতি দয়া। رَحْمَة শব্দের তুলনায় তাতে অর্থের مُبَالَغَة বা আধিক্য বেশি থাকা সত্ত্বেও এ স্থানে رَءُوْفٌ অর্থাৎ আয়াতসমূহের অন্ত্যমিল রক্ষার খাতিরে তাকে অগ্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا : আয়াতের মূলরূপ হলো- اِلَّا لِنَعْلَمَ ... جَعَلْنَا قِبْلَتَكَ الْاٰنَ قِبْلَةً لَكَ ثَانِيَةً অর্থাৎ আপনার প্রথম কিবলাকে আপনার জন্যে দ্বিতীয়বার কিবলা বানিয়েছি......।

قَوْلُهُ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ কিবলা পরিবর্তনের কারণ : এ আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! প্রথম হতেই আপনার জন্যে কা'বা ঘর কিবলারূপে নির্দিষ্ট ছিল মাঝখানে কিছুকালের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানিয়ে দেওয়া হয়। এটা সকলেরই জানা যে, পরীক্ষা এমন বিষয়েই হয়ে থাকে, যেটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, কা'বার পরিবর্তে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্ধারণ করাটা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে এ কারণে যে, তারা অধিকাংশই ছিল আরব এবং কুরাইশ। তারা কা'বার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিল। এই কিবলা পরিবর্তনের কারণে তাদেরকে নিজেদের বিশ্বাস ও অভ্যাসের বিপরীত করতে হয়। কিন্তু এখানে বুঝার ব্যাপার হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাঝে সমস্ত নবী-রাসূলের মহত্ত্ব ও গুণাবলি একীভূত হয়েছে। তাঁর রিসালত সমগ্র বিশ্ব ও সমস্ত উম্মতের জন্যে ব্যাপক, তাই একবার বাইতুল মুকাদ্দাসকেও কিবলার মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ اِلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ :

প্রশ্ন: এ আয়াতে ব্যবহৃত نَعْلَمَ ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে প্রযুক্ত حَتّٰى نَعْلَمَ اللّٰهُ ـ اِلَّا لِنَعْلَمَ ـ لَمَّا يَعْلَمِ ـ فَلَيَعْلَمَنَّ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বাহ্যত এরূপ বোঝা যায় যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে জানতে পেরেছেন, এগুলোর অস্তিত্বের পূর্বে তিনি এ সম্পর্কে জানতেন না। [নাউযুবিল্লাহ] অথচ যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অনাদি। كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا -আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ

উত্তর: ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে এর জবাব দিয়েছে-

১. এখানে عِلْم অর্থ- পরিচিতি লাভ ও সনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ অর্থাৎ যাতে তার দীনের উপর আস্থাবানেরা দীন প্রত্যাখ্যানকারী ও নড়বড়েদের থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক হয়ে যায়।
আল্লাহর ইলম সর্বব্যাপী ও সামগ্রিক। যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেও আল্লাহর স্বকীয় সামগ্রিক ইলমের আওতাভুক্ত। কিন্তু বাহ্য জগতে তা সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে ঘটনা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। পবিত্র কুরআনে যত স্থানে এ জেনে নেওয়া ধরনের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্য জাগতিক ও বাস্তব সংঘটন জ্ঞান, জাগতিক অবগতি নয়। এজন্যই মুসান্নিফ (র.) اِلَّا لِنَعْلَمَ -এর পরে عِلْمَ ظُهُوْرٍ উল্লেখ করেছেন।
২. কেউ এর অর্থ করেছেন- পরীক্ষাকরণ।
৩. কেউ বলেন, এসব জায়গায় ভবিষ্যৎ ক্রিয়া অতীত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত।
৪. কেউ বলেন, এখানে مُضَاف উহ্য রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর জানা বলতে রাসূল ﷺ ও মু'মিনদের জানা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যাতে আমার রাসূল ও মু'মিনগণ জানতে পারে ...।

-[তাফসীরে উসমানী, মাজেদী ও মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) ১/২৪০]

عَقِبَيْنِ عَقِبٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ- পায়ের গোড়ালি। এখানে اِنْقِلَابُ عَقِبَيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য- হক থেকে বাতিলের দিকে [illegible] মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

কিবলা পরিবর্তনের ইতিহাস : কিবলা পরিবর্তনের বিধান দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে নাজিল হয়েছে। ইবনে সা'দের [illegible] রয়েছে, নবী করীম ﷺ বিশর ইবনে বারা ইবনে মা'রূর (রা.) -এর বাড়িতে মেহমান হয়েছিলেন। সেখানে [illegible] জোহরের সময় হয়ে যায়। নবী করীম ﷺ সকলকে নিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যান। দু রাকাত পড়েছেন; তৃতীয় [illegible] রাকাতে হঠাৎ এ আয়াত নাজিল হয়। তৎক্ষণাৎ সকলে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিক হতে কা'বার দিকে ফিরে [illegible] ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন, কোনো এক স্থানে

http://islamiboi.wordpress.com

ঘোষণা এ অবস্থায় পৌছেছে যে, মুসল্লিগণ রুকূ অবস্থায় ছিলেন। নির্দেশ শ্রবণের সাথে সাথে সকলে সে অবস্থায়ই কা'বার দিকে ফিরে যান। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, বনূ সালিমার মসজিদে উক্ত ঘোষণা দ্বিতীয় দিন ফজরের সময় পৌছে। মুসল্লিগণ এক রাকাত পড়ে ফেলেছিলেন। এমতাবস্থায় ঘোষণা দেওয়া হলো যে, কিবলা পরিবর্তন করে কা'বার দিকে করা হয়েছে। ঘোষণা শ্রবণমাত্রই সকলে তাদের দিক ফিরিয়ে নেয়। –[জামালাইন : ২৩৮]

এখানে স্মর্তব্য যে, বাইতুল মুকাদ্দাস মদিনা হতে একেবারে উত্তরে অবস্থিত, আর কা'বা সম্পূর্ণ দক্ষিণে। জামাতসহকারে নামাজ পড়া অবস্থায় কিবলার দিক পরিবর্তন নিঃসন্দেহে ইমাম সাহেবকে মুক্তদীদের পিছনে আসতে হয়েছে এবং মুক্তাদীদেরকেও সমান্য নড়াচড়া করে কাতার সোজা করতে হয়েছে।

কিবলামুখী হওয়ার তাৎপর্য : প্রত্যেক ইবাদতে মু'মিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকেই থাকে। আল্লাহ পবিত্র; পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত; তিনি কোনো বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোনো ইবাদতকারী ব্যক্তি যদি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থি হতো না। কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত ইবাদতকারীর মুখ একদিকে করা হয়েছে। তা হলো, নামাজে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্য পদ্ধতি। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর মীমংসা মানুষের হতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতনৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। এ কারণে এর মীমংসা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াই বিধেয়।

–[মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপিত]

قَوْلُهُ اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ : বিদ্বান মনীষীবর্গের কেউ কেউ এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি উদ্ঘাটন করেছেন যে, কিবলা অনুসারী সকলেই নিম্নতম পর্যায়ে হেদায়েতের পথে রয়েছে। কিবলাতে অবিচল থাকা একটা সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সমতুল্য। এ আয়াত কিবলা বিশ্বাসীদের কাফির সাব্যস্ত না করার একটি ভিত্তি স্থির হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ শানে নুযূল : ইহুদিদের অপপ্রচারের কারণে কিংবা নিজে নিজেই কোনো কোনো মুসলমানের মনে এরূপ দ্বিধা দেখা দিয়েছিল যে, আসল কিবলা যেহেতু কা'বা শরীফ এবং বায়তুল মুকাদ্দাস সাময়িক কিবলা ছিল। সুতরাং সেদিকে যত সালাত আদায় করা হয়েছে, তা তো বেকার হয়ে গিয়েছে এবং যে সকল মুসলমান এ নতুন বিধানের আগে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের তো সমূহ ক্ষতি হয়ে গেল। তাদেরকেই জবাব দেওয়া হচ্ছে যে, এ আবার কোন ধরনের দ্বিধা। ছওয়াব তো পাবে আদেশ পালনকারীরা, তাতে কিবলা যেটাই হোক না কেন। যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেছেন, তারাও তো সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুমই পালন করেছেন। সুতরাং তাদের প্রতিদান পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণই সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِيْمَانَكُمْ اَىْ صَلَاتَكُمْ : এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেওয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কিবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না। কোনো কোনো হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামাজ। যেমনটি মুফাসসির (র.)ও করেছেন। তার মর্মার্থ হলো, সাবেক কিবলা বায়তুলমুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব নামাজ পড়া হয়েছে, আল্লাহ সেগুলো নষ্ট করবেন না; বরং তা শুদ্ধ ও কবুল হয়েছে। –[মা'আরিফ]

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ : অন্যান্য বিধিবিধানের ন্যায় কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত এ হুকুমটি পরিপূর্ণরূপে তাঁর স্নেহশীলতা, দয়ার্দ্রতা, মহানুভবতা ও মায়ামমতারই পরিচায়ক।

قَوْلُهُ وَقَدَّمَ الْاَبْلَغَ لِلْفَاصِلَةِ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন: সাধারণ রীতি হলো, নীচের থেকে উপরের দিকে উন্নতি ঘটে, এর বিপরীত নয়। যেমন বলা হয়- عَالِمٌ نَحْرِيْرٌ পক্ষান্তরে نَحْرِيْرٌ عَالِمٌ বলা হয় না। এ রীতি অনুযায়ী رَحِيْمٌ رَءُوْفٌ বলা উচিত ছিল।

উত্তর: فَاصِلَةٌ তথা আয়াতের অন্ত্যমিলের প্রতি লক্ষ্য করে এমনটি করা হয়েছে। কেননা পূর্বের আয়াতের শেষে এ ওজনের শব্দ রয়েছে। যদিও رَحِيْمٌ-এর তুলনায় رَءُوْفٌ-এর মধ্যে রহমত অতিমাত্রায় রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

١٤٤. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ نَرٰى تَقَلُّبَ تَصَرُّفَ وَجْهِكَ فِى جِهَةِ السَّمَاءِ مُتَطَلِّعًا اِلَى الْوَحْيِ وَمُتَشَوِّقًا لِلْاَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يَوَدُّ ذٰلِكَ لِاَنَّهَا قِبْلَةُ اِبْرٰهِيْمَ وَلِاَنَّهُ اَدْعٰى اِلٰى اِسْلَامِ الْعَرَبِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ نُحَوِّلَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا تُحِبُّهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ اِسْتَقْبِلْ فِى الصَّلٰوةِ شَطْرَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىِ الْكَعْبَةِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ خِطَابٌ لِلْاُمَّةِ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فِى الصَّلٰوةِ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَىِ التَّوَلِّىَ الْكَعْبَةَ الْحَقُّ الثَّابِتُ مِنْ رَّبِّهِمْ لِمَا فِىْ كُتُبِهِمْ مِّنْ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَنَّهُ يَتَحَوَّلُ اِلَيْهَا وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ اِمْتِثَالِ اَمْرِهٖ وَبِالْيَاءِ اَىِ الْيَهُوْدُ مِنْ اِنْكَارِ اَمْرِ الْقِبْلَةِ.

অনুবাদ :

১৪৪. ওহীর প্রত্যাশায় এবং কা'বার দিকে ফিরবার নির্দেশপ্রাপ্তির আগ্রহে আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানো আমি লক্ষ্য করেছি। এ স্থানে قَدْ শব্দটি تَحْقِيْق অর্থাৎ বক্তব্যটি সুসাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তারই তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন এজন্য যে, এটা অর্থাৎ কা'বা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা। দ্বিতীয়ত হযরত ﷺ-এর আহ্বান ছিল আরবের ইসলামের দিকেই। [আরবের কিবলা ছিল এই কা'বা।] সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে মুখ করিয়ে দিচ্ছি ফিরিয়ে দিচ্ছি [যা তুমি পছন্দ কর] ভালোবাস। অতএব তুমি মাসজিদুল হারামের অর্থাৎ কা'বার প্রতিই দিকেই তোমার মুখ ফিরাও অর্থাৎ সালাতের সময় ঐদিককেই তোমার কিবলা বানাও। তোমরা এ স্থানে উম্মতকে সম্বোধন করা হচ্ছে, যেখানেই থাক না কেন সালাতের সময় তার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে এটা] অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ ফিরানো তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়। কেননা তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিবরণে আছে যে, এই দিকে তাঁর কিবলা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি যদি ت সহ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচনরূপে গঠিত হয় তবে তার অর্থ হবে- হে মু'মিনগণ! তোমরা তাঁর নির্দেশ পালনার্থে যা কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন। আর যদি ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ বহুবচনরূপে গঠিত হয় তবে তার অর্থ হবে- কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি অস্বীকার করে ইহুদিগণ যা করছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।

তাহকীক ও তারকীব

لِلتَّحْقِيْقِ : বক্তব্য সুসাব্যস্ত করার জন্য। تَقَلُّبَ : বারবার তাকানো। مُتَطَلِّعٌ : প্রত্যাশী। مُتَشَوِّقٌ : আগ্রহী। كَانَ يَوَدُّ : কামনা করতেন, আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। اَدْعٰى : অধিক আহ্বানকারী। نُوَلِّيَنَّكَ : মুখ করিয়ে দিচ্ছি; تَوْلِيَه মাসদার। نُوَلِّيَنَّكَ : মুযারের সীগাহ। অর্থ- অভিমুখি করিয়ে দিচ্ছি। আর كَاف হলো মাফউলের যমীর। شَطْرٌ : অর্ধেক; شَطَرْتُ الشَّيْئَ জিনিসটি দ্বিখণ্ডিত করেছি। اَحْلُبُ حَلْبًا لَكَ شَطْرَهٗ আমি দুগ্ধ দোহন করব, তার অর্ধেক তোমার। نَحْوَ : প্রতি, দিকে। اَلثَّابِتُ : সুপ্রতিষ্ঠিত। نَعْتٌ : এর বহুবচন نُعُوْتٌ অর্থ- গুণ, বিবরণ। اِمْتِثَالٌ : পালন করা, আদায় করা।

http://islamiboi.wordpress.com

قَدْ نَرٰى : শব্দটি مُضَارِعْ বা বর্তমান জ্ঞাপক হলেও অতীত অর্থ সম্পন্ন। এরূপ ব্যবহারে এদিকেও ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, আপনি অস্থির ও বিচলিত হচ্ছেন কেন? আমরা তো আপনার অন্তরের টান ভালো করেই দেখে নিয়েছি। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূর্ণাঙ্গ সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

فِى السَّمَاءِ : এর فِىْ [মধ্যে, তে] অব্যয়টি اِلٰى [দিকে, প্রতি] অর্থে। فِىْ جِهَةِ السَّمَاءِ نَحْوَ السَّمَاءِ وَقِبَلَهَا আসমানের দিকে।

نُوَلِّيَنَّكَ : মুযারের সীগাহ, মাসদার تَوْلِيَةً আর كاف হলো মাফঊলের যমীর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ نَرٰى الخ **ওহীর অপেক্ষায় নবীজি ﷺ বারবার আকাশপানে তাকাতেন :** কা'বাই যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকৃত কিবলা এবং তাঁর মর্যাদা ও বিশেষত্বের উপযোগী ছিল, সেই সঙ্গে এটা ছিল সকল কিবলার সেরা এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এরও অনুসৃত কিবলা অন্য দিকে ইহুদিরা আপত্তি করত যে, এই নবী শরিয়তে আমাদের বিরোধী ও ইবরাহীম ধর্মাদর্শের অনুসারী হয়ে আমাদের কিবলা কেন অবলম্বন করছে? অপর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও যথার্থ ধর্মীয় আবেগের অধীনে বিশ্বাস করতেন যে, এখন যেহেতু ইমামত ও ধর্মীয় নেতৃত্ব ইহুদিদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, সুতরাং তাদের কিবলা আর [পরবর্তী] উম্মতের কিবলারূপে থাকতে পারে না, তাই বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায়কালেও তাঁর আন্তরিক কামনা ছিল, কিবলা পরিবর্তনের হুকুম এসে যাক। এই আগ্রহে ওহীবাহক ফেরেশতার প্রতীক্ষায় বারবার তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্থিত হতে থাকত। আয়াতে এ অবস্থাটিরই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ যদিও কখনো কোনো দিক-প্রান্তে সীমাবদ্ধ নন, কোনো স্থানে অবরুদ্ধ নন; তবুও বিশেষ তাজাল্লীকে আল কুরআনে আসমানের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়েছে। এজন্যই তত্ত্ববিদগণ লিখেছেন যে, দোয়া ও বিপদকালে আসমানের দিকে মুখ তুলে তাকানো দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম নির্দশন ও উপায়; বরং ঊর্ধ্বে জাগতিক এ সম্বন্ধ বিশ্বাসের পূর্ণতা ও আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। -[তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا **কা'বা কিবলা হোক- এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর আগ্রহের কারণ :** নবী করীম ﷺ বিভিন্ন কারণে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন এবং পছন্দ করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বাকে তাঁর জন্যে কিবলা নির্দিষ্ট করে দিন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে-

১. ইহুদিদের থেকে তাঁর কিবলা স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হওয়া।
২. মহানবী ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দীনে ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কুরআনও তাঁর শরিয়তকে দীনে ইবরাহীমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কিবলাও কা'বাই ছিল।
৩. তাতে আরবের লোকদেরকে ঈমানের দিকে নিয়ে আসা অধিক সহজ ছিল। কেননা আরবের গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দীনে ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তাঁর অনুসারী বলে দাবি করত।
৪. সাবেক কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস দ্বারা আহলে কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোলো / সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ মদিনার ইহুদিরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি শফী (র.) ও আহকামুল কুরআন থেকে সংক্ষপিত]

قَوْلُهُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ **মাসজিদুল হারামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :** মর্যাদা ও অভিজাত্য সম্পন্ন মসজিদ দ্বারা মক্কা শরীফের সে মসজিদ উদ্দেশ্য, যার অভ্যন্তরে রয়েছে কা'বা ঘর। কা'বা ঘর অতি সংক্ষিপ্ত পরিধির একখানা পাকা ঘরের নাম। মাসজিদুল হারাম বা হেরেম শরীফের বর্তমান ইমারত কাঠামোর প্রথম অংশ আব্বাসী খলিফা মাহদীর যুগের। পরবর্তী খলিফা ও সুলতানগণ বারবার তা সম্প্রসারিত করতে থাকেন। তুর্কি সুলতানের ভূমিকা এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান [অর্থাৎ সউদী শাসকের সম্প্রসারণের পূর্বেকার] রূপ কাঠামো সুলতান দ্বিতীয় সেলীম [মৃত্যু ১৫৭৭ খ্রি.] -এর শাসনামল হতে প্রায় অব্যাহত রয়েছে। এর খোলা চত্বরের পরিধি ৬০০ ফুট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চারদিকের একাধিক বিশালায়তন ও প্রশস্ত ইমারতরাজি এ হিসাবের অতিরিক্ত। প্রবেশ ফটকের [বাব] সংখ্যা একচল্লিশ এবং মিনারের সংখ্যা ছয়। আর ছোটবড় গম্বুজের সংখ্যা ১৫০-এর অধিক। অন্য একটি বর্ণনামতে উত্তর-পশ্চিম দিককার প্রশস্ততা ৫৪৫ ফুট, দক্ষিণ-পূর্ব দিককার ৫৫৩ ফুট, উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে ৩৬০ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৩২৪ ফুট।

-[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ : شَطْرَ দ্বারা মাসজিদুল হারাম -এর প্রান্ত দিকে উদ্দেশ্য, সরাসরি কা'বা শরীফের সম্মুখ বরাবরে নয়। কেননা দূরবর্তী অঞ্চলে এরূপ হুকুম পালন করা সম্ভব নয়। ফকীহগণ লিখেছেন– সালাতে যে কিবলামুখী হওয়া ফরজ করা হয়েছে তা সিনার জন্যে, মুখমণ্ডলের জন্যে তা শুধু সুন্নত। সালাত হতে বের হয়ে আসা শুধু তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন মুখমণ্ডলের সাথে বুকও কা'বার দিক হতে ফিরে যাবে। শুধু ঘাড় ঘুরে গেলেই সালাত বাতিল হয় না। –[তাফসীরে মাজেদী]

মসজিদে হারাম বলার কারণ : কা'বার চতুর্দিকে অবস্থিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলার কারণ হলো, সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ করা, পশুপাখি শিকার করা, তৃণাদি কাটা ইত্যাদি সব কিছু নিষিদ্ধ। মাসজিদুল হারামের ন্যায় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আর অন্য কোনো মসজিদের নেই।

কা'বা না বলে মাসজিদুল হারাম বলার তাৎপর্য ও একটি মাসআলা : মদিনাবাসী ও অন্যান্য এলাকার লোকদের জন্যে সরাসরি কা'বা ঘরের দিক নির্ণয় খুবই কঠিন ছিল। তাই উম্মতের জন্যে সহজ করার উদ্দেশ্যে তুলনামূলকভাবে একখানা বড় ইমারতের নাম নেওয়া হয়েছে [মাদারিক, বায়যাবী]। কিবলা রূপে কা'বা ঘরের দিকটি উদ্দেশ্য, সরাসরি কা'বা ঘর উদ্দেশ্য নয়। –[মাদারিক] ইমাম মালেক (র.)-এর এরূপ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মাসজিদুল হারাম সমগ্র বিশ্বের জন্যে কিবলা এবং কা'বা ঘর সে মসজিদের জন্যে কিবলা।

এখানে একটি ফিকহ-বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। আয়াতে কা'বা অথবা বায়তুল্লাহ বলার পরিবর্তে মসজিদে হারাম বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরি নয়, বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোনো স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাড়ানো জরুরি যাতে কা'বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোনো অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না। কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই, এ বিধান তাদের জন্যে নয়। তারা কা'বাগৃহ কিংবা মসজিদে হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : সংক্ষিপ্ত শব্দ إِلَى -এর পরিবর্তে شَطْرَ শব্দটি ব্যবহার করায় কিবলার দিকে মুখ করার বিষয়টি আরো সহজ হয়ে গেছে। شَطْر দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়– একটি অর্থ অর্ধেক। যেমন বলা হয়– شَطَرْتُ الشَّئَ 'জিনিসটিকে দ্বিখাণ্ডত করেছি।' আরবরা বলেন– اَحْلِبُ حَلْبًا لَكَ شَطْرُهُ 'আমি দুগ্ধ দোহন করব, তার অর্ধেক তোমার'। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো– দিক। এখানে এ দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণীয়। এখানে প্রথম অর্থটি গ্রহণীয় হতে পারে না। কেননা অর্ধেক মসজিদে হারামকে কিবলা বানানোর কোনো অর্থ হয় না। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ : [তোমরা যেখানেই থাক] এ থেকে ফকীহগণ এ বিধান আহরণ করেছেন যে, মানুষ যে স্থানে অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই তার সালাত বৈধ। সালাতের বিশুদ্ধতার জন্যে মসজিদ হওয়ার শর্ত নেই।

قَوْلُهُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ : অর্থাৎ আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে যা কিছু আপত্তি করে, তার কোনোই পরোয়া করবেন না। কারণ তারা নিজেদের কিতাব দ্বারাই এটা জানে যে, শেষ নবী কিছু দিনের জন্যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন এবং তারা এটা জানে যে, তাঁর আসল ও স্থায়ী কিবলা হবে ইবরাহীমী ধর্মাদর্শ অনুযায়ী। এ কারণে তারাও কিবলা পরিবর্তনকে সত্যই জানে। তারা যা কিছু বলে তার উৎস কেবল হিংসা-বিদ্বেষ। –[তাফসীরে উসমানী]

مِنْ رَّبِّهِمْ : এ কথাটি এ তথ্য আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কা'বাকে কিবলা বানানো পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহরই হুকুম, রাসূলুল্লাহ -এর ইজতিহাদ প্রসূত বিধান নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٥. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ عَلٰى صِدْقِكَ فِىْ اَمْرِ الْقِبْلَةِ مَّا تَبِعُوْا اَىْ لَا يَتَّبِعُوْنَ قِبْلَتَكَ عِنَادًا وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ قَطْعٌ لِطَمْعِهٖ فِىْ اِسْلَامِهِمْ وَطَمْعِهِمْ فِىْ عَوْدِهٖ اِلَيْهَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اَىِ الْيَهُوْدُ قِبْلَةَ النَّصٰرٰى وَبِالْعَكْسِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهَا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الْوَحْىِ اِنَّكَ اِذًا اِنِ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের নিকট কিবলা সম্পর্কে সত্যবাদিতার সকল দলিল নিয়ে আস তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না অর্থাৎ জেদবশত তার অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও। এ স্থানে لَئِنْ -এর لَام অক্ষরটি قَسَم বা শপথসূচক وَلَئِنْ اَتَيْتَ আয়াতটিতে তাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে অতি আগ্রহ ছিল এবং তিনি পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেই ফিরে আসবেন এ সম্পর্কে ইহুদিদের যে আশা ছিল, এ উভয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে। এবং তাদের কতক পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। অর্থাৎ ইহুদিগণ খ্রিস্টানদের এবং তার বিপরীত খ্রিস্টানগণ ইহুদিদের কিবলার অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান অর্থাৎ ওহী [আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির] যেদিকে তারা তোমাকে আহ্বান করছে তার অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তুমি তার অনুসরণ কর তবে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٤٦. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ اَىْ مُحَمَّدًا كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ بِنَعْتِهٖ فِىْ كُتُبِهِمْ قَالَ ابْنُ سَلَامٍ لَقَدْ عَرَفْتُهٗ حِيْنَ رَاَيْتُهٗ كَمَا اَعْرِفُ ابْنِىْ وَمَعْرِفَتِىْ لِمُحَمَّدٍ اَشَدُّ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ نَعْتَهٗ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিবরণের মাধ্যমে সেরূপ চিনে যেরূপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, তাঁকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি দেখা মাত্রই চিনে ফেলেছিলাম যেমন আমি আমার পুত্রকে চিনি। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এরপরিচয় আমার নিকট আরও সুবিদিত ছিল [বুখারী] এবং তাদের একদল জেনেশুনে সত্য অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বিবরণসমূহকে গোপন করে থাকে।

١٤٧. هٰذَا الَّذِىْ اَنْتَ عَلَيْهِ اَلْحَقُّ كَائِنًا مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ اَىْ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ فَهُوَ اَبْلَغُ مِنْ لَا تَمْتَرْ.

১৪৭. যে পথে তুমি রয়েছ তা সত্য مِنْ رَّبِّكَ এটা উহ্য كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি এ বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্তদের সন্দেহপোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। অর্থাৎ সন্দেহকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়ো না। لَا تَمْتَرْ [সন্দেহ করো না] রূপে এ বক্তব্যটি প্রকাশ করা অপেক্ষা আয়াতোক্ত বর্তমান রূপটিই [অর্থাৎ فَلَا تَكُوْنَنَّ] অধিক জোরালো ও مُبَالَغَة সম্পন্ন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

لَئِنْ اَتَيْتَ : যদি নিয়ে আসেন, পেশ করেন। اَتٰى يَاْتِى اِتْيَانًا নিয়ে আসা। اُوْتُوْا : اِتْيَانٌ মাসদার থেকে মাযী মাযহুলের সীগাহ। অর্থ– প্রদান করা হয়েছে। اٰيَةٌ : এর বহুবচন اٰيَاتٌ অর্থ– নিদর্শন, মু'জিযা। عِنَادٌ : বিদ্বেষ, হঠকারিতা।

قَطْعٌ : কর্তন করা। طَمْعٌ : লোভ, লালসা। عَدْ : ফিরে আসা। فَرْضًا : যদি ধরে নেওয়া হয়।

اٰتَيْنَا : [আমরা দান করেছি] (اِفْعَال) اِيْتَاءٌ অর্থ– প্রদান করা। حِيْنَ رَاَيْتَهٗ : যখন তাকে দেখেছি।

لَيَكْتُمُوْنَ : [তারা অবশ্যই গোপন করে] كَتَمَ (ن) كَتْمًا، كِتْمَانًا অর্থ– গোপন করা। اَلْمُمْتَرِيْنَ : مُمْتَرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সন্দেহকারী। اَلْاِمْتِرَاءُ : সন্দেহ করা। اِمْتَرٰى فِى الشَّيْءِ : شَكَّ فِيْهِ এ থেকেই مِرَاءٌ এবং مِرْيَةٌ - اَبْلَغُ : অধিক বালাগাতপূর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ **আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তন মানতে পারল না কেন?** আহলে কিতাব যখন কিবলা পরিবর্তনকে সত্য জেনেও কেবল হিংসা ও হঠকারিতাবশত সে সত্য গোপন করছে, তখন তাদের থেকে এই আশা করো না যে, তারা তোমাদের কিবলার অনুসরণ করবে। তারা তো এমনই হঠকারী যে, সম্ভাব্য সকল নিদর্শনও যদি তাদের দেখিয়ে দাও, তবুও তারা তোমাদের কিবলা স্বীকার করে নেবে না। তারা তো এ আশায় রয়েছে যে, কোনোক্রমে তোমাদেরকে নিজেদের অনুসারী বানিয়ে নিতে পারে কিনা। এজন্যই তারা বলত, তুমি যদি আমাদের কিবলায় স্থির থাকতে তাহলে বুঝতাম তুমিই প্রতিশ্রুত নবী, হয়তো পুনরায় আমাদের কিবলার দিকে ফিরে আসবে। বস্তুত এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও অবাস্তব লালসা। তুমি কখনোই তাদের কিবলার অনুসরণ করতে পার না। কিবলার বিধান এখন আর কিয়ামত পর্যন্ত কখনো রহিত হয়ে যাওয়ার নয়। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهٗ قَطْعٌ لِطَمْعِهِ فِىْ اِسْلَامِهِمْ وَطَمْعِهِمْ فِىْ عَوْدِهٖ اِلَيْهَا : মুসান্নিফ (র.) وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াতে ইহুদি-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কিবলার কোনো স্থিতি নেই; ইতঃপূর্বে তাদের কিবলা ছিল খানায়ে কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস হলো, আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে কা'বা হলো। আবারও হয়তো বাইতুল মুকাদ্দাসকেই কিবলা বানিয়ে নেবে।

قَوْلُهٗ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ : আহলে কিতাব অন্যদেরকে তাদের কিবলার অনুসারী বানানোর চেষ্টা কি আর করবে? তারাতো নিজেরাই আপসে কিবলার ব্যাপারে একমত নয়। ইহুদিদের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের গম্বুজ আর খ্রিস্টানরা কোনো স্থান বা ইমারতকে কিবলা স্থির না করলেও পূর্বদিককে কিবলা রূপে গ্রহণ করেছে, যেখানে হযরত ঈসা (আ). -এর রূহ ফুঁকা হয়েছিল। যখন তারা নিজেরাই একমত হতে পারছে না তখন তাদের এ পরস্পর বিরোধী কিবলায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে অনুসরণের আশা করাটাতো নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهٗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الخ : এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এভাবে সম্বোধন দ্বারা মূলত মুহাম্মদীকে অবহিত করা হচ্ছে যে, উল্লিখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং নবীও যদি এমনটি করেন [অবশ্য তা অসম্ভব], তবে তিনিও সীমালজ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

আহলে কিতাব কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি জেনেশুনেও মানল না : এ আয়াতে আলোচনা ছিল– হে রাসূল! আপনি হয়তো মনে করে থাকবেন যে, মুসলিমগণের জন্যে কা'বা ঘর কিবলা হওয়াকে আহলে কিতাব যদি কোনোভাবে স্বীকার করে নিত এবং অন্যদেরকে বিভ্রমে ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হতো, অহলে আপনি যে প্রতিশ্রুত নবী এতে কারো কোনো সন্দেহ থাকত না। তবে জেনে রাখুন! আপনার সম্পর্কে আহলে কিতাব সম্যক অবগত। আপনার বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান,

http://islamiboi.wordpress.com

আকৃতি-প্রকৃতি যাবতীয় অবস্থা তাদের ভালো করেই জানা। আপনার সর্বিক বৃত্তান্ত ও আপনি যে প্রতিশ্রুত নবী, এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিশ্চিত, যেমন সন্তানসন্ততি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নিশ্চত হয়ে থাকে, যে কারণে তারা তাদেরকে কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই চিনে ফেলে। কিন্তু ইহুদিরা কেউ কেউ এ বিষয়টি প্রকাশ করলেও অধিকাংশই জেনেশুনে গোপন করে রাখে। কিন্তু তারা গোপন করলে হবে কী, সত্য তো তা-ই যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আহলে কিতাব তা স্বীকার করুক আর নাই করুক– তাদের বিরোধিতার কারণে কোনো রকমের দ্বিধা করবেন না। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এরা যেমন কোনোরকম সন্দেহসংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় হলো, পূর্ণাঙ্গরূপে চেনার উদাহরণ পিতামাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তানসন্ততিকে চেনার সাথে দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবত পিতামাতাকেও ভালো করেই জানে। এভাবে উদাহরণ দেওয়ার কারণ হলো, পিতামাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতামাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে। কারণ, পিতামাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তানাদিকে নিজ হাতে লালনপালন করে। তাদের শরীরের এমন কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতামাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতামাতার গোপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনো দেখে না। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন] আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) -এর বর্ণনা মতে ইহুদিরা রাসূল ﷺ -কে নিজ সন্তানাদির চেয়েও বেশি চিনত। যেমন তিনি বলেছেন– لَقَدْ عَرَفْتُهُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ كَمَا اَعْرِفُ اِبْنِىْ وَمَعْرِفَتِىْ لِمُحَمَّدٍ اَشَدُّ

অর্থাৎ তাঁকে তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি দেখা মাত্রই চিনে ফেলেছিলাম যেমন আমি আমার পুত্রকে চিনি। বস্তুত তাঁর পরিচয় আমার নিকট আরও সুবিদিত ছিল। –[বুখারী]

قَوْلُهُ الْمُمْتَرِيْنَ : اِمْتِرَاءٌ থেকে ইসমে ফায়েল। অর্থ– সন্দেহে পতিত ব্যক্তি।

قَوْلُهُ اَبْلَغُ مِنْ لَا تَمْتَرْ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন: اِيْجَازٌ তথা সংক্ষিপ্তকরণের দাবি হিসেবে وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ না বলে সংক্ষেপে لَا تَمْتَرْ বলা উচিত ছিল, তা না করে দীর্ঘ ইবারতে ব্যক্ত করা হলো কেন?

উত্তর: এখানে اِطْنَابٌ তথা দীর্ঘায়িত করাটা অহেতুক নয়। কারণবশতই এমনটি করা হয়েছে। কেননা এরূপ বাকধারা সংক্ষেপণের চেয়ে অধিক মোবালাগাপূর্ণ।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٨. وَلِكُلٍّ مِنَ الْأُمَمِ وِّجْهَةٌ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا وَجْهَهُ فِىْ صَلَاتِهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بَادِرُوْا إِلَى الطَّاعَاتِ وَقُبُوْلِهَا أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

১৪৮. প্রত্যেক জাতিরই এক একটি দিক অর্থাৎ কিবলা রয়েছে যেদিকে সে সালাতে তার মুখ ফিরায় مُوَلِّيْهَا শব্দটির এক কেরাতে مُوَلَّاهَا রূপেও পাঠ রয়েছে। অতএব তোমরা সৎকাজে এগিয়ে যাও আনুগত্য প্রদর্শন ও তা গ্রহণ করার বিষয়ে তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি সকলকে জমায়েত করবেন। অনন্তর তিনি তোমাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْأُمَمُ : أُمَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- উম্মত, জাতি। وِجْهَةٌ : যার দিকে মুখ করা হয়, কিবলা। مُوَلِّيْهَا : অভিমুখী। بَادِرُوْا : অগ্রসর হও, দ্রুত চল। اَلْخَيْرَاتُ : এটি اَلْخَيْرَةُ -এর বহুবচন اَلْفَاضِلَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ - يُجَازِيْكُمْ : তোমাদের প্রতিদান দেবেন। مُوَلَّاهَا : ইসমে মাফউল, مَصْرُوْفٌ إِلَيْهِ অর্থাৎ যাকে অভিমুখী করানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْأُمَمِ : মুফাসসির (র.) وَلِكُلٍّ -এর পরে مِنَ الْأُمَمِ মাহযূফ মেনে مُضَافٌ إِلَيْهِ হযফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর مُضَافٌ -এর মতো مُضَافٌ إِلَيْهِ ও অহরহ হযফ হয়ে থাকে لِكُلٍّ -এর মূলরূপ হচ্ছে- لِكُلِّ أُمَّةٍ অর্থ- প্রত্যেক দীন ও ধর্মানুসারীদেরকে [চাই তা সত্য হোক কিংবা বাতিল হোক] একটি কেন্দ্রীয় দিক থাকে, যা তাদের কিবলা বলে আখ্যায়িত।

وِجْهَةٌ : এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু. যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ- কিবলা। এ ক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) وِجْهَةٌ -এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ مُوَلِّيْهَا : এখানে هُوَ দ্বারা فَرِيْقٌ [দল] উদ্দেশ্য, যা أُمَمٌ থেকে বুঝে আসে। كُلٌّ -এর মুনাসাবাতের কারণে هُوَ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি মুফাসসির (র.) امم -এর পরিবর্তে فريق ব্যবহার করতেন তাহলে অধিক সুস্পষ্ট হতো। -[সাবী]

مُوَلِّي - ইসমে ফায়েল। তৎসংশ্লিষ্ট هَا হলো প্রথম মাফউল, আর وِجْهَةٌ হলো দ্বিতীয় মাফউল। যেটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا : অর্থাৎ অপর কেরাতে ইসমে ফায়েলের বদলে ইসমে মাফউলের সীগাহ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সুরতে তার نَائِبُ فَاعِلٍ হবে প্রথম মাফউল- مُوَلَّاهَا اَىْ مَصْرُوْفٌ إِلَيْهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ **আয়াতের সারমর্ম :** এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দুটি অভিমত পাওয়া যায়-

১. কিবলা নিয়ে কলহ-বচসা অবান্তর। প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই আল্লাহ এক একটি কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তারা তার প্রতি মুখ করেই ইবাদত করে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর শরিয়তে কিবলা ছিল কা'বা শরীফ, আর হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়তে বাইতুল মুকদ্দাস। অনুরূপভাবে তোমাদের জন্যেও একটি স্বতন্ত্র কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমনিভাবে তোমাদের দীন স্বতন্ত্র, তেমনি তোমাদের কিবলাও স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। আর এ ক্ষেত্রে কোনো দিক নিজেদের পক্ষ থেকে কিবলা সাব্যস্ত হতে পারে না। আল্লাহ যেটি কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাই কিবলা হয়েছে। তাই এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে আসল উদ্দেশ্য তথা ইবাদতে মগ্ন হও। কেননা ইবাদত হলো মূল, কিবলা তো তার একটি মাধ্যম মাত্র।

http://islamiboi.wordpress.com

২. কিংবা এর অর্থ এই যে, মুসলমানদেরও সকল সম্প্রদায় কা'বার বিভিন্ন দিকে তথা কেউ পূর্বে কেউ পশ্চিমে অবস্থান করছিলেন, এমতাবস্থায় কারো কিবলা পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কারো কিবলা পূর্ব থেকে দক্ষিণে ইত্যাদি দিকে হবে। তাই কা'বা নিয়ে কলহ-বিবাদের কোনো মানে হয় না, নিজের দিক নিয়ে জেদাজেদি শোভা পায় না। যে পুণ্য সাধনা, পুণ্য সঞ্চয় আসল উদ্দেশ্য– তাতে দ্রুতগামী হও, সাধনার উপলক্ষ কিবলা নিয়ে টানাটানি না করে স্বয়ং সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। সকলকে ডিঙ্গিয়ে যাও। কিবলা নিয়ে তর্কবিতর্কে কোনো সার্থকতা নেই, কিবলার যে কোনো দিকে যেখানেই থাক না কেন, হাশরের ময়দানে কিন্তু আল্লাহ তোমাদের সকলকে জড় করবেন, একত্র ও সমবেত করবেন। তোমরা কিবলার বিভিন্ন দিকে মুখ করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে একই দিকে, একই কিবলার দিকে মুখ করেছ, তোমাদের নামাজও তাই একই দিকে পড়া হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। অতএব দিক নিয়ে, কিবলা নিয়ে তর্ক-বচসা অনর্থক।

–[তাফসীরে তাহেরী ও উসমানী]

قَوْلُهُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ : তোমরা সকলে কল্যাণসমূহের দিকে এগিয়ে যাও। এর অর্থ হলো– দ্রুত ও অবিলম্বে ইবাদত-বন্দেগিসমূহ পালন কর।

ইবাদত ও কল্যাণকর কাজ দ্রুত সম্পাদন করা উচিত : এ দলিলের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, ইবাদত-আনুগত্যের কাজ অবিলম্বে করা উত্তম, তা বিলম্বিত করা অপেক্ষা। বিলম্বিত করার পক্ষে কোনো দলিল থাকলে ভিন্ন কথা। যেমন– ওয়াক্ত শুরু হতেই নামাজ পড়া , জাকাত ফরজ হতেই তা দিয়ে দেওয়া, হজ ফরজ হতেই তা আদায় করা– এমনিভাবে অন্যান্য যাবতীয় ফরজ তার জন্য নির্দিষ্ট সময় হতেই, তার কারণ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা যেমন কাম্য, তেমনি অতীব উত্তম। তার কারণ এসব কাজের আদেশ অবিলম্বে পালনীয়। এসব কাজ বিলম্বিত করা কেবল কোনো দলিলের ভিত্তিতেই জায়েজ হতে পারে। যেমন– আদেশ পালনের জন্যে যদি কোনো সময় নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও সকলেরই মত হচ্ছে সে আদেশটিই অবিলম্বে পালন করে ফেলা আবশ্যক ও কল্যাণময়। তাই আল্লাহর উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে সব ন্যায় কাজ, ভালো কাজ বা শরিয়তের নির্দেশ খুব শীঘ্র এবং অবিলম্বে পালন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা তাঁর আদেশ তো এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, আদেশ শুনামাত্রই তা পালিত হবে। –[আহকামুল কুরআন, জাসসাস]

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : এটি অনেক প্রশ্ন ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মৌলিক জবাব। আল্লাহ কর্তৃক বিঘোষিত বিষয়াবলিতে মানুষ যে কোনো ক্ষেত্রেই যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা উপলব্ধি করে, তার ভিত্তি সর্বদাই আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষণ হয়ে থাকে। মানুষ নিজের সীমিত শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় আল্লাহর শক্তিকে সীমিত ও তাঁর কুদরত-সামর্থ্যকে স্থান-কালের পরিসীমায় গণ্ডিবদ্ধ ধারণা করে। মানুষের এই কূপমণ্ডূকতার সহজ মানসিকতা সামনে রেখে পবিত্র কুরআন বারবার তার উপর আঘাত হেনেছে এবং এ বাস্তবতার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, আল্লাহর কর্ম সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদানের আগে তাঁর অসীম কুদরত ও কর্মক্ষমতার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٩. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ لِسَفَرٍ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِىْ حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِ ـ

১৪৯. যেখান হতেই তুমি সফরের উদ্দেশ্যে বের হও না কেন মাসজিদুল হারামের দিকেই মুখ ফিরাও এটা নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়াটি ت [দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন] ও ى [নাম পুরুষ বহুবচন] উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। সফর এবং সফর ছাড়া সকল অবস্থায়ই এ বিষয়ের বিধান এক, এ কথার বর্ণনার জন্যে বক্তব্যটিকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে।

١٥٠. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ الْيَهُوْدِ اَوِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اَىْ مُجَادَلَةٌ فِى التَّوَلِّىْ اِلٰى غَيْرِهِ اَىْ لِتَنْتَفِىَ مُجَادَلَتُهُمْ لَكُمْ مِنْ قَوْلِ الْيَهُوْدِ يَجْحَدُ دِيْنَنَا وَيَتَّبِعُ قِبْلَتَنَا وَقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ يَدَّعِىْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَيُخَالِفُ قِبْلَتَهُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ بِالْعِنَادِ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا تَحَوَّلَ اِلَيْهَا اِلَّا مَيْلًا اِلٰى دِيْنِ اٰبَائِهِ وَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنٰى لَا يَكُوْنُ لِاَحَدٍ عَلَيْكُمْ كَلَامٌ اِلَّا كَلَامُ هٰؤُلَاءِ ـ

১৫০. এবং তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে। تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাতে তাদের মধ্যে জেদের বশবর্তী হয়ে সীমালঙ্ঘনকারীগণ ভিন্ন তোমাদের বিরুদ্ধে অপর কোনো লোকের অর্থাৎ ইহুদি ও মুশরিকগণের কোনো দলিল না থাকে। এটা ব্যতীত অপর কিবলার দিকে মুখ ফিরাবার বিষয়ে তোমাদের সাথে যেন কোনো বিতর্ক না থাকে। অর্থাৎ ইহুদিরা যে বলে মুহাম্মদ আমাদের ধর্ম অস্বীকার করে অথচ আমাদের কিবলার অনুসরণ করে; আর মুশরিকরা বলে [মুহাম্মদ] দাবি করে মিল্লাতে ইবরাহীমের অথচ তাঁর অনুসৃত কিবলার বিপরীত কাজ করে– তোমাদের সাথে এ বিতর্কের যেন অবসান হয়ে যায়। তবে যারা জালিম, যারা সীমালঙ্ঘনকারী তারা অবশ্য বলবে, স্বীয় পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি অনুরাগবশত মুহাম্মদ এই দিকে [কা'বার দিকে] কিবলা পরিবর্তন করে নিয়েছে। اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এটা এ স্থানে اِسْتِثْنَاء مُتَّصِل বা সমজাতিক ব্যত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের অভিযোগ ভিন্ন এ বিষয়ে আর কারো কোনো কথা বা অভিযোগ থাকবে না

http://islamiboi.wordpress.com

فَلَا تَخْشَوْهُمْ تَخَافُوْا جِدَالَهُمْ فِي التَّوَلِّي اِلَيْهَا وَاخْشَوْنِيْ بِامْتِثَالِ اَمْرِيْ وَلِاُتِمَّ عَطْفٌ عَلٰى لِئَلَّا يَكُوْنَ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ بِالْهِدَايَةِ اِلٰى مَعَالِمِ دِيْنِكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ اِلَى الْحَقِّ ـ

অনুবাদ : সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। অর্থাৎ এই দিকে [কা'বার দিকে] মুখ ফিরাতে যেয়ে তাদের বিতর্কের কোনো ভয় করো না। আর আমার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে শুধু আমাকেই ভয় কর যাতে তোমাদেরকে ধর্মীয় হুকুম-আহকামের ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শনাবলির হেদায়েত করে তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধান করতে পারি وَلِاُتِمَّ এটার لِئَلَّا يَكُوْنَ -এর সাথে এ স্থানে عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। এবং যাতে তোমরা সত্যের দিকে পরিচালিত হতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

كَرَّرَ : তাকরার করেছে, দ্বিরুক্তি করেছে। تَسَاوِيْ সমতা। حُجَّةٌ : বিতর্ক। مُجَادَلَةٌ : তর্কবিতর্ক।
فِي التَّوَلِّي : মুখ ফিরাবার বিষয়ে। لِتَنْتَفِيَ : নাকচ করার জন্য।
يَجْحَدُ : جَحَدَ (ف) جَحْدٌ ـ جُحُوْدًا অর্থ– অস্বীকার করা।
يَدَّعِيْ : اِدَّعَى (اِفْتِعَال) اِدِّعَاءٌ অর্থ– দাবি করা। بِالْعِنَادِ : জেদের বশবর্তী হয়ে। مَيْلٌ আকর্ষণ , টান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বারবার উল্লেখের তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ বাক্যটি দুবার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর কারণ বিভিন্ন।

১. কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্যে তো এক হৈচৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যেও তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কারণ একতো কিবলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয়ত মহান আল্লাহর বিধানে রহিতকরণের বিষয়টি নির্বোধদের বোধশক্তির উর্ধ্বের ব্যাপার। তার উপর কিবলা পরিবর্তনই হলো মুহাম্মদী শরিয়তের প্রথম রহিতকরণ। কাজেই এ নির্দেশটি যথার্থ তাকিদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় মনের প্রশান্তি অর্জন হয়তো যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কা'বাই হলো চূড়ান্ত কিবলা। এরপর পুনঃ পরিবর্তনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। মুফাসসির (র.) كَرَّرَهٗ لِلتَّاكِيْدِ অংশটুকু দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতাংশের পুনরুল্লেখ দৃশ্যত বিষয়বস্তুর দৃঢ়তা বিধানের লক্ষ্যে। এরূপ বাকপদ্ধতি আরববাসীদের সাধারণ কথনরীতির অন্তর্ভুক্ত।

২. তত্ত্ববিদ রহস্য বিশারদ আরিফগণ লিখেছেন যে, গভীরভাবে চিন্তা করলে এখানে মোট ছয়বার কিবলামুখী হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবারের আদেশ দ্বারা এক একটি বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। ১. প্রথমবারের আদেশ নিরেট আবশ্যিকতা [ওজূব] বুঝাবার জন্যে। ২. দ্বিতীয়বার বুঝানো হয়েছে অবস্থার ব্যাপ্তি অর্থাৎ সফর হোক কিংবা ইকামত। ৩. তৃতীয়বারে রয়েছে স্থান-অবস্থানের ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত অর্থাৎ দূরবর্তী-নিকটবর্তী, উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলের জন্যে বিধানের সামঞ্জস্য ও ব্যাপ্তি। ৪. চতুর্থবারের লক্ষ্য আদব শেখানো অর্থাৎ [সব সময়]

http://islamiboi.wordpress.com

কিবলামুখী থাকার প্রয়াস মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। ৫. পঞ্চমবারে আত্মিক মনোযোগ অর্থাৎ যেদিকে প্রতিপালকের বিশেষ সুদৃষ্টি রয়েছে, দিল যেন সেদিকেই নিমগ্ন থাকে এবং ৬. ষষ্ঠবারের উদ্দেশ্য তাকিদ ও দৃঢ়তা প্রদান অর্থাৎ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করা। –[তাফসীরে মাজেদী]

৩. মুফাসসিরগণ নিজ নিজ রুচি ও কুরআনবোধের আলোকে পুনরুল্লেখ বিধানের আরো নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। যেমন–

* কেউ বলেন, প্রথমবার নবীজির মন খুশি করার জন্যে, দ্বিতীয়বার সকল উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তৃতীয়বার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি নিরসনের জন্যে।

* কেউ বলেন, প্রথমবার হরমের অধিবাসীদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়বার জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীদের জন্যে এবং তৃতীয়বার সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে।–[মা'আরিফুল করআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) খ. ১, পৃ. ২৪৫]

قَوْلُهُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ : কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কিবলা ছিল কা'বা এবং শেষ নবীকেও এদিকেই মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। কাজেই আপনাকে কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ না দেওয়া হলে ইহুদিরা অবশ্যই অভিযোগ তুলত। অপর দিকে মক্কা শরীফের মুশরিকরা বলত, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা ছিল কা'বা আর এই নবী ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের দাবি করেন অথচ কিবলার ক্ষেত্রে করেন তাঁর বিরোধিতা। এখন তাদের কারোরই কথা বলার সুযোগ থাকল না।

তবে বেয়াড়া স্বভাব উল্টোরথীদের কথা আলাদা। ওরা এ প্রাঞ্জলতার পরেও প্রশ্নের ঝড় তুলে গোঁয়ার্তুমি করবে। যেমন কুরাইশরা বলবে– তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কিবলা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতিনীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইহুদিরা বলবে– আমাদের কিবলার সত্যতা জানার ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এরূপ অবিবেচকদের মন্তব্যের কোনো পরোয়া করবেন না। আমার আদেশ পালন করুন।

–[তাফসীরে উসমানী ও মাজেদী]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ : ইসলামি শরিয়ত পৃথিবীর বুকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবসম্মত জীবন বিধান। এর কিবলা স্থিরীকরণ ও কা'বামুখী হওয়ার বিধানও এ পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। لَعَلَّكُمْ -এর لَعَلَّ অব্যয় كَيْ [যাতে করে] অব্যয়ের সমার্থক, সন্দেহ বা দ্বিধাবোধক নয়। এর অর্থ হবে– 'যাতে' বা 'যেন'। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, যারা আগে হতে হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের সম্পর্কে আবার হেদায়েতপ্রাপ্তিতে ধন্য হওয়ার কথা বলা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তরসমূহ অসীম ও অপরিসীম।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٥١. كَمَآ اَرْسَلْنَا مُتَعَلِّقٌ بِاُتِمَّ اَىْ اِتْمَامًا كَاِتْمَامِهَا بِاِرْسَالِنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنَ وَيُزَكِّيْكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

১৫১. যেমন আমি প্রেরণ করেছি كَمَآ اَرْسَلْنَا পূর্বের لِاُتِمَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা যুক্ত। তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে, যাতে আমার অন্যান্য অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধানের মতো তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আমি আমার এই অনুগ্রহেরও পূর্ণতা বিধান করতে পারি। যে আমার আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে অর্থাৎ শিরক হতে তোমাদেরকে পাক করে এবং কিতাব আল-কুরআন ও হিকমত তাঁর আহকাম ও বিধিবিধানসমূহ শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জনতে না তা শিক্ষা দেয়।

١٥٢. فَاذْكُرُوْنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالتَّسْبِيْحِ وَنَحْوِهٖ اَذْكُرْكُمْ قِيْلَ مَعْنَاهُ اُجَازِيْكُمْ وَفِى الْحَدِيْثِ عَنِ اللّٰهِ مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَمَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَأٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَأٍ خَيْرٍ مِّنْ مَلَئِهٖ وَاشْكُرُوْا لِىْ نِعْمَتِىْ بِالطَّاعَةِ وَلَا تَكْفُرُوْنِ بِالْمَعْصِيَةِ.

১৫২. সালাত, তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়, এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করব। আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসে [হাদীসে কুদসীতে] আছে, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করবে। যে ব্যক্তি আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করবে আমিও তাকে তা হতে উৎকৃষ্টতর সমাবেশে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তাহকীক ও তারকীব

اِتْمَامٌ : পূরিপূর্ণ করা। يُزَكِّيْكُمْ : تَزْكِيَةٌ (تَفْعِيْل) زَكّٰى অর্থ- শুদ্ধ করা, পবিত্র করা।
اُجَازِيْكُمْ : তোমাদেরকে প্রতিদান দেব। مَلَأٌ : সমাবেশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কিবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ كَمَا اَرْسَلْنَا : এ বাক্যে উদাহরণসূচক যে 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো, যেভাবে আমি কিবলার ব্যাপারে তোমাদের উপর اِتْمَامِ نِعْمَتْ করেছি এভাবে যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কিবলা তোমাদের জন্যে নির্ধারণ করেছি তেমনিভাবে আমি নবুয়ত, রিসালাত ও হেদায়েতের ব্যাপারেও তোমাদের উপর اِتْمَامِ نِعْمَتْ করেছি । এভাবে যে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কামিল রাসূলকে তোমাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছি। অধিকন্তু আরও একটা নিয়ামত হলো তিনি তোমাদেরই বংশ ও জাতি থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী (র.) গ্রহণ করেছেন। তা হলো, কাফ -এর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُوْنِيْ -এর সাথে। অর্থাৎ আমি যেমন তোমাদের প্রতি কিবলাকে একটি নিয়ামত হিসেবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নিয়ামত দিয়েছি রাসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর জিকিরও আরেকটি নিয়ামত। এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নিয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে كَمَا اَرْسَلْنَا -এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি যেমনটি সূরা আনফালের كَمَا اَخْرَجَكَ এবং সূরা হিজরের كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ **জিকির -এর সুফল ও পুরস্কার :** অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে যখন তোমাদের প্রতি একাধিকবার আমার নিয়ামতের পূর্ণতা বিধান হয়ে গেছে, তখন তোমাদের কর্তব্য মুখে, হৃদয়ে, স্মরণে, চিন্তায় সর্বতোভাবে আমাকে মনে রাখা এবং আমার আনুগত্যে যত্নবান থাকা। তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ রাখব অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার নিত্যনতুন কৃপা ও রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। কাজেই তোমরা যথাসম্ভব আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে থাক; আমার অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা হতে বেঁচে থাক। –[তাফসীরে উসমানী]

হযরত থানভী (র.) বলেছেন, এদিকে বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করতে শুরু করল তো ওদিক থেকে করুণা বর্ষণ হতে থাকবে এবং এটাই বান্দার আল্লাহকে স্মরণ করার প্রকৃত সুফল ও পুরস্কার। সুতরাং মনের মাঝে এ বিষয়টি জাগরূক থাকলে জিকির-ফিকিরে নিমগ্ন বান্দার জন্যে কখনো দুশ্চিন্তা-অমনোযোগিতা দেখা দিতে পারে না এবং ফলত কিছু না পাওয়ার অভিযোগও উঠতে পারে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

জিকিরের তাৎপর্য : মুফাসসির কুরতুবী (র.) ইবনে খোয়াইয -এর আহকামুল কুরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অনুগত্য করে অর্থাৎ তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলো অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামাজ-রোজা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচরণ করে সে নামাজ, রোজা, তাসবীহ-তাহলীল প্রভৃতি বেশি করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না।

হযরত যুন্নুন মিসরী (র.) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সবদিক দিয়ে হেফাজত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আজ (রা.) বলেন, "আল্লাহর আজাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোনো আমলই যিকরুল্লাহর সমান নয়।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।" –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ : তাওহীদ আল্লাহর একত্ব ও এককত্ব, ঈমান ও ইসলামের দাবি পূরণ করতে থাকাই আল্লাহর শোকর আদায় করা। শোকরের উত্তম সংজ্ঞা হলো, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে আল্লাহরই পছন্দনীয় কাজে ব্যয় করা। وَلَا تَكْفُرُوْنِ কুফরি, শিরক, ধর্মহীনতা, ধর্মবিধিতে সন্দেহ পোষণ, আইন লঙ্ঘন ও বিদ'আত আচরণই আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও তাঁর নিয়ামতের প্রতি অবহেলা-অস্বীকৃতি। অকৃতজ্ঞতার অর্থ হলো, শক্তি-সামর্থ্যকে আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যয় করা। –[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১৫৩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا عَلَى الْاٰخِرَةِ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَالصَّلٰوةِ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكَرُّرِهَا وَعِظَمِهَا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِالْعَوْنِ.

১৫৩. হে বিশ্বাসীগণ! আনুগত্য প্রদর্শন ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা পরকালের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা কর সালাত বারবার আদায় করা হয় এবং এর গুরুত্বও সমধিক, সেহেতু এ স্থানে পৃথকভাবে সালাতের উল্লেখ করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাহায্যসহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

তাহকীক ও তারকীব

إِسْتَعِيْنُوْا : بَابِ اِفْعَال -এর اَلْاِسْتِعَانَةُ মাসদার থেকে اَمْر حَاضِر -এর সীগাহ অর্থ- সাহায্য প্রার্থনা কর।
اَلطَّاعَةُ : আনুগত্য। اَلْبَلَاءُ : বিপদ-আপদ। خَصَّهَا : বিশেষভাবে বলা تَكَرُّر : বারবার আদায় করা।
اَلْعَوْنُ : সাহায্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ধৈর্য ও নামাজ যাবতীয় সংকটের প্রতিকার : وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর" এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখকষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দুটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি নামাজ। বর্ণনারীতির মধ্যে اِسْتَعِيْنُوْا শব্দটিকে বিশেষ কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোনো সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামাজ। যে কোনো প্রয়োজনেই এ দুটি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। -[মা'আরিফ]

'সবর' -এর তাৎপর্য : 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে- সংযম অবলম্বন ও নফস -এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ। ইমাম রাগেব (র.) বলেন- اَلصَّبْرُ الْاِمْسَاكُ তথা সবর হলো সংকটকালে সংযম।

সবরের শাখা : কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর' -এর তিনটি শাখা রয়েছে-

১. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা,
২. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং
৩. যে কোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ যেসব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্ট পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা 'সবর' -এর পরিপন্থি নয়।

'সবর' -এর উপরিউক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণত তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম দুটি শাখা যে এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ- সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দুটি বিষয়ও যে 'সবর' -এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরিউক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে- "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" একথা শোনার সঙ্গে

http://islamiboi.wordpress.com

সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। 'ইবনে কাছীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কুরআনের অন্যত্র- إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ "সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুরস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে"- এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لِتَكَرُّرِهَا وَعِظَمِهَا : প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার ইবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে **পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ** হচ্ছে যে, নামাজ বারবার আদায় করা হয় এবং এর গুরুত্বও সমধিক। কেননা নামাজ **এমনই একটি ইবাদত যাতে** 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। নামাজের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা **রিপুকে আনুগত্যে রাখা হয়,** তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও **সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের** 'নফস' -এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গুনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ **থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার** বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর' -এর **অনুশীলন করতে হয়, নামাজের মধ্যেই** তার একটি পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ : বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাজি এবং সবরকারীগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তি কিংবা কোনো সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মতো শক্তি কারও থাকে না। বলাবাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

এ কথা নিত্য প্রত্যক্ষ যে, কোনো শক্তিধর ও বিরাট সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে মন কত মজবুত ও শক্তিশালী থাকে। বিপদকালে পুলিশের আগমন কিংবা কোনো প্রতাপশালী আইন প্রয়োগকারীর উপস্থিতিতেও মন কতই ভাবনামুক্ত থাকে। কঠিন রোগের সময় কোনো খ্যাতিমান চিকিৎসকের আগমন নিরাশ হৃদয়ে কেমন আশার সঞ্চার করে। তাহলে সর্বদর্শী ও সর্বজ্ঞ প্রকৃত সহায়তাদাতা ও হেফাজতকারীর সঙ্গে অন্তরের সংযোগ হয়ে গেলে অসহায় মানব যে কতখানি মনে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আল্লাহ সাথে থাকার অর্থ : ব্যাপক অর্থে তো ঈমানদার, কাফির, পুণ্যবান ও পাপাচারী সকলের জন্যে আল্লাহর সঙ্গ প্রযোজ্য। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ "তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" কিন্তু এখানে এ ব্যাপকতাবোধক সঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য বিশেষ ধরনের সঙ্গ-সান্নিধ্য, যার প্রতিক্রিয়া হলো বিশেষ করুণা ও বিশেষ দৃষ্টি। আল্লাহর এ বিশেষ সান্নিধ্যের অনুভূতিই রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহাবীগণ (রা.) -কে অপরিসীম শক্তি-সাহস ও ভীতিহীনতার অধিকারী বানিয়েছিল। আর বস্তব ব্যাপারও তা-ই; আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকার আত্মিক ধ্যান [মুরাকাবা]-এর চেয়ে আত্মার জন্যে অধিক সুস্বাদু কোনো খাদ্য এবং আহত হৃদয়ের জন্যে অধিক কার্যকর প্রশান্তি-প্রলেপ অন্য কিছু হতে পারে না। একমাত্র এ ধ্যানই ঈমানদারদের জন্যে অপছন্দনীয় ও প্রতিকূলকে পছন্দনীয় ও অনুকূল, তিক্তকে মিষ্ট ও বিষকে মিঠায় [বিশ্রীকে মিছরিতে] রূপান্তরিত করতে যথেষ্ট হয়ে থাকে।

সালাত সবরকে অন্তর্ভুক্ত করে : অর্থের প্রসারতায় 'সবর' একটি ব্যাপক ও সমন্বিত অর্থবোধক শব্দ, সালাত তার একটি বিশিষ্ট রূপ। সুতরাং সবরকারীদের জন্যে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তির এ নিয়ামত সাব্যস্ত হলে তা সালাত আদায়কারীদের জন্যে অবশ্যই সমভাবে সাব্যস্ত হবে। এজন্য সালাত আদায়কারীদের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। 'সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে রয়েছেন' বলেননি, কেননা তিনি যখন সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন, তখন সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে তো উত্তমরূপেই রয়েছেন। কারণ সালাত সবরকে অন্তর্ভুক্ত করে রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী সূত্রে মাজেদী

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٥٤. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ أَرْوَاحُهُمْ فِيْ حَوَاصِلِ طُيُوْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ تَعْلَمُوْنَ مَا هُمْ فِيْهِ.	১৫৪. আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। এই মর্মে একটি হাদীস আছে যে, সবুজ পাখির পেটে তাদের রূহসমূহ অবস্থান করে এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা তারা বিচরণ করে বেড়ায়। কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। কি [সুন্দর] অবস্থায় তারা আছে তোমরা তা জান না। أَمْوَاتٌ শব্দটি এ স্থানে خَبَر বা বিধেয়, তার مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য হলো هُمْ যা এ স্থানে উহ্য।

তাহকীক ও তারকীব

يُقْتَلُ : [নিহত হয়] মুযারে মাজহুলের সীগাহ। قَتَلَ (ن) قَتْلًا অর্থ– হত্যা করা। أَمْوَاتٌ : مَيِّتٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মৃত। أَحْيَاءٌ : حَيٌّ -এর বহুবচন। অর্থ– জীবিত। أَرْوَاحٌ : رُوْحٌ -এর বহুবচন। অর্থ– আত্মা। حَوَاصِلُ : حَوْصَلَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পেট, পাকস্থলী। طُيُوْرٌ : طَيْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পাখি। خُضْرٌ : সবুজ।
تَسْرَحُ : বিচরণ করে। حَيْثُ شَاءَتْ : যেখানে ইচ্ছা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ -এর আলোচনা : বদর যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী শাহাদাত বরণ করলে নির্বোধ কাফিররা বলতে লাগল যে, এরা অনর্থক নিজেদের জীবন নাশ করল, জীবনের স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হলো। এদের জবাব দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যে অর্থে তাদের মৃত মনে করছ, সে অর্থে তো তারা একেবারেই মৃত নয়; বরং তারা জীবিতদের চেয়েও অনেক উত্তম ও অধিকহারে স্বাদ আস্বাদন করছেন। পরিভাষায় এ ধরনের নিহতদের শহীদ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ : তোমরা বুঝতে পার না। সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি। কেননা বারযখ জগৎ জাগতিক ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবনযোগ্য নয় এবং মানুষ তার বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সে সূক্ষ্ম ও উন্নত জীবনের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না; বরং ওহী ও আল্লাহর বাণীতে তার সন্ধান পাওয়া যায়। –[তাফসীরে বায়যাবী]

আলমে বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত : ইসলামি রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি আলমে বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আজাব বা ছওয়াব অনুভব করে থাকে। এ জীবন প্রাপ্তির ব্যাপারে মু'মিন-কাফির এবং পুণ্যবান ও গুনাহগারের কোনো পার্থক্য নেই। তবে বরযখের জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণির লোকই সমানভাবে শামিল। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রাসূল এবং বিশেষ নেককার বান্দাদের জন্যে নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। অবশ্য সাধারণভাবে তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হলো অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশি অনুভূতি দেওয়া হয়। যেমন– মানুষের পায়ের গোড়ালি ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ– উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোড়ালির তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। তেমনি সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশি অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না; জীবিত মানুষের দেহের মতোই অবিকৃত

http://islamiboi.wordpress.com

থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

নবী ও শহীদগণের হায়াতের পার্থক্য : নবীগণ (আ.) এ ধরনের এক বিশেষ জীবনের অধিকার লাভে শহীদগণের উর্ধ্বে রয়েছেন এবং তাঁদের জীবনীশক্তি প্রবলতর ও অধিক বৈশিষ্ট্যময়। নবী-রাসূলগণ শহীদগণের চেয়েও অনেক বেশি মরতবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম-আহকামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। তাঁদের পরিত্যক্ত কোনো সম্পদ বণ্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রীগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

এখানে শহীদগণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে তাদের বিশেষ সান্নিধ্য-সংযোগ এবং বিশেষ সজীবতা ও মাহাত্ম্য বুঝাবার জন্যে। যেমন তাফসীরে বায়যাবীতে উল্লেখ হয়েছে–

«تَخْصِيْصُ الشُّهَدَاءِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَزِيْدِ الْبَهْجَةِ وَالْكَرَامَةِ - بَيْضَاوِيْ»

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রাসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোনো কোনো হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আওলিয়া এবং নেককার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেককার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশি।

সন্দেহের অপনোদন : যদি কোনো শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেত পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয়তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোনো শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোনো সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোনো কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনিষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রাসূল ও শহীদগণের লাশ মাটি ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোনো ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোনো উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'– এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না সেহেতু কুরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ [তোমরা বুঝতে পার না] বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মতো অনুভূতি তোমাদের দেওয়া হয়নি।

মাসআলা : ইবনুল আরাবী মালিকী (র.) বলেছেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে কোনো কোনো ইমাম শহীদের জন্যে জানাজা ও গোসল উভয়কে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা শাহাদাতই তো তাদের পূত-পবিত্র করে দিয়েছে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) জানাজার প্রয়োজনীয়তাকে অপরিবর্তিত রেখেছেন। –[আহকামুল কুরআন]

বরযখী জীবনের স্বরূপ : এ জীবন সম্পর্কে একদল মনীষী শুধু আত্মিক হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। তবে আত্মিক ও জড় এ উভয়বিধ হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পূর্বসূরিদের অনেকেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ জীবনটি দেহ ও আত্মার বাস্তবতাসমৃদ্ধ। কারো কারো মতে এটি শুধু আধ্যাত্মিক। তবে প্রথম অভিমতটির প্রাধান্য সুপ্রসিদ্ধ। –[রূহুল মা'আনী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٥٥. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لِلْعَدُوِّ وَالْجُوْعِ الْقَحْطِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ بِالْهَلَاكِ وَالْاَنْفُسِ بِالْقَتْلِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْمَوْتِ وَالثَّمَرٰتِ بِالْجَوَائِحِ اَىْ لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ فَنَنْظُرَ اَتَصْبِرُوْنَ اَمْ لَا وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْجَنَّةِ هُمْ.

১৫৫. আমি তোমাদেরকে শত্রুর ভয়, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, সম্পদ ধ্বংস করে এবং রাগ, মৃত্যু ও হত্যার মাধ্যমে জীবন নাশ করে ও বিভিন্ন বিপদাপদের মাধ্যমে ফল-ফসলের স্বল্পতা দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করব। তোমাদেরকে যাচাই করে নেব। অনন্তর দেখব তোমরা ধৈর্যধারণ কর কিনা। আর বিপদে ধৈর্যশীলদের জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

١٥٦. اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بَلَاءٌ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ مِلْكًا وَعَبِيْدًا يَفْعَلُ بِنَا مَا يَشَاءُ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْنَا فِى الْحَدِيْثِ مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ اَجَرَهُ اللّٰهُ فِيْهَا وَاَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا وَفِيْهِ اَنَّ مِصْبَاحَ النَّبِىِّ ﷺ طَفِئَ فَاسْتَرْجَعَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رض) اِنَّمَا هٰذَا مِصْبَاحٌ فَقَالَ كُلُّ مَا سَاءَ الْمُؤْمِنَ فَهُوَ مُصِيْبَةٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ فِىْ مَرَاسِيْلِهٖ.

১৫৬. তারা হলো যারা বিপদে পতিত হলে কষ্টে পড়লে বলে দাস ও মালিকানা সকল রূপেই নিশ্চয় আমরা আল্লাহর তিনি আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং আমরা নিশ্চিতভাবে পরকালে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। অনন্তর তিনি আমাদেরকে প্রতিদান প্রদান করবেন। হাদীসে আছে– বিপদের সময় "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করলে আল্লাহ তাকে পূর্ণফল দান করেন ও এর ফলে এতদপেক্ষা কোনো উত্তম বস্তু তাকে দেন। আরো আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরের বাতি নিভে গেলে তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পাঠ করলেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এটাতো সামান্য একটি বাতিমাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে বস্তুতে মু'মিন কষ্টপায়, তার খারাপ লাগে তা-ই তার জন্যে বিপদ। ইমাম আবূ দাউদ তৎপ্রণীত মারাসীলে এ হাদীসটির বর্ণনা করেছেন।

١٥٧. اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نِعْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ اِلَى الصَّوَابِ.

১৫৭. এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সালাত অর্থাৎ ক্ষমা ও রহমত অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, আর তারাই সত্য ও সঠিকপথে পরিচালিত।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

لَنَبْلُوَنَّكُمْ : [আমি তোমাদের অবশ্য পরীক্ষা করব] بَلٰى (ن) بَلَاءً অর্থ- পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

اَلْخَوْفُ : ভয়। خَافَ (ف) خَوْفًا অর্থ- ভয় পাওয়া। اَلْجُوْعُ : ক্ষুধা। اَلْقَحْطُ : দুর্ভিক্ষ। نَقْصٌ : ত্রুটি, ক্ষতি।

[illegible] : বিপদাপদ। اَصَابَتْ : [আক্রান্ত করল] اِصَابَةٌ অর্থ- আক্রান্ত করা। মাদ্দাহ صَوْبٌ -

اَصَابَتْهُ : কোনো কিছু তাকে আক্রান্ত করল।

مُصِيْبَةٌ : اَلْمُصِيْبَةُ كُلُّ مَا يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَيُصِيْبُهُ فِيْ نَفْسِهٖ اَوْ مَالِهٖ اَوْ وَلَدِهٖ

اِسْتَرْجَعَ : اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ল। طَفِئَ : নিভে গেল।

[illegible] : [illegible]। مَرَاسِيْلُ : مُرْسَلٌ -এর বহুবচন। উলূমুল হাদীসের পরিভাষা।

صَلَوٰتٌ : [illegible] صَلٰوةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- করুনা, প্রার্থণা, নামাজ। اَلْمُهْتَدُوْنَ : [হেদায়েত প্রাপ্তগণ] مُهْتَدٍ [ال] যোগে

اَلْمُهْتَدِيْ -এর বহুবচন। اِهْتَدٰى يَهْتَدِيْ اِهْتِدَاءً অর্থ- হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া, পথপ্রাপ্ত হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ **যোগসূত্র :** যাঁরা ধৈর্যের চরম উৎকর্ষ দেখাতে পেরেছেন উপরে সেই শহীদান সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে তোমাদের সকলের উপরই বালামুসিবত ও বিপদাপদ নিশ্চয় আপতিত হবে তবে তা শাস্তি ও আজাব রূপে নয়, বরং পরীক্ষা রূপে হবে এবং তোমাদের ধৈর্য যাচাই করা হবে। ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অত সহজ নয়। এ কারণে এ বাণী দ্বারা আগেভাগে সাবধান করে দিয়ে তাদের সান্ত্বনা ও নির্ভাবনার উত্তম উপকরণ সরবরাহ করা হলো। আর আল্লাহর পরীক্ষা করার লক্ষ্য হলো ফলাফল পৃথিবীবাসীর সামনে প্রকাশ করে দেওয়া। অন্যথায় এ বিষয়টিও যে আল্লাহ সর্বদা বিদিত রয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

–[তাফসীরে মাজেদী ও উসমানী]

قَوْلُهٗ بِشَيْءٍ : [কিছু] দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, পরীক্ষা খুব কঠিন হবে না; মালিকানাভুক্ত যে কোনো বিষয়ের নগণ্য পরিমাণ ও ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা হবে, পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিষয় দ্বারা নয়।

قَوْلُهٗ اَلْخَوْفِ : اَلْخَوْفُ শব্দটি ব্যাপ্তিসম্পন্ন জীবন, সম্পদ ও সম্মান -এর সব কিছুর ব্যাপারে শঙ্কা ও সংকট -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ اَلْجُوْعِ : اَلْجُوْعُ দ্বারা পরীক্ষা হলো, প্রয়োজন দেখা দেওয়া সত্ত্বেও হারাম ও অবৈধ সম্পদ থেকে আত্মরক্ষা করবে, সিয়াম পালনে অস্থির চঞ্চল হবে না এবং ক্ষুধা-দারিদ্র্যে শঙ্কিত হবে না।

قَوْلُهٗ اَمْوَالِ : সম্পদে সুদ-ঘুষ, আত্মসাৎ, অবৈধ বেচাকেনা এবং সম্পদ অর্জনের শরিয়ত পরিপন্থি যে কোনো উপায় বর্জন করবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সম্পদের ক্ষতি সাধিত হলে, চুরি গেলে, আগুন লেগে পুড়ে গেলে, সর্ব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করবে।

قَوْلُهٗ اَلْاَنْفُسِ : اَلْاَنْفُسُ জীবন-মৃত্যু, রোগ-ব্যাধি ও জিহাদের আঘাত-প্রত্যাঘাতে ধৈর্যশীল হবে।

قَوْلُهٗ اَلثَّمَرَاتِ : ফল-ফসল দ্বারা সন্তানসন্ততিও উদ্দেশ্য হতে পারে। এছাড়া ব্যবসাবাণিজ্য, ক্ষেত-কৃষি ইত্যাদির লাভ ও উৎপাদন এবং সব ধরনের সুনাম-সুখ্যাতির ক্ষেত্রগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, বান্দার পরীক্ষা তাওহীদ ও শিরকের মাঝে ব্যবধান রেখা টেনে দেয়। সাধারণ মানুষের পরীক্ষা হয় প্রকাশ্য শিরক সম্পর্কিত আর বিশিষ্টদের পরীক্ষা নেওয়া হয় সূক্ষ্ম শিরক সম্পর্কে। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, এ আয়াতটি অনিচ্ছাকৃত সাধনা [মুজাহাদা]ও উপকারী ও কার্যকর হওয়ার সুস্পষ্ট ভাষ্য।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ : বিপদ-আপদে এ আয়াতের উচ্চারণের অভ্যাস আজও অনেক মুসলিম পরিবারে **পরিদৃষ্ট হয়**। কিন্তু সবর অর্জিত হওয়ার জন্যে শুধু মৌখিক আবৃত্তি যথেষ্ট নয়, অন্তরেও অবশ্যই এ মর্মের পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি **অপরিহার্য**। তাফসীরে বায়যাবীতে এসেছে– وَلَيْسَ الصَّبْرُ بِالْاِسْتِرْجَاعِ بِاللِّسَانِ بَلْ بِهٖ وَبِالْقَلْبِ অর্থাৎ শুধু **মুখে ইন্নালিল্লাহ** .... পড়ার নাম সবর নয়, বরং মুখ ও মন দিয়ে পড়তে হবে।

قَوْلُهُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ : আমরা সকলেই শুধু বান্দা-মালিকানাভুক্ত দাসানুদাস। সব কিছুতেই তাঁর মালিকানা। আমরা নিজেরা আমাদের সব বিষয়বস্তু এর কোনো কিছুই আমার নয়, স্ত্রী নয়, সন্তান নয়, সম্পদ নয়, সম্পত্তি নয়, স্বদেশ নয়, স্বজাতি নয়, দেহ নয়, প্রাণ নয়।

মৌলিক তিনটি বিশ্বাস সবরের জন্যে সহায়ক : প্রথমত মানুষের সব দুঃখ-দুশ্চিন্তা, সকল বেদনা ও আক্ষেপ এবং সকল জ্বালার মূল কথা শুধু এতটুকু যে, সে তার প্রিয় বিষয়বস্তুগুলোকে নিজস্ব সাব্যস্ত করে রেখেছেন। কিন্তু এই ব্যাপক বিভ্রান্তি হতে হৃদয়-মনকে মুক্ত করতে পারলে তখন যে কোনো জিনিস যতই প্রিয় হোক না কেন, তা তো বিন্দুমাত্র নিজের রইল না। অতএব তখন আর দুঃখকষ্ট, বিষণ্নতা ও হায়-আফসোসের অবকাশ কোথায়? **দ্বিতীয়ত** পৃথিবীর যে কোনো দুঃখ-বেদনা, যে কোনো মনঃকষ্ট এবং যে কোনো মর্মজ্বালার তা যতই বিস্তৃত ও গভীর হোক না কেন– এ সবই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর কোনোটিই অক্ষয় চিরন্তন নয়। কেননা অনতিবিলম্বে এসব ছেড়ে প্রকৃত মালিকের দরবারে হাজিরা দিতে হবে। **তৃতীয়ত** সেখানে পৌঁছামাত্র সমুদয় বকেয়া উসুল হয়ে যাবে, সব হারানোর প্রাপ্তি ঘটবে, সকল বিচ্ছেদের অবসানে চির মিলন সূচিত হবে। মৌলিক বিশ্বাসের এ তিনটি ধারা যার হৃদয়ে যতখানি সুদৃঢ় হবে, পৃথিবীর বুকে সে তত পরিমাণ নিরাপত্তা ও স্থিরতা ভোগ করবে। –[তাফসীরে মাজেদী]

সবরের তিনটি স্তর : বিষয়াভিজ্ঞদের মতে আয়াতে বর্ণিত সবর প্রতিপালনের তিনটি স্তর রয়েছে–

ক. উচ্চস্তর : অন্তরে আয়াতের মর্ম চিত্রিত থাকবে এবং মুখেও এর শব্দমালা উচ্চারিত হবে।

খ. মধ্যমস্তর : মনে মনে এর অর্থ ভেবে নেবে, মুখে উচ্চারণ করবে না।

গ. নিম্নস্তর : মনে মর্মের উপস্থিতি ব্যতিরেকে শুধু মুখে উচ্চারণ করবে। একটি সম্ভাব্য চতুর্থ স্তরও রয়েছে। তা হলো, মনে বিশ্বাসের পর্যায়েও বিদ্যমান নেই, শুধু মুখে রটাতে থাকবে। এটি মূলত নিফাক বা কপটতা এবং এ অবস্থা ঈমানদারদের পরিসীমা বহির্ভূত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে যে, সাধারণ ও নগণ্য দুঃখকষ্ট ও অপছন্দনীয়তার ক্ষেত্রে তিনি বারবার এ বাক্য আবৃত্তি করতেন। তাঁর সাহাবীগণ (রা.) ও এরূপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। –[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

١٥٨. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ جَبَلَانِ بِمَكَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ أَعْلَامِ دِيْنِهِ جَمْعُ شَعِيْرَةٍ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ أَيْ تَلَبَّسَ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ فَلَا جُنَاحَ إِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ فِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ بِهِمَا بِأَنْ يَسْعٰى بَيْنَهُمَا سَبْعًا نَزَلَتْ لَمَّا كَرِهَ الْمُسْلِمُوْنَ ذٰلِكَ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ بِهِمَا وَعَلَيْهِمَا صَنَمَانِ يَمْسَحُوْنَهُمَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ فَرْضٍ لِمَا أَفَادَهُ رَفْعُ الْإِثْمِ مِنَ التَّخْيِيْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ رُكْنٌ وَبَيَّنَ ﷺ فَرْضِيَّتَهُ بِقَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ يَعْنِي الصَّفَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَتَشْدِيْدِ الطَّاءِ مَجْزُوْمًا وَفِيْهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِيْهَا خَيْرًا أَيْ بِخَيْرٍ أَيْ عَمَلٍ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافٍ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ لِعَمَلِهِ بِالْإِثَابَةِ عَلَيْهِ عَلِيْمٌ بِهِ.

অনুবাদ :

১৫৮. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া মক্কার দুটি পাহাড় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। [দেবদেবীর স্মরণিকা নিদর্শন নয়] شَعَائِرُ শব্দটি شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ তাঁর ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ। সুতরাং যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হজ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে অর্থাৎ হজ ও উমরার সাথে তার ইচ্ছা বিজড়িত করে এতদুভয়ের তওয়াফ করলে এ দুয়ের মাঝে সাত চক্কর দৌড়ালে তার কোনো অপরাধ পাপ নেই। يَطَّوَّفَ মূলত ছিল يَتَطَوَّفَ ; এর ط -এর মধ্যে ت -এর ادغام বা সন্ধি সূচিত হয়েছে। হজ ও উমরার আসল আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে ইচ্ছা করা ও জেয়ারত করা। মুসলিমগণ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী [দৌড়ানো] অপছন্দ করত। কারণ জাহিলি যুগে এতদুভয়ের মধ্যে [আসাফ ও নায়িলা নামক] দুটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সায়ী বা দৌড়ানো ও তওয়াফ করার সময় কাফিরগণ এ দুটিকে ভক্তিসহকারে স্পর্শ করত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফা ও মারওয়ার সায়ী ফরজ নয়। কেননা [এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে সাফা ও মারওয়ার তওয়াফে কোনো পাপ নেই] 'পাপ নেই' দ্বারা বান্দাকে এ বিষয়ে এখতিয়ার প্রদান করা বুঝায়। হযরত শাফেয়ী ও কতিপয় ইমাম এটাকে হজ ও উমরার অন্যতম 'রুকন' বা অবশ্য করণীয় বুনিয়াদ বলে মনে করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ওয়াজিব বা অবশ্য করণীয় হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে গেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী বা দৌড়ানো ফরজ করেছেন। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ যে স্থান হতে শুরু করেছেন অর্থাৎ সাফা তোমরাও সে স্থান হতে শুরু কর। এবং যে কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করবে تَطَوَّعَ ক্রিয়াটির ط مُشَدَّدٌ [তাশদীদযুক্ত ط] ও শেষে جَزْم যুক্ত রূপে ى সহ নাম পুরুষ একবচন বর্তমানকাল রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। এমতাবস্থায় ط অক্ষরটিতে ت -এর إِدْغَام বা সন্ধি সূচিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তওয়াফ ইত্যাদি যা তার উপর অবশ্য করণীয় নয় এমন কোনো কাজ করবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পুণ্যফল দান করে তার এই কার্যের মর্যাদা দেবেন। তিনি এতদসম্পর্কে অতি জ্ঞানবান।

خَيْرًا শব্দটি মূলত مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ কাসরা প্রদানকারী অক্ষরটি অপসারণের দরুন মানসূবরূপে ব্যবহৃত হয়েছে– এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এ স্থানে তাফসীরে بِخَيْرٍ -এর উল্লেখ করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

شَعَائِرُ : شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– চিহ্ন, আলামত। এ থেকেই شِعَار -এর ব্যবহার। أَعْلَامٌ : عَلَمٌ -এর বহুবচন। **অর্থ– চিহ্ন, নিদর্শন।** تَلَبَّسَ : বিজড়িত করল। اَلْحَجُّ : فِى الشَّرْعِ قَصْدُ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ لِأَدَاءِ الْمَنَاسِكِ **اَلْقَصْدُ : ইচ্ছা।** اَلزِّيَارَةُ : দর্শন। جُنَاحٌ : পাপ, إِثْمٌ : পাপ। جَنَحَ إِلَى كَذَا إِذَا مَالَ . اَلْجُنَاحُ الْمَيْلُ إِلَى الْإِثْمِ

يَسْعٰى : সাঈ করবে, দৌড়াবে। صَنَمَانِ : صَنَمٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ– মূর্তি।

يَمْسَحُوْنَ : স্পর্শ করত। مَسْحًا (ف) مَسَحَ অর্থ– স্পর্শ করা। اِبْدَؤُوْا : [শুরু কর] بِدَايَةً (ف) بَدَأَ অর্থ– শুরু করা।

اَلْإِثَابَةُ : ছওয়াব প্রদান করা, প্রতিদান দেওয়া।

قَوْلُهُ تَطَوَّعَ : ফরজ আমল ব্যতীত মানুষ স্বেচ্ছায় যেসব কাজ সম্পাদন করে তাকেই تَطَوُّعٌ [সেচ্ছা প্রণোদিত] বলা হয়।

قَوْلُهُ خَيْرًا : যে কোনো ভালোকে বুঝায়। এখানে خَيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য সব রকমের ইবাদত-আনুগত্য। আর এটাই অধিক **সমীচীন**। কেননা তা শব্দের ব্যাপকতার অনুকূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতের সাথে এ আয়াতের কয়েক দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে–

১. **ইতঃপূর্বে কা'বার** দিকে কিবলা পরিবর্তন ও কিবলাসমূহের মধ্যে কা'বার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ছিল। এবারে কা'বা যে হজ ও **উমরা পালনের** স্থান তা বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পূর্ণাঙ্গরূপে وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ -এর প্রত্যয়ন ও বিশ্লেষণ সাধিত হয়।

২. **এর আগে** ধৈর্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছিল। এবারে বলা হয়েছে যে, দেখ সাফা ও মারওয়া যে মহান আল্লাহর **নির্দশনাবলির** অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হজ ও উমরায় তার প্রদক্ষিণকে আবশ্যিক করা হয়েছে, তার কারণ তো এটাই যে, এ **কাজ হযরত** বিবি হাজেরা (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর ন্যায় পরম ধৈর্যশীলদ্বয়ের স্মৃতিবাহী। **হাদীস**, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে, যা দেখলে إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ -এর **সমর্থন পাওয়া যায়**।–[তাফসীরে উসমানী]

৩. **উপরে একটু** আগেই সবরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের বিবরণ দেওয়া হচ্ছিল। তার পরপরই হজের আলোচনা শুরু করাতে **সবর ও হজের** মাঝে একটি বিশেষ সংযোগ-সামঞ্জস্যও রয়েছে। কেননা হজ সম্পাদন ক্ষেত্রে নিত্য দিনের ভিড়-হাঙ্গামা, **টানাহ্যাঁচড়া**, লাগাতার সফর ও খণ্ডিত অবস্থান ইত্যাদি মিলিয়ে শুধু ফরজগুলো যথারীতি আদায় করে যাওয়াই একটি **কঠিন সংগ্রামতুল্য**। সুন্নত ও মোস্তাহাব তো কল্পনায়ই রেখে দিতে হয়। প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততায় উত্তেজনার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও জিহ্বা সংযত রাখুন, হাত-পা সামলে রাখুন, চোখ-কান নিয়ন্ত্রণে রাখুন। মোটকথা সবরের পরিপূর্ণ পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। –[তাফসীরে মাজেদী]

জালালাইনের হাশিয়াতে রয়েছে–

وَوَجْهُ ارْتِبَاطِ الْاٰيَةِ بِمَا قَبْلَهُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ لِأَنَّ فِيْهِمَا شَقَّ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ (ج ٢، ص ٢٣)

অর্থাৎ পূর্বে জিহাদের কথা আলোচিত হয়েছে এবার হজের আলোচনা করা হলো। কেননা উভয়টির মাঝেই জানমালের কষ্ট রয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ : সাফা ও মারওয়া এক সময় মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে দুটি ছোট পাহাড় ছিল। এখন তা শুধু পাথরখণ্ডরূপে সামান্য উঁচু রয়েছে। সাফা হরাম শরীফের ডানদিকে এবং মারওয়া বামদিকে অবস্থিত। এ দুটির মাঝে দূরত্ব হবে ৪৯৩ কদম বা প্রায় ৭ ফার্লং। সাফা শব্দের আভিধানিক অর্থ– পরিচ্ছন্ন পাথর বা নিরেট প্রস্তরখণ্ড বা পাথরের চাঁই। মারওয়া'র আভিধানিক অর্থ– সাদা বর্ণের কোমল পাথর।

سُمِّىَ الصَّفَا لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَيْهِ آدَمُ صَفِىُّ اللّٰهِ وَسُمِّىَ الْمَرْوَةُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَيْهِ امْرَأَةُ آدَمَ حَوَّاءُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . (حَاشِيَةُ جَلَالَيْن)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর দুধ খাওয়ার বয়সে মা হাজেরা (রা.) দুগ্ধপোষ্য শিশুকে একাকী ও পিপাসা-কাতর রেখে এ উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন যে, কোথাও কোনো কাফেলা দেখা গেলে তাদের নিকট হতে পানি পাওয়া যেতে পারে। এ সময় অস্থিরতার কারণে তিনি দৌড়ে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে চড়তেন, আবার সে পাহাড় থেকে এ পাহাড়ে চলে আসতেন যাতে পাহাড়ের উঁচু স্থান থেকে কোনো কাফেলা দৃষ্টিগোচর হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ شَعَائِرِ اللّٰهِ : شَعَائِرِ শব্দটি شَعِيْرَةٌ -এর একবচন। অর্থ- আলামত, চিহ্ন। شَعَائِرِ اللّٰهِ -আল্লাহর নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহর দীনের চিহ্ন ও নিদর্শনাদি। আল্লাহর দীনের সেসব আলামত, যা ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতীক সাব্যস্ত হতে পারে।
-[তাফসীরে মাজেদী]

আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় ঐ সমস্ত বস্তুকে شَعَائِرِ اللّٰهِ বলা হয় যার মাধ্যমে সাধারণত কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য নির্ণীত হয়। -[মা'আরিফুল কুরআন-১/২৫৩]

قَوْلُهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ **হজের বিধান :** হজ ইসলামি ইবাদত তালিকায় চতুর্থ স্তম্ভ। কিংবা সালাত, সাওম ও জাকাতের পরবর্তী চতুর্থ ফরজ। উম্মতের যে কোনো সদস্য, চাই সে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা হোক না কেন- আর্থিক সামর্থ্য, পথের নিরাপত্তা ও শরীরিক সামর্থ্যের শর্তে জীবনে একবার তার জন্যে হজ সম্পাদন ফরজ।

হজের আরকান অর্থাৎ হজের ফরজসমূহ তিনটি-

১. ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ হেরেমের পরিসীমায় প্রবেশের পূর্বে সাধারণ ব্যবহার্য পোশাক খুলে ফেলে ইহরাম বা হজের জন্যে বিশেষ ধরনের সেলাইবিহীন পোশাক পরিধান করা।
২. জিলহজ মাসের ৯ তারিখে আরাফা প্রান্তরে উপস্থিতি, যাকে পরিভাষায় বলা হয় উকূফ [অবস্থান] এবং
৩. তাওয়াফে যিয়ারত বা প্রধান তওয়াফ অর্থাৎ উকূফের পরে পবিত্র কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ বা তওয়াফ করা।

হজের ওয়াজিব ৫টি-

১. মুযদালিফায় অবস্থান করা অর্থাৎ আরাফার ময়দান থেকে মিনায় ফেরার পথে মুযদালিফা নামক স্থানে রাত্রি যাপন করা।
২. ১০, ১১ ও ১২ জিলহজে মিনায় অবস্থান করে কঙ্কর নিক্ষেপ, পরিভাষায় যাকে বলা হয় রাময়ুল জামারাত বা সংক্ষেপে রামী।
৩. মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা অর্থাৎ মিনায় শয়তানকে কঙ্কর মারার পর কুরবানি আদায় করে মাথার চুল মুণ্ডন করা।
৪. সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাঈ করা অর্থাৎ ১০ জিলহজ বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফে যিয়ারতের পর সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয় সাতবার সায়ী করা।
৫. কা'বা তওয়াফ [অর্থাৎ ফরজ তওয়াফের অতিরিক্ত বিদায়ী তওয়াফ পরিভাষায় যাকে বলা হয় তাওয়াফই সাদর]।

উমরার বিধান : 'উমরা' যার অপর নাম 'আল হাজ্জুল আসগার' বা ছোট হজ। এতে অবশ্য হজের ন্যায় মাস-তারিখের শর্ত নেই এবং আরাফার ময়দানে উকূফ, মুযদালিফায় অবস্থান, মিনা গমন ইত্যাদি নেই। বছরের যে কোনো মাসে এবং যে কোনো সময় উমরা পালন করা যায়। উমরার কার্যক্রম হচ্ছে হেরেমের বাইরে থেকে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর কা'বা ঘর তওয়াফ করবে এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করার পর মাথা কামিয়ে ফেলবে [বা চুল ছেঁটে ফেলবে]। এতেই উমরা সম্পাদিত হবে এবং ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারবে।

قَوْلُهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ : সাফা-মারওয়ার মূল সম্বন্ধ তো ছিল একত্ববাদের বিশিষ্টতম পরিবার অর্থাৎ হযরত হাজেরা, হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সঙ্গে। কিন্তু জাহেলিয়াতের যুগে এগুলোতেও মুশরিকরা অবৈধ দখল জমিয়েছিল এবং প্রতিটি পাহাড়ে এক একটি প্রতীক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তীর্থযাত্রায় গেলে দৌড়ে দৌড়ে এগুলোও স্পর্শ করত, চুমো খেত। প্রথম যুগের মুসলমান সাহাবীগণের হৃদয়ে শিরকের প্রতি ঘৃণা এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, স্বভাবতই তাদের মনে এরূপ আশঙ্কা দেখা দিল যে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে যাতায়াত করা আবার না শিরক ও অংশীবাদের পরিচায়ক হয়ে যায়। তাই তাঁরা সাফা-মারওয়া গমনে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

আয়াতে তাদের এ দ্বিধা বিদূরিত করার লক্ষ্যে ইরশাদ হয়েছে- এগুলো জাহিলি যুগের তো নয়-ই; বরং এগুলো প্রকৃত তাওহীদের নিদর্শন ও স্মরণিকা প্রতীক। সুতরাং এদের মাঝে যাতায়াতকে ইসলামি ও তাওহীদী হজের অঙ্গ সাব্যস্ত করা হলে তাতে কোনো প্রকারের ক্ষতি বা অন্যায় হবে না।

قَوْلُهُ يَطَّوَّفَ بِهِمَا সায়ী -এর বিধান : তওয়াফের মূল অর্থ হলো কোনো কিছুর চারদিক প্রদক্ষিণ করা ও চক্কর দেওয়া। [illegible] তবে সম্প্রসারিত অর্থরূপে কোনো কিছুর আশপাশে যাওয়াকেও তওয়াফ বলা যেতে [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

মাযহাব ও ইখতিলাফ : সাফা-মারওয়ার মধ্যকার এ সায়ী হানাফীদের মতে ওয়াজিব, ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে সুন্নত এবং মালেকী ও শাফেয়ীগণের মতে ফরজ। এ যাতায়াত হবে সাতবার। মাঝের কিছু দূরত্ব প্রায় দুই ফার্লং স্থান একটু দৌড়ে চলতে হয়। এজন্যই বিষয়টিকে সায়ী [দৌড়] নামে অভিহিত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী এ দূরত্বের পরিচিতি চিহ্নস্বরূপ সড়কের পাশে দুই প্রান্তে দুটি সবুজ বর্ণের ফলক স্থাপন করা হয়েছে। এক সময় এ স্থানটি ছিল অনাবাদি, এখন তো দস্তুরমতো বাজারে পরিণত হয়েছে এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে এখন সমাগম ও জীবনের স্পন্দন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী]

আয়াতের প্রকৃত মর্ম : বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) -এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا দ্বারা তো বোঝা যায়, সাফা-মারওয়ার সায়ী ওয়াজিব নয়। জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, ওহে আমার ভাগ্নে আয়াতের মর্ম এমন নয় যেমনটি তুমি বুঝেছ। যদি আয়াতের মর্ম এমনই হতো, তাহলে কুরআনের ইবারত এভাবে হতো– فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির জন্যে কোনো গুনাহ নেই যে সাফা-মাওয়ার সায়ী না করে।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াত আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। যার ঘটনা হলো, ইসলামের পূর্বে আনসারগণ 'মানাত' -এর পূজা করত। মুসলমান হওয়ার পর যখন সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করার হুকুম দেওয়া হলো তখন তারা কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতার কারণে মনে সংকোচবোধ করল। সে প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

মোটকথা আনসারদের সংকোচ ও দ্বিধা নিরসনের জন্যে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا বলা হয়েছে। এতে সাফা-মারওয়ার সায়ী বর্জনের অনুমতি দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। যদি তাই হতো তাহলে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا বলা হতো। অর্থাৎ لَا جُنَاحَ শব্দটি সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্জন করার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়নি।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) বলেন, এতদসত্ত্বেও যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, لَا جُنَاحَ শব্দটি শুধু اِبَاحَت -এর প্রতি দালালত করে, তাহলে তার মর্ম হলো আসাফ এবং নায়েলা তথা মূর্তি থাকাবস্থায়ও সাফা-মারওয়ার সায়ী করা জায়েজ। যেমন ধরুন, কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করল যে, কাপড়ে এক দিরহাম পরিমাণ নাপাকি লেগে থাকলে তা পরে নামাজ আদায় করা যাবে কিনা। তখন জবাব দেওয়া হবে– لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ اَنْ تُصَلِّيَ فِيْهِ অর্থাৎ এমন কাপড়ে নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। এখানে উক্ত ইবারত দ্বারা নিছক নামাজের اباحت বা বৈধতা এবং অনুমতি বুঝা যায় না; বরং কাপড়ে সামান্য নাপাকি লেগে থাকাবস্থায় নামাজ পড়ার অনুমতি বুঝা যায়। কেননা নামাজের বিধান তো পূর্ব থেকেই রয়েছে। অনুরূপভাবে মূল সায়ী তা পূর্ব থেকেই ওয়াজিব ছিল। এখন বলা হচ্ছে এতে মূর্তি থেকে থাকলেও সায়ী করা যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ২৫৪]

আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যে কোনো নেককাজ হোক এবং তার স্তর ও প্রকরণ যাই হোক মানুষ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে যা কিছু সম্পাদন করবে তার বিনিময় প্রতিদান সে পেয়েই যাবে।

قَوْلُهُ شَاكِرًا : শুকর শব্দ আল্লাহর দিকে প্রযোজ্য হলে তার অর্থ হবে এরূপ যে, তিনি বান্দার সামান্য মেহনতেও অনেক বেশি বিনিময় দিয়ে থাকেন।

(اَلشُّكْرُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُّعْطِيَ لِعَبْدِهٖ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُّهٗ بِشُكْرِ الْيَسِيْرِ وَ يُعْطِي الْكَثِيْرَ- مَعَالِم)

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষে শোকর হলো এই যে, তিনি বান্দাকে তার প্রাপ্যের ঊর্ধ্বে দান করেন এবং অল্পের বিনিময়ে অনেক দিয়ে দেন অর্থাৎ বান্দার নিয়ত সম্পর্কে তো তিনি অবহিত রয়েছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٥٩. وَنَزَلَ فِى الْيَهُوْدِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ النَّاسَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى كَاٰيَةِ الرَّجْمِ وَنَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ التَّوْرَاةِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ يُبْعِدُهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ اَلْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ كُلُّ شَىْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِاللَّعْنَةِ.

১৫৯. ইহুদিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে, আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি যেমন রাজম [ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা হত্যা] সম্পর্কিত আয়াত ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশংসা সংবলিত বিবরণাদি মানুষের জন্যে কিতাবে অর্থাৎ তাওরাতে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা লোকদের নিকট গোপন করে আল্লাহ তাদেরকে লানত করেন অর্থাৎ তাঁর রহমত হতে তাদেরকে বিদূরিত করে দেন এবং অভিশাপকারীগণও অর্থাৎ ফেরেশতা ও মু'মিনগণ বা প্রতিটি জিনিস তাদের লানতের বদদোয়া করে অভিশাপ দেয়।

١٦٠. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا رَجَعُوْا عَنْ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا عَمَلَهُمْ وَبَيَّنُوْا مَا كَتَمُوْهُ فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ اَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

১৬০. কিন্তু যারা তওবা করে তা হতে ফিরে আসে এবং নিজেদের কার্যকলাপ সংশোধন করে এবং যা গোপন করে রেখেছিল তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে এরাই তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমাপরবশ হই। অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল করি। আর আমি মু'মিনদের প্রতি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

١٦١. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ حَالٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اَىْ هُمْ مُسْتَحِقُّوْا ذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالنَّاسُ قِيْلَ عَامٌّ وَقِيْلَ الْمُؤْمِنُوْنَ.

১৬১. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয় وَهُمْ كُفَّارٌ এটা حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। তাদের উপর আল্লাহর ফেরেশতা এবং মানুষ সকলেরই অভিশাপ। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে তারা তারই যোগ্য হবে। কেউ কেউ বলেন اَلنَّاسِ [মানুষ] শব্দটি এ স্থলে عَام বা ব্যাপক। আর কেউ কেউ বলেন, এ শব্দটি দ্বারা এ স্থলে কেবল মু'মিনদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

١٦٢. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَىِ اللَّعْنَةِ اَوِ النَّارِ الْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ يُمْهَلُوْنَ لِتَوْبَةٍ اَوْ مَعْذِرَةٍ.

১৬২. তাতে অর্থাৎ লানতের মধ্যে বা লানত শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিতকৃত জাহান্নামের মধ্যে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি পলকমাত্র সময়ের জন্যেও লঘু করা হবে না আর তওবা করার জন্যে বা ওজর পেশ করার জন্যেও তাদেরকে বিরাম দেওয়া হবে না। অবকাশ দেওয়া হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

يَكْتُمُوْنَ : [গোপন করে] كَتَمَ (ن) كَتْمًا ـ كِتْمَانًا অর্থ– গোপন করা। اَلرَّجْمُ : পাথর দিয়ে আঘাত করা। مُسْتَحِقٌّ : ذٰلِكَ مُسْتَحِقُّوا -এর বহুবচন। অর্থ– অধিকারী, যোগ্য। اَلْمَدْلُوْلُ : ইঙ্গিতকৃত। خٰلِدِيْنَ : خُلُوْدٌ অর্থ– লেগে থাকা, জড়িয়ে থাকা অর্থাৎ সে শাস্তি ও লানত– চিরকাল তারা তাতেই পড়ে থাকবে। طَرْفَةَ عَيْنٍ : চোখের পলক। لَا يُنْظَرُوْنَ: সুযোগ দেওয়া হবে না। (اِفْعَال) اَنْظَرَ অর্থ– ঢিল দেওয়া, অবকাশ দেওয়া।

قَوْلُهُ اَيِ اللَّعْنَةَ اَوِ النَّارِ الْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا : এর দ্বারা فِيْهَا -এর مَرْجِعْ -এর ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা সব সময় থাকবে লানতে বা লানত দ্বারা ইঙ্গিতকৃত দোজখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র ও আলোচনা : পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ইহুদিরা হক তথা সত্যকে জানত ও চিনত– যেমনিভাবে পিতা সন্তানকে চিনে। এ চেনাজানার পরও তারা হক গোপন করত। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এখন এ আয়াতে তাদের সে কিতমানে হক বা সত্য গোপন করার ব্যাপারে সতর্কবাণী প্রদান করা হচ্ছে এবং তা থেকে তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমা ও রহমতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।

يَكْتُمُوْنَ : গোপন করে এবং এ সত্য গোপনও এত দুঃসাহসিকতার সাথে যে, তা শুধু নীরবতা অবলম্বন পর্যন্তই সীমিত থাকেনি; বরং সত্যের বিপরীত সাক্ষ্যদানে সদা প্রস্তুত। كِتْمَان স্বেচ্ছাকৃত ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে গোপন রাখাকে বলে। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে–

تَرْكُ اِظْهَارِ الشَّيْءِ قَصْدًا مَعَ مَسَاسِ الْحَاجَةِ اِلَيْهِ (روح)

অর্থাৎ كِتْمَان হলো ইচ্ছা করে কোনো কিছু গোপন করা তা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়া সত্ত্বেও।

قَوْلُهُ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ : লানতের তাৎপর্য :

* আল্লাহর লানত অর্থ– তিনি তাদের নিজ সান্নিধ্য হতে দূরে সরিয়ে দেন এবং দয়া-মেহেরবানিতে তাদের পরিত্যক্ত রাখেন। ইমাম রাগিব (র.) বলেন–

  وَ ذٰلِكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الْاٰخِرَةِ عُقُوْبَةٌ وَفِى الدُّنْيَا اِنْقِطَاعٌ عَنْ قُبُوْلِ رَحْمَتِهٖ وَتَوْفِيْقِهٖ ـ

  অর্থাৎ "আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আখিরাতে শাস্তি এবং দুনিয়ায় তাঁর রহমত ও তৌফিক [কল্যাণ উপকরণ] প্রাপ্তিতে বিচ্ছিন্নতা। –[রাগিব]
* সৃষ্ট জীবের লানত হলো, এ পাপাচারী দুর্ভাগাদের জন্যে বদদোয়া করা, তাদের জন্যে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকা ও তাঁর দয়া-করুণা থেকে বঞ্চিত থাকার প্রার্থনা করা । –[রুহুল মা'আনী ও রাগিব]

ফকীহগণ পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি আহরণ করেছেন যে, আলিমের জন্যে সত্য প্রচার [তাবলীগ] ও তাঁর জানা বিষয় অন্যদের পর্যন্ত পৌছে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

قَوْلُهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ اَيِ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ كُلُّ شَيْءٍ : আয়াতে লানতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু ও কীটপতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। মুফাসসির (র.) -এর وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ পরবর্তী اَلْمَلٰٓئِكَةُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ كُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ بِاللَّعْنَةِ এ ইবারত দ্বারা এমনটিই বুঝা যায়।

প্রত্যেকের লা'নত করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা লানত করেন এজন্য যে, সত্য গোপনকারীরা প্রকারান্তরে আল্লাহর মোকাবিলা করে থাকে। কেননা আল্লাহ চান হেদায়েতের বিস্তার করতে এবং মূর্খতা দূর করতে। আর ওরা চায় গোমরাহি ও মূর্খতার প্রসার ঘটাতে।

http://islamiboi.wordpress.com

ফেরেশতা, নবী এবং মু'মিনরা এজন্য লানত করে যে, তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা হলো বান্দাদের কাছে আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করা। আর এসব লোক তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করতে চায়।

আর তাদের সত্য গোপনের পরিণামে যখন দুনিয়ায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাকার বিপদাপদ নেমে আসে তখন পুরো প্রাণিজগৎ এমনকি জড়পদার্থের পর্যন্ত কষ্ট হয়। ফলে সকলেই তাদের উপর অভিশাপ দেয়।

–[কান্ধলভী : খ. ১, পৃ. ২৫৫, তাফসীরে উসমানী]

تَابُوْا তওবা করা কাজটির উদ্দেশ্য– ক. বিরত থাকা, খ. অনুতপ্ত হওয়া এবং গ. বর্জনের সংকল্প নিয়ে অনুনয়-বিনয় করা।

أَجْمَعِيْنَ শব্দটি দ্বারা বক্তব্যে জোর [তাকিদ] দেওয়া হয়েছে এবং এটি শুধু 'মানুষ' [اَلنَّاسُ] -এর সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং এর **সংযোগ রয়েছে আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ** এসব শব্দের সাথে। أَجْمَعِيْنَ পূর্বোল্লিখিত সকল শব্দের জন্যে 'তাকিদ', শুধু **اَلنَّاسُ শব্দের জন্য নয়। –[রূহুল মা'আনী]**

লানতের বিধান :

قَوْلُهُ وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ : 'কাফের অবস্থায় মারা গিয়েছে' এ কায়েদ বা সংযুক্তি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে উদ্ধৃত **লানতও সে সকল কাফিরের জন্য যারা** কাফির অবস্থায়ই মারা গিয়েছিল। কেননা মূল মানদণ্ড শেষ আমল ও মৃত্যুর সঙ্গে **জড়িত। সুতরাং যে কাফের কুফর** অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লানত করা বৈধ নয়। আর **আমাদের পক্ষে যেহেতু** কারো শেষ পরিণতির [মৃত্যুর] নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো উপায় নেই, সেহেতু **কোনো কাফেরের নাম** নিয়ে তার প্রতি লানত করাও জায়েজ নয়। আর রাসূল ﷺ যে সমস্ত কাফেরের নাম উল্লেখ করে **তার প্রতি লানত** করেছেন কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন।

লানতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাজুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো কাফেরের প্রতিও **লানত করা** বৈধ নয়, তখন কোনো মুসলমান কিংবা কোনো জীবজন্তুর উপর কেমন করে লানত করা যেতে পারে? তাই **আহলে সুন্নত** ওয়াল জামাতের মতে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো মু'মিন পাপী ব্যক্তিকে লানত করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। তবে কোনো **ব্যক্তিকে নির্ণীত** না করে অনির্দিষ্ট ও ব্যাপক শব্দে লানত করার বৈধতা রয়েছে। যথা– চোরকে অভিশাপ! সুনির্দিষ্ট পাপীকে **লানত করা জায়েজ** নয়, তবে অনির্ণীতরূপে পাপীদের জাতি-গোষ্ঠীকে লানত করা সকলের মতে বৈধ [ইবনুল আরাবী]। **বরং সহীহ** হাদীসে কোনো মু'মিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য বলা হয়েছে– لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ **"মু'মিনকে লানত** করা তাকে হত্যা করার ন্যায়" [ইবনুল আরাবী, মুসলিম শরীফের বরাতে]। যে মুসলমানরা তার কোনো **মুসলমান ভাইকে** কোনো অন্যায়-বিচ্যুতিতে লিপ্ত দেখামাত্র অবলীলায় লানত দিতে শুরু করে, তাদের এ আয়াত হতে শিক্ষা **গ্রহণ করা** বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ اَلْمَدْلُوْلِ بِهَا عَلَيْهَا : লানত দ্বারা ইঙ্গিতকৃত দোজখে। এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : فِيْهَا -এর مَرْجِع তো اَلنَّار হতে পারে না। কেননা পূর্বে তার কোনো উল্লেখ নেই। অন্যথায় اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ সাব্যস্ত হবে।

উত্তর : যদিও শব্দটি প্রকাশ্যে উল্লেখ নেই, তবে অন্য শব্দের অধীনে উল্লেখ হয়েছে। কারণ اَللَّعْنَةُ শব্দটি اَلنَّارُ বোঝায় অর্থাৎ যারা চিরতরে অভিশপ্ত হওয়ার যোগ্য তাদের জন্যে দোজখ অবধারিত। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ : 'লঘু করা'র ব্যাপারটি আজাব শুরু হয়ে যাওয়ার পরের। আর সুযোগ-অবকাশের ক্ষেত্র আজাব শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। অর্থাৎ দোজখে নিপতিত হওয়ার পরে তাদের আজাবের প্রচণ্ডতা বিন্দুমাত্র শিথিল করা হবে না এবং আজাবে নিপতিত হওয়ার আগেও তারা কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অবকাশ পাবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٦٣. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا صِفْ لَنَا رَبَّكَ وَاِلٰهُكُمْ اَيِ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا نَظِيْرَ لَهُ فِيْ ذَاتِهِ وَلَا فِيْ صِفَاتِهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

১৬৩. তারা [আরব মুশরিকগণ] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল, আমাদেরকে আপনার প্রভুর পরিচয় বর্ণনা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমাদের ইলাহ অর্থাৎ তোমাদের ইবাদতের উপযুক্ত সত্তা তিনিই এক ইলাহ তাঁর সত্তা ও গুণের কোনো নজির কোনো তুলনা নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই তিনি অতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

١٦٤. وَطَلَبُوْا اٰيَةً عَلٰى ذٰلِكَ فَنَزَلَ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالذَّهَابِ وَالْمَجِيْءِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالْفُلْكِ السُّفُنِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ وَلَا تَرْسُبُ مُوْقَرَةً بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ التِّجَارَاتِ وَالْحَمْلِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ مَطَرٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا يُبْسِهَا وَبَثَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ بِهِ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ لِاَنَّهُمْ يَنْمُوْنَ بِالْخِصْبِ الْكَائِنِ عَنْهُ وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ تَقْلِيْبِهَا جَنُوْبًا وَّشِمَالًا حَارَّةً وَّبَارِدَةً وَّالسَّحَابِ الْغَيْمِ الْمُسَخَّرِ الْمُذَلَّلِ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَسِيْرُ اِلٰى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ بِلَا عِلَاقَةٍ لَاٰيٰتٍ دَالَّاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

১৬৪. এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ আল্লাহর **ক্ষমতা ও গুণাবলি** সম্পর্কে তারা প্রমাণ দাবি **করলে তিনি নাজিল** করেন– আকাশমণ্ডলী ও **পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের** অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহের **সৃষ্টিতে, আগমন-নির্গমন,** বৃদ্ধি ও হ্রাস ইত্যাদির **মাধ্যমে দিবস** ও রাত্রির পরিবর্তনে, ব্যবসায় ও **পরিবহন সংক্রান্ত** যা মানুষের হিত সাধন করে **তা সহ সমুদ্রে** বিচরণশীল জলযানসমূহে **নৌকা ইত্যাদিতে যা** বোঝায় ভারি হওয়া সত্ত্বেও নীচে তলিয়ে **যায়** না এবং আকাশ হতে **আল্লাহ** যে বারি **বৃষ্টি** বর্ষণ করেন তাতে, **অনন্তর তিনি এর মাধ্যমে** ধরিত্রীকে মৃত্যুর পর **বিশুষ্ক হয়ে যাওয়ার** পর বৃক্ষলতাদি দ্বারা **পুনরুজ্জীবিত করেন** এবং তাতে উহার মধ্যে যে **তিনি সকল প্রকার** জীবজন্তু বিস্তার করে রেখেছেন **ইতস্তত ছড়িয়ে** রেখেছেন তাতে, কেননা আকাশ **হতে বর্ষিত** বারির মাধ্যমে সৃষ্ট শ্যামল ফলনের **সাহায্যেই** এ সকল জীবজন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; বায়ুর **দিক পরিবর্তনে,** উত্তর-দক্ষিণ, উষ্ম-শীতল ইত্যাদি রূপে এর ঘূর্ণনে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে কোনোরূপ কীলক ও বন্ধন ব্যতিরেকে বিদ্যমান অনুগত আল্লাহর নির্দেশের বাধ্য মেঘ পুঞ্জে, বারি-রাশিতে; আল্লাহ তা'আলা যেদিকে **ইচ্ছা** করেন সেদিকেই তা ভেসে যায়, জ্ঞানবান জাতির জন্যে অর্থাৎ চিন্তাশীল জাতির জন্যে আল্লাহ তা'আলার একত্বের নিদর্শন প্রমাণ রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

صِفْ : বর্ণনা কর, আলোচনা কর। وَصْفٌ (ض) وَصَفَ থেকে أَمْر-এর সীগাহ। اَىْ اُذْكُرْ اَوْصَافَ رَبِّكَ - نَظِيْرٌ : বহুবচন نُظَرَاءُ অর্থ– তুল্য। ذَاتٌ : বহুবচন ذَوَاتٌ অর্থ– সত্তা। صِفَاتٌ : صِفَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গুণ।
اَلْعَجَائِبُ : عَجِيْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ– আশ্চর্যকর বিষয়।
اِخْتِلَافٌ : বিভিন্ন, পরিবর্তন। اَلذَّهَابُ : যাওয়া– ذَهَبَ (ف) ذَهَابًا - اَلْمَجِيْئُ : আসা। جَاءَ يَجِيْئُ (ض) -
اَلْفُلْكُ : এটি একবচন এবং বহুবচন উভয়টি হতে পারে। একবচন হলো قُفْلٌ-এর ওযনে, আর বহুবচন হলো اُسْدٌ-এর ওযনে। অর্থ– জাহাজ। لَا تَرْسُبُ : (ن، لا) رَسَبَ ডুবে যাওয়া।
مُوَقَّرَةٌ : এটি بَاب تَفْعِيْل থেকে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ। تَوْقِيْرٌ - وَقْرٌ অর্থ– বোঝাই করা, ভারী করা। يَبِسَ : শুষ্ক।
بَثَّ : বিস্তার করেছে। فَرَّقَ : ছড়িয়ে দিয়েছে। دَابَّةٌ : অভিধানে دَابَّةٌ বলা হয়– كُلُّ مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ যা জমিনে বিচরণ করে। يَنْمُوْ : বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বড় হয়। نَمَا (ن) نُمُوًّا نَمَى অর্থ– বৃদ্ধি হওয়া।
اَلْخِصْبُ : (بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُوْنِ الصَّادِ) সবুজ ঘাসের আধিক্য, উর্বরতা। تَقْلِيْبٌ : পরিবর্তন।
اَلْغَيْمُ : মেঘ। عِلَاقَةٌ : সম্পর্ক।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ الخ-এর তারকীব : اِنَّ হরফুল মুসাব্বাহ বিল'ফেল فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ এটি كَائِنَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে اِنَّ-এর خَبَر مُقَدَّم আর لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ তার اِسْم مُؤَخَّر।
قَوْلُهُ مِنَ التِّجَارَةِ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِمَا يَنْفَعُ-এর মাঝে مَا শব্দটি مَوْصُوْلَة হিসেবে ব্যবহৃত। কেউ কেউ مَا শব্দটিকে مَصْدَرِيَّة হিসেবেও ধরে তার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন– اَىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنَفْعِ النَّاسِ –[জামালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : মুফাসসির (র.) وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا বলে আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো, একবার কুরাইশের কাফেররা রাসূল ﷺ-কে বলেছিল– يَا مُحَمَّدُ صِفْ لَنَا رَبَّكَ وَانْسُبْهُ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! তোমরা রবের গুণাবলি ও বংশধারা বর্ণনা কর।' তখন এ আয়াত এবং সূরা ইখলাস নাজিল হয়।

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে রিসালাত প্রমাণিত করা হয়েছে। এ আয়াতে তাওহীদ প্রমাণিত করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ : শুরুর وَاو টি عَاطِفَة তার عَطْف হয়েছে اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الخ-এর সাথে। আর وَاِلٰهُكُمْ-এর মাঝে সম্বোধন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। শানে নুযূলের সাথে সীমাবদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ : অর্থাৎ এখানে اِلٰهٌ শব্দটি كُمْ-এর দিকে اِضَافَتْ হওয়াটা وُقُوْع বা সে সময়ের অবস্থা হিসেবে নয় বরং اِسْتِحْقَاق বা অধিকারী ও যোগ্য হিসেবে। অর্থাৎ ইবাদতের যোগ্য উপাস্য একজনই। যদিও ভ্রান্ত ইলাহ হাজারটা থাকুক।

قَوْلُهُ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ **তাওহীদের মর্মার্থ :** এ আয়াতে বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। যথা– **প্রথমত** তিনি একক, সমগ্র বিশ্বের না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোনো সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ অংশীবিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোনো কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন যখন কোনো কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র সত্তা যাঁকে وَاحِد বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِد শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, মুফতি শফী (র.)]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَطَلَبُوْا آيَةً عَلَى الخ তাওহীদের **বাস্তব প্রমাণাদি :** মুশরিকদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার সিফত বা **গুণাবলির** দাবির জবাবে যখন আল্লাহ তা'আলা وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ নাজিল করেন তখন আরবের মুশরিকরা যেহেতু নিজেদের **বিশ্বাসের** পরিপন্থি ঘোষণা শুনল, তাই বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল– সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবি যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তারই প্রমাণ **পেশ করে** কুরআনে নাজিল করেন– إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। যেমন– আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন **তাঁরই** ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এ একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে **আল্লাহ তা'আলা** এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, তরল ও প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর **লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট** বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল **করে তোলার** জন্যে বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই **ইঙ্গিত করে যে,** এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না **হলে যেমন** এ কাজটি সম্ভব হতো না তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারত না, এগুলোর **পক্ষে সুদীর্ঘ পথ** অতিক্রম করারও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কুরআনে হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে–

إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ.

অর্থাৎ "আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর **পৃষ্ঠে ঠায় দাঁড়িয়ে** যাবে।"

قَوْلُهُ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ : শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের **মালামাল অন্য দেশে** আমদানি-রপ্তানি করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ **উপকারিতার** ভিত্তিতেই যুগে যুগে দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনো কিছুর ক্ষতিসাধিত না **হয়।** যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোনো মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত **না। অতঃপর পানি** বর্ষণের পর ভূপৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, **তোমাদের সবাই** নিজ নিজ প্রয়োজন মতো ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথক**ভাবে কি সে ব্যবস্থা** করতে পারত? আর কোনোক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন **করে রক্ষা করত?** কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– فَأَسْكَنّٰهُ فِي الْأَرْضِ، وَإِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ অর্থাৎ "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত **করেই নিঃশেষ করে** দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীবজন্তুর জন্যে কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত **করেছেন, আবার** কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক **ফল্গুধারা সমগ্র জমিনে** বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনোস্থানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এ **পানিরই একটা অংশকে** জমাট-বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট **হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে** একান্ত সংরক্ষিত, অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝরনাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। **সারকথা, উল্লিখিত** আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তাওহীদ বা **একত্ববাদই প্রমাণ করা** হয়েছে। –[মা'আরিফ]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ : আকাশ হোক কিংবা পৃথিবী– সব মাখলুক সৃষ্টিই হবে; অসৃষ্ট বা স্বগত স্বয়ং সত্তাবান এদের কোনোটিই নয়। মুশরিক পৌত্তলিকরা এগুলোকে পূজ্য সাব্যস্ত করেছে এবং ক্ষমতাধর ও প্রয়োজন নির্বাহী দেবদেবীর মর্যাদা দিয়ে এগুলোর পূজা-অর্চনা করেছে। পবিত্র কুরআন 'সৃষ্টি' শব্দ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, এসব অস্তিত্ববান বিষয় যতই বিরাট-বিশালকায় হোক না কেন, এগুলোও সৃষ্টি জগতের অণুপরমাণুবৎ সৃষ্টি মাত্র 'আকাশ দেবতা' 'ধরিত্রী মাতা' ইত্যাদি শ্রেণির শব্দ শুধু অর্থহীন ধ্বনি মাত্র। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ : পৃথিবীতে এমন অংশীবাদীদের অস্তিত্ব ও ছিল, যারা দিন ও রাতকে প্রাণধারী, ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী বিশ্বাস করে এগুলোকেও দেবদেবীর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং এসবের পূজা করেছে। এখানে এগুলোর পরিবর্তন ও হ্রাসবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের অসৃষ্ট বা স্বগত সৃষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, সময় ও কালের এ নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন খণ্ডগুলো তো নিজেদের আন্দোলন-সঞ্চালনের ক্ষমতাও রাখে না, সার্বিক ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সত্তাই রাতদিনকে আবর্তিত করেন

قَوْلُهُ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ : فُلْك এ শব্দটির مُذَكَّر ও مُؤَنَّث এবং مُفْرَد ও جَمْع একই রূপে ব্যবহৃত হয়। একবচনে مُذَكَّر এবং বহুবচনে مُؤَنَّث হিসেবে ধর্তব্য। কেননা আয়াতে الَّتِىْ تَجْرِىْ তার সিফত হয়েছে, যা مُؤَنَّث,

হযরত মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) বলেন, উপমহাদেশে প্রথম প্রথম রেলগাড়ি চলতে শুরু করলে গ্রামাঞ্চলে এটিরও পূজা শুরু হয়ে গেল এবং অনেক 'সরল বিশ্বাসী' মুশরিক তাদের দেবতাদের তালিকায় 'ইঞ্জিন দেবতা' নামে নতুন এক দেবতার নাম সংযোজিত করল। সুতরাং কল্পনা পূজারীরা যে কোনো এক সময় পালের জাহাজ বা বাষ্পীয় জাহাজেরও পূজা করে থাকবে, তাদের আর বিস্ময়ের কি আছে? فُلْك -এর ব্যাপকতা স্টিমার, লঞ্চ, সীট্রাক ইত্যাদি ছোট বড় সব জাহাজ এবং সাবমেরিন ও ডেস্ট্রয়ার ধরনের সামরিক জাহাজ, মোটকথা সব ধরনের নৌযানকে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমানে বিদ্যমান, ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কার সম্ভাব্য সামরিক যান হোক কিংবা বাণিজ্যিক পোত বা বিনোদ-তরি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ : এ গুণটি সব কিছুতে সম্মিলিত ও পরিব্যাপ্ত মানুষের জন্যে উপকারী এর ব্যাপ্তির প্রসারতা লক্ষণীয়। মানুষের জন্য উপকারী ও কল্যাণকর হওয়ার সম্ভবনাময় সব কিছু এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্য সব উপায়-উপকরণ যা তাদের ধনসম্পদের কার্যকারিতা বর্ধায় এ ধরনের উপকারী সব কিছুই ..। –[কুরতুবী]

কুরআন সর্বব্যাপী হওয়ার প্রমাণ : আল্লামা কুরতুবী (র.) আরো লিখেছেন, এক সমালোচক প্রশ্ন করে বসল, কুরআনের সর্বব্যাপী হওয়ার দাবি করা হয়ে থাকে, তবে তাতে লবণ, মরিচ ইত্যাদি স্বাদব্যঞ্জক মসল্লার কথা কোথায় রয়েছে? এর জবাব হলো এই যে, যা মানুষের জন্যে উপকারী, এর ব্যাপ্তি এ ধরনের সব কিছুকে শামিল করে।

قَوْلُهُ دَابَّةٍ : ব্যাপকভাবে সব ধরনের জীবজন্তুকে বুঝায়। ইতিহাসের সকল যুগেই জীবজন্তুর পূজা অংশীবাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে চলমান রয়েছে। ব্যবিলন, মিসর, ভারত ও অন্যান্য পৌত্তলিক দেশে গরু [গো-মাতা], বানর, হনুমান, বিড়াল, সাপ ও কচ্ছপ ইত্যাদির পূজা সর্বকালেই হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ -এর মাঝে মহান আল্লাহর সত্তার একত্ব আর اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -এর মাঝে তাঁর গুণাবলির একত্ব এবং خَلْقِ السَّمٰوٰتِ -এর মাঝে তাঁর কর্মগত একত্ব প্রমাণিত হলো। ফলে মুশরিকদের সন্দেহাবলির সম্পূর্ণ নিরসন হয়ে গেছে। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

١٦٥. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ اَنْدَادًا اَصْنَامًا يُحِبُّوْنَهُمْ
بِالتَّعْظِيْمِ وَالْخُضُوْعِ كَحُبِّ اللّٰهِ اَىْ
كَحُبِّهِمْ لَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ
مِنْ حُبِّهِمْ لِلْاَنْدَادِ لِاَنَّهُمْ لَا يَعْدِلُوْنَ
عَنْهُ بِحَالٍ مَّا وَالْكُفَّارُ يَعْدِلُوْنَ فِى
الشِّدَّةِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْ تَرٰى تَبْصُرُ يَا
مُحَمَّدُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِاتِّخَاذِ الْاَنْدَادِ
اِذْ يَرَوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ
يُبْصِرُوْنَ الْعَذَابَ لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا
وَاِذْ بِمَعْنٰى اِذَا اَنَّ اَىْ لِاَنَّ الْقُوَّةَ الْقُدْرَةَ
وَالْغَلَبَةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا حَالٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعَذَابِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يَرٰى
بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ فِيْهِ قِيْلَ
ضَمِيْرُ السَّامِعِ وَقِيْلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
فَهِىَ بِمَعْنٰى يَعْلَمُ وَاَنَّ وَمَا بَعْدَهَا
سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ وَجَوَابُ لَوْ
مَحْذُوْفٌ وَالْمَعْنٰى لَوْ عَلِمُوْا فِى
الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْقُدْرَةَ لِلّٰهِ
وَحْدَهٗ وَقْتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهٗ وَهُوَ يَوْمُ
الْقِيٰمَةِ لَمَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَنْدَادًا .

অনুবাদ :

১৬৫ লোকদের মধ্যে কেউ কেউ এমন যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে শরিকরূপে প্রতিমারূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার মতো তাদেরকেও তারা সম্মান ও বিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে ভালোবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রতিমাসমূহের প্রতি তাদের ভালোবাসার তুলনায় অধিক দৃঢ়। কেননা মু'মিনগণ কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুর দিকে মুখ ফিরায় না, পক্ষান্তরে মুশরিকগণ বিপদে পড়লে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। প্রতিমাসমূহকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে গ্রহণ করে যারা সীমালঙ্ঘন করেছে হে মুহাম্মদ! আপনি যদি তাদেরকে সেই সময় দেখতেন, তাদের অবস্থা অবলোকন করতেন যে সময় তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, اِذْ يَرَوْنَ -এর اِذْ শব্দটি এ স্থলে اِذَا অর্থাৎ ظَرْفِيَّة বা কালাধিকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর يَرَوْنَ ক্রিয়াটি بِنَاء لِلْفَاعِل অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য এবং بِنَاء لِلْمَفْعُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য, উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তা অবলোকন করবে তবে সাংঘাতিক এক বিষয় প্রত্যক্ষ করতেন। যে, اَنَّ الْقُوَّةَ শব্দটি এ স্থানে হেতুবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এর তাফসীরে لِاَنَّ [কেননা যে,] উল্লেখ করেছেন। কেননা যে, নিশ্চয় সকল শক্তি ক্ষমতা ও বিজয় আল্লাহরই, جَمِيْعًا শব্দটি এ স্থলে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

تَرٰى ক্রিয়াপদটি অপর এক পাঠে يَرٰى অর্থাৎ নামপুরুষ ও একবচনরূপে ব্যবহৃত রয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ কেউ বলেন, এর কর্তা হলো এতে বিদ্যমান هُوَ সর্বনাম; যার মর্ম হলো– প্রত্যেক শ্রোতা বা পাঠক।

আর কেউ কেউ বলেন এর কর্তা হলো اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ; তখন এ ক্রিয়াটি يَعْلَمُ [জানত] অর্থে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে এবং اَنَّ ও তৎপরবর্তী শব্দাবলি এর দুটি مَفْعُوْل বা কর্মপদের স্থলাভিষিক্ত বলে ধরা হবে। আর শর্তবাচক শব্দ لَوْ -এর জওয়াব এ স্থানে উহ্য বলে গণ্য হবে।

সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে– তারা যদি দুনিয়ায় এ কথা জানত যে, আল্লাহর আজাব অতি কঠোর এবং সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই যেমন এটা প্রত্যক্ষ করার সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা বাস্তবভাবে জানতে পারবে তবে তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকেই শরিক বলে গ্রহণ করত না।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

أَنْدَادٌ : نِدٌّ -এর বহুবচন। অর্থ– সমকক্ষ। اَلْخُضُوْعُ : নত হওয়া। لَا يَعْدِلُوْنَ عَنْهُ : তার থেকে ফিরে না।

بِحَالٍ مَّا : কোনো সময়ই। اَلْغَلَبَةُ : বিজয়। مُعَايَنَةٌ : প্রত্যক্ষ করা।

سُدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ : অর্থাৎ يَرَى হলো اَفْعَالُ قُلُوْبُ অর اَفْعَالُ قُلُوْبُ -এর জন্য যেহেতু দুটি মাফউল দরকার। **এজন্য মুফাসসির (রা.)** বলেন, প্রথম اَنَّ তার مَعْمُوْلٌ সহ এবং দ্বিতীয় اَنَّ তার مَعْمُوْلٌ সহ দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَى : প্রশ্ন. ১. لَوْ تَرَى এবং إِذْ মাযীর শুরুতে আসে, অথচ এখানে মুযারের শুরুতে এসেছে এর কারণ কি?

উত্তর. إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ-এর মধ্যে বাস্তব দর্শন ঘটা যেহেতু নিশ্চিত বিষয় এ কারণে মুযারের শুরুতে إذ আনা হয়েছে, যাতে **মাযীর তাবিলে হয়ে** নিশ্চিত বাস্তবায়ন বুঝায়। –[জামালাইন]

প্রশ্ন.২. তাহলে মুযারের স্থলে মাযীর সীগাহ আনা উচিত ছিল যাতে প্রকৃতভাবে নিশ্চিত বাস্তবায়ন বুঝায়?

উত্তর. দর্শন যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে তথা কিয়ামতের দিন ঘটবে, এ কারণে মুযারের সীগাহ দ্বারা সেদিক ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ : এ শব্দটুকু উল্লেখ করে جَوَاب مَحْذُوْف তথা رَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيْمًا -এর تَعْلِيْل বা কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ : قَوْلُهُ حَالٌ اَىْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ الْمُسْتَكِنِّ فِى الْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ الْوَاقِعِ خَبَرً لِأَنَّ تَقْدِيْرَهُ اَنَّ الْقُوَّةَ كَائِنَةٌ لِلّٰهِ جَمِيْعًا (مِنَ الْكَرْخِى)

قَوْلُهُ فَهِىَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ : অর্থাৎ يَرَى -এর ফায়েল اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا হলে এটি يَعْلَمُ -এর অর্থে হবে। কেননা জালেমদের **জন্যে আল্লাহর আজাবের** প্রচণ্ডতা দুনিয়ায় স্বচক্ষে দেখা সম্ভব নয়, কেননা আজাবের বাস্তবায়ন ঘটবে পরকালে। অতএব **এখানে দেখা দ্বারা** আত্মিকভাবে দেখা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে শিরকের কারণে প্রাপ্য আজাবের ভয়াবহতা ও প্রচণ্ডতার বিবরণ ছিল। এ আয়াতে সে **প্রচণ্ডতার** كَيْفِيَّتْ বা ধরন বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْدَادًا : এটি نِدٌّ -এর বহুবচন। সাধারণত اَنْدَادٌ দ্বারা মূর্তি, প্রতিমা ও দেবদেবী উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেগুলোর তারা **পূজা করত। এর** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূর্তি। এটাই কুরআনের বহুল ব্যবহৃত অর্থ এবং হযরত কাতাদা, মুজাহিদ প্রমুখ **অধিকাংশ মুফাসসিরের** অভিমতরূপে উদ্ধৃত। –[রূহুল মা'আনী] অনেকে সর্দার, নেতা ও গোত্র-সম্প্রদায়ের পুরোধাদেরও **উদ্দেশ্য বলেছেন।** অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যাদের তারা প্রভুতুল্য আনুগত্য করত। **–[রূহুল মা'আনী]** তৃতীয় একটি ব্যাপকতা সমৃদ্ধ অভিমত হলো, শব্দ তার ব্যাপ্তিতে অন্তরে প্রতিপত্তি বিস্তারকারী আল্লাহ **ব্যতীত অন্য সব** কিছুকে বলা হবে। ইমাম রাযী (র.) এ অভিমতটি সূফী ও আধ্যাত্মবাদীদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। **চতুর্থ অভিমত সূফী** ও আরিফগণের। তা হলো, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুতে তোমরা মন নিমগ্ন করলে, তাতে তুমি আল্লাহর **শরিক ও সমকক্ষ** সাব্যস্ত করলে। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ : অর্থাৎ তারা কেবল কথা ও শাখাগত কর্মেই তাদেরকে মহান আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করে না; **বরং হৃদয়ের ভালোবাসা**, যা কিনা সমুদয় কর্মের উৎসস্থল, সেখানে পর্যন্ত শিরক ও সমকক্ষতার শিকড় পৌঁছে গেছে। আর **তা শিরকের উচ্চস্তর**। কর্মগত শিরক তো তার সেবক ও অধীন মাত্র। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

আজও খ্রিস্টান জগতের আকর্ষণ ও ভালোবাসা আল্লাহকে ছেড়ে 'ঈশ্বরের পুত্র', 'রূহুল কুদুস' [পবিত্রাত্মা] ও 'কুমারী মেরী'র প্রতি অধিক। ওদিকে হিন্দুদের পক্ষপাতিত্ব ও প্রেম তাদের ঈশ্বর ও পরমাত্মার চেয়ে দুর্গা দেবী, লক্ষী দেবী, অগ্নি দেবতা ইত্যাদি দেবীর সঙ্গে এবং ঋষি মুনি ও সাধুদের সঙ্গে অনেক অধিক হারে লক্ষণীয়।

كَحُبِّ اللّٰهِ বলে একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ ভালোবাসা সরাসরি নিষিদ্ধ নয়; বরং মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি ভালোবাসাকে স্বভাবজাত স্তরে রেখে দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ শরিয়তের ইমামগণ, তরীকতের পীর-মুরশিদগণ [এবং শায়খ উস্তাদগণ] -এর প্রতি ভালোবাসাও মোস্তাহাব বরং একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত ওয়াজিব। কিন্তু প্রিয়জন ও প্রেমাস্পদকে স্রষ্টার স্তরে উন্নীত করা পর্যায়ের ভালোবাসা হারাম। 'ইয়া আলী', 'ইয়া হুসাইন', 'ইয়া খাজা', 'ইয়া গাওছ', 'ইয়া ওয়ারিছ' ইত্যাদি শ্লোগানের ভক্তির অর্ঘ্য প্রকাশকারীরা একটু নিজেদের মনের গভীরে তলিয়ে দেখবেন– ভালোবাসার কতটুকু আল্লাহর জন্যে অবশিষ্ট রেখেছেন, আর কতখানি গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদিত করে ছেড়েছেন।

قَوْلُهُ اَیْ كَحُبِّهِمْ لَهُ : এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. يُحِبُّوْنَ الْاَصْنَامَ كَمَا يُحِبُّوْنَ اللّٰهَ يَعْنِىْ يُسَوُّوْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فِىْ مَحَبَّتِهِمْ لِاَنَّهُمْ يُقِرُّوْنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ তারা মূর্তিকে ভালোবাসে যেমনিভাবে আল্লাহকে ভালোবাসে।

২. يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰهَ অর্থাৎ মু'মিনরা আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসে তারা মূর্তিকে সেভাবে ভালোবাসে।

–[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ : দেবদেবীর প্রতি মুশরিকদের যে ভালোবাসা– মহান আল্লাহর প্রতি মু'মিনগণের ভালোবাসা তার চেয়ে অনেক বেশি ও সুদৃঢ়। কেননা পার্থিব বিপদ-আপদে মুশরিকদের সে ভালোবাসা অনেক সময়ই দূরীভূত হয়ে যায়, আর আখেরাতের আজাব দেখে তো তারা নিজেদেরকে দেবদেবীর ভালোবাসা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং তাদের প্রতি নিজেদের ঘৃণাই প্রকাশ করবে, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণের অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সুখে-দুঃখে, সুস্থকালে-অসুস্থাবস্থায়, দুনিয়ায়-আখেরাতে সর্বদা অটুট ও একই রকম বিরাজমান। এমনকি মহান আল্লাহর প্রতি মু'মিনগণের যে ভালোবাসা তা নবী, ওলী, ফেরেশতা, বুযুর্গানে দীন, আলিম-ওলামা, বাপ-দাদা, সন্তানসন্ততি, ধনসম্পদ তথা মহান আল্লাহ ভিন্ন আর যা কিছুকে তারা ভালোবাসে তারও অধিক। কারণ মহান আল্লাহর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসা মৌলিক ও প্রত্যক্ষ, কিন্তু অন্যদের প্রতি তাদের ভালবাসা পরোক্ষ। মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তারা সব কিছুকে নির্দিষ্ট পরিমাপে ভালোবাসে। সে ভালোবাসায় তারতম্য না করলে ধর্মদ্রোহিতারই পরিচায়ক হবে। আল্লাহ তা'আলা ও গায়রুল্লাহর ভালোবাসাকে বরাবর সাব্যস্ত করা, তা সে গায়রুল্লাহ যেই হোক না কেন এটা মুশরিকদেরই কাজ। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٦٦. اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا اَيِ الرُّؤَسَاءُ مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا اَيْ اَنْكَرُوْا اِضْلَالَهُمْ وَقَدْ رَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ عَطْفٌ عَلٰى تَبَرَّأَ بِهِمْ عَنْهُمُ الْاَسْبَابُ الْوُصَلُ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاَرْحَامِ وَالْمَوَدَّةِ.

১৬৬. যখন অনুসৃতগণ تَبَرَّءَ اِذْ-এর اِذْ শব্দটি এস্থলে পূর্ববর্তী اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ-এর اِذْ হতে بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। অর্থাৎ নেতাগণ অনুসারীগণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করবে অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার অভিযোগ তারা অস্বীকার করবে আর অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং সকল সম্পর্ক অর্থাৎ আত্মীয়তা ও ভালোবাসার যে সম্পর্ক দুনিয়ায় তাদের পরস্পরে ছিল তা ছিন্ন হয়ে পড়বে।

وَرَاَوُا الْعَذَابَ বাক্যটি حَالِيَّة বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এর পূর্বে قَدْ শব্দটি ব্যবহার করেছে।

وَتَقَطَّعَتْ এটার تَبَرَّأَهُمْ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয় সংঘটিত হয়েছে। بِهِمْ -এর ب শব্দটি عَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করে بِهِمْ -এর তাফসীর عَنْهُمْ করা হয়েছে।

١٦٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً رَجْعَةً اِلَى الدُّنْيَا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ اَيِ الْمَتْبُوْعِيْنَ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا الْيَوْمَ وَلَوْ لِلتَّمَنِّيْ وَفَنَتَبَرَّأَ جَوَابُهُ كَذٰلِكَ كَمَا اَرَاهُمْ شِدَّةَ عَذَابِهِ وَتَبَرِّيْ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمُ السَّيِّئَةَ حَسَرٰتٍ حَالٌ نَدَامَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ دُخُوْلِهَا.

১৬৭. এবং যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে– হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত অর্থাৎ দুনিয়ায় পুনরাবর্তন হতো তবে আমরাও তাদের অর্থাৎ অনুসৃতদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আজ আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।

لَوْ اَنَّ لَنَا-এর لَوْ শব্দটি تَمَنِّيْ বা আশা প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, فَنَتَبَرَّأَ বাক্যটি হলো তার জবাব।

এভাবে অর্থাৎ তাঁর [আল্লাহর] শাস্তির কঠোরতা এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা প্রদর্শনের মতো আল্লাহ তাদের মন্দ কার্যাবলি তাদের পরিতাপরূপে মনস্তাপরূপে প্রতিভাত করবেন আর তারা কখনো জাহান্নামাগ্নি হতে তাতে প্রবেশ করার পর বের হতে পারবে না। حَسَرَاتٍ এটা এ স্থানে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ; অর্থ মনস্তাপরূপে।

তাহকীক ও তারকীব

اِذْ تَبَرَّأَ : [সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করবে] بَاب تَفَعُّل থেকে مَاضِي وَاحِد مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। اَلتَّبَرُّءُ পৃথক হয়ে যাওয়া।
اُتُّبِعُوْا : [অনুসৃত ব্যক্তিগণ] تَبِبَ (س) تَبَعًا অনুসরণ করা। এ থেকে مَاضِي مَجْهُوْل -এর সীগাহ।
اِذْ تَقَطَّعَتْ : [ছিন্ন হয়ে পড়বে] بَاب تَفَعُّل -এর اَلتَّقَطُّعُ [কর্তন করা] মাসদার থেকে مَاضِي مَعْرُوْف مُؤَنَّث -এর সীগাহ।
اَلْاَسْبَابُ : اَلسَّبَبُ -এর বহুবচন। অর্থ– রশি।

اَلسَّبَبُ فِي الْاَصْلِ الْحَبْلُ الَّذِيْ يُرْتَقٰى بِهِ لِلشَّجَرَةِ ثُمَّ اُطْلِقَ عَلٰى كُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ اِلٰى شَيْءٍ.

اَلْوُصَلُ : وُصْلَةٌ . وُصَلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সংযোগ সম্পর্ক। اَلْاَرْحَامُ : رَحِم -এর বহুবচন। অর্থ– গর্ভের সম্পর্ক।
اَلْمَوَدَّةُ : বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা। كَرَّةً : একবার। كَرَّةً اُخْرٰى আরেকবার। رَجْعَةً : পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। فَنَتَبَرَّأَ : তাহলে

http://islamiboi.wordpress.com

আমরাও সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। حَسَرَاتٍ : حَسْرَةٌ -এর ব-ব। হারানো বস্তুর প্রতি বেশি পরিমাণ আফসোসকে **حَسْرَة বলা** হয়। نَدَامَاتٍ : আফসোস।

قَوْلُهُ وَقْتَ مُعَايَنَتِهِمْ لَهُ : এটি إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ -এর যরফ।

قَوْلُهُ وَقَدْ رَاَوُا الْعَذَابَ : এখানে قَدْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَاو টি حَالِيَه এবং اَلَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا ও **اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا** উভয়ের যমীর থেকে قَدْ رَاَوُا الْعَذَابَ হাল হয়েছে এবং رَاَيْنَ যেমন- لَقِيْتُ زَيْدًا رَاكِبَيْنِ আর যেহেতু **قَدْ বিহীন মাযী** হাল হতে পারে না চাই প্রকাশ্য হোক বা গোপনভাবে। এ কারণে قَدْ টা উহ্য ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْ لِلتَّمَنِّى : لَوْ আকাঙ্ক্ষার জন্যে আর فَنَتَبَرَّاَ হলো এর জবাব। এখানে দু'টি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়-

প্রশ্ন : ১. لَوْ -এর জাযা لَامْ যোগে হয়, فَاء যোগে নয়। অথচ এখানে فَاء যোগে হয়েছে?

প্রশ্ন. ২. فَنَتَبَرَّاَ মানসূব হওয়ার কারণ কি? অথচ এখানে কোনো عَامِلِ نَصْب নেই।

উত্তর. মুসান্নিফ (র.) لَوْ لِلتَّمَنِّى বলে উভয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, উভয় বিষয় لَوْ شَرْطِيَّة **-এর জন্যে জরুরি** আর এটা لَوْ تَمَنِّى -এর পরে اَنْ উহ্য হওয়ার কারণে جَوَاب تَمَنِّى মানসূব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা : এখানে কিয়ামতের একটি বিশেষ দৃশ্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামতে যখন মুশরিক **নেতারা, তাদের** বিদ্বানবর্গ, শাসকবর্গ ও বিশিষ্টরা অনুগামী, শাসিত ও সাধারণ লোকদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে **তাদের অসহায়** নিরুপায় অবস্থায় ফেলে রাখবে এখানে সে সময়টির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ : অর্থাৎ যে জালিমরা মহান আল্লাহর জন্যে **শরিক স্থির করে** তারা যদি সেই অবশ্যম্ভাবী সময় দেখে নিত, যখন তারা মহান আল্লাহর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে যে, **সমস্ত শক্তি মহান** আল্লাহরই এবং মহান আল্লাহর শাস্তি হতে কেউ বাঁচতে পারবে না, তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর তাহলে তারা **মহান আল্লাহর** ইবাদত ছেড়ে অন্যের প্রতি কিছুতেই মনোনিবেশ করত না এবং অন্যের থেকে কোনো উপকার লাভের **প্রত্যাশা করত না।** -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ : বাতিলপন্থিদের পারস্পরিক সম্পর্কের যত দিক ও সূত্র রয়েছে- উস্তাদী-**শাগরিদী হোক,** নেতা-অনুগামী হোক, বংশ ও রক্ত বন্ধনের হোক, স্বদেশী-স্বজাতীয়তার হোক কিংবা বন্ধুত্বের হোক- **এ সবই এ পৃথিবী** পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ হয়ে দেখা দেওয়ার জগৎ কিয়ামতে সকলেই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন **বরং পরস্পর** বিরোধী মনে হবে। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের ভাষ্যেও স্পষ্ট রয়েছে- **اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ** [সেদিন মুত্তাকীগণ ব্যতীত আর সকলে একে অন্যের শত্রু হবে।] بِهِمْ -এর ب অব্যয়টি عَنْ অর্থেও নেওয়া **হয়েছে। بِهِمْ অর্থ** **عَنْهُمْ** সম্পর্কচ্ছেদ হবে কুফরির কারণে। বা এখানে মাধ্যম ও কারণবোধক। বক্তব্যের মূলরূপ হবে- **بِسَبَبِ كُفْرِهِمُ** **الْاَسْبَابُ الَّتِىْ كَانُوْا يَرْجُوْنَ مِنْهَا النَّجَاةَ** "তাদের কুফরির কারণে সেসব সূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে, যা দিয়ে **তারা মুক্তির স্বপ্ন** দেখছিল।" -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ : মহান আল্লাহর আজাব ও নিজেদের উপাস্যদর **উপেক্ষাভাব দেখে** সেদিন মুশরিকদের যেমন ভীষণ আফসোস হবে, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সমুদয় কর্মকেও **তাদের পরিতাপের** কারণ বানিয়ে দেবেন। কেননা তাদের হজ, উমরা ও দান-খয়রাতসহ আরও যত ভালো কাজ হবে তা **সবই তো শিরকের** কারণে প্রত্যাখ্যাত হবে। আর শিরকসহ আর যত পাপচার তারা করেছে তার বদলে শাস্তি ভোগ করবে। **এভাবে তাদের** ভালোমন্দ যাবতীয় কর্মই তাদের দুঃখের কারণ হয়ে যাবে। কোনো প্রকার কর্মেই কোনো লাভ তাদের **হবে না; বরং** স্থায়ীভাবে জাহান্নামবাসী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তাওহীদপন্থি মু'মিনগণ যদি গুনাহের কারণে জাহান্নামে **প্রবেশ করেও, তবুও** শেষ পর্যন্ত তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٦٨. وَنَزَلَ فِيْمَنْ حَرَّمَ السَّوَائِبَ وَنَحْوَهَا يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا حَالٌ طَيِّبًا صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ اَىْ مُسْتَلَذًّا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ طُرُقَ الشَّيْطٰنِ اَىْ تَزْيِيْنَهُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

১৬৮. যারা সায়িবা ইত্যাদি প্রাণী [স্বকপোল-কল্পিতভাবে] হারাম করে রেখেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ حَلٰلًا শব্দটি حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ও পবিত্র طَيِّبًا শব্দটি صِفَة مُؤَكِّدَه বা তাকিদব্যক বিশেষণ। উপভোগ্য খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক তার পথ অর্থাৎ তৎকর্তৃক সাজানো পথের অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, সুস্পষ্ট শত্রুতা পোষণকারী।

١٦٩. اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ الْاِثْمِ وَالْفَحْشَآءِ الْقَبِيْحِ شَرْعًا وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مِنْ تَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرَّمْ وَغَيْرِهِ.

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ পাপকার্য ও অশ্লীল অর্থাৎ শরিয়তের দৃষ্টিতে যা নিন্দনীয় সেই কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার অর্থাৎ যা তিনি হারাম করেননি তা হারাম বলে বিধান দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ দেয়।

١٧٠. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَتَحْلِيْلِ الطَّيِّبَاتِ قَالُوْا لَا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا مِنْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَتَحْرِيْمِ السَّوَائِبِ وَالْبَحَائِرِ قَالَ تَعَالٰى اَيَتَّبِعُوْنَهُمْ وَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَلَا يَهْتَدُوْنَ اِلَى الْحَقِّ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ.

১৭০. যখন তাদেরকে কাফিরদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যেমন– তাওহীদ ও পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল বলে মনে করা ইত্যাদি তা তোমরা অনুসরণ কর। তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রতিমা পূজা, সায়িবা ও বাহীরা হারামকরণ ইত্যাদি যাতে পেয়েছি বিদ্যামান দেখেছি তার অনুসরণ করব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ দীন ও ধর্ম বিষয়ে কিছুই বুঝত নয় এবং সৎপথে পরিচালিতও নয় তথাপিও তারা তাদের অনুসরণ করবে? اَوَلَوْ كَانَ -এর প্রশ্নবোধক هَمْزَه [হামযা] টি এ স্থানে اِنْكَار বা অসম্মতি ও অস্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

حَرَّمَ : [হারাম করেছে] মাসদার (تَفْعِيْل) اَلتَّحْرِيْمُ - اَلسَّوَائِبُ : এটি سَائِبَةٌ -এর বহুবচন। ঐ উষ্ট্রীকে سَائِبَة বলা হয়, যাকে কোনো মূর্তির নামে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সম্মানার্থে তার থেকে কোনো ধরনের উপকার লাভ করা হয় না।

طَيِّبٌ : পবিত্র। مُسْتَلِذٌّ : সুস্বাদু। خُطُوَاتٌ : এটি خُطْوَةٌ -এর বহুবচন।

http://islamiboi.wordpress.com

وَهِيَ اِسْمٌ لِمَسَافَةٍ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَتُسْتَعْمَلُ مَجَازًا فِي تَتَبُّعِ الْاٰثَارِ.
অর্থাৎ خُطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে, পদাঙ্ক। সুতরাং خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ -এর অর্থ হচ্ছে- শয়তানি কাজকর্ম। طُرُقٌ : এটি طَرِيْقٌ -এর বহুবচন। অর্থ- পথ।

تَزْيِيْنُهٗ : بَابُ تَفْعِيْلٍ -এর মাসদার। অর্থ- সুসজ্জিতকরণ। بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ : শত্রুতায় সুস্পষ্ট। اَلسُّوْءُ : سُوْءٌ বলা হয় যা মানুষকে দুঃখ দেয়। এটি গুনাহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা তা ব্যক্তিকে বর্তমানে বা পরিণামে দুঃখ দেয়। اَلْقُبْحُ : খারাপ, বিশ্রী। اَلْفَيْنَا : আমরা পেয়েছি। اَلْبَحَائِرُ : بَحِيْرَةٌ -এর বহুবচন। بَحِيْرَةٌ ঐ প্রাণীকে বলা হয়, যা গায়রুল্লাহর নামে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং নিদর্শন স্বরূপ তার কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهٗ وَنَحْوُهَا : এখানে نَحْو দ্বারা بَحِيْرَةٌ ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। بَحِيْرَةٌ বলা হয় ঐ প্রণীকে যা গায়রুল্লাহর নামে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং নিদর্শন স্বরূপ তার কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهٗ مِمَّا فِي الْاَرْضِ : এখানে مِنْ অব্যয় আংশিকতা বোধক। কেননা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই খাওয়ার যোগ্য বা আহার্য নয়। -[তাফসীরে বায়যাবী]

قَوْلُهٗ حَلَالًا তারকীব : حَلَالًا শব্দটি مِمَّا فِي الْاَرْضِ থেকে حَال হয়েছে; كُلُوْا -এর مَفْعُوْل নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। কেননা এ সুরতে مِمَّا فِي الْاَرْضِ অংশটি حَلَالًا থেকে সিফত অথবা حَال হবে আর صِفَت তার مَوْصُوْف -এর পূর্বে হওয়া এবং حَال তার ذُوالْحَال -এর আগে خِلَافِ ظَاهِر বা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত

حَلَال শব্দটি حَلٌّ থেকে নির্গত। حَلٌّ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো- গিঁঠ খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে তাতে যেন একটা গিঁঠই খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। -[মা'আরিফ]

এখানে حَلَالًا দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য- যেসব খাদ্য স্বভাবত ও নিজস্ব সত্তায় বৈধ এবং [কখনো তা] হারাম করা হয়নি। -[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهٗ طَيِّبًا : যেসব হালাল খাদ্য বৈধ মাধ্যমে আহরণ-উপার্জন করা হয়েছে এবং যাতে অপরের কোনো অধিকার-দাবি নেই। যেমন- অবৈধ [فَاسِد] বেচাকেনার মাধ্যমে না হওয়া, অবৈধ মজুরি চুক্তিতে না হওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ : এ অংশটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, যখন حَلَالًا দ্বারাই শরয়ী দৃষ্টিকোণে পবিত্র বস্তু উদ্দেশ্য, [কেননা যা শরয়ীভাবে হালাল হয় তা পবিত্রই হয়ে থাকে] তখন طَيِّبًا -কে উল্লেখ করার লাভ কী?

উত্তর: উত্তরের সারকথা হলো, এখানে طَيِّبًا -এর উল্লেখ صِفَت مُؤَكِّد হিসেবে, اِحْتِرَازِيَه হিসেবে নয়।
قَوْلُهٗ اَوْ مُسْتَلِذًّا : [مَفْعُوْل -এর সীগাহ হিসেবে] যে জিনিস পছন্দনীয় ও উপভোগ্য হবে। এ সুরতে طَيِّبًا صِفَت مُقَيِّدَة হবে, যা থেকে অপছন্দনীয় যথা তিক্ত ও স্বাদহীন বস্তু বের হয়ে যাবে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ২৬২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا الخ -এর আলোচনা : অংশীবাদমুক্ত একত্ববাদের ইবরাহীমী ধর্মবালম্বীদের ব্যতীত ইহুদি-খ্রিস্টান, পৌত্তলিক সকলেই পানাহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্তি ও বক্রতার শিকার হয়েছিল এবং হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম সব্যস্ত করে সব গুলিয়ে দিয়েছি। এখানে সেসব ভ্রান্তির দু একটির বিরবরণ এসেছে।

আরববাসীরা মূর্তিপূজা করত তারা মূর্তির নামে ষাঁড় ছেড়ে দিত এবং তার দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভকে অবৈধ মনে করত। বস্তুত এটাও একপ্রকারের শিরক। কেননা হালাল ও হারাম সব্যস্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো নেই। এ ক্ষেত্রে আর কারো হুকুম মানার অর্থ তাকে মহান আল্লাহর শরিক স্থির করা। তাই পূর্বের আয়াতে শিরকের

http://islamiboi.wordpress.com

সর্বনাশা অনিষ্টের বর্ণনা করার পর এবার হালালকে হারাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। যার সারমর্ম হলো, তোমরা ভূমিজাত যাবতীয় বস্তু আহার কর, কেবল শরিয়তের দৃষ্টিতে তা হালাল ও পবিত্র হলেই চলবে। যা মূলেই অবৈধ কিংবা প্রাসঙ্গিক কোনো কারণে অবৈধ হয়ে গেছে তা খেয়ো না। মূলেই যা হারাম তার দৃষ্টান্ত মৃত জন্তু ও শূকর এবং مَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে তার নামে যে পশু জবাই করা হয়। প্রাসঙ্গিক কারণে যা অবৈধ তা হলো, চুরি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি উপায়ে অর্জিত দ্রব্য। এসব পরিহার করে চলা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কখনই এমন করে বসো না যে, যা ইচ্ছা হারাম করলে, যেমন– মূর্তির নামে ষাঁড় ইত্যাদি। কিংবা যা ইচ্ছা হালাল করে নিলে, যেমন– مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ প্রভৃতি। –[তাফসীরে উসমানী]

হালাল আহারের গুরুত্ব : পবিত্র কুরআনের বিশিষ্ট ভাষ্যকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ -এর সমীপে আরজ করলেন, আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমাকে 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াত' [দোয়া কবুল হয় এমন] করে দেন। নবী করীম ﷺ জবাবে ইরশাদ করলেন, হালাল গ্রাসের নীতি অপরিহার্য করে নাও, তবে আপনাতেই দোয়া গৃহীত হওয়ার মর্যাদা পেয়ে যাবে [স্বতন্ত্র দোয়ার প্রয়োজন হবে না]। ইসলামে হালাল আহারের এ গুরুত্ব অনুধাবনীয়

قَوْلُهُ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ : শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক, তবে সম্পূর্ণ অভিন্ন অর্থবোধক নয়। سُوْءٌ সেসব বিষয় যা যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকের বিচারেও গর্হিত। فَحْشَاءُ হলো শরিয়তের নির্দেশিত মন্দ ও কুৎসিত বিষয়। سُوْءٌ ও فَحْشَاءُ হলো জ্ঞান যাকে গর্হিত ও শরিয়ত যাকে কুৎসিত বলে সাব্যস্ত করে। শব্দ দুটিকে অব্যয়যোগে সংযুক্ত [عَطْف] করা হয়েছে গুণগত ব্যবধানের কারণে [বায়যাবী]। কেউ কেউ এরূপ পার্থক্যও নিরূপণ করেছেন যে, سُوْءٌ -এর বিপরীতে শরিয়তে কোনো 'হদ্দ' নির্ণীত নেই। আর فَحْشَاءُ -এর প্রতিকারে শরিয়তের নির্ণীত শাস্তি 'হদ্দ' রয়েছে এ ব্যাখ্যাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর নামে সম্বন্ধিত। –[কুরতুবী, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত]

আবার অনেকে বলেন, سُوْءٌ অর্থ– সগীরা [ক্ষুদ্র] গুনাহ এবং فَحْشَاءُ অর্থ– কবীরা বা বড় গুনাহ অর্থাৎ সাধারণ গুনাহ এবং কবীরা গুনাহ। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ أَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ নিজেদের উদ্ভাবিত বিষয়গুলোকে আল্লাহর আইন মনে করতে থাকবে [এমন যেন না হয়]। অর্থাৎ মাসআলা-মাসাইল ও শরিয়তের বিধান নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নাও। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় কেবল শাখাগত বিষয়ই নয়; বরং আকিদা-বিশ্বাসে পর্যন্ত শরিয়তের স্পষ্ট নির্দেশ বর্জন করে নিজেদের পক্ষ হতে হুকুম গড়ে নেওয়া হয় এবং কুরআন হাদীসের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও পূর্বসূরি বুযুর্গানে দীনের মতামতের ভুল সাব্যস্ত করা হয়। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْل ক্রিয়ামূলক عَلٰى অব্যয় সংযোগের ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয়– করো নামে রটনা করা, অপবাদ দেওয়া, নিজের কথা অন্যের নামে চালিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে عِلْم [জানা] দ্বারা উদ্দেশ্য নিশ্চিত জ্ঞান কিংবা ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত অকাট্য জ্ঞান। সুতরাং এ হুমকি শুধু কুফরির ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, বরং বিদ'আতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতএব সকল কাফির ও সকল বিদ'আতিও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। –[ইবনে কাছীর] আর এতে সেসব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হবে যা আল্লাহর নামে সম্পর্কিত করা হয়, অথচ তা তাঁর পক্ষ থেকে হওয়ার বৈধতা নেই। –[মাদারিক]।

অন্ধ অনুসরণের নিন্দা : وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধের বিপরীতে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করে এটাও শিরক। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্যে কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন দুটি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এজন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোনো খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধিবিধানকে বোঝায় যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরিয়তের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত কোনো বিধিবিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধিবিধান বের করে নেওয়ার মতো কোনো যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোনো আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তার মধ্যে ইজতিহাদ [উদ্ভাবন] -এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েজ। অবশ্য এ আনুগত্য তার ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহর এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যেই হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোনো মুজাতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে করে আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য : উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উপস্থাপন করেন তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন, আয়াতে যে পূর্বপুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের অনুকরণ। যথার্থ ও সঠিত বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আ.) -এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দুটি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে–

اِنِّىْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ -

অর্থাৎ "আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.) -এর ধর্মবিশ্বাসের।"

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হরাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জয়েজ; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমাগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধিবিধানেরও উল্লেখ করেছেন। –[মা'আরিফ]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٧١ ১৭১. وَمَثَلُ صِفَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَنْ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ يَصُوْتُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاۤءً وَّنِدَاۤءً اَيْ صَوْتًا لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ اَيْ هُمْ فِيْ سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَعَدَمِ تَدَبُّرِهَا كَالْبَهَائِمِ تَسْمَعُ صَوْتَ رَاعِيْهَا وَلَا تَفْهَمُهُ هُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ الْمَوْعِظَةَ .

যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে আর যারা তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করে তাদের উপমা বিবরণ হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি আহ্বান করে ডাকে এমন কিছুকে যা হাঁকডাক ভিন্ন আর কিছুই শুনে না অর্থাৎ কেবল শব্দ শুনে মাত্র কিন্তু সে তার অর্থ বুঝে না। ওয়াজ-নসিয়ত ও উপদেশ শ্রবণ করার পর তাতে চিন্তাভাবনা না করার বিষয়ে তারা পশুর ন্যায়। পশু কেবল রাখালের হাঁকডাকই শুনতে পায় কিন্তু তার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। তারা বধির, মূক, অন্ধ সুতরাং তারা উপদেশের কিছুই বুঝবে না।

তাহকীক ও তারকীব

يَنْعِقُ : نَعَقَ (س) نَعْقًا অর্থ– আওয়াজ দেওয়া। রাখাল ছাগল পালকে আওয়াজ দিলে এবং ধমক দিলে বলা হয়– نَعَقَ الرَّاعِيْ بِغَنَمِهٖ نَعِيْقًا - اَلْبَهَائِمُ : بَهِيْمَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– চতুষ্পদ জন্তু। رَاعِيْ : রাখাল। صُمٌّ : বধির। بُكْمٌ : মূক। عُمْيٌ অন্ধ। لَا يَعْقِلُوْنَ : অনুভব করে না।

قَوْلُهٗ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ : **প্রশ্ন:** এখানে كَاف تَشْبِيْه টির কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা مَثَلُ শব্দের পর তার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় تَكْرَار বা দ্বিরুক্তি।

উত্তর: প্রথম مَثَلُ -এর অর্থ উপমা নয়; বরং তা সিফতের অর্থে। সুতরাং আর কোনো তাকরার নেই।

صُمٌّ : অর্থাৎ সত্যের আওয়াজের ব্যাপারে। সত্যের ব্যাপারে বধির, তাই তা শুনে না এবং তা দিয়ে উপকৃত হয় না।

بُكْمٌ : অর্থাৎ সত্যের স্বীকারোক্তি দানে তাদের জিহ্বা অচল, সত্য কথনে বোবা, তাই তা উচ্চারণ করে না।

عُمْيٌ : নিজের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে, হেদায়েত ও পথপ্রাপ্তিতে অন্ধ, তাই তা দেখতে পায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকার দৃষ্টান্ত : সত্যের পথে আহ্বানকারীর আহ্বানের বিষয় আলোচনা চলছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর আহূত উম্মতের আচরণের উপমা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ কাফেরদেরকে হেদায়েতের পথে ডাকার দৃষ্টান্ত ঠিক এই রকমের যেমন কোনো ব্যক্তি বনের পশুদের ডাকে, অথচ তারা তার আওয়াজই শোনে– এর বেশি কিছু নয়। যারা নিজেরা আলেম নয়, আবার আলেমদের কথা শুনেও না, তাদেরও অবস্থা এ রকমই। –[তাফসীরে ওসমানী]

مَثَلُ বা مَثَلُ দَاعِى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বাক্য বিন্যাসে دَاعِى [আহ্বানকারী] সম্বন্ধপদ (مُضَاف) উহ্য রয়েছে। মূল বক্তব্য হবে– مَثَلُ دَاعِى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا دَاعِيْهِمْ اِلَى الْاِيْمَانِ অর্থাৎ কাফিরদের ঈমানের প্রতি আহ্বানদাতার অবস্থা।

قَوْلُهٗ وَمَنْ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন: আয়াতে কাফেরদেরকে نَاعِق বা রাখালের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কেননা আয়াতের অনুবাদ হলো, এবং কাফেরদের উপমা ঐ রাখালের মতো যে চতুষ্পদ জানোয়ারকে ডাকে, অথচ বিষয়টি এমন নয়। কেননা রাখাল হলো دَاعِى [হেদায়েতের প্রতি আহ্বানকারী রাসূল বা মুসলমান] আর কাফেররা হলো مَدْعُو [চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো]।

উত্তর: এখানে مَعْطُوْف উহ্য রয়েছে। আর তা হলো– مَنْ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى সুতরাং এখানে কাফের এবং তাদের আহ্বানকারীকে একত্রে রাখাল এবং চতুষ্পদ জানোয়ারের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাফের এবং তাদের আহ্বানকারী হলো مُشَبَّه আর চতুষ্পদ জানোয়ার ও তার রাখাল হলো مُشَبَّه بِه যেন এখানে تَشْبِيْه টি تَشْبِيْهُ الْمُرَكَّبِ بِالْمُرَكَّبِ -এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখন আর কোনো প্রশ্ন বাকি রইল না।

قَوْلُهٗ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ : অর্থাৎ সে পশুর ন্যায়, যার কানে হাঁকডাকের শব্দ ধ্বনি তো পৌঁছে থাকে, তবে সে তার অর্থ ও মর্ম কিছুই বুঝে না। এ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরাও অনুরূপ আচরণই করছে সত্যের আহ্বানের সাথে। আহ্বানকারীর শব্দ ও ধ্বনি তো শুনতে পায়, কিন্তু তাতে চিন্তাভাবনা ও মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ তারা পাচ্ছে না। যেমন– পশু, যাকে ডাক দেওয়া হয়, সে তা শুনতে পায় তবে বুঝে না, তদ্রূপ কাফের শুনতে পায় কিন্তু বুঝে না।

–[হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বরাতে ইবনে জারীর]।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٧٢. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ حَلَالَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ عَلٰى مَا اُحِلَّ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

১৭২. হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা হতে পবিত্র অর্থাৎ হলাল বস্তু আহার কর এবং তিনি তোমাদের জন্যে যে এসব হালাল করে দিয়েছেন সে কথার উপর আল্লাহর শোকর কর, যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর।

١٧٣. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ اَىْ اَكْلَهَا اِذِ الْكَلَامُ فِيْهِ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا وَهِىَ مَا لَمْ تُذَكَّ شَرْعًا وَاُلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَا اُبِيْنَ مِنْ حَيٍّ وَخُصَّ مِنْهَا السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَ اَىِ الْمَسْفُوْحَ كَمَا فِى الْاَنْعَامِ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ خُصَّ اللَّحْمُ لِاَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَغَيْرُهُ تَبْعٌ لَهُ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ اَىْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ تَعَالٰى وَالْاِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَكَانُوْا يَرْفَعُوْنَهُ عِنْدَ الذَّبْحِ لِاٰلِهَتِهِمْ فَمَنِ اضْطُرَّ اَىْ اَلْجَأَتْهُ الضَّرُوْرَةُ اِلٰى اَكْلِ شَىْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَاَكَلَهُ غَيْرَ بَاغٍ خَارِجٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا عَادٍ مُتَعَدٍّ عَلَيْهِمْ بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ فِىْ اَكْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمٌ بِاَهْلِ طَاعَتِهٖ حَيْثُ وَسَّعَ لَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ وَخَرَجَ الْبَاغِىُ وَالْعَادِىُ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهٖ كَالْاٰبِقِ وَالْمَكَّاسِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اَكْلُ شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ مَا لَمْ يَتُوْبُوْا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ.

১৭৩. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন মৃত, অর্থাৎ তা আহার করা। কেননা এ স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা উদ্দেশ্য। পরবর্তী বিষয়সমূহেও এ কথা প্রযোজ্য। اَلْمَيْتَةُ বলা হয় যা শরিয়তের বিধানানুসারে জবাই করা হয়নি। হাদীসের বাক্য অনুযায়ী জীবিত প্রাণী হতে যদি কোনো অঙ্গচ্ছেদ করে দেওয়া হয় তবে তাও এ নির্দেশের হারামের অন্তর্ভুক্ত। মৃত পঙ্গপাল এবং মৃত মৎস্যের বিষয়টি এ বিধান হতে বিশেষভাবে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এগুলো মৃত হলেও তা আহার করা হালাল রক্ত, অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত, সূরা আন'আমে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে; শূকর-মাংস, মাংসই যেহেতু প্রধানত উদ্দেশ্য আর অন্য বস্তুসমূহ তার অধীন সেহেতু মাংসের কথা এ স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা অর্থাৎ আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যা জবাই করা হয়েছে। اَلْاِهْلَالُ [ইহলাল] অর্থ– উচ্চকণ্ঠে শব্দ করা। মুশরিকগণ জবাই করার সময় উচ্চকণ্ঠে তাদের দেবদেবীর নাম কীর্তন করত। কিন্তু যে অনন্যোপায় প্রয়োজন যদি কাউকেও উল্লিখিত বস্তুসমূহ গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং তার কিছু আহার করে অথচ মুসলিমগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে অন্যায়কারী এবং ডাকাতির মাধ্যমে তাদের উপর জুলুম করে সীমালজ্ঘকারী নয় তার জন্যে তা আহারে কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওলীদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল এবং অনুগতদের জন্যে পরম দয়ালু। আর তাই তিনি তাদের জন্যে এ বিষয়ে উদার অবকাশ দিয়েছেন। অনন্যোপায় অবস্থায় উক্ত হারাম জিনিসসমূহ হলাল হওয়ার বিধান হতে بَاغٍ [অন্যায়কারী] এবং عَادِى [সীমালজ্ঘনকারী] খারিজ হয়ে গেছে। এমনিভাবে যারা পাপ উদ্দেশ্যে সফরে বের হয় যেমন মালিকের গৃহ হতে পলায়নাকারী দাস, অন্যায়ভাবে শুল্ক আদায়কারী প্রভৃতিরাও بَاغٍ [অন্যায়কারী] ও عَادِى [সীমালজ্ঘনকারী] -এর সাথে একই দলভুক্ত। সুতরাং তওবা না করা পর্যন্ত তাদের কারো জন্যে উক্ত বস্তুসমূহের কিছু [অনন্যোপায় হয়েও] আহার করা হালাল নয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

لَمْ تُذَكَّ : [জবাই করা হয়নি] ذَكَاةً (ن) ذَكَّ অর্থ- জবাই করা। شَرْعًا : শরিয়ত অনুযায়ী। أُلْحِقَ بِهِ : [এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে] مَاضِى مَجْهُوْل -এর সীগাহ। (إِفْعَال) اَلْإِلْحَاقُ অর্থ- অন্তর্ভুক্ত করা। مَا أُبِيْنَ : [যা পৃথক করা হয়] مَاضِى مَجْهُوْل - اِبَانَةً (اِفْعَال) اَبَانَ অর্থ- পৃথক করা। حَيٌّ বহুবচন اَحْيَاءٌ অর্থ- জীবিত। خُصَّ : [খাস করা হয়েছে] اَلسَّمَكُ : বহুবচন اَسْمَاكٌ অর্থ- মাছ। اَلْجَرَادُ : টিডিড। اَلْمَسْفُوْحُ : প্রবাহিত। اِسْم مَفْعُوْل - مُعَظَّمٌ গুরুত্বপূর্ণ, বড়। تَبَعٌ : অনুসারী। বহুবচন اَتْبَاعٌ - اُهِلَّ : মাযী মাজহুলের সীগাহ। মাসদার اَلْإِهْلَالُ অর্থ- আওয়াজ উঁচু করা, ডাকাডাকি করা। হাজী সাহেব যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন বলা হয় اَهَلَّ الْمُحْرِمُ এমনিভাবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যে আওয়াজ বা চিৎকার করে তাকে اِهْلَالُ الصَّبِىِّ বলা হয়। اُضْطُرَّ : مَاضِى مَجْهُوْل وَاحِد مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। بَاب اِفْتِعَال -এর মাসদার اَلْإِضْطِرَارُ থেকে নির্গত। অর্থ- বাধ্য করা। بَاغٍ وَلَا عَادٍ : بَاغِى - بَغْىٌ থেকে। আর عَادِى (مُضَاعَف) শব্দটি اَلْعُدْوَانُ থেকে। উভয়টিই জুলুম এবং সীমালঙ্ঘনের অর্থ দেয়। وَسَّعَ : উদার অবকাশ দিয়েছেন। عَاصٍ : গুনাহগার, অবাধ্য। عِصْيَانٌ থেকে। اَلْآبِقُ : পলায়নকারী, পলাতক গোলাম। اَلْمَكَّاسُ : অন্যায়ভাবে চাঁদা আদায়কারী।

قَوْلُهُ فَمَنِ اضْطُرَّ : [হারাম খাদ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে নিরুপায় হলে]। اِضْطِرَار শব্দটি ضَرَرٌ [ক্ষতি, অনিষ্ট] ধাতুমূল থেকে নির্গত এবং এ ধাতুমূল হতে বাবে اِفْتِعَال -এর শব্দ।

غَيْرَ بَاغٍ -এর وَلَا عَادٍ -এর এ ব্যাখ্যা ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, আহনাফের মতে তার ব্যাখ্যা ওসমানীর বরাতে যা লেখা হয়েছে।

قَوْلُهُ غَفُوْرٌ : এত বড় ক্ষমাশীল যে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধের জন্যেও কৈফিয়ত তলব করেন না বা শাস্তি দেন না; বরং অপরাধকে অপরাধের তালিকাভুক্তই রাখেন না।

قَوْلُهُ رَحِيْمٌ : এমন দয়াবান যে, সংকটের মুহূর্তগুলোতে সহজ ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। -[জামালাইন - ২৪৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا الخ : ইতঃপূর্বে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুশরিকরা যেহেতু শয়তানের অনুসরণ হতে বিরত হয় না নিজেদের পক্ষ হতে বিধিনিষেধ তৈরি করে মহান আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়, নিজেদের বাপদাদাদের কুসংস্কার পরিহার করে না এবং তাদের পক্ষ হতে সত্য উপলব্ধি করার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই এখন উপেক্ষা করে কেবল মুসলিমগণকে পবিত্র বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নিজ অনুগ্রহ প্রকাশ করে তাদেরকে শোকর আদায়ের আদেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়ে গেছে যে, মু'মিনগণ মহান আল্লাহর প্রিয় ও অনুগত এবং মুশরিকরা তাঁর প্রত্যাখ্যাত, নিন্দিত ও নাফরমান। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ كُلُوْا : আজ্ঞাবোধক শব্দরূপ এখানে অনুমতি বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে- আদেশ বুঝাবার জন্যে নয়। তদ্রূপ 'খাও' দ্বারা শুধু আহার করা উদ্দেশ্য নয়, বরং বস্তুকে কাজে লাগাবার সব বৈধ পদ্ধতিই এর অন্তর্ভুক্ত। আহার দ্বারা উদ্দেশ্য সব পন্থায় কাজে লাগানো। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الخ : এখানে লক্ষ্য মুশরিকদের মনগড়া হারাম সাব্যস্তকৃত বিষয়গুলোকে খণ্ডন করা। বলা হচ্ছে- اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الخ অর্থাৎ প্রাণীকুলের মধ্যে শরিয়তের হারাম ধার্যকৃত শুধু এগুলোই। তোমরা যেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করে রেখেছ, সেগুলো নয়। হারাম বস্তু কি এ কয়েকটিই?

প্রশ্ন : এ স্থানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আয়াতে হারাম ঘোষণা তো উল্লিখিত বস্তুগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা اِنَّمَا শব্দটি حَصْر বা সীমাবদ্ধতা জ্ঞাপক। যার অর্থ দাঁড়ায়- এ ছাড়া আর কোনো জন্তু হারাম নয়। অথচ সহীহ হাদীস বা শরিয়তের অন্য কোনো প্রমাণের মাধ্যমে আরো অনেক কিছুই হারাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন- সমস্ত হিংস্র প্রাণী, গাধা, কুকুর ইত্যাদির গোশতও হারাম।

http://islamiboi.wordpress.com

উত্তর : সহীহ হাদীস বা শরিয়তের অন্য কোনো প্রমাণের মাধ্যমে যা হারাম ঘোষিত হয়েছে, তা এ আয়াতের আলোচ্য বিষয় নয়। যেমন রূহুল মা'আনীতে রয়েছে–

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ قَصْرُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدٌ بِمَا اعْتَقَدُوْهُ حَلَالًا -

অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য হারামকে উল্লিখিত ক্ষেত্রেসমূহে সার্বিকরূপে সীমিত করে দেওয়া নয়, বরং কাফিরদের হালাল ধারণাকৃত বিষয়ে আলোচনা আয়াতের বিশেষ লক্ষ্য। –[রূহুল মা'আনী]

তাফসীরে ওসমানীতে এর জবাবে বলা হয়েছে– এ সীমাবদ্ধতাকে আপেক্ষিক ধরা হবে অর্থাৎ কেবল সেই সব বস্তুর সাথে তুলনা করে, যেগুলোকে মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ হতে হারাম করে রেখেছে যেমন– বাহীরা, সাইবা প্রভৃতি সামনে যার আলোচনা আসবে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে– আমি তো কেবল মৃত বস্তু ও শূকর ইত্যাদি তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছিলাম, তোমরা যে ষাঁড় প্রভৃতির নিষিদ্ধতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী এটা তোমাদের নিছক মনগড়া। বাকি থাকল হিংস্র ও কদর্য প্রাণী, কিন্তু এগুলো যে নিষিদ্ধ তাতে মুশরিকদেরও কোনো দ্বিমত ছিল না। সুতরাং আয়াতের সীমাবদ্ধতা কেবল সেসব বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করেই করা হয়েছে, যেগুলোকে মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীতে কেবল নিজেদের পক্ষ হতে নিষিদ্ধ করেছিল। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اَلْمَيْتَةَ : মৃত; এর অর্থ যে প্রাণী কারো আঘাত করা ছাড়াই নিজে নিজে মারা যায় কিংবা শরিয়তের নির্ণীত জবাই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার আঘাতে মেরে ফেলা হয়। যেমন– শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা, জীবিত প্রাণীর কোনো অঙ্গ কেটে নেওয়া, কাঠ ও পাথরের আঘাতে কিংবা গুলতি ও বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা, উপর হতে নিম্নে পতনে বা শিংয়ের আঘাতে মৃত্যু ঘটা, হিংস্র পশু কর্তৃক বধ হওয়া, জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা ইত্যাদি। এ সকল অবস্থায় জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত হবে। অবশ্য হাদীস দ্বারা দুটি মৃত প্রাণীকে এ বিধান হতে পৃথক করে আমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে, আর তা হলো মাছ ও পঙ্গপাল। –[তাফসীরে ওসমানী]

জীবন্ত পশুর দেহ হতে কোনো অঙ্গ বা গোশতের টুকরো কেটে নিলে তাও মৃতরূপে পরিগণিত হবে।

হানাফীদের মতে মৃত প্রাণী [বা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ] দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করা জায়েজ নয়। এমনকি মৃত প্রাণীর গোশত কুকুর, শিকারি পাখি [বা অন্য কোনো প্রাণীকে] খাওয়ানো [বা অন্য কোনো প্রকারে ব্যবহার করা]ও বৈধ নয়। কেননা তাও 'মৃত থেকে উপকার লাভ'-এর শামিল। অথচ পবিত্র কুরআন মৃতকে শর্তহীনরূপে হারাম সাব্যস্ত করেছে। আমাদের [হানাফী] ইমামগণ বলেছেন, মৃত প্রাণী দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ করা জায়েজ নয়; তা কুকুর বা অন্য কোনো পশুপাখিকে খাওয়ানো চলবে না। কেননা তাও তো এক ধরনের উপকার লাভ। অথচ আল্লাহ তো মৃতকে প্রত্যক্ষরূপে কোনো কাজে লাগানো সম্পূর্ণ ও নিঃশর্তরূপে হারাম করে দিয়েছেন। –[জাসসাস]

তবে চামড়া পাকা [দাবাগাত] করে নিলে মৃত প্রাণীর চামড়া, অস্থি ইত্যাদি পাক হয়ে যাবে এবং তখন মৃত পরিগণিত হবে না। মাসআলাটি বিভিন্ন হাদীস ও সাহাবীগণের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। হানাফীগণ ও অন্যান্য ইমামগণের অনেকে এ অভিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরবর্গ এবং হাসান ইবনে সালিহ, সুফিয়ান ছাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান আল আম্বারী, আওযায়ী, শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বলেছেন, চামড়া পাকা করার পরে তা বিক্রি করা ও অন্যান্য কাজে লাগানো জায়েজ হবে। এভাবে পাক হওয়ার দাবিদারগণের প্রমাণ হলো বিভিন্ন সূত্রে ও বিভিন্ন ভাষ্যে নবী করীম ﷺ থেকে প্রাপ্ত বহুল প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হাদীসমূহ যা দাবাগাত দ্বারা মৃত প্রাণী পবিত্র হওয়ার এবং দাবাগাত এ ক্ষেত্রে জবাই সূত্রে পবিত্রতার স্থলবর্তী হওয়া সাব্যস্ত করে [জাসসাস]। সেসব হাদীস ভাষ্যের নমুনা নিম্নরূপ– اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ অর্থাৎ 'যে কোনো [কাঁচা চামড়া] পাকা [দাবাগাত] করা হলে তা পবিত্র হয়ে গেল।' –[হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে]

دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طَهُوْرُهَا অর্থাৎ 'মৃতপ্রাণীর চামড়া দাবাগাত করাই তার পবিত্রতা।' [যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) সূত্রে]।

زَكَاةُ الْاَدِيْمِ دِبَاغَتُهُ - অর্থাৎ 'চামড়ার পবিত্রতা হয় তার দাবাগাত পাকা করা। –[হযরত সালমা ইবনুল মুহাব্বাক]

তবে প্রাণীকুলের মধ্যে দুটি প্রাণী এমন যা সহীহ হাদীসের আলোকে জবাই করা ব্যতীতও হালাল। একটি হলো মাছ এবং অন্যটি টিড্ডী [পঙ্গপাল]।

হাদীস সূত্রে দুধরনের মৃত হালাল সাব্যস্ত হয়েছে– মাছ ও টিড্ডী [মাদারিক]। সুতরাং দারাকুতনী-এর আহরিত মাছ ও টিড্ডী– এ দু মৃত আমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে– হাদীসের কারণে এ আয়াত নির্দিষ্টকরণ (تَخْصِيْص) প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। –[কুরতুবী]

http://islamiboi.wordpress.com

মাসআলা : ফকীহ মুফাসসিরগণ এ বর্ণনাধারায় আরও একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তা হলো, যেসব খাদ্যে জবাইয়ের প্রশ্ন নেই [অর্থাৎ গোশত ব্যতীত অন্যান্য খাবার] তা পৌত্তলিক আগুন পূজারী [মাজূসী] ও অন্যান্য অ-কিতাবীদের নিকট হতে সংগৃহীত হলেও তা খাওয়া বৈধ হবে। –[কুরতুবীর সূত্রে মাজেদী]

قَوْلُهُ الدَّمَ : রক্ত দ্বারা শিরায় প্রবহমান রক্ত উদ্দেশ্য। এ রক্ত খাওয়া যেমন জায়েজ নয়, অন্য কোনোরূপে ব্যবহার করাও বৈধ নয়। যে রক্ত গোশতে লেগে থাকে তা হালাল ও পবিত্র। গোশত যদি না ধুয়ে রান্না করা হয় তবে তা খাওয়া জায়েজ, যদিও একটি রুচিবিরোধী কাজ। আবার প্রামাণ্য হাদীসের আলোকে দু ধরনের 'জমাট রক্ত' হালাল। ১. কলিজা, ২. যকৃত বা প্লীহা। (أُحِلَّتْ لَنَا دَمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) এ বিষয়টিও উম্মতের ফকীহগণের ঐকমত্য সমৃদ্ধ। অবশ্য আলিমগণ এ কথাও বলেছেন যে, কলিজা ও যকৃত মূলত গোশত জাতীয়, রক্ত জাতীয় নয়। [কেননা রক্ত থেকে তার রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে] রক্তের সংজ্ঞা এ দুটির জন্যে প্রযোজ্য হয় না। সুতরাং এ দুটিকে বিশিষ্ট বা ব্যত্যয় করারও কোনো প্রয়োজন নেই। তবু ও সাধারণ ধারণার প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীসে এ দুটিকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।]

قَوْلُهُ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ শূকর হারাম হওয়ার রহস্য : শূকর জীবিত হোক কিংবা মৃত সর্বাবস্থায় হারাম। এমনকি শরিয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হলেও তা হারাম। এর অস্থি, মাংস, চর্বি, নখ, পশম, শিরা তথা দেহের যাবতীয় অংশ অপবিত্র। এর দ্বারা কোনো প্রকার উপকার লাভ ও একে কোনো কাজে লাগানো জায়েজ নয়। এ স্থলে যেহেতু খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তাই কেবল গোশতের বিধান বলে দেওয়া হয়েছে। নয়তো এটা উম্মতের সর্বসম্মত রায় যে, শূকর যেহেতু নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, লোভ ও অপবিত্র বস্তুর প্রতি আসক্তিতে সকল প্রাণীর শীর্ষে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা এর সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন– فَإِنَّهُ رِجْسٌ 'এটা অবশ্যই অপবিত্র', তাই এটা নিঃসন্দেহে আমূল অপবিত্র। এর কোনো অংশই পবিত্র নয় এবং এর দ্বারা কোনো প্রকারে উপকৃত হওয়া জায়েজ নয়। যারা এর গোশত বেশি খায় এবং এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজে লাগায় তাদের মাঝে উপরিউক্ত স্বভাবগুলোও কদর্যরূপে প্রকাশ পায়। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ خَصَّ اللَّحْمَ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَغَيْرُهُ تَبَعٌ لَهُ : কুরআনের প্রত্যক্ষ বর্ণনায় হারাম করা হয়েছে শূকরের গোশত [لَحْم]। কিন্তু উম্মতের ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শূকরের শুধু গোশতই হারাম নয়, বরং তার চর্বি, অস্থি, চামড়া, লোম, চুল ইত্যাদি সবই হারাম। আয়াতে স্পষ্টত لَحْم শব্দের উল্লেখের কারণ হলো, গোশতই পশুর প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং মূল অংশ গোশতের কথা বলা হলে আনুষঙ্গিক রূপে অন্য সবই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ শূকর তার যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহকারে অপবিত্র। বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) তাঁর নিম্নোক্ত ইবারতে এ কথাই বলেছেন–

خَصَّ اللَّحْمَ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُوْدِ وَغَيْرُهُ تَبَعٌ لَهُ.

قَوْلُهُ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ : إِهْلَال -এর মূল অর্থ– আওয়াজ উঁচু করা, ডাকাডাকি করা, ঘোষণা দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি এখানে উদ্দেশ্য হলো, কোনো পশুকে কারো প্রতি সম্মান প্রদান, পূজা নিবেদন বা সান্নিধ্য অর্জন মানসে কোনো সৃষ্টির নামে উৎসর্গিত করা। এভাবে কোনো পশুকে জবাই করা হলে এবং তাতে কোনো সৃষ্টির জন্যে নজর-নিয়াজ বা অর্ঘ নিবেদনের উদ্দেশ্যে হলে সে পশু হারাম হয়ে যাবে, এমনকি তা জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করা হলেও। কেননা প্রাণের স্রষ্টা ছাড়া আর কারো জন্যে কোনো প্রাণ উৎসর্গিত হতে পারে না। যেমন– কোনো পীর-বুজুর্গের নামে ষাঁড় বা অন্য কোনো পশু উৎসর্গ করা বা খোদায়ী ষাড় [নাউযুবিল্লা] নামে ষাঁড় ছেড়ে দেওয়া, কোনো বাদশার আগমনে তাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোনো পশু জবাই করা, কোনো জিনের অত্যাচার হতে বাঁচার জন্যে তার নামে কোনো পশু জবাই করা, ইটের পাঁজা ভালো করে পোড়ার জন্যে ভেটস্বরূপ কোনো পশু জবাই করা ইত্যাদি সবই হারাম ও মৃত বলে গণ্য এবং এরূপ যে করবে সে মুশরিক সাব্যস্ত হবে। –[জাসসাস ও ওসমানী]

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, مَلْعُوْنٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ [আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যে জবাই করে, সে অভিশপ্ত।] অর্থাৎ যে ব্যক্তি পশু জবাই করে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সান্নিধ্য পেতে চায় সে অভিশপ্ত, এমনকি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিলেও। কেননা যখন সে ঘোষণা দিয়ে রেখেছে যে, এ পশুটি অমুকের জন্যে, এখন যতই আল্লাহর নাম নেওয়া হোক কাজে আসবে না। –[তাফসীরে ফাতহুল আযীয]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্যে যদি এ নিয়তে কোনো পশু নির্দিষ্ট করা হয় যে, তিনি তুষ্ট হয়ে আমার বাসনা পূরণ করে দেবেন, যেমন– সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের মাঝে এমন রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, তারা এরূপ নিয়তে বকরি মুরগি ইত্যাদি

http://islamiboi.wordpress.com

মানত করে থাকে; এ পশু হারাম হয়ে যায়। যদিও পরবর্তীতে জবাই করার সময় তা আল্লাহর নামেই করে থাকে। তবে হ্যাঁ, এরূপ মানত করার পরে যদি তওবা করে, তাহলে পশুটি হালাল হয়ে যাবে। −[বয়ানুল কুরআন]

এক শ্রেণির কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুজুর্গের মাজারে ছাগল মুরগি ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাজারের খাদেমরাই সাধারণত উৎসর্গীকৃত সেসব জন্তু ভোগদখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণির জীবজন্তু ক্রয় করা, জবাই করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হলাল। −[মা'আরিফুল কুরআন]

মহান আল্লাহর নামে পশু জবাই করার পর যদি গরিব-মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া হয় এবং তার ছওয়াব কোনো আত্মীয় বা পীর-বুজুর্গের নামে বখশিশ করা হয় অথবা কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানি করে তার নামে যদি তার ছওয়াব বখশিশ করা হয়, তবে কোনো দোষ নেই। কেননা এটা গায়রুল্লাহর জন্যে জবাই আদৌ নয়।

কতক লোক স্বভাবগত ধৃষ্টতার কারণে এসব ক্ষেত্রে এরূপ একটা বাহানা দেখায় যে, পীরের নামে নজরানা ইত্যাদিতেও তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, খাবার তৈরি করে মৃত ব্যক্তির নামে তা সদকা করা হবে। এর উত্তরে প্রথমত ভালো করে জেনে রাখুন যে, মহান আল্লাহর সামনে মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শনে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ হতে পরে না। দ্বিতীয়ত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোক, তোমরা গায়রুল্লাহর জন্যে যে পশু মানত করেছ যদি সে পশুর বদলে তার সমপরিমাণ গোশত খরিদ করে রান্না কর এবং তা ফকির-মিসকিনকে খাইয়ে দাও তাহলে কোনোরূপ দ্বিধা-সন্দেহ ছাড়া তোমাদের মতে সে মানত আদায় হবে কিনা? যদি নির্দ্বিধায় তোমরা এটা করতে পার এবং নিজ মানত সম্পর্কে এতে তোমাদের মনে কোনো খটকা না জাগে, তাহলে তোমরা সাচ্চা বটে। আর তা না হলে তোমরা মিথ্যুক এবং তোমাদের এ কাজ শিরক, পশুটি মৃত ও হারাম। −[তাফসীরে ওসমানী]

আয়াতের মর্ম হলো, চরম প্রয়োজন ও ঠেকার মুহূর্তে উল্লিখিত হারাম খাদ্যসমূহও ন্যূনতম পরিমাণে আহার করতে পারে। চরম প্রয়োজন দুভাবে হতে পারে−

১. ক্ষুধার তাড়নায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হওয়া এবং হালাল খাবার কোনো উপায়ে সংগৃহীত না হওয়া কিংবা সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণে হালাল খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্য না হওয়া কিংবা কোনো রোগ-ব্যাধির কারণে বিদ্যমান হালাল খাবার আহারের অযোগ্য হওয়া।

২. কোনো শাসক বা সবল প্রতিপক্ষ সে হারাম খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করলে। মোটকথা এ উপায়হীনতার সূত্র দুটি। এক. প্রচণ্ড ক্ষুধা; দুই. হারাম খেতে বাধ্য করা। −[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ : অর্থাৎ হারাম খাওয়ার সময় তার মনের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন না হতে হবে। আর তার প্রয়োজন হতে হবে বাস্তব। অবধ্যতা তো এভাবে যে, অনন্যোপায় অবস্থায় না পৌঁছতেই খেয়ে নিল। আর সীমালঙ্ঘন হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদরপূর্তি করে খাওয়া। কেবল প্রাণে বাঁচে পরিমাণই খাওয়া যাবে।
−[তাফসীরে ওসমানী]

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরবর্গ বলেছেন− لَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَّا قَدْرَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ অর্থাৎ "অনন্যোপায় ব্যক্তি মৃত প্রাণীর ততটুকুই খাবে, যতটুকু দিয়ে সে তার জীবন [শেষ নিঃশ্বাসটুকু] ধরে রাখতে পারে।" −[তাফসীরে কাবীর]

وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْجُمْهُوْرُ الْمَعْصِيَةُ الْعَارِضَةُ لَا يَمْنَعُ الرُّخْصَةَ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْبَغْيُ هُوَ طَلَبُ اَنْ يُؤْثِرَ نَفْسَهُ عَلٰى مُضْطَرٍّ آخَرَ بِاَنْ يَنْفَرِدَ بِتَنَاوُلِهٖ فَيَهْلَكَ الْآخَرُ وَالْعَدْوُ وَهُوَ التَّعَدِّيْ وَالتَّجَاوُزُ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَهُوَ سَدُّ الرَّمَقِ . (حَاشِيَة)

قَوْلُهُ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ : [সে হারাম বস্তু খেয়ে ফেললে গুনাহ নেই।] বরং অনেক ক্ষেত্রে তো এ রকম অবস্থায় না খেলে [এবং মৃত্যু মুখে পতিত হলে] গুনাহ হবে। তথা খাওয়া পরিহার করার কারণে গুনাহগার হবে [রূহুল মাআনী]। কেননা জীবন রক্ষা প্রথম স্তরের ফরজসমূহের অন্যতম। আর এরূপ চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে খাদ্য গ্রহণ না করা আত্মহত্যারই নামান্তর; যা হারাম খাওয়ার চেয়ে জঘন্যতর।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٧٤. اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا يَأْخُذُوْنَهٗ بَدْلَهٗ مِنْ سَفْلَتِهِمْ فَلَا يُظْهِرُوْنَهٗ خَوْفَ فَوْتِهٖ عَلَيْهِمْ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ لِاَنَّهَا مَالُهُمْ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غَضَبًا عَلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنْ دَنَسِ الذُّنُوْبِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ هُوَ النَّارُ.

১৭৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবরণ সংবলিত যে কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে তারা হলো ইহুদিগণ, ও এর বিনিময়ে দুনিয়ার [তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করে] অর্থাৎ অনুগত ছোট লোকদের নিকট হতে তারা বিনিময় গ্রহণ করে। আর এই স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তারা তা [রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কিত বিবরণাদি] প্রকাশ করে না তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। কেননা এ জাহান্নামাগ্নিই তাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধবশত তাদের সাথে কোনো কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে তাযকিয়া করবেন না; পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ বেদনাকর শাস্তি তা হলো জাহান্নাম।

١٧٥. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى اَخَذُوْهَا بَدْلَهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ لَوْ لَمْ يَكْتُمُوْا فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ اَىْ مَا اَشَدَّ صَبْرَهُمْ وَهُوَ تَعَجُّبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اِرْتِكَابِهِمْ مُوْجِبَاتِهَا مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ وَاِلَّا فَاَىُّ صَبْرٍ لَهُمْ.

১৭৫. তারাই ক্রয় করে নিয়েছে সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা হেদায়েত ও সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং যদি সত্য গোপন না করত তবে পরকালে যে ক্ষমা তাদের জন্যে রাখা হয়েছিল সেই ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি। আগুন সহ্য করতে তাদের কি ধৈর্য! অর্থাৎ কি ভীষণ তাদের এই ধৈর্য! বেপরোয়া ও দ্বিধাহীনভাবে জাহান্নাম-প্রবেশের কারণসমূহ তাদেরকে অবলম্বন করতে দেখে মু'মিনদের পক্ষ হতে হলো এ বিস্ময়। বস্তুত জাহান্নামাগ্নির উপর তাদের আর কি ধৈর্য হতে পারে?

١٧٦. ذٰلِكَ الَّذِىْ ذُكِرَ مِنْ اَكْلِهِمُ النَّارَ وَمَا بَعْدَهٗ بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَّلَ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ حَيْثُ اٰمَنُوْا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهٖ بِكَتْمِهٖ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ بِذٰلِكَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَقِيْلَ الْمُشْرِكُوْنَ فِى الْقُرْاٰنِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ شِعْرٌ وَبَعْضُهُمْ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ لَفِىْ شِقَاقٍ خِلَافٍ بَعِيْدٍ عَنِ الْحَقِّ.

১৭৬. তা অর্থাৎ জঠরে অগ্নি পুরা এবং যে সমস্ত বিষয় তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে তা এ কারণে যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। অনন্তর তাতে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। কিছু অংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আর কিছু অংশ গোপন করে তা প্রত্যাখ্যান করে; এবং এরূপভাবে অর্থাৎ কিছু বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে আর কিছু বিষয় প্রত্যাখ্যান করে যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করে তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেন, তারা হলো মুশরিক সম্প্রদায়। কুরআন সম্পর্কে তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছিল। তাদের কয়েকজন বলেছিল যে, এটা [আল কুরআন] কবিতা, কয়েকজন বলেছিল যে, এটা যাদু, আর কয়েকজন বলেছিল যে, এটা গণনাশাস্ত্রের বই। নিঃসন্দেহে তারা জিদের মধ্যে অর্থাৎ তার বিরোধিতায় সত্য হতে বহুদূরে পতিত।

بِاَنَّ اللّٰهَ -এর ب টি এ স্থানে سَبَبِيَّة বা হেতুবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بِالْحَقِّ শব্দটি نَزَّلَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْاِشْتِمَالُ : সংবলিত, শামিলকারী। اَلْمُشْتَمِلُ : সংবলিত, শামিলকারী। كَتَمَ অর্থ– গোপন করা। كَتَمَ (ن) كَتْمًا وَكِتْمَانًا [গোপন করে] : يَكْتُمُوْنَ (اِفْتِعَال) অর্থ– শামিল করা, অন্তর্ভুক্ত করা। سَفِلَتِهِمْ : سُفْلَةٌ নিম্ন শ্রেণির লোক। لَا يُظْهِرُوْنَهُ : তা প্রকাশ করত না। قَوْتٌ : ছুটে যাওয়া। مَالٌ : পরিণতি। دَنَسٌ : ময়লা। اَلْمُعَدَّةُ প্রস্তুতকৃত। اِعْدَادًا (اِفْعَال) اَعَدَّ অর্থ– প্রস্তুত করা। مُوْجِبَاتٌ : আবশ্যককারী। مُبَالَاةٌ : পরোয়া। شِعْرٌ : কবিতা। ব-ব اَشْعَارٌ - سِحْرٌ : যাদু। كَهَانَةٌ : গননাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র شِقَاقٌ : শত্রুতা, বিরোধিতা। بِحَيْثُ يَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ فِىْ شِقٍّ اَىْ طَرَفٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নযূল : এ আয়াতটি ঐ সকল ইহুদি আলেমদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা তাওরাতের বিধিবিধানকে এবং বিশেষ করে রাসূল ﷺ -এর বিবরণ সাধারণ মানুষ থেকে গোপন করত। এমনকি বর্ণিত গুণাবলির বিপরীত তথ্য পরিবেশন করত এবং সাধারণ জনগণ থেকে হাদিয়া-তোহফা আদায় করত।

ইহুদি আলেমদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী তাদের বংশধারা থেকেই হবেন। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈল থেকে শেষ নবীর আবির্ভাব হলো তখন তারা হিংসা, কায়েমী স্বার্থ ও উপহার-উপঢৌকনের লিপ্সায় তাওরাতে বর্ণিত রাসূল ﷺ -এর বিবরণ গোপন করতে থাকে। –[বয়ানুল কুরআনের টীকা]

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল যদিও একটা বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু তার আবেদন ব্যাপক। অর্থাৎ এখনো যদি কেউ সত্যকে গোপন করে এবং দীন বিক্রি করে সেও উক্ত ধমকির অধিকারী হবে।

قَوْلُهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا : এর অর্থ এমন নয় যে, বিনিময়ের পরিমাণ অধিক হলে বা তা খুব দামি কিছু হলে দীন বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে; বরং পার্থিব যে কোনো পরিমাণের বিনিময়ই তুচ্ছ ও নগণ্য। কেননা আখেরাতের স্থায়ী কল্যাণের তুলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভ তা যতই বিশাল হোক না কেন, সব সময় অল্প ও তুচ্ছই থাকবে।

قَوْلُهُ اِخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ : অর্থাৎ অকারণে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজেদেরই আসমানি কিতাবে কলহ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করেছে। অন্যথায় আল্লাহর বাণী পূর্ণাঙ্গ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল বিধায় তাতে মতপার্থক্যের কোনো অবকাশই ছিল না।

قَوْلُهُ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ : অর্থাৎ বিভ্রান্ত হয়ে সত্য ও ন্যায় হতে অনেক দূরে নিপতিত হয়েছে। অর্থ এরূপও করা যেতে পারে যে, তাদের মাঝে পরীক্ষিত এ চরম উদাসীনতার কারণ হলো, তারা আত্মগরযে ও স্বার্থ সিদ্ধির মানসে অযথা আল্লাহর সত্য বাণীতে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। পরিণতিতে তারা আরো মারাত্মক ভ্রান্তির শিকার হলো।

http://islamiboi.wordpress.com

١٧٧. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ فِي الصَّلٰوةِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى حَيْثُ زَعَمُوْا ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ اَىْ ذَا الْبِرِّ وَقُرِئَ الْبَارُّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكُتُبِ اَىِ الْكُتُبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى مَعَ حُبِّهٖ لَهٗ ذَوِى الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ الْمُسَافِرِ السَّائِلِيْنَ الطَّالِبِيْنَ وَفِى فَكِّ الرِّقَابِ الْمُكَاتَبِيْنَ وَالْاَسْرٰى وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَمَا قَبْلَهٗ فِى التَّطَوُّعِ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا اللّٰهَ اَوِ النَّاسَ وَالصّٰبِرِيْنَ نَصَبٌ عَلَى الْمَدْحِ فِى الْبَأْسَاءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالضَّرَّاءِ الْمَرَضِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ وَقْتَ شِدَّةِ الْقِتَالِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِى اِيْمَانِهِمْ اَوْ اِدِّعَاءِ الْبِرِّ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ اللّٰهَ.

অনুবাদ :

১৭৭. সালাতে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নেই। ইহুদি ও খ্রিস্টানগণের এহেন ধারণা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। পক্ষান্তরে পুণ্য হলো اَلْبِرَّ শব্দটি اَلْبَارُّ [অর্থাৎ পুণ্যবান] রূপেও অপর এক পাঠ রয়েছে। অর্থাৎ পুণ্যের অধিকারী হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব অর্থাৎ সকল কিতাব এবং নবীগণে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার অর্থাৎ সম্পদের প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও عَلٰى حُبِّهٖ-এর عَلٰى শব্দটি এ স্থানে مَعَ [সহ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আত্মীয়স্বজন, নিকট সম্পর্কের অধিকারী জন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পথ-সন্তান অর্থাৎ মুসাফির প্রার্থী যাচনাকারী এবং গ্রীবা সম্পর্কে অর্থাৎ মুকাতাব দাস ও বন্দীদের মুক্তকরণে অর্থদান করে আর সালাত কায়েম করে, জাকাত অর্থাৎ ফরজ জাকাত প্রদান করে। পূর্বে যে দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নফল অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা আদায় করে। আল্লাহ বা মানুষের সাথে যখন তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তারা তা পূরণ করে। সংকটে কঠিন দারিদ্র্যকষ্টে [দুঃখকষ্টে] অর্থাৎ অসুখ-বিসুখে এবং যুদ্ধকালে অর্থাৎ আল্লাহর পথে কঠিন লড়াইয়ে লিপ্ত যখন তখন যারা ধৈর্যধারণ করে। اَلصَّابِرِيْنَ শব্দটি نَصْبٌ عَلَى الْمَدْحِ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা অর্থাৎ উল্লিখিত গুণের অধিকারী যারা তারাই তাদের ঈমানের ও পুণ্যকর্মের দাবিতে সত্যবাদী এবং তারাই আল্লাহকে ভয়কারী।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْبِرُّ : পুণ্য اِسْمٌ جَامِعٌ لِلطَّاعَاتِ وَأَعْمَالِ الْخَيْرِ - اَنْ تُوَلُّوْا : মুখ ফিরানো। قِبَلَ : দিকে। فَكٌّ : যুক্ত করা।
اَلرِّقَابُ : رَقَبَةٌ-এর ব-ব। অর্থ– গর্দান, গ্রীবা। وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْعُنُقُ وَتُطْلَقُ عَلَى الْبَدَنِ كُلِّهِ
اَلْمُكَاتَبِيْنَ : مُكَاتَبٌ-এর ব-ব। অর্থ– মুকাতাব দাস। اَلْأَسْرٰى : বন্দী। اَسِيْرٌ-এর বহুবচন।
اَلْمُوْفُوْنَ : পূরণকারী। اِسْمُ فَاعِلٍ جَمْعُ مُذَكَّرٍ-এর সীগাহ। (اِفْعَال) اَلْاِيْفَاءُ অর্থাৎ পূরণ করা। মূলত مُوْفِيُوْنَ ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

وَأَصْلُ الْبَأْسِ فِي اللُّغَةِ الشِّدَّةُ । الْبَأْسُ : যুদ্ধ । الضَّرَّاءُ : অসুখ-বিসুখ । الْبَأْسَاءُ : সংকট, দারিদ্র্যকষ্ট ।

قَوْلُهُ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ .... : لَيْسَ এটি فِعْلٌ نَاقِصٌ مَاضِيْ جَامِدٌ এবং তার মুযারের ব্যবহার নেই। কেননা لَيْسَ যদিও মাযীর সীগাহ কিন্তু তার অর্থটি حَالٌ তথা বর্তমানকালের نَفِيْ বুঝায়।

قَوْلُهُ الْبِرَّ بِالنَّصْبِ : الْبِرَّ শব্দটি لَيْسَ -এর خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে, আর أَنْ تُوَلُّوْا মাসদার হয়ে لَيْسَ -এর إِسْمٌ مُؤَخَّرٌ হয়েছে। কোনো কোনো কেরাতে الْبِرُّ -কে لَيْسَ -এর إِسْمٌ সাব্যস্ত করে مَرْفُوْعٌ রূপেও পড়া হয়েছে।

الْبِرُّ : এ শব্দটি আরবি অভিধানের একটি ব্যাপক বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ, যা পুণ্যের সকল প্রকার ও প্রকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। উর্দুতে এর যথার্থ মর্ম প্রকাশ করা যায় طَاعَتْ [আনুগত্য, পুণ্য] শব্দ দিয়ে [এবং বাংলায় এর প্রতিশব্দ হবে পুণ্য ও সৎকাজ]। الْبِرُّ হলো ভালো কাজে বিস্তৃত অবকাশ। সুতরাং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে ছওয়াব এবং বান্দার পক্ষে হবে আনুগত্য। -[রাগিব]

قَوْلُهُ أَنْ تُوَلُّوْا : তোমরা অভিমুখী হও, মুখ ফিরাও। এ শব্দটি تَوْلِيَةٌ মাসদার থেকে جَمْعُ مُذَكَّرٍ حَاضِرٍ -এর সীগাহ। أَنْ -এর কারণে نُوْنِ إِعْرَابِيْ পড়ে গেছে। শব্দটি أَضْدَادٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। তার অর্থ- অভিমুখী হওয়া এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়া উভয়টি হতে পারে।

قَوْلُهُ ذَا الْبِرِّ وَقُرِئَ الْبَارُّ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো- لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ -এর মাঝে মাসদারের হামল যাতের উপর হচ্ছে, যা শুদ্ধ নয়। কেননা বাক্যটির তরজমা হচ্ছে- পুণ্য হলো তা, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। অথচ এটি অশুদ্ধ কথা।

উত্তর: উক্ত প্রশ্নের দুটি উত্তর দেওয়া হয়েছে-

১. মাসদারের পূর্বে ذُوْ উহ্য ধরা হবে। অর্থাৎ ذَا الْبِرِّ এভাবে মাসদার إِسْمُ فَاعِلٍ হয়ে যাবে। এখন অনুবাদ হবে- কিন্তু পুণ্যের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে।

২. بِرٌّ মাসদারটি بَارٌّ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেউ কেউ তৃতীয় আরেকটি উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, খবরের পূর্বে একটি মাসদার মাহযূফ মানা হবে। তাকদীরী ইবারত হবে- وَلٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ অর্থাৎ আনুগত্য তো [গ্রহণযোগ্য] তার আনুগত্য, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।

قَوْلُهُ نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ : এ ইবারত দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: প্রশ্নটি হলো, وَالصّٰبِرِيْنَ শব্দটি مَرْفُوْعٌ রূপে وَالصّٰبِرُوْنَ পড়া উচিত ছিল। কেননা এটি اَلْمُوْفُوْنَ -এর সাথে عَطْفٌ হয়েছে।

উত্তর: اَلْمُوْفُوْنَ -এর সাথে عَطْفٌ হওয়ার কারণে যদিও مَرْفُوْعٌ রূপে وَالصّٰبِرُوْنَ পড়া উচিত ছিল তথাপিও নসব দিয়ে পড়ার কারণ হলো, এর পূর্বে أَمْدَحُ শব্দ উহ্য রয়েছে। এ কারণেই وَالصّٰبِرِيْنَ পড়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দিক পূজার রহস্য : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর বুকে বিরাজমান অগণিত ভ্রান্তির মাঝে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তি ছিল 'দিক পূজা'। অর্থাৎ প্রাণহীন দেবদেবী, প্রতিমা, পাথর, গাছ, পাহাড়, সাগর ইত্যাদি ছাড়াও [কোনো বিশেষ বস্তুর] দিক, প্রান্তের পূজাও প্রচলিত ছিল। অন্ধকার যুগের অনেক সম্প্রদায় বিশ্বাস জমিয়ে নিয়েছিল যে, অমুক বিশেষ দিক যথা- পূর্বদিক পবিত্র, কিংবা অমুক নির্দিষ্ট দিক পূজনীয়।

পবিত্র কুরআন এখানে শিরক-এর এ বিশেষ দিকটি খণ্ডন করে ঘোষণা করছে- নিছক কোনো দিক কি করে পবিত্র ও শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে? যে কোনো দিক শুধু 'দিক' হওয়ার বিচারে কখনোই সম্মান বা পবিত্রতার পাত্র হতে পারে না এবং পুণ্য ও ইবাদতের সঙ্গে এর কোনোই সম্পর্ক নেই।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এ ভ্রান্তির বিষয়টি দৃষ্টিতে না থাকলে এ আয়াতে বাহ্যত জটিলতার সম্মুখীন হতে হবে।

এ কথাও স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্মে সালাতের কিবলারূপে নির্ণীত দিক শুধু দিক হওয়ার মানদণ্ডে নির্ণীত হয়নি; বরং ইসলাম তো কা'বা ঘরকে একটি কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে তাকে কিবলা [মুখ করার দিক] সাব্যস্ত করেছে, কোনো বিশেষ দিককে নয়। সুতরাং সালাত যে কোনো দিকেই হতে পারে, যদি সে দিকে কিবলা থাকে। এজন্যই সারা মুসলিম বিশ্বে এটা

http://islamiboi.wordpress.com

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় যে, মিসর, ত্রিপোলী ও আবিসিনিয়া [ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া] থেকে কা'বা পূর্বদিকে [হওয়ায় এসব দেশের লোকেরা পূর্বদিকে মুখ করে সালাত আদায় করে]। আবার ভারত, চীন ও আফগানিস্তান থেকে কা'বা পশ্চিম দিকে, সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মদিনা থেকে দক্ষিণ দিকে এবং ইয়েমেন ও লোহিত সাগরের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে অবস্থিত। এছাড়া আরো বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন কোণে [দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ইত্যাদি] কিবলা সব্যস্ত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فِى الصَّلَاةِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো, নামাজের বাইরে বিশেষ কোনো দিকে মুখ করা কোনো ধর্মাবলম্বীদের কাছেই প্রশংসনীয় কিংবা কাম্য নয়।

قَوْلُهُ الْمَشْرِقِ : সূর্য দেবতা শিরক জগতে 'বড় খোদা'র মর্যাদা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন পৌত্তলিক সম্প্রদায় ব্যাপকহারে সূর্যপূজা করেছে। সূর্য যেহেতু পূর্বদিকে উদিত হতে দেখা যায়, তাই জাহিলি যুগের সম্প্রদায়গুলোর প্রায় সকলেই পূর্বদিককেও পূত-পবিত্র মনে করেছে এবং পূর্বদিকে মুখ করা ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত হয়েছে। পবিত্র কুরআন এ পূর্বমুখীতার উপর তীব্র আঘাত হেনে বলে দিয়েছে যে, দিক-বলয়ের পবিত্রতার ধারণা কোনোক্রমেই ইবাদত-আনুগত্য হতে পারে না; বরং আয়াতের পরবর্তী অংশে বিবৃত বিষয়গুলোই ইবাদত-বন্দেগির মর্যাদায় ভূষিত। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الْمَغْرِبِ : পশ্চিম দিককে পূজাযোগ্য মনে করার ধারণাটি অবশ্য পূর্বদিকের তুলনায় অনেক কম। তবে মোটামুটি ব্যাপক হারে পশ্চিম পূজার মহামারি শিরক জগতে বিদ্যমান ছিল। সূর্যের উদয় ও অস্তের প্রতি লক্ষ্য করে মুশরিক সম্প্রদায়গুলোর চিন্তাধারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, জীবনের উৎস যদি পূর্বদিকে হয়ে থাকে তবে পশ্চিম দিকেও তো জীবনের স্থিতি কেন্দ্র ও জীবনাবসানের প্রান্ত দিক। সুতরাং এটিও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পাত্র হবে। পূর্ব ও পশ্চিম নাম দুটির উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ। উদ্দেশ্য যে কোনো দিক বুঝানো, শুধু দুটি দিক নির্দিষ্ট করে বুঝানোই উদ্দেশ্য নয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ الخ : পৌত্তলিক ধ্যানধারণা খণ্ডন করার পর এখন প্রকৃত ইবাদতের ফিরিস্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে। এতে উক্ত বিতর্কের ইতি টানা হয়েছে। সারমর্ম হলো, দিক বলয়ের পবিত্রতার ধারণা কোনোক্রমেই ইবাদত-আনুগত্য হতে পারে না; বরং আয়াতের পরবর্তী অংশে বিবৃত বিষয়গুলোই ইবাদত-বন্দেগির মর্যাদায় ভূষিত।

প্রথমে আকিদা ও আদর্শ সংস্কারে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা এটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না। আকাইদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ-এর মাঝে তার আলোচনা করা হয়েছে। এরপর ঈমানের অবশিষ্ট অংশের আলোচনা এসেছে- وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ-এর মাঝে। ঈমানের পর ইবাদতের স্তর। وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ-এর মাঝে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর وَالْمُوْفُوْنَ থেকে মুআমালাতের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ : এখানে ه সর্বনাম সম্পর্কে তিনিটি সম্ভবনা রয়েছে-

১. اَللّٰهُ [আল্লাহ তা'আলা]। সুতরাং 'তার প্রেমে' অর্থ- আল্লাহর প্রেমে। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষায়।

২. مَالٌ [সম্পদ] তখন অর্থ এভাবে করা হবে যে, সম্পদ ব্যয় করা সম্পদের মোহ ও আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও হবে। অর্থাৎ সর্বনাম দ্বারা 'আল্লাহ' স্থলে নিকটবর্তী اَلْمَالُ [সম্পদ] শব্দ উদ্দেশ্য হবে। অভিমতটি অধিকাংশের।

৩. اِيْتَانٌ যা اٰتَى থেকে বুঝে আসে। অর্থ- আল্লাহর পথে দান করাকে প্রিয় মনে করে অভাবীদের দান করে।

দ্বিতীয় অভিমতের মর্ম : অর্থাৎ ধনসম্পদের প্রতি মোহ ও আকর্ষণ তার অন্তরে বিদ্যমান, বাস্তব জীবনে সম্পদের প্রয়োজন ও মূল্যমানের কথাও তার জানা রয়েছে; তার কামনা-বাসনাগুলোও সদা জাগ্রত রয়েছে। নিজের জন্যে নিজের প্রিয় ও পছন্দনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করার পরিকল্পনা ও ইচ্ছাও তার পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এত কিছুর পরেও আল্লাহর হুকুমের সামনে সে মাথা নত করে দেয়। নিজের কামনা-বাসনাগুলো প্রদমিত রেখে নিজের শখ ও চাহিদাগুলো আল্লাহর নির্দেশ পালনে উৎসর্গিত করে দেয়, সে তো করার সে কাজ, যা তার আল্লাহর হুকুম। তার ব্যয়ক্ষেত্র হবে শরিয়ত নির্দেশিত ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহ।

قَوْلُهُ ذَوِى الْقُرْبٰى : এতে ইসলামের নির্দেশিত সুষম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তম ক্ষেত্রের বিন্যাস লক্ষণীয়। আয়াতের এ অংশে উম্মতের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর্থিক সহায়তার সূচনা করতে হবে আত্মীয় ও [illegible] দিয়ে। এরাই কোনো বিত্তশালীর সহায়তা পাওয়ার সর্বাগ্র অধিকারী।

http://islamiboi.wordpress.com

ভাইয়ের আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হবে আর বোন কুঁড়ে ঘর তৈরির জন্যে হিমশিম খাবে, সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দুয়ারে দুয়ারে ধন্না দেবে। চাচা ব্যক্তিগত অত্যাধুনিক গাড়িতে চড়বেন, আর ভাইপো একটা রিকশার ভাড়া যোগাড় করতে প্রাণান্ত হবে– এমন হতে পারে না। যে কোনো বিত্তবানকে তার অভাবগ্রস্ত আত্মীয়, জ্ঞাতি, ভাই-বোন, ভাইপো-ভাগ্নে এবং অন্যান্য আত্মীয়ের খোঁজখবর নিতে হবে সবার আগে। এর পরের নম্বর আসবে নিজের বস্তির, নিজের পাড়া ও মহল্লার ; ক্রমান্বয়ে নিজের গ্রাম, ইউনিয়ন ও শহরের এতিম ছেলে মেয়েদের, যাদের কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সম্পদশালী পূর্বপুরুষ, কোনো তত্ত্বধায়ক নেই। পরবর্তী স্তরে ক্রম অনুসারে আসবে উম্মতের নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও সাধারণ গরিবদের অধিকারের পালা। অতঃপর মুসাফির, প্রবাসী, পথচারী ও ফুটপাতের বাসিন্দারা, যারা পথ চলার খরচ-পাথেয় হতে বঞ্চিত এবং সে কারণে তার প্রয়োজনীয় সফর সম্পাদনে অপারগ। কিংবা বস্তিতে কোনো বহিরাগত- যার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে কেউ এগিয়ে আসছে না, কেউ তার দুরবস্থার সন্ধান ও তা লাঘরের ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সবশেষে রয়েছে অনটনের শিকার সাহায্যপ্রার্থী ভিক্ষুক। এ পূর্ণাঙ্গ আর্থসমাজিক কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে উম্মতের কোথাও কি দারিদ্য-অনটন, জীবনধারণ সংকট ও বেকার সমস্যা জনিত উপার্জন সংকটের অস্তিত্ব থাকতে পারে? –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الرِّقَابِ : এটি رَقَبَةٌ -এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ– ঘাড়, গর্দান। পরিভাষায় সেসব লোক যাদের মাথা পারাধীন কিংবা আবদ্ধ। অর্থাৎ দাস [দাসী] যারা অন্যর মালিকানাধীন কিংবা বন্দী। যে কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি মকদ্দমায় গ্রেফতার হয়ে কারারুদ্ধ জীবনযাপন করছে। اَلرَّقَبَةُ مَجَازٌ عَنِ الشَّخْصِ অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যক্তি, মানুষ।–[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ الخ : আদর্শ ও আকিদা সংস্কারের পরে লেনদেন বিষয়েরও সংস্কার-সংশোধন করা হলো। এখন ক্রমিকে রয়েছে ইবাদত। ইবাদত তো অসংখ্য রয়েছে। তবে প্রধানত মৌলিকভাবে তা দুভাগ করা যায়। ১. দৈহিক ২. আর্থিক বা সম্পদ দ্বারা ইবাদত। এখানে اَلصَّلٰوةُ ও اَلزَّكٰوةُ বলে উভয়ের মৌলিক দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সালাত সব ধরনের দৈহিক ইবাদতের প্রতীক এবং জাকাত সব ধরনের আর্থিক ইবাদতের প্রতীক। اَقَامَ الصَّلٰوةَ সালাত কায়েম অর্থাৎ যথা সময়ে যথানিয়মে যথার্থরূপে আদায় করতে থাকে। اٰتَى الزَّكٰوةَ অর্থাৎ শরিয়তের নির্ধারিত নীতি-পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিত জাকাত আদায় করতে থাকে।

قَوْلُهُ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ : আকিদা, মুআমালা ও ইবাদতের পরে এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখলাক নৈতিকতা বা নীতি চরিত্র। عهد সব ধরনের অঙ্গীকার ও চুক্তিকে সমন্বিত করে, তা স্রষ্টার সাথে বান্দার অঙ্গীকার হোক কিংবা বান্দাদের পারস্পরিক অঙ্গীকার হোক। মু'মিন তো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা মিথ্যা অঙ্গীকার নামে কোনো কিছুর সাথে পরিচিত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে এবং তাদের ও অন্য মানুষদের মাঝে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ : অর্থাৎ প্রকৃত যোগ্যতা ও মাহাত্ম্যে সমৃদ্ধ এবং আনুগত্য ও আল্লাহভীতিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হওয়ার নিদর্শন এগুলোই যা উপরে বর্ণিত হলো। এ মানদণ্ডে যাকে ইচ্ছা যাচাই ও পরখ করে দেখতে পার।

আয়াতের গুরুত্ব ও সারমর্ম : পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াত স্বকীয় মান-মর্যাদা ও মাহাত্ম্যপূর্ণ এবং অবশ্য পালনীয়। তবুও এ আয়াত সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর হাদীসে এরূপ স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান– مَنْ عَمِلَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ অর্থাৎ "এ আয়াত অনুসারে যে ব্যক্তি আমল করবে, সে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ করে নিল।"

বিষয়াভিজ্ঞগণ বলেছেন, এ আয়াতটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহের একটি এবং এতে দীনের ষোলোটি আমল সমন্বিত হয়েছে– ১. আল্লাহ এবং তার নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস। ২. হাশর-নশর ও কিয়ামতে বিশ্বাস। ৩. মীযান তথা আমলের পরিমাপে বিশ্বাস। ৪. হাওযে কাওছার -এ বিশ্বাস। ৫. শাফাআতে বিশ্বাস। ৬. জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস। ৭. ফেরেশতায় বিশ্বাস। ৮. আসমানি গ্রন্থসমূহে এবং তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হওয়াতে বিশ্বাস। ৯. নবীগণের প্রতি বিশ্বাস। ১০. আবশ্যকীয় ও পছন্দনীয় [ওয়াজিব ও মোস্তাহাব] ক্ষেত্রসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। ১১. আত্মীয়তা সংযোগ ও বিছিন্নতা বর্জন [সম্পদ ব্যয়ের সূত্রে]। ১২. এতিমের খোঁজখবর রাখা ও তাকে ছন্নছাড়া করে না রাখা। ১৩. তদ্রূপ মিসকিনের খোঁজখবর। ১৪. পথচারী-প্রবাসীদের খোঁজখবর। ১৫. সাহায্যপ্রার্থী ভিক্ষুকের সহায়তা ও ১৬. দাসী বন্দী-মুক্তির ব্যবস্থা। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো আধ্যাত্মবাদী বুজুর্গ এ আয়াতের অংশগুলোর সারবত্তা ও ব্যাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এ আয়াতটি শরিয়ত ও তরিকতের মূল ও মাপকাঠি। কেননা এ আয়াত প্রমাণ করে যে, মু'মিনের জন্যে শুধু মনের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। আবার শুধু বাহ্য কর্মও যথেষ্ট নয়, বরং অন্তরে ঈমান থাকা যেমন জরুরি, বাইরে আহকাম ও বিধিবিধান পালনও অপরিহার্য।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১৭৮ ١٧٨. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْمُمَاثَلَةُ فِى الْقَتْلٰى وَصْفًا وَفِعْلًا اَلْحُرُّ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَلَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَاَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِى الدِّيْنِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا .

১৭৮. হে মু'মিনগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাসের অর্থাৎ কার্যের পরিমাণ ও গুণ উভয়বিদ সমতার [হত্যার বা যখমের বদলায় সমতার] বিধান দেওয়া হয়েছে। ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে হত্যা করা হবে স্বাধীন ব্যক্তি দাসের বদলে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে যে, নারীর বদলে পুরুষকে হত্যা করা যাবে। আর ধর্ম বিশ্বাসের বেলায়ও এ সমতায় খেয়াল করা হবে। সুতরাং কাফের যদি স্বাধীনও হয় তবু তার বদলে কোনো মুসলিম সে দাস হলেও তাকে হত্যা করা যাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

كُتِبَ فُرِضَ : وَاَصْلُ الْكِتَابَةِ الْخَطُّ كُنِيَ بِهِ عَنِ الْاِلْزَامِ بِقَرِيْنَةِ عَلٰى অর্থাৎ كِتَابَت শব্দের মূল অর্থ হলো, লেখা। যেহেতু তার পূর্বে عَلٰى হরফ এসেছে আর এটি اِلْزَام [চাপিয়ে দেওয়া, আরোপ করা] নির্দেশ করে, সেহেতু এখানে তা فَرْض করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قِصَاص : এ শব্দটি قَصُّ الْاَثَرِ [সে পদচিহ্নের অনুসরণ করল] থেকে নির্গত। অনুরূপভাবে কাতেল বা হত্যাকারীও এমন পথে চলেছে, যাতে তার অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ তাকেও হত্যা করা হয়।

اَلْقِصَاصُ مَاخُوْذٌ مِنْ قَصِّ الْاَثَرِ فَكَاَنَ الْقَاتِلُ سَلَكَ طَرِيْقًا يُقْتَصُّ اَثَرُهُ فِيْهَا اَىْ يُتَّبَعُ وَيُمْشٰى عَلٰى سَبِيْلِهِ فِىْ ذٰلِكَ وَمِنْهُ سُمِّىَ قِصَّةً لِاَنَّ الْقِصَصَ الْحِكَايَةُ يُسَاوِى الْمَحْكِىْ .

اَلْمُمَاثَلَةُ : এ শব্দ বৃদ্ধির দ্বারা এ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে যে, قِصَاص -এর صِلَه হিসেবে فِىْ আসে না। অথচ এখানে فِىْ ব্যবহৃত হয়েছে। জবাব : قِصَاص শব্দে مُمَاثَلَة -এর অর্থ নিহিত রয়েছে, তাই صِلَه হিসেবে فِىْ ব্যবহার করা সঠিক আছে। (وَلِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْمُمَاثَلَةِ عُدِّىَ بِفِىْ وَقِيْلَ فِىْ لِلسَّبَبِيَّةِ اَىْ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে সৎকর্ম ও পুণ্যের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যার উপর হেদায়েত ও মুক্তি নির্ভরশীল ছিল। সেই সঙ্গে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আহলে কিতাব সেসব গুণ হতে বঞ্চিত। স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে গুণাবলি ব্যতীত দীনে সত্যবাদী ও মুত্তাকী কেউ হতে পারে না। কাজেই এখন একমাত্র মুসলিম ব্যতীত আর কেউ সে মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে না, আহলে কিতাবও নয়, অজ্ঞ আরববাসীও নয়। তাই আর সকলকে উপেক্ষা করে কেবল মু'মিনগণকে সম্বোধন করে পুণ্য ও সৎকর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা তথা কায়িক ও আর্থিক ইবাদতসমূহ এবং বিবিধ রকম লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে তা'লীম দেওয়া হয়েছে। কেননা এসব শাখা-প্রশাখা পালন করা তার পক্ষেই সম্ভব যে উপরিউক্ত মূলনীতিসমূহে পরিপক্বতা অর্জন করেছে। অন্যসব লোককে এ বিষয়ে সম্বোধন করার উপযুক্তই মনে করা হয়নি। এজন্য তাদের ভীষণভাবে লজ্জিত হওয়া উচিত। এবারে এসব শাখাগত বিধিবিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মু'মিনগণের হেদায়েত ও তা'লীমই মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে প্রসঙ্গত কোথাও

http://islamiboi.wordpress.com

স্পষ্টভাষায় এবং কোথাও ইঙ্গিতে অন্যদের ত্রুটিও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى -এর মাঝে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহুদি প্রভৃতি সম্প্রদায় কিসাসের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করেছে, তা আল্লাহর আইনের বিপরীতে তাদের মনগড়া বিষয়, যাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পূর্বের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে না আসমানি কিতাবে তাদের বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত ছিল, না নবীগণের প্রতি তাদের ঈমান পরিপক্ব ছিল। এমনিভাবে না তারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, না দুঃখকষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। অন্যথায় তারা নিজেদের কোনো আত্মীয় বা আপনজন নিহত হয়ে গেলে এরূপ অধৈর্য ও খামখেয়ালীপনার পরিচয় দিত না যে, তারা মহান আল্লাহর আইন, রাসূলের নির্দেশ ও কিতাবের তা'লীম সব কিছু বিসর্জন দিয়ে নিরপরাধ লোককে হত্যা করার আদেশ করত। -[তাফসীরে উসমানী]

এ থেকে একথাও বুঝে আসে যে, ইসলাম তার অনুগামীদের ব্যাপারে পার্থিব জীবনেও সমুন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকার আশাবাদী। এ উম্মত পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হবে, এটি একটি স্বীকৃত মূলনীতি। মুসলিম জাতির শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লাগাতার কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তির অধীন হয়ে থাকা যেমন ইসলামের প্রাথমিক স্বীকৃত নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত-ই নয়। [কিন্তু] ফৌজাদারি হোক কিংবা দেওয়ানি, উভয় শ্রেণির দণ্ডবিধির অধিকাংশ ধারাই তো এমন, যার বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ইসলামি হওয়ার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ এসব বিধান ও ধারা প্রয়োগের জন্য উম্মতের অধিকারে যথাযথ ক্ষমতাও তো থাকতে হবে।

শানে নুযূল : জাহিলি যুগে তো আইনের শাসন ছিল না বললেই চলে। তাই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই বিরাজমান ছিল। শক্তিমান গোত্র দুর্বল গোত্রকে যেভাবে ইচ্ছা জুলুম করত। জুলুমের একটি সুরত এই ছিল যে, কোনো শক্তিশালী গোত্রের কোনো লোক নিহত হলে শুধু হত্যাকারীর বদলে তার গোত্রের একাধিক লোককে হত্যা করে ফেলত। কখনো পূর্ণ গোত্রকেই ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করত। পুরুষের স্থলে মহিলাকে এবং গোলামের বদলে আজাদকে হত্যা করে ফেলত।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) ইবনে আবী হাতিমের সূত্রে বর্ণনা করেন, ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বে দুটি গোত্রের মাঝে যুদ্ধ বাঁধে। উভয় পক্ষের বহু নারী-পুরুষ ও স্বাধীন-পরাধীন লোকজন নিহত হয়। তাদের মকদ্দমার মীমাংসা না হতেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। বিবদমান উভয় গোত্রই ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার পর পরস্পরের নিহতদের রক্তপণ গ্রহণের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। তন্মধ্যে যে গোত্রটি ছিল শক্তিশালী তারা বলল, আমরা যতক্ষণ আমাদের গোলামদের বদলে তাদের আজাদ ব্যক্তিকে এবং নারীদের বদলে পুরুষকে হত্যা না করব ততক্ষণ রাজি হব না। তাদের এহেন জাহিলি কর্মকাণ্ডের খণ্ডনে এ আয়াত নাজিল হয়- اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

যার সারমর্ম হলো তাদের দাবির খণ্ডন করা। ইসলাম সে যুগের নিপীড়নমূলক প্রথাগুলোর সমাধি রচনা করে নিজের ইনসাফপূর্ণ এ আইন বাস্তবায়ন করেছে যে, যে কতল করেছে, কেবল তাকেই কতল করা হবে। কোনো নারী কাউকে কতল করলে তার বদলে কোনো নির্দোষ পুরুষকে হত্যা করা হবে না। অনুরূপভাবে কোনো গোলাম কাউকে কতল করলে তার বদলে কোনো নির্দোষ পুরুষকে হত্যা করা হবে না।

আয়াতের ব্যাখ্যা কিছুতেই এমন নয় যে, কোনো নারীকে যদি কোনো পুরুষ কতল করে অথবা গোলামকে কোনো আজাদ ব্যক্তি কতল করে তাহলে তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে না; বরং কিসাসে [হত্যাকারী ও নিহতের মাঝে] সমতা লক্ষণীয় হবে এবং খুন ও জীবনের বিচারে সকলেই সমান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ এমন হবে না যে উঁচু স্তরের কোনো ব্যক্তির জীবনের মূল্য সাধারণ স্তরের কোনো ব্যক্তির চেয়ে অধিক ধার্য হবে। যেমনটি জাহিলি যুগের আরবদের রীতি ছিল।

জাহিলি যুগের আরবে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাসকে মেরে ফেললে কিসাস স্বরূপ সেই অপরাধী স্বাধীন ব্যক্তির জীবননাশ করার পরিবর্তে কোনো গোলামের জীবননাশ করা হতো। এটা শুধু প্রাচীন জাহেলিয়াতেই নয়; বরং বর্তমান পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য জাতির মাঝেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। আমেরিকার ন্যায় তথাকথিত সভ্য দেশে তো আজ অবধি একজন সাদা [white] মানুষের রক্ত একজন নিগ্রো [কালো মানুষ negro] -এর রক্তের চেয়ে অনেক অনেক দামি। ওদিকে ফিরিংগী [ইউরোপীয়] শাসকরা তো তাদের একজন নিহত ব্যক্তির বিনিময়ে হত্যাকারীদের অনেকজনের জীবন অবলীলায় বিনাশ করে থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ الْمُمَاثَلَةُ : উদ্দেশ্য হলো কিসাসে [হত্যাকারী ও নিহতের মাঝে] সমতা লক্ষণীয় হবে এবং খুন ও জীবনের বিচারে সকলেই সমান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ এমন হবে না যে, উঁচু স্তরের কোনো ব্যক্তির জীবনের মূল্য সাধারণ স্তরের কোনো ব্যক্তির চেয়ে অধিক ধার্য হবে।

قَوْلُهُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ : অর্থাৎ প্রত্যেক স্বাধীন নিহত ব্যক্তির বদলে কেবল সেই স্বাধীন এক ব্যক্তিকেই হত্যা করা যেতে পারে, যে এই নিহতের হত্যাকারী। এমন হতে পারে না যে, সেই একজনের বদলে হত্যাকারী গোত্র হতে নিজেদের ইচ্ছামতো দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ : অর্থাৎ প্রত্যেক গোলামের বদলে সেই এক গোলামকেই হত্যা করা হবে যে তার হত্যাকারী। এরূপ করা যাবে না যে, অভিজাত শ্রেণির গোলামের বদলে নিম্নশ্রেণির একজন পুরুষকে হত্যা করবে, অথচ হত্যাকারী তাদের একজন গোলাম।

قَوْلُهُ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى : অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর বদলে সেই নারীকেই হত্যা করা যাবে, যে তাকে হত্যা করেছে। এটা হতে পারে না যে, উচ্চশ্রেণির নারীর বদলে নিম্নশ্রেণির একজন পুরুষকে হত্যা করবে, অথচ হত্যাকারী তাদের একজন নারী। সারকথা, কিসাস গ্রহণে প্রত্যেক গোলাম অপর গোলামের সমতুল্য, এই সমতুল্যতা রক্ষা করতে হবে। আহলে কিতাব ও অজ্ঞ আরবরা যে বাড়াবাড়ি করত তা পরিত্যাজ্য।

মাসআলা : এক্ষেত্রে হানাফী ফিকহের দুটি ধারা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য–

১. নিহত ব্যক্তি কাফের হয়েও যদি জিম্মি [ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক] হয়, তবে তাকে হত্যা করার কিসাসও হত্যাকারীর উপর বর্তাবে, এমনকি হত্যাকারী মুসলমান হলেও। তবে হ্যাঁ, নিহত কাফের যদি হারবী [অমুসলিম দেশের বিধর্মী নাগরিক] হয়, সে ক্ষেত্রে হারবী কাফের যেহেতু বিদ্রোহী ও শত্রু তালিকাভুক্ত এবং ইসলামি রাষ্ট্রের দুশমন এবং এ কারণে তার নাম দেওয়া হয়েছে হারবী حَرْبِى [যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ] সুতরাং স্পষ্টতই তাকে হত্যা করা হলে তার হত্যাকারীর জন্যে কিসাস সাব্যস্ত হবে না।

২. সজ্ঞান হত্যার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বদলে স্বাধীন হত্যাকারীকে তো হত্যা করা হবেই, এমনকি গোলাম ও ক্রীতদাসের হত্যাকারী [তার মনিব ব্যতীত] কোনো স্বাধীন ব্যক্তি হলেও কিসাস স্বরূপ হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। তদ্রূপ নিহত নারীর কিসাসে হত্যাকারিণী নারীকে তো হত্যা করা হবেই এমনকি নিহত নারীর বদলে তার হত্যাকারী পুরুষ হলে তাকেও হত্যা করা হবে।

قَوْلُهُ الْقَتْلٰى : এটি قَتِيْلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– নিহত ব্যক্তি।

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে হত্যা (قَتْلِ عَمْد) -এর শাস্তি পৃথিবীর প্রায় সব আইনেই মৃত্যুদণ্ডই রয়েছে। অবশ্য সজ্ঞান হত্যার সংজ্ঞা নির্ণয়ে যথেষ্ট মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সজ্ঞান [عَمْد] হত্যা হলো, কেউ কাউকে স্বেচ্ছায় লৌহাস্ত্র [মারণাস্ত্র] দ্বারা কিংবা চামড়া ও গোশত কেটে ফেলে এমন কোনো মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে মেরে ফেলা।

قَوْلُهُ وَصْفًا وَفِعْلًا : مُمَاثَلَتْ فِى الْوَصْفِ -এর মর্ম হলো, স্বাধীন এবং গোলামের পার্থক্য হবে না। আর مُمَاثَلَتْ فِى الْفِعْلِ -এর মর্ম হলো, যে পদ্ধতিতে এবং যে অস্ত্র দ্বারা নিহতের হত্যা করা হয়েছে হত্যাকারীকেও সে পদ্ধতি ও সে অস্ত্র দ্বারাই হত্যা করা হবে। আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করলে ঘাতককেও জ্বালিয়ে মারা হবে। পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করা হলে ঘাতককেও ডুবিয়ে মারা হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে। তবে এটা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে فَلَا قَوَدَ اِلَّا بِالسَّيْفِ অর্থাৎ 'তরবারি ছাড়া কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না।' যে কোনো অস্ত্র দ্বারাই সে কাউকে হত্যা করুক তাকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।

আহনাফের ব্যাখ্যা ও মাযহাব : এবারে প্রশ্ন হলো স্বাধীন ব্যক্তি যদি কোনো গোলামকে কিংবা পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে কিসাস গ্রহণ করা হবে কিনা? এ আয়াত সে ব্যাপারে নীরব। এ নিয়ে ইমামগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এক আয়াতে আছে– اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ অর্থাৎ প্রাণের বদলে প্রাণ [৫ : ৪৫] এক হাদীসে আছে– اَلْمُسْلِمُوْنَ

http://islamiboi.wordpress.com

تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ অর্থাৎ 'মুসলিমগণের পরস্পরের রক্ত সমান সমান।' এর ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, উভয় অবস্থায় কিসাস জারি হবে। অর্থাৎ শক্তিমান ও দুর্বল, সুস্থ ও পীড়িত, সুস্থ ও পঙ্গু প্রমুখ পক্ষ যেমন কিসাসের ক্ষেত্রে বরাবর গণ্য হয় তেমনি স্বাধীন ও গোলাম এবং পুরুষ ও নারী এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সমপর্যায়ের। তবে শর্ত হলো নিহত গোলাম স্বাধীন ব্যক্তির মালিকানাধীন হতে পারবে না। কেননা এ অবস্থা তার নিকট কিসাসের বিধান হতে ব্যতিক্রম। কোনো মুসলিম যদি কাফের জিম্মিকে হত্যা করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর কিসাস জারি হবে না। তবে মুসলিম ও কুফরি রাষ্ট্রের কাফিরের মধ্যে কারো মতেই কিসাস জারি হবে না। -[তাফসীরে উসমানী]

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : لَا دَلَالَةَ فِى الْاٰيَةِ عَلٰى اَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ كَمَا لَا يَدُلُّ عَلٰى عَكْسِهٖ لِاَنَّ الْمَفْهُوْمَ اِنَّمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّخْصِيْصِ غَرَضٌ سِوَى اِخْتِصَاصِ الْحُكْمِ وَقَدْ بَيَّنَّا مَا كَانَ الْغَرَضُ وَهُوَ اَنَّ نُزُوْلَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فِىْ حَيَّيْنِ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ بَيْنَهُمَا دِمَاءٌ وَكَانَ لِاَحَدِهِمَا طَوْلٌ عَلَى الْاٰخَرِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتّٰى اَسْلَمُوْا فَاَقْسَمُوْا لَيَقْتُلَنَّ الْحُرُّ مِنْكُمْ بِالْعَبْدِ وَالذَّكَرُ بِالْاُنْثٰى فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ رَدًّا لِمَا قَالُوْهُ وَاُمِرُوْا اَنْ يَتَبَاوَؤُا اَىْ يَتَكَافَئُوْا -(حَاشِيَةُ جَلَالَيْن صَفْحَه ٢٥، حَاشِيَة ١٨)

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) عَبْد -এর মোকাবিলায় حُرّ -কে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন- لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ ; এমনিভাবে তাঁরা কিয়াস দ্বারাও দলিল পেশ করেছেন।

فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا এ মতটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব অনুযায়ী। আহনাফের মত হলো, মুসলমানকে জিম্মি কাফেরের মোকাবিলায় হত্যা করা হবে।

শাফেয়ীদের দলিল : নবী করীম ﷺ -এর হাদীস- لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ **আহনাফের দলিল :** হাদীস শরীফে এসেছে اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَتَلَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ **শাফেয়ীদের দলিলের জবাব :** সে হাদীসে كَافِر حَرْبِى উদ্দেশ্য; كَافِر ذِمِّىْ নয়। কেননা كَافِر حَرْبِى যেন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তাই তাকে হত্যা করলে কিসাস আসবে না।

قَوْلُهٗ وَلَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ : এ ব্যাখ্যাটি করা হয়েছে مَفْهُوم مُخَالِف হিসেবে। অবশ্য اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ -এর মাঝে مَفْهُوم مُخَالِف -এর اِعْتِبَار করেননি। কেননা مَفْهُوم مُوَافِق এবং কিয়াস حُرّ -এর মোকাবিলায় عَبْد -এর কিসাস ওয়াজিব হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ যখন عَبْد -এর মোকাবিলায় عَبْد -কে হত্যা করা হয় তখন حُرّ -এর মোকাবিলায় عَبْد -কে بِطَرِيْقِ اَوْلٰى হত্যা করা হবে। আর তাদের নিকট [শাফেয়ী মতে] مَفْهُوم مُخَالِف -এর উপর কিয়াস অগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে اَلْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى -এর মাঝেও مَفْهُوم مُخَالِف -এর اِعْتِبَار করেননি। কেননা পুরুষের মোকাবিলায় মহিলাকে হত্যা করার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। এমনিভাবে মহিলার মোকাবিলায়ও পুরুষকে হত্যা করা হবে। কেননা এ সম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ রয়েছে- وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّهٗ ﷺ قَتَلَ يَهُوْدِيًّا بِاَمْرِهٖ

মু'তাযিলাদের মতের খণ্ডন : আয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এতে ভ্রান্ত উপদল মু'তাযিলাদের মতের খণ্ডন রয়েছে। কেননা মু'তাযিলারা কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারীকে কাফির ও ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত সাব্যস্ত করে। এ আয়াতে সর্বোচ্চ কবীরা গুনাহ অর্থাৎ কোনো মুসলমানকে হত্যার বিবরণ রয়েছে। অথচ হত্যাকারী মুসলমানই পরিগণিত হয়েছে, তাকে ইসলামের পরিবেষ্টন হতে বহিষ্কৃত ঘোষণা করা হয়নি।

http://islamiboi.wordpress.com

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنَ الْقَاتِلِيْنَ مِنْ دَمِ اَخِيْهِ الْمَقْتُوْلِ شَئٌ بِاَنْ تُرِكَ الْقِصَاصُ مِنْهُ وَتَنْكِيْرُ شَئٍ يُفِيْدُ سُقُوْطَ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَفِىْ ذِكْرِ اَخِيْهِ تَعَطُّفٌ دَاعٍ اِلَى الْعَفْوِ وَاِيْذَانٌ بِاَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ اُخُوَّةَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ مُبْتَدَأٌ شَرْطِيَّةٌ اَوْ مَوْصُوْلَةٌ وَالْخَبَرُ فَاتِّبَاعٌ اَىْ فَعَلَى الْعَافِىْ اِتِّبَاعٌ لِلْقَاتِلِ بِالْمَعْرُوْفِ بِاَنْ يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلَا عُنْفٍ وَتَرْتِيْبُ الْاِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ يُفِيْدُ اَنَّ الْوَاجِبَ اَحَدُهُمَا وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ وَالثَّانِى الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَنْهُ فَلَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَمِّهَا فَلَا شَئَ وَرَجَّحَ وَ عَلَى الْقَاتِلِ اَدَاءٌ لِلدِّيَةِ اِلَيْهِ اِلَى الْعَافِىْ وَهُوَ الْوَارِثُ بِاِحْسَانٍ بِلَا مَطْلٍ وَلَا بَخْسٍ ـ

অনুবাদ : নিহত ভাইয়ের খুন হতে হত্যাকারীর পক্ষে কিছু ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির পক্ষ হতে কিসাসের দাবি পরিত্যাগ করা হলে, مِنْ اَخِيْهِ شَئٌ এ স্থানে شَئٌ শব্দটি نَكِرَه অর্থাৎ অনির্দিষ্টবাচক রূপে ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিসাসের কিছু অংশ মার্জনা করা বা উত্তরাধিকারীগণের কারো কর্তৃক তা মার্জনা করা দ্বারা পুরো কিসাসের দাবিই রহিত হয়ে যায়। اَخِيْهِ [তার ভাইয়ের] শব্দটি তৎপ্রতি করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটা ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতি একজনকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করাও এর উদ্দেশ্য যে, হত্যা পরস্পর ঈমানী ভ্রাতৃত্বকে বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন করে না। فَمَنْ عُفِىَ -এর مَنْ শব্দটি شَرْطِيَّة বা শর্তবাচক কিংবা مَوْصُوْلَة বা সংযোগবাচক শব্দ। এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَر বা বিধেয় হলো فَاتِّبَاعٌ তখন তা অনুরসণ করা উচিত অর্থাৎ মার্জনাকারীর উচিত হত্যাকারীর অনুসরণ করা সদয়ভাব, অর্থাৎ রুক্ষভাব না দেখিয়ে দিয়ত বা রক্তপণের অর্থের তাগাদা করা عَفْو বা ক্ষমার পর তার অনুবর্তীতে ক্রমিকভাবে اِتِّبَاع বা হত্যাকারীকে অনুসরণ সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখ করা দ্বারা বুঝা যায়, এ দুটি বিধান অর্থাৎ কিসাস ও দিয়তের যে কোনো একটিই বিধেয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। তাঁর অপর একটি অভিমত হলো, এ বিষয়ে মূলত ওয়াজিব হলো কিসাস আর দিয়ত হলো তার বদল। সুতরাং কেউ যদি দিয়তের কোনো উল্লেখ না করে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তবে তার উপর কিছুই আর ধার্য হবে না। এ মতটিকেই অধিক গ্রহণীয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং হত্যাকারীর কর্তব্য হলো তাকে মার্জনাকারীকে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর নিকট ভালোভাবে অর্থাৎ টালবাহানা বা তার ক্ষতি না করে উক্ত দিয়ত আদায় করে দেওয়া।

তাহকীক ও তারকীব

عُفِىَ : ক্ষমা করা হলো। تَعَطُّفٌ : করুণা উদ্রেক। دَاعٍ : আহ্বানকারী, উদ্বুদ্ধকারী। اِيْذَانٌ : ইঙ্গিত করা, ঘোষণা দেওয়া। اُخُوَّةُ الْاِيْمَانِ : ঈমানী ভ্রাতৃত্ব। اَلْعَافِىْ : মার্জনাকারী। عُنُفٌ : রুক্ষতা, কঠোরতা। مَطْلٌ : টালবাহানা। بَخْسٌ : ক্ষতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ : অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে যদি রক্তের দাবি ক্ষমা করে দেয়, তবে হত্যাকারীকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা যাবে না। এখন দেখতে হবে তারা তাকে কোন প্রকারে ক্ষমা করেছে। কোনো রকম আর্থিক বিনিময় ব্যতীত কেবল ছওয়াবের উদ্দেশ্য ক্ষমা করেছে, নাকি শরয়ী দিয়ত ও আপস-রফা করেছে? প্রথম অবস্থায় হত্যাকারীর

http://islamiboi.wordpress.com

ওয়ারিশদের দাবিদাওয়া হতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় তার জন্য উচিত বিনিময়ের সে অর্থ কৃতজ্ঞতার সাথে খুশিমনে আদায় করে দেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ أَخِيْهِ : اَخِيْه ভাই শব্দের আলঙ্কারিক ব্যবহার এ বর্ণনাধারার চমকপ্রদ লক্ষণীয় বিষয়। হত্যাজনিত পরিস্থিতির চেয়ে অধিক উত্তেজনা ও প্রতিশোধ স্পৃহা অন্য কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে না। এহেন চরম মুহূর্তেও ভাই শব্দ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, কোনো হত্যাকারী খুনের ন্যায় মারাত্মক অপরাধ সত্ত্বেও কাফির হয়ে যায় না, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায় না। নিহতের অভিভাবক ও উত্তরাধিকারী তখনও হত্যাকারীর ধর্মীয় ভাই-ই থেকে যায়।

قَوْلُهُ شَيْءٌ : [কিছুটা] শব্দটি খুবই গুরুত্ববহ। অপরিহার্য দণ্ডের অংশবিশেষ ছাড় দেওয়া; সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। এর মর্ম হলো, নিহত ব্যক্তির আপনজন ও উত্তরাধিকারীরা যদি মনে করে যে, তারা হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড দাবি করবে না, বরং এর চেয়ে লঘু কোনো দণ্ড হওয়া পছন্দ করবে। কিংবা তারা [রক্তপণ নেবে, কিংবা] রক্তপণের [দিয়ত] পূর্ণ পরিমাণ থেকে অংশবিশেষ মাফ করে দিয়ে দায়মুক্ত করতে উদ্যত হবে।

قَوْلُهُ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ : [এবং অহেতুক উত্তেজনা ও হাঙ্গামা সৃষ্টির সুযোগ গ্রহণ না করা বাঞ্ছনীয়।] অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির পক্ষে যারা এখন বাদী ও ফারিয়াদির ভূমিকায় অবতীর্ণ, তারা তাদের প্রাপ্য রক্তপণের দাবির পরিমাণ ও তা আদায় করার ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতরূপে ও মানবতাসম্মত পন্থায় সম্পাদন করবে। অহেতুক একগুঁয়েমি ও উত্তেজনা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে সংকটে ফেলবে না কিংবা তারাও উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হবে না। কেননা এতে হাঙ্গামা ও অশান্তিই বৃদ্ধি পাবে।

পরিপূর্ণ উত্তেজনা ও পরিস্থিতির উত্তপ্ততার স্পর্শকাতর সময়ে এভাবে স্থিরতা, উদারতা ও ঠাণ্ডা মাথায় সতর্কতার সাথে ও পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তিতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান একমাত্র ইসলামি শরিয়তেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهُ وَتَرْتِيْبُ الْاِتِّبَاعِ عَلَى الْعَفْوِ الخ : এ ইবারত দ্বারা একথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, দিয়তটা কিসাসের বদল বা (تَابِعٌ) অনুগামী নয়; বরং তা স্বতন্ত্রভাবে ওয়াজিব হয়। কেননা কুরআনে কারীম اِتِّبَاع তথা দিয়তের দাবি করাকে عَفْو قِصَاص বা কিসাস ক্ষমা করার উপর মুরাত্তাব (مُرَتَّب) করেছে। অর্থাৎ প্রথম স্তর হলো কিসাসের। যদি কোনোভাবে কিসাস সাকেত হয়ে যায়, তাহলে এমনিতেই দিয়ত ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা গেল যে, দিয়ত কিসাসের বদল নয় যে, কিসাস ক্ষমা করা হলে দিয়তও এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যাবে; বরং উভয়টির মধ্যে একটি ওয়াজিব। তন্মধ্যে কিসাস মুকাদ্দম হবে। এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম অভিমত। যদি শুধু কিসাস ওয়াজিব হতো এবং দিয়ত তার বদল হতো, তাহলে সাধারণভাবে কিসাস ক্ষমা করার দ্বারা দিয়তের কথা উল্লেখ না করলে তা ওয়াজিব হবে না। অথচ দিয়ত উল্লেখ ছাড়াই ওয়াজিব হয়।

قَوْلُهُ وَالثَّانِي الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ عَنْهُ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় অভিমত । এ মতের সারকথা হলো, মূলত ওয়াজিব হলো কিসাস, আর দিয়ত তার বদল। যদি মৃতের ওয়ারিশগণ কিসাস ক্ষমা করে দেয় এবং দিয়তের কথা উল্লেখ না করে, তাহলে দিয়তও এমনিতেই ক্ষমা হয়ে যাবে । আর এটিই হলো قَوْل رَاجِح বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত। কেননা নির্দিষ্টভাবে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার নস বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ وَادَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ : এ বক্তব্যের লক্ষ্য হত্যাপরাধী ও তার পক্ষের লোকেরা। অর্থাৎ বিবাদী বা অপরাধী পক্ষের কর্তব্য হবে [আলোচনার মাধ্যমে] যে পরিমাণ অর্থদণ্ড স্থির হয়ে গিয়েছে, তাতে কোনো প্রকার টালবাহানা, গড়িমসি ও মারপ্যাঁচের আশ্রয় না নিয়ে এবং পরিস্থিতির তিক্ততা সৃষ্টি না করে তা ফরিয়াদি পক্ষ ও নিহতের উত্তরাধিকারীদের হাতে সুন্দর ও ভদ্রভাবে পৌঁছে দেবে। اِلَيْه -এর সর্বনাম নিহতের পক্ষকে নির্দেশ করে। اِلَيْه -এর সর্বনাম اَخٌ ভাই -এর জন্য [মাদারিক]। মানব চরিত্রের এসব সূক্ষ্ম ও নাজুক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে হত্যাকারী ও নিহত উভয় পক্ষের মনের অবস্থা ও তাদের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি নজর রেখে সুষ্ঠু ও সুষম আইন প্রণয়ন মনুষ্য সাধ্যের বহির্ভূত। কেননা আইন প্রণয়নের জন্য কলমধারীর হাত তো অবশেষে একটা শুকনো ও ঠুনকো মানুষেরই হাত। এতে বিভিন্নমুখী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে আইন প্রণয়ন একমাত্র মানব স্রষ্টা মহান সত্তার পক্ষেই সম্ভব।

http://islamiboi.wordpress.com

ذٰلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ جَوَازِ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ تَخْفِيْفٌ تَسْهِيْلٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ بِكُمْ حَيْثُ وَسَّعَ فِيْ ذٰلِكَ وَلَمْ يَحْتِمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُوْدِ الْقِصَاصَ وَعَلَى النَّصَارٰى الدِّيَةَ فَمَنِ اعْتَدٰى ظَلَمَ الْقَاتِلَ بِاَنْ قَتَلَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَيِ الْعَفْوِ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِى الْاٰخِرَةِ بِالنَّارِ اَوْ فِى الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ ـ

অনুবাদ : এটা কিসাস গ্রহণ বা তদস্থলে দিয়ত প্রদান করতঃ কিসাস হতে ক্ষমা লাভ করার উল্লিখিত বিধান তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব অর্থাৎ বিধানকে আরো সহজসাধ্য করা ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ। তাই এ বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে বেশ কিছু সুবিধা দিয়েছেন। ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর যেমন কেবল কিসাসের বিধান আর খ্রিস্টানদেরকে কেবল দিয়তের বিধান দেওয়া হয়েছিল, এ স্থানে তোমাদের জন্য এতদুভয়ের একটিকে অত্যাবশ্যক ও জরুরি বলে সাব্যস্ত করা হয়নি। এর অর্থাৎ ক্ষমা করার পরও যে সীমালঙ্ঘন করে অর্থাৎ হত্যাকারীর উপর জুলুম করে, যেমন তাকে হত্যা করে ফেলল তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ বেদনাকর শাস্তি। আখিরাতে জাহান্নামের, দুনিয়াতে নিহত ও খুন হওয়ার।

তাহকীক ও তারকীব

جَوَازُ الْقِصَاصِ : কিসাসের বৈধতা। تَخْفِيْفٌ : সহজসাধ্য করা, লাঘব করা। وَلَمْ يَحْتِمْ : অত্যাবশ্যক করা হয়নি।।

اِعْتَدٰى : সীমালঙ্ঘন করেছে।

اَلْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো– ذٰلِكَ এখানে اِسْمِ اِشَارَه وَاحِد কিন্তু তার মধ্যে مُشَارٌ اِلَيْه তিনটি। যথা– ১. কিসাসের বৈধতা ২. ক্ষমা ৩. দিয়ত।

জবাব হলো, ذٰلِكَ -এর মারজি' হলো উল্লিখিত বিধান, যার মধ্যে এ তিনটি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : ঐ পন্থা অর্থাৎ فَمَنْ عُفِىَ -তে উল্লিখিত বিধান অর্থাৎ ক্ষমা ও দিয়ত গ্রহণ সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধান [মাদারিক]। **একদিকে কিসাস বিধানের** বাহ্য কঠোরতা এবং অন্যদিকে ক্ষমা ও দিয়ত গ্রহণের কোমলতা ও উদারতা এ অভিনব সংমিশ্রণ **ও দুই বিপরীত মেরুতে সুষম** সমন্বয় বিধান করে ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো নির্মাণ শুধু সে আইনের ভাগ্যেই জুটতে পারে, যা **মানব-মস্তিষ্ক প্রসূত নয়, যা সব মস্তিষ্কের** স্রষ্টা প্রাজ্ঞ সত্তার প্রজ্ঞা প্রসূত।

قَوْلُهُ اِعْتَدٰى : বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন-এর রূপ ও ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যথা কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুনের **মিথ্যা দাবি উত্থাপন করা। কিংবা হত্যাকারীকে** একবার ক্ষমা করার পর আবার কেসাস [প্রাণদণ্ডের] পাঁয়তারা করা। [কিংবা **ক্ষমা লাভের বাহানার সুযোগে বিবাদী পক্ষের** দুর্ব্যবহার, গড়িমসি বা নতুন করে হুমকি প্রদান ইত্যাদি]। এ ধরনের দুরাচার ও **অনাচারে অভ্যস্ত অতি সাহসীদের অন্যায় ও জঘন্য** দুঃসাহস হতে ফেরাতে পারে একমাত্র **আখিরাতের আজাবের ভয়ই।**

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٧٩. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ اَيْ بَقَاءٌ عَظِيْمٌ يَاُولِي الْاَلْبَابِ ذَوِي الْعُقُوْلِ لِاَنَّ الْقَاتِلَ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ يُقْتَلُ ارْتَدَعَ فَاَحْيَا نَفْسَهُ وَمَنْ اَرَادَ قَتْلَهُ فَشُرِعَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الْقَتْلَ مَخَافَةَ الْقَوَدِ.

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন অর্থাৎ অধিক স্থায়িত্ব ও বাঁচোয়া। কেননা হত্যাকারী যদি জানতে পারে যে, পরিণামে তাকেও হত্যা করা হতে পারে তবে সে ভয় পাবে এবং তা হতে বিরত থাকবে। এভাবে সে নিজের জীবনও রক্ষা করতে সক্ষম হলো এবং যাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল তার জীবনও বাঁচাতে পারল। সুতরাং ইত্যাকার বিধান তোমাদের জন্যই প্রচলিত করা হয়েছে, যাতে তোমরা কিসাসের ভয়ে খুন ও হত্যা হতে বেঁচে থাকতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

اُولِي : اُولُ-এর মাজরুর রূপ, অর্থ- অধিকারী। اَلْاَلْبَابُ : لُبٌّ-এর ব-ব। অর্থ- বিবেক-বুদ্ধি। لُبُّ النَّخْلَةِ থেকে নির্গত।
ذَوِي : ذُوْ-এর বহুবচন। মূলত ذَوُوْنَ ছিল। ইযাফতের কারণে ن পড়ে গেছে। অর্থ- অধিকারী।
اِرْتَدَعَ : ভয় পাবে, কেঁপে উঠবে। اَحْيَا : বাঁচাল, রক্ষা করল। شُرِعَ : বিধান প্রচলিত করা হলো।
مَخَافَةٌ : আশঙ্কা, ভয়। اَلْقَوَدُ : কিসাস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ : বস্তুত কিসাস প্রত্যক্ষ্যরূপে ইনসাফ ও সাম্যের বিধি। এ বিধি সামাজিক ও সংঘবদ্ধ জীবনের সংহতি ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি, নিরাপত্তার সর্বোত্তম নিশ্চয়তা বিধায়ক। কেউ কাউকে জুলুম-নিপীড়ন করবে না; সবল-দুর্বল সকলের অধিকারই সংরক্ষিত থাকবে, সবল ও পেশীধারীরা দুর্বল অসহায়দের শোষণ-নিষ্পেষণ করে ছাড়া না পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদানকারী এবং উম্মত ও জাতির সর্বস্তরের লোকদের মাঝে নিরাপত্তা ও স্বস্তি উদ্ভাবনকারী আইন একমাত্র এটিই। একটি বিশেষ সময় ধরে এ আইনের বাস্তবায়ন চলতে থাকলে এ আইনের মূল চেতনা উম্মতের মাঝে মজ্জাগত হয়ে সমগ্র জাতির স্বভাব ও রুচিবোধ সুষ্ঠু রূপ লাভ করবে এবং আইনের শাসন, পরস্পরে আপস-সমঝোতা, সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও সেবা-সহায়তা জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে দেখতে না দেখতেই এ উম্মত সুনাগরিক, পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ জাতিরূপে অভিহিত হওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। -[তাফসীরে মাজেদী]

কিসাস জীবনের নিরাপত্তার বিধান করে : কিসাসের নির্দেশ দৃশ্যত কঠিন মনে হলেও যারা বিবেকবান, তারা বুঝতে সক্ষম যে, এ নির্দেশ দীর্ঘ জীবনের কারণ। কেননা কিসাসের ভয়ে প্রত্যেকেই অপরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকবে। ফলে উভয়ের প্রাণ রক্ষা পাবে। এভাবে কিসাসের ফলে নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী উভয়ের খান্দানও হত্যা হতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে। আরবে কে হত্যাকারী আর কে হত্যাকারী নয়, তার কোনো বিচার করা হতো না। যাকেই ভাগে পেত, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা তাকেই হত্যা করত। ফলে উভয় পক্ষে একটি খুনের দায়ে হাজারো প্রাণ নিপাত যেত। কিন্তু ইসলামের এ বিধান অনুযায়ী যখন কেবল হত্যাকারীর থেকেই কিসাস গ্রহণ করা হলো, তখন আর সকলের প্রাণ রক্ষা পেল। এ অর্থও করা যেতে পারে যে, কিসাস হত্যাকারীর জন্য পরকালীন জীবনের কারণ। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ : অর্থাৎ কিসাসের ভয়ে কাউকে হত্যা করা হতে বেঁচে থাক অথবা কিসাসের কারণে আখিরাতের আজাব হতে বেঁচে থাক। অথবা এর অর্থ যেহেতু কিসাসের বিধান দেওয়ার তাৎপর্য তোমরা জানতে পেরেছ, তাই এখন এর বিরোধিতা অর্থাৎ কিসাস পরিত্যাগ করা হতে বেঁচে থাক।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٨٠. كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ أَيْ أَسْبَابُهُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَالًا الْوَصِيَّةُ مَرْفُوعٌ بِكُتِبَ وَمُتَعَلِّقٌ بِإِذَا إِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةً وَدَالٌّ عَلَى جَوَابِهَا إِنْ كَانَتْ شَرْطِيَّةً وَجَوَابُ إِنْ مَحْذُوفٌ أَيْ فَلْيُوصِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ بِالْعَدْلِ بِأَنْ لَا يَزِيْدَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا يُفَضِّلَ الْغَنِيَّ حَقًّا مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ اللّٰهَ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِآيَةِ الْمِيْرَاثِ وَبِحَدِيْثٍ (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল অর্থাৎ তাঁর কারণসমূহ উপস্থিত হলে সে যদি খায়র অর্থাৎ ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে সৎভাবে অর্থাৎ ইনসাফানুসারে যেমন এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অসিয়ত না করা, ধনীদের প্রাধান্য দান না করা। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান দেওয়া হলো ফরজ করা হলো। اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি كُتِبَ ক্রিয়ার نَائِب فَاعِل বা উপকর্তা হিসেবে مَرْفُوْع রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

إِذَا حَضَرَ -এর إِذَا শব্দটি যদি ظَرْفِيَّة অর্থাৎ স্থান ও কালবাচক বলে বিবেচ্য হয়, তবে এটা إِذَا -এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট। আর যদি شَرْطِيَّة বা শর্তবাচক হয়, তবে এটা উক্ত شَرْطِيَّة -এর জওয়াবের প্রতি ইঙ্গিতবহ বলে গণ্য হবে। আর إِنْ تَرَكَ -এর إِنْ -এর জওয়াব এ স্থানে উহ্য বলে ধর্তব্য হবে। আর তা হলো فَلْيُوْصِ অর্থাৎ তাহলে সে যেন অসিয়ত করে। এটা আল্লাহকে ভয়কারীদের উপর একটি কর্তব্য। حَقًّا শব্দটি পূর্ববর্তী বক্তব্যের مَصْدَر مُؤَكِّدَة বা তাগিদবাচক সমধাতুজ পদ।

মিরাস সম্পর্কিত আয়াত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র ইরশাদ– "ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত হতে পারে না" [তিরমিযী] দ্বারা এ আয়াতোক্ত অসিয়তের নির্দেশ মানসূখ বা রহিত বলে বিবেচ্য।

١٨١. فَمَنْ بَدَّلَهُ أَيِ الْإِيْصَاءَ مِنْ شَاهِدٍ وَوَصِيٍّ بَعْدَمَا سَمِعَهُ عَلِمَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ أَيِ الْإِيْصَاءِ الْمُبَدَّلِ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ فِيْهِ إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِقَوْلِ الْمُوْصِيْ عَلِيْمٌ بِفِعْلِ الْوَصِيِّ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ .

১৮১. তা শ্রবণ করার পর অর্থাৎ তা অবহিত হওয়ার পর সাক্ষী ও অছির কেউ যদি তার অসিয়তের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তবে যারা পরিবর্তন করবে, তার অর্থাৎ পরিবর্তিত অসিয়তের পাপ তাদেরই। عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ -তে إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনাম هُمْ ব্যবহারের স্থলে প্রকাশ্যভাবে বিশেষ্য اَلَّذِيْنَ -এর ব্যবহার হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অসিয়তকারীর কথা সব শুনেন অছির কার্য সম্পর্কে সব জানেন; অনন্তর তিনি এর প্রতিফল দান করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১৮২. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا جَنَفًا مَيْلًا عَنِ الْحَقِّ خَطَأً اَوْ اِثْمًا بِاَنْ تَعَمَّدَ ذٰلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ اَوْ تَخْصِيْصِ غَنِيٍّ مَثَلًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْمُوْصِى وَالْمُوْصٰى لَهٗ بِالْاَمْرِ بِالْعَدْلِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ فِىْ ذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

১৮২. যদি কেউ অসিয়তকারীর مُوْصٍ শব্দটি مُخَفَّفَةٌ [লঘু, তাশদীদহীন] ও مُثَقَّلَةٌ [রূঢ়, তাশদীদসহ] উভয় রূপে পাঠ করা যায়। পক্ষ হতে বক্রতা অর্থাৎ ভুলক্রমে ন্যায়পথ হতে সরে যাওয়ার কিংবা পাপাচারের অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে ন্যায়-পথ ত্যাগ করার, যেমন এক তৃতীয়াংশ হতে বেশি পরিমাণের অসিয়ত করা বা কেবল ধনীদের প্রাধান্য দান করার আশঙ্কা করে অতঃপর সে তাদের মধ্যে অর্থাৎ অসিয়তকারী ও যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের নির্দেশ দান করতঃ কোনোরূপ মীমাংসা করে দেয়, তবে এতে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

فَلْيُوْصِ : **الْاِيْصَاءُ** মাসদার থেকে اَمْر غَائِب -এর সীগাহ অর্থ- সে যেন অসিয়ত করে। اَلْاَقْرَبِيْنَ : আত্মীয়স্বজন। بِالْمَعْرُوْفِ : **সৎভাবে**, ন্যায়সঙ্গতভাবে। لَا يَزِيْدُ : বৃদ্ধি করা হবে না। لَا يُفَضِّلُ : প্রাধান্য দান করা হবে না। حَقًّا : **কর্তব্য। شَاهِد** : সাক্ষী। وَصِىٌّ : যাকে অসিয়ত করা হয়। بَعْدَ سَمِعَهُ : শ্রবণের পর। اَلْمُبَدَّلُ : পরিবর্তিত। مُجَازٌ : **প্রতিদানপ্রাপ্ত** হবে। مُوْصٍ : অসিয়তকারী। جَنَفٌ : جَنَفٌ বলা হয় ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত সত্যপথ থেকে সরে যাওয়া। تَعَمَّدَ : **ইচ্ছা** করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : **অসিয়তের বিধান** : প্রথম আদেশ হলো কিসাস তথা মৃত ব্যক্তির প্রাণ সম্পর্কে। এবার **দ্বিতীয়** আদেশ হলো তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে। আর এটা পূর্বোক্ত মূলনীতির অন্যতম وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى -এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। আরবদের মধ্যে নিয়ম ছিল মৃত ব্যক্তির সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি তার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি নয়; বরং কেবলমাত্র ছেলেগণ লাভ করত। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন বঞ্চিত থাকত। এ আয়াতের ইরশাদ হয়েছে যে, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে ন্যায়নুগভাবে দেওয়া উচিত। এ হিসেবেই মুমূর্ষ ব্যক্তির অসিয়ত ফরজ করা হয়েছে। এ অসিয়ত সেই সময় ফরজ ছিল যখন পর্যন্ত মিরাসের আয়াত নাজিল হয়নি। অবশেষে সূরা নিসায় যখন মিরাসের আয়াত নাজিল হলো এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট করে দেন, তখন থেকে আর এ অসিয়ত ফরজ থাকেনি; বরং এ প্রয়োজনই মিটে যায়। হ্যাঁ, মোস্তাহাব পর্যায়ে এখনও সে আদেশ বহাল আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত জায়েজ নয় এবং এ অসিয়ত যেন এক তৃতীয়াংশ মালের বেশিতে না হয়। হ্যাঁ কারো ব্যাপারে যদি ঋণ, আমানত ইত্যাদি দেওয়া-নেওয়ার বিতর্ক থাকে, তবে তার উপর এখনো অসিয়ত ফরজ।

وَصِيَّةٌ : এর শাব্দিক অর্থ- উপদেশ। শরিয়তের পরিভাষায় অসিয়তকারীর [মৃত্যুপথ যাত্রীর] সেসব নির্দেশ, যা তার মৃত্যুর পর বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে থাকে। ফকীহগণ অসিয়তের বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. কোনো কোনো অসিয়ত ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় স্তরের। যথা– জাকাত ও কাফফারা আদায় করার অসিয়ত, আমানত [গচ্ছিত সম্পদ] ফেরত দেওয়া ও কর্জ আদায়ের অসিয়ত।
২. কোনো কোনোটি মোস্তাহাব ও পছন্দনীয় স্তররের। যথা– ছওয়াবের কাজের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া, যে আত্মীয় মিরাসের অধিকারী হবে না তার জন্যে মিরাস [পরিমাণ বা কমবেশি] -এর অসিয়ত করে যাওয়া।

http://islamiboi.wordpress.com

৩. কোনো কোনটি শুধু অনুমোদনযোগ্য মুবাহ হয়ে থাকে, যথা– কোনো বৈধ কাজের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া।

৪. কোনো কোনোটি এমনও হতে পারে যার বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ। এ ধরনের অসিয়ত বস্তুত অসিয়ত না করে যাওয়ার শামিল সাব্যস্ত হবে। যেমন– কোনো হরবী [অমুসলিম শত্রুদেশীয়] কাফিরের জন্য কিংবা কোনো অবৈধ কাজের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া।

৫. কোনো কোনো অসিয়ত স্থগিত বা মুলতবি বলেও অভিহিত হয়। এগুলোর বাস্তবায়ন শর্ত সাপেক্ষ হয়ে থাকে। যেমন– পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের [কিংবা কোনো ওয়ারিশের জন্য] অসিয়ত করা। এ ধরনের অসিয়তের বাস্তবায়ন সম্পদের অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন [অসিয়তকারীর মৃত্যুর পরে] -এর উপরে নির্ভর করে।

জ্ঞাতব্য : اَلْوَصِيَّةُ শব্দটি এখানে [বাক্য বিন্যাসে] اَلْاِيْصَاءُ ক্রিয়ামূল অর্থে এবং এ অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তার ক্রিয়া كُتِبَ পুংবাচক ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যথায় মূল বিধি অনুসারে كُتِبَتْ [স্ত্রীবাচক] হওয়ার কথা ছিল। অবশ্য স্ত্রীবাচক تَا [তা] বিলুপ্ত করার অন্য একটি কারণ এভাবেও বিবৃত হয়েছে যে, وَصِيَّةٌ [কর্তা] বিশেষ্যটি তার ক্রিয়া থেকে বেশ দূরত্বের ব্যবধানে রয়েছে এবং এ ধরনের দূরত্ব অন্তরায় হলে ক্রিয়ার স্ত্রীবাচক 'তা' উহ্য হয়ে যায়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ خَيْرًا : শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থ [ভালো, কল্যাণ] ছাড়া পবিত্র মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ অর্থে ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যথা– قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ অর্থাৎ তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে [বাকারা]। وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ ইত্যাদি। মোটকথা এখানে خَيْر শব্দটি সম্পদ অর্থে হওয়া সর্বসম্মত।

قَوْلُهُ فَمَنْ بَدَّلَهُ : অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তো ন্যায়ানুগভাবে অসিয়ত করেই মারা গিয়েছিল, কিন্তু আদায়কারীরা তা রক্ষা করেনি, তবে সে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোনো গুনাহ হবে না। সে তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেছে। যারা অসিয়ত লঙ্ঘন করেছে, গুনাহগার তারাই হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকলের কথা শোনেন এবং সকলের নিয়ত জানেন। [তাফসীরে উসমানী]

بَدَّلَهُ : এর কর্মকারক সর্বনাম দ্বারা অসিয়ত উদ্দেশ্য। بَدَّلَهُ-এর সর্বনাম اَلْاِيْصَاءُ [অসিয়ত করা] -কে নির্দেশ করে। তদ্রূপ سَمِعَهُ -এর সর্বনাম -[তাফসীরে কুরতুবী]। অর্থাৎ যে সাক্ষীদের সামনে অসিয়ত করা হয়েছিল যে, অমুক অমুক আত্মীয় এত এত অংশ পাবে। পরে সাক্ষীরা তাতে ছাঁটকাট করল এবং তাতে কারো হক নষ্ট হয়ে গেল। اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ [পাপ হবে রদবদলকারীদের]। বিচারকর্তা ও কাজিদের আশ্বস্ত করা হলো যে, অসিয়তের গলদ বাস্তবায়নে তোমাদের অপরাধ হবে কেন? অপরাধ তো হবে মিথ্যুক সাক্ষীদের।

قَوْلُهُ سَمِيْعٌ : তিনি ভালো করে জানেন যে, সাক্ষীরা কি কি উপায়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং মূল অসিয়তকে কিরূপ বিকৃত করেছে। عَلِيْمٌ : তিনি এ কথাও জানেন যে, বিচারক বা মীমাংসাকারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে কেমন অপরাগ ও নিরুপায় হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا : অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে কারো যদি এ আশঙ্কা থাকে বা জানতে পারে যে, সে কোনো কারণে ভুল করেছে এবং কারো প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেছে কিংবা সে জেনেশুনে মহান আল্লাহর আইনের খেলাফ কাউকে সম্পত্তি দিয়ে গেছে, তাহলে সেই অসিয়তকৃত ব্যক্তি ও ওয়ারিশদের মাঝে এরূপ রদবদল জায়েজ; বরং উত্তম।

قَوْلُهُ خَافَ : আরবি ভাষায় خَوْف সর্বদা ভয় পাওয়া ও আশঙ্কা করার অর্থেই ব্যবহৃত হয় না, বরং অবগতি ও বিদিত হওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যার মনে হলো এবং বুঝতে পারল। অর্থাৎ [মৃত্যু পথযাত্রী] অসিয়তকারীর ভাবগতি দেখে তার কাছে প্রতিভাত হলো যে, সে হয়তো জুলুম করা বা মিরাসের অধিকারী কাউকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা করছে। –[জাসসাস]

قَوْلُهُ جَنَفًا : جَنَفٌ বলা হয় না বুঝে ভুল করাকে কিংবা অনিয়ম করাকে। উদ্দেশ্য অনিচ্ছাকৃত ভুল কিংবা বুঝের ভুলের কারণে বাড়াবাড়ি।

اِثْمًا : এটা হলো জেনেশুনে ভুল, প্রকাশ্যভাবে কারো হক বিনষ্ট করা-যাকে পাপ বলা যেতে পারে। اَلْاِثْمُ হলো ইচ্ছাকৃত........[হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইবনু জারীর]

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْاُمَمِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ الْمَعَاصِيَ فَاِنَّهُ يُكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِيْ هِيَ مَبْدَؤُهَا .

অনুবাদ :

১৮৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো তা ফরজ করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পার। কেননা এটা সিয়াম পাপাচারের উৎস কুপ্রবৃত্তির বিনাশ করে।

١٨٤. اَيَّامًا نُصِبَ بِالصِّيَامِ اَوْ بِصُوْمُوْا مُقَدَّرًا مَّعْدُوْدٰتٍ اَيْ قَلَائِلَ اَوْ مُؤَقَّتَاتٍ بِعَدَدٍ مَعْلُوْمٍ وَهِيَ رَمَضَانُ كَمَا سَيَأْتِيْ وَقَلَّلَهُ تَسْهِيْلًا عَلَى الْمُكَلَّفِيْنَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ حِيْنَ شُهُوْدِهٖ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَيْ مُسَافِرًا سَفَرَ الْقَصْرِ وَاَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ فَاَفْطَرَ فَعِدَّةٌ فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا اَفْطَرَ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يَصُوْمُهَا بَدْلَهُ وَعَلَى الَّذِيْنَ لَا يُطِيْقُوْنَهُ لِكِبَرٍ اَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجٰى بُرْؤُهُ فِدْيَةٌ هِيَ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ اَيْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ فِيْ يَوْمٍ وَهُوَ مُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِاِضَافَةِ فِدْيَةٍ وَهِيَ لِلْبَيَانِ وَقِيْلَ لَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ.

১৮৪. গণনার অল্প কিছু দিনের জন্য اَيَّامًا শব্দটি صِيَام -এর মাধ্যমে বা উহ্য صُوْمُوْا ক্রিয়ার মাধ্যমে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনের জন্য। সামনে উল্লেখ হচ্ছে যে, এ দিনগুলো হলো রমজান মাস। মুকাল্লাফ বা আমল করার দায়িত্ব যে সমস্ত মানুষের উপর ন্যস্ত, তাদের সামনে বিষয়টি সহজসাধ্য করে তোলার জন্য এ দিনগুলোকে এত কম করে দেখানো হয়েছে।

এর [এ দিনগুলোর] উপস্থিত কালে তোমাদের কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে সালাত কসর হয়, এতটুকু দূরত্বের সফর হলে এবং এ উভয় অবস্থায় সিয়াম তার পক্ষে ক্লেশকর হওয়ায় তা ভেঙ্গে ফেললে অন্য দিনসমূহে এই সংখ্যা অর্থাৎ যতদিন সওম সে পরিত্যাগ করেছিল ততদিনের সওম তার উপর জরুরি হবে অর্থাৎ তার পরিবর্তে সে অন্য দিনসমূহে সওম পালন করবে। জরাগ্রস্ততা বা এমন অসুস্থতা, যা ভালো হওয়ার আশা করা যায় না, সে কারণে যারা সওম পালনের শক্তি রাখে না তাদের ফিদয়া দান কর্তব্য। তা হলো অভাগ্রস্তকে অন্নদান করা অর্থাৎ একদিনে যতটুকু পরিমাণ একজন আহার করে এক এক দিনের বিনিময়ে ততটুকু খাদ্য দান করা কর্তব্য। তা হলো প্রতিদিনের বিনিময়ে তদঞ্চলের প্রচলিত প্রধান খাদ্যের এক 'মুদ' পরিমাণ খাদ্য দান।

অপর এক কেরাতে فِدْيَةٌ শব্দটি পরবর্তী শব্দের দিকে اِضَافَة বা সম্বন্ধ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এ اِضَافَة বা সম্বন্ধ بَيَانِيَة বা বিবরণমূলক বলে বিবেচ্য হবে।

কেউ কেউ বলেন, يُطِيْقُوْنَهُ [যারা সওম পালনে সক্ষম] -এর পূর্বে না অর্থবোধক لَا শব্দটি [সক্ষম নয়] উহ্য মানার প্রয়োজন নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

وَكَانُوا مُخَيَّرِيْنَ فِيْ صَدْرِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ نُسِخَ بِتَعْيِيْنِ الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) إِلَّا الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إِذَا افْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَا نَسْخٍ فِيْ حَقِّهِمَا فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُوْرِ فِي الْفِدْيَةِ فَهُوَ اَيِ التَّطَوُّعُ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْإِفْطَارِ وَالْفِدْيَةِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ فَافْعَلُوْهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ.

অনুবাদ : মূলত ব্যাপার হলো, ইসলামের শুরুতে সওম পালন করা তদস্থলে ফিদিয়া প্রদানের এ বিধানদ্বয়ের যে কোনো একটি করার এখতিয়ার সাধারণ- ভাবে মুসলিমদের ছিল। পরে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে রমজানের মাস পাবে, সে যেন তার সওম পালন করে] এ আয়াতের মাধ্যমে ঐ বিধান মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গর্ভবতী বা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা যদি সন্তান সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করে এবং সে সওম পালন না করে তার বেলায় এ বিধানটি মানসূখ বা রহিত বলে বিবেচ্য নয়; বরং এখনও তা প্রযোজ্য বলে গণ্য। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফিদয়ার বেলায় উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বেশি দান করে সৎকাজ করে তবে তা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। সওম পালন করা তোমাদের জন্য সওম পালন না করা ও ফিদয়া প্রদান করা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর। اَنْ تَصُوْمُوْا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। خَيْرٌ لَّكُمْ এটা خَبَر বা বিধেয়। যদি তোমরা জানতে যে, এটা তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ তবে ঐ দিনগুলোতে [মাহে রমজানে] সওম পালন করতে। অর্থাৎ তোমাদের সওম পালন করাই উচিত।

তাহকীক ও তারকীব

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ : [তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে] صَوْم -এর ব-ব। অভিধানে কোনো কিছু হতে বিরত থাকাকে صَوْم বলে। قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ : كُلُّ مُمْسِكٍ عَنْ طَعَامٍ اَوْ كَلَامٍ اَوْ سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمٌ শরিয়তের দৃষ্টিতে সওম হলো- اَلْإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فِي النَّهَارِ مَعَ النِّيَّةِ.

كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شَيْئًا : আল্লাহ তার উপর কোনো কিছু ফরজ করেছেন। عَلٰى যোগে كُتِبَ -এর অর্থ হয় فُرِضَ বা ফরজ করা। اَلْأُمَمُ : اُمَّةٌ -এর ব-ব অর্থ- উম্মত, জাতি। يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ : কু-প্রবৃত্তি বিনাশ করে। اَلْمُكَلَّفِيْنَ : আমল করার দায়িত্ব যে সমস্ত মানুষের উপর ন্যস্ত اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ : রোজা তার জন্য কষ্টকর হলো। يُطِيْقُوْنَهُ : অতিকষ্টে রোজা রাখে। ইমাম রাগিব বলেন- طَاقَة বলা হয় এমন পরিমাণ সমর্থকে যা মানুষ কষ্টের সাথে করে। لَا يُطِيْقُوْنَهُ : রোজার শক্তি রাখে না। لَا يُرْجٰى : আশা করা যায় না। بُرُوْءٌ : ভালো, সুস্থতা। فِدْيَةٌ : মানুষ সম্পদ বা অন্য যা কিছুর মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে। مُدٌّ : মুদ, পরিমাপ। قُوْتٌ : খাদ্য।

اَلْمَعَاصِيْ : এ শব্দটি উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে, تَتَّقُوْنَ দ্বারা তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। اَلْمَعَاصِيْ হচ্ছে তার মাফউলে বিহী। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ نُصِبَ بِالصِّيَامِ اَوْ يَصُوْمُوْنَ : এখানে اَيَّامًا -এর মানসূব হওয়ার দুটি সূরতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি সূরত হলো- اَيَّامًا এটি اَلصِّيَام -এর কারণে মানসূব। কিন্তু এতে আপত্তি আছে। আর তা হলো, مَعْمُوْل ও عَامِل -এর মাঝে كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর দ্বারা فَاصِلَه بِالْاَجْنَبِيْ হয়েছে। তাই اَلصِّيَام আমেল হতে পারে না। ইমাম রাযী (র.)-এর জবাবে বলেন, مَعْمُوْل যদি ظَرْف হয়, তাহলে فَاصِلَة بِالْاَجْنَبِيْ সত্ত্বেও عَمَل করা শুদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় সুরত হলো- এর পূর্বে يَصُوْمُوْا উহ্য রয়েছে। এ সুরতে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি নেই। -[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ : **সিয়ামের বিধান :** রোজা ইসলামের একটি অন্যতম রুকন [স্তম্ভ]। যারা মনের গোলাম ও খেয়াল-খুশির পূজারী তাদের জন্য রোজা অত্যন্ত কঠিন। তাই এ বিধানটি খুবই জোরদার ও দৃঢ়াত্মক শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) হতে অদ্যাবধি এ বিধানটি বরাবর চলে আসছে, যদিও দিনক্ষণ নির্ধারণের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পূর্বোক্ত মূলনীতিসমূহের মাঝে যে ধৈর্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, রোজা তার একটি বৃহত্তম শাখা। হাদীসে রোজাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ صِيَام : صِيَامٌ শব্দটি صَوْمٌ -এর বহুবচন। আবার মাসদার হিসেবেও অর্থ হয়। অর্থাৎ, রোজা রাখা। ফজর [সুবহে সাদিক] -এর শুরু হতে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময় পানাহার ও স্ত্রী-সঙ্গম থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় সওম বা রোজা বলা হয়। ফরজ ও অবশ্য পালনীয় সওম হলো রমজান মাসের রোজা। গিবত, পরনিন্দা, অশ্লীল কথা ও কাজ, কু-কথা, কু-ব্যবহার ইত্যাদি জিহ্বা দ্বারা সম্পাদনযোগ্য যাবতীয় পাপ থেকে সওম পালনের সময় বিরত থাকার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক ও প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানসমূহের সবগুলোই এ বিষয়ে একমত যে, সওম দৈহিক রোগব্যাধি দূর করার জন্য উত্তম চিকিৎসা ও মানবদেহের জন্য উত্তম পরিষোধক। তাছাড়া সিয়াম পালনে সমগ্র উম্মতের অভ্যন্তরে সৈনিকসুলভ সাহসিকতা, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, সেদিক লক্ষ্য করলে মাত্র এক মাসের এ বার্ষিক প্রশিক্ষণ একটি সুষ্ঠু কর্মসূচি।

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্ম ও সকল সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো না কোনো প্রকারের সওমের সন্ধান পাওয়া যায় [দ্র. ব্রিটানিকা বিশ্বকোষের ৯ খ.১০৬ পৃ. ও ১০ খ. ১৯৩ পৃ. চতুর্দশ সংস্করণ]। তবে এখানে পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীরা কুরআনের লক্ষ্য নয়।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ : যারা তোমাদের আগে...] এর মূল লক্ষ্য কিতাবী সম্প্রদায়গুলোই হতে পারে। যেমন– সওম হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ছিল।

قَوْلُهُ مِنَ الْاُمَمِ : পূর্বোক্ত اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ -এর ব্যাপকতাকে প্রকাশ করার জন্য এবং যারা اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ দ্বারা নাসারাদের উদ্দেশ্য নিয়েছে তাদের মত খণ্ডনের জন্য مِنَ الْاُمَمِ অংশটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। –[জামালাইন ২৮৯]

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ এ বাক্য দ্বারা সিয়ামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেল। রোজার আসল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ-ভীতির স্বভাব গড়ে তোলা এবং উম্মত ও তার সদস্যদের মুত্তাকী বানানো।

তাকওয়া মানব প্রবৃত্তির একটি বিশেষ অবস্থা। ক্ষতিকর খাদ্য, পানীয় ও ক্ষতিকর অভ্যাসগুলোতে সংযম অবলম্বনের মাধ্যমে যেভাবে শারীরিক সুস্থতা অর্জিত হয় এবং জড় জগতের আস্বাদনীয় বিষয়বস্তু আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করার উপযোগিতা অর্জিত হয়, ক্ষুধার মাত্রা পরিমিত হয় এবং নির্দোষ রক্ত তৈরি হতে থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীর বুকে তাকওয়া অবলম্বন করলেও। [অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও অভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোতে সংযম অবলম্বন করলে] আখিরাতের আস্বাদনী বিষয়গুলো ও নিয়ামতসমূহ উপভোগ করে আনন্দ লাভের পূর্ণাঙ্গ উপযোগিতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের এ স্তরে এসেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সিয়ামের চেয়ে ইসলামের সিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। পৌত্তলিকদের অপূর্ণাঙ্গ ও নাম সর্বস্ব সিয়ামের তো আলোচনাই অপ্রয়োজনীয়। কিতাবী খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরও সিয়ামের গূঢ়তত্ত্ব শুধু এতটুকুই যে, তা পালন করা হয় কোনো বিপদাপদ দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে কিংবা সাময়িক ও তাৎক্ষণিক কোনো বিশেষ আত্মিক অবস্থা অর্জনের মানসে। ইহুদিদের প্রধান শব্দকোষ জিয়ুশ ইনসাইক্লোপেডিয়ায় রয়েছে– "প্রাচীন যুগে হয়তো কোনো শোক পালনের চিহ্নস্বরূপ সাওম পালন করা হতো কিংবা কোনো সংকট আসন্ন হলে কিংবা আধ্যাত্ম পথচারী [ভাববাদী] নিজের মাঝে ভাববাণী [ইলহাম] গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্য পালন করত।" [দ্র. ৫ খ. ৩৪৭ পৃ.] পক্ষান্তরে ইসলামে সিয়াম বলা হয় নিজের ইচ্ছায় ও খুশিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজের জন্য বৈধ এবং রুচি ও স্বভাবসম্মত কামনা-বাসনা পরিপূর্ণ পরিহার করাকে। এতে একদিকে দেহ ও স্বাস্থ্যের এবং অন্যদিকে আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

জ্ঞাতব্য : ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উপরও রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো তাতে রদবদল করে ফেলেছে। তাই لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ দ্বারা তাদেরকে কটাক্ষ করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুসলিমগণ! তোমরা নাফরমানি হতে দূরে থাক। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো এ বিধান রদবদল করে ফেলো না।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ : অর্থাৎ এ ফরজ সিয়ামেরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা-পরিমাণ রয়েছে। কেননা এটাই শৃঙ্খলার [ডিসিপ্লিন ও নিয়মানুবর্তিতার] দাবি। এমন নয় যে, যখন যার মন চাইল এবং যত দিন মনে চাইল, সিয়াম পালন করব। উম্মতের একসূত্রতা ও ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য করলেও সমগ্র উম্মতর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট পরিসংখ্যার সাথে হওয়াই অপরিহার্য ছিল। আনুষঙ্গিকরূপে এ দিকটিও পরিস্ফুটিত হলো যে, ফরজ সিয়ামের পরিমাণ খুব ভারি কিছু নয়। পুরো এক বছর বা ছয় মাস কিংবা তিন মাসও নয়, বরং সারা বছরে ২৯ বা ৩০ দিন মাত্র এর দ্বারা রমজানের একমাস বোঝানো হয়েছে। যেমনটা পরবর্তীতে আসছে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَلَّلَهُ تَسْهِيْلًا : রমজান মাসের রোজা মূলত বেশি হলেও মুকাল্লাফ বা আমল করার দায়িত্ব যে সমস্ত মানুষের উপর ন্যস্ত, তাদের সামনে বিষয়টি সহজসাধ্য করে তোলার জন্য এবং উদ্বুদ্ধ করণার্থে এ দিনগুলোকে এত কম করে দেখানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِى الْحَالَيْنِ : অর্থাৎ মুসাফির এবং অসুস্থ উভয় অবস্থায় রোজা ভাঙ্গার জন্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কষ্ট হওয়ার শর্ত রয়েছে। আহনাফের মতে সফরে রোজা ভাঙ্গার জন্য কষ্টের কোনো শর্ত নেই। সফর আরামদায়ক হলেও রোজা ভাঙ্গার অনুমতি আছে। আর অসুস্থ অবস্থায় রোজা ভাঙ্গার জন্য কষ্ট হওয়ার শর্ত রয়েছে। কেননা কোনো কোনো রোগের জন্য রোজা উপকারীও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সফরের অবস্থা এর ব্যতিক্রম। মূল সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ : [এবং অসুস্থতার কারণে সিয়াম পালন তার জন্য কষ্টকর হয়.....] অসুস্থতার অবস্থায় অবস্থা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। অসুস্থতা বেশ কঠিনও হতে পারে। আবার নামমাত্রও হতে পারে। তাছাড়া ঋতু, বয়স ও দৈহিক [কাঠামোগত] অবস্থার বিভিন্নতাও অসুস্থতার ব্যাপারে ক্রিয়াশীল হতে পারে। এখানে উদ্দেশ্য এমন অসুস্থতা, যা সিয়াম পালনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হয়। শুধু নামমাত্র অসুস্থ হওয়া সিয়াম পালন না করার অনুমতি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এমন অসুস্থ যে, তা নিয়ে সিয়াম পালন তার জন্য কঠিন। –[রুহুল মা'আনী]

আলেমগণ বলেছেন, তার অসুস্থতা যদি এমন হয় যে, যা [সিয়াম পালনে] তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক কিংবা তা দীর্ঘমেয়াদি বা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তার জন্য সিয়াম পালন না করা [ও ফিদয়া দেওয়া] বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ : **রোজা পালনে অক্ষম লোকদের জন্য অবকাশ :** ইসলামের প্রথম দিকে যেহেতু রোজা রাখার অভ্যাস ছিল না, তাই অনবরত একমাস রোজা রেখে যাওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই রোজা রাখতে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হয় যে, অসুখ বা সফরের কোনো ওজর না থাকলেও কেবল অনভ্যাসের কারণেও যদি তোমাদের জন্য রোজা রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তবু তোমাদের এখতিয়ার আছে। ইচ্ছা হলে রোজা রাখতেও পার, ইচ্ছা হলে রোজার বিকল্পও আদায় করতে পার। আর তা হলো এক একটি রোজার বদলে এক একজন দরিদ্রকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়ানো। কেননা সে যখন একদিনের খাবার অন্যকে দিয়ে দিল, তখন যেন নিজেকে এক দিনের পানাহার হতে নিবৃত্ত রাখল। ফলে এক পর্যায়ে রোজার সাথে মিল বা সংযোগ রক্ষা হলো। তারপর তারা যখন রোজা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল, তখন আর এ অনুমতি বাকি থাকেনি, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে। কোনো কোনো তাফসীরবেত্তা طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অর্থ করেছেন সদকায়ে ফিতর। তখন অর্থ হবে, যারা ফিদইয়া দিতে সক্ষম, তারা একজন অভাবী ব্যক্তিকে তার পরিমাণ মতো খাদ্য দিয়ে দিবে। আর শরিয়তে এর পরিমাণ হলো আধা সা' গম বা এক সা' যব। এ অর্থে আয়াতখানা রহিত হবে না। যারা এখনও একথা বলে যে, যার ইচ্ছা রমজানের রোজা রাখবে আর যার ইচ্ছা ফিদইয়া দিবে, কেবল রোজাই যে রাখতে হবে এরূপ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বস্তুত তারা হয় মূর্খ, নয়তো বেদীন।

–[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يُطِيْقُوْنَهُ : [তাতে সমর্থ হয়] ، সর্বনাম দ্বারা সওম উদ্দেশ্য অর্থাৎ এমন অবস্থা যে হিম্মত করে সাওম পালন করলে [illegible] করেই, কিন্তু তাতে জানের কষ্ট হয় এবং সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়, যেমন অশীতিপর বৃদ্ধি বা গর্ভবতী নারী ও [illegible] শিশুর মা। طَاقَةٌ ও وُسْعَةٌ [শক্তি-সামর্থ্য ও সঙ্গতি সাধ্য] শব্দ দুটিতে ভাষাবিদগণ পার্থক্য করেছেন। وُسْعَتْ যেমন [illegible] সমার্থক। আর طَاقَتْ -এর অর্থে কর্ম সম্পাদনকারীর সামর্থ্য তো রয়েছে; কিন্তু তাতে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার [illegible]। অর্থাৎ কাজ তো হয়ে যায়ই, তবে কিনা খুব কষ্ট-ক্লেশে।

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٥. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ هُدًى حَالٌ هَادِيًا مِنَ الضَّلَالَةِ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ اٰيَاتٍ وَاضِحَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى مِمَّا يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ مِنَ الْاَحْكَامِ وَمِنَ الْفُرْقَانِ مِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَمَنْ شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكَرَّرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيْمِ مَنْ شَهِدَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِذَا اَبَاحَ لَكُمُ الْفِطْرَ فِى الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَلِكَوْنِ ذٰلِكَ فِىْ مَعْنَى الْعِلَّةِ اَيْضًا لِلْاَمْرِ بِالصَّوْمِ عَطَفَ عَلَيْهِ وَلِتُكْمِلُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ الْعِدَّةَ اَىْ عِدَّةَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عِنْدَ اِكْمَالِهَا عَلٰى مَا هَدٰكُمْ اَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ .

অনুবাদ :

১৮৫. রমজান মাস হলো ঐ মাস যাতে অর্থাৎ লায়লাতুল কদরে লওহে মাহফূয হতে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে আল কুরআন যা মানুষের জন্য পথভ্রষ্টতা হতে সৎপথের দিশারী এখানে هُدًى শব্দটি حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ এবং হেদায়েতের অর্থাৎ যে সমস্ত বিধানের সাহায্যে মানুষ সত্যের দিকে পরিচালিত হয় তার উজ্জ্বল বিবরণ সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং প্রভেদকারী অর্থাৎ যা হক ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী।

তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন **এর সিয়াম** পালন করে এবং কেউ পীড়িত হলে কিংবা **ভ্রমণে থাকলে** অন্য সময় তাকে সংখ্যা পূরণ করতে হবে। **এ ধরনের** আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াতটি দ্বারা সওম পালন না করে ফিদয়া দেওয়ার এখতিয়ার সম্পর্কিত বিধানটি সাধারণভাবে সকলের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য ছিল তা মানসূখ বা রহিত হওয়ায় পীড়িত ও মুসাফিরের প্রতি একই হুকুম প্রযোজ্য হবে এ ধারণা নিরসনের জন্য এস্থানে তাদের বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ অনাদায়কৃত সওম **অন্য** সময়ে পূরণ করতে হবে।

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর, তা চান না। আর তাই **পীড়া ও** ভ্রমণকালে তিনি তোমাদের জন্য সওম পালন না **করারও** অনুমতি প্রদান করেছেন।

সাওম পালন সম্পর্কে নির্দেশ দানের পিছনে **যেহেতু** এটাও [উক্ত মনোভাবটি] কারণ হিসেবে কার্যকর **সেহেতু** তার সাথে عَطْف বা অন্বয় করে আল্লাহ তা'আলা **ইরশাদ** করেন– এবং এ জন্য যে, তোমরা রমজান মাসের **সওম** সংখ্যা পূরণ করবে। تُكْمِلُوْا ক্রিয়াটির تَخْفِيْف [লঘু, তাশদীদ ব্যতিরেকে] ও تَشْدِيْد [রূঢ়, তাশদীদসহ] উভয়রূপ পাঠ রয়েছে। আর তার সমাপ্তিতে তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করবে যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন। তাঁর [মনোনীত] ধর্মের নিদর্শনাদির প্রতি তোমাদের পরিচালিত করেছেন আর এজন্য যে তোমরা যেন এ সম্পর্কে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

شَهْرٌ : মাস। شَهْرٌ শব্দটি اَلْاِشْتِهَارُ তথা প্রকাশিত হওয়া থেকে নির্গত। رَمَضَانُ : اَلرَّمْضُ থেকে নির্গত। اَلرَّمْضُ অর্থ- شِدَّةُ الْحَرِّ বা প্রচণ্ড গরম। اَلرَّمْضَاءُ অর্থ- সূর্যের তীব্র তাপ। رَمَضَان নামকরণের কারণ হলো, এটি গুনাহকে জ্বালিয়ে দেয়। لِأَنَّهُ يَرْمِضُ الذُّنُوْبَ

مِمَّا يَهْدِيْ : যার দ্বারা পথ পাওয়া যায়। كُرِّرَ পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে। لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ : যাতে ধারণা না করা হয়।

تَعْمِيْم : ব্যাপকতা। اَبَاحَ : মুবাহ বা বৈধ রেখেছেন। مَعَالِمُ : مَعْلَمٌ -এর ব-ব অর্থ- নিদর্শন।

قَوْلُهُ وَلِكَوْنِ ذٰلِكَ فِىْ مَعْنَى الْعِلَّةِ عَطَفَ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ الخ.... জুমলায়ে فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ হলো جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ আর তার উপর لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ অংশটির عَطْف হয়েছে। আর এটি হলো جُمْلَة اِنْشَائِيَّه আর جُمْلَه فِعْلِيَّه -এর আতফ جُمْلَة اِنْشَائِيَّه -এর উপর শুদ্ধ নয়।

উত্তর: يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ তথা مَعْطُوْف عَلَيْه ইল্লতের অর্থে। আর لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ -ও ইল্লতের অর্থে। সুতরাং ইল্লতের উপর ইল্লতের আতফ হয়েছে। আর এটি শুদ্ধ আছে। -[জামালাইন : ২৭৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ : পূর্ণ কুরআন মাজীদের অবতরণ তো বেশ ধীর গতিতে প্রায় ২১-২২ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কুরআন নাজিল করার সূচনা হয়েছিল রমজান মাসে। কুরআনী ওহীর একেবারে সূচনার আয়াতসমূহ হচ্ছে সূরা আল আলাক -এর প্রথম অংশ এবং তা এ মাসেই [নবুয়তের ১ম বর্ষে] হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর নাজিল হয়েছিল। অনেক মুফাসসির এরূপ অভিমতও পোষণ করেছেন যে, পূর্ণ কুরআন মাজীদ দুনিয়ার [প্রথম] আসমানে এ মাসেই [একবারে] নাজিল হয়েছিল, পরে সেখান থেকে ওহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর নাজিল হতে থাকে।

اَلْقُرْاٰنُ : যেভাবে اَرْض শব্দ দ্বারা গোটা পৃথিবীকে বুঝানো হয়, আবার প্রতিটি ভূখণ্ডকেও বুঝানো হয়; তদ্রূপ কুরআন শব্দ পূর্ণ ৩০ পারা কুরআনকেও বুঝায়, আবার তার প্রতিটি অংশকেও বুঝায়।

قَوْلُهُ رَمَضَانَ : এটি ইসলামি পঞ্জিকায় চান্দ্র বছরের নবম মাস। শরিয়ত চাঁদের মাসের হিসাবকে গ্রহণ করেছে এবং সব হিসাবপত্রের জন্য চাঁদের দিনপঞ্জীকে কাজে লাগিয়েছে। চান্দ্র মাস যেহেতু ঋতু বদলের সাথে ঘুরেফিরে আসতে থাকে, তাই সিয়াম পালনকারী মুসলমানগণও এ আবর্তনের সাথে সাথে কখনও অল্প গরম, কখনো অল্প শীত, কখনও প্রচন্ড গরম ও প্রচণ্ড শীত, কখনও শুষ্ক আবহাওয়া, কখনও আর্দ্র আবহাওয়া মোটকথা সব ঋতুতে ক্ষুধা-পিপাসা সহন ও নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। সিয়ামের সংখ্যা নির্ধারণের সাথে সাথে শরিয়ত তার সময়ও নির্ণীত করে দিয়েছে। যখন যার মনে চায় শুধু সংখ্যাপূর্তির অধিকার দেওয়া হয়নি। কেননা এভাবে যার যার মর্জি মতে সিয়াম পালনে ব্যক্তি পর্যায়ের সংস্কার ও পরিশুদ্ধি হয়তো বা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু সামগ্রিক ও সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সংখ্যা নির্ণয়ের সাথে সাথে সময় নির্ধারণও জরুরি বিষয়। উম্মতের মাঝে ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্য আরব ও চীন, মিসর ও হিন্দুস্তান, ত্রিপোলী ও জাপান, ইথিওপিয়া ও অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান ও কানাডা, নাইজেরিয়া ও মেক্সিকো, বৃটেন ও অস্ট্রিয়া মোটকথা সারা বিশ্বের যেখানেই মুসলিম জনবসতি রয়েছে, সকলেরই এক অভিন্ন সময়ে এ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক প্যারেডে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য। সমাজ বিজ্ঞানীগণ অবগত রয়েছেন যে, উম্মাহর ঐক্য ও জাতীয় সংহতি সৃষ্টির জন্য এভাবে একসঙ্গে এক সময় করা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রদ। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ : অর্থাৎ এ মুবারক মাসের বিশেষ ফজিলত ও গুরুত্ব যখন তোমরা জানতে পারলে, তখন যে কেউ এ মাস পায়, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। ইতঃপূর্বে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ফিদয়া প্রদানের যে সাময়িক সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা এখন রহিত করা হলো।

ইসলাম স্বভাব ধর্ম : ইসলাম স্বভাব ধর্ম [অর্থাৎ এ ধর্মের প্রতিটি বিষয়ে মানুষের জন্মগত অবস্থা ও স্বভাবজাত চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে] এবং এ বৈশিষ্ট্য তার নৈতিক, সামাজিক ও ইবাদত নীতিতে ছোট-বড়, একক ও সার্বিক সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে একদিকে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। নামাজের জন্য সময় বা ওয়াক্তের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাব-নিকাশের বাঁধাধরা নিয়মের মুখাপেক্ষী করা হয়নি। সৌরপঞ্জীর অনুসারীরা তাদের ঘড়ি ও ঘণ্টা-মিনিটের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সৌরজগতের হিসাব-নিকাশে অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য। কোনো দেশ বা জাতি যদি জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এমন স্তরে পৌঁছে না থাকে যে, তাদের কাছে মানমন্দির [গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করার গৃহ] ও তার প্রয়োজনীয় উপকরণ

http://islamiboi.wordpress.com

ইত্যাদি থাকবে এবং অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্র-উপকরণ ব্যবহারে কাজ সমাধা করা হবে গণিত শাস্ত্রীয় লম্বা-চওড়া ফিরিস্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকবে, তবে তো ঐ বেচারাদের নিজেদের ধর্ম পালনের জন্যও অন্যের মুখপানে তাকিয়ে থাকতে হবে; বরং ইসলাম এমন এক সাদাসিধে হিসাবের কথা বলেছে, যা কোনো প্রকার যান্ত্রিক উপকরণ ব্যতিরেকে এবং গাণিতিক উচ্চতর মাধ্যম ব্যতিরেকে সহজেই পালনযোগ্য। শুধু চোখে চাঁদ দেখা হলো, সিয়াম শুরু করে দাও। [পঞ্জিকা-ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠায় তাকিয়ে তাকিয়ে ও আহকামে রমজানের উপর ভরসা রেখে ক্লান্তশ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।]

قَوْلُهُ شَهِدَ : ব্যাপক অর্থে। অর্থাৎ রমজান মাস শুরু হয়ে যাওয়ার কথা জানা গেলেই, তা নিজে চাঁদ দেখে হোক কিংবা অন্য কারো চাঁদ দেখার খবর শুনে হোক, অসুস্থ সফরকারী ও অন্যান্য অপারগদের বাদ দিয়ে সকলেই সিয়াম পালন শুরু করবে। شَهِدَ এখানে شُهُوْدٌ [উপস্থিতি] ধাতুমূল থেকে উপস্থিতির অর্থ নির্দেশ করে তা সরাসরি [নিজ চোখে দেখে] হোক কিংবা অবগতি সূত্রে হোক [তাফসীরে রূহুল মা'আনী]। হয় দেখে, নয় তো শুনে। -[তাফসীরে কাবীর]

চাঁদ দেখার মাসআলা : কোথাকার চাঁদ দেখা কত দূরের লোকের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে? ফকীহগণ এ প্রশ্নের জবাবে অনেক বেশি চুলচেরা বিশ্লেষণে সময় খুইয়েছেন। কিন্তু সহজ সরল কথা হলো, যেখানে চাঁদ দেখা গেল, সে শহর ও জনবসতির জন্য, বা আশপাশের জনবসতিগুলোর জন্য। শত শত ও হাজার হাজার মাইল দূরের চাঁদ দেখার খবর তার-বেতারের ফরমায়েশী খবর সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা, বোম্বাইয়ের চাঁদ দেখাকে ৯০০ মাইল দূরের কলকাতার জন্য প্রমাণ ঠাওরানো ইসলামি শরিয়তের মূলধারাকে নিপীড়ন করার শামিল। উদয়ক্ষেত্রের বিভিন্নতা (اِخْتِلَافُ مَطَالِع) সারা পৃথিবীতে একই দিনে, একই সময় চাঁদ দেখা না যাওয়ার ব্যাপারটি তো একটি সর্বজনবিদিত সুস্পষ্ট ব্যাপার, তা প্রত্যাখ্যান করা কোনো প্রকাশ্য সত্যকে অস্বীকার করার নামান্তর। উম্মতের ঐক্য তথা সিয়াম ও ঈদুল ফিতরে ঐক্যবদ্ধতা নিঃসন্দেহে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সে জন্য এভাবে উঠেপড়ে লাগাটাও স্বাভাবিক বিষয়কে স্বভাববিরুদ্ধ অস্বাভাবিকে-দিনকে রাত ও সহজকে কঠিন করারই ব্যর্থ প্রয়াস। ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন, কোনো সংবাদদাতা কোনো এলাকায় চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে তার হুকুম কি হবে, সে বিষয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেননা সে এলাকাটি হয়তো সংবাদপ্রদত্ত এলাকার কাছের হবে, কিংবা দূরের। কাছের হলে অভিন্ন হুকুম অর্থাৎ চাঁদ দেখার হুকুম সাব্যস্ত হবে। আর দূরের হলে তখন প্রতিটি এলাকার জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ : প্রথম দিকে বিধান শুধু এতটুকু ছিল যে, সুস্থ ও অবস্থানরত [অর্থাৎ মুসাফির নয়, মুকীম] ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিজে সিয়াম পালন না করে ফিদয়া দিতে পারত। فَمَنْ شَهِدَ আয়াত নাজিল হওয়ার পর থেকে সুস্থ ও মুকীমদের এ সুযোগ রহিত করা হলো এবং রমজানের সিয়াম তাদের জন্য আর ঐচ্ছিক রইল না; বরং আবশ্যিক হয়ে গেল। তবে অসুস্থ, অক্ষম ও মুসাফিরদের জন্য নগদ সিয়াম পালন না করে কাযা করার সুযোগ যথারীতি বহাল রইল। এ কারণেই مَنْ كَانَ مَرِيْضًا আয়াতাংশ পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে مَنْ شَهِدَ -এর শর্তহীন ও ব্যাপক আদেশে কেউ মনে না করে যে, অক্ষম অপারগদের সুযোগও রহিত করা হয়েছে। মোটকথা, বিধানটির পুনরুক্তি শুধু বাহ্যিক পুনরুল্লেখ, কোনো তাত্ত্বিক ও মৌলিক কারণে নয়। পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিধানের ব্যাপকতা দ্বারা সকলেরই সুযোগ রহিত করার ধারণা না জন্মে। এ কথাটিই মুসান্নিফ (র.) كَرَّرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيْمِ مَنْ شَهِدَ উক্ত ইবারতে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ : [কাজার দিনগুলোর গণনা] অর্থাৎ যত দিনের রোজা কাজা হয়ে যাবে, সেগুলো পূর্ণ করে দিলে রোজা আদায়ের পরিপূর্ণ ছওয়াবই পেয়ে যাবে।

সফর অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম, না ভঙ্গ করা উত্তম : হাদীস শরীফের আলোকে তো এটাই জানা যায় যে, সফর অবস্থায় রোজা না রাখাই উত্তম। এমনকি কখনো রোজা রাখা মুসাফিরের জন্য অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল ﷺ রমজান মাসে মক্কার উদ্দেশ্যে সফর করেন। সফর অবস্থায় তিনি রোজা ছিলেন। তার সফরসঙ্গীরাও রোজা ছিলেন। চলতে চলতে 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি পানির পেয়ালা চাইলেন। তিনি সকলের সামনে পেয়ালাটি উঁচু করে ধরে পানি পান করলেন। সকলেই তাকে পানি পান করতে দেখল। ক্ষণিক পর তিনি জানতে পেলেন যে, কিছুলোক এখনও রোজা ভাঙ্গেনি। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তারা গুনাহগার, তারা গুনাহগার। -[মুসলিম ও তিরমিযী]

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَائِمُ رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِى الْحَضَرِ (اِبْنُ مَاجَة)

অর্থাৎ সফর অবস্থায় রোজাকারী ঘরে বসে রোজা ভঙ্গকারীর সমতুল্য

সফর অবস্থায় রোজা না রাখার বৈধতার ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু রাখা উত্তম, না ভঙ্গ করা উত্তম- এ ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনের সামান্য মতভেদ রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٦. وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ أَقَرِيْبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيْهِ أَوْ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيْهِ فَنَزَلَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ مِنْهُمْ بِعِلْمِيْ فَأَخْبِرْهُمْ بِذٰلِكَ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ دُعَائِيْ بِالطَّاعَةِ وَلْيُؤْمِنُوْا يُدِيْمُوْا عَلَى الْإِيْمَانِ بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ يَهْتَدُوْنَ .

অনুবাদ :

১৮৬. কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিল "আমাদের প্রভু নিকটে না দূরে? যদি নিকটে হন তবে তাঁকে আমরা চুপি চুপি ডাকব, আর যদি দূরে হন তবে তাঁকে আমরা উচ্চৈঃস্বরে ডাকব।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে [বল] আমি তো আমার জ্ঞান হিসেবে তাদের নিকটেই আছি. তুমি এ সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তার যাচনা পূরণ করে তার এ আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও যেন আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান স্থাপন করে অর্থাৎ ঈমানের উপর সর্বদা যেন কায়েম থাকে হয়তো তারা ঠিক পথে চলতে পারে সত্যপথে পরিচালিত হতে পারে।

তাহকীক ও তারকীব

نُنَاجِيْهِ : চুপি চুপি ডাকব। نُنَادِيْهِ : উচ্চৈঃস্বরে ডাকব। أُجِيْبُ : আমি সাড়া দিই।
بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ : তার প্রার্থিত বিষয় পূরণ করার জন্য। فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ : তারা যেন আমার সাড়া দেয়।
يُدِيْمُوْا : সর্বদা স্থির থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইসলামের প্রাথমিক যুগে রমজান মাসের রাতসমূহের প্রথমাংশে পানাহার ও স্ত্রীগমনের অনুমতি ছিল; কিন্তু শুয়ে পড়ার পর এসব নিষিদ্ধ ছিল। কতিপয় লোকের পক্ষ হতে এর অন্যথা হয়ে যায়। তারা শয়নের পর স্ত্রীগমন করে বসে। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে এবং তজ্জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এর তওবা সম্পর্কেও জানতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। এতে তাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয় এবং মহান আল্লাহর আদেশ পালনে যত্নবান থাকার তাগিদ করা হয়। সেই সঙ্গে আগের হুকুম রহিত করে ভবিষ্যতের জন্য রমজানে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত রাতভর পানাহার ইত্যাদি হালাল করে দেওয়া হয়, যা সামনের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বের আয়াতে বান্দাদের প্রতি যে অবকাশ ও অনুগ্রহের উল্লেখ ছিল এই নৈকট্য, সাড়া দান ও বৈধকরণ দ্বারা তার আরও দৃঢ় সমর্থন হয়ে গেল।

আরেকটি যোগসূত্র এও যে, পূর্বের আয়াতে তাকবীর ও মহান আল্লাহর মহিমা বর্ণনার নির্দেশ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কয়েকজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের থেকে দূরে, না কাছে? দূরে হলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব আর কাছে হলে নিম্নস্বরে ডাকব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় এবং এতে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি তোমাদের নিকটে। তিনি প্রত্যেকের কথা শোনেন, চাই আস্তে ডাকুক, চাই উচ্চৈঃস্বরে। যেসব স্থানে উচ্চৈঃস্বরে ডাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার কারণ ভিন্ন, এমন নয় যে, আস্তে ডাকলে শোনেন না। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٧. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ بِمَعْنَى الْإِفْضَاءِ إِلَى نِسَائِكُمْ بِالْجِمَاعِ نَزَلَ نَسْخًا لِمَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيْمِهِ وَتَحْرِيْمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ الْعِشَاءِ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ كِنَايَةٌ عَنْ تَعَانُقِهِمَا أَوْ اِحْتِيَاجِ كُلٍّ مِّنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُوْنَ تَخُوْنُوْنَ أَنْفُسَكُمْ بِالْجِمَاعِ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَقَعَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ وَاعْتَذَرُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَابَ عَلَيْكُمْ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ إِذَا أُحِلَّ لَكُمْ بَاشِرُوْهُنَّ جَامِعُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا اُطْلُبُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ أَيْ أَبَاحَهُ مِنَ الْجِمَاعِ أَوْ قَدَّرَهُ مِنَ الْوَلَدِ.

অনুবাদ :

১৮৭. সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সাথে বাধাহীন ব্যবহার সহবাস বৈধ করা হয়েছে ইসলামের প্রথম যুগে সিয়ামের সময় ইশার পরই খানা-পিনা ও স্ত্রীসম্ভোগ ছিল হারাম। উক্ত বিধান মানসূখ করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ এ স্থানে পরস্পরকে পরিচ্ছদরূপে আখ্যায়িত করে পরস্পরের নিবিড় সম্পর্ক এবং একজন অন্যজনের প্রতি মুখাপেক্ষিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ জানতেন যে সিয়ামের রাত্রে স্ত্রীসম্ভোগ করে তোমরা নিজেদের সাথে প্রতারণা খেয়ানত করছিলে। [নিষিদ্ধকালীন সময়ে] হযরত ওমর ও কতিপয় সাহাবীর তরফ হতে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাঁরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ বিষয়ে ওজর পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছেন, তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমাদের জন্য যখন বৈধ করে দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে সঙ্গত হও সহবাসে লিপ্ত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন অর্থাৎ স্ত্রীসম্ভোগ বৈধ করা বা যে সন্তান তোমাদের তকদীরে রাখা হয়েছে তা কামনা কর, অনুসন্ধান কর।

তাহকীক ও তারকীব

اَلرَّفَثُ : এর মূল অর্থ হলো– অশ্লীল কথা। পরবর্তীতে সহবাস ও তার কাছাকাছি বিষয়কে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। اَلْاِفْضَاءُ : স্ত্রীসম্ভোগ। تَعَانُقٌ : নিবিড় সম্পর্ক, গলায় জড়িয়ে ধরা। تَخْتَانُوْنَ : প্রতারণা করছ। وَقَعَ : সংঘটিত হয়েছিল। اِعْتَذَرُوْا : ওজর পেশ করল।

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْاِفْضَاءِ : প্রশ্ন. رَفَثٌ -এর صِلَةٌ হিসেবে তো فِيْ কিংবা ب আসে। কিন্তু এখানে اِلٰى ব্যবহৃত হলো কেন? উত্তর. رَفَثٌ -এর মধ্যে যেহেতু اِفْضَاءٌ -এর অর্থও রয়েছে তাই صِلَةٌ হিসেবে اِلٰى আসা শুদ্ধ হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) بِمَعْنَى الْاِفْضَاءِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ২৯৫]

قَوْلُهُ تَخْتَانُوْنَ تَخُوْنُوْنَ : প্রশ্ন: تَخْتَانُوْنَ -এর তাফসীরে تَخُوْنُوْنَ উল্লেখ করে লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, تَخْتَانُوْنَ বাবে اِفْتِعَالٌ থেকে নির্গত। আর এটি সাধারণত লাযিম হয়ে থাকে। অথচ এখানে এটি اَنْفُسَكُمْ -এর দিকে مُتَعَدِّىْ হয়েছে। উত্তর : মূলত تَخْتَانُوْنَ -এর তাফসীরে تَخُوْنُوْنَ উল্লেখ করে এ প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ بَابِ اِفْتِعَالٌ এখানে مُجَرَّدْ -এর অর্থে। আর بَابِ اِفْتِعَالٌ ব্যবহার করা হয়েছে كَثْرَتِ خِيَانَتٌ -এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। –[জামালাইন : ২৯৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ : বর্তমান বিধানের ন্যায় ইসলামের প্রথম দিকে এরূপ অনুমতি ছিল না। প্রথম দিকে সিয়ামরত অবস্থায় দিনের মতো রাতের বেলায়ও স্ত্রীদের থেকে পৃথক অবস্থানের নির্দেশ ছিল। মূলত ইসলামি শরিয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হায়াতে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথম দিকে সহজ ও কোমল বিধান দেওয়া হয়েছে, পরে ধীরে ধীরে তা কঠোর ও শক্ত করা হয়েছে। যেমন– মদ খাওয়া প্রথমে শুধু অপছন্দনীয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং অগ্রসর হতে

http://islamiboi.wordpress.com

হতে অবশেষে তো সরাসরি হারাম ও চিরনিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর বিপরীত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম দিকে শক্ত ও কঠিন বিধান দিয়ে ধীরে ধীরে তাতে সহজতা ও ছাড় সংযোজিত হয়েছে। যেমন– এ সিয়ামের ব্যাপারটি। প্রথম দিকে রাতেও স্ত্রীসহবাস হারাম ছিল, পরে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الرَّفَثُ : এর শাব্দিক অর্থ কামোদ্দীপক ও অশ্লীল কথাবার্তা । কিন্তু এটি সকর্মক ক্রিয়ারূপে ব্যবহার করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায় সহবাস ও সহশয্যাবাস। এখানেও الرَّفَثُ إِلَى نِسَاءِ -এর মধ্যে إِلَى অব্যয় দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে। কেননা এটি সহবাস অর্থে [লিসানুল আরব]। পরোক্ষরূপে [প্রচ্ছন্ন] 'সহবাস' বুঝানো হয়েছে এবং সহবাসের অর্থ অন্তর্ভুক্ত করার কারণেই إِلَى দ্বারা সকর্মক করা হয়েছে [রাগিব]। প্রচ্ছন্নরূপে সহবাস বুঝানো হয়েছে [কাশ্‌শাফ]। এখানে رَفَثُ দ্বারা উদ্দেশ্য সঙ্গম ও সহবাস। –[ইবনুল আরাবী]

এতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ ও চাহিদা আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধির [তাযকিয়ার] বিন্দুমাত্র পরিপন্থি নয়। যেমনটা অনেক পৌত্তলিক ও জাহিলি যুগের ধর্মধারীরা মনে করে রেখেছে। তদ্রূপ রমজান মাসের সিয়াম ও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত থাকা এবং স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বসবাস ও মিলন সম্ভোগের মাঝে বিন্দুমাত্র বিরোধ নেই। যদিও যোগী-সন্ন্যাসী সাধুদের অলীক কর্মকাণ্ড তেমন ধারণা জন্ম দিয়েছে। ইসলামি শরিয়ত যে বিষয়টির নিয়ন্ত্রণে কড়া পাহারা বসিয়েছে, তা হলো কাম চরিতার্থ করার হারাম ও অবৈধ ক্ষেত্র ও উপায়সমূহ এবং সেসবের উপক্রমণিকা ও প্রাথমিক সূত্রগুলো। মূল কামচাহিদা নিষিদ্ধ করা হয়নি। কেননা ক্ষুধা, পিপাসা, বিশ্রাম ও নিদ্রার ন্যায় কামক্ষুধাও মানুষের স্বভাবজাত এবং যতক্ষণ তা যথাযথ সীমা লঙ্ঘন না করে, ততক্ষণ তা অকল্যাণকর নয়। নিজের ইচ্ছায় ও শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে রমজানের এক একটি সিয়াম ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে শরিয়ত লাগাতার দুই মাস অর্থাৎ ষাট দিন সিয়াম পালনের শাস্তি নির্ধারণ করেছে। স্বামী-স্ত্রী সম্মিলিত ইচ্ছায় সিয়াম ভঙ্গ করলে উভয়ের জন্য এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আর যদি স্ত্রীর অসম্মতিতে স্বামী তাকে সহবাসে বাধ্য করে, তখন স্ত্রীর পাপ হবে না, তবে জোর জবরদস্তি ও বাধ্য করার বিষয়টি বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য একদিনের কাজা যথেষ্ট হবে। কাফ্‌ফারা [ষাট দিনের সিয়াম] সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বেচ্ছায় সম্মতিতে হওয়ার উপর নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ : পরিচ্ছদ ও আচ্ছাদনের [لِبَاس] সঙ্গে উপমার যুক্তি কি? এ প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন, একে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়ার বিচারে। কারো মতে দৈহিক ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শ-সংযোগের বিচারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে প্রতিভাত হবে যে, মানুষের পোশাক ও আচ্ছাদনের একটি বিশেষ দিক হলো তাকে পর্দাবৃত রাখা। দেহের দোষ ও খুঁতগুলো গোপন রেখে তার শোভা ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা। এ উপমায় বিশেষভাবে এ দিকটির প্রতি ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়। যেন বলে দেওয়া হলো যে, প্রতিটি ইসলামি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী হবে একে অন্যের আবরণ; দোষ গোপনকারী ও পরস্পর সৌন্দর্য-শোভার সুষমা সৃষ্টিকারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তাদের যেভাবে একজন অন্যজনের দৈহিক, নৈতিক ও আত্মিক দোষ ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ রয়েছে, বলাই বাহুল্য অন্য কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর পক্ষে সে যত অধিক ঘনিষ্ঠই হোক না কেন তেমন সুযোগ নেই। স্বামী-স্ত্রী কারো কাছে অন্যের কোনো গোপন বিষয় গোপন থাকে না। এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রীর সততা ও নৈতিকতার পরিপূর্ণতা হবে এতেই যে, সে প্রতিটি দোষ-দুর্বলতা গোপন করে রাখবে, তাতে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবে এবং স্বামী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যথাসাধ্য উত্তমরূপে উপস্থাপন করবে। পক্ষান্তরে স্বামীও নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবেন একইভাবে। ইসলাম কোনো প্রকার কঠিন কর্মসূচি ও ক্লান্তিকর সাধনায় ঠেলে না দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সাবলীল ধারায় কথায় কথায় স্বামী-স্ত্রীর নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গতা বিধানের সরল-সহজ ও সর্বাধিক কার্যকর ব্যবস্থাপত্র তুলে ধরেছে। এ হলো সে ধর্মের শিক্ষা, যাতে নারীদের অবজ্ঞার পাত্র বানিয়ে রাখার অভিযোগে ফিরিঙ্গি বিশেষজ্ঞগণ তা নিম্নমানের হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন। হায় কপাল! প্রোপাগান্ডার বলে মিথ্যাও সত্য হয়ে যায়! তা না হলে এর চেয়ে জঘন্য মিথ্যা ও এর চেয়ে মারাত্মক অপবাদ আর কি হতে পারে? সীতা-সাবিত্রি ও স্বরস্বতী-ভগবতীদের ধর্মের কথা না হয় বাদই দিলাম। নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়মের ধারক-বাহক ইহুদি-খ্রিস্ট ধর্মের ধ্বজাধারীদের প্রশ্ন করছি- তাদের সমগ্র গ্রন্থভাণ্ডার ও পুস্তকাবলিতে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম, বিশ্বাস ও পারস্পরিক সৌহার্দ সম্প্রীতির এমন উচ্চাঙ্গ শিক্ষা কি কোথাও রয়েছে?

قَوْلُهُ وَابْتَغُوْا : কেউ وَابْتَغُوْا দ্বারা শবে কদরের সন্ধান করা এবং مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ দ্বারা শবে কদরের বিশাল ছওয়াব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ব্যাখ্যাকে তাফসীরে বিদ'আত ও অভিনবত্বের কাছাকাছি বলা যায় [কাশশাফ]। কেননা وَابْتَغُوْا দ্বারা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বংশবৃদ্ধিই উদ্দেশ্য; স্বেচ্ছাকৃত সন্তানহীনতা বা 'আযল' [অর্থাৎ জন্মনিরোধ] নয়। কারো কারো মতে, এতে আযলের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে [কাশশাফ]। গর্ভনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের যে সমকালীন আন্দোলন খুব জোরেশোরে চালানো হচ্ছে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ [ও সুখী পরিবার গঠন] ইত্যকার আকর্ষণীয় লেবেল লাগিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের বক্তব্যধারা দ্ব্যর্থতামুক্ত। পবিত্র কুরআন তার বাগ্মীতাপূর্ণ ও অনন্য বর্ণনাধারায় এসব প্রত্যাখ্যান করে স্পষ্ট ব্যক্ত করেছে যে, স্বামী-স্ত্রী মিলনের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিণতির প্রতি আশাবাদী ও আস্থাশীল থাকাই বাঞ্ছনীয়, তার প্রতীক্ষায় থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতির সাধারণ ও ব্যাপক বিধি এমনই। আর স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের প্রাকৃতিক ফলাফলকে চরম প্রয়োজন ও সবিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কৃত্রিম পন্থা ও স্বভাববিরুদ্ধ উপায়ে প্রতিহত করা, কনডম ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা [তথাকথিত] বিপদ দূর করা নয়; বরং তা শরীরের রোগ-যাতনা ও নৈতিক ব্যাধি-অবক্ষয় বাড়ানো, ব্যক্তি ও সমষ্টির জন্য নিত্য নতুন সমস্যা, বহুবিধ বিপদ ও নতুন নতুন ব্যাধি জন্ম দেওয়া এবং সর্বোপরি ব্যক্তি ও সমাজের জন্য নতুন নতুন বিপদ ও সমস্যা ডেকে আনা [এক কথায় সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধ্বংসী মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটানো] -রই নামান্তর।

http://islamiboi.wordpress.com

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ يَظْهَرَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اَيِ الصَّادِقِ بَيَانٌ لِلْخَيْطِ الْاَبْيَضِ وَبَيَانُ الْاَسْوَدِ مَحْذُوْفٌ اَىْ مِنَ اللَّيْلِ شَبَّهَ مَا يَبْدُوْ مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَبْشِ بِخَيْطَيْنِ اَبْيَضَ وَاَسْوَدَ فِى الْاِمْتِدَادِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ مِنَ الْفَجْرِ اِلَى اللَّيْلِ اَىْ اِلٰى دُخُوْلِهِ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ اَىْ نِسَاءَكُمْ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ مُقِيْمُوْنَ بِنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ فِى الْمَسٰجِدِ مُتَعَلِّقٌ بِعَاكِفُوْنَ نَهْىٌ لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُجَامِعُ اِمْرَاَتَهُ وَيَعُوْدُ تِلْكَ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ حُدُوْدُ اللّٰهِ حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَقِفُوْا عِنْدَهَا فَلَا تَقْرَبُوْهَا اَبْلَغُ مِنْ لَا تَعْتَدُوْهَا الْمُعَبَّرُ بِهِ فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ مَحَارِمَهُ ـ

অনুবাদ : সারা রাত্র তোমরা আহার কর, পান কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে ফজরের সুবহে সাদিক বা আসল ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্ট রূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়] সুস্পষ্ট না হয়। مِنَ الْفَجْرِ এটা اَلْخَيْطُ الْاَبْيَضُ বা শুভ্ররেখার বিবরণ। اَلْخَيْطُ الْاَسْوَدُ কৃষ্ণরেখার বিবরণ এ স্থানে উহ্য। তা হলো مِنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ রাত্রির কৃষ্ণরেখা। ঊষার শুভ্রতা এবং তৎসঙ্গে রাত্রির শেষলগ্নের [অপসৃয়মান] যে আঁধার ছড়িয়ে থাকে, এতদুভয়কে এস্থানে তাদের বিস্তৃতি হিসেবে সাদা কালো দুটি রেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর ফজর হতে [রাত্র পর্যন্ত] অর্থাৎ সূর্যাস্তের মাধ্যমে নিশাগম পর্যন্ত তোমরা সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফকালে অর্থাৎ ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থানরত থাকাকালে তাদের সাথে তোমাদের স্ত্রীগণের সাথে সঙ্গত হয়ো না। এ স্থানে ই'তিকাফরত অবস্থায় মসজিদ হতে বের হয়ে স্ত্রীসম্ভোগ করতঃ মসজিদ প্রত্যাবর্তন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। فِى الْمَسَاجِدِ এটা عَاكِفُوْنَ -এর مُتَعَلِّقٌ বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর সীমারেখা তাঁর বান্দাদের জন্য। তিনি এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে তারা তার নিকট এসে নিজেদের গতিরুদ্ধ করে, এই সীমারেখা লঙ্ঘন না করে সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। অপর একটি আয়াতে এ স্থানে لَا تَعْتَدُوْهَا [তা লঙ্ঘন করো না] উল্লেখ হয়েছে। তা অপেক্ষা এ আয়াতটিতে ব্যবহৃত لَا تَقْرَبُوْهَا [তার নিকটবর্তী হয়ো না] এ বর্ণনারীতিতে অধিক مُبَالَغَة বা জোর বিদ্যমান। এভাবে অর্থাৎ তোমাদের জন্য যেমন উল্লিখিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে তেমনি আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অবৈধ কার্যাবলি হতে বেঁচে থাকতে পারে।

তাহকীক ও তারকীব

شَبَّهَ : উপমা দেওয়া হয়েছে। مَا يَبْدُوْ : যা প্রকাশিত হয়। اَلْبَيَاضُ : শুভ্রতা। يَمْتَدُّ : বিস্তৃত হয়।

اَلْغَبْشُ : আঁধার। اَلْاِمْتِدَادُ : বিস্তৃতি। عٰكِفُوْنَ : অবস্থানরত।

اَلْاِعْتِكَافُ فِى اللُّغَةِ : اَللَّبْثُ وَاللُّزُوْمُ وَفِى الشَّرْعِ : اَلْمَكْثُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْعِبَادَةِ ـ

http://islamiboi.wordpress.com

اَلْحَدُّ فِى اللُّغَةِ : اَلْمَنْعُ وَأَصْلُهُ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ আর حُدُوْدُ : حَدٌّ -এর ব-ব। অর্থ– সীমারেখা। আহকাম বা বিধানকে حَدٌّ বলার কারণ হলো, এটি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দেয়। ليقفوا : তারা যেন গতিরুদ্ধ করে। اَلْمُعَبِّرُ : ব্যক্তকৃত, বর্ণনারীতি। مَحَارِمَهُ : অবৈধ কাজসমূহ।

قَوْلُهُ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا : এ অংশটির عَطْف হয়েছে পূর্বের بَاشِرُوْا -এর সাথে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ : অর্থাৎ সুবহে সদিক [প্রথম উষা] উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাসের অনুমতি রয়েছে।

اَلْخَيْطُ الْاَسْوَدُ مِنَ الْاَبْيَضِ : ফজরের সাদারেখাটি কালোরেখা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া দ্বারা পরোক্ষ অর্থে রাতের আঁধার মিলিয়ে গিয়ে সকালের আলো প্রকাশ পাওয়া অর্থাৎ ফজর হয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দিনের সাদা আভা রাতের কালো বর্ণ থেকে [মাআলিম]। খোদ শরিয়ত প্রবর্তক নবী করীম ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে– هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ : তা হলো রাতের কালো বর্ণ [আঁধার] ও দিনের সাদা বর্ণ [আলো]। –[বুখারী]

خَيْط [সূত্র] শব্দ দ্বারা রূপক অর্থে বর্ণ বুঝানো হয়। আর এখানে তো বাস্তবও অনেকটা তাই। কেননা প্রথম দিকের আলো রেখারূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الْفَجْرِ : শরিয়তের ফজর সুবহে কাযিব [প্রতারক উষা] নয়, যখন কিছু সময়ের জন্য উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত আলোকরশ্মি দেখা যায়; বরং এ মিথ্যা উষার একটু পরেই যে ঝলক দেখা যায় এবং যা পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তা-ই হলো শরিয়তি ফজর বা সুবহে সাদিক। জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সে হলো ডানে বামে বিস্তীর্ণ ফজর-উষা রেখা।

قَوْلُهُ شَبَّهَ مَا يَبْدُوْ مِنَ الْبَيَاضِ وَمَا يَمْتَدُّ مَعَهُ : লেখক এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, এখানে সুবহে সাদিককে خَيْط اَبْيَض -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ এ উপমাটি সুবহে কাযিবের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা সেটি সুতার মতো দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত হয়, আর সুবহে সাদিক প্রস্থে বিস্তৃত হয়। উক্ত ইবারতে এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, সুবহে সাদিক যখন প্রথমে উদয় হয়, তখন তার উপরিভাগের কোনাটা خَيْط اَبْيَض -এর মতো হয়। এ থেকে জানা গেল, মূলত প্রথম প্রকাশমান সুবহে সাদিকের কোনাকে خَيْط اَبْيَض -এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। –[জামালাইন]

اَلْغَبَشُ : এর অর্থ– غَلَسُ بَقِيَّةِ اللَّيْلِ বা শেষ রাতের আঁধার।

قَوْلُهُ اِلَى اللَّيْلِ : রাত পর্যন্ত অর্থাৎ যখন থেকে রাত শুরু হয় অর্থাৎ সূর্যগোলক সম্পূর্ণ অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত সিয়াম অব্যাহত রাখবে। রাতের আগমন শুরু হওয়া মাত্র সিয়াম পালন সমাপ্ত হতে হবে। রাতের কোনো অংশ সিয়ামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না।

'সাওমে বেসাল' [বিরতিহীন সাওম] অর্থাৎ দিনরাতের মাঝে একবারও ইফতার না করে অবিরাম সিয়াম পালন নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানও অনেক ফকীহ এ আয়াত থেকেই আহরণ করেছেন। হাদীসে তো পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছেই। এতে নিরবচ্ছিন্ন [সিয়াম পালন] নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) ও তা বলেছেন। –[কুরতুবী] সুতরাং আয়াত নির্দেশ করল যে, রাত সিয়ামের ক্ষেত্রে নয় এবং [নিরবচ্ছিন্নভাবে] দুদিনের সিয়াম পালন একটি সাওম রূপেই সাব্যস্ত হবে। নবী করীম ﷺ-ও তো এ আয়াত সূত্রে নিরবচ্ছিন্নতা হারাম হওয়া উদ্ঘাটন করেছেন। –[রুহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اَىْ اِلٰى دُخُوْلِهِ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ : এ অংশটুকু উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে غَايَة টা مُغَايَه -এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয়। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ عَاكِفُوْنَ : ই'তিকাফ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– নিজেকে কোনো কিছুতে নিরত রাখা বা লাগিয়ে রাখা। **শরিয়তের** পরিভাষায় মসজিদে অবস্থান করে নিজেকে ইবাদতের জন্য আবদ্ধ করে নেওয়া। সব সময়ের জন্য মসজিদে **থাকা, শোয়া,** পানাহার করা, শয়ন ও জাগরণ, পান ও ভোজন সব মসজিদ থেকে সম্পাদন করা এবং শরিয়ত সমর্থিত বা **প্রাকৃতিক জরুরি** প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদের বাইরে বের না হওয়া ই'তিকাফকারীর অপরিহার্য কর্তব্য। মানবিক [প্রাকৃতিক] **প্রয়োজন ও** জুমার ফরজ আদায়ের প্রয়োজন ব্যতীত বের না হওয়া তার জন্য ওয়াজিব [জাসসাস]। তার ই'তিকাফের **সময়সীমা** সর্বাধিক কত হতে পারে তা নির্ণীত নয়। তবে সর্বনিম্ন সময় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক মুহূর্ত [অর্থাৎ **স্বল্পক্ষণ] ও** হতে পারে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.) -এর মতে অন্তত একদিন একরাত [অর্থাৎ **পূর্ণ একদিন]** হতে হবে।

قَوْلُهُ فِى الْمَسَاجِدِ : এ থেকে আহরণ করা হয়েছে যে, ই'তিকাফ সর্বদা মসজিদেই হতে হবে। আলেমগণ **একমত হয়েছে** যে, ই'তিকাফ মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও হবে না। –[কুরতুবী] তবে মহিলাদের ই'তিকাফ মসজিদের **পরিবর্তে ঘরের** কোনো কোণে যেটি সালাত ও ইবাদতের জন্য সুনির্দিষ্ট করে নেওয়া হবে, সেখানেও হতে পারে। **মসজিদে তাদের** ই'তিকাফ করাকে ফকীহগণ মাকরূহ লিখেছেন। আর নারী তার ঘরের মসজিদে ই'তিকাফ করবে। যদি **ঘরে তার জন্য** কোনো মসজিদ [সালাতের নির্দিষ্ট স্থান] না থাকে, তবে সেখানে [মসজিদরূপে] কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে **নিয়ে ই'তিকাফ** করবে। –[হিদায়া]

সুন্নত ই'তিকাফ এ [রমজানের] ই'তিকাফই। পরিভাষায় এটি সুন্নতে কিফায়া অর্থাৎ কোনো জনপদের **যে কেউ এভাবে** ই'তিকাফ করলে সকলে দায়মুক্ত হবে এবং জনপদের পক্ষে সুন্নতটি প্রতিপালিত সাব্যস্ত হবে। তবে মূল **ই'তিকাফ শুধু** রমজানেই সীমাবদ্ধ নয়, তা যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় মোস্তাহাব ও যথেষ্ট ফজিলতের কাজ।

قَوْلُهُ فَلَا تَقْرَبُوْهَا أَبْلَغُ مِنْ لَا تَعْتَدُوْهَا الْمُعَبَّرُ بِهِ فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : لَا تَعْتَدُوْهَا -এর মাঝে সুস্পষ্ট**ভাবে নিষেধ করা** হয়েছে। আর فَلَا تَقْرَبُوْهَا -এর মাঝে كِنَايَةً বা ইঙ্গিতমূলকভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আর প্রসিদ্ধ নিয়ম **হলো–**

اَلْكِنَايَةُ اَبْلَغُ مِنَ التَّصْرِيْحِ .

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهِ لِلنَّاسِ : অর্থাৎ এখানে যেভাবে তিনি সিয়াম ও তার সীমা-পরিধি, সময় **ইত্যাদি এবং** ই'তিকাফ ও আনুষঙ্গিক বিধিমালা বিশদরূপে বর্ণনা করে দিলেন, তদ্রূপ মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের লক্ষ্যে **প্রদত্ত তার** অন্যান্য নীতি-বিধানও বিশদভাবেই বর্ণনা দিতে থাকেন। মর্ম হলো, তিনি যেভাবে এখানে তাঁর আদেশ ও **নিষেধের** পরিষ্কার বর্ণনা দিলেন, অনুরূপভাবে তাঁর দীন ও শরিয়তের অন্যান্য যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনসমূহও স্পষ্ট **ভাষায় ব্যক্ত করেন।** –[তাফসীরে কাবীর]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

১৮৮. وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ اَىْ لَا يَأْكُلْ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ الْحَرَامِ شَرْعًا كَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَ لَا تُدْلُوْا تُلْقُوْا بِهَا اَىْ بِحُكُوْمَتِهَا اَوْ بِالْاَمْوَالِ رِشْوَةً اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا بِالتَّحَاكُمِ فَرِيْقًا طَائِفَةً مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ مُتَلَبِّسِيْنَ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّكُمْ مُبْطِلُوْنَ ـ

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে শরিয়তের বিধানানুসারে যা হারাম তদ্রূপ পদ্ধতিতে যেমন– চুরি, অপহরণ ইত্যাদি উপায়ে গ্রাস করো না অর্থাৎ একজন অপরজনের অর্থসম্পদ লুটপাট করে ফেলো না।

মানুষের ধন-সম্পত্তির এক অংশ কিয়দংশ পাপের সাথে মিশ্রণ করে এবং তোমরা যে অন্যায়কারী তা জেনেশুনে বিচারের মাধ্যমে তা গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট এর বিচার নিয়ে যেয়ো না বা উৎকোচস্বরূপ কোনো সম্পদ বিচারকদের দিয়ো না। بِالْاِثْمِ শব্দটি এ স্থানে উহ্য مُتَلَبِّسِيْنَ -এর مُتَعَلِّق; তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

اَلسَّرِقَةُ : চুরি। اَلْغَصْبُ : অপহরণ। لَا تُدْلُوْا : নিক্ষেপ করো না। বিচার দায়ের করোনা। اِدْلَاءٌ -এর মূল অর্থ হলো– কূপের ভিতর বালতি ফেলা। তারপর সকল প্রকার নিক্ষেপের অর্থে ব্যবহৃত হয়। حُكُوْمَةٌ : বিচার। رِشْوَةٌ : ঘুষ ব-ব رِشًى - اَلْحُكَّامُ : حَاكِمٌ -এর ব-ব। অর্থ– বিচারক। اَلتَّحَاكُمُ : বিচার, ফয়সালা। مُتَلَبِّسِيْنَ : মিশ্রিত করে।

قَوْلُهُ لَاتُدْلُوْا بِهَا : এখানে لَا মুকাদ্দার ধরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এর عَطْف হয়েছে لَا تَاْكُلُوْا -এর সাথে । সুতরাং لِ **যেরূপ تَاكُلُوْا** مَجْزُوْمٌ بِالْجَازِمِ অনুরূপ تُدْلُوْا -ও مَجْزُوْمٌ بِالْجَازِمِ হবে। পার্থক্য শুধু এই যে, এখানে جَازِمٌ উহ্য আছে আর ওখানে **প্রকাশ রয়েছে।**

اِدْلَاءٌ -এর মূল অর্থ কূপে বালতি ঝুলিয়ে দেওয়া। রূপক অর্থে কোনো কিছু কোথাও পৌঁছে দেওয়া এবং উপায় ও মাধ্যম **রূপে ব্যবহার করা ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে।** আয়াতের অর্থ হবে– সম্পদকে বিচারপতিদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য, নিজের **প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য মাধ্যম বানিও না; ঘুষ** উপহার ইত্যাদি দিয়ে বিচারকদের প্রভাবিত করবে না। এখানে هَا **যমীর দ্বারা সম্পদ [اَمْوَال] উদ্দেশ্য।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : রোজা দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি উদ্দেশ্য **ছিল। এবার অর্থসম্পদের** পবিত্রকরণ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল যে, হালাল মাল তো **কেবল** রোজা **অবস্থায় খাওয়া** নিষেধ। কিন্তু হারাম মালামালের ক্ষেত্রে সারাজীবন রোজা রাখতে হবে। অর্থাৎ হারাম মাল জীবনে কখনো খাওয়া যাবে না। এর জন্য কোনো সময়সীমা নেই। চুরি, খিয়ানত, প্রতারণা, ঘুষ, ছিনতাই, জুয়া, অবৈধ লেনদেন ও সুদ ইত্যাদি উপায়ে অর্থোপার্জন সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ।

قَوْلُهُ لَا تَاْكُلُوْا : 'খাওয়া' এখানে শাব্দিক অর্থে নয়। অর্থাৎ শুধু আহার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং যে কোনো উপায়ে [গ্রাস করা, আত্মসাৎ করা] ও নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা। ব্যবহারিক ভাষায়ও এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয়, অমুক ভদ্রলোক টাকা খেয়ে ফেলেছে, মুদ্রাগুলো হজম করে ফেলেছে ও গিলে ফেলেছে ইত্যাদি ফকীহগণ তো বাতিল পন্থায় ভক্ষণের যে তাফসীল দিয়েছেন, তাতে জুয়া, অপহরণ, ছিনতাই, কারো হক মেরে দেওয়ার সাথে আরো একটি খাতকে বাতিল তালিকাভুক্ত করেছেন; সে সম্পদও বাতিলের বিধানভুক্ত, যাতে মালিকের মনের তুষ্টি নেই কিংবা মালিকের মনের তুষ্টি থাকলেও শরিয়ত যা হারাম ঘোষণা করেছে।–[কুরতুবী]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ اَمْوَالَكُمْ : সম্বোধনের লক্ষ্য সকল ঈমানদার; বিধানটি উম্মতের প্রতিটি সদস্যের জন্য। اَمْوَالَكُمْ -এর যথার্থ অনুবাদ 'নিজের সম্পদ' দ্বারা প্রকাশ সম্ভব নয়; বরং সেজন্য বলতে হবে একে অন্যের সম্পদ, যেমন- اُقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ দ্বারা একে অন্যকে খুন করা অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থ হবে তোমাদের একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে [ও অধিকারবিহীন রূপে] খাবে না। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ بَيْنَكُمْ : ফকীহগণ সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ বিধানটি শুধু মুসলমানদের অর্থসম্পদের ক্ষেত্রেই সীমিত নয় মুসলমান হোক কিংবা কাফের বিধর্মী হোক কারো অর্থ-সম্পদই ধাপ্পাবাজী, চক্রান্ত ও জুলুমবাজির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা বৈধ নয়। শুধু 'হারবী' [শত্রু পক্ষীয়] কাফেরদের সম্পদে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও তসরুফ বৈধ রয়েছে। কেননা তার সাথে তো যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়াই রয়েছে। তবুও এ ক্ষেত্রে বিষয়টি উন্মুক্ত অনুমোদন প্রদত্ত নয়; বরং তাতেও বিশেষ বিশেষ শর্ত সংযুক্ত ও বিধিনিষেধ রয়েছে। যেমন- ঘুষ, জালিয়াতি, খেয়ানত, বিশ্বাস ভঙ্গ করা এবং হারবী কাফেরের সাথে লেনদেন ক্ষেত্রেও বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ : অর্থাৎ জালিম বিচারককে কারও অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে জানিও না। অথবা বিচারককে নিজের পক্ষে এনে অন্যের মাল গ্রাস করার জন্য নিজের মাল তাকে ঘুষ দিয়ো না। কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা শপথ করে অথবা মিথ্যা দাবি করে অন্যের অর্থ-সম্পত্তি আত্মসাৎ করো না, বিশেষ করে নিজের অন্যায় সম্পর্কে যখন জানাও থাকে। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ بِالْاِثْمِ : اِثْم শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। আদালতের কার্যক্রম ও লেনদেনের তদবিরের ক্ষেত্রে যত ধরনের অন্যায় পন্থা অবলম্বন করা হয়, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আদালতের রায় প্রসঙ্গ : পৃথিবীর যে কোনো আদালত যতই উন্নত হোক না কেন বিচারক যতই ন্যায়পরায়ণ হোক না কেন, পৃথিবীর বুকে কোনো ফয়সালা তো আর অদৃশ্য জগতের জ্ঞান আহরণের সূত্র হতে পারে না, মামলার বিবরণ ও তথ্যের ভিত্তিতেই বিচারকদের রায় দিতে হয়। সুতরাং তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, অন্যায়-অবিচার ও ভুল তথ্যের শিকার হওয়ার সম্ভবনা সর্বদাই থেকে যায়। এ আয়াতে সে বাস্তবতাই ব্যক্ত করেছে যে, ন্যায় ও বাস্তব সত্য তো আল্লাহর নিকটেও সত্য সঠিক সাব্যস্ত হবে, আর অন্যায় অসত্য আল্লাহর নিকট অন্যায়ই থেকে যাবে, যদিও বিচারকর্তাদের সিদ্ধান্ত তার বিপরীতেও হয়। বিচারকের রায় ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় বানিয়ে দিতে পারে না। কেননা সে তো বাহ্যিক [সাক্ষ্য-প্রমাণের] ভিত্তিতে ফয়সালা দিতে থাকে। হাদীসে জোরদার ভাষায় এ বিষয়টির স্পষ্ট বিবৃত হয়েছে-

اِعْلَمِ ابْنَ اٰدَمَ اَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِىْ لَا يُحِلُّ لَكَ حَرَامًا وَيُحِقُّ لَكَ بَاطِلًا اِنَّمَا يَقْضِى الْقَاضِىْ بِنَحْوِ مَا يَرٰى وَيَشْهَدُ بِهِ الشُّهُوْدُ وَالْقَاضِىْ بَشَرٌ يُخْطِئُ وَيُصِيْبُ .

অর্থাৎ "আদম সন্তান! জেনে রাখ, বিচারকের রায় তোমার জন্য হারামকে হালাল ও অন্যায়কে ন্যায় করে দেয় না। বিচারক তো তাঁর উপলব্ধি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে রায় দিয়ে থাকেন। আর বিচারক একজন মানুষই, সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, আবার ভুল সিদ্ধান্তও দিতে পারে।" -[ইবনু জারীর]

আল্লাহর মনোনীত রাসূল ﷺ -ও অজানা প্রকৃত অবস্থায় অবগতি থাকার ব্যাপারে নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং অন্যরা কি করে তাতে পরিবর্তন সাধন করবে [ইবনুল আরাবী]; বরং যারা চাপাবাজি করে, কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে নিজের প্রভাব বা তদবিরের জোরে মামলা জিতে গেলেন, তাদের আরো বেশি ভীত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এ কারণে যে, তারা প্রতিপক্ষের অধিকার নষ্ট করা ও অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি অবশেষে বিচারককে প্রতারিত করার অপরাধও করলেন।

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٩. يَسْـئَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنِ الْاَهِلَّةِ جَمْعُ
هِلَالٍ لِمَ تَبْدُوْ دَقِيْقَةً ثُمَّ تَزِيْدُ حَتّٰى
تَمْتَلِئَ نُوْرًا ثُمَّ تَعُوْدُ كَمَا بَدَتْ وَلَا
تَكُوْنُ عَلٰى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمْسِ قُلْ
لَهُمْ هِيَ مَوَاقِيْتُ جَمْعُ مِيْقَاتٍ لِلنَّاسِ
يَعْلَمُوْنَ بِهَا اَوْقَاتَ زَرْعِهِمْ وَمَتَاجِرِهِمْ
وَعِدَّةَ نِسَائِهِمْ وَصِيَامِهِمْ وَاِفْطَارِهِمْ
وَالْحَجِّ عَطْفٌ عَلَى النَّاسِ اَيْ يُعْلَمُ بِهَا
وَقْتُهُ فَلَوِ اسْتَمَرَّتْ عَلٰى حَالَةٍ لَمْ يُعْرَفْ
ذٰلِكَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ
ظُهُوْرِهَا فِي الْاِحْرَامِ بِاَنْ تَنْقُبُوْا فِيْهَا
نَقْبًا تَدْخُلُوْنَ مِنْهُ وَتَخْرُجُوْنَ وَتَتْرُكُوا
الْبَابَ وَكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ وَيَزْعُمُوْنَهٗ
بِرًّا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ اَيْ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ
بِتَرْكِ مُخَالَفَتِهٖ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ
اَبْوَابِهَا فِي الْاِحْرَامِ كَغَيْرِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ.

অনুবাদ :

১৮৯. হে মুহাম্মদ ! লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে اَهِلَّةٌ শব্দটি هِلَالٌ [নতুন চাঁদ] -এর বহুবচন। প্রশ্ন করে যে, এটা শুরুতে কেন এমন সরু হয়ে আকাশে প্রকাশ পায় অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একদিন আলোয় আলোয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে পরে আবার ক্রমান্বয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সূর্যের মতো একই রূপে কেন বিদ্যমান থাকে না?

তাদেরকে বল, এটা সময় নির্দেশক مَوَاقِيْتُ শব্দটি مِيْقَاتٌ [সময় নির্দেশক] -এর বহুবচন। মানুষের ও হজের জন্য اَلْحَجّ -এর اَلنَّاسِ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয় সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে, কৃষি, ব্যবসায়, স্ত্রীগণের ইদ্দত, সাওম ও ইফতারের সময়। আর হজের নির্ধারিত সময়ও তারা এটার দ্বারা জানে। তা যদি সর্বদা একই রূপে বিদ্যমান থাকত তবে এসব কিছুই জানা যেত না।

ইহরামের সময় পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহ-প্রবেশ করাতে অর্থাৎ ইহরামকালে দ্বার পরিত্যাগ করে গৃহের পশ্চাৎদেশে ছিদ্র করতঃ এতে যে তোমরা প্রবেশ কর তাতে কোনো পুণ্য নেই।] জাহিলি যুগে আরবদের মধ্যে এ ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এতে পুণ্য হয় বলে তারা ধারণা করত।

কিন্তু পুণ্য হলো তার অর্থাৎ পুণ্যের অধিকারী হলো সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করে। অন্যান্য সময়ের মতো ইহরামকালেও তোমরা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পার। সফলকাম হতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْاَهِلَّةِ : اَلْاَهِلَّةُ শব্দটি هِلَالٌ -এর বহুবচন। মূলত اَهْلِلَةٌ ছিল। لَام -এর কাসরাটি পূর্বের সুকূনযুক্ত هَا -কে দেওয়া হয়েছে। তারপর لَام -কে لَام -এর মাঝে ইদগাম করা হয়েছে। তৃতীয় রাত পর্যন্ত উদীয়মান চাঁদকে হেলাল বলা হয়। তারপর قَمَر এবং পূর্ণ চাঁদকে بَدْر বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, প্রথম এবং শেষ দু রাতের চাঁদকে হেলাল বলা হয়। هِلَال -এর মূল অর্থ رَفْعُ الصَّوْتِ বা স্বর উঁচু করা, হৈ চৈ করা। নতুন চাঁদ দেখে মানুষ হৈ চৈ করে বিধায় একে এ নামকরণ করা হয়েছে।

تَبْدُوْ : [প্রকাশিত হয়] بُدُوًّا (ن) بَدَا অর্থ- প্রকাশিত হওয়া। دَقِيْقَةً : সরু বা চিকন হয়ে। تَمْتَلِئُ : [পরিপূর্ণ হয়ে উঠে] اِمْتَلَاءً مَتْلًا অর্থ- পরিপূর্ণ হওয়া। تَعُوْدُ : ফিরে যায়। كَمَا بَدَتْ : যেমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। مَوَاقِيْتُ : এটি مِيْقَاتٌ -এর ব-ব অর্থ- সময়, নির্দিষ্ট ও প্রতিশ্রুত সময়। কেউ বলেন, مُنْتَهَى الْوَقْتِ বা সময়ের প্রান্তসীমা। মূলত

http://islamiboi.wordpress.com

مِوْقَاتٌ ছিল। কাসরার পরে হওয়ার কারণে وَاو-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। مَتَاجِرُ : এটা مَتْجَرٌ -এর বহুবচন। এটি মাসদার, যরফে যমান নয়। অর্থ– ব্যবসায়। عِدَدٌ : এটি عِدَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মহিলাদের ইদ্দত। لَوِ اسْتَمَرَّتْ : যদি অব্যাহত থাকত। تَنْقُبُوْا : نَقْبًا (ن) نَقَبَ অর্থ– ছিদ্র করা। نَقْبًا : نَقْبٌ ব-ব اَنْقَابٌ অর্থ– ছিদ্র, গিরিপথ।

عَطْفٌ عَلَى النَّاسِ : মুফাস্সির (র.) এ ইবারত দ্বারা সেসব লোকদের সন্দেহ দূর করেছেন, যারা বলেন, وَالْحَجِّ -এর عَطْف হয়েছে مَوَاقِيْتُ -এর উপর। কেননা مَوَاقِيْت শব্দটি اَهِلَّه -এর যমীর هِيَ -এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। বাক্যটি এমন হবে– اَيِ الْاَهِلَّةُ هِيَ الْمَوَاقِيْتُ যদি اَلْحَجِّ -এর আতফ مواقيت শব্দটির উপর করা হয়, তখন هِيَ যমীরের উপর তার প্রয়োগ ঘটবে। বাক্যটি তখন এমন হবে– اَلْاَهِلَّةُ هِيَ الْحَجِّ অথচ এ অর্থ ঠিক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ :

প্রশ্ন: নতুন চাঁদ বা 'হিলাল' তো একই সময় একটিই হয়ে থাকে, অথচ প্রশ্ন হয়েছে 'চাঁদগুলো' [বহুবচন] শব্দ দ্বারা। এর কারণ কি?

উত্তর:

১. চাঁদগুলো সংক্রান্ত প্রশ্নের অর্থই হবে চাঁদের মাসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। আর প্রত্যেক মাসে চাঁদ ভিন্ন হয়ে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী]

২. প্রতি রাতের চাঁদ পূর্বের তুলনায় ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অতএব যেন তা পূর্বের রাতের ভিন্ন একটি চাঁদ। এভাবে তাতে তারতম্য হয় বিধায় বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। –[জামালাইন]

প্রশ্ন: চাঁদের মতো সূর্যও তো কমে বাড়ে। শুধু চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন হলো কেন?

উত্তর: চাঁদের প্রতি দিনের [বরং প্রতি রাতের] পরিবর্তন চাক্ষুষ বিষয়। এ কারণে এ বিষয়ে সহজেই প্রশ্ন দেখা দেয়। সূর্যের পরিবর্তন তো আর সাধারণ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ : মানুষের জন্য সময় অর্থাৎ তাদের পার্থিব লেনদেনের জন্যেও এবং শরিয়তের বিধিবিধান সংক্রান্ত হিসাবপত্রের জন্যও। চাঁদের মাসে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির সাহায্যে দিন, তারিখ ও মাসের হিসাবের বিষয়টি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

قَوْلُهُ وَالْحَجِّ : [এবং হজের সময়] চাঁদের মাসের হিসাব মানব সমাজের সাধারণ লেনদেন ও কায়-কারবারে তো লেগেই থাকে। এ ছাড়াও হজ ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির জন্যও চাঁদের হিসাবই মাপকাঠি ও সময় নিয়ন্ত্রক। বিশেষভাবে হজের নাম উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আরব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজ ও নগর জীবনের গুরুত্ব ছিল দর্শনীয়। কিংবা অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে হজের মধ্যে সময় চিনার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। কেননা হজ তার নির্ধারিত সময় ছাড়া আদায় বা কাজা কোনোটাই করা যায় না। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদত সে সময়েই আদায় করা জরুরি নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন: يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ -এর মধ্যে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। অথচ জবাবে তার হেকমত ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত জবাব দেওয়া হলো না কেন?

উত্তর: প্রশ্নের জবাবে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীর জন্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বা রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার তুলনায় স্বয়ং চাঁদের হেকমত ও উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হওয়া উচিত। কেননা বাহ্যিক হুকুম ও হেকমত বর্ণনাই রাসূলের শান। পক্ষান্তরে পরিবর্তনের রহস্য হলো গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। বান্দাদের এ ব্যাপারে জানার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাদেরকে তা জানানোরও প্রয়োজন নেই। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২২৮]

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে আরো বিস্তারিতভাবে এ জবাবটি দেওয়া হয়েছে। তা হলো, উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আহিল্লা' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের

http://islamiboi.wordpress.com

আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মতো হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দু প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে কেবল চাঁদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্ন এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোনো বিষয়ই এ জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে প্রকৃত জিজ্ঞাস্য ও জবাব হলো, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত রয়েছে? সে জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওহীর মাধমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত, তা এই যে, এতে তোমাদের কাজকর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)]

فَائِدَةٌ : اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَبَيْنَ الْمُدَّةِ وَالزَّمَانِ : أَنَّ الْمُدَّةَ الْمُطْلَقَةَ مُمْتَدُّ حَرَكَةِ الْفَلَكِ مِنْ مَبْدَئِهَا إِلَى مُنْتَهَاهَا، وَلِلزَّمَانِ مُدَّةٌ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى الْمَاضِيْ وَالْحَالِ وَالْمُسْتَقْبِلِ وَالْوَقْتُ الزَّمَانُ الْمَفْرُوضُ لِأَمْرٍ . (جَمَل - ٢٢٨)

চান্দ্র মাসের হিসাব রাখা ফরজে কিফায়া : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এখান থেকে এ তত্ত্বটি সুন্দরভাবে আহরণ করেছেন যে, যেহেতু শরিয়তের আমলগুলোর মাপকাঠি চাঁদের হিসাবে হওয়া স্থির হলো, তাই এ চাঁদের মাস, তারিখের হিসাব নিয়ন্ত্রণ ও তাতে গুরুত্ব প্রদানও ফরজে কিফায়া সাব্যস্ত হলো। ইংরেজি [খ্রিস্টাব্দ] মাস অনুসারে কায়কারবার করা যাদের অপরিহার্য, তাদের জন্য তো কিছুটা অপারগতা স্বীকৃত। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতিরেকে ইসলামি হিজরি ও চান্দ্র বর্ষের হিসাব বর্জন করে খ্রিস্টীয় ও ইংরেজি সৌরবর্ষের হিসাব গ্রহণ করা অতি আক্ষেপের বিষয়।

বাড়ন্ত চাঁদকে শুভ আর হ্রাসমুখী চাঁদকে অশুভ ধারণা করা ঠিক নয় : পবিত্র কুরআনের এক একটি আয়াতাংশ তাওহীদ ও একত্ববাদের ঘোষণা এবং শিরক ও অংশীবাদের খণ্ডনে সোচ্চার। পৃথিবীতে চন্দ্র পূজারী পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক। এদের অনেকে আবার 'নবশশী' -কে দেবতা মান্য করে পূজা করে। বাড়ন্ত [শুক্লপক্ষের] চাঁদকে শুভ ও হ্রাসমুখী [কৃষ্ণপক্ষের] চাঁদকে অশুভ মনে করার রীতি বিধর্মী তো বটেই অনেক মুসলিম পরিবারেও বিদ্যমান। ভারতীয় উপমহাদেশে মুদ্রিত যে কোনো পঞ্জিকা তুলে দেখুন তার অসংখ্য ঘর ভর্তি রয়েছে এ বিষয়ের লেখায় যে, অমুক তারিখ-দিনটি অমুক কাজের জন্য শুভ আর অমুক তারিখ অশুভ! পবিত্র কুরআনে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে এ কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ 'মানুষের জন্য কাজে লাগার বিষয়।' আল্লাহর এ আয়াত শশী পূজা ও তার সূত্র ধরে গজিয়ে উঠা সব অর্থহীন কাজের মূল কেটে দিয়েছে। নির্বোধ মানুষ, তুই চাঁদকে পূজা করছিস কি? চাঁদ তো তোরই সেবার জন্য।

শরিয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর হিসাবের গুরুত্ব : এ আয়াতে এতটুকু বুঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেনদেন, আদান-প্রদান ও হজ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, বিভিন্ন পর্বে ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা হলো, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে- فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

অর্থাৎ অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন বিলুপ্ত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের [illegible] অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।

http://islamiboi.wordpress.com

এ তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ ও মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়, কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কুরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরিয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমজানের রোজা, হজের মাস ও দিনসমূহ, আশুরা, ঈদ, শবেবরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধিনিষেধ সম্পৃক্ত সেগুলো সবই 'রুইয়াতে হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা এ আয়াতে هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ 'এটি মানুষের হজ ও সময় নির্ধারণের উপায়' বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও এ হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবু আল্লাহর নিকট চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামি শরিয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ হলো, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য এলাকার উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর । কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এ হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবাদত-বন্দেগির ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামি ইবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা শে'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসাবকে এই শর্তে নাজায়েজ বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চান্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ, এরূপ করতে রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا : জাহিলি যুগের আরবরা হজের ইহরামে থাকা অবস্থায় বাড়িঘরে আসতে হলে তখনো সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ **করাকে অশুভ ও কুলক্ষণ মনে করত। এজন্য তারা পেছনের দেয়ালে একটি দরজা** খুলে নিত এবং সেখান দিয়ে বাড়িঘরে **ঢুকত। কিংবা পিছন দিককার ছাদে চড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ত বা** দেয়াল টপকাত। এসব হতচ্ছাড়া কাণ্ড তাদের **দৃষ্টিতে ইবাদত ও কা'বা ঘরের প্রতি** শ্রদ্ধারূপে বিবেচিত হতো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নও মুসলিম **সাহাবীও এ ভুল ধারণার** শিকার হয়ে গেলেন। তাদের এ ভুল ধারণার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যেই এ আয়াত নাজিল হলো। **ফলে জাহিলি কুসংস্কারের** সংশোধন হয়ে গেল। এ আয়াতটি নবী করীম ﷺ -এর কতিপয় সাহাবী **সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা ইহরামে** নিজেদের বাড়িঘরে প্রবেশ করতেন পিছন দিক দিয়ে কিংবা ছাদে উঠে যেমনটা তাদের **নিয়ম ছিল জাহিলি যুগে**। –[তাফসীরে মাজেদী]।

فِى الْمِصْبَاحِ : نَقَبْتُ الْحَائِطَ «ن» نَقْبًا-خَرَقْتُهُ : بِاَنْ تَنْقُبُوْا فِيْهَا نَقْبًا ـ

قَوْلُهُ ذَا الْبِرِّ : প্রশ্ন: فِى الْإِحْرَامِ-এর বৃদ্ধির কারণ কি?

উত্তর: এর দ্বারা মূলত একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا এবং لِلنَّاسِ-এর মধ্যে বাহ্যত তো কানো যোগসূত্র নেই।

উত্তর: যোগসূত্র অবশ্যই আছে। আর তা হচ্ছে مَوَاقِيْتُ হলো হজের বিশেষ সময়। আর ইহরাম অবস্থায় ঘরের পশ্চাৎ দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা তাদের নিকট হজের আমলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই যোগসূত্র সুস্পষ্ট।

বিদ'আতের মূল ভিত্তি : এ আয়াত দ্বারা এ কথা ও জানা গেল যে, শরিয়তে যে কাজকে জরুরি আখ্যা দেয়নি বা ইবাদতরূপে গণ্য করেনি– উক্ত কাজ নিজ পক্ষ থেকে জরুরি বা ইবাদত মনের করা জায়েজ নয়। একইভাবে যে বস্তু শরিয়তে জায়েজ তাকে গুনাহ মনে করাও গুনাহ। বিদ'আত নাজায়েজ হওয়ার মূল কারণ হলো, যা জরুরি নয়, তাকে ফরজ বা ওয়াজিব মনে করা হয় বা কোনো কাজকে হারাম বা নাজায়েজ বলা হয়। এ আয়াতে শুধু ভিত্তিহীন দুটি রসমই খণ্ডন করা হয়নি; বরং সমস্ত অমূলক ধারণার উপর এ কথা বলে আঘাত করা হয়েছে যে, মূলত নেকী হলো আল্লাহকে ভয় করা এবং তার বিধানের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা। এ ধরনের অর্থহীন কোনো প্রথার সাথে বাস্তব নেকীর কোনো সম্বন্ধ নেই, যা প্রাচীনকাল থেকে পূর্বপুরুষদের অনুকরণে করে আসা হচ্ছে এবং মানুষের সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগা হওয়ার সাথেও কোনো সম্বন্ধ নেই। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٩٠. وَلَمَّا صُدَّ ﷺ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَصَالَحَ الْكُفَّارَ عَلٰى اَنْ يَعُوْدَ الْعَامَ الْقَابِلَ وَيَخْلُوْا لَهٗ مَكَّةَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَخَافُوْا اَنْ لَا تَفِيَ قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوْهُمْ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُوْنَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْاِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ نَزَلَ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ لِاِعْلَاءِ دِيْنِهٖ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَا تَعْتَدُوْا عَلَيْهِمْ بِالْاِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّ لَهُمْ.

১৯০. হুদায়বিয়ার বৎসর [৬ষ্ঠ হিজরি সনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [কা'বা জিয়ারত করতে] মক্কা প্রবেশে কুরাইশগণ কর্তৃক যখন বাধা প্রদান করা হয়েছিল তখন কাফিরদের সাথে তাঁর এই মর্মে সন্ধি হয় যে, তিনি আগামীবার এসে [ওমরা] সমাপন করবেন। আর কাফেরগণ তখন তিনদিনে জন্য মক্কা নগরী খালি করে দেবে। তদনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীগণসহ] 'কাজা ওমরা' পালন করার প্রস্তুতি নিলেন। তাঁদের তখন এই আশঙ্কা হলো যে, কুরাইশরা হয়তো সান্ধি পলন করবে না; বরং পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হবে। হেরেম শরীফে ইহরামে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ মাসে তাদের সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মুসলিমগণ পছন্দ করছিলেন না। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু প্রথম আক্রমণ শুরু করে তাদের উপর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে অর্থাৎ তাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তা অতিক্রমকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

١٩١. وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ بَرَاءَةٍ اَوْ بِقَوْلِهٖ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ اَيْ مِنْ مَكَّةَ وَقَدْ فُعِلَ بِهِمْ ذٰلِكَ عَامَ الْفَتْحِ وَالْفِتْنَةُ الشِّرْكُ مِنْهُمْ اَشَدُّ اَعْظَمُ مِنَ الْقَتْلِ لَهُمْ فِي الْحَرَمِ اَوِ الْاِحْرَامِ الَّتِيْ اِسْتَعْظَمْتُمُوْهُ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَيْ فِي الْحَرَمِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فِيْهِ فَاقْتُلُوْهُمْ فِيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا اَلِفٍ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ كَذٰلِكَ الْقَتْلُ وَالْاِخْرَاجُ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ.

১৯১. [প্রথম আক্রমণ না করার] এ হুকুমটি সূরা বারাআতের আয়াত এবং তা পরবর্তী এই বাক্য وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ [তাদের যেখানে পাও, হত্যা কর] দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।
যেখানে তাদের ধরতে পারবে অর্থাৎ তাদেরকে পাবে হত্যা কর। যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে অর্থাৎ মক্কা নগরী তোমরাও সেই স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কৃত কর। মক্কা বিজয়ের বৎসর তাদের সাথে এই [হত্যা ও বহিষ্কার করার] আচরণ করা হয়েছিল। হেরেম শরীফে ইহরামরত অবস্থায় হত্যা করা যাকে তোমরা গুরুতর পাপ বলে ধারণা করছ, তা হতে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ এদের এই শিরক বা অংশীবাদে বিশ্বাস নিকৃষ্টতর। অধিক গুরুতর। মাসজিদুল হারামের অর্থাৎ হেমের শরীফের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি সেখানে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে সেখানে হত্যা কর। اِنْ قَاتَلُوْا ـ حَتّٰى ـ يُقَاتِلُوْا ـ لَا تُقَاتِلُوْا এ তিনটি ক্রিয়া অপর এক কেরাতে اَلِف ব্যতীত [অর্থাৎ قَتَلُوْ ـ يَقْتُلُوْ ـ تَقْتُلُوْ] রূপে পঠিত রয়েছে। এটাই হত্যা ও বহিষ্কার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।

http://islamiboi.wordpress.com

١٩٢. فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ وَأَسْلَمُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ لَهُمْ رَحِيمٌ بِهِمْ.

১৯২. যদি তারা কুফর ও সত্যপ্রত্যাখ্যান হতে বিরত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

١٩٣. وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ تُوْجَدَ فِتْنَةٌ شِرْكٌ وَيَكُونَ الدِّيْنُ الْعِبَادَةُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا يُعْبَدُ سِوَاهُ فَإِنِ انْتَهَوْا عَنِ الشِّرْكِ فَلَا تَعْتَدُوْا عَلَيْهِمْ دَلَّ عَلٰى هٰذَا فَلَا عُدْوَانَ إِعْتِدَاءَ بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ وَمَنِ انْتَهٰى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ.

১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যাবৎ এ ফিতনা অর্থাৎ শিরক নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায় এর অস্তিত্ব আর না পাওয়া যায় এবং এক আল্লাহর জন্য-ই যেন হয় সকল দীন অর্থাৎ সকল ইবাদত-উপাসনা। তিনি ব্যতীত আর কারো যেন কোথাও উপাসনা না হয়। যদি তারা শিরক হতে বিরত হয় তবে আর তোমরা তাদের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ো না। পরবর্তী বাক্য فَلَا عُدْوَانَ উক্ত কথার প্রতি ইঙ্গিতবহ। অনন্তর সীমালঙ্ঘনকারী ব্যতীত আর কারো উপর বাড়াবাড়ি নেই অর্থাৎ হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে আর কারো প্রতি কঠোর আচরণ ও বাড়াবাড়ি চলতে পারে না। যে ব্যক্তি শিরক হতে বিরত রইল সে জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী বলে গণ্য নয়। সুতরাং তার উপর কোনোরূপ আক্রমণ ও পীড়ন চলতে পারে না।

তাহকীক ও তারকীব

لَمَّا صُدَّ : [যখন বাধা প্রদান করা হলো] صُدَّ মাযী মাজহুলের সীগাহ। صَدَّ (ن) صَدًّا অর্থ– বাধা দেওয়া, বারণ করা। عَامٌ : বছর। يُخْلُوا : খালি করে দেবে। تجهز : প্রস্তুতি নিলেন। لَا تَفِي : পূরণ করবে না। وَفٰى (ض) وَفَاءً অর্থ– পূর্ণ করা। إِعْلَاءٌ : উঁচু করা, সমুচ্চ করা। لَا تَعْتَدُوْا : [সীমালঙ্ঘন করো না] إِعْتَدٰى يَعْتَدِيْ إِعْتِدَاءً অর্থ– লঙ্ঘন করা।

اِعْتَدَى الْحَقَّ/ عَنِ الْحَقِّ - সত্যের সীমালঙ্ঘন করল। عَلٰى অব্যয়যোগে–জুলুম করা। مَا حُدَّ لَهُمْ : তাদের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল।

ثَقِفْتُمُوْهُمْ : ثَقِفَ الشَّيْءَ إِذَا ظَفَرَ بِهِ وَجَدَهُ عَلٰى جِهَةِ الْاَخْذِ وَالْغَلَبَةِ وَرَجُلٌ ثَقِفٌ سَرِيْعُ الْاَخْذِ لِأَقْرَانِهِ (س) ثَقْفًا অর্থ– ধরা, পাকড়াও করা। إِسْتَعْظَمُوْهُ : গুরুতর পাপ বলে ধারণা করেছে, মারাত্মক মনে করেছে।

فَإِنِ انْتَهَوْا : যদি তারা বিরত থাকে। إِنْتَهٰى شَيْءٌ কোনো কিছু শেষ হলো। إِنْتَهٰى عَنْ شَيْءٍ - কোনো কিছু থেকে বিরত হলো। إِنْتَهٰى مِنْ شَيْءٍ কোনো কিছু থেকে অবসর হলো। إِنْتَهٰى إِلَيْهِ الْخَبَرُ তার কাছে খবরটি পৌঁছল।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا أَلِفٍ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ : উক্ত ফে'ল তিনটি হলো–

১. لَا تَقْتُلُوْهُمْ - তাদেরকে হত্যা করো না।
২. يَقْتُلُوْكُمْ - তারা তোমাদের হত্যা করে।
৩. اُقْتُلُوْهُمْ - তোমরা তাদেরকে হত্যা কর।

تَكُوْنَ : تُوْجَدَ -এর ব্যাখ্যায় تُوْجَدَ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে كَانَ শব্দটি تَامَّةٌ নাকেসা নয়।

قَوْلُهُ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ : কুফরিকে ফিতনা নাম দেওয়ার কারণ হচ্ছে তা ধ্বংসে উপনীত করে, যেভাবে ফিতনাও ধ্বংসে উপনীত করে। –[জাসসাস]

عُدْوَانٌ : এর শাব্দিক অর্থ– বাড়াবাড়ি এখানে অর্থ– শাস্তি ও শাস্তিরূপে হত্যা। –[ইবনে কাছীর, রুহুল মা'আনী]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : ষষ্ঠ হিজরি সনের জিলকদ মাসে রাসূলে কারীম ﷺ ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন। তখন মক্কা ছিল মুশরিকদের দখলে তারা হুদাইবিয়া নামক স্থানে নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিল। অবশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর এ সন্ধি হলো যে, আগামী বছর তারা এসে ওমরা করবে। সুতরাং সপ্তম হিজরি সনের জিলকদ মাসে ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যাত্রা করলেন। সাহাবীদের আশঙ্কা হলো যে, মক্কার মুশরিকরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আক্রমণ না করে বসে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে নীরবতাও কল্যাণকর হবে না। আর যদি তাদের মোকাবিলা করা হয়, তাহলে সম্মানিত মাসে অর্থাৎ যে মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষেধ সে মাসেও যুদ্ধ করা অপরিহার্য হবে। আর নিষিদ্ধ চার মাস তথা জিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব মাসের একটি হলো জিলকদ। এ কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন যে, এ সন্ধিচুক্তিকারীদের সাথে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাবে না। তবে তারা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তখন তোমরা কোনোরূপ সঙ্কোচ না করে নির্দ্বিধায় তাদের মোকাবিলা করবে।

এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেবল ঐসব কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো, নারী, শিশু, ধর্মযাজক অর্থাৎ যারা দুনিয়াবিমুখ হয়ে ধর্মের ব্যাপারে নিয়োজিত যেমন- পাদ্রি, এভাবে বিকলাঙ্গ, মাজুর অথবা যেসব লোক কাফেরদের নিকট শ্রমিকরূপে কর্মরত, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। অর্থাৎ আয়াতে ঐসব মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তবে উল্লিখিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো প্রকার কাফেরদের সহায়তা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা জায়েজ। কেননা তারা اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত। -[মাযহারী, জাসসাস, মা'আরিফ]

ইসলাম শুধু ঐ সকল মানুষের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না বা সাধারণ জনগণ, তাদের সাথে যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই। বর্তমানে সাধারণ জনগণের মাথার উপর বোমাঘাত করা, নিরাপদ শহরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং তাদের উপর বিষাক্ত গ্যাস ছোড়া, অগ্নিবোমা [নেপাম বোমা] নিক্ষেপ করার আইন মানবতা ও ইসলামের যুদ্ধনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। শত শত নয় বরং হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ফেলে দেওয়ার পর কেবল সরি [sorry] বলা বর্তমান সভ্য বিশ্বের জন্য শোভা পায়, ইসলামের জন্য তা আদৌ শোভা পায় না। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَاتِلُوْا : যুদ্ধ করার এ হুকুম দেওয়া হচ্ছে কাদের? সে নিপীড়িত অসহায় মুসলমানদের, যারা দু-চার দশদিন বা দু-চার মাস নয়- দীর্ঘ তেরটি বছর যাবৎ দিনের পর দিন শিকার হয়েছেন মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের পর নির্যাতনের; বরং বলুন! যারা হায়েনার নখরাঘাত ও নরপশুদের বর্বরতা সইবার কঠিন পরীক্ষায় হয়েছিলেন সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ, আর এখন স্বদেশ ছেড়ে পরদেশে গিয়েও, জন্মভূমি ও বাড়িঘরের মায়া ত্যাগ করেও যারা মদিনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না।

قَوْلُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : তা হতে হবে আল্লাহরই পথে। শিরক দূরীভূত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সত্য ধর্মের ঝাণ্ডা উড্ডীন করা ও ন্যায় ধর্মের সহায়তার লক্ষ্যে। আত্মগরজে নয়- 'আত্মা'র স্বার্থে, অহং-এর নৈবেদ্যে নয়- অহং মিটাবার উদ্দেশ্যে। গোত্র-গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, প্রভাব-বলয় সম্প্রসারণে নয়, 'পণ্য বাজার' রক্ষার নামে, সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে, উপনিবেশ রক্ষার স্বার্থে কিংবা রফতানি বাজার তৈরির স্বার্থে- মোটকথা নতুন পুরাতন যত গোষ্ঠী ও বলয় স্বার্থ রয়েছে এ ধরনের জাহিলি পতাকার অধীনে জিহাদ নয়। পরিচ্ছন্ন ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ হতে হবে। আর আল্লাহর পথে হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর দীনের মর্যাদা বিকাশে জিহাদ হবে আল্লাহর কালেমার অগ্রগতি বিধান ও দীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে [اَلْجِهَادُ لِاِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ وَاِعْزَازِ الدِّيْنِ- مَدَارِك] অর্থাৎ তোমরা জিহাদ করবে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও তাঁর দীনের মর্যাদা বিধানে [اَىْ جَاهِدُوْا لِاِعْلَاءِ كَلِمَتِهٖ وَاِعْزَازِ دِيْنِهٖ - بَيْضَاوِى] অর্থাৎ দীনের স্বার্থে ও কালেমা প্রসারে অর্থাৎ তার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অন্বেষায়। -[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ যখন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়..... এর ভাষ্য কি বিবৃতি দিচ্ছে? দুটি বিষয় সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ক. যুদ্ধের সূচনা মুসলমানগণ নয়- অন্যপক্ষই করছিল। ((اَيِ الَّذِيْنَ يَبْدَءُوْنَكُمْ بِالْقِتَالِ - اِبْنُ عَبَّاس (رض)) অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করে। (اَيْ يُنَاجِزُوْنَكُمُ الْقِتَالَ دُوْنَ الْمُحَاجِزِيْنَ - مَدَارِك) অর্থাৎ যারা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রয়েছে, যারা সন্ধিকামী বা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে রয়েছে তারা নয়। [يُحِلُّ لَكُمُ الْقِتَالُ اِنْ قَاتَلَكُمُ الْكُفَّارُ - قُرْطُبِى] অর্থাৎ যুদ্ধ করা তোমাদর জন্য হলাল ও বৈধ হবে- যদি কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়-

খ. যুদ্ধের বিধান শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা বাস্তবিক যুদ্ধরত, কিংবা আধুনিক সামরিক পরিভাষায় বললে যারা সারিবদ্ধ ও সেনা সামাবেশকারী [combatants] তাদের মোকাবিলায়; সামরিক অবস্থানের নয় [Non - combatants] অসামরিক অবস্থানকে বোমা বর্ষণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা, শান্তিপ্রিয় নগরবাসীদের উপর বিমান হামলা চালানো এবং তাদের উপর বিষাক্ত গ্যাস ও বিস্ফোরক বর্ষণের 'অতি সভ্যতাসমৃদ্ধ' সামরিক বিধির সঙ্গে ইসলামের জিহাদ নীতির আদৌ কোনো পরিচয় নেই। বয়োবৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ-ব্যাধিগ্রস্ত, নিঃসঙ্গ জীবনযাপনকারী সাধু-সন্ন্যাসী- মোটকথা যুদ্ধে অপারগ বা যুদ্ধ সম্পর্ক রহিত সব শ্রেণির মানুষকে রাসূল ﷺ -এর প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুদ্ধ বহির্ভূত ঘোষণা করেই দিয়েছিলেন। সেই সাথে উক্ত আয়াতও সে ব্যতিক্রমের ইঙ্গিত প্রদান করছে–

لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَلَا الصِّبْيَانَ وَلَا الشَّيْخَ الْكَبِيْرَ وَلَا مَنْ اَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَكَفَّ يَدَاهُ (اِبْنُ عَبَّاس (رض)

অর্থাৎ নারীদের হত্যা করো না, শিশুদেরও নয়, বায়োবৃদ্ধদেরও নয় এবং যারা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতা প্রয়াসী হয়ে অস্ত্র থেকে হাত তুলে নিয়েছে, তাদেরও নয়।

অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী হয় না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না [তাদের হত্যা কর না]। [অর্থাৎ নারী, শিশু ও রাহিব-পাদ্রী-সন্ন্যাসী।]

হযরত ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কোনো যুদ্ধে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী ও শিশু হত্যার প্রতি তাঁর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত বুরায়দা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ যখন কোনো বাহিনী অভিযানে পাঠাতেন, তখন বলতেন– بِسْمِ اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْتُلُوْا اِمْرَأَةً وَلَا وَلِيْدًا وَلَا شَيْخًا كَبِيْرًا অর্থাৎ লড়াই কর আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পথে এবং কোনো নারীকে, কোনো শিশুকে, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মূল ফরমানে তো ফলদার গাছ কাটারও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তিনি এ হুকুম দিয়েছিলেন ইসলামি খেলাফতের সেনাবাহিনীর প্রথম সিপাহসালার [কমাণ্ডার ইন চীফ] ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুলায়মান (রা.)-কে। তিনি তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে। তার ফরমানের শব্দমালা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে–

وَاِنِّىْ اُوْصِيْكَ بِعَشْرٍ لَا تَقْتُلْ اِمْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيْرًا وَلَا هَرِمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا لَا تَضْرِبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيْرًا اِلَّا لِمَاكِلَةٍ وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّهُ.

অর্থাৎ আমি তোমাদের দশটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি- অবশ্যই কোনো নারীকে হত্যা করবে না, কোনো শিশুকে নয়, কোনো বয়োবৃদ্ধকে নয়, অবশ্যই কোনো ফলদার গাছ কাটবে না; অবশ্যই বসতি ধ্বংস করবে না, অবশ্যই কোনো ছাগল মেরে ফেলবে না, কোনো উটও নয় তবে [বাহিনীর] খাদ্য প্রয়োজনে এবং অবশ্যই কোনো খেজুর বাগান জ্বলিয়ে দেবে না, তছনছ করবে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَلَا تَعْتَدُوْا : অভিধানে [لَا تَعْتَدُوْا -এর ক্রিয়ামূল] -এর অর্থ ন্যায় ও অধিকারে সীমা অতিক্রম করা [مُجَاوَزَةُ الْحَقِّ]। এ অতিক্রমণের বিভিন্নরূপ হতে পারে। যথা–

ক. সীমা [حَدّ] দ্বারা শরিয়তের নির্ণীত সীমা উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ প্রতিশোধ স্পৃহা বা বিজয় উল্লাসে নির্বিচারে শত্রুপক্ষের যোদ্ধা-অযোদ্ধা নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করতে লেগে যাওয়া, তাদের ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, [বনভূমি] তৃণভূমিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, তাদের অবলা পশুগুলো ধ্বংস করা ইত্যাদি। কুরআন পৃথিবীকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে, শক্তির ব্যবহার শুধু ততটুকু বৈধ, যতটুকু না হলেই নয়।

খ. সীমা দ্বারা চুক্তির সীমাও উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন, চুক্তি ভঙ্গকারী ও অঙ্গীকার পদদলনে অভ্যস্ত সম্প্রদায়ের দেখাদেখি চুক্তির তোয়াক্কা না করে নিজেরাই প্রথমে আক্রমণ করে বসা। এ ধরনের আরো বিভিন্নরূপে সীমালঙ্ঘন হতে পারে। বস্তুত اِعْتِدَاء শব্দ বাড়াবাড়ির সবগুলো দিককেই অন্তর্ভুক্ত করে এবং যে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আক্রমণের সূচনা করে সীমালঙ্ঘন করো না কিংবা চুক্তিবদ্ধদের উপর আক্রমণ করে বা হুমকি প্রদান ও সতর্কীকরণ ব্যতিরেকে অতর্কিত আক্রমণ কিংবা অঙ্গ বিকৃত [হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি কর্তন] কিংবা যাদের হত্যা নিষিদ্ধ,তাদের হত্যা করে সীমা লঙ্ঘন। অর্থাৎ সম্ভাব্য কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করো না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিঃসন্দেহে মানুষের রক্তপাত ঘটানো অতি জঘন্য কাজ। কিন্তু যখন কোনো দল বা পার্টি নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা-ধারণাকে অন্যদের উপর চাপাতে চায় এবং মানুষকে সত্য গ্রহণ থেকে জোরপূর্বক বাধা দেয়, কোনো সমস্যার সমাধান বৈধ ও যুক্তিযুক্ত উপায়ে করার স্থলে পাশবিক শক্তি কাজে লাগায়, তখন তারা হত্যার তুলনায় আরও জঘন্য অন্যায়ের লিপ্ত হয়। এ ধরনের লোকদেরকে হত্যা করে তাদের এহেন কর্মকাণ্ড হতে দেশবাসীকে রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

মক্কী জীবনে কাফের গোষ্ঠী কর্তৃক সীমাহীন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও মুসলমানদের নির্দেশ ছিল তারা যেন ক্ষমা দ্বারা কাজ নেয়। মক্কী জীবনে এমন কোনো দিন আসেনি যে, সূর্য উদয়ের সাথে সাথে মুসলমানদের বিপক্ষে নতুন কোনো মসিবত না এসেছে। কিন্তু মুসলমানদের কঠোরভাবে বলা ছিল তারা যেন সদা ক্ষমার গুণ প্রদর্শন করে। আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা যে বিষয়টি প্রতিভাত হচ্ছে তা হলো, কাফেররা যেখানেই থাকুক তাদেরকে হত্যা করা বৈধ, মূলত এর উদ্দেশ্য এমন নয়; বরং প্রথম বিধান যুদ্ধের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ত এ আয়াত তার ব্যাপকতার উপর বহাল নয়। কারণ সামনেই এ থেকে বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে খাস করা হয়েছে।

وَاقْتُلُوْهُمْ -এর শব্দরূপ বহুবচন হওয়ার সূত্রে হানাফী ফকীহগণও এ তত্ত্ব আহরণ করেছেন যে, জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার অপরিহার্যতা [ফরজ] ব্যক্তিগত নয়; বরং সামগ্রিক ও সমষ্টিগত। অর্থাৎ ইমাম বা নেতার নেতৃত্বে। বাহিনী বিদ্যমান থাকার অপরিহার্যতা যেন ভাষ্যের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি (عِبَارَةُ النَّصِّ)। আর ইমাম অর্থাৎ মুসলিম জননেতার [রাষ্ট্রীয়] উপস্থিতি ভাষ্যের অন্তর্নিহিত দাবি (اِقْتِضَاءُ النَّصِّ)। কেননা ইমাম বা পরিচালক ব্যতীত বাহিনী সংগঠন ও তার শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ : অর্থাৎ হেরেম শরীফে হত্যা ও হানাহানির চেয়েও জঘন্যতম কাজে হচ্ছে তাওহীদ ও ঈমানের এ কেন্দ্রভূমিতে শিরক করা এবং শিরকের প্রচার-প্রসার ঘটানো। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, মসজিদুল হারামে গমনে তোমাদেরকে তাদের বাধাদান হারামে তোমরা তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে গুরুতর অপরাধ।

–[মাদারেক ও কাশশাফ]

قَوْلُهُ وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ : মসজিদে হারামে তাদেরকে হত্যা করো না, যতক্ষণ তারা তোমাদেরকে হত্যা না করে।

মাসআলা : হেরেম শরীফে মানুষ তো দূরের কথা কোনো শিকারি প্রাণীকে বধ করাও জায়েজ নয়। তবে এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হলো যে, হেরেমের অভ্যন্তরে কেউ যদি অন্য কাউকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তাহলে মোকাবিলা স্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ। –[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ بَرَاءَةٍ : সূরা বারাআতের সে আয়াতটি হলো– فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ الخ

قَوْلُهُ فِى الْحَرَمِ : عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -এর ব্যাখ্যা فِى الْحَرَمِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে অংশ বলে মূলত পূর্ণ জিনিসটিই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মসজিদে হারাম দ্বারা সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য। কারণ শুধু মসজিদে হারামেই যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়; বরং গোটা হেরেমেই নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ عَنِ الْكُفْرِ وَاَسْلَمُوْا : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত দিলেন যে, শুধু ঐ যুদ্ধ থেকে বিরতি নয় যার সূচনা তারা করেছিল; বরং সে যুদ্ধের মূল কারণ ও উৎস অর্থাৎ কুফরি ও শিরকি ধ্যানধারণা ও মতবাদ থেকে বিরত থাকতে হবে।

قَوْلُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : আয়াতের এ অংশটুকু স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পূর্ববর্তী اِنْتَهَوْا অংশে বিরতি দ্বারা কুফুর ও শিরক হতে বিরতি উদ্দেশ্য, শুধু যুদ্ধ বিরতি উদ্দেশ্য নয়। কেননা ক্ষমা ও দয়া গুণের প্রকাশ ঘটতে পারে কুফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী হওয়ার ক্ষেত্রেই, শুধু যুদ্ধ বর্জন করার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ কুফরি থেকে যে তওবা করবে, তার বিগত পাপ ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতেও তার সঙ্গে দয়ার আচরণ করা হবে। পবিত্র কুরআনেরই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ অর্থাৎ যারা কুফরি করে তাদের বলে দিন, তারা যদি [কুফর থেকে] বিরত হয়, তবে তাদের জন্য অতীতে যা হয়েছে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে : ফুকাহায়ে কেরাম ও মুফাসসিরগণ এ আয়াত থেকে হত্যাকারীর তওবা কবুল হওয়ার মাসআলাটিও উদ্ভাবন করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, কুফরি থেকে তওবা যেহেতু কবুল হতে পারে, আর স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যা [অতি মারাত্মক সন্দেহ নেই, তবুও তা] কুফরির চেয়ে তুলনামূলক লঘুপাপ। সুতরাং হত্যার অপরাধে তওবা কবুল না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? –[আহকামুল কুরআন : জাসসাস]

মক্কার কাফের ও অন্য ভূখণ্ডের কাফেরের মাঝে পার্থক্য : যদি এরা ইসলাম গ্রহণ না করে, তখন অন্য কাফেরদের ক্ষেত্রে যদিও জিযয়া দেওয়ার স্বীকারোক্তিতে যুদ্ধ বিরতির বিধান রয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে মক্কার এ কাফেররা আরবের বাসিন্দা হওয়ার কারণে তাদের জন্য জিজিয়া বিধি প্রযোজ্য হবে না। তাদের জন্য বিধান হলো– হয় ইসলাম, নয় হত্যা। ইসলাম যেহেতু একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং সেহেতু তার জন্য একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র ও নিজস্ব পরিমণ্ডল অপিরিহার্য ছিল। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের অন্তত একটি স্থান তো এমন হওয়ার ছিল, যা হবে কুফরি ও শিরক হতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাওহীদপন্থিদের জন্য [ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা বাস্তবায়নের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র] যথার্থ অর্থে পাক স্থান [আক্ষরিক অর্থে পবিত্র ভূমি]। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাসূল ﷺ -এর জন্মভূমি ওহী অবতরণক্ষেত্র [ও আল্লাহর পবিত্র ঘরের চৌহদ্দি] এর চেয়ে অধিক সমীচীন আর কোন ভূখণ্ড। ... [এজন্য] আরবের কাফেররা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের জন্য শুধুই হত্যা বিধিই প্রযোজ্য হবে। তাদের জিজিয়া দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে। –[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٩٤. اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ الْمُحَرَّمُ مُقَابِلٌ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ فَكَمَا قَاتَلُوْكُمْ فِيْهِ فَاقْتُلُوْهُمْ فِيْ مِثْلِهِ رَدٌّ لِاِسْتِعْظَامِ الْمُسْلِمِيْنَ ذٰلِكَ وَالْحُرُمٰتُ جَمْعُ حُرْمَةٍ مَا يَجِبُ اِحْتِرَامُهُ قِصَاصٌ اَىْ يُقْتَصُّ بِمِثْلِهَا اِذَا انْتُهِكَتْ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ بِالْقِتَالِ فِى الْحَرَمِ اَوِ الْاِحْرَامِ اَوِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ سُمِّىَ مُقَابَلَتُهُ اِعْتِدَاءً لِشِبْهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهٖ فِى الصُّوْرَةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِى الْاِنْتِصَارِ وَتَرْكِ الْاِعْتِدَاءِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ ـ

১৯৪. হারাম সম্মানিত ও নিষিদ্ধ মাস হারাম মাসের বিনিময়। সুতরাং তারা যখন এ মাসসমূহে তোমাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তোমরাও তদ্রূপ এগুলোতে তাদেরকে হত্যা করতে পার। মুসলমানগণ যেহেতু নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় বলে ধারণা করত সেহেতু এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার রদ ও অপনোদন করছেন। সকল সম্মানিত বিষয়ের জন্য রয়েছে حُرُمٰتٌ শব্দটি حُرْمَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ের সম্মান প্রদান অবশ্য কর্তব্য। কিসাস। অর্থাৎ তার সম্মান লঙ্ঘন করা হলে তদ্রূপভাবে তার বদলা নেওয়া হবে। সুতরাং হেরেম শরীফে বা ইহরামরত অবস্থায় বা নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে যে কেউ তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে তোমরা তার উপর অনুরূপ বাড়াবাড়ি করবে যেরূপ সে তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। বাড়াবাড়ি ও প্রতিশোধ গ্রহণ পরিত্যাগ করার দ্বারা যেহেতু তাদের পক্ষ হতে এটা বাড়াবাড়ি, সেহেতু اِعْتِدَاء ও বাড়াবাড়ির মোকাবিলা করাকেও বাহ্যত এ স্থানে اِعْتِدَاء [বাড়াবাড়ি] শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য ও সহযোগিতাসহ ভয়কারী ও মুত্তাকীদের সাথে থাকেন।

١٩٥. وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَاعَتِهٖ الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اَىْ اَنْفُسَكُمْ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ اِلَى التَّهْلُكَةِ الْهَلَاكِ بِالْاِمْسَاكِ عَنِ النَّفَقَةِ فِى الْجِهَادِ اَوْ تَرْكِهٖ لِاَنَّهُ يُقَوِّى الْعَدُوَّ عَلَيْكُمْ وَاَحْسِنُوْا بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ اَىْ يُثِيْبُهُمْ ـ

১৯৫. এবং আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যে অর্থাৎ জিহাদ ইত্যাদিতে ব্যয় কর। তোমরা নিজের হাত بِاَيْدِيْهِمْ -এর بَا হরফটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। অর্থাৎ জিহাদের মধ্যে ব্যয় করা হতে বিরত থেকে বা জিহাদ করা পরিত্যাগ করে নিজেদের ধ্বংস করো না। কেননা এটা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুদেরকেই শক্তি যোগাবে। আল্লাহর পথে ব্যয় ইত্যাদি করে পুণ্য সাধন কর, নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ তিনি তাদের পুণ্যফল দান করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمُحَرَّمُ : নিষিদ্ধ, সম্মানিত। مُقَابِلٌ : বিনিময়। اِذَا انْتُهِكَتْ : যখন লঙ্ঘন করা হবে। اَلْاِنْتِصَارُ : প্রতিশোধ গ্রহণ করা। اَلْاِعْتِدَاءُ : বাড়াবাড়ি।

اَلتَّهْلُكَةُ : এটি (خِلَافُ قِيَاسٍ) বিরল মাসদারের অন্তর্ভুক্ত। বাবে ضَرَبَ থেকে এর ব্যবহার। অর্থ– ধ্বংসে নিপতিত করা। اَلتَّهْلُكَةُ যেহেতু একটি বিরল মাসদার, তাই اَلْهَلَاكُ প্রসিদ্ধ মাসদার উল্লেখ করে তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। هَلَكَ (ض) -এর তিনটি মাসদার হচ্ছে– هَلَاكًا . تَهْلُكًا . تَهْلُكَةً -

اَحْسِنُوْا : তোমরা নেক আমল কর। اِحْسَانًا সদাচরণ করা, নেক কাজ করা, উত্তমরূপে করা। [اِلٰى অব্যয় যোগে] কারো প্রতি সদাচরণ করা, অনুগ্রহ করা। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩০৯]

يُحِبُّ : اَىْ يُثِيْبُهُمْ -এর ব্যাখ্যা يُثِيْبُ দ্বারা করাটা تَفْسِيْر بِالَّلازِم বা লাযেমী বস্তু দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। কেননা حُبٌّ -এর অর্থ হচ্ছে مَيَلَانُ الْقَلْبِ বা অন্তরের আকর্ষণ, ঝোঁক, টান ইত্যাদি, যা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে تَصَوُّرْ করা যায় না। যেমন رَحْمَةٌ -এর তাফসীর করা হয় اِحْسَانٌ দ্বারা। কেননা رَحْمَةٌ অর্থ رِقَّةُ الْقَلْبِ যা আল্লাহ তা'আলার জাতের ক্ষেত্রে تَصَوُّرْ করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও শানে নুযূল : সাহাবীগণের মনে এই সন্দেহ ছিল যে, এটা জিলকদ মাস এবং তা সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এ মাসসমূহে কোথাও কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এ মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করব? তাদের এ দ্বিধা দূর করার জন্যেই আয়াতটি নাজিল করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার হেরেম শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরিয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে [সম্মানিত মাসেও] যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েজ।

قَوْلُهُ اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ : কোনো মাসের পবিত্রতা বা মর্যাদা রক্ষার ভিত্তি হতে পারে মাত্র একটি বিষয়। তা হলো উভয় পক্ষ সে মর্যাদা রক্ষা করে চলবে তা না হলে তো কোনো মাসের পবিত্রতার ভিত্তিই থাকে না। কেননা বিষয়টি দুই প্রতিপক্ষের পারস্পরিক আচরণবিধি ও সমঝোতার উপরেই নির্ভরশীল।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ -এর শাব্দিক অর্থ– মর্যাদাসম্পন্ন মাস। আরবের গোত্রগুলো পরস্পরের প্রতি যুদ্ধংদেহী রূপে চলে আসছিল। এতদসত্ত্বেও এরূপ পারস্পরিক সমঝোতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বছরে চার মাস যুদ্ধ ও সংঘাত বন্ধ থাকবে এবং এ মাসগুলো শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গেই অতিবাহিত হবে। মাস চারটি ছিল– ১. মহররম: চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাস, ২. রজব: চান্দ্রবর্ষের সপ্তম মাস। ৩. জিলকদ : চান্দ্রবর্ষের একাদশ মাস ও ৪. জিলহজ: চান্দ্রবর্ষের দ্বাদশ মাস।

এখানে ৭ম হিজরির জিলকদ মাসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের একটি দল সঙ্গে নিয়ে [মক্কা অভিমুখে] রওয়ানা করেছিলেন। কিন্তু ওদিকে মুশরিকরা যুদ্ধের জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিল এবং চোরগোপ্তাভাবে তীর বর্ষণ পাথর নিক্ষেপ শুরু করে দিয়েছিল। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قِصَاصٌ : এর শাব্দিক অর্থ-বদলা বা প্রতিদান, তা কথায় হোক বা কাজেকর্মে কিংবা দৈহিক আচরণরূপে। এখানে উদ্দেশ্য কাজেকর্মে প্রতিদান। অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপক্ষ তোমাদের সাথে যেমন কাজ করেছে তোমরাও তাদের সঙ্গে তেমনই কর।

قَوْلُهُ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ : অর্থাৎ প্রতিপক্ষ তোমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করলে তথা পবিত্র মাসগুলোর মর্যাদা রক্ষা না করে যুদ্ধ শুরু করলে তোমরাও সামান তালে পাল্টা হামলা করবে। এখানে মুসলমানদের প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক জবাবি ব্যবস্থাকে শুধু রূপক অর্থেই এবং আরবি বাকরীতি অনুযায়ী مُشَاكَلَةٌ হিসেবেই করা হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী]

سُمِّىَ مُقَابَلَةً -এর দ্বারা একটি প্রশ্নের নিরসন করা হয়েছে। প্রশ্ন: যদি জালেমের কাছ থেকে জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া হয়, তাহলে তাকে জুলুম বলা হয় না। কারণ এটা তার অধিকার। অথচ এখানে প্রতিশোধ গ্রহণকে اِعْتِدَاءٌ [জুলুম] দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

উত্তর. উভয়টি বাহ্যিকভাবে একই ধরনের হওয়ায় এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমনটি করা হয়েছে- جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মাঝে।

আরবি বাকধারায় একটি রীতি আছে যে, কোনো কাজের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়, সে কাজের প্রতিদান ও শাস্তির জন্যও হুবহু ঐ একই শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন 'চক্রান্ত' বুঝাবার জন্য مَكْر শব্দ এবং তার পাল্টা ব্যবস্থার জন্যও এ শব্দই, তদ্রূপ كَيْد [ষড়যন্ত্র] -এর শাস্তির জন্যও হুবহু كَيْد শব্দ; উপহাসের (اِسْتِهْزَاءٌ) পাল্টা ব্যবস্থার জন্যও একই اِسْتِهْزَاءٌ শব্দের ব্যবহার। এ বর্ণনাশৈলী مُشَاكَلَة [সাদৃশ্য] নামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনে আরবি অলংকার بَلَاغَتْ শাস্ত্রের অন্যান্য রীতি-পদ্ধতির ন্যায় এ পদ্ধতিটিরও বহুল ব্যবহার রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ : মুত্তাকীগণের সাথে আল্লাহর সঙ্গ-এর অর্থ কি? এর ধরনই বা কি? মুফাসসির (র.) بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ শব্দ বৃদ্ধি করে তার জবাব দিয়েছেন যে, আল্লাহর সঙ্গে-এর রূপ হলো তাঁর সাহায্য, সহায়তা, তাঁর সংরক্ষণ [ও অবগতি] ইত্যাদি। ইমাম রাযী (র.) এখান থেকে এ তত্ত্ব আহরণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা জড় দেহধারী [সাকার] জড়বস্তু নন, কোনো স্থানে তিনি অবস্থিত নন, যেমন সব দেহধারী জড়বস্তু কোনো না কোনো শূন্যস্থানকে পূরণ করে রাখে। তাফসীরে কাবীরে রয়েছে- وَهٰذَا مِنْ اَقْوَى الدَّلَائِلِ عَلٰى اَنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا فِىْ مَكَانٍ অর্থাৎ এটাই অন্যতম প্রবল প্রমাণ যে, তিনি কোনো স্থানে আবদ্ধ নন।

قَوْلُهُ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যোগসূত্র : জীবন উৎসর্গ করার হুকুম তো জিহাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্তরূপে প্রদত্ত হয়েছে। এখন সম্পদ ব্যয় করার হুকুম পাওয়া গেল।

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ [আল্লাহর রাহে] শর্তটির প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু জীবন দিয়ে দেওয়াই যেমন ইসলামে কাম্য ও উদ্দেশ্য নয়, বরং কাম্য ও উদ্দেশ্য সে জীবনদান, যা হবে আল্লাহর পথে, আল্লাহর দীনের শ্রেষ্ঠত্ব বিধানের লক্ষ্যে; তদ্রূপ যে কোনো প্রকারে শুধু মাল খরচ করার কোনো মূল্য ও গুরুত্ব ইসলামে নেই। এখানে মূল্য ও মহিমা রয়েছে সে সম্পদ ব্যয়ের, যা হবে সত্য ন্যায়ের পথে, অসত্য-অন্যায়ের পথে নয়, যা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে নয়। বর্ণনাধারায় এখানে যদিও যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রয়োজনে ব্যয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তবুও ফী সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথের ব্যাপ্তি যে কোনো দীনি কাজে সম্পদ ব্যয় করাকে এর অন্তর্ভুক্ত করবে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ : প্রকৃত রূপ ছিল- وَلَا تُلْقُوْا اَنْفُسَكُمْ بِاَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ নিজেদের হাতে নিজেদের ধ্বংস করো না।' اَىْ لَا تُلْقُوْا اَنْفُسَكُمْ فِى الْهَلَاكِ অর্থাৎ 'নিজেদের অস্তিত্বকে তোমরা ধ্বংসে নিপতিত করো না।' -[বায়যাবী] এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতের জাতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কৃপণতা করে উম্মতকে ধ্বংসে নিপতিত করো না।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ [এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না।] আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে।

'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে? এখন কথা হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এ ক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে, এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাতাগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা-

১. ইমাম জাসসাস রাযী (র.) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে।

২. হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এ আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজিল হলো।

এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

١٩٦. وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ اَدُّوْهُمَا بِحُقُوْقِهِمَا فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ مُنِعْتُمْ عَنْ اِتْمَامِهَا بِعَدُوٍّ اَوْ نَحْوِهٖ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْىِ عَلَيْكُمْ وَهُوَ شَاةٌ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ اَىْ لَا تَتَحَلَّلُوْا حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ الْمَذْكُوْرُ مَحِلَّهٗ حَيْثُ يَحِلُّ ذَبْحُهٗ وَهُوَ مَكَانُ الْاِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) فَيُذْبَحُ فِيْهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَيُفَرَّقُ عَلٰى مَسَاكِيْنِهٖ وَيُحْلَقُ وَبِهٖ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ كَقُمَّلٍ وَصُدَاعٍ فَحَلَقَ فِى الْاِحْرَامِ فَفِدْيَةٌ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ لِثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَوْ صَدَقَةٍ بِثَلٰثَةِ اٰصُعٍ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ عَلٰى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ اَوْ نُسُكٍ اَىْ ذَبْحِ شَاةٍ اَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَاُلْحِقَ بِهٖ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِاَنَّهٗ اَوْلٰى بِالْكَفَّارَةِ وَكَذَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيْبِ وَاللُّبْسِ وَالدُّهْنِ لِعُذْرٍ اَوْ غَيْرِهٖ .

অনুবাদ :

১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পূর্ণ কর অর্থাৎ এতদুভয়ের হকসহ যথাযথভাবে এগুলো আদায় কর। কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও অর্থাৎ শত্রু ইত্যাদির কারণে তা পূরণ করতে বাধাগ্রস্ত হও তবে তোমাদের উপর কর্তব্য হবে সহজলভ্য যা সহজ হয় তা কুরবানি করা। আর তা হলো কমপক্ষে একটি ছাগী। যে পর্যন্ত উল্লিখিত কুরবানির পশু তার স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে তা জবাই করা বৈধ সেই স্থানে; ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, যে স্থানে সে বাধাপ্রাপ্ত হবে সে স্থানই হলো জবাই করার স্থান। না পৌছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না অর্থাৎ ইহরাম হতে হলাল হয়ো না। জবাইয়ের স্থানে পৌছার পর ইহরাম হতে হলাল হওয়ার নিয়তে উক্ত পশু জবাই করা হবে এবং মিসকিনদের মাঝে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে, আর সে তার মস্তক মুণ্ডন করবে এভাবে সে ইহরাম হতে হালাল হয়ে যেতে পারবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে যেমন– উকুন, মাথাব্যথা ইত্যাদির ফলে ইহরামরত অবস্থায়ই সে মাথা মুণ্ডন করে তবে তিন দিনের সিয়াম কিংবা তদঞ্চলের প্রধান খাদ্য হতে তিন সা' [এক এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সের] পরিমাণ খাদ্য ছয়জন মিসকিনকে সদকা কিংবা কুরবানি করে একটি বকরি জবাই করে। ফিদয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে আয়াতটিতে যে اَوْ [কিংবা] শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা تَخْيِيْر বা এখতিয়ারবাচক। তার ফিদয়া দেবে কোনোরূপ ওজন ব্যতিরেকে যদি কেউ মাথা মুণ্ডন করে, তবে সেও [ফিদয়া দানের] এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কাফফারা দানের বিধান এ ব্যক্তির জন্য আরো অধিক প্রাযোজ্য।

মাথা মুণ্ডন ব্যতীত যদি কেউ [তখনকার মতো অবৈধ] কিছু করে যেমন সুগন্ধি, সেলাই করা কাপড়, তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করে, তবে ওজরবশত হোক বা ওজর ব্যতীত হোক সর্বাবস্থায় তার উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَتِمُّوا : পূর্ণ কর। اَلْاِتْمَامُ মাসদার থেকে اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف -এর সীগাহ।
اُحْصِرْتُمْ : [যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও] مَاضِى مَجْهُوْل جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। (اِفْعَال) اَلْاِحْصَارُ অর্থ- বাধা দেওয়া, আটকিয়ে রাখা। বলা হয়- حَصَرَهُ عَنِ السَّفَرِ وَاَحْصَرَهُ [তাকে সফর থেকে বারণ করেছে।] اِسْتَيْسَرَ : সহজ হয়েছে। مَا اسْتَيْسَرَ যা সহজ হয়। اَلْهَدْىُ : বাইতুল্লাহ শরীফের জন্য হাদিয়া হিসেবে যেসব জন্তু প্রেরণ করা হয়। যেমন- গরু, ছাগল, উট। مَحِلَّهُ : مَحِلّ এমন স্থান যেখানে হাদীর জন্তু জবাই বা নহর করা বৈধ। يُفَرِّقُ : বণ্টন করে দেবে।
اِسْتَيْسَرَ : تَيَسَّرَ -এর ব্যাখ্যায় تَيَسَّرَ উল্লেখ করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, اِسْتَيْسَرَ শব্দটি تَيَسَّرَ -এর অর্থে اِسْتِفْعَال -এর খাসিয়ত হিসেবে প্রার্থনার অর্থ উদ্দেশ্য নয়।
قَوْلُهُ عَلَيْكُمْ : এখানে এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।
প্রশ্ন. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ হলো جَوَابْ شَرْط অথচ এটি جُمْلَة تَامَّة বা পূর্ণ জুমলা নয়। আর جَوَابْ شَرْط হওয়ার জন্য জুমলা হওয়া শর্ত।
উত্তর: এখানে عَلَيْكُمْ মাহযূফ মেনে এদিকে ইশারা করেছেন যে, আয়াতে مَا মুবতাদার খবরটি মাহযূফ রয়েছে, যাতে মুবতাদা তার খবরের সাথে মিলে জুমলা হয়ে শর্তের جَزَاء হতে পারে। ইবারতের প্রকৃত রূপ হলো- فَعَلَيْكُمْ مَا اسْتَيْسَرْتُمْ
اَذًى : ক্লেশ, কষ্ট। قُمَّلٌ : উকুন। صُدَاعٌ : মাথাব্যথা। اَصْعٍ : صَاعٌ -এর বহুবচন। পরিমাপ বিশেষ। قُوْتٌ : খাদ্য। نُسُكٌ : এটি نَسِيْكَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কুরবানি। মাসদার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কুরবানি করা। اِسْتَمْتَعَ : উপকার লাভ করল, তখনকার মতো অবৈধ কিছু করল।
قَوْلُهُ فَفِدْيَةٌ عَلَيْهِ : فَفِدْيَةٌ -এর মূলপাঠ ছিল فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ; এখানে فَفِدْيَةٌ মুবতাদা আর عَلَيْهِ তার খবর, যা মাহযূফ রয়েছে। মুফাসসির (র.) عَلَيْهِ বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।
لِثَلَاثَةِ اَيَّامٍ : এটি প্রথম ফিদয়া রোজার পরিমাণ। অর্থাৎ রোজার মাধ্যমে ফিদয়া দিলে তার পরিমাণ হলো তিনদিন রোজা রাখা। হাদীস শরীফে এ পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে بِثَلَاثَةِ اَصْعٍ : এখানে সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। এ পরিমাণও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। قُوْتُ الْبَلَدِ : بَلَدٌ বলতে এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হয়েছে। আর এটি তিন ইমামের মাযহাব। আহনাফের মতে যে কোনো খাবার দেওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতসমূহে সওমের বিধিবিধান ছিল। এখানে হজ ও ওমরা পরিপূর্ণ রূপে আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর কেউ ইহরাম বাঁধার পর কোনো কারণবশত হজে বাধাপ্রাপ্ত হলে বা পূর্ণ করতে না পারলে তার করণীয় কি? তা বলা হয়েছে।
قَوْلُهُ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ اَدُّوْهُمَا بِحُقُوْقِهِمَا : অর্থাৎ হজ ও ওমরাকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে আদায় করবে এদের যাবতীয় শর্ত ও হক আদায় করে। বিশিষ্ট তাবে-তাবেয়ী হযরত মুকাতিল (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ সময়ে এমন কিছু করো না, যা এ ইবাদত দুটির জন্য সমীচীন ও সঙ্গত নয়। [কুরতবীর সূত্রে মাজেদী]

প্রশ্ন: ইবারত দ্বারা হজ ও ওমরা উভয়টিই ফরজ কিংবা ওয়াজিব হওয়া বুঝে আসে। যেমনটি ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মাযহাব আবার উভয়টি নফল হওয়াও বুঝে আসে। কেননা اَمْر টা وُجُوْب -এর জন্য তাই হজ ও ওমরা উভয়টিই ওয়াজিব হবে আর نَدْب -এর জন্য হলে উভয়টিই مَنْدُوْب হবে, যা মাযহাবসমূহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

উত্তর:
১. ইসলামের শুরুলগ্নে হজ ও ওমরা উভয়টিই নফল ছিল। অতঃপর وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ দ্বারা হজের فَرْضِيَّتْ সাব্যস্ত হয়েছে তবে ওমরা আপন অবস্থায়ই রয়ে গেছে।
২. اَتِمُّوا -এর অর্থ হলো- اَدُّوْهُمَا بِحُقُوْقِهِمَا تَامَّيْنِ كَامِلَيْنِ بِاَرْكَانِهِمَا وَشُرُطِهِمَا অর্থাৎ এ আয়াতে হজ ও ওমরা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়নি; বরং এখানে সকল রোকন ও শর্তসহ পরিপূর্ণভাবে আদায়ের কথা বলা হয়েছে।
«لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْاِتْمَامِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْاَمْرِ بِاَصْلِ الْفِعْلِ الَّذِىْ اَمَرَ بِاِتْمَامِهِ - حَاشِيَةُ جَلَالَيْنِ».

http://islamiboi.wordpress.com

৩. আর যদি أَتِمُّوا শব্দকে তার বাহ্যিক অর্থেই রাখা হয়, তাহলে আয়াতের মর্ম হবে– আরম্ভ করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। কেননা আহনাফের মতে নফল ইবাদত শুরু করার দ্বারা ওয়াজিব হয়ে যায়।

৪. আরেকটি জবাব এও হতে পারে যে, এখানে হজ ও ওমরার নির্দেশটি মূলত উভয়টির মাঝে ফরজকৃত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রেখে দেওয়া হয়েছে। কেননা ওমরা সুন্নত হলেও তাতে কিছু বিধান ফরজ রয়েছে। যেমনিভাবে নফল নামাজের মাঝে কেরাত পড়া হলো ফরজ। –[জামাল]

قَوْلُهُ لِلّٰهِ : 'আল্লাহর জন্য।' এর ব্যাখ্যায় ফকীহ-মুফাসসির ইবনুল আরাবী একটি অত্যন্ত সুন্দর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন যাবতীয় ইবাদত ও কর্ম তো আল্লাহর সঙ্গেই সম্বন্ধিত হয়- তাঁর জ্ঞান-অবগতি, তাঁর ইচ্ছা-সংকল্প ইত্যাদির বিচারে। এতদসত্ত্বেও এখানে এভাবে নির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্য হলো একটি বিষয়ে সতর্কীকরণ যে, হজ ও ওমরায় উপস্থিতি কোনো মেলা-অনুষ্ঠানে, কোনো সমাবেশ-সম্মেলন মনে করে, গৌরব, প্রতিযোগিতা, দেনদরবার কিংবা শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থোদ্ধারের জন্য যেন না হয়; বরং পূর্ণাঙ্গ নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তেই যেন হয়। এ নির্দিষ্টকরণের রহস্য এই যে, আরববাসীরা হজ পালনে যেত সম্মিলন, পারস্পরিক যোগ-সংযোগ, সহায়তা-মৈত্রী, বিরোধ-সংঘাত, গৌরব-প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ এবং বাজার-মেলায় উপস্থিতি বিভিন্ন জাগতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। এতে তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর জন্য কোনো অংশ ছিল না বা তারা ছওয়াব ও নৈকট্য অর্জনের বিষয় মনে করে হজ পালন করত না। তাই আল্লাহ তা'আলা হুকুম করলেন যে, হজ ও ওমরা যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁর হুকুম পালনার্থে ও তাঁর হক আদায়ের লক্ষ্যে আদায় করা হয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

এখন প্রশ্ন উঠে, যদি কোনো ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোনো অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ **শানে নুযূল :** এ আয়াতটি হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণ ইহরাম অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হেরেমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি, ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, ইহরামের ফিদিয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানি কর। কুরবানি করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ -এ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহরাম খোলার শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুণ্ডানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েজ নয়, যতক্ষণ না ইহরামকারীর কুরবানি নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে।

হজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মর্ম :

قَوْلُهُ بِعَدُوٍّ : এটি ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী। কেননা তাঁদের মতে, একমাত্র দুশমনের দ্বারাই إِحْصَارٌ শুদ্ধ হতে পারে। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে এটি ব্যাপক। দুশমন ছাড়াও অসুস্থতা, রোগ-ব্যাধি, পথ-খরচ ফুরিয়ে যাওয়া ইত্যাদি দ্বারাও إِحْصَارٌ হতে পারে। কেননা হাদীসে এসেছে– مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

قَوْلُهُ الْهَدْيِ : শাব্দিক অর্থে যে কোনো উপঢৌকন, যা কা'বা ঘরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)সহ আরো অনেকে উট, গরু, ছাগল ও দুম্বা জাতীয় পশুর কথা বলেছেন। কেউ কেউ অবশ্য শুধু উটের কথা বলেছেন।

قَوْلُهُ مَحِلَّهُ : তার অবতরণ ক্ষেত্র অর্থাৎ হেরেম শরীফের এলাকা। কেননা এটিই কুরবানির মূলকেন্দ্র।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হেরেমের এলাকা। সেখানে পৌঁছে কুরবানি করতে হবে। নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা পাঠিয়ে জবাই করাতে হবে।

قَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا الخ **: যোগসূত্র :** পূর্বে জানা গেছে যে, ইহরাম অবস্থায় মাথামুণ্ডন বা চুল খাটো করা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি ইহরাম অবস্থায় কোনো ওজরবশত মাথামুণ্ডন কিংবা চুল খাটো করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কি করবে? এখান থেকে সে আলোচনা করা হচ্ছে যে, যদি কোনো রোগ-ব্যাধির কারণে মাথা কিংবা শরীরের অন্য কোনো স্থানের চুল বা পশম কর্তন করতে বা মুণ্ডাতে হয় তাহলে প্রয়োজন মতে মুণ্ডানো জায়েজ আছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ مِنْكُمْ مَرِيْضًا : এখানে صِفَتٌ উহ্য রয়েছে। أَيْ مَرِيْضًا مُحْتَاجًا إِلَى الْحَلْقِ আর مِنْكُمْ এটি ظَرْفٌ مُسْتَقَرٌّ হয়ে مَرِيْضًا -এর حَالٌ আর مِنْ হলো تَبْعِيْضِيَّةٌ

http://islamiboi.wordpress.com

فَاِذَآ اَمِنْتُمْ الْعَدُوَّ بِاَنْ ذَهَبَ اَوْ لَمْ يَكُنْ
فَمَنْ تَمَتَّعَ اسْتَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ اَىْ بِسَبَبِ
فَرَاغِهٖ مِنْهَا بِمَحْظُوْرَاتِ الْاِحْرَامِ اِلَى
الْحَجِّ اَىْ اَلْاِحْرَامِ بِهٖ بِاَنْ يَكُوْنَ اَحْرَمَ بِهَا
فِىْ اَشْهُرِهٖ فَمَا اسْتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْىِ
عَلَيْهِ وَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا بَعْدَ الْاِحْرَامِ بِهٖ
وَالْاَفْضَلُ يَوْمَ النَّحْرِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ الْهَدْىَ
لِفَقْدِهٖ اَوْ فَقْدِ ثَمَنِهٖ فَصِيَامُ اَىْ فَعَلَيْهِ
صِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ اَىْ فِىْ حَالِ
اِحْرَامِهٖ بِهٖ فَيَجِبُ حِيْنَئِذٍ اَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ
السَّابِعِ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ وَالْاَفْضَلُ قَبْلَ
السَّادِسِ لِكَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ
وَلَا يَجُوْزُ صَوْمُهَا اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ عَلٰى
اَصَحِّ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ
اِلٰى وَطَنِكُمْ مَكَّةَ اَوْ غَيْرِهَا وَقِيْلَ اِذَا
فَرَغْتُمْ مِنْ اَعْمَالِ الْحَجِّ وَفِيْهِ الْتِفَاتٌ
عَنِ الْغَيْبَةِ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ جُمْلَةٌ
تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا .

অনুবাদ : যখন তোমরা শত্রু হতে নিরাপদ হবে যেমন শত্রু চলে গেল বা বাস্তবেই তার কোনো শত্রু ছিল না, তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজের সাথে ওমরা দ্বারা অর্থাৎ তার ইহরাম করে, যেমন হজের জন্য নির্ধারিত মাসসমূহে সে তারও ইহরাম করল লাভবান হতে চায় তামাত্তুর মাধ্যমে অর্থাৎ ওমরা সম্পন্ন করে এবং তা হতে হালাল হয়ে ইহরামের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তু ভোগ করে লাভবান হতে চাইবে তার উপর কর্তব্য হবে সহজলভ্য যা তার জন্য সহজ হয় তা কুরবানি করা। তা হলো একটি বকরি জবাই করা। হজের ইহরাম করার পর এ কুরবানি করবে, তবে 'ইয়াওমুন নাহরে' [১০ই জিলহজ তারিখে] জবাই করা সর্বোত্তম। কিন্তু বাজারে না থাকায় বা মূল্য না থাকায় যদি কোনো ব্যক্তি তা উক্ত হাদী বা কুরবানির পশু না পায় তবে তার উপর কর্তব্য হলো হজের সময় অর্থাৎ ইহরামরত অবস্থায় তিন দিন ইহরামরত অবস্থায় যে তিন দিন সিয়াম পালন করবে এর জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো জিলহজ মাসের সপ্তম তারিখের পূর্বেই ইহরাম বেঁধে নেওয়া। এমনকি ষষ্ঠ তারিখের পূর্বে বাঁধা আরও উত্তম। কেননা হজ পালনকারীর জন্য আরাফার দিন [নবম তারিখ] সিয়াম পালন করা পছন্দনীয় নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম অভিমত হলো আইয়ামে তাশরীক -এ সিয়াম পালন করা জায়েজ নয়। এবং যখন তোমাদের গৃহে মক্কা বা অন্য কোথাও হোক প্রত্যাবর্তন করবে কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো যখন তোমরা হজের কার্যাদি সমাপন করে অবসর হবে। اِذَا رَجَعْتُمْ এতে غَائِبْ বা নাম পুরুষ হতে [দ্বিতীয় পুরুষের দিকে] اِلْتِفَاتْ [রূপান্তর] সংঘটিত হয়েছে। তখন সাত দিন– এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করা تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ বাক্যটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

مَحْظُوْرَاتٌ : مَحْظُوْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ- নিষিদ্ধ বস্তু [illegible] না থাকা, [illegible]

التَّشْرِيْقُ : يَوْمَ النَّحْرِ-এর পরবর্তী তিন দিনকে اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ বলা হয়। تَشْرِيْقٌ শব্দের অর্থ- গোশত শুকানো। যেহেতু সাধারণত এ দিনগুলোতে গোশত শুকানো হয় সেহেতু তার এ নাম রাখা হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِاَنْ ذَهَبَ اَوْ لَمْ يَكُنْ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে اَمِنْتُمْ-এর উভয় অর্থের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কেননা اَمِنْتُمْ-এর مُشْتَقٌّ مِنْهُ দুটি। ১. اَمْنَةٌ অর্থ- ভয় দূরীভূত হওয়া। ২. [illegible] স্থিতি, শান্তি। যা خَوْف-এর বিপরীত। সুতরাং যদি اَمْنَةٌ থেকে ব্যবহার হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে- [illegible] خَوْفَ الْعَدُوِّ [illegible] সূরতে এটি ঐ ব্যক্তির হুকুম হবে, যার বাধা দূর হয়ে গেছে। আর যার বাধা ছিল না সে তো এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত আছেই। আর যদি [illegible] থেকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে অর্থ হবে- যদি তোমরা শান্তি ও স্থিতিতে থাক। [illegible] تَزْوِيْجُ الْاَزْوَاجِ [illegible]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا اَمِنْتُمْ : আয়াতের শুরু অংশে উল্লিখিত সংকট ও ব্যাধির বিপরীতে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে এবং হজের সময় ওমরা করার বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। ওখানে حِصَارٌ দ্বারা যেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ নেওয়া হয়েছিল, এখানেও اَمْنٌ শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থ বুঝাবে। অর্থাৎ শত্রু জনিত সংকট দূর হওয়ার অর্থ যেমন বুঝাবে, তদ্রূপ ব্যাপকতার অর্থে রোগ-ব্যাধি উপশম হয়ে যাওয়াও বুঝাবে।

قَوْلُهُ الْعَدُوُّ : মুসান্নিফ (র.) যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী, তাই তিনি শুধু দুশমন থেকে নিরাপদ হওয়ার কথাই উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ : تَمَتَّعَ -এর শাব্দিক অর্থ– উপকার হাসিল করা। ফিকহের পরিভাষায় এর অর্থ হজ ও ওমরা একত্র করা। অর্থাৎ হজের মাসগুলোতে একবার ইহরাম বেঁধে ওমরা আদায় করার পর তা খুলে হালাল হয়ে পুনরায় দ্বিতীয়বার ইহরাম বেঁধে হজ করে নেওয়া। যেহেতু দুই ইহরামের মধ্যবর্তী সময়ে ইহরামকালীন নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করা যায় তাই একে تَمَتَّعَ বলা হয়।

হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করার বিধান : ইবরাহীমী ধর্ম ত্যাগ করে জাহিলি যুগের আরবরা যেসব কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা মনে করত হজের মৌসুমে ওমরা করা কঠিন পাপ। –[জাসসাস]

এ আয়াতে তাদের সে ধারণার সংশোধন এভাবে করা হয়েছে যে, মীকাতের সীমায় বসবাসকারীদের জন্য তো হজের মাসে হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা নিষিদ্ধ। কেননা তাদের হজের মাসের পরে দ্বিতীয়বার ওমরার জন্য আসা কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু মীকাতের বাইরের অধিবাসীদের জন্য দ্বিতীয়বার আসা কঠিন ব্যাপার, তাই দূরবর্তী এলাকার লোকজনের জন্য হজ ও ওমরা একত্রে আদায় করা জায়েজ। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩১২]

মীকাত : সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজযাত্রীগণ যিনি যেদিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ অথবা ওমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গুনাহের কাজ। যেমন বলা হয়েছে– لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -এর অর্থ তা-ই। অর্থাৎ যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে, না তাদের জন্য হজ ও ওমরা হজের মাসে একত্রে আদায় করা জায়েজ।

অবশ্য যারা হজের মৌসুমে হজ ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দুটি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে কুরবানি করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে, তারা বকরি, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয়, তা থেকে কোনো একটি পশু কুরবানি করবে। কিন্তু যাদের কুরবানি করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই, তারা দশটি রোজা রাখবে। হজের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ সমাপনের পর সাতটি রোজা রাখতে হবে। এ সাতটি রোজা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে । হজের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোজা পালন করতে না পারে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্য কুরবানি করাই ওয়াজিব। যখন সমর্থ হয়, তখন কারো মাধ্যমে হেরেম শরীফে কুরবানি আদায় করবে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

তামাত্তু ও কিরান : হজের মাসে হজের সাথে ওমরাকে একত্রকরণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে মীকাত হতে হজ ও ওমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা। শরিয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে কিরান' বলা হয়। এর ইহরাম হজের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজের শেষদিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম বাঁধবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজকর্ম শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ জিলহজ তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হেরেম শরীফের মধ্যেই ইহরাম বেঁধে নেবে। শরিয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় তামাত্তু'; কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ اَعْمَالِ الْحَجِّ : এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হজের কার্যাবলি থেকে অবসর হওয়া। অবসরের পর বাস্তবে কেউ নিজ বাড়িতে আসুক বা তখনও সেখানে অবস্থান করুক। ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ অন্যান্য ইমামদের মতে মক্কা থেকে [প্রত্যক্ষ অর্থে] স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ جُمْلَةٌ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهَا : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বক্তব্যের দৃঢ়তা বিধানের জন্য। যেমন কেউ এভাবে বলে– سَمِعْتُهُ بِاُذُنَىَّ - আমার দুই কানে তা শুনেছি। رَأَيْتُهُ بِعَيْنَىَّ - আমার দুই চোখে তা দেখেছি। كَتَبْتُ بِيَدَىَّ - আমি আমার হাতে লিখেছি।

http://islamiboi.wordpress.com

ذٰلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ وُجُوْبِ الْهَدْيِ اَوِ الصِّيَامِ عَلٰى مَنْ تَمَتَّعَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِاَنْ لَمْ يَكُوْنُوْا عَلٰى دُوْنَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَاِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صِيَامَ وَاِنْ تَمَتَّعَ وَفِيْ ذِكْرِ الْاَهْلِ اِشْعَارٌ بِاشْتِرَاطِ الْاِسْتِيْطَانِ فَلَوْ اَقَامَ قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَمْ يَسْتَوْطِنْ وَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ ذٰلِكَ وَهُوَ اَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالثَّانِىْ لَا وَالْاَهْلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفْسِ وَاُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيْمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ الْقَارِنُ وَهُوَ مَنْ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا اَوْ يُدْخِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّوَافِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ وَيَنْهَاكُمْ عَنْهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهٗ ـ

অনুবাদ : এটা অর্থাৎ তামাত্তু'কারীর জন্য সিয়াম পালন করার বা কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার উল্লিখিত বিধান তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মাসজিদুল হারামে উপস্থিত নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, যদি তার পরিজনবর্গ হেরেম শরীফের দুই মারহালার [হেঁটে চললে দু-দিনের পথ] ভিতরে না হয়, তবে এ বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি এতটুকু পরিমাণের ভিতর তারা বাস করে তবে তামাত্তু' করলেও তার উপর কুরবানি বা সিয়াম পালন করতে হবে না। আয়াটিতে اَهْل [পরিবারবর্গ] শব্দটির উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় উক্ত স্থানকে আবাস হিসেবে গ্রহণ করা শর্ত। সুতরাং হজের মাসসমূহের পূর্বে যদি কেউ এ স্থানে এসে বসবাস করে; কিন্তু এটাকে আবাসভূমিরূপে গ্রহণ না করে আর তামাত্তু' করে তবে তাকে তা [কুরবানি বা উক্ত নিয়মে সওম পালন] করতে হবে। এটা আমাদের শাফেয়ী মাযহাবের দুটি মতের একটি। আর দ্বিতীয় অভিমত হলো, এমতাবস্থায় তাকে তা করতে হবে না। তখন اَهْل শব্দ দ্বারা তার নিজেকে বুঝাবে।
সুন্নাহর উল্লেখ হিসেবে এ বিষয়ে তামাত্তু'কারীর সাথে কিরানও অন্তর্ভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি একই সাথে হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধে বা ওমরার তওয়াফ সম্পাদনের পূর্বেই এর সাথে হজেরও ইহরাম করে নেয়, তাকে 'কিরান' বলা হয়। আল্লাহকে অর্থাৎ তিনি যে সকল বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সকল বিষয় নিষেধ করেছেন, সে সকল বিষয়ে তাঁকে ভয় কর ও জেনে রাখ নিশ্চয় আল্লাহ যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তার শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

عَلٰى دُوْنَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ : হেরেম শরীফের দুই মারহালার ভিতরে না হয়
مَرْحَلَةٌ : হেঁটে চললে দুই দিনের পথ। اَهْلٌ : পরিবার। اِشْعَارٌ : বুঝানো, সংবাদ দেওয়া।
اَلْاِسْتِيْطَانُ : আবাস হিসেবে গ্রহণ করা

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ «ذٰلِكَ» الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ وُجُوْبِ الْهَدْيِ اَوِ الصِّيَامِ عَلٰى مَنْ تَمَتَّعَ : এ ব্যাখ্যা তথা ذٰلِكَ-এর مَرْجِعٌ বা ইঙ্গিত কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার প্রতি সাব্যস্ত করাটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব মতে। আহনাফের মতে ذٰلِكَ দ্বারা পূর্বোক্ত تَمَتُّعٌ বা উপকার লাভ তথা হজের মৌসুমে হজ ও ওমরা একত্রে করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আহনাফ হজের সময় তামাত্তু' ও কিরান অর্থাৎ হজ মওসুমে হজ ও ওমরা একত্রে করার দুটি পন্থাই বহিরাগতদের জন্য বৈধ হওয়ার এবং মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য বৈধ না হওয়ার অভিমত পোষণ করেছেন। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ بِاَنْ لَمْ يَكُوْنُوْا عَلٰى دُوْنَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : এ ইবারতটুকুর উদ্দেশ্য হলো তামাত্তু'কারীর উপর কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দুটি সুরত বর্ণনা করা। সারকথা হলো, তামাত্তু'কারী যদি اٰفَاقِىْ তথা বহিরাগত হয়, তাহলে তার উপর دَمُ تَمَتُّعٍ বা কুরবানি ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হেরেম থেকে কমপক্ষে দুই মারহালা দূরত্বে বসবাসকারীকে اٰفَاقِىْ বলা হয়। আর তা থেকে কম দূরত্বের বাসিন্দা তাঁর মতে حَضَرِىْ তথা স্থানীয় বলে বিবেচ্য। حَضَرِىْ ব্যক্তির উপর দমে তামাত্তু' এমনকি তার স্থলাভিষিক্ত রোজাও ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهٗ وَفِىْ ذِكْرِ الْاَهْلِ : এখানে لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-এর ব্যাখ্যা করা উদ্দেশ্য। এ আয়াতের মর্ম হলো, دَمُ تَمَتُّعٍ সাকেত বা রহিত হওয়ার জন্য শরয়ী মুকীম হওয়া জরুরি। যদি কেউ اَشْهُرُ حُرُمٍ-এর পূর্বে মক্কায় অবস্থান করে; কিন্তু তাকে বসবাসের স্থান না বানায় অর্থাৎ ১৫ দিন অবস্থানের ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে তার থেকে دَمُ تَمَتُّعٍ সাকেত হবে না। কেননা শরয়ী ইকামতের নিয়ত ছাড়া সে আফাকী [দূরের অধিবাসী] হিসেবেই গণ্য হবে। আর এ ধরনের ব্যক্তির উপর دَمُ تَمَتُّعٍ ওয়াজিব হয়। -[জামালাইন] খ. ১, পৃ. ৩১০]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٩٧. اَلْحَجُّ وَقْتُهُ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ وَقِيْلَ كُلُّهُ فَمَنْ فَرَضَ عَلٰى نَفْسِهِ فِيْهِنَّ الْحَجَّ بِالْاِحْرَامِ بِهِ فَلَا رَفَثَ جِمَاعَ فِيْهِ وَلَا فُسُوْقَ مَعَاصِىَ وَلَا جِدَالَ خِصَامَ فِى الْحَجِّ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْاَوَّلَيْنِ وَالْمُرَادُ فِى الثَّلٰثَةِ النَّهْىُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ ـ

১৯৭. হজ অর্থাৎ এর সময় হলো সুবিদিত কতিপয় মাস। শাওয়াল, জিলকদ এবং জিলহজ মাসের দশরাত; কেউ কেউ বলেন, জিলহজ মাসের পুরোটাই এর অন্তর্ভুক্ত। যে কেউ এই মাসগুলোতে নিজের উপর হজ করা তার ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে ফরজ করে নেয়, তার জন্য হজের সময় স্ত্রী ব্যবহার, অর্থাৎ স্ত্রীসহবাস অন্যায় আচরণ পাপাচার ও বিবাদ কলহ বৈধ নয়। অপর এক কেরাতে প্রথম দুটি শব্দ অর্থাৎ رَفَثٌ ও فُسُوْقٌ -এ ফাতহা সহকারে পঠিত রয়েছে। فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ এ তিনটিতে لَا [না-বাচক শব্দ] نَهْى [নিষেধাজ্ঞা] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা উত্তম যা কিছু কর। যেমন– সদকা ইত্যাদি আল্লাহ তা জানেন অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ : অর্থাৎ ওমরা তো সারা বছরই জায়েজ আছে এবং এর জন্য সবসময়ই ইহরাম বাঁধতে পারবে। কিন্তু হজ নির্ধারিত কয়েক মাসেই হয়ে থাকে। তার জন্য ইহরাম বাঁধার সময় হলো এ কয়েক মাস। কেউ যদি এ সময়ের মধ্যে ইহরাম বাঁধে, তাহলে তা হজের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সফরটিও হজের সফর রূপে বিবেচ্য হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তো শাওয়ালের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েজ নেই। কেউ বাঁধলে তার হজই হবে না। কেননা তাঁর মতে ইহরাম বাঁধা হজের অঙ্গীভূত রুকন এবং হজের কোনো রুকনই মৌসুমের পূর্বে আদায় করার বৈধতা নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইহরাম বাঁধা জায়েজ আছে। কেউ বাঁধলে তার হজ হয়ে যাবে; কিন্তু হজের সময়ের পূর্বে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। জায়েজের যুক্তি হলো হানাফীদের মতে ইহরাম হজের রুকন নয়, বরং এটি হজের শর্ত। যেমন অজু নামজের রুকন নয়, পূর্বশর্ত মাত্র।

قَوْلُهُ «اَلْحَجُّ» وَقْتُهُ : وَقْتُهُ বৃদ্ধি করে مُضَافٌ মাহযূফ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যদি মুযাফ মাহযূফ ধরা না হয়, তাহলে মাসদারকে তার জাতের উপর প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। কেননা اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ অর্থ–হজের কতগুলো মাস। অথচ মাস হজ নয়; বরং হজের সময়। মুযাফ মাহযূফ ধরা হলে আর আপত্তি থাকে না। –[জামালাইন: ৩১৫/ ১৫]

قَوْلُهُ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ : এ আয়াত পূর্বে বর্ণিত يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ الخ আয়াতের ব্যাপকতাকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কেননা সে আয়াত থেকে বুঝা যায় চাঁদের মাস সবগুলোই বুঝি হজের সময়।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ كُلُّهُ : এখানে قِيْلَ -এর প্রবক্তা হলেন ইমাম মালেক (র.)। কেননা তাঁর মতে জিলহজের পূর্ণ মাসই হজের মধ্যে শামিল।

قَوْلُهُ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ : فَرَضَ -এর মূল কথা হলো কোনো কিছু সাব্যস্ত হওয়া, কোনো কিছুর অপরিহার্যতা। তবে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেওয়ার বাস্তব নিদর্শন কি?

قَوْلُهُ بِالْاِحْرَامِ بِهِ : এ অংশটুকু দ্বারা ইমামগণের এখতেলাফের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে নিয়ত করা এবং ইহরাম বাঁধার দ্বারা হজ আবশ্যক হয়ে যায়; কিন্তু ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তালবিয়া এবং سُوْقُ هَدْىٍ [হাদী প্রেরণের] দ্বারা হজ আবশ্যক হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

http://islamiboi.wordpress.com

وَنَزَلَ فِيْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يَحُجُّوْنَ بِلَا زَادٍ فَيَكُوْنُوْنَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ وَتَزَوَّدُوْا مَا يُبْلِغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى مَا يُتَّقٰى بِهٖ سُؤَالَ النَّاسِ وَغَيْرِهٖ وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْأَلْبَابِ ذَوِي الْعُقُوْلِ.

অনুবাদ : ইয়েমেনবাসীগণ কোনোরূপ পাথেয় না নিয়েই হজ করতে বের হয়ে যেত। ফলে তারা [খরচাদির বিষয়ে] মানুষের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর যা দ্বারা তোমরা তোমাদের সফর সম্পন্ন করতে পার। নিশ্চয় তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয় যা দ্বারা মানুষের নিকট যাচনা ইত্যাদি হতে বেঁচে থাকা যায়। হে বোধশক্তি সম্পন্নগণ! জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকারীগণ। তোমরা আমাকে ভয় কর।

তাহকীক ও তারকীব

كَانُوا يَحُجُّوْنَ : তারা হজ করত। زَادٌ : পাথেয়, পথের খরচ। كَلًّا : বোঝা, চাপ। تَزَوَّدُوْا : তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর। مَا يُبْلِغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ : যা দ্বারা তোমাদের সফরের জন্য যথেষ্ট হবে। مَا يُتَّقٰى بِهٖ : যা দ্বারা বেঁচে থাকা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَنَزَلَ فِيْ أَهْلِ الْيَمَنِ الخ শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার জন্য জাহিলি যুগের হজযাত্রীদের মন-মানসিকতার অভিজ্ঞতা পূর্বশর্ত। তাই মুসান্নিফ (র.) শুরুতে আয়াতের শানে নুযূলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আরব জাহেলিয়াতের ইতিহাস লক্ষণীয়। এমনকি আজকের যুগেও ভারতবর্ষে এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যারা তীর্থযাত্রাকালে অর্থশূন্য হাতে বের হওয়াকে আধ্যাত্মিকতার শেষ মার্গ মনে করে থাকে। ওরা পথে পথে ভিক্ষার হাত বাড়াবে, অন্য কারো গলগ্রহ হয়ে উদরপূর্তি করবে আর নিজের সন্ন্যাসী ফকির হওয়াতে গর্ববোধ করবে। ইসলাম এ ধরনের কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে হুকুম দিয়েছে, হজ ও জেয়ারতের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় প্রয়োজনীয় অর্থসমগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাবে। অপরের গলগ্রহ হওয়ার মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। জাহিলি আরব যুগে এ ব্যাধি ছিল আরো বিস্তৃত। কোনো কোনো গোত্রে তো এরূপ বাড়াবাড়ি ছিল যে, ইহরামের ব্যবস্থা করার পরে যা কিছু সামগ্রী থাকত তা তারা ছুড়ে ফেলে দিত। তারা পাথেয় সঙ্গে না নিয়ে হজে যেত। এমনকি অনেকে ইহরাম বাঁধার পর তার অবশিষ্ট অর্থসামগ্রী ছুঁড়ে ফেলে দিত। ইয়েমেনবাসীদের নিয়ম ছিল, তারা হজে যাওয়ার সময় পাথেয় নিত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী। ওদিকে মক্কায় পৌঁছে তারা ভিক্ষায় নেমে যেত। আরবের এক শ্রেণির লোক পথখরচ সঙ্গে না নিয়ে হজে যেত। কেউ কেউ এমনও বলত, আল্লাহর ঘরে হজে যাওয়া হবে আর তিনি আমাদের খাওয়াবেন না, তা কি করে হয়! পরে তারা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে রাত যাপন করত। এ ধরনের কুসংস্কার, যা মিথ্যা অহমিকা ও প্রদর্শনীমূলক আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সেই সাথে যা একদিকে স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থি এবং অন্যদিকে আর্থসমাজিক ক্ষেত্রে যা অহেতুক বোঝা ও সমস্যা, ইসলামের মতো বাস্তববাদী ও গতিশীল ধর্ম এ ধরনের কুপ্রথা ও কুরীতি কি করে অনুমোদন করতে পারে? –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ فَيَكُوْنُوْنَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ : তারা বলত আমরা তাওয়াক্কুলকারী। আমরা আমাদের রবের ঘরে হজ করতে এসেছি, তিনি কি আমাদেরকে আহার দেবেন না। কিন্তু মক্কায় এসে তারা মানুষের কাছে হাত ছড়িয়ে দিত। এমনকি তা চুরি ডাকাতির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াত। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২৩৯]

مَا يُبْلِغُكُمْ : এটি উহ্য মাফউল।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٩٨. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِىْ اَنْ تَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا فَضْلاً رِزْقًا مِّنْ رَّبِّكُمْ بِالتِّجَارَةِ فِى الْحَجِّ نَزَلَ رَدًّا لِكَرَاهَتِهِمْ ذٰلِكَ فَاِذَا اَفَضْتُمْ دَفَعْتُمْ مِنْ عَرَفٰتٍ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِهَا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ بَعْدَ الْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَةَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ هُوَ جَبَلٌ فِىْ اٰخِرِ الْمُزْدَلِفَةِ يُقَالُ لَهُ قُزَحُ وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّهُ ﷺ وَقَفَ بِهٖ يَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَدْعُوْ حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهٖ وَمَنَاسِكِ حَجِّهٖ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيْلِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهٖ قَبْلَ هُدَاهُ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ .

১৯৮. হজের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাঁর নিকট হতে জীবিকা চাইতে সন্ধান করতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।

কেউ কেউ এটাকে [হজের সময় উপার্জন করাকে] নিন্দনীয় মনে করত বিধায় তাদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। যখন তোমরা আরাফা হতে সেখানে উকূফ বা অবস্থান করার পর চলে আসবে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবে তখন মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করার পর তালবিয়া অর্থাৎ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা...., .তাহলীল অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.... এবং দোয়া পাঠ করার মাধ্যমে মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করবে। 'মাশআরুল হারাম' মুযদালিফার শেষ প্রান্তরে অবস্থিত একটি পাহাড়। এটাকে 'কুযাহ'ও বলা হয়ে থাকে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে উকূফ [অবস্থান] করেছিলেন এবং [রাত্রি] অতি ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সে স্থানে দোয়া ও জিকির করেন। -[মুসলিম শরীফ]

এবং তাঁকে স্মরণ করবে কেননা, তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাদি এবং হজের বিধিবিধানের হেদায়েত করেছেন। كَمَا هَدٰكُمْ -এর كَاف অক্ষরটি تَعْلِيْلَة বা হেতুবোধক। ان كنتم -এর ان শব্দটি এ স্থানে مُثَقَّلَة [রূঢ় রূপ, তাশদীদসহ] হতে مُخَفَّفَة [লঘু বা তাশদীদহীন] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। নিশ্চয় এর পূর্বে তাঁর হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের মধ্যে ছিলে।

١٩٩. ثُمَّ اَفِيْضُوْا يَا قُرَيْشُ مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ اَىْ مِنْ عَرَفَةَ بِاَنْ تَقِفُوْا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تَرَفُّعًا عَنِ الْوُقُوْفِ مَعَهُمْ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيْبِ فِى الذِّكْرِ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمٌ بِهِمْ .

১৯৯. অতঃপর হে কুরাইশ সম্প্রদায়! অন্যান্য লোক যে স্থান হতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হতে আরাফার ময়দান হতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্তন কর। অর্থাৎ অন্যান্য লোকদের সাথে তোমরাও সেই স্থানে উকূফ [অবস্থান] কর। কুরাইশরা অহংকারবশত অন্যান্য লোকদের সাথে আরাফার ময়দানে উকূফ করত না। মুযদালিফায় উকূফ করে চলে আসত। তাই আল্লাহ তা'আলা এ স্থানে কুরাইশদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াতে ثُمَّ শব্দটি কেবলমাত্র বর্ণনানুক্রম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর আল্লাহর নিকট তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

فَاِذَا اَفَضْتُمْ : যখন তোমরা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবে। اَفَضْتُمْ শব্দটি فَاضَ الْمَاءُ থেকে নির্গত। অর্থ– পানি খুব প্রবল বেগে **প্রবাহিত হওয়া।** হাজী সাহেবগণ যেহেতু আরাফা থেকে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে তাই তাকে পানি প্রবাহিত হওয়ার সাথে **তুলনা করা হয়েছে।** اَلْوُقُوْفُ : অবস্থান করা। اَلْمَبِيْتُ : রাত্রি যাপন করা। حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا : অতি ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত। **اَفِيْضُوْا :** তোমরা দ্রুত গতিতে প্রত্যাবর্তন কর। بِاَنْ تَقِفُوْا بِهَا : তোমরা তাদের সাথে অবস্থান কর। تَرَفُّعًا : **অহংকারশত।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا শানে নুযূল : প্রাচীন আরবের জাহিলি চিন্তাধারার অন্যতম একটি এও ছিল যে, **হজের সফরে জীবিকা** উপার্জনকে তারা খারাপ মনে করত। পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় এ ভ্রান্তি অপনোদন করে দিল।

ইসলামে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির সফলতা রয়েছে : বস্তুত ইসলাম যেভাবে মানুষের পরকালীন সাফল্যের নিশ্চয়তা **দিয়ে থাকে,** তদ্রূপ ইহকালীন সাফল্যও তার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের এই ইহ-পরকালের **সমন্বয় ঘটেছে** তার নির্ধারিত প্রতিটি ইবাদতে অজু, সালাত, সালাতের জমাত, সিয়াম, জাকাত ইত্যাদি সব ইবাদতই **আত্মাকে সমুজ্জ্বল** করা এবং অভ্যন্তরকে পরিচ্ছন্ন করার সাথে সাথে পার্থিব, দৈহিক, বস্তুতান্ত্রিক ও আর্থসামাজিক উপকারিতা **ও কল্যাণে** পরিপূর্ণ। হজের ক্ষেত্রেও এ মূলনীতি পুরোপুরি কার্যকর হজের সুদীর্ঘ সফর, জল, স্থল ও বিমান পথে বন্দরের **পর বন্দর** ও দেশের পর দেশ অতিক্রম করা, উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকদের পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে **আগমন করে** এ বিশাল মহাসম্মিলনে সমবেত হওয়া শুধু ভ্রমণ বা একটু 'শুকনো ইবাদত' ও কতক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ **করার মধ্যে** সীমিত নয়। ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের জন্য এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সব ধরনের কল্যাণ এটা দিয়ে হাসিল **করা যেতে পারে** এবং তা করাই বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ فَضْلًا : এক্ষেত্রে মানুষের বিরূপ ধারণা ও মন্তব্যে এত বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসার **মালপত্র** নিয়ে মক্কা ও মিনার বাজারে উপস্থিত হলে কিংবা কোনো উটের মালিক তার উট আরাফা, মুযদালিফা ও মিনার **বাজারে** নিয়ে গেলে মনে করা হতো যে, তার হজই আদায় হয়নি এবং যদি ব্যবসাই করা হলো, তবে আর ইবাদত রইল **কোথায়?** পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় এ ভ্রান্তি অপনোদন করে দিল। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ نَزَلَ رَدًّا لِكَرَاهَتِهِمْ ذٰلِكَ : অর্থাৎ হজের সময় ব্যবসা করাতে কোনো সমস্যা নেই। আয়াতের মাঝে ব্যবসাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধও করা হয়নি এবং তার প্রতি উৎসাহিতও করা হয়নি; বরং অন্যান্য জায়েজ কাজের মতো এটাও একটি জায়েজ কাজ। তবে এখলাসের পরিপন্থি হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি হলো নিয়ত। যদি ব্যবসাই প্রধান ব্যাপার হয়ে থাকে, তাহলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু খালেসভাবে হজকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব হবে না। আর যদি উভয়টি সমান সমান হয়, তাহলে খারাপ ভালো কোনোটারই অধিকারী নয়। আর যদি হজই মুখ্য হয়ে থাকে এবং ব্যবসাটি হজের অনুগামী হয়, তাহলে ইখলাসের পরিপন্থি হবে না; বরং যদি ব্যবসার লাভের দ্বারা হজের আমলে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে তো অতিরিক্ত ছওয়াব মিলবে। আর এর ফলে হজ পালনকারী দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির কল্যাণ হাসিল করল।

–[সাবী খ. ১, পৃ. ১২৩, কামালাইন খ. ২, পৃ. ৭৩]

قَوْلُهُ فَاِذَا اَفَضْتُمْ : اِفَاضَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ– দলে দলে চলা বা প্রত্যাবর্তন করা। ফিকহের পরিভাষায় اِفَاضَةٌ বলা হয় আরাফা থেকে মুযদালিফায় গমনকে। আরাফায় হলো মক্কা মোয়ায্যামা ও তায়েফগামী পূর্বমুখী সড়কে মক্কা থেকে প্রায় ১০/১২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত কয়েক বর্গমাইলের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত একটি প্রান্তর। প্রান্তবর্তী আরাফায় নামক একটি ছোট পাহাড় থেকে এ নামের উৎপত্তি।

http://islamiboi.wordpress.com

مَشْعَرُ الْحَرَامِ : مَشْعَرٌ শব্দের অর্থ– আলামত, চিহ্ন, প্রতীক আর اَلْحَرَامُ অর্থ– সম্মানিত ও পবিত্র। এটি সম্মানসূচক বিশেষণ। এটি মুযদালিফার দুই ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যবর্তী বিশেষ স্থানটির [উপত্যকার] নাম। অবশ্য সমগ্র মুযদালিফাকেও 'আল মাশআরুল হারাম' বলা হয়। বিদ্বান সমাজে এতে দ্বিমত নেই যে, 'আল মাশআরুল হারাম' দ্বারা মুযদালিফাকেই বুঝানো হয়। প্রসিদ্ধ মতে সমগ্র মুযদালিফা-ই আল মাশআর। মুযদালিফা হচ্ছে মক্কা শরীফ থেকে ৬ মাইলের দূরত্বে। মিনা থেকে আরাফায় যাওয়ার জন্য রয়েছে একটি সোজা পথ। হাজীগণ ৯ তারিখে সে পথেই গিয়ে থাকেন। ফিরে আসার সময় বিকল্প পথ ধরে আসার হুকুম রয়েছে। একটু ঘুরে অন্য পথে আসলেই পথে পড়বে মুযদালিফা। হাজীদের সব কাফেলা ১০ তারিখের প্রথমাংশে [চাঁদের হিসাব অনুযায়ী রাত আগে দিন পরে হওয়ার ভিত্তিতে] এখানে পৌঁছে যায় এবং তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার, সালাত-ইসতিগফার করে এখানকার রাতটি কাটিয়ে দেয়। এখানে মসজিদ রয়েছে পাহাড়ের উপরে, একটি পাহাড়িকা, যেখানে ইমাম অবস্থান করেন। এটির নাম এ কারণে আল মাশআর যে, এটি ইবাদতের আলামত ও প্রতীক। আর আল হারাম বিশেষণ তার মর্যাদার কারণে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيْلِ : অর্থাৎ كَمَا هَدٰكُمْ -এর মাঝে كَافٌ বর্ণটি تَشْبِيْه বা উপমা প্রকাশের জন্য নয়, বরং তা تَعْلِيْل -এর জন্য। اَىْ اُذْكُرُوْهُ لِاَجْلِ هِدَايَتِهٖ اِيَّاكُمْ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জিকির করো এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে দীনের আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩১৬]

قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ ..... وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ : এখানে একদিকে যেমন নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর স্মরণে লেগে থাকার তাগিদ করা হয়েছে, তদ্রূপ অন্যদিকে এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, স্মরণ করার পন্থা নিজেদের আবিষ্কৃত হলে চলবে না, তা হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই নির্দেশিত। জিকির-এর হুকুমের পুনরুক্তি তাকিদের জন্য। –[তাফসীরে মাজেদী]

مُخَفَّفَةٌ : اَىْ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَالْاَصْلُ وَاِنَّكُمْ فَحُذِفَ الْاِسْمُ وَخُفِّفَتْ وَلَزِمَتِ اللَّامُ فِىْ حَذْفِهَا

قَوْلُهُ الضَّآلِّيْنَ : [ইবাদত ও আল্লাহর জিকিরের সঠিক পন্থাসমূহের ব্যাপারে।] ضَالٌّ [ضَآلِّيْنَ -এর একবচন] সব সময়ই পথাহারা বিভ্রান্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়; অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং ضَلَالٌ দ্বারা আল্লাহর বিধানসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্থ হতে পারে। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন, [اَلضَّلَالُ ضَرْبَانِ ضَلَالٌ فِى الْعُلُوْمِ النَّظَرِيَّةِ وَضَلَالٌ فِى الْعُلُوْمِ الْعَمَلِيَّةِ كَمَعْرِفَةِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِىْ هِىَ الْعِبَادَاتُ– (رَاغِبْ) অর্থাৎ اَلضَّلَالُ দু প্রকার : ১. তথ্যগত ও তাত্ত্বিক জ্ঞানে ভ্রান্ত অজ্ঞতা ২. প্রায়োগিক [প্র্যাকটিকাল] জ্ঞানে অজ্ঞতা। যেমন শরিয়তের বিধিমালা অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে এখানে এ দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ : কুরাইশের মনগড়া ধ্যানধারণাগুলোর একটি ছিল এরূপ যে, হজের সময় আমাদের আরাফায় যাওয়া কেন? সবার [সাধারণ মানুষের] সঙ্গে সেখানে যাওয়া আমাদের আভিজাত্যের পরিপন্থি। আমাদের জন্য মুযদালিফায় যাওয়াই যথেষ্ট। কুরাইশ ও তাদের অনুগামীরা মুযদালিফায় উকূফ [অবস্থান] করত, তারা, নিজেদের اَلْحُمْسُ বীররক্ষী [সম্ভবত কা'বা শরীফের রক্ষী] নামে অভিহিত করত। অন্যান্য আরবরা আরাফায় উকূফ করত। কুরাইশ এবং অন্য যারা তাদের ধর্ম অনুসারী ছিল, অর্থাৎ اَلْحُمْسُ সম্প্রদায় মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং বলত যে, আমরা তো আল্লাহর হেরেমের বাসিন্দা-খোদায়ী খিদমতগার। তারা বলত, আমরা হেরেমের বাইরে যাব না। [উল্লেখ্য আরাফায় হেরেম পরিসীমার বাইরে।] সুতরাং তারা সাধারণ জনতার সাথে আরাফায় অবস্থান পছন্দ করত না। তারা বলত, আমরা হেরেমের বাসিন্দা, হেরেমরক্ষী। আমাদের জন্য সমীচীন শুধু হেরেমকে শ্রদ্ধা করা; আমরা হিল্ল [হেরেমের বাইরের স্থান] -কে সম্মান দেখাতে পারি না। এ আয়াত এদেরই সংস্কারের লক্ষ্যে। اَلنَّاسُ দ্বারা মানবজাতি উদ্দেশ্য। –[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيْبِ فِى الذِّكْرِ : ثُمَّ এখানে সময়ের বিলম্ব বা কর্ম সম্পাদনের সময় বিন্যাসের ক্রমিকতা বুঝাবার জন্য নয়, বরং বক্তব্যে বিচ্ছিন্নতা বুঝাবার জন্য। অর্থাৎ একটি কথা শেষ হলো, এখন দ্বিতীয় নির্দেশ শোন।

বস্তুত এর দ্বারা একটি আপত্তির নিরসন করা হয়েছে। তা হলো- ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ -এর মাঝে ثُمَّ ব্যবহার দ্বারা বোঝা যায় যে, কুরাইশদেরকে প্রদত্ত আরাফায় অবস্থান করার নির্দেশটি হলো লোকজন আরাফা থেকে ফিরে মিনায় পৌঁছার পর। অথচ বাস্তবে ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা বিধান হলো সকলে عَرَفَاتٌ থেকে একই সময় রওয়ানা হবে। তাই মুফাসসির (র.) উপরিউক্ত ইবারতে জবাব দিয়েছেন। আরও একটি জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, বাক্যের মাঝে تَقْدِيْم تَاخِيْر হয়েছে। সুতরাং ثُمَّ اَفِيْضُوْا অংশটি পূর্বের وَاتَّقُوْنِ -এর সাথে مَعْطُوْف হবে আর فَاِذَا اَفَضْتُمْ তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তখন সাধারণভাবে সকল মানুষই তার মোখাতাব হবে। −[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ : যেহেতু সে পবিত্র স্থানটি হলো আল্লাহর রহমত অবতরণের অন্যতম স্থান এবং দোয়া কবুলের বিশেষ জায়গা তাই এখানে ইস্তিগফারের কথা বলা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, কোনো দিন এমন নেই, যে দিন আরাফা দিবসের চেয়ে অধিক সংখ্যক বান্দাকে দোজখ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

হজ : আদ্যপান্ত আত্মার পরিশুদ্ধির অপূর্ব ব্যবস্থা : হজের বর্ণনার শুরু থেকে লক্ষ্য করুন। আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যাপারে একটু পরপর কি পরিমাণ গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। হেরেম শরীফ বরং হেরেমের চৌহদ্দি যখন অনেক মনজিল দূরে, তখন থেকেই সারা জীবনের পরিচিত ও অভ্যস্ত পোশাক শরীর থেকে খুলে ফেলা হলো। এখন মাথায় টুপি নেই, কোনো পাগড়ি-পট্টিও নেই, শেরওয়ানি-সদরিয়া-কোট নেই, জামা-জুব্বা নেই, বাদশাহ ও ফকির, শাসক ও জনতা সকলেই দুই কাপড়ে এক লেবাসে। আর এ ইহরাম পরার সাথে সাথে সব সময়ের হারাম বিষয়গুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য, এ তালিকায় আরো সংযুক্ত হলো এমন অনেক বিষয়, যা ইতঃপূর্বে হালাল ছিল এবং সাধারণত সেগুলো হালাল। এগুলো এক দীর্ঘ সময়ের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কতই পছন্দনীয়, আকর্ষণীয়, কতই অভ্যস্ত বিষয় হাতের নাগালে থাকা ও সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও এ সময় বর্জন করতে হচ্ছেন। এতসব করেও মন ভরেনি। মুহুর্মুহু লাব্বাইক ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাক। হাজির! বান্দা হাজির!! শ্লোগানে আকাশ-বাতাস, পাহাড়-টিলা গুঞ্জরিত করতে থাক। অবিরাম আল্লাহর জিকির করতে থাক। এখন শেষ প্রান্তের কাছাকাটি এসে হুকুম পাওয়া গেল ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, কুকর্ম-কুকীর্তিগুলো স্মরণ করে সেগুলোর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাক।.........এত পূত-পবিত্র, এত পরিচ্ছন্ন এবং এত পরিশুদ্ধ সম্মিলনের সঙ্গে বিশ্বজগতের অন্য কোনো আনন্দ মেলা, অলীক ধ্যান-ধারণাপ্রসূত, কুসংস্কারমণ্ডিত, কাম স্বার্থতাড়িত মেলা অনুষ্ঠান, উৎসব আয়োজনের কোনোও তুলনা হতে পারে কি? বাস্তবতার চোখে ঠুলি পরে থাকলে কি আর করা! ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম মতবাদের সমপর্যায়ে রেখে বিচার বিশ্লেষণকারী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর এবং চোখ, কান, ও মেধার উপর কি জঘন্য অনাচারই না করে চলছে। −[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٠٠. فَاِذَا قَضَيْتُمْ اَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ عِبَادَاتِ حَجِّكُمْ بِاَنْ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقْتُمْ وَطُفْتُمْ وَاسْتَقْرَرْتُمْ بِمِنًى فَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالثَّنَاءِ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُوْنَهُمْ عِنْدَ فَرَاغِ حَجِّكُمْ بِالْمُفَاخَرَةِ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِكُمْ اِيَّاهُمْ وَنَصَبَ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ مِنْ ذِكْرِ الْمَنْصُوْبِ بِاُذْكُرُوْا اِذْ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ لَكَانَ صِفَةً لَهُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا نَصِيْبَنَا فِى الدُّنْيَا فَيُؤْتَاهُ فِيْهَا وَمَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نَصِيْبٍ.

২০০. অতঃপর যখন তোমরা অনুষ্ঠানাদি অর্থাৎ হজের ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করবে সামাধা করবে; অর্থাৎ যখন জামরা আকাবা, মস্তক মুণ্ডন, তাওয়াফ, মিনায় অবস্থান করে ফেলবে তখন তাকবীর ও ছানার [প্রশংসা করার] মাধ্যমে আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে হজ সমাপন করার পর যেমন গর্ব সহকারে তোমরা তাদের আলোচনা করতে; অথবা তোমরা তাদের যে আলোচনা করতে তদপেক্ষা গভীরভাবে। اَشَدَّ এটা اُذْكُرُوْا ক্রিয়াপদের মাধ্যমে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত ذِكْرًا হতে حَالٌ বা ভাববাচক পদ রূপে مَنْصُوْب হয়েছে। اَشَدَّ শব্দটি যদি ذِكْرًا-এর পর উল্লেখ হতো, তবে এটা তার صِفَةٌ বা বিশেষণ রূপে গণ্য হতো। মানুষের মধ্যে অনেকে বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ইহকালেই আমাদের হিস্যা দিয়ে দাও। অনন্তর ইহকালে তাদেরকে তা দিয়ে দেওয়া হয়। আর পরকালে তাদের কোনো কিছুই অংশ নেই।

٢٠١. وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً نِعْمَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً هِىَ الْجَنَّةُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِعَدَمِ دُخُوْلِهَا وَهٰذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُوْنَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْقَصْدُ بِهِ الْحَثُّ عَلَى طَلَبِ خَيْرَىِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ.

২০১. এবং তাদের মধ্যে অনেকে বলে, হে প্রভু! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ নিয়ামত দাও এবং পরকালেও কল্যাণ জান্নাত দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের আজাব হতে তাতে প্রবেশ না করিয়ে রক্ষা কর। এ স্থানে মুশরিক এবং মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, উভয় জাহানের মঙ্গলার্থে দোয়া করায় উৎসাহ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতটিতে তিনি এর পুণ্যফল দানের ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ করেন-

٢٠٢. اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ ثَوَابٌ مِنْ اَجْلِ مَا كَسَبُوْا عَمِلُوْا مِنَ الْحَجِّ وَالدُّعَاءِ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِىْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ.

২০২. যা তারা অর্জন করেছে হজ ও দোয়ার যে আমল তারা করেছে তা দ্বারা তার প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ পুণ্যফল তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণে অতি দ্রুত। হাদীসে আছে, দুনিয়ার দিনের অর্ধ দিন পরিমাণ সময়ের মধ্যে তিনি সমস্ত সৃষ্টির হিসাব সমাধা করে ফেলবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَفَاخِرَةُ : مَفْخَرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গর্ব, গৌরব গাথা يُؤْتَاهُ : তাকে প্রদান করা হয়। خَلَاقٌ : অংশ, হিসসা।

قِنَا : আমাদের রক্ষা করুন। وَقٰى يَقِىْ (ض) وِقَايَةً অর্থ– রক্ষা করা। اَلْحَثُّ : উদ্বুদ্ধ করা।

وَعْد : ওয়াদা করা হয়েছে। يُحَاسِبُ : হিসাব গ্রহণ করবেন। اَلْخَلْقُ : মাখলুক।

قَوْلُهُ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَ كُمْ : এখানে ذِكْر মাসদার كُمْ ফায়েল -এর দিকে **ইজাফত হয়েছে।** اٰبَائَكُمْ হলো তার মাফউল।

قَوْلُهُ اَوْ : কেউ বলেন– اَوْ হলো بَلْ -এর অর্থে। আর কেউ বলেন– وَاو -**এর অর্থে** ' اَىْ وَاَشَدَّ ذِكْرًا

قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِكُمْ اِيَّاهُمْ : এ ইবারতটুকু হলো مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ

قَوْلُهُ وَنُصِبَ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ : এখানে اَشَدَّ-এর মাঝে নসব হওয়ার কারণ **বর্ণনা করা হচ্ছে। আলোচনার** সারকথা হলো, اَشَدَّ ذِكْرًا এটি مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ থেকে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ **হয়েছে। আর যদি اَشَدَّ শব্দটি ذِكْرًا থেকে** مُؤَخَّرْ হতো, তাহলে صِفَةٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হতো। مَوْصُوْف نَكِرَهْ -**এর উপর যখন সিফত মুকাদ্দাম হয়, তখন তা** حَالٌ হয়ে যায়। এখানেও এ সুরতই হয়েছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩১৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : সাম্প্রদায়িক **শ্রেষ্ঠত্ব জাতীয় ঐতিহ্য** ও গৌরব, গোষ্ঠীর আভিজাত্য যেমন– আধুনিক জাহিলিয়াতের সভ্যতা-সংস্কৃতি (?) মৌলিক **উপাদান, তদ্রূপ আরবের জাহিলি ধর্মেও** তা ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান । আরবরা মিনায় সমবেত হলে প্রতিটি গোত্র স্বগোত্রের **জয়সূচক শ্লোগান** দিত, তাদের পূর্বপুরুষের কীর্তিগাথা অলঙ্কারপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে মজলিস উত্তপ্ত করত। এখানে তা বর্জন করে **আল্লাহর জিকির** করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فَاِذَا قَضَيْتُمْ اَدَّيْتُمْ : قَضٰى-এর ব্যাখ্যায় اَدّٰى আনার কারণ হলো قَضٰى যখন نَفْس فِعْل -এর সাথে مُعَلَّقٌ হয়, তখন তার অর্থ হয় اَلْاِتْمَامُ وَالْفَرَاغُ - পরিপূর্ণ করা ও অবসর হওয়া। যেমন কুরআনের বাণী– فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ «فُصِّلَتْ : ١٢» আর যখন غَيْرُ فِعْل -এর সাথে مُعَلَّقٌ হয়, তখন অর্থ হয় اَلْاِلْزَامُ – আরোপ করা, চাপিয়ে দেওয়া। যেমন কুরআনের বাণী– وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ আর যখন তা اِعْلَام -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখনও তার অর্থ اِلْزَام হবে। যেমন কুরআনের বাণী– وَقَضَيْنَا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَىْ اَعْلَمْنَاهُمْ আয়াতে প্রথমোক্ত অর্থটি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَنَاسِكَكُمْ : نُسُكًا (ن) نَسَكَ – تَطَوَّعَ بِقُرْبَةٍ অর্থ– নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। আর اَلنُّسُكُ [س ও ن উভয়টিতে পেশ দিয়ে] হলো তার থেকে اِسْم; কুরআনে কারীমে এসেছে– اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ আর اَلْمَنْسَكُ হলো সীনে ফাতহা ও কাসরাসহ কুরবানির সময় বা স্থান। তখন তার অর্থ হবে ইবাদতের স্থান। –[হাশিয়ায়ে জামাল -২৪২]

قَوْلُهُ رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ : جَمْرَةٌ -এর বহুবচন جَمَرَاتٌ এবং جِمَارٌ উভয়টি আসে। নিক্ষিপ্ত পাথর ও নিক্ষেপের স্থান উভয়টির ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার রয়েছে। তাই رَمَيْتُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ -এর অর্থ হলো– তোমরা সেই স্থানের দিকে পাথর নিক্ষেপ করেছ।

قَوْلُهُ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا : তাদের জিকিরের চেয়ে আল্লাহর জিকির বেশি পরিমাণে হবে। কেননা বাপ-দাদার অনুগ্রহ কেবল এইটুকু যে, তারা তোমাদেরকে লালনপালন করেছে; কিন্তু তারা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ পরিমাণ নিয়ামতে ধন্য করেছেন, যা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। সুতরাং এহেন পবিত্রতম স্থানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা উচিত। বাপ-দাদাদের আলোচনা অর্থহীন।

–[মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্দলভী (র.)]

http://islamiboi.wordpress.com

২০৩. وَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِالتَّكْبِيْرِ عِنْدَ رَمْىِ الْجَمَرَاتِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ اَىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةِ فَمَنْ تَعَجَّلَ اَىْ اِسْتَعْجَلَ بِالنَّفَرِ مِنْ مِنًى فِىْ يَوْمَيْنِ اَىْ فِىْ ثَانِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ بَعْدَ رَمْىِ جِمَارِهٖ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ بِالتَّعْجِيْلِ وَمَنْ تَاَخَّرَ بِهَا حَتّٰى بَاتَ لَيْلَةَ الثَّالِثِ وَرَمٰى جِمَارَهٗ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ اَىْ هُمْ مُخَيَّرُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ وَنَفْىُ الْاِثْمِ لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ فِىْ حَجِّهٖ لِاَنَّهُ الْحَاجُّ عَلَى الْحَقِيْقَةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ.

অনুবাদ :

২০৩. রমীয়ে জিমার বা কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ করে তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ আল্লাহকে স্মরণ কর। যদি কেউ দুই দিনের ভিতর অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন রমীয়ে জিমার বা কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সমাধা করার পর মিনা হতে চলে আসর ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করে শীঘ্র করে তবে এই তাড়াতাড়ি করায় তার কোনো পাপ নেই। আর যদি কেউ বিলম্ব করে এমনকি তৃতীয় রাতও সেখানে অতিবাহিত করে এবং রমীয়ে জিমার বা কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সমাধা করে তবে তাতেও তার কোনো পাপ নেই। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের এখতিয়ার রয়েছে। এই পাপ না হওয়া তার জন্য যে হজের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলেছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তিই হজ পালনকারী বলে গণ্য। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমদেরকে পরকালে তাঁর নিকট একত্র করা হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

رَمْىٌ : নিক্ষেপ করা। اَلْجَمَرَاتُ : جَمْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– কঙ্কর। تَعَجَّلَ : তাড়িতাড়ি করল।
اَلنَّفَرُ : রওয়ানা হওয়া, যাওয়া। تَاَخَّرَ : বিলম্ব করল। بَاتَ : রাত্রি যাপন করল।
مُخَيَّرُوْنَ : এখতিয়ারপ্রাপ্ত। نَفْىٌ : নাকচ করা। تُحْشَرُوْنَ : সমবেত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এদিকে হজের বয়ান চলছিল, ওদিকে আবার তখনই আল্লাহকে জিকির করার তাগিদ শুরু হয়ে গেল [কেননা অবশেষে শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ]। মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে অধিকহারে তাকবীর পাঠ সেখানকার কর্মসূচির একটি বড় অঙ্গ।

রমীয়ে জিমার সংক্রান্ত বিধান :

رَمْىُ جِمَارٍ-এর তাৎপর্য : তিনটি জামরায় তিনবার সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপের প্রসিদ্ধ কারণ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈলকে জবাই করার জন্য মিনায় যাওয়ার মুহূর্তে মসজিদের সন্নিকটে শয়তান তাকে প্ররোচিত করতে চেয়েছিল। তখন তিনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। এভাবে জামারায়ে আকাবার কাছে একই ঘটনা ঘটে। সেখান থেকেই এ আমলটি হাজীদের জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হয়। –[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১২৫]

মিনা : মক্কা মুয়াযযমা থেকে প্রায় চার মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত এমটি স্থান। এক সময় তো ধু–ধু প্রান্তর ছিল। এখন অবশ্য অনেক পাকা ইমারত ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে। কিছু সরকারি ভবনও রয়েছে। এলাকাটি প্রায় সারা বছর জনশূন্য থাকে। তবে হজের মৌসুমে এখানে পূর্ণ জনসমাগম হয়। বিত্তবান হাজীগণ বড় বড় ভবন ভাড়া নিয়ে থাকেন। এ সময় বাজারও খুব জমজমাট হয়ে যায় এবং সমগ্র পৃথিবীর পণ্যসামগ্রী এখানে বেচাকেনা হয়। হাজীদের কাফেলা আরাফা ও মুযদালিফা থেকে ফিরতি পথে সকালের দিকে এখানে পৌঁছে যায়। ১১/১২ তারিখের সন্ধ্যা পর্যন্ত তো তারা এখানেই অবস্থানরত থাকেন এবং হজ সংক্রান্ত অনেক ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব আমল এখানে পালন করা হয়। যেমন– কুরবানি করা, মাথা কামানো, শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ, ইহরামের পোশাক খুলে ফেলা ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ : এখানে اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ দ্বারা জিলহজের ১১, ১২, ১৩ উদ্দেশ্য, যাকে আইয়ামে তাশরীক বলা হয়। যে দিনগুলোতে সবকটি জমারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়। পক্ষান্তরে ১০ম তারিখে শুধু জামরায়ে আকাবাতেই পাথর মারতে হয়, তাই সেদিনটি এ বিধানের আওতায় পড়ে না। সে তিন দিনের নামাজের পর, রমীয়ে জিমারের পর এবং অন্য সময়েও বিশেষভাবে জিকির করতে হয়। মুসান্নিফ (র.) اَىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ التَّشْرِيْقِ : তাশরীক অর্থ– কুরবানির গোশত শুকানো। আইয়ামে তাশরীক হচ্ছে ১০, ১১, ১২ জিলহজ।

জ্ঞাতব্য : اَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ দ্বারা يَوْمُ النَّحْرِ তথা জিলহজের ১০, ১১, ও ১২তম তারিখ উদ্দেশ্য। আর فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ দ্বারা ১০ম তারিখ ব্যতীত ১১ ও ১২ জিলহজ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ عِنْدَ رَمْىِ الْجَمَرَاتِ : অর্থাৎ প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। এমনিভাবে প্রত্যেক নামাজের পর তাকবীর পাঠ করা এবং হাদী বা কুরবানির পশু জবাই করার সময় বলবে– بِسْمِ اللّٰهِ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا مِنْكَ وَاِلَيْكَ
–[হাশিয়ায়ে সাবী খ. ১, পৃ. ১২৫]

قَوْلُهُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ : অর্থাৎ মিনা থেকে মক্কা মুয়াযযমায় প্রত্যাবর্তনের জন্য দুটি পন্থাই অনুমোদিত। কেউ ১০ তারিখের পরে দুদিন অবস্থান করে ১২ তারিখ সন্ধ্যায় মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তা বৈধ। আবার কেউ ইচ্ছা করলে ১৩ তারিখ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করাও বৈধ।

১২ তারিখে ফিরে আসতে চাইলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সূর্যাস্তের পূর্বেই জামরায় কঙ্কর মারার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করতে হলে সূর্যাস্তের [১৩ তারিখের] আগেই কঙ্কর মেরে নেবে। যদি মিনায় সূর্যাস্ত হয়ে যায়, তাহলে রাত সেখানে কাটাবে। ১৩ তারিখ আবার সবকটি জামরায় পাথর মেরে মক্কায় চলে যাবে।

قَوْلُهُ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ : অর্থাৎ ১০ তারিখের পর শুধু দুই দিন মিনায় অবস্থান করে মক্কায় চলে গেল।

قَوْلُهُ اَىْ فِىْ ثَانِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ : অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাব মতে আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন। অর্থাৎ ১২ তারিখে। এ অংশটুকু উল্লেখ করে এ সংশয়ের অপনোদন করা হয়েছে যে, দুই দিনের প্রতিদিনই تَعَجَّلَ করা যাবে কিনা? এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ আগে যেতে চাইলে কেবল ১২ তারিখেই যেতে পারবে, ১১ তারিখে পারবে না।

قَوْلُهُ بَعْدَ رَمْىِ جِمَارِهِ : তা হলো সূর্য হেলে যাওয়ার পর এবং সূর্যাস্তের আগে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে হবে। যদি সূর্যাস্তের আগে মিনা ত্যাগ করতে না পারে তাহলে সেই রাত সেখানেই যাপন করতে হবে ৩য় দিন রমী করার জন্য। –[হাশিয়ায়ে সাবী]

قَوْلُهُ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ : কেউ ১২ তারিখে রমীয়ে জিমার করে মক্কা পৌঁছে গেলে তার কোনো পাপ নেই। অর্থাৎ তার হজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তার হজে কোনো ত্রুটি থাকবে না। আর যে আল্লাহর দেওয়া অবকাশ গ্রহণ না করে ১৩ তারিখের রমীয়ে জিমার করে গেল, তারও কোনো গুনাহ নেই। বস্তুত এখানে জাহেলিয়াতের একটি কুসংস্কার রহিত করা হয়েছে। সে যুগে কেউ তাড়াতাড়ি মক্কায় গমনকারীদেরকে পাপী মনে করত। আবার কেউ বিলম্বকারীদেরকে পাপী মনে করত। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বলে দিলেন, কাউকেই পাপী বলা যাবে না। কারণ উভয়টি পন্থাই বৈধ।

قَوْلُهُ اَىْ هُمْ مُخَيَّرُوْنَ : এ ইবারত দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন: نَفْىُ اِثْمٍ বা পাপ নাকচ করার বিষয়টি তো تَقْصِيْر বা ত্রুটির ক্ষেত্রে বলা হয়। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় দিন রমী করল সে তো কোনো ত্রুটি করল না, তারপরও এখানে نَفْىُ اِثْمٍ দ্বারা কি বুঝানো হলো?

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) هُمْ مُخَيَّرُوْنَ বলে তার জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ এ আয়াত দ্বারা এখানে উভয় ক্ষেত্রেই পাপ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বৈধতার প্রশ্নে উভয় পন্থা সমান। সুতরাং এ কথার অর্থ উভয়টির কোনো একটি উত্তম অনুত্তম না হওয়া বুঝানো বা উত্তমের বিচারে দুটিই সমান হওয়া বুঝানো নয়। হানাফী ফকীহদের মতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান অধিক উত্তম। –[তাফসীরে মাজেদী]

এ ব্যাখ্যায় হাশিয়ায়ে জামালের ইবারত লক্ষণীয়–

وَفِى الْمَقَامِ أَجْوِبَةٌ أُخْرَى . مِنْهَا مَا أَفَادَهُ السَّمِيْنُ، وَهُوَ اَنَّ هٰذَا مِنْ قُبَيْلِ الْمُشَاكَلَةِ عَلٰى حَدِّ قَوْلِهِ (تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ) (المائدة : ١١٦) وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الْكَرْخِىْ . فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ مَعْنٰى نَفْىِ الْاِثْمِ بِالتَّعْجِيْلِ وَالتَّاخِيْرِ التَّخْيِيْرُ بَيْنَهُمَا وَالرَّدُّ عَلٰى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَاِنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَثَمَ التَّعَجُّلَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَثَمَ التَّاَخُّرَ فَنَهَى الْاِثْمَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَخَيَّرَهُ، وَاِنْ كَانَ التَّاْخِيْرُ اَفْضَلَ لِاَنَّهُ يَجُوْزُ اَنْ يَقَعَ التَّخْيِيْرُ بَيْنَ الْفَاضِلِ وَالْاَفْضَلِ كَمَا خَيَّرَ الْمُسَافِرَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْاِفْطَارِ ، وَاِنْ كَانَ الصَّوْمُ اَفْضَلَ (حَاشِيَةُ الْجَمَلِ : ج ١، صـ ٢٤٥)

قَوْلُهُ وَنَفْىُ الْاِثْمِ : এ অংশটুকু উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِمَنِ اتَّقٰى হলো উহ্য মুবতাদার খবর। আর মুবতাদাটি হলো– وَنَفْىُ الْاِثْمِ

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ إِنَّهُ الْحَاجُّ : আয়াত থেকে এটাও জানা গেছে যে, ১২ কিংবা ১৩ তারিখের রমীয়ে জিমার করে যারা মক্কায় যায়, তাদের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। তারপর বলা হয়েছে এ গুনাহ ক্ষমার বিষয়টি তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ অশ্লীল কাজ বা কথা এবং ঝগড়াঝাটি থেকে বেঁচে থাকে। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করল সেই হলো প্রকৃত হাজী। অর্থাৎ সেই তার হজ দ্বারা উপকৃত, অন্য কেউ নয়। –[মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)]

চিত্রে হজের স্থানসমূহ

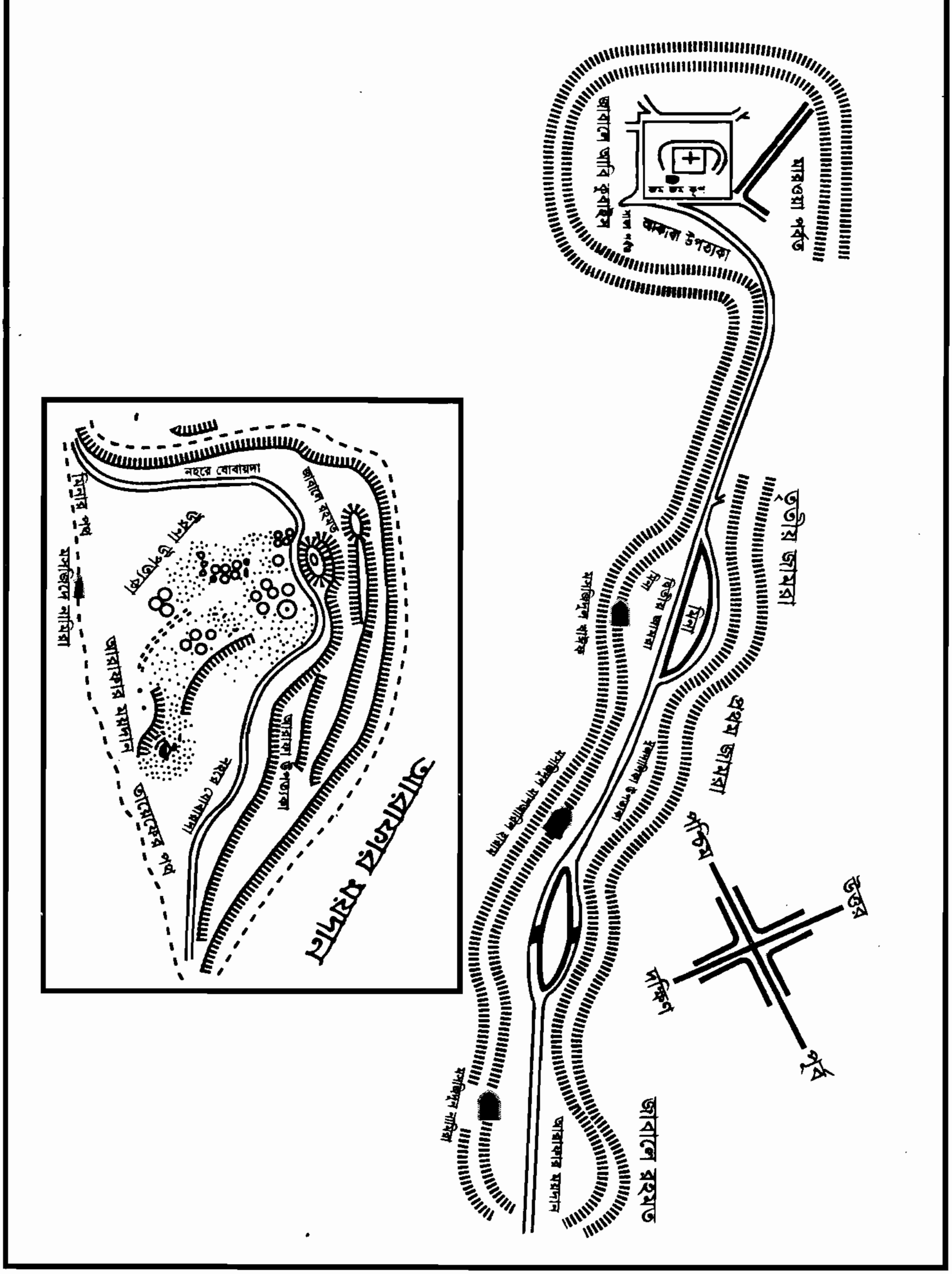

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٠٤. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْاٰخِرَةِ لِمُخَالَفَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهِ اَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ لَكَ وَلِاَتْبَاعِكَ لِعَدَاوَتِهِ لَكَ وَهُوَ الْاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ كَانَ مُنَافِقًا حُلْوَ الْكَلَامِ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَحْلِفُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِهِ وَمُحِبٌّ لَهُ فَيُدْنِيْ مَجْلِسَهُ فَاَكْذَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ ذٰلِكَ .

২০৪. মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যার পার্থিব জীবন সম্বন্ধে কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে কিন্তু যেহেতু এটা তার বিশ্বাস ও আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেহেতু পরকালে তার কথা তোমাকে চমৎকৃত করবে না। এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে যে, সেটি তার মুখের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সে হলো ঘোর কলহ প্রিয়। তোমার প্রতি শত্রুতাবশত তোমার অনুসারীগণও তোমার সাথে সে খুবই কলহপরায়ণ। এ লোকটি হলো অন্যতম মুনাফিক আখনাস ইবনে শারীক। সে রাসূল ﷺ -এর সাথে অতি মধুর কথা বলত। শপথ করে বলত যে, সে একজন মু'মিন এবং তাঁর প্রতি অতি ভালোবাসা পোষণ করে। এতে তিনি তাঁর মজলিসে তাকে নিকটে স্থান দেন। এ আয়াতে আল্লাহ তাকে [আখনাসকে] ঐ বিষয়ে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন।

٢٠٥. وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَحْرَقَهُ وَعَقَرَهَا لَيْلًا كَمَا قَالَ تَعَالٰى وَاِذَا تَوَلّٰى اِنْصَرَفَ عَنْكَ سَعٰى مَشٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اَيْ لَا يَرْضٰى بِهِ .

২০৫. একবার কোনো এক রাত্রে সে জনৈক মুসলমানের শস্যক্ষেত্র ও রক্তবর্ণের [মূল্যবান] উটের পাল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তখন সে হিংসার বশবর্তী হয়ে উক্ত শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দেয় এবং উটগুলোকে জবাই করে ফেলে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যখন সে ফিরে যায় আপনার নিকট থেকে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পায়, অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিচরণ করে, শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু বিনাশ করে। এগুলো তার অশান্তি সৃষ্টির অন্যতম। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তার এ কর্মে তিনি অসন্তুষ্ট হন।

٢٠٦. وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ فِيْ فِعْلِكَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ حَمَلَتْهُ الْاَنَفَةُ وَالْحَمِيَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْاِثْمِ الَّذِيْ اُمِرَ بِاتِّقَائِهِ فَحَسْبُهُ كَافِيْهِ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِيَ .

২০৬. যখন তাকে বলা হয় তুমি তোমার ক্রিয়াকর্মে আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান ঔদ্ধত্যপনা ও জাত্যাভিমান তাকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে। যা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত তার জন্য যথেষ্ট, আর এটা কতই না মন্দ আশ্রয়স্থল শয্যা।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

يُعْجِبُكَ : তোমাকে মুগ্ধ করে। يَشْهَدُ : সাক্ষী রাখে। مُوَافِقٌ : অনুকূল, সামঞ্জস্যপূর্ণ। اَلَدُّ : অতি ঝগড়াটে।
لِاَتْبَاعِكَ : তোমার অনুসারীদের জন্য। حُلْوُ الْكَلَامِ : মিষ্টভাষী। يَحْلِفُ : কসম করে। فَيُدْنِىْ : নিকটে স্থান দেন।
حُمُرٌ : রক্তবর্ণের উটের পাল। اَحْرَقَهُ : জ্বালিয়ে দিল। عَقَرَهَا : জবাই করে দিল। اَلْحَرْثُ : শস্যক্ষেত।
اَلنَّسْلُ : জীবজন্তু। اَلْعِزَّةُ : আত্মাভিমান। اَلْاَنَفَةُ : ঔদ্ধত্যপনা। اَنِفَ অর্থ– অহংকার করল, অপছন্দ করল।
اَلْحَمِيَّةُ : জাত্যাভিমান। اَلْمِهَادُ : শয্যা, আশ্রয়স্থল।

قَوْلُهُ يُعْجِبُكَ : اِعْجَابٌ অর্থ اِسْتِحْسَانُ الشَّئِ وَالْمَيْلُ اِلَيْهِ وَالتَّعْظِيْمُ لَهُ কোনো বস্তুকে ভালো মনে করা, তার প্রতি ঝুঁকে পড়া, সম্মান করা। ইমাম রাগেব (র.) বলেন–

اَلْعَجَبُ حَيْرَةٌ تَعْرِضُ لِلْاِنْسَانِ بِسَبَبِ الشَّئِ وَلَيْسَ هُوَ شَيْئًا فِىْ ذَاتِهِ حَالَةً حَقِيْقَةً، بَلْ هُوَ بِحَسْبِ الْاِضَافَةِ اِلَى مَنْ يَعْرِفُ السَّبَبَ وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ.

অর্থাৎ عَجَبٌ শব্দের অর্থ এমন বিস্ময়, যা কোনো বস্তুর প্রকৃত কারণ না জানার দ্বারা হয়। অথচ বস্তুটা মূলত আশ্চর্যের নয়; বরং যে কারণ জানে না, তার কাছে আশ্চর্য মনে হয় আর যে জানে তার কাছে মনে হয় না। সুতরাং اَعْجَبَنِىْ كَذَا -এর অর্থ হলো– আমার সামনে ঐ বস্তুটি এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে যে, আমি তার কারণ জানি না।

قَوْلُهُ يُشْهِدُ اللّٰهَ : شَهَادٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কসম করা। অর্থাৎ আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, তার মুখে যা আছে, সেটি তার মনেরও কথা। অথবা বলে যে, আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমার মুখের কথা অন্তরের কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ اَلَدُّ الْخِصَامِ : لَدٌّ থেকে ইসমে তাফযীল তথা আধিক্যবাচক শব্দ। অর্থ– অধিক কলহপ্রিয়। خِصَامٌ শব্দটি خاصم -এর মাসদার। যুজায (র.) বলেন, এটা خَصْمٌ -এর বহুবচন। যেমন صَعْبٌ -এর বহুবচন আসে صِعَابٌ এবং ضَخْمٌ -এর বহুবচন আসে ضِخَامٌ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীগণকে দু শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী; এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে মু'মিন; যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের কল্যাণ ও সমভাবে কামনা করে। এখানে 'নেফাক বা কপটতা ও 'এখলাস' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণি সম্পর্কে বলা হচ্ছে– কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেস বা আন্তরিকতাপূর্ণ প্রথমে মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ : وَمِنَ النَّاسِ [কতক মানুষ] কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা একজন মাত্র হওয়া জরুরি নয়; একজনও হতে পারে, একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে। কতকের [অনির্ণীত সংখ্যকের] প্রতি ইঙ্গিত। সুতরাং তা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের সম্ভাবনা রাখে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ : এর আতফ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ -এর উপর। وَمِنَ النَّاسِ তার উহ্য মুতা'আল্লিকের সাথে মিলে খবরে মুকাদ্দম। আর مَنْ يُعْجِبُكَ হলো তার মুবতাদা।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ : ব্যাখ্যাকার (র.) شَدِيْدٌ দ্বারা اَلَدُّ -এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, শব্দটি ইসমে তাফজীল নয়। কেননা এর স্ত্রীবাচক শব্দ আসে لَدَّى এবং বহুবচন আসে لُدٌّ

قَوْلُهُ وَهُوَ الْاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ : আখনাস হলো তার উপাধি। নাম হলো উবাই। اَخْنَسُ অর্থ– পিছনে থাকা। তাকে আখনাস উপাধি দেওয়ার কারণ হলো সে বদরের যুদ্ধে আবূ জেহেলের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার সময় বনু জোহরার তিনশত লোক নিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে বলেছিল, মুহাম্মদ হলো তোমাদের ভাগ্নে। যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে অন্যান্য লোকজনই তার জন্য যথেষ্ট। তোমাদের হাত তার রক্তে রঞ্জিত করার কি প্রয়োজন। আর

http://islamiboi.wordpress.com

যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে তোমরা তার কারণে সর্বাধিক ভাগ্যবান হবে। বনু জোহরার সকলে বলল, তোমার চিন্তাটি খুবই উত্তম। তখন সে বলেছিল- اِنِّىْ سَاَسْخَنُ بِكُمْ فَاتَّبِعُوْنِىْ অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে নিয়ে পিছনে রয়ে যাব আর তোমরা আমার অনুসরণ করবে।" সে থেকে তাকে আখনাস নামে উপাধি দেওয়া হয়। -[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ২৪৬]

قَوْلُهُ فَاَكْذَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَىْ بَيَّنَ كِذْبِهِ

قَوْلُهُ عَقَرَهَا لَيْلًا : عَقَرَ (ض) عَقْرًا অর্থ- জখম করা। عَقَرَ الْبَعِيْرِ بِا سَيْف অর্থ- উটের পা কেটে ফেলা ।

قَوْلُهُ وَاِذَا تَوَلّٰى : এ বাক্যটি পূর্বের يُعْجِبُكَ -এর সাথে عَطْف হতে পারে, কিংবা مُسْتَاْنِفَةٌ হতে পারে। তখন স্বতন্ত্রভাবে তার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ تَوَلّٰى، اِنْصَرَفَ عَنْكَ : تَوَلّٰى -এর তাফসীর اِنْصَرَفَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِنْصِرَافٌ অর্থে -وِلَايَتْ অর্থে নয়। যেমন কেউ কেউ বলেছেন। কেননা আয়াতটি আখনাস ইবনে শারীকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে কোনো গভর্নর ছিল না।

قَوْلُهُ يُهْلِكَ الْحَرْثَ : اَىْ بِالْاِحْرَاقِ অর্থাৎ জমিনের ফসল জ্বালিয়ে দিয়ে। اَلْحَرْثَ দ্বারা اَلزَّرْعُ কৃষিজাত ফসল উদ্দেশ্য। আর اَلنَّسْلُ দ্বারা গাধা উদ্দেশ্য। কেননা প্রাণী দ্বারা প্রাণীর বংশ বিস্তার ঘটে।

قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْخِصَامِ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর। মুবতাদাটি হলো هٰذَا অর্থাৎ وَهٰذَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ

مِنْ جُمْلَةِ الْخِصَامِ বাক্যটি বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন: لِيُفْسِدَ فِيْهَا হলো ব্যাপকতাবোধক। এর মধ্যে সর্বপ্রকারের ফ্যাসাদ শামিল রয়েছে। এরপর وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ বলার প্রয়োজন কি?

উত্তর : এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ দ্বারা এ উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এগুলো ফ্যাসাদের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ : এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা রয়েছে-

১. একবার হযরত ওমর (রা.) -কে লক্ষ্য করে জনৈক ব্যক্তি বলল- اِتَّقِ اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় করুন।' হযরত ওমর (রা.) এ কথা শোনামাত্রই বিনয়ের সাথে নিজের গণ্ডদেশকে মাটিতে রাখলেন। তিনি আয়াতের বাহ্যিক হুকুমের উপর আমল করে নিলেন। কেননা যাকে একথা প্রথমে বলা হয়েছিল সে অহংকার দেখিয়েছিল, তাই অহংকারীদের দলভুক্ত না হওয়ার জন্য তিনিও এ কথা শুনে বিনয় প্রদর্শন করেছেন।

২. এমনিভাবে বাদশা হারুনুর রশীদ (র.) সম্পর্কেও এমন ঘটনা রয়েছে। জনৈক ইহুদি এক বছর পর্যন্ত কোনো প্রয়োজনে তার দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। কিন্তু তার প্রয়োজন পূরণ হচ্ছিল না। একদিন বাদশা প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সওয়ারিতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় ইহুদি এসে সামনে দাঁড়াল এবং তাকে লক্ষ্য করে বলল- اِتَّقِ اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় করুন।' বাদশা তা শোনামাত্র সওয়ারি থেকে নেমে গেলেন এবং মাটিতে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। সেজদা থেকে মাথা তোলার পর হুকুম দিলেন ইহুদির প্রয়োজন পূরণ করে দাও। তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজন পূরণ করা হয়। বাদশা প্রাসাদে ফেরার পর কেউ জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মুমিনীন! একজন ইহুদির কথায় আপনি সঙ্গে সঙ্গে জমিনে লুটিয়ে পড়লেন, এর কারণ কি? বললেন, আমি ইহুদির কথায় এমনটি করিনি; বরং তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। তা হলো- وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ 'তাই আমি সওয়ারি থেকে নেমে সেজদা করেছিলাম।' -[তাফসীরে কুরতুবীর সূত্রে মা'আরেফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্দলভী খ. ১, পৃ. ৩১০]

قَوْلُهُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ : এটি উহ্য কসমের জবাব। উহ্য কসমটি হচ্ছে- اَلْفِرَاشُ الْمُوَطَّاُ لِلنَّوْمِ

قَوْلُهُ هِىَ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। তাহলো هِىَ -

http://islamiboi.wordpress.com

٢٠٧. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ يَبِيْعُ نَفْسَهُ اَىْ يَبْذُلُهَا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ رِضَاهُ وَهُوَ صُهَيْبٌ لَمَّا اٰذَاهُ الْمُشْرِكُوْنَ هَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَرَكَ لَهُمْ مَالَهُ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ حَيْثُ اَرْشَدَهُمْ لِمَا فِيْهِ رِضَاهُ ـ

অনুবাদ :

২০৭. মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর মর্জি লাভার্থে তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্ম-বিক্রয় করে দেয় يَشْرِىْ শব্দটি এ স্থানে বিক্রি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগিতে স্বীয় জানকে বিলীন করে দেয়। তিনি হলেন হযরত সুহাইব (রা.)। মুশরিকরা যখন তাঁকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে, তখন তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন। আর নিজের সমস্ত অর্থ-সম্পদ তাদের জন্য ছেড়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অতি দয়ার্দ্র। তাই যে বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টি বিদ্যমান, সেই দিকে তাদেরকে হেদায়েত করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ :

আয়াতের যোগসূত্র ও শানে নুযূল : আয়াতের এ অংশে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ আয়াতটি সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাজিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় সর্বদা ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

মুসতাদরাকে হাকেম, ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রা.)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কুরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারি থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূণীতে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূনীতে একটি তীরও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে আমি তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তেমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন! আমি তোমাদেরকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধনসম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কুরাইশদল রাজি হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রুমী (রা.) নিরাপদে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল ﷺ দুবার ইরশাদ করলেন– رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَايَحْيٰى، رَبِحَ الْبَيْعُ اَبَايَحْيٰى [হে আবূ ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।]

কোনো কোনো তাফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ : ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়–১. কেউ বলেন, يَشْرِىْ দ্বারা يَبِيْعُ তথা বিক্রয় করা উদ্দেশ্য। এ হিসেবে অর্থ হবে– কতিপয় মানুষ জান্নাতের বদলায় নিজেদের জান বিক্রি করে দেয়। ২. আর কেউ বলেন, يَشْرِىْ এর অর্থ يَشْتَرِىْ তথা ক্রয় করা। এ হিসেবে অর্থ হবে– কতিপয় মানুষ নেক আমল করে নিজেদের জানকে খরিদ করে নেয়। অর্থাৎ আশঙ্কাজনক এবং ভয়ানক বস্তু থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু রাজেহ বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত এটাই যে, يَشْرِىْ দ্বারা يَبِيْعُ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কতিপয় মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেদের জানকে আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তা আবার তাদের দায়িত্বেই ফিরিয়ে দেন এবং তা সংরক্ষণের জিম্মাদারিও তাদেরকেই দিয়ে থাকেন যে, এটি আমার আমানত। আমার অনুমতি ছাড়া তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে না। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ১, পৃ. ২৪৮]

ফায়দা : فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً থেকে এ পর্যন্ত মোট চার প্রকার লোকের কথা আলোচিত হয়েছে। যথা–

اَلْاَوَّلُ : رَاغِبٌ فِى الدُّنْيَا فَقَطْ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا ـ

اَلثَّانِىْ : رَاغِبٌ فِيْهَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ كَذٰلِكَ ـ

اَلثَّالِثُ : رَاغِبٌ فِى الْاٰخِرَةِ ظَاهِرًا وَفِى الدُّنْيَا بَاطِنًا ـ

اَلرَّابِعُ : رَاغِبٌ فِى الْاٰخِرَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مُعْرِضٌ عَنِ الدُّنْيَا كَذٰلِكَ ـ (جمل : ٢٤٥)

অর্থাৎ ১. বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে দুনিয়ামুখী। ২. দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টা কামনাকারী। ৩. বাহ্যিকভাবে আখিরাতমুখী এবং অন্তরিকভাবে দুনিয়ামুখী ৪. বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে আখিরাতমুখী এবং দুনিয়াবিমুখ। –[হাশিয়ায়ে জামাল : ২৪৫]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٠٨. وَنَزَلَ فِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ وَكَرِهُوْا الْاِبِلَ وَاَلْبَانِهَا بَعْدَ الْاِسْلَامِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا الْاِسْلَامُ كَافَّةً حَالٌ مِنَ السِّلْمِ اَىْ فِىْ جَمِيْعِ شَرَائِعِهٖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ طُرُقِ الشَّيْطٰنِ اَىْ تَزْيِيْنَهٗ بِالتَّفْرِيْقِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

২০৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর কতিপয় সঙ্গী [ইহুদি ধর্ম ত্যাগ করে] মুসলমান হওয়ার পরও [ইহুদি প্রথানুসারে] শনিবারের সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং উট ও তার দুধ অপছন্দ করতেন। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে মু'মিনগণ ! তোমরা ইসলামে اَلسِّلْمُ -এর س হরফটি ফাতাহ ও কাসরা উভয়সহ পাঠ করা যায়। অর্থ– ইসলাম। সম্পূর্ণরূপে كَافَّةً এটা اَلسِّلْمُ হতে حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদ। অর্থাৎ তার সকল বিধিবিধানে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক তার পথসমূহের অর্থাৎ এ বিভেদ সম্পর্কে তৎসৃষ্ট মনোহারিতার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ তার শত্রুতা সুস্পষ্ট।

٢٠٩. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِلْتُمْ عَنِ الدُّخُوْلِ فِىْ جَمِيْعِهٖ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ الْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلٰى اَنَّهٗ حَقٌّ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ لَا يُعْجِزُهٗ شَيْءٌ عَنْ اِنْتِقَامِهٖ مِنْكُمْ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ.

২০৯. **তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন অর্থাৎ** এটা সত্য, এ **কথার উজ্জ্বল প্রমাণাদি** আসার পরও যদি তোমাদের **পদস্খলন ঘটে** অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে এতে প্রবেশ করার **বিষয়টি** তোমরা উপেক্ষা কর তবে জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে কোনো কিছুই তাঁকে অপারগ করতে **সক্ষম** নয়। তিনি তাঁর ক্রিয়-কর্মে প্রজ্ঞাময়।

٢١٠. هَلْ مَا يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُ التَّارِكُوْنَ الدُّخُوْلَ فِيْهِ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ اَىْ اَمْرُهٗ كَقَوْلِهٖ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ اَىْ عَذَابُهٗ فِىْ ظُلَلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ مِنَ الْغَمَامِ السَّحَابِ وَالْمَلٰئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ تَمَّ اَمْرُ هَلَاكِهِمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِىْ.

২১০. তারা কেবল এরই অপেক্ষায় আছে هَلْ يَنْظُرُوْنَ -এর প্রশ্নবোধক শব্দ هَلْ এ স্থানে مَا [না-বাধক] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা পরিত্যাগ করেছে, তারা কেবল এরই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ; অপর একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ [তোমার প্রভুর আজাব আসবে] এ স্থানে اَمْرٌ অর্থ– আজাব, শাস্তি। ও তাঁর ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় ظُلَلٌ এটা ظُلَّةٌ -এর বহুবচন। اَلْغَمَامُ অর্থ– মেঘ। তাদের নিকট উপস্থিত হবেন তৎপর সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের ধ্বংস পূর্ণ হবে। সমস্ত বিষয় পরকালে আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُ : এটা مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য ও مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। অনন্তর তিনি এর বিনিময় ফল দান করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

عَظَّمُوا السَّبْتَ : শনিবারের সম্মান করল। كَافَّةً : সম্পূর্ণরূপে। فَإِنْ زَلَلْتُمْ : যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে। مِلْتُمْ : [যদি] উপক্ষো কর। لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ : কোনো কিছুই তাকে অপারগ করতে সক্ষম নয়। اِنْتِقَامٌ : প্রতিশোধ। صَنْعٌ : ক্রিয়া-কর্ম।
التَّارِكُونَ الدُّخُولَ فِيهِ : সম্পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করা বর্জনকারীগণ।
ظُلَلٌ : ظُلَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ- ছায়া। اَلْغَمَامُ : মেঘ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً :

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে ঈমান এবং ইখলাসের আলোচনা ছিল। এখন এ আয়াতে বলা হচ্ছে- ঈমান এবং ইখলাসের দাবি হলো দীন ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করা। ইসলামে প্রবেশ করার পর পূর্বের ধর্ম তথা ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসরণ করে কোনো কাজ না করা। এক ধর্মে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইখলাসের পরিপন্থি। শুধু তাই নয় এমনটি করা শাস্তিরও কারণ।

শানে নুযূল : হযরত ইবনে জারীর (র.) হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি দান করুন যে, আমরা শনিবারকে সম্মান করব এবং উটের গোশত বর্জন করব। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। ইহুদিদের নিকট শনিবার দিনটি সম্মানিত ছিল এবং উটের গোশত হারাম ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের ধারণা হলো যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে শনিবার ছিল মর্যাদাপূর্ণ দিবস। মুহাম্মদী শরিয়তে তার অমর্যাদা জরুরি নয়। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে উটের গোশত হারাম; কিন্তু মুহাম্মদী শরিয়তে তা ভক্ষণ করা ফরজ নয়, তবে জায়েজ। অতএব আমরা যদি পূর্বের ন্যায় শনিবার দিবসটির সম্মান করি এবং উটের গোশত হালাল হওয়ার আকিদা রাখা সত্ত্বেও তা ভক্ষণ না করি, তাহলে হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তেরও সম্মান প্রকাশ পাবে। অপরদিকে মুহাম্মদী শরিয়তেরও বিরোধিতা হবে না। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের এ ধারণার সংশোধন করেছেন। -[জামালাইন]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন : এ আয়াত থেকে যে শিক্ষাটি বড় করে ধরা দেয়, তা হলো ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। শুধু কতগুলো আকিদা-মতাদর্শ, অথবা শুধু কয়েকটি ইবাদত বা শুধু কিছু আইন-কানুনের নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে একটি স্বকীয় ও পরিব্যাপ্ত জীবনপদ্ধতি, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও তার শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত। এর প্রতিটি অঙ্গ তাঁর পূর্ণ কাঠামোর সঙ্গে এবং অন্যান্য অঙ্গগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সংযুক্ত। এখানে কোনো প্রকার কাটছাটের অবকাশ নেই। এমন হতে পারে না যে, কেউ ইসলামের তাওহীদ [একত্ববাদ] দর্শন তো মেনে নিল, কিন্তু ইবাদতের ক্ষেত্রে সে মসজিদ-মন্দির গীর্জা-মঠকে একাকার করে ফেলল। কিংবা কেউ রিসালাতের প্রতি ঈমান স্থাপন করে অর্থনীতির জন্য কার্লমার্কস ও চরিত্রনীতির জন্য গৌতম বুদ্ধের দুয়ারে ধর্ণা দিল। পরকাল, ইহকাল, সমাজ বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান ও অর্থ ব্যবস্থা -এর সবই ইসলামের নিজস্ব, যা অন্য কোনো তন্ত্র দর্শন, অন্য কোনো ধর্ম মতবাদের সঙ্গে জোড়াতালি দিতে প্রস্তুত নয়। -[তাফসীরে মাজেদী]

এ আয়াতে ঐসকল লোকদের জন্য বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে, যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ ও ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন এবং লেনদেন ও সামাজিক বিধানকে ধর্মের কোনো অংশই ভাবেন না। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষিতগণ যারা নিজেদেরকে মডার্ন জ্ঞান করে, তাদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তাভাবনা বেশি পরিলক্ষিত হয়। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ : শনিবারকে সম্মানিত মনে করা মানে সেদিন শিকার করাকে হারাম মনে করা।

قَوْلُهُ وَكَرِهُوا الْإِبِلَ : অর্থাৎ উটের গোশত খাওয়াকে অপছন্দ করল।

قَوْلُهُ وَأَلْبَانَهَا : এখানে اَلْإِبِلُ জিনস হওয়ার কারণে দুধের নিসবত তার প্রতি করা হয়েছে এবং স্ত্রীবাচক যমীর ব্যবহার করা হয়েছে।

ইহুদি ধর্মের উটের গোশত দুধ হারাম থাকার কারণ : হযরত ইয়াকুব (আ.) একবার 'আরকুন নাস' নামক রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি সুস্থতা লাভের মানত করেছিলেন যে, তিনি এ রোগ থেকে সুস্থ হলে তাঁর প্রিয় খাদ্য খাবেন না এবং প্রিয় পানীয় পান করবেন না। আর তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল উটের গোশত এবং প্রিয় পানীয় ছিল উটের দুধ। তিনি সুস্থ হলেন। ফলে নিজের উপর তা হারাম করে ফেলেন। এ হিসেবে তাঁর অনুসারী ও সন্তানদের জন্যও তা হারাম হয়ে যায়। সূরা আলে ইমরানের كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ -এর আয়াতের অধীনে এ বিষয়ে আলোচিত হবে।

-[জামালাইন খ. ১, পৃ. ২৪৮]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ السِّلْم : শাব্দিক অর্থ– সন্ধি, শান্তি, নিরাপত্তা। শব্দটি حَرْبٌ যুদ্ধ ও সংঘাতের বিপরীত অর্থবোধক। কিন্তু এখানে السِّلْم দ্বারা ইসলাম ধর্ম অর্থ নেওয়া হয়েছে।

قَالَ الْبَيْضَاوِيْ : اَلسِّلْمُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ الْاِسْتِسْلَامُ وَالطَّاعَةُ، وَلِذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى الصُّلْحِ وَالْاِسْلَامِ .

قَوْلُهُ حَالٌ مِنَ السِّلْمِ : এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের কথা খণ্ডন করেছেন যারা كَافَّةً -কে বিলুপ্ত মাসদারের সিফত বলেন। বাক্যটিকে তারা এমন মনে করেছেন اُدْخُلُوْا كَافَّةً কেননা ইবনে হিশাম বলেন, كَافَّةً শব্দটি হাল ও নাকেরা হওয়ার জন্য খাস। اَلسِّلْم শব্দটি مُؤَنَّثٌ ও مُذَكَّرٌ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয় বিধায় তার حَالٌ স্ত্রীলিঙ্গ হতে পেরেছে।

قَوْلُهُ مِنَ السِّلْمِ : এটা ঐ সকল ব্যক্তিদের কথা প্রত্যাখ্যানকল্পে যারা বলেন, كَافَّةً হলো اُدْخُلُوْا-এর যমীর থেকে হাল, কিংবা এজন্য যে, শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। আর سِلْم পুংলিঙ্গ অথবা এজন্য যে, سِلْم অর্থ ইসলামের কোনো অঙ্গ নয়। অথচ যুলহালটি শাখা তথা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হওয়া জরুরি। প্রথম দলিলের উত্তর اَلسِّلْم শব্দটি حَرْب -এর মতো। যা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় উত্তর হলো, ইসলাম দ্বারা শরিয়তের সকল আহকাম উদ্দেশ্য, আর শরিয়ত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। কাজেই سِلْم শব্দটি كَافَّةً থেকে হাল হওয়া সঙ্গত। ব্যাখ্যাকার (র.) স্বীয় উক্তি اَىْ فِىْ جَمِيْعِ شَرَائِعِهِ দ্বারা এ উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উল্লিখিত আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ এবং সাঈদ ইবনে ওমর প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সবাই ইহুদি ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ طُرُقَ : خُطُوَاتِ -এর ব্যাখ্যা طُرُقَ দ্বারা করে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, শয়তানের তো পা' নেই ।

উত্তর: এখানে হাল বলে مَحَلّ তথা রাস্তা উদ্দেশ্য।

تَزْيِيْنُهُ : اَىْ تَزْيِيْنُ الشَّيْطَانِ সুশোভিত করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা। যেমন– উটের গোশত হারাম করা এবং শনিবারকে বিশেষভাবে সম্মান দেওয়া।

زَلَلْتُمْ : زَلَّةٌ -এর শাব্দিক অর্থ– পিছলে যাওয়া, স্খলিত হওয়া, যা সাধারণত অনিচ্ছায়ই হয়ে থাকে। শব্দটি দ্বারা ভয় পাইয়ে দেওয়া হলো যে, ইচ্ছা করে ও জেনেশুনে বিরুদ্ধাচরণ তো কঠিন ব্যাপার, এমনকি ভুলক্রমে গাফলতিতে বিভ্রান্তি ক্ষেত্রেও পাকড়াও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ : مِلْتُمْ : যদি তোমরা উপেক্ষা কর। مَالَ عَنْ - مَيْلًا উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া .

قَوْلُهُ بِالتَّفْرِيْقِ الْمُخَالِفُ لَهَا : اَىْ بِتَفْرِيْقِ الْاَحْكَامِ بِالْعَمَلِ بِبَعْضِهَا الْمُوَافِقِ لِشَرِيْعَةِ مُوْسٰى وَعَدَمِ الْعَمَلِ بِالْبَعْضِ الْاٰخِرِ

قَوْلُهُ هَلْ يَنْظُرُوْنَ : এটি اِسْتِفْهَامٌ اِنْكَارِىْ অর্থাৎ তাদের জন্য আজাবের অপেক্ষা করা উচিত নয়। অর্থাৎ তারা যখন এমন কাজ করল যা আজাব ডেকে আনে, তখন যেন প্রকারান্তরে তারা আজাবের অপেক্ষা করছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ اَىْ اَمْرُهُ : **আল্লাহর আগমন-এর মর্ম** : আকাইদ ও ইসলামি মতাদর্শের একটি মৌলিক ও স্বীকৃত ধারা এরূপ যে, আল্লাহর জন্য কোনো অবস্থানক্ষেত্র বা স্থান ও পাত্র সাব্যস্ত হতে পারে না। সুতরাং ইসলামি আকিদা কি দৃষ্টে আল্লাহর জন্য গমন ও আগমনের কোনো অর্থ হয় না। এ কারণে অধিকাংশ মুফাসসির আয়াতটি মুতাশাবিহের তালিকাভুক্ত করেছেন। হযরত থানবী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার আগমন ইত্যাদির তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য ব্যস্ত হওয়া বৈধ নয়.......। তাফসীরে রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার শুধু এতটুকু লিখে ক্ষান্ত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে আসবেন, যেমনটা তাঁর মহান মহীয়ান সত্তার জন্য সমীচীন। (كَمَا يَلِيْقُ بِشَانِهِ)

অনেকে আবার আয়াতের يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ -এর মাঝে কোনো উপযুক্ত শব্দ যথা– اَمْر আদেশ অথবা بَأْس [দুর্যোগ] ইত্যাদি উহ্য ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর হুকুম এসে পড়া অর্থ– তাঁর আজাব এসে যাওয়া। বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) ও তাদেরই অনুসরণ করে اَمْرُه শব্দ উল্লেখ করে আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

قَوْلُهُ يَعْنِىْ اَنَّ الْاِسْنَادَ مَجَازِىٌّ : আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) বলেন, আয়াতের লক্ষ্য, সাধারণভাবে সকল প্রত্যাখ্যানকারী কাফের মুনাফিক ও কিতাবীদের ধরে নেওয়া। কিন্তু বর্ণনাধারা পূর্বাপর নজরে রেখে বক্তব্যের লক্ষ্য শুধু ইহুদিদের পর্যন্ত সীমিত রাখলে বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন উল্লিখিত [জটিল] তাফসীরসমূহের স্থানে শুধু ইহুদিদের ধ্যানধারণা মতে কথাটুকু সংযোজন করাই যথেষ্ট হবে। কেননা ইহুদিরা [সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার] সাদৃশ্য ও দেহাবয়ব বৈশিষ্ট্যের মতবাদ পোষণ করত এবং স্পষ্টভাবে আল্লাহর দেহধারী হওয়ার কথা বলত এবং আল্লাহর জ্যোতির্ময় প্রকাশকে

http://islamiboi.wordpress.com

মেঘমালার সঙ্গে বিশেষরূপে সম্পৃক্ত মনে করত; বরং তারা মেঘমালাকে যেন আল্লাহর বাহন সাব্যস্ত করে রেখেছিল তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ও পত্রাবলিতে আজ অবধি এ ধরনের বিবৃতি সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন– তুমি বস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি পরিধান করেছ। আকাশমণ্ডলকে চন্দ্রতাপের ন্যায় বিস্তার করেছ। তিনি জলে আপন উপরস্থ কক্ষের কড়ি কাষ্ঠ স্থাপন করেছেন। তিনি মেঘকে আপনার রথ করে থাকেন। বায়ু পক্ষের উপরে গমনাগমন করেন [গীত সংহিতা ১০৪ : ২৩]। দেখ সদাপ্রভু দ্রুতগামী মেঘে আরোহণ করে মিসরে গমন করেছেন। মিসরের প্রতিমাগণ তাঁর সক্ষাতে কাঁপবে [মিশাইয় পুস্তক ১৯ : ১] করূবগণ গৃহের দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ মেঘে পরিপূর্ণ ছিল। আর সদাপ্রভুর প্রতাপ করূপের উপর হতে উঠে গৃহের গোবরাটের উপরে দাঁড়াল। আর গৃহ মেঘে পরিপূর্ণ ও প্রাঙ্গণ সদাপ্রভুর প্রতাপের তেজে পরিপূর্ণ হল [যিহিস্কেল ১০ : ৩-৪]। মেঘের সাথে আল্লাহ তা'আলার বাহন বা সওয়ারিরূপে সম্বন্ধের কথা ইহুদি ধ্যানধারণায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এমনকি ব্রিটানিকা বিশ্বকোষের সর্বশেষ সংস্করণে আধা ইহুদি ও আধা খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণার মিশ্রণে আল্লাহ তা'আলার যে রূপ-প্রকৃতি অঙ্কন করা হয়েছে, তাতেও 'নাউযুবিল্লাহ' আল্লাহ তা'আলাকে মেঘের উপর সওয়ার দেখানো হয়েছে।

সুতরাং পবিত্র কুরআন এ আয়াতে নিজেদের কোনো ধ্যানধারণা প্রকাশ করেনি; বরং ইহুদি ধ্যানধারণার বিশুদ্ধতা বা ভ্রান্তিকে আলোচনার বিষয় না বানিয়ে শুধু তার প্রতিধ্বনি করেছে যে, ইসরাঈলীরা এ ধারণায়ই ডুবে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরসহ মেঘের উপর সওয়ার হয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হবেন এবং প্রতিটি অকাট্য বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

ইমামুল মুফাসসিরীন ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে বিষয়টির শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সেই সাথে পূর্বোক্ত সব ব্যাখ্যা হতে এটিকে অধিক প্রাঞ্জল এবং পূর্ববর্তী সবগুলোর চেয়ে এ ব্যাখ্যাটি স্পষ্টতর বলে এটিকেই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এখন আর আয়াতে কোনো রূপকতা বা অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে না।
–[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فِىْ ظُلَلٍ : فِىْ ظُلَلٍ হলো উল্লিখিত اِتْيَانٌ -এর ظَرْف - আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহমতের আকৃতিতে আজাব প্রেরণ করবেন। কেননা সাদা হালকা মেঘমালাতে সাধারণত বৃষ্টিই থেকে থাকে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কৌশল মাত্র। কেননা তারা নিজেদের ভিতরগত অস্বীকৃতিকে বাহ্যিক স্বীকারোক্তির আবরণে ঢাকার চেষ্টা করেছে। এজন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর আজাব ও রহমতের পর্দা তথা সাদা মেঘমালার আকৃতিতে প্রকাশিত হবে। আর আজাবের এ পদ্ধতিটি ভীতিপ্রদর্শনের জন্য অধিক মোবালাগাপূর্ণ। কেননা যেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে আজাব আসাটা খুবই কঠিন ব্যাপার, সেখানে রহমতের আকৃতিতে আসাটা তার চেয়েও কঠিন ব্যাপার হবে।
–[হাশিয়ায়ে জামাল, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)]

قَوْلُهُ وَالْمَلَائِكَةُ : ফেরেশতা আসার কারণ হলো ফেরেশতারা আল্লাহর আজাব আসার মাধ্যম।

قَوْلُهُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ : وَاِنَّمَا عُدِلَ عَلٰى صِيْغَةِ الْمَاضِىْ دَلَالَةً عَلٰى تَحَقُّقِهٖ، فَكَاَنَّهٗ قَدْ كَانَ ـ اَوِ الْجُمْلَةُ اِسْتِيْنَافِيَّةٌ

قَوْلُهُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ : হরফে জার এবং লফযে আল্লাহ মাজরূর পরবর্তী ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। জার মাজরূরকে مُتَعَلِّقٌ -এর পূর্বে আনার কারণে اِخْتِصَاص বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর দিকেই ...।

ফায়দা : হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাদের আগমনের ঘটনা কিয়ামতের দিন ঘটবে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে–

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِاْىْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ اَوْ يَاْتِىَ اٰيَاتُ رَبِّكَ ـ

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্র করবেন। সকলে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকবে এবং ফয়সালার অপেক্ষা করতে থাকবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় আরশ থেকে কুরসীতে অবতরণ করবেন। –[ইবনে মারদুইয়া, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) ৩১২ / ১৩]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢١١. سَلْ يَا مُحَمَّدُ بَنِيْ اِسْرَآءِيْلَ تَبْكِيْتًا كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ مُعَلِّقَةٌ سَلْ مِنَ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ وَهِيَ ثَانِيْ مَفْعُوْلَيْ اٰتَيْنَا وَمُمَيِّزُهَا مِنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ ظَاهِرَةٍ كَفَلْقِ الْبَحْرِ وَاِنْزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى فَبَدَّلُوْهَا كُفْرًا وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ اَيْ مَا اَنْعَمَ بِهٖ عَلَيْهِ مِنَ الْاٰيَاتِ لِاَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَةِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ كُفْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهٗ .

২১১. জিজ্ঞাসা করুন, হে মুহাম্মদ বনী ইসরাঈলকে লা জওয়াব করতে গিয়ে আমি প্রদান করেছি তাদেরকে কত উজ্জ্বল কত স্পষ্ট নিদর্শন যেমন– সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া, মান্না ও সালওয়া প্রেরণ ইত্যাদি। এখানে كَمْ শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ বা প্রশ্নবোধক শব্দ। এটি سَلْ শব্দটিকে তার দ্বিতীয় মাফউলে আমল করা থেকে বিরত রেখেছে। আর كَمْ হলো اٰتَيْنَا ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় মাফঊল। এর مُمَيِّزْ হলো مِنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ - কিন্তু এতদনুসারে ঈমান আনয়ন না করে তারা কুফরির মাধ্যমে এসব কিছু পরিবর্তন করে নেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পরও যে ব্যক্তি তা অর্থাৎ যে সমস্ত নিদর্শন দ্বারা তিনি অনুগ্রহ করেছেন তা কুফরির মাধ্যমে পরিবর্তন করবে আর এই নিদর্শনসমূহই তো হলো হেদায়েতের কারণ, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে শাস্তি দানে কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

تَسَلْ : জিজ্ঞাসা করুন, মূল اِسْئَلْ ছিল। مُعَلِّقَةٌ : বিরতকারী, প্রতিবন্ধক। فَلْقُ الْبَحْرِ : সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া।

اَلْعِقَابُ : শাস্তি।

تَبْكِيْتًا : লা-জবাব করা, চুপ করিয়ে দেওয়া। আর اِسْتِفْهَامْ টি জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তিরস্কার ও ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهٗ كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ مُعَلِّقَةٌ الخ : অর্থাৎ كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ টি سَلْ -কে مَفْعُوْلْ ثَانِيْ -এর মাঝে আমল করা থেকে প্রতিবন্ধক এবং নিজেই مَفْعُوْلْ ثَانِيْ -এর স্থলাভিষিক্ত, যাতে তার صَدَارَتْ كَلَامْ বাকি থাকে। –[জামালাইন]

প্রশ্ন: سَلْ তো একটি মাত্র مَفْعُوْلْ দাবি করে তার দ্বিতীয় মাফঊলের প্রয়োজন নেই। তাহলে سَلْ -কে দ্বিতীয় মাফঊলে আমল করা থেকে বারণ করার অর্থ কি?

উত্তর: سُؤَالْ যেহেতু عِلْم -এর سَبَبْ হয় আর عِلْم - اَفْعَالْ قُلُوْبْ হওয়ার কারণে দুটি مَفْعُوْلْ -এর দিকে مُتَعَدِّيْ হয় ও সবব দুটি مَفْعُوْلْ দাবি করে থাকে। সুতরাং سُؤَالْ যেহেতু عِلْمْ -এর سَبَبْ আর عِلْم হলো তার مُسَبَّبْ এবং অনেক সময় مُسَبَّبْ -এর قَائِمْ مَقَامْ হয়। এ কারণে এখানেও سَأَلْ যেহেতু عِلْم -এর قَائِمْ مَقَامْ তাই مُتَعَدِّيْ بِدُوْ مَفْعُوْلْ হয়ে গেছে।

পূর্ণ তারকীব : سَلْ এটি ফে'লে আমর। ضَمِيْر اَنْتَ তার ফায়েল, بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ হলো سَلْ -এর প্রথম মাফঊল। كَمْ تَمْيِيْز হলো كَمْ اِسْتِفْهَامِيَّة আর هُمْ হলো اٰتَيْنَا -এর প্রথম মাফঊল। مِنْ اٰيَةٍ হলো تَمْيِيْز আর (مُمَيِّزْ) كَمْ তার مُمَيِّزْ -এর সাথে মিলে اٰتَيْنَا -এর مَفْعُوْلْ ثَانِيْ مُقَدَّمْ আর اٰتَيْنَا তার ফায়েল এবং উভয় মাফঊলের সাথে জুমলা হয়ে فِعْلِيَّة جُمْلَة اِنْشَائِيَّة হয়েছে سَلْ -এর মাফঊলে ছানীর। سَلْ তার ফায়েল, মাফঊল এবং কায়েম মাকামে মাফঊল মিলে جُمْلَة اِنْشَائِيَّة هو مَقَام হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার স্পষ্ট নিষেধের পর তার বিরোধিতা করলে শাস্তি অনিবার্য। এবারে তারই সমর্থনে বলা হচ্ছে– তোমরা বনী ইসরাঈলদেরকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না, আমি তাদের নিকট কত রকমের স্পষ্ট নির্দেশাবলি পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু তারা যখন তা অমান্য করতেই থাকে, তখন তারা শাস্তিতে নিপতিত হয়। আমি প্রথমেই তাদেরকে শাস্তি দেইনি। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ مِنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍ : যখন كَمْ এবং তার مُمَيِّزْ -এর মাঝে فَصْل [দূরত্ব] হয়, তখন তার কারণে মাফঊল এবং তমীযের দূরত্ব হওয়ার কারণে مِنْ ব্যবহার করতে হয়। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন হাশিয়া ৩৬, পৃ. ৩১]

قَوْلُهُ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللّٰهِ : [ইব্দাল ...]-এর ক্রিয়ামূল] تَبْدِيْل অর্থ কোনো কিছুর মূল সত্তাকে কোনো কিছু থেকে অন্য কিছু করে দেওয়া, তাতে বিকৃতি সাধন করা, রূপ পরিবর্তন করে দেওয়া। আল্লাহর নিয়ামতসমূহে বিকৃতি ও রদবদলের একটি প্রক্রিয়া এটিও যে, হেদায়েত ও কল্যাণ লাভের জন্য আগত বিষয় সামগ্রীকে উল্টে দিয়ে সেগুলোকেই ফাসিকী-ফাজিরী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা; কিংবা এভাবে যে, যেসব বক্তব্য হেদায়েতের উপকরণ হতো, সেগুলো রদবদল, বিকৃতি ও গোপন করা শুরু হয়ে গেল তাফসীরবিদগণ এ উভয় দিকের কথাই বলেছেন।

قَوْلُهُ نِعْمَةَ اللّٰهِ : আল্লাহর নিয়ামত ব্যাপক অর্থে পার্থিব-অপার্থিব ও ধর্মীয় তথা সর্ববিধ নিয়ামতকে বুঝায়। এখানে যে কোনো নিয়ামতের বিকৃতি সাধনে কঠিন শাস্তির হুমকি উচ্চারিত হয়েছে। এখন ধর্মীয় নিয়ামতসমূহ যথা– আল্লাহর কিতাব বা নবীগণের আবির্ভাবের প্রকাশ ইত্যাদির বিকৃতি বা অস্বীকৃতি-অকৃতজ্ঞতায় আখিরাতে শাস্তির বিষয়টি সপ্রকাশ। তবে নিয়ামত পার্থিব হওয়ার ক্ষেত্রে যথা– স্বাস্থ্য, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ ও এগুলোর অপব্যবহারের মাসুল অসুস্থতা, ব্যর্থতা, অবমাননা, দারিদ্র্য, দেউলিয়াত্বের রূপে ভোগ করাও প্রত্যক্ষ বিষয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَايَةِ : এখানে مُسَبَّبْ বলে سَبَبْ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আয়াত যেহেতু হেদায়েতের কারণ এবং হেদায়েত হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত, তাই سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : এর অর্থ– কঠিন শাস্তি। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশাবলিতে পরিবর্তনের শাস্তি কঠোর। তাকে ইহজীবনে হত্যা করা হয়, তার অর্থসম্পদ লুণ্ঠিত হয় অথবা জিজিয়া আদায় করে লাঞ্ছনার জীবনযাপনে সে বাধ্য হয়। আর কিয়ামতে স্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ তো আছেই।

فَاِنَّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهٗ : প্রশ্ন জাগে এখানে لَهٗ উহ্য ধরার প্রয়োজন কি? **উত্তর :** مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ হলো مُبْتَدَأْ আর اَللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ জুমলা হয়ে খবর। অথচ খবর যখন জুমলা হয়, তখন তার একটি عَائِدْ থাকা জরুরি। এখানে لَهٗ উহ্য ধরে সেই عَائِدْ مَحْذُوْفْ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩২৮]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

২১২. زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا بِالتَّمْوِيْهِ فَاَحَبُّوْهَا وَ هُمْ يَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِفَقْرِهِمْ كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَصُهَيْبٍ اَىْ يَسْتَهْزِءُوْنَ بِهِمْ وَيَتَعَالَوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْمَالِ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَهُمْ هٰؤُلَاءِ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَىْ رِزْقًا وَاسِعًا فِى الْاٰخِرَةِ اَوْ الدُّنْيَا بِاَنْ يُمَلِّكَ الْمَسْخُوْرَ مِنْهُمْ اَمْوَالَ السَّاخِرِيْنَ وَرِقَابَهُمْ ـ

২১২. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করায় তা সুসজ্জিত। ফলে তারা তাকে ভালোবাসে। তারা মুসলিমগণকে যেমন– আম্মার, বিলাল, সুহায়ব, প্রমুখকে দরিদ্রতার কারণে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদেরকে তারা উপহাস করে এবং অর্থসম্পদের অহংকার প্রদর্শন করে। আর যারা শিরক হতে সাবধান হয়ে চলে এ দরিদ্র মু'মিনগণও হলেন এরূপ কিয়ামদের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন পরকালে তিনি প্রচুর রিজিক দান করবেন বা ইহজগতেই তিনি তাদেরকে তা দান করবেন। যেমন এই উপহাসকৃতরা একদিন উপহাসকারীদের ধন-সম্পদ ও গর্দানের [জানের] মালিক-মোক্তার হবে।

তাহকীক ও তারকীব

زُيِّنَ : সুসজ্জিত করা হয়েছে। اَلتَّمْوِيْهُ : اَىْ اَلزُّخْرُفَةُ وَالْبَهْجَةُ অর্থ– চাকচিক্য, ঔজ্জ্বল্য। فَاَحَبُّوْهَا : ফলে তারা তাকে ভালোবেসেছে। يَسْخَرُوْنَ : ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। يَتَعَالَوْنَ : অহংকার প্রদর্শন করে। اَلْمَسْخُوْرَ مِنْهُمْ : উপহাসকৃত। اَلسَّاخِرِيْنَ : উপহাসকারী। رِقَابَ : رَقَبَةٌ -এর বহুবচন অর্থ– গর্দান, জান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : [পার্থিব জীবন ও তার উপকরণ জাঁকজমক, বাগ-বাগিচা, ভবন-প্রাসাদ, মোটরকার, রেডিও, টিভি, শোরুম, সোফাসেট, ফার্নিচার ইত্যাদির অস্থায়ী ও ক্ষয়িষ্ণু হওয়া সত্ত্বেও তাদের দৃষ্টিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মান-মর্যাদার মানদণ্ডসূচক পরিগণিত হয় এবং এগুলোর প্রতি তাদের মনে বিশেষ আকর্ষণ অনুভূত হয়।] যারা কাফের, তারা এ পার্থিব জীবনের বস্তুতান্ত্রিক ও জড়জ স্বাদ উপভোগে সম্পদের মোহ ও বিলাস বিনোদনে নিমগ্ন থাকে। এগুলোকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এরই মানদণ্ডে সবকিছুর পরিমাপ করে। মূলত ওদের দৃষ্টিসীমা অতি সংকীর্ণ ও সীমিত। ওরা নামমাত্র আয়েশ-আরামের পেছনে পড়ে চিরন্তন আয়েশ ও অক্ষয় অফুরন্ত সুখভোগকে বিসর্জন দিতে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ : আল্লাহ তাদের জবাবে বলেন, তারা যে দুনিয়ার মাঝে এতটা মতোয়ারা এটা তাদের চরম মূর্খতা এবং ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। তারা জানে না এই দীন-দরিদ্ররাই কিয়ামতের দিন তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার স্তরে তাদের চেয়ে হাজার হাজার গুণ ঊর্ধ্বে ও অগ্রে অবস্থান করবে। কেননা সেদিন সবকিছুর তত্ত্ব ও বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যাবে। মু'মিনদের অবস্থান হবে ইল্লিয়্যীন-এ আর ওরা পড়ে থাকবে পৃথিবীর অতল তলে আসফালুস সাফিলীন [সিজ্জীন]-এ। –[তাফসীরে উসমানী : তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا : অর্থাৎ যারা শিরক হতে সাবধান হয়ে চলে তথা দরিদ্র মু'মিনগণ।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ : আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ইহকাল ও পরকালে অপরিমিত রিজিক দান করেন। কাজেই যে দরিদ্রদের নিয়ে কাফেররা হাসি-ঠাট্টারত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বনু কুরাইযা ও বনূ নাযীরের ধনসম্পত্তি এবং রোম-পারস্যের অধিকারী করেন। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢١٣. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً عَلَى الْإِيْمَانِ فَاخْتَلَفُوْا بِأَنْ اٰمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ اِلَيْهِمْ مُبَشِّرِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِالْجَنَّةِ مُنْذِرِيْنَ مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلَ لِيَحْكُمَ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الدِّيْنِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اَىِ الدِّيْنِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ اَىِ الْكِتٰبَ فَاٰمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ الْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِاخْتَلَفَ وَهِىَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ فِى الْمَعْنٰى بَغْيًا مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ لِلْبَيَانِ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ بِاِرَادَتِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ هِدَايَتَهٗ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ الطَّرِيْقِ الْحَقِّ ـ

২১৩. মানুষ এক মতাদর্শী ছিল অর্থাৎ সকলেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনন্তর তারা মতবিরোধিতার সৃষ্টি করে কেউ কেউ ঈমান আনয়ন করল আর কেউ কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি নবীগণকে মু'মিনদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন।

اَلْكِتٰبَ এটা একবচন হলেও এ স্থানে اَلْكُتُبَ বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত। بِالْحَقِّ এটা اَنْزَلَ ক্রিয়ার مُتَعَلِّقٌ বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট

মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে যে ধর্ম বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল এতদ্বয়ের তার মীমাংসার জন্য এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল স্পষ্ট নিদর্শন তাওহীদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি তাদের নিকট আসার পর مِنْ بَعْدِ এটা اِخْتَلَفَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট। এটা (مِنْ) এবং তৎপরবর্তী শব্দসমূহ অর্থগত দিক থেকে اِلَّا এই اِسْتِثْنَاءٌ বা ব্যত্যয়ের পূর্ববর্তী বলে বিবেচ্য। তারা কাফেররা পরস্পর বিদ্বেষ ও জেদবশত তাতে ধর্মে মতবিভেদ সৃষ্টি করে অনন্তর কেউ কেউ ঈমান আনয়ন করে, আর কেউ কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করে। যারা ঈমান আনয়ন করে তারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে, আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুমোদনে নিজ ইচ্ছায় সত্য পথে পরিচালিত করেন। مِنَ الْحَقِّ -এর مِنْ টি بَيَانِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অর্থাৎ যার হেদায়েতের ইচ্ছা করেন, তাকে সরল পথে সত্য পথে পরিচালিত করেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِاخْتَلَفَ অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ -এর তা'আল্লুক হলো اِخْتَلَفَ -এর সাথে।

قَوْلُهُ وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى : এখানে একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। **প্রশ্ন :** একটি حَرْفُ اِسْتِثْنَاءٍ -এর মাধ্যমে একাধিক اِسْتِثْنَاءٌ সঠিক নয়। অথচ এখানে এ **সুরতটিই** সংঘটিত হয়েছে। কেননা وَمَا مُسْتَثْنٰى হলো مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ এবং مُسْتَثْنٰى اَوَّلْ হলো اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ আর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো اِخْتَلَفَ فِيْهِ - ثَانِيْ

উত্তর. مِنْ এবং তৎপরবর্তী শব্দসমূহ তথা مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ **অর্থগত দিক থেকে** اِلَّا **তথা** اِسْتِثْنَاءٌ -এর পূর্ববর্তী বলে বিবেচ্য। সুতরাং اِسْتِثْنَاءٌ সঠিক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً **আয়াতের সারমর্ম :** হযরত আদম (আ.) **থেকে কিছুকাল যাবৎ একই দীন চলে আসছিল।** তারপর তার বংশধরগণ দীন নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি করে। তখন **আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। তাঁরা মু'মিন ও** অনুগতদেরকে ছওয়াবের সুসংবাদ দিতেন এবং **কাফের ও অবাধ্যদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করতেন। তাদের সঙ্গে সত্য** কিতাবও অবতীর্ণ করা হয়, যাতে **মানুষের মতবিরোধ ও কলহের নিরসন হয় এবং তাদের সে মতবিরোধ হতে সত্য দীন** নিরাপদ ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারপর **আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে** মতভেদ সেসব লোকই সৃষ্টি করে, যারা সে কিতাবসমূহ লাভ করেছিল। যেমন– ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাওরাত ও ইঞ্জীল নিয়ে মতভেদ ও তাতে বিকৃতি সাধন করেছিল। তাদের সে মতভেদ অজ্ঞতাপ্রসূত ছিল না; বরং জ্ঞাতসারেই কেবল দুনিয়ার ভালোবাসা এবং হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তারা তাতে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে মু'মিনদেরকে সত্য-সঠিক পথ দেখান এবং বিভ্রান্তিকর মতবিরোধ হতে তাদেরকে রক্ষা করেন। –[তাফসীরে উসমানী]

একটি ভ্রান্তির নিরসন : কতিপয় মূর্খ নিজেদের অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে ধর্মের ইতিহাস সংকলন করে বলে যে, মানুষ তার জীবন শুরু করেছে শিরকের অন্ধকার দ্বারা। তারপর ক্রমোন্নোতির মাধ্যমে এ অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলোর বৃদ্ধি ঘটেছে। এমনিভাবে মানুষ একত্ববাদে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন বলে, পৃথিবীতে মানুষের সূচনা ঘটেছে আলোর মধ্যেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তাকে বাতলে দিয়েছিলেন, তার জন্য সঠিক রাস্তা কোনটি এবং এ পৃথিবীর হাকিকত ও স্বরূপ কতটুকু, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত আদম জাতি সঠিক পথে অবিচল ছিল এবং একই উম্মত ছিল। এরপর মানুষ নিত্য নতুন পথের উন্মেষ ঘটাতে লাগল। বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করতে শুরু করল। তাদের এ কর্মকাণ্ড এ কারণে নয় যে, তাদের সামনে হক বিষয়টি প্রকাশ করা হয়নি; বরং তারা হক জানা সত্ত্বেও এবং কিছু মানুষ তাদের বৈধ অধিকার থেকে অগ্রসর হয়ে আরো বেশি লাভ ও উপকারিতা অর্জন করতে চেয়েছিল। ফলে পরস্পরের উপর জুলুম নির্যাতন করতে শুরু করল। এ খারাবি দূর করার জন্য বিভিন্ন নবীর আবির্ভাব ঘটানো শুরু করল। নবীদেরকে এজন্য প্রেরণ করা হয়নি যে, প্রত্যেকে নিজের নামের উপর একটি নতুন উম্মত গড়বেন এবং নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন করবেন; বরং তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাদের সামনে তাদের হারানো পথকে সুস্পষ্ট করে পুনরায় তাদেরকে একই উম্মতে পরিণত করবেন। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢١٤. وَنَزَلَ فِيْ جَهْدٍ اَصَابَ الْمُسْلِمِيْنَ اَمْ بَلْ أَ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ شِبْهُ مَا اَتَى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمِحَنِ فَتَصْبِرُوْا كَمَا صَبَرُوْا مَسَّتْهُمْ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ مُبَيِّنَةٌ لِمَا قَبْلَهَا الْبَأْسَاءُ شِدَّةُ الْفَقْرِ وَالضَّرَّاءُ الْمَرَضُ وَزُلْزِلُوْا اُزْعِجُوْا بِاَنْوَاعِ الْبَلَاءِ حَتّٰى يَقُوْلَ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ اَىْ قَالَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ اِسْتِبْطَاءً لِلنَّصْرِ لِتَنَاهِى الشِّدَّةِ عَلَيْهِمْ مَتٰى يَاْتِىْ نَصْرُ اللّٰهِ الَّذِىْ وُعِدْنَاهُ فَاُجِيْبُوْا مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ اِتْيَانُهُ.

২১৪. মুসলিমগণ কাফিরদের হাতে যে কষ্ট ও নিপীড়ন ভোগ করেন এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তোমরা কি মনে কর তোমারা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ পূর্বের মু'মিনগণ যে পরিশ্রম ও কষ্ট ভোগ করেছে তদ্রূপ অবস্থা আসেনি। সুতরাং তারা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছিল তোমরাও অনুরূপ ধৈর্যধারণ কর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল সংকট مَسَّتْهُمْ এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বিষয়টির বিবরণমূলক مُسْتَاْنِفَةٌ বা নববাক্য। ভীষণ অভাব ও দুঃখ পীড়া এবং তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল **বিভিন্ন ধরনের বিপদ**-আপদে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল; **[এমনকি] বিপদ ও কষ্টের** চূড়ান্ত ক্ষণেও সাহায্য আসতে **বিলম্ব** দেখে রাসূল ও তাঁর সাথে মু'মিনগণ পর্যন্ত বলছিল حَتّٰى يَقُوْلَ ক্রিয়াটি رَفْع ও نَصْب উভয় রূপে পাঠ করা যায়। আর এটা مَاضِىْ বা অতীতকাল অর্থে এ স্থানে ব্যবহৃত। বলে উঠেছিল, আমাদের সাথে যে সাহায্যের ওয়াদা করা হয়েছে সেই আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? অনন্তর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যুত্তর হলো হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য অর্থাৎ তার আগমন অতি নিকটে।

তাহকীক ও তারকীব

جَهْدٌ : **কষ্ট ও নিপীড়ন।** اَصَابَ : আক্রান্ত করেছে। اَلْاِصَابَةُ পৌছা, আঘাত হানা। مَثَلُ : যেরূপ, উপমা।
اَلَّذِيْنَ خَلَوْا : **পূর্ববর্তী**, যারা অতীত হয়েছেন। خَلَوْا (ن) خَلٰى : খালি হওয়া, আক্রান্ত হওয়া। اَلْمِحَنُ : পরিশ্রম ও কষ্ট, مِحْنَةٌ **-এর বহুবচন।** مَسَّتْهُمْ : তাদেরকে স্পর্শ করেছিল। مَسًّا (ن) مَسّٰى অর্থ– স্পর্শ করা। اَلْبَأْسَاءُ : ভীষণ অভাব।
اَلضَّرَّاءُ : **পীড়া**, অসুখ-বিসুখ। زُلْزِلُوْا : مَاضِىْ مَجْهُوْل جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ (فَعْلَلَةٌ) اَلزَّلْزَلَةُ অর্থ– **প্রকম্পিত করা।** اُزْعِجُوْا : مَاضِىْ مَجْهُوْل جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ, اَلْاِزْعَاجُ অর্থ– হেলিয়ে দেওয়া।
اَنْوَاعٌ : نَوْعٌ **-এর বহুবচন**, অর্থ– ধরন, প্রকার। اِسْتِبْطَاءً : বিলম্ব দেখে। لِتَنَاهِى الشِّدَّةِ : বিপদ ও কষ্টের চূড়ান্ত সময়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ : অর্থাৎ তোমরা কি মনে করেছ যে, এমনিতে বেহেশতে প্রবেশ করবে? তোমাদের উপর ঐ সকল বিষয় অতিবাহিত হবে না, যা প্রথম ঈমান গ্রহণকারীদের উপর অতিবাহিত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

শানে নুযূল : আব্দুর রাযযাক, ইবনে জারীর এবং ইবনে মুনযির (র.) কাতাদা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াত খন্দক যুদ্ধের সময় নাজিল হয়েছে। এর উদ্দেশ্য রাসূল ﷺ -এবং সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা প্রদান করা।

গযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : বিশুদ্ধ বর্ণনামতে ৫ম হিজরি সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে দশ হাজার মুশরিকদের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ অত্যধিক কষ্টের সম্মুখীন হন। এমনিতেই ছিলেন সহায়-সম্বলহীন সেই সাথে প্রচণ্ড শীতের ঋতু ছিল এবং মোকাবেলা ছিল দশ হাজার সুসজ্জিত যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তিদের সাথে। এ কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের নৈরাশ্যের অবস্থা এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জান্নাতে প্রবেশ করাকে সহজ ভাবছ? তোমাদের পূর্বে যে সকল নবী এবং তাঁদের অনুসারীগণ অতিবাহিত হয়েছে, তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা স্মরণ কর তাহলে তোমাদের নিজেদের কষ্টের অনুভব লাঘব হবে। পূর্বে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, দীনের অনুসারীদের মাথার উপর করাত রেখে শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। লোহার আংটা দ্বারা তাঁদের শরীর থেকে গোশত তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এসব জুলুম-অত্যাচার তাদেরকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অতএব তাঁরা যেরূপ ধৈর্য ধারণ করেছে, তোমরাও তদ্রূপ ধৈর্যধারণ কর। অচিরেই আল্লাহর সাহায্য আসবে। রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করা এবং তাঁদেরকে অটল ও অবিচল রাখা। তিনি ইরশাদ করলেন, অচিরেই এমন সময় আসছে যে, একজন আরোহী একাকী সান'আ থেকে 'হাজারা মাউত' ভ্রমণ করবে– সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না। –[জামালাইন]

আয়াতের শিক্ষা : মু'মিনগণকে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে এবং ধৈর্যধারণ করতে হবে। কেননা সব যুগেই আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের উম্মত শত্রুদের হাতে নিদারুণভাবে উৎপীড়িত হয়েছেন। সুতরাং পার্থিব জীবনের দুঃখকষ্ট ও শত্রুদের দাপট দেখে ঘাবড়ানো যাবে না।

قَوْلُهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ : অর্থাৎ মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে অস্থির হয়ে তাদের মুখ হতে এই নৈরাশ্যজনক কথা বের হয়ে গিয়েছিল। নবী ও মু'মিনগণের এ উক্তি কোনো সন্দেহপ্রসূত ছিল না। এতে তাদের প্রতি কোনো আপত্তি জাগতে পারে না। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

২১৫. يَسْئَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ اَىِ الَّذِىْ يُنْفِقُوْنَهُ وَالسَّائِلُ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ وَكَانَ شَيْخًا ذَا مَالٍ فَسَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَمَّا يُنْفِقُ وَعَلٰى مَنْ يُنْفِقُ قُلْ لَهُمْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ بَيَانٌ لِمَا شَامِلٌ لِلْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ وَفِيْهِ بَيَانُ الْمُنْفَقِ الَّذِىْ هُوَ اَحَدُ شِقَّىِ السُّؤَالِ وَاَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِىْ هُوَ الشِّقُّ الْاٰخَرُ بِقَوْلِهِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اَىْ هُمْ اَوْلٰى بِهِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ اِنْفَاقٍ وَغَيْرِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ .

অনুবাদ :

২১৫ হে মুহাম্মদ! লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করে যে, তারা কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নকর্তা হলেন আমর ইবনে জামূহ। তিনি ছিলেন একজন সম্পদশালী বৃদ্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কি এবং কার উপর তিনি অর্থ ব্যয় করবেন? বল, যে ধনসম্পদ ব্যয় করবে مِنْ خَيْرٍ -এটা مَاذَا يُنْفِقُوْنَ -এর مَا -এর بَيَانٌ বা বিবরণ। কম বা বেশি সকল পরিমাণ সম্পদই এর অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রশ্নের একটি অংশ অর্থাৎ কি ব্যয় করবে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ مَصْرَفٌ অর্থাৎ কাকে দেবে তার বর্ণনা সন্নিবেশিত হলো পরবর্তী فَلِلْوَالِدَيْنِ বাক্যটিতে। তা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদের জন্য। অর্থাৎ তারা তা পাওয়ার অধিক যোগ্য। উত্তম ব্যয় বা অন্য কিছু যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত। অনন্তর তিনি প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

عَمَّا يُنْفِقُ : কি খরচ করবেন। عَلٰى مَنْ يُنْفِقُ : কার উপর খরচ করবেন। شَامِلٌ : অন্তর্ভুক্তকারী।
بَيَانُ الْمُنْفَقِ : কি ব্যয় করবে তার বিবরণ। شِقَّىِ : شِقٌّ -এর দ্বিবচন। অর্থ– অংশ। اَلْمَصْرَفُ : ব্যয়ের খাত।
اِبْنُ السَّبِيْلِ: পথের ছেলে, মুসাফির।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতগুলোতে মৌলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কুফর ও মুনাফিকী ছেড়ে ইসলামে সর্বাত্মকভাবে দাখিল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জান-মাল খরচ ও সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবারে সে মূলনীতির অন্তর্গত শাখা-প্রশাখা বিবৃত হয়েছে যা জান-মাল, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। উদ্দেশ্য উক্ত মূলনীতির বিশদ ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব অন্তরে বদ্ধমূল করে তোলা । –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ : এসব লোক আপনার নিকট প্রশ্ন করে যে, তারা কি খরচ করবে? একই প্রশ্ন এ রুকূ'তেই দু আয়াত পরে হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ একই প্রশ্নের উত্তর দু আয়াতে কিছুটা ভিন্নতার সাথে প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে একটি বিষয় জানা জরুরি যে, কিসের ভিত্তি করে একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। এর রহস্য, ঘটনা এবং পরিস্থিতির উপর চিন্তাভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কি প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতের শানে নুযূল হচ্ছে– হযরত ওমর ইবনে জামূহ (রা.) রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন আমরা আমাদের সম্পদ থেকে কি খরচ করব এবং কোথায় খরচ করব? –[ইবনে মুনযির, তাফসীরে মাযহারী]

ইবনে জারীর (র.) -এর বর্ণনা মতে এ প্রশ্ন শুধু ইবনে জামূহ -এর নয়; বরং সাধারণ মুসলমানদেরও ছিল। এ প্রশ্নের দুটি অংশ রয়েছে– ক. আমাদের সম্পদ থেকে কি এবং কতটুকু খরচ করব? খ. কাদের জন্য খরচ করব?

http://islamiboi.wordpress.com

দ্বিতীয় আয়াত যা পরবর্তীতে আসছে তাও এ প্রশ্ন সংবলিত। ইবনে আবী হাতিমের **বর্ণনা মতে তার শানে নুযূল হলো, যখন** কুরআনে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের সম্পদ খরচ কর, তখন কতিপয় সাহাবী রাসূল ﷺ -এর দরবারে নিবেদন করলেন, আমাদের উপর আল্লাহর পথে ব্যয়ের যে নির্দেশ রয়েছে, আমরা তার ব্যাখ্যা জানতে চাই, কোন ধরনের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করব? এ প্রশ্নে কেবল একটি বিষয় রয়েছে অর্থাৎ কি ব্যয় করবে? ফলে উভয় প্রশ্নের ধরনের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা ঘটল। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যা বলা হয়েছে তার দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ কোথায় খরচ করবে? সেটি অধিক গুরুত্ব দিয়ে তার উত্তরটি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ কি খরচ করবে এর উত্তর অস্পষ্টভাবে দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

اَلَّذِىْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ذَا ইসমে ইশারা নয়; বরং ইসমে মওসূল। অর্থাৎ ذَا -এর তাফসীর হলো– اَلَّذِىْ টি مَا এর তাফসীর নয়। وَعَلٰى مَنْ يُنْفِقُ এ বাক্য উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন: ওমর ইবনে জামূহ -এর প্রশ্ন অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার উত্তর হয়নি। কারণ প্রশ্ন ছিল কি খরচ করবে সে সম্পর্কে, কার উপর খরচ করবে সে সম্পর্কে নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা فَلِلْوَالِدَيْنِ বলে ব্যয়ের খাত বর্ণনা করেছেন। অথচ এটা জিজ্ঞাসা ছিল না।

উত্তর : উভয় ব্যাপারেই প্রশ্ন ছিল, তবে সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে আয়াতে উল্লিখিত প্রশ্নে ব্যয়ের খাত উল্লেখ করা হয়নি। উত্তর দ্বারা প্রশ্ন বুঝা যাবে এ লক্ষ্যে তা বিলুপ্ত করা হয়েছে। مِنْ خَيْرٍ হলো مَا -এর বর্ণনা যা কমবেশি উভয়কে শামিল করে। এর মধ্যে ইঙ্গিতস্বরূপ ব্যয়ের খাতের বর্ণনা রয়েছে। তা হলো প্রশ্নের দুটি শাখার একটি। আর فَلِلْوَالِدَيْنِ হলো খাতের বর্ণনা যা প্রশ্নের দ্বিতীয় শাখা। প্রশ্নে যে বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ ছিল مَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ দ্বারা ইঙ্গিতস্বরূপ তার উত্তর দিয়েছেন। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ যা বিলুপ্ত ছিল فَلِلْوَالِدَيْنِ দ্বারা স্পষ্ট আকারে তার উত্তর দিয়েছেন। ব্যয়ের খাত তথা কাদের উপর খরচ করবে, এ বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কি খরচ করবে এবং কতটুকু খরচ করবে তা মানুষের অবস্থা ও সঠিক চিন্তার উপর মওকুফ থাকে। অবশ্য কাদের উপর খরচ করবে, এটা জানাই অধিক জরুরি, যাতে সম্পদ অপাত্রে ব্যয় না হয়। কারণ এতে সম্পদ বিনষ্ট করা হবে, উপরন্তু ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

قَوْلُهٗ فَلِلْوَالِدَيْنِ الخ : উৎকৃষ্ট ব্যয় খাতের তালিকাটি কত বিস্তৃত এবং তার ক্রমধারা কত হিকমতপূর্ণ তা অনুধাবনযোগ্য। মানুষের উপর সর্বাধিক **গুরুত্বপূর্ণ হক বা অধিকার হলো মাতাপিতার হক।** সর্বপ্রথম সম্পদ দ্বারা মাতাপিতার সেবা করতে হবে। এরপর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। **এর মধ্যে ভাই-বোন, চাচা-ফুফু সবই** এসে গেল। শরিয়ত বংশগত সম্বন্ধকে যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, এ ব্যাপারে এ আয়াতটি **সুস্পষ্ট প্রমাণ। এদের পরে উম্মতের ঐ সকল** মানুষের অধিকার রয়েছে, যারা বেঁচে থাকার সর্বাধিক আশ্রয়স্থল তথা পিতামাতার স্নেহছায়া **থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারপর আল্লাহর ঐ সকল** বান্দা, যারা কোনো প্রকার অক্ষমতার দরুন আয়-রোজগার থেকে বঞ্চিত রয়েছে **কিংবা বঞ্চিতের নিকটবর্তী হয়েছে। অর্থাৎ** যারা তাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার জন্য অন্যের সহায়তার মুখাপেক্ষী। **সর্বশেষ খাত হলো ঐ সকল সাধারণ জনগণ** যারা জন্মভূমি থেকে দূরে অবস্থানের কারণে সাময়িকভাবে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। নিকটতম এবং **দূরসম্পর্কীয়, এভাবে ধর্মীয়** সম্বন্ধ রাখে এমন ব্যক্তিবর্গ সবাই নিজ নিজ স্থানে কত সুন্দরভাবে একই সূত্রে গ্রথিত হয়েছে! **শরিয়তের উদ্দেশ্য আদৌ** এমন নয় যে, আমার প্রতিবেশী, ভাইবোন অনাহারে ছটফট করবে, আর আমরা তার প্রতি উদাসীন হয়ে চীন জাপানে দাতার রিলিফ তালিকায় নাম লেখাব।

قَوْلُهٗ هُمْ اَوْلٰى بِهٖ : এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উল্লিখিত ব্যয়ের খাতসমূহ উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে, নতুবা ব্যয়ের খাত এগুলোর মধ্যে সীমিত নয়। এসব ছাড়া ভিন্ন খাতেও ব্যয় করতে পারে। এর দ্বারা এ বিষয়টি বুঝা গেল যে, لِلْوَالِدَيْنِ -এর لَامْ অব্যয়টি اِخْتِصَاصْ -এর জন্য নয়।

قَوْلُهٗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ : এখানে خَيْرٍ তথা মঙ্গল শব্দটি ব্যাপকতা সম্পন্ন। শারীরিক, আর্থিক, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার এবং সর্বস্তরের সৎকাজকে তা অন্তর্ভুক্ত করে। এর সম্বন্ধ শুধু ব্যয় করার সাথে নয়; বরং সকল প্রকার কাজকর্মের সাথে। এ অর্থে শব্দটি অনেক ব্যাপক।

http://islamiboi.wordpress.com

٢١٦. كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ لِلْكُفَّارِ وَهُوَ كُرْهٌ مَكْرُوهٌ لَكُمْ طَبْعًا لِمَشَقَّتِهِ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوجِبَةِ لِهَلَاكِهَا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا لِأَنَّ فِيهِ إِمَّا الظَّفَرَ وَالْغَنِيمَةَ أَوِ الشَّهَادَةَ وَالْأَجْرَ وَفِي تَرْكِهِ وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ شَرًّا لِأَنَّ فِيهِ الذُّلَّ وَالْفَقْرَ وَحِرْمَانَ الْأَجْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ذٰلِكَ فَبَادِرُوا إِلَى مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ.

অনুবাদ :

২১৬. তোমাদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো তা ফরজ করা হলো যদিও স্বভাবগতভাবে তা কষ্টকর বলে অপ্রিয় অপছন্দনীয়। কিন্তু তোমাদের নিকট যা অপ্রিয়, হতে পারে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমাদের নিকট যা প্রিয়, হতে পারে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। মানুষের মন প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রতি অনুরক্ত অথচ তা ধ্বংসের কারণ এবং তা [নফস] কষ্টবরণ করা হতে পালায়নপর অথচ তা-ই [কষ্টবরণ] সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলে বিবেচ্য। সুতরাং যুদ্ধ, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয় তাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে। কেননা তাতে রয়েছে বিজয় ও গনিমতলব্ধ সম্পদ। আর তা না হলে রয়েছে শাহাদাত ও পুণ্যময় প্রতিদান। পক্ষান্তরে তা [যুদ্ধ] ত্যাগ করায় রয়েছে লাঞ্ছনা, দারিদ্র্য ও পুণ্যফল হতে বঞ্চনা, যদিও তোমাদের নিকট তা অর্থাৎ জেহাদ পরিত্যাগ করা বড় প্রিয়।
তোমাদের জন্য কি কল্যাণকর তা আল্লাহ জানেন, তোমরা তা জান না। সুতরাং তিনি তোমাদের যে বিষয়ের নির্দেশ দেন সেই দিকে তোমরা ধাবমান হও।

তাহকীক ও তারকীব

كُتِبَ عَلَيْكُمْ : তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ شَيْئًا - আল্লাহ তার উপর কোনো কিছু ফরজ করেছেন। عَلٰى যোগে كُتِبَ-এর অর্থ হয় فُرِضَ - كُرْهٌ : অপ্রিয়। طَبْعًا : স্বভাবগতভাবে। مَشَقَّةٌ : কষ্টকর। لِمَيْلِ النَّفْسِ : নফস অনুরক্ত হওয়ার কারণে। اَلْمُوجِبَةُ لِهَلَاكِهَا : ধ্বংসের কারণ। نُفُورٌ : দূরত্ব, অনাকর্ষণ। اَلتَّكْلِيفَاتُ : কষ্টবরণ। اَلظَّفَرُ : বিজয়। اَلذُّلُّ : লাঞ্ছনা। حِرْمَانٌ : বঞ্চনা। بَادِرُوا : তোমরা ধাবমান হও। ذٰلِكَ : এটা لَا تَعْلَمُونَ-এর মাফউল।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় ও যোগসূত্র : রাসূলুল্লাহ ﷺ যতদিন পবিত্র মক্কায় ছিলেন, ততদিন যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি যখন, পবিত্র মদীনায় হিজরত করেন, তখন যুদ্ধ অনুমোদিত হয়। তবে কেবল সেই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা নিজেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে সাধারণভাবে সর্বস্তরের কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়। শত্রু যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালায়, তবে তো জিহাদ ফরজে আইন আর তা না হলে ফরজে কিফায়া। তবে ফিকহী কিতাবসমূহে জিহাদের যে সমস্ত শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তা পাওয়া যেতে হবে।

–[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ : মুসলমানদের ঐ সময় জিহাদ করা ফরজ যখন তার শর্তাবলি পাওয়া যাবে। এ পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় পারায় জিহাদের কতিপয় শর্ত ও নিয়মকানুন বর্ণিত হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়গুলো পরবর্তীতে স্বস্থানে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ : নিজের প্রাণ কার নিকট প্রিয় নয়? সকল পশু নিজেকে বিপদে ফেলতে সংকোচ বোধ করে। সবাই নিজেকে রক্ষা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়; মক্কার গরিব মুহাজিরগণ যারা সবেমাত্র জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মদিনায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, তারা অর্থ-সম্পদ, মাল-আসবাব, সংখ্যাধিক্য এক কথায় কোনো দিক দিয়েই তাদের প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আসতে পারে না। এসব ভগ্নহৃদয় অভাবক্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদি যুদ্ধের নির্দেশ পেয়ে কিছুটা সংকোচবোধ করেন, তাহলে এটা তাদের ঈমানী শক্তির ক্ষেত্রে আদৌ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

قَوْلُهُ طَبْعًا : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'আলার হুকুম বিশেষভাবে যখন তা ফরজ হবে, অপছন্দ করা কুফরি।

উত্তর: স্বভাবজাত অপছন্দ কুফরি নয়। কারণ এটা মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়।

উল্লিখিত আয়াত ঐ সকল মানবতাহীন আধুনিক চিন্তাবিদদের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেছে যারা লিখেছেন যে, মুসলমানগণ গনিমতের মালের লালসায় যুদ্ধে আগ্রহী ছিল। كُرْهٌ শব্দটি মাসদার। এর অর্থ– অপছন্দনীয় অর্থাৎ মাফউল অর্থে। –[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢١٧. وَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَّلَ سَرَايَاهُ وَ اَمَّرَ عَلَيْهَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَحْشٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَقَتَلُوا ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ فِيْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ جُمَادَى الْاٰخِرَةِ وَالْتَبَسَ عَلَيْهِمْ بِرَجَبٍ فَعَيَّرَهُمُ الْكُفَّارُ بِاسْتِحْلَالِهِ فَنَزَلَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ قِتَالٍ فِيْهِ بَدَلُ اشْتِمَالٍ قُلْ لَهُمْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ عَظِيْمٌ وِزْرًا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَصَدٌّ مُبْتَدَأٌ مَنْعٌ لِلنَّاسِ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهِ وَكُفْرٌ بِهِ بِاللّٰهِ وَ صَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَيْ مَكَّةَ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ وَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُؤْمِنُوْنَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ اَكْبَرُ اَعْظَمُ وِزْرًا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْقِتَالِ فِيْهِ وَالْفِتْنَةُ الشِّرْكُ مِنْكُمْ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ لَكُمْ فِيْهِ.

২১৭. রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশের নেতৃত্বে কাফেরদের মোকাবিলায় প্রথম সারিয়্যা অর্থাৎ যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধকালে ইবনুল হাযরামী তাদের হাতে নিহত হয়। আর ঐ দিনটি ছিল জুমাদাল উখরা মাসের শেষ দিন। কিন্তু ঐ দিন রজব মাসের প্রথম তারিখ বলে তাদের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। [রজব মাস ছিল আরবে স্বীকৃত যুদ্ধ-নিষিদ্ধ মাসসমূহের অন্যতম মাস।] এতে কাফেরগণ মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড বৈধ করে নিয়েছে বলে দোষারোপ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, শাহরে হারামে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে قِتَالٍ فِيْهِ এটা بَدَلُ اشْتِمَالٍ বা সন্নিবিষ্ট স্থলাভিষিক্ত পদ। তাদের বল, তাতে যুদ্ধ করা বিরাট জিনিস, ভীষণ অন্যায়। قِتَالٌ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। كَبِيْرٌ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। কিন্তু আল্লাহর পথে অর্থাৎ দীনের পথে বাধা দান صَدٌّ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَكْبَرُ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। সে পথ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা, তাঁকে আল্লাহকে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারাম মক্কা যেতে বাধা দান করা এবং এর বাসিন্দাকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মু'মিনদেরকে সে স্থান হতে বহিষ্কার করা তাতে অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট আরো বিরাট, আরো ভীষণ পাপ। ফিতনা অর্থাৎ তোমাদের শিরক ঐ মাসে তোমাদের হত্যা করা অপেক্ষা ভীষণতর অন্যায়।

তাহকীক ও তারকীব

سَرَايَا : سَرِيَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– যোদ্ধাবাহিনী। اَمَّرَ : আমির বানিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। اِلْتَبَسَ : বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। عَيَّرَ : দোষারোপ করল, লজ্জা দিল। اِسْتِحْلَالٌ : হালাল ও বৈধ মনে করা। وِزْرٌ : অন্যায়।
صَدَّ : صَدًّا (ن) صَدَّ অর্থ– বাধা দেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঐতিহাসিক পটভূমি : দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে রাসূল ﷺ ৮ সদস্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে নাখলা নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করলেন। [নাখলা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম।] তিনি তাদেরকে এ উপদেশ দিলেন যে, কুরাইশদের গতিবিধি, কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেবে। তিনি তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দান

http://islamiboi.wordpress.com

করেননি। পথিমধ্যে তাদের সামনে কুরাইশদের একটি ছোট ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ ঘটল। তারা তাদের উপর আক্রমণ করে ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ হাজরামী নামক এক ব্যক্তিকে কতল করে ফেললেন। তাদের একজন পালিয়ে জীবন রক্ষা করল। অবশিষ্ট দুই ব্যক্তিকে ব্যবসার মাল আসবাবসহ বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনা ঘটেছিল জুমাদাল উখরার শেষ লগ্নে। তখন সন্দেহ দেখা দিল যে, এ আক্রমণ জুমাদাল উখরার শেষ তারিখে সংঘটিত হয়েছে নাকি রজবের প্রথম তারিখে? [রজব হলো যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ মাসসমূহের অন্তর্গত] কিন্তু কুরাইশরা এবং তাদের স্বপক্ষীয় ইহুদি ও মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ করল এবং কঠোর অভিযোগ করল। এ প্রসঙ্গে মুশরিকদের একটি প্রতিনিধিদল ও রাসূল ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করে। তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। এ আয়াতে তাদের অভিযোগের উত্তর এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ابْنَ الْحَضْرَمِيِّ : তার আসল নাম হলো ওমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাদ হাজরামী। হাজারা মউত নামক স্থানের প্রতি সম্বন্ধিত।

قَوْلُهُ سَرَايَا : سَرِيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– সেনাবাহিনীর একটি অংশ। পরিভাষায় ঐ সকল সেনা অভিযানকে سَرِيَّةٌ বলা হয় যাতে রাসূল ﷺ শরিক ছিলেন না। রাসূল ﷺ যাতে শরিক ছিলেন তাকে গাযওয়া বলা হয়। মোট গাযওয়া ও সারিয়্যা -এর সংখ্যা ৭০টি। সারিয়্যা চার থেকে পাঁচশত সৈন্য সংখ্যাকে বলা হয়, এর অধিককে বলা হয় جُنْدٌ;

সমস্যা ও সমাধান : মুফাসসির (র.) এ সারিয়্যাকে প্রথম সারিয়া বলে আখ্যা দিয়েছেন, অথচ মাওয়াহিব গ্রন্থে ইতঃপূর্বে আরও তিনটি সারিয়্যা ও চারটি গাজওয়া সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রথম সারিয়্যা সপ্তম হিজরি সনের রমজান মাসে প্রেরিত হয়েছিল। রাসূল ﷺ স্বীয় চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে তার সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০জন। তারপর দ্বিতীয় সারিয়্যা হলো সারিয়ায়ে উবায়দা ইবনুল হারিছ। এটা [হিজরতের অষ্টম মাস তথা শাওয়াল মাসে প্রেরিত হয়েছিল। এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ জন। তারপর তৃতীয় সারিয়্যা হলো সারিয়্যায়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস। এটা হেজাজের খেরার নামক উপত্যকায় প্রেরিত হয়েছিল। তখন ছিল হিজরতের নবম মাস জিলকদ। এর সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০ জন। এরপর চারটি গাযওয়া প্রেরিত হয়েছিল– ১. গাযওয়ায়ে অদ্দান, ২. বাওয়াত , ৩. যুল উসায়সা, ৪. বদর [প্রথম]। এরপর সারিয়্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এটা রজবের শেষে হিজরতের ১৭তম মাসে প্রেরিত হয়েছিল। কাজেই সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশকে প্রথম সারিয়া বলা প্রশ্নমুক্ত নয়।

সমাধান : এখানে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই হতে পারে যে, সর্বপ্রথম যে সারিয়ায় কেউ নিহত হয়েছে এবং গনিমতের মাল হস্তগত হয়েছে তা ছিল এটাই। এ কারণে এটাকে প্রথম সারিয়্যা বলা হয়েছে। কারণ এর পূর্বের কোনোটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি এবং কোনো গনিমতের মালও হস্তগত হয়নি। –[হাশিয়ায়ে সাবী]

قَوْلُهُ الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ بِرَجَبَ : জুমাদাল উখরার শেষ তারিখ মনে করে মুসলমানগণ হাজরামী কাফেলার উপর আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় দিন চাঁদ দেখার পরে তাদের সন্দেহ হলো। কেউ বললেন এটা গতকালের চাঁদ, কেউ বললেন আজকের চাঁদ। যদি গতকালের চাঁদ হয় তাহলে রজবের প্রথম তারিখে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। আর রজব মাসে যুদ্ধ করা হারাম। এ কারণে মুসলমানগণ চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন। অপরদিকে মক্কার মুশরিকরাও মুসলমানদের উপর অভিযোগ করতে শুরু করল যে, তোমরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধকে বৈধ মনে করেছ, এমনকি মুশরিকদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করল এবং মাসআলা জিজ্ঞেস করল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الخ.

قَوْلُهُ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنِ الخ : অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অবশ্যই অন্যায়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম তো নিজেদের জানা মতে জুমাদাল উখরায় যুদ্ধ করেছেন, নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ রজবে নয়। কাজেই তাদের এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। এতে আপত্তি করাই ন্যায়-বিরুদ্ধ। কিন্তু হরম ও পবিত্র এলাকায় কুফর বিস্তার করা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা জঘন্য অপরাধ এবং নিষিদ্ধ মাসেও মুসলমানদেরকে উৎপীড়ন করা সেই হত্যা হতে শতগুণ বেশি জঘন্য, যা মুসলমানদের দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে হয়ে গেছে। –[তাফসীরে উসমানী]

উত্তরের বিশ্লেষণ : এ আয়াতে বর্ণিত কাফেরদের আপত্তির উত্তরসমূহ আরো একটু বিস্তারিতভাবে দেওয়া যায়–

http://islamiboi.wordpress.com

وَلَا يَزَالُوْنَ اَىِ الْكُفَّارُ يُقَاتِلُوْنَكُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى كَىْ يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِلَى الْكُفْرِ اِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا وَالتَّقْيِيْدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيْدُ اَنَّهٗ لَوْ رَجَعَ اِلَى الْاِسْلَامِ لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهٗ فَيُثَابُ عَلَيْهِ وَلَا يُعِيْدُهٗ كَالْحَجِّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رح) وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অনুবাদ : হে মু'মিনগণ! তারা কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যেন حَتّٰى এ স্থানে كَىْ 'যেন' অর্থে ব্যবহৃত। তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে কুফরির দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফেররূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয় ইহকালে ও পরকালে তাদের সকল সৎ কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। বিনষ্ট হয়ে যায়। এ আমলগুলো কোনোরূপ ধর্তব্য বলে বিবেচ্য হয় না এবং এতে কোনো পুণ্যফলও পাবে না। মৃত্যুর সাথে বিজড়িত করে এ পরিণাম বর্ণনা করায় বুঝা যায় যে, যদি ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে ইসলামের দিকে ফিরে আসে, তবে আর তার ঐ পুণ্যকাজসমূহ নিষ্ফল বলে গণ্য হবে না। তখন তাকে এগুলোরও পুণ্যফল দান করা হবে। মুরতাদ হওয়ার পূর্বে কোনো ফরজ আমল করে থাকলে তা আর পুনরায় করতে হবে না। যেমন– হজ। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। তারাই অগ্নিবাসী! সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

لَايَزَالُوْنَ : সর্বদা করবে। يَرُدُّوْكُمْ : তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিতে। مَنْ يَرْتَدِدْ : যে মুরতাদ হয়ে যায়, ফিরে যায়।
حَبِطَتْ : নিষ্ফল হয়ে যায়। اِعْتِدَاءُ : ধর্তব্য। يُثَابُ عَلَيْهِ : পুণ্যফল দান করা হবে।
لَا يُعِيْدُ : পুনরায় করতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ الخ **মুশরিকদের ইসলাম বিদ্বেষ :** যতক্ষণ তোমরা সত্য দীনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ততক্ষণ এ মুশরিকরা কিছুতেই তোমাদের বিরোধিতা ও তোমাদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করতে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করবে না, তা মক্কার পবিত্র স্থান এবং পবিত্র মাসেই হোক না কেন? তারা না পবিত্র মক্কার হারাম এলাকার কোনো মর্যাদা রেখেছিল, না পবিত্র মাসের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। অহেতুক হিংসায় জ্বলে তারা মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কোনোক্রমেই মুসলিমগণের পবিত্র মক্কায় প্রবেশ ও ওমরা আদায়কে তারা সহ্য করে নিতে পারেনি। কাজেই এরূপ হঠকারী সম্প্রদায়ের নিন্দা সমালোচনার আর কি পরোয়া তোমরা করবে? তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পবিত্র মাসকে কেন বাধা মনে করা হবে?
–[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ الخ : দীন হতে ফিরে যাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি দীন ইসলাম হতে ফিরে যাওয়া এবং সে **অবস্থায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্থির থাকা এমন গুরুতর** আপদ, যা একজন লোকের জীবনভরের সৎকর্ম ধূলিসাৎ করে **দেয়। ফলে সে আর কোনোরূপ মঙ্গলের উপযুক্ত থাকে** না, ইহলোকে না জানমালের নিরাপত্তা থাকে, না বিবাহ-শাদি বহাল **থাকে, আর না সম্পত্তির উত্তরাধিকার বজায় থাকে**। সেই সঙ্গে আখিরাতেও সে কোনো ছওয়াবের অধিকারী থাকে না এবং **জাহান্নাম হতেও নিষ্কৃতি পাবে না। হ্যাঁ, পুনরায়** যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এর পরবর্তী সৎকর্মসমূহের ফলাফল সে **পুরোপুরি লাভ করবে। –[তাফসীরে উসমানী]**

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رح : উভয় মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতভেদ **রয়েছে। অর্থাৎ মুরতাদ হওয়ার** পরে যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সে মুরতাদ **হওয়ার পূর্বের কোনো ছওয়াব** পাবে না। যেমন এক ব্যক্তি নামাজ পড়ে মুরতাদ হয়ে গেল। নামাজের সময় বাকি থাকতেই **পুনরায় সে ইসলাম গ্রহণ** করল, এখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার উপর দ্বিতীয়বার নামাজ পড়া ওয়াজিব। **কেননা কুরআনের** আয়াতে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ কিন্তু ইমাম শাফেয়ী **(র.)-এর মতে উক্ত** নামাজ পুণরায় পড়া ওয়াজিব নয়।

মাসআলা : ১. দুনিয়ায় মুরতাদের আমল বিনষ্ট হওয়ার উদাহরণ হলো, বিবাহ বন্ধন থেকে স্ত্রী খারিজ হয়ে যায়। কোনো **মুসলমান নিকটা**ত্মীয় মৃত্যুবরণ করলে সে তার মিরাস থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলমান অবস্থায় সে যত নামাজ রোজা করেছিল, **তা সব নিষ্ফল** হয়ে যায়। মুরতাদের জানাজা পড়া নিষেধ। এমনকি মুসলমানদের কবরস্থানেও তাকে দাফন করা নিষেধ। **আর পরকালে** আমল বিনষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সে তার ইবাদতের কোনো ছওয়াব পাবে না। অনন্তকালের জন্য সে দোজখে প্রবিষ্ট হবে।

মাসআলা : ২. প্রকৃত কাফের ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় যদি কোনো নেক আমল থেকে থাকে, তাহলে আমলের ছওয়াব ঝুলন্ত থাকে। কখনও ইসলাম গ্রহণ করলে অতীতের সকল নেক কাজের ছওয়াব সে লাভ করে। আর কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায়; পরকালে সে কোনো ছওয়াব পাবে না।

মাসআলা : ৩. মুরতাদের প্রকৃত অবস্থা প্রকৃত কাফেরের চেয়ে জঘন্যতম। কাফেরের থেকে জিজিয়া কর গ্রহণ করা যায়; কিন্তু মুরতাদ থেকে জিজিয়া কবুল করা বৈধ নয়। মুরতাদ যদি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে পুরুষ হলে তাকে হত্যা করতে হবে, আর নারী হলে আজীবন তাকে বন্দী করে রাখতে হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢١٨. وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ اَنَّهُمْ اِنْ سَلِمُوْا مِنَ الْاِثْمِ فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ اَجْرٌ نَزَلَ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فَارَقُوْا اَوْطَانَهُمْ وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِاِعْلَاءِ دِيْنِهٖ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ثَوَابَهٗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمٌ بِهِمْ .

২১৮. উক্ত সারিয়্যায় [যোদ্ধাদলে] অংশগ্রহণকারীদের এ ধারণা হয় যে, পাপ হতে বেঁচে গেলাম বটে, কিন্তু ঐ জিহাদের শরিক হওয়ার কোনো ছওয়াব আমাদের হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– যারা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে অর্থাৎ স্বদেশ ভূমি পরিত্যাগ করে এবং তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ তার পুণ্যফল প্রত্যাশা করে। আল্লাহ মু'মিনদের বিষয়ে ক্ষমাপরায়ণ, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٢١٩. يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْقِمَارِ مَا حُكْمُهُمَا قُلْ لَهُمْ فِيْهِمَا اَيْ فِيْ تَعَاطِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ عَظِيْمٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ لِمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا مِنَ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوْلِ الْفُحْشِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ بِاللَّذَّةِ وَالْفَرَحِ فِي الْخَمْرِ وَاِصَابَةِ الْمَالِ بِلَا كَدٍّ فِي الْمَيْسِرِ وَاِثْمُهُمَا اَيْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ اَكْبَرُ اَعْظَمُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَلَمَّا نَزَلَتْ شَرِبَهَا قَوْمٌ وَامْتَنَعَ اٰخَرُوْنَ اِلٰى اَنْ حَرَّمَتْهُمَا اٰيَةُ الْمَائِدَةِ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ اَيْ مَا قَدْرَهٗ قُلْ اَنْفِقُوا الْعَفْوَ اَيِ الْفَاضِلَ عَنِ الْحَاجَةِ وَلَا تُنْفِقُوْا مَا تَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِ وَتُضَيِّعُوْا اَنْفُسَكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيْرِ هُوَ كَذٰلِكَ اَيْ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ .

২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও মায়সির জুয়া অর্থাৎ এতদুভয়ের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাদেরকে বল, উভয়ের মধ্যে এতদুভয়ের লেনদেন অবলম্বনে বিরাট পাপ মহাপাপ। كَبِيْرٌ এটা অপর এক কেরাতে ب -এর স্থলে তিন নোকতা বিশিষ্ট ث সহকারে كَثِيْرٌ রূপে পঠিত রয়েছে। কেননা এগুলোর কারণে কলহ-বিবাদ, গালিগালাজ এবং কটুভাষণ হয়। এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারও রয়েছে মদে স্বাদ উপভোগ ও আনন্দ লাভ হয়। আর জুয়ায় বিনা প্ররিশ্রমে অর্থ সমাগম হয়। কিন্তু এতদুভয়ের পাপ অর্থাৎ এতদুভয়ের মাধ্যমে যে অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা হয়, তা উপকার অপেক্ষা অধিক বিরাট। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরও মুসলমানদের একদল মদ পান করতেন ও অপর দল তা হতে বিরত রইলেন। শেষে সূরা মায়েদায় উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এতদুভয়কে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কি অর্থাৎ কি পরিমাণ তারা ব্যয় করবে? বল, যা উদ্বৃত্ত অর্থাৎ যা প্রয়োজনাতিরিক্ত, তা ব্যয় কর। যা তোমার প্রয়োজন তা [অন্যের জন্য] ব্যয় করো না ও নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন তোমাদের বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

اَلْعَفْوُ এটা অপর এক কেরাতে رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তার পূর্বে [مُبْتَدَأ উদ্দেশ্যরূপে] هُوَ শব্দটি উহ্য বলে বিবেচ্য হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

ظَنَّ : ধারণা করল। سَلِمُوْا : বেঁচে গেল। فَارَقُوْا : বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ত্যাগ করেছে।

أَوْطَانَ : وَطَنٌ -এর বহুবচন। অর্থ– স্বদেশ, মাতৃভূমি। يَرْجُوْنَ : তারা আশা করে। اَلْخَمْرُ : মদ, শরাব। اَلْمَيْسِرُ : জুয়া।

تَعَاطِيْ : লেনদেন। اَلْمُخَاصَمَةُ : কলহ-বিবাদ। مُشَاتَمَةٌ : গালিগালাজ। كَدٌّ : পরিশ্রম, কষ্ট। يَنْشَأُ : সৃষ্টি হয়।

اَلْمَفَاسِدُ : বিশৃঙ্খলা। اِمْتَنَعَ : বিরত রইল।

اَلْعَفْوَ : উদ্বৃত্ত। اَلْفَاضِلُ عَنِ الْحَاجَةِ : প্রয়োজনাতিরিক্ত। مَا تَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِ : যা তোমাদের প্রয়োজন। لَا تُضَيِّعُوْا اَنْفُسَكُمْ : নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না।

قَوْلُهُ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْعَفْوَ বিলুপ্ত ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে।

প্রশ্ন: এটাকে هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর বললে অসুবিধা কি?

উত্তর: তখন প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা থাকত না। কেননা প্রশ্ন হলো জুমলায়ে ফে'লিয়া। আর উত্তর হলো জুমলায়ে ইসমিয়া। আর এখন উভয়টি ফে'লিয়া হয়ে গেল।

كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ -এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, كَذٰلِكَ -এর মধ্যে كَافْ পরে উল্লিখিত يُبَيِّنُ -এর বিলুপ্ত মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে মানসূব অর্থাৎ تِبْيِيْنًا مِثْلَ هٰذَا التَّبْيِيْنِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا الخ : পূর্বের আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত সাহাবায়ে কেরাম তো একথা জানতে পারলেন যে, এ ঘটনা সম্পর্কে আমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তাদের এ সন্দেহ ছিল যে, সে যুদ্ধের কোনো ছওয়াব লাভ হবে কিনা? এ পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় যে, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং মহান আল্লাহর পথে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে সে যুদ্ধে তাদের কোনো ব্যক্তিস্বার্থও ছিল না, তারা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে। তারা এর উপযুক্ত। আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। এরূপ অনুগত বান্দাদের তিনি কিছুতেই বঞ্চিত করবেন না। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ : خَمْر ও مَيْسِر তথা মদ ও জুয়া শব্দ দুটি নিজ নিজ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মদের অধীনে ঐ সকল নেশাদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত যা মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। এভাবে জুয়া শব্দটি তার সকল ধরন ও প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। মদ ও জুয়া বর্তমানে যেভাবে ইংরেজ সভ্যতায় শুধু বৈধই নয়; বরং সভ্যতার বিশেষ অঙ্গ এবং সামাজিক মর্যাদার দলিল। এভাবে প্রাচীন আরব যুগেও তা সভ্যতার পরিচায়ক ছিল। শুধু আরবেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের এ পরিস্থিতি ছিল। হিন্দু, মিশরীয় সভ্যতা, রোমীয় সভ্যতা ইত্যাদির মধ্যে তো অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হতো। এমনকি ইসরাঈলী ও খ্রিস্টীয় সভ্যতা যা নবুয়তের মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কেবল ইসলামি শরিয়তই বিশ্বের অদ্বিতীয় কানুন, যা এসে তা অকাট্য হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে এটা সর্বপ্রথম আয়াত। অকাট্য হারাম হওয়ার বিধান পরবর্তীকালে অবতীর্ণ হয়েছে। মদ ও জুয়া সংশ্লিষ্ট প্রথম বিধানের কেবল অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করে ক্ষান্ত করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে তা হারাম হওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়ার জন্য মানুষের মন প্রস্তুত হয়ে যায়। এর পরে মদ পান করে নামাজ পড়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে– لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى "তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।" এর পর মদ জুয়া এবং এ ধরনের সকল বিষয়কে অকাট্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فِىْ تَعَاطِيْهِمَا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ ও মূল জুয়ার সত্তার মাঝে কোনো পাপ নেই; বরং তা কাজে বাস্তবায়ন করা ও ব্যবহারের মধ্যে পাপ রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِثْمُهُمَا -এর মধ্যে সববের প্রতি মাসদারের ইযাফত হয়েছে।

مَا يَنْشَأُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ এটা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো **দ্বিরুক্তির** অভিযোগ নিরসন করা।

অভিযোগ নিরসন : পূর্বে উল্লিখিত يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ -এর মধ্যে মূল ব্যয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল, আর এখানে ব্যয়ের পরিমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। **কাজেই এখানে এর দ্বিরুক্তি নেই।**

মদের আধুনিকায়ন : আল্লামা আলূসী বাগদাদী (র.) এ স্থানে **বিস্তারিতভাবে লিখেছেন** যে, আমাদের যুগে ফাসিকরা নেশা জাতীয় বিভিন্ন পানীয় **বস্তুর সুন্দর সুন্দর নাম** রেখেছেন। **যেমন– ইরক, অম্বরী** ইত্যাদি। কিন্তু মনে রাখতে **হবে** নাম পরিবর্তনের দ্বারা **কখনো বস্তুর** হাকিকত বা প্রকৃতি পরিবর্তন **হয় না এবং এর দ্বারা শরিয়তের** বিধানেরও কোনো তারতম্য **ঘটে না। মদকদ্রব্য সর্বাবস্থায় হারাম।** –[জামালাইন]

মদ ও জুয়া দ্বারা সামাজিক ক্ষতি : মদ পানের মাধ্যমে এ যাবৎ যত **অনিষ্ট ঘটেছে এবং ঘটছে** তা কারো অজানা নয়। অশ্লীল গালমন্দ ও বেহায়াপনা, হারাম কাজের প্রতি আহ্বান, **কলহ-দ্বন্দ্ব, বিভিন্নরূপ জীবন-বিনাশী** রোগের উদ্ভব, চুরি ডাকাতিতে উৎসাহ প্রদান, এমনকি মানুষকে হত্যা করা, বন্ধু-বান্ধবের **মাঝে জুতা-লাঠি উত্তোলন** করা ইত্যাদি সর্বপ্রকার গর্হিত কাজ মদ পানের মাধ্যমে অহরহ ঘটেই থাকে। উপরন্তু **জুয়ার ধ্বংসাত্মক পরিণামে** না জানি কত বংশ ও পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। ইংরেজদের সর্বাধিক বৃহৎ জুয়াখানা মন্টেকার্লোতে প্রতি বছর সীমাহীন সম্পদ **বিনষ্ট** হয়। দেওয়ালী উৎসবের রাতে হিন্দুস্থানে কি কিছুই ঘটে না? এতদসত্ত্বেও জুয়ার আধুনিক রূপকাঠামো, বিভিন্ন বীমা কোম্পানির নামে জুয়া, রেকোর্সের জুয়া, লটারি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অসংখ্য জুয়া প্রচলিত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ **আল্লাহর পথে ব্যয়ের পরিমাণ :** মহান আল্লাহর পথে কি পরিমাণ **অর্থ ব্যয় করতে হবে?** নির্দেশ হলো, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে। কেননা আখিরাতের ন্যায় **ইহকালের জন্যও চিন্তা থাকা** চাই। সমুদয় অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজ প্রয়োজন কিভাবে মেটানো হবে? যেসব দায়-দায়িত্ব **তোমার** উপর চাপানো রয়েছে তা পূরণ করবে কি উপায়ে? এভাবে কে জানে তোমরা তখন কত রকম ইহকালীন ও **পরকালীন** অনিষ্টের শিকার হবে। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

২২০. فِى اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَتَأْخُذُوْنَ بِالْاَصْلَحِ لَكُمْ فِيْهِمَا وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى وَمَا يَلْقَوْنَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِىْ شَأْنِهِمْ فَاِنَّهُمْ فَاِنْ وَاكَلُوْهُمْ يَأْثَمُوْا وَاِنْ عَزَلُوْا مَا لَهُمْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَصَنَعُوْا لَهُمْ طَعَامًا وَحْدَهُمْ فَحَرَجٌ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ فِىْ اَمْوَالِهِمْ بِتَنْمِيَتِهَا وَمُدَاخَلَتُكُمْ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ ذٰلِكَ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ اَىْ تَخْلِطُوْا نَفَقَتَهُمْ بِنَفَقَتِكُمْ فَاِخْوَانُكُمْ اَىْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ شَاْنِ الْاَخِ اَنْ يُخَالِطَ اَخَاهُ اَىْ فَلَكُمْ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ لِاَمْوَالِهِمْ بِمُخَالَطَتِهِ مِنَ الْمُصْلِحِ لَهَا فَيُجَازِىْ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ بِتَحْرِيْمِ الْمُخَالَطَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهِ.

২২০. ইহকাল ও পরকালের বিষয় সম্বন্ধে। অনন্তর উভয় স্থানে যা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর, তা যেন গ্রহণ করে নিতে পার। লোকে তোমাকে এতিম ও এদের বিষয়ে তাদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যদি তাদের সাথে একত্রে তাদের আহারের ব্যবস্থা করে তবে হতে হয় গুনাহগার, আর যদি ধন-সম্পত্তি আলাদা করে রাখা হয় এবং আলাদাভাবে তাদের আহারের ব্যবস্থা করতে হয় তাতে নানা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। বল, তাদেরকে অর্থাৎ এতিমদের ধন-সম্পত্তিতে প্রবৃদ্ধি সাধন করে এবং তাদের বিষয়ে ব্যাপৃত হয়ে তাদের সুব্যবস্থ করা তা পরিত্যাগ করা অপেক্ষা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে তোমাদের সংমিশ্রণ করে নাও অর্থাৎ তোমাদের ব্যয়-ভারের সাথে তাদের ব্যয়-ভারেরও সংমিশ্রণ করে নাও তবে তারা তো তোমাদের দীনি ভাই। আর ভাইতো ভাইকে একত্রে সংমিশ্রণ করতে পারে। অর্থাৎ অনুরূপ কাজ তোমরা করতে পার। আল্লাহ জানেন সম্পদের সংমিশ্রণ করে তাদের ধন-সম্পত্তির বিষয়ে কে হিতকারী আর কে তার অনিষ্টকারী। অনন্তর তিনি উভয়কেই প্রতিদান প্রদান করবেন।

আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন অর্থাৎ এ সংমিশ্রণ নিষিদ্ধ করে তোমাদের উপর বিষয়টি সংকীর্ণ করে দিতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রান্ত, তাঁর নির্দেশের বিষয়ে তিনি প্রবল এবং তাঁর কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْاَصْلَحُ : অধিক কল্যাণকর। اَلْيَتٰمٰى : يَتِيْمٌ -এর বহুবচন। অর্থ– এতিম, অনাথ। مَا يَلْقَوْنَهُ : যার সম্মুখীন হয়। اَلْحَرَجُ : অসুবিধা। فَاِنْ وَاكَلُوْهُمْ : যদি তাদের সাথে একত্রে তাদের আহারের ব্যবস্থা করে। يَأْثَمُوْا : গুনাহগার হতে হয়। وَاِنْ عَزَلُوْا : যদি আলাদা করে দেয়। تَنْمِيَةٌ : প্রবৃদ্ধি সাধন। مُدَاخَلَةٌ : শরিক করা। وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ : যদি সংমিশ্রণ কর। مُخَالَطَةٌ : সংমিশ্রণ। لَاَعْنَتَكُمْ : তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। لَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ : তোমাদের উপর বিষয়টি সংকীর্ণ করে দিতে পারতেন।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : অর্থাৎ ইহকাল নশ্বর, কিন্তু নানা রকম প্রয়োজনের স্থান। আর পরকাল অবিনশ্বর এবং সেটা পুরস্কার লাভের জায়গা। তাই চিন্তাভাবনা করে উভয় স্থানের জন্য তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করা উচিত। দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণকে সামনে রেখেই অর্থ ব্যয় করা দরকার। বিধিবিধান স্পষ্ট করে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এটাই যে, তোমরা চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পাবে। -[তাফসীরে উসমানী]

এতিমের সম্পদ ব্যয় নির্বাহের পদ্ধতি : কতিপয় লোক এতিমের অর্থ-সম্পত্তিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করত না। তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল- وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ [সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না।]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

"যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে।"

এর ফলে যারা এতিমদের লালনপালন করত, তারা ভয় পেয়ে যায়। তারা এতিমদের খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় খরচাদি পৃথক করে ফেলে। কেননা একত্রে থাকলে অনেক সময় এতিমেরটাও খাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে নতুন এক সমস্যা দেখা দিল। এতিমের জন্য কোনো কিছু তৈরি করার পর যা বেঁচে থাকত, তা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, যা ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। এই সতর্কতার ফলে উল্টো এতিমের ক্ষতি হতে লাগল। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উত্থাপিত হলে তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ **এতিমের কল্যাণ উদ্দেশ্য হওয়া চাই :** উদ্দেশ্য তো কেবল এতিমদের অর্থসম্পদ রক্ষা ও তার সুব্যবস্থা করা। কাজেই যে ক্ষেত্রে পৃথক করলে এতিমের উপকার হয়, সে ক্ষেত্রে পৃথক করাই বাঞ্ছনীয় আর যেখানে একত্র করাই লাভজনক মনে হয়, সেখানে যদি তাদের খরচাদি তোমাদের সাথে একত্র করে নাও এবং একবার তাদেরটা খেয়ে অন্যবার তোমাদেরটা তাদের খাওয়াও, তবে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা এতিম শিশু তো তোমাদেরই দীনি বা বংশীয় ভাই। ভাই-বেরাদরের মধ্যে পরস্পরে একত্রীকরণ এবং নিজে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানো অন্যায় নয়। হ্যাঁ এতিমদের যাতে কল্যাণ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, একত্রীকরণের মাঝে কার উদ্দেশ্য অর্থ আত্মসাৎ ও এতিমের ক্ষতিসাধন করা আর কার উদ্দেশ্য এতিমের কল্যাণ সাধন ও তার উপকার করা। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَمَا يَلْقَوْنَهُ : এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবারতে মুযাফ বিলুপ্ত রয়েছে। কেননা প্রশ্ন করা হয় অবস্থা সম্পর্কে, সত্তা সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهُ وَاَكَلُوْهُمْ : اَكَلُوْا -এর মধ্যে হামযাকে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করে وَاكَلُوْا রূপেও এসেছে। অর্থ হলো- মিলেমিশে পানাহার করা।

قَوْلُهُ فِىْ اَمْوَالِهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আর্থিক সংশোধনী উদ্দেশ্য, অন্য কোনোটি নয়। এতে প্রশ্নের সাথে উত্তরের সামঞ্জস্য হয়ে যাবে। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ -এর মধ্যেও এর আলামত রয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ تَرْكِ ذٰلِكَ : এখানে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ : এ বিলুপ্তির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَاِخْوَانُكُمْ হলো শর্তের জাযা। আর জাযা বাক্য হওয়া জরুরি। এজন্য هُمْ মুবতাদা উহ্য মানা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ فَلَكُمْ ذٰلِكَ : এ ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন : وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ হলো শর্ত আর فَاِخْوَانُكُمْ তার জাযা; কিন্তু শর্তের জাযা প্রযোজ্য হওয়া বৈধ নয়। কেননা উভয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকে না।

উত্তর : মূলত এখানে জাযা বিলুপ্ত হয়েছে। মুফাসসির (র.) فَلَكُمْ ذٰلِكَ বলে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জাযার সববকে জাযার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٢١. وَلَا تَنْكِحُوا تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا
الْمُسْلِمُوْنَ الْمُشْرِكٰتِ اَىِ الْكَافِرَاتِ
حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكَةٍ حُرَّةٍ لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا الْعَيْبُ
عَلٰى مَنْ تَزَوَّجَ اَمَةً وَالتَّرْغِيْبُ فِىْ
نِكَاحِ حُرَّةٍ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ
لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَهٰذَا مَخْصُوْصٌ
بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّاتِ بِاٰيَةِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَلَا تُنْكِحُوا تُزَوِّجُوا
الْمُشْرِكِيْنَ اَىِ الْكُفَّارَ الْمُؤْمِنَاتِ
حَتّٰى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ لِمَالِهِ وَجَمَالِهِ
اُولٰٓئِكَ اَىْ اَهْلُ الشِّرْكِ يَدْعُوْنَ اِلَى
النَّارِ بِدُعَائِهِمْ اِلَى الْعَمَلِ الْمُوْجِبِ
لَهَا فَلَا تَلِيْقُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَاللّٰهُ
يَدْعُوْا عَلٰى لِسَانِ رُسُلِهِ اِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ اَىِ الْعَمَلِ الْمُوْجِبِ لَهُمَا
بِاِذْنِهِ بِاِرَادَتِهِ فَتَجِبُ اِجَابَتُهُ بِتَزْوِيْجِ
اَوْلِيَائِهِ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ .

অনুবাদ :

২২১. হে মুসলিমগণ! অংশীবাদী অর্থাৎ কাফের নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা নিকাহ করো না বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করো না। অংশীবাদী নারী সৌন্দর্য ও অর্থসম্পদের দরুন তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও নিশ্চয় একজন ধর্মে বিশ্বাসী দাসী একজন স্বাধীনা অংশীবাদী নারী অপেক্ষা উত্তম। ঈমানের অধিকারিণী দাসীকে বিবাহ করলে [তৎকালে] দোষারোপ করা হতো। আর মুশরিক হলেও স্বাধীনা মহিলা বিবাহ করতে উৎসাহ প্রদান করা হতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেছিলেন।

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ [যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের পবিত্রা মহিলাগণকে বিবাহ করতে পার] এ আয়াতটির কারণে বক্ষ্যমাণ আয়াতটির বিধান যারা কিতাবী নয় সেই সমস্ত কাফের মহিলাদের বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য। ঈমান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমরা অংশীবাদী পুরুষের সাথে কাফের পুরুষগণের সাথে বিশ্বাসী মহিলাগণকে নিকাহ দিয়ো না বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো না। সৌন্দর্য ও ধন-সম্পত্তির কারণে অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চকমৎকৃত করলেও একজন মু'মিন দাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা অর্থাৎ অংশীবাদীগণ যে সমস্ত আমল দ্বারা জাহান্নামি হতে হয়, সেই সমস্ত আমলের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়ে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। সুতরাং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। আর আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের যবানে তাঁর অনুমোদন তাঁর ইচ্ছাক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে অর্থাৎ এতদুভয় লাভের আমলের দিকে আহ্বান করেন। সুতরাং তাঁর ওলী ও বন্ধুদের কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর এ আহ্বানের প্রত্যুত্তর দান করা কর্তব্য। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যেন তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

أَمَةٌ : একবচন, বহুবচন إِمَاءٌ অর্থ– বাঁদি, দাসী। حُرَّةٌ : স্বাধীনা। اَلْعَيْبُ : দোষারোপ করা। تَرْغِيْبٌ : উৎসাহ প্রদান করা। وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ : যদিও তোমাদেরকে বিমুগ্ধ করে। لَا تَلِيْقُ : উচিত নয়। مُنَاكَحَةٌ : বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা। اِجَابَةٌ : সাড়া দেওয়া। يَتَّعِظُوْنَ : উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিধর্মী ও মুশরিক নারী-পুরুষকে বিবাহ সম্পর্কীয় বিধান : প্রথম দিকে মুসলিম পুরুষ ও কাফের নারী কিংবা এর বিপরীত উভয় অবস্থায় বিবাহের অনুমতি ছিল। এ আয়াতে তা রহিত করা হয়েছে। মুশরিক নরনারীর সাথে মুসলিমের বিবাহ বৈধ নয়। বিবাহের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন মুশরিক হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। শিরকের অর্থ– জ্ঞান, শক্তি বা মহান আল্লাহর এরূপ অন্য কোনো গুণে কাউকে তাঁর সমকক্ষ মনে করা কিংবা কাউকে মহান আল্লাহর অনুরূপ সম্মান করা, যেমন– কাউকে সিজদা করা, কাউকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করা। তবে অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীর সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহ বৈধ প্রমাণিত আছে। তারা যদি নিজেদের দীনে প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রকৃতিবাদী ও নাস্তিক না হয়, তবে তারা মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না। বলা বাহুল্য, আধুনিক কালের অধিকাংশ ইহুদি-খ্রিস্টানই নাস্তিক্যবাদী।

আয়াতটির সারমর্ম হলো, মুসলিম পুরুষের জন্য মুশরিক নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়, যতক্ষণ সে ইসলাম গ্রহণ না করে। নিশ্চয় মুসলিম ক্রীতদাসী কাফের নারী হতে উত্তম, তা সে স্বাধীনই হোক না কেন এং বিত্ত, সৌন্দর্য ও বংশগত দিক থেকে যতই মনলোভা হোক না কেন। অনুরূপ কাফের পুরুষের সাথে মুসলিম নারীকে বিবাহ দিয়ো না। মুসলিম ক্রীতদাসও মুশরিক হতে অনেক ভালো, তা সে স্বাধীনই হোক না কেন এবং দেখতে-শুনতে ও ধনৈশ্বর্যে যতই পছন্দনীয় হোক না কেন। অর্থাৎ একজন অতি সাধারণ মুসলিমও মুশরিক অপেক্ষা শতগুণ ভালো, চাই সে মুশরিক যতই উচ্চ স্তরের হোক। –[তাফসীরে উসমানী]

কতিপয় মাসআলা :

১. কোনো মুসলমান হিন্দু ও অগ্নিউপাসক মহিলাকে বিবাহ করা নাজায়েজ। ২. আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী নারীর সাথে বিবাহ করা বৈধ, যদিও তা উত্তম নয়। হযরত ওমর (রা.) এটাকে অপছন্দ করেছেন। হাদীস শরীফে ধার্মিকা নারী বিবাহ করার নির্দেশ এসেছে। ইসলাম যেখানে মুসলমান ধর্মহীনা মহিলার সাথে বিবাহ করাকে অপছন্দ করেছে সেখানে অমুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ কিভাবে পছন্দনীয় হতে পারে? এ কারণেই হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট যখন সংবাদ পৌঁছল যে, ইরাক এবং সিরিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু বিবাহ সংঘটিত হচ্ছে তখন বিশেষ নির্দেশের মাধ্যমে তা থেকে বারণ করা হয়েছে এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণেও মুসলিম পরিবারের জন্য দূষণীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও। বর্তমানে এর ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। বর্তমান কালে কিছু মুসলমান নেতার বিবাহে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান মহিলা রয়েছে। তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের গোপন বিষয়াদি শত্রুদেশের নিকট পাচার হচ্ছে। বস্তুত পশ্চিমা দেশসমূহ মুসলিম নেতাদেরকে ইহুদি সুন্দরী নারীদের ফাঁদে ফেলে তাদেরকে নিজেদের আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন: আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে তো মুসলমান পুরুষের বিবাহ জায়েজ; কিন্তু এর বিপরীতে অর্থাৎ মুসলমান মহিলাদের বিবাহ আহলে কিতাব পুরুষের সাথে জায়েজ নয় কেন?

উত্তর: ১. প্রকৃতি ও সৃষ্টিগতভাবে মহিলারা দুর্বল হয়ে থাকে। উপরন্তু পুরুষকে নারীর শাসক ও অভিভাবক বানানো হয়েছে। অতএব স্বামীর আকিদার দ্বারা মহিলারা প্রভাবান্বিত হওয়া যুক্তির অধিক নিকটবর্তী। কাজেই মুসলমান মহিলা যদি আহলে কিতাব পুরুষের অধীনে থাকে, তাহলে তার ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে; এর বিপরীতে আশঙ্কা থাকে না, কিংবা অত্যন্ত কম থাকে।

উত্তর: ২. মুসলমানগণ যেহেতু পূর্বের নবীগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মানের সাথে তাদের নাম নেয়। পক্ষান্তরে ইহুদি, খ্রিস্টান আহলে কিতাবগণ মহানবী ﷺ-এর নবুয়তকে স্বীকার করে না, তারা তাঁর নামকে সম্মানের সাথে নেওয়াকেও জরুরি মনে করে না। অথচ মুসলমানদের উপর পূর্বের সকল নবীগণের নাম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে নেওয়া জরুরি এবং ইজমালীভাবে তাঁদের প্রতি ঈমান আনাও ফরজ। কোনো মুসলমান যদি কোনো নবীর ব্যাপারে বেয়াদবিমূলক উক্তি করে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যায়। অতএব, কোনো কিতাবী মহিলা চাই ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান তখন তার নবীর নাম মুসলমানের ঘরে আদব ও সম্মানের সাথে নিতে শুনবে। পক্ষান্তরে মুসলমান মহিলা যদি কোনো কিতাবী ইহুদি বা খ্রিস্টানের বিবাহে থাকে, তাহলে সে তার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নাম আদব ও সম্মানের সাথে নিতে শুনবে না, ফলে সে কষ্ট পাবে। আর এ কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে পারে। এ সকল কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমান মহিলার বিবাহ কিতাবী পুরুষের সাথে জায়েজ রাখা হয়নি।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٢٢. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ اَىِ الْحَيْضِ اَوْ مَكَانِهِ مَاذَا يَفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيْهِ قُلْ هُوَ اَذًى قَذَرٌ اَوْ مَحَلُّهُ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ اُتْرُكُوْا وَطْيَهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ اَىْ وَقْتِهِ اَوْ مَكَانِهِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ بِالْجِمَاعِ حَتّٰى يَطْهُرْنَ بِسُكُوْنِ الطَّاءِ وَتَشْدِيْدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الطَّاءِ اَىْ يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ لِلْجِمَاعِ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ بِتَجَنُّبِهِ فِى الْحَيْضِ وَهُوَ الْقُبُلُ وَلَا تَعْدُوْهُ اِلٰى غَيْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ يُثِيْبُ وَيُكْرِمُ التَّوَّابِيْنَ مِنَ الذُّنُوْبِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ مِنَ الْاَقْذَارِ.

অনুবাদ :

২২২. লোকেরা তোমাকে রজঃস্রাব অর্থাৎ ঋতু বা তা ক্ষরণের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, এ সময় স্ত্রীগণের সাথে কি করবে? এতদসম্পর্কে তারা জানতে চায়। বল, তা অশুচি বা তার ক্ষরণের স্থানটি অপবিত্র। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে সময়ে বা ঐ স্থানটি হতে স্ত্রীগণকে অর্থাৎ তাদের সাথে রতিক্রিয়া বর্জন করবে পরিত্যাগ করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রতিক্রিয়ার জন্য তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। يَطْهُرْنَ এ ক্রিয়াটি ط সাকিন বা ط ও ه -এর তাশদীদসহ পাঠ করা যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় মূলত ط -এ ت -এর اِدْغَامْ বা সন্ধি সংঘটিত হয়েছে বলে ধরা হবে। অর্থাৎ রজঃস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যতক্ষণ গোসল না করেছে [ততক্ষণ রাতিক্রিয়ার জন্য নিকটবর্তী হয়ো না।] সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে, তখন তাদের নিকট রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্যে সেই স্থানে গমন করবে যে স্থানে আল্লাহ রজঃস্রাবের সময় দূরে থাকতে তোমাদেরকে [নির্দেশ দিয়েছিলেন।] আর তা হলো যোনি প্রদেশ। সুতরাং অন্য কোনো পথে গমন করে সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ তা'আলা পাপাচার হতে তাওবাকারীগণকে ভালোবাসেন অর্থাৎ তাদের পুণ্যফল দেন ও সম্মান প্রদান করেন এবং যারা অশুচিতা হতে পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَحِيْضُ : রজস্রাব। اَذًى : অশুচি। اِعْتَزِلُوْا : বর্জন কর, ভিন্ন থাক। اِنْقِطَاعٌ : বন্ধ হওয়া। تَجَنُّبٌ : পরিত্যাগ করা। اَلْقُبُلُ : সম্মুখ পথ, যোনি পথ। لَا تَعْدُوْا : সীমালঙ্ঘন করো না। اَلْاَقْذَارُ : قَذَرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অশুচি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েজের বিধান : যৌবনপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাবকে হায়েজ বলে। এ সময় সহবাস, রোজা, নামাজ সব নিষিদ্ধ। সাধারণ নিয়মের বাইরে যে রক্তস্রাব হয়, সেটা রোগবিশেষ। তখন সহবাস ও নামাজ-রোজা বৈধ। জখম বা শিঙ্গা লাগানোর স্থান হতে রক্তক্ষরণের সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। ইহুদি ও অগ্নিপূজকরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীলোকের সাথে পানাহার ও এক ঘরে বসবাসকেও অবৈধ মনে করত। অপর দিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সহবাসও পরিহার করত না। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে এ আয়াত নাজিল হয়। তিনি এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেন, রজঃস্রাবকালে স্ত্রীগমন হারাম। তবে তাদের সাথে পানাহার ও একত্রে বাস জায়েজ। ইহুদিদের বাড়াবাড়ি ও খ্রিস্টানদের শৈথিল্য উভয় প্রকার প্রান্তিকতা পরিত্যাজ্য।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ الْمَحِيْضِ : যরফে যমান, রজঃস্রাব বা ঋতুকালীন সময়। শব্দটি যরফে মাকান হলে তার অর্থ হবে ঋতুর স্থান। মাসদার হলে তার স্থান হবে ঋতু আসা কিংবা ঋতুস্রাব যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট অবস্থায় সুস্থ গর্ভবিহীন নারী থেকে নির্গত হয়। -[লুগাতুল কুরআন] اَلْمَحِيْضُ هُوَ الْحَيْضُ وَهُوَ مَصْدَرٌ يُقَالُ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ حَيْضًا وَمَحِيْضًا فَهِيَ حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ

قَوْلُهُ اَوْ مَكَانَهُ : এটা مَحِيْض -এর দুটি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত। اَلْحَيْضُ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَحِيْض -এর م বর্ণটি মাসদার জ্ঞাপক, অর্থ- রক্তপ্রবাহ, রজঃস্রাব।

قَوْلُهُ قَذَرٌ اَوْ مَحَلُّهُ : এটা اَذًى -এর দুটি ব্যাখ্যা। প্রথম ব্যাখ্যা ঋতুকালীন সময়ে সঙ্গম করা নিষিদ্ধ। স্বাভাবিক কার্যকলাপ এবং তার নিকটবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ **শানে নুযূল :** ইহুদি সমাজের রীতি ছিল যে, মহিলারা ঋতুমতী হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হতো। কোনো কোণায় বা ভিন্ন ঘরে তাকে থাকতে বাধ্য করা হতো। একত্রে পানাহার করতে দেওয়া হতো না। হিন্দুদের প্রথাও একই ছিল। তারা ঋতুমতী মহিলাদের পানাহার-পাত্র এবং বিছানা ভিন্ন করে দিত। মোটকথা ঋতুকালে তার সাথে সামাজিক আচরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হতো। পশুর চেয়ে তাকে নিকৃষ্ট মনে করা হতো। এর বিপরীতে খ্রিস্টানদের অবস্থা ছিল এই যে, ঋতুস্রাব কালে তারা স্ত্রীসহবাস বৈধ মনে করত। মোটকথা উভয় দল এ ব্যাপারে ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত ছিল। হযরত আবূ দাহদা এবং একদল সাহাবী ঋতুকালে সহবাসের ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম মুসলিম প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহুদিদের অভ্যাস ছিল মহিলারা ঋতুমতী হলে তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিত। তাদের সাথে খানাপিনা বন্ধ করে দেওয়া হতো এবং সহবাস বর্জন করা হতো। মোটকথা তাদের সাথে উঠাবসা, থাকা-খাওয়া সবকিছু বন্ধ থাকত। কতিপয় সাহাবী ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে উঠাবসা এবং সহবাসের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, সহবাস ছাড়া অন্য কিছু নিষেধ নয়। হিন্দুস্থানেও কয়েক শতাব্দী পূর্বে এ রীতি ছিল। বিছানা-বর্তন সবকিছু আলাদা করে দেওয়া হতো। বিশেষত উঁচু বংশ জ্ঞানকারীদের মধ্যে সামান্য কিছুকাল পূর্বেও এ অবস্থা ছিল। এছাড়া আরও অনেক রীতি-নীতি ইহুদিদের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। নিজেদের অপেক্ষা নিচু বংশের জাতির জন্য ধর্মীয় পুস্তক অধ্যয়ন করার অধিকার ছিল না। নিম্ন বংশের মানুষ সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষমতাশীল থাকায় সুদকে আয়রোজগারের বিশেষ উপায় মনে করা এবং নিজেদেরকে ক্ষমতার অধিকারী মনে করা ইত্যাদি কার্যাবলি দ্বারা বুঝা যায় যে, হিন্দুদের বংশীয় সম্বন্ধ রয়েছে ইহুদিদের সাথে।

পবিত্র কুরআন ঋতুকালে সহবাসের মাসআলাকে اِسْتِعَارَةْ তথা রূপকভাবে বর্ণনা করেছে। যেমনটি কুরআনের অভ্যাস অর্থাৎ লজ্জাজনক বিষয়াদিকে ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দে বর্ণনা করে থাকে। একইভাবে এখানে وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ দ্বারা সঙ্গম না করার প্রতি নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ তাদের থেকে দূরে থাক। তাদের নিকট গমন করো না। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, ঋতুকালে একই বিছানায় তার সঙ্গে বসা বা একত্রে পানাহার করা থেকেও বিরত থাক। তাদেরকে সম্পূর্ণ অদৃশ্যরূপে ছেড়ে দাও। যেমন- ইহুদি, হিন্দু এবং অন্যান্য জাতির অভ্যাস ছিল। রাসূল ﷺ এ বিধানের স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যে, ঋতুকালে কেবল সহবাস থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য সকল সম্বন্ধ পূর্বের অবস্থার ন্যায় বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى يَطْهُرْنَ اَىْ يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ : পবিত্র হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত কথা হলো, হায়েজ যদি পূর্ণ মেয়াদ অর্থাৎ দশ দিনে বন্ধ হয়, তাহলে তখন থেকেই সহবাস জায়েজ। যদি তার আগেই বন্ধ হয়ে যায়, যেমন কোনো স্ত্রীলোকের মাসিকের নিয়ম হলো ছয় দিন। এখন এ ছয় দিনের শেষে যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে বন্ধ হওয়া মাত্রই মিলন জায়েজ নয়; বরং বন্ধের পর গোসল করে নেওয়া কিংবা এক সালাতের ওয়াক্ত অতিক্রান্ত শর্ত। যদি সাত-আট দিনের নিয়ম হয়ে থাকে, তাহলে ছয় দিনের শেষে বন্ধ হওয়ার পরও উক্ত মেয়াদ পার হতে হবে তারপর মিলন বৈধ। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٢٣. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ اَىْ مَحَلُّ زَرْعِكُمْ لِلْوَلَدِ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَىْ مَحَلَّهُ وَهُوَ الْقُبُلُ اَنّٰى كَيْفَ شِئْتُمْ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَاضْطِجَاعٍ وَاِقْبَالٍ وَاِدْبَارٍ نَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُوْدِ مَنْ اَتَى امْرَأَتَهُ فِىْ قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا جَاءَ الْوَلَدُ اَحْوَلَ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ الْعَمَلَ الصَّالِحَ كَالتَّسْمِيَةِ عَنِ الْجِمَاعِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ اَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْهُ بِالْجَنَّةِ.

অনুবাদ :

২২৩. স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে অর্থাৎ তার নির্ধারিত স্থান যোনি-প্রদেশে যেভাবে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, সামনে, পিছনে সকল অবস্থায় গমন করতে পার। ইহুদিরা বলত, কেউ যদি যোনিপ্রদেশে পিছন দিক থেকে সঙ্গম করে তবে সন্তান ট্যারা হয়। ঐ ধারণার প্রত্যাখ্যানে এ আয়াত নাজিল হয়। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু সৎ আমল যেমন রমনের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা করে নিও এবং আল্লাহকে তাঁর আদেশ-নিষেধের বেলায় ভয় করিও, আর জেনে রাখ! তোমরা পুনরুত্থানের মধ্যমে তাঁর সম্মুখীন হতে যাচ্ছ। অনন্তর তিনি তোমাদের কার্যের প্রতিফল প্রদান করবেন এবং বিশ্বাসীগণকে যারা তাঁকে ভয় করে, তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

তাহকীক ও তারকীব

حَرْثٌ : শস্যক্ষেত্র। قِيَامٌ : দাঁড়িয়ে। قُعُوْدٌ : বসে। اِضْطِجَاعٌ : শুয়ে। اِقْبَالٌ : সামনে। اِدْبَارٌ : পিছনে। اَحْوَلُ : ট্যারা। اَلتَّسْمِيَةُ : বিসমিল্লাহ বলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা সঙ্গত নয় : পেছনের দিক হতে সামনের পথে সঙ্গত হওয়াকে ইহুদিরা নিষিদ্ধ মনে করত। তারা বলত, এর ফলে সন্তান ট্যারা চোখের হয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলে তখন এ আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। তোমাদের বীর্য যেন তার বীজ এবং সন্তান তার ফসল। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন ও বংশ রক্ষা। কাজেই তোমাদের এখতিয়ার আছে সামনাসামনি, অথবা পাশাপাশি কিংবা পেছন দিক হতে বা বসা অবস্থায় যে কোনোভাবেই সঙ্গত হতে পার। তবে হ্যাঁ, বীজ বপন যেন সেই বিশেষ স্থানেই হয়, যেখান থেকে সন্তান উৎপাদনের সম্ভবনা আছে অর্থাৎ স্ত্রী-যোনিই ব্যবহার করতে হবে, পশ্চাদ্বার কিছুতেই নয়। সন্তান ট্যারা চোখের হওয়া সম্পর্কিত ইহুদিদের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٢٤. وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ اَىِ الْحَلْفَ بِهٖ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَىْ نُصُبًا لَهَا بِاَنْ تُكْثِرُوا الْحَلْفَ بِهٖ اَنْ لَا تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ فَتُكْرَهُ الْيَمِيْنُ عَلٰى ذٰلِكَ وَيُسَنُّ فِيْهِ الْحِنْثُ وَيُكَفِّرُ بِخِلَافِهَا عَلٰى فِعْلِ الْبِرِّ وَنَحْوِهٖ فَهِىَ طَاعَةٌ اَلْمَعْنٰى لَا تَمْتَنِعُوْا مِنْ فِعْلِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحْوِهٖ اِذَا حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ بَلِ ائْتُوْهُ وَكَفِّرُوْا لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا الْاِمْتِنَاعُ مِنْ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِكُمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِكُمْ.

২২৪. তোমরা আল্লাহকে আল্লাহর নামে শপথ করাকে তোমাদের শপথের অজুহাত হিসেবে প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড় করিও না তাঁর নাম নিয়ে অধিকহারে শপথ করো না। তোমরা সৎকার্য, আত্মসংযম ও লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে এ উদ্দেশ্যে اَنْ تَبَرُّوْا ক্রিয়াটির পূর্বে না আর্যবোধক শব্দ لا উহ্য রয়েছে। এতদ্বিষয়ের শপথ নিন্দনীয়। এ ধরনের শপথ ভঙ্গ করা সুন্নাহর মাধ্যমে প্রচলিত নিয়ম। এর বিপরীত কর্ম অর্থাৎ সৎ আমল ইত্যাদি করে তার কাফফারা প্রদান করতে হবে। এটা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বন্দেগি বলে গণ্য। অর্থাৎ যে সমস্ত সৎকর্ম না করার সে শপথ করেছিল তা করা হতে বিরত হবে না; বরং তা করবে ও শপথের কাফফারা দেবে। কেননা শপথ করে এ ধরনের সংকার্য হতে বিরত থাকার একটি ঘটনা হলো এই আয়াত নাজিলের কারণ। আল্লাহ অতি শুনেন তোমাদের সকল কথা এবং তিনি খুবই জানেন তোমাদের সকল অবস্থা।

٢٢٥. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ الْكَائِنِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَهُوَ مَا يَسْبِقُ اِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلْفِ نَحْوُ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ فَلَا اِثْمَ فِيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ اَىْ قَصَدَتْهُ مِنَ الْاَيْمَانِ اِذَا حَنِثْتُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِمَا كَانَ مِنَ اللَّغْوِ حَلِيْمٌ بِتَاْخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا.

২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য فِىْ اَيْمَانِكُمْ এটা এ স্থানে উহ্য اَلْكَائِنِ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না; তা হলো শপথের ইচ্ছা ব্যতিরেকে এমনিতেই যা কথায় কথায় মুখ হতে বের হয়ে যায়। যেমন- কথায় কথায় لَا وَاللّٰهِ [না, খোদার কসম] بَلٰى وَاللّٰهِ [হ্যাঁ, খোদার কসম] ইত্যাদি বলা। তাতে পাপ নেই বা তাতে কাফফারাও দিতে হয় না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। অর্থাৎ হৃদয় যে শপথের সংকল্প করে তা যখন ভঙ্গ করবে, তখন তোমাদের দায়ী করা হবে। আল্লাহ যা 'লাগব' বা অর্থহীন হয়,তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ এবং শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করায় তিনি পরম ধৈর্যশীল।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

مَا سَبَقَ اِلَيْهِ اللِّسَانُ : যা কথায় কথায় মুখ হতে বের হয়। اَللَّغْوُ : অনর্থক। اَلْحِنْثُ : কসম ভঙ্গ করা। نَصَبًا : লক্ষ্যবস্তু। عُرْضَةً : অজুহাত, প্রতিবন্ধক। تَأْخِيْرُ الْعُقُوْبَةِ : শাস্তি বিলম্বিত করা। مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلْفِ : কসমের ইচ্ছা ছাড়া। مُسْتَحِقٌّ : যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ **শানে নুযূল** : আরবে জাহিলি যুগের একটি রীতি ছিল যে, শপথ করে বলত আমরা অমুক নেক কাজ, পরহেজগারির কাজ বা সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ করব না। এ বিষয়ে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলত, আমরা এসব কাজ না করার ব্যাপারে শপথ করে ফেলেছি। এসব উত্তম কাজ বর্জন করা এমনিতেই দূষণীয়, উপরন্তু আল্লাহর নামে অন্যায় কাজের শপথ করা তাঁর নামকে হেয় করার শামিল। তাদের উক্ত রীতি নিষিদ্ধ করে এ আয়াত নাজিল হয়।

মাসআলা : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে পরে যদি তার নিকট স্পষ্ট হয় যে, শপথ ভঙ্গ করার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তাহলে সে তা ভঙ্গ করবে এবং কাফফারা দেবে। শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা হলো ১০ জন মিসকিনকে খাবার দান করা বা বস্ত্র দান করা বা একটি গোলাম আজাদ করা কিংবা তিনটি রোজা রাখা। অবশ্য স্বাভাবিক কথায় অনিচ্ছায় যে শপথ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, এ ধরনের শপথের ব্যাপারে পাকড়াও হবে না এবং কাফফারা দিতে হবে না।

عُرْضَةً -এর স্বাভাবিক এবং প্রচলিত অর্থ হলো নিশানা, টার্গেট, লক্ষ্যস্থল। কেউ কেউ এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। আরেকটি অর্থ হলো অন্তরায় বা প্রতিবন্ধক। এখানে এ অর্থটি অধিক উপযোগী। ফকীহগণ প্রয়োজন ছাড়া এবং বেশি বেশি শপথ করাকে অপছন্দ করেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের অমর্যাদা হয়। আর ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা শপথের তো কথাই চলে না। কেননা এ ধরনের কসম থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মূল কিতাবের ৩৪নং পৃষ্ঠার ৬নং হাশিয়া থেকেও তা বুঝে আসে। হাশিয়ার বক্তব্য নিম্নরূপ–

اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَدْ حَدَثَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ اُخْتِهٖ وَبَيْنَ زَوْجِ اُخْتِهٖ بَشِيْرِ بْنِ نُعْمَانَ فَقَسَمَ بِاللّٰهِ الْاَعْظَمِ اَنْ لَا يَتَكَلَّمَ مَعَهُ وَلَا يُحْسِنُ فِىْ حَقِّهٖ وَلَا يُصْلِحُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ خَصْمَائِهٖ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ.

قَوْلُهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ : 'লাগব কসম' -এর দুটি অর্থ– একটি হচ্ছে, কোনো অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মতে সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণত নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে, 'যায়েদ এসেছে' কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোনো ভবিষ্যৎ বিষয়ে এভাবে কসম কর বসল যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু, অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কসম বেরিয়ে গেছে এরকম– এতে কোনো পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে 'লাগব' বা 'অহেতুক' বলা হয়েছে। আখিরাতে এজন্যে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সেসব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় 'গামূস'। এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এর কোনো কাফ্ফারা দিতে হয় না। আর উল্লিখিত অর্থে 'লাগব' কসমের জন্যও কোনো কাফফারা নেই। এ আয়াতে এ দু রকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

'লাগব' -এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফফারা দিতে হয় না। আর একে 'লাগব' [অহেতুক] এজন্যে বলা হয় যে, এতে পার্থিব কোনো কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় না। এ অর্থে 'গামূস' কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে পাপ হলেও কোনো রকম কাফফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তাকে বলা হয় 'মুনআকিদা'। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি 'আমি অমুক কাজটি করব' কিংবা 'অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব' বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফফারা দিতেই হবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٢٦. لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَآئِهِمْ اَىْ يَحْلِفُوْنَ اَنْ لَا يُجَامِعُوْهُنَّ تَرَبُّصُ اِنْتِظَارُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا رَجَعُوْا فِيْهَا اَوْ بَعْدَهَا عَنِ الْيَمِيْنِ اِلَى الْوَطْئِ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُمْ مَا اَتَوْهُ مِنْ ضَرَرِ الْمَرْأَةِ بِالْحَلْفِ رَحِيْمٌ بِهِمْ ـ

অনুবাদ :

২২৬. যারা স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে অর্থাৎ সঙ্গম না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে, অপেক্ষা করবে অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় উক্ত সময়ে বা তৎপরে শপথ পরিত্যাগ করে সঙ্গত হওয়ার প্রতি প্রত্যাগত হয় তবে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, এরূপ শপথ করে স্ত্রীকে যে কষ্ট দিল তা ক্ষমা করে দেবেন ও তাদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু।

٢٢٧. وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اَىْ عَلَيْهِ بِاَنْ لَمْ يُفِيْئُوْا فَلْيُوْقِعُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِقَوْلِهِمْ عَلِيْمٌ بِعَزْمِهِمُ الْمَعْنٰى لَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ تَرَبُّصٍ مَا ذُكِرَ اِلَّا الْفَيْئَةَ اَوِ الطَّلَاقَ ـ

২২৭. আর যদি তারা তালাক প্রদানের সংকল্প করে যেমন শপথ হতে প্রত্যাগত হলো না, তবে যেন তারা তালাক দিয়ে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেন এবং তাদের সংকল্প সম্পর্কে তিনি খুব অবহিত। অর্থাৎ উক্ত সময় অপেক্ষার পর প্রত্যাগত হওয়া বা তালাক প্রদান এ দুটি ছাড়া তার আর কিছুই করার অধিকার নেই।

তাহকীক ও তারকীব

يُؤْلُوْنَ : এটি اِيْلَاءٌ থেকে جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ-এর সীগাহ। অর্থ– যারা স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে কসম করে। আরব জাহিলি প্রথার অন্যতম ছিল-স্বামী রাগের বশে স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস না করার কসম খেয়ে বসত। পরিভাষায় এ ধরনের কসমকে اِيْلَاءٌ [ঈলা] বলে। ইসলামি শরিয়ত এতে যে সংস্কার করেছে এবং এর যেসব বিধান রয়েছে, এখানে তারই আলোচনা রয়েছে। اَلْاِيْلَاءُ لُغَةً : اَلْحَلْفُ ـ يُقَالُ ، آلَى يُوَالِيْ اِيْلَاءً وَفِى الشَّرْعِ : اَلْيَمِيْنُ عَلٰى تَرْكِ وَطْئِ الزَّوْجَةِ

تَرَبُّصُ : অপেক্ষা, প্রতীক্ষা। فَاءُوْا : প্রত্যাগত হলো। فَاءَ يَفِيْئُ (ض) فَيْئَةً অর্থ– ফিরে আসা। এ কারণেই ছায়াকে فَيْئٌ বলা হয়। কেননা তা ফিরে আসে। وَاِنْ عَزَمُوْا : যদি সংকল্প করে। فَلْيُوْقِعُوْهُ : যেন তালাক দিয়ে দেয়।

اَلْفَيْئَةَ : প্রত্যাগত হওয়া।

قَوْلُهُ فَاِنْ فَاءُوْا : অর্থাৎ যদি সম্পর্কচ্ছেদের ইচ্ছা থেকে প্রত্যাগত হয় ও বিবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। فَاءُوْا শব্দটি اَلْفَيْئُ মাসদার থেকে جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ-এর সীগাহ। اَلْفَيْئُ অর্থ– কোনো বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈলার বিধান : কেউ যদি শপথ করে 'আমি স্ত্রীর কাছে যাব না', তবে চার মাসের ভিতরে তার কাছে গেলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। এ অবস্থায় স্ত্রী তার বিবাহাধীনে বহাল থাকবে। যদি চার মাস পার হয়ে যায় এবং এর ভিতরে স্ত্রীগমন না করে, তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে।

http://islamiboi.wordpress.com

বিশেষ জ্ঞাতব্য : চার মাস বা তার বেশি কিংবা মেয়াদ নির্ধারণ ব্যতিরেকেই স্ত্রীগমন করার শপথকে 'ঈলা' বলা হয়। চার মাসের কম হলে সেটা ঈলা হবে না। তিন প্রকার ঈলায়ই চার মাসের ভিতরে স্ত্রীগমন করলে শপথ ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। আর এ সময়ের ভিতর স্ত্রীগমন হতে বিরত থাকলে তালাক দেওয়া ছাড়াই স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। যদি চার মাসের কম সময়ের জন্য শপথ করে, উদাহরণত কেউ কসম খেল, আমি তিন মাস স্ত্রীগমন করব না। তাহলে এটা শরিয়তের পরিভাষায় ঈলা সাব্যস্ত হবে না। এর হুকুম হলো, যদি কসম ভেঙ্গে ফেলে অর্থাৎ উক্ত তিন মাসের মধ্যে স্ত্রীগমন করে, তবে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আর যদি কসম পূর্ণ করে অর্থাৎ তিন মাসের ভিতর স্ত্রীর কাছে না যায়, তবে স্ত্রী তালাক হবে না এবং কাফ্ফারাও দিতে হবে না। −[তাফসীরে উসমানী]

ঈলার চারটি সুরত : যদি স্বামী কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে−

১. কোনো সময় নির্ধারণ করল না।
২. চার মাসের কসম সময়ের শর্ত রাখলো।
৩. চার মাসের বেশি সময়ের শর্ত আরোপ করলো।
৪. চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখল।

বস্তুত ১ম ২য় ও ৩য় দিকগুলোকে শরিয়তে ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সেই স্ত্রীর উপর 'তালাকে-কাতয়ী' বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ পুনর্বার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া জায়েজ থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েজ হবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট থাকবে। −[বায়ানুল কুরআন সূত্রে মা'আরিফুর কুরআন]

قَوْلُهُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ : জাহিলি আরবরা ঈলা করার পরে যা তাদের সামাজিক আইনে এক ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদই ছিল- সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর খোরপোশের দায়দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নিয়ে নিত। ইসলাম এতে প্রথম সংস্কার এই করেছে যে, এটিকে তাৎক্ষণিক তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সম-পর্যায়ের সাব্যস্ত না করে শুধু তার প্রাথমিক পদক্ষেপ ও ভূমিকা সাব্যস্ত করেছে এবং ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ সময়সীমা হলো চার মাস, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব দিক নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনা করার জন্য সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট।

বিভিন্ন ধর্মে তালাক : তালাক বলা হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের আইনগত ও পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদকে। ইসলামপূর্ব বিশ্বে তালাকের ব্যাপারে ছিল আজব ধরনের বাড়াবাড়ি। একদিকে ইহুদি ধর্মে ছিল যথেচ্ছাচার, অপরদিকে খ্রিস্টধর্মে ছিল আইনের বাঁধন-কষণ। ইহুদিদের জন্য তালাকে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না এবং স্বামীকে তালাকের জন্য কোনো দায়দায়িত্বও নিতে হতো না বা জবাবদিহি করার প্রয়োজনও ছিল না। স্বামীর যখন ইচ্ছা, কারণে অকারণে একখানা তালাকনামা লিখে দিয়ে স্ত্রীর দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করত। আর স্ত্রীও তখনই অন্য কোনো পুরুষের হাত ধরে তার ঘর করতে চলে যেতে পারত। তাওরাতের বিধিমালায় রয়েছে− "কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোনো প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাড়ি হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে। আর সে স্ত্রী তাহার বাড়ি হইতে বিদায় হইবার পর গিয়া অন্য পুরুষের ভার্যা হইতে পারিবে।" এ অতি স্বাধীনতা ও লাগমহীনতার বিপরীতে খ্রিস্টবাদীরা এমন কড়াকড়ির বাঁধন-কষণ লাগিয়েছে যে, তারা আর [শত প্রয়োজনেও] স্বামী-স্ত্রীর

http://islamiboi.wordpress.com

পৃথক হওয়ার কোনো পথ রাখেনি। ইঞ্জিলের [বাইবেল নতুন নিয়ম] বর্ণনা-ভাষ্য..........অতএব, ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। .....যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্যকে বিবাহ করে, সে তাহার [স্ত্রী] বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে, আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে। "আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতেছি- আমি দিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতেছেন- স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে চালিয়া না যাউক......আর স্বামীও স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করুক।" এ কারণেই খ্রিস্টান বিশ্বের বড় দল অর্থাৎ ক্যাথলিকের [রক্ষণশীল] দলের মতে এখনও পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং কোনো একজনের মৃত্যু ব্যতীত [দাম্পত্য অমিলের বিভীষিকা থেকে] স্বামী-স্ত্রীর পৃথক হওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই। ইসলামপূর্ব যুগে খ্রিস্টবাদের এ দলটিরই অস্তিত্ব ছিল। প্রোটেস্টান্ট [প্রগতিবাদী] দলটির জন্ম হয়েছে ইসলামের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পরে [এবং বলা যায়, ইসলামি বিধানের ধাক্কা খেয়ে]। এদের মতে অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। তবে তাও আদালতে কোনো এক পক্ষের ব্যভিচার বা জুলুম-নির্যাতন প্রমাণিত হওয়ার পরেই।

এতো ছিল সেসব সম্প্রদায়ের হাল অবস্থা, [যারা নামে হলেও] কিতাবধারী। অর্থাৎ যেমন করেই হোক, তাদের আইনের ভিত্তি আসমানি কিতাব হওয়ারই দাবি রয়েছে। পক্ষান্তরে প্রাচীন জাহিলি বর্বর ও পৌত্তলিক 'সভ্য' ও 'উন্নত' জাতিসমূহের কথা– তা একদিকে গ্রীক ও হিন্দুদের ধর্মমতে এবং একটি বিশেষ কাল পর্যন্ত রোমানদের মাঝে তালাক নামের কোনো বিষয়ের সঙ্গে কোনো পরিচিতিই ছিল না; বরং হিন্দু ধর্মে তো আজ পর্যন্ত [১৯৪৫ খ্রি.] তালাক ও বিয়ে ভঙ্গ অবৈধই চলে আসছে। যদিও বাস্তবতায় বাধ্য হয়ে ইংরেজ শাসনাধীন ভারতে এখন তা বৈধ কারার জোর প্রচেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউন্সিলে ও সংসদে এর জন্য বিল উত্থাপন করা হচ্ছে। অন্যদিকে রোমানদের মাঝে গণতন্ত্রের যুগ শেষ হওয়ার পরে বিবাহ বিচ্ছেদ বৈধ ঘোষিত হওয়ার পর থেকে তাতে এমন প্রবল ঢল নেমেছিল, যেন আভিজাত্য ও বিবাহ বিচ্ছেদ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

পৃথিবীর এসব বড় বড় ধর্ম মতবাদ ও নামীদামী সভ্যজাতিগুলোর এ সীমাহীন বাড়াবাড়ি, বাঁধা-কষণ ও অবাস্তবতার প্রতি নজর রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে তবেই ইসলামের মিতাচার, সুষমতা ও তার প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধানের ভারসাম্যতার মূল্য প্রতিভাত হবে। ইসলাম মানব স্বভাবের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জরিপের ভিত্তিতে এ বিধান দিয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝের অমিল ও অসম্প্রীতি প্রতিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করলে [অবশ্য এ অমিলের কারণ-উপকরণের পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তি দেওয়া সম্ভব নয়; কেননা প্রতিটি দম্পতির ক্ষেত্রে বলা যায়- পৃথক পৃথক কারণ পরিলক্ষিত হবে] এবং মিলমিশ সৃষ্টির যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে তখনকার জন্য সর্বশেষ ব্যবস্থা এরূপ রাখা হয়েছে যে, উভয় পক্ষ স্বেচ্ছায় খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে [পরস্পর সামাজিক সৌহার্দবোধ অক্ষুণ্ন রেখেই] নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রত্যেকে জীবনের পথ পৃথক করে নেবে। এরই পারিভাষিক নাম তালাক। এ বিচ্ছেদে সংগঠনকেও লাগামহীন ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং এর জন্য পূর্বাপর অনেক শর্ত ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পরবর্তী আলোচনা এসব শর্ত ও বিধিনিষেধ সংক্রান্ত। –[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٢٨. وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ اَىْ لِيَنْتَظِرْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ عَنِ النِّكَاحِ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ تَمْضِىْ مِنْ حِيْنِ الطَّلَاقِ جَمْعُ قَرْءٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الطُّهْرُ اَوِ الْحَيْضُ قَوْلَانِ وَهٰذَا فِى الْمَدْخُوْلِ بِهِنَّ اِمَّا غَيْرُهُنَّ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا وَفِىْ غَيْرِ الْاٰيِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ كَمَا فِىْ سُوْرَةِ الطَّلَاقِ وَالْاِمَاءِ فَعِدَّتُهُنَّ قَرْاٰنِ بِالسُّنَّةِ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ مِنَ الْوَلَدِ اَوِ الْحَيْضِ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ بِمُرَاجَعَتِهِنَّ وَلَوْ اَبَيْنَ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ فِىْ زَمَنِ التَّرَبُّصِ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا بَيْنَهُمَا لَا ضِرَارَ الْمَرْاَةِ وَهُوَ تَحْرِيْضٌ عَلٰى قَصْدِهٖ لَا شَرْطٌ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ وَهٰذَا فِى الطَّلَاقِ الرَّجْعِىِّ وَاَحَقُّ لَا تَفْضِيْلَ فِيْهِ اِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِىْ نِكَاحِهِنَّ فِى الْعِدَّةِ ـ

২২৮. তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীগণ তালাকের সময় হতে তিন কুরু অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিজের বিষয়ে অপেক্ষায় প্রতীক্ষায় থাকবে। قُرُوْءٌ এটা قَرْءٌ [قَاف বর্ণের ফাতাহসহ] -এর বহুবচন। এর অর্থ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে– ১. রজঃস্রাব বা ২. তুহর [রজঃস্রাবমুক্ত দিনসমূহ]। এ ইদ্দত হলো مَدْخُوْل بِهِنَّ অর্থাৎ সঙ্গমকৃতা স্ত্রীর। সঙ্গমকৃতা না হলে তার তালাকের পর ইদ্দত পালন করতে হয় না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অপর এক স্থলে ইরশাদ করেন– فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا অর্থাৎ 'তাদের উপর ইদ্দত পালনের বিধান নেই যে, তারা তা গণনা করবে।' এমনিভাবে আয়িসা অর্থাৎ রজঃস্রাব সম্পর্কে নিরাশ মহিলা বা নাবালিকার বেলায়ও এ বিধান প্রযোজ্য নয়। তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। গর্ভবতী মহিলাগণও এর ব্যতিক্রম। সূরা তালাকে উল্লেখ হয়েছে যে, তাদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। দাসীগণের বিধানও এর ব্যতিক্রম। সুন্নার বিবরণানুসারে তাদের ইদ্দত হলো দুই 'কুরু'। তারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ তা'আলা রজঃস্রাব বা সন্তান যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা পরস্পরে সম্প্রীতির জীবন চায় স্ত্রীকে কষ্ট প্রদান তাদের উদ্দেশ্য না হয় তবে তাতে অর্থাৎ প্রতীক্ষা [ইদ্দত পালন] কালে তাদের পুনঃগ্রহণে রাজআত বা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তারা [স্ত্রীগণ] অস্বীকার করলেও তাদের পুরুষগণ স্বামীগণ অধিক হকদার। 'যদি সম্প্রীতির জীবন চায়' -এ কথা রাজআত বা স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের কোনো শর্ত নয়; বরং রাজআতের বেলায় এ ধরনের উদ্দেশ্য থাকা চাই এদিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাজআত বা পুনঃগ্রহণের বিধান তালাকে রাজঈর বেলায়ই কেবল প্রযোজ্য।

اَحَقُّ অর্থাৎ অধিক হকদার এ কথার তুলনামূলক বোধটি এ স্থানে বিবেচ্য নয়। কেননা ইদ্দতের মাঝে তাকে বিবাহ করার আর কারো কোনো হক নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قُرُوْءٌ : قَرْءٌ -এর বহুবচন। حَيْض এবং طُهر উভয়টির অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি اَضْدَادْ -এর অন্তর্ভুক্ত। قَرْءٌ -এর মূল অর্থ হলো اَلْاِجْتِمَاعُ বা একত্রিত হওয়া। حَيْض -এর নাম قَرْءٌ রাখার কারণ হলো, সে সময় গর্ভে রক্ত একত্রিত হয়।
اَلْمَدْخُوْلُ بِهِنَّ : সঙ্গমকৃতা স্ত্রী। اَلْاٰيِسَةُ : রক্তস্রাব সম্পর্কে নিরাশ মহিলা। اَلْحَوَامِلُ : حَامِلَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– গর্ভবতী। اَلْاِمَاءُ : اَمَةٌ -এর বহুবচন। বাঁদি, দাসী। بُعُوْلَةٌ : بَعْل -এর বহুবচন। অর্থ– স্বামী।
وَلَوْ اَبَيْنَ : যদিও অস্বীকার করে। تَحْرِيْض : উদ্বুদ্ধকরণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقَتُ : শাব্দিক অর্থে তালাকপ্রাপ্তা যে কোনো নারীকে বুঝায়; কিন্তু এখানে সে সকল তালাকপ্রাপ্তাই উদ্দেশ্য, যারা স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্কা এবং যার সঙ্গে স্বীকৃত একান্ত নির্জনবাস হয়েছে। এখানে এদের বিষয়ই আলোচনা হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা অন্যান্য প্রকার নারীদের আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ **ইদ্দত ও রাজআত সংক্রান্ত আলোচনা :** অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তালাকের সময় হতে তিন কুরু অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিজের বিষয়ে অপেক্ষায় থাকবে। এমন যেন না হয় যে, এদিকে স্বামী তালাক দিল, ওদিকে স্ত্রী আর দেরী না করে তখনই অন্য স্বামী গ্রহণ করল। এটি তালাক সংক্রান্ত প্রথম বিধিনিষেধ। প্রথম বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি পরবর্তী এ অবকাশকালীন সময়কেই শরিয়তের পরিভাষায় عِدَّتْ 'ইদ্দত' বলা হয়। স্ত্রীর জন্য এ নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা বিধানে অনেক হিকমত, রহস্য ও স্বার্থ-কুশলতা নিহিত রয়েছে। একদিকে স্বামী ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করার পূর্ণ অবকাশ পেয়ে যায়। অন্যদিকে স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। অন্যান্য সম্প্রদায়ও অপরাপর ধর্মাবলম্বীরা ইসলামি শরিয়ত নির্দেশিত অন্তর্বর্তীকাল ও বিরতির উপকারিতা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত। তিন মাসের সময় একেবারে কম নয়, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনার জন্য এবং অসন্তুষ্টির সাময়িক আবেগের জোয়ার স্তিমিত হওয়ার জন্য এ সময় যথেষ্ট। এ সময়ের মধ্যে যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি হয় এবং স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে উদ্যত হয়, তবে মৌলিক বা কার্যত ঐ তালাককে রহিত করতে পারে। পরিভাষায় এ ব্যবস্থাই رَجْعَتْ নামে অভিহিত।

قَوْلُهُ ثَلٰثَةُ قُرُوْءٍ : قَرْءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ শুধু একটি নির্দিষ্ট সময় বা নির্ধারিত মেয়াদ। আর এ শব্দটি اَضْدَادْ বা পরস্পর বিরোধী। তুহর [দুই মাসিকের মধ্যেবর্তী পবিত্রকাল] ও হায়েজ [মাসিক ঋতু] এ দুই অর্থের সম্ভবনাযুক্ত। এ কারণে তাফসীরবিদদের দুটি মত সৃষ্টি হয়েছে। এক দল এখানে طُهر বা পবিত্রতা অর্থে অর্থ স্থির করেছেন। যেমন ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতও এটিই। অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অনেকেই قَرْءٌ দ্বারা حَيْض বা অপবিত্রতাকালীন সময় অর্থ স্থির করেছেন। ভাষাবিদ ও অভিধান বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এ শেষোক্ত অর্থের অনুকূলে অধিক সনদ পাওয়া যায়। বলা হয়– اَقْرَتِ الْمَرْاَةُ যখন নারী মাসিক স্রাববতী হয়। মোটকথা, হানাফীগণের মতে সর্বসম্মত মাসআলা হলো, স্ত্রী তার তিনটি মাসিক হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিজেদের ইদ্দতের মেয়াদের মধ্যে মনে করবে এবং এ মেয়াদের মধ্যে সে নিজের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ জায়েজ মনে করবে না।

قَوْلُهُ مِنَ الْوَلَدِ اَوِ الْحَيْضِ : مَا خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন....ব্যাপক অর্থে, গর্ভে যা কিছুই থাক না কেন। তা প্রাণধারী শিশু হোক কিংবা মাসিকের রক্ত উভয়কেই مَا শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে। মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত ইবারতে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا بَيْنَهُمَا لَا ضِرَارَ الْمَرْاَةِ وَهُوَ تَحْرِيْضٌ عَلٰى قَصْدِهٖ لَا شَرْطٌ لِجَوَازِ الرَّجْعَةِ : এখানে বলা হচ্ছে, পুনঃগ্রহণ ও রাজআত দ্বারা যেন অধিক নির্যাতনের সুযোগ গ্রহণ করা না হয়। এরূপ নিয়ত থাকা না থাকা রাজআতের শর্ত নয়। যদিও বাহ্যত ও আইনত রাজআত তখনও সাব্যস্ত হবে। কেননা আইনগত বিধান ও নৈতিক উপদেশ দুটি পৃথক বিষয়। আইনগত বিধানের ফাঁকে এখানে নিয়ত বিশুদ্ধকরণ ও ইখলাসের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْحَقُّ لَا تَفْضِيْلَ فِيْهِ اِذًا لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِىْ نِكَاحِهِنَّ فِى الْعِدَّةِ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।
প্রশ্ন: اَلْحَقُّ হলো اِسْمُ تَفْضِيْل আর এটা مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ দাবি করে। অথচ এখানে তা সম্ভব নয়। কেননা স্বামী ছাড়া কেউ রাজআত দাবি করার অধিকার রাখে না। অথচ এর দ্বারা বুঝা যায়, স্বামীর অধিকার বেশি, তবে অন্যদেরও কিছু অধিকার আছে।
উত্তর: এখানে اِسْمُ تَفْضِيْل শব্দটি اِسْمُ فَاعِل -এর অর্থে। অর্থাৎ حَقِيْق তথা যোগ্য অর্থে। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই। মুসান্নিফ (র.) -এর ইবারত– اِذْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِىْ نِكَاحِهِنَّ فِى الْعِدَّةِ -এর উদ্দেশ্য এটাই।

http://islamiboi.wordpress.com

وَلَهُنَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ مِثْلُ الَّذِي لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَتَرْكِ الضِّرَارِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فَضِيلَةٌ فِي الْحَقِّ مِنْ وُجُوبِ طَاعَتِهِنَّ لَهُمْ لِمَا سَاقُوهُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْإِنْفَاقِ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ فِي مُلْكِهِ حَكِيمٌ فِيمَا دَبَّرَهُ لِخَلْقِهِ .

অনুবাদ : স্বামীগণের উপর নারীদের ন্যায়সঙ্গত শরিয়তের বিধানানুসারের অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের অর্থাৎ স্বামীদের তাদের অর্থাৎ স্ত্রীগণের উপর। যেমন স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করা, কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি। তবে নারীদের উপর পুরুষের রয়েছে প্রাধান্য অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা। তাদের উপর তাদের [স্বামীগণের] প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য। কেননা তারা [স্বামীগণ] তাদের মোহর প্রদান করে এবং তাদের ভরণ-পোষণ করে। আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি পরিচালনা বিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْحُقُوْقُ : حَقٌّ -এর বহুবচন। অর্থ– অধিকার, প্রাপ্য। بِالْمَعْرُوْفِ : ন্যায়সঙ্গতভাবে। حُسْنِ الْعِشْرَةِ : সদাচরণ। اَلضِّرَارُ : কষ্ট। لِمَا سَاقُوْهُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْاِنْفَاقِ : কেননা স্বামীগণ তাদের মোহর প্রদান করে এবং তাদের ভরণ-পোষণ করে। دَبَّرَ : تَدْبِيْرًا (تَفْعِيْل) دَبَّرَ অর্থ– পরিচালনা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ **স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য :** কুরআন এখানে অসাধারণ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একটি বড় বিষয়কে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছে। তা হলো, স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয়। বলা হয়েছে, যেরূপে স্বামীদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের উপর, তদ্রূপ স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর। অর্থাৎ যেন দুনিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হলো এমন মনে কর না যে, শুধু পুরুষদেরই নারীদের উপর অধিকার থাকে। না, তেমন নয়। অনুরূপভাবে নারীদেরও পুরুষদের উপর এবং স্ত্রীদেরও স্বামীদের উপর অধিকার বর্তায়। এখানে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের আগে বলা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং খোদাপ্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

নারী অধিকারের এ শ্লোগান ও সনদ আরবের একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছে, যখন দুনিয়ার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত এ ধ্যানধারণা সম্পর্কেও অনবগত ছিল এবং ইহুদি ও খ্রিস্টান মতবাদের ধর্মীয় জগতে তো নারী ছিল যেন সকল অকল্যাণের উৎস ও লাঞ্ছনা অমাননরার মূর্তপ্রতীক। –[তাফসীরে মাজেদী]

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা : ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে, এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেওয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থি জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কমবেশি করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির জন্যই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, উন্নয়ন ও উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কুরআন মানুষকে একটি জীবন বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা, এসব একটা পৃথক বিষয়, যাকে ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে– নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে একটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, 'যেহেতু আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।'

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীবজন্তুর মতো তাদেরও বেচাকেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদির ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না। অভিভাবকগণ তাদেরকে যার দায়িত্বে অর্পণ করত, তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মিরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন, কোনো জিনিসেরই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগদখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি ব্যবহার করতে পারবে, তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্যদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না, তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোনো কোনো সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক জনোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলিন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হতো। মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে; কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

'হযরত রাহমাতুললিল আলামীন' ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছেন। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরজ করেছেন। বিয়ে-শাদি ও ধনসম্পদে তাদের স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোনো প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন; কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয় যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফিতনাফ্যাসাদের মূল কারণ : স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সন্তানসন্ততির লালনপালন ও ঘরের কাজকর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়া নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কুরআনে এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ অর্থাৎ পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের

http://islamiboi.wordpress.com

সংশোধন আরেকটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফ্যাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে- اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ লোক কখনও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে না। যদি সীমালজ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনম্মন্যতা ও সংকীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে। বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজি ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফিতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফিতনা-ফ্যাসাদ ছাড়াচ্ছে, সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেতনা-ফ্যাসাদের কারণ উদ্ঘাটনের জন্য কোনো নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চালচলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোনো কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রাসূল ﷺ -এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমিন। -[মা'আরিফুল কুরআন]

নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে অধিকার এমনিতেই আদায় হয়ে যাবে : এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে নিজের অধিকার আদায় করার চেয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাগিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে। যদি কুরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে-বাইরে অর্থাৎ সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী পুরুষের অধিকারের সাদৃশ্য ও সমতুল্যতার রূপরেখা ও মানদণ্ড কি? এ সাদৃশ্য বা মান-পরিমাণের, সংখ্যা-পরিসংখ্যানের বিচারে নয়, বরং মূল অধিকার ও মুখ্য অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে। সমতুল্যতার দ্বারা উদ্দেশ্য পালনীয় কর্তব্যপরায়ণতা, সার্বিক কর্মকাণ্ডে নয়। এর অর্থ হচ্ছে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত হয়েছে- وَالْمُرَادُ بِالْمُمَاثَلَةِ الْوَاجِبِ فِيْ كَوْنِهِ حَسَنَةً لَا فِيْ جِنْسِ الْفِعْلِ

তাফসীরে বায়যাবীতে বর্ণিত হয়েছে- اَيْ فِي الْوُجُوْبِ وَاسْتِحْقَاقِ الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهِ অর্থাৎ স্বামী যেন এমন ভ্রান্ত ধারণার শিকার না হয় যে, তার পাল্লায় শুধু অধিকারই, কর্তব্য ও দায়িত্ব কিছুই নেই। তাদের উপরও দায়িত্ব কর্তব্য বর্তাবে, যেমন বর্তায় স্ত্রীদের উপর। আবার স্ত্রীরাও যেন এ প্রগতিবাদী উচ্ছৃঙ্খল ধারণার শিকার না হয় যে, খেদমত ও সেবা করা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ শুধু শুয়ে বসে সেবা গ্রহণ করা। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ بِالْمَعْرُوْفِ : আয়াতের এ অংশ পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের মাপকাঠি বাতলে দিয়েছে। আর তা হলো সমান সমান নয়; বরং ন্যায়সঙ্গতভাবে তথা শরিয়তের মূলনীতি ও সুষ্ঠু প্রজ্ঞার আলোকে। [মাদারেক]। যার যেমনটি প্রযোজ্য। শুধু [বুদ্ধিবৃত্তির নামে] কুপ্রবৃত্তি ও বল্গাহীনতা বা জাহেলিয়াত ও অপমূর্খতার ধারা ও দফার অধীনে কোনো সনদ তৈরি করে নারী অধিকার বিধির গালভরা নাম দিলেই তা কিছু হয়ে যাবে না। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ : পবিত্র কুরআন এই মাত্র জাহেলিয়াতের এক সময়ের অবাস্তব দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলে দিয়েছে যে, নারী অধিকারবিহীন নয়; তাদেরও পুরুষদের ন্যায় যথাসঙ্গত অধিকার রয়েছে। এখন আবার আধুনিক নব্য জাহেলিয়াতের অন্য একটি দাবির খণ্ডন দ্ব্যর্থহীন ও দ্বিধাহীন ঘোষণা দিচ্ছে- দুই শ্রেণির মাঝে সার্বিক সমতা ও পূর্ণাঙ্গ সমতা নয়; বরং পুরুষের নারীর উপরে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ لِمَا سَاقُوْهُ مِنَ الْمَهْرِ وَالْاِنْفَاقِ : এটা উভয়ের স্তর সাব্যস্ত করার কারণ নির্দেশক। কেননা আনন্দ উপভোগ এবং সন্তান কামনায় উভয়ে সমানভাবে অংশীদার। এভাবে গৃহস্থলী কাজ কারবার ক্ষেত্রেও উভয়ই অংশীদার। স্বামীর দায়িত্ব হলো বহির্গত কাজ-কারবার এবং স্ত্রীর দায়িত্ব আভ্যন্তরীণ কাজ-কারবার। উপরন্তু স্বামীর এক পর্যায়ের প্রাধান্য রয়েছে। -[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

২২৯. اَلطَّلَاقُ اَىْ اَلتَّطْلِيْقُ الَّذِىْ يُرَاجِعُ بَعْدَهُ مَرَّتٰنِ اَىْ اِثْنَتَانِ فَاِمْسَاكٌ م اَىْ فَعَلَيْكُمْ اِمْسَاكُهُنَّ بَعْدَهُ بِاَنْ تُرَاجِعُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ م اَىْ اِرْسَالُ لَهُنَّ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَيُّهَا الْاَزْوَاجُ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ مِنَ الْمُهُوْرِ شَيْئًا اِذَا طَلَّقْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّخَافَا اَىِ الزَّوْجَانِ اَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ اَىْ اَنْ لَا يَاْتِيَا بِمَا حَدَّهُ لَهُمَا مِنَ الْحُقُوْقِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُخَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ فَاَنْ لَا يُقِيْمَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ الضَّمِيْرِ فِيْهِ وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ فِى الْفِعْلَيْنِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ نَفْسَهَا مِنَ الْمَالِ لِيُطَلِّقَهَا اَىْ لَا حَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ فِىْ اَخْذِهٖ وَلَا الزَّوْجَةِ فِىْ بَذْلِهٖ تِلْكَ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

২২৯. তালাক অর্থাৎ যে তালাক দানের পর স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় তা দুবার অর্থাৎ দুটি। অতঃপর স্ত্রীকে সদাচারের সাথে অর্থাৎ কষ্ট প্রদান না করে রেখে দেবে অর্থাৎ এরপর তোমাদের কর্তব্য হলো তাদের রেখে দেওয়া, যেমন তাদের রাজআত বা ফিরিয়ে নিয়ে আসলে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। হে স্বামীগণ! যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও, তবে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা অর্থাৎ যে মোহর প্রদান করেছ তা হতে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। কিন্তু যদি তাদের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের আশঙ্কা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না। অর্থাৎ উভয়ের হক ও অধিকারের যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তা তারা পালন করতে পারবে না, [তবে তার বিধান ভিন্ন।] يَخَافَا ক্রিয়াটি অপর এক পাঠে مَجْهُوْل রূপে يُخَافَا আকারে পঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় اَنْ لَا يُقِيْمَا তার মধ্যে নিহিত যমীর বা দ্বিবাচক সর্বনাম হতে بَدَلُ اشْتِمَالٍ রূপে গণ্য হবে। অপর এক পাঠে يَخَافَا এবং يُقِيْمَا এ ক্রিয়াদ্বয় فَوْقَانِيَّة বা ঊর্ধ্ব নোকতাসহ [تَخَافَا এবং تُقِيْمَا রূপে] পঠিত রয়েছে। তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোনো কিছুর অর্থাৎ সম্পদের বিনিময়ে তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। অর্থাৎ স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করায় আর স্ত্রীর জন্য তা ব্যয় করায় কোনো পাপ নেই। এসব অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। যারা এ সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।

তাহকীক ও তারকীব

اَلطَّلَاقُ : طَلَاقٌ -এর অর্থ– বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা। اَلَّذِىْ يُرَاجِعُ بَعْدَهُ : যারপর ফিরিয়ে আনা যায়।

اِمْسَاكٌ : রেখে দেওয়া। تَسْرِيْحٌ : ছেড়ে দেওয়া।

قَالَ الرَّاغِبُ : اَلتَّسْرِيْحُ فِى الطَّلَاقِ مُسْتَعَارٌ مِنْ تَسْرِيْحِ الْاِبِلِ كَالطَّلَاقِ مُسْتَعَارٌ اِطْلَاقِ الْاِبِلِ

اِفْتَدَتْ بِهٖ : তার দ্বারা মুক্ত করে নিতে চাইলে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল :

১. **হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর** (রা.) বর্ণনা করেন– ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ তার স্ত্রীকে যতবার ইচ্ছা তালাক দিত **আবার ফিরিয়ে নিত।** কেউ কেউ এমনও করত যে, নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার **নিকটবর্তী হলে পুনরায়** ফিরিয়ে নিত। তারপর আবার তালাক দিয়ে দিত। বস্তুত স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা **বারবার এমনটি করত।** আলোচ্য আয়াতটি সে প্রসঙ্গেই নাজিল হয়। –[তাফসীরে মাযহারী, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩৬০]

২. **একবার এক ব্যক্তি** তার স্ত্রীকে বলে বসল, আমি তোমাকে তালাকও দেব না যে, আমার থেকে পৃথক হয়ে হয়ে যাবে, **আবার** কোনো দিন তোমার পাশেও আসব না। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল তা কিভাবে? স্বামী বলল, তোমাকে তালাক দিয়ে **আবার** যখনই ইদ্দত শেষ হওয়ার উপক্রম হবে পুনরায় ফিরিয়ে নেব। মহিলা গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দারবারে অভিযোগ করল। কিন্তু তিনি কোনো জাবাব দিলেন না। অতঃপর কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[তিরমিযী, হাকেম, লুবাব]

قَوْلُهُ اَلتَّطْلِيْقُ الَّذِىْ : এ অংশ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلطَّلَاقُ শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرْ যা মাসদার তথা تَطْلِيْق -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ এখানে طَلَاقْ দ্বারা স্বামীর 'তালাক প্রদান' কর্মটি উদ্দেশ্য। কেননা فِعْل طَلَاقْ বা তালাক কর্মটিই مُتَّصِفٌ بِالْوَحْدَةِ وَالْمُتَعَدِّدِ হয়ে থাকে; طَلَاقْ নয়, যা মহিলার সিফত হয়ে থাকে। সামনের শব্দ اَوْ تَسْرِيْحٌ দ্বারাও এ কথাটির সমর্থন মিলে। কেননা تَسْرِيْحٌ এটিও স্বামীর কর্ম।

قَوْلُهُ فَعَلَيْكُمْ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِمْسَاكٌ হলো মুবতাদা এবং তার খবর হলো فَعَلَيْكُمْ যা মাহযুফ রয়েছে।

প্রশ্ন: اِمْسَاكٌ শব্দটি এখানে মুবতাদা হয়েছে অথচ এটি نَكِرَةٌ যা মুবতাদা হতে পারে না।

উত্তর: بِمَعْرُوْفٍ শব্দটি اِمْسَاكٌ -এর সিফত হয়েছে বিধায় نَكِرَةٌ مَوْصُوْف بِالصِّفَةِ হয়েছে আর এ অবস্থায় তা মুবতাদা হতে পারে।

قَوْلُهُ اَىْ اِثْنَتَانِ : মুসান্নিফ (র.) مَرَّتَانِ -এর ব্যাখ্যায় اِثْنَتَانِ উল্লেখ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَرَّتَانِ দ্বারা তার প্রকৃত অর্থ তথা দুই বা দ্বিবচন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দুই তালাক। এখানে তার মাজাযী বা রূপক অর্থ তথা تَكْرَارْ [দ্বিরুক্তি] উদ্দেশ্য নয়। যেন এখানে তাদের বক্তব্যের খণ্ডন করা হচ্ছে, যারা বলে- مَرَّتَانْ এখানে تَكْرَارْ -এর অর্থে। মোটকথা, مَرَّتَانِ -এর প্রকৃত অর্থ 'দুই বা দ্বিবচন' আর তার মাজাযী বা রূপক অর্থ تَكْرَارْ [দ্বিরুক্তি]। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, রূপক অর্থের চেয়ে প্রকৃত অর্থই উত্তম। যারা এখানে মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে, তাদের বক্তব্য হলো একত্রে দুই তালাক সঠিক নয়, বরং দুইবার দুই তালাক দিতে হবে। আর যারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাদের মতে এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া জায়েজ আছে। –[জামালাইন] তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে মুফতি শফী (র.) রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বলেন, مَرَّتَانِ শব্দ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই তালাক দেওয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তালাক দিতে হবে।

রেজয়ী তালাক দুবারই দেওয়া যায় : তালাকে রেজয়ী বা যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় রাজআত করা যায়, তা দু'বার দেওয়া যায়। দুবারের পর হয়তো মহিলাকে মহব্বতের সাথে রেখে দেবে অন্যথায় ভদ্রোচিত নিয়মে বিদায় করে দেবে। এ **বিষয়টিই** فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -এর মাঝে বলা হয়েছে। অনেকে تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ দ্বারা তৃতীয় তালাক **উদ্দেশ্য নিয়েছেন।** কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তৃতীয় তালাক নারীর জন্য ضَرَرٌ خَالِصٌ বা নিছক ক্ষতি। এতে **কোনো উপকার** বা দয়ার আচরণ নেই। সুতরাং اِحْسَانٌ শব্দ ব্যবহারের যৌক্তিকতা কি? বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় **তালাকের পর যদি** رُجُوْعٌ করতে চায় এবং মহব্বতের সাথে সংসার পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তো ভালো অন্যথায় **চুপচাপ বসে থাকবে।** যখন মহিলার ইদ্দতকাল পূর্ণ হবে, তখন মহিলা এমনিতেই বায়েনা হয়ে যাবে। এর পর যদি উভয়ের **মর্জি হয় তাহলে ফের** বিবাহ করতে পারবে। আর এটাই হবে তার প্রতি ইহসান বা দয়া। –[জামালাইন: খ.১, পৃ. ৩৪০] তাফসীরে **মা'আরিফুল কুরআনে** মুফতি শফী (র.) বলেন– تَسْرِيْحٌ -এর অর্থ খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। এতে ইঙ্গিত

http://islamiboi.wordpress.com

... সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য অতিরিক্ত তালাক দেওয়া বা অন্য কোনো কাজ করার প্রয়োজন নেই। তালাক ... ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তিনি আরো বলেন, যেভাবে اِمْسَاكٌ-এর সাথে مَعْرُوْف শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে হলে উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে রাখা, তেমনিভাবে تَسْرِيْح -এর সাথে اِحْسَانٌ শব্দের শর্ত আরোপের ... উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তালাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সৎলোকের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে কোনো কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকে।

তালাক প্রদান পদ্ধতি : তালাক দেওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে–

১. طَلَاقُ اَحْسَنُ বা উত্তম তালাক পদ্ধতি। অর্থাৎ এমন তুহরে এক তালাক দেবে, যাতে সাহবাস হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে।

২. طَلَاقُ سُنِّىْ অর্থাৎ তিন তুহরে তিন তালাক। যখন মহিলা হায়েজ থেকে পবিত্র হবে, তখন সহবাসের পূর্বে তালাক দেবে। অতঃপর দ্বিতীয় হায়েজের অপেক্ষা করবে। দ্বিতীয় হায়েজের পর দ্বিতীয় তালাক এবং তৃতীয় হায়েজের পর তৃতীয় তালাক দিয়ে বিচ্ছেদ করে দিবে। আর যদি স্ত্রীর হায়েজ না আসে অর্থাৎ ছোট হয় কিংবা বৃদ্ধা হয় তাহলে প্রতি মাসে এক তালাক দিবে।

৩. طَلَاقُ بِدْعِىْ অর্থাৎ এক সময়ে বা এক তুহরেই তিন তালাক দেওয়া। এভাবে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে, কিন্তু স্বামী গুনাহগার হবে। অবশ্য এ তালাক সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কেউ কেউ মতবিরোধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মারফূ' হাদীস আমাদের মাযহাব সমর্থন করে। এমনকি হায়েজের মধ্যে তালাক দিলেও তা সংঘটিত হয়ে যায়, কিন্তু رُجُوْع করা ওয়াজিব। যদি হায়েজের সময় তালাক না হয়, তাহলে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হায়েজ অবস্থায় প্রদত্ত তালাক থেকে رُجُوْع করার বিধানের কি অর্থ? সুতরাং আল্লাহর ঘোষণা- তালাক দুবার অর্থাৎ সুন্নত তো হলো একবার এক তালাক দেবে অতঃপর দ্বিতীয় তালাক দেবে। তারপর চাই রুজু করবে বা তৃতীয় তালাক দিয়ে দেবে। এক সময় একত্রে যেহেতু দুই তালাক দেওয়া ভালো নয় তাই সংখ্যা ও ধীরস্থিরতার প্রতি ইঙ্গিত করে مَرَّتَان তথা দুবারের কথা বলেছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩৬০]

قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ :

স্ত্রীকে দেওয়া মোহর ফেরত নেওয়া হারাম : এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে তা হচ্ছে এই যে, কোনো কোনো অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না আবার তার অধিকার আদায় করারও কোনো চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগে স্বামী স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থ-কড়ি আদায় করার বা মহর মাফ করিয়ে নেওয়ার বা ফেরত নেওয়ার দাবি করে বসে। কুরআনে কারীম এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে, ইরশাদ হচ্ছে– وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাতে মহর ফিরিয়ে নেওয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে, স্ত্রীকে দেওয়া মহর ফেরত নেওয়া হারাম, স্ত্রীকে যে মোহর দেওয়া হয়েছে, তালাকের পরিবর্তে সেটা ফেরত গ্রহণ স্বামীর জন্য বৈধ নয়। হ্যাঁ, যখন নিরুপায় অবস্থায় হয়, কোনোক্রমেই তাদের মধ্যে বনিবনাও না হয় এবং তাদের আশঙ্কা হয় পারস্পরিক অসদ্ভাবের দরুন তারা মহান আল্লাহর বিধিনিষেধ রক্ষা করে চলতে পারবে না, সেই সাথে স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর অধিকার আদায়েরও কোনো ত্রুটি না হয়, তখন স্বামী ইচ্ছা করলে তালাকের বদলে মোহর ফেরত নিতে পারে। অন্যথায় স্ত্রীর নিকট হতে অর্থ গ্রহণ করা তার জন্য হারাম। –[তাফসীরে উসমানী]

খুলা তালাকের বিধান : এ আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা এভাবে করা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যখন রাগের বশবর্তী হয়ে তালাক দেয়, তখন এ জঘন্য আচরণ করে ফেলে যে, এতদিন যাবৎ [প্রিয়তমা] স্ত্রীকে দেওয়া মহর ও অলংকার-বস্ত্র সব কিছু ছিনিয়ে রেখে দেয়। আরবের জাহিলি যুগে এ রীতি আরো ব্যাপক-বিস্তৃত ছিল। এখানে এ নিপীড়নমূলক প্রথার প্রতিই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে বলে দেওয়া হলো যে, মহর ইত্যাদি যা কিছু স্বামী ইতঃপূর্বে স্ত্রীকে প্রদান করেছিল, তালাকের সময় তা ফেরত চাইতে পারবে না। এমনিতেও এ ব্যাপারটি ইসলামি নৈতিকতার পরিপন্থি।

http://islamiboi.wordpress.com

কাউকে **কোনো বস্তু উপহার দিয়ে** ফেরত নেওয়ার প্রতি হাদীসে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীসে তো এ নিচু কাজটিকে **কুকুরের আহার কর্মের পর** বমি করে ফেলে দিয়ে আবার তা চেটে চেটে খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি **আরো জঘন্যতম। কেননা একজন** স্বামীর জন্য এটি নিতান্তই লজ্জার কথা যে, সে স্ত্রীকে বিদায় করার সময় তার কাছ থেকে **পূর্বে দেওয়া কোনো বস্তু** রেখে দিচ্ছে। অথচ ইসলাম এ নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সময় কিছু **হাদিয়া দিয়ে বিদায় করবে।** –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩৬১]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মানুষ তার স্ত্রীর মহর হিসেবে যা আদায় করত, তা পুনরায় **আত্মসাৎ করে** নিত। আর সামাজেও সেটা দূষণীয় ছিল না। এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[আবূ দাঊদ, লুবাব]

قَوْلَهُ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ : আয়াতের মর্ম হলো, স্ত্রীদেরকে মহর বাবদ প্রদানকৃত কোনো বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। তবে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বনিবনা না হয়; স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা, অসদাচরণ ও বেয়াদবিমূলক ব্যবহার প্রকাশিত হয় এবং স্বামীর পক্ষ থেকে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে মারধর, গালাগালি ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহলে স্ত্রী স্বামীকে মহরের সম্পদ থেকে কিছু দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাইলে স্বামীর জন্য তা গ্রহণ করা জায়েজ হবে। আর এটাকেই পরিভাষায় خُلْع বলে। –[জালালাইন, সংশ্লিষ্ট হাশিয়া]

হযরত জুরাইয (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ছাবেত ইবনে কায়েস ও হাবীবা কিংবা জামীলা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাবীবা তাঁর স্বামীর ব্যাপারে নবীজী ﷺ -এর দরবারে অভিযোগ করলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন– তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে [মহর স্বরূপ] নেওয়া বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? তিনি সম্মতি জানালেন। তখন নবী করীম ﷺ স্বামীকে ডেকে এ প্রস্তাব শুনিয়ে বললেন– اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً অর্থাৎ বাগানের বিনিময়ে তাকে তালাক দিয়ে দাও। স্বামী আরজ করলেন, সেটি কি আমার জন্য হালাল হবে? নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। স্বামী আরজ করলেন, তাহলে আমি তাই করে নিলাম। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়। –[ইবনে জারীর, লুবাব]

خُلْع 'খুলা' তালাক সংক্রান্ত আলোচনা : স্ত্রী যদি বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ও স্বামীর নিকট হতে তালাক পাওয়ার উদ্দেশ্যে তার পূর্ণ মহর বা মহরের অংশবিশেষের দাবি ছেড়ে দিতে চায়, তবে এটিও বিচ্ছেদের একটি পন্থা হতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য সে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে। তালাকের এ বিশেষ পদ্ধতি, যাতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের আবেদন হয়ে থাকে- শরিয়তের পরিভাষায় তা خُلْع 'খুলা' তালাক নামে অভিহিত। এ 'খুলা' তালাক শুধু আয়াতে বর্ণিত আশঙ্কার ক্ষেত্রেই সীমিত নয়, বরং সাধারণভাবেই তা বৈধ।

خُلْع -এর পরিচয় : خَلَعَ (ف) يَخْلَعُ অর্থ– খুলে ফেলা। خَلَعَ الْمَرْأَةُ - স্ত্রী সম্পদের বিনিময়ে বিচ্ছেদ গ্রহণ করা। মহিলার পক্ষ থেকে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের দাবি হলে তাকে خُلْع বলে। আর স্বামীর পক্ষ থেকে সম্পদের বিনিময়ে তালাকের দাবি করা হলে তাকে طَلَاقٌ عَلَى الْمَالِ বলে।

قَوْلَهُ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ : এখানে হাদীসে বর্ণিত আছে বলে নিম্নোক্ত হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَائَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ بْنِ وَهَبِ بْنِ عَتِيْكِ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَهَا فَجَائَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ اِنِّىْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلَاقِىْ وَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَاِنَّمَا مَعَهُ هُدْبَةُ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ : أَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত রিফাআ (রা.)-এর এক স্ত্রী ছিল। রিফাআ (রা.) তাকে তালাক দিলে তিনি আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিছু দিন সংসার করার পর নতুন স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজি ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আমি পূর্বে রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে তালাক দিলে আমি আব্দুর রহমান ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সাথে বিবাহে আবদ্ধ হই। কিন্তু তার যৌনশক্তি নেই বললেই চলে। রাসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন, তাহলে কি তুমি ফের রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? যদি তাই চাও! তাহলে উভয়ে উভয়ের মধু আস্বাদন করতে হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣٠. فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأُهَا كَمَا فِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيِ الزَّوْجُ الثَّانِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيِ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَرَاجَعَا إِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْمَذْكُوْرَاتُ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

অনুবাদ :

২৩০. অতঃপর সে অর্থাৎ স্বামী দুই তালাক প্রদানের পর যদি তাকে তালাক দেয় তবে এ মোট তিন তালাকের পর সে তার অর্থাৎ পূর্ব স্বামীর জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীকে নিকাহ না করবে অর্থাৎ বিবাহ না করেছে এবং তার সাথে সঙ্গত না হয়েছে। শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] বর্ণিত একটি হাদীসে এ কথার উল্লেখ রয়েছে। তারপর সে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে যদি মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে তবে ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে উভয়ের প্রত্যাগত হতে কারো স্ত্রী ও প্রথম স্বামীর কোনো অপরাধ হবে না। এগুলো উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহর সীমারেখা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ যারা চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য তিনি তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন।

٢٣١. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِأَنْ تُرَاجِعُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ أَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اُتْرُكُوْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ بِالرَّجْعَةِ ضِرَارًا مَفْعُوْلٌ لَهُ لِتَعْتَدُوْا عَلَيْهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ وَالتَّطْلِيْقِ وَتَطْوِيْلِ الْحَبْسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِتَعْرِيْضِهَا إِلَى عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا مَهْزُوًّا بِهَا بِمُخَالَفَتِهَا اُذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْحِكْمَةِ مَا فِيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَعِظُكُمْ بِهِ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِالْعَمَلِ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ.

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করে অর্থাৎ ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তোমরা হয় [সদাচারের সাথে] কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে তাদেরকে রেখে দিবে অর্থাৎ রাজআত বা তাদের পুনঃগ্রহণ করে নেবে অথবা বিধিমতো মুক্ত করে দেবে অর্থাৎ ইদ্দতকাল পূর্ণ করার জন্য ছেড়ে রাখবে। তাদের বিবাহবন্ধন হতে মুক্তিপণ দিতে ও তালাক প্রদান করতে বাধ্য করে বা আটকে রাখাকে দীর্ঘায়িত করে তাঁদের ক্ষতি করত অন্যায় আচরণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে রাজআত বা পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে তোমরা আটকে রেখো না। যে এরূপ করে সে আল্লাহর আজাবের মাঝে নিজেকে পেশ করে নিজের প্রতিই জুলুম করে এবং তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে তার বিরোধিতা করে ঠাট্টা-তামাশা-এর বস্তু বানাইও না। তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ ইসলাম এবং যে কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন ও হিকমত অর্থাৎ তার বিধি-বিধানসমূহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, তা স্মরণ কর। অর্থাৎ এতদনুসারে আমল করে এগুলোর শুকরিয়া আদায় কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ! যে, নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞানময়। কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْثِنْتَيْنِ : দুই [তালাক]। يَطَأَ : সঙ্গম করবে। اِنْقِضَاءُ الْعِدَّةِ : ইদ্দত সমাপ্ত হওয়া। يَتَدَبَّرُوْنَ : **চিন্তাভাবনা করে।** اَجَلٌ : নির্দিষ্ট সময়। اِنْقِضَاءُ : অতিক্রান্ত হওয়া। لِتَعْتَدُوْا : অন্যায় আচরণের উদ্দেশ্যে। اَلْاِلْجَاءُ : বাধ্য করা, ঠেলে দেওয়া। اَلْاِفْتِدَاءُ : মুক্তিপণ দেওয়া। تَطْوِيْلُ الْحَبْسِ : আটকে রাখাকে দীর্ঘায়িত করা। تَعْرِيْضٌ : পেশ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ طَلَّقَهَا : অর্থাৎ এই প্রথম দুই তালাকের পর রাজআত না করলে এবং শুধু দ্বিতীয় তালাকে দৃঢ় অবস্থানই নয়, বরং তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা এ অবস্থায় এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝেশুনেই সে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারবে না। তাদের পুর্নবিবাহের শর্ত হলো স্ত্রী ইদ্দতের পর অপর স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বসবে এবং সে স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে কোনো কারণে তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

এখানে কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরিয়তসম্মত বিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। কেননা আয়াতে اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ -এর পর তৃতীয় তালাককে اِنْ [যদি] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ : এ অংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াতে উল্লিখিত بَعْدُ শব্দটি পেশের উপর مَبْنِىْ হয়েছে। কেননা তার মুযাফ ইলাই মাহযূফ রয়েছে। আর তা হলো– اَلطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ সুতরাং এ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না যে, حَرْفُ الْجَارِ -এর কারণে بَعْدَ মাজরূর হওয়া উচিত ছিল।

قَوْلُهُ تَنْكِحَ : تَنْكِحَ -এর ব্যাখ্যায় تَتَزَوَّجَ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نِكَاحٌ পারিভাষিক অর্থে অর্থাৎ শুধু বিয়ে চুক্তির অর্থে নয়; বরং এখানে মূল আভিধানিক অর্থ তথা وَطْى [সহবাস করা] উদ্দেশ্য। কেননা শুধু বিয়ে তো زَوْجًا দ্বারাই বোধগম্য হয়; সেই সঙ্গে تَنْكِحَ শব্দ বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সহবাস হওয়া প্রকাশ করা। অপর দিকে عَقْدِ نِكَاحٌ উদ্দেশ্য নিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতি নিসবতটি حَقِيْقِىْ হবে। আর যদি وَطْى উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পুরুষের ক্ষেত্রে নিসবতটি حَقِيْقِىْ হবে; কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে مَجَازِىْ হবে।

قَوْلُهُ يَطَأُهَا : অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী তার সঙ্গে সহবাসও করে নেবে। এ ইবারতটুকু দ্বারা ঐ সকল লোকদের মতকে খণ্ডন করা হচ্ছে, যারা হিল্লা করার জন্য শুধু عَقْدِ نِكَاحٌ -ই যথেষ্ট মনে করে। এ উক্তিটি মাশহুর হাদীসের পরিপন্থি।

মোটকথা, তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী ঐ প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না তবে পাঁচ শর্তে–

১. প্রথম স্বামীর তালাকের ইদ্দত পালন।
২. দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিয়ে।
৩. দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সহবাস।
৪. অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর তালাক প্রদান।
৫. তার তালাকের ইদ্দত পালন।

হিল্লা বিয়ের বিধান : কোনো তালাকপ্রাপ্তাকে নতুন স্বামীর এ শর্তে বিয়ে করা যে, সহবাসের পরে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, যাতে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হতে পারে- একে 'হালালা' [হিলা, হিল্লা বিয়ে] বলে। হাদীসে এ ধরনের **মুহাল্লিল** ও **মুহাল্লাল লাহু** -এর জন্য অভিশাপ উচ্চারিত হয়েছে। অধিকাংশ ফকীহের মতে এ বিয়ে ফাসিদ ও ত্রুটিপূর্ণ বিয়ে হিসেবে

http://islamiboi.wordpress.com

প্রতিপন্ন হবে। হানাফীদের মতে আইনগত পর্যায়ে বিয়ের শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়ার কারণে এ বিয়ে সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে এতে অবশ্যই গুনাহগার হবে। তবে মুফতি মাহমূদ হাসান গাঙ্গহী (র.) তাঁর মালফূযাতে বলেছেন, হাদীসে যে লানতের কথা উচ্চারিত হয়েছে তা ঐ সুরতের সঙ্গে প্রযোজ্য হবে, যখন হিল্লার জন্য কোনো পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় এবং তালাক দেওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তালাক শর্ত না করা হয় বা পারিশ্রমিক ধার্য না করা হয়; বরং সাধারণ গতিতে বিবাহ করে এবং নিজের মনে মনে রাখে যে দু-এক দিন পর তালাক দিয়ে দেব, যাতে বেচারা প্রথম স্বামীর সংসার বিনষ্ট না হয়ে যায়। তাহলে এটা শুধু জায়েজই নয়; বরং ছওয়াবও মিলবে।

-[মালফূযাতে ফকীহুল উম্মাহ খ. ১, পৃ. ১৪]

قَوْلُهُ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ : فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ-এর ব্যাখ্যায় قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে بُلُوْغ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلدُّنُوُّ مِنَ الْوُصُوْلِ অর্থাৎ ইদ্দত সমাপ্তির কাছাকাছি পৌছে যাওয়া, প্রকৃতই শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এ অর্থ নেওয়া হলে পরবর্তী শব্দ فَاَمْسِكُوْهُنَّ আনা শুদ্ধ হবে। কেননা ইদ্দত শেষ হলে তো আর اِمْسَاكٌ সম্ভব নয়। -[জালালাইন-সংশ্লিষ্ট টীকা]

قَوْلُهُ اَجَلَهُنَّ : তাদের সময়। اَجَلٌ কোনো কিছুর পূর্ণ সময়ও বুঝায়, আবার সময়ের শেষ প্রান্তও বুঝায়।

সারকথা, একবার বা দুবার পর্যন্ত দেওয়া রেজয়ী তালাক, যার ইদ্দতের সময় পূর্ণ হয়ে আসছে। এখনো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। এ সময় স্বামীর দুটি অধিকার রয়েছে- ক. হয়তো এ অর্ধ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে সসম্মানে ভদ্রতার সাথে নিজের বৈবাহিক সম্পর্কে ফিরিয়ে আনবে। খ. কিংবা ভদ্রতার সঙ্গে ও সসম্মানে তাকে নিজের বাড়ি থেকে বিদায় জানাবে এবং উভয়ে পৃথক হয়ে যাবে। মোটকথা উভয় পন্থার যেটিই গ্রহণ করা হোক, তাতে মূল লক্ষণীয় হবে শরিয়ত ও নৈতিকতার বিধান।

قَوْلُهُ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا : আল্লাহর আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না। খেলায় পরিণত করার একটি তাফসীর হচ্ছে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোনো কোনো লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাঁদিকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলত যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেওয়া বা মুক্তি দিয়ে দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাজিল হয়। এতে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসেবেও সম্পাদন করে তবুও তা কার্যকর হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, সেগুলো হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা উভয়ই সামান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাসমুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে মার্দুবিয়্যাহ্ উদ্ধৃত করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, আর ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) থেকে। -[মা'আরিফুল কুরআন : আয়াত- ১২৮]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣٢. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ خِطَابٌ لِلْاَوْلِيَاءِ اَىْ لَا تَمْنَعُوْهُنَّ مِنْ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ الْمُطَلِّقِيْنَ لَهُنَّ لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا اَنَّ اُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَاَرَادَ اَنْ يُّرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقِلٌ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ اِذَا تَرَاضَوْا اَىِ الْاَزْوَاجُ وَالنِّسَاءُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ شَرْعًا ذٰلِكَ النَّهْىُ عَنِ الْعَضْلِ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ لِاَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهٖ ذٰلِكُمْ اَىْ تَرْكُ الْعَضْلِ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ لَكُمْ وَلَهُمْ لِمَا يُخْشٰى عَلَى الزَّوْجَيْنِ مِنَ الرِّيْبَةِ بِسَبَبِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَاتَّبِعُوْا اَمْرَهُ .

অনুবাদ :

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তারা তাদের মুদ্দতে পৌঁছায় অর্থাৎ তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে তখন তারা যদি শরিয়তানুসারে বিধিমতো পরস্পর অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীগণ সম্মত হয়, তবে নিজেদের যারা তাদেরকে তালাক প্রদান করেছে সেই স্বামীগণকে বিবাহ করতে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। নিষেধ করো না। এ নির্দেশে মূলত নারীদের ওলী বা অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হাকিম (র.) বর্ণনা করেন, এ আয়াতটির শানে নুযূল হলো, মা'কিল ইবনে ইয়াসার নামক জনৈক সাহাবীর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিল। পরে তিনি তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে মা'কিল তাতে তার বোনকে বাধা দেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তা দ্বারা অর্থাৎ এই বাধা নিষিদ্ধ করা দ্বারা উপদেশ দান করা হয় তোমাদের মধ্যে যে জন আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তাকে। কেননা এ উপদেশ দ্বারা সে-ই কেবল উপকৃত হতে পারে। এটা অর্থাৎ বাধা প্রদান পরিত্যাগ করা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম মঙ্গলজনক। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে পূর্ব সম্পর্ক থাকায় তাদের বিষয়ে নানা সন্দেহের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে তা তোমাদের ও তাদের সকলের পক্ষে [ও পবিত্রতম।] এতে কি কি কল্যাণ নিহিত তা [আল্লাহই জানেন, আর তোমরা তা জান না। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশের অনুসরণ কর।

তাহকীক ও তারকীব

اَجَل : মুদ্দত, নির্দিষ্ট সময়। اِنْقَضَتْ : অতিক্রান্ত হলো। فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ : তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। اَلْعَضْلُ (ن) : বাধা দেওয়া। اَزْكٰى : শুদ্ধতম, অধিক উপকারী। يُقَالُ : زَكَا الزَّرْعُ اِذَا نَمَا بِكَثْرَةٍ وَبَرَكَةٍ - اَلرِّيْبَةُ : সন্দেহ। اَلْعَلَاقَةُ : সম্পর্ক। اَلْمَصْلَحَةُ : কল্যাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা ও যোগসূত্র : পূর্বের দুটি আয়াতে তালাকের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাসআলা আলোচিত হয়েছে। এখান থেকে এ সংক্রান্ত আরো কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে।

http://islamiboi.wordpress.com

এ আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণত তালাকপ্রাপ্ত নারীদের সাথে করা হয়। তা হলো তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া হয় কিংবা প্রথম স্বামীর সাথেও শরিয়ত মোতাবিক বিয়ে বসতে চায়, তাহলে তার অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন তালাক দেওয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশত উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় স্বামীও তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়াতে **নিজের** ইজ্জত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে বাধার সৃষ্টি করে। উক্ত আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ : এখানে فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ -এর ব্যাখ্যায় اِنْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ উল্লেখ করে এদিকে **ইঙ্গিত করেছেন** যে, এখানে بُلُوْغٌ দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় ইদ্দতের সময় শেষের কাছাকাছি পৌঁছা উদ্দেশ্য নয়; বরং **এখানে** حَقِيْقِىْ বা প্রত্যক্ষরূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার অর্থে। কেননা বিবাহ থেকে বারণ করার ব্যাপারটি কেবল **ইদ্দতের পরেই** হতে পারে। পক্ষান্তরে পূর্বের আয়াতে بُلُوْغٌ দ্বারা মাজাযী অর্থ তথা قُرْبٌ [নিকটবর্তী হওয়া] উদ্দেশ্য। -[জালালাইন, **সংশ্লিষ্ট টীকা**]

قَوْلُهُ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ : এটি فِعْل نَهْى جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। অর্থ- তোমরা **তাদেরকে বাধা দিও না।** [ن] عَضْلًا عَضْل অর্থ- কঠোরভাবে বাধা দেওয়া।

قَوْلُهُ خِطَابٌ لِلْاَوْلِيَاءِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে ঐ সমস্ত লোকদের **বক্তব্যের খণ্ডন করা উদ্দেশ্য, যারা** لَا تَعْضُلُوْا -এর مُخَاطَبٌ তালাক প্রদানকারী স্বামীকে আখ্যা দিয়ে থাকে। **তাদের মতে অর্থ হবে- তালাক প্রদানকারী স্বামীরা যেন** নিজেদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে বিবাহ বসতে বাধা না দেয়। এ **অর্থটি শুদ্ধ না হওয়ার কারণ হলো**, এ সুরতে اَزْوَاجَهُنَّ -এর মাজাযী অর্থ তথা مَا يَؤُوْلُ হিসেবে স্বামী **উদ্দেশ্য নিতে হবে। আর যদি** لَا تَعْضُلُوْهُنَّ -এর مُخَاطَبٌ স্ত্রীর অভিভাবক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে اَزْوَاجَهُنَّ -এর প্রকৃত **অর্থ তথা পূর্বের স্বামী উদ্দেশ্য হবে**, তখন অর্থ হবে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে বাধা দিয়ো না। **এখানে স্বামী** مَا كَانَ **হিসেবে হবে।** আর এটিই হলো তার প্রকৃত অর্থ।

قَوْلُهُ لِاَنَّ سَبَبَ نُزُوْلِهَا : **এটি এ কথার প্রমাণ যে,** لَا تَعْضُلُوْهُنَّ -এর মুখাতাব স্ত্রীর অভিভাবকরা, পূর্বের স্বামী নয়। কেননা আয়াতের **শানে নুযূল দ্বারা জানা যায় যে**, বাধাদানকারী অভিভাবকরাই ছিল।

قَوْلُهُ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ شَرْعًا : অর্থাৎ যখন উভয়ে শরিয়তের নিয়মানুযায়ী রাজি হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে **রাজি না হয়, তবে কোনো** এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ প্রয়োগ করা বৈধ হবে না।

এরপর بِالْمَعْرُوْفِ অংশ থেকে **বুঝা যায়** যে, মহিলা যদি শরিয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ করে, তাহলে তাকে বাধা দিতে নেই। আর শরিয়ত পরিপন্থি পন্থায় **করলে বাধা দেবে। যথা-** বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী স্ত্রীর মতো বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র **বিয়ে না করেই** যদি পুনঃবিবাহ করতে চায়, অথবা ইদ্দতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল **মুসলমানের এবং বিশেষ** করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, **এমনকি শক্তি প্রয়োগ** করতে হলেও তা করতে হবে। মুসান্নিফ (র.) شَرْعًا **শব্দ দ্বারা** এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ لِاَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهٖ : অর্থাৎ উল্লিখিত **আদেশ** দ্বারা মু'মিনগণকেই **উপদেশ** দেওয়া হয়েছে। কেননা এ উপদেশ দ্বারা তারাই উপকৃত হয়। তা না হলে **উপদেশ তো সকলের** জন্যই ব্যাপক, বিশেষ কারো জন্য সীমিত নয়। তাছাড়া মু'মিনগণকে **বিশেষভবে** উল্লেখ করা দ্বারা অন্যদের **প্রতি** তিরস্কার ও অবজ্ঞাও উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ যারা এসব আদেশ পালন করে না, তাদের যেন আল্লাহ তা'**আলা ও আখিরাতে** বিশ্বাসই নেই। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : প্রকৃত কল্যাণ আল্লাহই ভালো জানেন। **স্ত্রীকে বিবাহে** বাধা প্রদান না করা ও তার বিবাহ হয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন পবিত্রতা রয়েছে, যা বিবাহে বাধা **দেওয়ার মাঝে** আদৌ নেই। অনুরূপ স্ত্রী যখন প্রাক্তন স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট থাকে, তখন তারই সাথে তার বিবাহ হওয়ার মাঝে যে পবিত্রতা নিহিত আছে, তা অন্যের সাথে বিবাহ হওয়ার মাঝে আদৌ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদের মানোভাব এবং ভবিষ্যৎকালীন লাভ ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তোমরা তার কিছুই জান না। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣٣. وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَىْ لِيُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ عَامَيْنِ كَامِلَيْنِ صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ اَىِ الْاَبِ رِزْقُهُنَّ اِطْعَامُ الْوَالِدَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ عَلَى الْاِرْضَاعِ اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ بِالْمَعْرُوْفِ بِقَدْرِ طَاقَتِهٖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا طَاقَتَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا بِسَبَبِهٖ بِاَنْ تُكْرَهَ عَلٰى اِرْضَاعِهٖ اِذَا امْتَنَعَتْ وَلَا يُضَارَّ مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ اَىْ بِسَبَبِهٖ بِاَنْ يُّكَلَّفَ فَوْقَ طَاقَتِهٖ وَاِضَافَةُ الْوَلَدِ اِلٰى كُلٍّ مِّنْهُمَا فِى الْمَوْضَعَيْنِ لِلْاِسْتِعْطَافِ وَعَلَى الْوَارِثِ اَىْ وَارِثِ الْاَبِ وَهُوَ الصَّبِىُّ اَىْ عَلٰى وَلِيِّهٖ فِىْ مَالِهٖ مِثْلُ ذٰلِكَ الَّذِىْ عَلَى الْاَبِ لِلْوَالِدَةِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ فَاِنْ اَرَادَا اَىِ الْوَالِدَانِ فِصَالًا فِطَامًا لَهٗ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ صَادِرًا عَنْ تَرَاضٍ اِتِّفَاقٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا لِتَظْهَرَ مَصْلَحَةُ الصَّبِىِّ فِيْهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِىْ ذٰلِكَ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ خِطَابٌ لِلْاٰبَاءِ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مَرَاضِعَ غَيْرَ الْوَالِدَاتِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ اِذَا سَلَّمْتُمْ اِلَيْهِنَّ مَّآ اٰتَيْتُمْ اَىْ اَرَدْتُّمْ اِيْتَاءَهٗ لَهُنَّ مِنَ الْاُجْرَةِ بِالْمَعْرُوْفِ بِالْجَمِيْلِ كَطِيْبِ النَّفْسِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِّنْهُ.

অনুবাদ :

২৩৩. জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই হাওল كَامِلَيْنِ এটা صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ বা তাকিদবাচক বিশেষণ। অর্থাৎ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে অর্থাৎ সে যেন দুধ পান করায়। وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ الخ এ স্থানে বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক হলেও মূলত اَمْر বা নির্দেশ ব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা তার জন্য যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায়। এর অতিরিক্ত তার কর্তব্য নয়। জনকের পিতার কর্তব্য বিধিমতো অর্থাৎ তার সামর্থ্যানুসার তাদের জননীদের যদি তারা তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে স্তন্যপান করানোর দরুন জীবিকা খাদ্য ও বস্ত্র দান করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেওয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যায় না। অর্থাৎ সে যদি অস্বীকার করে তবে স্তন্য পান করানোর জন্য তাকে বাধ্য করে কষ্ট দেওয়া যায় না। এবং কোনো জনককে তার সন্তানের কারণে, যেমন– তার সাধ্যাতীত ব্যয়ভার তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে] ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। اِسْتِعْطَافٌ বা হৃদয়ে করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে উভয় স্থানে সন্তানকে প্রত্যেকের দিকে সম্বন্ধ করে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং উত্তরাধিকারীগণেরও পিতার উত্তরাধিকারী পুত্র অর্থাৎ তার ধন-সম্পত্তির যে অভিভাবক তার উপর অনুরূপ অর্থাৎ জননীকে খাদ্য ও বস্ত্র দান যেরূপ জনকের উপর কর্তব্য ছিল, তেমনি তা তার উপরও কর্তব্য তাদের পরস্পর সম্মতি। عَنْ تَرَاضٍ এটা এ স্থানে উহ্য صَادِرٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। ঐকমত্য এবং স্তন্যপান বন্ধ করতে সন্তানের কি কল্যাণ হতে পারে তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরস্পর পরামর্শক্রমে যদি তারা জনক ও জননী দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তার স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে এতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। যদি তোমরা এ স্থলে পিতাদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তোমাদের সন্তানদেরকে জননী ব্যতীত অন্য ধাত্রীদের দ্বারা স্তন্যপান করাতে চাও তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই, সাদাচারের সাথে সুন্দরভাবে, মনের খুশিতে তোমরা যা দিয়েছিলে অর্থাৎ তাদেরকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক তোমরা দিতে চেয়েছিলে তা যদি তাদেরকে অর্পণ কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যকলাপেরই দ্রষ্টা। তাঁর নিকট এর কিছুই গোপন নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْوَالِدٰتُ : وَالِدَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- জননীগণ। يُرْضِعْنَ : مُضَارِعْ جَمْع مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ- স্তন্যদান করবে। اَلْاَرْضَاعُ : দুধ পান করানো। حَوْلَيْنِ : حَوْلٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ- বছর। كِسْوَةٌ : বস্ত্র প্রদান। لَا تُكَلَّفُ : দায়িত্ব দেওয়া হয় না। وَسْعٌ : সামর্থ্য। لا تضار : ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। اِمْتَنَعَتْ : বিরত থাকল। لِلْاِسْتِعْطَافِ : করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে। فِصَالًا : স্তন্যপান বন্ধ করা। سُمِّيَ بِهٖ لِاَنَّ الْوَلَدَ يَنْفَصِلُ عَنْ لَبَنِ اُمِّهٖ اِلٰى غَيْرِهٖ مِنَ الْاَقْوَاتِ.

فِطَامًا : فِطَامًا (ن) فَطَمَ অর্থ- বাচ্চার দুধ ছাড়ানো। مَرَاضِعُ : مُرْضِعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- ধাত্রী। طِيْبَ النَّفْسِ : মনের খুশি। تَشَاوُرٌ : পরামর্শ। শব্দটি شُوْر থেকে নির্গত। شُوْر অর্থ- মধু নিংড়িয়ে বের করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ الخ : এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্বে ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলির আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালনপালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিবাহ বহাল থাকাকালে অথবা তালাক দেওয়ার পর স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থাপিত হোক এখানে উভয় অবস্থার বিধানই আলোচিত হয়েছে।

সন্তানদের স্তন্যদানের বিধান : মায়ের প্রতি নির্দেশ সে তার সন্তানকে দু-বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবে। এ মেয়াদ সেই পিতামাতার জন্য যারা সন্তানের দুধপানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। নয়তো এ মেয়াদ হ্রাস করাও জায়েজ, যেমন আয়াতের শেষে আসছে। যে মা বিবাহ বন্ধনে আছে, যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে, কিংবা তালাকের পর যার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে তারা সকলেই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। হ্যাঁ, তাদের মাঝে এই পার্থক্য রয়েছে যে, বিবাহাধীন ও ইদ্দত পালনরত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়া সর্বাবস্থায় জরুরি, চাই সে দুধ পান করাক আর না-ই করাক। কিন্তু যার ইদ্দত সমাপ্ত হয়েছে, তাকে ভরণপোষণ দিতে হবে কেবল দুধ খাওয়ানোর কারণে, অন্যথায় নয়। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু **জানা গেল যে, যখন মা** দ্বারা দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করানো ইচ্ছা হয় বা যে অবস্থায় পিতার **কাছ থেকে মাকে দুধ পান করানোর** বিনিময় আদায় করিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তার শেষ সীমা পূর্ণ দু-বছর। সাধারণভাবে **সর্বাবস্থায় যে দুধ** খাওয়ানোর মেয়াদ দু'বছর এর বেশি নয়, তা এ আয়াতে বলা হয়নি। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهٗ اَلْوَالِدٰتُ : এখানে وَالِدٰتُ **শব্দ দ্বারা কেবল তালাকপ্রাপ্তা মায়েরাই উদ্দেশ্য, নাকি সকল মায়েরাই?** এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তালাকপ্রাপ্তা **মায়েরাই উদ্দেশ্য,** কেননা পূর্ব **থেকে তাদের আলোচনাই** চলে আসছে। আর কেউ বলেন, সকল মায়েরাই উদ্দেশ্য। **কেননা আয়াতের শব্দ** ব্যাপক। **কিন্তু নাফকা [ভরণপোষণের]** কয়েদ দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইদ্দত পালনকারিণী নারীগণ **বের হয়ে গেছে। কেননা তাদের ভরণপোষণ তো পূর্ব** থেকেই ওয়াজিব রয়েছে। চাই তারা স্তন্যদান করুক বা না করুক।

قَوْلُهٗ لِيُرْضِعْنَ : يُرْضِعْنَ -এর তাফসীর لِيُرْضِعْنَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে خَبَرْ টি اَمْرْ -এর অর্থে আর এমনটি মোবালাগার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

শিশুদের দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব : শিশুদের দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব। কোনো অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে কোনো প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা এটা স্ত্রীর দায়িত্ব। -[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْوَالِدٰتُ : وَالِدَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– জননীগণ। يُرْضِعْنَ : مُضَارِعْ جَمْعْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– স্তন্যদান করবে। اَلْاَرْضَاعُ : দুধ পান করানো। حَوْلَيْنِ : حَوْلٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ– বছর। كِسْوَةٌ : বস্ত্র প্রদান। لَا تُكَلَّفُ : দায়িত্ব দেওয়া হয় না। وَسْعٌ : সামর্থ্য। لا تضار : ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় না। اِمْتَنَعَتْ : বিরত থাকল। لِلْاِسْتِعْطَافِ : করুণা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে। فِصَالًا : স্তন্যপান বন্ধ করা। سُمِّيَ بِهٖ لِاَنَّ الْوَلَدَ يَنْفَصِلُ عَنْ لَبَنِ اُمِّهٖ اِلٰى غَيْرِهٖ مِنَ الْاَقْوَاتِ.
فِطَامًا : فِطَامًا (ن) فَطَمَ অর্থ– বাচ্চার দুধ ছাড়ানো। مَرَاضِعُ : مُرْضِعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– ধাত্রী। طِيْبُ النَّفْسِ : মনের খুশি। تَشَاوُرٌ : পরামর্শ। শব্দটি شُوْر থকে নির্গত। شُوْر অর্থ– মধু নিংড়িয়ে বের করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ الخ : এ আয়াতে স্তন্যদান সম্পর্কে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্বে ও পরবর্তী আয়াতে তালাক সংক্রান্ত আদেশাবলির আলোচনা হয়েছে। এরই মধ্যে শিশুকে স্তন্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত তালাকের পরে শিশুর লালনপালন ও স্তন্যদান নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ আয়াতে এমন ন্যায়সঙ্গত নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। বিবাহ বহাল থাকাকালে অথবা তালাক দেওয়ার পর স্তন্যদান বা দুধ ছাড়ানোর বিষয় উপস্থাপিত হোক এখানে উভয় অবস্থার বিধানই আলোচিত হয়েছে।

সন্তানদের স্তন্যদানের বিধান : মায়ের প্রতি নির্দেশ সে তার সন্তানকে দু-বছর পর্যন্ত দুধ পান করাবে। এ মেয়াদ সেই পিতামাতার জন্য যারা সন্তানের দুধপানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়। নয়তো এ মেয়াদ হ্রাস করাও জায়েজ, যেমন আয়াতের শেষে আসছে। যে মা বিবাহ বন্ধনে আছে, যাকে তালাক দেওয়া হয়েছে, কিংবা তালাকের পর যার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে তারা সকলেই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। হ্যাঁ, তাদের মাঝে এই পার্থক্য রয়েছে যে, বিবাহাধীন ও ইদ্দত পালনরত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেওয়া সর্বাবস্থায় জরুরি, চাই সে দুধ পান করাক আর না-ই করাক। কিন্তু যার ইদ্দত সমাপ্ত হয়েছে, তাকে ভরণপোষণ দিতে হবে কেবল দুধ খাওয়ানোর কারণে, অন্যথায় নয়। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু জানা গেল যে, যখন মা দ্বারা দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করানো ইচ্ছা হয় বা যে অবস্থায় পিতার কাছ থেকে মাকে দুধ পান করানোর বিনিময় আদায় করিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তার শেষ সীমা পূর্ণ দু-বছর। সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় যে দুধ খাওয়ানোর মেয়াদ দু'বছর এর বেশি নয়, তা এ আয়াতে বলা হয়নি। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ الْوَالِدٰتُ : এখানে وَالِدٰتُ শব্দ দ্বারা কেবল তালাকপ্রাপ্তা মায়েরাই উদ্দেশ্য, নাকি সকল মায়েরাই? এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তালাকপ্রাপ্তা মায়েরাই উদ্দেশ্য, কেননা পূর্ব থেকে তাদের আলোচনাই চলে আসছে। আর কেউ বলেন, সকল মায়েরাই উদ্দেশ্য। কেননা আয়াতের শব্দ ব্যাপক। কিন্তু নাফকা [ভরণপোষণের] কয়েদ দ্বারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং ইদ্দত পালনকারিণী নারীগণ বের হয়ে গেছে। কেননা তাদের ভরণপোষণ তো পূর্ব থেকেই ওয়াজিব রয়েছে। চাই তারা স্তন্যদান করুক বা না করুক।

قَوْلُهٗ لِيُرْضِعْنَ : يُرْضِعْنَ -এর তাফসীর لِيُرْضِعْنَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে خَبَرٌ টি اَمْرٌ -এর অর্থে। আর এমনটি মোবালাগার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

শিশুদের দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব : শিশুদের দুধ পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব। কোনো অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুন স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে কোনো প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ বন্ধন বিদ্যমান থাকে। কেননা এটা স্ত্রীরই দায়িত্ব। –[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ : অর্থাৎ দুগ্ধদানের সর্বোচ্চ সীমা হলো দুবছর, তারপর দুগ্ধপান করানো যাবে না। অবশ্য দু-বছরের চেয়ে কম করতে পারবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ সাহেবাইনের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুগ্ধপান করানোর সীমা হলো ত্রিশ মাস। তিনি বলেন, আয়াতে দুবছর দ্বারা مُدَّتُ رِضَاعَتْ নির্ধারণ করা হয়নি; বরং দুগ্ধপান করিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা এখানে اَلْوَالِدٰتُ দ্বারা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উদ্দেশ্য। এ কথার প্রমাণ মিলে وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ দ্বারা। -[হাশিয়া]

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ : এখানে اَلْوَالِدُ না বলে اَلْمَوْلُوْدِ لَهُ বলার কারণ এ কথা বুঝানো যে, স্ত্রীগণ স্বামীদের জন্যই সন্তান প্রসব করে থাকে। মূলত পিতারাই হলেন সন্তানের অধিকারী। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানরা পিতার ভাগে থাকবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ عَلَى الْاِرْضَاعِ اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ بِالْمَعْرُوْفِ : এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণপোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা পিতার দায়িত্ব। তবে এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইদ্দতের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণপোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। -[মাযহারী সূত্রে মা'আরিফুল কুরআন]

মুসান্নিফ (র.) اِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ দ্বারা এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, দুগ্ধদানকারিণী যদি সে লোকের স্ত্রী কিংবা ইদ্দত পালনকারিণী হয়, তবে তার জন্য পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে না। কেননা স্ত্রী হিসেবে তার জন্য ভরণপোষণ পূর্ব থেকেই ওয়াজিব হবে। আর তালাক ও ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসেবে ভরণপোষণ পাবে না, কিন্তু শিশুকে স্তন্যদানের পরিবর্তে মাতা পারিশ্রমিক পাবে।

بِاَنْ تُكْرَهَ عَلٰى اِرْضَاعِ : اَىْ بِغَيْرِ اُجْرَةٍ اَوْ بِاُجْرَةٍ وَعَنْ اُجْرَةِ الْمِثْلِ حَيْثُ طَلَبَتْهَا

قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ : এটি পূর্বে বর্ণিত وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ -এর সাথে عَطْف হয়েছে। উভয়ের মধ্যবর্তী আয়াতাংশ مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ, যা اَلْمَعْرُوْفُ -এর ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। وَعَلَى الْوَارِثِ অর্থাৎ তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর উদরে সন্তান জন্মলাভ করে বা সন্তান জন্মের পর স্বামী যদি মারা যান এবং সম্পদ রেখে যান, তাহলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দুগ্ধদান করলে সন্তানের অভিভাবকগণ তার মাল থেকে মহিলার সে পরিমাণ ভরণপোষণ দেবে, যে পরিমাণ পিতা জীবিত থাকলে ওয়াজিব হতো।

قَوْلُهُ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ : আয়াতের উদ্দেশ্য, অনেক সময় মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দুধ খাওয়াবার প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকতে পারে। সুতরাং তেমন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো ধাত্রী বা মায়ের দুধ পান করানো দূষণীয় হবে না। এটা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে এ শর্তে যে, যথা চুক্তি ও যথা যুক্তি বিনিময় মজুরি আদায় করে দেওয়া হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣٤. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ يَمُوْتُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ يَتْرُكُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ أَيْ لِيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ بَعْدَهُمْ عَنِ النِّكَاحِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا مِنَ اللَّيَالِيْ وَهٰذَا فِيْ غَيْرِ الْحَوَامِلِ وَأَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِآيَةِ الطَّلَاقِ وَالْأَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ مِنَ التَّزَيُّنِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ بِالْمَعْرُوْفِ شَرْعًا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ عَالِمٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ.

অনুবাদ :

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা কাল পূর্ণ করে অর্থাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হয় আর পত্নী ছেড়ে যায় রেখে যায়, তাদের পর তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তবে চার মাস দশ রাত্রি নিজেদের নিয়ে অপেক্ষা করবে يَتَرَبَّصْنَ এটা এ স্থানে خَبَرِيَّة বা বিবরণমূলক হলেও أَمْر বা আজ্ঞাব্যঞ্জক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন এ সময়কাল অপেক্ষা করে। এ ইদ্দত যারা গর্ভবতী নয় তাদের জন্য প্রযোজ্য। সূরা তালাকে উল্লিখিত আয়াতানুসারে গর্ভবতীদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। আর হাদীসানুসারে দাসীগণের ইদ্দত হলো [অর্থাৎ যে সমস্ত দাসী গর্ভবতী নয়] এর **অর্ধেক। যখন** তারা তাদের মুদ্দত সীমায় পৌঁছায় অর্থাৎ তাদের **প্রতীক্ষার** সময়সীমা পূর্ণ করে তখন হে **অভিভাবকগণ! তারা** নিজেদের ব্যাপারে সাজসজ্জা, বিবাহের **পয়গামের জন্য** নিজেকে পেশ করা ইত্যাদি শরিয়তানুসারে **বিধিমতো** যা কিছু করে তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। বাইরের মতো ভিতর সম্পর্কেও তিনি জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ **বিধবার ইদ্দতকাল :** পৃথিবীর বুকে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তাদের পরে বিধবা সমস্যাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম ও মতবাদ বিধবা সমস্যাটিকে বিশেষ কোনো গুরুত্বই দেয়নি; বরং কোনো কোনো ধর্মে বিধবাকে জীবন্ত ভস্মীভূত করারই ব্যবস্থা রেখেছে। ইসলাম অবশ্য বিধবাকে জীবনে বেঁচে থাকার; বরং স্বামী সোহাগিনীদের ন্যায়ই বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। এ অধ্যায়টিও পার্থিব কল্যাণের বিচারে অন্তত ইসলামের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

قَوْلُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا مِنَ اللَّيَالِيْ : **প্রশ্ন** হতে পারে, সাধারণত মাস গণনায় দিনের **কথা উল্লেখ করা** হয়ে থাকে। যেমন- বলা হয় চার **মাস দশ দিন** কিন্তু চার মাস দশ রাত বলা হয় না। এখানে রাতের **কথা** বলা হলো কেন?
উত্তর : ইসলামের কিছু কিছু বিধান যেমন- হজ, রোজা, দুই ঈদ ও মহিলাদের ইদ্দত ইত্যাদির **সম্পর্ক** চান্দ্র মাসের সাথে। আর চান্দ্র তরিখের সূচনা হয় রাত দিয়ে আর দিন রাতের তাবে বা অনুগামী হয়ে থাকে। সুতরাং রাতের মাঝে দিন এমনিতেই অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এর বিপরীত হলে চান্দ্র তারিখে চার মাস দশ দিন অসম্পূর্ণ হবে। এজন্য মুফাসসির (র.) مِنَ اللَّيَالِيْ -এর শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, ইসলামি বর্ষপঞ্জিতে দিনকে রাতের **অনুগামী করা হয়েছে।** তবে **আরাফার দিন এর ব্যতিক্রম।** সেখানে রাতকে দিনের অনুগামী করা হয়েছে। অর্থাৎ ৯ জিলহজের দিবাগত রাতকে **উকূফে আরাফা হিসেবে** সে দিনের হুকুমে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بِآيَةِ الطَّلَاقِ : অর্থাৎ আয়াতের ব্যাপকতায় যারা গর্ভবতী এবং যারা গর্ভবতী নয় এমনকি দাসীগণও উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সূরা তালাকে উল্লিখিত আয়াত গর্ভবতীদেরকে এ বিধান থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আয়াতটি এই- وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তাদের ইদ্দত হলো গর্ভমুক্ত হওয়া। আর হাদীস অনুসারে দাসীগণও উল্লিখিত বিধান থেকে পৃথক হয়ে গেছে। হাদীসটি হলো- عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ অর্থাৎ দাসীদের ইদ্দত হলো দুই হায়েজ [অর্থাৎ স্বাধীনা নারীদের ইদ্দতের অর্ধেক]।

قَوْلُهُ شَرْعًا : বিধবা স্ত্রী যখন তার ইদ্দত সমাপ্ত করবে, অর্থাৎ গর্ভবতী না হলে চার মাস দশ দিন এবং গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা শেষ করবে, তখন শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বিবাহ করা তার জন্য দূষণীয় নয়। অনুরূপ সাজসজ্জা ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করাও তার জন্য বৈধ। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣٥. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ لَوَّحْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي الْعِدَّةِ كَقَوْلِ الْإِنْسَانِ مَثَلًا إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَمَنْ يَجِدُ مِثْلَكِ وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ أَضْمَرْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ مِنْ قَصْدِ نِكَاحِهِنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ بِالْخِطْبَةِ وَلَا تَصْبِرُونَ عَنْهُنَّ فَأَبَاحَ لَكُمُ التَّعْرِيضَ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا أَيْ نِكَاحًا إِلَّا لٰكِنْ أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا أَيْ مَا عُرِفَ شَرْعًا مِنَ التَّعْرِيضِ فَلَكُمْ ذٰلِكَ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَيْ عَلَى عَقْدِهِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ أَيِ الْمَكْتُوبُ مِنَ الْعِدَّةِ أَجَلَهُ بِأَنْ يَنْتَهِيَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ مِنَ الْعَزْمِ وَغَيْرِهِ فَاحْذَرُوهُ أَيْ يُعَاقِبَكُمْ إِذَا عَزَمْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ لِمَنْ يَحْذَرُهُ حَلِيمٌ بِتَأْخِيرِ الْعُقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا .

অনুবাদ :

২৩৫. স্ত্রীলোকদের নিকট অর্থাৎ যে সকল মহিলার স্বামী মারা গিয়েছে তাদের ইদ্দতকালে তোমরা ইঙ্গিতে আভাসে বিবাহের প্রস্তাব করলে যেমন কেউ বলল, তুমি বড় সুন্দরী, তোমার মতো স্ত্রী কয়জনে আর পায়? কতজন তোমার প্রতি অনুরক্ত ইত্যাদি। অথবা তোমাদের অন্তরে তাদের বিবাহের ইচ্ছা গোপন রাখলে লুকিয়ে রাখলে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা শীঘ্রই পয়গাম পাঠিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবে। তাদের বিষয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না। সুতরাং বিবাহের ইঙ্গিত করে রাখা তোমাদের জন্য বৈধ রাখা হয়েছে। শরিয়তানুসারে যা বিধিসম্মত যেমন– বিবাহের ইঙ্গিত করা ইত্যাদি সেই ধরনের কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট বিবাহের কোনো অঙ্গীকার নিও না। قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا : حَرْف اِسْتِثْنَاء বা ব্যত্যয়সূচক শব্দ إِلَّا এ স্থানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع বা বিজাত্য ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মুফাসসির (র.) إِلَّا -এর তাফসীরে لٰكِنْ ব্যবহার করেছেন। নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ নির্ধারিত ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ-চুক্তির অর্থাৎ সে ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করো না।

জেনে রাখ তোমাদের অন্তরে যা বিবাহের সংকল্প ইত্যাদি আছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তাকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ায় আল্লাহর শাস্তি প্রদান করাকে [ভয় কর এবং জেনে রাখ] যারা ভয় করে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, শাস্তিযোগ্যদের শাস্তি প্রদান বিলম্ব করতে সহনশীল।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ : যে সকল মহিলার স্বামী মারা গেছে। خِطْبَةٌ : পয়গাম, প্রস্তাব। تَلْوِيْح - ইঙ্গিত করা। لَوَّحْتُمْ : আভাস দিয়েছ। عَرَّضْتُمْ : ইঙ্গিত করেছ। اَزْوَاجُهُنَّ ... اَلتَّعْرِيْض : ইঙ্গিত, আভাস। اَبَاحَ : বৈধ রেখেছেন। رَاغِبٌ : অনুরক্ত। لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ : অঙ্গীকার নিও না। لَا تَعْزِمُوْا : সংকল্প করো না। عُقْدَةٌ : চুক্তি, বন্ধন। فَاحْذَرُوْا : ভয় কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَوَّحْتُمْ : এ শব্দটি تَلْوِيْح [ইঙ্গিত করা] মাসদার থেকে নির্গত।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اَىْ نِكَاحًا : سِرًّا -এর ব্যাপক প্রচলিত অর্থ– গোপন ও 'রহস্য' সকলেরই জানা। তবে শব্দটির রূপক অর্থ বিয়েও রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) سِرٌّ -এর ব্যাখ্যায় اَىْ نِكَاحًا বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣٦. لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وَفِي قِرَاءَةٍ تَمَاسُّوهُنَّ أَيْ تُجَامِعُوهُنَّ أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مَهْرًا وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ لَا تَبْعَةَ عَلَيْكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَمِ الْمَسِيسِ وَالْفَرْضِ بِإِثْمٍ وَلَا مَهْرَ فَطَلِّقُوهُنَّ وَمَتِّعُوهُنَّ أَعْطُوهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ عَلَى الْمُوسِعِ الْغَنِيِّ مِنْكُمْ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ الضَّيِّقِ الرِّزْقِ قَدَرُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا نَظَرَ إِلَى قَدْرِ الزَّوْجَةِ مَتَاعًا تَمْتِيعًا بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا صِفَةُ مَتَاعًا حَقًّا صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ الْمُطِيعِينَ.

অনুবাদ :

২৩৬. তোমাদের কোনো পাপ নেই স্ত্রীদেরকে তালাক দিলে যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ لَمْ تَمَسُّوهُنَّ এটা অপর এক কেরাতে تَمَاسُّوهُنَّ রূপে পঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে– যখন তোমরা সঙ্গত না হয়েছ। অথবা তাদের জন্য নির্ধারিত কিছু মহর; এখানে تَفْرِضُوا ক্রিয়াপদটির পূর্বে না-বাচক শব্দ لَمْ উহ্য রয়েছে। ধার্য করেছ مَا এ স্থানে مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ বা কালবাচক ক্রিয়ার উৎস অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ স্পর্শ করা বা মহর নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে যদি তালাক হয়, তবুও তোমাদের উপর পাপ বা মহর কিছুই বর্তাবে না। সুতরাং এমতাবস্থায়ও তালাক দিতে পার। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা কর অর্থাৎ তাদের মুত'আ স্বরূপ কিছু দিয়ে দাও। সচ্ছল ব্যক্তি অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিত্তবান সে তার সাধ্যমতো এবং বিত্তহীন জীবিকা যার সংকোচিত, সে তার সাধ্যানুযায়ী عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ [অর্থাৎ বিত্তবান ব্যক্তি তার সাধ্যমতো এবং বিত্তহীন তার সাধ্যমতো] এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় এই বিষয়ে স্ত্রীর সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। শরিয়তানুসারে বিধিসম্মতভাবে সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। مَتَاعًا শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرٍ হলেও مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎসরূপে ব্যবহৃত। এদিকে ইঙ্গিতকরণার্থে মাননীয় তাফসীরকার এর তাফসীরে تَمْتِيعًا শব্দটির ব্যবহার করেছেন। بِالْمَعْرُوفِ এটা مَتَاعًا-এর صِفَةٌ বা বিশেষণ। حَقًّا এটা مَتَاعًا-এর صِفَةٌ ثَانِيَةٌ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশেষণ। কিংবা مَصْدَرٌ مُؤَكَّدَةٌ অর্থাৎ তাকিদবাচক মাসদার। এটা সৎলোকদের আনুগত্যশীলদের কর্তব্য।

তাহকীক ও তারকীব

مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ : যে পর্যন্ত না তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করেছ। أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا : অথবা কিছু ধার্য করেছ।
فَرِيضَةً : নির্ধারিত মহর। تَبْعَةً : تَبْعَةٌ (ج) تَبْعَاتٌ অর্থ– পরিণতি, পরিণাম, দায়িত্ব।
عَدَمُ الْمَسِيسِ : স্পর্শ না করা। مَتِّعُوهُنَّ : মুতআ প্রদান কর।
مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ : যার দ্বারা তারা উপভোগ লাভ করবে। اَلْمُوسِعُ : বিত্তবান, সচ্ছল।
اَلْمُقْتِرُ : বিত্তহীন, অসচ্ছল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الخ শানে নুযূল : এক আনসারী সাহাবী জনৈকা মহিলাকে মহর নির্ধারণ ছাড়া বিবাহ করেছিলেন এবং সহবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়েছিলেন। সে মহিলা হুজুর ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে অভিযোগ করলে উক্ত

http://islamiboi.wordpress.com

আয়াতটি নাজিল হয়। তখন রাসূল ﷺ উক্ত সাহাবীকে ডেকে ইরশাদ করলেন– أَمْتِعْهَا وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ অর্থাৎ তাকে **কিছু উপঢৌকন** দিয়ে দাও, কমপক্ষে তোমার টুপিটি হলেও। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

জ্ঞাতব্য : মহর এবং সহবাস হিসেবে তালাককে চার ভাগে ভাগ করা যায়–

১. মহর নির্ধারণ করা হয়নি এবং সহবাস বা খালওয়াতে সহীহাও হয়নি।

২. মহর নির্ধারণ করা হয়েছে; কিন্তু খালওয়াতে সহীহা হয়নি।

এ দু অবস্থায় তালাকের বিধান উল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা জানা গেছে। উল্লিখিত আয়াতে প্রথম দুই সুরতের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম সুরতের হুকুম হলো মহর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। মূলত কুরআনে এ উপহারের কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। তবে এতটুকু বলে দেওয়া হয়েছে যে, সম্পদশালী তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী দেওয়া উচিত। হযরত হাসান (রা.) অনুরূপ একটি ঘটনায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিশ হাজার দিনার বা দিরহাম সমমূল্যের উপহার দিয়েছিলেন এবং কাজি সুরাইহ (র.) পাঁচ শত দিরহাম সমমূল্যের উপহার দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, مُتْعَةٌ -এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো এক জোড়া বস্ত্র প্রদান করা।

৩. মহর নির্ধারিত হয়েছে এবং খালওয়াতে সহীহাও হয়েছে। এ সুরতে তালাক দিলে নির্ধারিত মহর পুরোটাই দিতে হবে। কুরআনের অন্যত্র এটা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. মহর নির্ধারিত হয়নি তবে খালওয়াতে সহীহা হয়েছে। [এ সুরতে তালাক দিলে মহরে মিছিল বা প্রচলিত মহর দিতে হবে।] –[তাফসীরে উসমানী, জামালাইন]

قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ : মুফাসসির (র.) أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ -এর মাঝে لَمْ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, لَمْ -এর مَدْخُول তথা تَفْرِضُوا শব্দটি تَمَسُّوهُنَّ -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে। আর أَوْ শব্দটি এখানে وَاوْ -এর অর্থে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত مَسِيْس -এবং تَفْرِيْض مَهْر না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক প্রদানে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, أَوْ যখন سِيَاقِ نَفْيٍ -তে পতিত হয়, তখন عُمُوْم -এর ফায়দা দেয়। কেউ কেউ বলেছেন- تَفْرِضُوا শব্দটি أَنْ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে । কিন্তু এটা ঠিক নয়। এটি خِلَافُ ظَاهِرٍ বক্তব্য। কেননা এ সুরতে أَنْ উহ্য ধরতে হবে এবং أَوْ -কে إِلَّا কিংবা إِلَى -এর অর্থে ধরতে হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٣٧. وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ يَجِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النِّصْفُ إِلَّا لٰكِنْ أَنْ يَعْفُوْنَ أَيِ الزَّوْجَاتُ فَيَتْرُكْنَهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِيْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَيَتْرُكُ لَهَا الْكُلَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْوَلِيُّ إِذَا كَانَتْ مَحْجُوْرَةً فَلَا حَرَجَ فِيْ ذٰلِكَ وَأَنْ تَعْفُوْا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أَيْ أَنْ يَتَفَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ

২৩৭. তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও আর মহর ধার্য করে থাক তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক অর্থাৎ এমতাবস্থায় স্ত্রীগণ তার অর্ধেকের অধিকারী হবে, আর বাকি অর্ধেক তোমরা ফেরত পাবে। কিন্তু তারা যদি মাফ করে দেয় إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ : حَرْفُ اسْتِثْنَاء বা ব্যত্যয়সূচক শব্দ। এস্থানে اسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ বা বিজাত্য ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মাননীয় তাফসীরকার এস্থানে لٰكِنْ শব্দের ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ স্ত্রীগণ যদি তার দাবি পরিত্যাগ করে কিংবা যার হাতে রয়েছে বিবাহ বন্ধন সে অর্থাৎ স্বামী যদি মাফ করে দেয় অর্থাৎ সম্পূর্ণই তাকে [স্ত্রীকে] দিয়ে দেয় তবে তারা তা পাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, স্ত্রী যদি শরিয়তানুসারে মাহজূরা [অর্থাৎ উন্মাদ হওয়া, বুদ্ধিহীনতা ইত্যাদির দরুন যাকে কোনো বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধাদান করা হয় বা যার চুক্তি বিবেচ্য হয় না] হয়, তবে তার পক্ষ হতে তার ওলী বা অভিভাবক যদি মোহর মাফ করে দেয় তবে এতে তার কোনো অপরাধ নেই। এবং তোমাদের মাফ করে দেওয়া তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। وَأَنْ تَعْفُوْا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। أَقْرَبُ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা অর্থাৎ একজন অপরজনের উপর অনুগ্রহ করার কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্য-কলাপের দ্রষ্টা। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ : স্পর্শ করার পূর্বে। فَرَضْتُمْ : ধার্য করেছ। مَحْجُوْرَةٌ : উন্মাদ, বুদ্ধিহীনা। لَا تَنْسَوْا : ভুলে যেও না। اَلْفَضْلَ : অনুগ্রহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ الخ : তালাকের একটি অবস্থা এইমাত্র বর্ণিত হলো অর্থাৎ মহরও নির্ণীত ছিল না এবং সহবাস বা একান্ত নির্জনবাস-এর পূর্বেই তালাক হয়ে গিয়েছিল। এখন আরেকটি অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে, মহর তো নির্ণীত হয়েছিল, কিন্তু একান্ত নির্জনবাস বা সহবাসের পূর্বেই তালাক হয়ে গিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ বিধি অনুসারে নির্ণীত মহরের অর্ধেক দিয়ে দেওয়া স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে দুটি অবস্থা এ সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম। ক. স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার দাবি ছেড়ে দিল অর্থাৎ তার প্রাপ্য অর্ধেক মহরও মাফ করে দিল। খ. স্বামী তার দাবি ছেড়ে দিল অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রদত্ত মহরের যে অর্ধেক তার রেখে দেওয়ার বৈধতা ছিল, তা না রেখে পুরো মহরটাই স্ত্রীকে দিয়ে দিল।

قَوْلُهُ وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى : আইন ও বিধি এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে যে, এ ধরনের তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী অর্ধেক মহর রেখে দিতে পারে। এখন সঙ্গে সঙ্গেই আবার নৈতিকতার শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মার্গের প্রতি দিকনির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছে– অধিকার আদায়ের চেয়ে অনেক উত্তম হচ্ছে অধিকার ছেড়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ : সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে যা সম্বন্ধ স্থিতির নয়, সম্পর্কচ্ছেদ ও সম্বন্ধ সমাপ্তির নাম তখনও পরস্পর সদাচার, সুনীতি, মানবতা ও উদারতার জীবনাদর্শ থেকে সরে যেয়ো না। আয়াত থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলেই তাতে পুরানো সান্নিধ্য ও এককালের ভালোবাসা-সৌহার্দ নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং ক্রোধ-উষ্মার অপ্রীতিকর অবস্থায়ও আল্লাহভীতি, সুনীতি, সদাচরণ ও ক্ষমা-বদান্যতার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। لَا تَنْسَوْا -এর ক্রিয়ামূল نِسْيَانٌ এখানে 'ভুলে যাওয়া' অর্থে নয়। কেননা তা তো মানুষের সাধ্যাতীত; বরং এখানে অর্থ হচ্ছে বর্জন করা, এড়িয়ে যাওয়া ও উপেক্ষা করা। আবূ মুহাম্মদ বলেছেন, এখানে اَلنِّسْيَانُ বর্জন (اَلتَّرْكُ) অর্থে। -[ইবনে কুতাইবা]

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : সুতরাং তোমাদের যে কোনো ক্ষেত্রের যে কোনো স্তরের যে কোনো নেক ও ভালো কাজই তাঁর দরবারে অনুল্লেখ্য গুরুত্বহীন ও বেকার হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣٨. حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ الْخَمْسِ بِاَدَائِهَا فِيْ اَوْقَاتِهَا وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى هِيَ الْعَصْرُ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ اَوِ الصُّبْحِ اَوِ الظُّهْرِ اَوْ غَيْرُهَا اَقْوَالٌ وَاَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِفَضْلِهَا وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ فِي الصَّلٰوةِ قٰنِتِيْنَ قِيْلَ مُطِيْعِيْنَ لِقَوْلِهِ ﷺ كُلُّ قُنُوْتٍ فِي الْقُرْاٰنِ فَهُوَ طَاعَةٌ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقِيْلَ سَاكِتِيْنَ لِحَدِيْثِ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ فَاَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

অনুবাদ :

২৩৮. তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি ওয়াক্তানুসারে তা আদায় করতঃ যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] বর্ণিত হাদীসে আছে যে, এটা আসরের সালাত; কেউ কেউ বলেন, এটা ফজর। অপর কেউ বলেন, এটা জোহর। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের অভিমত রয়েছে। এর গুরুত্ব ও মর্যাদার জন্য এটাকে এইস্থানে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। এবং সালাতে তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল হওয়া। কেননা ইমাম আহমদ (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেন– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কুরআনে উল্লিখিত قُنُوْت শব্দটি সকল স্থানে আনুগত্য প্রদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো 'নীরবে'। কেননা শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, আমরা পূর্বে সালাতরত অবস্থায়ও কথা বলতাম। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং আমাদেরকে সালাতে কথাবার্তা হতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

٢٣٩. فَاِنْ خِفْتُمْ مِنْ عَدُوٍّ اَوْ سَيْلٍ اَوْ سَبُعٍ فَرِجَالًا جَمْعُ رَاجِلٍ اَيْ مُشَاةً صَلُّوْا اَوْ رُكْبَانًا جَمْعُ رَاكِبٍ اَيْ كَيْفَ اَمْكَنَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَ غَيْرِهَا وَيُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِذَا اَمِنْتُمْ مِنَ الْخَوْفِ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ اَيْ صَلُّوْا كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ قَبْلَ تَعْلِيْمِهِ مِنْ فَرَائِضِهَا وَحُقُوْقِهَا وَالْكَافُ بِمَعْنٰى مِثْلِ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ اَوْ مَصْدَرِيَّةٌ.

২৩৯. যদি তোমরা শত্রু বা বন্যা বা হিংস্র প্রাণীর আশঙ্কা কর, তবে পদচারী رِجَالٌ এটা رَاجِلٌ-এর বহুবচন, অর্থাৎ পদচারী। অথবা আরোহী অবস্থায় رُكْبَانٌ এটা رَاكِبٌ-এর বহুবচন, অর্থাৎ আরোহী। অর্থাৎ কিবলার দিকে মুখ করে বা অন্যদিকে মুখ করে বা রুকু-সেজদা ইশারা করে হোক বা যেভাবে সম্ভব তোমরা সালাত আদায় কর। অনন্তর যখন তোমরা আশঙ্কা হতে নিরাপদ বোধ কর, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর সালাত আদায় কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তিনি শিক্ষাদানের পূর্বে তার ফরজ ও হক সম্পর্কে তোমরা জানতে না।

كَمَا-এর كَ অর্থ হলো যেমন। مَا এস্থানে এটা مَوْصُوْلَةٌ অর্থাৎ সংযোজনবাচক সর্বনাম কিংবা مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎসমূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

حَافِظُوْا : তোমরা যত্নবান হও। بَابُ مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার اَلْمُحَافَظَةُ থেকে اَمْر حَاضِرْ -এর সীগাহ। اَلْوُسْطٰى : মধ্যবর্তী। اَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ : স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। لِفَضْلِهَا : এর গুরুত্ব ও মর্যাদার জন্য। سَيْل : বন্যা। سَبُعٌ : হিংস্রপ্রাণী। رِجَالٌ : رَاجِلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পদচারী। رُكْبَان : رَاكِبٌ -এর বহুবচন। অর্থ– আরোহী। كَيْفَ اَمْكَنَ : যেভাবে সম্ভব। يُؤْمِيْ : ইশারা করবে। اَلْاِيْمَاءُ : ইঙ্গিত করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ الخ **যোগসূত্র :** বেশ কিছু দূর থেকে স্ত্রীদের দাবিদাওয়া ও তাদের অধিকার কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা চলে আসছিল। পরেও এ সংক্রান্ত আলোচনাই চলবে। মাঝে সালাতের বিধান প্রসঙ্গে আলোচিত হচ্ছে। এতে এ তথ্যের প্রতি আরেকবার আলোকপাত হলো যে, ইসলামে সামাজিক আচার-আচরণ ও কারবারি লেনদেন, ব্যবহার ও কারবার এবং আইন ও সুনীতির বিষয়গুলো ইবাদত-বন্দেগি থেকে ভিন্ন নয়; বরং এখানে শরিয়তী জীবন ব্যবস্থায় স্রষ্টার অধিকার [হক্কুল্লাহ] ও সৃষ্টির পাওনা [হক্কুল ইবাদ] পাশাপাশি অবস্থানে চলছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : তালাকের বিধান আলোচনার মাঝে সালাত সম্পর্কে আদেশ করার কারণ হয়তো এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, পার্থিব লেনদেন ও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থেকে মহান আল্লাহর ইবাদতকে ভুলে যেয়ো না। অথবা এর কারণ এই যে, যারা খেয়াল-খুশির গোলাম, তাদের পক্ষে লোভ ও কার্পণ্যের প্রাবল্য হেতু ন্যায় প্রতিষ্ঠা রাখা ও ইনসাফের পরিচয় দেওয়াই বিশেষত মনোমালিন্য ও তালাকের সময় অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর উপর আবার তাদের পক্ষ হতে وَاَنْ تَعْفُوْا [যদি মাফ করে দাও] এবং وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ [তোমরা অনুগ্রহ করতে ভুলো না]-এর বাস্তবায়নের আশা রাখা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। তাই এর প্রতিকার স্বরূপ সাল্যত সম্পর্কে আদেশ করা হয়েছে। কেননা সালাতের রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াক্তের পাবন্দি এবং যাবতীয় নিয়মকানুনসহ সালাত আদায় একটি উত্তম প্রতিষেধক। মন্দ চরিত্র নিবারণ ও উত্তম চরিত্রের বিকাশ সাধনে সালাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ : সালাতে নিয়মানুবর্তী ও যত্নবান হও। বিষয়াভিজ্ঞগণ সালাত সংরক্ষণ ও নিয়মানুবর্তিতার তিনটি স্তর স্থির করেছেন। যথা–

১. **সাধারণ বা নিম্ন স্তর :** সালাত যথাসময়ে আদায় করা, ফরজ ওয়াজিবগুলো যথাযথ পালন করা।

২. **মধ্যবর্তী স্তর :** শরীর সব রকম বাহ্য পবিত্রতায় সজ্জিত হওয়া, স্বভাব ও অভ্যন্তর হালাল খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া। অন্তরে খুশূখুজূ তথা বিনয়-আকুতি থাকা ও সুন্নত-মোস্তাহাবগুলোর প্রতি পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও প্রতিপালিত হওয়া।

৩. **বিশেষ ও সর্বোচ্চ স্তর :** হৃদয়ের উপস্থিতি ও একাগ্রতা-নিমগ্নতা এতদূর হওয়া যেন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَالصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى : মধ্যবর্তী সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অধিকাংশ তাফসীর বিশেষজ্ঞ আসরের সালাতের কথা বলেছেন এবং ইবনে জারীরের তাফসীরে এ অর্থই হযরত আলী, হযরত ইবনে মাসঊদ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও কাতাদা, যাহহাক (রা.) প্রমুখ তাবেয়ী থেকে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম নাখয়ী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য ইবনে জরীরের তাফসীরেই পূর্বোল্লিখিতগণের সমপর্যায়ের মনীষীবর্গ হতে জোহর, মাগরিব ও ফজর সালাত মধ্যবর্তী সালাত হওয়া বর্ণিত হয়েছে। অনেকে এখানে শব্দের মূল অর্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সালাত যেহেতু নিজ নিজ স্থানে ইবাদত ও পুণ্যকর্ম তালিকার মধ্য পর্যায়ে রয়েছে এবং এদিক ওদিকের সালাতের হিসেবে যেহেতু প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাতকেই মধ্যবর্তী বলা যায়- সুতরাং যে কোনো সালাতই মধ্যবর্তী সালাত অভিধায় আখ্যায়িত হতে পারে। সুতরাং এতে কোনো বিশেষ ওয়াক্তের সালাত উদ্দেশ্য হওয়া জরুরি নয়। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا الخ : ইসলামে নামাজের গুরুত্ব এতই অধিক যে, মূল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ যুদ্ধকালেও তা মাফ হয়ে যায় না। সালাতে নিয়মানুবর্তিতার হুকুম সর্বাবস্থায় স্থায়ী ও অকাট্য। সুতরাং এ বিপদাশংকা কালেও সালাত বর্জন করার অনুমতি নেই। অবশ্য পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি সংবলিত অবকাশ অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٤٠. وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا فَلْيُوْصُوْا وَصِيَّةً وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ اَىْ عَلَيْهِمْ لِاَزْوَاجِهِمْ وَيُعْطُوْهُنَّ مَتَاعًا مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ اِلٰى تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ مَوْتِهِمُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِنَّ تَرَبُّصُهُ غَيْرَ اِخْرَاجٍ حَالٌ اَىْ غَيْرَ مُخْرِجَاتٍ مِنْ مَسْكَنِهِنَّ فَاِنْ خَرَجْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ يَا اَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ فِىْ مَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ شَرْعًا كَالتَّزَيُّنِ وَتَرْكِ الْاِحْدَادِ وَقَطْعِ النَّفَقَةِ عَنْهَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ فِىْ مُلْكِهِ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهِ وَالْوَصِيَّةُ الْمَذْكُوْرَةُ مَنْسُوْخَةٌ بِاٰيَةِ الْمِيْرَاثِ وَتَرَبُّصُ الْحَوْلِ بِاٰيَةِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا السَّابِقَةِ الْمُتَاَخِّرَةِ فِى النُّزُوْلِ وَالسُّكْنٰى ثَابِتَةٌ لَهَا عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ.

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং স্ত্রী রেখে যাচ্ছে, তারা যেন স্ত্রীকে বহিষ্কার না করে এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ তাদের বাসস্থান হতে বহিষ্কৃত না করে তাদের স্ত্রীর জন্য যেন অসিয়ত করে যায় অপর এক কেরাতে وَصِيَّةٌ শব্দ رَفع সহকারে পঠিত হয়েছে। এবং তাদেরকে যেন মুত'আ দেয় যা দ্বারা তারা ভরণপোষণের সংস্থান করবে তাদের অর্থাৎ স্বামীদের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এ সময়টা তাদের জন্য ইদ্দত হিসেবে আরোপ করা অবশ্য কর্তব্য। যদি তারা নিজেরা বের হয়ে যায়, তবে হে মৃত ব্যক্তির ওলী বা অভিভাবকগণ! শরিয়তানুসারে [বিধিসম্মতভাবে নিজেদের জন্য তারা যা করবে] যেমন সাজসজ্জা করা, সাজসজ্জা না করার বিধান পরিত্যাগ করা, ভরণপোষণ লাভের অধিকার ত্যাগ করা তাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রান্ত, তাঁর কর্মকাণ্ডে তিনি প্রজ্ঞাময়। এ অসিয়ত করে যাওয়ার বিধান মিরাস সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এক বৎসরকাল অপেক্ষা করার বিধান 'চার মাস দশ দিন' ইদ্দত পালনের বিধান সংবলিত আয়াত দ্বারা 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতটি [চার মাস দশ দিনের বিধান সংবলিত আয়াতটির] পূর্বে উল্লেখ হয়েছে বটে; কিন্তু নুযূল বা অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তা এর পরের। বাসস্থান প্রদানের বিধান এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত।

٢٤١. وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ يُعْطِيْنَهُ بِالْمَعْرُوْفِ بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ حَقًّا نُصِبَ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ اللّٰهَ كَرَّرَهُ لِيَعُمَّ الْمَمْسُوْسَةَ اَيْضًا اِذِ الْاٰيَةُ السَّابِقَةُ فِىْ غَيْرِهَا.

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের মুত'আ খরচপত্র দেওয়া হবে প্রথামতো অর্থাৎ সামর্থ্যানুসারে যারা আল্লাহকে ভয় করে এটা তাদের উপর কর্তব্য। حَقًّا এটা এ স্থানে উহ্য ক্রিয়া [حُقِّقَتْ] -এর মাধ্যমে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। স্পর্শকৃতা অর্থাৎ সঙ্গমকৃতা মহিলাগণও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। বিধানটির এ ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য আয়াতটির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতটি ছিল ঐ সকল স্ত্রী সম্পর্কে, যাদের সাথে স্বামীদের স্পর্শ [সঙ্গম] হয়নি।

٢٤٢. كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ تَتَدَبَّرُوْنَ

২৪২. এভাবে উল্লিখিত বিধানসমূহ যেমনি তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার, চিন্তা করতে পার।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

يُتَوَفَّوْنَ : মৃত্যুবরণ করে। يَذَرُوْنَ : রেখে যায়। فَلْيُوْصُوْا : তারা যেন অসিয়ত করে যায়। اَلنَّفَقَةُ : ব্যয়ভার, খরচ। اَلْكِسْوَةُ : পোশাক-পরিচ্ছদ। اَلْحَوْلُ : বছর। مَسْكَن : বাসস্থান। اَلتَّزَيُّنَ : সাজসজ্জা। اَلْاِحْدَادُ : শোক, সাজসজ্জা না করার বিধান। اَلْمُتَاَخِّرَةُ فِى النُّزُوْلِ : অবতীর্ণের ক্ষেত্রে পরের। اَلسُّكْنٰى : বাসস্থান প্রদান।

وَصِيَّةً : এটা مَفْعُوْل مُطْلَق বা সমধাতুজ কর্মরূপে এ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য মুফাসসির (র.) এটার পূর্বে فَلْيُوْصُوْا শব্দটি উহ্য রয়েছে বলে দেখিয়েছেন। অপর এক কেরাতে এটা رَفع সহকারে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য রূপে বিবেচ্য হবে।

غَيْرَ اِخْرَاجٍ : এটা حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। مَتَاعٌ : মুত'আ, খরচপত্র। بِقَدْرِ الْاِمْكَانِ : সামর্থ্যানুসারে। كرر : তাকরার করেছে, পুনরাবৃত্তি করেছে। لِيَعُمَّ : যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, ব্যাপক হয়ে যায়। اَلْمَمْسُوْسَةُ : স্পর্শকৃতা [সঙ্গমকৃতা]। اَلسَّابِقَةُ : পূর্ববর্তী। تَتَدَبَّرُوْنَ : চিন্তা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্ত্রীর জন্য অসিয়ত : অসিয়তের এ বিধান ছিল তখনকার জন্য, যখন মিরাস-বিধি অবতীর্ণ হয়নি। স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার বিধি অবতীর্ণ হওয়ার পরে এবং তাতে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র অংশ স্থির হয়ে যাওয়ার পরে এখন আর এ ধরনের অসিয়তের নির্দেশ অবশিষ্ট থাকেনি। মুফাসসিরগণের পরিভাষায় একেই নস্‌খ [রহিতকরণ] নাম দেওয়া হয়েছে। সে সময় অর্থাৎ মিরাস আইন নাজিল হওয়ার আগে পর্যন্ত শরিয়ত বিধবাদের জন্য নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করেছিল : ১. স্বামীর ঘরেই অবস্থান করতে চাইলে এক বছর পর্যন্ত কেউ তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না. ২. এ মেয়াদ পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ হতে নির্বাহ হবে। ৩. বিধবা নিজের স্বার্থ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে নিজেই সে ঘরে অবস্থান করতে না চাইলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে তার জন্য তা সম্পূর্ণ বৈধ এবং অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এ অধিকারটি ছেড়ে দেওয়ারও তার অধিকার আছে।

قَوْلُهُ مَتَاعًا : জীবনোপকরণ ভোগ। এখানে অর্থ অন্নবস্ত্র [খোরপোশ] ও বাসস্থান সংক্রান্ত বিষয়। اَلْمَتَاعُ ব্যাপক অর্থে ব্যয় নির্বাহ [খোরপোশ] ও অবস্থান [বাসস্থান] -কে অন্তর্ভুক্ত। –[রূহুল মা'আনী]

ইসলামে বিধবা নারীর মর্যাদা : বেচারী বিধবা ইসলামের আর্বিভাবকালে সব ধর্মে অসহায় অবস্থায় ছিল। আরবের জাহিলি যুগে তো কেউ তার সম্পর্কে কিছু বলারও পক্ষপাতী ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলাম এসেই প্রথমবার বিধবার মর্যাদা ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করল। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে তো বিধবা ও অপয়া অভিন্ন অর্থে ছিল এবং বিধবাকে পরিবারের সকল সদস্যের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েই জীবন কাটাতে হতো।

بِالْمَعْرُوْفِ -এর শর্ত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সে তৎপরতা কোনো শরিয়তি বিধানের পরিপন্থি– যেমন ইদ্দত বিধি লঙ্ঘন করেও হবে না আবার নৈতিকতা বিরোধী হলেও হবে না।

قَوْلُهُ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ الخ : যে নারীকে তালাক দিয়ে দেওয়া হলো তাকে যেন বিবস্ত্র, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও ছন্নছাড়া অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া না হয়; বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তার আরাম, বিশ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ব্যবস্থা করে দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। ফকীহগণ হাদীস ও সুন্নাহর আলোকে এ উদ্দেশ্যে তিন মাসের একটি মেয়াদ স্থির করেছেন। অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর অপরিহার্য দায়িত্ব। তিন তালাক না হওয়ার ক্ষেত্রে তো এ বিধান সর্বসম্মত। আর তিন তালাকের ক্ষেত্রেও হানাফীদের মতে এ বিধানই প্রযোজ্য ও পালনীয়।

পূর্বে খরচ অর্থাৎ পোশাক দেওয়ার নির্দেশ ছিল সেই তালাকের ক্ষেত্রে, যাতে বিবাহকালে না মহর ধার্য করা হয়েছিল, না বিবাহের পর স্বামী তাকে স্পর্শ করেছিল। এ আয়াতে সে নির্দেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে পোশাক দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু অন্যান্য তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয়, বরং মোস্তাহাব। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٤٣. اَلَمْ تَرَ اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ وَتَشْوِيْقٍ اِلَى اسْتِمَاعِ مَا بَعْدَهُ اَىْ يَنْتَهِ عِلْمُكَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ اَرْبَعَةٌ اَوْ ثَمَانِيَةٌ اَوْ عَشَرَةٌ اَوْ ثَلٰثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اَوْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا حَذَرَ الْمَوْتِ مَفْعُوْلٌ لَهُ وَهُمْ قَوْمٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِبِلَادِهِمْ فَفَرُّوْا فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا فَمَاتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ بِدُعَاءِ نَبِيِّهِمْ حِزْقِيْلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ وَسُكُوْنِ الزَّاىِ فَعَاشُوْا دَهْرًا عَلَيْهِمْ اَثَرُ الْمَوْتِ لَا يَلْبَسُوْنَ ثَوْبًا اِلَّا عَادَ كَالْكَفَنِ وَاسْتَمَرَّتْ فِىْ اَسْبَاطِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَمِنْهُ اِحْيَاءُ هٰؤُلَاءِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُوْنَ.

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি? পরে উল্লিখিত ঘটনাটি শোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং শ্রোতাকে চমৎকৃত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার জ্ঞান কি তাতে পৌঁছেনি? [আপনি কি এটা জানেন না?] মৃত্যুভয়ে حَذَرَ الْمَوْتِ এটা مَفْعُوْلٌ لَهُ বা হেতুবোধক কর্মপদ। হাজার হাজার লোক স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল। তারা ছিল বনী ইসরাঈলের একটি গোত্র। তাদের অঞ্চলে মহামারি আকারে প্লেগ দেখা দিলে সেখান থেকে তারা পলায়ন করেছিল। তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে; যা পরিমাণে চার, আট, দশ, ত্রিশ, চল্লিশ অথবা সত্তর হাজার। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের মৃত্যু হোক। ফলে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর তাদের নবী হযরত হিযকীল (আ.) [حِزْقِيْل - ح ও ق কাসরা এবং ز সাকিনসহ পঠিত।] -এর দোয়ায় আট বা ততোধিক দিন পর তিনি তাদেরকে জীবিত করেন। এরপর আরো দীর্ঘকাল তারা জীবিত থাকে। কিন্তু সবসময়ই তাদের উপর মৃত্যুর লক্ষণ পরিস্ফুট থাকত। কাপড় পরিধান করা মাত্র তা কাফনের রূপ ধারণ করত। তাদের পরবর্তী বংশধরদের মাঝেও এ অবস্থা বিদ্যমান দেখা যায়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাদেরকে জীবিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ লোক অর্থাৎ কাফেররা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

٢٤٤. وَالْقَصْدُ مِنْ ذِكْرِ خَبَرِ هٰؤُلَاءِ تَشْجِيْعُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ وَلِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ لِاِعْلَاءِ دِيْنِهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِكُمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِكُمْ فَيُجَازِيْكُمْ.

২৪৪. তাদের এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। তাই আয়াতটির সাথে عَطْف বা অন্বয় করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তোমরা আল্লাহর পথে তাঁর দীনকে সমুচ্চ করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম কর, আর জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা খুবই শুনেন, তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খুবই জানেন। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতিফল দান করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

تَعْجِيْب : চমৎকৃত করা। تَشْوِيْق : আগ্রহ সৃষ্টি করা। اِسْتِمَاعٌ : মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। لَمْ يَنْتَهِ : পৌঁছেনি। اَلْاِنْتِهَاءُ : শেষ। دِيَارٌ : دَارٌ-এর বহুবচন, অর্থ- বাড়ি-ঘর। اَلُوْفٌ : اَلْفٌ -এর বহুবচন, অর্থ- হাজার। এটি جَمْعُ كَثْرَة -এর ওযন। আর جَمْعُ قِلَّتْ -এর ওযন হলো اَلَافٌ। حَذَرٌ : ভয়, আশঙ্কা। اَلطَّاعُوْنُ : মহামারি। فَرُّوْا : তারা পলায়ন করল। فَرَّ (ض) فِرَارًا অর্থ- পলায়ন করা। عَاشُوْا : বেঁচে ছিল, জীবনযাপন করেছিল। اِسْتَمَرَّتْ : বহাল ছিল, অব্যাহত ছিল। اَسْبَاطٌ : سِبْطٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বংশধর। تَشْجِيْع : উৎসাহ প্রদান। يُجَازِيْكُمْ : তোমাদের প্রতিফল দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ : আরবি ভাষায় এরূপ বাকরীতি ঐ সময় ব্যবহার করা হয়, যখন শ্রোতার মাঝে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ ঘটনার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি উদ্দেশ্য হয়। আর رُؤْيَتْ দ্বারা সর্বদা চোখের দেখাই উদ্দেশ্য হয় না। কখনো তা দ্বারা চিন্তাভাবনাও উদ্দেশ্য হয়। এ ধরনের رُؤْيَتْ-কে رُؤْيَتْ قَلْبِيْ বলা হয়।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গিতে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত করেছেন। জেহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা জেহাদে অংশ নেওয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তাফসীরে ইবনে কাছীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোনো এক শহরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করত। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করানোর জন্য যে মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না- তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু-জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল, একটি লোকও জীবিত রইলো না। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারলো, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা যেহেতু সহজ ব্যাপার ছিল না, তাই তাদেরকে চারিদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মতো করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পচে-গলে এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আ.) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে মৃত লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন- "ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করেছেন।" আল্লাহর নবীর ভাষ্যে এসব হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করল। অনেক জড়বস্তুকে হয়তো মানুষ অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও আল্লাহর অনুগত এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির অধিকারী। কুরআন কারীমে اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন। মোটকথা একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বল- 'ওহে হাড়সমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।' সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল এককেটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রূহকে আদেশ দেওয়া হলো- হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতেই সেই নবীর সামনে লাশগুলো জীবিত হয়ে দাঁড়াল এবং বিস্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করা। আর সবাই বলতে লাগল- سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ অর্থাৎ 'তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।' এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে থাকা জেহাদ হোক বা প্লেগ মহামারিই হোক, আল্লাহ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী

http://islamiboi.wordpress.com

তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

মাসআলা : ফকীহবৃন্দ ও মুফাসসিরগণ এক্ষেত্রে প্লেগ [মহামারি] থেকে পলায়নের আলোচনা তুলেছেন এবং প্রসঙ্গত নবী করীম ﷺ -এর ফরমান উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ভূখণ্ডে প্লেগ দেখা দেয়, সেখান থেকে পালিয়ো না এবং বাইরে থেকে সেখানে যেয়ো না। এতে একটা যৌক্তিক প্রশ্ন দেখা দেয় যে, প্লেগ আক্রান্ত অঞ্চলে না যাওয়া এবং সেখান থেকে বের না হওয়া এ দুটি কার্যত পরস্পর বিরোধী নির্দেশ। কেননা মহামারী থেকে দূরে থাকা যদি অপরিহার্য হয়, তবে সেখান থেকে সরে আসার হুকুম পাওয়া সমীচীন, আর যদি অপরিহার্য না হয় তবে সে এলাকায় যাওয়াতে কোনো দোষ-আপত্তি না থাকাই সমীচীন। প্রকৃত রহস্য হলো, প্লেগ [ও মহামারী] আক্রান্ত অঞ্চল থেকে সরে যাওয়া ও পালানোর অর্থ হবে এই যে, একজনকে অনুমতি দেওয়া হলে সব পালাতে শুরু করবে এবং দেখতে না দেখতে পুরো এলাকা জনশূন্য হয়ে যাবে। এভাবে এলোপাতাড়ি পলায়ন ও আতঙ্ক সৃষ্টির ফলে সেই জনবসতি যে ভয়াবহ আর্থসামাজিক ক্ষতি, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত অবক্ষয়ের শিকার হবে তা বলাই বাহুল্য। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণেও এটা ভুল প্রমাণিত। তা ছাড়া এ ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি একদিকে যেমন সাহসিকতা, স্থৈর্য, বীরত্ব ও সহমর্মিতাবোধের পরিপন্থি, তদ্রূপ অপরদিকে এটা বাহ্য কারণ-উপকরণে পূর্ণ ভরসা-বিশ্বাসের পরিচায়ক। আল্লাহতে ভরসা ও তাওয়াক্কুলেরও পরিপন্থি। এ আচরণ একটা ধর্মানুসারী জাতির মর্যাদারও অনুকূল নয়। আবার মহামারিগ্রস্ত এলাকায় যেখানে অহরহ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে বেপরোয়া ঢুকে পড়ার অতি সাহস ও অসতর্কতা প্রদর্শন একদিকে বাহ্য কারণ-উপকরণের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষার পরিচায়ক অপরদিকে এটা মানুষের মধ্যে নিহিত স্বভাবসুলভ ভীতি-আশঙ্কার চাহিদাকে পদদলিত করার নামান্তর। এ পরস্পর বিরোধী দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে সমন্বিত ও মধ্যবর্তী নিরাপত্তাপূর্ণ সুষ্ঠু পন্থা নিরূপণ করা একমাত্র ইসলামের ন্যায় প্রজ্ঞা ও হিকমত-কুশলতাসমৃদ্ধ ধর্মমতেরই কাজ। ইসলাম এ ক্ষেত্রে যুক্তিগত ও স্বভাবজাত চাহিদার সবগুলো দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে এ সুষ্ঠু সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও আদর্শ বিধান দিয়েছে যে, যেখানে প্লেগ-মহামারি দেখা দেয় খামাখা [অতি সাহস দেখিয়ে] সেখানে যেয়ো না এবং অহেতুক [অতি ভীরুতার পরিচয় দিয়ে] সেখান থেকে পালিয়ো না। -[তাফসীরে মাজেদী]

মহামারির কারণে হযরত ওমর (রা.)-এর শাম থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা : তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) শাম দেশের সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শামের সীমান্ত এলাকা তাবুকের সন্নিকটে 'সারাগ' নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে পৌঁছে তিনি অবগত হলেন যে, শামে প্রচণ্ড মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। এ মহামারি ছিল শামের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ভয়ানক মহামারি, যা عَمْوَاس [আমওয়াস] নামে প্রসিদ্ধ। কেননা এ মহামারি সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটস্থ 'আমওয়াস' নামক একটি বস্তি থেকে শুরু হয়েছিল। অতঃপর গোটা অঞ্চলে তার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ে। হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) এ সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলেন যে, এ পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত? সেখানে যাওয়া নাকি ফিরে যাওয়া? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর কোনো নির্দেশ শুনেছেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (র.) বলেন, এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ হলো এই যে, রাসূল ﷺ মহামারি সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন যে, এটি একপ্রকার আজাব, যার দ্বারা কোনো কোনো জাতিকে শায়েস্তা করা হয়েছিল। তার কিছু অংশ বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো এলাকায় মহামারির সংবাদ শুনে সে যেন ঐ এলাকায় না যায়। আর যে পূর্ব থেকেই সে এলাকায় বিদ্যমান ছিল সে যেন মহামারি থেকে পালানোর উদ্দেশ্য সে এলাকা ত্যাগ না করে। -[বুখারী]

হযরত ফারুকে আযম (রা.) এ হাদীস শুনে সঙ্গীদেরকে ফিরে যাওয়ার হুকুম দিলেন। শামের গভর্নর হযরত আবূ উবাদাহ (রা.) সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর উক্ত নির্দেশ শুনে তিনি বলতে লাগলেন- أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ অর্থাৎ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন করতে চাচ্ছেন? উত্তরে হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) বলেন- نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ অর্থাৎ হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহরই তাকদীরের দিকে পলায়ন করছি। -[জামালাইন]

বস্তুত এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের ঘটনাটি সামনের আয়াতের ভূমিকা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। সামনের আয়াতে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করে বোঝানো হলো যে, জিহাদে গেলেই মৃত্যু হবে আর তা থেকে পালিয়ে থাকলে বেঁচে থাকা যাবে তা নয়; বরং মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনি জিহাদের ময়দানেও বাঁচাতে পারেন আবার বাড়িতেও মৃত্যু দিতে পারেন। যেমনটি বনী ইসরাঈলের উক্ত ঘটনায় লক্ষ্য করা গেল।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

২৪৫. مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ بِاِنْفَاقِ مَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا بِاَنْ يُنْفِقَهُ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ فَيُضٰعِفَهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَيُضَعِّفَهُ بِالتَّشْدِيْدِ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً مِنْ عَشْرٍ اِلٰى اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ كَمَا سَيَأْتِيْ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ يُمْسِكُ الرِّزْقَ عَمَّنْ يَشَاءُ اِبْتِلَاءً وَيَبْصُطُ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ اِمْتِحَانًا وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ .

২৪৫. কে এমন যে তার অর্থসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? অর্থাৎ মনের খুশিতে সানন্দে সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে। তিনি তার জন্য তা বহুগুণে সম্মুখে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবেন। يُضٰعِفُ ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে يُضَعِّفُ রূপে তাশদীদ সহ পঠিত রয়েছে। আর আল্লাহ সংকোচিত করেন বিপদে পরীক্ষা হিসেবে যার হতে ইচ্ছা তিনি রিজিক ফিরিয়ে রাখেন এবং সম্প্রসারিত করেন অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা পরীক্ষা হিসেবে সচ্ছলতা দান করেন। আর পরকালে পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যানীত হবে। অনন্তর তিনি তোমাদের কার্যাবলির প্রতিফল দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এইমাত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার আদেশ পাওয়া গিয়েছে। সমরোপকরণের জন্য স্বভাবতই মুসলিম উম্মতের প্রয়োজন দেখা দেবে বড় ধরনের পুঁজির। এজন্যই প্রথম নম্বরেই এখানে মিল্লাতের ধনবানদের এতে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

قَوْلُهٗ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : কর্জ বা ঋণ অর্থ হলো নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে কর্জ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব, এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেওয়া হবে। বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ তা'আলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে। আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেওয়ার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন—

১. কোনো একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ দুবার সদকা করার সমতুল্য।

২. ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগা বলাবলি করত যে, মুহাম্মদের রব অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে ইরশাদ হয়েছে— لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য করেছে। ধনসম্পদের লোভ তাঁদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি। তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমান যাঁরা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজেদের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন হযরত আবুদ দারদা (রা.) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দারদা (রা.) রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই! আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'আলা এর বদলে তোমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে চাচ্ছেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) এ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়ালেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলতে লাগলেন, আমি আমার দুটি বাগানই আল্লাহকে ঋণ দিলাম। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য রেখে দাও। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন এ দুটি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম যাতে খেজুরের ছয়শ ফলন্ত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এর বদলে আল্লাহ তোমাকে বেহেশত দান করবেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানালেন। স্ত্রীও তাঁর এ সৎকর্মের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদ দারদার জন্য তৈরি হয়েছে।

৩. ঋণ দেওয়ার বেলায় তা ফেরত দেওয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেওয়ার কোনো শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার [ঋণের] হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে। তবে যদি অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে। —[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٤٦. اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ الْجَمَاعَةِ مِنْ بَنِىْٓ
اِسْرَاۤءِيْلَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ مُوْسٰى اَىْ اِلٰى
قِصَّتِهِمْ وَخَبَرِهِمْ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ
هُوَ شَمْوِيْلُ ابْعَثْ اَقِمْ لَنَا مَلِكًا
نُّقَاتِلْ مَعَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَنْتَظِمُ
بِهِ كَلِمَتُنَا وَنَرْجِعُ اِلَيْهِ قَالَ النَّبِىُّ
لَهُمْ هَلْ عَسَيْتُمْ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ اِنْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا خَبَرُ
عَسٰى وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَقْرِيْرِ التَّوَقُّعِ
بِهَا قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا
وَاَبْنَاۤئِنَا بِسَبْيِهِمْ وَقَتْلِهِمْ وَقَدْ فَعَلَ
بِهِمْ ذٰلِكَ قَوْمُ جَالُوْتَ اَىْ لَا مَانِعَ لَنَا
مِنْهُ مَعَ وُجُوْدِ مُقْتَضِيْهِ قَالَ تَعَالٰى
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَجَبُنُوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَهُمُ الَّذِيْنَ
عَبَرُوا النَّهْرَ مَعَ طَالُوْتَ كَمَا سَيَاْتِىْ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ .

অনুবাদ :

২৪৬. তুমি কি মূসার মৃত্যুর পরবর্তী বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়কে একটি দলকে দেখনি? অর্থাৎ তাদের কাহিনী ও ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দাওনি? তারা যখন তাদের নবীকে শামূঈলকে বলেছিল, আমাদের জন্য এক রাজা পাঠাও নিযুক্ত কর আমরা তার সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব। অর্থাৎ তিনি আমাদের বিষয়ে সুব্যবস্থা করবেন এবং সকল সমস্যায় আমরা তাঁর শরণাপন্ন হব। তিনি অর্থাৎ নবী তাদেরকে বললেন, যদি তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হয়, তবে জিহাদ করবে না বলে কি তোমাদের থেকে আশঙ্কা করা যায়? عَسَيْتُمْ এটা ফাতাহ ও কাসরা উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। اَلَّا تُقَاتِلُوْا এটা عَسٰى -এর خَبَرٌ বা বিধেয়। আয়াতোক্ত আশঙ্কাটি সত্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি– এ কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে এ স্থানে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। তারা বলল, আমরা যখন স্ব-স্ব আবাস ও স্বীয় সন্তানসন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আমাদের কি হলো যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না? তাদের সন্তানসন্ততিদেরকে বন্দী ও হত্যা করে ফেলা হয়েছিল। আর তাদের এ অবস্থা করেছিল জালূত সম্প্রদায়। তাদের কথার মর্মার্থ হলো, যুদ্ধ করার যখন সঙ্গত কারণ বিদ্যমান, তখন আর এতে কি বাধা থাকতে পারে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হলো অল্প কজন ব্যতীত যারা তালূতের সাথে নদী অতিক্রম করতে পেরেছিল, তারা ছিল এরা; সামনে এ কথার উল্লেখ হচ্ছে। সকলেই তা হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং সাহস হারিয়ে ফেলল এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَلَأُ : নেতা, দল। শব্দটির অর্থ শুধু দল নয়, বরং তার অর্থ হলো বিশেষ দল, নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণি যাদেরকে দেখলে চোখ ও অন্তর ভক্তি-শ্রদ্ধায় ভরে যায়। আর مَلَأَ -এর আভিধানিক অর্থও হলো ভরা, পূর্ণ করা। اِبْعَثْ : প্রেরণ কর। بَعَثَ يَبْعَثُ بَعْثًا : প্রেরণ করা। اَقِمْ : নিযুক্ত কর। اِقَامَةً (اِفْعَالٌ) اَقَامَ অর্থ– নিযুক্ত করা। مَلِكٌ : রাজা, বাদশা, বহুবচন, مُلُوْكٌ - تَنْتَظِمُ بِهِ كَلِمَتُنَا : যার দ্বারা আমরা আমাদের বিষয়ে সুব্যবস্থা করব। سَبْىٌ : বন্দি করা। مُقْتَضٰى : সঙ্গত কারণ, দাবি। تَوَلَّوْا عَنْهُ : পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। جَبُنُوْا : সাহস হারিয়ে ফেলল। عَبَرُوْا : অতিক্রম করেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তালূত-জালূত প্রসঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ : হযরত মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর বনী ইসরাঈল গোত্র কিছুকাল সঠিক ছিল। এরপর তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং তাওরাতের পরিপন্থি কাজকর্ম শুরু করে। এমনকি কোনো কোনো ব্যক্তি মূর্তি পূজা করতে আরম্ভ করে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের উপর জালূত নামক জনৈক অত্যাচারী বাদশাহ চাপিয়ে দেন। উক্ত বাদশাহ ছিল

http://islamiboi.wordpress.com

আমালিকা গোত্রের। সে শুধু তাদেরকে পরাস্তই করেনি বরং বনী ইসরাঈলের তাবূতকেও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তখন বনী ইসরাঈলের অন্তরে নিজেদের সংশোধনের চিন্তা আসে। তারা তাদের যুগের নবী শামবীল (আ.)-এর নিকট আবেদন করল যে, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন। আমরা তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করব। হযরত শামবীল (আ.) আল্লাহর তা'আলার নিকট দোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে হযরত তালূতকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে দিলেন। হযরত তালূতের নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়।

ফিলিস্তিনে তৎকালীন রাজা ছিল জালূত। লোকটি অত্যন্ত বীর পুরুষ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। তার সঙ্গে ছিল প্রায় এক লাখ সৈন্য। তারা সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ছিল। এমতাবস্থায় হযরত তালূত চাইলেন যে, তার সৈন্যদের শক্তি পরীক্ষা করা হোক। যাতে যারা সাহসী এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞ নয়, তাদেরকে বাহিনী থেকে বাদ দেওয়া যায়। সুতরাং যে রাস্তা দিয়ে বনী ইসরাঈলের যাওয়া প্রয়োজন ছিল সে রাস্তায় ছিল একটি নদী। এ নদীটি জর্দান এবং ফিলিস্তিনের মাঝে অবস্থিত। উক্ত নদী অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল। তবে হযরত তালূত জানতেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার বেশ ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে তিনি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী এবং অনভিজ্ঞদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য এক পরীক্ষার আশ্রয় নিলেন। তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি নদী থেকে পানি পান করবে না। যে পান করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। যারা পানি পান না করবে তারাই আমার সঙ্গী হবে। অর্থাৎ মূল নির্দেশ এই ছিল যে, হাত দ্বারা পানি স্পর্শ করবে না। তবে এক আধ অঞ্জলি পানি মুখে দিয়ে গলা ভিজানোর অনুমতি ছিল। এতে কোনো দোষ নেই। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। লোকেরা পানি দেখে তার প্রতি ছুটে গেল। অধিকাংশ মানুষ পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পানি পান করল। মাত্র ৩১৩ জনের ক্ষুদ্র একটি দল নিজেদের প্রতিজ্ঞার উপর অবিচল থাকল: যারা তৃপ্তিসহকারে পানি পান করেছিল, তারা নদী পার হতে সক্ষম হলো না। পক্ষান্তরে যারা পানি পান করেনি বা সমান্য পান করেছিল তারা অনায়াসে নদী পার হয়ে গেল।

হযরত দাউদ (আ.) ছিল সে সময় কম বয়সী যুবক। ঘটনাক্রমে তালূতের সেনাবাহিনীর মধ্যে তিনি অংশগ্রহণ করলেন। হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন তাঁর অন্যান্য ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে খাটো ও স্বল্পবয়সী। তিনি ছাগল চরাতেন। তালূত সৈন্য প্রস্তুতিকালে তিনিও তার সাথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি পাথর পেয়েছিলেন। আল্লাহর কুদরতে পাথরটি তাকে বলল, হে দাউদ! তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে নাও। আমি হযরত হারূনের পাথর। আমার দ্বারা অনেক বাদশাহকে হত্যা করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) সাথে সাথে পাথরটি তাঁর ঝুলির মধ্যে নিয়ে নিলেন। এরপর তিনি আরেকটি পাথর পেলেন। পাথরটি বলল, আমি হযরত মূসা (আ.)-এর পাথর। আমার দ্বারা অমুক অমুক বাদশাহকে মারা হয়েছে। তিনি এ পাথরটিও তুলেন নিলেন। এরপর তৃতীয় আরেকটি পাথর তাকে বলল, আমাকে তুলে নাও, আমার দ্বারাই জালূতের মৃত্যু ঘটবে। হযরত দাউদ এ পাথরটিও তুলে নিলেন।

বিখ্যাত পাহলোয়ান জালূত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান জানালো। তার শক্তি ও ভয়ের কারণে কেউ সামনে অগ্রসর হচ্ছিল না। হযরত তালূত ঘোষণা দিলেন– যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করবে, আমি তার সাথে আমার কন্যাকে বিবাহ দেব। হযরত দাউদ (আ.) সামনে অগ্রসর হলেন। বাদশা তালূত নিজ ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্রও তাঁকে দিয়ে দিলেন। হযরত দাউদ (আ.) সামান্য অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বললেন, যদি আল্লাহ আমার সাহায্য না করেন, তাহলে এ সকল হাতিয়ার আমার কোনো কাজে আসবে না। কাজেই আমি অস্ত্র ছাড়াই তার সাথে লড়ব। এরপর হযরত দাউদ তার থলি এবং ধনুক নিয়ে ময়দানে অগ্রসর হলেন। জালূত বলল, তুমি আমার সাথে এ পাথর নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছ? যার দ্বারা মানুষ কুকুরকে তাড়িয়ে থাকে। হযরত দাউদ (আ.) বললেন, তুমি তো কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধম। জালূত রাগান্বিত হয়ে বলল, অবশ্যই আমি তোমার গোশত হিংস্র পশু-পাখিদেরকে খাওয়াব। হযরত দাউদ জবাব দিলেন, আল্লাহই তোমার গোশত পশুপাখিদেরকে খাওয়াবেন। এ বলে তিনি পাথর বের করে بِسْمِ اللّٰهِ اِلٰهِ اِبْرَاهِيْمَ বললেন। এরপর তাকে ফাঁদে রেখে দ্বিতীয় পাথর বের করলেন এবং বললেন, بِسْمِ اللّٰهِ اِلٰهِ اِسْحَاقَ এ বলেই তিনি উক্ত পাথরকে ফাঁদে রাখলেন। এরপর তৃতীয় পাথর বের করে বললেন, بِسْمِ اللّٰهِ اِلٰهِ يَعْقُوْبَ-এরপর তিনি তাকেও ফাঁদের মধ্যে রাখলেন। এরপর তিনি তা ঘুরালেন। একটি পাথর জালূতের মাথায় আঘাত করল, ফলে তার মাথার মগজ বের হয়ে গেল। তার সাথে আরো ৩০ জন মানুষ মারা গেল।

হযরত দাউদ (আ.) জালূতের মাথা কেটে ফেললেন এবং তার আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে তালূতের সামনে পেশ করলেন। তালূত বাহিনী বিজয় লাভ করে ফিরে আসল। এরপর বাদশাহ তালূত হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে তার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে খেলাফত ও নবুয়ত দান করলেন।
–[জামালাইন]

قَوْلُهُ شَمْوِيْل : হযরত শামবীল (আ.) প্রাচীন সিরিয়া [শাম]-এর পর্বতময় আফ্রিয়ম অঞ্চলে রামা নগরে অবস্থান করতেন।
–[তাফসীরে মাজেদী]

وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَقْرِيْرِ التَّوَقُّعِ بِهَا : অর্থাৎ هَلْ عَسَيْتُمْ-এর هَلْ প্রশ্নবোধক নয়; বরং বক্তব্যের দৃঢ়তা ও তাকীদবোধক। অর্থাৎ যা ভাবছি, তা হয়েই থাকবে।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٤٧. وَسَأَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ إِرْسَالَ مَلِكٍ فَأَجَابَهُ إِلَى إِرْسَالِ طَالُوتَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوْا أَنّٰى كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ وَكَانَ دَبَّاغًا أَوْ رَاعِيًا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ يَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلٰى إِقَامَةِ الْمُلْكِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ اخْتَارَهُ لِلْمُلْكِ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً سَعَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْمَلَهُمْ خَلْقًا وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ إِيْتَاءَهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ فَضْلَهُ عَلِيْمٌ بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ.

অনুবাদ :

২৪৭. অনন্তর তাদের নবী একজন রাজা মনোনীত করে পাঠাবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। তালূতকে সম্রাট হিসেবে প্রেরণ করতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দোয়া কবুল করেন। তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তালূতকে তোমাদের সম্রাট নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, আমাদের উপর কখন অর্থাৎ কিরূপে তার কর্তৃত্ব হবে, যখন তদপেক্ষা আমরা কর্তৃত্বের অধিক হকদার! কারণ সে রাজবংশের লোকও নয়, নবী-বংশের লোকও নয়। সে একজন চামড়া পাকাকারী অথবা একজন রাখাল মাত্র। এবং তাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেওয়া হয়নি। যা দ্বারা সে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য নিতে পারে। নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহই তাকে তোমাদের উপর অধিপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞান ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন, ঐশ্বর্যশালী করেছেন। সে যুগে বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনি সর্বাধিক জ্ঞানী, সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক গঠনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ যাকে দিতে ইচ্ছা করেন তাকে স্বীয় রাজ্য দান করেন। সুতরাং এর উপর কোনো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক এবং কে এর যোগ্য এই সম্পর্কে তিনি খুবই জানেন।

তাহকীক ও তারকীব

أَجَابَ : সাড়া দিলেন। إِرْسَالٌ : প্রেরণ করা। سِبْطُ الْمَمْلَكَةِ : রাজবংশ। دَبَّاغٌ : চামড়া পাকাকারী। رَاعِيٌ : রাখাল। سَعَةٌ : প্রাচুর্য। بَسْطَةٌ : সমৃদ্ধি। أَجْمَلُ : অধিকতর সুন্দর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْ سِبْطِ الْمَمْلَكَةِ وَلَا النُّبُوَّةِ : বনূ ইসরাঈলের মাঝে দুটি বিশেষ বংশ ছিল। একটি নবুয়ত বংশ অপরটি রাজ বংশ। আর তালূত নবুয়ত বংশেরও লোক ছিল না; আর রাজ বংশেরও না। ইবারতে এ কথা বলাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ : এখানে ইলম দ্বারা সেসব বিষয়ের জ্ঞান উদ্দেশ্য ছিল, যার সম্পর্ক রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য জয়ের সঙ্গে। আর দৈহিক প্রসারতা দ্বারা উদ্দেশ্য তালূত দৈহিক গঠন ও বাহ্য অবয়ব- ঔজ্জ্বল্যে অন্যদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনালঙ্কার ও শৈলী-সৌন্দর্য লক্ষণীয়। নামটি এমন চয়ন করা হয়েছে, যাতে দীর্ঘকায় হওয়ার পূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গবেষকদের একদল এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, طَالُوْت মূলত طَوْلُوْت ছিল, যা طول [দৈর্ঘ্য] থেকে নির্গত। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ غُرْفَةً : [غ বর্ণে পেশ দিয়ে] এক অঞ্জলি বা চিল্লু পানি।

قَوْلُهُ مِنْ مَائِهِ : এটি مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত। কেননা সরাসরি নদী পান করা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ لَمَّا وَافَوْهُ : এটি اَلْمُوَافَاةُ [পৌছা] মাসদার থেকে جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থাৎ তারা যখন পৌছল।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٤٨. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ لَمَّا طَلَبُوْا مِنْهُ اٰيَةً عَلٰى مُلْكِهِ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ الصُّنْدُوْقُ كَانَ فِيْهِ صُوَرُ الْاَنْبِيَاءِ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى اٰدَمَ وَاسْتَمَرَّ اِلَيْهِمْ فَغَلَبَتْهُمُ الْعَمَالِقَةُ عَلَيْهِ وَاَخَذُوْهُ وَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِهٖ عَلٰى عَدُوِّهِمْ وَيُقَدِّمُوْنَهُ فِى الْقِتَالِ وَيَسْكُنُوْنَ اِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى فِيْهِ سَكِيْنَةٌ طَمَانِيْنَةٌ لِقُلُوْبِكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ اَىْ تَرِكَاهُ وَهِىَ نَعْلَا مُوْسٰى وَعَصَاهُ وَعِمَامَةُ هٰرُوْنَ وَقَفِيْزٌ مِّنَ الْمَنِّ الَّذِىْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَرُضَاضُ الْاَلْوَاحِ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ حَالٌ مِّنْ فَاعِلِ يَاْتِيَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ عَلٰى مُلْكِهٖ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَحَمَلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى وَضَعَتْهُ عِنْدَ طَالُوْتَ فَاَقَرُّوْا بِمُلْكِهٖ وَتَسَارَعُوْا اِلَى الْجِهَادِ فَاخْتَارَ مِنْ شُبَّانِهِمْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا.

অনুবাদ :

২৪৮. তারা যখন তার [তালূতের] কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিদর্শন চাইল তখন তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট আসবে তাবূত সিন্দুক। এতে নবীদের প্রতিকৃতি রক্ষিত ছিল। হযরত আদম (আ.)-এর নিকট আল্লাহ তা'আলা এটি নাজিল করেছিলেন। পরে তা বনী ইসরাঈলের হস্তগত হয়। আমালিকা সম্প্রদায় তাদের উপর বিজয়ী হলে তারা তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ইসরাঈলীগণ এর অসিলায় শত্রুর উপর বিজয় প্রার্থনা করত। তারা সেটি যুদ্ধের মাঠে নিজের সম্মুখে স্থাপন করত এবং এর দ্বারা 'সকীনা' বা চিত্তপ্রশান্তি লাভ করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে রয়েছে সকীনা। তোমাদের প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন-পরিজন অর্থাৎ তারা দুজন যা রেখে গেছে তার অবশিষ্টাংশ। হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকা ও লাঠি; হযরত হারুন (আ.)-এর পাগড়ি, তাদের প্রতি অবতীর্ণ এক ঝুড়ি মান্না, তাওরাত-তখতির কিছু খণ্ডিত অংশ তাতে ছিল। ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবেন। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে তোমাদের জন্য তাতে তার কর্তৃত্বের নিদর্শন রয়েছে। অনন্তর তাদের দৃষ্টির সামনে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ফেরেশতারা তা বহন করে এনে তালূতের নিকট রাখল। এতে তারা তালূতের কর্তৃত্ব স্বীকার করে এবং জিহাদের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তখন তালূত যুবকদের মধ্য হতে বাছাই করে ৭০ হাজার যুবককে জিহাদের জন্য মনোনীত করেন।

তাহকীক ও তারকীব

صُوَرٌ : صُوْرَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– ছবি, আকৃতি। اِسْتَمَرَّ : অব্যাহত ছিল। غَلَبَتْ : বিজয়ী হলো। يَسْتَفْتِحُوْنَ بِهٖ : বিজয় প্রার্থনা করত। يَسْكُنُوْنَ اِلَيْهِ : প্রশান্তি লাভ করত। طَمَانِيْنَةٌ : প্রশান্তি। بَقِيَّةٌ : অবশিষ্টাংশ। قَفِيْزٌ : এক কাফীয, পরিমাপবিশেষ। رُضَاضٌ : খণ্ডিত অংশ। اَلْاَلْوَاحُ : لَوْحٌ -এর বহুবচন, অর্থ– তখতি। اَقَرُّوْا : স্বীকার করল। اَمْرٌ يُقِرُّ اِقْرَارًا : স্বীকার করা। تَسَارَعُوْا : দ্রুত গেল। شُبَّانٌ : شَبَابٌ -এর বহুবচন, অর্থ– যুবক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ **তাবূতে সাকীনা :** বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখত, আল্লাহ তা'আলা এর বদৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। ফিলিস্তিনের জালূত বনী ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা এই দাঁড়াল যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারি ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে এ সিদ্ধান্ত স্থির হলো যে, নাউযুবিল্লাহ! এ কুলক্ষণের গাঁটারিটি অন্য কোথাও ছুড়ে ফেলে আসা হোক। সিদ্ধান্ত মতে দুটি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাঁকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালূতের দরজায় পৌঁছে দিলেন। বনী ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালূতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালূত জালূতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। –[মা'আরিফুল কুরআন : ১৩৬]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٤٩. فَلَمَّا فَصَلَ خَرَجَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَكَانَ حَرًّا شَدِيْدًا وَطَلَبُوْا مِنْهُ الْمَاءَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ مُخْتَبِرُكُمْ بِنَهَرٍ لِيَظْهَرَ الْمُطِيْعُ مِنْكُمْ وَالْعَاصِيْ وَهُوَ بَيْنَ الْاَرْدُنِّ وَفِلَسْطِيْنَ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ اَيْ مِنْ مَائِهِ فَلَيْسَ مِنِّيْ اَيْ مِنْ اَتْبَاعِيْ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ يَذُقْهُ فَاِنَّهُ مِنِّيْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ بِيَدِهِ فَاكْتَفٰى بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا فَاِنَّهُ مِنِّيْ فَشَرِبُوْا مِنْهُ لَمَّا وَافَوْنَ بِكَثْرَةٍ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ فَاقْتَصَرُوْا عَلَى الْغُرْفَةِ رُوِيَ اَنَّهَا كَفَتْهُمْ لِشُرْبِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ وَكَانُوْا ثَلٰثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَهُمُ الَّذِيْنَ اقْتَصَرُوْا عَلَى الْغُرْفَةِ قَالُوْا اَيِ الَّذِيْنَ شَرِبُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ اَيْ بِقِتَالِهِمْ وَجَبُنُوْا وَلَمْ يُجَاوِزُوْهُ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ يُوْقِنُوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَهُمُ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْهُ كَمْ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى كَثِيْرٍ مِّنْ فِئَةٍ جَمَاعَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ.

অনুবাদ :

২৪৯. অতঃপর তালূত যখন সেনাদলসহ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে আলাদা হলো বের হলো। ঐ সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। তারা তার কাছে পানি চাইলে সে বলল, আল্লাহ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে অনুগত কে? আর অবাধ্য কে? তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করবেন। তোমাদের যাচাই করবেন। জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল ঐ নদীটির অবস্থান। যে কেউ তা থেকে অর্থাৎ তার পানি পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয় আমার অনুসারী বলে গণ্য নয় আর যে তা খাবে না তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত। এ ছাড়া যে তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সে-ও। غُرْفَةً -এর غ -এ ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। অর্থ– এক অঞ্জলি। এতটুকুতেই যথেষ্ট করবে এর অতিরিক্ত নেবে না সে-ও আমার দলভুক্ত।

কিন্তু যখন তারা সেখানে এসে পৌঁছল তখন অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই তা থেকে বেশি করে পান করল। ঐ অল্প সংখ্যকগণ কেবল এক অঞ্জলির উপরই যথেষ্ট করেছিল। বর্ণিত আছে যে, তাদের ও তাদের পশুগুলোর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা সংখ্যায় তিনশত এবং কিছু বেশি ছিল। সে এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা যখন তা অতিক্রম করল। এরা তারাই ছিল, যারা এক অঞ্জলি পানির উপর যথেষ্ট করেছিল। তখন যারা পানি পান করেছিল তারা বলল, জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আজ আমাদের নেই। তারা সাহস হারিয়ে ফেলল এবং তা [নদী] অতিক্রম করতে পারল না। আর যাদের প্রত্যয় ছিল দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা হলো যারা নদী অতিক্রম করতে পেরেছিল। তারা বলল, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছায় কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! كَمْ مِنْ فِئَةٍ এ স্থানে كَمْ শব্দটি خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। এ স্থানে كَمْ শব্দটি 'বহু' অর্থে ব্যবহৃত। فِئَةٌ অর্থ– দল। আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতাসহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

فَصَلَ : আলাদা হলো, বের হলো। مُبْتَلِيْكُمْ : তোমাদের পরীক্ষাকারী, পরীক্ষা করবেন। اِغْتَرَفَ : হাতে পানি গ্রহণ করল। وَافُوْا : তারা পৌছল। اِقْتَصَرُوْا : যথেষ্ট করেছিল, ক্ষান্ত করেছিল। كَفَتْ : যথেষ্ট হয়েছে। جَاوَزَ : অতিক্রম করল। جَبُنُوْا : সাহস হারিয়ে ফেলল। فِئَةً : দল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِجَالُوْتَ : জালূত [ইহুদি প্রতিপক্ষ]। ফিলিস্তিনী বাহিনীর প্রখ্যাত সেনানায়ক, দুর্ধর্ষ সুঠামদেহী পালোয়ান ছিল। দেখতে মানুষ নয়, যেন একটা দৈত্য। তাওরাতের বর্ণনা মতে তার দৈর্ঘ্য ছিল- মাথা বাদে ১০ ফুট। মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোহার পোশাক পরে থাকত এবং তার ঢালের ওজন ছিল তিন মণ। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর তাফসীরে লিখেন- এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই যে, অনুরূপভাবে মানুষের জোশ ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্য সংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদের দূরে সরানোই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন, যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতারই বেশি প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারীগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়ল এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারগ হয়ে গেল। রূহুল মা'আনীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল।

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠতার কথাও চিন্তা করেনি। –[মা'আরিফুল কুরআন]।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٥٠. وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ اَىْ ظَهَرُوْا لِقِتَالِهِمْ وَتَصَافُّوْا قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ اُصْبُبْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا بِتَقْوِيَةِ قُلُوْبِنَا عَلَى الْجِهَادِ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

২৫০. তারা যখন জালূত ও তার সেনাদলের সম্মুখীন হলো অর্থাৎ যুদ্ধার্থে সামনে আসল এবং কাতার করে দাঁড়াল তখন বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ঢেলে দাও ধৈর্য এবং জিহাদের জন্য আমাদের হৃদয় শক্তিশালী করে আমাদের পা' অবিচলিত রাখ এবং সত্য প্রত্যাখানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।

٢٥١. فَهَزَمُوْهُمْ كَسَرُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهٖ وَقَتَلَ دَاوٗدُ وَكَانَ فِىْ عَسْكَرِ طَالُوْتَ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اَىْ دَاوٗدَ اللّٰهُ الْمُلْكَ فِىْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَالْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ بَعْدَ مَوْتِ شَمْوِيْلَ وَطَالُوْتَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا لِاَحَدٍ قَبْلَهٗ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ كَصَنْعَةِ الدُّرُوْعِ وَمَنْطِقِ الطَّيْرِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَدَلُ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ بِغَلَبَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَخْرِيْبِ الْمَسَاجِدِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ فَدَفَعَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ـ

২৫১. সুতরাং তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছায় তাদেরকে পরাভূত করল। فَهَزَمُوْهُمْ অর্থ- তাদেরকে পরাভূত করল। আর দাঊদ তিনি তালূতের সেনাদলে শরিক ছিলেন জালূতকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তাকে দাঊদকে তালূতের পর বনী ইসরাঈলের কর্তৃত্ব ও শামুঈলের মৃত্যুর পর হিকমত নবুয়ত দান করেছিলেন। তার পূর্বে একই ব্যক্তির মধ্যে নবুয়ত ও কর্তৃত্ব আর কারো মধ্যে একত্রে দৃষ্ট হয় না এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন। যেমন বর্ম নির্মাণ কৌশল, পাখির ভাষা বুঝার ক্ষমতা ইত্যাদি তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে بَعْضَهُمْ এটা اَلنَّاسَ -এর بَدَل بَعْض বা অংশবিশেষ স্থলাভিষিক্ত পদ। অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী অংশীবাদীদের বিজয়, মুসলিমদের হত্যা ও মসজিদসমূহ বিধ্বংসের দরুন বিনষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বজগতের উপর অনুগ্রহশীল। তাই তিনি একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত করেন।

٢٥٢. تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا نَقُصُّهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلتَّاكِيْدُ بِاَنَّ وَغَيْرِهَا رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهٗ لَسْتَ مُرْسَلًا ـ

২৫২. এই সব এ সমস্ত আয়াতসমূহ আল্লাহর আয়াতমালা। হে মুহাম্মদ! আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে সত্যসহ আবৃত্তি করি বিবৃত করি। আর নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্যতম। এ স্থানে اِنَّ এবং এরূপ কতিপয় শব্দ ব্যবহার করে বিষয়টিকে আরো تَاكِيْد অর্থাৎ জোরালো করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি 'আপনি প্রেরিত পুরুষ [مُرْسَل] নন' রাসূল ﷺ সম্পর্কে কাফেরদের এহেন উক্তির প্রতিবাদ।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

بَرَزُوْا : সম্মুখীন হলো, প্রকাশিত হলো। تَصَافُّوا : কাতার করে দাঁড়াল। أَصْبِبْ : ঢেলে দাও। صَبَّ (ن) صَبًّا অর্থ- ঢেলে দেওয়া। تَقْوِيَةٌ : শক্তিশালী করা। هَزَمُوْا : পরাজিত হলো। عَسْكَرٌ : সৈন্যবাহিনী। صُنْعَةٌ : নির্মাণ। دِرْعٌ : أَدْرُوعٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বর্ম। مَنْطِقَ الطَّيْرِ : পাখির ভাষা। دَفْعٌ : دَفَعَ (ف) دَفْعًا অর্থ- প্রতিহত করা। غَلَبَةُ الْمُشْرِكِيْنَ : অংশবাদীদের বিজয়। تَخْرِيْبٌ : বিধ্বংস। ذُوْ فَضْلٍ : অনুগ্রহশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ : دَاوُدُ - দাউদ ইবনে যিশর [ইউসা] ইবনে উবেদ [উওয়ায়বিদ] [খ্রিস্টপূর্ব ৯২৩ -১০২৪] এক সত্য নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনের ১৬টি স্থানে তাঁর উল্লেখ রয়েছে। তালূত বাহিনীতে তিনি একজন তরুণ সাধারণ সৈনিকরূপে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হননি এবং রাজত্বও লাভ করেননি।

قَوْلُهُ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ : আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব দিলেন। অর্থাৎ এ রাজত্ব যে আল্লাহপ্রদত্ত ছিল, আল কুরআন প্রথমেই সে তথ্যটি স্পষ্ট করে দিল। ইসরাঈল জাতির জন্য এ ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তির শাসন কর্তৃত্ব। হযরত দাউদ (আ.) ইসরাঈলী বংশধারার দ্বিতীয় বাদশাহ হলেন। প্রথম মুকুটধারী ছিলেন তালূত: হযরত দাউদ (আ.) তার জামাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্রসহ তালূত যুদ্ধেক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। যিহূদা [ইয়াহুদা] গোত্র হযরত দাউদ (আ.)-কে তাদের শাসক নির্বাচিত করল এবং দুই বছরের অন্তর্দ্বন্দ্বের পর অন্যান্য গোত্রও তাঁকে মেনে নিতে একমত হলো। সাত বছর পর্যন্ত তিনি 'হেবরোন' [আল খালীল]-এ অবস্থান করে রাজ্য পরিচালনা করলেন। পরে শত্রুদের কবল থেকে জেরুজালেম মুক্ত করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করলেন। তিনি আশপাশের সকল শাসককে পরাভূত ও বশীভূত করে নিজের রাজ্যসীমা সুবিস্তৃত করেন। তাঁর রাজত্বকাল, রাজ্যজয় ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা-শ্রীবৃদ্ধি ইহুদি ইতিহাসের স্মরণীয় যুগ। −[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ الْحِكْمَةَ : এখানে হিকমত দ্বারা নুবয়ত উদ্দেশ্য, যা হিকমত ও প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ স্তর। অবশ্য হিকমতের সাধারণ ও প্রাথমিক অর্থ হলো বুদ্ধিমত্তা, সৎ বিবেকও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেউ কেউ বলেছেন, اَلْحِكْمَةَ হচ্ছে ইলম ও তদনুসারে আমল। আবার কেউ কেউ নবুয়ত দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। −[বাহর] অর্থাৎ নবুয়ত। হিকমত- যার দ্বারা সব বিষয়কে তার সঠিক ও সার্থক অবস্থানে স্থাপন করা যায়। আর এ অর্থের পূর্ণাঙ্গতা অর্জিত হয় নবুয়ত দ্বারা। সুতরাং এখানেও নবুয়ত উদ্দেশ্য হওয়া বস্তবতা বিরোধী হবে না।

قَوْلُهُ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ : যা ইচ্ছা শিক্ষা দিলেন......নবীগণের ইলমের সংখ্যা তালিকা নিরূপণ করা কার সাধ্য? مِمَّا يَشَاءُ যা ইচ্ছা-র ব্যাপ্তিতে সেসব বিদ্যা-দক্ষতা ও প্রযুক্তি রয়েছে, যা হযরত দাউদ (আ.)-কে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। مِمَّا -এর مِنْ অব্যয় আংশিকতাবোধক (تَبْعِيْضِيَّة) নয়, সূচনাবোধক (اِبْتِدَائِيَّة) অর্থাৎ যা 'তথা' বা 'অর্থাৎ' -এর অর্থ দেয়। عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ অর্থ হবে- শিখিয়ে দিলেন অর্থাৎ যা যা চাইলেন। −[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ : এখানে একটা ব্যাপকভিত্তিক বিধান জানিয়ে দেওয়া হলো যে, পৃথিবীর বুকে রাজত্ব ও ক্ষমতার যে পট পরিবর্তন ও উত্থান-পতন হয়ে থাকে, তা অপ্রয়োজনে ও অনর্থক নিছক কালচক্রে বা প্রকৃতির নিয়মেই স্বয়ংক্রিয়রূপে হয়ে থাকে- এমন নয়; বরং তা সবসময়ই উদ্দেশ্যগতরূপে ও হেকমতের অধীনেই হয়ে থাকে এবং তা দ্বারা নিপীড়ন, নিগ্রহ, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দমন করাই লক্ষ্য হয়ে থাকে। আয়াত দ্বারা এ তত্ত্বও প্রস্ফুটিত হলো যে, এ কার্যকারণ ও উপলক্ষের অধীনে এ বিশ্বে স্রষ্টার মর্জিতে যেসব ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাও সাধারণত সৃষ্টি ও বান্দাদের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। মোটকথা ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পট পরিবর্তনের পেছনে আল্লাহর রহমতই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। −[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ : আপনি নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পূর্বে যেমন নবী-রাসূলের আগমন হয়েছিল, তেমনি আপনিও একজন নবী। এ কারণেই তো আমি আপনার কাছে বিগত যুগের ঘটনাবলি যথাযথভাবে বর্ণনা করছি, অথচ আপনি এসব না কোনো কিতাবে পড়েছেন, না কোনো মানুষের কাছে শুনেছেন। −[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পারা

٢٥٣. تِلْكَ مُبْتَدَأٌ الرُّسُلُ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
بِتَخْصِيْصِهِ بِمَنْقَبَةٍ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ
مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ كَمُوْسٰى وَرَفَعَ
بَعْضَهُمْ اَىْ مُحَمَّدًا ﷺ دَرَجٰتٍ عَلٰى
غَيْرِهِ بِعُمُوْمِ الدَّعْوَةِ وَخَتْمِ النُّبُوَّةِ بِهِ
وَتَفْضِيْلِ اُمَّتِهِ عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ
وَالْمُعْجِزَاتِ الْمُتَكَاثِرَةِ وَالْخَصَائِصِ
الْعَدِيْدَةِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ
جِبْرَئِيْلَ يَسِيْرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ وَلَوْ شَاۤءَ
اللّٰهُ هُدَى النَّاسِ جَمِيْعًا مَا اقْتَتَلَ
الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ بَعْدِ الرُّسُلِ اَىْ اُمَمُهُمْ
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ لِاخْتِلَافِهِمْ
وَتَضْلِيْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا
لِمَشِيْئَةِ ذٰلِكَ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ ثَبَتَ
عَلٰى اِيْمَانِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ كَالنَّصَارٰى
بَعْدَ الْمَسِيْحِ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا
تَوْكِيْدٌ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ مِنْ
تَوْفِيْقِ مَنْ شَاۤءَ وَخُذْلَانِ مَنْ شَاۤءَ ـ

অনুবাদ :

২৫৩. এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে এমন বিশেষ কিছু গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি যেগুলো অন্যজনের মধ্যে নেই। কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এখানে تِلْكَ হলো مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَلرُّسُلُ হলো تِلْكَ -এর সিফত বা বিশ্লেষণ অথবা বিবরণমূলক অন্বয়। আর فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ হলো خَبَر বা বিধেয়। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে, যার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন যেমন– মূসা (আ.) আবার কাউকে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। অন্যান্যদের উপর দাওয়াতের ব্যাপকতা, খতমে নবুয়ত, তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান, অসংখ্য মু'জিযা ও আরো বহু বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করে। মরিয়ম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) দ্বারা তাঁকে শক্তি যুগিয়েছি শক্তিশালী করেছি। তিনি যে স্থানেই গমন করতেন জিবরাঈল (আ.) সঙ্গে থাকতেন।

আল্লাহ্ সকল মানুষের হেদায়েত চাইলে তাদের অর্থাৎ রাসূলগণের পরবর্তীরা অর্থাৎ তাঁদের উম্মতগণ পরস্পরে মতানৈক্যতা ও একজন আরেকজনকে ভ্রষ্ট বলার কারণে এ ধরনের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর, কিন্তু তাঁর [আল্লাহর] এরূপ অভিপ্রায়ের ফলে তারা মতবিরোধিতায় লিপ্ত হলো। অনন্তর তাদের কতক বিশ্বাস করল অর্থাৎ ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকল এবং কতক যেমন– হযরত ঈসার পর খ্রিস্টানগণ সত্য প্রত্যাখ্যান করল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতো না এ বাক্যটি তাকিদব্যঞ্জক। কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন যাকে ইচ্ছা তৌফিক অর্থাৎ সাহায্য, কৃতকার্যতা ও সৌভাগ্য দান করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা দেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلرُّسُلُ : رَسُوْلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– রাসূল, দূত। فَضَّلْنَا : বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছি। اَلتَّفْضِيْلُ : শ্রেষ্ঠত্ব দান করা।

مَنْقَبَةٌ : গুণ, মর্যাদা। বহুবচন مَنَاقِب - كَلَّمَ : কথা বলেছেন। اَلتَّكْلِيْمُ কথা বলা।

دَرَجَاتٍ : دَرَجَةٌ -এর বহুবচন। স্তর, উঁচু মর্যাদা। بِعُمُوْمِ الدَّعْوَةِ : দাওয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা।

اَلْمُتَكَاثِرَةُ : বহু, অনেক। اَيَّدْنَا : শক্তি যুগিয়েছি। اَلتَّأْيِيْدُ : শক্তিশালী করা।

يَسِيْرُ : চলত।

سَارَ (ض) سَيْرًا : চলা, সফর করা। خُذْلَانٌ: লাঞ্ছনা।

তারকীব : تِلْكَ : যদি تِلْكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ উল্লিখিত নবীদের জামাত হয়ে থাকে, যাদের আলোচনা اَنَّكَ عَنِ الْمُرْسَلِيْنَ -এর মাঝে কিংবা গোটা সূরার মাঝে রয়েছে তাহলে اَلرُّسُلُ -এর اَلِف لَام টি عَهْدِي হবে। আর যদি তার مُشَارٌ اِلَيْهِ সাধারণভাবে সকল নবী-রাসূল হয়, তাহলে اَلِف لَامْ টি اِسْتِغْرَاقِي হবে।

প্রশ্ন : এখানে تِلْكَ তথা اِسْمِ اِشَارَة بَعِيْد ব্যবহার করার কারণ কি?

উত্তর. এর কারণ হয়তো بُعْد زَمَانِي -এর দিকে ইঙ্গিত করা, আর না হয় আল্লাহর কাছে তাদের উঁচু মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করা।

صِفَة বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) اَلرُّسُلُ -কে تِلْكَ -এর صِفَة আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং مَوْصُوْف এবং صِفَة মিলে মুবতাদা। আর এ মুবতাদার খবর হলো– فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

প্রশ্ন : اَلرُّسُلُ -কে جُزْء اَوَّل এবং فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -কে جُزْء ثَانِي সাব্যস্ত করলে ক্ষতি কি?

উত্তর: خَبَر হওয়ার সাধারণ নিয়ম যেহেতু نَكِرَة হওয়া, আর اَلرُّسُلُ যেহেতু مَعْرِفَة হয়েছে, তাই اَلرُّسُلُ -কে خَبَر সাব্যস্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন : وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ -এর মাঝে دَرَجَاتٍ মানসূব হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : হয়তো مَصْدَر হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা دَرَجَاتٍ এটি رِفْعَة -এর অর্থে। اَيْ رَفَعَ رِفْعَةً অথবা اِلٰى رَفَعَ টি বা عَلٰى বা فِيْ দ্বারা مُتَعَدِّي ছিল। حَرْفُ الْجَرِّ -কে হযফ করার কারণে مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে কিছু পূর্বে বলা হয়েছে– اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ [রাসূল ﷺ ও নবীগণের অন্তর্গত] আয়াতের এ অংশ দ্বারা সন্দেহ হতে পারে, সম্ভবত তাঁর নবুয়তও পূর্বের নবীগণের ন্যায় সাময়িক ও এলাকাভিত্তিক ছিল এবং তাঁর মর্যাদা ও সম্মান অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হবে। এ সন্দেহ দূর করার জন্যে অতি স্পষ্টভাবে তাঁর মর্যাদাকে تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

নবীগণের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য : যে সকল নবী ও রাসূলগণের উল্লেখ কুরআন মাজীদে এসেছে তারা সকলে একই স্তরের ছিলেন না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ 'আমি কোনো কোনো নবীকে অপর নবীর উপর মর্যাদা দান করেছি।' সূরা বনী ইসরাঈলেও وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى

http://islamiboi.wordpress.com

بَعْضٍ -এর মাঝে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে । অতএব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবীগণের মধ্যে একে অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য فَضَّلْنَا -এর মুতাকাল্লিমের যমীরটি লক্ষণীয় যে, এ মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহর নিকট। আনুগত্যের বিচারে মাখলুকের নিকট সকলেই সমান। সবার প্রতি আনুগত্য এবং সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। বিষয়টি এ সূরার শেষে অপর এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন-

لَيْسَ مَقَامُ التَّفْضِيْلِ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هُوَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْكُمُ الْاِنْقِيَادُ وَالتَّسْلِيْمُ لَهٗ وَالْاِيْمَانُ بِهٖ .

অর্থাৎ নবীগণের পারস্পরিক মর্যাদার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনো মন্তব্য বা আলোচনা বৈধ নয়। অবশ্য পারস্পরিক তুলনা করা ছাড়াই তাঁদের মর্যাদা, অবস্থা ও ঘটনাবলি উল্লেখ করায় কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَا تُخَيِّرُوْنِىْ مِنْ بَيْنِ الْاَنْبِيَاءِ -[বুখারীও মুসলিম]

অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে অন্যান্য নবীগণের মধ্যে বিশেষ প্রধান্য দিয়ো না।' এর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায়। কিন্তু আয়াতে তো বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হচ্ছে। আয়াত এবং হাদীসের মাঝে সমাধান কি?

উত্তর. এর দ্বারা প্রাধান্যকে অস্বীকার করা জরুরি হয় না; বরং এতে উম্মতকে নবীগণের ব্যাপারে আদব ও সম্মান প্রদর্শনের একটি বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের যেহেতু সকল বিষয়ে এবং বি েষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যার উপর ভিত্তি করে প্রাধান্য দেবে সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত নও। এজন্য তোমরা এভাবে আমার প্রাধান্য বর্ণনা করবে না, যাতে অন্যান্য নবীদের মর্যাদাহানি হয়। অন্যথায় কোনো কোনো নবীর উপর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান সর্বস্বীকৃত এবং আহলে সুন্নতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা এটা প্রমাণিত।

আংশিক মর্যাদা দ্বারা সামগ্রিক বিচারে মর্যাদাবান হওয়া জরূরী হয় না। উদাহরণস্বরূপ হযরত সুলাইমান (আ.)-কে রাজত্বের ব্যাপারে, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ধৈর্যের ব্যাপরে, হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে, হযরত ঈসা (আ.)-এর রূহুল-কুদুস -এর সমর্থনে, হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহর সাথে কথোপকথনে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আল্লাহর বিশেষ বন্ধুত্বে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। কিন্তু এমন কিছু নবী রয়েছেন যাদের সামগ্রিকভাবে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। বিশেষ এ স্থানটি আমাদের নবী ﷺ -এর জন্যেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা কতিপয় সাহাবী পরস্পর আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) হলেন আল্লাহর বন্ধু বা খলিল। অপর একজন বললেন, হযরত আদম হলেন সাফিউল্লাহ [আল্লাহর মনোনীত]। তৃতীয় একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ.) হলেন কালিমাতুল্লাহ বা রূহুল্লাহ। কেউ বললেন, হযরত মূসা (আ.) হলেন কালীমুল্লাহ ইত্যবসরে নবী করীম ﷺ সেখানে তাশরীফ আনলেন, তিনি বললেন, আমি তোমাদের আলোচনা শুনেছি, নিঃসন্দেহে তাঁরা এমনই ছিলেন। اِلَّا وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ 'তবে আমি হলাম হাবীবুল্লাহ, এটা কোনো গর্বের বিষয় নয়। -[মাযহারী- খুলাসাতুত তাফসীর -এর বরাতে]

قَوْلُهٗ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ : অর্থাৎ যে সকল নবী-রাসূলের বৃত্তান্ত বর্ণিত হলো, আমি তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الخ : **প্রশ্ন :** হযরত ঈসা (আ.) -এর আলোচনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার ফায়দা কি?

উত্তর : এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা প্রকাশ এবং ইহুদীদের ধারণা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। কারণ ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে নবী মানত না। উপরন্তু বিভিন্নরূপ কটূক্তি করত।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে অনেক নবীদের আলোচনা এসেছে; কিন্তু কারো ক্ষেত্রে পিতৃ পরিচয় তথা অমুকের পুত্র অমুক উল্লেখ করা হয়নি। একমাত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে ঈসা ইবনে মরিয়ম উল্লিখিত হয়েছে, এর রহস্য কি?

উত্তর : এর দ্বারা নাসারাদের আকিদা খণ্ডন করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং আল্লাহর পুত্র ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন মরিয়মের পুত্র ঈসা। যেভাবে অন্যান্য মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে সৃষ্টি হয়, হযরত ঈসা (আ.)-ও হযরত মরিয়ম (আ.) -এর গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ **আয়াতের সারমর্ম :** নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সঠিক ইলমপ্রাপ্ত হওয়ার পরে মানুষের মধ্যে যেসব মতানৈক্য দেখা যায় এমনকি কলহ-দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধেরও সূত্রপাত ঘটে তা এ কারণে নয় যে, [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ অক্ষম ছিলেন, এসব মতবিরোধ এবং কলহ প্রতিরোধের শক্তি তাঁর ছিল না। বস্তুত তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে নবীগণের দাওয়াত থেকে বিমুখ হওয়ার কারো সুযোগ থাকত না এবং কুফরি ও নাফরমানি করা এবং তাঁর জমিনে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা কারো সাধ্য হতো না। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা এমন ছিল না যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের সবাইকে একই গতির উপর চলতে বাধ্য করবেন। তিনি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে ধর্ম বিশ্বাস এবং আমলে বিভিন্ন মত ও পথের মধ্য থেকে নিজেদের জন্যে কোনো একটি নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। নবীদেরকে তিনি দারোগারূপে প্রেরণ করেননি যে, বাধ্যতামূলক তারা লোকদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি টেনে আনবেন; বরং তাদের প্রেরণের উদ্দেশ্য এই যে, বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণাদি দ্বারা মানুষকে সততা ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান করবেন। বস্তুত যে সকল মতবিরোধ এবং যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তা সব এ কারণেই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে ইচ্ছাশক্তি ব্যবহারের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাকে কাজে লাগাবে। আর এ স্বাধীনতার কারণেই মানুষ বিভিন্ন মত ও পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহ যদি সবাইকে সরল সঠিক পথের উপর চালাতে ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই তা পারতেন। এমন নয় যে, তিনি তা চাইতেন কিন্তু স্বীয় উদ্দেশ্যে তিনি সফল হতেন না [নাউযুবিল্লাহ]। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ هَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একথা বলে দেওয়া যে, لَوْ شَاءَ হলো فِعْل مُتَعَدِّى আর তার مَفْعُوْل মাহজুফ রয়েছে। এটি হলো তার مَفْعُوْل

প্রশ্ন: সাধারণ ও প্রচলিত নিয়ম হলো, مَشِيَّة-এর مَفْعُوْل ওটাই হয়ে থাকে যা جَزَاء দেখে বুঝে আসে। যেমন কুরআনের আয়াত- لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَاكُمْ -এর মাঝে রয়েছে। এ আয়াতের মূলরূপ হলো- لَوْ شَاءَ اللّٰهُ هِدَايَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ সুতরাং উক্ত নিয়মের আলোকে উল্লিখিত আয়াতের মূলরূপ এমন হওয়া উচিত ছিল- لَوْ شَاءَ اللّٰهُ عَدَمَ الْقِتَالِ مَا اقْتَتَلُوْا কিন্তু মুফাসসির (র.) এখানে এমন বস্তুকে مَفْعُوْل মেনেছেন যা جَزَاء থেকে বুঝে আসে না। এতে বুঝা গেল مُصَنِّف এ স্থলে বর্ণিত নিয়মের সাথে একমত নন। এর রহস্য কি?

উত্তর : মুফাসসির (র.) নিয়মের সাথে একমতই আছেন। তবে এখানে সে নিয়ম প্রযোজ্য হচ্ছে না। এর কারণ হচ্ছে مَا اقْتَتَلَ দ্বারা যে مَفْعُوْل সাব্যস্ত হয়, তা হলো عَدَمُ الْقِتَالِ আর কোনো مَعْدُوْم বস্তুর সাথে مَشِيَّة এবং اِرَادَة-এর সম্পর্ক হতে পারে না। এ কারণে মুফাসসির (র.) এমনটি করেছেন।

قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِهِمْ : এর সম্পর্ক হলো اِقْتَتَلَ -এর সাথে।

ثَبَتَ عَلٰى اِيْمَانِهٖ : اٰمَنَ -এর ব্যাখ্যা ثَبَتَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ঈমান তো ইখতেলাফের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। ইখতেলাফের পর তার উপর কায়েম ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٥٤. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ زَكٰوتَهُ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِدَاءٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ صَدَاقَةٌ تَنْفَعُ وَّلَا شَفَاعَةٌ بِغَيْرِ اِذْنِهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ وَالْكٰفِرُوْنَ بِاللّٰهِ اَوْ بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ لِوَضْعِهِمْ اَمْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ.

অনুবাদ :

২৫৪. হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর অর্থাৎ তোমরা তার জাকাত আদায় কর। সেদিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ফিদিয়া দান বন্ধুত্ব এমন সহৃদ্যতা যা উপকারে আসে এবং তাঁর [আল্লাহর] অনুমতি ছাড়া কোনোরূপ সুপারিশ থাকবে না। ঐ দিন হলো কিয়ামতের দিন। شَفَاعَةٌ، خُلَّةٌ، بَيْعٌ এ তিনটি শব্দ অপর এক কেরাতে رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। আর যারা আল্লাহর বা যা ফরজ করা হয়েছে তার অস্বীকারকারী তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহর নির্দেশসমূহকে অপাত্রে স্থাপন করার দরুন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ زَكَاتَهُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে খরচ করার দ্বারা ওয়াজিব খরচ উদ্দেশ্য। সামনের কঠোর উক্তি এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করছে। কেননা যে কাজ ওয়াজিব নয় তার ব্যাপারে কঠোর উক্তি করা হয় না। কিন্তু হযরত থানভী (র.) বলেন, এখানে اِنْفَاق وَاجِب এবং غَيْر وَاجِب উভয়টিই উদ্দেশ্য হতে পারে। পরের وَعِيْد এ সম্পর্কে নয়; বরং সেটিতে কিয়ামতের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। −[জামালাইন]

قَوْلُهُ فِدَاءٌ : فِدْيَة -কে بَيْع দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কেননা فِدَاء বলা হয় اِشْتِرَاءُ النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكَةِ -কে। ফিদিয়া তথা মুক্তিপণ বলা হয় ঐ অর্থকে যা কোনো কয়েদিকে মুক্ত করার জন্যে প্রদান করা হয়। এখানে সবব দ্বারা মুসাব্বাব উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা بَيْع শাস্তি থেকে পরিত্রাণের ফায়দা দেয় না; বরং ফিদিয়া পরিত্রাণের ফায়দা দেয়। −[জামালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ (اَلْاٰيَة) : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর রাহে খরচ করা। ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, যে সকল মানুষ ঈমানের রাস্তা অবলম্বন করেছে তাদের ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে [যার উপর তারা ঈমান আনয়ন করেছে] জান ও মাল উৎসর্গ করা উচিত। কাজের সময় এখনই। পরকালে না কোনো কর্ম করা যাবে, না কোনো ছওয়াব কিনতে পাওয়া যাবে, না পরিস্থিতির দ্বারা লাভ করা যাবে। আর না কোনো সুপারিশকারী পাওয়া যাবে।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفٰعَةٌ : ইহুদি নাসারা এবং কাফের ও মুশরিকরা নিজ নিজ ধর্মগুরু তথা নবী, ওলী, পীর, বুজুর্গ প্রমুখের ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, আল্লাহর উপর তাদের এরূপ প্রভাব রয়েছে যে, তারা তাদের ক্ষমতা বলে নিজেদের অনুসারীদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হাসিল করিয়ে দেবেন বা দিতে পারেন। এটাকে তারা শাফাআত বলত। অর্থাৎ বর্তমানের অজ্ঞ, মূর্খ মনিবদের ন্যায় তাদের বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের

http://islamiboi.wordpress.com

বুজুর্গগণ উড়ে গিয়ে আল্লাহর কাছে বসবেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করিয়ে ছাড়বেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট এমন কোনো শাফাআতের অস্তিত্ব নেই। এরপর আয়াতুল কুরসী ও অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফে বলে দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট ভিন্ন এক প্রকারের শাফাআত লাভ হবে। তবে তা, ঐ সকল মানুষের ব্যাপারে করতে পারবেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ শাফাআতের অনুমতি দেবেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কেবল তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্যেই অনুমতি দান করবেন। ফেরেশতা, নবী-রাসূল, শহীদ এবং নেককার ব্যক্তিগণ এ শাফাআত করার অধিকারী হবে। তবে আল্লাহর উপর কারো কোনো প্রকার চাপ থাকবে না; বরং এর বিপরীতে এ সকল বান্দাগণও আল্লাহর ভয়ে এ পরিমাণ ভিতু এবং কম্পিত থাকবে যে, তাদের মুখমণ্ডলের রং বিবর্ণ হয়ে যাবে। وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ (اَلْاٰيَةَ) –[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَا بَيْعٌ فِدَاءٌ : بَيْع-এর ব্যাখ্যায় فِدَاء শব্দ উল্লেখ করার কারণ হলো, فِدَاء বলা হয়– اِشْتِرَاءُ النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكَةِ অর্থাৎ فِدْيَة হলো ঐ মূল্য যা বন্দি মুক্তির বিনিময়ে আদায় করা হয়। মূলত এখানে سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ বোঝানো হয়েছে। কেননা بَيْع আজাব থেকে মুক্তি দিতে পারে না; বরং فِدْيَة মুক্তি দিতে পারে ।

قَوْلُهُ تَنْفَعُ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে একথা জানানো উদ্দেশ্য যে, সাধারণ বন্ধুত্বকে নাকচ করা হয়নি; বরং উপকারী বন্ধুত্বকে নাকচ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ اِذْنِهٖ : এ অংশটুকু বৃদ্ধির উদ্দেশ্য একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্নটি হলো, وَلَا شَفَاعَةَ দ্বারা ঢালাওভাবে শাফাআতকে নাকচ করা কিভাবে সহীহ হলো? অথচ হাদীস দ্বারা কিয়ামতের দিন নবীগণের শাফাআত স্বীকৃত আছে।

উত্তর. এখানে যদিও مُطْلَقَ شَفَاعَة-কে নাকচ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য আয়াতে এ مُطْلَقَ-কে مُقَيَّد করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ : অর্থাৎ لَا بَيْعٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ এ তিনটি শব্দে لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ-এর اِسْم হওয়ার কারণে সাধারণ নিয়মে فَتْحَة হবে। যেমন– ইবনে কাছির, আবূ ওমর -এর কেরাতে ফাতহা রয়েছে; কিন্তু তাঁদের ছাড়া অন্যদের কেরাতে رَفْع সহ পঠিত রয়েছে। رَفْع হওয়ার কারণ হলো, মূলত এ ইবারতটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো– هَلْ فِيْهِ بَيْعٌ اَوْ خُلَّةٌ اَوْ شَفَاعَةٌ ? জবাব হলো– لَا بَيْعٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে জবাবেও رَفْع প্রদান করা হয়েছে। কেউ কেউ এ জবাবও দিয়েছেন যে, لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ-কে তাকরার করার কারণে مُهْمَل সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং بَيْع মুবতাদা হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। অবশ্য এ সুরতে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে بَيْعٌ خُلَّةٌ شَفَاعَةٌ হলো نَكِرَة যার মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ নয়। এর জবাব হলো– نَكِرَة تَحْتَ النَّفْيِ হওয়ার কারণে তা মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ : এখানে কাফের দ্বারা হয়তো সে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যকে অস্বীকার করে এবং তাদের ধন-সম্পদকে আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে ব্যয় করতে রাজি নয়। অথবা ঐ সকল মানুষ উদ্দেশ্য যারা কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যে ব্যাপারে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে কিংবা ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য যারা এমন অলীক ধারণায় লিপ্ত রয়েছে যে, পরকালে কোনো না কোনোভাবে তারা নাজাত ক্রয়ের এবং বন্ধুত্ব ও সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করার সুযোগ লাভ করবে। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٥٥. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اَىْ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ فِى الْوُجُوْدِ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الدَّائِمُ الْبَقَاءِ الْقَيُّوْمُ الْمُبَالِغُ فِى الْقِيَامِ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ نُعَاسٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا مَنْ ذَا الَّذِىْ اَىْ لَا اَحَدَ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ لَهٗ فِيْهَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اَىِ الْخَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ اَىْ اَمْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ اَنْ يَعْلَمَهُمْ بِهٖ مِنْهَا بِاَخْبَارِ الرُّسُلِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قِيْلَ اَحَاطَ عِلْمُهٗ بِهِمَا وَقِيْلَ مُلْكُهٗ وَقِيْلَ الْكُرْسِىُّ بِعَيْنِهٖ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِمَا لِعَظْمَتِهٖ لِحَدِيْثِ مَا السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ فِى الْكُرْسِىِّ اِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ اُلْقِيَتْ فِىْ تُرْسٍ وَلَا يَؤُدُهٗ يُثْقِلُهٗ حِفْظُهُمَا اَىِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِىُّ فَوْقَ خَلْقِهٖ بِالْقَهْرِ الْعَظِيْمُ الْكَبِيْرُ.

অনুবাদ :

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই অর্থাৎ বস্তুত অন্য কোনো উপাস্যের অস্তিত্ব নেই। তিনি চিরঞ্জীব যাঁর অস্তিত্ব চিরকাল থাকবে, অবিনশ্বর সৃষ্টির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে যিনি অতিশয় তৎপর, তাঁকে তন্দ্রা ঝিমানি ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সব কিছু মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস সকল রূপে তাঁরই, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে এমন কে আছে? অর্থাৎ কেউ নেই তাদের সম্মুখে যা অর্থাৎ সৃষ্টি ও পশ্চাতে যা আছে তা অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কিছু তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন অর্থাৎ রাসূলগণ কর্তৃক সংবাদ দানের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে যা জানাতে ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। অর্থাৎ তাঁর অবহিত বিষয়সমূহের কিছুই তারা জানে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হচ্ছে- তাঁর জ্ঞান এতদুভয়কে বেষ্টন করে রেখেছে। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সাম্রাজ্য এতদুভয়ের মাঝে বিস্তৃত। কেউ কেউ বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কুরসিই তার বিরাটত্বে এতদুভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। হাদীসে আছে, একটি বিরাট ঢালের মধ্যে সাতটি দিরহাম ঢেলে রাখলে যে অবস্থা কুরসির তুলনায় সাত আকাশের অবস্থাও হলো তদ্রূপ। তাদের অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না তা তাঁর নিকট ভারী বলে মনে হয় না। তিনি সর্বোচ্চ পরাক্রমে সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে, মহান শ্রেষ্ঠ।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

فِى الْوُجُوْدِ : বাস্তবে। اَلدَّائِمُ الْبَقَاءِ : যার অস্তিত্ব চিরকাল থাকবে। بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ : সৃষ্টির পরিচালনায়।
سِنَةٌ : তন্দ্রা, মূলরূপ وَسْنٌ নিয়মের বাইরে و -কে ফেলে তার পরিবর্তে শেষে ; যোগ করা হয়েছে।
نُعَاسٌ : তন্দ্রা, ঘুমের পূর্বে যা হয়। تُرْسٌ : ঢাল। لَا يَؤُدُهُ : তাঁকে ক্লান্ত করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الخ : **আয়াতুল কুরসী** : এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। হাদীসে এ আয়াতকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রভূত ফজিলত ও ছওয়াব বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে এত পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যার কোনো নজির নেই। এ কারণে হাদীস শরীফে এটাকে কুরআনের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়াত বলা হয়েছে।

আয়াতুল কুরসীর ফজিলত : সহীহ হাদীস শরীফে আয়াতুল কুরসীর বিস্তর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। এর ফজিলত ও বরকত সম্পর্কে সম্ভবত কেউ অনবহিত নয়। এটা পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতকে অন্য সকল আয়াত থেকে উৎকৃষ্ট বলেছেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং হযরত আবূ যর (রা.) থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– সূরা বাকারায় একটি আয়াত আছে যা সকল আয়াতের সর্দার। যে ঘরে তা পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান বের হয়ে যায়।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে বেহেশতে প্রবেশের ব্যাপারে মৃত্যু ছাড়া তার কোনো প্রতিবন্ধক থাকবে না।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফতের বর্ণনা অতি চমৎকার ও উন্নত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে প্রকাশ্য ইসম ও সর্বনামের মাধ্যমে ১৭ বার আল্লাহর নাম উল্লিখিত হয়েছে। যথা– ১. اَللّٰهُ ২. هُوَ ৩. اَلْحَىُّ ৪. اَلْقَيُّوْمُ ৫. لَا تَأْخُذُهُ -এর সর্বনাম ৬. لَهُ -এর সর্বনাম ৭. عِنْدَهُ -এর সর্বনাম ৮. بِإِذْنِهِ -এর সর্বনাম ৯. يَعْلَمُ -এর সর্বনাম ১০. عِلْمِهِ -এর সর্বনাম ১১. شَاءَ -এর সর্বনাম ১২. كُرْسِيُّهُ -এর সর্বনাম ১৩. يَؤُدُهُ -এর সর্বনাম ১৪. وَهُوَ ১৫. الْعَلِىُّ ১৬. الْعَظِيْمُ ১৭. حِفْظُهُمَا মাসদারের উহ্য সর্বনাম। এ মাসদারটি মাফউলের দিকে মুযাফ হয়েছে। আর তা হলো প্রকাশ্য সর্বনাম। -এর জন্যে ফায়েল আবশ্যক, আর ফায়েল হলো আল্লাহ। মাসদার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তা প্রকাশ্যে উল্লিখিত হয়। যেমন বলা হয়– وَلَا يَؤُدُهُ اَنْ يَحْفَظَهُمَا

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ -এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটি জাতিগত নাম। অর্থাৎ এমন সত্তা যিনি সমস্ত উত্তম গুণে গুণান্বিত এবং সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত। لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সে সত্তার বর্ণনা যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ তিনি চিরঞ্জীব ও স্বাধিষ্ট, বিশ্বধাতা, যিনি অনাদি, অনন্ত। হায়াতের বিশেষণ তাঁর সত্তার অংশবিশেষ। মৃত্যু কিংবা নাস্তি তার উপর কখনো আরোপিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। اَلْحَىُّ فِىْ نَفْسِهِ لَا يَمُوْتُ اَبَدًا (اِبْنُ كَثِيْر)

প্রশ্ন: পৃথিবীতে কখনো কি এমন কোনো জাতি গোষ্ঠী অতিবাহিত হয়েছে, যারা আল্লাহর اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ বিশেষণে সন্দেহ করেছে বা অস্বীকার করেছে?

উত্তর : একটি নয়; বরং রোম সাগরের তীরে বসবাসরত এমন অনেক গোত্র অতিবাহিত হয়েছে, যাদের বিশ্বাস এই ছিল যে, প্রত্যেক বছর অমুক তারিখে তাদের খোদা মৃত্যুবরণ করে এবং পরের দিন নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। সুতরাং

http://islamiboi.wordpress.com

প্রত্যেক বছর উক্ত নির্দিষ্ট তারিখে খোদার মৃতদেহ তৈরি করে তা আগুনে পোড়ানো হতো, আর পরের দিন তার জন্মের আনন্দে বিভিন্নরূপ আনন্দ উৎসব করত। হিন্দু ধর্মে দেবতাদের মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম এ আকিদার দৃষ্টান্ত। খ্রিস্টানদের আকিদাই বা এ ছাড়া আর কি যে, প্রথমে খোদা মানুষের আকৃতিতে জগতে আগমন করত। অতঃপর ক্রুশের উপর গিয়ে মৃত্যুবরণ করত। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ الخ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, إِلٰهَ দ্বারা مَعْبُوْد حَقِيْقِي উদ্দেশ্য; مُطْلَق مَعْبُوْد উদ্দেশ্য নয়। কেননা مَعْبُوْد مُطْلَق غَير حَقِيْقِي অনেক রয়েছে। আর مُطْلَق مَعْبُوْد -এর نَفِي করা হলে, مذب بَارِي লাযেম আসবে। অথচ এটা অসম্ভব। অবশ্য এ সুরতে এ প্রশ্ন হবে যে, যখন إِلٰه দ্বারা مَعْبُوْد حَقِيْقِي উদ্দেশ্য- যিনি একক, তখন إِلَّا هُوَ এর দ্বারা إِسْتِثْنَاء শুদ্ধ হবে না। কেননা এটি إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهٖ হবে।

উত্তর : مَعْبُوْد بِالْحَقِّ যেহেতু একটি كُلِّي সেহেতু مُسْتَثْنٰى مِنْهُ একটি হওয়ার কারণে. إِسْتِثْنَاء শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي الْوُجُوْدِ : এ অংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَا -এর খবরটি মাহযূফ রয়েছে। আর সেটি হলো فِي الْوُجُوْدِ

قَوْلُهُ الْقَيُّوْمُ : এটি قَائِم থেকে مُبَالَغَة -এর সীগাহ। অর্থ- যে নিজে কায়েম থাকে এবং অন্যকে কায়েম রাখে। قَيُّوْم মূলত قَيْوُوْم ছিল। وَاو এবং يَاء একত্র হওয়ার কারণে প্রথম [সাকিনযুক্ত।] وَاو -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং يَاء -কে يَاء -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। قَيُّوْم হয়েছে।

খ্রিস্টানরা যেভাবে আল্লাহর হায়াত বিশেষণের ব্যাপারে সত্য-বিচ্যুত হয়েছে তদ্রূপ তার قَيُّوْمِيَّة বিশেষণের ব্যাপারেও আজব ভ্রষ্টতায় নিমগ্ন হয়েছে। তাদের আকিদা এই যে, যেভাবে পুত্র পিতার অংশীদারিত্ব ছাড়া খোদা হতে পারে না তদ্রূপ খোদাও পুত্রের অংশিদারিত্ব ছাড়া খোদা হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহর পুত্র মসীহ খোদার মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ পিতাও তাঁর খোদায়িত্বে মসীহের মুখাপেক্ষী। قَيُّوْمِيَّة **বিশেষণ** উল্লেখ করে কুরআন খ্রিস্টানদের আকিদার উপর আঘাত হেনেছে। قَيُّوْم এমন সত্তা, যিনি স্বীয় সত্তার সাথে অধিষ্ঠিত এবং অন্যের অস্তিত্বের কারণ। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনি অধিষ্ঠিত রেখেছেন। প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -ই হলো ইসমে আজম। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ : এটি আল্লাহ তা'আলার صِفَات سَلْبِيَّة -এর অন্তর্ভুক্ত। سِنَة -এর সম্পর্ক চোখের সাথে। এটি নবীগণের ঘুম। আর نَوْم -এর সম্পর্ক কলবের সাথে। এটি فِطْرَة طَبِيْعَة যা প্রতিটি প্রাণীর উপর অপরিহার্যভাবে চেপে বসে। سِنَة বলা হয়- مَا يَتَقَدَّمُ مِنَ الْفُتُوْرِ وَالْإِسْتِرْخَاءِ مَعَ بَقَاءِ الشُّعُوْرِ অর্থাৎ ঘুমের পূর্বের গাফলতের সময় যে অনুভূতি বাকি থাকে তাকে سِنَة বলা হয়। এটিকে نُعَاس -ও বলা হয়।

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা হতে মুক্ত। পূর্বের বাক্য দ্বারা বুঝা গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র আসমান-জমিন এবং উভয়ের মধ্যকার সকল কায়েনাতকে তিনি অটুট রেখেছেন। কাজেই কোনো ব্যক্তির জন্যে তাঁর সৃষ্টি মোতাবেক এদিক-সেদিক যাওয়া সম্ভব নয়। যে মহান সত্তা এমন বিশাল কাজ আঞ্জাম দেন সম্ভবত তিনি কোনো সময় ক্লান্তও হতে পারেন, তাঁর বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্যে কিছু সময় থাকা উচিত। এ বাক্যে মানুষের এ ধরনের ধারণার ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহকে নিজেদের কিংবা অন্যান্য মাখলুকের সাথে তুলনা করো না। কারণ তিনি কোনোরূপ তুলনা এবং উপমা থেকে পবিত্র। তাঁর মহাশক্তির সামনে এ সকল কাজ কষ্টকর নয় এবং এতে তিনি কোনোরূপ ক্লান্তি অনুভব করেন না। তাঁর পবিত্র সত্তা সকল প্রকার প্রভাব, কষ্ট-ক্লেশ ও তন্দ্রা-নিদ্রা থেকে মুক্ত। জাহিলি ধর্মের দেবতারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় এবং ঘুমায়। এমন পরিস্থিতিতে তাদের বিভিন্নরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পায়। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আকিদা এই যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আসমান ও জমিনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সপ্তম দিনে তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কিন্তু ইসলামের খোদা সদা জাগ্রত ও সজাগ। কোনোরূপ কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে পবিত্র।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : لَهُ -এর لام হলো تَمْلِيْك -এর জন্য اِنْتِفَاع -এর জন্য নয়। অতএব, আসমান-জমিনের সকল বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন।

مِلْكًا خَلْقًا : এর দ্বারা ইশারা করেছেন যে, لَهُ -এর لام টি نَفْع -এর জন্যে নয়। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোনো বস্তুর উপকারের মুখাপেক্ষী নন।

قَوْلُهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ : অর্থাৎ এমন কেউ নেই যে, তাঁর অনুমতিবিহীন তাঁর সমীপে কারো জন্যে সুপারিশের ব্যাপারে মুখ খুলবে।

হযরত মসীহ (আ.)-এর শাফাআতে কুবরা খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ আকিদা। কুরআন মাজীদ খ্রিস্টানদের বিশেষ কুফরি আকিদাসমূহ এবং শাফাআত ইত্যাদির উপর আঘাত হেনেছে। খ্রিস্টানরা যেখানে শাফাআতের উপর তাদের নাজাতের বুনিয়াদ রেখেছে; এর বিপরীতে কোনো কোনো মুশরিক জাতি আল্লাহকে বিশেষ আইনকানুনের সাথে এমনভাবে আবদ্ধ জ্ঞান করেছে যে, তাদের জন্যে ক্ষমা ও শাফাআতের আর কোনো অবকাশ নেই। ইসলাম মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে বলে দিয়েছে যে, কারো শাফাআতের উপর নাজাত সীমাবদ্ধ নয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এর অবকাশ রেখেছেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ক্ষেত্রবিশেষ শাফাআতের অনুমতি দান করবেন এবং কবুলও করবেন। হাশরের ময়দানে সবচেয়ে বড় শাফাআতকারী হবেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ আয়াত থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত শাফাআতের বিষয়টি বের করেছেন।

قَوْلُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ : অর্থাৎ উপস্থিত অনুপস্থিত, অনুভবযোগ্য বা অযোগ্য ইত্যাদি সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহর রয়েছে। সবকিছুকেই সামানভাবে তাঁর জ্ঞানে বেষ্টন করে রেখেছে।

قَوْلُهُ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ : অর্থাৎ মানুষ বরং সমস্ত মাখলুক আল্লাহর ইলমের কোনো অংশকে আয়ত্তে আনতে পারে না। তবে আল্লাহ যতটুকু চান বান্দাকে তা দান করেন। সমস্ত সৃষ্টিরাজির অণু-পরমাণু পরিমাণ বস্তুর তাঁর জ্ঞান রয়েছে। এটা আল্লাহর বিশেষ একটি গুণ, কেউ এতে শরিক নেই।

قَوْلُهُ مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ : مِنْ عِلْمِهٖ -এর ব্যাখ্যায় مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, عِلْم দ্বারা مَعْلُوْمَات উদ্দেশ্য। কেননা عِلْم হলো صِفَت بَسِيْط যার মাঝে تَجَزِّى হতে পারে না। অবশ্য مَعْلُوْمَات -এর মধ্যে تجزى হতে পারে।

قَوْلُهُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ : اَلْكُرْسِىُّ অর্থ مَا يُجْلَسُ عَلَيْهِ যার উপর বসা হয়। كُرْسِى -এর মূল অর্থ হলো- কোনো বস্তু সম্পর্কেও অপর কোনো বস্তুর সাথে মিলানো। এর থেকেই كُرَّاسَة এর ব্যবহার। কেননা, এর মাঝেও কিছু পৃষ্ঠাকে অপর কিছু পৃষ্ঠার সাথে একত্র করা হয়। বলা হয়- تَكَرَّسَ فُلَانٌ الْحَطَبَ 'অমুক ব্যক্তি কাঠ একত্র করেছে।'

কুরসি শব্দটি সাধারণত রাজত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে اِسْتِعَارَه স্বরূপ বলা হয়। উর্দু ভাষায়ও কুরসি শব্দ বলে প্রশাসনিক ক্ষমতা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। আরশ কুরসির তত্ত্ব ও রহস্যের জ্ঞান মনুষ্য বিবেক বহির্ভূত। অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আরশ ও কুরসি বিশালকায় বস্তু। সমস্ত আসমান ও জমিন থেকে তা বহুগুণ বড়। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) হযরত আবূ যার (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন, কুরসী কি এবং কেমন? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার জান রয়েছে, সপ্ত আসমান ও জমিনের উদাহরণ আল্লাহর কুরসির সামনে এই যে, এক বিশাল ময়দানে কোনো আংটির বৃত্ত ফেলে দেওয়া হলো।

قَوْلُهُ وَلَا يَؤُوْدُهُ حِفْظُهُمَا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এ উভয় মহাসৃষ্টির সংরক্ষণে কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব হয় না। কারণ মহাশক্তিশালী আল্লাহর কুদরতের সামনে এসব বস্তু অতি নগণ্য ও তুচ্ছ।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ : অর্থাৎ তিনি অতি মহান এবং মর্যাদাবান। এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও উত্তম গুণাবলির বিষয়াদি অতি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে এসে গেছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٥٦. لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ عَلَى الدُّخُوْلِ فِيْهِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ اَيْ ظَهَرَ بِالْاٰيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اَنَّ الْاِيْمَانَ رُشْدٌ وَالْكُفْرَ غَيٌّ نَزَلَتْ فِيْمَنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ اَوْلَادٌ اَرَادَ اَنْ يُّكْرِهَهُمْ عَلَى الْاِسْلَامِ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ الشَّيْطَانِ اَوِ الْاَصْنَامِ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى بِالْعَقْدِ الْمُحْكَمِ لَا انْفِصَامَ انْقِطَاعَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِمَا يُقَالُ عَلِيْمٌ بِمَا يُفْعَلُ.

অনুবাদ :

২৫৬. দীন সম্পর্কে অর্থাৎ তাতে প্রবেশের বিষয়ে জোর-জবরদস্তি নেই। সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনাদি দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, ঈমানের পথ হলো সত্যপথ আর কুফরির পথ হলো ভ্রান্তপথ। মদিনার আনসার সাহাবীগণ স্ব-স্ব সন্তানাদিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করার প্রয়াস পেতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। যে তাগূতকে اَلطَّاغُوْتُ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শয়তানকে মতান্তরে প্রতিমাসমূহের অস্বীকার করবে ও আল্লাহতে বিশ্বাস করবে, সন্দেহ নেই সে ধারণ করেছে ধরেছে মজবুত একটি হাতল সুদৃঢ় একটি গ্রন্থি। যা অটুট যা ছিন্ন হওয়ার নয়। যা কিছু বলা হয় তা আল্লাহ শুনেন, যা করা হয় এতদসম্পর্কে তিনি পরিজ্ঞাত।

٢٥٧. اَللّٰهُ وَلِيُّ نَاصِرُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ الْاِيْمَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ذِكْرُ الْاِخْرَاجِ اِمَّا فِيْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اَوْ فِيْ كُلِّ مَنْ اٰمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ بِعْثَتِهِ مِنَ الْيَهُوْدِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

২৫৭. যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক। সাহায্যকারী তিনি তাদেরকে অন্ধকার অর্থাৎ কুফরি হতে বের করে আলোতে অর্থাৎ ঈমানের দিকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাগূত তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এখানে اِخْرَاج [বের করে আনা] দ্বারা বুঝা যায়, তা তার ভিতর ছিল অথচ কাফেরদের ভিতর ঈমান ছিল না। সুতরাং শব্দটির ব্যবহার يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ [অন্ধকার হতে তাদেরকে বের করে আনে] -এর মোকাবিলায় করা হয়েছে। কিংবা এ আয়াতটি হলো ঐ সমস্ত ইহুদিদের সম্পর্কে যারা রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখত। কিন্তু আবির্ভাবের পর তাঁকে অস্বীকার করল। তারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

اِكْرَاهٌ : জোর-জবরদস্তি। اَلرُّشْدُ : সত্যপথ। اَلْغَيُّ : ভ্রান্তপথ। اَلطَّاغُوْتُ : আল্লাহ ছাড়া যে কোনো বাতিল উপাস্য, স্বেচ্ছাচারী, শয়তান। উভয় লিঙ্গে এবং একবচনে ও বহুবচনে এর ব্যবহার রয়েছে। তবে বহুবচনের আলাদা শব্দ হলো طَوَاغِيْت এবং দ্বিবচনে طَاغُوْتَانِ ; اَلْعُرْوَةُ হাতল, গ্রন্থি। اَلْوُثْقٰى : মজবুত, সুদৃঢ়। اِنْفِصَامٌ : ছিন্ন হওয়া।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হুসাইন আনসারী নামক জনৈক ব্যক্তির দুটি ছেলে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। আনসারগণ যখন মুসলমান হলো তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকেও জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে ইচ্ছা করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। শানে নুযূলের দিক দিয়ে মুফাসসিরগণ এটাকে আহলে কিতাবের জন্যে খাস মনে করেন। অর্থাৎ, ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী কোনো আহলে কিতাব যদি কর আদায় করে তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না। বস্তুত এ আয়াতের হুকুম ব্যাপক। অর্থাৎ কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা যাবে না। কারণ আল্লাহ হেদায়েত ও গোমরাহিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তথাপি কুফর ও শিরকের সমাপ্তি এবং বাতিলের শক্তি খর্ব করার জন্যে জিহাদের বিধান, আর এখানে উল্লিখিত জোর-জবরদস্তি ভিন্ন ব্যাপার। জিহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে শক্তিকে দমন করা, যা আল্লাহর দীনের উপর আমল করতে এবং তাঁর মনোনীত দীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। কারণ এ ধরনের শক্তি মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে থাকে। এ কারণেই জিহাদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যেমন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে- اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ এভাবে মুরতাদ হওয়ার সাজা বা শাস্তির সাথেও এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ এ সাজার দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা উদ্দেশ্য নয়; বরং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ও নিয়মনীতির সংরক্ষণ উদ্দেশ্য। কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে একজন কাফেরের স্বীয় কুফরির উপর অটল থাকার অনুমতি থাকতে পারে। কিন্তু একবার যখন সে ইসলামে দীক্ষিত হলো, তখন তার বিরুদ্ধাচরণ এবং তা থেকে পদচ্যুত হওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই আগেই সে উত্তমরূপে ভেবেচিন্তে ইসলাম গ্রহণ করবে। কেননা যদি মুরতাদ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে বুনিয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি বিনষ্ট হয়ে যেত। আর এর দ্বারা মতবাদগত ভিন্নতা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পেত। ফলে যা ইসলামি সমাজব্যবস্থার শান্তি, নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আশঙ্কাযুক্ত হতো। এ কারণেই যেভাবে মানবাধিকারের নামে হত্যা, চুরি, ছিনতাই, ব্যভিচার ইত্যাদি অন্যায়ের অনুমতি দেওয়া যায় না। একইভাবে মুক্ত চিন্তার নামে একই ইসলামি রাষ্ট্রে মতবাদগত দ্রোহিতা তথা ধর্মচ্যুতির অনুমতিও দেওয়া যায় না। এটা কোনো বাধ্যবাধকতা নয়; বরং মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড ঠিক সেভাবেই ন্যায়ানুগ বিচার, যেভাবে হত্যা ও ডাকাতি এবং বিভিন্ন চারিত্রিক অন্যায়ে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে কঠোর সাজা দেওয়া আইনের দৃষ্টিতে সঠিক বিবেচিত। একটির উদ্দেশ্য হলো, রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, আর অপরটির উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রকে বিভিন্ন ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করা। রাষ্ট্রের সুশৃঙ্খলার জন্যে উভয় বিষয় অতি জরুরি। বর্তমান অধিকাংশ ইসলামি রাষ্ট্র এ উভয় বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়ারকারণে যেসব বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিরতার শিকার হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

قَوْلُهُ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ : অভিধানের দিক দিয়ে এমন সব ব্যক্তিকে طَاغُوْت বলা হয়, যারা বৈধ সীমা থেকে অতিক্রম করে যায়। কুরআনের পরিভাষায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহর দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে স্বপ্রভুত্ব ও স্বনির্ভরতার পরিচয় দেয়। আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের দাসত্বে বাধ্য করে। আল্লাহর মোকাবিলায় কোনো এক বান্দার হঠকারিতার তিনটি স্তর রয়েছে-

১. মৌলিকভাবে আল্লাহর আনুগত্যকে সত্য মনে করে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর হুকুমের খেলাফ করে এর নাম হলো ফিসক।
২. আল্লাহর আনুগত্য থেকে মৌলিকভাবে সে বের হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সাজে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে। এটা হলো কুফরি।
৩. নিজ প্রভুর বিদ্রোহী হয়ে তার দেশে প্রজাদের মধ্যে তার নিজের হুকুম চালায়। এ সর্বশেষ স্তরে কোনো ব্যক্তি উপনীত হলে তাকে তাগুত বলা হয়। -[জামালাইন]

قَوْلُهُ تَمَسَّكَ : اِسْتَمْسَكَ -এর ব্যাখ্যা تَمَسَّكَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتَمْسَكَ -এর মধ্যে سِيْن হরফটি অতিরিক্ত। بَابِ اِسْتِفْعَال -এর অর্থ প্রযোজ্য হবে না।

قَوْلُهُ ذِكْرُ الْاِخْرَاجِ : মুফাসসির (র.) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কাফেররা তো আলোর মধ্যে ছিলই না, তারপরও তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার মর্ম কি? মুফাসসির (র.) এ প্রশ্নের দুটি জবাব দিয়েছেন-

১. مُقَابَلَة স্বরূপ اِخْرَاج -এর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মু'মিনদের জন্যে যেহেতু اِخْرَاج শব্দের ব্যবহার করেছেন তাই কাফেরদের জন্যেও اِخْرَاج শব্দের ব্যবহার করেছেন। এটিকে বালাগাতের পরিভাষায় صِفَةُ مُقَابَلَة বলা হয়।
২. আরেকটি জবাব এই যে, এখানে ইহুদি নাসারাদের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যারা নিজেদের ধর্মীয় কিতাবের সুসংবাদে রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের পর তারা জিদ ও হঠকারিতাবশত সে ঈমান থেকে ফিরে যায়। যেন আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٥٨. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ حَاجَّ جَادَلَ اِبْرٰهِمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اَيْ حَمَلَهُ بَطَرُهٗ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ الْبَطَرِ وَهُوَ نَمْرُوْدُ اِذْ بَدَلٌ مِنْ حَاجَّ قَالَ اِبْرٰهِمُ لَمَّا قَالَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ الَّذِيْ تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ اَيْ يَخْلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ فِي الْاَجْسَادِ قَالَ هُوَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ بِالْقَتْلِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَدَعٰى بِرَجُلَيْنِ فَقَتَلَ اَحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْاٰخَرَ فَلَمَّا رَاٰهُ غَبِيًّا قَالَ اِبْرٰهِمُ مُنْتَقِلًا اِلٰى حُجَّةٍ اَوْضَحَ مِنْهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا اَنْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ تَحَيَّرَ وَدَهِشَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بِالْكُفْرِ اِلٰى مَحَجَّةِ الْاِحْتِجَاجِ .

অনুবাদ :

২৫৮. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল বিতণ্ডা করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে সাম্রাজ্য দিয়েছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর অপার নিয়ামত ও অনুগ্রহপ্রাপ্তিই তাকে এ ধরনেই গর্বোদ্যত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করতে উৎসাহ যোগিয়েছিল। এ লোকটি ছিল নমরূদ।

যখন اِذْ শব্দটি حَاجَّ -এর بَدَلْ বা স্থলাভিষিক্ত পদ। নমরূদ তাঁকে [ইবরাহীমকে] বলল, তোমার প্রভু কে? যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান কর? তখন ইবরাহীম বললেন, আমার প্রভু তিনি যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান অর্থাৎ শরীরে জন্ম ও মৃত্যুর সৃষ্টি করেন। সে বলল, আমিও তো হত্যা করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। এবং দুই ব্যক্তিকে ডেকে একজনকে হত্যা ও অপরজনকে মুক্তি দিয়ে দিল। তিনি [হযরত ইবরাহীম (আ.)] যখন দেখলেন যে, এ একেবারে নির্বোধ তখন ইবরাহীম বিতর্ক-কৌশল পরিবর্তন করে অধিকতর স্পষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়ে বললেন, আল্লাহ সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো দেখি! অনন্তর যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বিস্ময়ান্বিত ও হতচকিত হয়ে গেল। নিশ্চয় আল্লাহ কুফরি করে যারা সীমালঙ্ঘন করে সেই সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। প্রমাণ প্রদানের উপায় প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

حَاجَّ : বিতর্ক করেছে। بَاب مُفَاعَلَة থেকে। মূলরূপ حَاجَجَ এখানে ج -কে ج -এর মাঝে اِدْغَام করা হয়েছে। মাসদার مُحَاجَّةٌ মূলরূপ مُحَاجَجَةٌ ব্যবহার حَاجَّهٗ তার সাথে বিতর্ক করল। حَاجَّ مَعَهٗ নয়। حَمَلَهٗ : উদ্বুদ্ধ করেছিল। بَطَرٌ : গর্ব-অহংকার। اَلْاَجْسَادُ : جَسَدٌ -এর বহুবচন। শরীর, দেহ। غَبِيٌّ : নির্বোধ, বোকা। مَشْرِقٌ : অর্থ شُرُوْقٌ বা উদয়ের স্থান। مَغْرِبٌ : অর্থ غُرُوْبٌ বা অস্ত যাওয়ার স্থান। بُهِتَ : লাজভার হলে গেল। (ف) بَهْتًا হতবাক ও হতবুদ্ধি করা। بَهَتَهٗ شَيْئٌ : কোনো কিছু তাকে হতবুদ্ধি করল। মাযহুলের অর্থ সে হতবুদ্ধি হলো। مَحَجَّةٌ : প্রশস্ত রাস্তা, উপায়। اَلْاِحْتِجَاجُ : প্রমাণ প্রদান করা।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে মু'মিন ও কাফের এবং হেদায়েতের আলো ও কুফরির অন্ধকার সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এবারে তার সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে রাজা নমরূদকে দেখানো হয়েছে। আয়াতে পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرٰهِيْمَ فِىْ رَبِّه : আরবি সাহিত্যে এ বাকরীতিটি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর স্থানে ব্যবহৃত হয় । এর মধ্যে ভর্ৎসনার দিকটি সুস্পষ্ট। যখন কেউ কারো বিষয়ে কোনো বিস্ময়কর দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন এ ধরনের বাক্য ব্যবহার হয়, যেমন বলা হয়, তুমি কি অমুকের আচরণ দেখেছ? –[তাফসীরে কবীর, সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ جَادَلَ : حَاجَّ -এর তাফসীর جَادَلَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে حَاجَّ অর্থ– غَلَبَ فِى الْحُجَّةِ নয়। যেমন নাকি হাদীসে এসেছে– حَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى অর্থ– হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী হলেন। এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। এ জন্য যে, নমরূদ حُجَّة বা দলিল-প্রমাণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর জয়ী হয়নি; বরং সে নিছক তর্ক করেছে।

قَوْلُهُ اَىْ حَمَلَهُ بَطْرٌ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নমরূদের হুজ্জতবাজির কারণ ছিল রাজত্ব প্রদান।

قَوْلُهُ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ : বাক্যটি مَفْعُوْل لِاَجْلِه হযফসহ لَام মূলরূপ এমন– لِاَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ

قَوْلُهُ نَمْرُوْدُ : স্পষ্টত এখানে বিতর্ককারী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক কোনো বাদশাহ হবে। তাই মুফাসসির (র.) নমরূদের নাম উল্লেখ করেছেন। সে ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মভূমি ইরাকের বাদশাহ। এখানে তার আলোচনা করা হচ্ছে। বাইবেলে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নেই। এ কারণে আহলে কিতাবগণ এ ঘটনা মানতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে তালমুদে এর পূর্ণ ঘটনা উল্লিখিত রয়েছে এবং তা প্রায় কুরআনের অনুকূলেই। তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা নমরূদের দরবারে সবচেয়ে বড় পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন প্রকাশ্যে শিরকের বিরোধিতা ও তাওহীদের প্রচার শুরু করলেন এবং দেবালয়ে প্রবেশ করে দেব-দেবীকে ভেঙ্গে ফেললেন, তখন তাঁর পিতা নিজেই বাদশাহর দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। এরপর সে আলোচনা হয় যা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

বিতর্কের বিষয়বস্তু : বিতর্কিত বিষয়টি এই ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কাকে প্রভু বলেন? এ দ্বন্দ্বের কারণ এই ছিল যে, দ্বন্দ্বকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা রাজত্ব দান করেছেন– اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটা বুঝার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরি–

১. প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি সকল মুসলিম সোসাইটির সম্মিলিত ও সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা সবাই আল্লাহ তা'আলাকে رَبُّ الْاَرْبَابِ তথা মহাক্ষমতাবান স্রষ্টা মান্য করে এবং তাঁর মধ্যেই রব ও উপাস্য হওয়াকে সীমাবদ্ধ রাখে।

২. মুশরিকরা সর্বদা খোদায়িত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে–

ক. সৃষ্টির উর্ধ্বে এক মহান খোদায়িত্বের সত্তা, তিনি সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতাশীল এবং মানুষ নিজেদের দুঃখ-কষ্ট ও বিভিন্ন সমস্যায় তাঁর শরণাপন্ন হয়। এ খোদায়িত্বে তারা আল্লাহর সকল আত্মা, ফেরেশতা, জিন, নক্ষত্র এবং আরো বহু বস্তুকে অংশীদার স্থাপন করে। তাদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করে, তাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পূজা-পার্বন করে। তাদের আস্তানায় বিভিন্ন হাদিয়া-তোহফা উৎসর্গ করে।

খ. দ্বিতীয়টি হলো কৃষ্টি-কালচারজনিত ও প্রশাসনিক বিষয়ের ক্ষমতার অধিকারী। এ দ্বিতীয় প্রকারের খোদায়িত্বে বিশ্বের সকল মুশরিক জাতি নিজ নিজ যুগে আল্লাহ তা'আলা থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে বিভিন্ন রাজবংশ, ধর্মীয় পুরোহিত এবং সোসাইটির আগে-পরের মনীষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। অধিকাংশ রাজবংশীয় এ দ্বিতীয় অর্থে খোদায়ীর দাবিদার হয়েছে। এটাকে দৃঢ় করার জন্যে তারা সাধারণত প্রথম অর্থের খোদার সন্তান হওয়ার দাবি করেছে। আর ধর্ম অবলম্বনকারীদের এ বিষয়ে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। যেমন– জাপানের রাজবংশ এ অর্থে নিজেদেরকে আল্লাহর অবতার বলে থাকে। আর জাপানিরা তাদেরকে আল্লাহর দূত জ্ঞান করে।

নমরূদের এ খোদায়ী দাবিও এ দ্বিতীয় প্রকারের ছিল। সে আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিল না। আসমান, জমিন ও সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী সে নিজে হওয়ার দাবি করত না; বরং তার দাবি ছিল এই যে, ইরাকের এবং ইরাকের জনগণের সর্বময় শাসনকর্তা আমিই। আমার কথাই আইন, আমার উপর ক্ষমতাশীল কেউ নেই, কারো কাছে আমি জবাবদিহিতাকারী নই। ইরাকের যে কোনো অধিবাসী আমাকে তার রব মনে না করবে বা অন্য কাউকে তার পালনকর্তা

http://islamiboi.wordpress.com

[illegible] ও আমার বিদ্রোহী সাব্যস্ত হবে। নমরূদের এ বিশাল সাম্রাজ্যের রাজত্ব তাকে এত নির্ভীক, অহংকারি ও [illegible] যে, সে নিজেই খোদা হওয়ার দাবি করে বসেছিল। ইহুদিদের বইপুস্তকে এমনও বর্ণিত আছে যে, সে [illegible] একটি খোদায়ী আরশ বানিয়েছিল, উক্ত আরশে উপবেশন করে তার রাজত্ব পরিচালনা করত।

[illegible] ইবরাহীম (আ.) যখন বললেন, আমি কেবল একই রাব্বুল আলামীনকে আমার ইলাহ, উপাস্য ও প্রতিপালক [illegible]। অন্য কারো খোদায়িত্ব ও উপাস্য মানি না। তখন শুধু এ প্রশ্নই উঠল না যে, জাতিগত ধর্ম ও উপাস্যদের বিষয়ে [illegible] এ নতুন আকিদা কতটুকু বরদাশতযোগ্য; বরং এ প্রশ্নও দেখা দিল যে, জাতীয় নেতৃত্বে এবং তাঁর কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উপর এ আকিদার যে আঘাত পড়ল তাকে কিভাবে এড়িয়ে চলা যায়? এ কারণেই ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বিদ্রোহী হিসেবে নমরূদের সম্মুখীন হলেন।

নমরূদ একত্ববাদের এ আহ্বানকারীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল– সে কেমন খোদা? যার প্রতি তুমি মানুষকে আহ্বান করছ? আমাকে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য শোনাও। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ জীবন-মরণের সকল শক্তি তাঁরই হাতে। তিনিই সমস্ত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণকর্তা ও পালনকর্তা। জীবন মরণের সকল উৎস তাঁরই হাতে। কারো সাধ্য নেই যে, তাঁর এ ক্ষমতার মধ্যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যদিও উত্তরে প্রথম বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। তথাপি নমরূদ সাধারণভাবে এর উত্তর দিল যে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুজন আসামীকে ডেকে, সে একজনকে ক্ষমা করে দিল এবং অপরজনকে হত্যার নির্দেশ দিল। আর বলল, اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ 'আমি জীবন ও মরণ দান করি।' হযরত ইবরাহীম (আ.) সাথে সাথে দলিল শেষ করে মানুষের সাধারণ বুঝের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় দলিল পেশ করলেন। বললেন, জীবন-মরণের কথা বাদ থাক, প্রকৃতির সাধারণ একটি ক্ষেত্রে তোমার শক্তি প্রয়োগ করে দেখাও। নমরূদ সূর্যদেবীর অবতার নিজেকেই মনে করত এবং সূর্য- সে একথার সর্ববৃহৎ খোদা প্রবক্তা ছিল। তার এ ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডনার্থে তিনি সূর্যকেই দলিলস্বরূপ পেশ করলেন। বললেন– فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে পূর্বাচল থেকে অস্তাচলে আনয়ন করেন। আচ্ছা তুমি অস্তাচল থেকে পূর্বাচলে নিয়ে এস। কাফের নমরূদ অপারগ হয়ে গেল।' হযরত ইবরাহীম (আ.) অতি চমৎকারভাবে তাকে নির্বাক করে দিলেন।

কোনোভাবে নমরূদ এ দলিলের জবাব দিতে সক্ষম হলো না। কারণ সে জানত, ইবরাহীম যে খোদাকে রব মনে করে, সে খোদার নির্দেশের অধীনেই চন্দ্র-সূর্য আবর্তিত হয়। কিন্তু এভাবে তার সামনে যে বাস্তবতা সুস্পষ্ট হচ্ছিল তা মানার জন্যে সে প্রস্তুত হলো না। তার তাগুত আত্মা সত্য মেনে নিতে রাজি হলো না। রিপু পূজার অন্ধকার থেকে সত্য পূজার আলোর দিকে সে অগ্রসর হলো না।

তালমুদের বর্ণনায় রয়েছে যে, এর পরে নমরূদের নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে গ্রেফতার করা হলো এবং ১০ দিন তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হলো। এরপর রাজ কাউন্সিল তাঁকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করে মারার সিদ্ধান্ত নিল, ফলে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটল। সূরা আম্বিয়া, আনকাবূত ও সাফফাতে এর বর্ণনা এসেছে। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ بَطَرُهُ : بطر অর্থ গর্ব করা, অহংকার করা এবং অপাত্রে সীমাহীন গর্ব করা।

قَوْلُهُ اَيْ يَخْلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ : এ ইবারতটুকু দ্বারা নমরূদের আপত্তি বাতিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা يُحْيٖ وَيُمِيْتُ -এর মর্ম হলো, শরীরের মাঝে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করা, যা নমরূদের পক্ষে অসম্ভব।

تَحَيَّرَ وَدَهِشَ : بُهِتَ -এর ব্যাখ্যায় تَحَيَّرَ وَدَهِشَ উল্লেখ করে একথা বুঝিয়েছেন যে, بُهِتَ মাজহুলের সীগাহ হলেও معروف -এর অর্থে ব্যবহৃত। **اَلْمَحَجَّةُ :** প্রশস্ত রাস্তা।

قَوْلُهُ مُنْتَقِلًا اِلٰى حُجَّةٍ اَوْضَعَ مِنْهَا : এখানে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে–

প্রশ্ন : মানুষ কোনো একটি দলিল থেকে অন্য একটি দলিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে দুটি কারণে–

১. দলিলের মাঝে কোনো ত্রুটি বা সমস্যা থাকলে।

২. দলিলের মাঝে এমন কোনো অস্পষ্টতা থাকলে দলিলদাতা প্রকাশ করতে অক্ষম। বর্ণিত কোনো কারণই নবীর শানে সঠিক নয়। তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ) কি কারণে এক দলিল ছেড়ে অন্য দলিল দিতে গেলেন?

উত্তর : মূলত এটি اِنْتِقَالٌ عَنْ دَلِيْلٍ اِلٰى دَلِيْلٍ اٰخَرَ নয়; বরং এটি হলো دَلِيْلٍ خَفِيٍّ থেকে دَلِيْلٍ جَلِيٍّ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন। আর এটি কোনো সমস্য নয়; বরং বিজ্ঞোচিত কাজ।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٥٩. اَوْ رَأَيْتَ كَالَّذِىْ اَلْكَافُ زَائِدَةٌ مَرَّ
عَلٰى قَرْيَةٍ هِىَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ رَاكِبًا
عَلٰى حِمَارٍ وَمَعَهُ سَلَّةُ تِيْنٍ وَقَدَحُ
عَصِيْرٍ وَهُوَ عُزَيْرٌ وَهِىَ خَاوِيَةٌ
سَاقِطَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا سُقُوْفِهَا لَمَّا
خَرَّبَهَا بُخْتَنَصَّرَ قَالَ اَنّٰى كَيْفَ
يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
اِسْتِعْظَامًا لِقُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى
فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ وَاَلْبَثَهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ
بَعَثَهُ اَحْيَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفِيَّةَ ذٰلِكَ قَالَ
تَعَالٰى لَهُ كَمْ لَبِثْتَ مَكَثْتَ هُنَا قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ لِاَنَّهُ نَامَ اَوَّلَ
النَّهَارِ فَقُبِضَ وَاُحْيِىَ عِنْدَ الْغُرُوْبِ
فَظَنَّ اَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ
مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ التِّيْنِ
وَشَرَابِكَ الْعَصِيْرِ لَمْ يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ
مَعَ طُوْلِ الزَّمَانِ وَالْهَاءُ قِيْلَ اَصْلٌ مِنْ
سَانَهْتُ وَقِيْلَ لِلسَّكْتِ مِنْ سَانَيْتُ
وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِهَا وَانْظُرْ اِلٰى
حِمَارِكَ كَيْفَ هُوَ فَرَاٰهُ مَيْتًا وَعِظَامُهُ
بِيْضٌ تَلُوْحُ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ.

অনুবাদ :

২৫৯. অথবা তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখনি যে كَالَّذِىْ-এর كَاف টি অতিরিক্ত। গাধায় আরোহণ করে এমন এক নগর অতিক্রম করে যা ছাদের উপর পড়ে রয়েছে। অর্থাৎ ছাদসহ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। উক্ত ব্যক্তিটি ছিলেন হযরত উযাইর (আ.)। তিনি গাধায় চড়ে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর নিকট তখন এক থলে তীন এবং এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস ছিল। আর ঐ শহরটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস নগরী। সম্রাট বুখতানাসসার এটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কোথায় অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ এটাকে জীবিত করবেন। তিনি আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এ কথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন এবং এ অবস্থায় একশত বৎসর রাখলেন। অতঃপর তার পুনরুত্থানের রূপ প্রদর্শন কল্পে তাঁকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, তুমি কতকাল অবস্থান করলে? অর্থাৎ এ স্থানে কতদিন বাস করলে? সে বলল, একদিন বা একদিনের কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি দিনের শুরু ভাগে শুয়েছিলেন তখন তাঁর রূহ কবজা করা হয়েছিল, আর সূর্যাস্তের সময় তাঁকে পুনর্জীবন দান করা হয়। এতে তার ধারণা হয় যে, এটা ঐ নিদ্রার দিনটিই ছিল বুঝি।

তিনি বললেন, না, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্য তীন ও পানীয় বস্তুর আঙ্গুরের রসের প্রতি লক্ষ্য কর তা অবিকৃত রয়েছে, এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তা বিকৃত হয়নি। لَمْ يَتَسَنَّهْ-এর শেষ অক্ষর ه সম্পর্কে কারো অভিমত হলো যে, এটা তার মূলধাতুগত অক্ষর। আর এটা سَانَهْتُ হতে উদ্গত শব্দ। কেউ কেউ বলেন, এটা سَانَيْتُ হতে উদ্গত শব্দ। تَاء টি سَكْتَة 'সাকতা' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে তার বিলুপ্তিসহ পাঠ রয়েছে। এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর তা কেমনভাবে পড়ে রয়েছে। অনন্তর তিনি দেখেন যে, তা মরে পড়ে রয়েছে। হাড়গুলো শুকিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে এবং চকচক করছে। আমি এরূপ বিষয় করেছি যেন তুমি অবহিত হতে পার

http://islamiboi.wordpress.com

وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً عَلَى الْبَعْثِ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ مِنْ حِمَارِكَ كَيْفَ نُنْشِرُهَا نُحْيِيْهَا بِضَمِّ النُّوْنِ وَقُرِئَ بِفَتْحِهَا مِنْ اَنْشَرَ وَنَشَرَ لُغَتَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّهَا وَالزَّاىِ نُحَرِّكُهَا وَنَرْفَعُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَقَدْ تَرَكَّبَتْ وَكُسِيَتْ لَحْمًا وَنُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَنَهَقَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ذٰلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ قَالَ اَعْلَمُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اِعْلَمْ اَمْرٌ مِّنَ اللّٰهِ لَهُ.

এবং তোমাকে আমি মানব-জাতির জন্যে পুনরুত্থানের নিদর্শন স্বরূপ বানাব। আর তোমার গাধাটির অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর কিভাবে তা সংযোজিত করি। نُنْشِرُهَا -এর প্রথম অক্ষরটি পেশ ও ফাতাহ উভয় হরকত সহকারে পঠিত রয়েছে। نَشَرَ বা اَنْشَرَ এ দুই ধরনের বাব [ক্রিয়ার ব্যবহার প্রক্রিয়া] হতে উদ্গত শব্দ। অর্থাৎ কিভাবে তা পুনর্জীবিত করি। অপর এক কেরাতে এটা প্রথমাক্ষরটি পেশ ও শেষে ز সহ نُنْشِزُ রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ কিভাবে আমি তাকে সঞ্চালিত ও উত্থিত করি। অতঃপর মাংস দ্বারা ঢেকে দেই। অনন্তর তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন, এক একটি হাড় সংযোজিত হলো, হাড়ে গোশত স্থাপিত হলো, তাতে রূহ ফুৎকার করা হলো আর তা চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। যখন প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার পর তার নিকট তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তখন সে বলে উঠল, আমি জানি প্রত্যক্ষ দর্শনে জানি আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। اَعْلَمُ শব্দটি অপর এক কেরাতে اَمْر বা আল্লাহর তরফ থেকে অনুজ্ঞাবাচক শব্দ হিসেবে اِعْلَمْ [জেনে রাখ] রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

مَرَّ : অতিক্রম করল। سَلَّةٌ : থলে, ব্যাগ। قَدَحٌ : পেয়ালা। এটি একবচন। বহুবচন- اَقْدَاحٌ - عَصِيْرٌ : আঙ্গুরের রস। خَاوِيَةٌ : سَاقِطَةٌ : পতিত। عُرُوْشٌ : عَرْشٌ -এর বহুবচন। অর্থ- ছাদ, উঁচু স্থান। بِيْضٌ : সাদা। تَلُوْحُ : চকচক করছে। تُرُكِّبَتْ : সংযোজিত হলো। نَهِقَ : চিৎকার করল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ رَاَيْتَ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ : এ আয়াতের আতফ হলো পূর্বের আয়াতের বিষয়বস্তুর উপর। অধিকাংশ নাহবীদের মতে, বাক্যটি এমন ছিল- اَرَاَيْتَ كَالَّذِيْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ আল্লামা যমখশারী, বায়যাবী (র.) প্রমুখ رَاَيْتَ مِثْلَ الَّذِيْ مَرَّ الخ বলেছেন এবং এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত উজাইর (আ.)-এর ঘটনা এখানে বিবৃত হবে।

اَوْ رَاَيْتَ كَالَّذِيْ : এখানে رَاَيْتَ -এর বৃদ্ধি মূলত একটি আপত্তি নিরসনকল্পে।

প্রশ্ন : اَوْ كَالَّذِيْ -এর عَطْف পূর্বের كَالَّذِيْ حَاجَّ -এর সাথে সঠিক নয়। কেননা مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف -এর عَامِل এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে। এখানে مَعْطُوْف عَلَيْه -এর عَامِل হলো اِلٰى তার মানে كَالَّذِيْ -এর عَامِل ও- اِلٰى হবে। অথচ كَاف -এর মাঝে اِلٰى -এর অনুপ্রবেশ শুদ্ধ নয়।

উত্তর : উক্ত عَطْف টি مُفْرَدٌ عَلَى الْمُفْرَدِ হয়নি; বরং জুমলার عَطْف জুমলার উপর হয়েছে এবং اَوْ كَالَّذِيْ -এর পূর্বে اَرَاَيْتَ মাহযূফ রয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হযরত উযাইর (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা : পবিত্র কুরআনে হযরত উযাইর (আ.)-এর নাম কেবল সূরা তাওবার এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা উযাইর (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, যেভাবে নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। এছাড়া কুরআনের অন্য কোথাও তাঁর নাম বা তাঁর ঘটনা সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنّٰى يُؤْفَكُونَ -

অর্থাৎ আর ইহুদিরা বলে উযাইর আল্লাহর পুত্র, আর নাসারারা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের কেবল মুখ-নিঃসৃত কথা। তারাও সেসব মানুষের ন্যায়ই উক্তি করে যারা ইতঃপূর্বে কুফরির পথ অবলম্বন করেছে। তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত, তারা কোন দিকে বিচ্যুত হয়ে গমন করেছে? –[সূরা তাওবা]

হযরত উযায়ের (আ.)-এর ঘটনা : উপরিউক্ত আয়াতে একটি ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহর এক মনোনীত বান্দা স্বীয় গাধার উপর সওয়ার হয়ে এক জনপদ অতিক্রম করছিলেন। জনপদটি সম্পূর্ণ বিরান ও জনমানবহীন হয়ে পড়েছিল। সেখানে না কোনো ঘরবাড়ি ছিল, না কোনো বসবাসকারী। আল্লাহর উক্ত বান্দা এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও বিস্মিত হয়ে বললেন, এমন ধ্বংসমুখে পতিত বিরান জনপদ কিভাবে নতুনভাবে সজীব হবে? এ জনপদ কিরূপে আবার মানুষের পদভারে সপর হবে? এখানে তো এমন কোনো উৎস দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আল্লাহর উক্ত বান্দা এ চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন, ইতোমধ্যে উক্ত স্থানে তাঁর রূহ কবজ করে নেওয়া হলো। ১০০ বছর যাবৎ তিনি উক্ত অবস্থায় থাকলেন। এ দীর্ঘ সময় অতিক্রমের পর তাঁকে পুনরায় জীবিত করা হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কতদিন তুমি এ অবস্থায় কাটিয়েছ? তিনি যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ছিল সকাল, আর যখন জীবিত করা হলো তখন ছিল সূর্যাস্তের সময়। এ কারণে তিনি জবাব দিলেন একদিন বা কয়েক ঘণ্টা। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এমন নয়; বরং তুমি একশত বছর মৃত অবস্থায় কাটিয়েছ। এখন তোমার বিস্ময় ও আশ্চর্যের জবাব এই যে, একদিকে তুমি তোমার পানাহারের দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখ তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অপরদিকে তোমার গাধাটির দিকে লক্ষ্য কর, দেখ তার দেহ পচে-গলে কেবল তার কঙ্কাল অবশিষ্ট রয়েছে। এরপর তুমি আমার মহাশক্তির সামান্য অনুমান কর, যাকে আমি চেয়েছিলাম যে, তাকে আমি হেফাজত করব– ১০০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে ঋতু পরিবর্তনের কোনো প্রভাব তাতে পড়েনি। তা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেছে। আর যার ব্যাপারে আমি বিনষ্টের ইচ্ছা করেছিলাম তা পচে-গলে বিনাশ হয়ে গেছে। এখন দেখ তোমার সামনেই আমি তাকে জীবিত করছি। এসব কিছু এজন্যই করলাম, যাতে আমি তোমাকে এবং তোমার এ ঘটনাকে মানুষের জন্যে আমার কুদরতের নিদর্শন বানাই। বিশ্বাসের সাথে সাথে বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করতে পার। তখন তিনি স্বীয় দাসত্ব প্রকাশের স্বীকারোক্তি করলেন, নিঃসন্দেহে তোমার মহাশক্তির নিকট এসব কিছুই অতি সহজ। এখন আমার ইলমুল একিনের পরে আইনুল একিনও লাভ হলো।

উক্ত বুজুর্গ কে ছিলেন? : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, উক্ত বুজুর্গ কে ছিলেন? এর উত্তরে প্রসিদ্ধ মত হলো, তিনি ছিলেন হযরত উযাইর (আ.)। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জেরুজালেম যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে পুনর্বার জনমুখর করবেন, তিনি সেখানে গমন করে নগরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ধ্বংসমুখে পতিত দেখলেন। তখন মানবিক স্বভাবসুলভভাবে বলে উঠলেন, কিভাবে এ মৃত জনপদের পুনর্বার জীবন লাভ হবে? বস্তুত তাঁর এ উক্তি অস্বীকারমূলক ছিল না; বরং বিস্ময়মূলক ছিল। অর্থাৎ কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদাকে পূর্ণ করবেন? আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দা ও নবীর এ উক্তিকে পছন্দ করলেন না। কারণ তাঁর নির্দ্বিধায় ও বিনা বাক্যে তা মেনে নেওয়া উচিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত ঘটনার অবতারণা করলেন। তিনি যখন জীবিত হলেন, এর মধ্যেই জেরুজালেম তথা বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরায় জনমুখর হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, হযরত কাতাদা, হযরত সুলায়মান ও হযরত হাসান (রা.)-এর ধারণা মতে, এ ঘটনাটি হযরত উযাইর (আ.) সংশ্লিষ্ট।

–[তাফসীর ও তারীখে ইবনে কাছীর।]

ইতিহাস পর্যালোচনা : পবিত্র কুরআনে যেহেতু উক্ত বুজুর্গের নাম উল্লেখ হয়নি এবং রাসূল ﷺ থেকেও এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনা বিদ্যমান নেই, আর সাহাবী ও তাবেঈন থেকে যেসব উক্তি বর্ণিত রয়েছে তার উৎস হলো হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ, হযরত কাব আহবার ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ইসরাঈলী ঘটনা ও বর্ণনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্যে কেবল একটিই পথ বাকি রইল। আর তা হলো তাওরাত ও ইতিহাস থেকে এর সমাধান বের করা। তাওরাতে বিভিন্ন নবীগণের বর্ণনা ও ঐতিহাসিক আলোচনার উপর গবেষণা করলে এ সিদ্ধান্ত সামনে আসে যে, এ ঘটনাটি ইয়ারমিয়া নবী সংশ্লিষ্ট। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে দেখুন মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) সংকলিত কাসাসুল কুরআন ও হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৩২৫]

قَوْلُهُ بُخْتَنَصَّرُ : بُخْتَ অর্থ اِبْنٌ বা সন্তান, আর نَصَّرُ হলো একটি মূর্তির নাম। এ হিসেবে بُخْتَنَصَّرُ অর্থ– اِبْنُ الصَّنَمِ বা মূর্তির সন্তান। তার এ নামকরণের কারণ হলো তার মা তাকে نَصَّرُ নামক মূর্তির সামনে রেখে এসেছিল। তারপর থেকে তার এই নাম হয়ে যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ لَمْ يَتَسَنَّهْ أَيْ لَمْ يَتَغَيَّرْ : لَمْ يَتَسَنَّهْ বাব تَفَعُّل থেকে مُضَارِع وَاحِد مُذَكَّر غَائِب-এর সীগাহ। অর্থ– বছরের পর বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও নষ্ট হয়নি। কেউ তার শেষের هَاء-কে هَاءُ السَّكْتَةِ আখ্যা দিয়েছেন এবং মিলিয়ে পড়ার সময় অক্ষর বিলোপ করে পড়া আবশ্যক বলেছেন। তাদের মতে, মূলশব্দ হলো يَتَسَنَّ যার মূলরূপ হলো يَتَسَنَّى। جَزْم অবস্থায় اَلِف বিলোপ হয়ে يَتَسَنَّ হয়ে গেছে। এ মত অনুযায়ী শব্দটি سَنَةٌ থেকে নির্গত হবে। যার মূলরূপ سَنْوَةٌ ছিল। এ অভিমত ব্যক্তকারীদের মধ্যে আবূ ওমর শব্দটির উৎস সম্পর্কে বলেন, (تَفَعُّل) تَسَنِّيْ-এর মূলরূপ تَسَنُّنٌ ছিল। আর تَسَنُّنٌ-এর অর্থ হলো– تَغَيُّر বা পরিবর্তন। আর এ থেকেই কুরআনের শব্দ حَمَاءٍ مَسْنُوْنٍ-এর ব্যবহার রয়েছে। কেউ কেউ لَمْ يَتَسَنَّهْ-এর هَاء-কে মূল শব্দ বলে আখ্যা দিয়েছেন, যা وَقْف এবং وَصْل উভয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। এ মত অনুসারে শব্দটি سَنَةٌ থেকেই নির্গত হবে। তবে سَنَةٌ-এর মূলরূপ سَنْهَةٌ ধর্তব্য হবে। কেননা তার تَصْغِيْر ব্যবহার হয় سُنَيْهَةٌ রূপে।

প্রশ্ন : لَمْ يَتَسَنَّهْ-কে مُفْرَدْ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ তার দ্বারা খাদ্য এবং পানীয় উভয়টি উদ্দেশ্য। এ হিসেবে তো শব্দটি দ্বিবচনের হওয়া উচিত ছিল। একবচন হলো কেন?

উত্তর : طَعَام وَ شَرَاب বা খাদ্য-পানীয় উভয়টি غِذَا হিসেবে مُفْرَدْ-এর হুকুম রাখে, তাই يَتَسَنَّهْ-কে একবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ : **প্রশ্ন :** وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً-এর وَاو টি কিসের? عَاطِفَة নাকি اِسْتِيْنَافِيَة। যদি عَاطِفَة হয় তাহলে তার مَعْطُوف عَلَيْه কি হবে? বাহ্যত পূর্বে এমন কোনো مَعْطُوف عَلَيْه নেই যার উপর তার عَطْف হতে পারে।

উত্তর : ১. কেউ কেউ উক্ত وَاو টিকে اِسْتِيْنَافِيَة বলেছেন এবং لَام টি মাহযুফ فِعْل এর مُتَعَلِّق হিসেবে تَقْدِيْرِي ইবারত এই– فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِلنَّاسِ আর لِنَجْعَلَكَ মূলত لِاَنْ نَجْعَلَكَ ছিল। جَار এবং مَجْرُوْر মিলে মাহযুফ فِعْل-এর مُتَعَلِّق হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, উক্ত وَاو-কে عَاطِفَة ধরেছেন এবং فِعْل مَحْذُوْف-এর উপর عَطْف করেছেন। যেমন– মুফাসসির (র.) لِتَعْلَمَ-কে مَعْطُوف عَلَيْه উহ্য ধরেছেন। আর সে উহ্য مَعْطُوف عَلَيْه টি আবার আরেকটি فِعْل مُقَدَّر-এর সাথে مُتَعَلِّق সেটি হলো فَعَلْنَا [এটি পূর্বের আলোচনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।] তাকদীরী ইবারত হচ্ছে– فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتَعْلَمَ قُدْرَتَنَا عَلٰى اِحْيَاءِ الْمَوْتٰى

نُنْشِزُهَا এটি কয়েকভাবে পঠিত রয়েছে–

১. نُوْن-এ ضَمّ এবং زَاء সহ اِفْعَال থেকে نُنْشِزُهَا অর্থ– আমরা কিভাবে জীবিত করে উঠাই।

২. نُوْن-এ فَتْحَة এবং رَاء সহ بَاب نَصَرَ থেকে نَنْشُرُهَا।

৩. نُوْن-এ ضَمّ এবং رَاء সহ পঠিত بَاب اِفْعَال থেকে نُنْشِرُهَا অর্থ– نُحَرِّكُهَا وَنَرْفَعُهَا অর্থ– কিভাবে নাড়াচাড়া দেই এবং উঠাই। এর রূপক অর্থ– আমরা কিভাবে জীবন দান করি।

قَوْلُهُ نُحْيِيْهَا : এ ব্যাখ্যাটি ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা জীবন দানের ব্যাপারটি গোশত চড়ানোর পরই হয়ে থাকে। তাই এখানে اِحْيَاء দ্বারা একত্রীকরণ এবং একটি অঙ্গ আরেকটির সাথে মিলানো উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে, যা نُنْشِزُهَا-এর অর্থের সাথে মিল রাখে। আর কেউ বলেন, نُنْشِرُهَا রূপে পাঠ করা হবে। তখন অর্থ হবে لَفّ وَنَشْر অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৩২৪]

قَوْلُهُ نَرْفَعُهَا : أَيْ نَرْفَعُهَا عَنِ الْأَرْضِ لِتَرْكِيْبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ، وَنَرُدُّهَا اِلٰى اَمَاكِنِهَا مِنَ الْجَسَدِ فَنُرَكِّبُهَا تَرْكِيْبًا لِاِبْقَائِهَا আল্লামা আবুস সাউদ (র.) বলেন, যারা نُنْشِزُهَا-এর ব্যাখ্যা نُحْيِيْهَا করেছেন সম্ভবত তারা উক্ত ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এমনিভাবে نَشْر-এর ব্যাখ্যাও অনুরূপ। অর্থাৎ نَشَرَ اللّٰهُ الْمَوْتٰى اَيْ اَحْيَاهَا

قَوْلُهُ ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا : أَيْ نَسْتُرُهَا بِهٖ كَمَا يُسْتَرُ الْجَسَدُ بِاللِّبَاسِ

http://islamiboi.wordpress.com

٢٦٠. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ تَعَالٰى لَهٗ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ بِقُدْرَتِىْ عَلَى الْاِحْيَاءِ سَأَلَهٗ مَعَ عِلْمِهٖ بِاِيْمَانِهٖ بِذٰلِكَ لِيُجِيْبَهٗ بِمَا سَأَلَ فَيَعْلَمَ السَّامِعُوْنَ غَرْضَهٗ قَالَ بَلٰى اٰمَنْتُ وَلٰكِنْ سَأَلْتُكَ لِيَطْمَئِنَّ يَسْكُنَ قَلْبِىْ بِالْمُعَايَنَةِ الْمَضْمُوْمَةِ اِلَى الْاِسْتِدْلَالِ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ بِكَسْرِ الصَّادِ وَضَمِّهَا اَمِلْهُنَّ اِلَيْكَ وَقَطِّعْهُنَّ وَاخْلِطْ لَحْمَهُنَّ وَرِيْشَهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ اَرْضِكَ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ اِلَيْكَ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا سَرِيْعًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ لَا يُعْجِزُهٗ شَئٌ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ فَاَخَذَ طَاوُوْسًا وَنَسْرًا وَغُرَابًا وَ دِيْكًا وَفَعَلَ بِهِنَّ مَا ذُكِرَ وَاَمْسَكَ رُؤُوْسَهُنَّ عِنْدَهٗ وَدَعَاهُنَّ فَتَطَايَرَتِ الْاَجْزَاءُ اِلٰى بَعْضِهَا حَتّٰى تَكَامَلَتْ ثُمَّ اَقْبَلَتْ اِلٰى رُؤُوْسِهَا ـ

অনুবাদ :

২৬০. আর স্মরণ কর যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রভু! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে তা দেখাও! তিনি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, আমার পুনর্জীবন দান শক্তি সম্পর্কে তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো, তিনি যেন নিম্নোল্লিখিত জওয়াব দেন এবং তাঁর উক্ত প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য যেন শ্রোতাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সে বলল, নিশ্চয় বিশ্বাস করি তবে আপনার নিকট এ বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলাম প্রমাণযুক্ত এই প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা কেবল আমার চিত্তের প্রশান্তির আশ্বস্তির জন্যে। তিনি বললেন, তবে চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার বশীভূত করে নাও। صُرْهُنَّ শব্দটির প্রথমাক্ষর ص -এ পেশ ও কাসরা উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ এগুলোকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর টুকরা টুকরা করে কেটে ফেল এবং গোশত এ পালকগুলো একত্রে মিশ্রিত করে রাখ অতঃপর তোমার এই অঞ্চলের কোনো এক পাহাড়ে তাদের এক একটি অংশ স্থাপন কর। অনন্তর তাদেরকে তোমার দিকে ডাক দাও, তারা দৌড়িয়ে দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসবে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। তাঁর কাজে তিনি [প্রজ্ঞাময়।] তিনি তখন একটি ময়ূর, একটি শকুন, একটি কাক ও একটি মোরগ নিয়ে তদ্রূপ করলেন। প্রত্যেকটির মাথা নিজের হাতে রেখে ডাক দিলেন। প্রত্যেকটির স্ব-স্ব অংশ উড়ে উড়ে সংযোজিত হলো, পূর্ণ হওয়ার পর স্ব-স্ব মাথার দিকে দ্রুত বেগে আসল।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

أَرِنِيْ : আমাকে দেখাও! اَلْإِرَاءَةُ দেখানো। اَلْمُعَايَنَةُ : প্রত্যক্ষ দর্শন। صُرْ : বশীভূত কর।
اَمْهِلْهُنَّ : পোশ মানিয়ে লও। اَخْلِطْ : মিশ্রিত কর। رِيْشٌ : পালক। طَاوُوْسٌ : ময়ূর।
نَسْرٌ : শকুন। تَطَايَرَتْ : উড়ে এলো। تَكَامَلَتْ : পূর্ণ হলো। اَقْبَلَتْ : এগিয়ে এলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক মৃতকে জীবিতকরণ প্রত্যক্ষ করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এটি আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা

قَوْلُهُ فَيَعْلَمَ السَّامِعُوْنَ : একটি প্রশ্ন জাগতে পারে আল্লাহ তা'আলা তো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঈমান সম্পর্কে আগে থেকেই জ্ঞাত আছেন। এরপরও اَوَلَمْ تُؤْمِنْ বলে প্রশ্ন করলেন কেন?

তার উত্তরে বলা হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে প্রশ্নের কারণ عَدَمِ يَقِيْن وَعَدَمِ اِيْمَان ছিল না; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল– এ প্রশ্নের ফলে হযরত ইবরাহীম (আ.) এমন একটি জবাব দেবেন যাতে শ্রোতাদের এটা জানা হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর اِحْيَاءِ مَوْتٰى সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল اِطْمِيْنَانِ قَلْبِى অর্জন করা। যাতে عِلْمٌ بِالْوَحْيِ -এর সাথে عِلْمُ الْمُشَاهَدَةِ একত্র হয়ে অতিরিক্ত اِطْمِيْنَان লাভ হয়। সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকল না।

قَوْلُهُ فَصُرْهُنَّ : صَارَ يَصُوْرُ বা صَارَ يَصِيْرُ থেকে اَمْر -এর সীগাহ। এর অর্থ– টুকরা টুকরা করাও আসে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٦١. مَثَلُ صِفَةُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ طَاعَتِهٖ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُهُمْ تَتَضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ فَضْلُهٗ عَلِيْمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمُضَاعَفَةَ ـ

২৬১. যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে তাদের এ ব্যয়ের উপমা হলো একটি শস্য-বীজ, যা দ্বারা সাতটি শীষ জন্মায়, প্রতিটি শীষে একশত শস্য-কণা। তদ্রূপ তাদের আল্লাহর পথে ব্যয়কেও সাতশতগুণ বর্ধিত করে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা থেকেও অধিক বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ অতি বিস্তৃত, কে এই বহুগণ বৃদ্ধির উপযুক্ত তিনি তা খুবই অবহিত।

٢٦٢. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا عَلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا قَدْ اَحْسَنْتُ اِلَيْهِ وَجَبَرْتُ حَالَهٗ وَّلَآ اَذًى لَهٗ بِذِكْرِ ذٰلِكَ اِلٰى مَنْ لَا يُحِبُّ وُقُوْفَهٗ عَلَيْهِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ثَوَابُ اِنْفَاقِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

২৬২. যারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে যাকে দিল তার উপর অনুগ্রহ জেতায় না যেমন বলল, তার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তার অবস্থার প্রতি সদাশয়তা প্রদর্শন করে ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছি এবং যাকে সে [যাকে দান করা হয়েছে] জানাতে অনিচ্ছুক তার নিকট এ দানের কথা বা তদ্রূপ কিছু বলে তাকে ক্লেশও দেয় না– তাদের পুরস্কার অর্থাৎ তাদের এ দানের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রক্ষিত। আর পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

٢٦٣. قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ كَلَامٌ حَسَنٌ وَّرَدٌّ عَلَى السَّائِلِ جَمِيْلٌ وَّمَغْفِرَةٌ لَهٗ فِيْ اِلْحَاحِهٖ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى بِالْمَنِّ وَتَعْيِيْرٍ لَهٗ بِالسُّؤَالِ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ الْعِبَادِ حَلِيْمٌ بِتَاخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَنِ الْمَانِّ وَالْمُؤْذِىْ ـ

২৬৩. অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে এবং যাচনার জন্যে লজ্জা দিয়ে যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তা অপেক্ষা ভালো কথা সুন্দর কথা ও সুন্দর সদাশয়তার সাথে প্রার্থীর প্রত্যুত্তরে দান করা [এবং] তার পীড়াপীড়ি ক্ষমা করা অধিক উত্তম। আল্লাহ বান্দাদের সদকা ও দান হতে অমুখাপেক্ষী, এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ বলে বেড়ায় ও কষ্ট দেয় তার শাস্তি বিলম্বিত করাতে তিনি পরম সহনশীল।

তাহকীক ও তারকীব

حَبَّةٌ : দানা, শস্য। বহুবচন حُبُوْبٌ। اَنْبَتَتْ : অংকুরিত করল। اِنْبَاتًا : অংকুরিত করা, ফলানো। (ن) نَبَتَ نَبَاتًا অংকুরিত হওয়া, ফলা। نَبَتَ الزَّرْعُ : ফসল ফলেছে। اَنْبَتَ الْمَطَرُ الزَّرْعَ : বৃষ্টি ফসল ফলিয়েছে। سَنَابِلُ : سُنْبُلَةٌ-এর

http://islamiboi.wordpress.com

[illegible], শীষ। بَاب مُفَاعَلَة থেকে يُضَاعِفُ : দ্বিগুণ করেন। تَضَاعَفُ : দ্বিগুণ হলো, গুরুত্বর হলো। جُبِرَتْ حَالُهُ : তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে। إِلْحَالُ : পীড়াপীড়ি, যাচনা। تَعْيِيْرُ : লজ্জা দেওয়া। اَلْمَانُّ : খোঁটাদাতা, যে অনুগ্রহ করে তা বলে বেড়ায়। اَلْمُؤْذِيْ : কষ্ট দাতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ (الاية) : এর দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ثُمَّ لَا يَتَّبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى এটা এ বিষয়ের বিবরণ যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উল্লিখিত ফজিলত কেবল ঐ ব্যক্তির লাভ হবে, যে খরচ করে খোঁটা দেয় না, মুখে এমন কোনো শব্দ বের করে না, যার দ্বারা গ্রহীতার হেয়তা প্রকাশ পায়, ফলে গ্রহীতা মনে কষ্ট পায়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদের মধ্যে একজন হলো দান করে খোঁটা দানকারী। –[মুসলিম : কিতাবুল ঈমান।]

مَثَلُ মুযাফ, اَلَّذِيْنَ মাওসূল। يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্য হয়ে সিলা। উভয়টি মিলে مَثَلُ -এর মুযাফ ইলাইহ مُضَاف এবং مُضَاف اِلَيْه মিলে মুবতাদা। حَبَّة মাওসূফ اَنْبَتَتْ বাক্য হয়ে صِفَة। صِفَة ও مَوْصُوْف মিলে উহ্য শব্দের সাথে مُتَعَلِّق হয়ে خَبَر। ব্যাখ্যাকার صِفَة বৃদ্ধি করে বলে দিয়েছেন যে, مَثَل অর্থ উদাহরণ নয়, বরং صِفَة অর্থে।

প্রশ্ন : نَفَقَات বৃদ্ধির উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ হলো مُشَبَّه আর ك হলো হরফে তাশবীহ এবং مَثَل حَبَّة হলো مُشَبَّه بِه; অতঃপর اَلَّذِيْنَ ও مُشَبَّه بِه -এর মধ্যে মিল না হওয়ার কারণে তাশবীহ তথা দৃষ্টান্ত ঠিক হয়নি। কেননা مُشَبَّه بِه তথা مُشَبَّه يُنْفِقُوْنَ হলো প্রাণীর অন্তর্গত, আর مُشَبَّه তথা حَبَّة হলো জড়বস্তুর অন্তর্গত। এর দুটি উত্তর হতে পারে–

১. مشبة -এর পক্ষে শব্দ বিলুপ্ত মানতে হবে। যেমন– ব্যাখ্যাকার نَفَقَات উহ্য মেনেছেন। এখন বাক্যটি হবে–
مَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ.

২. مُشَبَّه بِه -এর পক্ষে শব্দ বিলুপ্ত মানতে হবে। এক্ষেত্রে বাক্য হবে– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

قَوْلُهُ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ : এ অংশটুকু দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর মাফউল রয়েছে।

প্রশ্ন : পূর্ব থেকেই তো مُضَاعَفَة -এর বিষয়টি বুঝে আসছে। এখানে দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করার দ্বারা তো তাকরার মনে হচ্ছে। এ তাকরারের উপকারিতা কি?

উত্তর. اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ বৃদ্ধি করে উক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পূর্বে উল্লিখিত مُضَاعَفَة -এর চেয়েও বেশি প্রদান করবেন।

خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ الخ : قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ ও مَوْصُوْف صِفَة মিলে মা'তূফ আলাইহ, مَغْفِرَةٌ মা'তূফ, উভয়টি মিলে মুবতাদা। হলো খবর।

প্রশ্ন : খবর হলো নাকেরা। কাজেই তা মুবতাদা হওয়া কিভাবে সঙ্গত হলো।

উত্তর. এর মা'তূফ আলাইহ যেহেতু মা'রেফা, এ কারণে মা'রূফ মুবতাদা হওয়া সঙ্গত হয়েছে।

প্রশ্ন : মা'তূফ আলাইহ হলো قَوْل আর এটা নাকেরা, যা নিজেই মুবতাদা হতে পারে না। এখানে কিভাবে হলো?

উত্তর : যখন নাকেরা শব্দের সিফত হিসেবে উল্লিখিত হয় তখন তা মুবতাদা হতে পারে।

قَوْلُهُ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ : দানগ্রহীতার জন্যে বিনম্রভাবে কথা বলা এবং দোয়ামূলক শব্দ বলা। যথা– আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এবং আমাকে স্বীয় করুণা দ্বারা উপকৃত করুন। এটা হলো قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ আর মাগফিরাতের উদ্দেশ্য হলো দানগ্রহীতার মুখ থেকে যদি অশোভনীয় কোনো শব্দ বের হয়ে যায়, তাহলে তাকে এড়িয়ে গিয়ে ক্ষমা করা। এ দুটি স্বভাব সে দান-সদকার চেয়ে উত্তম, যার পরে খোঁটা দেওয়া হয় বা তাদের মনে আঘাত দেওয়া হয়। মানুষের সাথে উত্তম কথা বলা এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করাও সদকা। –[মুসলিম]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٦٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ اَىْ اُجُوْرَهَا بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى اِبْطَالًا كَالَّذِىْ اَىْ كَاِبْطَالِ نَفَقَةِ الَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ اَىْ مُرَائِيًا لَهُمْ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَهُوَ الْمُنَافِقُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ حَجَرٍ اَمْلَسَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ مَطَرٌ شَدِيْدٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا صَلْبًا اَمْلَسَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَا يَقْدِرُوْنَ اِسْتِيْنَافٌ لِبَيَانِ مَثَلِ الْمُنَافِقِ الْمُنْفِقِ رِيَاۤءَ النَّاسِ وَجَمْعُ الضَّمِيْرِ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِىْ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا عَمِلُوْا اَىْ لَا يَجِدُوْنَ لَهٗ ثَوَابًا فِى الْاٰخِرَةِ كَمَا لَا يُوْجَدُ عَلَى الصَّفْوَانِ شَيْءٌ مِنَ التُّرَابِ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْهِ لِاِذْهَابِ الْمَطَرِ لَهٗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ.

অনুবাদ :

২৬৪. হে বিশ্বাসীগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে ও ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে অর্থাৎ তার ফলকে বিনষ্ট করো না। যেমন বিনষ্ট করে ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিজের ধন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে লোক প্রদর্শনী করে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না অর্থাৎ মুনাফিক তার উপমা একটি শক্ত পাথর মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত মুষলধারে বৃষ্টি হলো আর তাকে একেবারে সাফ করে মসৃণ শক্ত করে ছেড়ে গেল তাতে আর কিছুই নেই। যা তারা উপার্জন করেছে আমল করেছে তার কিছুর উপরই তাদের শক্তি হবে না। এ আয়াতে মুনাফিক অর্থাৎ যে রিয়া ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে নতুন করে তার উপমা বর্ণনা করা হয়েছে। لَا يَقْدِرُوْنَ اَلَّذِيْنَ-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে ক্রিয়াপদটিকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ শক্ত মসৃণ পাথরে সামান্য কিছু মাটি থাকলেও বৃষ্টির পানি তা ধুয়ে মুছে নেওয়ার দরুন তাতে যেমন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না তেমনি মুনাফিকগণও পরকালে তাদের সৎ আমলের কোনো ছওয়াব বা পুণ্যফল পাবে না। আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

صَفْوَانٌ : মসৃণ পাথর। اَمْلَسُ : মসৃন। وَابِلٌ : প্রবল বৃষ্টি। صَلْدًا : সাফ, পরিষ্কার।

لِاِذْهَابِ الْمَطَرِ لَهٗ : বৃষ্টির পানি তা ধুয়ে মুছে নেওয়ার দরুন।

قَوْلُهٗ جَمْعُ الضَّمِيْرِ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِىْ : এটিও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো يَقْدِرُوْنَ-এর যমিরতো اَلَّذِىْ يُنْفِقُ-এর দিকে ফিরেছে, যা কিনা مُفْرَد আর يَقْتَدِرُوْنَ-এর মধ্যকার যমীর হলো দ্বিবচনের।

উত্তর : الذى যদিও শব্দের দিক দিয়ে একবচন কিন্তু অর্থগতভাবে বহুবচন। সুতরাং تَطَابُق সঠিক আছে।

http://islamiboi.wordpress.com

أَيْ أُجُورَهَا : প্রশ্ন : أُجُوْر মুযাফ বিলুপ্ত মানার উপকারিতা কি?

উত্তর : মূল সদকা তথা মাল বাতিল হওয়ার কোনো অর্থ হতে পারে না। কেননা খোঁটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার দ্বারা সদকার মাল নষ্ট হয় না; বরং তার ছওয়াব বিনষ্ট হয়। এর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে أُجُورَهَا উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ نَفَقَات : এখানেও মুযাফ বিলুপ্তির কারণ مُشَبَّه ও مُشَبَّه بِهٖ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ اَعْطَتْ : اٰتَتْ -এর ব্যাখ্যায় اَعْطَتْ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اٰتَتْ শব্দটি মূলত اِيْتَاءٌ থেকে নির্গত, اِتْيَان থেকে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى :

صَدَقَاتِكُمْ أَيْ أُجُوْرَهَا : এখানে أُجُوْرَهَا মুযাফকে মাহযূফ ধরার কারণ হলো সদকা তথা সদকার সম্পদ বাতিল হওয়ার কোনো তাৎপর্য নেই। কেননা খোঁটা দেওয়া বা কষ্ট দেওয়ার দ্বারা সদকার সম্পদ বিনষ্ট হয় না; বরং তার ছওয়াব বা প্রতিদান বিনষ্ট হয়ে যায়। এ সংশয়টুকু দূর করার জন্যে أُجُوْرَهَا -কে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا : এটা একটা উপমা। এ উপমায় রিয়াকারীর নেক আমলসমূহকে বৃষ্টির সাথে তুলনা দিয়ে বুঝানো হয়েছে। এ বৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন রূপ নেক আমল, আর পাথরের দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়তের অনিষ্টতা। হালকা মাটির দ্বারা উদ্দেশ্য নেকির বাহ্যিক অবস্থা, যার নীচে নিয়তের অনিষ্টতা লুক্কায়িত থাকে। বৃষ্টির সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এই যে, তার দ্বারা সকল ফসল উৎপন্ন হয় ও সবুজ-শ্যামল আকার ধারণ করে। কিন্তু যখন উর্বর ভূমি শুধু উপরাংশেই নামেমাত্র কিছু মাটি থাকে আর তার নীচে সম্পূর্ণ পাথর আর পাথর লুক্কায়িত থাকে, তাতে বৃষ্টি আবদ্ধ থাকার পরিবর্তে তা আরও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এভাবে দান-সদকা যদিও বিভিন্ন রূপ কল্যাণ ও মঙ্গলের যোগ্যতা রাখে; কিন্তু তা উপকারী হওয়ার জন্যে খাঁটি ও নির্ভেজাল নিয়ত পাওয়া যাওয়া শর্ত। নিয়ত যদি সৎ না হয়, তাহলে উক্ত আমল সমূলে বিনাশ হয়ে যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٦٥. وَمَثَلُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اَيْ تَحْقِيْقًا لِلثَّوَابِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَهُ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ اِبْتِدَائِيَّةٌ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بُسْتَانٍ بِرَبْوَةٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مُسْتَوٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اَعْطَتْ اُكُلَهَا بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُوْنِهَا ثَمَرَهَا ضِعْفَيْنِ مِثْلَيْ مَا يُثْمِرُ غَيْرُهَا فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ مَطَرٌ خَفِيْفٌ يُصِيْبُهَا وَيَكْفِيْهَا لِاِرْتِفَاعِهَا الْمَعْنٰى تُثْمِرُ وَتَزْكُوْ كَثُرَ الْمَطَرُ اَمْ قَلَّ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُ مَنْ ذُكِرَ تَزْكُوْ عِنْدَ اللّٰهِ كَثُرَتْ اَمْ قَلَّتْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

অনুবাদ :

২৬৫. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে তালাশে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠকরণার্থে অর্থাৎ তার পুণ্যফল প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার আশায় ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে পক্ষান্তরে মুনাফিকগণ যেহেতু মূলত পরকালে অবিশ্বাস করে সেহেতু তারা পুণ্যফলের আশা করে না। مِنْ اَنْفُسِهِمْ -এর مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّة বা প্রারম্ভসূচক শব্দ। তাদের এ ব্যয়ের উপমা হলো কোনো উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান বাগান رَبْوَةٍ -এর "ر" হরফটি পেশ ও ফাতাহ উভয় হরকত সহকারেই পাঠ করা যায়। অর্থাৎ উঁচু সমতল ভূমি। যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয় ফলে তার ফল اُكُلَ -এর ك হরফটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপে পাঠ করা যায়। অর্থাৎ ফল-ফলাদি। অন্যস্থানে যা হয় তার দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে শিশির হালকা বৃষ্টিও যদি তাতে পড়ে তবে উচ্চভূমি হওয়ায় তাই তার জন্যে যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ বৃষ্টি কম হোক বা বেশি সর্বাবস্থায়ই ফল-ফলাদি ও ফসল তাতে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, তেমনি উল্লিখিত ব্যক্তির দানসমূহ আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে– দান বেশি হোক বা অল্প হোক। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন।

তাহকীক ও তারকীব

اِبْتِغَاءَ : তালাশ করা। تَثْبِيْتٌ : বলিষ্ঠকরণ। رَبْوَةٌ : উঁচুস্থান। اُكُلٌ : ফল। مَطَرٌ خَفِيْفٌ : হালকা বৃষ্টি।
تُثْمِرُ : ফল দেয়। تَزْكُوْ : বৃদ্ধি পায়।

قَوْلُهُ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : এর দ্বারা আল্লাহর পথে খরচ করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

তারকীব : مَثَلُ মুযাফ اَلَّذِيْنَ মাউসূল اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ জুমলা হয়ে সেলা। صِلَه এবং مَوْصُوْل মিলে مُضَافٌ اِلَيْه ও مُضَاف। مُضَافٌ اِلَيْه মিলে مُبْتَدَأ। অতঃপর كَمَثَلِ حَبَّةٍ : حَبَّة মাউসূফ اَنْبَتَتْ الخ জুমলা হয়ে সিফত। صِفَة ও مَوْصُوْف মিলে مُتَعَلِّقٌ مَحْذُوْف হয়ে মুবতাদার খবর।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ مَثَلُ صِفَةُ نَفَقَاتِ : মুফাসসির (র.) صِفَةُ বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, مَثَل এখানে مِثَال -এর অর্থে নয়; বরং صِفَةُ **-এর অর্থে।**

প্রশ্ন : نَفَقَات বৃদ্ধির উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ হলো مُشَبَّه আর كَاف হলো حَرْف تَشْبِيْه এবং مَثَل حَبَّة হলো مُشَبَّه بِه অতঃপর اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ ও مُشَبَّه بِه -এর মাঝে সামঞ্জস্য না হওয়ায় تَشْبِيْه শুদ্ধ হবে না। কেননা مُشَبَّه بِه তথা اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ হলো مُشَبَّه حَيَوَانَات -এর অন্তর্ভুক্ত, আর مُشَبَّه তথা حَبَّة হলো جَمَادَات -এর অন্তর্ভুক্ত, তাই تَشْبِيْه শুদ্ধ হয়নি। এর দুটি উত্তর হতে পারে–

১. এখানে مُشَبَّه এর جَانِب উহ্য ধরা হবে। যেমনটি মুফাসসির (র.) করেছেন। এখন তাকদীরী ইবারত হবে–

مَثَلُ نَفَقَةِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ الخ .

২. مُشَبَّه بِه -এর جَانِب উহ্য ধারা হবে। এ সুরতে তাকদীরী ইবারত হবে– مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ زَرْعِ حَبَّةٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى : এটা এ বিষয়ের বিবরণ যে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উল্লিখিত ফজিলত কেবল ঐ ব্যক্তির লাভ হবে, যে খরচ করে খোঁটা দেয় না, মুখের দ্বারা এমন কোনো শব্দ বের করে না, যার দ্বারা গ্রহীতার হেয়তা প্রকাশ পায়। ফলে সে মনে কষ্ট পায়। হাদীস শরীফে এসেছে– রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না। তাদের মধ্যে একজন হলো দান করে খোঁটা দানকারী।

–[মুসলিম : কিতাবুল ঈমান]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٦٦. اَيَوَدُّ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُ فِيْهَا ثَمَرٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَقَدْ اَصَابَهُ الْكِبَرُ فَضَعُفَ عَنِ الْكَسْبِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اَوْلَادٌ صِغَارٌ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ فَفَقَدُهَا اَحْوَجَ مَا كَانَ اِلَيْهَا وَبَقِىَ هُوَ وَ اَوْلَادُهُ عَجَزَةٌ مُتَحَيِّرِيْنَ لَا حِيْلَةَ لَهُمْ وَهٰذَا تَمْثِيْلٌ لِنَفَقَةِ الْمُرَائِىْ وَالْمَانِّ فِىْ ذَهَابِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا اَحْوَجَ مَا يَكُوْنُ اِلَيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) هُوَ لِرَجُلٍ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بُعِثَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِىْ حَتّٰى اَحْرَقَ اَعْمَالَهُ كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فَتَعْتَبِرُوْنَ .

অনুবাদ :

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় পছন্দ করে যে, তার একটি খর্জুর ও আঙ্গুর উদ্যান বাগান থাকুক, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে রয়েছে ফল সর্বপ্রকার ফলমূল, আর وَاَصَابَهُ এ বাক্যটি حَال বা ভাববাচক পদ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যে মাননীয় তাফসীরকার এ স্থানে قَدْ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় ফলে উপার্জন করা হতে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে তার সন্তানসন্ততিও দুর্বল অর্থাৎ ছোট ছোট। তাদেরও উপার্জনের শক্তি নেই। এমতাবস্থায় অগ্নিক্ষরা ঝড় প্রচণ্ড বাতাস তাতে লাগে এবং তা জ্বলে যায়। **অর্থাৎ যে সময় সে তার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি মুখাপেক্ষী ছিল সেই সময় তা হারিয়ে ফেলল।** ফলে সে আর তার সন্তানসন্ততি অক্ষম ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়ে রইল। কোনো উপায়– তদবির আর তাদের অবশিষ্ট নেই। সে ব্যক্তি রিয়া বা লোক দেখানো এবং বলে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে দান করে এটা তার উপমা। পরকালে যে যখন এর প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে, তখন তার সর্বপ্রকার দান এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, এর কোনো উপকারিতা তার লাভ হবে না। اَيَوَدُّ-এর প্রশ্নবোধক হামযাটি এ স্থানে না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এ উপমাটি হলো ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি বহু সৎ আমল করেছিল, পরে তার বিরুদ্ধে শয়তান প্রেরিত হলো; ফলে সে পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়ল আর সে তার সকল সৎ আমল জ্বালিয়ে দিল, বিনষ্ট করে দিল।

এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ যেমন সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে তেমনি আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার। আর তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

يَوَدُّ : কামনা করে, পছন্দ করে। وَدًّا (ن) وَدَّ - পছন্দ করা, কামনা করা। بُسْتَانٌ : বাগান। এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- بَسَاتِيْنُ

نَخِيْلٌ : খেজুর বৃক্ষ। أَعْنَابٌ : আঙ্গুর عِنَبٌ -এর বহুবচন। إِعْصَارٌ : প্রচণ্ড বায়ু, ঝড়-তুফান।

عَجَزَةٌ : অক্ষম। اَلْمُرَائِيُّ : রিয়াকারী। যে লোক দেখানোর জন্য আমল করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ : অর্থাৎ তোমরা যদি পছন্দ না কর যে, তোমাদের সারা জীবনের উপার্জন এমন নাজুক মুহূর্তে বিনাশ হয়ে যাক, যখন তোমরা তা দ্বারা উপকার লাভের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হবে। আর নতুন করে উপার্জনের সুযোগও থাকবে না। তাহলে তোমরা এটা কিভাবে পছন্দ কর যে, দুনিয়ার সারা জীবন আমল করার পরে পরকালের জীবনে এভাবে যাত্রা করবে যে সেখানে পৌঁছানোর পর তোমরা দেখতে পাবে, তোমাদের সারা জীবনের কৃতকর্মের এখানে কোনো মূল্য নেই। দুনিয়ায় তোমরা যা উপার্জন করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গেছে। পরকালের জন্যে কিছুই উপার্জন করে আননি যে, এখানে তা দ্বারা উপকৃত হবে। পরকালে তোমাদের নতুনভাবে উপার্জন করার কোনো সুযোগও মিলবে না। পরকালের জন্যে যা উপার্জন করার সুযোগ ছিল তা পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ। তোমরা যদি পরকালের চিন্তা না করে সারা জীবন দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাক, নিজেদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শক্তি-সামর্থ্য পার্থিব উপকার লাভের পিছনে ব্যয় কর, তাহলে জীবন দুনিয়ার চিন্তায় বিভোর থাক, নিজেদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শক্তি-সামর্থ্যকে পার্থিব উপকার লাভের পিছনে ব্যয় কর, তাহলে জীবন রবি অস্তমিত হওয়ার পরে তোমাদের অবস্থা ঐ বৃদ্ধের ন্যায় পরিতাপের হবে যার সারা জীবনের উপার্জন এবং জীবন ধারণের সহায় ছিল একটি মাত্র বাগান। সে বাগানটি একেবারে বৃদ্ধকালে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল, এখন আর সে নতুন করে বাগানটি তৈরি করতে সক্ষম নয়। আর সন্তানাদিও তাকে সহায়তা দেওয়ার যোগ্য নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ওমর (রা.) এ দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐ সকল লোকদেরকে বুঝেছেন, যারা সারা জীবন বিভিন্ন রূপ নেক আমল করে শেষ জীবনে শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। ফলে তার সারা জীবনের নেক আমল নস্যাৎ হয়ে যায়।

হযরত ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এ আয়াত সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? তারা উত্তর দিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। হযরত ওমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, বল তোমাদের ধারণা কি? অর্থাৎ এ ধরনের অস্পষ্ট উত্তর না দিয়ে যা বুঝে আসে তা বলে দাও । হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তখন আরজ করলেন– আমীরুল মু'মিনীন! এ আয়াত সম্পর্কে আমার অন্তরে একটি বিষয় এসেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, বল ভাতিজা তা কি? নিজেকে হেয় জ্ঞান করো না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরজ করলেন– এ আয়াতে সে ধনী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহর আনুগত্যমূলক নেক আমল করেছে। এরপর আল্লাহ তার নিকট শয়তান প্রেরণ করেছেন, ফলে সে নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নিজের আমলসমূহকে বরবাদ করেছে। –[রূহুল মা'আনী সূত্রে জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٦٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا زَكُّوْا مِنْ طَيِّبٰتِ جِيَادِ مَا كَسَبْتُمْ مِنَ الْمَالِ وَمِنْ طَيِّبٰتِ مِّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ مِنَ الْحُبُوْبِ وَالثِّمَارِ وَلَا تَيَمَّمُوْا تَقْصُدُوْا الْخَبِيْثَ الرَّدِيْءَ مِنْهُ اَىْ مِنَ الْمَذْكُوْرِ تُنْفِقُوْنَ فِى الزَّكٰوةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَيَمَّمُوْا وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اَىِ الْخَبِيْثَ لَوْ اُعْطِيْتُمُوْهُ فِىْ حُقُوْقِكُمْ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ بِالتَّسَاهُلِ وَغَضِّ الْبَصَرِ فَكَيْفَ تُؤَدُّوْنَ مِنْهُ حَقَّ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ نَفَقَاتِكُمْ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ عَلٰى كُلِّ حَالٍ.

٢٦٨. اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ يُخَوِّفُكُمْ بِهِ اِنْ تَصَدَّقْتُمْ فَتَمْسِكُوْا وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ الْبُخْلِ وَمَنْعِ الزَّكٰوةِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ عَلَى الْاِنْفَاقِ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ لِذُنُوْبِكُمْ وَفَضْلًا رِزْقًا خَلَفًا مِنْهُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ فَضْلُهُ عَلِيْمٌ بِالْمُنْفِقِ.

٢٦٩. يُؤْتِى الْحِكْمَةَ الْعِلْمَ النَّافِعَ الْمُؤَدِّىْ اِلَى الْعَمَلِ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا لِمَصِيْرِهِ اِلَى السَّعَادَةِ الْاَبَدِيَّةِ وَمَا يَذَّكَّرُ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ يَتَّعِظُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

অনুবাদ :

২৬৭. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা যে সম্পদ উপার্জন কর এবং আমি যা অর্থাৎ যে শস্য ও ফল-ফলাদি ভূমি হতে তোমাদের জন্যে উৎপাদন করি তা থেকে যা পবিত্র উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; তার জাকাত আদায় কর। জাকাতের মধ্যে তার উল্লিখিত সম্পদের নিকৃষ্ট নিম্নমানের বস্তু ব্যয় করার সংকল্প ইচ্ছা করো না। أَنْتُمْ تُنْفِقُوْنَ এটা تَيَمَّمُوْا -এর ضَمِيْر [সর্বনাম -তোমরা] -এর حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অথচ তোমাদের কোনো পাওনার বেলায় তা আদায় করা হলে যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে রাখ আনমনা ও অসতর্কভাবে এবং চক্ষু বুজে না রাখ তবে তোমরা নিজেরা তা নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ কর না। সুতরাং তোমরা তা হতে আল্লাহর হক কি করে আদায় করতে পার? জেনে রাখ! আল্লাহ তোমাদের এ দান হতে অমুখাপেক্ষী, সর্বাবস্থায় তিনি প্রশংসিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় অর্থাৎ যদি তোমরা দান-সদকা কর তবে দরিদ্রতার আশঙ্কা প্রদর্শন করে। ফলে তোমরা দান করা থেকে বিরত থাক। এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার কার্পণ্য ও জাকাত আদায় না করার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের উপর তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের পাপ কার্যসমূহের ক্ষমা এবং অনুগ্রহের অর্থাৎ এর স্থলে আরও অধিক রিজিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর আল্লাহ অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রহ অতি বিস্তৃত এবং তিনি ব্যয়কারী সম্পর্কে খুবই অবহিত।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত অর্থাৎ এমন লাভজনক জ্ঞান যা আমলের প্রতি প্রবুদ্ধ করে। দান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। কারণ এটা চির সৌভাগ্য অর্জনের পথে মানুষকে নিয়ে যায়। এবং বোধশক্তি সম্পন্নগণ অর্থাৎ বুদ্ধির অধিকারীগণ ভিন্ন অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। উপদেশ গ্রহণ করে না। يَذَّكَّرُ শব্দটির ت ই মূলত ذ -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

زَكُّوا : জাকাত আদায় কর। جِيَادٌ : উৎকৃষ্ট। اَلْحُبُوْبُ : এটি حَبَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– শস্য, দানা। اَلرَّدِئُ : নিকৃষ্ট, নিম্নমানের।

اَنْ تُغْمِضُوْا : اِغْمَاضًا (اِفْعَال) اَغْمَضَ চোখ বুঝে থাকা। اَلتَّسَاهُلُ : অসতর্কতা। غَضُّ الْبَصَرِ : চক্ষু বন্ধ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ : দান-সদকা কবুল হওয়ার জন্যে যেভাবে মানুষের অন্তরে কষ্ট না দেওয়া এবং লৌকিকতা থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি– যেমনটি পূর্বের আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে, তদ্রূপ হালাল ও পবিত্র হওয়াও জরুরি।

শানে নুযূল : মদিনার কতিপয় আনসার যারা খেজুর বাগানের মালিক ছিল, কোনো কোনো সময় তারা কম মূল্যের খারাপ খেজুরের ছড়া মসজিদে এনে ঝুলিয়ে রাখত, আসহাবে সুফফার যেহেতু জীবিকা নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই যখন তাদের ক্ষুধা লাগত তখন উক্ত খেজুরের ছড়া থেকে খেজুর খেয়ে নিত। এ সম্পর্কে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, তিরমিযীর বরাতে।]

قَوْلُهُ الْجِيَادِ : طَيِّبٰتِ -এর ব্যাখ্যা اَلْجِيَادُ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) এদিকে ইশারা করেছেন যে, এর অর্থ হালাল নয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, বরং এখানে তা উত্তমার্থে ব্যবহৃত।

طَيِّبٰتِ -এর ব্যাখ্যা : কোনো কোনো আলেম উত্তম দ্বারা করেছেন। ব্যাখ্যাকার (র.) ও এ মতের প্রবক্তা। এর আলামত স্বরূপ তারা مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ বাক্য স্থির করেছেন। কেননা ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তু হালাল হয়ে থাকে, তবে ভালোমন্দের দিক দিয়ে অনেক ব্যবধান থাকে। এ কারণেই এ طَيِّبٰت -এর অনুবাদ উত্তম দ্বারা করা হয়েছে। শানে নুযূলের ঘটনা দ্বারাও এর সমর্থন লাভ হয়। কেউ কেউ এর অর্থ হালাল বলেছেন, কারণ পূর্ণাঙ্গরূপে উত্তম বস্তু সেটাই যা হালাল হয়। যদি উভয় অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাতেও কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। অবশ্য যার নিকট উন্নতমানের বস্তু না থাকবে সে এ নিষেধাজ্ঞা বহির্ভূত হবে।

تُغْمِضُوْا মুযারের সীগাহ। অর্থ– চোখ বন্ধ করা। এখানে রূপকার্থে ক্ষমা করা উদ্দেশ্য।

উশরী ভূমির বিধান :

مِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ : اَخْرَجْنَا শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উশরী ভূমির উৎপন্ন ফসলের উশর দেওয়া ওয়াজিব। এ আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল পেশ করে বলেন, উশরী ভূমির কমবেশী সকল ফসলের উপর উশর ওয়াজিব। উশর ও খেরাজ উভয়টি ইসলামি সরকারের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত ট্যাক্সবিশেষ। উভয়টির মধ্যে পার্থক্য এই যে , উশর কেবল ট্যাক্সই নয়; বরং তার মধ্যে ইবাদতের দিকও রয়েছে। মুসলমান যেহেতু ইবাদতের যোগ্য এ কারণে উশরী ভূমি থেকে যে ট্যাক্স গ্রহণ করা হয়, তাকে উশর বলে। আর অমুসলিমদের থেকে যে ভূমির ট্যাক্স গ্রহণ করা হয় তাকে খেরাজ বলা হয়। উশর ও খেরাজের বিস্তারিত মাসআলা ফিকাহগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ : নেক কাজে যদি সম্পদ ব্যয় করা হয় তখন শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করে যে, এর দ্বারা তুমি অভাবী হয়ে যাবে, তোমার সম্পদের ঘাটতি হবে। পক্ষান্তরে অন্যায় কাজে ব্যয় করলে তখন সে অতিমাত্রায় উৎসাহ যোগায়। দেখা যায় যে, মসজিদ মাদরাসায় কিংবা অন্য কোনো নেক কাজে আর্থিক কাজে সহায়তা করতে ইচ্ছা করলে তখন শয়তান বিভিন্নভাবে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। ফলে বারবার সামান্য অর্থের জন্যে তাদের নিকট যাতায়াত করতে হয়। অথচ সিনেমা, টেলিভিশন, মদ, নাজায়েজ অনুষ্ঠান, অন্যায় মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি কাজে নির্দ্বিধায় মানুষ মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে।

اَلْبُخْلُ-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, فَحْشَاءِ শব্দটি ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত নয়, বরং কৃপণতা অর্থে।

হেকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ : হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সঠিক বিবেচনা শক্তি। এখানে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যার নিকট হিকমতের সম্পদ রয়েছে, তখন সে শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলবে না; বরং সে প্রশস্ত রাস্তা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। শয়তানের সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মুরিদ তথা চেলাদের মধ্যে এটাও বড় জ্ঞানবুদ্ধিতার পরিচয় যে, মানুষ স্বীয় সম্পদ আগলে রাখবে। সর্বদা উপার্জনের চিন্তায় বিভোর থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যাকে সঠিক বিবেচনা শক্তি ও আত্মিক আলো প্রদান করা হয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার কাজ। হিকমত ও জ্ঞানের চাহিদা এই যে, মানুষ যা উপার্জন করবে, তা দ্বারা নিজের মধ্যম পর্যায়ের প্রয়োজনাদি পূরণ করার পরে অন্তর খুলে ছওয়াবের রাস্তায় খরচ করবে। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٧٠. وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَدَّيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَوَفَّيْتُمْ بِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ بِمَنْعِ الزَّكٰوةِ وَالنَّذْرِ اَوْ بِوَضْعِ الْاِنْفَاقِ فِىْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ مِنْ مَعَاصِى اللّٰهِ مِنْ اَنْصَارٍ مَانِعِيْنَ لَهُمْ مِّنْ عَذَابِهٖ.

২৭০. যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অর্থাৎ যে জাকাত বা সদকা তোমরা আদায় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর আর তা পালন কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন। জাকাত ও মানত আদায় না করে বা অস্থানে অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যাচরণে ব্যয় করত যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদের কোনো সাহায্যকারী আল্লাহর শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষাকারী নেই।

٢٧١. اِنْ تُبْدُوْا تُظْهِرُوا الصَّدَقٰتِ اَىِ النَّوَافِلَ فَنِعِمَّا هِىَ اَىْ نِعْمَ شَيْئًا اِبْدَاؤُهَا وَاِنْ تُخْفُوْهَا تُسِرُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِبْدَائِهَا وَاِيْتَائِهَا الْاَغْنِيَاءَ اَمَّا صَدَقَةُ الْفَرْضِ فَالْاَفْضَلُ اِظْهَارُهَا لِيُقْتَدٰى بِهٖ وَلِئَلَّا يُتَّهَمَ وَاِيْتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيِّنٌ وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَبِالنُّوْنِ مَجْزُوْمًا بِالْعَطْفِ عَلٰى مَحَلِّ فَهُوَ وَمَرْفُوْعًا عَلَى الْاِسْتِيْنَافِ عَنْكُمْ مِّنْ بَعْضِ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ عَالِمٌ بِبَاطِنِهٖ كَظَاهِرِهٖ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ.

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যভাবে নফল দান-খয়রাত কর তবে তা ভালো অর্থাৎ তা প্রকাশ্যে করা কতই না ভালো আর যদি চুপি চুপি কর গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য দান করা ও সচ্ছল লোকদের প্রদান করা অপেক্ষা অধিক ভালো। পক্ষান্তরে ফরজ দান প্রকাশ্যে করা অধিক উত্তম। কারণ, অন্যরা [এ বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে] তার অনুসরণ করতে পারবে এবং [সে জাকাত দেয় না বলে] কারো কোনো সন্দেহ হবে না। আর এটা দরিদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট। এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু কতক পাপ মোচন করবেন। يُكَفِّرُ এটা ى [নাম পুরুষ একবচন] ও ن [প্রথম পুরুষ, বহুবচন] উভয় অক্ষরসহ পঠিত রয়েছে। فَهُوَ -এর جَوَاب شَرْط] مَحَلّ রূপে] -এ তার عَطْف বা অন্বয় হওয়ায় তা مَجْزُوْم বা জযমসহ আর اِسْتِيْنَاف বা নতুন বাক্যরূপে مَرْفُوْع পাঠ করা যায়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। বাইরের মতো তার ভিতর সম্পর্কেও তিনি জানেন। তার কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

نَفَقَةٌ : ব্যয়, খরচ। وَفَّيْتُمْ : পূরণ করলে। نَذْرٌ : মানত। لِيَقْتَدِيَ بِهِ : অনুসরণ করতে পারে।

لِئَلَّا يُتَّهَمَ : সন্দেহ হবে না। অপবাদ দিবে না। ظَاهِرٌ : বাইর, বাহির। بَاطِنٌ : ভিতর, অভ্যন্তর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মানতের বিধান : মানত এমন ইবাদতের ব্যাপারে করা যায়, যা ওয়াজিবের অন্তর্গত কিন্তু তা স্বয়ং ওয়াজিব নয়। যেমন- নামাজ, রোজা, হজ প্রভৃতি। এ কারণে কোনো মানুষ যদি রোগীকে দেখতে যাওয়ার মানত মানে তাহলে তা তার উপর ওয়াজিব হয় না। যদি কেউ পাপ কাজের মানত করে তাহলেও তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়; বরং তা পরিহার করাই ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে শপথ করে থাকলে শপথের কাফফারা আদায় করা আবশ্যক।

গায়রুল্লাহর নামে মানত করা নাজায়েজ।

মানতও যেহেতু নামাজ রোজার ন্যায় ইবাদত, কাজেই গায়রুল্লাহর জন্যে তা জায়েজ নয়, বরং এটা শিরক। কাজেই কোনো পীর, নবী, ওলী কারো নামে মানত করা শিরক। তা পরিহার করা জরুরি। -[জামালাইন]

দান-সদকা গোপনে করা উত্তম : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ এর দ্বারা বুঝা গেল যে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে গোপনে দান-সদকা করা উত্তম। তবে যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করার দ্বারা মানুষকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় কিংবা দোষারোপ থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য হয় তা স্বতন্ত্র। অন্যান্য ক্ষেত্রে গোপনে দান-সদকা করাই উত্তম। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- কিয়ামতের দিবসে যে সকল ব্যক্তিকে আরশের নীচে ছায়াদান করা হবে তাদের মধ্যে সে ব্যক্তিও থাকবে, যে গোপনভাবে দান-সদকা করেছে। এমনকি তার ডান হাতে যা খরচ করেছে তার বাম হাতও সে ব্যাপারে অবগত থাকবে না। [এ ধরনের বাচনভঙ্গী দ্বারা উত্তমরূপে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য] নফল দান সদকা গোপনে এবং ফরজ সদকা প্রকাশ্য দেওয়া উত্তম। لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ বাক্যটি مُعْتَرِضَةٌ অর্থাৎ আপনার উপর ওয়াজিব নয় যে, তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্ত বানাবেন; বরং কেবল সঠিক পথপ্রদর্শন করাই আপনার দায়িত্ব।

শানে নুযূল : কাব ইবনে হুমাইদ ও নাসায়ী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলমানগণ অমুসলিম আত্মীয়স্বজন এবং অমুসলিম গরিবদেরকে দান-সদকা করতে ইতস্ততা করত। তাদের ধারণা ছিল, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার দ্বারা কেবল মুসলমানদেরকে প্রদান করাই উদ্দেশ্য। এ আয়াত দ্বারা তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করা হয়েছে।

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)-এর মা কুফরি অবস্থায় থাকাকালে নিজ কন্যা হযরত আসমা (রা.)-এরই খেদমতে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে মদিনায় আগমন করে। হযরত আসমা রাসূল ﷺ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তাকে সাহায্য করেননি।

মাসআলা : এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, সদকা দ্বারা নফল দান-সদকা উদ্দেশ্য। মানবতার ভিত্তিতে কাফের জিম্মিকেও তা দেওয়া জায়েজ, তবে ওয়াজিব সদকা অমুসলিমকে দেওয়া জায়েজ নয়।

মাসআলা : কাফের জিম্মি অর্থাৎ যারা রাষ্ট্রদ্রোহী নয়, তাদেরকে শুধু জাকাত ও উশর দেওয়া নাজায়েজ, অন্যান্য নফল ও ওয়াজিব দান-সদকা দেওয়া জায়েজ । আয়াতে জাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مَجْزُومًا بِالْعَطْفِ : -এর দ্বারা يُكَفِّرُ -এর ই'রাব বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শব্দটিকে جَزْم দিয়ে পড়লে فَهُوَ -এর উপর আতফ হবে। কেননা فَهُوَ শর্তের জবাব হওয়ার কারণে জযমবিশিষ্ট। আর مَرْفُوع পড়লে مُسْتَانِفَه বাক্য হওয়ার কারণে শর্তের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। -[জামালাইন ৪২৩]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا : ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য এই যে, অভাব-অনটন সত্ত্বেও তারা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে, অন্যের দ্বারস্থ হবে না। দানের ব্যাপারে কাউকে পীড়াপীড়ি করবে না। কেউ কেউ এখানে اِلْحَاف -এর অর্থ করেছেন যে, তারা মোটেই কারো কাছে কিছু চাইবে না। কেউ বলেন, তারা চাওয়ার ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করবে না। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন উক্ত হাদীসে পাওয়া যায় যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে মিসকিন নয়, যে দু-একটি খেজুর বা দু-এক লোকমা আহারের জন্যে মানুষের দ্বারস্থ হয়, বরং প্রকৃত মিসকিন সে যে অভাব সত্ত্বেও মানুষের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকে। এরপর রাসূল ﷺ দলিল স্বরূপ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا আয়াত পাঠ করলেন। এ কারণেই পেশাদার ভিক্ষুকদের দান করার পরিবর্তে সাদা পোশাকধারী অভাবী এবং দীনি কার্যে নিয়োজিত, আলেম ও তালিবে ইলমদেরকে খুঁজে খুঁজে সহায়তা করা উচিত। কারণ এ ধরনের মানুষ অন্যের নিকট হাত সম্প্রসারণ করাকে নিজেদের জন্যে অপমানজনক মনে করে।

قَوْلُهُ اَيِ النَّاس : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, هُدَاهُمْ -এর যমীরটি اَلنَّاس -এর প্রতি **ফিরেছে**। **যদিও তা পূর্বে** স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে এ বাক্যের বিষয়বস্তু দ্বারা বোধগম্য হয় যে, এর দ্বারা فُقَرَاء উদ্দেশ্য নয়। **যেমনটা স্বাভাবিকভাবে বুঝে** আসে। কারণ এক্ষেত্রে অর্থ ঠিক থাকে না।

قَوْلُهُ مَجْزُوْمًا بِالْعَطْفِ عَلٰى مَحَلِّ فَهُوَ مَرْفُوْعًا عَلَى الْاِسْتِئْنَافِ : এ ইবারতে يُكَفِّر -**এর** اِعْرَاب বর্ণনা করা হয়েছে। يُكَفِّر -কে যদি مَجْزُوْم পড়া হয় তাহলে সেটা হবে فَهُوَ -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف **হওয়ার** কারণে। কেননা شَرْط টি جَوَابُ الشَّرْطِ হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে। আর مَرْفُوْع পড়া হলে جُمْلَة مُسْتَاْنِفَة **হওয়ার** কারণে হবে। فَهُوَ -এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٧٢. وَلَمَّا مَنَعَ ﷺ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ لِيُسْلِمُوْا نَزَلَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰيهُمْ اَيِ النَّاسِ اِلَى الدُّخُوْلِ فِى الْاِسْلَامِ اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ هِدَايَتَهُ اِلَى الدُّخُوْلِ فِيْهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ مَالٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ لِاَنَّ ثَوَابَهُ لَهَا وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ اللّٰهِ اَىْ ثَوَابِهِ لَا غَيْرَهُ مِنْ اَغْرَاضِ الدُّنْيَا خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ جَزَاؤُهُ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ تُنْقَصُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا وَالْجُمْلَتَانِ تَاكِيْدٌ لِلْاُوْلٰى .

২৭২. ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ মুশরিকদেরকে দান-সদকা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তাদের অর্থাৎ লোকদের সৎপথ গ্রহণের দায় অর্থাৎ তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার দায় তোমার নয়। তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া। বরং আল্লাহ যাকে এতে প্রবেশের হেদায়েতের ইচ্ছা করেন সৎপথে পরিচালিত করেন। যে 'খায়র' ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্য কেননা তার পুণ্যফল যে ব্যয় করে তারই এবং তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থেই অর্থাৎ দুনিয়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় কেবল পুণ্য লাভের আশায়ই ব্যয় করে থাক। وَمَا تُنْفِقُوْنَ এ বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ [বিবরণমূলক] হলেও মূলত এটা نَهِى বা নিষেধাজ্ঞার অর্থে ব্যবহৃত। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ এবং مَا تُنْفِقُوْنَ এ বাক্য দুটি এ স্থানে প্রথম বাক্যটির জন্যে তাকীদমূলক।

তাহকীক ও তারকীব

مَنَعَ : নিষেধ করলেন। اَلتَّصَدُّقُ : দান-সদকা করা। لِيُسْلِمُوْا : যাতে তারা মুসলমান হয়। اَغْرَاضٌ : স্বার্থ, গরজ। لَا تُنْقَصُوْنَ : হ্রাস করা হবে না, পুরোপুরি দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَى الدُّخُوْلِ فِى الْاِسْلَامِ : এ ইবারতটুকু দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : রাসূল ﷺ থেকে هِدَايَة -এর نَفِى করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? অথচ রাসূল ﷺ -এর আগমনই হয়েছে মানুষের হেদায়েতের জন্যে।

উত্তর : نَفِى দ্বারা উদ্দেশ্য اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ -এর نَفِى করা। اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ -এর نَفِى করা উদ্দেশ্য নয়। قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ : **প্রশ্ন :** وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ اللّٰهِ -এর মাঝে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করে থাক। অথচ বহু মানুষ লোক দেখানো ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করে থাকে। এর দ্বারা তো كِذْبِ بَارِى লাযেম আসে।

উত্তর : এখানে خَبَر টি نَهِى -এর অর্থে ব্যবহৃত। এর মর্ম হলো, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা ব্যতীত খরচ করো না।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٧٣. لِلْفُقَرَاءِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ اَيِ الصَّدَقَاتُ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ حَبَسُوْا اَنْفُسَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَنَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ الصُّفَّةِ وَهُمْ اَرْبَعُمِائَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَرْصَدُوْا لِتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَالْخُرُوْجِ مَعَ السَّرَايَا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا سَفَرًا فِي الْاَرْضِ لِلتِّجَارَةِ وَالْمَعَاشِ لِشُغْلِهِمْ عَنْهُ بِالْجِهَادِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ بِحَالِهِمْ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ اَيْ لِتَعَفُّفِهِمْ عَنِ السُّؤَالِ وَتَرْكِهِ تَعْرِفُهُمْ يَا مُخَاطَبًا بِسِيْمٰهُمْ عَلَامَتِهِمْ مِنَ التَّوَاضُعِ وَاَثَرِ الْجَهْدِ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ شَيْئًا فَيُلْحِفُوْنَ اِلْحَافًا اَيْ لَا سُؤَالَ لَهُمْ اَصْلًا فَلَا يَقَعُ مِنْهُمْ اِلْحَافٌ وَهُوَ الْاِلْحَاحُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

২৭৩. সাদাকাত অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য لِلْفُقَرَاءِ এটা এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য اَلصَّدَقَاتُ-এর خَبَر বা বিধেয়। যারা আল্লাহর পথে রুদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে তারা নিজেদেরকে আটকিয়ে রেখেছে। জিহাদের উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখায় তারা জীবিকা উপার্জন ও ব্যবসার জন্যে পৃথিবীতে ঘুরাফিরা সফর করতে পারে না। সুফফা [মসজিদে নববীর আঙ্গিনা] বাসী সাহাবীগণ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। তাঁরা সংখ্যায় [প্রায়] চারশত মুহাজির সাহাবী ছিলেন। কুরআন শিক্ষা ও জিহাদে বের হওয়ার জন্যে তারা সদা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। [ফলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফেরা করতে পারতেন না।] যে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ সে ব্যক্তি যাচনা না করার কারণে অর্থাৎ কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করা হতে তাদের বেঁচে থাকার কারণে তাদেরকে অভাবহীন ধারণা করে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তাদের চিহ্ন বিনয়, ক্ষুৎপিপাসার কষ্ট দর্শন করে তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। মানুষের নিকট তারা কিছুই যাচনা করে না যে তারা পীড়াপীড়ি করবে অর্থাৎ তারা আদতেই কোনোরূপ যাচনা করে না। সুতরাং তাদের তরফ থেকে পীড়াপীড়ি সংঘটিত হওয়ার কথাই উঠে না। اِلْحَافًا এটা এ স্থানে উহ্য يُلْحِفُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل مُطْلَق বা সমধাতুজ কর্ম। যে ধনসম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেবেন।

٢٧٤. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

২৭৪. যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে তাদের পুণ্যফল। সুতরাং তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

أُحْصِرُوْا : তারা নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখে। حُبِسُوْا : আটকিয়ে রেখেছে। اَلسَّرَايَا : سَرِيَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অভিযান। اَلْمَعَاشُ : জীবিকা উপার্জন। اَلتَّعَفُّفُ : যাচনা না করা। اَلْعِفَّةُ থেকে নির্গত, عَفَّ عَنِ الشَّيْءِ বিরত থাকল। سِمَاءٌ : নিদর্শন, سِمَةٌ : চিহ্ন [নিদর্শন] থেকে নির্গত। يُلْحِفُوْنَ : পীড়াপীড়ি করে। اِلْحَافًا : পীড়াপীড়ি করা। عَلَانِيَةً : প্রকাশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ আয়াতে সে সকল লোকের বিশেষ ছওয়াব ও ফজিলতের বর্ণনা রয়েছে– যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ যে কোনো মুহূর্তে খরচ করার প্রয়োজন হয়, তখনই তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে প্রস্তুত থাকে।

قَوْلُهُ لِتَعَفُّفِهِمْ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنَ التَّعَفُّفِ -এর مِنْ টি مِنْ تَعْلِيْلِيَّة , تَبْعِيْضِيَّة নয়।

قَوْلُهُ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا : পীড়াপীড়ি করে যাচনা করা। এখানে বয়ানশাস্ত্রের একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, যাকে نَفْيٌ بِاِيْجَابِهٖ বলা হয়। দৃশ্যত এক বস্তুর নেতিবাচক দ্বারা অপর বস্তুর সাব্যস্তকরণ اِثْبَات ঘটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের নফী উদ্দেশ্য হয়। উল্লিখিত আয়াতে দৃশ্যত পীড়াপীড়ি নফী করা হয়েছে। মূল যাচনা বা কামনার নফী করা হয়নি; কিন্তু বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য স্বাভাবিক নফী তথা مُقَيَّد ও قَيْد উভয়টির নফী।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ :

শানে নুযূল : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ইবনে আসাকির -এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ৪০ হাজার দিনার বা স্বর্ণমুদ্রা এভাবে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেন যে, দিনের বেলা দশ হাজার, রাতে দশ হাজার, গোপনে দশ হাজার এবং প্রকাশ্যে দশ হাজার দান করেন। তাঁর ফজিলতদান কল্পে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আব্দুর রাযযাক ও আবদ ইবনে হুমাইদ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে এ আয়াতের শানে নুযূল হযরত আলী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলীর নিকট চারটি দিরহাম ছিল। তিনি তার থেকে একটি রাতে, একটি দিনে, একটি গোপনে এবং একটি প্রকাশ্যে খরচ করেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ দুটি ছাড়া আরও কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে।

–[ফাতহুল কাদির সূত্রে জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

২৭৫. اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا اَىْ يَاْخُذُوْنَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِى الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُوْدِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ فِى الْقَدْرِ اَوِ الْاَجَلِ لَا يَقُوْمُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ اِلَّا قِيَامًا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ يُصَرِّعُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ الْجُنُوْنِ بِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِيَقُوْمُوْنَ ذٰلِكَ الَّذِىْ نَزَلَ بِهِمْ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا فِى الْجَوَازِ وَهٰذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيْهِ مُبَالَغَةً فَقَالَ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ بَلَغَهٗ مَوْعِظَةٌ وَعْظٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى عَنْ اَكْلِهٖ فَلَهٗ مَا سَلَفَ قَبْلَ النَّهْىِ اَىْ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَاَمْرُهٗ فِى الْعَفْوِ عَنْهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ اِلٰى اَكْلِهٖ مُشَبِّهًا لَهٗ بِالْبَيْعِ فِى الْحِلِّ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অনুবাদ :

২৭৫. যারা সুদ খায় অর্থাৎ তা গ্রহণ করে। তারা কবর থেকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা উন্মত্ততা দ্বারা হতবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দিয়েছে।

সুদ হলো, টাকা-পয়সা বা খাদ্যবস্তুর লেনদেনে পরিমাণ এবং মুদ্দতের মধ্যে দাতার পক্ষে অতিরিক্ত হওয়া। مِنَ الْمَسِّ এটা يَقُوْمُوْنَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট।

এটা অর্থাৎ এই যে অবস্থা তাদের উপর আপতিত এজন্য যে, তারা বলে বেচাকেনা তো বৈধ হওয়ার বেলায় সুদের মতো।

বক্তব্যটিতে مُبَالَغَة বা অধিক জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ বাক্যটিতে বিপরীত [অর্থাৎ সুদকে বেচাকেনার সাথে তুলনা না করে বেচাকেনাকে সুদের সাথে] তুলনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে ইরশাদ করেন– অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের তরফ থেকে উপদেশ এসেছে পৌঁছেছে এবং সে তা গ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছে অতীতে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে যা হয়েছে তা তারই অর্থাৎ তা আর ফিরানো হবে না এবং তার ক্ষমার বিষয়টি আল্লাহর এখতিয়ারে। বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তাকে বেচাকেনার সাথে তুল্য মনে করে যারা তার তা ভক্ষণের পুনরাবৃত্তি করবে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَتَخَبَّطُهُ : হতবুদ্ধি করে দেয়। يَصْرَعُهُ : صَرْعًا (ف) صَرَعَ আছাড় দেওয়া, ধরাশায়ী করা। اَلْمَسّ : উন্মত্ততা, স্পর্শ। عَكْس : বিপরীত, উল্টো। اَحَلَّ : হালাল করেছেন, اِحْلَال - হালাল করা। حَرَّمَ : হারাম করেছেন। تَحْرِيْمًا : হারাম করা। سَلَفَ : পূর্বে হয়েছে, অতীত হয়েছে। لَا يُسْتَرَدُّ : ফিরানো হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

رِبًا-এর অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া। বলা হয়- هٰذَا يَرْبُوْا عَلٰى هٰذَا -এটি তার চেয়ে বেশি। কুরআনে এসেছে- وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা মাল বৃদ্ধির জন্য যা প্রদান কর তা আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না।' শরিয়তে رِبَا الْفَضْلِ ও رِبَا النَّسِيْئَةِ -এর উপর এটি ব্যবহৃত হয়। رِبَا الْفَضْلِ বলা হয় এমন বাড়তি অংশকে যা বস্তুর মধ্যে বিনিময়হীন অর্জিত হয়। আর ربا النسيئة বলা হয় এমন উপকারিতাকে, যা মেয়াদের বিনিময়ে অর্জিত হয়। মোটকথা, পরিভাষায় সুদ সে বাড়তি অর্থকে বলে যা কোনো ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা পরস্পরে সিদ্ধান্তকৃত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ মূলধন ছাড়া অতিরিক্ত উসুল তথা আদায় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا :

সুদের আলোচনা : কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় সুদি কারবারের বিভিন্নরূপ প্রচলন ছিল। যেমন- এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতে কোনো বস্তু বিক্রি করত এবং মূল্য উসুল করার একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিত। উক্ত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর মূল্য উসুল না হলে তাকে আরও অতিরিক্ত সময় দিত। আর মূল্যেও বৃদ্ধি ঘটাত। অথবা যেমন একজন অপরজনকে কিছু ঋণ দিত এবং সিদ্ধান্ত করে নিত যে, এ মেয়াদের মধ্যে মূল ঋণ ছাড়াও বাড়তি এত পরিমাণ দিতে হবে। অথবা যেমন ঋণদাতা ও তা গ্রহীতার মাঝে এক বিশেষ মেয়াদের জন্যে একটি সিদ্ধান্ত করে নিত। উক্ত মেয়াদের মধ্যে মূল অর্থ ও বাড়তি অর্থ উসুল না হলে আরও বেশি সুযোগ দিত, এখানে এ প্রকার লেনদেনকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে মোট ছয়টি আয়াত রয়েছে, যেগুলোতে সুদ হারাম হওয়া এবং এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে সুদখোরের কুপরিণতি এবং রোজ হাশরে তার লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার উল্লেখ রয়েছে। এতে সুদখোরের অবস্থাকে জিনগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়েছে যে, জিনের প্রভাবে মানুষ সংজ্ঞাহীন এবং পাগল হতে পারে। বস্তবদর্শীদের থেকে এ ব্যাপারে প্রচুর সাক্ষ্য রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাইয়িম জওযী (র.) লিখেন, বিভিন্ন চিকিৎসক ও দার্শনিকগণ এটাকে স্বীকার করেছেন যে, বিভিন্ন কারণে মানুষ পাগল, বেহুঁশ ও মাতাল হয়ে থাকে। তন্মধ্যে জিনের আছরও একটি। যারা এটাকে অস্বীকার করে, তাদের নিকট জাহেরী অসম্ভবতা ছাড়া কোনো প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ اَىْ يَاْخُذُوْنَهُ : অর্থাৎ, সুদ নেয়। মুসান্নিফ (র.) يَاْكُلُوْنَهُ -এর ব্যাখ্যায় يَاْخُذُوْنَهُ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اَكْل বা খাওয়া দ্বারা শুধু খাওয়াই উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। চাই সেটা খাওয়া হোক বা পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা অন্য কিছু হোক। তবে যেহেতু খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তাই বিশেষভাবে খাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمَطْعُوْمَاتِ : মুসান্নিফ (র.) এ বাক্যটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব মোতাবেক আরোপ করেছেন। কেননা তাঁদের মতে, رِبوا হওয়ার জন্যে مَطْعُوْمَات বা ثَمَنِيَات হওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, قَدْر এবং جِنْس -এর মাঝে মিল হওয়াই رِبوا সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট مَطْعُوْمَات -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী নয়।

قَوْلُهُ فِى الْقَدْرِ وَالْاَجَلِ : এটি اَلْمُعَامَلَةُ থেকে بَدْل হয়েছে। قَدْر -এর সম্পর্ক হলো رِبوا فَضْل -এর সাথে, আর এটি হবে اِتِّحَادُ الْجِنْسِ -এর সুরতে। আর اَلْاَجَل -এর সম্পর্ক اِتِّحَاد عَيْن -এর ক্ষেত্রে । যদি جِنْس ভিন্ন হয় قَدْر অভিন্ন হয় তাহলে تَفَاضُل জায়েজ আছে; বাকি [ধার] জায়েজ নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

رِبٰوا -এর ইল্লত : আহনাফের মতে, رِبٰوا -এর ইল্লত হলো قَدْرٌ مَعَ الْجِنْسِ অর্থাৎ যে দুটি বস্তুর মাঝে مُبَادَلَه করা হবে, সে দুটি বস্তু যদি مَكِيْلِي বা مَوْزُوْنِي হয় এবং উভয়টির 'জিনস' অভিন্ন হয় তাহলে কমবেশি করা হরাম। আর যদি উভয়টি مَوْزُوْنِي বা مَكِيْلِي হয়; কিন্তু جِنْس এক না হয় [যেমন- স্বর্ণ-রুপা, গম-জব] তাহলে উভয়টির মধ্যে কমবেশি করা জায়েজ।

উল্লেখ্য, হাদীসে বর্ণিত ছয়টি বস্তু ছাড়াও যেখানে উক্ত ইল্লত পাওয়া যাবে সেখানেই رِبٰوا প্রমাণিত হবে। যেমন- চুনার বিনিময়ে চুনা বিক্রি করার ক্ষেত্রে বেশি কম করলে رِبٰوا হবে। কেননা উভয়টি مَكِيْلِي এবং উভয়টির جِنْس এক। এমনিভাবে লোহার বদলে লোহা এবং পিতলের বদলে পিতল -এরও একই বিধান।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট رِبٰوا -এর ইল্লত হলো مَطْعُوْمَات -এর মধ্যে طَعْم এবং اَثْمَان -এর মধ্যে ثَمَن হওয়া। যেমন- স্বর্ণ, রুপা ও মুদ্রা। তাঁদের মতে, ১ মণ লোহার বদলে ২ মণ লোহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ। কেননা এখানে ইল্লত তথা طَعْم এবং ثَمَنِيَة পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهُ مِنْ قُبُوْرِهِمْ : মুফাসসির (র.) مِنْ قُبُوْرِهِمْ কয়েদটি আরোপ করে এ সংশয় নিরসন করেছেন যে, দুনিয়াতে তো আমরা কত সুদখোরকেই দেখতে পাই। কই তাদের কারো উঠা-বসায় তো কোনো প্রকার উন্মত্ততা পরিলক্ষিত হয় না। তাহলে কুরআনের এ কথার মর্ম কি?

জবাব : আয়াতে বর্ণিত قِيَام দ্বারা হাশরের দিন নিজ নিজ কবর থেকে উঠা উদ্দেশ্য। দুনিয়ার উঠা-বসা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ قِيَامًا : এখানে قِيَامًا বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ -এর মাঝে حَرْف اِسْتِثْنَاء টি كَاف -এর উপর দাখেল হয়েছে। অথচ حَرْف اِسْتِثْنَاء নিয়ম অনুযায়ী كَاف -এর উপর দাখেল হওয়া শুদ্ধ নয়। মুসান্নিফ (র.) قِيَامًا উল্লেখ করে উক্ত সংশয়ের জবাব দিয়েছেন এভাবে যে, এখানে مُسْتَثْنٰى মাহযূফ রয়েছে। আর তা হলো قِيَامًا

قَوْلُهُ يَتَخَبَّطُهُ : এটি بَاب تَفَعُّل থেকে مُضَارِع وَاحِد مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ। অর্থ- যাকে শয়তান উন্মাদ করে রেখেছে। خَبْط -এর মূল অর্থ হলো- অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলা। কেউ যখন অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে চলে তখন আরবরা বলে- خَبْطُ الْعَشْوَاءِ

قَوْلُهُ مِنَ الْجُنُوْنِ : এটি اَلْمَسّ -এর তাফসীর।

قَالَ الْفَرَّاءُ اَلْمَسُّ الْجُنُوْنُ وَالْمَمْسُوْسُ الْمَجْنُوْنُ وَاَصْلُ الْمَسِّ بِالْيَدِ فَسُمِّيَ بِهِ لِاَنَّ الشَّيْطَانَ يَمَسُّهُ.

قَوْلُهُ يَصْرَعُهُ : اَيْ يَذْهَبُ عَقْلَهُ وَيَدْهَشُهُ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا : তারা বলে থাকে বেচা-কেনা ও রিবার মধ্যে প্রভেদ কি? উভয়ের উদ্দেশ্য তো মুনাফা অর্জন করাই। কাজেই ব্যবসা হালাল এবং রিবা হারাম কেন? বস্তুত এটা দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা, বরং বিবেকের দেওলিয়াত্ব ছাড়া কিছুই নয়। ব্যবসায় ক্রয়মূল্যের উপর যে লাভ নেওয়া হয় তার ধরন এবং সুদের ধরনের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তারা উভয়কে একই ধরনের মনে করে দলিল পেশ করে যে, ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর যে মুনাফা অর্জিত হয় তা জায়েজ, তাহলে ঋণের উপর বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর মুনাফা অর্জন করা নাজায়েজ হবে কেন? বর্তমান যুগের সুদখোররাও সুদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এ ধরনের দলিল পেশ করে থাকে। কিন্তু তারা চিন্তা করে না যে, জগতে যত ধরনের কারবার রয়েছে- চাই ব্যবসা-বাণিজ্য হোক কিংবা শিল্পকারখানা বা কৃষি, আর চাই মানুষ তাতে নিজ শ্রম ব্যয় করুক বা পুঁজি বিনিয়োগ করুক, কিংবা উভয়টি ব্যয় করুক এগুলোর মধ্যে কোনোটি এমন নয় যার মধ্যে মানুষ লোকসানের আশঙ্কাকেও বরণ করে না নেয়। অপরদিকে বিশ্ব বাজারে এক শ্রেণির ঋণ বিনিয়োগকারী মহাজন এমন হবে কেন? যারা লোকসানের আশঙ্কামুক্ত হয়ে এক নির্দিষ্ট নিশ্চিত মুনাফা অর্জনের অধিকারী বিবেচিত হবে?

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন হলো, যে সকল মানুষ কারবারে নিজ সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং যাদের প্রচেষ্টার উপর উক্ত কারবারের লাভ-লোকসানের আশঙ্কা থাকে তাদের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোনো মুনাফার জামানত থাকবে না; বরং লোকসানের সমস্ত দায়দায়িত্ব তাদেরই মাথায় চাপবে। আর পুঁজি বিনিয়োগকারী মহাজনরা আশঙ্কামুক্ত হয়ে তাদের চুক্তিকৃত মুনাফা অর্জন করতেই থাকবে। এটা কোন ধরনের জ্ঞান, বিবেক, মানবতা ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদের আলোকে বৈধ হতে পারে? এর অনিষ্টতা আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? তা বুঝে আসে না। এটা জুলুম-অত্যাচারের সুস্পষ্ট একটি পন্থা। ইসলামি শরিয়ত এটাকে কিভাবে বৈধ স্থির করতে পারে? উপরন্তু শরিয়ত তো ঈমানদারদেরকে অভাবীদের উপর কোনো প্রকার পার্থিব স্বার্থ ও লাভের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে মুক্ত হস্তে দান করবার জন্যে উৎসাহ দিয়েছে। যার দরুন সমাজের ভ্রাতৃত্ব, সমবেদনা, সহানুভূতি ও স্নেহ-মমতা বৃদ্ধি পায়। একজন সুদখোর মহাজনের তার বিনিয়োগকৃত অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় কেবল তার ব্যক্তিগত আর্থিক মুনাফা অর্জন। তাই অভাবগ্রস্ত, হতদরিদ্র ও পীড়িত মানুষ কাতরাতে থাক সে ব্যাপারে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। শরিয়ত এ পাষাণ ব্যবহারকে কিভাবে পছন্দ করতে পারে? মোটকথা ইসলামে সুদ সম্পূর্ণ হারাম, চাই ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্য হোক কিংবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে।

ব্যবসা ও সুদের নীতিগত পার্থক্য : যেসব কারণে ব্যবসা ও সুদ অর্থনৈতিক ও মানবিক বিচারে এক হতে পারে না সেগুলো নিম্নরূপ–

১. ব্যবসার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সমভাবে মুনাফার বিনিময় ঘটে। কেননা ক্রেতা বিক্রেতার থেকে গৃহীত বস্তু দ্বারা উপকৃত হয়। আর বিক্রেতা তার শ্রম, মেধা ও সময়ের পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, সেগুলোকে সে ক্রেতার জন্যে উক্ত বস্তু আমদানির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিল। পক্ষান্তরে সুদি লেনদেনের মধ্যে সমভাবে মুনাফার বিনিময় ঘটে না। সুদগ্রহীতা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করে, যা তার জন্যে নিশ্চিত উপকারী। কিন্তু এর বিপরীতে সুদদাতা কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদ লাভ করে, যা উপকারী হওয়া নিশ্চিত নয়, সে যদি ব্যক্তিস্বার্থে খরচ করার উদ্দেশ্যে পুঁজি নিয়ে থাকে তাহলে তো সুস্পষ্ট যে, এ মেয়াদ বা অবকাশ নিশ্চিত উপকারী নয়, আর যদি ব্যবসা, শিল্প ও পেশামূলক কোনো কাজের জন্যে গ্রহণ করে থাকে তাহলে এ মেয়াদের মধ্যে তার যেভাবে উপকারের সম্ভাবনা থাকে তদ্রূপ ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সুদি লেনদেন হয়তো এক পক্ষের উপর এবং অপর পক্ষের লোকসানের উপরে ধার্য হয়ে থাকে। অথবা এক পক্ষের নিশ্চিত উপকার আর অপর পক্ষের অনিশ্চিত উপকারের উপর চুক্তি হয়ে থাকে।

২. ব্যবসার মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে যতই অধিক লাভ গ্রহণ করুক, তা একবারই নিয়ে থাকে। কিন্তু সুদি কারবারে বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর একের পর এক মুনাফা উসুল করতে থাকে। মেয়াদ অতিক্রমের সাথে সাথে তার মুনাফার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ঋণগ্রহীতা তার মাল দ্বারা যতই উপকার লাভ করুক না কেন তা এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত থাকে। কিন্তু বিনিয়োগকারী যে উপকার লাভ করে তার কোনো সীমা থাকে না। এমন ও হতে পারে যে, ঋণগ্রহীতার সারা জীবনের সকল উপার্জিত সম্পদ তার জীবনধারণের সকল আসবাব-সামগ্রী এমনকি পরিধেয় বস্ত্র এবং বসবাসের ঘরও গ্রাস করে নেয়। এরপরও সুদখোর মহাজনের চাহিদা বহাল থেকে যায়।

ব্যবসায়ের পণ্য এবং তার মূল্যের বিনিময়ের সাথে লেনদেন শেষ হয়ে যায়। ক্রেতার পক্ষে বিক্রেতাকে কোনো বস্তু ফেরত দিতে হয় না। ঘর, দোকান, জমি বা আসবাবপত্রের ভাড়া স্বরূপ যে বিনিময় প্রদান করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে মূল বস্তু বিনষ্ট হয় না, বরং তা স্ব অবস্থায় বহাল থাকে। মালিকের নিকট পরে তা ফেরত দিতে হয়। কিন্তু সুদি লেনদেনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মূল ঋণের অর্থ বা বস্তুকে খরচ করে ফেলে। এরপর তার খরচকৃত মাল বা অর্থ যোগাড় করে বাড়তি মুনাফাসহ তাকে ফেরত দিতে হয়। এ সকল কারণে ব্যবসা এবং সুদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এত বিশাল পার্থক্য রয়েছে যে, ব্যবসা মনুষ্য সভ্যতা বিনির্মাণকারী সত্তা হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে সুদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি মনুষ্য সভ্যতা ও মানবতাকে সমূলে বিনাশ করে। উপরন্তু সুদের চারিত্রিক ক্ষতি এই যে, তা মানুষের মধ্যে কৃপণতা, ব্যক্তিস্বার্থ, ঘৃণা, নির্মমতা ও সম্পদপূজা ইত্যাদি স্বভাব সৃষ্টি করে। সমবেদনা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার আত্মাকে বিনাশ করে দেয়। এ কারণেই অর্থনৈতিক ও চরিত্রিক উভয় ক্ষেত্রে সুদ মানব জাতির জন্যে অতিশয় ক্ষতিকর বস্তু।

সুদের চারিত্রিক ক্ষতি : সুধীপাঠক! চারিত্রিক ও আত্মিক বিচারে লক্ষ্য করলে দেখবেন, সুদ মূলত ব্যক্তিস্বার্থ, কৃপণতা, নির্মমতা ইত্যাদি কুস্বভাবের কুফল বয়ে আনে। এ সকল কুস্বভাবকে মানুষের মধ্যে লালন করে। এর বিপরীত দান সদকার ফলে মানুষের মধ্যে বদান্যতা, হৃদ্যতা, সহমর্মিতা, আত্মিক প্রশস্ততা বা উদারতা সৃষ্টি হয়। দান-সদকার আমল করতে

http://islamiboi.wordpress.com

থাকার দ্বারা মানুষের মধ্যে এসব উত্তম গুণাবলি প্রতিপালিত হয়। এমন কে আছে যারা মানবিক এ দু ধরনের স্বভাবের মধ্য থেকে দ্বিতীয় প্রকারকে প্রথম প্রকারের তুলনায় উত্তম জ্ঞান না করবে?

সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি : অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে সুদভিত্তিক বিনিয়োগ বা ঋণ দু প্রকার। যথা–

ক. ব্যক্তিস্বার্থে বা ব্যক্তি প্রয়োজনে সরাসরি গৃহীত ঋণ।

খ. ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা বা কৃষি ইত্যাদি কাজের উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণ।

প্রথম প্রকার ঋণের ব্যাপারে বিশ্ববাসী জানে যে, উক্ত ক্ষেত্রে সুদ উসুল করার যে নিয়ম বা প্রচলন রয়েছে তা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই যে দেশে মহাজন ব্যক্তি বা সংস্থা এ ধরনের সুদের মাধ্যমে গরীব-দরিদ্র কৃষকদের রক্ত শোষণ না করছে। সুদের কারণে এ ধরনের ঋণ মানুষের পক্ষে পরিশোধ করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে যায়, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ অসম্ভবও হয়ে পড়ে। এক ঋণ পরিশোধের জন্যে একের পর এক ঋণ নিতে বাধ্য হয়ে পড়তে হয়। মূল ঋণ থেকে কয়েকগুণ সুদ পরিশোধ সত্ত্বেও ঋণ যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। শ্রম দ্বারা অর্জিত মুনাফার বেশির ভাগ অংশ সুদ বিনিয়োগকারী নিয়ে নেয়, আর এই দরিদ্র ব্যক্তির নিজ উপার্জিত অর্থের কিছুই নিজের এবং সন্তানাদি প্রতিপালনের জন্যে অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থা ক্রমান্বয়ে শ্রমিকের অন্তর থেকে শ্রমের প্রেরণা বিনাশ করে দেয়। ফলে রাষ্ট্রীয় উৎপাদনে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। এ ছাড়াও ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে মানুষ সর্বদা চিন্তাগ্রস্ত থাকতে হয়। সময়মতো আহার-বিহার সম্ভব হয় না। ফলে দিনদিন স্বাস্থ্য হানি ঘটতে থাকে। সুদি কারবারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল এই যে, মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত শোষণ করে মোটাতাজা হতে থাকে। কিন্তু দুর্বল, বিত্তহীন মানুষেরা দিনদিন আরও দুর্বল এবং নিঃস্ব হতে থাকে। অবশেষে রক্ত শোষণকারী গোষ্ঠী নিজেরাও তার ক্ষতি থেকে রেহাই পায় না। কারণ তাদের ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সাধারণ মানুষের যে কষ্ট-দুর্ভোগ পোহাতে হয় তার দ্বারা ধনীদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সুযোগ পেলে আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ আগুন শুধু নির্দিষ্ট এলাকায়ই নয়; বরং সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শত শহস্র নিরপরাধ মানুষকেও তাদের সাথে জীবন দিতে হয়। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيْهِ : উল্টা এভাবে যে, আলোচনা চলছে رِبٰوا সম্পর্কে, بَيْع সম্পর্কে নয়। তাই رِبٰوا -কে بَيْع -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া উচিত ছিল; بَيْع -কে رِبٰوا -এর সাথে নয়। এমনটি করা হয়েছে মোবালাগা স্বরূপ। কেননা তাদের দৃষ্টিতে সুদের বৈধতাটা মূল ছিল; বেচাকেনাকে তার উপর কিয়াস করেছে।

قَوْلُهُ وَعْظٌ : مَوْعِظَةٌ -এর তাফসীর وَعْظٌ দ্বারা করার উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, مَوْعِظَةٌ হলো ظَرْف ; এটি مَصْدَر مِيْمِى নয়।

قَوْلُهُ عَنْهُ : اَىْ عَنْ اَكْلِ الرِّبٰوا

قَوْلُهُ اِلَى اَكْلِهِ مُشَبِّهًا لَهُ بِالْبَيْعِ فِى الْحِلِّ : প্রশ্ন : আয়াত থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, যদি কেউ সুদ গ্রহণ করে তাহলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি হবে। যা মূলত মু'তাযিলাদের মতবাদ।

উত্তর : চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি ঐ সুরতে হবে যখন رِبٰوا -কে بَيْع -এর মতো হালাল মনে করে ব্যবহার করবে।

قَوْلُهُ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ : এখানে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল, সুদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর ভবিষ্যতের জন্যে যদি তওবা করে এবং এর থেকে বিরত থাকে তাহলে পূর্বের সঞ্চিত সম্পদ শরিয়তের বিধানে তারই মালিকানাধীন থাকবে। আর অভ্যন্তরীণ বিষয় তথা আন্তরিকভাবে এ থেকে বিরত থাকল কিনা কিংবা মুনাফিকসুলভ তওবা করল কিনা? তা আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে। তাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কুধারণা পোষণ করার অধিকার নেই। উপদেশ শোনা সত্ত্বেও যারা এ ধরনের কথা ও কারবারের পুনরাবৃত্তি ঘটায়– সুদ যেহেতু হারাম এ কারণে তারা দোজখে প্রবিষ্ট হবে। আর "সুদ ব্যবসার মতোই হালাল" তাদের এ ধরনের অন্যায় উক্তি কুফুরি হওয়ার কারণে তারা চিরস্থায়ীভাবে দোজখি হবে। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٧٦. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا يَنْقُصُهُ وَيُذْهِبُ بَرَكَتَهُ وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ يَزِيْدُهَا وَيُنَمِّيْهَا وَيُضَاعِفُ ثَوَابَهَا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ بِتَحْلِيْلِ الرِّبٰوا اَثِيْمٍ فَاجِرٍ بِاَكْلِهِ اَىْ يُعَاقِبُهُ.

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন তা হ্রাস করে দেন এবং তা হতে বরকত উঠিয়ে নেন এবং দান বৃদ্ধি করেন তার প্রবৃদ্ধি করেন এবং তার পুণ্যফল বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ সুদ হালাল ধারণাকারী প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ এবং তা ভক্ষণকারী পাপী অন্যায়কারীকে ভালোবাসেন না অর্থাৎ তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

٢٧٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

২৭৭. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রক্ষিত। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

٢٧٨. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا اُتْرُكُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ صَادِقِيْنَ فِىْ اِيْمَانِكُمْ فَاِنَّ مِنْ شَانِ الْمُؤْمِنِ اِمْتِثَالُ اَمْرِ اللّٰهِ نَزَلَتْ لَمَّا طَالَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ النَّهْىِ بِرِبٰوا كَانَ لَهُ قَبْلُ.

২৭৮. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ত্যাগ কর ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। ঈমানের মধ্যে যদি তোমরা সাচ্চা হয়ে থাক। কেননা আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই হলো মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, তার কর্তব্য। সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণের কেউ কেউ পূর্বের বকেয়া পাওনা তলব করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তাহকীক ও তারকীব

يَمْحَقُ : মুছে ফেলেন, হ্রাস করেছেন। مَحْق বলা হয় কোন বস্তু ক্রমান্বয়ে কমে যাওয়া। يُنَمِّيْهَا : বৃদ্ধি করেছেন। اَثِيْمٌ : অধিক গোনাহকারী। اَلْمُتَمَادِىْ فِى الذُّنُوْبِ - يُعَاقِبُ : শাস্তি প্রদান করবেন। ذَرُوْا : ছেড়ে দাও, ত্যাগ কর। اِمْتِثَالُ : পালন করা। طَالَبَ : তলব করল, তাগাদা দিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ : এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সদকাকে বাড়িয়ে দেন। এখানে সুদের সাথে সদকার আলোচনা এক বিশেষ সামঞ্জস্যের দরুন ঘটেছে। তা হলো, সুদ ও সদকার তত্ত্বের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। উভয়ের ফলাফলও ভিন্ন। সাধারণত উভয় ধরনের কাজ আঞ্জামকারীদের নিয়ত ও উদ্দেশ্যের মধ্যেও ব্যবধান থাকে।

সত্তাগত পার্থক্য : দান সদকার মধ্যে কোনো বিনিময়বিহীন অন্যদেরকে নিজেদের সম্পদ দান করা হয়। আর সুদের মধ্যে বিনিময়বিহীন অন্যের মাল গ্রহণ করা হয়। এ উভয় শ্রেণির নিয়ত ও উদ্দেশ্য এ কারণে সাংঘর্ষিক যে, দান-সদকাকারীরা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের মাল ঘাটতির বা নিঃশেষের সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহীতা নিজের বর্তমান অবৈধ সম্পদের উপর আরও সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষী থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

পরিণতির ক্ষেত্রে পার্থক্য : দান-সদকা দ্বারা সামাজে হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও সমবেদনা জন্ম নেয়। **পক্ষান্তরে সুদের দ্বারা** পারস্পরিক শত্রুতা, হিংসা, ক্রোধ, ঘৃণা ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা প্রসারিত হয়।

সুদ নিশ্চিহ্ন করা এবং সদকা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ও তা প্রত্যক্ষকরণ পূর্ণরূপে পরকালে ঘটবে। সুদি কারবার দ্বারা নামে মাত্রও কোনো বরকত ও মঙ্গল দৃষ্টিগোচর হবে না। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ শবে মে'রাজে এক ব্যক্তিকে রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে দেখেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে? হযরত জিবরাঈল (আ.) জবাব দিলেন– লোকটি ছিল সুদখোর মহাজন। যেহেতু সে সাধারণ দরিদ্র মানুষের সম্পদ অত্যন্ত নির্মমভাবে হরণ করত, তাদের রক্তশোষণ করে মোটাতাজা হয়েছিল। এ কারণে সুদখোরকে রক্তের নদীতে সন্তরণ করতে দেখা গেছে। এছাড়া দুনিয়ায়ও সুদখোর গোষ্ঠীর ধ্বংসাত্মক পরিণাম বহুবার দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সুদখোরির অভ্যাস মহাজনদের অন্তরে অর্থের লালসা বাড়িয়ে দেয়। মানবতা ও সহমর্মিতা বিদায় নেয়। জীবনের চেয়ে অর্থের মূল্যই তাদের দৃষ্টিতে বেশি হয়। সম্পদ হাতছাড়া হওয়া তাদের নিকট প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার ন্যায় হয়ে থাকে। ফলে তারা নিজেরাও সম্পদ দ্বারা পূর্ণরূপে শান্তিভোগ করতে পারে না। এর বিপরীতে দান-সদকার সমূহ বরকত জাতীয় সমবেদনা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে একে অন্যের অংশীদারিত্ব উভয় শ্রেণির মধ্যে দর্শনীয় বিষয়।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ : এর মধ্যে উভয় শ্রেণির নাফরমান শামিল রয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার আকিদা রাখা সত্ত্বেও সুদী কারবারকারী ব্যক্তিবর্গ এবং সুদ হারাম হওয়ার যারা আকিদা রাখে না এ উভয় শ্রেণি দোজখে প্রবিষ্ট হবে। তবে যে সকল সুদখোর সুদকে হালাল মনে করত তারা চিরস্থায়ীভাবে দোজখি হবে।

শান্তির উপকরণ এবং শান্তি এক জিনিস নয় : কারো সন্দেহ হতে পারে যে, বর্তমানে দেখা যায় সুদখোর শ্রেণি অনেক ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী। শান্তির বিভিন্নরূপ সরঞ্জাম; খাবার, বসবাসের সামগ্রী সব তাদেরই হাতে। কিন্তু চিন্তাভাবনা করলে দেখা যায়, শান্তির উপকরণ এবং প্রকৃত শান্তির মধ্যে বহু ব্যবধান রয়েছে। শান্তির আসবাব তো বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কলকারখানায় তৈরি হয়, বিভিন্ন বিপনী বিতানে বিক্রি হয়। কিন্তু শান্তি বলে যে বস্তু রয়েছে, তা কোনো ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয় না, কোনো বিপনী বিতানে বিক্রি হয় না, বরং তা এমন এক রহমত যা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত হয়। তা অনেক সময় শত সহস্র শান্তিসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও অর্জিত হয় না। সামান্য নিদ্রার কথা ধরা যাক, নিদ্রা আনয়নকল্পে এ উপায় অবলম্বন করা যায় যে, উত্তম ভবন নির্মিত হবে, যেখানে আলো-বাতাসের পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে, ঘরে মনোরম ফার্নিচার, পছন্দসই লেপ-তোষক ইত্যাদি হবে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও কি নিদ্রা আসা অনিবার্য? আপনি যদি এতে একমত না হন তাহলে আপনার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এ ব্যাপারে নেতিবাচক উত্তর দেবে। যাদের কোনো কারণে নিদ্রা আসে না। আমেরিকার ন্যায় ধনী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সম্পর্কে বিভিন্ন রিপোর্ট দ্বারা জানা যায় যে,৭৫% মানুষ ঘুমের বড়ি সেবন না করে ঘুমাতে পারে না এবং কোনো কোনো সময় ঘুমের বড়িও কার্যকর হয় না। বাজার থেকে আপনি ঘুমের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু ঘুম কোন বাজার থেকে ক্রয় করবেন? এভাবে অন্যান্য শান্তির ব্যাপারেও চিন্তা করুন!

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ : জাহিলি যুগে ঋণ আদায় না হওয়ার কারণে সুদের পর সুদের প্রচলন ছিল। মহাজনদের মুনাফা বেড়েই চলত, ফলে সামান্য অর্থ এক সময় পাহাড়াকার ধারণ করত, আর তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে যেত। এর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, কেউ যদি অভাবগ্রস্ত হয় [তাহলে সুদ নেওয়া তো দূরের কথা মূলধন আদায়ে] তাকে সহজভাবে অবকাশ দাও। আর যদি সম্পূর্ণ ঋণ ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা অতি উত্তম। বিভিন্ন হাদীসে এর অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। অনুধাবন করুন, উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কত ব্যবধান। মুসলিম জাতি যদি এ বরকতময় ঐশী বিধানকে বাস্তবায়ন না করে তাতে ইসলামের উপর অভিযোগ কিসের? কতই না ভালো হতো যদি বিশ্বের মুসলিমগণ তাদের ধর্মের উপকারিতা ও গুরুত্ব বুঝে তদনুযায়ী তাদের জীবন সজ্জিত করত।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ : কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ আয়াত নাজিল হওয়ার কিছুদিন পরেই রাসূল ﷺ ইহধাম ত্যাগ করেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

http://islamiboi.wordpress.com

২৭৯. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا مَا أُمِرْتُمْ بِهٖ فَأْذَنُوْا اِعْلَمُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لَكُمْ فِيْهِ تَهْدِيْدٌ شَدِيْدٌ لَهُمْ وَلَمَّا نَزَلَتْ قَالُوْا لَايَدَى لَنَا بِحَرْبِهٖ وَإِنْ تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أُصُوْلُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ بِزِيَادَةٍ وَلَا تُظْلَمُوْنَ بِنَقْصٍ ـ

২৮০. وَإِنْ كَانَ وَقَعَ غَرِيْمٌ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهُ أَىْ عَلَيْكُمْ تَاخِيْرُهُ إِلٰى مَيْسَرَةٍ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا أَىْ وَقْتِ يُسْرِهٖ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا بِالتَّشْدِيْدِ عَلٰى إِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْأَصْلِ فِى الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيْفِ عَلٰى حَذْفِهَا أَىْ تَتَصَدَّقُوْا عَلَى الْمُعْسِرِ بِالْإِبْرَاءِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ خَيْرٌ فَافْعَلُوْهُ فِى الْحَدِيْثِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

২৮১. وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ تُرَدُّوْنَ وَلِلْفَاعِلِ تَصِيْرُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى فِيْهِ كُلُّ نَفْسٍ جَزَاءَ مَا كَسَبَتْ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَّشَرٍّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ بِنَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ ـ

অনুবাদ :

২৭৯. তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যদি তোমরা না কর তবে ঘোষণা শোন জেনে রাখ, তোমাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের যুদ্ধ। এ আয়াতটিতে তাদের প্রতি চরম হুমকি বিদ্যমান। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর ঐ সাহাবীরা বললেন, তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কোনো শক্তি আমাদের নেই। যদি তোমরা তওবা কর তা থেকে ফিরে আস তবে তোমাদের মূলধন আসল ধন। তাতে বৃদ্ধি দেখিয়ে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং হ্রাস ঘটিয়ে তোমাদেরকেও অত্যাচার করা হবে না।

২৮০. যদি সে খাতক অভাবগ্রস্ত হয় كَانَ এটা এ স্থানে تَامَّة তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দান مَيْسَرَة -এর س অক্ষটি ফাতাহ ও পেশ উভয়রূপেই পাঠ করা যায় অর্থাৎ সচ্ছলতার সময়। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত বিলম্ব করা তোমাদের কর্তব্য। যদি সদকা করে দাও تَصَدَّقُوْا -এর ص তাশদীদসহ পাঠ করা হলে মূলত ص -এ ت -এর ইদগাম হয়েছে বলে বিবেচ্য হবে। আর তা বিলুপ্ত করে تَخْفِيْف [লঘু আকারে ; তাশদীদ ব্যতীত] রূপেও পাঠ করা যায়। অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত খাতককে ঋণের দাবি হতে মুক্ত দিয়ে যদি তা তার উপর সদকা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যদি তোমরা জান যে তা কল্যাণকর তবে তা তোমরা কর। হাদীসে আছে যে, যদি কেউ অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দেয় বা ঋণ মাফ করে দেয় তবে আল্লাহ তা'আলা নিজের ছায়ায় তাকে ছায়া প্রদান করবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। -[মুসলিম]

২৮১. তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُوْنَ এটা مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে- প্রত্যানীত হবে। আর مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্যরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে- তোমরা ফিরে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। অতঃপর ঐ দিন প্রত্যেককে তার কর্ম অর্থাৎ ভালো বা মন্দ যা করেছে তার প্রতিফল পুরাপুরি প্রদান করা হবে। আর সৎ আমল হ্রাস করে ও মন্দ আমল বৃদ্ধি করে তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায় করা হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِحَرْبٍ : حَرْبٌ -এর نَكِرَة টি تَعْظِيْم وَ شِدَّت বুঝানোর জন্যে সেই সাথে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে নিসবত করার দ্বারা ভয়াবহতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَدَ لَنَا : اَیْ لَا طَاقَةَ لَنَا

قَوْلُهُ وَقَعَ غَرِيْمٌ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, وَاِنْ كَانَ -এর كَانَ টি كَانَ تَامَّة ; তার খবরের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ كَانَ শব্দটি এখানে وَقَعَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَیْ عَلَيْكُمْ تَاخِيْرُهٗ : فَنَظِرَةٌ হলো মুবতাদা, আর তার খবর মাহযূফ রয়েছে। তাহলো عَلَيْكُمْ تَاخِيْرُهٗ আর এখানে খবরটি মাহযূফ রাখার প্রয়োজন এজন্য হয়েছে যে, فَنَظِرَةٌ জুমলা হয়ে جَوَابُ الشَّرْطِ হবে। আর تَاخِيْرُهٗ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হযেছে যে, نَظِرَة শব্দটি اِنْظَارٌ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো- অবকাশ দেওয়া; نَظَرٌ থেকে আসেনি, যার অর্থ হলো- দেখা।

قَوْلُهُ وَقْتِ يُسْرِهٖ : অংশটুকু দ্বারা ইশারা করেছেন যে, مَيْسَرَة শব্দটি ظَرْف হয়েছে; مَصْدَر مِيْمِى নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুদের শাস্তি : উপরের আয়াতসমূহে সুদখোরের জন্যে মোট পাঁচটি শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. تَخَبُّط ইরশাদ করেছেন- لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

২. مَحْق ইরশাদ হয়েছে - يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ

৩. حَرْب ইরশাদ হয়েছে- فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

৪. كُفْر ইরশাদ হয়েছে - وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার পরও যদি কেউ সুদ হলাল মনে করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে কুফরিতে নিপতিত হবে।

৫. خُلُوْدٌ فِى النَّارِ ইরশাদ হয়েছে- وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

http://islamiboi.wordpress.com

٢٨٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ تَعَامَلْتُمْ بِدَيْنٍ كَسَلَمٍ وَقَرْضٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى مَعْلُوْمٍ فَاكْتُبُوْهُ اِسْتِيْثَاقًا وَدَفْعًا لِلنِّزَاعِ وَلْيَكْتُبْ كِتَابَ الدَّيْنِ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ بِالْحَقِّ فِىْ كِتَابَتِهٖ لَا يَزِيْدُ فِى الْمَالِ وَالْاَجَلِ وَلَايَنْقُصُ وَلَا يَأْبَ يَمْتَنِعْ كَاتِبٌ مِّنْ اَنْ يَّكْتُبَ اِذَا دُعِىَ اِلَيْهَا كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ اَىْ فَضَّلَهُ بِالْكِتَابَةِ فَلَا يَبْخَلْ بِهَا وَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَأْبَ فَلْيَكْتُبْ تَاكِيْدٌ وَلْيُمْلِلِ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ الدَّيْنُ لِاَنَّهُ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ فَيُقِرُّ لِيَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ فِىْ اِمْلَائِهٖ وَلَا يَبْخَسْ يَنْقُصْ مِنْهُ اَىِ الْحَقِّ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا مُبَذِّرًا اَوْ ضَعِيْفًا عَنِ الْاِمْلَاءِ لِصِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ لِخَرَسٍ اَوْ جَهْلٍ بِاللُّغَةِ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ مُتَوَلِّىْ اَمْرِهٖ مِنْ وَالِدٍ وَ وَصِيٍّ وَقَيِّمٍ وَمُتَرْجِمٍ .

অনুবাদ :

২৮২. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের লেনদেন কারবার কর যেমন– 'সালাম' বা ঋণের কারবার কর। তখন বিষয়টির দৃঢ়তা ও ভবিষ্যতের বিবাদ নিরসনার্থে তা লিখে রাখ। তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক যেন তা ঋণ পত্র ন্যায়ভাবে লিখে দেয়। অর্থাৎ মাল বা সময়ের মধ্যে যেন নিজ হতে হ্রাস বা বৃদ্ধি করে না লিখে। লেখক যখন তাকে লিখে দিতে ডাকা হয় তখন সে লিখতে অস্বীকার করবে না। অসম্মতি জানাবে না। যেহেতু আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন كَمَا عَلَّمَهُ -এর كَاف টি لَا يَابَ -এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সে যেন লিখে। فَلْيَكْتُبْ এটা تَاكِيْد [তাকীদ] স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। তাকে যেহেতু তিনি লিখনশক্তি দ্বারা মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে তার কৃপণতা প্রদর্শন উচিত হবে না। যার উপর হক ঋণ বর্তাবে অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা সে যেন লেখককে বিষয়বস্তু বলে দেয়। কেননা [পরে বিবাদ সৃষ্টি হলে] তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হবে। সুতরাং যা তার উপর বর্তাবে তা জেনে রেখে সে যেন তার স্বীকৃতি দিয়ে রাখল। তা লিখাতে গিয়ে সে যেন তার প্রভুকে ভয় করে। আর এটার উক্ত হক হতে কিছু যেন হ্রাস না করে না কমায়। যার উপর হক বর্তাবে অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা সে যদি নির্বোধ কম বুদ্ধির, অপব্যয়ী কিংবা বৃদ্ধাবস্থা বা কম বয়সের দরুন সে যদি লিখাতে দুর্বল হয় বা বোবা, ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি কারণে সে যদি লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক অর্থাৎ পিতা, অছি, তত্ত্বাবধায়ক, অনুবাদক ইত্যাদি যারা তার কার্য-নির্বাহী রয়েছে তারা ন্যায়ভাবে তা লিখিয়ে দেবে।

http://islamiboi.wordpress.com

بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا اَشْهِدُوْا عَلَى الدَّيْنِ شَهِيْدَيْنِ شَاهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اَيْ بَالِغِي الْمُسْلِمِيْنَ الْاَحْرَارِ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا اَيِ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ يَشْهَدُوْنَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِدِيْنِهٖ وَعَدَالَتِهٖ وَتَعَدُّدُ النِّسَاءِ لِاَجْلِ اَنْ تَضِلَّ تَنْسٰى اِحْدٰيهُمَا الشَّهَادَةَ لِنَقْصِ عَقْلِهِنَّ وَضَبْطِهِنَّ فَتُذَكِّرَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اِحْدٰيهُمَا الذَّاكِرَةُ الْاُخْرٰى النَّاسِيَةَ وَجُمْلَةُ الْاِذْكَارِ مَحَلُّ الْعِلَّةِ اَيْ لِتُذَكِّرَ اِنْ ضَلَّتْ وَدَخَلَتْ عَلَى الضَّلَالِ لِاَنَّهٗ سَبَبُهٗ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ اِنْ شَرْطِيَّةً وَرَفْعِ تَذَكَّرَ اِسْتِيْنَافٌ جَوَابُهٗ .

অনুবাদ : সাক্ষীদের মধ্যে দীনদারি, আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠার কারণে যাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট তাদের মধ্যে দুজন সাবালক, মুসলিম, স্বাধীন পুরুষ এ ঋণের বিষয়ে সাক্ষী রাখবে। যদি দুজন পুরুষ সাক্ষী না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্যদান করবে। মহিলাদের একাধিক হওয়ার কারণ হলো, সাধারণভাবে তাদের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি কম থাকার কারণে তাদের একজন যদি বিভ্রান্ত হয় বিষয়বস্তু ভুলে যায় তবে যার স্মরণে আছে সে অপরজনকে ভুলকারিণীকে স্মরণ করিয়ে দেবে فَتُذَكِّرَ এটা তাশদীদসহ ও তাখফীফ বা তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

স্মরণ করানো সম্পর্কিত এ বাক্যটি উক্ত বিধানের হেতু রূপে গণ্য। অর্থাৎ যদি একজন ভুলে যায়, বিস্মৃতির শিকার হয় তবে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। কেননা এ বিস্মৃতিই তার [স্মরণ করিয়ে দেওয়ার] মূল কারণ। বস্তুত اِذْكَار হলো لَامِ عِلَّت -এর প্রবেশস্থল। اَيْ لِتُذَكِّرَ اِنْ ضَلَّتْ আর لَامِ عِلَّت টি ضَلَال -এর উপর প্রবেশ করার কারণ হলো সেটিই হলো تَذْكِيْر -এর সবব। আর এক কেরাতে اِنْ شَرْطِيَّه টি কাসরা এবং রফাসহ جُمْلَه مُسْتَانِفَه এবং جَوَاب شَرْط হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَامَلْتُمْ : تَدَايَنْتُمْ -এর অর্থ বর্ণনা করার জন্যে تَعَامَلْتُمْ -এর পরে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা تَدَايُن -এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা– ১. পরস্পরে বাকি লেনদেন করা। ২. বদলা দেওয়া। যেমন বলা হয়– كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' এখানে প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য। আরো একটি কারণ এই যে, পরে উল্লিখিত دَيْن শব্দটি تَدَايَنْتُمْ -এর জন্যে যাতে تَاسِيْس হয় تَاكِيْد না হয়। এজন্য تَعَامَلْتُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা تَدَايَنْتُمْ -কে دَيْن -এর অর্থে ধরা হলে সামনের دَيْن শব্দ تَدَايَنْتُمْ -এর تَاكِيْد হবে। অথচ تَاكِيْد থেকে تَاسِيْس উত্তম। তাই তদায়নতম -কে تَعَامَلْتُمْ -এর অর্থে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ اِنْ شَرْطِيَّةً وَرَفْعِ تَذَكَّرَ اِسْتِيْنَافٌ جَوَابُهٗ : অর্থ فَتُذَكِّرَ জুমলায়ে মুস্তানিফা হবে এ অর্থে যে, তার মধ্যে اِنْ شَرْطِيَّة আমল করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র ও : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে সুদি লেনদেনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং দান-সদকার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এখন পরস্পরে ঋণ লেনদেনের বিধান ও মাসআলার দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। কারণ সুদি লেনদেনকে যখন হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে আর সকল মানুষ দান-খয়রাত করার ক্ষমতা রাখে না এবং কিছু সংখ্যক মানুষ দান-খয়রাত গ্রহণকেও পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় মানবিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যে একটি উপায়ই থেকে গেল, তা হলো ঋণগ্রহণ। এ কারণে

http://islamiboi.wordpress.com

[illegible] ঋণ প্রদানের বড়ই ছওয়াব বর্ণিত হয়েছে তবে ঋণ যেভাবে এক অনস্বীকার্য জরুরি বিষয় এ ক্ষেত্রেও [illegible] বা গুরুত্ব না দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ দ্বন্দ্ব-কলহের কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঋণ সম্পর্কে জরুরি দিক-নির্দেশনা দান করেছেন। এ আয়াতকে 'আয়াতে দাইন' বলা হয়। এটা কুরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। ঋণ বা বাকি লেনদেনের দুটি ধরন আছে যথা–

ক. পণ্য নগদ উসুল করবে, নগদ গ্রহণ করবে এবং মূল্য পরিশোধের জন্যে মেয়াদ নির্ধারণ করবে।

খ. পণ্যের মূল্য নগদ প্রদান করবে, আর পণ্য হস্তান্তরের জন্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ স্থির করবে। দ্বিতীয়টিকে পরিভাষায় بَيْع سَلَم [সলম চুক্তি] বলে। হাদীসের দৃষ্টিতে এটা বৈধ। যদিও অনুপস্থিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى : ব্যাখ্যাকারগণ ইঙ্গিত স্বরূপ مَعْلُوْم শব্দ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো রূপ অস্পষ্টতা রাখা ঠিক নয়। যেমন বলল, শীতকালে বা গরমকালে ফসল কাটার সময় দিয়ে দেব। এগুলো প্রত্যেকটি অস্পষ্ট। এ ধরনের অস্পষ্টতা থেকে বাঁচার জন্যে মাস ও দিন তারিখ উল্লেখ করা জরুরি।

قَوْلُهُ فَاكْتُبُوْهُ : অর্থাৎ, যখন তোমরা পরস্পরে বাকি লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ। এ আয়াতে একটি বিশেষ রীতি বর্ণিত হয়েছে। তা হলো বাকি লেনদেন লিখে রাখা। সাধারণত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঋণ লেনদেনের বিষয়টি লিখে রাখা ও এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখাকে দূষণীয় এবং অনাস্থার দলিল মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, ঋণ এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তবলি লিখে রাখা উচিত এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোনোরূপ কলহ সৃষ্টি না হয়। এ আয়াতে অপর একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, ঋণ লেনদেন করলে তার মেয়াদ যেন অবশ্যই নির্ধারণ করা হয়। মেয়াদবিহীন ঋণ লেনদেন জায়েজ নয় কারণ এর দ্বারা দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, মেয়াদ সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়

قَوْلُهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ : কুরআন অবতরণের যুগে লেখার প্রচলন ততটা ছিল না, শিক্ষিত মানুষ কমই পাওয়া যেত। বর্তমান উন্নতির যুগেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার হার অতি নগণ্য কাজেই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখকের যা মনে চায় তাই লিখে দেবে। ফলে কারো ক্ষতি এবং কারো উপকার সাধিত হবে। এ করণেই বলা হয়েছে যে, লেখকের জন্যে ন্যায়নিষ্ঠা ও সততার সাথে সঠিক বিষয়টি লেখা আবশ্যক। এ লেখনীর সারমর্ম যেহেতু নিজ জিম্মায় অন্যের অধিকারের স্বীকারোক্তিকরণ, কাজেই লেখার ব্যবস্থা করা তারই দায়িত্ব, যার উপর অন্যের অধিকার বা হক থাকে। যে লিখবে এবং লিখাবে উভয়ের অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা জরুরি। [illegible] আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا : কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে, যার উপর অন্যের হক চেপে বসে সে অবুঝ কিংবা বৃদ্ধ, নাবালেগ, বোবা বা ভিন্নভাষী হতে পারে, যার দরুন লেখকের ভাষা সে বুঝে না। ফলে সে চুক্তিনামা লিখাতে সক্ষম হয় না। এমন ক্ষেত্রে তার অভিভাবক বা উকিল তার দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে।

সাক্ষ্যের ব্যাপারে কতিপয় জরুরি নীতি : পূর্বের আয়াতে চুক্তিনামা লিখা ও লিখানোর বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শুধু চুক্তিনামা লিখাই যথেষ্ট নয়, বরং সে ব্যাপারে সাক্ষী বানাবে, যাতে দ্বন্দ্বের সময় আদালতে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা হাকিম রায় দিতে পারেন। এ কারণেই শুধু লেখনী বা চুক্তিনামা শরয়ী দলিল নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যাপারে শরিয়তসিদ্ধ সাক্ষী না পাওয়া যাবে। বর্তমানেও আদালতে শুধু লেখনীর উপর মৌখিক সাক্ষী ছাড়া কোনো রায় দেওয়া হয় না।

সাক্ষ্যের ব্যাপারে দুজন ন্যায়নিষ্ঠাবান ধার্মিক মুসলমান পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা হওয়া আবশ্যক।

قَوْلُهُ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى : এর দ্বারা এক পুরুষের স্থলে দুই মহিলাকে সাক্ষী বানানোর রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, দুজন মহিলাকে একজনের স্থলে রাখার উদ্দেশ্য এই যে, স্বাভাবিকভাবে মহিলারা পুরুষের তুলনায় দুর্বল সৃষ্টি ও স্বল্প বুঝের অধিকারীণী। এ কারণে এক মহিলা যদি ঘটনার কিছু অংশ ভুলে যায় তখন অপর মহিলা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। বাকি কথা হলো, মহিলাকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল জ্ঞান করা হয়েছে কেন? পুরুষের ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা ধর্তব্য হয়নি কেন? বস্তুত এ প্রশ্নটি মানুষের শারীরিক কাঠামো ও বিভিন্ন উৎসের ব্যাপারে প্রশ্ন করার ন্যায় অর্থাৎ গর্ভধারণ ও স্তন্যের সম্পর্ক মহিলার ক্ষেত্রে করা হলো কেন? পুরুষ জাতি মহিলাদের চেয়ে শক্তিশালী ও সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অযোগ্য মনে করা হলো কেন? মহান স্রষ্টা যিনি বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে অবগত, তিনি সর্ববিষয়ে সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কেও অবগত। হ্যাঁ যদি ব্যবসায়িক লেনদেন সরাসরি হাতে হাতে হয়, আর তা লিখা না হয়, তা দূষণীয় নয়। অর্থাৎ দৈনন্দিন বেচাকেনা ও লেনদেন লিখে রাখা জরুরী নয়। তথাপি যদি লিখে রাখা হয় তাহলে তা উত্তম। যেমন বর্তমানে ক্যাশ-মেমোর প্রচলন রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا زَائِدَةٌ دُعُوا إِلَى
تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَلَا تَسْئَمُوا تَمَلُّوا مِنْ
أَنْ تَكْتُبُوهُ أَيْ مَا شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ
لِكَثْرَةِ وُقُوعِ ذٰلِكَ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا قَلِيلًا
أَوْ كَثِيرًا إِلَى أَجَلِهِ وَقْتِ حُلُولِهِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ
فِي تَكْتُبُوهُ ذٰلِكُمْ أَيِ الْكُتُبُ أَقْسَطُ أَعْدَلُ
عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَيْ أَعْوَنُ عَلَى
إِقَامَتِهَا لِأَنَّهُ يُذَكِّرُهَا وَأَدْنَى أَقْرَبُ إِلَى
أَنْ لَا تَرْتَابُوا تَشُكُّوا فِي قَدْرِ الْحَقِّ
وَالْأَجَلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَقَعَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ وَفِي
قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ فَتَكُونُ نَاقِصَةً وَاسْمُهَا
ضَمِيرُ التِّجَارَةِ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ أَيْ
تَقْبِضُونَهَا وَلَا أَجَلَ فِيهَا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِي أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُتَّجَرُ
فِيهِ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ أَدْفَعُ
لِلْاِخْتِلَافِ وَهٰذَا وَمَا قَبْلَهُ أَمْرُ نَدْبٍ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ صَاحِبَ الْحَقِّ وَمَنْ عَلَيْهِ
بِتَحْرِيفٍ أَوِ امْتِنَاعٍ مِنَ الشَّهَادَةِ أَوِ الْكِتَابَةِ
أَوْ لَا يَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَكْلِيفِهِمَا مَا
لَا يَلِيقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنْ تَفْعَلُوا
مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ
لَاحِقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ مَصَالِحَ أُمُورِكُمْ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ أَوْ
مُسْتَأْنَفٌ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

অনুবাদ : সাক্ষ্যদান বা সাক্ষী হওয়ার জন্যে যখন ডাকা হয় তখন সাক্ষীগণ যেন অস্বীকার না করে। مَا دُعُوْا এটা অর্থাৎ مَا শব্দটি এ স্থানে অতিরিক্ত। ছোট হোক বা বড় কম হোক বা বেশি যে হকের বিষয়ে তোমরা সাক্ষী হয়েছ মেয়াদসহ অর্থাৎ তার সময় শেষ হওয়ার সীমাসহ اِلٰى اَجَلِهٖ এটা تَكْتُبُوْهُ -এর ه সর্বনাম হতে حَال বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। লিখতে অধিক হারে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় বলে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। ত্যক্ত হয়ো না।

এটা অর্থাৎ লিখে নেওয়া আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর অধিক ইনসাফের ও প্রমাণের জন্যে দৃঢ়তর অর্থাৎ সাক্ষ্যদানের পক্ষে অধিকতর সহায়ক। কেননা তা তাকে মূল বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম হবে। এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদ ও পরিমাণ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার নিকটতর অধিক কাছের। কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর تِجَارَةٌ অপর এক কেরাতে এটা নসব সহকারে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় كَانَ টি نَاقِصَه বা অসমাপিকা বলে গণ্য হবে এবং تِجَارَةٌ [ব্যবসা] শব্দের প্রতি ইঙ্গিতবহ সর্বনাম هِيَ তার اِسْم বলে গণ্য হবে। তৎক্ষণাৎই কবজা করে নাও, যাতে কোনো মেয়াদ থাকে না, তা অর্থাৎ ঐ লেনদেনের বিষয় তোমরা না লিখলে কোনো দোষ নেই। যখন তোমরা বেচাকেনা কর তখন তার সাক্ষী রাখবে। কেননা এটা মতবিরোধ নিরসনে অধিক কার্যকরী।

এটা এবং পূর্বোল্লিখিত উভয় বিধানই মুস্তাহাব বলে বিবেচ্য।

লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অর্থাৎ লিখন বা সাক্ষ্যদানে তাদের সাধ্যের বাইরে কোনো জিনিস চাপিয়ে যার অধিকার সে অর্থাৎ ঋণদাতা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। কিংবা তার তাফসীর হলো, তারা কোনোরূপ পরিবর্তন করে বা সাক্ষ্যদান বা লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যার হক এবং যার উপর হক বর্তায় অর্থাৎ ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা তাদের কাউকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যদি তোমরা কর তবে তা তোমাদের জন্য অন্যায় অর্থাৎ আনুগত্যের সীমা অতিক্রম ও অন্যায় [বলে বিবেচিত]। তোমরা আল্লাহকে অর্থাৎ তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ সম্পর্কে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর বিষয়সমূহের শিক্ষা দেন। وَيُعَلِّمُكُمْ -এ বাক্যটিকে حَال مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ নির্ধারিত ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য বলে বিবেচনা করা যায়। অথবা এটা مُسْتَانِفَة বা একটি নতুন বাক্য। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষে অবহিত।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ : এর এক উদ্দেশ্য এই যে, কাউকে চুক্তিনামা লিখতে বা সাক্ষী হতে বাধ্য করা যাবে না। এর দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, লেখক যদি লেখার পারিশ্রমিক চায় কিংবা সাক্ষী আদালতে যাতায়াত বাবদ খরচ চায় তাহলে এটা তার প্রাপ্য।

قَوْلُهُ صَغِيْرًا كَانَ اَوْ كَبِيْرًا : এখানে كَانَ মাহযূফ ধরে ইশারা করেছেন যে, صَغِيْرًا এবং كَبِيْرًا হলো كَانَ مَحْذُوْف -এর খবর।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَقَعَ تِجَارَةً : تَكُوْنَ -এর তাফসীর تَقَعَ দ্বারা করে ইশারা করেছেন যে, এখানে كَانَ টি كَانَ تَامَّه আর تِجَارَة حَاضِرَة হলো তার اِسْم । অপর একটি কেরাতে تِجَارَة حَاضِرَة -এর মাঝে নসব দিয়ে পঠিত আছে। তখন تَكُوْنَ টি نَاقِصَة হবে। তাকদীরী ইবারত হবে– اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً حَاضِرَةً

قَوْلُهُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَوْ مُسْتَأْنِفٌ : এ অংশটুক দ্বারা একটি سُؤَال مُقَدَّر -এর জবাব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন : وَاتَّقُوا اللّٰهَ -এর উপর يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ -এর عَطْف সঠিক হয়নি। কেননা এর দ্বারা جُمْلَه اِنْشَائِيَّة -এর উপর جُمْلَه خَبَرِيَّة -এর عَطْف হয়, যা শুদ্ধ নয়।

উত্তর. এখানে واو টি عَاطِفَة নয়; বরং حَالِيَه বা اِسْتِئْنَافِيَّة

http://islamiboi.wordpress.com

٢٨٣. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ مُسَافِرِيْنَ وَتَدَايَنْتُمْ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرُهُنٌ وَفِىْ قِرَءَةٍ فَرِهٰنٌ مَقْبُوْضَةٌ تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ جَوَازَ الرَّهْنِ فِى الْحَضَرِ وَ وُجُوْدِ الْكَاتِبِ فَالتَّقْيِيْدُ بِمَا ذُكِرَ لِاَنَّ التَّوَثُّقَ فِيْهِ اَشَدُّ وَاَفَادَ قَوْلُهُ مَقْبُوْضَةٌ اِشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِى الرَّهْنِ وَالْاِكْتِفَاءَ بِهٖ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَ وَكِيْلِهٖ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَىِ الدَّائِنُ الْمَدِيْنَ عَلٰى حَقِّهٖ فَلَمْ يَرْتَهِنْ فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَىِ الْمَدِيْنُ اَمَانَتَهُ دَيْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ فِىْ اَدَائِهٖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لِاِقَامَتِهَا وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ خُصَّ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ وَلِاَنَّهُ اِذَا اَثِمَ تَبِعَهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْاٰثِمِيْنَ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ.

অনুবাদ :

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক অর্থাৎ যদি মুসাফির হও আর এমতাবস্থায় ঋণের লেনদেন কর আর কোনো লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখবে যা ঋণদাতার অধিকারে দেওয়া হবে। فَرُهُنٌ অপর এক কেরাতে এটা فَرِهٰنٌ রূপে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তার [বন্ধকের] মাধ্যমে বিষয়টি নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় করে নিবে।

সুন্নায় বর্ণিত আছে যে, বাড়িতে অবস্থান এবং লেখক উপস্থিত থাকাকালেও বন্ধক রাখা বৈধ। এ স্থানে বিধানটি উল্লিখিত শর্তে শর্তযুক্ত করার কারণ হলো, এ অবস্থায় নির্ভরযোগ্যকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় আরো বেশি।

مَقْبُوْضَةٌ [যা অধিকারে দেওয়া হবে] এ শর্তটি দ্বারা বুঝা যায়, রাহন বা বন্ধকের বেলায় [বন্ধকীয় বস্তুটি] 'কবজা' করা শর্ত। 'মুরতাহিন' বা যার নিকট বন্ধক থাকবে সে নিজে বা তার পক্ষ থেকে তদীয় উকিলের অধিকারে দেওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে। তোমরা যদি একে অপরকে বিশ্বাস কর অর্থাৎ ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার উপর আস্থা রাখে আর সেহেতু বন্ধক না নেয় তবে যাকে বিশ্বাস করা হলো অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা সে যেন যথাযথভাবে আমানত অর্থাৎ ঋণ প্রত্যর্পণ করে এবং তা আদায়ের বিষয়ে সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে।
যখন তোমাদেরকে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে ডাকা হয় তখন তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করে তার অন্তর পাপী। এ স্থানে এর [অন্তরের] কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, সাক্ষ্যের মূল স্থান এটাই। দ্বিতীয়ত এটা যদি পাপী হয় তবে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এর অধীন বলে [ঐগুলোও পাপী হবে।] সুতরাং তাকে পাপীগণের মতোই শাস্তি প্রদান করা হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ الخ : এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, বন্ধকী লেনদেন সফরেই হতে হবে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, সফরে যেহেতু এ ধরনের বিষয় সংঘটিত হয়, এ কারণেই তাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধু লেখনীর মাধ্যমে ঋণ দিতে প্রস্তুত না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করবে। লেখনী এবং বন্ধক উভয়টি একত্রে জায়েজ। আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋণদাতা নিজের সান্ত্বনার জন্যে বন্ধক রাখতে পারে। তবে مَقْبُوْضَةٌ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় যে, বন্ধকী দ্রব্য দ্বারা উপকার লাভ করা যাবে না; বরং তার এতটুকু অধিকার আছে যে, পাওনা উসুল করা পর্যন্ত সে উক্ত বস্তুকে নিজের করায়ত্তে রাখবে।

قَوْلُهُ فَرُهُنٌ : শব্দটি হয়তো মাসদার হবে না হয় رِهْنٌ -এর বহুবচন। কোনো কোনো কেরাতে رُهُنٌ বহুবচনের সীগাহ রয়েছে।

قَوْلُهُ تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا : এ জুমলাটি মাহযূফ ধরার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ মাওসূফ সিফত মিলে মুবতাদা আর تَسْتَوْثِقُوْنَ بِهَا জুমলা হয়ে তার খবর।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিতর্কিত ব্যাপারে যে ব্যক্তির সঠিক বিষয়টি জানা আছে, সে যেন সাক্ষ্য গোপন না করে, সে তা গোপন করলে তার অন্তর গুনাগার হবে। এখানে অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ এই যে, কেউ যেন এটাকে মুখের গুনাহ মনে না করে। কারণ প্রথমে অন্তর থেকেই ইচ্ছা সূচিত হয়। এ কারণে অন্তর প্রথমে গুনাহগার হবে। –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٨٤. لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا تُظْهِرُوا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ مِنَ السُّوءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ أَوْ تُخْفُوهُ تُسِرُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ يُجْزِكُمْ بِهِ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيبَهُ وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعِ اَىْ فَهُوَ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُمْ وَجَزَاؤُكُمْ.

অনুবাদ :

২৮৪. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে মন্দ চিন্তা এবং তা করার সংকল্প যা আছে তা জাহির কর প্রকাশ কর বা গোপন রাখ লুকায়িত রাখ আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার হিসাব নেবেন। অর্থাৎ তোমাদেরকে এর প্রতিফল দেবেন। অতঃপর যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করবেন তাকে ক্ষমা করবেন, আর যাকে শাস্তিদানের ইচ্ছা করবেন তাকে শাস্তি দেবেন। يَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ এ দুটি বাক্য শর্তবাচক إِنْ تُبْدُوا -এর জওয়াব (يُحَاسِبْكُمْ) -এর সাথে عَطْف বা অন্বয়রূপে জযমসহ পাঠ করা যায়। এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأ অর্থাৎ উদ্দেশ্য هُوَ -এর خَبَر বা বিধেয় রূপে এ দুটিকে رَفْع সহকারেও পাঠ করা যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তোমাদের হিসাব নেওয়া ও প্রতিদান দেওয়া -এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ الخ : এটা কুরআনের সর্ববৃহৎ সূরার সর্ববৃহৎ রুকূ'। এর মধ্যে তাওহীদি আকিদাকে পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। সূরার সূচনায় ধর্মীয় উসুল সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক শিক্ষা ছিল। আর সূরার সমাপ্তিতেও বুনিয়াদি আকিদার সামষ্টিক বিবরণ রয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 'হুসনুল খিতাম' বলা হয়।

হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, প্রভৃতি নেক আমল যে ব্যাপারে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা তা পালনে সচেষ্ট রয়েছি। এসব আমাদের সাধ্য বহির্ভূত নয়। কিন্তু অন্তরে যেসব খেয়াল ও সংকল্প জাগে তা আমাদের এখতিয়ারাধীন নয়। তা মানুষের শক্তির বাহিরে তথাপি আল্লাহ তা'আলা সে ব্যাপারে হিসাব নেওয়ার ঘোষণা করেছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, বর্তমানে তোমরা سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا বল। সাহাবীদের আনুগত্য দেখে আল্লাহ তা'আলা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অবতীর্ণ করলেন। এর দ্বারা প্রথম আয়াতটি রহিত হয়ে গেল। -[ফাতহুল কাদীর]

বুখারী, মুসলিম ও সুনানে আরবা'আ -এর নিম্নোক্ত হাদীসটিও এর সমর্থন করে–

إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسْوَسَتْ بِهٖ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ وَتَتَكَلَّمْ.

আমার উম্মতের অন্তরে যেসব কথা আসে 'আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যাপারে পাকড়াও হবে যেগুলোকে বাস্তবায়ন করা হয় বা যাকে প্রকাশ করা হয়।'

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অন্তরে সাধারণত ইচ্ছা এবং কল্পনার উপর পাকড়াও হবে না। যতক্ষণ না তাকে বাস্তবায়ন করবে কিংবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারীর ধারণা মতে, এ আয়াতটি মানসূখ নয়। কেননা হিসাবের জন্যে সাজা প্রদান অবধারিত নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যার হিসাব নেবেন অবশ্যই তাকে সাজা দেবেন; বরং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাফেরেরও হিসাব নেবেন। বহু মানুষ হিসাবের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ تُظْهِرُوْا : এ ব্যাখ্যা দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تُبْدُوْا শব্দটি اِبْدَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন। بَدْءٌ থেকে নয়, যার অর্থ- শুরু করা।
قَوْلُهُ مِنْ سُوْءٍ : -এর মধ্যে مِنْ বয়ানিয়া। এটা مَا -এর বর্ণনা।
قَوْلُهُ يُحَاسِبْكُمْ : এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে- ক. يُجْزِكُمْ তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। খ. يُخْبِرُكُنَّ তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। ব্যাখ্যাকার اَلْعَزْمِ عَلَيْهِ দ্বারা سُوْءٍ -এর ব্যাখ্যা প্রথম শব্দের দিক দিয়ে করেছেন। আর وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ-এর মধ্যে وَاو টি তাফসীরিয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের অন্তরে যেসব দৃঢ় সংকল্প আসে, অর্থাৎ যেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার দৃঢ় উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পাকড়াও করবেন। শুধু সাধারণ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর পাকড়াও করবেন না।
قَوْلُهُ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।
প্রশ্ন: وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ দ্বারা বুঝা যায় অন্তরের সাধারণ ইচ্ছার উপরও পাকড়াও হবে। অথচ এ ব্যাপারে বান্দার কোনো এখতিয়ার থাকে না। এমনিতেই বিভিন্ন সময় অন্তরে বিভিন্ন ইচ্ছা ও কামনা জাগে। কাজেই এর দ্বারা تَكْلِيْفُ مَا لَا يُطَاقُ সাব্যস্ত হয়।
উত্তর: مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ দ্বারা এমন ইচ্ছা উদ্দেশ্য যেগুলোকে বাস্তবে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প করা হয়। এভাবে ব্যাখ্যাকার (র.) يُحَاسِبْكُمْ -এর ব্যাখ্যা يُخْبِرْكُمْ দ্বারা করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, অন্তরের সাধারণ ইচ্ছার উপর কোনো পাকড়াও হবে না। যতক্ষণ না তাকে বাস্তবে পরিণত করবে। এর উত্তর দিয়েছেন যে, يُحَاسِبْكُمْ -এর অর্থ يُخْبِرْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দার আন্তরিক সাধারণ ইচ্ছার ব্যাপারেও অবহিত করবেন। যে সকল কপিতে يُجْزِكُمْ এসেছে তা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ দ্বারা মানসূখ হবে।
সার সংক্ষেপ : পূর্বোক্ত আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ الخ -কে যদি আম [ব্যাপক] রাখা হয় তাহলে আন্তরিক সাধারণ ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে শামিল করবে। দ্বিতীয়টি পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ দ্বারা মানসুখ হবে। আর পূর্বের আয়াতকে যদি দৃঢ় সংকল্পের উপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে নসখের প্রয়োজন হবে না; পরবর্তী আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বিশ্লেষণ হবে।
قَوْلُهُ عَطْفًا عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ : যদি يَغْفِرُ ও يُعَذِّبُ -কে জযম পড়া হয়, তাহলে শর্তের জবাব অর্থাৎ يُحَاسِبْ -এর উপর আতফ হবে, আর উভয়টিকে মারফূ' পড়লে هُوَ লুপ্ত মুবতাদার খবর হবে। বাক্যটি ইসতেনাফিয়া হবে।
قَوْلُهُ تُظْهِر : تُبْدُوْا -এর তাফসীর تُظْهِرُ দ্বারা করার উদ্দেশ্য এদিকে ইশারা করা যে, تُبْدُوْا শব্দটি اِبْدَاءٌ [প্রকাশ করা] থেকে এসেছে; بَدْءٌ [শুরু করা] থেকে নয়।
قَوْلُهُ مِنَ السُّوْءِ : এর مِنْ টি بَيَانِيَه বা বিবরণমূলক। আর বিবরণ দেওয়া হয়েছে مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ-এর মাঝে উল্লিখিত مَا -এর।
قَوْلُهُ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ : মুফাসসির (র.) اَلْعَزْمِ عَلَيْهِ বলে একটি প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন।
প্রশ্ন: وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ দ্বারা বোঝা যায় যে, অন্তরের ওয়াসওয়াসাসমূহেরও বিচার হবে। অথচ وَسَاوِس قَلْبِى বান্দার এখতিয়ারভুক্ত নয়। অধিকন্তু এটি تَكْلِيْفُ مَا لَا يُطَاقُ -এর শামিল।
উত্তর: মুফাসসির (র.) وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ বলে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন এভাবে যে, مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ দ্বারা ঐ সকল ওয়াসওয়াসা উদ্দেশ্য, যেগুলো আমলে পরিণত করার দৃঢ় সংকল্প করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) يُحَاسِبْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় يُجْزِكُمْ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এগুলোর বিচার হবে না; বরং সেগুলোর সম্পর্কে শুধু খবর দেওয়া হবে। তুমি অমুক ধারণা মনে পোষণ করেছ। আর যে নোসখায় يُحَاسِبْكُمْ -এর ব্যাখ্যায় يُجْزِكُمْ লিখা রয়েছে। তার উত্তর হলো- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা তা রহিত হয়েছে।
قَوْلُهُ وَالْفِعْلَانِ بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى جَوَابِ الشَّرْطِ وَالرَّفْعِ اَىْ فَهُوَ : অর্থাৎ يَغْفِرُ এবং يُعَذِّبُ -কে ضَمَّة সহ পড়া হলে جَوَاب شَرْط তথা يُحَاسِبْكُمْ-এর উপর عَطْف হবে। আর উভয়টিকে مَرْفُوْع পড়া হলে উভয়টি هو মুবতাদা মাহযূফের খবর হবে এবং جُمْلَة اِسْتِيْنَافِيَه হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٨٥. اٰمَنَ صَدَّقَ الرَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ
عَطْفٌ عَلَيْهِ كُلٌّ تَنْوِيْنُهٗ عِوَضٌ عَنِ
الْمُضَافِ اِلَيْهِ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ
وَكُتُبِهٖ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ وَرُسُلِهٖ
يَقُوْلُوْنَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ
فَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَمَا
فَعَلَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا
سَمِعْنَا مَا اَمَرْتَنَا بِهٖ سِمَاعَ قَبُوْلٍ
وَاَطَعْنَا نَسْاَلُكَ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ بِالْبَعْثِ.

২৮৫. রাসূল মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের তরফ হতে তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে অর্থাৎ তা সত্য বলে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মু'মিনগণও। اَلْمُؤْمِنُ এটা اَلرَّسُوْلُ এর সাথে عَطْف হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকে كُلٌّ -এর تَنْوِيْن [দুই পেশ] এ স্থানে مُضَاف اِلَيْه -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ كُتُبِه এটা বহুবচন ও একবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো কতক জনের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও কতক জনকে অস্বীকার করি না। আর তারা বলে তুমি আমাদেরকে যে সকল বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছ তা কবুল করার মতো আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ক্ষমা চাই, পুনরুত্থানের মাধ্যমে তোমারই নিকট প্রত্যাগমন প্রত্যাবর্তন।

٢٨٦. وَلَمَّا نَزَلَتِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ قَبْلَهَا شَكَا
الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ
الْمُحَاسَبَةُ بِهَا فَنَزَلَ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اَىْ مَا تَسَعُهٗ قُدْرَتُهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ مِنَ الْخَيْرِ اَىْ ثَوَابُهٗ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ مِنَ الشَّرِّ اَىْ
وِزْرُهٗ وَلَا يُؤَاخَذُ اَحَدٌ بِذَنْبِ اَحَدٍ وَلَا بِمَا
لَمْ يَكْسِبْهُ مِمَّا وَسْوَسَتْ بِهٖ نَفْسُهٗ.

২৮৬. উল্লিখিত اِنْ تُبْدُوْا الخ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর বিশ্বাসীগণ রাসূল ﷺ -এর খেদমতে ওয়াসওয়াসা বা মনের কুধারণা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এগুলোরও হিসাব-নিকাশ হবে শুনে তাদের খুবই আশঙ্কাবোধ হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন, আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অর্থাৎ যতটুকু একজনের সামর্থ্যে কুলায় ততটুকু পরিমাণই তিনি দায়িত্ব দেন। সে ভালো যা করে তা অর্থাৎ তার পুণ্যফল তারই এবং সে মন্দ যা করে তা অর্থাৎ তার পাপের বোঝা তারই। সুতরাং একজনের পাপে অন্যজনকে ধরা হবে না। মনে যে সমস্ত ওয়াস-ওয়াসা বা কুধারণা হয়, তা করার কৃতসংকল্প না হওয়া ও তা না করা পর্যন্ত ঐগুলোও ধরা হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

قُوْلُوْا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا بِالْعِقَابِ إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا تَرَكْنَا الصَّوَابَ لَا عَنْ عَمْدٍ كَمَا أَخَذْتَ بِهٖ مَنْ قَبْلَنَا وَقَدْ رَفَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ فَسُؤَالُهٗ اِعْتِرَافٌ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ

রَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا أَمْرًا يَثْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلُهٗ كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا أَيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَإِخْرَاجِ رُبُعِ الْمَالِ فِي الزَّكٰوةِ وَقَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ قُوَّةَ لَنَا بِهٖ مِنَ التَّكَالِيْفِ وَالْبَلَاءِ وَاعْفُ عَنَّا أُمْحُ ذُنُوْبَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ أَنْتَ مَوْلٰنَا سَيِّدُنَا وَمُتَوَلِّي أُمُوْرِنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَالْغَلَبَةِ فِي قِتَالِهِمْ فَإِنَّ مِنْ شَانِ الْمَوْلٰى أَنْ يَنْصُرَ مَوَالِيْهِ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَفِي الْحَدِيْثِ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لَهٗ عَقِبَ كُلِّ كَلِمَةٍ قَدْ فَعَلْتُ .

তোমরা বল, হে আমাদের প্রভু ! যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি সত্যকে আমরা পরিহার করে বসি তবে আমাদের পূর্ববর্তীগণকে এ কারণে যেমন পাকড়াও করেছ তেমন তুমি আমাদেরকে তোমার শাস্তিসহ পাকড়াও করো না।

হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মত হতে এ ধরনের পাপকর্মের শাস্তি রহিত করে দিয়েছেন। এর পরও এ সম্পর্কে ক্ষমা যাচনা করার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর এই মহা অনুগ্রহের স্বীকৃতি দান।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে যেমন বনু ইসরাঈলের উপর ছিল– তওবায় নিজেদের হত্যা করা, সম্পত্তির চতুর্থাংশের জাকাত প্রদান, নাপাকি লাগলে সে স্থানটি কেটে ফেলা ইত্যাদি কঠোর বিধান আমাদের উপর তেমন কঠোর বোঝা অর্থাৎ এমন ভারি দায়িত্ব যা বহন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তা আমাদের উপর অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার কষ্ট ও বিপদ আমাদের উপর অর্পণ করো না, যার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের মাফ কর, আমাদের প্রতি দয়া কর اَلرَّحْمَةُ [দয়া] শব্দটিতে مَغْفِرَةٌ ক্ষমা অপেক্ষা অধিক অনুকম্পা বিদ্যমান। তুমিই আমাদের অভিভাবক নেতা ও আমাদের সকল বিষয়ে কর্মবিধায়ক অতএব প্রমাণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় দান করে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য প্রদান কর। কারণ আশ্রিতদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করাই তো অভিভাবকের শান, তাঁর কর্তব্য।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ এগুলো তেলাওয়াত করে শুনান। প্রতিটি শব্দের পর তাঁকে বলা হয়েছিল– قَدْ فَعَلْتُ 'আমি নিশ্চিতভাবেই তা পূর্ণ করেছি।'

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ : প্রথম আয়াত নাজিলের পর সাহাবায়ে কেরাম ভয় পেয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ 'তোমরা বল, আমরা শুনলাম ও মানলাম।' অর্থাৎ প্রশ্ন জাগুক বা কঠিন মনে হোক, কোনো অবস্থাতেই মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করব না। তখন সকলের হৃদয় খুলে যায় এবং মনের অবচেতনে সকলের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়– سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ 'আমরা ঈমান আনলাম এবং আল্লাহর আদেশ মেনে নিলাম।' এভাবে তারা নিজেদের কষ্ট ও দ্বিধা সংশয় ঝেড়ে ফেলে আদেশ পালনে সংকল্প ও উদ্দীপনা প্রকাশ করলেন। আল্লাহর কাছে তাঁদের এ আকুতি পছন্দ হলো। কাজেই তিনি এ আয়াত দুটি ইরশাদ করলেন। প্রথম আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوْلُ -এর মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানের প্রশংসা করেছেন। যাতে তাদের ঈমানের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং পূর্বেকার সংশয় সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। এরপর দ্বিতীয় আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ -এর মাঝে বলে দেওয়া হয়েছে যে, কাউকে সাধ্যাতীত কষ্ট দেওয়া হয় না। তাই মন্দ কাজের খেয়াল ও কল্পনা বা ভুলত্রুটি ইত্যাদির জন্যে পাকড়াও হবে না। –[তাফসীরে ওসমানী]

হাদীসে এ দুটি আয়াতের ফজিলত বর্ণিত রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। এছাড়া আরও অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : যেহেতু اَلْمُؤْمِنُوْنَ-এর عَطْف হয়েছে اَلرَّسُوْلُ -এর উপর সেহেতু جُمْلَةٌ مَعْطُوْفَةٌ হয়ে خَبَر مُقَدَّم হবে আর كُلٌّ হবে مُبْتَدَأ مُؤَخَّر অথচ كُلٌّ নাকিরা হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ নয়।

উত্তর : كُلٌّ শব্দটি اِضَافَةً اِلَى الْغَيْرِ বা অন্যের প্রতি মুযাফ হওয়ার কারণে مَعْرِفَةٌ হয়েছে। কেননা كُلٌّ -এর তানবীনটি مُضَاف اِلَيْه -এর বদলে এসেছে। তাকদীরী ইবারত كُلُّهُمْ ছিল। আর عِوَض -এর হুকুম مُعَوَّض -এর মতোই হয়। তাই মারেফার প্রতি মুযাফ হওয়ার করণে শব্দটি মারেফা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : **প্রশ্ন** يَقُوْلُوْنَ উহ্য মানার প্রয়োজন কি?

উত্তর : لَا نُفَرِّقُ হলো جَمْع مُتَكَلِّم -এর সীগাহ। তার যমীরটি اَلرَّسُوْلُ ও اَلْمُؤْمِنُوْنَ -এর দিকে ফিরেছে। অথচ اِسْم ظَاهِر হওয়ার কারণে শব্দটি গায়েবের বিধানে শামিল। আর গায়েবের দিকে একই বাক্যে مُتَكَلِّم -এর যমীর ফিরতে পারে না। তাই نُفَرِّقُ -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য মেনেছেন, যাতে বহুবচন ও যমীরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আলে ইমরান মাদানী

وَهِىَ مِائَتَا اٰيَةٍ : ২০০ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে [আরম্ভ করছি]

---

١. الٓمّٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

٢. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ

٣. نَزَّلَ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ فِىْ اِخْبَارِهٖ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهٗ مِنَ الْكُتُبِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ

٤. مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ تَنْزِيْلِهٖ هُدًى حَالٌ بِمَعْنٰى هَادِيَيْنِ مِنَ الضَّلَالَةِ لِّلنَّاسِ مِمَّنْ تَبِعَهُمَا وَعَبَّرَ فِيْهِمَا بِاَنْزَلَ وَفِى الْقُرْاٰنِ بِنَزَّلَ الْمُقْتَضِىْ لِلتَّكْرِيْرِ لِاَنَّهُمَا اُنْزِلَا دَفْعَةً وَّاحِدَةً بِخِلَافِهٖ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَذَكَرَ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ لِيَعُمَّ مَا عَدَاهَا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِهٖ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ فَلَا يَمْنَعُهٗ شَىْءٌ مِنْ اِنْجَازِ وَعِيْدِهٖ وَوَعْدِهٖ ذُو انْتِقَامٍ عُقُوْبَةٍ شَدِيْدَةٍ مِمَّنْ عَصَاهُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى مِثْلِهَا اَحَدٌ ـ

অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিম-লাম মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

২. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তত্ত্বাবধায়ক।

৩. হে মুহাম্মদ! তিনি সত্যসহ بِالْحَقِّ এটা এ স্থানে উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ সত্য সংবাদবাহী রূপে তোমার প্রতি কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যা এর সম্মুখবর্তী পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।

৪. এটা অবতীর্ণ করার পূর্বে তিনি মানব জাতির অর্থাৎ যারা এতদুভয়ের অনুসরণ করে তাদের সৎপথ প্রদর্শনের জন্যে هُدًى এটা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ গোমরাহি থেকে হেদায়েতকারী রূপে অবতীর্ণ করেছেন। তাওরাত ও ইঞ্জিলের বেলায় اَنْزَلَ [যা এক দফায় অবতীর্ণ] কুরআন সম্পর্কে نَزَّلَ অর্থাৎ যা পুনঃপুন অবতীর্ণ, এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ঐ দুটি কিতাব এক দফায়ই সম্পূর্ণ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে আল কুরআন [অবতীর্ণ হয়েছে ক্রমে ক্রমে, বারবার।] এবং তিনি ফুরকান অর্থাৎ হক ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পৃথককারী কিতাবসমূহও অবতীর্ণ করেছেন। উল্লিখিত কিতাব তিনটি ছাড়াও অন্যান্য কিতাবসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে উক্ত তিনটির পর وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ এ বাক্যটির উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, তিনি তাঁর কাজের ব্যাপারে ক্ষমতাবান। তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করা ও হুমকি বাস্তবায়ন করার কোনো কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণকারী অর্থাৎ অবাধ্যাচরণকারীদের প্রতি সুকঠিন শাস্তি প্রদানকারী। তদ্রূপ শাস্তি প্রদান করতে আর কেউ সক্ষম নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

آلُ : বংশ, পরিবার, সন্তানাদি।

عِمْرَانَ : ইমরান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা ইমরান উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, ইমরান মরিয়মের পিতার নাম। হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা ইমরান এবং মরিয়মের পিতা ইমরানের মধ্যে ১ হাজার ৮ শত বছরের ব্যবধান রয়েছে।

قَوْلُهُ الٓمٓ : এ বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাগুলোকে [কুরআনের] পরিভাষায় 'হুরূফুল মুকাত্‌তাআত' বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বলা হয়। এগুলো সূরা বাকারার প্রারম্ভে লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এগুলো أَنَا اللّٰهُ أَعْلَمُ আমি আল্লাহ সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত] বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : সঠিক সত্য ও নির্ভুল যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ভেজাল সত্যসহ অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর حَقٌّ শব্দটি আরবি هَزْلٌ [বেহুদা, অনর্থক, বাজে] শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ قَبْلَ تَنْزِيْلِهِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, بَاء ইলসাক তথা মিলানো অর্থে। بِالْحَقِّ . مُتَلَبِّسًا -এর সাথে মুতাআল্লিক হয়ে হাল হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ بِمَعْنٰى هَادِيْيِنَ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : هُدًى হলো মাসদার, তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবদ্বয়ের উপর তার প্রয়োগ বৈধ নয়।

উত্তর : এখানে هُدًى মাসদারটি هَادِيَيْنِ অর্থে হয়ে হাল হয়েছে। আর সত্তার উপর হাল প্রয়োগ হতে পারে। قوله وانزل الْفُرْقَانُ : [আর সে আল্লাহ তা'আলাই ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।] فُرْقَانٌ [ফুরকান] এবং فَرْقٌ [ফরক] সমার্থবোধক শব্দ। তবে فَرْقٌ শব্দের অর্থ শুধু পার্থক্য নির্ণয় করা। আর فُرْقَانٌ [ফুরকান] শব্দের অর্থ– সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করা।

اَلْفُرْقَانُ اَبْلَغُ مِنَ الْفَرْقِ لِاَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِى الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ . (رَاغِب)

কারো কারো মতে, 'ফুরকান' শব্দের তাৎপর্য হলো সমগ্র আসমানী কিতাব, যা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করে। –[তাফসীরে কাশশাফ]

কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এর তাৎপর্য নবী ও রাসূলের জীবনের সে সকল অলৌকিক ঘটনাবলি [মু'জিযা], যা দ্বারা কুরআনুল কারীমের অলৌকিকতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং নবুয়তের সত্যতা বহন করে। –[তাফসীরে কাবীর]

وَالْمُخْتَارُ عِنْدِىْ اَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هٰذَا الْفُرْقَانِ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِىْ قرنها اللّٰهُ تَعَالٰى بِاِنْزَالِ هٰذِهِ الْكُتُبِ (كَبِيْر)

কিন্তু অধিকাংশ তাফসীর বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, فُرْقَانٌ [ফুরকান] শব্দের তাৎপর্য হলো সমগ্র কুরআনুল কারীম, যা মানব জীবনের সকল দিক বিভাগের ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।

–[তাফসীরে ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, কুরতুবী ও কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে নাজরান প্রতিনিধি দল : এ সূরার প্রথম ৮৩ আয়াত পর্যন্ত নাসারাদের নাজরান প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আরবের মানচিত্র সামনে থাকলে দেখা যাবে পূর্ব-দক্ষিণের যে অঞ্চল ইয়ামান নামে পরিচিত তার উত্তরাংশে এক জায়গার নাম হলো নাজরান। রাসূল ﷺ -এর যুগে এটা খ্রিস্টানদের বসতি ছিল। নবম কিংবা দশম হিজরিতে তাদের শীর্ষস্থানীয় ১৪ জন ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়েছিল। নাজরান হতে ষাট সদস্যের একটি সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়। তাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন সর্বখ্যাত ও স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী; আব্দুল মাসীহ আকিব নেতৃত্বে, আয়হাম সায়্যিদ বিচক্ষণতা ও কূটনীতিতে এবং আবূ হারিসা ইবনে আলকামা সবচেয়ে বড় ধর্মবেত্তা ও প্রধান পাদরি হিসেবে। এ তৃতীয় ব্যক্তি মূলে আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র বনু বাকর

http://islamiboi.wordpress.com

ইবনে ওয়াইলের লোক ছিল। পরে সে পাক্কা খ্রিস্টান হয়ে যায়। তার ধর্মীয় দৃঢ়তা ও মান-সম্ভ্রম দেখে রোমান শাসকবর্গ তার খুব কদর ও সম্মান করত। প্রচুর অর্থ দান ছাড়াও তার জন্য একটি গীর্জা তৈরি করে এবং তাকে ধর্ম-বিষয়ক প্রধান নিযুক্ত করে। এ প্রতিনিধি দলটি মহাসাড়ম্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয় এবং বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর সাথে কথোপকথন করে। বিস্তারিত বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) রচিত সীরাতগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ ঘটনা সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের প্রথম দিকের প্রায় আশি-নব্বইখানা আয়াত নাজিল হয়। রাসূল ﷺ আলোচনার মধ্যে তাদের ত্রিত্ববাদের আকিদা ও পুত্রত্বের অলীক ধারণার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন।

সূরাতুল বাকারায় যেভাবে বিশেষ করে ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল এ সূরায় তদ্রূপ খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হাদীস শরীফে সূরা আলে ইমরানের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ : [আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, উকনুম হিসেবেও নয় এবং অন্য কোনো ভাবেও নয়।] উকনুম আরবি শব্দ, যা প্রতিটি বস্তুর মূল ভিত্তিকে বুঝায়। আর খ্রিস্টীয় ধর্মমতে, খোদার প্রত্যেক অংশ যথা– পিতা, পুত্র এবং রূহুল কুদস ত্রিত্ববাদের যে কাউকে উকনুম বলা হয়। অর্থাৎ ঐ এক আল্লাহর কোনোই অংশীদার নেই, না তাঁর সত্তাতে, না তাঁর গুণাবলিতে এবং না তার কার্যাবলিতে। পৃথিবীতে এমন বহু অংশীবাদী ধর্মমতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং এখানো আছে, যাতে বলা হয় যে, সবার বড় খোদাতো নিঃসন্দেহে একজনই, কিন্তু তাঁর অধীনে দলগতভাবে বহু রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোদা আর দেবদেবী রয়েছে। কুরআন মাজীদ এসবের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে যে, শুধুমাত্র তাঁর অস্তিত্বেই অপর কোনো খোদা [কোনো অংশ] নেই– না কোনো ক্ষুদ্রের, না কোনো বৃহতের। উলূহিয়াত আর রবূবিয়াত সবকিছু একই সত্তায় নিহিত। আলোচ্য আয়াত এসব জাহিলি মতবাদ ছাড়াও বিশেষত খ্রিস্টীয় মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

–[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَلْحَىُّ : চিরঞ্জীব। তিনি সেই আল্লাহ, যিনি সর্বদাই জীবিত আছন। জীবিতই আছেন এবং জীবিতই থাকবেন। তাঁর মৃত্যুর কোনো সম্ভাবনাই নেই। না ক্রুশের উপরে, না অন্য কোনো রূপে। তার আয়ু আজকে যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি চিরকালের জন্যে সর্বদাই স্থিতিশীল। এমন নয় যে, তাঁর আকৃতি বারবার পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটবে। কখনো তিনি মানুষ হয়ে যাবেন, আবার কখনো বা জানোয়ারে রূপান্তরিত হয়ে যাবেন। নাঊযুবিল্লাহ ! তিনি জীবিত। [মা'আযাল্লাহ] এরূপ নন যে, প্রতি বছর তাঁর মৃত্যু আসতে থাকবে আর তিনি নতুন নতুন জীবন লাভ করতে থাকবেন।

قَوْلُهُ اَلْقَيُّوْمُ : তিনি আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং সমস্ত সৃষ্টিজগৎ তাঁরই অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে বিদ্যমান। সমগ্র বিশ্বকে তিনি ধারণ করে রেখেছেন। সবকিছুর রক্ষক ও নিয়ন্ত্রক তিনিই। এই নয় যে, তিনিও কোনো অর্থে অন্যের মুখাপেক্ষী। খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র কিংবা তিন উৎসের একজন জ্ঞান করে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-ও আল্লাহর সৃজিত। তিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তার জন্মের কালও বিশ্ব সৃষ্টির বহু পরে। কাজেই আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র কিভাবে হতে পারে? তোমাদের আকিদা সঠিক হয়ে থাকলে তিনি খোদায়িত্বের সিফতবিশিষ্ট এবং চিরন্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কখনো তাঁর উপর মৃত্যুর আগমন না হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু এক সময় তিনিও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন না।

খ্রিস্টানদের একটি মৌলিক বিশ্বাস, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং মহান আল্লাহ বা মহান আল্লাহর ছেলে কিংবা তিন আল্লাহর একজন। এ সূরার প্রথম আয়াতে খাঁটি তাওহীদের দাবি করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দুটি গুণ "اَلْحَىُّ" [চিরজীবী] ও "قَيُّوْم" [সারা বিশ্বের ধারক]-এর উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের এ দাবীকে সুস্পষ্টরূপে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করে। কাজেই, বিতর্ককালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, তোমরা কি জান না, মহান আল্লাহ حَىّ [চিরজীবী] যাঁর কখনো মৃত্যু হতে পারে না এবং তিনিই সৃষ্টিরাজির অস্তিত্ব দান করেছেন, তারপর তাদের বেঁচে থাকার উপকরণাদি সৃষ্টি করে তাদেরকে নিজ অপার শক্তিতে ধারণ করে রেখেছেন? পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর অবশ্যই মৃত্যু ও ধ্বংস আসবে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না, সে অন্যান্য জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করবে কি উপায়ে? এ কথা শুনে খ্রিস্টান দলটি স্বীকার করল, নিশ্চয় আপনি সত্য বলেছেন। হয়তো তারা মনে করে থাকবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী عِيْسٰى يَاْتِىْ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ [ঈসার উপর অবশ্যই ধ্বংস আসবে] সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। উত্তর নেতিবাচক হলে 'ঈসা বহুকাল পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছেন' আমাদের এ বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি আমাদেরকে আরও বেশি লা-জবাব ও পরাস্ত করতে সক্ষম হবেন। কাজেই শাব্দিক ঝগড়ায় না পড়াই সমীচীন। এরা হয়তো খ্রিস্টানদের সেই শাখার লোক হয়ে থাকবে, যারা ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর হত্যা ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ধারণাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে দৈহিকভাবে আকাশে তুলে নেওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে।

http://islamiboi.wordpress.com

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র.) 'আল জাওয়াবুস সহীহ' গ্রন্থে এবং 'আল ফারিক বায়নাল মাখলূক ওয়াল খালিক' -এর গ্রন্থকার লিখেছেন যে, শাম ও মিসরের খ্রিস্টানগণ সাধারণত এ আকিদাই পোষণ করত। কালক্রমে ইউরোপ হতে শাম ও মিসরেও তাদের এ ধারণা পৌঁছে যায়। মোট কথা, إِنَّ عِيسٰى اَتٰى عَلَيْهِ الْفَنَاءُ [নিশ্চয় ঈসার উপর মৃত্যু এসেছে] বাক্যটি হযরত ঈসা (আ.)-এর উলূহিয়্যাত [আল্লাহ হওয়া] -এর রদে অধিক স্পষ্ট ও লা-জবাব হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তার পরিবর্তে يَأْتِىْ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ [তাঁর উপর মৃত্যু আসবে] বলেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিতর্ক স্থলেও তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যে মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মৃত্যু শব্দের ব্যবহার পছন্দ করেননি। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : অর্থাৎ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এর পূর্বে নবীগণের উপর যে সকল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এ গ্রন্থ সেগুলোকে সত্যায়ন করে। অর্থাৎ সেসবে যা লিখিত ছিল সেগুলোকে সত্য জানে এবং তার বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে স্বীকার করে। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, কুরআনুল কারীমও একই সত্তার অবতারিত, যিনি পূর্বে বহু কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ : **কুরআন সকল আসমানী গ্রন্থের প্রত্যায়নকারী :** পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রত্যয়ন করে। তাওরাত, ইঞ্জিল প্রভৃতি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ কুরআন মাজীদ ও তার বাহকের প্রতি পথনির্দেশ করত এবং আপন আপন সময়ে উপযুক্ত বিধান ও হেদায়েত প্রদান করত। যেন বলে দেওয়া হলো মাসীহ (আ.) খোদায়ী বা তিনি যে মহান আল্লাহর ছেলে এ আকিদা তো কোনো আসমানী কিতাবেই বর্ণিত ছিল না, অথচ দীনের মূল বিষয়সমূহে সমস্ত আসমানী কিতাবই এক ও অভিন্ন। তাতে মুশরিকসুলভ আকিদা-বিশ্বাসের তালিম কখনই দেওয়া হয়নি।

قَوْلُهُ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ : মহান আল্লাহর আয়াতসমূহ– এখানে দুটি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি হলো কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ; আর অপর অর্থ হলো, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব। তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শন ও মহান আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শন, সাক্ষ্য ও অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণসমূহ।

তাওরাত ও ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক পটভূমি :

প্রশ্ন : বর্তমান বাইবেল, তাওরাত ও ইঞ্জিলে যেসব বিষয় বর্ণিত আছে কুরআন কি সেসবের সমর্থন ও সত্যায়ন করে?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব বুঝার জন্যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বুঝা আবশ্যক।

তাওরাত দ্বারা মূলত সে সকল বিধান উদ্দেশ্য যা হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে। তার মধ্য থেকে ১০টি বিধান ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা পাথরে খোদাই করে দান করেছিলেন। অবশিষ্ট বিধানগুলোকে হযরত মূসা (আ.) লিখে তার ১২ টি কপি বনি ইসরাঈলের ১২ টি গোত্রকে দান করেছিলেন, আর একটি কপি বনি লাবী -এর নিকট অর্পণ করেছিলেন, যাতে তারা তা সংরক্ষণ করে। সংরক্ষিত এ কপির নামই তাওরাত। এটা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের পর্যায়ে। বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম ধ্বংসযজ্ঞের পর্যন্ত তা সংরক্ষিত ছিল। বনি লাবীর নিকট অর্পিত কপি পাথরখণ্ডসহ সিন্ধুকে রাখা ছিল। বনি ইসরাঈল এটাকে তাওরাত বলে জানত। তবে সে ব্যাপারে তাদের অমনোযোগিতা এ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ইহুদি বাদশাহ ইউসিয়া ইবনে আমুন-এর আমলে তার সিংহাসনে আরোহণের ১৮ বছর পর যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইবাদতখানার পূর্ণঃনির্মাণ ঘটল তখন ঘটনাক্রমে বিশিষ্ট গণক সর্দার খালকিয়া এক জায়গায় সংরক্ষিত তাওরাত দেখতে পেল। সে আশ্চর্যকর বস্তু হিসেবে শাহী মুনশির নিকট তা অর্পণ করল। সে বাদশাহর সামনে তা এমনভাবে পেশ করল যেন একটি নতুন বস্তুর সন্ধান ঘটেছে। [দ্বিতীয় পরিচ্ছদ সালাতিন ২২, আয়াত নম্বর ৮-১৩ দ্রষ্টব্য] এ কারণেই বুখতে নাসসার যখন জেরুজালেম জয় করল এবং ইবাদতখানাসহ শহরের সকল ভবন ধ্বংস করল, এমনকি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলল, তখন বনি ইসরাঈলের সে মূল কপি পাওয়া গেল যার অধিকাংশ এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সামান্য সংখ্যক ছিল, আর তখন থেকে তা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর আজরা জ্যোতিষ [হযরত উযাইর (আ.)]-এর যুগে বনি ইসরাঈলের সন্তানাদি বাবেলের বন্দি জীবন থেকে যখন জেরুজালেম ফিরে এল তখন তারা দ্বিতীয়বার বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করল। হযরত উযাইর (আ.) তাঁর জাতির কতিপয় বিশিষ্ট বুজুর্গের সাহায্যে বনি ইসরাঈলের পূর্ণ ইতিহাস সংকলন করেন, যা বাইবেলের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের ৪টি অনুচ্ছেদ হযরত মূসা (আ.)-এর সীরাত তথা জীবনচরিত বিষয়ক। উক্ত সীরাতে উল্লিখিত নাজিল হওয়ার তারীখের ক্রমধারা অনুযায়ী তাওরাতের সে সকল আয়াতও যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে, যা আজরা বিশেষ বুজুর্গদের সহায়তায় লাভ করেছিলেন। অতএব বর্তমানে সে সকল বিক্ষিপ্ত অংশগুলোর নাম তাওরাত, যা হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনচরিতের মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা তাকে কেবল এ আলামত দ্বারা চিনতে পারি যে, ঐতিহাসিক বর্ণনার মাঝে যেখানে হযরত মূসা

http://islamiboi.wordpress.com

(আ.)-এর জীবনী লেখকগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে এ কথা বলেছেন যে, খোদাবন্দ তোমাদেরকে এ কথা বলেছেন– সেখান থেকে তাওরাতের একটি অংশ শুরু হয়। আর যেখানে হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনী শুরু হয়েছে তার আগেই তাওরাতের বর্ণনা শেষ হয়েছে।

কুরআন ঐ সকল বিক্ষিপ্ত অংশসমূহকেই তাওরাত অভিহিত করে এবং সেগুলোকেই সত্যায়ন করে। আর বাস্তব বিষয় এই যে, যে সকল অংশকে সংকলন করে কুরআনের সাথে যখন মোকাবিলা করা হয়, তখন ক্ষেত্রবিশেষ শাখাগত বিধানের পার্থক্য ছাড়া বুনিয়াদি বিষয়ে উভয় গ্রন্থের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও দেখা যায় না।

এভাবে ইঞ্জিল সে সকল ইলহামী উক্তি ও বাণীর নাম, যা হযরত ঈসা (আ.) জীবনের শেষ আড়াই কিংবা তিন বছরে নবী হিসেবে ইরশাদ করেছেন। সে সকল ইলহামী উক্তি ও বাণী তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত হয়েছে এবং সংকলিত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আমাদের কাছে বর্তমানে কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণ নেই। মোটকথা, এক দীর্ঘ সময়ের পরে যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনচরিত সংকলিত হলো এবং পুস্তিকা রচিত হলো তখন তার মধ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনার সাথে সাথে বিভিন্ন জায়গায় সে সকল মূল্যবান বাণীও নকল করা হয়েছে যা ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতাগণের নিকট মৌখিক বা লেখনীর মাধ্যমে পৌঁছেছিল। বর্তমান মাত্তা, মারকিস, লোকা, ইউহান্না এর যে সকল কিতাবকে ইঞ্জিল বলা হয় মূলত তা ইঞ্জিল নয়। প্রকৃত ইঞ্জিল হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর সে সকল বাণী যা সেগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমাদের নিকট তা চিনবার এবং লেখকদের নিজস্ব উক্তি থেকে তা প্রভেদ করার এ ছাড়া কোনো উপায় নেই যে, যেখানে জীবনচরিত লেখকগণ বলছেন যে, এটা হযরত ঈসা (আ.) ইরশাদ করেছেন কিংবা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেবল সেগুলোই মূল ইঞ্জিলের অংশ। কুরআন এ সকল অংশকেই ইঞ্জিল বলে এবং তাকে সত্যায়ন করে। বর্তমানে যদি কেউ সে সকল বিক্ষিপ্ত অংশকে সংকলন করে কুরআনের সাথে তুলনা করে তাহলে উভয়ের মধ্যে নিতান্ত কমই ব্যবধান লক্ষ্য করবে।

সারকথা : বর্তমান পরিভাষায় তাওরাত হলো কতিপয় পুস্তিকার সমষ্টির নাম। যেগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটিকে কোনো না কোনো নবীর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এসবের কোনো একটিকে তার শব্দ ও ভাষাসহ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত হওয়ার দাবি কোনো ইহুদি করতে পারে না। এভাবে ইঞ্জিলও কতিপয় কিতাবের সমষ্টির নাম, যেগুলোকে ঈসা মাসীহ (আ.)-এর প্রতি সম্বোন্ধিত বিভিন্ন মানুষের সংকলিত ঘটনাবলি ও বাণী। তবে তাদের সংকলকদের পরিচয় অজানা রয়ে গেছে। এগুলোর কোনোটি খ্রিস্টানদের আকিদার মধ্যে আসমানী বলা হয়নি; বরং পরিষ্কারভাবে এগুলোকে মাসীহী বলা হয়। এ সমষ্টিকে হযরত ঈসা (আ.) হাওয়ারীদের যুগে সাধারণভাবে প্রস্তুত করা হয়। –[তাফসীরের মাজেদী-বারকা বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ড ৫১৩ পৃ. এর বরাতে] এ ধরনের সনদবিহীন পবিত্র কিতাবসমূহের সত্যায়ন করা কুরআনের দায়িত্ব নয় এবং বর্তমান বাইবেলের কোনো অংশ কুরআন মান্যকারীদের ব্যাপারে দলিলও নয়।

قَوْلُهُ اَلْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ : এটা এ প্রশ্নের উত্তর যে, ফুরকান হলো কুরআনের অপর নাম। কাজেই এখানে দ্বিরুক্তি হলো। **উত্তর:** এখানে ফুরকানের শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে প্রভেদকারী।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.) বলেন, প্রত্যেক কালে এমন সময়োপযোগী বিষয় দেওয়া হয়েছে, যা হক-বাতিল, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার মাঝে মীমাংসা করে দেয়। কুরআন মাজিদ, অন্যান্য আসমানী কিতাব, নবীগণের মু'জিযা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত তার মীমাংসাও কুরআন দ্বারা করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ : আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী-এর ব্যাখ্যা : এরূপ অপরাধীদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং তারা মহান আল্লাহর মহাপরাক্রম হতে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না। এর মাঝেও মাসীহের খোদা হওয়ার বিষয়টি খণ্ডনের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা সেই নিরঙ্কুশ শক্তি ও ক্ষমতা মহান আল্লাহর জন্যে প্রমাণ করা হয়েছে, সুস্পষ্ট কথা তা মাসীহের মাঝে পাওয়া যায় না; বরং খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মাসীহ (আ.) কাউকে শাস্তি দেবেন তো দূরের কথা, নিজেকেই তো জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। [তাদের বিশ্বাস মতে] অত্যন্ত অসহায় ও মর্মান্তিক অবস্থায় তাদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এরপরও তিনি কী করে আল্লাহ বা আল্লাহর ছেলে হতে পারেন? সন্তান তো পিতাতুল্যই হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহর যিনি ছেলে তিনিও আল্লহ হবেন বৈ কি? কিন্তু একজন অসহায় সৃষ্টিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করা, পিতা ও সন্তান উভয়ের জন্যেই অবমাননাকর। মহান আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই। –[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

৫. إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ كَائِنٌ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ لِعِلْمِهٖ بِمَا يَقَعُ فِى الْعَالَمِ مِنْ كُلِّيٍّ وَجُزْئِيٍّ وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْحِسَّ لَا يَتَجَاوَزُهُمَا .

৬. هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ مِنْ ذُكُوْرَةٍ وَأُنُوْثَةٍ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ فِى مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِى صُنْعِهٖ .

অনুবাদ :

৫. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট জমিনের হোক فِى الْأَرْضِ এটা এ স্থানে উহ্য كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। বা আকাশের কিছুই গোপন থাকে না। কারণ বিশ্বব্যহ্মাণ্ডে ছোট বা বড়, সার্বিক বা আংশিক যাই ঘটুক না কেন সে সম্পর্কে তিনি খবর রাখেন।
বিশেষ করে শুধু আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করার কারণ হলো মানুষের অনুভূতি এ দুয়ের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

৬. তিনি মাতৃগর্ভে ছেলে বা মেয়ে, সাদা বা কালো ইত্যাদি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে প্রবল পরাক্রমশালী, তাঁর কাজে প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ : [আল্লাহর কাছে গোপন বলতে কিছু নেই] : মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যেমন অসীম, তেমনি তাঁর জ্ঞানও সর্বব্যাপী। বিশ্ব জগতের কোনো একটি বস্তুও এক মুহূর্তের জন্যে তাঁর অগোচরে থাকে না। সকল অপরাধী ও নিরপরাধ এবং সমস্ত অপরাধের ধরণ-ধারণ তাঁর জানা। অপরাধী পালিয়ে আত্মগোপন করতে চাইলে তা কোথায় পালাবে? এর দ্বারা ইশারা করে দেওয়া হলো যে, মাসীহ (আ.) আল্লাহ হতে পারে না। কেননা এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান তাঁর ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যতটুকু জানাতেন, ততটুকুই তিনি জানতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশ্নের জবাবে খ্রিস্টানরাও এ কথা স্বীকার করেছিল এবং আজও প্রচলিত ইঞ্জিল দ্বারা এটা প্রমাণিত। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهٗ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ : আসমান ও জমিনের নামের উল্লেখ এ আয়াতে করার তাৎপর্য হলো, মানুষের জ্ঞান ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পর্যন্ত সীমিত। প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াতে খ্রিস্টানদেরও সম্বোধন করা হয়েছে, তোমরা যে [যীশুখৃস্ট] হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর পুত্র তথা আল্লাহ বলে স্বীকার করছ, বল, তার কাছে এ পরিপূর্ণ ইলম কোথায় ছিল? তাছাড়া হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ মানা এবং আল্লাহকে বান্দার রূপ ধরে আগমনের এ কল্পিত আকিদার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে বান্দার আকৃতির সসীমতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করার ফলে মহান আল্লাহ সম্পর্কে এ সসীমতার ত্রুটির ধারণা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কি করে তোমরা খ্রিস্টানরা আল্লাহকে এত সংকীর্ণ ও সসীম বলে গ্রহণ করলে? –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ : অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে বিনা বাপে, আবার তিনি ইচ্ছা করলে বাপের মাধ্যমে কাউকে সৃষ্টি করতে পারেন।' তিনি সকল ব্যাপারে সকল দিকেই সর্বশক্তিমান। বাপ তো সৃষ্টির উৎস নয়, বরং একটি মাধ্যম মাত্র, যিনি সৃষ্টির মূল উৎসশক্তি তিনি ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে এ মাধ্যমটিকে হটিয়ে দিতে পারেন। يُصَوِّرُكُمْ শব্দের সম্বোধন একান্ত সাধারণভাবে এখানে মানব সৃষ্টিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তোমাদেরকে আকৃতি প্রদান করেন। فِى الْأَرْحَامِ অর্থ হলো– মাতৃগর্ভে। আর হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)-এর আকৃতি গঠন মায়ের গর্ভেই সম্পন্ন করা হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهٗ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী অপার শক্তি দ্বারা যেরূপ ও যেভাবে চেয়েছেন মাতৃগর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, পুরুষ বা নারী, সুদর্শন বা কদাকার। যেমন সৃষ্টি করার ছিল করে দিয়েছেন। একটি পানির ফোঁটাকে কতগুলি ধাপ অতিক্রম করিয়ে মানব আকৃতিতে পরিণত করেছেন। যাঁর শক্তি ও শিল্প নৈপুণ্যের এ অবস্থা তাঁর জ্ঞানে কি কোনো কমতি থাকতে পারে, বা যে মানুষ নিজেও মাতৃগর্ভের আঁধার প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে এসেছে এবং অপরাপর শিশুর মতো পানাহার ও মলমূত্র ত্যাগ করে তাকে সেই মহান পবিত্র আল্লাহর ছেলে, নাতি বলা যেতে পারে?

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا . – [৫ : ১৮]

খ্রিস্টানদের প্রশ্ন ছিল, হযরত মাসীহের প্রকাশ্য পিতা যখন কেউ নয় তখন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কাকে তাঁর পিতা বলা যায়? এর উত্তর يُصَوِّرُكُمْ فِى الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ দ্বারা আদায় হয়ে গেছে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা মানবাকৃতি গঠনের শক্তি মহান আল্লাহর কাছে, তা পিতামাতা উভয়ের মিলনের মাধ্যমেই হোক কিংবা শুধু জননীর ক্রিয়াগ্রহণশক্তি দ্বারাই হোক। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি মহাপরাক্রমশালী, যাঁর শক্তিকে কেউ পরিমাপ করতে পারে না। তিনি প্রজ্ঞাময়, যেখানে যেমন সমীচীন তাই করেন। তিনি হাওয়াকে মা ছাড়া, মাসীহকে বাপ ছাড়া এবং আদমকে মা-বাপ উভয় ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাজের রহস্য ও তাৎপর্য কে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে? –[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

٧. هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ
مُّحْكَمٰتٌ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ هُنَّ اُمُّ
الْكِتٰبِ اَصْلُهُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي
الْاَحْكَامِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ لَا يُفْهَمُ
مَعَانِيْهَا كَاَوَائِلِ السُّوَرِ وَجَعَلَهُ كُلَّهُ
مُحْكَمًا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اُحْكِمَتْ
اٰيَاتُهُ بِمَعْنٰى اَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ عَيْبٌ
وَمُتَشَابِهًا فِيْ قَوْلِهِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا
بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي
الْحُسْنِ وَالصِّدْقِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ
قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ فَيَتَّبِعُوْنَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ طَلَبَ الْفِتْنَةِ
لِجُهَّالِهِمْ بِوُقُوْعِهِمْ فِي الشُّبُهَاتِ
وَاللَّبْسِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهِ تَفْسِيْرِهِ وَمَا
يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَالرّٰسِخُوْنَ
الثَّابِتُوْنَ الْمُتَمَكِّنُوْنَ فِي الْعِلْمِ
مُبْتَدَاٌ خَبَرُهٗ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ اَيْ
بِالْمُتَشَابِهِ اَنَّهٗ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَلَا نَعْلَمُ
مَعْنَاهُ كُلٌّ مِّنَ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ
مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ بِاِدْغَامِ التَّاءِ
فِي الْاَصْلِ فِي الذَّالِ اَيْ يَتَّعِظُ اِلَّآ
اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

অনুবাদ :

৭. তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত দ্ব্যর্থহীন অর্থাৎ সুস্পষ্ট যার বক্তব্য এগুলো কিতাবের মূল অংশ আসল অংশ। এগুলো হলো হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধানসমূহের মূল ভিত্তি। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ যেগুলোর মর্ম বুঝা যায় না। যেমন অনেক সূরার শুরুর কতিপয় অক্ষর। أُحْكِمَتْ اٰيَاتُهُ [অর্থাৎ এর আয়াতসমূহ মুহকাম] এ আয়াতটিতে গোটা কুরআনকে 'মুহকাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থানে এর অর্থ হলো, এটা সকল প্রকার দোষত্রুটি মুক্ত। আবার كِتَابًا مُّتَشَابِهًا এ আয়াতটিতে গোটা কুরআনকে মুতাশাবিহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থলে এর অর্থ হলো– ভাষালঙ্কার, সৌন্দর্য ও সততায় এর কতক আয়াত কতক আয়াতের অনুরূপ এবং সামঞ্জস্যশীল। যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা অর্থাৎ সত্যের প্রতি বিরাগ-প্রবণতা শুধু তারাই এ সম্পর্কে সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত করে মূর্খদের জন্যে ফিতনা প্রত্যাশী হয়ে এবং তার তাবিলের ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা মুতাশাবিহ তার পিছনে ছুটে। অথচ এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর সুদৃঢ় যোগ্যতার অধিকারী। اَلرَّاسِخُوْنَ এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য يَقُوْلُوْنَ এটা خَبَر বা বিধেয়। তারা বলে আমরা এটা মুতাশাবিহ সম্পর্কে বিশ্বাস করি যে, এটাও আল্লাহর নিকট হতেই অবতীর্ণ; কিন্তু এর প্রকৃত মর্ম আমাদের জানা নেই। সকল কিছু অর্থাৎ মুহকাম ও মুতাশাবিহ সকল কিছুই আমাদের প্রভুর নিকট হতে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারীগণ ব্যতীত কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না يَذَّكَّرُ এতে মূলত ت এবং ذ -এর اِدْغَام বা সন্ধি সংঘটিত হয়েছে। উপদেশ লাভ করে না।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াত এবং নাজরান খ্রিস্টান দল : নাজরানের খ্রিস্টানগণ সমস্ত দলিল-প্রমাণে পরাভূত হয়ে শেষে রণকৌশল পরিবর্তন করে বলল, তা যা হোক আপনি তো হযরত মাসীহকে আল্লাহর 'কালিমা' ও তাঁর 'রূহ' মানেন। আমাদের দাবি প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ স্থানে এর তাত্ত্বিক জবাব একটি সাধারণ নীতির আকারে দেওয়া হয়েছে, যা উপলব্ধি করার পর হাজারও দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান হতে পারে। বিষয়টি এভাবে বুঝুন, কুরআন মাজিদ ও সমস্ত আসমানী কিতাবে দুই রকমের আয়াত পাওয়া যার এক তো সেসব আয়াত যার অর্থ সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট। তা হয়তো এ কারণে যে, অভিধান ও শব্দবিন্যাস প্রভৃতির দিক থেকে আয়াতের শব্দমালার মাঝে কোনো অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা নেই, ভাষার মাঝেও একাধিক অর্থের অবকাশ নেই এবং বিষয়বস্তুও সাধারণ স্বীকৃত মূলনীতিসমূহের পরিপন্থি নয়। কিংবা এ কারণে যে, ভাষা ও শব্দে আভিধানিক দিক থেকে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকলেও কুরআন-হাদীসের সুবিদিত ও অকাট্য উক্তি বা উম্মতের সর্ববাদী রায় কিংবা দীনের সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি দ্বারা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, বক্তার উদ্দেশ্য ঐ অর্থ নয়; বরং এই অর্থ। এরূপ আয়াতসমূহকে 'মুহকামাত' বলে। প্রকৃতপক্ষে কিতাবের যাবতীয় শিক্ষার মূলভিত্তি এ প্রকারের আয়াতই হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে 'মুতাশাবিহাত' বলে, অর্থাৎ যার অর্থ জানতে ও নির্ণয় করতে সংশয় ও বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হলো, এ দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে দেখতে হবে, কোন অর্থ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে অর্থ তার পরিপন্থি হবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং যা তার পরিপন্থি না হবে, তাকেই বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বলে গণ্য করতে হবে। যদি চূড়ান্ত চেষ্টার পরও বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তবে সবজান্তার দাবিতে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া উচিত নয়। যেসব ক্ষেত্রে জ্ঞানের কমতি ও যোগ্যতার ত্রুটির কারণে বিষয়ের রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আমরা সক্ষম না হই তাকেও এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। কিন্তু সাবধান এরূপ কোনো ব্যাখ্যা ও হেরফের করা যাবে না, যা ধর্মের মূলনীতি ও মুহকাম আয়াতের বিরোধী হয়। যেমন কুরআন মাজীদে হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে- إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ 'সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম।' [সূরা যুখরুফ : ৫৯] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ 'আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত তো আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে তিনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিলেন।' [সূরা আলে ইমরান : ৫৯] আরও বলা হয়েছে-

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ، مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ .

অর্থাৎ 'এই-ই ঈসা, মরিয়ম তনয়। আমি বললাম সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা মহান আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন হও এবং তা হয়ে যায়।

−[সূরা মারইয়াম : ৩৪-৩৫]

এছাড়া কোথাও কোথাও তাঁর খোদায়ী ও ছেলে হওয়ার বিষয়টি রদ করা হয়েছে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এসব মুহকাম আয়াত থেকে চোখ বন্ধ করে كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ 'তাঁর কালিমা, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর রূহ।' [সূরা নিসা : ১৭১] প্রভৃতি মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে ধাবিত হয় এবং তার যে অর্থ মুহকাম আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা বাদ দিয়ে এমন ভাসাভাসা অর্থ গ্রহণ করতে শুরু করে, যা কিতাবের সাধারণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং সর্বখ্যাত বর্ণনার পরিপন্থি, তবে সেটা তার মনের কুটিলতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে? কতক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তো চায় এরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষকে গোমরাহিতে ফাঁসিয়ে দিতে।

আবার কিছু দুর্বল ও টলটলায়মান বিশ্বাসের লোক নিজস্ব মত ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী টেনেহ্যাঁচড়ে এরূপ আয়াতের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস পায়। অথচ এর সত্যিকারের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনিই আপন অনুগ্রহে তা থেকে যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা অবহিত করেন। যারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী তারা মুহকাম ও মুতাশাবিহ সর্বপ্রকার আয়াতকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। তাঁদের এ প্রত্যয় আছে যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস হতে উৎসারিত, যাতে পরস্পর বিরোধ ও বৈসাদৃশ্যের কোনো অবকাশ নেই। এজন্যই তাঁরা মুতাশাবিহকে মুহকামের দিকে ফিরিয়ে অর্থ বোঝার চেষ্টার করে। আর যা তাঁদের বোধশক্তির উর্ধ্বে তা মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয় এবং বলে এর অর্থ তিনিই ভালো জানেন, আমাদের কাজ ঈমান আনা। −[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

মোট কথা, مُحْكَمَات দ্বারা সে সকল আয়াত উদ্দেশ্য যেগুলোতে বিভিন্ন আদেশ, নিষেধ-বিধান, মাসআলা ও কাহিনী বিবৃত রয়েছে; যেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব, তাকদীরের মাসআলা, বেহেশত-দোজখ, ফেরেশতা প্রভৃতি। অর্থাৎ যেগুলো বুঝা মানুষের জ্ঞান বহির্ভূত বা যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। কিংবা এমন অস্পষ্টতা রয়েছে যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করা সম্ভব।

قَوْلُهُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ : এখানে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কুরআনুল কারীমের যে সকল আয়াত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট, বা একটি মাত্র অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাই কুরআনের মূল ভিত্তি ও মানদণ্ড। যে সকল আয়াত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা, সেগুলোর অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহকাম আয়াতসমূহকেই মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন, কুরআনুল কারীমে মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ রয়েছে, মুতাশাবিহ আয়াত থেকে দলিল গ্রহণ করা শরয়ী আহকামের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ : এখানে বলা হয়েছে যে, যাদের অন্তরে বক্রতা থাকে তারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়ে। এর মাধ্যম তারা ফিতনা সৃষ্টি করে। যেমন পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-কে যে রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে এর দ্বারা খ্রিস্টান জাতি নিজেদের ভ্রান্ত আকিদার উপর দলিল পেশ করে। বস্তুত এটা বিদ'আতিদের অবস্থাও। কুরআনের সুস্পষ্ট আকিদার বিপরীতে বিদ'আতি দল যে ভ্রান্ত আকিদা পেশ করে এ ব্যাপারে তারা মুতাশাবিহ আয়াতমূহকে তাদের দলিল বানায়।

মুফাসসির আবূ বকর জাসসাস (র.)-এর মতে, এ আয়াতে ফিতনা فِتْنَة অর্থ– কুফরি ও গোমরাহি اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ এ সকল বক্র স্বভাববিশিষ্ট দুষ্কৃতিকারীদের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের চূড়ান্ত লক্ষ্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, তাদের বিকৃত ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ব্যাপারেও তারা নিষ্টাবান নয়। মূলত মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করার ও মুসলিম সমাজে বিভ্রান্ত সৃষ্টি, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যেই তারা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ : অর্থাৎ কুরআনুল কারীমের মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের নিজেদের ইচ্ছামাফিক ভুলবিকৃত অর্থ পরিবেশন করা। এখানে تَأْوِيل [তাবীল] শব্দটি تَحْرِيف অর্থাৎ বিকৃতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ : তাবীলের এক অর্থ হলো, কোনো বস্তুর মূল তত্ত্ব অবগত হওয়া। এ অর্থে إِلَّا اللّٰهُ -এর মাঝে ওয়াকফ করা জরুরি। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর মূল তত্ত্ব আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাবীলের আরেকটি অর্থ হলো, কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা করা। এ অর্থে ۷। -এর উপর ওয়াকফ করা যেতে পারে। কারণ যারা সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী তারাও বিশুদ্ধ তাফসীর ও ব্যাখ্যার ইলম রাখে। তাবীলের এ উভয় অর্থ কুরআনে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। –[ইবনে কাছীর সংক্ষেপিত]

তাফসীরশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ মত পোষণ করেন যে, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ এরপর যে চিহ্ন রয়েছে তা, ওয়াকফে তাম অর্থাৎ আয়াত পূর্ণ হওয়ার যতিচিহ্ন। অর্থাৎ বাক্য এখানে পরিসমাপ্ত হয়েছে। অতঃপর اَلرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ থেকে নতুনভাবে পরবর্তী বাক্যের সূচনা করা হয়েছে। যার খবর يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ মুবতাদা اَلرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ [গভীর পাণ্ডিত্যে পরিপক্ক জ্ঞানীগণ] يَقُوْلُوْنَ খবর অর্থাৎ তারা বলেন, সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে। ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম কুরতুবী (র.) বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ, ইবনে মাসউদ (রা.) হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)' ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) এবং আরবি ভাষা ও ব্যাকরণবিদ কিসাঈ, আখফাশ এবং ফাররা ও আবূ উবায়িদ প্রমুখ এ মতই প্রকাশ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এবং হানাফী ফিকহের অনুসারীগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতও উল্লিখিত মতের অনুসারী। –[রূহুল মা'আনী, মাদারেক ও কুরতুবী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨. وَيَقُوْلُوْنَ اَيْضًا اِذَا رَأَوْا مَنْ يَتَّبِعُهُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا تُمِلْهَا عَنِ الْحَقِّ بِابْتِغَاءِ تَأْوِيْلِهِ الَّذِىْ لَا يَلِيْقُ بِنَا كَمَا اَزَغْتَ قُلُوْبَ اُولٰئِكَ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا اَرْشَدْتَنَا اِلَيْهِ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً تَثْبِيْتًا اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

৮. যখন তারা ঐ সকল লোকদের দেখে যারা মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়ে তখন বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হেদায়েত দান করার পর সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করো না। অর্থাৎ তাদের অন্তর যেমন বক্র করে দিয়েছ তেমনি এ আয়াতসমূহের তাবিল বা ব্যাখ্যার পিছনে পড়ে যা আমাদের জন্যে অনুচিত সত্য হতে আমাদের ফিরিয়ে দিয়ো না। তোমার নিকট হতে পক্ষ হতে আমাদেরকে করুণা দান কর সুদৃঢ়তা দাও, তুমিই মহাদাতা।

٩. يَا رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ تَجْمَعُهُمْ لِيَوْمٍ اَىْ فِىْ يَوْمٍ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَتُجَازِيْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ كَمَا وَعَدْتَ بِذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ مَوْعِدَهُ بِالْبَعْثِ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالٰى وَالْغَرْضُ مِنَ الدُّعَاءِ بِذٰلِكَ بَيَانُ اَنَّ هَمَّهُمْ اَمْرُ الْاٰخِرَةِ وَلِذٰلِكَ سَاَلُوا الثُّبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ لِيَنَالُوْا ثَوَابَهَا رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ اِلٰى اٰخِرِهَا وَقَالَ

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি একদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানব জাতির একত্রকারী অর্থাৎ তুমি তাদেরকে একদিন একত্র করবে যাতে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐদিন তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবে। নিশ্চয় আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে তাঁর নির্ধারিত ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

اِنَّ اللّٰهَ এ বাক্যটিতে خِطَاب অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ হতে নাম পুরুষের দিকে اِلْتِفَات বা রূপান্তর হয়েছে। এটা আল্লাহর উক্তিও হতে পারে।

এ দোয়ার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, এর মূল চিন্তা ও ধ্যান হচ্ছে পরকাল। তাই সে স্থানে যাতে পুণ্যফল লাভ করতে পারে, সে জন্যই তারা আল্লাহর নিকট হেদায়েতের উপর সুদৃঢ়তার যাচনা করেছে।

শায়খাইন [বুখারী ও মুসলিম] বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الخ এ আয়াত তেলাওয়াত করে ইরশাদ করেছেন—

http://islamiboi.wordpress.com

فَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ تَعَالٰى فَاحْذَرُوْهُمْ وَرَوَى الطَّبَرَانِىْ فِى الْكَبِيْرِ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِىْ اِلَّا ثَلٰثَ خِلَالٍ وَذَكَرَ مِنْهَا اَنْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتٰبُ فَيَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِىْ تَأْوِيْلَهُ وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ الْحَدِيْثَ.

মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পিছনে পড়তে যখন কাউকে দেখতে পাবে, বুঝবে এরা তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে [এ আয়াত] উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।

আবূ মালেক আশআরী হতে তাবারানী তৎপ্রণিত 'আল কাবীর' এ বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, আমার উম্মত সম্পর্কে আমি তিনটি বিষয়ের আশঙ্কা করি। এদের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাদের সামনে আল্লাহর কিতাব খোলা হবে আর মু'মিনগণ মুতাশাবিহাতের তাবীলের [মনগড়া ব্যাখ্যার] পিছনে পড়বে। অথচ এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর ও সুদৃঢ় তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত আর বোধসম্পন্ন ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। –[আল হাদীস]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا : ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যে, হে আমাদের প্রতিপালক! অনুগ্রহ করে যখন আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, তখন সকল অবস্থায়ই আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখুন, আমাদের অবস্থা কখনো যেন ইহুদি ও নাসারাদের অনুরূপ না হয়। যাদের নিকট নবুয়ত ও মহান আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের মতো মহামূল্যবান নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও তারা গোমরাহ হয়েছে।

আয়াতে উল্লিখিত সমস্ত দোয়াসূচক কালিমা পরিপক্ক জ্ঞানীদের মুখনিঃসৃত দোয়া। তাঁরা নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তিতে আত্মগর্বী ও নিশ্চিন্ত থাকে না; বরং তাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট অবিচলতা এবং অতিরিক্ত করুণা ও দয়া প্রার্থনা করে, যাতে অর্জিত ধন হস্তচ্যুত না হয় এবং আল্লাহ না করুন অন্তর সরলপথ প্রাপ্তির পর বেঁকে না যায়। হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ প্রায়ই [উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে] এ দোয়া পড়তেন– يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ "হে অন্তরসমূহের ওলট-পালটকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ।

–[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ تَدْفَعَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ أَيْ عَذَابِهِ شَيْئًا وَأُولٰئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ بِفَتْحِ الْوَاوِ مَا تُوْقَدُ بِهِ.

১০. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর নিকট কোনো কাজে আসবে না অর্থাৎ এগুলো তাঁর শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে না এবং এরাই জাহান্নামের অগ্নির ইন্ধন। وَقُوْد এটা وَاو বর্ণে ফাতাহ সহকারে পঠিত। অর্থাৎ যার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

١١. دَأْبُهُمْ كَدَأْبِ كَعَادَةِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ كَعَادٍ وَثَمُوْدَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ أَهْلَكَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَالْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

১১. এদের অভ্যাস ফিরআউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীগণের অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মত যেমন আদ ও ছামূদগণের প্রথার অভ্যাসের ন্যায়। এরা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপের জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। এদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। كَذَّبُوْا এ বাক্যটি পূর্বোল্লিখিত বিষয়টির ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقُوْدٌ : وَاو বর্ণটি ফাতহা দিয়ে পঠিত, অর্থ- জ্বালানি। এটা ইসম, আর وَاو পেশযোগে হলে মাসদার হবে। সত্তার উপর মাসদার প্রয়োগ হতে পারে না। এ কারণেই যবরযুক্ত وَاو সহ ইসম সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে মাসদারের উপর এর প্রয়োগ হতে পারে।

قَوْلُهُ دَأْبُهُمْ : শব্দটি উহ্য মেনে ইশারা করেছেন যে, كَدَأْبِ فِرْعَوْنَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়ে মুসতানিফা বাক্য। دَأْب অর্থ- অভ্যাস, অবস্থা, (ف) دَأْب মাসদার। অবিরত কোনো কাজে লেগে থাকা। এ কারণেই এটা অভ্যাস অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ الْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةٌ : ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত ইবারত উহ্য মেনে ইশারা করেছেন যে, كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا حَالِيَة বাক্য নয়, কেননা অতীতকালীন সীগাহ حَال হওয়ার জন্যে قَدْ থাকা জরুরি; বরং এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের ব্যাখ্যা। এ কারণেই উভয় বাক্যের মাঝে وَاو উল্লেখ করা হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফের সম্প্রদায়ই হবে জাহান্নামের ইন্ধন; ধনসম্পদ সেদিন কাজে আসবে না : কিয়ামতের উল্লেখ করতে গিয়ে কাফেরদের পরিণতিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে কোনো বস্তুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। যেমন- আমি সূরার শুরুতে লিখে এসেছি। এসব আয়াতের প্রকৃত সম্বোধন ছিল নাজরানের প্রতিনিধি দলের প্রতি, যাদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ প্রতিনিধি দল বলেই জানা উচিত। ইমাম **ফখরুদ্দীন রাযী**

http://islamiboi.wordpress.com

(র.) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর রচিত সীরাতগ্রন্থের বরাতে লিখেন, এ প্রতিনিধি দল যখন নাজরান হতে পবিত্র মদিনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়, তখন তাদের প্রধান পাদরি আবূ হারিসা ইবনে আলকামা একটি খচ্চরে সওয়ার ছিল। পথ চলতে গিয়ে খচ্চরটি একবার হোঁচট খায়। তখন আবূ হারিসার ভাই কুরযা ইবনে আলকামা বলে উঠে- تَعِسَ الْاَبْعَدُ 'দূরবর্তী [অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ] ধ্বংস হোক।' নাউযুবিল্লাহ! আবূ হারিসা সঙ্গে সঙ্গে বলল, تَعِسَتْ اُمُّكَ 'তোর মা ধ্বংস হোক।' কুরয হতবুদ্ধি হয়ে এ প্রতি উত্তরের কারণ জিজ্ঞেস করলে আবূ হারিসা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা ভালো করে জানি, এ ব্যক্তি [মুহাম্মদ ﷺ] সেই প্রতীক্ষিত নবী, যাঁর সম্পর্কে আমাদের কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কুরয বলল, তাহলে মানছ না যে? সে বলল, لِاَنَّ هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكَ اَعْطَوْنَا اَمْوَالًا كَثِيْرَةً وَاَكْرَمُوْنَا فَلَوْ اٰمَنَّا بِمُحَمَّدٍ لَاَخَذُوْا مِنَّا كُلَّ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ 'কারণ, আমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনি, তাহলে এ সকল রাজা-বাদশা আমাদেরকে যে প্রভূত অর্থকড়ি ও মানসম্মান দিচ্ছে, তা সব কেড়ে নেবে। কুরয এ কথাটি তার অন্তরে লুকিয়ে রাখল এবং শেষ পর্যন্ত এ কথাই তার ইসলামের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাকে সন্তুষ্ট করুন। -[তাফসীরে ওসমানী]

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) বলেন, আমার মতে এ আয়াতগুলোতে আবূ হারিসার উল্লিখিত বক্তব্যেরই জবাব দেওয়া হয়েছে। যেন যুক্তি ও বর্ণনানির্ভর দলিল দ্বারা তাদের ভ্রান্ত আকিদা রদ করার পর সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পর যারা পার্থিব ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি ইত্যাদির কারণে ঈমান আনয়ন করছে না, তারা ভালো করে জেনে রাখুক, ধনসম্পদ ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তাদেরকে না পার্থিব জীবনে মহান আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে, না আখিরাতের মহা আজাব হতে। এর তরতাজা দৃষ্টান্ত তোমরা সম্প্রতি বদর প্রান্তরে মুসলিম ও মুশরিকদের লড়াইতে দেখে নিয়েছে। দুনিয়ার বাহার তো ক্ষণস্থায়ী। ভবিষ্যতের সাফল্য তাদের জন্যে রক্ষিত যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। এভাবে বহুদূর পর্যন্ত এ আলোচনা এগিয়ে গেছে। শব্দের ব্যাপকতা হিসেবে ইহুদি ও মুশরিকরাও এ সম্বোধনের আওতায় পড়ে গেছে, যদিও নাজরানের খ্রিস্টানরাই ছিল আসল লক্ষ্য। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ : যেমনিভাবে অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য প্রতীয়মান হয় যে, ফিরআউন গোষ্ঠীর ধনসম্পদ ও জনসম্পদ তাদের জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। মহান আল্লাহর আজাব হতে তাদের কিছুই তাদেরকে রেহাই দিতে পারেনি, তেমনি বর্তমান যুগের অন্যায়কারীও বেঈমানদের জন্যেও তাদের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি তাদের জন্যে মহান আল্লাহর আজাব থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরর্থক, নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হবে। آل فرعون। ফিরআউন গোষ্ঠী, দল বা সম্প্রদায় সম্পর্কীয় আলোচনা প্রথম পারার সূরা বাকারায় এতদসম্পর্কীয় টীকায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ফিরাউনের প্রসঙ্গ আলোচনার সাথে এ আলোচনার মিলের কারণ হলো- ফিরাআউন গোষ্ঠীর ধ্বংসলীলা তাদের চরম শাস্তি ও পরিণতি সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের দাবিদাররাও ঐকমত্য পোষণ করে। তাই এ সূরায় আলোচনার লক্ষ্যস্থল নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়। এ কারণে খ্রিস্টানগণ যেন ফিরআউন গোষ্ঠীর অশুভ পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাই ফিরআউন গোষ্ঠীর অবস্থা এ ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢. وَنَزَلَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَهُودَ بِالْإِسْلَامِ مَرْجِعَهُ مِنْ بَدْرٍ فَقَالُوا لَهُ لَا يَغُرَّنَّكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ إِغْمَارًا لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ الْيَهُوْدِ سَتُغْلَبُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَقَدْ وَقَعَ ذٰلِكَ وَتُحْشَرُوْنَ بِالْوَجْهَيْنِ فِي الْآخِرَةِ إِلَى جَهَنَّمَ فَتَدْخُلُوْنَهَا وَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِيَ .

১২. বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। তখন তারা তাকে উত্তর দিয়েছিল, যুদ্ধ সম্পর্কে অজ্ঞ ও অদক্ষ কিছু কোরাইশ লোককে পরাজিত ও হত্যা করতে পারা [আমাদের সম্পর্কে] আপনাকে যেন প্রবঞ্চনায় না ফেলে। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে, হে মুহাম্মদ! ইহুদিদের যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে বলুন, তোমরা শীঘ্রই দুনিয়াতে হত্যা, বন্দী ও জিজিয়া আরোপের মাধ্যমে পরাভূত হবে। تُغْلَبُوْنَ এখানে ت [দ্বিতীয় পুরুষ] এবং ي [প্রথম পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। আর সত্যিকারভাবেই তা ঘটেছিল। এবং তোমাদেরকে পরকালে একত্র করা হবে تُحْشَرُوْنَ এখানে দ্বিতীয় পুরুষ ও প্রথম পুরুষ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। জাহান্নামে। অনন্তর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। আর কতই না নিকৃষ্ট আবাস এটা। এটা কত নিকৃষ্ট শয্যা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْآيَةَ : **শানে নুযূল :** একটি শানে নুযূল তো ইবারতে বর্ণিত হয়েছে। কেউ বলেন, বদরের বিজয় দেখে ইহুদিরা বিশ্বাসের পথে কিছুটা এগিয়ে আসছিল। এ সময় তাদের কিছু লোক বলল, ব্যস্ত হয়ো না। দেখ, সামনে কি হয়। পরবর্তী বছরে ওহুদের পরাজয় দেখে তাদের মন শক্ত হয়ে গেল এবং স্পর্ধা বেড়ে গেল। এমনকি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমগণের সাথে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত হয়ে গেল। কবি ইবনে আশরাফ ষাট সওয়ারির একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় চলে গেল এবং আবূ সুফিয়ান প্রমুখ কুরাইশ কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে বলল, তোমরা আমরা এক। কাজেই সম্মিলিত বাহিনী তৈরি করে আমাদের উচিত মুহাম্মদের মোকাবিলা করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহই ভালো জানেন। যা হোক অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দেন, আরব উপদ্বীপে মুশরিকদের নাম-নিশানা কিছু বাকি থাকেনি। বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ ইহুদি গোত্রকে কতল করা হয়। বনু নযীরকে নির্বাসন দেওয়া হয়। নাজরানের খ্রিস্টানগণ বশ্যতা স্বীকার করে বার্ষিক কর দিতে বাধ্য হয় এবং প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত বিশ্বের বৃহৎ ও উদ্ধত শক্তিবর্গ মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে থাকে। মহান আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। –[তাফসীরে ওসমানী]

সম্ভাবনা আছে যে, কোনো ব্যক্তি এ আয়াতে সন্দেহ করতে পারে যে, আয়াত দ্বারা বুঝা যায় কাফেররা পরাজিত হবে, অথচ দুনিয়ার সকল কাফের পরাজিত নয়। এ সন্দেহ এ কারণে করা যাবে না যে, এখানে কাফের দ্বারা দুনিয়ার সকল কাফের উদ্দেশ্য নয়, বরং সে সময়ের মুশরিক ও ইহুদি জাতি উদ্দেশ্য। আর মুশরিকদেরকে সে যুগে গ্রেফতার ও হত্যা এবং ইহুদিদেরকে গ্রেফতার, হত্যা, কর আরোপ ও দেশান্তর করার মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল, আর খায়বার বিজয়ের পর সকল ইহুদিদের উপর কর আরোপ করা হয়েছিল –[জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

আল্লামা মাজেদী (র.) বলেন, تُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ -এর সম্পর্ক যে আখিরাতের সঙ্গে, তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। **কিন্তু আয়াতে** سَتُغْلَبُونَ 'তোমরা শীঘ্রই পরাজিত ও পরাভূত হবে।' মহান আল্লাহর দীনের দুশমনদের সম্পর্কে এ **দুঃসংবাদ শুধু আখিরাতেই হবে**, না দুনিয়ায়ও ইসলামি শক্তির মোকাবিলায় চূড়ান্ত পর্যায়ে বাতিল ও কাফের শক্তি পরাজিত ও পরাভূত **হবে? তা একটি** মৌলিক প্রশ্ন এ প্রসঙ্গে সমস্ত তাফসীরকারগণ সর্ববাদী সম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, দুনিয়ায় **চূড়ান্ত পর্যায়ে** কুফরি শক্তিই চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, পরাজিত ও পরাভূত হবে। এ আয়াতের হুকুম দুনিয়া ও **আখিরাত উভয়** ক্ষেত্রে কুফরি শক্তির চরম পরিণতি সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। তাফসীরকারগণ এ-ও বলেছেন, এ আয়াত **থেকে এটাও** প্রমাণিত হয় যে, কুফরি শক্তি অদূর ভবিষ্যতে এ মুসলিম শক্তির মোকাবিলায় পরাজিত, পরাভূত ও পর্যুদস্ত **হবে। বাস্তবে** দেখা গেল, মহান আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশাতেই তদানীন্তন কুফর শক্তি ও নাফরমান গোষ্ঠী পরাজিত, **পরাভূত**, পর্যুদস্ত ও বিতাড়িত হয়েছিল।

কাফেররা পরাভূত হবে : আমরা বলতে চাই, আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসঙ্গটি বদর বা ইহুদি শক্তি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের **সাথে** সম্পৃক্ত না করে একে সকল কুফরি শক্তির চরম পরিণাম সম্পর্কীয় একটি সাধারণ হুকুম ও ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গ্রহণ **করাই** উত্তম। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়কালীন বাতিল ও কুফরি শক্তি, চাই তা বদর হোক, খন্দক হোক, খায়বার হোক, হুনায়ন হোক আর মক্কা মুকাররমা বিজয় হোক, চূড়ান্ত পরাজয় কুফরি শক্তির জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলিম দীনের মুজাহিদের সাথে বাতিল ও কুফরি শক্তি যে যুগেই সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের মোকাবিলায় লিপ্ত হোক না, সকল যুগেই চূড়ান্ত বিজয় ইসলামি শক্তির, আর চূড়ান্ত পরাজয়, পর্যুদস্তুতা বাতিল ও কুফরি শক্তির জন্যেই নির্ধারিত হয়েছে। তাই আয়াতের প্রাসঙ্গিক ভবিষ্যদ্বাণী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরবর্তী যুগের সকল কুফরি শক্তির ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য বলে গ্রহণ করার মধ্যে সকল বিতর্কের অবসান নিহিত রয়েছে। ইতিহাসের নিরীক্ষণেও তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলিম শক্তি সকল যুগেই বাতিল শক্তির মোকাবিলায় বিজয়ের মর্যাদায় সুনাম অর্জন করেছে। আর চূড়ান্ত পর্যায়ে কাফের, মুশরিক ও ক্রুসেড শক্তি চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। তাই সকলকে আয়াতের হুকুমের ব্যাপারে সমানভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়।

মোদ্দাকথা, পবিত্র কুরআনের অলৌকিক মহত্ত্ব সকল দিকে প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত। কুরআন নাজিলের সময়ে মুসলমানদের **পার্থিব** সম্পদের অভাব, শক্তিহীনতা, অসহায়ত্বকে প্রত্যক্ষ করে এর কল্পনাও কি কেউ করতে পেরেছে যে, এ ধনশক্তি ও **জনশক্তিহীন**, মুষ্টিমেয় অসহায় দুর্বল লোকেরা বিপুল যশ, কীর্তি, শক্তি, সম্পদ ও খ্যাতির অধিকারী মক্কাবাসী, ইহুদি **সম্প্রদায়কে এমনকি** তদানীন্তন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় [পারস্য ও গ্রীক সাম্রাজ্যকে] পদানত, পরাজিত, পরাভূত ও পর্যুদস্ত **করতে সক্ষম হবে**, তাদের মোকাবিলা করার সাহস পাবে? কিন্তু ইতিহাসকে বিস্ময়াভিভূত করে ইসলামের স্বর্ণযুগের উজ্জ্বল **ইতিহাস রাসূলুল্লাহ** ﷺ -এর তিরোধানের পর এক যুগ সময় অতিবাহিত হতে না হতে সমগ্র বিশ্বের তদানীন্তন কালের **শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সাম্রাজ্যসমূহ** পরাজিত পরাভূত হয়ে ইসলামের সুশীতল ও সুমহান ছায়াতলে সমবেত হয়।

–[তাফসীরে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

১৩. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ عِبْرَةٌ وَذُكِّرَ الْفِعْلُ لِلْفَصْلِ فِي فِئَتَيْنِ فِرْقَتَيْنِ الْتَقَتَا يَوْمَ بَدْرٍ لِلْقِتَالِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ طَاعَتِهِ وَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ (رض) وَكَانُوا ثَلَثَمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُمْ فَرَسَانِ وَسِتُّ أَدْرُعٍ وَثَمَانِيَةُ سُيُوفٍ وَأَكْثَرُهُمْ رَجَّالَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَيِ الْكُفَّارُ مِثْلَيْهِمْ أَيِ الْمُسْلِمِيْنَ أَيْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ كَانُوا نَحْوَ أَلْفٍ رَأْيَ الْعَيْنِ أَيْ رُؤْيَةً ظَاهِرَةً مُعَايَنَةً وَقَدْ نَصَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ قِلَّتِهِمْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ يُقَوِّي بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ نَصْرَهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذْكُورِ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ لِذَوِي الْبَصَائِرِ أَفَلَا تَعْتَبِرُونَ بِذَٰلِكَ فَتُؤْمِنُونَ.

অনুবাদ :

১৩. তোমাদের জন্যে ছিল নিদর্শন অর্থাৎ শিক্ষা। كَانَ এ ক্রিয়াটিকে مُذَكَّرٌ বা পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এর اِسْم [কর্তা آيَةٌ] مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গ। কারণ كَانَ এবং آيَةٌ -এর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। দুটি দলের সম্প্রদায়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরের দিন একত্র হওয়ার মধ্যে। একদল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যে যুদ্ধে লড়েছিল। এরা সংখ্যায় ছিল তিনশত তেরজন। তাদের সঙ্গে মাত্র দুটি ঘোড়া, ছয়টি বর্ম ও আটটি তলোয়ার ছিল। অধিকাংশ মুজাহিদই ছিল পদাতিক। অন্যদল ছিল সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী; তারা তাদেরকে يَرَوْنَهُمْ এটা ي [নাম পুরুষ] এবং ت [দ্বিতীয় পুরুষ] উভয় রূপেই পাঠ করা যায়। অর্থাৎ কাফেরদেরকে চোখের দেখায় অর্থাৎ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখেছিল। এরা ছিল অনেক বেশি। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। আর অল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এদের [মুসলমানদের] সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ যাকে সাহায্য করার ইচ্ছা করেন তাকে নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন মজবুত করেন। নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য বিবেকবান লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে। সুতরাং তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না? অনন্তর ঈমান আনয়ন কর না?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَذُكِّرَ الْفِعْلُ الخ : **প্রশ্ন:** آيَةٌ হলো كَانَ -এর ইসম। ফে'লকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে অথচ স্ত্রীলিঙ্গ তথা كَانَتْ আনা উচিত ছিল, যাতে ফে'ল ও ইসমের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

উত্তর: ফে'ল এবং তার ইসমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হলে তখন মিল থাকা জরুরি নয়। আর এখানে لَكُمْ -এর ব্যবধান ঘটেছে।

اَلْفِئَةُ : দল, জামাত -এর কোনো একবচন শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বহুবচন فِيَاتٌ

قَوْلُهُ وَكَانُوا ثَلَثَمِائَةٍ الخ : তন্মধ্য হতে ৭৭ জন ছিলেন মুহাজির। তাদের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত আলী (রা.) আর আনসার ছিলেন ২৩৬ জন। তাঁদের পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে উবাইদা (রা.)। −[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৩৭৬]

اَدْرُعٌ : এটি دِرْعٌ -এর বহুবচন। অর্থ− লোহার বর্ম। وَدِرْعُ الْمَرْأَةِ قَمِيصُهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي فِئَتَيْنِ (الاية) : **বদর যুদ্ধ :** এ আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের নিকট ছিল সাতশত উট এবং একশত ঘোড়া। অপর পক্ষে মুসলমান মুজাহিদ ছিল তিন শতাধিক, তাদের নিকট ছিল সত্তরটি উট, দুটি ঘোড়া, ছয়টি লৌহবর্ম ও আটটি তরবারি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল। ফল এই হয়েছিল যে, কাফেরদের অন্তরে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কল্পনা ভীতিগ্রস্ত করেছিল। আর মুসলমানরা তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আরও বেশি মাত্রায় আল্লাহর অভিমুখী হয়েছিল। কাফেরদের পূর্ণসংখ্যা যা মুসলমানদের সংখ্যার প্রায় তিনগুণ ছিল, তা যদি প্রকাশ হয়ে যেত তাহলে সম্ভাবনা ছিল যে, মুসলমানদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হতো। কেননা فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ আয়াতে মুসলমানদের দ্বিগুণের উপর বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং আল্লাহর ওয়াদা ছিল। কিন্তু তিনগুণের উপর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি ছিল না। আর উভয় পক্ষের পরস্পরে দ্বিগুণ সংখ্যক দেখার বিষয়টি বিশেষ ক্ষেত্রে ছিল। −[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

١٤. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مَا
تَشْتَهِيْهِ النَّفْسُ وَتَدْعُوْ اِلَيْهِ زَيَّنَهَا اللّٰهُ
تَعَالٰى اِبْتِلَاءً اَوِ الشَّيْطَانُ مِنَ النِّسَاۤءِ
وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْاَمْوَالِ الْكَثِيْرَةِ
الْمُقَنْطَرَةِ الْمُجْتَمَعَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ الْحِسَانِ
وَالْاَنْعَامِ اَىِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
وَالْحَرْثِ الزَّرْعِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا ثُمَّ يَفْنٰى
وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ الْمَرْجِعِ وَهُوَ
الْجَنَّةُ فَيَنْبَغِى الرَّغْبَةُ فِيْهِ دُوْنَ غَيْرِهِ.

١٥. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ اَؤُنَبِّئُكُمْ اُخْبِرُكُمْ
بِخَيْرٍ مِنْ ذٰلِكُمْ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الشَّهَوَاتِ
اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ خَبَرٌ مُبْتَدَؤُهُ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ اَىْ مُقَدَّرِيْنَ
الْخُلُوْدَ فِيْهَا اِذَا دَخَلُوْهَا وَاَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
مِنَ الْحَيْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَقْذَرُ وَ
رِضْوَانٌ بِكَسْرِ اَوَّلِهِ وَضَمِّهِ لُغَتَانِ اَىْ
رِضًا كَثِيْرٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ عَالِمٌ
بِالْعِبَادِ فَيُجَازِىْ كُلًّا مِنْهُمْ بِعَمَلِهِ.

অনুবাদ :

১৪. নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য **সঞ্চিত** সম্পদরাশি, চিহ্নিত সৌন্দর্যমণ্ডিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি এবং কৃষি-ফসল ক্ষেত-খামার ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক বস্তুর অর্থাৎ প্রবৃত্তি যা কামনা করে, তা যে বস্তুর অনুরাগ সৃষ্টি করে সে সকল বস্তুর প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোহর করা হয়েছে। মানুষের পরীক্ষার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তা সুসজ্জিত করে তুলে ধরেছেন। কিংবা শয়তান মানুষের চোখে তা মনোহর করে তুলে ধরে। এটা উল্লিখিত বস্তু পার্থিব জীবনের সাজ-সরঞ্জাম। যা সে এতে ভোগ করে। অতঃপর সেসব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলা, তাঁর নিকটই রয়েছে সর্বোত্তম আশ্রয়। উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল অর্থাৎ জান্নাত। সুতরাং অন্য কিছুর প্রতি নয়; বরং আল্লাহর প্রতিই কেবল ধাবিত হওয়া কর্তব্য।

১৫. হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়কে বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব অর্থাৎ উল্লিখিত চিত্তাকর্ষক বস্তুসমূহ হতে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর বার্তা সংবাদ দেব? এ স্থানে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি تَقْرِيْرِىْ অর্থাৎ বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধানমূলক।

যারা শিরক হতে বেঁচে থাকে তাদের জন্যে রয়েছে উদ্যানরাজি لِلَّذِيْنَ الخ এটা خَبَرْ বা বিধেয়। جَنّٰتٌ الخ এটা مُبْتَدَأْ বা উদ্দেশ্য। যাদের পাদদেশে নদী বহমান। যখন তারা প্রবেশ করবে তখন সেখানে তারা স্থায়ী হবে। সেস্থানের স্থায়িত্ব তাদের জন্যে সুনির্ধারিত এবং রজঃস্রাব ইত্যাদি সকল প্রকার অসুচিতা থেকে সুপবিত্রা সঙ্গিনী ও আল্লাহর নিকট হতে বিরাট সন্তুষ্টি। رِضْوَانٌ -এর প্রথামাক্ষরে কাসরা ও পেশ এ দু-ধরনের উচ্চারণভঙ্গি বিদ্যমান। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দ্রষ্টা। অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং প্রত্যেককেই তিনি তদীয় কার্যানুসারে প্রতিদান দেবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ পার্থিব ভোগ সামগ্রী : মানুষ আকর্ষণীয় ভোগ সামগ্রীর মাঝে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। এ কারণেই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- مَا تَرَكْتُ بَعْدَ فِتْنَةٍ اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 'আমি আমার পর পুরুষদের জন্যে নারী অপেক্ষা বেশি ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।' হ্যাঁ, নারী দ্বারা যদি চারিত্রিক পবিত্রতা ও সন্তান বৃদ্ধি হয় তবে তা নিন্দনীয় নয়: বরং তা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয়। কাজেই রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তু হলো সতীসাধ্বী স্ত্রী, যার দিকে তাকালে অন্তর জুড়ায়, যাকে আদেশ করলে আনুগত্য করে। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তার অর্থসম্পদ ও স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষায় যত্নবান থাকে। এভাবেই সামনে ইহজীবনের ভোগ্যবস্তুর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সবগুলোর ভালোমন্দ হওয়ার বিষয়টি নিয়ত ও কর্মপদ্ধতির উপর নির্ভর করবে এবং এ হিসেবেই তার মাঝে তারতম্য হবে। কিন্তু দুনিয়ায় সংখ্যাধিক্য যেহেতু এমন লোকের, যারা ভোগবিলাসের সামগ্রীতে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহ ও নিজ পরিণতি ভুলে যায়। এজন্যই زُيِّنَ لِلنَّاسِ -এর মাঝে প্রকাশভঙ্গি ব্যাপক রাখা হয়েছে।

-[তাফসীরে ওসমানী]

এ সকল বস্তুর ভালোবাসা বা আকর্ষণ বেশিরভাগ মানুষের অন্তরে জায়েজের সীমারেখা থেকে নাফরমানির কারণ ঘটে। এখানে شَهَوَاتٌ দ্বারা مُشْتَهَاتٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে সকল বস্তু প্রকৃতগতভাবে মানুষের নিকট আকর্ষণীয় ও পছন্দনীয় হয়। এ কারণেই সেসবের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা অপছন্দনীয় নয়। তবে শর্ত হলো তা মধ্যম পর্যায়ের এবং শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে হবে। এগুলোকে সুশোভিত করাও আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষাবিশেষ।

قَوْلُهُ الْمَذْكُوْرُ : প্রশ্ন : ذٰلِكَ -এর মুশারুন ইলাইহ اَلتَّقْلِيْلُ وَالتَّكْثِيْرُ অতএব, ইসমে ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই।

উত্তর : اَلتَّقْلِيْلُ وَالتَّكْثِيْرُ এখানে اَلْمَذْكُوْرُ তথা উল্লিখিত অর্থে। ইসমে ইশারা ও মুশারুন ইলাইহির মাঝে কাজেই সামঞ্জস্য রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٦. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ اَوْ بَدْلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَه يَقُوْلُوْنَ يَا رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا صَدَّقْنَا بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

১৬. যারা اَلَّذِيْنَ الخ এটা نَعْتٌ বা বিশেষণ কিংবা পূর্বোল্লিখিত اَلَّذِيْنَ -এর بَدْلٌ বা স্থলাভিষিক্ত বাক্য। বলে, হে আমাদের প্রভু! আমরা বিশ্বাস করেছি তোমাকে এবং তোমার রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছি সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব হতে রক্ষা কর।

١٧. اَلصّٰبِرِيْنَ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ نَعْتٌ وَالصّٰدِقِيْنَ فِى الْاِيْمَانِ وَالْقٰنِتِيْنَ الْمُطِيْعِيْنَ لِلّٰهِ وَالْمُنْفِقِيْنَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ اللّٰهَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا بِالْاَسْحَارِ اَوَاخِرِ اللَّيْلِ خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهَا وَقْتُ الْغَفْلَةِ وَلَذَّةِ النَّوْمِ .

১৭. পাপকার্য হতে বিরত থেকে আনুগত্যের কার্য পালনে তারা ধৈর্যশীল, اَلصّٰبِرِيْنَ এটা نَعْتٌ বা বিশেষণ। ঈমানের বিষয়ে সত্যবাদী, অনুগত আল্লাহর বাধ্যগত, ব্যয়কারী দান সদকাকারী, এবং ঊষাকালে রাত্রি শেষে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী অর্থাৎ তারা বলে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا 'হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা কর।'

রাত্রির শেষভাগ যেহেতু নিদ্রাসুখ ও অসতর্কতার সময় সেহেতু বিশেষ করে এ স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨. شَهِدَ اللّٰهُ بَيَّنَ لِخَلْقِه بِالدَّلَائِلِ وَالْاٰيَاتِ اَنَّه لَآ اِلٰهَ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ فِي الْوُجُوْدِ اِلَّا هُوَ وَ شَهِدَ بِذٰلِكَ الْمَلٰئِكَةُ بِالْاِقْرَارِ وَاُولُوا الْعِلْمِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِالْاِعْتِقَادِ وَاللَّفْظِ قَائِمًا بِتَدْبِيْرِ مَصْنُوْعَاتِه وَنَصْبُه عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ اَىْ تَفَرَّدَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كَرَّرَه تَاكِيْدًا اَلْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِه الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِه .

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন অর্থাৎ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে সকল সৃষ্টিকে তিনি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। মূলতই আর কোনো অস্তিত্বশীল উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে এবং নবী ও বিশ্বাসীগণ যারা জ্ঞানের অধিকারী তারাও বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মাধ্যমে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে। তাঁর সৃষ্টি পরিচালনায় এককভাবে তিনি ন্যায়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত। قَائِمًا এটা حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদরূপে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যটির মর্মবোধক শব্দ تَفَرَّدَ [তিনি এক] এর عَامِلٌ রূপে গণ্য। اَلْقِسْطُ অর্থাৎ اَلْعَدْلُ বা ন্যায় নিষ্ঠা। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। تَاكِيْد বা জোর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এ বিষয়টির পুনরুক্তি করা হয়েছে। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী, তাঁর কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَعْتٌ اَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য একটি প্রশ্ন নিরসন করা যে, اَلْعِبَادُ যা নিকটবর্তী তা থেকে বদল কিংবা সিফত, এ ধারণাকে দূর করেছেন যে, এটা اِتَّقَوْا থেকে বদল কিংবা সিফত, اَلْعِبَادُ থেকে নয়।

قَوْلُهُ يَا رَبَّنَا : يَا উহ্য মেনে ইশারা করেছেন যে, رَبَّنَا শব্দটি উহ্য يَا -এর কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ نَعْتٌ : অর্থাৎ যেভাবে اَلَّذِيْنَ শব্দটি اِتَّقَوْا -এর সিফত তদ্রূপ اِتَّقَوْا ও সিফত।

قَوْلُهُ الصَّابِرُوْنَ وَالصَّادِقُوْنَ : অর্থাৎ ধৈর্যধারণকারী। ইমাম রাযী (র.) লিখেন, ফে'ল -এর পরিবর্তে ইসমে ফায়েল আনার কারণ হলো, সে সকল ব্যক্তির একটা বিশেষ অভ্যাস প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ : অর্থাৎ قَائِمًا - هُوَ থেকে হাল, اِلٰه -এর **সিফত হওয়ার কারণে নয়। কেননা সিফত** ও মওসূফের মধ্যে فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْفَاعِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمْلَةِ : এটা মূলত একটি প্রশ্নের উত্তর.।

প্রশ্ন: قَائِمًا যদি মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহ -এর সমষ্টি থেকে হাল হয় তাহলে প্রয়োগ বৈধ হয় না। যদি শুধু আল্লাহ শব্দ থেকে হাল হয় তাও বৈধ নয়। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو رَاكِبًا এ সময় হালের কোনো আমিল থাকবে না। এর উত্তর দিয়েছেন যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যটি অর্থের দিক দিয়ে تَفَرَّدَ অর্থে। কেননা ইসতিছনা নফীর পরে একবচন হওয়ার ফায়দা দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ : বিশেষভাবে শেষ রাতের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, তা অন্তরকে মজবুত রাখা এবং রূহানী শক্তি বৃদ্ধির কারণ হয়। নফসের উপর সে সময় জাগ্রত হওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। রাতের শেষ প্রহর ছাড়া অন্য সময় ইস্তিগফার হতে পারে না- এমন উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (الاية) : شَهَادَتْ অর্থ হলো- বর্ণনা করা, অবহিত করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, সেসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজের একত্ববাদের প্রতি আমাদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ফেরেশতা এবং আলেমগণও তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়। এতে আলেমগণের বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদাও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের এবং ফেরেশতাদের নামের সাথে আলেমদের কথা উল্লেখ করেছেন, তবে এর দ্বারা সেসব আলেম উদ্দেশ্য- যারা কিতাব ও সুন্নাহর ইলম সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٩. إِنَّ الدِّيْنَ الْمَرْضِيَّ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ الْإِسْلَامُ أَيِ الشَّرْعُ الْمَبْعُوْثُ بِهِ الرُّسُلُ الْمَبْنِيُّ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ أَنَّ بَدَلٌ مِنْ أَنَّهُ الخ بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فِي الدِّيْنِ بِأَنْ وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَغْيًا مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ أَيِ الْمُجَازَاةِ لَهُ.

১৯. নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম। অর্থাৎ তাওহীদের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জীবন-বিধানসহ রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন তা। إِنَّ এটা অপর এক কেরাতে أَنَّهُ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত বাক্যরূপে প্রথমাক্ষর ফাতাহসহ [أن রূপে] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা بَدَلِ اشْتِمَال বা সন্নিবেশিত স্থলাভিষিক্ত পদ বলে গণ্য হবে। যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তারা কাফেরদের প্রতি জিদবশত তাদের নিকট তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান আসার পর তাদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মতানৈক্য ঘটেছিল। কতকজন তাওহীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং আর কতকজন সত্য প্রত্যাখ্যান করল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করল। নিশ্চয় আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। অর্থাৎ তার প্রতিফল দানে [তিনি অতিদ্রুত]।

٢٠. فَإِنْ حَاجُّوْكَ خَاصَمَكَ الْكُفَّارُ يَا مُحَمَّدُ فِي الدِّيْنِ فَقُلْ لَهُمْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ انْقَدْتُ لَهُ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَخُصَّ الْوَجْهُ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلٰى وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْأُمِّيّٖنَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ءَأَسْلَمْتُمْ أَيْ أَسْلِمُوْا فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا مِنَ الضَّلَالِ وَإِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ أَيِ التَّبْلِيْغُ لِلرِّسَالَةِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ فَيُجَازِيْهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ.

২০. হে মুহাম্মদ! যদি তারা কাফেররা তোমাদের সাথে ধর্ম বিষয়ে বিতর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তবে তুমি এদের বল, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর নিকট চেহারা সমর্পণ করেছি। অর্থাৎ তাঁর প্রতি আমরা বাধ্যগত। শরীরের মধ্যে চেহারা সর্বোৎকৃষ্ট বলে তাকে বিশেষভাবে এ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই যখন সমর্পিত তখন অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর তো কথাই নেই এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে অর্থাৎ আরব মুশরিকদেরকে বল, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছ? অর্থাৎ তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে তারা পথভ্রষ্টতা হতে হেদায়েত পাবে আর যদি তারা ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। রিসালাতের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ বান্দাদের দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাদের কার্যাবলির প্রতিফল দান করবেন। এ আয়াতটি যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধান সংবলিত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ : ইসলাম এমন ধর্ম যার দাওয়াত ও তালীম প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে দান করেছেন। বর্তমানে তার পূর্ণাঙ্গ অবস্থা সেটাই, যাকে আখেরী জামানার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর এমনভাবে ঈমান ও একিন রাখতে হবে যেভাবে নবী করীম ﷺ রাখতে বলেছেন। শুধুমাত্র এমন আকিদা রাখা যে, আল্লাহ এক এবং কিছু নেক আমল করা ইসলাম নয় এবং তার দ্বারা নাজাত লাভ হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

২১. إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُقَاتِلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ رُوِيَ اَنَّهُمْ قَتَلُوْا ثَلٰثَةً وَارْبَعِيْنَ نَبِيًّا فَنَهَاهُمْ مِائَةٌ وَسَبْعُوْنَ مِنْ عِبَادِهِمْ فَقَتَلُوْهُمْ فِيْ يَوْمِهِمْ فَبَشِّرْهُمْ اَعْلِمْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ لَهُمْ وَدَخَلَتِ الْفَاءُ فِيْ خَبَرِ اِنَّ لِشِبْهِهِ اسْمِهَا الْمَوْصُوْلِ بِالشَّرْطِ .

২১. যারা আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে يَقْتُلُوْنَ এটা অপর এক কেরাতে يُقَاتِلُوْنَ রূপে পঠিত রয়েছে। এবং যারা মানুষের মধ্যে ন্যায়ের ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে এরা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। বর্ণিত আছে যে, তারা তেতাল্লিশজন নবীকে হত্যা করে। তখন তাদের দাসদের একশত সত্তরজন এর নিষেধ করলে ঐদিন তাদেরও তারা হত্যা করে। তুমি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও ঘোষণা দাও। এ স্থানে ব্যঙ্গার্থে এটাকে সুসংবাদ রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

اِنَّ -এর اِسْم এখানে اِسْمِ مَوْصُوْل বা সংযোজনবাচক বিশেষ্য [اَلَّذِيْنَ]। এই اَلَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ الخ বাক্যাংশটি শর্তবাচক অর্থ প্রকাশ করায় এটা শর্ত -এর অনুরূপ, ফলে তার خَبَرْ বা বিধেয় فَبَشِّرْهُمْ -এ فَ ব্যবহার করা হয়েছে।

২২. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ مَا عَمِلُوْهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَا اِعْتِدَادَ بِهَا لِعَدَمِ شَرْطِهَا وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ .

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলি অর্থাৎ যে সমস্ত ভালো কাজ তারা করেছে। যেমন– দান-সাদকা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইত্যাদি তা ইহকালে ও পরকালে নিষ্ফল হবে। বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকায় এসব আমল কোনো ধর্তব্যের হবে না। তাদের কোনো সাহায্যকারী হবে না। শাস্তি থেকে কোনো রক্ষাকারী থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ : অর্থাৎ তাদের অহংকার ও বিদ্রোহ এ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা শুধু নবীদেরকেই অন্যায়ভাবে হত্যা করেনি; বরং যারা হক ও ইনসাফের কথা বলত তাদেরকেও হত্যা করেছে। অর্থাৎ যারা খাঁটি ঈমানদার ছিল, সত্যের প্রতি মানুষদেরকে আহ্বান করত, সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধকে নিজের দায়িত্ব মনে করত।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُقَاتِلُوْنَ : ব্যাখ্যাকার এ মতভেদকে সামনের يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ -এর পরে উল্লেখ করলে আরও ভালো হতো। কারণ মতভেদটি দ্বিতীয় يَقْتُلُوْنَ শব্দের ক্ষেত্রে।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ : অর্থাৎ, যে সকল কাজের উপর তারা অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছে এবং মনে করছে যে, আমরা অনেক ভালো কাজ করছি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদের সে সকল কাজের পরিণাম এই।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٣. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا حَظًّا مِنَ الْكِتٰبِ التَّوْرٰىةِ يُدْعَوْنَ حَالٌ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ عَنْ قَبُوْلِ حُكْمِهٖ نَزَلَ فِى الْيَهُوْدِ زَنٰى مِنْهُمْ اِثْنَانِ فَتَحَاكَمُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ فَاَبَوْا فَجِئَ بِالتَّوْرٰىةِ فَوُجِدَ فِيْهَا فَرُجِمَا فَغَضِبُوْا .

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের يُدْعَوْنَ হলো اَلَّذِيْنَ -এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। তাওরাতের অংশ কিছু হিস্যা প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর তারাই তাঁর বিধান গ্রহণে পরাঙ্মুখ। একবার ইহুদিদের দুই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তারা রাসূল ﷺ -এর কাছে তার বিচার নিয়ে আসে। তখন তিনি তাদেরকে 'রজম' বা প্রস্তর নিক্ষেপে সংহার করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে। শেষে তাওরাত নিয়ে আসা হলে এতেও ঐ বিধান পাওয়া যায়। [তখন বাধ্য হয়ে] উক্ত দুই ব্যাভিচারীকে রজম করা হয়। ফলে তারা খুব রাগ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছিলেন।

٢٤. ذٰلِكَ التَّوَلِّىْ وَالْاِعْرَاضُ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اَىْ بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ اٰبَائِهِمُ الْعِجْلَ ثُمَّ تَزُوْلُ عَنْهُمْ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ مِنْ قَوْلِهِمْ ذٰلِكَ .

২৪. এটা অর্থাৎ এ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও পরাঙ্মুখ হওয়া এ হেতু যে, তারা বলে যে অর্থাৎ তাদের এ উক্তির কারণে, কয়েক দিন ব্যতীত অর্থাৎ চল্লিশ দিন, যে কয়েক দিন তাদের পূর্বপুরুষরা গোবৎসের পূজা করেছিল অগ্নি আমাদের স্পর্শ করবে না উক্ত কতকদিন পর তা তাদের উপর হতে অপসারিত হবে। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের এ মিথ্যা উদ্ভাবন উক্ত মিথ্যা কথন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে। فِىْ دِيْنِهِمْ এটা مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٢٥. فَكَيْفَ حَالُهُمْ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ اَىْ فِىْ يَوْمٍ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَغَيْرِهِمْ جَزَاءَ مَا كَسَبَتْ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَّشَرٍّ وَّهُمْ اَىِ النَّاسُ لَا يُظْلَمُوْنَ بِنَقْصِ حَسَنَةٍ اَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ .

২৫. কিভাবে তাদের কি অবস্থা হবে? সেদিন, যাতে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আমি তাদেরকে একত্র করব এবং কিতাবী বা অন্যান্য প্রত্যেককে তার অর্জিত কর্মের ভালো বা মন্দ যা সে করেছে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অর্থাৎ লোকদের প্রতি সৎ আমল হ্রাস করে বা মন্দ আমল বাড়িয়ে দিয়ে কোনো অন্যায় করা হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয় : এখানে সত্য ও অসত্যের আহ্বানকারীদের সাথে ইহুদিদের হঠকারিতা, বিরোধিতা, বিদ্বেষ ও এড়িয়ে চলার চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ : এসব আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য মদিনার ইহুদিরা, যাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা ইসলাম ও মুসলমান এবং তাদের নবীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ফলে একটি গোত্রকে এবং দুটি গোত্রকে দেশান্তর করা হয়েছিল।

ইহুদিরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থেরও অনুসরণ করে না : তাদেরকে যখন আহ্বান করা হয় যে, পাক কুরআনের দিকে আস, যা তোমাদের স্বীকৃত কিতাবসমূহের দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অবতীর্ণ এবং যা তোমাদের নিজেদের মতবিরোধসমূহের যথাযথ মীমাংসা দানকারী তখন তাদের ধর্মবেত্তাদের এক শ্রেণী অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অথচ পাক কুরআনের প্রতি আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাওরাত ইঞ্জিলের প্রতি আহ্বান; বরং অসম্ভব নয় যে, এ স্থলে মহান আল্লাহর কিতাব বলতে তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলকেই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ ধর, আমরা তোমাদের ঝগড়ার ফয়সালা তোমাদের কিতাবের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু পরিহাসের কথা, তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি ও তুচ্ছ স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নিজেরদের কিতাবের নির্দেশনা হতেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনে, না তার নির্দেশে কর্ণপাত করে। তাইতো তারা ব্যভিচারীর রজম [প্রস্তারাঘাতে হত্যা] -এর ক্ষেত্রে তাওরাতের সুস্পষ্ট নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে যায়। যেমনটা সূরা মায়িদায় আসবে। –[তাফসীরে ওসমানী]

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ : তাদের সকল ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসার জন্যে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ : অর্থাৎ, তারা ঐ গ্রন্থ মানতে অস্বীকার করার কারণ হলো তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তারা তো দোজখে প্রবেশ করবেই না। যদি প্রবিষ্ট হয়ই, তবে তা সামান্য কয়েকদিনের জন্যে হবে। তাদের এ মনগড়া দাবি তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা মনে করে তারা আল্লাহর অতি প্রিয়, আমরা যা কিছুই করি না কেন, বেহেশত আমাদের জন্যেই নির্ধারিত। আমরা ঈমানদার, আমরা অমুকের বংশধর এবং অমুক নবীর উম্মত। কাজেই আমাদেরকে আগুনে স্পর্শ করার কোনো ক্ষমতা নেই। আর যদি স্পর্শ করেও তাহলে পাপমুক্ত করার জন্যে কয়েকদিনের জন্য হতে পারে, এরপর আমরা বেহেশতে প্রবেশ করব। এ ভ্রান্ত ধারণা তাদেরকে এত নির্ভীক বানিয়ে দিয়েছে যে, তারা কঠোর থেকে কঠোর অন্যায়ে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে না।

قَوْلُهُ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : আকায়েদ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সম্পর্কে কোনো প্রমাণহীন অযৌক্তিক তথ্যহীন বক্তব্য ও বিশ্বাস নিজেরা মনগড়াভাবে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহর নামে ভিত্তিহীনভাবে তা চালিয়ে দেওয়াকে 'ইফতিরা' বা 'ভিত্তিহীন মনগড়া মিথ্যাচার' বলা হয়। আর ইহুদিগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসে অসংখ্য মনগড়া ভিত্তিহীন মিথ্যা রটনা করে এগুলোকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সপক্ষে কল্পিত 'রক্ষাকবচ' বানিয়ে নিয়েছিল। আর তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের মধ্যে এটিও উল্লেখযোগ্য ছিল যে, [শুধু নামে মাত্র চল্লিশ দিন ব্যতীত] জাহান্নাম তাদের জন্য হারাম। তাদের বুজুর্গদের সাথে সম্পর্ক ও বুজুর্গদের সুপারিশই তাদের নাজাতের জন্যে যথেষ্ট। তাদের নাজাত ঈমান ও আমল ব্যতীত আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।

فَكَيْفَ : এ প্রশ্নবোধক শব্দ আজাবের ভয়াবহতা, নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা বুঝানোর জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

وَوُفِّيَتْ : কারো উপর কোনো জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ কাউকেও বিনা অপরাধে অথবা অপরাধের মাত্রার চেয়ে শাস্তির পরিমাণ বেশি দেওয়া হবে না এবং কেউ তার সৎকর্মের প্রতিদান হতে বঞ্চিত হবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٦. وَنَزَلَ لَمَّا وَعَدَ ﷺ أُمَّتَهُ مُلْكَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ هَيْهَاتَ قُلِ اللّٰهُمَّ يَا اللّٰهُ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِيْتَائِهِ إِيَّاهُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِنَزْعِهِ مِنْهُ بِيَدِكَ بِقُدْرَتِكَ الْخَيْرُ أَيْ وَالشَّرُّ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

২৬. রাসূল ﷺ একদিন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হবে বলে যখন উম্মতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তখন মুনাফিকরা উপহাস করে বলেছিল, ইস, কেমন [পাগলের] কথা! এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– বল, আল্লাহুম্মা হে আল্লাহ ! সকল সাম্রাজ্যের অধিপতি তুমি তোমার সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর تُؤْتِي অর্থ– تُعْطِي বা প্রদান কর। এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে সম্মান দানের ইচ্ছা কর তাকে সম্মান দাও এবং তা ছিনিয়ে যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। তোমার হস্তেই তোমার ক্ষমতায়ই কল্যাণ এবং অকল্যাণ। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٧. تُوْلِجُ تُدْخِلُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ تُدْخِلُهُ فِي الَّيْلِ فَيَزِيْدُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْاٰخَرِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَالْإِنْسَانِ وَالطَّائِرِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ كَالنُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَيْ رِزْقًا وَاسِعًا.

২৭. তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর প্রবিষ্ট কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর প্রবিষ্ট কর। ফলে একটিতে যতটুকু হ্রাস পায় অন্যটিতে ততটুকু বৃদ্ধি পায়। তুমিই মৃত হতে জীবন্তের যেমন– বীর্য হতে মানুষের এবং ডিম হতে পাখির আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের যেমন– বীর্য এবং ডিমের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক প্রচুর জীবনোপকরণ দান কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ : সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর : পূর্বেই বলা হয়েছে, নাজরান প্রতিনিধি দলের নেতা আবূ হারিছা ইবনে আলকামা বলেছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনলে রোম সম্রাট আমাদেরকে যে সম্মান ও অর্থকড়ি দেয় তা সব বন্ধ করে দেবে। সম্ভবত এ স্থলে দোয়া ও মুনাজাত আকারে তার সে উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা রাজা-বাদশার ক্ষমতা ও তাদের দেওয়া সম্মান দ্বারা প্রতারিত হও। জেনে রেখ, সার্বভৌম ক্ষমতা ও সম্মানের আসল মালিক আল্লাহ তা'আলা। যাকে ইচ্ছা দেওয়া ও যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে। এটা কি সম্ভব নয় যে, তিনি

http://islamiboi.wordpress.com

রোম ও পারস্যের রাজত্ব ও মর্যাদা কেড়ে নিয়ে মুসলিমগণকে দান করবেন? বরং মহান আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে, তিনি এটা অবশ্যই করবেন। আজ মুসলিম সমাজের সহায়-সম্বলহীনতা ও শত্রুদের দাপট দেখে তোমাদের এটা বুঝে না আসারই কথা। এ কারণেই তো ইহুদি ও মুনাফিকরা এই বলে ঠাট্টা করত যে, কুরাইশদের আক্রমণের ভয়ে ভীত হয়ে যারা মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করছে, সেই মুসলমান আবার কায়সার ও কিসরার মুকুট ও সিংহাসন দখলের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কয়েক বছরের মধ্যেই দেখিয়ে দেন যে, রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ তিনি তাঁর প্রিয়নবীর হাতে তুলে দেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর আমলে তা মুসলিম মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টিত হয়।

আসলে এ বৈষয়িক ক্ষমতা ও সম্পদের আর কি মূল্য! সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ রূহানী ক্ষমতা ও ইজ্জতের শীর্ষস্থান তথা নবুয়ত ও রিসালাতের পদমর্যাদাই যখন বনী ইসরাঈল থেকে কেড়ে বনী ইসমাঈলকে দান করলেন, তখন রোম ও আরব বিশ্বের প্রকাশ্য রাজত্ব যাযাবর আরবদের হাতে তুলে দেওয়ার মাঝে আশ্চর্যের কি আছে? এ প্রার্থনা যেন এক রকম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, অতি সত্বর বিশ্বমানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। যে জাতি সভ্যতা বিবর্জিত হয়ে আলাদা পড়ে রয়েছে। তারা রাজক্ষমতা ও মহামর্যাদার অধিকারী হবে। এ যাবৎ যারা রাজত্ব করছিল তারা নিজেদের কর্মদোষে পতন ও হীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। –[তাফসীরে ওসমানী]

مَنْ تَشَاءُ এর শর্ত প্রত্যেক ব্যাপারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ এ রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন যে, সম্পদ রাজ্য, শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ামত বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সামগ্রিক কল্যাণের যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রাকৃতিক বিধানের ভিত্তিতেই সম্পাদন করেন। এসব নিয়ামত বণ্টনের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও নৈতিক মূল্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচিত নয় এবং নৈতিক উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান আল্লাহর প্রিয় ও নিকটতম হওয়া এসব প্রাকৃতিক নিয়ামত বণ্টনের নীতির সাথে আদৌ সম্পর্কিত নয়।

بِيَدِكَ الْخَيْرُ : অর্থাৎ মহান আল্লাহরই হাতে সর্বপ্রকার কল্যাণ। মন্দের সৃষ্টিও মৌলিকভাবে কল্যাণই বটে। কেননা সামগ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর মাঝে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সহীহ হাদীসে আছে– اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ অর্থাৎ, যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে, অকল্যাণ তোমার দিকে নয়। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٨. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ يُوَالُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اَىْ غَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ اَىْ يُوَالِيْهِمْ فَلَيْسَ مِنْ دِيْنِ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً مَصْدَرُ تَقِيَّةٍ اَىْ تَخَافُوْا مَخَافَةً فَلَكُمْ مُوَالَاتُهُمْ بِاللِّسَانِ دُوْنَ الْقَلْبِ وَهٰذَا قَبْلَ عِزَّةِ الْاِسْلَامِ وَيَجْرِىْ فِىْ مَنْ هُوَ فِىْ بَلَدٍ لَيْسَ قَوِيًّا فِيْهَا وَيُحَذِّرُكُمْ يُخَوِّفُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ اَىْ اَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكُمْ اِنْ وَالَيْتُمُوْهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ فَيُجَازِيْكُمْ .

২৮. বিশ্বাসীগণ যেন বিশ্বাসীগণ ব্যতীত এদের ছাড়া অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। তাদের সাথে যেন বন্ধুত্ব-সম্পর্ক না রাখে। যে কেউ এমন করবে অর্থাৎ তাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক রাখবে তার সাথে আল্লাহর দীনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে হ্যাঁ যদি তোমরা তাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা কর। تُقٰةً এটা এ স্থানে مَصْدَرٌ বা সমধাতুজ কর্ম। অর্থাৎ ভয় করার মতো [তোমাদের অবস্থা] হলে এদের সাথে তোমাদের মৌখিক বন্ধুত্ব হতে পারে; অন্তর হতে নয়। এ বিধান ইসলামের শক্তি ও গৌরব অর্জনের পূর্বে ছিল। বর্তমানে যে সমস্ত নগরে [অঞ্চলে] ইসলামপন্থিদের শক্তি নেই সেসব স্থানেও এ বিধান প্রযোজ্য। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করছেন। ভয় দেখাচ্ছেন যে, যদি এদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব পোষণ কর তবে তিনি তোমাদের উপর ক্রোধান্বিত হবেন। আর আল্লাহর দিকেই হলো প্রত্যাবর্তন। সে দিকেই ফিরতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দান করবেন।

٢٩. قُلْ لَهُمْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ قُلُوْبِكُمْ مِنْ مُوَالَاتِهِمْ اَوْ تُبْدُوْهُ تُظْهِرُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ مَنْ وَالَاهُمْ .

২৯. এদেরকে বল, তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ এদের প্রতি যে বন্ধুত্ব তোমাদের হৃদয়ে আছে তা তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর প্রকাশ কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং তিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তাও অবগত আছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যারা এদের অর্থাৎ কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে তাদের শাস্তি প্রদানও এর অন্তর্গত।

٣٠. وَاذْكُرْ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا غَايَةً فِىْ نِهَايَةِ الْبُعْدِ فَلَا يَصِلُ اِلَيْهَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ كَرَّرَهٗ لِلتَّاكِيْدِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ .

৩০. স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভালোকাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং সে যে মন্দকাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে। مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। تَوَدُّ الخ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। সেদিন সে কামনা করবে সে এবং এর মধ্যে যদি দূর ব্যবধান ঘটে যেত। চূড়ান্ত পর্যায়ের দূরত্ব হতো যে সে পর্যন্ত যেন পৌঁছতে না পারে। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর পুনরোক্তি করা হয়েছে। আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

يُوَالُوْنَهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَوْلِيَاءَ শব্দটি وَلِيٌّ [অর্থ– ভালোবাসা] থেকে গৃহীত, اِسْتِعَانَةٌ থেকে নয়।

تُقٰةً : এটা تُقْيَةً -এর মাফউলে মুতলাক, অর্থ– বিরত থাকা, হেফাজত করা। শব্দটি মূলত وُقْيَةٌ ছিল, وَاو -কে تَاء দ্বারা ও ى -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে تَاء -কে বিলুপ্ত وَاو বুঝানোর জন্যে পেশ দেওয়া হয়েছে। –[হাশিয়ায়ে জামাল]

تَقِيَّةً : مَصْدَر رَمْيَة এর ওজনে।

وَفِي الْمُخْتَارِ : تَقَى يَتْقِى كَقَضٰى يَقْضِى وَالتَّقْوٰى وَالتُّقٰى وَاحِدٌ وَالتُّقَاةُ وَالتَّقِيَّةُ . يُقَالُ اِتَّقٰى تَقِيَّةً وَتُقَاةً وَفِي الْقَامُوْسِ : تَقَيْتُ الشَّئَ اَتْقِيْتُهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ . (جمل : ٣٩٥)

قَوْلُهُ اَنْ يَغْضِبَ عَلَيْكُمْ : এর দ্বারা মুযাফ বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর দ্বারা ঐ সকল লোকদের কথা খণ্ডন করা হয়েছে যারা تُقٰةً -কে মাফউল সাব্যস্ত করেন। কেননা মাফউল হলো মাজায। আর মাজায বিনা প্রয়োজনে উদ্দেশ্য নেওয়া ঠিক নয়।

خَبَرُهُ تَوَدُّ -এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَمَا عَمِلَتْ -এর আতফ تَجِدُ -এর মা'মূলের উপর নয়; বরং এটা মুবতাদা, এর খবর হলো تَوَدُّ কেননা এ সময় عَمِلَتْ . تَوَدُّ -এর সর্বানাম থেকে হাল হবে। আর সাহায্য না করার কারণে হাল হওয়া সঙ্গত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ : **কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন** : কর্তৃত্ব ও রাজক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা এবং সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের লাগাম যখন একমাত্র মহান আল্লাহরই হাতে, তখন সেই মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুসলিমগণের জন্যে এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, তারা তাদের মুসলিম ভাইদের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট না থেকে অনর্থক মহান আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব করতে অগ্রসর হবে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনরা কখনই তাদের দোস্ত হতে পারে না। এ ধোঁকায় যারা পড়বে, তারা জেনে রাখুক, মহান আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা তাদের নসিবে নেই। একজন মুসলিমের আশা-নিরাশা শুধু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সাথেই সম্পৃক্ত থাকা উচিত। মহান আল্লাহর সাথে এরূপ সম্পর্ক যাদের আছে তারাই তাঁর আস্থা ও ভালোবাসা এবং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার উপযুক্ত হতে পারে। হ্যাঁ, কৌশলগত কারণে কাফেরদের অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে শরিয়তসম্মত ও যুক্তিযুক্ত নীতিতে যদি তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা হয়, তবে সেটা ব্যতিক্রম। যেমন– যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঠিক এ রকমই এক ব্যতিক্রম।

সম্পর্কে সূরা আনফালে ইরশাদ হয়েছে– مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ সেদিন কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে তো মহান আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার আশ্রয় জাহান্নাম আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল, তবে যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান নেওয়ার জন্যে হলে তা ব্যতিক্রম। [৮ : ১৬] তো কৌশল অবলম্বন বা দলে স্থান নেওয়ার জন্যে পিছপা হলে তা যেমন সত্যিকারের পৃষ্ঠপ্রদর্শন হয়ে যায় না; বরং বাহ্যদৃষ্টিতে হয় মাত্র, তেমনি এখানেও اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً -কে সত্যিকারের বন্ধুত্ব না বুঝে কেবল আপাতদৃষ্টিতেই বন্ধুত্ব মনে করা উচিত। আমরা এটাকে مُرَاءَاةٌ অর্থাৎ সৌজন্যমূলক আচরণ বলে থাকি। –[তাফসীরে ওসমানী]

এ আয়াতে কাফের, নাস্তিক মহান আল্লাহর নাফরমানদের সাথে মুসলমানগণের বন্ধুত্ব করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বুদ্ধি-বিবেচনা ও যৌক্তিকতার দিক হতে মুসলমান ও কাফেরের বন্ধত্ব সম্ভব নয় এবং আদর্শিক দিক হতেও পরস্পর বিরোধী চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মতৎপরতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব ... ...তীয় চেতনা, আত্মমর্যাদা বোধ ও ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

http://islamiboi.wordpress.com

مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ 'মু'মিন ব্যতীত।' অর্থাৎ মু'মিনগণকে বাদ দিয়ে কাফেরদের সাথে অথবা মু'মিনের সাথে মিলে কাফেরদের সাথে অর্থাৎ কিছু কিছু বন্ধু মু'মিন ও কিছু কিছু কাফের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ।

اَوْلِيَاءُ : শব্দটি وَلِيٌّ -এর বহুবচন– وَلِيٌّ এমন বন্ধুকে বলে যার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও বিশেষ সম্পর্ক থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনদের পরস্পরে বিশেষ সম্বন্ধ ও আন্তরিক ভালোবাসা থাকে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ বিষয় থেকে কঠোর নিষেধ করেছেন যে, তারা যেন কাফেরদেরকে তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু না বানায়। কারণ কাফের হলো আল্লাহর এবং মু'মিনদের শত্রু। কাজেই তাদেরকে মিত্র ভাবার কোনো প্রশ্নই আসে না এবং শরিয়ত মতে তা বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়বস্তুকে কুরআনের কয়েক জায়গায় অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে ঈমানদারগণ কাফেরদের সাথে মৈত্রী, বন্ধুত্ব ও বিশেষ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে। অবশ্য প্রয়োজন মাফিক ও বিশেষ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি করা যেতে পারে এবং ব্যবসায়িক লেনদেনও করা যেতে পারে। এভাবে যে সকল কাফের মুসলমানদের শত্রু নয়, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সদাচার করা বৈধ।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُ تُقٰةً : হ্যাঁ, যদি কাফেরদের তরফ হতে তোমাদের ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে, তবে এমন ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা মুক্তির জন্যে যতটুকু বাহ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা দরকার, শুধু ততটুকু সম্পর্ক স্থাপন করা অনুমোদনযোগ্য। কাফেরদের সম্পর্কে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা হতে পারে। যথা–

১. তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা।

২. বাহ্যিক সৌজন্য, উত্তম চারিত্রিক ব্যবহার, মানবীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও উদার ব্যবহার।

৩. ভদ্র আচরণ ও মানবীয় সম্পর্কের বুনিয়াদে তাদের উপকার ও কল্যাণ সাধন। এক্ষেত্রে ইসলামি আইন ও শরিয়তবিদগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হলো, কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়। তৃতীয় অবস্থা খুব কঠিন নয়। মানবীয় প্রেম, সৌজন্য, কল্যাণ ও উপকার মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফেরদের সাথে জায়েজ নেই। যাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্ত পরিবেশে বসবাস করছ, এমন ধরনের কাফেরদের সাথেও মানুষ হিসেবে সম্পর্ক রক্ষা ও উপকার সাধন করা বৈধ ও সঙ্গত। বাহ্যিক সৌজন্য ও মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন উত্তম আচরণ তিন অবস্থায় বৈধ। যথা–

১. ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে।

২. কাফেরের দীনি ফায়েদার লক্ষ্যে অর্থাৎ তার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হেদায়েতের পথে অগ্রসরের উদ্দেশ্যে।

৩. কাফের যখন মেহমান [অতিথি] হিসেবে আগমন করে তখন মেহমানের ইকরাম তথা সম্মান প্রদর্শনের জন্যে। এ তিন অবস্থা ব্যতীত নিজের স্বার্থ উদ্ধার, মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্যে কোনো কাফেরের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কোনো মতেই জায়েজ নয়। আর কাফেরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যদি নৈতিক-ধর্মীয় অবস্থার অবক্ষয় ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে মিলামিশা ও সম্পর্ক স্থাপন করা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ : অর্থাৎ তোমাদেরকে যখন অবশ্যই মহান আল্লাহর দরবারেই ফিরে যেতে হবে, তোমাদের চিরন্তন বাসস্থান যখন মহান আল্লাহরই সমীপে, তখন সে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য ও গোপন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রকার হুকুমের অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকো। এ আয়াতে মহান আল্লাহর প্রিয় রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে সকল মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗۤ اَمَدًا بَعِيْدًا : **কিয়ামতের দিন কাফেরদের আফসোস :** অর্থাৎ 'তার বদআমল ও তার প্রতিদানের এ দৃশ্য যদি তাকে অবলোকন করতে না হতো! এ আফসোস তাদের হৃদয়েই সৃষ্টি হবে যাদের কাছে তাদের ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের আমলের স্তূপ হাজির হবে এবং এমতাবস্থায় যে, হতভাগ্যের সামনে শুধু বদ আর বদের স্তূপই পরিলক্ষিত হবে। তার করুণ অবস্থার কথা কি কল্পনা করা যায়? بَيْنَهَا সর্বনামটি মানুষের নিজের দিকে আর بَيْنَهٗ -এর সর্বনামটি কিয়ামত দিবসের দিকে অর্থাৎ সে আফসোস করে বলবে– আহা! আমার আমলসহ আমার ও কিয়ামত দিবসের মধ্যে যদি আরও বিস্তর ব্যবধান থাকত! আমার সমস্ত কর্মের এ প্রতিদান দিবসটি যদি আরও অনেক দেরিতে অনুষ্ঠিত হতো!

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٣١. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا مَا نَعْبُدُ الْاَصْنَامَ اِلَّا حُبًّا لِلّٰهِ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَيْهِ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُثِيْبُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِمَنِ اتَّبَعَنِىْ مَا سَلَفَ مِنْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ رَحِيْمٌ بِهٖ .

৩১. মুশরিকগণ বলত, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই আমরা প্রতিমাপূজা করে থাকি যেন এগুলোর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে পুণ্যফল দান করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে তার তরফ হতে পূর্বে যা ঘটে গেছে অর্থাৎ গুনাহ ইত্যাদি আল্লাহ তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তার প্রতি পরম দয়ালু।

٣٢. قُلْ لَهُمْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فِيْمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ مِنَ التَّوْحِيْدِ فَاِنْ تَوَلَّوْا اَعْرَضُوْا عَنِ الطَّاعَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ فِيْهِ اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ اَىْ لَا يُحِبُّهُمْ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ .

৩২. এদেরকে বল, আল্লাহ ও রাসূল তোমাদেরকে তাওহীদ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে সম্পর্কে তাঁদের আনুগত্য কর। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আনুগত্য প্রদর্শন হতে পরাঙ্মুখ হয় তবে আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ এদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন। لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ এ স্থানে اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনাম [هُمْ - তারা] -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য اَلْكَافِرِيْنَ -এর ব্যবহার হয়েছে। মূলত ছিল لَا يُحِبُّهُمْ আল্লাহ এদেরকে ভালোবাসেন না; এদের শাস্তি প্রদান করবেন।

٣٣. اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اِخْتَارَ اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ بِمَعْنٰى اَنْفُسِهِمَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ بِجَعْلِ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَسْلِهِمْ .

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইমরানকেও বিশ্বজগতে মনোনীত করে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এদের বংশধরের মাঝে তিনি নবীগণের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন।

٣٤. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ وَلَدِ بَعْضٍ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

৩৪. এরা সন্তানসন্ততি, এদের কতকজন কতকজন থেকে জাত। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইহুদি খ্রিস্টানদের দাবি ছিল যে, আল্লাহর সাথে আমাদের এবং আমাদের সাথে আল্লাহর ভালোবাসা আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শুধু এ ধরনের দাবি এবং মনগড়া পন্থায় চলার দ্বারা আল্লাহর ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। এটা তাদের মৌখিক দাবি মাত্র, আর দলিল ছাড়া দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। ভালোবাসা একটি গোপন বিষয়, কার সাথে কার ভালোবাসা আছে বা নেই এবং কম আছে না বেশি, তা পরিমাপের কোনো যন্ত্র নেই। বিভিন্ন অবস্থা ও আচরণ দ্বারাই তা অনুমান করা

http://islamiboi.wordpress.com

যায়। ভালোবাসার যেসব নিদর্শনাবলি রয়েছে তার দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সকল লোক আল্লাহর ভালোবাসার দাবিদার এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসার মানদণ্ড জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কারো নিজ মালিকের সাথে প্রকৃত ভালোবাসার দাবি থাকে, তাহলে এটা তার জন্যে আবশ্যক যে, তাকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পরীক্ষার পর আসল ও নকল স্পষ্ট হয়ে যাবে।

يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ : بِمَعْنٰى يُثِيْبُكُمْ -এর ব্যাখ্যা يُثِيْبُكُمْ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ক করা সঙ্গত নয়। কেননা ভালোবাসা বলা হয়- مَيَلَانُ الْقَلْبِ اِلَى الشَّيْءِ তথা কোনো বস্তুর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণকে। আর আল্লাহ অন্তর থেকে মুক্ত।

উত্তর : ভালোবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য ছওয়াব ও প্রতিদান দান করা।

قَوْلُهُ اَطِيْعُوا اللّٰهَ : এ আয়াতেও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্বোধনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেও সম্বোধন করা হয়েছে। اَطِيْعُوا اللّٰهَ মৌলিকভাবে এবং মূল লক্ষ্য হিসেবে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উল্লেখ করা হয়েছে; اَلرَّسُوْلَ -এর আনুগত্যকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের অধীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক আনুগত্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা যায়। কেননা পয়গাম্বর মহান আল্লাহর পয়গাম ও নির্দেশসহ আগমন করে থাকেন।

قَوْلُهُ فَاِنْ تَوَلَّوْا : [যারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর আনুগত্যকে অস্বীকার করে এবং অবাধ্যতা প্রকাশ করে, মহান আল্লাহর মহব্বতের দাবিতে তাদের মুখে যত খৈ-ই ফুটুক না কেন, মূলত তাঁরা কাফের।] فَاِنْ تَوَلَّوْا অর্থাৎ যারা এমনি সাফ হুকুম মেনে নিতে অস্বীকার করে। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَعْرَضُوْا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَوَلَّوْا হলো অতীতকালীন সীগাহ, মুযারে নয়। যেমন- কেউ কেউ বলেছেন, কারণ মুযারের ক্ষেত্রে একটি تَاءٌ বিলুপ্তি অনিবার্য হয়। ব্যাপকতার উদ্দেশ্যে এবং এ কথা বুঝানোর জন্যে যে, তাওহীদ থেকে বিরত থাকা কুফরির কারণ ঘটে। هُمْ বহুবচনের স্থলে اَلْكٰفِرِيْنَ প্রকাশ্য ইসম ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ : এটাও একটি প্রশ্নের উত্তর। শাখাগত আমল থেকে বিমুখ হওয়া কুফরি অনিবার্য করে না। অথচ এখানে বলা হয়েছে- اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শাখাগত আমল থেকে বিরত থাকাও কুফরি অনিবার্য করে।

উত্তর : এখানে اِعْرَاضْ তথা বিরত থাকা দ্বারা তাওহীদের স্বীকারোক্তি থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ نُوْحٌ : [হযরত নুহ (আ.)] নূহ ইবনে লামেখ অথবা লমক একজন নবী। বহুকাল আগে ইরাকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আদম (আ.)-এর পর দশম পুরুষে তাঁর আগমন ঘটে। তিনি পরম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে সাড়ে নয়শত বছরকাল প্রকাশ্যে ও গোপনে, দিবসে ও রাতে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও জাতির স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই তাঁর বিরোধিতা করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনয়নকারী মুষ্টিমেয় লোক ও প্রাণীকুলের মধ্যে এক এক জোড়া প্রাণী ছাড়া, সমস্ত জনপদ, মানুষ, প্রাণীকুলসহ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন।

قَوْلُهُ اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর আলে ইবরাহীমের উল্লেখের সাথে আলে ইসমাঈলের উল্লেখ হয়ে গেছে। কেননা হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ছেলে ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) সম্পর্কীয় টীকা প্রথম পারার পঞ্চদশ রুকুতে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اٰلَ عِمْرَانَ : ইমরান নামীয় দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সন্ধান ইতিহাসে পাওয়া যায়। একজন হযরত মূসা (আ.)-এর পিতা ইমরান ইবনে ইয়াসহার। অপরজন তাঁর কয়েক শতাব্দী পরে হযরত মরিয়ম (আ.)-এর পিতা হযরত ঈসা (আ.) -এর সম্মানিত নানা ইমরান ইবনে মাতান। এখানে উভয় ইমরানই উদ্দেশ্য হতে পারে। কিন্তু আয়াতের পূর্ব-সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে ইমরান অর্থাৎ মরিয়ামের পিতা ইমরান গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। হাসান বসরী ও ওয়াহাব (র.)-এ ক্ষেত্রে পরবর্তী ইমরানের কথাই উল্লেখ করেছেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, রূহুল মা'আনী, কাবীর।]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ بِمَعْنَى اَنْفُسِهِمَا : ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধর দ্বারা স্বয়ং ইবরাহীম এবং ইমরান উদ্দেশ্য। ইমরান হযরত মূসা (আ.)-এর পিতার নাম। বংশধারা এরূপ– مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ يَصْهَرَ بْنِ قَاهَثَ بْنِ لَاوِى بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ হযরত মরিয়মের পিতার নামও ইমরান। তাঁর বংশধারা এরূপ– مَرْيَمَ بِنْتُ عِمْرَانَ بْنِ مَاثَانَ بْنِ يَاهُوْزَ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ উভয়ের মাঝে ১ হাজার ৮ শত বছরের ব্যবধান ছিল।

قَوْلُهُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইবরাহীমী বংশধারার ইতিবৃত্ত : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিরাজির মধ্যে জমিন, আসমান, চাঁদ, সুরুজ, তারকা, ফেরেশতা, জিন, গাছপালা, পাথর কত কিছু বিরাজমান। কিন্তু মানবজাতির পিতা হযরত আদম (আ.)-এর মাঝে তিনি নিজের সর্বব্যাপক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে দৈহিক ও আত্মিক যোগ্যতার যে সমষ্টি গচ্ছিত রাখেন তা আর কোনো সৃষ্টির মাঝে রাখেননি; বরং তিনি ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদমকে সিজদা করিয়ে একথা স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর দরবারে হযরত আদম (আ.)-এর মর্যাদা আর সব মাখলুকের উর্ধ্বে। হযরত আদম (আ.)-এর এ নির্বাচনী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, যাকে আমরা 'নবুয়ত' নামে অভিহিত করে থাকি, তা কেবল তাঁরই ব্যক্তিত্বের জন্যে নির্দিষ্ট ও সীমিত ছিল না; বরং পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-ও তা লাভ করেন এবং তাঁর পরে লাভ করেন তাঁর উত্তরপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)। এখান থেকে একটি নতুন অবস্থার সূত্রপাত হয়। হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর পর পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে তারা সকলে তাদেরই বংশধর। তাদের বংশধারার বাইরে কোনো জনগোষ্ঠীর বাস এ পৃথিবীতে ছিল না। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে। কেননা তাঁর পরে পৃথিবীতে তাঁর বংশধারা ছাড়া আরও বহু বংশধারা বর্তমান। কিন্তু যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অগণিত সৃষ্টিরাজির মধ্যে নবুয়তের পদমর্যাদার জন্যে কেবল হযরত আদম (আ.)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁরই সর্বজনীন জ্ঞান ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব পরবর্তীকালে এ মহান পদমর্যাদার জন্যে হাজারও বংশধারার মধ্যে কেবল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধারাকেই নিদিষ্ট করে দেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর যত নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটে তাঁরা সকলেই তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসহাক ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণত বংশধারা পিতার থেকেই বয়ে চলে। হযরত মাসীহ (আ.) বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধারণার সৃষ্টি হতে পারত যে, তাঁকে ইবরাহীমী বংশধারা হতে ব্যতিক্রম বলতে হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা اٰلَ عِمْرَانَ [ইমরানের বংশধর] ও ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ [তারা একে অপরের বংশধর] বলে ইশারা করে দিয়েছেন যে, হযরত মাসীহ (আ.) যখন বিনা বাপে জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন তাঁর বংশ পরিক্রমাও মায়ের দিক থেকেই ধরা হবে, মহান আল্লাহর থেকে নয়, নাউযুবিল্লাহ। আর তাঁর মা মরিয়াম (আ.)-এর পিতা ইমরানের বংশ পরাম্পরা তো শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত পৌছায়। কাজেই ইমরানের বংশ ইবরাহীমী বংশেরই একটি শাখা হলো, ফলে কোনো নবী আর ইবরাহীমী বংশের বাইরে হলো না। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ : অর্থাৎ তিনি সকলের দোয়া ও কথা শোনেন, তিনি সব কথা সব ভাষায়ই শুনেন এবং সকলের প্রকাশ্য ও গোপন যোগ্যতা জানেন, তিনি মানব মনের সকল চিন্তা-কল্পনাও জানেন। কাজেই এ ধারণা করার অবকাশ নেই যে, তিনি কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই যেনতেন প্রকারে মনোনীত করেছেন। তাঁর যাবতীয় কাজ পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে সাধিত হয়। –[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٣٥. اُذْكُرْ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ حَنَّةُ لَمَّا اَسَنَّتْ وَاشْتَاقَتْ لِلْوَلَدِ فَدَعَتِ اللّٰهَ وَاَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ يَا رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَجْعَلَ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا عَتِيْقًا خَالِصًا مِنْ شَوَاغِلِ الدُّنْيَا لِخِدْمَةِ بَيْتِكَ الْمُقَدَّسِ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ لِلدُّعَاءِ الْعَلِيْمُ بِالنِّيَّاتِ وَهَلَكَ عِمْرَانُ وَهِىَ حَامِلٌ.

৩৫. স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী হান্না বলেছিল অর্থাৎ একান্ত বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার পর সন্তান লাভের তীব্র বাসনায় সে আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিল। পরে যখন গর্ভসঞ্চারের অনুভব করেছিল তখন বলেছিল হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা তোমার নামে মুক্ত করে দিতে; অর্থাৎ জগতের যাবতীয় কাজ থেকে মুক্ত করে কেবল তোমার ঘর বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার উদ্দেশ্যে আমি মানত করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে এটা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি দোয়াসমূহের অতি শ্রবণকারী ও নিয়ত সম্পর্কে খুবই অবহিত। পরে তাঁকে গর্ভাবস্থায় রেখে ইমরান মারা গেলেন।

٣٦. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا وَلَدَتْهَا جَارِيَةً وَكَانَتْ تَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ غُلَامًا اِذْ لَمْ يَكُنْ يُحَرَّرُ اِلَّا الْغِلْمَانُ قَالَتْ مُتَعَذِّرَةً يَا رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِمَا وَضَعَتْ جُمْلَةُ اعْتِرَاضٍ مِنْ كَلَامِهٖ تَعَالٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِىْ طَلَبَتْ كَالْاُنْثٰى الَّتِىْ وُهِبَتْ لِاَنَّهٗ يُقْصَدُ لِلْخِدْمَةِ وَهِىَ لَا تَصْلُحُ لَهَا لِضُعْفِهَا وَعَوْرَتِهَا وَمَا يَعْتَرِيْهَا مِنَ الْحَيْضِ وَنَحْوِهٖ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا اَوْلَادَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الْمَطْرُوْدِ فِى الْحَدِيْثِ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا اِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

৩৬. অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল অর্থাৎ এক কন্যা সন্তান জন্ম দিল। তাঁর আশা ছিল হয়তো পুত্র সন্তানের জন্ম হবে। কারণ পুত্র সন্তান ব্যতীত কাউকে বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার জন্যে উৎসর্গ করার নিয়ম ছিল না। তাই সে কৈফিয়ত হিসেবে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তা কন্যা প্রসব করেছি; সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ তা অধিক অবগত। তিনি তা জানেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ الخ এটা আল্লাহর উক্তি হিসেবে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ বা বিচ্ছিন্ন বাক্য। وَضَعْتُ এটা অপর এক কেরাত অনুসারে ت -এ পেশ [উত্তম পুরুষ, একবচন] সহকারে পঠিত রয়েছে। যে পুত্রের সে প্রত্যাশা করেছিল সে পুত্র যে কন্যা তাকে দান করা হয়েছে সে কন্যার মতো নয় কারণ বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবা হলো উদ্দেশ্য। আর কন্যা শারীরিক গঠন-দুর্বল তা, পর্দার বিধান, রজঃস্রাব ইত্যাদির কারণে তার উপযুক্ত নয়। আমি তাঁর নাম মরিয়ম রাখলাম। আমি তাঁকে এবং তাঁর বংশধর সন্তানসন্ততিদেরকে অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান হতে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। হাদীসে আছে, জন্ম মুহূর্তে প্রত্যেক শিশুকেই শয়তান স্পর্শ করে। ফলে তারা চিৎকার করে উঠে। কেবল মাত্র মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র [হযরত ঈসা (আ.)] হলেন এর ব্যতিক্রম। –[বুখারী ও মুসলিম]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَنْ اَجْعَلَ : نَذَرْتُ-এর ব্যাখ্যা اَجْعَلُ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : মানত মানা হলো ফে'ল, স্বয়ং বস্তু নয়। এতে এ প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে যে, نَذَرْتُ শব্দটি এক মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়েছে। এক হলো مَا فِىْ بَطْنِىْ এবং দ্বিতীয় হল مُحَرَّرًا -

উত্তর : نَذَرْتُ শব্দটি جَعَلْتُ অর্থে, আর এটা দুই মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৩৭. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا اَىْ قَبِلَ مَرْيَمَ مِنْ اُمِّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اَنْشَأَهَا بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَكَانَتْ تَنْبُتُ فِى الْيَوْمِ كَمَا يَنْبُتُ الْمَوْلُوْدُ فِى الْعَامِ وَاَتَتْ بِهَا اُمُّهَا الْاَحْبَارَ سَدَنَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَتْ دُوْنَكُمْ هٰذِهِ النَّذِيْرَةَ فَتَنَافَسُوْا فِيْهَا لِاَنَّهَا بِنْتُ اِمَامِهِمْ فَقَالَ زَكَرِيَّا اَنَا اَحَقُّ بِهَا لِاَنَّ خَالَتَهَا عِنْدِىْ فَقَالُوْا لَا حَتّٰى نَقْتَرِعَ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اِلَى نَهْرِ الْاَرْدُنِّ وَاَلْقَوْا اَقْلَامَهُمْ عَلٰى اَنَّ مَنْ ثَبَتَ قَلَمُهٗ فِى الْمَاءِ وَصَعِدَ فَهُوَ اَوْلٰى بِهَا فَثَبَتَ قَلَمُ زَكَرِيَّا فَاَخَذَهَا وَبَنٰى لَهَا غُرْفَةً فِى الْمَسْجِدِ بِسُلَّمٍ لَا يَصْعَدُ اِلَيْهَا غَيْرُهٗ وَكَانَ يَأْتِيْهَا بِاَكْلِهَا وَشُرْبِهَا وَدُهْنِهَا فَيَجِدُ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِى الصَّيْفِ وَفَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِى الشِّتَاءِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى

৩৭. অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে উত্তমভাবে কবুল করলেন অর্থাৎ মরিয়মকে তাঁর মাতার পক্ষ থেকে গ্রহণ করে নিলেন। এবং তাঁকে ভালোভাবে বর্ধিত করলেন মনোহর গঠনে বড় করলেন। সাধারণভাবে শিশুরা এক বৎসরে যতটুকু বৃদ্ধি পায় তিনি একদিনেই ততটুকু বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। শেষে তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবায় নিয়োজিত ইহুদি আলেমদের নিকট আসলেন। বললেন, এ ছোট এবং প্রিয় উৎসর্গটি আপনারা গ্রহণ করুন। তখন তাঁরা সকলেই এতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ তিনি ছিলেন তাঁদের প্রধান [মরহুম ইমরান] -এর কন্যা। তখন [তাঁদের অন্যতম] হযরত যাকারিয়া (আ.) বললেন, আমি এর বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিকার রাখি। কারণ এর খালা আমার ঘরে [স্ত্রী হিসেবে] রয়েছেন। অন্যরা বললেন, এ বিষয়ে লটারি প্রদান ভিন্ন অন্য কোনো কথা আমরা মানব না। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় ঊনত্রিশজন। সকলেই জর্ডান নদীতে চললেন। যার কলম পানিতে স্থির থাকবে এবং ভেসে উঠবে সেই এর [মরিয়মের] তত্ত্বাবধানের অধিকার পাবে– এ শর্তে সকলেই স্ব-স্ব কলম পানিতে নিক্ষেপ করলেন, তখন হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর কলম স্থির থাকার ফলে তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন।

হযরত যাকারিয়া (আ.) মসজিদের উপর তাঁর থাকার জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সিড়ি ব্যতীত তাতে আরোহণ করা সম্ভবপর ছিল না; আর তিনি ভিন্ন অন্য কেউ সেখানে উঠত না। তিনি নিজে সেখানে তাঁর খাদ্য, পানীয়, তেল ইত্যাদি পৌঁছাতেন। তখন অনেক সময় মরিয়মের নিকট শীতকালীন ফল গ্রীষ্মে এবং গ্রীষ্মকালীন ফল শীতকালে দেখতে পেতেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

http://islamiboi.wordpress.com

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّشْدِيْدِ وَنَصَبِ زَكَرِيَّاءَ مَمْدُوْدًا وَمَقْصُوْرًا وَ الْفَاعِلُ اللّٰهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ الْغُرْفَةَ وَهِيَ أَشْرَفُ الْمَجَالِسِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى مِنْ أَيْنَ لَكِ هٰذَا قَالَتْ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يَأْتِيْنِيْ بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رِزْقًا وَاسِعًا بِلَا تَبِعَةٍ ـ

এবং তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে দিলেন। অর্থাৎ তাঁকে হযরত যাকারিয়া (আ.) স্বীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। كَفَّلَ এটা অপর এক কেরাতে ف -এ তাশদীদ [بَابُ تَفَعُّلٌ] সহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় زَكَرِيَّا মদসহ ও মদ ছাড়া উভয় রূপে উচ্চারণ করা যায়- مَنْصُوْبٌ হবে, আর উক্ত ক্রিয়াটির فَاعِلٌ বা কর্তা হবেন আল্লাহ তা'আলা। যখনই যাকারিয়া মিহরাবে উক্ত কক্ষে, আর এটা হলো সর্বোত্তম স্থান; তাঁর নিকট প্রবেশ করত তখনই তাঁর নিকট দেখতে পেত খাদ্য সামগ্রী। সে বলল, মরিয়ম তোমার জন্যে এটা কেমন করে কোথা হতে এল? বলল, অথচ সে তখন ছিল নিতান্ত বালিকা মাত্র তা আল্লাহর নিকট হতে, জান্নাত হতে আমার জন্যে আসে, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক কোনোরূপ পরিশ্রম ব্যতীত একজনকে প্রভূত জীবনোপকরণ দান করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিবি মরিয়মের লালনপালন এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী : যদিও তিনি মেয়ে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ছেলের চেয়েও বেশি কবুল করেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদিমগণের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন, যাতে তাঁরা সাধারণ নিয়মের বাইরে মেয়েটিকে গ্রহণ করে নেন। আর এমনিতে তিনি হযরত বিবি মরিয়মকে সমাদৃত আকারে সৃষ্টি করেন এবং নিজ সমাদৃত বান্দা যাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁকে ন্যস্ত করেন। সেই সঙ্গে নিজ দরবারে তাঁকে উৎকৃষ্ট সমাদরে ভূষিত করেন। দৈহিক, আত্মিক, জ্ঞানগত ও চারিত্রিক সর্বোতভাবে অসাধারণভাবে তাঁর উৎকর্ষ সাধন করেন। খাদিমগণের মাঝে তাঁর লালনপালন নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে নির্বাচনী লটারিতে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর নাম বের করে দিলেন, যাতে মেয়ে তার খালার কোলে থেকে প্রতিপালিত এবং হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর সযতন প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকলেন। বিবি মরিয়ম যখন পরিণত বয়সে পদার্পণ করলেন, তখন মসজিদের পাশে তাঁর জন্যে একটি কামরা বরাদ্দ করলেন। বিবি মরিয়ম সেখানে দিনভর ইবাদত ইত্যাদিতে মশগুল থাকতেন। রাত কাটাতেন খালার কাছে। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ : হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মায়ের মানতকে আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপে কন্যার মাধ্যমে কবুল করলেন, যা 'হায়কলে সুলায়মানী'র খিদমতের ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন ছিল। খ্রিস্টীয় লিপি অনুসারে হযরত মরিয়মকে তিন বছর বয়ঃক্রমকালে 'হায়কলে সুলায়মানী'র খাদিমা হিসেবে গ্রহণ করা হলো। আর ইবাদতখানার ছোটবড় সকল খাদিমরাই এ অল্প বয়স্কা মেয়েটিকে দেখে খুবই আনন্দিত হতো।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٣٨. هُنَالِكَ اَىْ لَمَّا رَأَى زَكَرِيَّا ذٰلِكَ وَعَلِمَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْاِتْيَانِ بِالشَّيْءِ فِىْ غَيْرِ حِيْنِهِ قَادِرٌ عَلَى الْاِتْيَانِ بِالْوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ اَهْلُ بَيْتِهِ انْقَرَضُوْا دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْمِحْرَابَ لِلصَّلٰوةِ جَوْفَ اللَّيْلِ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً وَلَدًا صَالِحًا اِنَّكَ سَمِيْعُ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ .

৩৮. সে স্থানেই অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ.) যখন দেখলেন এবং তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় এবং জ্ঞান হলো যে, অসময়ে যিনি কোনো দ্রব্য আনয়নে সক্ষম নিশ্চয় তিনি অসময়ে এ বৃদ্ধাবস্থায়ও সন্তান দানের ক্ষমতা রাখেন। তাঁর বংশের সকলেই তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রতিপালকের নিকট যখন মধ্যরাতে সালাতের জন্যে মিহরাবে প্রবেশ করেছিল তখন প্রার্থনা করে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে পক্ষ হতে পবিত্র বংশধর সৎ সন্তান দান কর। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী কবুলকারী।

٣٩. فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَىِ الْمَسْجِدِ اَنَّ اَىْ بِاَنَّ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ بِتَقْدِيْرِ الْقَوْلِ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ مُثَقَّلًا وَمُخَفَّفًا بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ كَائِنَةٍ مِنَ اللّٰهِ اَىْ بِعِيْسٰى اَنَّهُ رُوْحُ اللّٰهِ وَسُمِّىَ كَلِمَةً لِاَنَّهُ خَلَقَ بِكَلِمَةِ كُنْ وَسَيِّدًا مَتْبُوْعًا وَحَصُوْرًا مَنُوْعًا عَنِ النِّسَاءِ وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ رُوِىَ اَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا .

৩৯. অনন্তর যখন সে মিহরাবে মসজিদে সালাতে দাঁড়িয়েছিল ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল তাঁকে সম্বোধন করে বলল যে, ان এটা بان রূপে ব্যবহৃত। অপর এক কেরাতে এর প্রথমাক্ষর কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর পূর্বে قول ধাতু হতে উদ্গত কোনো শব্দ উহ্য ধরা হবে। আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। يبشرك এটা مثقلا বা তাশদীদসহ [باب تفعيل] ও مخففا [তাশদীদ ব্যতীত লঘু] উভয় রূপে পাঠ করা যায়। সে হবে আল্লাহর বাণীর অর্থাৎ হযরত ঈসার সমর্থক, من الله এটা এ স্থানে উহ্য كائنة -এর সাথে متعلق বা সংশ্লিষ্ট। তিনি [হযরত ঈসা] হলেন 'রূহুল্লাহ' বা আল্লাহর তরফ হতে আগত পবিত্রাত্মা। 'কুন' বাণী দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর বাণী বলে অভিহিত করা হয়; নেতা, অনুসৃত ব্যক্তি, জিতেন্দ্রিয় নারী সংস্রব থেকে বিরত এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। বর্ণিত আছে, তিনি কখনো কোনো পাপ কর্ম করেননি বা তাঁর কল্পনাও করেননি।

٤٠. قَالَ رَبِّ اَنّٰى كَيْفَ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَلَدٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ اَىْ بَلَغْتُ نِهَايَةَ السِّنِّ مِائَةً وَعِشْرِيْنَ سَنَةً وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ بَلَغَتْ ثَمَانِىْ وَتِسْعِيْنَ قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ غُلَامًا مِنْكُمَا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا يُعْجِزُهُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلِاِظْهَارِ هٰذِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِيْمَةِ اَلْهَمَهُ اللّٰهُ السُّؤَالَ لِيُجَابَ بِهَا .

৪০. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র সন্তান হবে কিরূপে? انى এটা এ স্থানে كيف [কিরূপে] অর্থে ব্যবহৃত। আমি বার্ধক্যে উপনীত চূড়ান্ত বয়ঃসীমায় আমি পৌঁছে গেছি। তাঁর তখন বয়স ছিল একশত বিশ বছর। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাঁর বয়স ছিল আটানব্বই বছর। তিনি বলেন, বিষয় এভাবেই হয়। তোমাদের মাধ্যমে শিশু জন্মদানের মতো আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। এ বিস্ময়কর কুদরত প্রকাশের নিমিত্ত আল্লাহ তাঁর মনে এরূপ জিজ্ঞাসার উদয় করেন যেন তিনি উত্তমরূপে উত্তর প্রদত্ত হন।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُنَالِكَ دَعَا : হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া : মহান আল্লাহর কুদরতের প্রত্যক্ষ দর্শনে প্রভাবান্বিত হয়ে সেখানেই তিনি মুনাজাত করলেন। هُنَا -এর অপর অর্থ সেখানের পরিবর্তে 'তৎক্ষণাৎ'ও হয়। هُنَا - ظَرْف আর ظَرْف শুধু স্থান নয়, সময়ও। অর্থাৎ যরফে মাকান হলে অর্থ হবে– সেখানে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আর যরফে যমান হলে অর্থ হবে– তখনই বা সে মুহূর্তেই মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। যদিও এখানে মূলত এর মর্ম যরফে মাকানই হয়ে থাকে। هُنَالِكَ دَعَا আয়াতাংশ থেকে কোনো কোনো মুবারক স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার দলিলও গ্রহণ করা হয়। এমনিভাবে কোনো কোনো সময় দোয়া কবুল হওয়ার দলিলও গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ.) এ অলৌকিক ঘটনা প্রত্যেক্ষ করে যখন উপলব্ধি করলেন যে, এ স্থানটি দোয়া কবুল হওয়ার ও আলৌকিক কিছু অনুষ্ঠিত হওয়ার জায়গা, তখনই সেখানেই তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

قَوْلُهُ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ : অমৌসুমি ফল দেখে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর অন্তরে [বার্ধক্য এবং স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও] এ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হলো যে, যদি আল্লাহ তা'আলা এভাবে তাঁকে একটি সন্তান দান করতেন তাহলে বেশ ভালো হতো। কারণ যে মহান সত্তা অমৌসুমি ফল দিতে সক্ষম তিনি অসময়ে সন্তান দান করতেও সক্ষম। অজান্তে তিনি আল্লাহর দরবারে মিনতির জন্যে হাত উঠালেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কবুলিয়াতের দ্বারা ধন্য করলেন। ফেরেশতা ডেকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া -এর সুসংবাদ দান করেছেন। যিনি কালিমাতুল্লাহ তথা হযরত ঈসা (আ.)-কে সত্যায়নকারী, নেতা ও নফসকে সংবরণকারী নবী হবেন এবং তিনি হবেন সৎ বান্দাদের অন্তর্গত। হযরত ইয়াহইয়া (আ.) -এর বিশেষ গুণ স্বরূপ حَصُوْر তথা নফস সংবরণকারী এবং গুনাহ থেকে দূরে অবস্থানকারী বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম حَصُوْر -এর অর্থ বলেছেন কাপুরুষ, এটা এখানে সঠিক নয়। কেননা এ ক্ষেত্র হলো প্রশংসা ও ফজিলত বর্ণনার। আর কাপুরুষতা কোনো ভালো গুণ নয়; বরং দোষ বিশেষ।

اَىْ جِبْرَائِيْلُ এটা সে প্রশ্নের উত্তর যে, نَادَتْ -এর ফায়েল হলো مَلَائِكَةٌ অথচ আহ্বানকারী কেবল হযরত জিবরাঈল। উত্তর হলো, এখানে ال দ্বারা اَقَلُّ جِنْس তথা সর্বনিম্ন সংখ্যা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল উদ্দেশ্য।

শক্তি ও ইচ্ছা আসবাব-উপকরণের অধীন নয় : যদিও ইহজাগতে তাঁর রীতি হলো স্বাভাবিক কারণ হতে কার্য সৃষ্টি করা তবু কখনো কখনো স্বাভাবিক কারণের বিপরীত অসাধারণ উপায়ে কোনো বস্তুর উদ্ভব ঘটানোও তাঁর একটি বিশেষ নীতি। আসলে বিবি মরিয়ম সিদ্দীকার নিকট অস্বাভাবিক উপায়ে রিজিক আসা, বহু অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ ঘটা, এসব দৃষ্টে বিবি মরিয়মের কক্ষে অবচেতন মনে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর প্রার্থনা, তারপর তাঁর বার্ধক্য ও স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও অস্বাভাবিক উপায়ে সন্তান লাভ এসব কিছুকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর সেই মহাবিস্ময়কর নিদর্শনের পূর্বাভাস মনে করতে হবে, যা বিবি মরিয়মের অস্তিত্ব হতে অদূর ভবিষ্যতে স্বামীসঙ্গ ব্যতিরেকেই প্রকাশ পাওয়ার ছিল। যেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর অস্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ [এভাবেই আল্লাহ তা'আলা যা চান করেন] বাক্যটি كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 'এভাবেই আল্লাহ পাক যা চান সৃষ্টি করেন।' বাক্যের ভূমিকা স্বরূপ, যা সামনে হযরত মসীহ (আ.)-এর অস্বাভাবিক জন্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ الْمَلٰئِكَةُ : শব্দটি বহুবচন; কিন্তু এটি অপরিহার্য নয় যে, কয়েকজন ফেরেশতা এসে ডেকে বলেছেন। বহুবচন অনেক সময় ইসমে জিনস তথা শ্রেণী বিশেষ্য বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

يَحْيٰى [ইয়াহইয়া] খ্রিস্টানদের আধুনিক সহীফায় তাঁর নাম লিখা হয়েছে يُوْحَنَّا [ইউহান্না]। বাইবেলে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ওহে যাকারিয়া ! শঙ্কিত হয়ো না, তোমার দোয়া কবুল হয়েছে এবং তোমার স্ত্রী ইল ইয়াশবা তোমার জন্যে সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম উইহান্না রেখ। তুমি সুখী ও আনন্দিত হবে। –[লুক ১ : ১৪] হযরত ইয়াহইয়া হযরত ঈসা (আ.)-এর খালাতো ভাই। বাইবেলের ভাষ্য মোতাবেক হযরত ঈসা (আ.) মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। ৩০ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিরোডাসের আদেশে শূলীতে শহীদ করা হয়।

قَوْلُهُ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ : এ সুসংবাদ সুনিশ্চিত হওয়ার নিদর্শন বা লক্ষণটা হবে কি ধরনের? আমাদের যৌবন কি আবার ফিরে আসবে? না আল্লাহ তা'আলা অপর কোনো বিপ্লবাত্মক ব্যবস্থা করবেন? প্রশ্নটি কোনো মতেই অবিশ্বাস বা অনাস্থাসূচক ছিল না। হযরত যাকারিয়া (আ.) এ অলৌকিকভাবে সন্তান জন্মের পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে অবগত হতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নটি যদি আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায়, তবুও প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতির সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ কোনো কিছু অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এ কথা জানার পর আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রশ্ন করাটা একান্ত স্বাভাবিক ও মানবীয় প্রকৃতির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। নবী হলেও তিনি মানবীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কেননা তিনিও একজন মানুষ ছিলেন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৪১. وَلَمَّا تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ آيَةً أَيْ عَلَامَةً عَلٰى حَمْلِ امْرَأَتِيْ قَالَ آيَتُكَ عَلَيْهِ أَنْ لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ أَيْ تَمْتَنِعُ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَيْ بِلَيَالِيْهَا إِلَّا رَمْزًا إِشَارَةً وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ صَلِّ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ أَوَاخِرِ النَّهَارِ وَأَوَائِلِهِ ـ

৪১. সুসংবাদ প্রদত্ত জিনিসটি শীঘ্র প্রাপ্তির প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ হওয়ায় বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারের চিহ্ন হিসেবে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, এর উপর তোমার জন্যে নিদর্শন এই যে, তুমি ইঙ্গিত ইশারা ব্যতীত রাতসহ তিন দিন কথা বলতে পারবে না। 'যিকরুল্লাহ' বা আল্লাহর জিকির ব্যতীত এদের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে দিনের শেষ ভাগে ও প্রথম ভাগে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। অর্থাৎ সালাত আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ آيَةً : বৃদ্ধকালে মু'জিযা স্বরূপ সন্তানের সুসংবাদ শুনে তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তিনি এর নির্দশন জানতে চাইলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এর নিদর্শন হলো, তিনদিন পর্যন্ত তোমার বাকশক্তি রুদ্ধ থাকবে। এটা আমার পক্ষ থেকে নিদর্শনমূলক হবে, তবে তুমি এ নীরবতার অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ আদায় কর। অর্থাৎ তোমার যখন এ অবস্থা হবে যে, তিন দিন তিন রাত ইশারা ছাড়া মুখে কারো সাথে কথা বলতে পারবে না এবং তোমার জিহ্বা কেবল মহান আল্লাহর জিকিরে নিবদ্ধ থাকবে, তখন বুঝে নেবে গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ! নিদর্শন এমন স্থির করেছিলেন, যা একদিকে নিদর্শনেরও কাজ দেবে, অন্যদিকে অবগতি লাভের; যা উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন তাও পরিপূর্ণভাবে সাধিত হয়ে যাবে। সারকথা, মহান আল্লাহর জিকির ও শোকর ছাড়া অন্য কোনো কথা ইচ্ছা করলেও বলতে পারবে না। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ رَمْزًا : ফিকহ ও তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এটা ইশারা বা আকার-ইঙ্গিত ইত্যাদি কথার স্থলাভিষিক্ত। [যেমন- বিবাহ উপলক্ষে ইজন চাওয়ার পর বালিগা মেয়ে যদি মাথা নেড়ে বা হেসে সম্মতি জানায়, তবে তাতেই আকদ তথা বিবাহ চুক্তি সিদ্ধ হয়ে যাবে।]

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ وَسَبِّحْ : অর্থাৎ মুখে এবং অন্তরে আল্লাহর জিকির ও তাসবীহে রত থাকুন। এমনটি যেন না হয়, কেউ যেন একথা মনে না করতে পারে যে, কোনো রোগ অথবা শাস্তির কারণে আপনার জবান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আপনি বোবা হয়ে গেছেন। যেমনটি বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে; বরং অবিরতভাবে আপনি মহান আল্লাহর জিকির ও তাসবীহের মাধ্যমে নিজ রসনাকে সিক্ত রাখুন, অবশ্য আপনি কারো সাথেই কোনো কথা বলতে পারবেন না, আর এটিই আপনার স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ ও ইয়াহইয়ার জন্মের পূর্বাভাস।

قَوْلُهُ عَشِيّ : দ্বিপ্রহরে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পর রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সমস্ত সময় আশিয়্যুন পরিধির অন্তর্ভুক্ত। –[তাফসীরে বায়যাবী]

قَوْلُهُ اِبْكَارٌ : সূর্যোদয়ের পর দিনের আলো ছড়িয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময় ইবকার -এর পরিধির আওতাভুক্ত। –[তাফসীরে কাশশাফ] পরিভাষা অনুসারে সকাল-সন্ধ্যা শব্দদ্বয় শুধু নির্দিষ্ট সময়কে না বুঝিয়ে বরং বিরামহীনভাবে সমস্ত সময়কেও বুঝানো হতে পারে। অর্থাৎ তখন বেশি করে মহান আল্লাহর জিকির করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠে লেগে থাকবে। বোঝা যায়, মানুষের সাথে কথা বলার শক্তি যদিও রহিত করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে এ তিন দিন কেবল জিকির ও শোকরের জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু জিকির ও শোকরে মশগুল থাকার বিষয়টির ইচ্ছা রহিত পর্যায়ের, বাধ্যতামূলক ছিল না। এ কারণেই তা আদেশ করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৪২. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ اِخْتَارَكِ وَطَهَّرَكِ مِنْ مَسِيْسِ الرِّجَالِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ اَىْ اَهْلِ زَمَانِكَ . ৪২. আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেছিল, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং পুরুষের স্পর্শ থেকে তোমাকে পবিত্র রেখেছেন এবং তোমার যুগের বিশ্বের নারীগণের মাঝে তোমাকে মনোনীত করেছেন নির্বাচিত করেছেন।

৪৩. يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ اَطِيْعِيْهِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ اَىْ صَلِّىْ مَعَ الْمُصَلِّيْنَ . ৪৩. হে মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের বন্দেগি কর, তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন কর, সেজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ সালাত আদায়কারীদের সাথে সালাত আদায় কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اصْطَفٰى : اِصْطِفَاءٌ থেকে মাযির সীগাহ, অর্থ– সে বেছে নিয়েছে, মনোনীত করেছে, নির্বাচিত করেছে।

قَوْلُهُ اَىْ جِبْرَائِيْلُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْمَلَائِكَةُ হলো ইসমে জিনস। এর সর্বনিম্ন সংখ্যা তথা এক উদ্দেশ্য। অথবা হযরত জিবরাঈলের সম্মানার্থে বহুবচন আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ : হযরত ঈসা (আ.)-কে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে এ কারণে যে, তাঁর জন্ম মুজিযার বহিঃপ্রকাশ ও মানুষের জন্মপদ্ধতির বিপরীত। পিতাবিহীন আল্লাহর খাস কুদরত দ্বারা كُنْ শব্দের মাধ্যমে ঘটেছে। প্রথম اِصْطَفٰى -এর সম্পর্ক হলো মরিয়মের শৈশবকালের সাথে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শুরু থেকেই বুজুর্গি দান করেছিলেন। তাঁর মায়ের দোয়া কবুল করে তাঁকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। এছাড়া ইবাদতখানার কাজকর্ম ছেলেদের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এ সুযোগ দান করা হয়েছে। এরপর তাঁর কক্ষে অমৌসুমি ফল মুজিযাস্বরূপ পৌছানো হত, হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে তা হতবাক করেছে। এ সকল কিছুই তিনি আল্লাহর বিশেষ মনোনীতা হওয়ার নিদর্শন।

বিবি মরিয়মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব : মাঝখানে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছিল, যা দ্বারা ইমরান পরিবারের মনোনয়নের বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটনার জন্যে সেটা ছিল ভূমিকা স্বরূপ। এখানেই তা সমাপ্ত। পুনরায় বিবি মরিয়ম ও হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটনায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে। কাজেই প্রথমে হযরত মাসীহের আগে তাঁর জননীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়। ফেরেশতাগণ বিবি মরিয়মকে বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে প্রথম দিন থেকেই বাছাই করে নিয়েছেন, যে কারণে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও নিজ নজরানায় আপনাকে কবুল করেছেন। নানা রকম উচ্চতর অবস্থা ও উন্নত কারামত আপনাকে দান

http://islamiboi.wordpress.com

করেছেন। নির্মল চরিত্র, অনাবিল প্রকৃতি এবং প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষে ভূষিত করে আপনাকে নিজ মসজিদের সেবা করার উপযুক্ত করে তুলেছেন। সর্বোপরি বিশ্বের সমস্ত নারীর উপর বিভিন্ন দিক থেকে আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেমন তাঁর মাঝে এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নিহিত রেখেছেন যে, পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে কেবল তাঁর একার অস্তিত্ব হতে হযরত মাসীহ (আ.)-এর মতো একজন মহান নবীর জন্ম হতে পারে। এ বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার আর কোনো নারী লাভ করেনি। -[তাফসীরে ওসমানী]

ফায়দা : হযরত মরিয়মের এ বিশেষ মর্যাদা তাঁর যুগের প্রতি লক্ষ্য করে। কেননা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে হযরত খাদীজা (রা.)-কেও خَيْرُ النِّسَاءِ তথা সর্বোৎকৃষ্ট নারী বলা হয়েছে এবং আরও বিভিন্ন নারীর মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- হযরত আছিয়া ও হযরত আয়েশা প্রমুখ। হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য সকল নারীর উপর তাঁর মর্যাদা এরূপ যেমন অন্যান্য খাদ্যের উপর আরবের প্রসিদ্ধ খাবার সারীদ -এর মর্যাদা।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় হযরত ফাতিমা (রা.)-কেও বিশেষ মর্যাদাবান নারীদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ طَهَّرَكِ : আপনাকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতার স্পর্শ হতে পবিত্র রেখেছেন, আপনার পূত-পবিত্র চরিত্রের এক নমুনা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে জরীর, রূহুল বয়ান, কবীর, বাহর]

আয়াতে কারীমাতে এ প্রশংসার মাধ্যমে ইসলামের জঘন্যতম দুশমন ইহুদিদের সে সকল হীন ও ঘৃণ্য প্রচারণা নিরসন করা হয়েছে, যাতে তারা হযরত মরিয়ম (আ.)-এর চরিত্রের উপর জঘন্য ও নিকৃষ্ট ধরনের অপবাদ ও কলঙ্ক আরোপ করেছিলেন; এমনকি বর্তমান যুগেও করছে।

قَوْلُهُ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ الخ : ইহুদি খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস : পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত আকিদা ও জঘন্য প্রচারণা নিরসন করা হয়েছে ; আর আলোচ্য আয়াতে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকিদা ও প্রচারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইহুদিদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মরিয়ম অত্যন্ত ইবাদতগুজার, সচ্চরিত্রা ও আনুগত্যশীলা রমণী ছিলেন। আর খ্রিস্টানদেরকে সতর্ক ও অবগত করে দেওয়া হয়েছে যে, মরিয়ম আল্লাহর পুত্রের [নাঊযুবিল্লাহ] মা ছিলেন না। তিনি এমন কোনো দেবী ছিলেন না, যাকে পূজা করা যেতে পারে, তাঁর ইবাদত করা যেত পারে বা আল্লাহর সাথে শিরক করা যেতে পারে; বরং তাঁর প্রাপ্য সকল মর্যাদা ও সম্মান এ পর্যন্ত সীমিত যে, তিনি তাঁর মালিক ও প্রভুর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, অত্যন্ত অনুগত, ইবাদতগুজার রমণী ছিলেন। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ : রুকুকারীগণ যেভাবে মহান আল্লাহর সম্মুখে রুকু করে আপনিও সেভাবে রুকু করুন। কিংবা এর অর্থ হলো, আপনি জামাতের সাথে সালাত আদায় করুন। যে ব্যক্তি অন্ততপক্ষে রুকুতেও ইমামের সাথে শরিক হতে পারে, তাকে রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য করা হয়। সম্ভবত এ কারণেই সালাতকে রুকু শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) তাঁর ফতোয়ায় যা বলেছেন, তা দ্বারা এমনই বোঝা যায়। এ ব্যাখ্যা অনুসারে اُقْنُتِيْ -এর قُنُوْت অর্থ দাঁড়ানো নিলে সালাতের কিয়াম, রুকু, সিজদা তিনটি অবস্থাই আয়াতে এসে যায়। -[তাফসীরে ওসমানী]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সম্ভবত সে সময় মেয়েদেরও সাধারণভাবে অথবা ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে কিংবা বিশেষভাবে বিবি মরিয়মের জন্যে জামাতে উপস্থিত হওয়া জায়েজ ছিল। এমনও হতে পারে যে, তিনি একা বা অন্য মেয়েদের সাথে কক্ষের ভিতর থেকে ইমামের ইকতিদা করে থাকবেন। এর যে কোনোটি হওয়ার অবকাশ আছে। -[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

٤٤. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ زَكَرِيَّا وَمَرْيَمَ
مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ اَخْبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ
نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ فِي الْمَاءِ
يَقْتَرِعُوْنَ لِيَظْهَرَ لَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ
يُرَبِّيْ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يَخْتَصِمُوْنَ فِيْ كَفَالَتِهَا فَتَعْرِفَ ذٰلِكَ
فَتُخْبِرَ بِهِ وَاِنَّمَا عَرَفْتَهُ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ .

অনুবাদ :

৪৪. এটা অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া ও মরিয়ম সম্পর্কিত উল্লিখিত কাহিনী অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ, আপনার থেকে যা কিছু অদৃশ্য সে সম্পর্কিত কাহিনী, হে মুহাম্মদ! যা আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করছি। মরিয়মের তত্ত্বাবধানের লালনপালনের ভার কে গ্রহণ করবে? এজন্য এটা উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে যখন তারা তাদের কলম পানিতে নিক্ষেপ করছিল অর্থাৎ লটারি দিচ্ছিল তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না এবং তাঁর তত্ত্বাবধান সম্পর্কে যখন তারা বাদানুবাদ করেছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। যে, বলা যায় তা নিজে জেনে এতদসম্পর্কে আপনি এদের সংবাদ দিচ্ছেন; বরং ওহীর মাধ্যমেই আপনি তৎসম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নবীগণের জ্ঞানের মূল উৎস ওহী : দৃশ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো লেখাপড়া করেননি। প্রথম থেকে আহলে কিতাবের বিশেষ সাহচর্যও পাননি যাতে অতীত ঘটনাবলির এরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হতে পারে। সাহচর্য পেলেই বা কি হতো? যেখানে তারা নিজেরাই নানা রকম কল্পকথা ও ভিত্তিহীন গালগল্পের অন্ধকারে ঘূরপাক খেয়ে চলেছে। কেউ শত্রুতাবশত এবং কেউ সীমাতিরিক্ত ভালোবাসার আবর্তে সত্যিকারের ঘটনাবলিকে বিকৃত করে ফেলেছিল। অন্ধের চোখ থেকে আলো গ্রহণের কি আশা থাকতে পারে? এহেন পরিস্থিতিতে মাক্কী ও মাদানী উভয় প্রকার সূরায় বিগত ঘটনাবলি এমন বিশুদ্ধ ও বিশদ বিবরণ দান, যা বড় বড় জ্ঞানের দাবিদারকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দেয় এবং কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকেনি; এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এ জ্ঞান প্রিয়নবী ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে দান করা হয়েছিল। কেননা তিনি সেসব অবস্থা না স্বচক্ষে দেখেছেন, না সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভের অপর কোনো মাধ্যম তাঁর কাছে ছিল। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ : এ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ যতটুকু জানা যায় তা হলো, 'হায়কলে সুলায়মানী' [বায়তুল মুকাদ্দাস] -এর খাদেম হিসেবে বহু লোক নিয়োজিত ছিল। তাদের কেউ ছিল ঝাড়ুদার, কেউ ঘরবাড়ি সংস্থাপনকারী, কেউ মেঝে ও বিছানা পরিচ্ছন্নকারী ও কার্পেট ইত্যাদি বিছানা বিছাবার কাজে নিয়োজিত, কেউ ছিল দারোয়ান, আবার কেউ ছিল মুয়াজ্জিন। হযরত মরিয়মের পিতা ইমরান ছিলেন তাঁর জীবদ্দশায় খাদিমদের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর ইন্তেকালের পর মরিয়মের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত হবে এ নিয়ে খাদিমদের মধ্যে বিতর্ক ও ঝগড়ার সূত্রপাত হলো। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন বিবি মরিয়মের নিকটাত্মীয় এবং খালু। তখন তাঁরা এ মতে পৌঁছল যে, ভাগ্যপরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তখন এমনি ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাওরাত যে কলম দিয়ে লিখা হতো, সে কলম দিয়ে তাওরাতের কিছু অংশ লিখে কলমসহ উক্ত লিখিত টুকরো জর্ডান নদীতে নিক্ষেপ করা হতো। কলম সাধারণত স্রোতের অনুকূলেই প্রবাহিত হতো। এ স্রোতের বিপরীতমুখী কলমের অধিকারীকেই কৃতকার্য ও সফল বলে ঘোষণা দেওয়া হতো এবং এ ব্যবস্থাকে গায়েবী ইঙ্গিতের স্থলাভিষিক্ত মনে করা হতো এবং মনে করা হতো, স্রোতের বিপরীতমুখী প্রবাহিত কলমের মালিকের পক্ষেই গায়েব থেকে রায় প্রদান করা হয়েছে। মরিয়মের অভিভাবকত্বের এ কলম পরীক্ষা তথা ভাগ্যপরীক্ষায় হযরত যাকারিয়া (আ.) কৃতকার্য হলেন।

قَوْلُهُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যখন মরিয়মের অভিভাবকত্বের 'কুরআহ' তথা ভাগ্যপরীক্ষা [জর্ডান নদীতে কলম নিক্ষেপের মাধ্যমে] অনুষ্ঠিত হয়, তখন আপনি তো স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং কোনো প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তির সাক্ষ্যও আপনার নিকট পৌঁছেনি। এরপরও আপনি যে ঘটনার নিখুঁত ও নির্ভুল বর্ণনা প্রদান করেছেন, তা একমাত্র ওহী ব্যতীত আর কোনো পদ্ধতিতে আপনার নিকট পৌঁছেছে? নিশ্চয় ওহী-ই একমাত্র মাধ্যম। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে মুশরিক, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিবেকের কাছে এ যুক্তি উত্থাপন আপনার নিকট ওহী নাজিলের জ্বলন্ত প্রমাণ এবং ওহী নাজিলের সত্যতা প্রমাণিত হওয়াই আপনার নবুয়তের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤٥. اُذْكُرْ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ اَىْ جِبْرَئِيْلُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اَىْ وَلَدٍ اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَاطَبَهَا بِنِسْبَتِهِ اِلَيْهَا تَنْبِيْهًا عَلٰى اَنَّهَا تَلِدُهُ بِلَا اَبٍ اِذْ عَادَةُ الرِّجَالِ نِسْبَتُهُمْ اِلٰى اٰبَائِهِمْ وَجِيْهًا ذَا جَاهٍ فِى الدُّنْيَا بِالنُّبُوَّةِ وَالْاٰخِرَةِ بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

৪৫. আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) বলল, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে তাঁর একটি কথার অর্থাৎ তাঁর তরফ থেকে একটি সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম মসীহ, মরিয়ম তনয় ঈসা। সে ইহলোকে নবুয়ত লাভে, পরলোকে শাফাআতের অধিকার ও উচ্চ মর্যাদা লাভে সম্মানিত সম্মানের অধিকারী. এবং আল্লাহর নিকট সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের মধ্যে হবে। তাঁকে [হযরত ঈসাকে] এ আয়াতে হযরত মরিয়মের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে [মরিয়মকে] সম্বোধন করত এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতার মাধ্যম ব্যতীত তাঁকে মরিয়ম জন্ম দেবেন। নইলে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে সন্তানের উল্লেখ করাই হলো সাধারণ নিয়ম।

٤٦. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ اَىْ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

৪৬. সে দোলনায় অর্থাৎ শিশু অবস্থায়, কথা বলার সময় হওয়ার পূর্বেই ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।

٤٧. قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ بِتَزَوُّجٍ وَلَا غَيْرِهٖ قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكِ مِنْ خَلْقِ وَلَدٍ مِّنْكِ بِلَا اَبٍ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا اَرَادَ خَلْقَهٗ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ ـ

৪৭. সে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে কোনো পুরুষ বিবাহ বা অন্য কোনোভাবে স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কিভাবে? اَنّٰى এটা এ স্থানে كَيْفَ [কিরূপে] অর্থে ব্যবহৃত। তিনি বললেন, এভাবেই অর্থাৎ পিতার মাধ্যম ব্যতীত তোমার সন্তান পয়দা করার বিষয়টি এরূপেই হবে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন অর্থাৎ তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন বলেন, হও; অনন্তর তা হয়ে যায়।

তাহকীক ও তারকীব

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মাসীহ مَسِيْحٌ শব্দটি মূলত হিব্রুতে ছিল মাশীহ (مَاشِيْحٌ) বা মাশীহা (مَشِيْحًا) অর্থ– বরকতময়। আরবিতে এসে এটা মাসীহ مَسِيْحٌ হয়ে গেছে। দাজ্জালকেও মাসীহ বলা হয়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আরবি শব্দ, এ নামে নামকরণের কারণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। মাসীহের দ্বিতীয় নাম বা উপাধি ঈসা। এর আসল হিব্রু উচ্চারণ ছিল ঈশূ اَيْشُوْعُ। আরবিতে এসে ঈসা হয়ে গেছে। এর অর্থ– নেতা। লক্ষণীয় বিষয় হলো, কুরআন মাজীদ ইবনে মরিয়ম [মরিয়ম তনয়] -কে হযরত মাসীহের নামের অংশরূপে ব্যবহার করেছেন। কেননা সুসংবাদ দানকালে খোদ মরিয়মকে এ

http://islamiboi.wordpress.com

কথা বলা হয়েছে যে, তোমাকে 'মহান আল্লাহর কালিমা' সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হলো, যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে **মরিয়ম, এটা নিশ্চয়** ঈসার পরিচয় দেওয়ার জন্য নয়; বরং এ বিষয়ে সচেতন করার জন্যে যে, বাপ না থাকার কারণে তাঁর **বংশ-পরিচয় মায়ের** সাথেই সম্পৃক্ত থাকবে। তাই মানুষের কাছে মহান আল্লাহর এ বিস্ময়কর নিদর্শন চির স্মরণীয় এবং বিবি **মরিয়মের মর্যাদা** অমর রাখার জন্যে মায়ের পরিচয়কে তাঁর নামের অংশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسٰى : عِيْسٰى হলো اَلْمَسِيْحُ থেকে বদল। হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি ছিল মাসীহ। ইবরানী ভাষায় **এর অর্থ** হলো- ভ্রমণকারী বা পর্যটক, বরকতময়, পুণ্যময়। তাঁকে এ কথা বলার কারণ, হয়তো তিনি খুব বেশি সফর ও **ভ্রমণ** করতেন অথবা তিনি যে কোনো রুগীর শরীরে হাত বুলালে মাসাহ করলে সে সুস্থ হয়ে যেত।

عِيْسٰى : শব্দটি اَيْشُوْعُ থেকে নিষ্পন্ন; কেউ বলেন, اَلْعِيْسُ থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ- বেশির ভাগ মিশ্রিত শুভ্রতা, যেহেতু তিনি সোনালি বর্ণের ছিলেন, এ কারণে তাঁকে ঈসা বলা হয়।

قَوْلُهُ ابْنُ مَرْيَمَ : এটা هُوَ মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ وَجِيْهًا : এটা كَلِمَةٌ থেকে হাল হয়েছে, যদিও শব্দটি নাকেরা। তবে এটা মওসূফা অর্থাৎ كلمة كائنة منه ছিল।

وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : এর আতফ হলো وَجِيْهًا -এর উপর।

فَهُوَ يَكُوْنُ এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنّٰى হলো هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ : হযরত মরিয়মকে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে। পুত্রকে পিতাবিহীন সৃষ্টি করার কারণে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে। মরিয়ম সে সময় পর্যন্ত ইহুদিদের প্রচলন মোতাবেক কুমারী তথা অবিবাহিতা ছিলেন, অবশ্য তাঁর বিবাহের ব্যাপারে দাউদ গোত্রের ইউসুফ নামক এক যুবকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সে কাঠের কাজ করত। ইঞ্জিলের বর্ণনা রয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈলকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্যালিলের নাসেরা শহরে এক কুমারীর নিকট পাঠানো হলো। দাউদ গোত্রের ইউসুফ নামের এক ব্যক্তি তার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল, উক্ত কুমারীর নাম ছিল মরিয়ম। -[লুকা খ. ১, পৃ. ২৬-২৭]

ইয়াসু' মাসীহের জন্ম এভাবে হয়েছিল যে, যখন তাঁর মা মরিয়মকে ইউসুফের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, বিবাহের পূর্বেই রূহুল কুদ্দুসের কুদরতে সে গর্ভবতী হয়েছিল। -[মাত্তা খ. ১, পৃ. ৮১]

قَوْلُهُ اَىْ وَلَد : এটা كَلِمَةٌ -এর ব্যাখ্যা :

মাসীহ (আ.) -কে 'কালিমা' বলার তাৎপর্য : হযরত মাসীহ (আ.)-কে এ স্থলে এবং কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় মহান আল্লাহর 'কালিমা' বলা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ .

অর্থাৎ 'মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ তো মহান আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর রূহ।' [সূরা নিসা : ১৭১] এমনিতে তো মহান আল্লাহর কালিমা অসংখ্য, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا .

অর্থাৎ 'বল, আমার প্রতিপালকের কালিমা লিপিবদ্ধ করার জন্যে সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনলেও।' [সূরা কাহাফ : ১০৯] কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর কালিমা [হুকুমে] বলা হয়ে থাকে এ দৃষ্টিতে যে, তাঁর জন্ম পিতার

http://islamiboi.wordpress.com

মাধ্যম ব্যতিরেকে সাধারণ নিয়মের বাইরে কেবল মহান আল্লাহর হুকুমে সাধিত হয়। যেসব কার্য স্বাভাবিক কারণাদির বাইরে ঘটে, সেগুলোকে সাধারণত সরাসরি মহান আল্লাহর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ 'আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। -[সূরা আনফাল : ১৭]

قَوْلُهُ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : এটা ইহুদিদের উক্তি খণ্ডনার্থে অবতীর্ণ হয়েছে, বলা হচ্ছে তোমরা যার ব্যাপারে সর্বপ্রকার অভিযোগ আরোপ কর এবং যাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা কর, মূলত সে অতি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। ইহুদিদের প্রাচীন কোনো কিতাবে হযরত মাসীহ (আ.)-এর কটূক্তি ও হেয়তার কমতি ছিল না। এটা কুরআনের বরকত ও মু'জিযা যে, তা অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে ইহুদিদের মধ্যেও এ ব্যাপারে পরিবর্তন এসেছে। এমনকি তালমুদের বিভিন্ন অভিযোগ তারা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। পরকালের ইজ্জত-সম্মান তো ভিন্ন কথা, দুনিয়াতে তাঁর সম্মান এভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, বিশ্বের একশত কোটির বেশি মুসলমান আজও তাঁকে আল্লাহর খাঁটি নবী মনে করে, তাঁর নামের শেষে আলাইহিস সালাম যুক্ত করে এবং প্রায় এক কোটি নাসারা তাঁকে রাসূলের মর্যাদা থেকেও উঁচু মনে করে- যদিও আকিদা ভ্রান্ত তথাপি এটা তাঁর ইজ্জত ও সম্মানেরই ফলাফল।

যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বিবি মরিয়মের অন্তরে এ দুশ্চিন্তা দেখা দেবে যে, কেবল নারী হতে সন্তানের জন্ম হলে দুনিয়ার মানুষ তাকে কিভাবে স্মরণ করবে? তারা নিরুপায় হয়ে আমার উপরই অপবাদ আরোপ করবে এবং নিকৃষ্ট উপাধি আরোপ করে সর্বদা তাঁকে উৎপীড়ন করবে। আমি কিভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব? এ কারণেই পরে وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁকে কেবল আখিরাতেই নয়; বরং দুনিয়াতেও প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন এবং শত্রুদের সব অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন। -[তাফসীরে ওসমানী]

হযরত ঈসা মাসীহের গুণাবলি : অত্যন্ত মার্জিত ও উচ্চস্তরের পুণ্যবান হবেন। প্রথমে মায়ের কোলে, তারপর বড় হয়ে তিনি আশ্চর্য কথা বলবেন। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বিবি মরিয়মকে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বের সুসংবাদগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, তিনি ধারণা করে বসবেন, মর্যাদা যখন লাভ হওয়ার হবে, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তো নিন্দা ও অপবাদের লক্ষবস্তুতে পরিণত হতে হবে। তখন নির্দোষ প্রমাণের কি উপায় হবে? এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দানকল্পে বলেন যে, বিচলিত হয়ো না, তোমার মুখ খোলার প্রয়োজনই পড়বে না। শুধু এতটুকু বলে দিও যে, আমি আজ রোজা রেখেছি, তাই কথা বলতে অপারগ। শিশু স্বয়ং জবাবদিহি করবে। সূরা মরিয়মে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- يُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا দ্বারা কেবল বিবি মরিয়মকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, শিশু বোবা হবে না। অন্যান্য শিশুর মতোই শৈশব ও পূর্ণ বয়সে কথা বলবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, হাশরের মাঠেও মানুষ হযরত ঈসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলবে- يَا عِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا অর্থাৎ 'হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর কালিমা, যাকে তিনি মরিয়মের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং আপনি তাঁর রূহ। আপনি শৈশবে দোলনায় কথা বলেছেন।' অনুরূপ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের দিন বলবেন-

اُذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا.

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে।' -[সূরা মায়েদা : ১১০] তাহলে সেখানেও কি এ নিদর্শন কেবল এ উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করা হবে যে, বিবি মরিয়ম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে যান তাঁর ছেলে বোবা হবে না, অন্যান্য শিশুর মতো কথা বলতে পারবে? [আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার বিভ্রান্তি হতে আমাদের রক্ষা করুন।]

-[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ : এর মর্ম প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, এটি কুরআনুল কারীমের বিস্ময়কর মু'জিযা যে, মাত্র একটি শব্দ দ্বারা গোটা **বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুটিত** করে তোলে। এখানে এ শব্দ দ্বারা তো তাঁর মূল মর্যাদা ও স্থানকে নির্ণীত করেছে যে, তিনি **মহান আল্লাহর ঘনিষ্ঠ** নৈকট্যের অধিকারী, অপর দিকে ইহুদি চক্রের ভ্রান্ত প্রচারণার অপনোদন করে তাঁর সম্মান ও মর্যাদার **সাক্ষ্যও দান করা** হয়েছে।

مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ শব্দ সংযোজনের ফলে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, তিনি একাই আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও নিকটতম মর্যাদার **অধিকারী** নন; বরং এমনি আল্লাহর অসংখ্য নবী, রাসূল ও প্রিয়তম বান্দা রয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যেই একজন। আর **হযরত** ঈসা মাসীহ (আ.) সকল সম্মান ও মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার আবদিয়্যাতের ঊর্ধ্বে কোনো সত্তা নন, এমন **কোনো** বৈশিষ্ট্য ও মর্তবার অধিকারী নন, যার কারণে তাঁকে আল্লাহ মানা যায় অথবা তাঁর বন্দেগি ও পূজা অর্চনা করা যায়।

قَوْلُهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : مَهْد অর্থ– দোলনা। দোলনায় কথা বলার উদ্দেশ্য পরিষ্কার যে, দুগ্ধ পানের বয়সে মু'জিযা স্বরূপ ভাবগাম্ভীর্যময় কথা বলবে। كُهُوْلَتْ অর্থ– অর্ধ বয়স, এ বয়সে কথা বলার উদ্দেশ্য কি? এ সময় তো সকলেই কথা বলে। এর উত্তর এই যে, এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো, দুগ্ধপানকালে কথা বলার বর্ণনা করা। এর সাথে প্রাপ্ত বয়সের কথা বলার উল্লেখ এজন্য এসেছে যে, মানুষ যেভাবে প্রাপ্ত বয়সে জ্ঞান-বিবেক খাটিয়ে কথা বলে– হযরত ঈসা (আ.) শৈশবে সেভাবে কথা বলবেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ৩২ বছর, যা ঠিক যৌবনকাল। দুনিয়ায় অবস্থানকালে তাঁর كُهُوْلَتْ মধ্যবয়সী হওয়ার সময় আসেনি। যখন তিনি পুনরায় অবতরণ করবেন, তখন তিনি এ বয়সে উপনীত হবেন। কেমন যেন এর দ্বারা তাঁর অবতরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে শৈশবকালে কথা বলার ন্যায় তাঁর সে সময়কার কথাও মু'জিযা স্বরূপ হবে।

قَوْلُهُ طِفْلًا قَبْلَ وَقْتِ الْكَلَامِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْمَهْدُ দ্বারা দোলনা উদ্দেশ্য নয়; বরং শৈশব অবস্থা উদ্দেশ্য। চাই কথা বলার সময় মায়ের কোলে বা বিছানায় কিংবা দোলনায় থাকুক না কেন।

كَهْلًا অর্থ– পরিণত বয়সে। 'কাহলান' শব্দটি কিশোর জীবন সমাপ্তির পর যৌবনের এক বিশেষ স্তর। প্রৌঢ়ত্বের এক বিশেষ স্তরকে বুঝায়, সাধারণত ত্রিশ বছর বয়স হতে পঞ্চাশ বছর কাল পর্যন্ত সময়কে 'কাহ্‌ল' বা পরিণত বয়স বলা হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী ও রূহুল মা'আনী]

হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে শিশু, কিশোর, পরিণত বয়স ইত্যকার শব্দ সমষ্টির ব্যবহার হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনিও অপরাপর মানুষের মতোই জীবনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ক্রমবিকাশের মাধ্যমেই বড় হবেন। আর ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে তাঁর পরিবর্ধিত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, তিনি اُلُوْهِيَّتْ তথা খোদায়ী শক্তিসম্পন্ন কোনো ঊর্ধ্বতন সত্তা ছিলেন না। তাঁর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিই তাঁর সম্পর্কে উলূহিয়্যাতের ধারণা অপনোদনের জ্বলন্ত প্রমাণ।

قَوْلُهُ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ : তোমার বিস্ময় যথার্থ। তবে আল্লাহর কুদরতের নিকট এটা কোনো দুরূহ বিষয় নয়। তিনি যখন ইচ্ছা করেন– স্বাভাবিক অবস্থার ও সূত্রসমূহের ধারা শেষ করে كُنْ -এর নির্দেশ দ্বারা মুহূর্তের মধ্যেই তা বাস্তবায়ন করেন।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ : অর্থাৎ এভাবেই পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই হয়ে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত বলে তুমি বিস্মিত ও আশ্চর্য হয়ো না। আল্লাহ তা'আলা যা চান, যখন চান, যেভাবে চান কার্য সম্পাদন করে থাকেন। তাঁর ক্ষমতার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, তিনি কোনো কাজের ইচ্ছা করলেই তা হয়ে যায়। তিনি কোনো মৌল পদার্থের মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি আসবাব-উপকরণেরও অধীন নন। –[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤٨. وَيُعَلِّمُهُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ الْكِتٰبَ الْخَطَّ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ .

৪৮. এবং তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব লেখনী হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল। يُعَلِّمُهُ এটা نُوْن [উত্তম পুরুষ, বহুবচন] ও ى [নাম পুরুষ, একবচন] উভয় রূপেই পাঠ করা যায়।

٤٩. وَنَجْعَلُهُ رَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ فِى الصِّبَا اَوْ بَعْدَ الْبُلُوْغِ فَنَفَخَ جِبْرَئِيْلُ فِىْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ وَكَانَ مِنْ اَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِىْ سُوْرَةِ مَرْيَمَ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ لَهُمْ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ اَنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ عَلَامَةٍ عَلٰى صِدْقِىْ مِنْ رَّبِّكُمْ هِىَ اَنِّىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا اَخْلُقُ اُصَوِّرُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مِثْلَ صُوْرَتِهِ وَالْكَافُ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ فَاَنْفُخُ فِيْهِ الضَّمِيْرُ لِلْكَافِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ طَائِرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهِ فَخَلَقَ لَهُمُ الْخُفَّاشَ لِاَنَّهُ اَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا فَكَانَ يَطِيْرُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَهُ فَاِذَا غَابَ عَنْ اَعْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيِّتًا وَاُبْرِئُ اَشْفِى الْاَكْمَهَ الَّذِىْ وُلِدَ اَعْمٰى وَالْاَبْرَصَ وَخُصَّا لِاَنَّهُمَا دَاءَانِ اَعْيَيَا الْاَطِبَّاءَ .

৪৯. এবং তাকে শৈশব অবস্থায়ই বা সাবালক তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করব। অনন্তর তাঁর জামার ফাঁক দিয়ে হযরত জিবরাঈল ফুঁক দেন। ফলে তিনি গর্ববতী হন। পরে তাঁর অবস্থা সূরা মরিয়মে উল্লিখিত অবস্থার ন্যায় হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তাদেরকে তিনি বলেন, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন অর্থাৎ আমার সত্যতার চিহ্ন নিয়ে এসেছি। তা হলো, আমি اِنِّىْ এটা অপর এক কেরাতে প্রথমাক্ষর কাসরাসহ পঠিত। এমতাবস্থায় তা اِسْتِئْنَاف বা নববাক্য বলে বিবেচ্য হবে। তোমাদের জন্যে কাদা দ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি অর্থাৎ তার অনুরূপ আকৃতি গঠন করব সুরত বানাব। كَهَيْئَةِ -এর كَاف টি এ স্থানে اَخْلُقُ -এর اِسْمِ مَفْعُوْل বা কর্মবাচক বিশেষ্য। অতঃপর তাতে আমি ফুৎকার দেব, فِيْهِ -এর ضَمِيْر বা সর্বনামটি উক্ত كَاف -এর প্রতি ইঙ্গিতবহ। ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর অভিপ্রায়ক্রমে তা পাখি হয়ে যাবে। طَيْرًا এটা অপর এক কেরাতে طَائِرًا রূপে পঠিত রয়েছে। অনন্তর তিনি তাদের চামচিকা সৃষ্টি করে দেখালেন। কারণ গঠন প্রকৃতি হিসেবে তা পাখিদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী বলে স্বীকৃত। [যাহোক, বানানোর পর] তা তাদের সামনে উড়ে প্রস্থান করত এবং তাদের দৃষ্টির অন্তরালে গিয়ে তা মরে পড়ে যেত। [এটা এজন্য যে, আল্লাহর সৃষ্টিই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মানুষকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা দেওয়া হলেও মানুষের সৃষ্টি অপূর্ণ থাকে।] তিনি আরও বলেন, জন্মান্ধ اَكْمَهَ অর্থাৎ জন্মান্ধ। ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে ভালো করব নিরাময় করব।

http://islamiboi.wordpress.com

وَكَانَ بَعْثُهُ فِيْ زَمَنِ الطِّبِّ فَأَبْرَأَ فِيْ يَوْمٍ خَمْسِيْنَ اَلْفًا بِالدُّعَاءِ بِشَرْطِ الْاِيْمَانِ وَأُحْيِي الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهٖ كَرَّرَهُ لِنَفْيِ تَوَهُّمِ الْاُلُوْهِيَّةِ فِيْهِ فَاَحْيَا عَازِرًا صَدِيْقًا لَهُ وَابْنَ الْعَجُوْزِ وَابْنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوْا وَ وُلِدَ لَهُمْ وَسَامَ بْنَ نُوْحٍ وَمَاتَ فِي الْحَالِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ تَخْبَئُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِمَّا لَمْ أُعَايِنْهُ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا اَكَلَ وَمَا يَأْكُلُ بَعْدُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

এ রোগ দুটির বিষয়ে যেহেতু চিকিৎসকগণ অক্ষম সেহেতু এ স্থানে বিশেষ করে এ দুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) -এর আগমন হয়েছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে। ঈমান গ্রহণের শর্তে একদিনে পঞ্চাশ হাজার রুগীকে তিনি দোয়া করে নিরাময় করেছিলেন। এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ক্রমে মৃতকে জীবন দান করব। তাঁর সম্পর্কে ঈশ্বরত্ব আরোপের ধারণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এ কথাটির অর্থাৎ بِاِذْنِ اللّٰهِ কথাটির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর বন্ধু আযারকে, জনৈকা বৃদ্ধার পুত্রকে ও আশিরের কন্যাকে জীবিত করেন। পরেও তারা জীবিত ছিল এবং তাদের সন্তানাদিও হয়। হযরত নূহ (আ.) -এর পুত্র সামকেও জীবিত করেছিলেন। তবে তিনি সে ক্ষণেই মারা যান।

তোমরা যা আহার কর ও তোমাদের গৃহে মজুদ করে রাখ গোপন করে রাখ, যা আমি দেখিনি তা তোমাদেরকে বলে দেব। একজন গৃহে কি আহার করে এসেছে এবং পরে কি আহার করবে তা তিনি বলে দিতেন।

তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْكَافُ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ : এ ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : فَاَنْفُخُ فِيْهِ -এর মধ্যে ه সর্বনাম كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ -এর كَافٌ -এর দিকে ফিরেছে, আর এটা হলো হরফ যার দিকে সর্বনাম ফিরতে পারে না।

উত্তর : এখানে كَاف হলো مِثْل অর্থে, যা ইসমে মাফউল। অর্থাৎ مُمَاثَلَةُ هَيْئَةِ الطَّيْرِ অর্থে।

قَوْلُهُ الْخَطُّ : اَلْكِتَابُ -এর ব্যাখ্যা اَلْخَطُّ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : তাওরাত ও ইঞ্জিলের আতফ اَلْكِتٰبُ -এর উপর সঠিক নয়। কারণ কিতাবের মধ্যে তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয়টি শামিল রয়েছে। কাজেই এটা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর অন্তর্গত হবে।

উত্তর : اَلْكِتٰبُ দ্বারা اَلْكِتَابَةُ উদ্দেশ্য। اَلْخَطُّ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ هِيَ اَنِّيْ : هِيَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنِّيْ তার পরের অংশসহ উহ্য মুবতাদার খবর; اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ থেকে বদল হওয়ার কারণে মানসূব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْحِكْمَةَ : সম্ভবত কিতাব ও হিকমত দ্বারা কুরআন ও হাদীস বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা হযরত মাসীহ (আ.) দুনিয়ায় পুনরাগমনের পর কুরআন ও হাদীসে নববী ﷺ অনুযায়ী ফয়সালা দেবেন। আর এটা তখন সম্ভব যখন তাঁকে এ বিষয়ের জ্ঞান দান করা হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ : বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একজন রাসূল হিসেবে তাঁর আগমন ঘটবে। এ রিসালাতের মর্যাদায় তিনি অভিষিক্ত হবেন। [মা'আযাল্লাহ] তিনি কোনো যাদুকর বা বাজিকর হবেন না, যেমনটি প্রতারক ইহুদিগণ মনে করে। [নাঊযুবিল্লাহ] না তিনি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র, যেমনটি খ্রিস্টানগণ অনর্থক মনে করে থাকে। اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ এখানে একথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নিকটই ইসলাম প্রচার করবেন। তাঁর আহ্বান বনী ইসরাঈল পর্যন্তই সীমিত। বনী ইসরাঈলের অন্য নবীগণের মতো তিনিও শুধু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়েরই নবী ও রাসূল ছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.) -এর মু'জিযা : جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ -এর মধ্যকার আয়াত শব্দের অর্থ– চিহ্ন বা নিদর্শন। এখানে মু'জিযা তথা অলৌকিক ঘটনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মু'জিযা এমন ধরনের ঘটনাবলি প্রকাশের নাম, যা সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রচলিত নিয়ম ও ব্যবস্থার ব্যতিক্রম।

قَوْلُهُ مِنْ رَّبِّكُمْ : আয়াতের এ অংশে এর প্রতিই সর্বাধিক জোর, তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, এ সকল মু'জিযা নবীগণের ইচ্ছা ও শক্তির দ্বারা হয় না, বরং নিঃসন্দেহে এর প্রকাশ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও কুদরতেই হয়। অবশ্য এসব মু'জিযার দ্বারা নবুয়ত ও রিসালাতের সাহায্য-সহযোগিতা ও তাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ اَخْلُقُ : خَلْق -এর অর্থ– সৃষ্টি। সৃষ্টি শব্দের সম্পর্ক যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে জড়িত হয়, তখন তার অর্থ অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা। আর خَلْق বা সৃষ্টিকর্মের সম্পর্ক যখন মানুষের সাথে হয়, তখন তার অর্থ হয়– পরিমাপ করা, বিশেষভাবে প্রস্তুত করা, আকৃতি দান করা, রূপ দান করা ও উপযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। মোট কথা, এক বা একাধিক বস্তু বা পদার্থকে তার নিজস্ব রূপ ঠিক রেখে অথবা আংশিক বা পরিপূর্ণ পরিবর্তন করে কিংবা প্রয়োজনীয় যোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে এক ধরন হতে অন্য ধরনে রূপান্তর করে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা, যা মানব জাতির উপকারে আসে। এখানে হযরত ঈসা (আ.) -এর সম্পর্কে اَخْلُقُ শব্দ বলার তাৎপর্য নতুন করে কিছু সৃষ্টি করা নয়; বরং আকৃতি প্রদান ও রূপদান করাই বুঝানো হয়েছে।

خَلَقَهُ تَقْدِيْرَهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنَّهُ يُحْدِثُ مَعْدُوْمًا (تاج) اَلْخَلْقُ اَصْلُهُ الْتَقْدِيْرُ الْمُسْتَقِيْمُ (رَاغِبْ) اَلَّذِىْ يَكُوْنُ بِالْاِسْتِحَالَةِ فَقَدْ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِغَيْرِ فِىْ بَعْضِ الْاَحْوَالِ وَالْخَلْقُ لَا يَسْتَعْمِلُ فِىْ كَافَّةِ النَّاسِ اِلَّا عَلٰى وَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا فِىْ مَعْنَى التَّقْدِيْرِ (رَاغِبْ) اَىْ اُقَدِّرُ وَاُصَوِّرُ (كَبِيْر) وَالْمُرَادُ بِالْخَلْقِ اَلتَّصْوِيْرُ وَالْاِبْرَازُ عَلٰى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ (رُوْح)

قَوْلُهُ لَكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একিন পয়দা করার লক্ষ্যে।

اَىْ لِاَجَلِ تَحْصِيْلِ اِيْمَانِكُمْ وَدَفْعِ تَكْذِيْبِكُمْ اِيَّاىَ (رُوْح) وَاللَّامُ فِىْ لَكُمْ لِلتَّعْلِيْلِ (بَحْر) সাধারণ জনতা সর্বদাই যুক্তি-প্রমাণের চেয়ে অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাবলির প্রতি বেশি আকৃষ্ট এবং প্রভাবান্বিত হয়। আর ইহুদিদের মধ্যেও এ ধরনের অলৌকিকত্ব ও অদ্ভুত ঘটনাবলির প্রতি আকর্ষণ বিশেষভাবে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ ছিল।

قَوْلُهُ مِنَ الطِّيْنِ : 'কাদা মাটির দ্বারা' আয়াতের এ অংশ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) -এর সত্যকে আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। আমার পাখি তৈরির ব্যাপরটি অনস্তিত্ব হতে কোনো কিছুকে অস্তিত্বে আনা নয়; বরং মহান আল্লাহর দেওয়া পদার্থ ও বস্তুকে তাঁর দেওয়া বিভিন্ন উপকরণকে বিশেষ পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও সংযোজনের মাধ্যমে তাঁরই শক্তিতে আকৃতি ও রূপদান করা শুধু। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ : বলা হয়ে থাকে, 'ইরহাস' [নবুয়ত পূর্বকালীন অলৌকিক ঘটনা] হিসেবে শৈশব কালেই তাঁর থেকে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যাতে অপবাদ আরোপকারীদের কুদরতের এক ছোট্ট নিদর্শন দেখিয়ে একথা বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, যখন আমার এক ফুঁ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাটির নিষ্প্রাণ আকৃতিকে প্রাণময় করে তোলেন, তখন তিনি যদি পুরুষাঙ্গ ব্যতিরেকেই রূহুল কুদুসের ফুঁ দ্বারা এক মহিমান্বিত রমণীর বাচ্চাদানীতে হযরত ঈসা (আ.)-এর আত্মা সঞ্চারিত করেন, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? বরং হযরত মাসীহ (আ.) যেহেতু হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ফুৎকারে জন্মলাভ করেছেন, সেহেতু তাঁর নিজের ফুৎকারকেও সেই জন্ম ধারারই সক্রিয় প্রভাব মনে করা

http://islamiboi.wordpress.com

উচিত। সূরা মায়িদার শেষ দিকে হযরত মাসীহ (আ.) -এর এসব অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে এক আলোচনা করা হবে। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য। সারকথা, হযরত মাসীহ (আ.) -এর মাঝে ফেরেশতাসুলভ ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যাবলির প্রাবল্য ছিল। সে অনুযায়ীই ক্রিয়াদি প্রকাশ পেত। কিন্তু তাই বলে ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ফেরেশতাগণের আদমকে সিজদা করার কারণে কোনোরূপ প্রশ্ন দেখা দেবে না। কেননা যাবতীয় মানবিক গুণাবলি তথা দৈহিক ও আত্মিক গুণ সমষ্টির সমারোহ যাঁর মাঝে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘটবে তাঁকে হযরত মাসীহ (আ.) হতেও শ্রেষ্ঠ স্বীকার করতে হবে আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূত-পবিত্র সত্তা। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اِنِّىْ اَخْلُقُ : এখানে خَلْق দ্বারা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়, কারণ তা কেবল আল্লাহই করেন। এখানে তার অর্থ হলো- বাহ্যিক গঠন-প্রকৃতি দান করা এবং তৈরি করা। ব্যখ্যাকার (র.) خَلْق -এর ব্যখ্যায় اُصَوِّرُ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। হযরত ঈসা (আ.) মাটি দ্বারা বাদুড়ের আকৃতি তৈরি করেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, বাদুড় হলো সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ পাখি। তার দাঁত ও স্তন আছে এবং পালকবিহীন উড়ে। মাগরিবের পরে এবং ফজরের পরেই কেবল তাকে দেখা যায়। -[সাবী]

قَوْلُهُ بِاِذْنِ اللّٰهِ : আয়াতের এ অংশে হযরত ঈসা (আ.) নিজস্ব ভাষণে সুস্পষ্টভাবে এ স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, আমি আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র কোনোটাই নই। আমার দ্বারা সংঘটিত এ সকল অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডকে আমার নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতার ফলশ্রুতি মনে করে গোমরাহির অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ো না, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ো না। যা কিছু আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, মূলত এসব কিছুই মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, তাঁরই শক্তি-ক্ষমতা ও মহান কুদরতের ফলেই হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ : জন্মান্ধ শিশুও আমার হাতের পরশে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তা হযরত ঈসা (আ.) -এর এক বিস্ময়কর মু'জিযা। বিভিন্ন রোগগ্রস্ত ব্যক্তির চক্ষুও অপারেশন ব্যতীত সুস্থ করে তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়, অথচ এখানে জন্মান্ধকে সুস্থ করার মতো অলৌকিক কাণ্ডের কথাই বলা হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে আকমাহ বলতে জন্মান্ধ ব্যক্তিকেই বুঝায়।

হযরত মাসীহ (আ.)-কে যুগোপযোগী মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল : সেকালে চিকিৎসক শ্রেণির প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। হযরত মাসীহ (আ.) -কে এমন সব মু'জিযা দেওয়া হয়, যা সমকালীন মানুষের উপর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবজনক বিষয়েও হযরত মাসীহের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মৃতকে জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ, যা কেবলমাত্র মহান স্রষ্টার জন্যই প্রযোজ্য; অন্য কারো জন্য নয়। যেমন- بِاِذْنِ [আল্লাহর হুকুমে] শব্দ দ্বারাও তা পরিস্ফুট হয়, কিন্তু হযরত মাসীহ (আ.) যেহেতু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এর মাধ্যম বা অসিলা ছিলেন, তাই রূপকার্থে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। -[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ بِاِذْنِ اللّٰهِ : দ্বিতীয়বার بِاِذْنِ اللّٰهِ বলার উদ্দেশ্য হলো, কেউ যেন এ ভুল ধারণার শিকার না হয় যে, আমি আল্লাহর গুণাবলি এবং তাঁর এখতিয়ার ও ক্ষমতার অধিকারী; বরং আমি তো তাঁরই অক্ষম বান্দা ও রাসূল। আমার হাতে যা কিছু প্রকাশ পায় তা হলো মু'জিযা; আল্লাহর নির্দেশেই তা প্রকাশিত হয়। ইমাম ইবনে কাছীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থানুযায়ী মু'জিযা দান করেন, যাতে তাঁর সত্যতা এবং মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে যাদুর প্রভাব ছিল, তাই তাঁকে এমন মর্যাদা দান করা হয়েছে, যার সামনে বড় বড় যাদুকররা ক্ষমতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে, ফলে তাদের নিকট হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে এবং তারা ঈমান এনেছে। আর হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ছিল, তাই তাঁকে মৃতকে জীবিত করার, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার মর্যাদা দান করা হয়েছে। বড় থেকে বড় কোনো চিকিৎসক এ ব্যাপারে ক্ষমতাশীল ছিল না। আমাদের নবী ﷺ -এর যুগে কবিতা, সাহিত্য এবং ফাসাহাত ও বালাগাত তথা ভাষা অলঙ্কারের বিশেষ প্রভাব ছিল, তাই তাঁকে কুরআনের ন্যায় উন্নত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত গ্রন্থ দান করা হয়, যার নজির পেশ করতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিদগণ অপারগ হয়েছে এবং এখন পর্যন্তও তাঁর চ্যালেঞ্জ বহাল রয়েছে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ তার সুমহান মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٥٠. وَجِئْتُكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ قَبْلِى مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِيْهَا فَاَحَلَّ لَهُمْ مِنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ مَالَا صِيْصِيَّةَ لَهٗ وَقِيْلَ اَحَلَّ الْجَمِيْعَ فَبَعْضَ بِمَعْنٰى كُلِّ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ كَرَّرَهٗ تَاكِيْدًا وَلِيُبْنٰى عَلَيْهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ فِيْمَا اٰمُرُكُمْ بِهٖ مِنْ تَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهٖ ـ

৫০. আর আমার আগমন হয়েছে আমার সম্মুখে অর্থাৎ আমার পূর্বে তাওরাতে যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্যে তাতে যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলিকে বৈধ করতে। মৎস্য, ঝুটিবিহীন পাখি ইত্যাদি তাদের জন্যে তিনি বৈধ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি তাদের জন্যে সবকিছুই বৈধ করে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আয়াতোক্ত بَعْض [কতক] শব্দটি كُلّ [সবকিছু] অর্থে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ বাক্যটির পুনরুক্তি করা হয়েছে। কিংবা পরবর্তী বাক্যটির বুনিয়াদরূপে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বিষয়ে যেসব নির্দেশ তোমাদেরকে দেই সেসব বিষয়ে আমার অনুসরণ কর।

٥١. اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا الَّذِىْ اٰمُرُكُمْ بِهٖ صِرَاطٌ طَرِيْقٌ مُّسْتَقِيْمٌ فَكَذَّبُوْهُ وَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ ـ

৫১. নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। এটাই যে পথের আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করি তাই সরল পথ পন্থা। কিন্তু তারা মিথ্যা বলে ধারণা করে তাকে অস্বীকার করল এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لِاُحِلَّ لَكُمْ : এটা উহ্য ফে'লের মা'মূল। মূল বাক্য এমন হবে– جِئْتُكُمْ لِاَجَلِ التَّحْلِيْلِ এর উপর আতফ مُصَدِّقًا নয়, কারণ তা হলো حَالٌ আর এটা হলো ইল্লত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ : অর্থাৎ তোমরা তো আমার সত্যতার নিদর্শনাবলি দেখলে। কাজেই এখন মহান আল্লাহকে ভয় করে আমার কথা শোনা তোমাদের কর্তব্য।

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ : অর্থাৎ সব কথার এক কথা এবং যাবতীয় মূলের আসল মূল হলো, আল্লাহ তা'আলাকে আমার ও তোমাদের সকলের একই প্রতিপালক মেনে নাও। বাপ-বেটার সম্বন্ধ স্থাপন করো না। তোমরা সকলে তাঁরই ইবাদত কর। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ এটাই। অর্থাৎ তাওহীদ, তাকওয়া ও রাসূলের আনুগত্য।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৫২. فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ وَاَرَادُوْا قَتْلَهُ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اَعْوَانِىْ ذَاهِبًا اِلَى اللّٰهِ لِاَنْصُرَ دِيْنَهُ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اَعْوَانُ دِيْنِهِ وَهُمْ اَصْفِيَاءُ عِيْسٰى اَوَّلُ مَنْ اٰمَنَ بِهِ وَكَانُوْا اِثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوْرِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوْا قَصَّارِيْنَ يَحُوْرُوْنَ الثِّيَابَ اَىْ يُبَيِّضُوْنَهَا اٰمَنَّا صَدَّقْنَا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ يَا عِيْسٰى بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

৫২. যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল জানতে পারলেন আর তারা তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায় করল তখন সে বলল, কে আমার সাহায্যকারী সহযোগিতাকারী গমন করতে প্রস্তুত আল্লাহর পথে, যাতে আমিও তাঁর দীনের সহযোগিতা করতে পারি। اِلَى اللّٰهِ এটা এ স্থানে উহ্য ذَاهِبًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। হাওয়ারীগণ-শিষ্যগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। তাঁর দীনের সাহায্যকারী। এরা [হাওয়ারীরা] হলো হযরত ঈসা (আ.) -এর অন্তরঙ্গ সঙ্গী। শুরুতেই তারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। এরা ছিল সংখ্যায় বারো। শব্দটি حَوْرٌ [হাওর] হতে উদ্গত। হাওর অর্থ হলো- নির্মল শুভ্র। কেউ কেউ বলেন, এরা পেশায় ছিল ধোপা। তারা কাপড় حَوْرٌ অর্থাৎ সাদা ও পরিষ্কার করত। এ হিসেবে তাদেরকে حَوَارِىٌّ [হাওয়ারী] বলে আখ্যায়িত করা হতো। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। হে ঈসা! তুমি সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম-আত্মসমর্পণকারী।

৫৩. رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ مِنَ الْاِنْجِيْلِ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ عِيْسٰى فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُوْلِكَ بِالصِّدْقِ ـ

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইঞ্জিলে যা কিছু অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এই রাসূলের অর্থাৎ হযরত ঈসার অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে তোমার একত্বের এবং তোমার রাসূলের সত্যতার সাক্ষ্যবহনকারীদের তালিকাভুক্ত কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْحَوَارِيُّوْنَ হাওয়ারী কারা ছিলেন : 'হাওয়ারী' কারা ছিলেন এবং তাদের এ উপাধির হেতু কি? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী সর্বপ্রথম যে দুই ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.) -এর অনুসারী হন তাঁরা ধোপা ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) তাদের দেখে বললেন, কি কাপড় পরিষ্কার করছ? এস, আমি তোমাদেরকে আত্মা পরিষ্কার করা শিখিয়ে দেই। সে মুহূর্তেই তারা তাঁর অনুসারী হয়ে যান। তারপর যারাই তাঁর অনুসরণ করেন, তাদের এ উপাধি হয়ে যায়। -[তাফসীরে ওসমানী]

আল্লামা মাজেদী (র.) বলেন, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) -এর প্রাথমিক শিষ্যগণ অধিকাংশ নদীর উপকূলবর্তী এলাকায় মৎসজীবী বাসিন্দা ছিলেন। এজন্যই [নদীর পানি তাদের বস্ত্রকে শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন করে তুলত বলে] তাদেরকে হাওয়ারী বলে সম্বোধন করা হতো। এ কারণেই তাঁর পরবর্তী শিষ্য ও সঙ্গীরাও এ উপাধিতেই পরিচিতি হয়ে পড়েন। এর প্রচলিত অর্থ হলো- নিষ্ঠাবান সহযোগী, মুখলিস সাথী। যেমনি হাদীসে হযরত যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে এ শব্দটি উপরিউক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হাওয়ারীরা প্রতি উত্তরে নিজেদেরকে اَنْصَارُ اللّٰهِ [আল্লাহর সাহায্যকারী] বলে ঘোষণা করলেন।

http://islamiboi.wordpress.com

٥٤. قَالَ تَعَالٰى وَمَكَرُوْا اَىْ كُفَّارُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِعِيْسٰى اِذْ وَكَّلُوْا بِهٖ مَنْ يَّقْتُلُهٗ غِيْلَةً وَمَكَرَ اللّٰهُ بِهِمْ بِاَنْ اَلْقٰى شِبْهَ عِيْسٰى عَلٰى مَنْ قَصَدَ قَتْلَهٗ فَقَتَلُوْهُ وَرُفِعَ عِيْسٰى وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ اَعْلَمُهُمْ بِهٖ .

অনুবাদ :

৫৪.আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– এবং তারা বনি ইসরাঈলভুক্ত কাফিরগণ হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে চক্রান্ত করল অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার জন্যে তারা কতিপয় লোক নিযুক্ত করেছিল। আল্লাহও এদের সঙ্গে ফন্দি করলেন। যে ব্যক্তি হযরত ঈসাকে হত্যা করার জন্যে গিয়েছিল হযরত ঈসার আকৃতির সাথে তার আকৃতিকে সাদৃশ করে দিয়েছিলেন। এতে তারা তাকেই [ঈসা মনে করে] হত্যা করল। আর হযরত ঈসাকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ফন্দিকারী অর্থাৎ এতদসম্পর্কে তিনি অধিক অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ الخ **হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র :** আয়াতে কারীমায় আল্লাহর প্রতি প্রতারণার যে সম্বন্ধ করা হয়েছে তা مُشَاكَلَة তথা কাফেরদের কাজের সহিত মিলস্বরূপ। প্রথম مَكَرُوْا-এর ফায়েল হলো ইহুদিরা। ইহুদিদের নেতা এবং ধর্মগুরুরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরোধিতা এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়ার পরে সর্বশেষ তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ইয়াসু নামক ইসরাঈলী নবুয়তের দাবিদারকে মেরে ফেলতে হবে। অতএব, তারা ধর্মীয় আদালতে নাস্তিকতার অভিযোগ তুলল। আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিল। এরপর রোমীয় বিচারকদের রাষ্ট্রীয় আদালতে দেশদ্রোহীতার মামলা করা হলো।

হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর বিরোধীদের এসব মামলা-মকদ্দমা শাম দেশের ফিলিস্তিন প্রদেশে পেশ হয়েছিল। শাম তখন রোম সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। এখানকার ইহুদি অধিবাসীদের নিজস্ব বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে শাম দেশের একজন গর্ভনর নিযুক্ত ছিল। তার অধীনে ছিল ফিলিস্তিন প্রদেশের প্রদেশিক গভর্নর। রোমীয়দের ধর্ম ছিল শিরক ও মূর্তিপূজার। ইহুদিদের নিজস্ব ব্যাপারে তাদের ধর্মীয় আদালতে মামলা করার এখতিয়ার ছিল। তবে দণ্ড কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রীয় আদালতের অনুমতি নিতে হতো। রাষ্ট্রদ্রোহীতার সাজা মৃত্যুদণ্ডের রায়ই স্বয়ং ইহুদি আদালতেও দিতে পারত। তবে তা কার্যকর করার নির্দেশ কেবল রাষ্ট্রীয় আদালতের হাতে ছিল। রাষ্ট্রীয় আদালতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা স্বরূপ শূলীতে চড়ানোর নিদের্শ দেওয়া হতো। ইহুদিদের এ ষড়যন্ত্রকে পবিত্র কুরআনে مَكَرُوْا শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمَكَرَ اللّٰهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাও তাদের এ জঘন্য গভীর চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার নিজস্ব কৌশল ও পরিকল্পনা অবলম্বন করলেন। কুরআনুল কারীমের 'ওয়া মাকারাল্লাহু' অংশের বাস্তব তাৎপর্য এই। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজস্ব কৌশল ও পরিকল্পনার মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) -কে শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পরিণতি থেকে রক্ষা করলেন।

قَوْلُهٗ الْمَكْرُ : 'মাকর' বলা হয় সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনকে । এটা মঙ্গলজনক উদ্দেশ্যে হলে ভালো, অসদুদ্দেশ্যে হলে মন্দ। এ কারণেই وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ-এর মাঝে اَلْمَكْرُ-এর সাথে اَلسَّيِّئُ বিশেষণ যুক্ত হয়েছে। এ স্থলে আল্লাহ তা'আলাকে خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। এমনকি তারা এই বলে রাজার কান ভারী করল যে, এ ব্যক্তি [নাউযুবিল্লাহ] ধর্মদ্রোহী। সে তাওরাত পাল্টে দিতে চায় এবং সে সকলকে বিধর্মী বানিয়ে ছাড়বে। ফলে রাজা হযরত মাসীহ (আ.) -কে গ্রেফতার করার হুকুম দিল। এদিকে এসব চলছিল আর অন্যদিকে তাদের এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম কৌশল চলছিল। সামনে যার বিবরণ আসছে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর কৌশল সর্বশ্রেষ্ঠ, যা কেউ নস্যাৎ করতে পারে না। –[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

আল্লাহর কিভাবে مَكَرَ করেন? আরবি ভাষায় একটি নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, কোনো কাজ অথবা শাস্তির ভাষার ক্ষেত্রে তার জবাবও একই শব্দ ও ভাষায় দেওয়া হয় এবং এ ধরনের প্রতিউত্তরের ভাষার ব্যবহারকে দূষণীয় মনে করা হয় না; বরং বক্তার বাকপটুতার বহিঃপ্রকাশ ভাবা হয়। যেমন ধরুন, কেউ বলল, যায়েদের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। যায়েদও পাল্টা আক্রমণ করেছে। এক্ষেত্রে যায়েদের আক্রমণটা মূলত শাস্তি প্রতিরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা; কিন্তু আরবি পরিভাষায় আক্রমণের পর পাল্টা আক্রমণ শব্দই ব্যবহৃত হয়। অথবা মনে করুন, কেউ যদি আমাকে ঠকায় বা প্রতারণা করে, তখন আমি যদি তার প্রতারণার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাই, তখন বলে থাকি– অমুকে আমাকে ঠকিয়েছে, আমিও তাকে ঠকিয়েছি। অথচ আমার তরফ হতে ঠকাবার ও প্রতারণা করার প্রসঙ্গই উঠে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে আমার তরফ হতে প্রতারক আমাকে ঠকাবার শাস্তিই পেয়ে থাকে।

এ ধরনের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেই কুরআনে হাকীমে

১. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ -এর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

২. ঠিক তেমনি اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَ اَكِيْدُ كَيْدًا তারাও ফাঁদ পাতে, আমিও ফাঁদ পাতি।

৩. جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ খারাবির শাস্তিও তেমনি খারাবি।

৪. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ -এর জবাবে বলা হয়েছে– اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ তারাও ঠাট্টা করে, আল্লাহও তাদরে সাথে ঠাট্টা করেন।

৫. فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ তারা বাড়াবাড়ি করলে, তোমরাও বাড়াবাড়ি কর। এ সমস্ত জায়গায় চক্রান্তের শাস্তি, খারাবির শাস্তি, ঠাট্টার শাস্তি, বাড়াবাড়ির শাস্তিই বুঝানো হয়েছে। এভাবে ব্যাপারটিকে বুঝে নিলে সকল জটিলতার অবসান হয়ে যায়। আর আল্লাহর ফাঁদ, খারাবি, ঠাট্টা ও বাড়াবাড়ি ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ জনিত কারণে কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। এছাড়া আরবি 'মকর' শব্দটি আবশ্যকীয়ভাবে কোনো দূষণীয় বিষয় নয়। 'মকর' শব্দটি প্রয়োগ জনিত কারণে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। মূল অর্থ, গোপন পরিকল্পনা, গভীর চক্রান্ত, ইংরেজিতে প্লান বলতে যা বুঝায়, আরবি ও উর্দুতে তদবির বলতে তাই বুঝায়।

আল্লাহর চক্রান্ত : কোনো দৈহিক শক্তি ও বস্তুগত ক্ষমতার অধিকারী কেউ আল্লাহর সাথে পাল্লা দিয়ে জয়ী হতে পারে না। এমনিভাবে কোনো বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলও আল্লাহর বুদ্ধিমত্তার সাথে টেক্কা দিতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে আল্লাহর বুদ্ধি, কৌশল ও পরিকল্পনাই সকলের উর্ধ্বে স্থান লাভ করেছে এবং সকল ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত ও অক্ষত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। শূলীবিদ্ধ করার জন্যে ভীষণ ভিড়, হৈচৈ ও গণ্ডগোলের মধ্য দিয়ে সময়ের স্বল্পতার কারণে, তাড়াহুড়া করে শূলীকক্ষে [ক্রুশবিদ্ধ করার স্থলে] সঠিকভাবে চিনতে না পেরে হযরত ঈসা (আ.)-এর সমবয়সী তাঁরই বংশের এক ব্যক্তি, যার দৈহিক গঠন আকৃতি হযরত ঈসা (আ.)-এর মতোই ছিল তাকে শূলীতে চড়িয়ে দিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলীবিদ্ধ করেছে বলে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে। আজকের গির্জার পাদ্রিসহ খ্রিস্টানগণ মনে করে যে, হযরত ঈসা মাসীহ (আ.) শূলীবিদ্ধ হয়েছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনঃজীবিত হয়েছেন। কিন্তু খ্রিস্টানদের বর্তমান প্রচলিত ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় ছাড়াও সর্বাধিক প্রাচীন সম্প্রদায় 'বাসিলিদিয়াস' সহ কতিপয় সম্প্রদায় ঠিক কুরআনুল কারীমে বর্ণিত ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ইসলামি আকিদার অনুরূপ আকিদাই পোষণ করে যে, ইহুদিরা চিনতে না পেরে হযরত ঈসা (আ.) -এর গঠন ও আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হযরত ঈসা (আ.)-এর বংশীয় জনৈক ব্যক্তিকেই শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-কে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। কিয়ামতের আগে তিনি স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং দজ্জালের সাথে যুদ্ধ করে দজ্জালকে পরাজিত করে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন ও বিজয় সাধনের পর স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

৫৫. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ قَابِضُكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَمُطَهِّرُكَ مُبْعِدُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ صَدَّقُوْا بِنُبُوَّتِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّصَارٰى فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِكَ وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَعْلُوْنَهُمْ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ ـ

অনুবাদ :

৫৫. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করব অর্থাৎ তোমাকে কবজ করে নিয়ে যাব এবং আমার নিকট তোমাকে দুনিয়া থেকে মৃত্যুদান ব্যতিরেকেই উঠিয়ে নিয়ে যাব এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের থেকে তোমাকে পাক করব। অর্থাৎ দূরে সরিয়ে নেব। আর তোমার অনুসারীগণকে অর্থাৎ মুসলিম ও খ্রিস্টান যারা তোমার নবুয়তকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তোমাকে প্রত্যাখ্যান- কারীদের উপর অর্থাৎ ইহুদিদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেব যুক্তি-প্রমাণ ও অস্ত্রবল সকলভাবে তারা এদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর ধর্মের যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছ আমি তার মীমাংসা করে দেব।

তাহকীক ও তারকীব

مُطَهِّرُكَ : مُبْعِدُكَ -এর ব্যাখ্যা مُبْعِدُكَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য। কারণ تَطْهِيْر নাপাকি দূরীভূত করাকে অনিবার্য করে। কাজেই এ প্রশ্ন দূর হয়ে গেল যে, পাক করার জন্যে নাপাক হওয়া জরুরি। আর তা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ **হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর সান্ত্বনা :** হযরত ঈসা (আ.) -কে সম্বোধন করে বলা হয় হযরত ঈসা (আ.) ইহুদিগণ কর্তৃক তাঁর গ্রেফতারির মুহূর্তে পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিজের পরিণতি সম্পর্কে স্পষ্টতই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, ইহুদিগণ তাঁকে গ্রেফতার করার পরই তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই মামলা দায়ের করবে এবং গ্রীকদের রাষ্ট্রীয় আদালতের অনুমোদনের পর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ঐ মুহূর্তেই হযরত ঈসা (আ.) -কে প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদানের জন্যে আয়াতে উল্লিখিত সান্ত্বনা বাণী তাঁকে শুনিয়ে দেন এবং সে ঘটনার বিবরণ নাজরান গোত্রের সাথে আলোচনা কালে শেষ রাসূল ﷺ -কে অবগত করান।

قَوْلُهُ مُتَوَفِّيْكَ : অর্থাৎ আমিই তোমার মৃত্যুদাতা। তাই এখন ইহুদিদের হাতে তোমার মৃত্যু হবে না। তোমার জন্যে আমার ইলমে নির্ধারিত ও প্রতিশ্রুত সময়ে তোমার মৃত্যু হবে। তাই তুমি ইহুদি জালিমদের এ ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা দেখে উদ্বিগ্ন, পেরেশান ও চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। এরা তোমার কিছুই করতে পারবে না এবং কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি তারা তোমার কোনো ধরনের ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাই রাখে না।

নিম্নোল্লিখিত নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহের বক্তব্য লক্ষণীয়–

اَىْ مُسْتَوْفِىْ اَجَلَكَ وَمَعْنَاهُ اِنِّىْ عَاصِمُكَ مِنْ اَنْ يَقْتُلَكَ الْكُفَّارُ وَمُؤَخِّرُكَ اِلٰى اَجَلٍ كَتَبْتُهُ لَكَ (كَشَّاف) مُمِيْتُكَ حَتْفَ اَنْفِكَ لَا قَتْلًا بِاَيْدِيْهِمْ (مَدَارِك) مُؤَخِّرُكَ اِلٰى اَجَلِكَ الْمُسَمّٰى عَاصِمًا اِيَّاكَ مِنْ قَتْلِهِمْ (بَيْضَاوِى) اِنِّىْ مُتِمُّ عُمُرَكَ

http://islamiboi.wordpress.com

فَحِيْنَئِذٍ اُتَوَفَّاكَ فَلَا اَتْرُكُهُمْ حَتّٰى يَقْتُلُوْكَ بَلْ اَنَا رَافِعُكَ اِلٰى سَمَائِىْ وَمُقَرِّبُكَ بِمَلَائِكَتِىْ وَاَصُوْنُكَ عَنْ اَنْ يَتَمَكَّنُوْا مِنْ قَتْلِكَ وَهٰذَا تَاوِيْلٌ حَسَنٌ (كَبِيْر)

تَوَفِّىْ : অর্থ– পুরোপুরি দেওয়া। তাই এখান থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে বলে দেন **যে, তোমাকে দীর্ঘ** হায়াত পুরোপুরি দেওয়া হবে।

مُتَوَفِّيْكَ : শব্দ দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, তখনই তার মৃত্যু ঘটবে। আমাদের বিশিষ্ট মুফাসসিরগণ এমন উক্তি **করেছেন**। ইমাম রাযী (র.) এটাকে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ সময় মতো তোমার মৃত্যু ঘটবে। তোমার **শত্রুপক্ষ** মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে সফল হবে না। তাদের কবল থেকে রক্ষা কল্পে তোমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

পবিত্র কুরআনে যদিও হযরত ঈসা (আ.) -কে স্বশরীরে উঠিয়ে নেওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই, তবে তার নিকটবর্তী অর্থ এ আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এ কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ আকিদা পোষণ করেন। হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্ম যেভাবে স্বাভাবিক জন্মসূত্র ও প্রক্রিয়ার বিপরীত তথা পিতাবিহীন কেবল হযরত জিবরাঈলের ফুৎকারের মাধ্যমে ঘটেছিল, কাজেই তাঁকে স্বশরীরে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এত অসম্ভবনা কিসের? বরং এটাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত যে, জন্মের ন্যায় তাঁর পরিণতিও স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত হবে।

প্রশ্ন : হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ থেকে তাঁকে বেশি মর্যাদাশীল মনে হয় না কি?

উত্তর : এ কথাটি সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। কেননা আল্লাহই জানেন দিনে-রাতে কি পরিমাণ ফেরেশতা আসমানে যাওয়া-আসা করে? কাজেই তারা সবাই কি মহানবী ﷺ -এর তুলনায় অধিক মর্যাদাবান হবেন? –[তাফসীরে মাজেদী]

مُتَوَفِّيْكَ : শব্দটি (تَفَعُّلٌ) تَوَفِّىْ থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ, মুযাফ। আর كَافْ হলো মুযাফ ইলাইহ, অর্থ– আমি তোমাকে মৃত্যুদানকারী, আমার আয়ত্তে উঠিয়ে নেব, শয়ন করাব। تُوَفِّىْ -এর অর্থ হলো– পুরোপুরি নেওয়া। অর্থাৎ আমি তোমাকে শয়ন করিয়ে নিদ্রা অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেব। এ ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে– هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ আয়াত [আল্লাহ তোমাকে রাতে শুইয়ে দিয়েছেন] দ্বারা শেষোক্তিটির সমর্থন মিলে। আর ঘটনাটি এমনই ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) -কে শয়ন অবস্থায় উঠিয়ে নিয়েছেন। –[মা'আলিম]

আবুল বাক্কা বলেন, مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ যদিও ইসমে ফায়েলের সীগাহ, তবে উভয়টি মুসতাকবিল তথা ভবিষ্যৎকালের অর্থে। বাক্যে আগপিছ ঘটেছে, মূলত رَافِعُكَ وَمُتَوَفِّيْكَ ছিল। কেননা হযরত ঈসা (আ.) -কে আগে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর তাঁর মৃত্যু হবে ভবিষ্যতে। তাফসীরে আব্বাসীতেও এর সমর্থন রয়েছে। ইমাম রাযী (র.) এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ হলো اِنِّىْ مُتَمِّمٌ عُمُرَكَ فَحِيْنَئِذٍ اُتَوَفَّاكَ অর্থে। অর্থাৎ مُتَوَفِّيْكَ -এর উদ্দেশ্য হলো, আমি তোমার বয়স পূর্ণ করব, বয়স পূর্ণ করার পর তোমাকে মৃত্যু দেব, কাফেরদের হাতে তোমাকে নিহত হতে দেব না, বরং আসমানে উঠিয়ে নেব। তোমার অবস্থান হবে ফেরেশতাদের সাথে, তোমাকে সেখানে **পৌঁছে** দেব। কাফেরদের হত্যা থেকে তোমায় রক্ষা করব। –[তাফসীরে কাবীর]

বি. দ্র. এ আয়াত সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা উচিত। تَوَفِّىْ শব্দ সম্পর্কে আবুল বাক্কা-এর কুল্লিয়াতে বলা হয়েছে– اَلتَّوَفِّىْ اَلْاِمَاتَةُ وَقَبْضُ الرُّوْحِ وَعَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُ الْعَامَّةِ وَالْاِسْتِيْفَاءُ وَاَخْذُ الْحَقِّ وَعَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُ الْبُلَغَاءِ . অর্থাৎ **সাধারণের নিকট** اَلتَّوَفِّىْ শব্দটি মৃত্যু ঘটানো ও প্রাণ সংহার অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু সাহিত্যালঙ্কারিকদের নিকট এর অর্থ **পুরোপুরি উসুল** করা ও প্রাপ্য আদায় করা। যেন তাদের নিকট মৃত্যু অর্থেও শব্দটি এ কারণেই ব্যবহৃত হয় যে, মৃত্যুতে **বিশেষ কোনো** অঙ্গ নয়, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ হতে পুরো আত্মাটাই উসুল করে নেওয়া হয়। এবারে মনে করুন, আল্লাহ **তা'আলা কারো দেহ** সমেত আত্মা নিয়ে গেলেন, এমতাবস্থায় কি اَلتَّوَفِّىْ শব্দটি আরও বেশি রকম প্রযোজ্য নয়?

যে সকল অভিধান প্রণেতা তাদের অভিধানে اَلتَّوَفِّىْ অর্থ প্রাণ সংহার লিখেছেন, তারা একথা বলেননি যে, দেহ সমেত **আত্মা তুলে নেওয়াকে** اَلتَّوَفِّىْ বলা হয় না এবং তারা এরূপ কোনো মূলনীতিও উল্লেখ করেননি যে, اَلتَّوَفِّىْ -এর কর্তা আল্লাহ **তা'আলা এবং কর্ম** কোনো প্রাণসম্পন্ন বস্তু হলে তার অর্থ মৃত্যু ছাড়া কিছুই হতে পারে না। হ্যাঁ সাধারণত প্রাণ সংহার **যেহেতু দেহ থেকে** বিচ্ছিন্ন করেই হয়ে থাকে, তাই তারা এ সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যু শব্দ লিখে দেন। **নয়তো** দেহ সমেত রূহ নিয়ে যাওয়াও اَلتَّوَفِّىْ -এর আভিধানিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا অর্থাৎ 'আল্লাহ জীবনসমূহের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়।' [৩৯ : ৪২] এখানে تَوَفِّىْ نَفْس

http://islamiboi.wordpress.com

তথা আত্মা সংহারের দুই পদ্ধতি বলা হয়েছে– মৃত্যু ও নিদ্রা। এ বিভক্তিও أَنْفُسٌ -এর উপর تَوَفِّى শব্দের প্রয়োগ এবং حِيْنَ مَوْتِهَا -এর শর্তারোপ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, تَوَفِّى ও মৃত্যু ভিন্ন দুই জিনিস। আসলে আত্মা হরণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক তো সেই স্তর যা মৃত্যু আকারে পাওয়া যায়। আরেক স্তর হয় নিদ্রার আকারে। কুরআন মাজীদ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল যে, উভয় ক্ষেত্রেই تُوَفِّى শব্দের প্রয়োগ বিধেয়; কেবল মৃত্যুর জন্যে নির্দিষ্ট নয়। এ কথার সমর্থনে কুরআন মাজীদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ 'তিনি রাত্রিবেলা তোমাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যা কিছু দিনের বেলা কর তা জানেন।' [৬ : ৬০] এ উভয় আয়াতে কুরআন মাজীদ নিদ্রার জন্যে যেমন تَوَفِّى শব্দের প্রয়োগকে বৈধ রেখেছে, অথচ নিদ্রার প্রাণ হরণ পূর্ণাঙ্গরূপে হয় না। তেমনিভাবে যদি সূরা আলে ইমরান ও মায়িদার আয়াতদ্বয়ে দেহ সমেত প্রাণ হরণ অর্থে تَوَفِّى শব্দকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাতে অসম্ভবের কি আছে? বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে নিদ্রা ও মৃত্যু অর্থে تَوَفِّى শব্দের ব্যবহার কুরআন মাজীদই শুরু করেছে। জাহিলি যুগের মানুষ তো সাধারণভাবে একথা জানতই না যে, মৃত্যু বা নিদ্রাকালে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে কোনো জিনিস হরণ করে নেন, যে কারণে তাদের বাকরীতিতে মৃত্যু ও নিদ্রা অর্থে تَوَفِّى শব্দের প্রচলন ছিল না। কুরআন মাজীদই মৃত্যু ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যে প্রথমে এ শব্দটির ব্যবহার শুরু করে। কাজেই কুরআনেরই এ অধিকার আছে যে, সে মৃত্যু ও নিদ্রার মতো দেহ সমেত আত্মা হরণ -এর মতো বিরল বিষয়ের জন্যেও এ শব্দটি ব্যবহার করবে।

মোদ্দাকথা, আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, تَوَفِّى শব্দটি মৃত্যু অর্থে প্রযুক্ত নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও বিশুদ্ধতম রেওয়ায়েত এটাই যে, হযরত মাসীহ (আ.)-কে জীবিত অবস্থায়ই আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। যেমন– রূহুল মাআনী প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে, তাঁর জীবিত উত্তোলন এবং দুনিয়ায় তাঁর পুনরায় অবতরণের বিষয়টি পূর্বসূরিদের একজনও অস্বীকার করেছে বলে বর্ণিত নেই; বরং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে এ বিষয়ে সকলের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন, ইবনে কাছীর প্রমুখ পুনরায় অবতরণ সম্পর্কিত গ্রন্থে ইমাম মালেক (র.) হতেও এ মত উদ্ধৃত আছে।

হযরত মাসীহ (আ.) যেসব মু'জিযা দেখিয়েছেন, তন্মধ্যে আরও বহু তাৎপর্য ছাড়াও একটি বিশেষ রহস্য এরূপ নিহিত রয়েছে যে, তাঁর আকাশে উত্তোলনের সাথে সেগুলোর একটা বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি শুরুতেই ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, একটি মাটির পুতুল যখন আমার ফুঁ দেওয়ার ফলে মহান আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে আকাশে উড়ে যায়, তখন যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলা 'রূহুল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং যিনি রূহুল কুদুসের ফুঁ দ্বারা জন্ম নিয়েছেন তাঁর পক্ষে কি এটা সম্ভব নয় যে, মহান আল্লাহর হুকুমে আকাশে উড়ে যাবেন? যার হাতের ছোঁয়ায় বা মুখের কথায় মহান আল্লাহর হুকুমে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে যায় এবং মৃত জীবিত হয়ে উঠে, তিনি যদি এ নশ্বর জগৎ হতে আলাদা হয়ে ফেরেশতাদের মতো আসমানে হাজার হাজার বছর জীবিত ও সুস্থ থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কি আছে? হযরত কাতাদা (রা.) বলেন– فَطَارَ مَعَ الْمَلٰئِكَةِ فَهُوَ مَعَهُمْ حَوْلَ الْعَرْشِ وَصَارَ اِنْسِيًّا مَلَكِيًّا سَمَاوِيًّا اَرْضِيًّا অর্থাৎ 'তিনি ফেরেশতাদের সাথে আসমানে উড়ে গেছেন এবং তাঁদের সাথেই আরশের পাশে অবস্থান করছেন। তিনি এখন একই সাথে মানুষ ও ফেরেশতাও এবং আকাশের ও মর্ত্যেরও। –[বাগাবী, ওসমানী]

رَافِعُكَ [এর মধ্যবর্তী সময়ে] অর্থাৎ হে ঈসা (আ.)! তোমার মৃত্যু তো যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে। তোমাকে ধ্বংস করার জন্য তোমার শত্রুদের গৃহীত পরিকল্পনা সফল হবে না। এ মুহূর্তে শত্রুদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে আমি [আল্লাহ] তোমাকে তাদের কাছ থেকে উঠিয়ে নেব।

رافعك, হযরত ঈসা (আ.) -কে উর্ধ্ব জগতে স্বশরীরে উঠিয়ে নেওয়ার কথা তো সরাসরি কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে। আর সুস্পষ্টতার নিকটতর শব্দ তো এ আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন হাদীসে তা আরও পরিষ্কার ও সুনিশ্চিত করে দিয়েছে।

وَاَوْلٰى هٰذِهِ الْاَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ اِنِّىْ قَابِضُكَ مِنَ الْاَرْضِ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ لِتَوَاتُرِ الْاَخْبَارِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (اِبْنُ جَرِيْر) مُمِيْتُكَ فِىْ وَقْتِكَ بَعْدَ النُّزُوْلِ مِنَ السَّمَاءِ وَرَافِعُكَ اِلَى الْاٰنِ (مَدَارِك)

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া সম্পর্কে সমগ্র উম্মত ঐকমত্য পোষণ করে। হযরত মাসীহ (আ.)-এর জন্মই যখন প্রচলিত সাধারণ রীতি ও নিয়ম বহির্ভূত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, বিনা বাপে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি মাত্র ফুঁকের মাধ্যমে আল্লাহর কুদরতে তাঁর জন্ম হয়েছে, তখন তাঁর মৃত্যুও অলৌকিক বা অস্বাভাবিক

http://islamiboi.wordpress.com

পদ্ধতিতে **অনুষ্ঠিত** হওয়াটা কি করে অসম্ভব হতে পারে? এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ারই বা কি কারণ থাকতে পারে? বরং এটিই **অধিক যুক্তিসঙ্গত** যে, তাঁর জন্মের মতো মৃত্যুও অস্বাভাবিক পদ্ধতি ও সাধারণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে হওয়াই স্বাভাবিক। **এমনটি হওয়াও** তো অসম্ভব নয় যে, ফেরেশতার ফুঁয়ের মাধ্যমে জন্ম হওয়ার মধ্যে ফেরেশতার মতোই মহাশূন্যে উড্ডয়নের **বৈশিষ্ট্য আল্লাহ** তা'আলা তাঁর দেহে রেখে দিয়েছেন। এ যুক্তি তো একবারেই ধোপে টিকে না যে, তাঁর মহাশূন্যে উড়ে **যাওয়ার কথা** জেনে নিলে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে সাইয়েদুল মুরসালীনের চেয়েও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে **মেনে নিতে** হয়। পরিশেষে বলতে হয়, আল্লাহ তা'আলাই এর প্রকৃত ইলম রাখেন যে, কত অগণিত অসংখ্য ফেরেশতা **প্রতিদিন জমিন** থেকে আকাশে উঠে যান। কত অগণিত ফেরেশতা বিভিন্ন আসমানে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। **তাই বলে** কি একথা মেনে নিতে হবে যে, তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর চেয়ে বেশি?

হযরত ঈসা (আ.) জীবিত না মৃত? : গোটা পৃথিবীতে কেবল ইহুদিদের এ আকিদা রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) নিহত এবং শূলীবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়েছেন, পরে জীবিত হননি। তাদের এ ভ্রান্ত আকিদাকে সূরা নিসার মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং এ আয়াতে مَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ দ্বারাও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) -কে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাদের প্রতি এ ষড়যন্ত্রকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে ইহুদিরা হযরত ঈসাকে হত্যার জন্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল। তাদের একজনকে আল্লাহ তা'আলা হুবহু হযরত ঈসা (আ.) -এর রূপে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। আর হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আয়াতের শব্দ এই– وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ 'তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলে ঝুলায়নি, তবে আল্লাহ তাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করেছেন।' তারা নিজেরাই একজনকে হত্যা করে আনন্দিত হয়েছে।

খ্রিস্টানরা বলত যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে, তাকে শূলে ঝুলানো হয়েছিল, তবে পুনরায় জীবিত করে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত তাদের ধারণাকেও খণ্ডন করেছে এবং বলে দিয়েছে যে, ইহুদিরা যেভাবে তাদেরই একজনকে হত্যা করে আনন্দ-উৎসব করেছিল, তা থেকেই খ্রিস্টানদের এ ধারণা হয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.)-ই নিহত হয়েছেন। এ কারণে ইহুদিদের ন্যায় খ্রিস্টানরাও شُبِّهَ لَهُمْ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ উভয় দলের বিপরীতে মুসলমানদের আকিদা তাই, যা এ আয়াত এবং আরও কতিপয় আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষার্থে জীবিত আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং শূলেও ঝুলায়নি। তিনি আসমানে বিদ্যমান রয়েছেন। কিয়ামতের প্রাক্কালে আসমান থেকে অবতরণ করে ইহুদি জাতির উপর বিজয় লাভ করবেন। অবশেষে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবেন। এ কথার উপরই মুসলিম জাতির ইজমা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) তালখীসুল খায়র গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এ আকিদা এবং এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। –[মা'রিফুল কুরআন ২য় খণ্ড]

قَوْلُهُ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : অর্থাৎ সত্যিকার মুসলমান ও সত্যিকার খ্রিস্টান। সত্যিকার খ্রিস্টান তারাই যারা **হযরত মুহাম্মদ** ﷺ -এর নবুয়ত প্রকাশের পর হযরত ঈসা (আ.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক রাসূলের প্রতি ঈমান এনে **মুসলমান হয়েছে**। কেননা যে কোনো পর্যায়ে কিয়ামত পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রু ইহুদিদের উপর খাঁটি খ্রিস্টান ও **মুসলমানদের প্রাধান্য** বহাল থাকবে। যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেও এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার ক্ষেত্রেও। বস্তুগত বিশ্লেষণ ও **প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে** তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আয়াতে বর্ণিত অবস্থাকে মেনে নিতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। **অর্থাৎ এর তাৎপর্য** উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই হতে পারে।

اَلْمُرَادُ مِنْ هٰذِهِ الْفَوْقِيَّةِ بِالْحُجَّةِ وَالدَّلِيْلِ (كَبِيْر) اَىْ بِالْقَهْرِ وَالْاِسْتِعْلَاءِ وَالسُّلْطَانِ (كَبِيْر) اَىْ ظَاهِرِيْنَ قَاهِرِيْنَ بِالْعِزَّةِ وَالْمَنَعَةِ وَالْحُجَّةِ (مَعَالِم) اَىْ يَعْلُوْنَ بِالْحُجَّةِ وَفِىْ اَكْثَرِ الْاَحْوَالِ بِهَا وَبِالسَّيْفِ (مَدَارِك)

তাফসীরে **কাবীরের রচয়িতা** ও মায়ালিমের রচয়িতা উভয়ের যুগই হিজরি ৬ষ্ঠ শতক। উভয়েই লিখেছেন- এ আয়াতের আলোকে **ইহুদিদের অবস্থার** প্রতি লক্ষ্য কর। ইহুদি জাতি সারা দুনিয়ায় কিভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও বঞ্চিত এবং তাদের মোকাবিলায় খ্রিস্টানদের আধিক্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٥٦. فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْجِزْيَةِ وَالْاٰخِرَةِ بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْهُ ـ

৫৬. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে আমি তাদেরকে হত্যা, কয়েদ ও জিজিয়া কর আরোপ করতঃ ইহকালেও জাহান্নামাগ্নির মাধ্যমে পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তা হতে রক্ষাকারী নেই।

٥٧. وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ اُجُوْرَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ اَىْ يُعَاقِبُهُمْ رُوِىَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَرْسَلَ اِلَيْهِ سَحَابَةً فَرَفَعَتْهُ فَتَعَلَّقَتْ بِهٖ اُمُّهٗ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا اِنَّ الْقِيٰمَةَ تَجْمَعُنَا وَكَانَ ذٰلِكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلَهٗ ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ سَنَةً وَعَاشَتْ اُمُّهٗ بَعْدَهٗ سِتَّ سِنِيْنَ وَرَوَى الشَّيْخَانِ حَدِيْثَ اَنَّهٗ يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ وَيَحْكُمُ بِشَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا ﷺ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَالْخِنْزِيْرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَفِىْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ اَنَّهٗ يَمْكُثُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ دَاوٗدَ الطَّيَالِسِىِّ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَيَتَوَفّٰى وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ فَيَحْتَمِلُ اَنَّ الْمُرَادَ مَجْمُوْعُ لُبْثِهٖ فِى الْاَرْضِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَبَعْدَهٗ ـ

৫৭. আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকার্য করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরি প্রদান করবেন। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

يُوَفِّيْهِمْ এটা ى [নাম পুরুষ] ও م [উত্তম পুরুষ বহুবচন] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.) -কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ এক খণ্ড মেঘ প্রেরণ করেছিলেন। তা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর মাতা তাঁকে জড়াইয়া ধরেন এবং কেঁদে উঠেন। তখন তিনি মাকে [সান্ত্বনা দিয়ে] বলেছিলেন, কিয়ামত আমাদের একত্রিত করবে। ঐ রাত ছিল পবিত্র [লাইলাতুল কদর]। তিনি ঐ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ। এরপর তাঁর মা আরো ছয় বছরকাল জীবিতা ছিলেন।

শায়খাইন [ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.)] একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আমাদের নবী রাসূল ﷺ -এর শরিয়তের বিধানানুসারে তিনি ফয়সালা প্রদান করবেন, দাজ্জাল ও শূকর হত্যা করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন এবং জিজিয়া কর রহিত করবেন।

মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি সাত বছর [দুনিয়াতে] অবস্থান করবেন।

আবূ দাঊদ ত্বয়ালিসির বর্ণনায় আছে যে, তিনি চল্লিশ বছর অবস্থান করে মারা যাবেন এবং তাঁর জানাজার নামাজ হবে। এ বর্ণনাটির মর্ম সম্ভবত এই যে, তাঁর আকাশে উত্থানের আগের ও পরের মোট অবস্থান হবে চল্লিশ বছর।

http://islamiboi.wordpress.com

৫৮. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ عِيْسٰى نَتْلُوْهُ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الْاٰيٰتِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِىْ نَتْلُوْهُ وَعَامِلُهُ مَا فِىْ ذٰلِكَ مِنْ مَعْنَى الْاِشَارَةِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ الْمُحْكَمِ اَىِ الْقُرْاٰنِ ـ

৫৮. তা হযরত ঈসা সম্পর্কে উল্লিখিত কাহিনী, হে মুহাম্মদ! তোমার নিকট নিদর্শন مِنَ الْاٰيٰتِ এটা نَتْلُوْهُ -এর কর্মপদ ه -এর حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ذٰلِكَ [তা] -এর মধ্যে اِشَارَةٌ [ইঙ্গিত করা] -এর যে মর্ম বিদ্যমান সে ক্রিয়া এ স্থানে তাঁর عَامِلٌ। ও সারগর্ভ দ্ব্যর্থহীন বাণী অর্থাৎ আল কুরআন হতে আবৃত্তি করছি অর্থাৎ বিবৃত করছি।

৫৯. اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى شَانَهُ الْغَرِيْبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ كَشَانِهِ فِىْ خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ اَبٍ وَلَا اُمٍّ وَهُوَ مِنْ تَشْبِيْهِ الْغَرِيْبِ بِالْاَغْرَبِ لِيَكُوْنَ اَقْطَعَ لِلْخَصْمِ وَاَوْقَعَ فِى النَّفْسِ خَلَقَهُ اَىْ اٰدَمَ اَىْ قَالَبَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ بَشَرًا فَيَكُوْنُ اَىْ فَكَانَ وَكَذٰلِكَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ كُنْ مِنْ غَيْرِ اَبٍ فَكَانَ ـ

৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার অর্থাৎ তাঁর এই বিরল ও অত্যাশ্চার্য অবস্থার দৃষ্টান্ত পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করার বিষয়ে আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ; তাকে আদমকে অর্থাৎ তাঁর কাঠামোকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন, অতঃপর তাকে বলেছিলেন মানুষ হও, ফলে সে হয়ে গেল। ঈসাও তদ্রূপ। আল্লাহ তাঁকে পিতা ভিন্ন সৃষ্টি হতে বললেন, আর তিনি হয়ে গেলেন।

يَكُوْنُ -এর প্রকৃত অর্থ হলো– হবে বা হচ্ছে। কিন্তু এখানে كَانَ [হয়ে গেল] অর্থাৎ অতীতকাল অর্থে ব্যবহৃত। এ স্থানে একটি বিরল বিষয়কে [ঈসার জন্মকে] বিরলতর অপর একটি বিষয়ের [আদমের জন্মের] সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের বিবাদ জোরালো যুক্তিতে খণ্ডন ও মনে অধিক প্রভাব সৃষ্টি করা এর উদ্দেশ্য।

৬০. اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ اَمْرُ عِيْسٰى فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ ـ

৬০. হযরত ঈসা (আ.)-এর বিষয়টি সত্য, তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে। اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ এটা এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَمْرُ عِيْسٰى [ঈসার বিষয়টি] এর خَبَرٌ বা বিধেয়। সুতরাং সন্দেহবাদীদের এতে সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِى الدُّنْيَا ইহুদি জাতির প্রতি দুনিয়ায় শাস্তি : ইহুদি জাতির প্রতি দুনিয়ায় শাস্তির ব্যাপারটা তাদের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে দেখুন। মহান আল্লাহর এমন কোনো আজাব নেই, যা বিগত দু-হাজার বছর যাবৎ এ হতভাগ্য জাতির উপর পতিত হয়নি। আর বর্তমানে অপর একটি জাতির সাহায্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। তাদের মাথায় কি আপদ সওয়ার হয়ে আছে তার বিবরণ আমি 'জিউশ [ইহুদি] এনসাইক্লোপেডিয়া'র উদ্ধৃতি সহকারে প্রথম পারার টীকায় উল্লেখ করেছি। এ জাতির সুখশান্তি, আমোদ-প্রমোদ -এর প্রত্যাশাও এক নাটক মাত্র। [প্রকৃতপক্ষে সম্পদের পরিবর্তে আজ তাদের সংকটই প্রকট। বড় বড় পুঁজির মালিক হওয়া সত্ত্বেও আজ ইহুদিদের বহির্বিশ্ব থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতে আজ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া একটি বর্ষপঞ্জিও তাদের

http://islamiboi.wordpress.com

অতিবাহিত হয়নি।] খাদ্যাভাব ও দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। জার্মান, ইটালী, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, রাশিয়া সেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে তাদেরকে কুকুর তাড়া করে বের করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৈশাচিক উল্লাস ও নারকীয় বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার অপরাধে আজও তাদেরকে ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া হয়। হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ইটালী, জার্মান ও রাশিয়া থেকে তাদের বিতাড়নের মর্মস্পর্শী ইতিহাস কার অজানা? তাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের দাগ আজও মুছে যায়নি।

قَوْلُهُ وَالْاٰخِرَةُ : আর রয়েছে আখিরাত। তাদের শাস্তির প্রকৃত ও ভয়াবহ রূপ তো মূলত আখিরাতেই প্রকাশ পাবে। সেদিন তাদেরকে তাদের প্রতারণা, ঠকবাজি আর চালবাজির প্রকৃত শাস্তি প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ الظّٰلِمِيْنَ : জুলুম বা অত্যাচার বলতে বুঝায় যথাযথ আচরণ না করা, বাড়াবাড়ি বা সঙ্কুচিত করা, অতিরঞ্জন ও সংকোচন করা। যার যা মর্যাদা অথবা অধিকার বা প্রাপ্য, তাকে তা বুঝিয়ে না দেওয়াই হলো জুলুম। এখানে জালিম বলতে ইহুদিদেরকেই বুঝানো হয়েছে। যারা হযরত ঈসা (আ.) -এর নবুয়ত, রিসালাত, শরিয়ত ও রাব্বুল আলামীনের কুদরতে তাঁর অভিনব জন্মবৃত্তান্ত ও তাঁর শারাফতে নসবেরও বিরোধিতা করত। অপর দিকে আয়াতে বিভ্রান্ত খ্রিস্টানদেরকেও বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত ঈসা (আ.) -কে মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে গ্রহণ না করে তাঁকেই মহান আল্লাহর সাকার প্রকাশ, অবতার ও মহান আল্লাহর পুত্র ইত্যাদি হিসেবে মেনে নিয়েছে ও তার প্রচার করেছে। হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত আকিদার ক্ষেত্রে ইহুদি ও নাসারা উভয়েই সিরাতুল মুস্তাকীমের সুষম ও ভারসাম্যমূলক পন্থাকে পরিহার, অতিরঞ্জন ও সংকোচনের অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : [হে আমার রাসূল!] এ সঠিক ঘটনাবলি হযরত ঈসা (আ.)-এর নির্ভুল কাহিনী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারেন।

ذٰلِكَ [ইসমে ইশারা লিল বায়ীদ] দূরের প্রতি ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা সম্মান-মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اِشَارَةٌ اِلٰى مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَبَئِنَا عِيْسٰى وَزَكَرِيَّا وَغَيْرِهِمَا (كَبِيْر) وَالْاِتْيَانُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْبُعْدِ لِلْاِشَارَةِ اِلٰى عِظَمِ الشَّانِ الْمُشَارِ اِلَيْهِ وَبُعْدِ مَنْزِلَةٍ فِى الشَّرْفِ (رُوْح)

قَوْلُهُ مِنَ الْاٰيَاتِ : অর্থাৎ শত শত বছর পূর্বের এ সকল কাহিনীর নির্ভুল ও সঠিক বিবরণ প্রদান আপনার নবুয়তের সত্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যই তুলে ধরেছেন যে, হে আমার রাসূল! আপনি যে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত অবস্থা ও সে সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলি নিখুঁত, নির্ভুল ও সঠিক বিবরণ প্রদান করেছেন, যে ঘটনাগুলোকে ইহুদিরা সংকোচন আর খ্রিস্টানগণ অতিরঞ্জনের আবর্জনার স্তূপে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। কুরআনুল কারীমের আয়াতে আপনি যে তার নিখুঁত, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সত্যিকার কাহিনীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিচ্ছেন, শত শত বছর আগের ঘটনাবলির অবিকৃত দিকসমূহ তুলে ধরে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ সত্যভিত্তিক বর্ণনা প্রদান করাটাই আপনার নবুয়ত, রিসালাতের সত্যতার ও আপনি যে মহান আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত তারই উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত প্রমাণ। আর আপনার পবিত্র জবান হতে বর্ণিত এ সকল কাহিনী আপনি নিজের তরফ থেকে বলেন না, বরং অদৃশ্য জগতের নিয়ন্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই এ মহাবাণী আপনার জবান মুবারক দ্বারা প্রকাশ করান।

قَوْلُهُ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ : আয়াতের এ অংশে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, আপনার জবান মুবারক হতে এসব ঘটনাবলির বিবরণ শুধু আপনার নবুয়ত-রিসালতের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণই। তদুপরি এ প্রাণস্পর্শী বর্ণনা অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞানময় ও সূক্ষ্ম তত্ত্বে ভরপুর।

قَوْلُهُ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ : হযরত ঈসা (আ.) মহান আল্লাহর বান্দা নয়; বরং তাঁর ছেলে– এ দাবি নিয়ে খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অনেক তর্ক করে। শেষে বলে, তিনি যদি আল্লাহর ছেলে না হন তবে আপনারাই বলুন। তিনি কার ছেলে? এরই জবাবে আল্লাহ তা'আলা খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে এ উপমা উপস্থাপন করেছেন, ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত তো আদমের অনুরূপ। তোমরা খ্রিস্টানরাও হযরত আদম (আ.)-কে একজন মানুষ বলেই বিশ্বাস কর, অথচ তাঁর জন্ম তো আরও অলৌকিক পদ্ধতিতে, মাতাপিতা ব্যতীতই তিনি সৃষ্টি হয়েছেন। তাঁকে যদি সৃষ্ট ও মানুষ হিসেবে মেনে নিতে পার, তবে হযরত ঈসা (আ.)-কে মানুষ হিসেবে মেনে নিতে আপত্তি কোথায়?

قَوْلُهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ : হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন, সেটাই সত্য। তার মাঝে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রকৃত বিষয় যা ছিল, তা কমবেশি না করে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে ওসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

٦١. فَمَنْ حَآجَّكَ جَادَلَكَ مِنَ النَّصَارٰى فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِاَمْرِهٖ فَقُلْ لَهُمْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ فَنَجْمَعُهُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ نَتَضَرَّعُ فِى الدُّعَاءِ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ بِاَنْ نَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَاذِبَ فِىْ شَانِ عِيْسٰى وَقَدْ دَعَا ﷺ وَفْدَ نَجْرَانَ لِذٰلِكَ لَمَّا حَاجُّوْهُ فِيْهِ فَقَالُوْا حَتّٰى نَنْظُرَ فِىْ اَمْرِنَا ثُمَّ نَاْتِيْكَ فَقَالَ ذُوْ رَاْيِهِمْ لَقَدْ عَرَفْتُمْ نُبُوَّتَهٗ وَاَنَّهٗ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا اِلَّا هَلَكُوْا فَوَادِعُوا الرَّجُلَ وَانْصَرِفُوْا فَاَتَوْهُ وَقَدْ خَرَجَ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَقَالَ لَهُمْ اِذَا دَعَوْتُ فَاَمِّنُوْا فَاَبَوْا اَنْ يُلَاعِنُوْا وَصَالَحُوْهُ عَلَى الْجِزْيَةِ رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ وَ رَوٰى اَبُوْ دَاوٗدَ اَنَّهُمْ صَالَحُوْهُ عَلٰى اَلْفَىْ حُلَّةٍ اَلنِّصْفُ فِىْ صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِىْ رَجَبٍ وَثَلٰثِيْنَ دِرْعًا وَثَلٰثِيْنَ فَرَسًا وَثَلٰثِيْنَ بَعِيْرًا وَثَلٰثِيْنَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ اَصْنَافِ السِّلَاحِ وَ رَوٰى اَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهٖ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ لَوْ خَرَجَ الَّذِيْنَ يُبَاهِلُوْنَهٗ لَرَجَعُوْا لَا يَجِدُوْنَ مَالًا وَلَا اَهْلًا وَ رَوَى الطَّبَرَانِىُّ مَرْفُوْعًا لَوْ خَرَجُوْا لَاحْتَرَقُوْا .

অনুবাদ :

৬১. এ বিষয়ে তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর খ্রিস্টানদের যারা এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে বাদানুবাদ করে তাদেরকে বল, আস, আমরা আমাদের পুত্রগণকে, তোমরা তোমাদের পুত্রগণকে, আমরা আমাদের নারীগণকে, তোমরা তোমাদের নারীগণকে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আহ্বান করি এবং তাদের একত্রিত করি অতঃপর বিনীত প্রার্থনা করি দোয়ায় খুব কাকুতি-মিনতি করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত দেই। অর্থাৎ বলি, হে আল্লাহ! ঈসার বিষয়ে যে মিথ্যাবাদী তার উপর তুমি লানত বর্ষণ কর!

রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসী খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলকে যখন তারা এই বিষয়ে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তখন এ আহ্বান জানিয়েছিলেন। অতঃপর তারা বলল, বিষয়টি চিন্তা করে নেই, পরে আসব। তাদের [আল আকিব নামক] জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তি তাদেরকে বলল, তোমরা তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞাত রয়েছ। যে সম্প্রদায়ই নবীর সাথে এ ধরনের 'মুবাহালা' করেছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও এবং বাড়ি ফিরে চল। এদিকে রাসূল ﷺ হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলীকে নিয়ে এ মুবাহালার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আমার দোয়ার সাথে আমিন বলিও। শেষ পর্যন্ত নাজরানবাসী খ্রিস্টানগণ মুবাহালায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং জিজিয়া প্রদান করতে রাজি হয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করে। -[আবূ নু'আইম] আবূ দাঊদ (র.) বর্ণনা করেন, দুই হাজার হুল্লা [এক ধরনের পরিচ্ছদ] অর্ধেক সফর মাসে বাকি অর্ধেক রজব মাসে দেয়, ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট, বিভিন্ন ধরনের ত্রিশটি যুদ্ধাস্ত্র দানের শর্তে তারা তাঁর সাথে সন্ধি করে। ইমাম আহমদ (র.) তৎপ্রণীত মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেন, যদি খ্রিস্টান প্রতিনিধি মুবাহালার জন্য বাহির হতো, তবে তারা বাড়ি ফিরে ধন-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন কিছুই পেত না। তাবরানী মারফূ' হাদীসে বর্ণনা করেন, যদি এরা মুবাহালা করতে বের হতো, তবে জ্বলে ভস্ম হয়ে যেত।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٢. إِنَّ هٰذَا الْمَذْكُورَ لَهُوَ الْقَصَصُ الْخَبَرُ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيمُ فِي صُنْعِهِ.

৬২. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়টি সত্য কাহিনী সত্য সংবাদ। এতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। مِنْ এটা এ স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরম পরাক্রমশালী, তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়।

٦٣. فَإِنْ تَوَلَّوْا أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ فَيُجَازِيهِمْ وَفِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ.

৬৩. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান হতে বিমুখ হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। অনন্তর তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন। اَلْمُفْسِدِيْنَ এ স্থানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ বা সর্বনাম هُمْ -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য পদ اَلْمُفْسِدِيْنَ -এর উল্লেখ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ : এটাকে মুবাহালার আয়াত বলা হয়। মুবাহালা অর্থ হলো– দু-পক্ষের প্রত্যেকেরই একে অন্যের উপর অভিসম্পাত দেওয়া অর্থাৎ বদদোয়া করা । এর ব্যাখ্যা হলো, যখন কোনো বিষয়ে দু পক্ষ ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণ শেষ হয় না তখন উভয় পক্ষ আল্লাহর দরবারে এই বলে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ! আমাদের দু-পক্ষের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর লানত বর্ষণ কর।

মুবাহালার পটভূমি : যখন কোনো বিষয়ে, নবম হিজরী সনে নাজরানের ১৪ জন বিশিষ্ট খ্রিস্টানের এক প্রতিনিধিদল রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদায়িত্বের ব্যাপারে কথোপকথন করল। এ ব্যাপারে ইসলামি আকিদা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু খ্রিস্টান প্রতিনিধিগণ তাদের কথার উপর অনড় থাকল। পরিশেষে রাসূল ﷺ তাই করলেন, যা কোনো একজন খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি এমন ক্ষেত্রে করে থাকে। তিনি আল্লাহর বিধানের অধীনে খ্রিস্টানদের মুবাহালার প্রতি আহ্বান জানালেন। বললেন, যেহেতু এ বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো, এখন এসো আমরা এবং তোমরা নিজ নিজ আত্মীয়স্বজন ও সন্তানাদিকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করি যে, যে পক্ষ অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।

মুবাহালার আহ্বান শুনে নাজরান প্রতিনিধিদল সময় চাইল যে, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জবাব দেবে। পরামর্শ সভায় তাদের সচেতন দায়িত্বশীলরা বলল, হে খ্রিস্টান সম্প্রদায়! নিশ্চয় তোমরা মনে মনে উপলব্ধি করেছ যে, মুহাম্মদ ﷺ একজন প্রেরিত নবী। হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে তিনি দ্ব্যর্থহীন মীমাংসাপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তোমরা জান, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈলের বংশধরদের মাঝে নবী পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। অসম্ভব নয় যে, তিনিই সেই নবী হবেন। কোনো নবীর সাথে মুবাহালার পরিণতি একটি সম্প্রদায়ের জন্য এটাই হতে পারে যে, তাদের ছোট বড় কেউ ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি পাবে না। নবীর লানতের পরিণাম প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোগ করতে থাকবে। কাজেই তার চেয়ে ভালো আমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নিজ দেশে ফিরে যাই। কারণ আরব জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিনে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তারা এ প্রস্তাবই অনুমোদন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা.) -কে সাথে নিয়ে বের হয়ে আসছিলেন। এ জ্যোতির্ময় চেহারাগুলো দেখে তাদের প্রধান পাদ্রি

http://islamiboi.wordpress.com

বলল, আমি এমন পবিত্র কতগুলো চেহারা দেখছি, যাদের দোয়া পাহাড় টলাতে পারে। এদের সাথে মুবাহালা করে তোমরা ধ্বংস হতে যেয়ো না। নচেৎ ভূপৃষ্ঠে একজন খ্রিস্টানেরও অস্তিত্ব থাকবে না। যাহোক, শেষ পর্যন্ত তারা মোকাবিলা ছেড়ে বার্ষিক কর দিতেই সম্মত হলো এবং সন্ধি করে দেশে ফিরে গেল। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুবাহালা করলে গোটা উপত্যকা আগুন হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হতো এবং আল্লাহ তা'আলা নাজরান ভূখণ্ডটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতেন। এক বছরের ভেতর সমস্ত খ্রিস্টান নির্মূল হয়ে যেত। –[তাফসীরে ওসমানী].

فَوَادَعُوْا اَيْ صَالَحُوْا অর্থাৎ মুবাহালা করো না; বরং তাদের সাথে সন্ধি কর।

فَاتَوْهُ : তারা রাসূল ﷺ -এর খেদমতে আসল এবং সন্ধি করল।

قَوْلُهُ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ : اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِهِمْ -এর স্থলে اَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ উল্লেখ করেছেন। যাতে স্পষ্টভাবে তাদের খারাপ গুণ প্রকাশিত হয়।

لَنَبْتَهِلْ (اِفْتِعَالٌ) : আমরা কেঁদে কেঁদে দোয়া করব। আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন, بَهْلَةٌ -এর আসল অর্থ হলো– অভিশাপের দোয়া বা বদদোয়া করা। এরপর তা স্বাভাবিক দোয়া অর্থেও ব্যবহৃত হতে থাকে। –[লুগাতুল কুরআন]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মুবাহালার পন্থা বা পদ্ধতি রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরও অবলম্বন করা যাবে কিনা এবং যে ফলাফল তাঁর মুবাহালায় প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল, অনুরূপ সর্বদাই প্রকাশ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী কিনা? একথা কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। পূর্বসূরিদের কতিপয়ের কর্মপদ্ধতি এবং কতক হানাফী ফকীহের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, মুবাহালার বৈধতা এখনও বহাল আছে। অবশ্য তা কেবল সেইসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মুবাহালায় নারী ও শিশুদের শরিক করা জরুরি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুবাহালায় প্রতিপক্ষের উপর যে আজাব আপতিত হওয়া অনিবার্য ছিল, এখনকার মুবাহালায় তদ্রূপ আজাব আসা অবশ্যম্ভাবী নয়; বরং বর্তমানে মুবাহালার উদ্দেশ্য কেবল দলিল-প্রমাণের দ্বারা চূড়ান্ত করে তর্কবিতর্কের অবসান ঘটানো। আমার ধারণা, মুবাহালা যে কোনো মিথ্যাবাদীর সাথে নয়; বরং ধোঁকাবাজ মিথ্যুকের সাথেই হওয়া উচিত। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, সুস্পষ্ট বর্ণনার পরেও হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপার যারা হটকারিতামূলভাবে, সত্য প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে মুবাহালা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ : অর্থাৎ এ সমগ্র ঘটনা যা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মাসীহ এবং তাঁর মা উভয়ই শুধু মানুষ ছিলেন। কেউ খোদায়িত্বে শরিক ছিলেন না। সত্তা, গুণাবলি ও উৎস সবকিছুই মনগড়া। এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি বাক্যের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : মহাপরাক্রমশালী ও কুশলী। এ বিশেষণে হযরত মাসীহ প্রমুখ কেউ আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্ব ব্যাপক জ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যেককেই সাজা দেবেন।

قَوْلُهُ فَاِنْ تَوَلَّوْا : অর্থাৎ এত স্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা তাদের ঔদ্ধত্য বহাল রাখে এবং সত্য মানতে অস্বীকার করে, দীন ও আকিদার মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করে, তাওহীদের স্থলে মানুষেকে শিরকের প্রতি আহ্বান করে, তাহলে তারা যেন মনে রাখে যে, আল্লাহর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি তাদের সকল কৃতকর্মের ব্যাপারে সম্যক অবগত। সে অনুপাতে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

قَوْلُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ : যদি তারা দলিল-প্রমাণ না মানে এবং মুবাহালা করতেও প্রস্তুত না হয়, তবে বুঝে নিতে পার, তাদের উদ্দেশ্য সত্য প্রতিষ্ঠা নয়; বরং তাদের অন্তরে নিজ বিশ্বাসের সত্যতারও আস্থা নেই। কেবল ফিতনা-ফ্যাসাদ বিস্তার করাই তাদের লক্ষ্য। তারা যেন ভালো করে বুঝে নেয়, সব ফাসাদকারী মহান আল্লাহর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٤. قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مُسْتَوٍ اَمْرُهَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هِيَ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَمَا اتَّخَذْتُمُ الْاَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ فَاِنْ تَوَلَّوْا اَعْرَضُوْا عَنِ التَّوْحِيْدِ فَقُوْلُوْا اَنْتُمْ لَهُمْ اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ مُوَحِّدُوْنَ.

৬৪. বল, হে কিতাবীগণ! অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ আস এমন কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই। سَوَآءٍ শব্দটি مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস। অর্থাৎ একই সমান তার বিষয়সমূহ। তা হলো আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করি না, কোনো কিছুকেই তাঁর সাথে শরিক করি না। তোমরা যেমন তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞ ও সন্ন্যাসীদেরকে 'রব' বলে মেনে নিয়েছ, তেমনি আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকেও 'রব' বলে গ্রহণ করে না। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাওহীদ গ্রহণ করা থেকে বিমুখ হয় তবে তোমরা এদেরকে বল, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ তাওহীদ অবলম্বনকারী।

٦٥. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُوْدُ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيٌّ وَنَحْنُ عَلٰى دِيْنِهٖ وَقَالَتِ النَّصَارٰى كَذٰلِكَ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ تُخَاصِمُوْنَ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ بِزَعْمِكُمْ اَنَّهٗ عَلٰى دِيْنِكُمْ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ بِزَمَنٍ طَوِيْلٍ وَبَعْدَ نُزُوْلِهِمَا حَدَثَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ بُطْلَانَ قَوْلِكُمْ.

৬৫. ইহুদিগণ বলত, হযরত ইবরাহীম ছিলেন ইহুদি। সুতরাং আমরা তাঁরই ধর্মে রয়েছি। খ্রিস্টানরাও নিজেদের ব্যাপারে এমন কথা বলত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে কিতাবীগণ! ইবরাহীম তোমাদের ধর্মানুসারী ছিলেন এ ধারণাবশত তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন তর্ক কর, বাদানুবাদ কর; অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তার দীর্ঘকাল পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এতদুভয়ের অবতীর্ণ হওয়ার পর উদ্ভব হয়েছিল ইহুদিবাদ এবং খ্রিস্টবাদের । সুতরাং তোমাদের এ কথা কত যে ভিত্তিহীন, তা তোমরা কি বুঝ না?

٦٦. هَا لِلتَّنْبِيْهِ اَنْتُمْ مُبْتَدَأٌ يَا هٰۤؤُلَآءِ وَالْخَبَرُ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ مِنْ اَمْرِ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَزَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ عَلٰى دِيْنِهِمَا فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ مِنْ شَاْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ شَاْنَهٗ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

৬৬. ওহে! দেখ, هَا এটা تَنْبِيْه বা সতর্কীকরণ অব্যয়। اَنْتُمْ শব্দটি مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। هٰۤؤُلَآءِ শব্দটির পূর্বে সম্বোধনবোধক অব্যয় يَا উহ্য রয়েছে। حَاجَجْتُمْ শব্দটি خَبَرٌ বা বিধেয়। যে বিষয়ে তোমাদের কিছু জ্ঞান আছে যেমন হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যে, তোমরা তাঁদের ধর্মের অনুসারী। সে বিষয়ে তর্ক কর। তবে যে বিষয়ে জ্ঞান নেই যেমন ইবরাহীম সম্পর্কে সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ তাঁর বিষয়ে জ্ঞাত আছেন, আর তোমরা জ্ঞাত নও।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ : 'আহলে কিতাব' শব্দটি যদিও ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, নাজরানী প্রতিনিধিদের সাথে এ আলোচনা হয়েছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এর দ্বারা ইহুদি সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেছেন। তবে উক্ত বাক্য দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য নেওয়া উত্তম। কারণ যে বিষয়ের দিকে তাঁকে আহ্বান করা হয়েছিল তা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান তিনো জাতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ আমরা এমন আকিদার উপর একমত হব, যে ব্যাপারে আমরা ঈমান রাখি এবং তোমরাও তা সঠিক হওয়াকে অস্বীকার কর না। তোমাদের নবীগণ থেকে এ আকিদা বর্ণিত রয়েছে। তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে এর তা'লীম বিদ্যমান রয়েছে।

নাজরান খ্রিস্টান দলের মিথ্যা দাবি : পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নাজরানের প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন, اَسْلِمُوْا 'তোমরা মুসলিম হয়ে যাও', তখন তারা জবাব দিয়েছিল, اَسْلَمْنَا 'আমরা তো মুসলিমই।' এর দ্বারা বোঝা গেল, মুসলিমগণের ন্যায় তাদেরও দাবী ছিল, তারা মুসলিম। অনুরূপ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সামনে তাওহীদ তুলে ধরা হলে তারা বলত, আমরাও মহান আল্লাহকে এক বলি; বরং যে কোনো ধর্মাবলম্বী কোনো না কোনো রঙে এক পর্যায়ে গিয়ে স্বীকার করে– বড় আল্লাহ একজনই। এখানে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, বুনিয়াদি আকিদা অর্থাৎ মহান আল্লাহকে এক বলা এবং নিজেকে মুসলিম বলে স্বীকার করা, যার উপর আমরা উভয় সম্প্রদায় একমত– এটা এমন এক বিষয়, যা আমাদের সকল কলহ ঘুচিয়ে দিতে পারে, যদি না আমরা নিজেদের হস্তক্ষেপ ও বিকৃতি সাধন দ্বারা এ আকিদার স্বরূপ পরিবর্তন করে ফেলি। প্রয়োজন শুধু এতটুকু যে, যেভাবে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে দেই, না তাকে ভিন্ন আর কারো বন্দেগি করব, না তাঁর পয়গাম্বরের সাথে এমন আচরণ করব, যা কেবল সর্বশক্তিমান প্রতিপালকের সাথেই প্রযোজ্য। যেমন কাউকে তাঁর ছেলে ও নাতি বলা শরিয়তের নির্দেশনা হতে চোখ বন্ধ করে কোনো বস্তুর বৈধাবৈধ হওয়াকে কোনো ব্যক্তির বৈধ-অবৈধ বলার উপর নির্ভরশীল মনে করা, যেমন– اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -এর তাফসীর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এসব বিষয় ইসলাম ও তাওহীদের দাবির পরিপন্থি। –[তাফসীরে ওসমানী]

দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি : এ আয়াত দ্বারা দাওয়াতের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি বুঝা যায়, তা হলো, যদি এমন কোনো দলকে দাওয়াত দেওয়া হয়, যারা আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে ভিন্নমুখী, তাহলে তার নিয়ম হলো, তাদেরকে কেবল এমন বিষয়ে একমত হয়ে দাওয়াত দিতে হবে, যে ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। যেমন রাসূল ﷺ যখন রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন তখন এমন বিষয় পেশ করেছিলেন, যে ব্যাপারে উভয়ে একমত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বিষয়ে।

قَوْلُهُ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ : تَعَالَوْا আদেশসূচক ক্রিয়া, বহুবচন। অর্থ– তোমরা এস, শব্দটি মাবনী। وَاوْ হলো ফায়েল বা কর্তা, শব্দটি মূলত تَعَالَيُوْا ছিল يَاءْ এবং তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হওয়ার কারণে يَاءْ -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে আলিফ বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে تَعَالَوْا -এর মাফঊল اِلٰى كَلِمَةٍ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পূর্বের تَعَالَوْا -এর মাফঊল উল্লেখ নেই কেন?

উত্তর : প্রথমটি দ্বারা শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল, আর দ্বিতীয়টি দ্বারা পরস্পর স্থিরকৃত বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : سَوَآءٍ -কে مُسْتَوٍ অর্থে নেওয়ার ফায়দা কি?

উত্তর : سَوَآءٍ শব্দটি মাসদার, কাজেই كَلِمَةٌ -এর উপর তার প্রয়োগ সঙ্গত নয়, এ কারণে مُسْتَوٍ অর্থে নেওয়া হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : أَمْرُهَا উহ্য মানার কারণ কি?

উত্তর : যেহেতু مُسْتَوٍ হলো পুংলিঙ্গ, তাই كَلِمَةٌ -এর উপর এর প্রয়োগ সঙ্গত নয়। কারণ এটা হলো স্ত্রীলিঙ্গ। এ কারণেই كَلِمَةٌ-এর পূর্বে أَمْرٌ উহ্য মেনেছেন, যাতে প্রয়োগ সঙ্গত হয়। −[তারবীহুল আরওয়াহ]

هِيَ أَنْ لَّا : এটা كَلِمَةٌ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ بِزَمَانٍ طَوِيْلٍ : হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান ছিল। আর হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে ছিল দু হাজার বছরের ব্যবধান। কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ.) কিভাবে ইহুদি বা খ্রিস্টান হতে পারেন? কারণ উভয় ধর্ম ইবরাহীম (আ.)-এর অনেক পরের।

هَآ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ : هَا হরফে তাম্বীহ, اَنْتُمْ মুবতাদা, يَا হরফে নেদা বিলুপ্ত, هٰٓؤُلَآءِ মুনাদা। নেদা মুনাদা মিলে মু'তারিযা বাক্য حَاجَجْتُمْ মুবতাদার খবর। সম্ভবনা আছে যে, هٰٓؤُلَآءِ হলো খবর, আর حَاجَجْتُمْ প্রথম বাক্যের বর্ণনা।

مُوَحِّدًا : **প্রশ্ন:** مُسْلِمًا -এর ব্যাখ্যা مُوَحِّدًا দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর: مُسْلِمًا দ্বারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় ইহুদি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর যে প্রশ্ন ছিল, ইসলামের উপরও সে প্রশ্ন হবে। কেননা পারিভাষিক ইসলামতো রাসূল ﷺ -এর আমল থেকেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ কারণেই মহানবী ﷺ হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) -এর বহু বছর পরে নবুয়ত লাভ করেছেন। এ কারণেই مُسْلِمًا -এর ব্যাখ্যা مُوَحِّدًا দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ : এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে- তোমরা সাক্ষী থাক, এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া রয়েছে যে, যখন দলিল-প্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও হক বিষয়কে কেউ না মানে, তখন আলোচনা শেষ করার জন্য নিজ মতবাদ প্রকাশ করে কথা শেষ করা উচিত, অতিরিক্ত আলাপ-আলোচনা সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ : হে আহলে কিতাব! তোমারা ইবরাহীমের ব্যাপারে কেন বিতর্ক কর? তাওরাত এবং ইঞ্জিল তো ইবরাহীমের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের ইহুদি এবং খ্রিস্টীয় মতবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলের পরে শুরু হয়েছে। আর ইবরাহীম তাওরাত ও ইঞ্জিল অবতীর্ণ হওয়ার হাজার হাজার বছর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও সহজে একথা বুঝতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে ধর্মের উপর ছিলেন, তা বর্তমানের ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্ম ছিল না।

قَوْلُهُ هَآ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ : এখানে هَا অবজ্ঞাজ্ঞাপক শব্দ। অর্থাৎ তোমরা এমন বির্বোধ যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল যেমন তোমরা বলে থাক আমরা হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মের উপর কিংবা হযরত ঈসা (আ.) -এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট সাধারণ কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত তোমরা সীমালজ্ঘন করেছ, বহু বিধান তোমরা পরিবর্তন করে ফেলেছ, তথাপি একটি সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু যে বিষয়ে আদৌ তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তোমরা দখল নিতে চেষ্টা করছ কেন?

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٧. قَالَ تَعَالٰى تَبْرِيَةً لِإِبْرَاهِيْمَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مَائِلًا عَنِ الْاَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ مُسْلِمًا مُوَحِّدًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

৬৭. এসব বিষয়ে হযরত ইবরাহীমের সম্পর্কহীনতার কথা বলতে গিয়ে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন– ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন হানীফ। সকল মিথ্যা ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এই মনোনীত ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ, মুসলিম তাওহীদবাদী এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

٦٨. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ أَحَقُّهُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ زَمَانِهِ وَهٰذَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِيْ أَكْثَرِ شَرْعِهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ أُمَّتِهِ فَهُمُ الَّذِيْنَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَّقُوْلُوْا نَحْنُ عَلٰى دِيْنِهِ لَا أَنْتُمْ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ نَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ.

৬৮. যারা ইবরাহীমের যুগে ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ; কারণ অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর শরিয়ত হযরত ইবরাহীমের শরিয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ [ও] তাঁর উম্মতের বিশ্বাসীগণ মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। ইবরাহীম সম্পর্কে এরাই বেশি হকদার। সুতরাং তোমরা নয়; বরং তাদের জন্যই বলা উচিত হবে যে, আমরা তাঁর [ইবরাহীমের] ধর্মের অনুসারী। আর আল্লাহর বিশ্বাসীদের অভিভাবক। তাদের সাহায্যকারী এবং রক্ষাকারী।

٦٩. وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُوْدُ مُعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا إِلٰى دِيْنِهِمْ وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ لِأَنَّ إِثْمَ إِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لَا يُطِيْعُوْنَهُمْ فِيْهِ وَمَا يَشْعُرُوْنَ بِذٰلِكَ.

৬৯. ইহুদিরা হযরত মু'আয, হুযায়ফা ও আম্মার (রা.) -কে তাদের ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– কিতাবীদের একদল তোমাদেরকে বিপদগামী করতে চায়; অথচ তারা তাদের নিজেদেরকে বিপথগামী করে। কেননা এ বিপথগামী করার পাপ এদের নিজেদের উপরই বর্তাবে। মু'মিনগণ এ বিষয়ে তাদের অনুসরণ করে না। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا মিল্লাতে ইবরাহীমী সন্দেহাতীতভাবে তাওহীদপন্থি : ইসলাম ও তাওহীদের দাবিতে যেমন সবাই সমান ছিল, তেমনি হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ.)-কে সম্মান ও মর্যাদা দানেও সকলে শামিল ছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে দাবি করে ইবরাহীম আমাদের ধর্মানুসারী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন– নাউযুবিল্লাহ। এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, ইহুদি ও নাসারারা যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী বলে দাবি করে, তা তো হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর হাজারও বছর পর অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁকে ইহুদি বা খ্রিস্টান কি করে বলা যেতে পারে? বরং তোমাদের কথামতো বলা যায় যে, তোমরা যে অর্থে ইহুদি বা খ্রিস্টান, সে অর্থে তো খোদ হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-কেও ইহুদি বা খ্রিস্টান বলা যায় না। যদি অর্থ এই হয়ে থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শরিয়ত আমাদের ধর্মের বেশি কাছাকাছি ছিল, তবে এটাও ভুল। তোমরা এটা কোত্থেকে জানলে? একথা না তোমাদের কিতাবে আছে, না আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জানিয়েছেন এবং না তোমরা এর

http://islamiboi.wordpress.com

সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাতে পার। যে বিষয়ে কোনো প্রকার জানাশুনা নেই, তা নিয়ে তর্ক করা বোকামি ছাড়া আর কি হতে পারে?

হযরত মাসীহ (আ.)-এর ঘটনাবলি, শেষ নবীর আগমন সম্পর্কিত সুসংবাদাদি ইত্যাদি বিষয়ে অপূর্ণ হলেও কিছুটা জ্ঞান তোমাদের ছিল এবং সে নিয়ে তর্কও তোমরা করেছ, কিন্তু যে বিষয়ে কোনোরূপ ছোঁয়াও তোমাদের লাগেনি বা যার একটু বাতাসও তোমরা পাওনি অন্তত তা তো মহান আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর। তিনিই জানেন হযরত ইবরাহীম (আ.) কি ছিলেন এবং বর্তমানে দুনিয়ায় কোন সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শ তাঁর কাছাকাছি? -[তাফসীরে ওসমানী]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এখানে مُسْلِمًا -এর ইসলাম দ্বারা বিশেষভাবে মুহাম্মদী শরিয়তকে বুঝানোর দরকার নেই; বরং এর অর্থ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য, যা সকল নবী-রাসূলের দীন। হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশেষভাবে এ নাম ও উপাধিকে সমুদ্ভাসিত করে তোলেন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ যখন তাকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, অনুগত হও, সে বলল, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হলাম। [২ : ১৩১] হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্তের এক একটি অক্ষর ঘোষণা করে যে, তিনি ছিলেন ইসলাম ও আত্মসমর্পণের বাস্তব দৃষ্টান্ত। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জবাইয়ের ঘটনায় فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ আয়াতাংশ তাঁর ইসলামের শানকে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী ও তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

قَوْلُهٗ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ **উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে হযরত ইবরাহীমের বেশি সাদৃশ্য :** আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বেশি সম্পর্ক ও সাদৃশ্য ছিল তখনকার উম্মতের আর পরবর্তীকালে এ নবীর উম্মতের। কাজেই এ উম্মত নামেও এবং আদর্শেও হযরত ইবরাহীমের সাথে বেশি সাদৃশ্যময়। অনুরূপ এ উম্মতের নবী আকৃতি, গঠন ও চরিত্রে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার অনুরূপই আবির্ভূত হয়েছেন। সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবে। [সূরা বাকারা : ১২৯] এজন্যই হাবশার খ্রিস্টান রাজা নাজাশী মুসলিম মুহাজিরগণকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দল নামে অভিহিত করতেন। সম্ভবত এ রকম সাদৃশ্যের কারণেই দরূদ শরীফে كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ সংযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই রকমের সালাত নাজিল করুন, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি নাজিল করেছেন। তিরমিযী শরীফে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে- اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وُلَاةً مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ وَلِيَّ اَبِيْ وَخَلِيْلُ رَبِّيْ অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই নবীগণের মধ্য হতে একজন অভিভাবক রয়েছেন। আমার অভিভাবক হচ্ছেন আমার পিতা এবং আমার প্রতিপালকের বন্ধু। মোটকথা সকল মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তিই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের নিকটবর্তী যে স্বীয় আমলে তাঁর ধর্ম এবং সুন্নতের অনুসরণ করেছে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর উপর ঈমান আনয়নকারী। যেহেতু ইবরাহীমী শরিয়তের অনেক বিধান ইসলামের অনুকূলে। কাজেই উক্ত ধর্মই ইবরাহীমী ধর্ম হওয়ার দাবির অধিক যোগ্য। আল্লাহ কেবল তাদের সাহায্যকারী, যারা ঈমান রাখে।

قَوْلُهٗ وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : আয়াত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, চরমপন্থি ইহুদি সম্প্রদায়ের ঘৃণ্য ও জঘন্য মানসিকতার দাপট এতটুকু পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, তারা এমন দুঃসাহসী অভিযান শুরু করেছিল, বাতিলের শক্তির উপর তারা এতটা আত্মগর্বে গর্বিত ও অভিমানী হয়ে উঠেছিল যে, তারা নবুয়তের যুগে শুধু ইসলাম কবুল করা হতে নিজেরাই দূরে সরে পড়েনি; বরং নব দীক্ষিত মুসলমানদেরকে দীন হতে মুরতাদ করার অপচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিল। আজকের বিশ্বে এমন অনেক খ্রিস্টান সংস্থা ও ব্যক্তি রয়েছে, যারা বন্ধুবরের ছদ্মাবেশে ত্রাণসামগ্রী কাঁধে উদগ্র কামনা নিয়ে মুসলিম বিশ্বের দ্বারে দ্বারে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মনের কোণে এ আশা নিয়ে যে, মুসলমানদের কি করে খ্রিস্টান শিরকবাদীতে পরিণত করা যায়। খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত না করতে পারলেও ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসকে কি করে নড়বড়ে ও দুর্বল করে দেওয়া যায়। তাদের এ প্রচেষ্টায় তারা অনেকটা সফলকামও হয়েছে বলা যায়। এ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আমাদের এ বাংলাদেশেও এমন তথাকথিত প্রগতিশীল বেঈমানের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য নয়, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে এবং ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ নাম রাখতেও লজ্জা বোধ করে। এমনকি জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্র ও প্রশাসনের উঁচু তলায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত ত্রিত্ববাদী খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক বা ধর্মান্তরিত করা ব্যক্তিদেরকেই বিয়ে করে নিশ্চিন্তায় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৭০. يَاهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ حَقٌّ.

৭০. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন আল্লাহর নির্দেশকে মুহাম্মদ ﷺ-এর বিবরণ সংবলিত আল কুরআনকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর। অর্থাৎ জান যে এটা সত্য।

৭১. يَاهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ تَخْلِطُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ بِالتَّحْرِيْفِ وَالتَّزْوِيْرِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ اَىْ نَعْتَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ حَقٌّ.

৭১. হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর? সত্যকে বিকৃত করে এবং মিথ্যাকে সাজিয়ে তার সাথে সংমিশ্রণ কর; এবং সত্য অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর গুণাবলি সংবলিত বিবরণসমূহ গোপন কর, অথচ তোমরা জান যে তা সত্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ طَائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : বিশেষভাবে এ আয়াতে ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। يُضِلُّوْنَكُمْ এখানে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ মূলত মুলমানদেরকে গোমরাহ করার অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলতা অর্জন করতে পারেনি; বরং তারা নিজেদের আমলনামাকে কলুষিত করেছে। وَمَا يَشْعُرُوْنَ অথচ এ আহাম্মক আর অজ্ঞদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কোনো অনুভূতি বা চেতনাই নেই।

قَوْلُهٗ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ : শেষ নবীর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হওয়ায় তোমাদের এ অস্বীকৃতি, বিরোধিতা ও হঠকারিতা তোমাদের অজ্ঞতা ও অনবহিত হওয়ার কারণে নয়, তোমরা আহলে কিতাবরা জেনে-বুঝে, স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে, স্বপ্রণোদিত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত সচেতনভাবে বিরোধিতা করছ এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লিখিত আয়াতের শব্দ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সকল ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সচেতনতার সাথেই বিকৃত ও পরিবর্তিত করে চলেছ।

–[তাফসীরে মাজেদী]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) বলেন, তোমরা তো তাওরাত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশ্বাসী। তাতে অর্থাৎ তাওরাতে আরবি নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কুরআন মাজীদ সম্পর্কে সুসংবাদ বিদ্যমান। তোমাদের অন্তর তা জানে এবং তোমরা নিজেদের মজলিসে তা স্বীকারও কর। এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে পাক কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে ও শেষ নবীর সত্যতা স্বীকার করতে কোন জিনিস বাধা হতে পারে? ভালো করে বুঝে রাখ, পাক কুরআনকে অবিশ্বাস করা যেন পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করার শামিল। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهٗ يَاهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ .... وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : হে কিতাবধারীগণ! কেন তোমরা ন্যায়ের উপর বাতিলের রং বা প্রলেপ দিয়ে ন্যায়কে গোপন করছ? এ কথা বলে ইহুদিদের বিশেষ দুটি অন্যায় চিহ্নিত করে তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম অন্যায় হলো হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যাকে সংমিশ্রণ করা, যাতে মানুষের নিকট হক ও বাতিল স্পষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি হলো, সত্য গোপন করা এবং নবী করীম ﷺ -এর যে সকল গুণাবলি তাওরাতে লিখিত ছিল, তা গোপন করা, যাতে মহানবী ﷺ -এর সত্যতা প্রকাশ না পায়। আর উপরিউক্ত এ দুটি অন্যায় তারা জেনে বুঝেই করত। এর দরুন তাদের অন্যায় ও নিকৃষ্টতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٢. وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدِ لِبَعْضِهِمْ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَيِ الْقُرْاٰنِ وَجْهَ النَّهَارِ اَوَّلَهُ وَاكْفُرُوْا بِهٖ اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَرْجِعُوْنَ عَنْ دِيْنِهِمْ اِذْ يَقُوْلُوْنَ مَا رَجَعَ هٰٓؤُلَاۤءِ عَنْهُ بَعْدَ دُخُوْلِهِمْ فِيْهِ وَهُمْ اُولُوْ عِلْمٍ اِلَّا لِعِلْمِهِمْ بُطْلَانَهُ .

৭২. কিতাবীদের অর্থাৎ ইহুদিদের একদল তাদের অপর কতককে বলে, বিশ্বাসীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তা দিনের প্রথমে শুরু ভাগে বিশ্বাস কর এবং তার শেষ ভাগে তা প্রত্যাখ্যান কর, হয়তো তারা বিশ্বাসীরা নিজেদের ধর্মমত হতে ফিরে আসতে পারে। কেননা এতে তারা বলবে, এরা জ্ঞানীগুণী। সুতরাং তা গ্রহণ করার পর তা মিথ্যা ও বাতিল বলে জানার পরই কেবল এরা তা থেকে ফিরে গেছে।

٧٣. وَقَالُوْا اَيْضًا وَلَا تُؤْمِنُوْا تُصَدِّقُوْا اِلَّا لِمَنْ اللَّامُ زَائِدَةٌ تَبِعَ وَافَقَ دِيْنَكُمْ قَالَ تَعَالٰى قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ هُوَ الْاِسْلَامُ وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ اَنْ اَيْ بِاَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ وَالْفَضَائِلِ وَاَنْ مَفْعُوْلُ تُؤْمِنُوْا وَالْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ اَحَدٌ قُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُسْتَثْنٰى الْمَعْنٰى لَا تُقِرُّوْا بِاَنَّ اَحَدًا يُؤْتٰى ذٰلِكَ اِلَّا مَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ اَوْ بِاَنْ يُّحَاجُّوْكُمْ اَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ يَغْلِبُوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

৭৩. এরা আরো বলে যে, যা তোমাদের দীনের অনুগামী অর্থাৎ তোমাদের দীনের সাথে সামঞ্জস্যশীল তা ব্যতীত আর কিছু বিশ্বাস করো না। সত্য বলে স্বীকার করো না। لِمَنْ -এর لَامْ টি এ স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই অর্থাৎ ইসলামই সত্যিকারের পথ অবশিষ্ট সবকিছুই হলো গুমরাহি বা পথভ্রষ্টতা। .... قُلْ اِنَّ الْهُدٰى এ বাক্যটি এখানে مُعْتَرِضَةٌ বা বিচ্ছিন্ন বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশ্বাস করো না যে, তোমাদেরকে যে কিতাবসমূহ, হিকমত ও মর্যাদা দান করা হয়েছে অনুরূপ আর কাউকে দেওয়া হবে। আয়াতটির মর্ম হলো, তোমাদের ধর্মের অনুসারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট স্বীকার করো না যে, অন্য কাউকে উক্তরূপ মর্যাদা দান করা হয়েছে বা হবে। اَنْ يُؤْتٰى শব্দটি بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত। এটা تُؤْمِنُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل বা কর্মপদ। اَحَدٌ এটা مُسْتَثْنٰى. مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -কে এ স্থানে তার আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাঁরা অর্থাৎ মু'মিনরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উত্থাপন করবে। তারা যুক্তিতে তোমাদের উপর প্রবল হয়ে যাবে।

http://islamiboi.wordpress.com

لِاَنَّكُمْ اَصَحَّ دِيْنًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ أَاَنْ بِهَمْزَةِ التَّوْبِيْخِ اَىْ أَاِيْتَاءَ اَحَدٍ مِّثْلَهٗ تُقِرُّوْنَ بِهٖ قَالَ تَعَالٰى قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ فَمِنْ اَيْنَ لَكُمْ اَنَّهٗ لَا يُؤْتٰى اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ كَثِيْرُ الْفَضْلِ عَلِيْمٌ بِمَنْ هُوَ اَهْلُهٗ .

তোমাদের ধর্মইতো সর্বাপেক্ষা সত্য ধর্ম। اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ -এর اَوْ -এর পর بِاَنْ শব্দটির উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বোল্লিখিত اَنْ يُؤْتٰى বাক্যটির সাথে এ বাক্যটির عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। অপর কিরাতে اَنْ -এর পূর্বে আরেকটি أ [হামযা] রয়েছে। এ হামযাটি تَوْبِيْخ বা হুমকি অর্থবোধক বলে গণ্য। এমতাবস্থায় আয়াতটির মর্ম হবে, তদ্রূপ কাউকে প্রদান করা হয়েছে বলে কি তোমরা স্বীকার কর? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বল, নিশ্চয় সকল অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। সুতরাং তোমাদের অনুরূপ আর কাউকেও দান করা হবে না, এ কথা তোমরা কোথায় পেলে? আল্লাহ প্রাচুর্যময়, অপার তাঁর অনুগ্রহ এবং কে তার যোগ্য এ সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবগত। [তিনিই এ ব্যাপারে সবার চেয়ে বেশি পরিজ্ঞাত।]

٧٤. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা বিশেষ করে বেছে নেন। আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اَىْ اَلْيَهُوْدِ لِبَعْضِهِمْ **ইহুদিদের অপর একটি প্রতারণার ঘটনা :** এখানে ইহুদিদের অপর এক প্রতারণা আলোচিত হয়েছে। যার দ্বারা তারা মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত। قَالَتْ طَّآئِفَةٌ -এর মধ্যে মদিনার পার্শ্ববর্তী ইহুদিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত ইহুদি নেতা ও ধর্মাযাজকরা ইসলামের আহ্বানকে দুর্বল করার জন্য এক ফন্দি খাঁটিয়েছিল। ফন্দিটি ছিল নিম্নরূপ– ইহুদিরা মুসলামনদের অন্তর খারাপ করার এবং সাধারণ মানুষকে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি কু-ধারণায় লিপ্ত হওয়ার জন্য গোপনে বিভিন্ন মানুষ তৈরি করে পাঠাতে থাকে। যেন তারা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে শীঘ্রই মুরতাদ হয়ে যায়। অতঃপর বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এ কথা প্রচার করতে থাকে যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করে ভিতরগত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। ইসলামে কিছুই নেই, আমরা ভেবেছিলাম ইসলামের কোনো বাস্তবতা রয়েছে; কিন্তু আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে অন্তসারশূন্য পেয়েছি। ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে এবং তাদের নবীর মধ্যে অমুক অমুক দোষত্রুটি ও বাতুলতা রয়েছে। এসব কারণেই আমরা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। অর্থাৎ ইসলাম পরিত্যাগ করেছি।

ইহুদি জাতির ঘৃণিত ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত শুধু একটাই নয়; বরং তাদের বিভিন্ন বই-পুস্তকেও এ ঘটনা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন স্পেনে ইসলামি শাসন ছিল, তখন রাষ্ট্রীয়পক্ষ থেকে বিভিন্নরূপে আরোপিত বিভিন্ন জুলুম-অত্যাচার থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই ইহুদিরা তাদের ধর্মগুরুদের অনুমতি ও ফতোয়াক্রমে মুখে ইসলাম প্রকাশ করতে থাকে। আন্তরিকভাবে কেউ মুসলমান ছিল না। –[জায়ুশ বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ড ৪৩২-৩৩ পৃ. মাজেদী]

বর্তমান যুগে যেসব ইংরেজ গবেষক, ইহুদি এবং খ্রিস্টান লেখকবৃন্দ ইংরেজি ভাষায় সীরাতুন্নবী লেখার এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যে, ভূমিকায় বিশেষ কোনো ধর্মের পক্ষপাতিত্ব না করে, কোনো ধর্মীয় গোড়ামির শিকার না হয়ে গ্রন্থনার প্রয়াস পেয়েছে। মনে হয় যেন আরবের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রশংসা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর মর্যাদা বর্ণনায় তারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে। কিন্তু যতই সামনের দিকে যাওয়া যায়, ততই তার আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, [নাঊযুবিল্লাহ]

http://islamiboi.wordpress.com

তাদের মস্তিষ্কের কিছু বিকৃতি ঘটেছিল, ইহুদি ও নাসারাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে তা থেকে বুঝা যায় যে, তারা কোথাও কারো নিকট থেকে কোনো বিষয়বস্তু শুনে তাকে নিজ ভাষায় নতুন রূপ দান করে প্রকাশ করেছে। বস্তুত এটাও প্রাচীন ইহুদিদের ষড়যন্ত্রসমূহের একটি নতুন চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা সাধারণ ইহুদিদের অজ্ঞতামূলক ধারণাই নয়; বরং তাদের ধর্মীয় শিক্ষাও এটাই। তাদের বড় বড় ধর্মীয় ইমামদের ফিকহী বিধানও এমনই ছিল। ঋণ এবং সুদের বিধানে বাইবেলগ্রন্থ ইসরাঈলী এবং অইসরাঈলীদের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান করেছে। -[ইসতেসনা, ১৫ : ৩১]

তালমুদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ইসরাঈলীর গরু কোনো অইসরাঈলীর গরুকে আঘাত করে, তাহলে এর কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো অইসরাঈলীর গরু কোনো ইসরাঈলীর গরুকে জখম করে, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক। যদি কারো কোনো বস্তু পড়ে পায় বা হারিয়ে যায় তাহলে লক্ষ্য করতে হবে যে, তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কারা বাস করে। যদি ইসরাঈলী মানুষ বসবাস করে, তাহলে প্রাপকের জন্য এ ব্যাপারে ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়। আর যদি অইসরাঈলী বসবাসকারী হয়, তাহলে ঘোষণাবিহীন সে তা নিজের কাছে রেখে দেবে। রিব্বী শামবীল বলেন, যদি কোনো বিচারকের নিকট কোনো উম্মী ও ইসরাঈলীর মুকদ্দমা যায়, আর বিচারক যদি ইসরাঈলী আইন অনুযায়ী তার ভাইকে মামলায় বিজয়ী করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিচারক তাকে বিজয়ী করবে এবং বলবে এটাই আমাদের আইন। আর যদি উম্মীদের আইন অনুযায়ী বিজয়ী করতে পারে, তাহলে তাকে উক্ত আইন অনুযায়ী বিজয়ী করবে এবং বলবে তোমাদেরই আইন মতে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছি। আর উভয় আইনে যদি তাকে বিজয়ী করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে সিদ্ধান্ত দ্বারাই হোক তাকে অবশ্যই বিজয়ী করবে। রিব্বী শামবীল বলেন, অইসরাঈলীদের সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। -[তালমুদ, মসনিলুনী পল ১৮৮০ খ্রি. মাজেদী]

أَوَّلَهُ : দিনের প্রথম ভাগকে وَجْهَ বলা হয়েছে এ কারণে যে, মুখমণ্ডল যেভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় তদ্রূপ দিনের প্রথম ভাগও সৌন্দর্যময় হয়ে থাকে। وَجْهَ -এর ব্যাখ্যা أَوَّلَ দ্বারা এ কারণে করা হয়েছে যে, সাক্ষাতের সময় যেমন মুখমণ্ডল আগে আসে, ঠিক তেমনিভাবে রাত শেষ হবার পরে দিনের প্রথম ভাগও সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

قَوْلُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : বর্তমান বিশ্বে আজও অনেক প্রাচ্য দেশীয় ফিরিঙ্গি, খ্রিস্টান ও ইহুদি দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ইউরোপীয় ভাষায় মহানবী ﷺ -এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করছে। রাসূল ﷺ -এর জীবনী গ্রন্থের ভূমিকায় এমনভাবে বিশ্ব সংস্কারক, জাতি গঠক, আইন প্রণেতা, বিশ্বনেতা ইত্যাদি প্রশংসার বুলি আওড়িয়ে গ্রন্থ রচনা করে নিজেদের উদার, নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক পণ্ডিত, দার্শনিক হিসেবে প্রমাণ করার জন্য মহানবী ﷺ -এর প্রশংসা ও স্তুতিতে যত সব বিস্ময়কর বিশেষণ সংযোজন করে। পরিশেষে গ্রন্থের ইতি এমনভাবে টানে, মনে হয় যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বিকার বা বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন [নাঊযুবিল্লাহ], তাঁর মস্তিষ্কের ভারসাম্য ছিল না। অথবা তিনি ইহুদি-নাসারাদের গ্রন্থ চুপিসারে কারো কাছ থেকে শুনে শুনে তা বলে বেড়াতেন ইত্যাদি। তাদের এ সকল আচরণ ও তাদের অতীত ঐতিহ্যবাহী সত্য গোপন, অসত্যের মিশ্রণ, ধোঁকাবাজি ও দাজ্জালী চরিত্রেরই প্রতিফলন বৈ কি হতে পারে? বস্তুত এ সকল শঠতা ও ধোঁকাবাজি তাদের অতীত চরিত্র ও ঐহিহ্যের নমুনা। -[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ : অগ্রবর্তী মুসতাছনা, আর أَنْ يُؤْتٰى أَحَدٌ মুসতাছনা মিনহু।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ ءَاَنْ بِهَمْزَةِ التَّوْبِيْخِ : এটা أَنْ يُؤْتٰى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ -এর মধ্যে দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবোধক হামযাটি ধমকের জন্য অর্থাৎ তোমার কি নিজেদের মতো হেকমত ও ফজিলত অন্যদেরকে দেওয়ার স্বীকারোক্তি করছ? এমনটি উচিত নয়।

قَوْلُهُ وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ : এ আয়াতটি তারকীবের দিক দিয়ে সর্বাধিক জটিল হিসেবে বিবেচিত। কেউ কেউ এ আয়াতের নয়টি তারকীব উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে সহজ তারকীবটি আল্লামা যমখশারী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ কাশশাফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তারকীব : وَاوْ **আতিফা,** لَا নাহিয়া, تُؤْمِنُوْا মুযারের সীগাহ, لَا -এর কারণে জযমী হিসেবে নূন বিলুপ্ত হয়েছে। وَاوْ টি **ফায়েল** يَا **হরফকে ইসতেছনা।** لِمَنْ -এর لَ টি হরফে জর, مَنْ ইসমে মাওসূল, মাজরূর। জার মাজরূর মিলে মাহযূফের **সাথে মুতাআল্লিক হয়ে** ইসতেছনার কারণে নসবের স্থলে। বাক্যটি এমন হলো–

وَلَا تُؤْمِنُوْا اَىْ تَعْتَقِدُوْا وَتُظْهِرُوْا بِاَنْ يُؤْتٰى اَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اُوْتِيْتُمْ لِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ اِلَّا لِاَشْيَاعِكُمْ دُوْنَ غَيْرِكُمْ ـ

قَوْلُهُ وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ : অর্থাৎ তারা পরস্পর এটাও বলল যে, তোমরা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করবে, তবে **ইহুদি মতবাদ ছাড়া** অন্য কোনো মতবাদ বিশ্বাস করবে না।

قَوْلُهُ اَنْ يُؤْتٰى اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ : এটাও ইহুদিদের উক্তি, এর আতফ হলো وَتُؤْمِنُوْا -এর উপর। অর্থাৎ তোমরা একথা **স্বীকার করো** না যে, তোমাদের মধ্যে যেভাবে নবুয়তের ধারা রয়েছে অন্য কেউ তার অধিকারী হতে পারে? ইহুদি মতবাদ **ছাড়া অন্য** কোনো ধর্মও কি সঠিক হতে পারে?

قَوْلُهُ بِاَنْ يُحَاجُّوْكُمْ : اَنْ উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বর্ণনা করা যে, এর আতফ হয়েছে بِاَنْ يُؤْتٰى -এর উপর। اَنْ **এখানে** اَوْ অর্থে নয়। কারণ এটা মাজায হওয়ার কারণে স্বাভাবিকের বিপরীতে।

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ : لَا تُؤْمِنُوْا ক্রিয়া এবং তার কর্ম اَنْ تُؤْتٰى الخ -এর মাঝে اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ মু'তারিযা বাক্য **উল্লিখিত** হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ : এটা একটা মু'তারিযা বাক্য। আগে পরের বাক্যের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। এর দ্বারা **কেবল** তাদের হীন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বাস্তবতা স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে তাদের ষড়যন্ত্র দ্বারা কিছুই হবে না, কারণ হেদায়েত আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত। তিনি যাকে হেদায়েত দিতে চান তার ব্যাপারে তোমাদের কোনো চক্রান্ত কোনো কাজে আসবে না।

قَوْلُهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এ আয়াতে দুটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে–

১. ইহুদিদের বিশিষ্ট আলেমগণ যখন তাদের শিষ্যদেরকে একথা শিখাতো যে, তোমরা দিনের প্রথমভাগে ঈমান আনবে এবং শেষভাগে মুরতাদ হয়ে যাবে। এতে করে যারা প্রকৃত মুসলমান তারা সন্দিহান হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। তারা শিষ্যদেরকে এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নির্দেশ দিত যে, তোমরা কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে। আন্তরিক, নিষ্ঠা ও সততার সাথে মুসলমান হবে না। এমন ধারণা করবে না যে, তোমাদেরকে যেভাবে ধর্ম, ওহী, শরিয়ত এবং বিশেষ ইলম ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, অন্য কাউকে এরূপ দান করা যেতে পারে বা তোমরা ছাড়া অন্য কেউ এ বিশেষ হকের উপর থাকতে পারে। যারা তোমাদের বিপরীতে আল্লাহর নিকট প্রমাণ পেশ করতে পারে এবং তোমাদেরকে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে পারে। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি মু'তারিযা না হয়ে عِنْدَكُمْ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ ইহুদিদের উক্তি হবে।

২. উল্লিখিত বাক্যের অর্থ হলো– হে ইহুদিরা! তোমরা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করার এ সকল অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র এজন্য করছ যে, একে তো তোমাদের এ চিন্তা রয়েছে যে, তোমাদেরকে যেরূপ ওহী, শরিয়ত, ধর্ম এবং ইলম ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছিল, ঠিক তদ্রূপ এসব অন্য কাউকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত তোমাদের আশঙ্কা ছিল, যদি হকের এ দাওয়াত প্রসার লাভ করে এবং তার মূল সুদৃঢ় হয়ে যায় তাহলে কেবল এটাই নয় যে, জগতে তোমাদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত রয়েছে তা বিলীন হয়ে যাবে; বরং তোমরা যে সত্যকে লুকানোর চেষ্টা করছ, তার আবরণও উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অথচ তোমাদের বুঝা উচিত ছিল যে, শরিয়ত ও ধর্ম আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা কারো উত্তরাধিকারী সম্পদ নয় যে, তিনি তা যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। তিনিই জানেন অনুগ্রহ কাকে দান করা উচিত।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٥. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ اَىْ بِمَالٍ كَثِيْرٍ يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ لِاَمَانَتِهٖ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ اَوْدَعَهُ رَجُلٌ اَلْفًا وَمِائَتَىْ اُوْقِيَةٍ ذَهَبًا فَاَدَّاهَا اِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَا يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ لِخِيَانَتِهٖ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا لَا تُفَارِقُهُ فَمَتٰى فَارَقْتَهُ اَنْكَرَهُ كَكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ اِسْتَوْدَعَهُ قُرَشِىٌّ دِيْنَارًا فَجَحَدَهُ ذٰلِكَ اَىْ تَرْكُ الْاَدَاءِ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا بِسَبَبِ قَوْلِهِمْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيِّيْنَ اَىِ الْعَرَبِ سَبِيْلٌ اَىْ اِثْمٌ لِاسْتِحْلَالِهِمْ ظُلْمَ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُمْ وَنَسَبُوْهُ اِلَيْهِ تَعَالٰى قَالَ تَعَالٰى وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ فِىْ نِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ ـ

৭৫. কিতাবীদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যে, কিন্তার অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ সম্পদ আমানত রাখলেও আমানতদারীর দরুন তা তোমাকে ফেরত দেবে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট এক ব্যক্তি বারশত উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিল। তিনি সম্পূর্ণ স্বর্ণ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনারও আমানত রাখলে খেয়ানতের কারণে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে তা তোমাদের নিকট ফেরৎ দেবে না। বিচ্ছিন্ন না হয়ে লেগে না থাকা পর্যন্ত সে কিছুই দেবে না। বিচ্ছিন্ন হলেই সে অস্বীকার করে বসে। যেমন– ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট জনৈক কুরাইশী ব্যক্তি একটি স্বর্ণমুদ্রা আমানত রেখেছিল। কিন্তু পরে সে তা অস্বীকার করে বসে। এটা অর্থাৎ আমানত আদায় না করা এ কারণে যে, তারা বলে بِاَنَّهُمْ -এর ب টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতু বোধক। অর্থাৎ তাদের এ উক্তির কারণে যে, নিরক্ষরদের অর্থাৎ সাধারণ আরবদের প্রতি আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। [এদের কিছু আত্মসাৎ করলে আমাদের] পাপ নেই। কারণ তাদের ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের এরা বৈধ বলে মনে করে এবং আল্লাহর প্রতি তারা তা আরোপ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এ ধরনের বিষয় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে [তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে] যে, তারা মিথ্যাবাদী।

٧٦. بَلٰى عَلَيْهِمْ فِيْهِمْ سَبِيْلٌ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ الَّذِىْ عَاهَدَ اللّٰهَ عَلَيْهِ اَوْ بِعَهْدِ اللّٰهِ اِلَيْهِ مِنْ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَغَيْرِهٖ وَاتَّقَى اللّٰهَ بِتَرْكِ الْمَعَاصِىْ وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اَىْ يُحِبُّهُمْ بِمَعْنٰى يُثِيْبُهُمْ ـ

৭৬. হ্যাঁ এদের প্রতিও তাদের নিশ্চয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যে কেউ আল্লাহর সহিত কৃত তার অঙ্গীকার বা আল্লাহর নামে শপথ করে আমানত ইত্যাদি আদায়ের যে চুক্তি তারা করে সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং পাপ বর্জন এবং সৎ আমল করার বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি পুণ্যফল দান করবেন।

وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ বা এ স্থানে اَلْمُتَّقِيْنَ সর্বনাম هُمْ -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য اَلْمُتَّقِيْنَ -এর উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত ছিল يُحِبُّهُمْ আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ (الاية) ইহুদিদের আর্থিক খেয়ানত : ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করার পর এখন তাদের আর্থিক বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ধার্মিকও রয়েছে। তাদের আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। জনৈক ব্যক্তি তার নিকট ১২০০ উকিয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিল [১ উকিয়া সমান সাড়ে সাত ভরি] লোকটি তার আমানত ফেরত চাওয়া মাত্র তিনি তাকে তা হস্তান্তর করেন। পক্ষান্তরে কা'ব ইবনে আশরাফ -এর নিকট জনৈক কুরাইশী একটি মাত্র দিনার আমানত রেখেছিল, লোকটি তা ফেরত চাইলে সে তা সরাসরি অস্বীকার করে বসল। এটা কেবল দু এক ব্যক্তির আচরণ ছিল না, বরং ইহুদিদের সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, অ-ইহুদিদের সম্পদ বৈধ অবৈধ যেভাবেই সম্ভব হতো তারা গ্রাস করত। এটাকে তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী জায়েজ মনে করত। এমনকি আল্লাহর প্রতি এর বৈধতার সম্বন্ধ করত। তারা বলত, তাওরাতে এ বিধান লিখিত আছে। এ ব্যাপারে আমরা কোনো কৈফিয়তের সম্মুখীন হব না। অথচ তারা এটা ভালোভাবেই জানত যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা। এ ধরনের অন্যায় করার পরও তারা মনে করত যে, তারা আল্লাহর অতি প্রিয় ও নৈকট্যভাজন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ الخ কেন নয় অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। যে ওয়াদা রক্ষা করে এবং আল্লাহকে ভয় করে সেই হলো মুত্তাকী।

قِنْطَارٌ : এটা একবচন, বহুবচন হলো قَنَاطِيْرُ অর্থ– অঢেল সম্পদ।

اَلْاُمِّيُّوْنَ : অর্থাৎ উম্মুল কুরা তথা মক্কার অধিবাসীবৃন্দ। ইহুদি সম্প্রদায় বংশগত অভিমান, আত্মম্ভরিতা, বিদ্বেষ ও জাতীয় গর্বে ভরপুর হওয়ার কারণে মক্কাবাসীদেরকে নিজেদের তুলনায় তুচ্ছ ও হেয় মনে করত এবং নিরক্ষর বলে সম্বোধন করত।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ : ইয়াহুদীরা অ-ইহুদি মানুষের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে, লেনদেন ও আচরণের ক্ষেত্রে অসৌজন্য ও অশালীন ব্যবহারের জন্য চিরকাল দুর্নামের অধিকারী। বস্তুত আত্মভিমানী ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত জাতির আচরণ সাধারণত এমনটিই হয়ে থাকে। বর্ণ বৈষম্যবাদে বিশ্বাসী, শ্বেতজাতি কৃষ্ণকায় লোকদের সাথে আচরণ কি ধরনের, তা বর্তমান সভ্যতা ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও উৎকর্ষতার দাবিদার বিশ্বে কি ধরনের, তা সমগ্র মানবতাবাদী বিশ্বই অবলোকন করেছে। سَبِيْلٌ হুজ্জত; এখানে দায়দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রধান বা সাফল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের [ইহুদিদের] উপর উম্মীদের [নিরক্ষরদের] কোনো দায়দায়িত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না [ইহুদিদের বর্ণনা মতে]।
–[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِ اللّٰهِ : [প্রকৃতপক্ষে এ তাকওয়া ও আল্লাহভীতিই সকল প্রকার নৈতিক উৎকর্ষতা ও উত্তম আচরণের মূল ভিত্তি।] بَلٰى অর্থাৎ কেন কোনো দায়দায়িত্ব থাকবে না? অবশ্যই এ দায়দায়িত্ব আছে। عَهْدِهٖ চুক্তি সম্পাদন স্রষ্টার সাথে হোক অথবা সৃষ্টির সাথেই হোক, সকল অবস্থায়ই তা রক্ষা ও পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা চুক্তির মর্যাদা ও গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সমস্ত ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্য দুটো জিনিসের উপরই নির্ভরশীল। একটি মহান আল্লাহর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও মহান আল্লাহর আহকামের যথাযথ মর্যাদা গুরুত্ব প্রদান ও সংরক্ষণ। আর দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পাদিত চুক্তির যথাযথ মর্যাদা, গুরুত্ব প্রদান ও সংরক্ষণ এবং সৃষ্টির সাথে সহমর্মিতা। [অর্থাৎ হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ] এ দু ধরনের বন্দেগির সমন্বয় ও সম্মিলনের মধ্যেই সকল প্রকার ইবাদত-বন্দেগি পুঞ্জীভূত রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٧. وَنَزَلَ فِى الْيَهُوْدِ لَمَّا بَدَّلُوْا نَعْتَ
النَّبِيِّ ﷺ وَعَهْدَ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فِى
التَّوْرٰةِ اَوْ فِيْمَنْ حَلَفَ كَاذِبًا فِىْ
دَعْوٰى اَوْ فِىْ بَيْعِ سِلْعَةٍ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَشْتَرُوْنَ يَسْتَبْدِلُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
اِلَيْهِمْ فِى الْاِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَاَدَاءِ
الْاَمَانَةِ وَاَيْمَانِهِمْ حَلْفِهِمْ بِهٖ تَعَالٰى
كَاذِبِيْنَ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا اُولٰۤئِكَ
لَا خَلَاقَ نَصِيْبَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ غَضَبًا عَلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ
اِلَيْهِمْ يَرْحَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ
يُطَهِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ ـ

৭৭. তাওরাতে উল্লিখিত রাসূল ﷺ -এর গুণাবলি সংবলিত বিবরণ এবং তাদের সাথে আল্লাহর চুক্তিসমূহ ইহুদিগণ কর্তৃক পরিবর্তিত করার বিষয়ে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ে বা দাবি ইত্যাদিতে মিথ্যা শপথ করার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং যথাযতভাবে আমানত আদায় করা সম্পর্কিত এদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তার এবং নিজেদের শপথকে অর্থাৎ আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে তা দুনিয়ার স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে বিনিময় করে এরা ঐসব লোক পরকালে যাদের কোনো অংশ নেই। لا خلاق অর্থ কোনো হিস্যা নেই। এদের উপর ক্রোধবশত কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না অর্থাৎ তাদের প্রতি দয়া করবেন না। এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর [শাস্তি]।

٧٨. وَاِنَّ مِنْهُمْ اَىْ اَهْلَ الْكِتٰبِ لَفَرِيْقًا
طَائِفَةً كَكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ يَلْوٗنَ
اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ اَىْ يَعْطِفُوْنَهَا
بِقِرَاءَتِهٖ عَنِ الْمُنْزَلِ اِلٰى مَا حَرَّفُوْهُ مِنْ
نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْوِهٖ لِتَحْسَبُوْهُ اَىْ
الْمُحَرَّفَ مِنَ الْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ
تَعَالٰى وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ ـ

৭৮. তাদের মধ্যে অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্যে একদল লোক আছেই যেমন কা'ব ইবনে আশরাফ যারা আল্লাহর কিতাবকে নিয়ে জিভ বাঁকায় অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর গুণাবলির বিবরণ ইত্যাদি সংবলিত আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে আবৃত্তি করতঃ সেগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত পাঠের দিকে নিয়ে যায় যাতে তোমরা তা ঐ বিকৃত পাঠকে আল্লাহর তরফ হতে নাজিলকৃত কিতাবের অংশ বলে মনে কর; অথচ তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, তা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত অথচ তা আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত নয়। তারা আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে অথচ তারা জানে যে, সত্যই তারা মিথ্যাবাদী।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا **শানে নুযূল :** খুলাসাতুত তাফসীর গ্রন্থকার জাহেদীর বরাতে লিখেন, একবার মদিনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কতিপয় ইহুদি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গমন করল, সে ছিল ইহুদিদের সরদার, তারা তার নিকট সাহায্যের আবেদন করল। কা'ব বলল, যে লোকটি নবুয়তের দাবি করছে তাঁর ব্যাপারে তোমাদের মন্তব্য কি? তারা জবাব দিল, তিনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর বান্দা। কা'ব বলল, তোমরা আমার নিকট কিছু পাবে না। নব মুসলিম ইহুদিরা বলল, একথা আমরা এমনিই বলেছিলাম, আমাদেরকে অবকাশ দিন, আমরা ভেবে-চিন্তে জবাব দেব। সামান্য সময় পরে এসে তারা বলল, মুহাম্মদ শেষ নবী নয়। কা'ব তাদের শপথ করতে বললে তারা এ ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করল না। এরপর কা'ব তাদের প্রত্যেককে পাঁচ সা' যব এবং আট গজ কাপড় দান করল। উল্লিখিত আয়াতটি এদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। আবূ উমামা বাহেলী কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের অধিকার বিনষ্ট করে আল্লাহ তার উপর বেহেশত হারাম করবেন এবং দোজখ অবধারিত করবেন। কেউ আরজ করল, যদি তা খুব সামান্য বস্তু হয়? তিনি জবাব দিলেন, যদিও তা পেলু বৃক্ষের শাখাও হয়। -[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا : দুনিয়ার স্বার্থে আখিরাতের চিরন্তন কল্যাণ ও মুক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে যত অধিক পরিমাণ মূল্যই গ্রহণ করুক না কেন, আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য ও স্বল্প।

উপরিউক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই নয় যে, পার্থিব সম্পদের পরিমাণ কম হলেই চুক্তি ভঙ্গ, বদদিয়ানতী ও খিয়ানত করা যাবে না। আর বিনিময় ও সম্পদের পরিমাণ বেশি হলে তা করা যাবে; বরং কোনো অবস্থাতেই দুনিয়ার স্বার্থ ও সম্পদকে আখিরাতের সাফল্য ও মুক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। কোনো অবস্থাতেই অসৌজন্যমূলক আচরণে মহান আল্লাহর আইনের সীমালঙ্ঘন ও চুক্তি ভঙ্গের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

عَهْدُ اللّٰهِ : অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। اَيْمَانِهِمْ অর্থাৎ তাদের পরস্পরের আচরণের ক্ষেত্রে যে সকল কসম তারা খেয়েছে।

قَوْلُهُ لَا خَلَاقَ : অর্থাৎ কল্যাণের কোনো অংশই তার জন্য নেই। (بخارى) اَىْ لَا خَيْرَ لَا يُكَلِّمُهُمْ অর্থাৎ দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকে সম্বোধন করবেন না, কথা বলবেন না। এর দ্বারা আজাব-গজব ও পাকড়াও সম্বোধন করা রহিত হওয়া বুঝায়নি; বরং لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ রহম ও করমের দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাবেন না। এখানে ক্রোধ ও কঠোরতার দৃষ্টিতে তাকানো রহিত হওয়া বুঝায়নি। لَا يُزَكِّيْهِمْ অর্থাৎ পাপের কলুষিত কালিমা হতে তাদেরকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত করবেন না। اَلِيْمٌ যন্ত্রণাদায়ক। এখানে مُؤْلِمٌ অর্থাৎ যে শাস্তির কঠোরতার কারণে তারা ব্যথা ও বেদনা উপভোগ করবে। বেদনাদায়ক শাস্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (بخارى) اَىْ مُؤْلِمٌ مُوْجِعٌ مِنَ الْاَلَمِ وَهُوَ مَوْضَعُ مَفْعَلٍ

قَوْلُهُ وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ : উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের অর্থের মধ্যে হেরফের করত বা শব্দ পরিবর্তন করে ইচ্ছামাফিক উদ্দেশ্য বের করত। তবে এর আসল অর্থ হলো, তারা আল্লাহর কিতাব পাঠকালে বিশেষ কোনো শব্দ বা বাক্য যদি তাদের মনগড়া আকিদার পরিপন্থি মনে করত, তবে জিহ্বার সাহায্যে ঘুরিয়ে ভিন্ন শব্দে পরিণত করত। কুরআন মান্যকারীদের মধ্যেও এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন- যে সকল ব্যক্তি নবীকে بَشَرٌ তথা মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে, তারা قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ -এর اِنَّمَا -কে اِنْ مَا পড়ে। তারা

http://islamiboi.wordpress.com

এর অর্থ করে– হে নবী! আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মতো মানুষ নই। এভাবে তারা মানুষের নিকট বলে যে, এটা আল্লাহর কালাম। বস্তুত তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে।

আহলে কিতাব নিজেদের আসমানি কিতাবের বিকৃতি সাধান করেছিল : এখানে কিতাবীদের বিকৃতি সাধনের অবস্থা বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আসমানি কিতাবে নিজেদের পক্ষ হতে কিছু বিষয় এমনভাবে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে পাঠ করে যে, যারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানে না, তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং মনে করে, এটাও আসমানি কিতাবেরই কথা। কেবল এতটুকুই নয়, বরং তারা মুখে দাবিও করে যে, এগুলো মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত। অথচ প্রকৃতপক্ষে না তা কিতাবে উল্লেখ আছে, না তা মহান আল্লাহর নিকট হতে এসেছে; বরং বিকৃত কিতাবকেও সমষ্টিগতভাবে মহান আল্লাহর কিতাব বলা যায় না। কেননা এতে নানা রকমের হস্তক্ষেপ, পরিবর্তন ও হেরফের করা হয়েছে। আর দুনিয়ায় যে বাইবেল প্রচলিত, তা নানারকম স্ববিরোধিতায় ভরপুর। তাতে এমন কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে, যাকে কিছুতেই মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণে আমাদের ওলামায়ে কেরাম অনেক বড় বড় পুস্তকাদিও রচনা করেছেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ : অর্থাৎ তাদের উপরিউক্ত দাবিতে এবং আল্লাহর ওহী বিবর্জিত তাদের মনগড়া ধর্মের নীতিমালা ও নৈতিকতায় তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কখনো তাদের সাথে তাদের চিরস্থায়ী শ্রেষ্ঠত্বের চুক্তি সম্পাদান করেননি। এগুলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট কথা। এ সকল আয়াতে ইহুদি আচরণ ও চরিত্রের বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপনের ফলে তাদের হীন চরিত্র ও মারাত্মক অপরাধ এবং জঘন্য আচরণের মুখোশ আরো ভীষণ ও প্রকটভাবে উন্মোচিত হয়েছে। তারা শুধু আল্লাহপ্রদত্ত শরিয়তের সীমা-ই লঙ্ঘন করেনি; বরং তারা আল্লাহর নাম ভাঙ্গিয়ে মনগড়া বিকৃত ধর্মমত সৃষ্টি করেছে। আর কেবল আচরণ ও কর্মেই অপরাধী নয়, বরং তাদের চরিত্র ও ক্রিয়াকাণ্ডের চেয়ে আরও বেশি জঘন্য ও ভয়াবহ আকিদা বিশ্বাসে তারা লিপ্ত হয়েছে।

يَقُوْلُوْنَ [তারা বলে] এখানে জরুরি নয় যে, তারা প্রকাশ্যেই বলে, বরং তাদের আচরণে ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তাদের মানসিকতা এ ধরনের। তাদের কার্যকলাপ দ্বারা বলা– বুঝানোটাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارٰى نَجْرَانَ اِنَّ عِيْسٰى اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَّخِذُوْهُ رَبًّا اَوْ لَمَّا طَلَبَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ السُّجُوْدَ لَهُ ﷺ **مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ** اَىِ الْفَهْمَ لِلشَّرِيْعَةِ **وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ** يَقُوْلُ **كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ** عُلَمَاءَ عَامِلِيْنَ مَنْسُوْبٌ اِلَى الرَّبِّ بِزِيَادَةِ اَلِفٍ وَنُوْنٍ تَفْخِيْمًا **بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ** بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ **الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ** اَىْ بِسَبَبِ ذٰلِكَ فَاِنَّ فَائِدَتَهُ اَنْ تَعْمَلُوْا ـ

৭৯. নাজরান অধিবাসী খ্রিস্টানরা বলেছিল, হযরত ঈসাকে প্রভু হিসেবে উপাসনা করতে তিনি নিজে তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এর প্রতিবাদে কিংবা কিছু সংখ্যক মুসলিম রাসূল ﷺ-কে সিজদা করার অনুমতি চেয়েছিল বলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন- কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত, অর্থাৎ শরিয়তের বিশেষ জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা উপলব্ধি ও নবুয়ত দান করার পর তার জন্য শোভন নয় উচিত নয় যে, সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও' বরং সে বলবে, 'তোমরা রব্বানী হও'; অর্থাৎ সৎকর্মশীল আলেম হও, رَبَّانِيٌّ শব্দটি অতিরিক্ত اَلِفٌ وَنُوْنٌ সহ تَفْخِيْمًا বা মর্যাদা বিধানরূপে رَبٌّ -এর সাথে مَنْسُوْبٌ বা সম্পর্কিত করে গঠিত শব্দ। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর تَعْلَمُوْنَ শব্দটি তাশদীদসহ অর্থাৎ بَابُ تَفْعِيْلٍ ও تَخْفِيْفٌ বা তাশদীদ ব্যতীত উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। অর্থাৎ এসব কারণে তোমরা তা হও। কেননা আমল বা কাজে রূপায়িত করার মধ্যেই এর উপকারিতা ও সার্থকতা নিহিত।

٨٠. **وَلَا يَاْمُرَكُمْ** بِالرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا اَىِ اللّٰهُ وَالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى يَقُوْلَ اَىِ الْبَشَرُ **اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا** كَمَا اتَّخَذَتِ الصَّابِئَةُ الْمَلٰئِكَةَ وَالْيَهُوْدُ عُزَيْرًا وَالنَّصٰرٰى عِيْسٰى **اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ** لَا يَنْبَغِيْ لَهُ هٰذَا ـ

৮০. সাবিঈ সম্প্রদায় যেমন ফেরেশতাগণকে, ইহুদিগণ যেমন উযায়িরকে, খ্রিস্টানরা যেমন ঈসাকে রব রূপে গ্রহণ করেছে। এমনিভাবে ফেরেশতাগণ ও নবীগণকে রব রূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদের নির্দেশ দেবে না। يَاْمُرُكُمْ এ ক্রিয়াটি رَفْعٌ সহকারে পঠিত হলে তা مُسْتَاْنِفَةٌ বা নববাক্য বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় উল্লিখিত اَلْبَشَرُ শব্দটি হবে এর কর্তা। মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কাফের হতে বলবে? তাঁর জন্য এটা কখনো উচিত নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতে কারীমায় কথা প্রসঙ্গে ইহুদিদের আলোচনা এসেছিল। এখন পুনরায় খ্রিস্টানদের আলোচনা শুরু হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তির অপনোদন করা হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.) -কে খোদা বানিয়ে বসে আছে। অথচ তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দা ও মানুষ। তাঁকে কিতাব, নবুয়ত ও হেকমত দ্বারা ধন্য করা হয়েছিল। আর এমন কোনো ব্যক্তি এ দাবি করতে পারে না যে, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা আমার উপাসনা কর ও দাস হও; বরং তিনি তো এ কথাই বলেন, তোমরা রবওয়ালা হয়ে যাও, রব্বানী শব্দটি মূলত রবের প্রতি সম্বন্ধিত, ان আধিক্যজ্ঞাপক। -[ফাতহুল কাদীর]

শানে নুযূল : কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি কি চান যে, নাসারারা যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর উপসনা করে আমরা তদ্রূপ আপনার উপসনা করব? রাসূল ﷺ বললেন, নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহর পানাহ যে, আমরা গায়রুল্লাহর উপাসনা করব কিংবা আমি গায়রুল্লাহর উপাসনার নির্দেশ দেব- আল্লাহ আমাকে এজন্য প্রেরণ করেননি এবং এর নির্দেশও দেননি। এ সময় উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

আবদ ইবনে হুমাইদ (র.) হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করল-

يَا رَسُوْلَ للهِ ﷺ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ كَمَا نُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ يُسَلِّمُكَ اَفَلَا نَسْجُدُ لَكَ؟

অর্থাৎ আমরা পরস্পর যেভাবে সালাম বিনিময় করি তদ্রূপ আপনাকেও সালাম করি। আমরা কি আপনাকে সেজদা করব না? রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, না। তবে তোমরা তোমাদের নবীর সম্মান কর, তাঁর পরিবারের হক আদায় কর। কারো জন্য গায়রুল্লাহর সেজদা করা উচিত নয়। তখন উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর যে বান্দাকে কিতাব, হেকমত ও মীমাংসা করার শক্তি দেন এবং নবুওয়তের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন, সে তো যথাযথভাবে মহান আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে তাদেরকে তাঁর আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করারই আহ্বান জানাবে। তাঁর কাজ এটা কখনই হতে পারে না যে, তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত হতে সরিয়ে তার নিজের বা অন্য কোনো সৃষ্টির বান্দা বানাতে শুরু করবে। অন্যথায় তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা যাকে যেই পদের উপযুক্ত জেনে পাঠিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে সে তার যোগ্য নয়।

এ দুনিয়ার কোনো সরকারও যদি কাউকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন, তখন প্রথমে দুটি বিষয় চিন্তা করেন-

ক. উক্ত ব্যক্তি সরকারের নীতি বোঝার ও আপন দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা?

খ. তার পক্ষ হতে সরকারি আইন পালন ও প্রজাসাধারণকে সরকারের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখার আশা কতটুকু করা যায়?

কোনো সরকার বা পার্লামেন্ট এমন কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করতে পারে না, যার সম্পর্কে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিস্তার বা সরকারি আইন ও নীতি লজ্ঘন করার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সম্ভব যে, সরকার কোনো ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের প্রেরণা সঠিকভাবে নিরূপণ নাও করতে পারে; কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষেত্রে তো সে সম্ভবনাও নেই। কারো সম্পর্কে যদি তার জানা থাকে যে, সে তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য হতে এক চুলও স্থানচ্যুত হবে না, তাহলে ভবিষ্যতে এর বিপরীত হওয়া একবারেই অসম্ভব। অন্যথায় মহান আল্লাহর জ্ঞানে ভুলত্রুটি থাকা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, নাউযুবিল্লাহ। এর দ্বারাই আম্বিয়া (আ.)-এর ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়, যেমন- আবূ হায়্যান 'আল বাহরুল মুহীত' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন এবং হযরত মাওলানা কাসেম নানুতাবী (র.) তাঁর রচনাবলিতে বিস্তারিত লিখেছেন। আর নবীগণ যখন মামুলি পর্যায়ের অন্যায়-অপরাধ হতেও পবিত্র, তখন শিরক ও আল্লাহ-দ্রোহিতার আর অবকাশ থাকে কোথায়? এর দ্বারা খ্রিস্টানদের এ দাবিও খণ্ডন হয়ে গেল যে, হযরত মাসীহ (আ.) যে মহান আল্লাহর ছেলে এবং তিনি নিজেও ইলাহ এ আকিদা খোদ হযরত মাসীহ (আ.) তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই

http://islamiboi.wordpress.com

মুসলিমগণের জন্যও তা নসিহত হয়ে গেল, যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করেছিল, **আমরা আপনাকে সালামের পরিবর্তে সিজদা** করলে দোষ কি? ইহুদিরা তাদের ধর্মযাজকদেরকে মহান আল্লাহর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত **করেছিল, নাউযুবিল্লাহ। এ আয়াতে** তাদেরকেও সাবধান করে দেওয়া হলো। –[তাফসীরে ওসমানী]

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ...... وَالنُّبُوَّةَ : কোনো মানুষকে কিতাব, হিকমত ও নবুয়ত রূপ নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে **যেমন তিনি মানুষকে নিজের** বান্দা বানাতে পারে না, তেমনি হযরত ঈসা (আ.)-কে নবুয়ত, কিতাব ও হিকমত প্রদানের মাধ্যমে **তিনি কাউকে** তাঁর বন্দেগির দাওয়াত ও পয়গাম দিতে পারেন না। যাকে উপরিউক্ত সব কয়টি নিয়ামতই দান করা হয়েছে, **যার আত্মা** মার্জিত, বিশুদ্ধ ও পবিত্র এবং যিনি অপরের আত্মাকেও মার্জিত ও পবিত্র করার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁর পক্ষে **এমনি শিরকের** দাওয়াত দেওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে?

اَلْحُكْمَ এখানে حُكْم -এর তাৎপর্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অথবা শরিয়তের আহকামকে অনুধাবন করার জ্ঞান- অর্জনকে বুঝানো **হয়েছে**। বলা হয়েছে–

اَلْحُكْمُ اَلْعِلْمُ وَالْفَهْمُ وَقِيْلَ اَيْضًا اَلْكِتَابُ الْاَحْكَامُ (قرطبى) ..... وَالظَّاهِرُ اَنَّ الْحُكْمَ هُوَ الْقَضَاءُ ـ (بحر)

হিকমত বা জ্ঞান বলতে এখানে সকল আসমানি কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। এখানে 'কিতাব' শব্দটি ইসমে জিনস হিসেবে **ব্যবহৃত হয়েছে**।

اَلرَّبَّانِىْ রাব্বানী : [যা মূলত হযরত ঈসা মাসীহ (আ.)-এর দাওয়াত ছিল।] রাব্বানী শব্দ রব -এর সাথে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত। রাব্বি শব্দের সামর্থবোধক অর্থাৎ বড় আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহর নিকটতম বান্দা।

مَعْنَى الرَّبَّانِىْ اَلْعَالِمُ بِدِيْنِ الرَّبِّ الَّذِىْ يَعْمَلُ بِعِلْمِهٖ ـ (قرطبى) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَوْمَ مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَلْيَوْمَ مَاتَ رَبَّانِىُّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ (قرطبى) وَهُمْ شَدِيْدُ التَّمَسُّكِ بِدِيْنِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهٖ ـ (مدارك)

قَوْلُهُ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ : এজন্য তোদেরকে এ ধরনের বেহুদা ও বাজে শিরক থেকে বেশি করে আত্মরক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

اَىْ بِسَبَبِ كَوْنِكُمْ مُعَلِّمِيْنَ الْكِتَابَ وَسَبَبِ كَوْنِكُمْ دَارِسِيْنَ لَهٗ ـ (بيضاوى)

ইমাম রাযী (র.) এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেছেন যে, ইলম, তা'লীম-তাআল্লুম অর্থাৎ শিক্ষা-সাধনা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকতার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার মর্ম ও তাৎপর্যই আল্লাহওয়ালা হওয়া। যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক জ্ঞান সাধনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরও আল্লাহওয়ালা হওয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হয় না, সে বৃথাই সময় নষ্ট করে। যে ইলম মানুষকে আল্লাহওয়ালা বানায় না, মহান আল্লাহর হাবীব হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ধরনের আমলহীন ইলম থেকে মহান আল্লাহর কাছে নিরাপদ আশ্রয় চেয়েছেন। (كبير) نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا تَخْشَعُ আয়াতের মর্ম হচ্ছে– ইলম তথা মহান আল্লাহ কিতাব মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তোমরা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে ডুবে আছ।

–[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ : যেমন খ্রিস্টানরা হযরত মসীহ (আ.) ও 'রূহুল কুদুস' -কে, কতক ইহুদি হযরত উযাইর (আ.) -কে এবং কতক মুশরিক ফেরেশতাদেরকে সাব্যস্ত করেছিল। ফেরেশতা ও নবীই যখন মহান আল্লাহর শরিক হতে পারে না, তখন পাথরের মূর্তি ও কাঠের ক্রুসের তো হিসাবই আসে না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨١. وَاذْكُرْ اِذْ حِيْنَ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ عَهْدَهُمْ لَمَا بِفَتْحِ اللَّامِ لِلْاِبْتِدَاءِ وَتَوْكِيْدِ مَعْنَى الْقَسَمِ الَّذِىْ فِىْ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ وَكَسْرِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِاَخْذَ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ اَىْ لِلَّذِىْ اٰتَيْتُكُمْ اِيَّاهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اٰتَيْنٰكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ جَوَابُ الْقَسَمِ اِنْ اَدْرَكْتُمُوْهُ وَاُمَمُهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ ءَاَقْرَرْتُمْ بِذٰلِكَ وَاَخَذْتُمْ قَبِلْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ عَهْدِىْ قَالُوْا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَاَتْبَاعِكُمْ بِذٰلِكَ وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ .

৮১. আর স্মরণ কর, যবে যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন- لَمَا-এর لَامٌ টি ফাতাহ সহকারে পঠিত। এমতাবস্থায় তা اِبْتِدَاءٌ বা সূচনাবাচক لَامٌ এবং অঙ্গীকার নেওয়ার মর্মে যে কসম ও শপথের অর্থ বিদ্যমান এর تَاكِيْد [তাকীদ] রূপে গণ্য হবে। আর তা কাসরাহ সহকারে পঠিত হলে اَخَذَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য হবে। উক্ত উভয় অবস্থায় مَا টি اِسْم مَوْصُوْل বা সংযোজক বিশেষ্য বলে বিবেচ্য হবে। اٰتَيْتُكُمْ এটা অপর এক কিরাআতে اٰتَيْنٰكُمْ [উত্তম পুরুষ, বহুবচন] রূপে পঠিত রয়েছে।
কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিলাম তার শপথ তোমাদের কাছে কিতাব ও হিকমতের যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন একজন রাসূল আসবে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তখন তাঁকে যদি তোমরা পাও তবে নিশ্চয় তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ এটা কসমের জওয়াব। এবং তাঁকে সাহায্য করবে। এ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে তাঁদের উম্মতগণ তাঁদের অধীন। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে বললেন, তোমরা কি তা স্বীকার করলে আমার অঙ্গীকার দেয় প্রতিশ্রুতি কি তোমরা গ্রহণ করলে? কবুল করে নিলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা নিজেদের ও তোমাদের অনুসারীদের সম্পর্কে তার সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে তোমাদের ও তাদের সম্পর্কে সাক্ষী থাকলাম।

٨٢. فَمَنْ تَوَلّٰى اَعْرَضَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقِ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ .

৮২. এর উক্ত অঙ্গীকারের পর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় যারা পরাঙ্মুখ হয় তারাই সত্যত্যাগী।

٨٣. اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ بِالْيَاءِ اَىِ الْمُتَوَلُّوْنَ وَالتَّاءِ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ اِنْقَادَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا بِلَا اِبَاءٍ وَكَرْهًا بِالسَّيْفِ وَمُعَايَنَةِ مَا يُلْجِئُ اِلَيْهِ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ .

৮৩. তারা অর্থাৎ পরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কি আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কিছু চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার না করে ও অনিচ্ছায় অথবা এমন জিনিস দর্শন করে যা তাকে মানতে বাধ্য করে তাঁর মাধ্যমে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর বাধ্যগত রয়েছে। আর তাঁর দিকেই এরা প্রত্যানীত হবে।
اَفَغَيْرَ -এর হামযাটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকারসূচক।
يَبْغُوْنَ শব্দটি ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ ও ى অর্থাৎ নাম পুরুষ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়।
يُرْجَعُوْنَ শব্দটি ت দ্বিতীয় পুরুষ ও ى অর্থাৎ নাম পুরুষ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

٨٤. قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ اَوْلَادِهِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ مُخْلِصُوْنَ فِى الْعِبَادَةِ ـ	অনুবাদ : ৮৪. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, আমরা আল্লাহ এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের সন্তানসন্ততিদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রদান করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করেছি; আমরা কাউকেও সত্য বলে বিশ্বাস ও কাউকে মিথ্যা বলে ধারণা করে অস্বীকার করত তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী ইবাদত পালনে একনিষ্ঠ।
٨٥. وَنَزَلَ فِيْمَنِ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ لِمَصِيْرِهِ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ ـ	৮৫. যারা মুরতাদ হয়ে গেছে [ইসলাম ত্যাগ করে] কাফেরদের সাথে মিলে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ নাজিল করেন, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে তার যাত্রা হওয়ায় সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَاِذْ حِيْنَ : حِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা দ্বারা ইশারা করেছেন যে, اِذْ শব্দটি হলো যরফিয়া। اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক। এ আয়াতের কয়েকটি তারকীব করা হয়েছে। এ আয়াতটি জটিল তারকীবসমূহের অন্তর্গত।

জালালাইন গ্রন্থকারের পছন্দনীয় তারকীব : এখানে وَاوْ টি ইসতেনাফিয়া, اِذْ উহ্য اُذْكُرْ-এর সাথে মুতাআল্লিক। لَمَّا-এর ل টি এখানে কসম অর্থে, اِبْتِدَاءْ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ দ্বারা বুঝা যায় তার গুরুত্বারোপের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কেউ লাম বর্ণ যেরসহ পড়েছেন। اَخَذَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ। উভয় ক্ষেত্রে مَا মাওসূলা, আর এক কেরাতে اٰتَيْنَاكُمْ এসেছে। لَتُؤْمِنُنَّ জবাবে কসম, اِيَّاهُ বিলুপ্ত রয়েছে। এটা মাওসূলের দিকে ফিরেছে, مَا হলো মাওসূলা, এটা শর্তের অর্থবোধক হতে পারে। আর لَتُؤْمِنُنَّ কসমের জবাবের স্থলাভিষিক্ত ও শর্তের জবাব।

قَوْلُهٗ أَاَقْرَرْتُمْ : এখানে জিজ্ঞাসাটি নির্দেশ অর্থে। কিংবা تَقْرِيْرِىْ -ও হতে পারে। اَفَغَيْرَ -এর মধ্যকার হামযাটি অস্বীকারজ্ঞাপক তথা না-বোধক। কাজেই এ প্রশ্ন দূর হয়ে গেল যে, আল্লাহর প্রশ্ন করার অর্থ কি?

প্রশ্ন : আল্লাহর বাণী لَا نُفَرِّقُ -এর উদ্দেশ্য হলো আমরা নবীদের মধ্যে প্রভেদ করি না। সবাইকে সমপর্যায়ের মনে করি। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা মতে, নবীগণের ফজিলত ও মর্যাদা বিভিন্নরূপ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ আয়াত দ্বারাও তো এ কথাই স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহলে لَا نُفَرِّقُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : প্রভেদ না করার অর্থ হলো তাদেরকে সত্যায়ন করা ও মিথ্যা সাব্যস্ত না করার ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক মর্যাদার দিক দিয়ে নয় অর্থাৎ আমরা ইহুদিদের মতে কোনো কোনো নবীকে সত্য জানি এবং কোনো কোনো নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করি, এমন নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : مُسْلِمُوْنَ -এর ব্যাখ্যা مُخْلِصُوْنَ দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর : এর কারণ হলো, اٰمَنَّا দ্বারাই ঈমানের বিষয়টি আগেই বুঝা গেছে, কাজেই এর দ্বারা ইখলাস উদ্দেশ্য।

وَشَهَادَتَهُمْ : এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এর আতফ হলো اَنْ উহ্য সহকারে اِيْمَانِهِمْ -এর উপর। মা'তূফ ফে'লটি ইসমের তাবীলে।

قَدْ : قَدْ বিলুপ্ত করার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَاوْ টি عَاطِفَةْ নয়; বরং حَالِيَةْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অঙ্গীকার যেখানে গ্রহণ করা হয়েছিল : مِيْثَاقٌ [অঙ্গীকার] শব্দটি পবিত্র কুরআনে একাধিক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। এটা [অঙ্গীকার গ্রহণ] হয়তো রূহানী জগতে কিংবা দুনিয়ায় ওহীর মাধ্যমে হয়েছে। তবে উভয়টির সম্ভবনাই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের থেকে তিন ধরনের অঙ্গীকার নিয়েছেন–

১. সূরা আ'রাফে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অধীনে উল্লিখিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য হলো সমস্ত মানুষ যেন আল্লাহর অস্তিত্বে এবং তাঁর রবুবিয়্যাতের উপর বিশ্বাস রাখে।

২. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَ الخ আয়াত দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল কেবল আহলে কিতাব আলেমদের থেকে, যাতে তারা সত্যকে গোপন না করে।

৩. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ আয়াত দ্বারা গৃহীত হয়েছে।

এ অঙ্গীকার কি বিষয়ে গৃহীত হয়েছে এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপ মন্তব্য রয়েছে। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা নবী করীম ﷺ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীদের থেকে মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাঁরা যদি তাঁর নবুয়তকাল পায় তাহলে তাঁরা যেন তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসেন এবং তাঁর সমর্থন ও সহায়তা করেন। অন্যথায় নিজ নিজ উম্মতকে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা প্রদান করে যাবেন।

হযরত তাউস হযরত হাসান বসরী ও হযরত কাতাদা (র.) বলেন, নবীদের থেকে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, তাঁরা যেন পরস্পর একে অন্যের সহায়তা ও সহযোগিতা করেন। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, মা'আরিফুল কুরআন]

এখানে এ বিষয়টি প্রনিধাণযোগ্য যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বের সকল নবী থেকে এ ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে এ অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতে প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে পরবর্তীকালে আগত নবীর সুসংবাদ দান করেছেন এবং তাঁর সহযোগিতা করার জোর তাকিদ দিয়েছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ কথা পাওয়া যায়নি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ থেকে এ ধরনের কোনো অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে। কিংবা তিনি স্বীয় উম্মতকে তাঁর পরবর্তীকালের আগত নবীর সংবাদ দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দান করেছেন। এর দ্বারা আহলে কিতাবকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করেছ। মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার এবং তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা এ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করছ, যা তোমাদের নবীগণ থেকে নেওয়া হয়েছিল। অতএব তোমরা বর্তমানে ঈমানের সীমারেখা থেকে বেরিয়ে এসেছ। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বহির্ভূত হয়েছ। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যদি পূর্বের নবীগণের আমলে আমাদের নবী করীম ﷺ -এর আবির্ভাব ঘটত, তাহলে তাদের সবার নবী হতেন তিনিই, সকল নবী তাঁর উম্মত গণ্য হতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তিনি শুধু উম্মতের নবী নন, বরং সকল নবীগণেরও নবী। যেমন এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, যদি হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার আনুগত্য ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকত না। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হযরত ঈসা (আ.) -এর আবির্ভাব ঘটবে, তখন তিনিও পবিত্র কুরআন ও তোমাদের নবীর বিধান অনুযায়ী আমল করবে। –[মা'আরিফ, ইবনে কাছীর]

এসব হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হলো যে, মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত সর্বব্যাপী এবং সর্বজনীন। তাঁর শরিয়তের মধ্যে অন্যান্য শরিয়ত নিহিত রয়েছে। তাঁর এ বাণী بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً দ্বারা এ কথার সমর্থন মিলে। অতএব এ কথা বুঝা ঠিক হবে না যে, নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত কেবল তাঁর যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী উম্মতের জন্য, বরং তাঁর নবুয়তের আমল এত ব্যাপৃত, যা হযরত আদম (আ.)-এর নবুয়তের পূর্বে সূচিত হয়েছে। كُنْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ অর্থাৎ আমি তখনও নবী ছিলাম যখন আদম (আ.) রূহ ও দেহের মধ্যে ছিলেন। হাশরের ময়দানে শাফাআতে কুবরা -এর জন্য অগ্রসর হওয়া এবং সকল আদম জাতি মহানবী ﷺ -এর পতাকাতলে সমবেত হওয়া, শবে মেরাজে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমস্ত নবীগণের ইমামতি করা মহানবী ﷺ -এর সর্বোপরি নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের নির্দশন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨٦. كَيْفَ اَىْ لَا يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَىْ وَشَهَادَتُهُمْ اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَقَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ الْحُجَجُ الظَّاهِرَاتُ عَلٰى صِدْقِ النَّبِىِّ ﷺ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৮৬. ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্যদানের পর এবং রাসূল ﷺ -এর সত্যতার স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর যে সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাকে আল্লাহ কিরূপে সত্য পথে হেদায়েত করবেন? অর্থাৎ তিনি তা করবেন না। كَيْفَ ই প্রশ্নবোধক শব্দটি এ স্থানে না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। شَهِدُوْا এটা অতীত কালবোধক ক্রিয়া হলেও এ স্থানে شَهَادَةٌ অর্থাৎ مَصْدَرْ বা ক্রিয়ার উৎস অর্থে ব্যবহৃত। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ কাফেরগণকে হেদায়েত করেন না। [অর্থাৎ আল্লাহ নিজ থেকে হেদায়েত দিয়ে দেন না। যদি বান্দা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ না করে।]

٨٧. اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

৮৭. এরাই তারা, যাদের প্রতিফল হলো আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মানুষ সকলের পক্ষ হতে লানত বা অভিসম্পাত।

٨٨. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَىِ اللَّعْنَةِ اَوِ النَّارِ الْمَدْلُوْلُ بِهَا عَلَيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ يُمْهَلُوْنَ.

৮৮. তারা এতে অভিসম্পাত বা লানত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিতবহ জাহান্নামে স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না। এবং তাদেরকে বিরামও সময়ও দেওয়া হবে না।

٨٩. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا عَمَلَهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُمْ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

৮৯. তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদের আমল সংশোধন করে তারা ব্যতিক্রম। নিশ্চয় আল্লাহ এদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম দয়ালু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَيْفَ لَا يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ : এ আয়াতের পূর্বে যে সকল বিষয়কে বারবার বর্ণনা করা হয়েছিল এখানে একই কথার পূর্ণরাবৃত্তি ঘটেছে। তা এই যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে আরবের ইহুদি আলেমগণ জানত এবং মুখে সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, তিনি সত্য নবী। তিনি যে দীক্ষা এনেছেন তা পূর্বের নবীদের আনীত দীক্ষার অনুকূলে। এরপর তারা যা কিছু করেছে তা নিছক গোঁড়ামি এবং শত্রুতামূলক। এটা ছিল তাদের প্রাচীন অভ্যাসের ফল। শত শত বৎসর যাবৎ তারা সে দোষে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছিল।

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ : কিন্তু যারা মুরতাদ হওয়ার পরে অনুতপ্ত হয়েছে এবং তওবা করে নিজ নিজ আমল ও আকিদা সংশোধন করেছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমাকারী, দুনিয়ায় সৎ আমলের প্রতি এবং পরকালে বেহেশতের প্রতি তাদের পথ নির্দেশকারী।

মুরতাদের তওবা গ্রহণযোগ্য : যে গুনাহই হোক না কেন তওবা দ্বারা তা ক্ষমা হয়ে যায়। তবে তওবার ক্ষেত্রে শর্ত হলো পাপ যে ধরনের হবে, তওবা সে ধরনের হতে হবে। জুলুম-অত্যাচারের তওবা হলো মজলুমের নিকট ক্ষমা চাইতে হবে বা যে কোনো উপায়ে ক্ষমা করাতে হবে। সুদখোরির তওবা হলো পূর্বে গৃহীত সুদের মাল ফেরত দিতে হবে। যদি এরূপ না করে কেবল অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি দিলে তওবা করে তাতে আল্লাহর হক সংক্রান্ত বিষয়াদি ক্ষমা হবে; কিন্তু বান্দার হক সংক্রান্ত সকল পাপ বহাল থাকবে। −[মা'আলিম]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৯০. وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعِيْسَى بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ بِمُوْسَى ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا بِمُحَمَّدٍ لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ إِذَا غَرْغَرُوْا أَوْ مَاتُوْا كُفَّارًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ .

৯০. আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল করেন, মূসার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর যারা ঈসাকে অস্বীকার করল, অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করে যাদের কুফরি আরো বৃদ্ধি পেল। মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছে গেলে বা কাফের অবস্থায় মারা গেলে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট।

৯১. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ مِقْدَارَ مَا يَمْلَؤُهَا ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُدْخِلَ الْفَاءُ فِي خَبَرِ إِنَّ لِشِبْهِ الَّذِيْنَ بِالشَّرْطِ وَإِيْذَانًا بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقَبُوْلِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْهُ .

৯১. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যান-কারীরূপে যাদের মৃত্যু ঘটে, তাদের পক্ষে পৃথিবী পূর্ণ অর্থাৎ তাও ভরে যায় ততটুকু পরিমাণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও কখনো তা কবুল করা হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি; আর তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তা অর্থাৎ এ পরিণাম থেকে তাদের কেউ রক্ষাকারী নেই।
যেহেতু اَلَّذِيْنَ -তে শর্তের মর্মের সাথে সামঞ্জস্য বিদ্যমান সেহেতু إِنَّ-এর خَبَرٌ বা বিধেয় فَلَنْ يُقْبَلَ -এ ف ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর মাধ্যমে এদিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, কাফের রূপে মৃত্যুবরণ করাই হলো তাদের তওবা কবুল না হওয়ার কারণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا (الاية) : এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মুরতাদ হওয়ার পরে যে ব্যক্তি তার উপর অটল থাকে; তওবা করে না, এমতাবস্থায় তার মৃত্যুর নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়। তখন তার তওবা কবুল হবে না। হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা জনৈক দোজখিকে বলবেন, যদি তোমার নিকট সারা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে কি দোজখের শাস্তির বিনিময়ে তা দান করা পছন্দ করবে? লোকটি বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন– দুনিয়ায় আমি তোমার নিকট এর চাইতে অনেক সহজ বস্তু কামনা করেছিলাম। তা এই যে, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক থেকে বিরত থাকনি। –[মুসনাদে আহমদ, বুখারী ও মুসলিম]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব রয়েছে। দুনিয়ায় তারা যদি কোনো ভালো কাজ করে থাকে, তাহলে কুফরির কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআন -এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, লোকটি অতিথিপরায়ণ ও গরিব-দুঃখীর সহায়তাকারী এবং ক্রীতদাস মুক্তকারী। এ সকল আমল কি তার উপকারে আসবে? নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, না। কারণ সে একদিনও আল্লাহর নিকট তার পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। –[মুসলিম]

http://islamiboi.wordpress.com

اَلْجُزْءُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পারা

৯২. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَىْ ثَوَابَهُ وَهُوَ الْجَنَّةُ حَتّٰى تُنْفِقُوْا تَصَدَّقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ . مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ فَيُجَازِىْ عَلَيْهِ .

৯৩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ اِنَّكَ تَزْعَمُ اَنَّكَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ لَا يَاْكُلُ لُحُوْمَ الْاِبِلِ وَاَلْبَانَهَا كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا حَلَالًا لِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَاءِيْلُ يَعْقُوْبُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَهُوَ الْاِبِلُ لَمَّا حَصَلَ لَهٗ عِرْقُ النَّسَا بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ فَنَذَرَ اِنْ شُفِىَ لَا يَاْكُلُهَا فَحَرَّمَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ اِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ تَكُنْ عَلٰى عَهْدِهٖ حَرَامًا كَمَا زَعَمُوْا قُلْ لَهُمْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَا لِيَتَبَيَّنَ صِدْقُ قَوْلِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ فَبُهِتُوْا وَلَمْ يَاْتُوْا بِهَا .

৯৪. قَالَ تَعَالٰى فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اَىْ ظُهُوْرِ الْحُجَّةِ بِاَنَّ التَّحْرِيْمَ اِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ يَعْقُوْبَ لَا عَلٰى عَهْدِ اِبْرَاهِيْمَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ الْمُتَجَاوِزُوْنَ الْحَقَّ اِلَى الْبَاطِلِ .

অনুবাদ :

৯২. তোমরা কল্যাণ তথা কল্যাণের ছওয়াব আর তা হচ্ছে বেহেশত লাভ করতে পারবে না। যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের প্রিয়তম বস্তু তথা তোমাদের অর্থ-সম্পদ হতে ব্যয় দান না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। সুতরাং তিনি এর উপর প্রতিদান দেবেন।

৯৩. ইহুদিরা যখন বলল, [হে মুহাম্মদ ﷺ] আপনি তো মনে করেন যে, আপনি মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর আছেন। অথচ ইবরাহীম (আ.) উটের গোশতও খেতেন না এবং দুধও ব্যবহার করতেন না। তখন তাদের জবাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাওরাত নাজিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল তথা হযরত ইয়াকূব (আ.) যেগুলো নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। আর তা ছিল উট যখন তার ইরকুননাসা ব্যাধি বা সাইটিকা রোগ হয়ে যায় (عِرْقُ النَّسَا) [শব্দটি নূনের জবর ও আলিফে মাকসূরার সাথে] তখন তিনি মানত করলেন যে, তিনি যদি সুস্থ হয়ে যান তাহলে উটের গোশত ও দুধ ব্যবহার করবেন না। সেগুলো ব্যতীত সকল আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। আর ইয়াকূবের নিজের উপর উট হারাম করে নেওয়ার বিষয়টা তো ইবরাহীমের পরের ঘটনা। তাঁর [ইবরাহীমের] যুগে উটের গোশত ও দুগ্ধ হারাম ছিল না। যেরূপ ইহুদিদের ধারণা। আপনি তাদেরকে [ইহুদিদেরকে] বলে দিন তোমরা তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর যাতে তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও। ফলে তারা নির্বাক হয়ে পড়ে এবং তাওরাত এনে দেখাতে পারেনি।

৯৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– অতএব, এরপরও অর্থাৎ হারাম করার বিষয়টি ইয়াকূবের তরফ থেকে হয়েছে ইবরাহীমের পক্ষ থেকে নয়– এই প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার পরও যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারাই জালেম। যারা হক ছেড়ে বাতিলের প্রতি ধাবমান।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٩٥. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فِى هٰذَا كَجَمِيْعِ مَا اَخْبَرَ بِهٖ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ الَّتِىْ اَنَا عَلَيْهَا حَنِيْفًا مَائِلًا عَنْ كُلِّ دِيْنٍ اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

৯৫. [হে রাসূল ﷺ !] আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন, এসব বিষয়েই যার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা সবাই ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর। যার উপর আমি রয়েছি। যিনি ছিলেন সকল বাতিল ধর্ম থেকে সরে গিয়ে একনিষ্ঠভাবে। [সত্যধর্ম] দীনে ইসলামের অনুসারী। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

তাহকীক ও তারকীব

نَالَ يَنَالُ কাঙ্খিত বস্তুতে পৌঁছা, পাওয়া, লাভ করা। اَلْبِرُّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পুরস্কার, বেহেশ্‌ত, কল্যাণ, অধিক পরিমাণ উপহার, সত্যবাদিতা ও অনুগত। [কামূস] কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, بِرّ শব্দটি যদি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার অর্থ হয় আনুগত্য, সত্যবাদিতা ও উপকারের ব্যাপকতা, তখন তার বিপরীতে اَلْفُجُوْرُ [নাফরমানি] ও اَلْعُقُوْقُ [নাফরমানি, বিরুদ্ধচারণ] আসে। তবে بِرّ এর সম্পর্ক যদি আল্লাহর সাথে করা হয় তখন তার উদ্দেশ্য হয় সন্তুষ্টি, রহমত ও জান্নাত। তখন তার বিপরীত শব্দ আসে غَضَبٌ [গোস্‌সা, ক্রোধ] ও عَذَابٌ [শাস্তি]। আলোচ্য আয়াতে بِرّ শব্দের মর্ম সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মুজাহিদ (র.) বলেন, এর মর্ম হলো জান্নাত। মুকাতিল ইবনে হিব্বানের মতে, তাক্‌ওয়া। কতিপয় ওলামাদের মতে আনুগত্য এবং কারো মতে কল্যাণ।-[তাফসীরে মাযহারী উর্দূ খ. ২, পৃ. ২৯১]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) হিবরুল উম্মাহ তথা উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ ইবনে আব্বাসের তাফসীরটিকেই গ্রহণ করেছেন। مِمَّا تُحِبُّوْنَ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয় পদটি بَعْضِيَّة অংশ বুঝাবার অর্থে এসেছে بَيَانِيَّة বা ব্যাখ্যা বুঝাতে নয়। তবে কেউ কেউ مِنْ -কে بَيَانِيَّة ও বলেছেন। এক কেরাতে مِمَّا تُحِبُّوْنَ -এর বদলে بَعْضَ مَا تُحِبُّوْنَ রয়েছে।

اِسْرَائِيْل ইবরানী বা হিব্রু ভাষার শব্দ। এর আরবি অনুবাদ হলো عَبْدُ اللّٰهِ [আব্দুল্লাহ] এটা হযরত ইয়াকুব (আ.) -এর নাম। আর তাঁর লকব ছিল ইয়াকুব। يَعْقُوْبُ [ইয়াকূব] অর্থ পরে বা পিছনে আগত ব্যক্তি। ইয়াকুবের অন্যান্য ভ্রাতাগণের জন্মের পর যেহেতু ছোট ভাই হিসেবে তাঁর জন্ম পরে হয়েছিল। এজন্যে তাঁকে ইয়াকুব বলা হতো। عِرْقُ النَّسَا পায়ের বিশেষ এক রোগ ব্যাপ্‌িক বলে। نَسَا শব্দটি عَصَا শব্দটির ওজনে হবে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৪৯, কামালাইন পারা ৪. পৃ. ৩]

مِلَّةَ : দীনের জন্য ঐ তরীকাকে মিল্লাত বলে যাকে আল্লাহ পাক নবীদের জবানে স্বীয় বান্দাদের জন্য শরিয়ত সিদ্ধ করেছেন। যাতে করে তারা নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহ অর্জন এবং উভয় জগতের দুরস্তী ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। মিল্লাত ও দীনের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, মিল্লাতের সম্পর্ক হয় নবীর দিকে। যথা ইবরাহীমের মিল্লাত, মূসার মিল্লাত, মুহাম্মদ ﷺ -এর মিল্লাত ইত্যাদি। পক্ষান্তরে দীনের সম্পর্ক হয় আল্লাহর দিকে। যেমন এটা আল্লাহর দীন। এটা আল্লাহর মিল্লাত বলা জায়েজ হবে না। তেমনিভাবে মিল্লাতের প্রয়োগ শরয়ী আহকামের সমষ্টির উপর হয়ে থাকে। এক একটি হুকুমের উপর মিল্লাত শব্দের ব্যবহার হয় না। সুতরাং শুধু নামাজ বা শুধু জাকাতকে মিল্লাত বলা যাবে না। [মাআরিফুল কুরআন, ইদরীস কান্দলবী (র.) খ. ২ পৃ. ৬. حَنِيْف - বহুবচনে حُنَفَاءُ সরল, ইসলামি বিধি বিধানের অনুসারী, মিল্লাতে ইবরাহীমির অনুসারী ও একত্ববাদী।

কতিপয় শব্দের তারকীব : مِمَّا এর মধ্যে مَا শব্দটি মাওসূলা বা মাওসূফা। আব্দুল হক্কানী বলেন, مَا টি এখানে মাসদারিয়া হতে পারে না। তবে আলূসী (র.) বলেছেন, আবূ আলীর মতে, মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত মাসদারিয়া ও مَا টি হতে পারবে। فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ -এর মধ্যে ব্যবহৃত بِهٖ যমীরের মারজি' [প্রত্যাবর্তন স্থল] পূর্বোক্ত مَا বা شَىْءٌ

http://islamiboi.wordpress.com

مِنْ قَبْلُ -মহল্লে নসবের মধ্যে অবস্থিত হয়েছে, কারণ এটা كَانَ -এর খবর حِلًّا হতে اِسْتِثْنَاء হয়েছে। اِلَّا مَا حَرَّمَ মুতা'আল্লিক হয়েছে حَرَّمَ ফে'লের সঙ্গে। আর مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ মুতা'আল্লিক হয়েছে اِفْتَرٰى ফে'লের সাথে। اِبْرَاهِيْمَ - حَنِيْفًا থেকে হাল হয়েছে। مِلَّةً শব্দ থেকেও হাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। -[তাফসীরে হক্কানী. পারা ৪, পৃ. ২-৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক একথা বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, কাফেরদের নাজাতের জন্য আখিরাতে গিয়ে তারা যদি সারা পৃথিবীর সম পরিমাণ অর্থ সম্পদও ব্যয় করে দেয়, তবুও তাদের জন্য উপকারী হবে না। لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ আয়াতটিতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে ব্যয় করলে আখিরাতে তাদের জন্য উপকারী হবে। -[তাফসীরে কাবীর- খ. ৮ পৃ. ১৪৭]

আলোচ্য আয়াত ও সাহাবাদের আমলের আবেগ :
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ الخ আয়াতটি অবতরণের পর সাহাবাদের অনেকেই নিজ নিজ প্রিয় বস্তু খোঁজে বের করে আল্লাহর রাসূলের দরবারে এসে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য দরখাস্ত করতে লাগলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন- মদিনার আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন হযরত আবূ তালহা আনসারী (রা.)। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক একটি বাগান। নবী করীম ﷺ এই বাগানটিতে মাঝে মধ্যে তশরিফ নিয়ে এর মিষ্টি মধুর পানি পান করতেন। অতঃপর যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ الخ আয়াতটি নাজিল হলো তখন আবূ তালহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা নিজের প্রিয় বস্তু দান না করা পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো আমার বায়রুহা বাগান। তাই এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম। আমি এর কল্যাণ আল্লাহর কাছে সঞ্চিত রাখতে চাই। সুতরাং আপনার ইচ্ছামতে একে ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা লাভজনক সম্পদ, তা লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কথা শুনেছি। আমি মনে করি তোমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বাগানটি দান করে দিলে ভালো হবে। হযরত আবূ তালহা বললেন, তা আমি করে নিবো ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর হযরত আবূ তালহা বাগানটি তাঁর আত্মীয় ও চাচার সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, হাস্‌সান ইবনে সাবেত ও উবাই ইবনে কাবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। [হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালেক, আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে হুমাইদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ।] এ রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা গেল, দান খয়রাত কেবল তাই নয় যা সাধারণ গরিবদেরকে দেওয়া হয়, বরং নিজের পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজনদের উপর ব্যয় করলেও তা ছওয়াবের কারণ হয়।

* হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) নিজের একটি ঘোড়া নিয়ে হুজুর ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার সম্পদের মধ্যে এ ঘোড়াটিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তাই আমি একে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতে চাই। হুজুর ﷺ একে গ্রহণ করে নিলেন। তবে এটাকে গ্রহণ করে তিনি তাঁরই পুত্র উসামাকে দিয়ে দিলেন। হযরত যায়েদ এটা দেখে মনে মনে কিছুটা চিন্তিত হলেন, যে আমার সদকা আমারই ঘরে চলে আসল। ফলে হুজুর ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, আল্লাহ পাক তোমার সদকা অবশ্যই কবুল করেছেন।
* হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এ আয়াতটি তেলাওয়াতকালে আমার মনে একথা আসলো যে, আমার সম্পদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়বস্তু হলো আমার মারজানা নামক রুমী দাসীটি। তাই আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একে আজাদ করে দিলাম। তিনি বলেন, আল্লাহ পাকের রাহে দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ না হলে আমি বাঁদীটিকে ফেরত এনে বিয়ে করে নিতাম।

হযরত ওমর (রা.)-ও এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে তার একাধিক বাঁদিকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।

-[দুররে মানছূর খ. ১, পৃ. ৫০]

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) টাকার বিনিময়ে চিনি খরিদ করে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর সরাসরি টাকা দান করে দেন না কেন? তার উত্তরে তিনি বললেন, চিনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। তাই আমার ইচ্ছে হলো সর্বাধিক প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করবো। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কেও তাঁর শিষ্য নাফে (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইবনে ওমর চিনি ক্রয় করে তা সদকা করে দিতেন। আমরা বললাম, যদি আপনি চিনি ক্রয় না করে এর মূল্য দ্বারা অন্য কোনো খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে নিতেন তাহলে গরিবদের জন্য অধিক উপকারী হতো। এর উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা যা বলছ, আমি তা অবশ্যই বুঝি। তবে আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি– لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ [তোমাদের প্রিয় বস্তু দান না করা পর্যন্ত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর ইবনে ওমর তো চিনিকে ভালোবাসে। [তাই আমি চিনি ক্রয় করে সদকা করছি।]

–[দূররে মানছূর খ. ১, পৃ. ৫১]

এরূপ আরো বহু ঘটনা হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থাবলিতে বিবৃত রয়েছে। এই আয়াত দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাস্তায় যে কোনো সদকা খয়রাত চাই ফরজ, ওয়াজিব হোক বা নফল হোক, তখনই তাতে পরিপূর্ণ ফজিলতও ছওয়াব অর্জন হবে যখন নিজের প্রিয় ও মায়ার বস্তু আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা হবে। এ রকম নয় যে, সদকা খয়রাত কে জরিমানা মনে করে দায়িত্ব হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বেকার ও নিম্নমানের বস্তু দান করার জন্য বেছে নিবে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫১৬]

বেকার ও নিজের অপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করার মধ্যেও ছওয়াব রয়েছে : যদিও উপরিউক্ত আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, পরিপূর্ণ কল্যাণ ও অধিক ছওয়াব অর্জন করাটা নির্ভরশীল নিজের প্রিয় বস্তু খোদার রাহে দান করার মধ্যে। তবে এতে একথা বুঝা যাচ্ছে না যে, নিজের অপ্রয়োজনীয়, বেকার নষ্ট মাল দান করার মধ্যে কোনো রকম ছওয়াবই নেই। বরং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা যা কিছু দান করছ আল্লাহ তার সম্পর্কে অবগত। এই আয়াতের মর্মে যদিও একথা রয়েছে যে, পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করা এবং কামেল নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া নির্ভরশীল প্রিয়বস্তু দান করার মধ্যে নিহিত। তবে যে কোনো ধরনের দান সাধারণ ছওয়াব হতে খালি নয়। নিজের অপ্রয়োজনীয় ও বেকার জিনিস-পত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি গরিবদেরকে দান করলেও এক রকম ছওয়াব পাওয়া যাবে। তবে দান করতে গেলেই শুধু বেকার নষ্ট ও নিম্নমানের বস্তু দান করার তরিকা গ্রহণ করে নেওয়াটা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫১৬]

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন : আয়াতে مِمَّا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রিয়বস্তু নিঃশেষ করে আল্লাহর পথে ব্যয় করা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য এই যে, যতটুকু ব্যয় করবে তার মধ্যে ভালো ও প্রিয়বস্তু দেখে ব্যয় করবে। তবেই পুরোপুরি ছওয়াবের অধিকারী হবে।

প্রিয়বস্তু ব্যয় করার অর্থ শুধু অধিক মূল্যবান বস্তু ব্যয় করা নয়। বরং স্বল্প এবং মূল্যের দিক দিয়ে নগণ্য এমন বস্তু কারো দৃষ্টিতে প্রিয় হলে, তা দান করলেও পুরাপুরি ছওয়াবের অধিকারী হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি মনে যা দান করা হয়, তা একটা খেজুরের দানা হলেও তাতে দাতা আয়াতে বর্ণিত ছওয়াবের অধিকারী হবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ১১১]

একটি প্রশ্নের সমাধান : আয়াত থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, যারা গরিব, নিঃস্ব এবং দান করার মতো অর্থ কড়ির মালিক নয়, তারা আয়াতে বর্ণিত কল্যাণ ও বিরাট পূণ্য হতে বঞ্চিত হবে। কারণ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রিয়বস্তু ব্যয় করা ব্যতীত এ পুণ্য অর্জিত হবে না। গরিব মিসকিনদের হাতে এমন কোনো আকর্ষণীয় বস্তু নেই যে, তা ব্যয় করে তারা এ পুণ্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়াতের অর্থ এরূপ নয় যে, প্রিয় অর্থকরী ব্যয় করা ব্যতীত এ লক্ষ্য অর্জিত হবে না। বরং এ পুণ্য ইবাদত, জিকির, তেলাওয়াতও অধিক নফল ইত্যাদি উপায়েও অর্জন করা যায়। কোনো কোনো হাদীসে এ বিষয় বস্তুটি পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আলুসী (র.) তার বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মা'আনিতে এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তা নিম্নে পেশ করা হলো–

১. আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে কথাটি বলা হয়েছে। আর তা সম্ভাব্যের শর্ত সাপেক্ষে হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুবালাগার ভিত্তিতে সাধারণ ভাষায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. কারো মতে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ এর মর্ম হলো এই যে, পরিপূর্ণ সর্ব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থায় কল্যাণ অর্জন হবে না প্রিয়বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান না করা পর্যন্ত। আর ফকির ব্যক্তি, যে নিজের দীর্ঘ জীবনের কোনো সময় আল্লাহর রাহে দান করেনি। এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ বলা অসমীচীন হবে না যে, সে পরিপূর্ণ নেককার হলো না এবং আল্লাহর পূর্ণ রহমত লাভে ধন্য হতে পারল না।

http://islamiboi.wordpress.com

৩. **কারো মতে এর জবাব হলো** এই যে, তোমরা প্রিয়বস্তু ব্যয় না করে অপ্রিয় বস্তু ব্যয় করে **পরিপূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা। এই জবাবের সারমর্ম** হলো এই যে, প্রিয়বস্তু দান করলে কল্যাণ অর্জন হবে। আর অপ্রিয় বস্তু দান **করলে কল্যাণ অর্জন হবে না। তবে আয়াতে** একথার প্রমাণ নেই যে, সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন প্রিয় বস্তুদান করার মধ্যে সীমিত এবং **অন্যান্য নির্দেশিত কার্যাবলি** পালন করণে কল্যাণ অর্জন হবে না। তখন ব্যয় করতে অক্ষম গরিবের জন্য নেককার হওয়া **এবং অন্যান্য আমলের** মাধ্যমে আল্লাহর কল্যাণ লাভে ধন্য হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। অনেক সময় মাল দান করার **মাধ্যমে কল্যাণ লাভের** তুলনায় অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে অধিক কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। তাই তো ওলামাদের **গ্রহণযোগ্য মতানুসারে** ধৈর্যধারণকারী গরিব শূকুর গুজার ধনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। −[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৩, পৃ. ২২৩]

قَوْلُهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ : অর্থাৎ তোমরা কোন জিনিস ব্যয় করছ, তা উত্তম না অনুত্তম, প্রিয় না **অপ্রিয়, ভালো না মন্দ** আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে অবগত আছেন। তাই সে অনুপাতেই তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ **যেহেতু সহীহ ও** ভেজাল নিয়ত সম্পর্কে অবগত, তাই মুখে বলার কোনো ফায়দা নেই। আল্লামা আলুসী (র.) বলেছেন, **فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ বলে** গোপনীয় ভাবে সদকা-খয়রাত করার দিকে উৎসাহ দানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ .... الخ : অর্থাৎ সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। **অর্থাৎ ইহুদিগণ** যে সকল বস্তু হারাম হওয়ার কথা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি সম্পর্ক করত। সে সব বস্তুর সবটাই বনী **ইসরাঈলের** জন্য হালাল ছিল। ঢালাও ভাবে সর্ব প্রকার খাদ্যবস্তু হালাল হওয়ার কথা বলা হয়নি যে, শুকর ও মৃত প্রাণির গোশত **হালাল ছিল** বলতে হবে। তবে হালাল বস্তু সমূহের মধ্য হতে হযরত ইয়াকূব (আ.) তাওরাত নাজিলের পূর্বে বিশেষ কারণে **তাঁর** নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর উম্মতের জন্যও তা হারাম ঘোষিত হয়ে যায়। হে **ইহুদিগণ!** যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে উটের গোশত ও দুধ নূহ ও ইবরাহীমের যুগ থেকে এ পর্যন্ত হারাম হিসেবে চলে আসার দাবিতে সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং পাঠ করে দেখাও। কিন্তু তারা সেই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে গিয়ে তাওরাত এনে দেখায়নি। এতে প্রমাণিত হলো, তারা তাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী। অতএব যারা নিজেদের মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে যে, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে উটের মাংস হারাম করেছেন, তারা বড়ই অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারী। হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা এখন ইবরাহীমের ধর্মের তথা ইসলামের অনুসারী হয়ে যাও, যাতে সামান্যতম বক্রতাও নেই। তিনি [ইবরাহীম (আ.)] মুশরিক ছিলেন না।

আয়াতের যোগসূত্র : বহুদূর থেকে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছিল। তাদের বিভিন্ন বিতর্ক অভিযোগের জবাব দেওয়া হচ্ছিল। এখানে সেই ধারাবাহিকতায়ই ইহুদিদের এক অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) পূর্বের আয়াতের সাথে যোগসূত্র বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রথম আয়াতে প্রিয় বস্তু ব্যয় করার আলোচনা ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রিয়বস্তু ত্যাগ করার কথা উল্লেখ হয়েছে। এভাবে আয়াত দুটির মধ্যে খুবই সূক্ষ্ম সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে। −[মা'আরিফ ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ৪]

শানে নুযূল : আল্লামা আলূসী কলবী থেকে ওয়াহেদীর বর্ণনা নকল করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন বললেন, আমি মিল্লাতে ইবরাহীম তথা ইবরাহীমের ধর্মের উপর রয়েছি। তখন ইহুদিরা অভিযোগ করে বলল, তা কেমন করে হবে? আপনি তো উটের গোশত ও দুধ খান, অথচ ইবরাহীমের ধর্মে তা হারাম ছিল। হুজুর ﷺ বললেন, ইবরাহীমের জন্য তা হালাল ছিল তাই আমরাও হালাল বিশ্বাস করি। তা শুনে ইহুদিরা বলল, আমরা আজ যে সকল বস্তুকে হারাম মনে করছি সেগুলো হযরত নূহ ও ইবরাহীম (আ.)-এর আমল থেকে হারাম হিসেবে চলে আসছে। তাদের এ কথার প্রতিবাদে এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহ পাক كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ .... الخ আয়াতটি নাজিল করেছেন।

−[তাফসীরে রূহুল মা'আনী− খ. ৪ পৃ. ২]

মূলত তারা নসখ বা রহিত করণের অস্বীকারকারী ছিল। তাই তাদের প্রতিবাদে এ আয়াত রহিত করণের ঘোষণা নিয়ে নাজিল হয়েছে যে, হালাল বস্তুকে হারাম করে নেওয়াটা তো রহিত করণের মাধ্যমেই হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে যে, সমস্ত খাদ্যদ্রব্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য হালাল ঘোষণা করেছেন, তা বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। শুধু যে খাদ্য দ্রব্য হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বেচ্ছায় নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিলেন, তা ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্যই তাদের জন্য হালাল ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত ইয়াকুব (আ.) নিজের উপর উট হারাম করে নেওয়ার কারণ : হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর عِرْقُ النَّسَا [ইরকুন নাসা] বা সাইটিকা রোগ দেখা দিয়েছিল। আর ইরকুন নাসা রোগ উরুর রগের মধ্যে এক রকম ব্যাধি হয়, এ রোগটি নিতম্ব বা পাছা থেকে উরু পর্যন্ত আসে। ঐ রোগে যে ব্যক্তি আক্রান্ত হয় ক্রমান্বয়ে তাঁর পা শুকিয়ে সে লেংড়া হয়ে পড়ে। ঐ রোগে যখন হযরত ইয়াকূব (আ.) আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি মানত করলেন, আল্লাহপাক যদি আমাকে সুস্থ করেন তাহলে আমি আমার প্রিয় খাবার বর্জন করে নিব। আর তাঁর প্রিয় খাবার ছিল উটের গোশত ও তাঁর দুধ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করলে তিনি তাঁর মানত অনুযায়ী নিজের উপর উটের গোশত খাওয়া এবং তার দুধ পান করা হারাম করে নেন। ভিন্ন এক রেওয়ায়েতে এসেছে যে, আমি যদি সুস্থ হই তবে আমার খাতিরে আমার উম্মতের উপরও উটের গোশত ও দুধ হারাম হয়ে যাবে। মোটকথা তিনি তাঁর মানত পুরা করতে নিজের উপর ইজতেহাদী ভাবে বা জাহেদগণের ন্যায় মনের বিরোধিতা করতে গিয়ে উটের গোশত ও তার দুধ নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাকেই আল্লাহ তা'আলা اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ الخ বলে উল্লেখ করেছেন।

মাসআলা : হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়তে হালাল বস্তুকে নজর মানত করে হারাম করে নেওয়ার অনুমতি ছিল। তাই তিনি এরূপ করেছিলেন। যেরূপ আমাদের শরিয়তে মুহাম্মদীতে হালাল বস্তুকে নজর মানত করে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে আমাদের শরিয়তে কোনো হালাল বস্তুকে নজর-মানত বা কসমের মাধ্যমে হারাম করে নেওয়ার অনুমতি নেই। হুজুর ﷺ মধু বা আপন বাদী মারিয়াকে বিবিদের খুশি করার উদ্দেশ্যে কসম করে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন, ফলে এর অসমর্থনে আল্লাহ পাক সূরা তাহরীমে নাজিল করেন, لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ الخ হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে কেন হারাম করেছেন? এতে প্রমাণিত হলো, আমাদের শরিয়তে হালালকে হারাম করে নেওয়ার অনুমতি নেই।

عِرْقُ النَّسَا বা সাইটিকা রোগের চিকিৎসা : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, একটা গ্রাম্য বকরির একটা নিতম্ব বা পাছা নিয়ে একে জ্বালিয়ে গলানো যাবে। অতঃপর তিন অংশ করে প্রতিদিন একাংশ সকালে বাসিমুখে পান করে নিবে। এর মাধ্যমে ইরকুন নাসা ব্যাধি দূর হয়ে যাবে।

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে যে, হুজুর ﷺ বলেছেন, একটি আরবি মধ্যম ধরনের বকরির পাছা নিয়ে তাকে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হবে। অতঃপর পাছাটির হাড্ডির গলিত মগজ বের করা হবে। তারপর তিন অংশ করে প্রতিদিন খালি পেটে বাসিমুখে এক অংশ করে খেয়ে নিবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এ চিকিৎসাটি এক শতাধিক রোগীকে বলে দিয়েছি, তারা সবাই আল্লাহর হুকুমে সুস্থ হয়েছে। -[তাফসীরে কুরতুবী খ. ৪, পৃ. ১৩৩- হাশিয়াতুস সাবী, খ. ১, পৃ. ১৬৮]

اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ .... الخ তাওরাত নাজিল হওয়ার পূর্বে হযরত ইয়াকূব (আ.) উল্লিখিত বস্তু ছাড়া অন্য কিছু নিজের জন্য এবং বনী ইসরাঈলের জন্য হারাম করেননি। তবে তাওরাত নাজিল হওয়ার পর তাওরাত তাদের জুলুম, অন্যায়, অনাচার ও কুফরের কারণে তাদের শাস্তি হিসেবে আরো কিছু খাদ্যদ্রব্য তাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا . وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ . حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ . (اَلنِّسَاءُ . ١٦٠) ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ . (اَلْاَنْعَامُ . ١٤٦)

প্রভৃতি আয়াতে শাস্তিমূলকভাবে তাদের উপর হালাল বস্তু হারাম করে দেওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে।

-[তাফসীরে কুরতুবী খ. ৪, পৃ. ১৩৩]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٩٦. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا قِبْلَتُنَا قَبْلَ قِبْلَتِكُمْ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ مُتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ فِى الْاَرْضِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ بِالْبَاءِ لُغَةً فِىْ مَكَّةَ سُمِّيَتْ بِذٰلِكَ لِاَنَّهَا تَبُكُّ اَعْنَاقَ الْجَبَابِرَةِ اَىْ تَدُقُّهَا بَنَاهُ الْمَلٰئِكَةُ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ وَوُضِعَ بَعْدَهُ الْاَقْصٰى وَبَيْنَهُمَا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً كَمَا فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَفِىْ حَدِيْثٍ اَنَّهُ اَوَّلُ مَا ظَهَرَ عَلٰى وَجْهِ الْمَاءِ عِنْدَ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ زُبْدَةً بَيْضَاءَ فَدُحِيَتِ الْاَرْضُ مِنْ تَحْتِهِ مُبٰرَكًا حَالٌ مِنَ الَّذِىْ اَىْ ذَا بَرَكَةٍ وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ لِاَنَّهُ قِبْلَتُهُمْ .

৯৬. আর সামনের আয়াতটি ওই সময় নাজিল হয় যখন ইহুদিরা বলেছিল যে, আমাদের কিবলা [বায়তুল মুকাদ্দাস] তোমাদের কিবলার [কা'বার] পূর্বেকার [ঘর]। নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা উপাসনালয় হিসেবে মানুষের জন্য পৃথিবীতে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে ঐ ঘর যা বাক্কায় অবস্থিত। মক্কার এক লোগাত بَكَّةَ -ও রয়েছে, با বর্ণের জবরের সাথে। বাক্কাকে এই জন্য বাক্কা (بَكَّةٌ) বলে যে, بَكَّةَ অর্থ ভেঙ্গে দেওয়া, গুড়িয়ে দেওয়া। যেহেতু বাক্কা তাকে ধ্বংসকারী বড় বড় জালেমদের গর্দান ভেঙ্গে দেয় ও গুড়িয়ে ফেলে, এই জন্য তাকে বাক্কা বলে নামকরণ করা হয়েছে। আদম (আ.) সৃষ্টির পূর্বে এ ঘরটি ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর মসজিদে আকসা নির্মিত হয়েছে। ঘর দুটি নির্মাণের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান রয়েছে। যেরূপ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে। অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে যে, আকাশসমূহ এবং জমিন সৃষ্টিকালে পানির পৃষ্ঠের উপর সাদা ফেনার ন্যায় যে বস্তুটি প্রকাশিত হয়েছিল তাই কাবা ছিল। অতঃপর জমিনকে তার নীচ থেকে বিস্তৃত করা হয়েছে। লোকদের জন্য বরকতময় (مُبَارَكًا) শব্দটি اَلَّذِىْ ইসমে মাওসূল থেকে তারকীবের মধ্যে হাল হয়েছে। এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। কারণ মক্কা তাদের সকলেরই কিবলা।

٩٧. فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مِنْهَا مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ اَىِ الْحَجَرُ الَّذِىْ قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ فَاَثَّرَ قَدَمَاهُ فِيْهِ وَبَقِىَ اِلَى الْاٰنِ مَعَ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَتَدَاوُلِ الْاَيْدِىْ عَلَيْهِ وَمِنْهَا تَضْعِيْفُ الْحَسَنَاتِ فِيْهِ وَاَنَّ الطَّيْرَ لَا يَعْلُوْهُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ بِقَتْلٍ اَوْ ظُلْمٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ .

৯৭. তাতে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাকামে ইবরাহীম। অর্থাৎ ঐ পাথর যার উপর হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণকালে দাঁড়াতেন। তাঁর উভয় পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এবং লোকদের হাতে বারংবার স্পর্শ করার পরও অদ্যাবধি তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এই নির্দশনসমূহের আরেকটি হলো, তাতে কৃত পুণ্য কাজের ছওয়াব অধিক হওয়া এবং কোনো পাখিও এ গৃহের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি এ ঘরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায় হত্যা বা জুলুম প্রভৃতির জন্য তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হয় না।

http://islamiboi.wordpress.com

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ فِىْ مَصْدَرِ الْحَجِّ بِمَعْنٰى قَصَدَ وَيُبْدَلُ مِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا طَرِيْقًا فَسَّرَهُ ﷺ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اَوْ بِمَا فَرَضَهُ مِنَ الْحَجِّ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ .

আর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ ঘরের হজ করা লোকদের জন্য আবশ্যকীয়। حَجٌّ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূলের মধ্যে حَا বর্ণের যবর ও যের বিশিষ্ট হওয়া স্বতন্ত্র দুটি লোগাত। حَجٌّ অর্থ قَصَدَ অর্থাৎ ইচ্ছা ও সংকল্প করা। যারা ঐ ঘর পর্যন্ত ভ্রমণের সামর্থ্য রাখে। (مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا) পূর্বোক্ত اَلنَّاسُ শব্দ হতে বদল হয়েছে। سَبِيْلًا অর্থ طَرِيْقًا [রাস্তা, পথ] পথের সামর্থ্যের ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ খরচ ও ভ্রমণের বাহন [খরচ] দ্বারা করেছেন। এই হাদীসটি হাকেমসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে অথবা তার উপর ফরজকৃত হজের অস্বীকার করে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন অর্থাৎ জিন, মানব ও ফেরেশতাকুল ও তাদের ইবাদতের তিনি অমুখাপেক্ষী।

তাহকীক ও তারকীব

بَكَّةَ [বাক্কা] দ্বারা এখানে মক্কাই উদ্দেশ্য। একদল ওলামা বলেছেন, বাক্কা ও মক্কা একই বস্তুর দুই নাম। কেননা بَا আর مِيْم মীম উচ্চারণ স্থলের প্রেক্ষিতে কাছাকাছি সম্পর্ক রাখে। যেমন– رَاتِبٌ - هٰذَا دَائِمٌ - ضَرْبَةُ لَازِمٍ -এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ضَرْبَةُ لَازِبٍ . هٰذَا دَائِبٌ ও رَاتِمٌ বলা হয়ে থাকে। এখানে ও مَكَّةَ -এর বদলে بَكَّةَ বলা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ মতটিরই অনুসরণ করেছেন। বাক্কার নামকরণ সম্পর্কে সুয়ূতী (র.) বলেছেন যে, বাক্কা শব্দের অর্থ হলো ভেঙ্গে ফেলা, গুঁড়িয়ে ফেলা। যে কোনো জালিম বাদশা আল্লাহর ঘরের প্রতি আক্রমণ করতে চাইলে, এ ঘরের প্রতি বক্র ভাবে অশনি দৃষ্টিতে তাকালে, আল্লাহ পাক তার গর্দানকে ভেঙ্গে দেন এবং কালো হাতকে গুঁড়িয়ে দেন। তাই এই ঘরকে মক্কা বা বাক্কা বলা হয়ে থাকে।

* ভিন্ন মতে, বাক্কা শব্দের আরেক অর্থ হলো ভিড় করা। বলা হয় تَبَاكَ الْقَوْمُ অর্থাৎ লোকেরা পরস্পর ভিড় করেছে। তাই সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন মক্কাকে এই জন্যই বাক্কা বলা হয় যে, (لِاَنَّهُمْ يَتَبَاكُوْنَ فِيْهَا اَىْ يَزْدَحِمُوْنَ فِى الطَّوَافِ) লোকেরা তওয়াফ কালে এত ভিড় করে থাকে।
* আর مَكَّةَ শব্দটির অর্থ হয়েছে দূর করা। যেহেতু মক্কা লোকদের গোনাহকে দূর করে দেয়, তাই একে মক্কা বলা হয়। বলা হয় اَمْتَكَ الْفَصِيْلُ ضَرْعَ اُمِّهِ اِذَا امْتَصَّ مَا فِيْهِ – উটনীর বাচ্চা তার মায়ের স্তন হতে পৃথক হয়ে পড়েছে, যখন সে স্তনের দুধ চুষে শেষ করে নিয়েছে।
* মক্কার আরেকটি অর্থ হলো আকর্ষণ করা, টানা। মক্কা যেহেতু সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে তার দিকে চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট করে, তাই একে মক্কা বলা হয়। যেমন বলা হয়– اَمْتَكَ الْفَصِيْلُ اِذَا اسْتَقْصٰى مَا فِى الضَّرْعِ
* মক্কা শব্দের আরেক অর্থ হলো পানি শুকিয়ে যাওয়া। যেমন– سُمِّيَتْ مَكَّةُ لِقِلَّةِ مَائِهَا كَاَنَّ اَرْضَهَا اَمْتَكَ مَائَهَا
* ভিন্ন আরেকদল ওলামা মক্কা ও বক্কার মধ্যে পার্থক্য ও প্রভেদ বর্ণনা করেছেন। ১. তাদের কেউ বলেন, বাক্কা হলো মসজিদে হারামের নাম, আর মক্কা হলো পূর্ণ শহরের নাম। ২. আর তাদের অধিকাংশরা বলেন, মক্কা হলো মসজিদে হারাম ও মাতাফের নাম। আর বাক্কা হলো পূর্ণ শহরের নাম। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৬১-৬২]
* হযরত ইকরামা (রা.) বলেছেন, বায়তুল্লাহ ও তার আশপাশ হলো বাক্কা,. আর এ ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ শহরটাই মক্কা। ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, বায়তুল্লাহ ও মসজিদে হারাম হলো বাক্কা আর পূর্ণ হারাম শরীফ হচ্ছে মক্কা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফজ্জ হতে তানঈম পর্যন্ত হলো মক্কা, আর বায়তুল্লাহ হতে বাতহা পর্যন্ত হচ্ছে বাক্কা। মুজাহিদ (র.) বলেন, বাক্কা হলো কা'বা, আর কাবার চতুর্পাশ হলো মক্কা। –[দূররে মানুছূর খ. ২, পৃ. ৫৩]

http://islamiboi.wordpress.com

اَلْحَجُّ -এর শাব্দিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা সংকল্প করা। এখানে حَجٌّ শব্দের জীমে যবর ও পড়া যাবে, এবং حِجٌّ যের ও পড়া যেতে **পারে। উভয়টাই** প্রসিদ্ধ কেরাতে সাব্‌আর অন্তর্ভুক্ত। আর পরিভাষায় হজ বলা হয় هُوَ الْقَصْدُ فِىْ اَشْهُرٍ مَعْلُوْمَاتٍ اِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالنُّسُكِ فِى الْعِبَادَةِ কে। سَبِيْلًا রাস্তা, পথ, বহুবচনে سُبُلٌ। এখানে اِسْتِطَاعَةٌ মুযাফ উহ্য **রয়েছে। অর্থাৎ** اِسْتِطَاعَةُ السَّبِيْلِ যার ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে এসেছে زَادٌ পথ খরচ رَاحِلَةٌ যাতায়াত খরচ এর সাথে।

اَسْمَاءُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ [পবিত্র মক্কার নামসমূহ] : পবিত্র মক্কার অনেক নাম রয়েছে, যথা – ১. مَكَّةُ [মক্কা] ২. بَكَّةُ [বাক্কা] ৩. **اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ** [আল-বাইতুল আতীক] ৪. اَلْبَيْتُ الْحَرَمُ [আল-বায়তুল হারাম] ৫. اَلْبَلَدُ الْاَمِيْنُ [আল-বালাদুল আমীন] ৬. **اَلْمَامُوْنُ** [আল-মামুন] ৭. اُمُّ الرَّحِيْمِ [উম্মুর রাহীম] ৮. اُمُّ الْقُرٰى [উম্মুল কুরা] ৯. صَلَاحٌ [সালাহ] ১০. اَلْعَرْشُ [আল-আরশ] ১১. **اَلْقَادِسُ** [আল-কাদিস] ১২. اَلْمُقَدَّسُ [আল-মুকাদ্দাস] ১৩. اَلنَّبَاسَةُ [আন্‌-নাবাসা] ১৩. اَلْحَاطِمَةُ - [আল-হাতিমা] ১৫. **اَلْبَنَاسَةُ** - [আল-বানাসা] ১৬. اَلرَّأْسُ [আর-রাস] ১৭. كُرْثَاءُ [কুরছা] ১৮, اَلْبَلْدَةُ [আল-বালদা] ১৯. اَلْبَنِيَّةُ [আল-বিনয়াহ] ২০. **اَلْكَعْبَةُ** [আল-কাবা]। –[জালালাইন খ. ১, পৃ. ৫১৪]

তারকীব : اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ মুবতাদা لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ খবর, مُبَارَكًا - اَلَّذِىْ থেকে হাল, অথবা هُدًى ও مُبَارَكًا উভয়টাই وُضِعَ এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ পূর্বোক্ত খবর, আর حِجُّ الْبَيْتِ পরে উক্ত মুবতাদা। مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ মুবতাদা, এর খবর مِنْهَا উহ্য আছে। অথবা مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ . اَحَدُهَا উহ্য মুবতাদার খবর।

–[জামালাইন, তাফসীরে হক্কানী, হাশিয়াতুস সাবী]

مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا — وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ -এর اَلنَّاسُ হতে بَدَلُ الْبَعْضِ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ বলে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের তরফ থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত তথা দীনে ইসলামের উপর আরোপিত আরেকটি অভিযোগের জবাব দান করেছেন। নবী করীম ﷺ যখন আল্লাহর নির্দেশে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তন করে নিলেন। তখন ইহুদিরা হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের উপর অভিযোগ, আপত্তি ও সমালোচনা করতে শুরু করে দিল। আর তারা বলতে লাগল, বায়তুল মুকাদ্দাস কাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকেই কিবলা বানানো উচিত। কারণ এটা বরকতময় স্থান। এটাই হবে হাশরের স্থান, অনেক নবীগণের সমাধিস্থান, এবং পূর্ববর্তী সকল নবীদের এটাই কিবলা। সুতরাং এসব কিছুর পরও বায়তুল মুকাদ্দাসকে বাদ দিয়ে কাবাকে কিবলা বানানো মোটেই ঠিক নয়। তাদের এ অভিযোগের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হয়েছে, কাবাই বিশ্বের সর্ব প্রথম ঘর বা উপাসনার জন্য সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর [মসজিদ]। তাই কাবাই বায়তুল মুকাদ্দাস হতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। সুতরাং তাকে কিবলা বানানোটাই উত্তম হওয়ার কথা।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৫৬]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করতে নির্দেশ **দিয়েছিলেন। আর** বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মিল্লাতে ইবরাহীমেরই আমল। সুতরাং সমীচীন হলো এরপর **বায়তুল্লাহ শরীফ তার** ফজিলত শ্রেষ্ঠত্বের কথা আলোচনা করা। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৪]

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনূল মনজির ইবনে জুরাইজের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইহুদিরা বলেছিল বায়তুল মুকাদ্দাস কাবা **শরীফ থেকে শ্রেষ্ঠ।** কেননা বায়তুল মুকাদ্দাস বহু নবীর হিজরতের স্থান। আর তা পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত। আর মুসলমানগণ বলেছিলেন **কাবা শরীফ** শ্রেষ্ঠ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ **-এর দরবারে** যখন এসব কথার বিবরণ পৌছে তখন اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ থেকে مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ পর্যন্ত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৪]

http://islamiboi.wordpress.com

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الخ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইবাদতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে যে ঘরটি নির্মাণ করা হয়েছে, তা এ মক্কার বুকে অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য পথের দিশারী।

কাবাগৃহ সর্বপ্রথম ঘর হওয়ার মর্ম : কাবাগৃহ পৃথিবীর সর্ব প্রথম ঘর কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে।

এক: বসবাসের জন্য হোক বা উপাসনার জন্য হোক সর্বপ্রথম ঘর পৃথিবীতে যা নির্মাণ করা হয়েছিল তা হচ্ছে কাবাগৃহ। এর পূর্বে বিশ্বে আর কোনো রকম ঘর নির্মিত হয়নি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদা, ও সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কাবাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর।

দুই: ইবাদত বন্দেগীর জন্য নির্মিত ঘর হিসেবে সর্বপ্রথম গৃহ। মানুষের বসবাসের জন্য এর পূর্বে ও ঘর থাকতে পারে। তবে কাবাকে প্রথম গৃহ ফজিলতের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)-সহ কিছু সংখ্যক আলেম এ মতটাই পোষণ করেছেন।

হযরত আবূ জর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাস করা হলো, উভয় ঘর নির্মাণে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিলো? জবাবে হুজুর ﷺ বললেন, চল্লিশ বৎসরের। –[বুখারী ও মুসলিম]

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, মসজিদে হারাম নির্মাতা হলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাতা হলেন, হযরত দাউদ ও সুলাইমান (আ.)। তারা উভয়ের ও ইবরাহীমের নির্মাণের কালের ব্যবধান চল্লিশ বৎসরের চেয়ে অনেক বেশি।

১. এর এক জবাব হলো এই যে, ইবরাহীম (আ.) যেরূপ বায়তুল্লাহ নির্মাতা তেমনিভাবে বায়তুল মুকাদ্দাসেরও নির্মাণকারী। তিনি বায়তুল্লাহর নির্মাণ করার চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন।

২. বায়তুল মুকাদ্দাসকে দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলাইমানের পূর্বে হয়তো, অন্যকোনো নবী নির্মাণ করেছিলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ে তাঁর পরে নির্মাণ করেন। সুতরাং চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান সেই নবীর নির্মাণ কালের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪ পৃ. ৪-৫]

৩. শায়খ আহমদ সাবী মালেকী (র.) বলেন, বাহ্যিক ভাবে ফেরেশতাগণ কর্তৃক বায়তুল্লাহ নির্মাণর মধ্যেও বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান বুঝা গেলেও তা ঠিক নয়। বরং হযরত আদম (আ.) বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। –[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৬৯]

৪. আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম ও সুলাইমান (আ.)-এর মধ্যে সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধান। সুতরাং হাদীসে আরোপিত প্রশ্নের জবাবে একথা বলা যেতে পারে যে, হয়তো হযরত ইবরাহীম ও হযরত সুলাইমান (আ.) ব্যতীত অন্য কোনো পয়গাম্বর গৃহ দুটির ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। আর তাঁরা উভয় এসে এর পুনঃ নির্মাণ করেছেন। সুতরাং ঐ পূর্বের নবীর নির্মাণ বা ভিত্তি স্থাপনের প্রেক্ষিতে কাবার চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয়েছিল। তিনি একথাও বলেন যে, ফেরেশতা কর্তৃক বায়তুল্লাহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী খ. ৪, প. ১৩৪-৩৫]

বায়তুল্লাহ নির্মাণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

১. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফ সর্ব প্রথম আল্লাহর ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। আর তাঁরা একে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে নির্মাণ করেছিলেন।

২. দ্বিতীয় বার কাবা নির্মিত হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে। হযরত আদম (আ.) হলেন, প্রথম মানব আর বায়তুল্লাহ হচ্ছে পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর।

৩. অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে আদমের পুত্র হযরত শীস (আ.) এই ঘরটিকে মাটি ও পাথর দ্বারা নির্মাণ করেন। হযরত নূহ (আ.)-এর জমানা পর্যন্ত তাঁর নির্মিতা কাবা রয়েছিল। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে বিশ্বব্যাপী প্লাবনের পরে কাবাগৃহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন হযরত শীস (আ.) একে নির্মাণ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী এই মহা বন্যার সময় আল্লাহ পাক কাবা গৃহকে আবূ কুবাইস পাহাড়ে উঠিয়ে নিয়ে হেফাজত করে রেখে দিয়েছিলেন।

৪. চতুর্থবার হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইঞ্জিনিয়ারির মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্মাতা হয়ে কাবা গৃহ নির্মাণ করেন। হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) সহায়তা করেছিলেন।

৫. পঞ্চমবার কাবাগৃহ নির্মাণ করেন আমালেকা সম্প্রদায়ের লোকেরা। আর তারা ছিলেন আমালিক ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)-এর আওলাদ, তারা ছিলেন তখনকার রাজা বাদশাহ।

http://islamiboi.wordpress.com

৬. **ষষ্ঠবার বায়তুল্লাহ শরীফ** নির্মাণ করেন জুরহাম গোত্রীয় লোকেরা। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন হারিস বিন **মিযাযে আসগর।**

৭. **সপ্তমবার কাবা নির্মাণ** করেন হুজুর ﷺ-এর পঞ্চম ঊর্ধ্বতন দাদা কুসাই।

৮. **অষ্টমবার কাবা গৃহ নির্মাণ** করেন কুরাইশগণ। তখনকার নির্মাণে হুজুর ﷺ ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স **ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর**। আর তখন তিনিই হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে হযরত **ইবরাহীম (আ.)** -এর ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

প্রথমত কাবার একটি অংশ 'হাতীম' কাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নির্মাণে কাবা গৃহের দরজা ছিল দুইটি, একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি **প্রশ্চাৎমুখী** হয়ে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশগণ শুধু পূর্ব দিকে একটি দরজা রাখে।

তৃতীয়ত তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে যাতে সবাই সহজে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। **বরং** তারা যাকে অনুমতি দেয় সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, আমার ইচ্ছা হয় কাবা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কাবাগৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞলোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেওয়ার আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথা বার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

৯. নবমবার কাবা গৃহ নির্মাণ করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) -এর ভাগ্নে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) মহানবী ﷺ-এর উপরিউক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি উক্ত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করেন এবং কাবা গৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশিদিন টিকেনি। অত্যাচারী হাজ্জাজ বিন ইউসূফ মক্কায় সৈন্যাভিযান চালিয়ে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

১০. দশমবার কাবা গৃহ নির্মাণ করেন হাজ্জাজ বিন ইউসূফ। সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের এ চির স্মরণীয় কীর্তিটি মুছে ফেলতে মনস্থ করে। সে মতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের এ কাজটি ঠিক হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা গৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কাবাগৃহকে ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলের কুরাইশগণ যে ভাবে নির্মাণ করেছিল সে ভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের পর কোনো কোনো বাদশাহ উল্লিখিত হাদীসের আলোকে কাবা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম মালেক (র.) ও ইবনে আনাস (র.) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কাবা গৃহের ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহদের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কাবাগৃহ তাদের হাতে একটি খেলায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমান যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই থাকতে দেওয়া উচিত। বিশ্বের মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট ভাঙ্গাগড়ার কাজ সবসময়ই অব্যাহত থাকে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, খানায়ে কাবা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্ব প্রথম উপাসনালয়।

কোনো কবি তার কবিতায় দশবারের নির্মাণের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন–

بَنٰى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشَرٌ فَخُذْهُمْ * مَلَائِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ وَاٰدَمُ۔

فَشِيْثٌ فَابْرَاهِيْم ثُمَّ عَمَالِيْقُ * قُصَىٌّ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمْ۔

وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بَنٰى كَذَا * بِنَاءُ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا مُتَمَّمُ۔

–[হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ১০৬-৭, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, রূহুল মা'আনী]

কাবা শরীফের ফজিলত : কাবা শরীফের অনেক ফজিলত রয়েছে–

১. প্রথম ফজিলত হলো কাবাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ। এক বর্ণনা অনুযায়ী কাবাগৃহের স্থানটিকে আল্লাহ পাক পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। কাবার স্থানটি পানির উপরে ভাসমান ফেনা ছিল জমিনকে তার নীচ হতে বিস্তার করা হয়েছে। –[তাফসীরে খাযেন খ. ১, পৃ. ৮০]

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবার এক নির্মাতা, আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাতা হলেন হযরত সুলাইমান (আ.)। আর হযরত খলীলুল্লাহ সুলাইমান (আ.) হতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। এ হিসেবেও কাবা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ারই কথা। হযরত আদম (আ.)-এর কেবলাও কাবাই ছিল।

২. কাবার দ্বিতীয় ফজিলত হলো এই যে, তাতে রয়েছে মাকামে ইবরাহীম। মাকাম অর্থ দাঁড়ানোর স্থান। হযরত ইবরাহীম (আ.) যে পাথরটির উপর দাঁড়িয়ে কাবাগৃহ নির্মাণের কাজ করেছিলেন সেই পাথরটিকে মাকামে ইবরাহীম বলা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ পাথরটির উপর আরোহন করলে পাথরটি প্রয়োজন অনুপাত উপরে উঠত ও নিচে অবতরণ করত। এক কথায় পাথরটি লিফটের ন্যায় কাজে দিতো। ইবরাহীম (আ.) পাথরের যে স্থানটিতে পা রাখতেন কেবল সে স্থানটি নরম হয়ে যেত, এমনকি তাঁর পদচিহ্ন তাতে অঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। এখনও তা অবশিষ্ট রয়েছে। হাজীদের জন্য এই পাথরের নিকট দু'রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব। মসজিদে হারামের যে কোনো স্থানে নামাজ পড়ে নিলে সেই ওয়াজিব পালিত হয়ে যাবে।

৩. কাবা শরীফ هُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের দিশারী, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কিবলা। তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে সকলেই নামাজ আদায় করে।

৪. তাতে রয়েছে اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি। যারা তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। পক্ষান্তরে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বখতে নসর জালিম বাদশাহ ধ্বংস করে দিয়েছিল। আবরাহার ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। যারা সেখানে অসুস্থতা ইত্যাদির জন্য দোয়া করে তাদের দোয়া কবুল হয়।

৫. কোনো পাখি কাবা শরীফের উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে না; বরং কাবার সামনে গিয়ে দিক পরিবর্তন করে জায়গা অতিক্রম করে। হ্যাঁ, কোনো পাখি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সুস্থ হওয়ার জন্য কাবার উপরে গিয়ে উড়ে আবহাওয়া ভোগ করা সেটা ভিন্ন কথা।

৬. কাবা শরীফের এরিয়াতে কোনো জংলী প্রাণীও একে অপরের উপর আক্রমণ করে না। কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না। যারাই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়, নিরাপত্তা লাভ করে। তাদের উপর কোনো আক্রমণ চালানো হয় না। এমনকি কোনো খুনিও যদি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে নেয়, তাকে সেখানে কেসাসের মধ্যেও হত্যা করার বিধান নেই। তবে যদি সে হারামের ভিতরেই হত্যাকাণ্ড বা অন্য কোনো অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি হারামের ভিতরেই দিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا অর্থাৎ "হে আমার প্রভু এ শহরটিকে নিরাপদ বানিয়ে দাও" এবং যারা সেখানে প্রবেশ করে তারা আখিরাতেও শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

–[তাফসীরে কাবীর, মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলবী]

৭. কোনো কোনো ইবাদত এ রকম রয়েছে, যেগুলো কাবা শরীফ ছাড়া অন্য কোথাও আদায়ই হয় না। যেমন– হজ, জিয়ারতে কাবা ও তওয়াফ ইত্যাদি। আবার অনেক ইবাদত যদিও অন্যান্য স্থানে আদায় করে নিলে পালিত হয়ে যায় বটে, তবে কাবা শরীফে আদায় করলে যে পরিমাণ ছওয়াব অর্জন হয় সে পরিমাণ হয় না। যথা–

* হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি তার ঘরে নামাজ আদায় করলে সে এক নামাজেরই ছওয়াব পাবে, আর তার মহল্লার মসজিদে আদায় করলে পঁচিশ গুণবেশি ছওয়াব পাবে, আর জুমার মসজিদে আদায় করলে পাঁচশত নামাজের ছওয়াব পাবে, আর বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার নামাজের ছওয়াব পারে, আর আমার মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার নামাজের ছওয়াব পাবে। আর মসজিদে হারামে নামাজ আদায় করলে এক লক্ষ নামাজের ছওয়াব পারে। –[ইবনে মাজাহ]

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মক্কাতে রমজান মাস পেল, অতঃপর সে পূর্ণ মাসের রোজা রাখল ও সাধ্যানুযায়ী তারাবীহসহ কিয়ামুল লাইল করল, আল্লাহ পাক গায়রে মক্কার [মক্কা ছাড়া অন্যস্থানে] এক লক্ষ রমজান মাসের রোজার ছওয়াব তাকে দান করবেন। প্রতিদিনে তাকে একটা নেকী দিবেন, প্রতিরাতে একটা নেকী দিবেন। প্রতিদিন ও রাত এক একটি গোলাম আজাদ করার ছওয়াব দিবেন। প্রতিদিন ও রাত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে এক একটি ঘোড়া দান করার ছওয়াব দিবেন, এবং প্রতিদিন তার একটা দোয়া কবুল করবেন।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমান]

http://islamiboi.wordpress.com

* হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মক্কা ও মদিনার যে কোনো একটিতে মারা যাবে সে কিয়ামতের দিন নিরাপদ হয়ে উঠবে। -[দূররে মানছূর]

এছাড়া আরো বহু ফজিলত কাবা শরীফ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় সেগুলো উল্লেখ করা হলো না। কাবা শরীফের এতসব ফজিলত থাকার পরও ইহুদিরা কিভাবে বলে যে, বায়তুল মুকাদ্দাস কাবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? এটা ছিল ইসলাম ও মুসলমান এবং আমাদের নবীজীর প্রতি তাদের জিদের বহিঃপ্রকাশ। যার প্রতিবাদে আল্লাহ পাক إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ বলে ঘোষণা করেছেন।

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আর যে ব্যক্তি কাবা শরীফে প্রবেশ করে নিল সে দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল বালা মসিবত হতে নিরাপত্তা লাভ করে নিল।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে অন্যায় ভাবে হারামের বাহিরে হত্যা করে অথবা শাস্তিযোগ্য যে কোনো অপরাধ করে হারামের ভিতরে দাখিল হয়ে যায়। তাহলে কাবা শরীফের সম্মানার্থে তাকে হারামের ভিতরে প্রাণদণ্ড ও দেওয়া যাবে না, এবং শাস্তিও প্রদান করা জায়েজ হবে না। হ্যাঁ, তবে আমাদের মাজহাব মতে খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে এবং তার কাছে কোনো দ্রব্য বিক্রি না করে তাকে হারাম শরীফের বাহিরে আসতে বাধ্য করা হবে। অতঃপর শাস্তি প্রদান করা যাবে। তবে যদি সে হারাম শরীফের ভিতরেই অপরাধ করে ফেলে তাহলে সে অপরাধের শাস্তি আলেমদের ঐকমত্যে হারামের ভিতরেই প্রদান করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হারামের বাইরে অপরাধ করে যে ব্যক্তি হারামে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার কাছ থেকে হারামের ভিতরেও কেসাস নেওয়া যাবে। -[তাফসীরে মাযহারী উর্দূ খ. ২, পৃ. ৩০২]

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.

আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপর এ গৃহের হজ করা ফরজ। তবে সবার উপর নয়; বরং যে এ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করে তাতে আল্লাহর কি ক্ষতি? কেননা আল্লাহ বিশ্বজগত থেকে বে-পরওয়া। কারো অস্বীকারে তাঁর কিছু আসে যায় না, বরং অস্বীকারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শর্তাধীনে মানবজাতির উপর কাবা গৃহের হজ ফরজ করেছেন। শর্ত হলো এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সুতরাং কাবা ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পথ খরচ, যাতায়াত খরচ এবং বাড়ি ফেরা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের ভরণপোষণের খরচের উপর যে ব্যক্তি সামর্থ্যবান হবে এবং আকেল, বালেগ, আজাদ ও সুস্থজ্ঞান রাখবে তার উপরই জীবনে মাত্র একবার হজ করা ফরজ। সুতরাং যারা সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপর হজ ফরজ নয়। তেমনিভাবে পাগল, না বালেগ, গোলাম ও অসুস্থ ব্যক্তির উপর হজ ফরজ নয়। রাস্তা নিরাপদ হওয়াও একটি শর্ত। তাই রাস্তায় যদি প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে তাহলেও ফরজ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর মতে, শারীরিক সুস্থতাও শর্ত। তাই তাদের মতে মাজুর, খুব বেশি দুর্বল ব্যক্তির উপরও হজ ফরজ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর নিকট শারীরিক সুস্থতা শর্ত নয়। সুতরাং তারা উভয়ের মতে শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির অসমর্থ নয়। তাই তার উপরও হজ ফরজ।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩০৩-৫]

মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরিয়ত মতে নাজায়েজ। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখন-ই হবে, যখন তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে। নিজ খরচে করুক বা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি অস্বীকার করে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ সারা বিশ্ব থেকে অমুখাপেক্ষী। সে ব্যক্তিই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যে পরিষ্কারভাবে হজকে ফরজ মনে করে না। সে যে ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত তা সবারই জানা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হজকে ফরজ বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করে না, সেও এক দিক দিয়ে অবিশ্বাসী। আয়াতে শাসনের ভঙ্গিতে তার সম্পর্কে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সে কাফেরদের মতো কাজেই লিপ্ত। অবিশ্বাসী কাফের যেরূপ হজের গুরুত্ব অনুভব করে না সেও তদ্রূপ। এ কারণেই ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ করে না তাদের জন্য এ আয়াতে কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে। কারণ সে কাফেরদের মতোই হয়ে গেছে। "নাউযুবিল্লাহ"। অথবা এখানে কুফর দ্বারা كُفْرَانُ نِعْمَتٍ বা নিয়ামতে অকৃতজ্ঞতা উদ্দেশ্য।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٩٨. قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ ۔

৯৮. হে রাসূল ﷺ আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ তথা কুরআনকে কেন অমান্য করছ? অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন। তোমাদেরকে এর প্রতিদান দিবেন।

٩٩. قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ تَصْرِفُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ دِيْنِهٖ مَنْ اٰمَنَ بِتَكْذِيْبِكُمُ النَّبِىَّ وَكَتْمِ نَعْتِهٖ تَبْغُوْنَهَا اَىْ تَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ عِوَجًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مُعْوَجَّةً اَىْ مَائِلَةً عَنِ الْحَقِّ وَاَنْتُمْ شُهَدَاۤءُ عَالِمُوْنَ بِاَنَّ الدِّيْنَ الْمَرْضِىَّ الْقَيِّمَ هُوَ دِيْنُ الْاِسْلَامِ كَمَا فِىْ كِتَابِكُمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ وَاِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ اِلٰى وَقْتِكُمْ لِيُجَازِيْكُمْ ۔

৯৯. [হে রাসূল ﷺ !] আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কেন মু'মিনদেরকে আল্লাহর পথ হতে তার দীন হতে নবীয়ে করীম ﷺ -এর মিথ্যায়ন করে ও তাঁর নিদর্শনাবলি লুকিয়ে বাধা দিচ্ছ? কেন তোমরা তাদের দীনের পথে বক্রতা অনুসন্ধান করছ? (عِوَجًا) মাসদার مُعْوَجَّةً ইসমে মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ সত্য বিমুখ পথ কেন খুঁজছ? অথচ তোমরা সাক্ষী এবং তোমরা জান যে, পছন্দনীয় এবং সঠিক ধর্ম ইসলামই, যেরূপ তোমাদের কিতাবে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কুফর মিথ্যায়ন প্রভৃতি আমল সম্পর্কে উদাসীন নন। তিনি কেবল তোমাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন মাত্র। অতঃপর তোমাদেরকে এর শাস্তি দেবেন।

١٠٠. وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ بَعْضُ الْيَهُوْدِ عَلَى الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فَغَاظَهُ تَاَلُّفُهُمْ فَذَكَّرَهُمْ بِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفِتَنِ فَتَشَاجَرُوْا وَكَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ ۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۔

১০০. সামনের আয়াতটি ঐ সময় নাজিল হয়, যখন জনৈক ইহুদি আওস ও খাজরাজ গোত্রীয় লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন তারা উভয় গোত্রের পারস্পরিক ভালোবাসায় তাকে ক্রোধান্বিত করে তোলে। সুতরাং ঐ ইহুদি ব্যক্তি আওস ও খাজরাজের মধ্যে জাহেলী যুগের ফেতনার [যুদ্ধের] কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার দরুন তারা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পরে, পরস্পরে রক্তপাত হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের দল বিশেষের কথা মেনে নাও, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর পুনরায় নাফরমান সম্প্রদায় বানিয়ে ছাড়বে।

١٠١. وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ وَتَوْبِيْخٍ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ يَتَمَسَّكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

১০১. আর তোমরা কেমন করে আল্লাহর নাফরমানি করতে পার (كَيْفَ) প্রশ্নবোধক শব্দটি আশ্চর্য ও তিরস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পঠিত হচ্ছে, এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বর্তমান রয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর দীন বা কুরআনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে, নিশ্চয় সে সরল সত্যপথের হেদায়েত পাবে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

عِوَجًا - (عَيْن) আইন বর্ণে যেরের সহিত মাআনিতে অর্থাৎ আর্থিক বিষয়ে ব্যবহৃত হয়। আর عِوَجًا আইন বর্ণে জবরের সহিত **বাহ্যিক দেহধারী** বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এখানে عِوَجًا মাসদারটি ইসমে মাফউল তথা مُعَوَّجَةً [বক্র] এর অর্থে **ব্যবহৃত হয়েছে।**

تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا বাক্যটির অর্থগত রূপ হবে تَتْرُكُوْنَ السَّبِيْلَ الْمُعْتَدِلَةَ وَتَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ الْمُعَوَّجَةَ তোমরা সরল **সঠিক পথ** ছেড়ে বক্র রাস্তা অনুসন্ধান করছ। -[হাশিয়াতুস সাবী]

عِوَجًا ـ تَبْغُوْنَهَا-এর যমীর (ها) থেকে হাল হয়েছে। আর وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ـ تَبْغُوْنَهَا-এর যমীর ওয়াও থেকে হাল **হয়েছে।**

وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَأَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيَاتُ اللّٰهِ বাক্য দুটি ফে'লের যমীরে ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। -[হাশিয়াতুস সাবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : قُلْ يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের ভ্রান্তবিশ্বাস ও তাদের সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা ছিল। মাঝখানে কাবাগৃহ ও হজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পুনরায় আহলে কিতাবদের সম্বোধন করা হচ্ছে। তবে এই সম্বোধনের বিষয়টি একটা বিশেষ ঘটনার সাথে জড়িত।

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আর যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে একদল লোক বর্ণনা করেছেন যে, এক ইহুদি ব্যক্তি যার নাম ছিল সাম্মাস ইবনে কায়েস। সে মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত হিংসা ও বিদ্বেষ রাখত। একদা সে আওস ও খাজরাজের এক মজলিস দিয়ে অতিক্রম করে। সেখানে আনসারী এই গোত্র দুটি এক জায়গায় বসেছিল। সাম্মাস যখন তাদের পরস্পরের ভালোবাসা ও স্নেহ মমতা দেখাল, তখন সে হিংসার আগুনে জ্বলে উঠল। মূর্খতার যুগে গোত্র দুটির মধ্যে অত্যন্ত দুশমনি ও বিদ্বেষ ছিল। প্রসিদ্ধ বুআছ যুদ্ধ এই দুটি গোত্রের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। আর সেই যুদ্ধে আওস গোত্রের লোকদের বিজয় হয়েছিল। সাম্মাস ইবনে কায়েসের চোখে আওস ও খাজরাজের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভালো লাগল না। এজন্য সে তাদের মধ্যে বিভক্তি ও বিবাদ সৃষ্টির চিন্তায় লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের মধ্যে বুআছ যুদ্ধের আলোচনা তোলে ধরা হোক। সুতরাং সে তার সাথি একজন ইহুদি যুবককে বলল, তুমি গিয়ে তাদের নিকট বসে যাবে। অতঃপর তাদের সামনে বুআছ যুদ্ধের আলোচনা তুলে ধরবে। সুতরাং সে এরূপই করল। আর ঐ যুদ্ধের সময় যে সব কবিতা পাঠ করা হয়েছিল সেগুলোকে সে পুনরাবৃত্তি করল। এই কবিতাগুলো পাঠ করা মাত্রই এক অগ্নিশিখা জ্বলে উঠলো। এবং তর্কযুদ্ধ, পরে লাঠি-ডান্ডার যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। উভয় গোত্রের লোকদের মধ্য থেকে এক একজন করে ময়দানে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। আওস ইবনে কাইযী নামক এক যুবক আওস গোত্রের তরফ থেকে আর বনী মাসলামার বিন মাসখার নামক এক যুবক খাজরাজের পক্ষ থেকে ময়দানে নেমে পড়ল। উভয় গোত্রের অন্যান্য লোকেরা তাদের উভয়ের সাথে যোগ দিতে লাগল। এমনকি যুদ্ধের সময় ও স্থান নির্ধারণ হয়ে গেল। হুজুর ﷺ যখন এর সংবাদ পেলেন তখন তাৎক্ষণিক ভাবে সেখানে উপস্থিত হলেন, আর বললেন, একি মূর্খতা? আমার জীবদ্দশায় মুসলমান হয়ে পরস্পর বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়ার পর তোমরা একি করছ? তোমরা কি এ অবস্থায়ই কুফরের দিকে ফিরে যেতে চাও? এতে উভয় পক্ষের চৈতন্য ফিরে পেল। তারা বুঝতে পারল এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনা। এরপর সবাই একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করল এবহং তওবা করল। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। আল্লামা আলূসী (র.)

http://islamiboi.wordpress.com

বলেছেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ থেকে নিয়ে وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। আর শায়খ আহমদ সাবী, মালেকী বলেছেন لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ পর্যন্ত নাজিল হয়। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, ১৪, হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, ১৭০]

আর আল্লামা সুয়ূতী (র.) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا الاية আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) ও সুয়ূতী (র.) অনুরূপ বলেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

এবং ফখরুদ্দীন রাজী (র.) ও সুয়ূতীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে কাবীর]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ .... الخ এই আয়াতে اٰيَاتِ اللّٰهِ বা আল্লাহর নিদর্শনাবলির ব্যাখ্যায় আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, আল্লাহর আয়াতসমূহের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ সকল দালাইল যেগুলোকে আল্লাহ পাক মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার উপর কায়েম করেছেন। আর তাদের তথা ইহুদিদের অস্বীকার করার মর্ম হচ্ছে নবুয়তে মুহাম্মদীর উপর প্রমাণ হওয়ার কথা অস্বীকার করা। وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের আমল অর্থাৎ নবুয়তে মুহাম্মদীর সত্যতার প্রমাণাদি অস্বীকার করার ব্যাপারে সাক্ষী প্রত্যক্ষকারী। তাই তিনি এর উপর তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এই আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদিদের পথ ভ্রষ্টতার প্রতিবাদ করেছেন। আর সামনের আয়াতে তাদের اِضْلَالٌ তথা দুর্বল মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্টকরণের উপর প্রতিবাদ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে– قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ হে রাসূল ﷺ! আপনি বলেদিন, তোমরা লোকদেরকে আল্লাহর দীনের রাস্তা থেকে কেন বিচ্ছিন্ন করছ? কেন তাদের দীনের পথে বক্রতা অনুসন্ধান করছ? وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ অথচ তোমরা নিজেরাই সাক্ষী নিজেরাই জান। কিসের উপর সাক্ষী, কিসের উপর অবগত? এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এ কথার উপর সাক্ষী যে, তাওরাতে একথা আছে যে, যে ধর্ম ব্যতীত আল্লাহ অন্য কোনো ধর্ম কবুল করেন না, সেটি হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো এই যে, তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের উপর প্রকাশিত মোজেজাত সম্পর্কে অবগত। তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো এই যে, আল্লাহর রাস্তা থেকে লোকদেরকে বিচ্ছিন্ন করা, বিরত রাখা অবৈধ হওয়ার উপর তোমরা অবশ্যই অবগত। وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ বলে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তী আয়াত يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ... الخ এর মধ্যে মুমিনদেরকে ইহুদিদের কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের প্রতারণা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উপর সতর্ক করা হয়েছিল। وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ মুমিনদেরকে একথার উপর সতর্ক করা হয়েছে যে, ইহুদি ও মুনাফিকদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে তাদের পবিত্র ধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে দেওয়া। অতঃপর وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ বলে পূর্বোক্ত ভীতি প্রদর্শনের পর প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৩-৭৫]

http://islamiboi.wordpress.com

١٠٢. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ بِاَنْ يُّطَاعَ فَلَا يُعْصٰى وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسٰى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَقْوٰى عَلٰى هٰذَا فَنُسِخَ بِقَوْلِهٖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ مُوَحِّدُوْنَ.

١٠٣. وَاعْتَصِمُوْا تَمَسَّكُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ اَىْ دِيْنِهٖ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا بَعْدَ الْاِسْلَامِ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْعَامَهٗ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجِ اِذْ كُنْتُمْ قَبْلَ الْاِسْلَامِ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ بِالْاِسْلَامِ فَاَصْبَحْتُمْ فَصِرْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا فِى الدِّيْنِ وَالْوِلَايَةِ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا طَرَفِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْوُقُوْعِ فِيْهَا اِلَّا اَنْ تَمُوْتُوْا كُفَّارًا فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا بِالْاِيْمَانِ كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

অনুবাদ :

১০২. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক যেরূপ তাকে ভয় করা উচিত। এরকম ভাবে যে, তাঁর আনুগত্য করা যাবে, নাফরমানি করা যাবে না। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাবে না। তাকে স্মরণ রাখা যাবে ভুলা যাবে না। এ আয়াত অবতরণের পর সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! এরূপ ভয় করার সামর্থ্য কার আছে? এর জবাবে আল্লাহ পাক তাঁর ইরশাদ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ দ্বারা রহিত করে দিলেন। আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

১০৩. আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে তথা দীনে ইসলামকে একত্র হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। আর মুসলমান হওয়ার পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। হে আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা! তোমরা নিজেদের উপর আল্লাহর কৃত নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। যখন তোমরা মুসলমান হওয়ার পূর্বে একে অন্যের দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে ইসলামের খাতিরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অনন্তর তোমরা তাঁরই নিয়ামতে পরস্পরে দীন ও সহায়তার ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা দোজখের পারের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিলে, তোমরা দোজখে নিক্ষিপ্ত হতে কেবল কাফেরাবস্থায় মৃত্যুবরণ করাটাই বাকি ছিল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে ঈমানের খাতিরে দোজখ হতে রক্ষা করেছেন। এমনিভাবে যেরূপ তোমাদের জন্য উল্লিখিত বিধানসমূহের বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পার।

http://islamiboi.wordpress.com

١٠٤. وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ الْإِسْلَامِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولٰئِكَ الدَّاعُوْنَ الْآمِرُوْنَ وَالنَّاهُوْنَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. الْفَائِزُوْنَ وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَا يَلْزَمُ كُلَّ الْأُمَّةِ وَلَا يَلِيْقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ كَالْجَاهِلِ وَقِيْلَ زَائِدَةٌ أَيْ لِتَكُوْنُوْا أُمَّةً.

١٠٥. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا عَنْ دِيْنِهِمْ وَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَأُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অনুবাদ :

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকা দরকার যারা মানুষকে কল্যাণ তথা ইসলামের দিকে আহ্বান করবে, ভালোকাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে আর তারাই তথা কল্যাণের প্রতি আহ্বানকারী ভালোকাজের নির্দেশ দানকারী ও মন্দকাজে বাধাদানকারীগণই সফলকাম কামিয়াব। আর আয়াতে বর্ণিত (مِّنْكُمْ) -এর মধ্যে مِنْ অব্যয় পদটি تَبْعِيْضِيَّةٌ অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা উল্লিখিত হুকুমটি ফরজে কেফায়াহ্ পর্যায়ের, উম্মতের সকল ব্যক্তির উপর আবশ্যকীয়ও নয় এবং প্রত্যেকের জন্য উপযোগীও নয়। যেমন উদাহরণত মূর্খ লোকের জন্য। কেউ কেউ مِنْ অব্যয় পদটিকে অতিরিক্ত বলেছেন। তখন (وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ) -এর মর্ম হবে (لِتَكُوْنُوْا أُمَّةً) যাতে তোমরা একদল হতে পারো।

১০৫. এবং তোমরা সেসব লোকদের ন্যায় হয়ো না যারা দলিল- প্রমাণপ্রাপ্ত হওয়ার পরও বিচ্ছিন্ন হচ্ছে আপন ধর্ম হতে এবং তাতে মতবিরোধ করেছে আর তারা হচ্ছে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

حَقَّ تُقَاتِهِ أَىْ حَقَّ تَقْوَاهُ - تُقَاةً বেঁচে থাকা, ভয় করা। تُقَاةً শব্দটি আসলে وُقَيَةٌ ছিল, পেশযুক্ত ওয়াও (و) টি 'তা' দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। যেরূপ تصمة ও تخمة এর মধ্যে করা হয়েছে। এবং যবর যুক্ত 'ইয়া' টি 'আলীফ' দ্বারা বদলে গেছে। ফলে تُقَاةً হয়ে গেছে। ইয়ার পূর্বের বর্ণ 'কাফ' হরফে সহীহ সাকিন, এজন্যে ইয়ার হরকত কাফের মধ্যে নকল করে দিয়ে ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদলানো হয়েছে। ইমাম যুজাজ (র.) এতে তিনটি লোগাত জায়েজ বলেছেন–

১. تُقَاةً, ২. وَقَاةً ও ৩. إِقَاةً -।

اِعْتِصَامٌ অর্থ– দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরা, শক্তভাবে ধরা।

حَبْلٌ অর্থ– দড়ি, রশি, রজ্জু। বহুবচনে حِبَالٌ - حُبُوْلٌ -। حَبْلَ اللّٰهِ বা আল্লাহর রশির মর্ম কি? তা সামনে আসতেছে ইনশাআল্লাহ। أَصْبَحْتُمْ মানে صِرْتُمْ

اِخْوَانٌ অর্থ– বন্ধু, ভাই أَخٌ -এর বহুবচন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধু ভাইয়ের (اخ) বহুবচনে আসে اِخْوَانٌ আর বংশীয় (أَخٌ) ভাইয়ের বহুবচন আসে اِخْوَةٌ - شَفَا - طَرْفٌ কিনারা, পার্শ্ব। বহুবচনে أَشْفَاءُ - حُفْرَةٌ অর্থ– গর্ত। বহুবচনে حُفَرٌ - اِنْقَاذٌ অর্থ– রক্ষা করা, মুক্তি দেওয়া।

http://islamiboi.wordpress.com

أُمَّةٌ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে দল বা জামাতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। أُمَّةٌ অর্থ **বিশেষ কোনো কাজে নিযুক্ত দল। أُمَّةٌ অর্থ– নবীগণের** অনুসারী। أُمَّةٌ অর্থ– নেতা, সরদার। যেমন ইরশাদ হয়েছে إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً - । **أُمَّةٌ অর্থ– দীন, মিল্লাত। যেমন** إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ - أُمَّةٌ অর্থ– জমানা, যথা وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

তারকীব : حَقَّ تُقَاتِهِ উহ্য মাসদারে মাওসূফের সিফত। আসল রূপ হবে اتَّقُوا اللّٰهَ تَقْوَىٰ حَقَّ تُقَاتِهِ - إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً । كُنْتُمْ **ফেলে নাকিস,** যমীর তার ইসিম ও أَعْدَاءً খবর। أَصْبَحْتُمْ ফেলে নাকিস, যমীর তার ইসিম ও إِخْوَانًا খবর। وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ - كُنْتُمْ ফে'লে নাকিস, যমীর তার ইসিম عَلَىٰ شَفَا الخ খবর। أُولَٰئِكَ - أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ **মুবতাদা** لهم উহ্য ফেলের মুতাআল্লিক। عَذَابٌ عَظِيمٌ সিফাত মাওসূফ মিলে খবর। –[হাশিয়াতুস সাবী, তাফসীরে হক্কানী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুনাফেকদের গোমরাহী এবং প্রতারণা থেকে মুমিনদেরকে সতর্ক থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। আর এই আয়াতে মুমিনদিগকে আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় রাখার, তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার এবং যাবতীয় কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত: ইরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। (اتَّقُوا اللّٰهَ) দ্বিতীয়ত: ইরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহর রশিকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ) তৃতীয়ত হুকুম হয়েছে, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর– (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ) এই বর্ণনা ধারার কারণ এই যে, মানুষ যখন কোনো কাজ করে তখন কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখেই করে। হয় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য করে অথবা কোনো কিছু পাওয়ার আশায় করে। আর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার বিষয়টা লাভ অর্জন করার চেয়ে অধিক গুরুত্ববহ। তাই প্রথমে আল্লাহর আজাব থেকে আত্মরক্ষা লাভের নিমিত্তে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর রশিকে সুদৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ সব আয়াতে নিজেকে কামেল রূপে গঠন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ-এ অন্যদের ঈমান ও আনুগত্যের চেষ্টা করে তাদেরকে কামেল বানানোর চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৬-৮২]

আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বগবী মোকাতেল ইবনে হাব্বানের বর্ণনায় লিখেছেন যে, বর্বরতার যুগে আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ছিল চরম দুশমনি এবং লড়াই। যখন প্রিয়নবী ﷺ মক্কায়ে মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদিনায় তাশরিফ আনলেন, তখন তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। উভয় গোত্র মুসলমান হয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভাই ভাই হয়ে বাস করতে লাগল। ঘটনাক্রমে একবার আওস গোত্রের সালবা ইবনে গনাম এবং খাজরাজ গোত্রের আসাদ ইবনে জোরার এর মধ্যে গোত্রীয় প্রাধান্য সম্পর্কে ঝগড়া হলো। সালবা বললেন আমরাই আওস গোত্রের লোক। আমাদের মধ্যেই রয়েছেন খোজায়া ইবনে সাবেত (রা.) যার একজনের সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষী গণ্য করা হয়। আর আমাদের গোত্রেই রয়েছে হানজালা (রা.) যাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন এবং আমাদের গোত্রেই রয়েছে আসেম ইবনে সাবেত আর আমাদের মধ্যেই রয়েছে হযরত সাদ ইবনে মা'আজ যার মৃত্যুর সময় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল। আর বনূ কুরাইজার ব্যাপারে আল্লাহ পাক তাঁর সিদ্ধান্ত পছন্দ করেছিলেন।

অপর পক্ষে খাজরাজ গোত্রের আসাদ বললেন, আমাদের গোত্রেই রয়েছেন চারজন ব্যক্তি যারা কুরআনের হাফেজ, কারী এবং আলেম হয়েছেন। তাঁরা হলেন উবাই ইবনে কাব, মু'আজ ইবনে জাবাল, জায়েদ ইবনে সাবেত এবং আবূ জায়েদ (রা.)। আর আমাদের মধ্যেই রয়েছেন সাদ ইবনে উবায়দা (রা.) যিনি আনসারদের খতিব এবং সরদার পদে অধিষ্ঠিত। তাদের উভয়ের বিতর্ক এভাবে শুরু হলো এবং পরস্পরে পরস্পরে গোস্যা ও রাগ এসে গেল। উভয়ে নিজ নিজ গোত্রের প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এমনকি উভয় গোত্রের লোকেরা হাতিয়ার নিয়ে হাজির হলো। এমন সময় প্রিয়নবী ﷺ আগমন করলেন, তখন এই আয়াত নাজিল হয়– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩১৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (الاية) আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ পাক মুসলমানদের জাগতিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে এক মূলনীতির আলোচনা করেছেন। আর তা হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করা। অর্থাৎ তাঁর অপছন্দনীয় কাজকর্ম

http://islamiboi.wordpress.com

থেকে বেঁচে থাকা। যার তিনটি স্তর রয়েছে। এসবের আলোচনা সূরা বাকারার শুরুর দিকে হয়েছে। আর وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا الخ আয়াতটিকে মুসলমানদের জাগতিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে দ্বিতীয় আরেকটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তাকওয়ার হকের মর্ম : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যেরূপ তাকে ভয় করার হক রয়েছে। এখানে বর্ণিত তাকওয়ার হক এর ব্যাখ্যায় ওলামাদের বিভিন্ন রকম উক্তি পাওয়া যায়। এর মধ্য থেকে কয়েকটি উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে–

গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাকওয়ার হক এর সূরত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন اَنْ يُّطَاعَ فَلَا يُعْصٰى وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسٰى অর্থাৎ তাকওয়ার হক হলো এই যে, প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখা কখনো তাকে না ভুলা এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

- মূলত এটি একটি হাদীস হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে মারফূ ও মাওকূফ উভয় রকম সনদে বর্ণিত হয়েছে।
- ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার হক আদায় কর, আল্লাহর নির্দেশাবলি পালনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যেন কোনো সমালোচকের সমালোচনায় বিরত না রাখে। আল্লাহর ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িয়ে যাও, এতে যদিও তোমাদের, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তান সন্ততির ক্ষতি হয়।
- হযরত আনাস (রা.) বলেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার হক আদায় করতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জবানের হেফাজত না করেছে।
- আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপতী (র.) বলেন, এই আয়াতের দাবি হলো ওয়ালায়েতের পরাকাষ্ঠা অর্জন করা ওয়াজিব।

মূলত: হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত তাক্‌ওয়ার হকের উদ্দেশ্য ও মর্মকেই ওলামাগণ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাযহারী ও মা'আরিফুল কুরআন]

তাকওয়ার হক পালন কি রহিত? : আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন যে, এই আয়াত নাজিল হলে সাহাবাদের জন্য বড় কঠিন মনে হলো, তাই তারা হুজুর ﷺ -এর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই হুকুম পালন করার মতো সামর্থ্য শক্তি কার মধ্যে রয়েছে? তাদের এ কথার পর فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ তোমাদের যতটুকু শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তদানুযায়ী তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে থাক। এই আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। মুকাতিল বলেছেন, সূরা আলে ইমরানের মধ্যে এ আয়াত ব্যতীত আর কোনো আয়াত রহিত নেই। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩১৮]

আল্লামা আলুসী (র.) বলেছেন, এই আয়াতটি রহিত হওয়ার কথা অনেক ওলামাগণই দাবি করেছেন। আর ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তা বর্ণিত রয়েছে। গ্রন্থকার ও অনুরূপই বলেছেন। আনাস, কাতাদা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এক বর্ণনায় এরূপই পাওয়া যায়। তবে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) এর ভাষ্য মতে, আয়াতটি রহিত নয়।

তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক ওলামাদের ধারণা যে, এই আয়াতের প্রথমাংশ (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ) ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনার আলোকে রহিত হয়ে গেছে। আর এর দ্বিতীয় অংশ (وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) রহিত হয়নি।

তবে জমহুর তত্ত্বজ্ঞানী ওলামাগণ বলেছেন, প্রথমাংশটি রহিত হয়ে যাওয়ার উক্তিটা ঠিক নয়। এর স্বপক্ষে তারা নিম্নে বর্ণিত প্রমাণাদি পেশ করেছেন।

১. হযরত মু'আজ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মু'আজ! তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার কি হক রয়েছে? উত্তরে হযরত মু'আজ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তা হচ্ছে এই যে, বান্দাগণ আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর এটা রহিত হয়ে যাওয়া ঠিক হতে পারে না।

২. (اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ) -এর অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ তাঁকে ভয় করার হক রয়েছে। আর তা অর্জিত হবে যাবতীয় পাপকর্ম বর্জনের মাধ্যমে। আর তা তো রহিত হওয়া জায়েজ হতে পারে না। কেননা এতে কোনো কোনো পাপ কাজ মুবাহ বুঝা যাবে। আর তখন اِتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আর اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ উভয়টার অর্থ এক হয়ে যাবে। সুতরাং বুঝা গেল এটা অরহিত। আর এর উদাহরণ হচ্ছে কুরআনের আয়াত وَجَاهِدُوا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

এই মতটি ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা আলূসী (র.) উভয় উক্তি ও মতের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে গিয়ে বলেছেন, যারা রহিত হওয়ার মত পোষণ করেছেন, তারা حَقَّ تُقَاتِهٖ এর মর্ম বলেন– مَا يَحِقُّ لَهٗ وَيَلِيْقُ بِجَلَالِهٖ وَعَظْمَتِهٖ অর্থাৎ আল্লহর হক এবং তাঁর বুযুর্গী ও সুমহান শান অনুযায়ী তাঁকে ভয় করা। আর এটাতো সম্ভব নয়। যেরূপ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ তে বলা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

আর যারা বলেন, রহিত নয় তাদের মতে এর মর্ম হচ্ছে এই যে, اِتَّقُوا اللّٰهَ اِتِّقَاءً حَقًّا اَىْ ثَابِتًا وَ وَاجِبًا অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, তথা এরূপ ভয় কর যেরূপ ভয় করা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত রয়েছে।

তখন فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আয়াতটি اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর ব্যাখ্যা হয়ে যাবে।

সুতরাং حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি রহিত না মানাই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ রহিত তখন বলার প্রয়োজন হতো যদি আয়াত দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব না হতো। আর এখানে তো সমন্বয় সম্ভব রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ مَا اسْتَطَعْتُمْ আল্লাহকে এরূপ ভয় কর, যেরূপ ভয় করা তাঁর হক রয়েছে নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী।

—[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ১৭-১৮. কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৭, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫২৪]

قَوْلُهٗ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ : আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। এরূপ স্থানে ইসলাম দ্বারা আন্তরিক ঈমান বিশ্বাসই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেননা মৃত্যুর সময় তো জাহেরী আমল নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি পালন করা সম্ভব হয় না। তাই এরূপ স্থানে ইসলাম দ্বারা আন্তরিক ঈমান বিশ্বাসই উদ্দেশ্য হওয়া স্বাভাবিক। এর প্রতিই গ্রন্থকার مُوَحِّدُوْنَ বলে ইঙ্গিত করেছেন। অথবা এর মর্ম হচ্ছে এই যে, دُوْمُوْا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ইসলামের উপর সর্বদা অটল থাক। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের অবস্থায়, আল্লাহর আনুগত্যের অবস্থায় বাকি থাক। যাতে করে মৃত্যু যখনই তোমাদের নিকট আসে তখন যেন ইসলামের অবস্থায় মৃত্যু নসীব হয়। এর প্রতি হাদীসেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি হলো এই – كَمَا تَحْيَوْنَ تَمُوْتُوْنَ وَكَمَا تَمُوْتُوْنَ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করবে, সে অবস্থায়ই মৃত্যু আসবে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু আসবে সেই অবস্থায়ই হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় যে একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, مُسْلِمُوْنَ-এর অর্থ– مُتَزَوِّجُوْنَ তা নেহায়াতই ভিত্তিহীন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, হাশিয়াতুস সাবী ও হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهٗ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا : তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না, দলাদলি করো না। ঐক্য-একতা এমন বস্তু যা প্রশংসিত হওয়ার মধ্যে পৃথিবীর কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে পবিত্র কুরআন যে কোনো বিষয়ে ঐক্য ও একতার দাওয়াত দেয়নি; বরং আল্লাহর রজ্জু বা তাঁর রশিতে সারা বিশ্বের লোকদেরকে বিশেষ করে বিশ্বমুসলিমকে ঐক্য হওয়ার দাওয়াত দিয়েছে। এবার আমাদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে আল্লাহর রশি কি?

حَبْلُ اللّٰهِ বা আল্লাহর রশির ব্যাখ্যা :

১. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) حَبْلُ اللّٰهِ বা আল্লাহর রশির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহর দীন, দীনে ইসলাম। তখন অর্থ হবে তোমরা একত্রিত হয়ে সুদৃঢ়ভাবে আল্লহর রশি তথা পবিত্র ইসলামকে ধারণ কর। ইসলাম নিয়ে পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

২. হযরত ইবনে মাসউদ ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلْقُرْاٰنُ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন আসমান থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রলম্বিত আল্লাহর রশি। তখন অর্থ হবে তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর কুরআনকে আঁকড়িয়ে ধর, কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

৩. আল্লাহর রশির অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য ও জামাতের অনুসরণ তথা সাহাবায়ে কেরামের জামাতের অনুসরণ। ইবনে মাসউদ থেকে এ ব্যাখ্যাটিও বর্ণিত আছে। সাবেত ইবনে মুযমী বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রা.) কে খুৎবা প্রদান করতে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

হে লোক সকল! তোমাদের জন্য আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য এবং সাহাবাদের জামাতের অনুসরণ আবশ্যকীয়। কেননা এ বিষয় দুটাই আল্লাহ তা'আলার রশি, যাকে আঁকড়ে ধরার জন্য তিনি নির্দেশ দান করেছেন।

—[তাফসীরে রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ১৮]

▌ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় বিষয়গুলো এই–

http://islamiboi.wordpress.com

১. আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবেনা।

২. সকলে মিলে সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরবে। এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে।

৩. শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব রাখবে।

আর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই– এক. অনর্থক কথাবার্তা ও বিতর্কানুষ্ঠান। দুই. সম্পদ বিনষ্ট করা। তিন. বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়া। –[মুসলিম, মুসনাদে আহমদ]

■ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ হতে দিবেন না। আল্লাহর হাত তথা সাহায্য জামাতের উপর রয়েছে, যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হলো, সে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে গেল। –[তিরমিযী]

■ হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বাঘ যেরূপ ছাগল পাল থেকে বিচ্ছিন্ন বকরিকে শিকার করে ফেলে, ঠিক তেমনিভাবে শয়তান মানুষের জন্য বাঘের মতো। তাই [জামাত থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোরাফেরা করো না এবং জামাতের সঙ্গে থাক। –[আহমদ]

■ হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জামাত থেকে দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রশিকে নিজের গর্দান হতে বের করে নিল।

–[মুসনাদে আহমদ, আবূ দাঊদ, তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩২০]

৪. হযরত আবূল আলিয়া (র.) হতে বর্ণিত, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করা তথা ইখলাছই হচ্ছে আল্লাহর রশি।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

৫. হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আল্লাহর রশির মানে হলো তাঁর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশ। আল্লাহর রশির ব্যাখ্যায় বিবৃত এসব বিষয়াদির একটার সঙ্গে অপরটির কোনো সংঘর্ষ নেই। বরং প্রত্যেকটিই অপরটির কাছাকাছি। তাই সবগুলো উদ্দেশ্য হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

৬. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, اَلْمُرَادُ مِنَ الْحَبْلِ هٰهُنَا كُلُّ شَيْءٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهٖ اِلَى الْحَقِّ فِيْ طَرِيْقِ الدِّيْنِ অর্থাৎ এখানে আল্লাহর রশির মর্ম হলো প্রত্যেক ঐ বস্তু যা দ্বারা দীনের পথে সত্য পর্যন্ত পৌঁছা যায়। সেই বস্তুর এক একটি এক এক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন। যেরূপ আমরা উপরে বলে এসেছি। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৮]

حَبْل বা রশির প্রয়োজনীয়তা : বলা বাহুল্য যে, কোনো ব্যক্তি যদি সূক্ষ্ম কোনো রাস্তায় চলে, তাতে পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে। তবে রাস্তার উভয় দিক থেকে বাঁধা কোনো রশি ধারণ করে নিলে পদস্খলিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। [যেরূপ আমাদের দেশে বাশের তৈরি হালকা সেতুর উভয় তরফ থেকে প্রলম্বিত এক পার্শ্বে একটি ধরনী বাশ থাকে।] আর এতে সন্দেহ নেই যে, হকের রাস্তা খুবই সূক্ষ্মতম রাস্তা, তাতে বহু লোকের পদস্খলন ঘটেছে। সুতরাং আল্লাহর লম্বিত রজ্জুকে তথা তাঁর প্রদত্ত ধর্ম, কিতাবকে আঁকড়ে ধরবে, তাঁর বিধি-বিধানের আনুগত্য করবে, সাহাবা তথা মুমিনদের জামাতের সমর্থন দিয়ে চলবে, সে নিশ্চিত ভাবেই আল্লাহ ও জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার সত্যপথ অতিক্রম করতে পদস্খলিত হয়ে জাহান্নামের অতলগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে না। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৭৮–৭৯]

وَلَا تَفَرَّقُوْا الخ -এর ব্যাখ্যা : আর তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, ইসলাম নিয়ে, ধর্ম নিয়ে দলাদলি করো না। ইজমায়ে উম্মতের খেলাফ বিভিন্ন মতের দিকে যেয়োনা। হক থেকে বিচ্যুত হয়োনা, পরস্পরে কোন্দল, যুদ্ধ বিগ্রহ সৃষ্টি করো না। যেরূপ জাহিলী যুগে এসব তোমাদের মধ্যে ছিল। বরং আল্লাহর নিয়ামত রাশিকে স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েতের মতো নিয়ামত দান করেছেন, ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে ধন্য করেছেন। ফলে তোমাদের মধ্যে পূর্বের পরস্পর দুশমনির অবসান ঘটেছে, একশত বিশ বৎসরে চলে আসা যুদ্ধ চিরতরে থেমে গড়ে উঠেছে তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি ও নিজের উপর অন্য মুসলমানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা।

আল্লাহর এই রজ্জুকে ধারণ করে তোমরা আজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্প্রদায় হিসেবে সনদ প্রাপ্ত হয়ে গেছ। অথচ তোমরাই দীনে ইসলাম নামক রশি পাবার পূর্বে কুরআন নামক খোদায়ী রজ্জু লাভের আগে বর্বর যুগের শ্রেষ্ঠ বর্বর শ্রেণিতে পরিগণিত ছিলে। তোমরা ছিলে জাহান্নামের গর্তের পার্শ্বে অবস্থান রত, দোজখের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম।

http://islamiboi.wordpress.com

ইতোমধ্যে মুহাম্মদ ﷺ খোদা প্রদত্ত দীনে ইসলাম ও কুরআনের রশি নিয়ে এসে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ পাক এভাবেই তাঁর নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সর্বদা হেদায়েতের উপর অটল থাকতে পার এবং ক্রমাগতভাবে সেই হেদায়েতের স্তর সমূহে উন্নতি লাভ করতে পার। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী সংযোজন বিয়োজনসহ]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الخ -এর ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আল্লাহ পাক ব্যক্তি সংশোধনের পথ ও পদ্ধতি এবং নীতিমালা বর্ণনা করার পর অন্যদেরকে সংশোধন ও কামেল বানানোর প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। যাতে করে ইহুদি, মুনাফেক বাতিল চক্রদের বিপরীতে মুমিনগণ পথ প্রাপ্ত ও পথের দিশারী হয়ে যেতে পারে, যেরূপ ওরা ছিল নিজে পথ হারা, ভ্রান্ত, গোমরাহ ও অন্যদেরকে গোমরাহকারী। ইরশাদ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা লোকদেরকে কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে। যাতে থাকবে তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি ও মঙ্গল। বিশেষ করে তারা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ ও শরিয়ত গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই বস্তুত সফলকাম।

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ এর মর্মার্থ : যারা ভালো জিনিসের দিকে ডাকে। خَيْر বা ভালোবস্তু ও কল্যাণের দিকে ডাকার মানে হলো এসব আকাইদ ও আমলের প্রতি আহ্বান করা যেগুলোর মধ্যে দীন দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে।

* ইবনে মারদুবিয়া ইমাম বাকির থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন ও আমার সুন্নতের উপর চলাই কল্যাণ বা খাইর। -[তাফসীরে মাযহারী]
* কারো মতে اَلْخَيْر -এর মানে হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনা। আর اَلْمَعْرُوْف বলতে অন্যান্য আনুগত্য।
* মুকাতিল বলেছেন, اَلْخَيْر -এর অর্থ হলো ইসলাম আর اَلْمَعْرُوْف অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য এবং اَلْمُنْكَر অর্থ হলো তার নাফরমানি।

مِنْكُمْ -এর সম্বোধিত ব্যক্তি কারা :

* কারো মতে, এতে সম্বোধন করা হয়েছে পূর্বের সম্বোধিত আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে।
* ইমাম যাহহাক (র.) বলেন, এতে সম্বোধিত হলেন কেবলমাত্র সাহাবায়ে কেরামগণ।
* তবে অধিসংখ্যক ওলামাগণের মতে এ সম্বোধন ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলেন প্রাথমিক সম্বোধিতগণ অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল মু'মিন-মুসলমানই এ সাধারণ সম্বোধনের আওতার অন্তর্ভুক্ত।

مِنْكُمْ -এর মধ্যে উল্লিখিত مِنْ অব্যয় পদটি অধিকাংশ ওলামার মতে تَبْعِيْضِيَّةٌ কিছু সংখ্যকের মতে بَيَانِيَّةٌ ।

আহলুস সুন্নাহ দু-চার জন আলেম ছাড়া পুরা উম্মতই এ কথার উপর একমত যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ফরজে কেফায়া, ফরজে আইন নয়। অর্থাৎ উম্মতের কিছু সংখ্যক লোকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান করে নিলে পুরো উম্মত দায় মুক্ত হয়ে যাবে। আর কেউই না করলে সকলেই গুনাহগার হবে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

مَعْرُوْف وَمُنْكَر -মারুফ বলতে ঐসব কাজ যার সৌন্দর্যতা আবশ্যকীয়ভাবে বা মোস্তাহাব হওয়ার প্রেক্ষিতে শরিয়তের তরফ থেকে জানা হয়েছে। আর মুনকার বলতে ঐ সব হারাম বা মাকরুহ কার্যাবলিকে শরিয়ত মন্দ বলে সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : উপরোল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকেরাই পরিপূর্ণ কামিয়াব ও সফলকাম।

উল্লেখ্য যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মৌখিকভাবে করাটাই কাম্য। শক্তি প্রয়োগ করাটা ব্যক্তি বিশেষের উপর আবশ্যকীয়। যেমন- প্রশাসকবৃন্দ ও সন্তানদের বেলায় মাতা-পিতা ও অভিভাবকগণ।

* সৎকাজটি যে পর্যায়ের হবে তার প্রতি আদেশকারীও ঐ পর্যায়ের হবে। সুতরাং সৎ কাজটি ফরজ, ওয়াজিব বা মোস্তাহাব হলে এর জন্য আদেশ করাটাও ফরজ, ওয়াজিব বা মোস্তাহাব হবে। তেমনিভাবে অসৎকাজটি যে পর্যায়ের হবে তার নিষেধ করাটাও সেই পর্যায়েরই হবে। সুতরাং হারাম কাজ থেকে নিষেধ করাটা ওয়াজিব হবে, আর মাকরুহে তাহরিমী থেকে নিষেধ করাটা সুন্নত হবে, এবং তানজিহী থেকে নিষেধ করাটা মোস্তাহাব হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

* গুনাহগার বা ফাসেকদের জন্যও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব। কারণ সকল অসৎ কাজে জড়িতদেরকেই নিষেধ করা ওয়াজিব। সুতরাং ফাসেক তার নিজ সত্ত্বাকে নিষেধ না করার দরুন অন্যদেরকে নিষেধ করার দায়িত্ব তার উপর থেকে সরে যাবে না। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৩]

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের শর্ত : সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য পাঁচটি জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে।

১. আদেশ ও নিষেধের সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে শরয়ী জ্ঞান থাকা। কারণ মূর্খ ব্যক্তি শরিয়ত সম্মত তরিকায় আদেশ নিষেধ করতে পারবে না।

২. এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা উদ্দেশ্য হওয়া। লোক দেখানো ও খ্যাতিলাভ উদ্দেশ্য না হওয়া।

৩. যাকে আদেশ করা হবে বা নিষেধ করা হবে তার প্রতি স্নেহপরায়ণ থাকা, নরম ও ভদ্র ভাষায় বলা।

৪. এ মহান কাজ করতে গিয়ে ধৈর্য ও সহনশীল থাকা।

৫. যে আদেশ বা নিষেধটা করেছে সেটা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা। [ফতোয়ায়ে আলমগীরী]

তাফসীরে আহমদীতে বলা হয়েছে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধাদানকারীর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। আর তা হচ্ছে আদেশ বা নিষেধকারীর শক্তি সামর্থ্যের ভিতরে হওয়া। ফেৎনা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকা। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا الخ : অর্থাৎ ঐ সব লোকদের ন্যায় হয়োনা, যারা ধর্ম নিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাওহীদ ও আখিরাতের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম মত পোষণ করেছে। যেমন- ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা। তাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পর। ঐ সব প্রমাণাদি উপস্থিত হয়ে যাওয়ার পর যা দ্বারা কালিমা একই প্রমাণিত হয় বা তাওরাত মতান্তরে কুরআন আসার পর। তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি।

আলোচ্য আয়াতে যত ইখতেলাফকে নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ বলা হয়েছে তা হচ্ছে আকাইদের ব্যাপারে। ফিকহী মাসাঈলের ইখতেলাফ জায়েজ বরং রহমতের কারণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো বিষয় তোমরা আল্লাহর কিতাবে পেয়ে গেলে তদানুযায়ীই আমল করে নিবে। এর ব্যতিক্রম করার কারো সুযোগ নেই। আর যদি আল্লাহর কিতাব [কুরআনে] না পাওয়া যায় তবে আমার সুন্নতের উপর আমল করে নিবে। এ ব্যাপারে আমার কোনো হাদীসও যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবাদের কথা অনুযায়ী আমল করে নিবে। আমার সাহাবাগণ নিঃসন্দেহে আকাশের নক্ষত্ররাজি তুল্য, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়েত পেয়ে যাবে। আর আমার সাহাবাগণের ইখতেলাফ বা মতবিরোধ তোমাদের জন্য রহমত। উল্লিখিত হাদীসটিতে বিশেষ সাহাবাগণ উদ্দেশ্য যারা মুজতাহিদ পর্যায়ের ছিলেন। ইমাম বায়হাকী "আল মাদখাল" গ্রন্থে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- اِخْتِلَافُ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَحْمَةٌ لِعِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবাগণের মতবিরোধ আল্লাহর বান্দাদের জন্য রহমত।

আল্লামা আলূসী (র.) এই মর্মে আরো অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহিদ ওলামাগণের মতবিরোধ শুধু জায়েজ তাই নয়; বরং রহমতও বটে। তবে ইজতেহাদী ইখতেলাফ কেবলমাত্র مَسَائِلُ غَيْر مَنْصُوْصَة -এর মধ্যেই হবে। কারণ مَسَائِلُ مَنْصُوْصَة -এর মধ্যে তো ইজতেহাদই জায়েজ নয়। তাতে আবার ইখতেলাফ কিসের। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৩-২৪]

بَلَاغَتْ তথা অলংকার শাস্ত্রীয় আলোচনা : এখানে تَشْبِيْه ও اِسْتِعَارَة সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে। তাই এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করে নেওয়া আবশ্যক।

اَلتَّشْبِيْهُ [উপমা] অর্থ এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে বিশেষ কোনো বিষয়ে বা অর্থে তুলনা দেওয়া। যেমন - زَيْدٌ كَالْاَسَدِ যায়েদ সিংহের মতো। এখানে যায়েদ مُشَبَّهٌ বা উপমেয়, আর সিংহ مُشَبَّهٌ بِهٖ বা উপমান। আর ك বর্ণটি اَلَةُ التَّشْبِيْهِ বা

http://islamiboi.wordpress.com

তুলনার মাধ্যম [বর্ণ]। যাকে কোনো বিষয়ে তুলনা দেওয়া হয় তাকে مُشَبَّهٌ আর যার সহিত দেওয়া হয় তাকে مُشَبَّهٌ بِهٖ **আর** যে **বিষয়ে তুলনা** দেওয়া হয় তাকে وَجْهُ الشَّبْهِ এবং যে বর্ণের মাধ্যমে তুলনা দেওয়া হয় তাকে اَلَةُ التَّشْبِيْهِ **বা হরফে তাশবীহ বলে।**

সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণটিতে زَيْد হবে মুশাব্বাহ আর اَسَد হবে মুশাব্বাহ বিহী আর ك [কাফ] বর্ণটি হবে হরফে তাশবীহ **এবং** مَعْنَى شُجَاعَتْ হবে وَجْهُ الشَّبْهِ উল্লেখ্য যে, তাশবীহের মধ্যে হরফে তাশবীহ উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

اَلْاِسْتِعَارَةُ: আর ইস্তেআরা বলা হয় উপমার ক্ষেত্রে হরফে তাশবীহ উল্লেখ না করে মুবালাগার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তুতে প্রকৃত **অর্থের** দাবি করা। যেমন– তুমি বললে لَقِيْتُ اَسَدًا। আমি সিংহের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। এখানে সিংহ বলে তুমি উদ্দেশ্য করছ বাহাদুর পুরুষকে।

সুতরাং উপরিউক্ত নিয়মের তাশবীহের মধ্যে যদি مُشَبَّهٌ উল্লেখ করে রূপক অর্থে مُشَبَّهٌ بِهٖ উদ্দেশ্য হয় তবে তাকে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ - اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ বলা হয়। আর যদি مُشَبَّهٌ بِهٖ উল্লেখ হয় আর مُشَبَّهٌ অনুল্লেখ থাকে তবে তাকে اِسْتِعَارَةٌ تَصْرِيْحِيَّةٌ বা اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ বলে। مُشَبَّهٌ بِهٖ এর কোনো لَازِم তথা আবশ্যকীয় বস্তুকে مُشَبَّهٌ -এর দিকে সম্পৃক্ত করাকে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ বলে। আর مُشَبَّهٌ بِهٖ -এর কোনো মুনাসিব বস্তুকে মুশাব্বাহের জন্য সাবিত করাকে اِسْتِعَارَةٌ تَرْشِيْحِيَّةٌ বলে।

اِسْتِعَارَةٌ تَبْعِيَّةٌ: কোনো ফেলের মধ্যে ইস্তেআরা হলে তাকে اِسْتِعَارَةٌ تَبْعِيَّةٌ বলে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ -এর মধ্যে দীন বা কুরআনকে حَبْل বা রশির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে আর মুশাব্বাহের জন্য অর্থাৎ দীন বা কুরআনের জন্য মুশাব্বাহ বিহীর নামটিকে ধার গ্রহণ করা হয়েছে اِسْتِعَارَةٌ تَصْرِيْحِيَّةٌ اَصْلِيَّةٌ -এর প্রেক্ষিতে। উভয়টার মধ্যে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হওয়ার বিষয়টা পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ تَصْرِيْحِيَّةٌ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা দীন বা কুরআনকে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে রশির সাথে। কারণ মানুষ যেরূপ রশি ধারণ করে নিলে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে সংরক্ষিত হয়ে যায় তেমনিভাবে দীন এবং কুরআনকে ধারণ করে নিলে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় ধ্বংস থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। সুতরাং রশি বা حَبْل হলো মুশাব্বাহ বিহী যাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দীন বা কুরআন **হচ্ছে** মুশাব্বাহ। তাই এখানে اِسْتِعَارَةٌ تَصْرِيْحِيَّةٌ বা مُصَرَّحَةٌ পাওয়া গেল। আর اِعْتِصَامٌ উল্লেখ করাটা تَرْشِيْح হয়েছে। **এতে** اِسْتِعَارَةٌ تَبْعِيَّةٌ ও হয়েছে। কেননা প্রথমে وثوق কে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে اِعْتِصَامٌ -এর সাথে। অতঃপর وُثُوْق **-এর জন্য** اِعْتِصَامٌ ধার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর اِعْتِصَامٌ থেকে اِعْتَصِمُوْا ক্রিয়া মুশতাক করা হয়েছে যা وَثِقُوْا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

* **اِخْوَانًا ও اَعْدَاءً** -এর মধ্যে صَنْعَتْ طِبَاق হয়েছে। একে صَنْعَتْ مُقَابَلَة ও বলা হয়ে থাকে।
* **يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** এর মধ্যেও صَنْعَتْ طِبَاق হয়েছে। اَمْر ও نَهْى একটা অপরটির বিপরীত। **তেমনিভাবে** مَعْرُوْف ও مُنْكَر ও একটি অপরটির বিপরীত।

–[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫২৪, হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৭১]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٦. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ وَهُمُ الْكٰفِرُوْنَ فَيُلْقَوْنَ فِى النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ يَوْمَ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ.

১০৬. সে দিনকে স্মরণ কর, যেদিন বহু মুখমণ্ডল শুভ্র [উজ্জ্বল] হবে আর বহু মুখমণ্ডল কালো হবে। তথা কিয়ামত দিবসে। অতঃপর যাদের মুখমণ্ডল কালো হবে আর তারা হবে কাফেররা। সুতরাং তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে এবং ভর্ৎসনার প্রেক্ষিতে তাদেরকে বলা হবে। তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ? (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) এর দিন ঈমান আনার পর। এখন কাফের হওয়ার শাস্তি ভোগ কর।

١٠٧. وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَىْ جَنَّتِهٖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১০৭. আর যাদের চেহারাসমূহ সাদা উজ্জ্বল হবে আর তারা হবে মু'মিনগণ তারা থাকবে আল্লাহর রহমতে তথা তাঁর জান্নাতে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

١٠٨. تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ بِاَنْ يَّاْخُذَهُمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ.

১০৮. ঐ সমস্ত অর্থাৎ এ সমস্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ যা আপনার নিকট সঠিকভাবে পাঠ করছি হে মুহাম্মদ ﷺ। আর আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীর উপর অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না যে, তাদেরকে তিনি অপরাধ ছাড়াই শাস্তি দিয়ে দিবেন।

١٠٩. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ.

১০৯. আর মালিকানা, সৃষ্টি ও অধীনস্ত বান্দা হওয়ার প্রেক্ষিতে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার এবং সব বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। ফেরত যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ تَبْيَضُّ الخ এর মধ্যে يَوْمَ শব্দটি اُذْكُرْ [স্মরণ কর] উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে মাফঊল বা কর্ম হওয়ার প্রেক্ষিতে জবরযুক্ত হয়েছে। تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ الخ পূর্ণ জুমলায়ে ফে'লিয়াটি بِتَاوِيْلِ مُفْرَدٍ মুযাফ ইলাইহি আর يَوْمَ মুযাফ মিলে مُرَكَّبْ اِضَافِىْ হয়ে اُذْكُرْ এর মাফঊল হয়েছে। অথবা يَوْمَ - ظَرْف হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। তখন ইবারতের রূপ হবে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ –[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৮৬]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কালো চেহারা ও সাদা চেহারা বিশিষ্ট কারা হবে? : কিয়ামত দিবসে সাদা চেহারা বিশিষ্ট কারা হবে এবং কালো চেহারা বিশিষ্ট কারা হবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন ধরনের উক্তি বর্ণিত রয়েছে। যেমন–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন আহলুস সুন্নাত এর চেহারা সাদা উজ্জ্বল শুভ্র হবে। আর বেদআতীদের চেহারা কালো হবে।

২. হযরত আতা (র.) বলেন, মুহাজির ও আনসারদের চেহারা সাদা হবে, আর বনূ কুরাইজা ও বনূ নজীরের চেহারা কালো হবে।

৩. হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে যে, যাদের চেহারা কালো হবে তারা হলো খারেজীরা আর যাদের চেহারা সাদা হবে তারা হবে ঐ সব ব্যক্তি যারা খারেজীদের হাতে শহীদ হবে। হযরত আবূ উমামা (রা.) কে যখন জিজ্ঞাসা হলো, তুমি কি এই হাদীসটি রাসূল ﷺ থেকে শুনেছ? তখন তিনি আঙ্গুলে গুণে বললেন, যদি আমি এই হাদীসটি হুজুর ﷺ হতে সাতবার না শুনতাম তাহলে বর্ণনা করতাম না। –[তিরমিযী, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫২৭]

৪. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, যাদের চেহারা কালো হবে তারা কাফেরগণ, আর যাদের চেহারা সাদা হবে তারাই হলেন মুমিনগণ। ইহাই অধিক গ্রহণযোগ্য। উল্লেখ্য যে, সাদা ও কালো হওয়ার অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ওলামাগণের দুটি মত পাওয়া যায়।

এক. প্রকৃত অর্থেই মুমিনদের চেহারা কিয়ামতের দিন সাদা সুন্দর হবে। আর কাফেরদের চেহারা কালো বিশ্রী হবে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতটিকেই গ্রহণযোগ্য করেছেন।

দুই. এখানে সাদা হওয়ার অর্থ আনন্দিত হওয়া, আর কালো হওয়ার অর্থ হলো এর বিপরীত নিরানন্দ ও দুঃখিত হওয়া।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৫]

فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ এর ব্যাখ্যা : অতএব, যাদের চেহারা কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ? এখানে বর্ণনা ভঙ্গির উপর একটা প্রশ্ন হয় যে, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা সাদা চেহারার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন, আর এর তাফসীলের সময় কালো চেহারা বিশিষ্টগণের কথা পূর্বে ও সাদা চেহারা বিশিষ্টগণের কথা পরে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইজমালের ব্যতিক্রম তাফসীল করলেন কেন এর রহস্য কি? ওলামায়ে মুফাসসিরীন এর অনেক জবাব দিয়েছেন। যথা –

১. এখানে আতফের জন্য ব্যবহৃত ওয়াও বর্ণটি উভয়টির মধ্যে কেবলমাত্র জমা ও একত্রিত করা বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে। তারতীব বা ধারাবাহিকতা বুঝাবার জন্য নয়।

২. বিশ্ব মানবতার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো তাদের কাছে আল্লাহর রহমত পৌছিয়ে দেওয়া, তাদের শাস্তি পৌছানো নয়। হুজুরে পাক ﷺ হাদীসে কুদসীতে আপন প্রভুর কথা নকল করে বলেন, خَلَقْتُهُمْ لِيَرْبَحُوْا عَلَيَّ لَا لِأَرْبَحَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি তারা আমার উপর লাভবান হওয়ার জন্য আমি তাদের উপর লাভবান হওয়ার জন্য নয়। বিষয়টা যখন এ রকমই হলো তাই আল্লাহ পাক প্রথমে ছওয়াবধারী সাদা চেহারা ওয়ালাদের কথা দ্বারা আলোচনাটা শুরু করেছেন। কারণ আলোচনায় উত্তমকে অধমের উপর প্রাধান্য দেওয়াটাই শ্রেয়। অতঃপর শেষ দিকে ও সাদা চেহারা ওয়ালাদের আলোচনার মাধ্যমে কথার সমাপ্তি টেনে এনেছেন। এ কথার উপর সর্তক করার জন্য যে, গজবের তুলনায় আল্লাহর রহমতের অভিপ্রায়টাই অধিক। যেরূপ তিনি বলেছেন, سَبَقَتْ رَحْمَتِيْ غَضَبِيْ আমার গজবের উপর আমার রহমত অগ্রগামী এবং প্রবল।

৩. ভাষাবিদ সাহিত্যিক ও কবিগণ বলেন, কথার শুরু এবং শেষ এমন জিনিস দ্বারা করার প্রয়োজন যে জিনিসটি মনে আনন্দ যোগায়। বলা বাহুল্য তা তো আল্লাহর রহমতই। তাই আলোচনা শুরু করা হয়েছে সাদা চেহারার সু সংবাদ প্রাপ্ত মুমিনদের দ্বারা এবং সমাপ্তও করা হয়েছে তাদেরই আলোচনার মাধ্যমে। –[তাফসীরে কবির খ. ৮, পৃ. ১৮৮-৮৯]

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এই যে, এই আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ? অথচ সম্বোধনটা হচ্ছে কাফেরদেরকে, ওরা তো কোনো সময় ইতোপূর্বে ঈমান আনেনি। তাই তাদেরকে কেমন করে বলা হলো তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ কি? এর জবাবে ওলামাগণ অনেক কিছু লিখেছেন, তন্মধ্যে থেকে নিম্নে কয়েকটি জবাব প্রদত্ত হলো–

http://islamiboi.wordpress.com

১. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, আদম সন্তানদের রূহসমূহকে তার পৃষ্ঠ থেকে পিপিলিকার ন্যায় বের করে আল্লাহ পাক তাদের থেকে আপন প্রভুত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে বলেছিলেন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তদুত্তরে সকলেই বলেছিলো قَالُوْا بَلٰى কেন হবেন না, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু। সেই দিন তো সকলই আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল। দুনিয়াতে এসে যারা ঈমানকে অক্ষুণ্ণ রাখেনি, বরং অবিশ্বাসী হয়ে কাফের হয়ে গেছে। মূলত তারা সকলেই ঈমান আনার পরই কাফের হয়েছে। এ হিসেবেই বলা হয়েছে أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ তোমরা কি মুমিন হওয়ার পর কাফের হয়ে গেলে?

২. আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, এই আয়াতে পূর্বাপর অবস্থা দেখলে বুঝা যায় এখানে সম্বোধিত কাফের বলতে আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টান কাফেরই উদ্দেশ্য। আর তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর উপর ঈমান এনেছিল। অতঃপর যখন তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন তখন তারা তার প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হয়ে যায়। হযরত ইকরামা, যুজাজ ও আসিম (র.) এ মত পোষণ করেছেন।

৩. একদল আলিমের মতে এখানে সাধারণ কাফের উদ্দেশ্য বিশেষ কোনো শ্রেণির কাফের উদ্দেশ্য নয়। তাদের মতানুযায়ী এক জবাব হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রথম জবাবটি। আরেকটি জবাব হলো এই যে, এখানে ঈমান দ্বারা ঈমানে ফিতরত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জন্মগতভাবে সকল মানুষের মধ্যে ঈমান আনার মতো যোগ্যতা ছিল, পরে কেউ সেই যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে মুমিন থেকেছে আর কেউ কাফের হয়েছে।

৪. হযরত হাসান (র.) বলেছেন, এখানে সম্বোধিত কাফের দ্বারা মুনাফিকগণ উদ্দেশ্য। তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান আনার পর কুফরি প্রকাশ করেছে।

৫. হযরত কাতাদাহ্ (র.) বলেছেন, এখানে ঈমান আনার পর যারা মুরতাদ হয়ে কাফের হয়েছে তারা উদ্দেশ্য।

৬. কারো মতে, এখানে কাফের দ্বারা খারেজীগণ উদ্দেশ্য। কেননা তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ অর্থাৎ তারা ধর্ম থেকে এ রকম ভাবে বের হয়ে যায়। যেরূপ তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়।

৭. কারো মতে এখানে সম্বোধিত কাফের দ্বারা বিদআতিরা উদ্দেশ্য। তবে শেষোক্ত ৬-৭ নং জবাব দুটিকে ইমাম রাযী (র.) খুবই দুর্বল বলেছেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৮৭, রূহুল মা'আনী খ. ৪, ২৫-২৬]

قَوْلُهُ وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ : অর্থাৎ আর যাদের চেহারা সেই দিন সাদা হবে, মুখমণ্ডল শুভ্র হবে তারা আল্লাহর রহমতে থাকবে। রহমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেহেশত। বেহেশত হলো আল্লাহ তা'আলার অবতরণ স্থল। সুতরাং এখানে حَالْ বলে مَحَلْ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর জান্নাতকে রহমত বলে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকলেই আল্লাহর রহমত তথা দয়ার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে জান্নাতের স্তরসমূহ লাভ হবে আমল অনুপাতে। এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ দ্বারা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাণীও এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, তিনি বলেছেন, তোমরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে আল্লাহর ক্ষমার দ্বারা আর জান্নাতে প্রবেশ করবে তার রহমত দ্বারা এবং জান্নাতে তোমাদের অংশ তথা স্তরসমূহ লাভ হবে আমল অনুযায়ী।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সত্যতা অবলম্বন কর, মধ্যপন্থায় চলো, ভালো থাক। কেননা কারো আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তবে কি আপনার আমলও আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। তদুত্তরে তিনি বললেন না, তবে যদি আমাকে আল্লাহ মাগফিরাত ও রহমত তথা দয়া দ্বারা ঢেকে নেন তাহলে জান্নাতে প্রবেশ হওয়া যাবে। -[বুখারী, মুসলিম, আহমদ, মাজহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৪]

قَوْلُهُ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِيْنَ : আর আল্লাহপাক বিশ্ববাসীর প্রতি জুলুম করার ইচ্ছা করছেন না। অর্থাৎ তাদের নেকীর ছওয়াবের মধ্যে কমতি করবে না, আর গুনাহের শাস্তি গোনাহের পরিমাণের উর্ধ্বে দিবেন না। কুফর যেহেতু সবচেয়ে বড় গুনাহ তাই এর শাস্তিও হবে বড় এবং চিরস্থায়ী। কেননা কাফেরদের দুনিয়াতে নিয়ত থাকে যতদিন তারা বেঁচে থাকবে ততদিনই কাফের অবস্থায়ই থাকবে। তাই তাদের সেই নিয়ত অনুযায়ী শাস্তিটাও হবে স্থায়ী। সুতরাং এটা কোনো জুলুম নয়। এছাড়া আল্লাহ হলেন সারা জাহানের মালিক। আর মালিক তার মালিকাধীন বস্তুতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তারই উপর কোনো জিনিস করা না করা ওয়াজিব নয়। তাহলে জুলুম হবে কেমন করে? জুলুম তো বলা হয় কোনো ওয়াজিব বর্জন করাকে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৫]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١٠. كُنْتُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ اُظْهِرَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ بِاللّٰهِ لَكَانَ الْاِيْمَانُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ الْكَافِرُوْنَ.

১১০. হে মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতগণ! আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে তোমরাই উত্তম দল যাদেরকে মানবজাতির উপকারার্থে বের করা হয়েছে তথা বিকাশ করা হয়েছে। তোমরা ভালোকাজের নির্দেশ দিয়ে থাক, আর মন্দকাজ থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখ। আর আহলে কিতাবরাও যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনত তবে তাদের জন্য ঈমান আনাটা ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু লোক মু'মিন রয়েছে যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তার সাথীরা আর তাদের অধিকাংশরাই নাফরমান কাফের।

١١١. لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اَيِ الْيَهُوْدُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ بِشَيْءٍ اِلَّا اَذًى بِاللِّسَانِ مِنْ سَبٍّ وَّوَعِيْدٍ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ مُنْهَزِمِيْنَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ عَلَيْكُمْ بَلْ لَكُمُ النَّصْرُ عَلَيْهِمْ.

১১১. হে মুসলমানগণ ! এই ইহুদিরা মৌখিক গালাগালি ও ভীতি প্রদর্শনে সামান্য কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে পরাজিত হয়ে, অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হবে না; বরং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে।

١١٢. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا حَيْثُمَا وُجِدُوْا فَلَا عِزَّ لَهُمْ وَلَا اعْتِصَامَ اِلَّا كَائِنِيْنَ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُوَ عَهْدُهُمْ اِلَيْهِمْ بِالْاَمَانِ عَلٰى اَدَاءِ الْجِزْيَةِ اَيْ لَا عِصْمَةَ لَهُمْ غَيْرُ ذٰلِكَ وَبَاءُوْا رَجَعُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اَيْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ تَاكِيْدٌ بِمَا عَصَوْا اَمْرَ اللّٰهِ وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ يَتَجَاوَزُوْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ.

১১২. তাদের [ইহুদিদের] উপর অপমান নির্ধারিত হয়ে আছে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তাদের কোনো ইজ্জত ও সম্মানের সাথে বাঁচার উপায় নেই। কেবলমাত্র আল্লাহর ও মানুষের তথা মু'মিনদের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত। আর মু'মিনদের প্রতিশ্রুতির অর্থ হলো ওদের জন্য তাদের তরফ থেকে জিজিয়া কর আদায়ের ভিত্তিতে নিরাপত্তা দেওয়ার সন্ধি চুক্তি হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া তাদের সংরক্ষণ হবে না। আর তারা আল্লাহর গজবে পতিত তথা প্রত্যাবর্তন করেছে। এবং দারিদ্র তাদের জন্য অবিচ্ছেদ্য করে দেওয়া হয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত। তা এ জন্যও যে, এটা তাকিদের জন্য এসেছে তারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করত। হালাল ছেড়ে হারামের দিকে ছুটে যেত।

http://islamiboi.wordpress.com

١١٣. لَيْسُوا اَىْ اَهْلُ الْكِتٰبِ سَوَاءً. مُسْتَوِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ مُسْتَقِيْمَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى الْحَقِّ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ يَتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ اَىْ فِىْ سَاعَاتِهِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ يُصَلُّوْنَ حَالٌ.

১১৩. তারা সব তথা আহলে কিতাবগণ সমান নয়, বরাবর নয়, আহলে কিতাবদের মধ্যে একদল এমনও আছে যারা অবিচল রয়েছে, তথা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়পদ রয়েছে, যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সাথিগণ। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে রাতের মুহূর্তসমূহে পাঠ করে সিজদারত অবস্থায় তথা নামাজরত অবস্থায়। (وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ) বাক্যটি يَتْلُوْنَ ক্রিয়ার ফা'য়েলের যমীর থেকে হাল হয়েছে।

١١٤. يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَاُولٰئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْسُوْا كَذٰلِكَ وَلَيْسُوْا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

১১৪. তারা ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি, আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হয়। তারাই তথা উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকেরাই নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেক লোক এ রকমও রয়েছে যারা উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী নয় এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্তও নয়।

١١٥. وَمَا تَفْعَلُوْا بِالتَّاءِ اَيَّتُهَا الْاُمَّةُ وَبِالْيَاءِ اَىِ الْاُمَّةُ الْقَائِمَةُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ بِالْوَجْهَيْنِ اَىْ تُعْدَمُوْا ثَوَابَهُ بَلْ تُجَازَوْنَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ.

১১৫. আর তারা যেসব সৎকাজ করবে সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। وَمَا تَفْعَلُوْا ক্রিয়াটি يَا ও تَا বর্ণের সাথে বিশুদ্ধ কেরাতে রয়েছে। ইয়ার يَا সাথে (يَفْعَلُوْا) হলে অর্থ হবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত যেদল যেসব সৎকাজ করবে সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা ...। আর তার (تَا) সহিত تَفْعَلُوْا হলে, অর্থ হবে, আর তোমরা যেসব সৎকাজ করবে হে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত দল। সেগুলোর প্রতি .... فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ -তেও অনুরূপ দুই সূরত হবে। অর্থাৎ তাদের বা তোমাদের সৎকাজের ছওয়াব বিনষ্ট করা হবে না; বরং এর উপর প্রতিদান দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের ব্যাপারে অবগত।

١١٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ تَدْفَعَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ اَىْ عَذَابِهِ شَيْئًا وَخَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِاَنَّ الْاِنْسَانَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ تَارَةً بِفِدَاءِ الْمَالِ وَتَارَةً بِالْاِسْتِعَانَةِ بِالْاَوْلَادِ وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর নিকট কোনো কাজে আসবে না, তথা বিন্দুমাত্রও তার কোনো শাস্তি হটাতে পারবে না। বিশেষভাবে এ দুটিকে এজন্য উল্লেখ করেছেন, কারণ মানুষ নিজের উপর থেকে হয়তো কোনো সময় অর্থের বিনিময়ে শাস্তি প্রতিহত করতে চায়, আবার কোনো সময় সন্তানদের সহায়তায়ও প্রতিহত করতে চায়। তবে আল্লাহর নিকট এ দুয়ের কোনোটাই উপকারে আসবে না যদি ঈমান নিয়ে না যেতে পারে আর তারাই হলো দোজখবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

http://islamiboi.wordpress.com

١١٧. مَثَلُ صِفَةُ مَا يُنْفِقُوْنَ اَىْ الْكُفَّارُ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِىْ عَدَاوَةِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ حَرٌّ اَوْ بَرْدٌ شَدِيْدٌ اَصَابَتْ حَرْثَ زَرْعَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ فَاَهْلَكَتْهُ فَلَمْ يَنْتَفِعُوْا بِهٖ فَكَذٰلِكَ نَفَقَاتُهُمْ ذَاهِبَةٌ لَا يَنْتَفِعُوْنَ بِهَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ بِضَيَاعِ نَفَقَاتِهِمْ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِالْكُفْرِ الْمُوْجِبِ لِضَيَاعِهَا .

১১৭. তারা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি শত্রুতা করতে এবং দান খয়রাত প্রভৃতি কাজে যা দুনিয়ার জীবনে ব্যয় করে তার উদাহরণ বা অবস্থা হলো এরূপ যেমন ঐ বাতাস যাতে রয়েছে তীব্র গরম বা ঠাণ্ডা, যা ঐ সব লোকদের শস্য খেতে গিয়ে লেগেছে, যারা নিজেদের প্রতি কুফর ও নাফরমানি করে জুলুম করেছে। অতঃপর সেগুলোকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ফলে তারা এ ক্ষেত থেকে উপকৃত হতে পারল না, তদ্রূপ অবস্থা তাদের দান-খয়রাতেরও যে, সেসব বেকার চলে যাবে, তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাদের সদকা খয়রাত বিনষ্ট করে তাদের প্রতি কোনো অত্যাচার করেননি; বরং তাদের সেসব ছদকার ছওয়াব বিনষ্টের কারণ-কুফর গ্রহণ করে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করছে।

তাহকীক ও তারকীব

كُنْتُمْ-এর كَانَ নাকেসা, তাম্মাহ, যায়েদা ও صَارَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার চারটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. كَانَ নাকেসা হলে অর্থ হবে, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলে।

২. তাম্মাহ হলে অর্থ হবে, حَدَثْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ و وَجَدْتُمْ وَخُلِقْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে সৃষ্ট হয়েছে।

৩. كَانَ যায়েদা বা অতিরিক্ত হলে অর্থ হবে. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اَىْ اَنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত।

৪. كَانَ بِمَعْنٰى صَارَ হলে অর্থ হবে, كُنْتُمْ اَىْ صِرْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে গেলে। তবে তৃতীয় সম্ভাবনা তথা যায়েদা বা অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাটিকে আল্লামা ইবনুল আম্বারী নেহায়েত ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, কারণ كَانَ বাক্যের মধ্যে বা শেষে অতিরিক্ত হয়ে থাকে, শুরুতে নয়। যেমন আরবগণ বলেন, عَبْدُ اللّٰهِ كَانَ قَائِمٌ [আব্দুল্লাহ দাঁড়ানো আছে] তবে তারা كَانَ কে অতিরিক্ত মেনে كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ قَائِمٌ বলেনি। এছাড়া আয়াতে খবরকে নসব [যবর] দিয়ে كَانَ কে অতিরিক্ত মানা জায়েজ হতে পারে না। كَانَ কে تَامَّةٌ ধরে নিলে যেরূপ একদল তাফসীরবিদগণ বলেছেন, তখন خَيْرَ اُمَّةٍ হালের অর্থে হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর كَانَ কে نَاقِصَةٌ মেনে নিলে যেরূপ অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেছেন, তেমনিভাবে كَانَ بِمَعْنٰى صَارَ হওয়ার সূরতেও خَيْرَ اُمَّةٍ - كَانَ ফেইলে নাকিসের খবর হওয়ার প্রেক্ষিতে নসব হবে। اُخْرِجَتْ অর্থ اُظْهِرَتْ প্রকাশ করা হয়েছে, বিকাশ করা হয়েছে তথা সৃষ্টি করা হয়েছে। اَذًى কষ্ট, তাকলিফ। اَلْاَدْبَارُ-دُبُرٌ এর বহুবচন পৃষ্ঠ, পিঠ। ضُرِبَتْ অর্থ এখানে اُلْزِمَتْ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। اَلذِّلَّةُ বেইজ্জতি, অপমান, লাঞ্ছনা। اَلْمَسْكَنَةُ দারিদ্রতা, গরিবী, পর মুখাপেক্ষীতা। حَبْلٌ-এর মূল

http://islamiboi.wordpress.com

অর্থ রশি, বহুবচনে حُبُوْلٌ - حِبَالٌ । তবে এখানে প্রতিশ্রুতির অর্থে ব্যবহার হয়েছে। بَاءُوْا অর্থ رَجَعُوْا অর্থাৎ তারা প্রত্যাবর্তন করেছে। بَوْءٌ মূল (بَوْءٌ) ঘর থেকে নির্গত। বলা হয় تَبَوَّأَ فُلَانٌ مَنْزِلَ كَذَا অমুক ব্যক্তি এরূপ একটি ঘর বানিয়েছে। آنَاءَ অর্থ- (اَوْقَاتٌ - سَاعَاتٌ) মুহূর্তসমূহ। এর একবচনের মধ্যে বহুবিধ লোগাত রয়েছে। যথা- اِنىً - [اَعْصًا -এর ওজনে] - اَنىً - [مَعْنىً -এর ওজনে] اِنْىٌ - اَنْىٌ আখফাশ থেকে اَنْو ও বর্ণিত আছে। يُسَارِعُوْنَ তারা দ্রুত সম্পন্ন করে, তাড়াতাড়ি করে। سُرْعَةٌ [দ্রুত করা, তাড়াতাড়ি করা] থেকে নির্গত। سُرْعَةٌ বা দ্রুত করা বলা হয় বৈধ মুহূর্তের মধ্যে আগে আগে কাজ সম্পন্ন করে নেওয়া। আর প্রশংসিত বিষয়। এর বিপরীত শব্দ আসে اِبْطَاءٌ [বিলম্ব করা]।

আর عُجْلَةٌ বা তাড়াহুড়ার অর্থ হলো অসমীচীন মুহূর্ত বা সময় আসার পূর্বে কাজ করে নেওয়া। এটা নিন্দনীয় বিষয়। এর বিপরীত শব্দ আসে اِنَاءَةٌ বা ধীরস্থিরভাবে কাজ করা বা প্রশংসিত। رِيْحٌ বাতাস, হাওয়া। বহুবচনে- اَرْوَاحٌ - اَرْيَاحٌ رِيَاحٌ তবে رِيْحٌ একবচনীয় শব্দটি আজাবের জন্য আর رِيَاحٌ বহুবচনীয় শব্দটি রহমতের জন্য খাছ। এই জন্যই হাদীস শরীফে এসেছে

- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

صِرٌّ ঠাণ্ডা বাতাস যা ক্ষেত ও গাছ পালাকে বিনষ্ট করে দেয়। কারো মতে, صِرٌّ অর্থ – লু হাওয়াও আসে যদিও তা অপ্রসিদ্ধ। যাজ্জাজ বলেছেন, اَلصِّرُّ অর্থ صَوْتُ لَهِيْبِ النَّارِ অগ্নি শিখার ধ্বনি। কারো মতে, صِرٌّ আসলে [হিম বাতাসের কনকনে আওয়াজ] صَرَّ الْقَلَمُ وَالْبَابُ صَرِيْرًا اِذَا صَوَّتَ [কলম ও দরজায় আওয়াজ করেছে] থেকে উদ্ভূত।

বালাগাত : تَأْمُرُوْنَ وَ تَنْهَوْنَ - اَلْمَعْرُوْفُ وَالْمُنْكَرُ - اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْفٰسِقُوْنَ -এর মধ্যে صَنْعَتُ طِبَاقٍ বা তেমনিভাবে مُقَابَلَة হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদের বিশ্বাসে অটল থাকতে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ الخ -এর মধ্যে এ নির্দেশটি আরো অধিকতর জোরদার করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মাহকে জগতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। এর প্রধান কারণই হচ্ছে তাদের উল্লিখিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য।

একটি প্রশ্ন ও সমাধান : (الاية) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হয়েছে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ এতে كُنْتُمْ ফে'লে মাযিটি যদি ফে'লে নাকিস হয়, তবে অর্থ হবে তোমরা উত্তম ছিলে। এ দ্বারা সন্দেহ হয় যে, এ উম্মত অতীতে শ্রেষ্ঠ ছিল কিন্তু এখন নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

১. এর উত্তরে কাজী সানাউল্লাহ (র.) বলেছেন, এখানে كَانَ (كُنْتُمْ) মাযীর সিগাহ সত্য যা অতীত কালে কোনো জিনিস প্রমাণিত করা বুঝায়। তবে এ দ্বারা এ কথা বুঝা যাচ্ছে না যে, অতীত কালের প্রমাণিত জিনিসটা এখন শেষ হয়ে গেছে বা ভবিষ্যতে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। এ রকমভাবে শেষ হওয়াটা নির্ভর করবে বাহ্যিক করীনা বা নিদর্শনের উপর। যেমন- যায়েদ পেট ভরে খেয়ে নেওয়ার পর কেউ বলল- كَانَ زَيْدٌ جَائِعًا قَبْلَ السَّاعَتَيْنِ অথাৎ যায়েদ দু'ঘণ্টা পূর্বে ক্ষুধার্ত ছিল। এতে বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এখন তার ক্ষুধা নেই। ক্ষুধার সময় তার শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি অতীতে বা ভবিষ্যতে শেষ হয়ে যাওয়ার কোনো নিদর্শন না থাকে তখন সর্বদাই বুঝা যাবে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا [আর আল্লাহ হলেন, ক্ষমাশীল ও দয়ালু] وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا আয়াত উভয়টিতে মাযী বা অতীত কালসূচক ক্রিয়া ব্যবহার হয়েছে। তবে এজন্য আল্লাহ পাক কোনো নির্দিষ্ট কালে ক্ষমাশীল দয়াবান ও জ্ঞাত বুঝা যায় না; বরং সর্বকালেই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান ও জ্ঞাত। তেমনিভাবে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ও একথা বুঝাচ্ছে যে, উম্মতে মুসলিমা অতীতে উত্তম ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৬]

http://islamiboi.wordpress.com

২. গ্রন্থকার আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন এর অর্থ হলো كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ فِى عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলে।

৩. এর অর্থ হলো পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে তোমাদেরকে উত্তম বলে স্মরণ করা হতো।

৪. অথবা এর অর্থ হবে كُنْتُمْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مَوْصُوْفِيْنَ بِاَنَّكُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে তোমাদের গুণ লিপিবদ্ধ আছে যে, তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত।

৫. তোমরা যখন থেকে ঈমান এনেছ, তখন থেকেই শ্রেষ্ঠ উম্মত। যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এছাড়া আরো অনেক জবাব ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৯৫]

আলোচ্য আয়াতটিতে উম্মত বলে সকল মুসলিম উম্মাহকেই বুঝানো হয়েছে। যদিও এর প্রাথমিক সম্বোধিতরা ছিলেন সাহাবাগণ। এই উম্মতকে তিনটি গুণের কারণে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলা হয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, সে যেন শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার শর্তগুলো পূর্ণ করে। আর ইশারা করেছেন আয়াতে উল্লিখিত তিনটি গুণের দিকে। অর্থাৎ ১. সৎকাজের আদেশ। ২. অসৎ কাজে বাধাদান ও ৩. আল্লাহর প্রতি ঈমান। এই তিনগুণ কারো মধ্যে অর্জিত হয়ে গেলে প্রকৃত পক্ষে সেই শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবিদার হতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি এবং আমার উম্মতগণ এ করুণায় দাখিল হওয়ার আগ পর্যন্ত বাকি সমস্ত উম্মতের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। -[মুসনাদে আহমদ]

তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে হাশরের মধ্যে বেহেশতীদের ১২০ কাতার হবে। তন্মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে ৮০ কাতার। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৭]

تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, ঈমানের উপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানের বিষয়কে অগ্রে আনার কারণ কি? অথচ ঈমান তো হলো যেকোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই এ হিসেবে ঈমানকে পূর্বে উল্লেখ করার ছিল। এর ব্যতিক্রম হলো কেন?

১. এর জবাবে কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, শ্রেষ্ঠ উম্মত যারা হন তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও অন্তরিক বিশ্বাস রেখে করে, লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে নয়। এ কথাটির উপর সতর্ক করার জন্যই ঈমানের কথা পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি আল্লাহর প্রতি ঈমান, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য এক বিশেষ ধরনের শর্ত।

২. অথবা পরবর্তী বাক্য وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ এর সহিত সম্পৃক্ত করার পক্ষে ঈমানের কথাটি শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৩৯]

৩. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) লিখেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার বিষয়টা সকল হকপন্থি উম্মতের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। আল্লাহর এই আয়াতের মাধ্যমে সকল উম্মতের উপর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত বুঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং হকপন্থি সকল উম্মতের মাঝে সমভাবে বিদ্যমান। ঈমানের কারণে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত অন্যান্য উম্মতের উপর প্রমাণিত করতে কার্যকর হতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে ক্রিয়াশীল বস্তু হচ্ছে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এ উম্মতের উন্নত ও শক্তিশালী পন্থায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দান করা যা অন্যান্য উম্মতের মধ্যে ছিল না। তাই ঈমানের পূর্বে এ দুটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ঈমান ছাড়া যেহেতু যে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না, তাই একে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৯৮]

৪. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, আলোচনাটা হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উদ্দেশ্যে, তাই এ দুটি বিষয়কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ঈমানসহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ তো অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ছিল। তাই এসবের কারণে এই উম্মতের ফজিলত প্রমাণিত হয় কেমন করে?

এর জবাবটি ইমাম রাযী (র.) আল্লামা কাফফাল (র.)-এর বরাত দিয়ে বলেছেন, যার সারমর্ম হলো এই যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সাধারণত তিন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। ১. অন্তর দ্বারা ঘৃণা করার মাধ্যমে। ২. জবান দ্বারা ও ৩. হাত তথা শক্তি প্রয়োগ তথা লড়াই ও জিহাদের মাধ্যমে। আর এই তৃতীয় পদ্ধতির সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ অর্থাৎ ইসলামি জিহাদের বিষয়টা বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়ে আছে একমাত্র আমাদের শরিয়তেই, অন্য কোনো শরিয়তে নয়। সুতরাং এই জিহাদের বিষয়টা অন্যান্য সকল উম্মতের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এর দ্বারাই আমরা বাকি সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ১৯৭]

http://islamiboi.wordpress.com

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ـ الخ অর্থাৎ ইহুদিদের উপর অপমান আর লাঞ্ছনা অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে। তথা তাদের কতল করা, বন্দি করা, তাদের সন্তানদের ও মহিলাদেরকে গোলাম-বাঁদি বানানো, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে আনাসহ যাবতীয় অপমান ও বেইজ্জতী সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তারা কোনোদিন পৃথিবীতে সম্মানের অধিকারী হতে পারবে না। তবে حَبْلٌ مِّنَ اللّٰهِ ও حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ -এর মাধ্যমে তাদের সেই বেইজ্জতির কিছুটা লাঘব হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতি, আশ্রয়ের মাধ্যমে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা কিছুটা হালকা হতে পারে। আল্লহর প্রতিশ্রুতি হলো ইসলাম। ইসলামের মাধ্যমে তাদের শিশু-সন্তানেরা, অযোদ্ধা মহিলারা এবং রোগী ও মাজুর পুরুষরা প্রাণ নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। কারণ তাদেরকে মারতে ইসলাম নিষেধ করেছে। আর মানুষের প্রতিশ্রুতি বলতে তাদের সাথে কৃত চুক্তি। তারা যদি মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়, চুক্তি করে নেয় তবুও তারা এক রকম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেতে পারবে। মানুষের প্রতিশ্রুতির মধ্যে অমুসলমানও শামিল। তাদের আশ্রয়েও তারা কিছুটা রক্ষা পেতে পারে। যেরূপ বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র। এই ইহুদিরা বেইজ্জত হয়ে মদিনা হতে বের হওয়ার পর থেকে প্রায় চৌদ্দশত বৎশর যাবত এরা বেইজ্জত হয়েই আছে। পৃথিবীতে তাদের কোনো স্বাধীন স্বীকৃত রাষ্ট্র নেই। ইসরাঈল স্বাধীন স্বীকৃত কোনো দেশ নয়। বিশ্ব তাদেরকে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি। তারা আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার ছত্রছায়ায় তাদের এক সেনা ছাউনির উর্ধ্বে কিছু নয়। তাদের সাহায্য সহায়তা যদি ইহুদিদের উপর থেকে সরে যায় তবে এক দিনের জন্যও তারা ইসরাইলে টিকে থাকতে পারবে না। তাই ইসরাইলের ইহুদিদের কারণে আল্লাহর ঘোষণা অসত্য প্রমাণিত হচ্ছে না। কারণ তিনি তো ইস্তেছনা বা পৃথক করে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর আশ্রয় বা মানুষের আশ্রয়ে তারা কিছুটা লাঞ্ছনা হতে বাঁচতে পারবে।

এখানে একটা প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ পাক বলেছেন, তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হলো এই যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং নবীদেরকে হত্যা করতো। প্রশ্ন হয় বর্তমান যুগের ইহুদিরা তো নবীদেরকে অন্যায় ভাবে হত্যা করছেনা। তদুপরি তাদের দিকে হত্যার সম্পর্ক হয় কেমন করে? এর জবাব হলো এই যে, তাঁরা বাব-দাদাদের না হক হত্যার প্রতি সন্তুষ্ট। তাই তাদের প্রতি এই হত্যার সম্পর্ক করা হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন, তাফসীরে কাবীর]

لَيْسُوْا سَوَآءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ ـ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উক্ত আয়াতের শানে নুযূল নিয়ে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়-

১. যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীগণ- যেমন হযরত সা'লবা ইবনে শুবা, উসাইদ ইবনে শুবা, উসাইদ ইবনে উবাইদ এবং তাদের সাথে ইহুদিদেরও কিছু লোকেরা ইসলাম কবুল করেন। ঈমান আনলেন, বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েন, তখন ইহুদি আলেমরা এবং তাদের অমুসলিমরা বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে যারা এবং যারা তাঁর অনুসারী হয়েছে তারা তো হলো আমাদের মন্দ-খারাপ লোকেরা যদি তারা ভালো মানুষ হতো তবে বাব-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মের দিকে যেতো না। তাদের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক لَيْسُوْا سَوَآءً থেকে নিয়ে اُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ পর্যন্ত আয়াত দুটি নাজিল করেন। এতে প্রমাণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যারা মুসলমান হয়েছে তারা মন্দলোক নয়; বরং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমরা যারা ইসলাম গ্রহণ কর নাই তারাই মন্দ ও দুষ্ট।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৩৩]

২. উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আরেকটি বিবরণ হলো এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেহেতু আহলে কিতাবদের অন্যান্য আচরণের কথা বর্ণিত হয়েছে তাই এই সত্য ঘোষণা করা হযেছে যে, আহলে কিতাবদের সকলই পথভ্রষ্ট না; বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং ভালোগুণে গুণান্বিত।

৩. ইমাম ছাওরী (র.) বলেছেন, যারা মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়ত তাদের সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

৪. হযরত আতা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি নাজরানের ৪০ জন, হাবশার ৩২ জন এবং রুমের ৩ জন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী ছিল পরে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান নিয়ে এসেছিলো। প্রিয় নবীর আবির্ভাবের পূর্বেই তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং তার হিজরতের পূর্বে মদিনায় আনসারদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ছিল। আনসারদের মধ্যে হযরত আসআদ ইবনে জোবায়ের, বারা ইবনে আনাস (রা.) সহ প্রমুখ সাহাবাদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ছিল। তারা মিল্লাতে ইবরাহীমি সম্পর্কে অবগত ছিল। তদানুযায়ী আমল করতো। অতঃপর আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর নবুয়তের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাকে সহায়তা করে তারা ধন্য হয়েছিল।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ২০৬, মাযহারী খ. ২, ৩৪৩, হাশিয়ায়ে জালালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١٨. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً اَصْفِيَاءَ تَطَّلِعُوْنَهُمْ عَلٰى سِرِّكُمْ مِنْ دُوْنِكُمْ اَىْ غَيْرِكُمْ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمُنَافِقِيْنَ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا نَصَبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اَىْ لَا يَقْصُرُوْنَ لَكُمْ جُهْدَهُمْ فِى الْفَسَادِ وَدُّوْا تَمَنَّوْا مَا عَنِتُّمْ اَىْ عَنَتَكُمْ وَهُوَ شِدَّةُ الضَّرَرِ قَدْ بَدَتْ ظَهَرَتِ الْبَغْضَاءُ الْعَدَاوَةُ لَكُمْ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ بِالْوَقِيْعَةِ فِيْكُمْ وَاطِّلَاعِ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى سِرِّكُمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ عَلٰى عَدَاوَتِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ذٰلِكَ فَلَا تُوَالُوْهُمْ ـ

১১৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের আপনজন ব্যতীত কোনো লোককে তথা ইহুদি, নাসারা ও মুনাফিকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু তথা অকৃত্রিম বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। যারা তোমাদের গোপন রহস্যের উপর অবগতি লাভ করে নিবে। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। خَبَالًا শব্দটি যের দানকারী فِىْ অব্যয় পদ উহ্য হওয়ার মাধ্যমে [মানসূব] যবর যুক্ত হয়েছে। আসল রূপ হবে لَا يَقْصُرُوْنَ لَكُمْ جُهْدَهُمْ فِى الْفَسَادِ [তারা তোমাদের জন্য ফাসাদ করার মধ্যে স্বীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি করবে না।] তারা কামনা করে আশা করে তোমাদের কষ্ট তথা তীব্র ক্ষতি। বস্তুত তাদের মুখ থেকেই তোমাদের কুৎসা রটনা করে এবং তোমাদের গোপন রহস্য সম্পর্কে মুশরিকদেরকে অবগত করে তোমাদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আর যা কিছু তাদের অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে তা অত্যন্ত জঘন্য। নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তাদের শত্রুতামির নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছি যদি তোমরা বুঝে নিতে পার। তবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রেখো না।

١١٩. هَاَ لِلتَّنْبِيْهِ اَنْتُمْ يَا اُولَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْكُمْ وَصَدَاقَتِهِمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ لِمُخَالَفَتِهِمْ لَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ اَىْ بِالْكُتُبِ كُلِّهَا وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِكِتَابِكُمْ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ اَطْرَافَ الْاَصَابِعِ مِنَ الْغَيْظِ ـ

১১৯. সাবধান! هَا শব্দটি সতর্ক করণের জন্য এসেছে। তোমরাই শুধু হে মুমিনগণ! তাদেরকে ভালোবাস, তাদের সঙ্গে তোমাদের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের দরুন, আর ওরা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে বিরোধ থাকার দরুন তোমাদেরকে ভালোবাসে না। আর তোমরা সকল আসমানি কিতাবের উপরই ঈমান রাখ এবং তারা তোমাদের কিতাবের [কুরআনের] উপর বিশ্বাস রাখে না। আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন একাকী হয় তখন তারা আক্রোশের কারণে আঙ্গুলি তথা আঙ্গুলির অগ্রভাগ কাটতে থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

شِدَّةِ الْغَضَبِ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ اِئْتِلَافِكُمْ وَيُعَبَّرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَضِّ الْاَنَامِلِ مَجَازًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عَضٌّ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ . اَيْ اِبْقَوْا عَلَيْهِ اِلَى الْمَوْتِ فَلَنْ تَرَوْا مَا يَسُرُّكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ وَمِنْهُ مَا يُضْمِرُهُ هٰؤُلَاءِ .

অর্থাৎ তীব্র রাগের কারণে এরা এরূপ করে, তোমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি দেখে প্রচণ্ড রাগকে রূপক অর্থে আঙ্গুলি কাটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যদিও সেখানে বাস্তবে আঙ্গুলি কাটা ছিল না। [হে রাসূল ﷺ] আপনি এদেরকে বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের আক্রোশের দরুন মরে যাও। অর্থাৎ তোমরা মরণ পর্যন্ত ক্রোধগ্রস্ত হয়ে থাক। তবুও তোমরা তোমাদের আনন্দদায়ক বস্তুটি দেখতে পাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বক্ষের কথা তথা মনের কথা খুব ভালো জানেন। আর এসব কথার থেকেই ঐসব কথা যেগুলোকে তারা লুকিয়ে রেখেছে।

١٢٠. اِنْ تَمْسَسْكُمْ تُصِبْكُمْ حَسَنَةٌ نِعْمَةٌ كَنَصْرٍ وَغَنِيْمَةٍ تَسُؤْهُمْ تُحْزِنُهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ كَهَزِيْمَةٍ وَجَدْبٍ يَفْرَحُوْا بِهَا وَجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِالشَّرْطِ قَبْلُ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُمْ مُتَنَاهُوْنَ فِيْ عَدَاوَتِكُمْ فَلِمَ تُوَالُوْنَهُمْ فَاجْتَنِبُوْهُمْ وَاِنْ تَصْبِرُوْا عَلٰى اَذَاهُمْ وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ مُوَالَاتِهِمْ وَغَيْرِهَا لَا يَضُرُّكُمْ بِكَسْرِ الضَّادِ وَسُكُوْنِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَتَشْدِيْدِهَا كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مُحِيْطٌ عَالِمٌ فَيُجَازِيْهِمْ بِهِ .

১২০. যদি তোমাদের কোনো কল্যাণ লাভ হয় তথা কোনো নিয়ামত তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। যেমন সাহায্য বা গনিমতের মাল তবে তারা দুঃখিত হয় টেনশনগ্রস্ত হয়। আর যদি তোমাদের কোনো প্রকার অকল্যাণ হয় যেমন– পরাজয় ও দুর্ভিক্ষ তখন এতে তারা আনন্দ বোধ করে। (اِنْ تَمْسَسْكُمْ) জুমলায়ে শর্তিয়াটি শর্তের পূর্বোক্ত বাক্য (وَاِذَا لَقُوْكُمْ الخ) -এর সাথে সম্পৃক্ত, আর এই বাক্য উভয়টির মাঝখানে (مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ الخ) বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হিসেবে এসেছে। মর্ম হলো এই যে, তারা তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণে চরমে পৌঁছে আছে। তদুপরি তোমরা তাদের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব কেন রাখ? সুতরাং তোমাদের জন্য তাদেরকে এড়িয়ে চলা উচিত। আর যদি তোমরা তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ কর এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না (لَا يَضُرُّكُمْ) -এর মধ্যে ض -এর যের ও ر [রা] সাকিনের সহিত এবং ض [দোয়াদের পেশ] ও ر [রার] তাশদীদের সহিতও কেরাত রয়েছে।

নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলিকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং জানেন। يَعْمَلُوْنَ -এর মধ্যে ى [ইয়া] ও ت [তা] উভয় বর্ণের সহিত কেরাত রয়েছে। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ভিন্ন কেরাত মতে তাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

بِطَانَةً বহুবচনে بَطَائِنُ অন্তরঙ্গ বন্ধু, অকৃত্রিম বন্ধু।

بِطَانَةً মূলত: কাপড়ের ভিতরের অংশকে বলা হয় যা শরীরে চামড়ার সাথে মিলে থাকে। যেরূপ ظِهَارَةٌ কাপড়ের বহিরাংশকে বলা হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

اَلْو - لَا يَأْلُوْنَ [ত্রুটি করা] মাসদার থেকে নির্গত। যা جَمْعُ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ সীগাহ। অর্থ- তারা ত্রুটি করে না।

خَبَالًا - خَبَالٌ অর্থ- ফ্যাসাদ, ক্ষতি। خَبَالٌ আসলে ঐ ফ্যাসাদকে বলা হয় যা মানুষের মধ্যে এসে যাওয়ার পর তার মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন, ব্যাধি, উন্মাদনা, পাগলামি। কোনো সময় সাধারণ ভাবে ক্ষতি ও ফ্যাসাদের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

اَىْ لَا يُقْصِرُوْنَ لَكُمْ فِى الْخَبَالِ اَىْ فِى الشَّرِّ এর প্রেক্ষিতে মানসূব হয়েছে। مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ শব্দটি خَبَالًا مَا অথবা لَا يَأْلُوْنَ -এর ফায়েলের যমীর হতে হাল হওয়ার প্রেক্ষিতে মানসূব হয়েছে। وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ -এর মধ্যে وَالْفَسَادِ টি মাসদারিয়া اَىْ عَنَتَكُمْ। عَنَتٌ অর্থ - شِدَّةُ الضَّرَرِ وَالْمَشَقَّةِ [অত্যন্ত ক্ষতি ও কষ্ট] اَلْبَغْضَاءُ - اَشَدُّ الْبُغْضِ মারাত্মক দুশমনি, চরম বিদ্বেষ। اَفْوَاهٌ - فَمٌ -এর বহুবচন মুখ। যা মূলত فَوَهٌ ছিল। এই জন্যই এর বহুবচন اَفْوَاهٌ -এর ওজনে আসে।

-[হাশিয়ায়ে জালালাইন, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, তাফসীরে কাবীর]

বালাগাত :

* لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَصْرِيْحِيَّةٌ হয়েছে। بِطَانَةً এর মূল অর্থ হচ্ছে কাপড়ের ভিতরের অংশ, চামড়ার দিকের অংশ। এখানে রহস্যবিদ অন্তরঙ্গ বন্ধুকে بِطَانَةً -এর সাথে তাশবীহ বা তুলনা দেওয়া হয়েছে, অতঃপর بطانة মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ করত: মুশাব্বাহ তথা অন্তরঙ্গ বন্ধু উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
* وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ -এর মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ تَمْثِيْلِيَّةٌ হয়েছে। এতে দুশমনের রাগ ও ক্রোধের অবস্থাকে লজ্জিত ও হতবুদ্ধি দিশেহারা ব্যক্তির দাঁত দ্বারা আঙ্গুল কাটার সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

-[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৩১-৩২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً - الخ অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের লোক [ঈমানদারগণ] ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক তাতেই তাদের আনন্দ।

আয়াতের শানে নুযূল : উপরোল্লিখিত আয়াত অবতরণের একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। আর তা হলো এই-

মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকা বসবাসকারী ইহুদিদের সাথে আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রাচীনকাল থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত এবং গোত্রগত উভয় পর্যায়েই তারা একে অন্যের প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। আওস ও খাজরাজ গোত্র মুসলমান হওয়ার পরও ইহুদিদের সাথে পুরাতন সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাদের লোকেরা ইহুদি বন্ধুত্বের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পূর্ণ ব্যবহার অব্যাহত রাখে। কিন্তু ইহুদিদের মনে মহানবী ﷺ ও তাঁর দীনের প্রতি শত্রুতা। তাই তারা এমন কোনো ব্যক্তিকে আন্তরিকতার সাথে ভালোবাসতে সম্মত ছিল না, যে এ ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। কাজেই তারা আওস ও খাজরাজ গোত্রের আনসারদের সাথে বাহ্যত পূর্ব সম্পর্ক বহাল রাখলেও এ সময় মনে মনে তাদের শত্রুতা হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যিক বন্ধুত্বের আড়ালে তারা মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকত এবং তাদের দলগত গোপন তথ্য শত্রুদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করতো। আলোচ্য আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের এহেন দুরভিসন্ধি থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি বর্ণনা করেছেন।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ১৬৩]

অতএব আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুরব্বী ও উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে যাবতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

http://islamiboi.wordpress.com

١٢١. وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ تُبَوِّئُ تُنَزِّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزَ يَقِفُوْنَ فِيْهَا لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِكُمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِكُمْ وَهُوَ يَوْمَ اُحُدٍ خَرَجَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِاَلْفٍ اَوْ اِلَّا خَمْسِيْنَ رَجُلًا وَالْمُشْرِكُوْنَ ثَلَاثَةُ اٰلَافٍ وَنَزَلَ بِالشِّعْبِ يَوْمَ السَّبْتِ سَابِعَ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ اِلَى اُحُدٍ وَسَوّٰى صُفُوْفَهُمْ وَاَجْلَسَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ جُبَيْرٍ بِسَفْحِ الْجَبَلِ وَقَالَ انْضَحُوْا عَنَّا بِالنَّبْلِ لَا يَاْتُوْنَا مِنْ وَرَائِنَا وَلَا تَبْرَحُوْا غُلِبْنَا اَوْ نُصِرْنَا .

১২২. اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ بَنُوْ سَلِمَةَ وَبَنُوْ حَارِثَةَ جَنَاحَا الْعَسْكَرِ اَنْ تَفْشَلَا تَجْبُنَا عَنِ الْقِتَالِ وَتَرْجِعَا لَمَّا رَجَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ الْمُنَافِقُ وَاَصْحَابُهُ وَقَالَ عَلَامَ نَقْتُلُ اَنْفُسَنَا وَاَوْلَادَنَا وَقَالَ لِاَبِيْ جَابِرٍ السُّلَمِيِّ الْقَائِلِ لَهُ اُنْشِدُكُمُ اللّٰهَ فِيْ نَبِيِّكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ فَثَبَّتَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَنْصَرِفَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا نَاصِرُهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَثِقُوْا بِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ .

অনুবাদ :

১২১. হে মুহাম্মদ ﷺ! স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন আপনি সকাল বেলা আপনার পরিজনদের কাছ থেকে মদিনা হতে বের হয়ে মু'মিমনদেরকে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থানে অবতরণ করিয়েছিলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা খুব শ্রোতা তোমাদের কথাবার্তার ব্যাপারে খুব অবগত তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে। আর তা ছিল ওহুদের দিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাজার বা নয়শত পঞ্চাশ জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলেন। অন্যদিকে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শনিবার তিনি ঘাঁটিতে গিয়ে অবতরণ করেন। আর তাঁর এবং তাঁর দলের পৃষ্ঠ দিলেন ওহুদ পাহাড়ের দিকে এবং তিনি সৈন্যদলের কাতারসমূহ ঠিক করে দিলেন। আর তিরন্দাজের একটি দল পাহাড়ি পথে মোতায়েন করলেন, যাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-কে। আর [তাদেরকে] বলেছিলেন, তোমরা শত্রুদেরকে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত করে আমাদের তরফ থেকে প্রতিহত করবে যাতে করে তারা আমাদের পিছন দিক থেকে আসতে না পারে। আর তোমাদের স্থান কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করবে না। আমরা পরাজিত হই বা বিজিত হই।

১২২. اذ পূর্বোক্ত اذ থেকে তারকীবে বদল হয়েছে। স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমাদের মধ্যে দু'দল তথা বনূ সালিমা ও বনূ হারিছা যারা সৈন্যদলের দুটি বাহু ছিল। সাহস হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ করা থেকে ভীরুতা প্রদর্শন করল এবং ফেরত চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ল ঐ মুহূর্তে যখন মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিরা ফেরত চলে গেল, আর বলল, আমরা কিসের উপর আমাদের ও আমাদের সন্তানদের প্রাণ হত্যা করাবো? আর সে আবূ জাবের সুলামীকে বলল, যিনি তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবী ও তোমাদের প্রাণের হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহর কসম দিচ্ছি আমরা যদি একে যুদ্ধ মনে করতাম তবে তোমাদের পিছনে সাহায্য করতাম [এটাতো যুদ্ধ নয়; বরং নিজেকে ধ্বংস করার নামান্তর] এমতাবস্থায় আল্লাহপাক তাদের উভয় দলকে দৃঢ়পদ করলেন, ফলে তারা [যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে] ফেরত এলো না। অথচ আল্লাহ পাক উভয় দলেরই সহায়ক সাহায্যকারী ছিলেন। আর মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত। তাঁর উপরই ভরসা করা উচিত, অন্য কারো উপর নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

إِذْ غَدَوْتَ [আপনি যখন সকাল বেলা বের হলেন] মাজী وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ। اَلْغُدُوْ [সকাল বেলা বের হওয়া] থেকে নির্গত। تُبَوِّئُ আপনি স্থান ঠিক করে দিচ্ছেন, অবতরণ করাচ্ছেন, ঠিক ও প্রস্তুত করছেন। تَبْوِئَةً মাসদার থেকে উদ্ভুত। تَبْوِئَةً মাসদারটি উপরিউক্ত অর্থ তিনটির জন্য ব্যবহৃত হয়। مَقَاعِدْ - مَقْعَدْ-এর বহুবচন, এর অর্থ- স্থান, অবস্থানস্থল। مَقْعَدْ ও مَقَامْ-এর আসল অর্থ হলো (مَحَلُّ الْقُعُوْدِ وَالْقِيَامِ) বসার স্থান ও দাঁড়ানোর স্থান। অতঃপর এতে ব্যাপকতা এসে যাওয়ার ফলে এখন রূপক অর্থে যেকোনো স্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে যায়। যদিও তাতে বসা বা দাঁড়ানোর মতো কাজ নাও পাওয়া যায়। إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ পূর্বোক্ত إِذْ غَدَوْتَ থেকে বদল হয়েছে। أَنْ تَفْشَلَا অর্থাৎ تَجْبُنَا ও تَضْعُفَا দুর্বল হওয়া, শৈথিল্য প্রদর্শন করা। اَلْفَشَلُ (س) ভীত হওয়া, শৈথিল্য প্রদর্শন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াত وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا-এর মধ্যে ইরশাদ হয়েছিল, যদি তোমরা সবর ও পরহেজগারী অবলম্বন কর তবে কাফেরদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতসমূহে ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কারণ এতে বদর যুদ্ধের তুলনায় সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন সাহাবা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ অমান্য হওয়ায় তারা এক পর্যায়ে পরাজিত হয়ে গিয়েছিলেন। এতে সবরের অভাবের ফলেই এ রকম হয়েছিল। ইমাম রাযী (র.) আরো একটি যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন, যে, ওহুদ যুদ্ধে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এর কারণে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এরূপ মুসলিম বিদ্বেষী কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মোটেই জায়েজ হতে পারে না। পূর্বের এক আয়াতে তাই বলা হয়েছিল।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ২২৪]

ওহুদ যুদ্ধ : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ الخ-এর মধ্যে বিবৃত ঘটনা দ্বারা সংখ্যা গরিষ্ঠ ওলামাদের মতে, ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাই উদ্দেশ্য। যদিও এতে বদর ও আহযাব যুদ্ধ উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে আরো দুটি মত বর্ণিত রয়েছে। তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো এই যে, হিজরি তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসের শুরুর দিকে মক্কার কাফেররা মদিনা আক্রমণ করার জন্য তিন হাজার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী নিয়ে ওহুদ পাহাড়ের নিকট অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের দলপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। [তখনও তিনি মুসলমান হননি] সংখ্যাধিক্য ছাড়াও তাদের নিকট যুদ্ধের সামগ্রীও ছিল অধিক এবং দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদর যুদ্ধে অপমানকর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জযবাও তাদের মধ্যে জাগরিত ছিল। স্বয়ং রাসূল ﷺ ও অভিজ্ঞ সাহাবাদের অভিমত ছিল মদিনার মধ্যেই থেকে যুদ্ধ করা যাক। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মতও ছিল অনুরূপই। কিছু সংখ্যক যুবক সাহাবা যারা শাহাদাত লাভের আশায় অস্থির ছিল বদর যুদ্ধে যাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তারা মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে হুজুরের কাছে বারংবার অনুরোধ জানাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের অনুরোধে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে নিলেন। আর যুদ্ধের পোশাক যেরাহ ইত্যাদি পরিধান করে তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তখন সাহাবাদের উপলব্ধি হলো যে, তিনি তো অনুরোধের কারণে বাধ্য হয়ে নিজের রায়ের বিরুদ্ধে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। ফলে কিছুসংখ্যক সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যদি ইচ্ছা হয় মদিনার ভিতরে থেকে প্রতিরোধ করার তাহলে এ রকমই করেন। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন, কোনো নবী যখন যুদ্ধের পোশাক পরে নেয় তখন তাঁর জন্য আল্লাহর ফয়সালা ব্যতীত ফেরত আসা বা পোশাক খুলে নেওয়া সমীচীন নয়।

এক হাজার মুজাহিদ তাঁর সঙ্গে বের হলেন, কিন্তু উভয় দল যখন মুখোমুখি হলো ঠিক ঐ মুহূর্তের আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশত সাথিকে নিয়ে শওত নামক স্থান থেকে একথা বলে ফিরত চলে আসল যে, আমাদের কথাই যখন মানা হলো না তাহলে অনর্থক প্রাণ কেন দেব? মুনাফিক আব্দুল্লাহর কথার দরুন বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া একটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এমন

http://islamiboi.wordpress.com

কি বনূ হারিসা ও বনূ সালিমা গোত্রদ্বয়ের মন এরূপ ভেঙ্গে পড়ল যে তারা ফেরত চলে আসার ইচ্ছা করে নিয়েছিল। পরে বুযুর্গ সাহাবাদের প্রচেষ্টায় এই মতানৈক্যের অবসান ঘটে। এই অবশিষ্ট সাতশ সাহাবাদেরকে নিয়ে নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন আর ওহুদ পাহাড়ের নিকট মদিনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় চার মাইল দূর গিয়ে নিজের সৈন্যদলকে এরূপ সারিবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত করলেন যে, ওহুদ পাহাড় ছিল পিছন দিকে, কুরাইশ দল ছিল সম্মুখে। এক পাশে ছিলো একটি গিরিপথ যে দিক থেকে হঠাৎ আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এই জন্য সেখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বাধীন পঞ্চাশজন দক্ষ তীরন্দাজের একটি দল মোতায়েন করে দিলেন, আর তাদেরকে তাকিদ দিয়ে বলে দিলেন যে, আমাদের পরিণতি যাই হোক না কেন, আমরা পরাজিত হই বা বিজয় লাভ করি, কিছুতে তোমরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করবে না। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হলো। কুরাইশরা বড় গুরুত্ব সহকারে ময়দানে অবতরণ করল। তাদের সংখ্যাছিল তিন হাজার, যাদের মধ্যে তিনশত ছিলো লৌহবর্ম পরিহিত সেনা, দুইশত ছিলো অশ্বারোহী বাকীরা ছিলো উষ্ট্রারোহী। কোরাইশ গোত্রের বড় বড় নেতারা সঙ্গে ছিল, সাহসবৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ এবং উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে মহিলারাও সাথে ছিল। হাতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যুদ্ধের সংগীত গাইতেছিল। আর বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে উত্তেজিত করতে ছিল।

ইসলামি দল তাঁর মোকাবিলায় মোট এক হাজারের চেয়েও কম ছিল। আর সমর সামগ্রীর অবস্থা ছিল এই যে, হুজুর ﷺ-এর বাহন ব্যতীত মাত্র একটি ঘোড়া ছিল।

যুদ্ধের সূচনা : যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লা ভারি ছিলো। এমনকি বিরোধী দলের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক সফলতাকে পরিপূর্ণ বিজয় পর্যন্ত পৌছানোর পরিবর্তে মুসলমানগণ গনিমতের মাল অর্জনের ফিকিরে লেগে যায়। এদিকে যে সব তীরন্দাজদেরকে হুজুর ﷺ গিরিপথ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করে রেখেছিলেন তারা যখন দেখতে পেল শত্রুদলের পা নড়েবড়ে হয়ে গেছে। তারা পলায়ন করতে শুরু করছে আর মুসলমানগণ গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে। তখন তারাও নিজেদের জায়গা ছেড়ে গনিমতের মাল গ্রহণের দিকে ধাবিত হতে লাগল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) তাদেরকে নবী করীম ﷺ-এর তাকিদ পূর্ণ নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বহুবার তাদেরকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কয়েকজন ব্যতীত কেউই বিরত হয়নি। এই সুযোগে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ যিনি তখন কাফের দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সুযোগের সৎ ব্যবহার করেছেন। ওহুদ পাহাড় ঘুরে পার্শ্বের গিরিপথ দিয়ে আক্রমণ করে বসলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) ও তাঁর অবশিষ্ট সাথিরা ঐ আক্রমণ রোধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। আর এই আক্রমণটি মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে হঠাৎ এসে পৌছে যায়। অপর দিকে কাফের সৈন্যদের যারা পালিয়ে গিয়েছিলো তারাও আবার ফেরত এসে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো। এ রকমভাবে যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে গেল। আর মুসলমানগণ এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার কারণে এরূপ হতাশাগ্রস্থ হলো যে, একটি বড় অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পলায়ন করল। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক বাহাদুর সাহাবীগণ তখনও ময়দান ছাড়েননি। এমতাবস্থায় কোথা থেকে জানি এ গুজব রটে গেল যে, নবী ﷺ শহীদ হয়ে গেছেন। এই সংবাদে সাহাবাদের অবশিষ্ট শক্তিটাও লোপ পেয়ে গেল। ফলে ময়দানে অবশিষ্ট লোক খুবই কম ছিলেন। ঐ সময় হুজুর ﷺ-এর পাশে কেবলমাত্র দশজন প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবী ছিলেন। আর তিনি আহত হয়ে গিয়েছিলেন। পরাজয়ে কোনো ত্রুটি ছিলনা। এমতাবস্থায় সাহাবাগণ জানতে পারলেন যে, হুজুর ﷺ বহাল তবিয়তে জীবিত আছেন। ফলে ক্ষণিকের মধ্যেই তারা চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে হুজুরের পাশে সমবেত হয়ে গেলেন। আর হুজুর ﷺ কে নিরাপদে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। অতঃপর কাফেররা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে অবশেষে মুসলমানদের বিজয় লাভ হয়।

قَوْلُهُ وَإِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ : এই আয়াতের মধ্যে বনূ হারিছা ও বনূ সালিমা গোত্রদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উভয় গোত্রের সম্পর্ক ছিল আওস ও খাজরাজের সাথে। মুসলমানরা যখন দেখল যে, কাফেরদের দলে তিন হাজার, আর আমাদের মাত্র সাতশত।

আর অস্ত্রের দিক দিয়েও তারা মক্কার কাফেরদের তুলনায় প্রায় নিরস্ত্রের মতোই ছিলো। ফলে তাদের মনের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হতে লাগল। তখন আল্লহর নবী ওহীর মাধ্যমে এক থাগুলো ইরশাদ করলেন যে, মুমিনদের একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। এছাড়া ইতঃপূর্বে বদর যুদ্ধে আল্লাহ পাক তো তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। অথচ তখন তোমরা দুর্বল ছিলে। সুতরাং তোমাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আশা করি তোমরা এখন শোকরগুযার হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢٣. وَنَزَلَ لَمَّا هُزِمُوْا تَذْكِيْرًا لَهُمْ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَالسِّلَاحِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعَمَهُ.

১২৩. আর সামনের আয়াতটি ঐ মুহূর্তে তাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নাজিল হলো, যখন তারা [ওহুদে এক পর্যায়ে সাময়িক] পরাজয় হয়ে গিয়েছিল। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, বদর মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটা স্থান। অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল সংখ্যা ও অস্ত্র কম হওয়ার কারণে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার তাঁর নিয়ামতরাজির।

١٢٤. اِذْ ظَرْفٌ لِنَصَرَكُمْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ تُوْعِدُهُمْ تَطْمِيْنًا لِقُلُوْبِهِمْ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ يُعِيْنَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ.

১২৪. اِذْ. نَصَرَكُمْ -এর যরফ [হে রাসূল ﷺ] স্মরণ করুন সেই সময়কে যখন আপনি মু'মিনদেরকে বলতে লাগলেন তাদের সান্ত্বনার জন্য তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতে লাগলেন যে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন (مُنْزَلِيْنَ) -এর মধ্যে জযম ও তাশদীদ যোগে দুটি কেরাত রয়েছে।

١٢٥. بَلٰى يَكْفِيْكُمْ ذٰلِكَ وَفِى الْاَنْفَالِ بِاَلْفٍ لِاَنَّهُ اَمَدَّهُمْ اَوَّلًا بِهَا ثُمَّ صَارَتْ ثَلٰثَةً ثُمَّ صَارَتْ خَمْسَةً كَمَا قَالَ تَعَالٰى اِنْ تَصْبِرُوْا عَلٰى لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فِى الْمُخَالَفَةِ وَيَأْتُوْكُمْ اَىِ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ فَوْرِهِمْ وَقْتِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا اَىْ مُعَلَّمِيْنَ وَقَدْ صَبَرُوْا وَاَنْجَزَ اللّٰهُ وَعْدَهُمْ بِاَنْ قَاتَلَتْ مَعَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى خَيْلٍ بُلْقٍ عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرًا وَ بِيْضٌ اَرْسَلُوْهَا بَيْنَ اَكْتَافِهِمْ.

১২৫. অবশ্যই তা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর সূরা আনফালে এক হাজারের কথা এসেছে তার কারণ হলো এই যে, প্রথমত এক হাজার দ্বারা সাহায্য করেছেন। অতঃপর তাদের সংখ্যা তিন হাজারে উন্নীত হয়েছে। তারপর পাঁচ হাজার হয়ে গেছে। যেরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যদি শত্রুদের সাথে মোকাবিলার সময় ধৈর্য ধারণ কর এবং বিরুদ্ধাচারণ হতে আল্লাহকে ভয় কর, আর এমন সময় যদি কাফেররা দ্রুতগতিতে তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে, তবে তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। (مُسَوِّمِيْنَ) -এর (و) ওয়াও যের ও যবরযোগে। যেরের অবস্থায় অর্থ হবে সমরনীতিতে পারদর্শী আর যবরের অবস্থায় অর্থ হবে, সমরবিদ্যায় শিক্ষিত। আর তাঁরা অবশ্যই ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহ ও তাদের সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, এ রকমভাবে যে, তাদের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাগণ চিত্রল ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে হলুদ বা সাদা রংগের পাগড়ি পরিহিতাবস্থায় যুদ্ধ করেছে, তাদের পাগড়ির শামলা উভয় কাঁধের দিকে ছেড়ে রেখেছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

١٢٦. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اَىِ الْاِمْدَادَ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ بِالنَّصْرِ وَلِتَطْمَئِنَّ تَسْكُنَ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ فَلَا تَجْزَعُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْجُنْدِ ـ

১২৬. এবং আল্লাহ তা'আলা শুধু তোমাদের নসরতের সুসংবাদ হিসেবে তা তথা সাহায্য করেছেন, আর তোমাদের মনকে যেন সে সাহায্য শান্ত রাখে এবং তোমরা যেন দুশমনদের সংখ্যাধিক্য ও নিজেদের সংখ্যাল্পতার কারণে ঘাবড়ে না যাও। আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হয়, যাকে চান তাকে তিনি সাহায্য দান করেন। সেই সাহায্য সৈন্যবাহিনীর আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়।

١٢٧. لِيَقْطَعَ مُتَعَلِّقٌ بِنَصْرِكُمْ اَىْ لِيُهْلِكَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ اَوْ يَكْبِتَهُمْ يُذِلَّهُمْ بِالْهَزِيْمَةِ فَيَنْقَلِبُوْا يَرْجِعُوْا خَائِبِيْنَ لَمْ يَنَالُوْا مَا رَامُوْهُ ـ

১২৭. لِيَقْطَعَ ـ نَصَرَكُمْ -এর মুতা'আল্লিক যাতে ধ্বংস করে দেন কাফেরদের এক অংশকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন পরাজয়ের মাধ্যমে যেন তারা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায় তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারল না।

١٢٨. وَنَزَلَ لَمَّا كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ﷺ وَشُجَّ وَجْهُهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ بَلِ الْاَمْرُ لِلّٰهِ فَاصْبِرْ اَوْ بِمَعْنٰى اِلٰى اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ بِالْاِسْلَامِ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ بِالْكُفْرِ ـ

১২৮. যখন ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রুবাঈ দাঁত মোবারক ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর চেহারা মোবারক যখম হয়ে পড়ে আর তিনি বললেন যে, সেই জাতি কেমন করে সফলতা লাভ করতে পারে যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে তখন সামনের আয়াতটি নাজিল হয়। [হে রাসূল ﷺ] এতে আপনার করণীয় কিছু নেই বরং মামলাটা আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত, তাই আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। او - الى ان -এর অর্থে ব্যবহৃত, আল্লাহ তা'আলা হয় তাদেরকে ক্ষমা করবেন তাদেরকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করে কিংবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন কুফরি গ্রহণ করার কারণে।

١٢٩. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهٗ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيْبَهٗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمٌ بِاَهْلِ طَاعَتِهٖ ـ

১২৯. আর মালিকানা, সৃষ্টি ও অধীন দাস হওয়ার প্রেক্ষিতে যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর। তিনি যাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করেন। আর যাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করেন তাকে শাস্তি দান করেন। আর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময় স্বীয় অনুসারীদের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

بَدْر মক্কা-মদিনার মধ্যস্থিত একটি কুয়ার নাম যা জুহাইনা গোত্রের বদরনামী এক লোকের ছিল। তার নামে এ কুয়াটির নাম রাখা হয়েছে। ওয়াকেদী বলেছেন, বদর একটি স্থানের নাম। কারো মতে এটা ঐ ময়দানের নাম যাতে এ কুয়াটি রয়েছে। اَذِلَّة শব্দটি ذَلِيْل -এর বহুবচন অর্থ লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও তুচ্ছ। কারণ তারা তখন কাফেরদের নজরে খুবই হীন ও তুচ্ছ ছিল। অথবা বলা যাবে, এখানে ذُلّ -এর প্রসিদ্ধ অর্থ লাঞ্ছিত হওয়া, হীন হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে ذِلَّتْ -এর মর্ম সৈন্য ও সমর সামনে তুচ্ছ হওয়া। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, তাফসীরে কাবীর]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ الاية : মুসলমানগণ কেবল মাত্র কুরাইশী কাফেলার উপর যারা ছিল নিরস্ত্র তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য বের হয়েছিলেন। এ জন্য কুরাইশরা এ সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে, এ কাফেলার ব্যবসা দ্বারা যে আমদানি হবে এসবগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা হবে। এ উদ্দেশ্য কে সামনে রেখেই মক্কাবাসী ঐ কাফেলার বাণিজ্য অধিক থেকে অধিকতর পুঁজি বিনিয়োগের চেষ্টা করেছিল। তাই মুসলমানগণ এই কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের সম্পূর্ণ মাল জব্দ করার চেষ্টা করলেন। আর এটা সমর নীতির সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বর্তমান যুগেও এ রকম হচ্ছে। বরং সম্প্রতি কেবল অজুহাত সৃষ্টি করে লোকদের এবং দেশ ও রাজ্যের বেসামরিক আসবাব পত্রকে যুদ্ধের সামান ও মারণাস্ত্র বলে এ সবগুলো জব্দ করা হচ্ছে।

বদর যুদ্ধের সারমর্ম ও এর গুরুত্ব : মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কুয়ার নাম বদর। মূলত এ কুয়াটি বদর নামী এক ব্যক্তির ছিল। তার নামে কুয়াটির নামও বদর হয়ে গেছে। তখনকার সময় ঐ স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য ছিল যে, সেখানে পানি ছিলো প্রচুর। এটা বাহরে আহমরের উপকুল থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত একটি ছাউনি ও বাজারের নাম। এ স্থানটি সিরিয়া, মদিনা ও মক্কার সড়কসমূহে তেমোড়ে ছিল। আর কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলা সমূহ এ পথ দিয়েই আসা-যাওয়া করত।

এটি তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। এখানেই ১৭ রমজান, শুক্রবার হিজরি দ্বিতীয় সাল মোতাবেক ১১ মার্চ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরাট ধরনের ইনকিলাব সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ ইতিহাসবিদগণও এর গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছে। হিস্টুরিস হাটুরী অফ ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে যে, "ইসলামি বিজয়ের ধারাবাহিকতায় বদর যুদ্ধ সর্বাধিক গুরুত্ব রাখে। -[হিস্টুরী হাটুরী অফ ওয়াল্ড খ. ৮. পৃ. ১২২]

এবং আমেরিকার প্রফেসর হিট্টির রচিত হিস্টুরি অফ দ্যা আরচস এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, এটা [বদর যুদ্ধ] ইসলামের সর্ব প্রথম সুস্পষ্ট বিজয় ছিল।" -[হিস্টুরী অফ দ্যা আরচস ১০৭ পৃ.]

মক্কার মুশরিকদের সৈন্য সংখ্যা এবং তাদের সশস্ত্র হওয়ার অবস্থা শুনে মুসলমানদের মধ্যে ঘাবরানো ও বিক্ষিপ্ততা এবং জুশের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হওয়াটা একটি কুদরতি ব্যাপার ছিল, আর তা হয়েছিলও বটে। ফলে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া ও ফরিয়াদ জানালেন। এর উপর আল্লাহ পাক এক হাজার ফেরেশতা অবতরণ করলেন। আর অতিরিক্ত আরো প্রেরণ করার এ অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তোমরা যদি সবর ও পরহেজগারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার তাহলে ফেরেশতাদের সংখ্যা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার করে দেওয়া হবে। বলা হয় যে, যেহেতু মুশরিকদের উত্তেজনা ও ক্রোধ টিকে থাকতে পারেনি তাই পূর্ব ঘোষিত সুসংবাদ অনুযায়ী তিন হাজার ফেরেশতা পাঠানো হয়েছিল, পাঁচ হাজারের সংখ্যা পূরণ করার প্রয়োজন পড়েনি। আর কিছু সংখ্যক তাফসীরবিদগণ বলেন, এই পাঁচ হাজারের সংখ্যাপূর্ণ করা হয়েছে। কারণ ফেরেশতাদের অবতরণ করার উদ্দেশ্য সরাসরি তাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ছিল না। বরং কেবলমাত্র মুসলমানদের সাহসবৃদ্ধি করাটাই উদ্দেশ্য ছিল। অন্যথায় ফেরেশতাদের মাধ্যমে যদি কাফেরদেরকে ধ্বংস করানোই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এত ফেরেশতা নাজিল করার প্রয়োজন ছিল না। একজন ফেরেশতাই সকলের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) ইসুদ্দুম জাতি তথা লূৎ (আ.) -এর জনপদকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যেহেতু এটা ছিলো জিহাদের বিষয় আর জিহাদ মানুষেরই করতে হয়, যাতে তারা ছওয়াব ও প্রতিদানের উপযোগী হতে পারে। ফেরেশতাদের কাজ ছিল কেবল সাহস বৃদ্ধি করে দেওয়া, যা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। -[জামালাইন -১/৫৩৮ - ৪১]

قَوْلُهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ : [হে রাসূল ﷺ ! এতে আপনার করণীয় কিছু নেই যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন কি শাস্তি দিবেন, কেননা তারা অত্যাচারী।] আলোচ্য আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. **প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী** আলোচ্য আয়াতটি ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রে নাজিল হয়েছে। ২. এবং অপ্রসিদ্ধ একটি মতানুসারে আয়াতটি বীরে মাউনার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রসিদ্ধ মতের অনুসারীদের মধ্যে আবার তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। ১. যথা- নবী করীম ﷺ ওহুদ যুদ্ধে কাফেরদের উপর বদদোয়া করতে চাইলে আয়াতটি নাজিল হয়।

উৎবা ইবনে উবাই ইবনে ওয়াক্কাস ওহুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ -এর চেহারা মুবারক জখম করেছিল যুদ্ধের শিরস্ত্রানের কড়া ভেঙ্গে কপাল মুবারকে ঢুকে যায় ও দান্দান মোবারক শহীদ হয়ে যায়। তখন আবূ হুযাইফার মাওলা সালিম তাঁর চেহারা

http://islamiboi.wordpress.com

থেকে রক্ত মুছতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি বলেছিলেন, ঐ জাতি কেমন করে কামিয়াব হতে পারে যে তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে তাদের প্রভুর প্রতি আহ্বান করছে। অতঃপর তিনি তাদের উপর বদদোয়া করতে চাইলেন, ফলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি কিছু সংখ্যক কাফেরদের নাম ধরে তাদের উপর লানত করেছেন। তিনি বলেছেন। اَللّٰهُمَّ الْعَنْ اَبَا سُفْيَانَ - اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ - اَللّٰهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ ফলে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়, আপনিতো আদিষ্ট বান্দামাত্র আপনার দায়িত্ব হলো তাদের জন্য মঙ্গলের দোয়া করা বদদোয়া না করা।

কারণ তাদের হেদায়েত পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছু নেই। তার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং এদের অনেককেই আল্লাহ পাক মুসলমান হওয়ার তৌফিক দিয়েছিলেন।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আয়াতটি হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। কারণ হুজুর ﷺ যখন দেখলেন হামজার মুছলার অবস্থা তখন তাঁর অন্তরে খুবই ব্যাথা লাগে। কেননা কাফেররা তাঁর নাক-কান কেটে ফেলেছিল, তাঁর গুপ্তাঙ্গও কেটে দিয়েছিলো। কলিজা কেটে টুকরা টুকরা করে দাত দ্বারা চিবিয়েছিল। এমতাবস্থা দেখে হুজুর ﷺ বলেছিলেন,আমি হামজার বদলে তাদের ত্রিশজনকে মুছলা করবো। ফলে আয়াতটি নাজিল হয়। উপরোল্লিখিত ঘটনা তিনটিই ওহুদে ঘটেছে তাই এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতেই আয়াতখানি নাজিল হয়েছে। আল্লামা কাফ্ফাল এরূপই বলেছেন।

২. দ্বিতীয় উক্তি মতে, ওহুদ যুদ্ধে যে সকল মুসলমান আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেছিলো এবং যারা সাময়িক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল তাদের উপর আল্লাহর রাসূল ﷺ লানত করার মনস্থ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করে তাকে তা থেকে বারণ করেন। এ উক্তিটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে।

৩. তৃতীয় উক্তি মতে, ওহুদ যুদ্ধে হুজুর ﷺ যারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং তাঁর নির্দেশের অমান্য করেছিল তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে চেয়েছিলেন। ফলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করে তাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪. দ্বিতীয় অপ্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আয়াতটি নাজিল হয়েছে বীরে মাউনার ঘটনা সম্পর্কে। নবী করীম ﷺ বীরে মাউনাবাসীর নিকট তাদের দরখাস্তনুযায়ী সত্তরজন কারী সাহাবীর একটি জামাত পাঠিয়ে ছিলেন। আমির ইবনে তুফাইল তার দল নিয়ে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে। ফলে রাসূল ﷺ চিন্তিত ও দুঃখিত হন এবং ঐ কাফেরদের উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বদদোয়া করতে থাকেন। অতঃপর আয়াতটি নাজিল করে তাকে বারণ করা হয়। এটা হচ্ছে ইমাম মুকাতিলের উক্তি। তবে এ মতটি খুবই দুর্বল। কারণ অধিকাংশ ওলামাগণ এর উপর একমত যে আয়াতটি ওহুদের ঘটনায় নাজিল হয়েছে। আর আয়াতটির পূর্বাপর অবস্থায়ও তাই বুঝা যাচ্ছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৮, পৃ. ২৩৮ - ৩৯]

ফায়দা : আল্লাহ পাকের ইন্তেজাম দু'রকম হয়ে থাকে। একটি হলো شَرْعِىْ বা আইনগত। আর অপরটি হলো تَكْوِيْنِىْ বা সৃষ্টিগত। আইনগত ইন্তেজামের সম্পর্ক নবীগণের সাথে। আর সৃষ্টি সংক্রান্ত ইন্তেজামের সম্পর্ক ফেরেশতাদের সাথে, অর্থাৎ আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর তাকদীরি হুকুম মতেই সেই ইন্তেজামটা হয়ে থাকে। হযরত খাজির (আ.)-এর ইন্তেজামটাও ছিলো সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে জড়িত। আর হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক তাঁর উপর অভিযোগ করাটা ছিলো আইন সংক্রান্ত বিষয়াদির ভিত্তিতে। وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا তদ্রূপ নবী করীম ﷺ কর্তৃক ইসলামের বিশেষ বিশেষ দুশমনদের বিরুদ্ধে তাদের নাম ধরে বদদোয়া করাটাও ছিল আইন সংক্রান্ত ইন্তেজামের ভিত্তিতে। কারণ তারা ছিল ইসলামের দুশমন, ওরা এরই উপযুক্ত যে তাদের উপর বদদোয়া করা যাবে। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা ও তাঁর তাকদীরে যেহেতু এ কথার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে রয়েছিল যে, তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হবে। তাই তিনি আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করে হুজুর ﷺ -কে তাদের সম্পর্কে বদদোয়া করা থেকে নিষেধ করে দিয়েছেন। এটা ছিলো তাকদিরী বা সৃষ্টি সংক্রান্ত ইন্তেজাম।

-[মাআরিফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ৪৭ - ৪৮]

http://islamiboi.wordpress.com

١٣٠. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً بِاَلِفٍ وَدُوْنِهَا بِاَنْ تَزِيْدُوْا فِي الْمَالِ عِنْدَ حُلُوْلِ الْاَجَلِ وَتُؤَخِّرُوا الطَّلَبَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ .

١٣١. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ اَنْ تُعَذَّبُوْا بِهَا .

١٣٢. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

١٣٣. وَسَارِعُوْا بِوَاوٍ وَدُوْنِهَا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اَيْ كَعَرْضِهِمَا لَوْ وُصِلَتْ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى وَالْعَرْضُ السَّعَةُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ اللّٰهَ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِيْ .

١٣٤. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ اَيِ الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ الْكَافِيْنَ عَنْ اِمْضَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ اَيِ التَّارِكِيْنَ عُقُوْبَتَهُمْ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ بِهٰذِهِ الْاَفْعَالِ اَيْ يُثِيْبُهُمْ .

অনুবাদ :

১৩০. হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না। (مُضٰعَفَةً) শব্দটিতে আলিফসহ এবং আলিফ ছাড়া উভয় পদ্ধতিই শুদ্ধ আছে। এ রকমভাবে যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়াতে তোমরা অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি করে দিয়ে প্রাপ্তি তলবে অবকাশ দিয়ে দিবে। আর সুদ বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, হয়তো তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। সফলকাম হয়ে যাবে।

১৩১. আর সেই দোজখকে ভয় করো যা মূলত কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তোমাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা থেকে ভয় করো।

১৩২. এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

১৩৩. তোমরা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও (سَارِعُوْا) শব্দের س-এর পূর্বে আতফের 'ওয়াও' এর সাথে এবং 'ওয়াও' ছাড়া উভয় কিরাতে রয়েছে। তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও সেই বেহেশতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের ন্যায় অর্থাৎ বেহেশতের প্রশস্ততা এ উভয়টির প্রশস্ততার ন্যায়, যদি উভয়টিকে একত্র করে নেওয়া হয়। আর (عَرْض) অর্থ প্রশস্ততা। যা আনুগত্য প্রদর্শন ও পাপরাশি বর্জনের মাধ্যমে পরহেজগার লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৩৪. যারা সচ্ছলতা এবং অভাবের সময় আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধকে দমন করে তথা ক্রোধ চরিতার্থ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে রাখে আর যেসব লোকেরা তাদের প্রতি অবিচার করেছে তাদেরকে মাফ করে তথা তাদের শাস্তি ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ এসব আমলের কারণে নেককার লোকদেরকে পছন্দ করেন অর্থাৎ তাদেরকে ছওয়াব প্রদান করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

١٣٥. وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً ذَنْبًا قَبِيْحًا كَالزِّنَا اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ بِمَا دُوْنَهُ كَالْقُبْلَةِ ذَكَرُوا اللّٰهَ اَىْ وَعِيْدَهُ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ اَىْ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا يُدِيْمُوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا بَلْ اَقْلَعُوْا عَنْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ الَّذِىْ اَتَوْهُ مَعْصِيَةٌ ـ

১৩৫. আর যারা কোনো প্রকাশ্য পাপকাজ করে ঘৃণ্য কোনো গুনাহের কাজ যথা ব্যভিচারের কোনো কাজ করে বা তার চেয়ে ছোট কোনো পাপ কাজ যথা অবৈধ চুম্বন দিয়ে নিজেদের প্রতি অবিচার করে বসে, তখন আল্লাহকে তথা তার ভীতির কথা স্মরণ করে এবং নিজের পাপ কার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কে আছে যে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলেছে তাতে এসরার করেনি সর্বদা লেগে থাকেনি বরং তা থেকে বিরত হয়ে পড়ে অথচ তারা জানে যে, তারা যা করেছে তা ছিল গুনাহের কাজ।

١٣٦. اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا اِذَا دَخَلُوْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ـ بِالطَّاعَةِ هٰذَا الْاَجْرُ ـ

১৩৬. তারাই সেসব লোক যাদের প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার তরফ থেকে ক্ষমা এবং বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে। তারা সেই বেহেশতে চিরদিন থাকবে। যখন থেকে তাতে প্রবেশ করবে। (خٰلِدِيْنَ) শব্দটি حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ তাদের জন্য বেহেশতে চিরকাল থাকার বিষয়টা স্থির হয়ে রয়েছে। আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমলকারীদের এ প্রতিদানটা কতইনা উত্তম প্রতিদান।

তাহকীক ও তারকীব

اَلرِّبَا-এর শাব্দিক অর্থ, অতিরিক্ত, বর্ধিতাংশ। আর শরিয়তের পরিভাষায় পরস্পর চুক্তি সম্পাদনকারী দুই ব্যক্তির কারো জন্য শর্তায়িত ঐ অর্থ বা বস্তুর অতিরিক্ত অংশকে রিবা বা সুদ বলা হয়, যার বদলে কোনো বিনিময় নেই।

(فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شُرِطَ لِاَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ)

অর্থনীতির পরিভাষায় রিবা বা সুদ বলা হয়, টাকার ঐ পরিমাণকে যা ঋণগ্রহীতা ঋণ গ্রহণের পরিমাণের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হারে প্রদান করে থাকে বিশেষ শর্ত মাফিক। −[আল মুজামুল ওয়াসীত, পৃ. ৩২৬]

اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً - اَضْعَاف এটা ضَعْف-এর বহুবচন, অর্থ দ্বিগুণ। তবে এখানে শাব্দিক অর্থটা শর্ত হিসেবে উদ্দেশ্য নয়। اَلرِّبَا শব্দ থেকে তারকীবের মধ্যে (حَالٌ) হাল হয়েছে। اَلْكَاظِمِيْنَ ـ يَكْظِمُ ـ كَظَمَ থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। অর্থ ক্রোধ সংবরণকারীগণ। كَظَمَ ـ كَظْمًا ক্রোধ সংবরণ করা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়া।

মশক পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় তার মাথা বা মুখ বেঁধে নেওয়াকে মূলত اَلْكَظْمُ বলে। বলা হয় فُلَانٌ كَظِيْمٌ অমুক ব্যক্তি ভারাক্রান্ত চিন্তিত।

اَلْغَيْظُ রাগ, ক্রোধ, গোস্সা। মন্দ কাজ বা বস্তু দেখলে মনে যে ক্ষোভের বা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে غَيْظٌ বা ক্রোধ বলে, যার প্রভাব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকাশ লাভ করে।

http://islamiboi.wordpress.com

غَضَبٌ ও غَيْظٌ -এর পার্থক্য : غَضَبٌ [গাজাব] ও غَيْظٌ [গাইজ] উভয়টার অর্থই ক্রোধ বা রাগ। তবে উভয়টার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে নিম্নরূপ–

- غَضَبٌ -এর পর প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে غَيْظٌ -এর পর তা হয় না।
- غَضَبٌ অঙ্গ প্রতঙ্গে ও চেহারায় অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশিত হয়ে যায়, তবে غَيْظٌ -এর মধ্যে অন্তরেই সীমিত থাকে।
- কারো মতে, উভয়টা সমার্থবোধক। তবে غَضَبٌ -এর সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করা শুদ্ধ আছে। আর غَيْظٌ -এর সম্পর্ক তার দিকে করা ঠিক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : বাহ্যত এসব আয়াতের পূর্বের সহিত কোনো যোগসূত্র বুঝা যায় না। এজন্য কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটা পৃথক ও স্বতন্ত্র করা। যার মধ্যে আল্লাহ পাক আদেশ, নিষেধ, উৎসাহ দান. ভীতি প্রদানের কথা একত্রিত করেছেন এবং উত্তম চরিত্র ও আমলের কথা বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম পূর্বের সহিত সম্বন্ধ ও যোগসূত্র বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো এই–

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবর ও তাকওয়ার হুকুম ছিল এবং কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব সংস্রব ও তাদেরকে রহস্যবিদ বন্ধু বানাতে নিষেধ ছিল। এখন এসব আয়াতের মধ্যে আবার সবর ও তাকওয়ার বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবর ও তাকওয়া কি বস্তু, ধৈর্যশীল ও মুত্তাকী কারা এবং তাদের কি কি গুণাবলি? এসবের মধ্যে সর্বাগ্রে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ হালাল খাবার হচ্ছে তাকওয়ার মূল ভিত্তি। এছাড়া কাফেররা সুদী কারবার করতো, আর যা মুনাফা অর্জন হত তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয় করত। ওহুদের যুদ্ধে যে অর্থ তারা ব্যয় করেছিলো তা ঐ কাফেলার ব্যবসায় অর্জিত মুনাফারই টাকা ছিল যে কাফেলাটি বদরের বছর সিরিয়া হতে এসেছিল। এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সুদ থেকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, তোমরা কাফেরদের ন্যায় এরূপ মনে করবেনা যে, আমরাও সুদী ব্যবসা দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য গ্রহণ করবো। সাবধান! সুদী ব্যবসা-বাণিজ্য করা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নামান্তর। মুসলমানদেরকে তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যেরূপভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে সুদ গ্রহণ হারাম। তেমনিভাবে সম্মিলিত ব্যবসা-বাণিজ্যি ও সুদী কারবার হারাম। ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে উভয় রকম সুদের প্রচলন ছিল। লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবে ও সুদী ব্যবসা করত এবং সম্মিলিত ভাবেও গোত্রের সকলে মিলে সুদী কারবার করত। সম্প্রতি একে কোম্পানী ও ব্যাংক বলা হয়। হাকীকত তাই যা পূর্বে ছিল কেবল নামে পরিবর্তন হয়েছে। নাম পরিবর্তন হয়ে গেলেই হাকীকত বদলে না। পবিত্র কুরআন সর্বপ্রকার সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। চাই ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত তথা কোম্পানী ও ব্যাংকের মাধ্যমে বীমার মাধ্যমে হোক। শরিয়তে চুরি, জিনা ও মদকে হারাম করে দিয়েছে, একবার কেউ যদি এগুলোকে আধুনিক কোনো নামে উন্নত পদ্ধতিতে করে তাহলে কি হালাল হয়ে যাবে? না, কখনো না। সর্বপ্রকার সুদের কারবার হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত ও বহুসংখ্যক হাদীস এসেছে।

ইরশাদ হয়েছে– يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰٓا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে চক্র বৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না, কথা দ্বারা একথা বুঝে নেওয়া ঠিক হবে না যে, অল্পহারে সুদ খেয়ে নেওয়া হয়তো জায়েজ হবে। কারণ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং আবরদের মধ্যে প্রচলিত চক্রবৃদ্ধি হারে সুদী লেনদেনের তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ রকম শব্দ এরূপ অর্থেই বলা হয়ে থাকে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য বহু শরিক সাব্যস্ত করিও না। এতে কি একজন বা দুইজন শরিক সাব্যস্ত করা জায়েজ হবে? না কখনো নয়, ঠিক তেমনিভাবে এখানেও কাফেরদের মধ্যে প্রচলিত সুদের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনার্থে اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় সর্বপ্রকার সুদই কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হারাম।

http://islamiboi.wordpress.com

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করে দিয়েছে। –[মাআরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ৪৯–৫২]

সুদের চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক অনিষ্ট :

১. মানব চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরে উপকার করা তো দূরের কথা, অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলেও তা সহ্য করতে পারে না।

২. সুদখোর কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

৩. সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থ লালসা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালো মন্দেরও পরিচয় থাকেনা এবং সুদের অশুভ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

৪. সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়। এছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোনো দোষ নাও থাকতো তবুও এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এছাড়া আরো অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে مَغْفِرَةٌ এর পূর্বে مَا يُوْجِبُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে তথা ক্ষমার কারণ ও মাধ্যমের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হও। আর মাগফিরাত বা ক্ষমার কারণ হলো করণীয় কার্যাদি পালন ও বর্জনীয় কর্মকাণ্ড বর্জন করা। সুতরাং এর মর্ম হলো, তোমরা শরিয়তের নির্দেশিত কাজসমূহ পালন ও নিষেধকৃত কাজসমূহ বর্জনের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও।

مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর মাগফিরাত বা ক্ষমার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ অনেক কথা বলেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা প্রদত্ত হলো।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রভুর ক্ষমার মর্ম হচ্ছে ইসলাম। এখানে তানবীন (مَغْفِرَةٌ) দ্বারা চূড়ান্ত ও বৃহৎ ক্ষমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর সেই ক্ষমা তো ইসলাম দ্বারাই লাভ হয়।

২. হযরত আলী (রা.) বলেন, ক্ষমা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরায়েজ পালন করা। কেননা এর দ্বারাই ক্ষমা অর্জন হয়।

৩. হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) বলেন, মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে ইখলাস। কারণ যাবতীয় ইবাদতের মূলই হচ্ছে ইখলাস। যেরূপ ইরশাদ হয়েছে – وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

৪. ইমামে তাফসীর আবুল আলিয়া বলেন, মাগফিরাতের অর্থ হলো হিজরত।

৫. ইমাম যাহ্হাক ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মাগফিরাতের মর্ম হলো জিহাদ। কেননা وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ থেকে নিয়ে ষাটটি আয়াত পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এসব আদেশ নিষেধ জিহাদের সাথেই খাছ হবে।

৬. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো তাকবীরে উলা।

৭. হযরত ওসমান (রা.) বলেন, এর মর্ম হচ্ছে পাঞ্জেগানা নামাজ।

৮. হযরত ইকরামা বলেন, মাগফিরাতের অর্থ হচ্ছে যাবতীয় আনুগত্য। কারণ ব্যাপক অর্থবহ শব্দে সর্বপ্রকার আনুগত্যকেই শামিল রাখে।

৯. ইমাম আসেম বলেন– سَارِعُوْٓا اَىْ بَادِرُوْا اِلَى التَّوْبَةِ مِنَ الرِّبَا وَالذُّنُوْبِ অর্থাৎ সুদ ও যাবতীয় পাপকার্য থেকে তওবার দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। কেননা ইতঃপূর্বে সুদের আলোচনা হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, মাগফিরাত দ্বারা সর্বপ্রকার ফরজ, ওয়াজিব পালন ও যাবতীয় গুনাহ থেকে তওবার অর্থ নেওয়াটাই উত্তম। কারণ শব্দ যেহেতু আম তাই খাছ করা সমীচীন নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাতের প্রতি যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার আবশ্যকীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে জান্নাতের প্রতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতেও নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা মাগফিরাতের মর্ম হচ্ছে শাস্তি না দেওয়া আর জান্নাতের মর্ম হচ্ছে প্রতিদান দেওয়া। তাই উভয়টিকে একত্রিত করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শরিয়তের আদেশ-নিষেধের মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য ক্ষমা ও ছওয়াব উভয়টিই লাভ করা একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ : বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিন, এ কথাটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের মতো। কেননা সূরায়ে হাদীদে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার প্রশ্ন হলো বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের মতো কথাটির মর্ম কি?

এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম অনেক উক্তি পেশ করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে কয়েকটি উক্তি পেশ করা হলো–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফসীর অনুযায়ী বেহেশতের প্রস্থ আসমান ও জমিনের প্রস্থের বরাবর কথাটি প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত। অর্থাৎ আসমান ও জমিনকে যদি স্তর বিশিষ্ট করে বিস্তার করে একটিকে অপরটির সঙ্গে মিলানো হয় তবে সকল স্তরের সম্মিলিত পরিমাণটা হবে বেহেশতের প্রস্থের সমান। রয়ে গেল দৈর্ঘ্যের কথা, তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। দৈর্ঘ্যের প্রশস্ততার কথা না বলে প্রস্থের প্রশস্ততার কথা এজন্য উল্লেখ করেছেন যে, দৈর্ঘ্যের প্রশস্ততায় প্রস্থের প্রশস্ততা বুঝায় না। পক্ষান্তরে প্রস্থের প্রশস্ততায় দৈর্ঘ্যেরও প্রশস্ততা বুঝায়।

২. অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে প্রস্থ বলে রূপক অর্থে প্রশস্ততা বুঝানো হয়েছে এবং জান্নাতের অধিক প্রশস্ততা বুঝাবার লক্ষ্যে উপমার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ এখানে عَرْض বা প্রস্থ طُوْل বা দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং প্রশস্ততার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপ বলা হয়– بِلَادٌ عَرِيْضَةٌ وَدَعْوٰى عَرِيْضَةٌ اَيْ وَاسِعَةٌ عَظِيْمَةٌ

৩. যে বেহেশতের প্রস্থ হবে আসমান–জমিনের সমান, তাহলো এক ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বেহেশতের পরিমাণ। সম্মিলিত বেহেশতের পরিমাণ নয়।

৪. আবূ মুসলিম বলেন, عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ -এর অর্থ হলো আসমান ও জমিনকে যদি জান্নাতের বিনিময়ে পেশ করা হয় তবে তার মূল্য হতে পারে। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে বেহেশত ও দোজখ বর্তমানে সৃষ্ট হয়ে আছে। কিয়ামতের পর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন এ রকম নয়। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা তাই। তাদের আকীদা হলো اَلْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ مَوْجُوْدَتَانِ الْاٰنَ হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বেহেশত সাত আসমানের উপরে আরশের নীচে সৃষ্ট। আর দোজখ সাত জমিনের নীচে সৃষ্ট।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৬-৭, হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৭৯ ও হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতে যখন এ কথার বর্ণনা দিলেন যে, জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই উপরিউক্ত আয়াতে তিনি মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন, যাতে করে লোকেরা ঐসব গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে পারে। আলোচ্য আয়াতে মুত্তাকীদের তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা, দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দান-খয়রাত করে।

দুই. وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ অর্থাৎ যারা ক্রোধকে সংবরণ করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اِنْفَاذِهٖ مَلَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَلْبَهٗ اَمْنًا وَاِيْمَانًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধকে সংবরণ করে নেয়, আল্লাহ পাক তার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন।

http://islamiboi.wordpress.com

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُنْفِذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও নিজের রাগকে সংবরণ করে দমিয়ে রাখে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত হাশরবাসীর সামনে ডেকে বেহেশতী হুরের সাথে তার যাকে ইচ্ছা হয় তার সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিবেন।

তিন. মুত্তাকীদের তৃতীয় গুণে বলা হয়েছে وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ – যারা অপরের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ। বস্তুত আল্লাহ পাক অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقُمْ مَنْ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ اَجْرٌ فَلَا يَقُوْمُ الْاِنْسَانُ عَفَا

অর্থাৎ হযরত হাসান থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলবেন, আল্লাহর উপর যার পাওনা রয়েছে সে দাঁড়াও এ কথা শুনার পর কেবল সে লোকটিই দাঁড়াবে যে অপরকে দুনিয়াতে মার্জনা করেছিল।

وَعَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُشْرَفَ لَهُ الْبُنْيَانُ وَتُرْفَعَ لَهُ الدَّرَجَاتُ فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهٗ وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهٗ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهٗ .

অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে তার উচ্চ প্রাসাদ ও উন্নত স্তর কামনা করে। তার উচিত, যে অত্যাচার করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। যে তাকে কিছু দেয় না তাকে দান করা এবং যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখতে চায় তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৫৮, তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৮,৯]

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً الخ :

আয়াতের যোগসূত্র : পূববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে। অতঃপর মুত্তাকীদেরকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথম শ্রেণির মুত্তাকী তাদের তিনটি গুণ পূর্বের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।
২. দ্বিতীয় শ্রেণির মুত্তাকী আলোচ্য আয়াতে তাদের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে।

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ পাক অপরের প্রতি অনুগ্রহ করতে আহ্বান করেছিলেন, আর আলোচ্য আয়াতে নিজের প্রতি অনুগ্রহ করতে আহ্বান করেছেন। কারণ গুনাহগার ব্যক্তি যখন তাওবা করে নেয় তখন তার তওবাটা তার নিজের জন্য অনুগ্রহই হয়ে থাকে।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর কাছে আমাদের চেয়ে অধিক সম্মানী। কারণ তাদের কেউ গুনাহ করে নিলে এর কাফফারা হিসেবে তার দরজার চৌকাটে লিখা হয়ে যেত যে, অমুক ব্যক্তি এই গুনাহ করেছে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করে বলেছিলেন যে, তোমরা বনী ইসরাঈলের চেয়ে উত্তম! কারণ তোমাদের গোনাহের কাফফারা সাব্যস্ত করা হয়েছে ইস্তেগফার অর্থাৎ ইস্তেগফারের মাধ্যমে তোমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

২. কালবীর বর্ণনায় এসেছে যে, এক আনসারী ও আরেকজন ছকীফ গোত্রের সাহাবীদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তারা উভয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে একত্রে কালাতিপাত করতে থাকে। একদা রাসূল ﷺ ছকীফী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কোনো এক জিহাদে চলে যান, আর তার বিবি বাচ্চার প্রয়োজন মিটাতে আনসারী ভাইকে স্থলাভিষিক্ত হিসেবে বাড়িতে রেখে যান। সে তার ছকীফী ভাইয়ের স্ত্রীর দেখা শুনা করতে থাকে। একদা কেশ খোলাবস্থায় তার স্ত্রীকে দেখে আনসারীর মনে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। ফলে অনুমতি ছাড়া তার গৃহে প্রবেশ করে তার মুখে যখন চুমু খেতে গেলো তখন মহিলাটি তার চেহারার উপর নিজের হাত রেখে দেয়। ফলে আনসারী তার হাতের পৃষ্ঠ দিকে চুমু খেয়ে নেওয়ার পর লজ্জায় ভেঙ্গে পরে এবং লজ্জিত হয়ে ফেরত চলে আসে। এদিকে মহিলাটি বলতে লাগল.

http://islamiboi.wordpress.com

সুবহানাল্লাহ! [হে আনসারী] তুমি তোমার আমানতে খিয়ানত করেছ এবং আপন প্রভুর নাফরমানি করেছ। অথচ তুমি তোমার প্রয়োজন ও মেটাতে পারলে না। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারী তারকৃত কর্মের উপর খুবই লজ্জিত হয়ে পাহাড়ে গিয়ে একাকী চলতে থাকে আর নিজের গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে থাকে। তার ছকীফী বন্ধু যখন বাড়িতে ফেরল তখন তার স্ত্রী তার কাছে ঘটনা খুলে বলল, ছকীফী তার অনুসন্ধানে বের হলো। খোঁজ করতে করতে গিয়ে সিজদারতবস্থায় তাকে সে পেল। তখন সে বলতেছিলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহকে মাফ কর। আমি তো আমার ভাইয়ের অবশ্যই খিয়ানত করেছি। ছকীফী বলল, মাথা উঠান। অতঃপর তাকে নিয়ে হুজুর ﷺ -এর দরবারে চলে গেল এবং এ নিয়তে হুজুরের মাধ্যমে তাকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করালো যে, হয়ত! আল্লাহ পাক তার মুক্তির কোনো পথ ও তওবার রাস্তা বের করে দিবেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ মদিনায় তাকে নিয়ে ফেরত আসার পর একদিন আসরের নামাজের সময় আলোচ্য আয়াতটি নিয়ে নাজিল হয়, তারপর হুজুর ﷺ আয়াটি তেলাওয়াত করেন- وَالَّذِيْنَ فَعَلُوْا থেকে নিয়ে وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ পর্যন্ত। আয়াতটি শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই তওবা ও গুনা মাফের ব্যবস্থাটা শুধু কি ঐ ব্যক্তির জন্যই খাছ নাকি সকল মানুষের জন্যই আম। হুজুর ﷺ জবাবে বললেন, এই সুযোগ সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত।

৩. ইমাম আতা (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি খেজুর বিক্রেতা নবহানের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যার উপনাম ছিলো আবূ মা'বাদ। ঘটনাটি হলো এই যে, একজন সুন্দরী মহিলা খেজুর কেনার জন্য তার কাছে আসল। নবহান বলল, এই বাহিরের খেজুরগুলো ভালো নয়, ঘরের ভিতরে এর চেয়ে উত্তম খেজুর রয়েছে। সুতরাং নবহান ঐ মহিলাটিকে নিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। ভিতরে গিয়ে তাকে আকড়ে ধরল এবং তাকে চুম্বন করল। মহিলাটি বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। এটা শুনে নবহান তাৎক্ষণিকভাবে মহিলাটিকে ছেড়ে দিল। আর এই কাজটির উপর অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা খুলে বলল। এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ৫৯-৬০, তাফসীরে কাবীর খ. ৫, ১১, তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৬৬]

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো এই যে, যারা কোনো সময় অশ্লীল কোনো কাজ তথা কবীরা গুনাহ করে নেওয়ার পর অথবা নিজেদের প্রতি কোনো অত্যাচার তথা সগীরা গুনাহ করে নেওয়ার পর যদি আল্লাহর আজাব- গজবের ভয়ের কথা স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়, তওবা করে নেয় এবং গুনাহে লেগে না থাকে। নিজেদের কৃত পাপকাজের উপর হঠকারিতা প্রদর্শন না করে, তাদের জন্যও বেহেশত তৈরি করে রাখা হয়েছে। মোটকথা প্রথম শ্রেণির মুত্তাকী মুহসীনিন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মুত্তাকী তওবাকারীগণ উভয়ের জন্যই বেহেশত রয়েছে। রয়ে গেল তৃতীয় আরেকটি, অর্থাৎ ঐসব মুমিন যারা গুনাহে কবীরা করার পর তওবা না করেই মারা গেছে। তাদের ক্ষমার ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন হয়ত। তিনি তাদেরকে নিজ কৃপায় ক্ষমা করে বেহেশত দিয়ে দিবেন নতুবা পাপানুযায়ী শাস্তি দিয়ে গুনাহ থেকে পাক করার পর বেহেশত দিবেন। এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা পক্ষান্তরে মুতাজিলা ও খারিজীরা বলে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

মাসআলা : সগীরা গুনাহ বার বার করলে তা কবীরা হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইস্তেগফারের দ্বারা কোনো কবীরা, কবীরা থাকে না, অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ইসরার তথা হঠকারিতার সাথে কোনো সগীরা সগীরা থাকে না; বরং কবীরা হয়ে যায়। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৬৮]

http://islamiboi.wordpress.com

١٣٧. وَنَزَلَ فِي هَزِيْمَةِ اُحُدٍ قَدْ خَلَتْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ طَرَائِقُ فِي الْكُفَّارِ بِاِمْهَالِهِمْ ثُمَّ اَخْذِهِمْ فَسِيْرُوْا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ الرُّسُلَ اَيْ اٰخِرُ اَمْرِهِمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَلَا تَحْزَنُوْا لِغَلَبَتِهِمْ فَاَنَا اُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ ـ	অনুবাদ : ১৩৭. ওহুদ যুদ্ধের পরাজয় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে কাফেরদেরকে অবকাশ দেওয়ার পর পাকড়াও করার বহু তরিকা অতিবাহিত হয়েছে। অতএব [হে মু'মিনগণ!] তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ রাসূলগণকে মিথ্যায়নকারীদের পরিণাম কেমন ছিল। অর্থাৎ তাদের পরিণাম ধ্বংসই হয়েছিল, সুতরাং তোমরা তাদের কাফেরদের সাময়িক বিজয়ের দরুন চিন্তিত হয়ো না। কারণ আমি তাদেরকে তাদের ধ্বংসের সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছি।
١٣٨. هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَيَانٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ مِنْهُمْ ـ	১৩৮. এটি পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা আর তাদের মধ্য থেকে পরহেজগারদের জন্য গোমরাহি থেকে পথের দিশারী ও উপদেশ।
١٣٩. وَلَا تَهِنُوْا تَضْعُفُوْا عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ وَلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا اَصَابَكُمْ بِاُحُدٍ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ بِالْغَلَبَةِ عَلَيْهِمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ حَقًّا وَجَوَابُهُ دَلَّ عَلَيْهِ مَجْمُوْعُ مَا قَبْلَهُ ـ	১৩৯. আর তোমরা সাহসহারা হয়ো না, কাফেরদের সাথে লড়াই করতে দুর্বল হয়ো না এবং ওহুদে তোমাদের উপর যা কিছু পৌঁছেছে এর জন্য চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই তাদের উপর জয়ের মাধ্যমে থাকবে বিজয়ী যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও। এখানে জবাবে শর্ত (فَلَا تَحْزَنُوْا) এর উপর পূর্বোক্ত (فَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا) প্রমাণ বহন করছে, তাই তা উহ্য রয়েছে।
١٤٠. اِنْ يَّمْسَسْكُمْ يُصِبْكُمْ بِاُحُدٍ قَرْحٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا جُهْدٌ مِنْ جُرْحٍ وَنَحْوِهٖ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ الْكُفَّارَ قَرْحٌ مِثْلُهٗ بِبَدْرٍ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا نُصَرِّفُهَا بَيْنَ النَّاسِ يَوْمًا لِفِرْقَةٍ وَيَوْمًا لِاُخْرٰى لِيَتَّعِظُوْا وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَخْلَصُوْا فِيْ اِيْمَانِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ـ يُكْرِمَهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ـ الْكَافِرِيْنَ اَيْ يُعَاقِبُهُمْ وَمَا يُنْعِمُ بِهٖ عَلَيْهِمْ اِسْتِدْرَاجٌ ـ	১৪০. যদি তোমাদের ওহুদে আঘাত লেগে থাকে। (قَرْحٌ) (ق) কাফের যবর ও পেশের সাথে যখন ইত্যাদির কষ্ট, তবে অনুরূপ আঘাত কাফের সম্প্রদায় বিশেষেরও [বদরে] লেগেছে। আর আমি এ জন্য মানুষের মাঝে দিনকাল পালাক্রমে পরিবর্তন করে থাকি, একদিন এক দলের আরেকদিন অপর দলের যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে! যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে অবগত হন যে গায়রে মুখলিস মু'মিনদের থেকে মুখলিস মু'মিন কারা এবং তোমাদের মধ্য থেকে যেন তিনি কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন তথা তাদেরকে শাহাদতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন, আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে কাফেরদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। আর তাদেরকে যা কিছু নিয়ামত দেওয়া হচ্ছে তা অবকাশ বৈ কিছু নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

١٤١. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُطَهِّرَهُمْ مِنَ الذُّنُوْبِ بِمَا يُصِيْبُهُمْ وَيَمْحَقَ يُهْلِكَ الْكَافِرِيْنَ ـ

১৪১. আর যেন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে পবিত্র করেন। তাদের প্রতি পৌঁছা কষ্টের মাধ্যমে যেন তাদেরকে গুনাহ থেকে পাক করেন এবং কাফেরদেরকে মিটিয়ে দেন। ধ্বংস করে দেন।

١٤٢. اَمْ بَلْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمْ يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ عِلْمَ ظُهُوْرٍ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ فِى الشَّدَائِدِ ـ

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করে নিবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে বিপদে ধৈর্যধারণকারী তা আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্যভাবে জেনে নেবেন না?

١٤٣. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الْاَصْلِ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ حَيْثُ قُلْتُمْ لَيْتَ لَنَا يَوْمًا كَيَوْمِ بَدْرٍ لِنَنَالَ مَا نَالَ شُهَدَاءُهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ اَىْ سَبَبَهُ وَهُوَ الْحَرْبُ ـ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ اَىْ بُصَرَاءُ تَتَامَّلُوْنَ الْحَالَ كَيْفَ هِىَ فَلِمَ انْهَزَمْتُمْ ـ

১৪৩. আর তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই তার আকাঙ্ক্ষা করেছিলে। (تَمَنَّوْنَ) মূলত تَتَمَنَّوْنَ ছিল, তাতে একটি ت তা বিলুপ্ত হয়েছে। যখন তোমরা বলেছিলে, আফসোস! আমাদের জন্যও যদি বদর দিবসের মতো একটি দিন হতো, তাহলে আমরাও তা অর্জন করতাম যা বদরের শহীদগণ অর্জন করেছে। এখন তো তোমরা মৃত্যুকে তথা মৃত্যুর কারণ যুদ্ধকে স্বচক্ষে দেখে নিলে অথচ তোমরা দেখছিলে চিন্তা-ফিকির করছিলে তোমাদের অবস্থার এ অবস্থা কেন সৃষ্টি হলো এবং তোমরা পরাজিত হলে কেন?

তাহকীক ও তারকীব

لَا تَهِنُوْا তোমরা হীনমনা হয়ো না, দুর্বল হয়ো না। এটা وَهْن থেকে جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। نُدَاوِلُهَا ـ مُدَاوَلَةٌ থেকে مُضَارِع مُتَكَلِّم -এর সীগাহ। আমরা একে পরিবর্তন করে থাকি, دَوْلَةٌ পরিবর্তন বিবর্তন থেকে নির্গত। اَلْاَعْلَوْنَ আসলে اَلْاَعْلَوُوْنَ ছিল, তালীলের পর اَعْلَوْنَ হয়েছে قَوْلُهُ اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ -এর মধ্যে قَرْح শব্দটিতে দুটি লোগাত রয়েছে। যথা قَرْح ও قُرْح যেরূপ ذَفٌ এর মধ্যে রয়েছে দুটি লোগাত। যথা اَلذَّفُ ও اَلذُّفُ ইমাম ফাররা বলেছেন, اَلْقَرْحُ بِالْفَتْحِ অর্থ জখম, আর اَلْقُرْحُ بِالضَّمِّ অর্থ জখমের কষ্ট। قَوْلُهُ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ ইমাম খলীল ইবনে আহমদ বলেছেন, تَمْحِيْص -এর আসল অর্থ হচ্ছে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত বা قَوْلُهُ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ مُحِقٌّ বিদূরিত করা। مَحْق এর আসল অর্থ تَنْقِيْصُ الشَّىْءِ قَلِيْلًا قَلِيْلًا ক্রমশ কোনো বস্তুতে হ্রাস ঘটানো। তা থেকেই مُحَاقٌ চাঁদের ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্তি। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, ও হাশিয়াতুস সাবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ الخ : এই আয়াতটি নাজিল করে আল্লাহ পাক হুজুর ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে সান্ত্বনা দান করেছেন। যখন তারা ওহুদ যুদ্ধে সাময়িকভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের পূর্বেও অনেক তরিকা অতিবাহিত হয়েছে। যথা আদ জাতি আল্লাহর নবী হুদ (আ.)-এর সাথে বিরোধিতা করেছে, ছামুদ জাতি হযরত সালেহ (আ.) -এর বিরোধিতা করেছে, নূহের সম্প্রদায় তাঁর সাথে, লূতের সম্প্রদায় তাঁর সঙ্গে, নমরুদ ও তার সম্প্রদায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাদেরকে তাঁদের স্বজাতীয় লোকেরা অনেক কষ্ট দিয়েছে। তাই আপনাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। আপনাদের মধ্যে তাদের অবস্থা দেখা দিবে। শেষ পর্যন্ত বিজয় আপনাদেরই হবে। যেরূপ পূর্ববর্তী নবীদের হয়েছিল।

سُنَنٌ শব্দটি سُنَّةٌ -এর বহুবচন। سُنَّةٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো যে কোনো রকম তরিকা, ভালো হোক বা মন্দ হোক। হাদীস শরীফে এসেছে– مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا

এখানে سُنَنٌ -এর পূর্বে একটি উহ্য শব্দ اَهْل ও মেনে নেওয়া যেতে পারে। কোনো কোনো আলেমের মতে, سُنَنٌ এর মর্ম হচ্ছে [পূর্ববর্তী] পয়গাম্বদের জাতিসমূহ। কেননা سُنَّةٌ -এর অর্থ জাতিও রয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৭০]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٤. وَنَزَلَ فِىْ هَزِيْمَتِهِمْ لَمَّا أُشِيْعَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قُتِلَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ كَغَيْرِهِ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ رَجَعْتُمْ إِلَى الْكُفْرِ وَالْجُمْلَةُ الْأَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ أَىْ مَا كَانَ مَعْبُوْدًا فَتَرْجِعُوْا وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ نِعَمَهُ بِالثَّبَاتِ .

১৪৪. সামনের আয়াতটি সাহাবাদের ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের মুহূর্তে তখন অবতীর্ণ হয় যখন এ কথা ছড়িয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ ﷺ -কে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আর সাহাবাদেরকে মুনাফিকরা বলল যে, মুহাম্মদ যেহেতু নিহত হয়ে গেছেন, তাই তোমরা নিজেদের পুরাতন ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করে চলে এসো! আর মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা অন্যদের ন্যায় নিহত হন। তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? অর্থাৎ তোমরা কি কুফরের দিকে ফিরে যাবে? পরবর্তী বাক্যটি (اِنْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ) ইস্তেফহামে ইনকারী বা অস্বীকৃতিবোধক প্রশ্নের মহলে রয়েছে। অর্থাৎ তিনি তো মা'বুদ ছিলেন না যে, তোমরা তাঁর [মৃত্যুর কারণে] ধর্ম থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিবে। বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; বরং সে তার নিজেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহ তা'আলা অচিরেই ছওয়াবের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করবেন।

١٤٥. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ بِقَضَائِهِ كِتٰبًا مَصْدَرٌ أَىْ كَتَبَ اللّٰهُ ذٰلِكَ مُؤَجَّلًا مُوَقَّتًا لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ فَلِمَ انْهَزَمْتُمْ وَالْهَزِيْمَةُ لَا تَدْفَعُ الْمَوْتَ وَالثَّبَاتُ لَا يَقْطَعُ الْحَيٰوةَ وَمَنْ يُرِدْ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا أَىْ جَزَاءَهُ مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا مَا قُسِمَ لَهُ وَلَا حَظَّ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا أَىْ مِنْ ثَوَابِهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ .

১৪৫. আর আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছাড়া তথা ফয়সালা ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সে জন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। (كِتٰبًا) শব্দটি মাসদার মাফউলের মুতলাক, এর ক্রিয়া ও কর্তা যথাক্রমে كَتَبَ اللّٰهُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক মৃত্যুর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় লিখে রেখে দিয়েছেন। মৃত্যু তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বাপর হয় না। তাহলে তোমরা সাহস হারা হবে কেন? সাহস হারিয়ে ফেলায় মৃত্যুকে হটাতে পারবে না। আর দৃঢ়পদ থাকায় জীবনকে নিঃশেষ করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি তার আমলের বদলে দুনিয়ার বিনিময় চায় তথা দুনিয়ার পুরস্কার চায় আমি তাকে তার ভাগ্যে নির্ধারিত অংশ দুনিয়া থেকেই দান করবো। তবে আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর যে আখিরাতের বিনিময় চায় আমি তাকে তা থেকেই দেব। তথা আখিরাতের ছওয়াব থেকে দিব। আর আমি অদূর ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞ লোকদেরকে পুরস্কার দান করব।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

مُحَمَّدٌ : ইমাম বগবী (র.) বলেন, مُحَمَّدٌ ঐ ব্যক্তি যিনি যাবতীয় গুণে গুণান্বিত। مُحَمَّدٌ বহুল প্রশংসিত যার প্রশংসা **বারংবার অধিক** পরিমাণে করা হয়। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নাম মোবারক। أَعْقَابٌ - عَقِبٌ এর বহুবচন, عَقِبٌ অর্থ **গোড়ালি,** পায়ের গিঁঠ।

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ কথাটির মর্ম হলো, এই যে, أَفَإِنْ مَاتَ -এর উপর যে প্রশ্নবোধক **হামযাটি** দাখিল হয়েছে, তা মূলত اِنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ -এর উপর দাখিল হয়েছে। ইবারতের রূপ হবে

أَانْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ الخ أَىْ لَا يَنْبَغِىْ مِنْكُمُ الْاِنْقِلَابُ وَالْاِرْتِدَادُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا مُبَلِّغٌ لَا مَعْبُودٌ -

তারকীব : أَنْ تَمُوْتَ - كَانَ এর ইসম। إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ তার খবর।

كِتَابًا مُؤَجَّلًا - كِتَابًا - كِتَابًا - مُؤَجَّلًا -এর সিফত। كَتَبَ (اللّٰهُ) উহ্য ফেলের মাফউলে মুতলাক اَللّٰهُ শব্দ ফায়েল মাওসূফ-সিফত মিলে মাফউলে মুতলাক। كَأَيِّنْ - (مَعْنَا) خَبَرِيَّةٌ كَمْ مُمَيِّزٌ - مِنْ نَبِيٍّ তার তমীয ও مُمَيِّزٌ - تَمِيْزٌ মিলে মুবতাদা ও فِى الدُّنْيَا উহ্য খবর। قَوْلُهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ - قَوْلَهُمْ - كَانَ -এর খবর ও إِلَّا أَنْ قَالُوْا তার ইসিম অথবা তার বিপরীত। -[তাফসীরে হক্কানী, হাশিয়াতুস সাবী ও জামালাইন।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতিম রবী'আর বরাত দিয়ে বলেন, ওহুদের দিন মুসলমানদের উপর আহত হওয়ার যে মসিবত পৌঁছার ছিল তা যখন পৌঁছল তখন তাঁরা আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে ডাকল। লোকেরা বলল, তিনি তো শহীদ হয়ে গেছেন। কিছু লোকেরা বলল, তিনি যদি নবী হতেন তবে শহীদ হতেন না। অন্য আরেকদল লোকেরা বলল, যে জিনিসের জন্য তোমাদের নবী যুদ্ধ করেছিলেন তার জন্য তোমরাও বিজয় লাভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক। অথবা যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে তোমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে যাও। ইবনুল মুনজির হযরত ওমর (রা.)-এর উক্তি নকল করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা ওহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ছেড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি পাহাড়ের উপর চড়ে যাই। একজন ইহুদিকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ মারা গেছে। আমি বললাম, যে বলবে মুহাম্মদ নিহত হয়েছে আমি তার গর্দান কেটে ফেলবো। ইতোমধ্যে আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য লোকেরা ফেরত আসতেছেন।

ইমাম বায়হাকী (র.) দালাইল গ্রন্থে আবুন নাজীহ -এর বর্ণনায় লিখেন যে, একজন মুহাজির জনৈক আনসারীর কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আনসারী সাহাবী রক্তের মধ্যে অস্থির হয়ে নড়াচড়া করতে ছিলেন। মুহাজির সাহাবী আনসারীকে বলল, তুমি কি জান? মুহাম্মদ তো শহীদ হয়ে গেছে। আনসারী জবাব দিল, মুহাম্মদ ﷺ যদি শহীদ হয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তিনি তো আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাই তোমরা এখন নিজেদের ধর্মের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করতে থাক। এর উপর وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ الخ আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৩৭৬]

শায়খ আহমদ সাবী বলেন, আলোচ্য আয়াতটিতে মুনাফেকদেরকে রদ করা হয়েছে। কেননা ওরা দুর্বল মুসলমানদেরকে **বলেছিল,** মুহাম্মদ যদি নিহত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের বাব-দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে **এসো! আলোচ্য** আয়াতে একথা বলে দিয়েছে যে, মুহাম্মদ একজন প্রেরিত রাসূল মাত্র, যেরূপ তাঁর পূর্বে আরো অনেক নবী **রাসূল অতিবাহিত** হয়ে গেছেন। তিনি উপাসনার যোগ্য রব নন যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর মৃত্যুর কারণে আল্লাহর ইবাদত

http://islamiboi.wordpress.com

ছেড়ে দিতে হবে। কেননা তাঁর মওজুদ থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রভুর প্রদত্ত রেসালাতের দায়িত্ব পালন তথা রেসালাতের তাবলীগ করা। এই জন্যই তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে নাজিল হয়েছিল- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا তবে আমাদের জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুবস্থায় সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব। আর এ কথায় আকিদা পোষণ করা আবশ্যকীয় যে, তাঁর মোজেজাসমূহ অব্যাহত থাকবে এবং তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা জরুরি।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন - مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ যে ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করল সে বস্তুত আল্লাহর অনুসরণ করল। কেবল তাঁর জীবদ্দশায় অনুসরণ করার কথা বলা হয়নি। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, حَيَوَاتِىْ خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِىْ خَيْرٌ لَكُمْ অর্থাৎ আমার জীবদ্দশাও তোমাদের জন্য ভালো এবং আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য ভালো। সুতরাং নবীজী যদি সাধারণ মৃত্যুতে মারা যান অথবা যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন তাহলে তোমাদের যুদ্ধ ত্যাগ করা বা ইসলাম ত্যাগ করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। -[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৮২]

কেউ যদি নবীর মৃত্যুর কারণে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিয়ে পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে এসে কাফের মুরতাদ হয়ে যায় তাতে আল্লাহর বিন্দুমাত্রও কোনো ক্ষতি হবে না। তবে যারা ইসলামের উপর অটুট থেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, আল্লাহ পাক অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ الخ : এই আয়াতে ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। যারা সাহসহারা হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে এবং যুদ্ধের উপর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এজন্য পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের সবরও ইস্তেকামাতের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٦. وَكَاَيِّنْ كَمْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ ضَمِيْرُهُ مَعَهُ خَبَرٌ مُبْتَدَؤُهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ جُمُوْعٌ كَثِيْرَةٌ فَمَا وَهَنُوْا جَبُنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنَ الْجِرَاحِ وَقَتْلِ اَنْبِيَائِهِمْ وَاَصْحَابِهِمْ وَمَا ضَعُفُوْا عَنِ الْجِهَادِ وَمَا اسْتَكَانُوْا خَضَعُوْا لِعَدُوِّهِمْ كَمَا فَعَلْتُمْ حِيْنَ قِيْلَ قُتِلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ عَلَى الْبَلَاءِ اَيْ يُثِيْبُهُمْ .

১৪৬. আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী হয়ে অনেক আল্লাহওয়ালা লোক শহীদ হয়েছেন। ভিন্ন এক কেরাতে এসেছে قَاتَلَ যার ফায়েল তার যমীর! অর্থ হবে, যাদের সঙ্গী হয়ে তারা যুদ্ধ করেছেন। مَعَهُ তারকীবে খবর হয়েছে আর رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ তার মুবতাদা। رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ -এর মানে হচ্ছে [গ্রন্থকারের মতে] বড় দল। আল্লাহর পথে যে বিপর্যয় ঘটেছিল তথা তাদের জখম, নবীগণ ও সাথিগণের শাহাদাত হয়েছিল। তাতে তারা সাহসহারা হয়ে ভেঙ্গে পড়েন নি, জিহাদ করা থেকে ক্লান্তও হয় নাই এবং নতও হয় নি তাদের শত্রুদের জন্য, তোমরা মুহাম্মদ শহীদ হয়ে গেছে বলার পর যেরূপ হয়েছ। আর আল্লাহ পাক মসিবতে সবর অবলম্বনকারী লোকদের ভালোবাসেন। অর্থাৎ তাদেরকে ছওয়াব দান করেন।

١٤٧. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ عِنْدَ قَتْلِ نَبِيِّهِمْ مَعَ ثَبَاتِهِمْ وَصَبْرِهِمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا تَجَاوُزَنَا الْحَدَّ فِيْ اَمْرِنَا اِيْذَانًا بِاَنَّ مَا اَصَابَهُمْ لِسُوْءِ فِعْلِهِمْ وَهَضْمًا لِاَنْفُسِهِمْ وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا بِالْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَادِ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ .

১৪৭. তাদের দৃঢ়পদ ও সবর সত্ত্বেও স্বীয় নবীদের শাহাদাতকালে তাদের দোয়া তো এতটুকুই ছিল যে, তারা আর কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে, হে আমাদের প্রতিপালক। মোচন করে দাও আমাদের পাপরাশি আর যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে তথা আমাদের সীমালঙ্ঘনকে। তাদের এ উক্তিটি এ কথা প্রকাশ করার জন্য ছিল যে, তাদের উপর যা কিছু মসিবত পৌঁছেছে এসব তাদের মন্দ আমলের কারণেই পৌঁছেছে এবং বিনয় প্রকাশার্থে ছিলো তাদের এ উক্তিটি। [হে আমাদের প্রতিপালক!] জিহাদের জন্য শক্তিদান করার মাধ্যমে আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ এবং কাফেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর।

١٤٨. فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا النَّصْرَ وَالْغَنِيْمَةَ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ اَيِ الْجَنَّةِ وَحُسْنُهُ التَّفَضُّلُ فَوْقَ الْاِسْتِحْقَاقِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ .

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ছওয়াব তথা সাহায্য ও গনিমতের মাল দান করেছেন। আর আখিরাতেও উত্তম ছওয়াব দান করেছেন। আখিরাতের ছওয়াব হচ্ছে জান্নাত আর উত্তম ছওয়াবের অর্থ হচ্ছে প্রাপ্ত অধিকারের চেয়ে বেশি অনুগ্রহপূর্বক দান করা। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَاَيِّنْ - كَافُ تَشْبِيْه দাখিল হয়েছে اَيّ -এর উপর। তানবীনের নূনকে কিয়াসের খেলাফ লিখে দেওয়া হয়েছে। এটা كَمْ خَبَرِيَّة -এর অর্থে ব্যবহৃত যা দ্বারা আধিক্য বুঝানো হয়েছে।

رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ এর অর্থ হলো جُمُوْعٌ كَثِيْرَةٌ বড়দল। رِبِّيُّوْنَ - رِبَّةٌ -এর দিকে মানসূব। رِبَّةٌ অর্থ জামাত, দল। এ অর্থটাই গ্রন্থকার গ্রহণ করেছেন, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই ইবনে জুবাইরের এক বর্ণনা মতে, এটা رَبٌّ -এর দিকে কিয়াসের খেলাফ নিসবত করা হয়েছে, যেরূপ رَبَّانِيٌّ - رَبٌّ -এর খেলাফে কিয়াস ইসমে মানসূব। এ বর্ণনা মতে, رِبِّيُّوْنَ -এর অর্থ হবে আল্লাহওয়ালাগণ। ইবনে যায়েদ বলেছেন– رِبِّيُّوْنَ অর্থ অনুসারীগণ।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِيْمَا يَأْمُرُوْنَكُمْ بِهٖ يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ اِلَى الْكُفْرِ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ـ

১৪৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে যে বিষয়ে কাফেররা আদেশ করছে সে বিষয়ে যদি তোমরা কাফেরদের অনুসরণ কর তবে তারা তোমাদের পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তথা মুরতাদ বানিয়ে দিবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

١٥٠. بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰـكُمْ نَاصِرُكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ـ فَاَطِيْعُوْهُ دُوْنَهُمْ ـ

১৫০. বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অভিভাবক তথা সাহায্যকারী আর তিনিই উত্তম সহায়ক সুতরাং তারই অনুসরণ কর, অন্য কারো নয়।

١٥١. سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا الْخَوْفَ وَقَدْ عَزَمُوْا بَعْدَ ارْتِحَالِهِمْ مِنْ اُحُدٍ عَلَى الْعَوْدِ وَاسْتِيْصَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَرُعِبُوْا وَلَمْ يَرْجِعُوْا بِمَا اَشْرَكُوْا بِسَبَبِ اِشْرَاكِهِمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا ـ حُجَّةً عَلٰى عِبَادَتِهٖ وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى مَاْوَى الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ هِىَ ـ

১৫১. অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তরে ভয়ভীতির সঞ্চার করবো। (اَلرُّعْبُ) আইন বর্ণে পেশ ও সাকিনের সাথে, তার অর্থ হয়েছে ভয়-ভীতি। কাফেররা ওহুদের ময়দান থেকে চলে আসার পর আবার ফেরত আসতে এবং মুসলমানদের মূলোৎপাটন করতে প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যার দরুন ফেরত আসতে পারেনি। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কোনো দলিল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি তথা মূর্তিপূজার উপর আল্লাহ কোনো দলিল অবতীর্ণ করেননি। আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম আর তা জালেমদের তথা কাফেরদের জন্য অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

١٥٢. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِيَّاكُمْ بِالنَّصْرِ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ تَقْتُلُوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ بِاِرَادَتِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ جَبُنْتُمْ عَنِ الْقِتَالِ وَتَنَازَعْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ فِى الْاَمْرِ اَىْ اَمْرِ النَّبِىِّ بِالْمَقَامِ فِىْ سَفْحِ الْجَبَلِ لِلرَّمْىِ فَقَالَ بَعْضُكُمْ نَذْهَبُ فَقَدْ نَصَرَ اَصْحَابُنَا وَبَعْضُكُمْ لَا نُخَالِفُ اَمْرَ النَّبِىِّ ﷺ وَعَصَيْتُمْ اَمْرَهٗ فَتَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِيْمَةِ مِنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمُ اللّٰهُ مَا تُحِبُّوْنَ مِنَ النَّصْرِ ـ

১৫২. আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে তাঁর সাহায্যের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, যখন তাঁর হুকুমে ইচ্ছায় তোমরা কাফেরদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই যুদ্ধ করা থেকে সাহসহারা হয়ে পড়লে এবং নির্দেশ তথা নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশ সম্পর্কে পরস্পর মতবিরোধ করলে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রিয়বস্তু তথা সাহায্য দেখিয়েছিলেন। তখন তোমরা নাফরমানি করেছিলে রাসূলের নির্দেশ এবং গনিমতের মাল অর্জনের জন্য নির্ধারিত স্থান ছেড়ে দিয়েছিলে।

http://islamiboi.wordpress.com

وَجَوابُ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ اَىْ مَنَعَكُمْ
نَصْرَهُ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا فَتَرَكَ
الْمَرْكَزَ لِلْغَنِيْمَةِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ
فَثَبَتَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ
وَاَصْحَابِهِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَطْفٌ عَلٰى جَوَابِ
اِذَا الْمُقَدَّرِ رَدَّكُمْ بِالْهَزِيْمَةِ عَنْهُمْ اَىْ
الْكُفَّارِ لِيَبْتَلِيَكُمْ - لِيَمْتَحِنَكُمْ
فَيَظْهَرَ الْمُخْلِصُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَقَدْ عَفَا
عَنْكُمْ مَا ارْتَكَبْتُمُوْهُ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْعَفْوِ -

وَلَقَدْ جَوَابُ اِذَا (مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ) -এর প্রতি পূর্ববর্তী বাক্য صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ ইঙ্গিত বহন করে। [তাই এটা উহ্য রয়েছে] তোমাদের মধ্যে কিছুলোক দুনিয়ার লাভ চায়। তাই তারা গনিমতের মাল গ্রহণের জন্য নির্ধারিত স্থান ছেড়ে দিয়েছে। আর কিছু লোক আখিরাতের লাভ চায় তাই তারা স্বস্থানে স্থির থেকে [যুদ্ধ করে] শহীদ হয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ও তাঁর সাথিগণ। অতঃপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেন তাদের থেকে তথা কাফেরদের থেকে ثُمَّ صَرَفَكُمْ -কে আতফ করা হয়েছে উহ্য জবাবে اِذَا তথা مَنَعَكُمْ نَصْرَهُ এর উপর, তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যার ফলে মুখলিস গাইরে মুখলিস থেকে পার্থক্য হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান ক্ষমা ও মার্জনার মাধ্যমে।

١٥٣. اُذْكُرُوْا اِذْ تُصْعِدُوْنَ تَبْعُدُوْنَ فِى الْاَرْضِ
هَارِبِيْنَ وَلَا تَلْوٗنَ تُعَرِّجُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ
وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرٰىكُمْ اَىْ مِنْ
وَرَائِكُمْ يَقُوْلُ اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِلَىَّ عِبَادَ
اللّٰهِ فَاَثَابَكُمْ فَجَازَاكُمْ غَمًّا بِالْهَزِيْمَةِ
بِغَمٍّ بِسَبَبِ غَمِّكُمُ الرَّسُوْلَ بِالْمُخَالَفَةِ
وَقِيْلَ الْبَاءُ بِمَعْنٰى عَلٰى اَىْ مُضَاعَفًا
عَلٰى غَمِّ فَوْتِ الْغَنِيْمَةِ لِكَيْلَا مُتَعَلِّقٌ
بِعَفَا اَوْ بِاَثَابَكُمْ فَلَا زَائِدَةٌ تَحْزَنُوْا عَلٰى
مَا فَاتَكُمْ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ مِنَ
الْقَتْلِ وَالْهَزِيْمَةِ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

১৫৩. আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমরা ঊর্ধ্বমুখে ছুটতেছিলে তথা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেছিলে এবং পিছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে ডাকছিলেন। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে এসো, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আমার দিকে এসো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কষ্টের বদলে কষ্ট দিলেন। তথা তোমাদের রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার বদলে তোমাদেরকে আল্লাহ পরাজয়ের কষ্ট দিলেন। ভিন্নমতে بَا বর্ণটি عَلٰى -এর অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ পরাজয়ের উপর গনিমত হাত ছাড়া হওয়ার কষ্ট দিলেন। যাতে তোমরা দুঃখবোধ না করে হস্তচ্যুত গনিমতের উপর এবং যে কতল ও পরাজয়ের বিপদ পৌঁছেছে তোমাদের প্রতি তার উপর। لِكَيْلَا . عَفَا অথবা اَثَابَكُمْ -এর সাথে মুতা'আল্লিক আর لَا বর্ণটি অতিরিক্ত। এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

তাহকীক ও তারকীব

ইবনে আমের ও কিসায়ী اَلرُّعُبَ আইন বর্ণের পেশের সাথে পড়েছেন আর অবশিষ্ট কারীগণ সাকিনের সাথে اَلرُّعْبَ পড়েছেন। **اَلرُّعْبَ মাসদার** ও اَلرُّعُبَ ইসমে মাসদার ও হতে পারে। اَلرُّعْبَ ঐ ভীতি যা অন্তরে সৃষ্টি হয় اَلرُّعْبَ -এর আসল অর্থ হচ্ছে **পরিপূর্ণ করে** দেওয়া, ভরে দেওয়া। বলা হয় سَيْلٌ رَاعِبٌ اِذَا مَلَأَ الْاَوْدِيَةَ وَالْاَنْهَارَ ভরপুর বন্যা, যখন বন্যার পানি মাঠ ও **নদ-নদী ভরে** যায়। ভীতি বা ত্রাসকে এই জন্য রুউব বলা হয়। কারণ রুউব অন্তরকে ভয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়, قَوْلُهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا - سُلْطَانًا এখানে দলিল প্রমাণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। سُلْطَانٌ এর উৎসমূল সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

১. ইমাম যুজাজ বলেন, সুলতান سَلِيْط থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে سَلِيْط অর্থ তেল, যার দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। রাজা বাদশাহকে এই জন্য সুলতান বলা হয়। কারণ তাদের দ্বারা লোকেরা নিজেদের অধিকার আদায় করে।
২. سُلْطَانٌ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দলিল। বাদশাহকে সুলতান এই জন্য বলা হয়, কারণ তিনি হলেন দলিলওয়ালা।
৩. লাইছ বলেন, (سُلْطَان) সুলতান অর্থ শক্তি। এই অর্থেই এসেছে سُلْطَانُ الْمَلِكِ বাদশাহের সুলতান অর্থাৎ قُوَّتَهُ وَقُدْرَتَهُ তার শক্তি ও সামর্থ্য। দলিলকে এই জন্য সুলতান বলা হয়, কারণ এ দ্বারা বাতিলকে প্রতিহত করার শক্তি অর্জন হয়।
৪. ইবনে ছুরাইদ বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর ধার ও তেজকে সুলতান বলা হয়। এটা لِسَانٌ سَلِيْطٌ তেজ জবান থেকে নির্গত। سَلَاطَةٌ অর্থ জবান তেজ হওয়া। قَوْلُهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ - تَحُسُّوْنَهُمْ অর্থাৎ تُقْتِلُوْنَهُمْ قَتْلًا كَثِيْرًا অর্থাৎ তোমরা যখন তাদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করতে ছিলে। লাইছ বলেন, اَلْحَسُّ অর্থ – ব্যাপক হত্যা, কতল। আবূ উবাইদ, যুজাজ ও ইবনে কুতাইবা বলেন, حَسٌّ অর্থ হত্যার মাধ্যমে নির্মূল করে ফেলা تَحُسُّوْنَهُمْ -এর অর্থ হবে تَسْتَأْصِلُوْنَهُمْ قَتْلًا ইশতেকাক বা শব্দ প্রকরণ শাস্ত্র বিশারদগণ বলেন, حسه তথা قَتَلَهُ কারণ হত্যা দ্বারা حِسٌّ বা অনুভূতি নষ্ট হয়ে যায়। لَا تَلْوُوْنَ عَلٰى اَحَدٍ তথা لَا تَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ شِدَّةِ الْهَرَبِ অর্থাৎ তীব্র পলায়নের কারণে কারো প্রতি তাকাতে পারেনি।
- قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الخ - اِنْ শর্তিয়া تُطِيْعُوْا শর্ত يَرُدُّوْكُمْ الخ জবাবে শর্ত। قَوْلُهُ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ - اللّٰهُ মুবতাদা مَوْلٰكُمْ খবর। قَوْلُهُ بِمَا اَشْرَكُوْا -এর মধ্যে بَا পূর্ববর্তী ক্রিয়া سَنُلْقِىْ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর مَا মাসদারিয়া। قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ الخ - صَدَقَ ফে'ল اَللّٰهُ ফায়েল كُمْ প্রথম মাফউল وَعْدَهُ দ্বিতীয় মাফউল حَتّٰى উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে তথা مَا دَامَ ذٰلِكَ اَىْ وَقْتَ فَشِلْكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়তেই মুনাফেকরা দুষ্কৃতির সুযোগ পেয়ে বসে। তারা মুসলমানদের বলতে লাগল যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাই তখন আমরা নিজ নিজ ধর্মে ফিরে যাইনা কেন? এতে সব বিবাদ বিসংবাদ মিটে যাবে। এ উক্তি থেকে মুনাফিকদের দুষ্টামি ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ফুটে উঠেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ) মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা এসব শত্রুর কথায় কর্ণপাত করবে না, তাদেরকে কোনো পরামর্শে শরিক করবেনা এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কোনো কাজ ও করবেনা। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন আল্লাহ ওয়ালাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি মুনাফিক তথা ইসলামের শত্রুদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২২, পৃ. ২১২]

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا الخ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ পাকই সাহায্যকারী। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহায্যের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মরতবা : ওহুদ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবার মতামত ভ্রান্তছিল সত্য, তবে এ ভ্রান্তির পরও আল্লাহ পাকের দয়া সাহাবাদের প্রতি দর্শনীয়। প্রথমত, لِيَبْتَلِيَكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি শাস্তি হিসেবে নয়, বরং পরীক্ষার জন্য। অতঃপর وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ বলে পরিষ্কার ভাষায় ত্রুটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ : مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا الخ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করেছিলেন এবং একদল শুধু পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে, গনিমতের মাল আহরণের ইচ্ছাকেই ইহকাল কামনা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন চিন্তা করা দরকার যে, যদি তারা স্বীয় স্থানে দায়িত্ব পালনরত থাকতেন এবং গনিমতের মাল আহরণে অংশ গ্রহণ না করতেন তবে কি তাদের প্রাপ্য অংশ হ্রাস পেত? কিংবা অংশ গ্রহণের ফলে কি তাদের প্রাপ্য অংশ বেড়ে গেছে? কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, গনিমতের আইন যাদের জানা আছে তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, মাল আহরণে শরিক হওয়া এবং স্বস্থানে অবস্থান করা উভয় অবস্থাতেই তারা সমান অংশ পেতেন। এতে বুঝা যায়, তাদের এ কর্ম নির্ভেজাল ইহকাল কামনা হতে পারে না; বরং একে জিহাদের কাজেই অংশ গ্রহণ বলা যায়। তবে স্বাভাবিক ভাবে তখন গনিমতের মালের কল্পনা অন্তরে জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু আল্লাহ পাক স্বীয় পয়গাম্বরের সহচরদের অন্তর এ থেকেও মুক্ত ও পবিত্র দেখতে চান। এ কারণে একেই ইহকাল কামনা রূপে ব্যক্ত করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ২১৫-১৬]

http://islamiboi.wordpress.com

১৫৪. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً اَمْنًا نُعَاسًا يَّغْشٰى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَكَانُوْا يَمِيْدُوْنَ تَحْتَ الْحَجَفِ وَتَسْقُطُ السُّيُوْفُ مِنْهُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَىْ حَمَلَتْهُمْ عَلَى الْهَمِّ فَلَا رَغْبَةَ لَهُمْ اِلَّا نَجَاتُهَا دُوْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابِهٖ فَلَمْ يَنَامُوْا وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ ظَنًّا غَيْرَ الظَّنِّ الْحَقِّ ظَنَّ اَىْ كَظَنِّ الْجَاهِلِيَّةِ حَيْثُ اعْتَقَدُوْا اَنَّ النَّبِيَّ قُتِلَ اَوْ لَا يَنْصُرُ يَقُوْلُوْنَ هَلْ مَا لَنَا مِنَ الْاَمْرِ اَىِ النَّصْرِ الَّذِىْ وَعَدْنَاهُ مِنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ قُلْ لَهُمْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ بِالنَّصْبِ تَوْكِيْدًا وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ لِلّٰهِ اَىِ الْقَضَاءُ لَهٗ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ يُظْهِرُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ بَيَانٌ لِمَا قَبْلَهٗ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ مَا قُتِلْنَا هٰهُنَا اَىْ لَوْ كَانَ الْاِخْتِيَارُ اِلَيْنَا لَمْ نَخْرُجْ فَلَمْ نُقْتَلْ لٰكِنْ اُخْرِجْنَا كُرْهًا .

অনুবাদ :

১৫৪. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর নাজিল করেছেন দুঃখের পর শান্তি তন্দ্রারূপে যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। يَغْشٰى -তে ي ও ت -এর সাথে। আর তারা হলো মুমিনগণ! তারা ঝুঁকে পড়তেছিল ঢালের নীচে এবং তলোয়ার তাদের হাত থেকে পড়তেছিল। আর একদল তাদের জীবনের চিন্তায় উদ্বিগ্ন ছিল। তাদের চিন্তা ছিল কেবল তাদের প্রাণ রক্ষার, নবী এবং সাহাবাদের কোনো চিন্তা তাদের ছিল না। আর তারা হলো মুনাফিকগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জাহেলীযুগের অজ্ঞ লোকদের ন্যায় অবাস্তব ধারণা করল। কারণ তারা ধারণা করেছিল হয়তো নবী নিহত হয়ে গেছেন অথবা তাঁকে সাহায্য করা হবে না, এই বলে যে, আমাদেরকে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার কিছুই আমাদের জন্য নেই। অথবা অনুবাদ হবে আমাদেরও কি কিছু এখতিয়ার আছে? مِنْ অব্যয় পদটি অতিরিক্ত। [হে রাসূল ﷺ] আপনি তাদের বলে দিন, সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। كُلَّهٗ যবরের সাথে হলে اَلْاَمْرَ -এর তাকিদ হবে আর পেশের সাথে হলে মুবতাদা হবে। তখন তার খবর হবে لِلّٰهِ অর্থাৎ ফায়সালা আল্লাহর হাতে তিনি যা ইচ্ছা করেন। আপনার কাছে যা প্রকাশ করে না তা তাদের অন্তরে গোপন রাখে, তারা বলে এটা পূর্বের বাক্যের ব্যাখ্যা যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোনো অধিকার থাকতো তাহলে আমরা এখানে এভাবে নিহত হতাম না অর্থাৎ আমাদের হাতে যদি এখতিয়ার থাকতো তবে আমরা মদিনা থেকে বের হতাম না এবং নিহতও হতাম না; কিন্তু আমাদেরকে জোরপূর্বক বের করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

قُلْ لَهُمْ لَوْ كُنْتُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ وَفِيكُمْ مَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ لَبَرَزَ خَرَجَ الَّذِيْنَ كُتِبَ قُضِىَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ مِنْكُمْ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ مَصَارِعِهِمْ فَيُقْتَلُوْا وَلَمْ يُنْجِهِمْ قُعُوْدُهُمْ لِاَنَّ قَضَاءَهُ تَعَالٰى كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ بِاُحُدٍ لِيَبْتَلِىَ يَخْتَبِرَ اللّٰهُ مَا فِى صُدُوْرِكُمْ قُلُوْبِكُمْ مِنَ الْاِخْلَاصِ وَالنِّفَاقِ وَلِيُمَحِّصَ يُمَيِّزَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ـ بِمَا فِىْ قُلُوْبِ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ وَاِنَّمَا يَبْتَلِىْ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ ـ

হে রাসূল ﷺ! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে যদি তোমরা স্বগৃহেও থাকতে তবুও তোমাদের মধ্যে যাদের ভাগ্যে নিহত হওয়া লিখা হয়ে আছে তারা অবশ্যই নিহত হওয়ার স্থানে বের হয়ে আসত। অতঃপর নিহত হয়ে যেত। তাদের গৃহে বসে থাকায় তাদেরকে বাঁচতে পারতো না। কারণ আল্লাহর ফয়সালা নিঃসন্দেহে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আর ওহুদ যুদ্ধে তার যা করার ছিল তা করে নিয়েছেন। আর এ সব কিছু এই জন্য হয়েছে [যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে] ইখলাস ও নেফাকের যা কিছু আছে তা পরীক্ষা করবেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিষ্কার করবেন তথা পার্থক্য করে দেবেন। আর আল্লাহ তা'আলা বক্ষের কথাসমূহ তথা অন্তরের কথাসমূহ ভালো রকম জানেন তার কাছে কোনো বিষয় গোপন নয়। আর পরীক্ষা তো কেবল লোকদের কাছে একথা প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে যে,

١٥٥. اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ عَنِ الْقِتَالِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ جَمْعُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَمْعُ الْكَافِرِيْنَ بِاُحُدٍ وَهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَّا اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلًا اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ اَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِوَسْوَسَتِهٖ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا مِنَ الذُّنُوْبِ وَهُوَ مُخَالَفَةُ اَمْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ حَلِيْمٌ لَا يُعَجِّلُ عَلَى الْعُصَاةِ ـ

১৫৫. নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে [রণাঙ্গণে] দুই দলে মোকাবিলা হওয়ার দিন যুদ্ধ করা থেকে ফিরে গিয়েছিল। দুই দল বলতে মুসলমান ও কাফেরদের দল উদ্দেশ্য। বারজন ছাড়া সকল মুসলমানই সরে পড়েছিল। তাদের পাপের পরিণামে শয়তানই তাদেরকে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে পদস্খলন ঘটিয়েছিল। আর সেই পাপটি হলো নবী করীম ﷺ -এর হুকুমের বিরোধিতা করা। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতীব সহিষ্ণু তথা পাপীদের শাস্তি দিতে তড়িঘড়ি করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ : এর মধ্যে بَا বর্ণটি বিনিময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন বলা হয়, **هٰذَا بِهٰذَا** -এর বিনিময়ে এটা। তখন অর্থ হবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ পৌছিয়েছেন। بَا বর্ণটি (مَعَ) **সাথে** সাথে অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তখন অর্থ হবে- اَثَابَهُمْ غَمًّا مَعَ غَمٍّ তাদেরকে এক দুঃখের সাথে আরেক **দুঃখ** দিয়েছেন। اَزَلَّ ও اِسْتَزَلَّ একই অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ শয়তান পদস্খলনের উপর প্ররোচিত করেছে।

তারকীব : وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ বাক্যটি হালিয়া। بِغَمٍّ ـ غَمًّا এর সিফত হওয়ার প্রেক্ষিতে مَحَلِّ نَصْب -এর মধ্যে **রয়েছে। এর-** نُعَاسًا টি جُمْلَة - يَغْشٰى । نُعَاسًا - اَمَنَةً থেকে عَطْف بَيَان ও হতে পারে। نُعَاسًا বদল হয়েছে اَمَنَةً থেকে। سিফত। قَوْلُهٗ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ - طَائِفَة মুবতাদা قَدْ اَهَمَّتْهُمْ খবর।

قَوْلُهٗ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ : شَىْءٌ ـ كَانَ -এর ইসিম ও لَنَا তার খবর। مَا قُتِلْنَا - لَوْ كَانَ -এর জওয়াব। **قَوْلُهٗ** لِيُمَيِّزَ وَلِيَبْتَلِىَ - **فِعْل** - لِيُمَيِّزَ وَلِيَبْتَلِىَ মুতা'আল্লিক হয়েছে لَبَرَزَ ফে'লের সাথে। وَلِيَبْتَلِىَ আতফ হয়েছে উহ্য ফে'ল مَا فَعَلَ -এর উপর। وَلِيُمَحِّصَ আতফ হয়েছে وَلِيَبْتَلِىَ -এর উপর। -[তাফসীরে কাবীর ও তাফসীরে হক্কানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٥٦. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَيِ الْمُنَافِقِيْنَ وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اَيْ فِيْ شَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا سَافَرُوْا فِى الْاَرْضِ فَمَاتُوْا اَوْ كَانُوْا غُزًّى جَمْعُ غَازٍ فَقُتِلُوْا لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا اَيْ لَا تَقُوْلُوْا كَقَوْلِهِمْ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْقَوْلَ فِيْ عَاقِبَةِ اَمْرِهِمْ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ فَلَا يَمْنَعُ عَنِ الْمَوْتِ قُعُوْدٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَصِيْرٌ . فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

১৫৬. হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা কাফের তথা মুনাফিক এবং যারা নিজেদের ভ্রাতাদের সম্পর্কে বলে- যখন তারা দেশ ভ্রমণে বের হয়। অতঃপর মারা যায় অথবা জিহাদে গমন করে এবং শহীদ হয়ে যায় [غُزًّى - غَازٍ -এর বহুবচন] যদি তারা আমাদের নিকট থাকত তবে তারা মারাও যেত না এবং নিহতও হতো না অর্থাৎ তোমরা তাদের কথার ন্যায় বলো না। তাদের জবানে এ কথাটি এ জন্য এসেছে যে তাদের শেষ পরিণতিতে যাতে আল্লাহ তা'আলা এ কথাটিকে তাদের অন্তরে আক্ষেপের কারণ বানিয়ে দেন। বস্তুত আল্লাহ পাকই জীবন ও মৃত্যুদান করেন। সুতরাং গৃহে বসে থাকা মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না। আর আল্লাহ তোমাদের ভিন্ন কেরাত মতে তাদের يَعْلَمُوْنَ শব্দটি تَا ও يَا -এর সাথে পড়া হয়েছে। যাবতীয় কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করছেন সুতরাং এর প্রতিদান তিনি তোমাদের দিবেন।

١٥٧. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيِ الْجِهَادِ اَوْ مُتُّمْ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَكَسْرِهَا مِنْ مَاتَ يَمُوْتُ وَيَمَاتُ اَيْ اَتَاكُمُ الْمَوْتُ فِيْهِ لَمَغْفِرَةٌ كَائِنَةٌ مِّنَ اللّٰهِ لِذُنُوْبِكُمْ وَرَحْمَةٌ مِنْهُ لَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَاللَّامُ وَمَدْخُوْلُهَا جَوَابُ الْقَسَمِ وَهُوَ فِيْ مَوْضِعِ الْفِعْلِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ . مِنَ الدُّنْيَا بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ .

১৫৭. আর যদি তোমরা আল্লাহর রাহে তথা জিহাদে শহীদ হও لَئِنْ -এর لَامْ বর্ণটি কসমের জন্য। অথবা সাধারণ মৃত্যুতে মারা যাও مُتُّمْ মীমের পেশ ও যেরের সাথে প্রথমটি مَاتَ . يَمُوْتُ বাবে نَصَرَ হতে আর দ্বিতীয়টি مَاتَ يَمَاتُ বাবে سَمِعَ হতে, অর্থাৎ আল্লাহর রাহে যদি তোমাদের মৃত্যু এসে যায় তবে তোমাদের পাপরাশির জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে ক্ষমা এবং দয়া লাভ হবে। এই ক্ষমা ও দয়া ঐ দুনিয়া থেকে উত্তম যা তোমরা ভিন্ন কেরাত মতে তারা সঞ্চয় কর বা করে لَمَغْفِرَةٌ -এর লাম ও তার মদখুল জওয়াবে কসম, তবে এটা ফে'লের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বাক্যের রূপ ছিল لَغُفِرَتْ لَكُمْ . لَمَغْفِرَةٌ الخ মুবতাদা আর خَيْرٌ الخ وَرَحْمَتُكُمْ তার খবর।

١٥٨. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ مُتُّمْ بِالْوَجْهَيْنِ اَوْ قُتِلْتُمْ فِى الْجِهَادِ اَوْ غَيْرِهٖ لَاِلَى اللّٰهِ لَا اِلٰى غَيْرِهٖ تُحْشَرُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ .

১৫৮. যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর لَئِنْ -এর লাম কসমের জন্য, আর مُتُّمْ পূর্বের ন্যায় দুই বাব থেকে আসবে অথবা তোমাদেরকে জিহাদে বা অন্য কোথাও নিহত করা হয় সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকটই তোমাদেরকে আখিরাতে একত্রিকরা হবে অন্য কারো দিকে নয়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

١٥٩. فَبِمَا مَا زَائِدَةٌ رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ يَا
مُحَمَّدُ لَهُمْ اَیْ سَهَّلْتَ اَخْلَاقَكَ اِذْ خَالَفُوْكَ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا سَيِّءَ الْخُلُقِ غَلِيْظَ الْقَلْبِ
جَافِيًا فَاَغْلَظْتَ لَهُمْ لَا انْفَضُّوْا تَفَرَّقُوْا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ تَجَاوَزْ عَنْهُمْ مَا اَتَوْهُ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ حَتّٰى اَغْفِرَ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ اِسْتَخْرِجْ اٰرَاءَهُمْ فِى الْاَمْرِ اَیْ
شَانِكَ مِنَ الْحَرْبِ وَغَيْرِهٖ تَطْيِيْبًا
لِقُلُوْبِهِمْ وَلِيَسْتَنَّ بِكَ وَكَانَ ﷺ كَثِيْرَ
الْمُشَاوَرَةِ لَهُمْ فَاِذَا عَزَمْتَ عَلٰى اِمْضَاءِ
مَا تُرِيْدُ بَعْدَ الْمُشَاوَرَةِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ.
ثِقْ بِهٖ لَا بِالْمُشَاوَرَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

১৫৯. হে রাসূল ﷺ! আল্লাহ তা'আলার রহমতে আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন আপনার চরিত্র কোমল হয় যখন তারা আপনার বিরোধিতা করে فَبِمَا -এর مَا টি অতিরিক্ত। যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠিন হৃদয় হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। অতএব আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন মার্জনা করুন তাদের কৃত অপরাধের এবং তাদের জন্য তাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করুন যাতে করে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দেই। আর যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য তাদের সাথে পরামর্শ করুন আর এ ব্যাপারে আপনার থেকে তরীকাও জারি হয়ে যাবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সাথে অধিক পরামর্শকারী ছিলেন। অতঃপর আপনি পরামর্শের পর আপনার ইচ্ছা বাস্তাবায়নের উপর সংকল্প করলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করুন পরামর্শের প্রতি নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ভরসাকারীদেরকে ভালোবাসেন।

١٦٠. اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ يُعِنْكُمْ عَلٰى عَدُوِّكُمْ
كَيَوْمِ بَدْرٍ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ
يَتْرُكْ نَصْرَكُمْ كَيَوْمِ اُحُدٍ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ اَیْ بَعْدَ خُذْلَانِهٖ اَیْ لَا
نَاصِرَ لَكُمْ وَعَلَى اللّٰهِ لَا غَيْرِهٖ فَلْيَتَوَكَّلِ
لِيَثِقِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

১৬০. যদি আল্লাহ তা'আলা বদর দিবসের ন্যায় তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। আর যদি আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে সাহায্য না করেন ওহুদ দিবসের ন্যায়, তবে তাঁর পর তথা তাঁর সাহায্য বর্জনের পর কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কেউই সাহায্যকারী হবে না তোমাদের জন্য আর মু'মিনদের আল্লাহর প্রতিই ভরসা করা উচিত, অন্য কারো প্রতি নয়।

١٦١. وَنَزَلَ لَمَّا فُقِدَتْ قَطِيْفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ
فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَعَلَّ النَّبِیَّ ﷺ اَخَذَهَا
وَمَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ يَخُوْنَ فِى
الْغَنِيْمَةِ فَلَا تَظُنُّوْا بِهٖ ذٰلِكَ

১৬১. আর বদরের দিন যখন একটি লাল চাদর হারিয়ে যায় তখন কিছু লোক বলল, হয়তো নবী করীম ﷺ নিয়ে নিছেন। এ কথার প্রেক্ষিতে সামনের আয়াতটি নাজিল হয়েছে। আর কোনো নবীর জন্য এটা সমীচীন নয় যে, তিনি গনিমতের মালে খেয়ানত করবেন। সুতরাং তাঁর প্রতি খেয়ানতের ধারণা পোষণ করো না,

http://islamiboi.wordpress.com

وَفِى قِرَاءَةٍ بِالْبِنَا لِلْمَفْعُوْلِ اَىْ يُنْسَبُ اِلَى الْغُلُوْلِ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَامِلًا لَهٗ عَلٰى عُنُقِهٖ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ اَلْغَالِ وَغَيْرِهٖ جَزَاءً مَّا كَسَبَتْ عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا .

ভিন্ন এক কেরাতে يُغَلَّ ক্রিয়াটি মাজহুল এসেছে অর্থাৎ খেয়ানতের দিকে নবীকে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। অথচ যে খেয়ানত করবে সে খেয়ানতকৃত বস্তু নিয়ে কেয়ামতের দিন হাজির হবে, তার গর্দান বহন করে। অতঃপর প্রত্যেকেই খেয়ানতকারী এবং যে করেনি সবাই নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান পরিপূর্ণ রূপে পাবে। আর তাদের প্রতি সামান্যতমও জুলুম করা হবে না।

١٦٢. اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ فَاطَاعَ وَلَمْ يَغُلَّ كَمَنْ بَآءَ رَجَعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ بِمَعْصِيَّتِهٖ وَغُلُوْلِهٖ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِىَ لَا .

১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করেছে খেয়ানত করেনি, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হতে পারে যে আল্লাহর গজব অর্জন করেছে? তাঁর নাফরমানী ও খেয়ানতের কারণে? বস্তুত তার ঠিকানা হলো দোজখ। আর তা কতইনা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল। না, তারা উভয়ে সমান হতে পারে না।

١٦٣. هُمْ دَرَجٰتٌ اَىْ اَصْحَابُ دَرَجٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَىْ مُخْتَلِفُوا الْمَنَازِلِ فَلِمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ اَلثَّوَابُ وَلِمَنْ بَاءَ بِسَخَطِهِ الْعِقَابُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ .

১৬৩. তাঁরা লোকেরা বিভিন্ন স্তর তথা বিভিন্ন স্তরের রয়েছে আল্লাহর নিকট তথা তাঁর নিকট লোকদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির তাবেদার হবে তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান আর যে ব্যক্তি তাঁর ক্রোধ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর আল্লাহর তা'আলা তাদের যাবতীয় কার্যাবলি লক্ষ্য করেছেন, সুতরাং তিনি তাদেরকে এর প্রতিদান দেবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فِىْ عَاقِبَةِ اَمْرِهِمْ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَام এখানে فِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। قَوْلُهٗ فِىْ شَأْنِهِمْ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে لِيَجْعَلَ-এর মধ্যে لَام টি আকিবত বা পরণতি বুঝাবার জন্য এসেছে। قَوْلُهٗ وَهُوَ فِىْ مَوْضِعِ الْفِعْلِ-এর প্রত্যাবর্তন স্থল হলো لَمَغْفِرَةٌ ; ইবারতের স্বরূপ হবে وَاللّٰهِ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَيُغْفَرَتْ لَكُمْ وَرَحْمَتُكُمْ এখানে জওয়াবে শর্ত উহ্য রয়েছে, কেননা প্রসিদ্ধ একটি কায়দা আছে যে, কসম আর শর্ত যখন একত্রিত হয়ে যায় তখন পূর্বোক্ত যা হয় তার জওয়াব উল্লিখিত হয় আর পরে উল্লিখিত বিষয়টির জওয়াব উহ্য থাকে। এই কায়দার প্রেক্ষিতে لَمَغْفِرَةٌ الخ জওয়াবে কসম হবে আর জওয়াবে শর্ত উহ্য রয়েছে যার উপর জওয়াবে কসম প্রমাণ বহন করছে। গ্রন্থকারের وَهُوَ فِىْ مَوْضِعِ الْفِعْلِ বলা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে তার দৃষ্টিতে জওয়াবে কসম হতে হলে ফে'ল হওয়া জরুরি, অথচ ইসিম ও ফে'ল উভয়টাই জওয়াবে কসম হতে পারে। قَوْلُهٗ وَقَدْ قَعَدُوْا . قَعَدُوْا . قَالُوْا-এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। আর মাজী قَدْ ব্যতীত حَال হতে পারে না, তাই গ্রন্থকার قَدْ উহ্য মেনে নিয়েছেন। غُزًّى اَلضَّرْبُ فِى الْاَرْضِ অর্থ– দূরবর্তী সফর খেলাফে কিয়াস غَازٍ আসার কথা ছিল। যেমন رَام এর জমা আসে رُمَاةٌ। غَلَّ . يَغُلُّ . غُلُوْلًا অর্থ– গনিমতের সম্পদে মধ্যে খেয়ানত করা। আর غُلٌّ অর্থ, বিদ্বেষ। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬০ -৬১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদেরকে ভ্রান্ত একটি আকিদা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে, যে আকিদা পোষণকারী ছিল কাফের মুনাফিকরা। মুনাফিকরা বলত মু'মিনদের দুঃখ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে, তারা যদি ওহুদ যুদ্ধে না যেত এবং আমাদের ন্যায় ঘরে বসে থাকত তবে তারা নিহত হতো না। আল্লাহ পাক মু'মিনদেরকে সতর্ক করে বলতেছেন, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না। কেননা হায়াত ও মউত, জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর হাতে। এর জন্য সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে এর পূর্বে কেউ মারতে পারবে না এবং মরতেও পারবে না। আর মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে গেলে কেউ

http://islamiboi.wordpress.com

কাউকে বাঁচাতেও পারবে না। কিন্তু যাদের ভেতরে ঈমান নেই তারা সব কিছুকে নিজেদের তদবীর প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল মনে করে। তাদের জন্য এ ধরনের যুক্তি প্রবণতা আফসোস ও পরিতাপের কারণ হয়ে থাকে। তারা আক্ষেপের কণ্ঠে বলে হায়! যদি এ রকম হতো তবে তা হতো আর যদি এ রকম না হতো তবে তা হতো না।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ : মৃত্যু তো আসবেই। তবে যে মৃত্যুর পর মানুষ আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাতের উপযুক্ত হয় সেই মৃত্যু দুনিয়ার সম্পদ ও আসবাবপত্র থেকে শতগুণে ভালো যা সংগ্রহণ করার জন্য তারা জীবন কুরবান করে থাকে। তাই আল্লাহর রাহে জিহাদ করা থেকে পিছপা হয়ে থাকা ঠিক নয়। বরং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জিহাদে আত্ম নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তাতে আল্লহর রহমত ও মাগফেরাত লাভ নিশ্চিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো ইখলাসের সাথে হতে হবে।
-[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬২]

قَوْلُهُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ الخ : নবী করীম ﷺ ছিলেন উত্তম চরিত্রের মূর্তপ্রতীক। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর নবীর প্রতি একটি বড় ইহসানের কথা উল্লেখ করছেন যে, হুজুর ﷺ-এর মধ্যে যে কোমলতা রয়েছে তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে। আর এই কোমলতাটা দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য একান্ত আবশ্যক। যদি তার মধ্যে এ গুণ না থাকত বরং এর বিপরীত তিনি শক্ত হৃদয়, রূঢ় স্বভাবের হতেন তবে লোকেরা তাঁর কাছে আসার পরিবর্তে তাঁর থেকে দূরে থাকত; সুতরাং আপনি ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে কাজ করতে থাকুন।

قَوْلُهُ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ : অর্থাৎ মুসলমানদের মনতুষ্টি ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে তাদের সাথে পরামর্শ করে নিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরামর্শের গুরুত্ব উপকার প্রয়োজনীয়তা ও শরিয়ত সিদ্ধতার কথা প্রমাণিত হচ্ছে। পরামর্শের এই হুকুমটা ওয়াজিব, কারো মতে মোস্তাহাব।

রাষ্ট্রের প্রধান ও শাসকবর্গের জন্য প্রয়োজন ঐ সব বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া, যে সব বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। অথবা যে বিষয়ে তাদের অস্পষ্টতা রয়েছে। সৈন্য দলের প্রধান হলো তার সাথে ফৌজি বিষয় সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের সাথে জনগণের ব্যাপারে এবং অধীনস্ত গভর্নর ও প্রাদেশিক আমিরদের সাথে তাদের এলাকায় প্রয়োজনাদি সম্পর্কে পরামর্শ করার প্রয়োজন।

ইবনে আতিয়া বলেন, এ রকম শাসকদের পদচ্যুতি ঘটানোর ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই, যারা জ্ঞানীদের কাছ থেকে পরামর্শ করে না। এসব পরামর্শ শুধু ঐ সকল ব্যাপারেই সীমিত থাকবে যার সম্বন্ধে শরিয়ত নীরব, অথবা সেসব বিষয় দেশ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত।

قَوْلُهُ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ : অর্থাৎ পরামর্শের পর যেদিকে আমার রায় দৃঢ় হয়ে যাবে আল্লাহর উপর ভরসা করে তা করে নিবেন। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পরামর্শ গ্রহণের পরও শেষ সিদ্ধান্ত সরকার প্রধানেরই থাকবে পরামর্শদাতাদের নয় এবং তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠদেরও নয় যেরূপ প্রচলিত গণতন্ত্রের রয়েছে। আরেকটি কথা এও বুঝা যাচ্ছে পরিপূর্ণ ভরসা ও তাওয়াক্কুল আল্লাহর সত্তার উপর হতে হবে উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতার জ্ঞান-বুদ্ধির উপর নয়। সামনের আয়াতে আল্লাহর উপর ভরসার জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ . (الاية) : ওহুদ যুদ্ধে যে সব লোকেরা রক্ষাব্যূহ ছেড়ে গনিমতের মাল আহরণের জন্য দৌড়ে এসেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে, আমরা যদি না যাই তাহলে সমস্ত মাল অন্যরা নিয়ে যাবে। এর উপর সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমরা এরূপ ধারণা কেমন করে পোষণ করছ যে, তোমাদের অংশ তোমাদেরকে দেওয়া হবে না? তোমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর কি তোমাদের পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নেই? স্মরণ রাখ! একজন পয়গাম্বর হতে খেয়ানত প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ খেয়ানত ও নবুয়ত পরস্পরে সাংঘর্ষিক বিষয়। নবীই যদি খেয়ানত করেন তবে তাঁর নবুয়তের উপর কিরূপে ইয়াকীন করা যাবে? খেয়ানত মস্ত বড় অপরাধ। হাদীস শরীফ এর তীব্র নিন্দা এসেছে।

যে সকল তীরন্দাজদেরকে পাহাড়ী রাস্তা হেফাজতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা মনে করল দুশমনের দলের পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে তাই আমরা বঞ্চিত থাকবো কেন? এ কথা ভেবে তারা নিজের স্থান ছেড়ে গনিমতের মাল সংগ্রহনের জন্য চলে এসেছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন নবী করীম ﷺ মদিনার ফেরত আসলেন তখন তাদেরকে ডেকে এনে নির্দেশ অমান্য করার হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। তারা কিছু ওজর পেশ করেছে যেগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে গ্রহণ করার মতো ছিল না। এর উপর হুজুর ﷺ বললেন- بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنَّا نَغُلُّ وَلَا نُقَسِّمُ لَكُمْ আসল কথা হলো এই যে, আমাদের উপর তোমাদের পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল না। তোমরা ধারণা করেছ, আমরা তোমাদের প্রতি খেয়ানত করবো। তোমাদের অংশ তোমাদেরকে দেবো না। আলোচ্য আয়াতটিতে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ الخ আয়াতটি একটি লাল বর্ণের চাদর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যা বদরের দিন হারিয়ে গিয়েছিল। কিছু লোকেরা এ কথা বলেছিল যে, সম্ভবত রাসূল ﷺ নিয়ে গেছেন (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) -এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٦٤. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اَىْ عَرَبِيًّا مِثْلَهُمْ لِيَفْهَمُوْا عَنْهُ وَيَشْرُفُوْا بِهٖ لَا مَلَكًا وَلَا عَجَمِيًّا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ اَلْقُرْاٰنِ وَيُزَكِّيْهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ السُّنَّةَ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهُمْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ بَعْثِهٖ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ.

১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের ন্যায় তিনিও আরবি ভাষা ভাষী, যাতে তাঁর কথা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং তাঁর দ্বারা গৌরবান্বিত হতে পারে, তাকে ফেরেশতা এবং অনারবি করে প্রেরণ করা হয়নি। যিনি তাদের নিকট তাঁর কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পাক করেন পবিত্র করেন পাপরাশি থেকে এবং তাদের কিতাব তথা কুরআন ও হেকমত তথা সুন্নত শিক্ষা দান করেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে। وَاِنْ كَانُوْا -এর মধ্যে اِنْ -এর সহজরূপ মূলত – اَنَّهُمْ كَانُوْا ছিল।

١٦٥. اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ بِاُحُدٍ بِقَتْلِ سَبْعِيْنَ مِنْكُمْ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا بِبَدْرٍ بِقَتْلِ سَبْعِيْنَ وَاَسْرِ سَبْعِيْنَ مِنْهُمْ قُلْتُمْ مُتَعَجِّبِيْنَ اَنّٰى مِنْ اَيْنَ لَنَا هٰذَا الْخُذْلَانُ وَنَحْنُ مُسْلِمُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْنَا وَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ فِىْ مَحَلِّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىِّ قُلْ لَهُمْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ لِاَنَّكُمْ تَرَكْتُمُ الْمَرْكَزَ فَخُذِلْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ النَّصْرُ وَمَنْعُهُ وَقَدْ جَازَاكُمْ بِخِلَافِكُمْ.

১৬৫. আর যখন তোমাদের উপর একটি স্পষ্ট মসিবত এসে পৌছল ওহুদে তোমাদের সত্তর জন শহীদ হওয়ার কারণে অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ মসিবত পৌছে দিয়েছে বদরে তাদের সত্তরজনকে নিহত করে ও সত্তরজনকে বন্দী করে। তখন তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করে বললে, এ পরাজয় কোথা থেকে আসল? অথচ আমরা মুসলমান এবং আল্লাহর রাসূল আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। পরবর্তী বাক্যটি ইস্তেফহামে এনকারীর মহল। আপনি বলে দিন, তাদেরকে এই পরাজয় তোমাদের নিজেদের তরফ থেকেই এসেছে। কারণ তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করেছ, যার ফলে তোমাদের পরাজয় এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর তাঁর থেকেই সাহায্য পাওয়া ও না পাওয়া বর্জন। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার প্রতিদান দিয়েছেন।

١٦٦. وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ بِاُحُدٍ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ بِاِرَادَتِهٖ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا.

১৬৬. আর যেদিন দু'দল পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিল ওহুদে সেদিন তোমাদের উপর যে বিপদ এসেছিল তা আল্লাহ তা'আলা হুকুম তথা ইচ্ছায়ই হয়েছিল এবং তা এজন্য হয়েছে যাতে প্রকৃত মু'মিনদেরকে আল্লাহ বাহ্যিকভাবেও জেনে নেন।

http://islamiboi.wordpress.com

١٦٧. وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَالَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ لَمَّا انْصَرَفُوْا عَنِ الْقِتَالِ وَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ وَاَصْحَابُهُ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْدَاءَهُ اَوِ ادْفَعُوْا عَنَّا الْقَوْمَ بِتَكْثِيْرِ سَوَادِكُمْ اِنْ لَّمْ تُقَاتِلُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ نُحْسِنُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ قَالَ تَعَالٰى تَكْذِيْبًا لَهُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ بِمَا اَظْهَرُوْا مِنْ خُذْلَانِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكَانُوْا قَبْلُ اَقْرَبَ اِلَى الْاِيْمَانِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَلَوْ عَلِمُوْا قِتَالًا لَمْ يَتَّبِعُوْكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ مِنَ النِّفَاقِ.

অনুবাদ :

১৬৭. এবং যাতে জেনে নেন তাদেরকে যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে মুনাফিকদেরকে বলা হলো, যখন তারা যুদ্ধ থেকে ফেরত এসে গেল আর তারা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিরা, তোমরা চলে এসো, আল্লাহর রাহে জিহাদ কর তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে অথবা আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে কাফের সম্প্রদায়কে আমাদের থেকে প্রতিহত কর যদি তোমরা জিহাদ না কর, তখন মুনাফিকরা বলল, যদি আমরা একে কোনো যুদ্ধ জানতাম তথা উপলব্ধি করতাম, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যায়িত করে বলেন, এই মুনাফিকরা এদিন ঈমানের তুলনায় কুফরের নিকটবর্তী হয়েছিল অনেক বেশি কারণ তারা মু'মিনদের নিকট নিজেদের কাপুরুষতা প্রকাশ করে দিয়েছে, ইতঃপূর্বে তারা বাহ্যিকভাবে ঈমানের নিকটবর্তী ছিল অধিক। তাঁরা মুখে এসব কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই, যদি তারা একে যুদ্ধ জানত তবুও তারা তোমাদের সঙ্গে আসত না এবং আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোভাবেই জানেন যা তারা অন্তরে গোপন রাখে। নেফাককে

١٦٨. اَلَّذِيْنَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ اَوْ نَعْتٌ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَقَدْ قَعَدُوْا عَنِ الْجِهَادِ لَوْ اَطَاعُوْنَا اَيْ شُهَدَاءُ اُحُدٍ وَاِخْوَانُنَا فِي الْقُعُوْدِ مَا قُتِلُوْا قُلْ لَهُمْ فَادْرَءُوْا اِدْفَعُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْ اَنَّ الْقُعُوْدَ يُنْجِيْ مِنْهُ.

১৬৮. যারা [মুনাফিকরা] দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ প্রথম اَلَّذِيْنَ থেকে তারকীবে বদল হয়েছে অথবা সিফত হয়েছে। তাদের দীনি ভাইদেরকে বলে অথচ তারা নিজেরাও জিহাদ করা থেকে বসে রয়েছে যদি তারা আমাদের কথা মানত বসে থাকার ক্ষেত্রে ওহুদের শহীদগণ বা আমাদের ভাইয়েরা তবে তারা নিহত হতো না। [হে রাসূল ﷺ] আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা নিজেদের মৃত্যুকে দূরীভূত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও একথার মধ্যে যে, যুদ্ধ থেকে বসে থাকায় মুক্তি দান করে মৃত্যু থেকে।

١٦٩. وَنَزَلَ فِي الشُّهَدَاءِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ لِاَجْلِ دِيْنِهٖ اَمْوَاتًا بَلْ هُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَرْوَاحُهُمْ فِيْ حَوَاصِلِ طُيُوْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ يُرْزَقُوْنَ يَاْكُلُوْنَ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.

১৬৯. সামনের আয়াতটি ওহুদের শহীদগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর যারা আল্লাহর রাহে তার দীনের জন্য মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। قُتِلُوْا ও قُتِّلُوْا উভয় রকম কেরাত রয়েছে; বরং তারা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত শহীদগণের রূহসমূহ সবুজ পাখির পেটে থেকে বেহেশতের যেথায় ইচ্ছা বিচরণ করছে, যেরূপ হাদীস শরীফে এসেছে। তাঁরা পানাহাররত বেহেশতের ফল দ্বারা।

http://islamiboi.wordpress.com

১৭০. فَرِحِيْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُرْزَقُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ يَفْرَحُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مِنْ اِخْوَانِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِيْنَ اَنْ اَىْ بِاَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اَىِ الَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ اَلْمَعْنٰى يَفْرَحُوْنَ بِاَمْنِهِمْ وَفَرْحِهِمْ.

অনুবাদ :

১৭০. আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তাঁরা আনন্দিত। فَرِحِيْنَ শব্দটি يُرْزَقُوْنَ -এর যমীর থেকে তারকীবে হাল হয়েছে। আর তারা সেসব লোকদের কারণেও আনন্দিত যারা তাদের পশ্চাতে রয়েছে, এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি অর্থাৎ তাদের মু'মিন ভাইদের কারণে। اَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ - اَلَّذِيْنَ থেকে তারকীবে বদল হয়েছে। তার কারণ, না সেজন্য তাদের উপর কোনো ভয়ভীতি আছে যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি এবং না তারা চিন্তিত হবে আখিরাতে। আয়াতের মর্ম হলো এই যে, তারা তাদের ভাইদের শান্তি ও আনন্দে আনন্দিত।

১৭১. يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ ثَوَابٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَّاَنَّ بِالْفَتْحِ عَطْفًا عَلٰى نِعْمَةٍ وَالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ يَاْجُرُهُمْ.

১৭১. তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত তথা ছওয়াব ও অনুগ্রহের কারণে আর তা এই জন্য যে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না; বরং তাদেরকে প্রতিদান প্রদান করেন। اَنَّ اللّٰهَ -এর اَنَّ যবরযুক্ত হলে نِعْمَةٍ -এর উপর আতফ হবে। আর যেরযুক্ত হলে নতুন বাক্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (الاية) : এ আয়াতটিকে নবীজী ﷺ মানুষ হওয়াটাকেই আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করছেন। আর বাস্তবে এ অনুগ্রহটি অবশ্যই বড়। কারণ এতে করে তিনি স্বজাতির ভাষায়ই আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে পারছেন, যা হৃদয়ঙ্গম করা সবার জন্য সহজ হবে। দ্বিতীয়ত একই সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি ধাবিত হবে এবং তাঁর কাছে যাবে। তৃতীয় মানুষের জন্য মানুষের অনুকরণ করাতো সম্ভব কিন্তু মানুষের জন্য ফেরেশতার অনুসরণ করা অসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া ফেরেশতা মানুষের আবেগ অনুভূতির গভীরতা ও সূক্ষ্মতা ও বুঝতে পারে না। সুতরাং পয়গাম্বর যদি ফেরেশতাদের থেকে হতো তবে এসব সৌন্দর্যতা থেকে বঞ্চিত থাকতো যা ধর্মের প্রচার ও দাওয়াতের জন্য জরুরি। এই জন্যই পয়গাম্বর যারাই এসেছেন সকলই মানুষই ছিলেন। কুরআনে পাক তাদের মানুষ হওয়ার বিষয়টাকে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ (الاية) : বুজুর্গ সাহাবাগণ তো বাস্তবদর্শী ছিলেন। তাঁরা তো কোনো ভুল বুঝাবুঝির শিকার ছিলেন না; কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণ এ কথা বুঝতে ছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন এবং আল্লাহর সাহায্য আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাই কোনো অবস্থাতেই কাফেররা আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। এই জন্য ওহুদে যখন সাময়িক পরাজয় হলো তখন তাদের মনে বড় কষ্ট পৌঁছল। তাঁরা পেরেশান হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। এটা কি হলো? আমরা আল্লাহর দীনের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। আর পরাজয়টাও ওদের তরফ থেকে যারা দীনকে মিটাতে এসেছিল। আলোচ্য আয়াতটি তাদের ঐ পেরেশানিকে দূরীভূত করার জন্যই নাজিল করা হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সত্তর জন্য শহীদ হয়েছেন। পক্ষান্তরে বদর যুদ্ধে কাফেরদের সত্তর জন মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে আর সত্তর জনকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ : অর্থাৎ এই সাময়িক পরাজয় ও সত্তর জনের শাহাদাত তোমাদের ঐ ভুলের কারণে হয়েছে যা তোমরা রাসূল ﷺ-এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশের পরও রক্ষাব্যূহ থেকে চলে এসেছিলে।

قَوْلُهُ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا (الاية) : আর এই পরাজয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এটাও ছিল যে, এর মাধ্যমে মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন তিনশত মুনাফিক সঙ্গে নিয়ে রাস্তা থেকেই ফেরত আসতে লাগল, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান গিয়ে তাকে বুঝাবার চেষ্ট করল এবং সাথে যুদ্ধে চলার জন্য রাজি করতে চাইল; কিন্তু সে জবাব দিল যে, আমাদের বিশ্বাস আছে এটা কোনো যুদ্ধ নয়; বরং ধ্বংস ও আত্মহত্যা। যদি তামাশার যুদ্ধও হতো তবে আমরা অবশ্যই সঙ্গে চলতাম। এ রকম ভুল কাজে আমরা আপনাদের সাথি কেন হবো? আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথিরা এ কথা এ জন্য বলেছিল যে, মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করার তাদের প্রস্তাব মানা হয়েছিল না। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তার সাথিরা এ কথা ঐ সময় বলল, যখন তারা শওক নামক স্থানে পৌঁছে ফেরত আসছিল। আর আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম আনসারী বুঝিয়ে তাদেরকে ফেরত আনার চেষ্টা করছিলেন।

قَوْلُهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الاية) : এই আয়াতে শহীদগণের বিশেষ ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। এখানে শহীদগণের প্রথম ফজিলত তো এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা মৃত নন, বরং তারা চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন।

শহীদগণের বাহ্যিকভাবে মৃত্যুবরণ করা, সমাধিতে দাফন হওয়া তো প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, এরপরও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদেরকে মৃত বলতে এবং মৃত মনে করতে যে নিষেধ এসেছে তার মর্ম কি?

এর জবাবে যদি বলা হয়, বরজখী জীবন উদ্দেশ্য, তবে তাতো প্রত্যেক মু'মিন-কাফেরেরই লাভ হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর তাদের রূহ জীবিত থাকে, আর কবরের প্রশ্নোত্তরের পর নেককার মু'মিনদের জন্য শান্তির ব্যবস্থা এবং কাফের ও ফাজেরদের জন্য কবরের আজাবের কথা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সুতরাং এই বরজখী জীবন যেহেতু সবাইকে শামিল রাখে তাহলে শহীদগণের এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য রইল কেমন করে?

জবাব হলো এই যে, কুরআনে কারীমের এই আয়াত একথা বলে দিয়েছে যে, শহীদগণ আল্লাহর তরফ থেকে জান্নাতের রিজিক প্রাপ্ত হন।

আর এক বিশেষ ধরনের জীবন তাদের লাভ হয় যা সাধারণ মৃতদের থেকে ভিন্ন হয়। এখন রয়ে গেল এ কথা যে, সেই ভিন্নতা ও স্বতন্ত্রটা কি এবং ঐ জীবনটার ধরণ কি? এর হাকীকত বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ না জানতে পারে এবং না জানার কোনো প্রয়োজন আছে। তবে কোনো কোনো সময় তাদের জীবনের বিশেষ আলামত দুনিয়াতেও তাদের দেহে প্রকাশিত হয়ে যায়। অর্থাৎ জমিন তাদের দেহকে ভক্ষণ করে না, যার বহু ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আবূ দাঊদের বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, ওহুদে যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হলো তখন আল্লাহ তাদের রূহসমূহকে সবুজ পাখীদের দেহে রেখে স্বাধীন করে দিয়েছেন। তারা জান্নাতে নহর ও বাগানের ফলমূলসমূহ থেকে তাদের রিজিক গ্রহণ করছে। অতঃপর তাদের ফানূস রূপী নীড়ে চলে আসে যা তাদের জন্য আরশের নীচে ঝুলন্ত করে রাখা হয়েছে। যখন তারা তাদের সুখ-শান্তির জীবন দেখল, তখন তারা বলতে লাগল- কেউ আছ কি? যে আমাদের অবস্থার সংবাদ আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট পৌঁছাতে পারবে? যারা আমাদের শহীদ হয়ে যাওয়ায় দুনিয়াতে শোকাহত রয়েছে। তাহলে তারা আর শোক চিন্তা করবে না, আর তারাও জিহাদ করার জন্য সচেষ্ট হবে। আল্লাহ পাক বললেন, আমি তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এর উপর وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

-[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬২-৬৫, মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ২৫৪-৫৫]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٧٢. اَلَّذِيْنَ مُبْتَدَأٌ اِسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ دُعَاءَهٗ بِالْخُرُوْجِ لِلْقِتَالِ لَمَّا اَرَادَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابُهُ الْعَوْدَ وَتَوَاعَدُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سُوْقَ بَدْرٍ الْعَامَ الْمُقْبِلَ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ بِاُحُدٍ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ بِطَاعَتِهٖ وَاتَّقَوْا مُخَالَفَتَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ .

১৭২. যারা ওহুদে আহত হয়ে পড়ার পরও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। অর্থাৎ তাঁর আহ্বানে আবার যুদ্ধের জন্য বের হতে সাড়া দিয়েছে, যখন আবূ সুফিয়ান ও তার সাথিরা আবার ফেরত আসতে চাইল এবং ওহুদের পরের বৎসর বদর নামক স্থানের বাজারে যুদ্ধ করার জন্য নবীর সাথে চ্যালেঞ্জ করল। اَلَّذِيْنَ মুবতাদা الخ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا খবর; তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বেঁচে থাকে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার তথা বেহেশত।

١٧٣. اَلَّذِيْنَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهٗ اَوْ نَعْتٌ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اَىْ نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الْاَشْجَعِيُّ اِنَّ النَّاسَ اَبَا سُفْيَانَ وَاَصْحَابَهٗ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمُ الْجُمُوْعَ لِيَسْتَاصِلُوْكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَلَا تَاْتُوْهُمْ فَزَادَهُمْ ذٰلِكَ الْقَوْلُ اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا بِاللّٰهِ وَيَقِيْنًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ كَافِيْنَا اَمْرَهُمْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ الْمُفَوَّضُ اِلَيْهِ الْاَمْرُ هُوَ وَخَرَجُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَافَوْا سُوْقَ بَدْرٍ وَاَلْقَى اللّٰهُ الرُّعْبَ فِيْ قَلْبِ اَبِيْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهٖ فَلَمْ يَاْتُوْا وَكَانَ مَعَهُمْ تِجَارَاتٌ فَبَاعُوْا وَرَبِحُوْا .

১৭৩. اَلَّذِيْنَ পূর্বোক্ত اَلَّذِيْنَ থেকে বদল হয়েছে অথবা সিফত হয়েছে। তাদেরকে লোকেরা যখন বলল তথা নুআইম ইবনে মাসউদ আশজায়ী যখন বলল, লোকেরা তথা আবূ সুফিয়ান ও তার সাথিরা তোমাদের জন্য একটি বড় দলকে সমবেত করেছে, তোমাদের মূলোৎপাটনের জন্য। সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় কর, তাদের মোকাবিলায় বের হয়ো না। তখন মুনাফিকদের এসব কথা তাদের মুসলমানদের ঈমান ও ইয়াকীনকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা বলেছে, আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং কর্ম সম্পাদনে তিনি অতি উত্তম। যাবতীয় বিষয় তাঁর উপরই ন্যাস্ত। সাহাবাগণ নবীজীর সাথে বের হয়ে বদরের বাজারে গিয়ে অবস্থান করেন, আর এ দিকে আল্লাহ পাক আবূ সুফিয়ান ও তার সাথিদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। যার কারণে তারা [তাদের প্রতিশ্রুতি মতে] আসতে পারেনি। মুসলমানদের সাথে ব্যবসার পণ্য ছিল তা বিক্রি করে তারা লাভবান হয়।

١٧٤. قَالَ تَعَالٰى فَانْقَلَبُوْا رَجَعُوْا مِنْ بَدْرٍ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ بِسَلَامَةٍ وَرِبْحٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ مِنْ قَتْلٍ اَوْ جُرْحٍ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ بِطَاعَتِهٖ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهٖ فِى الْخُرُوْجِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ عَلٰى اَهْلِ طَاعَتِهٖ .

১৭৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর তাঁরা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করে বহাল তবিয়তে মুনাফাসহ ফেরত এসেছে। তাদেরকে কোনো অনিষ্ট তথা কোনো হতাহতে স্পর্শ করেনি। তারপর তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসারী হয়েছে যুদ্ধে বের হওয়ার মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পালন করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যশীলদের জন্য মহান দানের অধিকারী।

http://islamiboi.wordpress.com

١٧٥. اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الْقَائِلُ لَكُمْ اَنَّ النَّاسَ الخ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ كُمْ اَوْلِيَاءَهُ الْكُفَّارَ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ فِيْ تَرْكِ اَمْرِيْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ حَقًّا .

১৭৫. নিশ্চয় যারা তোমাদের জন্য এ কথা **বলেছে যে,** লোকেরা তোমাদের জন্য বড় দল সমবেত করেছে। তারা তোমাদেরকে ভয় দেখায় নিজেদের কাফের বন্ধুদের ব্যাপারে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না **এবং** আমাকেই ভয় কর আমার নির্দেশ অমান্য করার ব্যাপারে যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ - اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল তার সেলাসহ মুবতাদা। لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ الخ পূর্বোক্ত খবর اَجْرٌ عَظِيْمٌ সিফত মাওসূফ মিলে পরে উক্ত মুবতাদা। মুবতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে প্রথম اَلَّذِيْنَ-এর খবর হয়েছে। قَوْلُهُ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ الخ : গ্রন্থকার মুফাসসির দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ-কে প্রথম اَلَّذِيْنَ থেকে বদল বা সিফত সাব্যস্ত করেছেন। তবে এতে একটি প্রশ্ন হয়। কারণ প্রথম اَلَّذِيْنَ দ্বারা বিশেষ লোকেরা উদ্দেশ্য যারা ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ দ্বারা সকল মুসলমান উদ্দেশ্য। তাই দুনো اَلَّذِيْنَ-এর উদ্দেশ্য এক হলো না। অথচ বদল ও সিফতের জন্য মুবদাল মিনহু ও **বদল,** তেমনিভাবে মাওসূফ ও সিফত এক ও অভিন্ন হওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং উত্তম হলো এই যে, দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ কে اَمْدَحُ **উহ্য** ফে'লের মাফঊলের ভিত্তিতে মানসূব সাব্যস্ত করে নেওয়া। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ الخ : حَسْبُنَا মুবতাদা اَللّٰهُ খবর, অথবা اَللّٰهُ মুবতাদা আর حَسْبُنَا পূর্বোক্ত খবর। بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ হালের স্থলে অবস্থিত হয়েছে فَانْقَلَبُوْا থেকে, لَمْ يَمْسَسْهُمْ ও اِنْقَلَبُوْا-এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। وَاتَّبَعُوْا মা'তুফ হয়েছে اِنْقَلَبُوْا-এর উপর। قَوْلُهُ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ الخ - ذٰلِكُمْ মুবতাদা اَلشَّيْطَانُ খবর। يُخَوِّفُ জুমলাটি اَلشَّيْطَانُ থেকে হাল হয়েছে তার মধ্যে আমেল হলো ইশারা। اَىْ يُخَوِّفُكُمْ بِاَوْلِيَائِهٖ اَوْ يُخَوِّفُ اَوْلِيَائَهٗ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : উপরে ওহুদ যুদ্ধের কাহিনীর বর্ণনা ছিল। উল্লিখিত اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الخ আয়াতে **সে** যুদ্ধ প্রসঙ্গেই আরেকটি যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে যা 'গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ' নামে খ্যাত। হামরাউল আসাদ **হলো** মদিনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম।

আয়াতের শানে নুযূল : অধিক সংখ্যক মুফাসসিরগণের মতে, আলোচ্য আয়াতটি গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ **সম্পর্কে** নাজিল হয়েছে। কোনো মুফাসসিরদের মতে, এ আয়াতটি গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে **ইমাম** ফখরুদ্দীন রাযী (রা.) বলেছেন – اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ ـ اِلٰى اَجْرٌ عَظِيْمٌ আয়াতটি নাজিল হয়েছে গাযওয়ায়ে **হামরাউল** আসাদ সম্পর্কে, আর اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ـ الى ـ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ পর্যন্ত নাজিল হয়েছে গাজওয়ায়ে বদরে ছুগরা সম্পর্কে। এ মতটিকে কাজী ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) ও মাওলানা **ইদ্রিস** কান্ধলবী (র.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ পছন্দ করেছেন। আল্লামা শায়খ আহমদ সাবী তাঁর রচিত হাশিয়াতুস সাবীতে **লিখেছেন,** সুয়ূতী সাহেবের জন্য উভয় আয়াতের সম্মিলিত শানে নুযূল হিসেবে গাযওয়ায়ে বদরে ছুগরার ঘটনাকে উল্লেখ করা ঠিক **হয়নি।**

–[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. **১৯১**]

গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : নাসায়ী ও তাবরানী বিশুদ্ধ সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর **উক্তি** উদ্ধৃত করেছেন যে, মুশরিকরা যখন ওহুদ থেকে ফেরত চলে গেল তখন তারা পরস্পরে বলতে লাগল, তোমরা মারাত্মক **ভুল** করেছ। না তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করতে পেরেছ এবং না পেরেছ বন্দী করে আনতে নিজেদের পেছনে সওয়ার **করিয়ে** যুবতী মহিলাদেরকে। সুতরাং তোমরা এখন আবার ফেরত চল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এ কথা শুনতে পেলেন, **তখন** মুসলমানদেরকে আহ্বান করলেন তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাতে সকলেই সাড়া দিলেন এবং হাজির হলেন।

http://islamiboi.wordpress.com

মুহাম্মদ বিন আমর বর্ণনা করেন যে, যখন তৃতীয় হিজরির শাওয়ালের ১৫ তারিখ শনিবার ওহুদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন শত্রুদল আবার ফিরে আসার আশঙ্কায় খাজরাজ ও আওসের নেতারা হুজুরের নিকট রাত্রিযাপন করল। ১৬ তারিখ রবিবার ফজরের সময় হলে হযরত বেলাল (রা.) আজান দিয়ে হুজুর ﷺ -এর অপেক্ষা করতে থাকেন। হুজুর ﷺ তাশরিফ আনলে একজন মযনী গোত্রের লোক তাকে সংবাদ দিল যে, মুশরিকরা যখন রাওয়াহা নামক স্থানে পৌছে তখন আবূ সুফিয়ান বলল, মদিনায় আবার ফেরত চল তাহলে মুসলমানদের যারা অবশিষ্ট রয়েছে তাদেরকে আমরা সমূলে উৎপাটন করে দেব। সফওয়ান ইবনে উমাইয়া অস্বীকার করল এবং বলতে লাগল, তোমরা এ রকম করো না মুসলমানেরা পরাজিত হয়ে চলে গেছে। এখন আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, খাজরাজের যে সব লোকেরা বাকি রয়ে গিয়েছিল তারাও তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়ে যাবে। তোমরা যদি আবার ফিরে যাও তবে আমার আশঙ্কা হয়, হয়তো তোমার বিজয় পরাজয়ে বদলে যেতে পারে। সুতরাং মক্কায়ই ফেরত চলে যাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, সফওয়ান সঠিক পথে না থাকলেও এই রায়ে সে সর্বাধিক অভ্রান্ত ছিল। কসম ঐ সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! এদের উপর বর্ষিত হওয়ার জন্য [গায়বি] পাথর নাম ধরে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। যদি তারা ফেরত আসত তবে বিগত দিনের ন্যায় তারা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ত, [তাদের চিহ্নও বাকি থাকত না] । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে আনলেন এ ব্যাপারে তারা উভয়ের সঙ্গে আলোচনা করলেন। উভয়ই জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! শত্রুদেরকে পিছন দিক থেকে ধাওয়া করা হোক তারা যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের উপর মাথাচাড়া দিতে না পারে।

এই পরামর্শের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলালকে নির্দেশ দিলেন, তুমি ঘোষণা করে দাও যে রাসূল ﷺ দুশমনদের উপর আক্রমণ করার জন্য তাদের প্রতি ধাওয়া করার নির্দেশ তোমাদেরকে দিচ্ছেন। তবে আমাদের সঙ্গে কেবল ঐ সব লোকই আজ যেতে পারবে, যারা গতকাল ওহুদের যুদ্ধে শরিক ছিল। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইরের গায়ে ছিল নয়টি জখম, তিনি এ গুলোর চিকিৎসা করতে ইচ্ছা করছিলেন। তিনি এই ঘোষণা শুনে বললেন, সানন্দে আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুম পালনে আমি হাজির। বনী সালমা গোত্রের চল্লিশজন আহত ব্যক্তি বের হয়ে গেলেন। তোফায়েল ইবনে নোমানের ছিল তেরটি জখম, খাব্বাশ বিন সাম্মারের ছিল দশটি, কাআব বিন মালেকের ছিল দশের কিছু উর্ধ্বে, আতিয়া ইবনে আমেরের ছিল নয়টি। মোটকথা মুসলমানগণ নিজেদের জখমের চিকিৎসার দিকেও মনোযোগ দেননি; বরং দ্রুত তারা অস্ত্র হাতে উঠিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মোটকথা হুজুর ﷺ সত্তর জন সাহাবীকে নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করলেন। যাতে তারা এ কথা বুঝতে না পারে যে মুসলমানরা গতকালের পরাজয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। মদিনা থেকে বের হয়ে তিনি আট মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ নামক স্থানে অবস্থান করেন। এখানে পৌছে সাহাবাগণ উট জবাই করলেন, পাক করার জন্য পাঁচশত জায়গায় আগুন জ্বালালেন, যাতে কাফেররা দূর থেকে দেখে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক মনে করে। মা'বাদে খুজায়ী, যে তখন মুশরিক ছিল এবং হুজুরের সাথে তার চুক্তি ছিল। সে মক্কার কোনো খবর তাঁর কাছে গোপন রাখত না। সে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার এবং আপনার সাথিদের উপর যে মসিবত নেমে এসেছে এই জন্য আমরা খুবই মর্মাহত। আমাদের মনের খাহিশ ছিল আল্লাহ আপনাকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। অতঃপর সে এখান থেকে বের হয়ে রাওহা নামক স্থানে আবূ সুফিয়ানের নিকট গিয়ে পৌছে । সেখানে মুশরিকরা ফেরত এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের উপর আক্রমণ করার জন্য সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল। তারা বলেছিল মুসলমানদের বড় বড় নেতা ও লিডারদেরকে তো আমরা খতম করে দিয়েছি। এবারে বাকি লোকদেরকে আক্রমণ করে শেষ করে তাদের তরফ থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবো। আবূ সুফিয়ান যখন মা'বাদকে দেখল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল সে দিকের খবর কি? উত্তরে মা'বাদ বলল, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথিরা এত বড় সৈন্যদল নিয়ে তোমাদের খোঁজে বের হয়েছে যে, এত বেশি সৈন্য আমি কখনো দেখিনি। তাঁরা তোমাদের উপর রাগে দাঁত পেষণ করছে। যারা তাদের সাথে যুদ্ধে শরিক হয়নি তারাও এখন তাদের সঙ্গে একত্র হয়েছে। আর নিজেদের অতীত কৃতকর্মের উপর তাঁরা লজ্জাবোধ করছে। তাঁরা তোমাদের উপর এত রাগান্বিত যে, আমি ইতঃপূর্বে এরূপ রাগ দেখিনি। আবূ সুফিয়ান বলল, আরে তোমার ধ্বংস হোক! তুমি বলছ কি? মা'বাদ বলল, খোদার কসম তোমরা সামনে চলামাত্রই মুসলমানদের ঘোড়ার কপাল দেখতে পাবে। আবূ সুফিয়ান বলল, খোদার কসম! আমরা তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের অবশিষ্ট লোকদেরও মূলোৎপাটন করে দেব। মা'বাদ বলল, আমি তোমাদেরকে এই কাজ থেকে নিষেধ করছি। মা'বাদের এ কথা সফওয়ানের পরামর্শের সাথে এক হয়ে আবূ সুফিয়ান এবং তার সাথিদের দিক পাল্টে দিল, আর তারা পাল্টা ধাওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি ফেরত চলে যায়। ঐ সময় কালেই আবূ সুফিয়ানের নিকট দিয়ে আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু সওয়ার অতিক্রম করে। আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য করছ? তারা বলল, মদিনায় পণ্য নিয়ে যাচ্ছি। আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মদকে একটি সংবাদ দিতে পারবে কি? যদি তোমরা এ কাজটি করে দিতে পার, তবে আমি আগামী কাল উকাজ বাজারে তোমাদের উটের উপর কিশমিশ উঠিয়ে দিবো। তারা বলল, হ্যাঁ! আমরা পারবো। আবূ সুফিয়ান বলল, তোমরা যখন মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট পৌছবে, তখন তাকে এ

http://islamiboi.wordpress.com

সংবাদটা দিয়ে দিবে যে, আমরা ফায়সালা করে নিয়েছি যে, আমরা মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদের উপর আক্রমণ করবো। যাতে অবশিষ্ট লোকেরাও খতম হয়ে যায়। এই সংবাদ পাঠিয়ে আবূ সুফিয়ান মক্কায় চলে গেছে। আর ঐ আরোহী দল গিয়ে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এই সংবাদটি দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ শুনে বললেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অতঃপর তিনি ঐ স্থানে ১৭,১৮, ও ১৯ শাওয়াল, সোম, মঙ্গল, ও বুধবার পর্যন্ত অবস্থান করেন। আর তখনই আল্লাহ পাক اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ الخ আয়াতটি নাজিল করেন।

−[তাফসীরে মাযহারী উর্দূ খ. ২, পৃ. ৪২২−৪৫]

গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা : ওহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান মক্কায় ফেরার ইচ্ছা করল তখন সে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি চান তবে আমাদের ও তোমাদের আবার যুদ্ধ হবে আগামী বৎসর বদরে। আবূ সুফিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, বদরে যেহেতু আমাদের বড় বড় নেতারা মারা গেছে, তাই আগামী বৎসর যদি ঐ বদরেই আবার যুদ্ধ হয়, আর আমরা ওহুদের ন্যায় সেখানেও মুসলমানদের বড় বড় নেতাদেরকে মারতে পারি তাহলে বদরের প্রতিশোধ হয়ে যাবে। হুজুর ﷺ আবূ সুফিয়ানের জবাবে বললেন, ঠিক আছে। বৎসর পূর্ণ হয়ে গেলে আবূ সুফিয়ান কুরাইশী দুই হাজার কাফেরদেরকে নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো। তাদের সঙ্গে ছিল পঞ্চাশটি ঘোড়া। এদিকে হুজুর ﷺ সাহাবাদেরকে তাঁর সঙ্গে চলার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁরা শুনামাত্রই সাথি হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আর বদর নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। আবূ সুফিয়ান মক্কা থেকে বের হয়ে মাত্র মাররুজ জাহরান নামক স্থানে পৌঁছে ছিল। তখন হঠাৎ তার মনের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ভয় ভীতির সঞ্চার হয়ে গেল। তবে সে কামনা করছিল যে, হুজুর ﷺ যদি ওয়াদার ক্ষেত্রে না আসেন তাহলে অভিযোগটা তাঁর উপর থাকবে। আর আমি লড়াই করা থেকে বেঁচে গেলাম। তাই সে মনে করল আমার জন্য সৈন্য বাহিনীকে মক্কায় ফেরত নিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন। ঘটনাক্রমে তার সাথে নুআইম ইবনে মাসউদ আশজায়ীর সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যে মক্কা থেকে ওমরা পালন করে ফেরত আসছিল। আবূ সুফিয়ান তাকে বলল, আমি মুহাম্মদ ও তাঁর সাথিদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলাম যে, বদরের মেলার মৌসুমে আগামী বৎসর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। কিন্তু এই বৎসরটি দুর্ভিক্ষের। এ রকম সময় যুদ্ধ করা উচিত নয়। এখন আমার এটাই উত্তম মনে হচ্ছে যে, আমি মক্কায় ফেরত চলে যাবো। তবে আমি এ কথাটা পছন্দ করি না যে, মুহাম্মদ তো প্রতিশ্রুত ক্ষেত্রে এসে পৌঁছে যাবে। আর আমি পৌঁছতে পারবো না। এতে মুসলমানদের দুঃসাহস আরো অধিক বেড়ে যাবে। তাই ভালো হবে এটাই যে, হে নুআইম! তুমি মদিনায় গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে দিবে যে, মক্কার কুরাইশগণ তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছে, যাদের প্রতিরোধ তোমরা করতে পারবে না। তাই তোমাদের যুদ্ধের জন্য বের না হওয়াটাই উত্তম হবে। ফলে মুসলমানরা এ রকম সংবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে এবং তাদের সাহস ভেঙ্গে যাবে। আর ভয়ের কারণে যুদ্ধের জন্য বের হবে না। আর আবূ সুফিয়ান নুআইম ইবনে মাসউদকে একথা বলল যে, এই কাজের বিনিময়ে আমি তোমাকে দশটা উট দেব। নুআইম পুরস্কারের লোভে মদিনায় পৌঁছে গিয়ে দেখল যে, মুসলমানগণ আবূ সুফিয়ানের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বদরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নুআইম তাদেরকে বলল, মক্কার লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য বিরাট বাহিনী তৈরি করছে। সুতরাং তোমাদের যুদ্ধ না করাটাই শ্রেয় হবে। নুআইম বলল, দেখ! ওহুদের বৎসর কুরাইশের লোকেরা তোমাদের ঘরে এসে তোমাদেরকে কতল করে গেছে এবং কোনো পরিবার হতাহত থেকে খালি নেই। এরপরও যদি তোমরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে যুদ্ধ করতে যাও, তবে আমি কসম খেয়ে বলছি যে, তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিও প্রাণে বেঁচে মদিনায় ফেরত আসতে পারবে না। এ কথা শুনার পর মুসলমানদের মধ্যে ভয়ের পরিবর্তে ঈমানী জোশ বেড়ে গেছে। আর তারা বলতে লাগলেন− حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। আর আল্লাহ যাদের কর্ম সম্পাদনকারী হয়ে যান তাদেরকে বড় থেকে মহা বড় কোনো বাহিনীও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, শপথ ঐ খোদার যার হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তাদের মোকাবিলায় বের হবো যদিও আমার একাই বের হতে হয়। অতঃপর তিনি বদর অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন সত্তর জন সাহাবী। যারা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বলে যাচ্ছিলেন। তিনি বদরে পৌঁছে আটদিন পর্যন্ত সেখানে আবূ সুফিয়ানের অপেক্ষায় অবস্থান করলেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান আসলো না এবং কোনো যুদ্ধও হলো না। এই দিনগুলোতে বদরে মেলা লেগেছিল। মুসলমানরা সেখানে কেনাবেচা করেছেন এবং খুবই লাভবান হয়েছেন। তাঁরা মুনাফা গ্রহণ করে মঙ্গলের সহিত মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। এই ঘটনাকে গাজওয়ায়ে বদরে সুগরা বলে। আর ওহুদের পূর্বে যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তাকে গাজওয়ায়ে বদরে কুবরা বলে।

−[মা'আরিফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ৯৫−৯৭]

http://islamiboi.wordpress.com

১৭৬. وَلَا يُحْزِنْكَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَبِفَتْحِهَا وَضَمِّ الزَّايِ مِنْ حَزَنَهُ لُغَةٌ فِي أَحْزَنَهُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ يَقَعُونَ فِيهِ سَرِيعًا بِنُصْرَتِهِ وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ أَوِ الْمُنَافِقُونَ أَيْ لَا تَهْتَمَّ لِكُفْرِهِمْ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا بِفِعْلِهِمْ وَإِنَّمَا يَضُرُّونَ أَنْفُسَهُمْ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا نَصِيبًا فِي الْآخِرَةِ أَيِ الْجَنَّةِ فَلِذَٰلِكَ خَذَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي النَّارِ.

অনুবাদ :

১৭৬. হে রাসূল ﷺ! আর তারা যেন তোমাকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। [لَا يُحْزِنْكَ ইয়ার পেশ ও যা বর্ণের যেরের সাথে এবং ইয়ার যবর ও যা বর্ণের পেশের সাথে, حَزَنَ বাবে نَصَرَ হতে এটা أَحْزَنَ -এর একটি লোগাত] যারা দ্রুতবেগে কুফরের দিকে ধাবিত হয় তথা কুফরের সহায়তা করে তাতে দ্রুত গতিতে পতিত হয় আর তারা হচ্ছে মক্কাবাসী কাফেররা বা মুনাফিকরা অর্থাৎ তাদের কুফরের কারণে আপনি চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। তারা কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তাদের কর্মকাণ্ডের দ্বারা; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছে। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তাদেরকে আখিরাতে কোনো কল্যাণের অংশ না দেওয়া অর্থাৎ বেহেশত না দেওয়া। এ জন্যই তাদেরকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত রেখেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে দোজখের কঠিন শাস্তি।

১৭৭. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ أَيْ أَخَذُوهُ بَدَلَهُ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ بِكُفْرِهِمْ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ.

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর খরিদ করে নিয়েছে তথা ঈমানের বদলে কুফরকে গ্রহণ করেছে [তারা] তাদের কুফর দ্বারা আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। এবং তাদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

১৭৮. وَلَا تَحْسَبَنَّ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي أَيْ إِمْلَاءَنَا لَهُمْ بِتَطْوِيلِ الْأَعْمَارِ وَتَأْخِيرِهِمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ وَمَعْمُولَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ فِي قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَمَسَدَّ الثَّانِي فِي الْأُخْرَى إِنَّمَا نُمْلِي نُمْهِلُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا بِكَثْرَةِ الْمَعَاصِي وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ذُو إِهَانَةٍ فِي الْآخِرَةِ.

১৭৮. وَلَا تَحْسَبَنَّ এটা يَاء ও تَاء -এর সাথে আর কাফেররা যেন এই ধারণা না করে যে আমি তাদেরকে যে অবকাশ দেই তা তাদের জন্য কল্যাণকর তথা আমার অবকাশ তাদের দীর্ঘজীবন ও শাস্তি প্রদানে বিলম্বকে যেন কল্যাণকর মনে না করে নিজেদের জন্য। يَاء -এর কেরাত অনুযায়ী (إِنَّمَا) -এর أَنَّ তার মা'মূলসহ দুই মাফঊলের স্থলবর্তী لَا تَحْسَبَنَّ ফে'লের আর لَا تَحْسَبَنَّ -এর কেরাত অনুযায়ী أَنَّ তার মা'মূলসহ لَا تَحْسَبَنَّ -এর দ্বিতীয় মাফঊলের স্থলবর্তী। আমি তো তাদেরকে এজন্য অবকাশ দেই যাতে তারা পাপে অধিক নাফরমানি করার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করতে পারে। আর তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত অপমানজনক তথা আখিরাতে অপমানযুক্ত শাস্তি।

http://islamiboi.wordpress.com

١٧٩. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ لِيَتْرُكَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ اَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلَاطِ الْمُخْلِصِ بِغَيْرِهِ حَتّٰى يَمِيْزَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَفْصِلُ الْخَبِيْثَ الْمُنَافِقَ مِنَ الطَّيِّبِ الْمُؤْمِنِ بِالتَّكَالِيْفِ الشَّاقَّةِ الْمُبِيْنَةِ لِذٰلِكَ فَفَعَلَ ذٰلِكَ يَوْمَ اُحُدٍ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوا الْمُنَافِقَ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ التَّمْيِيْزِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ يَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَيُطْلِعُهُ عَلٰى غَيْبِهٖ كَمَا اَطْلَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلٰى حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوا النِّفَاقَ فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

১৭৯. আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, মুসলমানদেরকে সে অবস্থাতেই রাখবেন হে লোকেরা! যাতে তোমরা রয়েছঃ তথা নিষ্ঠাবান ও অনিষ্ঠাবানের সংমিশ্রণের যে অবস্থাতে তোমরা রয়েছ, যে পর্যন্ত না নাপাককে তথা মুনাফিককে পাক তথা মু'মিন থেকে পৃথক করে দেবেন। এ পার্থক্য বিধানকারী কষ্টসাধ্য নির্দেশের মাধ্যমে যেরূপ ওহুদ দিবসে করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা এমন নন যে, তোমাদেরকে গায়বি বিষয়ে অবহিত করবেন যার কারণে তার পৃথকীকরণের পূর্বে তোমরা মুনাফিককে গায়রে মুনাফিক থেকে চিনে নিতে পারবে। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, অতঃপর তাকে গায়বি বিষয়ে অবগত করেন, যেরূপ তিনি নবী করীম ﷺ কে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর যদি তোমরা ঈমান আন এবং নেফাক থেকে বেঁচে থাক তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।

١٨٠. وَلَا تَحْسَبَنَّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اَيْ بِزَكَاتِهٖ هُوَ اَيْ بُخْلُهُمْ خَيْرًا لَّهُمْ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ وَالضَّمِيْرُ لِلْفَصْلِ وَالْاَوَّلُ بُخْلُهُمْ مُقَدَّرًا قَبْلَ الْمَوْصُوْلِ عَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ وَقَبْلَ الضَّمِيْرِ عَلَى التَّحْتَانِيَّةِ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ اَيْ بِزَكَاتِهٖ مِنَ الْمَالِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَنْ يُجْعَلَ حَيَّةً فِيْ عُنُقِهٖ تَنْهَشُهٗ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيْثِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَرِثُهُمَا بَعْدَ فَنَاءِ اَهْلِهِمَا وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ خَبِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ.

১৮০. وَلَا تَحْسَبَنَّ -ইয়া ও تَاء -এর সাথে তারা যেন এমন ধারণা না করে যারা কার্পণ্য করে সে বিষয়ে, আল্লাহ যা তাদের দান করেছেন। নিজের অনুগ্রহে যে, এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। لَا يَحْسَبَنَّ দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে خَيْرًا لَّهُمْ - (هو) যমীরটি فَصْل বা পার্থক্যের জন্য। আর প্রথম মাফউল الَّذِيْنَ -এর পূর্বে উহ্য রয়েছে لَا تَحْسَبَنَّ -এর কেরাতানুযায়ী, আর যমীরে ফসলের পূর্বে উহ্য হবে لَا يَحْسَبَنَّ -এর কেরাত অনুযায়ী; বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। সে সমস্ত ধন সম্পদকে তথা জাকাতের সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। তাদের মালকে সর্প বানিয়ে তাদের গর্দানে দেওয়া হবে যে সর্প তাদেরকে ছোবল মারতে থাকবে। যেরূপ হাদীস শরীফে এসেছে। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার প্রকৃত স্বত্বাধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তথা আসমান ও জমিনবাসী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনিই এসবের উত্তরাধিকারী হবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের বা তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কে খবর রাখেন। (يَعْمَلُوْنَ) -এর মধ্যে يَاء ও تَاء -এর সাথে উভয় কেরাত রয়েছে সুতরাং তিনি তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الخ : اَللّٰهُ -كَانَ -এর ইসিম তার খবর مُرِيْدًا উহ্য রয়েছে। ইবারতের রূপ হবে এমন مَا كَانَ اللّٰهُ مُرِيْدًا لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ - لِيَذَرَ - كَانَ -এর খবর হতে পারে না। يَذَرُ আসলে يَوْذَرُ ছিল, يَدَعُ -এর সামঞ্জস্যতায় তা থেকে (و) ওয়াওকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। নতুবা তার মধ্যে বিলুপ্তির কোনো কারণ ছিল না। يَذَرُ -এর মাজী আসে না। قَوْلُهٗ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الخ - اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ الخ - لَا يَحْسَبَنَّ -এর ফায়েল। خَيْرًا তার দ্বিতীয় মাফউল هُوَ যমীরে ফসল। আর উহ্য اَلْبُخْلُ বা هُوَ প্রথম মাফউল। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৬৮, তাফসীরে হক্কানী, পারা - ৪ পৃ. ৩৬-৩৯]

http://islamiboi.wordpress.com

١٨١. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ وَهُمُ الْيَهُوْدُ قَالُوْهُ لَمَّا نَزَلَ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَقَالُوْا لَوْ كَانَ غَنِيًّا مَا اسْتَقْرَضْنَا سَنَكْتُبُ نَاْمُرُ بِكَتْبِ مَا قَالُوْا فِىْ صَحَائِفِ اَعْمَالِهِمْ لِيُجَازُوْا عَلَيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ وَ نَكْتُبُ قَتْلَهُمْ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ الْاَنْبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّيَقُوْلُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اَىِ اللّٰهُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ النَّارِ ـ

١٨٢. وَيُقَالُ لَهُمْ اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا ذٰلِكَ الْعَذَابُ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ عَبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْاِنْسَانِ لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهِمَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اَىْ بِذِىْ ظُلْمٍ لِلْعَبِيْدِ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ـ

অনুবাদ :

১৮১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন ফকির আর আমরা ধনী। আর তারা হলো ইহুদিরা مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا যখন নাজিল হলো তখন তারা এ উক্তিটি করেছে আর বলেছে, যদি তিনি ধনী হতেন তবে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেন না। আমি তাদের এ কথা, যা তারা বলেছে এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে তাদের হত্যা করার বিষয়টি লিখে রাখব, তথা তাদের আমলনামায় লিখতে [ফেরেশতাদেরকে] নির্দেশ দেবো, যাতে করে এর ভিত্তিতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা যায়। سَتَكْتُبُ -এর মধ্যে এক কেরাত سَيُكْتَبُ- ও রয়েছে, يَاء- এর সাথে মুজারে মাজহুল। قَتْلَهُمْ -কে জবর ও পেশ উভয় সূরতে পাঠ করা হয়েছে। (يَقُوْلُ) নূন ও ইয়ার সাথে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে ফেরেশতাদের জবানে তাদেরকে বলবেন, আস্বাদন কর তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

১৮২. আর তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, এ শাস্তি হলো তারই প্রতিফল যা তোমাদের হাতে ইতঃপূর্বে পাঠিয়েছে হাত বলে মানুষ বুঝানো হয়েছে। কারণ অধিকাংশ কাজই উভয় হাত দ্বারাই করা হয়ে থাকে। আর এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য অত্যাচারী নন যে, তিনি তাদেরকে গুনাহ ব্যতীত শাস্তি দেবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٣. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ لِلَّذِيْنَ قَبْلَهُ قَالُوْا لِمُحَمَّدٍ اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا فِى التَّوْرٰىةِ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ نُصَدِّقُهُ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ـ فَلَا نُؤْمِنُ لَكَ حَتّٰى تَأْتِيْنَا بِهٖ وَهُوَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهَا فَاِنْ قُبِلَ جَاءَتْ نَارٌ بَيْضَاءُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَحْرَقَتْهُ وَاِلَّا بَقِىَ مَكَانَهٗ وَعَهِدَ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ذٰلِكَ اِلَّا فِى الْمَسِيْحِ وَمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ تَعَالٰى قُلْ لَهُمْ تَوْبِيْخًا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى فَقَتَلْتُمُوْهُمْ وَالْخِطَابُ لِمَنْ فِىْ زَمَنِ نَبِيِّنَا وَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ لِاَجْدَادِهِمْ لِرِضَاهُمْ بِهٖ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ اَنَّكُمْ تُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ الْاِتْيَانِ بِهٖ ـ

১৮৩. اَلَّذِيْنَ পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ-এর সিফত হয়েছে। যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে একথা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে তাওরাতে অঙ্গীকার করে রেখেছেন যে, আমরা যেন কোনো রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি। যে পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকট এমন কুরবানি উপস্থিত না করবেন যাকে অগ্নিগ্রাস করে নেবে। সুতরাং আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যে পর্যন্ত আপনি তা আমাদের নিকট না নিয়ে আসবেন। আর কুরবানি বলা হয় যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়, চাই চতুষ্পদ প্রাণী হোক বা অন্য কিছু হোক। কুরবানি যদি মকবুল হতো তবে আসমান থেকে একটি সাদা আগুন নেমে এসে একে জ্বালিয়ে দিত। অন্যথায় তা স্বস্থানে পড়ে থাকত। হযরত মসীহ (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত বনী ইসরাঈলদের জন্য এরূপ জ্বালানোর নিয়ম ছিল। হে রাসূল ﷺ! আপনি তাদেরকে তিরস্কারার্থে বলে দিন, নিশ্চয় আমার পূর্বে অনেক রাসূল সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তথা মু'জিযাসমূহ নিয়ে এবং তোমরা যা বল তা নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিলেন। যথা– জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)। অতঃপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেললে। সম্বোধন করা হয়েছে আমাদের নবীর যুগের [ইহুদি] যারা, তাদেরকে; যদিও এ [হত্যাকাণ্ড] কাজটি তাদের পিতা ও পিতামহদের ছিল। কারণ তাদের সেই কাজের এদের প্রতি সম্মতি ছিল। যদি তোমরা এ কথার মধ্যে সত্যবাদী হও যে, মু'জিযা নিয়ে আসার পর ঈমান গ্রহণ করে নিবে, তবে তাঁদেরকে হত্যা করেছিলে কেন?

١٨٤. فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ وَالزُّبُرِ كَصُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَالْكِتٰبِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِاِثْبَاتِ الْبَاءِ وَفِيْهِمَا الْمُنِيْرِ الْوَاضِحِ هُوَ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا ـ

১৮৪. হে রাসূল ﷺ! এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তবে আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি তথা মোজেজাসমূহ অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহ [যথা– ইবরাহীমের সহীফা এবং দীপ্তমান গ্রন্থসমূহসহ এসেছিলেন। ভিন্ন এক কেরাতে উভয়টিতে তথা اَلزُّبُرُ ও اَلْكِتٰبُ -তে بَا বর্ণসহ এসেছে। [অর্থাৎ بِالزُّبُرِ ও بِالْكِتٰبِ] দীপ্তি গ্রন্থ যেমন– তাওরাত ও ইঞ্জিল। সুতরাং তারা যেরূপ ধৈর্যধারণ করেছেন তেমনি আপনিও ধৈর্যধারণ করুন!

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ : এখানে حَرِيْق . مُحْرِق অর্থে ব্যবহৃত, যেরূপ اَلِيْم . مُؤْلِم অর্থে ব্যবহৃত। حَرِيْق অর্থ- দগ্ধ, আর مُحْرِق অর্থ- দগ্ধকারী।

قَوْلُهُ ذِيْ ظُلْمٍ : এতে ইশারা করা হয়েছে যে, ظَلَّام মুবালাগার সীগাহটি ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গাতেই মুবালাগার সীগাহ ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ : اَلْبَيِّنَاتُ - بَيِّنَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ দলিল এখানে দালাইল ও মুজেযার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلزُّبُرُ - زَبُوْرٌ এর বহুবচন। زَبُوْرٌ অর্থ- কিতাব, গ্রন্থ। زَبُوْر মূলত মাসদার, যার অর্থ লিখা, তবে এখানে মাসদার ইসমে মাফউলের (مَزْبُوْر) অর্থে ব্যবহার হয়েছে। اَلْكِتَابُ (ن - ض) زَبَرَ - কিতাব, গ্রন্থ বা পত্র লিখল।

ইমাম যাজ্জাজ (র.) বলেন, যে কোনো হেকমত বা প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থকে زَبُوْر বলে। তখন زَبْر. زَبُوْر তথা ধমক প্রদান থেকে উদ্ভব হওয়াটা অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। গ্রন্থ বা কিতাবকে এই জন্য যাবূর বলা হয়। কারণ তাতে খেলাফে হক থেকে ধমক প্রদান করা হয়ে থাকে। এ হিসেবেই হযরত দাউদ (আ.)-এর উপর অবতারিত কিতাবকেও যাবূর নামে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ তাতেও অধিক পরিমাণ ধমকি ও ভীতিপ্রদ কথা এবং উপদেশ বাণী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) بَا সহ بِالزُّبُرِ পাঠ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : সূরা আলে ইমরানের শুরুতে ইহুদিদের বদভ্যাস ও দুষ্কর্মের যে আলোচনা চলছিল এখান থেকে পুনরায় সে আলোচনা প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর অধিকাংশই এই বিষয় সম্পর্কিত। তবে মাঝখানে রাসূলে কারীম ﷺ ও মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা ও উপদেশমূলক আলোচনা সন্নিবেশিত হচ্ছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

ইমাম রাযী (র.) লিখেন, আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তার রাস্তায় জান-মাল কুরবানি করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। আলোচ্য আয়াতগুলোতে ইহুদিদের হুজুর ﷺ-এর নবুয়তের ব্যাপারে কতিপয় সন্দেহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১২১]

قَوْلُهُ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۤءُ :

আয়াতের শানে নুযূল : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে লিখেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বনী কায়নুকার ইহুদিদের কাছে একটি চিঠি দিয়ে পাঠান। চিঠিতে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ, নামাজ পড়া, জাকাত প্রদান এবং আল্লহর জন্য কর্জে হাসানা তথা আল্লাহর রাহে দান খয়রাত করার জন্য দাওয়াত দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবূ বকর একদিন ইহুদিদের মাদরাসায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, অনেক ইহুদি একজন লোকের নিকট সমবেত হয়ে আছে। আর সে ছিল ফাখখাস বিন আযুরা নামক এক ইহুদি। যে ইহুদিদের আলেমদের একজন ছিল এবং তার সঙ্গে আরো একজন আলেম ছিল যার নাম ছিল উশাই। হযরত আবূ বকর (রা.) ফাখখাসকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, আর মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহর কসম তোমরা অবশ্যই এ কথা জান যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, যিনি আল্লাহর তরফ থেকে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। আর তাঁর আলোচনা তোমাদের নিকট তাওরাতের মধ্যে লিখাও রয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আস এবং তাকে মেনে নাও, আর আল্লাহকে কর্জে হাসানা দান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ডবল ছওয়াব প্রদান করবেন। ফাখখাস বলল, আবূ বকর! তুমি বলছ যে, আমাদের প্রভু আমাদের কাছে আমাদের মাল ঋণ চাচ্ছেন, ঋণ তো গরিব ধনীর কাছে চায়। সুতরাং তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে আল্লাহ ফকির হলেন আর আমরা ধনী। আল্লাহ তো নিজে সুদ দিতে নিষেধ করেন, অথচ তিনি আমাদেরকে সুদ [দান খয়রাতের বর্ধিত হারে ছওয়াব] দিবেন। তিনি যদি ধনী হতেন, তবে আমাদেরকে সুদ দিতেন না। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর রাগ এসে গেল। তিনি ফাখখাসের মুখে সজোরে চড় মেরে দিলেন। আর বললেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের সাথে আমাদের শান্তি-চুক্তি না হতো তবে হে আল্লাহর দুশমন! আমি তোমার গর্দান কেটে ফেলতাম। ফাখখাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিচার দিল যে, দেখ মুহাম্মদ! তোমার সাথি আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে? হুজুর ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ রকম কাজ কেন করলে? হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এই খোদার দুশমন মারাত্মক জঘন্যতম উক্তি করেছিল। সে

http://islamiboi.wordpress.com

বলেছিল, আল্লাহ হলেন ফকির, আর আমরা ধনী। এ কথা শুনে আমার রাগ এসে গেছে, এই জন্য আমি তার মুখে চড় মেরেছি। ফাখখাস হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এ কথা অস্বীকার করে দিল। [আর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট কোনো সাক্ষী প্রমাণ ছিল না] এর উপর আল্লাহ পাক ফাখখাসের কথার প্রতিবাদে এবং হযরত আবূ বকর (রা.) -এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করলেন। ইকরামা, সুদ্দী ও মুকাতিল অনুরূপই বলেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৩৬-৩৭]

এই আয়াতে ইহুদিরা হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের অস্বীকার করেছে। কারণ তাদের দৃষ্টিতেও আল্লাহ তো কারো মুখাপেক্ষী নন, তাহলে তার অন্যের কাছে কর্জে হাসানা অবশ্যই মিথ্যা হবে। এ রকম কথা কুরআনে হওয়ার কথা নয়। তাই এতে প্রমাণিত হচ্ছে, এ কথা হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজ তরফ থেকে মিথ্যা বলেছেন। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি যেহেতু সুস্পষ্ট রূপে বাতিল ছিল তাই কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ জাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ তাঁর কোনো লাভের জন্য নয়; বরং যারা মালদার তাদের পার্থিব ও আখিরাতের ফায়দার জন্য ছিল; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আল্লাহকে ঋণদানের শিরোনামে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক ভদ্রলোকের জন্য অপরিহার্য সন্দেহাতীত হয়ে থাকে। তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিয়ে থাকে তার প্রতিদানও নিজ দায়িত্বে দিয়ে দিবেন।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ـ الخ :

আয়াতের যোগসূত্র : আলোচ্য আয়াতটি ইহুদিদের হুজুরের নবুয়তের উপর আরোপিত দ্বিতীয় একটি সন্দেহের অবসান হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বলেছে, আল্লাহ পাক আমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা এমন কোনো রাসূলের বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না সে এ রকম কুরবানি নিয়ে আসবে যাকে অগ্নি খেয়ে ফেলে। আর হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সেই মুজেজা দেখাতে পারছেন না। সুতরাং এতে বুঝা যাচ্ছে আপনি নবী নন।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি কা'আব ইবনে আশরাফ, কা'আব ইবনে আসাদ, মালেক ইবনে সায়ফ, ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুদা, যায়েদ ইবনে তাবুব ও ফাখখাস ইবনে আযুরা প্রমুখ ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হুজুর ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি মনে করেন, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আপনার উপর তিনি একটি কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। অথচ আল্লাহ আমাদের সাথে তাওরাতে অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা কোনো রাসূলের প্রতি ঈমান আনবো না। যতক্ষণ না তিনি এমন কুরবানি নিয়ে আসবেন মুজিযা হিসেবে যাকে অগ্নি গ্রাস করে ফেলবে। আর তার আওয়াজ হবে কম, নাজিল হবে আকাশ থেকে। যদি আপনি আমাদের কাছে এটা নিয়ে আসতে পারেন, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান নিয়ে আসবো। অতঃপর তাদের প্রতিবাদে আয়াতটি নাজিল হয় যে, ইতঃপূর্বে তো ঈসা ও মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত অনেক নবী রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তারা তো এ রকম মুজিযা তোমাদেরকে দেখিয়েছেন, এরপরও তোমরা তাদের প্রতি ঈমান আনবে দূরের কথা তাদের অনেককে হত্যা করেছ। যেমন- হযরত জাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)। সুতরাং তোমাদের এ দাবি ভিত্তিহীন, পাশ কেটে যাওয়ার ছল-চাতুরী মাত্র।

হযরত আতা (র.) বলেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা আল্লাহর জন্য প্রাণী জবাই করে এর আতুড়ী ও পাকস্থলীর পাতল চর্বির আবরণ ও ভালো মাংসকে একটি ঘরের মাঝখানে রেখে দিত, আর ছাদ খোলা থাকত। অতঃপর নবী ঘরের মধ্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। আর বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঘরের বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকত ঘরের চতুর্পাশে। তারপর আসমান থেকে একটা সাদা আগুন অবতীর্ণ হতো। যার আওয়াজ থাকত ক্ষীণ এবং কোনো ধুয়া থাকত না তাতে। আর এ আগুনটি ঐ কুরবানির বস্তুটিকে গ্রাস করে ফেলতো।

ইহুদিদের এ দাবি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের দু'রকম মতামত পাওয়া যায়। যথা-

এক. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, এ কথা তাওরাতে ছিল বটে, তবে শর্তের সহিত যে, এই মোজেজাটা হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর হবে না।

দুই. তাদের এ দাবিটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাওরাতে এ রকম কোনো কথা ছিল না। ইহুদিদের মিথ্যা বলা ও সত্য গোপন করার কথা সুবিদিত। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১২৬]

قَوْلُهُ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ الاٰيَة : এই আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, এদের অস্বীকার করার কারণে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা নবী না মানার বিষয়টা নতুন কিছু নয়, অস্বীকার করার ব্যাপারটা পূর্বের নবীদের সাথেও হয়ে আসছে।

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ جَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ بُعِّدَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ نَالَ غَايَةَ مَطْلُوْبِهِ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا أَيِ الْعَيْشُ فِيْهَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ الْبَاطِلِ يُتَمَتَّعُ بِهِ قَلِيْلًا ثُمَّ يَفْنٰى.

١٨٦. لَتُبْلَوُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النُّوْنَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ لَتُخْتَبَرُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ بِالْفَرَائِضِ فِيْهَا وَالْجَوَائِحِ وَأَنْفُسِكُمْ بِالْعِبَادَاتِ وَالْبَلَاءِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا مِنَ الْعَرَبِ أَذًى كَثِيْرًا مِنَ السَّبِّ وَالطَّعْنِ وَالتَّشْبِيْبِ بِنِسَائِكُمْ وَإِنْ تَصْبِرُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَتَتَّقُوا اللّٰهَ فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ أَيْ مِنْ مَعْزُوْمَاتِهَا الَّتِيْ يُعْزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوْبِهَا.

١٨٧. وَ اذْكُرْ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ أَيِ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرٰىةِ لَتُبَيِّنُنَّهُ أَيِ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُوْنَهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعْلَيْنِ فَنَبَذُوْهُ طَرَحُوا الْمِيْثَاقَ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ فَلَمْ يَعْمَلُوْا بِهِ وَاشْتَرَوْا بِهِ أَخَذُوْا بَدَلَهُ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا مِنْ سَفِلَتِهِمْ بِرِيَاسَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَتَمُوْهُ خَوْفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمْ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ شِرَاؤُهُمْ هٰذَا.

অনুবাদ :

১৮৫. প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করতে হবে এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পরিপূর্ণ ফল দেওয়া হবে। তথা তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর যাকে দোজখ হতে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম হবে, তথা সে তার চূড়ান্ত অভীষ্ট পাবে। আর পার্থিব জীবন তথা পার্থিব জীবনের জীবন যাত্রা ধোঁকার ভোগ্যবস্তু ছাড়া কিছু না তথা বাতিল পণ্য ছাড়া কিছুই না, যা থেকে খুবই কম উপকৃত হওয়া যায়। অতঃপর ধ্বংস হয়ে যায়।

১৮৬. অবশ্য তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদে তার ফরজসমূহ ও বিপদ-বালা দিয়ে এবং জনসম্পদে ইবাদত ও মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। لَتُبْلَوُنَّ -এর মধ্যে পরস্পর তিনটি নূন একত্র হওয়ার কারণে রফার [পেশের] চিহ্ন নূনকে এবং দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে বহুবচনের যমীর (و) ওয়াওকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এবং তোমরা পূর্ববর্তী আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান এবং আরবের মুশরিকদের তরফ থেকে অবশ্য বহু কষ্টদায়ক কথা তথা গালিগালাজ এবং তোমাদের মহিলাদের সাথে প্রেমযুক্ত কবিতা শ্রবণ করবে। আর যদি এতে ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক তবে নিশ্চয় তা হবে সৎসাহসের কাজ, তথা ঐসব উদ্দিষ্টের অন্তর্ভুক্ত হবে যার প্রতি অভিপ্রায় করা হয় তা ওয়াজিব হওয়ার কারণে।

১৮৭. আর স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা যখন আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তাওরাতে যে, তোমরা এই কিতাবখানি মানব জাতির নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না [ফে'ল দুটির মধ্যে ي ও ت -এর সাথে] তখন তারা তাকে তথা উক্ত অঙ্গীকারকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল যে, তার উপর আমল করলো না, আর হীন মূল্যে একে বিক্রি করল। অর্থাৎ জ্ঞানে তাদের নেতৃত্ব থাকার কারণে তাদের নিম্নশ্রেণির লোকদের কাছ থেকে পার্থিব স্বল্পমূল্য তার বদলে গ্রহণ করল, এবং সেই অল্পমূল্যটুকু হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা সেই অঙ্গীকারকে তাদের উপর গোপন রাখল। অথচ তারা যা ক্রয় করল তা কতইনা নিকৃষ্ট।

http://islamiboi.wordpress.com

١٨٨. لَا تَحْسَبَنَّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا فَعَلُوْا مِنْ اِضْلَالِ النَّاسِ وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْحَقِّ وَهُمْ عَلٰى ضَلَالٍ فَلَا يَحْسَبَنَّهُمْ بِالْوَجْهَيْنِ تَاكِيْدٌ بِمَفَازَةٍ بِمَكَانٍ يَنْجُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ مَكَانٍ يُعَذَّبُوْنَ فِيْهِ وَهُوَ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِيْهَا وَمَفْعُوْلَا يَحْسَبُ الْاُوْلٰى دَلَّ عَلَيْهِمَا مَفْعُوْلَا الثَّانِيَةِ عَلٰى قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَعَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ حُذِفَ الثَّانِى فَقَطْ.

১৮৮. আপনি মনে করবেন না لَا تَحْسَبَنَّ শব্দটি تَا ও يَا যোগে যারা নিজেদের কৃতকর্মের তথা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের উপর তথা সত্য ধারণের উপর অথচ তারা গোমরাহীতে রয়েছে, প্রশংসা কামনা করে, তারা এমন স্থানে রয়েছে মনে করবেন না যে, যেখান থেকে আখিরাতে শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে; বরং তারা এমন স্থানে হবে যেখানে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে, আর তা হচ্ছে দোজখ। فَلَا تَحْسَبَنَّ তাকিদের জন্য এসেছে। তাতেও পূর্বোক্ত উভয় পদ্ধতি তথা يَا ও تَا -এর সাথে পঠিত হবে। আর তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রথম لَا تَحْسَبَنَّ -এর উভয় মাফউল উহ্য রয়েছে। যার প্রতি দ্বিতীয় لَا يَحْسَبَنَّ -এর উভয় মাফউল ইঙ্গিত বহন করে يَا যুক্ত কেরাত অনুযায়ী আর تَا যুক্ত কেরাত অনুযায়ী কেবল দ্বিতীয় মাফউল বিলুপ্ত হবে।

١٨٩. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَزَائِنُ الْمَطَرِ وَالرِّزْقِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكَافِرِيْنَ وَاِنْجَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

১৮৯. আর আল্লাহর জন্যই হলো আসমান ও জমিনের রাজত্ব অর্থাৎ বৃষ্টির খাজানা, রিজিক ও উদ্ভিদ বৃক্ষাদিসহ প্রভৃতিতে রয়েছে কেবল তাঁরই রাজত্ব। আল্লাহই সর্ববিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া ও মুমিনদেরকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টিও তাঁর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - غُرُوْر বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। ধোকা দেওয়া, প্রতারণা করা। আল্লাহ পাক এখানে দুনিয়াকে ঐ পণ্যের সহিত উপমা দিয়েছেন, যার উপর দাম-দরকারী ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে। প্রতারিত হয়ে খরিদ করার পর ঐ পণ্য নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সে অবগত হয়েছে আর সে প্রতারণা দানকারী হলো ইবলিস শয়তান। قَوْلُهُ زُحْزِحَ - زَحْزَحَةٌ বিদূরীত করা, বিতাড়িত করা থেকে مَاضِى مَجْهُوْل -এর সীগাহ, قَوْلُهُ مَفَازَةٌ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ অর্থ- مَنْجَاةٌ মুক্তি পাওয়ার স্থান। বলা হয় فَازَ فُلَانٌ اَىْ نَجَا ইমাম ফাররা বলেন, بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ অর্থ بِبُعْدٍ مِنَ الْعَذَابِ - فَوْز -এর এক অর্থ অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকাও রয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর, জামালাইন]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : এ আয়াতটি ঐ চিরন্তন বাস্তব কথাটা বলা হয়েছে যে, মৃত্যু থেকে কেউই পলায়ন করে বাঁচতে পারবে না। প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদগ্রহণ করতে হবে। দুনিয়াতে ভালো মন্দ যে যেরূপ কাজ করেছে তাকে তার ই প্রতিদান দেওয়া যাবে। অতঃপর সফলতার মাপকাঠি বলতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, সফলতা হলো মূলত এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থেকেই তাঁর প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। আর জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে গেছে। সেই প্রকৃত সফলকাম। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন ধোকার সামান, যে ব্যক্তি নিজেকে হেফাজত করে চলে গেছে সেই ভাগ্যবান। আর যে এর ধোকায় গ্রেফতার হয়ে পড়েছে সে নিস্ফল, ব্যর্থ ও মনোরথ।

قَوْلُهُ وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ . (الاية)

ঈমানদারদের পরীক্ষা : মু'মিনদেরকে তাদের ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হবে। এর আলোচনা সূরায়ে বাকারার ৫৫ নং আয়াতে চলে গেছে। আহলে কিতাব ও মুশরিকদের তরফ থেকে কষ্ট পৌছার মর্ম হলো এই যে, মুসলমানদেরকে ওদের তরফ থেকে দীনে ইসলামে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতা, ইসলামের পয়গাম্বরের অবমাননা এবং তাদের গালি-গালাজ, অভিযোগ ও অর্থহীন কথাবার্তা শুনতে হবে। তাই তোমরা তাদের মোকাবিলায় সবর ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর। এতে শত্রু ও মিত্রতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তখনও ইসলাম প্রকাশ করেনি এবং বদর যুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয়নি, এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ হযরত সা'আদ বিন উবাদাকে অসুস্থাবস্থায় দেখতে গেলেন। রাস্তায় এক মজলিসে মুশরিক, কয়েকজন ইহুদি এবং আব্দুল্লাহ বিন উবাই প্রমুখ বসা ছিল। হুজুর ﷺ-এর সওয়ার হতে যে ধুলা-বালি উড়ল এতে আব্দুল্লাহ বিন উবাই অসন্তুষ্টির প্রকাশ করল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় থেমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াতও দিলেন। এর উপর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কিছু বেয়াদবিমূলক কথাও বলে ফেলল। সেখানে কিছু মুসলমানও ছিলেন, তারা তার বিপরীত হুজুরের প্রশংসা করলেন। তাদের উভয়ের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হুজুর ﷺ তাদের সকলকে নীরব করে দিলেন। অতঃপর হযরত সাআদের নিকট তশরিফ নিয়ে গেলেন। সেখানে হুজুর ﷺ সা'আদকেও এই ঘটনাটি শুনালেন। এর উপর সা'আদ (রা.) বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এসব এজন্য করছে যে, আপনার মদিনায় তশরিফ আনার পূর্বে মদিনার লোকেরা তাকে নেতা মানতো। আপনি আসার পর তার সেই নেতৃত্বের স্বপ্ন স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে, যার ফলে তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার এসব কথা তার অন্তরে পোষিত সে বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং আপনি ক্ষমার সাথে কাজ গ্রহণ করুন!

قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ - الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অঙ্গীকার তিনি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা তাওরাত কিতাবের শিক্ষার প্রচার প্রসার করবে। তাকে গোপন করে রাখবেনা। কিন্তু তারা তাওরাত পিছনে নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ এর উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে। আর হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর যে গুণাবলি তাওরাতে এসেছে তা গোপন করে রেখেছে। আর এই গোপন করে রাখার বিনিময়ে তুচ্ছ বদল তথা কিছু পানাহারের দ্রব্য ও ঘুষ গ্রহণ করেছে। বস্তুত তারা সত্য গোপন করে রাখার বিনিময়ে যা নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে তা খুবই নিকৃষ্ট।

- হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আল্লাহ পাক ওলামাদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, যারা যা কিছু জানবে তা অন্যের কাছে গোপন করে রাখবে না। জ্ঞানের কথা গোপন করে রাখা ধ্বংসের কারণ।
- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের কাছে যা কিছু বর্ণনা করবো তা গোপন করবে না। অতঃপর হুজুর ﷺ وَإِذْ أَخَذَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الخ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।
- হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কারো কাছে এমন ইলমের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় যা সে জানে, আর সে একে গোপন রাখল তবে তার মুখে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।

-[মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকিম; জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৭৬-৭৭. তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৪৮ -৪৯]

http://islamiboi.wordpress.com

১৯০. إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالْمَجِيْئِ وَالذَّهَابِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِّاُولِى الْاَلْبَابِ لِذَوِى الْعُقُوْلِ۔

অনুবাদ :

১৯০. নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং এর মধ্যে যা কিছু বিস্ময়কর বস্তুসমূহ রয়েছে তার সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন ও রাত্রির আসা-যাওয়া, বৃদ্ধি ও হ্রাসের মধ্যে পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য আল্লাহর কুদরতের উপর প্রমাণ বহনকারী বহু নিদর্শন রয়েছে।

১৯১. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ لِمَا قَبْلَهٗ اَوْ بَدَلٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ مُضْطَجِعِيْنَ اَىْ فِىْ كُلِّ حَالٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُصَلُّوْنَ كَذٰلِكَ حَسْبَ الطَّاقَةِ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَسْتَدِلُّوْا بِهٖ عَلٰى قُدْرَةِ صَانِعِهِمَا يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا الْخَلْقَ الَّذِىْ نَرَاهُ بَاطِلًا ۔ حَالٌ عَبَثًا بَلْ دَلِيْلًا عَلٰى كَمَالِ قُدْرَتِكَ سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ الْعَبَثِ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۔

১৯১. اَلَّذِيْنَ পূর্বোক্ত اُولِى الْاَلْبَابِ থেকে সিফত হয়েছে অথবা বদল। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যারা উল্লিখিতাবস্থায় সামার্থ্যানুযায়ী নামাজ পড়ে এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে, যাতে করে তারা এর মাধ্যমে আসমান ও জমিন স্রষ্টার শক্তির উপর প্রমাণ পেশ করতে পারে। আর এই চিন্তা গবেষণার ফলাফল হিসেবে তাঁরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এসব সৃষ্টবস্তু যা আমরা দেখছি তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি; বরং এসব তোমার পরিপূর্ণ শক্তির প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টি করেছ। সকল অনর্থক কাজ থেকে তুমি পবিত্র। আমাদেরকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

১৯২. رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ لِلْخُلُوْدِ فِيْهَا فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ اَهَنْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اِشْعَارًا بِتَخْصِيْصِ الْخِزْىِ بِهِمْ مِنْ زَائِدَةٌ اَنْصَارٍ اَعْوَانٍ يَمْنَعُوْنَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ۔

১৯২. হে আমাদের পালনকর্তা তুমি যাকে চিরদিনের জন্য দোজখে দাখিল কর, তাকে নিশ্চয় অপমান করেছ, আর জালেমদের তথা কাফেরদের জন্য তো কোনো সাহায্যকারী নেই। যারা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। এখানে যমীরের ক্ষেত্রে ইসমে জাহির ব্যবহার করে অপমান তাদের জন্য খাছ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

١٩٣. رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي يَدْعُو النَّاسَ لِلْإِيْمَانِ أَيْ إِلَيْهِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ أَوِ الْقُرْآنُ أَنْ أَيْ بِأَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا بِهِ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ غَطِّ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا فَلَا تُظْهِرْهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا وَتَوَفَّنَا اِقْبِضْ أَرْوَاحَنَا مَعَ فِيْ جُمْلَةِ الْأَبْرَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ -

১৯৩. হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে লোকদের আহ্বান করতে শুনেছি আর সেই আহ্বানকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ বা পবিত্র কুরআন। তিনি বলেছিলেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ফলে আমরা বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহসমূহ মাফ কর এবং আমাদের দোষত্রুটি দূর করে দাও তথা ঢেকে নাও! সুতরাং এসবের উপর শাস্তি প্রদান করে আমাদের সামনে প্রকাশ করো না। আর নেককারদের দলের সাথে তথা নবীগণ ও পুণ্যবানদের সাথে আমাদের মৃত্যুদান কর তথা প্রাণসমূহ কবজ কর।

١٩٤. رَبَّنَا وَآتِنَا أَعْطِنَا مَا وَعَدْتَّنَا بِهِ عَلٰى أَلْسِنَةِ رُسُلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْفَضْلِ وَسُؤَالُهُمْ ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ وَعْدُهُ تَعَالٰى لَا يُخْلَفُ سُؤَالٌ أَنْ يَجْعَلَهُمْ مِنْ مُسْتَحِقِّيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَيَقَّنُوْا اِسْتِحْقَاقَهُمْ لَهُ وَتَكْرِيْرُ رَبَّنَا مُبَالَغَةٌ فِي التَّضَرُّعِ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ الْوَعْدَ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ -

১৯৪. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার রাসূলগণের জবানে দয়া ও কৃপার যে ওয়াদা তুমি আমাদের করেছ তা আমাদেরকে দান কর! আল্লাহর ওয়াদা যদিও লজ্ঘিত হয় না, তারপরও তাদের সেই সুওয়ালটি এই জন্য যে, যাতে তিনি তাদেরকে উল্লিখিত বিষয়ের উপযুক্ত বানিয়ে দেন। কারণ তারা নিজেদেরকে এ ওয়াদার উপযুক্ত বলে ইয়াকীন করতে পারেনি। আর বারংবার (رَبَّنَا) হে আমাদের প্রতিপালক! বাক্যটি অনুনয়-বিনয়ের আধিক্য বুঝাবার স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি পুনরুত্থান ও প্রতিদানের ওয়াদার খেলাফ কর না।

তাহকীক ও তারকীব

فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ - إِنَّ খবরে - إِنَّ - لَاٰيٰتٍ ইসমে - الَّذِيْنَ الخ - أُولِي الْأَلْبَابِ এর সিফত বা বদল অথবা বয়ান। قِيَامًا ও قُعُوْدًا হাল হয়েছে يَذْكُرُوْنَ-এর যমীরে ফায়েল থেকে عَلٰى جُنُوْبِهِمْ -ও উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে হাল হয়েছে। অর্থাৎ مُضْطَجِعِيْنَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ বা كَائِنِيْنَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ - يَتَفَكَّرُوْنَ মা'তুফ হয়েছে يَذْكُرُوْنَ-এর উপর। بَاطِلًا - مَا خَلَقْتَ ফে'লের মাফউলে লাহু হয়েছে অথবা তা থেকে হাল হয়েছে। سُبْحَانَكَ উহ্য ফে'ল أُسَبِّحُ -এর মাফউলে মুতলাক। سُبْحَانَكَ তার পূর্বাপর বাক্যদ্বয়ের মধ্যে জুমলায়ে মু'তারিজা হিসেবে অবস্থিত হয়েছে। بَاطِل-এর অর্থ এখানে অনর্থক, অর্থহীন, বেকার।

قَوْلُهُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ : مِنْ أَنْصَارٍ-এর মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত তাকিদের জন্য এসেছে। مِنْ أَنْصَارٍ পরে উক্ত মুবতাদা (مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ) ও الظّٰلِمِيْنَ পূর্বোক্ত খবর (خَبَرٌ مُقَدَّمٌ)

قَوْلُهُ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ : মাওসূফ সিফত মিলে উহ্য মুবতাদা تَقَلُّبُهُمْ-এর খবর হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : মক্কার কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আল্লাহ যে এক তার উপর একটি প্রমাণ আমাদেরকে দেখাও। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ পাক إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ আয়াতটি নাজিল করলেন।
–[হাশিয়াতুস সাবী খ. ১, পৃ. ১৯৬]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললাম, হুজুর ﷺ থেকে প্রকাশিত অধিক আশ্চর্যজনক কোনো বিষয়ের ব্যাপারে আমাকে সংবাদ দেন। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদলেন অতঃপর বললেন, কি বলব? তাঁর তো প্রতিটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক। তবে একটির কথা বলছি শুন। তিনি এক রাতে আমার কাছে আসলেন এবং লেপের নীচে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর আমাকে বললেন, হে আয়েশা! যদি তুমি অনুমতি দাও তবে আমি আমার প্রতিপালকের কিছু ইবাদত করে আসি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আপনার সান্নিধ্যকেও ভালোবাসী এবং আপনার উদ্দেশ্য সাধন হওয়াকেও ভালোবাসি। আমি আপনাকে অবশ্যই অনুমতি দিলাম যেতে পারেন। অতঃপর তিনি ঘরে রাখা একটি মুশকের দিকে গিয়ে খুবই স্বল্প পানি দ্বারা অজু করলেন। তারপর নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করে ক্রন্দন করতে শুরু করে দেন, অতঃপর উচ্চ কণ্ঠে ক্রন্দন করতে থাকেন। তারপর নামাজ শেষ করে উভয় হাত উঠিয়ে দোয়াতে খুবই ক্রন্দন করলেন, এমনকি ক্রন্দনের কারণে চোখের পানিতে জমিন ভিজে গেছে। এমতাবস্থায় হযরত বেলাল (রা.) ফজরের নামাজের আজান দিতে এসে দেখেন হুজুর ﷺ ক্রন্দন করছেন। হযরত বেলাল (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি ক্রন্দন করছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তদুত্তরে হুজুর ﷺ বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হব না? অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, কেন আমি ক্রন্দন করবো না, অথচ আল্লাহ পাক আজ রাতে إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ আয়াতটি নাজিল করেছেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন, সেই ব্যক্তির ধ্বংস হোক, যে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করল অথচ তার ফিকির করল না।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন মেসওয়াক করতেন। অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ

হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেছেন تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ অর্থাৎ এক প্রহরের চিন্তা, ফিকির গোটা রাত্রির ইবাদত অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক উপকারী। –[তাফসীরে কাবীর – ৫/১৩৯ ও মা'আরিফুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আসমান-জমিন তথা আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে চিন্তা ফিকির ও গবেষণা করার প্রতি উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ তাতে রয়েছে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের নিদর্শনাবলি। আর সেই নিদর্শনাবলির মাধ্যমে লোকেরা তাদের প্রভুর পরিচয় লাভ করতে পারবে যা হচ্ছে মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

আসমান ও জমিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য : خَلْق মাসদার। এর অর্থ হলো সৃষ্টি ও নতুন আবিষ্কার। উদ্দেশ্য হলো এই যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলি রয়েছে। এসব নিদর্শন দ্বারা যে কোনো হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। শর্ত হলো তার আল্লাহ থেকে গাফেল না হওয়া, সৃষ্টি জগতের নিদর্শনগুলোকে চতুষ্পদ প্রাণীদের ন্যায় না দেখা বরং চিন্তাফিকির ও গবেষণার দৃষ্টিতে দেখা। যখন সে সৃষ্টি জগতের নেজামের মধ্যে চিন্তা ফিকির করে এবং আল্লাহ কুদরতের নিদর্শনাবলিকে প্রত্যক্ষ করে তখন এ বাস্তবতা তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, এটা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞ জনোচিত একটা ব্যবস্থাপনা। তখন সে বলে উঠে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

আর এ কথাও তার সামনে ভেসে উঠে, যে সৃষ্টিকে আল্লাহর চরিত্রের অনুভূতি দান করেছেন, যাদেরকে স্বাধীন হস্তক্ষেপের অধিকার দিয়েছেন, যাদেরকে বিবেক–বুদ্ধি দান করেছেন, ভালো মন্দ পার্থক্যের ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদেরকে যে দুনিয়ার জীবনের আমলের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং তাদেরকে নেকের উপর পুরস্কার ও পাপের শাস্তি যে প্রদান করা হবে না, তা হতেই পারে না। এরূপ বিশ্বজগতের নেজাম তথা পরিচালনার নীতিমালার উপর চিন্তা ভাবনা করলে তাদের অবশ্যই আখিরাতের ইয়াকীন অর্জন হয়ে যায়। আর আল্লাহর আজাব তথা শাস্তি থেকে পানাহ চাইতে শুরু করে বলতে থাকে سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি অবশ্যই সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র, সুতরাং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

তেমনিভাবে এই নিদর্শনাবলি প্রত্যেক্ষ করার কারণে তাদের অন্তর আত্মা এ কথার উপর শান্ত হয়ে পড়ে যে, পয়গাম্বর ﷺ এ বিশ্বজাহান ও তার শুরু এবং শেষ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন এবং জীবন পরিচালনার জন্য যে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সত্য। আর অন্তরের জবানে বলতে লাগে– رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

তাদের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, আল্লাহ তার ওয়াদাসমূহ পূরণ করবেন কিনা? তবে তাদের সন্দেহ এ ব্যাপারে ছিল যে, এই ওয়াদাসমূহের উপযুক্ত আমরাও হতে পারবো কিনা!

এই জন্য তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে যে, আমাদেরকে এসব ওয়াদার উপযুক্ত বানিয়ে দিন। এ রকম যেন না হয় যে, আমরা তো দুনিয়াতেও পয়গাম্বরের উপর ঈমান এনে কাফেরদের উপহাস ও গালি–গালাজের পাত্র হয়ে রইলাম। আর কিয়ামতের দিনও এসব কাফেরদের সামনে আমরা লাঞ্ছিত হবো।

http://islamiboi.wordpress.com

১৯৫. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دُعَاءَهُمْ أَنِّي أَيْ بِأَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ كَائِنٌ مِنْ بَعْضٍ أَيِ الذُّكُوْرُ مِنَ الْإِنَاثِ وَبِالْعَكْسِ وَالْجُمْلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا أَيْ هُمْ سَوَاءٌ فِي الْمُجَازَاةِ بِالْأَعْمَالِ وَتَرْكِ تَضْيِيْعِهَا نَزَلَتْ لَمَّا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا أَسْمَعُ اللّٰهَ ذِكْرَ النِّسَاءِ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ دِيْنِيْ وَقَاتَلُوْا الْكُفَّارَ وَقُتِلُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَقْدِيْمِهِ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ أَسْتُرُهَا بِالْمَغْفِرَةِ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ثَوَابًا مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى لَأُكَفِّرَنَّ مُؤَكِّدٌ لَهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ التَّكَلُّمِ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ الْجَزَاءِ .

১৯৬. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ أَعْدَاءُ اللّٰهِ فِيْمَا نَرَى مِنَ الْخَيْرِ وَنَحْنُ فِي الْجَهْدِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تَصَرُّفُهُمْ فِي الْبِلَادِ بِالتِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ .

অনুবাদ :

১৯৫. অতঃপর তাদের প্রতিপালক কবুল করে নিলেন তাদের দোয়া এই বলে যে আমি তোমাদের পুরুষ ও নারীর মধ্য থেকে কোনো আমলকারীর আমল বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অন্যের অংশ তথা পুরুষ মহিলার অংশ আর মহিলা পুরুষের অংশ। (لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ) বাক্যটি জুমলায়ে মু'তারিযা বা পূর্বাপর বাক্যের সাথে সম্পর্কহীন বাক্য যা পূর্বের কথার তাকিদ হিসেবে এসেছে। অর্থাৎ আমলের প্রতিদান ও তা বিনষ্ট না করার ক্ষেত্রে তারা নারী পুরুষ সকলেই সমান [فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا থেকে وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ] পর্যন্ত তখন নাজিল হয়েছে। যখন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! হিজরতের কোনো বিষয়ে আল্লাহকে মহিলাদের কথা উল্লেখ করতে আমি শুনছি না। যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছে এবং তাদেরকে নিজের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আর আমারই দীনের পথে অত্যাচারিত হয়েছেও কাফেরদের সাথে জিহাদ করেছে এবং নিহত হয়েছে। (قُتِلُوْا) -এর تَ বর্ণের তাখফীফ [সহজতা] ও তাশদীদের সাথে আরেক কেরাত قُتِلُوْا শব্দটি قُتِلُوْا-এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্যই আমি তাদের দোষত্রুটি দূরীভূত করে দেব, তথা ক্ষমা দ্বারা ঢেকে নেব। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে কর্মফল স্বরূপ ঐ বেহেশতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে বহু নহর প্রবাহিত। ثَوَابًا শব্দটি لَأُكَفِّرَنَّ ক্রিয়ার অর্থ থেকে মাফউলে মুতলাক, যা তাকিদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে বিনিময় এতে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের দিকে ইলতেফাত হয়েছে। বা বাচনভঙ্গির রূপ পরিবর্তন করা হয়েছে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম ছওয়াব প্রতিদান।

১৯৬. মুসলমনরা যখন বলল, আল্লাহর দুশমনদেরকে আমরা ভালো অবস্থায় দেখছি অথচ আমরা মুসলমান হওয়ার পরও কষ্টের মধ্যে আছি, তখন সামনের আয়াতটি নাজিল হয়েছে। নগরীতে কাফেরদের ব্যবসা ও উপার্জনের চালচলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়।

http://islamiboi.wordpress.com

١٩٧. هُوَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ يَتَمَتَّعُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا يَسِيرًا وَ يَفْنٰى ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ـ وَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِيَ ـ

১৯৭. এটা হলো সামান্য ফায়দা যা থেকে তারা দুনিয়াতে ফায়দা গ্রহণ করছে অতঃপর তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। আর এটা খুবই নিকৃষ্ট বিছানা।

١٩٨. لٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِينَ اَيْ مُقَدَّرِينَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا نُزُلًا هُوَ مَا يُعَدُّ لِلضَّيْفِ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ جَنّٰتٍ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الظَّرْفِ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا ـ

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ, তাতে তাঁরা চিরদিন থাকবে। তথা চিরদিন থাকাটা তাদের জন্য সাব্যস্ত করা হয়ে গেছে। তাতে আল্লাহর তরফ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। মেহমানদের জন্য যা কিছু প্রস্তুত করা হয় তাকে نُزُل বলে। نُزُلًا শব্দটি جَنّٰتٍ থেকে حَال হয়েছে। তাতে আমেল হলো যরফের অর্থ তথা ثَبَتَ لَهُمْ । আর নেককারদের জন্য আল্লাহর নিকট যা কিছু ছওয়াব রয়েছে তা একান্তই উত্তম দুনিয়ার সামগ্রী থেকে।

١٩٩. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ وَالنَّجَاشِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ اَيِ الْقُرْاٰنِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ اَيِ التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ خٰشِعِيْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُؤْمِنُ مُرَاعِيْ فِيْهِ مَعْنٰى مَنْ اَيْ مُتَوَاضِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الَّتِيْ عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ مِنْ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا بِاَنْ يَكْتُمُوْهَا خَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ كَفِعْلِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْيَهُوْدِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ثَوَابُ اَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُؤْتَوْنَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا فِي الْقَصَصِ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ فِيْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا ـ

১৯৯. আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তার সাথিরা এবং নাজ্জাশী, আর যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় কুরআন এবং যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তথা তাওরাত ও ইঞ্জিল -এর উপর। আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে। (خَاشِعِيْنَ) শব্দটি يُؤْمِنُ ফে'লের যমীর থেকে حَال হয়েছে, বহুবচন আনার ক্ষেত্রে لَمَنْ -এর মধ্যে উল্লিখিত مَنْ শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর আল্লাহর আয়াতসমূহকে যা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবী করীম ﷺ -এর গুণাবলি থেকে রয়েছে তাকে দুনিয়ার স্বল্পমূল্যে বিক্রি করো না। অর্থাৎ তারা গোপন রাখে না তাঁর গুণাবলিকে তাদের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায়, যেরূপ তারা ব্যতীত অন্যান্য ইহুদিরা তা করত। তারাই হলো সেসব লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তথা আমলের ছওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট তাদেরকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে,. যেরূপ সূরা কাসাসে বলা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। তিনি সমগ্র মাখলুকের হিসাব নিয়ে নিবেন দুনিয়ার অর্ধদিন পরিমাণ সময়ের মধ্যে।

http://islamiboi.wordpress.com

২০০. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمَصَائِبِ عَنِ الْمَعَاصِيْ وَصَابِرُوْا الْكُفَّارَ فَلَا يَكُوْنُوْا اَشَدُّ صَبْرًا مِنْكُمْ وَرَابِطُوْا اَقِيْمُوْا عَلَى الْجِهَادِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ بِالْجَنَّةِ وَتَنْجُوْنَ مِنَ النَّارِ .

২০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্যে, বিপদাপদে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপর ধৈর্যধারণ কর এবং কাফেরদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তারা যেন তোমাদের চেয়ে অধিক দৃঢ়তা অবলম্বনকারী হতে পারে। আর জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাক এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে থাক। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। জান্নাত লাভে সফল হবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

তাহকীক ও তারকীব

نُزُلًا পূর্বোক্ত جَنّٰتٌ থেকে হাল হয়েছে। نُزُل বলা হয় ঐ খাবারকে যা অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اصْبِرُوْا - صَبْر -এর শাব্দিক অর্থ হলো, বিরত রাখা ও বাঁধা। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ হলো নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা।

مُصَابَرَة বাবে মুফা'আলার মাসদার। صَبْر থেকেই নির্গত। এর অর্থ হলো– শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

صَبْر ও مُصَابَرَة -এর পার্থক্য : মানুষের আস্থা দু'রকম, **এক.** যা তার একা নিজের সাথে সম্পৃক্ত। **দুই.** যা তার এবং অন্যের মধ্যে যৌথ। প্রথমটিতে সবরের প্রয়োজন হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টিতে প্রয়োজন মুসাবারার। আর مُرَابَطَة -এর অর্থ হলো ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাজত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকাকেই রেবাত বা মোরাবাত বলা হয়।

–[তাফসীরে হক্কানী, তাফসীরে কাবীর, হাশিয়াতুস সাবী ও মা'আরিফুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ : এদের দোয়া ও দরখাস্তের জবাবে আল্লাহপাক ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদের কারো আমল নষ্ট করবো না। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা। একথা বলার কারণ হলো এই যে, ইসলাম বিভিন্ন বিষয়ে জন্মগত কিছু গুণের ব্যবধানের কারণে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করেছে। যেমন কর্তৃত্ব ও শাসক হওয়ার ক্ষেত্রে, রুজি রোজগারের ব্যাপারে, জিহাদে অংশ গ্রহণের বেলায় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে অর্ধেক অংশ-পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। এরকম মোটেই করা হবে না; বরং প্রত্যেক নেক কাজের ছওয়াব একজন পুরুষ করলে যেরূপ পাবে তেমনিভাবে ঐ কাজটি কোনো মহিলা করলে সেও পুরুষের সমানই পাবে। –[তাফসীরে কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ الخ : এই আয়াতের মধ্যে সম্বোধন যদিও রাসূল ﷺ -কে করা হয়েছে বটে; কিন্তু উদ্দেশ্য পুরা উম্মত। কারণ তাঁর তো কাফেরদের যে কোনো কাজ দ্বারা প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। সুতরাং অর্থ হবে – لَا يَغُرَّنَّكَ اَيُّهَا السَّامِعُ –[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৫৮, ও হাশিয়ায়ে জামাল খ. ১, পৃ. ৩৪৯]

http://islamiboi.wordpress.com

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন যে, পৌত্তলিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে আনন্দ উল্লাসে থাকতো। তাদের এই অবস্থা দেখে কোনো কোনো মুসলমানের মনে এই ভাবনা আসল যে, এই পৌত্তলিকরা আল্লাহর দুশমন হওয়া সত্ত্বেও এত স্বচ্ছল অবস্থায় এত আনন্দ উল্লাসে জীবনযাপন করে, অথচ আমরা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও এত অভাব-অনটনের কষ্টে কালযাপন করি। তখন এই আয়াতটি মুমিনদেরকে সান্ত্বনা ও ধৈর্যধারণ করার উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৬৩, কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৯]

قَوْلُهُ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ الخ : আলোচ্য আয়াতে ঐসব আহলে কিতাবের আলোচনা করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান এনে ধন্য হয়েছিল। তাদের ঈমান ও ঈমানী গুণাবলি উল্লেখ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্যান্য আহলে কিতাবদের থেকে পার্থক্য করে দিয়েছেন। যারা সর্বদা ইসলাম মুসলমান ও নবীর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত থাকতো। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লেগেই থাকতো এবং আসমানি কিতাবের তাওরাত ইঞ্জিলের বিকৃতি ঘটাতো।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইমাম নাসায়ী হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনা এবং ইবনে জারীর হযরত জাবের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর আসে তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন,তার উপর তোমরা জানাজার নামাজ পড়। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি একজন হাবশী গোলামের উপর নামাজ পড়বো? তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-ও বলেছেন এই আয়াতটি নাজ্জাশী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

হযরত আতা (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে ৪০ জন্য নাজরানবাসী সম্পর্কে। যাদের ৩২ জন ছিল আবিসিনিয়ার অধিবাসী। আর ৮ জন ছিল রোমের অধিবাসী। এরা ইতঃপূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী ছিলেন। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তার সাথিদের সম্পর্কে। আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে সে সমস্ত আহলে কিতাবদের সম্পর্কে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর উপর বিশ্বাস করেছিল। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৬৫-৬৬]

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا الخ : এ আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের সর্বশেষ আয়াত। মুসলমানদের জন্য এতে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের নসিহত করা হয়েছে। সমগ্র সূরার সারমর্ম যেন এ আয়াতটিতেই অতি সংক্ষেপে বিবৃত হয়ে গেছে। এতে প্রথমত সবরের নসিহত করা হয়েছে।

ছবরের অর্থ ও প্রকারভেদ : সবরের অর্থ শব্দ বিশ্লেষণে বর্ণনা করা হয়েছে। সবর চার প্রকার।

১. তাওহীদ, ইনসাফ, নবুয়ত ও আখিরাত পরিচয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির গবেষণা ও প্রমাণাদি পেশ করার কষ্টের উপর সবর বা ধৈর্যধারণ করা এবং ইসলাম বিরোধীদের আরোপিত অভিযোগ ও সন্দেহের জবাব বের করার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা।

২. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব বিষয়াদি পালন করার কষ্টের উপর সবর করা, যাকে 'সবর আলাত্তাআত' বলা হয়।

৩. নিষিদ্ধ ও শরিয়ত গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকার কষ্টের উপর সবর করা। যাকে 'সবরে আনিল মা'সিয়্যাত' বলা হয়।

৪. অসুস্থতা, দরিদ্রতা, দুর্ভিক্ষ ও ভয়-ভীতি প্রভৃতি দুনিয়ার বিপদাপদ ও বালা মসিবতের কষ্টে ধৈর্য-ধারণ করা, যাকে 'সবর আলাল মাসায়েব' বলা হয়।

اِصْبِرُوْا তোমরা সবর কর। এ নির্দেশের মধ্যে উল্লিখিত সকল প্রকার সবরই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আর মুসাবারার অর্থ হলো, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা।

মুরাবাতার অর্থ : মুরাবাতার ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদগণের দুটি উক্তি রয়েছে। যথা-

১. মুজাহিদগণের ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত হেফাজতে সুসজ্জিত থাকা যাতে শত্রুরা ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

আল্লাহ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একদিন ও একরাত আল্লাহর রাস্তায় তথা যুদ্ধে পাহারাদারী করবে সে এক মাস নামাজ ও এক মাস রোজা রাখার সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে।

২. মুরাবাতার দ্বিতীয় অর্থ হলো, জামাতের সাথে এক নামাজ আদায় করার পর দ্বিতীয় নামাজের অপেক্ষায় থাকা।

এই আয়াতের সর্বশেষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকওয়ার, যা এ সমুদয় কাজের প্রাণ এবং আমল কবুল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। শরিয়তের যাবতীয় হুকুম আহকামের ক্ষেত্রেই এ সমস্ত বিষয় প্রযোজ্য।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৬১ ও মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এসব আহকামের উপর আমল করার পুরোপুরী তৌফিক দান করুন। আমীন!

http://islamiboi.wordpress.com

سُوْرَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা নিসা মদিনায় অবতীর্ণ

مِائَةٌ وَّخَمْسٌ اَوْ سِتٌّ اَوْ سَبْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً

এতে ১৭৫ বা ১৭৬ মতান্তরে ১৭৭ টি আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ
اَىْ عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ
مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ اٰدَمَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
حَوَّاءَ بِالْمَدِّ مِنْ ضِلْعٍ مِنْ اَضْلَاعِهِ
الْيُسْرٰى وَبَثَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ مِنْهُمَا مِنْ اٰدَمَ
وَحَوَّاءَ رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً كَثِيْرَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ
التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى السِّيْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ
بِالتَّخْفِيْفِ بِحَذْفِهَا اَىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهِ
فِيْمَا بَيْنَكُمْ حَيْثُ يَقُوْلُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
اَسْأَلُكَ بِاللّٰهِ وَاَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ وَ **اتَّقُوا**
الْاَرْحَامَ اَنْ تَقْطَعُوْهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ **بِالْجَرِّ**
عَطْفًا عَلَى الضَّمِيْرِ فِىْ بِهِ **وَكَانُوْا**
يَتَنَاشَدُوْنَ بِالرَّحِمِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ **عَلَيْكُمْ**
رَقِيْبًا حَافِظًا لِاَعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيْكُمْ
بِهَا اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

অনুবাদ :

১. হে মানবমণ্ডলী তথা মক্কাবাসী। তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে তথা আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকেই তাঁর সঙ্গিনীও সৃষ্টি করেছেন। তথা হাওয়া (আ.) কে তাঁর বাম পাঁজরের বক্রতম হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করেছেন। حَوَّاء শব্দটি মদের সাথে। আর বিস্তার করেছেন তাঁদের উভয় তথা আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর ভয় কর সেই আল্লাহকে যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থী হও। تَسَاءَلُوْنَ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে– ১. দ্বিতীয় تَاء -কে সীন দ্বারা পরিবর্তন করে প্রথম সীনকে দ্বিতীয় সীনের মধ্যে ইদগাম বা সন্ধি করা অর্থাৎ تَسَّاءَلُوْنَ ২. দ্বিতীয় تَاء কে বিলুপ্ত করে তথা تَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ যার পদ্ধতি হলো এই যে, তোমরা একে অপরকে বল যে, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করছি বা তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ দিচ্ছি। আর আত্মীয়তা সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বেঁচে থাক। اَلْاَرْحَامَ -এর এক কেরাত যেরের সাথে بِهٖ -এর যমীরের উপর আতফ করে। আর আরববাসীগণ পরস্পরে একে অন্যকে আত্মীয়তা সম্পর্কেও শপথ দিত। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের যাবতীয় আমল সংরক্ষণ করে রাখেন, সুতরাং তিনি এর প্রতিদান তোমাদেরকে দেবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ সংরক্ষণ গুণে সর্বদাই গুণান্বিত।

http://islamiboi.wordpress.com

٢. وَنَزَلَ فِيْ يَتِيْمٍ طَلَبَ مِنْ وَلِيِّهِ مَالَهُ فَمَنَعَهُ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى الصِّغَارَ الْاُلٰى لَا اَبَ لَهُمْ اَمْوَالَهُمْ اِذَا بَلَغُوْا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ الْحَرَامَ بِالطَّيِّبِ الْحَلَالِ اَيْ تَأْخُذُوْهُ بَدَلَهُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ مِنْ اَخْذِ الْجَيِّدِ مِنْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَجَعْلَ الرَّدِيْئِ مِنْ مَالِكُمْ مَكَانَهُ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ مَضْمُوْمَةً اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ اَيْ اَكْلَهَا كَانَ حُوْبًا ذَنْبًا كَبِيْرًا عَظِيْمًا .

২. সামনের আয়াতটি একজন এতিম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যে তার অলীর কাছে তার মাল চাওয়ার পর সে দিতে অস্বীকার করেছিল। আর এতিমদেরকে তথা ঐ সকল ছোট ছেলেমেয়েদেরকে যাদের পিতা নেই, তাদের ধনসম্পদ দিয়ে দাও যখন তারা সাবালক হয়ে যায়। আর নিকৃষ্ট সম্পদের তথা হারামের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ তথা হালাল বদল করো না তথা গ্রহণ করো না। যেরূপ তোমরা এতিমের উৎকৃষ্ট মাল নিয়ে তার জায়গায় তোমাদের নিকৃষ্ট মাল রেখে দিয়ে থাক। আর তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে সংমিশ্রিত করে গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই এটা তথা তাদের সম্পদ গ্রাস করা মহাপাপ।

٣. وَلَمَّا نَزَلَتْ تَحَرَّجُوْا مِنْ وَلَايَةِ الْيَتٰمٰى وَكَانَ فِيْهِمْ مَنْ تَحْتَهُ الْعَشْرُ اَوِ الثَّمَانُ مِنَ الْاَزْوَاجِ فَلَا يَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فَنَزَلَتْ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا تَعْدِلُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَتَحَرَّجْتُمْ مِنْ اَمْرِهِمْ فَخَافُوْا اَيْضًا اَلَّا تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ اِذَا نَكَحْتُمُوْهُنَّ فَانْكِحُوْا تَزَوَّجُوْا مَا بِمَعْنٰى مَنْ طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ اَيْ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَاَرْبَعًا اَرْبَعًا وَلَا تَزِيْدُوْا عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فِيْهِنَّ بِالنَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ فَوَاحِدَةً اَنْكِحُوْهَا اَوْ اِقْتَصِرُوْا عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْاِمَاءِ اِذْ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْحُقُوْقِ مَا لِلزَّوْجَاتِ ذٰلِكَ اَيْ نِكَاحُ الْاَرْبَعِ فَقَطْ اَوِ الْوَاحِدَةِ وَالتَّسَرِّيْ اَدْنٰى اَقْرَبُ اِلٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا تَجُوْرُوْا .

৩. আলোচ্য আয়াতটি যখন নাজিল হলো তখন লোকেরা এতিমদের দায়িত্ব গ্রহণে জটিলতায় পড়ে গেল। অথচ তখন তাদের মধ্যে কারো অধীনে দশজন কারো আটজন স্ত্রী ছিল, যাদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করে চলতে পারছিল না। [তাদের সেই জটিলতার নিরসন কল্পে] সামনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, আর তোমরা তাদের ব্যাপারে গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও এবং এই এতিম মেয়েদেরকে বিয়ে করার অবস্থায়ও ইনসাফ না করার আশঙ্কা বোধ কর, তবে এতিম মেয়েরা ছাড়া অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করে নাও যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে দুই দুই, তিন তিন কিংবা চার চারটি করে, এর ঊর্ধ্বে যাবে না। তবে যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তাদের মধ্যেও ভরণপোষণ ও বারীর ক্ষেত্রে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজনকে বিয়ে কর। অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত বাঁদিতেই ক্ষান্ত থাক। কেননা বাঁদিদের ঐ অধিকার থাকে না যা স্ত্রীদের জন্য হয়ে থাকে। এতেই তথা চারজনের সঙ্গে বিয়ে বা একজনের সঙ্গে অথবা দাসীর উপর ক্ষান্ত থাকাতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভবনা।

http://islamiboi.wordpress.com

٤. وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ جَمْعُ صَدُقَةٍ مُهُوْرَهُنَّ نِحْلَةً مَصْدَرٌ عَطِيَّةً عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ اَيْ اِنْ طَابَتْ اَنْفُسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْنَهُ لَكُمْ فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا طَيِّبًا مَّرِيْئًا مَحْمُوْدَ الْعَاقِبَةِ لَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَيْكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ نَزَلَ رَدًّا عَلٰى مَنْ كَرِهَ ذٰلِكَ.

৪. আর তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্ট চিত্তে। صَدُقَاتٌ - صَدُقَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- মোহর। نِحْلَةً অর্থ- সন্তুষ্ট চিত্তে দান করা। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয় نَفْسًا শব্দটি ফায়েল থেকে পরিবর্তিত হয়ে তামঈয হয়েছে। বাক্যের আসল রূপ ছিল- طَابَتْ اَنْفُسُهُنَّ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْنَهُ لَكُمْ তবে তা তোমরা সানন্দে ভোগ করতে পার। অর্থাৎ তা খাওয়ার মধ্যে আখেরাতে তোমাদের জন্য কোনো ক্ষতি নেই। এ আয়াতটি তাদের ধারণা খণ্ডনের জন্য নাজিল হয়েছে যারা একে অপছন্দ মনে করত।

তাহকীক ও তারকীব

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ বলে কেবল মক্কাবাসীদেরই সম্বোধন করা হয়নি, যেরূপ গ্রন্থকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতানুসারে বলেছেন। বরং তারাসহ কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল মানুষই এর পরোক্ষ সম্বোধিত। কেননা তাকওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে আল্লাহ একই সত্তা তথা হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর থেকে সৃষ্ট হওয়ার মধ্যে তো সকল মানুষই শামিল। তাই এ সম্বোধনটিও সকলের জন্য ব্যাপক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, প্রসিদ্ধ কায়দা অনুযায়ী মক্কী আয়াতে يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ বলে আর মদনী আয়াতে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। অথচ সূরা নিসা পূর্ণটাই মদনী হওয়া সত্ত্বেও يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ বলে সম্বোধনের কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় যে, এই কায়দাটা সামগ্রিক নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত আদম (আ.)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আদমকে যেহেতু আদীম তথা মাটির সমগ্র উপরিভাগ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তাকে আদম বলা হয়। মাটির উপরিভাগে লাল, কালো, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সব ধরনের রংই ছিল, তাই তাঁর সন্তানদের মধ্যে লাল, কালো, সাদা, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا : স্ত্রীলিঙ্গে زَوْجَةٌ ও زَوْجٌ উভয়টাই ব্যবহার হয় ,তবে زَوْجٌ টাই অধিকতর বিশুদ্ধ। এখানে আদমের স্ত্রী হাওয়াকে زَوْجٌ বলা হয়েছে। হযরত حَوَّاءُ (আ.) যেহেতু حَيٌّ তথা জীবিত আদমের বাম পাঁজরের বক্রতম হাড্ডি থেকে সৃষ্ট হয়েছে তাই তাকে হাওয়া বলে নামকরণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَبَثَّ مِنْهُمَا : بَثَّ (ن) بَثًّا বিস্তার করা। قَوْلُهُ تَسَاءَلُوْنَ আসিম, হামযা ও কাসায়ী কারী সাহেবগণ تَسَاءَلُوْنَ পাঠ করেছেন, আর বাকীরা تَسَّاءَلُوْنَ পড়েছেন।

প্রথম কেরাতে সহজ করণার্থে বাবে تَفَعُّلٌ -এর প্রথম [তা] কে বিলুপ্ত করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় কেরাতে [تَاءٌ তা] কে সীন দ্বারা পরিবর্তন করে প্রথম سِيْن সীনকে দ্বিতীয় سِيْن সীনে ইদগাম করা হয়েছে। কারণ সরফীদের একটি নীতি হলো যে, তারা পরস্পর নিকটবর্তী মাখরাজের দুই হরফকে একত্রে পেলে কোনো সময় সহজ করণার্থে বিলুপ্ত আবার কখনো প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি দ্বারা পরিবর্তন করে ইদগাম করে থাকেন। قَوْلُهُ وَالْاَرْحَامَ - رَحِمٌ -এর বহুবচন। رَحِمٌ অর্থ – আত্মীয়তা সম্পর্ক, জরায়ু। এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক উদ্দেশ্য। اَلْاَرْحَامَ কে اِتَّقُوْا উহ্য ফেলের মাফউল হিসেবে যবর যুক্তও পড়া যায়, যেরূপ অধিকাংশ কারীগণ পাঠ করেছেন, এবং بِهٖ তে উল্লিখিত যেরযুক্ত যমীরের উপর আত্ফ করে মাজরূরও পড়া যেতে পারে। কাশশাফ প্রণেতা বলেছেন, উহ্য খবরের মুবতাদা হিসেবে মারফূ' ও পড়া যেতে পারে। তখন বাক্যের রূপ হবে

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ - وَالْاَرْحَامَ كَذٰلِكَ : يَتَامٰى - يَتِيْمٌ-এর বহুবচন। এতিম বলা হয় ঐ বাচ্চাকে, যার পিতা নেই, মারা গেছে। আর অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এতিম বলা হয়, যার মাতা নেই। يَتِيْمٌ শব্দটি يُتْمٌ একা হয়ে পড়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, يَتِيْمٌ শব্দটি فَعِيْلٌ-এর ওযনে হয়েছে। আর فَعِيْلٌ-এর ন্যায় শব্দের বহুবচন فَعْلٰى-এর ওজনে এসে থাকে فَعَالٰى-এর ওজনে নয়। যেমন- مَرِيْضٌ - مَرْضٰى ,قَتِيْلٌ - قَتْلٰى ও جَرِيْحٌ - جَرْحٰى। এই কায়দা অনুযায়ী يَتِيْمٌ-এর বহুবচন يَتْمٰى আসার কথা ছিল يَتَامٰى আসল কেন? এর জবাবে কাশ্শাফ প্রণেতা বলেন, يَتِيْمٌ-এর বহুবচন يَتْمٰى আর يَتْمٰى-এর বহুবচন হলো يَتَامٰى। অথবা বলা যাবে, يَتِيْمٌ-এর বহুবচন يَتَائِمُ। অতঃপর কলবে মকানী করে يَتَامٰى করা হয়েছে। ইমাম কাফফাল বলেছেন, يَتِيْمٌ-এর বহুবচন يَتَامٰى ও আসতে পারে। যেরূপ نَدِيْمٌ-এর জমা نَدَامٰى এসে থাকে। এছাড়া يَتِيْمٌ-এর জমা اَيْتَامٌ আসে। যেরূপ شَرِيْفٌ-এর জমা আসে اَشْرَافٌ।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে বালেগ হওয়ার পর এতিমদেরকে তাদের মাল বুঝিয়ে দিতে বলা হয়েছে। এবারে প্রশ্ন হয়, বালেগ হয়ে যাওয়ার পর তো আর তারা এতিম রইল না। সুতরাং এতিমদেরকে তাদের মাল দেওয়ার নির্দেশ কেমন করে হলো। এর জবাবে বলা হয়েছে, এখানে শাব্দিক অর্থে বালেগদেরকেও এতিম বলে দেওয়া হয়েছে। শরয়ী অর্থে নয়। শরিয়তে পিতৃহীন বালেগ লোকদেরকে এতিম না বললে শাব্দিক অর্থে বলা হয়ে থাকে। আর এখানে শাব্দিক অর্থটাই প্রযোজ্য। অথবা রূপক অর্থে مَجَازُ مَا كَانَ-এর প্রেক্ষিতে তাদেরকে এতিম বলা হয়েছে। কেননা এখন যদিও তারা বালেগ হয়ে যাওয়ার দরুন শরিয়তের দৃষ্টিতে এতিম থাকেনি, তবে নিকট অতীতে তো অবশ্যই ছিল। حُوْبًا অর্থ কবীরা গুনাহ। এতে حَابَ ও একটি লোগাত রয়েছে। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন- رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ

قَوْلُهُ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تُقْسِطُوْا : اِقْسَاطٌ অর্থ ইনসাফ করা। ছুলাছি মুজাররাদে قِسْطٌ অর্থ জুলুম করা। বাবে اِفْعَالٌ-এর মধ্যে হামযাটি سَلْبُ مَاخَذ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে তার অর্থ হয় জুলুম দূর করা তথা ইনসাফ করা। قَوْلُهُ . مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ শব্দ তিনটির অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে- দুই দুই, তিন তিন, চার চার।

আদল ও ওয়াসফের কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে।

قَوْلُهُ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً : صَدُقَاتٌ - صَدُقَةٌ-এর বহুবচন- অর্থ মহর।

نِحْلَةً শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে দিয়ানত, মিল্লত, শরিয়ত, মাজহাব। এখানে فَرِيْضَةً বা عَطِيَّةً তথা উপহার বা ফরজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর বহুবচন আসে نِحَلٌ ও نِحْلَاتٌ। هَنِيْئٌ -পবিত্র আনন্দদায়ক খাবার।

مَرِيْئٌ শুভ পরিণতি বিশিষ্ট, সহজে হজম হয় এরূপ খাবার।

قَوْلُهُ اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا : لَا تَاْكُلُوْا অর্থ হচ্ছে مُسْرِفِيْنَ وَمُبَادِرِيْنَ كِبَرَهُمْ এখানে اِسْرَافًا ও بِدَارًا শব্দদ্বয় ফে'লের যমীরে ফায়েল থেকে নাহবী তারকীবে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা পরিচিতি : এই সূরাটির নাম সূরায়ে নিসা। যেহেতু এই সূরার মধ্যে নারী জাতির অধিকার, বিবাহের বিধি-নিষেধ এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিশেষ বিধান ও তাগিদ রয়েছে তাই এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুন নিসা নামে।

আলোচ্য সূরাটি মদনী তথা মদিনায় হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ১৭০টি আয়াত হওয়ার ব্যাপারে ওলামাদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে এর উর্ধ্বে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে ১৭৫টি, কারো কারো মতে ১৭৬টি এবং কারো কারো মতে ১৭৭টি আয়াত রয়েছে। এতে ৩০৪৫ টি শব্দ, ১৬০৩০ টি হরফ ও ২০টি রুকূ' রয়েছে। এই সূরাটির মধ্যে এতিম-বিধবাদের হক, বিয়ে-শাদীর নিয়ম কানুন, মুহাজির ও আনসারদের ঐক্য এবং সেই ঐক্যে ফাটল ধরাবার মুনাফেকী অপচেষ্টা, আত্মীয়-স্বজনের হক, প্রতিবেশীর অধিকার, পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ, আত্ম সংশোধনের শিক্ষা, যুদ্ধ অবস্থায় নামাজের প্রশিক্ষণ, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি প্রভৃতি বিষয়ে এই সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

-[নুরুল কুরআন খ. ৪, পৃ. ১১১, তাফসীরে খাযেন খ. ১, পৃ. ৩৩৭ ও সাবী খ. ১, পৃ. ২০০]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা আলে ইমরানের শেষ বাক্যটি ছিল وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, হয়তো তোমরা জীবন সংগ্রামে সাফল্যমণ্ডিত হবে। এই সূরার প্রথম আয়াতেও আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণের নির্দেশ রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

ইরশাদ হয়েছে– يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই প্রতিপালককে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে। উভয় সূরাতেই আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণের তাগিদ রয়েছে। কারণ বিষয় এরূপ রয়েছে যেগুলোতে আল্লাহর ভয় ব্যতীত শুধু রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন লোকদেরকে সঠিক ও ইনসাফের পথে অবিচল রাখতে পারে না। আল্লাহর ভয়ই হচ্ছে মানব জীবনে চরম উৎকর্ষ সাধনের চাবি-কাঠি।

সূরা নিসার ফজিলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, সূরায়ে নিসার পাঁচটি আয়াত আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা থেকে অধিকতর প্রিয়। আয়াত পাঁচটি হলো এই–

١. اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الخ ـ ٢. اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ الخ ـ ٣. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ ٤. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ الخ ـ ٥. وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا الخ ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সূরায়ে নিসার আটটি আয়াত আমার নিকট সমগ্র পৃথিবী থেকে অধিক প্রিয়। আয়াত আটটি হলো এই [উপরিউক্ত পাঁচসহ নিম্নোক্ত ৩টি]

١. يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ الخ ـ

٢. وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ الخ ـ

٣. يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ـ

–[মাআরিফে ইদরিসিয়া খ. ২, পৃ. ১২৫-২৬]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ الخ এই আয়াতটিতে আল্লাহ পাক সর্বকালে সর্বস্থানের মানব জাতিকে তার প্রতি ভয় পোষণ করার নির্দেশ দান করেছেন। তারা সবাইকে একই পিতা– মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান একথা স্মরণ করে দিয়ে গোটা মানব জাতিকে একতা, ঐক্যবদ্ধতা, পরস্পরে মমত্ত্ববোধ ও সহমর্মিতার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন। আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট কারীদের প্রতি হাদীস শরীফে কঠোর ভাবে ভীতি বাণী এসেছে–

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ الخ ـ

এতিমদের মাল সম্পর্কে হুকুম : আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ পাক এতিমদের মাল-সম্পদ থেকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দান করেছেন। নিজেদের হালাল মালের বদলে তাদের সম্পত্তি যা এতিমের অভিভাবকদের জন্য হারাম তা গ্রহণ করার জন্য হুকুম করেছেন এবং নিজেদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে তাদের সম্পত্তি গ্রাস না করতে নির্দেশ দান করেছেন।

আয়াতের শানে নুযূল : মোকাতেল ও কালবী (র.) বর্ণনা করেছেন, একজন গাতফানী ব্যক্তির নিকট তার এতিম ভ্রাতুষ্পুত্রের অনেক ধনসম্পদ সঞ্চিত ছিল। এতিম সাবালক হয়ে চাচার নিকট তার অর্থ-সম্পদ দাবি করলে, চাচা তা আদায়ে অস্বীকৃতি জানায়। তখন উভয়ে এই মোকদ্দমা নিয়ে হাজির হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে। এই সময়ে এই আয়াতটি নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাজহারী খ. ২, পৃ. ৪৭২]

এতিমদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে হুকুম :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ الخ

পূর্ববর্তী আয়াতে এতিমদেরকে আর্থিক ক্ষতি পৌঁছানোর ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এতিম মেয়েদের বিয়ে করার ব্যাপারে হেদায়েত দেওয়া হচ্ছে। কেননা কোনো কোনো সময় আত্মীয়তার সূত্রে যে গায়রে মাহরাম অভিভাবক ব্যক্তির অধীনে এতিম মেয়েরা থাকত, ঐ মেয়ে উক্ত অভিভাবকের সম্পদের মধ্যে শরিক হয়ে যেতো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে। উদাহরণত ধরে নেন চাচাতো ভাই ও বোন। এমতাবস্থায় দুটি সূরতের সৃষ্টি হতো। কোনো সময় অলী বা অভিভাবক ঐ এতিম মেয়ের সম্পদ ও রূপ সৌন্দর্যতার লিপ্সায় এতিম বেচারীকে খুবই অল্প মহরে বিয়ে করে নিত। যেহেতু এতিম মেয়ের কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই, যে তার অধিকার আদায় ও সংরক্ষণের জন্য এবং দাম্পত্য জীবনের অন্যান্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিবাদী হবে। এ জন্য ঐ অলী তার মহরও দিতো কম এবং অন্যান্য অধিকারেও তাকে ঠকাতো। আবার কোনো সময় এ রকম হতো যে, এতিম মেয়ের রূপ সৌন্দর্য কম হলেও তার সঙ্গে যেন-তেনভাবে একটি বিয়ে করে নিতো এ ভয়ে যে, যদি অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে মেয়ের সম্পদ আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং আমার সম্পদে অন্য ব্যক্তি এসে শরিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ এতিম অসহায় স্ত্রীর সাথে কোনো রকম আকর্ষণ বা ভালোবাসা ঐ অভিভাবক রাখতো

http://islamiboi.wordpress.com

না। এরই প্রেক্ষিতে অলী বা অভিভাবকদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে যে, যদি তোমরা এ ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করো যে, তোমাদের অধীনস্ত এতিম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না এবং তাদের মহর আদায়ে ও অন্যান্য অধিকার প্রদানে ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে, তবে এমতাবস্থায় তোমাদের জন্য এসব এতিম মেয়েদের সাথে বিয়ের অনুমতি নেই; বরং তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য মহিলাদেরকে বিয়ে করে নাও, যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে। তবে গায়রে মাহরাম হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজনে এক থেকে নিয়ে চার পর্যন্ত বিয়ে করতে পারো। তবে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। উম্মতের কারো জন্য এক সাথে চারের উর্ধ্বে স্ত্রী রাখা যাবে না। আর যদি একাধিক মহিলাকে বিয়ে করলে তাদের সঙ্গে ইনসাফ করতে পারেবে না বলে আশঙ্কাবোধ করো, তবে এক বিয়ের উপরই যথেষ্ট করো। নতুবা তোমাদের শরয়ী বাঁদিদের উপর যথেষ্ট করো [যার প্রচলন বর্তমানে নেই] এই হুকুম পালন করে নিলে তোমরা বেইনসাফী এবং কারো অধিকার নষ্ট করার অন্যায় থেকে বেঁচে যেতে পারবে। -[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৩০-৩১]

মাসআলা : রাফেজীগণ এক সাথে নয়জনকে বিয়ে করা বা নয়জনকে স্ত্রী হিসেবে রাখা জায়েজ মনে করে। তারা দলিল হিসেবে আলোচ্য আয়াতটিকেই পেশ করে থাকে। ইমাম নখয়ী ও ইবনে আবী লাইলার দিকেও উক্তিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়। তারা বলেন, وَاو عَطْف বা সংযুক্তকারী (وَاو) ওয়াও বর্ণটি পূর্বাপরের উভয়টি বস্তুকে কেবল একত্র করে দেওয়ার জন্য এসে থাকে। সুতরাং فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ -এর মর্ম হবে, তোমরা বিয়ে করো দুজন মহিলাকে তিনজন এবং চারজনকে। সুতরাং ২+৩+ও ৪ = এর যোগফল হবে ৯। আর খারিজীগণ একই সাথে আঠারো জন মহিলার সঙ্গে বিয়ে জায়েজ হওয়াতে বিশ্বাসী। তারা বলে আয়াতের শব্দ (مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ) একক হলেও অর্থে দ্বিগুণ হওয়ার কথা পাওয়া যাচ্ছে। তাই নয়ের দ্বিগুণ আঠারো হবে। উল্লিখিত উক্তি উভয়টাই গলদ।

খারিজীদের উক্তি ভ্রান্ত হওয়ার কারণ হলো এই যে, উল্লিখিত শব্দগুলো তাকরারযুক্ত শব্দাবলি হতে নির্গত। তবে সংখ্যার তাকরার বা দ্বিগুণ হওয়ার কোনো সীমা নেই। দ্বিগুণের অর্থ শুধু দুবার বা দু সংখ্যাই নয়; বরং দুই- দুই - দুই ....। মোটকথা অসীমিত দুইকে مَثْنٰى শব্দে শামিল রাখে। যেমন কেউ যদি কোনো একদল মানুষকে বলে যে, তোমরা এ টাকাগুলো হতে দুটি দুটি করে নিয়ে নাও। তখন উদ্দেশ্য হয় প্রতিজনই দুই টাকা নিবে। উদ্দেশ্য এটা হয় না যে, তোমরা প্রত্যেকে চার টাকা নিয়ে নাও। আয়াতের মধ্যে যদি এ অর্থটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অর্থই ঠিক হবে না। কারণ সকল লোকদের জন্য দুইজন, তিনজন, চারজন, নয়জন বা আঠারোজন মহিলার সাথে বিয়ে সম্ভবই নয়। এই জন্যই তাফসীরে কাশশাফ প্রণেতা আল্লামা জারুল্লাহ যমখশারী (র.) লিখেন, এসব শব্দকে যদি এক হিসেবে উল্লেখ করা হয় অর্থাৎ মাদুল বা নির্গত বলা না হয় আর অর্থগত তাকরারের মর্ম সৃষ্টি না হয়] তাহলে সঠিক কোনো অর্থই হবে না। [অর্থাৎ যদি فَانْكِحُوْا اِثْنَيْنِ وَثَلَاثًا وَّاَرْبَعًا বলা হয় তবে অর্থ শুদ্ধ হবে না।

রাফেজীদের উক্তি ভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, অলংকার শাস্ত্রবিদগণ নয়ের সংখ্যা সঠিক বুঝাবার জন্য দুই, তিন ও চার বলেননি; বরং আয়াতের মর্ম হলো এই যে, প্রত্যেকের জন্য দুইজন মহিলার সাথে বিয়ে করা জায়েজ রয়েছে। তেমনিভাবে প্রত্যেকের জন্য তিনজনের সঙ্গে এবং চার জনের সঙ্গেও বিয়ে জায়েজ রয়েছে।

চারো মাযহাবের ইমামগণসহ জমহুর ওলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এক সাথে চারের অধিক মহিলা বিয়ে করা বা বিয়েতে রাখা নাজায়েজ। এ জন্যই তো আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর কায়েস বিন হারিছসহ অন্যান্য সাহাবাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ চারের উর্ধ্বে বিবিগণকে তালাক দিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তারাও সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৪৭৭-৭৮]

বহু বিবাহ ও পবিত্র ইসলাম : বহু বিবাহের প্রথাটা ইসলাম-পূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্ম মতেই বৈধ বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরাক, মিশর, বেবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণির চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে এসেছেন বটে; কিন্তু তাতে কোনো সুফল বয়ে আনেনি; বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থাটাই বিজয়ী হয়েছে। তাই বর্তমানে ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ ব্যক্তিরা তার পুনঃ প্রচলন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে তৎকালে এই সীমা-সংখ্যাহীন বহুবিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার কোনো অন্ত ছিল না। অন্যদিকে এ থেকে উদ্ভূত দায়িত্বের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করত না; বরং এই সব স্ত্রীকে তারা রাখতো দাসী-বাঁদির মতো এবং তাদের সাথে যথেচ্ছা ব্যবহার করতো। তাদের প্রতি কোনো রকম ইনসাফ করা হতো না। চরম বৈষম্য বিরাজ করতো পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অনেক সময় পছন্দসই দু একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাকিদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা

http://islamiboi.wordpress.com

হতো। পবিত্র কুরআন ও ইসলাম এই সামাজিক অনাচার ও জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এই ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাফের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। ইনসাফ করে চলতে পারলে চারজনকে রাখার অনুমতি দিয়েছে। অন্যথায় একজনের উপরই যথেষ্ট করতে নির্দেশ দিয়েছে।

একাধিক বিয়ের প্রয়োজনীয়তা :

১. বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হলো নিজের পবিত্রতা, দৃষ্টি রক্ষা করে চলা, লজ্জাস্থানের হেফাজত, সন্তান লাভ ও জেনা-ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। অনেক সময় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ধনবান অবসর লোকও সমাজে পাওয়া যায়। তারা চারজন স্ত্রীর হক যথারীতি আদায় করার সামর্থ্য রাখে। তাদের মতো লোকের নিকট হাজারো গরিব মানুষের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়। এমতাবস্থায় যদি তারা দু-চারজন গরিব পরিবারের মহিলাকে বিয়ে করে নেয় তবে তাতে অসুবিধা কি?

২. অনেক সময় মহিলারা বিভিন্ন রোগব্যাধি ও গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে স্বামীকে দেহদানের যোগ্য থাকে না। এমতাবস্থায় সুস্থ সবল ধনী স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়া ছাড়া জেনা থেকে বাঁচানোর আর কোনো উত্তম ব্যবস্থা নেই।

৩. অনেক সময় মহিলা রোগের কারণে বা বন্ধ্যা হওয়ার কারণে সন্তান জন্ম দেওয়ার যোগ্য থাকে না। অন্যদিকে স্বভাবগতভাবেই পুরুষদের সন্তান লাভের আগ্রহ থাকে অধিক। এমতাবস্থায় পূর্বের বন্ধ্যা বা রোগী স্ত্রীকে অকারণে তালাক দিয়ে দেওয়া বা কোনো অভিযোগ তৈরি করে তালাক দেওয়া [যেরূপ ইউরোপের দেশসমূহে প্রতিনিয়ত হয়ে থাকে] উত্তম হবে নাকি তার বিয়ে ও যাবতীয় অধিকার বহাল রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করে নেওয়া উত্তম হবে? কোনো জাতি যদি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চায়, তবে একাধিক বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো উত্তম পন্থা নেই।

৪. এছাড়া কুদরতিভাবেই মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের জন্মের হার কম পক্ষান্তরে মৃত্যুর হার বেশি। অনেক পুরুষ যুদ্ধে, জাহাজ ডুবে, আরো বিভিন্ন রকম দৈব দুর্ঘটনায় মারা যায়। সুতরাং একাধিক বিয়ের অনুমতি দেওয়া না হলে অতিরিক্ত সংখ্যক মহিলাদের জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য, চরিত্র ধ্বংস হওয়া প্রায় নিশ্চিত। তাই এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দ্বিতীয় বিবাহই উত্তম পদ্ধতি।

৫. মহিলারা পুরুষদের তুলনায় হাদীসানুযায়ী আকল বুদ্ধিতেও অর্ধেক এবং ধর্ম পালনেও অর্ধেক। যার ফলাফল হলো এই যে, মহিলা পুরুষের এক চতুর্থাংশ। আর একথা সুস্পষ্ট যে, চার চতুর্থাংশ মিলে পূর্ণ এক হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, চারজন মহিলা একজন পুরুষের সমান। এই জন্যই শরিয়ত একজন পুরুষকে এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করতে বা রাখতে অনুমতি প্রদান করেছে। -[মা'আরিফে ইদ্রীসিয়া খ. ২, পৃ.১৩৩-৩৭]

এক মহিলার জন্য একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ :

১. যদি একজন মহিলা একাধিক পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাহলে বিয়ের অধিকার হিসেবে প্রত্যেকেরই যৌন চাহিদা পূর্ণ করার অধিকার থাকবে, আর এতে ফ্যাসাদ ও পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। হতে পারে একই মুহূর্তে সকলেরই প্রয়োজন পড়ে যাবে। ফলে খুন খারাবির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

২. পুরুষ স্বভাবগত এবং জন্মগতভাবেই শাসক আর মহিলা শাসিত। এই জন্যই শরিয়ত তালাকের এখতিয়ার পুরুষকে প্রদান করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে স্বাধীন করে না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী ভিন্ন কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না।

সুতরাং পুরুষ যখন শাসকের পর্যায়ে হলো তখন যুক্তিসঙ্গত কারণেই একজন শাসকের অধীনে একাধিক শাসিত থাকতে পারবে।এই শাসকের অধীনে অনেক শাসিত থাকা লাঞ্ছনা ও অপমানের কোনো কারণ নয় এবং মুশকিলও নয়। পক্ষান্তরে যখন শাসিত ব্যক্তি এক হবে আর শাসক হবে একাধিক তখন শাসিত ব্যক্তিকে বিস্ময়কর মসিবতের সম্মুখীন হতে হবে। সে কার আনুগত্য করবে আর কার করবে না। আর এতে অপমানও অধিক। শাসক যতই বেশি হবে শাসিত ব্যক্তির অপমান ততই অধিক হবে।

এই জন্য ইসলামি শরিয়ত একজন মহিলকে একসাথে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেনি। কারণ এ অবস্থায় মহিলার জন্য অপমান লাঞ্ছনা অধিক এবং মসিবতও হবে কঠিন।

এ ছাড়া একাধিক স্বামীর মন যুগিয়ে চলা, তাদের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাওয়া, সবাইকে খুশি রাখা অসহনীয় ব্যাপার। তাই শরিয়ত একজন মহিলাকে দুই বা চারজন পুরুষকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়নি। যাতে করে মহিলা উল্লিখিত লাঞ্ছনা, অপমান ও অসহনীয় কষ্ট ও মসিবত থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৩. তাছাড়া একজন মহিলার একাধিক স্বামী হলে তাদের যৌন মিলনে যে সন্তান হবে, সে তাদের মধ্য থেকে কার সন্তান পরিচিত হবে? তার লালন-পালন ভরণ-পোষণ হবে কেমন করে? তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন হবে কিরূপে? এছাড়া এই সন্তান একাধিক স্বামীর জন্য যৌথ হবে, অথবা তারা বণ্টন করে নিবে। বণ্টন করে নিলে বণ্টনটা হবে কেমন করে?

http://islamiboi.wordpress.com

সন্তান যদি একটাই হয় তবে তাদের মধ্যে বণ্টনের উপায় হবে কি? আর একাধিক সন্তান হলে বণ্টনের পালা যখন আসবে তখন ছেলে মেয়ে হওয়ার ব্যবধানের প্রেক্ষিতে সূরত বা নমুনা, সুন্দর-অসুন্দর, দুর্বল-শক্তিশালী, সুস্থ-অসুস্থ, মেধাহীন ও মেধাসম্পন্ন হওয়াসহ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবধান ও পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। তখন তাদের সন্তান বণ্টনে খুবই জটিলতা সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে পরস্পরে কত রকম ঝগড়া, ফ্যাসাদ ও ফিতনা যে হবে তার কোনো সীমা পরিসীমা আছে কি? এসব জটিলতা ফিতনা ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই পবিত্র ইসলাম একই মুহূর্তে একজন মহিলাকে একাধিক স্বামী রাখতে বা একাধিক বিয়ে করতে নিষেধ করেছে। -[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৩৭-৩৮]

বিশ্বনবী ও বহু বিবাহ : নবী ﷺ-এর আগমনের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর দীনের বিধি-বিধান উম্মতের নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্ব মানবতার আত্মশুদ্ধির কাজ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের শিক্ষা, বিধি-বিধান, কথা ও কাজের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিস্তার করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোনো ধাপ নেই যেখানে নবীর শিক্ষা ও তার পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। পানাহার, উঠাবসা, নিদ্রা-জাগ্রত হওয়া, পাক-পবিত্রতা, ইবাদত-রিয়াজত, মুজাহাদা-সাধনা প্রভৃতি বিষয়ে মোটকথা জীবনের প্রতিস্তরে এমন কোনো ধাপ নেই যেখানে নবীর হেদায়েত ও পথ নির্দেশিকা বিদ্যমান নেই। ঘরের ভিতরে তিনি কি কি আমল করেছেন, বিবিগণের সাথে কিরূপ আচার-আচরণ করতেন ঘরে এসে দীনের মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞেসকারী মহিলাদেরকে তিনি কি কি জবাব প্রদান করেছেন? এরকম হাজারো মাসআলা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে নবীপত্নীদের মাধ্যমেই উম্মত জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। বহু বিবাহ করার মধ্যে তার এই উদ্দেশ্যটাই মুখ্য ছিল। শুধু হযরত আয়েশা (রা.) হতেই নবীজীর সীরাত সম্পর্কিত দুই হাজার দুইশত হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে ৩৭৮ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবীগণের মহান উদ্দেশ্য তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশোধনের চিন্তা-ফিকিরের কথা দুনিয়ার খাহেশ পূজারীরা কি করে জানবে? তারা তো সকলকেই নিজের উপর কিয়াস করে মাপতে জানে। এরই ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের নাস্তিক ও পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যবাদীরা হঠকারিতামূলকভাবে বিশ্ব নবীর বহু বিবাহকে এক বিশেষ যৌন সম্ভোগ ও কাম প্রবৃত্তির ভিত্তিতে হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে। হুজুর ﷺ-এর পবিত্র জীবনের উপর সামান্য চিন্তা করলেও কোনো বুদ্ধিমান ও ইনসাফ-প্রিয় লোক তাঁর বহু বিবাহ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করতে পারে না।

তিনি তাঁর পবিত্র জীবনটাকে মক্কাবাসীদের সামনে এরকমভাবে অতিবাহিত করেছেন যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে একজন ৪০ বৎসরের বয়স্কা সন্তানের মা তার [যার পূর্বের দুইজন স্বামী মারা গেছে] সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তার সাথেই অতিক্রান্ত করেছেন। আবার তাও এরকম যে, মাসের পর মাস বাড়ি-ঘর ছেড়ে গারে হেরায় গিয়ে ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর অন্যান্য সকল বিয়েই বয়স পঞ্চাশ হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। এই পঞ্চাশ বৎসরের জীবন এবং পূর্ণ যৌবনের সারাটা সময় মক্কাবাসীদের চোখের সামনে ছিল। কোনো সময় কোনো দুশমনের পক্ষেও তাঁর প্রতি এরূপ কোনো কথা উঠানোর সুযোগ হয়নি, যা দ্বারা তার পবিত্রতা ও খোদাভীতির বিষয়টা সন্দেহযুক্ত হতে পারে। তাঁর দুশমনেরা তাকে জাদুকর, কবি, পাগল, মিথ্যুক, মিথ্যারচনাকারীর ন্যায় বিভিন্ন অভিযোগ দিতে কোনো রকম ক্রটি করেনি। কিন্তু তাঁর নিষ্পাপ মাসুম জীবনের উপর এমন কোনো অপবাদ দেওয়ার দুঃসাহস করতে পারেনি, যা দ্বারা তার পবিত্র চরিত্র কলুষযুক্ত হতে পারে।

চিন্তা ফিকিরের বিষয় হলো এই যে, তিনি যৌবনের পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সংসার-বিমুখতা, তাকওয়া, পরহেজগারী, খোদাভীতি ও দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে দূরে থেকে কালাতিপাত করার পর কি কারণ ছিল যদ্দরুন তিনি বহু বিবাহ করতে বাধ্য হয়ে পড়লেন। মনে যদি সামান্যতম ইনসাফও অবশিষ্ট থাকে তবে এসব বিবাহের প্রকৃত কারণ ছাড়া অন্য কিছু বলা যেতে পারে না, যার আলোচনা উপরে হয়েছে।

হুজুর ﷺ-এর বহু বিবাহের অবস্থা : পঁচিশ বৎসর বয়স থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত একমাত্র হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর বিবাহে ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত সাওদা ও আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিবাহ হয়। হযরত সাওদা (রা.) হুজুরের ঘরে চলে আসেন। কিন্তু আয়েশা কম বয়সী হওয়ার দরুন তাঁর পিতা আবূ বকর (রা.)-এর ঘরেই থেকে যান। অতঃপর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর হিজরি দ্বিতীয় সনে তিনি হুজুর ﷺ-এর ঘরে আসেন। তখন হুজুর ﷺ-এর বয়স ছিল ৫৪ বৎসর। এই বয়সে উপনীত হওয়ার পর দুই স্ত্রী তার বিয়ের সূত্রে একত্র হলো। এখান থেকে একাধিত বিবাহের বিষয়টির সূচনা হয়। তার এক বৎসর পর হযরত হাফসা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে হয়। তারপর কয়েক মাস যাওয়ার পর হযরত যায়নাব বিনতে খুজাইমা (রা.)-এর সাথে বিবাহ হয়েছে। তিনি মাত্র আঠারো মাস বিবাহ বন্ধনে থেকে ইন্তেকাল করলেন। এক বর্ণনা মতে, তিনি হুজুর ﷺ -এর বিবাহ বন্ধনে মাত্র তিনমাস জীবিত থাকেন। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত উম্মে সালামা (রা.) -এর সাথে এবং পঞ্চম হিজরিতে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে চারজন স্ত্রী এক সাথে একত্র হয়েছিল। অথচ যে সময় উম্মতের জন্য চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল তখনই তিনি চারটি বিয়ে করে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি এরূপ করেননি। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরিতে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর সাথে, সপ্তম হিজরিতে উম্মে হাবীবার সঙ্গে এবং তারপর এই বৎসরই হযরত সুফিয়্যা ও হযরত মায়মূনা (রা.)-এর সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৯৬-৯৮]

http://islamiboi.wordpress.com

٥. وَلَا تُؤْتُوا اَيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ السُّفَهَاءَ الْمُبَذِّرِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ اَمْوَالَكُمْ اَيْ اَمْوَالَهُمْ الَّتِيْ فِيْ اَيْدِيْكُمْ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا مَصْدَرُ قَامَ اَيْ تَقُوْمُ بِمَعَاشِكُمْ وَصَلَاحِ اَوْلَادِكُمْ فَيُضَيِّعُوْهَا فِيْ غَيْرِ وَجْهِهَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ قِيَمًا جَمْعُ قِيْمَةٍ مَا تَقُوْمُ بِهِ الْاَمْتِعَةُ وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا اَطْعِمُوْهُمْ مِنْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوْفًا عِدُوْهُمْ عِدَةً جَمِيْلَةً بِاِعْطَائِهِمْ اَمْوَالَهُمْ اِذَا رَشَدُوْا .

٦. وَابْتَلُوْا اِخْتَبِرُوْا الْيَتٰمٰى قَبْلَ الْبُلُوْغِ فِيْ دِيْنِهِمْ وَتَصَرُّفِهِمْ فِيْ اَحْوَالِهِمْ حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اَيْ صَارُوْا اَهْلًا لَهُ بِالْاِحْتِلَامِ اَوِ السِّنِّ وَهُوَ اِسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رح) فَاِنْ اٰنَسْتُمْ اَبْصَرْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا صَلَاحًا فِيْ دِيْنِهِمْ وَمَالِهِمْ فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اَيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ اِسْرَافًا بِغَيْرِ حَقٍّ حَالٌ وَبِدَارًا اَيْ مُبَادِرِيْنَ اِلٰى اِنْفَاقِهَا مَخَافَةَ اَنْ يَكْبَرُوْا رُشْدًا فَيَلْزَمُكُمْ تَسْلِيْمُهَا اِلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اَيْ يَعِفَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَيَمْتَنِعُ مِنْ اَكْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ بِقَدْرِ اُجْرَةِ عَمَلِهِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَيْ اِلَى الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ اَنَّهُمْ تَسَلَّمُوْهَا وَبَرِئْتُمْ لِئَلَّا يَقَعَ اِخْتِلَافٌ فَتَرْجِعُوْا اِلَى الْبَيِّنَةِ وَهٰذَا اَمْرُ اِرْشَادٍ وَكَفٰى بِاللّٰهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيْبًا حَافِظًا لِاَعْمَالِ خَلْقِهِ وَمُحَاسِبُهُمْ .

অনুবাদ :

৫. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে ধনসম্পদকে তথা এতিমদের যে ধনসম্পদ তোমাদের হাতে রক্ষিত রয়েছে তাকে তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন তা নির্বোধ লোকদেরকে তথা অপচয়কারী পুরুষ, নারী ও বাচ্চাদের হাতে দিও না হে অভিভাবকগণ! قِيَامًا - قَامَ -এর মাসদার। অর্থাৎ যা দ্বারা তোমাদের জীবিকা ও তোমাদের সন্তানদের উপকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এ সম্পদ উল্লিখিত লোকদের হাতে দিয়ে দিলে তাকে অনর্থক বিনষ্ট করে ফেলবে। ভিন্ন এক কেরাতে قِيَمًا রয়েছে, তখন তা قِيْمَةٌ -এর বহুবচন হবে। অর্থাৎ যা দ্বারা তোমাদের বস্তু সামগ্রী ঠিক থাকে। তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদের সাথে বিনম্রভাবে কথা বল। অর্থাৎ তাদের সম্পদ বুঝদার হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে দিয়ে দেওয়ার সুন্দর ওয়াদা প্রদান কর।

৬. আর এতিমদেরকে পরীক্ষা কর বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, তাদের ধর্মীয় এবং লেনদেনের বিষয়ে। অতঃপর যখন তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌছে যাবে তথা স্বপ্নদোষ বা বয়সের মাধ্যমে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সেই বয়সটি হলো পনের বৎসর পরিপূর্ণ হওয়া। অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি তথা তাদের ধর্মীয় ও আর্থিক ব্যাপারে উপকারিতাবোধ দেখতে পাও, তবে তাদের ধনসম্পদ তাদের প্রতি সোপর্দ করতে পার এবং তারা বড় হয়ে উঠার ভয়ে যে, তখন তাদের সম্পদ তাদের প্রতি সোপর্দ করে দিতে হবে এই ভয়ে হে অভিভাবকগণ! তাড়াহুড়া করে অপচয় করে অন্যায় ভাবে ব্যয় করো না। اِسْرَافًا ও بِدَارًا - لَا تَأْكُلُوْا -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। আর ওলীদের মধ্যে যে ধনী সে যেন এতিমের সম্পদ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে এবং তা ভোগ করা থেকে বিরত থাকে। আর যে দরিদ্র সে যেন ভোগ করে নেয় ন্যায়নীতি অনুসারে তথা তার কাজের বিনিময় অনুপাতে। অতঃপর যখন তাদের তথা এতিমদের প্রতি তাদের সম্পত্তি ফেরত দিতে চাও তখন তাদের উপর সাক্ষী রেখে দিও যে, তারা পেয়ে গেছে আর তোমরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছ, যাতে তোমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়। আর যদি হয়ে যায় তবে যেন সাক্ষীর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পার। এ নির্দেশ বাক্যটি সংশোধনমূলক মোস্তাহাব বুঝাতে এসেছে। আর আল্লাহ তা'আলা হিসেব গ্রহণকারী হিসাবে যথেষ্ট তথা তিনি তাঁর সৃষ্টির কৃতকর্মের সংরক্ষণকারী ও হিসাব গ্রহণকারী।

http://islamiboi.wordpress.com

٧. وَنَزَلَ رَدًّا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ عَدَمِ تَوْرِيْثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ لِلرِّجَالِ الْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ نَصِيْبٌ حَظٌّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ الْمُتَوَفَّوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَيِ الْمَالِ أَوْ كَثُرَ جَعَلَهُ اللّٰهُ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا مَقْطُوْعًا بِتَسْلِيْمِهِ إِلَيْهِمْ.

৭. সামনের আয়াতটি জাহিলি যুগে প্রচলিত মহিলা ও শিশুদেরকে উত্তরাধিকার না দেওয়ার কুপ্রথার প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত পিতামাতা এবং নিকটতম আত্মীয়স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের জন্য তথা সন্তানাদি ও আত্মীয়দের জন্য অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্য অংশ রয়েছে, যা পিতামাতা এবং নিকটতম আত্মীয়স্বজন রেখে গেছে সে মালের অংশ বেশি হোক বা কম, তার পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তথা তাদের প্রতি সোপর্দ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তা সুনির্দিষ্ট।

٨. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ لِلْمِيْرَاثِ أُولُوا الْقُرْبٰى ذَوُو الْقَرَابَةِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقُوْلُوْا أَيُّهَا الْأَوْلِيَاءُ لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا قَوْلًا مَعْرُوْفًا جَمِيْلًا بِأَنْ تَعْتَذِرُوْا إِلَيْهِمْ إِنَّكُمْ لَا تَمْلِكُوْنَهُ وَإِنَّهُ لِلصِّغَارِ وَهٰذَا قِيْلَ مَنْسُوْخٌ وَقِيْلَ لَا وَلٰكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِيْ تَرْكِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نَدْبٌ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَاجِبٌ.

৮. আর যখন মিরাস বণ্টনের সময় উত্তরাধিকার পায় না এমন আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন ঐ সম্পদ থেকে বণ্টনের পূর্বে তাদেরকে কিছু দান কর এবং হে ওলীগণ! তাদের সাথে ভালো কথা বল, যখন ওয়ারিশদের মধ্যে নাবালেগরাও থাকে, অর্থাৎ তাদের কাছে এরূপ ওজর পেশ কর যে, তোমরা এ সম্পদের মালিক হতে পারবে না। কারণ এর ওয়ারিশরা হচ্ছে নাবালেগ। এক বর্ণনা মতে, যারা ওয়ারিশ নয় তাদেরকে দেওয়ার এ বিধানটি রহিত হয়ে গেছে। অন্য আরেক বর্ণনা মতে, এ হুকুমটি রহিত হয়নি। তবে লোকেরা এর উপর আমল না করাতেই সহজতা অনুভব করতে লেগেছে। রহিত না হওয়ার বর্ণনা মতে, নির্দেশটি হবে মোস্তাহাবের জন্য। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ নির্দেশটিও ওয়াজিব বুঝাতে এসেছে।

٩. وَلْيَخْشَ أَيْ لِيَخَفْ عَلَى الْيَتٰمٰى الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا أَيْ قَارَبُوْا أَنْ يَتْرُكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا أَوْلَادًا صِغَارًا خَافُوْا عَلَيْهِمُ الضِّيَاعَ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ أَمْرِ الْيَتٰمٰى وَلْيَأْتُوْا إِلَيْهِمْ مَا يُحِبُّوْنَ أَنْ يُفْعَلَ بِذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمْ وَلْيَقُوْلُوْا لِلْمَيِّتِ قَوْلًا سَدِيْدًا صَوَابًا بِأَنْ يَأْمُرُوْهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدُوْنِ ثُلُثِهِ وَيَدَعُ الْبَاقِيَ لِوَرَثَتِهِ وَلَا يَتْرُكُهُمْ عَالَةً.

৯. যারা নিজেদের পশ্চাতে তথা মৃত্যুর পর দুর্বল, অসমর্থ নাবালেগ সন্তানাদি রেখে যায় যাদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ রেখে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তাদের এতিমদের ব্যাপারে ভয় করা উচিত। অতএব, তারা যেন এতিমদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং এতিমদের সাথে যেন ঐ ব্যবহার করে, যা মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের সাথে করে যাওয়াকে পছন্দ করে। আর মৃত্যুর ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে তারা যেন সঠিক কথা বলে। এ রকমভাবে যে, তাকে যেন তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদের চেয়ে কম সদকা করতে এবং বাকি অংশ ওয়ারিশদের জন্য ছেড়ে যেতে ও তাদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে না রেখে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

http://islamiboi.wordpress.com

১০. إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ أَىْ مِلْأَهَا نَارًا لِأَنَّهُ يَؤُوْلُ إِلَيْهَا وَسَيَصْلَوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ يَدْخُلُوْنَ سَعِيْرًا نَارًا شَدِيْدَةً يَحْتَرِقُوْنَ فِيْهَا ـ

১০. নিশ্চয় যারা এতিমদের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে নাহক রূপে ভোগ করে, তাদের উদরে অগ্নিভক্ষণ করে ভরে। কেননা শেষ ফলে তাদের এ ভক্ষিত অর্থসম্পদ অগ্নিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অতিসত্বর তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে তথা মারাত্মক আগুনে প্রবেশ করবে, তাতে তারা জ্বলতে থাকবে। سَيَصْلَوْنَ ফে'লটি মা'রূফ ও মাজহুল উভয় রকমই পড়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا الخ

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক নির্বোধ ও বোকাদের হাতে তাদের সম্পদ সোপর্দ করে দিতে নিষেধ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে سُفَهَاءُ বলতে কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরিনগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে, এতিম মেয়েরা উদ্দেশ্য। আর أَمْوَالَكُمْ বলে এতিমদের মাল বুঝানো হয়েছে। যেহেতু এসব মাল তাদের অলী বা অভিভাবকদের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে তাই তাদের প্রতি সম্পৃক্ত করে أَمْوَالَكُمْ বলা হয়েছে। এর মধ্যে এতিমদের সম্পদকে নিজেদের সম্পদের ন্যায় সংরক্ষণযোগ্য মনে করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণের মতে, নির্বোধ বলে সম্বোধিত ব্যক্তিদের বিবি-বাচ্চা উদ্দেশ্য।

কারো মতে, নির্বোধ দ্বারা প্রত্যেক ঐ বোকা লোক উদ্দেশ্য যার মধ্যে নিজের সম্পদের হেফাজতের যোগ্যতা নেই। যেই ব্যক্তি বেওকুফির দরুন নিজের সম্পদকে বিনষ্ট করে ফেলে সেই নির্বোধ বা বোকা। সে চাই এতিম হোক বা নিজের স্ত্রী ও সন্তান হোক।

মাসআলা : আল্লাহপাকের ইরশাদ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ 'নির্বোধদের হাতে সম্পদ তুলে দিও না'-এর বাহ্যিক অর্থ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বোধদের বোকামি বিদূরিত না হয় এবং বুঝ–সমজ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্পদ তাদের কাছে সোপর্দ করা যাবে না, যদিও তারা শত বৎসরের বৃদ্ধ হোক না কেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবূ হানীফা (র.) বলেন, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে; যদি এর ভেতরে তাদের বুঝ–সমজ এসে যায় তবে তাদের সম্পদ তাদেরকে সোপর্দ করে দেওয়া যাবে। আর পঁচিশ বৎসর বয়স হয়ে গেলে সর্বাবস্থায় তাদের মাল তাদের হাওয়ালা করে দিতে হবে। পরিপূর্ণ বুঝ শক্তি আসুক বা না আসুক।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, পুরুষের আকল ও বোধশক্তি পঁচিশে গিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তারপর তাকে আর বঞ্চিত রাখা যায় না। আয়াতের কারীমার মধ্যে رُشْدًا শব্দটি নাকেরার সহিত এসেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, মাল সোপর্দ করে দেওয়ার জন্য এক রকম আকল-বুদ্ধি হয়ে যাওয়াটাই যথেষ্ট। সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পরিপূর্ণ বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হওয়ার জরুরি নয়। –[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৪২–৪৩]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا : এতিমরা বালেগ হয়ে যাওয়ার পর তাদের অর্থ সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করে দেওয়ার সময় সাক্ষীর সামনে দিয়ো।

মাসআলা : এতিমদেরকে সাক্ষীদের সামনে তাদের মাল বুঝিয়ে দেওয়া শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মতে ওয়াজিব। আর হানাফীদের মতে, মোস্তাহাব অর্থাৎ সাক্ষী রেখে দেওয়াটা উত্তম তবে ওয়াজিব নয়। –[মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৪৪]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الخ :

উপরিউক্ত আয়াতের শানে নুযূল : ইসলামপূর্ব যুদ্ধে মহিলা এবং নাবালেগ ছেলে মেয়েদেরকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ দেওয়া হতো না। কেবল যুদ্ধের উপযুক্ত পুরুষদেরকেই দেওয়া হতো। এর প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

আবুশ শায়খ ইবনে হিব্বান কিতাবুল ফরাইযের মধ্যে কলবীর সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, জাহেলী যুগের লোকেরা না মেয়েদেরকে উত্তরাধিকার দিত এবং না দিত ছেলেদেরকে ছোট। আওস বিন ছাবেত নামী একজন আনসারী সাহাবীর ইন্তেকাল হলো, সে দুইজন মেয়ে একজন ছোট ছেলে ও তাঁর স্ত্রীকে রেখে গেল। আওসের দুইজন চাচাত ভাই ছিল খালেদ ও আরফাজা। তারা উভয়ে তাঁর সমূহ সম্পত্তি নিয়ে গেল। ফলে আওসের স্ত্রী হুজুর ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি পেশ করলে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার জানা নেই, আমি কি বলব? এর উপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, ৪৯৪]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন যে, পুরুষদের ন্যায় মহিলাগণ এবং ছোট ছেলে-মেয়েরাও নিজেদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে অংশ পাবে। তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। মেয়ের অংশ ছেলের অংশের অর্ধেক সেটা ভিন্ন কথা। এতে মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়নি এবং এতে তাদের অবমূল্যায়নও হয়নি; বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকারের নীতি সম্পূর্ণ ইনসাফ ভিত্তিক। কারণ ইসলাম মহিলাদেরকে রুজি-রোজগারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে, পুরুষদের স্কন্ধে সেই দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এছাড়া মহিলাগণ মহরের মাধ্যমেও মাল পেয়ে থাকে। এ হিসেবে মহিলাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি আর্থিক দায়িত্ব রয়েছে পুরুষদের উপর। সুতরাং মহিলাদের অংশ পুরুষদের সমান হলে পুরুষদের উপর জুলুম হতো। কিন্তু আল্লাহপাক কারো প্রতি জুলুম করেননি। কেননা আল্লাহপাক যেমন ইনসাফগার তেমনি প্রজ্ঞাবানও বটে। -[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৫৯৮]

قَوْلُهُ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ الخ : আলোচ্য আয়াতটিকে কিছু সংখ্যক আলেম আয়াতে মিরাছের দ্বারা রহিত বলেছেন। তবে বিশুদ্ধতম কথা হলো এই যে, এই আয়াতটি রহিত নয়; বরং এতে উত্তম চরিত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, সাহায্যের উপযুক্ত আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকিনরা যাদের মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ নেই। উত্তরাধিকারের সম্পদ বণ্টনের সময় নফল হিসেবে তাদেরকেও অল্প কিছু দিয়ে দিবে এবং তাদের সঙ্গে মায়া ও দয়াপূর্ণ কথা বলবে।

সামনের আয়াত وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ-এর মধ্যে সেই হেদায়েত ও নির্দেশের তাকিদ প্রদান করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

١١. يُوْصِيْكُمُ يَأْمُرُكُمُ اللّٰهُ فِيْ شَأْنِ
أَوْلَادِكُمْ بِمَا يُذْكَرُ لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ
حَظِّ نَصِيْبِ الْأُنْثَيَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَتَا
مَعَهُ فَلَهُ نِصْفُ الْمَالِ وَلَهُمَا النِّصْفُ
فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ
الثُّلُثَانِ وَإِنْ إِنْفَرَدَ حَازَ الْمَالَ فَإِنْ كُنَّ
أَيِ الْأَوْلَادُ نِسَاءً فَقَطْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ وَكَذَا
الْاِثْنَتَانِ لِأَنَّهُ لِلْأُخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ فَهُمَا أَوْلٰى وَلِأَنَّ
الْبِنْتَ تَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكَرِ فَمَعَ
الْأُنْثٰى أَوْلٰى وَفَوْقَ قِيْلَ صِلَةٌ وَقِيْلَ
لِدَفْعِ تَوَهُّمِ زِيَادَةِ النَّصِيْبِ بِزِيَادَةِ
الْعَدَدِ لِمَا فُهِمَ اِسْتِحْقَاقُ الْاِثْنَتَيْنِ
الثُّلُثَيْنِ مِنْ جَعْلِ الثُّلُثِ لِلْوَاحِدَةِ مَعَ
الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَوْلُوْدَةُ وَاحِدَةً وَفِيْ
قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فَكَانَ تَامَّةٌ فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ أَيِ الْمَيِّتِ وَيُبْدَلُ
مِنْهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثٰى

অনুবাদ :

১১. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে সামনে উল্লিখিত কথাগুলো দ্বারা আদেশ দিয়েছেন– তাদের একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। যখন দুজন মেয়ে একজন ছেলের সাথে একত্র হবে তখন ছেলের জন্য হবে মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক, আর মেয়ে দুজনের হবে বাকি অর্ধেক। আর একজন ছেলের সাথে যদি একজন মেয়ে হয় তখন মেয়ে পাবে তিনভাগের একভাগ, আর ছেলে পাবে তিন ভাগের দুভাগ। আর ছেলে যদি একাই ওয়ারিশ হয়, তবে সমস্ত মাল সে একাই পেয়ে যাবে। কিন্তু তারা তথা সন্তানরা যদি নারীই হয় দুয়ের অধিক, তবে তাদের জন্য হবে তিনভাগের দুই অংশ ঐ মালের যা মৃত ব্যক্তি রেখে মারা গেছে। তেমনিভাবে মেয়ে দুজন হলেও দুই তৃতীয়াংশই পাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ– فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ অনুযায়ী দু-বোনের জন্য দুই তৃতীয়াংশ, সুতরাং দু-মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ উত্তমরূপে হবে। এছাড়া এক মেয়ে এক ছেলের সাথে এক তৃতীয়াংশের যখন মালিক হয় তখন এক মেয়ে আরেক মেয়ের সাথে উত্তমরূপে এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। কারো মতে, فَوْقَ اثْنَتَيْنِ -এর মধ্যে فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত। আরেক উক্তি মতে, মেয়েদের সংখ্যা বাড়ার সাথে অংশ বাড়ার ধারণা প্রতিহত করার জন্য فَوْقَ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ছেলের সাথে এক মেয়ে থাকাবস্থায় তার জন্য এক তৃতীয়াংশ সাব্যস্তকরণের দ্বারা দু-মেয়ের জন্য দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্তির কথা বোধ্য হয়েছে। আর মেয়ে যদি একজনই হয় এক কেরাত মতে وَاحِدَةٌ শব্দটি পেশের সাথে (وَاحِدَةٌ) পাঠ করা হয়েছে, তখন كَانَ টি হবে তাম্মাহ, নাকেসা নয়, তবে তার জন্য হবে অর্ধেক। আর মৃত ব্যক্তির পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক অংশ হবে, যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান তথা পুত্র বা কন্যা থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

وَنُكْتَةُ الْبَدَلِ إِفَادَةُ أَنَّهُمَا لَا يَشْتَرِكَانِ فِيْهِ وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْإِبْنِ وَبِالْأَبِ الْجَدُّ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَقَطْ أَوْ مَعَ زَوْجٍ فَلِأُمِّهِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَبِكَسْرِهَا فِرَارًا مِنَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ ضَمَّةٍ إِلَى كَسْرَةٍ لِثِقْلِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثُّلُثُ أَيْ ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ مَا يَبْقَى بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ أَيْ إِثْنَانِ فَصَاعِدًا ذُكُوْرًا أَوْ أَنَاثًا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ وَارِثُ مَنْ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ مِنْ بَعْدِ تَنْفِيْذِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ بِهَا أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَتَقْدِيْمُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَخَّرَةً عَنْهُ فِي الْوَفَاءِ لِلْإِهْتِمَامِ بِهَا اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَظَانٌّ أَنَّ ابْنَهُ أَنْفَعُ لَهُ فَيُعْطِيْهِ الْمِيْرَاثَ فَيَكُوْنُ الْأَبُ أَنْفَعُ وَبِالْعَكْسِ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ بِذٰلِكَ اللّٰهُ فَفَرَضَ لَكُمُ الْمِيْرَاثَ فَرِيْضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ حَكِيْمًا فِيْمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ أَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ.

أَبَوَيْهِ নাহবী তারকীব অনুযায়ী لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا থেকে বদল হয়েছে। আর বদল আনার রহস্য হলো একথা বুঝানো যে, মাতাপিতা ষষ্ঠাংশের মধ্যে যৌথভাবে শরিক নয়; [বরং প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ]। সন্তানের সাথে পুত্রের সন্তানদেরকেও, পিতার সাথে দাদাকেও যুক্ত করা হয়েছে। আর মৃত ব্যক্তির যদি সন্তান না থাকে এবং কেবল পিতামাতাই ওয়ারিশ হয় অথবা মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী থাকে তবে মাতা পাবে তিন ভাগের একাংশ (فلامه) -এর হামযা পেশের সাথে এবং যেরের সাথেও পাঠ হয়েছে উভয় ক্ষেত্রে। যেরের সাথে পঠিত হয়েছে পেশের পর যেরের দিকে প্রত্যাবর্তনের কাঠিন্য থেকে পরিত্রাণের জন্য। উল্লিখিতাবস্থায় পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হবে মাতার জন্য অথবা স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যা থাকবে তার তৃতীয়াংশ পাবে। আর অবশিষ্টাংশ পাবে পিতা। আর যদি তার তথা মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক ভাই অথবা বোন থাকে, তবে মাতার জন্য হবে ষষ্ঠাংশ আর অবশিষ্টাংশ পাবে পিতা এবং ভাই বা বোনদের জন্য কিছুই হবে না। উপরোল্লিখিত ওয়ারিশদের বর্ণিত উত্তরাধিকারের অংশসমূহ হবে অসিয়ত পালনের পর যা করে মারা গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর, যা মৃত ব্যক্তির উপর ছিল। يُوْصِي ক্রিয়াটি মা'রূফ ও মাজহুল উভয় রকমই পড়া হয়েছে। বিধানগতভাবে আদায়ের বেলায় ঋণের পর অসিয়ত পালন করা হলেও এখানে বর্ণনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদানের লক্ষ্যে অসিয়তকে ঋণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ মুবতাদা; তার খবর হলো لَا تَدْرُوْنَ । তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অধিকতর উপকারী হবে? তা তোমরা জান না। কেউ ধারণা করল, তার পুত্র তার জন্য অধিকতর উপকারী হবে। ফলে তাকে সে উত্তরাধিকার দান করার পর বাস্তবে তার পিতা তার জন্য অধিক উপকারী হয়ে যায় এবং এর বিপরীতও হতে পারে; বরং এ সম্পর্কে জ্ঞাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা, তাই তিনি তোমাদের জন্য উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এসব অংশ আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের জন্য যেসব অংশ নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে রহস্যবিদ। অর্থাৎ তিনি এ গুণে সর্বদা গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُوْصِي : إِيْصَاءٌ মাসদার থেকে মুজারে ওয়াহিদে মুজাক্কার গায়েবের সিগাহ। অর্থ তিনি অসিয়ত করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। অসিয়ত এর আসল অর্থ হচ্ছে ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে অসিয়ত ও নসিহত করা। অসিয়তের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে যেহেতু আল্লাহপাকের জন্য প্রয়োগ সম্ভব নয়, তাই গ্রন্থকার يُوْصِي -এর তাফসীর يَأْمُرُ দ্বারা করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ مَا تَرَكَ : إِنْ হরফে শর্ত। كُنَّ ফে'লে নাকিস, هُنَّ যমীর তার ইসিম نِسَاءً মাওসূফ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ সিফত। মাওসূফ সিফত মিলে খবরে كُنَّ। كُنَّ তার ইসিম ও তার খবর মিলে জুমলা হয়ে শর্ত। فَلَهُنَّ مَا تَرَكَ জবাবে শর্ত। শর্ত ও জবাবে শর্ত মিলে জুমলায়ে শর্তিয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفَوْقَ صِلَةٌ وَقِيْلَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ زِيَادَةِ النَّصِيْبِ الخ : এই ইবারতটি বৃদ্ধি করে গ্রন্থকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইকামতের জবাব দিয়েছেন। এ বাক্যটিতে দুটি জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফাররুদ বা একক মতটি হলো এই যে, তিনি বলেন, দুই তৃতীয়াংশ মেয়েরা তখনই পাবে যখন তারা দুয়ের অধিক হয়। অথচ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মত হলো এই যে, মেয়রা দুজন হলেও দুই তৃতীয়াংশ পাবে এবং দুইয়ের অধিক হলেও পাবে। তারা এই তাফাররুদের দুটি জবাব দিয়েছেন।

১. فَوْقَ শব্দটি صِلَةٌ হিসেবে অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ -এর মধ্যে فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় জবাব হলো এই যে, فَوْقَ শব্দটি একটি সম্ভাব্য সৃষ্ট ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা হলো এই যে, মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অংশও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কারণ তারা একজন হলে এক তৃতীয়াংশ পায়, দুইজন হলে দুই তৃতীয়াংশ, সুতরাং দুইয়ের অধিক হলেও তাদের অংশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে অথচ বাস্তবে বিষয়টি এ রকম ন। কারণ তারা দুইয়ের অধিক যতজনই হোক দুই তৃতীয়াংশই পাবে। আর এই সন্দেহটা যেহেতু فَوْقَ শব্দ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে তাই দ্বিতীয় জবাব হিসেবে বলে দিলেন যে, এই ধারণা দূর করার জন্য فَوْقَ শব্দ এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উত্তরাধিকার বিধান : لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الخ আয়াতের মধ্যে উত্তরাধিকারের সংরক্ষিত বিধান ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

জাহিলী যুগে উত্তরাধিকারের কারণ ছিল তিনটি। যথা–

১. বংশীয় সম্পর্ক। তবে বংশীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত লোকদের মধ্যেও কেবল তারাই ওয়ারিশ হতো, যারা স্বগোত্রের পক্ষে শত্রুদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার যোগ্যতা রাখত। অর্থাৎ সুস্থ যুবক পুরুষেরা কেবল ওয়ারিশ হতো। মৃত ব্যক্তির মহিলা, বাচ্চা ও দুর্বল আত্মীয়দেরকে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি থেকে অংশ দেওয়া হতো না।

২. تَبَنِّىْ বা কাউকে পালক পুত্র বানিয়ে নেওয়া। মৃত্যুর পর পোষ্য পুত্রও উত্তরাধিকারে অধিকারী হতো।

৩. অঙ্গীকার ও শপথ। অর্থাৎ একজন অপরজনকে বলে দিত আমার রক্ত তোমার রক্ত, আমার প্রাণ তোমার প্রাণ। আমার রক্ত বিনষ্ট হলে তোমার রক্তও বিনষ্ট হবে। আমি মারা গেলে তুমি হবে আমার ওয়ারিশ, আর তুমি মারা গেলে আমি হব তোমার ওয়ারিশ। আমার বদলে তুমি হবে পাকড়াও, আমি হবো তোমার বদলে। উভয়ে যখন পরস্পরে এরূপ অঙ্গীকার করে নিত তখন তারা উভয়ে একে অন্যের ওয়ারিশ হয়ে যেত। প্রথমে যে মারা যেত, দ্বিতীয়জন তার ওয়ারিশ হতো।

ইসলামের প্রথম যুগে পরস্পরে ওয়ারিশ হওয়ার কারণ ছিল দুটি। একটি ছিল হিজরত আর অপরটি ছিল ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। অর্থাৎ যখন কোনো সাহাবী হিজরত করে মদিনায় আসতেন তখন দ্বিতীয় মুহাজিরই তার ওয়ারিশ হতেন, যদিও তিনি তার আত্মীয় বা স্বজন না হতেন। আর গায়রে মুহাজির, মুহাজির ব্যক্তির ওয়ারিশ হতেন না, যদিও তিনি তার আত্মীয়ই হোক না কেন। আর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মর্ম হলো এই যে, হুজুর ﷺ যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করে আসলেন তখন তিনি দুই মুসলমানকে একজনকে অপরজনের ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। তারা উভয়ে পরস্পরে একে অন্যের ওয়ারিশ হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম অন্ধকার যুগের এবং ইসলামের প্রথম যুগের পরস্পরে ওয়ারিশ হওয়ার পদ্ধতিকে রহিত করে দিয়েছে। এবং ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি স্বরূপ তিনটি বস্তুকে সাব্যস্ত করেছে। ১. নসব বা বংশীয় সম্পর্ক তথা সন্তান ও জনক-জননী হওয়া। ২. বিবাহ অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী বিবাহ সম্পর্কের কারণে একে অন্যের ওয়ারিশ হয়ে থাকে এবং ৩. তৃতীয়টি হলো উলা বা দাস-দাসীকে স্বাধীন করা। যার ভিত্তিতে মালিক তার আজাদকৃত গোলাম বাঁদির, আর আজাদকৃত গোলাম বাঁদি তাদেরকে আজাদকারী মালিকের উত্তরাধিকারের ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ :

উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবী শাইবা, আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ ইবনে রবীর স্ত্রী হুজুর ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সাদ ইবনে রবীর দুটি কন্যা রয়েছে। আর তাদের পিতা রবী আপনার সঙ্গে ওহুদ যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছে এবং তার ত্যাজ্য সম্পত্তি সারাটাই তার চাচা নিয়ে নিয়েছে, তার কন্যাদেরকে কিছুই দেয়নি। আর অর্থ- সম্পদ ছাড়া তাদের বিয়ে-শাদীও হবে না। হুজুর ﷺ বললেন, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে ফয়সালা দিবেন। এর উপর উত্তরাধিকারের বিধান সম্বলিত يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ الخ আয়াতটি নাজিল হয়। এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর তিনি সা'আদের কন্যাদের চাচার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, সা'আদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ তার দুই মেয়েকে আর এক অষ্টমাংশ তার স্ত্রীকে দিয়ে দিবে আর বাকিটা তোমার জন্য হবে। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এটাই ইসলামের প্রথম মৃত্যের ত্যাজ্য সম্পত্তি, যা বণ্টন করা হয়েছে।

মেয়েদের অংশ : আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে দুই এর অধিক কন্যাদের অংশ বর্ণনা করেছেন। দুজন মেয়ের অংশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেননি। কারণ-

১. এর পূর্বে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ দ্বারা একথা জানা হয়ে গেছে যে, একজন ছেলের অংশ দুজন মেয়ের সমান। অর্থাৎ দুই তৃতীয়াংশ। এতে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দুই মেয়ের অংশ হবে দুই তৃতীয়াংশ।

২. এ ছাড়া এক ছেলের বর্তমানে যখন মেয়ের তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে দ্বিতীয় মেয়ের বর্তমানে তার জন্য উত্তমরূপে তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। কেননা পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের তুলনায় অধিক প্রাপ্তির অধিকার রাখে।

৩. শানে নুযূলের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুজুর ﷺ সা'আদের দুই মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহ পাক এক মেয়ে এবং তিন ও তিনের অধিক মেয়েদের হুকুম বর্ণনা করেছেন। তবে দুই মেয়ের হুকুম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। কিন্তু বোনদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দু বোনের দুই তৃতীয়াংশের কথা বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

اِنِ امْرُءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ـ

সুতরাং দু'বোনের অংশ যখন দুই তৃতীয়াংশ হলো তখন দু মেয়ের অংশ উত্তমরূপে দুই তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। কেননা মৃতের মেয়েরা মৃতের বোনদের তুলনায় নিকটতম।

মোটকথা দুই মেয়ের দুই তৃতীয়াংশ হওয়াটা পূর্বের আয়াত দ্বারা জানা হয়ে গিয়েছিল। এখানে সন্দেহ ছিল যে, যদি কারো তিন মেয়ে থাকে তবে হয়তো তাদের তিন তৃতীয়াংশ অর্থাৎ পূর্ণ সম্পদই মিলে যাবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এই সন্দেহের অবসানকল্পে বলে দিয়েছেন যে, মেয়েরা দুয়ের অধিক হলেও তাদের অংশ দুই তৃতীয়াংশ হতে বৃদ্ধি পাবে না।

পিতা-মাতার মিরাছী স্বত্ব : وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ এখানে পিতা-মাতার অংশের তিনটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

১. মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার সাথে যদি তার ছেলেমেয়েরাও থাকে তবে এ অবস্থায় মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মাতা-পিতা প্রত্যেকেই ষষ্ঠাংশ করে পাবে।

২. মৃত ব্যক্তির ছেলে-মেয়েও নেই এবং ভাই-বোনও নেই শুধু তার মাতা-পিতা রয়েছে। এমতাবস্থায় তার মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ আর পিতা পাবে অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ।

৩. তৃতীয় অবস্থা হলো এই যে, মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতার সাথে মৃতের ছেলে-মেয়ে নেই, তবে তার একাধিক ভাই-বোন রয়েছে, চায় সহোদর ভাই হোক বা বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয় হোক। এমতাবস্থায় মাতা পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ আর বাকি পুরোটা পেয়ে যাবে পিতা; এমতাবস্থায় ভাই-বোনেরা কিছুই পাবে না।

ওয়ারিশগণের এ পর্যন্ত যেসব অংশ বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবই মৃতব্যক্তির অসিয়ত পালন করার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে প্রথমে তার কাফন-দাফনের কাজ সারা যাবে, অতঃপর ঋণ পরিশোধ করা হবে, তার এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে অসিয়ত আদায় করা হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

١٢. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ مِنْكُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ـ وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ فِيْ ذٰلِكَ
وَلَدُ الْاِبْنِ بِالْاِجْمَاعِ وَلَهُنَّ أَيِ الزَّوْجَاتِ تَعَدَّدْنَ
أَوْلَا الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوْصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَوَلَدُ الْاِبْنِ كَالْوَلَدِ فِيْ
ذٰلِكَ إِجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ صِفَةٌ
وَالْخَبَرُ كَلٰلَةً أَيْ لَا وَالِدَ لَهٗ وَلَا وَلَدَ أَوِ امْرَأَةٌ
تُوْرَثُ كَلٰلَةً وَلَهٗ أَيْ لِلْمَوْرُوْثِ الْكَلَالَةِ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ أَيْ مِنْ أُمٍّ وَقَرَأَ بِهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرُهٗ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ فَإِنْ
كَانُوْا أَيِ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ أَكْثَرَ مِنْ
ذٰلِكَ أَيْ مِنْ وَاحِدٍ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ
يَسْتَوِيْ فِيْهِ ذُكُوْرُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ حَالٌ مِنْ
ضَمِيْرِ يُوْصٰى أَيْ غَيْرَ مُدْخِلِ الضَّرَرِ عَلَى
الْوَرَثَةِ بِأَنْ يُّوْصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَصِيَّةً
مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِيُوْصِيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِمَا دَبَّرَهٗ لِخَلْقِهٖ مِنَ الْفَرَائِضِ حَلِيْمٌ
بِتَاخِيْرِ الْعُقُوْبَةِ عَمَّنْ خَالَفَهٗ وَخَصَّتِ
السُّنَّةُ تَوْرِيْثَ مَنْ ذُكِرَ بِمَنْ لَيْسَ فِيْهِ مَانِعٌ
مِنْ قَتْلٍ أَوْ اخْتِلَافِ دِيْنٍ أَوْ رِقٍّ ـ

অনুবাদ :

১২. আর তোমাদের স্ত্রীদের ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক হবে তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, তোমাদের তরফ থেকে বা অন্য কোনো স্বামীর তরফ থেকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়– অসিয়তের পর যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর এ হুকুমের মধ্যে সন্তানের সাথে পুত্রের সন্তানদেরকেও মিলিত করা হয়েছে ইজমা দ্বারা। আর স্ত্রীদের জন্য চাই একাধিক হোক বা না হোক এক চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির যা তোমরা ছেড়ে যাও, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাদের তরফ থেকে হোক বা অন্য স্ত্রীর তরফ থেকে হোক, তবে তাদের জন্য হবে অষ্টমাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও অসিয়তের পর যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। এ হুকুমে ছেলের সন্তানরা আপন সন্তানের ন্যায় হবে ইজমা দ্বারা। আর যদি কোনো [মৃত] পুরুষ বা মহিলা কালালা তথা এমন ব্যক্তি হয় যার পিতা-পুত্র না থাকে এবং এ মৃতের বৈমাত্রেয় একভাই বা বোন থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির। وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ -এর মধ্যে يُّوْرَثُ বাক্যটি رَجُلٌ -এর সিফত হয়েছে। [মাওসূফ সিফত মিলে كَانَ -এর ইসিম] আর كَلٰلَةً তার খবর। এখানে ভাই-বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রমুখের কেরাতে وَلَهٗ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ রয়েছে। আর বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন, যদি একাধিক হয়, তবে তারা এক তৃতীয়াংশে শরিক হবে এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। অসিয়তের পর, যা করা হয় অথবা ঋণ পরিশোধের পর। এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। غَيْرَ مُضَآرٍّ তারকীবে يُوْصٰى -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। অর্থাৎ ওয়ারিশদেরকে ক্ষতি সাধনকারী না হয়ে। যেমন– এক তৃতীয়াংশেরও অধিক সম্পদ অসিয়ত করে। এটি আল্লাহর আদেশ। وَصِيَّةً শব্দটি يُوْصِيْكُمْ ফে'লের মাফউলে মুতলাক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাঁর বান্দাদের জন্য উত্তরাধিকার বিধান নির্ধারণে সহনশীল তাঁর বিরুদ্ধাচারণকারীদের থেকে শাস্তি পিছিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে। উল্লিখিত উত্তরাধিকার বিধান তাদের জন্যই প্রযোজ্য বলে সুন্নতে রাসূল খাস করে দিয়েছে, যাদের মধ্যে উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে। যেমন– হত্যা, ধর্মবিরোধ, গোলাম ও বাঁদি হওয়া।

http://islamiboi.wordpress.com

١٣. تِلْكَ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ مِنْ اَمْرِ الْيَتٰمٰى وَمَا بَعْدَهُ حُدُوْدُ اللّٰهِ شَرَائِعُهُ الَّتِىْ حَدَّهَا لِعِبَادِهٖ لِيَعْمَلُوْا بِهَا وَلَا يَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فِيْمَا حَكَمَ بِهٖ يُدْخِلْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ اِلْتِفَاتًا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

১৩. এসব এতিমদের বিষয়াদি ও তার পরবর্তী বিধানসমূহ আল্লাহ তা'আলার নির্দিষ্ট সীমাসমূহ তথা শরিয়তের বিধানসমূহ যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে তারা এর উপর আমল করে এবং এর সীমালঙ্ঘন না করে। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ঐসব বিষয়ে যার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, তাকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত রয়েছে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। يُدْخِلْهُ ইয়া ও নূনের সাথে, নূনের সুরতে গায়েব থেকে মুতাকাল্লিমের দিকে এলতেফাত হবে। আর এটাই বিরাট সাফল্য।

١٤. وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ بِالْوَجْهَيْنِ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ فِيْهَا عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ اِهَانَةٍ وَرُوْعِىَ فِى الضَّمَائِرِ فِى الْاٰيَتَيْنِ لَفْظُ مَنْ وَفِىْ خٰلِدِيْنَ مَعْنَاهَا .

১৪. আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমাসমূহ অতিক্রম করে তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। نُدْخِلْهُ -এর মধ্যে পূর্বের ন্যায় দুই সুরত হবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্য সেখানে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। উল্লিখিত আয়াত দ্বয়ের উভয়টির মধ্যেই যমীরসমূহে مَنْ শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আর خٰلِدِيْنَ -এর মধ্যে مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

كَلٰلَة [কালালা]-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত কালালার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

১. তবে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, যার ঊর্ধ্বতন পুরুষ যেমন– পিতা, দাদা বা পরদাদাও নেই এবং অধঃস্তন পুরুষ যেমন– ছেলে বা নাতিও নেই– এ রকম মৃত ব্যক্তিকে কালালা বলা হয়।
২. ঐ ওয়ারিশ যার ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন লোকেরা তথা পিতা, দাদা ও ছেলে, নাতি নেই, তাকে কালালা বলা হয়।
৩. ঐ ত্যাজ্য সম্পত্তি যা পুত্র ও পিতাবিহীন মৃত ব্যক্তি রেখে যায়, সেটাকে কালালা বলা হয়।

كَلَالَة আসলে كَلَالٌ -এর ন্যায় মাসদার। كَلَالٌ -এর অর্থ হলো শ্রান্ত ও ক্লান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে কালালা বলা হয়েছে। কেননা এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল। বলা হয় যে– كَلَّ الرَّجُلُ فِىْ مَشْيِهٖ كَلَالًا অর্থাৎ লোকটি তার চলার গতিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্লান্ত হয়ে গেছে। كَلَّ السَّيْفُ عَنْ ضَرْبَتِهٖ كُلُوْلًا وَكَلَالَةً অর্থাৎ তলোয়ার ভোঁতা হয়ে গেছে। كَلَّ اللِّسَانُ عَنِ الْكَلَامِ অর্থাৎ, জবান কথা বলতে অপারগ হয়ে গেছে। রূপক অর্থে কালালা দ্বারা ঐ আত্মীয়তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যাদের পরস্পরে পিতা– পুত্রের সম্পর্ক হয় না। অতঃপর কালালাকে যুল কালালার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর তা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য যার আসলও নেই অর্থাৎ বাপ-দাদাও নেই এবং নসলও নেই অর্থাৎ ছেলে বা নাতিও নেই। এমন ব্যক্তি চায় মৃত হোক বা কারো ওয়ারিশ হোক।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৫১৬, মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৩৬১]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বামী-স্ত্রীর ওয়ারিশী স্বত্ব : (الاية) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ আলোচ্য আয়াতটিতে স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর প্রত্যেকেরই দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

১. মৃত ব্যক্তি যদি স্ত্রী হয় আর তার কোনো সন্তান না থাকে তবে এ অবস্থায় তার স্বামী তার স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২. আর যদি স্ত্রীর সন্তান থাকে তাহলে এক অষ্টমাংশ পাবে। –[মা'আরিফে ইদ্রীসিয়া খ. ২, পৃ. ১৫১–৫৫]

বৈপিত্রেয় ভাইবোনের অংশ :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ الخ. আলোচ্য আয়াতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাই-বোন তিন প্রকার। যথা– ১. সহোদর ২. বৈমাত্রেয় অর্থাৎ পিতা এক তবে মাতা ভিন্ন ভিন্ন এবং ৩. বৈপিত্রেয় অর্থাৎ তাদের মাতা এক, তবে পিতা ভিন্ন ভিন্ন। আলোচ্য তৃতীয় প্রকার ভাই-বোনদের অংশের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– হযরত ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কা'আব, সা'আদ বিন আবী আক্কাস (রা.) প্রমুখের কেরাতে وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ এর পরে مِنَ الْأُمِّ -এর কথা উল্লেখ রয়েছে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরাই যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় তবে তারা একজন হলেও এক তৃতীয়াংশ পাবে। আর একাধিক হলেও সকলে মিলে এক তৃতীয়াংশ পাবে। কারণ বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা তাদের মাতার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির দিকে সম্পৃক্ত হয়। আর মাতা যেহেতু এক তৃতীয়াংশের অধিক পাবে না, তাই তারাও কেবল তাদের মাতার অংশেরই অধিকারী হবে। এই জন্যই এখানে নারী–পুরুষ উভয়কে সমান রাখা হয়েছে। মিরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী অংশ।

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে তিনবার অসিয়তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির কাফন–দাফনের খরচের পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে তার কৃত অসিয়ত আদায় করা যাবে। এর অধিক হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তার অসিয়ত বাতিল বলে বিবেচিত হবে। বিধানগত দিক দিয়ে ঋণ পরিশোধ অসিয়তের পূর্বে হলেও এখানে অসিয়তের গুরুত্ব প্রদানের জন্য অসিয়তকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলা : কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েজ নয়। যদি কেউ তার ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করে নেয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তার জন্য মিরাসী স্বত্বই যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের খুৎবায় ইরশাদ করেছেন– إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعْطٰى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ আল্লাহ পাক প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, অন্যান্য ওয়ারিশগণ যদি অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে অসিয়ত কার্যকর হয়ে যাবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি শরয়ী বিধান মোতাবেক বণ্টন করা হবে, যাতে সে ও তার মিরাসি স্বত্ব পাবে।

غَيْرَ مُضَارٍّ -এর ব্যাখ্যা : এর মর্ম হলো এই যে, মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির জন্য অসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে নিজের [illegible]কে ক্ষতি পৌঁছানো জায়েজ নেই। অসিয়ত বা ঋণের মাধ্যমে ক্ষতি পৌঁছানোর বিভিন্ন সূরত হতে পারে। যেমন– [illegible] ঋণের কথা স্বীকার করে নেওয়া বা নিজের ব্যক্তিগত সম্পদকে আমানতের মাল স্বীকার করা যে, এটা অমুকের [illegible]। যাতে করে তাতে মিরাসি স্বত্ব চলতে না পারে অথবা এক তৃতীয়াংশ মালের অধিক সম্পদের অসিয়ত করা। অথবা [illegible] ব্যক্তির উপর তার ঋণ পাওনা রয়েছে। কিন্তু সে বলে দিল যে, আদায় হয়ে গেছে ইত্যাদি। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬০৭]

قَوْلُهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ [illegible] : এতে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তথা বিধি-নিষেধ লঙ্ঘনকারীদের জন্য [illegible] করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٥. وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ الزِّنَا مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ اَيْ مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ شَهِدُوْا عَلَيْهِنَّ بِهَا فَاَمْسِكُوْهُنَّ اِحْبِسُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَامْنَعُوْهُنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَيْ مَلٰئِكَتُهُ اَوْ اِلٰى اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَى الْخُرُوْجِ مِنْهَا اُمِرُوْا بِذٰلِكَ اَوَّلَ الْاِسْلَامِ ثُمَّ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيْلًا بِجَلْدِ الْبِكْرِ مِائَةً وَتَغْرِيْبِهَا عَامًا وَرَجْمِ الْمُحْصَنَةِ وَفِي الْحَدِيْثِ لَمَّا بَيَّنَ الْحَدَّ قَالَ ﷺ خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জ কাজ তথা ব্যভিচার করে তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চারজন মুসলমান পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, লোকদের সাথে তাদের মিলামেশা করা হতে বিরত রাখ। যে পর্যন্ত তাদেরকে মৃত্যু তথা মৃত্যুর ফেরেশতাগণ তুলে না নেয়। অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ নির্ধারিত না করেন। এ হুকুমটি ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। অতঃপর তাদের এরূপ পথ নির্ধারণ করেছেন যে, কুমারী হলে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন আর বিবাহিতা হলে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। হাদীস শরীফে এসেছে যে, যখন হদ্দ বা ব্যভিচারের দণ্ডবিধি বর্ণনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের জন্য পথ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন।

١٦. وَالَّذٰنِ بِتَخْفِيْفِ النُّوْنِ وَتَشْدِيْدِهَا يَأْتِيٰنِهَا اَيِ الْفَاحِشَةَ الزِّنَا وَاللِّوَاطَةَ مِنْكُمْ اَيْ مِنَ الرِّجَالِ فَاٰذُوْهُمَا بِالسَّبِّ وَالضَّرْبِ بِالنِّعَالِ فَاِنْ تَابَا مِنْهَا وَاَصْلَحَا الْعَمَلَ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا وَلَا تُؤْذُوْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا عَلٰى مَنْ تَابَ رَحِيْمًا بِهِ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِالْحَدِّ اِنْ اُرِيْدَ بِهِ الزِّنَا وَكَذَا اِنْ اُرِيْدَ بِهَا اللِّوَاطَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (رحـ) لٰكِنَّ الْمَفْعُوْلَ بِهِ لَا يُرْجَمُ عِنْدَهُ وَاِنْ كَانَ مُحْصَنًا بَلْ يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ

১৬. وَالَّذٰنِ-এর নূনটি জযম ও তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। আর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে যে দুজন সেই কুকর্মে তথা ব্যভিচারে বা সমকামিতায় লিপ্ত হয়, তাদের উভয়কে শাস্তি দাও ভর্ৎসনা ও জুতা দ্বারা প্রহার করে। অতঃপর যদি তারা উভয়ে এ কুকর্ম থেকে তওবা করে নেয় এবং আমল সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের পেছনে পড়ো না এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীর তওবা গ্রহণকারী এবং তার প্রতি অতিশয় দয়ালু। এ হুকুমটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, হদের দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। এ কুকর্ম দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্য হোক অথবা সমকামিতা উদ্দেশ্য হোক। তবে তাঁর মতে, যার সঙ্গে এ কুকর্ম হয়েছে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা যাবে না যদিও সে বিবাহিত হয়; বরং তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে এবং নির্বাসন দেওয়া যাবে।

http://islamiboi.wordpress.com

وَاِرَادَةُ اللِّوَاطَةِ اَظْهَرُ بِدَلِيْلِ تَثْنِيَةِ الضَّمِيْرِ وَالْاَوَّلُ قَالَ اَرَادَ الزَّانِيْ وَالزَّانِيَةَ وَيَرُدُّهُ تَبْيِيْنُهُمَا بِمِنَ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيْرِ الرِّجَالِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِي الْاَذٰى وَالتَّوْبَةِ وَالْاِعْرَاضِ وَهُوَ مَخْصُوْصٌ بِالرِّجَالِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الْحَبْسِ۔

তবে সমকামিতা উদ্দেশ্য হওয়াটাই অধিকতর স্পষ্ট। কারণ আয়াতের (اَلَّذَانِ) -এর মধ্যে দ্বিবচনের সর্বনাম পদ এসেছে। আর প্রথম মত পোষণকারী [অর্থাৎ কুকর্ম দ্বারা ব্যভিচার উদ্দেশ্যকারী] উক্ত দ্বিবচন দ্বারা ব্যভিচার ও ব্যভিচারিণী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু مِنْ শব্দটিকে পুংবাচক ضَمِيْر বা সর্বনাম (كُمْ) -এর সাথে ব্যবহার করা এবং শাসন, তওবা, উপেক্ষা ইত্যাদি শাস্তির ক্ষেত্রে উভয়কে এক করা তাদের ঐ অর্থ প্রত্যাখ্যান করে। কেননা এ ধরনের শাস্তি তখন কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যেই ছিল নির্দিষ্ট। কারণ মহিলাদের হুকুম গৃহবন্দী হওয়ার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

১৭. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ اَيِ الَّتِيْ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ قَبُوْلَهَا بِفَضْلِهٖ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ الْمَعْصِيَةَ بِجَهَالَةٍ حَالٌ اَيْ جَاهِلِيْنَ اِذْ عَصَوْا رَبَّهُمْ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ زَمَنٍ قَرِيْبٍ قَبْلَ اَنْ يُغَرْغِرُوْا فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِيْ صُنْعِهٖ بِهِمْ۔ ١٧

১৭. আল্লাহর জন্য তওবা কবুল করাই জরুরি যা তিনি স্বীয় অনুগ্রহে নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছেন। ঐ সব লোকদের তওবা যারা ভুলবশত মন্দকাজ গুনাহ করে ফেলে। بِجَهَالَةٍ তারকীবে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ স্বীয় প্রভুর নাফরমানি কালে তারা মূর্খতাই করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে হলকুমে দম আসার পূর্বে তওবা করে ফেলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবাকে কবুল করে নেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অতীব অবহিত, তাদের প্রতি ব্যবহারে প্রজ্ঞাবান।

১৮. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ الذُّنُوْبَ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَاَخَذَ فِي النَّزْعِ قَالَ عِنْدَ مُشَاهَدَةِ مَا هُوَ فِيْهِ اِنِّيْ تُبْتُ الْئٰنَ فَلَا يَنْفَعُهُ ذٰلِكَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اِذَا تَابُوْا فِي الْاٰخِرَةِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا اَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا۔ ١٨

১৮. এবং তাদের জন্য তওবা নেই যারা মন্দকাজ ও গুনাহের কাজসমূহ করে যেতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায় এবং প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন ঐ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বলে আমি এখন তওবা করেছি। তখন তার তওবা কোনো উপকারে আসবে না এবং কবুলও হবে না। আর তাদের জন্যও তওবা নেই যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, যখন আখেরাতে আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় তওবা করবে তখন তাদের সেই তওবা কবুল করা হবে না। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

وَالّٰتِىْ শব্দটি اَلَّتِىْ-এর বহুবচন। আরবিগণ এর বহুবচনে কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন-
اَللَّوَاتُ ـ اَللَّوَاتِىْ ـ اَللَّاتُ ـ اَللَّاتِىْ

اَلْفَاحِشَةُ মন্দকথা বা কাজ। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেছেন, ওলামাদের ঐকমত্যে এখানে ফাহেশা বলতে ব্যভিচার উদ্দেশ্য। ব্যভিচার অনেক মন্দকাজের উপর অধিকতর মন্দ হওয়ার কারণে তার উপর ফাহেশা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কুফর, শিরক ও হত্যা এর চাইতেও জঘন্যতম মন্দকাজ, কিন্তু তার উপর তো ফাহেশা শব্দ ব্যবহার করা হয়নি তার কারণ কি? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, মানবদেহের চালিকা শক্তি তিনটি। যথা- ১. কথনশক্তি, ২. ক্রোধশক্তি ও ৩. কামশক্তি। কথনশক্তি নষ্ট হওয়ার দ্বারা কুফর, বিদআত প্রভৃতি সৃষ্ট হয়ে থাকে। ক্রোধশক্তি নষ্ট হলে হত্যা প্রভৃতি সংঘটিত হয়ে থাকে, আর কাম বা যৌনশক্তি ফাসেদ হলে ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি মন্দকাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং যৌনশক্তির ফাসেদ হওয়াটা নিকৃষ্টতম ফসাদ হলো। বিধায় ব্যভিচারকে ফাহেশার সাথে খাস করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِجَهَالَةٍ : জাহালত বা মূর্খতার কয়েকটি অর্থ রয়েছে-

১. যে কোনো পাপ কাজ মূর্খতা বা জাহালত। এ হিসেবে প্রত্যেক পাপী গুনাহগারই জাহেল মূর্খ হবে। কেননা গুনাহগার যদি তার ইলম বা ছওয়াব ও শাস্তির ইলম ও জ্ঞানকে ব্যবহার করত তবে গুনাহ করতে অগ্রসর হতো না। এ অর্থানুযায়ী জেনে বা না জেনে যে কোনো অবস্থায় গুনাহ করলে তাকে মাসিয়াত বলা যাবে।

২. জাহালতের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, গুনাহকে গুনাহ জেনে তবে তার শাস্তির পরিমাণ না জেনে করাকে জাহালত বলে।

৩. জাহালতের তৃতীয় ব্যাখ্যা হলো, গুনাহকে গুনাহ জানার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না জেনে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া।

-[তাফসীরে কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাজিল হওয়ার প্রেক্ষিতে وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ আয়াতটি পূর্বে وَالَّذٰنِ يَأْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ পরে নাজিল হয়েছে। জমহুর বা অধিকাংশ ওলামাদের মতে وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ আয়াতটি বিবাহিতা মহিলার জেনা বা ব্যভিচারের হুকুম সম্পর্কে আর দ্বিতীয় আয়াতটি অবিবাহিত ও অবিবাহিতার ব্যভিচারের হুকুম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর وَالَّذٰنِ ও مِنْكُمْ পুংলিঙ্গবোধক শব্দ تَغْلِيْب-এর কায়দার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন চন্দ্র, সূর্য উভয়টাকে একত্রে قَمَرَيْنِ বলা হয়। এতে চন্দ্রকে সূর্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে قَمَرَيْنِ বলা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে এখানে মহিলাদেরকে পুরুষদের অনুগামী করে তাদের উপর পুরুষদেরকে তাগলীব তথা প্রাধান্য দিয়ে اَلَّذٰنِ ও مِنْكُمْ পুংলিঙ্গবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ তাগলীবের ব্যবহার আরবি ভাষায় বহুল প্রচলিত রয়েছে। যেমন- عُمَرَيْنِ ـ اَبَوَيْنِ ইত্যাদি।

প্রথম আয়াতে হাকিম ও বিচারকদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, বিবাহিতা মহিলারা যদি ব্যভিচার করে তবে তাদের উপর চারজন স্বাধীন, আদেল ও মু'মিন পুরুষ সাক্ষী তলব কর। মহিলাদের সাক্ষ্য জেনার বেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। কঠোরতা অবলম্বনের জন্য চারজন সাক্ষী হওয়ার শর্ত লাগানো হয়েছে। অতঃপর যথারীতি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাদের শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে গৃহে আবদ্ধ করে রাখ। এমন যেন গৃহটাই তাদের জন্য কারাগার। অতঃপর হয়তো তারা গৃহবন্দী থাকতে থাকতে মারা যাবে অথবা আল্লাহ তা'আলা শরয়ী দণ্ডবিধান নাজিল করে তাদেরকে গৃহবন্দী থেকে মুক্তির পথ নির্ধারণ করে দিবেন। জেনার শাস্তির হুকুম নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা আমার কাছ থেকে পথ নিয়ে নাও। এ হাদীসে তিনি বলেছেন, বিবাহিতার জন্য একশত বেত্রাঘাতসহ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, অবিবাহিতার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন। আয়াতে উল্লিখিত বিধানটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগে। অতঃপর তা রহিত হয়ে গেছে। কারো মতে, রহিতকারী দলিল হলো আলোচ্য হাদীস। আবার কারো মতে, সূরা নূরের আয়াত- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ الخ

http://islamiboi.wordpress.com

তবে আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি; বরং অরহিতাবস্থায়ই বাকি রয়েছে। তবে আয়াতে জেনার শাস্তির বিবরণটি অস্পষ্ট ছিল, বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে ছিল। আর হাদীস বা সূরা নূরের আয়াত ব্যাখ্যা হিসেবে এসেছে।

–[রুহুল মা'আনী খ. ২, পৃ. ২৩৪-৩৫]

দ্বিতীয় আয়াত وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا الخ -এর মধ্যে বলা হয়েছে অবিবাহিত ও অবিবাহিতা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে কষ্ট পৌঁছানো। তবে সেই কষ্ট পৌঁছানোর বিশেষ কোনো পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। শাসকবর্গের বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে তাদেরকে কষ্ট পৌঁছানোর অর্থ হচ্ছে, মৌখিকভাবে লজ্জা-শরম দেওয়া এবং কার্যতভাবে শাসনের উদ্দেশ্যে জুতা ইত্যাদি দ্বারা কিছু প্রহার করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এ উক্তিটা উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে। আসল হুকুম এটাই যে, এ বিষয়টা বিচারকদের বিবেচনাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে তাও হদ্দের বিধান নাজিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে।

উভয় আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার মর্ম : জমহুরের মতে, প্রথম আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার অর্থ হলো বিবাহিতা মহিলাদের ব্যভিচার, আর দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার অর্থ হচ্ছে অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলার ব্যভিচার। পক্ষান্তরে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, প্রথম আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার মর্ম হচ্ছে বিবাহিতা মহিলাদের জেনা, আর দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত ফাহেশার অর্থ হচ্ছে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা।

আবূ মুসলিম ইস্পাহানী বলেন, প্রথম আয়াতে উল্লিখিত ফাহেশার অর্থ হলো মহিলায় মহিলায় সমকামিতা করা। আর দ্বিতীয় আয়াতে বিবৃত ফাহেশার মর্ম হলো, পুরুষে পুরুষে সমকামিতা বা লিওয়াতাত করা।

জমহুর বলেন, পুরুষদের ও নারীদের সমকামিতার কথা এখানে উল্লিখিত না হলেও জেনার হুকুমের উপর কিয়াস করে তা জেনে নেওয়া সম্ভব রয়েছে। যেরূপ শরিয়তের মধ্যে নবীযের ও দাদার হুকুম কিয়াসের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সব কথা তো আর কুরআনে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়নি; বরং অনেকটাই শরয়ী কিয়াসের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথবা বলা যাবে, দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত ফাহেশার মর্মের মধ্যে জেনার সাথে লিওয়াতাত ও মহিলাদের সমকামিতাও শামিল রয়েছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে সুয়ূতী (র.) الأَظْهَرُ الخ ইবারতে ফাহেশা দ্বারা লিওয়াতাত উদ্দেশ্য হওয়াটাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলাটা সঠিক হয়নি। আর ইস্পাহানীর উক্তি তো মোটেই ঠিক হতে পারেনি। কারণ নবীর যুগের পর সাহাবাদের মধ্যে যখন সমকামিতার শাস্তির প্রশ্ন উত্থাপিত হলো তখন তারা কিয়াসানুযায়ী বিভিন্ন রকম মত পেশ করেছেন। তাদের মধ্যে কেউই একথা মনে করেনি যে, সমকামিতার বিধান সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। যদি তা হতো তবে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার প্রশ্নই আসত না।

–[রুহুল মা'আনী খ. ৪, পৃ. ২৩৭, জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬১২-১৩, সাবী খ. ১, পৃ. ২০৯]

সমকামিতার বিধান :

১. সমকামীদের উপর ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, হদ আসবে না তা'যীর অর্থাৎ যুগের হাকিম বা শরয়ী বিচারকদের বিবেচনা মোতাবেক তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাবে। তাঁরা তাদের অবস্থানুযায়ী শাস্তি প্রদান করবেন। তবে জেনার শাস্তির ন্যায় তাতে হদ আসবে না। কারণ কিতাবুল্লাহতে কেবলমাত্র কষ্ট পৌঁছানোর কথা এসেছে। তাই খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কিতাবুল্লাহর উপর বর্ধন বা পরিবর্তন ঠিক হবে না। এছাড়া লিওয়াতাত বা সমকামিতা জেনার মতোও নয়। কারণ সন্তান না হওয়ার দরুন নসবের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটারও আশঙ্কা থাকে না এবং ব্যভিচারের ন্যায় উভয়ের তরফ থেকে খাহেশও হয় না। কেননা জেনাতে যেমন মাফউলের পূর্ণ খাহেশ হয়, তা সমকামিতাতে হয় না। সুতরাং এতে জেনার হদ বা সুনির্ধারিত শাস্তি আসতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী এবং ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর মতানুসারে তাদের উভয়কে জেনার হদ লাগানো যাবে। অর্থাৎ অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর এছাড়া আরো কয়েকটি উক্তি রয়েছে।

বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক উভয়বস্থায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। হত্যার পদ্ধতির মধ্যেও আবার তাঁর থেকে বিভিন্ন রকম মত বর্ণিত হয়েছে। তাঁর এক বর্ণনা মতে উভয়কে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হবে। আরেক বর্ণনা মতে, বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা সর্বাবস্থায় প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) তাঁর এ বর্ণনার সাথেই মত পোষণ করেছেন। তাঁর আরেক বর্ণনা মতে, সমকামীর উপর দেয়াল ফেলিয়ে হত্যা করা হবে। আরেকটি বর্ণনা মতে, পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা যাবে। এতে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মাযহাবও জানা হয়ে গেল।

http://islamiboi.wordpress.com

৩. ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.) -এর মত হলো, তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে– বিবাহিত হোক বা অবিবাহিতা হোক।

তাঁদের দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে– فَارْجُمُوا الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ অর্থাৎ উপরের ও নীচের উভয় ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর।

হযরত আবূ হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত হাদীসও তাঁদের দলিল– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَارْجُمُوا الْاَعْلٰى وَالْاَسْفَلَ অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা হযরত লূত (আ.) -এর সম্প্রদায়ের ন্যায় আমল করবে তাদের উপর ও নীচের উভয়কে প্রস্তারাঘাতে হত্যা কর। এছাড়া দলিলে আকলী হিসেবে তারা বলেন, লিওয়াতাতও জেনার মতো। কারণ তাতে সন্তান আশঙ্কামুক্তির দরুন খাহেশ আরো বেশি হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বিপরীত মত পোষণকারী ইমামগণের দলিলের জবাব :

১. বর্ণিত হাদীসগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল, তাই হদের মতো বিধান যা সামান্যতম সন্দেহ আসলেই বিদূরিত হয়ে যায় তা প্রমাণের জন্য এসব দুর্বল খবরে ওয়াহিদ যথেষ্ট নয়।

২. অথবা বলা যাবে, যারা হালাল মনে করে সমকামিতা করে তাদের বেলায় এসব বর্ণনা প্রযোজ্য।

৩. অথবা বলা যাবে, যারা এ সমস্ত রুচি বিবর্জিত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য سِيَاسَة হত্যা বা রজমের নির্দেশ দিয়েছিলেন– হদ হিসেবে নয়। আর ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের এ রকম করার অধিকার রয়েছে।

তাঁদের আকলী দলিলের জবাব হলো, সমকামিতা ব্যভিচারের মতো নয়। কারণ তাতে ফায়েলের খাহেশ হলেও মাফউলের খাহেশ হয় না, তাই তাতে হদ আসবে না। যদি তাতে হদ তথা সুনির্ধারিত শাস্তি হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর সাহাবীদের মধ্যে এর শাস্তির ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেওয়ার অবকাশ ছিল না। অথচ তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কারো মতে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করে ফেলা। আবার কারো মতে, উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে, অতঃপর পাথর মেরে হত্যা করা ইত্যাদি। যদি জেনার ন্যায় তাতে হদ আসত তবে তাদের মধ্যে এর শাস্তির ব্যাপারে এ রকম মতবিরোধ দেখা দিত না। এতে বুঝা যাচ্ছে এটা জেনার মতো নয়, তাই এতে জিনার শাস্তি হদও আসবে না; বরং তাতে তা'যীর আসবে। অর্থাৎ যুগের ইসলামি সরকারের কাজি বা বিচারকের বিবেচনা মোতাবেক তাদের অবস্থানুসারে শাস্তি প্রদান করা হবে। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ২, পৃ. ৫৩৫–৩৭, হেদায়া বেনায়া সমেত খ. ৬, পৃ. ৩০৮ –১১]

قَوْلُهُ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ الخ : পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তওবা করে নেয় এবং নিজেদের আমল সংশোধন করে নেয় তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আলোচ্য আয়াতে তওবা কবুলের শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে যারা নফসের ধোঁকায়, শয়তানের প্ররোচনায়, গুনাহের পরিণতি ও পারলৌকিক শাস্তি থেকে গাফেল হয়ে পাপ কাজ করে নেয়, অতঃপর অনতিবিলম্বে অর্থাৎ মওতের ফেরেশতা দেখার পূর্বে প্রাণবায়ু গলায় আসার আগে আগে তওবা করে নেয়, আল্লহর জন্য তাদের সেই তওবা কবুল করে নেওয়া স্বীয় করুণায় ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে অন্তিম অবস্থায় পৌঁছে গেলে মৃত্যুর ফেরেশতার চেহারা দেখে নেওয়ার পর, কারো কোনো তওবা কবুল হবে না। মৃত্যু যেহেতু নিশ্চিত আর নিশ্চিত বিষয় দূরে হলেও নিকটেই হয়ে থাকে। তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আয়াতে কারীমাতে مِنْ قَرِيْبٍ নিকটবর্তী সময় বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে– اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهٖ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ অর্থাৎ অন্তিম অবস্থায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।

তবে আল্লামা শায়খুল হিন্দ (র.) বলেন, جَهَالَة ও مِنْ قَرِيْبٍ শব্দ উভয়টিকে তার বাহ্যিক অর্থে রেখেই তাফসীর করা উত্তম তখন আয়াতের মর্ম হবে, তাওবা কবুলের ওয়াদা ও দায়িত্ব তাদের জন্যই রয়েছে যারা না জেনে, না বুঝে কোনো সগীরা বা কবীরা গুনাহ করে বসে। অতঃপর যখন সেই গুনাহের ধ্বংসাত্মক ক্ষতির উপর অবগত হয় তখনই অনতিবিলম্বে তওবা করে নেয় এবং আল্লাহর সামনে লজ্জিত হয়ে যায়। আর যারা জেনেবুঝে গুনাহ করে, সতর্ক করার পরও তওবা করে না, বিলম্ব করে তাদের তওবা যদিও আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় কবুল করে নেন সত্য, তবে তাদের তওবা কবুল করে নেওয়ার জন্য তাঁর ওয়াদা ও জিম্মাদারি নেই। যেরূপ প্রথম লোকদের জন্য ছিল। –[তাফসীরে মা'আরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৬৭]

http://islamiboi.wordpress.com

١٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ اَىْ ذَاتَهُنَّ كَرْهًا بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ لُغَتَانِ اَىْ مُكْرِهِيْهِنَّ عَلٰى ذٰلِكَ كَانُوْا فِى الْجَاهِلِيَّةِ يَرِثُوْنَ نِسَاۤءَ اَقْرِبَائِهِمْ فَاِنْ شَاۤءُوْا تَزَوَّجُوْهَا بِلَا صَدَاقٍ اَوْ زَوَّجُوْهَا وَاَخَذُوْا صَدَاقَهَا وَعَضَلُوْهَا حَتّٰى تَفْتَدِىْ بِمَا وَرِثَتْهُ اَوْ تَمُوْتَ فَيَرِثُوْهَا فَنُهُوْا عَنْ ذٰلِكَ وَلَا اَنْ تَعْضُلُوْهُنَّ اَىْ تَمْنَعُوْا اَزْوَاجَكُمْ عَنْ نِكَاحِ غَيْرِكُمْ بِاِمْسَاكِهِنَّ وَلَا رَغْبَةَ لَكُمْ فِيْهِنَّ ضِرَارًا لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ مِنَ الْمَهْرِ اِلَّا اَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا اَىْ بَيِّنَتٍ اَوْ هِىَ بَيِّنَةٌ اَىْ زِنًا نُشُوْزًا فَلَكُمْ اَنْ تُضَارُّوْهُنَّ حَتّٰى يَفْتَدِيْنَ مِنْكُمْ وَيَخْتَلِعْنَ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ اَىْ بِالْاِجْمَالِ فِى الْقَوْلِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمَبِيْتِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَاصْبِرُوْا فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا وَلَعَلَّهُ يَجْعَلُ فِيْهِنَّ ذٰلِكَ بِاَنْ يَرْزُقَكُمْ مِنْهُنَّ وَلَدًا صَالِحًا ـ

অনুবাদ :

১৯. হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের সত্তা কে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। كَرْهًا -এর মধ্যে দুটি লোগাত রয়েছে, كَاف -এ যবর ও পেশের সাথে। অর্থাৎ তাদের উপর বল প্রয়োগকারী হয়ে। মূর্খতার যুগে লোকেরা তাদের আত্মীয়দের স্ত্রীগণের মালিক হয়ে যেত। অতঃপর ইচ্ছা হলে তাদেরকে মহর ব্যতীতই বিয়ে করে নিত, অথবা অন্যের কাছে বিয়ে দিয়ে নিজেরা তার মহর নিয়ে নিত। অথবা তাকে আটকে রাখত, অতঃপর সেই বেচারি হয়তো নিজের প্রাপ্ত উত্তরাধিকার দিয়ে মুক্তি পেত, নতুবা সে মারা যাওয়ার পর তারা তার ওয়ারিশ হয়ে যেত। তাদেরকে এসব থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এবং তাদেরকে আটক রেখো না অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদেরকে অন্যের সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করো না তাদেরকে আটক করে রেখে ক্ষতি পৌঁছাবার জন্য, অথচ তাদের প্রতি তোমাদের কোনো আসক্তি নেই। যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ মহরের তার কিয়দংশ নিয়ে নাও। কিন্তু তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। مُبَيِّنَة -এর মধ্যে যবর ও যেরের সাথে। অর্থাৎ যা খুবই স্পষ্ট বা প্রকাশকারী তথা ব্যভিচার বা অবাধ্যতা। তখন তোমাদের জন্য তাদেরকে কষ্ট পৌঁছানো জায়েজ হবে। এমনকি তারা তোমাদেরকে বিনিময় দিয়ে খুলা করে নেবে। আর নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর, অর্থাৎ কথাবার্তা, ভরণপোষণ ও রাত্রি যাপনে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের বিকাশ ঘটাও। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে ধৈর্যধারণ কর। হয়তো তোমরা এমন এক বস্তুকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন। হয়তো তিনি তাদের মধ্যে কল্যাণ রেখে দিয়েছেন। এরূপে যে, তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে নেককার সন্তান দান করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٠. وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اَىْ اَخْذَهَا بَدْلَهَا بِاَنْ طَلَّقْتُمُوْهَا وَّ قَدْ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ اَىِ الزَّوْجَاتِ قِنْطَارًا مَالًا كَثِيْرًا صِدَاقًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا ظُلْمًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا وَنَصْبُهُمَا عَلَى الْحَالِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيْخِ وَلِلْاِنْكَارِ فِىْ -

২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী **গ্রহণ** করতে চাও, অর্থাৎ একজনকে তালাক **দিয়ে** অন্যজনকে তার স্থলে গ্রহণ করতে চাও। **অথচ** স্ত্রীদের একজনকে প্রচুর ধন মহর হিসেবে **দিয়ে** থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহ করে গ্রহণ করবে? উভয়টি [اِثْمًا ও ظُلْمًا] **হাল** হওয়ার ভিত্তিতে যবরযুক্ত হয়েছে, আর প্রশ্নবোধক হামযাটি তিরস্কারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢١. وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ اَىْ بِاَىِّ وَجْهٍ وَقَدْ اَفْضٰى وَصَلَ بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ بِالْجِمَاعِ الْمُقَرِّرِ لِلْمَهْرِ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا عَهْدًا غَلِيْظًا شَدِيْدًا وَّ هُوَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ مِنْ اِمْسَاكِهِنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحِهِنَّ بِاِحْسَانٍ -

২১. এবং তোমরা কেমন করে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমরা একজন অন্যজনের কাছে পৌঁছে এরকম সহবাসের সাথে যা মহরকে সাব্যস্ত করে। এতে ইস্তেফহাম প্রশ্নটি অস্বীকৃতিমূলক। এবং নারীরা তোমাদের কাছ থেকে কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। আর সেই অঙ্গীকার হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সদ্ভাবে রাখতে বা সদয়ভাবে ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٢. وَلَا تَنْكِحُوْا مَا بِمَعْنٰى مَنْ نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا لٰكِنْ مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ فِعْلِكُمْ فَاِنَّهٗ مَعْفُوٌّ عَنْهُ اِنَّهٗ اَىْ نِكَاحَهُنَّ كَانَ فَاحِشَةً قَبِيْحًا وَّمَقْتًا ط سَبَبًا لِلْمَقْتِ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ اَشَدُّ الْبُغْضِ وَسَاۤءَ بِئْسَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا ذٰلِكَ -

২২. আর তোমরা সেই নারীকে বিবাহ করো না, যাকে তোমাদের পিতা ও পিতামহগণ বিবাহ করেছেন। তবে অতীতে যা হওয়ার হয়ে গেছে, তোমাদের কর্মকাণ্ড তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আয়াতে مَا শব্দটি مَنْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **এটি** অর্থাৎ তাদেরকে বিয়ে করা অত্যন্ত জঘন্য, অশ্লীলতা ও আল্লাহর গজবের কাজ। আর তা হচ্ছে মারাত্মক ঘৃণ্য কাজ। আর অত্যন্ত নিকৃষ্টতর পন্থা এটা।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিধানাবলিতে সীমালঙ্ঘনের একটি বিশেষ সুরতের বর্ণনা করা হয়েছে যে, জবরদস্তিমূলকভাবে মহিলাদের মালিক হয়ে যাওয়াও আল্লাহর বিধানে সীমালঙ্ঘন করা।

মূর্খতার অন্ধকার যুগে এ প্রথা ছিল যে, যখন কোনো লোক স্ত্রী রেখে মারা যেত তখন তার অন্য স্ত্রীর তরফের আপন ছেলে অথবা অন্য কোনো ওয়ারিশ এসে ঐ বিধবা মহিলাটির উপর কোনো চাদর বা কাপড় ফেলে দিত। আর সে বলত, আমি যেরূপ মৃতব্যক্তির সম্পদের মালিক তেমনিভাবে এ বিধবারও মালিক। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করে নিত, বা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে মহরের অর্থ নিজে নিয়ে নিত এবং ইচ্ছা হলে তাকে নিজেও বিয়ে করত না এবং অন্য কারো কাছেও বিয়ে দিত না; বরং এমনিতে তাকে আটকে রাখত এ উদ্দেশ্যে যে, যখন ঐ বিধবা মারা যাবে তখন সে তার সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইরশাদ করছেন- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا الخ এবং তাতে স্ত্রীদেরকে কষ্ট দিয়ে খোলাতে বাধ্য করে তাদের মহরের মাল গ্রহণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আর তাদের সাথে সদ্ভাবে চলতে ও ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, তবে যদি প্রকাশ্য নাফরমানি, জেনাকারিণী ও অবাধ্য হয়ে যায় তখন তাদেরকে খোলা দিতে বাধ্য করে তালাক দিয়ে দিতে পার। অতঃপর وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ বলে স্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দিলে স্ত্রীদের মহরের অর্থ ফেরত গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এতে মহরের মাল অধিকই হোক না কেন।

قَوْلُهُ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الخ : জাহিলি যুগের একটি কুপ্রথা খণ্ডনের জন্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। প্রথাটি ছিল এই যে , তাদের কেউ যদি মারা যেত তখন তার স্ত্রীর মালিক তার [বড়] অন্য স্ত্রীর ছেলে হয়ে যেত। অতঃপর ইচ্ছা হলে সে নিজেই তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিত অথবা অন্য কারো সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিত। এর প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে সাআদ মুহাম্মদ ইবনে কা'আবে কুরযীর কথা নকল করে বলেছেন যে, আবূ কায়সের ইন্তেকাল হলে জাহিলি যুগের প্রথা অনুসারে তার ছেলে মিহসান তার স্ত্রীর মালিক হয়ে যায়। তার স্ত্রীকে মিহসান কোনো অংশ দেয়নি তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে ঘটনাটি শুনাল। তিনি বললেন, এখন চলে যাও, আমার আশা যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যাপারে হুকুম নাজিল করবেন।

ইবনে আবী হাতিম ও তাবারানী হযরত আদী ইবনে ছাবিতের মাধ্যমে এ ঘটনাটি একজন আনসারীর সূত্রে নকল করেছেন। এ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আবূ কায়েস ইবনে সালামার ইন্তেকাল হলো। আবূ কায়েস বড় নেককার একজন আনসারী ছিলেন। তার [অন্য স্ত্রীর ঘরের] ছেলে কায়েস তার পিতা আবূ কায়েস মারা যাওয়ার পর তার পিতার স্ত্রীর সাথে বিয়ে করতে চাইল। মহিলাটি কায়েসকে বলল, আমি তো তোমাকে নিজের ছেলেই মনে করি। আর তুমি তো তোমার সম্প্রদায়ের একজন নেককার ব্যক্তিও। [তারপরও বিয়ের প্রস্তাব?] অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি খুলে বলল। শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এখন তোমার ঘরে চলে যাও এবং আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় থাক। তারপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[মাযহারী খ. ২, পৃ. ৫৪৮-৪৯]

এতে পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হওয়া সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা- ১. فَاحِشَةً ২. مَقْتًا ৩. سَاءَ سَبِيلًا ফাহেশার মানে হলো আকলী মন্দ কাজ। অর্থাৎ পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করা আকল ও বিবেকের দৃষ্টিতেও জঘন্যতম খারাপ কাজ। আর مَقْتًا-এর মর্ম হলো শরিয়তের দৃষ্টিতে মন্দ। অর্থাৎ শরিয়তের আলোকে এবং আল্লাহর কাছেও কাজটি খুবই ঘৃণ্য, তাঁর ক্রোধ ও গজব নাজিল হওয়ার মতো কাজ। আর سَاءَ سَبِيلًا-এর মর্ম হলো, এ কাজটি সামাজিকভাবেও একটি খুবই খারাপ অভ্যাস ও তরিকা। মোটকথা চূড়ান্ত পর্যায়ের একটি ঘৃণ্য খারাপ কাজ। এরকম কাজ যে ব্যক্তি করে সে হত্যার উপযুক্ত। -[মাআরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৭৩-১৭৪]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَشَمِلَتِ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْاَبِ اَوِ الْاُمِّ وَبَنٰتُكُمْ وَشَمِلَتْ بَنَاتُ الْاَوْلَادِ وَاِنْ سَفُلْنَ وَاَخَوٰتُكُمْ مِنْ جِهَةِ الْاَبِ اَوِ الْاُمِّ وَعَمّٰتُكُمْ اَىْ اَخَوَاتُ اٰبَائِكُمْ وَاَجْدَادِكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ اَىْ اَخَوَاتُ اُمَّهَاتِكُمْ وَجَدَّاتِكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَتَدْخُلُ فِيْهِنَّ بَنَاتُ اَوْلَادِهِنَّ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ قَبْلَ اِسْتِكْمَالِ الْحَوْلَيْنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيْثُ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَيُلْحَقُ بِذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ الْبَنَاتُ مِنْهَا وَهُنَّ مَنْ اَرْضَعَتْهُنَّ مَوْطُوْءَتُهُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ مِنْهَا لِحَدِيْثِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمْ جَمْعُ رَبِيْبَةٍ وَهِىَ بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِهِ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ تَرْبُوْنَهَا صِفَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْغَالِبِ .

অনুবাদ :

২৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণকে বিয়ে করা, এ হুকুমে দাদি ও নানিগণও শামিল। তোমাদের কন্যাগণকে, এতে নাতিনরাও শামিল রয়েছে। যতই অধস্তন হোক না কেন, তোমাদের সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুকে তথা তোমাদের বাপ-দাদার বোনদেরকে, তোমাদের খালাকে তথা তোমাদের মাতা ও দাদির বোনদেরকে, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনী কন্যাকে, এতে তাদের মেয়েরাও শামিল রয়েছে, তোমাদের সেই মাতাগণকে, যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে। যারা দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পাঁচ ঢোক স্তন্য পান করিয়েছে, যেরূপ হাদীস শরীফ তা বর্ণনা করেছে, তোমাদের দুধবোনকে হাদীসের আলোকে তাদের সাথে দুধ মেয়েদেরকে হারাম করা হয়েছে। আর তারা হলো ঐ সব মেয়ে যাদেরকে তাদের সহবাস লব্ধ মহিলাগণ দুধপান করিয়েছে। তেমনিভাবে দুধ ফুফু, খালা, ভ্রাতৃকন্যা ও ভাগিনীরাও শামিল ঐ নীতির আলোকে যে, বংশীয় সম্পর্ক দ্বারা যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারাও তা হারাম হয়ে যায়। এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মা তাদের বিয়ে করাও তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে। তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সেই স্ত্রীদের কন্যাকে, যারা তোমাদের লালনপালনে আছে। رَبِيْبَةٌ - رَبَائِبُ -এর বহুবচন। আর সে হচ্ছে স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যা, যাদেরকে তোমরা লালনপালন করছ। তোমাদের লালন-পালনে রয়েছে কথাটি স্বাভাবিক রূপে এসেছে, আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

دَخَلْتُمْ فَلَا مَفْهُومَ لَهَا مِّنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِى **دَخَلْتُم** بِهِنَّ اَىْ جَامَعْتُمُوْهُنَّ فَاِنْ لَّمْ **تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِىْ** **نِكَاحِ** بَنَاتِهِنَّ اِذَا فَارَقْتُمُوْهُنَّ **وَحَلَائِلُ اَزْوَاجُ** **اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ** بِخِلَافِ **مَنْ** تَبَنَّيْتُمُوْهُمْ فَلَكُمْ نِكَاحُ حَلَائِلِهِمْ **وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ** مِنْ نَسَبٍ اَوْ **رَضَاعٍ** بِالنِّكَاحِ وَيَلْحَقُ بِهِمَا بِالسُّنَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا وَيَجُوْزُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ **وَمَلَكُهُمَا** مَعًا وَيَطَأُ وَاحِدَةً **اِلَّا** لٰكِنْ **مَا قَدْ سَلَفَ** فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ نِكَاحِكُمْ بَعْضَ **مَا** ذُكِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ **اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا** لِمَا سَلَفَ مِنْكُمْ قَبْلَ النَّهْيِ **رَّحِيْمًا** بِكُمْ فِىْ ذٰلِكَ ـ

সুতরাং এর বিপরীত অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তাহলে তোমাদের উপর কোনো গুনাহ নেই, তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার মধ্যে, যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে পৃথক করে দেবে। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকেও তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে তোমাদের পালক ছেলের স্ত্রীগণ [তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর] তোমাদের জন্য হালাল রয়েছে। এবং দুই বোনকে বংশীয় হোক বা দুধ শরিক হোক একত্রে বিবাহ করাও তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে হাদীসের আলোকে স্ত্রী, তার ফুফু ও খালাকে বিবাহ করাও এর সাথে হারাম করা হয়েছে। তবে তাদের প্রত্যেকের সাথে স্বতন্ত্রভাবে বিয়ে করা জায়েজ হবে এবং তারা উভয়ের একত্রে মালিক হওয়াও জায়েজ রয়েছে। তবে সহবাস কেবল একজনের সাথেই জায়েজ হবে। কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে জাহিলি যুগে মাহরাম মহিলাদেরকে তোমাদের বিয়ে করার উপরোল্লিখিত কথা তাতে তোমাদের উপর কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ সব ক্ষমাকারী যা নিষেধ হওয়ার পূর্বে তোমাদের থেকে হয়ে গেছে এবং এ ব্যাপারে তোমাদের উপর দয়ালু।

তাহকীক তারকীব

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ-এর মধ্যে اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এজন্য সংযোজন করা হয়েছে যে, এতে হারাম হওয়ার সম্পর্ক **মাতাদের** সত্তার সাথে করা হয়ে গেছে। অথচ সত্তা হারাম হওয়ার কোনো অর্থ নেই। কারণ হারাম ও হালাল হওয়া কাজের **অবস্থা**– সত্তার নয়। তাই এখানে তাদের বিয়ে করা কথাটি গ্রন্থকার সংযোজন করে দিয়েছেন। اُمَّهَات [মাতাগণ] শব্দটি اُمٌّ **-এর বহুবচন**। বহুবচনের মধ্যে هَا বর্ধিত করা হয়েছে। বিবেক সম্পন্ন ও বিবেকহীনদের বহুবচনের মধ্যে প্রার্থক্য বিধানের **জন্য এরূপ** করা হয়েছে। বিবেক সম্পন্নদের বহুবচনে বলা হয় اُمَّهَات আর বিবেকহীনদের বহুবচনে বলা হয়েছে اُمَّاتٌ।
اَلرَّبَائِبُ - رَبِيْبَةٌ-এর বহুবচন। رَبِيْبَةٌ স্ত্রীর ভিন্ন স্বামীর কন্যা, যে বর্তমান স্বামীর কোলে লালিত হচ্ছে। اَلْحُجُوْرُ - حَجْرٌ বা **حِجْرٌ -এর বহুবচন**। حَجْر অর্থ– কোল, লালনপালন, প্রতিপালন। فِىْ حُجُوْرِكُمْ -তোমাদের লালনপালনে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ সব নারীদের বিবরণ দিয়েছেন, যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম। কোনো কোনো নারীকে কোনো অবস্থাতেই বিয়ে করা হালাল হয় না তাদেরকে মুহাররামাতে আবাদিয়া বলা হয় তথা চিরতরে হারাম। আর কোনো কোনো নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম নয়; বরং বিশেষ অবস্থায় হারাম, তাদেরকে মুহাররামাতে মুওয়াক্কাতা বলা হয় তথা সাময়িক হারাম।

প্রথমোক্ত নারীগণ তিন প্রকার যথা– ১. বংশগত হারাম নারী, ২. দুধের কারণে হারাম নারী এবং শ্বশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী। ইরশাদ হয়েছে– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর তোমাদের মাতাগণকে বিবাহ করা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। أُمَّهَات শব্দের ব্যাপকতায় দাদি-নানি সবাই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَبَنٰتُكُمْ : স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার কন্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম। মোটকথা কন্যা, পৌত্রি, প্রপৌত্রি, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সবাইকে বিবাহ করা হারাম। তবে যে কন্যা ঔরসজাত নয়, বরং পালিত, তাদেরকে এবং তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করা জায়েজ, যদি অন্য কোনো পথে অবৈধতা না থাকে। তেমনিভাবে ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে সেও কন্যার পর্যায়ভুক্ত। তাদেরকেও বিয়ে করা জায়েজ নয়।

وَاَخَوٰتُكُمْ : সহোদরা বোনদেরকে বিবাহ করা হারাম। তেমনিভাবে বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনেদরকেও বিবাহ করা হারাম।

وَعَمّٰتُكُمْ : পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনকে অর্থাৎ তিন রকম ফুফুকে বিয়ে করা হারাম।

وَخٰلٰتُكُمْ : আপন মাতার তিন প্রকার বোন তথা খালাদের সাথে বিবাহ করা হারাম।

وَبَنٰتُ الْاَخِ : ভাতিজীর সাথেও বিবাহ হারাম, আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয় হোক।

وَبَنٰتُ الْاُخْتِ : বোনের কন্যা অর্থাৎ ভাগিনীদের সাথেও বিবাহ হারাম চাই আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক বা বৈপিত্রেয় হোক।

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ : যেসব নারীদের স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম। অল্প দুধপান করুক বা অধিক, একবার পান করুক বা একাধিক বার সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় একে হুরমতে রেযাআত বলা হয়।

দুধ পানের সময়সীমা : একথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ঐ সময়ই দুধ পানে বিবাহ-শাদি হারাম হওয়ার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে, যে সময়টি হয় দুধ পানের কাল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ অর্থাৎ দুধপানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা ঐ সময়ে দুধপান করলে হবে, যে সময় দুধপান করেই শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে, এ সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর বিশিষ্ট শাগরিদ হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং বাকি ইমাম তিনজনসহ অধিকাংশ ওলামাদের মতে, দুধ পানের ঊর্ধ্ব সময়সীমা হচ্ছে দুই বছর। এ মতের উপরই ফতোয়া।

তাই উভয় পক্ষের দালাইল ও জবাব উল্লেখ করা হলো না। কোনো বালক-বালিকা যদি দুই বৎসর বয়সের পর কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করে তবে দুধ পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

مِقْدَار رَضَاعَت **বা দুধ পানের পরিমাণ :** যে পরিমাণ দুধ দুই বৎসরকালের ভেতরে দুগ্ধপায়ী শিশু দুধ পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়, সেই পরিমাণের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে–

১. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, সাহেবাইনসহ অধিকাংশ ইমামগণের মতে, দুগ্ধপায়ী শিশু দুধ কম পান করুক বা বেশি পান করুক, তাতে দুধ পান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো দুধ পেটের ভেতরে পৌঁছতে হবে।
২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পাঁচবার দুধ পান করলে হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হবে। এর কমের মধ্যে নয়।
৩. এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মত হলো, কমপক্ষে তিনবার শিশু মহিলার স্তন চুষে দুধ পান করলে হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

জমহুরের দালাইল :

১. আল্লাহর তা'আলার বাণী- أُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ এতে নিঃশর্তভাবে দুধ পানের কথা বলা হয়েছে, কমবেশির কোনো উল্লেখ নেই।

২. হাদীস শরীফে এসেছে- إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ এসব হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, এতেও কমবেশির কোনো কথা উল্লেখ নেই।

৩. وَعَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيْلُهُ وَكَثِيْرُهُ এছাড়া আরো বহু দালাইল রয়েছে, লম্বা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পেশ করা হচ্ছে না।

৪. কিয়াসী দলিল হলো, দুধ মনীর ন্যায় একটি প্রবাহমান বস্তু। মনী দ্বারা হুরমত প্রমাণিত হওয়াতে যেহেতু কোনো সংখ্যা বা পরিমাণের শর্ত নেই, সুতরাং দুধের মধ্যেও কোনো রকম পান করার সংখ্যা বা পরিমাপ ধার্য করা ঠিক হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দলিল : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস, যাকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন- ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ হাদীসটি আল্লামা সুয়ূতী দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ হচ্ছে, তিনি হলেন শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম। তবে এ হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করা ঠিক হবে না। কারণ এটি রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম আহমদ (র.) -এর দলিল : তাঁর দলিল হচ্ছে- لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ অর্থাৎ, একবার বা দুইবার স্তন চুষলে হুরমাতে রেযাআত প্রমাণিত হয় না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল কমপক্ষে তিনবার চুষলে বা দুধ পান করলে হুরমতে রেযাআত প্রমাণিত হবে।

এর জবাবে বলা হয়েছে, এখানে দুবার চুষার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে শিশুর পেটে দুধ পৌঁছে যাওয়া। কারণ একবার বা দুবার যখন শিশু বাচ্চায় স্তনে মুখ লাগিয়ে চুষে তখন সাধারণত দুধ নেমে আসে না, অতঃপর পরবর্তী চুষার সময় দুধ নেমে আসে। এ হিসেবে হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, একবার বা দুবার চুষা দ্বারা হুরমত প্রমাণিত হয় না।

অথবা বলা যাবে, এটা ছিল পাঁচবার দুধপান করলে হুরমত প্রমাণিত হওয়ার সময়ের হুকুম। সুতরাং পাঁচবার পান করার হুকুম যেরূপ রহিত, তেমনিভাবে দুবার চুষলে হুরমত প্রমাণিত না হওয়ার হাদীসও রহিত। তাই সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহকে বাদ দিয়ে এসব রহিত হাদীসের উপর আমল করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَاَخَوٰتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ : অর্থাৎ দুধ পান সম্পর্কীয় যেসব বোন আছে তাদেরকেও বিবাহ করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ হলো, দুধপানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোনো বালক অথবা বালিকা কোনা স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তার মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদের ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয়ে যায় এবং সে স্ত্রীলোকের জেঠা-দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবাই পরস্পরে বৈবাহিক অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পরে যেসব বিবাহ হারাম হয়ে যায়, দুধপানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে- إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ অর্থাৎ বংশীয় সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তা'আলা যেসব বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করেছেন, দুধপানের কারণেও তা হারাম করেছেন।

মাসআলা : একটি বালক ও একটি বালিকা কোনো মহিলার দুধপান করলে তাদের পরস্পরে বিবাহ হতে পারে না। এমনিভাবে দুধ ভাই ও দুধ বোনের কন্যার সাথেও বিবাহ হতে পারে না।

মাসআলা : দুধ ভাই কিংবা দুধ বোনের বংশগত মাকে বিবাহ করা জায়েজ এবং বংশগত বোনের দুধ মাকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে দুধ বোনের বংশগত বোনের সাথে এবং বংশগত বোনের দুধ বোনের সাথেও বিয়ে জায়েজ।

মাসআলা : দুধ পানের সময়কালে মুখ কিংবা নাকের পথে দুধ ভিতরে গেলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়। যদি অন্য কোনো পথে দুধ ভিতরে প্রবেশ করানো হয় কিংবা দুধের ইনজেকশন দেওয়া হয়, তবে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

মাসআলা : স্ত্রীলোকের দুধ ছাড়া অন্য কোনো দুধ, যেমন- চতুষ্পদ জন্তু কিংবা পুরুষের দুধ দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না।

মাসআলা : যদি ঔষধে কিংবা গরু-ছাগলের দুধের মিশ্রিত হয়, তবে দুধপান জনিত অবৈধতা তখন প্রমাণিত হবে, যখন নারীর দুধ পরিমাণে অধিক হয়। সমান সমান হলেও অবৈধতা প্রমাণিত হয়। কম হলে হয় না।

মাসআলা : যদি কোনো পুরুষের বুকে দুধ হয় এবং তা কোনো শিশু পান করে, তবে এ দুধ পানের দ্বারা দুধ পান জনিত অবৈধতা বর্তায় না।

মাসআলা : দুধপান করার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তা দ্বারা অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। যদি কোনো মহিলা কোনো শিশুর মুখে স্তন দেয় কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তবে তাতে অবৈধতা প্রমাণিত হবে না এবং বিবাহ হালাল হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

মাসআলা : একব্যক্তি কোনো একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করল। অতঃপর অন্য একজন মহিলা বলল, আমি তোমাদের **উভয়কে দুধপান করিয়েছি,** যদি তারা উভয়ে একথার সত্যায়ন করে তবে বিবাহ ফাসেদ বলে ফয়সালা করা হবে। পক্ষান্তরে **উভয়ে যদি মিথ্যা বলে এবং** মহিলা ধার্মিকা ও খোদাভীরুও হয়, তবু বিবাহ ফাসেদ বলে ফয়সালা করা হবে না। কিন্তু এরপরও **তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন** হয়ে যাওয়া উত্তম।

মাসআলা : যেরূপ দুজন দীনদার পুরুষ লোকের সাক্ষ্য দ্বারা রেযাআত প্রমাণিত হয়ে যায়, তেমনিভাবে একজন পুরুষ ও **একজন** দীনদার মহিলার সাক্ষ্য দ্বারাও দুধপান জনিত অবৈধতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

মাসআলা : রেযাআত প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুজন দীনদার পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাপারটা যেহেতু হারাম ও হালালের তাই সতর্কতা উত্তম। এমনকি কোনো কোনো ফিকহবিদ লিখেছেন যে, যদি কোনো মহিলা বিবাহ করার সময় একজন ধার্মিক পুরুষ সাক্ষ্য দেয় যে, এরা উভয়েই দুধ ভাই-বোন, তবে বিবাহ জায়েজ হবে না। বিবাহের পরে সাক্ষ্য দিলে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই উত্তম। এমনকি একজন মহিলা সাক্ষ্য দিলেও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা উত্তম।

قَوْلُهُ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ : স্ত্রীদের মাতা তথা শাশুরিগণও স্বামীর জন্য হারাম। এখানেও স্ত্রীদের নানি, দাদি বংশগত হোক বা দুধগত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলা : বিবাহিতা স্ত্রীর মা যেমন হারাম, তেমনি ঐ মহিলার মাও হারাম যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করা হয়েছে কিংবা ব্যভিচার করা হয়েছে কিংবা কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা হয়েছে।

মাসআলা : শুধু বিবাহ দ্বারাই স্ত্রীর মাতা হারাম হয়ে যায়। এর জন্য সহবাস ইত্যাদি জরুরি নয়।

وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ -

অর্থাৎ যে মহিলাকে বিবাহ করে সহবাসও করেছে, সেই মহিলার অন্য স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, পৌত্রী ও দোহিত্রী হারাম হয়ে যায়। তাদেরকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি সহবাস না হয় শুধু বিবাহ হয়, তবে উল্লিখিত নারীরা হারাম হয় না। বিবাহের পর তাকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করে কিংবা তার গুপ্তাঙ্গের অভ্যন্তরে কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করে তবে এগুলোও সহবাসের পর্যায়ভুক্ত। ফলে স্ত্রীর কন্যা হারাম হয়ে যায়।

মাসআলা : এখানে نِسَآئِكُمْ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। কাজেই ঐ মহিলার কন্যা, পৌত্রি ও দোহিত্রীও হারাম হয়ে যায়, যার সাথে সন্দেহবশত সহবাস করা হয় বা ব্যভিচার করা হয়।

قَوْلُهُ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ : পুত্রের স্ত্রীগণও হারাম। পৌত্র, দৌহিত্র ও পুত্র শব্দের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তাদের স্ত্রীকেও বিবাহ করা জায়েজ হবে না।

مِنْ اَصْلَابِكُمْ কথাটি পোষ্য পুত্রকে বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়েছে। তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল। দুধ পুত্রও বংশগত পুত্রের পর্যায়ভুক্ত, কাজেই তার স্ত্রীকেও বিবাহ করা হারাম।

قَوْلُهُ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ : দুই বোনকে বিবাহে একত্রিত করাও হারাম। সহোদরা বোন হোক কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয় হোক, বংশের দিক দিয়ে হোক কিংবা দুধের দিক দিয়ে এ বিধান সবার জন্য প্রযোজ্য। তবে একবোনের তালাক হয়ে যাওয়ার পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলে কিংবা মৃত্যু হলে অপর বোনকে বিবাহ করা জায়েজ, ইদ্দতের মাঝখানে জায়েজ নয়।

মাসআলা : যেভাবে একসাথে দুই বোনকে একব্যক্তির বিবাহে একত্রিত করা হারাম, তেমনি ফুফু, ভ্রাতুষ্পুত্রী, খালা ও ভাগিনীকেও একব্যক্তির বিবাহে একত্রিত করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– لَا تُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . –[বুখারী ও মুসলিম]

মাসআলা : ফিকহবিদগণ একটি সামগ্রিক নীতি হিসেবে লিখেছেন, প্রত্যেক এমন দুজন মহিলা যাদের মধ্যে একজনকে পুরুষ ধরা হলে শরিয়ত মতে উভয়ের পরস্পরে বিবাহ দুরস্ত হয় না, তারা একজন পুরুষের বিবাহে একত্রিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ : অর্থাৎ জাহেলিয়াত যুগে যা কিছু হয়েছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। তবে ভবিষ্যতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا : মুসলমান হওয়ার পূর্বে তারা নিবুদ্ধিতা বশত যা কিছু করেছে, এখন মুসলমান হওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে তা ক্ষমা করবেন এবং তাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেবেন।

–[মা'আরেফ খ. ২, পৃ. ৩৯০- ৯৯ ও জামালাইন খ. ১, পৃ. ৬১৯–৬২২]

http://islamiboi.wordpress.com

اَلْجُزْءُ الْخَامِسُ : পঞ্চম পারা

٢٤. وَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنٰتُ اَىْ ذَوَاتُ
الْاَزْوَاجِ مِنَ النِّسَآءِ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَبْلَ
مُفَارَقَةِ اَزْوَاجِهِنَّ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ كُنَّ
اَوْلَا اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْاِمَاءِ
بِالسَّبْيِ فَلَكُمْ وَطْؤُهُنَّ وَاِنْ كَانَ لَهُنَّ
اَزْوَاجٌ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ
كِتٰبَ اللّٰهِ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ اَىْ كَتَبَ
ذٰلِكَ عَلَيْكُمْ وَاُحِلَّ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ
وَالْمَفْعُوْلِ لَكُمْ مَّا وَرَاۤءَ ذٰلِكُمْ اَىْ سِوٰى
مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنَ النِّسَاءِ لِ اَنْ
تَبْتَغُوْا تَطْلُبُوا النِّسَاءَ بِاَمْوَالِكُمْ
بِصَدَاقٍ اَوْ ثَمَنٍ ـ مُّحْصِنِيْنَ مُتَزَوِّجِيْنَ
غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ زَانِيْنَ فَمَا فَمَنِ
اسْتَمْتَعْتُمْ تَمَتَّعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ مِمَّنْ
تَزَوَّجْتُمْ بِالْوَطْئِ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
مُهُوْرَهُنَّ الَّتِىْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ اَنْتُمْ وَهُنَّ
بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ مِنْ حَطِّهَا اَوْ
بَعْضِهَا اَوْ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِيْمَا دَبَّرَهٗ لَهُمْ ـ

অনুবাদ :

২৪. আর তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে, সধবা নারীদেরকে তথা স্বামী ওয়ালী মহিলাদেরকে সকল মহিলাদের মধ্য থেকে অর্থাৎ তাদের স্বামীদের থেকে যথারীতি পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে তোমাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ, তারা স্বাধীন মুসলিম নারী হোক বা নাই হোক। তবে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে গেছে বাঁদিদের থেকে, যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের অধীনে এসে গেছে, তোমাদের জন্য তাদের সঙ্গে ইস্তেবরায়ে রেহেমের [পূর্বস্বামীর পানি থেকে জরায়ু মুক্ত হওয়ার] পর সহবাস করা জায়েজ আছে, যদিও তাদের স্বামীগণ দারুল হরবে বিদ্যমান থাকে না কেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিধানটি তোমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। كِتٰبَ শব্দটি মাফউলে মুতলাক হওয়ার ভিত্তিতে যবর যুক্ত হয়েছে, আসল রূপ ছিল كُتِبَ ذٰلِكَ – أُحِلَّ ফে'লটি মা'রূফ ও মাজহুল উভয় রকমভাবে গঠিত হয়েছে। এছাড়া অর্থাৎ তোমাদের উপর হারামকৃত উল্লিখিত নারীগণ ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। এই শর্তে যে, তোমরা নারীদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তথা মহর বা মূল্যের বিনিময়ে তলব করবে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ব্যভিচারের জন্য নয়। অতঃপর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা সহবাসের মাধ্যমে ভোগ করবে তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মহর যা তোমরা ধার্য করেছ তা দান কর। তোমাদের কোনো গুনাহ হবে না নির্ধারণের পর তোমরা ও তারা পরস্পরে মহর একেবারে না দেওয়া, হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে যদি সম্মত হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অতিশয় অবহিত এবং তাদের পরিচালনা বিষয়ে যা করেন তাতে প্রজ্ঞাময়।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنٰتُ অধিকাংশ ওলামাগণের মতে, اَلْمُحْصَنٰتُ সোয়াদে যবর দিয়ে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ, তারা হলো ঐ সব মহিলা, যারা বিবাহের মাধ্যমে নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে নিয়েছে। [বিবাহিতা নারীগণ]। আলোচ্য আয়াত ব্যতীত সকল স্থানে ইমাম কাসায়ী সোয়াদ -এ যেরের সহিত اِسْم فَاعِل -এর সীগাহ পড়েছেন। اِحْصَان [ইহসান] শব্দের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে বিরত রাখা, নিষেধ করা। বলা হয়, مَدِيْنَةٌ حَصِيْنَةٌ ও خَدْعٌ حَصِيْنَةٌ - اَىْ مَانِعَةٌ صَاحِبَهَا مِنَ الْجَرَاحَةِ সংরক্ষিত স্থানকে حِصْن বলে, কারণ তাতে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশকারীকে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ থাকে যে, পবিত্র কুরআনে اِحْصَان শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

১. اَلْحُرِّيَّةُ স্বাধীনতা। যেমন– اَلَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ এখানে مُحْصَنٰت স্বাধীন নারীদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
২. اَلْعَفَافُ তথা সতীত্ব রক্ষা, যথা مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
৩. اَلْاِحْصَانُ অর্থ ইসলাম, যথা– فَاِذَآ اُحْصِنَّ اَىْ اِذَا اَسْلَمْنَ [এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী]
৪. মহিলা স্বামী ওয়ালী হওয়া, যেমন اِمْرَأَةٌ مُحْصَنَةٌ অর্থাৎ সধবা নারী।

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর মধ্যে مُحْصَنٰت শব্দটি চতুর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসান্নিফ (রহ.) ذَوَاتُ الْاَزْوَاجِ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

উপরিউক্ত চারটি অর্থেই اِحْصَان শব্দের মূল অর্থ তথা বিরত রাখা, নিষেধ করার অর্থ সমভাবে পাওয়া যায়। কেননা স্বাধীনা মানুষের জন্য অপরের হুকুম চলতে বাধার কারণ, সতীত্ব মানুষকে অসমীচীন কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধ করে। এবং ইসলাম মানুষকে মনের কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রাখে। তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীকে অনেক কাজ থেকে বারণ করে থাকে। আর স্ত্রী স্বামীকে জেনায় লিপ্ত হতে বারণ করে। এতে বুঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত সকল অর্থেরই মূল উৎস হচ্ছে اِحْصَان শব্দের ধাতুগত মূল অর্থটি।

আলোচ্য আয়াতে اَلْمُحْصَنَاتُ শব্দটিকে সকল কারীগণই সোয়াদের জবরের সাথে তথা ইসমে মাফউলের সীগাহ পাঠ করেছেন। এছাড়া কুরআনের অন্যান্য সকল স্থানে জবর ও যেরের সাথে তথা ইসমে মাফউল ও ইসমে ফায়েল উভয় রূপেই পঠিত হয়েছে।

اَلْمُحْصَنَاتُ -এর পূর্বে وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ উহ্য মেনে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْمُحْصَنَاتُ শব্দটিকে পূর্বোক্ত আয়াতের اُمَّهَاتُكُمْ -এর উপর আত্ফ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ : সংযোজন করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্নটি হলো এই যে, হারাম হওয়া তো কোনো ক্রিয়ার মধ্যে হয়ে থাকে, সত্ত্বাতে নয়। অথচ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُحْصَنَاتُ দ্বারা এ সব মহিলাদের সত্তা হারাম হওয়া বুঝা যাচ্ছে।

জবাবে মুফাসসিরে আল্লাম اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ [তাদের বিয়ে করা] সংযোজন করেছেন। অর্থাৎ তোমাদের জন্য সধবা নারীদেরকে বিয়ে করা হারাম, তাদের সত্তা নয়। قَبْلَ مُفَارَقَةِ اَزْوَاجِهِنَّ বলে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিবাহিতা মহিলাগণ স্বীয় পূর্বস্বামী হতে যথারীতি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর, তাদেরকে বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা নেই। চাই তারা স্বাধীন হোক বা পরাধীন, তথা শরয়ী বাদী হোক।

قَوْلُهُ بِالسَّبْىِ -এই কয়েদ দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, যুদ্ধবন্দী বাদী হলে তার দারুল হরবের পূর্বস্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেও তার সহিত সহবাস জায়েজ রয়েছে। তবে যদি বাদী খরিদা হয়, অথবা বিবাহিতা হয় তাহলে পূর্বস্বামী হতে যথারীতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে সহবাস জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ অর্থাৎ كِتَابَ اللّٰهِ -এর كِتَاب মাফউলে মুতলাক হওয়ার প্রেক্ষিতে জবরযুক্ত হয়েছে। كِتَاب -এর আমেল হচ্ছে উহ্য كَتَبَ যা حُرِّمَتْ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। কেননা كِتَاب ـ فَرْض ও تَحْرِيْم একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। كَتَبَ اللّٰهُ ذٰلِكَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا বলে মুফাসসিরে আল্লাম সেই উহ্য আমেলের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

هُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ কথাটি বলে গ্রন্থকার একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো এই যে, اَلْمُؤْمِنَاتُ-এর কয়েদ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আহলে কিতাব মহিলাদেরকে বিয়ে করা ঠিক নয়। এর জবাবে তিনি বলেছেন, মুমিন মহিলা হওয়ার কয়েদটি অধিকাংশের প্রেক্ষিতে লাগানো হয়েছে। নতুবা বিয়ে শাদীর ব্যাপারে স্বাধীন মু'মিন নারীদের যে হুকুম, স্বাধীন আহলে কিতাব নারীদেরও সেই হুকুম। সুতরাং এর বিপরীত মর্ম গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ مُحْصَنَاتٍ - تَنْكِحُوْهُنَّ-এর মাফউলের যমীর হতে হাল হয়েছে, সিফত নয়। কেননা প্রসিদ্ধ কায়দা রয়েছে- اَلضَّمِيْرُ لَا يُوْصَفُ وَلَا يُوْصَفُ بِهٖ যমীর মাওসূফও হয় না এবং সিফতও হয় না।

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ হালে মুয়াক্কিদাহ اَخْدَانٌ - خِدْنٌ-এর বহুবচন। خِدْنٌ মানে বন্ধু।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৪১-৪২, জামালাইন খ. ২, পৃ. ১৬-১৭]

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ الخ পূর্বে আয়াতেও মাহরাম মহিলাদের আলোচনা হয়েছে, এবং আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ শ্রেণির মাহরাম নারীদের সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

যে সকল মহিলাদের সাথে বিয়ে শাদী শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম তারা প্রথমত দু প্রকার। যথা-

১. مُحَرَّمَاتٌ اَبَدِيَّةٌ [যারা চিরদিনের জন্য হারাম] ও

২. مُحَرَّمَاتٌ مُؤَقَّتَةٌ অর্থাৎ যারা সাময়িক হারাম।

প্রথম প্রকার আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

১. مُحَرَّمَاتٌ نَسَبِيَّةٌ [বংশীয় সূত্রে হারাম নারীগণ],

২. مُحَرَّمَاتٌ رَضَاعِيَّةٌ [দুধের সম্পর্কে হারাম নারীগণ] ও

৩. مُحَرَّمَاتٌ بِالْمُصَاهَرَةِ [বৈবাহিক সম্পর্কে হারাম নারীগণ]।

পূর্বোল্লিখিত আয়াতে উপরোক্ত তিন শ্রেণির চিরস্থায়ী হারাম নারীদের আলোচনা হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে চতুর্থ শ্রেণির হারাম নারী তথা مُحَرَّمَاتٌ مُؤَقَّتَةٌ বা সাময়িক হারাম নারীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ অর্থাৎ তেমনিভাবে তোমার জন্য সেই সব নারীদেরকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যাদের স্বামী রয়েছে। মুহসানাত বলে এখানে সধবা তথা স্বামীওয়ালা নারীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাদের স্বামীগণ মৃত্যুবরণ করার পূর্বে বা তাদেরকে তালাক দেওয়ার পূর্বে তাদের সাথে বিয়ে শাদী হারাম। তবে তাদের মৃত্যুর পর বা তাদের তরফ থেকে তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর এবং যথারীতি মৃত্যুর ইদ্দত ও তালাকের ইদ্দত পালন করার পর তাদের সাথে বিয়ে জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ : পূর্বের বিধান থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ স্বামী ওয়ালী নারীদেরকে অন্য ব্যক্তির বিবাহ করা জায়েজ নয়, তবে কোনো নারী যদি মালিকানাধীন দাসী হয়ে আসে তাহলে এই বিধান নয়। মুসলমানরা যদি দারুল হরবের কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং সেখান থেকে কিছু নারী বন্দী করে আসে তবে তাদের দারুল হরবে অবস্থানরত স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়। এখন এ নারী ইহুদি-খ্রিস্টান কিংবা মুসলমান হলে, দারুল ইসলামের যে কোনো মুসলমান তাকে বিয়ে করতে পারবে। আর আমীরুল মু'মিনীন যদি তাকে দাসী করে কোনো সিপাহীকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে বণ্টন করে দেন তবুও তাকে ভোগ করা জায়েজ হবে। কিন্তু এই বিবাহ ও ভোগ করা এক হায়েজ আসার পরে কিংবা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করার পর জায়েজ হবে।

মাসআলা : যদি কোনো কাফের মহিলা দারুল হরবে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার স্বামী কাফের থাকে, তবে শরিয়তের বিচারক তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলবে। যদি সে অস্বীকার করে তবে বিচারক তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করবে। এ বিচ্ছেদ তালাক বলে গণ্য হবে। এরপর ইদ্দত অতিবাহিত হলে মহিলা যে কোনো মুসলমানকে বিবাহ করতে পারবে।

-[জামালাইন খ. ৫, পৃ. ১৭, মা'আরেফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪০০]

শানে নুযূল : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতটি ঐ সব মুহাজির মহিলাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা স্বামী ছাড়া হিজরত করে এসে যেত এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদেরকে বিয়ে করে নিত, অতঃপর তাদের স্বামীগণ মুসলমান হয়ে হিজরত করে আসত। আল্লাহ পাক আয়াতটিকে এ রকম নারীদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭]

http://islamiboi.wordpress.com

মুসনাদে আহমদ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আওতাস যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মহিলা বন্দী হয়ে এসেছে যারা ছিল স্বামী ওয়ালী। আর হুজুরে পাক ﷺ তাদেরকে সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। অথচ তাদের স্বামীগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে স্বদেশে বর্তমান ছিল। তখন ঐ সব মহিলাদের সাথে সহবাস করতে সাহাবাদের মধ্যে ইতস্ততঃ ভাব সৃষ্টি হলো। ফলে তারা হুজুর ﷺ -এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الخ -[ইবনে কাসীর খ. ৫, পৃ. ২, মা'আরিফে ইদ্রসীয়া খ. ২, পৃ. ১৭৮]

আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, উল্লিখিত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো এই যে, যদি স্বাধীন নারীগণ হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে, আর তাদের স্বামীগণ মুসলমান হয়, তবে তারা দারুল হরবের মধ্যে থাকলেও তাদের স্ত্রীদের সাথে বিয়ে জায়েজ নয়। কারণ তারা স্বামী স্ত্রী উভয়ের দ্বীন-ধর্ম এক ও অভিন্ন যদিও বাহ্যত উভয়ের দেশ ভিন্ন ভিন্ন। তবে যদি কোনো মহিলা মুসলমান হয়ে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে আসে, আর তার স্বামী অমুসলিম হয় এবং দারুল হরবে বিদ্যমান থাকে তাহলে মহিলার নতুন বিবাহ জায়েজ রয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ -

সূরায়ে মুমতাহানার এই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, মুমিনা নারী যারা হিজরত করে এসেছে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যদি মু'মিনই প্রমাণিত হয় তবে তাদের দারুল হরবে অবস্থানরত কাফের স্বামীদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না। তারা একে অন্যের জন্য হালাল হবে না। এমতাবস্থায় তোমাদের জন্য তাদেরকে বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা নেই।

-[মাজহারী- খ. ৩, পৃ. ১৭]

قَوْلُهُ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ : অর্থাৎ, উল্লিখিত হারাম নারীদের ছাড়া অন্যান্য নারী তোমাদের জন্য হালাল। আয়াতে বর্ণিত নারীগণ ব্যতীত আরো কিছু মহিলাদেরকে বিয়ে করা হারাম, তাদের কথা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে না আসলেও অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহে এসেছে। যেমন- স্ত্রীর সহিত তার ফুফু অথবা খালাকে একত্রে বিয়েতে রাখা হারাম। কেননা হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا তেমনিভাবে তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকেও হালালার পূর্বে এবং অপরের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দতের ভেতরে বিবাহ করাও জায়েজ নেই।

আর স্বাধীন স্ত্রী থাকাবস্থায় কোনো বাদীকে বিয়ে করাও জায়েজ হবে না। এবং এক সাথে চারের অধিক পঞ্চম মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাও জায়েজ হবে না। -[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৪৬-৪৮]

قَوْلُهُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ : অর্থাৎ, হারাম নারীদের বর্ণনা এজন্য করা হয়েছে যাতে তোমরা স্বীয় অর্থ সম্পদের মাধ্যমে হালাল নারীদেরকে তালাশ কর এবং তাদেরকে বিবাহ কর।

আবূ বকর জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআনে লিখেন- এ থেকে দুটি বিষয় জানা গেল। এক. মোহর ব্যতীত বিবাহ হতে পারে না। এমনকি যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মোহর ব্যতীত বিবাহ হবে, তবুও মোহর অপরিহার্য হবে। এর সবিস্তারে আলোচনা ফিকহ গ্রন্থসমূহে রয়েছে। দুই. মোহর এমন বস্তু হতে হবে যাকে মাল বলা যায়।

বিবাহের শর্তাবলি : হালাল মহিলাদের সাথে বিবাহ কয়েকটি শর্তের সহিত জায়েজ। শর্তগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে-

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের তরফ থেকে মৌখিক তলব হতে হবে, অর্থাৎ প্রস্তাব ও সমর্থন। তবে ফিকহবিধগণ একে বিবাহের রুকন বলেছেন।

২. মোহর প্রদান। ৩. সদা-সর্বদা মহিলাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা উদ্দেশ্য হতে হবে। কোনো সময়-সীমা নির্ধারণ হতে পারবে না।

৪. গোপনীর ভাবে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে নিলেই বিয়ে হয়ে যায় না। বরং কমপক্ষে আকেল-বালেগ, মুসলিম দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা বিয়ের সাক্ষী হতে হবে। সাক্ষী ব্যতীত প্রস্তাব সমর্থন হয়ে গেল। তার শরিয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ হবে না। বরং জেনা বিবেচিত হবে। -[মাআরিফে ইদ্রিসীয়া খ. ২, পৃ. ১৭৯]

এছাড়া আরো কিছু শর্ত রয়েছে। যথা-

৫. স্বামী -স্ত্রী যারা হতে যাচ্ছে, তাদের উভয়ের প্রত্যেকেই সরাসরি অথবা উকিলের মাধ্যমে একে অন্যের প্রস্তাব সমর্থনের কথা শুনতে হবে।

৬. সাক্ষীগণ একত্রিতভাবে তারা উভয়ের কথা শুনতে হবে। -[ঈযাহুল মিশকাত খ. ৩, পৃ. ১৭]

http://islamiboi.wordpress.com

মাসআলা : ওলামাদের ঐকমত্যে মহরের ঊর্ধ্ব পরিমাণের সুনির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। উভয়েরা পরস্পরের সম্মতিতে মহরের পরিমাণ বেশির চেয়েও বেশি হতে পারে। তবে মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণে উলামাদের মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) -এর মতে, মহরের সর্বনিম্ন কোনো পরিমাণ নেই। বরং যে বস্তু এবং যে পরিমাণ বস্তু কেনা বেচার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ হতে পারে তা বিয়েতেও মোহর সাব্যস্ত হতে পারে। কারণ আয়াতের মধ্যে সাধারণভাবে أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ বলা হয়েছে। এতে মহরের কম বা বেশির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে ঐ পরিমাণ অর্থ যাকে চুরি করলে চোরের হাত কাটা যায়। আর সেই পরিমাণটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এক দিনার দশ দিরহাম। এক দিরহাম সমান সাড়ে চার মাশা বা তিনগ্রাম ও বাষট্টি গ্রামের সমপরিমাণ হয়। এ হিসেবে দশ দিরহাম সমান হবে ৩৬ গ্রাম ও ২ কিলোগ্রাম তাই এ পরিমাণে রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য হবে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ।

আর ইমাম মালেক (র.) -এর মতে $\frac{১}{৪}$ দিনার বা তিন দিরহাম।

তাদের উভয়ের দলিল হলো আল্লাহ পাকের ইরশাদ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ أَزْوَاجِهِمْ এখানে فَرْض -এর মানে হচ্ছে পরিমাণ নির্ধারণ করা। এতে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহপাক মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ -এর মধ্যে মাল মহর হতে বলা হয়েছে। আর দু এক দিরহামকে পরিভাষায় মাল বলা যায় না।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ تَنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -এতে স্বাধীন মহিলাকে বিয়ে করার সামর্থ না রাখাবস্থায় বাঁদীদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সামর্থ্য তথা মহর এক উল্লেখযোগ্য মাল হওয়া উচিত। নতুবা দু-চার টাকা থেকে কেউই অপারগ হয়ে থাকে না।

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ -

এছাড়া আরো বহু দালাইল রয়েছে। সংক্ষিপ্ত করণের লক্ষ্যে সেগুলো উল্লেখ করা হলো না। –[মাজহারী খ. ৩, পৃ. ২৮, জামালাইন খ. ২, পৃ. ১৮, ঈজাহুল মিশকাত খ. ৩, পৃ. ১১০–১১]

মুতা প্রসঙ্গ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً অর্থাৎ, বিবাহের পর যে সকল নারীদেরকে ভোগ কর, তাদের মোহর দিয়ে দাও। এটা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে।

এ আয়াতে اِسْتِمْتَاع ভোগ তথা ফায়দা গ্রহণ করার দ্বারা স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা বুঝানো হয়েছে। অথবা اِسْتِمْتَاع দ্বারা কেবলমাত্র বিয়ের আকদ বুঝানো হয়েছে।

প্রথমাবস্থায় পূর্ণ মহর ওয়াজিব হবে। আর যদি আকদের পর স্বামীর ঘরে যাওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে যায়। তবে অর্ধেক মোহর স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে। এ আয়াতে মহরের অর্থ প্রদানের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ প্রদান করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে উল্লিখিত فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ -এর মাঝে যে اِسْتِمْتَاع শব্দটি এসেছে তার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে اِنْتِفَاع বা ফায়দা গ্রহণ। كُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهٖ فَهُوَ مَتَاعٌ যে বস্তু দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা যায়, তাকেই مَتَاع বলে। আর এখানে اِسْتِمْتَاع দ্বারা বিয়ের পর সহবাসের মাধ্যমে অথবা কেবল আকদের মাধ্যমে ফায়দা গ্রহণ করাই অধিকাংশ ওলাময়ে উম্মতের অভিমত। পারিভাষিক অর্থে 'মুতা' বা সাময়িক বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। কারণ সেই নিকাহে মুতা বা সাময়িক বিবাহ ইসলামের প্রথম যুগে জায়েজ ছিল বটে, তবে পরবর্তীতে চির দিনের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেই বিধান রহিত হয়ে গেছে।

নিকাহে মুতা বা সাময়িক বিবাহ হারাম হওয়ার প্রমাণ : 'মুতা' হারাম হওয়ার বহু প্রমাণাদি রয়েছে। সে সবের মধ্য হতে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে–

১. আল্লাহ পাক স্ত্রী অথবা শরয়ী বাঁদী ছাড়া অন্য যে কোনো মহিলার সাথে সহবাস করাকে হারাম করেছেন। আর মুতার মাধ্যমে যে মহিলার সাথে সহবাস করা হয় সে স্ত্রীও নয়, এবং শরিয়ত সম্মত দাসী নয়। তাই মুতা হারাম। যেমন তিনি ইরশাদ করেন– اَلَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلٰٓى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ - এই আয়াতে উপরিউক্ত দুই শ্রেণির মহিলা ছাড়া যে কোনো নারীকে হারাম করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

সাময়িক বিয়ে বা মুতা দ্বারা লব্ধ মহিলা যে শরয়ী বাদী নয় তাতো স্পষ্টই। কারণ তাকে কেনা-বেচা করা যায় না, দান করা যায় না, এবং আজাদ করার বিধানও তার উপর জারি করা যায় না।

আর স্ত্রী যে নয় তাও সুস্পষ্ট। কারণ তাদেরকে খোদ শিয়াগণসহ কেহই স্ত্রী বলেন না। কেননা ঐ মহিলা ও মুতা কারী পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার চলে না। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থেকে একে অন্যের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ তেমনিভাবে মুতা দ্বারা অর্জিত মহিলার জন্য পুরুষের উপর ভরণ-পোষণ, খানা-খোরাক ওয়াজিব হয় না এবং বাসস্থান দেওয়াও ওয়াজিব হয় না। তার সাথে ঐ মহিলার সন্তানের জন্য বংশীয় সম্পর্কও প্রমাণিত হয় না। এবং তালাক হদ ও মহরের কিছুই মুতার মধ্যে আসেনা। এতে বুঝা গেল, মুতার মহিলা স্ত্রী ও নয় এবং শরয়ী দাসীও নয়। তাই এদেরকে মুতার নামে ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

২. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস- عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّ الرَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَنْسِيَّةِ অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতা [সাময়িক বিবাহ] এবং পোষ্য গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন।

৩. হযরত রবী হতে বর্ণিত হাদীস-

رُوِيَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبُرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ اَمَرْتُكُمْ بِالْاِسْتِمْتَاعِ مِنْ هٰذِهِ النِّسَاءِ اَلَا وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ نِسْئٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَلَا تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا - وَرُوِيَ عَنْهُ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ -

অর্থাৎ, হযরত রবী বিন সাবুরা জুহানী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি এক সকালে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে কাবার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, তখন তিনি বলতে ছিলেন, লোক সকল! আমি তোমাদেরকে এসব মহিলাদের সাথে মুতা করতে অনুমতি দিয়েছিলাম বটে, তবে জেনে রাখো! আল্লাহ পাক অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্তের জন্য একে তোমাদের উপর হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং মুতার কোনো মহিলা যার কাছে রয়েছে সে যেন তাকে অবশ্যই বিদায় দিয়ে দেয়। আর তাদেরকে যা কিছু তোমরা দিয়েছ তার কিছু ফেরত আনতে পারবে না।

তিনি আরো বলেছেন- মুতা বা নারীদেরকে সাময়িকভাবে বিবাহ করা হারাম। উপরোক্ত হাদীস তিনটি ওয়াহিদী তার আল বসীত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৪. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সামনে তাঁর খোতবার মধ্যে মুতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তাঁর এ নিষেধের উপর একজন সাহাবীও প্রতিবাদ করেন নি। এতে বুঝা গেল, সাহাবাদের মুতা হারাম হওয়ার ব্যাপারটা জানা ছিল। নতুবা অবশ্যই কেউ না কেউ প্রতিবাদ করতেন। এতে করে ইজমায়ে সাহাবা দ্বারাও মুতা হারাম প্রমাণিত হয়েছে।

চারো মাজহাবের ইমামসহ সকল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ওলামাদের ঐকমত্যে মুতা হারাম। ইমাম সারখসী ও হেদায়া প্রণেতা মালেক (র.) -এর প্রতি যে মুতার বৈধতার সম্পর্ক করেছেন, ইবনে হুমাম প্রমুখ ওলামাদের মতে তাদের এ সম্পর্ক করাটা ঠিক নয়। বরং ইমাম মালেক (র.) -এর মতেও মুতা হারাম। তার মাজহাবই এর প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ।

কেবলমাত্র শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাই বলে মুতা জায়েজ।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথমে জায়েজ ফতোয়া দিয়ে থাকলে পরবর্তীতে তিনি তার সেই মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর এ মত থেকে তওবা করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে তাফসীরে কাবীর দেখুন।

-[খ. ৫, পৃ. ৫১-৫৩]

মুতা ও শিয়া সম্প্রদায় : শিয়ারা বলে, মুতা জায়েজ। তারা আলোচ্য আয়াতের اِسْتِمْتَاع কে পারিভাষিক মুতা বলে। আর একেই তারা দলিল হিসেবে পেশ করে থাকে। কারণ তাতে وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ বলা হয়েছে। আর বিয়েতে মহর প্রদান করা হয়, আজর বা বিনিময় নয়। এতে বুঝা যাচ্ছে, এখানে মুতা উদ্দেশ্য। তেমনিভাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুতাকে জায়েজ বলেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

জবাব : আয়াতে বর্ণিত إِسْتِمْتَاع দ্বারা যে পারিভাষিক উদ্দেশ্য নয় তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে **মোহরকে** أَجْرٌ বলা হয়েছে। তাই এখানেও أُجُوْرَهُنَّ -এর মর্ম হবে مُهُوْرَهُنَّ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ফতোয়া থেকে তিনি যে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে তওবাও যে করেছেন ইতিপূর্বে তা আলোচনা হয়েছে। তাই তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

ইসলামের প্রথম যুগের ও শিয়াদের মুতার মধ্যকার পার্থক্য : শিয়ারা যেই মুতাকে জায়েজ বলে বিশ্বাস করে সেই মুতা কোনো ধর্মে কোনো এক সময়ও জায়েজ ছিল না। আর তাদের মুতা ইসলামের প্রথম যুগেও বৈধ ছিল না। কারণ শিয়াদের মুতা ও জেনার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আর জেনাতো কোনো ধর্মে কখনোই হালাল ছিল না। সমস্ত শরিয়ত ও ধর্ম ব্যভিচারের অবৈধতার উপর একমত। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে কোনো ধর্মে চাই আসমানি হোক বা মানব রচিত হোক কেবল মাত্র শিয়া মতালম্বী ছাড়া কোথাও তাদের এই ঘৃণ্য মুতার অস্তিত্বও খুজে পাওয়া যায় না।

শিয়াদের মতে, মুতার অর্থ হলো এই যে, হারাম ও সধবা নারীগণ ব্যতীত যে কোনো নারীর সাথে যতটুকু সময়ের ইচ্ছা যে কোনো রকম নির্ধারিত বিনিময়ের উপর পরস্পরে সম্মত হয়ে সাক্ষী ছাড়া নামকাওয়াস্তে আকদ করে নেওয়া। অতঃপর সেই নির্ধারিত মিয়াদ পার হয়ে যাওয়ার পর তালাক ব্যতীত মুতার নারী নিজে নিজেই তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তার উপর কোনো রকম ইদ্দতও থাকে না। আর মুতা হচ্ছে শিয়া মতালম্বীদের নিকট এক প্রকার বিবাহ এবং উচ্চতর ইবাদত। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট মুতা সুস্পষ্ট জেনা ও চরম নির্লজ্জ হারাম কাজ।

আর যে মুতা ইসলামের প্রথম যুগে জায়েজ তথা অনিষিদ্ধ ছিল, তার মর্ম হলো, এক প্রকার নিকাহে মুয়াক্কাত বা সাময়িক বিবাহ। অর্থাৎ এক সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীদের সামনে অভিভাবকের অনুমতিক্রমে বিবাহ করা। অতঃপর নির্দিষ্ট মিয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর মহিলা তালাক ব্যতীতই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে পৃথক হয়ে যাওয়া পর ইস্তেবরায়ে রেহেমের জন্য এক হায়েজ আসা আবশ্যক, যাতে করে অন্য জনের বীর্যের সাথে সংমিশ্রণ না ঘটে। কেবলমাত্র এই ধরনের মুতা ইসলামের প্রথম যুগে জায়েজ ছিল। অর্থাৎ মুর্খতার যুগের রেওয়ায বা প্রথানুযায়ী লোকেরা এরকম মুতা করত এবং শরিয়তের মধ্যে তখনও তার উপর কোনো নিষিদ্ধতা ও অবৈধতার হুকুম নাজিল হয়নি, যেরূপ মদ ও সুদের নিষিদ্ধতার এবং অবৈধতার উপর কোনো হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহর পানাহ! জায়েজের অর্থ এই নয় যে, হুজুরে পাক ﷺ মৌখিকভাবে নিকাহে মুতার অনুমতি দিয়েছিলেন।

অতঃপর নিকাহে মুতা হারাম হওয়ার প্রথম ঘোষণা হয়েছে খায়বার যুদ্ধে, দ্বিতীয়বার হারাম হওয়ার ঘোষণা হয়েছে আওতাস যুদ্ধে, তৃতীয়বার হয়েছে তবুক যুদ্ধে, অতঃপর বিদায় হজের মধ্যে মুতা হারাম হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

যাতে করে আম-খাছ সব ধরনের লোকেরাই এই মুতার অবৈধতা জেনে নিতে পারে। হুজুরে পাক ﷺ মুতা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই বারংবার ঘোষণা ঐ প্রথম বারের ঘোষণারই তাকিদ হিসাবে ছিল। যা তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় করেছিলেন, নতুন কোনো হুকুম ছিল না। রইল কথা শিয়াদের মুতার, অর্থাৎ নর-নারীকে একদিন বা দুদিনের জন্য বিনিময় সাব্যস্ত করে উপভোগ করা। ইহা নির্ভেজাল খাঁটি ব্যভিচার। তা কোনো সময়ও ইসলামের মধ্যে জায়েজ ও মুবাহ ছিল না। তাই রহিত হওয়ার তো প্রশ্নই আসতে পারে না। যেরূপ জেনা কোনো সময় না মুবাহ ছিল এবং না রহিত হয়েছে।

-[মাআরেফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ১৮২-৮৩]

মাসআলা : নিকাহে মুতার ন্যায় নিকাহে মুয়াক্কাতও হারাম ও বাতিল।

মুয়াক্কাত বিবাহ হলো নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্য বিবাহ করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'মুতা' বিবাহে মুতা শব্দ বলা হয়।এবং মুয়াক্কাত বিবাহ নিকাহ শব্দের মাধ্যমে যে সম্পন্ন হয়। -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪০৫]

http://islamiboi.wordpress.com

٢٥. وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا غِنًى اَنْ
يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْحَرَائِرَ الْمُؤْمِنٰتِ هُوَ
جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ فَمِنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ يَنْكِحُ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ
الْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ فَاكْتَفُوْا
بِظَاهِرِهِ وَكِلُوا السَّرَائِرَ اِلَيْهِ فَاِنَّهُ الْعَالِمُ
بِتَفَاصِيْلِهَا وَرُبَّ اَمَةٍ تَفْضُلُ الْحُرَّةَ فِيْهِ
وَهٰذَا تَانِيْسٌ بِنِكَاحِ الْاِمَاءِ بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ اَيْ اَنْتُمْ وَهُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيْنِ فَلَا
تَسْتَنْكِفُوْا مِنْ نِكَاحِهِنَّ فَانْكِحُوْهُنَّ
بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ مَوَالِيْهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اَعْطُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ
مَطْلٍ وَنَقْصٍ مُحْصَنٰتٍ عَفَائِفَ حَالٌ غَيْرَ
مُسٰفِحٰتٍ زَانِيَاتٍ جَهْرًا وَّلَا مُتَّخِذٰتِ
اَخْدَانٍ اَخِلَّاءٍ يَزْنُوْنَ بِهَا سِرًّا فَاِذَآ اُحْصِنَّ
زُوِّجْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَزَوَّجْنَ
فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ زِنًا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ
مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ الْحَرَائِرِ الْاَبْكَارِ اِذَا
زَنَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ الْحَدِّ فَيُجْلَدْنَ خَمْسِيْنَ
وَيُغَرَّبْنَ نِصْفَ سَنَةٍ وَيُقَاسُ عَلَيْهِنَّ الْعَبِيْدُ
وَلَمْ يُجْعَلِ الْاِحْصَانُ شَرْطًا لِوُجُوْبِ
الْحَدِّ بَلْ لِاِفَادَةِ اَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِنَّ اَصْلًا
ذٰلِكَ اَيْ نِكَاحُ الْمَمْلُوْكَاتِ عِنْدَ عَدَمِ
الطَّوْلِ لِمَنْ خَشِيَ خَافَ الْعَنَتَ الزِّنَا ـ

অনুবাদ :

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য না রাখে স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না রাখে মুসলমান হওয়ার কথাটা স্বাভাবিকভাবে এসেছে, তাই এর বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য করা ঠিক হবে না। তবে সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রিতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। সুতরাং তার বাহ্যিক ঈমানের উপর যথেষ্ট কর, আর অভ্যন্তরীন গোপন রহস্যাদির ব্যাপারটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। কারণ তিনি সেই ব্যাপারে সবিস্তারে অবগত আছেন। আর সেই অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রেক্ষিতে অনেক বাদী স্বাধীন নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। এতে বাদীদের বিয়ের প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

তোমরা পরস্পরে এক। অর্থাৎ তোমরা ও তারা ধর্মের ব্যাপারে বরাবর, সুতরাং তাদেরকে বিয়ে করার মধ্যে লজ্জাবোধ করোনা। তাই তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়মানুযায়ী কোনো রকম টালবাহানা ও হ্রাস ঘটানো ছাড়া তাদেরকে তাদের মহরানা প্রদান কর। এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পবিত্র হবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী হবে না কিংবা উপপতি গ্রহণ কারিণী হবে না। যারা তার সাথে গোপনে জেনা করে। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, এক কেরাতে মারুফের সীগাহের সাথে অর্থাৎ, যখন তারা বিয়ে করে নেয় তখন যদি কোনো অশ্লীল তথা জেনার কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর স্বাধীন কুমারী নারীদের অর্ধেক শাস্তি তথা হদ আসবে। যদি তারা জেনা করে নেয়। সুতরাং তাদেরকে পঞ্চাশটি বেত্রাঘাত ও অর্ধবৎসরের নির্বাসন দেওয়া হবে। এবং তাদের উপর গোলামদেরকে কেয়াস করা হবে। আর বিবাহিতা হওয়ার বিষয়টা হদ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হিসেবে নয়, বরং একথা বুঝাবার স্বার্থে এসেছে যে, তাদের উপর রজম মোটেই নেই। এ বিষয়টা তথা স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য না থাকা অবস্থায় বাদীদেরকে বিয়ে করার এ হুকুম তাদের জন্য তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ তথা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।

http://islamiboi.wordpress.com

وَاَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ سُمِّيَ بِهِ الزِّنَا لِاَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقُوبَةِ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْكُمْ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَخَافُهُ مِنَ الْاَحْرَارِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَكَذَا مَنِ اسْتَطَاعَ طَوْلَ حُرَّةٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رحـ) وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَوْ عَدِمَ وَخَافَ وَاَنْ تَصْبِرُوْا عَنْ نِكَاحِ الْمَمْلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ لِئَلَّا يَصِيرَ الْوَلَدُ رَقِيقًا وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِالتَّوْسِعَةِ فِي ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : عَنَتَ -এর আসল অর্থ হচ্ছে কষ্ট। আর ব্যভিচারের নাম عَنَتَ [কষ্ট] এই জন্য রাখা হয়েছে যে, ব্যভিচার দুনিয়াতে হদ এবং আখেরাতে শাস্তির মাধ্যমে কষ্টের কারণ। পক্ষান্তরে যে স্বাধীন লোকদের জেনাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই, তাদের জন্য বাঁদীদেরকে বিয়ে করা হালাল নয়। তেমনিভাবে এই হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্যও, যে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত এটাই। আল্লাহ পাকের ইরশাদ- مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ দ্বারা কাফের নারীগণ বের হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার জন্য বাঁদীদের কে বিয়ে করা হালাল হবে না, যদিও সামর্থ্য না রাখে এবং গুনাহের আশঙ্কা হয়। আর যদি তোমরা সবর কর বাঁদীদেরকে বিয়ে করা হতে, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে করে সন্তান গোলাম না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় এ ব্যাপারে প্রশস্ততা প্রদানের মাধ্যমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الخ : পূর্বে বিবাহের আহকামের বর্ণনা ছিল। তারই অধীনে এখন শরয়ী বাদীদের সাথে বিবাহের আলোচনা শুরু হয়েছে। এরই ভিতরে বাদী ও গোলামের জেনার শাস্তির হুকুমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের শাস্তি স্বাধীনদের শাস্তির অর্ধেক হবে।

طَوْل শক্তি, সামর্থ্যকেও বলে। আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে মু'মিন বাদীদেরকে বিয়ে করতে পারবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, যথাসম্ভব স্বাধীন নারীদেরকেই বিয়ে করা উচিত। আর বাদীকে যদি বিয়ে করতেই হয় তবে বাদী মু'মিন হতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাজহাব এটাই যে, স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকাবস্থায় বাদী বা আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করা মকরুহ। আর অন্যান্য ইমাম যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকলে বাঁদীদের সাথে বিবাহ হারাম, তেমনিভাবে কিতাবীয়া বাদীর সাথেও বিয়ে মোটেই জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ : অর্থাৎ, বাদীদের সাথে বিয়ে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে কর। যদি তারা অনুমতি প্রদান না করে তবে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ বাদীর নিজের মালিকানাই নিজের অর্জিত নেই। গোলামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ সেও তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবেনা।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন, বাদীদের মহর উত্তমরূপে আদায় কর। বাদী মনে করে তাদের সাথে টালবাহানা করো না। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, মহরের অর্থ সম্পদের অধিকারী হলো বাদী। আর অন্যান্য ইমামদের মতে, মহরের হকদার হলো মালিক।

قَوْلُهُ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ : অর্থাৎ, মু'মিন বাদীদের সাথে বিয়ে কর যাতে করে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সংরক্ষিত থাকতে পারে। স্বাধীনভাবে যৌনচারিতা করে ঘুরে না বেড়ায়। এবং গোপনীয় ভাবেও যাতে অবৈধ প্রেমমগ্ন না হয়। অতঃপর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক আসবে যা স্বাধীন নারীদের উপর এসে থাকে। এর দ্বারা অবিবাহিতা স্বাধীন নারী উদ্দেশ্য। তাদের ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশত বেত্রাঘাত। আর স্বাধীন নারী বা পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তবে তার শাস্তি হলো রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। রজম যেহেতু অর্ধেক করা যায় না, তাই চারো ইমামের মতে, গোলাম বাদী চাই বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত সর্বাবস্থায় তাদের থেকে ব্যভিচার প্রকাশ পেলে তার শাস্তি হবে ৫০ টি বেত্রাঘাত।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ الخ : অর্থাৎ, বাদীদের সাথে বিবাহ করার অনুমতি ঐ সব লোকদের জন্য, যাদের জেনায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ : অর্থাৎ, জেনার আশঙ্কা সত্ত্বেও যদি সবর কর এবং নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে পার, তবে এটা তোমাদের জন্য বাদীকে বিয়ে করার চেয়ে উত্তম। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো স্বাধীন মহিলা বিবাহের যোগ্য পাওয়া না যাবে।

–[জামালাইন খ. ২, পৃ. ২১ –২২]

http://islamiboi.wordpress.com

وَاَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ سُمِّيَ بِهِ الزِّنَا لِاَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ فِي الدُّنْيَا وَالْعُقُوْبَةِ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْكُمْ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَخَافُهُ مِنَ الْاَحْرَارِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَكَذَا مَنِ اسْتَطَاعَ طَوْلَ حُرَّةٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ (رح) وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَلَوْ عَدِمَ وَخَافَ وَاَنْ تَصْبِرُوْا عَنْ نِكَاحِ الْمَمْلُوْكَاتِ خَيْرٌ لَّكُمْ لِئَلَّا يَصِيْرَ الْوَلَدُ رَقِيْقًا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بِالتَّوْسِعَةِ فِي ذٰلِكَ.

অনুবাদ : عَنَتَ -এর আসল অর্থ হচ্ছে কষ্ট। আর ব্যভিচারের নাম عَنَتَ [কষ্ট] এই জন্য রাখা হয়েছে যে, ব্যভিচার দুনিয়াতে হদ এবং আখেরাতে শাস্তির মাধ্যমে কষ্টের কারণ। পক্ষান্তরে যে স্বাধীন লোকদের জেনাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই, তাদের জন্য বাঁদীদেরকে বিয়ে করা হালাল নয়। তেমনিভাবে এই হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্যও, যে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত এটাই। আল্লাহ পাকের ইরশাদ- مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ দ্বারা কাফের নারীগণ বের হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার জন্য বাঁদীদের কে বিয়ে করা হালাল হবে না, যদিও সামর্থ্য না রাখে এবং গুনাহের আশঙ্কা হয়। আর যদি তোমরা সবর কর বাঁদীদেরকে বিয়ে করা হতে, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে করে সন্তান গোলাম না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় এ ব্যাপারে প্রশস্ততা প্রদানের মাধ্যমে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الخ : পূর্বে বিবাহের আহকামের বর্ণনা ছিল। তারই অধীনে এখন শরয়ী বাঁদীদের সাথে বিবাহের আলোচনা শুরু হয়েছে। এরই ভিতরে বাঁদী ও গোলামের জেনার শাস্তির হুকুমও বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের শাস্তি স্বাধীনদের শাস্তির অর্ধেক হবে।

طَوْل শক্তি, সামর্থ্যকেও বলে। আলোচ্য আয়াতের মর্ম হলো এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে করতে পারবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, যথাসম্ভব স্বাধীন নারীদেরকেই বিয়ে করা উচিত। আর বাঁদীকে যদি বিয়ে করতেই হয় তবে বাঁদী মু'মিন হতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মাজহাব এটাই যে, স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকাবস্থায় বাঁদী বা আহলে কিতাব নারীদেরকে বিয়ে করা মকরূহ। আর অন্যান্য ইমাম যেমন- ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকলে বাঁদীদের সাথে বিবাহ হারাম, তেমনিভাবে কিতাবীয়া বাঁদীর সাথেও বিয়ে মোটেই জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ : অর্থাৎ, বাঁদীদের সাথে বিয়ে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে কর। যদি তারা অনুমতি প্রদান না করে তবে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। কারণ বাঁদীর নিজের মালিকানাই নিজের অর্জিত নেই। গোলামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাৎ সেও তার মালিকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবেনা।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন, বাঁদীদের মহর উত্তমরূপে আদায় কর। বাঁদী মনে করে তাদের সাথে টালবাহানা করো না। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, মহরের অর্থ সম্পদের অধিকারী হলো বাঁদী। আর অন্যান্য ইমামদের মতে, মহরের হকদার হলো মালিক।

قَوْلُهُ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ : অর্থাৎ, মু'মিন বাঁদীদের সাথে বিয়ে কর যাতে করে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সংরক্ষিত থাকতে পারে। স্বাধীনভাবে যৌনচারিতা করে ঘুরে না বেড়ায়। এবং গোপনীয় ভাবেও যাতে অবৈধ প্রেমমগ্ন না হয়। অতঃপর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তাদের উপর ঐ শাস্তির অর্ধেক আসবে যা স্বাধীন নারীদের উপর এসে থাকে। এর দ্বারা অবিবাহিতা স্বাধীন নারী উদ্দেশ্য। তাদের ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশত বেত্রাঘাত। আর স্বাধীন নারী বা পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তবে তার শাস্তি হলো রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। রজম যেহেতু অর্ধেক করা যায় না, তাই চারো ইমামের মতে, গোলাম বাঁদী চাই বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত সর্বাবস্থায় তাদের থেকে ব্যভিচার প্রকাশ পেলে তার শাস্তি হবে ৫০ টি বেত্রাঘাত।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ الخ : অর্থাৎ, বাঁদীদের সাথে বিবাহ করার অনুমতি ঐ সব লোকদের জন্য, যাদের জেনায় লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ : অর্থাৎ, জেনার আশঙ্কা সত্ত্বেও যদি সবর কর এবং নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে পার, তবে তা তোমাদের জন্য বাঁদীকে বিয়ে করার চেয়ে উত্তম। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো স্বাধীন মহিলা বিবাহের যোগ্য পাওয়া না যাবে।

-[জামালাইন খ. ২, পৃ. ২১ -২২]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٢٦. يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ وَمَصَالِحَ اَمْرِكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ طَرَائِقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فِي التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ فَتَتَّبِعُوْهُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ يَرْجِعُ بِكُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ الَّتِيْ كُنْتُمْ عَلَيْهَا اِلٰى طَاعَتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِكُمْ حَكِيْمٌ فِيْمَا دَبَّرَهُ لَكُمْ .

২৬. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মের বিধিবিধান ও তোমাদের সার্বিক বিষয়াদির কল্যাণ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে চান এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের হালাল হারাম সম্বন্ধীয় পথ প্রদর্শন করতে চান, যাতে তোমরা তাদের অনুসরণ করে নাও। আরো চান তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে তথা তোমরা তার যে সব পাপ কাজে ছিলে তা থেকে স্বীয় আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে আনতে চান। আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত এবং তোমাদের তদবীর সম্বন্ধে খুবই প্রজ্ঞাবান।

٢٧. وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ كَرَّرَهُ لِيُبْنٰى عَلَيْهِ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسُ اَوِ الزُّنَاةُ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا تَعْدِلُوْا عَنِ الْحَقِّ بِارْتِكَابِ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَتَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ .

২৭. আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে চান। একথাটির উপর পরবর্তী বাক্যের ভিত্তি রাখার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী তথা ইহুদি খ্রিস্টান, অগ্নি পুজক ও ব্যভিচারী। তারা চায় যে, তোমরা হারাম কর্মে লিপ্ত হয়ে হক থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়, যাতে তোমরাও তাদের অনুরূপ হয়ে যাও।

٢٨. يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ يُسَهِّلَ عَلَيْكُمْ اَحْكَامَ الشَّرْعِ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا لَا يَصْبِرُ عَنِ النِّسَاءِ وَالشَّهَوَاتِ .

২৮. আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, তাই তোমাদের উপর শরিয়তের বিধি-বিধান সহজ করে দেন। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে, যদ্দরুন মহিলা ও কামনা থেকে নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে না।

তাহকীক ও তারকীব

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ . يُرِيْدُ . لِيُبَيِّنَ -এর লাম يُرِيْدُ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। অথবা لِيُبَيِّنَ . يُرِيْدُ -এর মাফঊলে বিহী হয়েছে, তখন লাম বর্ণটি অতিরিক্ত হবে। বাক্যের রূপ হবে يُرِيْدُ اَنْ يُبَيِّنَ لِيُبَيِّنَ -এর মাফঊল উহ্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ ।

وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ -এর মধ্যে যে تَوْبَةٌ রয়েছে তা এখানে শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই জন্যই গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যা করেছেন يَرْجِعُ بِكُمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ দ্বারা وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا -এর মধ্যে ضَعِيْفًا শব্দটি اَلْاِنْسَانُ থেকে তারকীবে হাল হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ …… خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا : হালাল ও হারামের বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ পাক মুসলমানদের উপর স্বীয় করুণা ও দয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে এমন জিনিসের নির্দেশ দান করেছেন যা তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আনে। আর মনের খাহেশ পূজারীরা তোমাদেরকে ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়। খাহেশ পূজারীদের নিকট হালাল ও হারামের কোনো পার্থক্য নেই। ইরশাদ হয়েছে-

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

শানে নুযূল : অগ্নিপূজকরা আপন বোন, ভাতিজী, ভাগিনীদেরকে বিয়ে করা হালাল মনে করত। আল্লাহ পাক যখন এদেরকে হারাম করে দিলেন, তখন তারা বলতে লাগল [হে মুসলমানগণ!] তোমরা খালাতো বোন ও ফুফাতোবোনকে বিয়ে করা হালাল মনে কর অথচ খালা ও ফুফুকে হারাম বিশ্বাস কর। সুতরাং তোমরা ভাতিজী ও ভাগিনীদেরকে বিয়ে করো। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো তোমাদের অবস্থার প্রতি রহমত সহকারে মনোনিবেশ করা, ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক, জেনাকার, পাপাচারী, প্রবৃত্তি পূজারীরা চায় যে, তোমরা সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও।

তিনি তোমাদেরকে সহজ বিধান দান করেছেন। বিয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকাবস্থায় বাঁদীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দান করেছেন। উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মোহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। এবং প্রয়োজনের সময় ইনসাফ ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিবাহ করার অনুমতি দান করেছেন।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মধ্যে কামনা-বাসনার উপদান নিহিত আছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেওয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়তো। তাই নারীদেরকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

٢٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِالْحَرَامِ فِي الشَّرْعِ
كَالرِّبٰوا وَالْغَصْبِ اِلَّا لٰكِنْ اَنْ تَكُوْنَ
تَقَعَ تِجَارَةً وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ اَنْ
تَكُوْنَ الْاَمْوَالُ تِجَارَةً صَادِرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَطِيْبِ نَفْسٍ فَلَكُمْ اَنْ تَأْكُلُوْهَا
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِارْتِكَابِ مَا
يُؤَدِّيْ اِلٰى هَلَاكِهَا اَيًّا كَانَ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ بِقَرِيْنَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
فِيْ مَنْعِهِ لَكُمْ مِنْ ذٰلِكَ.

অনুবাদ :

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে তথা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম পন্থায় যথা সুদ ও ডাকাতির মাধ্যমে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা তোমরা ভোগ করতে পার। এক কেরাতে تِجَارَةً শব্দটি كَانَ নাকেসার খবর হওয়ার ভিত্তিতে জবরযুক্ত পঠিত হয়েছে। তখন অর্থ হবে ঐ মাল তোমাদের জন্য হালাল হবে, যা হবে ব্যবসায়ের মাল, যে ব্যবসা তোমাদের পরস্পরের সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হালাক করো না। চাই সেই ধ্বংসটা দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে হোক। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا এই ব্যাপক ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। এজন্যেই তো তিনি তোমাদেরকে এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে বারণ করেছেন।

٣٠. وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ اَيْ مَا نُهِيَ عَنْهُ عُدْوَانًا
تَجَاوُزًا لِلْحَلَالِ حَالٌ وَّظُلْمًا تَاكِيْدٌ
فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نُدْخِلُهُ نَارًا يَحْتَرِقُ فِيْهَا
وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا هَيِّنًا.

৩০. আর যে কেউ হালাল থেকে সীমালঙ্ঘন করে কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে তথা নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হবে তাকে অচিরেই আগুনে নিক্ষেপ করব, তাতে সে জ্বলতে থাকবে। নাহবী তারকীবে عُدْوَانًا - يَفْعَلْ-এর যমীর থেকে حَال হয়েছে। আর ظُلْمًا হয়েছে তাকিদ। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।

٣١. اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَهِيَ
مَا وَرَدَ عَلَيْهَا وَعِيْدٌ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا
وَالسَّرِقَةِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) هِيَ
اِلَى السَّبْعِمِائَةِ اَقْرَبُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّاٰتِكُمْ الصَّغَائِرَ بِالطَّاعَاتِ
وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا
اَيْ اِدْخَالًا اَوْ مَوْضِعًا كَرِيْمًا هُوَ الْجَنَّةُ.

৩১. যদি তোমরা বেঁচে থাকতে পার সেসব বড় গুনাহগুলো থেকে যেগুলোকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। আর ঐ গুনাহকে বড় গুনাহ বলা হয় যার উপর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার, চুরি প্রভৃতি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বড় গুনাহের সংখ্যা সাতশত এর কাছাকাছি। তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তথা ছোট গুনাহগুলো আনুগত্যের কারণে ক্ষমা করে দেব। আর তোমাদেরকে প্রবেশ করাব মর্যাদার স্থানে, আর তা হচ্ছে বেহেশত। مُدْخَلًا এই শব্দটির মীম বর্ণে পেশের সহিত ও জবরের সহিত উভয় পদ্ধতিতেই পঠিত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

بِالْبَاطِلِ الخ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ - بَيْنَكُمْ উহ্য ثَابِت শিবহে ফে'লের মুতা'আল্লিক হয়ে اَمْوَالَكُمْ থেকে حَال হয়েছে। بِالْبَاطِلِ - لَا تَأْكُلُوْا -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে।

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً الخ -এর মধ্যে اِلَّا ইস্তেছনায়ে মুনকাতের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। تَكُوْنَ এখানে تَامَّة ও হতে পারে এবং نَاقِصَة হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। تَامَّة হলে تِجَارَةٌ পেশযুক্ত হবে। আর نَاقِصَة হলে تِجَارَةً যবরযুক্ত হবে।

مُدْخَلًا মীমে পেশ ও যবরযুক্ত উভয় রকমই হতে পারে। পেশযুক্ত হলে মানে হবে প্রবেশ করো না। আর مَدْخَلًا জবরযুক্ত হলে অর্থ হবে প্রবেশের স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ : অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরস্পরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। বাতেলের মধ্যে ধোকা, প্রতারণা, কৃত্রিমতা, এবং খাঁটি-ভেজালের সংমিশ্রণসহ ঐ সকল ব্যবসা-বাণিজ্যও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেগুলো করতে শরিয়ত নিষেধ করেছে। যেমন- জুয়া, সুদ প্রভৃতি। তেমনিভাবে নিষিদ্ধবস্তুর ব্যবসা করাও বাতেলের মধ্যেই গণ্য হবে। যেমন- অপ্রয়োজনে ছবি তোলা, অডিও, ভিডিও ফিল্ম, নির্লজ্জ কেসেট ইত্যাদি। এগুলো তৈরি করা, বেঁচা ও মেরামত করা সবটাই নাজায়েজ।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ : অপরের যেসব সম্পদ পরস্পরের সম্মতি ও সন্তুষ্টিক্রমে খাওয়া যেতে পারে, চাই ব্যবসার মাধ্যমে হোক বা অন্য কোনো পন্থায় হোক, সকল বৈধ পন্থায়ই ভোগ করা শুদ্ধ আছে। ব্যবসা যেহেতু রুজি-রোজগারের জন্য শ্রেষ্ঠ পন্থা, তাই একে বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। নতুবা হাদিয়া, হেবা, চাকুরী, নকরী, মজদুরী সকল পন্থায়ই অর্জিত সম্পদ হালাল মালের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) বলেন, হুজুরে পাক ﷺ -কে হালাল-পবিত্র মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهٖ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ অর্থাৎ হাতের কামাই ও বিশুদ্ধ ব্যবসা লব্ধ সম্পদ। [আহমদ, হাকেম] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ الشُّهَدَاءِ অর্থাৎ, সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে। -[তিরমিযী]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে পাক ﷺ বলেছেন-

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ تَحْتَ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْاَصْبَهَانِىْ - تَرْغِيْب) অর্থাৎ, সত্যবাদী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নীচে স্থান পাবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ : অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। এতে মুফাস্‌সরি ঐকমত্যে আত্মহত্যাও শামিল এবং অন্যকে না হকভাবে হত্যা করাও শামিল। আর দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংসের কারণ গুনাহে লিপ্ত হওয়া এই অর্থের অন্তর্ভুক্ত। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ২৭]

قَوْلُهُ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ : অর্থাৎ, তোমরা যদি কবীরা তথা বড় বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাক, তবে তোমাদের বাকি ত্রুটি বিচ্যুতি তথা সগীরা বা ছোট ছোট গুনাহসমূহকে আমি নিজ দয়াগুণে ক্ষমা করে দিবো। এটা হচ্ছে আয়াতের মর্ম।

কবীরা ও সগীরা গুনাহের সংজ্ঞা : কোন গুনাহ কবীরা আর কোনটি সগীরা তার প্রভেদ ও পার্থক্য কুরআনে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেননি। এই জন্যই এর সংজ্ঞার ব্যাপারে ওলামাদের বিভিন্ন রকম মত ও ইবারত পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ ওলামাদের এসব সাধারণ ধারণা প্রসূত, নিশ্চিত কোনো কিছু না। কবীরার সংজ্ঞায় যা উল্লেখ করা হবে এর বিপরীতটাই হবে সগীরার সংজ্ঞা। নিম্নে কবীরার কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হচ্ছে।

১. যে গুনাহের কারণে গুনাহগারের প্রতি কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে অথবা হাদীসের মাধ্যমে তাকে কবীরা গুনাহ বলে। কতিপয় শাফেয়ী ওলামাগণ এ সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেছেন।

২. যে গুনাহের উপর শরয়ী হদ বা শাস্তি আসে তাকে কবীরা গুনাহ বলে। যেমন- চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান, অপবাদ প্রদান ইত্যাদি।

৩. পবিত্র কুরআনে যে জিনিস হারাম হওয়ার কথা সুস্পষ্টরূপে এসেছে অথবা যে গুনাহের ন্যায় গুনাহের উপর হদ আসে তাকে কবীরা গুনাহ বলে।

http://islamiboi.wordpress.com

৪. হযরত আলী (রা.) বলেন, যে গুনাহের আলোচনাকে আল্লাহ পাক দোজখ,গজব, লানত অথবা আজাব শব্দ দ্বারা শেষ করেছেন তাই কবীরা গুনাহ।
৫. সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, বান্দাদের মধ্যকার পারস্পরিক জুলুম ও অন্যায় হচ্ছে কবীরা, আর বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার ত্রুটি বিচ্যুতি হলো সগীরা।
৬. মালেক ইবনে মিগওয়াল বলেন, বেদআতীদের কৃত গুনাহ হচ্ছে কবীরা, আর সুন্নীদের কৃত গুনাহ হলো সগীরা।
৭. কারো মতে, স্বেচ্ছায় কৃত গুনাহ হচ্ছে কবীরা, আর খাতা ও ভুলবশত কৃত অথবা অপারগ ও বাধ্য হয়ে কৃত গুনাহ হচ্ছে সগীরা।
৮. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, যে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে কবীরা, আর সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি যা ইবাদত দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায় এবং মূল গুনাহের অসিলা ও মাধ্যম যেগুলোতে নেককার ও ফাসেক সকলেই লিপ্ত হয়ে থাকে তা হচ্ছে সগীরা। যেমন– দৃষ্টি, স্পর্শ ও চুম্বন। হ্যাঁ তবে যদি মূল গুনাহ জেনাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে এসব অসিলাও কবীরা হয়ে যাবে।
৯. যে গুনাহকে কুরআন হারাম শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছে, তা কবীরা।
১০. ইমাম ওয়াহেদী বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হলো এই যে, কবীরা গুনাহের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। যা দ্বারা বান্দাগণ সকল কবীরা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। যদি এরকম হতো, তাহলে তারা সগীরাতে অধিক পরিমাণে লিপ্ত হয়ে যেত। এমনকি সগীরাকে তারা হালাল মনে করে নিত। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের উপর কবীরা সগীরার সুস্পষ্ট পরিচিতি গোপন রেখেছেন, যাতে করে তারা কবীরাতে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সগীরা থেকেও বিরত থাকে। যেমন– তিনি সালাতে উস্তা, শবে কদর, জুমার দিনের দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্তটিকে গোপন রেখেছেন, যাতে করে লোকেরা এগুলো হাসিল করার জন্য পূর্ণ সময়েই ব্যস্ত থাকে।

কবীরা গুনাহের সংখ্যা : কবীরা গুনাহের যেরূপ নিশ্চিত কোনো সংজ্ঞা নেই, তেমনিভাবে সুনির্ধারিত কোনো সংখ্যাও তার নেই। বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ যে সংখ্যা বর্ণনা করেছেন তা সীমাবদ্ধতার অর্থে নয়। বরং আলোচনা করলে যতটার প্রয়োজন ছিল ততটাই বলেছেন। এই জন্য বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন রকম সংখ্যা এসেছে।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, ২. যাদু, ৩. অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪. এতিমের অর্থ-সম্পদ গ্রাস করা, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে আসা ও ৭. নির্দোষ মুমিন নারীদের উপর জেনার অপবাদ দেওয়া।

অন্য রেওয়ায়েতে নয়টি বলা হয়েছে, উল্লিখিত সাতটি আর অষ্টম ও নবম হলো– মাতা-পিতার নাফরমানি ও বায়তুল্লাহ তথা হারাম শরীফের ভিতরে খোদাদ্রোহিতা করা।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর বর্ণনায় তিনটি উল্লেখ হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কবীরার সংখ্যা সত্তর থেকে সাতশত পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন, لَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيْرَةَ مَعَ الْاِصْرَارِ অর্থাৎ ইস্তেগফার বা তওবা দ্বারা যে কোনো কবীরা গুনাহ মাফ হতে পারে, আর সর্বদা লেগে থাকলে সগীরাও কবীরায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

সগীরা ও কবীরার প্রকারভেদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ইমাম আবূ ইসহাক ইসফেরাইনী, কাজী আবূ বকর বাকিল্লানী, ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী, ইবনুল কুশাইরীসহ একদল আলেম বলেন, গুনাহের মধ্যে কোনো প্রকারভেদ নেই, গুনাহ সবটাই কবীরা বা বড়, সগীরা বা ছোট গুনাহ বলতে কোনো গুনাহ নেই। তারা বলেন, গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর নাফরমানির নাম। আর তার নাফরমানি আবার ছোট হয় কেমন করে? তবে ইবনে হাজার আসকালানীসহ প্রমুখ ওলামাদের উক্তি মতে, অধিকাংশ আলেমের মতে, গুনাহের মধ্যে সগীরা কবীরার বিভক্তি রয়েছে।

কারণ আলোচ্য আয়াতসহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিভিন্ন সহীহ হাদীসে কবীরা শব্দদ্বারা কবীরা গুনাহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, উভয় দলের মধ্যে গুনাহের প্রকারভেদ থাকা-না থাকার মতবিরোধটি মূলত এক রকম শাব্দিক ইখতেলাফ। অর্থগত কোনো ইখতেলাফ নয়। কারণ যারা বলেছেন, গুনাহ কোনোটাই সগীরা নেই, তারা আল্লাহপাকের মাহাত্ম্য, বুযুর্গী, শানের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর নাফরমানিকে সগীরা বা ছোট বলাকে অপছন্দ করেছেন। আর যারা সগীরা কবীরার প্রতি বিভক্তি করেছেন, তারা মূলত কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করেছেন। এছাড়া তূলনামূলক ভাবে এক গুনাহ অপর গুনাহ থেকে ছোট-বড় হওয়ার প্রেক্ষিতেই তারা বলেছেন, আল্লাহর শানের প্রেক্ষিতে নয়।

–[রুহুল মা'আনী খ. ৫, পৃ. ১৭-১৮, তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ৭৭-৮২, তাফসীরে খাজেন খ. ১, পৃ. ৩৬৭]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٣٢. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْ جِهَةِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ لِئَلَّا يُؤَدِّيْ إِلَى التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ ثَوَابٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا بِسَبَبِ مَا عَمِلُوْا مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ مِنْ طَاعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَحِفْظِ فُرُوْجِهِنَّ نَزَلَتْ لَمَّا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَيْتَنَا كُنَّا رِجَالًا فَجَاهَدْنَا وَكَانَ لَنَا مِثْلُ أَجْرِ الرِّجَالِ وَاسْأَلُوْا بِهَمْزَةٍ وَدُوْنِهَا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ . مَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهِ يُعْطِيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَضْلِ وَسُؤَالُكُمْ .

৩২. আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করোনা এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ পাক তোমাদের উপর অপরের দীন ও দুনিয়ার প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যাতে পরস্পরে হিংসা- বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়। পুরুষ যা অর্জন করে জিহাদ প্রভৃতি আমলের মাধ্যমে সেটা তাদের ছওয়াবের অংশ, আর নারী যা অর্জন করে স্বামীর আনুগত্য ও সতীত্ব রক্ষাসহ প্রভৃতি আমলের মাধ্যমে সেটা তাদের ছওয়াবের অংশ। আলোচ্য আয়াতটি তখন নাজিল হয়েছিল যখন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেছিলেন, আফসোস! আমরা যদি পুরুষ হতাম তবে তাদের ন্যায় জিহাদ করতাম এবং আমরাও পুরুষদের ন্যায় ছওয়াব পেতাম। আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। اِسْئَلُوْا তে হামযাসহ এবং হামজা ব্যতীত উভয় কেরাত রয়েছে। যা তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহ তোমাদেরকে তা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। এরই মধ্য থেকে অনুগ্রহের পাত্রও তোমাদের প্রার্থনা।

٣٣. وَلِكُلٍّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ أَيْ عَصَبَةً يُعْطَوْنَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ لَهُمْ مِنَ الْمَالِ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ بِالْفٍ وَدُوْنِهَا أَيْمَانُكُمْ جَمْعُ يَمِيْنٍ بِمَعْنَى الْقَسَمِ أَوِ الْيَدِ أَيِ الْحُلَفَاءِ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمُوْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى النُّصْرَةِ وَالْإِرْثِ فَاٰتُوْهُمُ الْآنَ نَصِيْبَهُمْ حَظَّهُمْ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا . مُطَّلِعًا وَمِنْهُ حَالُكُمْ وَهُوَ مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهٖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلٰى بِبَعْضٍ .

৩৩. পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ তাদের যে সম্পত্তি ত্যাগ করে যান তাদের নারী-পুরুষ সকলের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী তথা আসাবা নির্ধারণ করে দিয়েছি। তাদেরকে সেই সম্পত্তি যথারীতি প্রদান করা হবে। আর যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছ, عَاقَدَتْ -এর মধ্যে আলিফসহ এবং আলিফ ছাড়া উভয় কেরাতই রয়েছে। يَمِيْن . اَيْمَان -এর বহুবচন। يَمِيْن অর্থ- কসম ও অঙ্গীকার। অর্থাৎ মূর্খতার যুগে যাদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে সহায়তা প্রদান ও উত্তরাধিকারের উপর এখন তাদের মিরাসি অংশ দিয়ে দাও। আর তা হচ্ছে এক ষষ্ঠমাংশ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন। আর সেসব থেকে তোমাদের অবস্থা ও রয়েছে। وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ দ্বারা এ বিধান রহিত হয়ে গেছে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ (الاية) :

শানে নুযূল : একদা হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, পুরুষ লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত লাভ করে থাকে, আর আমরা মহিলা মানুষ এসব ফজিলতপূর্ণ কাজসমূহ থেকে বঞ্চিত থাকি। আর আমাদের উত্তরাধিকারের অংশও পুরুষদের অর্ধেক। এর প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়।

আলোচ্য আয়াতটির মর্ম হলো এই যে, পুরুষদেরকে আল্লাহপাক তার হেকমত অনুযায়ী যে শারীরিক শক্তি সামর্থ্য দান করেছেন। যার ভিত্তিতে তাঁরা জিহাদও করে থাকে এবং অন্যান্য বাইরের কাজেও অংশ নিয়ে থাকে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে তাদের উপর বিশেষ দান। তা থেকে মহিলাদেরকে পুরুষসুলভ যোগ্যতার কাজ করার আকাঙ্ক্ষা করা ঠিক নয়। তবে আল্লাহর আনুগত্য ও নেক কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিত।

একটিগুরুত্ব পূর্ণ চারিত্রিক নির্দেশনা : আলোচ্য আয়াতটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখলে সামাজিক জীবনে মানুষের শান্তি নসীব হবে। আল্লাহ পাক সকল মানুষকে এক রকম বানান নি। বরং তাদের মধ্যে বহুবিধ প্রেক্ষিতে পার্থক্য রেখেছেন। যেখানে লোকে এই খোদায়ী পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে তার দেওয়া স্বভাবগত সীমা রেখা পার হয়ে নিজেদের কৃত্রিম বৈশিষ্ট্যের সংযোজন ঘটায়, সেখানে এক প্রকার ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। মানুষের এই মানসিকতা যে, যাকেই তার চেয়ে কোনো দিকে অগ্রসর দেখে সে পেরেশান হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে সামাজিক জীবনে পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির মূল বস্তু। এর ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যে মঙ্গল তার জন্য বৈধ পন্থায় অর্জন হয় না, অবৈধ পন্থায় তা অর্জন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে উক্ত মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকিদ প্রদান করেছেন। অর্থাৎ যে নিয়ামত তিনি অন্যকে দান করেছেন তার আকাঙ্ক্ষা করো না বরং আল্লাহর দয়ার প্রার্থনা কর। তিনি তাঁর হেকমতানুযায়ী যে নিয়ামত প্রদান করা তোমাদের জন্য উপযোগী মনে করেন তা দান করেন।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الخ আয়াতটি ইবনে কাছীরসহ অধিকাংশ ওলামার মতে وَأُولُوا الْأَرْحَامِ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আল্লামা সুয়ূতীও তাই বলেছেন। তবে ইবনে জারীর তাবারী একে রহিত নয় বলে দাবি করেছেন।

–[কামালাইন খ. ২, পৃ. ২৯-৩০]

http://islamiboi.wordpress.com

٣٤. اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ مُسَلَّطُوْنَ عَلَى
النِّسَاءِ يُؤَدِّبُوْنَهُنَّ وَيَأْخُذُوْنَ عَلٰى
اَيْدِيْهِنَّ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى
بَعْضٍ اَىْ بِتَفْضِيْلِهٖ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ
بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْوِلَايَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ
وَبِمَآ اَنْفَقُوْا عَلَيْهِنَّ مِنْ اَمْوَالِهِمْ
فَالصّٰلِحٰتُ مِنْهُنَّ قٰنِتٰتٌ مُطِيْعَاتٌ
لِاَزْوَاجِهِنَّ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ اَىْ
لِفُرُوْجِهِنَّ وَغَيْرِهَا فِىْ غَيْبَةِ اَزْوَاجِهِنَّ
بِمَا حَفِظَ هُنَّ اللّٰهُ حَيْثُ اَوْصٰى
عَلَيْهِنَّ الْاَزْوَاجَ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ
نُشُوْزَهُنَّ عِصْيَانَهُنَّ لَكُمْ بِاَنْ ظَهَرَتْ
اَمَارَاتُهٗ فَعِظُوْهُنَّ فَخَوِّفُوْهُنَّ مِنَ اللّٰهِ
وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ اِعْتَزِلُوْا اِلٰى
فِرَاشٍ اٰخَرَ اِنْ اَظْهَرْنَ النُّشُوْزَ
وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ اِنْ لَمْ
يَرْجِعْنَ بِالْهِجْرَانِ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فِيْمَا
يُرَادُ مِنْهُنَّ فَلَا تَبْغُوْا تَطْلُبُوْا عَلَيْهِنَّ
سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلٰى ضَرْبِهِنَّ ظُلْمًا اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا فَاحْذَرُوْهُ اَنْ
يُعَاقِبَكُمْ اِنْ ظَلَمْتُمُوْهُنَّ ـ

অনুবাদ :

৩৪. পুরুষগণ নারীগণের উপর কর্তৃত্বশীল, তারা নারীদেরকে শিষ্টাচার শিখায় এবং অপছন্দনীয় কাজ হতে তাদেরকে বিরত রাখে এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তথা জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিভাবকত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নারীদের উপর পুরুষদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং এ কারণে যে, পুরুষগণ স্ত্রীদের উপর তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব তাদের মধ্য থেকে যে সকল নেককার স্ত্রীগণ তাদের স্বামীদের অনুগত হয়, তাদের স্বামীদের অবর্তমানে স্বীয় সতীত্ব প্রভৃতি বিষয় যা আল্লাহ সংরক্ষণীয় করে দিয়েছেন তা হেফাজত করে। যেরূপ তাদের স্বামীদেরকে আল্লাহপাক আদেশ দিয়েছেন, স্বীয় স্ত্রীদের হেফাজত করতে। আর যে সকল স্ত্রীদের অবাধ্যতার তোমরা আশঙ্কা কর, এ হিসেবে যে, তাদের অবাধ্যতার নিদর্শন প্রকাশ পেয়ে গেছে, তবে তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তথা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাও, এবং তাদেরকে শয্যাস্থান থেকে দূরে রাখো, অর্থাৎ তোমরা ভিন্ন শয্যা গ্রহণ কর। যদি তারা অবাধ্যতা প্রকাশ করে, আর শয্যা পৃথক করার পরও যদি তারা বাধ্য হয়ে ফেরত না আসে তখন তাদেরকে মৃদু প্রহার কর। এতে যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তাদের কাছ থেকে তোমাদের কাম্য বস্তুতে, তবে তাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে শক্ত প্রহারের কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহান শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং তোমরা তার শাস্তি হতে ভয় করতে থাক, যদি তাদের প্রতি জুলুম কর।

http://islamiboi.wordpress.com

৩৫. وَاِنْ خِفْتُمْ عَلِمْتُمْ شِقَاقَ خِلَافَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْاِضَافَةُ لِلْاِتِّسَاعِ اَىْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوْا اِلَيْهِمَا بِرِضَاهُمَا حَكَمًا رَجُلًا عَدْلًا مِّنْ اَهْلِهٖ اَقَارِبِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا وَيُوَكِّلُ الزَّوْجُ حَكَمَهٗ فِىْ طَلَاقٍ وَقَبُوْلِ عِوَضٍ عَلَيْهِ وَتُوَكِّلُ هِىَ حَكَمَهَا فِى الْاِخْتِلَاعِ فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوْعِ اَوْ يُفَرِّقَانِ اِنْ رَايَاهُ قَالَ تَعَالٰى اِنْ يُّرِيْدَآ اَىِ الْحَكَمَانِ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اَىْ يُقَدِّرُهُمَا عَلٰى مَا هُوَ الطَّاعَةُ مِنْ اِصْلَاحٍ اَوْ فِرَاقٍ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَىْءٍ خَبِيْرًا بِالْبَوَاطِنِ كَالظَّوَاهِرِ -

৩৫. আর যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদের আশঙ্কা বোধ কর জান, এখানে شِقَاقَ মাসদারের ইযাফত بَيْنِهِمَا জরফের দিকে হয়েছে, জরফের মধ্যে প্রস্ততা থাকার কারণে। ইবারতের আসল রূপ ছিল شِقَاقًا بَيْنَهُمَا [তখন] তারা উভয়ের সম্মতিতে স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনদের থেকে একজন বিচারক তারা উভয়ের দিকে প্রেরণ কর। স্বামী তার পক্ষের বিচারককে তালাক এবং তালাকের উপর বিনিময় গ্রহণের অধিকার দিয়ে দিবে। আর স্ত্রী তার পক্ষের বিচারককে খোলা প্রদানের অধিকার দিয়ে দেবে। অতঃপর উভয় বিচারক সংশোধনের চেষ্টা করবে, এবং অন্যায়কারীকে তার অন্যায় থেকে প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেবে, অথবা সমীচীন মনে করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যদি বিচারকদ্বয় সংশোধন করাবার চায়, তবে আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে তৌফিক দিয়ে দেবেন অর্থাৎ তারা উভয়কে সংশোধন বা বিচ্ছেদ যে কোনো একটির আনুগত্যের সামর্থ্য দিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত গোপন বিষয়াদি সম্বন্ধে বাহ্যিক বিষয়াদির ন্যায় খবর রাখেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوَّامٌ - قَوَّامُوْنَ قَوَّامٌ-এর বহুবচন। قَوَّامٌ অর্থ– ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, পরিচালক, কর্তৃত্বশীল শাসক ইত্যাদি। قَوَّامٌ আধিক্য বাচক শব্দ, মুবালাগার সীগাহ। اَلرِّجَالُ মুবতাদা, قَوَّامُوْنَ খবর। عَلَى النِّسَاءِ মুতা'আল্লিক হয়েছে قَوَّامُوْنَ -এর সাথে। তেমনিভাবে بِمَا ও قَوَّامُوْنَ-এর মুতাআল্লিক।

قَوْلُهٗ وَالْاِضَافَةُ لِلْاِتِّسَاعِ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। আর প্রশ্ন হলো এই যে, মাসদারের ইজাফত হয় ফায়েল অথবা মাফউলের দিকে। আর এখানে شِقَاقَ মাসদারের ইজাফত بَيْنَ-এর দিকে হচ্ছে, যা ফায়েল ও মাফউলের কোনোটাই নয়, বরং জরফ। উত্তর হলো এই যে, জরফের এরকম প্রশস্ততা রয়েছে যা গায়রে জরফের মধ্যে নেই। তাই এখানে মাসদারের ইজাফত জরফের দিকে হতে পেরেছে। কেননা একটি কায়দা রয়েছে– يَجُوْزُ فِى الظَّرْفِ مَا لَا يَجُوْزُ فِىْ غَيْرِهٖ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : নারীদের সম্পর্কে যে সকল বিধি-বিধান পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার উপর নিষিদ্ধতাও বর্ণিত হয়েছে। এবারে পুরুষদের অধিকারের আলোচনা হচ্ছে।

http://islamiboi.wordpress.com

শানে নুযূল : মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই আয়াত নাজিল হয় সা'দ ইবনে রবী ইবনে ওমর এবং তাঁর স্ত্রী হাবীবাহ বিনতে যায়েদ ইবনে আবি জোহাইর সম্পর্কে। আর কলবী বলেছেন, সা'দ এর স্ত্রীর নাম হলো খাওলা বিনতে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা। ঘটনার বিবরণ এই যে, সা'দের স্ত্রী তাঁর মর্জির খেলাফ কোনো কাজ করেছিল। এই জন্য সা'দ তাকে একটি চাপড় মারে। স্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় পিতাকে এ সম্পর্কে অবগত করে। পিতা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করে। প্রিয়নবী ﷺ স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীকে প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। ঠিক এমন সময় আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। তখন প্রিয়নবী ﷺ সা'দের স্ত্রীকে প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বারণ করে ইরশাদ করেন– আমি চেয়েছিলাম এক কিন্তু আল্লাহর মর্জি অন্য। আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই যে সর্বোত্তম এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ঘটনা বর্ণনার পর আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, একটি বর্ণনায় রয়েছে আয়াতখানি নাজিল হয়েছে জামিলা বিনতে আব্দুল্লাহ এবং তার স্বামী সাবেত ইবনে কায়েস সম্পর্কে।

* ইবনে আবি হাতেম হাসানের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, একজন স্ত্রী লোক প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে তার স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, সে তাকে প্রহার করেছে। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, স্বামীর নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতে পার, তখন এই আয়াত নাজিল হয়।
* ইবনে মরদাবিআহ হযরত আলী (রা.) -এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন যে, একজন আনসারী সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, সে আমাকে এত বেশি প্রহার করেছে যে, আমার চেহারায় এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, এভাবে প্রহার করার কোনো অধিকার তার নেই। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। –[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৩৩]

নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব : اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ এই আয়াতে নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব কর্তৃত্ব ও অভিভাবকত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। পুরুষদের নারীদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি ওহাবী বা আল্লাহ প্রদত্ত, তাতে পুরুষদের কোনো চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কোনো রকম অর্জনের দখল নেই। এটা কেবল সৃষ্টিগত। পুরুষকে ধী শক্তি, চেষ্টা-তদবীরের ক্ষমতা, জ্ঞানের প্রশস্ততা, দৈহিক শক্তি এবং যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রদান করা হয়েছে। আর এসব নিয়ামত এভাবে নারীদেরকে প্রদান করা হয়নি। এ কারণেই পুরুষকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে যা নারীদেরকে দেওয়া হয়নি। যেমন– নবুয়ত ইমামত, হুকুমত বা রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, জিহাদ ওয়াজিব হওয়া, জুমা ওয়াজিব হওয়া, দুই ঈদের নামাজ, আজান, খোতবা, নামাজের জামাত, উত্তরাধিকারে অধিকতর অংশলাভ, একাধিক বিয়ে করার ক্ষমতা, তালাক প্রদানের এখতিয়ার প্রভৃতি। আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে কসবী বা প্রচেষ্টা লব্ধ। আর তা হলো এই যে, পুরুষ তথা স্বামী নারী তথা স্ত্রীর মহরসহ যাবতীয় খরচ-পত্র, ভরণ-পোষণ, খোরপোষ, বাসস্থান সর্ব প্রকার ব্যয় ভার বহন করে চলে। এই দুই কারণে আল্লাহ পাক নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। এই প্রাধান্যের কারণেই প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রী লোককে আদেশ দিতাম যেন তার স্বামীকে সেজদা করে। [আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ]

স্ত্রী কর্তব্য : এমনি অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা। এটিই আলোচ্য আয়াতের মর্ম কথা। স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলার এই বিধান অমান্য করলে সমূহ অকল্যাণ এবং অমঙ্গলের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

–[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৩৩-৩৪]

ইসলামে নারীর অধিকার : সূরায়ে বাকারার এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ স্ত্রী লোকদের অধিকার পুরুষদের উপর ততটুকুই ওয়াজিব যতটুকু স্ত্রী লোকের উপর পুরুষের অধিকার। এখানে উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার সমান বলে ঘোষণা করে তা বাস্তবায়নের নিয়ম পদ্ধতি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। এতে জাহিলিয়্যাতের যুগ থেকে নারীদের ব্যাপারে যেসব অমানবিক আচরণ করা হতো সে সবের উৎখাত করা হয়েছে। অবশ্য এটা জরুরি নয় যে, অধিকার বাস্তবায়নের পদ্ধতিও একই ধরনের হবে। নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধরন অবশ্যই স্বতন্ত্র। কিন্তু অধিকারের সীমা সংকুচিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেমন– নারীর প্রতি গৃহের কর্তৃত্ব, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি বিশেষ কতগুলো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনি পুরুষের প্রতি নারীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জীবিকার্জনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অনুরূপ নারীদের প্রতি যেমন পুরুষের সেবা ও আনুগত্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তেমনি পুরুষের উপরও তাদের মহর ও খোরপোষের দায়িত্ব ফরজ করা হয়েছে। মোটকথা এ আয়াতের নারী এবং

http://islamiboi.wordpress.com

পুরুষের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য নারী জাতির উপর পুরুষ জাতির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যা আয়াতের শেষাংশে وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ বলে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী জাতির উপর পুরুষদের একস্তর প্রাধান্য রয়েছে। আর সেই প্রাধান্যের স্তরটি اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর তা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষ শাসক, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। আর নারীগণ পুরুষদের কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত। −[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪৩৬-৩৭]

ইসলাম পূর্বযুগে নারীর মজলুমানাবস্থা : নারীর অসহায়ত্ব ও দৈন্যদশার ইতিহাস এতটুকু সুদীর্ঘ ও সনাতন যতটুকু খোদ জুলুমের। অর্থাৎ যখন থেকে জুলুমের সূচনা পৃথিবীতে হয়েছে তখন থেকেই নারী নির্যাতিতা হয়ে আসছে। ইসলাম এসে নারীদের কেবল মজলুমানাবস্থা বিদূরিতই করেনি বরং তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে সম্মানিতাও করেছে।

নারীদের সম্পর্কে রোমান দৃষ্টিভঙ্গি : রোমানদের আমলে নারীকে জাতীয় যৌথ উপভোগের বস্তু মনে করা হতো যা থেকে প্রত্যেকের উপভোগের অধিকার ছিল।

নারী সম্পর্কে ইউহান্নার দৃষ্টিভঙ্গি : নারী সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.) এর এক শিষ্য ইউহান্নার দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, নারী হচ্ছে অনিষ্টের মূল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার শত্রু।

নারী সম্পর্কে খ্রিস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি : খ্রিস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নারী মানুষ হবে দূরের কথা জীবও নয়। খ্রিস্টীয় ৫৮৬ সালে সমগ্র খ্রিস্টান জাহানের জ্ঞানী, গুণীগণ এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ইউরোপে সমবেত হলো যে, নারীর মধ্যে রূহ বা আত্মা আছে কি নাই। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, নারীর মধ্যেও আত্মা রয়েছে।

নারী সম্পর্কে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি : প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে স্পর্শের অযোগ্য হতভাগীনি মনে করা হতো, আর এরকম অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়া হতো যে, সে জীবন্ত অবস্থায়ই জ্বলে মরাকে প্রাধান্য দিয়ে দিত। বিধবা নারীর শয্যা পৃথক করে দেওয়া হতো। তার জন্য অন্য কারো বিছানায় বসার অনুমতি ছিল না। তার বর্তন পৃথক করে দেওয়া হতো। বিয়ে শাদীসহ যে কোনো আদন্দ উৎসবে তার অংশগ্রহণ অমঙ্গলজনক মনে করা হতো। এগুলোই হচ্ছে ঐ অবস্থা যার দরুন এহেন অপমানের জীবনের উপর সে মৃত্যুকেই প্রাধান্য দিয়ে দিতো। আর হিন্দু ধর্মীয় ঠিকাদারেরা একে ধর্মীয় পবিত্রতা বলে নাম দিতো। আর যে নারী অবস্থায় বাধ্য হয়ে স্বামীর সাথে তারই শ্মশানে জ্বলে যেত তাকে বড় স্বামী ভক্তাদের মধ্যে গণ্য করা হতো।

অবাধ্য স্ত্রী ও তার সংশোধনের পদ্ধতি : পবিত্র কুরআন অবাধ্য স্ত্রীর সংশোধনের জন্য ক্রমাগত তিনটি পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে− وَاللّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ অর্থাৎ, স্ত্রীদের তরফ থেকে যদি নাফরমানি প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা ও তার নিদর্শনাবলি প্রকাশ হয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধনের পন্থা হলো এই যে, কোমলভাবে তাদেরকে বুঝাও। যদি তারা শুধু বুঝানোর দ্বারা নাফরমানি হতে বিরত না হয় তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের শয্যা পৃথক করে দাও। যাতে স্বামীর অসন্তুষ্টির কথা তারা উপলব্ধি করতে পারে। আর নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে শুভ পথে এসে যায়। فِى الْمَضَاجِعِ শব্দ দ্বারা একথা বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথক কেবল শয্যাতেই হবে গৃহে নয়। কারণ এতে স্ত্রীর মনোকষ্টও হবে অধিক এবং কোনো ফেতনা-ফ্যাসাদেরও আশঙ্কা সৃষ্টি হবে না। যে স্ত্রী ভদ্রতাসূলভ সতর্কীকরণ দ্বারা দুরস্ত না হয়, তবে তাকে তৃতীয় পর্যায়ে হালকা প্রহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্বামী তাকে হালকা প্রহার করতে পারবে, যাতে শরীরে কোনো রকম চিহ্ন না পড়ে। আর চেহারায় তো সম্পূর্ণ রূপে প্রহার নিষিদ্ধ। হালকা প্রহারের যদিও অনুমতি রয়েছে কিন্তু এর সাথে সাথে একথাও বিবৃত হয়েছে যে, لَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ অর্থাৎ ভদ্র, ভালো লোকেরা তাদের স্ত্রীদেরকে প্রহার করবেনা। এবং হুজুরে পাক ﷺ তাঁর কোনো স্ত্রীকে প্রহার করেছেন বলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সংশোধনের চতুর্থ পদ্ধতি : ঘরোয়া তিনটি পদ্ধতি যদি ফলপ্রসূ না হয় তখন চতুর্থ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। আর তা হচ্ছে দুইজন হাকেম সালিশ নিযুক্ত করা। স্বামীর পরিবারের লোকজন থেকে একজন সালিশ আর স্ত্রীর পরিবারের লোকজন থেকে আরেকজন সালিশ নিযুক্ত করা হবে। তারা উভয় এবং স্বামী-স্ত্রী যদি নিষ্ঠাবান হয় তবে অবশ্যই তারা তাদের সংশোধনের চেষ্টায় সফল হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

আর যদি সফল না হয় তখন সালিশদ্বয়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার এখতিয়ার হবে কি না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে।

উভয় পক্ষের সালিশকে যদি স্বামী-স্ত্রীর তরফ থেকে এ কথার এখতিয়ার প্রদান করা হয়ে থাকে যে, তোমরা মিলে মিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তাই মেনে নেবো। তখন সালিশদ্বয় সম্পূর্ণ রূপে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দুজন তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা খোলা প্রভৃতি যে কোনো সিদ্ধান্তে একমত হলে তাই হবে। এবং পুরুষদের তরফ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা উকিল হিসেবে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও হযরত আবূ হানীফা (র.) প্রমুখের এমনি অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অনুরূপ মতই পোষণ করেন। হ্যাঁ, যদি তারা উভয়কে উকিল বানিয়ে এ অধিকার না দেওয়া হয়, তবে তারা কেবল সংশোধনের জন্যই চেষ্টা করবে তালাক, খোলা প্রভৃতির অধিকার তাদের হবে না।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও সাঈদ ইবনে জুবাইরসহ প্রমুখদের মতে, তারা উভয় সালিশের তালাক, খোলা, মিলিয়ে দেওয়া, পৃথক করে দেওয়া প্রভৃতির পূর্ণ অধিকার থাকবে।

হযরত আলী (রা.) -এর সামনে এমনি এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপোষ মীমাংসা ছাড়া উল্লিখিত সালিশদ্বয়ের অন্য কোনো অধিকার থাকে না, যতক্ষণনা উভয় পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েত ক্রমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রা.) -এর খেদমতে এসে হাজির হলো, তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের একেক দল। হযরত আলী নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন হাকিম বা সালিশ নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিশ নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদিগকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? শোন, তোমরা যদি এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপোষ করে নেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই কর। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে তা টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি, এতদুভয় সালিশ আল্লাহর আইন অনুসারে ফায়সালা করবে। তা আমার মতের অনুসারী হোক বা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি। কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া বা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোনো ক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিশদের এ অধিকার দিচ্ছি যে তারা আমার উপর যে কোনো রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে স্ত্রীকে সম্মত করিয়ে দিতে পারেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, না তা হয় না। তোমারও সালিশদিগকে তেমনি অধিকার দেওয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনা দ্বারা কোনো কোনো মুজতাহিদ ইমাম এ বিষয়টি উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিশদের অধিকার সম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন– হযরত আলী (রা.) উভয়পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকার সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আজম আবূ হানীফা ও হযরত হাসান বসরী (র.) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লিখিত সালিশদ্বয়ের অধিকার সম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিশদ্বয় অধিকার সম্পন্ন নয়। তবে অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে তবে অধিকার সম্পন্ন হয়ে যায়। কুরআনে কারীমের এই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়। যার মাধ্যমে মামলা-মোকাদ্দমা আদালতে যাবার পূর্বেই পারিবারিক কিংবা সামাজিক পঞ্চায়েতেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৩৭-৩৮, মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ ৪৪৭-৪৮]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٣٦. وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَ اَحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِرًّا وَلِيْنَ جَانِبٍ وَبِذِى الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى الْقَرِيْبِ مِنْكَ فِى الْجِوَارِ اَوِالنَّسَبِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ الْبَعِيْدِ عَنْكَ فِى الْجِوَارِ اَوِالنَّسَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الرَّفِيْقِ فِىْ سَفَرٍ اَوْ صِنَاعَةٍ وَقِيْلَ الزَّوْجَةُ وَابْنِ السَّبِيْلِ الْمُنْقَطِعِ فِىْ سَفَرِهٖ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْاَرِقَّاءِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا مُتَكَبِّرًا فَخُوْرًا عَلَى النَّاسِ بِمَا اُوْتِىَ .

৩৬. আর আল্লাহর ইবাদত কর তথা তাকে একত্ব বিশ্বাস কর, এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না, আর পিতামাতার সাথে ইহসান কর, তথা তাদের সাথে উত্তম ও বিনম্র ব্যবহার প্রদর্শন কর এবং আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন প্রতিবেশিত্ব বা বংশীয় সম্পর্কে নিকটতম প্রতিবেশী প্রতিবেশিত্ব বা বংশীয় সম্পর্কে দূরবর্তী প্রতিবেশী, সফর বা সমবৃত্তির সাথী ভিন্নমতে জীবন সঙ্গীনি মুসাফির যে পথ চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছে এবং তোমাদের গোলামদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন না যারা দাম্ভিক এবং পার্থিক ধন দৌলত পেয়ে যারা লোকদের উপর গর্বিত।

٣٧. اَلَّذِيْنَ مُبْتَدَأٌ يَبْخَلُوْنَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ بِهٖ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ بِذٰلِكَ وَبِغَيْرِهٖ عَذَابًا مُّهِيْنًا ذَا اِهَانَةٍ .

৩৭. اَلَّذِيْنَ মুবতাদা, যারা কার্পণ্য করে আবশ্যকীয় বিষয়াদিতে এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে বলে এবং আল্লাহ তা'আলার স্বীয় কৃপায় যা জ্ঞান ও ধন দান করেছেন তাকে গোপন করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর ভীতি। আর তারা হচ্ছে ইহুদিরা لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ হলো اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর। আর আমি এসব কার্পণ্য প্রভৃতির কারণে নাফরমানদের জন্য অপমান জনক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।

٣٨. وَالَّذِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الَّذِيْنَ قَبْلَهُ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاۤءَ النَّاسِ مُرَائِيْنَ لَهُمْ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ كَالْمُنَافِقِيْنَ وَاَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا صَاحِبًا يَعْمَلُ بِاَمْرِهٖ كَهٰؤُلَاۤءِ فَسَاۤءَ بِئْسَ قَرِيْنًا هُوَ .

৩৮. وَالَّذِيْنَ পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস করে না যেমন- মুনাফিক ও মক্কাবাসী কাফেররা আর যার সাথী হয় শয়তান সে তার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে যেরূপ এসব লোকেরা। আর শয়তান তার অত্যন্ত নিকৃষ্ট সাথী।

http://islamiboi.wordpress.com

٣٩. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اَىْ اَىُّ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ وَلَوْ مَصْدَرِيَّةٌ اَىْ لَا ضَرَرَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الضَّرَرُ فِيْمَا هُمْ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا فَيُجَازِيْهِمْ بِمَا عَمِلُوْا .

৩৯. তাদের কি ক্ষতি হতো যদি তারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করতো এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা রিজিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করত? এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, لَوْ হচ্ছে মাসদারী অর্থাৎ এতে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, বরং যাতে তারা রয়েছে তাতেই ক্ষতি বিদ্যমান। এবং আল্লাহ তা'আলা] তাদের সকল বিষয়ে অবগত আছেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন।

٤٠. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ اَحَدًا مِثْقَالَ وَزْنَ ذَرَّةٍ اَصْغَرَ نَمْلَةٍ بِاَنْ يَنْقُصَهَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اَوْ يَزِيْدَهَا فِىْ سَيِّاٰتِهِ وَاِنْ تَكُ الذَّرَّةُ حَسَنَةً مِنْ مُؤْمِنٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فَكَانَ تَامَّةٌ يُّضٰعِفْهَا مِنْ عَشْرٍ اِلٰى اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُضَعِّفُهَا بِالتَّشْدِيْدِ وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ مِنْ عِنْدِهٖ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ اَجْرًا عَظِيْمًا لَا يَقْدِرُهُ اَحَدٌ .

৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি এক বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম পিপিলিকার সমপরিমাণ ছওয়াব কমান না এবং তার সমপরিমাণ গুনাহতে বৃদ্ধিও করে না। আর যদি কোনো নেককাজ হয় কোনো মু'মিনের তরফ থেকে, অন্য এক কেরাতে حَسَنَةٌ -এর পেশের সাথে তখন كَانَ টি তাম্মাহ হবে, তবে তিনি দশ থেকে সাত শতাধিক পরিমাণে ছওয়াব বাড়িয়ে দেন। এক কেরাত يُضَعِّفْهَا তাশদীদের সাথে এসেছে। এবং তার নিকট থেকে প্রবৃদ্ধিসহকারে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দান করেন যার উপর অন্য কারো সামর্থ্য নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا : এর পূর্বে اَحْسِنُوْا উহ্য মেনে ও একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো এই যে, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا হলো জুমলায়ে খবরিয়া, তার আতফ হয়েছে اُعْبُدُوا اللّٰهَ জুমলায়ে ইনশাইয়্যার উপর। অথচ عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاءِ ঠিক নয়। গ্রন্থকার اَحْسِنُوْا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مَعْطُوْف ও ইনশাইয়্যাহ। তাই কোনো অভিযোগ নেই। اَلَّذِيْنَ মুবতাদা, আর তার খবর উহ্য। আর তা হচ্ছে لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ –[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৩৪, তাফসীরে হক্কানী খ. ২, পৃ. ১১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْجَارِ الْجُنُبِ এ বাক্যটি আত্মীয় প্রতিবেশীর মোকাবিলায় ব্যবহার হয়েছে। যার মর্ম হলো এই যে, যে প্রতিবেশী আত্মীয় নয়, তার সাথেও প্রতিবেশী হিসেবে সদ্ব্যবহার করা উচিত। বহু হাদীসে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে তাকিদ এসেছে।

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সফর বা ব্যবসার সাথী এবং স্ত্রী ও ঐ সব লোক, যারা কোনো ফায়দার আশা নিয়ে কারো সান্নিধ্যে আসে তারাও শামিল। তাদের সাথেও কোমল সদ্ব্যবহার করতে হবে।

ফখর করা, আত্মম্ভরিতা করা, আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয় বস্তু। হাদীস শরীফে এ পর্যন্ত এসেছে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। যে সকল বস্তু আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, এসবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে আত্মম্ভরিতা, আত্ম প্রীতি এবং রিয়া ও মর্যাদা লাভের লিপসা। অহংকার ও গৌরবের পর তৃতীয় বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে কৃপণতা। আর্থিক কৃপণতা উদ্দেশ্য হওয়া তো সুস্পষ্টই। ইলমে দীনের ক্ষেত্রে কৃপণতা করাকেও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤١. فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِعَمَلِهَا وَهُوَ نَبِيُّهَا وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

৪১. তখন কাফেরদের অবস্থা কি দাঁড়াবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী নিয়ে আসব যিনি ঐ উম্মতের উপর সাক্ষ্য প্রদান করবেন, আর তিনি হবেন সেই উম্মতের নবী। আর হে মুহাম্মদ ﷺ আপনাকে তাদের উপর সাক্ষী উপস্থিত করব।

٤٢. يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْمَجِيْءِ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ أَيْ أَنْ تُسَوّٰى بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ مَعَ حَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَمَعَ إِدْغَامِهَا فِي السِّيْنِ أَيْ تَتَسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ بِأَنْ يَكُوْنُوْا تُرَابًا مِثْلَهَا لِعِظَمِ هَوْلِهِ كَمَا فِيْ اٰيَةٍ أُخْرٰى وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا عَمَّا عَمِلُوْهُ وَفِيْ وَقْتٍ اٰخَرَ يَكْتُمُوْنَ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

৪২. সেই দিন তথা সাক্ষী উপস্থিত করার দিন, যারা কাফের হয়েছে এবং রাসূল ﷺ -এর কথা অমান্য করেছে, তারা আকাঙ্ক্ষা করবে হায়! যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেতে পারত। تُسَوّٰى মাজহুল মারূফ উভয় রকমই পঠিত হয়েছে, এক تَاء 'তা' বিলুপ্তির সাথে এবং تَاء তা'কে সীনের মধ্যে ইদগাম করার সাথে। অর্থাৎ তারা সেই দিনের ভয়াবহতার কারণে মাটির ন্যায় হয়ে যেতে আকাঙ্ক্ষা করবে। যেমন– অন্য আয়াতে এসেছে, يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا [হায় আফসোস! যদি মাটি হয়ে যেতাম] আর তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে কোনো কথাই গোপন রাখতে পারবে না, যা কিছু আমল তারা করছে। তবে অন্য এক সময় গোপন রাখতে পারবে। যেমন– তাদের উক্তি নকল হয়েছে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ আল্লাহর কসম! হে প্রভু আমরা মুশরিক ছিলাম না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا : অর্থাৎ, প্রত্যেক উম্মতের নবী আল্লাহর দরবারে এ কথার সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আমার জাতির কাছে আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। তারা সেই পয়গামকে মেনে নেয়নি। সুতরাং আমার ত্রুটি কিসের? অতঃপর তাঁরা সকলের উপর আমাদের প্রিয়নবী ﷺ সাক্ষ্য দিবেন যে, হে আল্লাহ! তাঁরা সত্যই বলেছেন। আর তিনি এ সাক্ষ্যটা দিবেন পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতে, যাতে আল্লাহ পাক অতীতের সকল উম্মত ও তাদের নবীগণের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সকল নবীগণই খোদায়ী পয়গাম নিজ নিজ সম্প্রদায় ও উম্মতের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। –[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৩৮]

http://islamiboi.wordpress.com

٤٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ اَيْ لَا
تُصَلُّوْا وَاَنْتُمْ سُكَارٰى مِنَ الشَّرَابِ لِاَنَّ سَبَبَ
نُزُوْلِهَا صَلَاةُ جَمَاعَةٍ فِيْ حَالِ السُّكْرِ حَتّٰى
تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ بِاَنْ تَصْحُوْا وَلَا جُنُبًا
بِاِيْلَاجٍ اَوْ اِنْزَالٍ وَنَصْبُهٗ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ
يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهٖ اِلَّا عَابِرِيْ
مُجْتَازِيْ سَبِيْلٍ طَرِيْقٍ اَيْ مُسَافِرِيْنَ حَتّٰى
تَغْتَسِلُوْا فَلَكُمْ اَنْ تُصَلُّوْا وَاسْتُثْنِيَ الْمُسَافِرُ
لِاَنَّ لَهٗ حُكْمًا اٰخَرَ سَيَاْتِيْ وَقِيْلَ الْمُرَادُ النَّهْيُ
عَنْ قُرْبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلٰوةِ اَيِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا
عُبُوْرَهَا مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى
مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَيْ مُسَافِرِيْنَ
وَاَنْتُمْ جُنُبٌ اَوْ مُحْدِثُوْنَ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَائِطِ هُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ
اَيْ اَحْدَثَ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَا
اَلِفٍ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنٰى مِنَ اللَّمْسِ وَهُوَ الْجَسُّ
بِالْيَدِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ
الشَّافِعِيُّ وَاَلْحَقَ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِي الْبَشَرَةِ
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الْجِمَاعُ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً
تَطَّهَّرُوْنَ بِهٖ لِلصَّلٰوةِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالتَّفْتِيْشِ
وَهُوَ رَاجِعٌ اِلٰى مَا عَدَا الْمَرْضٰى فَتَيَمَّمُوْا اِقْصِدُوْا
بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ صَعِيْدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا
فَاضْرِبُوْا بِهٖ ضَرْبَتَيْنِ فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ
وَاَيْدِيْكُمْ ـ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ مِنْهُ وَمَسَحَ يَتَعَدّٰى
بِنَفْسِهٖ وَبِالْحَرْفِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

অনুবাদ :

৪৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা মদ্যপানে নেশাগ্রস্তাবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না। কেননা এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার কারণ ছিল নেশাগ্রস্তবস্থায় নামাজ পড়া, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বল, অর্থাৎ হুশে আসার পূর্ব পর্যন্ত। এবং জানাবাতের অবস্থায়ও নামাজের কাছে যেয়ো না, তা চাই যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে হোক বা ইঞ্জালের মাধ্যমে হোক। আর جُنُبًا শব্দটি হাল হওয়ার প্রেক্ষিতে যবরযুক্ত হয়েছে। جُنُبٌ একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে নাও। গোসলের পর তেমাদের জন্য নামাজ পড়া শুদ্ধ হবে। মুসাফিরকে পৃথক করা হয়েছে। কেননা তার জন্য ভিন্ন হুকুম [তায়াম্মুমের হুকুম] রয়েছে যার বর্ণনা অচিরেই আসছে। এক তাফসীর মতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, এতে নামাজের স্থান তথা মসজিদের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে না থেমে মসজিদ অতিক্রম করা যেতে পারে। যদি তোমরা এমন রোগে রোগাক্রান্ত হও যাতে পানি ক্ষতিকারক হয় কিংবা সফরে মুসাফির থাক অথচ তোমরা জানাবাত যুক্ত বা অজুহীন হও অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আস। اَلْغَائِطِ অর্থ ঐ ঘর যাকে প্রস্রাব ও পায়খানার প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার অজু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিংবা যদি তোমরা স্ত্রীজনকে স্পর্শ করে থাক, ভিন্ন এক কেরাতে আলিফ ছাড়া (اَوْ لَمَسْتُمْ) এসেছে, তবে কেরাত উভয়টার অর্থ একই। এটা لَمْس থেকে নির্গত, তার অর্থ হচ্ছে হাত দ্বারা স্পর্শ করা। ইবনে ওমরের উক্তি এটাই। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাজহাব এটাই। তিনি দেহের বাকি অংশের স্পর্শকে এই হাতের স্পর্শের সাথে মিলিত করেছেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে স্পর্শ করার অর্থ সহবাস বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তোমরা যদি খোঁজাখুঁজির পরও পানি না পাও যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে নামাজের জন্য এর সম্পর্ক রোগীরা ব্যতীত অন্যরা, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। অর্থাৎ নামাজের ওয়াক্ত দাখেল হওয়ার পর পাক মাটির ইচ্ছা করো এবং তাতে দুই বার হাত মারো, তারপর তা দ্বারা তোমাদের চেহারা ও কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করো। আর مَسَحَ শব্দটি সরাসরি ও সকর্মক হয় এবং হরফে জরের মাধ্যমেও হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচনকারী ও অতীব ক্ষমাশীল।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ : নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না, কাছেও যেয়োনা'র মর্ম হচ্ছে নামাজ পড়ো না। নামাজ পড়তে নিষেধ করার মধ্যে মুবালাগা বা অধিক তাকিদ প্রদানের লক্ষ্যে এরূপ বাচন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে।

وَاَنْتُمْ سُكَارٰى - لَا تَقْرَبُوا ফে'লের যমীর থেকে হাল হয়েছে। سُكَارٰى - سَكْرَانٌ-এর বহুবচন। এর বহুবচন سُكَارٰى এবং سُكْرٰى ও এসে থাকে। سَكْرَانٌ অর্থ– মদপানে মাতাল বা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি। سُكْر-এর মূল অর্থ হচ্ছে سَدُّ الطَّرِيْقِ রাস্তা বন্ধ করা। বলা হয় سَدُّ الْبَثْقِ নদীর বাঁধে ফাটল বন্ধ করেছে। اِنَّمَا سُكِرَتْ اَبْصَارُنَا অর্থাৎ মোদের চোখ আবৃত হয়ে যাওয়ার দরুন বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তাতে বাহিরের আলো প্রবেশ হচ্ছে না। এবং বস্তুকে তার প্রকৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। اَلسُّكْرُ مِنَ الشَّرَابِ বা মদের নেশার মানে সুস্থাবস্থায় তার বিবেকের যে অবস্থা ছিল তা বন্ধ হয়ে যাওয়া। মোটকথা এসবেই سُكْر-এর মূল অর্থ বন্ধ হওয়া পাওয়া যাচ্ছে। এখানে سُكْر সুকরের দ্বারা অধিকাংশ সাহাবা, তাবেয়ীন ও আয়িম্মায়ে দীনের মতে মদ্যপানে নেশা গ্রস্ত হওয়া।

আর ইমাম যাহহাকের মতে, অধিক ঘুমের তাড়নায় স্বাভাবিক জ্ঞান অনুভূতি না থাকা। جُنُبًا শব্দটিও হাল হওয়ার ভিত্তিতে মানসূব বা যবর যুক্ত হয়েছে। একে আতফ করা হয়েছে اَنْتُمْ سُكَارٰى-এর উপর। ইবারতের আসল রূপ হবে–

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ حَالَ مَا تَكُوْنُوْنَ سُكَارٰى وَحَالَ مَا تَكُوْنُوْنَ جُنُبًا .

جُنُب ইসিমটি মাসদার রূপে ব্যবহৃত। তাই এটা একবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারবে। সুতরাং جُنُبًا শব্দটিকে বহুবচনীয় পদ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى-এর উপর আতফ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। جُنُب-এর অর্থ হলো, গোসল না হলে চলে না এমন বড় অপবিত্রতায় অপবিত্র ব্যক্তি جُنُب-এর মূল অর্থ হচ্ছে দূর হওয়া। যে ব্যক্তির উপর গোসল ওয়াজিব তাকেও জুনুব বলা হয়। কারণ নামাজ ও মসজিদ থেকে দূরে সরে থাকে।

اَلْغَائِطُ অর্থ শৌচাগার, টয়লেট রুম। ঐ গৃহ যাকে প্রস্রাব-পায়খানার জন্য তৈরি করা হয়েছে। বহুবচন غَائِط - غِيْطَان আসলে নীচু ভূমিকে বলা হয়। যেহেতু প্রস্রাব-পায়খানার সময় লোকদের চোখের আড়ালে থাকার জন্য প্রাচীন যুগের মানুষ নীচুস্থান অন্বেষণ করতো, তাই এর স্থানকে غَائِط বলা হয়েছে। গায়েত যদিও মূলত স্থান বা রুমের নাম কিন্তু এখানে রূপক অর্থে প্রস্রাব-পায়খানা করার অর্থে তথা অজু নষ্টকর কাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ - مُلَامَسَة মানে একে অন্যকে স্পর্শ করা। তকে রূপক অর্থে এখানে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস উদ্দেশ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মত এটাই তবে অন্যান্য ইমামগণ বাহ্যিক অর্থ তথা পরস্পরে চামড়ায় চামড়ায় স্পর্শ করার অর্থটাই গ্রহণ করেছেন।

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا - تَيَمُّم-এর শাব্দিক অর্থ ইচ্ছা করা। মূলধাতু হচ্ছে اَمَّمَ এই জন্যই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়ত শর্ত। যদিও অজু ও গোসলের মধ্যে নিয়ত ওয়াজিব নয়। ইমাম জুফার (র.) -এর মতে, অজু-গোসলের ন্যায় তায়াম্মুমের মধ্যেও নিয়ত শর্ত নয়। এবং বাকি ইমামত্রয়ের মতে, অজু গোসলের মধ্যে নিয়ত শর্ত।

صَعِيْدًا طَيِّبًا মানে পবিত্র মাটি। صَعِيْد বলতে মাটি জাতীয় বুঝায়। চায় মাটি হোক বা বালু, চুনা পাথক প্রভৃতি হোক সবগুলোতেই তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। তায়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থাৎ জমিনে উভয় হাত মেরে চেহারা ও কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى الخ :

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্বে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এই আয়াতের দুটি শানে নুযূল বর্ণনা করেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com.

১. তিরমিযী শরীফ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) একদল বুযুর্গ সাহাবাকে তাঁর বাড়িতে খানার দাওয়াত করেন। তখন মদপান মুবাহ ছিল। তাই তারা আহারের পর মদপান করলেন। কিছুক্ষণ পর যখন মাগরিবের নামাজের সময় হলো, তখন তারা তাদের একজনকে নামাজের ইমামতি দিলেন। যেহেতু তারা নিশা গ্রস্ত ছিলেন, তাই قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত 'লা' বাদ দিয়ে পড়তে লাগলেন। তাদের এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আয়াত খানী অবতীর্ণ হয়। এরপর থেকে তারা নামাজের সময়ের মধ্যে আর মদ পান করেননি। বরং ইশার নামাজের পর পান করে নিতেন, ফলে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নেশা দূর হয়ে যেত। এবং তারা কি বলত তা বুঝে নিতে সক্ষম হয়ে যেত।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি একদল বুজুর্গ সাহাবাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদপান করার পর মসজিদে যেতেন নবীজী ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ার জন্য। আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১১২]

* আবূ দাউদ, তিরমিযী হযরত আলী (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) আমাদের জন্য খাবার তৈরি করান, এবং পানাহারের পর আমাদেরকে মদপান করান। এই ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বের। আমরা তখন নেশা গ্রস্ত হই। এমন অবস্থায় মাগরিবের নামাজের সময় এসে যায়। লোকেরা আমাকে ইমাম নির্বাচন করে। আমি নামাজে সূরায়ে কাফিরূন পড়তে গিয়ে قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ শেষ পর্যন্ত অনুরূপ ভাবেই লাম ব্যতীত পাঠ করি। এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। –[মাজহারী খ. ৩, পৃ. ৮৭]

পর্যায়ক্রমে মদপান হারাম হওয়ার ঘোষণা : ইসলাম তার সাধারণ রীতি অনুযায়ী বিধান জারি করার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়েই করে থাকে। এক সাথে সব কিছুর নির্দেশ দিয়ে দেয় না। এই রীতি মাফিকই মদ্যপানকে শরিয়তের পর্যায়ক্রমে হারাম ঘোষণা করেছে।

প্রথমে সূরায়ে বাকারাতে বলা হয়েছে মদ্য পানে কিছুটা সাময়িক উপকার থাকলেও ক্ষতি অধিক। ইরশাদ হয়েছে– يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ অতঃপর আলোচ্য আয়াতে কেবলমাত্র নামাজের সময় মদ্যপান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর সূরায়ে মায়েদায় সর্বাবস্থায় চিরদিনের জন্য মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى অর্থাৎ তোমরা নেশাগ্রস্তাবস্থায় নামাজের কাছেও যেয়োনা তথা নামাজ পড়ো না। এখানে صلوة দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরবিদ ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে নামাজ উদ্দেশ্য। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজ দ্বারা নামাজের স্থান তথা মসজিদ উদ্দেশ্য।

وَأَنْتُمْ سُكَارَى : অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে, মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত হওয়া উদ্দেশ্য। তবে ইমাম যাহহাক বলেন, নিদ্রার কারণে মাথায় নেশা সৃষ্টি হওয়া উদ্দেশ্য।

মাসআলা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া যেমন হারাম তেমনি কোনো কোনো মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামাজ পড়া জায়েজ নয়, যাতে মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কারো যদি নামাজের মাঝে তন্দ্রা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে তাকে কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়া উচিত, যাতে ঘুমের প্রভাব দূর হয়ে যায়। অন্যথায় ঘুমের ঘোরে সে বুঝতে পারবে না এবং দোয়া ইস্তেগফারের পরিবর্তে হয়তো নিজেই নিজেকে গালি দিতে থাকবে। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪৭০]

তায়াম্মুমের বিধান এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য : এটা আল্লাহ পাকের কতইনা অনুগ্রহ যে, তিনি অজু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্তে এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষা সহজ। বলা বাহুল্য ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এই সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়াম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়-মাসআলা মাসায়েল ফিকহের কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤٤. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا حَظًّا مِّنَ الْكِتٰبِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ . تَخْطُوْا طَرِيْقَ الْحَقِّ لِتَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ .

৪৪. তুমি কি তাদেরকে দেখনি? যাদেরকে আসমানি কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, আর তারা হচ্ছে ইহুদিরা। অথচ তারা হেদায়েতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে খরিদ করে, এবং তারা কামনা করে তোমরাও যাতে বিভ্রান্ত হয়ে যাও, আল্লাহর পথ থেকে তথা সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও, যাতে তোমরাও তাদের মতো হয়ে পড়।

٤٥. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ مِنْكُمْ فَيُخْبِرُكُمْ بِهِمْ لِتَجْتَنِبُوْهُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا حَافِظًا لَكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا مَانِعًا لَكُمْ مِنْ كَيْدِهِمْ .

৪৫. এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ভালোভাবেই জানেন, তাই তিনি তাদের সম্পর্কে তোমাদের অবগত করেছেন, যেন তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাক। আর বন্ধু হিসেবে তথা তোমাদের সংরক্ষক হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং সহায়ক তথা তোমাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষাকারী হিসেবেও আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

٤٦. مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا قَوْمٌ يُحَرِّفُوْنَ يُغَيِّرُوْنَ الْكَلِمَ الَّذِيْ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي التَّوْرٰةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَنْ مَّوَاضِعِهِ الَّتِيْ وُضِعَ عَلَيْهَا وَيَقُوْلُوْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ بِشَيْءٍ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ أَيْ لَا سَمِعْتَ وَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ رَاعِنَا . وَقَدْ نُهِيَ عَنْ خِطَابِهِ بِهَا وَهِيَ كَلِمَةُ سَبٍّ بِلُغَتِهِمْ لَيًّا تَحْرِيْفًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا قَدْحًا فِي الدِّيْنِ الْإِسْلَامِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بَدَلَ وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ فَقَطْ وَانْظُرْنَا أُنْظُرْ إِلَيْنَا بَدَلَ رَاعِنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِمَّا قَالُوْهُ وَأَقْوَمَ أَعْدَلَ مِنْهُ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ أَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ .

৪৬. আর ইহুদিদের কেউ কেউ ঐ কথা মোড় ঘুড়িয়ে নেয় তার লক্ষ্য থেকে, যা আল্লাহপাক হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর গুণাবলি সম্পর্কে তাওরাতে নাজিল করেছেন। আর নবী করীম ﷺ যখন তাদেরকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দান করেন, তখন তারা বলে, তোমার কথা শুনেছি, আর তোমার নির্দেশ অমান্য করেছি, আর [তারা একথাও বলে যে,] শোন, এমতাবস্থায় যে, তোমাকে যেন শুনানো না হয় غَيْرَ مُسْمَعٍ তারকীবে اِسْمَعْ -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে, বদদোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ তুমি যেন না শোন, আর তারা তাঁকে মুখ বাঁকিয়ে ও ইসলাম ধর্মের উপর দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে বলে, রায়েনা, [আমাদের রাখাল] অথচ তাদেরকে এ শব্দে তাকে সম্বোধন করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর ইহা হচ্ছে তাদের ভাষায় একটি গালির শব্দ। আর যদি তারা শুনেছি ও অমান্য করেছি -এর পরিবর্তে বলত, আমরা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি, এবং যদি কেবল শোন বলত, আর রায়েনার বদলে আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর বলত, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য ভালো এবং সুসঙ্গত হতো, ঐ কথার চেয়ে যা তারা বলেছে, কিন্তু তাদের কুফরির দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর লানত করেছেন, অর্থাৎ স্বীয় রহমত থেকে তাদের বিদূরিত করেছেন। পরিণামে তারা ঈমান আনছে না। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীরা।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

إِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ . إِسْمَعْ - غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর যমীর থেকে হাল হয়েছে। অর্থাৎ শোন অশ্রুতাবস্থায়। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে। رَاعِنَا ইহুদিদের হিব্রু ভাষায় একটি গালি। অর্থাৎ হে আহমক। অথবা رَاعِيْنَا পড়লে অর্থ হবে হে আমাদের রাখাল।

لَيًّا আসলে لَوْيًا ছিল। ওয়াও কে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে - يَاء -কে - يَاء -এর মধ্যে এদগাম করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলা। -[তাফসীরে কাবীর, সাবী, মাজহারী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ الخ আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদিদের একজন সরদারের নাম ছিল রেফাআ ইবনে যায়েদ ইবনে তাবুত। সে যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে কথা বলতো, তখন তার জিব টেনে কথাকে বিকৃত করে এমনভাবে কথা বলতো যেন তার কথা এবং তার কথার বিকৃত অর্থ অন্যরা বুঝতে না পারে এবং এভাবে সে বলতো, যে, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আমাদের দিকে মনোনিবেশ করুন। তারপর সে ইসলামের উপর দোষারোপ করতো এবং ইসলামের সমালোচনা করতো। رَاعِنَا এ বাক্যটির দুটি অর্থ। একটি হলো, আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন, আর অন্যটি হলো- হে আমাদের রাখাল। প্রকাশ্যে সে বলতো আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন এবং মুখ বিকৃত করে এমনভাবে বলতো যেন তার অর্থ হয় হে আমাদের রাখাল। এমনিভাবে তারা বলতো إِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ অর্থাৎ আপনি শুনুন, অপ্রিয় কথা যেন আপনাকে শুনতে না হয়, অথচ তার এ বাক্য দ্বারা একথার উদ্দেশ্য করতো যে, কিছুই যেন শুনতে না পাও। এই দুরাত্মা ইহুদিদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আল্লামা আলুসী (র.) দুরাত্মা ইহুদি রেফাআ ইবনে যায়েদের সঙ্গে মালেক ইবনে দোখশামের নামও উল্লেখ করেছেন যে, তারা উভয়ে উপরোল্লিখিত অন্যায় কাজটি করতো।

ইমাম রাযী এই পর্যায়ে মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নামও উল্লেখ করেছেন।

-[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৭০-৭১, তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১২০]

ইহুদিদের গুমরাহীর ব্যাখ্যা : مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ الخ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করে নেওয়ার কথা বিবৃত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই গোমরাহীর কিছুটা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। তাদের সেই গোমরাহী গুলো হচ্ছে-

১. একটি হলো يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ তারা তাওরাতের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটাতো। এক শব্দের স্থানে অন্য শব্দ রেখে দিত। যেমন, তারা বিবাহিতা-বিবাহিতদের জেনার শাস্তি রজমের স্থানে বেত্রাঘাত রেখে দিয়েছিল এবং তাতে তারা অপব্যাখ্যা প্রদান করতো।

২. তাদের দ্বিতীয় গোমরাহীর উল্লেখ করা হয়েছে- يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا দ্বারা। আমরা শুনেছি ও অমান্য করেছি কথাটার দুটি মর্ম হতে পারে।

ক. প্রিয়নবী ﷺ যখন তাদেরকে কোনো বিষয়ে নির্দেশ দান করতেন, তখন তারা বাহ্যিকভাবে বলতো আমরা শুনেছি আর মনে মনে বলতো আমরা অমান্য করেছি।

খ. তারা হুজুরে পাক ﷺ -এর বিরোধিতা ও তার নির্দেশের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে বলতো আমরা শুনেছি এবং অমান্য করেছি।

http://islamiboi.wordpress.com

৩. তাদের তৃতীয় প্রকার গোমরাহীর হচ্ছে اِسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ বলা। এ বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক. প্রশংসা ও সম্মান প্রদর্শন। দুই. অবমাননা ও গালি। প্রথম সূরতে অর্থ দাঁড়াবে আপনি আমাদের ভালো কথা শুনুন এমতাবস্থায় যে, মন্দ কথার প্রতি কর্ণপাত না করুন। আর দ্বিতীয় সূরতে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন–

ক. তারা নবীয়ে করীম ﷺ কে বলতো শুন, আর আন্তরিকভাবে বদদোয়া দিয়ে বলতো لَا سَمِعْتَ তুমি যেন কখনো না শোন, অর্থাৎ তুমি যেন বধির হয়ে যাও। তখন غَيْرَ مُسْمَعٍ -এর অর্থ হবে غَيْرَ سَامِعٍ কেননা শ্রোতা শ্রুত হয়ে থাকে, আবার শ্রুত হয়ে থাকে শ্রোতা।

খ. এ বাক্যের মর্ম হলো তুমি শোন, তবে غَيْرَ مُسْمَعٍ اَىْ غَيْرَ مَقْبُوْلٍ مِنْكَ অর্থাৎ তোমার কথা শোনা যাবে না তথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

গ. তুমি শোন, তবে পছন্দনীয় কোনো কথা শুনতে পাবে না। বরং তোমার কাছে যা অপছন্দনীয় তাই আমাদের কাছ থেকে তুমি শুনতে পাবে।

৪. তাদের চতুর্থ গোমরাহী হচ্ছে وَرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ বলা। رَاعِنَا-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি তাফসীর বিদগণের বিবৃত হয়েছে। যথা–

ক. ইহুদিরা পরস্পরে উপহাস ও ঠাট্টা স্বরূপ একথাটি বলতো। তাই মুসলমানদেরকে রাসূল ﷺ -এর সামনে একথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

খ. এ বাক্যের অর্থ হলো اِرْعِنَا سَمْعَكَ অর্থাৎ আমাদের কথায় কর্ণপাত কর এবং বুঝার জন্য নীরবতা অবলম্বন কর শ্রবণ কর। এরকম ভাষায় নবীদেরকে সম্বোধন করা ঠিক নয়, বরং তাদেরকে তাজীম ও সম্মানের সাথে সম্বোধন করা উচিত।

গ. তারা 'রায়েনা' বলে বাহ্যিকভাবে তাকে বুঝাতো যে, আমাদের কথার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ কর। আর তাদের ভাষা অনুযায়ী رُعُوْنَتْ তথা নির্বুদ্ধিতার গালি দিত। অর্থাৎ হে আমাদের নির্বোধ, আহমক।

ঘ. ইহুদিরা মুখ ঘুরিয়ে জবান বাকিয়ে বলতো رَاعِنَا ফলে ইহা হয়ে যেত رَاعِيْنَا অর্থাৎ আমাদের মেষপালের রাখাল।

তাদের এসব গুমরাহীর বর্ণনার পর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তারা যদি (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) শুনেছি ও অমান্য করেছি -এর পরিবর্তে (سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا) শুনেছি ও মেনে নিয়েছি বলতো এবং وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ এর বদলে শুধু اِسْمَعْ আমাদের কথা শুনুন বলতো, তেমনিভাবে رَاعِنَا-এর পবিবর্তে যদি اُنْظُرْنَا আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বলতো, তবে তাদের জন্য ভালো যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক হতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের কুফরির কারণে তাদের উপর লানত করেছেন, তাই তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকিরা ঈমান আনবে না। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১২১-২৪]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٤٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنَ التَّوْرٰةِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا نَمْحُوْ مَا فِيْهَا مِنَ الْعَيْنِ وَالْاَنْفِ وَالْحَاجِبِ فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا فَنَجْعَلُهَا كَالْاَقْفَاءِ لَوْحًا وَاحِدًا اَوْ نَلْعَنَهُمْ نَمْسَخُهُمْ قِرَدَةً كَمَا لَعَنَّا مَسَخْنَا اَصْحٰبَ السَّبْتِ ـ مِنْهُمْ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَضَاؤُهُ مَفْعُوْلًا ـ وَلَمَّا نَزَلَتْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ فَقِيْلَ كَانَ وَعِيْدًا بِشَرْطٍ فَلَمَّا اَسْلَمَ بَعْضُهُمْ رُفِعَ وَقِيْلَ يَكُوْنُ طَمْسٌ وَمَسْخٌ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ ـ

৪৭. হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা ঈমান আন সেই কিতাবের তথা কুরআনের প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি, যা সেই কিতাবের সত্যায়নকারী যে কিতাব তোমাদের নিকট রয়েছে, তথা তাওরাত। এর পূর্বে যে, আমি বিকৃত করে দেব অনেক চেহারাকে, তথা চেহারায় যা কিছু রয়েছে, যেমন– চোখ, নাক ও ভ্রুকে মুছে দেব, অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাৎ দিকে, ফলে করে দিব তাদের চেহারাগুলোকে গর্দানর ন্যায় এক তক্তা, অথবা শনিবারের ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে যেভাবে লানত করেছিলাম তথা আকৃতি বদলে দিয়েছিলাম তাদেরকে সেরূপ লানতের তথা আকৃতি বদলানোর পূর্বে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ তথা ফয়সালা কার্যকর হয়েই থাকে। উল্লিখিত আয়াত যখন নাজিল হলো তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) মুসলমান হয়ে যান। তাদের আকৃতি বিকৃত হলোনা কেন?] এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এটা ছিল একটি শর্তের সাথে [ঈমান গ্রহণ না করার সাথে] শর্তযুক্ত ভীতি প্রদর্শন, তাদের কেউ কেউ যখন ঈমান নিয়ে আসল, তখন সেই ধমক প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো। ভিন্ন উক্তি মতে তাদের চেহারা মুছে ফেলা ও সুরত বিকৃত করা কিয়ামতের পূর্বে হবে।

٤٨. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ اَيِ الْاِشْرَاكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ لِمَنْ يَّشَاءُ اَلْمَغْفِرَةَ لَهٗ بِاَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ وَمَنْ شَاءَ عَذَّبَهٗ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِذُنُوْبِهٖ ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا ذَنْبًا عَظِيْمًا كَبِيْرًا ـ

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করার অপরাধকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে তিনি ক্ষমা করতে চান ক্ষমা করেন, এভাবে যে, তাকে শাস্তি ব্যতীতই বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন, এবং মু'মিনদের মধ্য থেকে যাকে চান তার পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করার পরও জান্নাতে দাখিল করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করল, সে অবশ্যই মহাঅপবাদে তথা গুনাহে লিপ্ত হলো।

http://islamiboi.wordpress.com

٤٩. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ حَيْثُ قَالُوْا نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ اَىْ لَيْسَ الْاَمْرُ بِتَزْكِيَتِهِمْ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ يُطَهِّرُ مَنْ يَّشَاءُ بِالْاِيْمَانِ وَلَا يُظْلَمُوْنَ يُنْقَصُوْنَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ فَتِيْلًا قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ .

৪৯. হে রাসূল ﷺ! আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করে? আর তারা হচ্ছে ইহুদিরা। কেননা তারা বলত, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন। অর্থাৎ ব্যাপার এ রকম নয় যে, তাদের পবিত্র দাবি করাতেই তারা পবিত্র হয়ে যাবে। বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ঈমানের মাধ্যমে পবিত্র করেন। আর তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না, অর্থাৎ তাদের আমল থেকে খেজুর বীচের ছাল পরিমাণ হ্রাস ঘটিয়েও অবিচার করা হবে না।

٥٠. اُنْظُرْ مُتَعَجِّبًا كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ بِذٰلِكَ وَكَفٰى بِهٖ اِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا .

৫০. হে রাসূল ﷺ! দেখুন তারা এর মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا الخ .

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদিদের ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর এই আয়াতে তাদের সেই সমস্ত দুষ্কৃতি ও দৌরাত্ম্য সম্পর্কে সতর্ক করত, তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইহুদিদের প্রতি সতর্কবাণী : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। পবিত্র কুরআন তাওরাতের সত্যতা প্রমাণ করে, যা হযরত মূসা (আ.) -এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যা তোমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। মনে রেখো এখনও সময় আছে, ইচ্ছা করলে তোমরা আত্মরক্ষার সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। পবিত্র কুরআনের প্রতি এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতিও ঈমান আন। তোমাদের দৌরাত্ম্য, ষড়যন্ত্র, জুলুম-অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তোমাদের চেহারা বিকৃত করে পৃষ্ঠ দেশের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পূর্বে তোমরা ঈমান আন। যা কিছু করার অবিলম্বে কর। অথবা এমনও হতে পারে যেভাবে আসহাবে সাবত" তথা যাদেরকে শনিবারে মাছ না ধরার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। তোমাদের অবস্থাও তাদের ন্যায় হতে পারে। তারা নির্দেশ অমান্য করে মাছ ধরেছিল, পরিণামে আল্লাহপাক তাদেরকে লানত দিয়েছিলেন। তারা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল। তোমাদের অবস্থাও তাদের ন্যায় হতে পারে। অতএব, তাদের ন্যায় শাস্তি হওয়ার পূর্বেই তোমরা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও। আর আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হলো পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান। তাই তোমরা অবিলম্বে ঈমান আন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ পাক যে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ ইহুদিদের চেহারা বিকৃত হওয়া তা কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই হবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, চেহারা বিকৃত হওয়ার এই আজাবের জন্য শর্ত হলো ইহুদিদের ঈমান না আনা। কিন্তু যেহেতু কিছু ইহুদি ঈমান এনেছে তাই তাদের চেহারা বিকৃত হওয়ার এই শাস্তি রহিত হয়ে গেছে।

http://islamiboi.wordpress.com

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞান, বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের জন্য দুটি শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। একটি হলো চেহারা বিকৃত করা আর অপরটি হলো তাদের প্রতি লানত করা। যেহেতু তাদের প্রতি লানত দেওয়া হয়ে গেছে, তাই চেহারা বিকৃত করার শাস্তি হয়নি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, আমার মতে চেহারা বিকৃত করার সময় এখনও রয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন ইহুদিদের চেহারা বিকৃত করা হবে।

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত [উম্মতে দাওয়াত] হাশরের দিন দশ দলে বিভক্ত হবে।

একদলের হাশর হবে বানরের আকৃতিতে। আর একদলের হাশর হবে শুকরের আকৃতিতে। আর এক দলের হাশর হবে কুকুরের আকৃতিতে এবং আর একদলের হাশর হবে গাধার আকৃতিতে। -[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৭৫-৭৬]

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল** : তাবারানী ও ইবনে আবি হাতিম হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে গিয়ে আরজ করল যে, আমার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র আছে যে নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত হয় না। হুজুর ﷺ বললেন, তার ধর্ম কি? সে ব্যক্তি বললো, নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস করে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তার নিকট থেকে তার ধর্মকে ক্রয় করে লও। সর্ব প্রথম তাকে বল, তুমি আমাকে তোমার ধর্মকে তোহফা হিসেবে দান করে দাও। যদি অস্বীকার করে তবে একথা প্রমাণিত হবে যে, তার নিকট দুনিয়া থেকে দীন অতি প্রিয়। এই ব্যক্তি হুকুম পালন করল। কিন্তু তার ভ্রাতুষ্পুত্র তার দীনদারী বিক্রি করতে রাজি হলো না। এমন অবস্থায় ঐ ব্যক্তি হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে হাজির হলো এবং আরজ করলো, হুজুর তাকে আমি দ্বীনদারীর ব্যাপারে অত্যন্ত সুদৃঢ় পেয়েছি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الخ : আল্লাহপাক তাঁর সাথে শিরক করাকে মাফ করবে না। যদি সে তাওবা না করে শিরক নিয়ে মারা যায়। কিন্তু যদি কেউ শিরক থেকে তওবা করে নেয়, এবং ঈমান নিয়ে আসে তবে আল্লাহপাক তার অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। হাদীস শরীফে এসেছে- اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ অর্থাৎ গুনাহ থেকে তওবাকারী এরূপ যেমন সে গুনাহ করেই নাই। শিরক ছাড়া অন্য বাকি যে কোনো কবীরা বা সগীরা গুনাহ নিয়ে মারা গেলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে নিজ দয়ায় ক্ষমাও করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা হলে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি প্রদানের পরও জান্নাত দিতে পারেন। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা। পক্ষান্তরে মুতাযিলা ও কাদরিয়ারা বলে কবীরাহ গুনাহগারকে মাফ করে দেওয়া আল্লাহর জন্য জায়েজ নয়। বরং তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আলোচ্য আয়াত তাদের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ আয়াত দ্বারা একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, শরিয়তের পরিভাষায় ইহুদিদেরকে মুশরিক বলা যেতে পারে।

এক বর্ণনা মতে, আয়াতটি ওয়াহশী ও তার সাথীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তার বিবরণ হলো এই যে, ওয়াহশী যখন ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.) -কে শহীদ করে মক্কায় ফেরত আসলো তখন সে এবং তার সাথীরা লজ্জিত হয়ে হুজুর ﷺ -এর নিকট চিঠি লেখলো যে, আমরা আমাদের কৃত কর্মের উপর লজ্জিত হয়েছি। আর আমাদের জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে কেবল ঐ কথাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা আমরা মক্কায় শুনতে পেয়েছি। আর তা হচ্ছে এই যে, যা আপনি বলেন-

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ـ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ـ

অথচ আমি আল্লাহর সঙ্গে শিরক ও করেছি এবং নাহক হত্যা ও জেনাও করেছি। যদি এ আয়াতগুলো না হতো তাহলে আমরা অবশ্যই আপনার অনুসারী হয়ে যেতাম।

অতঃপর সূরায়ে ফুরকানের পরবর্তী এ দুটি আয়াত নাজিল হয়-

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّـٰاتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ـ

http://islamiboj.wordpress.com

এই আয়াত দুটি নাজিল হওয়ার পর হুজুর ﷺ একে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা পাঠ করার পর জবাবে লিখলো আমাদের জন্য আয়াতে বর্ণিত শর্ত শক্ত হয়ে যায়। কারণ নেক আমলের তৌফিক পাবো না বলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে। তারপর নাজিল হয় আলোচ্য আয়াতখানি। إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর হুজুরে পাক ﷺ তা লিখে তাদের কাছে পাঠান। তদুত্তরে তারা বলল, আমাদেরকে ক্ষমা করতে চাবেন না বলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে। তাপর অবতীর্ণ হয় পাইকারী ক্ষমার ঘোষণা নিয়ে قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ الخ অতঃপর এই আয়াতের সংবাদ পাঠালে তারা মুসলমান হয়ে যায়। –[তাফসীরে খাজেন খ. ১, পৃ. ৩৮৭, মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১২৭]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল :

১. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক যখন ইহুদিদেরকে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করলেন, তখন তারা বলতে লাগলো لَسْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَلْ نَحْنُ خَوَاصُّ اللّٰهِ تَعَالٰى আমরা মুশরিক নই, বরং আমরা আল্লাহর বিশেষ বান্দা। যেরূপ আল্লাহ পাক তাদের বক্তব্য নকল করে পবিত্র কুরআনে বলেছেন نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّٰهِ وَأَحِبَّاؤُهٗ আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। তিনি আরো নকল করেছেন لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصَارٰى আরো বলেছেন لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً এছাড়া তাদের কেউ কেউ একথাও বলতো আমাদের বাপ দাদারা ছিলেন নবী তাই তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদল ইহুদি তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে নবীয়ে করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ তাদের কোনো গুনাহ আছে কি? তিনি বললেন না। অতঃপর তারা বলল, আল্লাহর কসম আমরাও তাদের মতোই। আমরা রাতে যা কিছু করি তা দিনে আর দিনে যা কিছু করি তা রাতে মাফ হয়ে যায়। মোটকথা ইহুদিরা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মপ্রশংসা করেছিল এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ৫, পৃ. ১৩১]

৩. বগবী ও সালবী কলবীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লিখেছেন যে, কিছু সংখ্যক ইহুদি যাদের মধ্যে বহরী ইবনে আমরা, নোমান ইবনে আওফা এবং মারহাম ইবনে এজীদও ছিল, তারা নিজেদের ছোট সন্তানদেরকে হুজুর ﷺ-এর দরবারে নিয়ে এসে আরজ করলো, হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদের কি কোনো গুনাহ হতে পারে? তিনি বললেন, না। তখন তারা বলতে লাগল, আমরাও তাদের মতো। আমরা দিনে যা কিছু করি তা রাতে আর রাতে যা কিছু করি তা দিনে মাফ করে দেওয়া হয়। তাদের একথার উপর আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়। –[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৩১]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কোনো মানুষের জন্যে নিজের পবিত্রতা ও আত্ম প্রশংসা বর্ণনা করা জায়েজ নয়। কারণ আত্মার পবিত্রতা সৃষ্টি হয় তাকওয়ার মাধ্যমে আর তাকওয়া হচ্ছে একটি অভ্যন্তরীণ গোপনীয় বিষয়। আল্লাহ ছাড়া কেউ তা জানতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ এবং [ওহীর মাধ্যমে] নবী রাসূল ছাড়া অন্য কারো পক্ষে কোনো মানুষ পবিত্রতা বর্ণনা করা তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেওয়া ঠিক হবে না।

ইরশাদ হয়েছে– لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করো না, আল্লাহ ভালো জানেন পরহেজগার কে? بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা পবিত্রতা অর্জনের তৌফিক দান করেন।

–[তাফসীরে খাজেন খ. ১, পৃ. ৩৮৮]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٥١. وَنَزَلَ فِيْ كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُوْدِ لَمَّا قَدِمُوْا مَكَّةَ وَشَاهَدُوْا قَتْلَى بَدْرٍ وَحَرَّضُوا الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى الْاَخْذِ بِثَارِهِمْ وَمُحَارَبَةِ النَّبِيِّ ﷺ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ صَنَمَانِ لِقُرَيْشٍ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَبِيْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهِ حِيْنَ قَالُوْا لَهُمْ اَنَحْنُ اَهْدٰى سَبِيْلًا وَنَحْنُ وُلَاةُ الْبَيْتِ نَسْقِى الْحَاجَّ وَنَقْرِى الضَّيْفَ وَنَفُكُّ الْعَانِىَ وَنَفْعَلُ اَمْ مُحَمَّدٌ وَقَدْ خَالَفَ دِيْنَ اٰبَائِهِ وَقَطَعَ الرَّحِمَ وَفَارَقَ الْحَرَمَ هٰٓؤُلَآءِ اَىْ اَنْتُمْ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا اَقْوَمُ طَرِيْقًا .

৫১. সামনের আয়াতটি ইহুদি ওলামাদের মধ্য থেকে কা'ব ইবনে আশরাফ ও তার ন্যায় লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তারা মক্কায় এসে বদর যুদ্ধে নিহতদেরকে প্রত্যক্ষ করে এবং মুশরিকদেরকে তাদের নিহতদের খুনের বদলা গ্রহণ ও নবীয়ে করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। হে রাসূল ﷺ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যাদেরকে আসমানি কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, যারা মূর্তি এবং শয়তানের উপর বিশ্বাস রাখে, জিবত ও তাগুত কুরাইশদের দুটি মূর্তির নাম। আর তারা কাফেরদেরকে তথা আবূ সুফিয়ান ও তার সহচরদের সম্পর্কে বলে যখন তাদের আবূ সুফিয়ান ও তার সহচররা বলল যে, আমরা অধিকতর সুপথগামী না মুহাম্মদ ﷺ? অথচ আমরা বায়তুল্লাহর মুতাওয়াল্লী, হাজীদেরকে পানি পান করাই, অতিথিদের আপ্যায়ন করি এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করি এছাড়া আরো অনেক কিছু করে থাকি। পক্ষান্তরে সে [মুহাম্মদ ﷺ!] স্বীয় বাপ-দাদাদের ধর্মের বিরোধিতা ও আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে এবং হারাম শরীফ থেকে কেটে পড়েছে। যে, এরা অর্থাৎ তোমরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সুপথগামী।

٥٢. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا مَانِعًا مِنْ عَذَابِهِ .

৫২. এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি লানত করেন, তার জন্য কোনো সাহায্যকারী তথা আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষাকারী পাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بِثَارِهِمْ : اَلثَّارُ ও اَلثُّوْرَةُ খুনের বদলা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করা। اَلْجِبْتُ ও اَلطَّاغُوْتُ সুয়ূতী (র.) -এর ব্যাখ্যানুযায়ী কুরাইশদের দুটি মূর্তির নাম। আরবি লোগাত বিশারদগণ বলেছেন كُلُّ مَعْبُوْدٍ دُوْنَ اللّٰهِ فَهُوَ جِبْتٌ وَطَاغُوْتٌ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো বস্তুর উপাসনা করা হয় তাকেই জিবত ও তাগুত বলে। অধিকাংশ অভিধানবিদগণের মতে, اَلْجِبْتُ -এর মধ্যে সরফী কোনো রূপান্তর নেই; বরং এটা ইসমে জামেদ। তবে কাফফাল থেকে বর্ণিত আছে যে, جِبْتٌ আসলে ছিল جِبْسٌ আর جِبْسٌ -এর অর্থ হলো খবীছ-নিকৃষ্ট। অতঃপর সীনকে তা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আর طَاغُوْتٌ নির্গত হয়েছে طُغْيَانٌ [সীমালঙ্ঘন] থেকে, তথা আল্লাহর নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করা থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি বা বস্তু গুনাহে কবীরার প্রতি লোকদেরকে আহ্বান করে তাকেই তাগুত বলে আখ্যায়িত করা যাবে।

اَلْعَانِىْ কয়েদী, বন্দী।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াত أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ থেকেই ইহুদিদের দুষ্কৃতি ও বদ অভ্যাসের আলোচনা চলে আসছে। আলোচ্য আয়াত أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ الخ -এর মধ্যেও তাদের এ কর্ম কাণ্ডের উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল : তৃতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত ওহুদ যুদ্ধের পর হুয়াই ইবনে আখতাব ও কাব ইবনে আশরাফ ৭০ জন ইহুদি নিয়ে মক্কার কুরাইশদের নিকট উপস্থিত হয়। উদ্দেশ্য হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য গ্রহণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন। আর প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে ইহুদিরা যে শান্তি চুক্তি করেছিল, তা ভঙ্গ করা এর লক্ষ্য ছিল। মক্কায় পৌছে তারা আবূ সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো এবং তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পর আবূ সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীরা বলল, তোমরা হলে আহলে কিতাব। আর মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট আসমানি কিতাব নাজিল হয়। অতএব তোমরা পরস্পর কাছাকাছি এবং আমরা তোমাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারি না। এজন্য তোমরা প্রথমে আমাদের মূর্তিগুলোকে সেজদা কর, যাতে করে আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এবং তোমাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি। তখন তারা মূর্তিকে সেজদা করে। অতঃপর আবূ সুফিয়ান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের মতে, আমরা সুপথগামী নাকি মুহাম্মদ ﷺ ? তখন কা'ব জিজ্ঞাসা করে মুহাম্মদ ﷺ কি বলেন? তারা বললো, এক আল্লাহর ইবাদত করতে আদেশ দেয়, মূর্তি পূজা করতে নিষেধ করে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়। তাই আমাদের পরস্পরের মধ্যে তাঁর কারণে পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। তখন কা'ব বলে, তোমাদের ধর্ম কি? জবাবে আবূ সুফিয়ান বলে, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মুতাওয়াল্লী। হাজীদের পানাহারের ব্যবস্থা করি। তখন কাব বলে, মুসলমানদের চেয়ে তোমরাই সুপথ প্রাপ্ত। তারপর তারা সিদ্ধান্ত করে যে, ৩০ জন ইহুদি এবং ৩০ জন মক্কাবাসী কাবা শরীফ স্পর্শ করে অঙ্গীকার করবে যে, আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান করবো। তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়। ইরশাদ হয়েছে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ অর্থাৎ, হে রাসূল ﷺ ! আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যাদেরকে আসমানি কিতাবের কিছু অংশ দান করা হয়েছে। তাঁরা মূর্তি এবং শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর কাফেরদেরকে বলে, তোমরা মুসলমানদের চেয়ে সুপথগামী। তারা এসব লোক, যাদের উপর আল্লাহপাক লানত করেছেন। আর আল্লাহ যার প্রতি লানত করেন তার জন্য কোনো সাহায্যকারী আপনি পাবেন না, তার আজাব থেকে বাঁচাবার মতো কেউ তার জন্য পাবেন না।
–[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৮৪, তাফসীর কাবীর খ. ৯, পৃ. ১৩, মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৩৩]

اَلْجِبْتُ وَالطَّاغُوْتُ [জিবত ও তাগুতের ব্যাখ্যা] : ওলামায়ে কেরাম জিবত ও তাগুতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রকম উক্তি পেশ করেছেন। তা থেকে নিম্নে কয়েকটি উক্তি প্রদত্ত হয়েছে।

১. ইকরামা (রা.) -এর মতে, জিবত ও তাগুত কুরাইশদের দুটি মূর্তির নাম। যাদের সেজদা করে ইহুদিরা কুরাইশদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিল এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছিল।
২. আবূ উবাইদা (রা.) বলেন, জিব্‌ত ও তাগুত আল্লাহ ব্যতীত যে কোনো বাতিল উপাস্যকে বলে।
৩. ইমাম যাহহাক (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে জিবত এবং কাব ইবনে আশরাফকে তাগুত বলা হয়েছে।
৪. ইমাম শাবী ও মুজাহিদ (র.) বলেন, জিবতের অর্থ হচ্ছে যাদু আর তাগুতের অর্থ হচ্ছে শয়তান।
৫. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন, জিবতের অর্থ হলো গণক আর তাগুতের অর্থ হলো যাদুকর।
৬. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও আবুল আলিয়া এর বিপরীত বলেছেন। অর্থাৎ জিবতের অর্থ যাদুকর এবং তাগুতের অর্থ গণক।
৭. আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপতী (র.) বলেন, জিবতের উদ্দেশ্য হলো ঐ মূর্তি যার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আর তাগুতের উদ্দেশ্য হলো মূর্তির শয়তান। প্রত্যেক মূর্তির একটি শয়তান থাকে, যে মূর্তির ভেতরে থেকে কথা বলে এবং তা দ্বারা লোকদেরকে প্রতারিত করে। –[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৩৪]
৮. কাশশাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশরী বলেন, জিবত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূর্তি এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো উপাস্য। আর তাগুত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তান।
৯. জিবতের অর্থ– হচ্ছে প্রতিমা, আর তাগুতের অর্থ হলো প্রতিমাদের ভাষ্যকারগণ, যারা প্রতিমাদের তরফ থেকে অজস্র মিথ্যা ব্যাখ্যা করে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকে। এই উক্তিটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে।
–[তাফসীরে কাবীর খ. ৯, পৃ. ১৩৩]

উল্লিখিত সকল অর্থই জিবত ও তাগুতের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٥٣. أَمْ بَلْ أَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ أَيْ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَيْ شَيْئًا تَافِهًا قَدْرَ النُّقْرَةِ فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ لِفَرْطِ بُخْلِهِمْ ـ

৫৩. তাদের জন্য কি রাজত্বে কোনো অংশ রয়েছে? অর্থাৎ রাজত্বে তাদের কোনো অংশই নেই। যদি তাই হতো, তবে তারা অন্যান্য লোকদেরকে তিল পরিমাণ বস্তুও তথা কৃপণতার কারণে খেজুরের খোসা পরিমাণও দিত না।

٥٤. أَمْ بَلْ أَيَحْسُدُونَ النَّاسَ أَيِ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مِنَ النُّبُوَّةِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ أَيْ يَتَمَنَّوْنَ زَوَالَهُ عَنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاءِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ جَدَّهُ كَمُوسَى وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَكَانَ لِدَاوُدَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ امْرَأَةً وَلِسُلَيْمَانَ أَلْفٌ مَا بَيْنَ حُرَّةٍ وَسُرِّيَّةٍ ـ

৫৪. বরং তারা মানুষকে তথা নবী করীম ﷺ -কে হিংসা করে এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় অনুগ্রহ তাকে দান করেছেন তথা নবুয়ত ও অধিক স্ত্রীদান করেছেন। তারা তার থেকে সেই অনুগ্রহ বিদূরিত হওয়ার কামনা করে। আর বলে, যদি তিনি নবী হতেন, তবে নারীদের থেকে বিমুখ থাকতেন। নিশ্চয়ই আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর শ্রদ্ধাভাজন দাদা ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরকে যেমন- মূসা, দাউদ ও সুলাইমান (আ.)-কে কিতাব এবং হেকমত তথা নবুয়ত দান করেছি এবং তাঁদেরকে দিয়েছি বিশাল রাজত্ব। সুতরাং হযরত দাউদ (আ.) -এর নিরানব্বই জন স্ত্রী আর হযরত সুলাইমান (আ.) -এর স্বাধীন স্ত্রী ও দাসী মিলে একহাজার ছিল।

٥٥. فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ بِمُحَمَّدٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا عَذَابًا لِمَنْ لَا يُؤْمِنُ ـ

৫৫. অতঃপর অনেকে তাঁর তথা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং অনেকে তাঁর থেকে বিরত রয়েছে তাই ঈমান আনেনি। যারা ঈমান আনেনি তাদের শাস্তির জন্য দোজখের অগ্নি শিখাই যথেষ্ট।

٥٦. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نُدْخِلُهُمْ نَارًا يَحْتَرِقُونَ فِيهَا كُلَّمَا نَضِجَتْ احْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بِأَنْ تُعَادَ إِلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ غَيْرَ مُحْتَرِقَةٍ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ لِيُقَاسُوا شِدَّتَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ حَكِيمًا فِي خَلْقِهِ

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, আমি অচিরেই তাদেরকে দোজখে প্রবেশ করাব, তাতে তারা বিদগ্ধ হতে থাকবে। যখন তাদের চামড়া জ্বলে যাবে, তৎক্ষণাৎ আমি অন্য চামড়া পরিবর্তন করে দেব। এরকমভাবে যে, পূর্বের অদগ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যেন তারা আজাবের আস্বাদন গ্রহণ করতে পারে। তথা আজাবের তীব্রতা অনুভব করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী, তাঁকে কোনো বস্তুই অপারঙ্গম করতে পারে না, [এবং] স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে হেকমতের অধিকারী।

http://islamiboi.wordpress.com

٥٧. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قَذَرٍ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا دَائِمًا لَا تَنْسَخُهُ شَمْسٌ هُوَ ظِلُّ الْجَنَّةِ.

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব এমন বেহেশতে যার তলদেশে প্রবাহিত হয়েছে প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য ঋতুস্রাব এবং যে কোনো নোংরামি থেকে পবিত্র স্ত্রীগণ রয়েছে। আর আমি তাদেরকে স্থায়ী ছায়ায় প্রবেশ করাব যাকে সূর্যের কিরণ দূরীভূত করতে পারবে না। আর তা হচ্ছে বেহেশতের ছায়া।

তাহকীক ও তারকীব

نَقِيْرًا . نَقِيْرٌ . فَعِيْلٌ এর ওজনে। সামান্যতম বস্তু, তিল পরিমাণ। نَقِيْر মূলত, খেজুরের বীচের খোসার গিড়াকে বলে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যদি রাজত্ব পেয়ে যেতো, তাহলে কোর্পণ্যতার দরুন এক তিল পরিমাণ বস্তুও লোকদেরকে দান করতো না।

سَعِيْرًا . سَعِيْرٌ অর্থ প্রজ্বলিত অগ্নি। سَادِنُهَا - خَادِمُهَا অর্থ - سَادِنٌ অর্থ– খাদেম। ظِلٌّ . ظَلِيْلٌ অর্থ স্থায়ী ছায়া। ছায়ার আধিক্য বুঝাতে ظَلِيْل শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপ বলা হয় لَيْل أَلْيَل

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত রাজত্বের মর্ম : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) আলোচ্য আয়াতের বর্ণিত রাজত্বের কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

১. ইহুদিরা বলতো, রাজত্ব ও নবুয়তের অধিকতর উপযুক্ত হলাম আমরা। সুতরাং আরবদের অনুসরণ করবো কেমন করে? আল্লাহপাক তাদের এ দাবিকে আলোচ্য আয়াতে বাতিল প্রমাণিত করেছেন।

২. ইহুদিরা বলতো, শেষ জমানায় রাজত্ব তাদের হাতে চলে আসবে। অর্থাৎ তাদের থেকে এমন লোক বের হবে যে, তাদের রাজত্ব ও ক্ষমতাকে নতুনভাবে মজবুত করে তুলবে এবং লোকদেরকে তাদের ধর্মের প্রতি আহ্বান করবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক তাদেরকে মিথ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, যদি তাদেরকে রাজত্বের কিছু অংশ প্রদান করা হতো, তবে তারা এরূপ কৃপণতা প্রদর্শন করতো যে, সামান্যতম তিল পরিমাণ বস্তুও কাউকে দিত না। অথচ রাজত্ব ও কৃপণতা একত্রিত হতেই পারে না। –[তাফসীরে কাবীর খ. ৯, পৃ. ১৩৫-৩৬]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٥٨. إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ مَا
أُوتُمِنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ إِلٰى أَهْلِهَا .
نَزَلَتْ لَمَّا أَخَذَ عَلِيٌّ (رض) مِفْتَاحَ
الْكَعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ
الْحَجَبِيِّ سَادِنِهَا قَهْرًا لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ
ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَمَنَعَهُ وَقَالَ لَوْ
عَلِمْتُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ أَمْنَعْهُ فَأَمَرَهُ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ وَقَالَ هَاكَ
خَالِدَةً تَالِدَةً فَعَجِبَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَرَأَ لَهُ
عَلِيٌّ الْاٰيَةَ فَأَسْلَمَ وَأَعْطَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
لِأَخِيْهِ شَيْبَةَ فَبَقِيَ فِيْ وَلَدِهِ وَالْاٰيَةُ وَإِنْ
وَرَدَتْ عَلٰى سَبَبٍ خَاصٍّ فَعُمُوْمُهَا
مُعْتَبَرٌ بِقَرِيْنَةِ الْجَمْعِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَحْكُمُوْا
بِالْعَدْلِ . إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ مِيْمِ
نِعْمَ فِيْ مَا النَّكِرَةِ الْمَوْصُوْفَةِ أَيْ نِعْمَ
شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ . تَأْدِيَةَ الْأَمَانَةِ
وَالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا
لِمَا يُقَالُ بَصِيْرًا بِمَا يُفْعَلُ .

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহপাক তোমাদেরকে আদেশ করছেন, তোমরা যেন ঐ সব প্রাপ্য আমানতসমূহ যা তোমাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে। প্রাপকের কাছে পৌঁছে দাও। আলোচ্য আয়াতখানি তখন নাজিল হয়, যখন হযরত আলী (রা.) কাবার খাদেম উসমান ইবনে তালহা হাজাবীর কাছ থেকে জোরপূর্বক ঐ মুহূর্তে কাবাগৃহের চাবি নিয়ে আসেন। যখন হুজুর ﷺ মক্কা বিজয়ের বৎসর মক্কায় তাশরিফ এনেছিলেন, আর ওসমান ইবনে তালহা তাকে চাবি দিতে অস্বীকার করেছিল, এবং সে একথা বলেছিল যে, আমার যদি বিশ্বাস হতো তিনি আল্লাহর রাসূল তবে আমি চাবি দিতে অস্বীকার করতাম না। আয়াতখানি নাজিল হওয়ার পর হুজুর ﷺ হযরত আলীকে ওসমান ইবনে তালহা (রা.) -এর নিকট চাবি ফেরত দিতে নির্দেশ দেন, আর বললেন, এ চাবির খেদমত সর্বদাই তোমাদের নিকট থাকবে। এতে ওসমান বড় আশ্চর্যান্বিত হলো, জবাবে হযরত আলী (রা.) আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন, ফলে ওসমান ঈমান নিয়ে আসে। আর ওসমান ইবনে তালহা তার মৃত্যুর সময় চাবিটি তার ভাই শাইবার নিকট দিয়ে যায় এবং তাঁর আওলাদের মধ্যে অদ্যাবধি চাবি রাখার খেদমত বহাল রয়েছে। আয়াতটি যদিও বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু বহুবচনীয় শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার দরুন তার ব্যাপক অর্থই গ্রহণীয় হবে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে কোনো বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যেন ন্যায় ভিত্তিক বিচার মীমাংসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমানত আদায় ও ন্যায়বিচারের যে বিষয়ে উপদেশ দান করেছেন তা খুবই উত্তম। نِعِمَّا শব্দটিতে نِعْمَ -এর মীম বর্ণটি مَا -ই নাকেরায়ে মাওসূফার মধ্যে ইদগাম হয়েছে। ইবারতের রূপ হবে نِعْمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ নিশ্চয়ই আল্লাহপাক সকল কথার [সর্বশ্রোতা] ও সকল কাজের সর্বজ্ঞ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করেছেন। তথায় বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন তখন উসমান ইবনে তালহা ইবনে আবদুদ্দার যে ছিল কাবার খাদেম, সে কাবার দরজা বন্ধ করে ছাদের উপর উঠে গেল এবং হুজুর ﷺ -এর নিকট চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানালো আর একথা বলল যে, আমি যদি জানতাম আপনি আল্লাহর রাসূল তবে অবশ্যই চাবি দিতে অস্বীকার করতাম না। তখন হযরত আলী (রা.) বল পূর্বক তার হাত থেকে চাবি নিয়ে নেন এবং কাবাঘরের দরজা

http://islamiboi.wordpress.com

খুলে দেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। অতঃপর তিনি যখন বের হলেন তখন তার চাচা হযরত আব্বাস (রা.) চাবিটি তাকে দিয়ে দিতে আবেদন জানালেন, যাতে সে কাবা তথা পানি পান করানোর খেদমতের সাথে সাথে সাদানা তথা চাবি রাখার খেদমতও তার ভাগে এসে যায়। এমন সময় আলোচ্য আয়াত খানা নাজিল হয়। তখন প্রিয়নবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করলেন, চাবিটি উসমানের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার জন্য। ওসমান হযরত আলী (রা.)-কে বলল, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়ে জোরপূর্ব চাবি নিলে অতঃপর এখন আবার ফেরত দিচ্ছ এবং কোমল ব্যবহার দেখাচ্ছে তার কারণ কি?

হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহপাক তোমার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে তাকে যখন শুনালেন তখন উসমান আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ পাঠ করে মুসলমান হয়ে যায়। এদিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) নাজিল হয়ে হুজুরে পাক ﷺ কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, কাবা ঘরের চাবি রাখার খেদমত কিয়ামত পর্যন্ত উসমানের বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এটা হচ্ছে সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের উক্তি।

আবু রওক বলেছেন, হুজুরে পাক ﷺ ওসমান ইবনে তালহাকে বললেন, আমাকে কাবার চাবিটি দিয়ে দাও, সে বলল, আল্লাহর আমানত নিয়ে নিন। অতঃপর যখন তিনি গ্রহণ করতে চাইলেন তখন সে তার হাত গুটিয়ে নিল। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বললেন, তুমি যদি আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাসী হও, তবে আমাকে চাবিটি দিয়ে দাও। সে বলল, আল্লাহর আমানত নিয়ে নিন। অতঃপর তিনি যখন তা গ্রহণ করতে চাইলেন তখন সে হাত গুটি নেয়। তৃতীয়বার হুজুর ﷺ এরূপই বললেন, তখন সে আল্লাহর আমানত নিয়ে নিন বলে, চাবিটা হুজুরের হাতে সোপর্দ করে দেয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ চাবিটি সঙ্গে নিয়ে তওয়াফ করেন। তারপর বললেন, হে উসমান! তুমি আর আব্বাস যৌথভাবে চাবিটি গ্রহণ করে নাও। ফলে আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। অতঃপর হুজুরে পাক ﷺ উসমানকে বললেন, হে ওসমান! তুমি সর্বদার জন্য চাবিটি গ্রহণ কর। এই চাবি কোনো জালিম ব্যতীত কেউ তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে না। অতঃপর উসমান যখন হিজরত করে চলে যান তখন চাবিটি তার ভাই শাইবার নিকট দিয়ে যান। আর এই চাবি অদ্যাবধি তার বংশধরদের মধ্যেই রয়েছে।

উসমান ইবনে তালহা (রা.) -এর বিবৃতিতে তাঁর ঘটনা :

ইবনে সাদ ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আবদরীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, উসমান ইবনে তালহা বর্ণনা করেছেন, হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে দাওয়াত দিলেন। আমি বললাম মুহাম্মদ ﷺ! আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মমত ছেড়ে নতুন ধর্মমত নিয়ে এসেছ। আর এবারে তোমার লোভ হয়ে গেছে যে, আমিও তোমার পদাঙ্ককে অনুসরণ করে চলবো। উসমান বললেন, আমি সোমবার ও বৃহস্পতি বার মূর্খতার যুগে কাবা গৃহ খোলতাম। একদা হুজুরে পাক ﷺ অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কাবাঘরে প্রবেশ করার ইচ্ছা নিয়ে আসলেন। আমি তাকে কঠোর কথা ও দোষারোপ করলাম। তিনি ধৈর্যধারণ করলেন, অতঃপর বললেন, ওসমান। হয়তো এক দিন এই চাবিটি তুমি আমার হাতে দেখবে, তখন আমি যেখানে ইচ্ছা তাকে ব্যবহার করবো। আমি বললাম, তবে তো সেই কুরাইশ ধ্বংস ও পদদলিত হয়ে যাবে। তিনি বললেন, না তারা তখন প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হবে। একথা বলে তিনি কাবার ভিতরে প্রবেশ করে নিলেন। কিন্তু তাঁর একথা আমার অন্তরে রেখাপাত করেছিল। আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তাই আমি মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে খুবই গালাগালি করলো এবং আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা প্রদান করলো। মক্কা বিজয়ের দিন যখন আসল তখন তিনি আমাকে বললেন উসমান! চাবি নিয়ে আস, আমি চাবি নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে অতঃপর আমার নিকট ফেরত দান করে বললেন, সর্বদার জন্য তুমি এই চাবিটি নিয়ে নাও। জালিম ব্যতীত অন্য কেউ তোমার কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। উসমান! তোমাদেরকে আল্লাহপাক তার ঘরের আমানতদার বানিয়েছেন। সুতরাং এই ঘরের মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু অর্জন হয় তা যথারীতি ভোগ কর। আমি যখন ফেরত আসতে শুরু করলাম তখন তিনি আমাকে আহ্বান করলেন। আমি ফিরে গেলে তিনি ফরমালেন, সেই দিনটি কি হয়নি যার কথা আমি পূর্বে তোমার সঙ্গে বলেছিলাম। তার একথা বলায় আমার ঐ কথা স্মরণ হয়ে গেল, যা তিনি হিজরতের পূর্বে বলেছিলেন। আমি বললাম, অবশ্যই স্মরণ হয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। −[মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৪২-১৪৩]

এই ঘটনাটিকে আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) আরো বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা বিজয় করেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফ প্রাঙ্গনে তাশরিফ আনেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষক উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে চাবি দিতে বললেন, তিনি চাবি দিতে চাইলেন। এমন সময় হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! চাবিটি আমাকে দান করুন, যে আমাদের বংশে হাজীদের খেদমত, জমজমের পানি পান করানো এবং চাবিটি রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে। এই কথা শুনে হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা.) চাবি দিতে বিরত রইলেন। প্রিয়নবী ﷺ দ্বিতীয় বার চাবি চাইলেন, তখন পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো।

http://islamiboi.wordpress.com

তিনি তৃতীয় বার চাবি দিতে আদেশ দিলেন। তখন উসমান ইবনে তালহা (রা.) এই কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহর আমানত স্বরূপ দিলাম। হুজুর ﷺ দরজা খোলে ভিতরে প্রবেশ করেন। কাবা শরীফের ভিতরে যেসব মূর্তি ছিল সেগুলো ভেঙ্গে বাইরে ফেলে দিলেন এবং সেই স্থানসমূহ পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর বাইরে এসে কাবা শরীফের দ্বার প্রান্তে দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সকল শত্রু সৈন্যকে তিনি পরাজিত করেছেন। অতঃপর তিনি এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, জাহেলিয়াতের যুগের সকল কলহ দ্বন্দ্ব এখন আমার পায়ের তলে। সেই কলহ দ্বন্দ্ব কোনো আর্থিক ব্যাপারে হোক বা প্রাণের ব্যাপারে হোক। তবে হ্যাঁ বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষা করা এবং হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্ব পূর্বের ন্যায়ই থাকবে। এই ভাষণ শেষ করে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী (রা.) অগ্রসর হয়ে আরজ করলেন, আমাকে চাবিটি দান করুন যেন বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি রক্ষা করা এবং হাজীদের জমজমের পানি পান করানোর দায়িত্ব আমাদের উপরই থাকে। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ চাবি হযরত আলী (রা.) কে দিলেন না। তিনি মাকামে ইবরাহীমকে কাবা শরীফের ভিতর থেকে বের করে এনে দেওয়ালের সঙ্গে রেখে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, এই হলো তোমাদের কেবলা। অতঃপর তিনি তওয়াফে মশগুল হয়ে গেলেন। দুবার কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) নাজিল হলেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করতে শুরু করলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। আমি ইতিপূর্বে আপনাকে এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে শুনিনি। অতঃপর প্রিয়নবী ﷺ হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা.) কে ডাকলেন এবং কাবা শরীফের চাবি তাকে প্রদান করলেন এবং বললেন, আজকের দিন অঙ্গীকার রক্ষার, সৎকাজ করার এবং ভালো ব্যবহার করার দিন। –[ইবনে কাছীর খ. ৫, পৃ. ৫১]

আমানত রক্ষার নির্দেশ : এই আয়াতে আল্লাহপাক মু'মিনদেরকে আমানত রক্ষার বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন। যদিও এই আয়াত হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা.) -এর পক্ষে তাকে কা'বা শরীফের চাবি প্রদান সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কিন্তু এতে সর্বপ্রকার আমানত রক্ষার বিশেষ তাকিদ রয়েছে। কেননা তাফসীরবিদগণের একটি মূলনীতি রয়েছে– اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ একথা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের সম্পর্ক সাধারণত তিন প্রকার–

১. মানুষের সম্পর্ক তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহর সঙ্গে।
২. মানুষের সম্পর্ক সকল বান্দার সাথে।
৩. মানুষের সম্পর্ক তার নিজের সঙ্গে।

আমানতের প্রশ্ন সকল সম্পর্কের ব্যাপারেই উত্থিত হয় এবং সর্ব ক্ষেত্রে আমানতের হেফাজত ও আমানত আদায় করতে হয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৯৭]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে বিচারকদেরকে ইনসাফের সাথে বিচার মীমাংসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম করে না ততক্ষণ আল্লাহপাক তাঁর সঙ্গে থাকেন। আর যখন সে জুলুম করে বসে তখন আল্লাহ পাক তাকে তার নিজের দিকে সোপর্দ করে দেন। ইহুদিদের এই অভ্যাস ছিল যে, তারা আমানতের মধ্যে খেয়ানত করতো, মামলা মুকাদ্দমার ফয়সালায় ঘুষ প্রভৃতির কারণে পক্ষপাতিত্ব করতো। ইহুদিরা ব্যক্তিগত এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কারণে নির্দ্বিধায় ইনসাফের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতো। এই জন্য উল্লিখিত দুটি বস্তু থেকে মুসলমানদেরকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। –[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৫১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক بَيْنَ النَّاسِ বলেছেন, بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ কিংবা بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ বলেননি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, বিচার মীমাংসার ক্ষেত্রে সকল মানুষই বরাবর, মুসলমান হোক বা অমুসলিম, বন্ধু হোক বা শত্রু, স্বদেশী হোক বা ভিনদেশী, একই বর্ণ ও ভাষার হোক বা নাই হোক, বিচার মীমাংসাকারীদের ফরজ হলো এসব সম্পর্কের ঊর্ধ্বে থেকে হক ও ইনসাফ মোতাবেক ফয়সালা করা।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (র.) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইনসাফকারীগণ কিয়ামতের দিন রাহমানের ডান হাতের দিকে নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। আর রহমানের হাত উভয়টাই ডান। আর তারা হবে ঐ সব লোক, যারা বিচার মীমাংসার ফয়সালায় উভয় পক্ষের ব্যাপারে এবং নিজের কর্তৃত্বাধীন বিষয়াদিতে ইনসাফ করে থাকে। –[মুসলিম]
* হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ও নৈকট্যতম ব্যক্তি হবে ইনসাফগার হাকিম, বিচারক। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম ও কঠিনতম শাস্তির উপযুক্ত হবে জালিম বিচারক বা শাসক। –[তিরমিযী]

http://islamiboi.wordpress.com

৫৯. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى اَصْحَابَ الْاَمْرِ اَىِ الْوُلَاةَ مِنْكُمْ اِذَا اَمَرُوْكُمْ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ اَىْ كِتَابِهٖ وَالرَّسُوْلِ مُدَّةَ حَيَاتِهٖ وَبَعْدَهُ اِلٰى سُنَّتِهٖ اَىْ اِكْشِفُوْا عَلَيْهِ مِنْهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ اَىِ الرَّدُّ اِلَيْهِمَا خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ التَّنَازُعِ وَالْقَوْلِ بِالرَّاْىِ وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا مَاٰلًا .

অনুবাদ :

৫৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের বিচারকদের অনুসরণ কর যখন তারা তোমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান করে। অতঃপর যদি কোনো বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার তথা তাঁর কিতাবের প্রতি এবং রাসূলের জীবদ্দশায় রাসূলের প্রতি এবং তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সুন্নতের প্রতি অর্পণ কর, অর্থাৎ সে বিষয়ের সমাধান কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে জেনে নাও। যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করে থাক, এটি তথা কুরআন ও সুন্নাহের প্রতি অর্পণ করা তোমাদের জন্য ঝগড়া ও আপন রায় মত বলার চেয়ে উত্তম এবং পরিণতির দিক দিয়েও শ্রেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল :

১. বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ সকলেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা (রা.) সম্পর্কে, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুজাহিদদের একদল দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন।

২. ইবনে জারীর এবং ইবনে হাতেম সুদ্দির বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুজাহিদদের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এই বাহিনীতে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) -ও ছিলেন, যাদের উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল তাদের নিকট এই বাহিনী অতি প্রত্যুষে পৌঁছল। কিন্তু সেখানকার লোকেরা পলাতক ছিল, শুধু একজন লোক উপস্থিত ছিল। সে ব্যক্তি হযরত আম্মার (রা.) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলো এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করল। হযরত আম্মার (রা.) বললেন, তুমি এখানেই থাকো, মুসলমান হওয়ার উপকার তুমি পাবে। অতঃপর হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) যখন ঐ ব্যক্তির উপর হামলা করলেন, তখন হযরত আম্মার (রা.) বললেন, এই ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও, সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং আমার আশ্রয়ে এসে গেছে। তখন হযরত খালেদ ও আম্মারের মধ্যে এ বিষয়ে তর্ক হলো। এমন কি মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর তারা উভয়ে বিষয়টি প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি আম্মারের আশ্রয় দেওয়ার কথা ঠিক রাখলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন নেতার কথার বরখেলাফ না করা হয় সে বিষয়ে তাকিদ করলেন। স্বয়ং প্রিয়নবী ﷺ -এর সামনেও উভয়ের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলো। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, হে খালেদ! আম্মারকে গালি দিয়ো না। যে আম্মারকে গালি দিবে আল্লাহ পাক তাকে মন্দ বলবেন। যে আম্মারের প্রতি লানত দিবে আল্লাহপাক তার প্রতি লানত দিবেন। এই ফরমান শুনে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সঙ্গে সঙ্গে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হলেন, এবং হযরত আম্মার তার প্রতি রাজি হলেন। তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

–[রূহুল মা'আনী খ. ৫, পৃ. ৫৬, তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৪৭-৪৮]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত اُولِى الْاَمْرِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যকে আবশ্যকীয় করা হয়েছে। আল্লাহপাকের ইরশাদ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ দ্বারা এবং হুজুরে পাক ﷺ -এর তিরোধানের পর কুরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য করা ফরজ প্রমাণিত হয়েছে। এবং اُولِى الْاَمْرِ দ্বারা ইজমায়ে উম্মত ও শরয়ী

http://islamiboi.wordpress.com

কিয়াস দলিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত উলিল আমরের ব্যাখ্যায় ওলামাদের বিভিন্ন রকম উক্তি বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উক্তি বিবৃত হচ্ছে–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– هُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ তারা হলেন, ওলামা ও ফুকাহাগণ। যারা লোকদেরকে তাদের ধর্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান শিক্ষাদান করেন। হাসান যাহহাক ও মুজাহিদও এ মতই পোষণ করেন।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তারা হলেন ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও গভর্নরগণ। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকের উপর আবশ্যকীয় হলো, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করা এবং যথাযথ ভাবে আমানত আদায় করা। তারা যদি এরূপ করে নেয় তবে নাগরিকদের কর্তব্য হলো তাদের কথা মান্য করা এবং তাদের আনুগত্য করা।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِیْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ عَصَی اللّٰهَ وَمَنْ یُطِعِ الْاَمِیْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِیْ وَمَنْ یَعْصِ الْاَمِیْرَ فَقَدْ عَصَانِیْ.

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার আনুগত্য করল সে বস্তুত আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে আমার বিরুদ্ধাচারণ করল সে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করল, আর যে আমির বা শাসকের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল, আর যে আমিরের বিরুদ্ধাচারণ করল সে আমার বিরুদ্ধাচারণ করল।

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য আমিরের কথা শ্রবণ করা ও মান্য করা, চায় তাঁর পছন্দ হোক বা নাই হোক। তবে হ্যাঁ যদি তিনি আল্লাহর নাফরমানির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তখন তার সেই নির্দেশ শুনাও যাবে না এবং গ্রহণ করাও যাবে না। বরং হাদীস অনুযায়ী তার সেই রকম নির্দেশ পালন না করাটাই ওয়াজিব। কেননা ইরশাদ হয়েছে لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِیْ مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারণে যে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয়।

৩. মায়মুন ইবনে মেহরান বলেন, উলিল আমরের মানে হচ্ছে বিভিন্ন দিকে প্রেরিত ছোট ছোট সৈন্যদলের আমির বা নেতাগণ। কেননা আয়াতটি তো তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪. হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, উলিল আমরের উদ্দেশ্য হলো হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)। কেননা হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِنِّیْ لَا اَدْرِیْ مَا بَقَائِیْ فِیْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذِیْنَ مِنْ بَعْدِیْ اَبِیْ بَكْرٍ وَعُمَرَ অর্থাৎ, আমি তোমাদের মধ্যে কতদিন জীবিত থাকবো জানিনা। সুতরাং তোমরা আমার পর আবূ বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে। [তিরমিযী]

৫. কারো মতে, উলিল আমরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল সাহাবায়ে কেরাম। কেননা হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, اَصْحَابِیْ كَالنُّجُوْمِ بِاَیِّهِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ অর্থাৎ, আমার সাহাবাগণ আকাশের নক্ষত্রের মতো, তাদের যে কাউকে তোমরা যদি অনুসরণ কর তবে হেদায়েত পেয়ে যাবে। হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, مَثَلُ اَصْحَابِیْ فِیْ اُمَّتِیْ كَالْمِلْحِ فِی الطَّعَامِ لَا یَصْلُحُ الطَّعَامُ اِلَّا بِالْمِلْحِ অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবাদের উদাহরণ হচ্ছে খাদ্যে লবণের মতো, খাদ্য দ্রব্য লবণ ব্যতীত খাবার উপযোগী হতে পারে না।

আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, যারা বলেছেন, উলিল আমরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমির শাসক ও গভর্নরগণ তাদের উক্তিটাই অধিকতর বিশুদ্ধ।

আল্লামা যাজ্জাজ বলেন, যারা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং তাদের কল্যাণে ব্যস্ত তারা সকলেই উলিল আমরের অন্তর্ভুক্ত। –[তাফসীরে খাযেন খ. ১, পৃ. ৩৯২-৯৩]

ইজতেহাদ ও কিয়াসের প্রমাণ : فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِیْ شَیْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর।

কিতাব ও সুন্নাহর বা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তনের দুটি দিক রয়েছে। ১. তোমরা কিতাব ও সুন্নাহর সরাসরি হুকুম-আহকামের প্রতি প্রত্যাবর্তন কর। ২. কোনো বিষয়ে যদি কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সরাসরি নির্দেশ না থাকে, তবে যেসব সরাসরি নস-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ সমূহের উপর কেয়াস করে সে দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এখানে فَرُدُّوْهُ শব্দটি সব দিকেই ব্যাপক। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৫০৫]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٠. وَنَزَلَ لَمَّا اخْتَصَمَ يَهُوْدِيٌّ وَمُنَافِقٌ فَدَعَا الْمُنَافِقُ إِلٰى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَدَعَا الْيَهُوْدِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيَاهُ فَقَضٰى لِلْيَهُوْدِيِّ فَلَمْ يَرْضَ الْمُنَافِقُ وَأَتَيَا عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ الْيَهُوْدِيُّ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلْمُنَافِقِ أَكَذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَتَلَهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا إِلَى الطَّاغُوْتِ الْكَثِيْرِ الطُّغْيَانِ وَهُوَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ وَقَدْ أُمِرُوْٓا أَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَلَا يُوَالُوْهُ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ.

৬০. [সামনের আয়াতটি] তখন নাজিল হয়, যখন জনৈক ইহুদি ও মু'নাফিকের মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে পড়ে, ফলে মুনাফিক চাইল বিষয়টি কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে নিয়ে যেতে, যাতে সে উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে। আর ইহুদি ব্যক্তি বিষয়টি নবীয়ে করীম ﷺ-এর দরবারে বিষয়টি নিয়ে যেতে বলল। পরিশেষে তারা উভয়ে হুজুর ﷺ-এর দরবারে বিষয়টি নিয়ে আসলে তিনি ইহুদির পক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। তবে এই রায়ের প্রতি মু'নাফিক ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না। তাই তারা উভয়ে [ছানী বিচারের জন্য] হযরত ওমর (রা.) -এর নিকট আসল। তবে ইহুদি ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.) -এর নিকট হুজুর ﷺ-এর কৃত বিচার মীমাংসার কথাটিও উল্লেখ করে দিল। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিক লোকটিকে বললেন, ব্যাপারটা কি তাই? মুনাফিক বলল, জী হ্যাঁ। [তা শুনে] হযরত ওমর (রা.) তাকে হত্যা করে ফেললেন। হে রাসূল ﷺ! আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি? যারা দাবি করে যে, তারা সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই কিতাবসমূহের প্রতিও যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নিজেদের মামলা তাগুত-শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়। তাগুত বলা হয় অধিক সীমালঙ্ঘন কারীকে। আর সে হচ্ছে কা'ব ইবনে আশরাফ। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যাতে তারা তাকে অমান্য করে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব না রাখে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে হক থেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

٦١. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلٰى مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي الْقُرْاٰنِ مِنَ الْحُكْمِ وَإِلَى الرَّسُوْلِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ رَأَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ يُعْرِضُوْنَ عَنْكَ إِلٰى غَيْرِكَ صُدُوْدًا.

৬১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা কুরআনের সেই হুকুমের দিকে আস, যা আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর রাসূলের দিকে আস, যাতে তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করতে পারেন। তখন আপনি মুনাফিকদেরকে দেখবেন যে, তারা আপনার নিকট থেকে সম্পূর্ণ রূপে দূরে সরে অন্যদের দিকে চলে যাচ্ছে।

http://islamiboi.wordpress.com

٦٢. فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ عُقُوبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ اَيْ اَيَقْدِرُوْنَ عَلَى الْاِعْرَاضِ وَالْفِرَارِ مِنْهَا لَا ثُمَّ جَآءُوْكَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى يَصُدُّوْنَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ مَا اَرَدْنَا بِالْمُحَاكَمَةِ اِلٰى غَيْرِكَ اِلَّآ اِحْسَانًا صُلْحًا وَّتَوْفِيْقًا تَالِيْفًا بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ بِالتَّقْرِيْبِ فِي الْحُكْمِ دُوْنَ الْحَمْلِ عَلٰى مُرِّ الْحَقِّ ـ

৬২. তখন তাদের কি অবস্থা হবে তথা তারা কি করবে? যখন তাদের কৃতকর্ম তথা কুফর ও পাপের কারণে তাদের উপর কোনো বিপদ তথা শাস্তি এসে পড়বে। অর্থাৎ তারা কি সেই বিপদ থেকে এড়িয়ে এবং পলায়ন করে যেতে পারবে? না পারবে না। অতঃপর তারা আপনার নিকট আসবে, جَآءُوْكَ -এর আতফ يَصُدُّوْنَ -এর উপর হয়েছে। আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলবে যে, অন্যের নিকট মকদ্দমা নিয়ে যাওয়াতে কল্যাণ তথা সন্ধি এবং ফয়সালাতে ইনসাফ করত বাদী-বিবাদীর মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। হকের তিক্ততার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা নয়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَمْ تَرَ আপনি কি দেখেননি, লক্ষ্য করেননি? এ দ্বারা নবীয়ে কারীম ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে। اَلزَّعْمُ - يَزْعُمُوْنَ সত্য বা মিথ্যা বলা। এই শব্দটি বিপরীতার্থ বোধক শব্দাবলির অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত ও প্রমাণহীন উক্তির বেলায় زَعْم শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় সত্য কথার ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হয়।

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে زَعَمَ جِبْرَئِيْلُ যেমন ইমাম ইবনে ছা'লাবা (র.) -এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে زَعَمَ رَسُوْلُكَ ইমামুন নুহাত আল্লামা সীবওয়াই তার জগত বিখ্যাত কিতাব কিতাবে সীবওয়াই -এর মধ্যে তদীয় উস্তাদ খলীল ইবনে আহমদের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে প্রায়ই বলেছেন – زَعَمَ الْخَلِيْلُ كَذَا [আল্লামা খলীল এরূপ বলেছেন] তবে এখানে يَزْعُمُوْنَ -এর অর্থ হলো يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ, মিথ্যা দাবি করা। কেননা আয়াতটি নাজিল হয়েছে মু'নাফিকদের সম্পর্কে।

يُرِيْدُوْنَ - وَقَدْ اُمِرُوْا হাল হয়েছে। اَلَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ থেকে حَال হয়েছে। اَنَّهُمْ ও তার মা'মূল দুই মাফউলের স্থলবর্তী হয়েছে। يُرِيْدُوْنَ -এর যমীরে ফায়েল থেকে হাল হয়েছে। ضَلٰلًا بَعِيْدًا মুরাক্কাবে তাওসীফী হয়ে اَنْ يُّضِلَّ ফে'লের মাফউলে মুতলাক হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতগুলোর সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালার প্রতি চলে আসার নির্দেশ ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে শরিয়ত বিরুদ্ধ নীতিমালার দিকে চলে যাওয়ার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। [জামালাইন – ৫৬/২]

শানে নুযূল : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا الخ আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে চারটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তা নিম্নে প্রদত্ত হচ্ছে।

১. বহু সংখ্যক মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, [বিশর নামী] এক মুনাফিক এবং এক ইহুদি ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্ব হয়। ইহুদি বলল, তোমার ও আমার বিষয়টি মীমাংসা করবেন আবুল কাসেম হযরত মুহাম্মদ ﷺ আর মুনাফিক ব্যক্তি বলল, আমাদের উভয়ের বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে কা'আব ইবনে আশরাফ। তার কারণ হলো রাসূল ﷺ বিচার মীমাংসা করতেন যে কোনো প্রকার ঘুষ ব্যতীত ইনসাফের সাথে। আর কা'আব ইবনে আশরাফ বিচার করতো ঘুষ নিয়ে। আর এদিকে ইহুদি ব্যক্তি ছিল হকের উপর এবং মু'নাফিক ছিল বাতিলের উপর। এই জন্য ইহুদি ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর দিকে আর মুনাফিক ব্যক্তি কা'আব ইবনে আশরাফের দিকে বিচারটি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ইহুদি ব্যক্তি তার বক্তব্যে অনঢ় থাকার ফলে উভয়েই হুজুর ﷺ -এর নিকট গেল। হুজুর ﷺ অবস্থার বর্ণনা শুনে ইহুদিদের পক্ষে ও

http://islamiboi.wordpress.com

মুনাফিকের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন। এতে মুনাফিক লোকটি অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে ইহুদিকে বলল, চল আমরা আবূ বকরের নিকট যাই। হযরত আবূ বকর (রা.) এর নিকট গেলে তিনিও ইহুদির পক্ষে রায় প্রদান করেন। তাতে মুনাফিক লোকটি সম্মত হলো না। সে ইহুদিকে বলল, তোমার আমার বিচার হবে ওমরের দরবারে। অতঃপর তারা উভয়ে হযরত ওমর (রা.) -এর নিকট চলল। সেখানে যাওয়ার পর ইহুদি বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা.) মুনাফিকের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় প্রদান করেছেন। কিন্তু সে তাদের উভয়ের রায়ের উপর সম্মত হয়নি। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিককে বললেন, ব্যাপার কি এটাই? জবাবে সে বলল জি-হ্যাঁ। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা উভয়ে এখানে অবস্থান কর। ঘরে আমার একটি প্রয়োজন আছে তা সেরে আমি তোমাদের নিকট আসছি। ঘরে গিয়ে তিনি তাঁর তলোয়ারটি নিয়ে এসে মু'নাফিক ব্যক্তিটিকে হত্যা করে ফেললেন। অতঃপর বললেন, এটাই হচ্ছে ফয়সালা ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং রাসূলের বিচারে সন্তুষ্ট হয় না। তা দেখে ইহুদি লোকটি পলায়ন করল। অতঃপর নিহত মুনাফিকের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে হুজুর ﷺ -এর দরবারে হযরত ওমরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হুজুর ﷺ তাকে ঘটনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! [সে তো আপনার ফয়সালাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই সে মুরতাদ কাফের হয়ে গেছে।] এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) আলোচ্য আয়াতটি নিয়ে এসে বলেন- إِنَّهُ الْفَارُوقُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) অবশ্যই পার্থক্য বিধানকারী, সে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। অতঃপর হুজুর ﷺ হযরত ওমরকে বললেন, তুমি ফারুক। এই বর্ণনা মতে, তাগুতের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে কা'আব ইবনে আশরাফ।

২. আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে আর তাদের কতিপয় লোকেরা মুনাফিক হয়ে পড়ে। মূর্খতার যুগের কুরাইজা গোত্রের কেউ যদি নযীর গোত্রের কাউকে হত্যা করতো, তবে বনূ নযীরের নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারীকে কতল করা হতো। এবং দিয়ত বা রক্তমূল্য হিসেবে একশত অসক খেজুর গ্রহণ করা হতো। আর বনূ নজীরের কেউ যদি কুরাইজা গোত্রের কাউকে হত্যা করতো তখন তার বদলে বনূ নজীরের হত্যাকারীকে কতল করা হতো না, বরং রক্তমূল্য হিসেবে কেবল মাত্র ষাট অসক খেজুর প্রদান করা হতো। বনূ নযীর ছিল সামাজিকভাবে শ্রেষ্ঠ এবং আউস গোত্রের মিত্র গোষ্ঠী আর কুরাইজা ছিল খাজরাজ গোত্রের মিত্র গোষ্ঠী। হুজুরে পাক ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন এক নযীরী এক কুরাইজী ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। এ নিয়ে উভয় গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। বনু নজীর বলল, আমাদের উপর কোনো কেসাস নেই বরং পূর্বের প্রথানুযায়ী আমাদের উপর কেবল ষাট অসক খেজুর আসবে। এদিকে খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বলল, এটা তো মূর্খতা যুগের বিচার। এখন তোমরা ও আমরা ভাই ভাই, আমাদের ধর্মও এক। আমাদের একের উপর অন্যের পার্থক্য প্রভেদ নেই। বনূ নযীর তাদের একথা মেনে নিল না। ফলে মুনাফেকরা বলল, চল ইহুদি ধর্ম যাজক আবূ বুরদা আসলামী গণকের দিকে। আর মুসলমানগণ বললেন, চল রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে। মুনাফিকরা তা না মেনে ঐ গণকের নিকট চলে গেল তাদের এ বিষয়ে বিচার মীমাংসা গ্রহণের জন্য। এর প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ গণক লোকটিকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে মুসলমান হয়ে যায়। এটা হচ্ছে আল্লামা সুদ্দীর উক্তি। এ বর্ণনা মতে তাগুত হলো গণক লোকটি।

৩. হাসান বসরী (র.) বলেন, জনৈক মুসলমান ব্যক্তির এক মু'নাফিক ব্যক্তির উপর কিছু পাওনা ছিল। [এ নিয়ে দ্বন্দ্ব হলো] মু'নাফিক ব্যক্তি বিষয়টি এক মূর্তির দিকে নিয়ে যেতে চাইল। মূর্খতার যুগের লোকেরা যার দিকে তাদের বিষয়াদি মীমাংসার জন্য যেত। আর একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মূর্তির তরফ থেকে তরজমা করত। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। এ বর্ণনা মতে তাগুতের উদ্দেশ্য হবে ঐ তরজমাকারী ব্যক্তি।

৪. চতুর্থ বর্ণনায় ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেন যে, মূর্খতার যুগের লোকেরা তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য মূর্তিদের কাছে যেত। আর মীমাংসার পদ্ধতি ছিল এই যে, তারা মূর্তির সামনে চকমক পাথরে অগ্নি জ্বালাত। চকমক পাথরে যা বেরিয়ে আসত তদানুযায়ী তারা আমল করত। এ উক্তি অনুযায়ী তাগুতের উদ্দেশ্য হবে মূর্তি।

সারকথা হলো এই যে, কিছু লোক তাগুত তথা সীমালঙ্ঘনকারীদের দিকে মীমাংসার জন্য তাদের বিরোধ নিয়ে যেতে চাইল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দিকে নিয়ে যেতে সম্মত হলো না। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। কাজী ইয়াজ (র.) বলেন, বিচার মীমাংসার জন্য তাগুতের নিকট যাওয়া এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর রায় বা ফয়সালার উপর অসম্মত হওয়া কুফরি। এর উপর কাজী সাহেব অনেক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। বিস্তারিত জানতে হলে তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৬০ দেখে নিন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٣. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ النِّفَاقِ وَكِذْبِهِمْ فِيْ عُذْرِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ بِالصَّفْحِ وَعِظْهُمْ خَوِّفْهُمُ اللّٰهَ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْ شَانِ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا . مُؤَثِّرًا فِيْهِمْ اَيْ اِزْجُرْهُمْ لِيَرْجِعُوْا عَنْ كُفْرِهِمْ .

৬৩. এদের অন্তরে নেফাক ও ওজর বর্ণনায় মিথ্যা বলার ব্যাপার সেপার- যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তা খুব ভালোভাবেই জানেন, অতএব হে রাসূল ﷺ! ক্ষমার চোখে দেখে তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকুন এবং তাদেরকে উপদেশ দান করুন তথা তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করুন এবং তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলুন, যা তাদের মর্মস্পর্শী হয়। অর্থাৎ তাদেরকে ধমক প্রদান করুন যাতে তারা নিজেদের কুফরি থেকে ফিরে চলে আসে।

٦٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ فِيْمَا يَاْمُرُ بِهٖ وَيَحْكُمُ بِاِذْنِ اللّٰهِ بِاَمْرِهٖ لَا يُعْصٰى وَيُخَالَفُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِتَحَاكُمِهِمْ اِلَى الطَّاغُوْتِ جَآءُوْكَ تَائِبِيْنَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ تَفْخِيْمًا لِشَانِهٖ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا عَلَيْهِمْ رَّحِيْمًا بِهِمْ .

৬৪. আর আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাদের নির্দেশ ও ফয়সালা মান্য করা হয়, তাদের নাফরমানি ও বিরুদ্ধাচারণ যেন না করা হয়। আর সেই সব লোক যখন নিজেদের উপর তাগুতের নিকট মকদ্দমা নিয়ে গিয়ে জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা তাওবাকারী হয়ে আপনার কাছে চলে আসত, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হতেন। (وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ) -এর মধ্যে মধ্যম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের দিকে বাচনভঙ্গিতে ইলতেফাত বা পরিবর্তন হয়েছে রাসূল ﷺ -এর শানের মাহাত্ম্য বিকাশের উদ্দেশ্যে। তবে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তাদের তওবা কবুলকারী তাদের প্রতি দয়াময়রূপে পেত।

٦٥. فَلَا وَرَبِّكَ لَا زَائِدَةٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ اِخْتَلَطَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ضِيْقًا اَوْ شَكًّا مِّمَّا قَضَيْتَ بِهٖ وَيُسَلِّمُوْا يَنْقَادُوْا لِحُكْمِكَ تَسْلِيْمًا مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ .

৬৫. অতএব হে রাসূল ﷺ আপনার পালনকর্তার শপথ যে, (لَا) বর্ণটি অতিরিক্ত তারা কখনো মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা বা সন্দেহ পাবে না এবং আপনার রায়কে কোনো রকম বিরোধিতা ব্যতীত শান্ত চিত্তে মেনে নেবে।

http://islamiboi.wordpress.com

٦٦. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ مُفَسِّرَةٌ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ كَمَا كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيلَ مَا فَعَلُوهُ أَيِ الْمَكْتُوبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَلِيلٌ بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِ وَالنَّصْبِ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ مِنْ طَاعَةِ الرَّسُولِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا تَحْقِيقًا لِإِيمَانِهِمْ .

৬৬. আর যদি আমি তাদেরকে এই আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা কর, অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর যেরূপ আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি আদেশ করেছিলাম। এখানে أَنْ শব্দটি ব্যাখ্যাকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত অন্য কেউ এই আদেশ পালন করত না। قَلِيلٌ শব্দটি নাহবী তারকীবে বদল হওয়ার প্রেক্ষিতে পেশযুক্ত আর ইস্তেছনার প্রেক্ষিতে জবরযুক্ত হবে। যদি তারা উপদেশ অনুযায়ী কাজ করত তথা রাসূলের আনুগত্য করতো তবে তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম হতো এবং তাদের ঈমান দৃঢ়তর রাখত।

٦٧. وَإِذًا أَيْ لَوْ ثَبَتُوا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا أَجْرًا عَظِيمًا هُوَ الْجَنَّةُ .

৬৭. আর তখন তথা যদি তারা সুদৃঢ় থাকত, তবে আমি নিজের তরফ থেকে অবশ্যই তাদেরকে মহা প্রতিদান দিতাম। আর তা হলো বেহেশত।

٦٨. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا .

৬৮. আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَا أَرْسَلْنَا . إِلَّا لِيُطَاعَ থেকে قُلْ لَهُمْ فِيْ أَنْفُسِهِمْ الخ -এর মধ্যে فِيْ أَنْفُسِهِمْ - قُلْ -এর মুতা'আল্লিক হয়েছে। মাফঊলে লাহুর প্রেক্ষিতে নসবের ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়েছে। وَلَوْ أَنَّهُمْ শর্ত لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا الخ জওয়াবে শর্ত। فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ -এর মধ্যে لَا বর্ণটি অতিরিক্ত তাকিদ বুঝাতে এসেছে। বাক্যের রূপ হবে فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الخ **আয়াতের শানে নুযুল :** মদিনা শরীফের উপকণ্ঠে অবস্থিত হাররা নামক স্থানে কোনো পাহাড়ের নালা থেকে জমিনে পানি সেচনের ব্যাপারে হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) -এর সাথে এক মদিনাবাসী লোকের ঝগড়া হয়। তারা উভয়ে হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়।

তিনি আদেশ দেন জুবায়ের তুমি প্রথমে তোমার জমিনে পানি দাও অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর জমিনে পানি ছেড়ে দাও। আনসারী এ ফয়সালাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ জুবাইর আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে এরকম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এই কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে পড়ল। তিনি ইরশাদ করলেন, জুবায়ের! তোমার জমিনে পানি দেওয়ার পর পানিকে এতক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখ যে, বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌছে যায়। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও।

বস্তুত প্রিয়নবী ﷺ প্রথমে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তা এমন ছিল যে, হযরত জুবায়েরেরও কষ্ট হতো না এবং তাঁর প্রতিবেশীরও সুযোগ হতো। কিন্তু যেহেতু সেই ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করল। তাই তিনি এমন ব্যবস্থা দিলেন, যদ্দারা হযরত জুবায়ের (রা.) -এর হক পূর্ণভাবে আদায় হয়। হযরত জুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, এই সময়ে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয় এবং যে কোনো অবস্থায় প্রিয়নবী ﷺ -এর সকল সিদ্ধান্ত কে মেনে নেওয়ার বিধান পেশ করা হয়। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৫৮]

ইমাম রাযী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতটি পূর্ববর্তী ইহুদি ও মুনাফিক এর ঘটনাতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ মতটিকে তিনি পছন্দ করেছেন। ইমাম আতা মুজাহিদ এবং শা'বীও অনুরূপ বলেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٦٩. قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ نَرَاكَ فِى الْجَنَّةِ وَأَنْتَ فِى الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَنَحْنُ اَسْفَلُ مِنْكَ فَنَزَلَ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فِيْمَا اَمَرَابِهٖ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ اَفَاضِلَ اِصْحَابِ الْاَنْبِيَاءِ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِى الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيْقِ وَالشُّهَدَاءِ الْقَتْلٰى فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيْقًا ـ رُفَقَاءُ فِى الْجَنَّةِ بِاَنْ يَسْتَمْتَعَ فِيْهَا بِرُؤْيَتِهِمْ وَزِيَارَتِهِمْ وَالْحُضُوْرِ مَعَهُمْ وَاِنْ كَانَ مَقَرُّهُمْ فِىْ دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى غَيْرِهِمْ ـ

৬৯. কতিপয় সাহাবী (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনাকে আমরা বেহেশতে কেমনে দেখব? অথচ আপনি থাকবেন বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তরে আর আমরা থাকব আপনার নীচে। তাঁদের এ কথার প্রেক্ষিতে সামনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এবং যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিষয়াদিতে আনুগত্য করবে তারা সে সমস্ত লোকদের সাথী হবে, যাদের উপর আল্লাহপাক নিয়ামত দান করেছেন। যেমন– নবীগণ, সিদ্দীকগণ, তাঁরা হলেন নবীদের শ্রেষ্ঠতম সহচরগণ। তাদের সত্যবাদীতা ও সত্যায়নে আধিক্য বুঝতে তাদেরকে সিদ্দীক বা খুবই সত্যবাদী বলা হয়েছে, শহীদগণ তথা খোদার রাহে প্রাণোৎসর্গকারীগণ এবং উল্লিখিতগণ ব্যতীত অন্যান্য নেককারগণ। আর তাঁরাই হলো সর্বোত্তম সাথী। এরূপ জান্নাতের সাথী যে, তারা সেথায় পরস্পরের দর্শন, সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভে ধন্য হবেন। যদিও একের ঠিকানা অন্যের তুলনায় উঁচুস্তরে হবে।

٧٠. ذٰلِكَ اَىْ كَوْنُهُمْ مَعَ مَنْ ذُكِرَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ تَفَضَّلَ بِهٖ عَلَيْهِمْ لَا اَنَّهُمْ نَالُوْهُ بِطَاعَتِهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا بِثَوَابِ الْاٰخِرَةِ فَثِقُوْا بِمَا اَخْبَرَكُمْ بِهٖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ـ

৭০. এটি অর্থাৎ তাদের বর্ণিত লোকদের সহচর হওয়াটা আল্লাহ তা'আলার দান, তিনি তাদেরকে দান করেছেন, তারা নিজের আনুগত্যের বিনিময়ে অর্জন করেননি। নাহবী তারকীবে ذٰلِكَ শব্দটি মুবতাদা আর اَلْفَضْلُ الخ তার খবর। আর পরকালের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রদত্ত সংবাদে বিশ্বাস করো, তোমাকে তাঁর ন্যায় কোনো সংবাদ দাতা সংবাদ দিতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ الخ থেকে বয়ান হয়েছে। فاولئك জবাবে শর্ত। وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ الخ শর্ত
صِدِّيْق মুবালাগার সীগাহ। যার জীবনে একটি কথাও মিথ্যা বলেনি পুরোটা জীবনই সত্য বলে অতিবাহিত করেছেন তাকে সিদ্দীক বা অধিক সত্যবাদী বলা হয়। অথবা যার বক্তব্য হয় অন্তরে পোষিত আকিদা বিশ্বাসের মোতাবেক আর আমল হয় বক্তব্যের অনুরূপ তাকে সিদ্দীক বলা হয়। গ্রন্থকার اَفَاضِلَ اَصْحَابِ الْاَنْبِيَاءِ لِمُبَالَغَتِهِمْ فِى الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيْقِ বলে সিদ্দীকের এই সংজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই উম্মতের প্রধান সিদ্দীক হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। তিনিই হলেন নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব।

পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম নবীজী ﷺ-কে সত্যায়ন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার অনুসরণেই অনেক বুযুর্গ সাহাবাগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। وَحَسُنَ ফে'লে মদাহ اُولٰئِكَ তার ফায়েল আর مَخْصُوْصْ بِالْمَدْحِ হলো هٰؤُلَاءِ যা উহ্য রয়েছে। এবং رَفِيْقًا তামীয। ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ মুবতাদা اَلْفَضْلُ খবর। [তাফসীরে হাক্কানী, সাবী, রুহুল মা'আনী ও তাফসীরে কাবীর]

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :**

১. একদল মুফাসসিরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় আজাদকৃত গোলাম ছাওবান (রা.) -এর প্রতি অধিক মহব্বত রাখতেন। একদিন তিনি বিবর্ণ চেহারা ও বিষণ্ণ বদন নিয়ে হুজুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলে, তাঁর চেহারায় চিন্তার লক্ষণ উপলব্ধি করে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। তদুত্তরে ছাওবান (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার মধ্যে কোনো রোগ ব্যাধি নেই, তবে আপনাকে যখন দেখতে না পাই তখন আপনার দর্শন লাভ করার আগ পর্যন্ত আমার মন অস্থির হয়ে পড়ে। আপনার দিদার লাভ করে অশান্ত মনে শান্তি পাই। এবারে আমার মনে আখেরাতের ব্যাপারে চিন্তা হলো যে, আমি পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করলেও তো আপনার সঙ্গ পাবো না। আপনার দিদার নসীব আমার হবে না। কেননা আপনি নবীগণের সর্বোচ্চ স্তরে থাকবেন। আর আমি থাকবো আল্লাহর অন্যান্যা বান্দাদের স্তরে। তাই আমি আপনাকে সেখানে না দেখার আতঙ্কে ভোগছি। আর [আল্লাহ এমন না করুন] যদি জান্নাতে প্রবেশই করতে না পারি, তবে তো দেখা হওয়ার আর কথাই নেই। এই চিন্তায়ই আমাকে বিষণ্ন ও চিন্তাগ্রস্থ দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর এই চিন্তা নিরসন কল্পে আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। ইরশাদ হয়েছে- مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ الخ অর্থাৎ, যে বা যারা আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ-এর বিধানের আনুগত্য করবে তাঁরা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যথা- নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারদের সঙ্গে জান্নাতে সাথী হবে।

২. ইমামুত তাফসীর আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, একদল আনসারী সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি তো জান্নাতের সর্বোচ্চস্তরে বাস করবেন অথচ আমরা আপনার প্রতি আসক্ত থাকবো। তখন আমাদের অবস্থা কি হবে। আমরা কেমন করে আমাদের মনকে সান্ত্বনা দেবো? তাদের এ আরজের প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন।

৩. ইমাম মুকাতিল (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি একজন আনসারী সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি হুজুরে পাক ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যখন আপনার পবিত্র দরবার থেকে বেরিয়ে আমাদের বাড়ি ঘরে বিবি-বাচ্চাদের কাছে আসি অতঃপর যখন আবার আপনার কথা মনে পড়ে তখন আপনার দরবারে ফেরত এসে দিদার লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত মনে শান্তি পাইনি। অতঃপর আমরা আপনার জান্নাতে অবস্থানের কথা মনে মনে স্মরণ করলাম। কেননা আপনিতো থাকবেন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে আর আমরা থাকবো আপনার নীচে। তখন আমরা কেমন করে আপনার দর্শন লাভ করতে পারবো? আনসারীর এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।
অতঃপর যখন নবীজীর ইন্তেকাল হলো তখন আনসারীর ছেলে তাঁর নিকট সংবাদ নিয়ে যায়। তখন তিনি তাঁর এক বাগানে কর্মরত ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের খবর শুনে নবীজীর সত্যিকার আশেক আনসারী লোকটি আল্লাহর দরবারে দোয়া করে বসলেন। اَللّٰهُمَّ اَعْمِنِىْ حَتّٰى لَا اَرٰى شَيْئًا بَعْدَهٗ اِلٰى اَنْ اَلْقَاهُ [হে আল্লাহ আপনি আমার চক্ষুকে অন্ধ বানিয়ে দিন [পরকালে] তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্ব পর্যন্ত আমি যেন কাউকে দেখতে না পাই]। এই দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহর বান্দা আনসারী লোকটি স্বস্থানেই অন্ধ হয়ে পড়েন। তিনি নবীজীকে প্রাণাধিক ভালো বাসতেন, তাই আল্লাহ পাক এর বদলে বেহেশতে তাকে নবীজীর সাথী বানিয়েছেন।

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, নবী যুগের মুমিনগণ হুজুরে পাক ﷺ কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনাকে যা দেখার আমরা তো দুনিয়াতেই দেখে নিচ্ছি। কারণ পরকালে তো আপনি বহু উর্ধ্বে চলে যাবেন। তখন তো আমরা আর আপনার দেখা পাবো না। তাদের একথা শুনে হুজুর ﷺ ও চিন্তিত হলেন এবং তাঁরাও চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাদের এ চিন্তা দূরীকরণার্থে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। তত্বজ্ঞানী ওলামাগণ শানে নুযূলের এসব বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, তার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়াতটির অবতরণের প্রেক্ষাপট হওয়া আবশ্যক। আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করণ। সুতরাং আয়াতটি সকল মুকাল্লাফ বান্দাদের বেলায়ই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহর নিকট সে উঁচুস্তর ও সম্মানিত মাকাম পাবে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৭৬]

আল্লাহ রাসূলের অনুগতরা নবী-সিদ্দীকদের সঙ্গী হওয়ার মর্ম : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তারা পরকালে, বেহেশতে নবীগণ এবং সিদ্দীকগণের সঙ্গী হবে। একথার মর্ম এটা নয় যে, অনুগতরা ও নবী-সিদ্দীকগণ একই স্তরের জান্নাতে থাকবে। বরং এর মর্ম হলো, তারা সকলেই জান্নাতে থাকবে যদিও ভিন্ন ভিন্ন স্তরের হয়। তবে স্তর ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে তারা একে অন্যের সাথে দেখা- সাক্ষাৎ করতে পারবে। যখন ইচ্ছা করবে তখনই দর্শন ও সাক্ষাৎ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত সঙ্গী হওয়ার মর্ম।
-[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৭৭]

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র.) সুদীর্ঘ আলোচনার পর লিখেছেন, উল্লিখিত চারগুণে গুণান্বিত লোক ব্যতীত অন্য কেউই জান্নাতে প্রবেশ হবে না। হয়তো: নবুয়তের গুণে গুণান্বিত হয়ে নবী হতে হবে। এই গুণটা কারো ইচ্ছাধীন নয়। বরং আল্লাহর বিশেষ দান। নতুবা সিদ্দীকিয়্যাতের বিশেষণে বিশেষিত হয়ে সিদ্দীক হতে হবে। কিংবা শহীদ বা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
-[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ, ১৮০]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧١. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ اَىْ اِحْتَرِزُوْا مِنْهُ وَتَيَقَّظُوْا لَهُ فَانْفِرُوْا اِنْهَضُوْا اِلٰى قِتَالِهِ ثُبَاتٍ مُتَفَرِّقِيْنَ سَرِيَّةً بَعْدَ اُخْرٰى اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ ۔

৭১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য স্বীয় অস্ত্রধারণ কর, অর্থাৎ শত্রুর প্রতি সতর্কতা অবলম্বন কর এবং সজাগ দৃষ্টি রাখো। অতঃপর দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ক্ষুদ্র সেনাদল হিসাবে অথবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়।

٧٢. وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ لِيَتَاَخَّرَنَّ عَنِ الْقِتَالِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ الْمُنَافِقِ وَاَصْحَابِهِ وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَاللَّامُ فِى الْفِعْلِ لِلْقَسَمِ وَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ كَقَتْلٍ وَهَزِيْمَةٍ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيْدًا حَاضِرًا فَاُصَابَ ۔

৭২. এবং তোমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা যুদ্ধে বের হতে অবশ্যই বিলম্ব করে। যেমন মু'নাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীরা। তাকে বাহ্যিক হিসেবে মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। لَيُبَطِّئَنَّ ক্রিয়াটির মধ্যে لَام বর্ণটি কসমের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তোমাদের উপর কোনো বিপদ যেমন মৃত্যু ও পরাজয় যদি উপস্থিত হয় তবে সে বলে যে, আল্লাহপাক আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। যদি থাকতাম তবে আমার উপরও সেই বিপদ পৌঁছত।

٧٣. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ كَفَتْحٍ وَغَنِيْمَةٍ لَيَقُوْلَنَّ نَادِمًا كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ مَعْرِفَةٌ وَصَدَاقَةٌ وَهٰذَا رَاجِعٌ اِلٰى قَوْلِهِ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِعْتَرَضَ بِهِ بَيْنَ الْقَوْلِ وَمَقُوْلِهِ وَهُوَ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا اٰخُذُ حَظًّا وَافِرًا مِنَ الْغَنِيْمَةِ ۔

৭৩. আর যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ যেমন বিজয় ও গনিমতের মাল আসে, তখন তারা এমনভাবে লজ্জিত হয়ে বলতে শুরু করে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো মিত্রতা -তথা পরিচিতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্কই ছিল না। وَلَئِنْ -এর মধ্যে لَام বর্ণটি কসমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। كَاَنْ لَمْ كَاَنْ - مُخَفَّفَةٌ - مِنْ مُثَقَّلَةٍ টি كَان -এর تَكُنْ -এর ইসিম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كَاَنَّهُ। لَمْ تَكُنْ 'ইয়া ও তা -এর সাথে উভয় রকমই পঠিত হয়েছে। অর্থগত দিক দিয়ে كَاَنْ لَمْ تَكُنْ الخ বাক্যটি সম্পৃক্ত হয়েছে পূর্বতী বাক্য قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ الخ -এর সাথে। আর كَاَنْ لَمْ تَكُنْ الخ বাক্যটি قَول - (لَيَقُوْلَنَّ) ও مَقُوْلَه - (يَا لَيْتَنِىْ) -এর মধ্যে জুমলায়ে মুতারিজা হিসেবে এসেছে। সে বলে আহ! যদি তাদের সাথে থাকতাম তবে আমিও সে সফলতা লাভ করতাম। অর্থাৎ গনিমতের মালের বড় অংশ লাভ করতাম।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

حِذْر ও حَذَر اَثَر - اِثْر ও اَثَر - مِثْل - مَثَل -এর ন্যায়। حِذْر বা حَذَر -এর অর্থ হচ্ছে- সরঞ্জাম, আসবাব, সতর্কতা, সজাগ দৃষ্টি ও আশঙ্কা পূর্ণ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন- অস্ত্র ইত্যাদি। ইমাম ওয়াহেদী বলেছেন, এখানে حِذْر -এর দুটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। এক. অস্ত্র। তখন আয়াতের মর্ম হবে خُذُوْا سِلَاحَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অস্ত্র ধারণ কর এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। দুই. সতর্ক ও সচেতন থাকা। তখন মানে হবে اِحْذَرُوْا عَدُوَّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের শত্রুদের থেকে সতর্ক ও সচেতন থাকো। দ্বিতীয় অর্থেও অস্ত্র ধারণের কথা শামিল রাখে। ثُبَاتٍ - ثُبَةٌ -এর বহুবচন। ثُبَةٌ -এর অর্থ হলো বিক্ষিপ্ত দল, সৈন্যদল। আর جَمِيْعًا অর্থ مُجْتَمِعِيْنَ একত্রিতাবস্থায়, একত্রিত ভাবে, সম্মিলিতভাবে। ثُبَاتٍ ও جَمِيْعًا শব্দ দু'টি اِنْفِرُوْا থেকে حَال হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ الخ : আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের, অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয়াংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে এই যে, কোনো বিষয়ে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়। দ্বিতীয়ত বুঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিত ভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলত মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا অর্থাৎ হে নবী ﷺ! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোনো বিপদাপদই আসেনা, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের তকদির বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেননি।

আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৪৫৫-৫৬]

قَوْلُهُ وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ الخ : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, এখানেও মু'মিনদেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথচ এ প্রসঙ্গে যেসব গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তা মু'মিনদের গুণাবলি হতে পারে না।

১. কাজেই আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন যে, এতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু তারাও প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবি করেছিল, সেহেতু তাদেরকেও মু'মিনদেরই একটি দল বা জামাত বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, স্বজাতি, বংশ ও পরস্পর মিশ্রণের প্রেক্ষিতে মুনাফিকদেরকে মু'মিনদের পর্যায়ভুক্ত গণনা করা হয়েছে।
৩. আল্লাহপাক বাহ্যিকভাবে তাদেরকে মু'মিন ধার্য করেছেন। কেননা বাহ্যত তারা মু'মিনদের সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।
৪. তাদের দাবি ও ধারণাতে, তাদেরকে মু'মিনদের ভেতরে গণনা করে সম্বোধন করা হয়েছে, যদিও তারা মূলত মুনাফিক ছিল।

একদল মুফাসসির এখানে উল্লিখিত জিহাদে বিলম্বকারীগণ দ্বারা দুর্বল মু'মিনগণকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

-[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৮৪]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৭৪. قَالَ تَعَالَى فَلْيُقَاتِلْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ لِإِعْلَاءِ دِيْنِهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ يَبِيْعُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ يُسْتَشْهَدْ اَوْ يَغْلِبْ يَظْفِرْ بِعَدُوِّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ثَوَابًا جَزِيْلًا.

৭৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রি করে তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর রাহে তার দীনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে সে শহীদ হোক বা শত্রুর উপর জয়ী হোক আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব। তথা মহা প্রতিদান দেব।

৭৫. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ اَىْ لَا مَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْقِتَالِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِىْ تَخْلِيْصِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ حَبَسَهُمُ الْكُفَّارُ عَنِ الْهِجْرَةِ وَاٰذَوْهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) كُنْتُ اَنَا وَاُمِّىْ مِنْهُمْ. الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ دَاعِيْنَ يَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ مَكَّةَ الظَّالِمِ اَهْلُهَا بِالْكُفْرِ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيًّا يَتَوَلّٰى اُمُوْرَنَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا. يَمْنَعُنَا مِنْهُمْ وَقَدِ اسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُمْ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمُ الْخُرُوْجَ وَبَقِىَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ وَوَلّٰى ﷺ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ فَاَنْصَفَ مَظْلُوْمَهُمْ مِنْ ظَالِمِهِمْ.

৭৫. আর তোমাদের কি হলো যে, এখানে ইস্তেফহাম বা প্রশ্নবোধক শব্দটি শাসনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা আল্লাহর রাহে এবং পুরুষ-নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের মুক্তির জন্য কেন জিহাদ করো না? যাদেরকে কাফেরগণ হিজরত করা থেকে বিরত রেখেছে এবং কষ্ট পৌঁছিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এবং আমার মাতা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এই মক্কা জনপদ যার অধিবাসীগণ কুফরি করার কারণে অত্যাচারী তা থেকে আমাদিগকে অন্যত্র নিয়ে যাও। তোমার তরফ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও যে, আমাদের বিষয়াদির দায়িত্ব নেবে এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও যে তাদের থেকে আমাদের কে রক্ষা করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাদের অনেককে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ করে দিয়েছেন। আর কিছু লোক মক্কা বিজয় হওয়া পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করেছে। হুজুরে পাক ﷺ আত্তাব ইবনে উসাইদকে তাদের অভিভাবক নির্ধারণ করে দিলেন। যিনি মাজলুমদেরকে জালেমদের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে দিয়েছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

٧٦. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ الشَّيْطَانِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اَنْصَارَ دِيْنِهٖ تَغْلِبُوْهُمْ لِقُوَّتِكُمْ بِاللّٰهِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِيْفًا وَاهِيًا لَايُقَاوِمُ كَيْدَ اللّٰهِ بِالْكٰفِرِيْنَ.

৭৬. যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে। আর যারা কাফির তারা তাগুত বা শয়তানের পথে জিহাদ করে। অতএব, তেমরা শয়তানের বন্ধুদের তথা শয়তানের ধর্মের সহায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। খোদা প্রদত্ত শক্তির কারণে তোমরাই বিজয়ী থাকবে। নিশ্চয়ই মু'মিনদের বিরুদ্ধে শয়তানের চক্রান্তএকান্তই দুর্বল। কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর চক্রান্তের মোকাবিলা করতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

نُؤْتِيْهِ اَجْرًا ۔ وَمَنْ يُقَاتِلْ الخ শর্ত। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তার মুতা'আল্লিক আর اَلَّذِيْنَ الخ তার ফায়েল। فَلْيُقَاتِلْ ফে'ল عَظِيْمًا তার জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়ায়ে ইনশাইয়্যাহ হয়েছে।

-[তাফসীরে কাবীর, রুহুল মা'আনী ও হক্কানী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ : আলোচ্য আয়াতে জালিমদের জনপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কানগরী। হিজরতের পর মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানগণ বিশেষ করে বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও বাচ্চারা কাফেরদের জুলুম ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর দরবারে সাহায্যের দোয়া করতেছিল। আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন যে, তোমরা এসব মুসলমানদেরকে নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য কেন জিহাদ করছ না। এই আয়াতকে দলিল বানিয়ে ওলামাগণ বলেছেন, যে অঞ্চলে মুসলমানরা আবদ্ধ, তাদেরকে জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য অন্যান্য মুসলমানদের উপর জিহাদ করা ফরজ। এটা হচ্ছে জিহাদের দ্বিতীয় প্রকার। প্রথম প্রকার জিহাদ ছিল আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত তথা দীনের প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে।

قَوْلُهٗ اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الاية) : মু'মিন ও কাফের উভয়ই যুদ্ধ করে। তবে উভয়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরাট তফাত রয়েছে। মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে। আর কাফের কেবল দুনিয়ার স্বার্থ ও ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে লড়াই করে। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৬১]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٧٧. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ عَنْ قِتَالِ الْكُفَّارِ لَمَّا طَلَبُوْهُ بِمَكَّةَ لِاَذَى الْكُفَّارِ لَهُمْ وَهُمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ يَخَافُوْنَ النَّاسَ الْكُفَّارَ اَىْ عَذَابَهُمْ بِالْقَتْلِ كَخَشْيَةِ هِمْ عَذَابَ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً مِنْ خَشْيَتِهِمْ لَهُ وَنَصْبُ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ وَجَوَابُ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ اِذَا وَمَا بَعْدَهَا اَىْ فَاجَأَتْهُمُ الْخَشْيَةُ وَقَالُوْا جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا هَلَّا اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ لَهُمْ مَتَاعُ الدُّنْيَا مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا وَالْاِسْتِمْتَاعُ بِهَا قَلِيْلٌ اٰئِلٌ اِلَى الْفَنَاءِ وَالْاٰخِرَةُ اَىِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى عَذَابَ اللّٰهِ بِتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ وَلَا تُظْلَمُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تُنْقَصُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَتِيْلًا قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ فَجَاهِدُوْا .

৭৭. হে রাসূল ﷺ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি? যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত সংযত রাখ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে। যখন তারা মক্কার কাফেরদের যন্ত্রণার কারণে যুদ্ধ প্রার্থনা করেছিল। আর তারা ছিলেন একদল সাহাবা (রা.)। নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত দিতে থাক। অতঃপর যখন তাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হলো তখন তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে তথা কাফেরদের হত্যার শাস্তিকে ভয় করতে লাগল। যেমন– তারা আল্লাহকে তথা তাঁর আজাবকে ভয় করে। এমনকি তাঁর ভয়ের চেয়েও অধিক ভয় করতে লাগল। اَشَدَّ নসব বা যবরযুক্ত হয়েছে حَال হওয়ার প্রেক্ষিতে। لَمَّا -এর জবাব اِذَا ও তার পরবর্তী শব্দে বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ আচমকা তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি হয়ে গেল। আর তারা মৃত্যুর ভয়ে বলতে লাগল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরজ করলেন? আরো কিছু দিন আমাদেরকে কেন অবকাশ দিলেন না? হে রাসূল ﷺ! আপনি তাদেরকে বলেদিন যে, দুনিয়ার সামগ্রী অর্থাৎ দুনিয়ায় উপকৃত হওয়ার বস্তু বা উপকৃত হওয়াটা খুবই স্বল্প অর্থাৎ ধ্বংসের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। আর আখেরাত তথা জান্নাত তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর নাফরমানি বর্জন করে তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। আর তোমাদের আমলের ছওয়াব কমিয়ে একটি সূতা তথা খেজুর বীচের তুষ পরিমাণও তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ -এর মধ্যে হামযাটি اِسْتِفْهَام تَعَجُّبِى -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হে মোহাম্মদ ﷺ! লক্ষ্য করুন, আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি তারা কেমন করে জিহাদকে অপছন্দ করে অথচ ইতিপূর্বে তারা জিহাদ প্রার্থনা করেছিল এবং এর জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

وَنَصْبُ اَشَدَّ عَلَى الْحَالِ অর্থাৎ اَشَدَّ শব্দটি তারকীবে 'হাল' হওয়ার ভিত্তিতে যবরযুক্ত হয়েছে। বাক্যের রূপ হবে– يَخْشَوْنَ اَشَدَّ خَشْيَةً

মাফঊলে মুতলাক হওয়ার প্রেক্ষিতে ও মানসূব হতে পারে। তখন বাক্যের মূল রূপ হবে يَخْشَوْنَ النَّاسَ مِثْلَ خَشْيَةِ اللّٰهِ

اِذَا -এর اِذَا فَرِيْقٌ -এর জবাবের প্রতি لَمَّا -এর فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الخ অর্থাৎ قَوْلُهُ وَجَوَابُ لَمَّا دَلَّ عَلَيْهِ اِذَا وَمَا بَعْدَهَا ও তার পরবর্তী শব্দে ইঙ্গিত করেছে। শায়খ আহমদ সাবী (র.) হাশিয়ায়ে সাবীতে বলেছেন, এ রকম না বলে মুফাসসিরে আল্লাম যদি جَوَابُ لَمَّا اِذَا وَمَا بَعْدَهَا বলতেন তবে ভালো হতো।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দুটি উক্তি রয়েছে।

১. **প্রথম উক্তি :** আয়াতটি এক শ্রেণির দুর্বল মু'মিনদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাফসীরবিদ কালবী (র.) বলেন, আয়াতটি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, কুদামা ইবনে মাজউন ও সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) -এর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা মদিনায় হিজরতের পূর্বে নবীয়ে করীম ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। মুশরিকদের তরফ থেকে অনেক যন্ত্রণা সয়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন জানালেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদেরকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান করুন। তিনি তাদেরকে জবাবে বললেন, তোমরা তোমাদের হাতকে সংযত রাখ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে। বরং তোমরা নামাজ আদায় ও জাকাত প্রদানে নিয়োজিত থাক। কারণ আমাকে এখনো আল্লাহর তরফ থেকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। অতঃপর হিজরতের পর বদরে যখন তাদের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হলো, তখন তাঁরা এ সংখ্যা লঘিষ্ঠ ও দুর্বলাবস্থায় যুদ্ধ করাটাকে অপছন্দ করল। তাঁদের এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন। এ উক্তি বা মত পোষণকারীগণ তাঁদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে বলেন যে, যাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ একথা বলতে বাধ্য হলেন যে, তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, তারা অবশ্যই যুদ্ধ বা জিহাদের প্রতি আগ্রহী ছিল। আর জিহাদের প্রতি আগ্রহী তো কেবল মু'মিনগণই হতে পারে, মুনাফিকরা নয়। সুতরাং এতে প্রমাণিত হলো যে,আয়াতটি মু'মিনদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। তবে একথার জবাবে বলা যেতে পারে যে, মুনাফিকরা নিজেদেরকে মু'মিন বলে প্রকাশ করত, আর একথা বলত যে, আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে চাই। অতঃপর আল্লাহ যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দিলেন, তখন তারা জিহাদের প্রতি অনীহা প্রকাশ করল, এবং তাদের বক্তব্যের বিপরীত আচরণ তাদের থেকে প্রকাশ পেল।

২. **দ্বিতীয় উক্তি :** এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি হলো এই যে, আয়াতটি নাজিল হয়েছে মুনাফিকদের সম্বন্ধে। যারা এ উক্তির পক্ষে রয়েছেন তারা বলেন, আলোচ্য আয়াতটি এমন কিছু বিষয়কে শামিল রেখেছে যা কেবল মু'নাফিকদের জন্যই খাছ। যেমন বলা হয়েছে– يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً [তারা লোকদেরকে এরকম ভাবে ভয় করে, যেরূপ আল্লাহকে ভয় করা উচিত ছিল বা তার চেয়ে আরো অধিক পরিমাণে লোকদেরকে তারা ভয় করে চলে।] আর মানুষকে এরূপ ভয় করা তো মুনাফিকদের জন্যই শোভা পায়, মু'মিনদের জন্য নয়। কেননা কোনো মু'মিনের জন্য আল্লাহর চেয়ে অধিক অন্য কাউকে ভয় করা জায়েজ হতে পারে না। এছাড়া আল্লাহ পাক তাদের উক্তি নকল করে বলেছেন যে, তারা একথা বলেছিল رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি আপনি কেন লড়াই ফরজ করেছেন? এতে করে তারা আল্লাহর উপর অভিযোগ করল। আর আল্লাহর উপর অভিযোগ আপত্তি করা কেবলমাত্র কাফের মুনাফিকদের তরফ থেকেই হতে পারে, মু'মিনদের পক্ষ থেকে নয়। তৃতীয় আল্লাহ পাক রাসূল ﷺ কে জানিয়ে দিলেন যে, مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ দুনিয়ার সামগ্রী খুবই স্বল্প, আর আখেরাত তাদের জন্য উত্তর যারা আল্লাহকে ভয় করে। আর এরকম কথাতো তাদেরকেই বলা হয়ে থাকে, যাদের আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার প্রতি আসক্তি অধিক। আর এটা যে মুনাফিকদের স্বভাব তা তো বলাই বাহুল্য।

তবে প্রথম উক্তিকারীগণ এসব কথার জবাব এভাবে দিয়ে থাকেন যে, জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রতি অনীহাটা মূলত: মানুষের স্বভাবগত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

আর আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত ভয় দ্বারা সেই স্বভাবগত ভয়ই উদ্দেশ্য। আর তাদের উক্তি, হে প্রভু! আমাদের উপর আপনি কেন যুদ্ধ ফরজ করলেন? মূলত: অভিযোগ ও আপত্তিমূলক নয়; বরং যুদ্ধের কষ্ট লাঘব আকাঙ্ক্ষা স্বরূপ ছিল। আর দুনিয়ার সামগ্রী স্বল্প আর আখেরাত খোদাভীরুদের জন্য উত্তম, একথাটির অস্বীকার কারী ছিল না। বরং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করার জন্য আল্লাহপাক তাদেরকে একথাটি শুনিয়েছেন। যাতে একথা শুনে তাদের অন্তর থেকে যুদ্ধের অনীহা ও পার্থিব জীবনের প্রীতি বিদূরিত হয়ে যায় এবং নির্ভিক হৃদয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই হলো আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দ্বিবিধ উক্তি। তবে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন, মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হওয়ার উক্তিটা-ই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা পরবর্তী এক আয়াতে উল্লিখিত– وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ উক্তিটা নিঃসন্দেহে মুনাফিকদেরই। -[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ১৯০ - ৯১]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৭৮. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ حُصُونٍ مُشَيَّدَةٍ مُرْتَفِعَةٍ فَلَا تَخْشَوُا الْقِتَالَ خَوْفَ الْمَوْتِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ أَيِ الْيَهُودَ حَسَنَةٌ خِصْبٌ وَسَعَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جَدْبٌ وَبَلَاءٌ كَمَا حَصَلَ لَهُمْ عِنْدَ قُدُومِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ يَا مُحَمَّدُ أَيْ بِشُؤْمِكَ قُلْ لَهُمْ كُلٌّ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مِنْ قِبَلِهِ فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ أَيْ لَا يُقَارِبُونَ أَنْ يَفْهَمُوا حَدِيثًا ـ يُلْقَى إِلَيْهِمْ وَمَا اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ مِنْ فَرْطِ جَهْلِهِمْ وَنَفْيُ مُقَارَبَةِ الْفِعْلِ أَشَدُّ مِنْ نَفْيِهِ ـ

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে অবশ্যই পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় সুউচ্চ দুর্গের মধ্যে থাক। সুতরাং মৃত্যুর আশঙ্কায় **জিহাদকে** ভয় করো না। যদি তাদের তথা **ইহুদিদের** কোনো কল্যাণ তথা সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য **সাধিত হয় তখন** তারা বলে, এতো আল্লাহর তরফ **থেকে। আর যদি** কোনো অকল্যাণ হয়, তথা কোনো **দুর্ভিক্ষ** ও মহামারি দেখা দেয়, যেরূপ তাদের **দেখা দিয়েছিল** নবী করীম ﷺ-এর মদিনায় সুভাগমন কালে। **তখন** তারা বলে, এতো তোমার পক্ষ থেকে হে **মুহাম্মদ** ﷺ ! অর্থাৎ তোমার দুর্ভাগ্যের কারণেই এসেছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, ভালোমন্দ এসবই আল্লাহর তরফ থেকে। তবে এ জাতির কি হলো যে, তারা কথা বুঝার নিকটবর্তীও হয় না যে কথা তাদেরকে বলা হয়। مَا দ্বারা ইস্তেফহাম বা প্রশ্ন করা হয়েছে। তাদের মূর্খতার আধিক্য বুঝাতে। আসর বোধের অস্বীকার করার তুলনায় বোধের নিকটবর্তীতার অস্বীকার করাটা কঠোরতর।

৭৯. مَا أَصَابَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مِنْ حَسَنَةٍ خَيْرٍ فَمِنَ اللّٰهِ أَتَتْكَ فَضْلًا مِنْهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ بَلِيَّةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ أَتَتْكَ حَيْثُ ارْتَكَبْتَ مَا يَسْتَوْجِبُهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَأَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ رَسُولًا حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ـ عَلٰى رِسَالَتِكَ ـ

৭৯. হে মানবমণ্ডলী! যা কিছু কল্যাণকর হয় তা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়। তথা তার অনুগ্রহেই হয় আর যা কিছু অকল্যাণকর হয় বিপদ-বালা আসে তা তোমারই কারণে হয়, বিপদ-বালার কারণ গুনাহে লিপ্ত হওয়াতেই আসে। হে মুহাম্মদ ﷺ ! আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। رَسُولًا শব্দটি তারকীবে حَال مُؤَكِّدَه হয়েছে। এবং আপনার রিসালাতের উপর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

৮০. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى أَعْرَضَ عَنْ طَاعَتِهِ فَلَا يُهِمَّنَّكَ فَمَا أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا حَافِظًا لِأَعْمَالِهِمْ بَلْ نَذِيرًا وَإِلَيْنَا أَمْرُهُمْ فَنُجَازِيهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ ـ

৮০. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করল, সে বস্তুত আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হলো তাতে আপনার চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ আমি আপনাকে তাদের আমালের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি। বরং ভীতি প্রদর্শনকারী পয়গাম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর তাদের মু'আমালা আমার দিকেই ফিরে আসবে। তখন আমি তাদেরকে প্রতিদান দেবো। এই হুকুমটা জিহাদের হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে প্রযোজ্য ছিল।

http://islamiboi.wordpress.com

٨١. وَيَقُولُونَ اَيِ الْمُنَافِقُونَ إِذَا جَاءُوكَ اَمْرُنَا طَاعَةٌ لَكَ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الطَّاءِ وَتَرْكِهِ اَيْ اَضْمَرَتْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ لَكَ فِي حُضُورِكَ مِنَ الطَّاعَةِ اَيْ عِصْيَانَكَ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ يَأْمُرُ بِكَتْبِ مَا يُبَيِّتُونَ فِي صَحَائِفِهِمْ لِيُجَازُوا عَلَيْهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بِالصَّفْحِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ثِقْ بِهِ فَإِنَّهُ كَافِيكَ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا مُفَوَّضًا اِلَيْهِ.

৮১. আর তারা তথা মুনাফিকরা যখন আপনার কাছে আসে তখন বলে যে, আমাদের কাজ হচ্ছে আপনার আনুগত্য করা। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলে, তাদের একদল রাতে ঐ কথার বিপরীত বলে, যা আপনার সামনে আনুগত্যের জন্য বলেছিল। অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধাচরণের জন্য পরামর্শ করে। (بَيَّتَ طَّائِفَةٌ) -এর মধ্যে 'তা'কে 'ত্বোয়া'র মধ্যে ইদগাম করেও পঠিত হয়েছে। এবং ইদগাম বিহীনও পাঠ করা হয়েছে। এবং আল্লাহ ত'আলা তাদের পরামর্শকে তাদের আমলনামায় লিখে রাখছেন তথা লিখে রাখতে নির্দেশ দিচ্ছেন, যাতে তারা এর উপর প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। অতএব, ক্ষমার সাথে আপনি তাদের আচরণ উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন, কেননা তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। বস্তুত আল্লাহই কার্য সম্পাদনকারী হিসেবে যথেষ্ট।

٨٢. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ يَتَأَمَّلُونَ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدِيعَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا تَنَاقُضًا فِي مَعَانِيهِ وَتَبَايُنًا فِي نَظْمِهِ.

৮২. তারা কি কুরআনের মধ্যে এবং তার অভিনব অর্থের মধ্যে চিন্তা করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে হতো, তবে তারা এতে অবশ্যই অনেক বৈপরীত্য তথা তার শব্দে ও অর্থে অনেক গরমিল পেতো।

তাহকীক ও তারকীব

بُرُوجٌ . بُرْجٌ -এর বহুবচন। بُرْجٌ অর্থ- দুর্গ, কেল্লা। مُّشَيَّدَةٌ সুউচ্চ। ইমাম যাজ্জাজ এ শব্দটির অর্থ এরূপই বলেছেন। ইকরামা বলেন, এর অর্থ হলো مُطَيَّلَةٌ بِالشِّيْدِ চুনা দ্বারা প্রলেপযুক্ত, মজবুত। ইমাম মুজাহিদ (র.) مُشَيِّدَةٌ পাঠ করেছেন। যেরূপ قَصْرٌ مُّشَيَّدٌ -এর মধ্যে বলা হয়েছে। আর আবূ নাঈম বিন মাইসারা مُشَيِّدَةٌ ইয়া বর্ণের যেরের সহিত পাঠ করেছেন।

بَيَّتَ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ আল্লামা সুয়ূতী (র.) -এর মর্ম বর্ণনা করেছেন এই যে, মুনাফিকরা যখন হুজুরে পাক ﷺ -এর নিকট থেকে বাইরে আসত, তখন তারা হুজুর ﷺ -এর বাণীর বিপরীত কথা অন্তরে পোষণ করে রাখতো। অথচ এ মর্মটা গ্রহণ করা ঠিক নয়। কেননা হুজুর ﷺ -এর বাণীর বিপরীত কথা তো তাদের দিলে তখনও পোষণ করে রাখতো যখন

http://islamiboi.wordpress.com

তাঁরা তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকতো। এ জন্যই মুনাফিকরা মজলিসের মধ্যেই سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا বলে ফেলতো। যদি মুফাসসিরে আল্লাম بَيَّتَ -এর ব্যাখ্যা تَدْبِيْرُ الْاَمْرِ لَيْلًا [রাতের ষড়যন্ত্র] দ্বারা করতেন তবে অধিক ভালো হতো। কেননা মুনাফিকরা রাতে হুজুর ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে থাকতো। -[জামালাইন, সাবী, রুহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মুনাফিকরা ওহুদ যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিল যে, যেভাবে আমরা রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করে এসেছি। তারাও যদি সেভাবে আমাদের সঙ্গে চলে আসতো, তবে মৃত্যু মুখে পতিত হতো না। তখন আল্লাহপাক আলোচ্য আয়াতটি নাজিল করেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, তোমরা যত সুরক্ষিত দুর্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো না কেন, মৃত্যু তোমাদের অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। এ পৃথিবীতে যার আগমন হয়েছে তাকে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে। -[নূরুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ১৩৫]

وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ الخ -**আয়াতের শানে নুযূল :** রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন ইহুদি ও মুনাফিকরা বলল যে, এই ব্যক্তি [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীরা যখন আমাদের এখানে [মদিনায়] এসেছে তখন থেকে আমাদের ক্ষেত-খামারে এবং ফলমূলে শুধু ক্ষতিই হচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭৩]

ইরশাদ হয়েছে, যদি এদের কোনো প্রকার কল্যাণ লাভ হয় তবে তারা বলে, এতো আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ মেহেরবানি। পক্ষান্তরে যখন তাদের কোনো বিপদ হয় তখন তারা বলে, এই অবস্থাতো শুধু তোমার কারণে। আপনি বলে দিন, ভালোমন্দ সবকিছুই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ الخ -**আয়াতের শানে নুযূল :** আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহরই অনুগত হলো। আর যে আমার প্রতি মহব্বত রাখলো সে নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের প্রতি মহব্বত রাখলো। এই কথা শুনে কতিপয় মুনাফিক বলতে লাগলো খ্রিস্টানরা যেভাবে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ.) কে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছিল, মনে হয় ইনিও আমাদের কাছ থেকে তাই চান। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭৬]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨٣. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ عَنْ سَرَايَا النَّبِيِّ ﷺ مِمَّا حَصَلَ لَهُمْ مِّنَ الْأَمْنِ بِالنَّصْرِ أَوِ الْخَوْفِ بِالْهَزِيْمَةِ أَذَاعُوْا بِهِ أَفْشَوْهُ نَزَلَ فِيْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ أَوْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ فَتَضْعَفُ قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَتَأَذَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ رَدُّوْهُ اَيِ الْخَبَرَ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإِلٰى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اَيْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ اَكَابِرِ الصَّحَابَةِ اَيْ لَوْ سَكَتُوْا عَنْهُ حَتّٰى يُخْبَرُوْا بِهِ لَعَلِمَهُ هَلْ هُوَ مِمَّا يَنْبَغِيْ اَنْ يُذَاعَ اَوْلَا الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ يَتَّبِعُوْنَهُ وَيَطْلُبُوْنَ عِلْمَهُ وَهُمُ الْمُذِيْعُوْنَ مِنْهُمْ مِنَ الرَّسُوْلِ وَأُولِي الْأَمْرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ بِالْقُرْاٰنِ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ فِيْمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ إِلَّا قَلِيْلًا ـ

৮৩. আর যখন তাদের নিকট নবী করীম ﷺ-এর সৈন্যদলের কোনো শান্তির সাহায্যের বা ভয়ের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছে তখন তারা তা খুব প্রচার করে। আয়াতটি নাজিল হয়েছে একদল মুনাফিক সম্পর্কে অথবা দুর্বল মুমিনদের সম্পর্কে যারা এরূপ করতো। এতে মুমিনদের অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি হতো, ফলে নবী করীম ﷺ কষ্ট অনুভব করতেন। আর যদি তারা এ সংবাদ রাসূল ﷺ পর্যন্ত বা নিজেদের শাসক তথা বুজুর্গ সাহাবীদের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিত অর্থাৎ তাদেরকে সংবাদ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যদি তারা নীরবতা অবলম্বন করতো। তবে তাদের তথ্য সন্ধানীরা তা অনুসন্ধান করে দেখত রাসূল ﷺ ও বুজুর্গ সাহাবাদের থেকে তা প্রচার করা যায় কিনা। আর সেই তথ্য সন্ধানীরা হচ্ছে মুনাফিক প্রচারকগণ। যদি ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ দান ও কুরআনের মাধ্যমে অনুগ্রহ না হতো, তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই নির্লজ্জ কাজে শয়তানের হুকুমের অনুসরণ করতে।

٨٤. فَقَاتِلْ يَا مُحَمَّدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ فَلَا تَهْتَمَّ بِتَخَلُّفِهِمْ عَنْكَ اَلْمَعْنٰى قَاتِلْ وَلَوْ وَحْدَكَ فَإِنَّكَ مَوْعُوْدٌ بِالنَّصْرِ ـ

৮৪. অতএব, হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহর রাহে জিহাদ করুন। আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের জিম্মাদার নন। সুতরাং তারা আপনার থেকে পিছনে রয়ে যাওয়ার কারণে চিন্তিত হবেন না। আয়াতের মর্ম হলো আপনি একা হলেও জিহাদ করতে থাকুন। কেননা আপনাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَثَّهُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَرَغِّبْهُمْ فِيْهِ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ حَرْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا مِنْهُمْ وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا تَعْذِيْبًا مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَخْرُجَنَّ وَلَوْ وَحْدِىْ فَخَرَجَ بِسَبْعِيْنَ رَاكِبًا اِلٰى بَدْرِ الصُّغْرٰى فَكَفَّ اللّٰهُ بَأْسَ الْكُفَّارِ بِاِلْقَاءِ الرُّعْبِ فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَمَنْعِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ الْخُرُوْجِ كَمَا تَقَدَّمَ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ ـ

আর আপনি মু'মিনদেরকে জিহাদের উপর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং আল্লাহ তা'আলা জিহাদের ব্যাপারে তাদের চেয়ে অত্যন্ত কঠিন ও শাস্তিদানে অতিশয় কঠোর। আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবীয়ে করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কেবল একা হলেও জিহাদে বের হয়ে যাবো। অতঃপর তিনি সত্তরজন আরোহীদেরকে নিয়ে বদরে সুগরার দিকে বের হয়ে পড়েন। ফলে আল্লাহপাক কাফেরদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে এবং আবূ সুফিয়ানকে যুদ্ধে বের হওয়া থেকে বিরত রেখে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। যেরূপ এর আলোচনা সূরা আলে-ইমরানে চলে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا جَاۤءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ (الاية) -আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। তাঁরা দুশমনের মোকাবিলা করতো। কোথাও তাঁরা বিজয়ী হতেন, আবার কোথাও পরাজিত। কিন্তু মুনাফিকরা সর্বদা পূর্বাহ্ন খবর সংগ্রহের চেষ্টা করতো। এবং খবর পাওয়া মাত্রই প্রিয়নবী ﷺ -এর তরফ থেকে ঘোষণার পূর্বেই তারা সে খবর প্রচার আরম্ভ করে দিত। যদি পরাজয়ের খবর হতো তবে মুনাফিকরা তা ফলাও করে প্রচার করতো। এবং দুর্বল মনা মুসলমানদেরকে আরো দুর্বল করার চেষ্টা করতো। এতে নতুন-নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতো। আর এসব খবরের কারণে দুশমনদের উপকৃত হওয়ার সুযোগ থাকতো। তখন আল্লাহপাক উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল করেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, কিছু দুর্বল রায়ের মুসলমানগণকে যখন কোনো সাময়িক দলের ভালো-মন্দ খবর পৌছতো অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে জয়ের ওয়াদা বা ভয়ের কথা প্রকাশ করতেন, তখন এই দুর্বল রায়ের লোকেরা তা প্রচার করে দিতো। আর এ প্রচারের ফলে কাজ নষ্ট হয়ে যেত। শত্রুদের যদি নিরাপত্তার সংবাদ পৌছতো, তবে তারা নিজেদের সংরক্ষণের চেষ্টা করতো। আর যদি ভয়ের খবর পৌছতো তাহলে যুদ্ধ, ঝগড়া ও ফ্যাসাদের দিকে এগিয়ে আসতো। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৭৮]

হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এই আয়াতের শানে নুযূলের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) -এর হাদীসটি উল্লেখ করা ভালো মনে হচ্ছে। আর তা হলো এই যে, হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে এ খবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্নীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) এ খবর শুনে ঘর থেকে মসজিদে নববীর দিকে এলেন। যখন মসজিদের দ্বারে পৌছলেন তখন জানতে পারলেন যে, মসজিদেও এই কথাটির চর্চা হচ্ছে। এটা দেখে তিনি ভাবলেন এ খবরটা যাচাই করা উচিত। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আপনি কি আপনার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন? হুজুর ﷺ বললেন, না। হযরত ওমর বলেন, আমি একথা যাচাই করে মসজিদে গেলাম। আর দরজায় দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দেননি। তোমরা যা বলছ তা ভুল। তখন এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৬৮]

উড়োকথা প্রচার করা মারাত্মক গুনাহ ও ফেতনার কারণ : আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, লোক মুখে শ্রুত উড়োকথা যাচাই বাছাই না করেই বর্ণনা করা ঠিক নয়। যেমন- রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন- كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে জনশ্রুত কথা তদন্ত ছাড়াই বলে ফেলে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨٥. مَنْ يَّشْفَعْ بَيْنَ النَّاسِ شَفَاعَةً حَسَنَةً مُوَافِقَةً لِلشَّرْعِ يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِنَ الْاَجْرِ مِّنْهَا بِسَبَبِهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً مُخَالِفَةً لَهُ يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ نَصِيْبٌ مِنَ الْوِزْرِ مِّنْهَا بِسَبَبِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا مُقْتَدِرًا فَيُجَازِىْ كُلَّ اَحَدٍ بِمَا عَمِلَ .

৮৫. আর যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে শরিয়ত মোতাবেক সৎকাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, সে তার কারণে ছওয়াবের একটি অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি শরিয়ত বিরোধী মন্দ কোনো কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে তার কারণে গুনাহের বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। সুতরাং প্রত্যেককেই তিনি আমলের প্রতিদান দিবেন।

٨٦. وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ اَىْ قِيْلَ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَحَيُّوْا الْمُحَيِّىَ بِاَحْسَنَ مِنْهَا بِاَنْ تَقُوْلُوْا لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَوْ رُدُّوْهَا بِاَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَىِ الْوَاجِبُ اَحَدُهُمَا وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا مُحَاسِبًا فَيُجَازِىْ عَلَيْهِ وَمِنْهُ رَدُّ السَّلَامِ وَخَصَّتِ السُّنَّةُ الْكَافِرَ وَالْمُبْتَدِعَ وَالْفَاسِقَ الْمُسْلِمَ عَلٰى قَاضِى الْحَاجَةِ وَمَنْ فِى الْحَمَّامِ وَالْاٰكِلِ فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ بَلْ يُكْرَهُ فِىْ غَيْرِ الْاَخِيْرِ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ .

৮৬. আর যখন তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয়। যেমন– কেউ তোমাদেরকে বলল, সালামুন আলাইকুম, তখন তোমরা সালামকারীকে তার চেয়েও উত্তম কথায় জবাব দাও।

যেমন তোমরা তাকে বললে, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অথবা অনুরূপ কথাই বলে দাও। যেমন– তোমরা তাকে অনুরূপ কথাই বলে দিলে যা সে বলেছে। অর্থাৎ, দুয়ের যে কোনো একটা বলা ওয়াজিব, তবে প্রথমটা উত্তম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে হিসেব-নিকাশ গ্রহণকারী। সুতরাং তিনি এরই ভিত্তিতে প্রতিদান দেবেন। আর সালামের জবাব দেওয়া এরই অংশবিশেষ। তবে কাফের, বেদআতী, ফাসেক, শৌচকার্যরত মুসলিম, বাথরুমে প্রবেশিত ব্যক্তি এবং ভোজনরত ব্যক্তিকে হাদীস দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের উপর সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে না। বরং শেষোক্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকিদের উপর সালাম করা মাকরূহ হবে। আর কাফেরের সালামের জবাবে 'ওয়া আলাইকা' বলা যাবে।

٨٧. اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاللّٰهِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ مِنْ قُبُوْرِكُمْ اِلٰى فِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ . وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا قَوْلًا .

৮৭. আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে কবর থেকে সমবেত করবেন কিয়ামতের দিন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে কথাবার্তায় অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? কেউই নয়।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا (الاية) **সালাম ও ইসলাম :** এ আয়াতে আল্লাহপাক সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تَحِيَّة শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি : تَحِيَّة -এর শাব্দিক অর্থ কাউকে حَيَّاكَ اللّٰهُ [আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন] বলা। ইসলাম পূর্বকালে আরবরা পরস্পরে সাক্ষাত কালে حَيَّاكَ اللّٰهُ কিংবা اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا কিংবা اَنْعِمْ صَبَاحًا ইত্যাদি সম্ভাষণে সালাম করতো। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার রীতির প্রচলন করেছে। -এর অর্থ তুমি সর্ব প্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, সালাম শব্দটি আল্লাহ তা'আলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর অর্থ এই যে, اَللّٰهُ رَقِيْبٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষক।

জগতের অন্য যে কোনো সভ্য জাতি পরস্পরে সাক্ষাতকালে তারা যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশক বাক্য ব্যবহার করে থাকে, তাদের সেই সব বাক্যের তুলনায় ইসলামের সালামের বাক্য হাজারো গুণে উত্তম। কেননা তাদের সেই বাক্যে কেবল প্রীতি লেন-দেন হয়। আর ইসলামের সালাম ও এর জওয়াবে প্রীতি বিনিময়ের সাথে সাথে এর মাধ্যমে দোয়াও করা হয়।

ইরশাদ হয়েছে, فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا অর্থাৎ, সালামকারী সালামের মাধ্যমে যেরূপ শব্দ ব্যবহার করেছে তার চেয়ে উত্তমরূপে জবাব দাও। অথবা তার শব্দই পুনঃরায় বলে দাও। সুতরাং কেবল সালাম শব্দের জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে, আর তার উর্ধ্বে রহমত ও বরকত শব্দ যোগ করে দেওয়াটা মোস্তাহাব হবে।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলল। তিনি তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সে দশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর লোকটি বসে গেল। অতঃপর আরেকজন ব্যক্তি এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ হুজুর ﷺ তাঁর জবাব দিয়ে বললেন, সে বিশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে। এরপর সে বসে গেল। তারপর আরেকজন ব্যক্তি এসে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলল। হুজুর তাঁর জবাব দিয়ে বললেন, সে ত্রিশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে। তারপর সেও বসে গেল, হযরত মা'আজ ইবনে আনাসের বর্ণনায় এসছে যে, চতুর্থ একজন ব্যক্তি এসে বলল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ وَمَغْفِرَتُهٗ তিনি তাঁরও জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন, সে চল্লিশটি ছওয়াব প্রাপ্ত হয়েছে।

মাসআলা : সালামের জওয়াব দেওয়া ফরজে কেফায়া। কোনো জামাতের যে কোনো একজনে জওয়াব দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে। ফতোয়ায়ে সিরাজিয়াতে অনুরূপ বলা হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কোনো একদল মানুষ অন্যদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে গেলে তাদের একজনের সালাম করে নেওয়াই যথেষ্ট। তেমনিভাবে বসে আছে এরকম একদল লোকদের মধ্য থেকে একজনে জবাব দিলেই সবার পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। তবে বসা লোকদের মধ্য থেকে যদি কাউকে বিশেষভাবে নাম ধরে আগন্তুক ব্যক্তি সালাম করে, তবে কেবল তার উপরই জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে। অন্য কোনো ব্যক্তি দিলে যথেষ্ট হবে না। তেমনিভাবে যদি কোনো নির্দিষ্ট জামাত লোকদেরকে সালাম করার পর বাইরের কোনো ব্যক্তি সালামের জবাব দিয়ে দেয় তবে যথেষ্ট হবে না। [বয়ানুল আহকাম]

মাসআলা : আগে সালাম করা সুন্নত। আর তাই উত্তম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পরস্পরে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দিব, যা দ্বারা তোমাদের পরস্পরে মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। তা হচ্ছে পরস্পর সালামের প্রসার ঘটানো। [মুসলিম]

মাসআলা : আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে, পদব্রজে গমনকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠরা সংখ্যা গরিষ্ঠদেরকে সালাম করবে। আর বড় ছোটকে সালাম করবে।

http://islamiboi.wordpress.com

মাসআলা : বালক এবং মহিলাদেরকেও সালাম করা যাবে। কেননা হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেছেন এবং তাদেরকে সালাম করেছেন। -[বুখারী, মুসলিম]

হযরত জারীর (রা.) -এর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করা কালে তাদেরকে সালাম করেছেন। -[আহমদ]

ফতোয়ায়ে গারায়েব -এ রয়েছে, বেগানাহ যুবতী মহিলাকে এবং আমরদ [দাড়ি মোঁচ গজায়নি এমন বালক] কে সালাম করা মাকরূহ। তারা যদি সালাম করে তবে জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়। হযরত কাজী ছানা উল্লাহ পানিপতী (র.) বলেন, আমি বলি, এ হুকুমটি হলো ফেতনার আশঙ্কার মুহূর্তে।

মাসআলা : পরিবারের লোক ও তার আপন গৃহে দাখিল হলে গৃহবাসীদেরকে সালাম করবে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি তোমার গৃহে প্রবেশ হলে গৃহবাসীদেরকে সালাম করবে। তা তোমার জন্য এবং তোমার ঘর ওয়ালাদের জন্য বরকতের কারণ হবে। -[তিরমিযী]

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি যদি শূন্য গৃহে প্রবেশ করে তবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলে সালাম করবে। ফেরেশতাগণ এ সালামের জবাব দেবে। শিরআহ নামক গ্রন্থে এরূপই বলা হয়েছে।

মাসআলা : কথা বলার পূর্বে সালাম করা সুন্নত। হযরত জাবের (রা.) -এর সূত্রে বর্ণিত এক মারফূ' হাদীসে এসেছে, اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ অর্থাৎ, কথা বলার পূর্বে সালাম করা বিধেয়। -[তিরমিযী]

মাসআলা : মুসলিম ভাইকে প্রতিবার সাক্ষাতে সালাম করা সুন্নত। সালাম করার পর যদি বৃক্ষ বা দেয়াল আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে নতুন করে আবার সালাম করতে হবে। আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসে এরূপই এসেছে।

মাসআলা : বিদায় নেওয়ার সময় সালাম করা সুন্নত।

মাসআলা : যদি কোনো ব্যক্তি কারো পক্ষ হতে সালাম পৌছায় তবে সালাম প্রাপ্ত ব্যক্তি- وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ বলে জবাব দিবে।

মাসআলা : অমুসলিমদেরকে আগে বেড়ে সালাম করা জায়েজ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে অগ্রগামী হয়ে সালাম করবে না। রাস্তায় পাওয়া গেলে তাদেরকে সংকীর্ণ রাস্তায় চলতে বাধ্য করবে। [অর্থাৎ তোমরা নিজেরা প্রশস্ত রাস্তায় চলবে] । -[মুসলিম]

কোনো দলের মধ্যে যদি মুসলমান, প্রতিমাপূজারী, মুশরিক এবং ইহুদি পাওয়া যায়, তবে তাদেরকে সালাম করা যাবে। কিন্তু সালাম করার মূহূর্তে মুসলমানকে সালাম করার নিয়ত রাখতে হবে। যাতে করে অমুসলিমকে আগে বেড়ে সালাম করা না হয়।

মাসআলা : জিম্মি কাফেরদের সালামের জবাব দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কেবলমাত্র وَعَلَيْكَ বলে জবাব দিবে। এর চেয়ে অধিক বলা যাবে না। কেননা বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে যখন আহলে কিতাবগণ সালাম করে, তখন তোমরা وَعَلَيْكُمْ বলো।

মাসআলা : নামাজ এবং খোতবার ভিতর সালামের জবাব দেওয়া জায়েজ নয়। দিলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। উচ্চকণ্ঠে তেলাওয়াতে কুরআনের সময়, হাদীস বর্ণনা করার সময়, ইলমি আলোচনার সময় এবং আজান ও ইকামতের সময় সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেবল জায়েজ।

মাসআলা : সালামের পূর্ণতা হচ্ছে মুসাফাহা ও মু'আনাকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পরস্পরের সালামের পরিপূরক হচ্ছে মুসাফাহা। -[আহমদ, তিরমিযী]

শরহুস সুন্নাহ নামক গ্রন্থে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইস্তেকবাল করেছেন এবং আমার সঙ্গে মু'আনাকা করেছেন। -[তাফসীরে মাজহারী খ. ৩, পৃ. ১৮২- ৮৭]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٨٨. وَلَمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اُحُدٍ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِمْ فَقَالَ فَرِيْقٌ اُقْتُلْهُمْ وَقَالَ فَرِيْقٌ لَا فَنَزَلَ فَمَالَكُمْ اَىْ مَا شَانُكُمْ صِرْتُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ فِرْقَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ رَدَّهُمْ بِمَا كَسَبُوْا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِى اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ اَىْ تَعُدُّوْهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُهْتَدِيْنَ وَالْاِسْتِفْهَامُ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لِلْاِنْكَارِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَى الْهُدٰى .

৮৮. আর মুনাফিক লোকেরা যখন ওহুদ থেকে ফেরত আসল, তখন তাদের সম্পর্কে লোকেরা [সাহাবা] মতবিরোধ করে নিল। একদল বলল, তাদেরকে হত্যা করে ফেল, আর অন্যদল বলল, তাদেরকে হত্যা করো না। ফলে সামনের আয়াতটি নাজিল হলো। তোমাদের কি হলো অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা কি হলো যে, তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দু-দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাদের কৃত কুফর ও নাফরমানির দরুন। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেছেন? অর্থাৎ অথচ তোমরা তাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত মনে কর। ইস্তেফহাম উভয়স্থানেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য হেদায়েতের কোনো রাস্তা পাবে না।

٨٩. وَدُّوْا تَمَنَّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ سَوَاۤءً فِى الْكُفْرِ فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُوَالُوْنَهُمْ وَاِنْ اَظْهَرُوا الْاِيْمَانَ . حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هِجْرَةً صَحِيْحَةً تُحَقِّقُ اِيْمَانَهُمْ فَاِنْ تَوَلَّوْا وَاَقَامُوْا عَلٰى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَخُذُوْهُمْ بِالْاَسْرِ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا تُوَالُوْنَهٗ وَلَا نَصِيْرًا تَنْتَصِرُوْنَ بِهٖ عَلٰى عَدُوِّكُمْ .

৮৯. তারা চায় যে, তোমরাও কাফির হয়ে যাও যেরূপ তারা কাফের হয়েছে। যাতে তোমরা ও তারা কুফরিতে সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্য থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধু বানিয়ো না যদিও তারা [মুখে] ঈমান প্রকাশ করে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে বিশুদ্ধ রূপে হিজরত করে যা তাদের ঈমানকে প্রমাণিত করবে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয় এবং বর্তমান নেফাকের অবস্থাতেই অটল থাকে তাহলে তাদেরকে বন্দী করে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যাতে তার সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করতে লাগো এবং সাহায্যকারীও বানিও না যা দ্বারা তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলায় সাহায্য গ্রহণ করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ الخ - مَا মুবতাদা, لَكُمْ খবর। فِى الْمُنٰفِقِيْنَ . صِرْتُمْ উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর فِئَتَيْنِ সেই উহ্য ফে'লে নাকিসের খবর। رَكَسَ ও اَرْكَسَ উভয়টারই অর্থ হলো এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিল। اِرْتِكَاسٌ অর্থ ফিরে যাওয়া।

http://islamiboi.wordpress.com

ك . قَوْلُهُ كَمَا - وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ الخ لَوْ تَكْفُرُوْنَ তাবীলের মাধ্যমে মাসদার হয়ে ودوا ফেউলের মাফউল হয়েছে। كَفَرُوْا উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। مَا শব্দটি মাসদারের অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ كَفُرُوْا كَكُفْرِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ الخ : এখানে ইস্তেফহামটি ইনকার বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এই মুনাফিকদের ব্যাপারে মতবিরোধ হওয়াটা উচিত নয়। কেননা তাদের কৃতকর্মের দ্বারা তাদের নেফাক প্রকাশিত হয়ে গেছে। ফলে তারা প্রকাশ্য কাফের হয়ে গেছে। তারা ছিল ঐ সব মুনাফিক যারা ওহুদ যুদ্ধে মদিনা হতে কিছু দূরে গিয়ে রাস্তা থেকেই ফেরত এসে গিয়েছিল। আর এজন্য এই বাহানা করেছিল যে, পরামর্শের মধ্যে আমাদের কথা তো মেনে নেওয়া হয়নি। [তাই আমরা যাবো কেন?] [বুখারী ও মুসলিম এবং জামালাইন]

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে তাফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন রকম মতামত রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো।

১. আলোচ্য আয়াতটি ঐসব লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা মদিনায় হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে মুসলমান হয়ে এসেছিল। অতঃপর কিছুদিন অবস্থান করে তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা মদিনার বাইরে ময়দানে বের হয়ে যেতে চাই। সুতরাং আমাদেরকে অনুমতি প্রদান করুন। হুজুর ﷺ তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর তারা মদিনা থেকে বের হয়ে চলতে চলতে মুশরিকদের সাথে [মক্কাতে] গিয়ে মিলিত হয়ে গেল। তাদের সম্পর্কে মু'মিনদের দু রকম মত হয়ে গেল। একদল বলল, তারা মু'মিন নয়। কেননা তারা আমাদের ন্যায় মু'মিন হলে আমাদের সঙ্গে থাকতো এবং আমরা যেরূপ কাফিরদের যন্ত্রণায় সবর ও ধৈর্যধারণ করছি তারাও করতো। আর দ্বিতীয় দল বলল, তারা মুসলমান। তাদের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে কাফির বলাটা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক আয়াতটি নাজিল করে তাদের নেফাক ও কুফরের অবস্থা বর্ণনা করে দিলেন।

২. আয়াতটি তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মক্কায় নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছিল। অথচ তারা গোপনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তা করতো। তাদের সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেল। একদল বলে তারা মুসলমান আর অপর দল বলে তারা কাফের মুনাফিক। ফলে তাদের এ বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা (রা.) -এর উক্তি।

৩. আয়াতটি মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল ও তার সাথীত্রয়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যারা ওহুদ যুদ্ধের দিন একথা বলে রাস্তা থেকে ফেরত এসে গিয়েছিল যে, আমরা তো একে যুদ্ধই মনে করি না, বরং আত্মঘাতী কাজ মনে করি। যদি একে যুদ্ধ মনে করতাম, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুকরণ করতাম। তাদের সম্পর্কে সাহাবাদের দু'দল হয়ে গেল। একদল বলেন, তারা কাফের হয়ে গেছে। আর অন্যদল বলেন, তারা কাফের হয়নি। ফলে তাদের এ মতবিরোধের নিরসন কল্পে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) -এ শানে নুযূলটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এটা হচ্ছে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর উক্তি। তবে এ উক্তির প্রতি অনেকের মন্তব্য রয়েছে। কেননা আয়াতের বর্ণনা ধারা অনুযায়ী বুঝা যাচ্ছে, তারা ছিল মক্কাবাসী। কেননা তাতে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

৪. আয়াতটি নাজিল হয়েছে ঐ সব লোকদের সম্পর্কে, যারা পথভ্রষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করে ইয়ামামার দিকে পলায়ন করেছিল। অতঃপর তাদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। এটা হচ্ছে ইকরামার উক্তি।

৫. তারা হলো উরাইনা ওয়ালা, যারা মুসলমানদের উট ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছিল, এবং উটের রাখাল হুজুর পাক ﷺ -এর আজাদকৃত গোলাম ইয়াসারকে হত্যা করেছিল।

৬. ইবনে যায়েদ বলেন, ইফকের ঘটনার সাথে জড়িত মুনাফিকদের সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ১০, পৃ. ২২৫-২৬]

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا اِلَّا الَّذِيْنَ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হুজুরে পাক ﷺ মক্কায় তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার পূর্বে হেলাল ইবনে উওয়াইমির আসলামীর সাথে এ চুক্তি হয়েছিল যে, সে হুজুর ﷺ -কে সাহায্য করবে না এবং হুজুর ﷺ -এর বিরুদ্ধেও কাউকে সহায়তা করবে না। আর যে ব্যক্তি হেলালের নিকট চলে যাবে এবং তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে নিবে, তার জন্য আমাদের তরফ থেকে অনুরূপই নিরাপত্তা হবে যেরূপ স্বয়ং হেলালের জন্য। চাই ঐ ব্যক্তি হেলালের সম্প্রদায়ের হোক বা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের হোক। এর পরি প্রেক্ষিতে وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ থেকে فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا পর্যন্ত নাজিল হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٩٠. اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ يَلْجَأُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ عَهْدٌ بِالْاَمَانِ لَهُمْ وَلِمَنْ وَصَلَ اِلَيْهِمْ كَمَا عَاهَدَ النَّبِيُّ ﷺ هِلَالَ ابْنَ عُوَيْمِرٍ الْاَسْلَمِيَّ اَوْ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْكُمْ وَقَدْ حَصِرَتْ ضَاقَتْ صُدُوْرُهُمْ عَنْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ مَعَ قَوْمِهِمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ مَعَكُمْ اَىْ مُمْسِكِيْنَ عَنْ قِتَالِكُمْ وَقِتَالِهِمْ فَلَا تَتَعَرَّضُوْا اِلَيْهِمْ بِاَخْذٍ وَلَا قَتْلٍ وَهٰذَا وَمَا بَعْدَهٗ مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ تَسْلِيْطَهُمْ عَلَيْكُمْ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ بِاَنْ يُّقَوِّىَ قُلُوْبَهُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ وَلٰكِنَّهٗ لَمْ يَشَأْهُ فَاَلْقٰى فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ الصُّلْحَ اَىْ اِنْقَادُوْا فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا طَرِيْقًا بِالْاَخْذِ اَوِ الْقَتْلِ ـ

৯০. কিন্তু তাদেরকে হত্যা করো না যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে শান্তি চুক্তি রয়েছে তাদের জন্য এবং ওদের জন্য যাদের সাথে তারা মিলিত হয়েছে। যেরূপ নবী করীম ﷺ হেলাল ইবনে উআইমীর আসলামীর সাথে শান্তি চুক্তি করেছিলেন। অথবা যারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের অন্তর স্বজাতির পক্ষ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পক্ষ হয়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে এবং স্বজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত, সুতরাং তাদেরকে পাকড়াও ও হত্যা করার পিছনে পড়ো না। এ হুকুমটি এবং এর পরবর্তী হুকুমটি জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাদেরকে তোমাদের উপর প্রবল করে দেওয়ার তবে অবশ্যই তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতে পারতেন তাদের অন্তরকে শক্তিশালী করে দিয়ে। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর ইচ্ছা করেননি। যার দরুন তিনি তাদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়েছেন। অতঃপর যদি তারা তোমাদের নিকট থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে অর্থাৎ তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পাকড়াও ও হত্যার কোনো পথ দেননি।

http://islamiboi.wordpress.com

٩١. سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ بِاِظْهَارِ الْاِيْمَانِ عِنْدَكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ بِالْكُفْرِ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ وَهُمْ اَسَدٌ وَغَطْفَانُ كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ دُعُوْا اِلَى الشِّرْكِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا وَقَعُوْا اَشَدَّ وُقُوْعٍ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ بِتَرْكِ قِتَالِكُمْ وَلَمْ يُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَلَمْ يَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ فَخُذُوْهُمْ بِالْاَسْرِ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا بُرْهَانًا بَيِّنًا ظَاهِرًا عَلٰى قَتْلِهِمْ وَسَبْيِهِمْ لِغَدْرِهِمْ.

৯১. তোমরা অচিরেই এমন কিছু লোক পাবে, যারা তোমাদের কাছে ঈমান প্রকাশ করে তোমাদের নিকটও এবং স্বজাতিদের নিকট নিয়ে গেলে তাদের কাছেও কুফর প্রকাশ করে নির্বিঘ্ন থাকতে চায়। আর তারা হলো আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়। যখনই তাদেরকে ফেতনার দিকে ফেরত আনা হয় তথা শিরকের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা দৃঢ়তার সাথে তাতে নিপতিত হয়। অতএব, তারা যদি তোমাদের থেকে যুদ্ধ বর্জনের মাধ্যমে নিবৃত্ত না থাকে তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহ তোমাদের থেকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে কয়েদ করে পাকড়াও কর এবং যেখানেই পাও হত্যা কর। তারা ঐসব লোক যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য প্রমাণ দান করেছি তথা তাদেরই গাদ্দারীর কারণে তাদের হত্যার ও বন্দী করার উপর প্রকাশ্য প্রমাণ দান করেছি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الخ - اِلَّا الَّذِيْنَ ইস্তেসনা হয়েছে فَاقْتُلُوْهُمْ থেকে। بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ পূর্ণ জুমলায়ে খবরিয়াটি قَوْمٌ-এর সিফত হয়েছে। اَوْ جَاءُوْا আতফ হয়েছে يَصِلُوْنَ-এর উপর حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ - বাক্যটি উহ্য قَدْ-এর সহিত حَالٌ হয়েছে। جَاءُوْكُمْ-এর ফায়েলের যমীর হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ اَنْ يَّأْمَنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ الخ আয়াতটি আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা যখন মদিনায় আসতো, তখন নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো এতে করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের কোনো ক্ষতি পৌঁছেত না। আর তাঁরা যখন নিজেদের গোত্রের কাছে যেত তখন নিজেদেরকে কাফির বলে প্রকাশ করতো এবং তাদের ন্যায় কথা বলতো। যাতে তাদের থেকেও নিরাপদ থাকতে পারে। আর তাদের সম্প্রদায়ের কোনো লোক যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতো যে, তোমরা কার উপর ঈমান এনেছ? তখন তারা বলতো, আমরা বানর ও বিচ্ছুর উপর ঈমান এনেছি।

আলোচ্য আয়াতটি তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এবং এতে তাদের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। -[মাআরিফে ইদ্রিসিয়া খ. ২, পৃ. ২৭৬ - ৭৭]

http://islamiboi.wordpress.com

٩٢. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اَىْ
مَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ قَتْلٌ لَهُ
اِلَّا خَطَأً مُخْطِئًا فِىْ قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ
قَصْدٍ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً بِاَنْ قَصَدَ
رَمْىَ غَيْرِهِ كَصَيْدٍ اَوْ شَجَرَةٍ فَاَصَابَهُ اَوْ
ضَرَبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَتَحْرِيْرُ
عِتْقُ رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَلَيْهِ وَدِيَةٌ
مُّسَلَّمَةٌ مُؤَدَّاةٌ اِلَى اَهْلِهِ اَىْ وَرَثَةِ
الْمَقْتُوْلِ اِلَّا اَنْ يَّصَّدَّقُوْا يَتَصَدَّقُوْا
عَلَيْهِ بِهَا بِاَنْ يَّعْفُوْا عَنْهَا وَبَيَّنَتِ
السُّنَّةُ اَنَّهَا مِائَةٌ ـ مِنَ الْاِبِلِ عِشْرُوْنَ
بِنْتَ مَخَاضٍ وَكَذَا بَنَاتُ لَبُوْنٍ وَبَنُوْ
لَبُوْنٍ وَحِقَاقٌ وَجِذَاعٌ وَاَنَّهَا عَلَى عَاقِلَةِ
الْقَاتِلِ وَهُمْ عَصَبَةُ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ
مُوَزَّعَةً عَلَيْهِمْ عَلَى ثَلٰثِ سِنِيْنَ عَلَى
الْغَنِىِّ مِنْهُمْ نِصْفُ دِيْنَارٍ وَالْمُتَوَسِّطِ
رُبُعٌ كُلَّ سَنَةٍ فَاِنْ لَمْ يَفُوْا فَمِنْ بَيْتِ
الْمَالِ فَاِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْجَانِىْ فَاِنْ
كَانَ الْمَقْتُوْلُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ حَرْبٍ لَكُمْ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَلَى
قَاتِلِهِ كَفَّارَةً وَلَا دِيَةَ تُسَلَّمُ اِلَى اَهْلِهِ
لِحَرَابَتِهِمْ ـ

অনুবাদ :

৯২. কোনো মু'মিনকে হত্যা করা মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয় ভুলবশত ব্যতীত অর্থাৎ অনিচ্ছাবশত, ভুল করা ছাড়া তার [একজন মুমিনের] দ্বারা অন্য এক মুমিনের হত্যা সংঘটিত হওয়া উচিত নয়। কেউ কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করলে যেমন, শিকার বা কোনো বৃক্ষ ইত্যাদি করে একজন তীর ছুড়েছিল কিন্তু কারও গায়ে লেগে সে মারা গেল অথবা এমন এক অস্ত্র দ্বারা তাকে আঘাত করেছিল যদ্দ্বারা সাধারণত মানুষ হত্যা করা যায় না। তবে এক মু'মিন গর্দান অর্থাৎ মু'মিন দাস মুক্ত করা স্বাধীন করা এবং তার পরিজনবর্গকে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণকে দিয়ত-রক্তপণ অর্পণ করা পরিশোধ করা তার উপর বিধেয়, যদি না তারা সদকা করে অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ তা ক্ষমা করতঃ তার উপর সদকা করে দেয়।

সুন্নাতে দিয়ত বা রক্তপণের বিবরণে উল্লেখ হয়েছে যে, তার পরিমাণ হলো একশ উট। তন্মধ্যে বিশটি বিনতে মাখাজ [দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণকারী স্ত্রী উট] এবং তত পরিমাণ বিনত লাবূন [তৃতীয় বৎসরে পদার্পণকারী স্ত্রী উট] বানূ লাবূন [অর্থাৎ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণকারী পুরুষ উট], হিকাক [অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে পদার্পণকারী উট], জিযা' [অর্থাৎ পঞ্চম বৎসরে পদার্পণকারী উট] হতে হবে।

উক্ত রক্তপণ ধার্য হবে হত্যাকারীর আকিলাগণের উপর। তারা হলো হত্যাকারীর ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন আসাবাগণ। নিম্নবর্ণিত হারে তা তিন বৎসর মেয়াদে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। প্রতি বৎসর ধনীদের উপর অর্ধ দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] এবং মধ্যবিত্তদের উপর এক চতুর্থাংশ দিনার হারে তা ধার্য হবে। আসাবাগণ যদি তা পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তা আদায় করা হবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে খোদ অপরাধীর দায়িত্বে তা বর্তাবে।

যদি সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি তোমদের শত্রু পক্ষের অর্থাৎ আহলে হারব বা তোমাদের সাথে যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের লোক হয় এবং মু'মিন হয় তবে কাফ্ফারা হিসাবে এক মু'মিন দাস মুক্ত করা হত্যাকারীর উপর বিধেয়।

http://islamiboi.wordpress.com

وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ عَهْدٌ كَأَهْلِ الذِّمَّةِ فَدِيَةٌ لَهُ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَهِيَ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ إِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَثُلُثَا عُشْرِهَا إِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَلَى قَاتِلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ بِأَنْ فَقَدَهَا وَمَا يُحَصِّلُهَا بِهِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعَالَى الْاِنْتِقَالَ إِلَى الطَّعَامِ كَالظِّهَارِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا فِيمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ ـ

যেহেতু শত্রুদেশের বাসিন্দা সেহেতু তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা হবে না। আর যদি সে অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ চুক্তিবদ্ধ, যেমন জিম্মিগণ তবে সে রক্তপণের অধিকারী হবে যা তার পরিজনবর্গকে অর্পণ করা হবে এবং একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা এ হত্যাকারীর উপর জরুরি হবে।

[যদি সে] অর্থাৎ জিম্মি ইহুদি বা খ্রিস্টান হয় তবে তার রক্তপণের পরিমাণ হলো একজন মু'মিনের রক্তপণের একতৃতীয়াংশ। আর যে সে যদি অগ্নিপূজারীয় তবে তার রক্তপণের পরিমাণ হলো, একজন মু'মিনের রক্তপণের এক দশমাংশের দুই তৃতীয়াংশ। যে ব্যক্তি মুক্ত করার দাস না পায় অর্থাৎ তা পাওয়া যায় না বা তার মূল্য তার নেই তবে কাফফারা হিসাবে একাধিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করা তার উপর বিধেয়।

যিহার এর কাফফারার ন্যায় আল্লাহ তা'আলা এখানে সিয়াম পালন সম্ভব না হলে দরিদ্রদেরকে আহার প্রদানের বিধান উল্লেখ করেনি। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অধিকতর নির্ভরযোগ্য অভিমত। এটা আল্লাহর তরফ হতে তওবার বিধান এবং আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের জন্য ব্যবস্থা প্রদানে প্রজ্ঞাময়।

تَوْبَةً এটা এখানে উহ্য একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে مَصْدَر বা সমধাতুজ কর্ম হিসাবে مَنْصُوب [ফাতাহযুক্ত] হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

نَسَمَةٌ : نَسَمَةٌ ব.ব نَسَمَاتٌ ব্যক্তি, লোক, প্রাণী, শ্বাস, বাতাস।

مُوَزَّعَةٌ : مُوَزَّعَةٌ [اِسْم فَاعِل : وَاحِد مُؤَنَّث] বণ্টনকৃত, বাবে تَفْعِيل থেকে وَزَّعَ تَوْزِيْعًا বিতরণ করা।

دِيَةٌ : دِيَةٌ বহুবচন دِيَاتٌ রক্তমূল্য, হত্যাকারীর উপর ধার্য্যকৃত ক্ষতিপূরণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। এখানেও সে আলোচনা করা হয়েছে।

শানে নুযূল : আবদ ইবনে হামীদ এবং ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীআ একজন মু'মিনকে না জেনে হত্যা করে ফেলেছিলেন। যার প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ঘটনার বিবরণ : রাসূল ﷺ এখনও হিজরত করেননি। আইয়্যাশ ইবনে রাবীআ নামে এক ব্যক্তি মুসলমান হন কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়নের ভয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে পারেননি। এমনকি তার পরিবারের কাউকেও তিনি তা জানাননি। সে সময় মদিনা মুসলমানদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। একজন দু'জন করে বিপদগ্রস্ত মুসলমানগণ মক্কা ছেড়ে মদিনার পথে পাড়ি জামাচ্ছেন। তাদের মতো আইয়্যাশ ইবনে রাবীআ ও মদিনায় চলে গেছেন। আইয়্যাশ ইবনে রাবীআ এবং আবু জেহেল পরস্পরে সৎ ভাই ছিল। উভয়ের মা এক বাপ ভিন্ন। তিনি মদিনায় চলে যাওয়ায় তার মা খুব পেরেশান হলেন। মায়ের পেরেশানী ও অস্থিরতার কারণে আবু জেহেলও পেরেশান হলো। ফলে আবু জেহেল তার অপর ভাই হারেস এবং আরেকজন ব্যক্তি হারেস ইবনে জায়েদ ইবনে আবি উনায়সাকে নিয়ে মদিনায় পৌছল। তারা

http://islamiboi.wordpress.com

আইয়্যাশকে কেঁদে কেঁদে তার মায়ের অবস্থা শুনাল এবং পূর্ণ আশ্বাস দিল যে, তুমি শুধু তোমার মায়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য মক্কায় চলো। আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করব না। হযরত আইয়্যাশ স্বীয় মায়ের অস্থিরতা এবং ভ্রাতাবৃন্দের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে নিজেকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন এবং তাদের সাথে মক্কা যাওয়ার জন্য রওনা হলেন।

মদিনা থেকে দুই মঞ্জিল পথ অতিক্রম করার তারা তার সাথে গাদ্দারী করল। যা কিছু ঘটার আশঙ্কা ছিল তা সবই ঘটল। প্রথমে তার হাত পা বাঁধল। তার পর তিন কাফের মিলে অত্যন্ত নির্মমভাবে এ পরিমাণ বেত্রাঘাত করল যে, তার শরীর ঝাজরা হয়ে যায়। তারপর তাকে তপ্ত রোদে ফেলে রাখে এবং বলে যতক্ষণ না ইসলাম ধর্ম বর্জন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত রোদের তাপে জ্বলতে থাকবে।

রক্তে রঞ্জিত শরীর। হাত পা বাঁধা। সফরের ক্লান্তি। মায়ের কষ্টের অনুভূতি। ভাইদের পৈশাচিক নির্মমতা। মক্কার তপ্ত কংকরময় ভূমিতে পুড়ে যাওয়া আইয়্যাশ অবশেষে অপারগ হয়ে কুলাতে না পেরে মুখ থেকে সে অবাঞ্ছিত বাক্য বের করলেন, যা বলার জন্য তার দিল আদৌ প্রস্তুত ছিল না। নির্যাতন থেকে মুক্তির আশায় তাকে সে বাক্যটি উচ্চারণ করতে হয়েছে। তার এ অসহায়ত্বের উপর নিন্দা করে আবু জেহেলের সাথে আসা হারেস ইবনে জায়েদ একটি সাংঘাতিক উক্তি করে যে, হে আইয়্যাশ তোমার ধর্ম কি কেবল এইটুকু? এতই হালকা? যেন মরার উপর খাড়ার ঘা। আইয়্যাশ রাগে ক্ষোভে বেসামাল হয়ে গেলেন। কসম খেয়ে বললেন, যখনই সুযোগ হবে তোমাকে হত্যা করে ছাড়ব।

তারপর কোনো মতে হযরত আইয়্যাশ মদিনায় পৌছে যান। তার কিছুদিনের মধ্যেই সেই ব্যাঙ্গকারী হারেস ইবনে যায়েদও মক্কা থেকে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। ঐ দিকে হযরত আইয়্যাশ হারেসের মুসলমান হওয়ার সংবাদ জানতেন না। একদিন ঘটনাচক্রে কোবার পাশে উভয়ের সাক্ষাত ঘটল। হারেসের নির্দয় আচরণের যাবতীয় ব্যাপার তার মনে জাগল। ভাবলেন হয়তো এবারও সে অন্য কাউকে নির্যাতন করার কুমতলবে এসেছে। তাই তিনি তলোয়ার মেরে তার গর্দার উড়িয়ে দিলেন। দুর্ঘটনা সম্পর্কে সকলে অবগত হওয়ার পর আইয়্যাশকে জানালেন যে হারেস তো মুসলমান হয়ে মদিনায় এসেছিল। এ খবর শুনে হযরত আইয়্যাশ রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে নিবেদন জানালেন যে, হুজুরের তো ভালো করেই জানা আছে, যে হযরত হারেস আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল। আমার অন্তরে সেসব দুঃখ জাগ্রত ছিল এবং আমি তার মুসলমান হওয়ার কথা একবারেই জানতাম না। একথা চলাকালীন অবস্থায়ই কুরআনের আয়াত নাজিল হয়। [জামালাইন খ- ২. পৃ. ৭৮]।

হত্যার প্রকার ও তার শরয়ী বিধান : ফুকাহায়ে কেরাম قَتْل -এর পাঁচ প্রকার উল্লেখ করেছেন।

প্রথম প্রকার : قَتْل عَمْد অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা হচ্ছে বাহ্যত ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গচ্ছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মতো। যথা ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার : قَتْل شِبْهُ عَمْد অর্থাৎ ইচ্ছকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই : ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয় যা দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার : قَتْل خَطَأً অর্থাৎ ভ্রমবশত: হত্যা। এটির দুই সূরত। ১. خَطَأً فِى الْقَصْدِ ২. خَطَأً فِى الْفِعْلِ.

১. خَطَأً فِى الْقَصْدِ হলো– ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল হরবের কাফের মনে করে লক্ষ্য স্থির করত : গুলি করে ফেলা।

২. خَطَأً فِى الْفِعْلِ হলো– লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলি ছোঁড়া; কিন্তু তা কোনো মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া।

এখানে خَطَأً [ভ্রম] বলতে غَيْرُ عَمْد ইচ্ছা নয়, বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই قَتْل خَطَأً ও قَتْل شِبْهُ عَمْد উভয় প্রকারের বিধান একই। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পঁচিশটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হলো পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারের বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেরহাম অথবা এক হজার দিনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ বেশি এবং তৃতীয় প্রকারের গুনাহ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গুনাহ হবে। –[মাআরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

উপরিউক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হলো তা পার্থিব বিধানের দিক বিবেচনায়। গুনাহের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শাস্তির বিধানও এরই উপর নির্ভলশীল আল্লাহ তা'আলা জানেন, এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

চতুর্থ প্রকার : قَائِمٌ مَقَامَ بِالْخَطَأِ অর্থাৎ ভ্রমবশত: হত্যার স্থলাভিষিক্ত। যেমন কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কারো উপর গড়িয়ে পড়ল এবং তার চাপে সে মারা গেল।

পঞ্চম প্রকার : قَتْلٌ بِالسَّبَبِ অর্থাৎ হত্যার কারণ হওয়া। যেমন, কেউ অন্যের জমিতে কূপ খনন করল যাতে নিপতিত হয়ে কেউ মারা গেল অথবা বড় পাথর রেখে দিল যার সাথে সংঘর্ষ লেগে কেউ মারা গেল।

অনুরূপভাবে مَقْتُوْلٌ বা নিহত ব্যক্তি চার প্রকার।

১. مُؤْمِنٌ মুমিন ২. ذِمِّىٌّ জিযিয়া প্রদানকারী কাফের। ৩. مُصَالِحٌ مُسْتَأْمِنٌ চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত কাফের, ৪. حَرْبِىٌّ দারুল হরবের কাফের।

হত্যার মোট প্রকার : قَاتِلٌ ও مَقْتُوْلٌ উভয়ের অবস্থাভেদে কতলের অনেক সূরত ও প্রকার সাব্যস্ত হয়। হিসাব করলে তা সর্বোচ্চ আট প্রকার হয়। কেননা নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় জিম্মী, না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফের হবে। এ চার অবস্থার কোনো না কোনো একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার : হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশত। এতএব, মোট প্রকার হলো আটটি-

১. মুসলামনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
২. মুসলমানকে ভ্রমবশত হত্যা করা।
৩. জিম্মিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
৪. জিম্মিকে ভ্রমবশত হত্যা করা।
৫. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
৬. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশত হত্যাকরা।
৭. হরবী কাফেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।
৮ হরবী কাফেরকে ভ্রমবশত হত্যা।

বিধান : এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে?

প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান. অর্থাৎ কেসাস ওয়াজিব হওয়া সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا এ বর্ণিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের বিধান. দারাকুতনীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে জিম্মি হত্যার বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন। -[তাখরীজে হেদায়া।]

চতুর্থ প্রকার وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ আয়াতে উল্লিখিত হবে।

পঞ্চম প্রকারের পূর্ববর্তী রুকুর فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রাকরের সাথেই উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, مِيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই এর রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিশুদ্ধাভাবে প্রমাণ করা হয়েছে।

সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল হরবের কাফেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব ভ্রমবশত: হত্যার বৈধতা আর ও সন্দেহতীতরূপে প্রমাণিত হবে। -[বয়ানুল কুরআন, মাআরিফুল কুরআন]

কতিপয় মাসআলা :

* রক্ত বিনিময়ের উপরিউক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। -[হেদায়া]

http://islamiboi.wordpress.com

* মুসলমান ও জিম্মির রক্ত বিনিময় সামান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, دِيَةُ كُلِّ ذِي عَهْدٍ اَلْفُ دِيْنَارٍ [হেদায়া, আবূ দাঊদ]।
*. কাফ্ফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোজা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্তবিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের জিম্মায় ওয়াজিব। শরিয়তের পভিাষায় তাদেরকে আকেলা বলা হয়। -[বয়ানুল কুরআন]
* কাফ্ফারায় বাদী ও ক্রীতদাস সমান। رَقَبَة শব্দে উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।
* নিহত ব্যক্তির রক্ত বিনিময় তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কোনো কানো ওয়ারিশ স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সকলে মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।
* যে নিহত ব্যক্তির কোনো ওয়ারিশ নেই, তার রক্ত বিনিময় বায়তুর মাল তথা সারকারি কোষাগারে জমা হবে। কেননা রক্ত বিনিময় হলো ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তি বিধান তাই। -[বায়ানুল কুরআন]

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় [জিম্মি অথবা অভয়প্রাপ্ত] -এর ক্ষেত্রে যে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হয়, বাহ্যত তা তখনই হয়, যখন জিম্মি কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়, মুসলমান কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল- এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি জিম্মি হলে তার রক্ত বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা জিম্মি বে ওয়ারিশের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত- বিনিময়সহ বাযতুল মালে যায়। [দুররে মুখতার] নিহত ব্যক্তি জিম্মি না হলে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না। [বয়ানুল কুরআন]

* কাফ্ফারার রোজায় যদি রোগ ব্যধির কারণে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়, তবে প্রথম থেকে রোজা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোজা ভাঙ্গতে হয় তাতে ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবে না।
* ওজরবশত : রোজা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।
* ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই তওবা করা উচিত। -[বয়ানুল কুরআন]

দিয়ত কি? : ভুলবশত হত্যা করলে নিহতের পরিবারর্গকে যে রক্তপণ দেওয়া হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য, তাকে পরিভাষায় দিয়াত বলা হয়।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ : এখানে মূলত نَفِيْ -এর সূরতে نَهِيْ বুঝানো হয়েছে। যেমন- وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ -এর মাঝে হয়েছে। কেননা যদি বাহ্যিকভাবে نَفِيْ -এর অর্থেই ধরা হতো তাহলে এটি একটি সংবাদ হতো। যার বাস্তবে ঘটা আবশ্যক হতো। ফলে অর্থ হবে কোনো মুমিনের হত্যা সংঘটিত হয়নি। অথচ এটি একটি বস্তবতা বিরোধী কথা।

মুসান্নিফ (র.) اَىْ مَا يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ قَتْلٌ لَهُ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مُخْطِئًا فِىْ قَتْلِهِ : এ বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, خَطَاءً হাল হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর মাসদারটি ইসমে ফায়েলের অর্থে। এমনও হতে পারে যে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে এবং উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। তখন ইবারত এমন হবে।اِلَّا قَتْلًا خَطَاءً

قَوْلُهُ بِاَنْ قَصَدَ رَمْىَ غَيْرِهِ الخ : ভুলবশত কোনো মুসলিমকে হত্যা করলে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। মুসান্নিফ (র.) এখানে কয়েকটি অবস্থা তুলে ধরেছেন। যেমন কোনো মুসলিমকে শিকার মনে করে হত্যা করা শিকারকে লক্ষ্য করে তীর বা গুলি চালানো কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোনো মুসলিমের দেহে বিদ্ধ হওয়া।

এছাড়াও আরেকটি সুরত এই হতে পারে যে, কাফিরদের মধ্যে বসবাসকারী কোনো মুসলিমকে কাফির মনে করে হত্যা করা। এখানে এ শেষোক্ত অবস্থার বর্ণনাই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। মুসলিম মুজাহিদগণ অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতেন। পূর্বের আয়াতের সাথে এ অবস্থাই বেশি সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও ভুলক্রমে করার বাকি অবস্থাগুলোর একই বিধান। সেগুলোও এর মধ্যে এসে গেছে।

اَوْ ضَرَبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا : شِبْهُ عَمْدٍ কে সুস্পষ্টরূপে আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুফাসসির (র.) এ তাবীলটি করেছেন। -[হাশিয়া]

http://islamiboi.wordpress.com

قَوْلُهُ نَسَمَةً : অর্থ প্রাণী মানুষ এবং জন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। رَقَبَةً -এর পরে এ শব্দটির উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে جُزْء অংশ বলে كُلّ [পূর্ণ বস্তু] বুঝানো হয়েছে। رَقَبَةٌ -শব্দটি সাধারণত ক্রীতদাসের অর্থেই সুপরিচিত।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

১. تَحْرِيْرُ হলো মুবতাদা এবং তার খবর মাহযূফ রয়েছে। اَىْ فَعَلَيْهِ تَحْرِيْرُ

২. অথবা تَحْرِيْرُ হলো উহ্য মুবতদার খবর। اَىْ فَاوْجَبَ عَلَيْهِ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اِلَّا قَتْلاً خَطَأً

৩. تَحْرِيْرُ উহ্য ফেলের ফায়েল ও হতে পারে। اَىْ لِيَجِبَ عَلَيْهِ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اِلَّا قَتْلاً خَطَأً

৪. এটাও হতে পারে যে, عَلَيْهِ হলো শর্তের জাযা আর যেহেতু জাযার জন্য জুমলা হওয়া শর্ত, তাই عَلَيْهِ কে মাহযূফ ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ دِيَةٌ : এর عَطْف হয়েছে تَحْرِيْر -এর সাথে। আর دِيَةٌ শব্দটি মূলত. মাসদার। অধিকৃত সম্পদের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এ কারণেই তার সিফত হিসেবে مُسْلِمَةٌ আনা হয়েছে। دِيَةٌ এর মূল রূপ وَدْىٌ ছিল। وَاو হযফ করে তার বদলে শেষে تَاء تَانِيْث বৃদ্ধি করা হয়েছে। دِيَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ : এ আয়াতে ভুলবশত হত্যা করলে তার দু'টি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

এক. এক মুসলিম গোলাম আজাদ করা এবং সে সঙ্গতি না থাকলে একাধিক্রমে দু'মাস রোজা রাখা। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নিজ অপরাধের কাফ্ফারা [প্রায়শ্চিত্ত]।

দুই. নিহতের পরিবারবর্গকে রক্তপণ দেওয়া। এটা তাদের অধিকার। তারা ক্ষমা করলে ক্ষমা হতে পারে। কিন্তু কাফ্ফারা কারও ক্ষমা করার দ্বারা ক্ষমা হয় না।

এর মোট তিনটি অবস্থা হতে পারে। কেননা ভুলে যে মুসলিমকে হত্যা করা হলো তার ওয়ারিশ মুসলিম হবে বা কাফির। কাফির হলে তার সাথে মৈত্রী বন্ধন থাকবে কি থাকবে না। প্রথম দুই অবস্থায় নিহতের ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দিতে হবে। তৃতীয় অবস্থায় রক্তপণ দিতে হবে না। কাফ্ফারা সর্বাবস্থায়ই দিতে হবে।

কতলের কাফ্ফারায় গোলাম আজাদ সম্পর্কিত মাসআলা : কতলের কাফ্ফারায় হানাফীদের মতে মুমিন গোলাম আজাদ করা জরুরি। কেননা আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু অন্যান্য কাফ্ফারায় মুমিন গোলাম আজাদ করা জরুরি নয়। কাফের গেলাম আজাদ করলেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত হলো সকল কাফ্ফারায়ই মুমিন গোলাম আজাদ করা জরুরি।

আর গোলাম হতে হবে সুস্থ ও পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অধিকারী। লেংড়া, অন্ধ, পাগল তথা প্রতিবন্ধী গেলাম আজাদ করলে আদায় হবে না আনুরূপভাবে মুদাব্বির, উম্মে ওয়ালাদ ও ঐ মুকাতিব, যার আংশিক টাকা আদায় হয়েছে তাদেরকে আজাদ করাও যথেষ্ট হবে না। কেননা আয়াতে مُطْلَقُ رَقَبَةٍ বলা হয়েছে। আর مُطْلَقٌ দ্বারা فَرْد كَامِل উদ্দেশ্য হয়। উপরে বর্ণিত গোলামরা কেউ যাতের দিক থেকে আর কেউ সিফতের দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তাদের দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না। -[জামালাইন খ. ২, পৃ. ৮০] অবশ্য পুরুষ মহিলা, ছোট বড় সকলকেই আজাদ করা যাবে।

কতলের কাফ্ফারায় মুমিন গলোম আজাদ করার রহস্য : হত্যাকারী কোনো মুমিনকে হত্যা করে পৃথিবীর বুক থেকে একজন মুমিন কমিয়ে দিয়েছে। তাই মুমিনদেরই একজনকে আজাদ করে তার ক্ষতিপূরণ করবে। কেননা গোলামি হলো প্রকারান্তরে মৃত্যু আর আজাদি হলো জীবন।

قَوْلُ اِلَّا اَنْ يَّصَّدَّقُوْا : ইস্তেছনার কারণে মানসূব হয়েছে। اَىْ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْيَانِ اِلَّا حِيْنَ التَّصَدُّقِ

اَنْ يَّصَّدَّقُوْا. রক্তপণের ক্ষমাকে تَصَدُّقٌ অর্থাৎ দান অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এ কথারই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাই উত্তম। سُمِّىَ الْعَفْوُ عَنْهَا صَدَقَةً حَثًّا عَلَيْهِ تَنْبِيْهًا عَلٰى فَضْلِهِ (بَيْضَاوِىْ) অর্থাৎ ক্ষমাকে সদকা নাম দেওয়ার অর্থ তাতে উৎসাহ দেওয়া এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা। -[বায়যাবী সূত্রে মাজেদী]

وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাতানুসারে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো বিশটি اِبْنُ لَبُوْنِ -এর স্থলে اِبْنُ مَخَاضٍ প্রদান করা হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে তা বিদ্যমান।

http://islamiboi.wordpress.com

আর দিয়ত মুদ্রায় পরিশোধ করলে তার পরিমাণ হলো, এক হাজার দীনার স্বর্ণমুদ্র অথবা দশ হাজার দিরহাম বা রৌপ্যমুদ্রা। ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে বার হাজার দিরহাম।

সাহেবাইনের মতে উপরিউক্ত তিনটি বস্তু ছাড়াও অন্য বস্তুর দ্বারা দিয়ত দেওয়া যাবে। যেমন, দুইশত গাভী অথবা একহাজার ছাগল কিংবা দুই শত জোড়া কাপড়।

قَوْلُهُ وَهُمْ عَصَبَةُ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত। কেননা রাসূল ﷺ -এর যুগে এমনই ছিল। আকিলার বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত হলো, হত্যাকারী ব্যক্তি যদি দীওয়ানা অর্থাৎ সরকারি ভাতাপ্রাপ্তদের রেজিস্টারভুক্ত হয়ে থাকে তবে উক্ত দীওয়ানভুক্ত ব্যক্তিরা তার আকিলা হবে এবং তাদের প্রাপ্তব্য ভাতা হতে তা পরিশোধ করা হবে। কেননা হযরত ওমর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এমনই পদক্ষেপ নিয়েছেন কিন্তু কোনো সাহাবী আপত্তি করেননি। তবে হত্যাকারী রেজিস্টারভুক্ত না হলে তার বংশের লোকেরাই তার আকেলা হবে।

সংশয় নিরসন : এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। কুরআনেও তো উল্লেখ রয়েছে- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।

জবাব : এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজ কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ক্রটি করবে না। আর আয়াতের সম্পর্ক বিশেষ গুনাহের সাথে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপরের কোনো গুনাহের জিম্মাদার হবে না কিন্তু দুনিয়াবী শাস্তি ও বিধানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং কোনো আপত্তি বাকি থাকল না।

রক্তপণের ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব : হত্যার কাফ্ফারা তথা গেলাম আজাদ এবং রোজা রাখা শুধুমাত্র হত্যাকারীর দায়িত্ব তবে দিয়তের মাঝে অন্যান্য সহযোগীরাও শরিক হবে।

قَوْلُهُ نِصْفُ دِيْنَارٍ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে।

قَوْلُهُ ثُلُثَا عُشْرِهَا : এটিও ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে।

قَوْلُهُ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ : অর্থাৎ কোনো হরবী কাফের মুসলমান হয়ে দারুল হরবে বসবাস করছে অথবা দারুল ইসলামে হিজরত করার পর কোনো প্রয়োজনে দারুল হরবে নিজের আত্মীয় স্বজনদের কাছে গমন করে এবং সেখানে কোনো মুসলমানের হাতে নিহত হয়।

قَوْلُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ : এটিও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। তিনি ঐ হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন যেখানে ইহুদি নাসারা তথা আহলে কিতাবের দিয়ত চারহাজার দিরহাম এবং মাজুসীদের দিয়ত আটশ দিরহাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যেহেতু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দিয়তের আর্থিক পরিমাণ দশ হাজারের বদলে বার হাজার তাই তার এক তৃতীয়াংশ চারহাজার এবং দশমাংশের দুই তৃতীয়াংশ আটশ দিরহাম।

ইমাম মলেক (র.) -এর মতে জিম্মির দিয়ত ছয়হাজার দিরহাম। কেননা একটি হাদীসে রয়েছে- عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِ অর্থাৎ কাফেরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক। কিন্তু হানাফীগণ হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আজম (রা.) -এর আমলের ভিত্তিতে জিম্মি ও মুসলমানের দিয়ত সামান মনে করেন। এ বিষয়ে একটি হাদীস ও রয়েছে।

قَوْلُهُ وَبِهٖ اَخَذَ الشَّافِعِىُّ : এ ক্ষেত্রে হানাফী এবং শাফেয়ী উভয়ের মতামত এক ও অভিন্ন দু'মাস একটানা রোজা না রাখতে পারলে যিহারের কাফ্ফারার মতো ষাট মিসকিনকে খাদ্য দান করলে চলবে না।

যিহার : যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের কোনো অঙ্গের সাথে বিবাহিতা স্ত্রীকে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়।

قَوْلُهُ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ : এ আয়াতে এ বিষয়ের তাকিদ স্বরূপ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, কাফ্ফারা ও দিয়তের এ ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, কোনো বান্দার পক্ষ থেকে নয়। কোনো পীর বা ধর্মগুরু কাউকে ক্ষমা করলে তার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৯৩. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا بِأَنْ يَقْصُدَ قَتْلَهُ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ أَبْعَدَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا فِى النَّارِ وَهٰذَا مُؤَوَّلٌ بِمَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْبِأَنَّ هٰذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوْزِىَ وَلَا بِدْعَ فِىْ خُلْفِ الْوَعِيْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّهَا عَلٰى ظَاهِرِهَا وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِغَيْرِهَا مِنْ أٰيَاتِ الْمَغْفِرَةِ وَبَيَّنَتْ أٰيَةُ الْبَقَرَةِ أَنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُقْتَلُ بِهِ وَأَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ إِنْ عُفِىَ عَنْهُ وَسَبَقَ قَدْرُهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ بَيْنَ الْعَمَدِ فِى الصِّفَةِ وَالْخَطَأِ قَتْلًا يُسَمّٰى شِبْهَ الْعَمَدِ وَهُوَ أَنْ يَقْتُلَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَلَا قِصَاصَ فِيْهِ بَلْ دِيَةٌ كَالْعَمَدِ فِى الصِّفَةِ وَالْخَطَأِ فِى التَّاجِيْلِ وَالْحَمْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ وَالْعَمَدُ أَوْلٰى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَأِ ـ

৯৩. কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করলে যেমন, তাকে মু'মিন বলে জানার পরও হত্যার ইচ্ছায় এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করল যা দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায়। তার শাস্তি জাহান্নাম সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন। তাকে অভিসম্পাত করবেন। তার রহমত হতে বিতাড়িত করে দিবেন। এবং জাহান্নামে তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।

এ আয়াতটি মর্ম বর্ণনায় বলা হয় যে, এ শাস্তি ঐ ব্যক্তির উপরই প্রযোজ্য হবে যে ব্যক্তি তা [মু'মিনকে হত্যা করা] হালাল ও বৈধ বলে মনে করে। বা তার অর্থ হলো, যদি এর যথার্থ শাস্তি দেওয়া হয় তবে সেটাই হলো যথার্থ শাস্তি। আর [ক্ষমা প্রদর্শন করত] হুমকির বিপরীত করাতে কোনো বিস্ময় বা প্রশ্ন হয় না আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ আল্লাহ শিরক ভিন্ন অন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেন যাকে তাঁর ইচ্ছা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আয়াতটি এখানে বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত। এ আয়াতটি ক্ষমার বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহের জন্য নাসিখ বা হুকুম রহিতকারী বলে গণ্য।

সূরা বাকারায় উল্লেখ হয়েছে যে, স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে তাকে [কিসাসের বিধান অনুসারে] হত্যা করা হবে। আর যদি [নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক] তাকে মাফ করে দেওয়া হয় তবে তার উপর রক্তপণ ধার্য হবে। তার পরিমাণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুন্নাহর বর্ণনায় জানা যায় যে, কাতলে আমাদ অর্থাৎ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যা ও কাতলে খাতা অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যার মাঝামাঝি শিবহে আমাদ অর্থাৎ প্রায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যা নামক আরেক ধরনের হত্যাকাণ্ড রয়েছে। তা হলো হত্যা করার ইচ্ছায় একজনকে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা যা দ্বারা সাধারণত: হত্যা করা যায় না; এতে কিসাস নয়, বরং দিয়ত বা রক্তপণ ধার্য হয়। আর তা [রক্তপণ] অবস্থা হিসাবে কাতলে আমদ বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যা। আর সময়সীমা ও আকিলাদের ঘাড়ে ধার্য দিয়ত প্রদান হিসাবে কাতলে খাতা অর্থাৎ ভুলবশতঃ হত্যার অনুরূপ। কাতলে খাতা বা ভুলবশত: হত্যার তুলনায় এতে এবং কাতলে আমাদ অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হত্যার কাফফারার বিধান প্রযোজ্য হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। [এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো এতে কাফফারা নেই।]

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

بِدْعٌ : بِدْعٌ বহুবচন **إِبْدَاعٌ** অভূতপূর্ব, নতুন। আর কামূসে এর অর্থ দেওয়া হয়েছে বিরলতা, স্বল্পতা।
قِصَاصٌ : قِصَاصٌ প্রতিশোধ, শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا....الخ : যদি কোনো মুসলিম অপর এক মুসলিমকে অজ্ঞাতসারে নয়; বরং মুসলিম জেনেই হত্যা করে, তবে আখেরাতে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, লা'নত ও মহাশাস্তি। কাফফারা দ্বারা তার নিষ্কৃতি হবে না। তার পার্থিব সাজা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার যেসব পরিচিত ও সাধারন ধরন পদ্ধতি রয়েছে, তাতো আছেই, কিন্তু তাছাড়া আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এই সতর্ককরণের আওতায় সেসব পদ্ধতিও পড়ে যাবে, যেগুলো কোনো শরিয়ত বিরোধী আইন অনুসারে এবং কোনো কাফির আইন ও প্রশাসনের অধীনে সংঘটিত হয়। যেমন কেউ কোনো কাফির রাষ্ট্রের সৈনিক কিংবা পুলিশ বিভাগের ভর্তি হয়ে ঐ রাষ্ট্রের কোনো বিদ্রোহী ও অপরাধী মুসলমানের উপর গুলি করা কিংবা কোনো অমুসলিম আদালতের আসনে ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ হিসেবে বসে কোনো মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া ইত্যাদি। -[মাজেদী]

قَوْلُهُ عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ : অর্থাৎ উক্ত আজাবের উপযুক্ত তখন হবে যখন সে তাকে মু'মিন মনে করে হত্যা করে। যদি হরবী মনে করে হত্যা করে তাহলে আজাবের উপযুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا مَأْوَلٌ بِمَنْ .... : এখান থেকে একটি প্রসিদ্ধ সংশয়ের জবাব দিচ্ছেন। সংশয়: জাহান্নামে চির দিনের জন্য প্রবেশ করবে কাফেররা। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও অকাট্য প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্ট যে, গুনাহগার মুমিনের শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ নয়। কিন্তু এ আয়াতের বহ্যিক অর্থে বুঝা যাচ্ছে হত্যাকারী মুমিনের শাস্তি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

প্রথম জবাব : স্থায়ী জাহান্নাম সেই ব্যক্তির জন্য যে মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ মনে করে। কেননা এর ফলে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যায়। যে এ শাস্তি কাফিরকেই দেওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় জবাব : এ জঘন্যতম অপরাধের প্রকৃত শাস্তি তো হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বাকি আল্লাহ সব কিছুর মালিক। তিনি যা ইচ্ছা করবেন। তিনি দয়ার আচরণ করে চিরদিন নাও দিতে পারেন। এতে অবশ্য **خَلْفُ وَعِيْد** এর সম্ভাবনা রয়েছে। আর **خلف وعده** মন্দ হলেও **خَلْفُ وَعِيْد** মন্দ নয়। শাস্তির ঘোষণা দিয়ে তা না দেওয়ার মাঝে কোনো বিস্ময় নেই। হাদীস শরীফে এসেছে- مَنْ وَعَدَهُ اللّٰهُ عَلٰى عَمَلٍ ثَوَابًا فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَمَنْ اَوْعَدَهُ عَلٰى عَمَلِهِ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ

তারপরও আপত্তি থেকেই যায় যে, প্রকৃত শাস্তি যদি তাই হয় তাহলে তো মুমিনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তিই দেওয়া হচ্ছে যা শরিয়তের অকাট্য নীতির বিপরীত। তাই কেউ কেউ বলেন, এ স্থলে স্থায়ী জাহান্নাম দ্বারা দীর্ঘ জাহান্নাম বাস বোঝান হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا بِدْعَ : اَيْ لَانُدْرَةَ বিস্ময়ের কিছু নেই।

তৃতীয় জবাব : **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ** বলে তৃতীয় জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার সারকথা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বারা অপরাধের জঘন্যতা বুঝানো হয়েছে। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই এ মতের বিপরীত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে।

মু'তাযিলাদের খণ্ডন : قَوْلُهُ بِمَنِ اسْتَحَلَّ : এ অংশটুকু দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতেরও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা জহান্নামে চির দিনের জন্য প্রবেশ করবে কাফেররা। সুন্নাহ, ইজমা ও অকাট্য প্রমাণের আলোকে সুস্পষ্ট যে, গুনাহগার মুমিনের শাস্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশ নয়। পক্ষান্তরে মু'তাযিলারা বলে, যে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে সে যদি তওবা ছাড়া মারা যায় তাহলে সেও চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাবে।

قَوْلُهُ وَهُوَ وَالْعَمْدُ اَوْلٰى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَاِ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে। আর হানাফীদের মতে **قَتْلُ عَمْد** -এর ক্ষেত্রে শুধু কেসাস আসবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে **قَتْلُ خَطَا** এর মাঝে যখন কাফ্ফারা আছে সেহেতু **قَتْلُ عَمْد** -এর মাঝে আরো জোরালোভাবে আসবে। -[কামালাইন-৮০]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٩٤. وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ نَفَرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (رض) بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ وَهُوَ يَسُوْقُ غَنَمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا اِلَّا تَقِيَّةً فَقَتَلُوْهُ وَاسْتَاقُوْا غَنَمَهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ لِلْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَمَ بِاَلِفٍ وَدُوْنَهَا. اَيِ التَّحِيَّةَ اَوِ الْاِنْقِيَادُ بِقَوْلِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ الَّتِيْ هِيَ اِمَارَةٌ عَلٰى اِسْلَامِهِ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَاِنَّمَا قُلْتَ هٰذَا تَقِيَّةً لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ فَتَقْتُلُوْهُ تَبْتَغُوْنَ تَطْلُبُوْنَ بِذٰلِكَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَتَاعَهَا مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ تُغْنِيْكُمْ عَنْ قَتْلِ مِثْلِهِ لِمَا لَهُ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ تُعْصَمُ دِمَاؤُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِكُمُ الشَّهَادَةَ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ بِالْاِشْتِهَارِ بِالْاِيْمَانِ وَالْاِسْتِقَامَةِ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تَقْتُلُوْا مُؤْمِنًا وَافْعَلُوْا بِالدَّاخِلِ فِي الْاِسْلَامِ كَمَا فُعِلَ بِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

৯৪. একদল সাহাবী জিহাদের সফরে কোনো এক পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। পাশে বনূ সুলাইমের এক ব্যক্তি কিছু ছাগল চড়াচ্ছিল। সে তাদেরকে দেখে সালাম করল। তাদের ধারণা হলো, প্রাণ বাচাবার উদ্দেশ্যই এ ব্যক্তি সালাম করেছে। ফলে তারা তাকে হত্যা করে সমুদয় ছাগল ছিনিয়ে নিলেন।

এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে জেহাদের সফরে বের হবে تَبَيَّنُوْا এটা উভয় স্থানেই অপর এক ক্বেরাতে تَثَبَّتُوْا রূপে পঠিত রয়েছে। খুব পরীক্ষা করে নিবে এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে اَلسَّلَمَ এর لَامْ -এর পর اَلِفْ সহ ও তা ব্যতিরেকে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ অভিবাদন করলে, এর অর্থ এরূপও হতে পারে, ইসলামের নির্দর্শন কালিমা-ই শাহাদত পাঠ করে আনুগত্য প্রদর্শন করলে ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী কামনায় তাকে বলো না, তুমি বিশ্বাসী নও তুমি কেবল নিজের জান ও মাল রক্ষা করে এরূপ বলছো। আর এর ফলশ্রুতিতে তাকে হত্যা করে ফেলবে– এমন যেন না হয়।

আল্লাহর নিকট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রচুর অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড হতে যা তোমাদেরকে অনপেক্ষ করতে সক্ষম। তোমরাও তো পূর্বে এরূপই ছিলে। শুধুমাত্র কালিমা-ই-শাহাদতের স্বীকৃতির মাধ্যমেই তো তোমরা নিজেদের জান মাল রক্ষা করতে পারলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের ঈমানের সংবাদ প্রচার করে দিয়ে ও ঈমানে তোমাদেরকে দৃঢ়তা দান করত: তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং কোনো বিশ্বাসী ব্যক্তিকে হত্যা করছো কি-না তা পরীক্ষা করে নেবে। তোমাদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত জনের সাথেও অদ্রূপ ব্যবহার করবে।

তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

تَقِيَّةً : تَقِيَّةً -আত্মরক্ষা, খোদাভীতি, বাবে ضَرَبَ থেকে وَقَى يَقِى تُقًى রক্ষা করা।
اِسْتَاقَ : اِسْتَاقَ [বাবে اِفْتِعَالٌ] চালিয়ে নেওয়া পরিচালিত করা।
تَبَيَّنَ : تَبَيَّنَ [বাবে تَفَعُّلٌ] পরীক্ষা করা , যাচাই করা, স্পষ্ট হওয়া।
اِنْقِيَادٌ : اِنْقِيَادٌ - আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া।
مَتَاعٌ : مَتَاعٌ বহুবচন غَنَائِمُ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।
دِمَاءٌ : دَمٌ ব.ব دِمَاءٌ রক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে মুমিন হত্যার আলোচনা ছিল। এখানে বলা হচ্ছে, মুসলমান হওয়ার জন্য বাহ্যিক নিদর্শনাবলিই যথেষ্ট। জাহেরী আলামত দেখেই বিরত থাকতে হবে। ভেতরে সে মুমিন হোক বা না হোক।

শানে নুযূল ও আলোচনা : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ একদল মুজাহিদকে এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন। সে সম্প্রদায়ের একজন লোক মুসলিম ছিলেন। নাম মারদাস ইবনে নাহীক। মুসলমানরা হামলা করলে সে কওমের সকলে পালিয়ে যায়। শুধু মিরদাস ইবনে নাহীক একা থেকে যায় এবং সে নিজের যাবতীয় ধন সম্পদ নিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। মুজাহিদগণকে দেখে তিনি সালাম দিলেন। কিন্তু তারা তাকেও কাফির মনে করলেন এবং ভাবলেন, জানমাল বাচানোর দায়ে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছে। কাজেই তারা তাকে হত্যা করলেন এবং তার পশুপাল ও ধন সম্পদ হস্তগত করলেন। হত্যাকারী সাহাবী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে উসামা। রাসূল ﷺ -এর পালকপুত্র যায়েদ নয়। তিনি গিয়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার তলোয়ার থেকে বাচার জন্য সালাম করেছে এবং কালিমা পড়েছে। রাসূল ﷺ রাগতস্বরে বললেন هَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَهُ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে? তারপর যায়েদ ইবনে উসামা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ" আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূল ﷺ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং কাফফারা স্বরূপ গোলাম আজাদ করতে বললেন। সেই সাথে তার পশুপাল ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত যায়েদ বিন উসামা (রা.) সে ভুলের কারণে হৃদয়ে এত বেশি চোট পেলেন যে, এতেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। ইন্তেকালের পর দাফন করা হলো। কিন্তু তৎক্ষণাত লাশ কবর থেকে বের হয়ে যায়। তিনবার এ ঘটনার ঘটল। উপস্থিত লোকজন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদিও মাটি তার চেয়ে মন্দ লোককে গ্রহণ করেছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সতর্ক করার জন্য এমনটি করেছেন। তারপর বললেন, যাও এবার দাফন কর। এবার দাফন করার পর মাটি তাঁকে গ্রহণ করেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এতে মুসলিমগণকে সাবধান ও তাকিদ করা হয়েছে যে, তোমরা যখন যুদ্ধাভিযানে যাও, তখন যাচাই করে কাজ করো। চিন্তা ভাবনা না করে কোনো পদক্ষেপ নিও না। কেউ তোমাদের সামনে নিজেকে মুসলিমরূপে প্রকাশ করলে, তার মুসলিম হওয়াকে কখনই অস্বীকার করো না। মহান আল্লাহর নিকট প্রচুর গনিমত আছে এরূপ তুচ্ছ মালামালের পতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলি বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোনো বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে। [মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا :
ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয় : আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোনো কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا। অর্থাৎ তোমারা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কার্জ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। এমনটি যেন না হয়, কাফির ভেবে কোনো কালিমা পড়া মুসলমানকে হত্যা করে ফেল।

এরূপ তথ্যানুসন্ধান ও সতর্কতা অবলম্বন করা সফর ও বাড়িতে, স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্রই এবং সর্বাবস্থায়ই ওয়াজিব। তবে এ ক্ষেত্রে জিহাদের সফর দ্বারা কেবল এ কারণে সীমিত করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে ঘটনাটি আকস্মিকভাবে জিহাদের সফরেই ঘটে যায়। -[কুরতবী সূত্রে মাজেদী]

http://islamiboi.wordpress.com

কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণত: সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণত জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ খবর না নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে ভেবে চিন্তে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে। -[বাহরে মুহীত সূত্রে মাআরিফুল কুরআন]

কেবলার অনুসারীকে কাফের না বলার তাৎপর্য : এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কালেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোনো ইসলামি বৈশিষ্ট যথা নামাজ, আজান ইত্যাদিতে যোগদান করে তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলমানদের মতোই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ কথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপর ও উপরিউক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন সে, নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভুত বলার কিংবা তার সাথে কাফেরের মতো ব্যবহার করার অধিকার কারও নেই। এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন: আমরা কেবলার অনুসারীকে কোনো পাপ কার্যের কারণে কাফের সাব্যস্ত করি না। কোনো কোনো হাদীসে এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহগার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফের বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলামান বলে, কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোনো কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংগঠিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতোই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারও থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরি কালেমা ও বলাবলি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোনো অকাট্য ও স্বত:সিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফেরদের কোনো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে, যেমন- গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহতীতভাবে কুফরি কাজকর্মের কারণে কাফের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদি ও খ্রিস্টান সবাই নিজেকে মুমিন মুসলমান বলত। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কালেমার স্বীকারোক্তিই নয়, ইসলামি বৈশিষ্ট্য, যথা নামাজ আজান ইত্যাদির ও অনুগামী ছিল। আজানে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাথে আশহাদু আন্না মহাম্মাদার রাসূলুল্লাহও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকে ও নবী রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবি করত, যা কুরআন সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের এজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হলো এই যে, প্রত্যেক কালেমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে তা খোজাখুজি করার প্রয়োজন নেই, অন্তরের বিষয় আল্লাহর হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোনো কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুরতাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনোরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই। -[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ : এখানে মুসলমান সাহাবী ও অন্যান্যদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমারাও এরূপই ছিলে, অর্থাৎ ইসলামের আগে তোমরা পার্থিব স্বার্থে অন্যায় রক্তপাত করতে। এখন তো তোমরা মুসলিম। কাজেই তা আর করা উচিত নয়। বরং যা সম্পর্কে মুসলিম, হওয়ার সম্ভাবনা ও থাকে, তাকে হত্যা করতে যেয়ো না। কিংবা অর্থ এই যে, ইতিপূর্বে ইসলামের সূচনা লগ্নে তোমরা কাফিরদের দেশেই বাস করতে। তোমাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও স্বতন্ত্র আবাসভূমি ছিল না। তখন তোমাদের ইসলাম যেমন গ্রহণযাগ্য ছিল এবং তোমাদের জান মালের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উচিত সে রকম মুসলিমগণের সার্বিক নিরপত্তা বিধান করা। কাউকে যাচাই না করে হত্যা করো না। চিন্তাভাবনা ও সতর্কতার সাথে কাজ করা উচিত।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রকাশ্য কাজ কর্ম ও মনের অভিপ্রেত সবই জানেন। কাজেই, যাকে হত্যা করবে কেবল মহান আল্লাহর আদেশ অুযায়ীই হত্যা করবে। কোনো ব্যক্তি স্বার্থের যেন এতে দখল না থাকে। কোনো কাফির যদি নিজের জান মালের ভয়ে তোমাদের সম্মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং ধোঁকা দিয়ে জান মাল রক্ষা করে নেয়, তবে আল্লাহ পাক তো সব জানেন। তাঁর শাস্তি হতে রক্ষা পাবে না কিছুতেই। কিন্তু তোমরা তাকে কিছুই বলো না। এটা তোমাদের কাজ নয়। আমিই দেখব।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

৯৫. لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ الْجِهَادِ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ بِالرَّفْعِ صِفَةٌ وَالنَّصَبِ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ زَمَانَةٍ اَوْ عَمًى وَنَحْوِهِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ لِضَرَرٍ دَرَجَةً ط فَضِيْلَةً لِاِسْتِوَائِهِمَا فِى النِّيَّةِ وَزِيَادَةِ الْمُجَاهِدِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَكُلًّا مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى الْجَنَّةَ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ اَجْرًا عَظِيْمًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ ـ

৯৫. [বিশ্বাসীদের মধ্যে] অঙ্গহীনতা, দুর্বলতা, অন্ধত্ব ইত্যাদির কারণে যারা অক্ষম নয় অথচ জিহাদ না করে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় জানমাল দ্বারা জেহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধনপ্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যারা ওজরবশত [ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা ফজিলত দিয়েছেন। তারা উভয়ে নিয়ত হিসাবে সমান তবে জিহাদকারী সক্রিয়ভাবে তাতে লিপ্ত বলে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ প্রত্যেককেই উভয় দলকেই কল্যাণের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা ওজর অজুহাত ব্যতিরেকে ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

غَيْرُ এটা رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত হলে صَفْ বা বিশেষণরূপে গণ্য হবে। আর نَصَبْ [যবর] সহকারে পঠিত হলে اِسْتِثْنَاءْ বা ব্যত্যয় বলে বিবেচ্য হবে।

৯৬. دَرَجٰتٍ مِنْهُ مَنَازِلَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنَ الْكَرَامَةِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِاَوْلِيَائِهِ رَحِيْمًا بِاَهْلِ طَاعَتِهِ ـ

৯৬. এটা তাঁর নিকট হতে মর্যাদা অর্থাৎ, মর্যাদা হিসাবে কতক হতে অপর কতক সুউচ্চ মানযিলসমূহ এবং ক্ষমা ও দয়া। আল্লাহ তাঁর ওলীদের প্রতি ক্ষমাশীল এবং আনুগত্য পরায়ণদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

دَرَجٰت -এটা পূর্বোক্ত আয়াতের اَجْرًا -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً এখানে উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে مَصْدَرْ বা সমধাতুজ কর্ম হিসাবে এ উভয়টি مَنْصُوْب যবরযুক্ত] রূপে পঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

لَايَسْتَوِىْ : সমান নয়। اَلْاِسْتِوَاءُ সমান হওয়া।

اَلْقَاعِدُوْنَ : যারা ঘরে বসে থাকে।

زَمَانَةٌ : অঙ্গহীনতা।

بِالْمُبَاشَرَةِ : সরাসরি, সক্রিয়ভাবে লিপ্ত।

بِالرَّفْعِ صِفَةٌ অর্থাৎ قَاعِدُوْنَ -এর সিফত হওয়ার কারণে غَيْرُ শব্দটি মারফূ' হবে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রশ্ন : اَلْقَاعِدُوْنَ তো اَلِفْ لَامْ -এর সিফত হওয়ার কারণে مَعْرِفَةٌ হয়েছে তাই এটি সিফত হওয়া শুদ্ধ হলো কিভাবে?

উত্তর :

১. غَيْر শব্দটি বিপরীত বস্তুর মাঝে পতিত হয় তখনও তা مَعْرِفَةٌ হয়ে যায়।

২. اَلْقَاعِدُوْنَ এর মাঝে اَلِفْ لَامْ টি হয়েছে। যার কারণে এটি نَكِرَةٌ -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩. اَلْقَاعِدُوْنَ দ্বারা যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট জাতি উদ্দেশ্য নয়, তাই এটি نَكِرَةٌ ই রয়ে গেছে। মারেফা তো اَلْقَاعِدُوْنَ তখন হয় যখন তার কোনো নির্দিষ্ট জাতি উদ্দেশ্য হবে।

বাহ্যিকভাবে غَيْر শব্দটি اَلْقَاعِدُوْنَ থেকে بَدَل হয়েছে। আর بدل مبدل منه -এর মাঝে تَعْرِيْف وَتَنْكِيْر -এর মাঝে মোতাবাকাত আবশ্যক নয়। غَيْر -এর উপর নসব পড়া ও জায়েজ আছে القاعدون থেকে اِسْتِثْنَاء -এর কারণে। مِنَ الزَّمَانَة এটি لِلضَّرَر -এর بَيَانٌ হয়েছে।

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ الخ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : উপরে না জেনেশুনে হত্যা করার কারণে মুসলমানগণকে ভর্ৎসনা ও সাবধান করা হয়েছিল, যে কারণে সম্ভাবনা ছিল কেউ এর প্রতিক্রিয়ায় জিহাদই ছেড়ে দেবে। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদগণের সামনে এরূপ এসেই পড়ে। তাই এ আয়াতে মুজাহিদগণের মর্যাদা তুলে ধরে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়াতের সারমর্ম, পঙ্গু অন্ধ, রুগ্ণ ও ওজর বিশিষ্টদের জন্য তো জিহাদ ফরজ নয়। বাকি সব মুসলিমগণের মধ্যে যারা জিহাদ করে, তাদের বিরাট মর্যাদা জিহাদ থেকে যারা বিরত, তারা সে মর্যাদা হতে বঞ্চিত, যদিও জিহাদ না করলেও তারা জান্নাতী হবে, বটে। বোঝা গেল, জিহাদ ফরযে কিফায়া। ফরযে আইন নয়। অর্থাৎ মুসলিমগণের মধ্যে প্রয়োজন মাফিক একদল লোক যদি জিহাদে লিপ্ত থাকে তবে বাকিদের কোনো গুনাহ হবে না। নচেৎ সকলেই গুনাহগার হবে।

শানে নুযূল : যখন এ আয়াত নাজিল হয় যে, ঘরে অবস্থানকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী সমান নয়, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) [অন্ধ সাহাবী] সহ আরো প্রতিবন্ধী ও দুর্বল সাহাবীগণ আরজ করল, আমরা তো মাজুর। ওজরের কারণে আমরা জিহাদে শামিল হতে পরি না। ফলে আমরা জিহাদের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত থাকছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ অংশটি নাজিল করে ইস্তেসনা করে দেন যে, ওজরের কারণে যুদ্ধে অংশ করতে অপারগ ব্যক্তিরা প্রতিদানে মুজাহিদদের সাথে শামিল থাকবে।

قَوْلُهُ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ : অর্থাৎ مَغْفِرَةً এবং رَحْمَةً উভয়টি স্বীয় فِعْل مُقَدَّر -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে أَجْرًا -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে নয়, তাকদীরী ইবারত এভাবে হবে- غَفَرَ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَرَحِمَهُمُ الله رَحْمَةً

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি জিহাদকারীদের জন্য প্রতিদান, ক্ষমা ও দয়ার যে অঙ্গীকার করেছেন তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কিংবা, মুজাহিদগণের দ্বারা অজ্ঞাতসারে কোনো মুসলিমের রক্তপাত ঘটলে তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই এ আশঙ্কায় জিহাদ ত্যাগ করো না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

٩٧. وَنَزَلَ فِيْ جَمَاعَةٍ اَسْلَمُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا فَقُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ مَعَ الْكُفَّارِ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ بِالْمُقَامِ مَعَ الْكُفَّارِ وَتَرْكِ الْهِجْرَةِ قَالُوْا لَهُمْ مُوَبِّخِيْنَ فِيْمَ كُنْتُمْ اَيْ فِيْ اَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ مِنْ اَمْرِ دِيْنِكُمْ قَالُوْا مُعْتَذِرِيْنَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ عَاجِزِيْنَ عَنْ اِقَامَةِ الدِّيْنِ فِي الْاَرْضِ اَرْضِ مَكَّةَ قَالُوْا لَهُمْ تَوْبِيْخًا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا مِنْ اَرْضِ الْكُفْرِ اِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ كَمَا فَعَلَ غَيْرُكُمْ قَالَ تَعَالٰى فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا هِيَ .

৯৭. কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু তারা হিজরত করে আসেনি। ফলে তারা বদর যুদ্ধে কাফিরদের সাথে শামিল হয়ে নিহত হয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, যারা কাফিরদের সাথে অবস্থান করতঃ এবং হিজরত পরিত্যাগ করত: নিজেদের উপর জুলুম করেছে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতারা ভর্ৎসনা স্বরে তাদেরকে [বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?] অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা কৈফিয়ত দানরূপে বলে দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম অর্থাৎ মক্কা ভূমিতে দীনের প্রতিষ্ঠা করতে আমরা অক্ষম ছিলাম। তারা ভর্ৎসনা স্বরে তাদেরকে [বলে] অন্যান্যদের মতো কুফরিস্থান ত্যাগ করত: অন্যস্থানে তোমরা হিজরত করে যাওয়ার মতো আল্লাহর দুনিয়া কি এতটুকু প্রশস্ত ছিল না? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এদের আবাসস্থল জাহান্নাম আর কত মন্দ আবাস এটা।

٩٨. اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً لَا قُوَّةَ لَهُمْ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَا نَفَقَةَ وَلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلٰى اَرْضِ الْهِجْرَةِ .

৯৮. তবে যেসব অসহায় পুরুষ নারী ও শিশু কোনো উপায় পায় না অর্থাৎ হিজরত করার যাদের শক্তি ও সঙ্গতি নেই এবং হিজরতের বা অন্য অঞ্চলে যাওয়ার কোনো পথও পায় না।

٩٩. فَاُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا .

৯৯. আল্লাহ হয়তো তাদের পাপ মোচন করবেন। কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

١٠٠. وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا مُهَاجَرًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فِي الطَّرِيْقِ كَمَا وَقَعَ الْجُنْدَعِ بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ فَقَدْ وَقَعَ ثَبَتَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

১০০. কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল অর্থাৎ হিজরতযোগ্য স্থান এবং জীবনোপকরণে প্রাচুর্য লাভ করলে এবং কেউ আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে বের হলে এবং পথে তার মৃত্যু ঘটলে যেমন জুনদা ইবনে যামরা আল লাইসীর বেলায় ঘটেছিল তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর সুসাব্যস্ত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

بِالْمَقَامِ : অবস্থান করার কারণে।

مُوَبِّخِيْنَ : مُوَبِّخٌ [اِسْم فَاعِل : وَاحِدٌ مُذَكَّر] ব. ব مُوَبِّخُوْنَ ধমকদাতা।

مُهَاجَرٌ : مَهْجَرٌ ব. ব مَهَاجِر সফর করার স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দ্বীন ও ঈমান বাচানোর জন্য হিজরত করা ফরজ : এমন কিছু মুসলিমও আছে, যারা সত্যিকারভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা কাফির রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং তাদের কাছে অসহায়। কাফিরদের ভয়ে তারা প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতে পারে না। জিহাদের আদেশও তারা তামিল করতে সক্ষম হয় না। তাদের জন্য সে দেশ ত্যাগ করা ফরজ। এ রুকুতে তারই আলোচনা।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে অর্থাৎ কাফিরদের সাথে মিলেমিশে বাস করে, আর হিজরত করে না, তাদের মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন দীনের অনুসারী ছিলে? তারা বলে আমরা তো মুসলিমই ছিলাম, কিন্তু অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা হেতু দীনের কাজ কর্ম করতে পারতাম না। ফেরেশতাগণ বলেন, মহান আল্লাহর জমিন তো সুপ্রশস্ত ছিল। তোমরা তো অন্যত্র হিজরত করতে পারতে? বস্তুত এরূপ লোকদের আবাসস্থল জাহান্নাম। হ্যা, যারা দুর্বল কিংবা নারী ও শিশু, না হিজরতের উপায় গ্রহণ করতে পারে, না তাদের হিজরতের পথ জানা আছে, তারা ক্ষমার যোগ্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এতদ্বারা জানা গেল, যে দেশে মুসলিমগণ খোলামেলা [নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারে না, সেখান থেকে হিজরতে করা ফরজ। কেবল ওজর বিশিষ্ট ও অসহায় ছাড়া আর কারোর জন্য সেখানে পড়ে থাকার অনুমতি নেই।

বর্তমানে হিজরতের বিধান : যখন ইসলামের পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি অর্জিত হলো এবং বিরুদ্ধবাদীদের শক্তি খর্ব হলো তখন থেকে হিজরতের আবশ্যিকতা বাকি থাকেনি। এতদসত্ত্বেও কখনো কোথাও হিজরত করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে হিজরত করা ওয়াজিব হবে। আর لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ হাদীসের মর্মও তাই।

হিজরতের সংজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে হিজরতের ফজিলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি হিজরান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অসন্তুষ্টচিত্তে কোনো কিছুকে ত্যাগ করা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় দারুল কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত। -[রুহুল মা'আনী]

মোল্লা আলী কারী (র.) মেশকাতের শরাহতে বলেন, ধর্মীয় কারণে কোনো দেশ ত্যাগ করা হিজরতের অন্তর্ভুক্ত। -[মেরকাত ১ম খণ্ড ৩৯ পৃ.]

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোনো দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরতের ফজিলত : জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কুরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কুরআনের পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এক. হিজরতের ফজিলত, দুই. হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং তিন. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

হিজরতের ফজিলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাক্বারায় এক আয়াতে রয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পাথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহপ্রার্থী। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা তওবায় আছে : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জানা ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে বিরাট মর্যদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

http://islamiboi.wordpress.com

তৃতীয় আয়াত : আলোচ্য সূরা নিসার–

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার ছওয়াব আল্লাহর জিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে যান। পথিমধ্যে সর্পদংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোটকথা, উপরিউক্ত তিনটি আয়াত দারুল কুফর থেকে হিজরতের উৎসাহ দান এবং বিরাট ফজিলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয়।

হিজরতের বরকত : হিজরতের বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

যারা আল্লাহর জন্য হিজরতে করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট ছওয়াব তো রয়েছেই , যদি তারা বুঝে।

সূরা নিসার উল্লিখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে। 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ সুবিধা পাবে।

আয়াতে বর্ণিত مُرَاغَمْ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مُرَاغَمًا বলে দেওয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য হিজরত করে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের ছওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

মোটকথা হলো– আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে মুহাজিরদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব প্রতিপত্তি অন্বেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বুখারী শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের জন্যই হয়। অর্থাৎ এটিই বিশুদ্ধ হিজরত।এর ফজিলত ও বরকত কুরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ঐ বস্তুই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।

আজকাল কিছু সংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তরবর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। [মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهٗ وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً :

হিজরতের উপকারিতা : এ আয়াতে হিজরতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মাহান আল্লাহর জন্য হিজরত করবে ও নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করবে, সে বসবাসের জন্য বহু জায়গা পাবে এবং তাঁর জীবন ও জীবিকা নির্বাহের স্বাচ্ছন্দ্য......

লাভ হবে কাজেই, কোথায় থাকবে, কি খাবে এ ভয়ে হিজরত থেকে বিরত থেকো না এবং আশঙ্কাও করো না যে, পথিমধ্যে মৃত্যু হয়ে গেলে না এ দিকের থাকলাম, না ওদিকের হলাম। কেননা এ অবস্থায়ও হিজরতের পুরোপুরি ছওয়াব লাভ হবে। মৃত্যু তো তার নির্দিষ্ট সময়ই আসে, আগে আসতে পারে না।

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ.

শানে নুযূল : সাদ ইবনে জুবাইর প্রমুখ থেকে তাবারী বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত জমরাহ নামক এক ব্যক্তির ব্যাপারে নাজিল হয়েছে তিনি হিজরতের পর মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। যখন তিনি আল্লাহর কালাম اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا শুনতে পেলেন তখন তিনি অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তার পরিবারের লোকজনকে বললেন, আমাকে মদিনায় নিয়ে চলো। নির্দেশ মতো তারা তাকে খাটে করে মদিনায় নিয়ে চললেল। পথে তানঈম নাক স্থানে পৌছার পর তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। তখন তার প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[জামালাইন, পৃ: ৮৫, খ. ২]

http://islamiboi.wordpress.com

١٠١. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِى الْاَرْضِ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِىْ اَنْ تَقْصُرُوْا
مِنَ الصَّلٰوةِ بِاَنْ تَرُدُّوْهَا مِنْ اَرْبَعٍ
اِلَى اثْنَتَيْنِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمْ اَىْ
يَنَالُكُمْ بِمَكْرُوْهٍ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَيَانٌ
لِلْوَاقِعِ اِذْ ذَاكَ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ وَ بَيَّنَتِ
السُّنَّةُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّفَرِ الطَّوِيْلِ
الْمُبَاحِ وَهُوَ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِىَ
مَرْحَلَتَانِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنَّهُ رُخْصَةٌ لَا وَاجِبٌ
وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا بَيِّنَ الْعَدَاوَةِ.

অনুবাদ :

১০১. এবং তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে পরিভ্রমণ করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে অর্থাৎ তোমাদের ক্ষতিকর কিছু করবে তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে অর্থাৎ, চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত করে আদায় করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাদের শত্রুতা সুস্পষ্ট।

সুন্নাহতে বর্ণিত আছে যে, এ সফরের অর্থ হলো দীর্ঘ ও বৈধ উদ্দেশ্যে যে সফর সংঘটিত হয়। কমপক্ষে তার দূরত্ব চার বুরাদ পরিমাণ স্থান হতে হবে। আর চার বুরাদ হলো দুই মারহালা। [বার হাজার কদমে একমাইল। এ হিসাবে বার মাইলে এক বুরাদ। সুতরাং চার বুরাদে আটচল্লিশ মাইল।]

اِنْ خِفْتُمْ [তোমাদের যদি আশঙ্কা হয়..........] তৎসময়ের বাস্তব অবস্থার বিবরণ হিসাবে এ কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ স্থানে مَفْهُوْمِ مُخَالِفْ বা বিপরীতার্থ বিবেচ্য হবেনা।

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ [এতে তোমাদের কোনো দোষ নেই] এ বাক্যাংশটি দ্বারা প্রমাণ হয় যে. এ বিধানটি জায়েজ মাত্র। এটা ওয়াজিব বা অবশ্যকরণীয় নয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, শরিয়তের পারিভাষিক অর্থে যা সফর সেই সফরে কসর বা সালাত সংক্ষিপ্ত করা জরুরি।

তাহকীক ও তারকীব

يَنَالُ : وَاحِدْ مُذَكَّرْ : مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ (نَيْلٌ) [নাইল] সে পাবে, পায় বাবে سَمِعَ থেকে نَالَ يَنَالُ نَيْلًا অর্থ– পাওয়া।
بَيِّنٌ : وَاحِدْمُذَكَّرْ : صِفَةْ مُشَبَّهَةْ (بَيِّنْ) সুস্পষ্ট, পরিষ্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্বে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও হিজরতের জন্য সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

শানে নুযূল : হযরত আলী (রা.) বলেন বনূ নাজ্জারের কিছু লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের অধিকাংশ সময় সফরে থাকতে হয়। এমন অবস্থায় নামাজ পড়ার কি সূরত? এ প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ : অর্থাৎ তোমরা যখন জিহাদ ইত্যাদির জন্য সফর কর এবং তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তথা কাফিরদের পক্ষ হতে এ আশঙ্কা কর যে, সুযোগ পেলে তারা আক্রমণ করে বসবে। তাহলে সালাত সংক্ষিপ্ত কর। অর্থাৎ বাড়ি থাকাকালে যে সালাত চার রাকাত পড়তে হয়, তা দু'রাকাত পড়।

কসরের বিধান : কাফিরের উৎপীড়নের আশঙ্কা সেই সময় ছিল, যখন এ আয়াত নাজিল হয়। সে আশঙ্কা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ যথারীতি কসর আদায় করতে থাকেন, সাহাবায়ে কেরামকেও এরূপ করতে নির্দেশ দিতেন। এখন হামেশাই সফরে কসরের নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাতে উল্লিখিত ভয় থাকুক বা নাই থাকুক। এটা আল্লাহর তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা জরুরি, যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) -এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো কসরের ব্যাপারে তো ভয় ও শঙ্কার কয়েদ লাগানো হয়েছে এখনতো অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে, এখনও কি কসরের অনুমতি অবশিষ্ট থাকবে? হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার অন্তরেও এ ব্যাপারে সন্দেহ ছিল কিন্তু রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ, সুতরাং তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করো। –[মুসলিম]

সফর এবং কসরের মাসআলা :

* যে সফর তিন মনজিলের কম হয়ে তাতে কসর করার অনুমতি নেই। তিন মনজিল মাইলের হিসেবে ৪৮ মাইল যা প্রায় ৭৭.২৫ কিলোমিটার হয়।
* যে সফরের কসরের অনুমতি রয়েছে তাতে পূর্ণ নামাজ পড়া জায়েজ আছে কি না? হযরত আলী (রা.)হযরত ইবনে ওমর, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত হাসান বসরী, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ, হযরত কাতাদাহ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কসর আবশ্যক। পক্ষান্তরে হযরত উসমান গণী, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস হযরত ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে মুসাফিরের জন্য কসর করা এবং পূর্ণ নামাজ পড়া উভয়টিই জায়েজ।
* পাপের সফরেও ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে কসর করার অনুমতি রয়েছে। অন্যান্য ইমামদের মতে অনুমতি নেই।
* মুসাফির নিজ আবাদী থেকে বের হতেই কসর করতে পারবে। এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্ঠয়ের ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম মালেক (র.) -এর ফতোয়া হলো মুসাফির আবাদী থেকে কমপক্ষে তিন মাইল অতিক্রম করার পর কসর করবে।
* সফরের মঝে কোথাও ইকামতের নিয়ত করলে ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে শুধু চার দিন ইকামতের নিয়ত করলেই কসরের অনুমতি শেষ হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ (র.) -এর মতে বিশ ওয়াক্তের বেশি পরিমাণ নামাজের সময়ের ইকামত করে তাহলে অনুমতি শেষ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে যদি পনের দিন একই জায়গায় অবস্থানের নিয়ত করে তাহলে কসরের অনুমতি শেষ হয়ে যাবে।
* যদি কোথাও পনের দিনের অবস্থানের নিয়ত ছাড়াই কোনো কারণে অবস্থান দীর্ঘ হয়ে যায়, তাহলে কসরই পড়বে। এভাবে বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও।
* কোনো লঞ্চ স্টীমারের ঐ কর্মচারী যে পরিবার পরিজন নিয়ে তাতে বসবাস করে কিংবা এমন ব্যক্তি যে সর্বদা সফরে থাকে সে সবসময় কসর করবে।
* কোনো মুসাফির মুকীমরে পিছনে নামাজের ইক্তেদা করলে পূর্ণ নামাজ পড়বে। ইক্তেদা পূর্ণ নামাজে করুক বা আংশিকের মাঝে করুক। ইমাম মালেক (রা.) -এর মতে কমপক্ষে এক রাকাতে ইক্তেদা আবশ্যক। হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.) বলেন, মুসাফির মুকীমের ইক্তেদা করেও কসর পড়তে পারবে।
* সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌছার পর যদি সেখানে পনের দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থান ও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরিয়তের পরিভাষায় কসর বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদূর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের মতো কসর পড়তে হবে না, পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে।
* কসর শুধু তিনি ওয়াক্তের ফরজ নামাজে হবে। মাগরিব, ফজর সুন্নত ও বিতিরের নামাজে কসর নেই।
* কেউ সফর অবস্থায় মুকীম অবস্থায় কাজা হওয়া নামাজ পড়তে চাইলে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে। এমনিভাবে সফরে কাজা হওয়া নামাজ মুকীম অবস্থায় পড়লে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট কসরই পড়া হবে।
* পূর্ণ নামাজের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধ হয় এতে নামাজ পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ কসরও শরিয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ হয় না, বরং ছওয়াব পাওয়া যায়। –[মাআরেফ পৃ. ২৭৯]

قَوْلَهُ بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ : অর্থাৎ إِنْ خِفْتُمْ শর্তটি কুরআন নাজিলের সময়ের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কেননা এ আয়াত নাজিলের সময় সাধারণ মুসলমানদের সফরে দুশমনের আশঙ্কা বিরাজ করত। সুতরাং এর مَفْهُوم مُخَالِفٌ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, শত্রু আশঙ্কা। না থাকলে নামাজে কসর করা জায়েজ নেই।

قَوْلَهُ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ : بَرِيْد -এর বহুবচন। মূলত : بَرِيْدَهْ دَمْ এর مُعَرَّبْ তথা আরববি কৃত। যার অর্থ লেজকাটা। পথের দূরত্বের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বার হাজার কদমে এক মাইল। এ হিসেবে বার মাইলে এক বুরাদ। সুতরাং চার বুরাদে আট চল্লিশ মাইল। এ হিসাবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্বাভাবিক সফরে তিন দিন তিন রাত সমপরিমাণ দূরত্ব।

قَوْلَهُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ : مُبِيْنًا -এর ব্যাখ্যায় بَيْنَ الْعَدَاوَةِ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مُبِيْن শব্দটি مُتَعَدِّيْ بِمَعْنٰى لَازِمْ

قَوْلَهُ الْمُبَاحُ : এ কয়েদ দ্বারা পাপের সফর বের হয়ে যায় না।

http://islamiboi.wordpress.com

١٠٢. وَاِذَا كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ حَاضِرًا فِيْهِمْ وَاَنْتُمْ
تَخَافُوْنَ الْعَدُوَّ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ وَهٰذَا
جَرٰى عَلٰى عَادَةِ الْقُرْاٰنِ فِى الْخِطَابِ فَلَا
مَفْهُوْمَ لَهٗ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَتَتَاخَّرَ
طَائِفَةٌ وَلْيَاْخُذُوْا اَىِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ قَامَتْ
مَعَكَ اَسْلِحَتَهُمْ مَعَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا اَىْ صَلَّوْا
فَلْيَكُوْنُوْا اَىِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مِنْ وَّرَائِكُمْ
يَحْرُسُوْنَ اِلٰى اَنْ تَقْضُوا الصَّلٰوةَ وَتَذْهَبَ هٰذِهِ
الطَّائِفَةُ تَحْرُسُ وَلْتَاْتِ طَائِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ
يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ
وَاَسْلِحَتَهُمْ مَعَهُمْ اِلٰى اَنْ يَقْضُوا الصَّلٰوةَ
وَقَدْ فَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَذٰلِكَ بِبَطْنِ نَخْلٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَدَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ عَنْ
اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ
مَيْلَةً وَّاحِدَةً بِاَنْ يَحْمِلُوْا عَلَيْكُمْ فَيَاْخُذُوْكُمْ
وَهٰذَا عِلَّةُ الْاَمْرِ بِاَخْذِ السِّلَاحِ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ
مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ فَلَا تَحْمِلُوْهَا
وَهٰذَا يُفِيْدُ اَنْ يُّجَابَ حَمْلُهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُذْرِ
وَهُوَ اَحَدُ قَوْلَىِ الشَّافِعِىِّ (رح) وَالثَّانِىْ اَنَّهٗ
سُنَّةٌ وَّرُجِّحَ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ مِّنَ الْعَدُوِّ اَىْ
اِحْتَرِزُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ
لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ذَا اِهَانَةٍ.

অনুবাদ :

১০২. হে মুহাম্মদ ! তুমি যখন তাদের মাঝে উপস্থিত থাক আর তোমরা শত্রুর ভয় কর এ অবস্থায় তাদের সাথে সালাত কয়েম কর তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় আর আরেক দল যেন পিছনে থাকে এবং যে দল তোমার সাথে দাঁড়িয়েছে তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারা যখন সিজদা করবে অর্থাৎ সালাত আদায়ে থাকবে তখন তারা যেন অর্থাৎ অপর দলটি যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান করে। তারা সালাত না হওয়া পর্যন্ত পাহারা দিবে এবং পরে এ দল অর্থাৎ যারা তোমার সাথে প্রথমে দাড়িয়েছে তারা পাহারা দিতে যাবে।

আর অপর দল যারা সালাতে শরিক হয়নি, তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরিক হয় এবং সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।

শায়খাইন [বুখারী ও মুসলিম] বর্ণনা করেন যে, বাতনে নাখ্‌লা নামক স্থানে রাসূল ﷺ এরূপ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করেছিলেন।

فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ [যখন তুমি সালাত কায়েম করবে] আল কুরআনের প্রচলিত রীতি অনুসারে এখানেও রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে বটে তবে مَفْهُوْم مُخَالِفْ বা বিপরীতার্থ বিবেচ্য হবে না।

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কামনা করে তোমরা যখন সালাতে দাড়াও তখন যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও আর তারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ তোমাদের উপর হামলা চালিয়ে তোমাদেরকে পাকড়াও করে ফেলতে পারে। এটাই হলো সালাতের সময় অস্ত্র হাতে রাখার কারণ।

যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমারা অস্ত্র রেখে দিলে ওটা সাথে বহন না করলে তোমাদের কোনো দোষ নেই।

এ বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, এ সুবিধা না থাকলে অস্ত্র সাথে বহন করা অবশ্য জরুরি। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্যতম অভিমত। তার অপর অভিমত হলো, এটা সুন্নত। এ মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত।

শত্রু হতে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব তোমারা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

تَتَأَخَّرُ : (مُضَارِعٌ مَعْرُوفٌ : وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ) সে পিছনে থাকে, থাকবে বাবে تَفَعُّلٌ থেকে বিলম্ব করা, পিছনে পড়া।

أَسْلِحَةٌ : سِلَاحٌ বহুবচন أَسْلِحَةٌ অস্ত্র, সরঞ্জাম।

يَحْرُسُونَ : (مُضَارِعٌ مَعْرُوفٌ : جَمْعٌ مُذَكَّرٌ) তারা পাহারা দিবে, দেয়। বাবে نَصَرَ থেকে حَرَسَ يَحْرُسُ حَرْسًا حِرَاسَةً পাহারা দেওয়া, প্রহরায় থাকা।

اِحْتَرِزُوْا : (مَاضِيْ مَعْرُوفٌ : جَمْعٌ مُذَكَّرٌ) তারা বেঁচে থাকবে বা প্রহেজ করবে, বাবে افتعال থেকে পরহেজ করা, বেঁচে থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শক্র আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে সালাতের নিয়ম : পূর্বে সফর অবস্থায় সলাত আদায়ের নিয়ম বলা হয়েছিল। এবার শক্রর আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে সে অবস্থায় কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে তার বর্ণনা। কাফির বাহিনীর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকলে মুসলিম বাহিনী দু'দলে বিভক্ত থাকবে। একদল ইমামের সাথে অর্ধেক সালাত আদায় করে শক্রর সামনে গিয়ে অবস্থান নিবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে অর্ধেক আদায় করবে। ইমাম সালাম ফেরানোর পর উভয় দল পৃথকভাবে অবশিষ্ট অর্ধেক আদায় করে নিবে। মাগরিবের সালাত হলে প্রথম দল দু'রাকাত এবং দ্বিতীয় দল এক রাকাত ইমামের সাথে আদায় করবে এ অবস্থায় সালাতে চলাফেরা ক্ষমাযোগ্য। তরবারি, বর্ম, ঢাল ইত্যাদিও সাথে রাখার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে শক্র সৈন্য সুযোগ পেয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে না বসে।

শানে নুযূল : হযরত আবূ আইয়্যাশ (রা.) বলেন, আমরা যাতুর রিকার অভিযানে আসফালান এবং দাহনান নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। সে অভিযানে মুশরিকরা আমাদের কিবলার দিকে অবস্থান করেছিল। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ সে সময় মুসলমান হননি। তিনি মুশরিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। যোহরের সময় হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে জামাত করে নামাজ আদায় করেন। তখন তারা পরস্পরে বলাবলি শুরু করল যে, একটি সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেল। যদি নামাজরত অবস্থায় মুসলমানদের উপর হামলা করা হতো তাহলে সহজেই কাজ হয়ে যেত। তখন তাদের একজন বলে উঠল, একটু পরেই তাদের এমন একটি নামাজ রয়েছে, যা তাদের কাছে জানমাল ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা বেশি প্রিয়। মুশরিকরা আসর নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করছিল। এদিকে মুশরিকদের এ আলোচনা চলছিল অপর দিকে হযরত জিবরীল (আ.) সালাতুল খওফ পড়ার বিধান সম্বলিত উক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন।

–[ইবনে কাসীর : খ. ১, পৃ : ৫৪৮ জামালাইন : খ. ২, পৃ : ৯০]।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইক্তেদায় 'সালাতুল খওফ : যখন আসরের সময় হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণ বাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর গোটা বাহিনী দু'টি সারিতে বিভক্ত হয়ে হুজুরের ইক্তেদায় নামাজ শুরু করলেন। সকলেই প্রথম রাকাতের রুকু এবং কিয়াম একত্রে করলেন। সিজদার সময় প্রথম কাতারে সৈন্যরা নবীজি ﷺ -এর সাথে সিজদা করল এবং দ্বিতীয় কাতারের সৈন্যরা দাড়িয়ে রইলেন। যাতে মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সিজদাবস্থায় দেখে সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস না করে। প্রথম কাতারের সৈন্যরা সিজদা করে উঠার পর দ্বিতীয় কাতারের সৈন্যরা নিজ নিজ স্থানে সিজদা করে নেন। তারপর সামনের কাতারের সৈন্যরা পেছনে এবং পেছনের সৈন্যরা সামনে চলে যান। দ্বিতীয় রাকাতের কিয়াম ও রুকু সকলে একত্রে করার পর সিজদার সময় পুনরায় পূর্বের নিয়মে প্রথম কাতার ওয়ালারা নবীজির সাথে সিজদা করেছেন এবং দ্বিতীয় কাতারের সৈন্যরা দাড়িয়ে থাকেন এবং পরে সিজদা করে নেন। এভাবেই বাকি নামাজটুকু শেষ করা হয়।

সলাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি : এখানে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধের ময়দান ঈদের ময়দানের মতো হয় না যে, সব সময় একই পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করা হবে। বরং সেখানে তরবারির ঝনঝনানী, তীরের বর্ষণ, বন্দুকের গর্জন, তোপ-কামানের গোলা বর্ষণ ইত্যাদি ভয়ানক অবস্থায় নামাজ পড়তে হয়। এজন্য যুদ্ধের অবস্থার বিভিন্নতার কারণে সেখানে নামাজ পড়ার পদ্ধতি ও বিভিন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ নামাজের চৌদ্দটি পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। ইমামগণ নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী সে পদ্ধতিগুলো থেকে কোনো একটি বা কয়েকটি পদ্ধতি নির্বাচন করেছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো পছন্দ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে পছন্দনীয় পদ্ধতি : সৈন্য বাহিনীর এক অংশ ইমামের সাথে নামাজ পড়বে এবং আরেক অংশ শক্রদের মোকাবিলায় থাকবে। এক রাকাত পূর্ণ হলে প্রথম অংশ সালাম ফিরিয়ে শক্রদের মোকাবিলায় যাবে এবং

http://islamiboi.wordpress.com

দ্বিতীয় অংশ এসে ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শরিক হবে। এভাবে ইমামের দুই রাকাত শেষ হবে এবং সৈন্যদের এক এক রাকাত। [এ পদ্ধতিটি হযরত ইবনে আব্বাস, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ এবং মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত]।

সালাতুল খওফের দ্বিতীয় পদ্ধতি : দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, প্রথম অংশ ইমামের সাথে এক রাকাত পড়ে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে এক রাকাত ইমামের পিছনে পড়বে। তারপর প্রত্যেকে পালাক্রমে এসে নিজেদের ছুটে যাওয়া নামাজের এক এক রাকাত নিজে নিজে আদায় করবে। এভাবে প্রত্যেক অংশের এক রাকাত ইমামের সাথে হবে এবং এক রাকাত ভিন্ন ভিন্নভাবে হবে।

সালাতুল খওফের তৃতীয় পদ্ধতি : তৃতীয় পদ্ধতি হলো– ইমামের পেছনে সৈন্যদের এক অংশ দুই রাকাত আদায় করবে এবং তাশাহহুদের পর সালাম ফিরিয়ে দুশমনদের মোকাবিলায় যাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে তৃতীয় রাকাতে এসে শরিক হবে এবং ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে। এভাবে ইমামের চার রাকাত হবে এবং সৈন্যদের দুই দুই রাকাত হবে।

সলাতুল খওফের চতুর্থ পদ্ধতি : সৈন্যদের এক অংশ ইমামের সাথে এক রাকাত পড়বে এবং ইমাম দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ালে মুক্তাদীগণ নিজেরা এক রাকাত তাশাহুদসহ পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর দ্বিতীয় অংশ এসে এ অবস্থায় ইমামের পিছনে ইক্তিদা করবে। ইমাম এখনও দ্বিতীয় রাকাতে থাকবেন। তারা অবশিষ্ট নামাজ ইমামের সাথে পড়ার পর নিজেরা এক রাকাত পড়ে নিবে। এ সুরতে ইমামকে দ্বিতীয় রাকাতের কিয়াম দীর্ঘায়িত করতে হবে।

এছাড়াও আরো পদ্ধতি রয়েছে। জানার জন্য ফিকহের বড় বড় কিতাবের দ্রষ্টব্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সালাতুল খওফের বিধান : আয়াতে বলা হয়েছে اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ [অর্থাৎ আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন], এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ' এর বিধান নেই। কেননা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে । নবী বিদ্যমান থাকলে ওজর ব্যতীত অন্য কেউ নামাজে ইমাম হতে পারে না । রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তার স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফিকহবিদগণের মতে সালাতুল খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি। [মা'আরিফ : ২৭৯]

ইমামদের মধ্যে শুধু ইমাম আবূ ইউসুফ (রা.)-এর মাজহাব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর সালাতুল খওফ পড়া জায়েজ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পর এখন এমন কোনো ব্যক্তিত্ব বাকি নেই যার পেছনে সকলে নামাজ পড়ার জন্য লালায়িত হবে। বরং এখন পদ্ধতি এই হতে পারে যে, সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে নিবে। [জামালাইন]

* মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে সালাতুল খওফ পড়া যেমন জায়েজ, তেমনিভাবে যদি বাঘ ভল্লুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাজের সময় ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনও সালাতুল খওফ পড়া জায়েজ।
* আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকাত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাতের নিয়ম হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাকাতের পর সালাম ফিরিয়েছেন। [বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের দ্রষ্টব্য।]

قَوْلُهُ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ : এ অংশটুকু দ্বারা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতের খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র.) উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর صَلَاةُ الْخَوْفِ জায়েজ নেই। অন্যান্য ইমামদের নিকট তা এখনও জায়েজ আছে। তবে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে বালার কারণ হলো কুরআনের বর্ণনাধারার স্বাভাবিক রীতি।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَحْمِلُوْا عَلَيْكُمْ فَيَاْخُذُوْكُمْ : এটি وَلْيَاْخُذُوْهُمْ -এর ইল্লত। অর্থাৎ হাতিয়ার এ জন্য সাথে রাখবে যে, যাতে শত্রুরা অতর্কিত হামলা না করতে পারে।

قَوْلُهُ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ : অর্থাৎ বৃষ্টি, অসুস্থতা বা দুর্বলতা হেতু যদি অস্ত্র বহন করা মুশকিল হয়, তবে অস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি আছে তবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখা চাই, অর্থাৎ বর্ম, ঢাল সাথে রাখবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : শত্রুর ভয়ে যদি উল্লিখিত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করার মতো সুযোগ না পাওয়া যায়, তবে জামাত স্থগিত রেখে প্রত্যেকে আলাদা সালাত আদায় করে নেবে। বাহন থেকে নামার সুযোগ না হলে সাওয়ার অবস্থায়ই ইশারায় আদায় করে নিবে। আর যদি সে সুযোগও না হয়, তবে কাজা করবে।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا : অর্থা আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী সুব্যবস্থা, সতর্কতা ও সুকৌশলের সাথে কাজ কর। মহান আল্লাহর অনুগ্রহের আশা রাখ। তিনি তোমাদের হাতে কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন। তাদেরকে ভয় করো না।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٣. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَرَغْتُمْ مِنْهَا فَاذْكُرُوا اللّٰهَ بِالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ مُضْطَجِعِيْنَ اَىْ فِىْ كُلِّ حَالٍ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ اَمِنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ اَدُّوْهَا بِحُقُوْقِهَا اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّكْتُوْبًا اَىْ مَفْرُوْضًا مَّوْقُوْتًا مُقَدَّرًا وَقْتُهَا فَلَا تُؤَخَّرُ عَنْهُ.

১০৩. যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তা আদায় করে অবসর পাবে তখন দাড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বোপরি শুয়ে অর্থাৎ সকল অবস্থায় তাসবীহ তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করবে।

যখন তোমরা ভরসাজনক অবস্থায় হবে অর্থাৎ নিরাপদ হবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করবে। অর্থাৎ তার সকল হকসহ তা আদায় করবে। নিশ্চয় সালাত বিশ্বাসীদের উপর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছে নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ তার সময় সুনির্ধারিত সুতরাং ঐ সময় হতে তাকে পিছিয়ে নেওয়া যাবে না।

١٠٤. وَنَزَلَ لَمَّا بَعَثَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً فِىْ طَلَبِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهِ لَمَّا رَجَعُوْا مِنْ اُحُدٍ فَشَكَوُا الْجِرَاحَاتِ وَلَا تَهِنُوْا تَضْعُفُوْا فِى ابْتِغَاءِ طَلَبِ الْقَوْمِ الْكُفَّارِ لِتُقَاتِلُوْهُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ تَجِدُوْنَ اَلَمَ الْجِرَاحِ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ اَىْ مِثْلَكُمْ وَلَا يَجْبُنُوْنَ عَنْ قِتَالِكُمْ وَتَرْجُوْنَ اَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنَ النَّصْرِ وَالثَّوَابِ عَلَيْهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ هُمْ فَاَنْتُمْ تَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِمْ بِذٰلِكَ فَيَنْبَغِىْ اَنْ تَكُوْنُوْا اَرْغَبَ مِنْهُمْ فِيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِكُلِّ شَىْءٍ حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهِ.

১০৪. উহুদ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের অনুসন্ধানে রাসূল ﷺ একদল সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলে তারা তখন জখমী ইত্যাদির অজুহাত পেশ করে।

এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, কোনো কাফির সম্প্রদায়ের তালাশে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের অনুসন্ধানে কাতর হয়ো না, দুর্বল হয়ে পড়ো না। যদি তোমরা কষ্ট পাও অর্থাৎ আঘাতের যন্ত্রণা পাও তবে তারাও তো তোমাদের মতো তোমাদের অনুরূপ [যন্ত্রণা পায়।] এতদসত্ত্বেও তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুর্বল ও সাহসহারা হয় না। অথচ তোমরা আল্লাহর নিকট যা আশা কর অর্থাৎ যে সাহায্য ও পুণ্যফল আশা কর তারা তা আশা করে না। তোমরা তাদের অপেক্ষা বিশ্বাসে কর্মের পুণ্যফলের ক্ষেত্রে প্রাধান্য রাখ, সুতরাং তাতেও তোমাদেরকে তাদের অপেক্ষা অধিক আগ্রহ পোষণ করা উচিত। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে অবহিত এবং তিনি তার কার্যকৌশলে প্রজ্ঞাময়।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

تَهْلِيْل : ইহা বাবে تَفْعِيْل এর মাসদার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করা, জয়ধ্বনি দেওয়া।

تَسْبِيْح : ইহা বাবে تَفْعِيْل এর মাসদার গুণ কীর্তন করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা।

مُضْطَجِعِيْنَ : مُضْطَجِع বহুবচন مضطجعون শয়নকারী, শায়িত।

مَفْرُوْضًا : (اِسْمُ مَفْعُوْل : وَاحِدْ مُذَكَّر) ধার্য কৃত, নির্ধারিত।

شَكَوْا : (مَاضِى مَعْرُوف : جَمْعُ مُذَكَّرغَائِبْ) তারা অভিযোগ করল। বাবে ضَرَبَ থেকে شَكَى يَشْكِى شِكَايَةً অভিযোগ করা।

اَلَم : اَلَمٌ বহুবচন اَلاَمٌ কষ্ট, ক্লেশ, ব্যথা।

يَجْبُنُوْنَ : (مُضَارِعْ مَعْرُوفْ : جَمْعُ مُذَكَّر) তারা ভীরু হবে। বাবে كَرُمَ থেকে جُبْنَ يَجْبُنُ جُبْنًا جَبَانَةً ভীরু হওয়া।

اَرْغَبُ : اَرْغَبُ (اِسْمُ تَفْضِيْل) বহুবচন اَرْغَبُوْنَ، اَرَاغِبُ অধিক আগ্রহী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِكُمْ : ভয়-ভীতি কালে সংকট ও উৎকণ্ঠার কারণে সালাতে কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে সালাত শেষে দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, এমন কি যখন যুদ্ধরত থাক, তখনও। কেননা সময়সহ যাবতীয় শর্ত শরায়েত রক্ষার বিষয়টি তো সালাতের সাথে সম্পৃক্ত, যদ্দরুন সংকট ও উৎকণ্ঠা দেখা দেওয়ার অবকাশ ছিল। সালাতের অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় কোনোরূপ শর্তের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই মহান আল্লাহর জিকির অনুমোদিত। কাজেই কোনো অবস্থাতেই তাঁর জিকির হতে গাফিল হয়ো না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কেবল সেই ব্যক্তিই ক্ষমাযোগ্য, যার বিবেক-বুদ্ধি কোনো কারণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অন্যথায় মাহান আল্লাহর জিকির না করার জন্য কারও ওজরই গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ : ভীতির অবসান হলে যথাযথ নিয়মে সালাত আদায় করা ফরজ যখন উপরিউক্ত ভয়ের অবসান ঘটবে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যাও, তখন যে সালাত আদায় করবে, তা ধীরস্থিরভাবে সকল নিয়ম-কানুন ও শর্ত শরায়েত এবং আদব কায়দা রক্ষা করেই আদায় করবে, যে অতিরিক্ত নড়াচড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা ভীতিকর অবস্থায়ই প্রযোজ্য। নিশ্চয়ই সালাত তার সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তেই ফরজ। সফরে, ইকামতে ভয় ভীতিকালে ও শান্ত অবস্থায় সর্বদাই সেই নির্দিষ্ট সময়ই আদায় করতে হবে। ইচ্ছামতো আদায় করা যাবে না। অথবা এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলা সালাত সম্পর্কে পূর্ণ নীতিমালা স্থির করে দিয়েছেন। মুকীম অবস্থায় কিভাবে আদায় করতে হবে, সফরে কিভাবে এবং ভয়-ভীতিকালে তার পদ্ধতি কি হবে এবং শান্ত অবস্থায় কি? সবই ঠিক করে দিয়েছেন। কাজেই সর্বাবস্থায় সে নীতির অনুসরণ করতে হবে।

قَوْلُهُ لَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ : অর্থাৎ কাফিরদের অনুসন্ধান ও পশ্চাদ্ধাবনে, [তাড়িয়ে নিয়ে যেতে] সৎসাহসের পরিচয় দাও, কোনোরূপ দুর্বলতা প্রকাশ কারো না। তাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে তোমারা যদি আহত ও যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হয়ে থাক, তবে সে কষ্টে তো তারাও অংশীদার অর্থাৎ তারাও আহত নিহত হয়ে চলেছে। অথচ ভবিষ্যতে মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের যে আশা আছে তার কিছুই তাদের নেই। অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার কাফিরদের উপর বিজয় ও আখেরাতে মহা প্রতিদান পাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে ও প্রয়োজন সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তার আদেশের মাঝে তোমাদের দীন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ নিহিত। কাজেই তাঁর আদেশ পালনকে সুবর্ণ সুযোগ ও অনুগ্রহ মনে কর।

http://islamiboi.wordpress.com

١٠٥. وَسَرَقَ طُعْمَةُ بْنُ اُبَيْرِقٍ دِرْعًا وَخَبَاهَا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ فَوُجِدَتْ عِنْدَهُ فَرَمَاهُ طُعْمَةُ بِهَا وَحَلَفَ اَنَّهُ مَا سَرَقَهَا فَسَأَلَ قَوْمُهُ النَّبِيَّ ﷺ اَنْ يُجَادِلَ عَنْهُ وَيُبَرِّئَهُ فَنَزَلَ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلْنَا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ عَلَّمَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ كَطُعْمَةَ خَصِيْمًا مُخَاصِمًا عَنْهُمْ.

١٠٦. وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ مِمَّا هَمَمْتَ بِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অনুবাদ :

১০৫. তু'মা ইবনে উবায়রাক নামক জনৈক ব্যক্তি একটি বর্ম চুরি করে জনৈক ইহুদির নিকট সেটা লুকিয়ে রাখে। তালাশের পর শেষে তার [উক্ত ইহুদির] নিকট সেটা পাওয়া যায়। তখন তু'মা এ সম্পর্কে তাকে দোষারোপ করে এবং শপথ করে বলে যে, সে ওটা চুরি করেনি। তু'মার বংশের লোকেরা তার পক্ষে তার মীমাংসা করতে এবং তাকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করতে রাসূল ﷺ -কে অনুরোধ জানায়। **এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন :** তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা প্রদর্শন করেছেন অর্থাৎ যা জানিয়েছেন তদনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের যেমন তু'মার সমর্থনে তর্ক করো না। অর্থাৎ তার পক্ষে তুমি বিতর্ককারী হয়ো না। بِالْحَقِّ এটা اَنْزَلْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

১০৬. এ বিষয়ে যে ইচ্ছা করেছিলে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

دِرْعٌ : دِرْعٌ ব.ব اَدْرُعٌ، دُرُوْعٌ - বর্ম, অনুত্রাণ।

هَمَمْتَ : (مَاضِىْ مَعْرُوْف : وَاحِدْ مُذَكَّر) আপনি ইচ্ছা করলেন বাবে نَصَرَ থেকে هَمَّ يَهُمُّ بِهِ ইচ্ছা করা, করতে চাওয়া চিন্তিত হওয়া।

دِرْعًا : مُؤَنَّثٌ হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থ লৌহ বর্ম। আর دِرْعٌ - مُذَكَّرٌ হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থ উড়না।

خَبَاهَا : اَىِ الدِّرْعَ অর্থাৎ বর্মটি লুকিয়ে রেখেছে।

عَلَّمَكَ : এর দ্বারা ইশারা করেছেন যে, اَرَاكَ اللّٰهُ এর رُؤْيَتٌ শব্দটি عِلْمٌ -এর অর্থে। অন্যথায় তিন মাফউলের দিকে مُتَعَدِّىْ হওয়া লাযেম হতো। এখানে বিদ্যমান নেই।

مِمَّا هَمَمْتَ : اَىْ بِقَطْعِ يَدِ الْيَهُوْدِ

قُرِءَ عَنْهُ : অর্থাৎ এক কেরাতে جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ -এর স্থলে عَنْهُ ও পঠিত রয়েছে।

مُبِيْنًا : اَىْ مُبِيْنًا بَيِّنًا -এর পরে بَيِّنًا উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, مُبِيْنًا - مُتَعَدِّىْ টি লাযেম -এর অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল ও আলোচনা : ১০৫ থেকে সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কুরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলি এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য ব্যাপক। এ ছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।

মুনাফিক ও দুর্বল প্রকৃতির মুসলিমগণের মধ্যে কেউ কোনো পাপ ও অপরাধ করে ফেললে শাস্তি ও দুর্নাম হতে বাচার জন্য নানারকম ছল চাতুরীর আশ্রয় নিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে এসে এমন ধারায় তা প্রকাশ করত, যাতে তিনি তাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ মনে করেন। পরন্তু কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে তাকে অপরাধী বানানোর চেষ্টা চালাত।

ঘটনার বিবরণ : হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদিনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্য কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। হযরত রেফাআহ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় ভরে রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিঁধ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআহ ব্যাপার দেখে ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদার কাছে ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোজাখুজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, আজ রাত্রে আমরা বনী উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী উবায়রাক নিজেরাই এসে হাজির হলো এবং বলল, এটা লবীদ ইবনে সাহলের কাজ। আমরা তো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লবীদ তরবারি কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

http://islamiboi.wordpress.com

বনী উবায়রাক আস্তে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয়নি। আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনে জরীরের রেওয়াতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী ইবায়রাক জনৈক ইহুদির প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশত তারা আটার বস্তা সামান্য ছিড়ে ফেলেছিল। ফলে রেফাআর গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্রশস্ত্র এবং লৌহ-বর্ম ও ইহুদির কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হলো। ইহুদি কসম খেয়ে বলল, ইবনে উবায়রাক আমাকে লৌহ বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়েত ও বগভীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী উবায়ারাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না তখন ইহুদির ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, এখন বিষয়টি বনী উবায়রাক ও ইহুদির মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হযরত কাতাদা ও রেফাআহ এর প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে রেফাআহ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদির ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন, তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদির। বনী উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয় বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি তিনি ইহুদির উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে হযরত কাতাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন: আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করেছেন। এতে হযরত কাতাদাহ খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোনো কিছু না বলাই ভালো ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআহকেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআহও ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন- وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ [আল্লাহ সহায়]

বেশিদিন অতিবাহিত হতে না হতেই এ ব্যাপারে কুরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকূ' অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে ঘটনার বাস্তবরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

পবিত্র কুরআন বনী উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে ইহুদিকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেফাআহ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। এদিকে বনী উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে উবায়রাক মদিনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফেরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফিক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফের এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তাফসীর বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কায় ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল সে ঘটনা জানতে পেরে তাকে বহিষ্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[মা'আরিফুল কুরআন]

রাসূল ﷺ -এর ইজতিহাদ করার অধিকার : إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

১. যেসব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কোনো স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সেগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরি বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদদ্বারাও করতেন।

২. আল্লাহ তা'আলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরিয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মতো ছিল না। যাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ফয়সালা করতেন, তাতে কোনো ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন।

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র কুরআন থেকে যা কিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহরই বোঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলেম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বোঝেন, সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ বলা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فَاحْكُمْ بِمَآ أَرٰىكَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্য কারও নয়।

৫. মিথ্যা মকদ্দমা ও মিথ্যা দাবির তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম। [মাআরিফুল কুরআন]

উল্লিখিত আয়াত থেকে যা বোঝা যায় :

* উক্ত ঘটনা থেকে প্রথমত : একটি বিষয়ে জানা গেল যে, নবীগণেরও মানুষ হিসেবে ক্রটি বিচ্যুতি হতে পারে।
* দ্বিতীয়ত : জানা গেল, নবী ﷺ আলিমুল গায়েব নন। অন্যথায় তিনি প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে তৎক্ষণাত জেনে যেতেন।
* তৃতীয়ত : জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তার নবীগণের হেফাজত করে থাকেন। এবং কখনো ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেলেও তৎক্ষণাত শোধরিয়ে দেন। [জামালাইন]

১০৬. قَوْلُهُ وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ : অর্থাৎ খোজ খবর না নিয়ে কেবল বাহ্য অবস্থা দেখে প্রকৃত চোরকে নির্দোষ ও নির্দোষ ইহুদিকে চোর মনে করাটা আপনার নিষ্পাপ হওয়া ও মহা মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয়, এর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এর দ্বারা সেই সকল সরলপ্রাণ সাহাবীগণকেও পূর্ণ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, যারা ইসলামি জাতীয় ভ্রাতৃত্বের কারণে চোরের প্রতি সুধারণা রেখে ইহুদিকে চোর সাব্যস্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

١٠٧. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ يَخُوْنُوْنَهَا بِالْمَعَاصِيْ لِاَنَّ وَبَالَ خِيَانَتِهِمْ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا كَثِيْرَ الْخِيَانَةِ اَثِيْمًا اَيْ يُعَاقِبُهُ ـ

١٠٨. يَسْتَخْفُوْنَ اَيْ طُعْمَةُ وَقَوْمُهُ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ يَعْلَمُهُ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ يُضْمِرُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ مِنْ عَزْمِهِمْ عَلَى الْحَلْفِ عَلٰى نَفْيِ السَّرِقَةِ وَرَمْيِ الْيَهُوْدِيِّ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ج عِلْمًا ـ

অনুবাদ :

১০৭ যারা নিজেদের প্রতারিত করে অর্থাৎ পাপকার্য করে নিজেদের সাথে খেয়ানত করে; কেননা এ খেয়ানতের মন্দ পরিণাম তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে; তাদের পক্ষে কথা বলো না। আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারী অতি খেয়ানতকারী পাপীকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তাকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

১০৮. [তারা] যেমন তু'মা ও তার গোষ্ঠী লজ্জায় মানুষ হতে গোপন করে কিন্তু আল্লাহ হতে গোপন করে না। অপছন্দনীয় কথা অর্থাৎ নিজে চুরি না করার এবং ঐ ইহুদির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়ে শপথ করার সংকল্প সম্পর্কে তারা যখন লুকিয়ে রাখে গোপন করে রাখে তখন তিনি তাদের সাথে বিদ্যমান। অর্থাৎ তাদের এ গোপন সংকল্প তিনি জানেন। তারা যা করে তা তিনি তাঁর জ্ঞানে বেষ্টন করে রেখেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

وَبَالٌ : ইহা বাবে كَرُمَ -এর মাসদার, ক্ষতি, বিপদ, কষ্ট।

خَوَّانٌ : ব. خَوَّانٌ ব. خَوَّانُوْنَ প্রতারক, প্রবঞ্চক।

يُعَاقِبُ : [وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ : مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ] তিনি শাস্তি দিবেন عَاقَبَ يُعَاقِبُ عِقَابًا শাস্তি দেওয়া, সাজা দেওয়া।

يُضْمِرُوْنَ : [جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ : مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ] তারা গোপন করে اَضْمَرَ يُضْمِرُ اِضْمَارًا - গোপন করা, লুকানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতে প্রকৃত চোর ও তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর ছলচাতুরী উন্মোচিত করে দেওয়ায় সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিখিল সৃষ্টি বিশেষত উম্মতের প্রতি তাঁর যে অতলান্তিক স্নেহ মায়া ছিল তার আলোড়নে অপরাধীদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকবেন। তাই ইরশাদ হয়েছে, ওসব প্রবঞ্চকের পক্ষে মহান আল্লাহর দরবারে যুক্তিতর্ক করছেন কেন? ওদের আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। ওরা রাতে লোক চক্ষুর আড়ালে অবৈধ পরামর্শে বসে, অথচ মহান আল্লাহর কাছে লজ্জা পায় না, যিনি সদাসর্বদা তাদের সঙ্গে এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলি তার আয়ত্বে। আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা নাও করে থাকেন, তবুও এ সম্ভাবনা তো অবশ্যই ছিল যে, তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বসবেন। যেমন, দেখুন হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে এক জায়গায় পরিষ্কার বলা হয়েছে– يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ সে লুতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার নিকট যুক্তিতর্ক করতে লাগল।

ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ পাক অভিমুখী, [১১ :৭৪,৭৫] কাজেই এ সম্ভাবনার মুখবন্ধের জন্য আল্লাহ তা'আলা আগেভাগেই এ নির্দেশ দিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করতে নির্দেশ করে দিয়েছেন।

–[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٠٩. هٰاَنْتُمْ يَا هٰؤُلَاۤءِ خِطَابٌ لِقَوْمِ طُعْمَةَ جَادَلْتُمْ خَاصَمْتُمْ عَنْهُمْ اَىْ عَنْ طُعْمَةَ وَذَوِيْهِ وَقُرِئَ عَنْهُ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِذَا عَذَّبَهُمْ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا يَتَوَلّٰى اَمْرَهُمْ وَيَذُبُّ عَنْهُمْ اَىْ لَا اَحَدَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১০৯. ও হে! তোমরাই هؤلاء -এর পূর্বে সম্বোধন বোধক শব্দ يا উহ্য রয়েছে। এখানে সম্বোধন হলো তু'মার সম্প্রদায়ের প্রতি عنهم এক কেরাতে عنه রূপেও এর পাঠ রয়েছে। ইহজীবনে তাদের পক্ষে তু'মা ও তার সংশ্লিষ্টদের পক্ষে কথা বলছ; তর্ক করছ; কিয়ামতের দিন যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে তখন আল্লাহর সম্মুখে কে তাদের পক্ষে কথা বলবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? অর্থাৎ কে তাদের বিষয়ের দায়িত্ব বহন করবে ও তাদের হতে শাস্তি প্রতিহত করবে? না, কেউই এরূপ করবে না।

١١٠. وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا ذَنْبًا يَسُوْءُ بِهٖ غَيْرَهٗ كَرَمْىِ طُعْمَةَ الْيَهُوْدِىَّ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ يَعْمَلْ ذَنْبٍ قَاصِرٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ عَنْهُ اَىْ يَتُبْ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا لَهٗ رَحِيْمًا بِهٖ .

১১০. কেউ যদি মন্দ পাপ কাজ করে যা অন্যকে ক্লেশ দেয় যেমন, ইহুদির ঘাড়ে তু'মা কর্তৃক দোষ চাপিয়ে দেওয়া বা নিজের প্রতি জুলুম করে অর্থাৎ এমন পাপকার্য করে যা কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে পরে সে সেটা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা করে তবে সে আল্লাহকে তার সম্পর্কে ক্ষমাশীল তার প্রতি পরম দয়ালু পাবে।

١١١. وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا ذَنْبًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ لِاَنَّ وَبَالَهٗ عَلَيْهَا وَلَا يَضُرُّ غَيْرَهٗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهٖ .

১১১. যে অপরাধ করে পাপকার্য করে সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। কেননা এর মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে অন্য কারও কোনো ক্ষতি করবে না। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তার কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়।

١١٢. وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْۤئَةً ذَنْبًا صَغِيْرًا اَوْ اِثْمًا ذَنْبًا كَبِيْرًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْۤئًا مِنْهُ فَقَدِ احْتَمَلَ تَحَمَّلَ بُهْتَانًا بِرَمْيِهٖ وَاِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا بِكَسْبِهٖ

১১২. কেউ কোনো খাতা অর্থাৎ ছোট পাপ বা অপরাধ অর্থাৎ বড় পাপ করে তা [নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে] তা আরোপ করে মিথ্যা অপবাদ এবং তা অবলম্বন করে স্পষ্ট নির্ভেজাল পাপের বোঝা উঠিয়ে নেয়, বহন করে।

তাহকীক ও তারকীব

يَذُبُّ : (مُضَارِعْ مَعْرُوْف : وَاحِدْ مُذَكَّرْ) সে রক্ষা করবে, বাবে نَصَرَ থেকে ذَبَّ يَذُبُّ ذَبًّا তাড়িয়ে দেওয়া ذَبَّ عِنْدَ রক্ষা করা।

رَمْى : [ইহা বাবে ضَرَبَ এর মাসদার] নিক্ষেপ করণ, অপবাদ।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচনা : এখানে চোর ও তার গোত্রের সেসব লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা তার পক্ষপাতিত্ব করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেন। এ অন্যায় পক্ষপাত দ্বারা কিয়ামতের দিন চোরের কোনো আর লাভ হতে পারে না। -[তাফসীরে উসমানী।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ الخ :

ظُلْم ও سُوْء দ্বারা ছোট ও বড় পাপ বোঝানো হয়েছে। অথবা سُوْء হলো সেই পাপ, যা দ্বারা অন্যকে ব্যথা দেওয়া হয়। যেমন কারো উপর অপবাদ আরোপ। আর যে পাপের অনিষ্ট নিজের উপরই বর্তায় তা জুলুম। বলা হয়েছে পাপকর্ম যেমনই হোক তার প্রতিষেধক হলো তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা। তওবা করলে আল্লাহ সব গুনাহই ক্ষমা করে দেন। কেউ জেনেশুনে ছল চাতুরী করে কোনো দোষীকে নির্দোষ প্রমাণ করলে বা ভুলে দোষীকে নির্দোষ মনে করলে তাতে তার অপরাধ মোটেই লাঘব হয় না। হ্যাঁ, তওবা করলে ক্ষমা হতে পারে। এর দ্বারা চোর এবং যারা জ্ঞাতসারে বা না জেনে তার পক্ষপাতিত্ব করেছিল, তাদের সকলকেই তওবা ও ইস্তিগফারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে এ কথার প্রতি ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, এখনও যদি কেউ নিজ অবস্থানে অটল থাকে এবং তওবা না করে তবে সে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা হতে বঞ্চিত থাকবে। -[তাফসীরে উসমানী]

তওবার তাৎপর্য : ১১০ তম আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ ও অসংক্রামক গোনাহ অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহই তওবা ও ইস্তেগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও এস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরি। শুধু মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতূবু ইলাইহি বলার নাম তওবা ও ইস্তেগফার নয়। তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সে জন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প না হয়, তবে মুখে মুখে আস্তাগফিরুল্লাহ' বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরি : [এক] অতীত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, [দুই] উপস্থিত গোনাহ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং [তিন] ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেচে থাঁকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহের সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেওয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেওয়া তওবার অন্যতম শর্ত। নিজের গোনাহের দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ: ১১২তম আয়াতে অর্থাৎ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সে জন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহকে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহের শাস্তি, দ্বিতীয়ত: অপবাদের কঠোর শাস্তি। -[মাআরিফুল কুরআন]

وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পাপ কাজ করবে তার পরিণতি খোদ তাকেই ভোগ করতে হবে। তাকেই তার শাস্তি দেওয়া হবে অন্যকে নয়। কেননা এরূপ তো সেই করতে পারে যে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অবগত নয় বা যার হিতাহিত জ্ঞান নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোনোরূপ অতিশয়োক্তি ছাড়াই সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়। তাঁর আদালতে এরূপ ঘটার অবকাশ কোথায়? কাজেই নিজে চুরি করে ইহুদির উপর অপবাদ চাপালে কি লাভ হবে?

-[তাফসীরে উসমানী]

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا الخ **অর্থাৎ** কেউ ছোট বড় যে কোনো পাপ করে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপালে তার উপর তো দু'টি পাপ বর্তাল। একটি মিথ্যা অপবাদ, আরেকটি সেই আসল পাপ। সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, নিজে চুরি করে ইহুদির মাথায় দোষ চাপানোর দ্বারা বিপদ আরও বেড়ে গেল, লাভ হলো না কিছুই। আরও জানা গেল, পাপ ছোট হোক কিংবা বড় তওবা ছাড়া তার কোনো প্রতিশেধক নেই। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

١١٣. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَرَحْمَتُهُ بِالْعِصْمَةِ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ مِنْ قَوْمِ طُعْمَةَ اَنْ يُضِلُّوْكَ عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ بِتَلْبِيْسِهِمْ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ لِاَنَّ وَبَالَ اِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَافِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ بِذٰلِكَ وَغَيْرِهِ عَظِيْمًا .

অনুবাদ :

১১৩. হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও পাপ হতে বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যমে দয়া না থাকলে তাদের অর্থাৎ তু'মার সম্প্রদায়ের একদল সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে তোমাকে সঠিক মীমাংসা প্রদান হতে পথভ্রষ্ট করতে চাইতই, তবে তারা নিজেদেরকে ব্যতীত আর কাউকেই পথভ্রষ্ট করে না আর তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ তাদের এ পথভ্রষ্ট করার মন্দ পরিণাম কেবল তাদের উপরই বর্তাবে।

আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন এবং হিকমত অর্থাৎ তার মধ্যে যে সমস্ত বিধি বিধান বিদ্যমান তা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি বিধিবিধান ও অদৃশ্য সম্পর্কে যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তোমার উপর আল্লাহর এটা এবং আরো অন্যান্য বিরাট অনুগ্রহ বিদ্যমান।

مِنْ شَيْءٍ -এর مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ الخ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে উক্ত প্রতারকদের ছলচাতুরী প্রকাশ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহা মর্যাদা ও নিষ্পাপ হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। আরও দেখানো হয়েছে যে, সকল গুণ ও যোগ্যতার মধ্যমণি যেইজ্ঞান, সে ক্ষেত্রে ও তিনি সবার উপরে। তার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ অনন্ত, যা আমাদের ব্যাঞ্জনা ও বোধশক্তির উর্ধ্বে। সেই সাথে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে এবং কথাবার্তা ও সাক্ষ্য সবূত দেখেও তা সত্য মনে করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চোরকে নির্দোষ ভেবেছিলেন। সত্যকে পাশ কাটানো বা সত্যকে রাখঢাক দেওয়ার মনোবৃত্তি এর কারণ ছিল না আদৌ। আর এতটুকুতে কোনো দোষও ছিল না; বরং এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। অবশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহে যখন সত্য প্রকাশ হলো তখন আর কোনো সংশয় বাকি থাকল না। এ সমুদয় কথার উদ্দেশ্য এই যে, ভবিষ্যতে যাতে এসব প্রতারক প্রিয়নবী ﷺ -কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা আর না করে এবং তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যায়। সেই সাথে তিনি যেন নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা অনুসারে চিন্তা-ভাবনা ও সর্তকতার সাথে কাজ করেন। -[তাফসীরে উসমানী]

কুরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য : وَاَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ বাক্যে 'কিতাব' এর সাথে 'হিকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে 'হেকমত' তাও আল্লাহ তা'আলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহর শব্দাবলি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কুরআন ও সুন্নাহ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব।

এ থেকে কোনো কোনো ফিকহবিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার- এক. مَتْلُوْ [যা তেওলায়াত করা হয়] এবং দুই. غَيْرُ مَتْلُوْ [যা তেলাওয়াত করা হয় না]। প্রথম প্রকার ওহী কুরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলি উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ। এর শব্দাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এবং মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টিজীবের চেয়ে বেশি : وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মতো সর্বব্যাপী ছিল না। যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। বরং আল্লাহ যতটুকু দান করতেন তিনি তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্টজীবের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি। -[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١٤. لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوٰهُمْ اَىِ النَّاسِ اَىْ مَا يَتَنَاجَوْنَ فِيْهِ وَيَتَحَدَّثُوْنَ اِلَّا نَجْوٰى مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ عَمَلِ بِرٍّ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ لَا غَيْرِهِ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اَىِ اللّٰهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

১১৪. তাদের অর্থাৎ লোকদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে তারা যে গোপন সলা ও আলোচনা করে তাতে কোনো কল্যাণ নেই তবে যে ব্যক্তি দান খয়রাত, ভালো কাজ সৎকর্ম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তার পরামর্শে অবশ্য কল্যাণ বিদ্যমান। জাগতিক কোনো উদ্দেশ্য নয় আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে তার আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা উল্লিখিত কাজসমূহ করলে তাকে তিনি يُؤْتِيْهِ এটা ى [নাম পুরুষ] ও نُوْن [প্রথম পুরুষ বহুবচন] সহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মহাপুরস্কার দেবেন।

١١٥. وَمَنْ يُشَاقِقِ يُخَالِفِ الرَّسُوْلَ فِيْمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ بِالْمُعْجِزَاتِ وَيَتَّبِعْ طَرِيْقًا غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ طَرِيْقِهِمُ الَّذِىْ هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ بِاَنْ يَكْفُرَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى نَجْعَلْهُ وَالِيًا لِمَا تَوَلَّاهُ مِنَ الضَّلَالِ بِاَنْ نُخَلِّىَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِى الدُّنْيَا وَنُصْلِهِ نُدْخِلْهُ فِى الْاٰخِرَةِ جَهَنَّمَ لِيَحْتَرِقَ فِيْهَا وَسَاءَتْ مَصِيْرًا مَرْجِعًا هِىَ.

১১৫. কারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর অর্থাৎ তার নিকট মু'জিযার মাধ্যমে ন্যায়ও সত্য উদঘাটিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে অর্থাৎ তিনি যে ন্যায় সত্য নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে তারা যে পথে অধিষ্ঠিত তা ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে অর্থাৎ যদি সে কুফরি করে তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবে অর্থাৎ পৃথিবীতে সে ও তার অবলম্বিত বিষয়ের মাঝে তাকে বাধাহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে যে পথভ্রষ্টতা সে অবলম্বন করেছে তাকে তার নির্বাহী বানিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। অর্থাৎ দগ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাকে পরকালে তাতে প্রবিষ্ট করব। আর কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল সেটা। اَلْمَصِيْرُ অর্থ- প্রত্যাবর্তনস্থল।

তাহকীক ও তারকীব

نُخَلِّىْ : (جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ : مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ) আমরা ছেড়ে দেব, বাবে تَفْعِيْلٌ থেকে خَلّٰى يُخَلِّىْ অর্থ- ছেড়ে দেওয়া, মুক্ত করা।

يَحْتَرِقُ : (وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ : مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ) সে জ্বলে যাবে বা যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوٰىهُمْ :

আলোচনা : মুনাফিক ও কূট চরিত্ররা মানুষের কাছে নিজেদের নামদাম, ফলানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কানেকানে কথা বলত। এ ছাড়া মজলিসে বসে নিজেরা অনর্থক বিষয়ে কানাকানি করত। কারও ছিদ্রান্বেষণ, কারও দোষচর্চা, কারও সম্পর্কে ফালতু অভিযোগ ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকত। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, যারা পরস্পরে কানেকানে পরামর্শ করে তাদের বেশির ভাগ পরামর্শেই কোনো কল্যাণ থাকে না। অকপট ও সত্যকথা গোপন করার দরকার পড়ে না গুপ্তালোচনায় কোনো না কোনো প্রতারণা থাকে। হ্যাঁ, যদি গোপনই করতে হয় তবে দান খয়রাতের কথা গোপন কর যাতে গ্রহীতা লজ্জিত না হয় বা কোনো অজ্ঞজনকে শোধরানো তাকে সঠিক কথা বোঝানো ও সহীহ মাসআলা শেখানোর বিষয়টি গোপনে লোকজনের আড়ালে সম্পন্ন কর, যাতে তার অসম্মান না হয়, কিংবা দুই ব্যক্তির মাঝে বিবাদ ঘটলে যদি উত্তেজিত ব্যক্তি মীমাংসায় আসতে না চায় তবে তাকে গোপনে বোঝাও, প্রয়োজনে বানিয়ে কথা বলারও অনুমতি আছে। শেষে বলা হয়েছে যে, কেউ এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বাসনায় করলে তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। অর্থাৎ এরূপ কাজ লোক দেখানোর মনোবৃত্তি বা কোনো পার্থিব স্বার্থে যেন না হয়। [উসমানী]

পারস্পরিক সলাপরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা : বলা হয়েছে : لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ অর্থাৎ মানুষের যেসব পারস্পরিক সলাপরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোনো মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে– اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ এসব সলাপরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোনো কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা এক হাদীসে বলা হয়েছে : মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহর জিকির কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوْفٌ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরিয়তে প্রশংসিত এবং যা শরিয়ত পন্থিদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে مُنْكَرٌ ঐ কাজ, যা শরিয়তের অপছন্দনীয় এবং শরিয়তপন্থিদের কাছে অপরিচিত।

যে কোনো সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহ দান আমর বিল মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেওয়া পথভ্রান্তকে পথ বলে দেওয়া ইত্যাদি সৎকাজ আমর বিল মা'রূফ-এর অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পারস্পরিক শান্তি স্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহু লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এছাড়া দু'টি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যপ্ত করে [এক] সৃষ্টজীবের উপকার করা, [দুই] মনুষকে দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তাফসীরবিদগণ বলেন, এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজিব সদকা জাকাত নফল সদকা এবং যে কোনো সদকা এবং যে কোনো উপকার এর অন্তর্ভুক্ত। –[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى الخ : অর্থাৎ কারও কাছে হক কথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যদি সে রাসূলের আদেশ অমান্য করে এবং মুসলিমদের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে তবে তার পরিণাম জাহান্নাম। যেমন উপরিউক্ত চোর করেছিল। সে নিজের অপরাধ স্বীকার ও তওবা না করে, বরং হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে মক্কা শরীফে পালিয়েছিল এবং মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছিল।

ইজমা মানা ফরজ : মুসলিম বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াত থেকে এ মাসআলাও উদ্ভাবন করেছেন যে, উম্মতের ইজমা [সর্ববাদীসম্মত রায়] –কে অস্বীকারকারী জাহান্নামী। অর্থাৎ ইজমা মানা ফরজ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর হাত মুসলিমগণের জমাতের উপর। যে দলছুট হয় সে জাহান্নামে পতিত হয়। –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

١١٦. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ.

١١٧. اِنْ مَا يَدْعُوْنَ يَعْبُدُ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ اِلَّا اِنٰثًا اَصْنَامًا مُؤَنَّثَةً كَاللَّاتِ وَالْعُزّٰى وَمَنَاةَ وَاِنْ مَا يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ بِعِبَادَتِهَا اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا خَارِجًا عَنِ الطَّاعَةِ لِطَاعَتِهِمْ لَهٗ فِيْهَا وَهُوَ اِبْلِيْسُ.

অনুবাদ :

১১৬. আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত সব কিছু ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে সে অন্যায় ও সত্য হতে বহুদূর পথভ্রষ্ট।

১১৭. তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তারা অর্থাৎ মুশরিকরা নারীমূর্তিকে ডাকে অর্থাৎ লাত, উযযা, মানাত ইত্যাদি নারী মূর্তিসমূহের উপাসনা করে। এবং তারা প্রতিমা পূজায় শয়তানের আনুগত্য করে বিদ্রোহী অর্থাৎ অবাধ্য শয়তানকেই অর্থাৎ ইবলীসকেই ডাকে অর্থাৎ এসব প্রতিমা পূজার মাধ্যমে মূলত : শয়তানেরই তারা উপাসনা করে। اِنْ يَّدْعُوْنَ -এর اِنْ টি এ আয়াতের উভয় স্থানেই مَا ['না'] অর্থে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ الخ শিরকের নীচে যে কোনো গুনাহ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু শিরক কখনই ক্ষমা হবে না। মুশরিকদের জন্য শাস্তিই অবধারিত। কাজেই চুরি করা ও অপবাদ আরোপ করা যদিও কবীরা গুনাহ ছিল তবুও সম্ভাবনা ছিল আল্লাহ স্বীয় কৃপায় সে চোরকে ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু সে যখন রাসূলের আদেশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো, তখন তার ক্ষমাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে গেল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এর দ্বারা জানা গেল মাহান আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা করাই কেবল শিরক নয়, বরং মহান আল্লাহর আদেশের বিপরীতে অন্য কারও আদেশ পছন্দ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। -[তাফসীরে উসমানী]

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া : এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরিক ও কাফিররা যে শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। এতএব এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না। বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়, তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার : এক প্রকার জুলুম আল্লাহ তা'আলা কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পরে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লহ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। -[ইবনে কাছীর]।

শিরকের তাৎপর্য : শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সৃষ্টবস্তুকে ইবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, পবিত্র কুরআন তা উদ্ধৃত করেছে-

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

http://islamiboi.wordpress.com

অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম যখন তোমাদেরকে বিশ্বপালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরিকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে এদেরকে ইবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌছে দিয়েছে। [ফাতহুল মুলহিম]। জানা গেল যে, স্রষ্টা, রিজিকতাদা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোনো সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করাই শিরক। –[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا : **শিরক মানুষকে চরম গুমরাহীতে ফেলে দেয় :** সুদূর পথভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার কারণ সে তো মহান আল্লাহ হতেই প্রকাশ্য বিমুখ হয়ে তাঁর বিপরীতে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে এবং শয়তানের বংশবদ ও অনুগত হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তার রহমত সব কিছু হতেই সে বেপরওয়া হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ হতে যে এত দূরে সে মহান আল্লাহর মাগফিরাত ও ক্ষমার উপযুক্ত কি করে হতে পারে? বরং এমনতরো লোককে ক্ষমা করা অযৌক্তিক ও ন্যায়বিরুদ্ধ সাব্যস্ত হওয়া উচিত। এ কারণেই এরূপ লোকদের ক্ষমাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম যতবড় পাপীই হোক তার দোষ যেহেতু কর্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ আকিদা বিশ্বাস সম্পর্ক ও আশাবাদ সবই যথারীতি বহাল আছে, তাই আজ হোক কাল হোক তার মাগফিরাত অবশ্যই হবে। মহান আল্লাহর যখন ইচ্ছা হবে তখন ক্ষমা করবেন। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِلَّا إِنَاثًا : মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে উপাস্য বানিয়েছে তারা তো এমন সব দেবী, নারীর নামে যাদের নাম উয্যা, মানাত, নাইলা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَإِنْ يَدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيْدًا : আর সত্যিকার অর্থে তারা তো মহান আল্লাহর অভিশপ্ত উদ্ধত শয়তানেরই উপাসনা করে। সেই তো তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এরূপ বানিয়েছে। মুর্তিপূজা তো শয়তানেরই আনুগত্য ও তাকে খুশি করার নামান্তর। এর দ্বারা মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা ও তাদের ঘোর মূর্খতা তুলে ধরাই উদ্দেশ্য দেখুন প্রথম মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণের চেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা আর কি হতে পারে? পরন্তু উপাস্য বানাল তো কাকে বানাল? পাথরের মূর্তিকে, যার মাঝে কোনোরূপ অনুভূতি ও নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই। নারীর নামে তাদের নামকরণ করল। আর এ সবই করল সেই শয়তানের প্ররোচনায় যে মহান আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত, তার রহমত হতে বিতাড়িত। এই পথ ভ্রষ্টতারও কি কোনো দৃষ্টান্ত আছে? চূড়ান্ত পর্যায়ের আহমকের পক্ষেও কি এটা গ্রহণ করা সম্ভব? –[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١١٨. لَعَنَهُ اللّٰهُ اَبْعَدَهُ عَنْ رَحْمَتِهٖ وَقَالَ اَىِ الشَّيْطٰنُ لَاَتَّخِذَنَّ لَاَجْعَلَنَّ لِىْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا حَظًّا مَّفْرُوْضًا مَقْطُوْعًا اَدْعُوْهُمْ اِلٰى طَاعَتِىْ ـ

১১৮. আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেন অর্থাৎ তাঁর রহমত হতে তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। এবং সে অর্থাৎ শয়তান বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের একটা নির্দিষ্ট অংশ হিস্যা গ্রহণ করবই অর্থাৎ তাদেরকে আমার আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়ে আমার জন্য একটা অংশ নিয়ে নেব। مَفْرُوْضًا অর্থ সুনির্ধারিত।

١١٩. وَلَاُضِلَّنَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ بِالْوَسْوَسَةِ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ اَلْقِى فِىْ قُلُوْبِهِمْ طُوْلَ الْحَيٰوةِ وَاَنْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ يَقْطَعُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَقَدْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِالْبَحَائِرِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ دِيْنَهُ بِالْكُفْرِ وَاِحْلَالِ مَاحَرَّمَ وَتَحْرِيْمِ مَا اُحِلَّ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا يَتَوَلَّاهُ وَيُطِيْعُهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا لِمَصِيْرِهٖ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ ـ

১১৯. ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদেরকে সত্য ও ন্যায় হতে পথভ্রষ্ট করবই। তাদের মনে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে দীর্ঘায়ু হওয়ার বাসনা সৃষ্টি করব এবং এ ধারণা দেব যে কিয়ামত ও হিসাব নিকাশ বলতে কিছুই নেই। এবং তাদেরকে নিশ্চয় আমি নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ অর্থাৎ ওটা কর্তন করবেই। لَيُبَتِّكُنَّ অর্থ কর্তন করবেই। বাহীরা পশুগুলোর ক্ষেত্রে তা করত [দ্রষ্টব্য: সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৩] এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা কুফরি ও হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে আল্লাহর সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁর দীনকে বিকৃত করবেই আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে যে ব্যক্তি অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে। অর্থাৎ তার সাথে সম্পর্ক করবে ও তার অনুগত্য প্রদর্শন করবে সে এ কারণে চিরস্থায়ী জাহান্নামে গমন করত: প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্টত : ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

١٢٠. يَعِدُهُمْ طُوْلَ الْعُمْرِ وَيُمَنِّيْهِمْ نَيْلَ الْاٰمَالِ فِى الدُّنْيَا وَاَنْ لَا بَعْثَ وَلَا جَزَاءَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ بِذٰلِكَ اِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا ـ

১২০. সে তাদেরকে দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে পৃথিবীতে সকল কামনা পূরণ হওয়ার এবং পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ হবে না বলে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। শয়তান তাদেরকে এতদ্বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। সকলই মিথ্যা নিষ্ফল।

١٢١. اُولٰۤئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا مَعْدِلًا ـ

১২১. এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা থেকে তারা নিষ্কৃতির উপায় প্রত্যাবর্তন স্থল পাবে না।

http://islamiboi.wordpress.com

١٢٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا اَيْ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ وَحَقَّهُ حَقًّا وَمَنْ اَيْ لَا اَحَدَ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا قَوْلًا .

১২২. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আল্লাহ তা'আলা তার অঙ্গীকার করেছেন এবং তা সুদৃঢ় করেছেন। কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? অর্থাৎ কেউ অধিক সত্যবাদী নয়।

مَفْعُوْل وَعْدَ اللّٰهِ এটা مَصْدَر বা সমাধাতুজ কর্ম مُطْلَق হিসাবে مَنْصُوْب ফাতাহযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। قِيْلًا অর্থ, কথা।

তাহকীক ও তারকীব

وَسْوَسَة : [ইহা বাবে فَعْلَلَة এর মাসদার] কুমন্ত্রণা, ওয়াসওয়াসা। مُؤَبَّدَة : (اِسْمُ فَاعِل : وَاحِدْمُؤَنَّث) স্থায়ী, চিরকাল।

طُوْل - [ইহা نَصَرَ এর মাসদার] দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য। طُوْلُ الْعُمْر - দীর্ঘ জীবন।

مَعْدِل : مَعْدِلٌ বহুবচন مَعَادِلٌ - প্রত্যাবর্তনের স্থল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا শয়তানের ওয়াদা আদমকে সেজদা না করার কারণে শয়তান যখন অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয় তখনই সে বলেছিল আমি তো ধ্বংস হয়েছিই তোমার বান্দা আদম সন্তানদের বড় একটি অংশকেও আমার পথে টেনে আনব। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে আমার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাব। যেমন সূরা হিজর, বনী ইসরাঈল প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শয়তান অভিশপ্ত ও সম্পাদিত হওয়া ছাড়াও শয়তান প্রথম দিন হতেই সমগ্র মানব জাতির শত্রু ও অহিতকামী। সে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশও করেছে। কাজেই এ ধারণা করারও অবকাশ থাকল না যে শয়তান যদিও সব রকমের দুষ্টমতি ও ভ্রষ্ট কিন্তু তবুও বিশেষ কাউকে কানো হিতকর কথা বলতেও তো পারে। বস্তুত সে আদি শত্রু। বনী আদমকে যা কিছু বলবে তা অনিষ্ট সাধন ও ধ্বংস করার মনোবৃত্তি নিয়েই বলবে। এরূপ ভ্রষ্ট ও অশুভার্থী জনের আনুগত্য করা কত বড় মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا বা নির্ধারিত অংশ নেওয়ার এক অর্থ এটাও যে, তোমার বান্দারা আমার জন্য অর্থ সম্পদের একটা অংশ ধার্য করবে, যেমন এক শ্রেণির লোকদের দেবী প্রভৃতি গায়রুল্লাহর নামে নজর নিয়ায দিয়ে থাকে। [উসমানী]

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ অর্থাৎ যারা আমার ভাগে আসবে আমি তাদেরকে সত্য পথ হতে বিচ্যুত করব এবং তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ইহলৌকিক স্বার্থ চরিতার্থ হওয়ার এবং হিসাব নিকাশ ও পরকালীন বিষয়াদি না ঘটার আশা দেব।

তাদেরকে জীব জন্তুর কান ফুঁড়ে, দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করার এবং মহান আল্লাহর সৃজিত আকার-আকৃতি ও তাঁর স্থিরীকৃত বিধানকে বিকৃত করার তা'লীম দেব।

قَوْلُهُ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ .... فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ : কাফিরদের রেওয়াজ ছিল তারা উট ছাগলের বাচ্চাকে কান ফুঁড়ে বা কানে কোনো চিহ্ন লাগিয়ে দেব দেবীর নামে ছেড়ে দিত। এ ছাড়া আকৃতি পরিবর্তন অর্থাৎ খোঁজা করা, সুঁই দ্বারা দেহে তিলক চিহ্ন বা কোনো চিত্র অঙ্কন করা, শিশুদের মাথায় কারও নামে টিকি রাখা ইত্যাদি নানা রকম রীতি তাদের মাঝে চালু ছিল। এসব পরিহার করে চলা মুসলিমগণের জন্য একান্ত কর্তব্য। দাড়ি কামানোও এ আকৃতি পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে। মহান আল্লাহর যে কোনো বিধানে পরিবর্তন সাধন ঘোরতম অন্যায়। তিনি যা হালাল করেছেন। তাকে হারাম বা তিনি যা হারাম করেছেন তাকে হালাল করলে ইসলাম থেকে খারিজ হতে হয়। যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা যেন নিশ্চয় জানে যে তারা শয়তানের সেই নির্ধারিত অংশের অন্তর্ভুক্ত যার কথা উপরে বলা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী]

১২১. قَوْلُهُ اُولٰۤئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا : অর্থাৎ শয়তানের ইতর স্বভাব ও দুষ্ট মনোবৃত্তি এবং তার চিরায়ত শত্রুতা সম্পর্কে যখন অবগত হলে তখন যে কেউ তার প্রকৃত মা'বুদ হতে বিমুখ হয়ে শয়তানের আনুগত্য করবে সে যে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তার যাবতীয় ওয়াদা ও আশা ছলনা মাত্র। কাজেই তার অনুসারীদের পরিমণাম তো এটাই যে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তা থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় থাকবে না।-[তাফসীরে উসমানী]

১২২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ যারা শয়তানের অনিষ্ট হতে নিরাপদ আছে মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলে এবং সৎকাজে লিপ্ত থাকে তারা চিরদিন পরম সুখের বেহেশতে থাকবে। এ হলো মহান আল্লাহর ওয়াদা। তাঁর চেয়ে সত্য কথা আর কারও হতে পারে না। এমন সত্য ওয়াদা ছেড়ে শয়তানের মিথ্যা আশ্বাসে ভরসা করা কত বড় বিভ্রান্তি : এর দ্বারা যে কি পরিমাণ ক্ষতির বোঝা মাথায় তোলা হয়। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢٣. نَزَلَ لَمَّا افْتَخَرَ الْمُسْلِمُونَ وَاَهْلُ الْكِتَابِ لَيْسَ الْاَمْرُ مَنُوطًا بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ط بَلْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهِ اِمَّا فِى الْاٰخِرَةِ اَوْ فِى الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ وَالْمِحَنِ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ وَلِيًّا يَحْفَظُهُ وَلَا نَصِيْرًا يَمْنَعُهُ مِنْهُ .

১২৩. কিতাবীগণ ও মুসলিমগণ স্ব-স্ব বিষয়ে অহংকার প্রদর্শন করে এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশির উপর কোনো বিষয় নির্ভরশীল নয়। বরং সৎ আমল হিসাবেই ফয়সালা হয়ে থাকে। কেউ মন্দ কাজ করলে সে পরকালে বা হাদীসে আছে যে, দুনিয়াতেই আপদ-বিপদ ও কষ্টে নিপতিত হয়ে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত সে তার জন্য কোনো অভিভাবক যে তাকে হেফাজত করবে ও সাহায্যকারী পাবে না। যে তাকে তার নিকট থেকে রক্ষা করবে।

١٢٤. وَمَنْ يَعْمَلْ شَيْئًا مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا قَدْرَ نَقْرَةِ النَّوَاةِ .

১২৪. পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজসমূহের কিছু করলে এবং সে যদি মু'মিন হয় তবে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। نَقِيْرًا -অর্থ অর্জুর বিচির বাকল পরিমাণ ও। يَدْخُلُوْنَ এটা مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্যরূপে ও مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পাঠ করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

مَنُوْطًا : (اِسْمُ مَفْعُوْل : وَاحِد مُذَكَّر) অর্পিত, নিয়োজিত, নির্ভরশীল।

مِحَنٌ : مِحْنَةٌ বহুবচন مِحَنٌ মেহনত, কষ্ট, ক্লেশ।

نَقْرَةٌ : نَقْرَةٌ বহুবচন نُقَرٌ، نِقَارٌ - গর্ত, খেজুরের বিচির গর্ত।

نَوَاةٌ : نَوَاةٌ বহুবচন نَوًى - বিচি, আঁটি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى : কিতাবধারী তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, তারা মহান আল্লাহর খাস বান্দা যেসব পাপের কারণে অন্যরা ধৃত হবে, তাদেরকে সেসব কারণে ধর-পাকড় করা হবে না। আমাদের নবী বিশেষ সুপারিশে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নেবেন। একদল অজ্ঞ মুসলিমও নিজেদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা রাখে। আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে মুক্তি ও পুরস্কার কারও আশা ও ধারণার উপর নির্ভর করে না। মন্দ কাজ যেই করবে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। মহান আল্লাহ যাকে পাকড়াও করবেন তার আজাবের সময় কারও সাহায্য কাজে লাগবে না। আল্লাহ পাক মুক্তি দিলেই মুক্তি লাভ হতে পারে। যে কেউ ভালো কাজ করবে শর্ত হলো ঈমান থাকতে হবে সে জান্নাতাবাসী হবে এবং নিজের সৎকাজে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে যার কথা শাস্তি ও পুরস্কারের সম্পর্ক কর্মের সাথে, কারও আশা আকাঙ্ক্ষায় কিছু হয় না। কজেই মিথ্যা আশায় পদাঘাত হান, সৎকাজে হিম্মত কর। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহলে কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহলে কিতাবরা বলল, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কারণ আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। সুমলমানরা বলল, আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কেননা আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এতে বলা হয়েছে যে এ গর্ব ও অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবি দ্বারা কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না। [মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ : এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা হতে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ অর্থাৎ যে কেউ কোনো অসৎকাজ করবে সে জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোনো কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চিন্তা করো না, সাধ্যমতো কাজ করে যাও। কেননা [উল্লিখিত শাস্তি যে জাহান্নমই হবে, তা জরুরি নয়] তোমরা দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহের কাফ্ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি কারও পায়ে কাঁটা ফুটে তাও গোনাহের কাফফারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোনো দুঃখ কষ্ট, অসুখ বিসুখ অথবা ভাবনা চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও তাফসীরে ইবনে জারীর হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদেরকে مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ আয়াতটি শুনালেন, তখন তাদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন, ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ" আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোনো মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রাসূল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ বকর! আপনার মোটেই চিন্তা হবে না। কেননা দুনিয়ার দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়াতে আছে, তিনি বললেন, আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোনো দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না! হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আরজ করলেন, নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাস, এটাই আপনার প্রতিফল।

আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবি ও বাসনায় লিপ্ত হয়োনা; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমারা সাফল্য লাভ করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে। -[মাআরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢٥ . وَمَنْ أَيْ لَا أَحَدَ أَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ أَيْ اِنْقَادَ وَأَخْلَصَ عَمَلَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّدٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ الْمُوَافِقَةَ لِمِلَّةِ الْإِسْلَامِ حَنِيْفًا حَالٌ أَيْ مَائِلًا عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا صَفِيًّا خَالِصَ الْمَحَبَّةِ لَهُ .

১২৫. তার অপেক্ষা আর কার দীন উত্তম যে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে অর্থাৎ আনুগত্য প্রদর্শন করে ও তার প্রতি ইখলাস প্রদর্শন করে ও একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে আর সে হয় সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ একত্ববাদী এবং ইসলামি ধর্মাদর্শের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ বিধায় একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? حَنِيْفًا এটা حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদ। অর্থাৎ সকল ধর্মাদর্শ হতে বিমুখ হয়ে সরল সঠিক এ ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তা অনুসরণ করে? না, আর কারও ধর্ম তদপেক্ষা উত্তম নেই। এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে অন্তরঙ্গ ও তৎপ্রতি নির্ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী রূপে [গ্রহণ করেছেন।]

١٢٦ . وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطًا عِلْمًا وَقُدْرَةً أَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

১২৬. [আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে] মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসাবে সব কিছু আল্লাহর এবং সব কিছুকে আল্লাহ তার জ্ঞানে ও কুদরতে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। অর্থাৎ সকল সময়েই তিনি এ গুণে গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

اِنْقَادَ : (مَاضِيْ مَعْرُوْف : وَاحِد مُذَكَّر غَائِب) সে অনুগত হলো।
قَيِّم : দামি, মূল্যবান, সোজা। صَفِيًّا : صَفِيٌّ - নির্মল, খাঁটি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ : ইতিপূর্বে জানা হয়েছে, মহান আল্লাহর নিকট কর্মই গ্রহণযোগ্য মিথ্যা আশায় কোনো ফল হয় না। কিতাবী ও অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের জন্য এটাই অমোঘ বিধান। এর দ্বারা ইসলামপন্থি তথা সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও প্রশংসার প্রতিও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়ে গেছে। সেই সাথে আহলে কিতাবের অসৎবৃত্তি ও নিন্দার প্রতি ও এবার খোলাখুলি বলা হচ্ছে ধার্মিকতার ক্ষেত্রে যার মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সম্মুখে মস্তক স্থাপন করে সৎকাজে কায়েমে নিমগ্ন থাকে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে তাদের মোকাবিলা কে করতে পারে? -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا : হযরত ইবরাহীম (আ.) একান্তভাবে মহান আল্লাহরই জন্য আত্মনিবেদিত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, উক্ত গুণত্রয় পরিপূর্ণরূপে কেবল মহান সাহাবীগণের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল আহলে কিতাবের মধ্যে নয়। কাজেই আহলে কিতাবের পূর্বোক্ত আশা আকাঙ্খা সম্পূর্ণ অবান্তর ও বাতিল প্রমাণিত হয়। -[তাফসীরে উসমানী]

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ الخ অর্থাৎ আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবাই মাহান আল্লাহর বান্দা তাঁর মাখলুক ও অধিকারভুক্ত এবং তারই আয়ত্তাধীন। তিনি নিজ রহমত ও হিকমত অনুযায়ী যার সঙ্গে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করেন। কারও প্রতি তাঁর মুখাপেক্ষিতা নেই। বন্ধু গ্রহণ দ্বারা কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে এবং জগতের যাবতীয় কার্য ভালো হোক, কি মন্দ তার শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে যেন সন্দিহান না হয়। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

১২৭. وَيَسْتَفْتُوْنَكَ يَطْلُبُوْنَ مِنْكَ الْفَتْوٰى فِىْ شَأْنِ النِّسَآءِ وَمِيْرَاثِهِنَّ قُلِ لَّهُمُ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الْقُرْاٰنِ مِنْ اٰيَةِ الْمِيْرَاثِ وَيُفْتِيْكُمْ اَيْضًا فِىْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَاكُتِبَ فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَ تَرْغَبُوْنَ اَيُّهَا الْاَوْلِيَآءُ عَنْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ لِدَمَامَتِهِنَّ وَتَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَتَزَوَّجْنَ طَمَعًا فِىْ مِيْرَاثِهِنَّ اَىْ يُفْتِيْكُمْ اَنْ لَا تَفْعَلُوْا ذٰلِكَ وَفِى الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الصِّغَارِ مِنَ الْوِلْدَانِ اَنْ تُعْطُوْهُمْ حُقُوْقَهُمْ وَيَاْمُرُكُمْ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ فِى الْمِيْرَاثِ وَالْمَهْرِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ .

অনুবাদ :

১২৭. লোক তোমার নিকট নারীদের ও তাদের উত্তরাধিকারত্বের বিষয়ে জানতে চায়, ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে। তাদেরকে বল আল্লাহ এবং আল কিতাবে অর্থাৎ আল কুরআনে তোমাদের নিকট মিরাশ সম্পর্কে যা আবৃত্তি করা হয় তা তোমাদেরকে পরিষ্কার জানাচ্ছেন এবং ঐ পিতৃহীনা নারী মিরাশ তাদের যে প্রাপ্য নির্ধারিত রয়েছে তা তোমারা প্রদান কর না অথচ হে অভিভাবকগণ ! তোমরা স্ত্রীহীনা হওয়ার কারণে নিজেরাও তাদেরকে বিবাহ করতে চাও না এবং তাদের মিরাশ হস্তগত করার লালসায় অন্য কারও নিকট তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিয়ে রাখ। এ সমস্ত নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে, এ ধরনের কাজ তোমরা করো না।

এবং অসহায় ছোট শিশুদের সম্পর্কেও তিনি জানাচ্ছেন যে, তাদের অধিকার তোমরা আদায় করে দেবে এবং তিনি তোমাদেরকে আরো নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এতিমদের বিষয়ে অর্থাৎ তাদের মিরাশ ও মহর ইত্যাদিতে তোমরা ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। এবং যে কোনো সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

دَمَامَةٌ : دَمَامَةٌ কুৎসিত আকৃতি, বিভৎসতা।

تَعْضُلُوْنَ : جَمْعُ مُذَكَّرٍ (مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ) তোমরা বারণ কর বাবে نَصَرَ থেকে নিষেধ করা, বারণ করা।

طَمَعًا : طَمْعٌ - লোভ, আশা।

صِغَارٌ : صَغِيْرٌ বহুবচন صِغَارٌ ছোট, নাবালেগ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এতিম মেয়েদের বিধান : এ সূরার শুরুতে এতিমের হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছিল কোনো এতিম মেয়ের ওলী [চাচাতো ভাই বা এরূপ কেউ] যদি মনে করে আমি তার হক পুরোপুরি আদায় করতে পারব না. তবে সে নিজে তাকে বিবাহ না করে? অন্যের সাথে যেন বিবাহ দিয়ে দেয় এবং নিজে তার অভিভাবক হিসেবে থেকে যায়।

http://islamiboi.wordpress.com

এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমগণ এরূপ মেয়েদের বিবাহ করা ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ মেয়েদের পক্ষে এটাই উত্তম যে, অভিভাবক নিজেই তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে নেবে। সে যেমন তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে অন্যরা তা রাখবে না। তাই এক পর্যায়ে মুসলিমগণ প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তাদেরকে বিবাহ করার অনুমতি চাইলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং অনুমতি দেওয়া হয়। বলা হয়েছে যে, পূর্বে যে নিষেধ করা হয়েছিল সে তো কেবল সেই অবস্থায় যখন তোমরা তাদের হক পুরোপুরি আদায় করতে পারবে না। এতিমের হক আদায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এতিমের সাথে সদাচরণ ও তার মঙ্গলের জন্য যদি এরূপ বিবাহ করা হয় তবে তার পূর্ণ অনুমতি আছে।

প্রাক ইসলামি আরবে নারী, শিশু ও এতিম : প্রাক ইসলামি আরবে নারী, শিশু ও এতিমদের বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। তাদেরকে মিরাশ ও দেওয়া হতো না। বলা হতো যারা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারবে মিরাশ তাদেরই প্রাপ্য। এতিম মেয়েদেরকে তাদের অলীগণই বিবাহ করত এবং মহরানা ও ভরণ-পোষণে ঠকাত। তাদের ধন-সম্পদ ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করত। সূরার শুরুতে এসব বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে। এস্থলে কয়েক রুকূ' আগে হতেই যে বিষয়টি চলে আসছে তার সারমর্ম এই যে, কেবল মহান আল্লাহর আদেশই অবশ্য পালনীয় বিষয়, তার বিপরীতে কারও যুক্তি, মনগড়া আইন, ব্যক্তি বিশেষের আদেশ, নিজ জ্ঞান, অন্যের অনুমান ইত্যাদি কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মহান আল্লাহর হুকুমের সামনে অন্য কারো কথা মানা এবং মহান আল্লাহর আদেশ ছেড়ে তা মান্য করা প্রকাশ্য কুফর ও পথভ্রষ্টতা। এ বিষয়টিকে নানা বর্ণনাশৈলী ও কঠোর ভঙ্গিমার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এবার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর বরাতে নারী ও এতিম মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কিছু মাসআলা বর্ণিত করা হয় যাতে উল্লিখিত সতর্কীকরণ ও গুরুত্বারোপের পর নারীদের অধিকার আদায়ে কোনো সমস্যা বাকি না থাকে।

বর্ণিত আছে, নারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিরাশের আদেশ ঘোষণা করলেন, তখন কতিপয় আরব নেতা তার সঙ্গে সাক্ষাত করে বিস্ময় প্রকাশ করল যে, আমরা শুনেছি, আপনি বোন ও কন্যাকে মিরাশ দেওয়ার হুকুম দিয়েছেন অথচ মিরাশ তো কেবল তাদেরই প্রাপ্য যারা শত্রুর সাথে লড়তে পারে ও গনিমত অর্জনে সক্ষম হয়। তিনি বললেন, মহান আল্লাহর আদেশ এটাই যে তাদের মিরাশ দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا : অর্থাৎ তোমাদের খুটিনাটি যাবতীয় সৎকাজের সম্যক খবর মহান আল্লাহর আছে। এতিম ও নারীদের ব্যাপারে যা কিছু ভালো কাজ করবে তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে। -[উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

١٢٨. وَاِنِ امْرَاَةٌ مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ خَافَتْ تَوَقَّعَتْ مِنْ بَعْلِهَا زَوْجِهَا نُشُوْزًا تَرَفُّعًا عَلَيْهَا بِتَرْكِ مَضَاجَعَتِهَا وَالتَّقْصِيْرِ فِىْ نَفْقَتِهَا لِبُغْضِهَا وَطُمُوْحِ عَيْنِهِ اِلٰى اَجْمَلَ مِنْهَا اَوْ اِعْرَاضًا عَنْهَا بِوَجْهِهٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّصَّالَحَا فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُصْلِحَا مِنْ اَصْلَحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا فِى الْقَسْمِ وَ النَّفْقَةِ بِاَنْ تَتْرُكَ لَهُ شَيْئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحْبَةِ فَاِنْ رَضِيَتْ بِذٰلِكَ وَاِلَّا فَعَلَى الزَّوْجِ اَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا اَوْ يُفَارِقُهَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ مِنَ الْفُرْقَةِ وَالنُّشُوْزِ وَ الْاِعْرَاضِ قَالَ تَعَالٰى فِىْ بَيَانِ مَاجُبِلَ عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ شِدَّةَ الْبُخْلِ اَىْ جُبِلَتْ عَلَيْهِ فَكَاَنَّهٗ حَاضِرَتُهٗ لَا تَغِيْبُ عَنْهُ الْمَعْنٰى اَنَّ الْمَرْاَةَ لَا تَكَادُ تَسْمَحُ بِنَصِيْبِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالرَّجُلُ لَا يَكَادُ يَسْمَحُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهٖ اِذَا اَحَبَّ غَيْرَهَا وَاِنْ تُحْسِنُوْا عِشْرَهَ النِّسَاءِ وَتَتَّقُوْا الْجَوْرَ عَلَيْهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

অনুবাদ :

১২৮. কোনো নারী যদি তার পুরুষ অর্থাৎ স্বামীর পক্ষ হতে দুর্ব্যবহারের অর্থাৎ তাকে ঘৃণা কারার কারণে বা অধিকতর সুন্দরী অন্য কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ার কারণে স্বামী যদি শয্যা পরিহার ও তার ভরণ পোষণে সংকোচন করে তার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের ও উপেক্ষার তার নিকট হতে বিমুখ হওয়ার ভয় করে আশঙ্কা করে তবে তারা উভয়ে আপস নিষ্পত্তি করতে চাইলে যেমন, স্ত্রী এ স্বামীর সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে দিন বণ্টন ও ভরণ পোষণ ব্যয়ের বেলায় তার কিছু দাবি ছেড়ে দিয়ে আপস মীমাংসা করলে এতে তাদের কোনো দোষ নেই। তবে স্ত্রী যদি এতে সম্মত না হয় তবে স্বামী তাকে রাখলে পূর্ণ অধিকার প্রদান করে রাখবে নতুবা সম্পূর্ণরূপে তাকে পরিত্যাগ করবে। এবং বিচ্ছিন্ন করা, দুর্ব্যবহার করা ও উপেক্ষা করা আপস নিষ্পত্তিই শ্রেয়।

মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাবের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : মানুষের মন স্বভাবত লালসাময়। ফলে সে অতিশয় কৃপণ। এ অস্থায়ই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে সেটা যেন এতটুকু সময়ের জন্যও তার কাছ থেকে অনুপস্থিত হয় না; বরং সব সময়ই তার নিকট উপস্থিত থাকে। অর্থাৎ মানুষের এ স্বভাবের দরুন স্ত্রী স্বামীর নিকট তার প্রাপ্তব্য অংশ ছেড়ে দিতে চাইবে না বা স্বামী যদি অন্য কোনো নারীকে ভালোবেসে থাকে তবে সেও তার স্ত্রীর সাথে কোনোরূপ সহযোগিতামূলক ব্যবহার করতে চাইবে না।

যদি তোমরা স্ত্রীর সাথে সংসার যাত্রা নির্বাহে সৎকর্মপরায়ণ হও এবং তাদের পীড়ন করা হতে সাবধান হও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তার সবিশেষ খবর রাখেন। অন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

وَاِنِ امْرَاَةٌ এটা এখানে এমন একটি উহ্য فِعْل বা ক্রিয়ার মাধ্যমে مَرْفُوْعٌ [পেশযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়া خَافَتْ যার বিবরণ ব্যক্ত করছে।

يَصَّالَحَا এতে মূলত : ص ও ت -এর اِدْغَام বা সন্ধি হয়েছে। অপর এক কেরাতে اَصْلَحَ ক্রিয়া রূপ হতে উদগত শব্দ يُصْلِحَا রূপে পঠিত হয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

طُمُوحٌ : طُمُوحٌ প্রত্যাশা, কামনা, বাসনা, উচ্চাভিলাষ।

جُبِلَ : (مَاضِى مَجْهُوْل : وَاحِدْ مُذَكَّر) তাকে তৈরি করা হয়েছে বাবে نَصَرَ ও ضَرَبَ থেকে তৈরি করা, বানানো, আকৃতি প্রদান করা।

نَشْدَةً : نَشْدَةً [ইহা نَصَرَ এর মাসদার] সন্ধান, খোজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ : وَإِنِ امْرَأَةٌ .... وَاسِعًا حَكِيْمًا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌছে দেয়। পবিত্র কুরআন নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণিকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া ভালোবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যে, তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮. তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কতিপয় ঘটনা তাফসীরে মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআনের সাধারণ নীতি فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে, পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোনো আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদ অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবি আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়তো এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

–[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ : অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনে কারীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথনির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে কাজেই স্ত্রী হয়তো মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়তো মনে করবে যে, দায়দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ, বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? এতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে, সাথে সাথে এরশাদ করা হয়েছে .... وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا যদি কোনো নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোনো গোনাহ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

এখানে গোনাহ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান প্রদানের মতো মনে হয়। কারণ স্বামীকে মহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবি হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বস্তুত এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার মাত্র। অতএব এটা সম্পূর্ণ জায়েজ। -[মাআরিফুল কুরআন]

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় : তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নেবে। এখানে بَيْنَهُمَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না; বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাকর ও স্বার্থের পরিপন্থি। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا অর্থাৎ আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশত স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েজ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবাহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে, বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান দেবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এর প্রতিদান হবে কল্পনার উর্ধ্বে, ধারণাতীত।

মোটকথা, পবিত্র কুরআন উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ব করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়। -[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ : অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীতে মিটমাট খুবই উত্তম বিষয় : কোনো পত্নী যদি দেখে স্বামীর মন তার থেকে উঠে গেছে এবং সে জন্য নিজের মহরানা ও ভরণ-পোষণ কিছুটা হ্রাস করে দিয়ে তাকে প্রসন্ন ও নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে নেয় তবে এরূপ মিটমাটের কারণে কারও কোনো পাপ হবে না। স্বামী স্ত্রীতে মিটমাট ও বনিবনাও খুবই উত্তম বিষয়। হ্যাঁ, স্ত্রীকে অকারণে যন্ত্রণা দেওয়া বা বিনা অনুমতিতে তার অর্থসম্পদে হস্তক্ষেপ করা গুনাহের কাজ। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ : অর্থাৎ নিজের স্বার্থ, অর্থ লালসা ও কার্পণ্য মানুষের মজ্জাগত বিষয়। কাজেই অবস্থা দৃষ্টে স্ত্রী যদি স্বামীর কিছু আর্থিক উপকার করে তবে সে খুশি হয়ে যাবে।

فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا : অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে যদি ভালো আচরণ কর এবং দুর্ব্যবহার ও বিবাদ বিসম্বাদ পরিহার কর, তবে মহান আল্লাহ তো তোমাদের সব খবরাখবর রাখেন। এ পুণ্যের ছওয়াব অবশ্যই দেবেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ অবস্থায় মন উঠে যাওয়া ও নাখোশ হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার ঘটাবে না, ফলে প্রসন্ন করার জন্য নিজের অধিকার হ্রাসেরও প্রয়োজন পড়বে না। -[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٢٩. وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا تُسَوُّوْا بَيْنَ النِّسَآءِ فِى الْمَحَبَّةِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ اِلَى الَّتِىْ تُحِبُّوْنَهَا فِى الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ فَتَذَرُوْهَا اَىْ تَتْرُكُوْا الْمَمَالَ عَلَيْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ الَّتِىْ لَا هِىَ اَيِّمٌ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ وَاِنْ تُصْلِحُوْا بِالْعَدْلِ فِى الْقَسْمِ وَتَتَّقُوْا الْجَوْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا لِمَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ مِنَ الْمَيْلِ رَحِيْمًا بِكُمْ فِىْ ذٰلِكَ ـ

১২৯. তোমরা তার যতই কামনা কর না কেন ভালোবাসার ক্ষেত্রে কখনও তোমারা স্ত্রীদের বরাবর করতে পারবে না, সমান ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের প্রতি অর্থাৎ ভরণ পোষণ ও দিন বণ্টনের ক্ষেত্রে যাকে ভালোবাস কেবল তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না আর অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না। অর্থাৎ যার প্রতি বিমুখ তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে রেখো না যে, সে স্বামীহীনাও নয় আবার স্বামীর অধিকারিনীও নয়।
যদি তোমরা দিন বণ্টনের ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার করতে: নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং পীড়ন করা হতে সাবধান হও, তবে আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে যে একজনের প্রতি অধিক আকর্ষণ বিদ্যমান তৎপ্রতি ক্ষমাশীল এবং এ বিষয়ে তোমাদের সাথে পরম দয়ালু।

١٣٠. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا اَىِ الزَّوْجَانِ بِالطَّلَاقِ يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا عَنْ صَاحِبِهِ مِنْ سَعَتِهِ اَىْ فَضْلِهِ بِاَنْ يَرْزُقَهَا زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَرْزُقَهُ غَيْرَهَا وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا لِخَلْقِهِ فِى الْفَضْلِ حَكِيْمًا فِيْمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ ـ

১৩০. যদি তারা অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী তালাকের মাধ্যমে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ তার প্রাচুর্য দ্বারা, তার অনুগ্রহ দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অপর জন হতে অভাব মুক্ত করে দেবেন। যেমন, স্ত্রীর জন্য অন্য কোনো স্বামীর, আর স্বামীর জন্য অন্য কোনো স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দেবেন।
আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে প্রাচুর্যময় এবং তাদের জন্য তিনি যা ব্যবস্থা করেন তাতে প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

مَمَالٌ : مَمَالٌ [ইহা বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার] ঝুকে যাওয়া, ধাবিত হওয়া।
جَوْرٌ : جَوْرٌ [ইহা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার] জুলুম করা, অন্যায় করা।
مَيْلٌ : مَيْلٌ [ইহা ضَرَبَ এর মাসদার] ধাবিত হওয়া।
دَبَّرَ : دَبَّرَ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ : مَاضِىْ مَعْرُوْفٌ] ব্যবস্থা করা, পরিচালনা করা, চিন্তা করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ الخ : অর্থাৎ স্ত্রী একাধিক থাকলে মনের ভালোবাসা ও অন্যান্য আচার-আচরণে সমতা রক্ষা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে এরূপ বৈষম্য ও করো না যে, একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে গেলে এবং অন্যজনকে মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখলে; না সুখ-শান্তিতে রাখছ, না ত্যাগ করছ যে, অন্যত্র তার বিবাহ হবে। -[তাফসীরে উসমানী]

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا : অর্থাৎ যদি সংশোধন ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ কর এবং জুলুম ও অধিকার খর্ব করা হতে যথাসম্ভব বেঁচে থাক, তবে এরপর কিছু হয়ে গেলে তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ : অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যদি বিচ্ছেদকেই পছন্দ করে নেয় এবং তালাককেই স্থির হয়ে যায়, তবে কোনো অসুবিধা নেই, আল্লাহর তা'আলা প্রত্যেকের কর্মবিধায়ক ও সকলের প্রয়োজন সমাধানকারী। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, স্ত্রীকে আরামে রাখবে, কোনো প্রকার কষ্ট দেবে না। আর তা না পারলে তালাক দেওয়াই সমীচীন। -[তাফসীরে উসমান]

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٣١. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ مِنْ قَبْلِكُمْ اَىِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى وَاِيَّاكُمْ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَنِ اَىْ بِاَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ خَافُوْا عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ وَ قُلْنَا لَهُمْ وَلَكُمْ اَنْ تَكْفُرُوْا بِمَا وَصَّيْتُمْ بِهِ فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ خَلْقًا وَمِلْكًا وَعَبِيْدًا فَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا عَنْ خَلْقِهِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ حَمِيْدًا مَحْمُوْدًا فِى صُنْعِهِ بِهِمْ .

১৩১. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব অর্থাৎ কিতাবসমূহ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদেরকে এবং হে কুরআনের অধিকারীগণ! তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, আল্লাহকে ভয় কর। তার শাস্তিকে ভয় কর; অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর।

আর তোমাদেরকে ও তাদেরকে বলেছিলাম, তোমরা যে বিষয়ে তোমাদেরকে অসিয়ত করা হয়েছে তা যদি প্রত্যাখ্যান কর তবে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু সৃষ্টি, মালিকানা ও দাস হিসাবে আল্লাহর। সুতরাং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান তাঁর কোনোরূপ ক্ষতি করবে না। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি এবং তাদের ইবাদত হতে অনপেক্ষ এবং তাদের সাথে আচরণে তিনি প্রশংসাভাজন।

اَنْ এটা بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত। حَمِيْد অর্থ مَحْمُوْد বা প্রশংসিত।

١٣٢. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ كَرَّرَهُ تَاكِيْدًا لِتَقْرِيْرِ مُوْجِبِ التَّقْوٰى وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا شَهِيْدًا بِاَنَّ مَا فِيْهِمَا لَهُ .

১৩২. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। তাকওয়া ও তাকে ভয় করার মূল কারণটির মধ্যে ......বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ আয়াতটির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। উকিল হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। অর্থাৎ এতদুভয়ের সব কিছু আল্লাহর এ কথার সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

١٣٣. اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ يَاَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ بَدَلَكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا .

১৩৩. হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত এবং তোমাদের স্থলে অন্য এক সম্প্রদায়কে আনতে পারেন। আর আল্লাহ এতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

http://islamiboi.wordpress.com

١٣٤. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لِمَنْ اَرَادَهُ لَا عِنْدَ غَيْرِهِ فَلِمَ يَطْلُبُ اَحَدُهُمَا الْاَخَسَّ وَهَلَّا طَلَبَ الْاَعْلٰى بِاِخْلَاصِهِ لَهُ حَيْثُ كَانَ مَطْلَبُهُ لَا يُوْجَدُ اِلَّا عِنْدَهُ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

১৩৪. যে ব্যক্তি তার কার্যের মাধ্যমে ইহকালে পুরস্কার চায় সে জেনে রাখুক, যে আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকাল সকল কালের পুরুস্কার বিদ্যমান, যে ব্যক্তি তা চায় তার জন্য। অন্য কারও নিকট তা নেই। সুতরাং তোমরা এতদুভয়ের নিকৃষ্টতরটি কেন চাও? ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে শ্রেয়স্তরটি কেন চাও না? কারণ, তিনি ব্যতীত আর কারও নিকট তো উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا : **সব কিছুর মালিক আল্লাহ এবং তিনিই কর্মবিধায়ক** : উৎসাহ দান ও সতর্কীকরণ ছিল ইতিপূর্বের আলোচনা মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ মহান আল্লাহর আদেশ মান্য করা ও তার বিরুদ্ধাচরণ পরিহার করা সকলের জন্যই অবশ্য কর্তব্য। তার আদেশের বর্তমানে অন্য কারও কথায় কর্ণপাত করা আদৌ জায়েজ নয়। মাঝখানে এতিম ও নারী সম্পর্কিত কতিপয় বিধান উদ্ধৃত হয়েছে। কারণ এ ক্ষেত্রে তখন সমানে অন্যায় অনাচার চলছিল। এখন আবার সেই উদ্বুদ্ধ ও সতর্কীকরণ করা হচ্ছে। এ আয়াদ্বয়ের সারমর্ম এই যে, তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আদেশ শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় কর, তার অবাধ্যতা প্রকাশ করো না। কেউ যদি তার আদেশ অমান্য করে, তবে জেনে রাখুন মহান আল্লাহ সব কিছুর মালিক। কার ও কোনো পরওয়া তার নেই। অর্থাৎ সে নিজেরই ক্ষতি করবে মহান আল্লাহর কিছু ক্ষতি হবে না। যদি আনুগত্য প্রকাশ কর, তবুও মনে রেখ, তিনি সব কিছুর অধিকর্তা। তোমাদের যাবতীয় কার্য সমাধা করতে পারেন। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : অর্থাৎ আসমান ও জমিন যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিন বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহর সচ্ছলতা প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ তা'আলার কোনোই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ পাকের অপার রহমত ও সহয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য কারো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন এবং অনায়াসে তা সুসম্পন্ন করে দেবেন।

–[মাআরিফুল কুরআন]

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ .... : এ আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভিরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। –[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করলে তোমাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয়ই দিবেন। কাজেই কেবল দুনিয়ার পেছনে পড়া ও আখেরাত থেকে বঞ্চিত হওয়া নিতান্তই মুর্খতা।

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কাজ দেখেন সব কথা শুনেন। তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٣٥. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ قَائِمِيْنَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ شُهَدَاۤءَ بِالْحَقِّ لِلّٰهِ وَلَوْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاشْهَدُوْا عَلَيْهَا بِاَنْ تُقِرُّوْا بِالْحَقِّ وَلَا تَكْتُمُوْهُ اَوْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنِ الْمَشْهُوْدُ عَلَيْهِ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا مِنْكُمْ وَاَعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى فِىْ شَهَادَتِكُمْ بِاَنْ تُحَابُّوا الْغَنِىَّ لِرِضَاهُ اَوِ الْفَقِيْرَ رَحْمَةً لَهٗ اَنْ لَا تَعْدِلُوْا تَمِيْلُوْا عَنِ الْحَقِّ وَاِنْ تَلْوٗا تُحَرِّفُوا الشَّهَادَةَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِ الْوَاوِ الْاُوْلٰى تَخْفِيْفًا اَوْ تُعْرِضُوْا عَنْ اَدَائِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

১৩৫. হে বিশ্বাসী ! তোমারা ন্যায় বিচারে ইনসাফ বিধানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কায়েম থাকবে। আল্লাহর উদ্দেশ্য সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করবে, যদি ও এটা এ সাক্ষ্য তোমাদের নিজের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয় অর্থাৎ এদের বিরুদ্ধে হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে, সত্যকে স্বীকার করে নেবে এবং তা গোপন করে রাখবে না। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হচ্ছে সে বিত্তবান হউক বা বিত্তহীন তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহই উভয়ের যোগ্যতর অভিভাবক এবং তাদের কল্যাণ সম্পর্কে তিনিই অধিক অবহিত। ন্যায় বিধান না করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সত্য হতে বিমুখ হয়ে সাক্ষ্য প্রদানে তোমরা প্রবৃত্তির অনুরসণ করো না। যেমন বিত্তশালীর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার পক্ষে বা বিত্তহীনের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে তার পক্ষে সাক্ষ্য দান করো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অর্থাৎ সাক্ষ্য বিকৃত কর বা তা প্রাদানে পাশ কেটে যাও তবে জেনে রাখ, তোমারা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

اَنْ -এর পূর্বে একটি হেতুবোধ لَامْ উহ্য রয়েছে।

تَعْدِلُوْا -এর পূর্বে একটি নাবোধক শব্দ لَا উহ্য রয়েছে।

تَلْوٗا এটা মূলত: ছিল تَلْوُوْا অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف বা সরলী ও লঘু করণার্থে প্রথম وَاوْ টি বিলুপ্ত করে পঠিত রয়েছে।

١٣٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا دَاوِمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ عَلَى الرُّسُلِ بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فِى الْفِعْلَيْنِ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ ـ

১৩৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ তার রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে অর্থাৎ আল কুরআনে এবং যে কিতাব অর্থাৎ কিতাবসমূহ তার রাসূলগণের উপর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর। অর্থাৎ এ বিশ্বাসের উপর চির প্রতিষ্ঠিত থাক।

আর যে কেউ আল্লাহ, তার ফেরেশতা, তার কিতাব, তার রাসূল এবং পরকাল প্রত্যাখ্যান করে সে সত্য হতে বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

نَزَّلَ ও اَنْزَلَ এ উভয় ক্রিয়াই অপর এক কেরাত بِنَاءٌ لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য গঠিত রয়েছে।

http://islamiboi.wordpress.com

তাহকীক ও তারকীব

تَكْتُمُونَ : (جَمْعُ مُذَكَّرٍ : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَعْرُوفٌ) বহুবচন তোমরা গোপন কর, বাবে نَصَرَ থেকে كَتَمَ يَكْتُمُ كِتْمَانًا গোপন করা। مَصَالِحُ : مَصْلَحَةٌ বহুবচন স্বার্থ, সুবিধা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুনিয়ার বুকে **নবী প্রেরণ ও কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি** প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি। **সূরা নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল** থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্যদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে **সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত** করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। **সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু** এমনকি শব্দাবলি ও প্রায় অভিন্ন। সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, **হযরত আদম (আ.) কে প্রতিনিধিরূপে দুনিয়ায়** পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক সাহীফা ও আসমানি **কিতাব নাজিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার** বুকে শান্তি শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক **ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ** ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ নসিহত, তালিম ও তরবিয়তের **মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে** সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত **শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা** হবে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও **ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল** থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগত**ভাবেও নির্দেশ** দেওয়া **হয়েছে, যেন** সে নিজে ন্যায়নীতির **উপর স্থির থাকে** এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর **অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য** চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির **একটি** পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। **তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন** ন্যায়নীতিকে **পদদলিত করবে** নিজেরা তো ন্যায়নীতির ধার ধরবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির **উপর স্থির থাকতে** দেবে না; তখন তাদেরকে **দমন করার জন্য** আইন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। **এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ** ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠ করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের **কথা**, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা **শুধু** সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব; এ ব্যাপারে জনগণের কোনো দায়দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের **জনগণ সরকারের** কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবি করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। **এরই কুফল আজ** সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল **সব দেশেই আইন** প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য **অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা** দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর মনমানসিকতা, আবেগ **অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনী**য়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করেছে। তারপর জনমত যাচাই **করার জন্য তার প্রকাশ ও** প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকর করার জন্য **সরকারের প্রশাসনযন্ত্র** সচল হয়ে উঠে। যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত **রয়েছেন দেশের** সুদক্ষ বিশেজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তারা সক্রিয় কর্মতৎপরতা **প্রদর্শন করছেন**। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্রমন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের **অন্ধ অনুকরণের** ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। –[মাআরিফুল কুরআন]

খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি : সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি চলমান সামাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রাসূলে আরাবি ﷺ-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি, বরং

http://islamiboi.wordpress.com

ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না একমাত্র খোদাভীতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব উপলব্ধি করতে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কুরআন মাজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্ট করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানুষের ধ্যান ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহাবিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্ববর্তী অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রা, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্রমন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোনো আধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোনো গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রাসূলে আরাবি ﷺ -এর পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, খোদাভীতি ও আখেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। এরশাদ হয়েছে- أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ মনে রেখো একমাত্র আল্লাহর স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহ বস্তুত: পক্ষে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ।

কুরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানে ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে। যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, জুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখেরাতে জান্নাত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতি সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে। -[মাআরিফুল কুরআন।]

قَوْلُهُ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ : অর্থাৎ সাক্ষ্য সততা ও মহান আল্লাহর আদেশ অনুসারেই দেওয়া উচিত। যদিও তাতে তোমাদের বিশেষ প্রিয়জনের ক্ষতি হয়ে যায়, যা সত্য তাই প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। পার্থিব স্বার্থের খাতিরে আখেরাতের ক্ষতি কুড়িও না।

قَوْلُهُ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا : সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও সততা রক্ষা করা ফরজ। সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের মনের ইচ্ছাও প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যেমন বিত্তবানের পক্ষপাত করে বা অভাভগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সত্য গোপন করা। যা সত্য তাই বল। তাদের প্রতি আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশি সহানুভূতিশীল এবং তিনি তাদের হিতাহিত সম্বন্ধে অবগত। তার কোনো কিছুর কমতি নেই। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا : জিহ্বা বিকৃত করার অর্থ সত্য বললেও জিহ্বা চাপিয়ে ও কথা পেঁচিয়ে বলা, যাতে শ্রোতা সন্দেহে পড়ে যায়। অর্থাৎ স্পষ্ট না বলা। পাশ কাটানোর অর্থ সব কথা না বলা এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য ছেড়ে যাওয়া। এ উভয় অবস্থায় মিথ্যা বলা না হলেও সত্য প্রকাশ না করার দরুন গুনাহ হবে। সাক্ষ্য সত্য ও দিতে হবে এবং স্পষ্ট ও পূর্ণও। -[তাফসীরে উসমানী]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الخ : অর্থাৎ যে ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ প্রত্যয়ী হতে হবে। কোনো একটি নির্দেশও অস্বীকার করলে সে মুসলিম হতে পারে না। কেবল বাহ্য ও মৌখিক কথার কোনো মূল্য নেই।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٣٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِمُوْسٰى وَهُمُ الْيَهُوْدُ ثُمَّ كَفَرُوْا بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ ثُمَّ اٰمَنُوْا بَعْدَهُ ثُمَّ كَفَرُوْا بِعِيْسٰى ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا بِمُحَمَّدٍ لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ مَا اَقَامُوْا عَلَيْهِ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَى الْحَقِّ.

১৩৭. যারা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে অর্থাৎ ইহুদি সম্প্রদায় পরে গোবৎস উপাসনা করে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, অতঃপর পুনঃবিশ্বাস এনেছে, অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে কুফরি করেছে, অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তাদের ঐ কুফরি আরো বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তারা যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত তা কখনও ক্ষমা করার নন আর কখনও তাদেরকে পথ অর্থাৎ সত্যে উপনীত হওয়ার পন্থা প্রদর্শন করার নন।

١٣٨. بَشِّرِ اَخْبِرْ يَا مُحَمَّدُ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ.

১৩৮. হে মুহাম্মদ! [মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও] অর্থাৎ খবর দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তি।

١٣٩. اَلَّذِيْنَ بَدَلٌ اَوْ نَعْتٌ لِلْمُنٰفِقِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط لِمَا يَتَوَهَّمُوْنَ فِيْهِمْ مِنَ الْقُوَّةِ اَيَبْتَغُوْنَ يَطْلُبُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ اَىْ لَا يَجِدُوْنَهَا عِنْدَهُمْ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَا يَنَالُهَا اِلَّا اَوْلِيَاؤُهُ.

১৩৯. মু'মিনদের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে তাদের শক্তি আছে বলে ধারণা করে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এরা কি তাদের নিকট শক্তি চায়? বল অনুসন্ধান করে? না, তা তাদের নিকট পাবে না। ইহকালে ও পরকালে সমস্ত শক্তি তো আল্লাহরই। তারা ওলী ও বন্ধুরা ব্যতীত আর কেউ তা পাবে না।

اَلَّذِيْنَ এটা بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ অথবা মুনাফিকদের نَعْتٌ বা বিশ্লেষণ।

اَيَبْتَغُوْنَ -এর প্রশ্নবোধকটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اِزْدَادُوْا : বৃদ্ধি করল।

مَا اَقَامُوْا عَلَيْهِ : তারা যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।

يَتَوَهَّمُوْنَ : তারা ধারণা করে।

اَلْعِزَّةُ : শক্তি।

يَبْتَغُوْنَ : তারা চায়, কামনা করে।

http://islamiboi.wordpress.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا : মুনাফিকী করে মুক্তি পাওয়া যাবে না : কেবল প্রকাশ্য ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু অন্তরে দোদুল্যমান এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন ছাড়াই মারা গেলে, তার মুক্তির কোনো পথ নেই। সে কাফির । বাইরে ইসলাম জাহির করলে কোনো কাজ হবে না। এর দ্বারা মুনাফিকদের কথা বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, এ আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ। তারা প্রথমে ঈমান এনেছিল। তারপর বাছুর পূজা করে কাফির হয়ে যায়। আবার তওবা করে মু'মিন হয়। সবশেষে হযরত ঈসা (আ.) কে অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়। আরও পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবিশ্বাস করে সে কুফরিতে অগ্রগামী হতে থাকে। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا : এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরির মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কুরআন হাদীসের অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বড় কট্টর কাফির বা মুরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব বার বার কুফরি করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফিকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بَشِّرْ অর্থাৎ, সুসংবাদ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোনো সুসংবাদ শোনার জন্য প্রত্যেকই উদগ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এছাড়া আর কোনো সংবাদ নেই। বরং তাদের জন্য সুসংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয় : দ্বিতীয় আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা অবান্তর প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইজ্জত সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইজ্জত সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারাধীন।

কাফির ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলামেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান মর্যাদা, শক্তিসামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য সহযোগিতায় আমাদের ও মান মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্খা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকারে কোনো মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোনো ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত। এতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তারা শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামি!

এ সম্পর্কে সূরায়ে মুনাফিকূন -এ ইরশাদ হয়েছে– وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ ইজ্জত-সম্মান একমাত্র আল্লাহ, রাসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়। এখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে হযরত রাসূল ﷺ ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফির ও মুশরিকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোনো ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফারূকে আজম হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বান্দাদের [মাখলুকের] সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

http://islamiboi.wordpress.com

হযরত আবূ বকর (রা.) আহকামুল কুরআনে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফির, মুশরিক পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয়নি। কেননা সূরা মুনাফিকূনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ -কে ও মুমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সম্মান হয়, তবে তা আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তার রাসূল ﷺ ও মুমিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ আখেরাতের আরাম-আয়েশ, ইজ্জত-সম্মান কোনো কাফির বা মুশরিক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান মর্যদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ব থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হতমান হলে পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজির রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا : অর্থাৎ মুনাফিকরা মুসলিমগণকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, তারা মনে করে কাফিরদের সাথে উঠাবসা করলে আমরা দুনিয়ায় সম্মানিত হব। এটা বিলকুল মিথ্যা। সম্মান ও মর্যাদা সব আল্লাহরই হাতে। যে তার আনুগত্য করবে সে ইজ্জত পাবে। মুনাফিকরা, তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে লাঞ্ছিত থাকবে। -[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ : এ আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আনআমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে। আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাজিল করেছিলাম যে, কাফির ও মুনাফিকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত- সম্মানের মালিক মুক্তার মনে করেছে।

বাতিলপন্থিদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম : সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আনআমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সম্মিলিত মর্ম এই যে, যদি কোনো প্রভাবে কাতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কোনো আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম।

মোটকথা, বাতিলপন্থিদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথম : তাদের কুফরি চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরি। দ্বিতীয়ত : গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসেকি। তৃতীয়ত : পার্থিব প্রয়োজনবশত বিরক্তি সহকারে বসা জায়েজ। চতুর্থতঃ জোর জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ পঞ্চমতঃ তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া ছওয়াবের কাজ। -[মা'আরিফুল কুরআন]

কুফরির প্রতি মৌন সম্মতি ও কুফরি : আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে- اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ অর্থাৎ এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহের অংশীদার হবে। অর্থাৎ খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরি কথাবার্তা মনেপ্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুত: তোমরাও কাফির হয়ে যাবে। কেননা কুফরিকে পছন্দ করাও কুফরি। আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠাবসা করে এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরিয়তকে হেয় পতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতোই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। -[মা'আরিফুল কুরআন]

http://islamiboi.wordpress.com

١٤٠. وَقَدْ نَزَّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ فِىْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ اَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ اَىْ اَنَّهُ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ اَىِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُسْتَهْزِءِيْنَ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ اِنَّكُمْ اِذًا اِنْ قَعَدْتُمْ مَعَهُمْ مِّثْلُهُمْ فِى الْاِثْمِ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا كَمَا اجْتَمَعُوْا فِى الدُّنْيَا عَلَى الْكُفْرِ وَالْاِسْتِهْزَاءِ

অনুবাদ :

১৪০ আল কিতাবে نَزَّلَ -এটা مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যও مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য উভয়রূপেই রয়েছে। অর্থাৎ আল কুরআনে, তার সূরা আনআমে اَنْ এটা مُثَقَّلَة [তশদীদসহ রূঢ়রূপ] হতে مُخَفَّفَة [তাশদীদহীন লঘু] রূপে পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে তার اِسْم বা উদ্দেশ্যটি উহ্য। মূলত: ছিল اَنَّهٗ নিশ্চয় এটা যে ....]। তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর অর্থাৎ আল কুরআনের কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারী ও বিদ্রূপকারীদের সাথে বসো না। অন্যথায় অর্থাৎ এমতাবস্থায়ও যদি তাদের সাথে বস তবে পাপের ক্ষেত্রে তোমরাও তাদের মতো হয়ে পড়বে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন। যেমন, দুনিয়াতে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং বিদ্রূপ করার কাজে তাদেরকে একত্রিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا الخ : যে সব মজলিসে পবিত্র কুরআন নিয়ে তামাশা করা হয় তাতে সংশ্লিষ্ট থাকা যাবে না। আয়াতে বলা হচ্ছে হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কুরআন মাজীদে পূর্বেই নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে মজলিসে কুরআন নিয়ে তামাশা করা হয় ও তার প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন করা হয় সেখানে কিছুতেই বসবে না। নতুবা তোমাদেরকেও তাদের অনুরূপ মনে করা হবে। হ্যা , যখন তারা অন্য কথায় লিপ্ত হবে, তখন বসতে মানা নেই। মুনাফিকদের মুজলিসমূহে মহান আল্লাহর বিধানাবলিতে অবিশ্বাস জ্ঞাপন ও কুরআন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। পূর্বেই আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে নিম্নের আয়াতে প্রতি وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনা মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়বে। [৬ : ৬৮] এ আয়াত পূর্বে নাজিল হয়েছিল।

–[তাফসীরে উসমানী]

http://islamiboi.wordpress.com

১৪১. اَلَّذِيْنَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ يَتَرَبَّصُوْنَ
يَنْتَظِرُوْنَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ
ظَفَرٌ وَغَنِيْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا لَكُمْ اَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ فِي الدِّيْنِ وَالْجِهَادِ فَاَعْطُوْنَا مِنَ
الْغَنِيْمَةِ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ مِنَ
الظَّفَرِ عَلَيْكُمْ قَالُوْا لَهُمْ اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ
نَسْتَوْلِ عَلَيْكُمْ وَنَقْدِرْ عَلٰى اَخْذِكُمْ وَقَتْلِكُمْ
فَاَبْقَيْنَا عَلَيْكُمْ وَ اَلَمْ نَمْنَعْكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَظْفَرُوْا بِكُمْ بِتَخْذِيْلِهِمْ
وَمُرَاسَلَتِكُمْ بِاَخْبَارِهِمْ فَلَنَا عَلَيْكُمُ الْمِنَّةُ
قَالَ تَعَالٰى فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَنْ يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلَهُمُ
النَّارَ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا بِالْاِسْتِئْصَالِ.

১৪২. اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ بِاِظْهَارِهِمْ
خِلَافَ مَا اَبْطَنُوْهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدْفَعُوْا عَنْهُمْ
اَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ مُجَازِيْهِمْ
عَلٰى خِدَاعِهِمْ فَيَفْتَضِحُوْنَ فِى الدُّنْيَا
بِاطِّلَاعِ اللّٰهِ نَبِيَّهُ عَلٰى مَا اَبْطَنُوْهُ
وَيُعَاقَبُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ
مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَامُوْا كُسَالٰى مُتَثَاقِلِيْنَ
يُرَاۤءُوْنَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ
يُصَلُّوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا رِيَاءً.

অনুবাদ :

১৪১. যারা اَلَّذِيْنَ এটা পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। তোমাদের উপর বিপদ নেমে আসার অপেক্ষায় থাকে, প্রতীক্ষায় থাকে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের জয় সাফল্য ও গনিমত লাভ হলে তোমাদেরকে তারা বলে, ধর্ম বিশ্বাস ও জেহাদের ক্ষেত্রে আমরা কি তোমাদের সঙ্গে নই? সুতরাং আমাদেরকে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীন হতে অংশ দাও। আর ভাগ্য যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অনুকূল হয়। অর্থাৎ তাদের যদি তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ ঘটে তখন তাদেরকে এরা বলে আমরা কি তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার মতো ছিলাম না? অর্থাৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করার এবং হত্যা করার শক্তি আমাদের ছিল কিন্তু আমরা তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করেছি আর আমরা কি বিশ্বাসীদেরকে অপমান করত: ও তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করত তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া হতে বাধা দিয়ে রাখিনি? সুতরাং তোমাদের প্রতি আমাদের বহু অনুগ্রহ বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের [মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন।] তোমাদেরকে জান্নাতে এবং তাদেরকে তিনি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবেন। এবং আল্লাহ কখনও মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার কোনো পথ কোনো উপায় রাখবেন না।

১৪২. ইসলামের জাগতিক বিধানসমূহ হতে নিজেদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা অন্তরে যে কুফরি গোপন করে রেখেছে তার বিপরীত ঈমানের কথা প্রকাশ করত। মুনাফিকরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়; বস্তুত তিনিই তাদেরকে প্রতারিত করেন। অর্থাৎ তিনি এদের মুনাফিকীর প্রতিফল প্রদান করবেন। অনন্তর তারা অন্তরে যা গোপন করে রেখেছে আল্লাহ কর্তৃক তা রাসূলকে অবহিত করার মাধ্যমে তারা এ দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত হবে এবং পরকালেও তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। মু'মিনদের সাথে তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে বিরাট এক বোঝা বহন করছে সেভাবে দাঁড়ায়। এ সালাতের মাধ্যমে তারা লোক প্রদর্শনী করে এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। অর্থাৎ কেবল রিয়া ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তারা সালাতে শরিক হয়।

http://islamiboi.wordpress.com

١٤٣. مُذَبْذَبِيْنَ مُتَرَدِّدِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ لَا مَنْسُوْبِيْنَ اِلٰى هٰؤُلَاۤءِ اَىِ الْكُفَّارِ وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاۤءِ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا اِلَى الْهُدٰى ـ

১৪৩. দোটানায় অর্থাৎ কুফর ও ঈমানের মাঝে তারা দোদুল্যমান, দ্বিধান্বিত। না এদের অর্থাৎ কাফিরদের সাথে তারা সম্পর্কিত আর না এদের অর্থাৎ মু'মিনদের সাথে তারা সংশ্লিষ্ট। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য হেদায়েতের কোনো পথ পাবে না।

١٤٤. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ بِمُوَالَاتِهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا بُرْهَانًا بَيِّنًا عَلٰى نِفَاقِكُمْ ـ

১৪৪. হে বিশ্বাসীগণ! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ তোমাদের মুনাফিকীর উপর সুস্পষ্ট দলিল দিতে চাও?

١٤٥. اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْمَكَانِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَهُوَ قَعْرُهَا وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ مَانِعًا مِنَ الْعَذَابِ ـ

১৪৫. নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামাগ্নির নিম্নতম স্তরে স্থানে, অর্থাৎ তার গহীন গহ্বরে থাকবে এবং তাদের পক্ষে তুমি কখনও কোনো সহায় পাবে না। যে শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে।

তাহকীক ও তারকীব

دَوَائِرَ : دَائِرَةٌ বহুবচন دَوَائِرُ অর্থ– বিপদ, দুর্যোগ, পরিধি।

ظَفَرٌ : ظَفَرٌ [ইহা سَمِعَ -এর মাসদার] সফলতা বিজয়।

نَسْتَوِىْ : نَسْتَوِىْ [مُضَارِعْ مَعْرُوْف : جَمْعُ مُتَكَلِّمْ] অর্থ– আমরা প্রভাব বিস্তার করি। বাবে اِسْتِفْعَالٌ থেকে اِسْتَوٰى يَسْتَوِىْ অর্থ– প্রভাব বিস্তার করা, কর্তৃত্ব লাভ করা।

تَخْذِيْلٌ : تَخْذِيْلٌ [ইহা বাবে تَفْعِيْلٌ -এর মাসদার] লাঞ্ছিত করা, অপদস্ত করা।

مِنَّةٌ : مِنَّةٌ বহুবচন مِنَنٌ অর্থ– অনুগ্রহ , দয়া।

اِسْتِيْصَالٌ : اِسْتِيْصَالٌ অর্থ– সমূলে ধ্বংস করা, শিকড় উপড়ে ফেলা।

يَفْتَضِحُوْنَ : يَفْتَضِحُوْنَ (مُضَارِعْ مَعْرُوْف : جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ) অর্থ– তারা অপদস্ত হবে। বাবে اِفْتِعَالٌ থেকে অপদস্ত হওয়া।

مُتَثَاقِلِيْنَ : مُتَثَاقِلٌ বহুবচনে مُتَثَاقِلُوْنَ অর্থ– অলস, কুঁড়ে বোঝা বহনকারী।

مُتَرَدِّدِيْنَ : مُتَرَدِّدٌ বহুবচনে مُتَرَدِّدُوْنَ অর্থ– দ্বিধান্বিত, সন্দিহান।

http://islamiboi.wordpress.com

অনুবাদ :

١٤٦. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَ النِّفَاقِ وَاَصْلَحُوْا عَمَلَهُمْ وَاعْتَصَمُوْا وَثِقُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ مِنَ الرِّيَاءِ فَاُولٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا يُؤْتُوْنَهُ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا فِى الْاٰخِرِ هُوَ الْجَنَّةُ.

১৪৬. কিন্তু যারা মুনাফিকী হতে তওবা করে, নিজেদের আমল সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে অর্থাৎ তাঁর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দীনকে রিয়া ও লোক প্রদর্শন হতে নির্মল করে তারাই বিশ্বাসীদের সাথে থাকবে। অর্থাৎ বিশ্বাসীদেরকে যা প্রদান করা হবে তাতে তারা থাকবে এবং বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ পরকালে মহাপুরস্কার দেবেন অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।

١٤٧. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ نِعَمَهُ وَاٰمَنْتُمْ بِهٖ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَىْ لَا يُعَذِّبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا لِاَعْمَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْاِثَابَةِ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ.

১৪৭. যদি তোমরা তার নেয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর, তবে তোমাদের শাস্তি দানে আল্লাহর কি কাজ? অর্থাৎ তবে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না।
مَا يَفْعَلُ এখানে نَفِى বা নিষেধাত্মক অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার করা হয়েছে। আর আল্লাহ মু'মিনদের কাজের গুণগ্রাহী, তাদেরকে তিনি পুণ্যফল দেবেন এবং তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ : এখানে মুনাফিকদের বাচার উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যেই মুনাফিক তার মুনাফিকী হতে তওবা করবে, নিজের কাজ কর্ম সংশোধন করবে, মহান আল্লাহর প্রিয় দীনকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে, মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে এবং লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও অন্যান্য চারিত্রিক দোষ হতে দীনকে পাকপবিত্র রাখবে সে খাঁটি মু'মিন, দুনিয়া ও আখেরাতে সে মু'মিনগণের সঙ্গে থাকবে। ঈমানদারগণের জন্য রয়েছে মহা প্রদিতান। যারা মুনাফিকী হতে তওবা করবে তারাও সে প্রতিদানে শরিক থাকবে। −[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ : অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে একমাত্র ঐসব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কোনোরূপ রিয়াকারী যা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই মুখলেস শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে মাজহারীতে লিখিত আছে− الَّذِىْ يَعْمَلُ لِلّٰهِ لَا يُحِبُّ اَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ অর্থাৎ, মুখলেস সে ব্যক্তিকে বলে যে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং ঐ কাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না। −[মাআরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের মূল্যায়ন করেন। তিনি বান্দাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত। কাজেই, যে ব্যক্তি তার আদেশ ও নিষেধকে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করে ও সেগুলোকে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মনে করে এবং তাতে বিশ্বাস রাখে, পরম দয়ালু ন্যায়পরায়ণ আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিকে কেন শাস্তি দিতে যাবেন। অর্থাৎ তা কস্মিনকালেও শাস্তি দিবেন না। তিনি তো উদ্ধত অহংকারীকেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। −[তাফসীরে উসমানী]

١٥٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ كُلِّهِمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيْهِمْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اُجُوْرَهُمْ ط ثَوَابَ اَعْمَالِهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمًا بِاَهْلِ طَاعَتِهٖ.	১৫২. যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণ সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করে না, তাদেরকেই তিনি তাদের কার্যের পুরস্কার দিবেন نُؤْتِيْهِمْ শব্দটি نُوْن দ্বারা অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন ও ى দ্বারা অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে পঠিত রয়েছে। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল তাঁর বন্ধুদের প্রতি এবং পরম দয়ালু। বাধ্যগতদের বিষয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ : اَلْجَهْرَ শব্দের মর্ম হলো رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْقَوْلِ وَغَيْرِهٖ অর্থাৎ আওয়াজ উঁচু করা। এখানে جَهْرٌ بِالْقَوْلِ দ্বারা সাধারণ (مُطْلَقٌ) اِظْهَارٌ বা প্রকাশকরণ উদ্দেশ্য। চাই তা সশব্দে হোক বা না হোক।

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : এটি উহ্য مُسْتَثْنٰى مِنْه সুতরাং এ আপত্তি শেষ হয়ে গেল যে, اِلَّا مَنْ ظُلِمَ পূর্বের থেকে اِسْتِثْنَا শুদ্ধ নয় এবং اَلْجَهْرَ হলো মাসদারের উহ্য ফায়েল আর মাসদারের ফায়েল হযফ করা জায়েজ আছে। আর اِلَّا مَنْ ظُلِمَ সেই উহ্য ফায়েল থেকেই مُسْتَثْنٰى কিংবা উহ্য مُضَافٌ মানা হবে। মূল ইবারত হবে এভাবে- اِلَّا ظُهَرَ مَنْ ظُلِمَ উক্ত উভয় সূরতে مُسْتَثْنٰى টি مُتَّصِلٌ হবে।

قَوْلُهُ اَىْ يُعَاقِبُ عَلَيْهِ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে মহব্বত না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্রোধ ও শাস্তি।

قَوْلُهُ : فَاِنْ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا : এ জুমলাটি جَوَابُ شَرْطٍ আর اِنْ تُبْدُوْا এবং اِنْ تُخْفُوْهُ এবং اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ -এই তিনটি জুমলা عَفُوًّا -এর মাধ্যমে شَرْطٌ হয়েছে। جَوَابُ شَرْطٍ দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে মূলত তৃতীয় জুমলা তথা اَوْتَعْفُوْا এর جَوَابُ شَرْطٍ উদ্দেশ্য। কেননা যদি শর্ত দ্বারা اِخْفَاءُ خَيْرٍ বা اِبْدَاءُ خَيْرٍ উদ্দেশ্য হতো তাহলে جَوَابُ شَرْطٍ হিসেবে শুধু فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا বলে ক্ষান্ত করা শুদ্ধ হবে না। এ থেকে জানা গেল, اِبْدَاءُ خَيْرٍ এবং اِخْفَاءُ خَيْرٍ যে কেবল ভূমিকা স্বরূপ আনা হয়েছে। একথা বোঝানোর জন্য যে, প্রকাশ্যে কিংবা গোপনভাবে কল্যাণ কাজ করাও ছওয়াবের কাজ কিন্তু প্রতিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া অনেক বড় ছওয়াবের কাজ। কেননা এটি আল্লাহ তা'আলারও সিফত

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ : **পরনিন্দা ও কুৎসা রচনা** : আলোচ্য আয়াত চারিত্রিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক অর্থে পরনিন্দা ও কুৎসা রচনা এবং আইনের ভাষায় কারো মানহানিকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ, একক জাতি উভয়ের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এক মহান নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। اَلْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ এ কথার আওতায় কারো অনুপস্থিতিতে কারো নিন্দা চর্চা করা এসে যায় এবং সম্মুখে পরস্পর তীব্র বাকবিতণ্ডা ও অকারণে ও শরিয়তের ন্যায়সঙ্গত কল্যাণদৃষ্টি ব্যতীত নিন্দাবাদ কোনো অবস্থায়ই জায়েজ নয়; সামনেও নয় আর অগোচরেও নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ : অবশ্য মজলুম ব্যক্তি তার মনের উষ্ণতা-বাষ্প বকেঝকেও নিবারণ করতে পারে এবং বিচারের সামনে অভিযোগও করতে পারে।

মানুষের স্বভাবগত দাবি, তার পূর্ণ অক্ষমতা ও আংশিক অক্ষমতার প্রয়োজনের প্রতি এতটা গুরুত্ব প্রদান শরিয়তে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম করেছে কী? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামি শরিয়ত মাজলুমকে জালেমের সামলোচনা করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সেই সাথে একথাও বলে দিয়েছে যে, এটি আল্লাহর দৃষ্টিতে কোনো ভালো কাজ নয়; বরং ভালো কাজ হলো, ক্ষমা করে নিজের ভেতর আল্লাহর আখলাক সৃষ্টি কর।

এ হচ্ছে অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনে ইসলামি মূলনীতি এবং অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত। একদিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ অর্থাৎ তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে শত্রুতা ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।

আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যচার প্রতিরোধ করা যায়; কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে, যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কুরআনে কারীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে যায়। –[জামালাইন-২/১১৮]

قَوْلُهُ إِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تَعْفُوْا الخ : চারিত্রিক দিক থেকে এ তিনটি স্তর বস্তুত ভিন্ন এবং এক্ষেত্রে অতি সুন্দর ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। إِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا মানুষ স্বভাবিকভাবেই কোনো ভালো কাজ করার সাথে সাথেই তার প্রকাশনা ও ঘোষণা দিয়ে থাকে। মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা আদায় করার প্রবণতা তার কিছুটা স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এক রকম সৎকাজ এতেও হয়ে গেল, নেকী এতেও হলো; কিন্তু তা হালকা ধরনের, প্রাথমিক পর্যায়ের।

قَوْلُهُ اَوْ تُخْفُوْهُ : দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদা এই, সৎকাজ করে এবং মানুষের কাছ থেকে বিনিময় ও সুখ্যাতির কোনো আশাই করবে না; বরং কোনো লোককে তা জানতেই দেবে না এবং সর্বদা উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

কতিপয় জরুরী টীকা :

قَوْلُهُ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ : তৃতীয় মর্যাদা এই যে, কোনো লোক কারো পক্ষ থেকে কোনো মন্দ আচরণের সম্মুখীন হয়ে গেলে সে তা এড়িয়ে যায় প্রতিশোধ নেয় না। তবে এটা সহ্য করা তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এতে সে যা অর্জন করে তার মূল্য সদ্ব্যবহার ও সদাচারণের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

এই আয়াতে নির্যাতিতকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা পরাক্রান্ত ও শক্তিমান হয়েও যখন অপরাধীকে ক্ষমা করেন, তখন অধীনস্থ ও দুর্বল বান্দার তো বিনাবাক্যে অন্যের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা উচিত। সারকথা, জুলুমের জন্য জালিমের প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ, তবে ধৈর্য ধরে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদেরকে সংশোধন করতে চাইলে তাদের উৎপীড়ন ও অপকার্যে ধৈর্যধারণ কর এবং গোপনে সদয়ভাবে তাদেরকে বোঝাও। প্রকাশ্যে তিরস্কারও নিন্দা পরিহার কর। তাদেরকে প্রকাশ্য শত্রু বানিও না। –[তাফসীরে উসমানী, টীকা-২১১]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ .... وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ الخ : ইহুদিরাও জঘন্য মুনাফিক : এখান থেকে ইহুদিদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। ইহুদিদের চরিত্রে মুনাফিকী ও কপটতা ছিল অতিমাত্রায়। রাসূলে কারীম ﷺ -এর জমানায় যারা মুনাফিক ছিল তারা হয় ইহুদি ছিল, অথবা তাদের সাথে যারা সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত ও তাদের পরামর্শ মানত, এমন সব লোক ছিল। তাই কুরআন মাজীদের অধিকাংশ বর্ণনায় একই স্থানে উভয় দলের উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, কিন্তু তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে না, আবার কতক রাসূলকে মানে, কতককে অস্বীকার করে, মোটকথা ইসলাম ও কুফরের মাঝখানে নিজেদের জন্য একটি নতুন ধর্মমত উদ্ভাবন করে, তারাই প্রকৃত কাফের, তাদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী টীকা-২১২]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তখনই গ্রহণযোগ্য যখন সমকালীন নবীর প্রতিও ঈমান আনা হয় ও তাঁর আদেশ পালন করা হয়। নবীকে অস্বীকার করে মহান আল্লাহকে মানা অর্থহীন, তাঁর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই; বরং কোনো একজন নবীকে অস্বীকার করা মহান আল্লাহ ও অন্য সব নবীকে অস্বীকার করার নামান্তর। ইহুদিরা যখন রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রত্যাখ্যান করল তখন তারা আল্লাহকে এবং অন্য সব নবীকে প্রত্যাখ্যানাকারী বলে সাব্যস্ত হলো এবং ঘোর কাফের হিসেবে গণ্য হলো। –[তাফসীরে উসমানী]

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا : আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও সতর্ক করা হয়েছে যে, কেউ মনে করতে পারে উপরে বর্ণিত চিহ্নিত লোকদের অবস্থান ও মর্যাদা তো কাফেরদের চেয়ে ভালো হবে। কিছুতেই নয়; বরং তারাও পাকা কাফের বলে প্রমাণিত। اُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ বাক্য বিন্যাসেই তাকিদ রয়েছে। তদুপরি حَقًّا শব্দটি অতিরিক্ত তাতে জোর সৃষ্টি করেছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ الخ : এ আয়াতে ঈমানদারদের চরিত্র ও আদর্শের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা সকল নবী রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। যেমন নাকি মুসলমানগণ কোনো নবীকে অস্বীকার করে না।

এ আয়াত দ্বারা وَحْدَتْ اَدْيَانْ তথা 'সকল ধর্ম এক' এ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। যার প্রবক্তাদের নিকট মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা জরুরি নয় এবং ঐ সকল অমুসলিমকেও মুক্তির যোগ্য মনে করে যারা নিজেদের ধারণামতে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ঈমান বিল্লাহর সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর রিসালতের প্রতিও ঈমান আনা আবশ্যক। যদি এই শেষ রিসালতকে কেউ অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহর প্রতি তার ঈমানও অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়বে। উল্লিখিত আয়াতে মূলত ইহুদিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা পূর্ববর্তী নবীদের মধ্য হতে নিজেদের সিলসিলারই কতিপয় নবীকে স্বীকার করে না। যেমন তারা হযরত ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.)-কে নবী বলে স্বীকার করে না। অনুরূপভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কেও অস্বীকার করেছে। কিন্তু যেহেতু কুরআনের শব্দ ব্যাপক, তাই ইহুদি খ্রিস্টান ছাড়াও বর্তমান যুগের মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবীরাও এতে শামিল হবে। ইউরোপে Deists নামে একটি ফের্কা আছে এবং হিন্দুস্থানেও ব্রাহ্মণ সমাজ নামে একটি ফের্কা আছে। যারা তাওহীদের প্রবক্তা। কিন্তু বিশ্বাসগতভাবে তারা ওহী ও নবুয়তের অস্বীকারকারী। এসব এমন ভুল ও অসম্পূর্ণ চিন্তাধারা যেগুলো নিঃশেষ ও নির্মূল করার জন্যই ইসলামের আগমন। ইসলাম তো সকল নবী-রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শের স্বীকার করে। এতে কোনো অবকাশ নেই যে, অমুক নবীকে মানা যাবে বা অমুককে মানা যাবে না।

এ আয়াতে ঐ সকল নামধারী মুক্তচিন্তার অধিকারী মুসলমানকেও সতর্ক করে দিয়েছে, যারা শরিয়তের মধ্য হতে নিজেদের পছন্দসই বিষয়কে বেছে নেয়। যেমনটি হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাট আকবার করেছিল। সে কুফর ও ইসলামের সংমিশ্রণে দীনে ইলাহী নামে এক নতুন ধর্মের আবিষ্কার করেছিল।

অনুবাদ

١٥٣. يَسْـئَلُـكَ يَـا مُـحَـمَّـدُ اَهْلُ الْـكِـتٰـبِ الْـيَـهُـوْدُ اَنْ تُـنَـزِّلَ عَـلَـيْـهِـمْ كِـتٰـبًـا مِّـنَ السَّـمَـآءِ جُـمْـلَـةً كَـمَـا اُنْـزِلَ عَـلٰـى مُـوْسٰـى تَـعَـنُّـتًـا فَاِنِ اسْـتَـكْـبَـرْتَ ذٰلِكَ فَـقَـدْ سَـاَلُـوْا اَىْ اٰبَـاؤُهُـمْ مُـوْسٰٓـى اَكْـبَـرَ اَعْـظَـمَ مِـنْ ذٰلِـكَ فَـقَـالُـوْٓا اَرِنَـا اللّٰـهَ جَـهْـرَةً عَـيَـانًـا فَـاَخَـذَتْـهُـمُ الصّٰـعِـقَـةُ الْـمَـوْتُ عِـقَـابًـا لَـهُـمْ بِـظُـلْـمِـهِـمْ ج حَـيْـثُ تَـعَـنَّـتُـوْا فِـى الـسُّـؤَالِ ثُـمَّ اتَّـخَـذُوا الْـعِـجْـلَ اِلٰـهًـا مِـنْۢ بَـعْـدِ مَـا جَـآءَتْـهُـمُ الْـبَـيِّـنٰـتُ الْـمُـعْـجِـزَاتُ عَـلٰـى وَحْـدَانِـيَّـةِ اللّٰـهِ تَـعَـالٰـى فَـعَـفَـوْنَـا عَـنْ ذٰلِـكَ ج وَلَـمْ نَـسْـتَـاصِـلْـهُـمْ وَاٰتَـيْـنَـا مُـوْسٰـى سُـلْـطٰـنًـا مُّـبِـيْـنًـا تَـسَـلُّـطًـا بَـيِّـنًـا ظَـاهِـرًا عَـلَـيْـهِـمْ حَـيْـثُ اَمَـرَهُـمْ بِـقَـتْـلِ اَنْـفُـسِـهِـمْ تَـوْبَـةً فَـاَطَـاعُـوْهُ.

১৫৩. হে মুহাম্মদ! কিতাবীগণ অর্থাৎ ইহুদিগণ তোমাকে কষ্ট প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাকে তাদের জন্য আসমান থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর যেমন এক দফায় সম্পূর্ণ কিতাব নাজিল হয়েছিল তেমনি এক দফায় সম্পূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করতে বলে। তোমার নিকট যদি এই দাবি সাংঘাতিক বলে মনে হয় তবে জেনে রাখ, মূসার নিকট তারা অর্থাৎ তাদের পিতৃপুরুষরা এতদপেক্ষাও বড় সাংঘাতিক দাবী করেছিল। তারা বলেছিল, প্রকাশ্যে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে আমাদেরকে আল্লাহ দর্শন করাও। তাদের এই সীমালঙ্ঘনের জন্য অর্থাৎ প্রশ্নে এই ধরনের অবাধ্যতা প্রদর্শন করায় তারা বজ্রাহত হয়েছিল। অর্থাৎ এর শাস্তি স্বরূপ তারা বজ্রের মাধ্যমে মৃত্যুর শিকার হয়েছিল তাদের নিকট আল্লাহর একত্ববাদিতার উপর স্পষ্ট প্রমাণ মুজেযাসমূহ আসার পরও তারা গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, আমি এটাও ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। ফলে তাদেরকে আর সমূলে ধ্বংস করিনি এবং মূসাকে স্পষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেছিল। অর্থাৎ তাদের উপর তাকে সুস্পষ্ট ক্ষমতার অধিকারী করেছিলাম। তিনি তাদেরকে তওবা স্বরূপ স্ব স্ব জনকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন তাদেরকে তা পালন করতে হয়েছিল।

١٥٤. وَرَفَـعْـنَـا فَـوْقَـهُـمُ الـطُّـوْرَ الْـجَـبَـلَ بِـمِـيْـثَـاقِـهِـمْ بِـسَـبَـبِ اَخْـذِ الْـمِـيْـثَـاقِ عَـلَـيْـهِـمْ لِـيَـخَـافُـوْا فَـيَـقْـبَـلُـوْهُ وَقُـلْـنَـا لَـهُـمْ وَهُـوَ مُـظِـلٌّ عَـلَـيْـهِـمُ ادْخُـلُـوا الْـبَـابَ بَـابَ الْقَرْيَـةِ سُجَّدًا سُجُوْدَ اِنْـحِـنَاءٍ وَقُلْنَا لَـهُـمْ لَا تَـعْـدُوْا وَفِـىْ قِـرَاءَةٍ بِـفَـتْـحِ الْـعَـيْـنِ وَتَـشْـدِيْـدِ الـدَّالِ وَفِـيْـهِ اِدْغَـامُ الـتَّـاءِ فِـى الْاَصْلِ فِى الدَّالِ اَىْ لَا تَـعْـتَـدُوْا فِى السَّبْتِ بِـاصْـطِـيَـادِ الْـحِـيْـتَـانِ فِـيْـهِ وَاَخَـذْنَـا مِـنْـهُـمْ مِّـيْـثَـاقًـا غَـلِـيْـظًـا عَـلٰـى ذٰلِـكَ فَـنَـقَـضُـوْهُ.

১৫৪. তাদের অঙ্গীকারের জন্য অর্থাৎ তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য তূর পর্বতকে তাদের উপরে তুলে ধরেছিলাম যেন তারা ভয় পায় এবং তা গ্রহণ করে নেয় এবং তা তাদের মাথার উপর স্থির রেখেই তাদেরকে বলেছিলাম, নতশিরে অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ে দ্বারে অর্থাৎ নগর দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে বলেছিলাম শনিবারে অর্থাৎ এদিন মৎস শিকার করত তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। لَا تَعْدُوْا এটা অপর এক কেরাতে ع বর্ণে ফাতাহ ও د বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটাতে মূলত د বর্ণ ت -এর اِدْغَام অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে বলে ধরা হবে। অর্থ– সীমালঙ্ঘন করিও না। এবং এই বিষয়ে আমি তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম কিন্তু তারা তাও ভঙ্গ করে।

١٥٥. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَا زَائِدَةٌ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوْفٍ اَيْ لَعَنَّاهُمْ بِسَبَبِ نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ لِلنَّبِيِّ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط لَا تَعِيْ كَلَامَكَ بَلْ طَبَعَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا تَعِيْ وَعْظًا فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ص مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ .

১৫৫. তাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে فَبِمَا -এর مَا শব্দটি এই স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। আর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। এই স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়া (لَعَنَّا) -এর সাথে এটি مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আমি তাদেরকে অভিসম্পাত করেছিলাম তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং "আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত" সুতরাং তোমার কথা ধরতে পারি না। রাসূল ﷺ সমীপে তাদের এই উক্তি করার কারণে আমি তাদের অভিসম্পাত করেছিলাম; বরং তাদের সত্য-প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ তাতে সিল করে দিয়েছেন, মোহর করে দিয়েছেন। ফলে তারা কোনো উপদেশ ধরে রাখতে পারে না। সুতরাং তাদের খুব কম জনই যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সাথীগণ বিশ্বাস আনয়ন করে।

١٥٦. وَبِكُفْرِهِمْ ثَانِيًا بِعِيْسٰى وَكُرِّرَ الْبَاءُ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا لا حَيْثُ رَمَوْهَا بِالزِّنَا .

১৫৬. এবং দ্বিতীয়বার ঈসার সাথে কুফরি করার কারণে بِكُفْرِهِمْ এটাকে যে বাক্যটির সাথে عَطْف করা হয়েছে সেই বাক্যটি অর্থাৎ بِمَا نَقْضِهِمْ বাক্যটি এবং এর মাঝে فَصْل বা ব্যবধান থাকায় এই স্থানে ب অক্ষরটির পুনরুক্তি করা হয়েছে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেওয়ার কারণে তাদেরকে অভিসম্পাত করেছিলাম। হযরত মারইয়ামকে তারা ব্যভিচারের অপবাদ দিয়েছিল।

١٥٧. وَقَوْلِهِمْ مُفْتَخِرِيْنَ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ط فِيْ زَعْمِهِمْ اَيْ بِمَجْمُوْعِ ذٰلِكَ عَذَّبْنَاهُمْ قَالَ تَعَالٰى تَكْذِيْبًا لَهُمْ فِيْ قَتْلِهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط الْمَقْتُوْلُ وَالْمَصْلُوْبُ وَهُوَ صَاحِبُهُمْ بِعِيْسٰى اَيْ اَلْقَى اللّٰهُ عَلَيْهِ شِبْهَهُ فَظَنُّوْهُ اِيَّاهُ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط اَيْ فِيْ عِيْسٰى لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مِنْ قَتْلِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْضُهُمْ لَمَّا رَاَوُا الْمَقْتُوْلَ اَلْوَجْهُ وَجْهُ عِيْسٰى وَالْجَسَدُ لَيْسَ بِجَسَدِهِ فَلَيْسَ بِهِ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ بَلْ هُوَ هُوَ .

১৫৭. আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' অহংকার করত তাদের ধারণানুসারে এই উক্তি করায় অর্থাৎ উল্লিখিত এই সব কারণে আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছি। হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করা সম্পর্কিত বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি। কিন্তু তাদের এরূপ ভুল ধারণা হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের সঙ্গী ক্রুশবিদ্ধ ও নিহত ব্যক্তিটির সাথে হযরত ঈসার চেহারার সামঞ্জস্যতায় তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। আল্লাহ তাকে হযরত ঈসার, আকৃতির সদৃশ করে দিলে তারা তাকেই ঈসা বলে ধারণা করে বসে ও তাকে হত্যা করে। যারা তাঁর অর্থাৎ হযরত ঈসার বিষয়ে মতভেদ করেছিল নিশ্চয় তারা তার এই হত্যা সম্পর্কে সংশয়যুক্ত। পরে নিহত ব্যক্তিটিকে দেখে তাদের কয়েকজন বলেছিল, চেহারা তো ঈসার মতো মনে হয় তবে শরীরের আকৃতি তাঁর আকৃতির মতো নয়। সুতরাং এ ঈসা নয়। অপর কয়েকজন বলেছিল, ন এ-ই সেই।

مَا لَهُمْ بِهِ بِقَتْلِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَىْ لٰكِنْ يَّتَّبِعُوْنَ فِيْهِ الظَّنَّ الَّذِىْ تَخَيَّلُوْهُ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا لا حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِنَفْيِ الْقَتْلِ ـ

আর এই সম্পর্কে অর্থাৎ তার হত্যা সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই নেই اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ এটি اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ এই বিষয়ে তারা কেবল তাদের ধারণাকৃত সন্দেহেরই অনুসরণ করে। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করেনি। يَقِيْنًا শব্দটি হত্যা না করার বক্তব্যটির তাকিদ স্বরূপ حَالٌ হয়েছে।

১৫৮ . بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا فِىْ مُلْكِهِ حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهِ ـ

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে তার নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী ও তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়।

১৫৯ . وَاِنْ مَّا مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اَحَدٌ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ بِعِيْسٰى قَبْلَ مَوْتِهِ ج اَىِ الْكِتَابِىْ حِيْنَ يُعَايِنُ مَلٰئِكَةَ الْمَوْتِ فَلَا يَنْفَعُهُ اِيْمَانُهُ اَوْ قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى لَمَّا يَنْزِلُ قُرْبَ السَّاعَةِ كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عِيْسٰى عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ج بِمَا فَعَلُوْهُ لَمَّا بُعِثَ اِلَيْهِمْ ـ

১৫৯. কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, সে اِنْ এটা এ স্থানে مَا বা না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মৃত্যুর পূর্বে যখন সে মৃত্যুর ফেরেশতা দর্শন করবে তখন তার উপর অর্থাৎ হযরত ঈসার বিশ্বাস আনায়ন করবে না। কিন্তু এই সময়ের বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা তার কোনো উপরকার সাধিত হবে না। অথবা এর অর্থ হলো, হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি অবতরণ করবেন, তখন তাঁর অর্থাৎ ঈসার মৃত্যুর পূর্বে সকল কিতাবী তাঁর উপর ঈমান আনবেন। এবং কিয়ামতের দিন সে অর্থাৎ ঈসা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ যখন তাঁকে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন তারা কি করেছে সেই সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য দান করবেন।

১৬০ . فَبِظُلْمٍ اَىْ بِسَبَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا هُمُ الْيَهُوْدُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ هِىَ الَّتِىْ فِىْ قَوْلِهِ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ اَلْاٰيَةَ وَبِصَدِّهِمْ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهِ صَدًّا كَثِيْرًا لا

১৬০. যারা ইহুদি হয়েছে তাদের জুলুমের জন্য هَادُوْا অর্থ- ইহুদিগণ। তাদের জন্য অবৈধ করেছি উত্তম জিনিস যা তাদের জন্য বৈধ ছিল, আল্লাহর বাণী حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ এই আয়াতে তার বিবরণ বিদ্যমান। এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের পথে বহুবিধ বাধাদানের জন্য। كَثِيْرًا শব্দটি এই স্থানে উহ্য صَدَّ -এর বিশেষণ। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে صَدًّا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬১ . وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ فِى التَّوْرٰىةِ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط بِالرِّشٰى فِى الْحُكْمِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا ـ

১৬১. এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে যদিও তা তাওরাতে তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং বিচার-মীমাংসার ঘুষ গ্রহণ করত অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

١٦٢. لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ الثَّابِتُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَالْمُؤْمِنُوْنَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْكُتُبِ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ بالنون والياء اَجْرًا عَظِيْمًا هُوَ الْجَنَّةُ.

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা স্বজ্ঞানে সুদৃঢ় স্থিত প্রজ্ঞ- যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তারা এবং মুমিনগণ অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা যে কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং যারা সালাত কায়েম করে, اَلْمُقِيْمِيْنَ শব্দটি نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ রূপে অর্থাৎ مَدْح বা প্রশংসা অর্থবোধক কোনো فِعْل বা ক্রিয়ার مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب [ফাতাহযুক্ত] হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে এটি رَفْع [পেশযুক্ত] সহকারেও পঠিত রয়েছে। এবং যারা জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকেই শীঘ্র আমি মহা পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত দিব। سَنُؤْتِيْهِمْ এটি نُوْن দ্বারা অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন ও ى দ্বারা অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَيَانًا : এটি হয়তো বা উহ্য মাসদারের সিফত হবে। اَىْ اَرِنَا اِرَاءَةً عَيَانًا এ সূরতে لَفْظًا মাসদার হবে কিংবা اَىْ رُؤْيَةً عَيَانًا হবে। مَصْدَرٌ بِغَيْرِلَفْظِهٖ

قَوْلُهُ فَاِنِ اسْتَكْبَرْتَ الخ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَقَدْ سَاَلُوْا হলো উহ্য شَرْط -এর জাযা।

قَوْلُهُ اٰبَاءُهُمْ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগের ইহুদিদের প্রতি উক্ত প্রশ্নের নিসবত করাটা মাজাযী বা রূপক অর্থে। কেননা নবীযুগে বিদ্যমান ইহুদিরা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রশ্নের ব্যাপারে একমত বা সন্তুষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ اَلْمُعْجِزَاتُ : اَلْبَيِّنٰتُ -এর তাফসীরে اَلْمُعْجِزَاتُ উল্লেখ করে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, اَلْبَيِّنٰتُ দ্বারা উদ্দেশ্য তাওরাত নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। কেননা গরুর বাছুরকে উপাস্য বানানোর সময় তাওরাত প্রদান করা হয়নি; বরং তার পরে প্রদান করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ بَابَ الْقَرْيَةِ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْبَابَ -এর মধ্যকার اَلِفْ لَامْ টি مُضَافْ اِلَيْهِ -এর عِوَضْ বা বদলায় আনা হয়েছে। আর اَلْقَرْيَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য আয়লা নগরী।

قَوْلُهُ سُجُوْدَ انْحِنَاءٍ : এখানে উদ্দেশ্য হলো سُجَّدًا দ্বারা তার পরিচিত অর্থ তথা وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে سَجْدَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বুঝা এবং বিনয় ও অক্ষমতা প্রদর্শন করা।

قَوْلُهُ لَا تَعْدُوْا : نَهِى مُضَارِعْ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ- তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। تَعْدُوْا মূলত تَعْدُوُوْا ছিল। প্রথম واو -টি পেশযুক্ত। এটি শব্দের لَامْ কালিমা। وَاوْ -এর উপর পেশ কঠিন হওয়ার কারণে পড়ে গেছে। এখন দুই وَاوْ -এর মাঝে দুটি সাকিন একত্রে হওয়ার কারণে وَاوْ -টি পড়ে গেছে। ফলে تَعْدُوْا হয়েছে। অপর এক কেরাতে تَعَدُّوْا রয়েছে। যা মূলত تَعْتَدُوْا ছিল। প্রথম تَاء -টি دَالْ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তার পর দুটি دَالْ পরস্পরে ইদগাম হয়েছে। ফলে تَعَدُّوْا হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى ذٰلِكَ نَقَضُوْهُ : এ অংশটুকু বৃদ্ধির উদ্দেশ্য একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা। প্রশ্নে فَبِمَا نَقْضِهِمْ -এর مُتَفَرَّعٌ عَلَيْهِ বিদ্যমান নেই। সুতরাং تَفْرِيْعٌ সঠিক হয়নি।

উত্তর. বাক্যে সংক্ষিপ্ততা রয়েছে। মূল ইবারত হবে এভাবে–

وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا عَلٰى ذٰلِكَ فَنَقَضُهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِمْ الخ

قَوْلُهُ غُلْفٌ : এটি غِلَافٌ-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ ثَانِيًا بِعِيْسٰى : অর্থাৎ প্রথমবার হযরত মূসা (আ.)-এবং তাওরাতের প্রতি কুফরি করার কারণে আর দ্বিতীয়বার হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি কুফরি করার কারণে তাদের অন্তকরণে মোহর পড়েছিল। উভয়টিই طَبَعَ عَلَى الْقُلُوْبِ -এর কারণে সমৃদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন নাকি সাধারণ কুফর মোহর মেরে দেওয়ার কারণ। এটি عَطْفُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ -এর অন্তর্ভুক্ত। مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه এর মাঝে যেহেতু কারণ (سَبَبٌ) ভিন্ন ভিন্ন, তাই এখানে عَطْفُ الشَّئِ عَلٰى نَفْسِه লাযেম আসে না।

قَوْلُهُ فِىْ زَعْمِهِمْ : এর সম্পর্ক হলো اِنَّا قَتَلْنَا -এর সাথে এবং এটি আল্লাহ তা'আলার উক্তি। অর্থাৎ ইহুদিরা নিজেদের ধারণামতে হত্যা করেছে। বাস্তবে তারা হত্যা করেনি।

আর যদি فِىْ زَعْمِهِمْ -এর সম্পর্ক রাসূল ﷺ -এর সাথে হয় তাহলে এটি ইহুদিদের উক্তি হবে। যার মর্ম হলো, আমরা ঈসা ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছি, যিনি খ্রিস্টানদের ধারণা মতে আল্লাহর রাসূল কেননা ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর রিসালতে বিশ্বাসী ছিল না।

قَوْلُهُ اَىْ بِمَجْمُوْعِ ذٰلِكَ : অর্থাৎ উল্লিখিত সবগুলোর عَطْف হয়েছে فَبِمَا نَقْضِهِمْ -এর উপর।

قَوْلُهُ الْمَقْتُوْلَ وَالْمَطْلُوْبُ : এটি شُبِّهَ -এর নায়েবে ফা'য়েল।

قَوْلُهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ : اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ হওয়ার কারণ হলো ظَنّ শব্দটি عِلْم-এর জিনসভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ الْكِتَابِىْ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, بِه -এর যমীর হযরত ঈসা (আ.)-এর দিকে এবং مَوْتِه -এর যমীর উহ্য اَحَد -এর দিকে ফিরেছে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাবী।

قَوْلُهُ اَوْ قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى : এর দ্বারা দ্বিতীয় তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ অবস্থায় উভয় যমীর হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ফিরবে।

قَوْلُهُ وَهِىَ الَّتِىْ فِىْ قَوْلِه : এর দ্বারা সূরা আন'আমের প্রতি ইঙ্গিত।

قَوْلُهُ صَدًّا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَثِيْرًا হলো উহ্য মওসূফের সিফত।

قَوْلُهُ نُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ : অর্থাৎ اَمْدَحُ উহ্য থাকার কারণে اَلْمُقِيْمِيْنَ শব্দটি নসবযুক্ত হয়েছে। اَىْ اَمْدَحُ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ এ সূরতে জুমলাটি مُعْتَرِضَه হবে এবং وَاوْ-টি اِعْتِرَاضِيَّه হবে।

قَوْلُهُ وَقُرِءَ بِالرَّفْعِ : অর্থাৎ اَلْمُقِيْمُوْنَ তথা رَفْع সহও পঠিত রয়েছে। এ সূরতে اَلرَّاسِخُوْنَ -এর সাথে عَطْف হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহে তাদের আরো কিছু নিন্দনীয় কার্যকলাপের দীর্ঘ তালিকা পেশ করে তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তি ও আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে এই প্রসঙ্গ বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

শানে নুযূল ও ইহুদিদের হঠকারিতা : কতিপয় ইহুদি দলপতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান হতে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের

আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করেনি; বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদিদের স্বরূপ উদঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রাসূলদেরও উত্যক্ত করতো, আল্লাহদ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসতো। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে 'আল্লাহ' দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর আকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে ইহুদিরা অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকাশ্য মুজেযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ তা'আলাকে ত্যাগ করে গো-বসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (আ.)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়তো তারা শরিয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নিচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো লঙ্ঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখিরাতেও তাদের নিকৃষ্টতার শাস্তি ভোগ করতে হবে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ : [সুতরাং এমন জাতির নিকট থেকে এমন ফরমায়েশ কোনো আচমকা বা বিরল কিছুই নয়]। আনুষঙ্গিকভাবে এ উত্তরও পাওয়া গেল যে, স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তো এমন বস্তু এনেছিলেন, এর পরেও কেন এসব জালেমের দল বাজে কথা থেকে নিবৃত্ত হয়নি? তারা তো তাঁর কাছে সরাসরি আল্লাহর দর্শনের আবেদন করেছিল। ঘটনা প্রবাহের যাবতীয় কাহিনী এর কারণে তুলে ধরা হয়েছে যে, আসলে তাদের জাতীয় ইতিহাস হঠকারিতা ও বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। এ ধরনের আপত্তিকর আবেদনের মূল উদ্দেশ্য সত্যের অন্বেষণ-অনুসন্ধান নয়; বরং শুধুই আস্ফালন ও পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া।

هٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ طَلَبَ هٰؤُلَاءِ لِتُنُزُوْلِ الْكِتَابِ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ لَيْسَ لِاَجْلِ الْاَسْتَرِ شَاءَ بَلْ لِمَحْضِ الْعِنَادِ (كَبِيْر) : অর্থাৎ এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আসমান থেকে তাদের উপর কিতাব অবতরণের দাবির অর্থ সত্যের উদঘাটন নয়; বরং একমাত্র শত্রুতাই উদ্দেশ্য। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ : ثم শব্দটি সময়ের বিলম্বজ্ঞাপক নয়; বরং কল্পনার দূরত্ব জ্ঞাপক অর্থাৎ এমন বেহুদা ও অনর্থক আবেদন কি কম ছিল? এ থেকেও অনর্থক ও গুরুতর অপরাধমূলক আচরণ এই ছিল যে, তারা গো-বৎসের পূজা শুরু করে দিয়েছিল। مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর পেশকৃত প্রমাণাদি ও মুজেযাসমূহ [অলৌকিক কর্মকাণ্ড] জানা, বুঝা ও দেখার পরও শিরক, বিশেষত জঘন্যতম শ্রেণির শিরক। গো-বৎসের পূজা এমনিতেই জঘন্য ছিল; সুস্থ বিবেক বুদ্ধি এ কাজকে অস্বীকার করে। কিন্তু সত্যের প্রচারক পয়গাম্বরের আনীত বলিষ্ঠ প্রমাণাদি ও সুস্পষ্ট যুক্তির উপস্থিতিতে এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় বটে। –[তাফসীরে মাজেদী : ৩৮৯]

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا : তাঁর সে ক্ষমতা এই যে, তিনি বাছুরটাকে জবাই করে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। তারপর তার ছাই ভস্ম সাগরে উপরের বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন। তাছাড়া সত্তর হাজার বাছুর-পূজারীকে হত্যা করা হয়েছিল। –[তাফসীরে উসমানী : ২১৫]

قَوْلُهُ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ : অর্থাৎ ইহুদিরা যখন বলল, তাওরাতের বিধানাবলি কঠিন। আমরা এটা মানি না। তখন তূর পাহাড়কে উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তাওরাতের বিধানাবলি কবুল কর ও শক্ত করে ধর, নয়তো এই পাহাড়ের তলায় তোমাদের চাপা দেওয়া হবে। –[তাফসীরে উসমানী : ২১৬]

قَوْلُهُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا : ইহুদিদের প্রতি আদেশ হয়েছিল, সিজদা করে মাথা ঝুঁকিয়ে নগরে প্রবেশ কর। তারা সিজদার পরিবর্তে নিতম্ব ঘেঁষে ঢুকতে লাগল। এভাবে তারা নগরে পৌঁছতেই প্লেগ-আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুপুরের মধ্যেই প্রায় সত্তর হাজার খতম হয়ে যায়। –[তাফসীরে উসমানী : ২১৭]

قَوْلُهُ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ : **ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা :** ইহুদিদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা এদিনই বেশি মাছ দেখা যেত। তারা এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল যে, নদীর তীরে একটি হাউজ তৈরি করল। শনিবার সে হাউজে নদী থেকে মাছ আসলে তারা মুখ বন্ধ করে দিত। পরদিন তারা তা শিকার করত। এই দুষ্টবুদ্ধি ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বানরে পরিণত করেন, যা সমস্ত জীব-জন্তুর মধ্যে নিকৃষ্টতর ও মূল্যহীন। –[তাফসীরে উসমানী : ২১৮]

قَوْلُهُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ : **আয়াতের যোগসূত্র :** পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের দৌরাত্ম্য এবং তজ্জন্য তাদের নিন্দা ও শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তাদের কতিপয় অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেমন– হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের মিথ্যা দাবি ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করা বা শূলে চড়ানোর ব্যাপারে তারা যে দাবি করছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। তারা যাকে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তি ঈসা (আ.) নয়; বরং তার সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে তাদের নির্যাতন ও হস্তক্ষেপ হতে উদ্ধার করে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে নিরাপদে আসমানে উত্তোলন করেছেন। –[মা'আরিফুল কুরআন]

ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ : ইহুদিরা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে পরে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করেন। কারণ স্বরূপ দেখানো হয়েছে, তাদের এই অঙ্গীকার ভঙ্গ মহান আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান, অন্যায়ভাবে নবীগণের রক্তপাত এবং তাদের এই উক্তি যে, আমাদের অন্তরে আবরণের ভেতর। রাসূলে কারীম ﷺ ইহুদিদেরকে সুপথে ডাকলে তারা বলতে থাকে, আমাদের অন্তর আচ্ছাদনের ভেতর। তোমার কথা সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ব্যাপারটি তারা যা বলছে তা নয়, আসলে কুফরির কারণে তাদের অন্তরে মহান আল্লাহ তা'আলা মোহর করে দিয়েছেন। কাজেই, ঈমান তাদের নসীবে নেই। হ্যাঁ, কিছু লোক এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ।

–[তাফসীরে উসমানী : ২১৯]

ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, খোদায়ী নিদর্শনাদির অস্বীকৃতি, নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং তাদের قُلُوْبُنَا غُلْفٌ উক্তির ব্যাখ্যা ১ম পারায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মূলত فَبِمَا نَقْضِهِمْ বাক্যের স্বীকৃত উহ্য কথা এই (قُرْطُبِي) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ অর্থাৎ তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে আমরা তাদেরকে অভিশাপ দিলাম [কাতাদা (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত কুরতুবী] আরবি ভাষার বাকধারা অনুসারে এরূপ উহ্য রীতি ব্যাপক। শ্রোতাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে এ ধরনের কথা উহ্য রাখা হয় (قُرْطُبِي) حُذِفَ هٰذَا لِعِلْمِ السَّامِعِ এটা শ্রোতাদের জ্ঞানের জন্য উহ্য রাখা হয়। –[কুরতুবী]।

এ কথাটির জওয়াব উহ্য রাখা আলংকারিক দিক থেকে অতিসুন্দর, যা শ্রোতার স্মৃতিপটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। –[বাহর]।

بِمَا শব্দে م বর্ণটি অতিরিক্ত এবং কথার গুরুত্ব জ্ঞাপক। –[তাফসীরে মাজেদী : ৩৯১]

قَوْلُهُ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ : এ ধরনের সীল-মোহর প্রথমেই লাগানো হয় না, কেবল বিনিময় বা শাস্তিরূপেই লাগানো হয়। আর এক্ষেত্রে তো এর ব্যাখ্যাই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কুফরির উপর কুফরির বিনিময়ে।

–[কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী : ৩৯২]

قَوْلُهُ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا : [এবং অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ এ ঈমান মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়] এই যৎসামান্য ঈমান অলাভজনক এ কারণে হবে যে, এ ঈমান সকল নবীর উপর ঈমানকে অন্তর্ভুক্ত করবে না اَيْ اِلَّا اِيْمَانًا قَلِيْلًا اَيْ بِبَعْضِ الْاَنْبِيَاءِ وَذٰلِكَ غَيْرُ نَافِعٍ لَهُمْ (قُرْطُبِي) وَهٰذَا غَيْرُ مُفِيْدٍ لِاَنَّ الْكُفْرَ بِالْبَعْضِ كُفْرٌ بِالْكُلِّ (رُوْح) অর্থাৎ কেবল সামান্য ঈমান, যার অর্থ কিছু নবীর প্রতি ঈমান, আর এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। –[কুরতুবী]

আর এটা উপকারী নয়, কেননা কিছু সংখ্যকের প্রতি কুফরি সকলের প্রতি কুফরির সমতুল্য। –[রূহুল মা'আনী]

কিতাবীদের ঈমানের অবস্থাটি এই ছিল যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনার অঙ্গীকার করতো আর হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করতো; হযরত ইসহাককে সত্যায়ন করতো, কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে মিথ্যা জ্ঞান করতো। অথবা উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়াকে যদিও মেনে নিত, কিন্তু সর্বশেষ নবী স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে অস্বীকার করতো। এ অবস্থায় ঈমান শব্দের উপর শরয়ী ঈমানের প্রয়োগ হতে পারে না। শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যবহারিক অর্থে ঈমান সে বস্তুকেই বলা হয়, যা নবুয়তের গোটা সূত্রকেই তার বিশ্বাসের আওতাভুক্ত করে নেয়। সুতরাং এক নবীর উপর বিশ্বাস করে অন্যান্য নবীদেরকে অস্বীকার করার কোনো অর্থই হতে পারে না। لِأَنَّهُ إِيْمَانٌ لُغَوِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ (تهانوى) فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَنْ يَكْفُرْ بِرَسُوْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ بِالْإِيْمَانِ بِأَحَدٍ مِنَ الرُّسُوْلِ اَلْبَتَّةَ (كبير) কারণ সে হচ্ছে শাব্দিক বা আভিধানিক ঈমান, শরয়ী ঈমান নয় [থানভী], অতএব আমরা স্পষ্ট বলেছি যে, যে লোক এক রাসূলকে অস্বীকার করে, সে অবশ্যই রাসূলদের মধ্য থেকে একজন রাসূলের উপর ঈমান আনার অধিকারী হয় না। –[কাবীর, তাফসীরে মাজেদী : ৩৯৩]

وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا : [এভাবে যে, নাউযুবিল্লাহ! তিনি দুশ্চরিত্রা ছিলেন] بُهْتَانًا عَظِيْمًا অতি জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। ইহুদিদের পুস্তকগুলোতে এই পবিত্র চরিত্রের সতী সাধ্বী মহিলা সম্পর্কে এমন বহু জঘন্য বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে এ পৃষ্ঠাগুলোতে প্রতিবাদ রূপেও সেসব কাহিনী লেখনীতে প্রকাশ করার যোগ্য নয়। কুরআন মাজীদ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এসব অপকথার উপর সালংকার বর্ণনায় শুধু 'বুহতানুন আযীম' জঘন্য অপবাদ বলে ইশারা দিয়েই ক্ষান্ত রয়েছে। মারইয়ামের উপর টীকা বিগত ৩য় পারায় লিখিত হয়েছে। ইনি ইমরানের কন্যা এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর শ্রদ্ধেয়া মা ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী ইউসুফের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়নি, যিনি কাঠের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। উভয়েই অত্যন্ত ধার্মিক ও খোদাপোরস্ত লোক ছিলেন। بِكُفْرِهِمْ এখানে ইহুদিদের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং কি কি কারণে এসব শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানে ইহুদিদের কুফরি বলতে হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে কুফরির কথা বুঝানো হয়েছে।

–[বায়যাভী, তাফসীরে মাজেদী টীকা : ৩৯৪]

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ الخ : অর্থাৎ তাদের শাস্তির আরো কারণ হলো, তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করে কুফরির বৃদ্ধি সাধন করেছিল, হযরত মারইয়ামের প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করেছিল এবং এই দম্ভোক্তিতে লিপ্ত ছিল যে, আমরা মহান আল্লাহর রাসূল মারইয়ামের ছেলে ঈসাকে হত্যা করেছি। এ সমস্ত কারণে তাদের উপর আজাব ও মসিবত নাজিল হয়। –[তাফসীরে উসমানী : ২২০]

এটা কাদের উক্তি? স্পষ্টত ইহুদিদের উক্তি, যারা এতে সন্তুষ্টি ছিল এবং গর্বের সঙ্গে এর দাবিও করতো اَلْمَسِيْحَ -رَسُوْلَ اللّٰهِ। শব্দদ্বয় ইহুদিদের নয়, তারাতো এ দু'টি পদ-মর্যাদা বা মাসীহ হওয়া এবং রাসূল হওয়াই অস্বীকার করতো। কুরআন মাজীদ মূল ঘটনা হিসেবে তাঁর আসল স্থান ও মর্যাদা বিবৃত করেছে। এটা কুরআন মাজীদের সাধারণ বর্ণনাধারা। এখানে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর গুণ-পরিচয় বিবৃত করা হয়েছে। –[বাহর]

হতে পারে তাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাদের কদর্য ভাষার পরিবর্তে সুন্দর ভাষায় বিবৃত করেছেন।

–[তাফসীরে কাবীর, কাশশাফ]

এ-ও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা নব পর্যায়ে তাঁর প্রশংসা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। –[বায়যাভী]

এও সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও তা স্বীকার করতো না [মাদারিক]। إِنَّا قَتَلْنَا কতল বা হত্যার আসল অর্থ হচ্ছে দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন করা, তা যে কোনো ভাবে এবং যে কোনো উপায়েই হোক না কেন। উর্দু এবং বাংলা বাগধারায় এটাকেই বলা হয় বিনাশ সাধন করা, শেষ করে দেওয়া; أَصْلُ الْقَتْلِ إِزَالَةُ الرُّوْحِ عَنِ الْجَسَدِ (راغب) অর্থাৎ হত্যা বা নিধনের মূল হচ্ছে দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করা। –[রাগিব] হত্যা করা অর্থ মেরে ফেলা, প্রহার দ্বারা, প্রস্তর দ্বারা, বিষ প্রয়োগ দ্বারা বা অন্য কোনো উপায়ে। –[তাজ] هُوَ إِزَالَةُ الرُّوْحِ عَنِ الْجَسَدِ كَالْمَوْتِ (ابو البقاء) অর্থাৎ কতল বা হত্যা মৃত্যুর মতো, দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন করা। –[আবুল বাকা] ইমাম কুরতুবী অন্য একটি আয়াত তথা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন–

اَلْقَتْلُ هُوَ كُلُّ فِعْلٍ يُفِيْتُ الرُّوْحَ وَهُوَ اَنْوَاعٌ مِنَ النَّحْرِ وَالذَّبْحَةِ وَالْخَنْقِ وَالرَّضْخِ وَشِبْهِهِ

অর্থাৎ কতল বা হত্যা হচ্ছে, এমন কর্ম, যা দ্বারা প্রাণ হরণ করা হয়। তা কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন নহর করা, জবাই করা, গলা টিপে মারা, টুকরা টুকরা করা বা এ ধরনের অন্য কোনো উপায়ে প্রাণ বধ করা। এখানে ফিকহের পরিভাষায় হত্যা উদ্দেশ্য নয়, যার অর্থ কেবল ধারালো অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে রোমান আদালত থেকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হলেও এবং সে দেশীয় আদালত মৃত্যু-দণ্ডাদেশ কার্যকর করতে সক্ষম হলেও তাঁকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করায় এবং তাঁকে মৃত্যু-দণ্ডাদেশ শোনানোর সর্বতোভাবে ইহুদিদের হস্তই সক্রিয় ছিল। কুরআন মাজীদ যেহেতু কোনো সুক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম তত্ত্বও বাদ দেয় না, এ কারণে তা যথার্থভাবেই তাঁর হত্যা বা হত্যার উদ্যোগের দায়িত্ব ইহুদিদের উপর ন্যস্ত করে। ইঞ্জিলের নানাবিধ বর্ণনাতো এতটুকু অংশে অর্থের ক্ষেত্রে, অনেকাংশে শব্দের ক্ষেত্রেও একমত যে, রোমান আদালতের বিচারক পোলাটিস কিছুতেই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষপাতি ছিল না; বরং আদালতের বিচারক তো তা থেকে যথারীতি দূরে থাকতে চাইতেন। কিন্তু ইহুদিরা মিথ্যা আপীল দায়ের করে মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং সন্ত্রাস আর বিপর্যয় সৃষ্টির হুমকি দিয়ে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দান করতে বিচারককে বাধ্য করে। মথিতে উল্লিখিত ইঞ্জীলের একটা ক্ষুদ্র বিবরণ লক্ষণীয়- "পীলাত তখন দেখিলেন, তাঁর চেষ্টা বিফল, বরং আরো গোলযোগ হচ্ছে, তখন জল নিয়ে লোকদের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তাহা বুঝিবে। তাহাতে সমস্ত লোক উত্তর করিল, তাহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপর বর্তাক। তখন তিনি তাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন।" -[মথিঃ২৪-২৬]

অন্যান্য ইঞ্জীলও একথা স্বীকার করে। বরং লূক -এ তো এতটুকু অতিরিক্ত স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রক্ষা করার জন্য তিন তিনবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহুদিরা প্রতিবারই তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে। -[লূকঃ ২৩ঃ২২]

এসব তো স্বয়ং খ্রিস্টানদের বিবরণ। খোদ ইহুদীদের রচিত হযরত ঈসা (আ.)-এর যে প্রাচীনতম জীবনীগ্রন্থ বিশ্বে সুপ্রসিদ্ধ এবং যার ইংরেজী অনুবাদও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এ ঘটনাকে গর্বের সঙ্গে নিজেদের কীর্তি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ইঞ্জীলে হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষ্যে তাঁর নিহত হওয়ার যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লিখিত হয়েছে, তাতেও দেখা যায় যে, সমস্ত দায়-দায়িত্ব ইহুদি কর্তা ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাতে রোমান বা বিচারকদের উল্লেখ দেখা যায় না। যেমন- "সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদেরকে স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে জিরূজালেমে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীন বর্গের, প্রধান শাসকদের এবং অধ্যাপকদের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে।" -[মথি ১৬ঃ২১]

পরে তিনি তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হবে এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে হইবে।" -[মার্ক ৮ঃ৩১]

"তিনি কহিলেন, মানুষ্য পুত্রকে অনেক দুৎখ ভোগ করিতে হইবে, প্রাচীনবর্গ, প্রধান শাসকগণ ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, এবং হত হইতে হইবে।" -[লূক ৯ঃ২২] -[তাফসীরে মাজেদী : ৩৯৫]

قَوْلُهُ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ : সূরা আলে ইমরানের يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুশমন ইহুদিদের দুরভিসন্ধি বানচাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ.)-কে হেফাজত করা প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাঁকে হত্যা করার কোনো সুযোগ ইহুদিদেরকে দেওয়া হবে না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে ইহুদিদের দুষ্কর্মের বর্ণনার সাথে আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আ.)-এর হত্যা সংক্রান্ত ইহুদিদের মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে- وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ অর্থাৎ ওরা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি; বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল।

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে তাফসীর হযরত যাহ্হাক (রহ.) **বলেন-ইহুদিরা যখন** হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তাঁর ভক্ত সহচরবৃন্দ একস্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আ.)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলিস তখন রক্তপিপাসু ইহুদি ঘাতকদের হযরত ঈসা (আ.)-এর অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদি দুরাচারী একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় ভক্ত-অনুচরদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ এই গৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে ও নিহত হতে এবং পরকালে বেহেশতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা (আ.) নিজের জামা ও পাগড়ি তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সদৃশ করে দেওয়া হলো। যখন তিনি গৃহ হতে বহির্গত হলেন, তখন ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদিরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না; বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ হতে বেরিয়ে এলো তখন অন্য ইহুদিরা তাকেই ঈসা (আ.) মনে করে পাকড়াও করলো এবং শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। -[তাফসীরে মাযহারী]

উপরিউক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনোটিই সত্য হতে পারে। কুরআনে কারীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত সত্য ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। অবশ্য কুরআন পাকের আয়াত ও তার তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, শুধু অনুমান করে তারা বিভিন্ন উক্তি ও দাবি করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا .

অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে, তাদের কাছে, এ সম্পর্কে কোনো সত্য-নির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বলল, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আ.)-এর মতো হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আ.) হয় তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আ.)-ই বা গেলেন কোথায়? -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ২, পৃ. ৫৪৮]

قَوْلُهُ بَلْ شُبِّهَ لَهُمْ : অথবা তারা ধোঁকায় পতিত হয়েছে অথবা আসল সত্য তাদের কাছে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে। এরা কারা ছিল? কারা সন্দেহে পতিত হয়েছিল, বা কাদের উপর আসল বিষয় গোলমাল বা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল? স্পষ্ট যে, উদ্দেশ্য সেসব ইহুদি বা মাসীহ (আ.) -এর দুশমন, উপর থেকে যাদের সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছে। যেন বলা হয়েছে যে, তাদের উপর সন্দেহ পতিত হয়েছে [মাদারিক]। তাদের কাছে ব্যাপারটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। -[বায়যাভী]

অথবা এভাবে বলা যায় যে, নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে তারা সন্দেহে পতিত হয় এবং তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তারা সন্দেহে পতিত হয়। নিহত এবং শূলিবিদ্ধ ব্যক্তি তাদের নিকট সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল (জালালাইন)। মোটকথা আমাদের সমস্ত মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, ইহুদিরা ধোঁকায় পতিত হয় এবং তারা হযরত মাসীহ মনে করে অন্য কাউকে শূলিবিদ্ধ করে। কিন্তু যাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছে, সে কে ছিল এবং ধোঁকায় স্বরূপই বা কি হয়েছিল, এ প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব কুরআন মাজীদে নেই, কোনো বিশুদ্ধ হাদীসেও নেই। -[তাফসীরে মাজেদী : ৩৯৭]

قَوْلُهُ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا : হযরত ঈসা (আ.)-কে যে হত্যা করা হয়নি, তা জোর দিয়ে বুঝানোর জন্য এ আয়াতাংশে **يَقِيْنًا শব্দ যোগ করা হয়েছে।** -[কাশশাফ, মাদারিক, জালালাইন]

মাসীহ (আ.)-এর মৃত্যু বা হত্যা যেহেতু এক বিরাট গুমরাহীর কারণ এবং দুনিয়ার দুটি বিরাট জাতি অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান গুমরাহীতে লিপ্ত ও নিমজ্জিত। এ কারণে কুরআন মাজীদ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করার প্রয়োজন অনুভব করছে। -[তাফসীরে মাজেদী : ৪০১]

قَوْلُهُ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ : ইহুদিরা কি হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছিল? আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন যে, ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেনি, শূলেও চড়ায়নি। এ সম্পর্কে তারা নানা রকম কথা বলছে তা শুধুই অনুমান নির্ভর। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভ্রমে ফেলেছেন। প্রকৃত জ্ঞান তাদের কারোরই নেই। আসলে আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। তিনি তো সব কিছুই করতে সক্ষম এবং তাঁর সব কাজেই তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনা হয়েছিল এই যে, ইহুদিরা যখন হযরত মসীহ (আ.)-কে হত্যা করার সংকল্পে এগিয়ে আসল, তখন তাদের একজন লোক সবার আগে কক্ষে প্রবেশ করল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মসীহ (আ.)-কে আকাশে তুলে নিলেন এবং সেই ব্যক্তির চেহারাকে অবিকল মাসীহ (আ.)-এর আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিলেন। দলের অন্যান্য লোক ভিতরে ঢুকে তাকেই মাসীহ (আ.) মনে করল এবং হত্যা করল। পরে যখন খেয়াল হলো তখন বলতে লাগল, আরে এর চেহারা তো মসীহ সদৃশ, কিন্তু বাকি শরীর তো আমাদের সঙ্গীর মতো মনে হচ্ছে। কেউ বলল, এ যদি মাসীহ (আ.) হয়ে থাকে, তবে আমাদের সাথী কই গেল? আবার আমাদের লোকটি হয়ে থাকলে মাসীহ (আ.) কোথায়? এভাবে আন্দাজ-অনুমান করে এক একজন এক এক ধরনের কথা বলতে লাগল। প্রকৃত ঘটনা কারোরই জানা ছিল না। সত্য তো এই যে, হযরত ঈসা (আ.) আদৌ নিহত হননি; বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আকাশে তুলে নিয়েছেন এবং ইহুদিদেরকে বিভ্রমে ফেলে দিয়েছেন।

اِلَيْهِ অর্থ নিজের দিকে বা নিজের আসমানের দিকে। এভাবে مُضَافٌ উহ্য রাখার দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদে ভুরি ভুরি রয়েছে। আর যেভাবে আল্লাহ "তাঁর দিকে ডেকে নিয়েছেন" অর্থ আখিরাত পানে ডেকে নিয়েছেন বুঝা যায়, তেমনিভাবে আরবি উর্দু বাকরীতিতে আল্লাহর দিকে তুলে নেওয়ার অর্থ আসমানের দিকে তুলে নেওয়া। এখানে তাঁকে আসমানে দিকে তুলে নেওয়া বুঝানো হয়েছে -[রাগিব] কারণ আল্লাহতো স্থানপাত্রের উর্ধ্বে। -[কুরতুবী, মাদারিক ও বাহর]

رَفَعَهُ -رَفْع তথা উপরে তোলার আসল অর্থ হচ্ছে শারীরিক বা বস্তুগতভাবে উপরে তোলা। اَلرَّفْعُ يُقَالُ فِى الْاَجْسَامِ الْمَوْضُوْعَةِ اِذَا اَعْلَيْتَهَا عَنْ مَكَانِهَا (رَاغِبْ) অর্থাৎ কোনো বস্তুকে তার স্থান থেকে উপরে তোলাকে رَفْع বলা হয়। এটা বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। -[রাগিব]

তবে রূপকভাবে মর্যাদা উন্নীত করা অর্থেও رَفْع শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। (رَاغِبْ) اَىْ رُفِعَ مِنْ حَيْثُ التَّشْرِيْفِ অর্থাৎ মর্যাদা বৃদ্ধি হিসেবে তাকে উপরে তোলা হয়েছে। -[রাগিব]

কিন্তু বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করার জন্য কোনো শক্তিশালী কারণ বর্তমান থাকতে হবে; যা এখানে নেই। কোনো কোনো অজ্ঞ এবং নব উদ্ভূত ফিরকা যুক্তি দিয়ে বলে যে, رَفَعَهُ বা উপরে তুলে নেওয়াকে যেহেতু আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সুতরাং বাধ্য হয়ে এখানে মর্যাদা উন্নীত করা অর্থই গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ رَفْع -কে রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এ যুক্তি কুরআন অনুধাবন থেকে অনেক দূরে থাকারই প্রমাণ বহন করে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, কুরআন মাজীদে এ ধরনের আয়াত আছে কিনা? وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ এখানে আল্লাহর দিকে হিজরত অর্থ কি দারুল ইসলাম বা মদীনার দিকে হিজরত করার অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ এখানে পালনকর্তার দিকে গমন করা অর্থ যে, শাম দেশে গমন করা, তা বুঝতে কি কারো কষ্ট হয়? এ ধরনের আরো অনেক আয়াত উল্লেখ করা যায়। ইমাম রাযী (র.) যথার্থই লিখেছেন, সম্মান আর মর্যাদার যে প্রেক্ষাপটে এখানে আল্লাহর পানে তুলে নেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিজেই এ কথার প্রমাণ যে, এ তুলে নেওয়াটা কোনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট বিষয়। সালেহ আর মুত্তাকীদের ব্যাপক হারে জান্নাতে প্রবেশ এবং জান্নাতের সুখ ভোগ ও স্থান কাল উপভোগ থেকে তা স্বতন্ত্র কিছু رَفَعَهُ اِلَيْهِ اَعْظَمُ مِنْ بَابِ الثَّوَابِ مِنَ الْجَنَّةِ وَمِنْ كُلِّ مَا فِيْهَا مِنَ اللَّذَّاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ (كَبِيْر) জান্নাত আর জান্নাতের সমুদয় বস্তুগত সুখ সম্ভোগের চেয়ে আল্লাহর দিকে তুলে নেওয়া অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মর্যাদা উন্নীত করা ছওয়াবের বিবেচনায় অনেক বড়। -[তাফসীরে কাবীর]

দৈহিকভাবে উপরে তুলে নেওয়া বিশ্বাস করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য এবং ইসলামের জন্য শর্ত হোক বা না হোক, মোটকথা কুরআনের বাহ্যিক অর্থের এটাই নিকটতর অবশ্যই। –[তাফসীরে মাজেদী : ৪০২]

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا : অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা অতি পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।" ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-কে কতল করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আ.)-কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদের দুর্বলতার প্রমাণ। –[মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৫০]

এখানে গুণবাচক শব্দ আযীয তথা প্রতাপান্বিত ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আপন নবীকে রক্ষা করতে এবং উর্ধ্বে তুলে নিতে অর্থাৎ শারীরিক এবং আত্মিক উভয় দিক থেকে উর্ধ্বে তুলে নিতে সক্ষম। আর গুণবাচক শব্দ হাকীম ব্যবহার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর দুশমনদের সঙ্গে তিনি যে আচরণ করছেন, তা নিতান্তই যুক্তিযুক্ত এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবিও তা-ই। –[তাফসীরে মাজেদী : ৪০৩]

قَوْلُهُ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهٖ : অর্থাৎ ইহুদিরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল।

এই আয়াতের مَوْتِهٖ অর্থাৎ 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দের দ্বারা এখানে ইহুদিদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তাফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদিই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলি অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোনো উপকার আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তাফসীরে যা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো مَوْتِهٖ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তাফসীর হলো আহলে কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদিরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকার করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা]। অপরদিকে খ্রিস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আ.)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবিদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদিদের মতোই হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতি ভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কুরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না; বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে; কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনবে। খ্রিস্টানরা মুসলমানদের মতো সহীহ আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদিদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া হতে সর্বপ্রকার কুফরি ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَلَيَقْتُلَنَّ الدَّجَّالَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَتَكُوْنُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) وَاقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَبْلَ مَوْتِ عِيْسٰى يُعِيْدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (قُرْطُبِيْ)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরো বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কুরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার, যাতে বলা হয়েছে 'আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না; বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- "হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর পূর্বে।" এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অত্র তাফসীর বিশ্বস্ত সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অত্র আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। উপরিউক্ত তাফসীরের ভিত্তিতে অত্র আয়াত স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, অদ্যাবধি হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু হয়নি; বরং কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে তিনি আবার যখন আসমান থেকে সশরীরে অবতরণ করবেন এবং তাঁর অতরণের সাথে আল্লাহ তা'আলার যেসব নিগূঢ় রহস্য জড়িত রয়েছে তা যখন পূর্ণ এবং তাঁর দায়িত্ব সুসম্পন্ন হবে, তখন এ পৃথিবীর বুকেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর কবরের স্থানও নির্ধারিত রয়েছে।

সূরা 'যুখরুফ'-এর ৬১তম আয়াতেও এ সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে- وَاِنَّهٗ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ অর্থাৎ "হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব, তোমরা কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মান্য কর।" অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে اِنَّهٗ 'নিশ্চয় তিনি' **শব্দ দ্বারা** হযরত ঈসা (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের **অন্যতম নিদর্শন। অন্য আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত** ঈসা (আ.)-এর পুনরাগামনের খবর দেওয়া হয়েছে **যার অর্থ আলামত বা লক্ষণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস** (রা.) থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَاِنَّهٗ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ قَالَ خُرُوْجُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ (تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ)

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ **ইবনে** আব্বাস (রা.) وَاِنَّهٗ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে **হযরত** ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব কিয়ামতের অন্যতম আলামত। -[ইবনে কাসীর]

মোটকথা, উপরিউক্ত আয়াতের উভয় কেরাত অনুসারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস ও ইহুদিদের উপর পূর্ণ বিজয়ী হওয়া প্রতীয়মান হচ্ছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন-

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَحَادِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ اَخْبَرَ بِنُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِمَامًا عَدْلًا (اِبْنُ كَثِيْر)

অর্থাৎ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তিনি কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে মুফতী শফী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, এ ধরনের মুতাওয়াতির রেওয়ায়েতসমূহ আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) একত্র করেছেন। এ অধম সেটি আরবি ভাষায় সংকলণ করেছি। তিনি তার নামকরণ করেছেন اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِىْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ 'আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মসীহ' যা তৎকালেই মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি হলব শহরের জনৈক প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ বর্ধিত ব্যাখ্যা ও টিকাসহ তা বৈরুত থেকে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের আকীদা অপরিহার্য, এটা অস্বীকারকারী কাফের : আলোচ্য আয়াত এ বিষয়ে একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তা ছাড়া সূরা আলে-ইমরানের তাফসীরেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছ এবং বর্তমান যুগের কোনো কোনো নাস্তিক যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে, তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৫০-৫৫২]

قَوْلُهُ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا : কিয়ামতে হযরত ঈসা (আ.) ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন : হযরত ঈসা (আ.) এখনও আসমানে জীবিত অবস্থায় আছেন। দাজ্জালের আবির্ভাবের পর তিনি পুনরায় পৃথিবীকে ফিরে আসবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ঈমান আনবে যে, নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ.) জীবিত, তাঁর মৃত্যু হয়নি। কিয়ামত দিবসে হযরত ঈসা (আ.) তাদের কাজ-কর্ম ও অবস্থাদি প্রকাশ করে দেবেন যে, ইহুদিরা আমাকে অস্বীকার করেছিল ও আমার শত্রুতা করেছিল। আর খ্রিস্টানরা আমাকে আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করেছিল।
–[তাফসীরে উসমানী : ২২২]

قَوْلُهُ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ الخ : আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদিদের অপকীর্তি ও তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহেও তাদের কতিপয় অপকর্মের বর্ণনা এবং অন্য এক ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো আখিরাতে তো তাদের নির্ধারিত শাস্তি হবেই তদুপরি তাদের গোমরাহীর কারণে ইহজগতেই অনেক পবিত্র বস্তু যা ইতিপূর্বে হালাল ছিল, শাস্তিস্বরূপ তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।
–[মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৫৩]

যেভাবে ব্যক্তির বিকৃত মন সংশোধনের একটা উপায় এই যে, কোনো কোনো মুবাহ বা বৈধ বস্তু থেকেও তাকে বিরত রাখতে হয়, তেমনিভাবে যখন একটা জাতির মেজায বিকৃত হয়ে যায়, তখন তাদের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে সব বৈধ বস্তুতে তারা অভ্যস্ত, তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করতে হয়। فَبِظُلْمٍ -এ ب অব্যয় কারণজ্ঞাপক অর্থাৎ তাদের জুলুমের কারণে। এ থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের উপর যেসব কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল, তা অকারণে নয়, বরং তাদের বাড়াবাড়ির কারণেই করা হয়েছিল। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, পাপের ফলে তরীকতের পথের পথিকের যে সংকুচিত অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাও এ ধরনেরই। –[তাফসীরে মাজেদী : ৪০৬]

অর্থাৎ তাদের শরিয়তে সুদ, ঘুষ, খিয়ানত ইত্যাদি আমদানির যেসব মাধ্যমকে হারাম করা হয়েছে, সেসব অবলম্বন করত যেসব নিয়ামত থেকে ইহুদিরা বঞ্চিত হয়, তা যা কিছু ছিল, এখানে সেসবের কারণ স্পষ্টভাবে বিবৃত করা হয়েছে। যথা– ১. তাদের ব্যক্তিগত জোর-জবরদস্তি, বাড়াবাড়ি এবং পাপাচার (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا) ২. তাদের সংক্রামক গোমরাহী-বিভ্রান্তি (وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا) ৩. তাদের সুদ খাওয়া, আর তা-ও নিষিদ্ধ করার পর (وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ) অবৈধ আমদানি সম্পর্কে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করা (وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) –[তাফসীরে মাজেদী : ৪০৯]

উল্লেখ্য যে, ইসলামি শরিয়তেও কোনো কোনো দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা করা হয়েছে শারীরিক বা আধ্যাত্মিক দিক থেকে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের জন্য কোনো দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।
–[মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৫৪]

قَوْلُهُ لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ الخ : বনী ইসরাঈলগণ সবাই এক ধরনের ছিল না : বনী ইসরাঈলে যাদের জ্ঞানে পরিপক্ক, যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং যাঁরা ঈমানদার, তাঁরা কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জীল সবই বিশ্বাস করে। আর যাঁরা সালাত কায়েম রাখে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে তাঁদের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি তাদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করব। পক্ষান্তরে যারা প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। –[তাফসীরে উসমানী : ২২৪]

আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে ঐসব ইহুদিদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কুফরি আকীদার উপর অনড় ছিল এবং বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত ছিল। এখন ঐসব ব্যক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে, যারা আহলে কিতাব ছিলেন সত্য; কিন্তু যখন নবীয়ে আখেরী যামান ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তাঁর সম্পর্কে তাদের কিতাবে [লিখিত] নিদর্শন ও লক্ষণাদি দেখে ঈমান এনেছিলেন। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে ঐসব লক্ষণ পুরোপুরি পরিদৃষ্ট হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, হযরত উসাইদ, হযরত সা'লাবা (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। এই আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।
–[মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৫৫]

অনুবাদ :

١٦٣. إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوْحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ج وَ كَمَا أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ اِبْنَيْهِ وَيَعْقُوْبَ ابْنَ إِسْحٰقَ وَالْأَسْبَاطِ أَوْلَادِهٖ وَعِيْسٰى وَأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا اَبَاهُ دَاوُدَ زَبُوْرًا بِالْفَتْحِ اِسْمٌ لِلْكِتَابِ الْمُؤْتٰى وَالضَّمِّ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى مَزْبُوْرًا أَيْ مَكْتُوْبًا .

১৬৩. তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রেরণ করেছিলাম এবং ইবরাহীম তাঁর দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক এবং ইসহাক তনয় ইয়াকুব ও তার সন্তানগণ বংশধরগণ [ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মান (আ.)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর] তার সুলায়মানের পিতা দাউদকে যাবূর প্রদান করেছিলাম। زَبُوْر -এর ز অক্ষরটি ফাতাহসহ পঠিত হলে তা তাঁকে প্রদত্ত কিতাবের নাম বলে বিবেচ্য হবে। আর পেশ সহকারে পাঠ হলে এটা مَصْدَرْ বলে বিবেচ্য হবে। অর্থ হলো مَزْبُوْر বা লিপিবদ্ধ বস্তু।

١٦٤. وَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط رُوِيَ أَنَّهُ تَعَالٰى بَعَثَ ثَمَانِيَةَ اٰلَافِ نَبِيٍّ أَرْبَعَةَ اٰلَافٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَأَرْبَعَةَ اٰلَافٍ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قَالَهُ الشَّيْخُ فِيْ سُوْرَةِ غَافِرٍ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى بِلَا وَاسِطَةٍ تَكْلِيْمًا ج

১৬৪. আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বিবৃত করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বিবৃত করিনি। [শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী সূরা গাফিরে উল্লেখ করেছেন।] বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে চার হাজার ইসরাঈল গোত্রে আর অবশিষ্ট মানুষদের হতে হলো বাকি চার হাজার। এবং মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন।

١٦٥. رُسُلًا بَدَلٌ مِنْ رُسُلًا قَبْلَهُ مُبَشِّرِيْنَ بِالثَّوَابِ مَنْ اٰمَنَ وَمُنْذِرِيْنَ بِالْعِقَابِ مَنْ كَفَرَ أَرْسَلْنَاهُمْ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ مَقَالٌ بَعْدَ إِرْسَالِ الرُّسُلِ ط إِلَيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَبَعَثْنَاهُمْ لِقَطْعِ عُذْرِهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا فِيْ مُلْكِهٖ حَكِيْمًا فِيْ صُنْعِهٖ .

১৬৫. যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য পুণ্যফলের সুসংবাদ বাহী ও যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী রাসূল প্রেরণ করেছি رُسُلًا এটি পূর্বোল্লিখিত رُسُلًا -এর بَدَل। যাতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো দলিল কোনো কথা না থাকে এবং এই কথা না বলে যে, رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِهٖ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ [হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট কেন একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।] অর্থাৎ আমি তাদের অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী ও তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়।

١٦٦. وَنَزَلَ لَمَّا سُئِلَ الْيَهُوْدُ عَنْ نُبُوَّتِهٖ ﷺ
فَاَنْكَرُوْهُ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ يُبَيِّنُ نُبُوَّتَكَ
بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمُعْجِزِ اَنْزَلَهٗ
مُتَلَبِّسًا بِعِلْمِهٖ ج اَىْ عَالِمًا بِهٖ اَوْ وَفِيْهِ
عِلْمُهٗ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ط لَكَ اَيْضًا
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ط عَلٰى ذٰلِكَ.

১৬৬. ইহুদীদেরকে রাসূল ﷺ -এর নবী হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তা অস্বীকার করে। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমার প্রতি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই কুরআন তৎমাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন অর্থাৎ তোমার নবুয়ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন এটা তিনি জেনে-শুনে بِعِلْمِهٖ এটা এখানে উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ এতদসম্পর্কে অবহিত হয়ে অবতীর্ণ করেছেন। বা এই বাক্যটির মর্ম হলো তাতে তার জ্ঞান বিদ্যমান। এবং ফেরেশতাগণও তোমার পক্ষে সাক্ষী আর এতদ্বিষয়ে সাক্ষীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

١٦٧. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَصَدُّوْا النَّاسَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِ الْاِسْلَامِ بِكَتْمِهِمْ
نَعْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ الْيَهُوْدُ قَدْ ضَلُّوْا
ضَلٰلًا بَعِيْدًا عَنِ الْحَقِّ.

১৬৭. যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথে অর্থাৎ দীনে ইসলামের পথে রাসূল ﷺ -এর গুণাবলির বিবরণ গোপন করত মানুষকে বাধা দেয় অর্থাৎ ইহুদিরা [তারা] সত্য থেকে বহুদূর পথভ্রষ্ট হয়েছে।

١٦٨. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَظَلَمُوْا نَبِيَّهٗ
بِكِتْمَانِ نَعْتِهٖ لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا لا مِنَ الطُّرُقِ.

১৬৮. যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে ও নবীর গুণাবলি গোপন করে তাঁর উপরে জুলুম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না; তাদেরকে কখনও কোনো পথপ্রদর্শন করবেন না।

١٦٩. اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ اَيِ الطَّرِيْقَ الْمُؤَدِّىْ اِلَيْهَا
خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَآ اِذَا دَخَلُوْهَا
اَبَدًا ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا هَيِّنًا.

১৬৯. জাহান্নামের পথ অর্থাৎ যে পথ পরিণামে তার দিকে নিয়ে যায় সে পথ ব্যতীত; যেখানে যখন প্রবেশ করবে তারা স্থায়ী হবে অর্থাৎ সেখানে স্থায়ীভাবে থাকাই তাদের জন্য নির্ধারিত। এবং এটা আল্লাহর পক্ষে অতি অনায়াসের, অতি সহজ।

١٧٠. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ قَدْ جَآءَكُمُ
الرَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا
بِهٖ وَاقْصِدُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط مِمَّا اَنْتُمْ فِيْهِ
وَاِنْ تَكْفُرُوْا بِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ مَا فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا فَلَا يَضُرُّهٗ
كُفْرُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ
حَكِيْمًا فِىْ صُنْعِهٖ بِهِمْ.

১৭০. হে লোকসকল! অর্থাৎ হে মক্কাবাসী রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্যসহ আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তোমরা যে অবস্থায় আছ তদপেক্ষা তোমাদের জন্য মঙ্গল কামনা কর। আর তোমরা যদি তাঁকে অস্বীকার কর তবে তাঁর কোনোই ক্ষতি হবে না। কারণ, আসমান ও জমিনে যা আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সবকিছু আল্লাহর। আর আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ও তাদের সাথে আচরণে তিনি প্রজ্ঞাময়।

١٧١. يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ الْاِنْجِيْلِ لَا تَغْلُوْا تَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْلَ الْحَقَّ ط مِنْ تَنْزِيْهِهٖ عَنِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَآ اَوْصَلَهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ اَىْ ذُوْ رُوْحٍ مِّنْهُ ز اُضِيْفَ اِلَيْهِ تَعَالٰى تَشْرِيْفًا لَهٗ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمْتُمْ اِبْنَ اللّٰهِ اَوْ اِلٰهًا مَعَهٗ اَوْ ثَالِثَ ثَلٰثَةٍ لِاَنَّ ذَا الرُّوْحِ مُرَكَّبٌ وَالْاِلٰهُ مُنَزَّهٌ عَنِ التَّرْكِيْبِ وَ عَنْ نِسْبَةِ الْمُرَكَّبِ اِلَيْهِ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ قف وَلَا تَقُوْلُوْا اَلْاٰلِهَةُ ثَلٰثَةٌ ط اَللّٰهُ وَعِيْسٰى وَاُمُّهٗ اِنْتَهُوْا عَنْ ذٰلِكَ وَاْتُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط مِنْهُ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ م لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط خَلْقًا وَمِلْكًا وَالْمِلْكِيَّةُ تُنَافِى الْبُنُوَّةَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا شَهِيْدًا عَلٰى ذٰلِكَ.

১৭১. হে কিতাবের অর্থাৎ ইঞ্জীলের অধিকারীগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না, সীমালঙ্ঘন করিও না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অর্থাৎ শিরক করা ও সন্তান আরোপ করা হতে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য কথা আরোপ করিও না। মারইয়াম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট অর্পণ করেছেন। তাঁর সাথে সম্বন্ধিত করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে [রূহ]-এর অধিকারী এক সত্তা। তাঁর সম্মানার্থে কেবল তাঁকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে, তোমরা যে ধারণা কর তিনি আল্লাহর পুত্র বা তাঁর সাথে শরিক এক ইলাহ বা তিনের এক ইলাহ বা তিনের এক– তা নয়। কারণ রূহসম্মত বস্তু যৌগিক হয়ে থাকে আর যৌগিকতা এবং কোনো যৌগিক বস্তুর আরোপ করা হতে আল্লাহ হলেন অতি পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বলো না আল্লাহ, ঈসা ও তাঁর মাতা মিলে তিন ইলাহ। এটা হতে নিবৃত্ত হও এবং এটা অপেক্ষা তোমাদের জন্য যা কল্যাণকর তা অর্থাৎ তাওহীদ অবলম্বন কর। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ। সন্তান হওয়া হতে তিনি উর্ধ্বে; এটা থেকে তিনি সুপবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সকল কিছু আল্লাহর। আর মালিকানা ও সন্তান হওয়ার মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। আর এর উপর উকিল হিসেবে অর্থাৎ সাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ : এখানে كَافٌ বর্ণটি উহ্য মাসদারের সিফত। তাকদীরী ইবারত এভাবে হবে– اِيْحَاءً مِثْلَ اِيْحَائِنَا আর مَا সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এটি مَصْدَرِيَّهْ হয় তাহলে عَائِدٌ আবশ্যক হবে না, আর যদি الذى এর অর্থে হয়, তাহলে عَائِدٌ উহ্য থাকবে। তাকদীরী ইবারত হবে এভাবে– كَالَّذِىْ اَوْحَيْنَاهُ اِلٰى نُوْحٍ

قَوْلُهٗ كَمَآ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) এখানে كَمَا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَوْحَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ -এর عَطْف হয়েছে اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ -এর সাথে, نُوْحٍ -এর সাথে নয়, অন্যথায় এতে তাকরার লাজেম আসবে।

قَوْلُهُ زَبُوْرًا بِالْفَتْحِ اِسْمُ الْكِتَابِ : زبور শব্দটির প্রথম বর্ণ তথা زَاء বর্ণে ফাতহাসহ فَعُوْلٌ-এর ওজনে পঠিত। مَفْعُوْل-এর অর্থে। যেমন رَكُوْبٌ শব্দটি مَرْكُوْبٌ-এর অর্থে। আর এটি زَبَرَهُ [অর্থ كَتَبَهُ সে লিখল] থেকে নির্গত। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম। তাতে একশত পঞ্চাশটি সূরা ছিল। আর শব্দটি পেশ সহ زُبُوْر পঠিত হলে তা মাসদার হবে, مَزْبُوْر-এর অর্থে।

قَوْلُهُ وَاَرْسَلْنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رُسُلًا-এর নসব প্রদানকারী আমেল হলো اَرْسَلْنَا উহ্য ফে'ল।

قَوْلُهُ بِلَا وَاسِطَةٍ : এটি ঐ سُوَال مُقَدَّرٌ-এর জবাব যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলে তো প্রত্যেক নবী থেকেই প্রমাণিত রয়েছে। তারপর ও হযরত মূসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : অন্যান্য নারীদের সাথে আল্লাহর কথা বলে (بِالْوَاسِطَةِ) পরোক্ষভাবে হয়েছে আর হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে।

قَوْلُهُ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো একটি আপত্তির নিরসন করা। তা হলো হেদায়েত এবং خُلُوْد তথা চিরস্থায়ী হওয়ার সময়টি এক নয়। অথচ حَالْ এবং ذُوالْحَالْ-এর সময় বা কাল এক ও অভিন্ন হওয়া জরুরি।

উত্তর. জাহান্নামের প্রতি পথ প্রদর্শন নির্ধারিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ بِهِ : এখানে মুফাসসির (র.) بِهٖ উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اٰمِنُوْا-এর مُتَعَلِّقْ - بِهٖ উহ্য রয়েছে, خَيْرًا নয়। কেননা গোটা কুরআনে اٰمَنُوْا-এর مُتَعَلِّقْ সর্বদা بَاء হরফের সাথেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ : خَيْرٌ-এর নসব প্রদানকারী আমেল সম্পর্কে নাহু শাস্ত্রবিদগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। **ইমাম সিবওয়াই এবং খলীল** (র.)-এর বক্তব্য হলো اِقْصِدُوْا কিংবা اَتُوْا ফে'ল উহ্য রয়েছে। আর ইমাম ফাররা (র.)-এর বক্তব্য হলো **خَيْرًا শব্দটি উহ্য মাসদারের সিফত** হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। اَىْ اٰمِنُوْا اِيْمَانًا يَكُنِ الْاِيْمَانُ خَيْرًا لَّكُمْ

উল্লিখিত তিনটি সূরতের মধ্যে তৃতীয়টি সর্বাধিক রাজেহ বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত। তারপর প্রথমটি এবং তারপর দ্বিতীয়টি।

قَوْلُهُ مِمَّا اَنْتُمْ : **এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنْ تَفْضِيْلِيَّه তার مُفَضَّلْ عَلَيْه সহ উহ্য রয়েছে।** সুতরাং এখন এ ইশকাল হবে না যে, **اِسْم تَفْضِيْل-এর ব্যবহার তিন পদ্ধতির কোন পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। অথচ** এখানে একটি পদ্ধতিও নেই।

قَوْلُهُ فَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُكُمْ : এখানে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِنْ تَكْفُرُوْا শর্তের جَزَا উহ্য রয়েছে। আর উল্লিখিত ইবারত সে জাযার প্রতি দালালত করে; কিন্তু সেটি جَزَاء নয়। কেননা যদি فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-কে جَزَاء মানা হয় তাহলে تَرَتُّبُ الْجَزَاءِ عَلَى الشَّرْطِ না হওয়ার আপত্তি আসবে।

قَوْلُهُ الْاِنْجِيْلِ : **প্রশ্ন** 'আহলে কিতাবের' তাফসীর اَلْاِنْجِيْلِ দ্বারা কেন করা হলো? অথচ আহলে কিতাবের মধ্যে ইহুদিরাও শামেল আছে।

উত্তর. সামনে غُلُوٌّ فِى الدِّيْنِ-এর যে বর্ণনা আসছে তা জীবনে সঙ্গী এবং সন্তান থেকে মুক্ত। যার মেসদাক কেবল খ্রিস্টানরাই হতে পারে; ইহুদিরা নয়। (تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ)

قَوْلُهُ الْقَوْلَ : এখানে اَلْقَوْلَ উহ্য ধরার দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْحَقَّ উহ্য মওসূফের সিফত হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْصَلَهَا : **প্রশ্ন.** اَلْقَاهَا-এর তাফসীরে اَوْصَلَهَا উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর. যেহেতু اَلْقٰى-এর صِلَه হিসেবে اِلٰى আসতে পারে না, এজন্য এখানে ইঙ্গিত করা হলো যে, اَلْقٰى ফে'লটি اَوْصَلَ-এর অর্থ শামেল রাখে। যার কারণে صِلَه হিসেবে اِلٰى আনা শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ ذُو الرُّوْحِ : **প্রশ্ন** رُوْحٌ-এর তাফসীর ذُوالرُّوْحِ তথা مُضَافْ উহ্য ধরে করা হলো কেন?

উত্তর. এভাবে করার কারণ হলো, যাতে رَسُوْلُ اللّٰهِ-এর উপর رُوْحٌ-এর ব্যবহার শুদ্ধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ عَنْ ذٰلِكَ وَاتُوْا : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِنْتَهُوْا-এর **মাফঊল উহ্য রয়েছে**। আর خَيْرًا উহ্য ফেল اِئْتُوْا **-এর কারণে** মানসূব হয়েছে। সুতরাং এ আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, خَيْر **থেকে বারণ করা আল্লাহ** তা'আলার শানের জন্য **উপযুক্ত** নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ الخ : **যোগসূত্র :** পূর্বের আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, **ইহুদিদের কিছু** নেতৃস্থানীয় লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর উপর ঈমান আনার ব্যাপারে এ শর্ত করল যে, যেভাবে **হযরত মূসা (আ.)**-এর উপর একত্রে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল অনুরূপভাবে আপনি এমন কোনো লিখিত কিতাব নিয়ে **আসুন। তাহলে আমরা** ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তাদের এ প্রশ্নের ভিত্তি ছিল বিদ্বেষ ও হটকারিতা উপর। ইখলাসের উপর **ছিল না। এখানে প্রশ্ন** হয়– যদি ঈমান আনার জন্য আসমান থেকে লিখিত কিতাব নাজিল হওয়া আবশ্যক হয়, তাহলে হযরত মূসা (আ.)**-এর উপর অবতীর্ণ** একত্রে লিখিত কিতাব তাওরাত নাজিল হওয়ার পর তোমাদের পূর্বপুরুষরা তার উপর ঈমান আনেনি কেন? **অধিকন্তু তারা হযরত** মূসা (আ.)-এর কাছে তদাপেক্ষা বড় বিষয় দাবি করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি দেখার অবান্তর দাবি **করেছিল**। যার ফলে তাদের এ বেয়াদবির কারণে আসমান থেকে বিজলি এসে তাদেরকে ভস্ম করে দিয়েছিল।

উক্ত আয়াতসমূহে এ আপত্তিরই ভিন্ন আঙ্গিকে জবাব দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা যারা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনার জন্য এ শর্ত জুড়ে দিচ্ছ যে, আপনি আসমান থেকে একটি লিখিত কিতাব এনে দেখান, তোমরাই বল, যেসব বিশিষ্ট নবীগণের আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে, তাঁদেরকে তোমরা নবী হিসেবে মান্য করে থাক। অথচ তাঁদের ব্যাপারে তোমরা এ দাবি পেশ কর না। সুতরাং যে দলিলের ভিত্তিতে তাঁদেরকে তো তোমরা নবী হিসেবে মান্য করে থাক, অর্থাৎ মুজেযা দেখে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর কাছেও তো অনুরূপ মুজেযা রয়েছে, তাহলে তাঁর উপর ঈমান নিয়ে এসো! কিন্তু প্রকৃত কথা হলো, তোমাদের এ দাবি সত্য অন্বেষণের জন্য নয়, বরং হটকারিতা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে।

কুরআনে উল্লিখিত নবী রাসূলের নাম : কুরআনে কারীমে যেসব নবী রাসূলের নাম ও তাঁদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা ২৪ কিংবা ২৫। ১. হযরত আদম (আ.) ২. হযরত ইদ্রীস (আ.) ৩. হযরত নূহ (আ.) ৪. হযরত হুদ (আ.) ৫. হযরত সালেহ (আ.) ৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৭. হযরত লূত (আ.) ৮. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৯. হযরত ইসহাক (আ.) ১০ হযরত ইয়াকূব (আ.) ১১. হযরত ইউসুফ (আ.) ১২. হযরত আইয়ূব (আ.) ১৩. হযরত শুয়াইব (আ.) ১৪. হযরত মূসা (আ.) ১৫. হযরত হারূন (আ.) ১৬. হযরত ইউনুস (আ.) ১৭. হযরত দাউদ (আ.) ১৮ হযরত সুলাইমান (আ.) ১৯ হযরত ইলিয়াস (আ.) ২০. হযরত মাসীহ (আ.) ২১. হযরত যাকারিয়া (আ.) ২২. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ২৩. হযরত ঈসা (আ.) ২৪. হযরত যুল কিফল (আ.) ২৫. হযরত মুহাম্মাদ ﷺ।

সকল নবী-রাসূলের মোট সংখ্যা : যেসব নবী রাসূলের নাম ও ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়নি, তাঁদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এক প্রসিদ্ধ হাদীসে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। অপর হাদীসে আট হাজার বলা হয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণনা দুর্বল বলে আখ্যায়িত। কুরআন ও হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকু জানা যায় যে, বিভিন্ন সময় নবীগণ আগমন করেছিলেন এবং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর এসে সে ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর পর যে কয়জন নবুয়তের মিথ্যা দাবি করেছে কিংবা ভবিষ্যতে করবে, তাদের সবাই মিথ্যুক ও দাজ্জাল বলে সাব্যস্ত। তাদেরকে যারা নবী হিসেবে বিশ্বাস করবে তারা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে। –[জামালাইন ২/১৩১, ১৩২]

কতিপয় জরুরী টীকা :

ওহী প্রত্যাখ্যান মূলত কুফরি : এ দ্বারা জানা গেল যে, ওহী একান্তই মহান আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর বার্তা, যা নবীগণের নিকট প্রেরিত হয়। পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেমন মহান আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমন ওহীই মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ করেন। সেগুলো যে বিশ্বাস করে এটাকেও তার বিশ্বাস করা উচিত। এটাকে প্রত্যাখ্যান করে সে যেন প্রকারান্তরে সেগুলোর প্রত্যাখ্যানকারী হলো। হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তীদের সাথে তুলনা করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, হযরত আদম (আ.)-এর সময় হতে যে ওহী নাজিলের ধারা শুরু হয়, সেটা ছিল ওহীর সম্পূর্ণ প্রাথমিক অবস্থা। হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত তার পূর্ণতা বিধান হয়। অর্থাৎ প্রথম অবস্থা ছিল নিছক শিক্ষাপর্ব। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে তা

পরিপূর্ণ হয়ে যেন পরীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল, যাতে অনুগতদেরকে পুরস্কৃত এবং অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কাজেই মহামর্যাদাবান আম্বিয়ায়ে কেরামের ধারাও হযরত নূহ (আ.) হতেই শুরু হয়। ওহীর সাথে আবাধ্যাচরণকারীদেরকে সর্বপ্রথম শাস্তি দেওয়াও তাঁর আমল হতেই আরম্ভ হয়। সারকথা, পূর্বে মহান আল্লাহর আদেশ ও আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো না; বরং তাদেরকে ক্ষমাযোগ্য মনে করে অবকাশ দেওয়া হতো এবং বোঝানোরই চেষ্টা চালানো হতো। হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার লাভ করল, মহান আল্লাহর আদেশ পালনের ব্যাপারে মানুষের কোনোরূপে অস্পষ্টতা থাকল না, তখন থেকে অবাধ্যদের উপর শাস্তি নাজিল করা শুরু হয়। সর্বপ্রথম তাঁর জমানায় মহাপ্লাবন হয়। তারপর হযরত নূহ (আ.), শুয়াইব (আ.) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের আমলে কাফেরদের উপর বিভিন্ন রকমের শাস্তি আসে। প্রিয়নবী ﷺ -এর ওহীকে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের ওহীর সাথে তুলনা করে কিতাবী ও মক্কা শরীফের মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাঁর ওহীকে মানবে না, সে মহা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-২২৬]

ওহী বিভিন্ন প্রকার তাতে ঈমান রাখা ফরজ : হযরত নূহ (আ.)-এর পর যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেন, তাঁদের কথা اَلنَّبِيِّيْنَ শব্দ দ্বারা] অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার পর তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও সুবিখ্যাত তাঁদের কথা বিশেষভাবে নমোল্লেখসহ বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তা ঠিক সেই সকল ওহীর মতো সত্য ও তা স্বীকার করে নেওয়া সেই সব ওহীর মতোই জরুরি, যা মহা মর্যাদাবান ও সুপ্রসিদ্ধ নবীগণের প্রতি নাজিল হয়েছিল। আরো জানা গেল যে, নবীগণের প্রতি যে ওহী আসে তা কখনও ফেরেশতাগণ নিয়ে আসেন, কখনো তাদেরকে লিখিত কিতাবই দেওয়া হয়, আবার কখনো কোনোরূপ মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সরাসরিই নবীর সাথে কথা বলেন। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা যেহেতু মহান আল্লাহরই হুকুম, অন্য কারো নয়, তাই বান্দাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য একই রকম ফরজ, তা বান্দাদের নিকট পৌঁছার পদ্ধতি লিখিত হোক বা মৌখিক কিংবা হোক কিংবা হোক বার্তা আকারে। কাজেই, ইহুদিরা যে বলে, তুমি আসমান হতে তাওরাতের মতো একই সাথে গোটা একখানি কিতাব আনতে পারলে তোমাকে বিশ্বাস করব, নচেৎ নয়, এটা কত বড় ঈমানহীনতা ও নির্বুদ্ধিতা! ওহী যখন মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং তা অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি বিভিন্ন, তখন যে কোনো পদ্ধতিতেই নাজিল হোক না কেন তা মানতে দ্বিধা-সংশয় করা বা তা প্রত্যাখ্যান করা কিংবা একথা বলা যে, অমুক পদ্ধতিতে আসলে মানব, নয়তো মানব না– এটা প্রকাশ্য কুফরি ও সুস্পষ্ট আহমকী। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-২২৭]

قَوْلُهُ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ : নবী ও রাসূল পাঠানোর কারণ : মুমিনগণকে সুসংবাদ দান এবং কাফেরদরেকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একের পর এক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যাতে কিয়ামতের দিন কেউ এই অজুহাত দেখাতে না পারে যে, তুমি কিসে খুশি, কিসে নারাজ? তা আমরা জানতাম না। জানলে অবশ্যই সে অনুসারে চলতাম। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যখন নবীগণকে মুজেযাসহ পাঠালেন এবং তাঁরা সত্যের পথ দেখালেন, তখন আর কারো সত্য দীনে কবুল না করার কোনো অজুহাত শোনা যেতে পারে না; বরং সব রকমের অজুহাত-অভিযোগ নিঃশেষ হয়ে যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা; বরং তিনি জবরদস্তি করলেই বা কে বাধা দিতে পারে? কিন্তু তা পছন্দ করেন না। –[তাফসীরে উসমানী : ২২৮]

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا : এ গুণটি উল্লেখ করে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি সত্যিকার মালিক, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের অধিকারী; পয়গাম্বরদের প্রেরণ না করেও তিনি যে কোনো ওজর প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাকীমও। এ গুণটির উল্লেখ দ্বারা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর পরিপূর্ণ হিকমত ও বিবেচনার দাবি এই যে, তিনি বাহ্যিক ওজরও বাকি থাকতে দেবেন না। –[তাফসীরে মাজেদী: টীকা ৪১৭]

قَوْلُهُ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ : এখানে لٰكِنْ অর্থ এখন যদি এরা, বিশেষত ইহুদিরা এতদসত্ত্বেও নবুয়তে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে না নেয়, তবে বর্ণনায় দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াত إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ আয়াতটি শ্রবণ করে ইহুদিরা বলেছিল আমরা তো তাঁর রিসালতের সাক্ষ্য দেই না। إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ আয়াত নাজিল হলে কিছুলোক বলেছিল, আমরা তোমার পক্ষে এ সাক্ষ্য দেই না, তখন لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ আয়াতটি নাজিল হয়। বক্তব্যে কিছু কথা উহ্য রয়েছে, যা পরবর্তী বাক্য থেকে বুঝা যায়। কাফেররা বলে, হে মুহাম্মাদ ﷺ! তুমি যা কিছু বলছ, আমরা তার সাক্ষ্য দেই না, তাহলে কে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে? –[তাফসীরে মাজেদী: টীকা ৪১৮]

জ্ঞানের সে পরিপক্কতাই কুরআনকে মুজেযায় পরিণত করেছে : اَللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহর সাক্ষ্য এ কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে وَاَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ এতে কুরআনের পরিপূর্ণতার গুণ প্রমাণ হয়। মু'তাযিলারা আল্লাহর যেসব গুণ অস্বীকার করে, আহলে সুন্নাতের মুতাকাল্লিমীনরা এ আয়াত দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। −[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৪১৮]

قَوْلُهٗ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ : অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে আল্লাহর সাক্ষ্যের পর অন্য কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়ে না। وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ আল্লাহর সাক্ষ্য তো কুরআনের মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে; কিন্তু ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের তাৎপর্য কি? সাধারণ তাফসীরকাররা বলেন যে, ফেরেশতারা এসব অবিশ্বাসীদের চেয়ে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ, তারা যখন রাসূলের পক্ষে সাক্ষ্য দান করেন, তখন অবিশ্বাসীদের আর কি মূল্য থাকতে পারে? তবে বক্তব্যের আর এটা দিক এও হতে পারে যে, প্রকৃতির রাজ্যের সমস্ত কর্মকাণ্ড ফেরেশতাদের দ্বারাই সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের কার্যত সাক্ষ্য যা মূলত ফেরেশতাদেরই সাক্ষ্য, তার সবটুকুই তো রাসূল, ইসলাম ও রাসূলের উপস্থাপিত দীনেরই সাক্ষ্য এবং তারই সহায়ক ও সমর্থক। بِاللّٰهِ শব্দে بَاء অব্যয়টি অতিরিক্ত। −[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৪২০]

قَوْلُهٗ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ : যোগসূত্র : ইতিপূর্বে ইহুদিদের একটি অন্যায় আবদারের জবাব দিয়ে নবুয়তে মুহাম্মাদীর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এবার সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুয়তের প্রতি আস্থা ও ঈমান এবং তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করা সম্ভব, অন্য কোনো পন্থায় নয়। −[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৬১]

মহানবী ﷺ ও তাঁর কিতাবের প্রত্যায়ন এবং তার বিরুদ্ধবাদী তথা কিতাবীদের মত খণ্ডন ও তার পথভ্রষ্টতা প্রমাণ করার পর এবার সাধারণভাবে সকল মানুষকে ডাক দিয়ে বলা হয়েছে, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিকট সত্য দীন ও সত্য কিতাব নিয়ে আমার রাসূল এসে গেছেন। এখন তাঁর আনুগত্য করার মাঝেই তোমাদের কল্যাণ। আর যদি তাঁকে অস্বীকার কর, তবে জেনে রেখ, আসমান-জমিনের সমুদয় বস্তু তাঁরই। তোমাদের যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফ। সবকিছুর পুরো হিসাব-নিকাশ হবে এবং তার সমুচিত বদলাও দেওয়া হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ আয়াত দ্বারাও স্পষ্ট বোঝা গেল, নবীর উপরে যে ওহী নাজিল হয়, তা মানা ফরজ এবং অস্বীকার করা কুফর। −[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২৩১]

قَوْلُهٗ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ : যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদিদের সম্বোধন করে তাদের গোমরাহীর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবার খ্রিস্টানদের সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ও হযরত ঈসা মসীহ (আ.) সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদাসমূহ খণ্ডন করা হচ্ছে। −[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ২/৫৬২]

নবী ও রাসূলগণকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা ফরজ এবং দ্বিত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সরাসরি কুফরি : কিতাবীগণ তাদের নবী রাসূলের প্রশংসায় অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করত ও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তাদেরকে মহান আল্লাহ বলেছেন, দীনি বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না। যার প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস আছে, তার প্রশংসা করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়। যতটুকু সত্য ও প্রমাণিত তার বেশি বলা অনুচিত। আল্লাহ তা'আলার মহিমান্বিত সত্তা সম্পর্কেও কেবল তা-ই বল, যা সত্য ও প্রমাণিত। নিজেদের পক্ষ হতে কিছু বলো না। তোমরা একী সর্বনাশা কথা বলছ যে, যে ঈসা মহান আল্লাহর রাসূল এবং তিনি মহান আল্লাহর হুকুমে সৃষ্ট, তাঁকে ওহীর বিপরীতে মহান আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করছ ও তিন আল্লাহর প্রবক্তা হয়ে গেছে? এক আল্লাহ তো আল্লাহ স্বয়ং, দ্বিতীয় ঈসা এবং তৃতীয় মারইয়াম। তোমরা এসব থেকে নিবৃত হও। মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। কেউ তাঁর ছেলেও হতে পারে না। তাঁর সত্তা এসব হতে পূতপবিত্র। এসব বিভ্রান্তির উৎস হলো তোমাদের ওহী বিমুখিতা। তোমরা যদি ওহীর অনুসরণ করতে তাহলে কাউকে মহান আল্লাহর ছেলে সাব্যস্ত করতে না এবং তিন আল্লাহর প্রবক্তা হয়ে প্রকাশ্য মুশরিক হতে না। পরন্তু, এখন আবার নবী শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ ﷺ ও কিতাব তথা শ্রেষ্ঠ কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে ডবল কাফের হতে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কিতাবীদের এক শ্রেণি তো হযরত ঈসা (আ.)-কে রাসূল বলেই স্বীকার করেনি, অধিকন্তু তাঁকে হত্যা করা পছন্দ করেছে। তাদের সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় তাঁকে মহান আল্লাহর পুত্র স্থির করেছে। উভয় শ্রেণিই কাফের। তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ ছিল ওহী থেকে সরে দাঁড়ানো। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুক্তি ওহীর অনুসরণেই মাঝে সীমাবদ্ধ।

−[তাফসীরে উসমানী : টীকা ২৩২]

দীনের ক্ষেত্রে غُلُوٌّ বা বাড়াবাড়ি করা এই যে, বিশ্বাস ও কর্মে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন-বিয়োজনকে স্থান দেওয়া, তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। اَهْلُ الْكِتٰبِ বলে এখানে ইঞ্জীল কিতাবধারী বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। আয়াতটি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইহুদিদের আপত্তিকর বিষয়ের উল্লেখ করত সেসবের জবাব দিয়ে এখানে খ্রিস্টানদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা হচ্ছে, যারা ইহুদিদের অতিরঞ্জনের বিপরীতে হ্রাস করারও চরম স্তরে উপনীত হয়েছিল। তারা হযরত ঈসা মাসীহকে একজন সৎ ও মকবুল বান্দার পরিবর্তে খোদা বা খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। হযরত থানভী (র.) বলেন, ইহুদিদের বাড়াবাড়ি ছিল জাহেরী বিধানের ক্ষেত্রে খুঁত খুঁজে বেড়ানো এবং বাহ্যিক দিক থেকে বিমুখতা। আর সত্যপন্থা হচ্ছে জাহের এবং বাতেনকে একত্র করা। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৪২৮]

قَوْلُهُ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ : ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম : আয়াতে ইহুদি-নাসারাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غُلُوٌّ শব্দের অর্থ- সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন- اَلْغُلُوُّ فِى الدِّيْنِ هُوَ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الْحَقِّ فِيْهِ অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে غُلُوٌّ [বাড়াবাড়ি] করার অর্থ- তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা হচ্ছে- আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে ইহুদিরা তাকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে স্বীকার করেনি, বরং তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উপর [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা] **মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দা করেছে।** ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের কারণে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের **গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বারবার প্রত্যক্ষ হয়েছে,** তাই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ **ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন।** মুসনাদে আহমদে হযরত ফারুকে আযম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ **ইরশাদ করেছেন-** لَا تُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ **অর্থাৎ 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম** (আ.)-এর **ব্যাপারে করেছে। খুব স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।'** ইমাম **বুখারী ও ইবনে মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।**

সারকথা, আল্লাহর বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি **আল্লাহর রাসূল।** এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহর কোনো বিশেষণে বিভূষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা **ইহুদি**-নাসারাদের মতো বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুত ইহুদি-খ্রিস্টানরা শুধু নবীদের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি; বরং এটা যখন তাদের স্বাভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবীদের সহচর অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল, পাদ্রী-পুরোহিতদেরও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করাও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবীদের অনুগত এবং তাদের শিক্ষার অনুসারী, না শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পণ্ডিত-পুরোহিতরূপে পরিগণিত হন। ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী পুরোহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্মকর্মের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কুরআন পাক ঘোষণা করছে- اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল।" রাসূলকে তো কাদা বানিয়েছিলই, রাসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবীদেরও পূজা করা শুরু করেছিল।

এর থেকে বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী ﷺ স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজের সময় রমীয়ে জামারাহ অর্থাৎ কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারি আকারে পাথরকুচি নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন- بِمِثْلِهِنَّ بِمِثْلِهِنَّ অর্থাৎ এ ধরনের মাঝারি আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দু'বার বললেন। অতঃপর আরো বললেন- إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِى الدِّيْنِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِىْ دِيْنِهِمْ অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থেকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল-

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল : প্রথমত হজের সময় যে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারি আকারের হওয়াই সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থি। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরিয়তের নির্ধারিত সীমা। সেটা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়ত যে কোনো কাজে সুন্নতসম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের সীমা : পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কুরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিয়ে করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন। বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনোটাই দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডির মধ্যে পড়ে না। ইসলামি সমাজ -ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুয়তের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে রাষ্ট্রের এলাকা বহু দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার কোনো মোহ ছিল না। এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুধাবন করতে অপারগ হওয়ায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا অর্থাৎ তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করছে যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা : ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলে পাক ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রকার বিদ'আতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ অর্থাৎ প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রাসূলে মকবুল ﷺ -এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোনো বিষয়কে ছওয়াবের কাজ মনে করাই বিদ'আত।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে চরম অপরাধ এজন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দীন ও শরিয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্ববর্তী উম্মতদেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রাসূলদের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা কি কি বর্ধিত করেছে আর আসল রূপরেখা কি ছিল? তা জানারও কোনো উপায় ছিল না।

দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনো গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামি শরিয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তদীয় 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা : উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী করীম ﷺ -এর কঠোর হুঁশিয়ারি এবং শরিয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা অবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করেছে যে, ধর্মীয় আলেম-ওলামা, পীর-বুযুর্গানের কোনো প্রয়োজনই নেই। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। এ মনোভাবাপন্ন কোনো কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবি ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কুরআনের হাকিকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি 'অনুবাদ পুস্তক' পাঠ করেই নিজেকে কুরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনাপ্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো তবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোনো বিষয় বা শাস্ত্রের বই-পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারেনি। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোনো পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শোনা যায় না। এমন কি দর্জি-বিদ্যা বা পাক-প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোনো সুদক্ষ দর্জি বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না, বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কুরআন-হাদীসকে এত হালকা মনে করেছে যে, এগুলো বোঝার জন্য কোনো ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যি পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক এমন গড্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, তাদের ধারণা, কুরআন পাক বোঝার জন্য তরজমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষীদের তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপর দিকে বহু মুসলমান অন্ধভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত। যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি ইলম-আমল, ইসলাহ ও পরহেজগারীর মাপকাঠিতে টেকেন কিনা? তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামি শরিয়তের পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাব আল্লাহওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহর কিতাব দ্বারা আল্লাহওয়ালা লোকদের চিনতে হবে অর্থাৎ প্রথমে কুরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের চিনে নাও। অতঃপর দেখ, তাঁরা কুরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারা কুরআন হাদীসের রঙ্গে রঞ্জিত কিনা। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ২, পৃ. ৫৬৬-৫৭০]

قَوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ : كلمة শব্দে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর কালিমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। যথা–

১. ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, কোনো শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নারী পুরুষের বীর্যের সম্মিলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ তা'আলার كُنْ [হও] নির্দেশ দেওয়া; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মলাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে কালিমাতুল্লাহ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধু আল্লাহ তা'আলা এই কালেমাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মারইয়ামের কাছে পৌঁছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকরী ও বাস্তবায়িত হলো।

২. কারো মতে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থ আল্লাহর সু-সংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে সু-সংবাদ দান করেছিলেন, সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা- إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ অর্থাৎ এবং যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন 'কালেমা' সম্পর্কে।

৩. কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَرُوْحٌ مِّنْهُ : এ শব্দের দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। **প্রথমত** হযরত ঈসা (আ.)-কে 'রূহ' বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে **সম্পর্কিত করার কারণ কি?**

এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যথা-

১. কারো মতে 'রূহ' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। **কেননা প্রচলিত** রীতি রয়েছে যে, কোনো বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝানোর জন্য তাকে সরাসরি **'রূহ' বলা হয়। হযরত** ঈসা (আ.)-এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোনো দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ তা'**আলার ইচ্ছা এবং** كُنْ নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি অতি **শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব,** প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে 'রূহ' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার **সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান** ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন মসজিদের সম্মানার্থে তাকে **'আল্লাহর মসজিদ' বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলা** হয়, অথবা কোনো একান্ত অনুগত বান্দাকে **আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা বলা হয়।** যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ **আয়াতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'আল্লাহর বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।**

২. **কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে** মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আ.) প্রেরিত **হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের** মূল যেমন রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। অতএব, তাঁকে **'রূহ'** বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন- وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কুরআনকেও **'রূহ'** উপাধিত ভূষিত করা হয়েছে। কেননা কুরআন পাক হলো আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

৩. কেউ বলেন 'রূহ শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ হযরত ঈসা (আ.)-এর নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

৪. কারো অভিমতে- এখানে একটি ذُوْ শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে ছিল ذُوْ رُوْحٍ مِّنْهُ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ বিশিষ্ট। প্রাণবিশিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে সব প্রাণীই সমান। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

৫. আরেকটি অভিমত এই যে, رُوْحٌ [রূহ] শব্দ ফুঁ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। **আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ.)** হযরত মারইয়াম (আ.)-এর গলাবন্ধে ফুঁ দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) শুধু ফুৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে 'রূহুল্লাহ' খেতাব দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহই ঈসা (আ.)-এর মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা : আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন যে, একদিন খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খ্রিস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হলো। সে বলল তোমাদের কুরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ সে কুরআনের رُوْحٌ مِّنْهُ শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআন পাকের অন্য আয়াত وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ পাঠ **করলেন।** এখানে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দ দ্বারা সবকিছুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যার অর্থ আসমানে **ও জমিনে যা কিছু**

আছে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতএব رُوْحٌ مِّنْهُ শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আ.) আল্লাহর অংশ, তবে جَمِيْعًا مِّنْهُ শব্দের অর্থ করতে হবে আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর অংশ [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক]। অতএব, হযরত ঈসা (আ.)-এর বিশেষ কোনো মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খ্রিস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

قَوْلُهُ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ : কুরআন নাজিলের সমসাময়িককালে খ্রিস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীরি উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো– মসীহই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো– মসীহ খোদার পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্যের সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মারইয়াম এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পরিবর্তে রূহুল কুদুস তথা পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আ.) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোটকথা, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে তিনের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি আপনোদনের জন্য কুরআনে কারীমে প্রতিটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হলো হযরত ঈসা (আ.) তার মাতা হযরত মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষ ও আল্লাহ তা'আলার সত্য রাসূল। এর অতিরিক্ত যা কিছু বলা হয় বা ধারণা পোষণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদিদের মতো অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খ্রিস্টানদের মতো অতিভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হযরত ঈসা (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তির দু'টি পরস্পরবিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খ্রিস্টানদের বিভিন্ন উপদলের ভ্রান্ত আকীদার ভিন্ন দিক ও তার মোকাবিলায় ইসলামি আকীদার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সবিস্তারে জানার জন্য মরহুম হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানুভী (র.) কর্তৃক সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'ইজহারুল হক' অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বইটি মূল আরবি হতে উর্দু তরজমায় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যাসহ সম্প্রতি করাচী দারুল উলূম হতে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৬৩-৫৬৬]

قَوْلُهُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا : অর্থাৎ আসমানে ও জমিনের উপর হতে নিচে পর্যন্ত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। অতএব, তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা একাই সকল কার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা : কোনো সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব একমাত্র বিবেক বর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ২/৫৬৬]

অনুবাদ :

١٧٢. لَنْ يَّسْتَنْكِفَ يَتَكَبَّرَ وَيَانِفَ الْمَسِيْحُ الَّذِيْ زَعَمْتُمْ اَنَّهُ اِلٰهٌ عَنْ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَسْتَنْكِفُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا عَبِيْدًا وَهٰذَا مِنْ اَحْسَنِ الْاِسْتِطْرَادِ ذُكِرَ لِلرَّدِّ عَلٰى مَنْ زَعَمَ اَنَّهَا اٰلِهَةٌ اَوْ بَنَاتُ اللّٰهِ كَمَا رَدَّ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى النَّصَارٰى الزَّاعِمِيْنَ ذٰلِكَ الْمَقْصُوْدُ خِطَابُهُمْ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا فِي الْاٰخِرَةِ.

১৭২. মসীহ যাকে তোমরা ইলাহ বলে ধারণা কর সে আল্লাহর দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না। এতে অহমিকা প্রদর্শন বা অহঙ্কার করে না। এবং আল্লাহর দরবারের ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণও আল্লাহর দাস হওয়াতে লজ্জাবোধ করে না। আয়াতোক্ত ভঙ্গিটি একটি চমৎকার ও উত্তম প্রত্যুত্তর ভঙ্গি। পূর্বের বাক্যটিতে খ্রিস্টানদের যারা হযরত ঈসা সম্পর্কে ইলাহ হওয়ার ধারণা পোষণ করে ধারণার যেমন প্রত্যুত্তর দান করা হয়েছে। তেমনি এই স্থানে ফেরেশতাগণকে যারা উপাস্য এবং আল্লাহর কন্যা বলে ধারণা পোষণ করে তাদের প্রত্যুত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থানে মূলত এদেরই সম্বোধন করা উদ্দেশ্য। **এবং কেউ তাঁর দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করলে ও অহমিকা প্রদর্শন করলে তিনি** পরকালে **তাদের সকলকে তাঁর নিকট একত্র করবেন।**

١٧٣. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ثَوَابَ اَعْمَالِهِمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ مَا لَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْ عِبَادَتِهٖ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ مُؤْلِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ.

১৭৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তিনি তাদেরকে পূর্ণ পারিশ্রমিক অর্থাৎ তাদের কাজের পুণ্যফল প্রদান করবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশি দিবেন। এমন বস্তু দিবেন যা চোখ দেখেনি, কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানবের হৃদয়ে যার কল্পনাও উদয় হয়নি। কিন্তু যারা তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করে ও অহমিকা প্রদর্শন করে তাদেরকে তিনি মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামাগ্নির শাস্তি প্রদান করবেন।

١٧٤. وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ وَلِيًّا يَدْفَعُهُ عَنْهُمْ وَّلَا نَصِيْرًا يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ.

১৭৪. এবং আল্লাহ ব্যতীত তাঁকে ছাড়া নিজেদের জন্য তারা কোনো অভিভাবক যে তাদের পক্ষ হতে তা প্রতিহত করবে এবং যে তাঁর হতে তা বাধা দিয়ে রাখবে এমন কোনো সহায় পাবে না।

١٧٥. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ حُجَّةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَيْكُمْ وَهُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا وَهُوَ الْقُرْاٰنُ.

১৭৫. হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালকের **পক্ষ** হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ দলিল এসেছে আর তা হলেন রাসূল ﷺ এবং আমি তোমাদের প্রতি **স্পষ্ট** স্বচ্ছ জ্যোতি অর্থাৎ আল কুরআন **অবতীর্ণ করেছি।**

١٧٦. فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا ط طَرِيْقًا مُّسْتَقِيْمًا هُوَ دِيْنُ الْإِسْلَامِ.

১৭৬. যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তাঁকেই অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে পরিচালিত করবেন।

١٧٧. يَسْتَفْتُوْنَكَ ط فِي الْكَلٰلَةِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط إِنِ امْرُؤٌ مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ هَلَكَ مَاتَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ أَيْ وَلَا وَالِدٌ وَهُوَ الْكَلٰلَةُ وَلَهٗ أُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ أَيِ الْأَخُ كَذٰلِكَ يَرِثُهَا جَمِيْعَ مَا تَرَكَتْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ذَكَرٌ فَلَا شَيْءَ لَهٗ أَوْ أُنْثٰى فَلَهٗ مَا فَضَلَ عَنْ نَصِيْبِهَا وَلَوْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَوِ الْأَخُ مِنْ أُمٍّ فَفَرْضُهُ السُّدُسُ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ السُّوْرَةِ فَإِنْ كَانَتَا أَيِ الْأُخْتَانِ اثْنَتَيْنِ أَيْ فَصَاعِدًا لِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ جَابِرٍ وَقَدْ مَاتَ عَنْ أَخَوَاتٍ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط الْأَخُ وَإِنْ كَانُوْٓا أَيِ الْوَرَثَةُ إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ لِ أَنْ لَا تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ الْمِيْرَاثُ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّهَا اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْفَرَائِضِ.

১৭৭. লোকেরা আপনার নিকট কালালা সম্পর্কে পরিষ্কার জানতে চায়। বলুন, কালালা সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার জানাচ্ছেন যে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে মারা গেলে إِمْرُءٌ এটা এখানে উহ্য এমন একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে مَرْفُوْعٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে যে ক্রিয়াটির বিবরণ হলো পরবর্তী ক্রিয়া هَلَكَ সে যদি সন্তান ও পিতৃহীন হয় এমন ব্যক্তিকেই কালালা বলা হয় থাকে [এবং তার] আপন বা পিতা শরিক এক ভাগ্নী থাকে তবে তার [অর্থাৎ ভগ্নীর] জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং যদি সন্তানহীনা হয় তবে সে অর্থাৎ ভ্রাতা [তার] সাকুল্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যদি তার অর্থাৎ মৃতা ভগ্নীর পুত্র সন্তান থাকে তবে সে [ভ্রাতা] কিছুই পাবে না। আর যদি তার কন্যা সন্তান থাকে তবে তাকে [কন্যাকে] তার নির্ধারিত হিস্যা প্রদানের পর অবশিষ্টাংশ সে [ভ্রাতা] পাবে। আর উক্তরূপ ভ্রাতা ও ভগ্নী যদি বৈপিত্রেয় হয় তবে তার [অর্থাৎ ভ্রাতার] অংশ হলো এক ষষ্ঠাংশ। সূরার প্রথমে এর উল্লেখ হয়েছে। তার অর্থাৎ ভগ্নীগণ দুই বা ততোধিক; কারণ, হযরত জাবির সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। তিনি বহু ভগ্নী রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন; হলে তাদের জন্য তার অর্থাৎ ভ্রাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ হবে আর যদি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাই বোন উভয়ই থাকে তবে তাদের এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান হবে। তোমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হও সে জন্য আল্লাহ তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম-বিধানসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। মীরাছের বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত। শায়খাইন অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, ফারায়িয সম্পর্কে এ আয়াতটিই হলো সর্বশেষ নাজিলকৃত আয়াত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَيَسْتَنْكِفُ : مُضَارِعْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ্। মাসদার হলো, **اِسْتِنْكَافْ** **অর্থ,** সে লজ্জাবোধ করে, ঘৃণা করে এবং সে অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। উক্ত শব্দটির মূলবর্ণ হলো **نَكِفَ (س، ن) نَكْفًا وَنَكَفًا** অর্থ– অপাত্রে অহঙ্কার করা।

قَوْلُهُ اَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ : اَلْمَلَائِكَةُ এর عَطْف হয়েছে اَلْمَسِيْحُ-এর সাথে। আবার এমনও হতে পারে যে, اَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ বাক্যাংশটি مُرَكَّب تَوْصِيْفِىْ হয়ে مُبْتَدَا হবে এবং لَا يَسْتَنْكِفُوْنَ তার উহ্য খবর।

قَوْلُهُ هٰذَا مِنْ اَحْسَنِ الْاِسْتِطْرَادِ : অর্থাৎ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ-এর সাথে اِسْتِطْرَاد اَحْسَنْ রয়েছে।

اِسْتِطْرَاد مُطْلَقْ-এর সংজ্ঞা : ذِكْرُ الشَّيْءِ فِىْ غَيْرِ مَحَلِّهٖ لِمُنَاسَبَةٍ কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষ উপলক্ষে অপাত্রে উল্লেখ করা।

اِسْتِطْرَادْ-এর **দ্বিতীয় সংজ্ঞা : উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে অনুদ্দিষ্ট বিষয়টি আবশ্যক হয়ে যায়।** اِسْتِطْرَاد حَسَنْ বলা হয় দ্বিতীয় অর্থের জন্য [যেটি **উদ্দিষ্ট হয়] প্রথম অর্থটিকে** মাধ্যম বানানো। মুফাসসির (র.) এখানে هٰذَا مِنْ اَحْسَنِ الْاِسْتِطْرَادِ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, **উল্লিখিত** আয়াতে اِسْتِطْرَاد حَسَنْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَيْهِ : اَىْ اِلَى اللّٰهِ اَوِ الْاَقْرَانِ

قَوْلُهُ اولـه الزَّاعِمِيْنَ ذٰلِكَ : এটি اَلنَّصَارٰى-এর সিফত। **আর** ذٰلِكَ **দ্বারা** খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস তথা – رَبَّنِيَّتْ اُلُوْهِيَّتْ এবং تَثْلِيْث প্রতিটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا : এটি يَهْدِيْهِمْ-**এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : নাজরান অধিবাসী নাসারাদের একটি দল রাসূল ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ করল যে, আপনি আমাদের সাথীর বদনাম কেন করেন? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের সাথী কে? তারা বলল, হযরত ঈসা (আ.)। রাসূল ﷺ বললেন, আমি তাঁর সম্পর্কে কি বলেছি? তারা বলল, আপনি তাঁকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বলেছেন। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর বান্দা হওয়া হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্য কোনো দোষের কিছু নয়। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

–[তাফসীরে খাযেন ও রূহুল মা'আনী]

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) **আল্লাহর বান্দা হওয়ার মাঝে লজ্জাবোধ** করেন না। শুধু তিনি-ই নন, বরং আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করে না। **আল্লাহর বান্দা হওয়া তো চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মানের বিষয়।** অপমান ও লাঞ্ছনা তো রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার মাঝে। যেমন **খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র** এবং উপাস্য এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা আখ্যা দিয়ে তাদের ইবাদত করতে শুরু করে দিয়েছে। **–[জামালাইন ২/১৭৩]**

নবীগণ শ্রেষ্ঠ নাকি ফেরেশতাগণ? কোনো কোনো মুফাসসির উক্ত আয়াতের অধীনে নবী এবং ফেরেশতাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনাও করেছেন। কেউ ফেরেশতাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, আবার কেউ নবীদেরকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। প্রথম উক্তিটি মু'তাযিলা এবং কতিপয় আশাইরা মতাবলম্বীরা করে থাকে। দ্বিতীয় উক্তিটি অধিকাংশ আশাইরাদের। কিন্তু ইনসাফের কথা হলো, উক্ত আয়াতের সাথে এ আলোচনার কোনো সম্পর্কে নেই এবং এ আলোচনায় কোনো ফায়দাও নেই। কুরআন ও হাদীসে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা আসেনি।

فَائِدَةٌ : اِسْتَدَلَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الْقَائِلُوْنَ بِتَفْضِيْلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ، وَهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَاقِلَانِىْ وَالْحَلِيْمِىْ مِنْ اَئِمَّةِ الْاَشْعَرِيَّةِ وَجُمْهُوْرِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَقَرَّرَ زَمَخْشَرِىٌّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ بِمَا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ، وَاَطَالَ الْبَيْضَاوِىُّ وَابْنُ الْمُنِيْرِ فِى الرَّدِّ عَلَى وَالْمُنْصِفُ يَرٰى اَنَّ التَّفَاضُلَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ مِنْ قَبِيْلِ الرَّجْمِ بِالْغَيْبِ.

–[জামালাইন ২/১৩৭, ১৩৮]

ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মু'তাযিলাদের বিশ্বাস : মু'তাযিলাদের বিশ্বাস হলো, ফেরেশতারা নবীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাফসীরে কাশ্শাফের লেখক উক্ত আয়াত দ্বারা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। মু'তাযিলদের দাবি উক্ত আয়াতের দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে مَقَامِ عَبْدِيَّةٍ নাকচ করা হয়েছে এবং مَقَامِ اِبْنِيَّةٍ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর اِبْن তথা পুত্র যেহেতু পিতার অংশ হয়ে থাকে সেহেতু পুত্র প্রমাণিত হওয়া মানে আল্লাহর অংশ প্রমাণিত হওয়া।

দলিল : لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ-এর মধ্যে لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ হলো مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ হলো মা'তুফ। تَرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى কায়দা অনুসারে মা'তুফ আলাইহি-এর চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। যাতে মা'তুফটি মা'তুফ' আলাইহি-এর জন্য দলিলের স্থলে হয়। উক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ না করা হলো মা'তুফ আলাইহি এবং ফেরেশতাদের লজ্জাবোধ না হওয়াটা হলো মা'তুফ। আর মু'তাযিলাদের বক্তব্য অনুযায়ী মা'তুফ আলাইহি শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। সে হিসেবে উক্ত বিধানের আলোকে মু'তাযিলাদের দৃষ্টিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না। কেননা ফেরেশতারা শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না। যেন ফেরেশতাদের লজ্জাবোধ না করা হযরত ঈসা (আ.)-এর লজ্জাবোধ না করার দলিল। এ কারণেই বলা হয়- لَا تَسْتَنْكِفُ فُلَانٌ عَنْ خِدْمَتِىْ وَلَا اَبَاهُ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আমার খেদমত করতে লজ্জাবোধ করে না, এমনকি তার পিতাও না। উক্ত দৃষ্টান্তে تَرَقِّىْ مِنَ الْاَدْنٰى اِلَى الْاَعْلٰى পাওয়া গিয়েছে। কেননা পিতা পুত্র থেকে উত্তম হয়ে থাকেন। এ কারণেই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে لَا يَسْتَنْكِفُ فُلَانٌ عَنْ خِدْمَتِىْ وَلَا غُلَامُهٗ বলা হয় না। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে- لَنْ يَّسْتَنْكِفَ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ الْوَزِيْرُ وَلَا السُّلْطَانُ কিন্তু এর উল্টোটি বলা হয় না। সুতরাং উক্ত বিধানোর আলোকে আয়াতের মর্ম হবে- لَا يَسْتَنْكِفُ الْمَسِيْحُ وَلَا مَنْ فَوْقَهٗ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না এমনকি তাঁর চেয়ে সম্মানীরাও না।

মু'তাযিলাদের দলিল খণ্ডন : আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, খ্রিস্টানদের হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র হওয়ার বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহর কন্যা হওয়া সংক্রান্ত মুশরিকদের বিশ্বাসটিকেও খণ্ডন করা হয়েছে। বস্তুত এটি মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডনের স্থান নয়। কেননা পূর্ব থেকে আলোচনা চলে আসছে খ্রিস্টানদেরকে উদ্দেশ্য করে। সূরা যুখরুফে মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ; বুঝা গেল, উক্ত আয়াতে ফেরেশতাদের লজ্জাবোধ হওয়ার আলোচনাটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। অন্যথায় প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল; হযরত ঈসা (আ.)-এর লজ্জাবোধ না হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা। যেন এরূপ বিশ্বাসীদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা যা বিশ্বাস কর তা সঠিক নয়। কেননা পুত্র বা কন্যা [সন্তান] পিতার গোলাম হওয়াতে লজ্জাবোধ করে। আর হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা বা গোলাম হওয়াতে লজ্জাবোধ করেন না। যদি হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র হতেন, তাহলে আল্লাহর বান্দা হওয়াতে লজ্জাবোধ করতেন। আর একই অবস্থা ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে। সুতরাং বোঝা গেল, مَعْطُوْف হিসেবে ফেরেশতাদের আলোচনা পরে করার দ্বারা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। -[জামালাইন- ২/১৩৮, ১৩৯]

মহান আল্লাহর বান্দা হওয়াই উচ্চমর্যাদা ও সম্মানের বিষয় : মহান আল্লাহর বান্দা হওয়া, তাঁর ইবাদত ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা উচ্চ পর্যায়ের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। হযরত মাসীহ (আ.) ও ঘনিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে এ নি'য়ামতের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা জেনে নাও। তাঁরা কি এটাকে হেয় জ্ঞান করবে, বা করতে পারে? হ্যাঁ, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করা লজ্জার বিষয়ই বটে, যেমন, খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহর ছেলে ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা মেনে নিয়ে তাদের ও দেব-দেবীর উপাসনা করছে। বস্তুত এদের জন্য রয়েছে অনন্ত শাস্তি ও লাঞ্ছনা। -[তাফসীরে উসমানী-২৩৪]

قَوْلُهُ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا : মহান আল্লাহর বন্দেগীতে উন্নাসিকতার ভয়াবহ পরিণতি : যেসব ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগীতে উন্নাসিকতা দেখাবে ও অহংকার করবে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। একদিন সকলকেই মহান আল্লাহর নিকট সমবেত হতে হবে। তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে মহান আল্লাহর বন্দেগী করেছে, তারা তাদের কাজের পরিপূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে; বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া অপেক্ষাও বেশি বড় বড় নিয়ামত তাদের দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেছে ও অহংকার দেখিয়েছে তারা মহা শাস্তিতে নিঃপতিত হবে। তাদের কোনো শুভার্থী ও সাহায্যকারী থাকবে না। মহান আল্লাহর শরিক বানিয়ে যাদের উপাসনা করেছিল, যদ্দরুন এই শাস্তি, সেই তারাও কোনো কাজে আসবে না। কাজেই, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ভালো করে বুঝে নিক যে, এ উভয় অবস্থার কোনটি তাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং হযরত মাসীহ (আ.)-এর যথার্থ মর্যাদা কি? –[তাফসীরে উসমানী : ২৩৫]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : মহানবী ﷺ ও পবিত্র কুরআন : পূর্বে মহান আল্লাহর ওহী বিশেষত কুরআন মাজীদের মর্যাদা ও তার সত্যতার বিবরণ এবং তার অনুসরণ ও আনুগত্যের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে খ্রিস্টান সম্প্রদায় যে হযরত মাসীহ (আ.)-কে মহান আল্লাহ ও তাঁর ছেলে বলে বিশ্বাস করে, তার উল্লেখপূর্বক প্রমাণ করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত আকীদা। অবশেষে এবার আবার সেই আসল ও জরুরি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, হে মানুষ! তোমাদের নিকট বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ অর্থাৎ আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ, যাঁর মুজেযাসমূহ ও ক্ষুরধার বক্তব্য যুক্তি বিরোধীদের মতবাদকে ধূলিস্যাত করে দিয়েছে ও সমুজ্জ্বল জ্যোতি তথা কুরআন মাজীদ পৌঁছে গেছে, যা হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। এখন আর কোনো দ্বিধা ও চিন্তার অবকাশ নেই। যে কেউ মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, এই পবিত্র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে মহান আল্লাহর রহমত ও কৃপায় প্রবেশ করবে এবং সরাসরি তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে, যে এর বিপরীত করবে তাঁর পথভ্রষ্টতা ও দুর্ভোগ যে কতখানি, তা এর দ্বারাই অনুমান করে নিবে। –[তাফসীরে উসমানী : ২৩৬]

قَوْلُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : 'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ– অকাট্য দলিল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মুজেযাসমূহ, তাঁর বিস্ময়কর কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রিসালতের অকাট্য দলিল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার পরে আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আবশ্যক হয় না। অতএব তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতে نُوْرٌ [নূর] শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

যেমন সূরা মায়িদার আয়াত قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল আলো এসেছে, আর তা হচ্ছে এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ কুরআন। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

এই আয়াতে যাকে 'কিতাবুন-মুবীন' বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে তাকেই 'নূরুম মুবীন' বলা হয়েছে। আবার নূর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কিতাব অর্থ আল-কুরআনও হতে পারে। –[রূহুল মা'আনী] তবে তার অর্থ এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবীয় দৈহিকতা হতে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৫৭৩]

قَوْلُهُ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ : কালালার বিধান : সূরার শুরুতে মিরাসের আয়াতে কালালার মিরাস বর্ণিত হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে এ আয়াত নাজিল হয়। 'কালালা' অর্থ– দুর্বল, অসহায়। এ স্থলে বোঝানো হয়েছে, যার পিতা ও সন্তান-সন্ততি নেই, যেমন পূর্বেও বলা হয়েছে। পিতা ও আওলাদই আসল ওয়ারিশ। এ ওয়ারিশ যার নেই তার আপন ভাই-বোনকে সন্তান-সন্ততির পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। আপন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এ মর্যাদা পাবে। এক বোন হলে অর্ধেক, দুই বোন হলে দুই তৃতীয়াংশ এবং

ভাই-বোন উভয় থাকলে ভাই দুই ভাগ, বোন এক ভাগ পাবে। যদি শুধু ভাই থাকে, বোন না থাকে, তবে সে বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, অর্থাৎ তার কোনো অংশ নির্ধারিত নেই কারণ সে আসাবা যেমন আয়াতে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বাকি থাকল বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। সূরার শুরুতে তাদের মিরাস বর্ণিত হয়েছে। তাদের অংশ নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ কোনো পুরুষ যদি এক বোন রেখে মারা যায়, পিতা ও সন্তান কিছুই না থাকে তবে সে বোন সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। -[তাফসীরে উসমানী : ২৩৭, ২৩৮]

যদি এর বিপরীত হয় অর্থাৎ কোনো মহিলা তার আপন বা বৈমাত্রেয় ভাই রেখো মারা গেল, তখন সে ভাই-ই বোনের সমুদয় সম্পত্তির অধিকারী, যেহেতু সে 'আসাবা'। তার কোনো ছেলে সন্তান থাকলে কিছুই পাবে না। কন্যা থাকলে তার মিরাসের পর যা অবশিষ্ট থাকবে ভাই তার অধিকারী হবে। মৃত ব্যক্তি বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন রেখে যায়, তবে তার জন্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ নির্ধারিত যেমন সূরার শুরুতে গেছে। -[তাফসীরে উসমানী : ২৩৯]

বোনের সংখ্যা দুয়ের বেশি হলেও তারা দুই তৃতীয়াংশই পাবে। -[তাফসীরে উসমানী : ২৪০]

কতক পুরুষ ও কতক নারী অর্থাৎ ভাইবোন উভয়ই যদি রেখে যায়, তবে ভাই দুই ভাগ ও বোন এক ভাগ পাবে, যেমন সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।, -[তাফসীরে উসমানী : ২৪১]

قَوْلُهُ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا الخ : আল্লাহর নির্দেশ না মানার পরিণতি পথভ্রষ্টতা : মহান আল্লাহ পরম দয়ালু ও কৃপাময়। কেবল বান্দার হেদায়েতের জন্য এবং তাকে পথভ্রষ্টতা হতে বাঁচানোর লক্ষ্যে বিশদভাবে সঠিক বিধান বর্ণনা করেন। যেমন এ স্থলে কালালার মীরাস বর্ণনা করেছেন। এতে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ নেই। তিনি তো অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী। কাজেই, যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহের মূল্যায়ন করবেন না; বরং তাঁর আদেশ পাশ কাটিয়ে চলবে, তার দুর্ভাগ্যের কী কোনো পরীসীমা আছে? বোঝা গেল, যাবতীয় বিধান মেনে চলা বান্দার জন্য অপরিহার্য। যদি কোনো মামূলী ও খুঁটিনাটি বিষয়েও মহান আল্লাহর আদেশ থেকে সরে দাঁড়ায় তবে পথভ্রষ্টতা অনিবার্য। এখন যারা তাঁর পবিত্র সত্তা ও তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম অমান্য করে এবং নিজের খেয়াল খুশি ও বুদ্ধি-বিবেচনাকেই গুরু মেনে চলে, তাদের পথভ্রষ্টতা ও হীনতা যে কোন পর্যায়ের তা এর দ্বারাই অনুমান করে নিন। -[তাফসীরে উসমানী : ২৪২]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দার হেদায়েতকে পছন্দ করেন। এবার তিনি বলেছেন তিনি সবকিছু সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। বোঝানো হলো, দীনি বিষয়াদি সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজন জিজ্ঞেস করে নাও। এতদ্বারা বোঝা যায় কালালা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম যে প্রশ্ন করেছিলেন, প্রচ্ছন্নভাবে তার প্রশংসা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আরো বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন, তোমরা জান না। তোমরা তো এতটুকু বলতে পার না যে, কালালা ও অন্যান্য অবস্থায় যার যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তার প্রকৃত কারণ কী? মানুষের বিবেক-বুদ্ধি কী করে এর উপযুক্ত হতে পারে যে, তার উপর নির্ভর করে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস দেখাবে? যারা নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের স্তরভেদ নির্ণয় করার মতো যোগ্যতা রাখে না, তারা মহান আল্লাহর এক অদ্বিতীয়, অনুপম, অতুলনীয় সত্তা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু বলে না দিলে কি-ই বা বুঝতে পারে? -[তাফসীরে উসমানী : ২৪৩]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ স্থলে কালালার বিধান ও তার শানে নুযূল বর্ণনা করার দ্বারা কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যায়-

ক. পূর্বে যেন وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ আয়াতটির বক্তব্য এবং তার পরে ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে, কিতাবীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল, তদ্রূপ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ.... -এর পর ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের অবস্থা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে ওহী হতে পশ্চাদপসরণকারীদের পথভ্রষ্টতা ও মন্দ স্বভাব এবং ওহীর অনুসরণকারীগণের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়।

খ. এরই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা এই, আহলে কিতাব তো এই জঘন্যতম কাণ্ড করে বসে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার পূতপবিত্র সত্তার জন্য সন্তান ও শরিক সাব্যস্ত করার মতো গুরুতর বিষয়কে নিজেদের ঈমান বানিয়েছে এবং মহান আল্লাহর ওহীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করেছে; পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ -এর অবস্থা এই যে, ঈমান ও ইবাদতের মৌলিক

বিষয়গুলো তো বটেই এমনকি মিরাস, বিবাহ ইত্যাদি খুঁটিনাটি ও শাখাগত বিষয়েও তারা ওহীর সন্ধান ও প্রতীক্ষায় থাকেন। সর্ববিষয়ে তাঁরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক ও রুচি-মর্জিকে সিদ্ধান্তদাতা মনে করে না। একবারে যদি ভালো করে বুঝে না আসে তবে পুনর্বার এসে মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয় এবং মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে নেয়। এ প্রসঙ্গে জনৈক বুজুর্গের নিম্নোক্ত বাণীটি প্রণিধানযোগ্য ببیں تفاوت راہ کجاست تا بکجا অর্থাৎ লক্ষ্য করুন, পথের পার্থক্য কোথা হতে কোথা পর্যন্ত!

মহানবী ﷺ -ও ওহীর হুকুম ছাড়া নিচের পক্ষ হতে কোনো আদেশ দিতেন না। কোনো বিষয়ে ওহীর আদেশ সামনে না থাকলে ওহী নাজিলের অপেক্ষা করতেন। ওহী আসলে সে অনুযায়ী ফয়সালা দিতেন।

এতদ্বারা পরিষ্কার জানা গেল যে, এক পবিত্র সত্তা ছাড়া সিদ্ধান্তদাতা আর কেউ নয়। বহু আয়াতেই اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ 'আদেশ দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই' প্রভৃতি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন বাক্য রয়েছে। বাকি যা কিছু সবই মাধ্যম। তাদের দ্বারা অন্যের কাছে মহান আল্লাহর আদেশ পৌছান হয়। হ্যাঁ, এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, কোন মাধ্যম নিকটতম, কোনটা দূরের। যেমন রাষ্ট্রীয় আইন প্রচারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও পদস্থ আমলা-কর্মকর্তা হতে নিম্নস্তরের কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই মাধ্যম বিশেষ, কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে।

কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহর ওহীকে ছেড়ে কোনো গোমরাহ যদি অন্য কারো কথা শোনে ও মানে তবে তার চেয়ে ঘোর পথভ্রষ্টতা আর কী হতে পারে?

তাছাড়া এ আলোচনার মাঝে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সম্পূর্ণ কিতাব একইবার অবতীর্ণ হয়ে যাওয়ার মাঝে, যেমন কিতাবীরা দাবি করছে, সেই সৌন্দর্য নেই, যা প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী বারবার নাজিল হওয়ার মাঝে রয়েছে। কেননা এ অবস্থায় প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজন হিসেবে জিজ্ঞেস করার সুযোগ থাকে এবং ওহী মারফত সে তার জবাব পেতে পারে। যেমন আলোচ্য স্থানসহ কুরআন মাজীদের আরো বহুস্থানে তাই হয়েছে। এ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ হওয়া ছাড়াও এর সাথে এমন একটি গৌরবজনক বিষয় জড়িত রয়েছে, যা আর কোনো উম্মতের ভাগ্যে ঘটেনি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্মরণীয় হওয়ার সম্মান ও তাঁর সম্বোধন লাভের মহা মর্যাদা। আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। যেমন সাহাবীর শুভার্থে বা যার প্রশ্নের জবাবে কোনো আয়াত নাজিল হয়েছে সে সাহাবীর জন্য সেটা একটা পরম মর্যাদার বিষয় বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধের ক্ষেত্রে যাঁর সমর্থনে ওহী নাজিল হয়েছে তাঁর মাহাত্ম্য ও সুনাম কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। কাজেই, কালালা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ করে সাধারণভাবে এরূপ সর্বপ্রকার প্রশ্নোত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের লক্ষ্যেই প্রশ্নের কথা সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশ্ন কালালা সম্পর্কে এর দৃষ্টান্ত কুরআন মাজীদে আর কোথাও নেই, সেই সাথে উত্তরকেও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। [মহান আল্লাহ ভালো জানেন, তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শক]।

মোটকথা, ওহী যাবতীয় বিধানের উৎসমূল। এই অনুসরণের উপর হেদায়েত নির্ভরশীল। কুফর ও বিভ্রান্তি এরই বিরোধিতা করার মঝে সীমাবদ্ধ। এই বিরুদ্ধাচরণই ছিল মহানবী ﷺ -এর সময়ে ইহুদি, খ্রিস্টান, মুশরিক, ও অপরাপর সমস্ত পথভ্রষ্টদলগুলোর গোমরাহীর মূল কারণ। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পবিত্র কিতাবের বহু জায়গায় ওহীর অনুসরণ করার সুফল এবং তার বিরুদ্ধাচরণ করার কুফল তুলে ধরেছেন। বিশেষত এ স্থলে তো পুরো দু'টো রুকু' এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই অবতীর্ণ করেছেন; আর তাও বিশদভাবে, উপমা -ইঙ্গিতের সাথে। সম্ভবত এ কারণেই ইমাম বুখারী (র.) তাঁর হাদীসগ্রন্থে بَابٌ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ [রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি ওহীর সূচনা কিভাবে হয়েছিল] শিরোনামটির ভেতর اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ আয়াতটিকেও শিরোনামের অংশরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এই রুকুদ্বয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। যেন অর্থ দাঁড়াল– এ আয়াত হতে ওহী বিষয়ক আয়াতসমূহের শেষ পর্যন্ত [সবগুলো আয়াত আমার এ শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত]। আল্লাহ ভালো জানেন। –[তাফসীরে উসমানী : ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০]

سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা মায়িদা, মদিনায় অবতীর্ণ

مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً اَوِاثْنَتَانِ اَوْ ثَلٰثٌ

আয়াত : ১২০/১২২/১২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط الْعُهُوْدِ الْمُؤَكَّدَةِ الَّتِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَالنَّاسِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اَكْلًا بَعْدَ الذَّبْحِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ تَحْرِيْمُهٗ فِيْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْاٰيَةَ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ مُتَّصِلًا وَالتَّحْرِيْمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْوِهٖ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ اَيْ مُحْرِمُوْنَ وَنُصِبَ غَيْرَ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيْرِ لَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ مِنَ التَّحْلِيْلِ وَغَيْرِهٖ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

১. হে বিশ্বাসী তোমরা অঙ্গীকার অর্থাৎ তোমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে বা লোকদের মধ্যে যে দৃঢ়বদ্ধ অঙ্গীকার করা হয়েছে তা পূরণ কর। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ এ আয়াতটিতে যেসব জন্তুর কথা বলা হয়েছে সেগুলো ব্যতীত চতুষ্পদ আনআম অর্থাৎ উট, গরু, মেষ-ছাগল বিধিমতো জবাই করে আহার করা اِلَّا مَا يُتْلٰى এটা দ্বারা যদি حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ –এ আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত হয় তবে এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যদি এর অর্থ এই করা হয় যে সাধারণ মৃত্যু ইত্যাদির কারণে যা অবৈধ তা ব্যতীত হবে اِسْتِثْنَاء -টি مُتَّصِلٌ বলেও বিবেচ্য হতে পারে। তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো তবে ইহরামরত অবস্থায় শিকারকে বৈধ মনে করবে না। حُرُمٌ : এটা مُحْرِمٌ বা ইহরামকারী [اِسْمِ فَاعِلٍ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। غَيْرَ এটা لَكُمْ স্থিত ضَمِيْر বা সর্বনামের حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْب -রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা হালাল করা বা অন্য কিছু করার আদেশ দান করেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ হতে পারে না।

٢. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ جَمْعُ شَعِيْرَةٍ اَيْ مَعَالِمِ دِيْنِهٖ بِالصَّيْدِ فِي الْاِحْرَامِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ بِالْقِتَالِ فِيْهِ وَلَا الْهَدْيَ مَا اُهْدِيَ اِلَى الْحَرَمِ مِنَ النَّعَمِ بِالتَّعَرُّضِ لَهٗ.

২. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা করো না شَعَائِرَ : এটা شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রতীক। অর্থাৎ ইহরামরত অবস্থায় শিকার করত তাঁর ধর্মীয় প্রতীকসমূহের পবিত্র মাসের অর্থাৎ উক্ত সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ করত, হাদীসমূহের অর্থাৎ যেসব পশু কুরবানীর উদ্দেশ্যে কাবায় প্রেরিত হয় সেসব পশুর কোনো ক্ষতি সাধন করত অবমাননা করো না।

وَلَا الْقَلَائِدَ جَمْعُ قَلَادَةٍ وَهِيَ مَا كَانَ يُتَقَلَّدُ بِهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لِيَأْمَنَ أَيْ فَلَا تَتَعَرَّضُوا لَهَا وَلَا صْحَابِهَا وَلَا تَحِلُّوا آمِّينَ قَاصِدِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ بِأَنْ تُقَاتِلُوهُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا رِزْقًا مِنْ رَبِّهِمْ بِالتِّجَارَةِ وَرِضْوَانًا ط مِنْهُ بِقَصْدِهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ بَرَاءَةٍ وَإِذَا حَلَلْتُمْ مِنَ الْإِحْرَامِ فَاصْطَادُوا ط أَمْرُ إِبَاحَةٍ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شَنَآنُ بِفَتْحِ النُّوْنِ وَسُكُوْنِهَا بُغْضُ قَوْمٍ لِأَجْلِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا م عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ بِفِعْلِ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَالتَّقْوَىٰ ص بِتَرْكِ مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ وَلَا تَعَاوَنُوا فِيهِ حَذْفُ إِحْدَى التَّائَيْنِ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْإِثْمِ الْمَعَاصِي وَالْعُدْوَانِ ص التَّعَدِّي فِي حُدُوْدِ اللّٰهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط خَافُوا عِقَابَهُ بِأَنْ تُطِيعُوهُ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ.

গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর الْقَلَائِد : এটা قَلَادَة -এর বহুবচন। অর্থ- হার। অর্থাৎ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যেসব কুরবানির পশুর গলায় হরম শরীফের লতা গুল্মাদির দ্বারা হার পরানো হয়েছে, সেসব পশুর বা তাদের মালিকদের কোনোরূপ ক্ষতি করো না। এবং তাদের প্রভুর অনুগ্রহ অর্থাৎ বৈধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা অনুসন্ধান এবং নিজেদের ধারণানুসারে প্রভুর সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ বায়তুল হারাম অভিমুখীদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে তাদের অবমাননা করবে না। অর্থাৎ তাদের হত্যা করবে না। সূরা বারাআতে উল্লিখিত আয়াতের মর্মানুসারে এ বিধানটি মানসুখ বা রহিত বলে গণ্য। যখন তোমরা ইহরাম হতে হালাল হবে তখন শিকার করতে পারে। فَاصْطَادُوا : إِبَاحَة বা অনুমতি প্রদান অর্থে এখানে নির্দেশাত্মক বাক্যটির ব্যবহার হয়েছে। তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হতে বাধা দেওয়ায় কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে, তাতে লিপ্ত না করে। شَنَآنُ : এটার [প্রথম] নূনটি ফাতাহ ও সাকিন উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। অর্থ- বিদ্বেষ। তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে সৎকর্মে অর্থাৎ যা করতে তোমরা নির্দেশিত হয়েছ তা করাতে ও আত্মসংযমে অর্থাৎ যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করাতে এবং একে অন্যের সাহায্য করবে না لَا تَعَاوَنُوا : এটাতে মূলত দু'টি تَاء -এর একটি লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। পাপে অবাধ্যাচরণে ও সীমা অতিক্রমণে অর্থাৎ আল্লাহর হুদূদ ও সীমালঙ্ঘন করায় এবং আল্লাহকে অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর। নিশ্চয় আল্লাহ যে ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْمَائِدَةِ : এর বহুবচন مَوَائِدُ অর্থ- দস্তরখান।

قَوْلُهُ بِالْعُقُوْدِ : একবচন عَقْدٌ অর্থ- সুদৃঢ় চুক্তি। এখানে عَقْدٌ মাসদার হয়ে إِسْم হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بَهِيْمَةُ : এর বহুবচন بَهَائِمُ অর্থ- গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। بَهِيْمَةٌ শব্দটি إِبْهَامٌ থেকে নির্গত। যেহেতু চতুষ্পদ জন্তুর আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে থাকে সেহেতু তাকে بَهَائِمُ বলা হয়।

قَوْلُهُ أَنْعَامِ : এর একবচন نَعَمٌ অর্থ- ভেড়া, বকরি, গাভী, মহিষ, উট। أَنْعَامٌ -এর মাঝে উট শামিল হওয়া আবশ্যক। উটকে বাদ দিয়ে সমষ্টিগতভাবে অন্য প্রাণীকে أَنْعَامٌ বলা যাবে না। যেহেতু আরবদের নিকট উট অনেক বড় নিয়ামত তাই তাকে نَعَمٌ বলা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَكْلًا : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন. حِلَّتْ এবং حُرِّمَتْ তথা বৈধ ও অবৈধ তো ক্রিয়ার গুণ। কিন্তু এখানে এতদুভয়কে জাত তথা জন্তুর গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে যা শুদ্ধ নয়।

উত্তর. এখানে اَكْلًا উহ্য ধরে এ প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ : اِسْتِثْنَاء -টি مُنْقَطِعٌ এজন্য যে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তথা بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ এবং مُسْتَثْنٰى তথা مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ এক জিনসভুক্ত নয়। مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো ذَوَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর مُسْتَثْنٰى হলো اَلْفَاظٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ مُتَّصِلًا : مُضَاف মুকাদ্দর ধরার সুরতে اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ বাক্যটি اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ থেকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে। তাকদীরী ইবারত এভাবে হবে- اَىْ اِلَّا مُحَرَّمًا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ আর مُحَرَّمٌ দ্বারা مَيْتَةٌ বা মৃত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لِمَا عُرِضَ مِنَ الْمَوْتِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উল্লিখিত জন্তুর حُرْمَتْ বা অবৈধ হওয়াটা তার সত্তাগত কারণে নয়, বরং মৃত্যুর কারণে طَارِئٌ বা আপতিত।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ : এ জুমলাটি غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ -এর ضَمِيْر مُسْتَتِرْ থেকে حَالٌ হয়েছে। যা لَكُمْ -এর যমীরের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ হলো ذُوالْحَالِ আর وَاَنْتُمْ حُرُمٌ হলো حَالٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল ও আলোচ্য বিষয় : এটি সূরা মায়িদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়িদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে এটি শেষ দিকের সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.)-এর থেকে বর্ণিত আছে, সূরা মায়িদা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে 'আযবা' নামীয় উষ্ট্রীয় পিঠে ছওয়ার ছিলেন। সাধারণত ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও চাপ অনুভূত হতো তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল এমন কি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিচে নেমে আসেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা যায়, এটি ছিল বিদায় হজের সফর। বিদায় হজ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ থেকে ফিরে আসার পর হুজুর ﷺ প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহরে মুহীত' গ্রন্থে বলেন, সূরা মায়িদার কিয়দাংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দাংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দাংশ বিদায় হজের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবূ ওবায়দাহ, হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়া ইবনে কায়েস বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

اَلْمَائِدَةُ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ تَنْزِيْلًا فَاَحِلُّوْا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوْا حَرَامَهَا .

অর্থাৎ "সূরা মায়িদা কুরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্য হারাম মনে করো।"

তাফসীরে ইবনে কাসীর গ্রন্থে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি একবার হজের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, জুবায়ের! তুমি কি সূরা মায়িদা পাঠ কর? তিনি আরজ করলেন, জী হ্যাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, এটি কুরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো। সূরা মায়িদাতেও সূরা নিসার মতো মাসআলা-মাসায়েল, লেনদেন, পারস্পরিক দিক দিয়ে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান অভিন্ন। কেননা এ দুটি সূরায় প্রধানত মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ যথা তাওহীদ, রিসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়িদা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা এ দু'টি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তরিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেনদেন ও বান্দার হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর হক, এতিমের হক, পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ কর।" এ কারণেই সূরা মায়িদার অপর নাম সূরা ওকূদ। অর্থাৎ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি, বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমর ইবনে হাযম (রা.)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন সে ফরমানের শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন। -[মা'আরিফুল কুরআন ৩/১-২

অঙ্গীকার : اَلْعُقُوْدُ অর্থ- অঙ্গীকার। عَقْد শব্দটি খুবই প্রচলিত। এ শব্দটি শরিয়তের সব ধরনের অঙ্গীকারকে শামিল করে; চাই তার সম্পর্ক স্রষ্টার সঙ্গেই হোক বা সৃষ্টির সাথে। "ঐ সমস্ত অঙ্গীকার, যা তোমাদের মাঝে আল্লাহর সঙ্গে অথবা মানুষের মাঝে হয়ে থাকে।" -[ইবনে আব্বাস]

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণত অঙ্গীকার ঐ সব ব্যাপারে, যা শরিয়তের অঙ্গীকার। যথা রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, পাম্পরিক লেনদেন ইত্যাদি মু'আমালাত ও আখলাকিয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত সবই এর মধ্যে এসে গেছে। হাসান বলেন, "এ হলো দীন সম্পর্কিত অঙ্গীকার, যেমন মানুষ অঙ্গীকার করে বেচা-কেনা লেনদেন, বিয়ে-শাদী, তালাক, পরস্পর ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-কৃষ্টি, মালিকানা-ইখতিয়ার প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে, যা শরিয়তের বহির্ভূত নয় একইভাবে, যদি কেউ আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণের অঙ্গীকার করে তাও এর মধ্যে শামিল।" -[কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী : ৪৬৫ টীকা ২]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ : অর্থাৎ হে বিশ্বাসীগণ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। এতে প্রথম يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবি। এরপর বলা হয়েছে اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ; عُقُوْدُ শব্দটির عَقْدٌ শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ- বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عَقْد বলা হয়। এভাবে عُقُوْد-এর অর্থ হয় عُهُوْد অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) উপরিউক্ত অর্থে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের 'ইজমা' [ঐকমত্য] বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা অথবা না করার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عَقْد عَهْد ও مُعَاقَدَة বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরিউক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরি ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে, আয়াতে চুক্তি বলে কোন ধরনের চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তাফসীরবিদদের বাহ্যত বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাজিলকৃত বিধি-বিধানে হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

তাফসীরবিদ ইবনে সা'আদ ও যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, এখানে ঐসব চুক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পর একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন, এখানে শপথ ও অঙ্গীকারকে বোঝানো হয়েছে, যা জাহিলায়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ, রবী, কাতাদা (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদও এ কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই। অতএব, উপরিউক্ত সব চুক্তি অঙ্গীকারই عُقُوْد শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন, যত প্রকার চুক্তি আছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন, এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। যথা-

১. পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণত ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার।

২. নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন- নিজ জিম্মায় কোনো বস্তুর মানত মানা অথবা কসমের মাধ্যমে কোনো কাজ নিজের উপর জরুরি করে নেওয়া।

৩. মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সেসব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারে আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেনদেন, বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শেয়ার-ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যেসব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলাও প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরিয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। -[মা'আরিফুল কুরআন ৩/৩-৪]

قَوْلُهُ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ : অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে উপরিউক্ত ব্যাপক আইনের খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ যেসব জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بَهِيْمَةٌ [নির্বোধ প্রাণী] বলা হয়। কেননা মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مُبْهَمٌ তথা দুর্বোধ্য থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন, সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بَهِيْمَةٌ বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নেই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হলো এই যে, কোনো প্রাণী মূলত বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোনো বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে স্তরের পার্থক্য অবশ্যই আছে। এগুলোর মধ্যে ততটুকু বুদ্ধি নেই, যতটুকু মানুষের মধ্যে আছে। এ কারণেই মানুষ বিভিন্ন বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট হয়েছে, কিন্তু জন্তুরা আদিষ্ট হয়নি। অবশ্য নিজ নিজ প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জন্তু, এমন কি বৃক্ষ এবং প্রস্তরকেও বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার গুণগান করে। বলা হয়েছে- وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ ; বুদ্ধি না থাকলে এগুলো স্বীয় সৃষ্টিকর্তার পরিচয় কিভাবে লাভ করতো এবং কেমন করেই বা তাঁর পবিত্রতা জপ করতো?

ইমাম শা'রানীর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, বুদ্ধিহীনতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জীব-জন্তুর কাছে অস্পষ্ট থাকে বলেই এগুলোকে بَهِيْمَةٌ বলা হয় না; বরং এর কারণ এই যে, তাদের ভাষা মানুষ বুঝে না। তাদের কথা মানুষের কাছে অস্পষ্ট। মোটকথা, প্রত্যেক প্রাণীকেই بَهِيْمَةٌ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

اَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- পালিত জন্তু। যেমন- উট, গরু, মহিলা, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে اَنْعَامٌ বলা হয়। بَهِيْمَةٌ শব্দের ব্যাপকতাকে اَنْعَامٌ শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, আট প্রকার গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عُقُوْدٌ শব্দ প্রয়োগ করে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল সেই অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দাদের কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উট, চাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরিয়তের নিয়ম অনুয়ায়ী তোমরা এগুলোকে জবাই করে খেতে পার।

তোমরা আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশটি যথাযথ সীমার ভেতরে রেখে মেনে চল। অগ্নি-উপাসক ও মূর্তিপূজারীদের মতো সর্বাবস্থায় এসব জন্তুকে জবাই করা হারাম মনে করো না। এতে খোদায়ী প্রজ্ঞায় আপত্তি এবং খোদায়ী নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। অপরদিকে অন্যান্য মাংসভোজী সম্প্রদায়ের মতো বল্গাহীনভাবে যে কোনো জন্তুকে আহার্যে পরিণত করো না; বরং আল্লাহপ্রদত্ত আইন অনুযায়ী হালাল জন্তুসমূহের গোশত ভক্ষণ কর এবং হারাম জন্তু থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই বিশ্বজগতের স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেক জন্তুর স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য এবং ভক্ষণকারী মানুষের মধ্যে তার সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তুকেই মানুষের জন্য হালাল করেছেন, যা খেলে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য ও আত্মিক চরিত্রের উপর কোনোরূপ মন্দ প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। তিনি নোংরা ও অপবিত্র জন্তুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ এগুলো মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক অপকারী অথবা এতে মানব চরিত্র বিনষ্ট হয়। এ কারণেই ব্যাপক নির্দেশ থেকে কিছু জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে।

প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে- اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ সেসব জন্তু ছাড়া, যেগুলোর অবৈধতা কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন মৃত জন্তু, শূকর ইত্যাদি। দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হচ্ছে- غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ চারপেয়ে জন্তু ও বনের শিকার তোমাদের জন্য হালাল। কিন্তু তোমরা যখন হজ অথবা ওমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাক, তখন শিকার করা অপরাধ ও গুনাহ। -[মা'আরিফুল কুরআন -৩/৫-৬]

قَوْلُهُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : অর্থাৎ সেসব জন্তু ছাড়া, যেগুলোর অবৈধতা কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন- মৃত জন্তু, শূকর ইত্যাদি।

قَوْلُهُ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ : ইহরাম অবস্থায় শিকার : অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুও শিকার করা ইহরাম অবস্থায় হালাল নয়। اَلصَّيْدُ অর্থাৎ শিকার শব্দটির অর্থ হলো, ঐ সমস্ত জন্তু শিকার করা, যাদের গোশত খাওয়া হালাল। "এ স্থানে শিকার শব্দ দ্বারা ঐ প্রাণী শিকার করার অর্থ নেওয়া হয়েছে, যাদের গোশত খাওয়া বৈধ" [রাগিব]। এছাড়া সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক প্রাণীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর এদের মেরে ফেলাতে তা 'শিকার' পর্যায়ভুক্ত হবে না। صَيْد শব্দে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, শিকার ঐ সব জন্তুকে ধরা, যারা নিরীহ চতুষ্পদ বিশিষ্ট এবং যাদের ধরতে কোনোরূপ হিলা-বাহানার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত গৃহপালিত জন্তু- ভেড়া, বকরি, গাভী, উট ইত্যাদি যা শিকার করা হয় না; বরং প্রত্যেহ তাদেরকে ধরে জবাই করে খাওয়া হয় ; এদের জবাই করাতে কোনো দোষ নেই। অর্থাৎ যা 'শিকার' করা হবে, তা ইহরামমুক্ত অবস্থায়ও শিকার করা হালাল, আর যা 'শিকার' পর্যায়ের নয় তা ইহরামমুক্ত বা ইহরামযুক্ত উভয় অবস্থাতেই মারা বৈধ। -[কুরতুবী]

وَاَنْتُمْ حُرُمٌ অর্থাৎ যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে না, হরম শরীফের সীমানার মধ্যে থাকবে না। চাই ইহরাম থাকুক বা না থাকুক। নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ হলো শিকারযোগ্য জন্তুর হরম শরীফের সীমানার মধ্যে অবস্থান করা।

-[তাফসীরে মাজেদী : পৃ. ৪৬৬, টীকা ৪]

ইহরাম অবস্থায় কেবল **স্থলের প্রাণী শিকার করা নিষেধ, জলজ প্রাণী শিকারের অনুমতি আছে। ইহরাম অবস্থায়** সম্মান রক্ষার যখন এতটা গুরুত্ব যে, এ **অবস্থায় শিকার করা নিষেধ, তখন হারাম শরীফের রক্ষার গুরুত্ব** যে আরো কত বেশি হবে, তা বলাই বাহুল্য। **কাজেই ইহরাম অবস্থা হোক আর নাই হোক সর্বাবস্থায়** হারাম শরীফে প্রাণী শিকার করা হারাম। لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ **দ্বারা এটাই** বোঝা যায়। -[তাফসীরে উসমানী পৃ. ৪৮৪, টীকা-৪]

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ : হুকুম দানের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ : যেই মহান আল্লাহ সমগ্র মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আপন প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাদের মাঝে স্তর বিন্যাস করছেন, প্রত্যেক স্তরের মাঝে তার যোগ্যতা অনুসারে পৃথক বৈশিষ্ট্য ও শক্তি নিহিত রেখেছেন এবং জীবন মৃত্যুর বিচিত্র ধরণ-ধারণা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, নিশ্চয় সেই মহান আল্লাহরই এ ইখতিয়ার আছে যে, তিনি নিজ অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নিরঙ্কুশ শক্তি অনুযায়ী সৃষ্টি নিচয়ের যাকে যার জন্য এবং যে অবস্থায় ইচ্ছা হালাল বা হারাম করবেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْاَلُوْنَ তাঁর কাজ সম্পর্কে **প্রশ্ন** তোলার **অধিকার কারো নেই, কিন্তু সকলেরই কাজের কৈফিয়ত চাওয়ার ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।**

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৫]

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। তা মেনে চলতে কারো টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এতে সম্ভবত এ রহস্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে কিছু সংখ্যক জন্তু জবাই করে খাওয়ার অনুমতি প্রদান অন্যায় নয়। যে প্রভু এসব প্রাণী সৃজন করেছেন তিনিই পূর্ণ জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে এ আইন রচনা করেছেন। তিনিই কতিপয় নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের খাদ্য করেছেন। মাটি বৃক্ষ ও তরুলতার খাদ্য, বৃক্ষ জীব-জন্তুর খাদ্য এবং জীব-জন্তু মানুষের আহার্য মানুষের চাইতে সেরা জীব পৃথিবীতে নেই। কাজেই মানুষ কারো খাদ্য হতে পারে না।

-[মা'আরিফুল কুরআন খ.৩, পৃ. ৬]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ : যোগসূত্র : সূরা মায়িদার প্রথম আয়াতে চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত হালাল ও হারাম মেনে চলা সম্পর্কিত। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে এ অঙ্গীকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দফা বর্ণিত হচ্ছে। যথা- ১. আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং অসম্মান প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। ২. স্বজন ও ভিন্নজন, **শত্রু ও মিত্র সবার সাথে** ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করা এবং অন্যায়ের প্রত্যুত্তর করার নিষেধাজ্ঞা। -[মা'আরিফুল কুরআন খ.৩, পৃ. ৬]

শানে নুযুল : কয়েকটি ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের হেতু। প্রথমে ঘটনাগুলো জেনে নেওয়া দরকার, যাতে আয়াতের বিষয়বস্তু পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হোদায়বিয়ার ঘটনা। এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের ষষ্ঠ বছরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে ওমরা পালন করতে মনস্থ করেন। সেমতে তিনি সহস্রাধিক ভক্ত সমভিব্যাহারে ওমরার ইহরাম বেঁধে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মক্কার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তিনি মক্কাবাসীদের সংবাদ দেন যে, আমরা কোনোরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু ওমরা পালন করার জন্য আগমন করেছি। আমাদের মক্কা প্রবেশের অনুমতি দাও। মক্কার মুশরিকরা অনুমতি প্রদানে সম্মত হলো না এবং কঠোর ও কড়া শর্তাবলির অধীনে এরূপ চুক্তি সম্পাদন করলো যে, আপাতত সবাই ইহরাম খুলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে। আগামী বছর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আগমন করবে এবং মাত্র তিনদিন অবস্থান করে ওমরা পালন করে মক্কা ত্যাগ করবে। এ ছাড়া আরো এমন কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, যা মেনে নেওয়া বাহ্যত মুসলমানদের ভাবমূর্তি ও আত্মসম্মানের পরিপন্থি ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে সবাই মদীনায় ফিরে গেলন। অতঃপর সপ্তম হিজরির যিলকদ মাসে পুনরায় চুক্তির শর্তাবলির অধীনে এ ওমরা করা হয়। মোটকথা, হোদায়বিয়ার ঘটনা এবং উপরিউক্ত অবমাননাকর শর্তাবলি সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে মক্কার মুশরিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কার মুশরিক হাতীম ইবনে হিন্দ পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনায় আগমন করে। পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার পর সে সঙ্গী লোকজন ও জিনিসপত্র মদীনার বাইরে রেখে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং কপটতার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করে। তার উদ্দেশ্যে ছিল যাতে মুসলমানরা তার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না করে। কিন্তু তার আসার আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের বলে দিয়েছিলেন যে, আজ আমার কাছে এক ব্যক্তি আসবে। সে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে। হাতীম ফিরে যাবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি কুফর নিয়ে এসেছিল এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ফিরে গেছে। সে দরবার থেকে বের হয়ে হয়ে সোজা মদীনার বাইরে পৌঁছল এবং মদীনাবাসীদের বিচরণরত উট-ছাগল হাঁকিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সাহাবায়ে কেরাম এ সংবাদ অবগত হয়ে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন, কিন্তু ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে চলে যায়। এরপর হিজরতের সপ্তম বছরে যখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ওমরার কাযা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তখন দূর থেকে 'লাব্বাইকা' ধ্বনি শুনে দেখলেন, সেই হাতীম ইবনে হিন্দ মদীনাবাসীদের কাছ থেকে চোরাই করা জন্তু জানোয়ার নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছে। তখন সাহাবায়ে কেরামের মনে ইচ্ছা জাগে আক্রমণ করে তার কাছ থেকে জন্তু-জানোয়ারগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এর ভবলীলা এখানেই সাঙ্গ করে দেওয়ার।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, অষ্টম হিজরির রমজান মাসে মক্কা মুকাররমা বিজিত হয় এবং প্রায় সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মুশরিকদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণ ছাড়াই মুক্ত করে দেন। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আপন কাজ করতে থাকে। এমন কি, জাহেলিয়াত যুগের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হজ ও ওমরা পালন করতে থাকে। এ সময় সাহাবায়ে কেরামের মনে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনা জাগরিত হয়। তাঁরা ভাবতে থাকেন, এরা সম্পূর্ণ বৈধ ও সত্য পন্থায় ওমরা পালন করতে আমাদের বাধাদান করেছিল, আমরা তাদের অবৈধ ও ভ্রান্ত পন্থায় ওমরা ও হজ্জ পালনের সুযোগ দেব কেন? আমরা তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের জানোয়ার কেড়ে নেব এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেব।

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) ইকরিমা ও সুদ্দীর বর্ণনার মাধ্যমে এসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন তোমাদের নিজ দায়িত্ব। কোনো শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে এ দায়িত্বে ত্রুটি করার অনুমতি নেই। নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহও বৈধ নয়। কুরবানির জন্তুকে হেরেমে পৌঁছতে না দেওয়া অথবা ছিনিয়ে নেওয়াও জায়েজ নয়। সেসব মুশরিক ইহরাম বেঁধে নিজ ধারণা অনুযায়ী আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, যদিও কুফরের কারণে তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, তথাপি আল্লাহর নিদর্শনাবলির সংরক্ষণ ও এগুলোর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের বাধা দান করা যাবে না। এছাড়া, যারা ওমরা করতে তোমাদের বাধা দিয়েছিল, তাদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে তাদের মক্কা প্রবেশ অথবা হজ্জব্রত পালনে বাধাদান করা বৈধ হবে না। কেননা, এভাবে তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে তোমাদের পক্ষ থেকেও অন্যায় হয়ে যাবে। আর এটা ইসলামে বৈধ নয়।

–[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৭,৮,৯]

قَوْلُهُ لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ : "হে মুমিনগণ! অবমাননা করো না আল্লাহ তা'আলার [ধর্মীয়] নিদর্শনাবলির" [অর্থাৎ যেসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে আল্লাহ তা'আলা কিছু নির্দেশ করেছেন, সেসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তৎপ্রতি বে-আদবী করো না। উদাহরণত হেরেম ও ইহরামের আদব এই যে, এতে শিকার করতে পারবে না। অতএব, শিকার করা বে-আদবী ও হারাম হবে]। এবং সম্মানিত মাসসমূহের [অবমানা করো না। অর্থাৎ এসব মাসে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না।] এবং হেরেমে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জন্তুর [অবমাননা করো না। অর্থাৎ এগুলোকে ছিনিয়ে নিও না] এবং ঐসব জন্তুর [অবমাননা করো না] যেগুলোর [গলায় এরূপ চিহ্নিতকরণের জন্য] কণ্ঠাভরণ রয়েছে [যে, এগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত; হেরেম শরীফে জবাই করা হবে] এবং ঐসব লোকের [অবমাননা করো না] যারা বায়তুল হারাম [অর্থাৎ কা'বাগৃহ] অভিমুখে যাচ্ছে এবং স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। [অর্থাৎ এসব বস্তুর আদব রক্ষার্থে কাফেরদের সাথেও ফাসাদে জড়িত হয়ো না] এবং [পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে ইহরামের আদব রক্ষার্থে শিকার হারাম করা হয়েছিল, তা শুধু ইহরাম পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নতুবা] তোমরা যখন ইহরাম থেকে বের হয়ে আস, তখন [অনুমতি আছে} শিকার কর [তবে হেরেমের অভ্যন্তরে শিকার করো না] ; এবং [পূর্বে যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তাতে] যারা [হোদায়বিয়ার বছরে] পবিত্র মসজিদ থেকে [অর্থাৎ পবিত্র মসজিদে যেতে] তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, [অর্থাৎ মক্কার কাফের সম্প্রদায়] সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে [শরিয়তের] সীমালজ্ঘনে প্রবৃত্ত না করে [অর্থাৎ তোমরা উল্লিখিত নির্দেশসমূহের যেন বিরুদ্ধাচরণ না করে বস] এবং সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর [উদাহরণত উল্লিখিত নির্দেশসমূহের ক্ষেত্রে অপরকেও উৎসাহিত কর] এবং পাপ ও সীমালজ্ঘনে একে অন্যের সহায়তা করো না। [উদাহরণত কেউ উল্লিখিত নির্দেশসমূহের বিরোধিতা করলে তোমরা তার সাহায্য করো না]। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর [এতে বিধি-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়ে যায়]। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা [নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে কঠোর শাস্তিদাতা।

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ : অর্থাৎ হে মুমিনগণ! আল্লাহর নিদর্শনাবলির অবমাননা করো না। এখানে شَعَائِرَ শব্দটি شَعِيْرَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ– চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شَعَائِرِ اِسْلَامْ তথা ইসলামের 'নিদর্শনাবলি' বলা হয়। যেমন নামাজ, আজান, হজ সুন্নতি দাড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহর নিদর্শনাবলির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী ও আতা (র.) থেকে বর্ণিত বাহরে মুহীত ও রূহুল মা'আনী গ্রন্থে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস (র.) এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই, আল্লাহর নিদর্শনাবলির অর্থ হলো– সব শরিয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজিব, ফরজ ও এগুলোর সীমা। আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর নিদর্শনালির অবমাননা করো না। আল্লাহর নিদর্শনাবলির এক অবমাননা এই যে, মূলতই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়ত এই যে, এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়ত এই যে, নির্ধারিত সীমালজ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে– وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের আল্লাহ-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১০]

قَوْلُهُ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ : বছরের মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত : সম্মানিত মাস চারটি। যেমন ইরশাদ হয়েছে– مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ [৯:৩৬]। যুলকা'দা, যুলহিজ্জা; মুহাররম ও রজব। এর সম্মান রক্ষার অর্থ এ সময় অন্যান্য মাস অপেক্ষা বেশি সৎকাজ ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং অন্যায় অপকার্য হতে বিরত থাকার চেষ্টা করা। বিশেষত হাজীদেরকে কষ্ট ক্লেশ দিয়ে হজ আদায়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। এসব কাজ বছরের সব মাসেই জরুরি। তবে এ মাসগুলোতে এর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাকি এ সময়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান করা যাবে কিনা? এ সম্পর্কে অধিকাংশ আলেম এবং ইবনে জারীরের বর্ণনা মতে তো সর্বাবাদীসম্মত রায় হলো এ মাসগুলোতে তা নিষিদ্ধ নয়। সূরা তাওবায় ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আসবে। –[তাফসীরে উসমানী, টীকা-৭]

قَوْلُهُ الْهَدْىَ : অর্থাৎ কুরবানির পশু। কিন্তু এ শব্দটি ঐ কুরবানির পশুর জন্য খাস, যা কা'বায় প্রেরিত হয়;

اَلْهَدْىُ مُخْتَصٌّ بِمَا يُهْدٰى اِلَى الْبَيْتِ (رَاغِبْ)

قَوْلُهُ الْقَلَائِدَ : قَلَائِدُ শব্দটি قَلَادَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হার বা পট্টি, যা কুরবানির জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্ন স্বরূপ বেঁধে দেওয়া হতো, যাতে কুরবানির পশুরূপে সবাই চিনতে পারে এবং তার ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকে। সেই সাথে যারা দেখবে, তাদের মনে অনুরূপ কার্যের আগ্রহ সৃষ্টি করাও এর উদ্দেশ্য। কুরআন মাজীদ এ সবের সম্মান ও মর্যাদা বহাল রেখেছে এবং হাদী [কুরবানির জন্য প্রেরিত পশু] বা তার চিহ্নাদির অবমাননা নিষিদ্ধ করেছে। -[তাফসীরে উসমানী টীকা : ৮]

قَوْلُهُ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ : *দৃশ্যত এটা মুসলিমগণের বৈশিষ্ট্য। কাজেই কোনো নিষ্ঠাবান মুসলিম হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে* রওয়ানা হলে তাকে সম্মান কর। তার পথে বাধার সৃষ্টি করো না। মুশরিকরাও নিজেদের ধারণা মতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় বায়তুল্লাহর হজ আদায় করতে আসত। সে হিসেবে এ আয়াতের ব্যাপকতায় তারাও শামিল হয়ে থাকে তবে বলতে হবে এটা ইসলামের প্রথম দিকের কথা। পরবর্তীকালে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে- إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا অর্থাৎ মুশরিকরা তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে। -[তাফসীরে উসমানী পৃ.৯]

قَوْلُهُ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا : অর্থাৎ প্রথম আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকার করতে পারবে। -[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১১]

فَاصْطَادُوْا শব্দটি أَمْر বা নির্দেশসূচক। কিন্তু অপরিহার্য অর্থ নয়; বরং এর অর্থ অনুমতি মাত্র। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় এখন তোমাদের জন্য শিকার করায় দোষ নেই নিষেধাজ্ঞা না থাকায় নির্দেশ মুবাহ হয়ে গেছে। -[রূহুল মা'আনী] নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বৈধ করা হয়েছে। -[জাসসাস] তাদের থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় শিকার করা মুবাহ পর্যায়ের হয়েছে। -[মাদারিক] **অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় তোমাদের জন্য যে শিকার হারাম ছিল, এমন আমি তা তোমাদের জন্য মুবাহ করে দিলাম।** -[ইবনে কাসীর]। **মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, একটি মুবাহ কাজের জন্য নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহার হওয়ায় বোঝা যায় যে, মুবাহ কাজটি পরিত্যাগ করলে তা নিষিদ্ধ বলে মনে হয়, সে মুবাহ কাজটি সম্পন্ন করা কাম্য।** আর এর দ্বারা শরিয়তের ব্যাপারে যারা কঠোরতা আরোপ করেন, তাদের ভ্রান্তি উন্মোচিত করার মতো কঠোরতা আরোপ করে। -[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৪৩৮, টীকা ৭]

قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ : কোনো অবস্থাতেই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না : পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সকল নিদর্শনকে সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছেন হিজরি ৬ সালে মক্কায় মুশরিকরা সে সবগুলোর অমর্যাদা করেছিল। যুল ক'দাহ মাসে প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ প্রিয়নবী ﷺ ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ হতে রওয়ানা হন। তাঁরা হুদাইবিয়া পর্যন্ত পৌছলে মুশরিকরা তাঁদেরকে এ ধর্মীয় কার্য পালনে বাধা দেয়। তাঁরা ইহরামের অবস্থা, পবিত্র কা'বার মর্যাদা, পবিত্র মাস কুরবানির পশু ও তার বিশেষ চিহ্ন [কিলাদা] কোনো কিছুর প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করেনি। মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির এ অবমাননা ও দীনি কার্য সম্পাদনে বাধা দানের কারণে এরূপ জালিম ও বর্বর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলিমগণ যে পরিমাণই ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রদর্শন করত তা ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় উত্তাপিত হয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের অবকাশ ছিল। কিন্তু ইসলামের ভালোবাসা ও শত্রুতা উভয়ই 'ন্যায়-নিক্তি'তে পরিমিত। কুরআন মাজীদ এরূপ জালিম ও স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়ের মুকাবিলার ক্ষেত্রে নিজ আবেগ উত্তেজনা সংযত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। ভালোবাসা ও শত্রুতার আতিশয্যে মানুষ সাধারণত সীমালঙ্ঘন করে বসে। তাই বলা হয়েছে, শত্রুতা যতই প্রচণ্ডতর হোক তার কারণে তোমরা যেন সীমলঙ্ঘন না করে ফেল এবং ন্যায়-নীতি বিসর্জন না দাও। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১]

قَوْلُهُ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কুরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি

হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা ব্যবস্থাপনা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্য শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরি করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোনো মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো-লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যই জরুরি নয়, মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরেই এ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী; বরং এরপরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ঈসালে ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ তা'আলার স্বীয় অসম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ সামর্থ্য দ্বারা বিশ্বচরাচরের জন্য এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্য যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্য দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকদের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো। এমতাবস্থায় সাহায্য সহযোগিতার দশাও তাই হতো; যা এ জগতে সাধারণত নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্ম বন্টন কোনো সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারাবিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। তারা সে কারবারকেই নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য করে নিয়েছে।

যদি কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো সরকার কর্ম বন্টন করতো এবং কোনো দলকে ছুতারের কাজের জন্য, কাউকে কর্মকারের কাজের জন্য, কাউকে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য, কাউকে পানির জন্য এবং কাউকে খাদ্য সরবরাহের জন্য নিযুক্ত করতো, তবে কোন ব্যক্তি এ নির্দেশ পালনের জন্য দিনের শান্তি ও রাতের নিদ্রা নষ্ট করতে সম্মত হতো?

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানবকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার অন্তরে সে কাজের আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত করে দিয়েছেন। ফলে সে কোনোরূপ আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সে কাজকেই জীবনের একমাত্র করণীয় কাজ বলে মনে করে। এর দ্বারাই সে জীবিকা অর্জন করে। এ অটুট ব্যবস্থার ফলশ্রুতি এই যে, মানুষের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র কয়েকটি টাকা খরচ করলেই অনায়াসে অর্জিত হয়ে যায়। রাঁধা খাদ্য, সেলাই করা পোশাক, নির্মাণ করা আসবাবপত্র তৈরি করা গৃহ ইত্যাদি সবকিছু একজন মানুষ কিছু পয়সা ব্যয় করেই অর্জন করতে পারে। এ ব্যবস্থা না থাকলে একজন কোটিপতি মানুষ সমস্ত সম্পদ লুটিয়ে দিয়েও একদানা শস্য অর্জন করতে পারতো না। আপনি হোটেলে অবস্থান করে যে বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে– তার আটা আমেরিকার, ঘি পাঞ্জাবের, গোশত সিন্ধু প্রদেশের মসলা বিভিন্ন দেশের, থালা-বাসন ও আসবাবপত্র বিভিন্ন দেশের, খেদমতগার বেয়ারা-বাবুর্চি বিভিন্ন শহরের। তারা সবাই আপনার সেবায় নিয়োজিত। যে লোকমাটি [গ্রাস] আপনার মুখে পৌঁছে, তাতে লাখো যন্ত্রপাতি, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ কাজ করেছে। এর পরেই তা আপনার মুখরোচক হতে পেরেছে। আপনি ভোরবেলায় ঘর থেকে বের হন। তিন চার মাইল দূরে যেতে হবে– আপনার এতটুকু শক্তি অথবা সময় নেই। আপনি নিকটবর্তী কোনো স্থানে ট্যাক্সি, রিকশা অথবা বাস দাঁড়ানো দেখতে পাবেন, যার লোহা অস্ট্রেলিয়ার, কাঠ বার্মার,

যন্ত্রপাতি আমেরিকার, ড্রাইভার সীমান্ত প্রদেশের এবং কণ্ডাকটর যুক্ত প্রদেশের। চিন্তা করুন, এ কোন কোন জায়গার সাজ-সরাম, কোন কোন জায়গার মানুষ আপনার সেবার জন্য দণ্ডায়মান! আপনি কয়েকটি পয়সা দিয়ে তাদের সবার খেদমত হাসিল করতে পারেন। কোন সরকার তাদের বাধ্য করেছে এবং কোনো ব্যক্তি আপনার জন্য এগুলো সরবরাহ করতে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে? বলা বাহুল্য, এগুলো আল্লাহর ব্যবস্থারই ফল। অন্তরের মালিক আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে এ আইন জারি করে দিয়েছেন।

আজকাল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে আল্লাহর এ ব্যবস্থা পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে কি করবে? তা নির্ধারণ করা সরকারের দায়িত্ব। এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মানবীয় স্বাধীনতা হরণ করতে হয়েছে। ফলে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে এবং হাজারো মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। অবশিষ্ট মানুষগুলোকে কঠিন উৎপীড়ন ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে মেশিনের কলকব্জার মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে কোনো জায়গায় কোনো বস্তুর উৎপাদন বেড়ে গেলেও তা মানুষের মানবতা ধ্বংস করেই বেড়েছে। অতএব, সওদাটি যে সস্তা নয়, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থায় একদিকে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং অপরদিকে আল্লাহর বণ্টনের কারণে বিশেষ বিশেষ কাজ করতে বাধ্যও। এ বাধ্যবাধকতা যেহেতু স্বভাবজাত, এ কারণে কেউ একে জোর-জবরদস্তি মনে করতে পারে না। কঠোরতর পরিশ্রম এবং নিকৃষ্টতম কাজের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার এবং চেষ্টা সহকারে তা অর্জন করার লোক সর্বত্র ও সর্বকালে পাওয়া যায়। কোনো সরকার যদি তাদের এ কাজে বাধ্য করা শুরু করে, তবে তারা পালাতে থাকবে। মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন দিকও রয়েছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্য পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাপনাকে তছনছও করে দিতে পারে।

এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি, যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালোমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভবও ছিল না। এখন অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা স্বীয় হেফাজতের জন্য বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে, যাতে এক দল অথবা এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বণ্টন : আব্দুল করীম শাহরাস্তানী প্রণীত 'মিলাল ওয়ান নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে: প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশি ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে: প্রাচ্য, পশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর। প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে করতো থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এইভাবে যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ-গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এবং বংশ গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনূ হাশেম এক জাতি, বনূ তামীম অন্য জাতি এবং বনূ খোযাআহ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো! হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চ জাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যদের রক্তধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা এবং বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে দাঁড় করে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমন কি, মুসলমানরা ও এ জাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধির বিভাগই নয়, বরং তাদের মধ্যের ভাগফলকেও ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাযী, নজদী

এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারি কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয় ও কুরআনী শিক্ষা : কুরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নিসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, "তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোনো আরবের অনারবের উপর অথবা কোনো শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আল্লাহ-ভীতি ও আল্লাহ আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কুরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই] ঘোষণা করে আবিসিনিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচু জাতের মানুষকে কুরাইশী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে , তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের পরিবারিক সম্পর্ককে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও সুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

"হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবশা থেকে এবং সুহায়েব রোম থেকে এলেন, অথচ মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবূ জাহল, এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার!" এমন কি, কুরআন পাক ঘোষণা করেছে– خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছ; কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হুনাইনের যুদ্ধে কুরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারি নিচে এসে গিয়েছিল। বদর, ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলি এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার এই যুক্তিসঙ্গত ও বিশুদ্ধ মূলনীতিই কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ব্যক্ত করেছে– تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিতে পরস্পরে সহযোগিতা কর, পাপকর্মও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না।

চিন্তা করুন, উল্লিখিত আয়াতে কুরআন পাক একথা বলেনি যে, মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা কর এবং অন্যের করো না; বরং মুসলমানের সহযোগিতার যে আসল ভিত্তি অর্থাৎ সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতি তাকেই সহযোগিতার বুনিয়াদ করা হয়ছে।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায়কার্যে তারও সাহায্য করো না; বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা প্রকৃতপক্ষে এটাই তার প্রতি যথাযথ বিশুদ্ধ সাহায্য, যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا তাঁরা বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য করার অর্থ তো আমরা বুঝি, কিন্তু অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করার অর্থ কি? তিনি বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখ। এটাই তাকে সাহায্য করা।

কুরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও আল্লাহ-ভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছেন। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার-উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بِرٌّ ও تَقْوٰى দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بِرٌّ শব্দের অর্থ– সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে فِعْلُ الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ সৎকর্ম এবং تَقْوٰى শব্দের অর্থ– تَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ অর্থাৎ মন্দ কাজ বর্জন। إِثْمٌ শব্দের অর্থ– যে কোনো পাপকর্ম, অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদত সম্পর্কিত। عُدْوَانٌ শব্দের অর্থ– সীমালঙ্ঘন করা। এখানে এর অর্থ হচ্ছে– অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে সাহায্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

সহীহ বুখারীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানায়, তার আহ্বানে যত লোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎ কর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহ্বানে যত লোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গুনাহ তারও হবে। এতে তাদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে কাসীর (র.) বর্ণিত তাবারানীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকরি ও পদ গ্রহণ করা হতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রূহুল মা'আনীতে فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন ডাক দেওয়া হবে, অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্র করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কুরআন ও সুন্নাহর এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে খাড়া করে দিয়েছিল এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা আল্লাহ-ভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞানোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোনো দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্য জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহবান-প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলন হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে بِرّ ও تَقْوٰى তথা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اِثْم ও عُدْوَانٌ তথা পাপ এবং অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সব দেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোজ রোজ বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য, এর কারণ, দু'টি। যথা-

১. প্রচলিত সরকারগুলো কুরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে, ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে تَقْوٰى ও بِرّ অর্থাৎ সৎ কর্ম ও আল্লাহ-ভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করে, যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ! তারা যদি একবারও পরীক্ষামূলকভাবে হলেও এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং আল্লাহর কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি, আরাম আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

২. জনগণ মনে করে দিয়েছে যে, অপরাধপ্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়; বরং অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কুরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ -এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১২-১৮]

٣. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ اَىْ اَكْلُهَا وَالدَّمُ اَيِ
الْمَسْفُوْحُ كَمَا فِى الْاَنْعَامِ وَلَحْمُ
الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ بِاَنْ ذُبِحَ
عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ الْمَيْتَةُ
خَنِقًا وَالْمَوْقُوْذَةُ الْمَقْتُوْلَةُ ضَرْبًا
وَالْمُتَرَدِّيَةُ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ اِلٰى سِفْلٍ
فَمَاتَتْ وَالنَّطِيْحَةُ الْمَقْتُوْلَةُ بِنَطْحِ
اُخْرٰى لَهَا وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ اِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ اَىْ اَدْرَكْتُمْ فِيْهِ الرُّوْحَ مِنْ هٰذِهِ
الْاَشْيَاءِ فَذَبَحْتُمُوْهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى اِسْمِ
النُّصُبِ جَمْعُ نِصَابٍ وَهِىَ الْاَصْنَامُ وَاَنْ
تَسْتَقْسِمُوْا تَطْلُبُوا الْقِسْمَ وَالْحُكْمَ
بِالْاَزْلَامِ ط جَمْعُ زَلَمٍ بِفَتْحِ الزَّاىِ وَضَمِّهَا
مَعَ فَتْحِ اللَّامِ قِدْحٌ بِكَسْرِ الْقَافِ سَهْمٌ
صَغِيْرٌ لَا رِيْشَ لَهٗ وَلَا نَصْلَ وَكَانَتْ
سَبْعَةً عِنْدَ سَادِنِ الْكَعْبَةِ عَلَيْهَا اِعْلَامٌ
وَكَانُوْا يُجِيْبُوْنَهَا فَاِنْ اَمَرَتْهُمْ اِيْتَمَرُوْا
وَاِنْ نَهَتْهُمْ اِنْتَهَوْا ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط خُرُوْجٌ
عَنِ الطَّاعَةِ وَنَزَلَ بِعَرَفَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ اَنْ
تَرْتَدُّوْا عَنْهُ بَعْدَ طَمَعِهِمْ فِىْ ذٰلِكَ لَمَّا
رَاَوْا مِنْ قُوَّتِهٖ .

অনুবাদ

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীবজন্তু, অর্থাৎ তা আহার করা, রক্ত অর্থাৎ বহমান রক্ত। যেমনটা সূরা আন'আমে উল্লেখ হয়েছে। শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গিকৃত পশু অর্থাৎ যা তিনি ব্যতীত অপর কিছুর নামে জবাই করা হয়েছে, [গলা চেপে মারা জন্তু] অর্থাৎ গলা টিপে যা মারা হয়েছে, আঘাতে মৃত জন্তু অর্থাৎ প্রহারে নিহত জন্তু, পতনে মৃত অর্থাৎ যা উপর হতে নীচে পড়ে মারা গিয়েছে তা, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু অর্থাৎ অপর কোনো জন্তুর শিঙ্গের আঘাতে যার মৃত্যু হয়েছে তা, হিংস্র পশুর ভক্ষণকৃত জন্তু; তবে যা তোমরা জবাই করে পবিত্র করে নিয়েছ অর্থাৎ উল্লিখিত ধরনের জন্তুসমূহের মধ্যে প্রাণ থাকতে যদি কোনোটিকে ধরতে পার আর তা জবাই করে নাও তবে তা হালাল। আর যা জবাই করা হয় মূর্তির নামে اَلنُّصُبُ : এটা نِصَابٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রতিমা। এবং ভাগ্য নির্ধারণ করা মীমাংসা ও বণ্টন অনুসন্ধান করা জুয়ার তীর দ্বারা। اَلْاَزْلَامُ : এটা زَلَمٌ -এর বহুবচন। زَلَمٌ শব্দটি ز -এ ফাতাহ বা পেশসহ এবং لَامْ -এর ফাতাহসহ পঠিত, অর্থ– قِدْحٌ ; এটা ق -এ কাসরাসহ পঠিত। অর্থাৎ ছোট তীর যাতে কোনো পাখনা ও ফাল নেই। এসবই পাপ কাজ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি অবাধ্যাচার। জাহেলী যুগে কা'বার সেবায়েতের নিকট এ ধরনের সাতটি তীর ছিল। প্রত্যেকটিতে বিশেষ চিহ্ন প্রদত্ত ছিল। এগুলোর মাধ্যমে তারা কার্য সম্পাদনের প্রয়াস পেত। যদি নির্দেশ পেত তবে তা করত, আর নিষেধ হলে তা হতে বিরত থাকত। বিদায় হজের বছর আরাফার ময়দানে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, আজ কাফেররা তোমাদের দীনের বিষয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ বহু কামনা থাকা সত্ত্বেও তারা এ ধর্মের শক্তি দর্শনে তোমাদের মুরতাদ বা বিধর্মী হয়ে যাওয়া সম্পর্কে তারা নিরাশ হয়ে গিয়েছে।

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ اَحْكَامَهُ وَفَرَائِضَهُ فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَهَا حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ بِاِكْمَالِهِ وَقِيْلَ بِدُخُوْلِ مَكَّةَ اٰمِنِيْنَ وَرَضِيْتُ اِخْتَرْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ مَجَاعَةٍ اِلٰى اَكْلِ شَيْءٍ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَاَكَلَ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ مَائِلٍ لِاِثْمٍ مَعْصِيَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُ مَا اَكَلَ رَّحِيْمٌ بِهِ فِيْ اِبَاحَتِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْمَائِلِ لِاِثْمٍ اَيِ الْمُتَلَبِّسِ بِهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيْقِ وَالْبَاغِيْ مَثَلًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْاَكْلُ ـ

সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন অর্থাৎ বিধিবিধান ও ফরজসমূহ পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম; নতুন কোনো হালাল বা হারামের বিধান নাজিল হবে না; এবং তা পূর্ণাঙ্গ করার মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। কেউ কেউ বলেন এর মর্ম হলো, নিরাপদে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দান করত তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করলাম, মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের দিকে অবাধ্যচারের প্রতি আকর্ষিত না হয়ে, না বুঝে ক্ষুধার তীব্র তাড়ানায় যা হারাম করা হয়েছে তার কিছু আহার করতে বাধ্য হলে, ফলে আহার করে ফেললে তখন নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা সে আহার করে ফেলেছে তজ্জন্য ক্ষমাশীল এবং এ ধরনের ব্যক্তির জন্য তার অনুমতি প্রদানে পরম দয়ালু পক্ষান্তরে পাপের প্রতি আকর্ষণবশত অর্থাৎ তার সাথে বিজড়িত হয়ে, যেমন সে রাহাজানিকারী বা রাষ্ট্রদ্রোহী হয় আর সে উক্ত অবস্থায় নিপতিত হয় তবে তার জন্য সেটা আহার করা বৈধ নয়।

٤. يَسْئَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ مِنَ الطَّعَامِ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ لا الْمُسْتَلَذَّاتُ وَصَيْدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ الْكَوَاسِبِ مِنَ الْكِلَابِ وَالسِّبَاعِ وَالطَّيْرِ مُكَلِّبِيْنَ حَالٌ مِنْ كَلَّبْتُ الْكَلْبَ بِالتَّشْدِيْدِ اَرْسَلْتُهُ عَلَى الصَّيْدِ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ مُكَلِّبِيْنَ اَيْ تُؤَدِّبُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ز مِنْ اٰدَابِ الصَّيْدِ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ قَتَلْنَهُ بِاَنْ لَمْ يَاْكُلْنَ مِنْهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَلَّمَةِ فَلَا يَحِلُّ صَيْدُهَا وَعَلَامَتُهَا اَنْ تَسْتَرْسِلَ اِذَا اُرْسِلَتْ وَتَنْزَجِرَ اِذَا زُجِرَتْ ـ

৪. হে মুহাম্মাদ! লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী খাদ্যবস্তু বৈধ করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভালো সুখাদ্য বস্তু এবং শিকারী পশুপাখী অর্থাৎ শিকারী কুকুর, হিংস্র জন্তু ও পাখী ইত্যাদি যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছে مُكَلِّبِيْنَ এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। তাশদীদসহ পঠিত (بَاب تَفْعِيْل) كَلَّبْتُ হতে গঠিত শব্দ। كَلَّبْتُ الْكَلْبَ অর্থ হলো কুকুরটি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলাম। যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিকার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন তাদের শিকার তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। تُعَلِّمُوْنَهُنَّ এটা مُكَلِّبِيْنَ-এর জমীর هُمْ-এর حَال ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ যেগুলোকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অনন্তর তারা যা তোমাদের জন্য ধরে রাখে তা আহার কর। অর্থাৎ যদি শিকারের কিছু না খেয়ে তোমাদের জন্য রেখে দেয় তবে তা মেরে ফেললেও তোমরা আহার করতে পার। পক্ষান্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে তৎকর্তৃক শিকার আহার করা হালাল নয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার আলামত হলো, তাকে দৌড়ালে দৌড়ে, থামালে থেমে যায়।

وَتَمْسِكُ الصَّيْدَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ وَاَقَلُّ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذٰلِكَ ثَلٰثُ مَرَّاتٍ فَاِنْ اَكَلَتْ مِنْهُ فَلَيْسَ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلٰى صَاحِبِهَا فَلَا يَحِلُّ اَكْلُهُ كَمَا فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَفِيْهِ اِنَّ صَيْدَ السَّهْمِ اِذَا اُرْسِلَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كَصَيْدِ الْمُعَلَّمِ مِنَ الْجَوَارِحِ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ص عِنْدَ اِرْسَالِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

আর শিকার করে তা শিকারীর জন্য রেখে দেয় নিজে খেয়ে ফেলে না। ন্যূনপক্ষে তিনবার যদি এরূপ করে তবে তাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। এটা যদি শিকারের কিছু খেয়ে ফেলে তবে তার জন্য [শিকারীর জন্য] সে ধরেছে বলে বিবেচ্য হবে না এবং ওটা ভক্ষণ করা তার জন্য বৈধ হবে না। সহীহাইনের [বুখারী, মুসলিমের] বর্ণনায়ও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ হয়েছে যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করে কিছু শিকার করা হলে ওটাও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তুর শিকারের মতো বৈধ। এবং প্রেরণ করার সময় এতে আল্লাহর নাম নিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর।

٥. اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ط الْمُسْتَلَذَّاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اَىْ ذَبَائِحُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى حِلٌّ حَلَالٌ لَّكُمْ ص وَطَعَامُكُمْ اِيَّاهُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ز وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ الْحَرَائِرُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ حِلٌّ لَّكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ مُتَزَوِّجِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ مُعْلِنِيْنَ بِالزِّنَا بِهِنَّ وَلَا مُتَّخِذِىْٓ اَخْدَانٍ ط اَخِلَّاءٍ مِنْهُنَّ تُسِرُّوْنَ بِالزِّنَا بِهِنَّ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ اَىْ يَرْتَدَّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ز الصَّالِحُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ اِذَا مَاتَ عَلَيْهِ .

৫. আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস সুখাদ্য বস্তু বৈধ করা হলো। যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক জবাইকৃত জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ হালাল করা হলো এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ। অর্থাৎ সেটা তাদেরকে আহার করানও বৈধ। আর বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা স্বাধীনা নারী তোমাদের জন্য বিবাহ করা বৈধ হয়েছে যদি তাদেরকে তাদের বিনিময় অর্থাৎ মোহর প্রদান কর। বিবাহের জন্য এটা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী রূপে যেন হয় ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়, প্রকাশ্যে জেনা করার জন্য নয় এবং উপপত্নী গ্রহণের এদেরকে বান্ধবীরূপে গ্রহণ অর্থাৎ এদের সাথে গোপন ব্যভিচার চালানোর জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে অর্থাৎ মুরতাদ ও বিধর্মী হয়ে গেলে তার ইতিপূর্বের সৎ কর্ম নিষ্ফল হবে। সেটা ধর্তব্য বলে বিবেচ্য হবে না এবং সেটার কোনো ছওয়াব বা পুণ্যফলও প্রদান করা হবে না। আর এ অবস্থায় যখন মারা যাবে তখন পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمَيْتَةُ : মৃত, ঐ জন্তু যা শরয়ী জবাই পদ্ধতি ব্যতীত কোনো দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়।

قَوْلُهُ اَكْلُهَا : এখানে مُضَافٌ মাহযূফ মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حِلَّتْ এবং حُرِّمَتْ -এর সম্পর্ক اِفْعَالٌ বা কর্মের সাথে হয়, জাত বা সত্তার সাথে নয়।

قَوْلُهُ اَلْمُنْخَنِقَةُ : اِسْم فَاعِلْ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ। اِنْفِعَالٌ - اِنْخِنَاقٌ/ خَنْقًا (ن) خَنَقَ শ্বাসরোধ করে মারা, গলাটিপে হত্যা করা।

قَوْلُهُ اُهِلَّ : اَلْاِهْلَالُ অর্থ- رَفْعُ الصَّوْتِ বা আওয়াজ উঁচু করা। لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ-এর মধ্যে لَامْ -টি بَاءَ بِمَعْنٰى عِنْدَ -এর অর্থে; অর্থ হলো- مَا رُفِعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ذَكَاتِهٖ بِاسْمِ غَيْرِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ اَلْمَوْقُوْذَةُ : وَقَذَ (ض) [আঘাত করা] থেকে ইসমে মাফউলের সীগাহ। অর্থ- আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত।

قَوْلُهُ اَلْمُتَرَدِّيَةُ : تَرَدّٰى (تَفَعُّلٌ) [নীচে পড়া, পতিত হওয়া] থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ। অর্থ- উপর থেকে পড়ে মৃত জন্তু।

قَوْلُهُ اَلنَّطِيْحَةُ : فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে صِيْغَةَ صِفَتْ ইসমে মাফউল তথা مَنْطُوْحَةٌ -এর অর্থে। نَطَحَ (ف،ن) نَطْحًا -এর বকরি যা অন্যের শিঙ -এর আঘাতে মারা গেছে। অভিধানবিদদের কেউ কেউ বিশেষভাবে বকরির কথা বলেন না। অর্থাৎ যে কোনো জন্তু, যা অন্য জন্তুর শিঙের আঘাতে মারা গেছে।

প্রশ্ন: نَطِيْحَةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওযনে এসেছে। আর فَعِيْلَةٌ -এর ওযনে مُذَكَّرْ وَ مُؤَنَّثْ উভয়টি একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে تَاء-এর প্রয়োজন ছিল না।

উত্তর. نَطِيْحَة -এর تَاء -টি اِنْتِقَالٌ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ اِلَى الْاِسْمِيَّةِ -এর জন্য; تَانِيْث -এর জন্য নয়। যেমনটি ذَبِيْحَة -এর মধ্যে রয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْهُ : এখানে مِنْهُ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। **প্রশ্ন.** فَاَكَلَ السَّبُعُ -এর মর্ম হলো, যাকে হিংস্রপ্রাণী ভক্ষণ করেছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, হিংস্রপ্রাণী যা খেয়ে ফেলেছে তা তো নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর শেষ হয়ে যাওয়া বস্তুর সাথে বৈধ-অবৈধ হুকুমের কী সম্পর্ক?

উত্তর : মুসান্নিফ (রা.) এখানে مِنْهُ উল্লেখ করে সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, যে প্রাণীর কিছু অংশ হিংস্রপ্রাণী খেয়ে ফেলেছে, যার কারণে প্রাণীটি মারা গেছে, তা খাওয়া হালাল নয়।

قَوْلُهُ اَلْمُتَرَدِّيَةُ : পতনে মৃত জন্তু। চাই তা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যাক বা কূপের মধ্যে পড়ে মারা যাক।

قَوْلُهُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ : এটি اَلْمُنْخَنِقَةُ এবং তার পরবর্তী বিষয় থেকে اِسْتِثْنَاء হয়েছে; ذَكَاة অর্থ হলো, জবাই করা।

قَوْلُهُ عَلٰى اِسْمِ النُّصُبِ : প্রশ্ন. اِسْم শব্দটি বৃদ্ধি করায় লাভ বা উপকারিতা কী?

উত্তর. এখানে اِسْم শব্দটি বৃদ্ধি করায় লাভ হলো, যাতে ذَبْح -এর صِلَه হিসেবে عَلٰى আসাটা শুদ্ধ হয়।

قَوْلُهُ رَضِيْتُ : এটি অবস্থার বিবরণ (بَيَان حَالٌ) -এর জন্য جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য। এর আতফ اَكْمَلْتُ -এর সাথে নয়। কেননা, তখন এটা আবশ্যক হবে যে, ইসলামের ব্যাপারে ধর্ম হিসেবে আজ রাজি হয়েছেন, পূর্বে রাজি ছিলেন না। অথচ ইসলাম পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ধর্ম এবং সকল নবীর দীন ছিল এ ইসলাম। رَضِيْتُ শব্দটি مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْلٌ আর তাহলে اَلْاِسْلَامَ আর دِيْنًا হলো তামীয।

قَوْلُهُ اِخْتَرْتُ : কেউ কেউ বলেছেন, رَضِيْتُ অর্থ হলো اِخْتَرْتُ যা দু'টি মাফউলের দিকে مُتَعَدِّىْ হয়। আর প্রথম মাফউল হলো اَلْاِسْلَامَ এবং দ্বিতীয় মাফউল হলো دِيْنًا সুতরাং এ সূরতে دِيْنًا -কে حَالٌ বা تَمْيِيْز আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।

قَوْلُهُ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ : مُتَجَانِفٍ শব্দটি بَاب تَفَاعُلٌ থেকে إِسْم فَاعِلٌ-এর সীগাহ্। অর্থ মন্দের প্রতি ধাবমান **ہٗ**, সত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। غَيْرَ শব্দটি حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ مَخْمَصَةٍ : এমন ক্ষুধা যাতে পেট লেগে যায়।

قَوْلُهُ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ : এ আয়াত পবিত্র কুরআনের তিন জায়গায় এসছে। এখানে, সূরা বাকারায় এবং সূরা নাহলে। কিন্তু সূরা বাকারা ছাড়া সব জায়গায় جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। এখানে মুফাসসির (রা.) فَاَكَلَهٗ উল্লেখ করে جَوَاب شَرْط উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাস'আলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর গোশত মানুষের জন্য শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর, যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কুরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর গোশতে কোনো শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নেই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে– তোমাদের জন্য মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা জবাই ব্যতীত কোনো রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এ ধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন, একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী।

–[মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারা কুতনী, বায়হাকী]

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত **দ্বিতীয় হারাম বস্তু** হচ্ছে রক্ত। কুরআনের অন্য আয়াতে اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا বলায় বোঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা-ই হারাম; সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় হারাম বস্তু : শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বোঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ হারাম বস্তু : ঐ জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদিও জবাইয়ের সময়ও অন্যের নাম নেওয়া হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরিকরা মূর্তিদের নামে জবাই করতো। অধুনা কোনো কোনো মূর্খ লোক পীর-ফকিরের নামে জবাই করে। যদিও জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করে, তাই সাধারাণ ফিকহবিদরা একেও وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতদৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম হারাম বস্তু : مُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। অথবা নিজেই কোনো জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ হারাম বস্তু : مَوْقُوْذَةُ অর্থাৎ ঐ জন্তুর হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হয়েছে। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারালো অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও مَوْقُوْذَةُ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। مُنْخَنِقَةُ এবং مَوْقُوْذَةُ উভয়টি مَيْتَةٌ তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েজ মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেন, আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে তা খেতে পারব কিনা? তিনি উত্তরে বললেন, তীরের যে অংশ ধারালো নয়, যদি সেই অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা مَوْقُوْذَةُ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারালো অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলীতে মরে যায়, ফিকহবিদগণ সেটাকেও مَوْقُوْذَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলতেন– اَلْمَقْتُوْلَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوْذَةُ অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তা-ই مَوْقُوْذَةٌ অতএব হারাম। [জাসসাস]। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রা.) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেকী (র.) প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। –[তাফসীরে কুরতুবী]

সপ্তম হারাম বস্তু : مُتَرَدِّيَةٌ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো পাহাড়, টিলা, উঁচু দালান থেকে পড়ে অথবা কূপে পড়ে মারা যায়। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোনো শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নীচে পড়ে গিয়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় مُتَرَدِّيَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোনো পাখীকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানিতে পড়ে যায়, তবে সেটা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা.) এ বিষয়বস্তুটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। –[জাস্সাস]

অষ্টম হারাম বস্তু : نَطِيْحَةٌ অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোনো সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোনো জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম হারাম বস্তু : ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোনো হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়।

উপরিউক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিধান বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ অর্থাৎ এসব জন্তুর মধ্যে কোনোটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর জবাই করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে। এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা মৃত ও রক্তকে জবাই করার সম্ভাবনা নেই এবং শূকর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে জবাই করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.), কাতাদা (র.) প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীরা এ বিষয়ে একমত যে, এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটির ব্যাপারে নয় পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদাবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে দেওয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম হারাম বস্তু : ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর জবাই করা হয়। 'নুছুব' ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কা'বা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কুরবানি করত। এটাকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরিউক্ত সর্বপ্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। কুরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ হারাম বস্তু : اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ হারাম اَزْلَامٌ শব্দটি زَلَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াতে যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্য সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটি نَعَمْ [হ্যাঁ] একটিতে لَا [না] এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কা'বাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোনো কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী? তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে তাকে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। এর বিনিময়ে খাদেম তূন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হ্যাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে এলে মনে করা হতো যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের গোশত বণ্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরিক হয়ে উট ইত্যাদি জবাই করে তার গোশত প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বণ্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে ভাগ করত। ফলে জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বণ্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমরা বলেন, ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে যেমন– ভবিষ্যৎ-কথন বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ -এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

قَوْلُهُ اِسْتِقْسَامٌ بِالْاَزْلَامِ : শব্দটি কখনো জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ণয় করা হয়। কুরআন পাক একে مَيْسِرْ নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ ও শা'বী (র.) বলেন– আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হতো, পারস্য ও রোমেও তেমনি দাবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হতো। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে অংশ নির্ধারণের ন্যায় এগুলো হারাম। –[তাফসীরে মাযহারী]

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বণ্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে– ذَالِكُمْ فِسْقٌ অর্থাৎ এ বণ্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছে– اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ অর্থাৎ অদ্য কাফেররা তোমাদের দীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে বিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহকে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বছরের বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলে ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামি আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নেই। এ কারণে মুসলমানরা যেন তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বীয় পালনকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে।

قَوْلُهُ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ .... وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا : এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে আরাফার দিন। এ দিনটি সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবার। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে আরাফাতের 'জবলে রহমত' [রহমতের পাহাড়] -এর কাছে। এ স্থানটিই আরাফার দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময়টা ছিল আসরের পর, যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষত শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়ই দোয়া কবুলের সময়।

হজের জন্য মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল আলামীন সাহাবায়ে কেরামের সাথে জাবালে রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্র আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজের প্রধান রোকন অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত।

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রী ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াত কুরআনের শেষ দিকের আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোনো আয়াত নাজিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত এর পর নাজিল হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে ছিলেন। কেননা দশম হিজরির ৯ই যিলহজ্জ তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরির ১২ রবিউল আউল তারিখে রাসূলে কারীম ﷺ ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্র্যের যে স্বাক্ষর বহন করে। এর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানবজাতিকে সত্য দীন ও আল্লাহর নিয়ামত চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোলকলায় পূর্ণ করে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ.)-এর আমল থেকে যে সত্য ধর্ম ও আল্লাহর নিয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নিয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেওয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্ম ও নিয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হলো।

এতে যেমন সব নবী ও রাসূলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সৌভাগ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি সাথে সাথে সব উম্মতের বিপরীতে তাঁর উম্মতেরও স্বাতন্ত্র্যমূলক মর্যাদার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

এ কারণেই একবার কতিপয় ইহুদি আলেম হযরত ফারূক (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আপনাদের কুরআনে এমন একটি আয়াত আছে, যা ইহুদিদের প্রতি অবতীর্ণ হলে তারা অবতরণের দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসেবে উদযাপন করত। ফারূকে আযম প্রশ্ন করলেন, আপনাদের ইঙ্গিত কোনো আয়াতটির প্রতি? তারা উত্তরে اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন।

হযরত ফারূকে আযম (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আমরা জানি এ আয়াতটি কোনো জায়গায়, কোন দিনে অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, এ দিনটি ছিল আমাদের জন্য একসাথে দু'টি ঈদের দিন। একটি আরাফা ও অপরটি জুমুআ।

ঈদ ও উৎসবপর্ব উদযাপনের ইসলামি মূলনীতি : ফারূকে আযম (রা.)-এর এ উত্তরে একটি ইসলামি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ মূলনীতিটি বিশ্বের সব জাতি ও ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামেরই স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। বিশ্বের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই নিজ নিজ অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির স্মৃতিবার্ষিকী উদযাপন করে। এসব দিন তাদের কাছে ঈদ অথবা উৎসবপর্বের মর্যাদা সহকারে পালিত হয়ে থাকে।

কোথাও কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম অথবা মৃত্যু অথবা সিংহাসনারোহণ দিবস পালন করা হয় এবং কোথাও কোনো বিশেষ দেশ অথবা শহর বিজয় অথবা কোনো মহান ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি দিবস পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ইসলামে ব্যক্তিপূজার স্থান নেই। ইসলাম মূর্খতার যুগের যাবতীয় রীতিপ্রথা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্মৃতি পরিত্যাগ করে মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা করার নীতি অবলম্বন করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 'খলীলুল্লাহ' উপাধি দান করা হয়েছে। কুরআন পাক وَاِذَا ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ বলে তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা ও তাতে তাঁর সাফল্যের প্রশংসা করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস উদযাপন করা হয়নি এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও তদীয় জননীর জন্ম ও মৃত্যু দিবস অথবা কোনো স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়নি।

হ্যাঁ, তাঁর কাজকর্মের মধ্যে যেসব বিষয় ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেগুলোর শুধু স্মৃতিই সংরক্ষিত রাখা হয়নি; **বরং সেগুলোকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ধর্মের অঙ্গ তথা ফরজ-ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। কুরবানি, খাতনা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়াদৌড়ি, মিনার তিন জায়গায় কঙ্কর নিক্ষেপ এগুলো সবই তাঁদের ক্রিয়াকর্মের স্মৃতি, যা তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে স্বীয় নফসের কামনা-বাসনা ও স্বভাবজাত দাবি পিষ্ট করে সম্পাদন করেছিলেন। এসব ক্রিয়াকর্ম প্রত্যেক যুগের মানুষকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করে দেওয়ার শিক্ষা দেয়।**

এমনিভাবে ইসলামের যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তাঁর জন্ম-মৃত্যু অথবা ব্যক্তিগত কোনো সাফল্যের স্মৃতিতে দিবস পালন করার পরিবর্তে তাঁর ক্রিয়াকর্মের দিবস পালন করা হয়েছে। তাও আবার কোনো বিশেষ ইবাদতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন– শবে-বরাত, রমযানুল মুবারক, শবে ক্বদর, আরাফা দিবস, আশুরা দিবস ইত্যাদি। ঈদ মাত্র দুইটি, তাও খাঁটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত করা হয়েছে। প্রথম ঈদ পবিত্র রমজানের শেষে এবং হজের মাসগুলোর প্রারম্ভে এবং দ্বিতীয় ঈদ পবিত্র হজব্রত সমাপনান্তে রাখা হয়েছে।

মোট কথা, হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর উপরিউক্ত উত্তর থেকে বোঝা যায় যায় যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ন্যায় আমাদের ঈদ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির অনুগামী নয় যে, যেদিনই কোনো বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হবে, সেদিনকেই আমরা ঈদ দিবস হিসেবে উদযাপন করব। প্রাচীন জাহিলিয়াতের যুগে এ প্রথাই প্রচলিত ছিল আজকালকার আধুনিক জাহিলিয়াতও এ প্রথাটিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এমন কি অন্যান্য জাতির অনুকরণে মুসলমানরাও এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মদিবসে 'ঈদে-মীলাদ' উদযাপন করে। তাদের দেখে কিছু সংখ্যক মুসলমান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মদিবসে 'ঈদে-মিলাদুন্নবী' নামে একটি নতুন ঈদ উদ্ভাবন করেছে। এ দিবসে বাজারে মিছিল বের করা, তাতে বাজে ও অশালীন কর্মকাণ্ড করা এবং রাতে আলোকসজ্জা করাকে তারা ইবাদত মনে করে থাকে। অথচ সাহাবী , তাবেয়ী ও পূর্ববর্তী মনীষীদের কাজেকর্মে এর কোনো মূল খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃত সত্য এই যে, যেসব জাতি প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও বিস্ময়কর কীর্তির দিক দিয়ে কাঙাল, তাদের মধ্যে এসব দিবস পালনের রীতি প্রচলিত হতে পারে। সাবধান! নীলমণির মতো তাদের দু'চারটি ব্যক্তিত্ব এবং তাদের বিশেষ কীর্তিকেই স্মৃতিদিবস হিসেবে পালন করাকে তারা জাতীয় গৌরব বলে মনে করে।

ইসলামে এরূপ দিবস পালনের প্রথা চালু হলে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও অধিক পয়গাম্বর রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই শুধু জন্ম নয়, বিস্ময়কর কীর্তিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটিই দিনই অক্ষয় কীর্তিতে ভাস্বর হওয়ার কারণে তা পালন করা দরকার। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত যেসব প্রতিভা ও কীর্তির কারণে তিনি সমগ্র আরবে 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন, সেগুলো কি উদযাপনের যোগ্য নয়? এরপর রয়েছে কুরআন অবতরণ, হিজরত, বদর যুদ্ধ, ওহুদ, খন্দক, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যান্য যুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে একটিও এমন নয় যে, তার স্মৃতি উদযাপন না করলে চলে। এমনিভাবে তাঁর হাজার হাজার মুজেযা ও স্মৃতি উদযাপনের দাবি রাখে। সত্য বলতে কি, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর পবিত্র জীবনের প্রত্যেক দিন নয় প্রত্যেক মুহূর্তেই স্মৃতি উদযাপনের যোগ্যতা রাখে।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর পর তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবী রয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন, তাঁর অনুপম জীবনযাত্রার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাদের স্মৃতি উদযাপন না করলে তা অবিচার হবে নাকি? একবার এ প্রথা চালু হয়ে পড়লে সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম মনীষীবৃন্দ, আল্লাহর ওলীগণ, ওলামা ও মাশায়েখ, যাঁদের সংখ্যা কয়েক কোটি হবে, স্মৃতি উদযাপনের তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা হবে নাকি? পক্ষান্তরে যদি স্থিরীকৃত হয় যে, সবারই স্মৃতি দিবস উদযাপন করা হবে, তবে সারা বছরের একটি দিনও স্মৃতি উদযাপন থেকে মুক্ত থাকবে না; বরং প্রতিদিনের প্রতি ঘণ্টায় কয়েকটি স্মৃতি ও কয়েকটি ঈদ উদযাপন করতে হবে।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এ প্রথাকে জাহিলিয়াতের প্রথা আখ্যা দিয়ে বর্জন করেছেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর উক্তি এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এবার আলোচ্য আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য শুনুন, এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে তিনটি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের সুসংবাদ দিয়েছেন। যথা– ১. দীনের পূর্ণতা। ২. নিয়ামতের সম্পূর্ণতা এবং ৩. ইসলামি শরিয়ত নির্বাচন।

দীনের পূর্ণতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্যকার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ বলেন, আজ সত্য দীনের যাবতীয় ফরজ- সীমা, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পূর্ণ করে দেওয়া হলো। এখন এতে কোনোরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা এবং হ্রাস করার সম্ভাবনা বাকি নেই। –[রূহুল মা'আনী]

এ কারণেই এ আয়াত অবতরণের পর কোনো নতুন বিধান অবতীর্ণ হয়নি। যে কয়েকখানি আয়াত এরপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা হয় উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সম্বলিত, না হয় পূর্ব বর্ণিত বিধি-বিধানের তাকিদ সম্বলিত।

তবে ইজতিহাদের মূলনীতি অনুসরণ করে মুজতাহিদ ইমামগণ যদি নতুন ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে বিধি-বিধান প্রকাশ করেন, তবে তা উপরিউক্ত বর্ণনার নয়। কেননা কুরআন পাক যেমন বিধি-বিধানের সীমা, ফরজ ইত্যাদি বর্ণনা করেছে, তেমনি ইজতিহাদের ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব বিধি-বিধান প্রকাশ করা হবে, তা একদিক দিয়ে কুরআনেরই বর্ণিত বিধি-বিধান। কেননা এগুলো কুরআন বর্ণিত মূলনীতির অধীন।

সার কথা দীনের পূর্ণতার অর্থ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী এই যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধানকে পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। এখন এতে কোনোরূপ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা নেই এবং রহিত হয়ে কম হওয়ারও আশঙ্কা নেই। কেননা এর পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সাথে সাথে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর ওহী ছাড়া কুরআনের কোনো নির্দেশ রহিত হতে পারে না। তবে ইজতিহাদের মূলনীতির অধীনে মুজতাহিদ ইমামদের পক্ষ থেকে যে বাহ্যিক পরিবর্ধন হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে পরিবর্ধন নয়; বরং কুরআনী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা মাত্র।

নিয়ামত সম্পূর্ণ করার অর্থ মুসলমানদের প্রাধান্য ও উত্থান এবং বিরুদ্ধবাদীদের পরাভূত ও বিজিত হওয়া। মক্কা বিজয়, মূর্খতা যুগের কু-প্রথার অবলুপ্তি এবং সে বছর হজে কোনো মুশরিকের যোগদান না করার মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রকাশ লাভ করে। এখানে কুরআনের ভাষায় এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, আয়াতে دِيْن -এর সাথে إِكْمَالٌ শব্দটি এবং نِعْمَتْ -এর সাথে إِتْمَامٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ إِتْمَامٌ ও إِكْمَالٌ উভয়টিকে বাহ্যত সমার্থবোধক মনে করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের অর্থের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যা 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে ইমাম রাগেব ইস্পানী এভাবে বর্ণনা করেছেন, কোনো বস্তুর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্ণ হয়ে গেলে তাকে বলা হয় اِكْمَالٌ ও تَكْمِيْل এবং এক বস্তুর উপর অন্য বস্তুর আবশ্যকতা ফুরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় اِتْمَامٌ সুতরাং دِيْن اِكْمَالٌ -এর সারমর্ম এই যে, এ জগতে আল্লাহর আইন ও ধর্মের বিধি-বিধান প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা আজ পূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং اِتْمَام نِعْمَتْ -এর অর্থ এই যে, এখন মুসলমানরা কারো মুখাপেক্ষী নয়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রাধান্য, শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, যা দ্বারা তারা সত্য ধর্মের বিধি-বিধানকে কার্যকরভাবে জারি ও প্রয়োগ করতে পারে।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে دِيْن -কে মুসলমানদের দিকে সম্বন্ধ করে دِيْنَكُمْ বলা হয়েছে এবং نِعْمَتْ -কে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করে نِعْمَتِيْ বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, دِيْن বা ধর্ম মুসলমানদের ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে এবং نِعْمَتْ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণত্ব লাভ করে। -[তাফসীরে আল-কাইয়্যিম : ইবনে কাইয়্যিম (র.)]

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এ কথাও ফুঠে উঠেছে যে, অদ্য দীনের পূর্ণতা লাভের অর্থ এই নয় যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের ধর্ম অপূর্ণ ছিল। বাহরে মুহীত গ্রন্থে কাফফাল মরওয়াযীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূলের ধর্মই তাঁর যমানা হিসেবে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ যে যুগে যে পয়গাম্বরের প্রতি কোনো শরিয়ত বা ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ যুগ ও ঐ জাতি হিসেবে সে ধর্মই ছিল পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্ব থেকেই এ কথা ছিল যে, এ জাতি ও এ যুগের জন্য যে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ, পরবর্তী যুগ ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের জন্য সে ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হবে না; বরং এ ধর্মকে রহিত করে অন্য ধর্ম ও শরিয়ত প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এর ব্যতিক্রম। এ শরিয়ত সর্বশেষ যুগে নাজিল হওয়ার কারণে সবদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনো বিশেষ যুগ, বিশেষ ভূখণ্ড অথবা বিশেষ জাতির সাথে এর সম্পর্ক নেই; বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক জাতির জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় পুরস্কার এই যে, এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে মনোনীত করেছেন, যা সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যাতে পারলৌকিক মুক্তি সীমাবদ্ধ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম একটি বড় অবদান এবং এ ধর্মটিই সব দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ। এরপর নতুন কোনো ধর্ম আগমন করবে না এবং এতে কোনোরূপ সংযোগজন-বিয়োজনও করা হবে না।

এ কারণেই আয়াতটি অবতরণের সময় সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু হযরত ওমর ফারূক (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কান্নার কারণে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আপনি এ নশ্বর পৃথিবীতে আর বেশিদিন অবস্থান করবেন না। কেননা দীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাসূলের প্রয়োজনও মিটে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ বক্তব্যের সত্যতা সমর্থন করেন। -[ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত]

সে মতে পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে, এর মাত্র একাশি দিন পর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইহজগৎ থেকে বিদায় হয়ে গেলেন।
-[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/২০-২৯]

ইসলাম পরিপূর্ণ দীন-জীবনব্যবস্থা : এর সংবাদ ও ঘটনাবলিতে পূর্ণ সত্যতা বর্ণনায় পরিপূর্ণ প্রভাব এবং এর বিধানে পুরোপুরি ভারসাম্যতা বিদ্যমান। যেসব বিষয় পূর্ববর্তী কিতাব ও অন্যান্য আসমানি ধর্মে সীমিত ও অপূর্ণ ছিল, এ সরল ও সুপ্রতিষ্ঠিত দীন দ্বারা তার পূর্ণতা বিধান করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীস তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা বা কারণের ভিত্তিতে [কিয়াস দ্বারা] যে সমস্ত বিধান দিয়েছে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তো সর্বদাই চলতে থাকবে। কিন্তু রদ-বদলের কোনোরূপ সুযোগ তাতে রাখা হয়নি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৯]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ : যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে হালাল ও হারাম জন্তুর বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শিকারী কুকুর ও বাজপাখি দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আয়াতে তারই উত্তরে বর্ণিত হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৩০]

পূর্বের আয়াতে বহু হারাম জিনিসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে তাহলে হালাল জিনিস কি কি? তার উত্তরে দেওয়া হয়েছে যে, হালালের সীমারেখা তো সুবিস্তৃত। দৈহিক বা দীনী দিক থেকে ক্ষতিকারক কয়েকটি জিনিস ছাড়া দুনিয়ার তাবৎ পাক পবিত্র বস্তুই হালাল। শিকারী জন্তুর শিকার সম্পর্কে কেউ কেউ বিশেষভাবে প্রশ্ন করেছিল বলে আয়াতের পরবর্তী অংশে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩]

শানে নুযূল : মুসতারাকে হাকেম, ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে জারীর-এ আবূ রাফে কর্তৃক বর্ণিত শানে নুযুল উল্লেখ রয়েছে যাকে হাকেম (র.) বিশুদ্ধ বলেছেন। রেওয়ায়েতটির সারসংক্ষেপ হলো, একবার হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। হুজুর ﷺ -এর কারণ জানতে চাইলে উত্তরে বললেন, যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতা আসে না। খোঁজ করে জানা গেল, ঘরে কুকুরের একটি বাচ্চা ছিল। হুজুর ﷺ কুকুর ছানাটিকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এর ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক সাহাবা কুকুর দিয়ে শিকার করার হুকুম হুজুর ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। -[জামালাইন : ২/১৫৫]

শিকার ও শিকারী জন্তুর বিধান : শিকারী কুকুর, বাজ পাখী ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জীব কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে হালাল। যথা- ১. শিকারী জানোয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়া। ২. তাকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়া। ৩. শরিয়তে স্বীকৃত পন্থায় তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। যথা কুকুরকে শেখানো হবে যে, সে শিকার ধরে নিজে খাবে না; বাজকে তা'লীম দেওয়া হবে যে, তাকে ডাকা মাত্র চলে আসবে এমন কি তখন শিকারের পেছনে ধাবমান থাকলেও। কুকুর যদি শিকার ধরে নিজেই খায় কিংবা বাজ পাখীকে ডাকা হলে যদি না আসে তা হলে বুঝতে হবে- সে যখন তার কথা শুনছে না তখন শিকারও তার জন্য নয়; বরং নিজের জন্যই ধরেছে। একথাই হযরত শাহ সাহেব (র.) এভাবে লিখেন, সে যখন মানুষের চরিত্র শিখল, তখন যেন মানুষই তা জবাই করল। ৪. ছাড়ার সময় মহান আল্লাহর নাম নেওয়া অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে ছাড়া। কুরআনের ভাষায়ই এ শর্ত চতুষ্ঠয় ব্যক্ত হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে পঞ্চম আরো একটি শর্ত হলো শিকারী জীব কর্তৃক শিকারকে যখমও করতে হবে, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়। 'جَوَارِحُ' শব্দটির মূলধাতু 'جَرْحٌ' [যখম করা] দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে শিকারী প্রাণীর শিকার করা জীব হারাম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সে জীব যদি মারা না গিয়ে থাকে এবং তাকে জবাই করে নেওয়া হয়, তবে হালাল। যেহেতু ইরশাদ হয়েছে- وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [যাকে হিংস্র পশু ভক্ষণ করেছে [তাও হারাম] তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ]। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২৪]

اَلْجَوَارِحُ শব্দটি جَارِحَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো সব শিকারী পশু বা জন্তু। চাই তা পশু হোক বা পাখী। শিকারী কুকুর বা বাজপাখী দ্বারা শিকার করানো হলে এরূপ শিকারকে সায়েদা বলে। -[রাগিব]

جَارِحَة নাম এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এরা শিকারকৃত জন্তুকে জখম করে ফেলে। কেউ কেউ বলেন, নখ বা থাবার আঘাতে জখম হওয়ার কারণে এরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। -[জাসসাস]

যখম হওয়ার কারণে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে, কেননা শিকারী জন্তু শিকার ধরার সময় তাকে যখম বা আহত করে ফেলে।-[খাযিন]

উত্তর থেকে দু'টি শর্ত বেরিয়ে এসেছে। প্রথমটি হলো : শিকারী জন্তু এমন, যাদের শিকার করা শিখানো হয়েছে, প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। ফকীহগণ এর দ্বারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এ শর্তটি কেবল বন্য জন্তুর জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং গৃহপালিত জন্তুর বেলায়ও তা প্রযোজ্য। বস্তুত গৃহপালিত পশু যদি শিকার ধরার জন্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত না হয়, তবে তার শিকারকৃত জন্তু হালাল হবে না। অবশ্য যে জন্তু [চাই সে বন্য হোক বা গৃহপালিত] প্রশিক্ষিত বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হবে, তার কাজ শিকারীর কাজ হিসেবে গণ্য হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো : শিকারী পশুকে শিকার ধরার জন্য লেলিয়ে দিতে হবে। এমন যেন না হয় যে, সে নিজে শিকার ধরে এনে তোমাদের সামনে রেখে দিয়েছে। وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ এ বাক্যটি তারকীব বা বাক্য-বিন্যাসের দিক দিয়ে اَلطَّيِّبَاتُ শব্দের সাথে সম্পৃক্ত এবং صَيْد শব্দটি مُضَافٌ এখানে উহ্য আছে যা أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ -এ বাক্যটির সাথে সম্পৃক্ত [কাশশাফ]। আর ঐ জন্তুর শিকার, যাকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ। -[কুরতুবী]

مُكَلِّبِيْنَ -এর একটা অর্থ হলো কুকুরকে শিক্ষা দানকারী এবং দ্বিতীয় অর্থ হলো: শিকারের উপর আক্রমণকারী। এ দু'টি অর্থের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ নেই। আরবি ভাষা- ভাষীরা দু'টি অর্থই গ্রহণ করেছেন। শিকারী কুকুরকে যাকে শিকার ধরা শিখায়, তাকে 'মুকাল্লাব' বলা হয়। -[তাফসীরে মাজেদী : ২/৪৭৫]

قَوْلُهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ : অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে পবিত্র বস্তুর ব্যবহার ও শিকার ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন না হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ পার্থিব স্বাদ-আহলাদে নিবিষ্ট হয়ে এবং শিকার ইত্যাদি কাজে মগ্ন হয়ে মহান আল্লাহ ও আখিরাত ভুলে বসে। তাই সতর্ক করার প্রয়োজন ছিল যে, মহান আল্লাহকে ভুলো না। মনে রেখ, হিসাবের দিন বেশি দূরে নয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ রাশি ও সে অনুপাতে তোমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং তোমাদের প্রিয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব অবশ্যই গ্রহণ করা হবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২৫]

قَوْلُهُ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ : অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হলো। 'আজ' বলে ঐ দিনকে বোঝানো হয়েছে যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ দশম হিজরির বিদায় হজের আরাফার দিন। উদ্দেশ্যে এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্য হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হলো। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ আয়াতে طَيِّبَاتٌ অর্থাৎ পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ অর্থাৎ আল্লাহ হালাল করেন তাদের জন্য طَيِّبَاتٌ এবং হারাম করেন خَبَائِثُ ; এখানে طَيِّبَاتٌ -এর বিপরীতে خَبَائِثُ ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طَيِّبَاتٌ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خَبَائِثُ নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই মানুষকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভেরই যোগ্য নয়।

পবিত্র কুরআন এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে : بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানবচরিত্র প্রভাবান্বিত হয় তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানি যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিতরূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই পবিত্র কুরআন বলে- يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا এখানে সৎকর্মের জন্য হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

বিশেষ করে গোশত মানবদেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে গোশত চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে গোশত থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরিয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ বাক্যটিতে হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখানে দেখতে হবে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব মনে করার জন্য এরূপ কোনো শর্ত আছে কিনা যে, প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জীল অনুযায়ী বিশুদ্ধ আমল করতে হবে, নাকি বিকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী এবং ঈসা ও মারইয়াম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্তকারীরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে? কুরআনের অসংখ্য বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য কোনো ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হওয়ার দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট, যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো পথভ্রষ্টতায় পতিত থাকে।

পবিত্র কুরআন যাদের আহলে কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে বারবার এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهٖ অর্থাৎ এরা নিজেদের ঐশীগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদিরা হযরত ওযাইর (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ : এতদসত্ত্বেও যখন কুরআন তাদের আহলে কিতাব বলেই আখ্যা দেয়, তখন বোঝা গেল যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত থাকবে; বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ হোক না কেন।

ইমাম জাস্‌সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তাওরাত পাঠ করে এবং ইহুদিদের শনিবারকে পবিত্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে? হযরত ফারূকে আযম (রা.) উত্তরে লিখে পাঠালেন, তাদেরকে আহলে কিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে।
–[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/ ৩৭-৩৯]

قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ .... أُوتُوا الْكِتَابَ আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহের বিধান : অর্থাৎ তোমাদের জন্য মুসলমান সতী সাধ্বী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। এমনিভাবে আহলে কিতাবদের সতী সাধ্বী মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল। এখানে উভয় স্থলে مُحْصَنَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি অভিধান ও সাধারণ বাচনভঙ্গিতে এর অর্থ দু'টি। যথা- ১. স্বাধীন ও মুক্ত-এর বিপরীতে রয়েছে ক্রীতদাসী। ২. সতী-সাধ্বী মহিলা। আভিধানিক দিক দিয়ে এখানে উভয় অর্থই বোঝানো যেতে পারে। এখানে তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে مُحْصَنَاتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- স্বাধীন ও মুক্ত মহিলা। অতএব, বাক্যের সারমর্ম এই যে, আহলে কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের জন্য হালাল, ক্রীতদাসী হালাল নয়।

কিন্তু অধিক সংখ্যক আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সতী-সাধ্বী মহিলা হালাল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা সতীসাধ্বী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম; বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম ও উপযুক্ত বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ করা কিংবা আহলে কিতাব মহিলাকে, সর্বক্ষেত্রে সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাজ নয়।

অতএব, এ বাক্যের বিষয়বস্তু হলো এই যে, মুসলমানের জন্য কোনো মুসলমান মহিলাকে অথবা আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে 'আহলে কিতাব' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহলে কিতাব নয়, এমন অমুসলিম মহিলাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হলো।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেসব অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ই আহলে কিতাব সম্প্রদায় হতে পারে, তাদের ছাড়া বর্তমানকালের আর কোনো সম্প্রদায়ই আহলে কিতাব নয়। অগ্নিউপাসক অথবা মূর্তিপূজক হিন্দু অথবা শিখ, আর্য, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই এ শ্রেণিভুক্ত। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এমন কোনো গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণের দাবি করে, যার ঐশীগ্রন্থ ও প্রত্যাদেশ হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তারাই আহলে কিতাব। বলা বাহুল্য, তাওরাত ও ইঞ্জীলই এমন কিতাব এবং এ কিতাবদ্বয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান জগতে

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত পানাহার করে। কিন্তু জন্তু জানোয়ার ছাড়া অন্য কোনো জন্তু পানাহারে সময় এরূপ বাধ্যবাধকতা নেই যে, 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'বিসমিল্লাহ' বলেই পানাহার করতে হবে নতুবা হালাল হবে না। বড় জোর প্রত্যেক বস্তু পানাহারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। কিন্তু জন্তু-জানোয়ার জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ তখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করলে জন্তুটি মৃত ও হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর রহস্য কি?

চিন্তা করলেই পার্থক্য ফুঠে উঠে। প্রাণীদের প্রাণ এক দিক দিয়ে সব সমান। তাই এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে হত্যা করবে এবং জবাই করে খেয়ে ফেলবে, বাহ্যত তা বৈধ হওয়া সমীচীন নয়। এখন যাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এটি একটি বিরাট নিয়ামত বলতে হবে। অতএব, জন্তু জবাই করার সময় কল্পনায় এ নিয়ামতের উপলব্ধি ও শোকর আদায়কে জরুরি সাব্যস্ত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য, দানা, ফল ইত্যাদি এর বিপরীত। এগুলো সৃজিতই হয়েছে যাতে মানুষ এগুলোকে কেটে-পিষে স্বীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে। তাই, শুধু বিসমিল্লাহ বলা মোস্তাহাব পর্যায়ে রাখা হয়েছে; ওয়াজিব বা জরুরি করা হয়নি।

এর আরো একটি কারণ এই যে, মুশরিকরা জন্তু জবাই করার সময় দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করতো। এ প্রথা জাহেলিয়্যাত যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইসলামি শরিয়ত তাদের এই কাফেরসুলভ প্রথাকে একটি চমৎকার ইবাদতে রূপান্তরিত করে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাকে জরুরি সাব্যস্ত করেছে। ভ্রান্ত নামের পরিবর্তে বিশুদ্ধ নাম প্রস্তাব করাই ছিল এ মুশরিকসুলভ প্রথা মিটাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। নতুবা প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস পরিত্যক্ত হওয়া ছিল সুকঠিন। –[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৩৩-৩৭]

قَوْلُهُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ : অর্থাৎ আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে 'খাদ্য' বলতে জবাই করা জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারকা, ইবরাহীম, কাতাদা, সুদ্দী, যাহহাক, মুজাহিদ (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। কেননা অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে কিতাব, মূর্তি উপাসক, মুশরিক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে জবাই করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোনো লোকের কাছ থেকে যে কোনো বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানদের জন্য খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু আহলে কিতাবদের জন্য হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যথা– ১. কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় আহলে কিতাব কারা? ২. কিতাব বলে কোন কিতাবকে বোঝানো হয়েছে? ৩. আহলে কিতাব হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরি কি না? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোনো লিখিত পাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐসব ঐশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর কিতাব হওয়া কুরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর, হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এসব কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সেগুলোকে আল্লাহর প্রত্যাদেশ বলে মনে করে, তারাই আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে যা আল্লাহর কিতাব বলে কুরআন ও সুন্নাহর নিশ্চিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেরূপ কোনো কিতাবের অনুসারীরা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরিক, অগ্নি উপাসক, মূর্তিপূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিই আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'সাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত। যেসব আলেমের মতে যারা হযরত দাউদ (আ.)-এর যাবুরের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁরা তাদেরও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যাবূর কিতাবের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি, তাঁরা এদের মূর্তি ও অগ্নি-উপসাকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহলে কিতাব বলা যায় তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি। তাদের জবাই করা জন্তু মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের জবাই করা জন্তু তাদের জন্য হালাল।

এখানে দেখতে হবে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব মনে করার জন্য এরূপ কোনো শর্ত আছে কিনা যে, প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জীল অনুযায়ী বিশুদ্ধ আমল করতে হবে, নাকি বিকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী এবং ঈসা ও মারইয়াম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্তকারীরাও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হবে? কুরআনের অসংখ্য বর্ণনাদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য কোনো ঐশীগ্রন্থে বিশ্বাসী ও তার অনুসারী হওয়ার দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট, যদিও অনুসরণ করতে গিয়ে হাজারো পথভ্রষ্টতায় পতিত থাকে।

পবিত্র কুরআন যাদের আহলে কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছে তাদের সম্পর্কে বারবার এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ অর্থাৎ এরা নিজেদের ঐশীগ্রন্থে পরিবর্তন সাধন করেছে এবং এ কথাও বলেছে যে, ইহুদিরা হযরত ওযাইর (আ.)-কে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে।

قَوْلُهُ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ : এতদসত্ত্বেও যখন কুরআন তাদের আহলে কিতাব বলেই আখ্যা দেয়, তখন বোঝা গেল যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত থাকবে; বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হোক এবং আমল যতই মন্দ হোক না কেন।

ইমাম জাস্সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা পত্রের মাধ্যমে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে এমন কিছু লোক বসবাস করে, যারা তাওরাত পাঠ করে এবং ইহুদিদের শনিবারকে পবিত্র দিবস মনে করে, কিন্তু কিয়ামতে বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে? হযরত ফারূকে আযম (রা.) উত্তরে লিখে পাঠালেন, তাদেরকে আহলে কিতাবেরই একটি দল বলে মনে করতে হবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/ ৩৭-৩৯]

قَوْلُهُ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ .... أُوْتُوا الْكِتٰبَ আহলে কিতাব নারী ও মুশরিক নারীকে বিবাহের বিধান : অর্থাৎ তোমাদের জন্য মুসলমান সতী সাধ্বী মহিলাদেরকে বিবাহ করা হালাল। এমনিভাবে আহলে কিতাবদের সতী সাধ্বী মহিলাদেরকেও বিবাহ করা হালাল। এখানে উভয় স্থলে مُحْصَنٰتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি অভিধান ও সাধারণ বাচনভঙ্গিতে এর অর্থ দু'টি। যথা– ১. স্বাধীন ও মুক্ত-এর বিপরীতে রয়েছে ক্রীতদাসী। ২. সতী-সাধ্বী মহিলা। আভিধানিক দিক দিয়ে এখানে উভয় অর্থই বোঝানো যেতে পারে। এখানে তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে مُحْصَنٰتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– স্বাধীন ও মুক্ত মহিলা। অতএব, বাক্যের সারমর্ম এই যে, আহলে কিতাবদের স্বাধীন মহিলা মুসলমানদের জন্য হালাল, ক্রীতদাসী হালাল নয়।

কিন্তু অধিক সংখ্যক আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সতী-সাধ্বী মহিলা হালাল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যারা সতীসাধ্বী নয়, তাদের বিবাহ করা হারাম; বরং এর উদ্দেশ্য উত্তম ও উপযুক্ত বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা। অর্থাৎ মুসলমান মহিলাকেই বিবাহ করা কিংবা আহলে কিতাব মহিলাকে, সর্বক্ষেত্রে সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার চেষ্টা থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও পাপাচারিণী মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাজ নয়।

অতএব, এ বাক্যের বিষয়বস্তু হলো এই যে, মুসলমানের জন্য কোনো মুসলমান মহিলাকে অথবা আহলে কিতাব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল। তবে উভয় অবস্থাতে সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিবাহ করার প্রতি লক্ষ্য থাকা দরকার। ব্যভিচারিণী ও অবিশ্বাসযোগ্য মহিলার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ইহকাল ও পরকাল উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব, এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এক্ষেত্রে 'আহলে কিতাব' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় আহলে কিতাব নয়, এমন অমুসলিম মহিলাকে সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ করা হারাম প্রমাণিত হলো।

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বর্তমান যুগে যেসব অমুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ই আহলে কিতাব সম্প্রদায় হতে পারে, তাদের ছাড়া বর্তমানকালের আর কোনো সম্প্রদায়ই আহলে কিতাব নয়। অগ্নিউপাসক অথবা মূর্তিপূজক হিন্দু অথবা শিখ, আর্য, বৌদ্ধ ইত্যাদি সবাই এ শ্রেণিভুক্ত। কেননা একথা বর্ণিত হয়েছে যে, যারা এমন কোনো গ্রন্থে বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণের দাবি করে, যার ঐশীগ্রন্থ ও প্রত্যাদেশ হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তারাই আহলে কিতাব। বলা বাহুল্য, তাওরাত ও ইঞ্জীলই এমন কিতাব এবং এ কিতাবদ্বয়ের অনুসারী কিছু কিছু সম্প্রদায় বর্তমান জগতে

বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া যাবূর ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা জগতে কোথাও বিদ্যমান নেই এবং এগুলোর অনুসরণ করে বলে কেউ দাবিও করে না। বর্তমান যুগে 'বেদ', 'গ্রন্থসাহেব', 'যরথুস্ত্র' ইত্যাদিও পবিত্র কিতাব বলে কথিত হয়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নায় এগুলোর ওহী ও ঐশীগ্রন্থ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। সম্ভবত যাবূর ও ইবরাহিমী সহীফার বিকৃত রূপ, যা কালচক্রে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটক, বেদ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে, এরূপ নিছক সম্ভাবনাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণে সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকে একমাত্র ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলাদের সাথেই মুসলমানদের বিয়ে হালাল। অন্য কোনো ধর্মালম্বী মহিলার সাথে, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়, ততক্ষণ মুসলমানের বিয়ে হারাম।

পবিত্র কুরআনের আয়াত وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ আয়াতে এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এর অর্থ এই যে, কোনো মুশরিক মহিলাকে ততক্ষণ বিয়ে করো না, যতক্ষণ সে মুসলমান না হয়। আহলে কিতাব ছাড়া বর্তমান জগতের সব সম্প্রদায়েই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে দু'টি আয়াত রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে: মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কোনো মুশরিক মহিলাকে বিয়ে করা হারাম। অপরটি সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াত, যাতে বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবদের মহিলাকে বিয়ে করা জায়েজ।

তাই অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী উভয় আয়াতের মর্ম এই সাব্যস্ত করেছেন যে, নীতিগতভাবে মুশরিক মহিলার সাথে মুসলমানের বিবাহ না হওয়া উচিত। কিন্তু সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলাদের ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মহিলার সাথে মুসলমান হওয়া ব্যতীত মুসলমানের বিয়ে হতে পারে না। এখন রইল ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলাদের ব্যাপার। কোনো কোনো সাহাবীর মতে এ বিয়েও জায়েজ নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর মতও তাই। কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার উক্তি সুস্পষ্ট- وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ অর্থাৎ "মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মুশরিক মহিলাদেরকে বিয়ে করো না।" তারা মারইয়াম তনয় ঈসাকে অথবা অন্য কাউকে আল্লাহ ও পরওয়ারদিগার সাব্যস্ত করে। এর চাইতে বড় শিরক আর কোনটি তা আমার জানা নেই। একবার মায়মূন ইবনে মিহরান হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে দেশে বসবাস করি, সেখানে অধিকাংশই আহলে কিতাব। আমরা তাদের মেয়েদের বিয়ে করতে এবং তাদের জবাই করা জন্তু খেতে পারি কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উত্তরে উপরিউক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। একটিতে মুশরিক মহিলাদের বিয়ে করা হারাম বলা হয়েছে এবং অপরটিতে আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা হালাল বর্ণিত হয়েছে।

মায়মূন ইবনে মিহরান বললেন, পবিত্র কুরআনের এ দু'টি আয়াত আমিও পাঠ করি এবং জানি। আমার প্রশ্ন এই যে, উভয় আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য শরিয়তের নির্দেশ কি? উত্তরে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) পুনরায় আয়াত দু'টি পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন এবং নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বললেন না। মুসলিম আলেমরা এর অর্থ এই ধরেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে বিয়ে হালাল হলেও এ বিয়ের ফলে নিজের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য বরং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে যেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেবে, তার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতেও আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করা মাকরূহ তথা অনুচিত।

হযরত জাস্‌সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে শাকীক ইবনে সালামার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) মাদায়েন পৌঁছে জনৈক ইহুদি স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.) সংবাদ পেয়ে তাঁকে পত্র লিখে বললেন, স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিয়ে দাও। হযরত হুযাইফা উত্তরে লিখলেন যে, সে কি আমার জন্য হারাম? খলীফা উত্তরে লিখে পাঠালেন যে, আমি হারাম বলি না, কিন্তু ইহুদি স্ত্রীলোকরা সাধারণভাবে সতী-সাধ্বী নয়। তাই আমার আশঙ্কা যে, এ পথে তোমাদের পরিবারেও না অশ্লীলতা ও ব্যভিচার অনুপ্রবেশ করবে। কিতাবুল আসার গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান এ ঘটনাকে ইমাম আবূ হানীফার অভিমত বলে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বার হযরত ফারূকে আযম (র.) হুযাইফাকে যে পত্র লিখেন তার ভাষা ছিল এরূপ–

اَعْزِمُ عَلَيْكَ اَنْ لَا تَضَعَ كِتَابِىْ حَتّٰى تَخْلِىَ سَبِيْلَهَا فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَقْتَدِيَكَ الْمُسْلِمُوْنَ فَيَخْتَارُوْا نِسَاءَ اَهْلِ الذِّمَّةِ لِجَمَالِهِنَّ وَكَفٰى بِذَالِكَ فِتْنَةً لِنِسَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, পাঠান্তে এ পত্র রাখার পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দাও। আমার আশঙ্কা হয় অন্য মুসলমানরাও না আবার তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ফলে তারা রূপ ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জিম্মি আহলে কিতাব মহিলাদের মুসলমান মহিলাদের বিপরীতে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করবে। মুসলমান মহিলাদের জন্য এর চাইতে বড় বিপদ আর কিছু হবে না। -[কিতাবুল আসার পৃ. ১৫৬]

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র.) বলেন, হানাফী মাযহাবের ফিকহবিদরা এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এ বিয়েকে হারাম বলেন না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অনিষ্ট ও ক্ষতির কারণে মাকরূহ মনে করেন। আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন: শুধু হুযাইফা নন, তালহা এবং কা'ব ইবনে মালেক (র.) ও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁরাও সূরা মায়িদার আয়াতদৃষ্টে আহলে কিতাব মহিলাদের পাণি গ্রহণ করেন। খলীফা ফারূকে আযম (র.) সংবাদ পেয়ে তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং তালাক দানের নির্দেশ দেন।

ফারূকে আযমের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। কোনো ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলা মুসলমানের সহধর্মিণী হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে, সে যুগে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। তাদের মধ্যে ব্যভিচার থাকলে আমাদের আমাদের পরিবার কলুষিত হয়ে পড়বে কিংবা তাদের রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মানুষ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেবে; ফলে মুসলমান মহিলারা বিপদে পতিত হবে, এটিই ছিল তখনকার যুগের একমাত্র আশঙ্কা। কিন্তু ফারূকে আযমের দূরদর্শী দৃষ্টি এতটুকু অনিষ্টকে সামনে রেখেই উপরিউক্ত সাহাবীদের তালাক দানে বাধ্য করেছিলেন। যদি আজকালকার চিত্র তাঁদের দৃষ্টির সম্মুখে থাকত, তবে অনুমান করুন, একে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা কি কর্মপন্থা অবলম্বন করতেন? প্রথমত আজকাল যারা আদমশুমারীর খাতায় নিজেকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান নামে লিপিবদ্ধ করায়, তাদের অনেকেই বিশ্বাসের দিক দিয়ে খ্রিস্টবাদ ও ইহুদিবাদকে অভিশাপ মনে করে। তারা যেমন তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে না, তেমনি হযরত ঈসা (আ.) ও মূসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল মনে করে না। বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা পুরোপুরি নাস্তিক। শুধু জাতিগত অথবা প্রথাগতভাবে নিজেকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বলে।

এমতাবস্থায় তাদের স্ত্রীলোক মুসলমানের জন্য কিছুতেই হালাল নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তারা স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করে, তবুও তাদেরকে মুসলমান পরিবারে স্থান দেওয়া গোটা পরিবারের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংস ডেকে আনার শামিল। এই যুগে এ পথে ইসলাম ও মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অনেক চক্রান্ত হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, একটি মেয়ে গোটা একটা মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংস করে দিয়েছে। এগুলো এমন বিষয় যে, কোনো সচেতন মানুষই অন্যদেরকে এরূপ সুযোগ দিতে পারে না।

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আজকালকার তথাকথিত আহলে কিতাব স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা থেকে বিরত থাকাই মুসলমানদের উচিত। আয়াতের শেষাংশে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আহলে কিতাব স্ত্রীলোকদের রাখতেই চাও, তবে নিয়মিত বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে রাখ। তাদের মোহর ইত্যাদি প্রাপ্য পরিশোধ কর। তাদেরকে পরিচারিকা হিসেবে রাখা এবং ব্যভিচারে ব্যবহার করা হারাম। -[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ৫০-৫৪]

قَوْلُهُ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىْٓ اَخْدَانٍ : বিবাহের মূল লক্ষ্য চরিত্র রক্ষা : পূর্বে যেমন নারীর চারিত্রিক পবিত্রতার কথা বলা হয়েছিল তেমনি এ স্থলে পুরুষকে চারিত্রিক পরিশুদ্ধি বজায় রাখতে আদেশ করা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ 'সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।' [সূরা নূর : ২৬] এ দ্বারা আরো জানা গেল যে, মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে বিবাহের লক্ষ্য অমূল্য চরিত্রকে রক্ষা করা এবং বিবাহের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা; কাম প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় সুধা চরিতার্থ নয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৩২]

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব : নিকাহ ইসলামের দৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়; বরং একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা। এর উপকারিতা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অপরিসীম। তাই নিকাহ বা শাদীর জন্য উর্দূ ভাষায় আরেকটি শব্দ 'খানা-আবাদী বা 'গৃহ-আবাদ' আছে। বিরান ঘর এবং উজাড় গৃহ এর দ্বারাই আবাদ হয়। ইসলামে নারী ও পুরুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক কেবল এ কারণেই বৈধ হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর আসল মাকসুদ হবে একটা খান্দানের গোড়া পত্তন করা এবং পরস্পর সম্পর্কের দ্বারা স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করা। যারা নিজেদেরকে সৃষ্টি-কালচার ও তাহযীব-তামাদ্দুনের দাবিদার বলে মনে করে, কিন্তু আসলে তারা জাহিল বা অজ্ঞ, তাদের সমাজে এ ধরনের বিবাহের ব্যবস্থা ছাড়া আরো দু'ধরনের নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যবস্থা আগে থেকে প্রচলিত আছে এবং তা এখনো চালু আছে। এর একটা ব্যবস্থা হলো স্পষ্ট ব্যভিচার। নারী ব্যভিচার করার জন্য স্বাধীন থাকে এবং একে সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। সমাজ তাকে এ থেকে বাধা দেয় না এবং রাষ্ট্রও কোনো আপত্তি করতে পারে না। যখন ইচ্ছা তখন কোনো পুরুষ তার কাছে যায় এবং নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে তার অঙ্গে পানি স্খলিত করত মুখ কালো করে ফিরে আসে। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো গোপন প্রেম, অর্থাৎ যেখানে পবিত্রতা বলে কিছু নেই। এখানে ভদ্র ও বেশ্যার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। অবশ্য এ ধরনের গোপন প্রণয় সম্বন্ধে বেশি প্রচার না হওয়ায় সবাই স্ব-স্ব মর্যাদায় সমাজে বসবাস করে। কোনো কেলেংকারী প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ বিষয়টি অনেকেই জানে; কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে তা ছড়ানো হয় না। ইসলাম এ দু'টি সভ্য অপরাধকে সমাজের অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং নারী ও পুরুষের মাঝে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে। আর বিয়ে -শাদী গোপনে হয় না, বরং প্রকাশ্যে হয়। এখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তাঁর মাধ্যমে একজন পুরুষ খেদমতের জিম্মাদারী কবুল করে নেয়। উভয়ের মাঝে পারস্পরিক হক প্রতিষ্ঠিত হয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। তারা উভয়ে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভালো-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের চড়াই-উতরাই পার হওয়ার জন্য যথাসাধ্য ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে। আর এসব অনুষ্ঠিত হয় সাক্ষীর উপস্থিতিতে। مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ -এ বাক্যটি ব্যবহারের দ্বারা কুরআন মাজীদ দাম্পত্য জীবনের যে সুউচ্চ ও সম্মানিত পদ্ধতি পেশ করেছে, এখানে কোনো জড় সভ্যতা আজও পৌছতে পারেনি। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা -৩৩]

٦. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اَىْ اَرَدْتُمُ الْقِيَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اَىْ مَعَهَا كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ اَىْ اَلْصِقُوا الْمَسْحَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اِسَالَةِ مَاءٍ وَهُوَ اِسْمُ جِنْسٍ فَيَكْفِىْ اَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَسْحُ بَعْضِ شَعْرِهٖ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ رح وَاَرْجُلَكُمْ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى اَيْدِيَكُمْ وَالْجَرُّ عَلَى الْجِوَارِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط اَىْ مَعَهُمَا كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِيَانِ فِىْ كُلِّ رِجْلٍ عِنْدَ مَفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْاَيْدِىْ وَالْاَرْجُلِ الْمَغْسُوْلَةِ بِالرَّاْسِ الْمَمْسُوْحِ يُفِيْدُ وُجُوْبَ التَّرْتِيْبِ فِىْ طَهَارَةِ هٰذِهِ الْاَعْضَاءِ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ رح وَيُؤْخَذُ مِنَ السُّنَّةِ وُجُوْبُ النِّيَّةِ فِيْهِ كَغَيْرِهٖ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط فَاغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَىْ مُسَافِرِيْنَ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَىْ اَحْدَثَ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ سَبَقَ مِثْلُهٗ فِىْ اٰيَةِ النِّسَاءِ.

অনুবাদ :

৬. হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে অর্থাৎ দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে আর তোমরা যদি মুহদাস বা অজুহীন হও তখন তোমরা ধৌত করবে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত অর্থাৎ কনুইসহ; সুন্নায় এ কথা বিবৃত হয়েছে। এবং তোমাদের মাথায় হাত বুলাবে। بِرُءُوْسِكُمْ -এর بَاء -টি اِلْصَاقْ বা লেপটানো, লাগানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পানি না বহিয়ে মাসাহকে এর সাথে লাগাও। এটি اِسْم جِنْس বা জাতিবাচক বিশেষ্য। **সুতরাং যতটুকু হলে 'মাসাহ' হয়েছে বলে বলা যাবে এখানে ততটুকু করাই যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে। সামান্য কয়টি চুল হলো এর পরিমাণ। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর** অভিমত। **এবং তোমাদের পা** اَرْجُلَكُمْ : এটি اَيْدِيَكُمْ -এর সাথে عَطْف হিসেবে مَنْصُوْب বা ফাতাহযুক্তরূপে আর عَلَى الْجِوَارِ جَرٌّ অর্থাৎ প্রতিবেশী শব্দটি [بِرُءُوْسِكُمْ] -এর جَرٌّ বা কাসরার সাথে সামঞ্জস্যকল্পে এটি কাসরাযুক্তরূপেও পঠিত রয়েছে। গ্রন্থি পর্যন্ত সুন্নায় বিবৃত হয়েছে গ্রন্থিসহ ধৌত করবে। জংঘা ও পায়ের সংযোগস্থলে যে দু'টি হাড় বাইরের দিকে উঁচু হয়ে থাকে সে দু'টিকে كَعْب বা গ্রন্থি ও গোড়ালীর হাড় বলা হয়। এখানে হাত ও পা অর্থাৎ অজুতে যে দু'টি অঙ্গের সম্পর্ক হলো ধৌত করার সাথে এতদুভয়ের মাঝে মাসাহ করার সাথে সম্পর্কিত মাথার বিধান উল্লেখ করায় প্রমাণ হয় যে, অজুর সময় এগুলোর মধ্যে تَرْتِيْب বা আনুপূর্বিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখা ওয়াজিব। এটিই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। হাদীসে আছে যে, অন্যান্য ইবাদতের মতো অজুতেও নিয়ত করা ওয়াজিব। যদি তোমরা জুনুবী থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। অর্থাৎ গোসল করে নিবে। যদি তোমরা পীড়িত হও অর্থাৎ এতটুকু অসুস্থ হও যে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর বলে প্রতিভাত হয় অথবা পর্যটনে থাক অর্থাৎ মুসাফির হও অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে আগমন করে অর্থাৎ তোমাদের কেউ 'মুহদাস' বা অজুহীন হয় অথবা তোমরা স্ত্রী-সংগত হও **সূরা নিসায়** এতাদৃশ আয়াতের উল্লেখ হয়েছে।

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً بَعْدَ طَلَبِهِ فَتَيَمَّمُوْا اِقْصِدُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مَعَ الْمَرَافِقِ مِنْهُ ط بِضَرْبَتَيْنِ وَالْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الْمُرَادَ اِسْتِيْعَابُ الْعُضْوَيْنِ بِالْمَسْحِ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ضَيِّقٍ بِمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالذُّنُوْبِ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ بِبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّيْنِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعَمَهُ ـ

এবং অনুসন্ধান করেও পানি না পাও তবে বিশুদ্ধ মাটির অর্থাৎ পবিত্র মাটির তায়াম্মুম করবে, ইচ্ছা করবে এবং সেটা দু'বার কনুইসহ তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে; بِوُجُوْهِكُمْ-এর بَاءٌ-টি اِلْصَاقٌ বা মিলানো, লেপটানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে যে, মাসাহ -এর বেলায় উভয় অঙ্গ اِسْتِيْعَابٌ বা সম্পূর্ণ আবেষ্টন করে নিতে হবে। অজু গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদির বিধান ফরজ করত আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, অসুবিধায় ফেলতে চান না [বরং তিনি তোমাদেরকে] পাপ ও অপবিত্রতা হতে পবিত্র করতে চান এবং দীনের বিধানসমূহ বর্ণনা করে দিয়ে তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা তাঁর নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ اَرَدْتُمُ الْقِيَامَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ দ্বারা বোঝা যায় যে, নামাজ শুরু করার পর 'তাহারাত' আবশ্যক। অথচ নামাজ শুরু করার পূর্বেই 'তাহারাত' অর্জন করা জরুরি।

উত্তর. আয়াতে বর্ণিত শব্দ اِذَا قُمْتُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِذَا اَرَدْتُمُ الْقِيَامَ অর্থাৎ যখন তোমরা নামাজ পড়ার ইচ্ছা কর তখন 'তাহারাত' হাসিল কর।

প্রশ্ন. এখানে আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, قُمْتُمْ বলে اَرَدْتُمْ উদ্দেশ্য নেওয়ার মাঝে সামঞ্জস্যতা কী?

উত্তর. এখানে مُسَبَّبٌ বলে سَبَبٌ মুরাদ নেওয়া হয়েছে। যেহেতু اِرَادَةٌ হলো قِيَامٌ বা দণ্ডায়মান হওয়ার سَبَبٌ এবং قِيَامٌ হলো مُسَبَّبٌ তাই এখানে قِيَامٌ বলে اِرَادَةٌ মুরাদ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে নিম্নোক্ত سُوَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব স্বরূপ।

প্রশ্ন. উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যখনই নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে তখনই 'তাহরাত' অর্জন করতে হবে। চাই পূর্বে তাহারাত থাক বা না থাক। আসলেই কি বিষয়টি এমন?

উত্তর. অজু তথা তাহারাত ঐ সময় আবশ্যক যখন তাহারাত না থাকবে। এর প্রতি আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা উত্তম।

قَوْلُهُ اَلْمَرَافِقِ : এটি مِرْفَقٌ-এর বহুবচন। অর্থে ঐ জোড়া যা বাহু এবং কালাইয়ের মাঝে অবস্থিত। যাকে বাংলায় কনুই বলে।

قَوْلُهُ اَلْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ : কেউ বলেন, এখানে بَاءٌ অতিরিক্ত। কেউ বলেন تَبْعِيْضٌ -এর জন্য। ইবনে হিশাম এবং জমখশরী বলেন, اِلْصَاقٌ -এর জন্য। অর্থাৎ পূর্ণ মাথা কিংবা আংশিক মাথার সাথে মাসাহকে সম্পৃক্ত করে দাও। ইমাম মালেক এবং আহমদ (র.) সতর্কতামূলক اِسْتِيْعَابٌ বা পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব বলেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) اَقَلُّ مِقْدَارٍ

বা সর্বনিম্ন পরিমাণকে ওয়াজিব বলেছেন। কেননা এটা মাসাহ -এর নিশ্চিত পরিমাণ। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করা ওয়াজিব বলেছেন। তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন– إِنَّهُ مَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ - اَلنَّاصِيَةُ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ وَهُوَ بِقَدْرِ الرَّأْسِ অর্থাৎ হাদীসে আছে রাসূল ﷺ نَاصِيَة তথা মাথার অগ্রভাগে মাসাহ করেছেন।

قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ : অর্থাৎ أَرْجُلَكُمْ -এর মাঝে দু'টি কেরাত রয়েছে, তন্মধ্যে ১টি হচ্ছে, لَامْ বর্ণে ফাতহাসহ। এটি নাফে ইবনে আমের, কাসাই এবং হাফস (র.) হযরত আসেম থেকে বর্ণনা করেন।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ : এটি অন্যান্য কারী সাহেবদের মতে। এ ইখতেলাফের কারণে পা ধৌত করা কিংবা মাসাহ করার ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে ধৌত করা ওয়াজিব এবং শীয়াদের মতে মাসাহ করা ওয়াজিব। আর দাউদ ইবনে আলী এবং যায়দিয়া ফেরকার নিকট ধৌত এবং মাসাহ উভয়ের মাঝে সমন্বয় করার মতো প্রদান করে।

قَوْلُهُ وَالْجَرُّ لِلْجَوَارِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন. অনেক কারী সাহেব أَرْجُلَكُمْ -এর মাঝে لَامْ বর্ণে কাসরা দিয়ে পড়ে থাকেন। جَرّ দিয়ে পড়ার সূরতে رُؤُسِكُمْ -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে মাসাহর হুকুম হবে। অথচ এ মাযহাব খারেজী এবং শিয়াদের। যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাবের পরিপন্থি।

উত্তর : أَرْجُلَكُمْ -এর মাঝে لَامْ বর্ণে কাসরা দিয়ে পড়ার কারণ جَوَارْ বা প্রতিবেশির প্রতি লক্ষ্য রাখা مَجْرُوْر -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে নয়। কুরআন এবং আরবদের ভাষায় এরূপ ব্যবহারের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا : যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের [illegible] জীবন ও পানাহার সম্পর্কিত হালাল বস্তুসমূহের আলোচনা ছিল। যা আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। সুতরাং [illegible] হলো, নিয়ামতদাতার শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা। আর কৃকজ্ঞতা আদায়ের একটি পদ্ধতি হলো [illegible] বা পবিত্রতা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তাহারাতের জন্যও তার পদ্ধতি জানা আবশ্যক। এ [illegible] পদ্ধতিও বর্ণনা করা হচ্ছে। –[জামালাইন ২/১৬৬]

[illegible] ভূষিত করা হলো তা শোনামাত্র একজন ভদ্র ও সত্যনিষ্ঠ [illegible] হয়ে উঠবে। স্বভাবতভাবেই তাঁর ইচ্ছা জাগবে সেই [illegible] দিতে কৃপা স্বীকার এবং চরম বন্দেগী ও [illegible] ইচ্ছা করবে তথা সালাত [illegible] ও স্বভাবতই পছন্দনীয় [illegible] তা এক পর্যায়ে মানুষকে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি হতে দূরে সরিয়ে পাশবিক গুণাবলির নিকটবর্তী করে দেয়। অজু ও গোসলের সমস্ত কারণ সেইসব উপভোগেরই অনিবার্য সৃষ্টি। কাজেই তোমাদের মনোলোভা বস্তুসমূহ হতে সম্পূর্ণ [illegible] হয়ে যখন আমার দিকে আমার ইচ্ছা করবে তখন প্রথম পাশবিকতার প্রভাবাদি ও পানাহার ইত্যাদি হতে সৃষ্ট মলিনতা হতে পবিত্র হয়ে নাও। এ পবিত্রতা অজু ও গোসল দ্বারা অর্জিত হয়। অজু দ্বারা মুমিনের দেহই যে পাক-সাফ হয় তা নয়, বরং যথানিয়মে অজু করলে তার পানির ফোটার সাথে গুনাহও ঝরে যায়। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-৩৪]

নামাজের জন্য অজু অপরিহার্য : ঘুম থেকে জাগ বা পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে সালাত আদায়ার্থে উঠ। প্রথমে অজু করে লও। তবে অজু করা জরুরি তখনই, যখন প্রথম থেকে অজু না থাকে। আয়াতের শেষে এসব বিধানের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে– وَلٰكِنْ لِيُطَهِّرَكُمْ তবে তিনি তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে চান।' এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দরবারে স্থান দেওয়ার জন্যই হাত মুখ ইত্যাদি ধোয়াকে আবশ্যিক করেছেন। যদি এ পবিত্রতা পূর্ব থেকে অর্জিত থাকে এবং তা ভঙ্গের কোনো কারণ না পাওয়া গিয়ে থাকে, তবে পবিত্রকে পুনরায় পবিত্র করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে পবিত্রতার্জনকে আবশ্যিক করা হলে উম্মত অসুবিধায় পড়ে যেত। ইরশাদ হয়েছে– مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ حَرَجٍ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা

তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না।" হ্যাঁ, অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতা, জ্যোতিময়তা এবং উদ্যম অর্জনের জন্য তাজা অজু করা হলে সেটা মোস্তাহাব। সম্ভবত এ জন্যই إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ আয়াতের অঙ্গ বিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যা দ্বারা প্রত্যেকবার সলাত আদায়ে যাওয়ার সময় নতুন অজু করার প্রতি উৎসাহ পাওয়া যায়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৩৫]

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজের ইরাদা কর, অথচ অজু নেই أَىْ إِذَا أَرَدْتُّمْ যখন তোমরা ইরাদা করবে। অর্থাৎ যখন তোমরা দাঁড়াবার ইরাদা করবে, কাজের ইরাদার দ্বারা আসল কাজের কথা বলা হয়েছে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য। অজু অবস্থায় নেই বা অজু নষ্ট হয়ে গেছে। এ বাক্যটি উহ্য ধরে নেওয়া হয়েছে। এটা সর্ববাদী অভিমত। এজন্য অজু থাকার পর আবার অজু করা নামাজের জন্য জরুরি নয়। আয়াতে প্রকাশ্য অর্থ যে ব্যক্তি নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তার জন্য অজু করা ওয়াজিব, যদি সে মুহদাস বা অপবিত্র না হয়: কিন্তু ইজমা বা সর্ববাদী অভিমত এর বিপরীত। সাধারণত আমি এর দ্বারা কয়েদ বা শর্তের ইরাদা করেছি। আসল অর্থ হলো− যখন তোমরা নাপাক অবস্থায় নামাজের জন্য প্রস্তুতি নেবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.), আবূ মূসা (রা.), জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), উবায়দা সালমানী, আবূ আলীয়া, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, ইবরাহীম ও হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, যদি শরীর অপবিত্র না হয়, তবে সব সালাতের জন্য অজু করা ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। বস্তুত নতুন অজুর ফজিলত খুব বেশি- তা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনদের সাধারণ আমল এরূপ ছিল। সুতরাং এবং এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অজু থাকা সত্ত্বেও অজু করা মোস্তাহাব। মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে নতুনভাবে অজু করা অতীব উত্তম। হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা প্রত্যেক সালাতের জন্য নতুন অজু করতেন। আর তাদের এ আমল মোস্তাহাব হিসেবে পরিগণিত। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে আমি তাদেরকে সব সালাতের সময় অজু করার নির্দেশ দিতাম। এসব বর্ণনায় জানা যায় যে, সব নামাজের জন্য অজু করা মোস্তাহাব, যদি নামাজি অপবিত্র না হয়। ইবনে সিরীন (র.) বলেন, খুলাফায়ে রাশেদীন সব নামাজের জন্য অজু করতেন। তারা এ নির্দেশকে মোস্তাহাব, হিসেবে গ্রহণ করেন এবং অধিকাংশ সাহাবী যাদের মধ্যে ইবনে ওমর (রা.)-ও শামিল, তাঁরা ফজিলতের আশায় সব নামাজের জন্য অজু করতেন এবং নবী কারীম ﷺ -ও এরূপ করতেন। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৩৫]

قَوْلُهُ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ : এখন অজুর আরকান [বিধান] বর্ণিত হচ্ছে। অন্য ধর্মের বিপরীতে ইসলাম অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হাসিলের সাথে সাথে বাহ্যিক ও শারীরিক পবিত্রতার জন্য তাগিদ দেয়। আর ইসলাম তার মৌলিক ইবাদত নামাজের উর্ধ্বে অজু করা আবশ্যক মনে করে। অজু ছাড়া নামাজ হয় না। হুকুম আহকামের আয়াতগুলো কুরআনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আলেমদের অভিমত এই যে, এই আয়াতগুলো কুরআন মজীদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসাইলের আয়াত। এর অধিকাংশই ইবাদত সম্পর্কিত হুকুম-আহকাম, যা তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমন কি এ একটা আয়াত থেকে কোনো কোনো আলেম ও ফকীহ আটশত এমন কি হাজার হাজার মাসআলা বের করেছেন। একজন আলেম বলেন, এর মধ্যে এক হাজার মাসআলা আছে। আমাদের মদীনার সাথীগণ এটা অন্বেষণ করা শুরু করেন এবং তারা আটশো মাসআলা পর্যন্ত পৌঁছান; কিন্তু তারা হাজারে পৌঁছতে পারেননি। অজুর মধ্যে কেবল চারটি জিনিস ফরজ, আর এগুলো এ আয়াতে বর্ণিত আছে। যথা− ১. فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করবে। ২. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ কনুইসহ হাত ধৌত করবে। ৩. وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ তোমাদের মাথা মাসাহ করবে। অথবা পানি ভেজা হাত মাথায় বুলাবে। ৪. وَ(اغْسِلُوْا) أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থাৎ টাখনুসহ পা ধৌত করবে। এছাড়া আর যা আছে; যথা কুলি করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, গরগরা করা ইত্যাদি। এর মধ্যে কিছু আছে সুন্নত এবং কিছু মোস্তাহাব। বিস্তারিত ফিকহের কিতাবে আছে। তাফসীরে এর বিবরণের প্রয়োজন নেই। অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি দেওয়া, ধৌত করা, ময়লা, সাফ করা ইত্যাদি কাজে যত হিকমত বা গুঢ় রহস্য আছে এবং শরীরের জন্য কল্যাণকর যা এতে রয়েছে, হুজুরে ক্বালব বা একাগ্রতা সৃষ্টিতে যা সহায়ক এসব ব্যাপারে লিখতে গেলে একটা আলাদা গ্রন্থের প্রয়োজন পড়বে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন− فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চেহারা ধৌত করবে। ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট চেহারা ধোয়ার অর্থ হলো, তার উপর পানি ঢেলে দিয়ে হাত ফেরাতে হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট চেহারার উপর কেবল পানি ফেলে দিলেই হবে হাত দিয়ে মলার বা রগড়াবার দরকার নেই। চেহারা ধৌত করার জন্য, তার উপর পানি দেওয়া এবং হাত দিয়ে মলা আমাদের নিকট খুবই জরুরি। অন্যেরা বলেন, এটাই আমাদের সাথী ও সর্বস্তরের ফকীহদের অভিমত যে, চেহারার উপর পানি দেওয়াই যথেষ্ট হাত দিয়ে রগড়ানোর দরকার নেই।

قَوْلُهُ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ : এবং তোমাদের হাতগুলো কনুইসহ ধৌত করবে। اِلٰى শব্দটি শেষ অবস্থা বা প্রান্ত বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এর সীমানার বর্ণনা আয়াতে আছে। কেননা اِلٰى শব্দের আগেও পরে যা আছে, তা একত্র করতে হবে, বা আলাদা রাখতে হবে। অভিজ্ঞ ব্যাকরণবিদের অভিমত হলো, পরে বর্ণিত জিনিস যদি পূর্বে বর্ণিত জিনিসের অনুরূপ হয়, তবে তা পূর্বের সাথে একত্র করতে হবে। আর যদি ভিন্ন হয়, তবে তা বহির্ভূত থাকবে। কেননা اِلٰى শব্দের পরে যা বর্ণিত হয়, তা যদি তার পূর্বের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সীবাওয়াইহ ও অন্যান্যদের এটাই অভিমত।
–[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ৩৬]

قَوْلُهُ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ : [বা অন্য কোনো উপায়ে গোসল নষ্ট হয়ে যায় এবং গোসলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়] لٰمَسْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা স্পর্শ কর। এখানে স্পর্শ করা অর্থ হলো: স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা। সাহাবা, তাবেয়ীনের মতে এবং অভিধানে এর অর্থ এরূপই। স্পর্শ করার অর্থ হলো, সহবাস করা। স্পর্শ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে সহবাসের প্রতি। হযরত আলী (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মূসা (রা.), হাসান, উবায়দা ও শা'বী (র.) বলেন, স্পর্শ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে সহবাসের প্রতি। যদি কেউ পড়ে اَوْ لَمَسْتُمْ অথবা তোমরা স্পর্শ কর [নারীদের], এখানে স্পষ্ট যে, স্ত্রীদের সাথে সহবাস বুঝানো হয়েছে। কেননা স্পর্শ, দু'জন না হলে সম্ভব নয়, খুব কম জিনিসেই এটা হতে পারে। –[তাফসীরে মাজেদী: টীকা-৩৮]

তায়াম্মুমের বিধান : অজু ও গোসলের সবধরনের প্রয়োজনীয়তার সাথে এটা সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যখন পানি ব্যবহারে সক্ষম হবে না, চাই তা অসুখের কারণে হোক, বা দূরত্বের কারণে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক না কেন। এর অর্থ হলো: যদি তোমরা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হও। সর্দি লাগার ভয়, রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা , পানি আনা খুবই কষ্টকর, এসবের হুকুম পানি না পাওয়ার হুকুমের মধ্যে শামিল। হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, একদা হযরত আমর ইবনে আস (রা.) তাঁর সাথে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করেন। কেননা পানি ব্যবহারে তাঁর সর্দি লাগার আশঙ্কা ছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা বৈধ রেখেছেন। আমর ইবনে আস (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, সর্দি লাগার ভয়ে, পানি থাকা সত্ত্বেও তিনি তায়াম্মুম করেন। আর এ ব্যাপারে নবী করীম ﷺ তাকে অনুমতি দেন। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সর্দির কারণে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মাদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে গোসল করতে ভয় পায়, তার জন্য ক্ষতির ভয়ে তায়াম্মুম করা জায়েজ। তায়াম্মুম করার পর নামাজের জামাতে শামিল হওয়ার অনুমতি হাদীসে আছে। ইমরান ইবনে হুসাইন এর হাদীসে আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে আলাদা দেখতে পেলেন, তিনি সকলের সাথে নামাজ আদায় করলেন না। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! জামাতের সাথে নামাজ পড়তে কে তোমাকে বাধা দিয়েছে? তখন সে সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, কিন্তু আমার কাছে কোনো পানি নেই। তখন রাসূল ﷺ বলেন, তোমার জন্য পবিত্র মাটিই যথেষ্ট ছিল। বুখারী শরীফে এটা উল্লেখ আছে। উম্মতের ফকীহগণ, যাঁদের উম্মতের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী বলা যেতে পারে, তারা ব্যাপারটি পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন। পানি তো পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু মূল্য খুব বেশি। আর যদি এরূপ অল্প পানি অবশিষ্ট থাকে যে, অজু করার ফলে পান করার জন্য কোনো পানি থাকবে না, এ ধরনের সব ক্ষেত্রে পানি অবশিষ্ট থাকা না থাকার হুকুম এবং তায়াম্মুম করা দুরস্ত হবে। আমাদের সাথীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কেউ পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা তার পবিত্রতা হাসিলের জন্য যথেষ্ট হবে, কোনো ক্ষতি ব্যতিরেকে, তবে সে তা করবে। আর যদি তার সাথে পানি থাকে, অথচ সে পানি ব্যবহারে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, অথবা সে বহু মূল্য দেওয়া সত্ত্বেও পানি পাবে না, এমতাবস্থায় সে তায়াম্মুম করবে। আর এ ব্যাপারে তার কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই।
–[তাফসীরে মাজেদী: টীকা-৩৯]

قَوْلُهُ صَعِيْدًا طَيِّبًا : তায়াম্মুমের বর্ণনা এবং তায়াম্মুম করার নিয়ম সূরা নিসার সংশ্লিষ্ট আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। صَعِيْدًا طَيِّبًا অর্থাৎ পবিত্র মাটি দিয়ে। صَعِيْدًا -এর অর্থ হলো– মাটি জাতীয় জিনিস। যে জিনিসে মাটির অংশ থাকবে, তা এ হুকুমের মধ্যে শামিল। صَعِيْدٌ মাটির নাম। কাজেই মাটি জাতীয় জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম করা যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, জমিনের মাটি, বালি ও পাথর ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪০]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ "যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর"-এর তাৎপর্য : পূর্বের রুকূতে যে নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা হয়েছিল তা শুনে বান্দার মনে আলোড়ন জেগে উঠল সেই সত্যিকার অনুগ্রহদাতার বন্দেগী করার জন্য পত্রপাঠে দাঁড়িয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিলেন, তাঁর দরবারে হাজিরা দিতে হলে কীভাবে পাক-পবিত্র হয়ে দিতে

হবে। এ শিক্ষা দানও একটা নিয়ামত হলো। আর পানি ও মাটির ব্যবহার দ্বারা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা সাধন করা আরো এক নিয়ামত। তাই ইরশাদ হয়েছে- لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আগের ঐসব নিয়ামত স্মরণ করার পূর্বে এ নতুন নিয়ামতরাজির, যা অজুর বিধান প্রসঙ্গে প্রদত্ত হলো, শোকর আদায় করা উচিত। সম্ভবত এ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ থেকেই হযরত বিলাল (রা.) তাহিয়্যাতুল অজুর সন্ধান পেয়েছেন। এ মধ্যবর্তী নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন করার পর পূর্বের আয়াতে বর্ণিত সেই মহা অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজিকে পুনরায় সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে বান্দা নিজ প্রতিপালকের দরবারে দণ্ডায়মান হতে ইচ্ছা করেছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৪২]

قَوْلُهُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ : আল্লাহর রবুবিয়াতের অঙ্গীকার : مِيْثَاقَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অঙ্গীকার। এর দ্বারা কোনো অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে? এক দলের অভিমত হলো: এর অর্থ আলেম আরওয়াহ বা রূহের জগতের সেই অঙ্গীকার, যা সমস্ত বনী আদম থেকে আল্লাহর রব হওয়া সম্পর্কে গৃহীত হয়েছিল। মুজাহিদ, কালবী ও মুকাতিল (র.) বলেন, এ হলো সে অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তা'আলা তাদের [রূহদের] থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যখন তিনি তাদেরকে আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছিলেন। মানুষের আত্মার মাঝে স্বভাবগতভাবে আল্লাহর সন্ধান লাভের জন্য যে ব্যাকুলতা আছে; এ হলো সে অঙ্গীকারের বাহ্যিকরূপ। কিন্তু এখানকার সম্বোধনটি সমস্ত মানুষ জাতির জন্য নয়, বরং এখানে কেবলমাত্র ঈমানদারকে সম্বোধন করা হয়েছে। সে জন্য সহজ ও সরলভাবে এ অঙ্গীকারের অর্থ হলো তা, যা একজন কালিমা পাঠকারী ইসলাম কবুল করার সময় করে থাকেন; অর্থাৎ ইসলামের হুকুম-আহকাম প্রতিপালনের জন্য ব্যাপক অঙ্গীকার। কথিত আছে- মীসাক হলো মুমিনের অঙ্গীকার, যার নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়েছে। এর চাইতে হৃদয়গ্রাহী তাফসীর হলো- مِيْثَاقَكُمْ বা তোমাদের অঙ্গীকার এর অর্থ হচ্ছে- ঐ বায়'আত ও ইতা'আত [অনুসরণ], যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং বিশিষ্ট তাবেয়ী সুদ্দী (র.) ও অন্যান্যদের থেকে এরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরীনের অভিমত; যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সুদ্দী (র.) প্রমুখ। তারা বলেন, এ হলো সেই ওয়াদা ও অঙ্গীকার, যা তাঁরা মহানবী ﷺ -এর সঙ্গে আকাবার রাতে এবং গাছের নীচে শ্রবণ ও অনুসরণ দ্বারা সুখে ও দুঃখে সর্বাবস্থায় মেনে চলার জন্য করেছিলেন। এ হলো সেই অঙ্গীকার, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাদের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শুনবেন এবং মানবেন। এ হলো সে অঙ্গীকার, যা তারা শুনবেন ও মানবেন বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বায়আতের সময় স্বীকার করে নিতেন, তাদের ভালো ও মন্দ সর্বাবস্থায়। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত। এরূপ অঙ্গীকার তো নিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের শান ও মর্যাদা প্রকাশের জন্য এর সম্পর্ক নিজের জাতের দিকে করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন- اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ বরং তারা আল্লাহর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে, যদিও তারা আসলে বায়'আত গ্রহণ করেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের সাথের অঙ্গীকারকে, তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তাবেয়ী সুদ্দী (র.) থেকে এরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে যে, এ মীসাক বা অঙ্গিকারের অর্থ হলো: ইসলামের সত্যতার জ্ঞানজাত ও লিখিত দলিল। যুক্তিবাদীগণ সাধারণত এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুদ্দী (র.) বলেন, মীসাকের অর্থ হলো, জ্ঞানজাত ও শরিয়তের ঐ সমস্ত দলিল প্রমাণ, যা আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও দীনের বিধি-বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অধিকাংশ যুক্তবাদীদের অভিমত এরূপ। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪৫]

قَوْلُهُ يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ : "আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষ্য প্রদান"-এর মর্মকথা : এর আগের আয়াতে মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি ও নিজেদের ওয়াদা অঙ্গীকার স্মরণ করতে আদেশ করা হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে, কেবল মুখে স্মরণ করা নয়, বরং কার্যকর পন্থায় তার প্রমাণ দিতে হবে। এ আয়াতে এরই প্রতি সজাগ করা হয়েছে যে, তোমরা যদি মহান আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ ও নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার বিস্মৃত না হয়ে থাক, তবে তোমাদের কর্তব্য সেই সত্যিকার অনুগ্রকারীর হক আদায় ও নিজেদের প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করার নিমিত্ত সদাসর্বদা কোমর বেঁধে থাকা এবং নিয়ামতের প্রকৃত মালিক মহান পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে কোনো আদেশ আসামাত্র তা তা'মীল করার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া। সেই সাথে মহান আল্লাহর হকের সঙ্গে মাখলুকের হক আদায়েও পূর্ণ যত্নবান থাকা। قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ -এর মাঝে হক্কুল্লাহ এবং شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ -এর মাঝে হক্কুল ইবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম পারার শেষেও এ রকমের একটি আয়াত আছে। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, সেখানে بِالْقِسْطِ -কে لِلّٰهِ -এর আগে আনা হয়েছে। তার কারণ সম্ভবত এই যে, সেখানে বহু দূর হতে হক্কুল ইবাদের আলোচনা চলে আসছিল, আর এখানে প্রথম থেকেই

হক্কুল্লাহর উপর বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ হিসেবে সেখানে بِالْقِسْطِ -কে এবং এখানে لِلّٰهِ -কে প্রথমে আনা স্থানোপযোগী হয়েছে, তাছাড়া এখানে বিদ্বিষ্ট শত্রুর সাথে আচরণের কথা বলা হয়েছে। তাই ইনসাফের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। আর সূরা নিসায় রয়েছে পছন্দনীয় বস্তুর উল্লেখ। তাই সেখানে সবচেয়ে প্রিয়তমের তথা মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করানো হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা ৪৫]

قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا : সুবিচার ও ন্যায়-নীতি : বস্তুত হক আদায়ের দ্বিতীয় নাম হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। اَلَّا تَعْدِلُوْا - اِعْدِلُوْا বা সুবিচার না করা; সুবিচার করবে; অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে প্রথমে বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফী করতে মানা করা হয়েছে; পরে বলা হচ্ছে: পরিপূর্ণ ইনসাফ কায়েম করবে। شَنَاٰنُ قَوْمٍ বা কোনো কাওমের প্রতি বিদ্বেষ। মুসলমান হওয়ার কারণে যে কাওমের সাথে মুসলমানদের দুশমনী বা শত্রুতা হবে; উল্লেখ্য যে, তারা হবে ইসলামের দুশমন কাফের সম্প্রদায়। সুতরাং বলা হলো: দুশমনদের হক আদায়েও যেন ত্রুটি না করা হয়। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! দুনিয়ার এমন কোন আইন পাওয়া যাবে, সেখানে তাদের শত্রু ও বিদ্রোহীদের হক আদায়ে এমন উদারতা দেখিয়েছে। ফকীহগণ আয়াত থেকে এরূপ [নির্দেশ] বের করেছেন যে, কাফেরদের কুফরি তাদেরকে এ সুযোগ থেকে মাহরূম করনি, তাদের হক পরিবর্তন করা যাবে; বরং তাদের হক আদায় করতে হবে। আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরের কুফরি তাদের উপর ইনসাফ করতে বাধা দেয় না। আর যখন কাফেরের সাথে ইনসাফ করা জরুরি, তখন কুফরি থেকে কম স্তরের জিনিস, তথা ফাসেক ও বেদয়াতীদের সাথে কেন ইনসাফ করা যাবে না? যখন বিদ্রোহী ও খোদাদ্রোহীদের সাথে ইনসাফ করা জরুরি, তখন তাওহীদ ও রিসালাত স্বীকারকারীদের সাথে ইনসাফ করা আরো অধিক জরুরি নয় কী? বড় বড় ব্যাখ্যাকারগণ বার বার এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এতে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে যে, কাফের- যারা আল্লাহর শত্রু, তাদের সাথে ইনসাফ করার নির্দেশ যদি এরূপ হয়, তবে মুমিনদের সাথে কি ধরনের ইনসাফ করা প্রয়োজন। আয়াতে মুমিনদের হক ইনসাফের সাথে আদায়ের নির্দেশ আছে, যখন আল্লাহ কাফেরদের প্রতিও ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। ভীষণ ক্রোধের সময় কে নিজেকে সংযত রাখতে পারে। এখানে এ ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে তোমাদের অন্তরে যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়, তা যেন তোমাদেরকে তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ না করে। আদল ও ইনসাফ সর্বাবস্থায় যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে। প্ররোচিত করার অর্থ হলো- মুশরিকদের প্রতি তোমাদের ক্রোধ যেন ইনসাফ বহির্ভূত না হয়; এমতাবস্থায় তোমরা তাদের সাথে এমন কাজ করে বসবে, যা বৈধ নয়। প্রথমে তাদেরকে এমন বিদ্বেষ পরিহার করতে বলা হয়েছে, যা ইনসাফ না করতে উদ্বুদ্ধ করে, পরে বাক্যের ধারা পরিবর্তন করে তাদেরকে স্পষ্টভাবে 'আদল' বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, কাজের ব্যাপারে স্বভাবের চাহিদা মতো আমল না করা একটি মুজাহাদা। এখানে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪৮]

قَوْلُهُ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى : তাকওয়ার অর্থ ও অর্জনের উপায় : যেসব জিনিস শরিয়তে নিষিদ্ধ বা কোনো প্রকারের ক্ষতিকারক তা পরিহার করে চলার দ্বারা মানব মনে যে এক জ্যোতির্ময় অবস্থা বলিয়ান হয়ে উঠে তার নাম তাকওয়া। তাকওয়া অর্জন করার বহু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উপায় উপকরণ আছে। যাবতীয় সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্রকে তাকওয়া হাসিলের মাধ্যম ও উপকরণরূপে গণ্য করা যায়। তবে আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আদল ও কিসত অর্থাৎ দোস্ত ও দুশমনের প্রতি সমান ইনসাফ করা এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও শত্রুতার ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, এ মহৎ গুণই তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও নিকটতম মাধ্যমসমূহের অন্যতম। এজন্যই বলা হয়েছে- هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -এর আদল [ন্যায়পরায়ণতা], যার নির্দেশ তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। এর চর্চা দ্বারা দ্রুত তাকওয়ার অবস্থা অর্জিত হয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৪৭]

আদল ইনসাফ মুত্তাকীদের সবচেয়ে বড় গুণ : যেই আদল ও ইনসাফকে কোনো রকমের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা ব্যাহত করতে না পারে এবং যা অবলম্বন করলে মানুষের জন্য মুত্তাকী হওয়া সহজ হয়ে যায়, তা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর শাস্তির চিন্তা اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -এর বিষয়বস্তুকে পুন:পুন: স্মরণ করার দ্বারা এই ভীতি জাগরিত হয়। যখন কোনো মুমিনের অন্তরে এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকবে যে, আমার কোনো প্রকাশ্য ও গোপন কাজ মহান আল্লাহর অগোচরে থাকে না। তখন মহান আল্লাহর ভীতিতে তার অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকবে, যার ফলশ্রুতিতে যেসব ব্যাপারে ন্যায় ও ইনসাফের পথ অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য গোলামের মতো প্রস্তুত থাকবে। এর ফলে সে যে প্রতিদান লাভ করবে তা সামনের وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৪৮]

পরীক্ষার নম্বর, সনদ, সার্টিফিকেট ও নির্বাচনে ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত : পরিশেষে এখানে আরেকটি বিষয় জানা জরুরি। তা এই যে, আজকাল 'শাহাদাত' তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মুকদ্দমায় কোনো বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় 'শাহাদত' শব্দটি আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণত যদি ডাক্তার কোনো রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকরি করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবিরা গুনাহ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেওয়া একটি শাহাদাত। যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশি নম্বর দেওয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে। উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই [illegible] এমনিভাবে আইন সভা ও কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেওয়াও [illegible] যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং সততা ও [illegible] চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কতজন [illegible] বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হারজিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনো [illegible] ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়। কখনো চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনো সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনো চিন্তা করে না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোট দেওয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে যাকে শাফাআত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কুরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, তাকে সুপারিশকৃত ব্যক্তির পুণ্য থেকে অংশ দেওয়া এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ ভোটপ্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্য উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোটদাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সেই পেত, তবে এর জন্য সে নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা এ ওকালতি এমন সব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত, যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরিক। কাজেই কোনো অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্বের জন্য ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে বসবে।

মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। যথা– ১. সাক্ষ্যদান। ২. সুপারিশ করা এবং ৩. সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোটদান করা যেমন বিরাট ছওয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি অযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশত অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৫৯-৬১]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا : এর দ্বারা পূর্ববর্তী দলের বিপরীতে সেই দলের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা কুরআন মাজীদের এমন সব সুস্পষ্ট বক্তব্য ও নিদর্শনকে অস্বীকার করে, সত্য পথের সঠিক সন্ধান দেওয়ার জন্য যা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৫০]

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ : অর্থাৎ জাহান্নামের অধিবাসী। এখানে অধিবাসী বলতে কিছুদিনের জন্য নয়; বরং তারা চিরদিন এবং চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৫১]

قَوْلُهُ يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا الخ : সূরা মায়িদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেওয়ার এবং তাদের তা মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন– وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ। এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং শরিয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ শরিয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। এ কারণেই اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরিউক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলাকৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করে, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়েছে, একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তাফসীরবিদরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণত মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাকে হযরত জাবের কর্তৃক বর্ণিত আছে, কোনো এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীরা বিশ্রাম নিতে লাগলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নিচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হাত করে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারি উঁচিয়ে বলল, এখন আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আল্লাহ তা'আলা। আগন্তুক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন, আল্লাহ তা'আলা। কয়েকবার এরূপ বাক্য বিনিময় হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারি কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের ডেকে ঘটনা শোনালেন। আগন্তুক বেদুঈন তখনো তাঁর পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না।

কোনো কোনো সাহাবী থেকে এ আয়াতের তাফসীরে প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মকদ্দমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী নযীরের ইহুদিদের বস্তিতে যান। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে দিয়ে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহশ নামক এক দুরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পেছনে দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গাম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

এসব ঘটনায় কোনো বৈপরীত্য নেই, সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের অদৃশ্য হেফাজতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে– اِتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ; এতে প্রথমত বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাজতের আসল কারণ হচ্ছে, তাকওয়া তথা আল্লাহর উপর নির্ভর করা। যে কোনো জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে এভাবে হেফাজত ও সংরক্ষণ করা হবে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৬৩, ৬৪]

অনুবাদ :

٧. وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِالْاِسْلَامِ وَمِيْثَاقَهُ عَهْدَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ لا عَاهَدَكُمْ عَلَيْهِ اِذْ قُلْتُمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ بَايَعْتُمُوْهُ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز فِيْ كُلِّ مَا تَاْمُرُ بِهٖ وَتَنْهٰى مِمَّا نُحِبُّ وَنَكْرَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط فِيْ مِيْثَاقِهٖ اَنْ تَنْقُضُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ فَبِغَيْرِهٖ اَوْلٰى ـ

৭. ইসলামের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ তা স্মরণ কর। এবং তোমরা যখন রাসূল ﷺ -কে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণের সময় বলেছিলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে যে নির্দেশ দেন এবং আমাদের প্রিয় ও অপ্রিয় যে বস্তু আপনি নিষেধ করেন তা সম্পূর্ণ মেনে নিলাম তখন তিনি তোমাদেরকে যে চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ করেছিলেন, যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছিলেন তাও স্মরণ কর। এবং আল্লাহকে তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বিষয়ে ভয় কর। বক্ষে যা আছে অর্থাৎ অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ে তো তিনি আরো বেশি অবহিত হবেন।

٨. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ قَائِمِيْنَ لِلّٰهِ بِحُقُوْقِهٖ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز بِالْعَدْلِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ شَنَاٰنُ بُغْضُ قَوْمٍ اَيِ الْكُفَّارِ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط فَتَنَالُوْا مِنْهُمْ لِعَدَاوَتِهِمْ اِعْدِلُوْا قف فِي الْعَدُوِّ وَالْوَلِيِّ هُوَ اَيِ الْعَدْلُ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

৮. হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় ও ইনসাফের সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; তার হকসমূহের বিষয়ে সুদৃঢ় থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থাৎ কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার না করার ব্যাপারে উত্তেজিত না করে, প্ররোচিত না করে এবং তাদের প্রতি শত্রুতাবশত তাদের কোনো অন্যায় ক্ষতি করো না। শত্রু ও মিত্র সকলের প্রতি সুবিচার করবে, এটা অর্থাৎ এ সুবিচার করা তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহর তার খবর রাখেন। অনন্তর তিনি তোমাদের তার প্রতিফল দান করবেন।

٩. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا وَعْدًا حَسَنًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ ـ

৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত।

١٠. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ـ

১০. আর যারা কুফরি করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারাই প্রজ্বলিত জাহান্নামের অধিবাসী।

١١. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ هُمْ قُرَيْشٌ اَنْ يَّبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ لِيَفْتِكُوْا بِكُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَعَصَمَكُمْ مِمَّا اَرَادُوْا بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

১১. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় অর্থাৎ কুরাইশগণ তোমাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতে চাইলে অর্থাৎ অকস্মাৎ আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে হাত চালাতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ তাদের সংযত করেছিলেন। তোমাদের বিরুদ্ধে তারা যা করতে চেয়েছিল তা হতে তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেন। আল্লাহকে ভয় কর আর আল্লাহরই প্রতিই বিশ্বাসীগণ নির্ভর করুক।

١٢. وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ج بِمَا يُذْكَرُ بَعْدُ وَبَعَثْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اَقَمْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط مِنْ كُلِّ سِبْطٍ نَقِيْبٌ يَكُوْنُ كَفِيْلًا عَلٰى قَوْمِهِ بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ تَوْثِقَةً عَلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ نَصَرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا بِالْاِنْفَاقِ فِىْ سَبِيْلِهٖ لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْمِيْثَاقِ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَالسَّوَاۤءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسَطُ.

১২. আল্লাহ নিম্নবর্ণিতভাবে বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। আর আমি তাদের মধ্য হতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। بَعَثْنَا -এখানে নাম পুরুষ হতে প্রথম পুরুষে اِلْتِفَاتْ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। অর্থ– প্রেরণ করেছিলাম। প্রতিটি উপগোত্রের একেকজন নেতা ছিল। এরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব গোত্রের পক্ষ হতে এ অঙ্গীকার পূরণের জামিনদার ছিল। বিষয়টি সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছিল। আর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, আমি সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে আছি; যদি তোমরা لَئِنْ -এর لَامْ -টি এখানে قَسَمْ বা শপথ অর্থবোধক। সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও, আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর, তাদেরকে সম্মান কর, সাহায্য কর এবং তাঁর পথে ব্যয় করত আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে অবশ্যই তোমাদের দোষ মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এর এ অঙ্গীকারের পরও কেউ যদি সত্য প্রত্যাখ্যান করে তবে সে নিশ্চয় সরল পথ হারাল। সত্য পথের বিষয়ে ভুল করে ফেলল। اَلسَّوَاۤءُ -এর মূল অর্থ হলো, মাঝামাঝি।

١٣. فَبِمَا نَقْضِهِمْ قَالَ تَعَالٰى فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَا زَائِدَةٌ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ اَبْعَدْنَاهُمْ مِنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ج لَا تَلِيْنُ لِقَبُوْلِ الْاِيْمَانِ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ الَّذِىْ فِى التَّوْرٰىةِ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَغَيْرِهٖ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ لا الَّتِىْ وَضَعَهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا اَىْ يُبَدِّلُوْنَهٗ.

১৩. কিন্তু তারা উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে مَا : এটা এখানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। তাদেরকে অভিসম্পাত করেছি। আমার রহমত হতে বিদূরিত করে দিয়েছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। ফলে ঈমান গ্রহণের জন্য তা আর কোমল হয় না। তারা তাওরাতে রাসূল ﷺ -এর বিবরণ সম্বলিত ও অন্যান্য বিষয়ে যে শব্দাবলি ছিল সেগুলো স্থানচ্যুত করে। অর্থাৎ যে অর্থে আল্লাহ তা'আলা তা রক্ষিত করেছিলেন সেটাকে পরিবর্তন করে।

وَنَسُوْا تَرَكُوْا حَظًّا نَصِيبًا مِّمَّا ذُكِّرُوْا أُمِرُوْا بِهٖ ج فِى التَّوْرٰىةِ مِنْ اِتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَزَالُ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَطَّلِعُ تَظْهَرُ عَلٰى خَآئِنَةٍ اَىْ خِيَانَةٍ مِّنْهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَغَيْرِهٖ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مِمَّنْ اَسْلَمَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ -

এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল নির্দেশিত হয়েছিল সেটার এক অংশ ভুলে গিয়েছে। অর্থাৎ তাওরাতে রাসূল কারীম ﷺ -এর অনুসরণ সম্পর্কে যা নির্দেশ করা হয়েছিল তা পরিহার করে বসেছে। তুমি এখানে মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে। সর্বদা তদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত অর্থাৎ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা ব্যতীত সকলকেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পারে, এদের মাঝে তার প্রকাশ ঘটতে দেখবে। خَآئِنَةٍ : এটা এখানে مَصْدَرْ বা ক্রিয়ামূল অর্থে ব্যবহৃত এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে خِيَانَةٍ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। এদেরকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করার বিধানটি অস্ত্র ধারণ সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে 'মানসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে।

١٤. وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهٖ اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ كَمَا اَخَذْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ الْيَهُوْدِ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص فِى الْاِنْجِيْلِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَغَيْرِهٖ وَنَقَضُوا الْمِيْثَاقَ فَاَغْرَيْنَا اَوْقَعْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط بِتَفَرُّقِهِمْ وَاخْتِلَافِ اَهْوَائِهِمْ فَكُلُّ فِرْقَةٍ تُكَفِّرُ الْاُخْرٰى وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ فِى الْاٰخِرَةِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ -

১৪. যারা বলে 'আমরা খ্রিস্টান' مِنَ الَّذِيْنَ এটা اَخَذْنَا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যেমন ইহুদি সম্প্রদায় তথা বনী ইসরাইলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু ইঞ্জীলে ঈমান আনয়ন ও অন্যান্য বিষয়ে তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গেছে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসেছে। [সুতরাং] পরস্পরে অনৈক্য ও স্বার্থের সংঘাতের ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি, সৃষ্টি করে রেখেছি। ফলে, এদের একদল অপর দলকে কাফের বলে অভিহিত করে থাকে। তারা যা করত শীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে পরকালে তা জানিয়ে দিবেন এবং তাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন।

١٥. يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا مُحَمَّدٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ تَكْتُمُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ كَاٰيَةِ الرَّجْمِ وَصِفَتِهٖ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط مِنْ ذٰلِكَ فَلَا يُبَيِّنُهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ اِلَّا افْتِضَاحُكُمْ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ هُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَّكِتٰبٌ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ لا بَيِّنٌ ظَاهِرٌ -

১৫. হে কিতাবীগণ! অর্থাৎ হে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়! আমার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তোমাদের নিকট আগমন করেছেন। তোমরা কিতাবের অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলের যা লুকিয়ে রাখতে গোপন রাখতে যেমন রাজম অর্থাৎ বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করত হত্যা করার বিধান এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিবরণ সম্বলিত আয়াতসমূহ সে তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং তার অনেকাংশ উপেক্ষা করে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশ করার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ না থাকে তবে কেবল তোমাদের লজ্জা দেওয়ার জন্য তিনি তা প্রকাশ করেন না। আল্লাহর নিকট হতে এ জ্যোতি: অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ ও স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন এক কিতাব অর্থাৎ আল কুরআন তোমাদের নিকট এসেছে।

١٦. يَهْدِىْ بِهِ اَىْ بِالْكِتَابِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ بِاَنْ اٰمَنَ سُبُلَ السَّلٰمِ طُرُقَ السَّلَامَةِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ الْاِيْمَانِ بِاِذْنِهٖ بِاِرَادَتِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

১৬. ঈমান আনয়ন করত যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এটা দ্বারা অর্থাৎ এ কিতাব দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিতে স্বত:প্রণোদিতভাবে অন্ধকার হতে অর্থাৎ কুফরি হতে বের করে আলোর দিকে অর্থাৎ ঈমানের দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে দীনে ইসলামের দিকে পরিচালিত করেন। سُبُلَ السَّلَامِ অর্থ– শান্তির পথসমূহ।

١٧. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط حَيْثُ جَعَلُوْهُ اِلٰهًا وَهُمُ الْيَعْقُوْبِيَّةُ فِرْقَةٌ مِّنَ النَّصَارٰى قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ اَىْ يَدْفَعُ مِنَ عَذَابِ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ط اَىْ لَا اَحَدَ يَمْلِكُ ذٰلِكَ وَلَوْكَانَ الْمَسِيْحُ اِلٰهًا لَقَدَرَ عَلَيْهِ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَاءَهٗ قَدِيْرٌ ـ

১৭. যারা বলে, মারইয়াম তনয় মসীহ-ই আল্লাহ অর্থাৎ তাকে যারা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছেই। এরা হলো ইয়াকুবিয়্যা নামে খ্রিস্টানদের একটি দল বল, মারইয়াম তনয় মসীহ, তার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি আল্লাহ ধ্বংস **করতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁকে বাধা দেওয়ার শক্তি কার আছে? অর্থাৎ তাঁর আজাবকে প্রতিহত করার** ক্ষমতা আর কার আছে? না, কারো সে শক্তি নেই। মসীহ যদি ইলাহ হতো তবে নিশ্চয় তার সে ক্ষমতা থাকতো। আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে অর্থাৎ যাতে চান তাতে শক্তি রাখেন।

١٨. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى اَىْ كُلٌّ مِّنْهُمَا نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ اَىْ كَاَبْنَائِهٖ فِى الْقُرْبِ وَالْمَنْزِلَةِ وَهُوَ كَاَبِيْنَا فِى الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط اِنْ صَدَقْتُمْ فِىْ ذٰلِكَ وَلَا يُعَذِّبُ الْاَبُ وَلَدَهٗ وَلَا الْحَبِيْبُ حَبِيْبَهٗ وَقَدْ عَذَّبَكُمْ فَاَنْتُمْ كَاذِبُوْنَ ـ

১৮. ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই বলে– আমরা আল্লাহর পুত্র অর্থাৎ নৈকট্য ও মর্যাদায় আমরা তাঁর পুত্রের মতো আর স্নেহ ও বাৎসল্যে তিনি আমাদের পিতার মতো ও তাঁর প্রিয়। হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বল, তোমরা যদি এ কথায় সত্য হয়ে থাক, তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? কেননা পিতা তার পুত্রকে এবং প্রিয়জন তার প্রেমাস্পদকে তো আজাব দেয় না, অথচ তিনি তোমাদের বহুবার আজাব দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা মিথ্যাবাদী।

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ خَلَقَ ط مِنَ الْبَشَرِ لَكُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيْبَهُ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ .

বরং আল্লাহ যাদের অর্থাৎ যে সমস্ত মানুষ **সৃষ্টি করেছেন** তাদের মধ্যে তোমরাও মানুষ। সুতরাং তাদের জন্য যা তোমাদের জন্য তা-ই, আর তাদের উপর যা বর্তায় তোমাদের উপরও তা-ই বর্তাবে। তিনি যাকে ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। **যাকে** শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন। সুতরাং এর **উপর কোনো প্রশ্ন** তোলা যেতে পারে না। আসমান ও **জমিন এবং এদের মধ্যে যা কিছু** আছে তার সার্বভৌমত্ব **আল্লাহরই। আর তাঁর দিকেই** প্রত্যাবর্তন। اَلْمَصِيْرُ অর্থ– **প্রত্যাবর্তন স্থল।**

١٩. يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا مُحَمَّدٌ يُبَيِّنُ لَكُمْ شَرَائِعَ الدِّيْنِ عَلٰى فَتْرَةٍ اِنْقِطَاعٍ مِّنَ الرُّسُلِ اِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيْسٰى رَسُوْلٌ وَمُدَّةٌ ذَالِكَ خَمْسُمِأَةٍ وَتِسْعٌ وَّسِتُّوْنَ سَنَةً لِ اَنْ لَا تَقُوْلُوْا اِذْ عُذِّبْتُمْ مَا جَآءَنَا مِنْ زَائِدَةٌ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ط فَلَا عُذْرَ لَكُمْ اِذَا وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ تَعْذِيْبُكُمْ اِنْ لَمْ تَتَّبِعُوْهُ .

১৯. হে কিতাবীগণ! রাসূল প্রেরণ **বন্ধ থাকার পর অর্থাৎ তাতে** বিরতির পর আমার রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ **তোমাদের নিকট** আগমন করেছেন। সে তোমাদের **নিকট তোমাদের ধর্মের** বিধানসমূহ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে যাতে **তোমরা শাস্তিগ্রস্ত** হওয়ার সময় এ কথা বলতে না **পার যে, কোনো সংবাদ** বহনকারী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট **আসেনি।** اَنْ -এর পূর্বে একটি হেতুবোধক لَامْ উহ্য রয়েছে। **এখন তো** তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী **এসেছে।** مِنْ بَشِيْرٍ -এর مِنْ -টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। **সুতরাং এখন আর তোমাদের কৈফিয়তের কিছু** নেই। **রাসূল ﷺ ও ঈসা আলাইহিস্ সালামের মাঝে** কোনো নবী **আসেননি। আর এর মুদ্দত ছিল, পাঁচশত** উনসত্তর বছর। **আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তোমরা যদি** তাঁর অনুসরণ না কর তবে তোমাদেরকে **শাস্তি প্রদানও এর [আল্লাহর** শক্তির] অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَقِيْبٌ : বহুবচন, نُقَبَاءُ অর্থ– নেতা, প্রতিনিধি, জাতির অবস্থা পর্যবক্ষেণকারী। এটি **فَعِيْلٌ -এর ওজনে فَاعِلٌ -এর অর্থে।**

قَوْلُهُ لَئِنْ اَقَمْتُمْ : لَامْ হরফটি কসম উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিতকারী। اِنْ হলো شَرْط -এর **জন্য। তাকদীরী ইবারত** হবে– وَاللّٰهِ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ আর لَاُكَفِّرَنَّ হলো جَوَاب قَسَمْ যা جَوَاب شَرْط -এর **স্থলাভিষিক্ত।**

قَوْلُهُ عَزَّرْتُمُوْهُمْ : تَعْزِيْرٌ থেকে مَاضِى جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ -এর সীগাহ্ وَاوْ **হলো** اِشْبَاعٌ**-এর জন্য।** অর্থ– তোমরা দুশমনের মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য করবে।

قَوْلُهُ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ : এটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য। ইহুদিদের **হৃদয়ের রূঢ়তা** বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ خِيَانَةٍ : ইশারা করা হয়েছে যে, خَائِنَةٍ শব্দটি فَاعِلٌ -এর ওজনে **মাসদার।** যেমন আ'মাশের কেরাতে شَافِيَةٌ ও عَاقِبَةٌ শব্দদ্বয়ে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ضَائِنَةً -এর স্থলে خِيَانَةً **পড়েছেন।** এছাড়াও আয়াতের অন্যান্য শব্দ তথা مِنْهُمْ এবং فَاعْفُ عَنْهُمْ -ও এর দিকে ইঙ্গিতবহন করে।

قَوْلُهُ بِآيَةِ السَّيْفِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো এ আয়াত- اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

قَوْلُهُ اَغْرَيْنَا : اَىْ اَلْصَقْنَا وَاَلْزَمْنَا -এর সীগাহ্। অর্থ- আমরা ফেলে দিয়েছি, জুড়ে দিয়েছি। মাضِى جَمْع مُتَكَلِّمْ থেকে اِغْرَاءٌ শব্দটি

قَوْلُهُ بَيْنَهُمْ : هُمْ যমীর নাসারাদের বিভিন্ন ফেরকার দিকে ফিরেছে। আর তারা হলো- ১. نَسْطُوْرِيَّة যাদের আকীদা হলো, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। ২. يَعْقُوْبِيَّة : যাদের বিশ্বাস হলো, হযরত ঈসা (আ.)-ই খোদা। ৩. مَلْكَانِيَّة : যাদের বিশ্বাস হলো খোদা হলো তিন জনের সমষ্টি।

قَوْلُهُ كَآيَةِ الرَّجْمِ : এটি ইহুদিদের كِتْمَانٌ বা কিতাবের বিধান গোপন করার উদাহরণ। আর নাসারাদের গোপন করার উদাহরণ হলো مُبَشِّرًا مِّنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ اَحْمَدُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الخ : হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র হতে বারজন প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন। তাফসীরবেত্তাগণ তাওরাতের বরাতে তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ গোত্রকে অঙ্গীকার পূরণে তাকিদ করা ও তাদের অবস্থার তত্ত্বাবধান করা। কৌতুহলের ব্যাপার হলো, হিজরতের পূর্বে আকাবার রজনীতে মদীনা শরীফের আনসারগণ যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন তখন তাদের মধ্যে দ্বাদশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ বারজনই আপন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে মহানবী ﷺ -এর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ -এ উম্মত সম্পর্কে যে খলীফাগণের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তাদের সংখ্যাও বনী ইসরাঈলের উক্ত প্রতিনিধিবর্গের সমান। তাফসীরবেত্তাগণ তাওরাত হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বলেছিলেন, আমি তোমার বংশধরগণের মধ্যে বারজন নেতা সৃষ্টি করব। সম্ভবত এর দ্বারা সেই দ্বাদশ খলীফার কথাই বোঝানো হয়েছে, যার উল্লেখ জাবের ইবনে সামুরার হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ৫৩]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الخ : যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছিল। এ আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও তার পরিণতির আলোচনা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি ভয়াবহ হয়ে থাকে।

ইহুদিদের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ : উক্ত আয়াতে ইহুদিদের দুটি অঙ্গীকার ভঙ্গের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যথা-

১. হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরে অবস্থানকালীন সময়ে বনী ইসরাঈল শাম থেকে হিজরত করে মিশরে বসবাস করা শুরু করে। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে ফেরাউন ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বনী ইসরাঈলকে নিয়ে শামে চলে আসুন। যেহেতু আদ জাতির কিছু অবশিষ্ট লোক শাম দখল করেছিল তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন যুদ্ধ করে তা মুক্ত করে সেখানে বসবাস করুন। আদ জাতির মধ্যে আমালিক নামক একজন লোক ছিল। শামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারীরা যেহেতু তার বংশধর ছিল তাই তাদেরকে আমালিকা বলা হয়। আমালিকা সম্প্রদায়ের লোকজন বেশ উচু-লম্বা ও দুর্ধর্ষ ছিল। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের বারো কবীলা থেকে বারো জন লোক নির্বাচন করেছিলেন, যাদেরকে নিজ কবীলার ধর্মীয় এবং আখলাকী তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যখন তিনি শামের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন এই বারোজনকে আগে পাঠিয়ে দিলেন আমালিকাদের অবস্থা জেনে আসার জন্য। যাওয়ার সময় অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমালিকার শৌর্য-বীর্য ও শক্তিমত্তার এমন কথা এসে বনী ইসরাঈলের কাছে বর্ণনা করবে না, যা শুনে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। ফলে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে। আমলিকার হাল অবস্থা জেনে এসে বারোজনের মধ্যে দশজনই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। নিজের কবীলার কাছে আসল অবস্থা ফাঁস করে দেয়। যার কারণে বনী ইসরাঈল মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যুদ্ধে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলের সে অঙ্গীকার ভঙ্গের বর্ণনা এসেছে।

২. দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল তাওরাতের বিধান মান্য করার ব্যাপারে। এতে নামাজ, রোজা, জাকাত ইত্যাকার বন্দেগী অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তারা সেগুলো পালন করেনি। সুরা আলে ইমরানে সেসবের বিবরণ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এ আয়াতে পূর্বের সে অঙ্গীকার পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, উক্ত অঙ্গীকার মোতাবেক ইহুদিদের প্রতি হযরত ঈসা এবং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর অনুসরণ আবশ্যক ছিল। কিন্তু তারা তা পূরণ করেনি। প্রকারান্তরে তারা তাওরাতের

অনুসারী নয়। কেননা তাওরাতের যে সকল আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) ও আখেরী নবী ﷺ -এর গুণাবলি ও আলামত বর্ণনা করা হয়েছিল সেগুলো তারা পাল্টে ফেলেছে। শাব্দিক ও অর্থগত তাহরীফ বা বিকৃতি ঘটিয়েছে। –[জামালাইন ২/১৭৩, ১৭৪]

قَوْلُهُ وَقَالَ اللّٰهُ إِنِّىْ مَعَكُمْ : এ সম্বোধন হয়তো বার নেতাকে করা হয়েছে, তখন অর্থ হবে, তোমরা নিজ দায়িত্ব পালন কর, আমার সাহায্য ও অনুগ্রহ তোমাদের সাথে রয়েছে; সমস্ত বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সাথে। অর্থাৎ তোমরা কখনই আমাকে তোমাদের থেকে দূরে মনে করো না। তোমরা প্রকাশ্যে ও বা গোপনে যা কিছু করবে তা সদা-সর্বত্র আমি দেখছি। কাজেই, যা করবে সাবধানে করবে। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-৫৪]

আল্লাহর সঙ্গে থাকার ধারণা খোদাভীরু একটি জাতির জন্য কত দৃঢ় মনোবল সৃষ্টির সহায়ক, তা বলাই বাহুল্য। এরপর আত্মা শক্তিশালী হয় এবং প্রশান্তি লাভ করে। এ ধারণার পর পরাজয়ের কোনো সম্ভাবনাই সামনে আসে না। আজ যদি কোনো 'ভাইসরয়' সাধারণ কোনো নাগরিককে বলে: 'ঘাবড়াবে না, আমি তোমার সাথে আছি' এমতাবস্থায়, তার শক্তিসাহস কতই না বৃদ্ধি পাবে! বস্তুত এখানে সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, মালিকুল মুলক, আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ যখন তাঁর সাথে থাকার কথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তখন এর চাইতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্তর আর কি হতে পারে? এটা এক ধরনের ব্যাখ্যা। এখন অন্যরূপ তাফসীর হলো– যখন আল্লাহ সঙ্গী হিসেবে থাকেন, তখন কোনো বান্দা কি গুনাহ করতে পারে? নিজের চাইতে শ্রেয় বা বড় কোনো তদারককারী যখন উপস্থিত থাকেন, তখন তার সামনে আমরা কোনোরূপ ভুলত্রুটি ও অপরাধমূলক কিছু করতে সাহসী হই না। এমতাবস্থায় সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন সঙ্গে থাকেন, এরপরও কি কোনোরূপ অন্যায়-অপকর্ম করা যায়? বস্তুত গুনাহে ভীতি প্রদর্শন বা নেক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ যাই হোক না কেন, আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন। এরূপ ধারণা করা খুবই উপকারী মহৌষধ। সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, مَعِيَّتْ বা সঙ্গে থাকার অর্থ দৈহিক সঙ্গে থাকা নয়, যেমন বড়দেহী সৃষ্টজীব একে অপরের সাথে মেলামেশা করে; বরং এই সঙ্গতা হচ্ছে জ্ঞান, শক্তি ও সাহায্যের আবেষ্টনীর। অর্থাৎ আমি তোমাদের সঙ্গী জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে। আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনি এবং তোমাদের কাজকর্ম দেখি। আর তোমাদের হৃদয়ের গোপন খবরও আমি জানি। তোমাদের এসব কাজের বিনিময় দানে আমি সক্ষম। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা এবং আবেষ্টনী দ্বারা। আর এ মা'ইয়্যাতের (مَعِيَّتْ) দ্বারা বুঝা যায় বড় ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা। অর্থাৎ আমি তোমাদের সাহায্যকারী ও উপকারী। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৫৮]

قَوْلُهُ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর পর যত রাসূলই আসবেন তোমরা তাঁদের বিশ্বাস করবে, তাদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। প্রাণ দিয়েও এবং অর্থ সম্পদ দিয়েও। –[তাফসীরে উসমানী, টীকা-৫৫]

قَوْلُهُ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : মহান আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার তাৎপর্য : আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার অর্থ, তাঁর দীন ও তাঁর নবীর সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা। ঋণদাতার আশা থাকে, তার টাকা তার হাতে ফিরে আসবে। গ্রহীতাও ঋণ পরিশোধকে নিজ দায়িত্ব মনে করে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহরই দেওয়া জিনিস থেকে যা তাঁর পথে ব্যয় করা হবে তা কখনো হারিয়ে যাবে না, কিংবা হ্রাসও পাবে না। আল্লাহ তা'আলা কোনো চাপের মুখে নয়; বরং নিছক নিজের অনুগ্রহ বশেই এটা নিজ দায়িত্বে জরুরি করে নিয়েছেন যে, সে জিনিস বিরাট প্রবৃদ্ধির সাথে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন।
–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৫৬]

ইরশাদ হচ্ছে– وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহকে ঋণদান কর উত্তম ঋণ।" উত্তম ঋণের অর্থ ঐ ঋণ, যা আন্তরিকতা সহকারে দান করা হয় যাতে কোনো জাগতিক স্বার্থ জড়িত না থাকে। আল্লাহর পথে প্রিয়বস্তু দান করা এবং অকেজো ও বেকার বস্তু দান না করাও উত্তম ঋণের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে ঋণদান শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা ঋণকে আইনত, সাধারণের প্রথাগত এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে অবশ্য পরিশোধযোগ্য মনে করা হয়। এমনিভাবে এরূপ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে যে, এর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া যাবে। স্বতন্ত্রভাবে ফরজ জাকাত উল্লেখ করার পর এখানে উত্তম ঋণ উল্লেখ করাতে বোঝা যায় যে, উত্তম ঋণ বলে অন্যান্য সদকা-খয়রাতকে বোঝানো হয়েছে। এতে আরো বোঝা যায় যে, শুধু জাকাত প্রদান করেই মুসলমান আর্থিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় না। জাকাত ছাড়াও কিছু আর্থিক দায়িত্ব বহন করা তার উপর জরুরি। কোথাও মসজিদ না থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা এবং সরকার ধর্মীয় শিক্ষার ব্যয় বহন না করলে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা মুসলমানদের কর্তব্য। পার্থক্য এতটুকু যে, জাকাত ফরজে আইন আর এগুলো হলো ফরজে কেফায়া।

ফরজে কেফায়ার অর্থ এই যে, সমাজের কিছু লোক অথবা কোনো দল এসব প্রয়োজন মিটিয়ে দিলে অন্য সব মুসলমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। আর যদি কেউ এসব প্রয়োজন না মিটায়, তবে সবাই গুনাহগার হয়। আজকাল দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসাসমূহের যে দুরবস্থা তা একমাত্র তারাই জানে, যারা দীনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করে এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। মুসলমানরা জানে যে, জাকাত প্রদান করা তাদের উপর ফরজ, তা জানা সত্ত্বেও কম সংখ্যকই পুরোপুরি হিসাব করে পুরোপুরি জাকাত প্রদান করে। তাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে, এরপর তাদের কোনো আর দায়িত্ব নেই। তারা মসজিদ এবং মাদরাসার প্রয়োজনেই জাকাতের অর্থ পেশ করে। অথচ জাকাত ছাড়াই এসব ফরজ মুসলমানদের দায়িত্ব আরোপিত। পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াত এবং অন্যান্য আরো অনেক আয়াত বিষয়টিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

অঙ্গীকারের প্রধান দফা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, তোমরা অঙ্গীকার মেনে চললে প্রতিদানে তোমাদের অতীত সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে চিরস্থায়ী শান্তি ও আরামের জান্নাতে রাখা হবে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি কেউ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে, তবে সে স্বচ্ছ ও সরল পথ ছেড়ে স্বেচ্ছায় ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হয়। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ৩৬৮]

قَوْلُهُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ : বনী ইসরাঈল কোনো কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেনি। এরূপ দ্ব্যর্থহীন ও সুদৃঢ় অঙ্গীকারের পরও যারা নিজেদেরকে মহান আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা হিসেবে প্রমাণ না দিয়ে বরং বিশ্বাসঘাতকতা করতে লেগে পড়ে, তারা সাফল্য ও মুক্তির সরল পথ হারিয়ে ফেলেছে। বলা যায় না, তারা ধ্বংসের কোন গহ্বরে নিপতিত হবে। এখানে যেসব বিষয়ে বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সালাত আদায়, জাকাত প্রদান, নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং জানমাল দিয়ে তাদের সাহায্য করা। এর মধ্যে প্রথমটি দৈহিক ইবাদত, দ্বিতীয়টি বৈষয়িক, তৃতীয় আত্মিক ও মৌখিক আর চতুর্থটি প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়টিরই নৈতিক সম্পূরক। এগুলোর উল্লেখ দ্বারা যেন ইঙ্গিত করে দেওয়া হলো যে, জানমাল, দেহমন প্রতিটি বিষয় দ্বারা মহান আল্লাহর আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দাও। কিন্তু বনী ইসরাঈল বেছে বেছে প্রতিটির বিপরীত আচরণ করল। কোনো কথা ও অঙ্গীকারে স্থির থাকল না। এ বিশ্বাস হননের যে পরিণাম তাদের ভোগ করতে হয়, তা সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। –[তাফসীরে উসমান : টীকা-৫৯]

قَوْلُهُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ الخ : অর্থাৎ "আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোনো কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে সরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফফিফীনে رَانَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা– كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ "কুরআনি আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলিকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে মরিচা পড়ে গেছে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে বলেন, মানুষ প্রথমে যখন কোনো পাপকাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কালো দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপকাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গুনাহের কারণে একটি কালো দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মতো হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং তাতে কোনো জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে, পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোনো সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا কোনো পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না; বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছওয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা যা সে ইহকালেই লাভ করে। কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন– إِنَّ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، وَإِنَّ جَزَاءَ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا অর্থাৎ পুণ্যকাজের একটি তাৎক্ষণিক প্রতিদান এই যে, এরপর সে আরো পুণ্য কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে। এমনিভাবে পাপ কাজের একটি তাৎক্ষণিক সাজা এই যে, এক পাপের পর অন্তর আরো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে বোঝা যায় যে, পুণ্যকাজ পুণ্যকাজকে এবং পাপকাজ পাপকাজকে আকর্ষণ করে।

বনী ইসরাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহর কালামকে তারা স্বস্থান থেকে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে। কখনো শব্দে, কখনো অর্থে এবং কখনো তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রিস্টানও একথা কিছু স্বীকার করে। –[তাফসীরে উসমানী]

এ আত্মিক সাজার ফলশ্রুতি এই যে, وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ অর্থাৎ তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা দ্বারা লাভবান হওয়ার কথা ভুলে গেল। এরপর আল্লাহ বলেন, তাদের এ সাজা এমনভাবে তাদের গলার হার হয়ে গেল যে, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ আপনি সর্বদাই তাদের কোনো না কোনো প্রতারণার বিষয় অবগত হতে থাকবে। -[মা'আরিফুল কুরআন -৩/৭০,৭১]

قَوْلُهُ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ : অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ফেরেববাজীর ধারা আজও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কারণেই আপনি সর্বদা তাদের কোনো না কোনো প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত হয়ে চলেছেন। -[তাফসীরে উসমান : টীকা-৬৩]

قَوْلُهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ : অল্প কয়েকজন ছাড়া। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) প্রমুখ। এঁরা পূর্বে আহলে কিতাব ছিলেন এবং পরে মুসলমান হয়ে যান। -[মা'আরিফুল কুরআন ৩/৭১]

قَوْلُهُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ : এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের যেসব কুকীর্তি ও অসচ্চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে ঘৃণা ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করতে পারতেন এবং তাদেরকে কাছে আসতেও নিষেধ করতে পারতেন। তাই আয়াতের শেষ বাক্যে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ . اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ **অর্থাৎ আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের কুকীর্তি মার্জনা করুন। তাদের থেকে দূরে সরে থাকুন।** কেননা আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। **উদ্দেশ্য এই যে, তাদের এসব অবস্থা সত্ত্বেও আপনি স্বভাবগত চাহিদা** অনুযায়ী পরিচালিত হবেন না। অর্থাৎ ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবেন না তথা তাদের কঠোরতা ও অচেতনতার কারণে যদিও ওয়াজ এবং উপদেশও কার্যকরী হওয়ার আশা সুদূরপরাহত, তথাপি উদারতা ও সচ্চরিত্রতা এমন পরশ পাথর, যার পরশে অচেতনদের মধ্যেও চেতনা সঞ্চারিত হতো পারে। তারা সচেতন হোক না বা না হোক, আপনার নিজ চরিত্রও ব্যবহার ঠিক রাখা জরুরি। সদ্ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। এর দৌলতে মুসলমানরা অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে। -[মা'আরিফুল কুরআন ৩/৭২]

قَوْلُهُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ : অর্থাৎ এটাই যখন তাদের চিরায়ত স্বভাব, আর তাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি তৎপরতার পেছনে পড়ার ও প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস করে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব, তাদেরকে উপেক্ষা করুন ও ক্ষমা করে দিন। তাদের মন্দ আচরণের বদলা উত্তম আচরণ ও সদয় ব্যবহার দ্বারা প্রদান করুন। হয়তোবা এর দ্বারা তারা কিছুটা প্রভাবিত হবে। হযরত কাতাদা (রা.) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াতটি قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা যুদ্ধের আদেশ দ্বারা এটা অনিবার্য হয়ে যায় না যে, এরূপ সম্প্রদায়ের সাথে কখনো কোনো অবস্থাতেই ক্ষমা ও উপেক্ষা এবং মনোজয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।
-[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৬৫]

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ : [আর নেক কাজের মধ্যে এটাও একটা যে শরীয়ত সম্মত বিনা প্রয়োজনে কাউকে অপমান ও অপদস্থ না করা]। مُحْسِنِيْنَ অর্থ- নেককার। আরবী ভাষায় اِحْسَانٌ শব্দটি কেবল নেক আমল ও নেককাজ করার অর্থ ব্যবহৃত হয়। উর্দু ভাষায় ইহসান [অনুগ্রহ] যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা এর অনুরূপ নয়। **অভিজ্ঞ আলেমগণ এ থেকে এ অর্থ নিয়েছেন যে, এমন কাফের, যারা দ্বীনের অস্বীকারকারী, খিয়ানতকারী, বিশ্বাসঘাতক, তাদের ক্ষমা** করা যখন নেক কাজ, তখন **মুসলমানদের ক্ষমা করলে তার ফজিলত তো অবর্ণনীয়; স্মরণীয় যে, খিয়ানতকারী** কাফেরকে ক্ষমা করাই ইহসান; এতদ্ব্যতীত, অন্যদের **ক্ষমা করার ফজীলত আরো অধিক।** -**[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৬৬]**

قَوْلُهُ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى : নাসারা শব্দের ব্যাখ্যা : নাসারা (نَصَارٰى) -এর মূল হয়তো نَصْرٌ যার অর্থ সাহায্য করা অথবা نَاصِرَة যা **শাম দেশের [সিরিয়ার] অন্তর্গত একটি জনপদের** নাম, যেখানে হযরত মাসীহ (আ.) বাস করতেন। এ কারণেই তাঁকে মাসীহ নাসিরী বলা হয়। **যারা নিজেদের নাসারা** বলত, তারা যেন দাবি করত, আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার সত্য দ্বীন ও নবীর সাহায্যকারী এবং মাসীহ নাসিরী (আ.)-এর অনুসারী। এ মৌলিক দাবি ও আখ্যাগত দর্প সত্ত্বেও দীনের ব্যাপারে তারা যে নীতি অবলম্বন করেছিল, তা সামনে বর্ণিত হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৬৬]

قَوْلُهُ اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ : অর্থাৎ ইহুদিদের মতো তাদের থেকেও অঙ্গীকার নেওয়া হয়। কিন্তু তারাও অঙ্গীকার লঙ্ঘন ও বিশ্বাসঘাতকতায় পূর্বসূরীদের চেয়ে কিছু কম করেনি। তারাও সেই সব অমূল্য উপদেশ দ্বারা একটুও উপকৃত হয়নি, যার উপর ছিল তাদের মুক্তি সাফল্যের ভিত্তি; বরং তাদের ধর্মের সারবত্তা সেই উপদেশগুলোকেই তারা বাইবেল থেকে চিরতরে মুছে ফেলে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৬৭]

قَوْلُهُ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الخ : আসমানি সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার পরিণাম : নাসারাদের নিজেদের মধ্যে বা ইহুদি ও নাসারার মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেল। আসমানি সবক বিলুপ্ত করা ও বিস্মৃত হওয়ার যে অপরিহার্য পরিণাম দেখা দেওয়ার ছিল, তা ঠিকই দেখা দিল। অর্থাৎ ওহীর আসল জ্যোতিই যখন তাদের মাঝে থাকল না, তখন তারা আন্দাজ-অনুমান ও কুপ্রবৃত্তির অন্ধকারে একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ শুরু করে দিল। ধর্ম থাকল না, কিন্তু ধর্মীয় বিবাদ রয়ে গেল। অসংখ্য দল-উপদল গজিয়ে উঠল। তারা অন্ধকারে একে অন্যের সাথে লড়াই করতে লাগল। এই দলীয় সংঘাত শেষ পর্যন্ত মারাত্মক শত্রুতা ও ভয়াবহ বিদ্বেষে পর্যবসিত হলো। কোনোই সন্দেহ নেই আজ মুসলিম উম্মাহর মাঝেও অনেক মতভেদ ও বিভক্তি এবং ধর্মীয় সংঘাত বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলার ওহী বর্তমান ও শরিয়তী কানুনও আলহামদুলিল্লাহ যথাযথভাবে সংরক্ষিত সেহেতু বহু মতভেদ সত্ত্বেও উম্মাহর একটি বৃহত্তম দল সর্বদা সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকবে। পক্ষান্তরে ইহুদি নাসারার মতভেদ কিংবা প্রটেস্টান্ট-ক্যাথলিক ইত্যাদি দলগুলো নিজেদের মধ্যকার সংঘাতে কোনো দলই সত্যের রাজপথে না আজ প্রতিষ্ঠিত আছে, না কিয়ামত পর্যন্ত কখনো প্রতিষ্ঠিত হতো পারবে। কেননা তারা তাদের সীমালঙ্ঘন ও ভ্রান্ত কর্মপন্থা দ্বারা ওহীর আলোকধারা দূরীভূত করে ফেলেছিল, অথচ সে আলো ব্যতিরেকে কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর আইন-কানুন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান করতে পারে না। এখন তারা যতদিন সেই বিকৃত বাইবেলের আঁচল আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ কুটীল চক্রবাক ও ভিত্তিহীন মত-মতান্তর এবং দলগত হিংসা-বিদ্বেষের ঘোর অন্ধকার হতে বের হয়ে সত্যের পথ দেখতে পাওয়া ও স্থায়ী মুক্তির রাজপথে চলতে পারা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। বাকি যারা আজ নামমাত্র ধর্ম, বিশেষত খ্রিস্টান ধর্মের ধ্বজাধারী, মাসীহ শব্দ বা বর্তমান বাইবেলকে যারা নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ব্যবহার করছে, সেই সব নাসারার কথা এ আয়াতে বলা হয়নি। আর যদি ধরে নেওয়া হয়, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা, একের বিরুদ্ধে অন্যের গোপন ষড়যন্ত্র, এমন কি প্রকাশ্য রণোন্মাদনার কথা ওয়াকিফহাল মহলের অজানা নয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ৬৮]

بَيْنَهُمْ অর্থ- তাদের মাঝে। অর্থাৎ নাসারাদের বিভিন্ন কাওমের মাঝে। ইশারা হচ্ছে, নাসারাদের আভ্যন্তরীণ দীনি কোন্দল মাসীহদের মধ্যে যত রকমের ফিরকা আছে এবং তাদের মাঝে প্রচলিত যেসব জটিল মতভেদ আছে, বাইরে থেকে তা অনুমান করা খুবই কঠিন। এর সাথে বর্তমানে ইউরোপের রাজনৈতিক দলগুলোকে যদি শামিল করা হয়, তবে তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট! জার্মানীর তিক্ততা ফ্রান্সের সাথে। বৃটেনের হিংসা-বিদ্বেষ রাশিয়ার প্রতি, ফ্রান্সের বৈরীতা স্পেনের সাথে, ইটালীর প্রতি আমেরিকার বিদ্বেষ ইত্যাদি। এছাড়া আভ্যন্তরীণ পার্থিব সংঘর্ষ ও সংঘাত যে কি ধরনের আছে, তার তো হিসেব নেই। আয়াতাংশ- اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ মানে কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ সব সময়, ভবিষ্যতেও। কুরআন মাজীদ স্পষ্ট যে, বাক্যটি মানুষ জাতির বাকধারা অনুযায়ী আনা হয়েছে। বাক্যের কিয়ামত পর্যন্ত এর অর্থ হলো- যতদিন এ পৃথিবী থাকবে। কুরআন মাজীদে ইবলীসের প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর লা'নত থাকবে। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ লা'নত বা অভিশাপ তার উপর সব সময় থাকবে। এ অর্থ নয় যে, সে হাশরের দিনের পর লা'নত থেকে মুক্ত হবে। এ জন্য নব্য ভ্রান্ত একজন ব্যাখ্যাদাতা, এ আয়াতের শেষে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, নাসরারা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকবে। আর এরূপ ধারণাও করা যেতে পারে যে, কোনো সময় হয়তো তারা সবাই ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যাবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, গুনাহ ও অপরাধ যেমন আখিরাতে শাস্তির কারণ হবে, তদ্রূপ তা দুনিয়াতেও শাস্তির কারণ হতে পারে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৬৯]

قَوْلُهُ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ : এ শব্দের সম্বোধন ইহুদি-নাসারার প্রতি। অর্থাৎ এতটা রদবদলের পরও যার আগমনী বার্তা কোনো না কোনো পর্যায়ে তোমাদের কিতাবে আছে, সেই আখেরী নবী এসে গেছেন। তাঁর মুখে আল্লাহ তা'আলা আপন কালাম নাজিল করেছেন। হযরত মাসীহ (আ.) যেসব বিষয়ে অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন তিনি তার পূর্ণতা বিধান করেছেন। তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব কথা তোমরা গোপন করতে এবং যা রদবদল করে প্রচার করতে, তন্মধ্যে যা কিছু জরুরি তা এই মহানবী ﷺ প্রকাশ করেন এবং যেসব বিষয়ে কোনো প্রয়োজন নেই তা উপেক্ষা করেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৭১]

قَوْلُهُ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ : তিনি অনেক ব্যাপার উপেক্ষা করেন। এ আয়াতের উদ্দেশ্য তারা, যাদের ব্যাপারে তিনি উপেক্ষা করতেন। এদের ব্যাপার উল্লেখ হলে গুনাহগারদের অপদস্থ করা ছাড়া, শরিয়তের কোনো উপকার এতে নেই; [তাই তা স্পষ্ট করে বলা হলো না]। বস্তুত তা উল্লেখ করা হলো না, কেননা এতে দীনের প্রচারের কোনো স্বার্থ নেই। তা বর্ণনা করা হয়নি, কেননা এতে দীনের কোনো উপকার নেই, শরিয়তের হুকুম জিন্দা করার এবং বিদয়াতকে মিটিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, এ আয়াত আল্লাহওয়ালাদের জন্য দলিল যে, যতক্ষণ দীনের উপকারে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ করবে না এবং শত্রুতার দ্বারা আত্মার ক্রোধ প্রকাশ করবে না।

–[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৭২]

قَوْلُهُ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ : সম্ভবত নূর দ্বারা খোদ রাসূলে কারীম ﷺ -কে এবং কিতাবুম মুবীন দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টানরা যে মহান আল্লাহর ওহীকে বিলুপ্ত করে আন্দাজ-অনুমান ও খেয়াল-খুশির অন্ধকারে ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের গভীর খাদে পড়ে রয়েছে, বর্তমান অবস্থায় যা থেকে বের হয়ে আসা কিয়ামত পর্যন্ত কখনই সম্ভব নয়, তাদেরকে বলে দিন, মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় আলো এসেছেন তোমরা চিরমুক্তির সঠিক পথে যদি চলতে চাও, তবে এ আলোতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ কর। শান্তির মুক্ত পথ পেয়ে যাবে এবং অন্ধকার হতে বের হয়ে আলোর ধারায় স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারবে। আর যার সন্তুষ্টির অনুসরণ করে পথ চলছ তাঁরই সাহায্যে অনায়াসে সরল পথ অতিক্রম করতে পারবে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৭২]

قَوْلُهُ يَهْدِىْ بِهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ : অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করে এবং সেই চিন্তা ও ধ্যানে মশগুল থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর। এ থেকে এ সত্য প্রকাশিত হয় যে, তারাই হেদায়েতের রাস্তার সন্ধান পেয়েছে, যারা তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। سُبُلَ السَّلَامِ মানে 'শান্তির পথ।' পূর্ণ শান্তি দৈহিক আত্মিক দিক দিয়ে কেবল জান্নাতে পৌঁছানোর পরেই হাসিল হবে। সেই জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা হলো, আকীদা দুরস্ত হওয়া এবং নেক আমল করা। শান্তির রাস্তা চিরস্থায়ী শান্তিধামে নিয়ে পৌঁছায়, আর তা হলো, জান্নাত। বলা হয়েছে– তা হলো জন্নাতে পৌঁছাবার রাস্তা। بِهٖ শব্দের মধ্যে সর্বনামটি كِتَابٌ শব্দের দিকে ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ স্পষ্ট কিতাব দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। স্পষ্টত জানা যায় যে, ه সর্বনামটি কিতাবের প্রতি ইঙ্গিতবহ। اَىْ بِالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৭৪]

قَوْلُهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ : খ্রিস্টানদের নির্ভেজাল কুফরি বিশ্বাস হলো, মাসীহ ছাড়া আর কেউ আল্লাহ নয়। বলা হয়ে থাকে, এটা খ্রিস্টানদের মধ্যে ইয়াকুবিয়্যা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাদের মতে, মহান মাসীহ (আ.)-এর কায়াধারণ করে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন [নাউযুবিল্লাহ]। অথবা আয়াতের মর্ম এই যে, খ্রিস্টান সম্প্রদায় যখন মসীহ সম্পর্কে উলূহিয়্যাতের [মা'বুদ হবার] আকীদা পোষণ করে আবার সেই সাথে মুখে তাওহীদের শ্লোগান দেয় যে, আল্লাহ একই, তখন এ উভয় বিশ্বাসের অনিবার্য ফল দাঁড়ায়, তাদের মতে আল্লাহ মাসীহ ছাড়া কেউ নয়। যে অর্থই নেওয়া হোক, এ বিশ্বাস নির্জলা কুফর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা ৭৩]

قَوْلُهُ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ .... وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا : মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে তাঁর মতো মনে করার অসারতা : ধরে নাও যদি সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ মাসীহ (আ.) মারইয়াম (আ.) এবং আগে পরের সমস্ত জগদ্বাসীকে একত্র করে একই মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে চান, তবে তোমরাই বল, কে তাঁর হাত ধরে রাখতে পারে? অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যতের সমুদয় মানুষকেও যদি একত্র করে দেওয়া হয় এবং মহান আল্লাহ এক নিমিষে সকলকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে সকলের সম্মিলিত শক্তি ও এক আল্লাহর ইচ্ছাকে ক্ষণিকের জন্যও মুলতবি করতে সক্ষম হবে না। কেননা সৃষ্টজীবের শক্তি আল্লাহর দেওয়া এবং তাও সীমিত, অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল শক্তির আধার এবং তাঁর শক্তি অসীম। তাঁর শক্তির সম্মুখে সৃষ্টিমালার শক্তি নিতান্তই অসহায়। যাদেরকে রদ করে এ বক্তব্য রাখা হয়েছে, খোদ তারাও একথা স্বীকার করে; বরং খোদ মাসীহ ইবনে মারইয়ামও যাঁকে তারা আল্লাহ সাব্যস্ত করছে, একথা স্বীকার করতেন। কাজেই, মারকাসের ইঞ্জীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর এ উক্তি বিদ্যমান যে, 'হে পিতা! সবকিছু তোমার শক্তির অধীন। তুমি আমা হতে এ [মৃত্যুর] পেয়ালা হটিয়ে দাও- আমি যেভাবে চাই সেভাবে নয়; বরং যেভাবে তোমার ইচ্ছা।' কাজেই যেই মাসীহকে তোমরা আল্লাহ বল এবং তার যে জননী তোমাদের বিশ্বাস মতে আল্লাহর মা হলো, তারা দু'জনও গোটা বিশ্ববাসীর সাথে মিলে মহান আল্লাহর ইচ্ছার সম্মুখে অসহায় প্রমাণিত হলো। এবার নিজেরাই চিন্তা কর মাসীহ বা তাঁর মা কিংবা অন্যান্য মাখলুক সম্পর্কে উলূহিয়্যাতের [মা'বুদ হবার] দাবি করাটা কত বড় ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা হবে। আয়াতের এ ব্যাখ্যা আমরা هَلَاكٌ [ধ্বংস]-কে মৃত্যু অর্থে গ্রহণ করেছি, তবে جَمِيْعًا শব্দটির কিঞ্চিত ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। শব্দটির যে অর্থ আমরা উল্লেখ করেছি তা আরবি ভাষাবিদদের বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি

সঙ্গতিপূর্ণ। তবে এটাও সম্ভব যে, এ আয়াতে هَلَاكٌ -কে মৃত্যু অর্থে নেওয়া হবে না, যেমন আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেন, অনেক সময় هَلَاكٌ -এর অর্থ হয় কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, যেমন- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ মহান আল্লাহর সত্তা ব্যতিরেকে সবকিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে থাকে। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি হযরত মাসীহ, তাঁর মা এবং বিশ্বের সকলকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, তা হলে কে আছে যে তার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে? কবি বলেছেন-

اوست سلطاں ہرچہ خواہد آں کند * عالمے را در دمے ویراں کند ۔

অর্থাৎ তিনিই মহারাজ, যা ইচ্ছা তাই করেন। সারা বিশ্বকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারেন।

হযরত শাহ সাহেব (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে নবীগণের সম্পর্কে এমন কথা বলেন, যাতে উম্মত তাদেরকে বান্দা হওয়ার সীমারেখা হতে উপরে তুলে না নেয়। নয়তো মহান আল্লাহর নিকট তাদের যে মর্যাদা ও সমাদর সে সৃষ্টিতে তাঁরা এরূপ সম্ভাষণের বহু উর্ধ্বে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৭৪]

وَأُمَّهُ অর্থাৎ "এবং তার মাতা"। মাসীহের সঙ্গে তাঁর মাতা মারইয়াম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ হলো, মাসীহদের বিরাট এক অঞ্চলে তিনিও খোদার সাথে খোদায়িত্বের শরিক। লাখো নয়, বরং কোটি কোটি মাসীহদের বিশ্বাস, তিনিও খোদার আসনে আসীন [নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা]। এ ব্যাপারে আসল ঘটনা জানার জন্য মৎ-প্রণীত ইংরেজী তাফসীর দ্রষ্টব্য।

-[তাফসীরে মাজেদী, ৭৮ নং টীকার অংশবিশেষ]

قَوْلُهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ : মাসীহীদের আকীদা : হযরত মাসীহ (আ.) বিনা বাপে পয়দা হয়েছেন। আর এর দ্বারা তারা দলিল নিয়ে থাকে যে, এ ধরনের জ্ঞানবহির্ভূত অস্তিত্বকে কিভাবে ইনসান বা মানুষ মনে করা যেতে পারে? তিনি অবশ্যই মানুষের উর্ধ্বে, আল্লাহর সৃষ্টিতে শরিক। এখানে এ অভিমতের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্বাবস্থায় সব কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যদি কোনো মাখলুককে তাঁর সৃষ্টি-বিধানের সাধারণ নিয়মের বাইরে সৃষ্টি করেন, তা দিয়ে সে মাখলুকের খোদা হয়ে যাওয়া বা সে সৃষ্টজীব না হওয়া কিরূপে বুঝা যায়। يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। তিনি যা সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে করতে চান, সেভাবেই করেন। তিনি মাখলুককে সাধারণ নিয়ম মোতাবেক সৃষ্টি করতে পারেন এবং নিয়মের বাইরেও সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর এ সৃষ্টি করার শক্তি কোনো অবস্থার সাথে বা কোনো বিধানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি মাধ্যমসহ এবং মাধ্যম ব্যতিরেকে সমভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। কোনো সময় তিনি আসল থেকে সৃষ্টি করেন এবং কোনো সময় তা বাদ দিয়ে। তিনি কখনো একইরূপ জিনিস থেকে, তার অনুরূপ জিনিস সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টজীবের অনেক কিছু কোনো মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেন, আবার কখনো তা মাধ্যম সহকারে সৃষ্টি করেন। তাঁর সৃষ্টি সব একই ধরনের নয়, বরং সৃষ্টির সময় তিনি যেভাবে চান, তা সেভাবে সৃষ্টি করেন। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৮১]

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهُ : ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মিথ্যা দাবি- "তারা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন" : সম্ভবত তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান এই জন্য বলে যে, তাদের বাইবেলে আল্লাহ ইসরাঈল [ইয়াকুব (আ.)]-কে নিজের পুত্র এবং নিজে তার পিতা বলে উল্লেখ করেছেন। এদিকে খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত মাসীহ (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে থাকে। এভাবে ইসরাঈলের বংশধর এবং মাসীহের উম্মত হওয়ার কারণেই খুব সম্ভব তারা নিজেদের সম্পর্কে اَبْنَاءُ اللّٰهِ [আল্লাহর সন্তান] শব্দ ব্যবহার করেছে। এটাও সম্ভব যে, সন্তান বলে আল্লাহর খাস বান্দা ও প্রিয়পাত্র বোঝাচ্ছে, যেন প্রিয়পাত্র হিসেবে সন্তানতুল্য। এ হিসেবে اَبْنَاءُ -এর মর্ম اَحِبَّاءُ -এর অনুরূপ।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র নয় : সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ছেলে হওয়া সৃষ্টির পক্ষে যেহেতু অসম্ভব ও সুস্পষ্টরূপে বাতিল এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব, যেমন ইরশাদ হয়েছে- يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ অর্থাৎ তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। -[সূরা মায়িদা : রুকু-৮], সেহেতু এ বাক্যে প্রথমে প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবিকেই রদ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সম্প্রদায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও জঘন্য রকম পাপাচারের দরুন ইহজগতেও নানাভাবে লাঞ্ছনা ও শাস্তিতে নিপতিত এবং আখিরাতেও স্থায়ী শাস্তির উপযুক্ততা তাদের রয়েছে, যা যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত ও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, তাদের মতো পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কেও বিবেকবান লোক কি মুহূর্তের জন্যও এ ধারণা রাখতে পারে যে, তারা মহান আল্লাহর প্রিয় ও আপনজন হবে? মহান আল্লাহর সাথে কারো রক্তের সম্পর্ক তো নেই, তার ভালোবাসাও কেবল আনুগত্য ও সৎকর্ম দ্বারাই লাভ করা যেতে

পারে। কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির উপযুক্ত এরূপ ঘোর অপরাধীদের তো লজ্জা করা উচিত যে, কী করে তারা نَحْنُ اَبْنٰٓءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ -এর দাবি করে? হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে তার ঔরসজাতই ছিল, অথচ তার সম্পর্কেও আল্লাহ পাক ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন- اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে তো অসৎকর্মশীল।

-[সূরা হুদ : রুকূ- ৪ ; তাফসীরে উসমানী : টীকা, ৭৭-৭৮]

قَوْلُهٗ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا : অর্থাৎ আমাদের আদেশ-নিষেধ অত্যন্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে খুলে বর্ণনা করেন। এ রুকুর শুরুতে বনী ইসরাঈলের [ইহুদি-নাসারার] নানা রকম অপকর্ম ও নির্বুদ্ধিতা তুলে ধরে অবশেষে বলা হয়েছে, এখন তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে গেছেন, যিনি তোমাদের অন্যায়-অপকর্ম তুলে ধরে তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে যেতে চান। তারপর জানিয়ে দেওয়া হয় হেদায়েতের এ আলো অর্জন দু'টো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা-

১. আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ হতে এ পর্যন্ত এরই বর্ণনা ছিল।
২. সকল নবীর সেরা নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন, যিনি পূর্ববর্তী সকল নবীর গুণাবলির ধারক এবং সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ শরিয়তের ব্যাখ্যাতা। আলোচ্য আয়াত يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ -এর মাঝে এ বিষয়েরই বর্ণনা করা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৮২]

قَوْلُهٗ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কে? হযরত মাসীহ (আ.) এরপর প্রায় ছয়শ' বছর পর্যন্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমনধারা বন্ধ ছিল। দু'একটি জায়গা বাদ দিলে সমগ্র বিশ্ব অজ্ঞানতা, আখিরাত সম্পর্কে উদাসীনতা ও জীবন ভোগের স্বেচ্ছাচারিতায় নিমজ্জিত ছিল। হেদায়েতের আলোকবর্তিকা নিভে গিয়েছিল। অন্যায়-অনাচার, নৈরাজ্য ও ধর্মহীনতার ঘনঘটা আকাশ বলয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ পরিস্থিতি নিখিল বিশ্বের সংশোধন ও সংস্কার সধানার্থে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দিশারী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী সায়্যিদুল মুরসালীন ﷺ-কে প্রেরণ করেন। তিনি অজ্ঞদেরকে সাফল্য ও মুক্তির পথ দেখান, উদাসীনদেরকে নিজ সতর্কবাণী দ্বারা জাগ্রত করেন এবং হতোদ্যমদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে উদ্দীপিত করে তোলেন। এভাবে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মহান আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেল, তা কেউ মানুক আর না মানুক। -[তাফসীরে উসমানী: টীকা-৮৩]

قَوْلُهٗ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ : فَتْرَتْ -এর শাব্দিক অর্থ- মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া এবং কোনো কাজকে বন্ধ করে দেওয়া। আলোচ্য আয়াতে তাফসীরবিদরা فَتْرَتْ -এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ পয়গাম্বরদরে আগমন পরম্পরা কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকা। হযরত ঈসার পর শেষ নবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فَتْرَتْ -এর জমানা।

فَتْرَتْ -এর জমানা কতটুকু : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গাম্বরদের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনো বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গাম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গাম্বর আগমন করেছিলেন। অতপর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচশ' বছরকাল পয়গাম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فَتْرَتْ তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনো এত দীর্ঘ সময় পয়গাম্বরদের আগমন বন্ধ ছিল না। হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরো বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কমবেশি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এতে আসল উদ্দেশ্যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বুখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা ও শেষ নবী ﷺ -এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়শ' বছর। এ সময়ের মধ্যে কোনো পয়গাম্বর প্রেরিত হননি। বুখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسٰى অর্থাৎ আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে- لَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ অর্থাৎ আমাদের মাঝখানে কোনো পয়গাম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিনজন রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ.) কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়েছে।

বিরতির সময় খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু তার নবুয়তকাল ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে, পরে নয়।

অন্তর্বর্তীকালের বিধান : আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, যদি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো রাসূল, পয়গাম্বর অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের শরিয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শিরক ছাড়া অন্য কোনো কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আজাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অন্তবর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কিনা?

অধিকাংশ ফিকহবিদ বলেন, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শিরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা একত্ববাদের প্রতি কোনো পয়গাম্বরের পথপ্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালে তাদের কাছে কোনো রাসূল আগমন না করলেও তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌঁছেনি বলে তাদের ওজর পেশ করার কোনো যুক্তি ছিল কি?

উত্তর. হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আমল পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিসসা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র.) প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তাওরাতের আসল কপি কারো কাছে কোনো অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থি নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত : আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন। আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে আল্লাহ প্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নিয়ামত মনে করা। কেননা পয়গাম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্য তা আবার খোলা হয়েছে। দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তার আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোনো আলো ছিল না। আল্লাহর সৃষ্ট মানব আল্লাহর সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপুজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহিলিয়্যাতের যুগে এহেন পথভ্রষ্ট জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণে ও নবুয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্য জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেনদেন, সামাজিকতাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও তাঁর পয়গাম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোনো চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মুমূর্ষ রোগী শুধু আরোগ্য লাভই করে না, বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের শ্রেষ্ঠত্বে কারো মনে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকার বিরাজ করেছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে যে, অতীতে যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, সব মু'জিযা একদিকে রেখে একা এ মু'জিযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে। –[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৭৮-৮০]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : [আর এতো হলো তাঁরই কুদরতের একটি প্রকাশ। তিনি শত শত বছর পর এমন একজন পয়গাম্বর পাঠালেন, যিনি সব পয়গাম্বরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ]। আয়াতের এ অংশে বোঝা যায় যে, তিনি তোমাদের দাবি নস্যাৎ করার জন্য এই পয়গাম্বরকে পাঠিয়েছেন। অবশ্য যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে এছাড়া অন্যভাবেও তিনি দলিল পেশ করতে পারতেন। আর তোমাদের শ্বাস ফেলারও অবকাশ হতো না। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯০]

٢٠. وَ اذْكُرْ إِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَيْ مِنْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا أَصْحَابَ خَدَمٍ وَحَشَمٍ وَاٰتٰكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى وَفَلْقِ الْبَحْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ ـ

٢١. يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُطَهَّرَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ أَمَرَكُمْ بِدُخُوْلِهَا وَهِيَ الشَّامُ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى أَدْبَارِكُمْ تَنْهَزِمُوْا خَوْفَ الْعَدُوِّ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ فِيْ سَعْيِكُمْ ـ

٢٢. قَالُوْا يٰمُوْسٰى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ مِنْ بَقَايَا عَادٍ طِوَالًا ذَوِيْ قُوَّةٍ وَإِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُوْنَ لَهَا ـ

٢٣. قَالَ لَهُمْ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ مُخَالَفَةَ أَمْرِ اللّٰهِ وَهُمَا يُوْشَعُ وَكَالِبُ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَعَثَهُمْ مُوْسٰى فِيْ كَشْفِ أَحْوَالِ الْجَبَابِرَةِ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا بِالْعِصْمَةِ فَكَتَمَا مَا اطَّلَعَا عَلَيْهِ مِنْ حَالِهِمْ إِلَّا عَنْ مُوْسٰى بِخِلَافِ بَقِيَّةِ النُّقَبَاءِ فَأَفْشَوْهُ فَجَبُنُوْا ـ

অনুবাদ :

২০. এবং স্মরণ কর মূসা যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর তিনি তোমাদের মধ্য হতে فِيْكُمْ এর فِيْ [মধ্যে] অব্যয়টি এখানে مِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী করেছেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি লোক-লস্কর ও চাকর-নওকরের অধিকারী করেছেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি দেননি যেমন, মান্না, সালওয়া, সমুদ্র বিদারণ ইত্যাদি তা তোমাদেরকে দিয়েছেন।

২১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তোমাদেরকে যেখানে অর্থাৎ শামে প্রবেশ করতে নির্দেশ করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করো না অর্থাৎ শত্রুর ভয়ে হার মেনে নিয়ো না নতুবা তোমাদের প্রচেষ্টায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

২২. তারা বলল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত লম্বা লম্বা, প্রচণ্ড শক্তিমত্তার অধিকারী, আদ জাতির অবশিষ্ট এক সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না; তারা সেখান থেকে বের হয়ে গেলে তবে আমরা তাতে প্রবেশ করব।

২৩. যারা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় করছিল তাদের মধ্যে দু'জন অর্থাৎ ইয়ূশা ও কালাব, যেসব গোত্র নেতাকে হযরত মূসা (আ.) ঐ শক্তি মদমত্ত সম্প্রদায়ের হালচালের খোঁজ খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন এরা দু'জন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা হযরত মূসা (আ.) ব্যতীত অন্য সকলের নিকট হতে উক্ত শত্রু সম্প্রদায়ের যে অবস্থা ও শক্তি দর্শন করে এসেছিলেন তা গোপন রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে অন্য গোত্রনেতারা তা প্রকাশ করে দিয়েছিল। ফলে বনী ইসরাঈল তাদের শক্তির কথা শুনে সাহস শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। যাদের প্রতি আল্লাহ পাপ হতে হেফাজত করত অনুগ্রহ করেছিলেন তারা বলল–

ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج بَابَ الْقَرْيَةِ وَلَا تَخْشَوْهُمْ فَإِنَّهُمْ اَجْسَادٌ بِلَا قُلُوْبٍ فَإِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ ج قَالَا ذٰلِكَ تَيَقُّنًا بِنَصْرِ اللّٰهِ وَاِنْجَازِ وَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ .

তোমরা এ জনপদের দ্বারে প্রবেশ কর, এদের ভয় করো না। এরা প্রাণহীন গুটিকয়েক শরীর মাত্র। প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে। আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর ওয়াদা পূরণের প্রতি নিরঙ্কুশ প্রত্যয় হেতু তারা এ কথা বলতে পেরেছিলেন। আর তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।

٢٤. قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هُمْ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ عَنِ الْقِتَالِ .

২৪. তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে ততদিন সেখানে আমরা প্রবেশ করবই না। তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে এদের সাথে যুদ্ধ কর, আমরা যুদ্ধ না করে এখানেই বসে থাকব।

٢٥. قَالَ مُوْسٰى حِيْنَئِذٍ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَ اِلَّا اَخِيْ وَلَا اَمْلِكُ غَيْرَهُمَا فَاجْبِرْهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ فَافْرُقْ فَافْصِلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ .

২৫. সে অর্থাৎ মূসা তখন **বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই। আমরা দু'জন ব্যতীত আর কারো উপর আমার এমন ক্ষমতা নেই যে,** তাকে আনুগত্যের জন্য বাধ্য করতে পারি। সুতরাং তুমি আমাদেরও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফারাক করে দাও, ফয়সালা করে দাও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ مِنْكُمْ : প্রশ্ন. فِيْكُمْ -এর তাফসীর مِنْكُمْ দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর. كُمْ -এর মধ্যে বাস্তবিক ظَرْف হওয়ার যোগ্যতা নেই।

قَوْلُهُ الْمُقَدَّسَةُ : অর্থ– পবিত্র।

قَوْلُهُ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوٰى : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে পৃথিবীর মধ্যে সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না, বরং মান্না-সালওয়ার কারণে আংশিক বা আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব ছিল।

قَوْلُهُ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا : এ বাক্যটির ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা আছে। ১. جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ হতে পারে। এ সুরতে এটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হবে। ২. جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হতে পারে। এ সুরতে এটি رَجُلَانِ -এর দ্বিতীয় সিফত হবে।

قَوْلُهُ بَابَ الْقَرْيَةِ : اَلْبَابَ -এর তাফসীর بَابَ الْقَرْيَةِ দ্বারা করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْبَابَ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ -টি مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর عِوَض বা বদলে এসেছে।

قَوْلُهُ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ : এখানে واو -টি হলো اِسْتِيْنَافِيَّةٌ -এর وَاوْ এবং বাক্যটি اَمْرٌ مَحْذُوْفٌ -এর জবাবের স্থানে। তাকদীরী ইবারত হবে تَنَبَّهُوْا فَتَوَكَّلُوْا عَلَى اللّٰهِ এখানে فَاءٌ বর্ণটি আর مُسْتَانِفَهٌ

تَوَكَّلُوْا عَلَى اللّٰهِ হলো مُتَعَلِّقْ مُقَدَّمْ -এর جَوَابُ شَرْط উহ্য রয়েছে। যার প্রতি পূর্বের إِنْ كُنْتُمْ আর হলো شَرْط এবং **বাক্য তথা** تَوَكَّلُوا ইঙ্গিত বহন করে।

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ إِنِّىْ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ : جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ -টি আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করার জন্য **ব্যবহৃত হয়েছে।** قَالَ হলো قَوْل আর তার পরবর্তী বাক্যটি তার مَقُوْل আর لَا أَمْلِكُ হলো إِنَّ -এর খবর। إِلَّا হরফে ইস্তেসনা حَصْر **বা** সীমাবদ্ধতা বোঝানোর জন্য এসেছে আর نَفْسِىْ হলো মাফউলেবিহী।

قَوْلُهُ وَاِلَّا اَخِىْ : اَخِىْ শব্দটির পূর্বোল্লেখিত نَفْسِىْ -এর সাথে عَطْف হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরের পূর্বে ।لا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَخِىْ : এতে رَفْع, نَصَبْ এবং جَرْ তিন ধরনের ই'রাব হওয়ার অবকাশ আছে। যথা– ১. যদি أَمْلِكُ -এর ضَمِيْر مُسْتَتَرْ -এর সাথে عَطْف হয় তাহলে رَفْع হবে। ২. যদি ان -এর সাথে عَطْف হয় তাহলে نَصَبْ হবে। ৩. আর যদি مَجْرُوْر -এর সাথে عَطْف হয় তাহলে مَجْرُوْر হবে।

قَوْلُهُ يَتِيْهُوْنَ : এটি (ض) تِيْهٌ থেকে مُضَارِعْ جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ্। অর্থ– উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে।

قَوْلُهُ لَا تَاْسَ : তুমি চিন্তা করো না, দু:খ করো না। تَاْسَ শব্দটি (س) أَسًى মাসদার হতে مُضَارِعْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ্। মূলত تَاْسَىْ ছিল। لَانَىْ نَهْى -এর কারণে يَاء বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ الخ : হযরত মূসা (আ.)-এর বাণী : হযরত মূসা (আ.)-এর এ বক্তৃতা সে সময়ের, যখন বনী ইসরাঈলরা মিশরীয়দের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে সিনাই প্রান্তরে স্বাধীনভাবে বসবাস করছিল। হযরত মূসা (আ.), যিনি তাদের দীনি নবীও ছিলেন এবং দুনিয়ার লিডারও ছিলেন, তাদেরকে ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে বলেছেন– তোমরা ফিলিস্তিনে ফিরে চলো এবং সেখান থেকে অত্যাচারী 'আমালিকা' সম্প্রদায়কে বের করে দিয়ে তোমরা সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করো। ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণ এবং বাস্তব নিদর্শনের নিরিখে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলগণ মিশর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৪০ সনে বেরিয়ে আসে এবং ফিলিস্তিনের উপর ইসরাঈলী আক্রমণ সংঘটিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ সনে। এ হিসেবে হযরত মূসা (আ.)-এর বক্তৃতার সময়কাল ছিল এর মাঝখানের কোনো এক সময়। সম্ভবত এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ সময়ের ঘটনা। যেমন তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ১ম অধ্যায় পাঠে জানা যায়। তিনি জর্ডান নদীর তীরে মুআব নামক ময়দানে, মিশর থেকে বেরিয়ে আসার চল্লিশতম বছরের, ১১তম মাসের, ১ম তারিখে এ বক্তৃতা দেন। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯১]

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা : তাফসীরে মূযিহুল কুরআনে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মভূমি ত্যাগ করে মহান আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়েন এবং শামদেশে [সিরিয়ায়] এসে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘকাল যাবত তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। সহসা আল্লাহ তা'আলা তাকে সুসংবাদ দিলেন, পৃথিবীতে তোমার বংশধরগণের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটবে। আমি তাদেরকে শামদেশের কর্তৃত্ব দেব এবং তাদেরকে নবুয়ত, দীন, কিতাব ও রাজত্বের অধিকারী করব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময় এ ওয়াদা পূর্ণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের দাসত্ব হতে মুক্তি দান করেন এবং ফিরাউনকে ডুবিয়ে মারেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেন, তোমরা আমালিকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করে শাম দেশ জয় করে নাও। তারপর সে দেশ তোমাদেরই হবে। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র হতে বার জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, তোমরা শামে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি জেনে এসো! তারা এসে সে দেশের গুণগান করল এবং সেই সাথে সেখানকার অধিবাসী আমালিকা সম্প্রদায়ের শক্তিমত্তার কথাও প্রকাশ করল। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরা বনী

ইসরাঈলের কাছে সে দেশের সমৃদ্ধি বর্ণনা করো, কিন্তু আমালিকা সম্প্রদায়ের শক্তিমত্তার কথা ব্যক্ত করো না। তাদের মধ্যে দু'জন হযরত মূসা (আ.)-এর আদেশ পালন করে। বাকি দশজন অমান্য করে। বনী ইসরাঈল সব শুনে হীনমন্যতা দেখাতে লাগল। তারা চাইল আবার মিশরে ফিরে যাবে। এ ভুলের মাশুলে শাম বিজয়ে তাদের চল্লিশ বছর বিলম্ব ঘটল। এ দীর্ঘ সময় তারা মরুভূমিতে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে কাটাল। ইতোমধ্যে তাদের সে প্রজন্মের সকলেই মারা গেল। কেবল উপযুক্ত দুই প্রতিনিধি তখনও বেঁচেছিলেন। তাঁরা হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত হলেন এবং তাঁদের হাতেই সিরিয়া বিজিত হলো।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা ৮৫]

قَوْلُهُ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ : দুনিয়াত ক্ষতি তো স্পষ্ট যে, বাদশাহী এবং এমন বড় বাদশাহী থেকে বঞ্চিত হবে। আর আখিরাতের ক্ষতি হলো, জিহাদের হুকুম অমান্য করার জন্য আখেরাতে এর ফলস্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, গুনাহের কারণে কখনো কখনো শাস্তি দুনিয়াতেই হয়ে যায়। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯৫]

আমালিকা জাতি : এরা ছিল কাওমে 'আমালিকাহ'। এরা ছিল খুবই শক্তিশালী এবং যুদ্ধবাজ জাতি। এরা বনী ইসরাঈলদের অতি পুরাতন শত্রু। 'তাওরাত' এবং 'তারিখে ইসরাঈল' এদের রক্তপাতের কাহিনীতে রঞ্জিত। তাওরাতে এ কাওম সম্পর্কে বনী ইসরাঈলদের ভাষায়, এরূপ বর্ণিত আছে, আমাদের এমন শক্তি নেই যে, আমরা তাদের উপর আক্রমণ করবো। কেননা তারা আমাদের চাইতে শক্তিশালী। –[গণনা পুস্তক ১৩ : ৩২] এ জমিন, যার গোপন সংবাদ নেওয়ার জন্য আমি গিয়েছিলাম, এমনই জমিন, যা তার বাসিন্দাদের গিলে ফেলে। আর যাদেরকে আমি সেখানে দেখেছি, তারা সবাই খুবই শক্তিশালী। আমি সেখানে 'বনী ইনাক' গোত্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছি, তারা শক্তিশালী বংশের লোক। আমরা তাদের দৃষ্টিতে ফড়িং স্বরূপ ছিলাম। আর সত্য বলতে কি, আমরা এরূপই ছিলাম [গণনা পুস্তক ১৩ : ৩২]

جَبَّارِيْنَ শব্দটি মোটাসোটা, নাদুশ-নুদুশ ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য। বস্তুত এখানকার অর্থ হলো اَىْ عِظَامَ الْاَجْسَامِ طُوْلًا [দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে লম্বা চওড়া দেহবিশিষ্ট। –[কুরতুবী]

জাব্বার ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার দেহ খুব উঁচু হয়, মোটাতাজা শক্তিশালী হয়। –[তাফসীরে কাবীর]

ইহুদিদের বর্ণনায় জানা যায় যে, তারা ছিল দীর্ঘ কায়াবিশিষ্ট। এছাড়া তাদের ঘটনা সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত আছে। তাদের সম্পর্কে আল কুরআনে যে جَبَّارٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা খোদ তাওরাতেও উল্লেখ আছে। যেমন উপরের আলোচনায় তা ব্যক্ত করা হয়েছে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৯৬]

قَوْلُهُ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ : 'তাওয়াক্কুল'-এর মর্ম : বৈধ আসবাব-উপকরণ পরিহার করা 'তাওয়াক্কুল' নয়। তাওয়াক্কুল অর্থ, কোনোও ভালো কাজের লক্ষ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চরিত্র করা, তারপর তা ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা; নিজ প্রচেষ্টায় দর্পিত না হওয়া। বৈধ আসবাব উপকরণ ছেড়ে দিয়ে বসে বসে আশার জাল বোনা, কোনো আল্লাহ-নির্ভরতা নয়; বরং আত্মহনন মাত্র। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৯৫]

قَوْلُهُ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ : এটা সেই জাতির উক্তি, যারা দাবি করে نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّٓاؤُهٗ অর্থাৎ আমরা মহান আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয়জন। বস্তুত তাদের উপর্যুপরি অবাধ্যতা ও চিরায়ত হঠকারিতা দৃষ্টে এরূপ উক্তি অস্বাভাবিক কিছু নয়। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ৯৬]

٢٦. قَالَ تَعَالَى لَهُ فَاِنَّهَا اَىِ الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ج يَتِيْهُوْنَ يَتَحَيَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط وَهِىَ تِسْعَةُ فَرَاسِخَ قَالَهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) فَلَا تَاْسَ تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ رُوِىَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَسِيْرُوْنَ اللَّيْلَ جَادِّيْنَ فَاِذَا اَصْبَحُوْا اِذَا هُمْ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ ابْتَدَؤُوْا مِنْهُ وَيَسِيْرُوْنَ النَّهَارَ كَذٰلِكَ حَتّٰى اِنْقَرَضُوْا كُلُّهُمْ اِلَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْعِشْرِيْنَ قِيْلَ وَكَانُوْا سِتَّمِائَةِ اَلْفٍ وَمَاتَ هٰرُوْنُ وَمُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِى التِّيْهِ وَكَانَ رَحْمَةً لَهُمَا وَعَذَابًا لِاُولٰئِكَ وَسَأَلَ مُوْسٰى رَبَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ اَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ فَاَدْنَاهُ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ وَنُبِّئَ يُوْشَعُ بَعْدَ الْاَرْبَعِيْنَ وَاُمِرَ بِقِتَالِ الْجَبَّارِيْنَ فَسَارَ بِمَنْ بَقِىَ مَعَهُ وَقَاتَلَهُمْ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَوَقَفَتْ لَهُ الشَّمْسُ سَاعَةً حَتّٰى فَرَغَ عَنْ قِتَالِهِمْ وَرَوٰى اَحْمَدُ فِىْ مُسْنَدِهِ حَدِيْثَ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ عَلٰى بَشَرٍ اِلَّا لِيُوْشَعَ لَيَالِىَ سَارَ اِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ ـ

অনুবাদ :

২৬. তাকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তবে এটা অর্থাৎ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করা চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল। তারা পৃথিবীতে অস্থির হয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ স্থানটির পরিসর ছিল মাত্র নয় ফারসাখ। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না, চিন্তিত হয়ো না। বর্ণিত আছে যে, তারা প্রতি রাতে নয়া উদ্যমে যাত্রা করত। কিন্তু সকাল হলে দেখত, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই তারা পড়ে রয়েছে। দিনেও আবার তদ্রূপ হতো। শেষ পর্যন্ত যাদের বয়স ত্রিশ বছরের কম ছিল তারা ব্যতীত সবাই সেখানে মারা যায়। বলা হয়, তাদের তখন সংখ্যা ছিল ছয়শ' হাজার। সেখানেই হযরত হারূন ও হযরত মূসা (আ.) ইন্তেকাল করেন। অবশ্য এ অবস্থাটি তাদের দু'জনের ক্ষেত্রে ছিল রহমত স্বরূপ আর ওদের ক্ষেত্রে ছিল আজাব স্বরূপ। হাদীসে আছে মৃত্যুর সময় হযরত মূসা আল্লাহর দরবারে মিনতি করেছিলেন, একটি ঢিল নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় পবিত্র ভূমির ততটুকু নিকট যেন আল্লাহ তাঁকে পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ তাঁকে ততটুকু নিকট করে দিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত ইউশা নবী হন। তিনি ঐ অত্যাচারী প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হন। তখন তিনি যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের নিয়েই যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করেন। ঐদিন ছিল জুমাবার। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় তাঁদের জন্য কিছুক্ষণ গতিরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ফলে তাঁরা ঐদিনই যুদ্ধ শেষ করতে সক্ষম হন। হযরত আহমাদ তৎপ্রণীত মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, [পূর্ববর্তী নবীদের যুগে] হযরত ইউশা ব্যতীত আর কোনো মানুষের জন্য সূর্যের গতিরুদ্ধ হয়নি। তাঁর জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস যাত্রার সময় সূর্যের গতিরুদ্ধ করা হয়েছিল।

٢٧. وَاتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ عَلٰى قَوْمِكَ نَبَاَ خَبَرَ ابْنَىْ اٰدَمَ هَابِيْلَ وَقَابِيْلَ بِالْحَقِّ ـ مُتَعَلِّقٌ بِاُتْلُ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ كَبْشٌ لِّهَابِيْلَ وَزَرْعٌ لِقَابِيْلَ فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَهُوَ هَابِيْلُ بِاَنْ نَزَلَتْ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاَكَلَتْ قُرْبَانًا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ط وَهُوَ قَابِيْلُ فَغَضَبَ وَاَضْمَرَ الْحَسَدَ فِىْ نَفْسِهٖ اِلٰى اَنْ حَجَّ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهٗ لَاَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ لِمَ قَالَ لِتَقَبُّلِ قُرْبَانِكَ دُوْنِىْ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

২৭. হে মুহাম্মাদ আদমের দু'পত্র হাবীল ও কাবীলের সংবাদ বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে অর্থাৎ তোমার সম্প্রদায়কে যথাযথভাবে শোনাও। بِالْحَقِّ : এটা اُتْلُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। যখন তারা উভয়ই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানি করেছিল। হাবীলের পক্ষ হতে ছিল একটি মেষ আর কাবীলের পক্ষ হতে ছিল কিছু শস্য। তখন একজনের অর্থাৎ হাবীলের কুরবানি কবুল হলো, আকাশ হতে অগ্নিখণ্ড এসে তা দগ্ধ করে দিল এবং অন্যজনের অর্থাৎ কাবীলের [কুরবানী] কবুল হলো না। এতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে এবং হযরত আদমের হজ্বযাত্রা পর্যন্ত সে এ বিদ্বেষ মনে গোপন করে রাখে। সে তাকে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। সে [হাবীল] বলল, কেন? সে [কাবীল] বলল, তোমার কুরবানি হলো আর আমারটা হলো না। অপরজন বলল, আল্লাহ মুত্তাকীগণের কুরবানিই কবুল করেন।

٢٨. لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ بَسَطْتَ مَدَدْتَ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ فِىْ قَتْلِكَ ـ

২৮. যদি তুমি لَئِنْ -এর لَامْ -টি قَسْمِيَّةٌ বা শপথ অর্থব্যঞ্জক। আমাকে হত্যা করার জন্য হাত উঠাও, আমার প্রতি হাত সম্প্রসারিত কর তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলব না। তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

٢٩. اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ تَرْجِعَ بِاِثْمِىْ بِاِثْمِ قَتْلِىْ وَاِثْمِكَ الَّذِىْ ارْتَكَبْتَهٗ مِنْ قَبْلُ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ج وَلَا اُرِيْدُ اَنْ اَبُوْءَ بِاِثْمِكَ اِذَا قَتَلْتُكَ فَاَكُوْنَ مِنْهُمْ قَالَ تَعَالٰى وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ج

২৯. তুমি আমার অর্থাৎ আমাকে হত্যার ও পূর্বেকৃত তোমার পাপসহ ফিরে যাও, প্রত্যাবর্তন কর অনন্তর অগ্নিবাসী হও এটাই আমি কামনা করি। তোমার পাপসহ আমি প্রত্যাবর্তন করতে চাই না। যদি তোমাকে আমি হত্যা করি তবে আমিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– এটাই জালেমদের কর্মফল।

٣٠. فَطَوَّعَتْ زَيَّنَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ فَصَارَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ بِقَتْلِهٖ وَلَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ بِهٖ لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَيِّتٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَحَمَلَهٗ عَلٰى ظَهْرِهٖ ـ

৩০. অতপর তার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাকে উত্তেজিত করল, এ কর্মটিকে তার সামনে আকর্ষণীয় করে ধরল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে, সে তাঁকে হত্যা করত, ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো। কিন্তু এখন আর কি করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কারণ পৃথিবীতে আদম সন্তানের এটা ছিল প্রথম মৃত্যু। তাই সে তাকে পিঠে বহন করে ঘুরতে লাগল।

٣١. فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ يَنْبُشُ التُّرَابَ بِمِنْقَارِهٖ وَرِجْلَيْهِ وَيُثِيْرُهُ عَلٰى غُرَابٍ اٰخَرَ مَيِّتٍ مَعَهُ حَتّٰى وَارَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِىْ يَسْتُرُ سَوْءَةَ جِيْفَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ عَنْ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْاَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۚ عَلٰى حَمْلِهٖ وَحَفَرَلَهٗ وَوَارَاهُ.

৩১. অনন্তর আল্লাহ তা'আলা এক কাক পাঠালেন, যে তার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় আচ্ছাদিত করা যায় এটা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। এটা চঞ্চু ও পায়ের নখের সাহায্যে মাটি খুড়ে অপর একটি মৃত কাকের উপর ঢেলে ওটাকে ঢেকে দিয়েছিল। সে বলল, হায়! আমি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না যাতে আমার ভাইয়ের মরদেহ গোপন করতে পারি। তারপর সে ওটা পিঠে বহন করার দরুন অনুতপ্ত হলো। যা হোক পরে সে গর্ত খনন করে ঐ লাশ গোপন করল

٣٢. مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ الَّذِىْ فَعَلَهُ قَابِيْلُ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ اَىِ الشَّانُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلَهَا اَوْ بِغَيْرِ فَسَادٍ اَتَاهُ فِى الْاَرْضِ مِنْ كُفْرٍ اَوْ زِنًا اَوْ قَطْعِ طَرِيْقٍ وَنَحْوِهٖ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا بِاَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ قَتْلِهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ حَيْثُ اِنْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَصَوْنِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ اَىْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز الْمُعْجِزَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ مُجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ بِالْكُفْرِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ .

৩২. এ কারণে অর্থাৎ কাবীলের এ কাজের দরুন বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, أَنَّهُ -এর ضَمِيْر বা সর্বনামটি شَأْنٌ বা অবস্থাব্যাঞ্জক। অপর কোনো প্রাণ হত্যা বা দুনিয়াতে কুফরি, ব্যভিচার, রাহাজানি ইত্যাদি করত ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ভিন্ন কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে অর্থাৎ হত্যা হতে বিরত থাকলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রাণের হুরমত ও মর্যাদা বিনষ্ট করা বা রক্ষা করা হিসেবে এ বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছে। তাদের নিকট অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ মুজেযাসহ আগমন করেছিল; কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে দুনিয়ার অপব্যবহারকারীই রয়ে গেল। অর্থাৎ কুফরি, হত্যা ইত্যাদি কাজ করে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবেই তারা রয়ে গেল।

٣٣. وَنَزَلَ فِي الْعُرَنِيِّيْنَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ مَرْضٰى فَاَذِنَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّخْرُجُوْا اِلَى الْاِبِلِ وَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوْا لْاِبِلَ اِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ بِمُحَارِبَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَيْ اَيْدِيْهِمُ الْيُمْنٰى وَاَرْجُلُهُمُ الْيُسْرٰى اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط اَوْ لِتَرْتِيْبِ الْاَحْوَالِ فَالْقَتْلُ لِمَنْ قَتَلَ فَقَطْ وَالصَّلْبُ لِمَنْ قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ وَالْقَطْعُ لِمَنْ اَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَالنَّفْيُ لِمَنْ اَخَافَ فَقَطْ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاَصَحُّ قَوْلَيْهِ اَنَّ الصَّلْبَ ثَلَاثًا بَعْدَ الْقَتْلِ وَقِيْلَ قَبْلَهٗ قَلِيْلًا وَيُلْحَقُ بِالنَّفْيِ مَا اَشْبَهَهٗ فِي التَّنْكِيْلِ مِنَ الْحَبْسِ وَغَيْرِهٖ ذٰلِكَ الْجَزَاءُ الْمَذْكُوْرُ لَهُمْ خِزْيٌ ذُلٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ هُوَ عَذَابُ النَّارِ ـ

৩৩. উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় আসে। তারা ছিল **অসুস্থ। তখন রাসূল** ﷺ তাদেরকে উষ্ট্র-চারণক্ষেত্রে গিয়ে **[ঔষধ হিসেবে] উষ্ট্রের দুধ** ও প্রস্রাব পান করতে অনুমতি **দেন। পরে এরা সুস্থ হয়ে** উক্ত চারণক্ষেত্রের রাখালদেরকে হত্যা **করে উটগুলো** নিয়ে পালিয়ে যায়। [রাসূল ﷺ এদেরকে **ধরে এনে** শাস্তি প্রদান করেছিলেন।] এদের বিষয়ে **আল্লাহ** তা'আলা নাজিল করেন– যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রাহাজানি করত দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কাজ করে তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে او [অথবা] শব্দটি অবস্থার প্রেক্ষিতে শাস্তির বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে। যে ব্যক্তি কেবল হত্যাকাণ্ড করেছে তার শাস্তি হলো হত্যা; আর যে ব্যক্তি হত্যা ও ছিনতাই উভয় অন্যায় করছে তার শাস্তি হলো ক্রুশবিদ্ধ করা; যে ব্যক্তি কেবল ছিনতাই করেছে হত্যা করেনি তার **শাস্তি হলো হস্ত-পদ ব্যবচ্ছেদকরণ**; আর যে ব্যক্তি শুধু ভীতি প্রদান করেছে তার শাস্তি হলো নির্বাসন। ইমাম শাফেয়ীর অভিমতও এটাই। তবে তাঁর অধিকতর সঠিক অভিমত হলো, এ ধরনের অপরাধীকে হত্যা করত তিন দিন পর্যন্ত শূলে লটকিয়ে রাখা হবে। কেউ কেউ বলেন, হত্যার পূর্বে কিছুক্ষণ শূলে লটকানো হবে। নির্বাসনদণ্ডের অনুরূপ যেসব সম্মানসম্পন্ন দণ্ড রয়েছে, যেমন বন্দী করা ইত্যাদিও এর শামিল বলে বিবেচ্য। এটাই অর্থাৎ উল্লিখিত শাস্তি দুনিয়ায় তাদের লাঞ্ছনা অবমাননা এবং তাদের জন্য পরকালেও রয়েছে মহা শাস্তি। অর্থাৎ জাহান্নামের আজাব।

٣٤. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَ الْمُحَارِبِيْنَ وَالْقُطَّاعِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَهُمْ مَا اَتَوْهُ رَحِيْمٌ بِهِمْ عَبَّرَ بِذٰلِكَ دُوْنَ فَلَا تَحُدُّوْهُمْ لِيُفِيْدَ اَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِتَوْبَتِهِ اِلَّا حُدُوْدَ اللّٰهِ دُوْنَ حُقُوْقِ الْاٰدَمِيِّيْنَ كَذَا ظَهَرَ لِيْ وَلَمْ اَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِذَا قَتَلَ وَاَخَذَ الْمَالَ يُقْتَلُ وَيُقْطَعُ وَلَا يُصْلَبُ وَهُوَ اَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَلَا تُفِيْدُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ شَيْئًا وَهُوَ اَصَحُّ قَوْلَيْهِ اَيْضًا .

৩৪. তবে তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসার পূর্বে যারা অর্থাৎ রাহাজানিকারী ও যুদ্ধকারীদের মধ্যে যারা তওবা করবে তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। জেনে রাখ যা তারা করেছে তৎপ্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু। এখানে لا تحدوهم অর্থাৎ "তওবা করলে এদের উপর হদ আরোপ করো না" এ কথা না বলে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' ভঙ্গিতে বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তওবার মাধ্যমে কেবল আল্লাহর হকই রহিত হতে পারে; এতে মানুষের হক মাফ হয়ে যাবে না। আমি এর এতটুকুই মর্মোদ্ধার করতে পেরেছি। মুফাসসিরগণের কেউ এর প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন বলে দেখিনি। যদি কেউ হত্যা ও ছিনতাই উভয় ধরনের অপরাধ করে তবে তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর অধিকতর সঠিক অভিমত হলো তাকে অঙ্গচ্ছেদ ও হত্যা উভয় ধরনের শাস্তি প্রদান করা হবে। তাকে শূলে চড়ানো হবে না। ইমাম শাফেয়ীর অধিকতর সঠিক অভিমত হলো, আয়ত্তাধীন হওয়ার পর যদি সে তওবা করে তবে তাতে কোনো লাভ হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُتْلُ : অর্থ– পড়, তেলাওয়াত কর। تِلَاوَةٌ মাসদার থেকে وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ।

قَوْلُهُ تَبُوْءَ : এটি (ن) بَوْءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ। অর্থ– তুমি অর্জন করবে, তুমি ফিরবে।

قَوْلُهُ طَوَّعَتْ : تَطْوِيْعٌ মাসদার থেকে مَاضِى وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ। সে আগ্রহ জাগিয়েছে, সে রাজি করেছে, সে উদ্বুদ্ধ করেছে, সে সহজ করে দিয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন]

قَوْلُهُ سَوْءَةَ : اَىْ حَمْلَ الْجَسَدِ عَلٰى ظَهْرِهٖ অর্থাৎ স্বীয় ভাই হাবীলের লাশকে নিজের পিঠে বহন করে ঘুরছিল এবং দাফনের পদ্ধতি না জানা থাকার কারণে লজ্জিত হয়েছে। حَمْلَةٌ-এর আরেকটি মর্ম এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, حَمْلَةٌ-এর যমীরের مَرْجِعْ হলো قَتْلٌ তখন তরজমা হবে কাবীলকে তার নফস স্বীয় ভ্রাতা হাবীলকে হত্যার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার কারণে সে লজ্জিত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ اِنْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا : এর সম্পর্ক হলো كَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا-এর সাথে। অর্থাৎ যে একটি প্রাণ হত্যা করে তার মানহানি করল, সে যেন সকল প্রাণের মানহানি করল।

قَوْلُهُ وَصَوْنِهَا : এর সম্পর্ক فَكَاَنَّمَا اَحْيَى النَّاسَ جَمِيْعًا-এর সাথে। অর্থাৎ যেন সে একটি প্রাণ রক্ষা করে সকল মানুষের প্রাণকে বাঁচিয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ اِنْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَصَوْنِهَا : এ জুমলাটি لَفٌّ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ হিসেবে হয়েছে।

قَوْلُهُ عُرَنِيِّيْنَ : এটি عَرَبِىٌّ-এর বহুবচন। এটি আরবের একটি গোত্র عُرَيْنَةٌ-এর দিকে সম্পৃক্ত; عُرَنِيِّيْنَ-এর মধ্যে يَاء হলো نَسَبِىْ যেমন جُهَيْنَةٌ শব্দটি جُهَيْنِىْ গোত্রের দিকে নিসবত হয়েছে। –[জামালাইন]

قَوْلُهُ اَوْ لِتَرْتِيْبِ الْاَحْوَالِ : অর্থাৎ اَوْ শব্দটি কুরআনের যেখানেই এসেছে সেখানে تَخْيِيْر -এর জন্য এসেছে। শুধুমাত্র এখানে তা تَرْتِيْبٌ -এর জন্য এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتْلُ : এর عَطْف হয়েছে পূর্বের উহ্য اُذْكُرْ -এর সাথে। اَىْ اُذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ মَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْف -এর মাঝে সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্পষ্ট। তাহলে مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর মাঝে জিহাদ থেকে কাপুরুষতা প্রদর্শন করে জীবন বাঁচানোর আলোচনা রয়েছে আর مَعْطُوْف -এর মাঝে অন্যায়ভাবে প্রাণ হত্যার আলোচনা রয়েছে। উভয়টিই অপরাধ ও গুনাহ।

قَوْلُهُ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ : এর দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর দুই ঔরসজাত পুত্র হাবীল ও কাবীলকে বুঝানো হয়েছে। কাবীল ছিল বড় ছেলে। তার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ছিল কৃষিকর্ম। আর হাবীল ছিল ছোট। তার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ছিল পশু পালন। হাসান (র.) বলেন, উক্ত ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত মতটিই সঠিক। কেননা এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে যে, হত্যাকারী লাশ দাফনের পদ্ধতি জানত না। একটি কাকের কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে দাফন কার্য সম্পন্ন করে। যদি তা বনী ইসরাঈলের ঘটনা হতো তাহলে দাফনের পদ্ধতি জানা থাকার কথা ছিল। কেননা ইতিপূর্বে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে থাকবে।

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ : [হে আমার পয়গাম্বর!] عَلَيْهِمْ তাদের কাছে। এর সর্বনামটি কাদের দিকে ইঙ্গিতবহ? আহলে কিতাব এবং বিশেষ করে আহলে কিতাবদের মাঝে যারা বিদ্বেষপরায়ণ তাদের দিকে ইঙ্গিতবহ। যেমন বলা হয়েছে– وَاتْلُ عَلٰى اَهْلِ كِتَابٍ আহলে কিতাবদেরকে শোনান। –[তাফসীরে কাবীর]

এসব বিদ্রোহী, বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের কাছে বর্ণনা করুন। –[ইবনে কাসীর] এসব ইহুদিদের কাছে বর্ণনা করুন, যারা তাদের হাত তোমাদের প্রতি উঠাতে চায়। –[ইবনে জারীর] কিন্তু সব মানুষের প্রতি সম্বোধনটি হতে পারে। যথা وَاتْلُ عَلَى النَّاسِ মানুষকে শোনান। –[তাফসীরে কাবীর]

ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো দু'টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। যথা– ১. বংশমর্যাদা কোনো কাজে আসে না। সে-ই আল্লাহর কাছে মকবুল, যে তাঁর হুকুমের অনুসারী হয়। ২. বিদ্বেষবশত মানুষ কত জঘন্য শয়তানি কাজ 'অন্যায়'-ই না করে বসে! اِبْنَىْ اٰدَمَ মানে আদম (আ.)-এর দুই পুত্র। এঁরা হলেন- হাবিল ও কাবীল। তাওরাতে কায়েন ও হাবিল উল্লেখ আছে। কাবীল ছিল বড় এবং হাবিল ছিল ছোট। তাওরাতের বর্ণনায় জানা যায় যে, কাবীল ছিল কৃষিজীবী এবং হাবিল ভেড়া বকরি চরাতো এবং ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ করতো। بِالْحَقِّ অর্থাৎ যথাযথভাবে। উহ্য বাক্যটি এরূপ– مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ - تِلَاوَةً مُتَلَبِّسَةً بِالْحَقِّ وَالصِّحَّةِ অর্থাৎ সঠিকভাবে, সঠিক ও সত্যভাবে শোনান। –[কাশ্শাফ]

তাজ্জবের ব্যাপার নয়, আসল উদ্দেশ্য হলো কুরআনের বর্ণিত এ ঘটনা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য। তাওরাত গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় এ কাহিনীটি সত্য মিথ্যা মিশ্রিত নয়। বিশিষ্ট মুফাসসির ইমাম রাযী (র.) অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন; অর্থাৎ কুরআনের এ কাহিনী, কুরআনের অন্যান্য কাহিনীর ন্যায় হেদায়েতের শিক্ষা গ্রহণের জন্য। পুরানো জাহেলিয়্যাত ও আধুনিক জাহেলিয়্যাতের ন্যায় কাহিনী কেবল কাহিনীর জন্য, আর্ট কেবল আর্টের জন্য; কুরআন মাজীদের মাকসুদ তা নয়। অর্থাৎ তা নির্ভরযোগ্য, অধিকাংশ গল্পকারের ন্যায় তা আমোদ-ফূর্তির উপকরণ নয়, যার মধ্যে কোনো ফায়দা বা উপকার নেই, বরং তা অবান্তর কথা মাত্র। –[তাফসীরে কাবীর]

আর একথাটি এ কাহিনীর সাথে কেবল সম্পৃক্ত নয়, বরং কুরআন মাজীদে বর্ণিত সমস্ত কিসসা-কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য হলো– উপদেশ, নসিহত ও হেদায়েত গ্রহণ ও কবুল করা। এ থেকে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, কুরআনে কিসসা কাহিনী বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হলো– উপদেশ গ্রহণ করা, তা কেবল কাহিনী-ই নয়। –[তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১০৪]

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য : তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে– وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। এতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ

মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনোরূপ মিথ্যা, জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ থাকা এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হওয়া উচিত নয়।

পবিত্র কুরআন শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে– نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ; দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে– اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ; তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে– ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ এসব জায়গায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলির সাথে حَقّ শব্দ ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, ঘটনাবলি বর্ণনায় সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। জগতে রেওয়ায়েত ও বর্ণনার ভিত্তিতে যেসব অনিষ্ট দেখা দেয়, সাধারণত সেগুলোর মূল কারণ ঘটনাবলি বর্ণনায় অসাবধানতা। সামান্য শব্দ ও ভঙ্গির পরিবর্তনে ঘটনার বিবরণ বিকৃত হয়ে যায়। এ অসাবধানতার কারণেই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধর্ম ও শরিয়ত বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলি কতিপয় ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক গল্প-গুজবের সমষ্টিতে পর্যবসিত হয়েছে। আয়াতে بِالْحَقِّ শব্দযোগ করে এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা পবিত্র কুরআনের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহ্যত নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলি যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ আল্লাহর ওহী ও নবুয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ ভূমিকার পর পবিত্র কুরআন পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন– اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারো নৈকট্যলাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে কুরবান বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায় কুরবান ঐ জন্তুকে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে জবাই করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর পুত্রদ্বয়ের কুরবানির ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত রয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) একে পূর্ববর্তী পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ঘটনা : যখন আদম ও হাওয়া (আ.) পৃথিবীতে আসেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা-এরূপ যমজ সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো। তখন ভ্রাতা -ভগিনী ছাড়া হযরত আদমের আর কোনো সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে হযরত আদম (আ.)-এর শরিয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা ভগিনীরূপে গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমা সুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়ামানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জিদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আ.) তাঁর শরিয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্য নিজ নিজ কুরবানি পেশ কর। যার কুরবানি গৃহীত হবে, সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। হযরত আদম (আ.)-এর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কুরবানিই গৃহীত হবে।

তৎকালে কুরাবানি গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা অবতীর্ণ হয়ে কুরবানিকে ভস্মীভূত করে তা আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি ভস্মীভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হতো। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করতো। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানি করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানির জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটিকে ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল– لَاَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত্য বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল– اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ম

এই যে, তিনি আল্লাহভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানিও গৃহীত হতো। তুমি তা করনি, তাই কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?

এ বাক্যে হিংসুটের হিংসার প্রতিকার বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ হিংসাকারী যখন দেখে যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছে, যা সে প্রাপ্ত হয়নি, তখন একে নিজ কর্মদোষ ও গুনাহের ফলশ্রুতি মনে করে গুনাহ থেকে তওবা করা উচিত। অন্যের নিয়ামত আপনোদনের চেষ্টা করা উচিত নয়। তাতে উপকারের পরিবর্তে অপকারই হবে বেশি। কারণ, আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়া আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল।

সৎকর্ম গৃহীত হওয়া আন্তরিকতা ও আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল : এখানে হাবিল ও কাবিলের কথোপকথনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে যে, সৎকর্ম ও ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ ভীতির উপর নির্ভরশীল। যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, তার সৎকর্মও গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলেমগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত ইবাদতকারী ও সৎকর্মীদের জন্য চাবুক স্বরূপ। এজন্যই হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) অন্তিম মুহূর্তে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, আপনি তো সারা জীবন সৎকর্ম ও ইবাদতে মশগুল ছিলেন। এখন কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, তোমরা তো একথা বলছ, আর আমার কানে আল্লাহ তা'আলার এ বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে- إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ; আমার কোনো ইবাদত গৃহীত হবে কিনা? তা আমার জানা নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, **আল্লাহ তা'আলা আমার কোনো সৎকর্ম** গ্রহণ করেছেন, তবে এটা হবে **আমার জন্য একটি বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী স্বর্ণে পরিণত হয়ে** আমার অধিকারে এসে গেলেও **আমি তাকে কিছুই মনে করব না।**

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, যদি নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আমার একটি নামাজ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে, তবে আমার জন্য এটি হবে সমগ্র বিশ্ব ও তার অগণিত নিয়ামতের চাইতেও উত্তম।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) কোনো এক ব্যক্তিকে পত্র মারফত নিম্নোক্ত উপদেশাবলি প্রেরণ করেন, আমি জোর দিয়ে বলছি যে, তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন কর। এছাড়া কোনো সৎকর্ম গৃহীত হয় না। আল্লাহভীরু ছাড়া কারো প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয় না এবং এটি ছাড়া কোনো কিছুর ছওয়াবও পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের উপদেশদাতা অনেক; কিন্তু একে কাজে পরিণত করে এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্য।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহভীতির সাথে ছোট সৎকর্মও ছোট নয়। যে সৎকর্ম গৃহীত হয়ে যায়, তাকে কেমন করে ছোট বলা যায়। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ৯৮-১০১]

قَوْلُهُ قُرْبَانًا : এখানে قُرْبَانًا [কুরবানি] শব্দের প্রচলিত অর্থ জবাই করা নয়; বরং শাব্দিক অর্থ খুবই গুরুত্ববহ; যথা- মানত করা। যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হয়, তাই-ই কুরবানি [রাগিব]। যে জবাই ও কুরবানির দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা হয়, তার নামই কুরবানি [কবীর]। যে ভালো কাজের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতের নৈকট্য হাসিল করার ইচ্ছা করা হয়, তাই কুরবান [জাস্সাস]। قُرْبَانٌ বিশেষ্য জাতীয় শব্দ। এক বা দ্বিবচনে এর প্রয়োগ এরূপই হয়ে থাকে। বিশেষ্য জাতীয় শব্দ এক বা দ্বিবচনের জন্য ব্যবহার হতে পারে। -[তাফসীরে কবীর, তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১০৫]

হাবিল ও কাবিলের ঘটনা ও আনুষঙ্গিক তাৎপর্য : হযরত আদম (আ.)-এর ঔরসজাত ছেলে হাবীল ও কাবীলের ঘটনা তাদেরকে শোনাও। কেননা সে ঘটনায় মহান আল্লাহর কাছে এক ভাইয়ের সমাদর ও তার তাকওয়া পরহেজগারীর কারণে তার প্রতি অপর ভাইয়ের হিংসা-বিদ্বেষ এবং শেষ পর্যন্ত তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গে অন্যায় রক্তপাতের কী পরিণাম তাও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বের রুকুতে বলা হয়েছিল, বনী ইসরাঈলকে যখন অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ করা হয়, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করে। এবার হাবীল ও কাবীলের ঘটনাটি মূলত এ বিষয়ের ভূমিকা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুত্তাকী ও মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হত্যা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। তাদেরকে তা থেকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সাবধান ও নিষেধ করা হয়েছিল। তথাপি তাদেরকে সর্বদাই সে কাজে কীরূপ কৃতসংকল্প ও তৎপর লক্ষ্য করা যায়! তারা পূর্বেও বহু নবীকে হত্যা করেছে। আজও মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় নবীর বিরুদ্ধে কেবল হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কী রকম জঘন্য চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন জালিম ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে আত্মরক্ষা করা, অপর দিকে নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মানুষের প্রাণনাশ ও গ্রেফতারের চক্রান্ত করা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এর

উপর আবার তারা দাবি করে আমরা মহান আল্লাহর ছেলে ও তাঁর প্রিয়জন। এ বক্তব্য অনুযায়ী কাবীল ও হাবীলের কাহিনী এবং সে প্রসঙ্গে مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ আয়াত উল্লেখ প্রকৃতপক্ষে সেই বিষয়বস্তুর ভূমিকা স্বরূপ, যা পরবর্তী আয়াত وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -এর মাঝে ব্যক্ত হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-৯৯]

قَوْلُهُ لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ الخ : হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তবে তার জন্য সেই জালিমকে হত্যা করার অনুমতি আছে। তবে ধৈর্যধারণ করলে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। আর এটা সে আক্রমণকারী মুসলিম হলে তখনকার কথা। পক্ষান্তরে যেকোনো প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের মাঝে শরয়ী কল্যাণ নিহিত রয়েছে, সেখানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা জায়েজ নয়, যেমন কাফের ও বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করা। ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ আর যারা কখনো বিদ্রোহের সম্মুখীন হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

-[সূরা শূরা, তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১০৩]

قَوْلُهُ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ : অর্থাৎ তোমার ভয়ে নয়; বরং মহান আল্লাহকে ভয় করে আমি তোমাকে অনুরোধ করি শরিয়তের সীমারেখা অনুযায়ী যতক্ষণ সম্ভব তুমি ভাইয়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করো না। আইয়ুব সুখতিয়ানী (র.) বলতেন, উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি এ আয়াতের নির্দেশ পালন করে দেখিয়েছেন, তিনি হলেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)। -[ইবনে কাসীর] তিনি আপন শিরচ্ছেদ হতে দিয়েছেন, তবু নিজ ইচ্ছায় কোনো একজন মুসলিমের আঙ্গুলও কাটা যেতে দেননি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৪]

قَوْلُهُ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْۤءَ بِاِثْمِىْ الخ : হত্যাকারীর উপর নিহতের পাপ চাপিয়ে দেওয়া হবে, নিজের অন্যান্য পাপের সাথে আমাকে হত্যা করার পাপও অর্জন করে নাও। ইবনে জারীর (র) মুফাসসিরগণের ঐকমত্য বর্ণনা করেন যে, এটাই بِاِثْمِىْ -এর অর্থ। আর যারা বলেন, কিয়ামতের দিন মজলুমের গুনাহের বোঝা জালিমের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের সে বক্তব্যও এক পর্যায়ে সঠিক। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, সেটা এ আয়াতের ব্যাখ্যা নয়। এবার হাবীলের বক্তব্যের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, তুমি যদি আমাকে হত্যা করার গুনাহ নিজ মাথায় চাপানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাক, তবে আমিও সিদ্ধান্ত করেছি আত্মরক্ষার কোনো উপায় অবলম্বন করব না। যাতে করে আইনের ঊর্ধ্বে উচ্চতর আদর্শ বর্জনের অভিযোগও আমার উপর না বর্তায়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৫]

হত্যাকারীর পরিণতি : পার্থিব ক্ষতি তো এই যে, যার দ্বারা তার বাহুবল বৃদ্ধি পেত, এমন একজন শক্তিমান ভাইকে সে হারাল এবং শেষ পর্যন্ত নিজে উন্মাদ হয়ে মারা গেল। হাদীসে আছে জুলুম ও আত্মীয়তা ছেদন, এমন দুটি পাপ, যার শাস্তি আখিরাতের আগে ইহজগতেই ভোগ করতে হয়। আর পরকালীন ক্ষতি এই যে, দুনিয়ার জুলুম আত্মীয়তা বিচ্ছেদ, ইচ্ছাকৃত হত্যা ও নিরাপত্তাহীনতার দুয়ার খুলে দেওয়ার কারণে এক তো সে এসব গুনাহের শাস্তির উপযুক্ত হলো, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতেও এ প্রকারের যত পাপাচার দুনিয়ার সংঘটিত হবে, প্রথম উদ্ভাবক হিসেবে সে তার সবগুলোতে অংশীদার থাকবে, যেমন হাদীসে স্পষ্ট আছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৮]

লাশ মাটিতে দাফনের প্রচলন : এর আগে আর কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি। তাই হত্যা করার পর সে বুঝতে পারল না লাশ কী করবে? অবশেষে সে দেখল, একটি কাক মাটি খুড়ছে বা অন্য একটি মরা কাককে মাটি সরিয়ে তাতে লুকাচ্ছে । তখন তার কিছুটা হুঁশ হলো যে, আমিও তো ভাইয়ের লাশ দাফন করে ফেলতে পারি। সেই সঙ্গে অনুতাপও হলো যে, বিবেক-বুদ্ধি ও ভ্রাতৃত্ববোধে আমি এ তুচ্ছ প্রাণীটি অপেক্ষাও অধম হয়ে গেলাম? সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা একটি মামুলী প্রাণী দ্বারা এ জন্যই তাকে সচেতন করেছেন যে, সে নিজ পাশবিকতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষণিক লজ্জিত হোক। পশুপাখীর মধ্যে কাকের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজ ভাইদের লাশ মুক্ত স্থানে পরিত্যাক্ত দেখলে প্রচণ্ড হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়।

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১০৯]

قَوْلُهُ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ : অনুতাপ তো কেবল সেটাই কাজে আসে যার সাথে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা, বিনয় ও সমতা এবং প্রতিবিধানের ফিকির থাকে। এখানে তার মন:স্তাপ মহান আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে ছিল না; বরং এর কারণ ছিল নিজের দূরবস্থা, সে হত্যা করার পর যার সম্মুখীন হয়েছিল। -[তাফসীরে উসমানী: টীকা- ১১০]

লাঞ্ছনা ও ক্ষতি এর থেকে আর বেশি কী হতে পারে যে, সে দুনিয়াতে সর্বপ্রথম খুন করে এবং মানুষ খুন তথা স্বীয় ভাইয়ের খুনের অপরাধে অপরাধী হয়। ফলে সে আখিরাতে কঠোর আজাবের হকদার হয়। فَاَصْبَحَ অর্থাৎ সে হয়ে গেল। এখানে اَصْبَحَ শব্দের অর্থ– কতল বা হত্যা রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছিল, তা নয়; বরং এর অর্থ হলো– কোনো এক সময়ে। হত্যা করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দিনরাতের যে সময়েই তা হোক না কেন, এ শব্দের দৃষ্টিতে তা হয় জায়েজ। اَصْبَحَ **শব্দটি** صَارَ শব্দের অনুরূপ অর্থাৎ হয়ে গেল। আরবি ভাষা-ভাষীদের কাছে এরূপ প্রচলন আছে। কেউ কেউ এ বাকধারার অর্থ বুঝতে ভুল করে। যেমন বর্ণিত আছে اَصْبَحَ অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড রাতে সংঘটিত হয়েছিল; বরং এর অর্থ হলো অনির্ধারিত সময়, তা দিনেও হতে পারে এবং রাতেও সংঘটিত হতে পারে। আরব ভাষা-ভাষীরা এরূপই অর্থ নিয়ে থাকেন। –[জাসসাস] তোমরা কি দেখ না, তারা اَمْسٰى - اَضْحٰى، ظَلَّ ও بَاتَ এ শব্দগুলোর অর্থ صَارَ বা হয়ে গেল নিয়ে থাকে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১১৫]

قَوْلُهُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ : অর্থাৎ অন্যায় হত্যাকাণ্ডের মাঝে যে ইহজাগতিক ও পারলৌকিক ক্ষতি রয়েছে এবং যে অশুভ পরিণতি তা বয়ে আনে, তার দরুন এমন কি খোদ ঘাতকও অনেক সময় নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতাপদগ্ধ হতে থাকে। এ কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে এ বিধান দেই যে......। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১১]

قَوْلُهُ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ : দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি বহু রকমে হতে পারে। যেমন সত্যপন্থিদেরকে সত্য দীনে বাধা প্রদান, নবীগণের অবমাননা কিংবা নাউযুবিল্লাহ মুরতাদ হয়ে গিয়ে নিজ অস্তিত্ব দ্বারা অন্যকে মুরতাদ হতে প্ররোচিত করা ইত্যাদি।
–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১২]

قَوْلُهُ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا এক ব্যক্তি হত্যা সকলকে হত্যার সমতুল্য : এ আয়াতের উপর **এরূপ প্রশ্ন হতে পারে যে, এক ব্যক্তির হত্যাকারী, কিরূপে সকল মানুষের হত্যাকারীর সমান হতে পারে? আয়াতে** فَكَاَنَّمَا **[অর্থাৎ সে যেন করলো]। শব্দের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রশ্ন আর থাকে না।** এরূপ ইরশাদ হয়নি যে, একজনকে হত্যাকারী এবং সকলকে হত্যাকারী কানুন বা আইনের দৃষ্টিতে সমান। আদালতের কানুন ও নিয়মের দৃষ্টিতে উভয়ই সমান তা বলা হয়নি। এখানে উদ্দেশ্য হলো হত্যাকারীর স্বভাবের উপর আলোকপাত করা। যে জালিম ও অত্যাচারী বিনা কারণে এবং বিনা দোষে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন নাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না, তবে এ দুঃসাহস এবং নাফসের পাপিষ্ঠতা পারলে সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করে ফেলবে। এখানে তার দৃষ্টিতে আসল উদ্দেশ্যে হলো শরিয়তের কানুনের অমর্যাদা করা এবং তা অবমাননার জন্য দুঃসাহস দেখানো। এ হিসেবে যে, সে হারামভাবে রক্ত প্রবাহের পর্দা বিদীর্ণ করেছে এবং কতলের প্রচলন ঘটিয়েছে এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে এ নিয়ম চালু করেছে। –[বায়যাভী]

এক ব্যক্তির হত্যাকারীকে সকল মানুষের হত্যাকারীর সাথে এজন্য তুলনা করা হয়েছে যে, হত্যার কাজকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে যাতে বুঝানো যায়। –[তাফসীরে কাবীর]

বর্ণিত আছে, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি একজনকে খুন করা হালাল বা বৈধ মনে করলো , সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করা হালাল মনে করলো; কেননা, সে শরিয়তের বিধানকে অস্বীকার করেছে।

মহানবী ﷺ -এর হাদীসে এ প্রসঙ্গে একস্থানে উল্লেখ আছে যে, সারা পৃথিবীর যেখানেই কোনো না-হক হত্যা সংঘটিত হয়, তার শাস্তির একটা অংশ কাবিলের আলমানামায় লিখিত হয়। কেননা এ ধরনের জুলুম ও অত্যাচারের সর্বপ্রথম স্থপতি সে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না। এরূপ করলে হযরত আদম (আ.)-এর প্রথম পুত্রের উপর এর একটা অংশ চলে যাবে। কেননা, সে-ই ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কতলের ধারা প্রবাহিত করে। –[বুখারী শরীফ, কিতাবুল আম্বিয়া। আদম (আ.)-এর সৃষ্টি এবং তাঁর বংশধরগণ অধ্যায়]

বর্তমান তাওরাতে মানুষ হত্যার অপরাধ সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মানুষের খুন বা রক্ত প্রবাহিত করবে, অন্য মানুষের দ্বারা তার রক্ত প্রবাহিত করানো হবে। কেননা মানুষকে তাঁর সুরতে সৃষ্টি করেছেন। –[আদি পুস্তক ৯ : ৬]। কিন্তু তালমুদে, [কুরআনের ইংরেজী ভাষ্যকার রাডবীলের বর্ণনানুসারে] নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি বর্ণিত আছে : যে কেউ একজন ইসরাঈলীকে হত্যা করবে, তার জন্য এরূপ মনে করা হবে যে, সে যেন ইসরাঈল বংশের সকলকে হত্যা করলো।

একটি সহীহ হাদীসে এ মর্মে উদ্ধৃত আছে, যা একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজের প্রচলন করবে এবং তার পর আমল করবে, সে তার বিনিময় লাভ করবে এবং সেই কাজের আমল অন্য যারা করবে, তাদের

আমলের সমপরিমাণ বিনিময়ও সে পাবে; এমতাবস্থায় তাদের আমলের বিনিময় কম দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি একটি **খারাপ কাজের প্রচলন** করে এবং নিজে তা আমল করে, তার বিনিময় সে পাবে এবং অন্য যারা এ কাজ করবে, তাদের কাজের হিসেবে সেও এর একটা হিস্‌সা পাবে। এমতাবস্থায় তাদের গুনাহের প্রতিফল কম দেওয়া হবে না। হাদীসে যদি এরূপ ব্যাখ্যা নাও থাকতো, তবুও এই মাসআলাটি যথাস্থানে জ্ঞান ও বিবেকসম্মত। এখানে اَحْيَاهَا শব্দের অর্থ জীবিত করা নয়; বরং এর অর্থ হলো– মৃত্যু থেকে বাঁচানো এবং ধ্বংসকর কারণ থেকে দূরে রাখা। যেমন মুজাহিদ বলেন– نَجَاهَا مِنَ الْهَلَاكَةِ অর্থাৎ সে যেন ধ্বংস থেকে তাকে রক্ষা করলো, যে ব্যক্তি তার কতল থেকে রক্ষা পেল। প্রাণ রক্ষা করা– এর অর্থ হলো ধ্বংস থেকে রক্ষা করা। যেমন জ্বালানো, ডুবানো, প্রচণ্ড ক্ষুধা, প্রচণ্ড শীত, গরম ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। এই বাঁচানো বা রক্ষা করা তখনই প্রশংসার দাবিদার ও বিনিময় পাওয়ার যোগ্য হবে, যখন সে বাঁচানো হবে না-হক খুন থেকে। পক্ষান্তরে, বাঁচানোকে যদি সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে কিসাস ইত্যাদির সময় যদি কাউকে ওয়াজিব খুন থেকে বাঁচানো হয়, তবে তা হবে গুনাহ এবং হারামের উপর সাহায্য করার মতো। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১২০,১২১]

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে শান্তি ভঙ্গ করাই হলো সীমালংঘন : বনী ইসরাঈলের বহু লোক এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও দ্ব্যর্থহীন আদশোবলি শুনেও নিজেদের জুলুম নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘন হতে নিবৃত্ত হয়নি। নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করা ও নিজেদের মধ্যে খুন-খারাবি করা তাদের চিরায়ত স্বভাব। আজও তারা শেষ নবী ﷺ -কে [নাউযুবিল্লাহ] হত্যা বা উৎপীড়ন করার এবং মুসলিমগণকে হেনস্থা করার জন্য সর্বতোভাবে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তারা এতটুকুও উপলব্ধি করে না যে, তাওরাতের বিধান অনুসারে যে কোনোও একজন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করাটা এতবড় অপরাধ যে, ঘাতক বিশ্বের সমগ্র মানুষের হত্যাকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়, তখন বিশ্ব-মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বাপেক্ষা সমাদৃত ও পবিত্র মানব সমাজকে হত্যা ও উৎপীড়ন করা, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও লড়াই করতে বদ্ধপরিকর হওয়া মহান আল্লাহর নিকট কত বড় জঘন্য অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহর দূতগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা তো খোদ মহান আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর! সম্ভবত এ কারণেই পরবর্তী আয়াতে সেইসব লোকের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি তুলে ধরা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাক ও নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে লড়াই করে বা পৃথিবীতে নানা রকম অশান্তি বিস্তারে 'সীমালঙ্ঘনকারী' সাব্যস্ত হয়। –[তাফসীরে উসমানী: টীকা-১১৫]

ثُمَّ শব্দটি কখনো কখনো দূরের অর্থ প্রকাশ করে। –[রূহুল মা'আনী] বস্তুত এখানকার অর্থ হলো পয়গাম্বরদের আগমনের কারণে যে ফল ও লাভ হয়, এখানে তার কিছুই হয়নি; বরং উল্টো ফল দেখা যায়।

لَمُسْرِفُوْنَ অবশ্যই তারা সীমালঙ্ঘনকারী। اِسْرَافٌ শব্দের সব ধরনের বাড়াবাড়ি ও গুনাহ শামিল। এর তাৎপর্য হলো পয়গাম্বররা আগমন করা সত্ত্বেও অধিকাংশ ইসরাঈল খোদায়ী বিধানের লাগাতার বিরোধিতা করতে থাকে। সব কাজে বাড়াবাড়ি করাই হলো اِسْرَافٌ [রূহ] অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই ছিল সীমা অতিক্রমকারী, আল্লাহর হুকুম তরককারী। –[কুরতুবী]

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারী এবং নিজেদের প্রবৃত্তির সেবাদাস, নিজেদের নবীদের খেলাফকারী। তাদের এসব কাজ ছিল জমিনের মধ্যে তাদের বাড়াবাড়ির শামিল। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১২৩]

এখানে এ ঘটনা উল্লেখের উদ্দেশ্য : এখানে হাবীল ও কাবিলের ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদেরকে তাদের চক্রান্ত ও হিংসার প্রতি খুব সূক্ষ্মভাবে নিন্দা করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, ইহুদিদের একটি দল রাসূল ﷺ এবং তাঁর কতিপয় সাহাবীকে খাবারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং সংগোপনে এ চক্রান্ত করেছিল যে, তাঁদের প্রতি অতর্কিত হামলা করবে। এভাবে তারা ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে চক্রান্তের কথা তাঁর নবীকে জানিয়ে দেন। ফলে তিনি তাদের দাওয়াতে শরিক হননি। তাদের এ চক্রান্ত একমাত্র এ জন্য ছিল যে, আখেরী জমানার নবী বনী ইসরাঈলের মাঝে না এসে বনী ইসমাঈলে কেন এলেন? অথচ তারা তাঁর নবী হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জানত। –[জামালাইন-২/১৮৬]

قَوْلُهُ اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ : শানে নুযূল : উকাল এবং উরায়না থেকে কিছু লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় এলো। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যানুকূল হলো না। [তাই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাসূল ﷺ তাদেরকে মদীনার বাইরে অবস্থিত সদকার উটের আস্তাবলে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, তোমরা সেখানে গিয়ে উটের দুধ এবং পেশাব পান কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ করে দিবেন। রাসূল ﷺ -এর কথামতো তারা আমল করল। অল্প দিনেই তারা

সুস্থ হয়ে যায়। সুস্থ হওয়ার পর তাদের দুর্মতি হলো। উট ও আস্তাবলের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত সাহাবী হযরত ইয়াসার (রা.)-এর চোখ উপড়ে ফেলে এবং পরে তাকে হত্যাও করে। তারপর উটগুলো নিয়ে নিজেদের দেশের দিকে রওয়ানা হলো এবং মুরতাদ হয়ে গেল। মদীনায় এ সংবাদ পৌঁছল। নবী কারীম ﷺ জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে সরদার নিযুক্ত করে কিছুসংখ্যক সাহাবীকে প্রেরণ করলেন তাদেরকে ধরে আনার জন্য। অবশেষে তারা ধরা পড়ে। তারপর অপরাধীদের সকলের চোখ উপড়ে ফেলা হয় এবং হত্যা করে ফেলা হয়। -[জামালাইন ২/১৮৬]

কুরআনি আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে আল্লাহভীতি ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মতো কুরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে আল্লাহভীতি ও পরকালকল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোনো আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কুরআন পাকের এ বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতের অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরিয়তের শাস্তি তিন প্রকার : চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরিয়তের পরিভাষার কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'পাকিস্তান দণ্ডবিধি' ও 'বাংলাদেশ দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামি শরিয়তে এরূপ নয়। ইসলামি শরিয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, হুদূদ, কিসাস ও তা'যীরাত অর্থাৎ দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানানোর পূর্বে প্রথমত একথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, এসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানি করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' [আল্লাহর হক] এবং 'হক্কুল ইবাদ [বান্দার হক] দু'ই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহর হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই বিধিবিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত একথা জানা জরুরি যে, ইসলামি শরিয়ত বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্য যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামি সরকার যদি শরিয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েজ। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামি দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোনো শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, যেসব শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' তথা 'দণ্ড' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম। যথা-

১. যেসব অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এর বহুবচন 'হুদূদ'।

২. যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরিয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কিসাস'। কুরআন পাক হুদূদ ও কিসাস পূর্ণ ব্যাখ্যাসহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রাসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতেরও উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কুরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কিসাস' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, যেস জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা দণ্ড। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরিয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরিয়তের বিধিবিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোনো সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোনো পার্থক্য হয় না এবং কোনো শাসক ও বিচারক তা ক্ষমা করতে পারে না। **শরিয়তে হুদূদ মাত্র পাঁচটি :** ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ এ চারটির শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোনো শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গুনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যেও শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়। কিন্তু হুদূদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুটিই নাজায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদূদের শাস্তি সাধারণত কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলিও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলির মধ্য থেকে যদি কোনো একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরিয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোনো সন্দেহ অথবা কোনো শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরিয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণত দৈহিক ও শারীরিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হবে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্য নির্ধারিত শর্তসমূহে কোনো ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেওয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেওয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেওয়া হবে। কিসাসের শাস্তিও হুদূদের মতো কুরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হদূদকে আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণত যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কিসাস এর বিপরীত। কিসাসে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কিসাস হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। জখমের কিসাসও তদ্রূপ।

পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কিসাস অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে, বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করেন দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে, এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণ রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোনো শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

এ পর্যন্ত হুদূদ, কিসাস, তা'যীরাত প্রভৃতি পরিভাষার অর্থ ও তৎসংক্রান্ত জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হলো। এবার এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও হুদূদের বিবরণ শুনুন। প্রথম আয়াতে যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম ও মুকাবিলা করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রথমে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করার অর্থ কি এবং এরা কারা? مُحَارَبَةٌ শব্দটি حَرْبٌ মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ হলো– ছিনিয়ে নেওয়া। বাচন পদ্ধিতিতে এ শব্দটি سِلْمٌ অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, حَرْبٌ -এর অর্থ হচ্ছে অশান্তি বিস্তার করা। একথা জানা যে, বিক্ষিপ্ত

চুরি, হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনায় জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না; বরং কোনো সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী দল ডাকাতি, হত্যা ও লুটতরাজে প্রবৃত্ত হলেই জননিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এ কারণেই ফিকহবিদরা ঐ দল অথবা ব্যক্তিদের এ শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ডাকাতি করে এবং শক্তির জোরে সরকারের আইন ভঙ্গ করতে চায়। শব্দান্তরে তাদেরকে ডাকাত দল অথবা বিদ্রোহী দল বলা যায়। সাধারণ চোর, পকেটমার প্রমুখ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আলোচ্য আয়াতে مُحَارَبَةٌ অর্থাৎ সংগ্রাম করাকে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে, অথচ ডাকাত অথবা বিদ্রোহীদের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয় জনগণের সাথে। এর কারণ এই যে, কোনো শক্তিশালী দল যখন শক্তির জোরে রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তখন বাহ্যত জনগণের সাথে সংঘর্ষ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে। রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ ও রাসূলের আইন কার্যকর থাকবে, তখন এ সংঘর্ষও আল্লাহ ও রাসূলের বিপক্ষেই গণ্য হবে।

সারকথা এই যে. প্রথম আয়াতে বর্ণিত শাস্তি ঐসব ডাকাত ও বিদ্রোহীদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং প্রকাশ্যে সরকারের আইন অমান্য করার চেষ্টা করে। এর অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অর্থ লুণ্ঠন করা, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি থেকে শুরু করে হত্যা ও রক্তপাত পর্যন্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেই مُقَاتَلَةٌ ও مُحَارَبَةٌ শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। مُقَاتَلَةٌ শব্দটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাতে কেউ নিহত হোক বা না হোক এবং অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে مُحَارَبَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি সহকারে অশান্তি ছড়ানো এবং নিরাপত্তা ব্যাহত করা।

এ অপরাধের শাস্তি কুরআন পাক স্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং আল্লাহর হক অর্থাৎ গভর্নমেন্টবাদী অপরাধ হিসেবে প্রয়োগ করেছে। শরিয়তের পরিভাষায় একেই 'হদ' বলা হয়। এবার শুনুন ডাকাতি ও রাহাজানির শাস্তি। আয়াতে চারটি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا ...... مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ : অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। প্রথমোক্ত তিন শাস্তিতে بَابُ تَفْعِيْل থেকে مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ক্রিয়ার পৌন:পুনিকতা ও তীব্রতা বোঝায়। ক্রিয়াপদে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অথবা শূলে চড়ানো অথবা হস্তপদ কেটে দেওয়া সাধারণ শাস্তির মতো নয় যে, যে লোক অপরাধী প্রমাণিত হবে, তাকেই শাস্তি দেওয়া হবে; বরং এ অপরাধ দলের মধ্য থেকে একজনে করলেও গোটা দলকে হত্যা অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা গোটা দলেরই হস্তপদ কেটে দেওয়া হবে।

এ ছাড়া এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ শাস্তি কিসাস হিসেবে নয় যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মাফ করে দিলেই মাফ হয়ে যাবে, বরং তা আল্লাহর হক হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা মাফ করলেও তা মাফ হবে না। بَابُ تَفْعِيْل থেকে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার কারণে এ দু'টি ইঙ্গিতই বোঝা যাচ্ছে।

ডাকাতির এ চারটি শাস্তি, اَوْ [অথবা] শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দটি যেমন কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে থেকে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দান অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি কর্ম বণ্টনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী ফিকহবিদদের একটি দল প্রথমোক্ত অর্থ ধরে মত প্রকাশ করেছেন যে, শরিয়তের পক্ষ থেকে শাসক ও বিচারককে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ডাকাত দলের শক্তি এবং অপরাধের তীব্রতা ও লঘুতা দৃষ্টে তিনি শাস্তি চতুষ্টয় অথবা যে কোনো একটি শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.), আতা (রা.) দাঊদ (র.), হাসান বসরী (র.), যাহহাক (র.), নাখায়ী (র.), মুজাহিদ (র.), এবং ইমাম চতুষ্ঠয়ের মধ্যে ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবও তাই। ইমাম আবূ হানীফা (র.), শাফেয়ী (র.), আহমদ ইবনে হাম্বল (র.), এবং একদল সাহাবী ও তাবেয়ী اَوْ শব্দটিকে কর্ম বণ্টনের অর্থে ধরে নিয়ে বলেছেন যে, আয়াতে রাহাজানির বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীস থেকেও তাঁদের এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বুরদা আসলামীর সাথে এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু সে সন্ধি ভঙ্গ করে এবং মুসলমান হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসরমান একটি কাফেলা লুট করে। এ ঘটনার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) রাহাজানির শাস্তি সংক্রান্ত নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করেন। নির্দেশনামায় বলা হয়, যে ব্যক্তি হত্যা ও লুণ্ঠন উভয় অপরাধ করে, তাকে শূলে চড়াতে হবে। যে শুধু হত্যা করে তাকে হত্যা করতে হবে। যে শুধু অর্থ লুট করে তার হস্তপদ বিপরীত দিক

থেকে কর্তন করতে হবে। ডাকাত দলের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যায়, তার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে। পক্ষান্তরে যে হত্যা ও লুণ্ঠন কিছুই করেনি, শুধু ভীতি প্রদর্শন করে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে, তাকে দেশান্তরিত করতে হবে। যদি ডাকাতদল ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো মুসলিম অথবা অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে এবং অর্থ লুণ্ঠন না করে, তবে তাদের শাস্তি হবে أَنْ يُّقَتَّلُوْٓا অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে তাদের কিছু সংখ্যক লোক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকলেও তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। আর যদি হত্যা ও অর্থ লুণ্ঠন উভয় অপরাধই সাব্যস্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি হবে। يُصَلَّبُوْٓا অর্থাৎ সাবইকে শূলে চড়ানো হবে। এর ধরন হবে এই যে, জীবিতাবস্থায় শূলে চড়িয়ে পরে বর্শা ইত্যাদি দ্বারা তার পেটে চিরে দেওয়া হবে। যদি ডাকাতদল শুধু অর্থ লুট করে, তবে তাদের শাস্তি হবে أَنْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ অর্থাৎ ডান হাত কব্জি থেকে এবং বাম পা গিঁট থেকে কেটে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রেও যদি কিছু লোক অর্থ লুণ্ঠনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে তবুও সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা দলের অন্যদের সাহায্য ও সহযোগিতার ভরসায়ই তারা এ কাজ করে। তাই অপরাধে সবাই সমান অংশীদার। যদি ডাকাতদল হত্যা ও লুণ্ঠনের পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যায়, তবে তাদের সাজা হবে أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ অর্থাৎ তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

একদল ফিকহবিদের মতে দেশ থেকে বহিষ্কার করার অর্থ এই যে, তাদেরকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামি রাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, যে জায়গায় ডাকাতির আশঙ্কা ছিল, সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর ফয়সালা এই যে, অপরাধীকে এখান থেকে বের করে অন্য শহরে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে যেহেতু সে সেখানকার অধিবাসীদেরকেও উত্যক্ত করবে, তাই এ জাতীয় অপরাধীকে জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে হবে। অবাধ চলাফেরা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে এটাই তার পক্ষে দেশ থেকে বহিষ্কার। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও এ ফয়সালাই দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আজকাল এ জাতীয় সশস্ত্র আক্রমণে শুধু লুটতারাজ, হত্যা ইত্যাদি হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদি ঘটনাই ঘটে থাকে। পবিত্র কুরআনের وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا বাক্যে এ জাতীয় সব অপরাধই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় সশস্ত্র আক্রমণকারীরা কোন শাস্তির যোগ্য?

উত্তর এই যে, **এক্ষেত্রে বিচারক শাস্তি চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে অবস্থানুযায়ী যে কোনো একটি শাস্তি জারি করবেন।** যদি ব্যভিচারের যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যভিচারে হদ জারি করবেন।

এমনিভাবে শুধু কিছু লোককে জখম করে থাকলে জখমের কিসাস জারি করা হবে। শেষ আয়াতে বলা হয়েছে- ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ দুনিয়াতে প্রদত্ত এ শাস্তি হচ্ছে তাদের জাগতিক লাঞ্ছনা। আখিরাতের শাস্তি হবে আরো কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী। এতে বোঝা যায় যে, তওবা না করলে জাগতিক হুদূদ, কিসাস ইত্যাদি দ্বারা পরকালের শাস্তি মাফ হবে না, হ্যাঁ, সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি খাঁটি মনে তওবা করলে পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا আয়াতে একটি ব্যতিক্রমের কথা বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, ডাকাত ও বিদ্রোহীদল যদি সরকারি লোকদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে শক্তি-সামর্থ্য বহাল থাকা অবস্থায় তওবা করে এবং ডাকাতি ও রাহাজানি থেকে হাত গুটিয়ে নেয, তবে তাদের ক্ষেত্রে হদ প্রযোজ্য হবে না। এ ব্যতিক্রমটি হুদূদের সাধারণ আইন থেকে ভিন্নধর্মী। কেননা চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি অপরাধে আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর অপরাধী খাঁটি মনে তওবা করলেও হদ মাফ হয় না। যদিও আখিরাতের শাস্তি মাফ হয়ে যায়। একদিকে ডাকাতদের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। এদের একজনের অপরাধে গোটা দলকেই শাস্তি দেওয়া হয়। তাই অপরদিকে ব্যতিক্রমের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে হালকা করেও দেওয়া হয়েছে যে, তওবা করলে জাগতিক শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এছাড়া এতে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। তা এই যে, একটি শক্তিশালী দলকে বশে আনা সহজ কাজ নয়। তাই তাদের সামনে সত্যোপলব্ধির দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যাতে তারা তওবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এছাড়া আরো একটি উদ্দেশ্যে এই যে, মৃত্যুদণ্ড নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত শাস্তি। ইসলামি আইনের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, এ শাস্তির প্রয়োগ যেন যথাসম্ভব কম হয়। অথচ ডাকাতির ক্ষেত্রে একটি দলকে হত্যা করা জরুরি হয়ে পড়ে। তাই ডাকাতদের সামনে সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এ সুযোগের কারণেই আলী আসাদী নামক জনৈক দুর্ধর্ষ ডাকাত ডাকাতি থেকে তওবা করতে সক্ষম হয়েছিল।

আলী আসাদী মদীনার অদূরে একটি সংঘবদ্ধ দল তৈরি করে পথিকদের অর্থসম্পদ লুট করতো। একদিন কাফেলার মধ্যে থেকে জনৈক কারীর মুখে সে এ আয়াত শুনতে পেল- يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ [হে আমার অনাচারী বান্দারা! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।] সে কারীর কাছে পৌঁছে আয়াতটি পুনরায় পাঠ করতে

অনুরোধ করল। পুনর্বার আয়াতটি শুনেই সে তরবারির কোষবদ্ধ করে রাহাজানি থেকে তওবা করলো এবং মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে উপস্থিত হলো। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) তার হাত ধরে তাকে মারওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে বললেন, আপনি তাকে কোনো শাস্তি দিতে পারবে না।

সরকার তার অপতৎপরতায় অতিষ্ঠ ছিল। ফলে তার সুমতি দেখে সবাই সন্তুষ্ট হলো। হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে হারেসা ইবনে বদর বিদ্রোহ ঘোষণা করে হত্যা ও লুটতরাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছুদিন পরই তওবা করে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.) তাকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি।

এখানে স্মর্তব্য যে, হদ মাফ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বান্দার যেসব হক সে নষ্ট করে, তাও মাফ হয়ে যায়; বরং এরূপ তওবাকারী যদি কারো অর্থসম্পদ হরণ করে থাকে এবং জীবিত থাকে, তবে তা ফেরত দেওয়া জরুরি এবং কাউকে হত্যা অথবা জখম করে থাকলে তার কিসাস জরুরি। অবশ্যই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা ক্ষমা করে দিলে তা ক্ষমা হয়ে যাবে। কারো পার্থিব ক্ষতি করে থাকলে তার ক্ষতিপূরণ দান করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-সহ অধিক সংখ্যক ফিকহবিদের মাযহাব তাই। এছাড়া বান্দার পাওনা থেকে অব্যাহতি লাভ করা স্বয়ং তওবার একটি অঙ্গ। এটা ছাড়া তওবা পূর্ণ হয় না। তাই কোনো ডাকাতকে তওবাকারী বলে তখনই গণ্য করা হবে, যখন সে বান্দার পাওনাও পরিশোধ করে দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১০২-১১০]

قَوْلُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا : "দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়"-এর মর্ম : অধিকাংশ তাফসীরবেত্তা এখানে অশান্তি সৃষ্টি দ্বারা ডাকাতি ও লুটতরাজ করা বুঝিয়েছেন। তবে আয়াতের শব্দকে ব্যাপকার্থে রেখে দিলে বিষয়বস্তু অধিকতর প্রশস্ত হয়ে যায়। বিশুদ্ধ হাদীসে আয়াতের যে শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে, তারও চাহিদা হলো শব্দকে ব্যাপকার্থে গ্রহণ করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা দেশে অশান্তি বিস্তার করা- এ দুটো এমনই ব্যাপক কথা যে, কাফেরদের আক্রমণ, ধর্মদ্রোহিতা, লুটতরাজ, ডাকাতি, অন্যায়ভাবে জানমালের ক্ষতিসাধন, অপরাধী কার্যক্রমের ষড়যন্ত্র, বিভ্রান্তির প্রোপাগাণ্ডা ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর প্রত্যেকটিই এমন অপরাধ যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনিবার্যভাবে সম্মুখে বর্ণিত শাস্তি চতুষ্টয়ের যে কোনো একটির উপযুক্ত হয়ে যায়। -[তাফসীর উসমানী : টীকা-১১৬]

ডাকাতদের চারটি অবস্থা হতে পারে : যথা- ১. কেবল হত্যা করেছে, লুটতরাজ করেনি ২.হত্যা ও লুট উভয়ই করেছে ৩. মালামাল লুট করেছে, খুন-খারাবি করেনি, ৪. কোনটিই করতে পারেনি, তার আগেই ধরা পড়ে গেছে। এ চারও অবস্থায় চার প্রকারের শাস্তি আবর্তিত হয়, যা ধারাবাহিকভাবে সামনে বর্ণিত হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১১৯]

قَوْلُهُ اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا الخ : চার ধরনের শাস্তি : এখানে চার প্রকারের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে এবং চারটি শাস্তি চার স্থানের জন্য নির্ধারিত। সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কথা হলো- ইমামকে এ চারটি শাস্তির মধ্য হতে সব ধরনের অপরাধের জন্য যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যদিও কোনো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত এরূপ। অধিকাংশের মত হলো- এই সমস্ত শাস্তি অপরাধের মাত্রা হিসেবে প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার বা সদিচ্ছা হিসেবে নয়। -[মা'আলিম]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মাজলায, কাতাদা, হাসান (র.)-সহ একদল বলেন, অপরাধের ধরন ও মাত্রা হিসেবে শাস্তি হতে হবে। -[বাহর]

এর অর্থ হলো, অবস্থার প্রতি খেয়াল রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আল্লাহ-ই ভালো জানেন। -[হিদায়া]

শাস্তির ধারা বর্ণনার মাঝে যে বারবার اَوْ [অথবা] শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা এখতিয়ারের জন্য আসেনি, বরং তা তাফসীলের অর্থ প্রকাশের জন্য আনা হয়েছে। আয়াতের মধ্যে যে اَوْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা ব্যাখ্যার জন্য। -[বায়যাভী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আতা (র.)-এর বর্ণনায় বলেন, এখানে اَوْ শব্দটি এখতিয়ারের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, 'বয়ান' বা স্পষ্ট বর্ণনার জন্য এসছে। কেননা হুকুম আহকামগুলো বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য। এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। -[কবীর]

يُقَتَّلُوْا অর্থাৎ তাদের হত্যা করা হবে। এ শাস্তিটি তার জন্য, যখন ডাকাতি করার সময় কেউ কাউকে হত্যা করে ফেলবে, কিন্তু তার ধনসম্পদ নিতে পারবে না। تَقْتِيْل শব্দটি تَفْعِيْل থেকে এসেছে। সে কারণে তার অর্থ হবে, হত্যা বা কিসাসের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। এর দ্বারা ঐ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাই শরিয়তের হক। এটি 'ওয়ালী' [বা নিহত ব্যক্তির অভিভাবক] মাফ করে দিলে তা মাফ হবে না। তাদেরকে 'হদ' প্রয়োগ করে হত্যা করতে হবে। যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ালীরা তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তাদের এ ক্ষমা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা শরিয়তের হক। -[হিদায়া]

রাহাজানি ছিনতাই অপরাধ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য কেবল ক্ষতিকারক নয়, বরং তা সমাজে শান্তির জন্যও একটি মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। কাজেই 'ফরিয়াদীর' আবেদনে এ ধরনের মামলা প্রত্যাহার করা উচিত নয়।

يُصَلَّبُوْا অর্থাৎ তাদের শূলেবিদ্ধ করা হবে। এ শূলেবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড তখন দিতে হবে, যখন কোনো ব্যক্তি রাহাজানি বা ছিনতাই করার সময় হত্যা ও লুণ্ঠন এ দুধরনের অপরাধে অপরাধী হবে। হানাফী মাযহাবে শূলের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হবে কিনা, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র.) বলেন, এটাই প্রকাশ্য অভিমত যে, শূলেদণ্ড দেওয়া না দেওয়া ইমাম বা নেতার ইচ্ছা। কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে যে, শূলেদণ্ড দেওয়া বা না দেওয়া এটা ইমামের এখতিয়ার। এটিই স্পষ্ট অভিমত। –[হিদায়া]

স্পষ্ট অভিমত এই যে, শূলে শাস্তি দেওয়া না দেওয়া এটা বিচারকের ইচ্ছাধীন, যদি তিনি চান, তবে এরূপ করতে পারেন এবং না-ও করতে পারেন এবং কেবল কতলের ফয়সালাও দিতে পারেন। –[মাবসূত]

তবে ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) অভিমত হলো এ ধরনের অপরাধীদের অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কারণ প্রথমত এটা আল কুরআনের বিধান। দ্বিতীয়ত এ ধরনের শাস্তির যে মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহলো প্রকাশ করে দেওয়া, যা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক হয়ে থাকে। হযরত আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এটা পরিত্যাগ করা যাবে না। কেননা, এটা কুরআনের নির্দেশ। আর এ ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য হলো প্রকাশ করে দেওয়া, যাতে অন্যেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। –[হিদায়া]

হযরত আবু ইউসুফ (র.) আরো বলেন ইমামের জন্য শূলীদণ্ড মওকুফ করা ঠিক হবে না; কেননা এর উদ্দেশ্য হলো– অন্যেরা যাতে হুঁশিয়ার হয়ে যায়, সে জন্য প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। –[মাবসূত]

হিদায়া গ্রন্থের লেখক বলেন, কতলের দ্বারাই তো প্রকাশ ও প্রচার হয়ে যায়, তবে শূলীতে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিলে, তা আরো ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। সে জন্য বিষয়টি ইমাম বা বিচারকের এখতিয়ারে ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের অভিমত হলো, কতলের দ্বারাই প্রচার ও প্রকাশ হয়ে যায়, কিন্তু শূলীদণ্ডে মৃত্যু দিলে তা আরো ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তবে এ ব্যাপারে এখতিয়ার হলো বিচারকের। –[হিদায়া]

قَوْلُهُ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ : কাটা হবে তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। অর্থাৎ ডান হাত এবং বাম পা কাটা যাবে। এ শাস্তি ঐরূপ অপরাধের জন্য, যখন মাল লুণ্ঠন করা হবে, তবে প্রাণহানি ঘটবে না। এরূপে শাস্তির ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, যখন কতল অথবা শূলীদণ্ডের শাস্তি স্ব-স্ব অপরাধের কারণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে; তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার মতো শাস্তি প্রয়োগের দরকার নেই। কেননা শাস্তির বড় বিধান প্রয়োগের পর ছোট বিধান প্রয়োগের প্রশ্নই উঠে না। যেমন– যদি কোনো ব্যক্তি চুরি এবং জেনার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়; এমতাবস্থায়, সে কেবল জেনার দণ্ড ভোগ করবে এবং পাথর মেরে তাকে মারার পর আর হাত কাটার আলাদা শাস্তির প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা এবং শূলে দেওয়া, এটা সংখ্যায় দু'টি শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে না; বরং তার হাত পা কেটে হত্যা করা বা শূলে চড়িয়ে হত্যা করা– এটা একটা শাস্তি মাত্র। যদিও শাস্তির বিধানটি কঠিন, তবে তা এজন্য যে, তার অপরাধটিও গুরুতর। আর অন্যায় ও অপরাধের ভয়াবহতা এই যে, অপরাধী হত্যা ও লুণ্ঠন দু'টি কাজ করে সর্বসাধারণের শান্তি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করেছে। এ সমস্ত ব্যাখ্যা হিদায়াসহ অন্যান্য ফিকহের কিতাবে উল্লেখ আছে।

قَوْلُهُ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ : অর্থাৎ দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ শাস্তি ঐ অবস্থার প্রেক্ষিতে, যখন জানমাল কিছুই লুণ্ঠিত হয়নি; বরং এ ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রাক্কালে গ্রেফতার হয়েছে। দেশ থেকে বের করে দেওয়ার অর্থ হলো– ১. নির্বাসিত করা। ২. স্বাধীনভাবে চলাফেরাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অর্থাৎ তার স্বাধীনতা হরণ করতে হবে এবং তাকে 'কয়েদখানা' বা 'জেলখানায়' আটকে রাখতে হবে। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং অভিধানেও এর সমর্থন দেখা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, দেশ থেকে বহিষ্কার করার অর্থ হলো: তাকে বন্দী করে রাখা। এটাই অধিকাংশ আভিধানবিদের অভিমত। –[তাফসীরে কাবীর]

আমাদের নিকট বহিষ্কারের অর্থ হলো, তাকে আটক করে রাখা বা জেলে দেওয়া। আরবি ভাষা-ভাষীরা اَلنَّفْىُ [বহিষ্কার] শব্দটি এরূপ অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। কেননা, সে ব্যক্তি তখন তার ঘরবাড়িও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। –[রুহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ قِيْلَ نَفْيُهُمْ اَنْ يُخَلَّدُوْا فِى السِّجْنِ : কথিত আছে, তাদের বের করে দিবে, অর্থাৎ [illegible] তাদের [illegible] বন্দি করবে। –তফ. [illegible] হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত হলো, দেশ থেকে বহিষ্কার করা হলে সে অপরাধী

হয়তো অন্য কোনো মুসলিম অধ্যুষিত শহরে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে ফিতনা-ফাসাদ ঘটাতে থাকবে। আর যদি সে কোনো অমুসলিম অধ্যুষিত শহরে চলে যায়, তবে সে সেখানে গিয়ে ইসলামের দুশমনদের হাতকে শক্তিশালী করবে। কাজেই, এখানে বহিষ্কারের অর্থ হলো, তাকে আটকে রাখা, কয়েদ করে রাখা। মাবসূত, হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই চারটি অবস্থা ব্যতিরেকে, পঞ্চম অবস্থাটি এরূপ হতে পারে যে, ডাকাতদল কাউকে কেবল 'যখম' করে ছেড়েছিল, এমতাবস্থায় এ হুকুম হবে সাধারণ 'যখমের' অনুরূপ। এখানে 'কিসাস' বা মুক্তিপণ দিয়ে এবং কাউকে জামিন রেখে সে মুক্ত হতে পারবে এবং এটি 'হক্কুল ইবাদ' বা 'বান্দার হক' হওয়ার কারণে ক্ষমাও পেতে পারে।

প্রগতিবাদী ও আধুনিকতার ধ্বজাধারীরা যাদের অপর নাম হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার সেবাদাস, তারা হয়তো ইসলামি সাজার কঠোরতা দেখে আঁতকে উঠবেন। কিন্তু সব ধরনের তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে গিয়ে যদি কার্যকারিতা ও বাস্তবতার নিরীখে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে যে, যে দেশে আইন শিথিল করে শাস্তি হ্রাস করা হয়েছে, সেখানে অপরাধ প্রবণতা ও অশান্তি কোন ধরনের? পক্ষান্তরে সে জাতির অবস্থা কিরূপ, যেখানে এখানো ইসলামি বিধান মতো 'শাস্তি ও হদ' কায়েমের প্রথা প্রচলিত আছে? আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের রেকর্ড সংখ্যক অপরাধের তুলনায় নজদ, হিজাজ ও ইয়ামনে সংঘটিত অপরাধ কিরূপ? Gunmen এবং Gangster এর ন্যায় পরিভাষা প্রত্যহ কোথায় তৈরি হচ্ছে? লুটতরাজ, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন-খারাবি তো আরবের বেদুঈনরা করতো, কিন্তু আজকের তথাকথিত সভ্য দুনিয়ার ডাকাতদের সাথে কি তাদের তুলনা করা যায়? এটা তো বাস্তব ঘটনা, খুবই বাস্তব, সরল মনে বিশ্বাসের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃত ও জ্ঞানসম্মত ব্যাপার এই যে, ইসলাম জীবন -জিন্দেগী ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য যে সুন্দর বিধান দুনিয়ার সামনে পেশ করেছে এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনোপকরণের জন্য যে ব্যবস্থা সহজতর করেছে- এর পরও যদি কোনো জালিম আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি বিশেষ না-শুকরি প্রকাশ করে, সাধারণ মানুষের শান্তিময় জীবন যাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর বান্দাদের জানমাল জোর করে কেড়ে নিতে চায়; আর পাশব-প্রবৃত্তির সীমাহীন দাপট দেখায় এ ধরনের পশু চরিত্রের পশুদের শাস্তিও হলো খুবই গুরুতর। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১২৫]

قَوْلُهُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : [আর যেন এমন মনে না করা হয় যে, এ ধরনের অপরাধীদের জন্য দুনিয়ার শাস্তিই যথেষ্ট।] এখান থেকে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ মাসআলা বের করেছেন যে, গুনাহের কাফফারার জন্য 'হদ' জারি করাই যথেষ্ট নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, তার উপর 'হদ' কায়েম করলে, তা হবে গুনাহ বা অপরাধের কাফফারাস্বরূপ হবে না। -[জাসসাস]

এ আয়াতটি তার জন্য মজবুত দলিল, যে বলে : 'হদ' কায়েমের ফলে আখিরাতের শাস্তি মওকুফ হবে না। -[রূহুল মা'আনী]

মালেকী মাযহাবের ইমামদের অভিমতও এরূপ। যখন কোনো যোদ্ধাদল [ডাকাত] বের হয় এবং কাফেলার লোকদের সাথে মারামারি করে, এমতাবস্থায় কোনো ডাকাত যদি কাফেলার কাউকে হত্যা করে এবং তাদের কেউ নিহত না হয়, তবে ডাকাতদের সবাইকে হত্যা করতে হবে। -[তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী : টীকা- ১২৭]

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ : অপরাধ থেকে তওবা করা : [কেননা আল্লাহ তওবাকারীদের উপর থেকে 'হদ'ও মার্জনা করে দেন]। এখন না তাদের হাত-পা কাটা যাবে, না তাদের শূলিতে চড়ানো যাবে এবং না তাদের দেশ থেকে বের করা যাবে। এই সমস্ত নির্ধারিত শাস্তি, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্থিরকৃত, তওবা করার পর সব মওকূফ হয়ে যাবে এবং এখন আর কোনো দাবি-দাওয়া ইসলামি হুকুমতের পক্ষ থেকে থাকবে না। অবশ্য মৃতদের ওয়ারিশ ও দাবিদারদের এ ব্যাপারে এখতিয়ার থাকবে যে, হয় তারা মাফ করে দিবে, নয়তো মালের দ্বারা সন্ধি করে নিবে। চাইলে খুনের বদলা খুন চাইতে পারে; তবে ব্যাপারটি এখন কেবল বান্দাদের মাঝেই সীমিত। তওবা করার পর যদি কাউকে গ্রেফতার করা হয়, এমতাবস্থায় যে, সে ইচ্ছা করেই খুন করেছিল নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজনরা চাইলে তাকে খুনও করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারে। কেননা তওবা করার পর তার উপর আর কোনো 'হদ' কায়েম করা যাবে না। -[হিদায়া]

উপরিউক্ত আয়াতে যখন 'হদ' মওকুফ করা হয়েছে, এমতাবস্থায় লোকদের হক ওয়াজিব হয় তার মালে, দেহে এবং আহত হওয়ার কারণে। -[জাস্সাস]

যদি সে হত্যা করে থাকে, তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়রা তাকে হত্যা করতে পারে। আর যদি তারা ইচ্ছা করে, তবে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারে। কেননা, এ হত্যা হবে কিসাসস্বরূপ। এমতাবস্থায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার সাথে সন্ধি করা শুদ্ধ হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

অনুবাদ :

٣٥. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ خَافُوْا عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ وَابْتَغُوْٓا اُطْلُبُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ مَا يُقَرِّبُكُمْ اِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهٖ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لِاِعْلَاءِ دِيْنِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ ـ

৩৫. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। অর্থাৎ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর। এবং তাঁর প্রতি অসিলা তালাশ কর। অর্থাৎ যেসব আনুগত্যের কাজ তাঁর নৈকট্যলাভের সহায়ক সেগুলোর অনুসন্ধান **কর** এবং তাঁর ধর্মকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে **তাঁর পথে জিহাদ** কর যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হতে **পার। সফলকাম** হতে পার।

٣٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ ثَبَتَ اَنَّ لَهُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৩৬. যারা সত্য প্রত্যা**খ্যান করেছে** কিয়ামতের দিন শাস্তি হতে মুক্তি লাভের **জন্য দুনিয়া**তে যা কিছু আছে এবং সমপরিমাণ আরো **কিছু যদি** তাদের হয়ে যায় আর সবকিছু যদি তার **পণস্বরূপ দিয়ে** দেয় তবুও তাদের নিকট হতে তা **গৃহীত হবে না** এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

٣٧. يُرِيْدُوْنَ يَتَمَنَّوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا ز وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ دَائِمٌ ـ

৩৭. তারা অগ্নি হতে **বের হতে চাইবে,** কামনা করবে; কিন্তু তারা তা **থেকে বের হওয়া**র নয় এবং তাদের জন্য স্থায়ী অর্থাৎ **চিরকালের শাস্তি** রয়েছে।

٣٨. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ اَلْ فِيْهِمَا مَوْصُوْلَةٌ مُبْتَدَأٌ وَلِشِبْهِهٖ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِىْ خَبَرِهٖ وَهُوَ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا اَىْ يَمِيْنَ كُلٍّ مِّنْهُمَا مِنَ الْكُوْعِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الَّذِىْ يُقْطَعُ فِيْهِ رُبْعُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا وَاَنَّهٗ اِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى مِنْ مَفْصِلِ الْقَدَمِ ثُمَّ الْيَدُ الْيُسْرٰى ثُمَّ الرِّجْلُ الْيُمْنٰى وَبَعْدَ ذٰلِكَ يُعَزَّرُ جَزَآءً نَصَبَ عَلَى الْمَصْدَرِ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا عُقُوْبَةً لَّهُمَا مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ خَلْقِهٖ ـ

৩৮. পুরুষ কিংবা **নারী চুরি করলে** তাদের হস্ত কর্তন কর। অর্থাৎ **প্রত্যেকের ডান হাত** কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলবে। **اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ : এতদুভয়ের اَلِفْ وَلَامْ** অক্ষরদ্বয় **مَوْصُوْلَةٌ বা সংযোজক** অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা **مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য**। যেহেতু শর্তের মর্মের সাথে এর **সাদৃশ্য বিদ্যমান** সেহেতু এর خَبَرٌ বা বিধেয় **فَاقْطَعُوْا-তে** فَ ব্যবহার করা হয়েছে সুন্নায় বর্ণিত **আছে যে,** এক দিনারের চার ভাগের একভাগ বা **ততোধিক মূল্যের** দ্রব্য চুরিতে হস্তকর্তন করার বিধান **প্রযোজ্য হবে**। একবার শাস্তিভোগ করার পর পুনরায় **যদি চুরি করে** তবে গোড়ালী পর্যন্ত পদচ্ছেদন **করা হবে। পুনর্বার** করলে বাম হাত; পুনর্বার করলে ডান **পা কর্তন** করা হবে। এর পরও যদি চুরি করে তবে কাজি বিবেচনামত শাস্তি প্রদান করবেন। ওদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ; এটা আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড। এটা তাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্বরূপ। **جَزَآءً :** শব্দটি **مَصْدَرٌ** বা সমধাতুজ কর্মরূপে **مَنْصُوْبٌ** ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর বিষয়ে পরাক্রমশালী এবং তাঁর সৃষ্টিতে প্রজ্ঞাময়।

٣٩. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ رَجَعَ عَنِ السَّرِقَةِ وَاَصْلَحَ عَمَلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فِى التَّعْبِيْرِ بِهٰذَا مَا تَقَدَّمَ فَلَا يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ حَقُّ الْاٰدَمِيِّ مِنَ الْقَطْعِ وَرَدِّ الْمَالِ نَعَمْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّهُ اِنْ عُفِىَ عَنْهُ قَبْلَ الرَّفْعِ اِلَى الْاِمَامِ سَقَطَ الْقَطْعُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ .

৩৯. কিন্তু সীমালঙ্ঘনের পর কেউ তওবা করলে, চুরি হতে ফিরে গেলে এবং নিজের কাজে সৎপরায়ণ হলে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।] পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি এ স্থানেও এ ধরনের বাক্য ভঙ্গিমা দ্বারা বুঝা যায় যে, তওবা করা দ্বারা হস্তকর্তন ও চুরিকৃত মাল ফেরত দেওয়ার বিষয়ে বান্দার হক রহিত হয় না। তবে সুন্নায় বিবৃত হয়েছে যে, বিচারকের নিকট বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে যদি হকদার তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে হস্তকর্তনের বিধান তার উপর হতে রহিত হয়ে যাবে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত।

٤٠. اَلَمْ تَعْلَمْ اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّقْرِيْرِ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ تَعْذِيْبَهُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ التَّعْذِيْبُ وَالْمَغْفِرَةُ .

৪০. তুমি কি জান না যে, اَلَمْ : এখানে تَقْرِيْر বা বিষয়টির সুসাব্যস্তকরণের উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। যাকে তিনি শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন এবং যাকে তিনি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। শাস্তি প্রদান ও ক্ষমা প্রদর্শনও তাঁর এ শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

٤١. يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ صُنْعُ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ يَقَعُوْنَ فِيْهِ بِسُرْعَةٍ اَىْ يُظْهِرُوْنَهُ اِذَا وَجَدُوْا فُرْصَةً مِنْ لِلْبَيَانِ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ بِاَلْسِنَتِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقَالُوْا وَلَمْ يُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ج وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ج قَوْمٌ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ الَّذِى افْتَرَتْهُ اَحْبَارُهُمْ سَمَاعَ قَبُوْلٍ سَمّٰعُوْنَ مِنْكَ لِقَوْمٍ لِاَجْلِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لا مِنَ الْيَهُوْدِ لَمْ يَاْتُوْكَ ط وَهُمْ اَهْلُ خَيْبَرَ زَنٰى فِيْهِمْ مُحْصَنَانِ فَكَرِهُوْا رَجْمَهُمَا .

৪১. হে রাসূল! যারা মুখে বলে অর্থাৎ কথায় বলে বিশ্বাস করেছি; কিন্তু অন্তর তাদের বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ মুনাফিকগণ ও যারা ইহুদি হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানে তৎপর, তাতে দ্রুত গিয়ে নিপতিত হয়; সুযোগ পেলেই তা প্রকাশ কর তারা অর্থাৎ তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। مِنْ এটা بَيَانِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। بِاَفْوَاهِهِمْ : এটা قَالُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল অর্থাৎ এদের ধর্মীয় নেতারা যে মিথ্যা রচনা করে তা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা তা শ্রবণ করে لِقَوْمٍ -এর ل -টি হেতুবোধক। এ ইহুদিদের যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি অর্থাৎ খায়বারবাসীগণ। তারা তাদের জন্য অর্থাৎ সে সম্প্রদায়ের পক্ষে তোমার কথা শুনতে কোন পেতে থাকে। মূলত বিষয়টি ছিল এই যে, খায়বারবাসীদের মধ্যে দুই বিবাহিত ইহুদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের ধর্মীয় বিধানানুসারে রাজম অর্থাৎ তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি দান করাটা তাদের পছন্দ হলো না।

فَبَعَثُوا قُرَيْظَةَ لِيَسْأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حُكْمِهِمَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ الَّذِيْ فِي التَّوْرٰىةِ كَاٰيَةِ الرَّجْمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ج الَّتِيْ وَضَعَهُ اللّٰهُ عَلَيْهَا اَيْ يُبَدِّلُوْنَهُ ـ يَقُوْلُوْنَ لِمَنْ اَرْسَلُوْهُمْ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا الْحُكْمَ الْمُحَرَّفَ اَيِ الْجَلْدَ اَيْ اَفْتَاكُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ فَخُذُوْهُ فَاقْبَلُوْهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ بَلْ اَفْتَاكُمْ بِخِلَافِهِ فَاحْذَرُوْا ط اَنْ تَقْبَلُوْهُ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ اِضْلَالَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط فِيْ دَفْعِهَا اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ط مِنَ الْكُفْرِ وَلَوْ اَرَادَهُ لَكَانَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ج ذُلٌّ بِالْفَضِيْحَةِ وَالْجِزْيَةِ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

তখন তারা ইহুদি কুরাইযা গোত্রকে এ বিষয়ে বিধান দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রেরণ করে। তাওরাতের শব্দসমূহকে যেমন 'রাজম' সম্পর্কিত আয়াত ইত্যাদি তারা স্থানচ্যুত করে। যেভাবে আল্লাহ ব্যবহার করেছিলেন **সেভাবে না করে এগুলো** বিকৃত ও পরিবর্তিত করে। **যাদেরকে পাঠিয়েছিল** তাদেরকে বলে, এ প্রকার **যদি বিধান দেয় অর্থাৎ** বিকৃত বিধান অনুসারে **মুহাম্মাদ ﷺ -ও যদি এদের সম্পর্কে বেত্রাঘাতের বিধান দেয়** তবে তা গ্রহণ করো, মেনে নিও **আর যদি সে রকম না দেয়** বরং এর বিপরীত **বিধান দেয় তবে তা গ্রহণ করা** হতে সাবধান থেকো। **আল্লাহ যাকে ফেতনায় লিপ্ত করতে চান** অর্থাৎ পথভ্রান্ত **করতে চান তার জন্য আল্লাহর নিকট** তা প্রতিহত করার বিষয়ে **তোমার কিছুই করার নেই**। এরা তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ কুফরি হতে বিশুদ্ধ করতে চান না। যদি চাইতেন তবে নিশ্চয় তা হতো। অবমাননা ও জিযিয়া কর আরোপের মাধ্যমে তাদের জন্য আছে **দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি।**

٤٢. هُمْ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ط بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِهَا اَيِ الْحَرَامِ كَالرِّشٰى فَاِنْ جَاۤءُوْكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَاَعْرِضْ عَنْهُمْ ج هٰذَا التَّخْيِيْرُ مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهِ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمُ الْاٰيَةَ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ اِذَا تَرَافَعُوْا اِلَيْنَا وَهُوَ اَصَحُّ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَلَوْ تَرَافَعُوْا اِلَيْنَا مَعَ مُسْلِمٍ وَجَبَ اِجْمَاعًا وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ط وَاِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ط بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ الْعَادِلِيْنَ فِي الْحُكْمِ اَيْ يُثِيْبُهُمْ ـ

৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণে অতি আগ্রহী এবং অবৈধ ভক্ষণে যেমন ঘুষ ইত্যাদিতে অতিশয় আসক্ত। اَلسُّحْتُ -এর ح -তে পেশ ও সাকিনসহ পঠিত। অর্থ– হারাম, অবৈধ। اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ এদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি করে দিয়ো- এ আয়াতটির মাধ্যমে এ এখতিয়ার সম্বলিত বিধানটি 'মানসুখ' বা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা যদি আমাদের নিকট বিচার নিয়ে আসে তবে মীমাংসা করে দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অধিকতর বিশুদ্ধ মত এটাই। আর যদি কোনো মুসলিমকে জড়িত করে তবে মীমাংসা করে দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়ের ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে অর্থাৎ বিচার মীমাংসায় যারা ন্যায় অবলম্বন করে তাদেরকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ তাদেরকে পুণ্যফল দান করবেন।

٤٣. وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ بِالرَّجْمِ اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ اَيْ لَمْ يَقْصِدُوْا بِذٰلِكَ مَعْرِفَةَ الْحَقِّ بَلْ مَا هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ يُعْرِضُوْنَ عَنْ حُكْمِكَ بِالرَّجْمِ الْمُوَافِقِ لِكِتَابِهِمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط التَّحْكِيْمِ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৪৩. তারা তোমার উপর কিরূপে বিচার-ভার ন্যাস্ত করবে যখন তাদের নিকট রয়েছে তাওরাত, আর তাতে রয়েছে রাজ্‌ম সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশ? অর্থাৎ এ বিচার প্রত্যাশায় তাদের মূল উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান নয়, বরং তারা অধিকতর সহজ বিধানের প্রত্যাশী। এরপরও অর্থাৎ তাওরাতের পর বিধানের সাথে সাম স্যপূর্ণ 'রজম' বা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার রায় দানের পরও তারা তোমার মীমাংসা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা উপেক্ষা করে। আসলে এরা বিশ্বাসীই নয়। كَيْفَ এ প্রশ্নবোধকটি এ স্থানে تَعَجُّبْ বা বিস্ময় প্রকাশার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثَبَتَ : প্রশ্ন. لَوْ اَنَّهُمْ-এর মাঝে ثَبَتَ **উহ্য মানার কারণ কী?**

উত্তর. لَوْ হরফে শর্ত فِعْل-এর শুরুতে আসে। এখানে যদি ثَبَتَ ফে'লটি উহ্য না ধরা হতো তাহলে لَوْ শব্দটি হরফের **শুরুতে আসা লাজেম হতো। সেহেতু এখানে ثَبَتَ ফে'লটি উল্লেখ করা হয়েছে।**

قَوْلُهُ اَلْ فِيْهِمَا مَوْصُوْلَةٌ : অর্থাৎ اَلسَّارِقُ اَلسَّارِقَةُ-এর اَلِفْ لَامْ-টি مَوْصُوْلَهْ হিসেবে এসেছে। অর্থের ক্ষেত্রে اَلَّذِيْ سَرَقَ وَالَّتِيْ سَرَقَتْ হবে। আর ইসমে মাউসুল مُبْتَدَأْ এবং শর্তের অর্থ পোষণ করে বিধায় তার খবরটি فَاقْطَعُوْا জাযার অর্থ পোষণ করে বিধায় তার শুরুতে فَاءْ এসেছে।

قَوْلُهُ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ : অর্থাৎ جَزَاءً শব্দটি مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। اَيْ يُجْزَوْنَ جَزَاءً

نَكَالْ : এরূপ শক্তিকে বলা হয় যা থেকে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

قَوْلُهُ فِي التَّعْبِيْرِ بِهٰذَا : অর্থাৎ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ-এর জবাবে فَلَا تَحَرَّوْا বলা হয়নি; বরং فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ **عَلَيْهِ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তওবার কারণে حُقُوْقُ الْعِبَادِ** বা বান্দার হক ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি ক্ষমা করবেন, যা حُقُوْقُ اللّٰهِ-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি তথা হাত কর্তন এবং চুরিকৃত মাল ফেরত দেওয়াটা ক্ষমা করবেন না।

قَوْلُهُ لَا يَحْزُنْكَ صُنْعُ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, حُزْنٌ وَمَلَالٌ দুঃখ ও পেরেশানীর সম্পর্কে ذَاتْ বা সত্তার সাথে নয়; বরং فِعْلْ বা কর্মের সাথে হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যেই মুফাসসির (র.) এখানে صُنْعُ শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ سَمَّعُوْنَ : এটি مُبْتَدَأْ مَحْذُوْفْ-এর খবর। اَيْ هُمْ سَمَّعُوْنَ

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ : اَيْ مِنْ بَعْدِ تَحَقُّقِ مَوَاضِعِهِ الَّتِيْ وَضَعَ اللّٰهُ অর্থাৎ শব্দের মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও শব্দকে তার যথার্থ মর্ম থেকে সরিয়ে দেয়।

قَوْلُهُ خِزْيٌ : خِزْيٌ অর্থ– লাঞ্ছনা।

اَلسُّحْتُ : অর্থ– হারাম। এটি سُحْتُهُ থেকে নির্গত। এটা সে সময় বলা হয় যখন কোনো বস্তুকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা হয়। হারাম মাল যেহেতু سُحُوْتُ الْبَرَكَةِ বা বরকত উপড়ে ফেলে তাই তাকে سُحْتْ বলা হয়।

اَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ : অর্থাৎ তারা বড় হারামখোর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ : যোগ সূত্র ও আলোচনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডাকাতি ও বিদ্রোহের শাস্তি এবং তার বিস্তারিত বিধি উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী তিন আয়াতের পর চুরির শাস্তি বর্ণিত হবে। মাঝখানে তিন আয়াতে আল্লাহভীতি, ইবাদত ও জিহাদের প্রতি উৎসাহদান এবং কুফরি, নাফরমানি ও পাপের ধ্বংসকারিতা বিবৃত হয়েছে। কুরআনের এ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কুরআন শাসকের ভঙ্গিতে শুধু দণ্ড ও শাস্তির আইন ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অভিভাবকসুলভ ভঙ্গিতে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত থাকার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ ও পরকালের ভয় এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও প্রশান্তিকে কল্পনায় উপস্থিত করে অপরাধীদের অন্তরকে অপরাধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এ কারণেই অধিকাংশ অপরাধ ও দণ্ডবিধির সাথে সাথে اِتَّقُوا اللّٰهَ [আল্লাহকে ভয় কর] ইত্যাদি বাক্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এখানেও প্রথম আয়াতে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রথমত اِتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আল্লাহর ভয়ই মানুষকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে।

দ্বিতীয়ত وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। وَسِيْلَةٌ শব্দটি وَسْل ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি س, ص উভয় বর্ণ দিয়ে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وَصْل -এর অর্থ যে কোনোরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وَسْل -এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।

–[সিহাহ, জওহরী, মুফারাতাদুল কুরআন]

তাই وَصْلَة ও وَصِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কোনো উপায়ে। পক্ষান্তরে وَسِيْلَةٌ ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়। –[লিসানুল আরব, মুফারাদাতুল কুরআন]

وَسِيْلَةٌ শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, সাহাবী ও তাবেয়ীরা ইবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وَسِيْلَةٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। হাকিমের বর্ণনা মতে হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর, হযরত আতা (র.) ও হাসান বসরী (র.) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১১১, ১২২]

আখিরাত সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা : তাওহীদ ও রিসালতের ন্যায় প্রত্যাবর্তনের স্থান ও আখিরাতের ব্যাপারেও মূর্খ লোকেরা অসংখ্য ভুলের মাঝে লিপ্ত। তাদের একটা বড় গলদ হলো সেখানকার কাজকর্ম ও আচার-আচরণকে তারা দুনিয়ার কাজকর্ম ও আচরণের অনুরূপ মনে করে। যেমন– এখানকার অফিস আদালতে, দফতরে দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে কাজকর্ম করা যায়, যেখানেও এরূপ নজর-নিয়াজ ও ঘুষ-রিশওয়াত দিয়ে সব কাজ সেরে নেওয়া যাবে এবং প্রত্যেক গুনাহ ও অপরাধের জন্য কিছু অর্থ প্রদান করলেই রিপোর্ট পক্ষে চলে আসবে। কুরআন মাজীদে এ 'বিশ্বখ্যাত' ত্রুটিকে বারবার উল্লেখ করে এর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে আখিরাতে কুফরির ফিদইয়া বা কাফ্ফারা কোনো ধনসম্পদ দিয়ে আদায় করা যাবে না।

اَنَّ لَهُمْ নিশ্চয় তাদের জন্য অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের জন্য যদি এ পরিমাণ ধনসম্পদ হয়। مَعَهٗ তার সাথে এখানকার ، সর্বামটি مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا অর্থাৎ জমিনে যা আছে তা সব একসাথে এ বাক্যের প্রতি ইঙ্গিতবহ। لَوْ যদি; এ শব্দটি যে বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তার অর্থ হয় এমন একটি কল্পনাপ্রসূত কথা, যা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। বস্তুত, এখানেও সে অর্থ যে, এ কল্পনাপ্রসূত ব্যবস্থার দ্বারাও আজাব থেকে কেউ নাজাত বা মুক্তি পাবে না। مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا যা কিছু জমিনে আছে সবই। এর মধ্যে ঐ সমস্ত কিছু এসে গিয়েছে, যা মানুষ কল্পনা করতে পারে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৩৩]

قَوْلُهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ : শানে নুযুল : মাখযুম বংশের যে নারীর চুরির ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়েছে সেই ঘটনাটি বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। ফতহে মক্কার সময় একজন মাখযুমী মহিলা চুরি করেছিল। মহিলা যেহেতু সম্ভ্রান্ত বংশের ছিল তাই কুরাইশদের পক্ষে তার হাত কর্তন করা কঠিন হলো। তাই কুরাইশরা হযরত উসামা ইবনে যায়দের মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর কাছে সুপারিশ করালো। রাসূল ﷺ সুপরিশ শুনে রাগ হলেন এবং বললেন, আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ডের বেলায়ও সুপারিশ করা হচ্ছে? যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরির দায়ে ধরা পড়তো

তাহলেও তার হাত কাটা যেতো। তারপর তিনি মহিলার হাত কাটার নির্দেশ জারি করলেন। হাত কাটার পর মহিলাটি নবীজী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আমার তওবা কি কবুল হবে? নবীজী ﷺ বললেন, তুমি আজ এমন নিষ্পাপ হয়ে গেছো যেন তোমার মায়ের পেট থেকে আজ ভূমিষ্ট হয়েছো। -[জামালাইন -২/১৯৪]

চোরের শাস্তি ও তার যৌক্তিকতা : চোরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা চোরাই মালের বদলে নয়; বরং তার চুরিকার্যের দণ্ড। যাতে সে নিজে এবং অন্যান্য লোক সতর্ক হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, যেখানেই এ দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়, সেখানে দু'চার জনের শাস্তির পর চুরির দুয়ারই সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। আজ তথাকথিত সভ্যতার দাবিদারগণ এ রকম শাস্তিকে বর্বরতা আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু চুরিকার্য যদি তাদের নিকট কোনো সভ্য কর্ম না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চিত বলা যায়, তাদের কোনো সভ্য দণ্ডবিধি এ অসভ্য কর্ম তৎপরতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হতে পারে না। কোনো লঘু অমানবিকতা অবলম্বনে যদি বহু সংখ্যক চোরকে সভ্য করে তোলা যায়, তবে সভ্যতার ধ্বজাধারীদের তো এ ভেবে তাতে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, বর্বরতা দ্বারা তাদের সভ্যতার মিশনে সাহায্য লাভ হয়। কিছু সংখ্যক নামধারী তাফসীরবেত্তাও চেষ্টা চালাচ্ছে হস্তচ্ছেদনের এ শাস্তিকে চুরির সর্বশেষ শাস্তি সাব্যস্ত করতে। তার আগে লঘু শাস্তি আরোপের অধিকার খোদ শরিয়তের পক্ষ হতে লাভ করা যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, না কুরআন মাজীদে চুরি কর্মের জন্য এর চেয়ে লঘু শাস্তি কোথাও পাওয়া যায়, না নবুয়তি যুগ বা সাহাবায়ে কেরামের আমলে তার কোনো দৃষ্টান্তের হদীস মিলে। কোনো লোক কি এ দাবি করতে পারে যে, এ সুদীর্ঘকালে যত চোর ধরা পড়েছে তাদের একজনও প্রাথমিক পর্যায়ের চোর ছিল না, যার উপর অন্তত বৈধতা বর্ণনার জন্য হলেও হস্তচ্ছেদন অপেক্ষা লঘুতর কোনো প্রাথমিক শাস্তি আরোপ করা যেত?

অতীতে কোনো এক ধর্মদ্রোহী চুরির এ দণ্ড সম্পর্কে এরূপ কথাও বলেছিল যে, শরিয়ত যেখানে এক হাতের দিয়ত নির্ধারণ করেছে পাঁচশ' দীনার, সেখানে এরূপ মূল্যবান হাতকে পাঁচ-দশ টাকা চুরির অপরাধে কী করে কাটা যেতে পারে? জনৈক প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ তাঁর জ্ঞানগর্ভ জবাবে কী সুন্দর বলেছেন- إِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ أَمِيْنَةً كَانَتْ ثَمِيْنَةً فَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ 'হাত যখন বিশ্বস্ত ছিল, তখন তার ঠিকই মূল্য ছিল, কিন্তু সে যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল, তখন মূল্যও হারিয়ে ফেলল।"

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১২৬]

আল্লাহর পরিচয় : عَزِيْزٌ অর্থ- মহাপরাক্রমশালী। এ গুণবাচক শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ-ই সর্বশক্তিমান। তিনি যেরূপ ইচ্ছা, অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেন। কেউ তাঁর উপর প্রতিবাদ করতে পারে না। حَكِيْمٌ অর্থ- হিকমতওয়ালা। এ গুণবাচক শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুমই মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে খালি নয়। এজন্য তিনি চুরির শাস্তি তা-ই নির্ধারণ করেছেন, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জীবনের জন্য মহা উপকারী। ইমাম রাযী (র.) এখানে আসমাঈ-এর সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, একদা আমি জনৈক বেদুঈনের সামনে 'সূরা মায়িদা' তেলাওয়াত করি। তখন এ আয়াত আসলে ভুলবশত আমার মুখ দিয়ে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বা অধিক ক্ষমাশীল, করুণাময় বেরিয়ে যায়। তখন সে বেদুঈন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এটি কার কথা? আমি বলি, এ হলো 'কালামে ইলাহী' বা আল্লাহর কালাম। তখন সে বলে, আয়াতটি দ্বিতীয়বার পড়ুন। আমি আয়াতটি আবার পড়ি এবং বুঝতে পারি যে, عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -এর পরিবর্তে আমার মুখ থেকে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বেরিয়ে গেছে। তখন বেদুঈন বলেন, এখন আপনি ঠিকভাবে পড়েছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিরূপে জানলে? জবাবে বলে, বাক্যের ধারায় আমি বুঝতে পেরেছি। এখানে যখন শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, তখন 'বালাগাত' বা অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুসারে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -এর পরিবর্তে عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

-[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৩৭]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ : যোগসূত্র : সূরা মায়িদার তৃতীয় রুকু থেকে আহলে কিতাবদের আলোচনা চলছিল। মাঝখানে তাদের কিছু কিছু আলোচনা এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্য বিশেষ বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছিল। এখানে পুনরায় আহলে কিতাবদের সম্পর্কেই সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আহলে কিতাবদের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিস্টান দুই সম্প্রদায় ছাড়াও আরেকটি সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। এরা ছিল প্রকৃত পক্ষে ইহুদি কিন্তু কপটতাপূর্বক মুসলমান হয়েছিল। তারা মুসলমানদের সামনে ইসলাম প্রকাশ করত, অথচ স্বধর্মালম্বী ইহুদিদের মধ্যে বসে ইসলামও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবান বর্ষণ করত। আলোচ্য তিনটি আয়াত এ তিন সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ ও অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, এরা আল্লাহ তা'আলার বিধান ও নির্দেশের বিপরীতে স্বীয় কামনা-বাসনা ও বিচার-বুদ্ধিকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান ও

নির্দেশের মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় বাসনার ছাঁচে ঢেলে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছনা ও অশুভ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদের জন্য কতিপয় মৌলিক বিধান ও নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে।

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদি গোত্রসমূহে সংঘটিত দু'টি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত দু'টি অবতীর্ণ হয়। একটি ঘটনা ছিল হত্যা ও কিসাস বিষয়ক এবং অপরটি ছিল ব্যভিচার ও তার শাস্তি সংক্রান্ত। ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন যে, ইসলাম পূর্বকালে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বস্তরে অন্যায়-অত্যাচারের রাজত্ব চলছিল। সবল দুর্বলকে এবং উচ্চবিত্তরা নিম্নবিত্তদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখত। সবল-সম্ভ্রান্তের জন্য ছিল ভিন্ন আইন। বর্তমানকালেও সভ্যতার দাবিদার অনেক দেশে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক আইন প্রচলিত রয়েছে। মানবতার দিশারী রাসূলে কারীম ﷺ -ই এসব স্বাতন্ত্র্য, চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছেন, মানবাধিকারে সমতা ঘোষণা করেছেন এবং মানব ও মানতাকে মনুষ্যত্বের সবক দিয়েছেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের পূর্বে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইহুদিদের দু'টি গোত্র বনী কুরাইযা ও বনী নযীরের বসতি ছিল। তন্মধ্যে বনী কুরাইজার তুলনায় বনী নযীর শক্তি, শৌর্যবীর্য, অর্থ ও সম্মান বেশি ছিল। ফলে তারা প্রায়ই বনী কুরাইযার প্রতি অন্যায় অবিচার করত এবং তারা তা নির্বিবাদে সহ্য করত। এমন কি, তারা বনী কুরাইযাকে এ অবমাননাকর চুক্তি করতেও বাধ্য করল যে, যদি বনী নযীয়ের কোনো ব্যক্তি বনী কুরাইযার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে তাদের কিসাস অর্থাৎ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ লওয়ার অধিকার থাকবে না; বরং মাত্র সত্তর ওসক খেজুর রক্ত বিনিময়স্বরূপ প্রদান করা হবে [আরবি ওজনে ওসক একটি পরিমাণ, যা আমাদের ওজনে প্রায় পাঁচ মণ দশ সেরের সমান]। এ রক্ত বিনিময়ের পরিমাণ হবে বনী নযীরের রক্ত বিনিময়ের দ্বিগুণ। অর্থাৎ একশ' চল্লিশ ওসক খেজুর। শুধু তাই নয়, নিহত ব্যক্তি মহিলা হলে তার বিনিময়ে বনী কুরাইযার একজন পুরুষকে হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যক্তি পুরুষ হলে তার বিনিময়ে বনী কুরাইযার দু'জন পুরুষকে হত্যা করা হবে। বনী নুযাইয়েরর ক্রীতদাসকে হত্যা করলে তার বিনিময়ে বনী কুরাইযার স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। বনী নযীরের কারও এক হাত কাটা হলে বিনিময়ে বনী কুরাইযার দু'হাত এবং এক কানের বিনিময়ে দু'কান কাটা হবে। ইসলামের পূর্বে এ গোত্রদ্বয়ে এ আইনই প্রচলিত ছিল। দুর্বলতাবশত বনী কুরাইযা তাই মানতে বাধ্য ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরতের পর মদীনা যখন দারুল ইসলামে পরিণত হলো, এ গোত্রদ্বয় তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং কোনো চুক্তি হলেও ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য ছিল না। কিন্তু তারা দূরে থেকেই ইসলামের ন্যায়বিচার ও সাধারণ সহজবোধ্যতা নিরীক্ষণ করে বনী কুরাইযার কাছে দ্বিগুণ রক্ত বিনিময় দাবি করল। বনী কুরাইযা ইসলামে দীক্ষিত ছিল না এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাদের কোনো চুক্তিও ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক ছিল। তারা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী দৃষ্টে জানত যে, মুহাম্মাদ ﷺ শেষ নবী। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পার্থিব লোভের কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করতো না। তারা আরো দেখছিল যে, ইসলাম মানবিক সমতা, ন্যায়বিচার ও ইনসাফের পতাকাবাহী। তারাই বনী নযীরের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা একটি আশ্রয় খুঁজে পেল। তারা একথা বলে দ্বিগুণ রক্ত বিনিময় দিতে অস্বীকার করল যে, আমরাও তোমরা একই পরিবারভুক্ত, একই দেশের বাসিন্দা এবং একই ইহুদি ধর্মাবলম্বী। আমাদের দুর্বলতা ও তোমাদের জবরদস্তির কারণে এতদিন আমরা যেসমস্ত অন্যায় চুক্তি মেনে চলেছি এখন থেকে তা আর মানব না।

এ উত্তর শুনে বনী নযীর উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলো। কিন্তু কতিপয় প্রবীন লোকের পরামর্শক্রমে স্থির হলো, ব্যাপারটির ফয়সালার জন্য উভয় পক্ষ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর শরণাপন্ন হবে। বনী কুরাইযা মনে মনে তাই চাচ্ছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, মহানবী ﷺ বনী নযীরের উৎপীড়ন নীতি বহাল রাখবেন না। বনী নযীর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়েও গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা মকদ্দমা উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই কিছুলোককে পাঠিয়ে দিল, যারা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাদেরই স্বধর্মাবলম্বী ইহুদি। কিন্তু কপটতাপূর্বক ইসলাম প্রকাশ করে মহানবী ﷺ -এর নিকট আসা যাওয়া করত। বনী নযীরের উদ্দেশ্য ছিল, তার মকদ্দমা ও ফয়সালার পূর্বে এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ -এর মনোভাব ও মতবাদ জেনে নেওয়া। তারা গুরুত্ব সহকারে বলে দিল যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের পক্ষে রায় দেন, তবে তা মেনে নেব, অন্যথায় মেনে নেওয়া অঙ্গীকার করব না।

এ ঘটনাটি ইমাম বগভী (র.) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুসনদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর সারমর্ম বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ব্যভিচার সংক্রান্ত। ইমাম বগভীর বর্ণনা মতে, এ ঘটনাটি ঘটে খায়বরের ইহুদিদের মধ্যে। তাওরাত নির্ধারিত শাস্তি অনুযায়ী উভয়কে প্রস্তরবর্ষণে হত্যা করা ছিল অপরিহার্য। কিন্তু তারা ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইহুদিরা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাদের শাস্তি লঘু করতে চাইল। তারা জানত যে, ইসলামে মাসআলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা আছে। তাই তারা মনে করল যে, এ শাস্তির ব্যাপারেও ইসলামের বিধান কঠোর না হয়ে নরমই হবে। সে মতে খায়বরের ইহুদিরা বনী কুরাইযাকে অনুরোধ করল, যাতে তারা মুহাম্মাদ ﷺ -এর দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে দেয়। অপরাধীদ্বয়কেও তারা সাথে সাথে পাঠিয়ে দিল। তাদেরও উদ্দেশ্যে ছিল, যদি তিনি কোনো লঘু শাস্তির রায় দেন, তবে মেনে নেওয়া হবে, অন্যথায় অস্বীকার করা হবে। বনী কুরাইযা প্রথমে ইতস্তত করল, কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর একথাই স্থির হলো যে, কয়েকজন সর্দার অপরাধীদ্বয়কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যাবে এবং তাঁকে দিয়েই এর ফয়সালা করাবে।

সে মতে কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমুখের একটি প্রতিনিধিদলে অপরাধীদ্বয়কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, যদি বিবাহিত পুরষ ও নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাদের শাস্তি কি? মহানবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার ফায়সালা মেনে নেবে কি? তারা সম্মতি প্রকাশ করল। ঠিক সে মুহূর্তেই ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) নির্দেশ নিয়ে অবতরণ করলেন যে, তাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে হবে। তারা এ ফয়সালা শুনে তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। জিবরাঈল (আ.) মহানবী ﷺ -কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন, আমার এ ফয়সালা মানা না মানার জন্য ইবনে সূরিয়াকে বিচারক নির্ধারণ কর। অতঃপর জিবরাঈল (আ.) ইবনে সূরিয়ার পরিচয় ও গুণাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে দিলেন। তিনি আগত প্রতিণিধিদলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ঐ শ্বেতকায় এক চোখ অন্ধ যুবককে চেন কি, যে ফাদাকে বসবাস করে এবং যাকে ইবনে সুরিয়া বলা হয়? সবাই বলল, চিনি। আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমরা তাকে কিরূপ মনে কর? তারা বলল, ভূপৃষ্ঠে তার চাইতে বড় কোনো ইহুদি আলেম নেই। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন।

ইবনে সূরিয়ার আগমনের পর রাসূলে কারীম ﷺ তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বর্ণিত মাসআলায় তাওরাতের নির্দেশ কি? সে বলল, আপনি আমাকে যে সত্তার কসম দিয়েছেন, আমি তারই কসম খাচ্ছি। যদি আপনি কসম না দিতেন এবং মিথ্যা কথা বললে তাওরাত আমাকে পুড়িয়ে দেবে এ আশঙ্কা না থাকত, তবে আমি এ সত্য প্রকাশ করতাম না। সত্য বলতে কি, তাওরাতেও এ নির্দেশই রয়েছে যে, অপরাধীদ্বয়কে প্রস্তর মেরে হত্যা করতে হবে।

মহানবী ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা কি কারণে তাওরাতের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ কর? ইবনে সূরিয়া বলল, আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের জনৈক রাজকুমার ব্যভিচারের অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। আমরা তাকে খাতির করে ছেড়ে দিলাম, প্রস্তর মেরে হত্যা করলাম না। কিছুদিন একজন সাধারণ লোক এ অপরাধে অভিযুক্ত হয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করতে চাইল, কিন্তু অপরাধীর পক্ষে একদল লোক বেঁকে বসল। তারা বলল, তাকে শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তি দিতে হলে আগে রাজকুমারকে দিতে হবে, নতুবা আমরা তার প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করতে দেব না। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে, সবার পক্ষে গ্রহণীয় একটি লঘু শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার এবং তাওরাতের নির্দেশ পরিত্যাগ করা উচিত। সে মতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ব্যভিচারের অপরাধীকে কিছু মারপিট করে মুখে চুনকালি মাখিয়ে মিছিল বের করতে হবে। বর্তমানে এ শাস্তিই প্রচলিত রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১২৩ -১২৬]

قَوْلُهُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ : অর্থাৎ আপনি এমন লোকদের কথায় ব্যথিত হবেন না, يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ [হে আমার রাসূল!] কুরআন মাজীদ, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উল্লেখ কেবলমাত্র اَلنَّبِيُّ ও اَلرَّسُوْلُ হিসেবে এসেছে, যা তৃতীয় পুরুষ; এবং দ্বিতীয় পুরুষ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ ও اَيُّهَا النَّبِيُّ হিসেবে উল্লেখ হওয়ার কারণে এ ইঙ্গিত বহন করে যে, এখন আর কোনো ব্যক্তি নবুওয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব আসবে না। يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ তারা দৌড়ে গিয়ে কুফুরীতে আপতিত হয়। অর্থাৎ তারা কুফরীর প্রতি অধিক আগ্রহশীল। يُسَارِعُوْنَ - مُضَارِعْ صِيْغَةْ مُسَارَعَةْ بَابُ শব্দটি مُفَاعَلَةْ-এর ওযনে এসেছে, অর্থ হলো, তারা কুফরির প্রতি এমনই আগ্রহশীল যে, তারা দৌড়ে একে অন্যের আগে যেতে চায়। ইমাম (রা.) বলেন, কুরআন মাজীদে يَاَيُّهَا النَّبِيُّ [হে আমার নবী!] এ সম্বোধনটি বারবার এসেছে; কিন্তু يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ হে আমার রাসূল! আপনি পৌঁছে দিন, যা নাজিল করা হয়েছে আপনার প্রতি। এ ধরনের সম্বোধনে তাজিম ও সম্মান প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের সম্বোধন তাশরীফ ও তা'জীমের জন্য হয়ে থাকে।

–[তাফসীরে কাবীর]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, এ আয়াতে তরিকতপন্থিদের আসল অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে, তারা যেন নাফরমানদের ব্যাপারে বেশি চিন্তা-ভাবনা না করে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪২]

قَوْلُهُ سَمَّاعُوْنَ : এর অর্থ অত্যধিক শ্রবণকারী, যে অপরের কথা শোনার জন্য কান পেতে রাখে। অনেক সময় এর দ্বারা গোয়েন্দাগিরিও বোঝানো হয়। আবার কখনো অধিক গ্রহণকারীরও বোঝানো হয়, যেমন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ -এর মাঝে শোনা অর্থ গ্রহণ করাই বোঝানো হয়েছে। মুফাস্‌সির (র.) এখানে প্রথম অর্থ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এটাকে দ্বিতীয় অর্থে নিয়েছেন। সে হিসেবে سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থ- মিথ্যা ও অসত্যকে অত্যধিক গ্রহণ ও মান্যকারী। سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ যারা নিজেরা তোমার কাছে না এসে এদেরকে পাঠিয়েছে সেই দ্বিতীয় দলের কথা এরা খুব বেশি মানে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩২]

قَوْلُهُ لِلْكَذِبِ : মুনাফিক ও ইহুদি এ ধরনের লোকদের বৈশিষ্ট্য একই। তা হলো এরা মিথ্যা ও বাতিল বিষয়কে খুব খেয়াল করে শোনে এবং তা কবুল করে নেয়। سَمَّاعُوْنَ শব্দের মূলধাতু হলো سَمِعَ; যার অর্থ- কবুল করা, গ্রহণ করা। আরবি ভাষায় এ ধরনের ব্যবহার খুব বেশি। যেমন- وَالسَّمْعُ يَسْتَعْمِلُ وَيُرَادُ مِنْهُ الْقَبُوْلُ শোনা, এর অর্থ হলো কবুল করা। -[তাফসীরে কাবীর] পাদ্রীরা যা মনগড়া কথা বলতো, তা তারা কবুল করে নিত। -[বায়যাভী]

لِلْكَذِبِ অর্থাৎ মিথ্যার জন্য। এখানে অর্থ হলো মিথ্যার কারণে। অর্থাৎ তারা এজন্য খবর শুনতো যে, যাতে তারা মিথ্যা বলতে পারে এবং ভিত্তিহীন প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করতে পারে। অর্থাৎ তারা আপনার থেকে এজন্য কথাবার্তা শ্রবণ করে, যাতে তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে পারে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪৪]

قَوْلُهُ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ : [অহংকার ও হিংসার কারণে]। 'তারা আপনার থেকে অহংকার ও বিদ্বেষের কারণে দূরে দূরে থাকে। অর্থাৎ এদের কিছু এমন, যারা অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে আপনার কাছে আসে না, যেমন খায়বরের ইহুদিরা। আর কিছু এমন, যারা আপনার মজলিসে আসে; কিন্তু সত্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে নয়; বরং তারা গুপ্তচর হিসেবে আসে, যাতে অন্যের কাছে অবান্তর কথা পৌঁছাতে পারে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪৫]

قَوْلُهُ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ : ইহুদি প্রসঙ্গ : এখানে বড় ও বিশিষ্ট ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে। যারা শত্রুতাবশত, অহংকার হেতু নিজেরা তো নবীর দরবারে হাজির হতো না, কিন্তু যখনই সুযোগ পেত, তখনই তাদের কাছে সংরক্ষিত আল্লাহর কালামকে বিকৃত করতো দ্বিধাবোধ করতো না। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদিরা তাদের মধ্যে সংঘটিত এক জেনাকারের মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করে। তখন তিনি বলেন, তাওরাতে জেনাকারকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ মওজুদ আছে, সে মুতাবিক শাস্তি দিয়ে দাও। তখন সে জালেমরা তা গোপন করে ফেলে।
-[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৪৬]

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا : অর্থাৎ তা মেনে নেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করবে না। يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ তারা বলতো। অর্থাৎ এরা তাদের ঐসব লোককে বলতো, যাদেরকে তারা নবী কারীম ﷺ -এর মজলিসে প্রেরণ করতো। هٰذَا অর্থাৎ এই হুকুম। আসল আসমানি হুকুম বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মনগড়া যেসব কথা বলতো فَخُذُوْهُ অর্থাৎ তা মানার জন্য অঙ্গীকার করবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, আয়াতে সে ব্যক্তির নিন্দা করা হচ্ছে, যে জ্ঞানীদের সংস্পর্শে এজন্য আসে না যে, সে মাসআলার উপর আমল করবে, বরং তারা তাদের সোহবতে এ উদ্দেশ্যে আসে যে, যদি তাদের মর্জি মুতাবিক কিছু কথাবার্তা পায় তবে তা দিয়ে বদনাম সৃষ্টি করবে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-৪৪৭]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ : মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো জিনিসই অস্তিত্ব লাভ করে না, হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা, কল্যাণ ও অকল্যাণ কোনো কিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অস্তিত্বপ্রাপ্ত হতে পারে না। এটা এমনই এক মূলনীতি যা অস্বীকার করা স্বীকার করা অপেক্ষা ঢের শক্ত। মনে করুন, এক ব্যক্তি চুরি করতে ইচ্ছা করেছে, কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা সে চুরি না করুক। এখন সে যদি ভালো ও মন্দ কোনোটিরই ইচ্ছা না করে, তবে তাতে মহান আল্লাহর বেকারত্ব, ঔদাসিন্য ও নির্বুদ্ধিতা সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। এসব দিকে চিন্তা করার পর শেষ পর্যন্ত এটাই মানতে হবে যে, কোনো জিনিসই তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না; বিষয়টি নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কিত আলোচনাও অত্যন্ত দীর্ঘ। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৫]

قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ : যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি তারা কারা এবং কেন? প্রথমে ইহুদি ও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিশেষভাবে কয়েকটি কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, যথা- সর্বদা মিথ্যা ও ভ্রান্তির দিকে আকৃষ্ট হওয়া, সত্যপন্থিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা, কূটীল চরিত্র ও দুষ্টমতিদের সহযোগিতা করা, হেদায়েতের বাণীকে বিকৃতাকারে পেশ করা এবং নিজের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোনো সত্য কথাকে গ্রহণ না করা। যে জাতির মাঝে এসব চরিত্র পাওয়া যাবে তাকে সেই রুগ্ণ ব্যক্তির সাথে তুলনা করতে পারেন, যে না ওষুধ পথ্য ব্যবহার করবে, না ক্ষতিকর দ্রব্যাদি পরিহার করে চলবে। সর্বদা ডাক্তার-চিকিৎসককে ঠাট্টা-উপহাস করাই তার কাজ। কেউ সুপরামর্শ দিলে তাকে গালাপাল শুনতে হবে। ব্যবস্থা পত্র ছিড়ে ফেলা বা তাতে রদবদল করা তার স্বভাব। সেই সঙ্গে তার অঙ্গীকার সে ওষুধ, তা রুচি মর্জির পরিপন্থি হবে, তা কস্মিনকালেও ব্যবহার করবে না। এমতাবস্থায় কোনো ডাক্তার যা হেকীম, তা যদি তার পিতাও হয়, যদি চিকিৎসা করা ছেড়ে দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে, এরূপ রোগীকে তার স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতার পরিণাম ভোগ করতে দেওয়া হোক, তবে কি সেটাই চিকিৎসকের নির্দয়তা বা অবহেলা সাব্যস্ত হবে, নাকি তাকে খোদ রোগীর আত্মহত্যা মনে করা হবে? এমতাবস্থায় সে রোগী যদি মারা যায় তবে এ বলে চিকিৎসককে অভিযুক্ত করা যাবে না যে, সে চিকিৎসা করে তা সুস্থ করতে চায়নি কেন? বরং রোগীর উপরই অভিযোগ আসবে যে, সে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করেছে এবং চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায় চিকিৎসককে বাধাগ্রস্ত করেছে। ঠিক এভাবেই এখানে ইহুদিদের দুষ্কর্ম, স্বেচ্ছারিতা ও হঠকারিতার উল্লেখপূর্বক যে বলা হলো [مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান] এবং أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ [এরাই তারা যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি] এর অর্থ এটাই যে, তাদের অযোগ্যতা ও অপকর্মের কারণে মহান আল্লাহ তাদের উপর থেকে আপন কৃপাদৃষ্টি তুলে নিয়েছেন। এরপর আর তাদের সুপথে আসার ও পবিত্রতা ধারণ করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাজেই আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে কষ্ট দিবেন না। ইরশাদ হয়েছে- وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ [যারা কুফরের দিকে ধাবিত হয় তাদের জন্য দুঃখ করবেন না]। যদি প্রশ্ন করা হয়, মহান আল্লাহর তো এ ক্ষমতাও আছে যে, তাদের যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম জবরদস্তিমূরক দমন করে দিয়ে তাদেরকে বাধ্য করে দিতেন, যাতে স্বেচ্ছাচারিতা করতেই না পারে। তা আমরাও স্বীকার করি মহান আল্লাহর অপর শক্তির সামনে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়। ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا "তোমার প্রতিপালক চাইলে পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই ঈমান আনত।"-[সূরা ইউনুস: ৯৯]

কিন্তু দুনিয়ার সামগ্রিক নীতিই রাখা হয়েছে কাউকে ভালো-মন্দ কোনো কাজে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করা হবে না। যদি কেবল ভালো কাজে সকলকে বাধ্য করে দেওয়া হতো, তবে বিশ্বসৃষ্টির লক্ষ্যই পূর্ণ হতো না এবং আল্লাহ তা'আলার বহু গুণ এমন রয়ে যেত, যা প্রকাশের কোনো স্থান পাওয়া যেত না, যেমন ক্ষমা, সহনশীলতা, শাস্তি দান, প্রবল পরাক্রম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, বিচার দিবসের একচ্ছত্র মালিকানা ইত্যাদি। অথচ বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ছিল তাঁর সমস্ত গুণাবলিকে প্রকাশ করা। যে কোনো ধর্ম বা কোনো মানুষ, যে মহান আল্লাহকে স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ কর্তা মনে করে, সে শেষতক বিশ্বসৃষ্টির এছাড়া দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য দেখাতে পারবে না। لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا [তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে কে উত্তম। -[সূরা মূলক] এর চেয়ে বেশি আলোচনার সুযোগ এখানে নেই; বরং এতটুকুও আমাদের মূল বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৬]

قَوْلُهُ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : আখিরাতের আজাবের প্রকাশ তো আখিরাতেই হবে। কিন্তু দুনিয়ার অপমান, অপদস্থতা, লাঞ্ছনার আজাব কিছুদিনের মধ্যেই সংঘটিত হয়, যা দোস্ত ও দুশমন সবাই তাদের চোখ দিয়ে অবলোকন করে। মুনাফিকদের নিফাক একে একে প্রকাশ পেয়েছে; ফলে সমাজে তারা অপমান অপদস্থ হয়েছে। এখন থাকলো ইহুদিদের কথা। সে ব্যাপারে দেখা যায় যে, তাদের বৃহৎ ও শক্তিশালী সম্প্রদায় বনূ নযীর, বনূ কুরাইযা, বনূ কায়নুকা, তারা সবাই বন্দী হয়েছে, নির্বাসিত হয়েছে এবং নিহত হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৫০]

قَوْلُهُ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ : অর্থাৎ মিথ্যা শ্রবণে খুবই আগ্রহশীল। এখানে ইহুদিদের বিশেষ ও সাধারণ সব ধরনের লোকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। سَمِعَ অর্থ- শ্রবণ; এখানে শ্রবণের সাথে মিথ্যা ও বাতিল গ্রহণ করার ব্যাপারও আছে। এ শব্দটি একটু আগের আয়াতে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ তাকিদের জন্য শব্দটি আবার আনা হয়েছে। كَرَّرَهٗ تَاكِيْدًا تَعْظِيْمًا বিশেষ তাকিদ ও সম্মানের জন্য শব্দটি পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে। كَرَّرَ لِلتَّاكِيْدِ শব্দটি তাকিদের জন্য পুনরায় আনা হয়েছে। اَكَّلُوْنَ لِلسُّحْتِ اَىِ السُّحْتُ الْحَرَامُ হারাম ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত। সব ধরনের হারাম খাদ্যের জন্য سُحْتٌ শব্দটি ব্যবহার হয়। مَا خَبُثَ مِنَ الْكَاسِبِ যে উপার্জন অবৈধ অথবা হারাম, তাই سُحْتٌ -[কামূস]

وَهُوَ كُلُّ مَا لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ যে উপার্জন বৈধ নয়, তাই সুহত [মাদরিক]। এখানে অর্থ হলো, রিশওয়াত বা ঘুষ। এ অর্থই তার জন্য এখন খাস। রিশওয়াতকে-ই সুহত বলা হয়। –[তাজ, রাগিব] হারামভাবে যা নেওয়া হয়, তাকে রিশওয়াত বলে। –[তাফসীরে কাবীর] হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। هُوَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ -এটি [সুহত] হুকুমের দিক দিয়ে রিশওয়াত বা ঘুষের মতো। –[মাদারিক]। هُوَ الرِّشْوَةُ -এ হলো [সুহত] রিশওয়াত বা ঘুষের সমতুল্য।

এ বিশেষ গুণটি ছিল বিশিষ্ট ও বড় বড় ইহুদিদের যারা ঘুষের বিনিময়ে উল্টাপাল্টা হুকুম-আহকাম বর্ণনা করতো এবং মাসআলা-মাসাইল পরিবর্তনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের কাছে যে আসমানি কিতাব আছে [তাওরাত], তাতে তাদের ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ঘুষ গ্রহণ না করা সম্পর্কে এরূপ হুকুম আছে; তোমাদের সব ফিরকার মধ্যে কাজী নিয়োগ করবে। তারা যেন ইনসাফের সাথে লোকদের মাঝে বিচার করে। তোমরা বিচারের সময় মকদ্দমা পরিবর্তন করবে না। তোমরা পক্ষপাতিত্ব করবে না এবং রিশওয়াত বা ঘুষ গ্রহণ করবে না। কেননা ঘুষ বিবেকবান লোকদের চোখকে অন্ধ করে দেয় এবং সত্যবাদী লোকদের কথাকে ফিরিয়ে দেয়। [দ্বিতীয় বিবরণ, ১৬: ১৮, ১৯]। কিন্তু তাদের বুজুর্গরা 'তালমুদে' এরূপ হুকুম রেখেছিল যে, যখন কোনো মকদ্দামায় এক দল ইসরাঈলী হয় এবং অপরদল গায়রে ইসরাঈলী; এমতাবস্থায় ইসরাঈলীদের পক্ষে যদি ইহুদি শরিয়ত মুতাবিক ফয়সালা করা সম্ভব হয়, তবে তা করবে এবং এরূপ বলে দাও যে, এটাই আমাদের কানুন। আর যদি তাদের সে ফায়সালা গায়রে ইসরাঈলী কানুনের অনুরূপ হয়, তবে তা করে দেবে এবং গায়রে ইসরাঈলীদের বলবে, এটাই তোমাদের গ্রন্থ মুতাবিক ফয়সালা। আর যদি সে ফয়সালা দু'টি নিয়মের কোনো একটির সাথে না মিলে, তখন বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করবে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বলেন, আল্লাহর উক্ত আয়াতে 'রহমতের' দলিল আছে। কেননা এখানে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে, অধিক খারাপ অভ্যাস ও গুনাহের কারণে। ছোট গুনাহের কারণে নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়নি, যার থেকে সাধারণত অভ্যাসগত কারণে কেউ মুক্ত হতে পারে না। এ হলো তরবিয়তকারী মাশায়েখে কেরামের অবস্থা যে, তারা সামান্য অপরাধকেও উপেক্ষা করেন। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৫১]

قَوْلُهُ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ : চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ, দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরো একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে, اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ অর্থাৎ তারা **سُحْت [সুহ্ত] খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহতের শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে** মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ **অর্থেই কুরআনে বলা হয়েছে–** فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ তা'আলা আজাব দ্বারা তোদের মূলোৎপাটন করে দেবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্ত' বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা.), ইবরাহীম নখয়ী (র.), হাসান বসরী (র.) মুজাহিদ (র.), কাতাদা (র.) ও যাহ্হাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে সমাজে ঘুষ চালু হয়ে যায়, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয় পড়লে কারো জানমাল ও ইজ্জত আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে সুহ্ত আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমূখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালি বা মধ্যস্থতা করে।

শরিয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনত জায়েজ নয়, সে কাজের পারিশ্রামিক গ্রহণ করা। উদাহরণত যে কাজ করা কোনো ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে কাজের জন্য কোনো পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারি কর্মকর্তা ও করণিকগণ চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট কোনো লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা-ই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তারা কারো কাছে থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোনো পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘুষ। রোজা নামাজ, হজ তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এর জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফিকহবিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কুরআন শিক্ষাদান করা ও নামাজের ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে ন্যায়সঙ্গত কাজও করে দেয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারো অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরিউক্ত গুনাহ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং আল্লাহর নির্দেশের বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদের এ থেকে রক্ষা করুন!

–[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৩৩, ১৩৪]

قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ : [আপনাকে দু'টি ব্যাপারেই ইখতিয়ার-স্বাধীনতা দেওয়া হলো, আপনি যা ভালো মনে করেন, তা করবেন]। فَإِنْ جَاءُوكَ যদি তারা আপনার কাছে আসে কোনো ব্যাপার বা মোকদ্দমা নিয়ে। এখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তো মদীনার বাদশা এবং দুনিয়ার দিক দিয়ে ক্ষমতাবান নির্দেশদাতা। এজন্য ইহুদিরা অবশ্যই তাদের ব্যাপারগুলো তাঁর সামনে আনতে বাধ্য ছিল। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে এরূপ ছিল যে, শরিয়তে মুহাম্মাদী শরিয়তে ইহুদি থেকে অনেক সহজ ছিল। এজন্য মদীনার বহু ইহুদি তাদের বিবাদ-বিসংবাদ মিটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে নিয়ে আসতো। জিম্মিদের ব্যাপারে ফায়সালা করা ইসলামের আমীরের জন্য ওয়াজিব, অন্যান্য কাফেরের জন্য ওয়াজিব নয়, কেবল জায়েজ মাত্র, তাও প্রয়োজন, কল্যাণ ও মঙ্গলের খাতিরে। যেমন বলা হয়েছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইখতিয়ার যে, কাফেরদের ব্যাপারে ফয়সালা করা আমাদের জন্য ওয়াজিব নয়, যদি তারা যিম্মী না হয়, বরং তাদের মাঝে হুকুম দেওয়া জায়েজ, যদি আমরা তা দিতে চাই। এ ইখতিয়ার কেবল তাদের জন্য খাস, যাদের ব্যাপারে তাদের কোনো জিম্মাদারী নেই।

[এখন সেসব ন্যায়বিচারের নিয়ম-কানুন ইসলামের কানুনের অন্তর্ভুক্ত]। وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ -যদি আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করেন; এবং নবী কারীম ﷺ -এর এ উপেক্ষা অবশ্যই দীনের কোনো কল্যাণের খাতিরেই হতো فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا -তবে তারা কখনো আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ জন্য আপনি কোনো চিন্তা করবেন না যে, নাখোশ হয়ে এরা আপনার সাথে কোনোরূপ শত্রুতা করবে। بِالْقِسْطِ ন্যায়মতে; যেভাবে আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, যা কুরআনে আছে এবং ইসলামি শরিয়তের বিধানে আছে। ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা এ ব্যাপারে দেওয়া হয়েছে যে, জিম্মি নয়– এরূপ কাফেরদের ব্যাপারে ফয়সালা বা বিচার করা যেতে পারে এবং নাও করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ফয়সালা করতেই হয়, তবে এটা জরুরি যে, তা শরিয়তের কানুনের আওতায় করতে হবে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ১৫২,১৫৩]

ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ তাফসীরবেত্তা হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য এ ইখতিয়ার ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। তারপর ইসলাম যখন শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন ইরশাদ হয়– وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ। অর্থাৎ "শরিয়তের কানুন অনুযায়ী তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করুন।" পাশ কাটিয়ে চলা ও উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৭]

قَوْلُهُ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : কুরআন মাজীদ বারংবার এ বিষয়ে জোর দিয়েছে যে, একজন লোক যতই **দুষ্ট ও জালিম হোক না কেন, তার ক্ষেত্রেও তোমার ন্যায়ের আচল যেন বে-ইনসাফীর ছিটাফোঁটা দ্বারা কালিমালিপ্ত** না হতে **পারে। এটাই একমাত্র নীতি যা দ্বারা আসমান জমিনের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকতে পারে। –**[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৩৮]

[আর আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন, স্পষ্ট যে, তাদেরকে তিনি সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দেন]। এখানে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যত অপরাধী-ই হোক না কেন, আপনি তাদের ব্যাপারে সর্বাবস্থায় সত্য ও ন্যায়ের উপর স্থির থাকবেন, তা থেকে বিচ্যুত হবেন না। بِالْحَقِّ অর্থাৎ সত্যসহ এবং ইনসাফের সাথে, যদিও তারা কুফরির মধ্যে থাকে সত্যপথ বিচ্যুত হয়ে। –[তাফসীরে মাজেদী: টীকা-১৫৪]

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমের মকদ্দমা বিধি : এখানে স্মর্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদালতে মকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদিরা ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ জিম্মিও ছিল না। তবে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে 'যুদ্ধ নয়' মর্মে চুক্তি সম্পাদন করেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে শরিয়ত অনুযায়ী তাদের মকদ্দমার ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা জিম্মি হলে এবং ইসলামি আদালতে মকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরজ হতো; নির্লিপ্ত থাকা জায়েজ হতো না। কেননা তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে মুসলমান ও জিম্মির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে– وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ তারা আপনার কাছে মকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি শরিয়ত অনুযায়ী তার

ফয়সালা করে দিন। এ আয়াতে ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা জিম্মি নয়. বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোনো চুক্তি করেছে। যেমন বনী কুরাইযা ও বনী নযীর। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা জিম্মি এবং ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক। এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মকদ্দমার নিজ শরিয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মকদ্দমা সম্পর্কেই দেওয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে নুযূলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত বিনিময়ের মকদ্দমা এবং অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মকদ্দমা। এ জাতীয় সাধারণ আইনে শ্রেণি অথবা ধর্মের কারণে কোনোরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণত চুরির শাস্তি হস্তকর্তন শুধু মুসলমানদের বেলাই প্রযোজ্য নয়; বরং দেশের যে কোনো বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামি আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরি নয়।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদ্যপান ও শূকরের মাংস মুসলমানদের জন্য হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদের এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিয়ে-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিয়ে শুদ্ধ ছিল, তিনি তা বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নিপূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরায় ইহুদি ও খ্রিস্টানরা ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মি ছিল। মহানবী ﷺ জানতেন যে, অগ্নি উপাসকদের ধর্মে মা ও ভাগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনো তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেননি; বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মোটকথা, ইসলামি রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এসব ব্যাপারে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে। তবে যদি তারা উভয় পক্ষ মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামি আইন অনুযায়ীই ফয়সালা করবেন। কেননা তখন তিনিই উভয় পক্ষের নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন।

قَوْلُهُ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ : আয়াতে নবী কারীম ﷺ -কে ইসলামি আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের; যাতে কোনো সম্প্রদায়ই আওতা বহির্ভূত নয় অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্য আসে। এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরিয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। **يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ** বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে। এতে রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল তারা সবাই ছিল মুনাফিক। ইহুদিদের সাথে এদের গোপন যোগসাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত। -[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১২৯,১৩০]

قَوْلُهُ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ : অর্থাৎ আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- তারা আপনাকে বিচারক বানায়; অথচ যেই তাওরাতকে আসমানি কিতাব বলে তারা বিশ্বাস করে তার ফয়সালায় তারা রাজি হয় না। বাস্তবিকপক্ষে তাদের ঈমান নেই কোনোটির উপরই, না পাক কুরআনের উপর, না তাওরাতের উপর। সামনের রুকুতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রশংসাপূর্বক সতর্ক করা হয়েছে যে, তা এতো উত্তম ও হেদায়তপূর্ণ কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এ অপদার্থরা তার মূল্যায়ন করেনি। উপরন্তু তারা তাকে এমনভাবেই নষ্ট করে ফেলে যে, আজ আসল কিতাবের কোনো হাদীসই পাওয়া যায় না। অবশেষে, আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহে সর্বশেষে সেই কিতাব নাজিল করলেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মূল বক্তব্যের সংরক্ষক ও সমর্থক। এর স্থায়ী হেফাজতের দায়িত্ব প্রেরণকারী নিজ জিম্মায় রেখে দিয়েছেন। সকল প্রশংসা তাঁরই। -[তাফসীরে উসমানী : পৃ. ১৩৯]

٤٤. اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَنُوْرٌ بَيَانٌ لِلْاَحْكَامِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ مِنْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا انْقَادُوْا لِلّٰهِ لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ وَالْاَحْبَارُ الْفُقَهَاءُ بِمَا اَىْ بِسَبَبِ الَّذِى اسْتُحْفِظُوْا اسْتَوْدَعُوْهُ اَىْ اسْتَحْفَظَهُمُ اللّٰهُ اِيَّاهُ مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ اَنْ يُّبَدِّلُوْهُ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج اَنَّهُ حَقٌّ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ اَيُّهَا الْيَهُوْدُ فِىْ اِظْهَارِ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالرَّجْمِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْشَوْنِ فِىْ كِتْمَانِهِ وَلَا تَشْتَرُوْا تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط مِنَ الدُّنْيَا تَاْخُذُوْنَهُ عَلٰى كِتْمَانِهَا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ بِهِ -

অনুবাদ :

৪৪. আমিই তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। তাতে ছিল গুমরাহী হতে সৎপথের পথনির্দেশ ও আলো অর্থাৎ বিধানসমূহের বিবরণ এর মাধ্যমে ইসরাঈল গোত্রের নবীগণ যারা ছিলেন অনুগত আল্লাহর বাধ্যগত ইহুদিদেরকে বিধান দিত। এবং রাব্বানীগণ অর্থাৎ তাদের বিদ্বানগণ ও আহ্বায়কগণও অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল بِمَا -এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। তাদের মধ্যে ওটা সংরক্ষণ করা হয়েছিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর হেফাজতকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং এ সত্য এতদসম্পর্কে তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং হে ইহুদিগণ! রাসূল ﷺ -এর প্রশংসা সম্বলিত বিবরণ, রাজম সম্পর্কিত আয়াত ইত্যাদি যা কিছু তোমাদের নিকট রয়েছে তার প্রকাশ করতে মানুষকে ভয় করো না, তা গোপন করার ব্যাপারে; বরং আমাকে ভয় কর! দুনিয়ার নগণ্য মূল্য যা গোপন করত তোমরা উপার্জন কর তার বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রয় করো না, পরিবর্তন করো না। **আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।**

٤٥. وَكَتَبْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَىِ التَّوْرٰىةِ اَنَّ النَّفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ لا اِذَا قَتَلَتْهَا وَالْعَيْنَ تُفْقَأُ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ يُجْدَعُ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ تُقْطَعُ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ تُقْلَعُ بِالسِّنِّ لا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فِى الْاَرْبَعَةِ وَالْجُرُوْحَ بِالْوَجْهَيْنِ قِصَاصٌ ط اَىْ يُقْتَصُّ فِيْهَا -

৪৫. তাদের জন্য তাতে অর্থাৎ তাওরাতে বিধান ফরজ করে দিয়েছিলাম যে প্রাণের অর্থাৎ কোনো প্রাণ যদি অন্য কোনো প্রাণকে হত্যা করে তবে এর বদলে ঐ প্রাণ হত্যা করা হবে, চোখ গলিয়ে দেওয়া হবে চোখের বদলে, নাকের বদলে নাক কেটে দেওয়া হবে, কানের বদলে কান বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে, দাঁতের বদলে দাঁত উপড়ে ফেলা হবে। اَلْاُذُنَ، اَلْاَنْفَ، اَلْعَيْنَ، اَلسِّنَّ : এ চারটি অপর এক কেরাতে رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত রয়েছে। এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। اَلْجُرُوْحَ এটা رَفْع [পেশ] ও نَصْب [যবর] **উভয়রূপে** পঠিত রয়েছে।

إِذَا أَمْكَنَ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالذَّكَرِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَمَا لَا يُمْكِنُ فِيْهِ الْحُكُوْمَةُ وَهٰذَا الْحُكْمُ وَإِنْ كُتِبَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ مُقَرَّرٌ فِيْ شَرْعِنَا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ أَيْ بِالْقِصَاصِ بِأَنْ مَكَّنَ مِنْ نَفْسِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط لِمَا أَتَاهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِي الْقِصَاصِ وَغَيْرِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে জখমের অনুরূপ জখম করা সম্ভব যেমন হাত-পা, পুরুষাঙ্গ ইত্যাদিতে তা করা হবে। আর যেসব স্থানে তা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে সুবিচারের ভিত্তিতে মীমাংসা দেওয়া **হবে। উল্লিখিত** বিধান তাদের জন্য ছিল বটে তবে আমাদের **শরিয়তেও তা** বিদ্যমান রাখা হয়েছে। অনন্তর **কেউ এতে অর্থাৎ** কিসাসের জন্য নিজেকে 'সাদকা' **করলে অর্থাৎ** নিজেকে সমর্পণ করলে তাতে সে যে পাপ **করেছে তার** কাফফারা হবে। কিসাস ইত্যাদি সম্পর্কে **আল্লাহ যা অবতীর্ণ** করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না **তারাই সীমালঙ্ঘনকারী**।

٤٦. وَقَفَّيْنَا اِتَّبَعْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ أَيِ النَّبِيِّيْنَ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهٗ مِنَ التَّوْرٰىةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ وَنُوْرٌ لا بَيَانٌ لِلْاَحْكَامِ وَمُصَدِّقًا حَالٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْاَحْكَامِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ط

৪৬. তাদের অর্থাৎ নবীদের পিছনে প্রেরণ করেছিলাম, অনুবর্তী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ঈসাকে তার সম্মুখে **অর্থাৎ তার পূর্বে** অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং তাকে **ইঞ্জীল** দিয়েছিলাম; তাতে ছিল গুমরাহী হতে সুপথের নির্দেশ এবং আলো অর্থাৎ বিধিবিধানসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণ। এবং তার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের অর্থাৎ এর বিধিবিধানসমূহের সমর্থকরূপে এবং সাবধানীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশরূপে। **مُصَدِّقًا শব্দটি حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।**

٤٧. وَقُلْنَا وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ يَحْكُمَ وَكَسْرِ لَامِهٖ عَطْفًا عَلٰى مَعْمُوْلِ اٰتَيْنَاهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

৪৭. **আর বলেছিলাম, ইঞ্জীল অনুসারীগণ** যেন আল্লাহ তাতে **যা অর্থাৎ যেসব বিধিবিধান** অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে **বিধান দেয়।** لِيَحْكُمَ এটা অপর এক কেরাতে اٰتَيْنَاهُ ক্রিয়ার مَعْمُوْلٌ -এর সাথে عَطْفٌ বা অব্যয় হিসেবে نَصْبٌ [যবর] এবং لَامٌ -এ কাসরা সহকারে পঠিত রয়েছে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারা সত্যত্যাগী।

٤٨. وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ يَامُحَمَّدُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا شَاهِدًا عَلَيْهِ وَالْكِتٰبُ بِمَعْنَى الْكُتُبِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِذَا تَرَافَعُوْا اِلَيْكَ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَادِلًا عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ اَيُّهَا الْاُمَمُ شِرْعَةً شَرِيْعَةً وَّمِنْهَاجًا ط طَرِيْقًا وَاضِحًا فِى الدِّيْنِ تَمْشُوْنَ عَلَيْهِ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً عَلٰى شَرِيْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَّلٰكِنْ فَرَّقَكُمْ فِرَقًا لِّيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُخْتَلِفَةِ لِيَنْظُرَ الْمُطِيْعَ مِنْكُمْ وَالْعَاصِىَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط سَارِعُوْآ اِلَيْهَا اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا بِالْبَعْثِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَيَجْزِىْ كُلًّا مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ.

৪৮. হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব আল কুরআন সত্যসহ بِالْحَقِّ শব্দটি اَنْزَلْنَا ক্রিয়াপদের সাথে مُتَعَلِّقٌ। এর সামনে অর্থাৎ এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের অর্থাৎ কিতাবসমূহের সমর্থক ও তার সংরক্ষকরূপে সাক্ষীরূপে। সুতরাং কিতাবীরা যদি তোমার নিকট বিচার উত্থাপন করে তবে আল্লাহ তোমার নিকট যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি করো এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা হতে ফিরে গিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। হে উম্মতবর্গ! তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরিয়ত বিধান ও পথ ধর্মের বিষয়ে সুস্পষ্ট পথ যার উপরে তোমরা চলবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন অর্থাৎ একই শরিয়তের অনুসারী করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের যা অর্থাৎ যে বিভিন্ন শরিয়ত ও ধর্মমত দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মধ্যে কে আনুগত্যশীল এবং কে অবাধ্য? তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে তিনি তোমাদেরকে পৃথক পৃথক করে রেখেছেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর দ্রুত ধাবমান হও, পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা ধর্মের বিষয়ে মতভেদ করছিলে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন।

٤٩. وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ لِ اَنْ لَا يَّفْتِنُوْكَ يُضِلُّوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ط

৪৯. কিতাব অবতীর্ণ যেন তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না কর এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে, পথভ্রষ্ট না করে।

অনুবাদ :

٤٤. اِنَّـآ اَنْزَلْنَـا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَنُوْرٌ بَيَانٌ لِلْاَحْكَامِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ مِنْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا انْقَادُوْا لِلّٰهِ لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ وَالْاَحْبَارُ الْفُقَهَاءُ بِمَا اَىْ بِسَبَبِ الَّذِىْ اسْتُحْفِظُوْا اِسْتَوْدَعُوْهُ اَىْ اِسْتَحْفَظَهُمُ اللّٰهُ اِيَّاهُ مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ اَنْ يُّبَدِّلُوْهُ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج اَنَّهُ حَقٌّ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ اَيُّهَا الْيَهُوْدُ فِىْ اِظْهَارِ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالرَّجْمِ وَغَيْرِهِمَا وَاخْشَوْنِ فِىْ كِتْمَانِهِ وَلَا تَشْتَرُوْا تَسْتَبْدِلُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط مِنَ الدُّنْيَا تَاْخُذُوْنَهُ عَلٰى كِتْمَانِهَا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ بِهٖ .

৪৪. আমিই তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম। তাতে ছিল গুমরাহী হতে সৎপথের পথনির্দেশ ও আলো অর্থাৎ বিধানসমূহের বিবরণ এর মাধ্যমে ইসরাঈল গোত্রের নবীগণ যারা ছিলেন অনুগত আল্লাহর বাধ্যগত ইহুদিদেরকে বিধান দিত। এবং রাব্বানীগণ অর্থাৎ তাদের বিদ্বানগণ ও আহ্বায়কগণও অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল অর্থাৎ ফকীহগণও বিধান দিত। এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কোনোরূপ পরিবর্তন করা হতে রক্ষক করা হয়েছিল بِمَا -এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। তাদের মধ্যে ওটা সংরক্ষণ করা হয়েছিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর হেফাজতকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং এ সত্য এতদসম্পর্কে তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং হে ইহুদিগণ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রশংসা সম্বলিত বিবরণ, রাজ্‌ম সম্পর্কিত আয়াত ইত্যাদি যা কিছু তোমাদের নিকট রয়েছে তার প্রকাশ করতে মানুষকে ভয় করো না, তা গোপন করার ব্যাপারে; বরং আমাকে ভয় কর! দুনিয়ার নগণ্য মূল্য যা গোপন করত তোমরা উপার্জন কর তার বিনিময়ে আমার আয়াতসমূহ বিক্রয় করো না, পরিবর্তন করো না। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

٤٥. وَكَتَبْنَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَىْ التَّوْرٰىةِ اَنَّ النَّفْسَ تُقْتَلُ بِالنَّفْسِ لا اِذَا قَتَلَتْهَا وَالْعَيْنَ تُفْقَأُ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ يُجْدَعُ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ تُقْطَعُ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ تُقْلَعُ بِالسِّنِّ لا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ فِى الْاَرْبَعَةِ وَالْجُرُوْحَ بِالْوَجْهَيْنِ قِصَاصٌ ط اَىْ يُقْتَصُّ فِيْهَا .

৪৫. তাদের জন্য তাতে অর্থাৎ তাওরাতে বিধান ফরজ করে দিয়েছিলাম যে প্রাণের অর্থাৎ কোনো প্রাণ যদি অন্য কোনো প্রাণকে হত্যা করে তবে এর বদলে ঐ প্রাণ হত্যা করা হবে, চোখ গলিয়ে দেওয়া হবে চোখের বদলে, নাকের বদলে নাক কেটে দেওয়া হবে, কানের বদলে কান বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে, দাঁতের বদলে দাঁত উপড়ে ফেলা হবে। اَلْاُذُنَ، اَلْاَنْفَ، اَلْعَيْنَ، اَلسِّنَّ : এ চারটি অপর এক কেরাতে رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত রয়েছে। এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। اَلْجُرُوْحَ এটা رَفْع [পেশ] ও نَصَبْ [যবর] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ بِالْقِصَاصِ بِاَنْ مَكَّنَ مِنْ نَفْسِهِ : এ তাফসীর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব মতে। অন্যথায় ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে تَصَدَّقَ -এর অর্থ হলো– ক্ষমা করা। অর্থাৎ নিহতের ওয়ারিশগণ হত্যাকারীর কিসাস ক্ষমা করে দেওয়া তাদের পক্ষে সদকা।

قَوْلُهُ قُلْنَا : এখানে قُلْنَا উহ্য ধরার কারণ হলো قَفَّيْنَا -এর সাথে عَطْف সহীহ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بِنَصَبِ لِيَحْكُمَ : لَامْ كَىْ -এর পর اَنْ مُقَدَّرَهْ -এর কারণে يَحْكُمُ মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفًا عَلَى مَعْمُوْلِ اٰتَيْنَا : আর সে উহ্য مَعْمُوْل হলো اٰتَيْنَاهُ هُدًى وَمَوْعِظَةً -এর مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে মানসূব। তাকদীরী ইবারত হবে– وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ لِلْهُدٰى وَالْمَوْعِظَةِ وَحُكْمُهُمْ بِهِ

قَوْلُهُ اَنْ : এটা হেতুবোধক এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে لِ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَفْتِنُوْكَ : এর পূর্বে একটি 'না'। সূচক শব্দ لَا উহ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়িদার সপ্তম রুকু। এতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এ বিষয়টিকে সূরা মায়িদার প্রথম থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে। বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর প্রেরিত বিধিবিধানের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, যা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের চিরাচরিত বদভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ রুকুতে আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের অধিকারী ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে তাদের এ অবাধ্যতা ও তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে প্রথম দুই আয়াতে সতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'কিসাস' সম্পর্কে কতিপয় বিধান উল্লেখ করেছেন। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল, তা কিসাস সম্পর্কেই ছিল অর্থাৎ বনী নুযাইর রক্ত বিনিময় ও কিসাসের ব্যাপারে সমতায় বিশ্বাসী ছিল না; বরং বনী কুরাইযাকে নিজেদের চাইতে কম রক্ত বিনিময় গ্রহণ করতে বাধ্য করত। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের আইন প্রয়োগ করার জন্য ইহুদিদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে, তাদেরকে কাফের ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে ইঞ্জীলধারী খ্রিস্টানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে অন্য আইন প্রয়োগ করার কারণে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে তাদেরকে উদ্ধত ও অবাধ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে মুসলমানদের এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আহলে কিতাবদের এ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে এবং নাম-যশ ও অর্থের লোভে যেন আল্লাহর নির্দেশাবলি পরিবর্তন না করে অথবা আল্লাহপ্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে স্বরচিত আইন যেন প্রয়োগ না করে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তা এই যে, মৌলিক বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাপারে যদিও সব পয়গাম্বর একই পথের অনুসারী, কিন্তু আল্লাহর রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক পয়গাম্বরকে তাঁর জমানার উপযোগী শরিয়ত দান করা হয়েছে, যাতে অনেক শাখাগত বিধিবিধান ভিন্নতর রাখা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পয়গাম্বরকে প্রদত্ত শরিয়ত তাঁর আমলে উপযোগী ও অবশ্য পালনীয় ছিল এবং যখন তা রহিত করে অন্য শরিয়ত আনা হলো, তখন তাই উপযোগী ও অবশ্যপালনীয় হয়ে গেছে। এতে শরিয়তসমূহের বিভিন্নতা ও পরিবর্তিত হতে থাকার একটি বিশেষ রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৩৭]

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ : অর্থাৎ আমি তাওরাত গ্রন্থ অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তাওরাতের শরিয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তাওরাতের কোনোরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না; বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধিবিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তাওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

قَوْلُهُ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ .... وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ : অর্থাৎ তাওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যতদিন তার শরিয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গাম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহওয়ালা ও আলেমরা সবাই এ তাওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন।

এ বাক্যে পয়গাম্বরদের প্রতিনিধিদের দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ رَبَّانِيُّوْنَ এবং দ্বিতীয় ভাগ أَحْبَارُ ; رَبَّانِي শব্দটি رَبٌّ -এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহওয়ালা [আল্লাহভক্ত।]। أَحْبَارُ শব্দটি حِبْرٌ -এর বহুবচন। ইহুদিদের বাকপদ্ধতিতে তালিমকে حِبْرٌ বলা হতো। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহর জরুরি বিধিবিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলেমও হবেন। নতুবা ইলম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোনো ব্যক্তি আল্লাহভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে ইলম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরি ফরজ ও ওয়াজিবের উপর আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহভক্ত ও আলেমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরি হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ী তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশির ভাগ ইবাদত, আমল ও জিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু ইলম হাসিল করে ক্ষান্ত হয়, তাকে 'রাব্বানী' অর্থাৎ আল্লাহভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পরদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরিয়তের নির্দেশাবলি বর্ণনা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশির ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদতে বেশি সময় ব্যয় করে না, তাকে حِبْرٌ বা আলেম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরিয়ত ও তরিকত এবং আলেম ও মাশায়েখের মৌলিক অভিন্নতাও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলেম ও সুফী দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যত পৃথক পৃথক বলে মনে হয়।

قَوْلُهُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ : অর্থাৎ এসব পয়গাম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণির প্রতিনিধিবর্গ আলেম ও মাশায়েখ তাওরাতের নির্দেশাবলি প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের হেফাজত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হলো যে, তাওরাত একটি ঐশীগ্রন্থ, পথপদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ওলামা, যাঁরা এর হেফাজত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদিদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে, তোমরা পূববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাওরাতের হেফাজত করার পরিবর্তে এর বিধিবিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তাওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী ﷺ -এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদদিদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– পার্থিব নাম-যশ ও অর্থলিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রতবোধ করছ। কারণ এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদি জনগণ তোমাদের পেছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড় লোকদের কাছ থেকে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে তাওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেওয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বর্তনাম যুগের ইহুদিদেরকে বলা হয়েছে– فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা এমর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে জরুরি মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না; বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি হলো জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাব।

قَوْلُهُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ .... وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ : এরপর এখানে তাওরাতের বরাত দিয়ে কিসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি ইহুদিদের জন্য তাওরাতে এ বিধান অবতরণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে। বনী কুরাইযা ও বনী নযীরের একটি মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনী নযীর গায়ের জোরে বনী কুরাইযাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী নযীরের কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী নযীরের কোনো ব্যক্তি বনী কুরাইযার কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে কিসাস নয়, শুধু রক্ত বিনিময় দেওয়া হবে। তাও বনী নযীরের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ জাহিলিয়্যাতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তাওরাতেও কিসাসও রক্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্য নিজেদের মকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এজলাসে উপস্থিত করে।

قَوْلُهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ : অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম। তারা আল্লাহর বিধানে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতের প্রথমে হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরবর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তাওরাতের মতোই হেদায়েত ও জ্যোতি।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কুরআন হলো তাওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক : পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতরণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত ইঞ্জীলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে। কারণ যখন তাওরাতের অধিকারীরা তাওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কুরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কুরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবিদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী ﷺ -কে তাওরাতধারী ও ইঞ্জিলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহপ্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদিদের কতিপয় আলেম মহানবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানেন আমরা ইহুদিদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তাহলো এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মকদ্দমা রয়েছে, আমরা মকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা হুজুরে পাক ﷺ -কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোনো ফয়সালা দেবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না? এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

পয়গাম্বরগণের বিভিন্ন শরিয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সকল নবী যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা ও শরিয়তসমূহও যখন আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরিয়তের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَاۤ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণির জন্য একটি বিশেষ শরিয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ রয়েছে। যদি আল্লাহ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরিয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন

ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন নতুন গ্রন্থ ও শরিয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরিয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে, এর বিপক্ষে আল্লাহর নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না। শরিয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট তাৎপর্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য-অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, জিকির ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো উদ্দেশ্যেও নয়; বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে– আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য। এ কারণেই সে সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, যে সময়ে নামাজ পড়লে ছওয়াব তো দূরের কথা, উল্টা পাপের বোঝাই ভারি হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ। এ সময়ে রোজা রাখা নিশ্চিত গুনাহ। ৯ জিলহজ ছাড়া অন্য কোনোদিন কোনো মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্র হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাবে কোনো ছওয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ জিলহজ তারিখে এটি সর্ববৃহৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন ও যেখানে নিষেধ করা হয় তখন সেখানে তাই হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়; বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্রপথেই বিদআত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরিয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তা-ই। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন পয়গাম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরিয়ত অবতরণ করে মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো একটি কাজ অথবা এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়; বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহর অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরিয়তসমূহের পার্থক্যের আর একটি বড় তাৎপর্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক স্তরের মানুষের মন-মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। আর কালের পরিবর্তন মানব স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেওয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই আল্লাহর রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধিবিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' [রদকারী আদেশ] ও 'মনসুখ' [রদকৃত আদেশ] -এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এলো, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশত কোনো নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুঁশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন; বরং শরিয়তসমূহে নাসিখ ও মনসুখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মতো। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করেন। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিনদিন এ ঔষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখে দেবে, তখন অমুক ঔষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে; বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রটিই নির্ভুল ও জরুরি ছিল এবং পরবর্তী অবস্থায় পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরি।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারসংক্ষেপ :

১. প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদিদের দায়েরকৃত মকদ্দমায় মহানবী ﷺ ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তাওরাতের শরিয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তসমূহের বিধিবিধানকে যদি কুরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন, ইহুদিদের মকদ্দমায় কিসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তাওরাতেও ছিল এবং অতঃপর কুরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

২. দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কিসাস সম্পর্কিত বিধান তাওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ জারি করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরিয়তসমূহের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, সেগুলো

আমাদের শরিয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওরাতের অনুসারীদের তাওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদের ইঞ্জীল অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ এ গ্রন্থদ্বয়ও তার শরিয়ত মহানবী ﷺ -এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব বিধান কুরআন রহিত করেনি, আজও সেগুলোর অনুসরণ করা জরুরি।

৩. আল্লাহর প্রেরিত বিধিবিধান সত্য নয়, এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যত বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

৪. ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম; বিশেষত আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

৫. আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গাম্বর ও তাঁদের শরিয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন; কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধিবিধান এবং এ পার্থক্য বিরাট তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল।

–[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৪১-১৪৭]

قَوْلُهُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ : অর্থাৎ তাদেরকে তাওরাত সংরক্ষণের জিম্মাদার বানানো হয়েছিল। কুরআন মাজীদের মতো إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ আমিই তাঁর সংরক্ষণকারী এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। কাজেই ওলামায়ে কেরাম ও পণ্ডিতগণ যতদিন নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ততদিন তাওরাত সংরক্ষিত ও অনুসৃত ছিল। শেষ পর্যন্ত দুনিয়াদার ধর্মযাজকদের হাতে তা বিকৃত হয়ে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪২]

قَوْلُهُ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا : অর্থাৎ মানুষের ভয় ও পার্থিব লালসায় আসমানি কিতাবে রদবদল করো না ও তার বিধান ও সংবাদসমূহ গোপন রেখো না। **মহান আল্লাহর শাস্তি ও** প্রতিশোধকে ভয় কর। **তাওরাতের মাহাত্ম্য ও জনপ্রিয়তা তুলে ধরার পর এ বক্তব্য হয়তো সেই সব ইহুদি ধর্মযাজক ও** নেতৃবর্গকে **লক্ষ্য করে রাখা হয়েছে, যারা কুরআন নাজিলের সময় বর্তমান ছিল।** কেননা তারা রাজমের বিধান প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা নবী কারীম ﷺ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গোপন করতো ও তার অর্থের নানা রকম অপব্যাখ্যা করাত। মাঝখানে মুসলিম উম্মাহকে নসিহত করা হয়েছে, তোমরা অপরাপর জাতির মতো কারো ভয়ে বা অর্থ ও মর্যাদার লোভে পড়ে নিজেদের আসমানি কিতাবকে নষ্ট করো না। কাজেই মহান আল্লাহর প্রশংসা এ উম্মত তাদের কিতাবের একটি হরফও লাপাত্তা করেনি। তারা আজ অবধি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর বিকৃতি সাধন ও রদবদলের প্রচেষ্টা হতে তাকে রক্ষা করে এসেছে এবং সর্বদাই করে যাবে। [ইনশাআল্লাহ] –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৩]

قَوْلُهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ : مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ [আল্লাহ যা নাজিল করেছেন] মুতাবিক বিধান না দেওয়ার অর্থ খুব সম্ভব কিভাবে ঘোষিত নির্দেশের অস্তিত্বই অস্বীকার করে দেওয়া এবং তদস্থলে নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য বিধান প্রণয়ন করে নেওয়া। যেমন ইহুদিরা রজমের বিধান সম্পর্কে করেছিল। তো এরূপ লোকের কাফের হওয়ার মাঝে কি সন্দেহ থাকতে পারে? পক্ষান্তরে, এর অর্থ যদি হয় আল্লাহর দেওয়া বিধানের সত্যতা বিশ্বাস করার পর কার্যত তার পরিপন্থি ফয়সালা দান, তা হলে 'কাফের' অর্থ হবে কর্মগত কাফের। অর্থাৎ তার কর্মগত অবস্থা কাফেরদের মতো।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৪]

قَوْلُهُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الخ : কিসাসের এ বিধান ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে। উসূল শাস্ত্রের বহু আলেম স্পষ্ট বলেছেন, কুরআন মাজীদ বা নবী করীম ﷺ পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহের কোনো বিধান বর্ণনা করে থাকলে তা এ উম্মতের জন্যও অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত হবে। যদি না রাসুলুল্লাহ ﷺ কোথাও তার কোনোরূপ নিন্দা বা সংশোধন করে থাকেন। অর্থাৎ বিনা রদ ও প্রত্যাখ্যানে তা শোনানো মূলত গ্রহণ করে নেওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

–[তাফসীর উসমানী : টীকা ১৪৫]

قَوْلُهُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ : অর্থাৎ আঘাতের বদলা মার্জনা করে দেওয়ার দ্বারা আহত ব্যক্তির পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। বহু হাদীসে একথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। কতক মুফাসসির এ আয়াতকে আঘাতকারীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ আহত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীকে ক্ষমা করে দেয়, তবে তার পাপমোচন হয়ে যাবে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই বেশি গ্রহণযোগ্য। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৬]

قَوْلُهُ وَقَضَيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ .... بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ : অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) খোদ নিজের মুখেও তাওরাতের তাসদীক করতেন এবং তাঁকে দেওয়া কিতাব ইঞ্জীল ও তাওরাতের সমর্থন করতেন। হেদায়েত ও আলো হিসেবে ইঞ্জীলের ধরন-ধারণ তাওরাতেরই অনুরূপ। বিধানের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সামান্যই পার্থক্য ছিল। যেমন لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ -এর মাঝে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ পার্থক্য তাওরাতের তাসদীক করার পরিপন্থি নয়। যেমন আজ আমরা কুরআনকে বিশ্বাস ও কেবল তারই বিধানকে স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আলহামদু লিল্লাহ সমস্ত আসমানি কিতাব সম্পর্কেও বিশ্বাস পোষণ করি যে তা সব মহান আল্লাহরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৪৯]

এই সত্যতা বর্তমান যুগে পরিবর্তিত ইঞ্জীল গ্রন্থেও হযরত ঈসা (আ.)-এর জবানীতে অবশিষ্ট আছে- "তোমরা এরূপ মনে করবে না যে, আমি তাওরাত অথবা অন্যান্য নবীদের কাছে প্রেরিত কিতাব মানসুখ বা বাতিল করার জন্য আগমন করেছি, বরং আমি পরিপূর্ণ করার জন্য এসেছি।" -[মথি, ৫; ১৭]। اٰثَارِهِمْ -এ هُمْ সর্বনামটি বনু ইসরাঈল যুগের নবীদের প্রতি ইঙ্গিতসূচক। অর্থাৎ ঐ সমস্ত নবীগণ, যারা আপনার পূর্বে ঈমান এনেছিল, হে মুহাম্মাদ।

قَوْلُهُ وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ : আমরা পাঠিয়েছিলাম তাদের পশ্চাতে, অর্থাৎ তাঁদের পদচিহ্নের উপর পিছে পিছে পাঠিয়েছিলাম। এ বাক্যে এ কথার প্রতি ইশারা হলো যে, হযরত ঈসা (আ.) সেরূপ একজন নবী ছিলেন, যেরূপ তাঁর পূর্বে বনূ ইসরাঈলের মধ্যে নবী হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রাপ্ত ওহী অন্যান্য নবীদের ব্যক্তিত্ব ও ওহীর মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য ছিল না। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৭১]

قَوْلُهُ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ : ইঞ্জীল নাজিল হওয়ার সময় যেসব খ্রিষ্টান বর্তমান ছিল হয়তো তাদেরকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা এখানে বর্ণিত হয়েছে। অথবা কুরআন নাজিলের সময় যেসব খ্রিস্টান উপস্থিত ছিল, তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইঞ্জীলে যা কিছু নাজিল করেছেন, অবিকল সে অনুযায়ী যেন তারা বিধান দেয়। অর্থাৎ আখেরী জমানার নবী ও পবিত্র ফারকালীত সম্পর্কে ইঞ্জীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর ভাষায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা যে গোপন করার বা তার অবাস্তব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা না করে। সেই মহান দিশারী ও শ্রেষ্ঠ সংস্কারক সম্পর্কে মাসীহ (আ.) বলে গেছেন, সে আত্মা এসে তোমাদেরকে সত্যতার সব পথ জানিয়ে দেবেন, তারই অস্বীকৃতিতে বদ্ধপরিকর হয়ে নিজের স্থায়ী ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্যতা ছাড়া আর কি হতে পারে? পবিত্র মাসীহ (আ.) ও তার প্রতিপালকের আনুগত্য করার কি এটাই অর্থ? -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ১৫০]

قَوْلُهُ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ الخ : مُهَيْمِنٌ -এর একাধিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যথা- বিশ্বস্ত, বিজয়ী ফয়সালাদাতা, রক্ষক ও সাক্ষী। এর প্রতিটি অর্থ হিসেবে কুরআন কারীমে যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের 'মুহাইমিন' তা সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা যে আমানত তাওরাত, ইঞ্জীল প্রভৃতি গ্রন্থে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তা আরো অতিরিক্ত বিষয়ের সাথে কুরআন মাজীদে সংরক্ষিত আছে, যাতে কোনো প্রকার খেয়ানত ঘটেনি। কিছু কিছু শাখাগত বিষয় সেই কাল বা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল সেগুলোকে কুরআন রহিত করে দিয়েছে। তার যেসব বিষয়বস্তু অপূর্ণ ছিল কুরআন তার পূর্ণতা বিধান করেছে এবং যে অংশ সে সময়ের দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন ছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে।

শানে নুযূল : ইহুদিদের মধ্যে নিজেদের ক্ষণিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে ছিল তাদের বড় বড় পণ্ডিত ও নেতৃবর্গ। তারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে এসে বিবাদ-নিষ্পত্তির আবেদন জানাল। তারা এও বলল যে, আপনি জানেন ইহুদি জাতির অধিকাংশ আমাদের অধীন ও অনুগত। আপনি আমাদের পক্ষে ফয়সালা দিলে আমরা মুসলিম হয়ে যাব এবং তার ফলশ্রুতিতে গোটা ইহুদি জাতি ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। মহানবী ﷺ এই উৎকোচমূলক ইসলাম গ্রহণ কবুল করলেন না। তিনি তাদের খেয়াল-খুশি মেনে নিতে সাফ অস্বীকৃতি জানালেন। তারই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাজিল হয়। -[ইবনে কাসীর]

পূর্ববর্তী টীকায় আমরা এ আয়াতের যে শানে নুযূল লিখেছি, তা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রিয়নবী ﷺ তাদের খেয়াল খুশি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার আগে নয়, বরং পরেই এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। কাজেই বলতে হবে এ আয়াত তাঁর স্থিতিশীলতার সমর্থন ও ভবিষ্যতেও নিষ্পাপের মর্যাদায় স্থিরপদ থাকতে অনুপ্রাণিত করার জন্য নাজিল হয়েছে। যারা এ প্রকার আয়াতকে নবী কারীম ﷺ-এর নিষ্পাপগুণের বিরুদ্ধে মনে করে, তারা নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ উপলব্ধির অধিকারী। এক তো, কাউকে কোনো কাজে নিষেধ করলে সেটা এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়ত আম্বিয়ায়ে কেরাম যে নিষ্পাপ তার অর্থ মহান আল্লাহর অবাধ্যতা তাঁদের দ্বারা ঘটতেই পারে না। অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পর্কে একথা জানার পর যে, সে কাজ মহান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাঁরা কখনই তাতে লিপ্ত হতে পারে না। কখনো ভুলে বা ইজতিহাদ ও রায় নির্ধারণগত ত্রুটিবশত উত্তমের স্থলে অধম গ্রহণ করলে বা অপ্রিয়কে প্রিয় জেনে করে ফেললে, সেটা নিষ্পাপের পরিপন্থি নয়। পরিভাষায় এর নাম 'যাল্লাৎ' অর্থাৎ ফসকে যাওয়া। যেমন হযরত আদম (আ.) ও অপরাপর কতক নবীর ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ রহস্য উপলব্ধি করতে পারলে وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ [সূরা মায়িদা :৪৮] وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ [সূরা মায়িদা : ৪৯] প্রভৃতি আয়াতসমূহের মর্ম উপলব্ধি করতে কোনোরূপ জটিলতা থাকবে না।

কেননা এসব আয়াতে কেবল এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে যে, আপনি ঐসব অভিশপ্তদের বাক চাতুর্যে প্রভাবিত হবেন না এবং এমন কোনো রায় গ্রহণ করবেন না, যা দ্বারা অনিচ্ছাজনিতভাবে হলেও তাদের খেয়াল খুশির দৃশ্যতা অনুবর্তন হয়ে যায়। উদাহরণত আলোচ্য আয়াত যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে, ইহুদিরা কিরূপ প্রতারণামূলক একটা প্রস্তাব মহানবী ﷺ -এর সম্মুখে পেশ করেছিল যে, তাদের মত অনুযায়ী রায় প্রদান করলে সমস্ত ইহুদি মুসলিম হয়ে যাবে। তারা জানত, তাঁর কাছে ইহজগতে ইসলামের চেয়ে বেশি আর কোনো জিনিস নেই। এরূপ ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ স্থিরপদ ব্যক্তির পক্ষেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, তাদের তুচ্ছ একটা ইচ্ছা পূরণ করলে যখন এত বড় দীনি স্বার্থসিদ্ধ হয়,. তখন দোষ কী? এরূপ বিপজ্জনক ও পিচ্ছিল স্থানে রাসূলে কারীম ﷺ -এর অসাধারণ তাকওয়া ও অভাবিত বিচক্ষণতা তো আয়াত নাজিলের আগেই তাদের ছল-চাতুরী প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু ধরে নিন যদি এরূপ নাও হতো, তথাপি আয়াতের বক্তব্য বিষয়, যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, মহানবী ﷺ -এর নিষ্পাপ গুণের পরিপন্থি ছিল না। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা ১৫১-১৫৩]

قَوْلُهُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ : অর্থাৎ শরিয়তসমূহের পারস্পরিক পার্থক্য দেখে অযথা প্রশ্ন ও কুটিল তর্কে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করো না। মহান আল্লাহর সান্নিধ্য সন্ধানীদের উচিত কাজের মাঝে নিজ পারঙ্গমতা প্রদর্শন করা এবং আসমানি শরিয়ত যেসব আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা ও কর্মের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে তার জন্য তৎপর থাকা। [তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৫৬]

قَوْلُهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ : [এ দুনিয়াতে] بَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ তাদের কোনো পাপের কারণে। এখানে পাপ বা অন্যায়ের অর্থ হলো, ইহুদিদের কুরআনের ফয়সালা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ অমান্য করা। পবিত্র, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া গুনাহ।

প্রকাশ থাকে যে, কুফরি ও খারাপ আকীদার শাস্তি আখিরাতের জন্য রাখা হয়েছে, কিন্তু এ দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য শাস্তি তারা এ দুনিয়াতেই পাবে। বস্তুত ইহুদিদের কয়েদ করা, দেশ থেকে বহিষ্কার করা এবং কতল বা হত্যা করার শাস্তি সবই এ দুনিয়াতেই দেখেছে। مِنْ বা 'কোনো' শব্দটি ব্যবহারের কারণে মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে, যেমনটা নাকেরা বা অনির্দিষ্টসূচক শব্দ ব্যবহারে প্রকাশ পায়। এখানে এ সন্দেহ রয়েছে যে, মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং গুনাহে বেশি বেশি লিপ্ত হলে, বড়ত্ব মহত্ত্ব কিরূপে প্রকাশ পায়। فَاِنْ تَوَلَّوْا যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; এই মুখ ফিরানো হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হুকুম থেকে যা কুরআনের নির্দেশের বাস্তবরূপ। যেমন তাফসীরে বায়যাভীতে আছে– যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় নাজিলকৃত আল্লাহর হুকুম থেকে এবং তারা ইরাদা করে অন্য কিছুর। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৮৬]

قَوْلُهُ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ : জাহেলী যুগের রীতিনীতি কাম্য নয় : [অথচ তারা সে যুগ থেকে নিজেরা পরিত্রাণ চাইতো] এখানে ইহুদি ও নাসারাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যে ইসলামি কানুন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, এরূপ করা তো ইচ্ছাকৃতভাবে জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তনের শামিল। যে কানুনের ভিত আদল ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা তো হলো খোদায়ী কানুন ইসলাম। পক্ষান্তরে জাহেলী যুগের কাওমের বিধান বাস্তবায়ন তো এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল [আর আরব জাহেলী ও যুগেও তারা এর বাইরে ছিল না।] যে, অত্যাচারীর সাথী হবে; শক্তিমানকে আরো শক্তিশালী করবে এবং মজলুম ব্যক্তিদের কোনো খোঁজ খবর নেবে না। এমন কি ইহুদিরা আহলে কিতাব এবং শরিয়তের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও, প্রচলিত রীতি-নীতির প্রভাবে তারা এতই প্রভাবান্বিত হয়েছিল যে, তাদের দু'টি দল বনু নযীর ও বনু কুরাইযা, যারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো; এর মধ্যে বনু নযীর অধিক প্রভাশালী হওয়ার কারণে তারা এ নিয়ম করে নিয়েছিল যে, হত্যা বা অন্য কোনো অপরাধের কারণে দিয়্যতস্বরূপ যে অর্থ তারা নিজেরা আদায় করতো, তার দ্বিগুণ অর্থ [একই ধরনের অপরাধের জন্য] তারা বনূ কুরাইযা থেকে উসূল করতো!

اَلْجَاهِلِيَّةُ শব্দের উপর টীকা সূরা আলে ইমরান ১৫৪ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। জাহেলী যুগের কানুন হিসেবে ঐসব কানুন বিবেচিত হবে, যা খোদায়ী ও আসমানি কানুনের বিপরীত মানুষের তৈরি মতবাদ মাত্র। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বিস্তারিতভাবে তাদের সমালোচনা করেছেন, যারা খোদায়ী কানুনের মোকাবিলায় তাকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বেদখল করেও অন্যান্য কাওমের রীতি-নীতি চালাতো। অথবা তারা মানুষ কর্তৃক আবিষ্কৃত বিষয়কে গ্রাহ্য করতো। আর এ ধরনের লোকদের স্পষ্ট কাফের বলা হয়েছে, যাদের সাথে জিহাদ করা ওয়াজিব। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি যদিও দীর্ঘ তবুও নিম্নোক্ত বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য "আল্লাহ তাদের ঘৃণা করেন, যারা আল্লাহর সুদৃঢ় হুকুম থেকে বেরিয়ে যায়, যা সব ধরনের কল্যাণের আধার, সব ধরনের খারাপ কাজ থেকে নিষেধকারী, মানুষের অভিমত ও অভিলাষের বিরুদ্ধে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, ঐসব পরিভাষার বিরোধী, যা মানুষেরা মনগড়া বানিয়ে নেয়, আল্লাহর শরিয়তের সুদৃঢ় কোনো দলিল ব্যতিরেকে; যেমন জাহেলী যুগের লোকেরা এর দ্বারা গোমরাহী, পথভ্রষ্টতার বিচার করতো, যা তারা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছামতো বানিয়ে নিয়েছিল। যেমন তাতারী শাসকবর্গ তাদের দেশ শাসনের জন্য নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছিল, যা তারা নিজের দেশে তৈরি করেছিল। তাদের জন্য যে গ্রন্থ তৈরি করে নিয়েছিল, তা পরিপূর্ণ ছিল এমন হুকুম-আহকাম দিয়ে, যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শরিয়তের বিধি-বিধান থেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। যথা– ইহুদি, নাসারা, মিল্লাতে ইসলামিয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে এমন অনেক হুকুম আছে, যা তারা কেবল প্রবৃত্তি পরায়ণতার জন্য গ্রহণ করেছিল। ফলে তা তাদের নবীর শরিয়ত হিসেবে পেশ করতো এবং কিতাবুল্লাহ সুন্নতে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর হুকুমের বিপরীতে দাঁড় করাতো। যে এরূপ করবে, সে কতলের উপযোগী হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং এছাড়া অন্য কোনো কিছুর দ্বারা ফায়সালা করা যাবে না, চাই তা কম সম্পর্কে হোক, বা বেশি সম্পর্কে। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-১৮৮]

قَوْلُهُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ : আল্লাহর শরিয়তের বিধানের বাইরে ন্যায়নিষ্ঠ, হিকমতপূর্ণ, সঠিক ও উপযোগী কানুন আর কি হতে পারে? এ সোজা কথাটি কেবল তারাই বুঝতে পারে, যাদের জ্ঞান শিরক ও নাস্তিকের রং থেকে মুক্ত, পরিষ্কার এবং ঈমান ইয়াকীনের আলোকে সমুজ্জ্বল। –[তাফসীরে মাজেদী : টীকা– ১৮৯]

অনুবাদ :

٥١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ م تُوَالُوْنَهُمْ وَتُوَادُّوْنَهُمْ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ لِاتِّحَادِهِمْ فِى الْكُفْرِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ط مِنْ جُمْلَتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بِمُوَالَاتِهِمُ الْكُفَّارَ ـ

৫১. হে বিশ্বাসীগণ! ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা পোষণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু। কারণ কুফরি মতাদর্শে তারা এক। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের একজন হবে। অর্থাৎ তাদের গোষ্ঠীভুক্ত বলে বিবেচ্য হবে। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না।

٥٢. فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ضُعْفُ اِعْتِقَادٍ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ الْمُنَافِقِ يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ فِىْ مُوَالَاتِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مُعْتَذِرِيْنَ عَنْهَا نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ يَدُوْرُ بِهَا الدَّهْرُ عَلَيْنَا مِنْ جَدْبٍ اَوْ غَلَبَةٍ وَلَا يَتِمُّ اَمْرُ مُحَمَّدٍ فَلَا يَمِيْرُوْنَا قَالَ تَعَالٰى فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ بِالنَّصْرِ لِنَبِيِّهِ بِاِظْهَارِ دِيْنِهِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ بِهَتْكِ سِتْرِ الْمُنَافِقِيْنَ وَافْتِضَاحِهِمْ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ مِنَ الشَّكِّ وَمُوَالَاةِ الْكُفَّارِ نٰدِمِيْنَ ـ

৫২. যাদের অন্ত:করণে ব্যাধি রয়েছে অর্থাৎ যাদের বিশ্বাস দুর্বল যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক তুমি তাদেরকে এদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে দ্রুত ধাবমান দেখতে পাবে। এ বিষয়ে অজুহাত দেখিয়ে তারা বলে, আমরা ভাগ্য বিপর্যয় ঘটনার আশংকা করি অর্থাৎ সময়ের আবর্তনে দুর্ভিক্ষ বা শত্রুর বিজয় লাভ ইত্যাদির কারণে আমাদের উপর বিপদ নেমে আসবে, পক্ষান্তরে মুহাম্মাদের বিষয়টিও পূর্ণতা লাভ করবে না; এমতাবস্থায় এদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখলে আমাদেরকে কে খেতে-পরতে দেবে! আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধর্মের প্রকাশ ঘটিয়ে নবীকে সাহায্য করত বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে মুনাফিকদের আবরণ উন্মোচন ও এদেরকে লাঞ্ছিত করত এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা অর্থাৎ যে সন্দেহ ও কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব গোপন রেখেছে তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে।

٥٣. وَيَقُوْلُ بِالرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا بِوَاوٍ وَدُوْنِهَا وَبِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى يَاْتِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِبَعْضِهِمْ اِذَا هُتِكَ سِتْرُهُمْ تَعَجُّبًا ـ

৫৩. এবং বলবে يَقُوْلُ -এর পূর্বে وَاوْ সহ এবং وَاوْ ব্যতিরেকে পাঠ রয়েছে এটা اِسْتِيْنَافْ। অর্থাৎ নতুন বাক্যরূপে رَفْعٌ [পেশ] সহকারে পঠিত হতে পারে। আর يَاْتِىَ ক্রিয়ার সাথে عَطْفٌ বা অব্যয়রূপে نَصْبٌ [যবর] সহও পঠিত হতে পারে। মুমিনগণ যখন তাদের মুখোশ উন্মোচিত হবে তখন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাদের কাউকেও–

أَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ غَايَةَ اِجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ فِى الدِّيْنِ قَالَ تَعَالٰى حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ الصَّالِحَةُ فَاَصْبَحُوْا فَصَارُوْا خٰسِرِيْنَ الدُّنْيَا بِالْفَضِيْحَةِ وَالْاٰخِرَةِ بِالْعِقَابِ ـ

এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে শপথ করত যে, ধর্ম বিশ্বাসে তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাদের সৎ কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়েছে; বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ফলে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়ে এবং পরকালে শাস্তিগ্রস্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

٥٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ بِالْفَكِّ وَالْاِدْغَامِ يَرْجِعْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ اِلَى الْكُفْرِ اِخْبَارٌ بِمَا عَلِمَ تَعَالٰى وُقُوْعَهُ وَقَدْ اِرْتَدَّ جَمَاعَةٌ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بَدَلَهُمْ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ ۙ قَالَ ﷺ هُمْ قَوْمُ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِىْ صَحِيْحِهٖ اَذِلَّةٍ عَاطِفِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ اَشِدَّاءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ فِيْهِ كَمَا يَخَافُ الْمُنَافِقُوْنَ لَوْمَ الْكُفَّارِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنَ الْاَوْصَافِ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ كَثِيْرُ الْفَضْلِ عَلِيْمٌ بِمَنْ هُوَ اَهْلُهٗ ـ

৫৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ স্বধর্ম হতে কুফরিতে ফিরে গেলে يَرْتَدَّ এটা اِدْغَام অর্থাৎ সন্ধিভূত আকারে ও এটা ব্যতীত উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اَعِزَّة অর্থ– কঠোর। এ আয়াতটিতে মূলত ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর তিরোধানের পর এক দল লোক ইসলাম ত্যাগ করত মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ এদের স্থলে এমন এক সম্প্রদায় আনবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তাঁকে যারা ভালোবাসবে; তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল দয়াপরবশ ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং মুনাফিকরা যেমন কাফেরদের নিন্দার ভয় করে তারা তেমন কোনো নিন্দুকের ভয় করবে না। হাকিম (র.) তৎপ্রণীত সহীহে বর্ণনা করেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবূ মূসা আশ'আরীর প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, তার সম্প্রদায় হবে এ সম্প্রদায় এটা অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলির অধিকারী হওয়া আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, অপার অনুগ্রহের অধিকারী তিনি এবং কে তার যোগ্য তৎসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

٥٥. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمَنَا هَجَرُوْنَا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ خَاشِعُوْنَ اَوْ يُصَلُّوْنَ صَلٰوةَ التَّطَوُّعِ ـ

৫৫. একবার হযরত ইবনে সালাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার গোষ্ঠী তো আমাকে ত্যাগ করেছে। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়। رَاكِعُوْنَ এখানে এর মর্ম হলো যারা বিনত বা যারা নফল সালাত আদায় করে।

٥٦. وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيُعِيْنُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ لِنَصْرِهٖ اِيَّاهُمْ اَوْقَعَهٗ مَوْقِعَ فَاِنَّهُمْ بَيَانًا لِاَنَّهُمْ مِنْ حِزْبِهٖ اَىْ اِتْبَاعِهٖ ـ

৫৬. কেউ আল্লাহ ও তার রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অনন্তর তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করলে আল্লাহর দলই তো এদেরকে আল্লাহর সাহায্যের কারণে বিজয়ী হবে। এরাই আল্লাহর দল অর্থাৎ তাঁর অনুসারী, এ কথা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে اِنَّهُمْ [নিশ্চয় তারা] -এর স্থলে [اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর দল.......] বলে বর্তমান বাক্যভঙ্গিমা গ্রহণ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تُوَالُوْنَهُمْ وَتُوَادُّوْنَهُمْ : تُوَالُوْنَهُمْ মূলত تُوَالِيُوْنَهُمْ ছিল। يَاءْ -এর উপর পেশ কঠিন বিধায় সে -لَامْ -কে দেওয়া হয়েছে। এখন وَاوْ এবং يَاءْ দু'টি বর্ণ সাকিন অবস্থায় একত্র হওয়ার কারণে يَاءْ -কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে এবং لَامْ -এর কাসরা বিলুপ্ত হয়ে تُوَالُوْنَهُمْ হয়ে গেছে।

تُوَادُّوْنَ মূলত تُوَادِدُوْنَ ছিল। دَالْ -কে دَالْ -এর মাঝে ইদগাম করার ফলে تُوَادُّوْنَ হয়েছে। উভয়টি مُضَارِعْ جَمْعْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهٗ اَوْلِيَاءَ : এটি وَلِىٌّ -এর বহুবচন। وَلِىٌّ -এর বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যেমন মহব্বতকারী, বন্ধু, সাহায্যকারী, নিকটবর্তী প্রতিবেশি, মিত্র অনুসারী ইত্যাদি। এজন্য কোনো একটি অর্থ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মুফাসসির (র.) تُوَادُّوْنَ বলে অর্থ শনাক্ত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ مِنْ جُمْلَتِهِمْ : ইহুদি-নাসারাদের থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে কঠোরতা বর্ণনা করার জন্য এ জুমলাটি আনা হয়েছে। মর্ম হলো– حُكْمُهٗ كَحُكْمِهِمْ

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ : এটি اِنَّهُمْ مِنْهُمْ -এর ইল্লত।

قَوْلُهٗ يُسَارِعُوْنَ : এটি قُلُوْبِهِمْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ دَائِرَةٌ : বিপর্যয়, বিপদ। এটি دَوْرٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো, ঘোরাফেরা করা دَائِرَةٌ শব্দটি এমন সিফতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর مَوْصُوْفْ উল্লেখ থাকে না। دائرة মওসূফ। তার সিফত হলো يَدُوْرُ بِهَا

قَوْلُهٗ الْمِيْرَةُ : مِيْرَةٌ অর্থ- খাদ্য, শস্য। اَىْ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى الْمِيرة অর্থাৎ ইহুদি-নাসারা আমাদেরকে খাদ্য দিবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَاۤءَ : প্রথম আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না। এরপর যদি কোনো মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোনো ইহুদি অথবা খ্রিস্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

শানে নুযূল : তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না; বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোনো বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য

করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদিরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশি দিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরাইযার এসব ইহুদি একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ গ্রহণ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে সামেত প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছু সংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইহুদিদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এ কারণেই বলল, এদের সাথে সম্পর্কছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল, এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেন– فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ অর্থাৎ এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবি ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে, এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবি করত? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুনাফিকদের লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছে, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পরে সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্য ধর্ম ইসলামের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ কররেছেন। কোনো ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না, হতে পারে না। কারণ এর হেফাজতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোনো জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাজত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ তা'আলার কাজ কোনো ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়িকাঠও পঁচে গলে মাটি হতে থাকে। কবি চমৎকার বলেছেন– اِنَّ الْمَقَادِيْرَ اِذَا سَاعَدَتْ * اَلْحِقَتِ الْعَاجِزَ بِالْقَادِرِ

অর্থাৎ ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন অক্ষম ও অকর্মণ্য ব্যক্তি দ্বারা সক্ষম ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির কাজ উদ্ধার করে নেয়।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলিও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মাকবূল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও নিজেরাও আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসবেন। এ গুণটি দুই অংশে বিভক্ত। যথা–

১. আল্লাহর সাথে তাদের ভালোবাসা। একে কোনো না কোনো স্তরের মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালোবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালোবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালোবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণত আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের মনে তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতের ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর প্রতি স্বভাবজাত ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

২. তাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা; কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোনো ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শোনানোরও কোনো বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভালোবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে– قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালোবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে **এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা।** এমন করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসবেন **বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরো** জানা যায় যে, যে দল সুন্নত বিরোধী কাজকর্ম ও বিদআত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

উপরিউক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ এখানে أَذِلَّةٌ কামূস অভিধানের বর্ণনানুযায়ী ذَلِيْلٌ কিংবা ذَلُوْلٌ শব্দের বহুবচন হতে পারে। আরবি ভাষায় ذَلِيْلٌ শব্দের অর্থ তাই, যা উর্দু ইত্যাদি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে অর্থাৎ 'হীন'। ذَلُوْلٌ শব্দের অর্থ– নম্র ও সহজসাধ্য; যাকে সহজে বশ করা যায়। তাফসীরবিদগণের মতে আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ অর্থাৎ আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থি হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে أَعِزَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عَزِيْزٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর দীনের শত্রুদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্র করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালোবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্তা ও সত্তাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দীনের খাতিরে নিবেদিত। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ ও রাসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাতহে উল্লিখিত أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুরও তাই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোনো আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমত বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না, জেল-জুলুম, যখম হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারো ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশ এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে এগুলোর অর্জন করতে পারে না।

-[মা'আরিফুল কুরআন ৩/১৫১-১৫৬]

ইসলামের স্থায়িত্ব ও হেফাজত সম্পর্কে অভাবনীয় ভবিষ্যদ্বাণী : পূর্বের আয়াতগুলোতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের পরিণামে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে বসত। যেমন- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ নেহায়েত দৃঢ়তা ও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে ইসলাম থেকে ফিরে গিয়ে এসব লোক নিজেদের ক্ষতি করবে, ইসলামের কিছু ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ধর্মত্যাগীদের পরিবর্তে বা তাদের মোকাবিলায় এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাঁদের অন্তরে থাকবে মহান আল্লাহর প্রেম আর মহান আল্লাহও তাদের ভালোবাসবেন। তারা মুসলিমগণের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ও শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনমনীয় হবে। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানি ও সাহায্যক্রমে প্রতি যুগেই এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়ে আসছে। ধর্মদ্রোহিতার সবচেয়ে ভয়াবহ ফেতনা দেখা দিয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফত কালে। কয়েক রকমের মুরতাদ ইসলামের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর ঈমানী হিম্মত, অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের আত্মত্যাগী ও প্রেমিকসুলভ খেদমত সে আগুনকে নিভিয়ে দেন এবং সমগ্র আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে নতুনভাবে ঈমান ও ইখলাসের পথে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আজও আমরা দেখতে পাই, যখনই কিছু সংখ্যক মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী লোক ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হতে শুরু করে, তখন তাদের চেয়ে বেশি সংখ্যক এবং তাদের তুলনায় শিক্ষিত অমুসলিমকে ইসলাম তার মজ্জাগত আকর্ষণীয় শক্তি দ্বারা নিজের দিকে টেনে আনে। আর মুরতাদদের মুণ্ডপাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একদল বিশ্বস্ত ও ত্যাগী মুসলিমকে দাঁড় করিয়ে দেন, যারা মহান আল্লাহর পথে কারো তিরস্কার ও গালমন্দের বিন্দুমাত্র পরওয়া করে না। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৬৮]

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিমদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং ইসলামের হেফাজত ও সমর্থনের জন্য আল্লাহ তা'আলা উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী একটি দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর তা ঘুর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের সেই দল, যারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই : সর্বপ্রথম মুসায়লামাতুল কায্যাব মহানবী ﷺ -এর সাথে নবুয়তে অংশীদারিত্বের দাবি করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী ﷺ -এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে, যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি না হতো তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবিতে মিথ্যাবাদী ছিল। তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই নবীজী ﷺ ইন্তেকাল করেন।

এমনিভাবে ইয়েমেন মুজাজ গোত্রের সরদার আসওয়াদ আনাসী নবুয়তের দাবি করে বসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দমন করার জন্য ইয়েমেনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষদিকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। বনী আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদ নবুয়ত দাবি করে বসে।

উপরিউক্ত তিনটি গোত্র হুজুরে আকরাম ﷺ রোগশয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে ইসলামি আইন অনুযায়ী জাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুজুর ﷺ -এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোনো পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা.) সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামি দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে- এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মতো মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সামনে এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন, যার ফলে জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন, 'যারা মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামি আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্র করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।'

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরি করে ফেললেন। এ কারণেই হযরত আলী মুর্তযা (রা.), হাসান বসরী (র.), যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই এই নয় যে, অন্য কোনো দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন; বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কুরআনি নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মোকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরি হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হলো। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রা.)-এর হাতে নিহত হলো এবং তাঁর দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদের মোকাবিলায়ও হযরত খালিদ (রা.)-ই গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আওয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আনাসীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয় বার্তা, যা চরম সংকট মুহূর্তে খলীফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য জাকাত অস্বীকারকারীদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন। এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ [নিশ্চয় আল্লাহভক্তদের দলই বিজয়ী।] আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মোকাবিলার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কুরআন পাক বর্ণনা করেছেন, তা সবই হযরত আবূ বকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

অর্থাৎ প্রথমত আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ভালোবাসেন। দ্বিতীয়ত তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসেন। তৃতীয়ত তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফেরদের বেলায় কঠোর। চতুর্থত তাঁদের জিহাদ নিশ্চিতরূপেই আল্লাহর পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামি জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-দতবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হবে না, বরং এ সবই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরিউক্ত চার আয়াতে মুসলমানদের কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসেবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও অতঃপর তাঁর রাসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশালী। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই সম্পর্ক, পৃথক কিছু নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমান সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়, সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ অর্থাৎ প্রথমত তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামাজ পড়ে। দ্বিতীয়ত স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে জাকাত প্রদান করে। তৃতীয়ত তারা বিনম্র ও বিনয়ী, স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য وَهُمْ رَاكِعُوْنَ -এ رُكُوْع শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে রুকুর অর্থ পারিভাষিক রুকু, যা নামাজের একটি রোকন يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ -এর পর وَهُمْ رَاكِعُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাজকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামাজ থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নামাজ পড়ে, কিন্তু তাদের নামাজে রুকু নেই। রুকু একমাত্র ইসলামি নামাজেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন, এখানে 'রুকু' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ নত হওয়া, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরে মুহীত গ্রন্থে আবূ হাইয়্যান এবং কাশ্শাফ গ্রন্থে যামাখশারী (র.) এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল কুরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্ব করে না; বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ বাক্যটি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকুতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকু অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামাজ শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মেটাবেন, এতটুকু দেরি করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ তা'আলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তিনি তা মূল্যায়ন করেছেন।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদীসবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামাজ ও জাকাতের পাবন্দি করে। বস্তুত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রা.) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য সাব্যস্ত হবেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে- اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে, আপনি তাকে শত্রু মনে করুন! হযরত আলী (রা.)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলি ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রা.)-এর শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক। সাহাবায়ে কেরাম এবং সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোনো এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (র.)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে কি হযরত আলী (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনিও আয়াতের মিসদাক বা লক্ষণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কুরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে- وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহর দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহর দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সবার উপর জয়ী হয়েছে। যে শক্তিই পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর মোকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কিসরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নামনিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহর এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৫৬-১৬০]

'আওলিয়া' শব্দের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য : اَوْلِيَاءَ শব্দটি وَلِيٌّ-এর বহুবচন, যার অর্থ বন্ধু, আত্মীয়, সাহায্যকারী **ইত্যাদি। ইহুদি ও নাসারা** এবং সূরা নিসার বর্ণনা অনুযায়ী কোনো কাফেরের সাথেই মুসলিমগণ বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক স্থাপন করবে **না। এখানে লক্ষণীয় যে, বন্ধুত্ব,** ভদ্রতা, সদ্ব্যবহার, সন্ধি, ন্যায় ও ইনসাফ ইত্যাদি সব আলাদা আলাদা বিষয়। মুসলিমগণ ভালো **মনে করলে বৈধ পন্থায় যে কোনো কাফেরদের সাথে চুক্তি** বদ্ধ হতে পারেন।

ইরশাদ **হয়েছে-** وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ **অর্থাৎ** তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে **ঝুঁকবেন ও আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবেন। -[সূরা আনফাল : ৬১]**

ন্যায় ও ইনাসাফের নির্দেশ মুমিন কাফের প্রতিটি মানুষের সাথেই সমান, যেমনটা পূর্বের আয়াতসমূহ দ্বারা জানা গেছে। ভদ্রতা, সদাচরণ বা সমাদর ইত্যাদি কেবল মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রকাশ করে না, এমন কাফেরদের সাথেই প্রযোজ্য। যেমনটা সূরা মুমতাহানায় স্পষ্ট আছে। বাকি مُوَالَاةٌ অর্থাৎ বন্ধুত্বসুলভ নির্ভরতা ও ভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য-সহযোগিতা জাতীয় সম্পর্ক কোনো কাফেরের সাথে হতে পারে না। তাদের সাথে এটা করার অধিকার কোনো মুসলিমের নেই, তবে বাহ্যিক ধরন-ধারণে বন্ধুত্ব মনে হয়, এরূপ সম্পর্ক যা اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاتًا-এর অন্তর্ভুক্ত এবং ইসলাম ও মুসলিমগণের সামগ্রিক অবস্থার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, এরূপ সাধারণ সাহায্য-সহযোগিতার অনুমতি আছে। খুলাফায়ে রাশেদীনের কারো কারো পক্ষ হতে এক্ষেত্রে যে অসাধারণ কড়াকড়ির কথা বর্ণিত আছে, তাকে ক্ষতির চোরাই পথ বন্ধকরণ ও অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৬২]

قَوْلُهٗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ : অর্থাৎ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও আভ্যন্তরীণ হিংসা-বিদ্বেষ সত্ত্বেও তারা একে অপরের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রাখে। ইহুদি ইহুদির এবং খ্রিস্টান খ্রিষ্টানের মিত্র। মুসলিম জাতিকে মুকাবিলায় সমস্ত কাফের একে অপরের মিত্র ও সহযোগী। اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ সব কাফের একই জাতি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা ১৬৩]

অনুবাদ :

٥٧. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا مَهْزُوًّا بِهٖ وَلَعِبًا مِّنْ لِلْبَيَانِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْجَرِّ وَالنَّصَبِ اَوْلِيَآءَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِ مُوَالَاتِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ صادقين فى ايمانكم ـ

৫৭. হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা مِنَ الَّذِيْنَ -এর مِنْ শব্দটি بَيَانِيَّةٌ অর্থাৎ বিবরণমূলক। তোমাদের দীনকে উপহাস অর্থাৎ উপহাসের বস্তু ও ক্রীড়ারূপে গ্রহণ করেছে তাদেরকে ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে অর্থাৎ মুশরিক ও অংশীবাদীদেরকে, اَلْكُفَّارَ শব্দটি مَنْصُوْبٌ ও مَجْرُوْرٌ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে সত্যবাদী হও তবে এদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করত আল্লাহকে ভয় কর।

٥٨. وَ الَّذِيْنَ اِذَا نَادَيْتُمْ دَعَوْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ بِالْاَذَانِ اتَّخَذُوْهَا اَىِ الصَّلٰوةَ هُزُوًا مَهْزُوًّا بِهَا وَّلَعِبًا ط بِاَنْ يَّسْتَهْزِءُوْا بِهَا وَيَتَضَاحَكُوْا ذٰلِكَ الْاِتِّخَاذُ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ـ

৫৮. এবং তোমরা যখন আজানের মাধ্যমে সালাতের জন্য ডাক আহ্বান কর তখন তারা তাকে সালাতকে হাস্যাস্পদ, উপহাস্য বস্তু, ক্রীড়া-কৌতুকরূপে বানিয়ে নেয় অর্থাৎ তাকে নিয়ে তারা ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি-তামাশা করে। এটা এ হাসি-তামাশারূপে পরিণত করা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।

٥٩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُوْدُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِمَنْ تُؤْمِنُ مِنَ الرُّسُلِ فَقَالَ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الْاٰيَةَ فَلَمَّا ذَكَرَ عِيْسٰى قَالُوْا لَا نَعْلَمُ دِيْنًا شَرًّا مِنْ دِيْنِكُمْ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ تُنْكِرُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ لا اِلَى الْاَنْبِيَاءِ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ عَطْفٌ عَلٰى اَنْ اٰمَنَّا الْمَعْنٰى مَا تُنْكِرُوْنَ اِلَّا اِيْمَانَنَا وَمُخَالَفَتَكُمْ فِىْ عَدَمِ قَبُوْلِهٖ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْفِسْقِ اللَّازِمِ عَنْهُ وَلَيْسَ هٰذَا مِمَّا يُنْكَرُ ـ

৫৯. ইহুদিরা একবার রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, কোন কোন নবীর উপর আপনি বিশ্বাস রাখেন। তখন তিনি.....بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ পূর্ণ এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। এতে হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ এলে এরা বলল, আপনার এ ধর্ম অপেক্ষা মন্দ আর কোনো ধর্ম আছে কিনা? আমরা জানি না। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– বল হে কিতাবীগণ! আমরা আল্লাহতে ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা পূর্বে নবীগণের প্রতি [অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি, এটা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নও।] অন্য কোনো কারণে তোমরা আমাদেরকে অস্বীকার করছ না। এবং তোমাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।........اِنَّ اَكْثَرَكُمْ পূর্বোল্লিখিত اٰمَنَّا -এর সাথে এর عَطْفٌ হয়েছে। আয়াতটির মর্ম হলো, তোমরা আমাদের ঈমান গ্রহণকেই অস্বীকার করছে। ঈমান গ্রহণ না করার মাধ্যমে তোমাদের এ বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো এ ফিসক। অর্থাৎ এ বিরুদ্ধাচরণই 'ফিসক' নামে অভিহিত অথচ ঈমান আনয়ন এমন বিষয় নয় যা অস্বীকার করা যায়।

٦٠. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ أُخْبِرُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ أَهْلِ ذٰلِكَ الَّذِىْ تَنْقِمُوْنَهُ مَثُوْبَةً ثَوَابًا بِمَعْنٰى جَزَاءً عِنْدَ اللّٰهِ ط هُوَ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ أَبْعَدَهُ عَنْ رَحْمَتِهٖ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ بِالْمَسْخِ وَ مَنْ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط الشَّيْطَانَ بِطَاعَتِهٖ وَرَاعٰى فِىْ مِنْهُمْ مَعْنٰى مَنْ وَفِيْمَا قَبْلَهُ لَفْظَهَا وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ بَاءِ عَبُدَ وَإِضَافَتِهٖ إِلٰى مَا بَعْدَهُ اِسْمُ جَمْعٍ لِعَبْدٍ وَنَصْبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْقِرَدَةِ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا تَمْيِيْزٌ لِأَنَّ مَأْوَاهُمُ النَّارُ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَأَصْلُ السَّوَاءِ الْوَسَطُ وَذِكْرُ شَرٍّ وَأَضَلَّ فِىْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِمْ لَا نَعْلَمُ دِيْنًا شَرًّا مِنْ دِيْنِكُمْ.

৬০. বল, আমি কি তোমাদেরকে এটা অর্থাৎ যার প্রতি তোমরা বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন তার অপেক্ষা, আল্লাহর নিকট অধিক নিকৃষ্ট পরিণামের নিকৃষ্ট প্রতিদানের অধিকারীর সংবাদ দিব? খবর বলব? সে হলো যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, অর্থাৎ স্বীয় রহমত হতে বিতাড়িত করেছেন, যার উপরে তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছে, যাদের কিছু সংখ্যককে তিনি বিকৃত করে বানর ও কিছু সংখ্যককে শূকর করেছেন এবং যারা তাগুতের অর্থাৎ শয়তানের আনুগত্য প্রদর্শন করে ও তার উপাসনা করে মِنْهُمْ-এর সর্বনাম هُمْ-টিতে مَنْ-এর মর্মের ও পূর্ববর্তী শব্দসমূহে مَنْ-এর শাব্দিক আঙ্গিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। عَبَدَ এটা অপর এক কেরাতে عَبُدَ-এর اِسْمُ جَمْعٍ হিসেবে ب-এ পেশ ও পরবর্তী শব্দ [اَلطَّاغُوْتَ]-এর প্রতি اِضَافَتْ সম্বন্ধ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পূর্বোল্লিখিত قِرَدَةٌ-এর সাথে عَطْف বা ..... مَنْصُوْب [যবরযুক্ত] ব্যবহৃত হয়েছে। [তারাই মর্যাদায় নিকৃষ্ট] مَكَانًا এটা تَمْيِيْز বা স্বাতন্ত্র্যবোধক পদ। কারণ জাহান্নাম হলো এদের আবাসস্থল এবং সরল পথ হতে সত্য পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত। এরা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। سَوَاءٌ : এর মূলত অর্থ হলো মাঝামাঝি। এ আয়াতে তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট আর কোনো ধর্মের কথা আমরা জানি না; ইহুদিদের এ উক্তির মোকাবিলায় شَرٌّ [অধিক নিকৃষ্ট] ও اَضَلُّ [অধিক সত্যপথ বিচ্যুত] এ শব্দ দু'টির উল্লেখ করা হয়েছে।

٦١. وَإِذَا جَآءُوْكُمْ أَىْ مُنَافِقُو الْيَهُوْدِ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوْا إِلَيْكُمْ مُتَلَبِّسِيْنَ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكُمْ مُتَلَبِّسِيْنَ بِهٖ ط وَلَمْ يُؤْمِنُوْا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ مِنَ النِّفَاقِ.

৬১. তারা অর্থাৎ ইহুদি মুনাফিকরা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তারা তোমাদের নিকট অবিশ্বাসসহ আসে এবং তোমাদের নিকট হতে ওটা নিয়েই বের হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তারা ঈমান গ্রহণ করে না। তারা যা অর্থাৎ যে মুনাফেকী গোপন করে আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। بِالْكُفْرِ এটা এখানে উহ্য শব্দ مُتَلَبِّسِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। بِهٖ এটা এখানে উহ্য শব্দ مُتَلَبِّسِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٦٢. وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ أَىِ الْيَهُوْدِ يُسَارِعُوْنَ يَقَعُوْنَ سَرِيْعًا فِى الْإِثْمِ الْكَذِبِ وَالْعُدْوَانِ الظُّلْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط الْحَرَامَ كَالرُّشٰى لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَمَلُهُمْ هٰذَا.

৬২. তাদের অর্থাৎ ইহুদিদের অনেককেই তুমি পাপে অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণে সীমালঙ্ঘনে জুলুমে ও অবৈধ ভক্ষণে হারাম দ্রব্য ভক্ষণে যেমন ঘুষ ইত্যাদিতে তৎপর দেখবে, দ্রুত গিয়ে নিপতিত হতে দেখবে। তারা যা করে তা অর্থাৎ তাদের এ কর্ম কত নিকৃষ্ট!

٦٣. لَوْلَا هَلَّا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ مِنْهُمْ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ الْكَذِبَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ تَرْكَ نَهْيِهِمْ .

৬৩. তাদের রাব্বানীগণ ও ফকীহগণ কেন তাদেরকে পাপকথা অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না? তারা যা করে তা অর্থাৎ তাদের এ নিষেধ কার্য পরিহার করা কত নিকৃষ্ট। لَوْلَا এটা حَرْفُ تَنْبِيْه অর্থাৎ সতর্ককারী শব্দ هَلَّا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٤. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَمَّا ضُيِّقَ عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ اَنْ كَانُوْا اَكْثَرَ النَّاسِ مَالًا يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ط مَقْبُوْضَةٌ عَنْ اِدْرَارِ الرِّزْقِ عَلَيْنَا كَنَوْا بِهِ عَنِ الْبُخْلِ تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى غُلَّتْ اُمْسِكَتْ اَيْدِيْهِمْ عَنْ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ دُعَاءً عَلَيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا م بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتٰنِ مُبَالَغَةً فِى الْوَصْفِ بِالْجُوْدِ وَثَنَّى الْيَدَ لِاِفَادَةِ الْكَثْرَةِ اِذْ غَايَةُ مَا يَبْذُلُهُ السَّخِيُّ مِنْ مَالِهِ اَنْ يُعْطِيَ بِيَدَيْهِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط مِنْ تَوْسِيْعٍ وَتَضْيِيْقٍ لَا اِعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ط لِكُفْرِهِمْ بِهِ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تُخَالِفُ الْاُخْرٰى كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَىْ لِحَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ لا اَىْ كُلَّمَا اَرَادُوْهُ رَدَّهُمْ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ط اَىْ مُفْسِدِيْنَ بِالْمَعَاصِىْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ .

৬৪. মদীনার ইহুদিরা ছিল ধনী সম্প্রদায়। কিন্তু রাসূল ﷺ -কে অস্বীকার করার কারণে তারা অভাব ও কষ্টে নিপতিত হয়ে তখন তারা নিম্নের উক্তিটি করেছিল। ইহুদিরা বলে, আল্লাহ বদ্ধহস্ত। তিনি আমাদেরকে প্রচুর জীবিকা প্রদান করা হতে হাত গুটিয়ে রেখেছেন। এ বাক্যটি দ্বারা তারা কৃপণতার দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছে। অথচ আল্লাহ তা হতে বহু ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন [তাদের হাতই বদ্ধ] অর্থাৎ ভালো কাজ করা হতে অবরুদ্ধ। এ বাক্যটি তাদের প্রতি বদ দোয়া স্বরূপ। এবং তারা যা বলে তজ্জন্য তারা অভিশপ্ত। না, বরং আল্লাহর উভয় হাতই যুক্ত। يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ আল্লাহ অতি দানশীল, বদান্যতার গুণ আল্লাহ তা'আলার মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে এখানে এ ধরনের বাগভঙ্গিমা ব্যবহার করা হয়েছে। পরিমাণের আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য এখানে يَدْ শব্দটিকে تَثْنِيَةٌ বা দ্বি-বচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, দাতা হিসেবে যে মহান সে যখন প্রদান করে দুই হাত পূর্ণ করেই দেয়। যেভাবে তার ইচ্ছা তিনি দান করেন। কারো জন্য প্রশস্ততা বিধান আবার কারো জন্য সংকীর্ণ করা। সুতরাং তাঁর উপর কোনো অভিযোগ হতে পারে না। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ আল-কুরআন তা অস্বীকার করায় তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই; তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছে। ফলে তাদের প্রতিটি দল অপর দলের সাথে মতবিরোধ করে থাকে। যতবার তারা যুদ্ধের অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন। অর্থাৎ যতবারই তারা যুদ্ধ লাগানোর প্রয়াস পায় ততবারই তিনি এদেরকে প্রতিহত করেন। আর তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়। পাপকর্ম করে তারা বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালোবাসেন না অর্থাৎ তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন।

٦٥. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا بِمُحَمَّدٍ وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ.

৬৫. কিতাবীগণ যদি মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করত এবং কুফর হতে বেঁচে থাকত তাহলে তাদের পাপ মোচন করতাম এবং তাদেরকে সুখ-জান্নাতে প্রবেশ করাতাম।

٦٦. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِمَا وَمِنْهُ الْاِيْمَانُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَمَآ أُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنَ الْكِتٰبِ مِنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط بِاَنْ يُّوَسِّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقَ وَيُفِيْضَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْهُمْ اُمَّةٌ جَمَاعَةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط تَعْمَلُ بِهِ وَهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ بِئْسَ مَا يَعْمَلُوْنَ.

৬৬. তারা যদি তাওরাত ও ইঞ্জীল অনুসারে কাজ করত ও তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতো মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর বিশ্বাস স্থাপনও এর অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে যা অর্থাৎ যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যদি সুদৃঢ় থাকতো তাহলে তারা উপর নীচ সবদিক হতে খাদ্য লাভ করতো। অর্থাৎ তাদের রিজিক প্রশস্ত করে দেওয়া হতো এবং সবদিক হতে প্রাচুর্যের ঢল বইয়ে দেওয়া হতো। তাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় একদল এমন যারা মধ্যপন্থী; অর্থাৎ এরা তা অনুসারে কাজ করে। তারা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ। তারা রাসুল ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ যা করে তা নিকৃষ্ট ও কত মন্দ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تَتَّخِذُوْا : بِلَا مَجْزُوْمٌ فِعْلٌ مُضَارِعٌ তার সাথে যমীর হলো فَاعِلْ আর اَلَّذِيْ হলো ইসমে মাউসূল। اِتَّخَذُوْا ফেয়েল এবং ফায়েল। دِيْنَكُمْ হলো মাফউলে বিহী। هُزُوًا হলো مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং لَعِبًا হলো মাতুফ। مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ মিলে দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। সবগুলো মিলে জুমলা হয়ে صِلَةٌ হয়েছে صِلَةٌ এবং مَوْصُوْلَهْ মিলে لَا تَتَّخِذُوْا ফে'লের প্রথম মাফউল। اَوْلِيَآءَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। لَا تَتَّخِذُوْا ফে'লের, ফায়েল ও মাফউল মিলে جَوَابُ نِدَا হয়েছে। نِدَا তার مُنَادٰى এবং جَوَابُ نِدَا মিলে جُمْلَهْ نِدَائِيَّهْ হয়ে قُلْ উহ্য ফে'লের مَقُوْلَهْ

قَوْلُهُ مَهْزُوًّا بِهِ : অর্থাৎ هُزُوًا মাসদার হয়ে مَفْعُوْل -এর অর্থে।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ : جَرّ হবে اَلَّذِيْنَ-এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ النَّصْبُ : আর নসব হবে اَلَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا -এর সাথে عَطْف হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ وَاِذَا الَّذِيْنَ نَادَيْتُمْ الخ : পূর্ববর্তী বাক্যটির উপর এর عَطْف হয়েছে তা বুঝানোর জন্য তাফসীরে وَاو -এর পর اَلَّذِيْنَ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُمْ : এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

قَوْلُهُ تَنْقِمُوْنَ : তোমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কর, দুশমনি রাখ, দোষ অন্বেষণ কর, সমালোচনা কর। نَقْمٌ থেকে নির্গত مُضَارِعٌ جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ -এর সীগাহ্।

قَوْلُهُ الْمَعْنَى مَا تُنْكِرُوْنَ إِلَّا إِيْمَانَنَا : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, هَلْ تَنْقِمُوْنَ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَام -টি হলো اِنْكَارِىْ বা অস্বীকৃতি প্রকাশক।

قَوْلُهُ ثَوَابًا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَثُوْبَةً শব্দটি مَصْدَرْ مِيْمِىْ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; ظَرْف হিসেবে নয়।

قَوْلُهُ وَذِكْرُ شَرٌّ وَ اَضَلُّ فِىْ مُقَابَلَةِ الخ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। **প্রশ্ন.** شَرٌّ এবং اَضَلُّ শব্দদ্বয় ইসমে তাফযীলের সীগাহ। যার জন্য مُفَضَّلْ عَلَيْهِ -এর প্রয়োজন রয়েছে। উক্ত আয়াতে ইহুদিরা হলো مُفَضَّلْ এবং মুসলমানগণ হলো مُفَضَّلْ عَلَيْهِ আর مُفَضَّلْ এবং مُفَضَّلْ عَلَيْهِ মূলগুণে (نَفْس وَصْف) শরিক থাকে। সুতরাং ইহুদি এবং মুসলমানগণ نَفْس شَرَارَتْ এবং ضَلَالَتْ -এর ক্ষেত্রে শরিক হবে। যদিও ইহুদিরা মুসলমানের চেয়ে অগ্রগামী হবে। অথচ এটা বাস্তবতা পরিপন্থি।

উত্তর : এখানে شَرَارَتْ এবং ضَلَالَتْ ব্যবহার করা হয়েছে مُقَابَلَهْ এবং مُشَاكَلَهْ হিসেবে। কেননা ইহুদিরা বলেছিল- لَا نَعْلَمُ دِيْنًا شَرًّا مِنْ دِيْنِكُمْ পবিত্র কুরআনে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন جَزَآءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মাঝে জুলুমের جَزَآء -কে مُشَاكَلَةً হিসেবে سَيِّئَةً বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় জবাব : কখনো اِسْمُ تَفْضِيْل নফসে যিয়াদতী বর্ণনা করার জন্যও আসে।

مُقْتَصِدٌ : সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا : ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করতো : পূর্বের আয়াতগুলোতে মুসলিমগণকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ বাকভঙ্গিতে সে নিষেধাজ্ঞাকেই জোরদার করা হয়েছে এবং সে বন্ধুত্বের প্রতি ঘৃণা জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একজন মুসলিমের দৃষ্টিতে তার নিজ দীন অপেক্ষা সম্মানী ও মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না। তাই তাকে বলা হয়েছে, ইহুদি-নাসারা ও মুশরিকরা তোমাদের দীন নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করে। তাদের মধ্যে যারা চুপচাপ, তারাও এসব অপকার্য দেখে নিন্দা প্রকাশ করে না; বরং খুশি হয়। কাফেরদের এসব বালখিল্যসুলভ ও ন্যাক্কারজনক তৎপরতার কথা জেনেও কোনো একজন মুসলিম, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র আল্লাহভীতি ও নামমাত্র ঈমানী চেতনা আছে, তাদের সাথে এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে এবং বন্ধুত্বসুলভ আচার-আচরণ বজায় রাখতে প্রস্তুত থাকতে পারে কি? তাদের কুফর ও হঠকারিতা এবং ইসলাম বিদ্বেষের বিষয়টি যদি বাদও রাখা যায়, তবুও সরল সঠিক দীনের সাথে তাদের ঠাট্টা উপহাস তাদের সাথে সম্পর্ক পরিহারের একটি বড় কারণ হতে পারে, আর এতদসঙ্গে অন্যান্য কারণ তো রয়েছেই।

আজান নিয়েও ছিল ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের গাত্রদাহ : তোমরা আজান দিলে তাদের গাত্রদাহ হয় এবং তারা ঠাট্টা-মশকারা শুরু করে দেয়। এটা তাদের চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আজানের শব্দাবলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ, তাওহীদের ঘোষণা, নবী করীম ﷺ -এর রিসালতের সাক্ষ্য, যিনি সাবেক সকল নবী-রাসূল ও আসমানি কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী, সর্বপ্রকার ইবাদতের সমন্বিতরূপ যেই সালাত এবং যা চূড়ান্ত পর্যায়ের বন্দেগীর নিদর্শন, তার প্রতি আহ্বান এবং দোজাহানের সাফল্য ও পরম কামিয়াবী অর্জনের বলিষ্ঠ ডাক। এর মধ্যে এমন কি আছে, যা হাসি-ঠাট্টার উপযুক্ত? এরূপ পুণ্য ও সত্য-ন্যায়ের আওয়াজকে উপহাস করা কেবল তারই কাজ হতে পারে, যার মস্তিষ্ক বুদ্ধি-বিবেক হতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য এবং ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার মতো জ্ঞান যার বিলকুল নেই। রেওয়ায়েতে আছে মদীনায় জনৈক খ্রিস্টান ছিল, সে যখন আজানের 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি শুনত, তখন বলত قَدْ حُرِقَ الْكَاذِبُ মিথ্যুক জ্বলে গেল বা জ্বলে যাক। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে তার নিজের অবস্থার সঙ্গে উক্তিটি বেজায় সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কেননা সে দুর্মুখ ছিল মিথ্যুক। ইসলামের ক্রমবিস্তার দেখে সে প্রতিনিয়ত দগ্ধিভূত হচ্ছিল। অকস্মাৎ একদিন একটি মেয়ে আগুন নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে। সে সপরিবারে ঘুমে অচেতন ছিল। মেয়েটির হাত থেকে তার অগোচরে ক্ষণিক অঙ্গার পড়ে যায় এবং তাতেই লোকজনসহ গোটা ঘর জ্বলে ভস্ম হয় যায়। এভাবে আল্লাহ

মিথ্যাবাদী কিভাবে দোজখের আগুনের পূর্বে এ দুনিয়ার আগুনেই দগ্ধ হয়। আজান নিয়ে উপহাস সম্পর্কে বিশুদ্ধ সূত্রে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন জয় করে ফিরেছিলেন। পথে হযরত বিলাল (রা.) আজান দেন। কয়েকটি কিশোর তা নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দিল এবং আজানের শব্দগুলো সুর মিলিয়ে উচ্চারণ করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবূ মাহযূরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে ডেকে পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আবূ মাহযূরার অন্তরে ইসলামের আলো জ্বালিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মক্কার মুয়াযযিন নিযুক্ত করলেন। এভাবে মহান আল্লাহর কুদরতে নকল আমলে পরিণত হলো। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৩,১৭৪]

قَوْلُهُ يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا : আজান নিয়ে বিদ্রূপকারীরা ছিল মূলত নির্বোধ ও নাফরমান : কোনো কাজের নিন্দা ও উপহাস দু'কারণে হতে পারে। হয়তো সে কাজটিই উপহাসযোগ্য অথবা কর্তা নিজে উপহাসের পাত্র। পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, আজান এমন কোনো কাজ নয়, যার উপহাস কেবল তরল প্রকৃতির বা নির্বোধ শ্রেণির লোক ছাড়া আর কেউ করতে পারে। আর আয়াতে আজানদাতার মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্নের ঢংয়ে সচেতন করা হয়েছে যে, বিদ্রূপকারীরা, যারা ভাগ্যক্রমে আহলে কিতাব ও শরিয়ত সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দাবি করে, সামান্য একটু চিন্তা করে ইনসাফের সাথে বলুক, মুসলিমগণের প্রতি তাদের এতো আক্রোশ কেন? তারা কি আমাদের এমন কোনো দোষ ত্রুটি দেখতে পায়, যা প্রকৃতই ঠাট্টাযোগ্য? অবশ্য এটা স্বতন্ত্র কথা যে, আমরা এক ও লা-শারীক আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখি, তাঁর অবতীর্ণ সমস্ত আসমানি কিতাব ও তাঁর পাঠানো সকল নবী-রাসূলের প্রতি নিষ্ঠার সাথে ঈমান রাখি। এর বিপরীতে ঠাট্টাকারীদের অবস্থা হলো, তারা না মহান আল্লাহর প্রকৃত ও খাঁটি তাওহীদের উপর কায়েম আছে, না সকল নবী-রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এবার তোমরাই ইনসাফের সাথে বল, যারা চরম পর্যায়ের নাফরমান, তারা মহান আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সম্পর্কে টু শব্দটি করার এবং তাদের নিন্দা-উপহাস করার অধিকার তাদের কোথায় আছে? -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৫]

قَوْلُهُ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ : আজান নিয়ে ঠাট্টা-মশকারাকারীরাই নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট : মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা এবং যে কোনোকালে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, খাঁটি মনে তাতে বিশ্বাস রাখাই যদি তোমাদের দৃষ্টিতে মুসলিমগণের সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ ও বড় দোষ হয়ে থাকে, আর সে কারণেই তোমরা তাদেরকে নিন্দা উপহাসের পাত্র বানিয়ে থাক, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একদল লোকের সংবাদ জানাই, যারা নিজ অন্যায়-অনাচার ও অপবিত্রতার কারণে নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত ও গজবের নিদর্শন অদ্যাবধি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। ধোঁকাবাজী, অশ্লীলতা ও লোভ-লালসার শাস্তি স্বরূপ তাদের মধ্যে অনেককে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়। আর যারা মহান আল্লাহর বন্দেগী পরিহার করে শয়তানের দাসত্ব অবলম্বন করেছে, ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে সেই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ও পথহারা সম্প্রদায়ই প্রকৃত অর্থে তোমাদের গালমন্দ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপযুক্ত হতে পারে। বলা বাহুল্য, তোমরা নিজেরাই সেই লোক। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৬]

قَوْلُهُ وَاِذَا جَاۤءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ নির্ভেজাল কপট ও বিধর্মী ব্যতীত কেউ ইসলাম ও আজান নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে না : উল্লিখিত বিদ্রূপকারীদের মধ্যে এখানে বিশেষ এক শ্রেণির অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, যারা পেছনে ইসলামের নিন্দা ও মুসলিমগণকে উপহাস করতো, কিন্তু নবী করীম ﷺ বা খাঁটি মুসলিমগণের সামনে এসে কপটভাবে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিত। অথচ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত এক মুহূর্তেও ইসলামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। কারণ নবী করীম ﷺ -এর ওয়াজ-নসিহতও তাদের মাঝে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি। তারা কি মুখে ইসলাম ও ঈমান শব্দ উচ্চারণ করে মহান আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবে? যেই মহান আল্লাহ দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞাতা এবং মনের সকল গোপন কথা ও লুক্কায়িত রহস্য সম্পর্কে অবগত, তাঁর সম্পর্কে যদি তাদের এ ধারণা হয়ে থাকে যে, কেবল শাব্দিক ঈমান দ্বারাই তাঁকে খুশি করে নেবে, তবে এর চেয়ে বেশি আর কোন কাজ ঠাট্টাযোগ্য হতে পারে? এ আয়াত থেকে যেন ইহুদি-নাসারার সেই সব বিদ্রূপাত্মক কাজ-কর্মের বর্ণনা শুরু হলো, যেগুলো জ্ঞাত হওয়ার পর মুসলিমগণকে ব্যঙ্গ করার পরিবর্তে বরং তাদের নিজেদেরই নিজেদের ব্যঙ্গ করা উচিত। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এ বিষয়েরই অবশিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৭]

قَوْلُهُ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ইহুদিদের চারিত্রিক বিপর্যয় : প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদিদের চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে। যদিও সাধারণভাবে ইহুদিদের অবস্থা তাই ছিল তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভালো লোকও ছিল। কুরআন পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার জন্য كَثِيرًا [অনেক] শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষণ إِثْم [পাপ] শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায়, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোনো কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনোরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদিদের কু-অভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে- يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ [তারা দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়]। সৎকর্মে পয়গাম্বর ও ওলীগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কেও কুরআন বলেছে। يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ তাঁরা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৬৫]

قَوْلُهُ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ الخ : আলেম ও দরবেশ শ্রেণির গাফলতির কারণে জনগণ বিপদের সম্মুখীন হয়; আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের আম-জনসাধারণ পাপাচারে নিমজ্জিত হয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অর্থাৎ দরবেশ ও আলেম শ্রেণি বোবা শয়তান বনে যায়, এ অবস্থাই হয়েছিল বনী ইসরাঈলের। সাধারণ লোক পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর বিধান ভুলে গিয়েছিল। মাশায়েখ ও আলেম নামে যারা পরিচিত ছিল তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ নিষেধ করার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ পার্থিব লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি-পরবশতায় তারা আওয়ামকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মাখলুকের ভয় বা দুনিয়ার লালসা তাদের হক কথা বলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ নীরব দর্শন ও ঢিলেমির কারণেই পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, তাই উম্মতে মুহাম্মাদিকে কুরআন-হাদীসের বহু স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোনো সময়ই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের এই গুরুদায়িত্ব আদায়ে যেন গাফলতি না হয়, তা যে কোনো ব্যক্তিরই বিরুদ্ধে যাক না কেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৭৯]

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ الخ মহান আল্লাহ সম্পর্কে আহলে কিতাবের ধৃষ্ঠতাপূর্ণ উক্তি এবং এর পরিণতি : নবী কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবকালে অন্যায়-অনাচার, কুফর, অবাধ্যতা, ব্যভিচার, অবৈধাহার ইত্যাদি দুষ্কৃতির আবিলতায় আহলে কিতাবের অন্তর এতটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে ধৃষ্টতা প্রদর্শনেও তারা দ্বিধা করতো না। তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা একজন মামুলী মানুষের স্তরে নেমে এসেছিল। তাঁর শানে তারা অবলীলায় এমন সব উক্তি আরোপ করত, যা শুনলে যে কারও শরীর শিউরে উঠবে। কখনো বলত- إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ অভাবগ্রস্ত, আমরা অভাবমুক্ত। কখনো তাদের মুখ থেকে বের হতো- يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর হাত রুদ্ধ। এরও অর্থ ওটাই যে إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ দ্বারা তারা যা বোঝাতো, অর্থাৎ আল্লাহ পাক অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর ভাণ্ডারে আর কিছু নেই [না'উযুবিল্লাহ], অথবা غُلَّ يَدٌ দ্বারা কার্পণ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অর্থাৎ অভাবী তো নন, তবে আজকাল ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে গেছেন। -[না'উযুবিল্লাহ]

যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, এ কুফরি বাক্যের উদ্দেশ্য, কুফর ও অবাধ্যতার শাস্তিতে আল্লাহ তা'আলা যখন এ অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের উপর লাঞ্ছনা, দুর্ভোগ ও অভাব-অভিযোগ চাপিয়ে দিলেন, তখন যেখানে তাদের উচিত ছিল নিজেদের অন্যায়-অনাচার উপলব্ধি করা ও সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া, সেখানে তারা উল্টা আল্লাহ তা'আলার শানে গোস্তাখী শুরু করে দিল। তাদের মনে এ ধারণা জেগে থাকবে যে, আমরা নবীগণের বংশধর, বরং মহান আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলাম। আর এখন এ কি শুরু

হয়ে গেল, পৃথিবীতে ইসমাঈলের বংশধরগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এ দিকে বিশ্ববিজয়, ওদিকে আসমানি বরকতধারা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ইসরাঈলের বংশধর। আল্লাহ পাক ছিল আমাদের; আর আমরা তাঁর। আজ আমরা লাঞ্ছিত ও সর্বস্বান্ত হয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা তো আজও সেই ইসরাঈলের বংশধর এবং তাঁর সন্তান ও প্রিয়পাত্রই আছি, যেমন আগে ছিলাম। তথাপি কেন এ অবস্থা? সম্ভবত আমরা যে মহান আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়জন [না'উযুবিল্লাহ] তাঁর ভাণ্ডারে অভাব দেখা দিয়েছে কিংবা তিনি ব্যয়কুণ্ঠ হয়ে গেছেন। নির্বোধেরা এতটুকু বুঝল না যে, মহান আল্লাহর ভাণ্ডার অসীম-অফুরান। তাঁর গুণাবলি অপরিবর্তনীয় ও অপরিসীম। যদি [নাউযুবিল্লাহ] তাঁর ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যেত কিংবা সৃষ্টির প্রতিপালন ও কল্যাণ সাধন হতে তিনি হাত গুটিয়ে নিতেন, তাহলে নিখিল বিশ্বের চিরায়ত নিয়ম-শৃঙ্খলা কী করে প্রতিষ্ঠিত থাকত? আখেরী নবী ও তাঁর সঙ্গি-সাথীদের যে ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উত্থান তোমরা চাক্ষুষ দেখছ, তখন এটা কার হাতের অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হতো? অতএব, তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তাঁর হাত রুদ্ধ হয়নি। অবশ্য ধৃষ্টতা ও অপকর্মের অশুভ পরিণামে আল্লাহ তা'আলার যে লা'নত ও অভিশাপ তোমাদের উপর পতিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর সুপ্রশস্ত জমিনকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। ভবিষ্যতে তা আরো বেশি সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। নিজেদের দুরবস্থাকে মহান মহান আল্লাহর দুর্দিনের ফল বলে বিবেচনা করা তোমাদের চরম অপোগণ্ডতা। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা -১৮০]

মহান আল্লাহর সত্তা তাঁর শানের মুতাবিক : আল্লাহ তা'আলার জন্য যেখানে হাত, পা, চোখ ইত্যাদি শব্দাবলি আরোপ করা হয়েছে, তাদ্বারা ভুলেও এ ধারণা করা উচিত নয় যে, [না'উযুবিল্লাহ] তিনি মানুষের মতো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার সত্তা, অস্তিত্ব, জীবন, জ্ঞান ইত্যাদি যেমন কোনো দৃষ্টান্ত, তুলনা ও স্বরূপ সম্পর্কে যেমন এর বেশি কিছুই বলা যায় না। জনৈক কবি বলেছেন-

اے برتر از خیال وقیاس وگماں ووهم * وزهر چه گفته اند شنیدیم وخوانده ایم

منزل تمام گشت وبپایاں رسید عمر * ما همچناں در اول وصف تو مانده یم

অর্থাৎ "হে ঐ সত্তা, যিনি ধারণা, অনুমান, কল্পনা ও অনুভূতির উর্ধ্বে। যে যা কিছু বলেছে, যা শুনেছি ও পড়েছি সব কিছুরই উর্ধ্বে। সফরের মঞ্জিল শেষ হয়ে গেল, জীবন পৌঁছে গেছে অন্তিম, আমরা তোমার প্রথম গুণেই রয়ে গেছি এখনও স্বপ্নচারী।"

আলোচ্য শব্দ ও বিশেষণগুলোকেও অনুরূপ মনে করতে হবে। সারকথা আল্লাহ তা'আলার সত্তা যেমন নিরুপম, তেমনি তাঁর শ্রবণ, দর্শন, হাত ইত্যাদি গুণাবলির অর্থও তাঁর মহান সত্তা ও শানের মুতাবিক এবং আমাদের ধারণা ও ক্ষমতা-বলয় এবং বর্ণনা শক্তির আয়ত্ত বহির্ভূত। ইরশাদ হচ্ছে- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ অর্থাৎ তাঁর মত নেই কোনো বস্তু, তিনি শ্রবণকারী, দ্রষ্টা। হযরত শাহ আব্দুল কাদির (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দু'হাতের অর্থ করেছেন দক্ষিণা ও দণ্ডের হাত। অর্থাৎ আজকাল মহান আল্লাহর দক্ষিণার হাত উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এবং দণ্ডের হাত বনী ইসরাঈলের উপর উন্মুক্ত, যেমন সম্মুখের আয়াতসমূহের ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১২৮]

قَوْلُهُ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ : পার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণ পরীক্ষা এবং অবকাশ : কখনো কারো প্রতি, কি পরিমাণ ব্যয় করা দরকার তা তিনিই ভালো জানেন। তিনি কখনো অনুগত বান্দাকে পরীক্ষা বা সংশোধন করার উদ্দেশ্যে অভাব-অনটনেও ফেলেন, কখনো আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ পরকালীন নিয়ামতের আগে পার্থিব কল্যাণের দুয়ারও খুলে দেন। এর বিপরীতে একজন অপরাধী পাপিষ্টের উপর অনেক সময় আখিরাতের শাস্তির পূর্বে পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদ নিপতিত করা হয়, আবার কখনো প্রাচুর্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে অতিরিক্ত অবকাশ দেওয়া হয়, যাতে সে মহান আল্লাহর উপর্যুপরি অনুগ্রহ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজ অন্যায়-অপরাধের উপর কিছুটা অনুতপ্ত হয় অথবা নিজ দুর্ভাগ্যের পাল্লা ভালো রকমে বোঝাই করে চরম শাস্তির উপযুক্ত হয়। এই বিভিন্ন রকমের অবস্থা ও উদ্দেশ্যে এবং রকমারি রহস্যের বর্তমানে কে সমাদৃত আর কে বিতাড়িত? সে ফয়সালা আল্লাহ কর্তৃক অবহিতকরণ কিংবা বাইরের অবস্থা ও লক্ষণের ভিত্তিতে সাধিত হতে পারে। যেমন- এ চোরের হাত কাটা হলো, আবার ডাক্তার এক রোগীর হাত কেটে দিল। আমরা বাইরের লক্ষণ ও অবস্থা দেখে উভয়ের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, একজনের হাত কাটা হয়েছে শাস্তি স্বরূপ এবং অন্যজনের চিকিৎসা ও অনুকম্পা স্বরূপ। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-১৮৩]

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ الخ : আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরোপুরি পালন করার উপায় : ولو انهم اقاموا التوراة الخ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও আল্লাহভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদিরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عَمَلٌ তথা পালন করার পরিবর্তে اِقَامَتْ তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোনো রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকে। যেমন কোনো স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনো দিকে ঝুঁকে থাকবে না; বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদিরা আজও তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন পাকের নির্দেশাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে ত্রুটিপূর্ণ এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্মরূপে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নিয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে উপর নিচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিজিক বর্ষিত হবে। উপর নিচের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিজিকপ্রাপ্ত হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ইহুদিদের কুকর্ম এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলির পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসারপ্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কুরআনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকাশ্য নির্দেশাবলি দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করেছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার জন্য এ ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদও আরাম আয়েশ হ্রাস পাবে না. বরং আরো বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহ নিরসন : এ বিবরণ থেকে একথাও জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদির জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নিয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হতো। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভ করেছে। যেমন– আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে সেই ইহকালে অবশ্যম্ভাবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ এখানে কোনো সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে। তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অটনের আকারেও। পয়গাম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ ধন-দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থে এ কথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদিদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদির অবস্থা নয়; বরং مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছেন। তবে তাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতিকারী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান ছিল, এরপর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। –[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৭৩, ১৭৪]

৬৭. يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ جَمِيْعَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَلَا تَكْتُمْ شَيْئًا مِنْهُ خَوْفًا اَنْ تُنَالَ بِمَكْرُوْهٍ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ اَىْ لَمْ تُبَلِّغْ جَمِيْعَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ط بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ لِاَنَّ كِتْمَانَ بَعْضِهَا كَكِتْمَانِ كُلِّهَا وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اَنْ يَّقْتُلُوْكَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحْرَسُ حَتّٰى نَزَلَتْ فَقَالَ انْصَرِفُوْا عَنِّىْ فَقَدْ عَصَمَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى رَوَاهُ الْحَاكِمُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ .

অনুবাদ :

৬৭. হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার যাবতীয় সবকিছু প্রচার কর। বিপদ ঘটবে– এ আশঙ্কায় কোনো কিছু গোপন করবে না। যদি না কর অর্থাৎ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার যাবতীয় সকল কিছু যদি প্রচার না কর তবে তো তুমি বার্তা প্রচার করলে না। কারণ কতক অংশ গোপন করার অর্থ হলো সবটাই গোপন করা। মানুষ তোমাকে হত্যা করে ফেলবে তা হতে আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। হাকিম বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাজিল হওয়া পর্যন্ত রাসূল ﷺ -কে পাহারা দেওয়া হতো। আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। رِسَالَةَ : শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

৬৮. قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ الدِّيْنِ مُعْتَدٍّ بِهٖ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ط بِاَنْ تَعْمَلُوْا بِمَا فِيْهِ وَمِنْهُ الْاِيْمَانُ بِىْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج لِكُفْرِهِمْ بِهٖ فَلَا تَاْسَ تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِكَ اَىْ لَا تَهْتَمَّ بِهِمْ .

৬৮. বল, হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইঞ্জীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত অর্থাৎ এতদনুসারে কাজ না করা পর্যন্ত; আর এটার মধ্যে আমার প্রতি ঈমান আনয়নও অন্তর্ভুক্ত। তোমরা কিছুর উপরই নও। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কোনো ধর্মের উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত নও। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তা অস্বীকার করার কারণে তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করবেই। সুতরাং তুমি সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য অর্থাৎ তারা ঈমান আনয়ন না করলে তাদের জন্য দুঃখ করো না, বিষণ্ন হয়ো না। এদের জন্য তুমি চিন্তিত হয়ো না।

৬৯. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا هُمُ الْيَهُوْدُ مُبْتَدَاٌ وَالصّٰبِئُوْنَ فِرْقَةٌ مِنْهُمْ وَالنَّصٰرٰى وَيُبْدَلُ مِنَ الْمُبْتَدَاِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ خَبَرُ الْمُبْتَدَاِ وَدَالٌّ عَلٰى خَبَرِ اِنَّ .

৬৯. বিশ্বাসীগণ, ইহুদিগণ, সাবিয়ী ইহুদিদের একটি গোত্র ও খ্রিস্টানগণ তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে আখিরাতে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। اَلَّذِيْنَ هَادُوْا الخ : এটা مُبْتَدَاٌ বা উদ্দেশ্য। مَنْ اٰمَنَ الخ ; এটা উক্ত مُبْتَدَاٌ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। فَلَاخَوْفٌ الخ : এটা উক্ত مُبْتَدَاٌ -এর خَبَرٌ বা বিধেয় এবং اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর خَبَرٌ বা বিধেয়ের উপর ইঙ্গিতবহ।

٧٠. لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ط كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ مِنَ الْحَقِّ كَذَّبُوْهُ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا مِّنْهُمْ يَقْتُلُوْنَ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَالتَّعْبِيْرُ بِهٖ دُوْنَ قَتَلُوْا حِكَايَةً لِلْحَالِ الْمَاضِيَةِ لِلْفَاصِلَةِ.

৭০. বনী ইসরাঈলের নিকট হতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের মধ্য হতে কোনো রাসূল তাদের নিকট এমন কিছু সত্য নিয়ে এসেছে যা তাদের মনঃপূত হয়নি তখন তারা তা অঙ্গীকার করেছে। তাদের কতজনকে তো মিথ্যাবাদী বলে আর তাদের কতজনকে হত্যা করে যেমন হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করে। আয়াতসমূহের অন্তমিল রক্ষা এবং অতীতে সংঘটিত ঘটনাটির ঘটমান চিত্র ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এখানে قَتَلُوْا [অতীতকালব্যঞ্জক শব্দ] -এর স্থলে يَقْتُلُوْنَ [বর্তমানকাল] ব্যবহার করা হয়েছে।

٧١. وَحَسِبُوْٓا ظَنُّوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ بِالرَّفْعِ فَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَالنَّصْبِ فَهِيَ نَاصِبَةٌ اَيْ تَقَعُ فِتْنَةٌ عَذَابٌ بِهِمْ عَلٰى تَكْذِيْبِ الرُّسُلِ وَقَتْلِهِمْ فَعَمُوْا عَنِ الْحَقِّ فَلَمْ يُبْصِرُوْهُ وَصَمُّوْا عَنْ اِسْتِمَاعِهٖ ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لَمَّا تَابُوْا ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا ثَانِيًا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ط بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيْرِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ.

৭১. তারা মনে করেছিল কোনো বিপদ হবে না; অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার ও তাদেরকে হত্যার দরুন তাদের উপর কোনো আজাব হবে না বলে তারা ভেবেছিল। ফলে তারা সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা আর দেখতে পায়নি এবং তা শ্রবণ করা হতে বধির হয়ে পড়েছিল। অতঃপর তারা যখন অনুতপ্ত হলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হয়েছিলেন। পুনরায় দ্বিতীয় বারের জন্য তাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হয়েছিল। তারা যা করে আল্লাহ তা অবলোকন করেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে প্রতিফল দিবেন। اَلَّا تَكُوْنَ : এটা رَفْع [পেশ] সহযোগে হলে শব্দটি اَنْ مُثَقَّلَةٌ [তাশদীদসহ রূঢ় রূপ] হতে مُخَفَّفَةٌ [তাশদীদহীন লঘুরূপে] রূপান্তরিত বলে বিবেচ্য হবে। আর তা نَصْب [যবর] সহযোগে পঠিত হলে اَنْ -টি نَاصِبَةٌ [নসব দানকারী] [اَنَّ] বলে বিবেচ্য হবে। كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ : এটা عَمُوْا وَ صَمُّوْا -স্থিত ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনাম [هُمْ] -এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ।

٧٢. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط سَبَقَ مِثْلُهٗ وَقَالَ لَهُمُ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ط فَاِنِّيْ عَبْدٌ وَلَسْتُ بِاِلٰهٍ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَهٗ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مَنَعَهٗ اَنْ يَّدْخُلَهَا وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ زَائِدَةٌ اَنْصَارٍ يَمْنَعُوْنَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

৭২. যারা বলে, আল্লাহই মারইয়াম তনয় মসীহ তারা নিশ্চয় সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে। এরূপ আয়াত পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অথচ মসীহ এদেরকে বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহরই ইবাদত কর। কেননা, আমি ইলাহ নই; একজন দাস মাত্র। কেউ ইবাদত ইত্যাদিতে আল্লাহর শরিক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন। অর্থাৎ তার জন্য তাতে প্রবেশ রুদ্ধ করে দিবেন। তার আবাস হলো জাহান্নাম; সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। যে আল্লাহর আজাব হতে তাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে। مِنْ اَنْصَارٍ : এতে مِنْ -টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٧٣. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاۤ اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ اٰلِهَةٍ ثَلٰثَةٍ - اَىْ اَحَدُهَا وَالْاٰخَرَانِ عِيْسٰى وَاُمُّهٗ وَهُمْ فِرْقَةٌ مِنَ النَّصَارٰى وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ مِنَ التَّثْلِيْثِ وَلَمْ يُوَحِّدُوْا لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَىْ ثَبَتُوْا عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ وَهُوَ النَّارُ -

৭৩. যারা বলে আল্লাহ তো তিন ইলাহর তৃতীয় ইলাহ। অর্থাৎ তিনি এদের একজন। বাকি দু'জন হচ্ছেন ঈসা ও তাঁর মাতা। এরা হলো খ্রিস্টানদের অন্যতম একটি সম্প্রদায়। তারা তো কুফরি করেছেই। যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ হতে নিবৃত্ত হয়ে একত্ববাদের অনুসারী না হলে তাদের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ তাতে কায়েম হয়ে রয়েছে তাদের উপর মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি অর্থাৎ জাহান্নামাগ্নির শাস্তি আপতিত হবেই।

٧٤. اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ط مِمَّا قَالُوْهُ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لِمَنْ تَابَ رَحِيْمٌ بِهٖ -

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তারা যা বলে তা হতে তাঁর নিকট ক্ষমা করবে না? আল্লাহ তো যারা তওবা করে তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

٧٥. مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ط قَدْ خَلَتْ مَضَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط فَهُوَ يَمْضِىْ مِثْلَهُمْ وَلَيْسَ بِاِلٰهٍ كَمَا زَعَمُوْا وَاِلَّا لَمَا مَضٰى وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ط مُبَالَغَةً فِى الصِّدْقِ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ط كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْبَشَرِ وَمَنْ كَانَ كَذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ اِلٰهًا لِتَرْكِيْبِهٖ وَضُعْفِهٖ وَمَا يَنْشَاُ مِنْهُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ اُنْظُرْ مُتَعَجِّبًا كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى كَيْفَ يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ -

৭৫. মারইয়াম-তনয় মসীহ তো একজন রাসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন, অতীত হয়েছেন। তাদের মতো তিনিও একদিন গত হয়ে যাবেন। তাদের ধারণা সত্য নয়, তিনি ইলাহ নন। যদি ইলাহ হতেন তবে নিশ্চয় গত হতেন না। আর তার মাতা সত্যনিষ্ঠা রমণী, সত্যবাদিতার চরমে অধিষ্ঠিতা মহিলা ছিল। অন্যান্য মানুষের মতো তারা উভয়েও আহার করত আর যে এধরনের হবে সে যৌগিকতা, মানবিক দুর্বলতা ও মল-মূত্রাদির মতো অশুচিতা নির্গমনের দরুন ইলাহ হতে পারে না। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য কর, তাদের জন্য আমার একত্ববাদ সম্পর্কে আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। দেখ, তারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরও কিভাবে সত্য হতে বিমুখ হয়ে, মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। اَنّٰى : এটা এখানে كَيْفَ কিভাবে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٦. قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ط وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِكُمُ الْعَلِيْمُ بِاَحْوَالِكُمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ -

৭৬. বল, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা যার নেই? আল্লাহ তোমাদের কণ্ঠস্বর অতি শুনেন এবং তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অতি অবহিত। دُوْنَ اللّٰهِ : অর্থ আল্লাহ ব্যতীত। اَتَعْبُدُوْنَ : এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি এখানে اِنْكَار অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِاَنَّ كِتْمَانَ بَعْضِهَا كَكِتْمَانِ كُلِّهَا : এটি رِسَالَاتٌ শব্দকে বহুবচন ব্যবহারের ইল্লত। অর্থাৎ রিসালতের কিয়দাংশ অস্বীকার গোটাটাকে অস্বীকারের নামান্তর।

قَوْلُهُ اَنْ يَّقْتُلُوْا : এ জুমলাটি উহ্য ধরার উদ্দেশ্য হলো একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব প্রদান করা। **প্রশ্ন** : আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ-এর মর্ম তো হলো আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে মানুষের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখাবেন। অথচ মানুষের পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছেন। যেমন গাযওয়ায়ে উহুদে তাঁর চেহারা মুবারক আহত হওয়া, তাঁর সম্মুখভাগের দাঁত মুবারক ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি।

উত্তর : আয়াতে বর্ণিত হেফাজত দ্বারা উদ্দেশ্য কতল বা হত্যা করা থেকে সুরক্ষিত রাখা। সাধারণ হেফাজত উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এখন কোনো প্রশ্ন থাকল না।

قَوْلُهُ مِنَ الدِّيْنِ مُعْتَدِيْهِ : এটি একটি سُوَالٌ مُقَدَّرٌ-এর জবাব। **প্রশ্ন** : ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের ব্যাপারে এটা বলা শুদ্ধ নয় যে, তোমরা কোনো বস্তুর উপর নও। কেননা তারা যে ধর্মের উপর ছিল তাও তো কোনো একটি বস্তু ছিল।

উত্তর : উক্ত বাক্যে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, شَيْئٌ বা বস্তু দ্বারা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম উদ্দেশ্যে, নিজেদের মনগড়া ধর্ম নয়।

قَوْلُهُ الصّٰبِئُوْنَ : এটি صَابِئٌ-এর বহুবচন। ইসমে ফা'য়েল। অর্থ- দীন থেকে নির্গমনকারী। যখন কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো তখন আরবরা বলত- قَدْ صَبَأَ সে দীন থেকে বেরিয়ে গেছে। এ দলটিকে صَابِئٌ এজন্য বলা হয় যে, তারা ইহুদি এবং খ্রিষ্টধর্ম থেকে বেরিয়ে তারকারাজির পূজা-পার্বনে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের কেন্দ্রভূমি ছিল حَرَّانُ [হাররান]। আবূ ইসহাক সাবী এ দলের সাথে সম্পর্ক রাখত।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এ জুমলার নয়টি তারকীব হতে পারে। তন্মধ্যে সহজ তিনটি তারকীব প্রদত্ত হলো-

১. اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, নাসেব। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اٰمَنُوْا সেলাহ। صَلِى এবং مَوْصُوْل মিলে اِنَّ -এর ইসিম فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ এটি জুমলা হয়ে اِنَّ-এর উহ্য খবর।

২. وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ
وَاوْ হলো اِسْتِيْنَافِيَّةٌ আর اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। هَادُوْا সেলাহ। صِلَةٌ এবং مَوْصُوْل মিলে আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ وَالصَّابِئُوْنَ হলো مَعْطُوْف ; مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং وَالنَّصَارٰى মা'তুফ এখন তিন مَعْطُوْف মিলে مُبْدَلٌ مِنْهُ হয়েছে। مَعْطُوْف এবং مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ হলো مَعْطُوْف এখন مَعْطُوْف عَلَيْهِ আর وَعَمِلَ صَالِحًا জুমলা হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْهِ মিলে بَدْلٌ তারপর مُبْدَلٌ مِنْهُ . بَدْلٌ মিলে মুবতাদা। فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ জুমলা হয়ে মুবতাদার খবর।

৩. اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। اٰمَنُوْا হলো সেলাহ। সেলাহ-মাওসূল মিলে মা'তুফ আলাইহি। وَاوْ আতেফা। اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল। هَادُوْا সেলাহ। ইসমে মাওসূল এবং সেলাহ মিলে মা'তুফ আলাইহি। وَاوْ عَاطِفَةٌ الصَّابِئُوْنَ মা'তুফ আলাইহি এবং মা'তুফ। وَاوْ হরফে আতফ। اَلنَّصَارٰى মা'তুফ। তিন মা'তুফ মিলে مُبْدَلٌ مِنْهُ আর مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ হলো بَدْلٌ ; বদল-মুবদাল মিনহু মিলে اِنَّ-এর ইসিম। فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ হলো اِنَّ-এর খবর।

قَوْلُهُ كَذَّبُوْهُ : এটি كُلَّمَا-এর উহ্য جَزَاءٌ

قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيْرُ بِهِ : অর্থাৎ এখানে مَاضِىْ-এর সীগাহ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে مُضَارِعٌ-এর সীগাহ। এর একটি কারণ হলো حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٌ হিসেবে করা হয়েছে। আরেকটি কারণ হলো, فَاصِلَةٌ বা আয়াতের শেষ ছন্দ মিলের জন্য।

قَوْلُهُ تَقَعُ : এতে ইশারা করা হয়েছে যে, تَكُوْنُ **শব্দটি** تَامَّةٌ **সুতরাং** তার খবরের প্রয়োজন নেই। فِتْنَةٌ হলো تَكُوْنُ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيْرِ : অর্থাৎ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ عَمُوْا وَصَمُّوْا **-এর যমীর থেকে** بَدْلُ الْبَعْضِ হয়েছে। এও হতে পারে যে, كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ হলো اُولٰئِكَ উহ্য মুবাতাদার খবর।

قَوْلُهُ فِرْقَةٌ مِنَ النَّصَارٰى : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা রয়েছে যে, **হযরত ঈসা (আ.)**-কে যারা ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ বলে তারা নাসারাদের একটি ফেরকা। এছাড়াও নাসারাদের আরো ফেরকা রয়েছে **যারা হযরত ঈসা (আ.)-কে** ইলাহ মনে করে। সুতরাং উভয় কথায় কোনো বৈপরীত্ব থাকলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ الخ : প্রচারকার্যের তাগিদ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা : এ আয়াতদ্বয়ের এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকুতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বক্রতা, **বিপথগামিতা, হঠকারিতা** এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও **সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে** মহানবী ﷺ নিরাশ হয়ে পড়তেন। কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকাজে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় **প্রতিক্রিয়া এরূপ** হতে পারতো যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনে **পরওয়া না করে প্রচারকাজে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ** থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের **সম্মুখীন** হতে **হতো। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটাই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভালো, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।**

আয়াতের فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য, এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌঁছতে বাকি রাখেন, তবে আপনি পয়গাম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজের সময় মহানবী ﷺ -এর একটি উপদেশ : বিদায় হজের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিকে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিকে দয়ার সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গাম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন– اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সাহাবীরা স্বীকার করলেন, জী হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এরপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছে, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণির লোককে বোঝানো হয়েছে। যথা– ১. যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। ২. যারা তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌঁছানোর পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথরূপে পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট **আমানতের ন্যায়** অনুভব করেছেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে **যতাসাধ্য চেষ্টা করেছেন**। যদি কোনো বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন তবে **মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা** দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন, যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। **সহীহ বুখারীতে হযরত** মুআজ (রা.)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে **اَخْبَرَ بِهٖ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهٖ تَاَثُّمًا অর্থাৎ** এ আমানত না পৌঁছানোর কারণে গুনাহগার হওয়ার ভয়ে হযরত মুআজ (রা.) **হাদীসটি** মৃত্যুর সময় **বর্ণনা করেছেন।** وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া **হয়েছে যে, যত** বিরোধিতাই **করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ** করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসেবে সাধারণভাবে মহানবী ﷺ -এর সাথে **সাথে থাকতেন** এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। **কারণ, এ দায়িত্ব** স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন।

হযরত হাসান (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে দারুন ভয়ের **সঞ্চার হয়েছিল**। কারণ চতুর্দিক থেকে হয়তো সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা কররবে। অতঃপর যখন এ **আয়াত** অবতীর্ণ হলো, তখন ভয়ভীতি দূর হয়ে **অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়।**

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এর প্রচারকাজে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ **-এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম** হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও **জিহাদে** সাময়িকভাবে কোনোরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থি নয়। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৭৪, ১৭৫]

قَوْلُهُ يَآ اَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ : যোগসূত্র : পূর্বে আহলে কিতাবদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের **বর্তমান** তরিকা, যা সত্য বলে তারা দাবি করে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা অসার; মুক্তির জন্য এটা যথেষ্ট নয়, বরং মুক্তি **ইসলামের উপরই নির্ভরশীল**। এতদসত্ত্বেও তাদের কুফরকে আঁকড়ে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সান্ত্বনার বিষয়বস্তু **বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝখানে বিশেষ** সম্পর্ক ও প্রয়োজন হেতু প্রচার কার্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৭৬]

قَوْلُهُ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ : কাফেরদের জন্য দুঃখ করবে না : হুজুর ﷺ অধিক দয়া-মমতাপ্রবণ হওয়ার কারণে কাফেরদের অবস্থা দর্শনে খুবই চিন্তান্বিত ও পেরেশান **থাকতেন। তাঁকে বলা** হচ্ছে- আপনি এতো চিন্তিত ও দুঃখিত হবেন না। তারা তো তাদের বিদ্রোহ ও শত্রুতার কারণে আজাবের **উপযুক্ত বা** হকদার হয়েছে। কাজেই সহমর্মিতা বিবেচনার কোনো অবকাশ নেই। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা **দেওয়া হয়েছে,** তাঁকে চিন্তিত বা চিন্তান্বিত হতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা, তা ছিল তাঁর জন্য সান্ত্বনা, তাঁকে চিন্তিত হতে নিষেধ **করা হয়নি। কেননা** চিন্তামুক্ত হওয়া তাঁর জন্য সম্ভব ছিল না; বরং তাঁকে শান্ত থাকতে বলা হয়েছে এবং অধিক পেরেশানী প্রকাশ **করতে নিষেধ করা** হয়েছে। আপনি তাদের উপর লা'নত ও আজাব নাজিল হওয়ার কারণে আফসোস করবেন না। কেননা তারা **কাফের, ফলে আজাব ও লা'নতের** হকদার। -[তাফসীরে কাবীর]

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, যারা সত্য দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের ব্যাপারে বেশি চিন্তা করবেন না, যেমন অধিক স্নেহপ্রবণ লোকেরা **করে থাকে**। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-২৩৭]

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ الخ : এতে সহজবোধ্যতার কারণে কিছু **শব্দকে** আগেপিছে করা হয়েছে। **এছাড়া আর কোনো** পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সাফল্য অর্জন সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল : উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারো বংশগত ও **জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস** ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক আমার **কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা** সুস্পষ্ট যে, কুরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার **মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাত** ও ইঞ্জীলেও এরই **নির্দেশ** রয়েছে এবং কুরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই **অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কুরআন** অবতরণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি **বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তাওরাত,** ইঞ্জীল ও যাবুরের অনুসরণ **বিশুদ্ধ হতে** পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব **সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যারা** মুসলমান হবে, তারাই পরকালে **মুক্তি ও ছওয়াবের** অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, **এরা কুফর** ও পাপের পথে থেকে এ যাবত ইসলাম ও **মুসলমানদের বিরুদ্ধে** যেসব হীন চক্রান্ত করেছে মুসলমান হওয়ার পর এদের **পরিণাম** কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, **অতীত সব গুনাহ** ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের **উল্লেখ** নিষ্প্রয়োজন। কেননা আয়াতে যে স্তরের ঈমান **ও আনুগত্য কামনা করা** হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ **স্তরের প্রতি** যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু **তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল**। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোনো শাসনকর্তা অথবা বাদশা এরূপ স্থলে বলে থাকেন, আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যেই আনুগত্য করবে সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছে। যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমার যে কৃপাদৃষ্টি তা কোনো বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়; বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরিউক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অংশ তিনটি। যথা– আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম।

রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই : এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। এ আয়াত সে ক্ষেত্রে নয় ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহ্বান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে রাসূল অথবা রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুষ্ঠুরূপে উল্লিখিত না হওয়ার কোনো সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনোরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কুরআনও তার শত শত আয়াতে রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিকে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল ও রাসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোনো ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রিসালত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, 'প্রত্যেক বিজ্ঞ ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মূর্তিপূজারী হিন্দু থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে; পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়।' [নাউযুবিল্লাহ]

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে কুরআন পাঠের শক্তি এবং কুরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কুরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করতে খুব বেশি বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। যারা কুরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লিখিত হলো–

ঈমানে মুফাসসালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারার শেষভাগে কুরআনের ভাষা এরূপ– كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ অর্থাৎ সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গাম্বরগণের প্রতি এভাবে যে, তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে আমরা কোনোরূপ পার্থক্য করি না। এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঈমানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে একথাও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো একজন অথবা কয়েকজন পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কখনো মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং সমস্ত পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই শর্ত। যদি একজন রাসূলও বিশ্বাস থেকে বাদ পড়েন, তবে এরূপ ঈমান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا .

অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং রাসূলদের অস্বীকার করে, আল্লাহ এবং রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় [অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পয়গাম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না] এবং যারা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে অন্য কোনো রাস্তা করে নিতে চায়, তবে বুঝে নাও যে, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফের।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهٗ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ অর্থাৎ আজ হযরত মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে– এরূপ বলা কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ নয় কি?

এছাড়া যে কোনো যুগে যে কোনো ধর্ম পালন করাই যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে শেষ নবী ﷺ -এর আবির্ভাব ও কুরআন অবতরণ এবং এক শরিয়তের পর অন্য শরিয়ত প্রেরণ করা অর্থহীন। প্রথম রাসূল যে শরিয়ত ও যে গ্রন্থ নিয়ে আগমন

করেছিলেন, তাই যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য রাসূল ও গ্রন্থ প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল? বড়জোর এমন একদল লোক থাকাই যথেষ্ট **হতো, যারা সেই শরিয়ত ও গ্রন্থের** হেফাজত করতেন এবং তা পালন করতে ও করাতে সচেষ্ট হতেন; সাধারণভাবে যা প্রত্যেক **উম্মতের আলেমরা করে** থাকেন। এমতাবস্থায় কুরআন পাকের এ উক্তির কি মানে হয় যে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا [**অর্থাৎ আমি** তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরিয়ত ও বিশেষ পথ নির্ধারণ করেছি?]

এরপর এর কি বৈধতা থাকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ রিসালত ও কুরআনে অবিশ্বাসী ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য জাতির সাথে **শুধু প্রচার যুদ্ধই** করেননি; বরং তরবারির যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছেন? ঈমানদার ও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যদি শুধু **আল্লাহর প্রতি** এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট হতো, তবে বেচারা ইবলীস কোন পাপে বিতাড়িত হলো? **আল্লাহর প্রতি কি** তার বিশ্বাস ছিল না, কিংবা সে কি পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল? সে তো ক্রোধান্বিত অবস্থায় إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ [পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত] বলে পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল।

বাস্তব সত্য এই যে, এ বিভ্রান্তিটি হচ্ছে ঐসব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের ফসল, যারা মনে করে যে, দীন বিজাতিকে উপঢৌকন হিসেবে দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে বিজাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথচ কুরআন পাক প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছে যে, অমুসলমানদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, মানবতা ইত্যাদি সবকিছুই করা দরকার, কিন্তু ধর্মের চতু:সীমার পুরোপুরি সংরক্ষণ এবং এর সীমান্তের দেখাশোনার দায়িত্ব উপেক্ষা করে নয়। কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস একেবারেই উল্লেখ করা না হতো, তবুও অন্য যেসব আয়াতে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতগুলোই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং এ আয়াতেও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ কুরআনের পরিভাষায় 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' বললে সে বিশ্বাসই ধরতে হবে যাতে আল্লাহর নির্দেশিত সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বস স্থাপন করা হয়। কুরআনের এ পরিভাষায় নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে- فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাস যেরূপ ছিল, একমাত্র সেরূপ বিশ্বাসই 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস' নামে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাসের বড় স্তম্ভই যে 'রাসূলের প্রতি বিশ্বাস' ছিল একথা কারো অজানা নয়। তাই مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শব্দের মধ্যে 'রাসূলের প্রতি বিশ্বাস' ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৮০-১৮৩]

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ : كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُهُمْ **অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের কাছে** তাদের রাসূল যখন কোনো নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচি বিরুদ্ধ হতো, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করতো এবং পয়গাম্বরদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করতো এবং কাউকে হত্যা করতো। এটি ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতো। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোনো সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন বিদ্রোহের কুপরিণাম কখনো সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর হুঁশিয়ারি থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত কাজ তাই করতে থাকে। এমন কি, কতক পয়গাম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বাদশা বখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। হযরত ঈসা (আ.)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। -[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৮৪]

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ : অর্থাৎ হযরত মসীহ, রূহুল কুদস ও আল্লাহ কিংবা মসীহ, মারইয়াম ও আল্লাহ সবাই আল্লাহ। [নাঊযুবিল্লাহ] তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ। এরপর তাঁরা তিনজনই এক; একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তি বিরোধী ধর্ম বিশ্বাসকে তারা জটিল ও স্বার্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারো বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়।

মসীহ (আ.)-এর উপাস্যতা খণ্ডন : قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ অন্যান্য পয়গাম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি, যা উপাস্য হওয়ার

লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ (আ.) যিনি তাঁদের মতোই একজন মানুষ স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না। চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীব-জন্তু থেকে সে পরাঙমুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌঁছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত কিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মাসীহ ও মারইয়ামের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি– মসীহ ও মারইয়াম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোনো বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানবমণ্ডলীর মতো স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগত থেকে পরাঙমুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থি যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে যাবে। [নাউযুবিল্লাহ]

হযরত মারইয়াম (আ.) পয়গাম্বর ছিলেন নাকি ওলী? : হযরত মারইয়ামের পয়গাম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صِدِّيْقَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন নবী নন। কারণ প্রশংসার স্থলে সাধারণত উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نَبِيَّةٌ বলা হতো। অথচ বলা হয়েছে صِدِّيْقَةٌ এটি ওলীত্বের একটি স্তর। –[রূহুল মা'আনী, সংক্ষেপিত]

আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ মহানবী ﷺ -এর পূর্বে পুরুষদের কাছেই ওহী প্রেরিত হয়েছে। [সূরা ইউসুফ : রুকু১২] –[মা'আরিফুল কুরআন : খ. ৩, পৃ. ১৮৭, ১৮৮]

قَوْلُهُ قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ : বনী ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাঁদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রেরিত রাসূল যারা তাদের অক্ষ জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ অর্থাৎ কোনো কোনো পয়গাম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করে ফেলে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর পয়গাম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কাউকে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গাম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিণত করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে– لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ অর্থাৎ যেসব বনী ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামেরই নাম, তারা কাফের হয়ে গেছে। এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রিস্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদিদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ অর্থাৎ ইহুদিরা বলে যে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র।

غُلُوٌّ শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লঙ্ঘন করা।

উদাহরণত পয়গাম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করা হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালঙ্ঘন।

বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি : পয়গাম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করা বনী ইসরাঈলের এ পরস্পরবিরোধী দু'টি কাজই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে– اَلْجَاهِلُ إِمَّا مُفْرِطٌ أَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি কখনো মিথ্যাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালঙ্ঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বনী ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দু'টি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গাম্বরের সাথে করেছে অর্থাৎ কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের সম্বোধন করে যেসব নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেওয়া হয়েছে, তা ধর্ম ও ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামান্য এদিক সেদিক হলেই মানুষ পথভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ : এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু রয়েছে। তাঁরই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলি শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তার জন্য দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ, যা মানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রাসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোনো গ্রন্থ তা যতই সর্ববিষয় সম্বলিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না; বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য দু'টি উপায় রেখেছেন– আল্লাহর গ্রন্থ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গাম্বরগণ তাদের উত্তরসূরী আলেম ও মাশায়েখ এরা সবাই এ মানবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকে বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও তাদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ বাক্যটিকে ভুল অর্থে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে রাসূলকে বরং পীরদেরকে ও 'আলেমুল গায়েব' এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং পীরপূজা ও কবরপূজা আরম্ভ করেছে, অপরদিকে আল্লাহর রাসূলকে শুধু একজন পত্র বাহককে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গাম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফের বলা হয়েছে তেমনি তাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহর সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে– لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ আয়াতটি এ বিষয়বস্তুর ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রাসূল ও তাঁদের উত্তরসূরীদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলির অধিকারী মনে করা আরো গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় : আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না । সূক্ষ্মদর্শী তাফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকিদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ধর্মের মাঝে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যামাখশারী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে ভিক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকরা এবং ফিকহ সংক্রান্ত মাসআলায় ফিকহবিদরা এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরিউক্ত তাফসীরবিদের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি, তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তাফসীরবিদরা বলেন, এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কুরআন ও সুন্নাহর মাসআলার যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবী এবং তাবেয়ীদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে– وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاۤءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন ৩/১৯০-১৯৩]

অনুবাদ :

٧٧. قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَا تَغْلُوْا تُجَاوِزُوْا الْحَدَّ فِىْ دِيْنِكُمْ غُلُوًّا غَيْرَ الْحَقِّ بِاَنْ تَضَعُوْا عِيْسٰى اَوْ تَرْفَعُوْهُ فَوْقَ حَقِّهٖ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَاۤءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ بِغُلُوِّهِمْ وَهُمْ اَسْلَافُهُمْ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَالسَّوَاۤءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسَطُ .

৭৭. বল, হে কিতাবীগণ! অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ, তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না, غَيْرَ الْحَقِّ : এটি এখানে উহ্য مَصْدَرْ বা ক্রিয়ামূল। غُلُوْ -এর صِفَتْ বা বিশেষণ এটা বোঝানোর জন্য তাফসীরে غُلُوًّا -এর উল্লেখ করা হয়েছে। সীমালঙ্ঘন করো না। যেমন, হযরত ঈসা (আ.)-কে নীচু মনে করো না বা তাঁকে স্বীয় স্থান হতে উর্ধ্বেও তুলো না। আর যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে বাড়াবাড়ির কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষগণ এবং অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ সত্যপথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। اَلسَّوَاۤءُ -এর আসল অর্থ হলো মাঝামাঝি।

٧٨. لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ بِاَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَهُمْ اَصْحَابُ اَيْلَةَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط بِاَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَمُسِخُوْا خَنَازِيْرَ وَهُمْ اَصْحَابُ الْمَاۤئِدَةِ ذٰلِكَ اللَّعْنُ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ .

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়াম-তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। দাউদ আয়লা অধিবাসীদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা বানরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। [সূরা মায়িদার শেষে এদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।] আর মায়িদাওয়ালাদের বিরুদ্ধে হযরত ঈসা (আ.) বদদোয়া করলে তারা শূকরে পরিণত হয়েছিল। এটা অর্থাৎ এ অভিশাপ এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী।

٧٩. كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ اَىْ لَا يَنْهٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنْ مُعَاوَدَةِ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ فَلَهُمْ هٰذَا .

৭৯. তারা যেসব গর্হিত কাজ করতো তা হতে তার অভ্যাস হতে তারা পরস্পরকে একে অন্যকে বারণ করতো না নিষেধ করতো না। তারা যা করতো তা অর্থাৎ তাদের এ কর্ম কত নিকৃষ্ট।

٨٠. تَرٰى يَا مُحَمَّدُ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ بُغْضًا لَكَ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ مِنَ الْعَمَلِ لِمَعَادِهِمِ الْمُوْجِبِ لَهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ .

৮০. হে মুহাম্মাদ! তাদের অনেককে তুমি তোমার প্রতি বিদ্বেষবশত মক্কার সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। কত নিকৃষ্ট যা অর্থাৎ যে কাজ তারা তাদের পরকালের জন্য আগে পাঠিয়েছে। তা আখিরাতে তাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী। যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর শাস্তিতে তারা স্থায়ী হবে।

٨١. وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَيِ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ خَارِجُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ ـ

৮১. তারা আল্লাহ, নবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী হলে তাদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতো না; কিন্তু তাদের অনেকে সত্যত্যাগী, ঈমানের সীমার বাইরে।

٨٢. لَتَجِدَنَّ يَا مُحَمَّدُ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لِتَضَاعُفِ كُفْرِهِمْ وَجَهْلِهِمْ وَانْهِمَاكِهِمْ فِىْ اِتِّبَاعِ الْهَوٰى وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّا نَصٰرٰى ط ذٰلِكَ اَىْ قُرْبُ مَوَدَّتِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ عُلَمَاءَ وَرُهْبَانًا عُبَّادًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ الْحَقِّ كَمَا يَسْتَكْبِرُ الْيَهُوْدُ وَاَهْلُ مَكَّةَ ـ

৮২. হে মুহাম্মাদ! অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদি ও মক্কার অংশীবাদীদেরকেই অজ্ঞানতা, কুফরির আধিক্য এবং রিপু-প্রবৃত্তি চরিতার্থকরণে এদের মগ্নতার দরুন এদেরকে তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং যারা বলে 'আমরা খ্রিস্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখতে পাবে। এটা অর্থাৎ বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে হওয়া এ কারণে যে তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারমুক্ত লোক অর্থাৎ ইবাদতকারী রয়েছে আর তারা ইহুদি ও মক্কাবাসীদের মতো আল্লাহর ইবাদত করা হতে অহংকারও করে না। بِاَنَّ : এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَيْلَةَ : তাবরিয়া সাগরের তীরে অবস্থিত একটি জনপদ।

قَوْلُهُ مَعَاوَدَةً : এটি একটি سُوَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব। প্রশ্নটি হলো, مُنْكَرْ বা মন্দকাজ করার পর তা থেকে নিষেধ করার না কোনো উপকারিতা আছে না তা কোনো যৌক্তিক বিষয়। কেননা যে জিনিস সংঘটিত হয়ে গেছে তা নিঃশেষ করা সম্ভব নয়। এখানে مُعَاوَدَةً মুযাফকে মাহযূফ মেনে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে مُنْكَرْ বা মন্দকাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ فِعْلُهُمْ : এটি مَا -এর বয়ান।

قَوْلُهُ هٰذَا : এটি مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ

قَوْلُهُ مِنْهُمْ : اَىْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

قَوْلُهُ الْمُوْجِبِ : প্রশ্ন এখানে اَلْمُوْجِبِ উহ্য ধরার কী প্রয়োজনীয়তা ছিল? উত্তর : এ জন্য যে, اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ হলো مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ আর مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ ফায়েলের بَيَانْ হয়ে থাকে। আর سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ বাক্যটি مَا قَدَّمَتْ -এর বয়ান হওয়া সহীহ হবে না যতক্ষণ اَلْمُوْجِبِ মুযাফকে মাহযূফ ধরা না হবে। কেননা مَا قَدَّمَتْ আহলে কিতাবের ফেয়েল এবং سَخِطَ আল্লাহর ফেয়েল। সুতরাং হামল শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ قِسِّيْسِيْنَ : রোমীয় ভাষায় এর অর্থ হলো আলেমগণ। পণ্ডিতবর্গ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম : দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে **বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর** অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে প্রথমত হযরত দাউদ (আ.)-এর মুখে, যার ফলে তাদের **আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে শূকরে পরিণত হয়।** অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষাজনিত এ অভিসম্পাত তাদের **ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক** প্রতিক্রিয়া **এই হয়** যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোনো কোনো **তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এখানে স্থানো**পযোগিতার কারণে মাত্র দুজন পয়গাম্বররের ভাষ্যে তাদের উপর অভিসম্পাত **বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে** তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা **(আ.) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী হযরত** মুহাম্মাদ ﷺ -এর বক্তব্যে। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গা**ম্বরের উক্তির মাধ্যমে তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত** হয়েছে, যারা পয়গাম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে **সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিতে অংশীদার** করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। -**[মা'আরিফুল কুরআন : ৩/১৯৩]**

قَوْلُهُ لَا يَتَنَاهَوْنَ : এর দু'টি **অর্থ হতে পারে ক. বিরত হতো না। -[রূহুল মা'আনী] খ. একে অন্যকে বাধা দিতো না।** এটাই প্রসিদ্ধ। **যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে পাপাচার ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায় এবং বাধা দেওয়ার কেউ থাকে না তখন সর্বগ্রাসী শাস্তির আশঙ্কা থাকে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২০৯]**

قَوْلُهُ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ : এ হলো তাদের আজাব যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ যে আল্লাহ রাগান্বিত তাদের উপর, এখানে اَنْ শব্দটি مَوْصُوْلَةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে কারণে। -[জুমাল] مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ যা তারা পাঠিয়েছে তাদের আগে অর্থাৎ নিজেদের আমল কুফরি আকাঈদ, যার প্রতিফল তারা আখিরাতে ভোগ করবে। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা ২৬৫]

قَوْلُهُ النَّبِيُّ : এর দ্বারা কতক তাফসীরবেত্তা হযরত মূসা (আ.)-কে এবং আর কতিপয়ে হযরত নবী করীম ﷺ -কেও বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, ঐসব ইহুদিরা যদি বাস্তবিকই হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতা ও শিক্ষামালায় বিশ্বাস থাকত, তবে হযরত মূসা (আ.) যার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সেই আখেরী নবীর বিরুদ্ধে তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করতো না, অথবা তারা যদি নবী কারীম ﷺ -এর প্রতি নিষ্ঠাবান বিশ্বাস স্থাপন করতো তবে ইসলামের দুশমনদের সাথে যোগসাজশ করার মতো অপতৎপরতা তাদের দ্বারা সংঘটিত হতো না। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হিসেবে আয়াতের সম্পর্ক ইহুদি ও মুনাফিকদের সাথে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা-২১২]

নাসারাদের ইসলামপ্রীতি : এখানে নাসারাদের ইসলামের সাথে সম্পর্কের দিকে দিয়ে নিকটবর্তী হওয়ার দু'টি কারণ **বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো তাদের মাঝে জ্ঞান**-পিপাসু, রাত্রি জাগরণকারী জ্ঞানী ব্যক্তি ও দুনিয়াত্যাগী দরবেশরা আছেন। **দ্বিতীয়ত তাদের অন্তরে বিনয়-নম্রতা** বিরাজমান। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য, ঐ প্রকৃত ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সাধারণ মাসিহী, **বিশেষত ফিরিঙ্গী কাওম এখানে** উদ্দেশ্য হতেই পারে না। কেননা, উপরিউক্ত দু'টি গুণের অভাব এদের মাঝে আছে; বরং এর **অর্থ হলো সে পুরাতন** 'নাসারা কাওম' [Nazarenes]।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা এ জন্য যে, অর্থাৎ এসব নাসারাদের ইসলামের সাথে নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণ।

قَوْلُهُ قِسِّيْسِيْنَ : قَسٌّ -এর আভিধানিক অর্থ হলো রাত্রিতে কোনো বস্তু অন্বেষণ করা। যেমন উল্লেখ আছে قَسٌّ -এর **আসল অর্থ হলো,** 'কোনো বস্তু রাত্রিতে তালাশ ও অন্বেষণ করাকে قَسٌّ বলা হয়। -[রাগিব] আর নাসারা আলেমগণ যেহেতু রাত্রি **জাগরণকারী** আবিদ ছিলেন, তাই তাদেরকে قِسِّيْسٌ বলা হয়। [ইমাম রাগিব (র.) বলেন,] قِسِّيْسٌ হলো নাসারা সর্দারদের **মাঝের** আলেম ও আবিদ ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য ভাষা বিজ্ঞানদের এরূপ মতও বর্ণিত আছে যে, قِسِّيْسٌ শব্দটি আরবি শব্দ, যা সুরিয়ানী বা ল্যাটিন ভাষা থেকে এসে আরবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অভিজ্ঞ আলেমগণ এ আয়াত থেকে এ তত্ত্ব বের করেছেন যে, বিনয় ইত্যাদি উত্তম গুণাবলি সব সময়ই মর্যাদার দাবি রাখে, তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, এমন কি তা নাসারাদের কাছে পাওয়া গেলেও। যেমনটা উল্লেখ আছে। এ আয়াত এ কথার দলিল যে, বিনয়, 'ইলম ও আমলে উৎকর্ষ লাভ করা এবং প্রবৃত্তি পরায়ণতা পরিহার করা প্রশংসনীয় কাজ, তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন। -[রূহুল মা'আনী]

এ আয়াত একথার দলিল যে ইলমের মর্যাদা হলো হেদায়েতের রাস্তার নির্দেশক এবং উত্তম পরিণতির সহায়ক। -[বাহর]

তাফসীরে মাদারিকে উল্লেখ আছে যে, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়- ইলম খুবই উপকারী বস্তু, তা কল্যাণের রাস্তা দেখায়, যদিও তা জ্ঞান-পিপাসু পণ্ডিতদের ইলম হয়। এরূপ আম্বিয়াতের ইলম, যদিও তা সংসার ত্যাগী দরবেশ এবং অহংকারমুক্ত কোনো নাসারার ইলমও হয়।

হাকীমুল উম্মত থানভী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জ্ঞান ও আখলাকের উপর আমলের বিরাট প্রভাব আছে। যে জন্য তরিকতের মাশায়েখগণ আমলের উপর ইলম ও আখলাকের গুরুত্বও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। -[তাফসীরে মাজেদী : টীকা-২৭০]

জ্ঞাতব্য : বর্তমান ফিরিঙ্গি কওম তো নিজেদেরকে প্রকাশ্যভাবে মাসীহী হিসেবে স্বীকার করে না, নাসারা বলা তো দূরের কথা! আধা নাস্তিক ও আধা মুশরিক কওমের নাসারাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই; কাজেই তাদের বন্ধুত্বের বা শত্রুতার ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। -[তাফসীরে মাজেদী]

اَلْجُزْءُ السَّابِعُ : সপ্তম পারা

অনুবাদ :

٨٣. نَزَلَتْ فِيْ وَفْدِ النَّجَّاشِيِّ الْقَادِمِيْنَ مِنَ الْحَبْشَةِ قَرأَ عَلَيْهِمْ ﷺ سُوْرَةَ يٰسٓ فَبَكَوْا وَاَسْلَمُوْا وَقَالُوْا مَا اَشْبَهَ هٰذَا بِمَا كَانَ يَنْزِلُ عَلٰى عِيْسٰى قَالَ تَعَالٰى وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ مِنَ الْقُرْاٰنِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا صَدَّقْنَا بِنَبِيِّكَ وَكِتَابِكَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ الْمُقِرِّيْنَ بِتَصْدِيْقِهِمَا ـ

৮৩. একবার হাবশা হতে সম্রাট নাজাশীর প্রতিনিধি হিসেবে একদল লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে আসে। তিনি তাদেরকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে শুনান। এটা শুনে তারা কেঁদে ফেলে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ঐ সময় বলেছিল, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার সাথে এটা কত সাদৃশ্যপূর্ণ। এ উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল কুরআন তা যখন তারা শ্রবণ করে তখন যে সত্য তারা উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে! তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। তোমার নবী ও কিতাব সত্য বলে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর। এতদুভয়ের সত্যতা যারা স্বীকার করেছে তাদের।

٨٤. وَقَالَ فِيْ جَوَابِ مَنْ عَيَّرَهُمْ بِالْاِسْلَامِ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ اَلْقُرْاٰنِ اَىْ لَا مَانِعَ لَنَا مِنَ الْاِيْمَانِ مَعَ وُجُوْدِ مُقْتَضِيْهِ وَنَطْمَعُ عَطْفٌ عَلٰى نُؤْمِنُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ ـ

৮৪. এবং তারা বলেছিল, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ইহুদিরা তাদেরকে লজ্জা দিলে তারা উত্তরে বলেছিল, আল্লাহ ও আমাদের নিকট আগত সত্যে কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন না করার কি আছে? অর্থাৎ ঈমান আনার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের ঈমান আনয়নের পথে কোনো বাধা নেই। এবং আমাদের প্রভু আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অর্থাৎ মু'মিনদের সাথে জান্নাতে অন্তর্ভুক্ত করুন এ প্রত্যাশা না করার কি কারণ থাকতে পারে? وَنَطْمَعُ পূর্বোল্লিখিত نُؤْمِنُ -এর সাথে এর عَطْفٌ বা অন্বয় সাধিত হয়েছে।

٨٥. قَالَ تَعَالٰى فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ بِالْاِيْمَانِ ـ

৮৫. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এবং তাদের এ কথার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এটা ঈমানের বিষয়ে আন্তরিকতা পোষণকারীদের পুরস্কার।

٨٦. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ـ

৮৬. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে তারাই অগ্নিবাসী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاِذَا سَمِعُوْا : শুরুর وَاوْ টি যদি اِسْتِيْنَافِيَهْ ধরা হয় তাহলে এটি كَلَامْ مُسْتَأْنِفْ হবে। মুফাসসির (র.) قَالَ تَعَالٰى বলে এ তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর যদি وَاوْ টি عَاطِفَةْ হয় তাহলে তার عَطْف [সম্পর্ক] হবে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ -এর সাথে। اَىْ ذٰلِكَ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

قَوْلُهُ رَبَّنَا اٰمَنَّا : এটি جُمْلَةْ مُسْتَأْنِفَةْ যা একটি سُؤَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে যখন তাদের সে অবস্থা হতো তখন তারা কি বলত? তার জবাব হলো- يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا

قَوْلُهُ مُقْتَضِيَه : অর্থাৎ যেহেতু ঈমানের مُوْجِبْ বিদ্যমান রয়েছে এবং সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহ তাদের মাঝে রয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى نُؤْمِنُ : অর্থাৎ نَطْمَعُ -এর আতফ نُؤْمِنُ -এর সাথে। এটি مُبْتَدَأْ مَحْذُوْفْ -এর খবর নয়। اَىْ نَحْنُ نَطْمَعُ কেননা, হযফ হওয়াটা জাহেরের খেলাফ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ الخ : এ প্রত্যয়নকারী ব্যক্তি কারা ছিলেন? হাদীস ও জীবনচরিতের পুস্তকাদি থেকে সর্বসম্মতভাবে জানা যায় যে, এঁরা হলেন আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশী [মৃ. ৯ হিজরি] এবং তাঁর পরিষদবর্গ। এঁরা সত্য মনীষী ছিলেন। নবী করীম ﷺ হিজরতের পূর্বে যখন মক্কা মুয়াযযমা থেকে একদল সাহাবীকে হাবশাতে হিজরত করতে বলেন, তখন ঘটনাক্রমে হযরত জাফর তাইয়্যার (রা.) নাজাশীর ফরমায়েশ অনুযায়ী পরিপূর্ণ দরবারে সূরা মরিয়মের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শুনান। ফলে নাজাশী এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত সকলে অভিভূত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতটি নাজাশী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শানে নাজিল হয়। ইবনে হিশাম বলেন, আল্লাহর শপথ! নাজাশী এমনভাবে ক্রন্দন করেন যে, তাঁর দাড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তার সঙ্গী-সাথীরাও এমনভাবে কাঁদেন যে, তাঁদের মাসহাফসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়, যখন তাঁরা শুনেন যা তাঁদের কাছে তেলাওয়াত করা হয়। অতঃপর নাজাশী বলেন, নিশ্চয় এটা এবং যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.) একই উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে।

قَوْلُهُ مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ : যা নাজিল হয়েছে রাসূলের প্রতি। এটি ছিল সূরা মরিয়মের আয়াত। তিনি তাঁর সামনে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ এর প্রথম থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর হযরত জাফর (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন তাঁদের সামনে আরো কুরআন তেলাওয়াত করেন। তখন তিনি সূরা মরিয়ম পাঠ করেন।

قَوْلُهُ اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ : তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত। اِفَاضَةْ অর্থাৎ অশ্রু অধিক প্রবাহিত হয়। কুরতুবী (র.) বলেন, উত্তম ফায়েজ হলো যখন তা অধিক হয় এবং প্রবাহিত হয়, যেমন পানির প্রবাহ। জ্ঞানীদের প্রতিক্রিয়া এরূপই হয়ে থাকে। তারা হা-হুতাশ করে না, কিন্তু তাদের অশ্রু নির্গত হতে থাকে। তিনি আরো বলেন, এ হলো বিজ্ঞজনদের অবস্থা যে, তারা ক্রন্দন করে, কিন্তু চিল্লাচিল্লি করে না; তারা প্রার্থনা করে, কিন্তু চিৎকার করে না।

قَوْلُهُ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ الخ : এজন্য যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করেছে। সত্য কথার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অশ্রু বিগলিত হওয়া এবং ক্রন্দন করা যেন সালেহীন বা নেককারদের রীতি। তাওরাতে আছে, সবলোক শরিয়তের কথা শুনে ক্রন্দন করত। অতিরিক্ত হাসি যেমন অমনোযোগিতার প্রমাণ; তেমনি কলবের ভীতি-সন্ত্রস্ততা নিদর্শন হলো জীবন্ত আত্মা বা রূহের। اَلْحَقُّ শব্দটি আনার তাৎপর্য হলো, ইঞ্জীলে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জবানীতে আখেরী নবী আসার যে ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত আছে, তার ব্যাখ্যা 'রূহে হক' বা 'সত্য আত্মার' দ্বারা করা হয়েছে।

মুরশিদ হাকীমুল উম্মত থানবী (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা সুফিদের 'অজদ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'অজদ' নাম হলো অনিচ্ছাকৃত প্রশংসিত অবস্থার। فَاكْتُبْنَا তালিকাভুক্ত করুন আমাদের। এখানে اَلْكِتَابُ -এর অর্থ হলো- স্থিরভাবে বানিয়ে দেওয়া বা করে দেওয়া। কুরতুবী (র.) বলেন, فَاكْتُبْنَا -এর অর্থ হলো- আমাদের তার অন্তর্ভুক্ত যা লেখা হয়ে গেছে। اَلشَّاهِدِيْنَ সাক্ষ্যবহনের শামিল অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর কালাম এবং মুহাম্মদ ﷺ যে সত্য নবী এর সাক্ষী। আবূ আলী বলেন, যারা সাক্ষ্য দেয় আপনার নবী কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদন করে।

قَوْلُهُ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ : এজন্য যে, তারা সত্যকে চিনেছে। এখানে প্রথম مِنْ শব্দটি سَبَبْ বা কারণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং দ্বিতীয় مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةْ বা 'হকের কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাবার শুরু অর্থে এবং দ্বিতীয়টি কিছু বা কতকের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -[মাজেদী টীকা- ২৭১]

অনুবাদ :

٨٧. وَنَزَلَ لَمَّا هَمَّ قَوْمٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَنْ يُّلَازِمُوْا الصَّوْمَ وَالْقِيَامَ وَلَا يَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَلَا يَأْكُلُوا اللَّحْمَ وَلَا يَنَامُوْا عَلَى الْفِرَاشِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط تَتَجَاوَزُوْا اَمْرَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

৮৭. কতিপয় সাহাবী একবার সংকল্প করেন যে, তাঁরা সর্বদা রোজা রাখবেন আর সালাত ও ইবাদত-বন্দেগি করবেন, কখনো নারী ও সুগন্ধির নিকটবর্তী হবেন না, মাংস আহার করবেন না ও বিছানায় শয়ন করবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করেছেন সে সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশসমূহ লঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

٨٨. وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص مَفْعُوْلٌ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُوْرُ قَبْلَهُ حَالٌ مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ

৮৮. আল্লাহ তোমাদেরকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হতে আহার কর حَلٰلًا এটা مَفْعُوْلٌ বা কর্মকারক। তৎপূর্ববর্তী جَارٌ مَجْرُوْرٌ অর্থাৎ مِمَّا রাযাকাকুম رَزَقَكُمْ হলো حَالٌ। তার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট এবং ভয় কর আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

٨٩. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ الْكَائِنِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ هُوَ مَا يَسْبِقُ اِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْحَلْفِ كَقَوْلِ الْاِنْسَانِ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَاقَدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ج عَلَيْهِ بِاَنْ حَلَفْتُمْ عَنْ قَصْدٍ فَكَفَّارَتُهٗٓ اَيِ الْيَمِيْنِ اِذَا حَنَثْتُمْ فِيْهِ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ مِنْهُ اَهْلِيْكُمْ اَيْ اَقْصَدِهٖ وَاَغْلَبِهٖ لَا اَعْلَاهُ وَلَا اَدْنَاهُ ـ

৮৯. তোমাদের নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না। নিরর্থক কসম হলো, যা শপথের ইচ্ছা ছাড়াই মুখ হতে নিসৃত হয়ে পড়ে। যেমন– কেউ কথা বলতে বলতে বলে ফেলল, لَا وَاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! এটা নয়। بَلٰى وَاللّٰهِ অর্থাৎ হ্যাঁ আল্লাহর কসম। কিন্তু যেসব শপথে তোমরা গ্রন্থি বাঁধ। অর্থাৎ যা ইচ্ছাকৃতভাবে কর। عَقَّدْتُّمْ এটা তাশদীদসহ বাবে تَفْعِيْل ও তাশীদবিহীন بَابُ ضَرَبَ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে বাবে مُفَاعَلَة - عَاقَدْتُّمْ রূপেও পঠিত রয়েছে। সেসবের জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। অনন্তর এটার অর্থাৎ কসম ভঙ্গ করলে এর কাফফারা হলো তোমরা তোমাদের জন্য পরিজনদেরকে যা খেতে দাও তার মধ্যম ধরনের দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান। অর্থাৎ প্রত্যেক দরিদ্রকে সে ধরনের খাদ্য হতে এক মুদ পরিমাণ প্রদান করতে হবে। সাধারণভাবে যা প্রচলিত এবং যা মধ্যম ধরনের তা হলেই হবে। একেবারে উচ্চশ্রেণির বা একেবারে নিম্নশ্রেণির যেন না হয়।

أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا يُسَمّٰى كِسْوَةً كَقَمِيْصٍ
وَعِمَامَةٍ وَإِزَارٍ وَلَا يَكْفِيْ دَفْعُ مَا ذُكِرَ إِلٰى
مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَوْ تَحْرِيْرُ
عِتْقُ رَقَبَةٍ ط مُؤْمِنَةٍ كَمَا فِيْ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
وَالظِّهَارِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ وَاحِدًا مِمَّا ذُكِرَ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ ط كَفَّارَتُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ
التَّتَابُعُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ
كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ط وَحَنِثْتُمْ
وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ إِنْ تَنْكُثُوْهَا مَا لَمْ
تَكُنْ عَلٰى فِعْلِ بِرٍّ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
كَمَا فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ كَذٰلِكَ أَيْ مِثْلَ مَا
بَيَّنَ لَكُمْ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান। অর্থাৎ যতটুকু পরিমাণ কাপড় পরিচ্ছদ বলে গণ্য, যেমন– একটি জামা, পাগড়ি ও লুঙ্গি দান করা। উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ একজনকে দিলে যথেষ্ট হবে না। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। কিংবা একজন দাস মুক্ত করা। স্বাধীন করা। হত্যা ও জিহার সম্পর্কিত কাফফারার সময় যেমন মু'মিন দাস মুক্ত করার বিধান বিদ্যমান তেমনি مُطْلَقٌ অর্থাৎ শর্তমুক্ত বিষয়টি مُقَيَّدٌ অর্থাৎ শর্তযুক্ত বিষয়ের উপর প্রয়োগ করার নীতি অনুসারে এখানেও কাফফারার ক্ষেত্রে দাসটিকে মু'মিন বা বিশ্বাসী হতে হবে। উল্লিখিত বিষয়সমূহের কোনো একটির যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তার কাফফারা হলো তিন দিন রোজা রাখা। বাহ্যতই বুঝা যায় অবিচ্ছিন্ন ও একাধারে এ দিনসমূহের রোজা জরুরি নয়। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর অভিমত। এটা অর্থাৎ উল্লিখিত বিধান হলো তোমরা শপথ করত ভঙ্গ করলে উক্ত শপথের কাফফারা। শপথ যদি কোনো সংক্রান্ত না হয় তবে সেটা ভঙ্গ করা হতে তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন তেমন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

٩٠. يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ
الْمُسْكِرُ الَّذِيْ يُخَامِرُ الْعَقْلَ وَالْمَيْسِرُ
الْقِمَارُ وَالْأَنْصَابُ الْأَصْنَامُ وَالْأَزْلَامُ قِدَاحُ
الْاِسْتِقْسَامِ رِجْسٌ خَبِيْثٌ مُسْتَقْذَرٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط الَّذِيْ يُزَيِّنُهُ فَاجْتَنِبُوْهُ
أَيِ الرِّجْسَ الْمُعَبَّرَ بِهِ عَنْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ أَنْ
تَفْعَلُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

৯০. হে বিশ্বাসীগণ! মদ অর্থাৎ যাতে জ্ঞান বিলোপ হওয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান সেই ধরনের নেশাকর পানীয়, মায়সির অর্থাৎ জুয়া দেব-মূর্তি প্রতিমা শর অর্থাৎ ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্যবস্তু মন্দ ও হেয় বস্তু শয়তানের কার্য। অর্থাৎ এমন কার্য শয়তান যা তোমাদের সামনে সুশোভিত করে তুলে ধরে। সুতরাং তোমরা ওটা অর্থাৎ رِجْسٌ বা কলুষিত বস্তু বলে অভিহিত এ জাতীয় বস্তুতে লিপ্ত হওয়া বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

٩١. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ اِذَا اَتَيْتُمُوْهُمَا لِمَا يَحْصُلُ فِيْهِمَا مِنَ الشَّرِّ وَالْفِتَنِ وَيَصُدَّكُمْ بِالْاِشْتِغَالِ بِهِمَا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج خَصَّهَا بِالذِّكْرِ تَعْظِيْمًا لَّهَا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ عَنْ اِتْيَانِهِمَا اَىْ اِنْتَهُوْا.

৯১. শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা অর্থাৎ যদি তোমরা এতদুভয় কার্য কর তবে তার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়; কারণ এ ধরনের কার্য দ্বারা অন্যায় ও বিশৃঙ্খলাই ঘটে এবং তোমাদরেকে এতদুভয়ের নেশায় মগ্ন করত আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হতে ফিরিয়ে রাখতে চায়। এরপরও কি তোমরা এগুলোতে লিপ্ত হওয়া হতে নিবৃত্ত হওয়ার নয়? অর্থাৎ তোমরা নিবৃত্ত হও। আল্লাহর স্মরণ ও সালাতের অধিক গুরুত্বের দরুন এখানে বিশেষভাবে এ দুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٢. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ج الْمَعَاصِىَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الطَّاعَةِ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ الْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ وَجَزَاؤُكُمْ عَلَيْنَا.

৯২. তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং পাপকার্য হতে সতর্ক হও; তোমরা যদি আনুগত্য প্রদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য। অর্থাৎ তার কাজ হলো স্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়া আর তোমাদের শাস্তি বিধান সে আমার কাজ।

٩٣. لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اَكَلُوْا مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قَبْلَ التَّحْرِيْمِ اِذَا مَا اتَّقَوْا الْمُحَرَّمَاتِ وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوْا اَثْبَتُوْا عَلَى التَّقْوٰى وَالْاِيْمَانِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ط الْعَمَلَ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ بِمَعْنٰى اَنَّهُمْ يُثِيْبُهُمْ.

৯৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা মদ, জুয়া হারাম হওয়ার পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে আহার করেছে তজ্জন্য তাদের কোনো পাপ নেই যদি তারা নিষিদ্ধ কার্যসমূহ হতে বেঁচে থাকে, বিশ্বাস স্থাপন করে অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়ার উপর কায়েম থাকে অতঃপর সাবধান হয় ও আমল ভালো করে এবং আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়দেরকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে পুণ্যফল দান করেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَفْعُوْل وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُوْرُ قَبْلَهُ حَالٌ : অর্থাৎ حَلَالًا طَيِّبًا মওসূফ সিফত মিলে كُلُوْا-এর مَفْعُوْلٌ আর مِمَّا رَزَقَكُمْ - حَلَالًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে حَالٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে। তাকদীরী ইবারত এভাবে– كُلُوْا شَيْئًا حَلَالًا كَوْنُهُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ কেননা, مما رزقكم মূলত نَكِرَةٌ-এর صِفَتٌ হওয়ার কারণে حَالٌ مُقَدَّمٌ হয়ে حَالٌ طَيِّبًا হয়েছে। মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারতে এ তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ الْكَائِنُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِىْ اَيْمَانِكُمْ হলো اَللَّغْوِ-এর সিফত; حَالٌ নয়। অথবা فِىْ اَيْمَانِكُمْ **এটা** এখানে উহ্য اَلْكَائِنُ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ مَا يَسْبِقُ اِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব।

قَوْلُهُ بِمَا عَقَّدْتُّمْ : اَيْ وَثَقْتُمْ بِالنِّيَّةِ وَالْقَصْدِ অর্থাৎ নিয়ত এবং ইচ্ছার মাধ্যমে যা দৃঢ় করেছ। শব্দটি تَعْقِيْد মাসদার থেকে مَاضِىْ جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। তোমরা গিট লাগিয়েছ, মজবুত করেছ।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عَقَّدْتُّمْ -এর مَا টি হলো مَوْصُوْلَةٌ এবং عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ জুমলা হয়ে সেলাহ। আর যখন সেলাহ জুমলা হয় তখন তাতে যমীর عَائِدْ হওয়া জরুরি হয়। আর সেটি হলো عَلَيْهِ ।

قَوْلُهُ حَنِثْتُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শুধু কসম কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার سَبَبْ বা কারণ নয়; বরং কসম ভঙ্গ করা হলো কাফফারার সবব।

قَوْلُهُ مُؤْمِنَةٍ : এটি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে।

قَوْلُهُ مُدٌّ : এক মুদের পরিমাণ ৬৮ তোলা ৩ মাশা অথবা ৭৯৬ গ্রাম ৬৮ মিলিগ্রাম।

قَوْلُهُ كَفَّارَتُهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَصِيَامُ হলো مُبْتَدَأْ আর كَفَّارَةٌ হলো তার উহ্য খবর।

قَوْلُهُ حَيْثُ مُسْتَقْذَرٌ : اَلرِّجْسُ -এর অর্থ অধিকাংশের মতে نَجَسٌ বা অপবিত্র। আর কেউ কেউ বলেন, رِجْس শব্দটি অর্থগতভাবে اِسْمُ جَمْعٍ আর এ কারণেই مُفْرَدْ হওয়া সত্ত্বেও مُتَعَدِّدْ -এর খবর হয়েছে। মুফাসসির (র.) এখানে مُسْتَقْذَرٌ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, رِجْس দ্বারা উদ্দেশ্য طَبْعِىْ বা প্রকৃতিগত অপবিত্রতা উদ্দেশ্য নয়, বরং عَقْلِىْ অপবিত্রতা উদ্দেশ্য। ইমাম জুযায (র.) বলেন, رِجْس [ر বর্ণে ফাতহা এবং কাসরা উভয়ভাবেই] প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়।

قَوْلُهُ الرِّجْس : এটি একটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব।

প্রশ্ন. اِجْتَنِبُوْهُ -এর যমীরটি مُتَعَدِّدْ অর্থাৎ পূর্বে উল্লিখিত চারটি বস্তুর প্রতি ফিরেছে। অথচ যমীর হলো একবচনের।

উত্তর. একবচনের যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلرِّجْس যা اِسْمُ جَمْعٍ হওয়ার কারণে হুকুমের ক্ষেত্রে مُتَعَدِّدْ [একাধিক]। মুফাসসির (র.) بِالْاِشْتِغَالِ ، اِذَا اَتَيْتُمُوْهُمَا ، اَنْ تَفْعَلُوْهُ এ তিনটি জুমলা বৃদ্ধি করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, আদেশ এবং নিষেধের সম্পর্ক اَفْعَالْ তথা ক্রিয়ার সাথে হয়ে থাকে; ذَاتْ এবং عَيْن -এর সাথে হয় না।

قَوْلُهُ ثَبَتُوْا : মুফাসসির (র.) এখানে ثَبَتُوْا বৃদ্ধি করেছেন تَكْرَارْ -এর আপত্তি দূর করার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ : অর্থাৎ ইহজীবনে তার কোনো কাফফারা নেই, যেমন মুনআকিদা [ভবিষ্যতের কোনো কাজ করা না করার ইচ্ছাকৃত শপথ] এর ক্ষেত্রে কাফফারা আছে। لَغْو তথা নিরর্থক শপথের ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পারার শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। উপরে বৈধ বস্তু নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে আলোচনা ছিল। শপথও যেহেতু নিষিদ্ধকরণের একটি পদ্ধতি, তাই এ স্থলে শপথের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। -[উসমানী : টীকা- ২১৬]

قَوْلُهُ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ : অর্থাৎ শপথ ভাঙ্গার পর এর কাফফারা দেওয়া হয়। আহার্য দানের ক্ষেত্রে এ এখতিয়ার আছে যে, ইচ্ছা করলে দশজন দরিদ্রকে বাড়িতে বসিয়েও খাওয়াতে পারে, আর ইচ্ছা করলে ফিতরার সমপরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বা তার মূল্য এক একজন দরিদ্রের মাঝে বণ্টন করতে পারে। -[উসমানী : টীকা- ২১৭]

قَوْلُهُ اَوْ كِسْوَتُهُمْ : শরীরের অধিকাংশ ঢেকে যায়- এ পরিমাণ বস্ত্র, যেমন এক জোড়া জামা-পায়জামা বা লুঙ্গি ও চাদর। -[উসমানী : টীকা- ২১৮]

قَوْلُهُ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : একজন গোলাম আজাদ করা। এতে মু'মিন হওয়ার শর্ত নেই। -[উসমানী : টীকা ২১৯]

قَوْلُهُ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ : অর্থাৎ একাধারে তিনদিন রোজা রাখবে। সামর্থ্য না থাকার অর্থ নেসাবের মালিক না হওয়া। -[**উসমানী : টীকা**- ২২০]

قَوْلُهُ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ : শপথ রক্ষার অর্থ নিষ্প্রয়োজনে কথায় কথায় শপথ না করা। এ অভ্যাস ভালো নয়। আর **শপথ করে ফেললে** যথাসাধ্য তা পূর্ণ করা কর্তব্য। কোনো কারণে ভেঙ্গে ফেললে কাফফারা আদায় জরুরি। এসবগুলো শপথ **রক্ষার অন্তর্ভুক্ত**। -[উসমানী : টীকা ২২১]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ : এটা কতবড় অনুগ্রহ যে, আমরা উপাদেয় বস্ত্র পরিহার করতে চাইলে তিনি তা নিষেধ করে দিয়েছেন। আবার কেউ ভুলে শপথের মাধ্যমে কোনো উত্তম বস্তু নিজের উপর নিষিদ্ধ করে ফেললে শপথ রক্ষার সাথে তা হালাল করার পন্থাও বাতলে দিয়েছেন। -[উসমানী : টীকা- ২২২]

قَوْلُهُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ : اَنْصَابٌ ও اَزْلَامٌ -এর ব্যাখ্যা এ সূরারই শুরুতে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ -এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। -[উসমানী : টীকা- ২২৩]

আল্লামা যামাখশারী এখানে একটি প্রশ্ন করেছেন যে, প্রথম আয়াতে মদ ও জুয়ার উল্লেখ انصاب [মূর্তি পূজার বেদী] ও ازلام [ভাগ্য নির্ধারক তীর]-এর সাথে করা হয়েছে, আর বর্তমানে আয়াতে এ দুটির উল্লেখ আলাদাভাবে কেন করা হয়েছে? তিনি নিজেই এর জবাব এরূপ দিয়েছেন যে, এ আয়াতে কেবল মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, আর উদ্দেশ্য হলো তাদের মদ ও জুয়া থেকে বিরত রাখা। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী আয়াতে যে চারটি বস্তুকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ হলো মুসলমানদের মদ ও জুয়ার প্রতি অধিক ঘৃণা সৃষ্টি করা। কেননা এটা এমন একটি ঘৃণ্য কাজ, যা জাহিলি যুগের লোকেরা ও মুশরিকরা করত। [তাফসীরে কাশ্‌শাফে উল্লেখ আছে-] মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার তাকিদস্বরূপ 'আনসাব' ও 'আযলাম' -এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, এসব হলো জাহিলি যুগের ক্রিয়াকর্ম এবং মুশরিকদের কাজ। পরে এ দুটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মদ ও জুয়া যে হারাম তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। -[মাজেদী : টীকা- ২৮৭]

মদপানের নিষিদ্ধতা : মদ সম্পর্কে এ আয়াতের পূর্বে কিছু আয়াত নাজিল হয়েছিল। সর্বপ্রথম নাজিল হয়- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ 'লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে, কিন্তু এর পাপ উপকার অপেক্ষা বেশি।' -[সূরা বাকারা : ২১৯]

এ আয়াতে মদ হারাম হওয়ার প্রতি যদিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু মদ্যপান ত্যাগ করার সরাসরি আদেশ যেহেতু ছিল না তাই হযরত ওমর (রা.) বললেন, اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বিষয়টি পুরোপুরি বর্ণনা করুন।' তখন দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ো না।' -[সূরা নিসা : ৪৩]

এ আয়াতেও মদ পানের কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই যদিও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য এটা এ কথার ইঙ্গিত করছিল যে, শীঘ্রই মদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আরবে মদ পানের রেওয়াজ চরমে পৌছে গিয়েছিল। এটা সহসা ছেড়ে দেওয়া তাদের অবস্থানুযায়ী সহজসাধ্য ছিল না। তাই অত্যন্ত প্রজ্ঞাজনোচিতভাবে পর্যায়ক্রমে প্রথমে তাদের অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আস্তে আস্তে নিষেধাজ্ঞার বিধানটি তাদের জন্য অনায়াসসাধ্য করে তোলা হয়েছে। কাজেই হযরত ওমর (রা.) দ্বিতীয় আয়াতটি শুনেও পূর্বের মতো বললেন, اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا بَيَانًا شَافِيًا অবশেষে সূরা মায়িদার বক্ষ্যমাণ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে স্পষ্টভাবে প্রতিমা পূজার মতো এ ঘৃণ্য বস্তুও পরিহার করতে আদেশ করা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) আয়াতসমূহের শেষ অংশ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ অর্থাৎ 'তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?' শোনামাত্রই চিৎকার

করে উঠলেন, اِنْتَهَيْنَا اِنْتَهَيْنَا [আমরা নিবৃত্ত হলাম, নিবৃত্ত হলাম]। তখন প্রত্যেকে মদের মটকা ভেঙ্গে ফেলল। শুঁড়িখানা ধ্বংস করে দিল। মদিনার অলিগলিতে পানির মতো মদের ঢল বয়ে গেল। সমগ্র আরব এ ঘৃণ্য পানীয় পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহর মারেফাত এবং নববী আনুগত্য ও মহব্বতের শারাবান তাহুরা পানে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সমস্ত অনিষ্টের উৎসমূল ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে মহানবী ﷺ -এর জিহাদ এমনই ফলপ্রসূ হলো যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যাবে না! মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরত দেখুন আল কুরআন এতদিন পূর্বে এত কঠোরভাবে যে বস্তু নিষিদ্ধ করেছিল, এতদিন পর সবচেয়ে বড় মদ্যপ দেশ আমেরিকা ইত্যাদি বৃহৎ শক্তিবর্গ তার ক্ষতি ও অনিষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে। আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা।
-[তাফসীরে উসমানী : টীকা ২২৪]

মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার কারণ : মদ পানের কারণে বুদ্ধি-বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে অনেক সময় মদখোর উন্মাদ হয়ে যায় এবং তখন নিজেরাই বিবাদ-কলহ শুরু করে দেয়। এমনকি কখনো নেশার ঘোর কেটে যাওয়ার পরও সে দ্বন্দ্বের রেশ বাকি থেকে যায়। পরিণামে স্থায়ী শত্রুতার সূত্রপাত ঘটে। জুয়ারও এ একই অবস্থা বরং কিছু বেশিই। হারজিতের কারণে তাতে প্রচণ্ড মারামারি ও অনর্থের সৃষ্টি হয়ে যায়। এভাবে শয়তান তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার দরুন সুযোগ পেয়ে যায়। এ তো ছিল বাহ্য ক্ষতির দিক। আর এর অভ্যন্তরীণ ক্ষতি এই যে, মানুষ এসবে লিপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত-বন্দেগি হতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল হয়ে পড়ে। চাক্ষুস দর্শন ও অভিজ্ঞতা এর সাক্ষী। দাবা খেলোয়াড়দেরকেই দেখুন না, সালাত আদায় আর কি, পানাহার ও ঘরবাড়ির কোনো খবর থাকে না। এসব বস্তু যখন এত কিছু বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ ক্ষতির উৎস তখন একজন মুসলিম কি এসব পরিহার না করে পারে? -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২২৫]

قَوْلُهُ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا الخ : কোনো জিনিসের উপকার ক্ষতি যদি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে নাও পার তবুও মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অবশ্যই তামিল কর। আইন অমান্য কখনোই করো না। অন্যথায় আমার নবী তো মহান আল্লাহর বিধানাবলি স্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেনই, অমান্য করার পরিণাম কি হবে তা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা ২২৬]

৯৪. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمْ لَيَخْتَبِرَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ يُرْسِلُهُ لَكُمْ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيِ الصِّغَارَ مِنْهُ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ الْكِبَارَ مِنْهُ وَكَانَ ذٰلِكَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ فَكَانَتِ الْوَحْشُ وَالطَّيْرُ تَغْشَاهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ ج حَالٌ اَيْ غَائِبًا لَمْ يَرَهُ فَيَجْتَنِبُ الصَّيْدَ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّهْيِ عَنْهُ فَاصْطَادَهُ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৯৫. يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط مُحْرِمُوْنَ بِحَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ بِالتَّنْوِيْنِ وَرَفْعِ مَا بَعْدَهُ اَيْ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ هُوَ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ اَيْ شِبْهَهُ فِي الْخِلْقَةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِاِضَافَةِ جَزَاءٍ يَحْكُمُ بِهٖ اَيْ بِالْمِثْلِ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ لَهُمَا فِطْنَةٌ يُمَيِّزَانِ بِهَا اَشْبَهَ الْاَشْيَاءِ بِهٖ وَقَدْ حَكَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ فِيْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهٖ بِبَقَرَةٍ ـ

অনুবাদ :

৯৪. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের হাত দ্বারা যেসব ছোট প্রাণী ও বর্শা দ্বারা যেসব বড় প্রাণী শিকার করা যায় সে বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। অর্থাৎ তোমাদের কাছে ঐসব প্রাণী প্রেরণ করে তোমাদেরকে যাচাই করে দেখবেন। যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যতই অবহিত হন কে তাঁকে অদৃশ্য অবস্থায়ও ভয় করে। بِالْغَيْبِ এটা حَالٌ। অর্থাৎ অদৃশ্য অবস্থায় তাকে না দেখেও ভয় করে এবং শিকার হতে বিরত থাকে। এরপর অর্থাৎ নিষেধ করার পরও কেউ সীমালঙ্ঘন করলে এবং শিকার করলে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সাহাবীগণ ছিলেন সে সময় ইহরামরত। বন্যপ্রাণী ও পক্ষীকুল তাঁদের হাওদার নিকট এসে ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করছিল।

৯৫. হে বিশ্বাসীগণ! ইহরামে থাকাকালে অর্থাৎ হজ বা ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরামরত অবস্থায় তোমরা শিকার জন্তু বধ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা বধ করলে তার বিনিময় হলো অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির উপর যা বিনিময় ধার্য হবে তা হলো যা বধ করল তার অনুরূপ অর্থাৎ গঠন প্রকৃতির দিক হতে তার সদৃশ্যযুক্ত গৃহপালিত জন্তু جَزَاءٌ: এতে তানভীন ও পরবর্তী শব্দটি (مِثْلُ) তে رَفْع [পেশ] সহকারে পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে পরবর্তী শব্দটির দিকে اِضَافَتْ অর্থাৎ সম্বন্ধিত করেও এটা পঠিত রয়েছে। যার ফয়সালা করবে অর্থাৎ অনুরূপ হওয়ার ফয়সালা দেবে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বান দুজন লোক যারা হবে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন। ফলে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণী সম্পর্কে তারা ফয়সালা দিতে সক্ষম হতে পারবে। হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ওমর এবং হযরত আলী (রা.) উটপাখির ক্ষেত্রে উট, হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা.) বন্যগরু ও গাধার ক্ষেত্রে গাভী,

وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَوْفٍ فِي الظَّبْيِ بِشَاةٍ حَكَمَ بِهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَمَامِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُهَا فِي الْعَبِّ هَدْيًا حَالٌ مِنْ جَزَاءٍ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَيْ يُبْلَغُ بِهِ الْحَرَمَ فَيُذْبَحُ فِيْهِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِيْنِهِ وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُذْبَحَ حَيْثُ كَانَ وَنَصَبُهُ نَعْتًا لِمَا قَبْلَهُ وَإِنْ أُضِيْفَ لِأَنَّ إِضَافَتَهُ لَفْظِيَّةٌ لَا تُفِيْدُ تَعْرِيْفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّيْدِ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ كَالْعُصْفُوْرِ وَالْجَرَادِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ أَوْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْجَزَاءِ وَإِنْ وَجَدَهُ هِيَ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ مِمَّا يُسَاوِيْ الْجَزَاءَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِإِضَافَةِ كَفَّارَةٍ لِمَا بَعْدَهُ وَهِيَ لِلْبَيَانِ أَوْ عَلَيْهِ عَدْلُ مِثْلُ ذٰلِكَ الطَّعَامِ صِيَامًا يَصُوْمُهُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَإِنْ وَجَدَهُ وَجَبَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ لِيَذُوْقَ وَبَالَ ثِقْلِ جَزَاءِ أَمْرِهِ الَّذِيْ فَعَلَهُ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ قَبْلَ تَحْرِيْمِهِ وَمَنْ عَادَ عَلَيْهِ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى أَمْرِهِ ذُو انْتِقَامٍ مِمَّنْ عَصَاهُ وَأُلْحِقَ بِقَتْلِهِ مُتَعَمِّدًا فِيْمَا ذُكِرَ الْخَطَأُ ـ

হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আউফ (রা.) হরিণের ক্ষেত্রে বকরি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ কবুতরের ক্ষেত্রেও তা অর্থাৎ বকরি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কারণ মুখ না ডুবিয়ে পানি পান করার মধ্যে এদের সাদৃশ্য বর্তমান। ওটা কা'বাতে প্রেরিত বা কুরবানিস্বরূপ। هَدْيًا এটা جَزَاءٌ -এর حَالٌ। অর্থাৎ সেটা হরম শরীফে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই **এটাকে জবাই করা হবে এবং তথাকার দরিদ্রদের মধ্যে তা** সদকা করা হবে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে জবাই করলে জায়েজ হবে না। بَالِغَ এটা পূর্ববর্তী শব্দ (هَدْيًا) -এর বিশেষণরূপে مَنْصُوْب [যবরযুক্ত] হয়েছে। এখানে পরবর্তী শব্দ (الْكَعْبَة) -এর দিকে এর إِضَافَتْ বা সম্বন্ধ হলেও সেটা لَفْظِيْ বা শাব্দিক ও বাহ্যিক। সুতরাং ওটা مَعْرِفَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্টবাচক শব্দ বলে বিবেচ্য নয়। সুতরাং هَدْيًا শব্দটি نَكِرَةٌ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট হলেও এটা (بَالِغَ الْكَعْبَةِ) সেটা (هَدْيًا) -এর বিশেষণ হতে পারে। শিকার যদি এমন হয় গৃহপালিত পশুর মধ্যে যার সদৃশ কোনো প্রাণী নেই যেমন– চড়ুই, পতঙ্গ ইত্যাদি হলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। **অথবা তার উপর ধার্য হবে কাফফারা।** ওটা **হলো দরিদ্রকে অন্নদান অর্থাৎ বিনিময় মূল্যে যে পরিমাণ খাদ্য** পাওয়া যায় সে পরিমাণ খাদ্য এবং উক্ত শহরের সাধারণ খাদ্য হিসেবে যা প্রচলিত তাই এক একজন দরিদ্রকে এক মুদ [অর্থাৎ প্রায় ১৮ লিটার] পরিমাণে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাদৃশ্য আছে এমন বিনিময় পাওয়া গেলেও এ কাফফারা দেওয়া যেতে পারে। كَفَّارَةٌ অপর এক কেরাতে এটা পরবর্তী শব্দ (طَعَامٌ) -এর প্রতি إِضَافَةٌ অর্থাৎ সম্বন্ধ সহকারে পঠিত রয়েছে। আর এ إِضَافَةٌ টি এখানে بَيَانِيَة বা বিবরণমূলক। কিংবা তার উপর ধার্য হবে উক্ত খাদ্যের সমপরিমাণ সিয়াম পালন করা। প্রতি মুদ [অর্থাৎ প্রায় ১৮ লিটার] পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে একদিন রোজা রাখবে। দরিদ্রদেরকে অন্নদানের সামর্থ্য থাকলেও সে সিয়াম পালন করতে পারবে। তার উপর কাফফারার এ বিধান ধার্য করা হয়েছে যাতে সে তার কৃত কর্মের কুফল বিনিময়ের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। যা গত হয়েছে অর্থাৎ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যে শিকার করেছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, কেউ ওটা পুনরায় করলে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী তাঁর বিষয়ে তিনি ক্ষমতাশালী এবং অবাধ্যচারীদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ইচ্ছাকৃত শিকার করার ক্ষেত্রে যেসব বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে ভুল করে শিকার করার ক্ষেত্রে সেগুলো প্রযোজ্য হবে।

٩٦. أُحِلَّ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالًا كُنْتُمْ أَوْ مُحْرِمِينَ صَيْدُ الْبَحْرِ أَنْ تَأْكُلُوهُ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ كَالسَّمَكِ بِخِلَافِ مَا يَعِيشُ فِيهِ وَفِي الْبَرِّ كَالسَّرَطَانِ وَطَعَامُهُ مَا يَقْذِفُهُ إِلَى السَّاحِلِ مَيْتًا مَتَاعًا تَمْتِيعًا لَكُمْ تَأْكُلُونَهُ وَلِلسَّيَّارَةِ ج الْمُسَافِرِينَ مِنْكُمْ يَتَزَوَّدُونَهُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ وَهُوَ مَا يَعِيشُ فِيهِ مِنَ الْوَحْشِ الْمَأْكُولِ أَنْ تَصِيدُوهُ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط فَلَوْ صَادَهُ حَلَالٌ فَلِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ـ

৯৬. হে লোক সকল! তোমরা ইহরামরত অবস্থায় হও বা হালাল অবস্থায় তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার অর্থাৎ সেসব প্রাণী পানি ব্যতীত জীবন ধারণ করতে সক্ষম নয় যেমন মৎস্য ও তার খাদ্য অর্থাৎ যা কূলে নিক্ষিপ্ত হয় মৃত অবস্থায় তা ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে। তোমাদের জন্য অর্থাৎ তোমরা তা আহার করবে এবং পর্যটকদের জন্য অর্থাৎ তোমাদের মুসাফিরের জন্য; তারা এটা পাথেয় হিসেবে নেবে ভোগ উপভোগ্য বস্তু হিসেবে। আর যেসব প্রাণী জল ও স্থল উভয় স্থানেই জীবন ধারণ করতে পারে যেমন কাঁকড়া সেগুলো এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং তোমরা যতক্ষণ ইহরামরত থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার অর্থাৎ আহার করা বৈধ এ ধরনের যেসব বন্য জন্তু স্থলে জীবন ধারণ করে সেগুলো শিকার করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুন্নায় বিবৃত হয়েছে যে, কোনো হালাল ব্যক্তি যদি তা শিকার করে তবে ইহরামরত ব্যক্তির জন্যও তা আহার করা বৈধ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নিকট তোমাদের একত্রিত করা হবে।

٩٧. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ الْمُحَرَّمَ قِيٰمًا لِلنَّاسِ يَقُومُ بِهِ أَمْرُ دِينِهِمْ بِالْحَجِّ إِلَيْهِ وَدُنْيَاهُمْ بِأَمْنِ دَاخِلِهِ وَعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ وَجَبْىِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ وَفِي قِرَاءَةٍ قِيَمًا بِلَا أَلِفٍ مَصْدَرُ قَامَ عَيْنُهُ مُعْتَلٌّ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ بِمَعْنَى الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبَ قِيَامًا لَهُمْ بِأَمْنِهِمُ الْقِتَالَ فِيهَا ـ

৯৭. আল্লাহ তা'আলা বায়তুল হারাম পবিত্র কা'বা ঘর মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটার হজ করার মাধ্যমে তাদের দীন ও ধর্মীয় কল্যাণের আর এতে প্রবেশকারী ব্যক্তির নিরাপত্তালাভ, কোনো বিষয়ে তাকে উত্যক্ত না করার বিধান এবং এখানে যাবতীয় ফল আমদানির ব্যবস্থার মধ্যে তাদের জাগতিক কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পবিত্র মাস অর্থাৎ জিলকদ, জিলহজ, মহররম, রজব এ নিষিদ্ধ মাসসমূহেও যুদ্ধবিগ্রহ হতে নিরাপদ থাকার দরুন তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

وَالْهَدْىَ وَالْقَلَائِدَ ط قِيَامًا لَهُمْ بِأَمْنِ صَاحِبِهِمَا مِنَ التَّعَرُّضِ لَهُ ذٰلِكَ الْجَعْلُ الْمَذْكُورُ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ فَاِنْ جَعَلَهُ ذٰلِكَ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ لَكُمْ اَوْ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْكُمْ قَبْلَ وُقُوْعِهَا دَلِيْلٌ عَلٰى عِلْمِهٖ بِمَا فِى الْوُجُوْدِ وَمَا هُوَ كَائِنٌ ـ

কুরবানির জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারণ করেছেন। কেননা এর মাধ্যমে মালিকগণ দুষ্কৃতিকারীদের উত্ত্যক্তি হতে নিরাপদ থাকতে পারে। এটা অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে নির্ধারণ এ হেতু যে তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তোমাদের কল্যাণের জন্য ও তোমাদের হতে অকল্যাণ দূর করার জন্য এসব ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই আল্লাহ তা'আলা করেছেন, এরূপ কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় সবকিছুই তাঁর জ্ঞান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। قِيَامًا এটা অপর এক কেরাতে قَامَ ক্রিয়ার مَصْدَرْ অর্থাৎ ক্রিয়ামূলরূপে مُعْتَلْ عَيْن হিসেবে اَلِف ব্যতীত قِيَمًا আকারে পঠিত রয়েছে।

৯৮. اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِاَعْدَائِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِاَوْلِيَائِهٖ رَحِيْمٌ بِهِمْ ـ

৯৮. জেনে রাখ, আল্লাহ তাঁর শত্রুদের শাস্তিদানে অতি কঠোর এবং বন্ধুদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল ও তাদের সম্পর্কে পরম দয়ালু।

৯৯. مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْاِبْلَاغُ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ تُظْهِرُوْنَ مِنَ الْعَمَلِ وَمَا تَكْتُمُوْنَ تُخْفُوْنَ مِنْهُ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

৯৯. প্রচার করাই কেবল অর্থাৎ তোমাদের নিকট কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়াই রাসূলের কর্তব্য। তোমরা যা প্রকাশ কর। অর্থাৎ যেসব কাজ প্রকাশ্যে কর ও গোপন কর অর্থাৎ অপ্রকাশ্যে কর আল্লাহ তা জানেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেবেন।

১০০. قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ الْحَرَامُ وَالطَّيِّبُ الْحَلَالُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ط فَاتَّقُوا اللّٰهَ تَرْكَهُ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ ـ

১০০. বল, মন্দ অর্থাৎ হারাম এবং ভালো অর্থাৎ হালাল এক নয় যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তি সম্পন্নরা তা বর্জন করত আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত অর্থাৎ সফলকাম হতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ بِالْغَيْبِ শব্দটি مَنْ মাওসূল থেকে حَالْ হয়েছে, يَخَافُهُ -এর যমীর থেকে নয়। তাহলে তো আল্লাহ তা'আলা غَائِبْ হওয়া লাযেম আসবে। غَائِبْ দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। আর بِالْغَيْبِ শব্দটি غَائِبًا -এর সাথে, আর لَمْ يَرَهُ শব্দটি بِالْغَيْبِ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ : এখানে فَعَلَيْهِ বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, جَزَاءٌ সর্বদা জুমলা হয়ে থাকে অথচ এখানে জুমলা হয়নি। উত্তরের সারকথা হলো, এখানে জাযাটি হলো عَلَيْهِ جَزَاءٌ বা জুমলা।

قَوْلُهُ يَحْكُمُ بِهِ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ : প্রশ্ন. ذَوَا عَدْلٍ হলো يَحْكُمُ -এর ফায়েল। অথচ সিফতের ফায়েল হওয়া সহীহ নয়। উত্তর. يَحْكُمُ -এর ফায়েল উহ্য রয়েছে। তা হলো رَجُلَانِ মাহযূফ মেনে সে জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ মাওসূফ সিফত মিলে يَحْكُمُ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ وَاِنْ وَجَدَهُ اَىِ الْجَزَاءَ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَوْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ -এর মাঝে اَوْ টি تَخْيِيْر -এর জন্য تَرْتِيْبٌ -এর জন্য নয়।

قَوْلُهُ وَهِىَ لِلْبَيَانِ : অর্থাৎ كَفَّارَةٌ শব্দটি طَعَامٌ -এর দিকে ইযাফতের সুরতে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةٌ হবে। যেমন- خَاتَمُ فِضَّةٌ -এর মাঝে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ تَاكُلُوْهُ : صَيْدُ الْبَحْرِ -এর তাফসীর تَاكُلُوْهُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَيْد দ্বারা উদ্দেশ্য শিকারি জন্তু। শিকার কর্মটি নয়। কেননা তার সাথে اَكْل শব্দ উহ্য ধরা জরুরি। কেননা কোনো প্রাণী নিজের জাতের দিক দিয়ে حِلَّتْ এবং حُرْمَتْ -এর গুণে গুণান্বিত হয় না; বরং فِعْل حِلَّتْ وَحُرْمَتْ -এর সাথে مُتَّصِفْ হয়। এ কারণেই মুফাসসির (র.) تَاكُلُوْا শব্দটি উহ্য ধরেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ تَصِيْدُوْهُ : এতেও একথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, نَفْس صَيْد বা শুধুমাত্র صَيْد -এর حِلَّتْ এবং حُرْمَتْ -এর কোনো মর্ম নেই; বরং فِعْل صَيْد হলো হারাম।

قَوْلُهُ يَقُوْمُ بِهِ : মুফাসসির (র.) قِيَامًا -এর তাফসীর يَقُوْمُ بِهِ -এর দ্বারা করে এ আপত্তির জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, قِيَامًا -এর حَمْل - كَعْبَةُ الْبَيْتِ -এর উপর সঠিক নয়।

قَوْلُهُ عَيْنُهُ مُعْتَلٌ : অর্থাৎ قِيَامًا মূলত قِوَامًا ছিল। কাসরার পর وَاوْ হওয়ার কারণে তা يَاءْ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ الْاَشْهُرَ الْحُرُمَ : وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ -এর তাফসীর اَلْاَشْهُرَ الْحُرُمَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلشَّهْرَ الْحَرَامَ -এর اَلِفْ لَامْ টি جِنْس -এর জন্য এসেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ الخ : শানে নুযূল : বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, মদ হারাম করার আয়াত নাজিল হলে সাহাবায়ে কেরামে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যারা নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার আগে মদ পান করেছেন এবং সে অবস্থায়ই ইন্তেকাল করেছেন তাদের কি অবস্থা হবে? উহুদের যুদ্ধে কোনো কোনো সাহাবী মদপান করার পর শরিক হয়েছিলেন এবং পেটে মদ থাকা অবস্থায়ই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২২৭]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ الخ : ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য : পূর্বের রুকূতে উত্তম বস্তু নিষিদ্ধকরণ ও সীমালঙ্ঘন হতে বিরত থাকার আদেশ দানের পর এমন কতিপয় বস্তু পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা স্থায়ীভাবে হারাম। এ রুকূতে স্থায়ীভাবে হারাম নয় এমন কিছু জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এগুলোর নিষিদ্ধতা বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সঙ্গে সীমিত, যেমন ইহরাম অবস্থায় শিকার করা। বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুগত বান্দাদের জন্য এটা একটা পরীক্ষা যে, ইহরাম অবস্থায় যখন শিকার জন্তু তার সামনে থাকে এবং অতি সহজেই সে তা ধরতে বা মারতে পারে, তখন এমন কে আছে, যে আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে ও তাঁর আদেশ পালনে রত হয় এবং সীমালঙ্ঘন তথা আদেশ অমান্য করার শাস্তিকে প্রচণ্ড ভয় করে। 'আসহাবুস সাবত' [শনিবার সংশ্লিষ্ট জাতি]-এর ঘটনা সূরা বাকারায় বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু শনিবারের মাঠ শিকার করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা প্রতারণা ও ছলচাতুরীর সঙ্গে সে আদেশ লঙ্ঘন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর চরম লাঞ্ছনাকর শাস্তি নাজিল করেন। অনুরূপভাবে ইহরাম অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীরও খানিকটা পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। হুদাইবিয়ায় যখন এ আদেশ নাজিল হয়, তখন ধারে-কাছেই বিপুল পরিমাণ শিকার জন্তু ছিল ইচ্ছা করলেই হাতে ধরা বা শরবিদ্ধ করা যেত। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ প্রমাণ করে দেখালেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় দুনিয়ার আর কোনো জাতি তাদের সমান কৃতকার্য হতে পারেনি। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২২৮]

قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ الخ : জেনেশুনে বধ করার অর্থ নিজের ইহরাম অবস্থা এবং এ অবস্থায় শিকারের নিষেধাজ্ঞা মনে থাকা সত্ত্বেও শিকার করা। এখানে শুধু জেনেশুনে শিকার করলে তখনকার বিধান বলা হয়েছে যে, তার সে কাজের বিনিময় দিতে হবে, আর আল্লাহ তা'আলা যে শাস্তি দান করবেন, সে তো স্বতন্ত্র রয়েছেই। যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ অর্থাৎ কেউ পুনরাবৃত্তি করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেবেন। আর যদি কেউ ভুলবশত শিকার করে, তবে তারও বদলা একই, তবে আল্লাহ তা'আলা তার শাস্তি মওকুফ করবেন।

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩১]

ইহরাম অবস্থায় শিকারের মাসআলা : হানাফী মাযহাবে মাসআলা হলো, ইহরাম অবস্থায় কেউ শিকার জন্তু ধরলে তা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। মেরে ফেললে দুজন বিবেচক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং সে মূল্যের গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি কোনো পশু কিনে কা'বার নিকট অর্থাৎ হারাম এলাকার ভিতের নিয়ে জবাই করতে হবে। তার গোশ্‌ত নিজে খাওয়া যাবে না। সে মূল্যের খাদ্যশস্য কিনে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করলেও চলবে কিংবা যতজন দরিদ্রের মাঝে তা বণ্টন করা যেত সে পরিমাণ রোজাও রাখা যেতে পারে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩২]

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ : অর্থাৎ আদেশ নাজিলের আগে বা প্রাক-ইসলামি যুগে কেউ এ কাজ করে থাকলে তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না, অথচ ইসলামের আগেও আরবগণ ইহরাম অবস্থায় শিকার কার্যকে অন্যায় মনে করত, যে হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ অযৌক্তিক ছিল না যে, তোমাদের ধারণায় যে কাজ অপরাধ ছিল তা করলে কেন?

-[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৩]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ : অর্থাৎ কোনো অপরাধী তার হাত থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং ইনসাফ ও সামগ্রিক কল্যাণ দৃষ্টে যে অপরাধ শাস্তিযোগ্য আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন না। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৪]

قَوْلُهُ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ الخ : হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, ইহরাম অবস্থায় সমুদ্রের শিকার অর্থাৎ মাছ হালাল আর সমুদ্রের খাবার অর্থাৎ যে মাছ পানি থেকে আলাদা হয়ে মরে গেছে সে শিকার করেনি তাও হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের উপকারার্থে এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পাছে কেউ মনে করে বসে এটা হজের বদৌলতে হালাল হয়েছে, তাই যোগ করে দিয়েছেন অপরাপর মুসাফিরদের জন্যও। মাছ পুকুরে থাকলেও তা সমুদ্রেরই শিকার বলে গণ্য। এ তো ইহরাম অবস্থায় শিকারের বিধান জানা গেল। ইহরাম অবস্থায় লক্ষ্য থাকে মক্কা মুকাররমা। এ নগরী ও এর আশেপাশে সর্বদাই শিকার জন্তু বধ নিষিদ্ধ, এমনকি তাকে তাড়ানো বা ভড়কানোও। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৫]

قَوْلُهُ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِلنَّاسِ : **পবিত্র কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য :** কা'বা শরীফ ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠার উপায়। হজ ও ওমরা এমন দুটি ইবাদত যা সরাসরি কা'বার সাথে সম্পৃক্ত। সালাতের জন্যও কা'বার দিকে মুখ করা শর্ত। এভাবে কা'বা মানুষের ধর্মীয় বিষয়াদি প্রতিষ্ঠার উপায় হলো। তারপর হজ ইত্যাদির মৌসুমে সমগ্র বিশ্বের লাখ লাখ মুসলিম যখন সেখানে সমবেত হয় তখন নানারকম ব্যবসায়িক, রাজনৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা যে স্থানকে حَرَمٌ اٰمِنٌ 'নিরাপদ ও পবিত্র স্থান' বানিয়েছেন। ফলে মানুষই নয়, বরং পশুপাখি পর্যন্ত সেখানে নিরাপত্তা লাভ করে। প্রাক-ইসলামি যুগে, যখন রক্তপাত ও হানাহানি একটা মামুলি বিষয় ছিল, তখনও একজন মানুষ সেখানে তার পিতার ঘাতককে পর্যন্ত কিছু বলতে পারত না। বৈষয়িক দিক থেকে মানুষ এটা দেখে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায় যে, এর তরুলতাহীন প্রান্তরে কোত্থেকে এত বিপুল পরিমাণ পানাহার সামগ্রী ও উৎকৃষ্টমানের ফলমূলের সমাহার ঘটে। এসব কিছুই قِيٰمًا لِلنَّاسِ -এর ফলশ্রুতি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মহান আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পূর্বেই এটা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিশ্ব মানবতার জন্য সার্বজনীন ও স্থায়ী হেদায়েতের ফল্গুধারা এখান থেকেই উৎসারিত হবে এবং মানব জাতির মহান সংস্কারক দো-জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বাসভূমি হওয়ার মহামর্যাদা বিশ্বজগতের মধ্যে কেবল এখানের পবিত্র মাটিই লাভ করেছে। এসব দিকে লক্ষ্য করেও কা'বাকে قِيٰمًا لِلنَّاسِ

বলা যেতে পারে। কেননা কা'বা বিশ্ব মানবতার জন্য নৈতিক পরিশোধন, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা বিধান ও হেদায়েতের জ্ঞান রশ্মির কেন্দ্রবিন্দু। কোনো জিনিসেরই প্রতিষ্ঠাতার কেন্দ্রবিন্দু ছাড়া সম্ভব নয়। এছাড়া বিদগ্ধ সত্য-সন্ধানীদের মতে قِيَامًا لِلنَّاسِ -এর অর্থ এই যে, কা'বা শরীফের অস্তিত্বই নিখিল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার অসিলা। যতদিন কা'বাগৃহ ও তার মর্যাদা রক্ষাকারীদের অস্তিত্ব থাকবে নিখিল বিশ্বও ততদিন থাকবে অস্তিত্বমান, যেদিন বিশ্বজগতকে ধ্বংস করাই হবে মহান আল্লাহর ইচ্ছা সেদিন এই 'বায়তুল্লাহ' নামক পবিত্র স্থানকেই সর্বাগ্রে তুলে নেওয়া হবে, যেমন জগৎ সৃজনের সূচনাও হয়েছিল এ গৃহের নির্মাণ দ্বারা। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ মক্কা শরীফে অবস্থিত গৃহকেই মানুষের জন্য সর্বপ্রথম স্থাপিত করা হয়। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে [যুস-সাবীকাতাইন নামক] এক কৃষ্ণাঙ্গ কা'বাগৃহের পাথর একটি একটি করে উৎপাটিত করবে। বিশ্বজগতকে যতদিন বিদ্যমান রাখা মহান আল্লাহ তা'আলার কাম্য হবে, ততদিন যত বড় শক্তিধরই হোক, কারো পক্ষে কা'বাকে ধ্বংস করার মতো কদর্য অভিপ্রেত চরিতার্থ করা সম্ভব হবে না। 'আসহাবে ফীল' বা হস্তিবাহিনীর ঘটনা কে না শুনেছে? তারপরও প্রত্যেক যুগে কত জাতি ও কত ব্যক্তি এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে, কিন্তু এটা মহান আল্লাহর সংরক্ষণ ও ইসলামের সত্যতার এক বিস্ময়কর নিদর্শন যে, বাহ্য কোনো উপকরণ ও ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ সে ইবলিসী দুরভিসন্ধিতে সফলকাম হতে পারেনি এবং হতেও পারবে না। হ্যাঁ, কা'বার ইমারত ধ্বংস করার পথে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, তখন মনে করতে হবে বিশ্ববিনাশের ফরমানও এসে গেছে। দুনিয়ার সরকারগুলোও নিজ রাজধানী ও রাজ প্রাসাদ সংস্কার বা স্থানান্তর করতে চায় তখন সাধারণ শ্রমিক দ্বারাই তা ভেঙ্গে ফেলার কার্যসাধন করা হয়। সম্ভবত ইমাম বুখারী (র.) এ জন্যই بَابُ جَعَلَ كَعْبَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِيَامًا لِلنَّاسِ الاية অনুচ্ছেদে 'যুস-সাবীকাতাইন' -এর হাদীস উদ্ধৃত করে قِيَامًا لِلنَّاسِ -এর ঐ অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। আমাদের উস্তাদ ও এ তরজমাকারী হযরত শায়খুল হিন্দ (র.) বুখারী শরীফের দরসে এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোদ্দাকথা, আলোচ্য আয়াতে ইহরামকারীর বিধান বর্ণনা করার পর কা'বা শরীফের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা উদ্দেশ্য। তারপর কা'বা ও ইহরামের সামঞ্জস্যে নিষিদ্ধ মাস, হাদী ও কালাইদের কথাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন এ সূরারই শুরুতে لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ -এর সাথে غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ -কেও যোগ করে দেওয়া হয়েছিল। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৬]

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : অর্থাৎ ইহরাম অবস্থা বা কা'বা ইত্যাদির মর্যাদা সম্পর্কে যেসব বিধান দেওয়া হলো, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় তার বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে মনে রাখবে মহান আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। আর ভুলে কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে যদি কাফফারা ইত্যাদি দ্বারা তার প্রতিবিধান করে নাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি **মহান ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৮]**

قَوْلُهُ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ : মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর বিধান ও বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়ে নিজ দায়িত্ব আদায় করেছেন। ফলে বান্দার উপর মহান আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। এখন তোমরা প্রকাশ্য গোপনে যেমন কাজই করবে, তা মহান আল্লাহর সামনে। হিসাব-নিকাশকালে তিনি তার বিন্দুটি পর্যন্ত তোমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৩৯]

قَوْلُهُ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ : এ রুকূর পূর্বের রুকূতে বলা হয়েছিল, উত্তম ও হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করো না; বরং বিধিসম্মতভাবে তা ভোগ কর। সে বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ করার পর মদ প্রভৃতি অপবিত্র ও ঘৃণ্য বস্তুর নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করা হয়। সে প্রসঙ্গেই ইহরামরত ব্যক্তির শিকারকে হারাম করা হয়েছে। অর্থাৎ মদ, মৃত জন্তু ইত্যাদি যেমন ঘৃণ্য বস্তু ইহরামরত ব্যক্তির শিকারকেও তদ্রূপ মনে কর। ইহরামের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করার পর এবার সতর্ক করার হয়েছে যে ভালো ও মন্দ বস্তু কখনো এক সমান হতে পারে না। অল্প বস্তু যদি ভালো ও হালাল হয়, তা বিস্তর মন্দ ও হারাম বস্তু অপেক্ষা উত্তম। বুদ্ধিমানের উচিত সর্বদা উত্তম ও হালাল বস্তু গ্রহণ করা; ঘৃণ্য ও হারাম বস্তু যত বেশি মনমুগ্ধকরই হোক না কেন, তার দিকে ভ্রুক্ষেপও না করা। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪০]

অনুবাদ :

١٠١. وَنَزَلَ لَمَّا اَكْثَرُوا سُؤَالَهُ ﷺ يٰاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاۤءَ اِنْ
تُبْدَ تُظْهَرَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ لِمَا فِيْهَا مِنَ
الْمَشَقَّةِ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ
الْقُرْاٰنُ اَيْ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ تُبْدَ
لَكُمْ ط اَلْمَعْنٰى اِذَا سَاَلْتُمْ عَنْ اَشْيَاۤءَ
فِيْ زَمَنِهٖ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ بِاِبْدَائِهَا وَمَتٰى
اَبْدَاهَا سَاۤءَتْكُمْ فَلَا تَسْئَلُوْا عَنْهَا
عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ط عَنْ مَسْاَلَتِكُمْ فَلَا
تَعُوْدُوْا وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ .

১০১. কতিপয় লোক এমন ছিল যারা রাসূল ﷺ -কে অনর্থক অনেক ধরনের প্রশ্ন করতে থাকত। এ সংশ্রবে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে, হে বিশ্বাসীগণ! সেসব বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করো না যা উদ্ঘাটিত হলে প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে যেহেতু সেটা তোমাদের জন্য কষ্টকর প্রতিপন্ন হবে। কুরআন অবতরণের কালে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর জীবনকালে তোমরা যদি সেসব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর জীবনকালে আল কুরআন যে সময় অবতীর্ণ হচ্ছে এমতাবস্থায় যদি কোনো বিষয় উদ্ঘাটনের প্রার্থনা তোমরা কর আর তিনি তা উদ্ঘাটন করে দেবেন তখন তোমাদের জন্য তা ক্লেশকর হবে। সুতরাং সকল বিষয় সম্পর্কে অনর্থক তোমরা প্রশ্ন করো না। আল্লাহ তা অর্থাৎ তোমাদের এ নানা প্রশ্ন উত্থাপন ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এর আর পুনরাবৃত্তি করো না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

١٠٢. قَدْ سَاَلَهَا اَيِ الْاَشْيَاۤءَ قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
اَنْبِيَاۤءَهُمْ فَاُجِيْبُوْا بِبَيَانِ اَحْكَامِهَا ثُمَّ
اَصْبَحُوْا صَارُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ بِتَرْكِهِمُ
الْعَمَلَ بِهَا .

১০২. তোমাদের পূর্বেও তো এর অর্থাৎ এসব বিষয় সম্পর্কে এক সম্প্রদায় তাদের নবীগণকে প্রশ্ন করেছিল। তাঁরা এসব কিছুর বিধান পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতঃপর এতদনুসারে কাজ করা পরিত্যাগ করত এতদসম্পর্কেও তারা কাফের হয়ে যায়।

١٠٣. مَا جَعَلَ شَرَعَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا
سَاۤئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ كَمَا كَانَ
اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُوْنَهُ رَوَى الْبُخَارِيُّ
عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ
الَّتِيْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلَا
يَحْلِبُهَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّاۤئِبَةُ
الَّتِيْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِاٰلِهَتِهِمْ فَلَا
يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ .

১০৩. বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ও হাম এর বিধান আল্লাহ দেননি। জাহিলি যুগের লোকেরা এসব করত। ইমাম বুখারী হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জাহিলি যুগে যে উষ্ট্রী ও ছাগী ইত্যাদির দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হতো তাকে বহীরা বলা হতো। এরপর কেউই এর দুগ্ধ দোহন করত না। আর কিছু প্রাণী তারা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিত। এতে কেউ আর আরোহণ করত না এবং তার দ্বারা কোনো বোঝা বহন করত না। একে তারা সায়িবা বলে অভিহিত করত।

وَالْوَصِيْلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ تَبْكُرُ فِيْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْاِبِلِ بِاُنْثٰى ثُمَّ تُثَنِّىْ بَعْدَهٗ بِاُنْثٰى وَكَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِطَوَاغِيْتِهِمْ اِنْ وَصَلَتْ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ وَالْحَامُ فَحْلُ الْاِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُوْدَ فَاِذَا قَضٰى ضِرَابَهٗ وَدَعُوْهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَاَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوْهُ الْحَامِيَ وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط فِيْ ذٰلِكَ وَنِسْبَتِهٖ اِلَيْهِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ اِنَّ ذٰلِكَ اِفْتِرَاءٌ لِاَنَّهُمْ قَلَّدُوْا فِيْهِ اٰبَاءَهُمْ ـ

ওয়াসীলা বলা হতো ঐসব উষ্ট্রীকে যা প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়বারই মাদি বাচ্চা প্রসব করে। এগুলোকেও তারা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিত। মাঝে কোনোরূপ নর বাচ্চা না হয়ে পরপর নিরবচ্ছিন্নভাবে যেহেতু মাদি বাচ্চা প্রসব করত সেহেতু তাকে ওয়াসীলা [অর্থাৎ মিলিত] বলা হতো। হাম হচ্ছে পুরুষ উষ্ট্র। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রজননক্রিয়া তার দ্বারা সম্পাদন হলে তাকেও তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত, বোঝা বহন ইত্যাদির কাজে তাকে আর ব্যবহার করা হতো না। তাকে তারা হামীও বলত। এসব বিষয়ে এবং এগুলোকে আল্লাহর প্রতি আরোপ করে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণই আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না যে, এটা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ। কারণ তারা এ বিষয়ে পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণ করে মাত্র।

١٠٤. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ اَيْ اِلٰى حُكْمِهٖ مِنْ تَحْلِيْلِ مَا حَرَّمْتُمْ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط مِنَ الدِّيْنِ وَالشَّرِيْعَةِ قَالَ تَعَالٰى اَحَسْبُهُمْ ذٰلِكَ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ اِلَى الْحَقِّ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ ـ

১০৪. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, অর্থাৎ তোমরা নিজেরা যা নিষিদ্ধ করে রেখেছ তা বৈধ করার বিধানের দিকে এস, তারা বলে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে যাতে পেয়েছি অর্থাৎ যে ধর্ম ও বিধিবিধানে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কী! যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না ও সত্যের দিকে পরিচালিতও ছিল না, তথাপি তোমরা তদ্রূপ ধারণা কর? أ এ প্রশ্নবোধক অক্ষরটি এখানে اِنْكَارٌ অর্থাৎ অস্বীকৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٥. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج اَيْ اِحْفَظُوْهَا وَقُوْمُوْا بِصَلَاحِهَا لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط

১০৫. হে বিশ্বাসীগণ! নিজেদের বিষয় নিয়ে তোমরা থাক। অর্থাৎ নিজেদের রক্ষা কর ও তার সংশোধন কল্পে সচেষ্ট হও তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

قِيْلَ الْمُرَادُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ غَيْرُهُمْ لِحَدِيْثِ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَأْىٍ بِرَأْيِهٖ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হলো কিতাবীদের মধ্যে যদি কেউ পথভ্রষ্ট হয় তবে এ অবস্থায় কোনো ক্ষতি হবে না। অপরাপর ভাষ্যকারগণ বলেন, কিতাবী বা যারা কিতাবী নয় সাধারণভাবে সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। কেননা হযরত আবূ ছা'লাবা আল খুশানী (রা.) বর্ণনা করেন, এ আয়াতটি সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তখন ইরশাদ করেছিলেন, সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম হতে নিষেধ করতে থাক। যখন দেখবে কৃপণতার আনুগত্য হবে, প্রবৃত্তি অনুসৃত হবে, দুনিয়াদারির প্রাধান্য ঘটবে, প্রত্যেকেই নিজের মতকেই চূড়ান্ত বলে ভাববে তখন তুমি নিজেকে নিয়ে কর্তব্যরত থাকবে। হাকিম প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন এবং তোমাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন।

١٠٦. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اَىْ اَسْبَابُهٗ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ لِيَشْهَدْ وَاِضَافَةُ شَهَادَةٍ لِبَيْنَ عَلَى الْاِتِّسَاعِ وَحِيْنَ بَدَلٌ مِنْ اِذَا اَوْ ظَرْفٌ لِحَضَرَ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اَىْ غَيْرِ مِلَّتِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ سَافَرْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْبِسُوْنَهُمَا تُوْقِفُوْنَهُمَا صِفَةُ اٰخَرٰنِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ اَىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَيُقْسِمٰنِ يَحْلِفَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِيْهِمَا وَيَقُوْلَانِ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ بِاللّٰهِ ثَمَنًا عِوَضًا نَأْخُذُهُ بَدَلَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِاَنْ نَحْلِفَ بِهٖ اَوْ نَشْهَدَ كِذْبًا لِاَجْلِهٖ .

১০৬. হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। মৃত্যুর কারণ ও লক্ষণসমূহ দেখা দেয় তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এ বাক্যটি خَبَرِيَّةٌ অর্থাৎ বিবরণমূলক বাক্য হলেও এখানে اَمْر বা অনুজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা সাক্ষ্য রাখ। شَهَادَةٌ এখানে اِتِّسَاعٌ অর্থাৎ ব্যাকরণগত সুপ্রশস্ত অবকাশ বিদ্যমান থাকায় তৎপরবর্তী শব্দ بَيْنِكُمْ -এর প্রতি এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ হতে পেরেছে। حِيْنَ এটা পূর্বোল্লিখিত اِذَا -এর بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। অথবা حَضَرَ ক্রিয়াটির ظَرْف অর্থাৎ কালাধিকরণ পদ। তোমরা পৃথিবীতে পর্যটনরত থাকলে অর্থাৎ সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ব্যতীত অর্থাৎ তোমাদের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য লোকদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে অর্থাৎ এ দুজনের বিষয়ে তোমাদের যদি কোনোরূপ দ্বিধা হয় তবে সালাতের পর অর্থাৎ আসরের সালাতের পর তাদেরকে ফিরিয়ে রাখবে, তাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখবে। تَحْبِسُوْنَهُمَا এটা اٰخَرٰنِ -এর صِفَتْ। অনন্তর তারা আল্লাহর নামে কসম করবে, শপথ করবে এবং বলবে আমরা তার অর্থাৎ আল্লাহর নামের কোনো মূল্য নেব না অর্থাৎ এর জন্য মিথ্যা শপথ বা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করত তদস্থলে দুনিয়ার কোনো বিনিময় গ্রহণ করব না।

وَلَوْ كَانَ الْمُقْسَمُ لَهُ اَوِ الْمَشْهُوْدُ لَهُ ذَا قُرْبٰى قَرَابَةٍ مِنَّا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَمَرَنَا بِاِقَامَتِهَا اِنَّآ اِذًا اِنْ كَتَمْنَاهَا لَمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ـ

যদি সে অর্থাৎ যার পক্ষে শপথ করা হচ্ছে বা যার পক্ষে সাক্ষ্য দান করা হচ্ছে সে আমাদের নৈকট্যের অধিকারী আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য যে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন তা গোপন করব না। তাহলে অর্থাৎ গোপন করলে নিশ্চয় আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

١٠٧. فَاِنْ عُثِرَ اِطَّلَعَ بَعْدَ حَلْفِهِمَا عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا اَىْ فِعْلًا مَا يُوْجِبُهُ مِنْ خِيَانَةٍ اَوْ كِذْبٍ فِى الشَّهَادَةِ بِاَنْ وُجِدَ عِنْدَهُمَا مَثَلًا مَا اتُّهِمَا بِهٖ وَادَّعَيَا اَنَّهُمَا ابْتَاعَاهُ مِنَ الْمَيِّتِ اَوْ اَوْصٰى لَهُمَا بِهٖ فَاٰخَرَانِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا فِىْ تَوَجُّهِ الْيَمِيْنِ عَلَيْهِمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْوَصِيَّةُ وَهُمُ الْوَرَثَةُ وَيُبْدَلُ مِنْ اٰخَرَانِ الْاَوْلَيٰنِ بِالْمَيِّتِ اَىِ الْاَقْرَبَانِ اِلَيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الْاَوَّلِيْنَ جَمْعُ اَوَّلٍ صِفَةٌ اَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ عَلٰى خِيَانَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَيَقُوْلَانِ لَشَهَادَتُنَا يَمِيْنُنَا اَحَقُّ اَصْدَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يَمِيْنِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا تَجَاوَزْنَا الْحَقَّ فِى الْيَمِيْنِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

১০৭. যদি উদ্‌ঘাটিত হয় যে, অর্থাৎ তাদের শপথ করার পর একথা প্রকাশ পায় যে, তারা দুজন পাপে বিজড়িত হয়েছে অর্থাৎ তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান বা খেয়ানত ইত্যাদি অবলম্বন করত, পাপযোগ্য কাজ করেছে বলে প্রকাশ পায়। যেমন, তাদের নিকট এমন কিছু আলামত পাওয়া গেল যা দ্বারা তাদেরকে সন্দেহ করা যায় আর তারা দাবি করল যে মৃত ব্যক্তির নিকট হতে তারা তা ক্রয় করে নিয়েছে বা মৃত ব্যক্তি তাদের জন্যই তা অসিয়ত করে দিয়েছে ইত্যাদি। তবে যাদের বিরুদ্ধে অসিয়তের হকদার হওয়ার দাবি উঠেছে তাদের অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের মধ্য হতে উক্ত দুজন সাক্ষীর বিরুদ্ধে কসম দেওয়ার জন্য নিকটতম অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়, اَلْاَوْلَيٰنِ এটা اٰخَرَانِ -এর بَدَلٌ। অপর এক কেরাতে এটা اَوَّلٌ -এর বহুবচন اَوَّلِيْنَ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা اَلَّذِيْنَ -এর صِفَتٌ বা তার بَدَلٌ বলে বিবেচ্য হবে। দুজন স্থলবর্তী হবে এবং উক্ত দু-সাক্ষীর খেয়ানত সম্পর্কে আল্লাহর নামে শপথ করবে। বলবে আমাদের সাক্ষ্য অর্থাৎ আমাদের শপথ অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য তাদের শপথ হতে অধিকতর হক অর্থাৎ সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘনকারী নই অর্থাৎ শপথ করার মধ্যে আমরা সত্য লঙ্ঘন করিনি করলে আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَشْيَاءَ : **اَشْيَاءُ** মূলত شَيْئَاءُ ছিল। فُعَلَاءُ -এর ওজনে। حَمْرَاءُ -এর মতো। আরবদের নিকট দুই হামযার **মধ্যখানে اَلِفْ উচ্চারণে কঠিন**। যার কারণে প্রথম হামযাকে [যা লাম কালিমা] قَلْبِ مَكَانِىْ করে شِيْن -এর পূর্বে আনা **হয়েছে। এখন তার ওজন لَفْعَاءُ -এর ওজনে** اَشْيَاءُ হয়েছে। এখন এটি اَلِفْ تَانِيْث مَمْدُوْدَةٌ -এর কারণে **غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ হয়ে** গেছে। –[**ই'রাবুল কুরআন**]

قَوْلُهُ إِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ : এখানে إِنْ হরফে শর্ত। تُسْئَلُوا হলো فِعْل حِيْنَ يُنَزَّلُ شَرْط তারপর عَنْهَا হলো تَسْئَلُوْا -এর مُتَعَلِّق আর هَا যমীর উপরোল্লিখিত اَشْيَاءُ -এর দিকে ফিরেছে। আর تَسْئَلُوْا الْقُرْاٰنُ হলো ظَرْف -এর এবং تُبْدَلَكُمْ হলো جَوَاب شَرْط -

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى إِذَا سَئَلْتُمْ : এ ইবারতটুকু উল্লেখ করে মুসান্নিফ (র.) একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে দুটি جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ এবং جُمْلَةٌ نَهِيٌّ রয়েছে। جُمْلَةٌ نَهِيٌّ টি আগে এসেছে। অথচ তা উভয়টি জুমলার পরে হওয়ার কথা। আর দুটি جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ -এর মধ্যে প্রথমটি পশ্চাতে আর দ্বিতীয়টি অগ্রে আসা উচিত। এখানে نَهِيٌّ -কে আগে আনা হয়েছে اِهْتِمَام زَجَرْ -এর কারণে। আর এ تَقْدِيْم ও تَاخِيْر অর্থগতভাবে হয়েছে। কেননা, وَاوْ তারতীবের তাকাজা করে না।

قَوْلُهُ إِذَا سَئَلْتُمْ عَنْ اَشْيَاءَ : এটি দ্বিতীয় জুমলার মর্ম। আর مَتٰى اَبْدَاهَا سَائَتْكُمْ হলো প্রথম জুমলার মর্ম।

قَوْلُهُ فَلَا تَسْئَلُوْا عَنْهَا : এটি نَهِيٌّ -এর মর্ম।

قَوْلُهُ إِذَا سَئَلْتُمْ عَنْ اَشْيَاءَ : এটি مُبْتَدَأٌ مُتَضَمِّنٌ بِمَعْنَى الشَّرْطِ বা এমন মুবতাদা যা শর্তের অর্থ পোষণকারী। আর يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ عَنْ اِبْدَائِهَا হলো তার জাযা।

قَوْلُهُ عَنْ مَسْئَلَتِكُمْ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَنْهَا -এর যমীর مَسْئَلَةٌ -এর দিকে ফিরেছে। আর এটি يَسْئَلُوْنَ থেকে বুঝে আসে।

قَوْلُهُ شَرَعَ : جَعَلَ -এর তাফসীর شَرَعَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, جَعَلَ ফে'লটিতে شَرَعَ -এর অর্থ রয়েছে বিধায় এটি এক মাফউলের দিকে মুতাআদ্দী।

قَوْلُهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ : এখানে مِنْ হরফটি অতিরিক্ত। بَحِيْرَةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে মাফউলের অর্থে। তার শেষে নিয়মবহির্ভূত تَا যোগ করা হয়েছে। এজন্য যে, তা وَصْفِيَّتْ থেকে اِسْمِيَّتْ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। যার কারণে جَامِدْ হয়ে গেছে।

بَحِيْرَةٌ -এর সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের অনেক মতভেদ রয়েছে। সবচেয়ে শক্তিশালী উক্তি হলো, যদি কোনো উষ্ট্রী পাঁচবার বাচ্চা প্রসব করত এবং প্রতিবারই বাচ্চাটি নর হতো তাহলে সে উষ্ট্রীর কান ছেদন করে তাকে মূর্তির নামে ছেড়ে দেওয়া হতো। তার উপর আরোহণ করা হারাম মনে করা হতো এবং কেউ প্রাণীটিকে কোথাও পানাহার করতে বাধা দিত না। [ই'রাবুল কুরআন, দারবীশ] তাফসীরে উসমানীতে বলা হয়েছে– ওই পশু যার দুধ তারা প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত, নিজেরা ব্যবহার করত না।

–[তাফসীরে উসমানী : ২/৫৮৮]

قَوْلُهُ سَائِبَةٌ : এটি سَابَ يَسِيْبُ [মুক্ত করা] থেকে اِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ। তার ধরন এই ছিল যে, জাহিলি যুগে এভাবে মানত করা হতো যে, যদি আমি অমুক সফর থেকে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারি কিংবা রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে পারি তাহলে আমার উষ্ট্রীটি মুক্ত করে দেব। এভাবে ছেড়ে দেওয়া উষ্ট্রীকে سَائِبَةٌ বলা হতো। –[প্রাগুক্ত]

قَوْلُهُ الْبِكْرُ : [ب ও ك বর্ণে যবর দিয়ে] যুবতী উষ্ট্রী। تَبْكُرُ فِىْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْاِبِلِ بِالْاُنْثٰى اَىْ تَلِدُ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ بِالْاُنْثٰى ঐ যুবতী উষ্ট্রী যা প্রথম বাচ্চা নর প্রসব করেছে।

قَوْلُهُ وَصِيْلَةٌ : ঐ যুবতী উষ্ট্রী যার প্রথম বাচ্চা মাদি হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাচ্চাও মাদি হয়েছে। যেহেতু সে ক্রমান্বয়ে দুটি মাদি বাচ্চা প্রসব করেছে তাই তাকে وَصِيْلَةٌ বলা হতো। এরূপ উষ্ট্রীকে আরবে মূর্তির নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার থেকে কোনো খেদমত নেওয়া হতো না।

قَوْلُهُ حَام : حَمٰى يَحْمِىْ حَمْيًا وَحِمْيَةً [বারণ করা] থেকে ইসমে ফায়েলের সীগাহ। কেউ কেউ বলেন, حَامٌ বলা হয় ঐ উষ্ট্রীকে যার গর্ভ থেকে দশটি বাচ্চা হয়েছে। যেন তার পিঠ পরিবহন থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।

اَىْ لَا يُرْكَبُ وَلَا يُحْمَلُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَاءٍ وَلَا مَرْعًى

তাফসীরে উসমানীতে রয়েছে– এমন নর উট, যা সুনির্ধারিত সংখ্যায় সংগম করেছে। একেও তারা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিত।

قَوْلُهُ وَاِضَافَةُ شَهَادَةِ لِبَيْنَ عَلَى الْاِتِّسَاعِ : অর্থাৎ যরফকে فَاعِلْ -এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে বা اِتِّسَاعْ আরবি ব্যাকরণের অবকাশ থাকার কারণে। তাই এ আপত্তি করা যাবে না যে, মাসদার **ইযাফত হয় ফয়েল** কিংবা মাফউলের দিকে এখানে ব্যতিক্রম করা হলো কেন?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَسْئَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ : পূর্ববর্তী রুকূর সারকথা **ছিল দীনি বিধানে** বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য হতে বাধা দেওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন তা নিজের উপর **হারাম সাব্যস্ত করো না। আর** যেসব বস্তু ঘৃণ্য ও হারাম, তা হারাম স্থায়ীভাবেই হোক, কিংবা বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ সময়ে তা থেকে **সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক।** এ আয়াতসমূহে সতর্ক করা হয়েছে যে, শরিয়ত যা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেনি, সে সম্পর্কে অনর্থক ও **নিষ্প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করো না।** বৈধাবৈধকরণ সম্পর্কে বিধানদাতার স্পষ্ট উক্তি যেমন হেদায়েত ও ব্যুৎপত্তির **অসিলা,** তেমনি তার **নীরবতাও রহমত ও** সুবিধার মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার জ্ঞান ও **প্রজ্ঞাক্রমে যে বস্তু বৈধ বা অবৈধ করেছেন** তা চিরদিনের **জন্য বৈধ বা অবৈধ** হয়ে গেছে আর যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন **তার মাঝে সুযোগ ও প্রশস্ত**তা **রয়ে গেছে। মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরাম** তাকে ইজতিহাদ **করার সুযোগ পেয়েছেন। আমরা তা করা, না করার** ব্যাপারে আজাদ রয়ে গেছি। **এখন যদি এরূপ বিষয়ে অনর্থক** খোঁড়াখুঁড়ি ও **প্রশ্নোত্তরের দরজা খুলে দেওয়া হয়, আর এদিকে কুরআন** মাজীদও অবতরণমান এবং বিধান প্রদানের দ্বারও উন্মোচিত, তাহলে **যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে প্রশ্নের উত্তরে** এমন কোনো বিধান নাজিল করা হবে যারপর যদ্দরুন তোমাদের এ স্বাধীনতা এবং ইজতিহাদের সুযোগ আর থাকবে না। তখন যে জিনিস নিজেরা চেয়ে এনেছ, তা যদি পালন করতে না পার, তবে লজ্জার শেষ থাকবে না। মহান আল্লাহ তা'আলার চিরায়ত নীতি এরূপই প্রতীয়মান হয় যে, কোনো বিষয়ে যখন অতিরিক্ত প্রশ্ন ও খোঁড়াখুঁড়ি করা হয় এবং অর্থহীন সম্ভাবনা ও ফাঁকফোকড় বের করা হয়, তখন ওদিক থেকে কঠোরতাও বৃদ্ধি পায়। কেননা এরূপ প্রশ্নমালা দ্বারা এটাই ফুটে উঠে যে, প্রশ্নকর্তাদের নিজেদের উপর আস্থা আছে যে বিধানই দেওয়া হবে, তা পালনের জন্য তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত। বান্দার নিকট দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতা দৃষ্টে এরূপ দাবি কখনই সমীচীন নয়। তথাপি এ দাবির কারণে সে এর উপযুক্ত হয়ে যায় যে, উপর থেকে বিধানের কিছুটা কঠোরতা আরোপ করা হবে এবং সে নিজেকে যতটা যোগ্য জাহির করবে সে অনুযায়ী পরীক্ষাও ততটা কঠিন করে দেওয়া হবে। কাজেই গরু জবাই সংক্রান্ত বনী ইসরাঈলের ঘটনায় এমনই হয়েছিল।

হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, হে মানুষ! মহান আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূল! প্রতি বছর? তিনি বললেন, আমি হ্যাঁ বললে প্রতি বছরই ফরজ হয়ে যেত, কিন্তু তখন তোমাদের পক্ষে আদায় করা সম্ভব হতো না। আমি যে বিষয়ে তোমাদের স্বাধীন ছেড়ে দেই, তোমরাও সে বিষয়ে আমাকে ছেড়ে দাও। আরেক হাদীসে ইরশাদ করেন, মুসলিমগণের মধ্যে সেই ব্যক্তি বড়ই অপরাধী যার প্রশ্নের কারণে এমন জিনিস হারাম হয়ে যায় যা পূর্বে **হারাম** ছিল না। মোদ্দাকথা, এ আয়াত শরয়ী বিধানাবলি সম্পর্কে এরূপ অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিজ্ঞাসাপত্রের দ্বার রুদ্ধ করে। **বাকি যেসব** হাদীসে আছে, কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর কাছে খুঁটিনাটি বিষয়ে অর্থহীন প্রশ্ন করত এবং তাদেরকে তা **থেকে নিবৃত্ত করা** হয়, সেসব হাদীস আমাদের বক্তব্যের পরিপন্থি নয়।

আমরা لَا تَسْئَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ -এর اَشْيَاءَ শব্দকে ব্যাপক মনে করি, যা বিধিবিধান ও ঘটনাবলি উভয়কে শামিল করে। অনুরূপ تَسُؤْكُمْ [illegible] **এটাও** ব্যাপক অর্থ সংবলিত। অর্থ হবে এই যে, বিধিবিধান ও ঘটনাবলি কোনো বিষয়েই তোমরা অনর্থক প্রশ্ন **করবে না।** [illegible] **নয় যে** জবাব দেওয়া হবে, তা তোমাদের ভালো লাগবে না। যেমন কোনো কঠিন বিধান আসল, কিংবা কোনো **শর্ত বৃদ্ধি করা হলো, অথবা** এমন কোনো ঘটনা প্রকাশ পেল যা দ্বারা তোমাদের তিরস্কার করা হলো। এসবই تَسُؤْكُمْ -এর **অন্তর্ভুক্ত। বাকি** [illegible] **বিষয়ে জিজ্ঞাসা** করা বা কোনো প্রমাণভিত্তিক সন্দেহ নিরসনার্থে প্রশ্ন করা দূষণীয় নয়।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৪১]

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا : এর অর্থ হয়তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা সেসব বিষয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি যখন যে বিষয়ে কোনো বিধান দেননি, তখন মানুষ সে সম্পর্কে স্বাধীন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে কোনো ধরপাকড় করবেন না। উসূলে ফিকহের কোনো কোনো ইমাম এরই থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, সবকিছু মূলত বৈধ। অথবা এর অর্থ তোমরা পূর্বে এরূপ অর্থহীন যত প্রশ্ন করেছ তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে সতর্ক থেক। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪২]

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ : এক তো এগুলো ছিল শিরকের নিদর্শন। সেই সঙ্গে যেই পশুর গোশ্‌ত বা দুধ কিংবা যাকে সওয়ারি ইত্যাদির কাজে লাগানো আল্লাহ তা'আলা বৈধ করেছেন তার বৈধাবৈধের বিষয়ে নিজেদের পক্ষ হতে শর্তারোপ করা যেন নিজেদেরকে বিধানদাতার সমপর্যায়ভুক্ত জ্ঞান করারই নামান্তর। এর উপরও বড় জুলুমের কথা ছিল এই যে, নিজেদের এ অংশীবাদীমূলক রসম-রেওয়াজকে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করত। এরই জবাব দেওয়া হয়েছে যে, এসব কুসংস্কার কখনই মহান আল্লাহ তা'আলা স্থির করেননি। তাদের পূর্বপুরুষেরা মহান আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করেছিল। সেটাকেই অধিকাংশ কাণ্ডজ্ঞানহীন আম লোকে কবুল করে নেয়। মোটকথা এখানে সতর্ক করা হয়েছে যে, নিষ্প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে শরয়ী বিধানকে কঠিন করে তোলা যেমন গুরুতর অপরাধ, তার চেয়ে শতগুণ বড় অপরাধ বিধানদাতার আদেশ ব্যতিরেকে কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কোনো জিনিসের বৈধাবৈধ নিরূপণ করা। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪৪]

قَوْلُهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ الخ : অজ্ঞ লোকদের সবচেয়ে বড় দলিল এটাই হয়ে থাকে যে, যে কাজ বাপদাদার আমল হতে চলে আসছে তার বিপরীত কীরূপে করা যায়? তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতার কারণে যদি ধ্বংস গহ্বরে গিয়ে পতিত হয়, তবু কি তোমরা তাদেরই পথে চলবে? হযরত শাহ সাহেব (র.) লেখেন, বাপের সম্পর্কে যদি জানা থাকে সে হকপন্থি ও ইলমের অধিকারী ছিল, তবে তার পথ অনুসরণ করবে, অন্যথায় সেটা পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ কারো অন্ধ অনুসরণ তা যেমনই হোক এটা কখনই জায়েজ নয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪৫]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ الخ : অর্থাৎ এত কিছু উপদেশ আসা সত্ত্বেও কাফেররা যদি অংশিবাদীমূলক রুসম-রেওয়াজ এবং বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণ হতে নিবৃত্ত না হয়, তবে তোমরা বেশি দুঃখ করো না। কারো পথভ্রষ্টতা দ্বারা তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা সরল পথে থাক। সরল পথ তো এটাই যে, মানুষ ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করবে, নিজে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকবে অন্যকেও বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তবু যদি তারা বিরত না হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা বোঝা নিতান্তই ভুল যে, এক ব্যক্তি যদি নিজের নামাজ-রোজা ঠিক রাখে, তবে আমর বিল মা'রূফ না করলেও কোনো ক্ষতি নেই। اِهْتِدَاءٌ [সরল পথে থাকা] শব্দের মাঝে সৎকাজের আদেশসহ যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্য শামিল। এ আয়াতে বক্তব্যের লক্ষ্য যদিও বাহ্যত মুসলিমগণের দিকে, কিন্তু এর দ্বারা সেসব কাফেরদেরও সতর্ক করা উদ্দেশ্য যারা বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ তোমাদের বাপ-দাদা যদি সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে থাকে, তবে জেনেশুনে তাদের অনুসরণে তোমরা কেন নিজেদের ধ্বংস করছ? তাদের ছেড়ে দিয়ে তোমরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা কর। লাভ-লোকসান বুঝতে চেষ্টা কর। বাপ-দাদা যদি পথভ্রষ্ট হয় এবং তাদের সন্তানবর্গ তাদের বিপরীতে সৎপথপ্রাপ্ত হয় তবে পূর্বপুরুষের এ বিরোধিতা তাদের জন্য মোটেই ক্ষতিকারক হবে না। কোনো অবস্থাতেই বাপ-দাদার পথের বাইরে পা রাখা যাবে না, রাখলে নাক কাটা যাবে এটা একটা অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। বুদ্ধিমানের উচিত নিজ পরিণাম চিন্তা করা। পূর্বাপরের সকলেই যখন মহান আল্লাহর সামনে একত্র হবে তখন প্রত্যেকেই নিজ কর্ম ও পরিণতি দেখতে পাবে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৪৬]

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট; অন্যরা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কুরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থি। সেসব আয়াত সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি সৎকাজে আদেশ দান -এর পরিপন্থি নয়। তোমরা যদি

সৎকাজে আদেশ দান পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যই তাফসীর বাহরে মুহীতে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) থেকে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে– তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জিহাদ এবং সৎকাজে আদেশ দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। কুরআনের اِذَا اهْتَدَيْتُمْ শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ দানের কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়। –[মা'আরিফ– ৩/২৩০]

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ শানে নুযূল : এ আয়াতসমূহের শানে নুযূল এই যে, বুদাইল নামক এক মুসলিম তামীম ও আদী নামক দুজন খ্রিস্টানের সাথে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরিয়া যায়। সেখানে পৌঁছার পর বুদাইল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে তার অর্থ– সম্পত্তির একটি তালিকা লিখে **মালামালের মধ্যে** রেখে দেয়। **সঙ্গীদ্বয়কে** সে এর কিছুই অবগত করেনি। রোগ যখন তীব্রাকার ধারণ করে ত**খন** সে **সঙ্গীদ্বয়কে বলল, আমার** যাবতীয় **মালামাল** ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দিও। তারা সে মতে সব মাল এনে **ওয়ারিশদের নিকট হস্তান্তর করল। কিন্তু** সোনার কারুকাজ করা একটি রূপার পেয়ালা তারা সরিয়ে রাখল। **মালামালের মধ্যে ওয়ারিশরা উপরিউক্ত তালিকাটি পেয়ে গেল।** তারা অছিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করল, মৃত ব্যক্তি **কি তার কোনো মাল বিক্রয় করেছে কিংবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কারণে চিকিৎসা** ইত্যাদিতে কিছু ব্যয় **হয়ে গেছে কি? তারা নেতিবাচক উত্তর দিল। শেষ পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট মামলা রুজু** হলো। **ওয়ারিশদের কিছু দাবী প্রমাণ না থাকায় খ্রিস্টানদ্বয় হতে এই মর্মে শপথ** নেওয়া হলো যে, তারা মৃত ব্যক্তির মালামালে **কোনো প্রকার খেয়ানত করেনি এবং তারা কোনো কিছু লুকায়নি। শপথের ভিত্তিতে তাদের পক্ষেই** রায় দেওয়া হলো। কিছুদিন **পর তথ্য পাওয়া গেল তারা মক্কা শরীফের জনৈক স্বর্ণকারের** কাছে পেয়ালাটি বিক্রয় করে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলে তারা **বলল**, আমরা মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে এটি কিনে নিয়েছিলাম, কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো সাক্ষী না থাকায় প্রথমে আমরা এর উল্লেখ করিনি, পাছে আমাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়। ওয়ারিশরা পুনরায় নবী করীম ﷺ -এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করল। এবার পূর্বাবস্থার বিপরীতে অছিদ্বয় ক্রয় সম্পর্কে বাদী এবং ওয়ারিশগণ বিবাদী হলো। সাক্ষী না থাকায় মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম দুজন ওয়ারিশ শপথ করল যে, পেয়ালাটি মৃত ব্যক্তির মালিকানায় ছিল। খ্রিস্টান দুজন মিথ্যা শপথ করেছে। কাজেই যে মূল্যে তারা পেয়ালাটি বিক্রয় করেছিল অর্থাৎ এক হাজার দিরহাম তা ওয়ারিশদের পরিশোধ করা হলো। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৫৪]

قَوْلُهُ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ : অর্থাৎ সালাতুল আসরের পর। এটা লোক সমাবেশ ও দোয়া কবুলের সময়। হয়তো ভয়ে মিথ্যা শপথ হতে বিরত থাকবে। অথব যে কোনো সালাতান্তে কিংবা অছির ধর্মানুযায়ী সালাতের পর।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৫১]

اَلْمَعْنٰى لِيُشْهِدَ الْمُحْتَضَرُ عَلٰى وَصِيَّتِهٖ اِثْنَيْنِ اَوْ يُوْصِيْ اِلَيْهِمَا مِنْ اَهْلِ دِيْنِهٖ اَوْ غَيْرِهِمْ اِنْ فَقَدَهُمْ لِسَفَرٍ وَنَحْوِهٖ فَاِنِ ارْتَابَ الْوَرَثَةُ فِيْهِمَا فَادَّعَوْا اَنَّهُمَا خَانَا بِاَخْذِ شَيْءٍ اَوْ دَفْعِهٖ اِلٰى شَخْصٍ زَعَمَا اَنَّ الْمَيِّتَ اَوْصٰى لَهٗ فَيَحْلِفَانِ الخ فَاِنِ اطَّلَعَ عَلٰى اَمَارَةِ تَكْذِيْبِهِمَا فَادَّعَيَا دَافِعًا لَهٗ حَلَفَ اَقْرَبُ الْوَرَثَةِ عَلٰى كِذْبِهِمَا وَصِدْقِ مَا ادَّعَوْهُ وَالْحُكْمُ ثَابِتٌ فِى الْوَصِيَّيْنِ مَنْسُوْخٌ فِى الشَّاهِدَيْنِ وَكَذَا شَهَادَةُ غَيْرِ اَهْلِ الْمِلَّةِ مَنْسُوْخَةٌ وَاعْتِبَارُ صَلٰوةِ الْعَصْرِ لِلتَّغْلِيْظِ وَتَخْصِيْصُ الْحَلَفِ فِى الْاٰيَةِ بِاثْنَيْنِ مِنْ اَقْرَبِ الْوَرَثَةِ لِخُصُوْصِ الْوَاقِعَةِ الَّتِىْ نَزَلَتْ لَهَا وَهِىَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ خَرَجَ مَعَ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ بَدَاءٍ وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ فَمَاتَ السَّهْمِىُّ بِاَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهٖ فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَرُفِعَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَلَتْ فَاَحْلَفَهُمَا ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالَ ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِىٍّ فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ الثَّانِيَةُ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ اَوْلِيَاءِ السَّهْمِىِّ فَحَلَفَا ـ

অনুবাদ :

যাহোক এ আয়াত দুটির মর্ম হলো মরণমুখ ব্যক্তি তার অধর্মাবলম্বী দুব্যক্তিকে বা সফর ইত্যাদির কারণে অধর্মাবলম্বী না পেলে অন্য কোনো ধর্মের দু-ব্যক্তিকে তার এ অসিয়ত সম্পর্কে সাক্ষ্য রাখবে বা এ দুজনকে অসিয়ত করে যাবে। পরে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের যদি এ দু-ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহ হয় এবং দাবি করে **যে, এরা এ সামগ্রী** হতে কিছু আত্মসাৎ করে নিয়েছে **বা অমুক এক ব্যক্তিকে তারা কিছু** দিয়ে দিয়েছে **যার সম্পর্কে তাদের দুজন বলে যে, মৃত ব্যক্তি** তার পক্ষেও অসিয়ত করে গিয়েছে **তবে তারা দুজন শপথ করবে।** আর উক্ত দু-সাক্ষীর মিথ্যাচারের **যদি কোনো আলামত** পাওয়া যায় এবং মৃত ব্যক্তি **তাদেরকে প্রদান করেছে** বলে তারা দাবি করে তবে মৃত **ব্যক্তির সর্বাধিক** নিকটবর্তী আত্মীয় এদের মিথ্যা প্রতিপন্ন **হওয়ার এবং** নিজেদের দাবির সত্যতা সম্পর্কে হলফ করবে। **উক্ত** বিধানটি অছিদের ক্ষেত্রে এখনও বিদ্যমান **তবে** সাক্ষীগণ এবং অপর ধর্মাবলম্বীর সাক্ষী গ্রহণের **ক্ষেত্রে** মানসূখ অর্থাৎ রহিত বলে বিবেচ্য। বিষয়টির **গুরুত্ব** প্রকাশার্থে আসরের সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে ঘটনাটির প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছিল সে ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য করে এ আয়াতটিতে মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকট দুজন আত্মীয়দের সাক্ষ্য দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো, ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, সাহম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তামীম আদ্দারী ও আদী ইবনে বাদ্দা নামক দু খ্রিস্টান ব্যক্তির সাথে সফরে যাত্রা করে। পথে ঐ সাহমী ব্যক্তি এমন এক স্থানে মারা যায় যেখানে কোনো মুসলিম ব্যক্তি ছিল না। ঐ দু খ্রিস্টান ব্যক্তি বাড়ি ফিরে সাহমীর আত্মীয়বর্গের নিকট তার দ্রব্যসামগ্রী **যা** ছিল ফেরত দেয়। কিন্তু সোনার জড়োয়া কাজ **করা** একটি রৌপ্যের পেয়ালা তাতে না পেয়ে **তার** আত্মীয়স্বজন রাসূল ﷺ -এর নিকট এ বিষয়টি **উত্থাপন** করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তদনুসারে তাদেরকে হলফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে **মক্কায়** এক ব্যক্তির নিকট ঐ পেয়ালাটি পাওয়া যায়। সে **বলল,** আমি তামীম ও আদীর নিকট হতে এটা ক্রয় **করেছি।** তখন দ্বিতীয় আয়াতটি নাজিল হয়। তদনুসারে **উক্ত** মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ দুই আত্মীয় **হলফ করে।**

وَفِى رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَرَجُلٌ اٰخَرُ مِنْهُمْ فَحَلَفَا وَكَانَا اَقْرَبَ اِلَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ فَمَرِضَ فَاَوْصَى اِلَيْهِمَا وَاَمَرَهُمَا اَنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ اَهْلَهُ فَلَمَّا مَاتَ اَخَذَ الْجَامَ وَدَفَعَا اِلَى اَهْلِهِ مَا بَقِىَ .

তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, আমর ইবনুল আস এবং অপর এক ব্যক্তি হলফ করে। তারা দুজন উক্ত মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয় ছিল। **অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সাহমী ব্যক্তিটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।** তখন সে তার সঙ্গী উক্ত **দুজনকে অসিয়ত করে যায়** এবং তার জিনিসপত্র **আত্মীয়স্বজনের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে** অনুরোধ করে। **সে মারা গেলে তারা উক্ত রৌপ্যের পেয়ালাটি** গোপন করে বাকি জিনিসপত্র **ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।**

১০৮. ذٰلِكَ الْحُكْمُ الْمَذْكُوْرُ مِنْ رَدِّ الْيَمِيْنِ عَلَى الْوَرَثَةِ اَدْنٰى اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ يَّاْتُوْا اَىِ الشُّهُوْدُ اَوِ الْاَوْصِيَاءُ بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا الَّذِىْ تَحَمَّلُوْهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيْفٍ وَلَا خِيَانَةٍ اَوْ اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ط عَلَى الْوَرَثَةِ الْمُدَّعِيْنَ فَيَحْلِفُوْنَ عَلٰى خِيَانَتِهِمْ وَكِذْبِهِمْ فَيَفْتَضِحُوْنَ وَيَغْرَمُوْنَ فَلَا يَكْذِبُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَالْكِذْبِ وَاسْمَعُوْا ط مَا تُؤْمَرُوْنَ بِهِ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ الْخَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهٖ اِلٰى سَبِيْلِ الْخَيْرِ .

১০৮. এটা অর্থাৎ পুনরায় ওয়ারিশানের **হলফ** নেওয়ার উল্লিখিত বিধান তাদের অর্থাৎ **সাক্ষীগণ কিংবা** অছিগণের যথাযথ সাক্ষ্য দানের অর্থাৎ যে **বিষয়ে** সাক্ষ্য দান করছে তাতে কোনোরূপ বিকৃতি বা খেয়ানত প্রদর্শন না করত যথাযথভাবে তা বহন **করার** ও তা প্রদানের এবং শপথের পর পুনরায় **বাদীপক্ষ ওয়ারিশানের** শপথ নেওয়া হবে এ ভয়ের **অধিকতর সম্ভাবনা।** অর্থাৎ তারা এদের খেয়ানত ও মিথ্যাচার সম্পর্কে শপথ করবে। এতে তারা অপমানিত হবে এ ভয়ে তারা মিথ্যা না বলার অধিক সম্ভাবনা। খেয়ানত ও মিথ্যাচার বর্জন করত আল্লাহকে ভয় কর এবং তিনি যার নির্দেশ করেন তা শোনার মতো শোন! আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ যারা তাঁর আনুগত্যের গণ্ডি হতে বের হয়ে গিয়েছে তাদেরকে সৎপথে **মঙ্গল ও কল্যাণের পথে** পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمَعْنٰى : অর্থাৎ শেষে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মর্ম।

قَوْلُهُ لِيَشْهَدَ الْمُحْتَضِرَ : এ ইবারতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এটি اَمْرٌ বা নির্দেশজ্ঞাপক। অর্থাৎ মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির উচিত নিজের অসিয়তের উপর দুজনের সাক্ষী রাখা।

قَوْلُهُ اَوْ يُوْصِىْ اِلَيْهِمَا : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতের দুটি তাফসীর রয়েছে। তাফসীরে খাজিনের ইবারত এই- وَاخْتَلَفُوْا فِىْ هٰذَيْنِ الْاِثْنَيْنِ فَقِيْلَ هُمَا الشَّاهِدَانِ اللَّذَانِ يَشْهَدَانِ عَلٰى وَصِيَّةِ الْوَصِىِّ وَقِيْلَ هُمَا وَصِيَّانِ لِاَنَّ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِمَا وَلِاَنَّهٗ تَعَالٰى قَالَ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ وَالشَّاهِدُ لَا يَلْزَمُهُ الْيَمِيْنَ .

অর্থাৎ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে? কেউ বলেন, اِثْنَيْنِ দ্বারা ঐ দুই সাক্ষী উদ্দেশ্য, যাকে অসিয়তকারী **মৃত্যুর** সময় সাক্ষী রেখে গেছে। কেউ বলেন, যার ব্যাপারে অসিয়ত করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য। কেননা উক্ত ঘটনা এদের **ব্যাপারেই** ঘটেছে। দ্বিতীয় কথা হলো, সাক্ষীদের উপর তো কসম আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় সূরতে شَهَادَةٌ অর্থ হবে উপস্থিত থাকা। **যেমন** বলা হয়- شَهِدْتُّ وَصِيَّةَ فُلَانٍ اَىْ حَضَرْتُهَا

قَوْلُهُ اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ : اَوْ يَخَافُوْا পূর্বোল্লিখিত اَدْنٰى -এর সাথে এর عَطْف হয়েছে এটা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তাফসীরে [illegible] -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

১٠٩. اُذْكُرْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهِمْ مَاذَا اَىِ الَّذِىْ اُجِبْتُمْ ط بِهٖ حِيْنَ دَعَوْتُمْ اِلَى التَّوْحِيْدِ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ط بِذٰلِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ وَذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمُهُ لِشِدَّةِ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَفَزَعِهِمْ ثُمَّ يَشْهَدُوْنَ عَلٰى اُمَمِهِمْ لِمَا يَسْكُنُوْنَ ـ

১১০. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ م بِشُكْرِهَا اِذْ اَيَّدْتُّكَ قَوَّيْتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قف جِبْرَئِيْلَ تُكَلِّمُ النَّاسَ حَالٌ مِنَ الْكَافِ فِىْ اَيَّدْتُّكَ فِى الْمَهْدِ اَىْ طِفْلًا وَكَهْلًا ج يُفِيْدُ نُزُوْلَهُ قَبْلَ السَّاعَةِ لِاَنَّهُ رُفِعَ قَبْلَ الْكُهُوْلَةِ كَمَا سَبَقَ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ كَصُوْرَةِ الطَّيْرِ وَالْكَافُ اِسْمٌ بِمَعْنٰى مِثْلِ مَفْعُوْلٌ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ بِاِرَادَتِىْ ـ

অনুবাদ :

১০৯. স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করবেন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এবং তারা যে জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ৎসনা করে জিজ্ঞাসা করবেন, যখন তোমরা তাওহীদের দিকে ডাক দিলে তখন তোমরা কি সাড়া পেয়েছিলে? مَاذَا -এর ذَا টি اَلَّذِىْ [যা اِسْمُ مَوْصُوْل অর্থাৎ সংযোজক সর্বনাম] অর্থে ব্যবহৃত, এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে اَلَّذِىْ -এর উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, এতদসম্পর্কে আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্পর্কে অর্থাৎ বান্দা হতে যা গায়েব এতদসম্পর্কে অবহিত। প্রথমে কিয়ামতের মারাত্মক বিভীষিকা দর্শনে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার দরুন তারা এ সম্পর্কে ভুলে যাবেন। পরে যখন আত্মস্থ হবেন এবং তাদের স্বস্তি ফিরে আসবে তখন অবশ্য তারা স্ব-স্ব উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবেন।

১১০. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত স্মরণ কর; পবিত্র আত্মা দ্বারা অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দ্বারা আমি তোমাকে সমর্থন জুগিয়েছিলাম, শক্তিশালী করেছিলাম। দোলনায় থাকা অবস্থায় অর্থাৎ শিশু অবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে। تُكَلِّمُ النَّاسَ এটা اَيَّدْتُّكَ -এর كَ [অর্থ- তুমি] -এর حَالٌ । এ বাক্যটি দ্বারা বুঝা যায়, কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় তাঁর আগমন হবে। কেননা, সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ হয়েছে যে, বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছার পূর্বেই তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম; তুমি কাদা-মাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ রূপ আকৃতি গঠন করতে كَهَيْئَةِ -এর كَ টি এখানে مِثْلِ [অর্থ- মতো] অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় اِسْم অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে গণ্য। এটা এখানে مَفْعُوْل অর্থাৎ কর্মকারক। এবং তাতে ফুৎকার দিতে ফলে আমার অনুমতিক্রমে আমার অভিপ্রায়ে তা পাখি হয়ে যেত।

وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى مِنْ قُبُوْرِهِمْ اَحْيَاءً بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ حِيْنَ هَمُّوْا بِقَتْلِكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ مَا هٰذَآ اَلَّذِيْ جِئْتَ بِهٖ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سَاحِرٌ اَيْ عِيْسٰى ـ

জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করতে এবং আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করত কবর হতে বের করতে; আমি তোমা হতে বনী ইসরাঈলকে যখন তারা তোমাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল তখন নিবৃত্ত রেখেছিলাম। তুমি যখন তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ অর্থাৎ মু'জিযাসহ এসেছিলে তখন তাদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বলেছি; এটা অর্থাৎ তুমি যা নিয়ে এসেছ তা তো স্পষ্ট জাদু। سِحْرٌ এটা অপর এক কেরাতে سَاحِرٌ [জাদুকর অর্থে ব্যবহৃত।] এমতাবস্থায় এটা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে বলে বিবেচ্য হবে।

١١١. وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَمَرْتُهُمْ عَلٰى لِسَانِهٖ اَنْ اَيْ بِاَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ع عِيْسٰى قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهِمَا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ـ

১১১. যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ওহী করেছিলাম, অর্থাৎ তারা ঈসার জবানিতে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূল ঈসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তখন তারা বলেছিল আমরা তোমাদের উভয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা আত্মসমর্পণকারী। اَنْ এটা এখানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٢. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ اَيْ يَفْعَلُ رَبُّكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَنَصْبِ مَا بَعْدَهٗ اَيْ تَقْدِرُ اَنْ تَسْاَلَهٗ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ط قَالَ لَهُمْ عِيْسٰى اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ اِقْتِرَاحِ الْاٰيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

১১২. স্মরণ কর হাওয়ারীগণ বলেছিল, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি এতে সক্ষম يَسْتَطِيْعُ এটা অপর এক কেরাতে ت [অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ হিসেবে] সহযোগে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর পরবর্তী শব্দ [رَبَّكَ] مَنْصُوْبٌ [ফাতাহযুক্ত] পঠিত হবে। মর্ম হবে– হে ঈসা! তুমি কি এ বিষয়ে তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাতে পার? আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করতে? অর্থাৎ তিনি কি এটা করবেন? ঈসা তাদেরকে বলেছিল এ ধরনের অলৌকিক নিদর্শন তলব করা সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

١١٣. قَالُوْا نُرِيْدُ سُؤَالَهَا مِنْ اَجْلِ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ تَسْكُنَ قُلُوْبُنَا بِزِيَادَةِ الْيَقِيْنِ وَنَعْلَمَ نَزْدَادُ عِلْمًا اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اَنَّكَ قَدْ صَدَقْتَنَا فِيْ اِدِّعَاءِ النُّبُوَّةِ وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

১১৩. তারা বলেছিল যে, আমরা এ জন্য তার প্রার্থনা করি চাই যে, তার কিছু আহার করব এবং এতে প্রত্যয়ের প্রবৃদ্ধিতে আমাদের চিত্তপ্রশান্তি ঘটবে, আমাদের শান্তি লাভ হবে। আমরা জানতে পারব অর্থাৎ এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে যে তুমি নবুয়ত দাবির বিষয়ে আমাদের সাথে সত্য বলেছ এবং আমরা হব তার সাক্ষী। اَنْ قَدْ এটা اَنْ শব্দটি এখানে مُثَقَّلَةٌ অর্থাৎ রূঢ়রূপ [তাশদীদসহরূপ] হতে পরিবর্তিত হয়ে مُخَفَّفَةٌ বা লঘুরূপে [তাশদীদহীন রূপে] ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٤. قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا اَىْ يَوْمَ نُزُوْلِهَا عِيْدًا نُعَظِّمُهُ وَنُشَرِّفُهُ لِّاَوَّلِنَا بَدَلٌ مِنْ لَنَا بِاِعَادَةِ الْجَارِ وَاٰخِرِنَا مِمَّنْ يَّأْتِىْ بَعْدَنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ج عَلٰى قُدْرَتِكَ وَنُبُوَّتِىْ وَارْزُقْنَا اِيَّاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

১১৪. মরিয়াম তনয় ঈসা বলল, হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর। এটা অর্থাৎ এটা অবতরণের দিনে আমাদের যারা প্রথমে ও যারা পরে অর্থাৎ বর্তমানে যারা আছে ও পরে যারা আসবে সকলের জন্য হবে আনন্দ উৎসব। অর্থাৎ এটাকে আমরা সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করব। لِّاَوَّلِنَا এতে লাম حَرْف جَارّ -এর পুনরাবৃত্তিসহ এটা لَنَا -এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তোমরা হরফ হতে তোমার কুদরত ও আমার নবুয়তের নিদর্শনস্বরূপ এবং তা দ্বারা আমাদেরকে জীবিকা দান কর; আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

١١٥. قَالَ اللّٰهُ مُسْتَجِيْبًا لَهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْكُمْ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ اَىْ بَعْدَ نُزُوْلِهَا مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ فَنَزَلَتِ الْمَلٰئِكَةُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ عَلَيْهَا سَبْعَةُ اَرْغِفَةٍ وَسَبْعَةُ اَحْوَاتٍ فَاَكَلُوْا مِنْهَا حَتّٰى شَبِعُوْا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) وَفِىْ حَدِيْثٍ اُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا فَاُمِرُوْا اَنْ لَّا يَخُوْنُوْا وَلَا يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا فَرُفِعَتْ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ.

১১৫. আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করত বললেন, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তা প্রেরণ করব। مُنَزِّلُهَا এটা তাশদীদহীন ও তাশদীদসহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। কিন্তু এরপর অর্থাৎ এটা প্রেরণের পর তোমাদের মধ্যে কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকেও দেব না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অনন্তর আকাশ হতে ফেরেশতাগণ খাঞ্চাসহ অবতরণ করেন। তাতে ছিল সাতটি রুটি ও সাতটি মৎস্য। তারা তা পরম পরিতৃপ্তির সাথে আহর করল। অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, রুটি ও গোশ্‌তসহ আকাশ হতে খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদেরকে এতে খেয়ানত করতে এবং আগামীর জন্য সঞ্চয় করে রাখতে নিষেধ করল এবং আগামীর জন্যও সঞ্চয় করে রাখল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তা উঠিয়ে নিলেন। আর এরা আজাবস্বরূপ বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهِمْ : এ ইবারতটি একটি سُؤَالٌ مُقَدَّرٌ -এর জবাব। **প্রশ্ন.** আল্লাহ তা'আলা তো হলেন عَلَّامُ الْغُيُوْبِ সকল বিষয়ে জ্ঞাত। তাঁর তো কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই। তারপরও তিনি কেন প্রশ্ন করলেন?

উত্তর. আল্লাহ তা'আলা জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেননি; বরং ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে করেছেন। যেমনটি وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ -এর মাঝে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىِ الَّذِىْ : এটিও একটি سُؤَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাব। **প্রশ্ন.** اِذْ ইসমুল ইশারা مَحْسُوْس বা অনুভূত বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তার مُشَارٌ اِلَيْهِ টি غَيْر مَحْسُوْسِىْ বিষয়ের জবাব হয়েছে। **উত্তর.** এখানে اِذْ ইসমুল ইশারাটি اِسْمِ مَوْصُوْل তথা اَلَّذِىْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কোনো প্রশ্ন বাকি থাকল না।

قَوْلُهُ ذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمُهُ الخ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। **প্রশ্ন.** আম্বিয়া (আ.)-এর তাওহীদের দাওয়াতে উম্মতেরা দুনিয়াতে কি জবাব দিয়েছিল তা তো তাদের জানা থাকা উচিত ছিল। তারপরও কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে তাঁরা কেন বলবেন, আমাদের জানা ছিল না যে, উম্মত আমাদের কি জবাব দিয়েছিল। এর দ্বারা তো মিথ্যা বলা লাযেম আসে, যা নবীদের শানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাও কি আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে।

উত্তর. জানার অস্বীকার করাটা তাদের মিথ্যার কারণে নয়; বরং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কারণে হবে। কেননা কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের উপর এমন ভীতির সঞ্চার হবে যে, নবীরা পর্যন্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়বেন। কিন্তু এ জবাবটি দুর্বল জবাব। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) উক্ত আপত্তির জবাবে বলেছেন, নবীদের উক্ত জবাব আল্লাহর আদব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য হবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় রাসূল ﷺ -এর প্রশ্নের জবাবে বলতে اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অথচ অনেক বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান থাকত।

قَوْلُهُ طِفْلًا : فِى الْمَهْدِ -এর ব্যাখ্যায় طِفْلًا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَهْد দ্বারা শিশুকাল উদ্দেশ্য। সরাসরি কোল উদ্দেশ্য নয়। কেননা আয়াতে مَهْد -এর মোকাবিলায় كَهْلًا শব্দ এসেছে। এখানে জ্ঞানের অপূর্ণতা ও পূর্ণতার সময় বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا : لَيْسَ এটা এখানে مَا বা না-সূচক অর্থে ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ اَكْمَهَ : মায়ের পেট থেকে যে অন্ধ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। জন্মান্ধ।

قَوْلُهُ اَمَرْتُهُمْ عَلٰى لِسَانِهٖ : এটি একটি سُؤَالْ مُقَدَّرْ-এর জবাব। **প্রশ্ন.** হাওয়ারীরা তো নবী ছিলেন না। তারপরও তাদের প্রতি ওহী প্রেরণের মর্ম কি?

উত্তর : এখানে সরাসরি ওহী উদ্দেশ্য নয়; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مِنْ اَجَلِ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْ نَأْكُلَ এখানে مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ .... اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ : হাশরের ভয়াল দিনে যখন মহা প্রতাপশালী আল্লাহর চরম রুদ্ররূপের প্রকাশ ঘটবে, বড় বড় ব্যক্তিদেরও যখন হুঁশ থাকবে না এবং উচ্চস্তরের নবীগণের মুখে শুধু ধ্বনিত হবে, হায় আমার কি হবে! হায় আমার কি হবে! তখন প্রচণ্ড ভয় ও ত্রাসে আল্লাহ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে لَا عِلْمَ لَنَا 'আমরা কিছুই জানি না' ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না। অবশেষে নবী কারীম ﷺ -এর অসিলায় যখন সকলের প্রতি মহান আল্লাহর রহমত ও কৃপা দৃষ্টি হবে, তখন কিছু বলার হিম্মত হবে। হযরত হাসান (র.), হযরত মুজাহিদ (র.) প্রমুখ হতে এরূপই বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে لَا عِلْمَ لَنَا -এর অর্থ হে আল্লাহ! তোমার পরিপূর্ণ সর্বব্যাপী জ্ঞানের সামনে আমাদের কিছুই জানা নেই। এটা যেন মহান আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে আদব ও বিনায়াত্মক জবাব। ইবনে জুরাইজের মতে এর অর্থ– আমরা জানি না আমাদের পেছনে তারা কি না কি করছে। আমরা তো কেবল সেই সব কাজ ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারি যেগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ্যে হতো। পশ্চাতের ও গোপনীয় অবস্থাসমূহের জ্ঞান একমাত্র عَلَّامُ الْغُيُوْبِ [অদৃশ্যের জ্ঞাতা]-ই রাখেন। সামনের রুকুতে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জবানিতে যে উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে– وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا তা দ্বারা শেষোক্ত অর্থই সমর্থিত হয়। সহীহ হাদীসে আছে, হাউজে কাওসারের তীরে প্রিয়নবী ﷺ যখন কতক লোক

সম্পর্কে বলবেন, **هٰؤُلَاءِ أَصْحَابِيْ এরা আমার দলের**। তখন জবাব দেওয়া হবে, لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ অর্থাৎ আপনি **জানেন না। আপনার পরে এরা কি সব কাণ্ড করেছে**। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৫৮]

قَوْلُهُ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الخ ঈসা ইবনে মরিয়মের কতিপয় স্পষ্ট মু'জিযা : কোলে **বসে তিনি যে কথা বলেন,** তার বিবরণ সূরা মরিয়মে আসবে اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِيَ الْكِتٰبَ অর্থাৎ আমি আল্লাহর বান্দা তিনি **আমাকে কিতাব দিয়েছেন**। আশ্চর্যের বিষয় খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহ (আ.)-এর শৈশবকালীন কথা বলা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ **করেনি। অবশ্য** এটা উল্লেখ করেছে যে, তিনি বারো বছর বয়সে ইহুদিদের সামনে এমন বিজ্ঞজনোচিত দলিল প্রমাণ পেশ **করেন, যা শুনে** পণ্ডিতবর্গ নিরুত্তর ও বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায় এবং শ্রোতাগণ উল্লাসে বাহ বাহ করে উঠে।

এমনিতে তো আম্বিয়ায়ে কেরামের সকলেই বরং অনেক মু'মিন সাধারণও আপন আপন অবস্থা অনুযায়ী 'রূহুল কুদ্স' দ্বারা সাহায্য **প্রাপ্ত হন। কিন্তু হযরত** ঈসা (আ.)-এর অস্তিত্বই তো হয়েছিল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ফুঁক দ্বারা, যদ্দরুন বিশেষ ধরনের **প্রকৃতিগত সম্বন্ধ** ও সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। নবীগণের কতককে কতকের উপর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা **হয়েছে–**

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ . (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ)

রূহের জগতে 'রূহুল কুদ্স' -এর দৃষ্টান্ত বস্তুজগতের বিদ্যুৎ শক্তির কেন্দ্র সদৃশ মনে করতে পারেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্ধারিত পরিচালক নিয়ম অনুসারে যখণ বিদ্যুৎ চালু করে এবং যেসব বস্তুতে বিদ্যুৎ পৌছানোর উদ্দেশ্যে সংযোগ দেয় তখন মুহূর্তের মধ্যে নিস্তব্ধ ও থেমে থাকা মেশিনগুলো তীব্র শক্তিতে ঘুরতে থাকে। কোনো রোগীর উপর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্ধারিত অবশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও নিথর শিরাগুলো বিদ্যুৎস্পর্শের সাথে সাথে নড়াচড়া শুরু করে দেয় ও তৎপর হয়ে উঠে। অনেক সময় ডাক্তার তো এ পর্যন্ত দাবি করে বসেছে যে, বৈদ্যুতিক শক্তি আরোপ দ্বারা সব রকমের রোগই ভালো করা যেতে পারে। [ফারীদ ওয়াজদী, দায়িরাতুল মা'আরিফ] যখন এ মামুলি বস্তু জাগতিক বিদ্যুতেরই এ অবস্থা, তখন চিন্তা করে দেখুন রূহানী জগরেত সেই বিদ্যুৎ যার কেন্দ্র হচ্ছে কুদ্স, তার কি পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা রূহুল কুদসের সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর মহান সত্তার সম্বন্ধ এমনই এক বিশেষ ধরনের ও বিশেষ নিয়মে স্থাপিত করেছেন, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ্য বিজয়, জিতেন্দ্রিয়তা ও জীবনের বিশেষ বিশেষ লক্ষণরূপে। তাঁর রূহুল্লাহ উপাধি, শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের একই রকম কথপোকথন, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জীবন সঞ্চারের উপযুক্ত মাটির কায়া তৈরি ও তাতে মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে জীবাত্মার ফুৎকার, হতাশ ব্যাধিগ্রস্তদেরকে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কোনো রকম প্রাকৃতিক আসবাব-উপকরণ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নির্দোষ করে তেলা এমনকি মৃত লাশের মাঝে মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে পুনর্বার আত্মা প্রত্যানয়ন, বনী ইসরাঈলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর আকাশে উত্তোলন এবং এত সুদীর্ঘ আয়ুর কোনো প্রতিক্রিয়া তাঁর পবিত্র জীবনে দেখা না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো সেই বিশেষ সম্পর্ক হতেই সৃষ্ট, যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ধরন ও বিশেষ নিয়মে তাঁর ও রূহুল কুদসের মাঝে স্থাপিত করেছেন। প্রত্যেক নবীর সাথেই আল্লাহ তা'আলার কিছু স্বতন্ত্র আচার-আচরণ হয়ে থাকে। তার কারণ ও রহস্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান সেই আল্লামুল গুয়ূব-ই রাখেন। ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় সেই স্বতন্ত্র আচার-আচরণসমূহই শাখাগত শ্রেষ্ঠত্ব (فَضَائِلُ جُزْئِيَّةٌ) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এর দ্বারা কারো সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। উলূহিয়্যাত [মাবুদ হওয়া] প্রমাণ হওয়া তো দূরের কথা।

وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ -এর মাঝে خَلْقٌ শব্দটি কেবল বাহ্য আকার-আকৃতি দিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ প্রকৃত অর্থে খালিক [স্রষ্টা] সেই সত্তা ছাড়া আর কেউ নয়; যিনি اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির সুন্দরতম কর্তা। এ কারণেই এ স্থলে بِاِذْنِيْ **অর্থাৎ 'আমার হুকুমে'** শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা আলে ইমরানে হযরত মাসীহ (আ.)-এর জবানিতে এর

পুনরাবৃত্তি করানো হয়েছে। যাহোক এখানে এবং সূরা আলে ইমরানে যেসব আলৌকিক বিষয়কে হযরত মাসীহ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সেগুলোর অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা কেবল সেই ধর্মদ্রোহীই করতে পারে, যে মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে নিজ বুদ্ধি ও যুক্তির অধীন মনে করে। বাকি যারা মহান আল্লাহর 'কুদরতি কানুন' শিরোনামের অধীনে মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাবলিকে অস্বীকার করতে চায়, আমি স্বতন্ত্র এক রচনায় তাদের জবাব দিয়েছি। তা পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ সব রকমের সংশয়-সন্দেহের নিরসন হবে। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৬১]

قَوْلُهُ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا الخ : অর্থাৎ পরীক্ষা করার জন্য নয়; বরং বরকতের আশায় যাচনা করছি, যাতে গায়েব থেকে বিনা মেহনতে রুজি আসতে থাকে এবং আমরা প্রশান্ত চিত্ত ও একাগ্রতার সাথে ইবাদতে লিপ্ত থাকতে পারি। আর আপনি জান্নাতের নিয়ামত ইত্যাদির সম্পর্কে যেসব গায়বি সংববাদ দান করেন, একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেখে সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ প্রত্যয় লাভ হয়। সেই সঙ্গে চাক্ষুস সাক্ষীরূপে আমরা তার সাক্ষ্য প্রদান করতে পারি, যাতে সর্বদা এ মু'জিযা প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। কতক তাফসীরবেত্তা উদ্ধৃত করেছেন, হযরত মাসীহ (আ.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তোমরা মহান আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ত্রিশ দিন রোজা রেখে, যাই প্রার্থনা করবে মঞ্জুর হবে। হাওয়ারীগণ রোজা রাখল এবং খাঞ্চা প্রার্থনা করল। এটাই وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا - এর অর্থ মহান আল্লাহই ভালো জানেন। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৬৬]

قَوْلُهُ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا الخ : অর্থাৎ যেদিন আকাশ থেকে খাদ্য ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ হবে। সেদিন আমাদের আগের পরের সকলের জন্যই ঈদ হয়ে থাকবে। আমরা সর্বদা জাতীয় পর্ব হিসেবে তা উদ্‌যাপন করব। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا -এর বক্তব্যটি ঠিক ঐ রকমের যেমন– اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটির সম্পর্কে বুখারী শরীফে ইহুদিদের এ উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছিলেন– اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ اٰيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا অর্থাৎ তোমরা এমন একটি আয়াত পাঠ কর, যেটি আমাদের সম্পর্কে নাজিল হলে আমরা তাকে ঈদরূপে গ্রহণ করতাম। উক্ত আয়াতকে ঈদ বানানোর অর্থ যেমন আয়াত নাজিলের দিনকে ঈদ বানানো [অন্যান্য রেওয়ায়েতে বা স্পষ্টরূপে আছে]। মায়িদাহ [খাঞ্চা]-কে ঈদ বানানোর অর্থও তেমনি বুঝে নিতে পারেন। বলা হয়, সে খাঞ্চা রবিবার দিন অবতীর্ণ হয়েছিল, যা খ্রিস্টানদের কাছে মুসলিমগণের জুমা বারের মতো সাপ্তাহিক ঈদ। –[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৬৭]

অস্বাভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করা উচিত নয় : নিয়ামত যখন অসাধারণ ও অভিনব হবে, তখন তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের গুরুত্বও সাধারণ অপেক্ষা বেশিই হবে বৈ কি! আবার অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও হবে অসাধারণ ও ভিন্নধর্মী। 'মূযীহুল কুরআনে' আছে, কেউ বলেন, সে খাঞ্চা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নাজিল হয়েছিল। তারপর তাদের কতিপয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ কেবল দরিদ্র ও অভাবীদেরকেই খেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বিত্তবান ও সুখিরাও খেতে শুরু করে। পরিণামে প্রায় আশিজন লোক শূকর ও বানর হয়ে যায়। পূর্বে এ শাস্তি ইহুদিদের দেওয়া হয়েছিল। পরে আর কেউ ভোগ করেনি। কেউ বলেন, খাঞ্চা নাজিল হয়নি, বরং সতর্কবাণী শুনে তারা ভয় পেয়ে যায়, পুনরায় আর প্রার্থনা করেনি। কিন্তু নবীর দোয়া বৃথা যেতে পারে না এবং পবিত্র কুরআনে তার উদ্ধৃতিও তাৎপর্যহীন নয়। এ দোয়ার ফলেই সম্ভবত হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মত সর্বদা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করে আসছে। আর তাদের মধ্যে যে কেউ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে অর্থাৎ একাগ্র মনে ইবাদতে নিবিষ্ট হবে না; বরং পাপ কর্মে অর্থ ব্যয় করবে, আখেরাতে সে সর্বাধিক শাস্তি ভোগ করবে। এতে মুসলিমগণের জন্য শিক্ষা হলো যে, অস্বাভাবিক পন্থায় কিছু যাচনা করবে না, কেননা তার কৃতজ্ঞাত আদায় অত্যন্ত কঠিন। বরং বাহ্য আসবাব-উপকরণ নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকবে। এটাই উত্তম। এ ঘটনা দ্বারাও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে কারো সাহায্য-সহযোগিতা কাজে আসে না।

–[তাফসীরে উসমানী : টীকা– ২৭০]

অনুবাদ :

١١٦. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اَىْ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِعِيْسٰى فِى الْقِيٰمَةِ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهٖ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ عِيْسٰى قَدْ اُرْعِدَ سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ مِنَ الشَّرِيْكِ وَغَيْرِهٖ مَا يَكُوْنُ مَا يَنْبَغِىْ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ط خَبَرُ لَيْسَ وَلِىَ لِلتَّبْيِيْنِ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ط تَعْلَمُ مَا اُخْفِيْهِ فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ط اَىْ مَا تُخْفِيْهِ مِنْ مَعْلُوْمَاتِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ .

১১৬. আর স্মরণ কর, আল্লাহ তা'আলা বললেন, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঈসাকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি ভর্ৎসনা স্বরূপ বলবেন, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আ-মাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) সন্ত্রস্ত হয়ে বলবে তুমি ম-হিমান্বিত, তোমার কোনো অংশী হওয়া ইত্যাদি বিষয় হতে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়, উচিত নয়। بِحَقٍّ এটা لَيْسَ -এর خَبَرْ যদি আমি তা বলতাম তবে তুমি তো তা জানতে। আমার অন্তরে যা আমি গোপন করি তা তুমি অবগত কিন্তু তোমার অন্তরে তুমি যেসব জ্ঞান গোপন করে রেখেছ তা আমি অবগত নই। তুমি তো অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

١١٧. مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ وَهُوَ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ج وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا رَقِيْبًا اَمْنَعُهُمْ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ ج فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ قَبَضْتَنِىْ بِالرَّفْعِ اِلَى السَّمَاءِ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط الْحَفِيْظَ لِاَعْمَالِهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مِنْ قَوْلِىْ لَهُمْ وَقَوْلِهِمْ بَعْدِىْ وَغَيْرِ ذٰلِكَ شَهِيْدٌ مُطَّلِعٌ عَالِمٌ بِهٖ .

১১৭. তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি। সেটা এই যে, তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, পরিদর্শক। তারা অন্যায় যা কিছু বলত তা হতে আমি তাদেরকে বারণ করতাম। যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে আমাকে [পৃথিবী হতে] আকাশে উঠিয়ে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের উপর নিগাহবান, তাদের কার্যকলাপের সংরক্ষক। এবং তাদেরকে আমি কি বলেছি আর আমার উত্থাপনের পর আমার সম্পর্কে তারা কি বলেছে ইত্যাদি সব বিষয়ে তুমিই সাক্ষী। অর্থাৎ এতদবিষয়ে তুমিই অবহিত এবং তোমারই জানা আছে সব।

١١٨. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ أَيْ مَنْ أَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَإِنْتَ مَالِكُهُمْ تَتَصَرَّفُ فِيهِمْ كَيْفَ شِئْتَ لَا إِعْتِرَاضَ عَلَيْكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ أَيْ لِمَنْ أُمِنَ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ الْحَكِيمُ فِي صُنْعِهِ.

১১৮. তাদের মধ্যে যারা কুফরির উপর প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে তুমি যদি শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা। তুমি তাদের অধিকর্তা। সুতরাং যদৃচ্ছা তাদের সাথে ব্যবহার করার অধিকার তোমার সংরক্ষিত। এতে কারো কোনো প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। **আর তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে যদি ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, তোমার বিষয়ে তুমি ক্ষমতাবান** এবং **তোমার কার্যকলাপে প্রজ্ঞাময়।**

١١٩. قَالَ اللّٰهُ هٰذَا أَيْ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِينَ فِي الدُّنْيَا كَعِيسٰى صِدْقُهُمْ ط لِأَنَّهُ يَوْمُ الْجَزَاءِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُوا عَنْهُ ط بِثَوَابِهِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَنْفَعُ الْكَاذِبِينَ فِي الدُّنْيَا صِدْقُهُمْ فِيهِ كَالْكُفَّارِ لِمَا يُؤْمِنُونَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْعَذَابِ.

১১৯. **আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এই সেইদিন** অর্থাৎ **কিয়ামতের দিন যেদিন দুনিয়াতে যারা** সত্যবাদী ছিল **যেমন হযরত ঈসা (আ.) তারা স্বীয়** সত্যবাদিতার **জন্য উপকৃত হবে। কেননা আজ প্রতিদান** প্রাপ্তির **দিন। তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।** তাদের আনুগত্য দর্শনে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও প্রতিদান পেয়ে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা মহাসফলতা। কিন্তু পৃথিবীতে যারা ছিল মিথ্যাবাদী, যেমন কাফেরগণ, এখানে তাদের সত্যবাদী হওয়াতে কোনো উপকার আসবে না। কেননা, আজাব দর্শন মাত্র সবাই ঈমান নিয়ে আসবে। আর এ ঈমান আনার কোনো মূল্য নেই।

١٢٠. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ خَزَائِنُ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِهَا وَمَا فِيهِنَّ ط أَتٰى بِمَا تَغْلِيبًا لِغَيْرِ الْعَاقِلِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْهُ إِثَابَةُ الصَّادِقِ وَتَعْذِيبُ الْكَاذِبِ وَخَصَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ تَعَالٰى فَلَيْسَ عَلَيْهَا بِقَادِرٍ.

১২০. আসমান ও জমিন এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই অর্থাৎ বৃষ্টি, বৃক্ষলতা, জীবনোপকরণ ইত্যাদি সব কিছুর ভাণ্ডারই তাঁর এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। সত্যবাদীকে পুণ্য ফল দান করা আর মিথ্যাবাদীকে শাস্তি প্রদানও তাঁর শক্তির অন্তর্ভুক্ত। বিবেকের যুক্তির আলোকে আল্লাহ তা'আলার স্বীয় সত্তা তাঁর শক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার সত্তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই। مَا فِيهِنَّ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বুদ্ধিহীন প্রাণীর সংখ্যাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে এখানে مَا -এর ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أَيْ يَقُوْلُ : قَالَ -এর তাফসীরে মুযারের সীগাহ يَقُوْلُ ব্যবহার করে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, পূর্বাপর দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লিখিত কথাবার্তা কিয়ামতের দিন হবে। আর قَالَ দ্বারা বোঝা যায় যে, তা দুনিয়াতে হয়ে গেছে। তাই يَقُوْلُ উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিলেন যে, মাযী মুযারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَوْبِيْخًا لِقَوْمِهِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُؤَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা তো হলেন- عَلَّامُ الْغُيُوْبِ সকল বিষয়ে জ্ঞাত। তাঁর কাছে কোনো ব্যাপার গোপন নয়। হযরত ঈসা (আ.) তার উম্মতকে কিছু বলা বা না বলাও তাঁর জ্ঞানের অধীনে। তারপরও তিনি কেন প্রশ্ন করলেন?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্ন জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাঁর উম্মতকে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে করেছেন। তাই কোনো ইশকাল থাকল না।

قَوْلُهُ لِقَوْمِهِ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে বোঝানো হয়েছে যে, ত্রুটি-বিচ্যুতি উম্মতের পক্ষ থেকে হয়েছে। নবীর পক্ষ থেকে নয়।

قَوْلُهُ وَلِيْ لِلتَّبْيِيْنِ : এখানে ঐসব লোকের মতের খণ্ডন করা হয়েছে যারা لِيْ কে حَقٌّ -এর সাথে সম্পৃক্ত মনে করেন। খণ্ডন এভাবে যে, جَارٌ এবং مَجْرُوْرٌ -এর صِلَةٌ আগে আসতে পারে না।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ اِلَى السَّمَاءِ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে تَوَفِّيْ অর্থ মৃত্যু নয়। কেননা تَوَفِّيْ অর্থ হলো اَخْذُ الشَّيْئِ وَافِيًا কোনো কিছুকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা। মৃত্যুও তার একটি রূপ। সুতরাং এখন এ আপত্তি শেষ হলো যে, বাহ্যত বুঝে আসে, تَوَفَّيْتَنِيْ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য। অথচ হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু আসেনি।

قَوْلُهُ وَخَصَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ تَعَالٰى : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এর মাঝে তো আল্লাহ তা'আলাও দাখেল আছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলাকে যদি কোনো شَيْئٌ -এর অন্তর্ভুক্ত না মানা হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা لَا شَيْئَ বা কোনো কিছু না হওয়া লাজেম আসে। যা সুস্পষ্ট ভ্রান্ত কথা। তাই আল্লাহ তা'আলাকে বস্তুর অংশ মনে করা আবশ্যক। আবার كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল। সে হিসেবে তাঁরও মৃত্যুবরণ করা লাজেম আসে। এর সমাধান কি?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা বস্তুর অন্তর্ভুক্ত তবে অন্যান্য বস্তুর মতো নয়। এজন্য আকল বা বিবেক আল্লাহ তা'আলার জাতকে সকল বস্তু হতে আলাদা ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান তবে নিজের যাতে ক্ষমতাবান নয়। কেননা قُدْرَتْ বা ক্ষমতার সম্পর্ক তো مُمْكِنَاتْ -এর সাথে হয়ে থাকে, وَاجِبَاتُ وَمُحَالَّاتْ -এর সাথে নয়। সুতরাং شَيْئٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে (جُمَلٌ) كُلُّ مَوْجُوْدٍ يُمْكِنُ اِيْجَادُهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ الخ : অর্থাৎ আমি এরূপ ঘৃণ্য উক্তি কীরূপে করতে পারতাম! আপনার সত্তা এর থেকে পবিত্র যে, উলূহিয়্যাত ইত্যাদিতে কাউকে আপনার শরিক স্থির করা হবে। আপনি যাকে নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন সে কোনো অন্যায় কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারে না। কাজেই আপনার পবিত্রতা ও আমার নিষ্পাপ অবস্থা এ উভয়ের চাহিদা হলো, আমি কখনো এরূপ ঘৃণ্য কথা বলতে পারি না। সব দলিল-প্রমাণ বাদ দিয়ে শেষ কথা হলো, আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বাইরে তো কোনো কিছু থাকতে পারে না। যদি বাস্তবিকই আমি এরূপ বলতাম, তবে আপনার তো জানার কথা। আপনি স্বয়ং জানেন আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে এরূপ কোনো কথা বলিনি। এমনকি আমার

অন্তরে এরূপ পূতিগন্ধময় বিষয়ের বুদবুদও কখনো জাগেনি। আপনার কাছে আমার বা অন্য কারো মনের কল্পনা, ধারণা কোনো কিছুই গোপন নয়। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭২]

قَوْلُهُ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ : আমি আপনার নির্দেশ হতে এক চুলও বিচ্যুত হইনি, আমার উলূহিয়্যাতের তালিম আমি কি করে দিতে পারি? বরং আমি তো তাদেরকে আপনারই বন্দেগীর প্রতি ডেকেছি এবং সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়েছি যে, আমার ও তোমাদের সকলেরই প্রতিপালক সেই এক আল্লাহ, যিনি একাই ইবাদতের উপযুক্ত। আধুনিক বাইবেলেও এ বিষয় সম্পর্কে বহু সুস্পষ্ট নির্দেশনা মওজুদ রয়েছে। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭৩]

قَوْلُهُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

আমি যে কুল মাখলূককে কেবল আপনার তাওহীদ ও বন্দেগির প্রতি দাওয়াত দিয়েছি তাই নয়, যতদিন তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর রেখেছি ও তত্ত্বাবধানরত থেকেছি, যাতে কেউ ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস ও অমূলক ধ্যান-ধারণার উদ্ভব ঘটিয়ে না বসে। হ্যাঁ, তাদের মাঝে আমার অবস্থানের যে মেয়াদ আপনার অনাদি জ্ঞানে স্থিরীকৃত ছিল, তা পূর্ণ করার পর আপনি যখন আমাকে তাদের মাঝ থেকে তুলে নেবেন। যেমন اَلتَّوَفِّىْ -এর মূলধাতু ও مَا دُمْتُ فِيْهِمْ -এর শর্তারোপ দ্বারা প্রতীয়মান হয়] তারপর তা শুধু আপনিই তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে পারতেন ও তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারতেন। আমি তাদের সম্পর্কে কিছুই বলতে সক্ষম নই। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭৪]

قَوْلُهُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ আপনি নিজ বান্দাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। কাজেই তাদেরকে শাস্তি দিলে সেটা সম্পূর্ণ প্রজ্ঞা ও ন্যায় ভিত্তিকই হবে। আর যদি ক্ষমা করে দেন, সে ক্ষমাও দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত হবে না মোটেই। কেননা আপনি عَزِيْزٌ পরাক্রান্ত। কোনো অপরাধী আপনার ক্ষমতার আওতা হতে পালিয়ে যেতে পারে না যে, আপনি তাদের কাবুতে পাবেন না। আর যেহেতু আপনি حَكِيْمٌ [প্রজ্ঞাময়]-ও তাই কোনো অপরাধীকে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন সেও সম্ভব নয়। মোটকথা তাদের সম্পর্কে আপনি যে ফয়সালাই করবেন তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও পরাক্রান্তসুলভই হবে। হযরত মাসীহ (আ.)-এর বক্তব্য যেহেতু হাশরের ময়দানে হবে, যেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনোরূপ সুপারিশ ও কৃপা প্রার্থনা চলবার নয়, তাই তিনি عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -এর স্থলে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ [ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু] ইত্যাদি বিশেষণের উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহলোকে নিজ প্রতিপালকের নিকট আরজ করেছিলেন, رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! এস প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। কাজেই যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত আর কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -[সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৬]

অর্থাৎ এখনও সুযোগ আছে আপনি আপন করুণায় তাদেরকে ভবিষ্যতে তওবা করতে আপনার দিকে প্রত্যাবর্তনের তৌফিক দিয়ে পেছনের পাপরাশি ক্ষমা করে দিতে পারেন। -[তাফসীরে উসমানী : টীকা- ২৭৫]

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আন‘আম মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ الْاٰيَاتِ الثَّلٰثَ وَاِلَّا قُلْ تَعَالَوْا الْاٰيَاتِ الثَّلٰثَ وَهِىَ مِائَةٌ وَّخَمْسٌ اَوْ سِتٌّ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً

কিন্তু وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ থেকে তিন আয়াত পর্যন্ত এবং قُلْ تَعَالَوْا থেকে তিন আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলো মক্কায় অবতীর্ণ নয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. اَلْحَمْدُ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ ثَابِتٌ لِلّٰهِ وَهَلِ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ بِذٰلِكَ لِلْاِيْمَانِ بِهٖ اَوْ لِلثَّنَاءِ بِهٖ اَوْ هُمَا اِحْتِمَالَاتٌ اُفِيْدُهَا الثَّالِثُ قَالَهُ الشَّيْخُ فِىْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمَا اَعْظَمُ الْمَخْلُوْقَاتِ لِلنَّاظِرِيْنَ وَجَعَلَ خَلَقَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط اَىْ كُلَّ ظُلْمَةٍ وَنُوْرٍ وَجَمَعَهَا دُوْنَهٗ لِكَثْرَةِ اَسْبَابِهَا وَهٰذَا مِنْ دَلَائِلِ وَحْدَانِيَّتِهٖ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَعَ قِيَامِ هٰذَا الدَّلِيْلِ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ يُسَوُّوْنَ بِهٖ غَيْرَهٗ فِى الْعِبَادَةِ ـ

২. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهُ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ط لَكُمْ تَمُوْتُوْنَ عِنْدَ اِنْتِهَائِهٖ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى مَضْرُوْبٌ عِنْدَهٗ لِبَعْثِكُمْ ثُمَّ اَنْتُمْ اَيُّهَا الْكُفَّارُ تَمْتَرُوْنَ تَشُكُّوْنَ فِى الْبَعْثِ بَعْدَ عِلْمِكُمْ اَنَّهٗ اِبْتَدَاَ خَلْقَكُمْ وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ فَهُوَ عَلَى الْاِعَادَةِ اَقْدَرُ ـ

অনুবাদ :

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই বিদ্যমান। اَلْحَمْدُ - হামদ হলো, মহৎ ও সুন্দর গুণাবলির সংকীর্তন। এ আয়াতের মাধ্যমে ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য হামদ সম্পর্কিত সংবাদ প্রদান, না প্রশংসা কীর্তন, না এতদুভয়েই এর উদ্দেশ্য, এ সম্পর্কে একাধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে আশ্ শায়খ আল মহাল্লী সূরা কাহফে এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, এগুলোর মধ্যে তৃতীয় সম্ভাবনাটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। দর্শকদের সামনে এ দুটি যেহেতু সৃষ্টির মধ্যে কলেবের সর্ববৃহৎ সেহেতু এখানে এ দুটিকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সৃষ্টি করেছেন সকল প্রকার অন্ধকার ও আলো। اَلظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ -অন্ধকার সৃষ্টির কারণ যেহেতু একাধিক সেহেতু এখানে اَلظُّلُمَاتُ [অন্ধকার রাশি] শব্দটি جَمْعٌ অর্থাৎ বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এরূপ নয় বিধায় اَلنُّوْرُ [আলো] শব্দটিকে جَمْعٌ অর্থাৎ বহু-বচনরূপে ব্যবহার করা হয়নি। এসব কিছুই তাঁর একত্বের প্রমাণবহ। এ প্রমাণসমূহের পরও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। ইবাদত ও উপাসনার ক্ষেত্রে অন্যকে তাঁর সাথে সমান করে ধরে।

২. তিনিই তোমাদের আদি পিতা আদমকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করতঃ তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জন্য এক কাল নির্ধারিত করেছেন। যার অন্তে তোমাদের মৃত্যু ঘটে। আর তোমাদের পুনরুত্থানের জন্যও তাঁর নিকট নির্ধারিত কাল, সুনির্দিষ্ট সময় বিদ্যমান। হে কাফেরগণ! এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর। অর্থাৎ তোমরা জান যে, তিনিই শুরুতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি প্রথম সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন, তিনি তো তা পুনরায় করতে অধিকতর পারঙ্গম। এরপরও তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ করছ?

٣. وَهُوَ اللّٰهُ مُسْتَحِقٌّ لِلْعِبَادِ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْأَرْضِ ط يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تَجْهَرُوْنَ بِهِ بَيْنَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ـ

৩. আসমান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ। তিনিই **সকল** ইবাদতের যোগ্য। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে তোমরা যা অপ্রকাশ্যে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর তিনি তা জানেন। এবং তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অর্থাৎ ভালো বা মন্দ তোমরা যা কর এতদসম্পর্কে তিনি অবহিত।

٤. وَمَا تَاْتِيْهِمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ مِنْ زَائِدَةٌ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ـ

৪. তাদের প্রতিপালকের এমন কোনো আল কুরআনের আয়াত তাদের নিকট **অর্থাৎ** মক্কাবাসীদের নিকট উপস্থিত হয় না যা হতে তারা মুখ না ফিরায়। مِنْ اٰيَةٍ এখানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ **অর্থাৎ অতিরিক্ত**।

٥. فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ بِالْقُرْاٰنِ لَمَّا جَآءَهُمْ ط فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْبٰٓؤُا عَوَاقِبُ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ـ

৫. **সত্য অর্থাৎ আল কুরআন যখন** তাদের নিকট এসেছে তারা **তা প্রত্যাখ্যান করেছে**। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত **তার যথার্থ পরিণাম** তার শীঘ্র অবহতি হবে।

٦. اَلَمْ يَرَوْا فِىْ اَسْفَارِهِمْ اِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا كَمْ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ مَكَّنّٰهُمْ اَعْطَيْنَاهُمْ مَكَانًا فِى الْاَرْضِ بِالْقُوَّةِ وَالسَّعَةِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ نُعْطِ لَكُمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ الْمَطَرَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ص مُتَتَابِعًا وَجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ تَحْتَ مَسَاكِنِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ـ

৬. **শাম ইত্যাদি অঞ্চলের পরিভ্রমণে** তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে, কত অতীত জাতিকে বিনাশ করেছি; তাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি ও প্রাচুর্যে এমনভাবে স্থান দিয়েছিলাম, এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকে করিনি, সে শক্তি ও প্রাচুর্য তোমাদেরকে দেইনি। এবং তাদের উপর মুষলধারে নিরবচ্ছিন্নভাবে আকাশ অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং তাদের পাদদেশে অর্থাৎ তাদের আবাসমূহের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম। আতঃপর তাদের পাপের দরুন অর্থাৎ নবীগণকে অস্বীকার করার দরুন তাদেরকে আমি বিনাশ করেছি এবং তাদের পর নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি। كَمْ -এটা এখানে خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক; অর্থ-কত। لَكُمْ -এটাতে غَيْب বা নামপুরুষ হতে اِلْتِفَات বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

٧. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا مَكْتُوْبًا فِىْ قِرْطَاسٍ رَقٍّ كَمَا اقْتَرَحُوْهُ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ اَبْلَغُ مِنْ عَايَنُوْهُ لِاَنَّهُ اَنْفٰى لِلشَّكِّ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ تَعَنُّتًا وَعِنَادًا ـ

৭. যদি তাদের আবদারানুসারে কাগজে পত্রে লিপিবদ্ধ কিতাবও তোমার প্রতি অবতারণ করতাম আর তারা যদি তা হাত দ্বারা স্পর্শও করত তবু সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীগণ জেদ ও বিদ্বেষ বশত বলত এটা স্পষ্ট জাদু ব্যতীত কিছুই নয়। عَايَنُوْهُ অর্থাৎ তারা যদি তা সামনে দেখত- এটা না বলে তারা যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করত- ধরনের বাক্য ভঙ্গিমা ব্যবহার করা অধিকতর অলঙ্কার সম্মত হয়েছে। কেননা, সন্দেহ দূরীকরণার্থে এটা অধিক কার্যকারী। اِنْ এটা এখানে 'না'বোধক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨. وَقَالُوْا لَوْلَا هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَلَكٌ ط يُصَدِّقُهُ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا كَمَا اقْتَرَحُوْهُ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا لَقُضِيَ الْاَمْرُ بِهَلَاكِهِمْ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ يُمْهَلُوْنَ لِتَوْبَةٍ اَوْ مَعْذِرَةٍ كَعَادَةِ اللّٰهِ فِيْمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ اِهْلَاكِهِمْ عِنْدَ وُجُوْدِ مُقْتَرَحِهِمْ اِذَا لَمْ يُؤْمِنُوْا .

৮. তারা বলে, তার নিকট অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তার সমর্থকরূপে [কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় না?] لَوْلَا-এটা এখানে تَنْبِيْه বা সতর্কবাচক শব্দ هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি তাদের দাবি অনুসারে আমি ফেরেশতাও প্রেরণ করতাম তবুও তারা বিশ্বাস আনত না ফলে তাদের ধ্বংসের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যেত আর পূর্ববর্তী উম্মতগণের দাবি অনুসারে নিদর্শন আসার পরও ঈমান গ্রহণ না করায় তাদেরকে ধ্বংস করার মতো আল্লাহর চিরায়ত নিয়ম হিসেবে এদেরকেও ধ্বংস করে দেওয়া হতো। তওবা বা অজুহাত পেশেরও তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হতো না;

٩. وَلَوْ جَعَلْنٰهُ اَيِ الْمُنَزَّلَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ اَيِ الْمَلَكَ رَجُلًا اَيْ عَلٰى صُوْرَتِهٖ لِيَتَمَكَّنُوْا مِنْ رُؤْيَتِهٖ اِذْ لَا قُوَّةَ لِلْبَشَرِ عَلٰى رُؤْيَةِ الْمَلَكِ وَ لَوْ اَنْزَلْنٰهُ وَجَعَلْنٰهُ رَجُلًا لَلَبَسْنَا شَبَّهْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .

৯. যদি তাকে অর্থাৎ এদের প্রতি প্রেরিতজনকে ফেরেশতা করতাম তবে তাকে ঐ ফেরেশতাকে মানুষরূপেই প্রেরণ করতাম। অর্থাৎ তাকে দর্শন করার জন্য মানুষ আকারেই তাকে তখন প্রেরণ করতে হতো। কেননা ফেরেশতাকে স্বআকৃতিতে দেখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তখন অর্থাৎ ফেরেশতাকে যদি মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করতাম তখনও সে বিভ্রমেই তাদেরকে ফেলতাম সে সন্দেহেই তাদেরকে ফেলতাম যে বিভ্রম এখন তারা নিজেদের উপর সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ তখনও এরা বলত, তিনি তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নন।

١٠. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِّلنَّبِيِّ ﷺ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْقُ بِمَنِ اسْتَهْزَاَ بِكَ .

১০. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে; পরিণামে যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল তা অর্থাৎ তা আবার বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। অর্থাৎ তা এদের উপরই আপতিত হয়েছে, তেমনিভাবে যারা আপনার সাথে বিদ্রূপ করে তাদের উপরও তা আপতিত হবে। এ আয়াতটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هَلِ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ بِذٰلِكَ : এ প্রশ্নবোধক বাক্য দ্বারা বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (ثَابِتٌ) দ্বারা যে ثُبُوْتُ حَمْدٍ -এর সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা তিনটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. **হয়তো** এ কথার সংবাদ দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি হলো اَزَلِيْ এবং اَبَدِيْ এবং এর উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হওয়ার কারণে اِسْتِمْرَارْ -এর উপর দালালত করেছে। এ সুরতে জুমলাটি শব্দগত এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই خَبَرِيَّةٌ হবে।

২. **অথবা, উদ্দেশ্য** হবে اِنْشَاءُ حَمْدٍ এটাকে মুফাসসির (র.) اَوِ الثَّنَاءُ بِهٖ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এ সুরতে জুমলাটি শব্দগতভাবে خَبَرِيَّةٌ হবে এবং অর্থগতভাবে اِنْشَائِيَّةٌ হবে।

৩. উভয়টিই উদ্দেশ্য হবে। এটাকে তিনি أَوْ هُمَا দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। এ সুরতে উভয় অর্থেই হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হবে। আর প্রথম সুরতে সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে হাকীকত এবং إِنْشَاءُ حَمْد-এর ক্ষেত্রে মাজায বা রূপক অর্থে হবে। আর দ্বিতীয় সুরতে إِنْشَاءُ حَمْد-এর ক্ষেত্রে হাকীকত এবং সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে রূপক অর্থে হবে। সারকথা হলো, প্রথম দুই সুরতের মধ্যে একটিতে জুমলার ব্যবহার মৌলিকভাবে হবে এবং অপরটিতে بِالتَّبْعِ বা অনুগামী হিসেবে হবে। আর তৃতীয় সুরতে উভয় জুমলার ব্যবহার بِالْأَصْلِ বা মূল হিসেবে হবে। এজন্যই তৃতীয় সুরতটি প্রথম দুই সুরতের চেয়ে অধিক উপকারী। কেননা, উভয়টির মাঝে মূল হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।

قَوْلُهُ خَلَقَ : جَعَلَ-এর ব্যাখ্যায় خَلَقَ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جَعَلَ ফে'লটি এখানে خَلَقَ وَاَنْشَأَ -এর অর্থে। صَيَّرَ-এর অর্থে নয়। আর এ কারণেই এটি একটি মাফউলের দিকে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِكَثْرَةِ اَسْبَابِهَا : ظُلْمَتْ -এর সবব যেহেতু অনেকগুলো এজন্য ظُلُمَاتْ-কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আর نُوْر-এর প্রকার যেহেতু একটি তাই তাকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَوَاقِبُ : **প্রশ্ন.** এখানে عَوَاقِبُ মুযাফকে মাহযূফ মানার দ্বারা কী ফায়দা? **উত্তর.** এজন্য যে, মূল اَنْبَاءٌ বা সংবাদ তো দুনিয়াতেই জানা যাবে। তবে তার পরিণতি ও ফলাফল আখেরাতে জানা যাবে। এ কথা বুঝানোর জন্য عَوَاقِبُ **শব্দটি উহ্য ধরা হয়েছে।**

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ اَنْفَى لِلشَّكِّ : অর্থাৎ مُعَايَنَةْ -এর স্থলে لَمْس শব্দ ব্যবহার نَفِىْ شَكْ **তথা সন্দেহ দূরীকরণে** অধিক কার্যকরী। কেননা দেখার ক্ষেত্রে তো **কখনো জাদু এবং নজরবন্দীর ধোঁকাও থেকে থাকে। কিন্তু** لَمْس **বা স্পর্শ** করে অবগত **লাভ করার মাঝে ধোঁকা ও ভুলের আশঙ্কা থাকে না।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আন‘আমের বৈশিষ্ট্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা আন‘আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত ব্যতীত গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তাসবীহ পাঠ করতে করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তাফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ, কালবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় এ কথাই বলেন।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ الخ : আবূ ইসহাক ইসফারায়িনী বলেন, এ সূরাটিতে তাওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, ‘সর্বাধিক প্রশংসা আল্লাহর জন্য’ এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞতার বাহক, তিনিই হামদ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে سَمَاوَاتٌ শব্দটিকে বহুবচনে এবং اَرْض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডলও সাতটি। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট; তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

এমনিভাবে ظُلُمَاتٌ শব্দটি বহুবচনে এবং نُوْر শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نُوْر বলে বিশুদ্ধ ও **সরল পথ** ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظُلُمَاتٌ বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য।

–[তাফসীরে মাযহারী ও বাহরে মুহীত]

এখানে এ **বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য** যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে خَلَقَ শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর **উদ্ভব করাকে** جَعَلَ শব্দের **মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।** এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও **ভূমণ্ডলের মতো স্বতন্ত্র ও** স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং পরনির্ভর, আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে **উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে,** এ

জগতে অন্ধকার হলো আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। যেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না **থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।**

একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ : আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্যে একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে **জগতের ঐসব জাতিকে হুঁশিয়ার** করা, যারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে **পরিত্যাগ করে বসেছে।**

অগ্নি-উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দুজন– ইয়াযদান ও আহরামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহরামানকে **অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে** বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আল্লাহর অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খ্রিস্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক' -এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা তা আল্লাহর বন্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানব জাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ তা'আলা 'আশরাফুল মখলূকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হলো, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা এমনকি পোকা-মাকড়কেও সিজদার যোগ্য উপাস্য, রুজিদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরিউক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা অন্ধকার ও আলো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। অতএব এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করা যায়? প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎবিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে।

قَوْلُهٗ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে এক বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে।

–[তাফসীরে মাজহারী]

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দুটি মনজিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগৎ-সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে, ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহর ফেরেশতারা জানেন, বরং এদিক দিয়ে মানুষ মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা সে সর্বদা, সর্বত্র আশেপাশে আদম সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থাৎ আরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্ট জীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশপাশে প্রত্যক্ষ করে وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কেয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা

মনস্তাত্ত্বিক ও স্বভাবিক বিষয়। তাই কিয়ামতের আগমনে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর। এটা অনুচিত।

قَوْلُهُ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ الخ : এ আয়াতে প্রথম দুআয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এমন এক সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

قَوْلُهُ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ : এ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্য যে কোনো নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়- এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তাভাবনা করে না।

قَوْلُهُ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ : এ আয়াতে কতিপয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে : অর্থাৎ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হলো, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্যের' অর্থ কুরআন হতে পারে এবং নবী করীম ﷺ -এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে। কেননা, মহানবী ﷺ আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী ﷺ কোনো মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মী [নিরক্ষর] উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়স এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায় যে, তিনি কোনো দিন কবিতা বা কাব্যচর্চার দিকে আকৃষ্ট হননি এবং কখনো বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হননি। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পরদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মোকাবিলা করার জন্য আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলংকারবিদদের চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী ﷺ -কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, অথচ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস তাদের কারও হলো না।

এভাবে নবী করীম ﷺ এবং কুরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে হাজারো মু'জিযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে- فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۤؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ অর্থাৎ আজ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযা, তাঁর আনীত হেদায়েত, কিয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোনো উপকার হবে না, কেননা সেটা কর্মজগৎ নয়- প্রতিদান দিবস। আল্লাহ তা'আলা এখনও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহর নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/২৫৬-৬০]

قَوْلُهُ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা আল্লাহর বিধান ও পয়গাম্বরদের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকারী উপদেশ। 'জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক' জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কুরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে

অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি; বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গুনাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিসসা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ঔষুধের স্থলে ব্যবহার করা হয়, না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সম্ভবত এ কারণেই কুরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মতো নয় যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কুরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি; বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোনো কাহিনী কখনো স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোনো কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্য জরুরি, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যলোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মা-সংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবসীর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে- كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ অর্থাৎ তাদের পূর্বে অনেক 'কারনকে' [অর্থাৎ সম্প্রদায়কে] আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। قَرْنٍ শব্দের অর্থ একাধিক। সমসাময়িক লোকসমাজকেও قَرْنٍ বলা হয় এবং সুদীর্ঘ কালকেও قَرْنٍ বলা হয়। দশ বছর থেকে একশ বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قَرْنٍ শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোনো কোনো ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে : মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন : তুমি এক 'কার্‌ন' দোয়া পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ 'বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী ﷺ জনৈক বালককে দেন যে, তুমি এক 'কার্‌ন' জীবিত থেক। বালকটি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিল। خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ এ হদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলেম 'এক কার্‌ন' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গাম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থসম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মতো শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতির ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

قَوْلُهُ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতে পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

এমনিতেও আল্লাহ তা'আলার এ শক্তি-সামর্থ্য আমরা প্রতিয়িনত প্রত্যক্ষ করে থাকি। দৈনিক লাখো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু কারও স্থান অপূর্ণ থাকে না। কোনো জায়গায় জনবসতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সে জায়গা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। একবার আরাফাতের ময়দানে প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে চিন্তাস্রোত এদিকে প্রবাহিত হলো যে, আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে এ জনসমুদ্রের মধ্যে কেউ বিদ্যমান ছিল না এবং তাদের স্থলে প্রায় সমসংখ্যক অন্য মানুষ ছিল, কিন্তু আজ তাদের কোনো চিহ্নই নেই। এভাবে প্রতিটি জনসমাবেশকে অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে মিলিয়ে দেখলে প্রতিটি জনসমাবেশই কার্যকারী উপদেশদাতা দৃষ্টিগোচন হয়। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

قَوْلُهُ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ الخ : এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবি পেশ করে বসল। সে বলল, আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে, হে আব্দুল্লাহ! রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল, আপনি এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাজী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদাতও বরণ করেছিল। জাতির এহেন হঠকারিতাপূর্ণ দাবি-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতামাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়তো তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এ কারণেই আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, তাদের এসব দাবি-দাওয়া কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা যেসব দাবি-দাওয়া করছে, আপনার সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য তার চাইতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি তাদের সামনে এলেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। উদাহরণত তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি যদি আকাশ থেকে কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতরণ করে দেই, শুধু তাই নয়, তারা যদি তা স্বচক্ষে দেখেও নেয় এবং ভেলকি সৃষ্টির আশঙ্কা দূরীকরণার্থ হাতে স্পর্শও করে নেয় তবুও একথাই বলে দেবে যে, إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা প্রকাশ্যে জাদু বৈ কিছু নয়। কারণ, হঠকারিতাবশতই তারা এসব দাবি-দাওয়া করছে।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا الخ : এ আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। **পূর্বোল্লিখিত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, নজর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ (রা.) একবার একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে, আমরা আপনার প্রতি** বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে গ্রন্থ নিয়ে আসেন। **গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দেবে যে,** এ গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষে থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফিলরা এসব দাবি-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহর আইন এই যে, কোনো জাতি কোনো পয়গাম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোনো মু'জিযা দাবি করে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণের সামান্য বিলম্বও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আজাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে– لَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ আমি যদি তাদের চাহিদা মতো মু'জিযা দেখানোর জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই, তবে মু'জিযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মু'জিযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ : পূর্বোক্ত প্রশ্নের আরেকটি উত্তর এ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবি করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে যেমন হযরত জিবরাঈল (আ.) বহুবার মহানবী ﷺ -এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে। এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে, স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গাম্বরদের এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতী ঘটনাবলির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সাহস হারাননি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আজাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহর বিধানাবলি প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কিনা তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না।

অনুবাদ :

١١. قُلْ لَهُمْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ الرُّسُلَ مِنْ هَلَاكِهِمْ بِالْعَذَابِ لِتَعْتَبِرُوْا .

১১. এদেরকে বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে দেখ যারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল শাস্তিস্বরূপ কী ধ্বংসকর পরিণাম তাদের ঘটেছে।

١٢. قُلْ لِمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلْ لِّلّٰهِ ط اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرِهٖ كَتَبَ قَضٰى عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط فَضْلًا مِنْهُ وَفِيْهِ تَلَطُّفٌ فِىْ دُعَائِهِمْ اِلَى الْاِيْمَانِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لِيُجَازِيَكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ ط اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِتَعْرِيْضِهَا لِلْعَذَابِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

১২. বল, আসমান ও জমিনে যা আছে তা কার? তারা যদি না বলে তবে তুমিই বল, তা আল্লাহরই। কেননা, এটা ব্যতীত এর আর কোনো জবাব নেই। তিনি অনুগ্রহ করত দয়া করা নিজের কর্তব্য বলে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। স্থির করেছেন। এ বাক্যটিতে তাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবানের ক্ষেত্রে কোমলতা প্রকাশ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দানের জন্য তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। এতে কোনো দ্বিধা কোনো সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করত নিজেই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا এটা مُبْتَدَأٌ অর্থাৎ উদ্দেশ্য فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এটা خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয়।

١٣. وَلَهٗ تَعَالٰى مَا سَكَنَ حَلَّ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط اَىْ كُلُّ شَىْءٍ فَهُوَ رَبُّهٗ وَخَالِقُهٗ وَمَالِكُهٗ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا يُقَالُ الْعَلِيْمُ بِمَا يُفْعَلُ .

১৩. রাত্রি ও দিবসে যা কিছু থাকে অবস্থান করে তা তাঁরই অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসের তিনিই প্রভু, তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই অধিকর্তা। যা বলা হয় তা তিনি শুনেন, যা করা হয় তা তিনি খুবই জানেন।

١٤. قُلْ لَهُمْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا اَعْبُدُهٗ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُبْدِعِهِمَا وَهُوَ يُطْعِمُ يَرْزُقُ وَلَا يُطْعَمُ ط يُرْزَقُ لَا قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَ قِيْلَ لِىْ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهٖ .

১৪. এদেরকে বল, আমি কি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এতদুভয়ের নমুনাবিহীন নির্মাতা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? অর্থাৎ অন্য কারও উপাসনা করব? না, তা করতে পারি না। তিনিই খাদ্য দান করেন, জীবিকা দান করেন তাঁকে কেউ খাদ্য দান করে না জীবিকা দান করে না। বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে অর্থাৎ এ উম্মতের মধ্যে আল্লাহর প্রতি নিজেকে যারা সমর্পণ করে তাদের মধ্যে যেন আমিই প্রথম হই এবং আমাকে বলা হয়েছে তাঁর সাথে কখনও তুমি অংশী স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

١٥. قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ بِعِبَادَةِ غَيْرِهٖ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ .

১৫. বল, আমি যদি অন্যের উপাসনা করত আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে মহা এক দিনের অর্থাৎ কিয়ামত দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

١٦. مَنْ يُّصْرَفْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ اَىِ الْعَذَابُ وَلِلْفَاعِلِ اَىِ اللّٰهُ وَالْعَائِدُ مَحْذُوْفٌ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ط تَعَالٰى اَىْ اَرَادَ لَهُ الْخَيْرَ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ النَّجَاةُ الظَّاهِرَةُ .

১৬. সেদিন যাকে তা হতে রক্ষা করা হবে তার প্রতি, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দয়া প্রদর্শন করলেন। অর্থাৎ তিনি তার কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায় করলেন। আর এটাই স্পষ্ট সফলতা। সুপ্রকাশ্য মুক্তি। يُصْرَفْ এটা مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে যার হতে শাস্তি ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। আর مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্যরূপে পঠিত হলে এটার কর্তা হবেন আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ফিরিয়ে রেখেছেন। এমতাবস্থায় اَلْعَذَاب শব্দটির প্রতি ইঙ্গিতবহ সর্বনামটি উহ্য বলে বিবেচ্য হবে।

١٧. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ بَلَاءٍ كَمَرَضٍ وَفَقْرٍ فَلَا كَاشِفَ رَافِعَ لَهُ اِلَّا هُوَ ط وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ كَصِحَّةٍ وَغِنًى فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ مَسُّكَ بِهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى رَدِّهٖ عَنْكَ غَيْرُهٗ .

১৭. আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করলে কষ্টে ফেললে যেমন– অসুস্থতা, দারিদ্রতা ইত্যাদি তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী নিবারণকারী কেউ নেই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করলে যেমন সুস্বাস্থ্য, সচ্ছলতা ইত্যাদি দান করলে তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তোমাকে ক্লেশ বা কল্যাণ দানও তাঁর এ ক্ষমতাভুক্ত জিনিস। তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমার হতে এটা রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না।

١٨. وَهُوَ الْقَاهِرُ الْقَادِرُ الَّذِىْ لَا يُعْجِزُهٗ شَيْءٌ مُسْتَعْلِيًا فَوْقَ عِبَادِهٖ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِىْ خَلْقِهٖ الْخَبِيْرُ بِبَوَاطِنِهِمْ كَظَوَاهِرِهِمْ .

১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী ক্ষমতাশালী। কেউই তাঁকে অক্ষম করতে সক্ষম নয়। তিনি তাঁর সৃষ্ট বিষয়ে প্রজ্ঞাময় এবং তাদের বাইরের মতো আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত।

١٩. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ اِئْتِنَا بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ فَاِنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اَنْكَرُوْكَ قُلْ لَهُمْ اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمُبْتَدَاِ قُلِ اللّٰهُ اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهٗ هُوَ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ عَلٰى صِدْقِىْ وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ يَاَهْلَ مَكَّةَ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ط عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ اُنْذِرَكُمْ اَىْ بَلَغَهُ الْقُرْاٰنُ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ .

১৯. যখন কাফেরগণ রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, আপনার নবুয়তের সমর্থনে সাক্ষ্য দানের জন্য কাউকেও নিয়ে আসুন। কারণ কিতাবীরা আপনার অস্বীকার করে, তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– এদেরকে বল, সাক্ষ্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কী? شَهَادَةً এটা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্যের রূপ হতে পরবর্তী হয়ে এখানে تَمْيِيْز হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা যদি উত্তর না দেয় তবে তুমিই বল, আল্লাহ। কারণ এটা ব্যতীত এর আর কোনো উত্তর নেই। তিনিই আমার তোমাদের মধ্যে আমার সত্যতার সাক্ষী। আর হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌঁছবে وَمَنْ بَلَغَ -এর اُنْذِرَكُمْ -এর كُمْ সর্বনামের সাথে عَطْف সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ জিন ও মানব জাতিসমূহের যার নিকট কুরআন পৌঁছবে।

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ قُلْ لَّهُمْ لَآ أَشْهَدُ ج بِذٰلِكَ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مَعَهُ مِنَ الْاَصْنَامِ ـ .

এত দ্বারা সতর্ক করার জন্য আমার নিকট এ কুরআন প্রেরিত হয়েছে। তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও রয়েছে? أَئِنَّكُمْ-এখানে اِنْكَارٌ অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার করা হয়েছে। এদেরকে বল, আমি সে সাক্ষ্য দেই না। বল, তিনি একক ইলাহ আর তোমরা তাঁর সাথে প্রতিমাসমূহের যে শরিক কর তা হতে আমি মুক্ত।

٢٠. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ اَىْ مُحَمَّدًا بِنَعْتِهٖ فِىْ كِتَابِهِمْ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَ هُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ مِنْهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ـ

২০. যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি তারা তাকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -কে তাদের কিতাবে তাঁর সম্পর্কে বিবরণ থাকায় সেরূপ চিনে যেরূপ চিনে তাদের সন্তানগণকে; তাদের মধ্যে যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ হলো মুবতাদা। فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ হলো খবর।

প্রশ্ন. খবরের শুরুতে কিভাবে فَاءٌ আনা হলো? উত্তর. এ কারণে যে, مَوْصُوْلٌ-এর মধ্যে شَرْطٌ -এর অর্থ পাওয়া যায়। যার কারণে তার খবরের মধ্যে جَزَاءٌ -এর অর্থ রয়েছে। এ কারণে فَاءٌ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَلَّ : سَكَنَ -এর ব্যাখ্যায় حَلَّ بِمَعْنَى اِسْتَقَرَّ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও سُكُوْنٌ [স্থিরতা] حَرَكَتٌ [নড়াচাড়া]-এর বিপরীতকে বলা হয় কিন্তু এখানে সাধারণ اِسْتِقْرَارٌ উদ্দেশ্য। এটি আরবদের উক্তি تَقِيْكُمُ الْحَرَّ -এর মতো اَىْ تَقِيْكَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ

قَوْلُهُ الْعَائِدُ مَحْذُوْفٌ : এটি يُصْرَفُ-কে مَعْرُوْفٌ পড়ার সুরতে হবে। বাহ্যিকভাবে এখানে اَلْعَذَابُ মাহযূফ থাকার কথা। কেননা, নাহবী কায়দা হলো غَيْرُ مَوْصُوْلٍ-এর দিকে عَائِدٌ -এর হযফ জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ النَّجَاةُ الظَّاهِرَةُ : এ কারণে যে, এ কামিয়াবিটি হবে সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং স্থায়ী। পক্ষান্তরে পার্থিব কামিয়াবি অস্থায়ী।

قَوْلُهُ مُسْتَعْلِيًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَوْقَ عِبَادِهٖ জুমলাটি اَلْقَاهِرُ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর اِسْتِعْلَاءٌ থেকে عُلُوٌّ فِى الْقُدْرَةِ وَالشَّانِ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ : اَىْ قُلِ اللّٰهُ اَكْبَرُ এখানে اَكْبَرُ শব্দটি মাহযূফ আছে। কেননা, مَقُوْلَهْ মুফরাদ হয় না। পূর্ণ জুমলা হতে হয়।

قَوْلُهُ هُوَ شَهِيْدٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, شَهِيْدٌ হলো هُوَ মুবতাদা মাহযূফের খবর।

প্রশ্ন. اَللّٰهُ শব্দকে মুবতাদা এবং সরাসরি شَهِيْدٌ -কে খবর ধরা হলে কোনো সমস্যা রয়েছে? তাহলে তো هُوَ মুবতাদা মাহযূফ উহ্য ধরতে হবে না।

উত্তর. اَللّٰهُ শব্দকে মুবতাদা এবং شَهِيْدٌ -কে খবর ধরা এজন্য শুধু নয় যে, اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً -এর জবাব হিসেবে اَللّٰهُ شَهِيْدٌ হওয়া শুদ্ধ নয়। কেননা তখন মূল বা তাকদীরী ইবারত হবে- اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ আর এতে উত্তরটি প্রশ্ন অনুযায়ী হয়নি।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ اَنْذِرَكُمْ : অর্থাৎ مَنْ بَلَغَ -এর 'আতফ' اَنْذِرَكُمْ -এর মাফউলের যমীর كُمْ -এর সাথে, তার ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ ফায়েলের উপর নয়।

قَوْلُهُ اَىْ بَلَغَهُ الْقُرْاٰنُ : এখানে بَلَغَ-এর ফায়েলের যমীর নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ لِمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ : এ আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন, সবার মালিক আল্লাহ। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলাকেই মানত।

قَوْلُهُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : এ বাক্যে اِلٰى শব্দটি فِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্র করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্র করতে থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ : সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে- اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ عَلٰى غَضَبِىْ অর্থাৎ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরিকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ ঈমান অবলম্বন করেনি। -[কুরতুবী]

لَهُ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ : এখানে سُكُوْنٌ অর্থ اِسْتِقْرَارٌ [অবস্থান করা], অর্থাৎ পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত, তা সবই আল্লাহর। অথবা এর অর্থ سُكُوْنٌ وَحَرَكَتٌ -এর সমষ্টি। অর্থাৎ مَا سَكَنَ وَمَا تَحَرَّكَ [স্থাবর ও অবস্থার]। আয়াতে শুধু سُكُوْنٌ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত حَرَكَتٌ আপনা-আপনিই বোঝা যায়। -[মাআরিফুল কুরআন ৩/২৬৭-৬৮]

قَوْلُهُ قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলে দিন, মনে কর, যদি আমিও স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কিয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীদের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কোন ছার!

مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ অর্থাৎ হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে। وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ الخ : এ আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সত্যিকারভাবে কোনো ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যত একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশি এর কোনো গুরুত্ব নেই।

এ বিশ্বাসটিও ইসলামের অন্যতম বৈপ্লবিক বিশ্বাস। এ বিশ্বাস মুসলমানদের সমগ্র সৃষ্টি জগৎ থেকে বিমুখ করে একমাত্র স্রষ্টার মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। ফলে মুসলমানরা এমন একটি নজিরবিহীন সদাপ্রফুল্ল সম্প্রদায়ের পরিণত হয়ে গেছে, যারা দারিদ্র্যে এবং উপবাসেও সারা বিশ্বের উপর ভারী কারো সামনে মস্তক অবনত করতে জানে না।

কুরআন মাজীদে এ বিষয়বস্তুটি বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে– مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে রহমত মানুষের জন্য খুলে দিয়েছেন তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই এবং যাকে তিনি আটকে দেন, তাকে খুলে দেওয়ারই কেউ নেই। সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই দোয়ায় একথা বলতেন, اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন, তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই, আপনি যা আটকে দেন, তার কোনো দাতা নেই এবং আপনার বিপক্ষে কোনো চেষ্টাকারীর চেষ্টা উপকার সাধন করতে পারে না। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে বৎস! আমি আরজ করলাম আদেশ করুন, আমি হাজির আছি। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, আল্লাহ তোমাকে স্মরণ রাখবেন। তুমি আল্লাহকে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোনেকিছু যাচনা করতে হলে তুমি আল্লাহর কাছেই যাচনা কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই– তোমার এমন কোনো উপকার করতে সমগ্র সৃষ্ট জীবন সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলেও তারা কখনও তো করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাসে ধৈর্যধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা কর। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা স্বভাববিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত কষ্টের সাথে এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত। –[তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ]

পরিতাপের বিষয়, কুরআন পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ তা'আলার সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানদের সংখ্য নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে না; বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গাম্বর ও ওলীদের অসিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা, এটা জায়েজ। স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। সরাসরি কোনো সৃষ্ট জীবকে অভাব পূরণের জন্য ডাকা এ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থি ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সরল পথে কায়েম রাখুন।

قَوْلُهٗ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ : অর্থাৎ আল্লাহই তা'আলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তম ব্যক্তিরাও সবকাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, তিনি নৈকট্যশীল রাসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ। তিনি প্রজ্ঞাময়ও বটে, তাঁর সব কাজেই প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বিদ্যমান। তিনি সর্বজ্ঞ। আয়াতে قَاهِرٌ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য এবং حَكِيْمٌ শব্দ দ্বারা সবকিছু বেষ্টনকারী জ্ঞান বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, পরাকাষ্ঠামূলক যাবতীয় গুণ-প্রজ্ঞা ও শক্তি-সামার্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা একক।

قَوْلُهٗ قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً : অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ আয়াতের একটি বিশেষ শানে নুযূল উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, মক্কাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী ﷺ -এর দরবারে এসে বলল, আপনি রাসূল হওয়ার দাবি করেন। এ দাবির পক্ষে আপনার সাক্ষী কে? কেননা, আপনার সত্যায়ন করার মতো কোনো লোক আমরা পাইনি। আমরা খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছে এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের পুরোপুরি চেষ্টা করেছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়– قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً অর্থাৎ আপনি বলে দিন আল্লাহর চাইতে অধিক প্রবল কোন সাক্ষ্য হবে? সারা জাহান এবং সবার লাভ-লোকসান তাঁরই আয়ত্তাধীন। অতঃপর আপনি বলে দিন আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সাক্ষী। আল্লাহর সাক্ষ্যের অর্থ ঐসব মু'জিযা ও নিদর্শন, যা আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -এর সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন। তাই পরের আয়াতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এ সাক্ষ্যের পরও কি তোমরা এর বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যও শরিক আছে। এরূপ করলে স্বীয় পরিণাম ভেবে নাও, আমি এরূপ সাক্ষ্য দিতে পারি না।

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ : অর্থাৎ আপনি বলে দিন আল্লাহ একক উপাস্য; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরও বলা হয়েছে- وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি ওহীযোগে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদের আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করি এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, যাদের কাছে কিয়ামত পর্যন্ত এ কুরআন পৌছবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ সর্বশেষ নবী এবং কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত এর শিক্ষা ও তেলাওয়াত বাকি থাকবে এবং এর অনুসরণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য হবে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, যার কাছে কুরআন পৌছে গেল, সে যেন মুহাম্মদ ﷺ -এর সাক্ষ্য লাভ করল। অন্য এক হাদীসে আছে, যার কাছে কুরআন পৌছে আমি তার ভীতি প্রদর্শক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জোর দিয়ে বলেন- بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ আমার নির্দেশাবলি ও শিক্ষাকে মানুষের কাছে পৌছাও যদি তা একটি আয়াতও হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সতেজ ও সুস্থ রাখুন, যে আমার কোনো উক্তি শুনে তা স্মরণ রাখে; অতঃপর তা উম্মতের কাছে পৌছে দেয়। কেননা অনেক সময় প্রত্যক্ষ শ্রোতার চাইতে পরোক্ষ শ্রোতা কালামের মর্ম অধিক অনুধাবন করে।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ : এখানে কাফেদের এ উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে যে, আমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে তথ্যানুসন্ধান করে জেনে নিয়েছি, তাদের কেউ আপনাদের সত্যতা ও নবুয়তের সাক্ষ্য দেয় না। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে এমনভাবে চিনে, যেমন করে চিনে নিজের সন্তানদেরকে।

কারণ এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৈহিক আকৃতি, জন্মভূমি, হিজরত-ভূমি, অভ্যাস, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। এ বর্ণনার পর কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শুধু মহানবী ﷺ -এর আলোচনাই নয় তাঁর সাহাবায়ে কেরামের বিস্তারিত অবস্থাও তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে এবং তা পাঠ করে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনবে না এরূপ সম্ভাবনা নেই।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তুলনামূলকভাবে বলেছেন, 'যেমন, মানুষ নিজ সন্তানদের চেনে।' একথা বলেননি যে, 'যেমন সন্তানরা পিতামাতাকে চেনে।' এর কারণ এই যে, পিতামাতার পরিচয় সন্তানের জন্য অত্যধিক হয়ে থাকে। সন্তানের দেহের প্রত্যেকটি অংশ পিতামাতার দৃষ্টিতে থাকে। তারা শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত তাদের হাতে ও ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়। তাই পিতামাতা সন্তানকে যতটুকু চিনতে পারে ততটুকু সন্তান পিতামাতাকে চিনতে পারে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) পূর্বে ইহুদি ছিলেন, পরে মুসলমান হয়ে যান। হযরত ফারূকে আজম (রা.) একবার তাঁকে প্রশ্ন করেন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন যে, তোমরা আমাদের পয়গাম্বরকে এমন চেন, যেমন নিজ সন্তানদেকে চেন- এরূপ বলার কারণ কি? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত গুণাবলির দ্বারাই চিনি, যা তাওরাতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই আমাদের এ জ্ঞান অকাট্য ও সুনিশ্চিত। নিজ সন্তানরা এরূপ নয় তাদের পরিচয় সন্দেহ হতে পারে যে, আমাদের সন্তান কিনা?

হযরত যায়েদ ইবনে সা'না (রা.) আহলে কিতাবদের একজন ছিলেন। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীলের বর্ণনার মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনেছিলেন। শুধু একটি মাত্র গুণের সত্যতা তিনি পূর্বে জানতে পারেননি। পরীক্ষার পর তাও জানতে পারেন। তা হলো এই যে, তাঁর সহনশীলতা ক্রোধের উপর প্রবল হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ গুণটিও তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান দেখতে পান। অতঃপর কালবিলম্ব না করে তিনি মুসলমান হয়ে যান।

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে, আহলে কিতাবরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূর্ণরূপে চেনা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না। এভাবে তারা নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/২৭১-৭৫]

অনুবাদ :

٢١. وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِنِسْبَتِهِ الشَّرِيْكَ اِلَيْهِ اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهِ ط الْقُرْاٰنَ اِنَّهُ اَىِ الشَّاْنَ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ بِذٰلِكَ -

২১. যে ব্যক্তি আল্লাহ-এর প্রতি শরিক আরোপ করে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিদর্শনকে অর্থাৎ আল কুরআনকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? না, কেউ নেই। এরূপ জালিমগণ নিশ্চয় সফলকাম হয় না। اِنَّهُ-এর সর্বনামটি شَاْنٌ বাচক।

٢٢. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا تَوْبِيْخًا اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ شُرَكَاۤءُ اللّٰهِ -

২২. আর স্মরণ কর যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর ভৎসনা স্বরে অংশীবাদীদেরকে বলব, যাদেরকে তোমরা মনে করতে যে, এরা আল্লাহর শরিক তোমাদের সে শরিকগণ আজ কোথায়?

٢٣. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ بِالتَّاۤءِ وَالْيَاۤءِ فِتْنَتُهُمْ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ اَىْ مَعْذِرَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَىْ قَوْلُهُمْ وَاللّٰهِ رَبِّنَا بِالْجَرِّ نَعْتٌ وَالنَّصْبِ نِدَاۤءٌ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ -

২৩. অতঃপর তাদের এটা ভিন্ন এ কথা বলার অন্য কোনো কৈফিয়ত অন্য কোনো অজুহাত থাকবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না। لَمْ تَكُنْ এটা ت [নামবাচক স্ত্রীলিঙ্গ] ও ى [নামবাচক পুংলিঙ্গ] উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। فِتْنَتُهُمْ এটা نَصْب [ফাতাহসহ] ও رَفْع ও [পেশসহ] উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। رَبِّنَا -এটা جَرّ [কাসরা] সহ পঠিত হলে اللّٰه-এর نَعْتٌ বা বিশেষণ আর نَصْب [ফাতাহ]-সহ পঠিত হলে نِدَاۤءٌ অর্থাৎ সম্বোধিত পদ বলে বিবেচ্য হবে।

٢٤. قَالَ تَعَالٰى اُنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِنَفْىِ الشِّرْكِ عَنْهُمْ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الشُّرَكَاۤءِ -

২৪. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! দেখ, তারা নিজেদের হতে শিরকের অপনোদন করে নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তারা আল্লাহর শরিকানা সম্পর্কিত যে মিথ্যা রচনা করত তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হলো, অদৃশ্য হয়ে গেল।

٢٥. وَمِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج اِذَا قَرَأْتَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَغْطِيَةً لِ اَنْ لَا يَفْقَهُوْهُ اَنْ يَّفْهَمُوا الْقُرْاٰنَ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط صَمَمًا فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ط حَتّٰٓى اِذَا جَاۤءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ مَا هٰذَآ الْقُرْاٰنُ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ اَكَاذِيْبُ الْاَوَّلِيْنَ كَالْاَضَاحِيْكِ وَالْاَعَاجِيْبِ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ -

২৫. তাদের মধ্যে কতক যখন তুমি তেলাওয়াত কর তখন তোমার দিকে কান পেতে রাখে। কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ আচ্ছাদন দিয়ে দিয়েছি যেন তারা তা অর্থাৎ আল কুরআন উপলব্ধি করতে না পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে। তাদেরকে বধির করে দিয়েছি। তাদের কর্ণে ছিপি এটে দিয়েছি। ফলে গ্রহণ করার মতো তারা শুনতে পায় না এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না; এমনকি তারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, এটা অর্থাৎ আল কুরআন তো সেকালের উপকথা বৈ কিছুই নয়। অর্থাৎ রোমাঞ্চকর ও রম্যরচনার মতো মিথ্যা কাহিনী বৈ কিছুই নয়। اَسَاطِيْر এটা اُسْطُوْرَةٌ [প্রথমাক্ষর পেশযুক্ত]-এর বহুবচন।

٢٦. وَهُمْ يَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنْهُ أَيْ عَنِ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُوْنَ عَنْهُ ط فَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقِيْلَ نَزَلَتْ فِيْ أَبِيْ طَالِبٍ كَانَ يَنْهٰى عَنْ أَذَاهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ وَإِنْ مَا يُهْلِكُوْنَ بِالنَّأْيِ عَنْهُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ لِأَنَّ ضَرَرَهُ عَلَيْهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ بِذٰلِكَ.

২৬. তারা লোকদেরকে তা হতে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ হতে বিরত রাখে এবং নিজেরাও তা হতে দূরে থাকে ফলে, তারা ঈমান আনে না। আর তা হতে দূরে থেকে তারা নিজেদেরকেই কেবল ধ্বংস করছে। কারণ এর ক্ষতি তাদের নিজেদের উপরই বর্তায়। অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না।

٢٧. وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ إِذْ وُقِفُوْا عُرِضُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنَا نُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا **وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِرَفْعِ الْفِعْلَيْنِ اِسْتِئْنَافًا وَنَصْبِهِمَا فِيْ جَوَابِ التَّمَنِّيْ وَرَفْعِ الْأَوَّلِ وَنَصْبِ الثَّانِيْ وَجَوَابُ لَوْ** لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيْمًا.

২৭. হে মুহাম্মদ! **তুমি যদি দেখতে** পেতে যখন তাদেরকে **অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে,** হাজির করা হবে অনন্তর **তারা বলবে, হায়! যদি পৃথিবীতে** আমাদের প্রত্যাবর্তন **ঘটত তবে আমরা আমাদের** প্রতিপালকের নিদর্শনকে **মিথ্যা বলতাম না এবং আমরা মু'মিনদের** অন্তর্ভুক্ত হতাম। **[হে মুহাম্মদ, তুমি এটা দেখলে] তখন** মারাত্মক একটি **বিষয় দেখতে পেতে।** يَا-এটা تَنْبِيْه বা সতর্ক বাচক **শব্দ।** نُكَذِّبَ وَنَكُوْنَ এ দুটি ক্রিয়া مُسْتَأْنِفَةٌ অর্থাৎ **নতুন বাক্য হিসেবে** رَفْع [পেশ] সহকারে কিংবা جَوَابُ تَمَنِّيْ অর্থাৎ কামনাবোধক মর্মের জবাব হিসেবে نَصَبْ [যবর] সহকারে, কিংবা প্রথমটি رَفْع ও দ্বিতীয়টি نَصَبْ সহকারে পাঠ করা যায়। لَوْ -এর জবাব এখানে উহ্য। তা হলো, لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيْمًا তখন নিশ্চয় তুমি মারাত্মক একটি বিষয় দেখতে পেতে।

٢٨. قَالَ تَعَالٰى بَلْ لِلْإِضْرَابِ عَنْ إِرَادَةِ الْإِيْمَانِ الْمَفْهُوْمِ مِنَ التَّمَنِّيْ بَدَا ظَهَرَ لَهُمْ مَا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ط يَكْتُمُوْنَ بِقَوْلِهِمْ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ بِشَهَادَةِ جَوَارِحِهِمْ فَتَمَنَّوْا ذٰلِكَ وَلَوْ رُدُّوْا إِلَى الدُّنْيَا فَرْضًا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ مِنَ الشِّرْكِ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِيْ وَعْدِهِمْ بِالْإِيْمَانِ.

২৮. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: বরং পূর্বে তারা যা গোপন করত অর্থাৎ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের প্রভু আমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। এ কথা বলে তারা যে জিনিস [অর্থাৎ তাদের কুফরি] গোপন করে রেখেছিল [তা এখন] এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে গেছে, উন্মোচিত হয়ে গেছে। আর তাই আজ তারা অনুরূপ কামনা করছে। পৃথিবীতে তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে অর্থাৎ যে শিরক করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করত। নিশ্চয় ঈমান আনয়ন সম্পর্কিত অঙ্গীকারে তারা মিথ্যাবাদী। بَلْ এটা এখানে إِضْرَابْ অর্থাৎ ঈমান না আনয়নের উপর এদের দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে বাহ্যত ঈমান গ্রহণ করার যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হচ্ছে তাকে মিথ্যা ও বাতিল প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٩. وَقَالُوْا أَيْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ إِنْ مَا هِيَ أَيِ الْحَيٰوةُ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ.

২৯. তারা অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারীগণ বলে, আমাদের এটাই হলো অর্থাৎ পার্থিব জীবনই হলো একমাত্র জীবন। আমরা পুনরুত্থিত হবো না। إِنْ এটা এখানে না মর্মবোধক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০. وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ط لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا قَالَ لَهُمْ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ تَوْبِيْخًا اَلَيْسَ هٰذَا الْبَعْثُ وَالْحِسَابُ بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط اِنَّهُ لَحَقٌّ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ بِهٖ فِى الدُّنْيَا ـ

৩০. তুমি যদি দেখতে পেতে যখন এদেরকে প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে উপস্থিত করা হবে, তবে সাংঘাতিক একটি বিষয় দেখতে। তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা স্বরে ফেরেশতাগণের জবানিতে বলবেন, এটা এ পুনরুত্থান ও হিসাব-কিতাব কি সত্য নয়? তারা বলবে, নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের শপথ এটা সত্য। তিনি বলবেন, সুতরাং পৃথিবীতে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করতে তজ্জন্য এখন শাস্তির স্বাদ ভোগ কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنْ قَالُوْا : اَنْ قَالُوْا-এর اَنْ টি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার মূল অর্থবোধক। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে قَوْلُهُمْ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنْ لَا يَفْعَلُوْا : اَنْ এটা হেতুবোধক। এ কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তাফসীরে এর পূর্বে لِ-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ لَّا يَفْهَمُوْا : يَفْقَهُوْا -এর পূর্বে না অর্থবোধক لَا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ هٰذَا : এর اِنْ-টি এখানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَسَاطِيْرُ : এটা اُسْطُوْرَةٌ [প্রথামাক্ষর পেশযুক্ত]-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ يَنْاَوْنَ : অর্থ তারা দূরে থাকে।

قَوْلُهُ اَنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللّٰهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَزْعُمُوْنَ -এর উভয় মাফঊল পূর্বের বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যাওয়ার কারণে মাহযূফ রয়েছে।

قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ : فِتْنَتُهُمْ -এর نَصْب হয়েছে এটি كَانَ -এর خَبَرْ مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে এবং اِلَّا اَنْ قَالُوْا অংশটি اِسْمُ مُؤَخَّرْ হওয়ার কারণে। অন্যথায় সেটি مَحَلّ হিসেবে مَرْفُوْعٌ এবং رَفْعٌ তার বিপরীত হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ مَعْذِرَتُهُمْ : এটি فِتْنَةٌ-এর তাফসীর।

قَوْلُهُ اَىْ قَوْلُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ قَالُوْا- -এর মধ্যে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ যাতে اِسْتِثْنَاءٌ শুদ্ধ হয়।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ نَعْتٌ وَالنَّصْبِ نِدَاءٌ : অর্থাৎ رَبِّنَا يَا-এর মাঝে দুটি কেরাত রয়েছে। যদি رَبِّنَا শব্দটি اَللّٰهُ শব্দের সিফত হয় তাহলে جَرّ হবে আর যদি উহ্য يَا হরফে নেদার مُنَادٰى হয় তাহলে نَصَبْ হবে। اَىْ رَبَّنَا

قَوْلُهُ اَلْاَسْطُوْرَةُ : অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ যেসব মিথ্যা ও মনগড়া গল্প কাহিনী রচনা করেছে।

قَوْلُهُ يَنْاَوْنَ : نَاٰى (ف) نَاْيًا [দূরে থাকা] থেকে مُضَارِعْ جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– তারা দূরে থাকে।

قَوْلُهُ اِسْتِيْنَافًا يَعْنِىْ لَا نُكَذِّبُ : এটি একটি سُؤَالْ مُقَدَّرْ -এর জবাব। اَىْ لَا ؟اَىْ مَاذَا تَفْعَلُوْنَ لَوْ رُدِدْتُمْ نُكَذِّبَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর وَاوْ -এর পর اَنْ উহ্য থাকার সাথে সাথে تَمَنِّى -এর জবাব হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। একটি কেরাত রয়েছে نُكَذِّبُ -এর رَفْعٌ সহকারে এবং نَكُوْنَ-এর نَصْب সহকারে। প্রথমটিতে رَفْعٌ হয়েছে تَمَنِّى এবং তার জবাবের মধ্যখানে খবর হওয়ার কারণে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ نَكُوْنَ -এর নসব হয়েছে تَمَنِّى -এর জবাব হওয়ার কারণে। আর لَوْ تَرٰى -এর জবাব মাহযূফ রয়েছে। যেমন মুফাসসির (র.) لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ بَلْ لِلْإِضْرَابِ : اَىْ لِإِبْطَالِ مَا يُفْهَمُ مِنَ التَّمَنِّىْ অর্থাৎ ঈমানের আকাঙ্ক্ষাকে বাতিল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেননা তাদের এ কামনা দৃঢ় সংকল্প ও সত্য স্বীকার করার কারণে হবে না; বরং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদানের কারণে লজ্জার কারণে হবে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا : এর আতফ হয়েছে لَعَادُوْا-এর সাথে اَىْ لَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুশরিকদের ব্যর্থতার অবস্থা : পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে- وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ মুশরিক ও তাদের তৈরি করা উপাস্যসমূহকে একত্র করব। ثُمَّ نَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۤؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন? এখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরির অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঝে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসা শুরু হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন যেমন তীরসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না। -[মুস্তাদরাক, বায়হাকী]

উপরিউক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কুরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লিখিত রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে- كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ একদিন তোমার পালনকর্তার কাছে এক হাজার বছরের মতো হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্নরূপ হবে। তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্র প্রথমত দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনোরূপ পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে! এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ثُمَّ শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُوْلُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ثُمَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে এ উত্তর দেবে- وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ : এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারো প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থসম্পদ এদের জন্যই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালোবাসা ও আসক্তি নিশেষ হয়ে গেছে এবং এছাড়া তাদের মুখে কোনো উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবি করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলি এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনীয় ঘটনাবলি দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল। তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহর মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন, তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলি ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্য তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন যেন তারা পৃথিবীর মতো অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা-ভাষণে অদ্বিতীয় পটু; এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কুরআন পাকের অপর এক আয়াতে يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শিরকি ও কুফরি অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দেবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করত। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু কর্ণ এরা সবাই ছিল আল্লাহ তা'আলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে– اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোনো তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ এদিন তারা আল্লাহর কাছে কোনো কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথমে তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মহা-বিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার মিথ্যা আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দেবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, মুনকার-নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে এবং তোমার দীন কি? কাফের বলবে, هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মু'মিন বলবে, رَبِّىَ اللّٰهُ وَدِيْنِىَ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ আমার পালনকর্তা আল্লাহ এবং আমার দীন ইসলাম। এতে বোঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নুতবা কাফের মু'মিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারত। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছে ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করত। ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। যেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকর হবে না।

তাফসীরে 'বাহরে মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোনো কোনো তাফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোনো সৃষ্ট জীবকে খোলাখুলি আল্লাহ কিংবা আল্লাহর প্রতিনিধি না বললেও আল্লাহর সব ক্ষমতা সৃষ্ট জীবে বণ্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্ট জীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাচনা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুজি-রোজগার, সন্তানসন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করত। তারা নিজেদেরকে মুশরিক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে. যে, তারা মুশরিক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন। আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কাফের ও গুনাহগারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসাবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যেও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলছে; আল্লাহর বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরিক তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরি করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহর অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি [শরিক] ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরির অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, মনগড়া তৈরি করা বলে মুশরিকদের এসব অপব্যাখ্যা বোঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত।

উদাহরণত তারা বলত– مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

একানে প্রশ্ন হয়, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যখন এ প্রশ্ন ও উত্তর হবে, তখন মিথ্যা উপাস্যরা উধাও হয়ে থাকবে, কেউ সামনে থাকবে না। কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে– اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতে আল্লাহ নির্দেশ দেবেন, অত্যাচারীদের, তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের এবং তারা যাদের উপাসনা করত সবাইকে একত্র কর। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা উপাস্যরাও হাশরে উপস্থিত থাকবে।

উত্তর এই যে, আয়াতে তাদের উধাও হওয়ার অর্থ অংশীদার কিংবা সুপারিশকারী হিসাবে তারা অনুপস্থিত থাকবে। অর্থাৎ অংশীবাদীদের কোনো উপকারই তারা করতে পারবে না, বরং এমনিতেই সেখানে উপস্থিত থাকবে। এভাবে উভয় আয়াতে কোনোরূপ গরমিল থাকে না। একথা বলাও সম্ভব যে, এক সময়ে তাদেরকে একত্র করা হবে এবং পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উপরিউক্ত প্রশ্ন করা হবে।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদের যা ইচ্ছা বলার স্বাধীনতা দানের মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। –[ইবনে হাব্বান]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে কাজের দরুন মানুষ দোজখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন, সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। –[মুসনাদে আহমদ]

মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি কে? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এ হলো মিথ্যাবাদী।

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না। এমনকি হাসি-ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কুঅভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিজিক কমিয়ে দেয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ : যাহহাক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কুরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী ﷺ -এর চাচা আবূ তালিব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কুরআনের পরিবর্তে নবী করীম ﷺ হবেন। –[মাআরিফুল কুরআন : ৩/২৭৭-৮২]

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ الخ : ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে– ১. একত্ববাদ, ২. রিসালত ও ৩. আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যত এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কুরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অবশেষ ছওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, পরকালে যখন তাদেরকে দোজখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস! আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তার প্রেরিত নিদর্শনাবলি ও নির্দেশাবলিতে মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহ্বল আকাঙ্ক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন, এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্ক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপারে এই যে, পয়গাম্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গাম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে তা সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোজখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোনো ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্য বলছে– অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

قَوْلُهُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا : إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا-এর عَطْف হয়েছে عَادُوْا-এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে এ কথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোনো জীবন মানি না, এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না। এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবত হওয়াকে এবং হিসাব-কিতাব, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্য বাস্তব ঘটনাবলির বিশ্বাস না থাকা জরুরি নয়; বরং আজকাল যেমন অনেক কাফের ইসলামি সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতাবশত ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কুরআন পাক বর্তমান জীবনে কোনো কোনো কাফের সম্পর্কে বলে– وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا অর্থাৎ তারা নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী ﷺ -কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে-পড়ে লেগে আছে।

মোটকথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে 'দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব' সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তাফসীরে মাযহারীতে তাবারানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বিচারদণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন, সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশি হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌঁছাতে পার। আল্লাহ তা'আলা আরও বলবেন, আমি জাহান্নামের আজাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও সে পূর্বের মতোই কাজ করবে।

–[মা'আরিফুল কুরআন: ৩/২৮৫-৮৬]

অনুবাদ :

٣١. قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ط بِالْبَعْثِ حَتّٰى غَايَةٌ لِلتَّكْذِيْبِ اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ الْقِيٰمَةُ بَغْتَةً فُجَاءَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا هِىَ شِدَّةُ التَّاَلُّمِ وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ اَىْ هٰذَا اَوَانُكِ فَاحْضُرِىْ عَلٰى مَا فَرَّطْنَا قَصَّرْنَا فِيْهَا اَىِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ط بِاَنْ تَاْتِيَهُمْ عِنْدَ الْبَعْثِ فِىْ اَقْبَحِ شَىْءٍ صُوْرَةً وَاَنْتَنِهِ رِيْحًا فَتَرْكَبُهُمْ اَلَا سَآءَ بِئْسَ مَا يَزِرُوْنَ يَحْمِلُوْنَهُ حَمْلُهُمْ ذٰلِكَ ـ

৩১. যারা পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। حَتّٰى এটা তাদের কর্তৃক পুনরুত্থান অস্বীকার করার সীমা বর্ণনা করছে। এমনকি যখন আকস্মাৎ তাদেরকে নিকট নির্দিষ্ট ক্ষণ অর্থাৎ কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে, হায়! আমাদের আক্ষেপ! يَا حَسْرَتَنَا অর্থ হে আমাদের দুঃসহ যন্ত্রণা ও ক্লেশ! এখানে مَجَازٌ অর্থাৎ রূপকার্থে এর আহ্বান জানানো হচ্ছে। অর্থাৎ এটাই তোমার সমুপস্থিতির প্রকৃষ্ট সময় সুতরাং তুমি উপস্থিত হও। এতে দুনিয়াতে আমরা যে অবহেলা করেছি ত্রুটি করেছি এ শাস্তি তজ্জন্য। তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। অত্যন্ত কুশ্রী ও দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় কিয়ামতের দিন তাদের এ কৃতকর্ম উপস্থিত হবে এবং তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। দেখ, তারা যা বহন করত তা অর্থাৎ তাদের এ বোঝা কত মন্দ! কত নিকৃষ্ট!

٣٢. وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اَىِ الْاِشْتِغَالُ بِهَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَاَمَّا الطَّاعَاتُ وَمَا يُعِيْنُ عَلَيْهَا فَمِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ اَىِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط الشِّرْكَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ ذٰلِكَ فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

৩২. পার্থিব জীবন অর্থাৎ তার লিপ্ততা তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নয়। তবে ইবাদত-বন্দেগি ও তার সহায়ক বিষয়সমূহ পরকালের বিষয় বলে গণ্য। بَغْتَةً অর্থ অকস্মাৎ। আর যারা শিরক হতে বেঁচে থাকে তাদের জন্য পরকালের আবাসই অর্থাৎ জান্নাতই শ্রেয় তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? করলে ঈমান গ্রহণ করতে পারতে। يَعْقِلُوْنَ এটা ى [নাম পুরুষ] ও ت [দ্বিতীয় পুরুষ] রূপে পঠিত রয়েছে।

٣٣. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ نَعْلَمُ اِنَّهُ اَىِ الشَّاْنُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ لَكَ مِنَ التَّكْذِيْبِ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ فِى السِّرِّ لِعِلْمِهِمْ اَنَّكَ صَادِقٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّخْفِيْفِ اَىْ لَا يَنْسِبُوْنَكَ اِلَى الْكِذْبِ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ وَضَعَهُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اَىِ الْقُرْاٰنِ يَجْحَدُوْنَ يُكَذِّبُوْنَ ـ

৩৩. অবশ্য জানি যে, قَدْ এটা تَحْقِيْق বা সুনিশ্চিতার্থ বোধক শব্দ। اِنَّهُ -এর সর্বনাম ه -টি এখানে شَاْن -রূপে ব্যবহৃত। তারা তোমাকে অস্বীকার করে যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়; তবে তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, গোপনে, এ কারণে যে, তারা তোমাকে সত্যবাদী বলে নিশ্চিত জানে। لَا يُكَذِّبُوْنَكَ এটা অপর এক কেরাতে تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদহীনরূপে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তারা তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে না। বরং সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর আয়াতকে অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করে, মিথ্যা বলে মনে করে। لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ এখানে [هُمْ] ضَمِيْر বা [তারা] সর্বনাম স্থানে এর [اَلظّٰلِمِيْنَ] ব্যবহার হয়েছে।

٣٤. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ج بِاِهْلَاكِ قَوْمِهِمْ فَاصْبِرْ حَتّٰى يَاْتِيَكَ النَّصْرُ بِاِهْلَاكِ قَوْمِكَ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط مَوَاعِيْدِهٖ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِيْنَ مَا يَسْكُنُ بِهٖ قَلْبُكَ.

৩৪. তোমার পূর্বে বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল কিন্তু তাদেরকে অস্বীকার করা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের সম্প্রদায়ের ধ্বংস কল্পে তাদের পক্ষে আমাদের সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। সুতরাং তুমিও তোমার সম্প্রদায়ের ধ্বংস কল্পে তোমার পক্ষে আল্লাহর সাহায্য না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহর আদেশ তাঁর অঙ্গীকার কেউ পরিবর্তন করার নেই। প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে; যা দ্বারা তোমার হৃদয়ে প্রশান্তি আসবে। এ আয়াতটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ।

٣٥. وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَظُمَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ عَنِ الْاِسْلَامِ لِحِرْصِكَ عَلَيْهِمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا سِرْبًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا مَصْعَدًا فِي السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط مِمَّا اقْتَرَحُوْا فَافْعَلِ الْمَعْنٰى اِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ هِدَايَتَهُمْ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى وَلٰكِنْ لَّمْ يَشَأْ ذٰلِكَ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ بِذٰلِكَ.

৩৫. যদি ইসলাম সম্পর্কে তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় অর্থাৎ এতদ্বিষয়ে তোমার সুতীব্র আগ্রহের কারণে এটা যদি তোমার জন্য ক্লেশ করা হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাদের আবদারানুসারে কোনো নিদর্শন নিয়ে আস। মোটকথা, তা পারলে, যাও, কর। আর তোমার পক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং এদের বিষয়ে আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ যদি এদের হেদায়েত চাইতেন তবে তাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করতেন। কিন্তু তিনি তা চাননি ফলে এরাও ঈমান আনেনি। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

٣٦. اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَكَ اِلَى الْاِيْمَانِ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط سِمَاعَ تَفَهُّمٍ وَاعْتِبَارٍ وَالْمَوْتٰى اَيِ الْكُفَّارُ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ فِيْ عَدَمِ السِّمَاعِ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ فِي الْاٰخِرَةِ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ يُرَدُّوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ.

৩৬. ঈমানের প্রতি তোমার আহ্বানে সাড়া কেবল তারাই দেবে যারা শুনে। অর্থাৎ উপলব্ধি করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শুনে। মৃতগণ অর্থাৎ কাফেরগণ, না শোনার বিষয়ে কাফেদেরকে এখানে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে পরকালে পুনর্জীবন দান করবেন; অতঃপর তাঁর দিকেই এরা প্রত্যানীত হবে তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অনন্তর তিনি তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করবেন।

٣٧. وَقَالُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ
اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْمَائِدَةِ
قُلْ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ
بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اٰيَةً مِّمَّا اقْتَرَحُوْا
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ نُزُوْلَهَا بَلَاءٌ
عَلَيْهِمْ لِوُجُوْبِ هَلَاكِهِمْ اِنْ جَحَدُوْهَا .

৩৭. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ বলে, তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট কোনো নিদর্শন যেমন– উষ্ট্রী, লাঠি, খাঞ্চা ভরা খাদ্য ইত্যাদি অবতীর্ণ হয়নি কেন? لَوْلَا এটা এখানে সতর্কী ব্যঞ্জক শব্দ هَلَّا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদেরকে বল, আল্লাহ তাদের দাবি অনুসারে নিদর্শন অবতরণ করতে সক্ষম; يُنَزِّلُ এটা তাশদীদসহ [بَابُ تَفْعِيْل] এবং তাশদীদ ব্যতিরেকে [بَابُ ضَرَبَ]-ও পঠিত রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না যে, এর অবতারণ তাদের জন্য মহা এক পরীক্ষা। কারণ, তখন যদি তারা তার অস্বীকার করে তবে এদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে।

٣٨. وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ دَآبَّةٍ تَمْشِىْ فِى الْاَرْضِ
وَلَا طَآئِرٍ يَّطِيْرُ فِى الْهَوَاءِ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ
اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ فِىْ تَقْدِيْرِ خَلْقِهَا وَرِزْقِهَا
وَاَحْوَالِهَا مَا فَرَّطْنَا تَرَكْنَا فِى الْكِتٰبِ
اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مِنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ فَلَمْ
نَكْتُبْهُ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ فَيَقْضِىْ
بَيْنَهُمْ وَيَقْتَصُّ لِلْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ ثُمَّ
يَقُوْلُ لَهُمْ كُوْنُوْا تُرَابًا .

৩৮. ভূপৃষ্ঠে বিচরণ রত এমন জীব নেই এবং স্বীয় ডানার সাহায্যে বাতাসে এমন কোনো পাখি উড়ে না যা সৃষ্টি, জীবনোপকরণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমাদের মতো এক একটি উম্মত নয়। مِنْ دَآبَّةٍ এতে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত। কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুজে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করেনি, না লিখে ছেড়ে দেইনি। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সকলে একত্র হবে। مِنْ شَىْءٍ -এর مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত। অনন্তর তিনি সকলের মধ্যে মীমাংসা করবেন। এমনকি শিংহীন প্রাণী শিংওয়ালা প্রাণী হতে বদলা হবে। শেষে এদের সকল কিছুকে মাটি হয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

٣٩. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ صُمٌّ عَنْ
سِمَاعِهَا سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَبُكْمٌ عَنِ النُّطْقِ
بِالْحَقِّ فِى الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ
اِضْلَالَهٗ يُضْلِلْهُ ط وَمَنْ يَّشَاْ هِدَايَتَهٗ يَجْعَلْهُ
عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ .

৩৯. যারা আমার আয়াতে অর্থাৎ আল কুরআনকে মিথ্যা বলে, তারা তা গ্রহণ করার কর্ণে শ্রবণ করা হতে বধির, সত্য কথা বলা সম্পর্কে মূক, তারা অন্ধকারে অর্থাৎ কুফরিতে নিমজ্জিত। যাকে আল্লাহ বিপথগামী করতে চান বিপথগামী করেন, আর যাকে হেদায়েতের ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি সরল পথে দীনে ইসলামের পথে স্থাপন করেন।

٤٠. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِاَهْلِ مَكَّةَ اَرَاَيْتَكُمْ
اَخْبِرُوْنِىْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ فِى الدُّنْيَا
اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ الْقِيٰمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ
عَلَيْهِ بَغْتَةً اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ج لَا اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ اَنَّ الْاَصْنَامَ تَنْفَعُكُمْ
فَادْعُوْهَا .

৪০. হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীদেরকে বল, তোমরা ভেবে দেখ আমাকে সংবাদ দাও যে, দুনিয়াতে আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে অথবা এটা শাস্তি সংবলিত নির্দিষ্ট ক্ষণ কিয়ামত দিবস অকস্মাৎ তোমাদের নিকট উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? না, ডাকবে না। তোমরা যদি এ কথায় সত্যবাদী হও যে, এ সকল প্রতিমা তোমাদের উপকার করে তবে তাদেরকেই ডাক।

٤١. بَلْ إِيَّاهُ لَا غَيْرَهُ تَدْعُوْنَ فِي الشَّدَائِدِ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ أَيْ يَكْشِفُهُ عَنْكُمْ مِنَ الضُّرِّ وَنَحْوِهِ إِنْ شَاءَ كَشْفَهُ وَتَنْسَوْنَ تَتْرُكُوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ مَعَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْعُوْنَهُ.

৪১. বরং তোমরা বিপদে কেবল তাঁকেই ডাক, অপর কাউকেও নয়। যার দিকে তোমরা ডাক তা তিনি দূর করবেন অর্থাৎ যে ক্লেশ, দুঃখ ইত্যাদি বিদূরণের জন্য তোমরা তাঁকে ডাক তিনি তো মোচন করবেন যদি তিনি দূর করার ইচ্ছা করেন। তাঁর সাথে যে সমস্ত প্রতিমা তোমার শরিক করতে তা তোমরা বিস্মৃত হবে, পরিত্যগ করবে। এদেরকে আর ডাকবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَغْتَةً : অর্থ অকস্মাৎ। এটি بَاغِتَةً-এর অর্থে হয়ে حَالٌ হয়েছে। نَفَقًا অর্থ সুড়ঙ্গ। سُلَّمًا অর্থ সোপান।

قَوْلُهُ حَتّٰى غَايَةٌ لِلتَّكْذِيْبِ : অর্থাৎ حَتّٰى হরফটি تَكْذِيْب বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শেষ সীমা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। خُسْرَانٌ-এর সীমা বর্ণনা করার জন্য নয়। কেননা তাদের خُسْرَانٌ বা ক্ষতিগ্রস্ততার কোনো সীমা নেই। পক্ষান্তরে تَكْذِيْب-এর সীমা রয়েছে। তাহলো তা দুনিয়াতেই হবে কেয়ামতের পর তা বন্ধ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ نِدَائُهَا مَجَازٌ : এখানে نِدَا বা আহ্বানটা মাজাযী ও রূপক অর্থে হওয়ার কারণ হলো, আহ্বান তো তাকে করা হয় যার মাঝে ফিরে তাকানোর যোগ্যতা রয়েছে। حَسْرَتٌ-এর মাঝে সে যোগ্যতা নেই। সুতরাং حَسْرَتٌ-কে عُقَلَاءُ ও বিবেকবানদের স্তরে রেখে আহ্বান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ الدُّنْيَا : এটি فِيْهَا-এর যমীরকে যাহের করা হয়েছে। অথচ পূর্বে কাছাকাছি কোথাও দুনিয়ার আলোচনা নেই। কিন্তু দুনিয়া যেহেতু যেহনীভাবে مَعْلُوْمٌ বা জানা জিনিস তাই তার দিকে যমীর ফিরানো হয়েছে। তাই إِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ-এর ইশকাল বাকি থাকল না।

قَوْلُهُ حَمْلُهُمْ ذٰلِكَ : এটি مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ

قَوْلُهُ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ : এতে মাউসূফকে সিফতের দিকে إِضَافَتْ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটি يَعْقِلُوْنَ-এর মাফউল। **প্রশ্ন.** এখানে فِي السِّرِّ অংশটি বৃদ্ধি করার ফায়দা কী? **উত্তর.** এর দ্বারা تَعَارُضْ দূর করা হয়েছে। تَعَارُضْ হলো এই যে, لَا يُكَذِّبُوْنَكَ এবং يَجْحَدُوْنَ-এর মাঝে تَعَارُضْ রয়েছে। কেননা, لَا يُكَذِّبُوْنَ-এর মর্ম হলো মিথ্যা প্রতিপন্ন না করা। আর يَجْحَدُوْنَ-এর মর্ম হলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

নিরসন : উক্ত تَعَارُضْ এভাবে নিরসন করা হয়েছে যে, تَكْذِيْب না করা অন্তরের দ্বারা আর تَكْذِيْب করাটা মুখে মুখে।

قَوْلُهُ وَضَعَهُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ : এর মর্ম হলো لٰكِنَّهُمْ-এর স্থলে لٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ যমীরই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যেহেতু কাফেরদের জুলুমের চরিত্রটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল তাই যমীরের স্থলে إِسْمِ ظَاهِرْ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُكَذِّبُوْنَ : يَجْحَدُوْنَ-এর তাফসীর يُكَذِّبُوْنَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَجْحَدُوْنَ-কে بَاء-এর মাধ্যমে مُتَعَدِّيْ করার কারণ হলো তাতে يُكَذِّبُوْنَ-এর অর্থ নিহিত রয়েছে। আর يُكَذِّبُوْنَ-এর মধ্যে بَاء-এর দ্বারা مُتَعَدِّيْ করা হয় বিধায় এখানেও তেমনটি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَادْعُوْهَا : এটি إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-এর উহ্য জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الخ কাফেরদের বাজে কথার প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দান : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতেও বলা হয়েছে فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ অর্থাৎ কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বর্ণনাসূত্রে তাফসীরে মাজহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দুজন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শুরাইক ও আবূ জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবূ জাহলকে জিজ্ঞেস করল, হে আবুল হিকাম! [আরবে আবূ জাহল 'আবুল হিকাম' অর্থাৎ জ্ঞানধর নামে খ্যাত ছিল। ইসলামি যুগে কুফরি ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবূ জাহল' অর্থাৎ মূর্খতাধর উপাধি দেওয়া হয়।] আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি, আমাকে সত্য সত্য বল। তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?

আবূ জাহল আল্লাহর কসম খেয়ে বলল, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী কুসাই' -এ সব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কুরাইশরা রিক্তহস্ত থেকে যাবে আমরা তা কিরূপে সত্য করতে পারি? পতাকা বনী কুসাই -এর হাতে রয়েছে। হেরেম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুয়তও তাদের মধ্যেই ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কুরাইশদের হাতে কি থাকবে? নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবূ জাহল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আপনি মিথ্যাবাদী– এরূপ কোনো ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেওয়া যেতে পারে, কোনো রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে নয় আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যত যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে ও তাঁর নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়।

قَوْلُهُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ : এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকে জীবিত করা হবে। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোনো শিংবিশিষ্ট জন্তু কোনো শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এ দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেওয়া হবে। এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধও নেওয়া হবে। যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে– 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়ই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে– يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ আফসোস, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম। ইমাম বগভী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেওয়া হবে।

সৃষ্ট জীবের পাওনার গুরুত্ব : সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোনো শরিয়ত ও বিধিবিধান পালন করতে আদেশ দেওয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমরা বলেন, হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেওয়া হবে। তাদের অন্য কোনো কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যে, সৃষ্ট জীবের পাম্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়– এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও ইবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন। –[মাআরিফুল কুরআন, ৩/২৯২-৯৪]

অনুবাদ :

٤٢. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ زَائِدَةٌ قَبْلِكَ رُسُلًا فَكَذَّبُوهُمْ فَأَخَذْنٰهُمْ بِالْبَأْسَاءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالضَّرَّاءِ الْمَرَضِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ يَتَذَلَّلُونَ فَيُؤْمِنُونَ .

৪২. তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ -এর مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। কিন্তু তারা তাদেরকে অস্বীকার করেছে ফলে তাদেরকে অর্থ-সংকট, চরম দারিদ্র্য ও দুঃখ দ্বারা অসুস্থতা দ্বারা পীড়িত করেছি যাতে তারা বিনীত হয়, অবনত হয় এবং ঈমান আনয়ন করে।

٤٣. فَلَوْلَا فَهَلَّا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا عَذَابُنَا تَضَرَّعُوا أَيْ لَمْ يَفْعَلُوا ذٰلِكَ مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضِي لَهُ وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فَلَنْ تَلِينَ لِلْإِيمَانِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ الْمَعَاصِي فَأَصَرُّوا عَلَيْهَا .

৪৩. আমার শাস্তি অর্থাৎ আজাব যখন তাদের উপর আপতিত হলো তখন তারা কেন বিনীত হলো না? বিনীত হওয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও তারা এটা করল না। আসলে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছে তাই এটা ঈমান আনয়নের জন্য কোমল হচ্ছে না এবং তারা যা অর্থাৎ যে পাপ ও অবাধ্যাচরণ করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে ধরেছিল। ফলে তারা এর উপর জিদ ধরে বসে থাকে। لَوْلَا -এটা এখানে تَنْبِيه বা সতর্কীসূচক শব্দ هَلَّا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٤. فَلَمَّا نَسُوا تَرَكُوا مَا ذُكِّرُوا وُعِظُوا وَ خُوِّفُوا بِهِ مِنَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ فَلَمْ يَتَّعِظُوا فَتَحْنَا بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط مِنَ النِّعَمِ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا فَرَحَ بَطَرٍ أَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ بَغْتَةً فَجْأَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ آيِسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ .

৪৪. এর মাধ্যমে অর্থাৎ দারিদ্র্য ও রোগ-শোক দ্বারা তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল শিক্ষাদান এবং ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো তা পরিত্যাগ করল এবং কোনো উপদেশ গ্রহণ করল না তখন উন্মুক্ত করে দিলাম; فَتَحْنَا এটা তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] ও তাশদীদ ব্যতিরেকেই উভয়রূপে পাঠ করা যায়। তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার অর্থাৎ তাদের প্রতি অবকাশ প্রদান স্বরূপ সকল স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বার অবশেষে তাদেরকে প্রদত্ত স্বাচ্ছন্দ্যে তারা যখন মত্ত হলো অহংকারে আত্মহারা হয়ে উঠল তখন অকস্মাৎ হঠাৎ তাদেরকে শাস্তিতে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনই তারা নিরাশ হলো। অর্থাৎ সকল কল্যাণ সম্পর্কে তারা হতাশ হয়ে পড়ল।

٤٥. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ط أَيْ آخِرُهُمْ بِأَنْ اُسْتُؤْصِلُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ عَلٰى نَصْرِ الرُّسُلِ وَهَلَاكِ الْكٰفِرِينَ .

৪৫. অতঃপর সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হলো। অর্থাৎ এদের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত উৎপাটিত করা হলো রাসূলগণকে সাহায্য এবং কাফেরদের ধ্বংস করায় প্রশংসা আল্লাহরই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

٤٦. قُلْ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَرَأَيْتُمْ أَخْبِرُوْنِيْ إِنْ أَخَذَ
اللّٰهُ سَمْعَكُمْ أَصَمَّكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ عَمَاكُمْ
وَخَتَمَ طَبَعَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ فَلَا تَعْرِفُوْنَ
شَيْئًا مَّنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهِ ط
بِمَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بِزَعْمِكُمْ أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ الدَّلَالَاتِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا
ثُمَّ هُمْ يَصْرِفُوْنَ عَنْهَا فَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

৪৬. মক্কাবাসীদেরকে বল, ভেবে দেখ, আমাকে সংবাদ দাও, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন অর্থাৎ তোমাদেরকে বধির ও অন্ধ করে দেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করে দেন, সিল করে দেন। কিছুই তোমরা চিনতে ও বুঝতে না পার তবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ তোমাদের ধারণায় আছে যে তোমাদেরকে এগুলো অর্থাৎ যেগুলো তোমাদের হতে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেগুলো ফিরিয়ে দেবে? দেখ কিরূপভাবে আমি নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ আমার একত্বের নিদর্শনসমূহের বর্ণনা করি। প্রতদসত্ত্বেও তারা এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং ঈমান আনয়ন করে না।

٤٧. قُلْ لَهُمْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً
أَوْ جَهْرَةً لَيْلًا أَوْ نَهَارًا هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ أَيْ مَا يُهْلَكُ إِلَّا هُمْ.

৪৭. তাদেরকে বল, তোমরা আমাকে বল, আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে অর্থাৎ রাত্রে বা দিনে তোমাদের উপর আপতিত হলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত কাফেরগণ ব্যতীত আর কে ধ্বংস হবে? অর্থাৎ এরা ব্যতীত আর কেউ ধ্বংস হবে না।

٤٨. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ مَنْ
اٰمَنَ بِالْجَنَّةِ وَمُنْذِرِيْنَ ج مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ
فَمَنْ اٰمَنَ بِهِمْ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ.

৪৮. রাসূলগণকে শুধু যারা ঈমান আনয়ন করবে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদবাহী এবং যারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করবে তাদের জন্য সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করি। কেউ তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেও স্বীয় কার্য সংশোধন করলে পরকালে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।

٤٩. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ يَخْرُجُوْنَ عَنِ الطَّاعَةِ.

৪৯. যারা আমার নির্দেশকে অস্বীকার করে সত্য ত্যাগের কারণে আনুগত্যের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে।

٥٠. قُلْ لَهُمْ لَّآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ
الَّتِيْ مِنْهَا يُرْزَقُ وَلَآ أَنِّيْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
مَا غَابَ عَنِّيْ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيَّ وَلَآ أَقُوْلُ
لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ ج مِنَ الْمَلٰئِكَةِ إِنْ مَا
أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى إِلَيَّ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الْأَعْمٰى الْكَافِرُ وَالْبَصِيْرُ الْمُؤْمِنُ لَا
أَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ فَتُؤْمِنُوْنَ.

৫০. তাদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার বর্তমান যা হতে তিনি জীবনোপকরণ দান করেন, অদৃশ্য সম্পর্কেও অর্থাৎ যা আমার দৃষ্টির বাইরে এবং যার সম্পর্কে আমাকে ওহী প্রেরণ করা হয়নি সে সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদের এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতাগণের অন্যতম একজন ফেরেশতা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি; إن এটা এখানে না-বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বল, অন্ধ অর্থাৎ কাফের ও চক্ষুষ্মান অর্থাৎ মু'মিন কি সমান? তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? তা করলে তোমরা ঈমান নিয়ে আসতে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نُصَرِّفُ : এখানে অর্থ বর্ণনা করি।

قَوْلُهُ مِنْ زَائِدَةٌ : مِنْ قَبْلِكَ -এর মাঝে مِنْ হরফটি হলো অতিরিক্ত। কেননা ظَرْف হরফে জর দাবি করে না।

قَوْلُهُ رُسُلًا : এটি اَرْسَلْنَا-এর উহ্য মাফউল।

قَوْلُهُ فَكَذَّبُوْهُمْ : **প্রশ্ন.** এখানে فَكَذَّبُوْهُمْ মাহযূফ ধরার কি প্রয়োজন হলো? **উত্তর** : যাতে فَاَخَذْنَاهُمْ -এর تَفْرِيْع সঠিক হয়। তাকদীরী ইবারত হবে- وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فَكَذَّبُوْهُمْ فَاَخَذْنٰهُمْ অন্যথায় শুধু রাসূল প্রেরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের কোনো প্রশ্নই নেই, বরং অস্বীকার করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে।

قَوْلُهُ اَخَذَهُ مِنْكُمْ : **প্রশ্ন.** اَخَذَهُ-এর মধ্যে যমীর একবচন কেন আনা হলো? অথচ তার مَرْجِعْ হলো বহুবচন।
উত্তর : উল্লিখিত مَاخُوْذٌ-এর তাবীলে যমীর একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِزَعْمِكُمْ : এর সম্পর্ক হলো مِنْ اِلٰهٍ-এর সাথে। অর্থাৎ ঐ ইলাহ যাকে তোমরা ইলাহ মনে কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ .... لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ : অর্থাৎ আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে কিনা। তারা যখন এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশি লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া হলো। অর্থাৎ তাদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বারে খুলে দেওয়া হলো এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হলো। আশা ছিল যে, তারা এ সব নিয়ামত দেখে নিয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা আল্লাহকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হলো। নিয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ ও রাসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওজর-আপত্তির আর কোনো ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা অকস্মাৎ তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমনভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবার ও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতের উপর এ আজাব জলেস্থলে ও অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে সিমার করে দিয়েছে। হযরত নূহ (আ.) -এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যুপরি আট দিন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হযরত লূত (আ.)-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টিয়ে দেওয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে বেঙ, মাছ ইত্যাদি জীবজন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহরে মাইয়্যেত' তথা মৃত সাগর নামে এবং 'বাহরে লুত' নামেও অভিহিত করা হয়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আজাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোনো সময় তারা বাহ্যত স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তী তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি। আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোনো জাতির প্রতি আকস্মাৎ আজাব নাজিল করেন না, বরং প্রথমে হুঁশিয়ারির জন্য অল্প শাস্তি অবতারণ করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি তাদেরকে বড় আজাবের স্বাদ গ্রহণ করানোর পূর্বে একটি ছোট আজাবের স্বাদ গ্রহণ করাই, যাতে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসে।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ ভালো-মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয়; বরং অসৎ লোক সৎ লোকের চাইতে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আসল প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতেই হবে। তাই কিয়ামতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন' প্রতিদান দিবস। কিন্তু আজাবের নমুনা হিসেবে কিছু কষ্ট এবং ছওয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশত ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোনো কোনো সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোনো কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

মোটকথা, দুনিয়ার সুখ ও কষ্ট প্রকৃত শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং শাস্তি ও প্রতিদানের নমুনামাত্র। সমগ্র বিশ্বজগৎ পরকালের একটি শো-রুম। ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যের নমুনা দেখাবার জন্য দোকানের অগ্রভাগে একটি শো-রুম সাজিয়ে রাখে, যাতে নমুনা দেখে ক্রেতার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব, বোঝা গেল যে, দুনিয়ার কষ্ট ও সুখ প্রকৃতপক্ষে শাস্তি ও প্রতিদান নয়, বরং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি কৌশলমাত্র।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্যে। কারণ স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এতে বোঝা গেল যে, দুনিয়াতে আজাব হিসেবে যে কষ্ট বিপদ কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহর রহমত কার্যরত থাকে।

فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষায় সম্মুখীন করা হয়, অর্থাৎ তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। এতে সাধারণ মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে রয়েছে এবং সফল জীবনযাপন করছে। অনেক সময় আজাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহের এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোনো ব্যক্তির উপর নিয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে অথচ সে গুনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আজাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন– ১. প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, ২, সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চান, তখন তাদের জন্য বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ বিশ্বাসভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে– আল্লাহর ব্যাপক আজাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর পর বলা হয়েছে– وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী অত্যাচারীদের উপর আজাব নাজিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্য একটি নিয়ামত। এজন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, ৩/২৯৬-৯৯]

قَوْلُهُ قُلْ لَّاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ الخ : কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তিনটি দাবি করেছিল। ১. যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে মু'জিযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আমাদের জন্য একত্র করে দিন। ২. যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রাসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলি ব্যক্ত করুন, যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্বে থেকেই করে নিতে পারি। ৩. আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতোই পিতামাতার

মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘোরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সমঅংশীদার, তিনি কিভাবে আল্লাহর রাসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলিতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোনো ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহর রাসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরিউক্ত তিনটি দাবির উত্তরে বলা হয়েছে- قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডার দাবি করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আল্লাহ তা'আলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? তোমরা দাবি করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদের বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবি করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবি করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ আমি আল্লাহর রাসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলি মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্য একটি দুটি নয়- অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রিসালত দাবি করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া, আল্লাহ তা'আলারই মতো প্রত্যেক ছোট বড় অদৃশ্য বিষয় অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের ঊর্ধ্বে কোনো ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরি নয়। রাসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত ঐশীবাণী অনুসরণ করবেন, নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহ্বান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা একদিকে রিসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রাসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরও পথনির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রিস্টানদের মতো রাসূলকে আল্লাহ না মনে করে বসে। রাসূলের মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার দাবিও তাই; এ ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদিরা রাসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রিস্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদরা অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে- وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বোঝা যায় ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে, এতে কোনো বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তাফসীরবিদরা যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোনো মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ভাণ্ডার পয়গাম্বর কুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোনো ওলী অথবা বুজুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন। সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে- وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ অর্থাৎ আমি তোমাদের বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রিসালতে অস্বীকার করবে। মধ্যবর্তী বাক্যে কথার ভঙ্গি পরিবর্তন করে لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলার পরিবর্তে وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে "আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না" বলা হয়েছে।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোনো ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ তা'আলার সব ভাণ্ডার রাসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশত এসব দাবি করত। কাজেই কাফেরদের

এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবি কখনও করিনি।

কিন্তু অদৃশ্য বিষয় জানার প্রশ্নটি এমন নয়। কেননা তারা জ্যোতিষী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের সম্পর্কেও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। অতএব, আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস রাখাও অবান্তর ছিল না। বিশেষ করে, তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে অনেক অদৃশ্য সংবাদও শুনেছিল এবং তদনুযায়ী ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। তাই এখানে শুধু 'বলি না' বলাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং 'অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে যেসব অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান কোনো রাসূল, ফেরেশতা কিংবা ওলীকে দান করা হয়, কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান' বলা যায় না। এ থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেছে। এ ব্যাপারে কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। বরং সব ফেরেশতা এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাইকে যেটুকু জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাদের সবার জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশি জ্ঞান একা মহানবী ﷺ -কে দান করা হয়েছিল।

সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস তাই। কিন্তু এর সাথে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা অনুযায়ী পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব পণ্ডিতের এটাও বিশ্বাস যে, সমগ্র সৃষ্টজগতের পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁর স্রষ্টা, রিজিকদাতা ও সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু কোনো ফেরেশতা কিংবা রাসূল তাঁর সমতুল্য নয়, এ কারণেই কোনো ফেরেশতা কিংবা পয়গাম্বরকে লাখো অদৃশ্য বিষয় জানা সত্ত্বেও 'আলিমুল গায়ব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী বলা যায় না। এ গুণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার।

মোটামুটিভাবে সাইয়্যেদুর রাসূল, সরওয়ারে কায়েনাত, ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা সম্পর্কে সর্বাধিক অর্থবহ বাক্য হচ্ছে এই- بعد از خدا بزرگ تونی قصه مختصر [সংক্ষেপে আল্লাহর পরে তুমিই সবার বড়]। জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ফেরেশতা ও নবী-রাসূলের চাইতে তাঁর জ্ঞান অধিক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সমান নয়। সমান হওয়ার দাবি করা খ্রিস্টবাদ প্রবর্তিত বাড়াবাড়ির পথ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না। উদ্দেশ্যে এই যে, মানসিক আবেগপ্রবণতা ও হঠকারিতা পরিহার করে বাস্তব সত্য উপলব্ধি কর, যাতে তোমরা অন্ধদের মধ্যে গণ্য না হও এবং চক্ষুষ্মান হয়ে যাও। সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা তোমরা এ দৃষ্টি অর্জন করতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্কবিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রিসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশঙ্কা করে।

মোটকথা এই যে, কিয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে- ১. কিয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, ২. অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং ৩. সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। কিন্তু প্রথমোক্ত দু-প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশি আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে- وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে কুরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন। [৩/৩০৩-৬]

অনুবাদ :

٥١. وَاَنْذِرْ خَوِّفْ بِهٖ بِالْقُرْاٰنِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ وَلِيٌّ يَنْصُرُهُمْ وَّلَا شَفِيْعٌ يَّشْفَعُ لَهُمْ وَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُحْشَرُوْا وَهِىَ مَحَلُّ الْخَوْفِ وَالْمُرَادُ بِهِمُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْعَاصُوْنَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ بِاِقْلَاعِهِمْ عَمَّا هُمْ فِيْهِ وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ.

৫১. তুমি তাদেরকে এটা অর্থাৎ আল কুরআন দ্বারা সতর্ক কর ভয় প্রদর্শন কর, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক যে তাদেরকে সাহায্য করবে বা সুপারিশকারী যে তাদের জন্য সুপারিশ করবে এমন কেউ থাকবে না। لَيْسَ لَهُمْ না অর্থবোধক এ বাক্যটি يُحْشَرُوْا ক্রিয়ার ضَمِيْر [সর্বনাম] هُمْ -এর حَالٌ আর এটাই হচ্ছে مَحَلُّ الْخَوْفِ অর্থাৎ ভয়ের স্থান। এখানে পাপী মুমিনদের কথা বুঝানো হয়েছে। হয়তো তারা বর্তমানে যে মন্দ কাজে লিপ্ত তার মূলোৎপাটন করত এবং সৎ আমল করত আল্লাহকে ভয় করবে।

٥٢. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَجْهَهٗ ط تَعَالٰى لِاَشْيَاءَ مِنْ اَعْرَاضِ الدُّنْيَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ طَعَنُوْا فِيْهِمْ وَطَلَبُوْا اَنْ يَّطْرُدَهُمْ لِيُجَالِسُوْهُ وَاَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ طَمَعًا فِىْ اِسْلَامِهِمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ اِنْ كَانَ بَاطِنُهُمْ غَيْرَ مَرْضِيٍّ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ جَوَابُ النَّفْيِ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ.

৫২. যারা তাদের প্রতিপালককে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কেবল তাঁরই আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে অন্য কোনো জাগতিক উদ্দেশ্যে নয় তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। এরা হলেন দরিদ্র মুসলিমগণ। মুশরিকরা তাদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখত এবং কটাক্ষ করত। রাসূল ﷺ -এর দরবারে বসার পূর্বশর্ত হিসেবে মুশরিকরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়ার দাবি করেছিল। এদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি রাসূল ﷺ -এর আগ্রহাতিশয্যের কারণে তিনি তার ইচ্ছাও করে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা উক্ত নির্দেশ নাজিল করেছিলেন। তাদের অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তর যদি সন্তোষজনক না হয় তবে এর জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় مِنْ شَيْءٍ এখানে مِنْ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। এবং তোমার কোনো বিষয়ের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে। فَتَطْرُدَهُمْ এটা উক্ত نَفِى অর্থাৎ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ এ না-বোধক বক্তব্যটির জবাব। তবে তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি এরূপ কর।

٥٣. وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا ابْتَلَيْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اَىِ الشَّرِيْفَ بِالْوَضِيْعِ وَالْغَنِىَّ بِالْفَقِيْرِ بِاَنْ قَدَّمْنَاهُ بِالسَّبْقِ اِلَى الْاِيْمَانِ لِيَقُوْلُوْا اَىِ الشُّرَفَاءُ وَالْاَغْنِيَاءُ مُنْكِرِيْنَ.

৫৩. এভাবে তাদের একদলকে অন্য দল যারা অর্থাৎ কুলিন এবং হীন, ধনী এবং নির্ধন, একদলকে অপর দল দ্বারা পরীক্ষা করি যেমন একদলকে অগ্রে ঈমান আনার তাওফীক দিয়ে দেই যেন তারা অর্থাৎ উচ্চবিত্ত ও মর্যাদার অধিকারী সত্য অস্বীকারকারীগণ–

أَهٰٓؤُلَاۤءِ الْفُقَرَاءُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ط بِالْهِدَايَةِ اَىْ لَوْ كَانَ مَا هُمْ عَلَيْهِ هُدًى مَا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ لَهٗ فَيَهْدِيْهِمْ بَلٰى .

বলে, আমাদে মধ্যে কি এদের এ দরিদ্রদের প্রতিই আল্লাহ হেদায়েত করত অনুগ্রহ করলেন? অর্থাৎ এরা যে পথ গ্রহণ করেছে তা যদি হেদায়েত এবং সৎপথ হতো তবে কখনও এরা আমাদের অগ্রে তা গ্রহণ করতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ কি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন? নিশ্চয় তিনি অবহিত। তাই তাদেরকে তিনি হেদায়েত করেন।

٥٤. وَاِذَا جَاۤءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ لَهُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ قَضٰى رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ اَيِ الشَّاْنُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْفَتْحِ بَدَلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْۤءًا بِجَهَالَةٍ مِنْهُ حَيْثُ اِرْتَكَبَهٗ ثُمَّ تَابَ رَجَعَ مِنْ بَعْدِهٖ بَعْدَ عَمَلِهٖ عَنْهُ وَاَصْلَحَ عَمَلَهٗ فَاَنَّهٗ اَيِ اللّٰهُ غَفُوْرٌ لَهٗ رَحِيْمٌ بِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْفَتْحِ اَىْ فَالْمَغْفِرَةُ لَهٗ .

৫৪. যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে বল ‘তোমাদের প্রতি সালাম’ তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা নিজের কর্তব্য বলে স্থির করেছেন। ফয়সালা করে নিয়েছেন। اَنَّهٗ-এর ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনাম ـهٗ-টি شَاْن বাচক। অপর এক কিরাতে এটা اَلرَّحْمَةَ -এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ হিসেবে হামযাটি ফাতাহসহ اَنَّهٗ রূপে পঠিত রয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অর্থাৎ তাতে জড়িত হয়ে পড়ে অতঃপর তওবা করে অর্থাৎ তাতে লিপ্ত হওয়ার পর তা হতে ফিরে যায় এবং স্বীয় আমল সংশোধন করে তবে তো তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল, তার বিষয়ে পরম দয়ালু। অর্থাৎ তবে তার জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মাগফিরাত। فَاَنَّهٗ-অপর এক কেরাতে এর হামযা অক্ষরটি ফাতাহ সহকারে পঠিত রয়েছে।

٥٥. وَكَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ الْقُرْاٰنَ لِيَظْهَرَ الْحَقُّ فَيُعْمَلَ بِهٖ وَلِتَسْتَبِيْنَ تَظْهَرَ سَبِيْلُ طَرِيْقُ الْمُجْرِمِيْنَ فَتُجْتَنَبَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِىْ اُخْرٰى بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَنَصْبِ سَبِيْلَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ .

৫৫. এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন বর্ণনা করে দিয়েছি সেভাবে কুরআনের আয়াতসমূহ সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই, বিবৃত করে দেই যাতে মানুষ আমল করতে পারে এবং যাতে অপরাধীদের পথ, তাদের পন্থা প্রকাশিত হয়, সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে, তা হতে মানুষ দূরে সরে থাকতে পারে। لِتَسْتَبِيْنَ অপর এক কেরাতে تَحْتَانِيَّه [ى] অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে এবং অন্য এক কেরাতে فَوْقَانِيَّة [ت] দ্বিতীয় পুরুষরূপে ও سَبِيْل শব্দটি مَنْصُوْب [ফাতাহসহ]-রূপে পঠিত রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় এখানে রাসূল ﷺ -এর প্রতি সম্বোধন হচ্ছে বলে বিবেচ্য হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَتَنَّا : এখানে এর অর্থ আমরা পরীক্ষা করি।

قَوْلُهٗ وَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُحْشَرُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جُمْلَه مَنْفِيَّة [না-বাচক বাক্যটি] اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ -এর সিফত নয়। কেননা, اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ হলো مَعْرِفَه এবং جُمْلَه হলো نَكِرَه আর نَكِرَه শব্দ -এর مَعْرِفَه

সিফত হতে পারে না। এমনিভাবে يَحْشُرُوْا-এর যমীর থেকেও সিফত হতে পারে না। কেননা, প্রসিদ্ধ কায়দা হলো اَلضَّمِيْرُ لَا يُوْصَفُ وَلَا يُوْصَفُ بِهِ বরং يَحْشُرُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হতে পারে।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَحَلُّ الْخَوْفِ : এ ইবারতটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُؤَال مُقَدَّرٌ-এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. হাশর সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনের কী উদ্দেশ্য? হাশর তো অবশ্যম্ভাবী হবে। সে সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। ভয় প্রদর্শন দ্বারা কোনো উপকার হবে না।

উত্তর : مَحَلُّ اِنْذَارٌ তথা مُخَوَّفٌ بِهِ এমন অবস্থায় হাশর যে, তার কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। আর اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ দ্বারা গুনাহগার মু'মিন উদ্দেশ্য। কেননা, যে ব্যক্তি হাশরের বিশ্বাস রাখে না তাকে ভয় দেখানো অনর্থক কাজ। আর যে পূর্ব থেকেই মুত্তাকী তাকে ভয় দেখানো تَحْصِيْلُ حَاصِلٌ লাজেম আসে। সুতরাং এটা নির্ধারিত হলো যে, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে তারা গুনাহগার মু'মিন।

قَوْلُهُ جَوَابُ النَّفْيِ : অর্থাৎ فَتَطْرُدُهُمْ বাক্যটি مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ-এর জবাব। এটি تَطْرُدَ ফে'লের নসব হওয়ার কারণ বর্ণনা।

قَوْلُهُ اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَتَكُوْنَ شَرْط مَحْذُوْف-এর جَزَاء مُقَدَّمٌ সুতরাং جَوَاب نَفِيْ তাকরার হওয়ার সংশয় দূর হয়ে গেল।

قَوْلُهُ بِالسَّبْقِ : اَىْ بِسَبَبِ السَّبْقِ

قَوْلُهُ لِيَقُوْلُوْا : এখানে لَامٌ-টি عَاقِبَتْ-এর জন্য। সুতরাং এ আপত্তি খতম হয়ে গেল যে, اِبْتِلَاء-এর ইল্লত পূর্বোক্ত উক্তিকে সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْفَتْحِ : ফাতহার সুরতে رَحْمَةٌ থেকে বদল হবে। আর কাসরার সুরতে جُمْلَه مُسْتَانِفَه হবে, যা سُؤَال مُقَدَّرٌ-এর জবাব হবে। অর্থাৎ রহমতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে مَا هِىَ- আর مَنْ عَمِلَ الخ থেকে পূর্ণ জুমলা সে سُؤَال مُقَدَّرٌ -এর জবাব।

قَوْلُهُ فَالْمَغْفِرَةُ لَهُ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنَّهُ-এর মাঝে اَنَّ তার ইসমসহ মুবতাদা। আর لَهُ তার খবর।

قَوْلُهُ لِيَظْهَرَ الْحَقُّ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِتَسْتَبِيْنَ-এর আতফ হলো عِلَّتْ مُقَدَّرَه -এর সাথে। সুতরাং পূর্বের সাথে عَطْف হওয়া অশুদ্ধ হওয়ার সংশয় শেষ হয়ে গেল। আর আয়াতে مُضَارِعٌ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে اِسْتِمْرَارٌ বুঝানোর জন্য। সুতরাং تَخْصِيْصُ بِالْمُسْتَقْبِلِ -এর আপত্তিও শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ : অর্থাৎ একটি কেরাতে لِيَسْتَبِيْنَ শব্দটি يَاء-সহ পঠিত হয়েছে এবং اَلسَّبِيْلُ তার ফায়েল। আর سَبِيْلٌ যেহেতু مُذَكَّرٌ এবং مُؤَنَّثٌ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয় তাই عَدَم مُطَابَقَتْ-এর আপত্তিও করা যাবে না। আর اَلسَّبِيْلَ নসব হওয়ার সুরতে تَسْتَبِيْنَ-এর মাফউল হবে। حَاضِرٌ -এর সীগার সুরতে সম্বোধন রাসূল ﷺ -কে করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا جَاۤءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ الخ : এ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরবিদদের উক্তি দ্বিবিধ। অধিকাংশের মতে এ আয়াতগুলোও পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সমর্থনে তাঁরা এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ সর্দাররা আবূ তালিবের মাধ্যমে দাবি জানাল যে, আপনার মজলিসে দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোক থাকে। তাদের কাতারে বসে আপনার কথাবার্তা শুনতে পারি না। আমাদের আগমনের সময় যদি তাদের মজলিস থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, তবে আমরা আপনার কথাবার্তা শুনব ও চিন্তাভাবনা করব।

এতে হযরত ফারূকে আযম (রা.) পরামর্শ দিলেন যে, এ দাবি মেনে নিতে অসুবিধা কি? মুসলমানরা তো অকৃত্রিম বন্ধু আছেই। তাদেরকে কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকতে বলে দেওয়া হবে। সম্ভবত এভাবে কুরাইশ সর্দাররা আল্লাহর কালাম শুনবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে।

কিন্তু পূর্ববর্তী আয়াতে এ পরামর্শের বিপক্ষে নির্দেশ আসে যে, কখনও এমনটি করা যাবে না। এমন করা অন্যায় ও অবিচার। এ নির্দেশ অবতীর্ণ হলে ফারূকে আযম (রা.) নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েন যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়ে হয়তো তিনি মহা অন্যায় করে ফেলেছেন। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতের সারমর্ম এই যে, আপনাকে অতীত ভুলের জন্য পাকড়াও করা হবে না বলে তাদেরকে শান্ত করে দিন। শুধু তাই নয়, পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য নিয়ামতের ওয়াদাও শুনিয়ে দিন। তাঁর দরবারের এ আইন সম্পর্কেও বলে দিন যে, যখন কোনো মুসলমান অজ্ঞতাবশত কোনো মন্দ কাজ করে বসে, অতঃপর ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে নেয় এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার অতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং ভবিষ্যতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামত থেকেও তাকে বঞ্চিত করবেন না।

এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতগুলো পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত বিশেষ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরবিদ এসব আয়াতের বিষয়বস্তুকে একটি স্বতন্ত্র নির্দেশনামা হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ বিষয়বস্তু তাদের সম্পর্কে, যারা অজ্ঞতাবশত কোনো গুনাহ করে ফেলে এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত উভয়বিধ উক্তিতে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। কেননা, সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন মাজীদের কোনো নির্দেশ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও যদি তার ভাষা ও বিষয়বস্তু ব্যাপক হয়, তবে সে নির্দেশটি শুধু সে বিশেষ ঘটনার সাথেই সম্পৃক্ত থাকে না, বরং এটি ব্যাপক নির্দেশের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে তবুও এ নির্দেশ একটি ব্যাপক বিধির মর্যাদা রাখে, যা প্রত্যেক গুনাহগারের বেলায় প্রযোজ্য, যে গুনাহ করার পর স্বীয় ভুল বুঝতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্ম সংশোধন করে নেয়।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ৩/৩১৩-১৪]

٥٦. قُلْ إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قُلْ لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ فِيْ عِبَادَتِهَا قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا إِنِ اتَّبَعْتُهَا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

٥٧. قُلْ إِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ قَدْ كَذَّبْتُمْ بِهِ ط بِرَبِّيْ حَيْثُ أَشْرَكْتُمْ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ ط مِنَ الْعَذَابِ إِنِ مَا الْحُكْمُ فِيْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهِ إِلَّا لِلّٰهِ ط وَحْدَهُ يَقْضِ الْقَضَاءَ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ الْحَاكِمِيْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَقُصُّ أَيْ يَقُوْلُ.

٥٨. قُلْ لَّهُمْ لَّوْ أَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ط بِأَنْ أُعَجِّلَهُ لَكُمْ وَأَسْتَرِيْحَ وَلٰكِنَّهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ مَتٰى يُعَاقِبُهُمْ.

٥٩. وَعِنْدَهُ تَعَالٰى مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَزَائِنُهُ أَوِ الطُّرُقُ الْمُوْصِلَةُ إِلٰى عِلْمِهِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ وَهِيَ الْخَمْسَةُ الَّتِيْ فِيْ قَوْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَيَعْلَمُ مَا يَحْدُثُ فِي الْبَرِّ الْقِفَارِ وَالْبَحْرِ ط الْقُرَى الَّتِيْ عَلَى الْأَنْهَارِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ زَائِدَةٌ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ عَطْفٌ عَلٰى وَرَقَةٍ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ وَالْإِسْتِثْنَاءُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ قَبْلَهُ.

অনুবাদ :

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর অর্থাৎ যাদের উপাসনা কর তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বল, তাদের উপাসনা করে আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না। যদি এর অনুসরণ করি তবে আমি বিপথগামী হবো এবং সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

৫৭. বল, আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণের উপর, দ্ব্যর্থহীন বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ তোমরা তাকে অর্থাৎ আমার প্রভুকে তাঁর সাথে শিরক করত অস্বীকার করেছ। وَكَذَّبْتُمْ বাক্যটি حَالٌ এ কথা বুঝানোর জন্য তাফসীরে وَاوْ-এর পর قَدْ উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরা যা অর্থাৎ যে শাস্তি সত্বর চাইছ তা আমার নিকট নেই। এ বিষয়েই হোক বা অন্য কোনো বিষয়ে সকল কর্তৃত্ব এক আল্লাহরই। তিনি সত্য ফয়সালা দেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে বিচারকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। يَقْضِيْ অপর এক কেরাতে এর স্থলে يَقُصُّ পঠিত রয়েছে। অর্থ হলো, বিবৃত করেন।

৫৮. বল, তোমরা যা সত্বর চাইছ তা যদি আমার নিকট থাকত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হয়ে যেত। অতি শীঘ্র তা তোমাদের উপর চাপিয়ে তোমাদের হতে নিশ্চিন্ত হতাম। কিন্তু তা মূলত আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে অর্থাৎ কবে তাদেরকে তিনি শাস্তি প্রদান করবেন এতদসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

৫৯. অদৃশ্যের কুঞ্জি অর্থাৎ তার ভাণ্ডার বা তার ইলমে পৌঁছানোর পন্থাসমূহ তাঁর নিকটই, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, এটা হলো, إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [৩১ : ৩৪] এ আয়াতটিতে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়। বারর অর্থাৎ মাঠে, বনজঙ্গলে এবং বাহরে অর্থাৎ নদীর তীরবর্তী জনপদসমূহে যা কিছু আছে এবং ঘটে তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না; مِنْ وَّرَقَةٍ-এর مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা কাঁচা ও শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফূজে নেই। وَلَا حَبَّةٍ পূর্বোল্লিখিত وَرَقَةٍ-এর সাথে عَطْف হয়েছে। إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ পূর্বোল্লিখিত اِسْتِثْنَاء অর্থাৎ ব্যত্যয়ী বাক্য إِلَّا يَعْلَمُهَا-এর بَدَل اِشْتِمَال অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট স্থলাভিষিক্ত পদরূপে এ اِسْتِثْنَاء অর্থাৎ ব্যত্যয়ী বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٠. وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ يَقْبِضُ أَرْوَاحَكُمْ عِنْدَ النَّوْمِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ كَسَبْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ أَيِ النَّهَارِ بِرَدِّ أَرْوَاحِكُمْ لِيُقْضٰى أَجَلٌ مُّسَمًّى ج هُوَ أَجَلُ الْحَيٰوةِ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ.

৬০. তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন, নিদ্রাকালে তোমাদের রূহসমূহ নিয়ে যান এবং দিবসে তোমরা যা কর তা তিনি জানেন; অতঃপর এতে অর্থাৎ দিবসে তোমাদের রূহসমূহ ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাতে নির্ধারিত কাল অর্থাৎ জীবনের মেয়াদ পূর্ণ হয়। অতঃপর পুরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنِ الْحُكْمُ : এর إِنْ শব্দটি না-বাচক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই إِنْ -এর পরে مَا শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ الْقَضَاءَ : **اَلْحَقُّ শব্দটি এখানে مَوْصُوْف অর্থাৎ বিশেষ্যতব্য পদ اَلْقَضَاءَ-এর صِفَتْ অর্থাৎ বিশেষণ। একথা বুঝানোর জন্য তাফসীরে এর পূর্বে اَلْقَضَاءَ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।**

قَوْلُهُ مَا جَرَحْتُمْ : অর্থ তোমরা যা অর্জন কর।

قَوْلُهُ قَدْ كَذَّبْتُمْ : প্রশ্ন. এখানে قَدْ শব্দটি মাহযূফ ধরার কী প্রয়োজন হলো? উত্তর : فِعْل مَاضِىْ যেহেতু قَدْ ছাড়া حَالْ হতে পারে না এজন্য এখানে قَدْ উহ্য ধরা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْقَضَاءَ الْحَقَّ : প্রশ্ন. এখানে اَلْقَضَاءَ মাহযূফ ধরার কী প্রয়োজন দেখা দিল? উত্তর. এটা মাহযূফ ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, الحق মাহযূফ মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। সুতরাং এখন এ সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল যে, اَلْحَقِّ শব্দের সিফত হওয়ার কারণে মাজরূর হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَقُصُّ : اَىْ يَقُصُّ الْحَقَّ অর্থাৎ يَقُوْلُ الْحَقَّ

قَوْلُهُ الْمَفَاتِحُ : **এটি مِفْتَحٌ [بِكَسْرِ الْمِيْمِ]-এর বহুবচন।** অর্থ– চাবি। কেউ কেউ বলেন, مَفْتَحٌ [بِفَتْحِ الْمِيْمِ] -এর বহুবচন। অর্থ– **খাজানা, ভাণ্ডার।**

قَوْلُهُ الْقَفْرُ : খালি ভূমি।

قَوْلُهُ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ مِنَ الْاِسْتِثْنَاءِ : **অর্থাৎ** إِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ হলো প্রথম اِسْتِثْنَاء তথা إِلَّا يَعْلَمُهَا থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। মূলত এটি তাফসীরে **কাশশাফ রচয়িতার প্রতি খণ্ডন।** কেননা তিনি দ্বিতীয় اِسْتِثْنَاء টিকে প্রথমটির تَاكِيْد আখ্যা দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে– وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ - مفاتح শব্দটি বহুবচন। এর একবচন مِفْتَحٌ ও مَفْتَحٌ উভয়টিই হতে পারে। مَفْتَحٌ -এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مِفْتَحٌ-এর অর্থ চাবি; আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ ও অনুবাদক مِفْتَحٌ -এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা 'চাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বুঝানো যায়।

কুরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর : غَيْب শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি। -[মাযহারী]

প্রথম প্রকার দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কিয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণত কে কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিজিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন কোথায় কি পরিমাণ হবে। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করা সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ : এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা, অর্থাৎ কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে, তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নজিরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবি ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عِنْدَهٗ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য বলা হয়েছে- لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবহিত নয়। তাই এ বাক্য দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে- ১. আল্লাহ তা'আলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া; এবং ২. তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কুরআনের পরিভাষায় غَيْب শব্দের অর্থ পূর্বে তাফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব প্রাপ্ত করলেও কোনো সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্য দৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু غَيْب শব্দটি মানুষ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غَيْب বলে অভিহিত করে, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিদ প্রশ্ন মাথ-চাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণত জ্যোতির্বিদ্যা, ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, গণনা বিদ্যা কিংবা হস্তরেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ ও ইলহাম' [সত্য স্বর্গীয় প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞান] দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি জেনে ফেলে অথবা মৌসুমি বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয় এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন পাক 'ইলমে গায়েব'কে আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা 'কাশ্‌ফ ও ইলহামে'র মাধ্যমে যদি কোনো বান্দাকে কোনো ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'ইলমে গায়েব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান-অর্জন করা হয়, তাও কুরআনি পরিভাষা অনুযায়ী 'ইলমে গায়েব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে

দেওয়া। কারণ আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোনো হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেওয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়; কিন্তু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের নিকট সেগুলো অজানা থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ একমাস, দু-মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা এখন পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোনো হাকীম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বছর দু-বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ঔষধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ স্বভাবত এর কোনো ক্রিয়া নাড়িতে থাকে না।

মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেওয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই সবার চোখে ফুটে উঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরিউক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। ইলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনোটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা ইলম বটে, কিন্তু 'গায়েব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একত্রিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলা বাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই, যেমন আমরা কোনো রেল গাড়ির কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবি করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয় এবং একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়। গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চারটি ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এক্স-রে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্স-রে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা, কুরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়েব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবত যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃতপক্ষে 'গায়েব' নয়, যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না হওয়ার দরুন তাকে 'গায়েব' বলেই অভিহিত করা হয়।

এমনিভাবে কোনো রাসূল ও নবীকে ওহীর মাধ্যমে এবং ওলীকে কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে যে কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয়ের ইলম দেওয়া হয়, দেওয়ার পর তা আর গায়েব থাকে না। কুরআনে একে গায়েব না বলে أَنْبَاءُ الْغَيْبِ [গায়েবের খবর] বলা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত রয়েছে- تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ তাই আলোচ্য আয়াত لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ অর্থাৎ অদৃশ্যের ভাণ্ডার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এতে কোনোরূপ প্রশ্ন ও ব্যতিক্রমের অবকাশ নেই।

এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলার 'আলিমুল গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ গুণটি বিধৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যসমূহে এর বিপরীত দৃশ্য অর্থাৎ উপস্থিত ও বিদ্যমান বিষয়সমূহ জ্ঞাত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী; কোনো অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের বাইরে নয়। আয়াতে বলা হয়েছে- স্থলে ও জলে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। কোন বৃক্ষের কোন পাতা ঝরে না, সেটা তিনিই জানেন। এমনিভাবে যে শস্যকণা মাটির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকে, তাও তিনি জানেন এবং সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকটি আর্দ্র ও শুষ্ক কণা তাঁর জ্ঞানে ও লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মোটকথা, জ্ঞান সম্পর্কিত দুটি বিষয় একান্তই আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। কোনো ফেরেশতা, কোনো রাসূল কিংবা কোনো সৃষ্ট জীব এতে তাঁর অংশীদার নয়। একটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান ও অপরটি সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান। কোনো অণু-পরমাণুও এ জ্ঞানের অগোচরে নয়। প্রথম আয়াতে এ দুটি বিশেষ গুণই বর্ণিত হয়েছে।

এর প্রথম বাক্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহে সমগ্র দৃশ্য জগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান বর্ণনা করে প্রথমে বলা হয়েছে- وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ স্থলে ও জলে যা রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। 'স্থলে ও জলে' বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও দৃশ্যজগৎ বোঝানো হয়েছে। যেমন সকাল ও বিকাল বলে সম্পূর্ণ সময় এবং পূর্ব ও পশ্চিম বলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ বোঝানো হয়। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত।

অতঃপর বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানগতভাবে সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিবেষ্টন করা শুধু এই নয় যে, বড় বড় বস্তুগুলোর খবরই তিনি জানেন; বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম এবং গোপন থেকে গোপনতম বস্তুও তাঁর জ্ঞানের পরিধির মধ্যে রয়েছে। বলা হয়েছে- وَمَا تَسْقُطُ مِن وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا অর্থাৎ সারা জাহানে কোনো বৃক্ষের এমন কোনো পাতা ঝরে না, যা তাঁর জানা নেই। উদ্দেশ্যে এই যে, প্রত্যেক বৃক্ষের প্রত্যেক পাতা ঝরার পূর্বে ঝরার সময় এবং ঝরার পর তিনি জানেন। তাঁর জানা আছে যে, বৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতা কতবার নড়াচড়া করবে, কখন এবং কোথায় ঝরবে। অতঃপর কোন কোন অবস্থা অতিক্রম করবে। ঝরার কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তার আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা, বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়া হচ্ছে পাতার ক্রমবিকাশ ও বনজ জীবনের সর্বশেষ স্তর। তাই শেষ অবস্থা উল্লেখ করে আগাগোড়া অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ : অর্থাৎ ভূপ্রষ্ঠের গভীরতায় ও অন্ধকারে যে শষ্যকণা পড়ে রয়েছে, তাও তাঁর জানা আছে। প্রথমে বৃক্ষপত্র উল্লেখ করা হয়েছে, যা সাধারণ দৃষ্টির সামনে ঝরে, এরপর শস্যকণা উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষক ক্ষেত্রে বপন করে কিংবা আপনা-আপনি মাটির গভীরতায় ও অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে, অতঃপর আল্লাহর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিব্যাপ্ত হওয়া আর্দ্র ও শুষ্কা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এসব বিষয় আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য গ্রন্থে লিখিত আছে। কারও কারও মতে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলে 'লওহে মাহফূজ' বুঝানো হয়েছে এবং কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ আল্লাহর জ্ঞান। একে 'প্রকাশ্য গ্রন্থ' বলার কারণ এই যে, লিখিত বিষয়বস্তু যেমন ভুলভ্রান্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানও সমগ্র সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে শুধু আনুমানিক নয় সুনিশ্চিত।

সৃষ্টজগতের কোনো কণাও তাঁর অবগতির বাইরে নয়- এ ধরনের সর্বব্যাপী জ্ঞান যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য কুরআন পাকের অনেক আয়াত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। সূরা লোকমানে বলা হয়েছে-

إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى السَّمَاوَاتِ أَوْ فِى الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ অর্থাৎ সরিষা পরিমাণ কোনো শষ্যকণা যদি পাথরের বুকে বিজড়িত থাকে অথবা আকাশে কিংবা ভূপৃষ্ঠে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকেও একত্র করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। আয়াতুল কুরসীতে আছে-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সব মানুষের সামনের ও পশ্চাতের সব অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। সব মানুষ একত্র হয়ে তাঁর জ্ঞানের মধ্য থেকে একটি বিষয়কেও বেষ্টন করতে পারে না। তবে যতটুকু জ্ঞান আল্লাহ কাউকে দিতে চান।' সূরা ইউনুসে আছে- لَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ আসমান ও জমিনে এক কণা পরিমাণ বস্তুও আপনার পালনকর্তার জ্ঞান থেকে পৃথক নয়। সূরা তালাকে আছে- وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্ববিষয়কে বেষ্টন করে রয়েছে। এমনিভাবে অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান [যাকে কুরআনের অদৃশ্য বিষয় বলা হয়েছে এবং যার ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে] কিংবা সমগ্র সৃষ্টজগতের সর্বব্যাপী জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। কোনো ফেরেশতা কিংবা রাসূলের জ্ঞানকে এরূপ সর্বব্যাপী মনে করা খ্রিস্টানদের মতো রাসূলকে আল্লাহর স্তরে উন্নীত করা ও আল্লাহর সমতুল্য মনে করার শামিল, যা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শিরক। সূরা শু'আরায় শিরকের স্বরূপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে- تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ - إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা বলবে, আল্লাহর কসম আমরা ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম, যখন তোমাদেরকে [অর্থাৎ **মূর্তিদেরকে**] বিশ্বপালকর্তার সমতুল্য করে নিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের এবং বিশেষভাবে শেষ নবী ﷺ-কে হাজারো লাখো অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং সব ফেরেশতা ও পয়গাম্বরের চাইতে বেশি দান করেছিলেন। **কিন্তু** এটা জানা যে, আল্লাহ তা'আলার সমান কারও জ্ঞান নয় এবং হতেও পারে না। নতুবা খ্রিস্টানদের মতো রাসূলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি হবে। তারা রাসূলকে আল্লাহর সমতুল্য করে দিয়েছে, যার নাম শিরক [নাঊযুবিল্লাহ]।

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত বর্ণিত হলো। এতে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সম্পর্কিত গুণের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা প্রত্যেক অদৃশ্য, দৃশ্য ও প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনভিাবে আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কিত গুণ ও তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এগুণটিও তাঁর সত্তার বৈশিষ্ট্য। বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে তোমাদের আত্মা একপ্রকার করায়ত্ত করে নেন এবং পুনরায় প্রত্যুষে জাগ্রত করে দেন, যাতে তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ করে দেওয়া হয়। সারাদিন তোমরা যা কিছু কর, তা সবই তিনি জানেন। আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের ফলেই মানুষের জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুরুত্থানের একটা নমুনা প্রত্যহ সামনে আসতে থাকে। হাদীসে নিদ্রাকে 'মৃত্যুর ভাই' বলা হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, নিদ্রা মানুষের সব শক্তিকে মৃত্যুর মতোই নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা, অতঃপর জাগরণের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে মানুষকে হুঁশিয়ার করেছেন যে, যেভাবে প্রতি রাতে ও প্রতি সকালে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত মৃত্যুবরণ করে জীবিত হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত অবলোকন করে, এমনিভাবে ঘটবে সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যু। অতঃপর সামগ্রিক জীবন লাভকেও বুঝে নাও, যাকে হাশর বলা হবে। যে সত্তা প্রথমোক্তটি করতে পারেন, শেষোক্তটি করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভবন নয়। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ **অর্থাৎ অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে** কতৃকর্ম বলে দেবেন **অর্থাৎ কৃতকর্মের হিসাব হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি প্রদান করা হবে।** -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩২১-২৭]

অনুবাদ :

٦١. وَهُوَ الْقَاهِرُ مُسْتَعْلِيًا فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ط مَلٰئِكَةً تُحْصِيْ اَعْمَالَكُمْ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُوَكَّلُوْنَ بِقَبْضِ الْاَرْوَاحِ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ يُقَصِّرُوْنَ فِيْمَا يُؤْمَرُوْنَ .

৬১. তিনি স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী কর্তৃত্বশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক অর্থাৎ আমলের হিসেবে রক্ষাকারী ফেরেশতা প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যুকাল ঘনিয়ে আসে তখন আমার প্রেরিতরা অর্থাৎ প্রাণ সংহারের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাগণ তার মৃত্যু ঘটায়। تَوَفَّتْهُ এটা অপর এক কেরাতে تَوَفَّاهُ রূপে পঠিত রয়েছে। আর তারা কোনো ত্রুটি করে না। অর্থাৎ তাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় তাতে তারা কোনোরূপ ত্রুটি করে না।

٦٢. ثُمَّ رُدُّوْا اَيِ الْخَلْقُ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ مَالِكُهُمُ الْحَقِّ ط الثَّابِتُ الْعَادِلُ لِيُجَازِيَهُمْ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِيْهِمْ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ يُحَاسِبُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فِيْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ .

৬২. অতঃপর তাদের প্রকৃত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রতিপালকের নিকট মালিকের নিকট প্রতিদান প্রদানের উদ্দেশ্যে তারা অর্থাৎ সকল সৃষ্টি প্রত্যানীত হবে। দেখ, তাঁরই সকল বিধান। অর্থাৎ এদের উপর কার্যকারী ফয়সালা কেবল তাঁরই। হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। হাদীসে আছে যে, দুনিয়ার দিন হিসেবে অর্ধ দিনের ভিতর তিনি সকল সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ করে ফেলবেন।

٦٣. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِاَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اَهْوَالِهِمَا فِيْ اَسْفَارِكُمْ حِيْنَ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا عَلَانِيَةً وَّخُفْيَةً ج سِرًّا تَقُوْلُوْنَ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَنْجَيْتَنَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ اَنْجٰنَا اَيِ اللّٰهُ مِنْ هٰذِهِ الظُّلُمٰتِ وَالشَّدَائِدِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৬৩. হে মুহাম্মদ! মক্কাবাসীদেরকে বল, কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে যখন তোমরা স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে অর্থাৎ তোমাদের পরিভ্রমণকালে এতদুভয়ের বিভীষিকাময় বিপদে কাতরভাবে প্রকাশ্যে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় কর। বল, আমাদেরকে এটা হতে অর্থাৎ এ অন্ধকার ও বিপদ হতে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অর্থাৎ মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হব। لَئِنْ-এর لَامْ টি قَسَمِيَّةٌ অর্থাৎ শপথবাচক। اَنْجَيْتَنَا এটা অপর এক কেরাতে اَنْجَانَا [নামপুরুষ, বহুবচন] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর কর্তা হবেন আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তি দেন।

٦٤. قُلِ لَهُمُ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ غَمٍّ سِوَاهَا ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ بِهِ .

৬৪. তাদেরকে বল, আল্লাহই তোমাদেরকে তা হতে এবং এ ছাড়াও সমস্ত দুঃখকষ্ট হতে চিন্তাভাবনা হতে ত্রাণ করেন। يُنَجِّيْكُمْ এটা তাশদীদসহ [بَابِ تَفْعِيْل] এবং তাশদীদ ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে। এরপরও তোমরা তাঁর সাথে শরিক কর।

٦٥. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ كَالْحِجَارَةِ وَالصَّيْحَةِ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ كَالْخَسْفِ اَوْ يَلْبِسَكُمْ يَخْلُطَكُمْ شِيَعًا فِرَقًا مُخْتَلِفَةَ الْاَهْوَاءِ وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ط بِالْقِتَالِ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذَا اَهْوَنُ وَاَيْسَرُ وَلَمَّا نَزَلَ مَا قَبْلَهٗ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوٰى مُسْلِمٌ حَدِيْثَ سَاَلْتُ رَبِّيْٓ اَنْ لَّا يَجْعَلَ بَاْسَ اُمَّتِيْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا وَفِيْ حَدِيْثٍ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ اَمَا اَنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَاْتِ تَاْوِيْلُهَا بَعْدُ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ الدَّالَّاتِ عَلٰى قُدْرَتِنَا لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ.

৬৫. বল, তোমাদের **ঊর্ধ্বদেশ অর্থাৎ** আকাশ হতে যেমন পাথর বা প্রচণ্ড গর্জনের **মাধ্যমে** অথবা তলদেশ হতে যেমন ভূগর্ভে প্রোথিত **করত** শাস্তি প্রেরণ করতে বা তোমাদেরকে দলে দলে **অর্থাৎ বিভিন্ন মতাবলম্বী দলে** বিভক্ত করে দিতে এলোমেলো **করে দিতে** এবং এক দলকে অপর দলের সাথে **যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে** নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে নিশ্চয় **তিনি সক্ষম।** এ আয়াত নাজিল হলে রাসূল ﷺ **ইরশাদ** করেছিলেন, এটিই তুলনামূলকভাবে **সহজ। আর** পূর্ববর্ণিত আজাবসমূহ সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন, **হে** আল্লাহ! তোমার অসিলায় আমরা ঐগুলো হতে পানাহ চাই। [বুখারী] মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে পরস্পর যেন বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি না হয় এ মর্মে আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো; এ দোয়া কবুল করা হলো না। অন্য একটি হাদীসে আছে, এ আয়াতটি নাজিল হলে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে তবে এখনও তা বাস্তবে ঘটেনি। দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ অর্থাৎ আমার কুদরতের প্রমাণবহ নিদর্শনসমূহ এদের জন্য বিবৃত করি, বর্ণনা করি যাতে তারা অনুধাবন করে। অর্থাৎ জানতে পারে যে, তারা যে পথে বিদ্যমান তা বাতিল ও ভ্রান্ত।

٦٦. وَكَذَّبَ بِهٖ بِالْقُرْاٰنِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ط الصِّدْقُ قُلْ لَّهُمْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ فَاُجَازِيْكُمْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَاَمْرُكُمْ اِلَى اللّٰهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ.

৬৬. তোমার কওম তো তাকে অর্থাৎ আল কুরআনকে অস্বীকার করেছে অথচ তা সঠিক সত্য। তাদেরকে বল, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই **যে,** তোমাদেরকে আমি প্রতিদান দেব। আমি তো **একজন** সতর্ককারী মাত্র। তোমাদের বিষয় আল্লাহর **উপরই** ন্যস্ত। এ কথা যুদ্ধ সম্পর্কিত আয়াত **নাজিল হওয়ার** পূর্বের ছিল।

٦٧. لِكُلِّ نَبَاٍ خَبَرٍ مُّسْتَقَرٌّ وَقْتٌ يَقَعُ فِيْهِ وَيَسْتَقِرُّ وَمِنْهُ عَذَابُكُمْ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ تَهْدِيْدٌ لَّهُمْ.

৬৭. প্রত্যেক বার্তার জন্য খবরের জন্য **নির্ধারণ রয়েছে।** অর্থাৎ তা সংঘটিত হওয়ার **নির্ধারিত কাল রয়েছে।** তোমাদের শাস্তিও এরই **অন্তর্ভুক্ত এবং শীঘ্রই তোমরা** অবহিত হবে। এ **বাক্যটি এদের প্রতি হুমকিস্বরূপ।**

٦٨. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِالْاِسْتِهْزَاءِ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَلَا تُجَالِسْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط وَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الزَّائِدَةِ يُنْسِيَنَّكَ بِسُكُوْنِ النُّوْنِ وَالتَّخْفِيْفِ وَفَتْحِهَا وَالتَّشْدِيْدِ الشَّيْطٰنُ فَقَعَدْتَ مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى اَىْ تَذْكِرَةٍ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِنْ قُمْنَا كُلَّمَا خَاضُوْا لَمْ نَسْتَطِعْ اَنْ نَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ وَاَنْ نَطُوْفَ ـ

৬৮. তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে অর্থাৎ আল কুরআন সম্বন্ধে কৌতুকে মত্ত, তখন এদের থেকে দূরে সরে যাবে, এদের সাথে বসবে না যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং যদি إِمَّا এতে শর্তবাচক শব্দ إِنْ -এর نُوْن টি অতিরিক্ত مَا -এর مِيْم -এ إِدْغَام অর্থাৎ সন্ধিভূত হয়েছে। তোমাকে ভ্রমে ফেলে يُنْسِيَنَّكَ -এর نُوْن -এ সাকিন এবং তাশদীদহীনভাবে অথবা نُوْن -এ ফাতাহ ও তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। শয়তান আর তাদের সাথে বসে পড়ে তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এখানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনাম [هُمْ] -এর স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্য [اَلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ]-এর ব্যবহার হয়েছে। উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাহাবীগণ বললেন, যতবার তারা এ ধরনের আলোচনায় লিপ্ত হয় ততবারই যদি আমাদেরকে উঠে যেতে হয় তবে তো আর আমাদের পক্ষে বায়তুল্লাহ কা'বা মসজিদে বসা বা তার তাওয়াফ করা সম্ভবপর হবে না।

٦٩. فَنَزَلَ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ مِنْ حِسَابِهِمْ اَيِ الْخَائِضِيْنَ مِّنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ اِذَا جَالَسُوْهُمْ وَّلٰكِنْ عَلَيْهِمْ ذِكْرٰى تَذْكِرَةٌ لَهُمْ وَمَوْعِظَةٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الْخَوْضَ ـ

৬৯. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তাদের অর্থাৎ কৌতুকে লিপ্ত মুশরিকদের কর্মের দায়িত্ব তাদের নয় যারা আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহর ভয়সহ যদি তারা বসে তবে তাদেরকে তাদের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে না। তবে উপদেশ দেওয়া তাদেরকে শিক্ষাদান ও নসিহত করা তাদের কর্তব্য। যাতে তারা তাতে লিপ্ত হতে ভয় করে। مِنْ شَيْءٍ -এর مِنْ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত।

٧٠. وَذَرِ اُتْرُكِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمُ الَّذِيْ كُلِّفُوْهُ لَعِبًا وَّلَهْوًا بِاسْتِهْزَائِهِمْ بِهٖ وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَلَا تَتَعَرَّضْ لَهُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ وَذَكِّرْ عِظْ بِهٖ بِالْقُرْاٰنِ النَّاسَ اَنْ لَا تُبْسَلَ نَفْسٌ تُسْلَمَ اِلَى الْهَلَاكِ بِمَا كَسَبَتْ عَمِلَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ وَلِيٌّ نَاصِرٌ وَّلَا شَفِيْعٌ ج يَمْنَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ ـ

৭০. যারা তাদের উপর বর্ণিত [দীনকে] হাসিঠাট্টা করত ক্রীড়া-কৌতুকরূপে বানিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের পরিত্যাগ কর, বর্জন কর। আর তাদের পিছনে পড়ো না। এ বিধান ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিল হওয়ার পূর্বের। এর অর্থাৎ আল কুরআনের মাধ্যমে লোকদেরকে উপদেশ দাও; নসিহত কর যাতে কোনো প্রাণ নিজ উপার্জনের জন্য কৃতকর্মের জন্য লাঞ্ছিত না হয় أَنْ تُبْسَلَ -এর أَنْ টি হেতুবোধক। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে এর পূর্বে ل উল্লেখ করা হয়েছে। تُبْسَلَ -এর পূর্বে না অর্থবোধক শব্দ لَا উহ্য রয়েছে। ধ্বংসের জন্য সমর্পিত না হয় যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী এবং সুপারিশকারী থাকবে না যে তার হতে শাস্তি প্রতিহত করতে পারবে।

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ تَفْدِ كُلَّ فِدَاءٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط مَا تَفْدِي بِهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ مَاءٍ بَالِغٍ نِهَايَةَ الْحَرَارَةِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِكُفْرِهِمْ.

এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও অর্থাৎ সম্পূর্ণ মুক্তিপণ দিলেও যা দেওয়া হবে তা গৃহীত হবে না। এরাই তারা যারা কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে। সত্য প্রত্যাখ্যান হেতু এদের কুফরির কারণে এদের জন্য রয়েছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الذِّكْرٰى : অর্থ تَذَكُّرٍ স্মরণ হওয়া। **قَوْلُهُ حَمِيْمٍ** : অর্থ, চরম পর্যায়ের উষ্ণ পানি।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ : এটি كَلَام مُسْتَانِف স্বীয় মাখলুকের উপর তার ক্ষমতার বিবরণ দিতে গিয়ে আনা হয়েছে। هُوَ মুবতাদা এবং اَلْقَاهِرُ তার খবর। فَوْقَ হলো ظَرْف আর مُسْتَعْلِيًا হলো উহ্য حَالٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ -

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءَ الخ : **এটি আমলসমূহ হেফাজত করার সীমা। অর্থাৎ জীবদ্দশায় মৃত্যু পর্যন্ত। আমলের হেফাজত করা হবে।**

قَوْلُهُ الْمَلَائِكَةُ : **অর্থাৎ মৃত্যুর ফেরেশতা ও তার সহকারিগণ।**

قَوْلُهُ حِيْنَ : এখানে حِيْنَ শব্দটি উল্লেখ করে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, تَدْعُوْنَهٗ হাল হয়েছে يُنَجِّيْكُمْ-এর মাফউলের যমীর থেকে।

قَوْلُهُ الظُّلُمَاتِ وَا لشَّدَائِدِ : এতটুকু ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো هٰذِهٖ ইসমে ইশারার مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ধারণ করা।

قَوْلُهُ هٰذَا : هٰذَا হলো মুবতাদা আর اَهْوَنُ وَاَيْسَرُ তার খবর।

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ ذِكْرٰى : এটি মুবতাদা হওয়ার কারণে মহল হিসেবে মারফূ' হয়েছে। তার খবর মাহযূফ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ : এ আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়বস্তুরই আরও বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সকল বান্দার উপর প্রবল প্রতাপান্বিত। তিনি বান্দাকে যতদিন জীবিত রাখতে চান, ততদিন তার জন্য দেহরক্ষী ফেরেশতা প্রেরণ করেন, ফলে তার ক্ষতি করার সাধ্য কারও থাকে না। অতঃপর যখন জীবনের নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়ে যায়, তখন এ দেহরক্ষী ফেরেশতাদলই তার মৃত্যুর অসিলা হয়ে যায় এবং তার মৃত্যুর উপকরণ সংগ্রহে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না; বরং رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতির সামনে উপস্থিত এবং সারা জীবনের হিসাবের কথা কল্পনা করলে কার সাধ্য আছে যে, সফলকাম হবে এবং শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে– اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতিই শুধু নন, বান্দাদের মাওলা এবং প্রভুও। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে বান্দাকে সাহায্য করবেন । এরপর বলা হয়েছে, নিশ্চয় ফয়সালা এবং নির্দেশ তাঁরই। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, একটিমাত্র সত্তা অগণিত মানুষের হিসাব সমাধা করবেন কিভাবে? তাই অতঃপর বলা হয়েছে– وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ অর্থাৎ নিজের কাজের সাথে তুলনা করে আল্লাহর কাজকে বোঝা মূর্খতা বৈ নয়। তিনি অত্যন্ত দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। –[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩২৭-২৮]

قَوْلُهُ قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আল্লাহর জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্ণিত হচ্ছে–

প্রথম আয়াতে ظُلُمٰتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অন্ধকার। ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে– রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধুলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউয়ের অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্য ظُلُمٰتٌ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য অন্ধকার মানুষের প্রতি একটি নিয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ-বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظُلْمَةٌ শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তাফসীরবিদরা এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্যে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেবদেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহ্বান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতিভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, দেবদেবীরা বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদের বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো দেবদেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন, বরং অন্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনিই উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং দেবদেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে– ১. আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি-সামর্থ্য, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্যবান। ২. সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই করায়ত্ত এবং ৩. একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেবদেবীর পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলকেই আহ্বান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় : মুশরিকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যত বড় অপরাধই হোক কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্য একটি শিক্ষার চাবুকবিশেষ। আমরা মুসলমানরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না, বরং আমাদের সব ধ্যান-ধারণা বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেবদেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না; কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম, উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেবদেবীর চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার : আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ঔষুধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কুরআন পাক বারবার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণত মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্য এক প্রকার রহমত। কারণ বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষদের সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যই কুরআন পাক বলে وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ

আমি তাদের পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন। [সূরা শুরা] এ আয়াতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ- কারও গায়ে কোনো কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা দিলে তা সবই কোনো না কোনো গুনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অনেক গুনাহ ক্ষমাও করে দেন।

আল্লামা কাযী বাইযাভী (র.) বলেন, এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গুনাহগাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গুনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপুমক্তদের রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চ স্তর দান করা হয়ে থাকে।

মোটকথা এই যে, পাপ থেকে মুক্ত নয় এরূপ সাধারণ লোকেরা যে কোনো অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ কষ্ট ও অস্থিরতায় পতিত হয়, তা সবই পাপের ফলশ্রুতি। এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সংকটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছেই দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম, ঔষধপত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলাকৌশল অনর্থক। বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ তা'আলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজসরঞ্জামকেও তাঁরই নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা সব সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নিয়ামত! এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে। অগ্নি, বাতাস, পানি, মৃত্তিকা এবং পৃথিবীর সব শক্তি তাঁর নির্দেশের অনুগামী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অগ্নি দাহন করতে পারে না, পানি নির্বাপণ করতে পারে না, কোনো ঔষধ ক্রিয়া করতে পারে না এবং কোনো পথ্য রোগীর ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জামের পিছনে পড়েছে, তখন সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ঔষধ কিংবা ইঞ্জেকশনের উপকার প্রমাণিত হওয়া কিংবা কোনো বস্তুগত কলাকৌশলের সাফল্য অর্জন করা অমনোযোগিতা ও পাপের সাথেও সম্ভবপর। কিন্তু যখন সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন এসব বস্তু ব্যর্থ দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমান যুগে মানুষকে আরাম দেওয়া ও কষ্ট দূর করার জন্য কত রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম যে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। পঞ্চাশ বছর আগের মানুষ এসব বস্তুর কল্পনাও করতে পারত না। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নতুন নতুন দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধপত্র, নানা রকমের ইঞ্জেকশন এবং বড় বড় সুদক্ষ ডাক্তার ও স্থানে স্থানে হাসপাতালের প্রাচুর্য কার না জানা আছে। পঞ্চাশ-ষাট বছরের আগের মানুষ এগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত মানুষ আজকের মতো এত বেশি রুগ্‌ণ ও দুর্বল ছিল না। এমনিভাবে আজ ব্যাপক সংক্রামক ব্যাধির জন্য নানা রকমের টীকা রয়েছে। দুর্ঘটনার কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিন, বিপদ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক সংবাদ প্রেরণ ও তাৎক্ষণিক সাহায্যের উপায়াদি ও আসবাবপত্রের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু এসব বস্তুগত সাজসরঞ্জাম যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষ দুর্ঘটনা ও বিপদাপদের শিকার পূর্বের তুলনায় বেশি হচ্ছে। এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, বিগত যুগে স্রষ্টার প্রতি অমনোযোগিতা ও প্রকাশ্য অবাধ্যতা এত অধিক ছিল না, যতটুকু বর্তমানকালে রয়েছে। বিগত যুগে আরাম-আয়েশের সাজসরঞ্জামকে আল্লাহ তা'আলার দান মনে করে কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু আজকের মানুষ বিদ্রোহের মানোভাব নিয়ে এগুলো ব্যবহার করতে সচেষ্ট। তাই যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রাচুর্য তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরিকরা আল্লাহকেই স্মরণ করে এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্য বস্তুনিষ্ঠ সাজসরঞ্জাম ও কলাকৌশলের চেয়ে অধিক আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে অর্থাৎ সব কলাকৌশল সামগ্রিক হিসাবে উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বারবার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন পন্দি-ফিকির করা হচ্ছে কিন্তু ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ কারার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যত তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোড়া ছুটেই চলেছে।

চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্য সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যত লাভ-লোকসানের উর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলাকৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এরপর কুরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলাকৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসাবে ব্যবহার করা। এ ছাড়া নিরাপত্তার আর কোনো বিকল্প পথ নেই। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩২৯-৩২]

قَوْلُـهُ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْٓ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ الـخ বাতিলপন্থিদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গুনাহ সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গুনাহ। এ থেকে বেঁচে থাক উচিত। এর বিবরণ এরূপ-

প্রথম আয়াতে يَخُوْضُوْنَ শব্দটি خَوْضٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خَوْض বলা হয়। কুরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণত এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ এবং فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই خَوْضٌ فِى الْاٰيَاتِ -এর অনুবাদ এ স্থলে 'ছিদ্রান্বেষণ' [অর্থাৎ দোষ খোঁজাখুঁজি করা] কিংবা 'কলহ করা' করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলিতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ ও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদের শোনানোর জন্য। নতুবা তিনি এর আগে কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোনো নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর মিথ্যাপন্থিদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে- ১. মজিলস ত্যাগ করা, ২. সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া- তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলার হয়েছে তাতে প্রথম প্রকারই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ মজলিসে বসা যাবে না সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করে দেয় অর্থাৎ ভুলক্রমে তাদের মজিলসে যোগদান করে ফেল, নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ- উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গুনাহ। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে বলেন, এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহের মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জানমাল কিংবা ইজ্জতের আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েজ। উদাহরণত অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয় তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

قَوْلُهُ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ : অর্থাৎ 'যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করে দেয়।' এখানে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোনো আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদোষ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর রাসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর. এই যে, বিশেষ কোনো তাৎপর্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীরাও ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পক্ষে থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেওয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, আয়াতের এ বাক্যে থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোনো ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَمَا اسْتَكْرَهُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গুনাহ এবং যে কাজ অপরে জোর-জবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গুনাহ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাসসাস (রা.) আহকামুল কুরআনে বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল কিংবা শরিয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হ্যাঁ সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোনো দোষ নেই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস (রা.) মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গুনাহ; তারা তখন কোনো অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরি লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালিমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোনো শর্ত আয়াতে নেই। কুরআন পাকের অন্য আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে– وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে তবে আমরা মসজিদে হারামে নামাজ ও তওয়াফ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে [এটি মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা] এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়– وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে হারাম গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোনো দায়দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেওয়া। সম্ভবত দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

قَوْلُهُ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا : এখানে ذَرْ শব্দটি وَذَرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই : আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দুটি অর্থ হতে পারে– ১. তাদের জন্য সত্যধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে, কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ২. তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

قَوْلُهُ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কাণ্ড করত না।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– ১. উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরি।

আয়াতের শেষে আজাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে أَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া। কোনো ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। প্রথমত স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্যে সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য কোনো আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোনো অর্থসম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থসম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ অর্থাৎ 'এরা ঐ লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্য দেওয়া হবে।' অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরো জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্য মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীও পরিণামে তাদের অনুরূপ আজাবে পতিত হবে।

উল্লিখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোনো মানুষের জন্যই বিষতুল্য। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমত বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভালো এবং ভালোকে মন্দ করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি প্রথমবার গুনাহ করে, তখন তার মানসপটে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কালো দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সেও গুনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুনাহ করে চলে এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে না, তখন একের পর এক কালো দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নূরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ফলশ্রুতিতে ভালোমন্দের পার্থক্য থাকে না। কুরআন পাকে رَانَ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

–[তাফসীরে মাআরিফ-৩/৩৪৫-৪৯]

অনুবাদ :

٧١. قُلْ أَنَدْعُوا نَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا بِعِبَادَتِهِ وَلَا يَضُرُّنَا بِتَرْكِهَا وَهُوَ الْأَصْنَامُ وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا نَرْجِعُ مُشْرِكِيْنَ بَعْدَ إِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ إِلَى الْإِسْلَامِ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ أَضَلَّتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ص مُتَحَيِّرًا لَا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَبُ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ لَهُ أَصْحٰبٌ رُفْقَةٌ يَّدْعُوْنَهُ إِلَى الْهُدَى أَيْ لِيَهْدُوْهُ الطَّرِيْقَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ ائْتِنَا ط فَلَا يُجِيْبُهُمْ فَيَهْلِكُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ وَجُمْلَةُ التَّشْبِيْهِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ نُرَدُّ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ الَّذِيْ هُوَ الْإِسْلَامُ هُوَ الْهُدٰى ط وَمَا عَدَاهُ ضَلَالٌ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ أَيْ بِأَنْ نُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৭১. বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব এমন কিছুর অর্থাৎ প্রতিমার উপাসনা করব যার উপাসনা আমাদের কোনো উপকার কিংবা তার বর্জন কোনো অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে অর্থাৎ ইসলামের দিকে পরিচালিত করার পর আমরা কি সে ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান পৃথিবীতে প্ররোচিত করত পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে? পেরেশান করে ফেলেছে। কোথায় যাবে তা সে জানে না। অর্থাৎ আমরা কি মুশরিক হয়ে যাব? حَيْرَانَ এটা اِسْتَهْوَتْهُ -এর সর্বনাম , -এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। তারা সঙ্গীগণ সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহ্বান করে অর্থাৎ পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তারা তাকে আহ্বান করে, বলে আমাদের নিকট এসো কিন্তু সে তা গ্রহণ করে না ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। أَنَدْعُوا এ বাক্যটিতে اِنْكَارٌ অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে এবং كَالَّذِيْ এ উপমাবোধক বাক্যটি نُرَدُّ -এর ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনামের حَالٌ বল, আল্লাহর পথই অর্থাৎ ইসলামের পথই পথ, এটা ব্যতীত আর সকল কিছুই গোমরাহি। আর আমরা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। لِنُسْلِمَ -এর لَامٌ টি أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ারমূল অর্থবোধক أَنْ -এর অর্থে ব্যবহৃত। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে بِأَنْ نُسْلِمَ উল্লেখ করা হয়েছে।

٧٢. وَأَنْ أَيْ بِأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ط تَعَالٰى وَهُوَ الَّذِيْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ تُجْمَعُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِلْحِسَابِ.

৭২. এবং সালাত কায়েম করতে ও তাঁকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতেও আদিষ্ট হয়েছি। এবং তাঁরই নিকট হিসাব-নিকাশের জন্য কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সমবেত করা হবে, একত্র করা হবে। وَأَنْ পূর্বোল্লিখিত لِنُسْلِمَ-এর সাথে عَطْف হয়েছে।

٧٣. وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط أَيْ مُحِقًّا وَ اذْكُرْ يَوْمَ يَقُوْلُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ ط هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَوْمَ يَقُوْلُ لِلْخَلْقِ قُوْمُوْا فَيَقُوْمُوْا قَوْلُهُ الْحَقُّ ط الصِّدْقُ الْوَاقِعُ لَا مُحَالَةَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ط

৭৩. তিনিই সত্যিকারভাবে যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর স্মরণ কর যেদিন তিনি কোনো জিনিসকে বলবেন হও, তখনই তা হয়ে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি সকল সৃষ্টিকে বলবেন দাঁড়াও, অনন্তর সকলেই দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। সঠিক ও নিঃসন্দেহে তা অবশ্যম্ভাবী। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।

الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ اِسْرَافِيْلَ لَا مِلْكَ فِيْهِ لِغَيْرِهِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِىْ خَلْقِهِ الْخَبِيْرُ بِبَاطِنِ الْاَشْيَاءِ كَظَاهِرِهَا ـ

অর্থাৎ যেদিন হযরত ইসরাফীলের তরফ হতে দ্বিতীয় দফা ফুৎকার হবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁরই। এদিন তিনি ব্যতীত আর কারও কোনোরূপ আধিপত্য হবে না। বলা হবে, কর্তৃত্ব আজ কার? তা একমাত্র আল্লাহরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য অর্থাৎ যা দৃশ্যমান নয় ও যা দৃশ্যমান আছে সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় এবং বাহ্যিক অবস্থার মতো প্রতিটি জিনিসির অভ্যন্তর সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ অবহিত।

٧٤. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ هُوَ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ تَارَحُ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ج تَعْبُدُهَا اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ اِنِّىْٓ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ بِاتِّخَاذِهَا فِىْ ضَلٰلٍ عَنِ الْحَقِّ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ ـ

৭৪. আর স্মরণ কর ইবরাহীম তার পিতা আযরকে এটা তার উপাধি। তার প্রকৃত নাম হলো তারাহ। বলেছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করবেন? এর **উপাসনা করবেন? اَتَتَّخِذُ এখানে تَوْبِيْخ বা তিরস্কার অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।** [আমি তো] এটা করায় আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে পরিষ্কার সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

٧٥. وَكَذٰلِكَ كَمَا اَرَيْنَاهُ اِضْلَالَ اَبِيْهِ وَقَوْمِهِ نُرِىْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ مُلْكَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَسْتَدِلَّ بِهٖ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ بِهَا وَجُمْلَةُ وَكَذٰلِكَ وَمَا بَعْدَهَا اِعْتِرَاضٌ وَعَطْفٌ عَلٰى قَالَ ـ

৭৫. এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তাকে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট হওয়া প্রদর্শন করেছি সেভাবে ইবরাহীমকে আমার একত্ব সম্পর্কে যুক্তিদানের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা ও কুদরত দেখাই যাতে সে এতদ্বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। كَذٰلِكَ এটা ও তৎপরবর্তী বাক্য جُمْلَة مُعْتَرِضَة অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বাক্যরূপে বিবেচ্য এবং قَالَ -এর সাথে এর عَطْف হয়েছে।

٧٦. فَلَمَّا جَنَّ اَظْلَمَ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قِيْلَ هُوَ الزُّهَرَةُ قَالَ لِقَوْمِهٖ وَكَانُوْا نَجَّامِيْنَ هٰذَا رَبِّىْ ج فِىْ زَعْمِكُمْ فَلَمَّا اَفَلَ غَابَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ اَنْ اَتَّخِذَهُمْ اَرْبَابًا لِاَنَّ الرَّبَّ لَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ التَّغَيُّرُ وَالْاِنْتِقَالُ لِاَنَّهُمَا مِنْ شَانِ الْحَوَادِثِ فَلَمْ يَنْجَعْ فِيْهِمْ ذٰلِكَ ـ

৭৬. অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল অর্থাৎ সব কিছু অন্ধকার করে ফেলল, তখন সে নক্ষত্র কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল যুহরা নক্ষত্র দেখে তার সম্প্রদায়কে বলল, আর এরা ছিল জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এটা তোমাদের ধারণায় আমার প্রভু; অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো অদৃশ্য হলো তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা -কে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করা আমি পছন্দ করি না। কারণ, যিনি প্রভু হবেন তার মধ্যে কোনোরূপ বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কেননা, এটা حَادِثْ অর্থাৎ সৃষ্ট জিনিসের চিহ্ন। কিন্তু তাদের উপর এ যুক্তি কোনো প্রভাব বিস্তার করল না।

٧٧. فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا طَالِعًا قَالَ لَهُمْ هٰذَا رَبِّیْ ج فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِیْ رَبِّیْ يُثَبِّتْنِیْ عَلَى الْهُدٰى لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ تَعْرِيْضٌ لِقَوْمِهٖ بِاَنَّهُمْ عَلٰى ضَلَالٍ فَلَمْ يَنْجَعْ فِيْهِمْ ذٰلِكَ ـ

৭৭. অতঃপর যখন সে চন্দ্র উদিত হতে দেখল তাদেরকে বলল, এটা আমার প্রভু এটাও যখন অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, আমাকে আমার প্রভু সৎপথ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ সৎপথে প্রতিষ্ঠিত না রাখলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো। বাক্যটি এদিকে ইঙ্গিতবহ যে, তারা অর্থাৎ হযরত ইবরাহীমের কওম পথভ্রষ্টতায় বিদ্যমান। কিন্তু এ কথাও তাদের মধ্যে কোনো প্রভাব আনয়ন করল না।

٧٨. فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا ذَكَّرَهُ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِهٖ رَبِّیْ هٰذَاۤ اَكْبَرُ ج مِنَ الْكَوْكَبِ وَالْقَمَرِ فَلَمَّا اَفَلَتْ وَقَوِيَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ وَلَمْ يَرْجِعُوْا قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْاَجْرَامِ الْمُحْدَثَةِ الْمُحْتَاجَةِ اِلٰى مُحْدِثٍ ـ

৭৮. অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হতে দেখল; তখন সে বলল, এটা আমার প্রভু, هٰذَا رَبِّیْ এখানে خَبَرْ অর্থাৎ বিধেয়টি [رَبِّیْ] যেহেতু مُذَكَّرٌ বা পুংলিঙ্গবাচক সেহেতু هٰذَا-কেও مُذَكَّرٌ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ বাচকরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা চন্দ্র ও নক্ষত্রের তুলনায় বৃহৎ। যখন এটাও অস্তমিত হলো আর তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও যখন তারা ফিরল না তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এ প্রতিমা ও এ সৃষ্ট কতগুলো **জড়পদার্থ যেগুলো স্বীয় অস্তিত্বের ব্যাপারে একজন সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী,** সেসব যা আল্লাহর সাথে শরিক কর তা হতে আমি মুক্ত।

٧٩. فَقَالُوْا لَهٗ مَا تَعْبُدُ قَالَ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ قَصَدْتُ بِعِبَادَتِیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَیِ اللّٰهَ حَنِيْفًا مَائِلًا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهٖ ـ

৭৯. তারা বলল, তবে তুমি কার উপাসনা কর? তিনি বললেন, আমি একনিষ্ঠভাবে অর্থাৎ সব ধর্ম হতে নির্লিপ্ত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এ ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর দিকেই মুখ ফিরাচ্ছি তাঁকেই আমার ইবাদত উপাসনার উদ্দেশ্য রাখি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা। আর আমি তাঁর সাথে শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٨٠. وَحَاۤجَّهٗ قَوْمُهٗ ط جَادَلُوْهُ فِیْ دِيْنِهٖ وَهَدَّدُوْهُ بِالْاَصْنَامِ اَنْ تُصِيْبَهٗ بِسُوْءٍ اِنْ تَرَكَهَا قَالَ اَتُحَاۤجُّوْنِّیْ بِتَشْدِيْدِ النُّوْنِ وَتَخْفِيْفِهَا بِحَذْفِ اِحْدَى النُّوْنَيْنِ وَهِیَ نُوْنُ الرَّفْعِ عِنْدَ النُّحَاةِ وَنُوْنُ الْوِقَايَةِ عِنْدَ الْقُرَّاۤءِ اَیْ اَتُجَادِلُوْنَنِیْ فِیْ وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ط تَعَالٰى اِلَيْهَا وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ مِنَ الْاَصْنَامِ ـ

৮০. তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো অর্থাৎ তার ধর্ম মত নিয়ে তারা তার সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হলো। তারা হুমকি দিল, প্রতিমাসমূহকে যদি ত্যাগ কর তবে তোমার অকল্যাণ হবে। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে তাঁর একত্ব সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্ক কর? বিবাদ কর? অথচ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর হেদায়েত করেছেন। تُحَاۤجُّوْنِّیْ-এর نُوْن অক্ষরটি তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। একটি نُوْن বিলুপ্ত করত তাশদীদহীনভাবেও পাঠ করা যায়। নাহবী অর্থাৎ আরবি ব্যাকরণবিদদের অভিমত অনুসারে বিলুপ্ত نُوْن-টি হলো نُوْن رَفْع ক্বারী অর্থাৎ **কুরআন** পাঠবিদগণের অভিমত অনুসারে তা হলো, **نُوْن وِقَايَة** তোমরা যাকে তাঁর শরিক কর অর্থাৎ **প্রতিমাসমূহ তাকে** আমি ভয় করি না।

اَنْ تُصِيْبَنِىْ بِسُوْءٍ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلٰى شَىْءٍ اِلَّآ لٰكِنْ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْئًا ط مِنَ الْمَكْرُوْهِ يُصِيْبُنِىْ فَيَكُوْنُ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ط اَىْ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَىْءٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ بِهٰذَا فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ এসব প্রতিমা আমার কোনো অকল্যাণ করতে পারবে বলে আমার কোনো ভয় নেই। কারণ কোনো কিছুর উপর এদের কোনোরূপ ক্ষমতা নেই। তবে আমার প্রতিপালক কোনোরূপ অকল্যাণ করতে চাইলে তা হবে। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তাঁর জ্ঞান সব কিছুতেই বিস্তৃত। তোমরা কি তা অনুধাবন কর না? করলে ঈমান গ্রহণ করতে পারতে। اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ - اِسْتِثْنَاء অর্থাৎ ব্যত্যয়সূচক শব্দ اِلَّآ এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ হয়েছে। এটা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তাফসীরে لٰكِنْ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

٨١. وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ وَهِىَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ فِى الْعِبَادَةِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ بِعِبَادَتِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ط حُجَّةً وَبُرْهَانًا وَهُوَ الْقَادِرُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ج اَنَحْنُ اَمْ اَنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ مَنِ الْاَحَقُّ بِهٖ اَىْ وَهُوَ نَحْنُ فَاتَّبِعُوْهُ ـ

৮১. তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ এগুলি কোনোরূপ ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। যে বিষয়ে অর্থাৎ যেসব জিনিসের উপাসনা করার কোনো সনদ যুক্তি-প্রমাণ অবতীর্ণ করেনি তাকে উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরিক করতে তোমরা আল্লাহর ভয় কর না। অথচ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। সুতরাং এ দু-দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিক হকদার তোমরা না আমরা? কে অধিক হকদার এতদ্বিষয়ে যদি তোমরা জান তবে বল। এরা হলাম আমরাই। অতএব এদেরই অর্থাৎ আমাদেরই তোমরা অনুসরণ কর।

٨٢. قَالَ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْآ يَخْلِطُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اَىْ شِرْكٍ كَمَا فُسِّرَ بِذٰلِكَ فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ـ

৮২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে জুলুমের অর্থাৎ শিরকের, সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় শিরক দ্বারা জুলুম শব্দের তাফসীর করা হয়েছে সংমিশ্রণ করেনি তাদের জন্যই রয়েছে আজাব ও শাস্তি হতে নিরাপত্তা। আর তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بَازِغًا : অর্থ উদিত। **قَوْلُهٗ فَطَرَ** : অর্থ সৃষ্টি করেছেন। **قَوْلُهٗ لَمْ يَلْبِسُوْا** : অর্থ তারা সংমিশ্রণ করেনি।

قَوْلُهٗ اَنَدْعُوْا : هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ টি اِنْكَارْ এবং تَوْبِيْخ-এর অর্থে। আর نَدْعُوْا-এর শেষে اَلِفْ টি বহুবচনের সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মাসহাফে উসমানীর রাসমুল খত অনুযায়ী হয়েছে।

قَوْلُهٗ نُرَدُّ : এটি مُضَارِعْ مَجْهُوْل مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। اَنَدْعُوْا -এর সাথে তার আতফ হয়েছে। نَحْنُ -এর فَاعِلْ نَائِبْ উহ্য রয়েছে। ফে'লটি نُرَدُّ -এর তাফসীর। আর نَرْجِعُ শব্দটি نُرَدُّ-এর যমীর থেকে مُشْرِكِيْنَ حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِسْتَهْوَتْهُ : এটি اِسْتِهْوَاءٌ থেকে مَاضِىْ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। ه হলো মাফঊলের যমীর। অর্থ সে গোমরাহ করেছে।

قَوْلُهُ حَيْرَانَ : অর্থ পেরেশান। সিফতে মুশাব্বাহার সীগাহ। তার مُؤَنَّثْ হলো حَيْرٰى

قَوْلُهُ كَالَّذِيْ اسْتَهْوَتْهُ : এটি نُرَدُّ জুমলার نَائِب فَاعِلْ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। তাকদীরী ইবারত হবে- نُرَدُّ مُشْتَبِهِيْنَ الَّذِيْ اِسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ এবং حَيْرَانَ শব্দটি اِسْتَهْوَتْهُ-এর মাফঊলের যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ ذَكَّرَ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِهِ : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন.** هٰذَا-এর مَرْجِعْ হলো اَلشَّمْسَ যা مُؤَنَّثْ سَمَاعِيْ সুতরাং ইসমে ইশারাও هٰذِهِ হওয়া উচিত ছিল, যাতে اِسْمِ اِشَارَه এবং مُشَارٌ اِلَيْه-এর মাঝে مُطَابَقَتْ বা সামঞ্জস্য বাকি থাকে। **উত্তর.** যখন اِسْمِ اِشَارَه এবং مُشَارٌ اِلَيْه-এর মাঝে مُطَابَقَتْ না হয় তখন খবরের رِعَايَتْ করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً : পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে মুশরিকদের সম্বোধন এবং প্রতিমা পূজা ছেড়ে আল্লাহর আরাধনার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গিতে স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমা ও তারকা পূজার বিপক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা আযরকে বললেন, তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'আযর' একথাই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী (র.) এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে যান। চাচাকে পিতা বলে আরবি বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা বলা হয়েছে। যারকানী (র.) 'মাওয়াহিব' গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান : আযর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা হোন কিংবা চাচা সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল- وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্য পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করেন।

তাফসীরে বাহরে মুহীত -এ বলা হয়েছে, এতে বোঝা যায় যে, পরিবারের কোনো সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে, তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থি নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবি তাই। আরও জানা গেল যে, সত্য প্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকটাত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গাম্বরদের সুন্নত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব : এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন, তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত রয়েছে। মুশরিক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতীয়তা যদি মুসলিম জাতীয়তার পরিপন্থি হয়, তবে মুসলিম জাতীয়তার বিপরীত সব জাতীয়তাই বর্জনীয়। কুরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য উত্তম আদর্শ অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদের পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন খাড়া থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহর ইবাদতে সমবেত না হও।

বলা বাহুল্য, এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করে। উম্মতে মুহাম্মাদী ও অন্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতীয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কোন জাতীয় লোক? উত্তর হলো نَحْنُ قَوْمٌ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমরা মুসলমান জাতি। [বুখারী] এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদের পিতার দিকে সম্বন্ধ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন- يَا قَوْمِ إِنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ হে আমার কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এখানে এই ইঙ্গিতই করা হয়েছে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরিকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্বজনরা ও তাঁর পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও করত। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দুটি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজাও পথভ্রষ্টতা। পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন- وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সে সব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিতেই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰى كَوْكَبًا - قَالَ هٰذَا رَبِّىْ : অর্থাৎ এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হলো এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন, এ নক্ষত্র আমার পালনকর্তা। উদ্দেশ্যে এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন, لَآ أُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ এবং اٰفِلِيْنَ শব্দটি اُفُوْلٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- অস্ত যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালোবাসি না যে বস্তু আল্লাহ কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোনো রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় স্বজনদেরকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন, [তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী] এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন না করতে থাকতেন তবে আমিও তোমাদের মতো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোনো সত্তা, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথ প্রদর্শন করা হয়। এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন, [তোমাদের ধারণা অনুযায়ী] এটি আমার পালনকর্তা এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতিসত্বর সৃষ্টিগোচন হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন- يَا قَوْمِ إِنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরিকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনোটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত; বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'লা-শরীক আল্লাহর' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) পয়গাম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেননি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র-পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র-পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয় অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) এসব অবস্থার মধ্যে থেকে শুধু নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তিমিত হওয়াকে এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলোর একপ্রকার পতনরূপে গণ্য হয়ে। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গাম্বরগণ সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ তাত্ত্বিক আলোচনার পেছনে বেশি পড়েন না; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

দীন প্রচারকদের জন্য কয়েকটি নির্দেশ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকগণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম নির্দেশ এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে ইবরাহীম (আ.) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র-পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেননি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা নক্ষত্রপুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষতাহীনতার মতো সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোনো ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে আলেম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) জাতিকে একথা বলেননি যে, তোমরা এরূপ কর; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে ফিরিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালকর্তা । উদ্দেশ্যে তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা, সত্যকথা বলে দেওয়াই সংস্কার ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকারী ভঙ্গিতে বলা জরুরি। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৫৩-৫৭]

অনুবাদ :

٨٣. وَتِلْكَ مُبْتَدأٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ حُجَّتُنَا الَّتِىْ اِحْتَجَّ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ اُفُوْلِ الْكَوْكَبِ وَمَا بَعْدَهُ وَالْخَبَرُ اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ اَرْشَدْنَاهُ لَهَا حُجَّةً عَلٰى قَوْمِهٖ ط نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ط بِالْاِضَافَةِ وَالتَّنْوِيْنِ فِى الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ ـ

৮৩. এ আমার যুক্তি تِلْكَ এটা مُبْتَدأٌ অর্থাৎ উদ্দেশ্য। حُجَّتُنَا এটা تِلْكَ-এর بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। اٰتَيْنَاهَا এটা خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয়। আমি নক্ষত্র অস্তমিত হওয়া ও তৎপরবর্তীতে উল্লিখিত যেসব বিষয় দ্বারা ইবরাহীম আল্লাহর একত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন সেগুলো যা আমি ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তাকে যেসব যুক্তির সন্ধান আমি করে দিয়েছিলাম। যাকে ইচ্ছা আমি জ্ঞানে ও হিকমতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নত করি। دَرَجَاتٍ مَّنْ এটা اِضَافَةٌ অর্থাৎ সম্বন্ধ বাচক অথবা তানবীনসহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তোমার প্রতিপালক তাঁর কার্যে প্রজ্ঞাময়, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

٨٤. وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط اِبْنَهٗ كُلًّا مِنْهُمَا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ اِبْرَاهِيْمَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ اَىْ نُوْحٍ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِبْنَهٗ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ ابْنَ يَعْقُوْبَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنٰهُمْ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

৮৪. এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও তার [ইসহাকের] পুত্র ইয়াকুব; এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে অর্থাৎ ইবরাহীমের পূর্বে নূহকে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার নূহের বংশধর দাউদ তৎপত্র সুলায়মান, আইয়ুব, ইয়াকুব পুত্র ইউসুফ, মূসা ও হারুনকেও। আর এভাবেই অর্থাৎ তাদেরকে যেভাবে পুরস্কৃত করেছি সেভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে আমি পুরস্কৃত করি।

٨٥. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى اِبْنَهٗ وَعِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ يُفِيْدُ اَنَّ الذُّرِّيَّةَ يَتَنَاوَلُ اَوْلَادَ الْبِنْتِ وَاِلْيَاسَ ط ابْنَ اَخِىْ هَارُوْنَ اَخِىْ مُوْسٰى كُلٌّ مِنْهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

৮৫. এবং যাকারিয়া তৎপুত্র ইয়াহইয়া মরিয়াম তনয় ঈসা এবং মূসার ভ্রাতা হারুনের ভ্রাতুষ্পুত্র ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এদের প্রত্যেকেই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। মরিয়ম তনয় ঈসার উল্লেখ দ্বারা বোঝা যায় ذُرِّيَّةٌ [সন্তানসন্ততি] শব্দটি কন্যার সন্তানসন্ততিকেও শামিল করে।

٨٦. وَاِسْمٰعِيْلَ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَالْيَسَعَ اَللَّامُ زَائِدَةٌ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط ابْنَ هَارَانَ اَخِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَكُلًّا مِنْهُمْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ بِالنُّبُوَّةِ ـ

৮৬. এবং ইবরাহীম তনয় ইসমাঈল, আল ইয়াসআ, ইউনুস এবং ইবরাহীমের ভ্রাতা হারুনের পুত্র লূতকে, এদের প্রত্যেককে নবুয়ত দান করত বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। اَلْيَسَعَ-এর اَلِفْ وَلَامْ টি زائدة বা অতিরিক্ত।

٨٧. وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ج عَطْفٌ عَلٰى كُلًّا اَوْ نُوْحًا وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ لِاَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلَدٌ وَبَعْضُهُمْ كَانَ فِىْ وَلَدِهٖ كَافِرٌ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ اخْتَرْنَاهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

৮৭. এবং এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম, গ্রহণ করে নিয়েছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। وَمِنْ اٰبَائِهِمْ পূর্বোল্লিখিত كُلًّا বা نُوْحًا-এর সাথে এ আয়াতটির عَطْف হয়েছে। এ আয়াতে مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ অর্থাৎ ঐকদেশিক বলে বিবেচ্য হবে। কারণ এদের কতকজন নিঃসন্তান ছিলেন, আবার সন্তানদের মধ্যেও কতকজন ছিল কাফের।

٨٨. ذٰلِكَ الدِّيْنُ الَّذِىْ هُدُوْا اِلَيْهِ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَلَوْ اَشْرَكُوْا فَرْضًا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

৮৮. এটা অর্থাৎ যে ধর্মপথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল তা আল্লাহর পরিচালিত পথ; স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। যদি তারা শিরক করত অর্থাৎ এটা ধরে নেওয়া হলো তবে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেত।

٨٩. اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَالْحُكْمَ الْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا اَىْ بِهٰذِهِ الثَّلٰثَةِ هٰۤؤُلَاۤءِ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا اَرْصَدْنَا لَهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ.

৮৯. এদেরকেই কিতাব, অর্থাৎ কিতাবসমূহ বিধান হিকমত ও নবুয়ত প্রদান করেছি। এগুলোকে অর্থাৎ এ তিনটিকে যদি এরা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা প্রত্যাখ্যান করে তবে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এগুলোর ভার অর্পণ করেছি, এমন এক সম্প্রদায় প্রস্তুত করেছি যারা এগুলোর কাফের ও প্রত্যাখ্যানকারী নয়। এরা হলো মুহাজির ও আনসারগণ।

٩٠. اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمْ طَرِيْقِهِمْ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالصَّبْرِ اقْتَدِهْ ط بِهَاءِ السَّكْتِ وَقْفًا وَّوَصْلًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِهَا وَصْلًا قُلْ لِاَهْلِ مَكَّةَ لَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَىِ الْقُرْاٰنِ اَجْرًا ط تُعْطُوْنِيْهِ اِنْ هُوَ مَا الْقُرْاٰنُ اِلَّا ذِكْرٰى عِظَةٌ لِلْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ.

৯০. এরা তারাই যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের হেদায়েতের অর্থাৎ একত্ববাদ, ধৈর্যধারণ ইত্যাদি তাদের অনুসৃত পথের অনুসরণ কর। اِقْتَدِهْ ওয়াকফ হোক বা মিলিতভাবে পাঠ হোক উভয় অবস্থায়ই এর শেষে ہ-টি সাকতা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে وَصْل অর্থাৎ মিলিতভাবে পাঠের ক্ষেত্রে এটা বিলুপ্ত করে পঠিত রয়েছে। মক্কাবাসীদেরকে বল, এর জন্য অর্থাৎ আল কুরআনের জন্য আমি তোমাদের নিকট পরিশ্রমিক যা তোমরা দেবে তা চাই না। এটা অর্থাৎ আল কুরআন তো বিশ্বজগতের জন্য জিন ও মানবের জন্য নসিহত উপদেশ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْهُ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, تِلْكَ ইসমে ইশারা। حُجَّتُنَا হলো مُشَارٌ اِلَيْهِ উভয়টি মিলে **মুবতাদা। আর** اٰتَيْنَا হলো তার খবর। [অপর একটি তারকীব] تِلْكَ মুবতাদা। حُجَّتُنَا প্রথম খবর। اٰتَيْنَاهُ জুমলা হয়ে **দ্বিতীয় খবর।**

قَوْلُهُ الَّتِىْ اِحْتَجَّ : এটি تِلْكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ -এর বিবরণ।

قَوْلُهُ اَرْشَدْنَاهُ لَهَا : **প্রশ্ন.** اٰتَيْنَا-এর তাফসীর اَرْشَدْنَاهُ দ্বারা করার ফায়দা কী? **উত্তর.** যেহেতু حُجَّتٌ কোনো দেওয়ার বস্তু নয়, তাই اتينا-এর তাফসীর اَرْشَدْنَا দ্বারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلٰى قَوْمِهٖ : **প্রশ্ন.** এখানে حُجَّةٌ -কে কেন উহ্য ধরা হলো? **উত্তর.** এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, عَلٰى قَوْمِهٖ টা حُجَّةٌ-এর مُتَعَلِّقٌ হবে اٰتَيْنَا-এর নয়। কেননা, اِيْتَاءٌ-এর সেলা عَلٰى আসে না।

قَوْلُهُ نُوْحٍ : এ শব্দটি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো ذُرِّيَّتِهٖ-এর যমীরের مَرْجِعٌ নির্ণয় করা। আর তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.) ; হযরত ইবরাহীম (আ.) নন। কেননা, হযরত ইউনুস (আ.) ও হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর নন। অথচ উভয়ের عَطْف হয়েছে পূর্বের সাথে।

قَوْلُهُ اِبْنَ اَخِىْ هَارُوْنَ اَخِىْ مُوْسٰى : **প্রশ্ন.** اِلْيَاسُ ابْنُ اَخِىْ مُوْسٰى এ সংক্ষিপ্ত বাক্য বাদ দিয়ে উক্ত দীর্ঘ বাক্য কেন ব্যবহার করা হলো? **উত্তর.** এভাবে প্রকাশ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর আপন ভাই নয়, বরং মা শরিক ভাই। কিন্তু এটি দুর্বল মত।

قَوْلُهُ اَلْيَسَعَ اللَّامُ زَائِدَةٌ : اَلْيَسَعَ-এর اَلِفْ لَامْ অতিরিক্ত। কেননা, عَلَمٌ বা মানুষের নামে اَلِفْ لَامْ আসে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَبَعْضُهُمْ كَانَ فِىْ وَلَدِهٖ كَافِرٌ : لِاَنَّ দ্বারা وَمِنْ اٰبَائِهِمْ -এর مِنْ হরফটি تبعيضية হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, مِنْ-কে تَبْعِيْضِيَّةٌ ধরা না হলে আয়াতে সকল মানুষের সন্তানকে হেদায়েত প্রাপ্ত বলতে হবে। অথচ তাদের মধ্যে কারো তো সন্তানই ছিল না। যেমন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)। কারো সন্তান কাফেরও ছিল। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান কেনান।

قَوْلُهُ اِقْتَدِهْ : **প্রশ্ন.** এ থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারী ছিলেন। তাঁকে তাঁদের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। **উত্তর.** مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالصَّبْرِ বৃদ্ধি করে এ আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। অনুসরণ কেবল কষ্টে ধৈর্যধারণ এবং তাওহীদের ক্ষেত্রে; শাখা-প্রশাখার মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ هَاءُ السَّكْتِ : ঐ هَا-কে বলা হয় যাকে কালিমার ওয়াকফের সময় বৃদ্ধি করা হয়। যখন শেষ হরফটি হরকতবিশিষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেছেন, اِقْتَدِهْ -এর মধ্যে هَاءٌ হলো মাসদারের যমীর। اَىْ اِقْتَدِاءُ الْاِقْتِدَاءِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, স্বজাতির বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে প্রকাশ্য বিজয় লাভ করেছেন এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দিয়েছেন, এটা ছিল আমারই অবদান। আমিই তাঁকে বিশুদ্ধ মতবাদ দান করেছি এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বলে দিয়েছি। কেউ যেন স্বীকার, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বাগ্মিতার জন্য গর্বিত না হয়। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কারও নৌকা তীরে ভিড়ে না। নিছক মানববুদ্ধিই সত্যোপলব্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। যুগে যুগেই দেখা যাচ্ছে যে, বড় বড় সুনিপুন দার্শনিক পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং অনেক অশিক্ষিত মূর্খ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও মতবাদের অনুসারী হয়।

قَوْلُهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ : অর্থাৎ আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা সমুন্নত করে দেই। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সারা বিশ্বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে সম্মানের আসন লাভ করেছেন, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই যে তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাও আমারই দান। এতে কারও স্বকীয়তার প্রভাব নেই। এরপর ছয়টি আয়াতে সতেরো জন পয়গাম্বরের তালিকা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বপুরুষ, অধিকাংশই তাঁর সন্তানসন্ততি এবং কেউ কেউ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র। এসব আয়াতে একদিকে তাঁদের সুপথ প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্যবান হওয়া এবং সরল পথে থাকার কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে. তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাই ধর্মের কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। অপরদিকে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর পথে স্বীয় পিতা, স্বদেশ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা পরকালের উচ্চ মর্তবা ও চিরস্থায়ী শান্তির পূর্বে দুনিয়াতে তাঁকে উত্তম স্বজন এবং উত্তম দেশ দান করেছেন। কেননা তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, সবাই তাঁরই সন্তানসন্ততি ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ.) থেকে যে শাখা বের হয়, তাতে বনী ইসরাঈলের সব পয়গাম্বর রয়েছেন এবং দ্বিতীয় যে শাখা হযরত ইসমাঈল (আ.) থেকে বের হয়, তাতে সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন, নবিয়্যুল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সবাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এতে আরও জানা গেল যে, সম্মান, অপমান এবং মুক্তি ও শাস্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজেরই ক্রিয়াকর্মের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো নবী বা ওলী থাকা সন্তানসন্ততির মধ্যে কোনো আলেম এবং পুণ্যবান থাকাও একটি বড় নিয়ামত। এর দ্বারাও মানুষের উপকার হয়।

আয়াতে উল্লিখিত সতেরো জন পয়গাম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তানসন্ততি। বলা হয়েছে- وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান অর্থাৎ পৌত্র নন, দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলেম ও ফিকহবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذُرِّيَّتْ শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হুসাইন (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বংশধরভুক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আ.) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপর দিকে মক্কার মুশরিকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহর সত্তা। সাথে অন্যকে আরাধনায় শরিক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব, তোমরা যদি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

قَوْلُهُ فَإِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ : পরিশেষে মহানবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, আপনার কিছুসংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা আপনার নবুয়ত স্বীকার করার জন্য আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্য গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার স্থলে তাঁদের উল্লেখ করেছেন। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهِمْ

−[মাআরিফুল কুরআন, ৩/৩৬২-৬৩]

٩١. وَمَا قَدَرُوا اَيِ الْيَهُوْدُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اَيْ مَا عَظَّمُوْهُ حَقَّ عَظْمَتِهٖٓ اَوْ مَا عَرَفُوْهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهٖٓ اِذْ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ خَاصَمُوْهُ فِي الْقُرْاٰنِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ط قُلْ لَهُمْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ قَرَاطِيْسَ اَيْ يَكْتُبُوْنَهٗ فِيْ دَفَاتِرَ مُقَطَّعَةٍ يُبْدُوْنَهَا اَيْ مَا يُحِبُّوْنَ اِبْدَاءَهٗ مِنْهَا وَيُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ج مِمَّا فِيْهَا كَنَعْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعُلِّمْتُمْ اَيُّهَا الْيَهُوْدُ فِي الْقُرْاٰنِ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ط مِنَ التَّوْرٰةِ بِبَيَانِ مَا الْتَبَسَ عَلَيْكُمْ وَاخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ قُلِ اللّٰهُ اَنْزَلَهٗ اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ غَيْرُهٗ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ باطلهم يَلْعَبُوْنَ .

٩٢. وَهٰذَا الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهٗ مِنَ الْكُتُبِ وَلِتُنْذِرَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ عَطْفٌ عَلٰى مَعْنٰى مَا قَبْلَهٗ اَيْ اَنْزَلْنَاهُ لِلْبَرَكَةِ وَالتَّصْدِيْقِ وَلِتُنْذِرَ بِهٖ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط اَيْ اَهْلَ مَكَّةَ وَسَائِرَ النَّاسِ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهَا .

অনুবাদ :

৯১. তারা অর্থাৎ ইহুদিরা আল্লাহর যথাযোগ্য কদর করেনি। অর্থাৎ যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি; তাঁর যথাযথ মা'রিফাত ও পরিচয় লাভ করতে পারেনি। তাই তারা রাসূল ﷺ -এর সাথে কুরআন নিয়ে বিতর্ক কালে তাঁকে বলেছিল, 'আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেননি।' এদেরকে বল, তবে মূসার আনীত কিতাব কে অবতারণ করেছিল? যে কিতাব ছিল মানুষের জন্য আলো ও পথ নির্দেশ যা তোমরা পৃষ্ঠাসমূহে রাখ। অর্থাৎ বিভিন্ন খণ্ডে যা তোমরা লিপিবদ্ধ করে রাখ। তার কিছু প্রকাশ কর, অর্থাৎ তার যতটুকু প্রকাশ করতে তোমরা ভালোবাস ততটুকু প্রকাশ কর এবং অনেকাংশ অর্থাৎ যে অংশে রাসূল ﷺ -এর বিবরণ বিদ্যমান সে অংশসমূহ তোমরা গোপন কর। এবং হে ইহুদি সম্প্রদায়! যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণও তাওরাতে জানতে পারেনি অর্থাৎ যেসব বিষয় তোমাদের নিকট অস্পষ্ট ছিল এবং যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে কুরআনে সেসব বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তারা যদি উত্তর না দেয় তবে তুমিই বল, আল্লাহই তা অবতারণ করেছিলেন। কারণ, এটা ছাড়া এর আর কোনো উত্তর নেই। অতঃপর তাদেরকে তাদের মগ্নতায় এ সম্পর্কে তাদের নিরর্থক আলোচনায় খেলতে ছেড়ে দাও। تَجْعَلُوْنَهٗ এটাসহ তিন স্থানে [تَجْعَلُوْنَهٗ، تُبْدُوْنَهَا، تُخْفُوْنَ] ت [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] ও ي [নাম পুরুষরূপে]-সহ পঠিত রয়েছে।

৯২. এ কিতব অর্থাৎ আল কুরআন কল্যাণময় করে অবতারণ করেছি যা তার সামনের অর্থাৎ পূর্বের কিতাবসমূহের সমর্থক এবং এটা দ্বারা তুমি জনপদমাতা অর্থাৎ মক্কা নগরীর অধিবাসী ও তৎপার্শ্ববর্তীকে অর্থাৎ সব মানুষকে যেন সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা তাতে বিশ্বাস করে এবং তারা পরকালের শাস্তির ভয়ে তাদের সালাতের হেফাজত করে। لِتُنْذِرَ এটা ت [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] ও ي [প্রথম পুরুষরূপে]-সহ পঠিত রয়েছে। পূর্ববর্তী বাক্যের মর্মার্থের সাথে এর عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ এটা [আল কুরআন] কল্যাণ, সমর্থন ও সতর্কীকরণার্থে আমি অবতারণ করেছি।

٩٣. وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدٌ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِادِّعَاءِ النُّبُوَّةِ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ نَزَلَتْ فِىْ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ط وَهُمُ الْمُسْتَهْزِءُوْنَ قَالُوْا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ الْمَذْكُوْرُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ج اِلَيْهِمْ بِالضَّرْبِ وَالتَّعْذِيْبِ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ تَعْنِيْفًا اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط اِلَيْنَا لِنَقْبِضَهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ اَلْهَوَانِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ وَالْاِيْحَاءِ كِذْبًا وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ تَتَكَبَّرُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَجَوَابُ لَوْ لَرَأَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا.

৯৩. যে ব্যক্তি নবী না হয়েও নবুয়তের দাবি করতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়, যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না। আয়াতাংশ ভণ্ড নবী মুসায়লাম আলকাযযাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতারণ করেছেন আমি শীঘ্র তা অবতারণ করব। এটা হলো বিদ্রূপকারীদের উক্তি। তারা বলত, আমরাও ইচ্ছা করলে অনুরূপ বলতে পারি। তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? না, অন্য কেউ নেই। হে মুহাম্মদ! তুমি যদি দেখতে উল্লিখিত জালিমগণ যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় রইবে মুমূর্ষু অবস্থায় রইবে এবং ফেরেশতাগণ মারপিঠ ও শাস্তিদানের জন্য এদের প্রতি হাত বাড়িয়ে রইবে এবং রুক্ষভাবে বলবে, আমাদের নিকট তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। যাতে আমরা তা সংহার করে নিয়ে যেতে পারি। তোমরা নবুয়ত ও ওহী লাভের মিথ্যা দাবি করত আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে অর্থাৎ তার উপর ঈমান আনয়ন সম্বন্ধে অহংকার প্রদর্শন করতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে সে জন্য তোমাদের আজ অবমাননাকর লাঞ্ছনাকর শাস্তি দেওয়া হবে। لَوْ تَرٰى -এ لَوْ -এর জবাব উহ্য। এটা হলো, لَرَأَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ভীষণ ভয়াবহ একটি বিষয় দেখতে পেতে।

٩٤. وَيُقَالُ لَهُمْ اِذَا بُعِثُوْا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى مُنْفَرِدِيْنَ عَنِ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَىْ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ اَعْطَيْنَاكُمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ج فِى الدُّنْيَا بِغَيْرِ اِخْتِيَارِكُمْ.

৯৪. এবং তাদেরকে পুনরুত্থিত করার সময় বলা হবে তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্ঞাতি-পরিবার, ধন-দৌলত ও সন্তানসন্ততিহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছে যেমন প্রথমে তোমাদেরকে খালি পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলাম; তোমাদেরকে যা অর্থাৎ যেসব ধন-দৌলত প্রদান করেছিলাম তা তোমরা তোমাদের অনিচ্ছায় পশ্চাতে অর্থাৎ দুনিয়াতে ফেলে এসেছ।

وَ يُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الْاَصْنَامَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ اَىْ فِىْ اِسْتِحْقَاقِ عِبَادَتِكُمْ شُرَكٰؤُا ط اللّٰهِ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصْلُكُمْ اَىْ تَشَتَّتَ جَمْعُكُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ ظَرْفٌ اَىْ وَصْلُكُمْ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ ذَهَبَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ فِى الدُّنْيَا مِنْ شَفَاعَتِهَا ـ

এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা স্বরে বলা হবে তোমরা যাদেরকে তোমাদের উপাসনার অধিকারী বলে আল্লাহর শরিক করতে সেই সুপারিশকারীগণকেও অর্থাৎ প্রতিমাসমূহকেও তো তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হয়ে গেছে তোমাদের সমাবেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা তাদের সুপারিশ সম্পর্কে দুনিয়াতে যা ধারণা করতে, তাও নিষ্ফল হয়েছে, তাও হারিয়ে গেছে। بَيْنَكُمْ এটা অপর এক কেরাতে ظَرْف অর্থাৎ স্থান ও কাল বাচক পদরূপে نَصْب [ফাতাহ] সহকারে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَوَّلْنَاكُمْ : অর্থ– যা তোমাদেরকে দান করেছিলাম।

قَوْلُهُ الْيَهُوْدُ : مَا قَدَرُوْا -এর فَاعِلْ ইহুদিদেরকে সাব্যস্ত করে মুশরিকদের সম্ভাবনাকে দূর করা হয়েছে। কেননা تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ মুশরিকদের অবস্থার সাথে বেমানান। কারণ মুশরিকরা তো আহলে কিতাব নয় যে, কিতাবকে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখবে।

قَوْلُهُ فِى الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ : সে তিনটি স্থান হলো– تَجْعَلُوْنَهٗ ـ تُبْدُوْنَهَا ـ تُخْفُوْنَهَا

قَوْلُهُ قَرَاطِيْسَ : قِرْطَاسٌ -এর বহুবচন। ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠা।

قَوْلُهُ يَكْتُبُوْنَهٗ فِىْ دَفَاتِرَ : প্রশ্ন. قَرَاطِيْسُ শব্দটি কিতাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ -এর কোনো মর্ম নেই। উত্তর. বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) উক্ত ইবারত মাহযূফ ধরে এ আপত্তিরই জবাব দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাওরাতকে বিভিন্ন দফতরে বা খাতায় লিখত।

قَوْلُهُ اَنْزَلَهٗ : এতে ইশারা করা হয়েছে যে, اَللّٰهُ মুবতাদা এবং اَنْزَلَهٗ উহ্য খবর। এর প্রতি করীনা হলো مَنْ اَنْزَلَ আর اَنْزَلَهٗ-কে উহ্য ধরে একটি প্রশ্নের জবাব প্রদানও উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. اَللّٰهُ হলো قُلْ উহ্য اَمْر-এর مَقُوْلَه আর مَقُوْلَه -এর জন্য জুমলা হওয়া জরুরি। অথচ اَللّٰهُ শব্দটি একক; জুমলা নয়।

উত্তর. اَللّٰهُ শব্দের পর اَنْزَلَ মাহযূফ রয়েছে। আর اَللّٰهُ اَنْزَلَ জুমলা হয়ে قُلْ -এর مَقُوْلَه হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى مَعْنٰى مَا قَبْلَهٗ : এটি পূর্বের বাক্যের মর্মের উপর আতফ হয়েছে। মাহযূফের ইল্লত নয়। তাকদীরী ইবারত এভাবে– وَاَنْزَلْنٰهُ لِتُنْذِرَ الخ কেননা হযফ তো প্রয়োজনের সময়ই করা হয়। আর এখানে হযফের প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ : تَرٰى -এর মাফউল اَلظّٰلِمُوْنَ-এর দালালতের কারণে মাহযূফ রয়েছে। اَىْ تَرَى الظّٰلِمِيْنَ يَا مُحَمَّدُ

قَوْلُهُ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا : حُفَاةً শব্দটি حَافٍ وَحَافِىْ -এর বহুবচন। অর্থ– খালি পা। عُرَاةً-এর একবচন হলো عَارٍ উলঙ্গ শরীর। غُرْلًا -এর একবচন হলো اَغْرَلُ অর্থ– খতনাবিহীন।

قَوْلُهُ بَيْنَكُمْ : যদি بَيْنَكُمْ-কে مَرْفُوْعٌ পড়া হয় তাহলে تَقَطَّعَ -এর فَاعِلْ হবে। আর যদি مَنْصُوْب পড়া হয় তাহলে ظَرْف হিসেবে হবে। আর تَقَطَّعَ-এর ফায়েল যমীর হবে, যা اِتِّصَالْ -এর দিকে ফিরেছে। اَىْ وَصْلُكُمْ بَيْنَكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ : দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যারা বলেছিল আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি কখনও কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ করেননি, গ্রন্থ ও রাসূল প্রেরণ ব্যাপারটি মূলত ভিত্তিহীন।

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তি পূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা তারা কোনো গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোনো কালেই ছিল না। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে এটি ইহুদিদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যত এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থি ছিল। ইমাম বগভী (র.) -এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদিরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়েছিল এবং তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছেন, যারা এমন বাজে কথা বলেছে তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকে চেনেনি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হতো না। যারা সর্বাবস্থায় ঐশী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তাওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির একজন হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছ, সে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিন– তোমরা এমন বক্রগামী যে, যে তাওরাতকে তোমরা ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করে গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোনো পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদিরা সেগুলো তাওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষ تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قَرَاطِيْسُ শব্দটি قِرْطَاسٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

قَوْلُهُ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ : অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তাওরাত ও ইঞ্জিলের চাইতেও **অধিক জ্ঞান দান করা** হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তাওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? **এ প্রশ্নের উত্তর কি দেবে**; আপনিই বলে দিন! আল্লাহ তা'আলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন **আপনার কাজও শেষ** হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

قَوْلُهُ وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ الخ : তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে–

وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ـ

অর্থাৎ তাওরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কুরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কুরআনের সত্যতার জন্য তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী ইসরাঈলের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা অর্থাৎ মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোনো বিশেষ পয়গাম্বর ও গ্রন্থ এ যাবৎ অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কুরআন

বিশেষভাবে তাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মুয়াযযমাকে কুরআন পাক 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কিবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু। -[তাফসীরে মাযহারী]

উম্মুল কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ : অর্থাৎ যারা পরকালের বিশ্বাস করে, তারা কুরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদি ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ইচ্ছা, মেনে নেওয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এবং এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে তৈরি করা– এটি পরকালের বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, আল্লাহভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি-প্রমাণে চিন্তাভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরোয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায় পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালের বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোনো সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীতি এবং পরকাল ভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কুরআন পাকের কোনো সূরা বরং কোনো রুকু এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। -[মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৬৯-৭২]

٩٥. إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ شَاقُّ الْحَبِّ عَنِ النَّبَاتِ وَالنَّوٰى ط عَنِ النَّخْلِ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَالْاِنْسَانِ وَالطَّائِرِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ النُّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَيِّ ط ذٰلِكُمُ الْفَالِقُ الْمُخْرِجُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ فَكَيْفَ تُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ .

٩٦. فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ج مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الصُّبْحِ اَىْ شَاقُّ عُمُوْدِ الصُّبْحِ وَهُوَ اَوَّلُ مَا يَبْدُوْ مِنْ نُوْرِ النَّهَارِ عَنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا يَسْكُنُ فِيْهِ الْخَلْقُ مِنَ التَّعَبِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ اللَّيْلِ حُسْبَانًا ط حِسَابًا لِلْاَوْقَاتِ اَوِ الْبَاءُ مَحْذُوْفَةٌ وَهُوَ حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ اَىْ يَجْرِيَانِ بِحُسْبَانٍ كَمَا فِىْ سُوْرَةِ الرَّحْمٰنِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْعَلِيْمِ بِخَلْقِهِ .

٩٧. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط فِى الْاَسْفَارِ قَدْ فَصَّلْنَا بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ الدَّالَّاتِ عَلٰى قُدْرَتِنَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ .

অনুবাদ :

৯৫. আল্লাহই বৃক্ষের দানা ও খর্জুরের আঁটি অঙ্কুরিত করেন। বিদীর্ণ করেন। তিনিই প্রাণহীন হতে **জীবন্তকে** যেমন, মানুষকে শুক্র হতে ও পাখিকে ডিম হতে **নির্গত করেন** এবং জীবন্ত হতে প্রাণহীনকে **যেমন, শুক্র ও ডিম** নির্গত করেন। এ তো অর্থাৎ **অঙ্কুরোদগমকারী ও নির্গতকারীই** তো আল্লাহ, সুতরাং **তোমরা কোথায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ প্রমাণ** প্রতিষ্ঠার পরও ঈমান আনয়ন না করে তোমরা কিরূপে ফিরে যাবে?

৯৬. তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান ভোরের আলোকস্তম্ভ বিদীরণ করেন। রাত্রের আঁধার চিরে দিনের প্রথম যে আলো পরিস্ফুট হয় তাকে ভোরের আলোস্তম্ভ বলা হয়। اَلْاِصْبَاحِ এটা মূলত مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল। এখানে বিশেষ্য اَلصُّبْحُ [ভোর] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এতে সব সৃষ্টজীব শ্রান্তি হতে বিশ্রাম নেয় এবং সময় গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। এসব অর্থাৎ উল্লিখিত সব এমন এক সত্তা কর্তৃক **সুনির্ধারিত যিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।** اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ **পূর্বোল্লিখিত** اَللَّيْلِ -**এর** مَحَلِّ [স্থান]-এর **সাথে** عَطْف **বা অন্বয় সাধিতরূপে এ দুটি** مَنْصُوْب **[ফাতাহযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।** حُسْبَانًا এখানে এর পূর্বে بِ উহ্য রয়েছে। এটা এখানে উহ্য শব্দ يَجْرِيَانِ -এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ يَجْرِيَانِ بِحُسْبَانٍ উভয়ই হিসাব অনুসারে সঞ্চরণশীল। সূরা আর রাহমানেও এরূপ উল্লিখিত হয়েছে।

৯৭. তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন পরিভ্রমণের সময় তোমরা তা দ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আমি আমার কুদরতের উপর প্রমাণবহ নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই, বিবৃত করে দেই।

٩٨. وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ هِيَ اٰدَمُ فَمُسْتَقَرٌّ مِنْكُمْ فِي الرَّحِمِ وَّمُسْتَوْدَعٌ ط مِنْكُمْ فِي الصُّلْبِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ اَيْ مَكَانُ قَرَارٍ لَكُمْ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ مَا يُقَالُ لَهُمْ.

৯৮. তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি আদম হতে পয়দা করেছেন সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তোমাদের জন্য রয়েছে মাতার গর্ভাশয়ে স্থিত স্থান এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পিতার শিরদাঁড়ায় গচ্ছিত থাকার স্থান। যা বলা হয় তা অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই। مُسْتَقَرٌّ এটা অপর এক কেরাতে قَ অক্ষরে ফাতাহসহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ অবস্থাস্থল।

٩٩. وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ج فَاَخْرَجْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهٖ بِالْمَاءِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ يَنْبُتُ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ اَيِ النَّبَاتِ شَيْئًا خَضِرًا بِمَعْنٰى اَخْضَرَ نُّخْرِجُ مِنْهُ مِنَ الْخَضِرِ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ج يَرْكَبُ بَعْضُهٗ بَعْضًا كَسَنَابِلِ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا وَمِنَ النَّخْلِ خَبَرٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ مِنْ طَلْعِهَا اَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فِيْ اَكْمَامِهَا وَالْمُبْتَدَاُ قِنْوَانٌ عَرَاجِيْنُ دَانِيَةٌ قَرِيْبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَّ اَخْرَجْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَرَقُهُمَا حَالٌ وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط ثَمَرُهُمَا اُنْظُرُوْٓا يَا مُخَاطَبِيْنَ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ اِلٰى ثَمَرِهٖ بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبِضَمِّهِمَا وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ كَشَجَرَةٍ وَشَجَرٍ وَخَشَبَةٍ وَخَشَبٍ اِذَآ اَثْمَرَ اَوَّلُ مَا يَبْدُوْ كَيْفَ هُوَ وَاِلٰى يَنْعِهٖ ط نُضْجِهٖ اِذَا اَدْرَكَ كَيْفَ يَعُوْدُ.

৯৯. তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা অর্থাৎ পানি দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করেন। অনন্তর তা হতে চারা হতে সবুজ জিনিস উদ্গত করেন। পরে তা হতে অর্থাৎ সবুজ গাছ হতে ঘন সন্নিবিষ্ট একটির পর আরেকটি স্তরে স্তরে সাজান শস্যদানা উৎপাদন করেন। যেমন গম ইত্যাদির শীষ। এবং খর্জুর বৃক্ষের মাথি হতে অর্থাৎ তার থোড়ে প্রথম যে ফুল জাতীয় বস্তু উদ্গত হয় তা হতে [ঝুলন্ত কাঁদি] একটির নিকট আরেকটি সাজানো কচি ফলগুচ্ছ [নির্গত করেন। এবং] তা দ্বারা আরো উদ্গত করেন [আঙ্গুর কুঞ্জ] তার উদ্যান যাইতুন ও দাড়িম্ব এ দুটির পাতা একটি আরেকটির সদৃশ এবং ফল বিসদৃশ। হে সম্বোধিত জন! শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর এর ফলের দিকে যখন ফল উদগম হয় অর্থাৎ প্রথম অংকুরিত হওয়ার সময় কিরূপ থাকে এবং এর পক্বতার প্রতি। অর্থাৎ যখন তা পরিপক্ব তখন কিরূপে এটা রূপান্তরিত হয় দেখ। اَخْرَجْنَا এতে غَيْب অর্থাৎ নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَات অর্থাৎ রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে। خَضِر এরা এখানে اَخْضَر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنَ النَّخْلِ এটা خَبَر অর্থাৎ বিধেয়। مِنْ طَلْعِهَا -এটা مِنَ النَّخْلِ এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। قِنْوَانٌ এটা مُبْتَدَأ অর্থাৎ উদ্দেশ্য। مُشْتَبِهًا এটা حَال অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ثَمَر-এর ث ও م-এ ফাতাহ বা উভয়টিতেই পেশ সহকারে পাঠ করা যায়। এটা ثَمَرَةٌ-এর বহুবচন। যেমন شَجَرَةٌ [বৃক্ষ] -এর বহুবচন شَجَر এবং خَشَبَةٌ [কাষ্ঠ] এর বহুবচন خَشَب -

إِنَّ فِي ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ دَالَّاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى عَلَى الْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا فِي الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ ـ

বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্য পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার প্রমাণবহ নিদর্শন রয়েছে। কেবল বিশ্বাসীগণই যেহেতু ঈমানের বিষয়ে এটা দ্বারা উপকৃত হতে পারে সেহেতু এখানে এদেরকেই বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কাফেরদের অবস্থা এর বিপরীত!

١٠٠. وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ شُرَكَاءَ مَفْعُوْلٌ اَوَّلُ وَيُبْدَلُ مِنْهُ الْجِنَّ حَيْثُ اَطَاعُوْهُمْ فِيْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَ قَدْ خَلَقَهُمْ فَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ شُرَكَاءَ وَخَرَقُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَيْ اِخْتَلَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط حَيْثُ قَالُوْا عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَنٰتُ اللّٰهِ سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ بِاَنَّ لَهٗ وَلَدًا ـ

১০০. তারা জিনকে আল্লাহর শরিক করে। অর্থাৎ প্রতিমা পূজার ব্যাপারে তারা এদেরই অনুসরণ করে। অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেমন করে এরা তাঁর শরিক হতে পারে? এবং তারা অজ্ঞানতা বশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে। এ বিষয়ে মিথ্যা রচনা করে। যেমন তারা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। তিনিই মহিমান্বিত পবিত্রতা তাঁরই। তারা যা বলে যে, তার সন্তানসন্ততি রয়েছে তিনি তার উর্ধ্বে। لِلّٰهِ এটা جَعَلُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِيْ। شُرَكَاءَ এটা উক্ত ক্রিয়ার مَفْعُوْل اَوَّل - الْجِنَّ এটা شُرَكَاءَ -এর بَدَل। وَخَلَقَهُمْ এ বাক্যটি حَال অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে এর পূর্বে قَدْ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। خَرَقُوْا এটা তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَنْعِ : অর্থাৎ পক্ব হওয়া।

قَوْلُهُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ : এ জুমলাটি كَلَام مُسْتَانِفٌ হয়ে পূর্বের ইল্লত হয়েছে এবং দ্বিতীয় খবর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর حَيّ দ্বারা প্রত্যেক ঐ বস্তু উদ্দেশ্য যার মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। চাই তার মধ্যে রূহ থাকুক বা না থাকুক। আর مَيِّت দ্বারা প্রত্যেক ঐ বস্তু উদ্দেশ্য যার মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা নেই।

قَوْلُهُ مُخْرِجُ : এর আতফ হয়েছে فَالِقُ -এর সাথে। এজন্য يُخْرِجُ -এর স্থলে مُخْرِجُ ইসমে ফায়েলের সীগাহ আনা হয়েছে, যাতে আতফ শুদ্ধ হয়ে যায়। আর يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ এটি فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى -এর বয়ান। এজন্য وَاو বাদ দিয়ে يُخْرِجُ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন. اِخْرَاجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ কেন বয়ান হতে পারে না? উত্তর. এজন্য যে, فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى টি -এর জিনস। তার বিপরীত জিনিস নয়। অথচ بَيَان তার مُبَيَّن-এর মর্মের মাঝে مُطَابَقَت জরুরি।

قَوْلُهُ فَكَيْفَ تَعْرِفُوْنَ الخ : اَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ -এর তাফসীর كَيْفَ تَعْرِفُوْنَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ

قَوْلُهُ مَصْدَرٌ : অর্থাৎ اَلْاِصْبَاحُ বাবে اِفْعَالٌ -এর মাসদার। যার অর্থ হলো دُخُوْلٌ فِي الصُّبْحِ কিন্তু এখানে এ অর্থ নয়। বরং এখানে অর্থ হলো শুধু সকাল। মাসদার বলে মাসদারের اَثَرْ অর্থাৎ সকাল বোঝানো হয়েছে। আর কুফাবাসীদের মতে, جَاعِلُ-এর স্থলে جَعَلَ রয়েছে। কারণ তাদের দৃষ্টিতে اِسْم -এর সাথে فِعْل -এর আতফ জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَحَلِّ اللَّيْلِ : অর্থাৎ لَيْل -এর মহল جَاعِلُ -এর মাফউল হওয়ার কারণে নসব হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ حَالٌ مِنَ الْمُقَدَّرِ : অর্থাৎ حُسْبَان উহ্য يَجْرِيَانِ থেকে حَالٌ হয়েছে। যদি মুফাসসির (র.) مُقَدَّرٌ থেকে حَالٌ না বলে مُتَعَلِّقٌ বলতেন তাহলে বেশি ভালো হতো।

قَوْلُهُ قِنْوَانٌ : এটি قِنْوٌ-এর বহুবচন। অর্থ– থোকা, কাঁদি, খেজুরের গুচ্ছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের হঠকারিতা ও অপরিণামদর্শিতা বর্ণিত হয়েছিল। এসব দোষের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা। তাই আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী। এতে আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক জীব ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগৎ স্রষ্টারই কাজ এতে কোনো মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোনো প্রভাব নেই। আল্লাহর শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অংকুর গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মুল বিষয়। লাঙ্গল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশি কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা যেন না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেঁটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম হওয়া, অতঃপর তাতে রঙ্গবেঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফলফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বৃদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরি করতে অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানবীয় কর্মের কোনো প্রভাব নেই। তাই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ অর্থাৎ তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না, যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, না আমি করি? দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে– يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত্যু বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম– এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন– ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ অর্থাৎ এগুলো সবই এক আল্লাহর কাজ। অতঃপর একথা জেনেশুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ : فَالِقٌ শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং إِصْبَاحٌ শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فَالِقُ الْإِصْبَاحِ এর অর্থ প্রভাতকে ফাঁককারী। অর্থাৎ গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তি ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোনো সৃষ্ট জীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

রাত্রিকে সৃষ্ট জীবের আরামের জন্য প্রাকৃতিক ও বাধ্যতামূলক নির্ধারণ একটি বিরাট নিয়ামত : এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا-سَكَنٌ শব্দটি سُكُوْنٌ থেকে উদ্ভূত। যেখানে পৌছে মানুষ শান্তি, স্বস্তি ও আরাম লাভ করে তাকেই سَكَنٌ বলা হয়। এ কারণেই মানুষের বাসগৃহকে কুরআনে سَكَنٌ বলা হয়েছে। جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا কেননা, কুঁড়ে ঘর হলেও মানুষ সেখানে পৌছে স্বভাবতই স্বস্তি ও আরাম বোধ করে। কাজেই আলোচ্য বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে প্রত্যেক প্রাণীর জন্য আরামদায়ক করেছেন। فَالِقُ الْإِصْبَاحِ বাক্যে ঐসব নিয়ামতের বর্ণনা ছিল, যা মানুষ দিবালোকে অর্জন করে, রাত্রির অন্ধকারে নয়। এরপর جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ দিনের বেলা সব কাজকারবার করে বিধায় দিবালোক যেমন একটি বিরাট নিয়ামত, তেমনি রাত্রির অন্ধকারকেও মন্দ মনে করো না। এটিও একটি বড় নিয়ামত। সারাদিনের শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষ রাত্রে আরাম করে পরদিন আবার নবোদ্যমে কাজ করার যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা মানবপ্রকৃতি অব্যাহত পরিশ্রম সহ্য করতে পারত না।

রাত্রির অন্ধকারকে আরামের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া একটি স্বতন্ত্র নিয়ামত এবং আল্লাহ তা'আলার অজেয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এ নিয়ামতটি প্রত্যহ অযাচিতভাবে পাওয়া যায়। তাই এটি যে কত বিরাট নিয়ামত ও অনুগ্রহ, সেদিকে মানুষ ভ্রুক্ষেপও করে না। চিন্তা করুন, যদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট করত, তবে কেউ হয়তো সকাল আটটায়, কেউ দুপুর বারোটায়, কেউ বিকাল চারটায় এবং কেউ রাতের বিভিন্ন অংশে ঘুমাবার ইচ্ছা করত। ফলে দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অহরহ মানুষ কাজকারবার ও শ্রমে লিপ্ত থাকত এবং মিল-ফ্যাক্টরী সর্বক্ষণ চালু থাকত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে নিদ্রিতদের নিদ্রায় এবং কর্মীদের কাজে ব্যাঘাত ঘটত। কেননা, কর্মীদের হট্টগোলে নিদ্রিতদের নিদ্রা ভেঙে যেত এবং নিদ্রিতদের অনুপস্থিতি কর্মীদের কাজ বিঘ্নিত করত। এ ছাড়া নিদ্রিতদের এমন সব অনেক কাজ বাদ পড়ে যেত, যা নিদ্রার সময়ই হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি শুধু মানুষের উপরই নয় প্রত্যেক প্রাণীর উপর রাত্রিবেলায় নিদ্রাকে এমনভাবে চাপিয়ে দিয়েছে যে, সবাই কাজকর্ম ছেড়ে ঘুমাতে বাধ্য। সন্ধ্যার সাথে সাথেই যাবতীয় পশু-পাখি ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু নিজ নিজ বাসস্থান ও গৃহের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে কাজ ছেড়ে বিশ্রামের চিন্তা করে। সমগ্র বিশ্বে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও বিশ্রামে সাহায্য করে। কেননা অধিক আলোতে স্বভাবতই সুনিদ্রা আসে না। চিন্তা করুন, যদি সারা বিশ্বের রাষ্ট্র ও জনগণ আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে নিদ্রার কোনো সময় নির্দিষ্ট করতে চাইত, তবে প্রথমত তাতে কত যে অসুবিধা দেখা দিত তার ইয়ত্তা নেই। দ্বিতীয়ত সব মানুষ যদি কোনো চুক্তি অনুসরণ করে নিদ্রা যেত, তবে জন্তু-জানোয়ারকে কে চুক্তি অনুকরণে বাধ্য করতে পারত। তারা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করত এবং নিদ্রিত মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র তছনছ করে ফেলত। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের উপর নির্দিষ্ট এক সময়ে নিদ্রা চাপিয়ে দিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দিয়েছে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

সৌর ও চান্দ্র হিসাব : বলা হয়েছে- وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا - حُسْبَانٌ একটি ধাতু। এর অর্থ- হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীন রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বছর, মাস, দিন, ঘণ্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতিবধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতিবিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্য কোনো ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকাও দেখা দেয় না। উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে।

قَوْلُهٗ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ : হাজারো বছরে এদের গতিতে এক সেকেন্ড পার্থক্য হয় না। পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্য কয়েক দিন বা কযেক ঘণ্টার বিরতি দেখা যেত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনাআপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা রয়েছে। কিন্তু এসব গোলকের পরিবর্তনীয় ও অটল ব্যবস্থা মানুষের দৃষ্টিকে হতচকিত ও নিজের দিকে আকৃষ্ট করে দিয়েছে। ফলে মানুষ একথা ভুলে গেছে যে, ঐশীগ্রন্থ, পয়গাম্বর ও রাসূলরা এ সত্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য অবতীর্ণ হন।

কুরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং এ দুটিই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। এটি ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থে এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলামি বিধিবিধানে চান্দ্রমাস ও বছর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামি তারিখ এবং ইসলামি বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজন বশত সৌর ও অন্যান্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোনো পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেওয়া পাপের কারণ। এতে রমজান কিংবা জিলহজ ও মহররম কবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ : অর্থাৎ এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেন্ড এদিকে-ওদিক হয় না একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

قَوْلُهٗ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ : অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ

এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কল-কব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্র পুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে এই বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোনো একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্ম-প্রবঞ্চিত।

قَوْلُهُ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্য। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখেও আল্লাহকে চেনে না, তারা বেখবর ও অসচেতন।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ : مُسْتَقَرٌّ শব্দটি قَرَارٌ থেকে উদ্ভূত। কোনো বস্তুর অবস্থানস্থলকে مُسْتَقَرٌّ বলা হয়। مُسْتَوْدَعٌ শব্দটি وَدِيْعَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারো কাছে কোনো বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেওয়া। অতএব, مُسْتَوْدَعٌ ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোনো বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্য একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কুরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এ ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন, مُسْتَوْدَعٌ ও مُسْتَقَرٌّ যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন, কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কুরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীর মাযহারীতে বলেছেন, مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোজখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক, কিংবা কবর ও বরযখই হোক সবগুলোই হচ্ছে مُسْتَوْدَعٌ অর্থাৎ সাময়িক অবস্থানস্থল। কুরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থাৎ তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফির সদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়েও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনজিল অতিক্রম করতে থাকে। বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সৃষ্ট জগতের তামাশায় মত্ত হয়ে যারা আসল বাসস্থান এবং আল্লাহ ও পরকালকে ভুলে যায়, শেষ এ আয়াতে তাদের চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন করে এবং দুনিয়ার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তি পায়। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৭৩-৭৮]

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً : আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণিবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. উর্ধ্বজগৎ, ২. অধঃজগৎ এবং ৩. শূন্যজগৎ। অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ ও বাগানের বর্ণনা এবং ২. মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সেমতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলেফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এরপর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এরপর উর্ধ্বজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পুনঃ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লিখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণিবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে রাখা হয়েছে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় নিয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই مُنْعَمٌ عَلَيْهِ যাদেরকে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণিবিন্যাস বহাল রয়েছে; অর্থাৎ শস্যের অবস্থা বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৮১]

অনুবাদ :

١٠١. هُوَ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مُبْدِعُهُمَا مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ اَنّٰى كَيْفَ يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ط زَوْجَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ج مِنْ شَانِهِ اَنْ يَخْلُقَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ

১০১. তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা অর্থাৎ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে এতদুভয়ের উদ্ভাবক। তাঁর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো কোনো সঙ্গিনী নেই অর্থাৎ ভার্যা নেই। তিনিই তো সব কিছু অর্থাৎ যেসব জিনিস সৃষ্টি হতে পারে তা সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। اَنّٰى এটা এখানে كَيْفَ [কিরূপে।] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٢. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ج وَحِّدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ حَفِيْظٌ ـ

১০২. তিনিই আল্লাহ; তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, তিনি এক বলে স্বীকার কর, তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক রক্ষক।

١٠٣. لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ اَىْ لَا تَرَاهُ وَهٰذَا مَخْصُوْصٌ لِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَحَدِيْثِ الشَّيْخَيْنِ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ لَا تُحِيْطُ بِهٖ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج اَىْ يَرَاهَا وَلَا تَرَاهُ وَلَا يَجُوْزُ فِىْ غَيْرِهٖ اَنْ يُدْرِكَ الْبَصَرَ وَهُوَ لَا يُدْرِكُهٗ اَوْ يُحِيْطُ بِهٖ عِلْمًا وَهُوَ اللَّطِيْفُ بِاَوْلِيَائِهٖ الْخَبِيْرُ بِهِمْ ـ

১০৩. তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন। তাঁকে দৃষ্টি অবলোকন করতে পারে না। পরকালে মু'মিনদের কর্তৃক তাঁকে দর্শন করার বিষয়টি এ আয়াতটির মর্ম হতে ব্যতিক্রম। কেননা একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ বহু চেহারা এ দিন সজীব-সুন্দর হবে তার প্রতিপালকের প্রতি দেখতে থাকবে। শাইখাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ -ইরশাদ করেন, পূর্ণিমার চাঁদ যেমন তোমরা অবলোকন কর তদ্রূপ অতি সত্বরই তোমরা আল্লাহকে দর্শন করতে পারবে। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটির মর্ম হলো, সেটা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। কিন্তু দৃষ্টি শক্তি তাঁর অধিগত। অর্থাৎ তিনি তাকে দেখেন কিন্তু সে তাঁকে অবলোকন করতে সক্ষম নয়। অপর কারও ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় যে, সে তা দেখবে কিন্তু তা তাকে দেখবে না। কিংবা বাক্যটির মর্ম হলো, তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা তা বেষ্টন করতে পারঙ্গম। তিনি তাঁর ওলীগণের সম্পর্কে অতি কোমল, তাদের বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

١٠٤. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ حُجَجٌ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنْ اَبْصَرَهَا فَاٰمَنَ فَلِنَفْسِهٖ ج اَبْصَرَ لِاَنَّ ثَوَابَ اِبْصَارِهٖ لَهٗ وَمَنْ عَمِىَ عَنْهَا فَضَلَّ فَعَلَيْهَا ط وَبَالُ ضَلَالِهٖ وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ رَقِيْبٍ لِاَعْمَالِكُمْ اِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ ـ

১০৪. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয় এসেছে। সুতরাং কেউ এটা লক্ষ্য করলে অনন্তর ঈমান আনয়ন করলে সে নিজের জন্যই তা লক্ষ্য করল। কারণ তা লক্ষ্য করার পুণ্যফল তারই হবে। আর যে সেটা হতে অন্ধ হবে অনন্তর পথভ্রষ্ট হবে তার নিজের উপরই তা বর্তাবে অর্থাৎ তার পথভ্রষ্টতার মন্দ পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আমি তোমাদের অর্থাৎ তোমাদের কার্যসমূহের রক্ষক নই, তত্ত্বাবধায়ক নই। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

١٠٥. وَكَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِيَعْتَبِرُوْا وَلِيَقُوْلُوْا اَيِ الْكُفَّارُ فِيْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ دَارَسْتَ ذَاكَرْتَ اَهْلَ الْكِتَابِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ دَرَسْتَ اَيْ كُتُبَ الْمَاضِيْنَ وَجِئْتَ بِهٰذَا مِنْهَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ـ

১০৫. এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেমন বর্ণনা করে দিয়েছি তেমনি নিদর্শনাবলি বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি বর্ণনা করি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং যেন তারা অর্থাৎ কাফেরগণ অবশেষে বলে, তুমি এটা অধ্যয়ন করেছ। অর্থাৎ কিতাবীদের সাথে আলোচনা করে এসে বলছ। আমি তো এটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। دَارَسْتَ এটা অপর এক কেরাতে دَرَسْتَ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হলো, তুমি অতীত যুগের কিতাবসমূহ পাঠ করত তা নিয়ে এসেছ।

١٠٦. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط اَيِ الْقُرْاٰنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

১০৬. তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় অর্থাৎ আল কুরআন তুমি তারই অনুসরণ কর। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর।

١٠٧. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوْا ط وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ج رَقِيْبًا فَنُجَازِيْهِمْ بِاَعْمَالِهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ فَتُجْبِرُهُمْ عَلَى الْاِيْمَانِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ ـ

১০৭. আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা শিরক করত না এবং তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করেনি, তত্ত্বাবধায়ক করেনি। আমিই তাদের কৃতকার্যের প্রতিফল দান করব। আর তুমি তাদের অভিভাবকও নও। যে তাদেরকে তুমি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য করতে পার। এ বিধান ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশের পূর্বের।

١٠٨. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ هُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيِ الْاَصْنَامِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا اِعْتِدَاءً وَظُلْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اَيْ جَهْلٍ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ كَذٰلِكَ كَمَا زَيَّنَّ لِهٰؤُلَاءِ مَا هُمْ عَلَيْهِ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ص مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَاَتَوْهُ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فِى الاخرة فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ ـ

১০৮. আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে অর্থাৎ যে প্রতিমাসমূহকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারাও অজ্ঞানতা বশত অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞানতার কারণে সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে ও সীমাতিক্রম করে আল্লাহকেও গালি দেবে! এভাবে অর্থাৎ যেভাবে এদের বর্তমান অবস্থা এদের জন্য আমি সুশোভন করে দিয়েছি সেভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের ভালো ও মন্দ কার্যকলাপ সুশোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা তা করে। অতঃপর পরকালে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন এবং তাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করবেন।

١٠٩. وَاَقْسَمُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَىْ غَايَةَ اِجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ مِّمَّا اقْتَرَحُوْا لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ط قُلْ لَهُمْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ يُنَزِّلُهَا كَمَا يَشَاءُ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ وَمَا يُشْعِرُكُمْ يُدْرِيْكُمْ بِاِيْمَانِهِمْ اِذَا جَاءَتْ اَىْ اَنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ ذٰلِكَ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ لِمَا سَبَقَ فِىْ عِلْمِىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ خِطَابًا لِلْكُفَّارِ وَفِىْ اُخْرٰى بِفَتْحِ اَنَّ بِمَعْنٰى لَعَلَّ اَوْ مَعْمُوْلَةٌ لِمَا قَبْلَهَا .

১০৯. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ চূড়ান্ত পর্যায়ের শপথ করে বলে, তাদের আবদার অনুসারে তাদের নিকট যদি নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা তাতে বিশ্বাস করত। এদেরকে বল, নিদর্শন তো আল্লাহর নিকট। যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন তা অবতারণ করেন। আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এটা এলেও তাদের ঈমান সম্পর্কে তোমরা কি করে বুঝবে? তোমাদের কিভাবে এটা বোধগম্য হবে? তোমাদের তা বোধগম্য হবে না। তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কারণ, পূর্ব হতেই আমি তা জানি। يُشْعِرُكُمْ এটা অপর এক কেরাতে কাফেরদের প্রতি সম্বোধন হিসেবে ت সহ [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] পঠিত রয়েছে। اَنَّهَا অপর এক কেরাতে এর হামযাটি ফাতাহযুক্তরূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা لَعَلَّ [হয়তোবা] অর্থে ব্যবহৃত বলে বিবেচ্য হবে কিংবা পূর্ববর্তী ক্রিয়ার مَعْمُوْل রূপে গণ্য হবে।

١١٠. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ نُحَوِّلُ قُلُوْبَهُمْ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ وَاَبْصَارَهُمْ عَنْهُ فَلَا يُبْصِرُوْنَهُ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَىْ بِمَا اُنْزِلَ مِنَ الْاٰيَاتِ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ نَتْرُكُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ ضَلَالِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ مُتَحَيِّرِيْنَ .

১১০. তারা যেমন প্রথমবারে তাতে অর্থাৎ প্রেরিত নিদর্শসমূহে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তর তাদের হৃদয় সত্য হতে ফিরিয়ে দেব, ফলে তারা তা বুঝবে না এবং চক্ষু তা হতে ঘুরিয়ে দেব। ফলে তারা তা দেখতে পারবে না। সুতরাং ঈমানও আনয়ন করবে না। আর তাদের অবাধ্যতায় গোমরাহিতে তাদেরকে উদভ্রান্ত হয়ে অস্থির ও পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াতে ইতস্তত বিচরণ করে ফিরতে দেব ছেড়ে দেব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَصَائِرُ : অর্থ যুক্তি-প্রমাণাদি।

قَوْلُهُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ মুবতাদা মাহযূফের খবর। اَىْ هُوَ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ অথবা بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ হলো মুবতাদা আর তার খবর হলো اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ -

بَدِيْعٌ শব্দটি مُبْدِعٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। سَمِيْعٌ যেমন مُسْمِعٌ-এর অর্থে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ-এর মধ্যে صِفَتْ مُشَبَّه-এর اِضَافَتْ হয়েছে فَاعِلْ -এর দিকে। তার মূলরূপ হলো- بَدِيْعٌ سَمٰوٰتُهٗ وَاَرْضُهٗ

قَوْلُهُ مِنْ شَانِهٖ اَنْ يَخْلُقَ : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে একটি سُؤَال مُقَدَّرٌ-এর জবাব প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ -এর মাঝে আল্লাহর যাতও দাখেল আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে আল্লাহর যাত এবং সিফত لَا شَيْءَ হওয়া লাযেম আসে, যা অসম্ভব। আর যদি দাখেল থাকে তাহলে আল্লাহর যাত ও সিফত মাখলুক হওয়া লাযেম আসে।

উত্তর. أَىْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ مَا عَدَا ذَاتِه وَصِفَاتِه হয়েছে عَامٌ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ টি شَيْءٍ -এর মাঝে خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ

قَوْلُهُ وَهٰذَا مَخْصُوصٌ لِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ : এ অংশটুকু বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো মু'তাযিলাদের اِمْتِنَاعِ رُؤْيَتْ বা আল্লাহর দীদার অসম্ভব হওয়ার দাবি খণ্ডন করা। মু'তাযিলাদের বিশ্বাস হলো, আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দীদার হবে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস হলো, আখেরাতে মু'মিনগণ আল্লাহর দীদার হাসিল করবেন।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْمُرَادُ تُحِيْطُ بِه : যদি لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় عَدَمِ اِحَاطَه বেষ্টন না করা, তাহলে সে সুরতে مَخْصُوْص হবে না; বরং عُمُوْمِيَّتْ বা ব্যাপকতা বাকি থাকবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার হাকীকত অনুভব করা দুনিয়া এবং আখেরাতের কোথাও সম্ভব হবে না।

قَوْلُهُ وَيُحِيْطُ بِهَا عِلْمًا : এটি اِدْرَاكْ-এর দ্বিতীয় অর্থ।

قَوْلُهُ قُلْ يَا مُحَمَّدُ : **প্রশ্ন.** এখানে قُلْ يَا مُحَمَّدُ উহ্য মানার কী কারণ?

উত্তর : এ অংশটুকু বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উক্ত কথাটি রাসূল ﷺ -এর জবান মুবারক থেকে বের হয়েছে। অন্যথায় এ আপত্তি হবে যে, وَمَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ-এর কী অর্থ? কারণ আল্লাহ থেকে حِفْظ-এর নফী করাটা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ لِيَعْتَبِرُوْا : **প্রশ্ন.** মুফাসসির (র.) এখানে يَعْتَبِرُوْا উহ্য মানলেন কেন?

উত্তর. যাতে وَلِيَقُوْلُوْا-এর আতফ সহীহ হতে পারে।

قَوْلُهُ نُبَيِّنَهُ : تَبْيِيْنٌ মাসদার থেকে مُضَارِعْ جَمْع مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। আমরা খুলে খুলে বর্ণনা করব। لِنُبَيِّنَهُ -এর মধ্যে لَامْ টি تَعْلِيْل-এর জন্য।

قَوْلُهُ فَاَتَوْهُ : এখানে فَاَتَوْهُ উহ্য ধরার কারণ হলো, যাতে এর উপর ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ الخ -এর আতফ সহীহ হয়। কেননা, مَعْطُوْف হলো ওয়াদা এবং وَعِيْد সতর্কবাণী। আর এটা ভালো ও মন্দ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। সাধারণ تَزْيِيْن -এর ক্ষেত্রে হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَىْ اَنْتُمْ لَا تَدْرُوْنَ ذٰلِكَ : এখানে মু'মিনদেরকে খেতাব করা হচ্ছে। এতে মু'মিনদেরকে মুশরিকদের ফয়মায়েশী মু'জিযার আশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মু'মিনরা এ কামনা করত যে, যদি মুশরিকদের দাবি অনুযায়ী রাসূল ﷺ -এর হাতে মু'জিযা প্রকাশ পেত, তাহলে ভালো হতো। যাতে মুশরিকরা ঈমান নিয়ে আসে। তাদের এ কামনার ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা মুশরিকদের ফরমায়েশী মু'জিযার কামনা করবে না। তোমাদের কি জানা আছে যে, তারা এসব মু'জিযা দেখে ঈমান আনবে? আমার ইলমে আযালীতে রয়েছে যে, তারা এসব দেখেও ঈমান আনবে না।

মুফাসসির (র.)-এর দুটি ব্যাখ্যা করেছেন। একটি হলো, مَا يُشْعِرُكُمْ -এর মধ্যে مَا হলো اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ বা অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন।

اَىْ لَا تَدْرُوْنَ بِاَنَّهَا اِذَا جَاءَتِ الْاٰيَاتُ لَا يُؤْمِنُوْنَ فَلِذٰلِكَ تَمَنَّوْنَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ ذٰلِكَ فَلَا تَتَمَنَّى بِهَا অর্থাৎ তোমরা জান না যে, যদি তাদের দাবি অনুযায়ী মু'জিযা প্রকাশও পেত তবু তারা ঈমান আনবে না। সুতরাং তোমরা তা কামনা করো না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, اَنَّ হরফটি لَعَلَّ-এর অর্থে। এর সারকথা হলো, يُشْعِرُكُمْ-এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য আছে। اَىْ مَا يُشْعِرُكُمْ بِاِيْمَانِهِمْ وَاَىْ لَعَلَّهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَا يُؤْمِنُوْنَ আর لَعَلَّ সে সময় নিশ্চিত অর্থে আসবে। অর্থাৎ তাদের দাবি মোতাবেক মু'জিযা এলেও নিঃসন্দেহে তারা ঈমান আনবে না। তাদের উদ্দেশ্য হলো আয়াতকে জাহের মোতাবেক বানানো। আর (بِالْكَسْرِ) اِنَّ-এর সুরতে جُمْلَه مُسْتَانِفَه হবে। যা সর্বদা سُؤَال مُقَدَّرْ -এর জবাবে আসে। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে مَا يُشْعِرُكُمْ مَا يَكُوْنُ مِنْهُمْ তার জবাবে বলা হয়েছে- اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

قَوْلُهُ وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ : এর আতফ হলো لَا يُؤْمِنُوْنَ-এর সাথে।

اَىْ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّا حِيْنَئِذٍ نُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ وَاَبْصَارَهُمْ فَلَا يُبْصِرُوْنَهُ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا .

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে أَبْصَارٌ শব্দটি بَصَرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ- দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি। إِدْرَاكٌ শব্দের অর্থ- পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ স্থলে إِدْرَاكٌ শব্দের অর্থ- 'বেষ্টন করা' বর্ণনা করেছেন। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

এতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীবজন্তুর সৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে।

১. সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি এমনকি সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ যাবৎ পৃথিবীতে যম মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দণ্ডায়মান হয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়। -[তাফসীরে মাযহারী]

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ জীবজন্তুর দৃষ্টিকেও এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জন্তুর ক্ষুদ্রতম চক্ষুও পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ? এদের বিপরীতে পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্ব কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েসমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহর পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি অসীম। মানবিক ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কল্পনা সসীম। এটা সবাই জানে যে, কোনো অসীমকে কোনো সসীম নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে না। তাই বিশ্বের যত বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক যুক্তিতর্কের নিরিখে স্রষ্টার সত্তা ও গুণাবলির অনুসন্ধান ও গবেষণায় জীবনপাত করেছেন এবং যত সূফী মনীষী 'কাশফ' [অন্তর্দৃষ্টি] ও 'ইলহাম' [ঐশীজ্ঞান] -এর আলো নিয়ে এ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, তারা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি এবং পেতে পারে না।

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা : মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভব নয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) যখন رَبِّ أَرِنِيْ [হে পরওয়ারদিগার! আমাকে দেখা দাও] বলে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল- لَنْ تَرَانِيْ [তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।] হযরত মূসা (আ.)-ই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোনো জিন ও মানুষের সাধ্য কি! তবে পরকালে মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ কিয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনের এক আয়াতে আছে- كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ কাফেররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে আড়ালে ও বঞ্চিত থাকবে। পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ ঘটবে- হাশরে অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌঁছার পরও। জান্নাতিদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নিয়ামত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন, তোমরা যেসব নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোনো নিয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতিরা নিবেদন করবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দোজখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশি আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত সোহায়েব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারীর এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, [পরকালে] তোমরা স্বীয় পালনকর্তাকে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে। তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে জান্নাতে মর্যাদা দান করবেন তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতি এ নিয়ামত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের রাতে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগৎ বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কিয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আয়াতের অর্থ এটা নয়, বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কিয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে সর্বাবস্থায় দেখা হতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহর সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

২. আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর দ্বিতীয় গুণ যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অনুকণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তাঁর অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারে না। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

قَوْلُهُ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ : আরবি অভিধানে لَطِيْف শব্দটি দু-অর্থে ব্যবহৃত হয়, ১. দয়ালু, ২. সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না কিংবা জানা যায় না। خَبِيْر শব্দের অর্থ- যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ সূক্ষ্ম। তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لَطِيْف শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও তাই সব গুনাহের কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- বুদ্ধি ও জ্ঞান । অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بَصَائِرُ বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ কুরআন, রাসূল ﷺ ও বিভিন্ন মু'জিযা আগমন করেছে এবং তোমরা রাসূলের চরিত্র, কাজকারবার ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজের উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। অর্থাৎ মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব নয়, যেমনটি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রাসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলি পৌঁছিয়ে দেওয়া ও বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা, না করা মানুষের দায়িত্ব।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ ও রিসালতের যেসব প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে- كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ অর্থাৎ আমি এমনিভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণাদি বর্ণনা করে থাকি।

قَوْلُهُ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ হেদায়েতের সব সাজসরঞ্জাম, মু'জিযা, অনুপম প্রমাণাদি- যেমন, কুরআন একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত

আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে– সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোনো হঠকারী অবিশ্বাসীরও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে دَرَسْتَ অর্থাৎ এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যায়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে– وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্য এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনে রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এ দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন।

চতুর্থ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে– কে মানে, আর কে মানে না– আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন যা অনুসরণ করার জন্য পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে, এ বিশ্বাস যে আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্য পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন গ্রহণ করল না।

পঞ্চম আয়াতে এর কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শিরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই উচিত।

–[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন : ৩/৩৮৩-৮৮]

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জারীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিতৃব্য আবূ তালিব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরিক সর্দাররা মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পারস্পরিক বলাবলি করতে থাকে– আবূ তালিবের মৃত্যু আমাদের জন্য কঠিন সামস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থি হবে। লোকে বলবে, আবূ তালিব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবূ তালিবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবূ তালিব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুদের মোকাবিলায় সবসময় তাঁর ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কুরায়েশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবূ তালিবের কাছে যাওয়ার জন্য একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো। আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহল, আমর ইবনে আস প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্য মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। সে আবূ তালিবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধিদলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবূ তালিবকে বলল, আপনি আমাদের মান্যবর সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদের মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা উপাস্য করবেন; আমরা কিছুই বলব না।

আবূ তালেব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাছে ডেকে বললেন, এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা কি চান? তারা বলল, আমাদের বাসনা, আপনি আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নিই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে?

আবূ জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একথা শুনতেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবূ তালিবও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র এ কালেমা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কালেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চাচাজান, আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কালেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কালেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কুরাইশ সর্দারদের নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল– হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদের মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকে গালি দেব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রাসূল বলে দাবি করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়– لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ আপনি ঐ প্রতিমাদের মন্দ বলবেন না, যাদের তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে। এখানে لَا تَسُبُّوْا শব্দটি سَبٌّ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোনো মানুষকে বরং কোনো জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবত কোনো সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোনো কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কুরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদের গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরাও আপনার আল্লাহকে গালি-গালাজ করব।

এতে কুরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোনো কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল; যেমন বলা হয়েছে–

مَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ এবং مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا-اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ- اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

এসব বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছিল, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে لَا تَسُبُّوْا বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো কখনও কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করলে তা তাঁর মনঃকষ্টের কারণ হতে পারে, তাই ব্যাপক সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সকল সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাধারণ হয়ে যান। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

এখন প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। অথচ এসব আয়াত রহিত নয়; অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর. কুরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসাবে কোনো সত্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তা বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্যে নয় এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদের মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষায় বিশেষ বাকপদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোনো বিষয়ের তথ্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির দোষত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণত আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কুরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতাও ফুটে উঠে। বলা হয়েছে– ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ অর্থাৎ প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয় দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে– اِنَّكُمْ

وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়; পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফিকহবিদরা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্য পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নাজায়েজ হবে। যেমন, মকরূহ স্থানসমূহে কুরআন তেলাওয়াত যে নাজায়েজ তা সবাই জানে। –[রূহুল মাআনী]

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে এবং কুরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোনো বাক্য উচ্চারিত হয়নি, যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা এবং এ সম্পর্কিত কুরআনি নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়েছে।

কোনো পাপের কারণ হওয়াও পাপ : উদাহরণত একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ এবং কোনো না কোনো স্তরে প্রশংসনীয় হয় কিন্তু সে কাজ করলে যদি কোনো ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ প্রতিমাদের মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবত মূলত তা ছওয়াব এবং প্রশংসনীয়ও বটে কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমা পূজারীরা আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদের মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তার পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহীমী ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমত কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত কা'বাগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটিমাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠে থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে, যাতে কা'বাগৃহে প্রবেশ তাদের ইচ্ছানুযায়ী হতে পারে; প্রত্যেকেই যেন বিনা বাধায় প্রবেশ করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন, আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বাগৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মাণের অনুরূপ করে দিই। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বাগৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবি রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বাগৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশঙ্কা আঁচ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতি জানা গেল যে, কোনো বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোনো অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মাআনী গ্রন্থে আবূ মনসূর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর জিহাদ ও কাফের নিধন ফরজ করেছে। অথচ কাফের নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো এই যে, কোনো মুসলমান কোনো কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলমানদের হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জিহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরিউক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জিহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কুরআন তেলাওয়াত, আজান ও নামাজের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজেদের ইবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবূ মনসূর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরি শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরি কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়। যেমন মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়।

এমনিভাবে কা'বাগৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোনো উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোনো ধর্মীয় অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোনো ইসলামি উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোনো অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোনো অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না; বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যথাসাধ্য অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী (র.) ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) উভয়েই এক জানাজার নামাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, জনসাধারণের ভ্রান্ত কর্মপন্থার কারণে আমরা জরুরি কাজ কিভাবে ত্যাগ করতে পারি? জানাজার নামাজ ফরজ। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল মানআনীতে বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তায় বৈধ বরং ইবাদত, কিন্তু শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কাজটি শরিয়তের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফিকহবিদরা হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোনো কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে যদ্দরুন তার কঠোর গুনাহগার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন, অমুক কাজটি করলে খুবই ভালো হতো। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গুনাহ পুত্রের উপর বর্তাবে না। -[খুলাসাতুল ফাতওয়া]

এমনিভাবে কাউকে ওয়াজ-উপদেশ দানের ক্ষেত্রে যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোনো অপকর্ম করে বসবে যদ্দরুন আরও অধিকতর গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন-

بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَةً اَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوْا فِىْ اَشَدِّ مِنْهُ অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্য পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোনো ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয়।

কিন্তু যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোনো প্রকার ইসলামি বৈশিষ্ট্য হবে তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনও ত্যাগ করা যাবে না; বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলি সাক্ষ্য দেয় যে; নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামি বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত আবূ জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কুরাইশ সর্দাররা তাওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয় তবেও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামি উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যা ত্যাগ করলে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশঙ্কার কারণে পরিত্যাগ করা যাবে। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : ৩/৩৯১-৯৭]

اَلْجُزْءُ الثَّامِنُ : অষ্টম পারা

١١١. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى كَمَا اقْتَرَحُوْا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ قَبِيْلٍ اَىْ فَوْجًا فَوْجًا وَبِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ اَىْ مُعَايَنَةً فَشَهِدُوْا بِصِدْقِكَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا لِمَا سَبَقَ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّآ لٰكِنْ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ اِيْمَانَهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ذٰلِكَ ـ

١١٢. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا كَمَا جَعَلْنَا هٰؤُلَآءِ اَعْدَاءَكَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ شَيٰطِيْنَ مَرَدَةَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ يُوَسْوِسُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ مُمَوَّهَهُ مِنَ الْبَاطِلِ غُرُوْرًا اَىْ لِيَغُرُّوْهُمْ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ اَىِ الْاِيْحَاءَ الْمَذْكُوْرَ فَذَرْهُمْ دَعِ الْكُفَّارَ وَمَا يَفْتَرُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا زُيِّنَ لَهُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ ـ

١١٣. وَلِتَصْغٰى عَطْفٌ عَلٰى غُرُوْرًا اَىْ تَمِيْلَ اِلَيْهِ اَىِ الزُّخْرُفِ اَفْئِدَةُ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا يَكْتَسِبُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ مِنَ الذُّنُوْبِ فَيُعَاقَبُوْا عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ :

১১১. তাদের অভিলাস অনুসারে আমি তাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তু দলে দলে তাদের মাঝে হাজির করলেও সমবেত করলেও ; قُبُلًا -এর ق ও ب এ পেশসহ পড়া হলে قَبِيْل -এর বহুবচন বলে গণ্য হবে। অর্থ দলে দলে। আর ق কাসরা ও ب ফাতাহসহ পঠিত হলে তার অর্থ হবে সমক্ষে, সামনে। আর এগুলি তোমার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলেও তারা বিশ্বাস করবে না। কারণ আল্লাহর জ্ঞানে এ সম্পর্কে পূর্ব হতে এ কথা আছে। তবে আল্লাহ যদি তাদের ঈমান আনয়নের অভিপ্রায় করেন তাহলে তারা ঈমান আনয়ন করতে পারে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এতদসম্পর্কে অজ্ঞ। اِلَّا এই حَرْفُ اِسْتِثْنَاءٍ অর্থাৎ প্রত্যয়সূচক শব্দ এ স্থানে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ বা ছিন্ন ব্যত্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা বুঝানোর জন্য তাফসীরে لٰكِنَّ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

১১২. এরূপ অর্থাৎ এদেরকে যেমন আপনার শত্রু বানিয়েছি তেমনি শয়তান অর্থাৎ অবাধ্যচারী ; شَيٰطِيْنَ এটা عدوا -এর بدل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। মানব ও জিনকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি। প্রবঞ্চনার জন্য অর্থাৎ এদেরকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা অসত্য কথা দ্বারা সুশোভিত করত প্ররোচিত করে ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দান করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এটা উক্ত প্ররোচনার কাজ করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কাফেরদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে অর্থাৎ কুফরি ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় তাদের চোখে শোভন করে রাখা হয়েছে সেগুলো বর্জন কর, ছেড়ে রাখ। এ বিধান যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিলের পূর্বের।

১১৩. এবং তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন হৃদয় যেন এর প্রতি মিথ্যা মিশ্রিত সুশোভিত বাক্যের প্রতি; وَلِتَصْغٰى পূর্বোল্লিখিত غُرُوْرًا -এর সাথে এটার عَطْف অর্থাৎ অন্বয় হয়েছে। অনুরাগী হয় আকর্ষিত হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর তারা যা অর্থাৎ যে সমস্ত পাপ কাজ করে তাতে যেন তারা লিপ্ত থাকতে পারে। অনন্তর এর কারণে তারা শাস্তিগ্রস্ত হবে। لِيَقْتَرِفُوْا অর্থ তারা যেন অর্জন করে।

١١٤. وَنَزَلَ لَمَّا طَلَبُوْا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ حَكَمًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ أَطْلُبُ حَكَمًا قَاضِيًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ مُفَصَّلًا مُبَيَّنًا فِيْهِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهٖ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ الشَّاكِّيْنَ فِيْهِ وَالْمُرَادُ بِذٰلِكَ التَّقْرِيْرُ لِلْكُفَّارِ أَنَّهٗ حَقٌّ .

১১৪. তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট তাঁর ও তাদের মধ্যে একজন সালিস নিয়ুক্তির দাবি জানালে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– বল, তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য একজন সালিস আমার ও তোমাদের মধ্যে অপর একজন বিচারক তালাশ করব? অনুসন্ধান করব? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি বাতিল হতে হকের পরিষ্কার পার্থক্যকরণ সংবলিত সুস্পষ্ট কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যাদেরকে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত প্রদান করেছি তারা যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গীগণ জানে যে তা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। مُنَزَّلٌ শব্দটি [ز -এ] তাশদীদ সহ ও তাশদীদ ব্যতীত উভয় রূপেই পাঠ করা যায়। সুতরাং তুমি দ্বিধাকারীদের সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। এ আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের সম্মুখে এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলা যে তা সত্য।

١١٥. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ بِالْأَحْكَامِ وَالْمَوَاعِيْدِ صِدْقًا وَّعَدْلًا تَمْيِيْزٌ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ بِنَقْصٍ أَوْ خُلْفٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا يُقَالُ الْعَلِيْمُ بِمَا يُفْعَلُ .

১১৫. সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী বিধিবিধান ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে হ্রাস বা উলটপালট করত তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি যা বলা হয় অতি শোনেন এবং যা করা হয় তা খুবই জানেন। صِدْقًا وَّعَدْلًا শব্দদ্বয় এ স্থানে تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٦. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ أَيِ الْكُفَّارِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهٖ إِنْ مَا يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ فِيْ مُجَادَلَتِهِمْ لَكَ فِيْ أَمْرِ الْمَيْتَةِ إِذْ قَالُوْا مَا قَتَلَ اللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَأْكُلُوْهُ مِمَّا قَتَلْتُمْ وَإِنْ مَا هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ يَكْذِبُوْنَ فِيْ ذٰلِكَ .

১১৬. যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের অর্থাৎ কাফেরদের কথামতো চল তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর ধর্ম হতে বিচ্যুত করবে। তারা তো মৃত বস্তু নিয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদে কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ -এর إِنْ শব্দটি এ স্থানে না-বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলে, 'তোমাদের কর্তৃক নিহত বস্তু আহার করা অপেক্ষা আল্লাহ কর্তৃক নিহত বস্তু আহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত।' আর তারা তো শুধু ধারণাই করে। এ বিষয়ে কেবল মিথ্যাই বলে। إِنْ هُمْ এ স্থানেও إِنْ শব্দটি না-বাচক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١١٧. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ أَيْ عَالِمٌ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ فَيُجَازِيْ كُلًّا مِنْهُمْ .

১১৭. তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় তোমার প্রতিপালক সে সম্বন্ধে অধিক অবহিত অর্থাৎ তিনি তা জানেন। এবং কে সৎ পথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি প্রত্যেককেই [illegible]র্মর প্রতিফল দান করবেন।

١١٨. فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَىْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ .

১১৮. তোমারা তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হলে যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে তা আহার করা।

١١٩. وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنَ الذَّبَائِحِ وَقَدْ فُصِّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَلِلْفَاعِلِ فِى الْفِعْلَيْنِ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِىْ اٰيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط مِنْهُ فَهُوَ اَيْضًا حَلَالٌ لَّكُمْ الْمَعْنٰى لَا مَانِعَ لَكُمْ مِنْ اَكْلِ مَا ذُكِرَ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْمُحَرَّمَ اَكْلُهُ وَهٰذَا لَيْسَ مِنْهُ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا بِاَهْوَائِهِمْ بِمَا تَهْوَاهُ اَنْفُسُهُمْ مِنْ تَحْلِيْلِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط يَعْتَمِدُوْنَهُ فِىْ ذٰلِكَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ الْمُتَجَاوِزِيْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ .

১১৯. তোমাদের হয়েছে কি যে, যাতে অর্থাৎ যে সমস্ত জবাইকৃত প্রাণীতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তোমরা তা আহার করবে না? অথচ فُصِّلَ وَحُرِّمَ এ দুটি ক্রিয়া مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য ও مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ এ আয়াতটিতে তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তোমারা যদি নিরুপায় হও। তবে এগুলোও [নিষিদ্ধগুলোও] তোমাদের জন্য আহার করা হালাল। অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুসমূহ আহার করায় তোমাদের কোনো বাধা নেই। যেগুলো আহার করা নিষিদ্ধ তা পূর্বে বর্ণনা করে দিয়েছি। আর এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেক অজ্ঞানতা বশত অর্থাৎ তদ্বিষয়ে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ব্যতীত নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা অর্থাৎ মৃত বস্তু হালাল করা যা তাদের মন চায় তা দ্বারা নিশ্চয় অন্যকে বিপথগামী করে। لَيُضِلُّوْنَ তার ى টি ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে অর্থাৎ যারা হালালের সীমা অতিক্রম করত, হারাম গ্রহণ করে তাদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

١٢٠. وَذَرُوْا اُتْرُكُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ ط عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ وَالْاِثْمُ قِيْلَ الزِّنَا وَقِيْلَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ يَكْتَسِبُوْنَ .

১২০. তোমরা প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্য পাপ ত্যাগ কর বর্জন কর। এ স্থানে পাপ বলতে কেউ কেউ বলেন ব্যভিচার; অপর কতকজন বলেন, সাধারণভাবে সকল পাপকেই বুঝানো হয়েছে। যারা পাপ করে তাদেরকে পরকালে তারা যা করেছে, যা অর্জন করেছে এর সমুচিত প্রতিফল দেওয়া হবে।

١٢١. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِاَنْ مَاتَ اَوْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ وَاِلَّا فَمَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ وَلَمْ يُسَمِّ فِيْهِ عَمَدًا اَوْ نِسْيَانًا فَهُوَ حَلَالٌ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاِنَّهٗ اَيِ الْاَكْلَ مِنْهُ لَفِسْقٌ ط خُرُوْجٌ عَمَّا يَحِلُّ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ يُوَسْوِسُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ الْكُفَّارِ لِيُجَادِلُوْكُمْ ط فِيْ تَحْلِيْلِ الْمَيْتَةِ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ فِيْهِ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ .

১২১. যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি অর্থাৎ যা মারা গেল বা অন্যের নামে জবাই করা হলো তা আহার করো না। কিন্তু কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি জবাই করে, আর ইচ্ছা করে হোক বা ভুল বশত সে যদি তাতে আল্লাহর নাম না-ও নেয় তবুও তা হালাল। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমতও অনুরূপ। তা অর্থাৎ এর কিছু আহার করা অবশ্যই পাপ ও হালালের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য। শয়তান তার বন্ধুদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে মৃত প্রাণীকে হালাল করার বিষয়ে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়, মন্ত্রণা দেয়। যদি তোমরা তাতে তাদের কথামতো চল তবে তোমরা অবশ্যই অংশীবাদী বলে সাব্যস্ত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَمْعُ قَبِيْلٍ : قُبُلٌ শব্দটি قَبِيْلٌ -এর বহুবচন। যেমন رُغُفٌ টি رَغِيْفٌ -এর বহুবচন। অর্থ- জামাত, দল। কারো কারো মতে এটা قُبُلٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো দৃষ্টির সম্মুখে, قُبُلًا টা كُلَّ থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَيٰطِيْنَ : এটা عَدُوًّا হতে بَدَلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَرَدَةً : এ শব্দটি বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে شَيَاطِيْنَ দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মানুষ প্রকৃত শয়তান হতে পারে না, অবাধ্যতার কারণে মানুষকে শয়তান বলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ يُوَسْوِسُ : يُوَسْوِسُ -এর মাধ্যমে يُوْحِيْ-এর তাফসীরকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. শয়তানের দিকে ওহীর নিসবত করা বৈধ নয়; বরং অসম্ভব।

উত্তর. ওহী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা। কাজেই কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ جَعَلْنَا هٰؤُلَاءِ اَعْدَائَكَ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যে, جَعَلَ টা صَيَّرَ অর্থে যা দুটি মাফউল কামনা করে। প্রথম মাফউল হলো عَدُوًّا যা مُؤَخَّرٌ হয়েছে। আর لِكُلِّ نَبِيٍّ হলো দ্বিতীয় মাফউল যা مُقَدَّمٌ হয়েছে। আর شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ এটা عَدُوًّا হতে بَدَلٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ عَدُوًّا -কে দ্বিতীয় মাফউল বলেছেন, আর شَيَاطِيْنَ -কে প্রথম মাফউল বলেছেন। আর لِكُلِّ টা উভয়ের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে عَدُوًّا থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَرَدَةٌ : এটা مَارِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ- অবাধ্য।

قَوْلُهُ لِيَغُرُّوْهُمْ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, غُرُوْرًا টা مَفْعُوْلٌ لَهٗ হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى غُرُوْرًا : لِتَصْغٰى -এর عَطْفٌ হয়েছে غُرُوْرًا -এর উপর। لِتَصْغٰى টাও যেহেতু يُوْحِيْ -এর ইল্লত হয়েছে, কাজেই مَعْطُوْفٌ এবং مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর উপর عَدَمُ مُنَاسَبَتْ -এর প্রশ্নও হতে পারে না।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِذَالِكَ التَّقْرِيْرِ اَنَّهُ حَقٌّ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি সংশয়ের অপনোদন উদ্দেশ্য।

সংশয় : فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ -এর মধ্যে পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-কে কোনোরূপ সংশয় পোষণ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ সংশয় পোষণ করার তো কোনো প্রশ্নই ছিল না। কেননা কুরআন তো স্বয়ং রাসূল ﷺ -এর উপরই অবতীর্ণ হচ্ছিল, তাহলে পুনরায় সংশয় পোষণের অর্থ কি?

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, اَمْرَاءُ-এর সম্পর্ক হলো কুরআনের সত্য হওয়ার ব্যাপারে আহলে কিতাবের জ্ঞানের সাথে, অর্থাৎ কাফেরদের থেকে কুরআন সত্য হওয়া ও আল্লাহর পক্ষ থেকে অতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করানো।

এর দ্বিতীয় উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, বাক্যের মধ্যে تَعْرِيْض বা ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ সম্বোধন যদিও রাসূল ﷺ -কে করা হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাবী কাফেররা।

قَوْلُهُ تَمَّتْ : এর অর্থ হলো- بَلَغَتِ الْغَايَةَ اِخْبَارُهُ مَوَاعِيْدُهُ

قَوْلُهُ صِدْقًا وَعَدْلًا : এখানে صِدْقًا-এর সম্পর্ক হয়েছে مواعيد-এর সাথে। আর عَدْلًا-এর সম্পর্ক হয়েছে اَحْكَام -এর সাথে। এটা لَفٌّ نَشْرٌ غَيْرُ مُرَتَّبٍ -এর ভিত্তিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيْ عَالِمٌ : মুসান্নেফ (র.) اَعْلَمُ -এর তাফসীর عَالِمٌ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন।

প্রশ্ন. اِسْمُ تَفْضِيْل টা اِسْمُ ظَاهِرْ -কে নসব দেয় না তবে শুধুমাত্র مَسْئَلَةُ الْكُحْلِ -এর ক্ষেত্রে, যা নাহুশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। অথচ এখানে اَعْلَمُ ইসমে তাফযীল مَنْ يَضِلُّ -কে নসব দিচ্ছে। কেননা مَنْ يَضِلُّ টা নসবের স্থানে রয়েছে।

উত্তর. مَنْ يَضِلُّ টা اَعْلَمُ-এর কারণে مَنْصُوْب হয়নি; বরং اَعْلَمُ টা عَالِمٌ অর্থে হওয়ার কারণেই مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইসলামের দুশমনদের দুশমনির কথা উল্লিখিত হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের দুশমনির বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে পবিত্র কুরআনকে যারা বিদ্রূপ করত তাদের মধ্যে এ পাঁচজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

১. ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা আল মাখযুমী ২. আছি ইবনে ওয়ায়েলুছ সাহমী ৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছজ জুহরী ৪. আসওয়াদ ইবনুল মোত্তালিব ৫. আলহারম ইবনে হানজালা। তারা একবার দলেবলে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, যদি ফেরেশতারা আমাদের সম্মুখে এসে সাক্ষ্য দেয় অথবা আমাদের মৃত ব্যক্তি এসে আপনার সত্যতার কথা বলে তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। কাফেরদের এ কথারই জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন-

"যদি আমি ফেরেশতাদেরকে আসমান থেকে নাজিল করি আর ফেরেশতাগণ আল্লাহর নবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে, এভাবে কবর থেকে মৃত ব্যক্তিরা উঠে আসে এবং আল্লাহর নবীর সত্যতার কথা প্রকাশ করে এমনকি যদি পূর্বকালের সমস্ত উম্মতকে পুনর্জীবন দান করা হয় এবং তারা এই দুরাত্মা কাফেরদের সম্মুখে হাজির হয় তবুও তারা ঈমান আনবে না। কোনো অবস্থাতেই তারা সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না। এর কারণ, তাদের হীন এবং নীচ প্রবৃত্তি, তাদের হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, তাদের জেদ হঠকারিতা এবং অহমিকা। এসব চারিত্রিক দুর্বলতাই তাদের ঈমানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এসব বাধা তারা অতিক্রম করবে না তাই ঈমানও আনবে না।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ : তবে হ্যাঁ, স্বয়ং আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে সকল পৌত্তলিককেই তিনি বলপূর্বক মু'মিন বানাতে পারেন। এমন অবস্থায় তাদের একজনও মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ পাক জবরদস্তি করা বা বলপ্রয়োগের নীতি পছন্দ করেন না। ঈমান আনতে হবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ : কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। কেননা তারা মূর্খ। আর মূর্খতার কারণেই তারা এমন মু'জিযা দেখতে চায় যা তাদের জন্যে মহাবিপদের কারণ হতে পারে। কেননা যদি এমন মু'জিযা দেখানোর পরও তারা ঈমান না আনে তবে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ এবং তাদের শাস্তি হবে অনিবার্য। মূর্খতাবশত তারা এ সত্য উপলব্ধি করে না বলেই এমন মু'জিযা দাবি করে।

-[তাফসীরে কবীর, খ. ১৩, পৃষ্ঠা-১৪৯-১৫০ ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৮৩]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী তাদের মূর্খতার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তাদের জাহালত বা মূর্খতা এই যে, তারা ঈমান আনয়নের ইচ্ছাই করে না। তাদের মধ্যে ঈমান লাভের অন্বেষণ নেই। অথচ তারা বিস্ময়কর, অলৌকিক বস্তু তথা মু'জিযা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আল্লাহর নবীর আসল শিক্ষা এবং ঈমানের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে তারা চিন্তাই করে না। আর আল্লাহর নবীকে তারা জাদুকর মনে করে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা এই সত্যই উপলব্ধি করে না যে, মু'জিযা প্রদর্শনের ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে, বান্দার হাতে নয়।

–[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৩০৭ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী, খ. ২, পৃ. ৫১৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) এ কথাও লিখেছেন যে, কোনো নবীর জন্যে একটি মু'জিযা জরুরি যেন মানুষ সত্যবাদী এবং মিথ্যবাদীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু যখন কোনো সম্প্রদায় একাধিক মু'জিযা দাবি করে এবং একটি মু'জিযা দেখার পর আর একটির দাবি উত্থাপিত হয় তখন বুঝতে হবে যে, এ সম্প্রদায় সত্য গ্রহণে ইচ্ছুক নয়, বরং একাধিক মু'জিযা প্রদর্শনের দাবির মধ্যেই রয়েছে তাদের হঠকারিতা এবং জেদ। আর যারা ঈমানের ব্যাপারে হঠকারিতা করে, জেদ ধরে তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। –[তাফসীরে কবীর, খ. ১৩, পৃ. ১৫০]

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা : এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শাওকানী (রা.) লিখেছেন যে, এতে সান্ত্বনা রয়েছে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্যে। কেননা কাফেরদের আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান না আনার কারণে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হতেন। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যেভাবে এই কাফেররা ঈমান আনে না এবং পবিত্র কুরআনের তথা ইসলামের প্রতি বিদ্রূপ করে ঠিক তেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের সঙ্গেও মানবতার দুশমনরা অনুরূপ ব্যবহার করেছে। অতএব, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা বা আপনার সাথে শত্রুতা করা, মু'মিনদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা নতুন কিছু নয়। –[তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ১৫৩]

হক ও বাতিলের সংঘর্ষ যুগে যুগে : বস্তুত সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীতে ভালো-মন্দ এবং পাপ-পুণ্যের, সত্য-অসত্যের সংঘর্ষ বিদ্যমান রয়েছে। একদিকে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আগমন করেছেন নবী-রাসূলগণ। অন্যদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট করার জন্যে সচেষ্ট রয়েছে শয়তানি শক্তি। তাই আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে শয়তানি শক্তির সংঘর্ষ হয়েছে যুগে যুগে। আলোচ্য আয়াতে এ সত্যেরই ঘোষণা রয়েছে যে, হে রাসূল! যেমন এ যুগের দুরাত্মা কাফেররা আপনার সাথে শত্রুতা করেছে, আপনার বিরোধিতা করছে প্রতি পদক্ষেপে, ঠিক এভাবেই মানুষ ও জিনের মধ্যে যারা শয়তান তারা প্রত্যেক নবীকে কষ্ট দিয়েছে। অতএব, এদের আচরণে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা এ শয়তানদের আচরণ যেমন চির পরিচিত তেমনি চির নিন্দিতও।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছে যে হে রাসূল! আপনি চিন্তিত হবেন না, যেভাবে আপনার যুগের কাফেররা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেছে এবং আপনার বিরোধিতা করছে ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক নবীর সাথে তাদের যুগের কাফেররা এমন ব্যবহারই করেছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন– وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ [হে রাসূল!] আপনার পূর্বে আগমনকারী রাসূলগণকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে যার উপর তারা ধৈর্যধারণ করেছেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ওহী নাজিল হয় তখন হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রা.) প্রিয়নবী ﷺ -কে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিলেন, আপনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন, এ বাণী যিনিই ইতঃপূর্বে এনেছেন তাঁর সাথে শত্রুতা করা হয়েছে।

শয়তান হলো মানুষের শত্রু : নবীগণের শত্রু দুষ্ট মানুষও হয় এবং দুষ্ট জিনও হয়, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ইরশাদ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে এবং জিনের মধ্যেও। বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত আবূ যর (রা.) নামাজ আদায় করেছিলেন তখন প্রিয়নবী ﷺ বললেন, তুমি কি জিন ও মানুষ শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করেছ? হযরত আবূ যর (রা.) আরজ করেন, মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, রয়েছে। আর মানুষ শয়তান জিন শয়তান থেকেও মারাত্মক।

قَوْلُهُ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا : অর্থাৎ এ শয়তানদের কাজ হলো মানুষকে তারা প্রতারণা করে, একে অন্যের কাছে তারা মানুষকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে কথা সাজিয়ে বলে। এভাবে যেন মানুষ সহজে তাদের প্রতি আকৃষ্ট এবং প্রতারিত হয়। যেহেতু আখেরাতে তাদের বিশ্বাস নেই, তাই তারা এমন অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে।
–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু], খ. ৯, পৃ. ৫]

قَوْلُهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ : অর্থাৎ যদি আপনার পরওয়ারদেগার ইচ্ছা করতেন তবে এ দুরাত্মারা এমন কাজ করতে পারত না। কিন্তু যেহেতু কোনো লোককে ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা আল্লাহ পাকের নীতি বিরুদ্ধ কাজ, তাই আল্লাহ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব, হে রাসূল! আপনিও তাদেরকে ছেড়ে দিন, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ছানাউল্লা পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো মু'মিনকে প্রতারণা করা যখন ইবলিস শয়তানের পক্ষে সম্ভব না হয় তখন সে দুষ্ট লোকের নিকট যায় এবং মু'মিন বান্দাকে প্রতারিত করার জন্যেই দুষ্ট লোকটিকে প্ররোচনা দেয়। হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হাদীসেও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। উক্ত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ একথাও বলেছেন যে, মানুষ শয়তান জিন শয়তান থেকেও মারাত্মক হয়। মালেক ইবনে দীনারের কথা হলো জিন শয়তানের চেয়ে মানুষ শয়তান অধিকতর কঠোর হয়, তার প্রমাণ এই যে, আমি যখন জিন শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি তখন সে আমার নিকট থেকে চলে যায় কিন্তু মানুষ শয়তান আমাকে গুনাহর দিকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট থাকে।

তাফসীরকার ইকরামা, যাহহাক, সুদ্দী এবং কালবীর মতে মানুষ শয়তান বলতে বুঝানো হয়েছে সেই শয়তানগুলোকে যারা মানুষকে প্রতারণা করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। কেননা মানুষ শয়তান হয় না। আর জিন শয়তান হলো সেগুলো যারা জিনদেরকে প্রতারণা করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। ইবলিস তার সৈন্যদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। একভাগ জিনদেরকে প্রতারণা করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, আর একভাগ মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। উভয় দলই প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদের দুশমন। প্রত্যেক দল সর্বদা অন্য দলের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং বলে যে আমি এভাবে অমুককে প্রতারিত করেছি তুমিও এভাবেই মানুষকে প্রতারিত কর। জিন শয়তান মানুষ শয়তানকে এভাবেই বলে। আর এ অর্থেই ইরশাদ হয়েছে– يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ অর্থাৎ তারা একে অন্যকে এভাবেই নিজেদের প্রতারণার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করত।
–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ৭, পৃ. ৫; তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ২০২]

আল্লামা আলূসী (র.) আরেকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, জিন জিনই, তারা শয়তান নয়। আর শয়তান হলো ইবলিসের বংশধর। তাদের মৃত্যু হবে ইবলিসের মৃত্যুর সময়। আর জিনের মৃত্যু হয়ে থাকে সর্বদা। জিন মু'মিনও হয় এবং কাফেরও হয়। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৩, পৃ. ১৫৪]

ইমাম রাযী (রা.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে "শায়াতীন" যাদেরকে বলা হয়েছে তারা হলো দুষ্ট জিন বা মানুষ। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শয়তান যে সর্বদা জিনই হবে তা নয় বরং কোনো সময় মানুষ শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, এ মত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহেদ, হাসান, এবং কাতাদা (রা.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ পোষণ করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, যারা গণক তারা হলো মানুষ শয়তান।

قَوْلُهُ وَلِتَصْغٰى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ : অর্থাৎ যাতে করে শয়তানদের বানানো এবং সাজানো কথার দিকে সেসব লোকের মন আকৃষ্ট হয় যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না।

এর দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শয়তান ওয়াসওয়াসা কেন দেয় তার কারণ কি একথা প্রকাশ করা। অর্থাৎ এবং সাজানো কথার প্রতি মানব মনকে আকৃষ্ট করাই হলো শয়তানের প্ররোচনার উদ্দেশ্য।

আখেরাতের প্রতি ঈমান হলো রক্ষাকবচ : এ আয়াত দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষা করার মৌলিক পন্থা হলো আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস। আখেরাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসই হলো এ পর্যায়ে মানুষের জন্যে রক্ষাকবচ। যে আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, যে একথা মনে করে যে অবশেষে আমার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব পেশ করতে হবে। ভালোকাজের জন্যে রয়েছে পুরস্কার এবং মন্দকাজের জন্যে রয়েছে শাস্তি সে শয়তানের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হবে না। এ জন্যে পবিত্র কুরআনে আখেরাতের কথা বহুবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আরো কয়েকটি কথা প্রমাণিত হয়। শয়তানের প্ররোচনার কারণে সর্বপ্রথম মানব মন মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَلِتَصْغٰى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ

আর দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যায় কাজকে মানুষ পছন্দ করে তাই ইরশাদ হয়েছে- وَلِيَرْضَوْهُ

এবং তৃতীয় পর্যায়ে মানুষ মন্দ এবং নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয় তাই ইরশাদ হয়েছে- وَلِيَقْتَرِفُوْا

কিন্তু এ অবস্থা তাদের হয় যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস রাখে তারা শয়তানের প্রতারণার প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ পাকের নিকটি শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

-[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৩০৭]

قَوْلُهُ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আলোচিত হয়েছিল যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সত্য ও অভ্রান্ত হওয়ার পক্ষে খোলাখুলি মু'জিযা ও প্রমাণাদি দেখা ও জানা সত্ত্বেও হঠকারিতাবশত বিশেষ ধরনের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি করে, কুরআন পাক তাদের বক্র দাবির উত্তরে বলেছে যে, তারা যেসব মু'জিযা এখন দেখতে চায়, সেগুলো প্রকাশ করাও আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু হঠকারীরা এগুলো দেখার পরও অবাধ্যতা পরিহার করবে না। আল্লাহর চিরাচরিত আইনানুসারে অতঃপর এর ফলশ্রুতি হবে এই যে, সবাইকে আজাব গ্রাস করে নেবে।

এ কারণেই দয়ার সাগর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রার্থিত মু'জিযা প্রকাশ করতে দয়াবশত অস্বীকার করেন এবং যেসব মু'জিযা এ যাবৎ তাদের সামনে এসে গিয়েছিল, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য তাদেরকে বানিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাক সত্য এবং আল্লাহর কালাম।

প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে রিসালত ও নবুয়তে মতবিরোধ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিদ্যমান। আমি রিসালতের দাবিদার এবং তোমরা অবিশ্বাসী। শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে আমার পক্ষে এ বিষয়ের ফয়সালা এভাবে দেওয়া হয়ে গেছে যে, আমার দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি হচ্ছে স্বয়ং কুরআনের অলৌকিকতা। কুরআন বিশ্বের সকল জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে যে, এটি আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে যদি কারও সন্দেহ থাকে তবে সে এ কালামের একটি ছোট সূরা কিংবা আয়াতের অনুরূপ সূরা কিংবা আয়াত উপস্থিত করে দেখাক। এ চ্যালেঞ্জের জওয়াবে সমগ্র আরব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, সন্তানসন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু কুরবান করেছিল, তাদের মধ্যে থেকে একটি লোকও এমন বের হলো না, যে কুরআনের মোকাবিলায় দুটি আয়াতও রচনা করে দেখিয়ে দিতে পারে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি যিনি কোথাও কারও কাছে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি তিনি এমন বিস্ময়কর কালাম জনসমক্ষে পেশ করলেন, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব বরং সমগ্র বিশ্ব অক্ষম হয়ে পড়েছে। সত্য গ্রহণের জন্য এ খোলাখুলি মু'জিযাটি যথেষ্ট ছিল না কি? এটি প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠতম বিচারপতির এজলাস থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ফয়সালা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর সত্য রাসূল এবং কুরআন আল্লাহর সত্য কালাম।

প্রথম আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا অর্থাৎ তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ তা'আলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোনো ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কুরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কুরআনের সত্যতা এবং আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে- هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا এতে কুরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে- ১. কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। ২. এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ এর মোকাবিলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। ৩. যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৪. পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশ করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কুরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে- فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না। যেমন স্বয়ং তিনি বলেন, আমি কোনো সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি। -[ইবনে কাসীর] এতে বোঝা গেল যে, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোককে শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, তখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াতে কুরআন পাকের আরও দুটি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কুরআন পাক যে আল্লাহর কালাম এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে- تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিকে দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কলামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই।

تَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। [বাহরে-মুহীত] কুরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু-প্রকার। ১. যাতে বিশ্ব-ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি, অবস্থা, সৎকাজের জন্য পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎকাজের জন্য শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং ২. যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ দু-প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কুরআন পাকের صِدْقًا وَّعَدْلًا দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে । صِدْق -এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে। অর্থাৎ কুরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনোরূপ ভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। عَدْل -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার সব বিধান عَدْل তথা ন্যায়বিচারভিত্তিক। عَدْل শব্দের দুটি অর্থ এক. ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা না হয়। দুই. সমতা ও সুষমতা।

অর্থাৎ আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোনো কঠোরতাও নেই, যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোনো বাধ্যকতা আরোপ করেন না। আলোচ্য আয়াত تَمَّتْ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কুরআনে শুধু صِدْق وَعَدْل বিদ্যমানই নয়, বরং কুরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কুরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক একথাটি একমাত্র আল্লাহ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোনো আইন সভা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোনো রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতার পরিপন্থি দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কুরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি [অর্থাৎ কুরআনের বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলি, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন সবই সত্য, এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই। কুরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্য সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লঙ্ঘন নেই।] কুরআন যে আল্লাহর কালাম তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ অর্থাৎ আল্লাহর কালামের কোনো পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোনো ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহর কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনের উর্ধ্বে। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন- اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য অছে যে, এ রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? কুরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশি ছিল, কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কুরআন সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কাজের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কুরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে– وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অন্যত্র বলা হয়েছে– وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে–

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধিবিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহর পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদের যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরও পুরস্কৃত করবেন।

বিসমিল্লাহ বিনে জবাইকৃত জন্তুর বিধান : যেহেতু لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেই জন্তু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি তা ভক্ষণ করো না। এ জন্যই এ সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা সন্নিবেশন করা যথোপযুক্ত মনে করছি।

ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আহমদ ও ইবনে সীরীন (র.) তা খাওয়া জায়েজ নয়। চাই স্বেচ্ছায় বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করুক বা ভুলবশত করুক। উল্লিখিত আয়াতটি তাঁদের দলিল।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত : তাঁদের মতে ভুলবশত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে তা খাওয়া জায়েজ।

দলিল :

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে ভুলবশত বিসমিল্লাহ বিনে জবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূল ﷺ বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের রসনায় আল্লাহর নাম বিদ্যমান রয়েছে। [দারাকুতনী] অপর বর্ণনায় রসনার পরিবর্তে অন্তঃকরণের উল্লেখ রয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমান যদি জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায় তবুও তা আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে ফেলো।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ ইচ্ছাকৃত পরিত্যাগ করুক বা ভুলবশত পরিত্যাগ করুক! সেই জন্তু খাওয়া বৈধ। তাঁর দলিল হলো– প্রত্যেক মু'মিনের হৃদয়ে আল্লাহর নাম রয়েছে।

আর তিনি বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করা দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। কেননা আলোচিত আয়াতে না খাওয়ার কারণ فِسْقٌ বলা হয়েছে। তিনি فِسْقٌ -এর মেসদাক সেই জন্তুকে নিয়েছেন যা আল্লাহ বিনে অন্য কারো নামে জবাই করা হয়েছে।

١٢٢. وَنَزَلَ فِيْ اَبِيْ جَهْلٍ وَغَيْرِهٖ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا بِالْكُفْرِ فَاَحْيَيْنٰهُ بِالْهُدٰى وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ يَبْصُرُ بِهٖ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِهٖ وَهُوَ الْاِيْمَانُ كَمَنْ مَّثَلُهٗ مَثَلُ زَائِدَةٌ اَيْ كَمَنْ هُوَ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا وَهُوَ الْكَافِرُ لَا كَذٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْاِيْمَانُ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِيْ ـ

অনুবাদ :

১২২. আবূ জাহল প্রমুখ কাফেরদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন যে ব্যক্তি কুফরির কারণে মৃত ছিল, অতঃপর সৎপথ প্রদর্শন করত যাকে আমি জীবিত করেছি এবং যাকে মানষের মধ্যে চলার জন্য আলো অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি যা দ্বারা সে সত্যকে অন্য বিষয় হতে পৃথক করে দর্শন করতে পারে সেই ব্যক্তি কি তার كَمَنْ مَّثَلُهٗ -এর مَثَلُ শব্দটি زَائِدَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তা হতে যে বাহির হওয়ার নয়? অর্থাৎ যে কাফের তার মতো? না, ঐ ব্যক্তি তার মতো নয়। এরূপ অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য যেমন ঈমান আনয়ন শোভন করে দেওয়া হয়েছে তেমনিভাবে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তাদের কৃতকর্ম অর্থাৎ কুফরি, অবাধ্যাচরণ ইত্যাদি শোভন করে রাখা হয়েছে।

١٢٣. وَكَذٰلِكَ كَمَا جَعَلْنَا فُسَّاقَ مَكَّةَ اَكَابِرَهَا جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا بِالصَّدِّ عَنِ الْاِيْمَانِ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ لِاَنَّ وَبَالَهٗ عَلَيْهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ بِذٰلِكَ ـ

১২৩. এমনিভাবে অর্থাৎ যেমনিভাবে মক্কাবাসীর প্রধানদেরকে অন্যায়াচারী বানিয়েছি তেমনিভাবে প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদেরকে প্রধান করেছি যেন তারা সেখানে ঈমান গ্রহণ হতে লোকদের বাধা প্রদান করত চক্রান্ত করে; কিন্তু মূলত তারা শুধু নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। কেননা তার মন্দ পরিণাম তাদের নিজেদের উপর বর্তাবে অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না।

١٢٤. وَاِذَا جَاۤءَتْهُمْ اَيْ اَهْلَ مَكَّةَ اٰيَةٌ عَلٰى صِدْقِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٖ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ مِنَ الرِّسَالَةِ وَالْوَحْيِ اِلَيْنَا لِاَنَّا اَكْثَرُ مَالًا وَاَكْبَرُ سِنًّا قَالَ تَعَالٰى اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ وَحَيْثُ مَفْعُوْلٌ بِهٖ لِفِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ اَعْلَمُ اَيْ يَعْلَمُ الْمَوْضِعَ الصَّالِحَ لِوَضْعِهَا فِيْهِ فَيَضَعُهَا وَهٰۤؤُلَاۤءِ لَيْسُوْا اَهْلًا لَهَا سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا بِقَوْلِهِمْ ذٰلِكَ صَغَارٌ ذُلٌّ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ اَيْ بِسَبَبِ مَكْرِهِمْ ـ

১২৪. যখন তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট রাসূল ﷺ -এর সত্যতার কোনো নির্দশন আসে তারা তখন বলে, আল্লাহর রাসূলগণকে যা অর্থাৎ যে রিসালত ও ওহী দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে তা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করব না। কেননা আমাদের বিত্ত-বৈভব অধিক, আমরা বয়সেও প্রবীণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ রিসালতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভালো জানেন। অর্থাৎ তার যোগ্য স্থান সম্পর্কে তিনিই অবহিত। সেস্থানেই তিনি ঐ ভার অর্পণ করেন। আর তারা [এ কাফেররা] এর যোগ্য নয়। সুতরাং তাদের এ দায়িত্বভার পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যারা এ কথা বলে অপরাধ করেছে তারা যে চক্রান্ত করে এর কারণে অর্থাৎ তাদের চক্রান্তের দরুন আল্লাহর নিকট হতে লাঞ্ছনা অবমাননা ও কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে। رِسٰلَتِهٖ এটা একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। حَيْثُ -এটা اَعْلَمُ ক্রিয়া কর্তৃক ইঙ্গিতকৃত উহ্য একটি ক্রিয়া [يَعْلَمُ] -এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ অর্থাৎ মুখ্য কর্ম।

١٢٥. فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ بِاَنْ يَّقْذِفَ فِىْ قَلْبِهٖ نُوْرًا فَيَنْفَسِخُ لَهٗ وَيَقْبَلُهٗ كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَنْ قَبُوْلِهٖ حَرَجًا شَدِيْدَ الضِّيْقِ بِكَسْرِ الرَّاءِ صِفَةٌ وَفَتْحِهَا مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهٖ مُبَالَغَةً كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يَصَّاعَدُ وَفِيْهِمَا اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ وَفِىْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا فِى السَّمَاءِ ط اِذَا كُلِّفَ الْاِيْمَانَ لِشِدَّتِهٖ عَلَيْهِ كَذٰلِكَ الْجَعْلِ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ الْعَذَابَ اَوِ الشَّيْطَانَ اَىْ يُسَلِّطُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

১২৫. আল্লাহ কাউকে সৎ পথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন। হাদীসে আছে যে, তিনি হৃদয়ে জ্যোতি সৃষ্টি করে দেন যা দ্বারা তা সম্প্রসারিত হয় ফলে সে তা কবুল করতে পারে। এবং কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার হৃদয় তা [ইসলাম] কবুল করার বিষয়ে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; ضَيِّقًا-এর ى -টি তাশদীদসহ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। ঈমানের জন্য চাপ দিলে এটা তার কাছে এত কঠিন লাগে ; حَرَجًا -এর ر -তে কাসরাসহ হলে এটা বিশেষণ বলে বিবেচ্য হবে। আর তা ফাতাহসহ হলে হবে مَصْدَرٌ অর্থাৎ ক্রিয়ামূল। এমতাবস্থায় এটাকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করা হবে مُبَالَغَةً বা অতিশয়োক্তি স্বরূপ। এর অর্থ, অতিশয় সংকীর্ণ। যে সে যেন আকাশে আরোহণ করছে। يَصَّعَّدُ এটা অপর এক কেরাতে يَصَّاعَدُ রূপে পঠিত রয়েছে। এ দুটিতেই [يَصَّعَّدُ এবং يَصَّاعَدُ] মূলত ص-এ ت-এর اِدْغَامٌ অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে বলে ধরা হবে। আর এক কেরাতে ص -এ সাকিনসহ পঠিত রয়েছে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এরূপে এ ধরনের লাঞ্ছিত করার মতো লাঞ্ছিত করেন অর্থাৎ তার উপর আজাব কিংবা শয়তানকে চাপিয়ে দেন।

١٢٦. وَهٰذَا الَّذِىْ اَنْتَ عَلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ صِرَاطُ طَرِيْقُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا لَا عِوَجَ فِيْهِ وَنَصْبُهٗ عَلَى الْحَالِ الْمُؤَكِّدَةِ لِلْجُمْلَةِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْاِشَارَةِ قَدْ فَصَّلْنَا بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ اَىْ يَتَّعِظُوْنَ وَخُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا .

১২৬. এটাই অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ তুমি যে পথে প্রতিষ্ঠিত তাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ صِرَاطُ অর্থ, পথ। এতে কোনো বক্রতা নেই। مُسْتَقِيْمًا এটা বাক্যটির তাকীদমূলক حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদরূপে مَنْصُوْبٌ ব্যবহৃত হয়েছে। هٰذَا এ ইঙ্গিতবাচক শব্দটির মর্মবোধক ক্রিয়া [يُشِيْرُ] এ স্থানে তার عَامِلٌ রূপে গণ্য। যে সম্প্রদায় শিক্ষা গ্রহণ করে يَذَّكَّرُوْنَ এতে মূলত ذ -এ ت -এর اِدْغَامٌ অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে। উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য বিশদভাবে নিদর্শন বর্ণনা করে দিয়েছি, বিবৃত করে দিয়েছি। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তারাই যেহেতু এটা দ্বারা উপকৃত হয় সেহেতু এ স্থানে বিশেষ করে তাদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

١٢٧. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اَىِ السَّلَامَةِ وَهِىَ الْجَنَّةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১২৭. তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির ঘর প্রশান্তির আলয় অর্থাৎ জান্নাত। এবং তারা যা করত তার জন্য তিনি তাদের বন্ধু।

١٢٨. وَ اذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ اَىِ اللّٰهُ الْخَلْقَ جَمِيْعًا ج وَيُقَالُ لَهُمْ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ج بِاَغْوَائِكُمْ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ الَّذِيْنَ اَطَاعُوْهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ اِنْتَفَعَ الْاِنْسُ بِتَزْيِيْنِ الْجِنِّ لَهُمُ الشَّهَوَاتِ وَالْجِنُّ بِطَاعَةِ الْاِنْسِ لَهُمْ وَبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِىْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ط وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَهٰذَا تَحَسُّرٌ مِنْهُمْ قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ النَّارُ مَثْوٰكُمْ مَاْوٰكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط مِنَ الْاَوْقَاتِ الَّتِىْ يَخْرُجُوْنَ فِيْهَا لِشُرْبِ الْحَمِيْمِ فَاِنَّهَا خَارِجَهَا كَمَا قَالَ تَعَالٰى ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ فِىْ مَنْ عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّهُمْ يُؤْمِنُوْنَ فَمَا بِمَعْنٰى مَنْ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهِ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ ـ

১২৮. এবং স্মরণ কর যেদিন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। يَحْشُرُ এটা نُوْن [অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন] ও ى সহ [নাম পুরুষরূপে] পঠিত রয়েছে। আর তাদেরকে বলা হবে হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্ররোচনার মাধ্যমে অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করেছিলে এবং মানব সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা অর্থাৎ যারা তাদের অনুসরণ করেছিল, তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা পরস্পরের আস্বাদ লাভ করেছি। অর্থাৎ জিনদের কর্তৃক মানুষের কুপ্রবৃত্তির মনোহর করা দ্বারা মানুষ লাভবান হয়েছে, আর মানুষ কর্তৃক এদের অনুসরণ দ্বারা জিনরা লাভবান হয়েছে। আর তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এখন আমরা তাতে উপনীত। এটা মূলত তাদের আফসোসের উক্তি। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ফেরেশতাদের জবানিতে বলবেন, অগ্নিই তোমাদের ঠিকানা অবাসস্থল। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যে সময় তারা হামীম অর্থাৎ উষ্ণ পানি পানের উদ্দেশ্যে বের হবে সেই সময়টা এর ব্যতিক্রম। কেননা এটা জাহান্নামের বাইরে অবস্থিত। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ অর্থাৎ অতঃপর জাহান্নামের দিকেই এদের প্রত্যাবর্তন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ উক্তিটি ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তারা একদিন ঈমান আনত। এমতাবস্থায় مَا শব্দটি مَنْ রূপে ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর কাজে অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١٢٩. وَكَذٰلِكَ كَمَا مَتَّعْنَا عُصَاةَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ نُوَلِّىْ مِنَ الْوَلَايَةِ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا اَىْ عَلٰى بَعْضٍ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِىْ ـ

১২৯. এরূপে অর্থাৎ যেভাবে অবাধ্যচারী জিন ও মানুষদের কতকজনকে কতকজন দ্বারা লাভবান করেছি সেভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের পাপাচারের **জন্য** জালিমদের একদলকে অপর দলের উপর আধিপত্য দান করি। نُوَلِّىْ এটা وَلَايَةٌ থেকে পঠিত ক্রিয়া। **অর্থ.** আধিপত্য দান করা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَثَلُ زَائِدَةٌ : যাতে করে تَكْرَارْ-এর সম্ভাবনা অবশিষ্ট না থাকে। অতিরিক্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, مَثَلُ টা হচ্ছে সিফত। যদি مَثَلُ-কে অতিরিক্ত মানা না হয় তবে صِفَتْ-এর ظُلُمَاتْ-এর মধ্যে হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ ظُلُمَاتْ-এর মধ্যে ذَاتْ হয়ে থাকে; صِفَتْ নয়।

قَوْلُهُ ضَيِّقًا بِالتَّخْفِيْفِ : এটা মাসদার। এ সুরতে حَمْل টা মুবালাগার ভিত্তিতে زَيْدٌ عَدْلٌ-এর অন্তর্গত মাজাযের ভিত্তিতে হবে। আর যদি তাশদীদ সহ হয় তবে صِفَتْ مُشَبَّهْ হবে।

قَوْلُهُ حَرَجًا : رَاءْ বর্ণে যের দিয়ে। صِفَتْ مُشَبَّهْ-এর সীগাহ শব্দের মতবিরোধের কারণে تَكْرَارْ-এর মধ্যে এক ধরনের حُسْن সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর বাকূন (র.) رَاءْ-কে যবর দিয়ে পড়েছেন। এ সুরতে এটা حَرَجَةٌ-এর বহুবচন হবে। অর্থ شِدَّةُ الضِّيْقِ আর যদি মাসদার হয় তবে حَمْل হবে মুবালাগার ভিত্তিতে।

قَوْلُهُ يَصَّعَّدُ : এটা বাবে تَفْعِيْل হতে আর يَصَّاعَدُ বাবে تَفَاعُلْ হতে।

قَوْلُهُ مِنَ الْوِلَايَةِ : اَلْوَلَايَةُ শব্দের وَاوْ বর্ণটি যবরযুক্ত অর্থ সাহায্য করা। আর وَاوْ বর্ণটি যেরযুক্ত হলে অর্থ হবে সুলতান, বাদশাহ। স্থানের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় অর্থ অধিক যথোপযুক্ত। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি عَلٰى بَعْضٍ এ অর্থকেই বুঝাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের কলহ-দ্বন্দ্বের উল্লেখ ছিল। এরপর মুসলমানগণকে তাদের অনুসরণ না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমান এবং কাফেরের সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যেন মুসলিম এবং কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় এবং একথা জানা যায় যে, কে নিন্দনীয় আর কে অনুসরণীয়।

শানে নুযূল : আবূ শায়খ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রা.) এবং আবূ জাহল সম্পর্কে আর ইবনে জারীর যাহহাকের এ বর্ণনারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত হযরত হামযা (রা.) এবং আবূ জাহল এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা হয়েছিল এই যে, আবূ জাহল হুজুর ﷺ-এর পৃষ্ঠ মোবারকে উষ্ট্রের নাড়িভুঁড়ি রেখে দিয়েছিল। হযরত হামযা (রা.) তখন শিকার থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি এ সংবাদ পেয়ে সরাসরি আবূ জাহলের নিকট রাগান্বিত অবস্থায় পৌছলেন। তার অবস্থা দেখে আবূ জাহল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, দেখুন মুহাম্মদ ﷺ আমাদের সম্মুখে কি পেশ করেছে। আমাদের উপাস্যদের গালি দিচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরোধিতা করছে। তখন হযরত হামযা (রা.) বলেছিলেন তোমার চেয়ে বড় আহাম্মক আর কে হবে? তুমি আল্লাহ পাককে বাদ দিয়ে পাথরের পূজা কর। আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। ইকরিমা এবং কালবী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আম্মার ইবনে ইয়াসির এবং আবূ জাহল সম্পর্কে।

–[তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ২০৯-১০]

এ তিনটি বর্ণনা একত্রে করলে দেখা যায় যে, مَثَلُهٗ فِى الظُّلُمَاتِ বাক্য দ্বারা আবূ জাহলকে বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে সকলেই একমত। তবে এর মোকাবিলায় মুসলমান কে? এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করা হয়েছে।

মু'মিন জীবিত আর কাফের মৃত : এ দৃষ্টান্তে মু'মিনকে জীবিত এবং কাফেরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বিষয়টি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রখেছে– اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى কুরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছার জন্য পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন

করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্টজীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয় মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয় তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে উঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মতো হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্টজগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশি কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদ্গত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা , পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্য নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিকে দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশি পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভালো প্রাকৃতিক পোশাক পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারে প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনিভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যত মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ ইত্যাদি কোনো কাজেই আসে না।

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে 'সৃষ্টির সেরা' পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মঞ্জিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরিউক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ । এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারী দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোনো বৃহত্তম হুঁশিয়ার জন্তুর জ্ঞানচেতনাও কাজ করে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোনো বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অপরকে এসব উপকারী বস্তসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অপরকে এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌঁছাতে হবে তখন কুরআনে এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে আল্লাহর প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি কখনও এ কাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন। মাওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন– زیر کان موشگا فان دهی * کرده هر خرطوم خط ابلهی

আল্লাহর প্রত্যাদেশের অনুসারী ও মু'মিন ব্যক্তিই যখন জীবনের লক্ষ্যের দিক দিয়ে জীবিত, তখন একথাও বোঝা গেল. যে ব্যক্তি এরূপ নয়, সে মৃত বলেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য। মাওলানা রুমীর ভাষায় জীবনের লক্ষ্য হলো–

زندگی از بہر طاعت وبندگی است * بے عبادت زندگی شرمندگی ست

آدمیت لحم وشحم وپوست نیست * آدمیت جز رضائے دوست نیست

এটি ছিল মু'মিন ও কাফেরের কুরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। মু'মিন জীবিত আর কাফের মৃত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঈমান ও কুফরের আলো ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার : ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয় বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত একমাত্র এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে : যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে সক্ষম। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু অপকারী সে তা বাছাই করতে সক্ষম নয়। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে, ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফের ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোনো খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোনো অনুভূতিও তার নেই। কুরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই বলেছে- يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ তারা বাহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বুঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফিল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কুরআন বলে- وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফিল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক ও প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোনো প্রভাব ছিল না।

এর বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন-

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ـ

উদ্দেশ্য এই যে, ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ কাফের ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ কুফরের অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চেনে না, অপরের কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় : এ আয়াতে نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ বলে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকাহ, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশ চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌছায়। আলো কোনো অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধাকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌছে না। কিরণ প্রখর হলে দূরে পৌছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায়ও সর্বযুগে মানুষের সাথে আছে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি, কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবেই সবাই তা দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে

মু'মিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু-না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফেরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, هر کس بخیال خویش خبطی دارد [প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিকে পোষণ করে।] শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে– এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। [নাউযুবিল্লাহ মিনহু]

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ : এ আয়াতে একদিকে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য, অন্য দিকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে দুরাত্মা কাফেরদের জন্য। ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! যেভাবে মক্কার দুর্বৃত্ত পৌত্তলিকরা আপনার বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে তথা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার চক্রান্ত করে চলেছে, ঠিক তেমনিভাবে অন্য নবীদের বিরুদ্ধেও সে যুগের দুষ্ট লোকেরা তাই করেছে। অতএব, মক্কার দুরাত্মা কাফেরদের অন্যায় আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই, কেননা যখনই এবং যেখানেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোনো নবী আগমন করেছেন, তখন সেখানকার বড় বড় দুষ্ট লোকেরা তাদেরকে মন্দ বলেছে, তাঁদের প্রতিরোধ করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে। হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউন, এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিরুদ্ধে নমরুদ যা করেছে, মক্কার আবূ জাহলরা প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাই করেছে, অতএব এটি দুষ্ট লোকদের পুরাতন নীতি।

তবে সব যুগেই পাপিষ্ঠ লোকদের সকল চক্রান্ত বিফল হয়েছে, তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তারা সত্যকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। ফেরাউন লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, নমরুদের পরিণামও শোচনীয় হয়েছে, হযরত নূহ (আ.)-এর অবাধ্য সম্প্রদায় অবশেষে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় প্লাবিত হয়ে শেষ হয়েছে। সামুদ সম্প্রদায়, আদ সম্প্রদায় চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আর সত্য সর্বকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে যুগে যুগে। অতএব, হে রাসূল! বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ইতিহাস সাক্ষী। অবশেষে তাই হয়েছিল। প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে নির্যাতিত অবস্থায় হিজরত করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মাত্র ৮ বছর পরই প্রিয়নবী ﷺ মক্কায় ফিরে এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দশ হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এবং আল্লাহর ঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠে এই আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল– وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا হে রাসূল! আপনি ঘোষণা করুন সত্য এসেছে মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেওয়ারই যোগ্য।

قَوْلُهُ مَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ : আর তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে। অথচ তা তারা বোঝে না। ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেররা যে ষড়যন্ত্র করে তার ভয়াবহ পরিণতি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা তা বোঝে না। মক্কায় পৌত্তলিকরা শহরের সকল প্রবেশদ্বারে তাদের লোক নিয়োগ করেছিল যারা শহরে আগমনকারীদেরকে প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে সতর্ক করে দিত যেন তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর কথা শ্রবণ না করে, তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয়।

وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ -এর শানে নুযূল : আল্লামা বগবী ইমাম কাতাদা (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবূ জাহল বলেছিল, আবদে মানাফের বংশধরেরা উচ্চ মর্যাদা অর্জনে আমাদের সঙ্গে লড়াই করছে। অবশেষে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এ কথা বলেছে যে, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন যার নিকট ওহী আসে। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও তাকে মানব না। আর কখনও তার অনুসারী হবো না। তবে যদি আমাদের নিকটও তেমনি ওহী আসে যেমন তার নিকট আসে তাহলে তাকে মানব।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ বলেছে, যদি নবুয়তে সত্যিই কোনো জরুরি বিষয় হয় তবে আমি তোমার চেয়েও নবুয়তের অধিকতর হকদার, কেননা আমার বয়স বেশি এবং ধনসম্পদও বেশি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ২১১ ; তাফসীরে কাবীর খ. ১৩, পৃ. ১৭৫]

নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয় বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান পদ : কুরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জবাবে বলেছে– اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, রিসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধেরা মনে করে রেখেছে যে, নবুয়ত বংশগত আভিজাত্য কিংবা গোত্রীয় সরদারি ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রিসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহর দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালত ও নবুয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলি অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহর বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না; বরং আল্লাহর এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরি যে, আল্লাহ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে– سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ এখানে صَغَارٌ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ– অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্র সরদার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতি সত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহর কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহর কাছে' এর এক অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সরদার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন পয়গাম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানিত বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবূ জাহল, আবূ লাহাব প্রমুখ কোরায়েশ সরদারের শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাসীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙে দেয়।

দীন সম্পর্কে অন্তর খুলে দেওয়া এবং এর লক্ষণাদি : তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্টতায় অটল ব্যক্তিদের কিছু চিহ্ন ও লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দিতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে شَرْحُ صَدْر অর্থাৎ অন্তর খুলে দেওয়ার তাফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় [সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে]। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মতো কোনো লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে– وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তাফসীরবিদ কালবী বলেন, তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্য কোনো পথ থাকে না। হযরত ফারূকে আজম (রা.) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর জিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কেরাম দীনের ব্যাপারে উন্মুক্ত অন্তর ছিলেন : আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গে এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ইসলামি বিধিবিধানে তারা খুব কমই সন্দেহ-সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবন যেসব প্রশ্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুনতি কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গের কল্যাণ আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شَرْحُ صَدْر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের অন্তরে পথ খুঁজে পেত না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা : আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্কবিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں
ڈور کو سلجھا رہا ہے پرسرا ملتا نہیں

অর্থাৎ দার্শনিক তর্কবিতর্কের মধ্যে আল্লাহকে পায় না। সে সুতা ভাঁজ করে, কিন্তু সুতার মাথা খুঁজে পায় না।

সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে- رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- كَذٰلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : আর এভাবেই আমি পাপিষ্ঠদেরকে তাদের কার্যকলাপের কারণে একে অন্যের সাথী করে দেই। শয়তান জিন আর তাদের মানবরূপী বন্ধুদের ভয়াবহ পরিণতির ন্যায় অন্যান্য জালেম পাপিষ্ঠদের পরিণতিও হবে ভয়াবহ। তাদের পাপ যত বেশি হবে শাস্তিও হবে তত বেশি। আল্লাহর নাফরমানির ব্যাপারে দুনিয়াতে যেমন তারা একমত ছিল দোজখেও তাদেরকে এভাবে একত্রিত করা হবে।

তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন-

১. আর যেভাবে আমি কাফের জিন ও মানুষকে দুনিয়াতে একে অন্যের দ্বারা নিজ নিজ মতলব উদ্ধারের সুযোগ দিয়েছি ঠিক তেমনিভাবে তাদের কৃতকর্মের কারণে দোজখে তাদেরকে কাছাকাছি রাখব।

২. نُوَلِّيْ শব্দটির অর্থ একজনকে অন্যের বন্ধু বানানো অর্থাৎ মু'মিনকে মু'মিনের বন্ধু এবং কাফেরদেরকে কাফেরদের বন্ধু বানিয়ে দেই। এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে সত্যসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে, কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করে। পক্ষান্তরে এক কাফের অন্য কাফেরকে মন্দ ও ঘৃণ্য কাজে উৎসাহিত করে এবং একে অন্যকে সাহায্য করে।

৩. ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো আমি দোজখে কাফেরদেরকে একের পর এককে কাতারবন্দী করে প্রেরণ করব। نُوَلِّيْ শব্দের আরেকটি অর্থ হলো একে অন্যের কাছাকাছি থাকা অর্থাৎ এই কাফেররা দোজখে একে অন্যের কাছাকাছি থাকবে।

৪. আর এ শব্দটির অর্থ কোনো কিছু সোপর্দ করাও হয়। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে আমি কোনো কোনো কাফের মানুষকে কাফের জিনের নিকট এবং কোনো কাফের জিনকে কাফের মানুষের সোপর্দ করি।

৫. কালবী (র.) আবূ সালেহের সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক যখন কোনো সম্প্রদায়ের কল্যাণের মর্জি করেন নেককার লোকদেরকে তাদের শাসক নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ পাক কোনো সম্প্রদায়ের অকল্যাণ চান তখন মন্দ লোকদেরকে তাদের শসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ কথার আলোকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, আমি কোনো কোনো জালেমকে অন্য জালেমদের উপর প্রবল করে দেই আর এক জালেমের মাধ্যমে অন্য জালেমকে পাকড়াও করি।

কালবীর এ ব্যাখ্যার আলোকে হযরত আলী (রা.)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। যখন ঘাতক ইবনে মুলজিমের আঘাতে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের সময় ঘনিয়ে আসে তখন লোকেরা তাঁর খেদমতে আরজ করল, আমীরুল মু'মিনীন আপনার স্থলে কোনো লোককে মনোনীত করুন। তখন হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করেন তবে নেককার লোকদেরকে শাসনকর্তা নিয়োগ করবেন। এরপর হযরত আলী (রা.) এ কথাও বলে দিলেন, আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করেই হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

বর্ণিত আছে যে, জালেম হলো পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের জীবন্ত গজব, জালেমের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মানুষের শাস্তি বিধান করেন, অতঃপর জালেমকে শাস্তি দেন।

অনুবাদ :

١٣٠. يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ اَىْ مِنْ مَجْمُوْعِكُمْ اَىْ بَعْضِكُمْ اَلصَّادِقِ بِالْاِنْسِ اَوْ رُسُلُ الْجِنِّ نُذُرُهُمْ اَلَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ الرُّسُلِ فَيُبَلِّغُوْنَ قَوْمَهُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا اَنْ قَدْ بَلَغَنَا قَالَ تَعَالٰى وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَلَمْ يُؤْمِنُوْا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ـ

১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি। অর্থাৎ তোমাদের সকলের মধ্যে হতে কি রাসূলগণ আসেনি। এমতাবস্থায় মানুষ রাসূলগণের বেলায় কেবল এটা প্রযোজ্য হবে। কিংবা জিন রাসূল বলত সেই সমস্ত জিনদেরকে বুঝাবে যারা নবীগণের বাচনিক ধর্ম-কথা শুনে স্বীয় জাতির নিকট তা পৌঁছাত। যারা তোমাদের নিকট আমার নিদর্শন বিবৃত করত এবং তোমাদের এ দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত? তারা বলবে আমাদের নিকট তোমার কথা পৌঁছেছে এই সম্পর্কে আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেই। আল্লাহ তা'আলা বলবেন বস্তুত পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল ফলে তারা ঈমান আনয়ন করেনি। আর নিজেদের বিপক্ষে তারা সাক্ষী দিল যে, তারা ছিল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী।

١٣١. ذٰلِكَ اَىْ اِرْسَالُ الرُّسُلِ اَنْ اللَّامُ مُقَدَّرَةٌ وَهِىَ مُخَفَّفَةٌ اَىْ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ مِّنْهَا وَاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ لَمْ يُرْسَلْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلٌ يُّبَيِّنُ لَهُمْ ـ

১৩১. এটা অর্থাৎ রাসুল প্রেরণ এই হেতু যে, اَنْ -এটা مُثَقَّلَةٌ অর্থাৎ তাশদীদ যুক্ত রূঢ় রূপ হতে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে রূপান্তরিত। এটার পূর্বে একটি হেতুবোধক لَامْ উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল لِاَنَّهُ [এজন্য যে.....]। তোমার প্রভু কোনো জনপদকে তার সীমালঙ্ঘনের জন্য তৎক্ষণ ধ্বংস করার নন যতক্ষণ তার অধিবাসীগণ অনবহিত। অর্থাৎ যতক্ষণ তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ না করা হয়েছে এবং তাদেরকে সব কিছু স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে না দেওয়া হয়েছে ততক্ষণ তাদেরকে তিনি ধ্বংস করেন না।

١٣٢. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْعَامِلِيْنَ دَرَجٰتٌ جَزَاءٌ مِّمَّا عَمِلُوْا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ ـ

১৩২. আমলকারীদের প্রত্যেকেই ভালো বা মন্দ যা করে তদনুসারে তার স্থান অর্থাৎ প্রতিদান রয়েছে। এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। يَعْمَلُوْنَ -এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ রূপে পঠিত রয়েছে।

١٣٣. وَرَبُّكَ الْغَنِىُّ عَنْ خَلْقِهٖ وَعِبَادَتِهِمْ ذُوا الرَّحْمَةِ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ يَاَهْلَ مَكَّةَ بِالْاِهْلَاكِ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ مِنَ الْخَلْقِ كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ اَذْهَبَهُمْ وَلٰكِنَّهُ تَعَالٰى اَبْقَاكُمْ رَحْمَةً لَّكُمْ ـ

১৩৩. তোমার প্রতিপালক সকল সৃষ্টি ও তাদের বন্দেগি হতে অনপেক্ষ দয়াশীল। হে মক্কাবাসীগণ! তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করত অপসারিত করত এবং তোমাদের পর সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন যেমন তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে তাদেরকে অপসারিত করত তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি তোমাদের প্রতি কৃপা বশত তোমাদেরকে টিকিয়ে রেখেছেন।

١٣٤. إِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ مِنَ السَّاعَةِ وَالْعَذَابِ لَاٰتٍ لَا مُحَالَةَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فَائِتِيْنَ عَذَابَنَا .

১৩৪. তোমাদের নিকট যা অর্থাৎ কিয়ামত ও আজাব সম্পর্কে যে, ঘোষণা করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বাস্তবায়িত হবেই। তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না; আমার শাস্তিকে হটাতে পারবে না।

١٣٥. قُلْ لَهُمْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ عَلٰى حَالَتِىْ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اَىِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ اَنَحْنُ اَمْ اَنْتُمْ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ يَسْعَدُ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ .

১৩৫. এদেরকে বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমারা তোমাদের স্থানে অর্থাৎ তোমাদের অবস্থায় কাজ কর। আমি আমার অবস্থায় কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার পরিণাম মঙ্গলময়? مَنْ এটা مَوْصُوْلَةٌ অর্থাৎ সংযোজক পদ এবং تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل অর্থাৎ কর্মকারক। অর্থাৎ পরকালে কার জন্য প্রশংসনীয় পরিণাম বিদ্যমান, আমাদের জন্য না তোমাদের জন্য? আর জালিমগণ কাফেরগণ কখনও সফলকাম হবে না, সৌভাগ্যশীল হতে পারবে না।

١٣٦. وَجَعَلُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ خَلَقَ مِنَ الْحَرْثِ الزَّرْعِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا يَصْرِفُوْنَهُ اِلَى الضِّيْفَانِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَلِشُرَكَائِهِمْ نَصِيْبًا يَصْرِفُوْنَهُ اِلٰى سَدَنَتِهَا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَكَانُوْا اِذَا سَقَطَ فِىْ نَصِيْبِ اللّٰهِ شَىْءٌ مِنْ نَصِيْبِهَا الْتَقَطُوْهُ اَوْ فِىْ نَصِيْبِهَا شَىْءٌ مِنْ نَصِيْبِهِ تَرَكُوْهُ وَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ هٰذَا كَمَا قَالَ تَعَالٰى فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ اَىْ لِجِهَتِهٖ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَآءَ بِئْسَ مَا يَحْكُمُوْنَ حُكْمُهُمْ هٰذَا .

১৩৬. আল্লাহ যে কৃষি দ্রব্য অর্থাৎ শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন ذَرَاَ অর্থ, সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্য হতে তারা মক্কার কাফেররা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে। এই অংশ তারা মেহমান ও দরিদ্রদের খাতে ব্যয় করে। আর এক অংশ তারা দেবতাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখে। এটা তারা সেবায়েতদের পেছনে ব্যয় করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, زَعْم এটার ز -এর ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত পাঠ করা যায়। এটা আল্লাহর জন্য এবং তা আমাদের দেবতাদের জন্য দেবদেবীদের জন্য নির্ধারিত হিস্যা হতে কিছু যদি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হিস্যায় মিশে যেতো তবে তা তারা কুড়িয়ে পূরণ করে দিত। আর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হিস্যা হতে যদি কিছু দেবদেবীদের নামে নির্ধারিত হিস্যার সাথে মিশে পড়ত তবে তারা এটা এমনিতেই ছেড়ে দিত। তা পূরণ করত না। বলত, আল্লাহ এটার মুখাপেক্ষী নন। এই আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর দিকে অর্থাৎ সেই অংশে পৌঁছায় না আর যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের দিকে পৌঁছায় তারা যা মীমাংসা করে অর্থাৎ তাদের এই মীমাংসা কত নিকৃষ্ট! কত মন্দ!

١٣٧. وَكَذٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لَهُمْ مَا ذُكِرَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ بِالْوَادِ شُرَكَآؤُهُمْ مِنَ الْجِنِّ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ زَيَّنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُوْلِ وَرَفْعِ قَتْلِ وَنَصْبِ الْاَوْلَادِ بِهِ وَجَرِّ شُرَكَائِهِمْ بِاِضَافَتِهِ وَفِيْهِ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ اِلَيْهِ بِالْمَفْعُوْلِ وَلَا يَضُرُّ وَ اِضَافَةُ الْقَتْلِ اِلَى الشُّرَكَاءِ لِاَمْرِهِمْ بِهِ لِيُرْدُوْهُمْ يُهْلِكُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا يَخْلِطُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ .

১৩৭. এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়টি যেভাবে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে সেভাবে তাদের জিন দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে জীবন্ত প্রোথিত করত সন্তান হত্যাকে শোভন করে ধরেছে। তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ সৃষ্টির জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। شُرَكَآؤُهُمْ এটা زَيَّنَ ক্রিয়ার فَاعِل অর্থাৎ কর্তারূপে رَفْع সহ পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে زُيِّنَ ক্রিয়াটি مَجْهُوْل; قَتْل শব্দটি رَفْع সহযোগে, اَوْلَاد শব্দটি قَتْل -এর مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب রূপে এবং এটার [قَتْل -এর] اِضَافَةٌ হওয়ার মাধ্যমে شُرَكَاءُ শব্দটি جَرّ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় مُضَاف সম্বন্ধিত পদ অর্থাৎ قَتْل ও مُضَاف اِلَيْه [যার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ شُرَكَاءُ]-এর মাঝে একটি مَفْعُوْل -এর মাধ্যমে ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে পড়ে। شُرَكَاءُ অর্থাৎ দেবতাদের প্রতি قَتْل অর্থাৎ হত্যার اِضَافَةٌ করায় অর্থের মধ্যে কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা মূলত এরাই তাদেরকে হত্যার প্ররোচনা দেয়। لِيُرْدُوْهُمْ অর্থ, তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এটা করত না সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যা নিয়ে থাকতে দাও।

١٣٨. وَقَالُوْا هٰذِهِ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ حَرَامٌ لَا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ مِنْ خَدَمَةِ الْاَوْثَانِ وَغَيْرِهِمْ بِزَعْمِهِمْ اَيْ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيْهِ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا فَلَا تُرْكَبُ كَالسَّوَائِبِ وَالْحَوَامِيْ وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا عِنْدَ ذَبْحِهَا بَلْ يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اَصْنَامِهِمْ وَنَسَبُوْا ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ اِفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَيْهِ .

১৩৮. তারা তাদের ধারণা অনুসারে অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের কোনো যুক্তি নেই কেবলমাত্র ধারণার উপর নির্ভর করে বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্য নিষিদ্ধ অর্থাৎ হারাম। আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত অর্থাৎ দেবতাদের সেবায়েত প্রমুখ ব্যক্তিরা ব্যতীত কেউ এসব আহার করতে পারবে না। এবং কতক গবাদি পশু রয়েছে যাদের পৃষ্ঠে অর্থাৎ তাতে আরোহণ নিষিদ্ধ যেমন সায়েবা ও হামী জাতীয় পশু এবং কতক পশু এমন যাদের বেলায় অর্থাৎ জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না, তদস্থলে প্রতিমাসমূহের নাম নিয়ে তারা জবাই করে এবং এটা তাঁর প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে। তিনি শীঘ্র তাদেরকে তাঁর সম্বন্ধে এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল দেবেন।

١٣٩. وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ الْمُحَرَّمَةِ وَهِيَ السَّوَائِبُ اَوِ الْبَحَائِرُ خَالِصَةٌ حَلَالٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا ج اَيِ النِّسَاءِ .

১৩৯. তারা আরও বলে, এসব নিষিদ্ধ গবাদি পশুর গর্ভে অর্থাৎ সায়িবা বাহিরার গর্ভে যা আছে বিশেষ করে কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য বৈধ এবং এটা আমাদের সঙ্গিনীদের অর্থাৎ স্ত্রীগণের জন্য অবৈধ।

وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ مَعَ تَانِيْثِ الْفِعْلِ وَتَذْكِيْرِهٖ فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيْهِمُ اللّٰهُ وَصْفَهُمْ ذٰلِكَ بِالتَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ اَىْ جَزَآءَهٗ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ .

আর তা যদি মৃত হয় مَيْتَةً এটার ক্রিয়া অর্থাৎ يَكُنْ শব্দটি পুংবাচক হোক বা স্ত্রীবাচক উভয় অবস্থায় مَيْتَةً শব্দটি رَفْع ও نَصْب সহ পঠিত রয়েছে। তবে নারী-পুরুষ সকলে এতে অংশীদার। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ শীঘ্র তাদের হারাম ও হালাল বলে এ বিশেষণের প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি তাঁর কাজে প্রজ্ঞাময়, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

١٤٠. قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَوْلَادَهُمْ بِالْوَادِ سَفَهًا جَهْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ مِمَّا ذُكِرَ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ .

১৪০. যারা অজ্ঞতার কারণে নির্বুদ্ধিতা বশত মূর্খতা বশত স্বীয় সন্তাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করে হত্যা করে قَتَلُوْا এটা তাশদীদ সহ ও তাশদীদ হীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে আল্লাহর প্রদত্ত উল্লিখিত জীবিকা নিষিদ্ধ করে তারা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يُقَالُ لَهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ-এর عَامِلْ উহ্য রয়েছে আর তা হলো يُقَالُ, পূর্বে উল্লিখিত نَحْشُرُهُمْ নয়। اَلْمَعْشَرُ অর্থ হলো জামাত। এর বহুবচন হলো مَعَاشِرُ-আর জিন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তান।

قَوْلُهٗ اِسْتَكْثَرْتُمْ : এখানে سِيْن এবং تَاءْ আধিক্যের তাকিদের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِاَغْوَائِكُمْ : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ بِاَغْوَاءِ الْاِنْسِ

قَوْلُهٗ مِنْ مَجْمُوْعِكُمُ الصَّادِقِ بِالْاِنْسِ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা।

প্রশ্ন. রাসূল মানুষ হয়ে থাকেন, জিন নয়। অথচ رُسُلٌ مِّنْكُمْ দ্বারা বুঝা যায় যে, জিনদের মধ্যে থেকেও রাসূল হয়ে থাকেন। কেননা এখানে মানব ও দানব উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে।

উত্তর. সম্বোধনের ক্ষেত্রে যখন জিন ও ইনসান একত্রিত হয় যেমনটি এখানে হয়েছে, তখন مِنْكُمْ বলা বৈধ হয়ে থাকে। যদিও উদ্দেশ্য একজনই হয়ে থাকুক না কেন। যেমন يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ-এর মধ্যে লবণাক্ত সমুদ্র উদ্দেশ্য, কেননা লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই মুক্তা বের হয়ে আসে, মিঠা পানির নদী থেকে নয়, তথাপিও এখানে مِنْهُمَا বলা বৈধ হয়েছে। مِنْكُمْ অর্থ হলো مِنْ مَجْمُوْعِكُمُ الصَّادِقِ بِالْاِنْسِ উদ্দেশ্য হচ্ছে- مِنْكُمْ দ্বারা সকল সম্বোধিত উদ্দেশ্য। আর সকলের মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই مِنْكُمْ সেই সময়ও প্রযোজ্য হবে যখন শুধুমাত্র একদলই উদ্দেশ্য হবে, আর এখানে মানব উদ্দেশ্য।

رُسُلٌ দ্বারা দ্বিতীয় আরেকটি উত্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে رُسُلٌ দ্বারা পারিভাষিক رُسُلٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং শাব্দিক رُسُلٌ তথা দূত উদ্দেশ্য। আর এরা হলো সে সকল জিন যারা রাসূল ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াত শুনেছিল। মনে হয় যেন তারা রাসূল ﷺ -এর পক্ষ হতে সেই সম্প্রদায়ের প্রতি দূত এবং ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হলো اَلْاَمْرُ ذَالِكَ মুবতাদা উহ্য রাখার কারণ হলো একটি প্রশ্নের সমাধান দেওয়া।

প্রশ্ন. اِنْ لَمْ يَكُنْ হতে ইল্লত বর্ণিত হচ্ছে اِنْ টা মূলত لِاَنَّ ছিল। আর ইল্লত তো হুকুমেরই হয়ে থাকে। আর ذَالِكَ টা হুকুম নয়।

উত্তর. উত্তরের সার হলো, ذَالِكَ টা উহ্য মুবতাদার খবর আর তাতে حُكْم রয়েছে। কাজেই ইল্লত বর্ণনা করা বিশুদ্ধ হয়ে গেল। আর لَامْ উহ্য মানার কারণে عَدَمُ رَبْط-এর প্রশ্নও তিরোহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ قَوْم اٰخَرِيْنَ : দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার অধিবাসীগণ।

قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ : এ বাক্য বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– কাশশাফ গ্রন্থকার ও সে সকল লোকদের মতাদর্শকে খণ্ডন করা যারা যেই মাসদার فَاعِلْ-এর দিকে মুযাফ হওয়ার মাঝে مَفْعُوْلْ দ্বারা فَصْل বা পার্থক্য করা কবিতার প্রয়োজন ব্যতিরেকে নাজায়েজ মনে করে থাকেন।

বিস্তারিত বিবরণ : وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ : এ আয়াতে একাধিক কেরাত রয়েছে। লিখিত কেরাতটি জমহুরের কেরাত তা হলো زَيَّنَ ফে'লে মারূফ আর شُرَكَاؤُهُمْ তার ফায়েল। قَتْل হলো زَيَّنَ-এর মাফউল, এই কেরাতে কোনো প্রশ্ন নেই। এটা ছাড়াও ইবনে আমেরের বর্ণিত অপর আরেকটি কেরাত এরূপ যে, وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلُ اَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ এখানে زُيِّنَ হলো ফে'লে মাজহুল। আর قَتْل টা زُيِّنَ-এর نَائِبْ فَاعِلْ হওয়ার কারণে মারফূ হয়েছে। আর اَوْلَادَهُمْ মাফউল হওয়ার কারণে মানসূব এবং شُرَكَائِهِمْ টা قَتْل-এর মুযাফ ইলাইহি হওয়ার কারণে মাজরূর হয়েছে। এ সুরতে قَتْل মুযাফ এবং شُرَكَائِهِمْ মুযাফ ইলাইহি এর মাঝে اَوْلَادَهُمْ মাফউলের দ্বারা فَصْل আবশ্যক হয় যা কাব্যিক প্রয়োজন ব্যতীত গদ্য বাক্যে বৈধ নয়। আর এটাও পবিত্র কুরআনে রয়েছে যা স্বীয় শব্দ ও অর্থের দিক থেকে ফাসাহাত ও বলাগাতের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। এটা অবৈধ হওয়ার কারণ নাহবীদের দৃষ্টিতে এই যে, مُضَافْ এবং مُضَافْ اِلَيْهِ -এর মাঝে কাব্যিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে فَصْل জায়েজ নয়। কেননা مُضَافْ اِلَيْهِ টা مُضَافْ-এর জন্য جُزْء-এর সমপর্যায়ে হয়ে থাকে। যেহেতু مُضَافْ اِلَيْهِ টা مُضَافْ-এর তানবীনের স্থানে পতিত হয়ে থাকে। কাজেই যেভাবে اِسْم-এর جُزْء সমূহের মধ্যে فَصْل জায়েজ নেই, তদ্রূপ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহির মাঝেও فَصْل জায়েজ নেই। আর এটা বসরী নাহবীগণের অভিমত অনুসারে। অবশ্য কূফী নাহবীগণের মতে যদি মুযাফ মাসদার এবং মুযাফ ইলাইহি তার ফায়েল হয় এবং فَصْل টা মাফউলের মাধ্যমে হয় যেমনটি ইবনে আমেরের উল্লিখিত কেরাতে হয়েছে তবে তা বৈধ। لَا يَضُرُّهُ বলে গ্রন্থকার এই উত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। –[ই'রাবুল কুরআন]

ইবনে মালিক ও কাফিয়ার ব্যাখ্যায় এ فَصْل-কে কাব্যিক প্রয়োজন ব্যতীতই বৈধ বলেছেন। তিনি বলেন–

اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفَاعِلِ مَفْصُوْلًا بَيْنَهُمَا بِمَفْعُوْلِ الْمَصْدَرِ جَائِزَةٌ

قَوْلُهُ وَاِضَافَةُ الْقَتْلِ اِلَى شُرَكَائِهِمْ لِاَمْرِهِمْ بِهِ : এখানে اِضَافَةُ الْقَتْلِ হলো মুবতাদা لِاَمْرِهِمْ بِهِ হলো তার খবর। উদ্দেশ্য হলো قَتْل -এর ইযাফত شُرَكَاءْ-এর দিকে করা مَجَازْ হিসেবে হয়েছে। মূল হত্যাকারী তো মুশরিকরাই। কিন্তু যেহেতু شُرَكَاءْ হলো হত্যার নির্দেশ প্রদানকারী এজন্য قَتْل-এর ইযাফত شُرَكَاءْ -এর দিকে তাদের নির্দেশদাতা/ اٰمِرْ হওয়ার কারণে করে দেওয়া হয়েছে। এটাকে اِسْنَادْ مَجَازِىْ বলা হয়। যেমন– بَنَى الْاَمِيْرُ الْمَدِيْنَةَ -এর মধ্যে بِنَاءْ-এর ইযাফত আমীরের দিকে مَجَازْ রূপে হয়েছে তার নির্মাণের নির্দেশ দেওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ : যদি كَانَ টি تَامَّةٌ হয় তবে مَيْتَةٌ টা مَرْفُوْعْ হবে, আর نَاقِصَهْ হয় তবে نَصَبْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন : দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন– তোমাদের মধ্যে থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? এতে বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বর রূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছেন, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বর রূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেই কেউ বলেন, রাসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রাসূল হয়নি; বরং মানব রাসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌঁছানোর জন্য জিনদের মধ্যে থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে মানব রাসূলদের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রাসূল বলে দেওয়া হয়। যেসব তাফসীরবিদ এ কথা বলেন, তাঁদের প্রমাণ ঐসব আয়াত, যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কুরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পৌঁছিয়েছে। উদাহরণত وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ এবং সূরা জিনের আয়াত قَالُوْآ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলেম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী ﷺ -এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব রাসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রাসূলই আগমন করতেন। শেষনবী ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিনদের একমাত্র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তাও কোনো এক বিশেষ কালের জন্য নয়; বরং কিয়ামত অবাধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রাসূল।

জিনদেরই হিন্দুদের কোনো রাসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা : কালবী মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ উক্তিই পছন্দ করেছেন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাজহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন, এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ.)-এর পূর্বে জিনদের রাসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হতো। যখন একথা প্রমাণিত যে পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানব জাতির মতো বিধিবিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরিয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাজী সানাউল্লাহ (র.) আরো বলেন, ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদের সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলি পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতির মতো শুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণা করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রাসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলির সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলিও বিদ্যমান থাকত তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাব ও রিসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোনো জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদের পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়তের আলো প্রেরণ করা হয়।

চতুর্থ আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

قَوْلُهُ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ে রাসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এজন্যে ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন কিংবা তাঁর কোনো কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়াগুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ। নতুবা বেচারা মানুষ নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতিনীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কোনো মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি, যেমন হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি এগুলো কোনো মানব চেয়েছিল কি? না তার চাওয়ার মতো অনুভূতি ছিল? কিছুই নয়, বরং

ما نبوديم وتقاضا ما نبود
لطف تونا گفته ما می شنود

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। জগৎ সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল : মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে رَبُّكَ الْغَنِيُّ শব্দ দ্বারা বিশ্ব পানকর্তার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথে ذُو الرَّحْمَةِ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি যদিও কারও মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার সাথে সাথে তিনি ذُو الرَّحْمَةِ অর্থাৎ করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ যে কোনো মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য : অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করত না, বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হতো। কুরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায় তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে উঠে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যূষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্য যেমন রোজগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও যানবাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী, কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোনো ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোনো শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়। এ স্থলে ذُو الرَّحْمَةِ শব্দের পরিবর্তে رَحْمَانٌ কিংবা رَحِيمٌ শব্দ ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে যেত। কিন্তু غَنِيٌّ শব্দের সাথে রহমত গুণ সংযোজনের মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য ذُو الرَّحْمَةِ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি غَنِيٌّ ও পুরোপুরি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি রহমতের অধিকারী। এ গুণটিই পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থ প্রেরণের আসল কারণ।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক কাজে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজির প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউ ছিল না।

অন্য এক জাতি ছিল যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে–

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। 'নিয়ে যাওয়ার' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় আয়াতে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, إِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ وَّمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহর সে আজাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে–

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি মক্কাবাসীদের বলে দিন– হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখ, জালিম অর্থাৎ অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ স্থলে আয়াতে مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ বলা হয়েছে এবং عَاقِبَةُ الدَّارِ الْاٰخِرَةِ বলা হয়নি। এতে বোঝা যায় যে, পরজগতের পূর্বে ইহজগতেও পরিণামে আল্লাহর সৎ বান্দারাই সফল হয়ে থাকে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই শক্তিশালী প্রতাপান্বিত শত্রুরা তাঁদের পদানত হয়ে যায় এবং শত্রুদের দেশ তাঁদের হাতে বিজিত হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে গোটা আরব উপত্যকা তাঁর অধিকারে এসে যায়। ইয়েমেন ও বাহরাইন থেকে শুরু করে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর তাঁর খলিফা ও সাহাবীদের হাতে প্রায় সমগ্র বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে এসে যায়। এভাবে আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায় যে, كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ অর্থাৎ আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার পয়গম্বররাই জয়ী হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ অর্থাৎ আমি আমার রাসূলদের এবং মু'মিনদের অবশ্যই সাহায্য করব, এ জগতেও এবং ঐ দিনও যেদিন কাজকর্মের হিসেবে সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতারা সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

চতুর্থ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানি হতো, তার এক অংশ আল্লাহর জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেবদেবীদের নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহর নামের অংশ থেকে গরিব-মিসকিনকে দান করা হতো এবং দেবদেবীর অংশ প্রতিমাগৃহের পূজারী রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত।

প্রথমত এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদের অংশীদার করা হতো। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহর অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত আল্লাহ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোনো সময় এমনও হতো যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোনো বস্তু আল্লাহর অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর অংশ থেকে কোনো বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে

যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কুরআন পক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে- سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ অর্থাৎ তাদের এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের হুঁশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা : এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুঁশিয়ারি। এতে ঐসব মুসলমানদের জন্যও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মূহূর্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াক্ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও আল্লাহর যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হতো না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামাজ, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোনো অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহর আমাদের এবং সব মুসলমানকে এহেন কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الخ যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের কুফর-শিরক সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ বিভিন্ন কুপ্রথা উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত কুপ্রথাসমূহ হচ্ছে এই-

১. তারা খাদ্যশস্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহর এবং কিছু অংশ দেবদেবীর নামে পৃথক করত। অতঃপর যদি ঘটনাক্রমে আল্লাহর অংশ থেকে কিছু পরিমাণ দেবদেবীদের অংশে মিশে যেত, তবে তা এমননিই থাকতে দিত। পক্ষান্তরে ব্যাপার উল্টো হলে তা তুলে নিয়ে প্রতিমাগুলোর অংশ পুরো করে দিত। এর বাহানা ছিল এই যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত ; তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অংশীদাররা অভাবগ্রস্ত। তাদের অংশ হ্রাস পাওয়া উচিত নয়। এ কুপ্রথাটি আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী আয়াতে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. বহীরা, সায়েবা ইত্যাদি জন্তু দেবদেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং বলা হতো যে, এ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত। এতেও প্রতিমার অংশ ছিল এই যে, একে তাঁর সন্তুষ্টি মনে করা হতো।

৩. মুশরিকরা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত। ৪. কিছু শস্যক্ষেত্র প্রতিমাদের নামে ওয়াকফ করে দিত এবং বলত যে, এর উৎপন্ন ফসল শুধু পুরুষরা ভোগ করবে, মহিলাদেরকে কিছু দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন। তাদের দাবি করার অধিকার নেই। ৫. চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও তারা এমনি ধরনের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করত এবং কোনো কোনো জন্তু শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিত। ৬. তারা যেসব চতুষ্পদ জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত সেগুলোতে আরোহণ করা কিংবা বোঝা বহন করা সম্পূর্ণ হারাম মনে করত। ৭. বিশেষ কতকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা কোনো সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতো না, উদাহরণত দুধ দোহন করার সময়, আরোহণ করার সময় এবং জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করত না। ৮. বহিরা কিংবা সায়েবা নামে অভিহিত করে যেসব জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোকে জবাই করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও জবাই করত কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম মনে করত। পক্ষান্তরে মৃত বাচ্চা বের হলে তা সবার জন্য হালাল হতো। ৯. কোনো কোনো জন্তুর দুধও পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম ছিল। ১০. বহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হামী -এ চার প্রকার জন্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত। এসব রেওয়ায়েত দুররে-মনসূর ও রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।

-[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

অনুবাদ :

١٤١. وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ خَلَقَ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ مَعْرُوْشٰتٍ مَبْسُوْطَاتٍ عَلَى الْاَرْضِ كَالْبِطِّيْخِ وَغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ بِاَنْ اِرْتَفَعَتْ عَلٰى سَاقٍ كَالنَّخْلِ وَ اَنْشَاَ النَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ ثَمَرُهٗ وَحَبُّهٗ فِى الْهَيْئَةِ وَالطَّعْمِ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَرَقُهُمَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط طَعْمُهُمَا كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ قَبْلَ النَّضْجِ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ زَكٰوتَهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مِنَ الْعُشْرِ اَوْ نِصْفِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا ط بِاِعْطَاءِ كُلِّهٖ فَلَا يَبْقٰى لِعِيَالِكُمْ شَئٌ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّ لَهُمْ .

১৪১. তিনি লতাগুল অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ মাটিতে বিছিয়ে থাকে যেমন– তরমুজ ইত্যাদির গাছ ও বৃক্ষের অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান যেমন– খেজুর বৃক্ষ উদ্যান বাগান রাজি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ ও বিভিন্ন স্বাদের শস্য যার ফল ও দানা আকৃতিতে ও স্বাদে বিভিন্ন। যয়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন, যে দুটির পাতা একে অন্যের সদৃশ ও স্বাদ বিসদৃশ। যখন ফলোদগম হয় তখন পরিপক্বতার পূর্বেও এটার ফল তোমরা আহার কর এবং ফসল কাটার দিনেও حَصَادٌ -এটার ح -এ কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকত দ্বারা পাঠ করা যায়। তার হক অর্থাৎ এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক জাকাত প্রদান কর। পরিবারের জন্য কিছুই না রেখে একেবারে সব কিছু দিয়ে অপচয় করো না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে অর্থাৎ তাদের জন্য নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

١٤٢. وَ اَنْشَاَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً صَالِحَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا كَالْاِبِلِ الْكِبَارِ وَفَرْشًا لَا تَصْلُحُ لَهٗ كَالْاِبِلِ الصِّغَارِ وَالْغَنَمِ سُمِّيَتْ فَرْشًا لِاَنَّهَا كَالْفَرْشِ لِلْاَرْضِ لِدُنُوِّهَا مِنْهَا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ طَرَائِقَهٗ فِى التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ .

১৪২. এবং গবাদিপশুর মধ্যে কতক ভারবাহী বোঝা বহনের যোগ্য, যেমন বড় বড় উট এবং কতক ফারশ অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় পশু যেগুলো ভার বহনের যোগ্য নয় যেমন– ছোট উট ও ভেড়া-বকরি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। ছোট হওয়ার কারণে এগুলো যেহেতু মাটির সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে, এগুলোকে ভূমি-শয্যা বা ফারশ বলে মনে হয় সেহেতু এই ছোট প্রাণীকে আরবিতে 'ফারশ' [শয্যা] বলে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে যা জীবিকারূপে দিয়েছেন তা আহার কর এবং নিজেদের মনমতো হালাল বা হারাম করে শয়তানের পদাঙ্ক অর্থাৎ তার পথ অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তার শত্রুতা সুস্পষ্ট।

١٤٣. ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ج اَصْنَافٍ بَدَلٌ مِنْ
حَمُوْلَةً وَفَرْشًا مِنَ الضَّاْنِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَمِنَ الْمَعْزِ بِالْفَتْحِ
وَالسُّكُوْنِ اثْنَيْنِ ط قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ
حَرَّمَ ذُكُوْرَ الْاَنْعَامِ تَارَةً وَاِنَاثَهَا اُخْرٰى
وَنَسَبَ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ ءٰالذَّكَرَيْنِ مِنَ
الضَّاْنِ وَالْمَعْزِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اَمِ
الْاُنْثَيَيْنِ مِنْهُمَا اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ط ذَكَرًا كَانَ اَوْ اُنْثٰى
نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ عَنْ كَيْفِيَةِ تَحْرِيْمِ ذٰلِكَ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ الْمَعْنٰى مِنْ اَيْنَ جَاءَ
التَّحْرِيْمُ فَاِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الذُّكُوْرَةِ
فَجَمِيْعُ الذُّكُوْرِ حَرَامٌ اَوِ الْاُنُوْثَةِ فَجَمِيْعُ
الْاِنَاثِ اَوْ اِشْتِمَالِ الرَّحْمِ فَالزَّوْجَانِ فَمِنْ
اَيْنَ التَّخْصِيْصُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ .

১৪৩. আট জোড়া আট প্রকার পশু ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত حَمُوْلَةً وَفَرْشًا -এর بَدَلٌ মেষ হতে দুপ্রকার নর ও স্ত্রী ও ছাগল হতে দুপ্রকার। اَلْمَعْز -এর ع-এ ফাতাহ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। হে মুহাম্মদ! যারা গবাদিপশুর কোনো সময় নর জাতিকে অবৈধ বলে নির্ণয় করে, অন্য আরেক সময় স্ত্রী জাতিকে অবৈধ বলে নির্ধারণ করে আর আল্লাহর দিকে তা আরোপ করে তাদেরকে বল, মেষ ও ভেড়ার নর দুটিই ءٰالذَّكَرَيْنِ এস্থানে اِنْكَارٌ অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, না এতদুভয়ের মাদি দুটি নিষিদ্ধ করেছেন, না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে নর হউক বা মাদি তা? এতে তোমরা সত্যবাদী হলে তা নিষিদ্ধ হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর। অর্থাৎ বল, কিসের কারণে এগুলো অবৈধ হলো? যদি নর হওয়ার কারণে হয় তবে সকল ধরনের নর প্রাণীই হারাম হওয়া উচিত; যদি মাদী হওয়ার কারণে তা হয় তবে সকল ধরনের মাদি প্রাণীই হারাম হওয়া দরকার। আর মাদী পশুর গর্ভে থাকার কারণে যদি এটা হয়ে থাকে তবে নর ও মাদি উভয় জাতীয় পশুই হারাম হওয়া উচিত। কোনো সময় এই প্রকার কোনো সময় ঐ প্রকার হারাম করার বিশেষত্ব কোথা হতে আসল?

١٤٤. وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط
قُلْ ءٰالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ط اَمْ بَلْ
كُنْتُمْ شُهَدَاءَ حُضُوْرًا اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا
التَّحْرِيْمِ فَاعْتَمَدْتُّمْ ذٰلِكَ لَا بَلْ اَنْتُمْ
كٰذِبُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِذٰلِكَ لِيُضِلَّ
النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

১৪৪. এবং উট হতে দুইটি ও গরু হতে দুটি ; বল, নর দুটিই কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন? না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? না আল্লাহ যখন এসব হারাম হওয়ার নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা সমক্ষে ছিলে? উপস্থিত ছিল? যে এটার উপর নির্ভর করে তোমরা এবম্বিধ কথা বলছ, না তোমরা এতে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে উক্তরূপ মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? না, কেউ নেই। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَعْرُوْشَاتٍ : এটা اِسْمُ مَفْعُوْل -এর جَمْعُ مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ, একবচনে مَعْرُوْشَةٌ অর্থ– মাচায় ছড়ানো লতা গুল্ম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুতলাক গুল্মকে مَعْرُوْشَاتٌ বলা হয় চাই তা মাচায় ছড়ানো হোক বা না হোক। এতে আঙ্গুর, তরমুজ, খরবুজা, লাউ ইত্যাদি ধরনের গুল্ম লতা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ اَكْلُهُ : মুযাফ ইলাইহির যমীর ذرع-এর দিকে ফিরেছে; نَخْل-এর দিকে নয়। কেননা نَخْل হলো مُؤَنَّثْ سِمَاعِيْ আর اَكْلُهُ-এর যমীর হলো مُذَكَّرٌ যার কারণে مُطَابَقَتْ হবে না, বাকিগুলোকে ذَرْع-এর উপর কিয়াস করা হবে।

قَوْلُهُ قَبْلَ النُّضْجِ : এটা একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. اِذَا اَثْمَرَ -এর কার্যত কোনো উপকারিতা বুঝা যায় না। কেননা ফল খাওয়ার সম্পর্ক ফল আসার পরেই হয়ে থাকে। ফল আগমনের পূর্বে খাওয়া সম্ভব নয়।

উত্তর. قَبْلَ النُّضْجِ-এর বৃদ্ধিকরণ এ প্রশ্নের সমাধান কল্পেই হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সাধারণত এই ধারণা হতে পারে যে, ফল ভক্ষণের সম্পর্ক ফল পাকার পরেই হয়ে থাকে। অথচ কতিপয় ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই খাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَاَنْشَا مِنَ الْاَنْعَامِ : এখানে اَنْشَا শব্দটি উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, مِنَ الْاَنْعَامِ-এর আতফ جَنّٰتٍ-এর উপর হয়েছে, কেননা নিকটবর্তীর উপর আতফ করা দ্বারা অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ حَمُوْلَةً : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ -কে উহ্য ফে'লের মাফউল স্বীকৃতি দানকারীদের মতাদর্শকে খণ্ডন করার জন্য আনা হয়েছে, তখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, كُلُوْا ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ কেননা প্রয়োজনহীন উহ্য মানা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الضَّاْنِ : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ হতে بَدْل হয়েছে। ضَاْن শব্দটি ضَائِن -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ : **প্রশ্ন.** زَوْجَيْنِ শব্দটি زَوْج-এর দ্বিবচন; জোড়াকে زَوْجٌ বলা হয়। যা দু'-এর উপর সম্বলিত। কাজেই زَوْجَيْنِ অর্থ হবে দুই জোড়া তথা চার। আর এ সুরতে زَوْجَيْنِ -এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না।

উত্তর. زَوْج -এর দুটি অর্থ রয়েছে–

১. زَوْجٌ বলা হয় যার সাথে তার সমজাতীয় অন্যটি হবে। তার জন্য দু' হওয়া জরুরি নয়, যেমন স্বামীকে زَوْجٌ বলা হয়।

২. অন্য অর্থ হলো জোড়া। সে সময় زَوْجَيْنِ অর্থ হবে চার আর এ অর্থের ভিত্তিতে زَوْجَيْنِ -এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ءَالذَّكَرَيْنِ : এটা حَرَّمَ -এর مَفْعُوْل بِه مُقَدَّمٌ হয়েছে। আর اَمْ হলো حَرْف عَطْف আর الْاُنْثَيَيْنِ হলো ذَكَرَيْنِ -এর উপর আতফ। এরপর বাক্য হয়ে قُلْ -এর مَقُوْلَه হওয়ার কারণে نَصْب -এর স্থানে হয়েছে। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِيْ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পতভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালিমরা আল্লাহ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নির্মিত নিষ্প্রাণ, অচেতন প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাগুলোর অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার

অনুবাদ :

١٤١. وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَا خَلَقَ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ
مَعْرُوْشٰتٍ مَبْسُوْطَاتٍ عَلَى الْاَرْضِ
كَالْبِطِّيْخِ وَغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ بِاَنْ ارْتَفَعَتْ
عَلٰى سَاقٍ كَالنَّخْلِ وَ اَنْشَاَ النَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ ثَمَرُهٗ وَحَبُّهٗ فِى
الْهَيْئَةِ وَالطَّعْمِ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَرَقُهُمَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط
طُعْمُهُمَا كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَآ اَثْمَرَ قَبْلَ
النَّضْجِ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ زَكٰوتَهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ
بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مِنَ الْعُشْرِ اَوْ نِصْفِهٖ وَلَا
تُسْرِفُوْا ط بِاِعْطَاءِ كُلِّهٖ فَلَا يَبْقٰى
لِعِيَالِكُمْ شَئٌ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ
الْمُتَجَاوِزِيْنَ مَا حُدَّ لَهُمْ .

১৪১. তিনি লতাগুল অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ মাটিতে বিছিয়ে থাকে যেমন– তরমুজ ইত্যাদির গাছ ও বৃক্ষের অর্থাৎ যে সমস্ত গাছ কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান যেমন– খেজুর বৃক্ষ উদ্যান বাগান রাজি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন খেজুর বৃক্ষ ও বিভিন্ন স্বাদের শস্য যার ফল ও দানা আকৃতিতে ও স্বাদে বিভিন্ন। যয়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন, যে দুটির পাতা একে অন্যের সদৃশ ও স্বাদ বিসদৃশ। যখন ফলোদগম হয় তখন পরিপক্বতার পূর্বেও এটার ফল তোমরা আহার কর এবং ফসল কাটার দিনেও حَصَادْ -এটার ح -এ কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকত দ্বারা পাঠ করা যায়। তার হক অর্থাৎ এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক জাকাত প্রদান কর। পরিবারের জন্য কিছুই না রেখে একেবারে সব কিছু দিয়ে অপচয় করো না; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে অর্থাৎ তাদের জন্য নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

١٤٢. وَ اَنْشَاَ مِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً صَالِحَةً
لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا كَالْاِبِلِ الْكِبَارِ وَفَرْشًا
لَاتَصْلُحُ لَهٗ كَالْاِبِلِ الصِّغَارِ وَالْغَنَمِ
سُمِّيَتْ فَرْشًا لِاَنَّهَا كَالْفَرْشِ لِلْاَرْضِ
لِدُنُوِّهَا مِنْهَا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا
تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ طَرَائِقَهٗ فِى
التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ .

১৪২. এবং গবাদিপশুর মধ্যে কতক ভারবাহী বোঝা বহনের যোগ্য, যেমন বড় বড় উট এবং কতক ফারশ অর্থাৎ ক্ষুদ্রকায় পশু যেগুলো ভার বহনের যোগ্য নয় যেমন– ছোট উট ও ভেড়া-বকরি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। ছোট হওয়ার কারণে এগুলো যেহেতু মাটির সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যে, এগুলোকে ভূমি-শয্যা বা ফারশ বলে মনে হয় সেহেতু এই ছোট প্রাণীকে আরবিতে 'ফারশ' [শয্যা] বলে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ তোমাদেরকে যা জীবিকারূপে দিয়েছেন তা আহার কর এবং নিজেদের মনমতো হালাল বা হারাম করে শয়তানের পদাঙ্ক অর্থাৎ তার পথ অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তার শত্রুতা সুস্পষ্ট।

١٤٣. ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ ج أَصْنَافٍ بَدَلٌ مِنْ حَمُوْلَةً وَفَرْشًا مِنَ الضَّأْنِ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَمِنَ الْمَعْزِ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُوْنِ اثْنَيْنِ ط قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ حَرَّمَ ذُكُوْرَ الْأَنْعَامِ تَارَةً وَإِنَاثَهَا أُخْرٰى وَنَسَبَ ذٰلِكَ إِلَى اللّٰهِ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ مِنْهُمَا أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ط ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى نَبِّئُوْنِيْ بِعِلْمٍ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَحْرِيْمِ ذٰلِكَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ الْمَعْنٰى مِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّحْرِيْمُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الذُّكُوْرَةِ فَجَمِيْعُ الذُّكُوْرِ حَرَامٌ أَوِ الْأُنُوْثَةِ فَجَمِيْعُ الْإِنَاثِ أَوْ اشْتِمَالِ الرَّحِمِ فَالزَّوْجَانِ فَمِنْ أَيْنَ التَّخْصِيْصُ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْإِنْكَارِ.

১৪৩. আট জোড়া আট প্রকার পশু ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত حَمُوْلَةً وَفَرْشًا -এর بَدَل মেষ হতে দুপ্রকার নর ও স্ত্রী ও ছাগল হতে দুপ্রকার। اَلْمَعْز -এর ع-এ ফাতাহ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। হে মুহাম্মদ! যারা গবাদিপশুর কোনো সময় নর জাতিকে অবৈধ বলে নির্ণয় করে, অন্য আরেক সময় স্ত্রী জাতিকে অবৈধ বলে নির্ধারণ করে আর আল্লাহর দিকে তা আরোপ করে তাদেরকে বল, মেষ ও ভেড়ার নর দুটিই ءٰٓالذَّكَرَيْنِ এস্থানে اِنْكَار অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন, না এতদুভয়ের মাদি দুটি নিষিদ্ধ করেছেন, না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে নর হউক বা মাদি তা? এতে তোমরা সত্যবাদী হলে তা নিষিদ্ধ হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর। অর্থাৎ বল, কিসের কারণে এগুলো অবৈধ হলো? যদি নর হওয়ার কারণে হয় তবে সকল ধরনের নর প্রাণীই হারাম হওয়া উচিত; যদি মাদী হওয়ার কারণে তা হয় তবে সকল ধরনের মাদি প্রাণীই হারাম হওয়া দরকার। আর মাদী পশুর গর্ভে থাকার কারণে যদি এটা হয়ে থাকে তবে নর ও মাদি উভয় জাতীয় পশুই হারাম হওয়া উচিত। কোনো সময় এই প্রকার কোনো সময় ঐ প্রকার হারাম করার বিশেষত্ব কোথা হতে আসল?

١٤٤. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ط قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ط أَمْ بَلْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ حُضُوْرًا إِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا التَّحْرِيْمِ فَاعْتَمَدْتُّمْ ذٰلِكَ لَا بَلْ أَنْتُمْ كَاذِبُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِذٰلِكَ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

১৪৪. এবং উট হতে দুইটি ও গরু হতে দুটি ; বল, নর দুটিই কিংবা মাদি দুটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন? না মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? না আল্লাহ যখন এসব হারাম হওয়ার নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা সমক্ষে ছিলে? উপস্থিত ছিল? যে এটার উপর নির্ভর করে তোমরা এবম্বিধ কথা বলছ, না তোমরা এতে মিথ্যাবাদী? যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্পর্কে উক্তরূপ মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? না, কেউ নেই। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَعْرُوْشَاتٍ : এটা اِسْمُ مَفْعُوْل-এর جَمْعُ مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ, একবচনে مَعْرُوْشَةٌ অর্থ– মাচায় ছড়ানো লতা গুল্ম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুতলাক গুল্মকে مَعْرُوْشَاتٌ বলা হয় চাই তা মাচায় ছড়ানো হোক বা না হোক। এতে আঙ্গুর, তরমুজ, খরবুজা, লাউ ইত্যাদি ধরনের গুল্ম লতা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ اُكُلُهُ : মুযাফ ইলাইহির যমীর ذرع-এর দিকে ফিরেছে; نَخْل-এর দিকে নয়। কেননা نَخْل হলো مُؤَنَّثْ سِمَاعِىْ আর اُكُلُ-এর যমীর হলো مُذَكَّرْ যার কারণে مُطَابَقَتْ হবে না, বাকিগুলোকে ذَرْع-এর উপর কিয়াস করা হবে।

قَوْلُهُ قَبْلَ النُّضْجِ : এটা একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. اِذَا اَثْمَرَ-এর কার্যত কোনো উপকারিতা বুঝা যায় না। কেননা ফল খাওয়ার সম্পর্ক ফল আসার পরেই হয়ে থাকে। ফল আগমনের পূর্বে খাওয়া সম্ভব নয়।

উত্তর. قَبْلَ النُّضْج-এর বৃদ্ধিকরণ এ প্রশ্নের সমাধান কল্পেই হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সাধারণত এই ধারণা হতে পারে যে, ফল ভক্ষণের সম্পর্ক ফল পাকার পরেই হয়ে থাকে। অথচ কতিপয় ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই খাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَاَنْشَا مِنَ الْاَنْعَامِ : এখানে اَنْشَا শব্দটি উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, مِنَ الْاَنْعَامِ-এর আতফ جَنّٰت-এর উপর হয়েছে, কেননা নিকটবর্তীর উপর আতফ করা দ্বারা অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ حَمُوْلَةً : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ-কে উহ্য ফে'লের মাফউল স্বীকৃতি দানকারীদের মতাদর্শকে খণ্ডন করার জন্য আনা হয়েছে, তখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, كُلُوْا ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ কেননা প্রয়োজনহীন উহ্য মানা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الضَّأْنِ : এটা ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ হতে بَدَلْ হয়েছে। ضَأْنٌ শব্দটি ضَائِنٌ-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ : **প্রশ্ন.** زَوْجَيْنِ শব্দটি زَوْجٌ-এর দ্বিবচন; জোড়াকে زَوْجٌ বলা হয়। যা দু'-এর উপর সম্বলিত। কাজেই زَوْجَيْنِ অর্থ হবে দুই জোড়া তথা চার। আর এ সুরতে زَوْجَيْنِ-এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না।

উত্তর. زَوْجٌ-এর দুটি অর্থ রয়েছে–

১. زَوْجٌ বলা হয় যার সাথে তার সমজাতীয় অন্যটি হবে। তার জন্য দু' হওয়া জরুরি নয়, যেমন স্বামীকে زَوْجٌ বলা হয়।

২. অন্য অর্থ হলো জোড়া। সে সময় زَوْجَيْنِ অর্থ হবে চার আর এ অর্থের ভিত্তিতে زَوْجَيْنِ-এর সিফত اِثْنَيْنِ নেওয়া বৈধ হবে না। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ءَالذَّكَرَيْنِ : এটা حَرَّمَ-এর مَفْعُوْل بِهٖ مُقَدَّمْ হয়েছে। আর اَمْ হলো حَرْف عَطْف আর الْاُنْثَيَيْنِ হলো ذَكَرَيْنِ-এর উপর আতফ। এরপর বাক্য হয়ে قُلْ-এর مَقُوْلَه হওয়ার কারণে نَصْب-এর স্থানে হয়েছে। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِىْ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পতভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালিমরা আল্লাহ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নির্মিত নিষ্প্রাণ, অচেতন প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছুতায় প্রতিমাগুলোর অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার

সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরিক ও অংশীদার করে ফেলেছে। অতঃপর তাদের সরলপথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদের দান করার কাজে কোনো অংশীদার নেই তখন ইবাদতে তাদের অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদের দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলো ব্যবহার করতে পার, এরপরও যেসব বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য সেই সব নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণে রাখা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শয়তানি ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে اَنْشَاَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং مَعْرُوْشَاتٌ শব্দটি عَرْشٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা, مَعْرُوْشَاتٌ বলে উদ্ভিদের ঐসব লতিকা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচা বা কাঠামোর উপর চড়ানো হয় যেমন– আঙ্গুর ও কোনো শাকসবজি। এর বিপরীতে غَيْرُ مَعْرُوْشَاتٌ বলে ঐ সমস্ত বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না। কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক ; কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না, যেমন– তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نَخْلٌ শব্দের অর্থ খেজুর বৃক্ষ, زَرْعٌ সর্বপ্রকার শস্য, زَيْتُوْنٌ জয়তুন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رُمَّانٌ ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। ১. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় এবং ২. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহর চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারা গাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরি, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমত ফলই ধরে না, যদি ধরেও তবে তা বাড়ে না এবং বাকি থাকে না, যেমন– আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোনো বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না, চড়লেও ফল দুর্বল হয়ে যায়, যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোনো কোনো বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবত সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোনো কোনো ফল মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ব হয় আর কোনো কোনো ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্য কিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরি। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এরপর বিশেষভাবে খেজুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খেজুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্য খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এর দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেওয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণত মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দুটি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ এখানে اُكُلُهٗ-এর সর্বনাম زَرْعٌ এবং نَخْلٌ উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ রয়েছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি, বাতাস, একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যাঁর জ্ঞান ও তাৎপর্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে, জয়তুন ও ডালিম। জয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দু প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। জয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবির পরিপূরক। বলা হয়েছে- كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ অর্থাৎ এসব বৃক্ষের ও শস্য ক্ষেত্রের ফসল আহার কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোনো প্রয়োজন মেটাতে চান না, বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। اِذَآ اَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তামাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার- পরিপক্ব হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর : দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে- وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ এখানে اٰتُوْا শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حَصَادٌ বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকির-মিসকিনকে দান করা বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ : অর্থাৎ সৎলোকদের ধনসম্পদে ফকির-মিসকিনদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে। এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বুঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের জাকাত-ওশর বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং জাকাত মদিনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরজ হয়েছে। তাই এখানে 'হক' -এর অর্থ ক্ষেতের জাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদিনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حَقٌّ -এর অর্থ জাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দলূসী 'আহকামুল কুরআনে' এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদিনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্য ক্ষেত্রের জাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কেননা তাঁদের মতে জাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিলের আয়াতে জাকাতের পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎ লোকের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হতো। অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল নামানের সময় যেসব গরিব মিসকিন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হতো। কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম-পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও ফসল এভাবে দান করার প্রথা কুরআন পাকের اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দুবছর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন অন্যান্য ধনসম্পদের জাকাত ও নিসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের জাকাতও বর্ণনা করেন। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে- مَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّاقِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ

অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচের ব্যবস্থা নেই, শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব।

ইসলামি শরিয়ত জাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার জাকাতের পরিমাণ বেশি আর পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, জাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণত যদি কেউ কোনো লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনারূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ জাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব। কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশি। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর জাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর জাকাত ও তার অর্ধেক। অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনারূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যাধিক। এজন্য এগুলোর জাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোনো নিসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশি সর্বাবস্থায় তার জাকাত বের করা জরুরি। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের ফসলের জাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোনো নিসাব বর্ণিত হয়নি।

বলা হয়েছে- اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্যসামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নিসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে জাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে জাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত হাদীসে কোনো নিসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই উৎপন্ন ফসল কমবেশি যাই হোক, তার উপর দশ ভাগের এক কিংবা বিশ ভাগের একভাগ জাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর পথে যদি কেউ সমস্ত ধনসম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না, বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর এই যে, বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রুটিরূপে দেখা দেয়। যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ত্রুটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে? তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

অনুবাদ :

١٤٥. قُلْ لَآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ شَيْئًا مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مَيْتَةً بِالنَّصْبِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ مَعَ التَّحْتَانِيَّةِ اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا سَائِلًا بِخِلَافِ غَيْرِهٖ كَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ حَرَامٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج اَىْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ اِلٰى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَاَكَلَهٗ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ لَّهٗ مَا اَكَلَ رَّحِيْمٌ بِهٖ وَيَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ كُلُّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

১৪৫. বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি নিষিদ্ধ কিছুই পাই না মড়া, বহমান রক্ত পক্ষান্তরে যা বহমান নয় যেমন, কলিজা, তিলি ইত্যাদির বিধান এটা হতে ভিন্ন ; يَكُوْنَ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে ও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গরূপে পঠিত। مَيْتَةً এটা مَنْصُوْب রূপে পঠিত। অপর এক কেরাতে এটা অর্থাৎ مَيْتَةٌ শব্দটি رَفْع সহ পঠিত রয়েছে। এ অবস্থায় يَكُوْنَ-এর ى অক্ষরটি পেশযুক্ত হবে। مَسْفُوْحًا অর্থ বহমান। ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা, এসব অপবিত্র হারাম। তবে যা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে অর্থাৎ অন্য কিছুর নামে জবাই করার কারণে অবৈধ। তাও হারাম। তবে কেউ অবাধ্যাচারী ও সীমলঙ্ঘনকারী না হওয়া উল্লিখিত বস্তুসমূহের কিছু গ্রহণে একান্ত বাধ্য হলে তোমার প্রতিপালক তার প্রতি যা আহার করে ফেলেছে তার জন্য ক্ষমাশীল, তার বিষয়ে পরম দয়ালু। হাদীস ও সুন্নার বিবরণ অনুসারে উল্লিখিত অবৈধ বস্তুসমূহের মধ্যে তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত হিংস্র পশু ও নখরবিশিষ্ট থাবার অধিকারী হিংস্র পাখিসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

١٤٦. وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا اَىِ الْيَهُوْدِ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ج وَهُوَ مَا لَمْ تُفَرَّقْ اَصَابِعُهٗ كَالْاِبِلِ وَالنَّعَامِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا الثُّرُوْبَ وَشَحْمَ الْكُلٰى اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَىْ مَا عَلِقَ بِهَا مِنْهُ اَوْ حَمَلَتْهُ الْحَوَايَا الْاَمْعَاءُ جَمْعُ حَاوِيَاءٍ اَوْ حَاوِيَةٍ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ط مِنْهُ وَهُوَ شَحْمُ الْاَلْيَةِ فَاِنَّهٗ اُحِلَّ لَهُمْ ذٰلِكَ التَّحْرِيْمُ جَزَيْنٰهُمْ بِهٖ بِبَغْيِهِمْ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ بِمَا سَبَقَ فِىْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ فِىْ اَخْبَارِنَا وَمَوَاعِيْدِنَا .

১৪৬. যারা ইহুদি হয়েছে তাদের জন্য অর্থাৎ ইহুদিগণের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু অর্থাৎ যে সমস্ত পশুর আঙ্গুল বিভক্ত নয় যেমন– উট, উটপাখি ইত্যাদি সেগুলো নিষিদ্ধ করেছিলাম। এবং গরু ও ছাগলের মধ্যে এতদুভয়ের চর্বি অর্থাৎ পাকস্থলী ও গুর্দার চর্বি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম তবে এগুলোর পৃষ্ঠ, অন্ত্র সংলগ্ন কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি অর্থাৎ নিতম্ব সংলগ্ন চর্বি ; তা তাদের জন্য হালাল ছিল নিষিদ্ধ ছিল না। اَلْحَوَايَا এটা حَاوِيَاءٌ বা حَاوِيَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– অন্ত্র। তাদের অবাধ্যতার দরুন بِبَغْيِهِمْ এটার ب টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক। সূরা আননিসায় উল্লিখিত সীমালঙ্ঘনের দরুন তাদেরকে এ প্রতিফল অর্থাৎ তাদের জন্য ঐ সমস্ত জিনিস নিষিদ্ধ করত প্রতিফল প্রদান করেছিলাম। আমি তো আমার প্রতিশ্রুতি ও সংবাদ দানে সত্যবাদী।

١٤٧. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فِيمَا جِئْتَ بِهِ فَقُلْ لَهُمْ رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ج حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ بِهِ وَفِيهِ تَلَطُّفٌ بِدُعَائِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَذَابُهُ إِذَا جَاءَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

১৪৭. অতঃপর যদি তারা তোমাকে তুমি যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আগমন করেছ সেসব বিষয়ে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে বল, তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক তাই তিনি তোমাদের অপরাধসমূহের শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেন না। এ বাক্যটি ঈমানের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করতে কোমলতা প্রদর্শনমূলক। এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি যখন আসে তখন আর তা রদ হয় না।

١٤٨. سَيَقُولُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط فَإِشْرَاكُنَا وَتَحْرِيمُنَا بِمَشِيئَتِهِ فَهُوَ رَاضٍ بِهِ قَالَ تَعَالَى كَذٰلِكَ كَمَا كَذَّبَ هٰؤُلَاءِ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ حَتّٰى ذَاقُوا بَأْسَنَا ط عَذَابَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ بِأَنَّ اللّٰهَ رَاضٍ بِذٰلِكَ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ط أَيْ لَا عِلْمَ عِنْدَكُمْ إِنْ مَا تَتَّبِعُونَ فِي ذٰلِكَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ تَكْذِبُونَ فِيهِ.

১৪৮. যারা শিরক করেছে তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না। অতএব আমাদের এ শিরক করা ও নিষিদ্ধ করা তাঁর ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তিনি এতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে অর্থাৎ এরা যেমন অস্বীকার করেছে তাদেরকে পূর্ববর্তীগণও তাদের নবীগণকে অস্বীকার করেছিল। অবশেষে তারা আমার যন্ত্রণা শাস্তি ভোগ করেছিল। বল, আল্লাহ যে তোমাদের এ কাজে সন্তুষ্ট এমন কোনো জ্ঞান তোমাদের নিকট আছে কি? থাকলে আমার নিকট তা পেশ কর। না, আসলে তোমাদের নিকট কোনো যুক্তি ও জ্ঞান নেই। এ বিষয়ে তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং কেবল অনুমানই করে থাক। অর্থাৎ মিথ্যাই বলে থাক। إِنْ تَتَّبِعُونَ -এটার إِنْ টি না-বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। إِنْ أَنْتُمْ এটার إِنْ টিও 'না' বাচক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٤٩. قُلْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ حُجَّةٌ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج التَّامَّةُ فَلَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدٰكُمْ أَجْمَعِيْنَ.

১৪৯. তোমাদের যখন কোনো যুক্তি নেই বল, পূর্ণাঙ্গ চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি যদি তোমাদের হেদায়েতের ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতেন।

١٥٠. قُلْ هَلُمَّ أَحْضِرُوا شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ج الَّذِي حَرَّمْتُمُوهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ يُشْرِكُوْنَ.

১৫০. বল, তোমরা যে সমস্ত জিনিস নিষিদ্ধ করে রেখেছ আল্লাহ যে এটা নিষিদ্ধ করেছেন এ সম্বন্ধে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরকে নিয়ে আস, হাজির কর। তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে এটা স্বীকার করো না। যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে; যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায় অর্থাৎ শিরক করে তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ شَيْئًا : এখানে مَا টি হলো مَوْصُوْلَهْ আর أُوْحِي হলো তার সেলাহ, তার عَائِدْ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَلَّذِي أَوْحَاهُ اللّٰهُ إِلَي

قَوْلُهُ شَيْئًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা مُحَرَّمًا উহ্য মাওসূফের সিফত হয়েছে। অর্থাৎ شَيْئًا مُحَرَّمًا

قَوْلُهُ مَيْتَةً بِالنَّصَبِ : كَانَ-কে যদি نَاقِصَهْ মানা হয় তবে তার যমীর উহ্য হবে এবং ঐ যমীরের مَرْجِعْ হবে شَيْئٌ مُحَرَّمٌ আর مَيْتَةً টা كَانَ-এর খবর হওয়ার কারণে مَنْصُوْبْ হবে আর يَكُوْنَ টা স্বীয় اِسْم-এর مَرْجِعْ যা مُحَرَّمْ-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে مُذَكَّرْ-এর সীগাহ হবে। এ সুরতে খবর অর্থাৎ مَيْتَةً-এর প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। আর تَكُوْنَ যা مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ খবরের প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে হবে। এ উভয় সুরতেই مَيْتَةً নসবযুক্ত হবে। আর مَيْتَةٌ -এর রফা'র সুরতে تَكُوْنَ-এর মধ্যে শুধুমাত্র এক কেরাতই হবে। অর্থাৎ উপরে নুক্তাযুক্ত تاء দ্বারা। আর এ সুরতে تَكُوْنَ টা تَامَّهْ হবে এবং مَيْتَةٌ তার فَاعِلْ হবে। যখন উল্লিখিত আলোচনা বুঝে আসল গ্রন্থকারের বক্তব্য وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ مَعَ التَّحْتَانِيَّةِ এটা লিখনির ভ্রান্তি বলে বিবেচিত হবে। বিশুদ্ধ হলো اَلْفَوْقَانِيَّةُ তথা تاء দ্বারা হওয়া।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ : যদি عُمُوْمِ أَحْوَالْ থেকে مُسْتَثْنٰى মানা হয় তবে তা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে। আর যদি বলা হয় যে, مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো مُحَرَّمًا যা ذَاتْ আর مُسْتَثْنٰى হলো مَيْتَةً যা সিফত। কাজেই مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর জিনস থেকে না হওয়ার কারণে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হবে। আর প্রথমটি হলো অধিক নিকটবর্তী। -[সাবী]

قَوْلُهُ حَرَامٌ : গ্রন্থকার যদি رِجْس-এর তাফসীর حَرَامْ-এর পরিবর্তে نَجَسْ দ্বারা করতেন তবে উত্তম হতো। কেননা হুরমত তো إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً الخ ইস্তেছনা থেকে বুঝে আসে।

قَوْلُهُ أَوْ فِسْقًا : এর عَطْف হলো مَيْتَةً -এর উপর এর মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ذَا فِسْقٍ মুবালাগার ভিত্তিতে حَمْل হবে। এ সুরতে زَيْدٌ عَدْلٌ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার নিকটবর্তিতার কারণে لَحْمَ خِنْزِيْرٍ-এর উপরও عَطْف হওয়া বৈধ রয়েছে। আর فَإِنَّهُ رِجْس এটা جُمْلَهْ مُعْتَرِضَهْ হয়েছে।

قَوْلُهُ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ : এটা فِسْقًا-এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রশ্ন. আয়াত দ্বারা উল্লিখিত চারটি বিষয়ের মধ্যেই হুরমতটা সীমাবদ্ধ হওয়া বুঝে আসে। অথচ এগুলো ব্যতীত ও আরো অনেক কিছু হারাম রয়েছে।

উত্তর. حَصْرِحَقِيْقِيْ বা প্রকৃত সীমাবদ্ধকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং হাদীস দ্বারা আরো অনেক কিছু হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلتُّرُوْبُ : এটা تَرْبٌ -এর বহুবচন। অর্থ চর্বির ঐ পাতলা আবরণকে বলে যা পাকস্থলী এবং নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদির উপর রয়েছে।

قَوْلُهُ كُلَي : এটা كُلْيَةٌ-এর বহুবচন। গ্রুপ, দলকে বলে।

قَوْلُهُ شَحْمُ الْأَلْيَةِ : অর্থ মেরুদণ্ডের চর্বি যা লেজের হাড়ের সাথে লেগে থাকে।

قَوْلُهُ نَحْنُ : এটা أَشْرَكْنَا-এর উহ্য যমীরের তাকিদ হয়েছে। যাতে করে مَرْفُوْعْ مُتَّصِلْ-এর উপর আতফ ঠিক থাকে। কেননা ضَمِيْر مَرْفُوْعْ مُتَّصِلْ-এর উপর আতফ করার জন্য فَصْلْ বা تَاكِيْد-এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ حُجَّةٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ উহ্য شَرْط-এর جَزَاءْ যাকে মুসান্নেফ (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاءِ-এর প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ اَحْضِرُوْا : প্রশ্ন : هَلُمَّ-এর তাফসীর اَحْضِرُوْا যা جَمْعْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ এর দ্বারা করার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে?

উত্তর. هَلُمَّ এটা اَسْمَاءُ اَفْعَالٍ -এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে হেজাযবাসীদের ভাষা অনুপাতে ব্যবহার হয়েছে। কেননা হেজাযবাসীদের নিকট এটা غَيْرُ مُنْصَرِفْ ; বনূ তামীমের বিপরীত। কাজেই এ প্রশ্ন এখানে শেষ হয়ে গেল যে, এখানে هَلُمُّوْا বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা উচিত ছিল। কেননা এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ অনেক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেই সব হালাল বস্তুর উল্লেখ রয়েছে যেগুলো জাহিলি যুগে পৌত্তলিকরা হারাম মনে করত। আর এ আয়াতে সেই হারাম বস্তুসমূহের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোকে পৌত্তলিকরা হালাল মনে করতো। –[তাফসীরে মারেআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.), খ. ২, পৃ. ৫৫৩]

ইমাম রাযী (র.) এ সম্পর্কে লিখেছেন যেহেতু ইতঃপূর্বে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হালাল হারামের সিদ্ধান্ত শুধু ওহীর মাধ্যমেই হয় আল্লাহ পাকই ঘোষণা করেন কোনো বস্তু হালাল আর কোনো বস্তু হারাম। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলুন আমার প্রতি যে ওহী নাজিল হয়েছে, মানুষের আহার্যের মধ্যে আমি চারটি বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নিষিদ্ধ পাই না।

আর এ চারটি বস্তু হলো : ১. যে জন্তু নিজে মরে গেছে ২. প্রবাহিত রক্ত ৩. শূকরের গোশ্‌ত ৪. অবৈধভাবে জবাই করা জন্তু যার উপর আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর নাম উচ্চারিত হয়েছে।

অতএব, এ চারটি বস্তু ব্যতীত আর কিছু ওহীর মাধ্যমে হারাম ঘোষিত হয়নি আর ওহী আসে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট। –[তাফসীরে কবীর, খ. ১৩, পৃ. ২১৯]

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ আদেশ দিয়েছেন যে, হে রাসুল! আপনি এ কাফেরদের জানিয়ে দিন যে ওহী আমার নিকট এসেছে তাতে চারটি জিনিসকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। [যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে করা হয়েছে] আমর ইবনে দীনার হযরত জাবের (রা.)-এর নিকট প্রশ্ন করেছিলেন, লোকে বলে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিনে গৃহপালিত গাধার গোশ্‌তকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ থেকে হাকাম ইবনে ওমর এ বর্ণনাই করেছেন। কিন্তু এই সমুদ্র তথা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথা অস্বীকার করেন। আর আলোচ্য আয়াত قُلْ لَّآ اَجِدُ পাঠ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বর্বরতার যুগে লোকেরা কোনো বস্তু আহার করতো আর কোনো বস্তু পরিহার করতো। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন আসমানি গ্রন্থ নাজিল করেছেন এবং হালাল হারামের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। যা আল্লাহর তরফ থেকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে তা হালাল, আর যা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হারাম আর যে ব্যাপারে নীরবতা পালন করা হয়েছে তা মাফ, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত قُلْ لَّآ اَجِدُ তেলাওয়াত করেন।

এক সাহাবীর বকরি মরে গেল। বিষয়টি প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে আলোচিত হলো, তিনি ইরশাদ করলেন তুমি তার চামড়াটা বের করলে না কেন? ঐ সাহাবী আরজ করলেন, মৃত বকরির চামড়া নেওয়া কি বৈধ? তখন প্রিয়নবী ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, মৃত বকরির গোশ্‌ত খাওয়া হারাম কিন্তু তার চামড়া দ্বারা তুমি উপকৃত হতে পার। তাই তিনি লোক পাঠিয়ে ঐ মৃত বকরির চামড়া বের করলেন এবং তা দ্বারা পানির মশক তৈরি করলেন যা অনেকদিন তাঁর কাজে লাগে।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ৯, পৃ. ২৩]

قَوْلُهٗ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ : আমি ইহুদিদের জন্য হারাম করেছিলাম প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী, আর গরু ছাগল থেকে তাদের চর্বি। পূর্ববর্তী আয়াতে হারাম বস্তুসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে কখনও কখনও সাময়িকভাবে কোনো বস্তু হারাম ঘোষণা করা হয়েছে যেমন অভিশপ্ত ইহুদি জাতির অন্যায়-অনাচারের শাস্তিস্বরূপ

নখরযুক্ত প্রাণী মাত্রকে তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। যার আঙ্গুলে ফাঁক নেই এমন বিশিষ্ট জন্তু যেমন– উটপাখি, হাঁস প্রভৃতি এবং গরু-ছাগলের পৃষ্ঠ দেশে একটি অন্ত্রে এবং হাড়ে চর্বি জড়ানো থাকে তা এবং অস্থি মজ্জার ভিতরে যে চর্বি থাকে তাও তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছিল।

ইহুদিরা একথা বলে বেড়াত যে এসব বস্তু হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জমানা থেকে হারাম বলে আসছে। কিন্তু তাদের এ দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাই পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হয়েছে– ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আমি ইহুদিদেরকে তাদের বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছি, এ বস্তুসমূহ হালাল ঘোষণা করা মাধ্যমে। কেননা, ইহুদিরা নবীগণকে হত্যা করেছে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রেখেছে, সুদ গ্রহণ করেছে, মানুষের অর্থসম্পদ হজম করেছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাব সম্পর্কে তাদের কিতাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে, চির অভিশপ্ত ইহুদি জাতি এত বড় অপরাধী ছিল, তাদের ব্যাপারে কোনো বস্তুকে হারাম করলে তাদের কি কিছু যায় আসে? তারা যে জন্ম অপরাধী। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এর জবাবে লিখেছেন, হয়তো আখেরাতের শাস্তি বৃদ্ধি করার নিমিত্তে এসব বস্তু হারাম ঘোষিত হয়েছে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বছরে যখন প্রিয়নবী ﷺ মক্কা মোয়াজ্জমায় ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, ইহুদিদের উপর আল্লাহর লানত, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি মৃত্যু জন্তুর চর্বি হারাম করে দিয়েছেন, কিন্তু তারা এ চর্বিকে রান্না করে বিক্রয় করেছে, আর তার মূল্য ভোগ করেছে। –[বুখারী]

قَوْلُهُ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ : নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী। এর তাৎপর্য হলো পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে, আর নেক কারদের জন্য যে ছওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে অবশেষে সবই সত্য প্রমাণিত হবে, আর পবিত্র কুরআনে অতীতের যে ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কতিপয় বিরোধপূর্ণ মাসায়েল : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে পালিত গাধা ভক্ষণ করা হারাম। অন্যান্য কতিপয় ফকীহ বলেন যে, তা হারাম নয়; বরং কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কারণে তা নিষিদ্ধ করেছিলেন। হিংস্র প্রাণী, শিকারি পাখি এবং মৃতভোজী প্রাণীকে হানাফীগণ সাধারণত হারাম বলে থাকেন। কিন্তু ইমাম মালেক এবং ইমাম আওযায়ী (র.)-এর মতে শিকারি পাখি হালাল। ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর নিকট শুধুমাত্র ঐ হিংস্র প্রাণীই হারাম যা মানুষের উপর আক্রমণ করে থাকে, যেমন– বাঘ, চিতা, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি। ইকরিমা (র.)-এর নিকট কাক, বিজ্জু [গোশ্‌তভোজী একজাতীয় প্রাণী] উভয়টি খাওয়া হলাল অনুরূপভাবে হানাফীগণের মতে সকল প্রকার কীটপতঙ্গ হারাম। কিন্তু ইবনে আবী লায়লা এবং ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট সর্প হালাল।

١٥١. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ أَقْرَأْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ مُفَسِّرَةٌ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ أَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ج وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْوَأْدِ مِنْ أَجْلِ إِمْلَاقٍ ط فَقْرٍ تَخَافُونَهُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ الْكَبَائِرَ كَالزِّنَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج أَيْ عَلَانِيَتَهَا وَسِرَّهَا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ كَالْقَوَدِ وَحَدِّ الرِّدَّةِ وَرَجْمِ الْمُحْصَنِ ذَٰلِكُمُ الْمَذْكُورُ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَتَدَبَّرُونَ.

অনুবাদ :

১৫১. বল, আসো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা আবৃত্তি করে বিস্তারিত পাঠ করে শুনাই; তোমরা তার কোনো শরিক করবে না, পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য দরিদ্রতার আশঙ্কায় তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত হত্যা করবে না। مِنْ إِمْلَاقٍ এটার مِنْ টি হেতুবোধক। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। গোপন ও বাহ্যিক অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ অর্থাৎ কবীরা গুনাহ, যেমন ব্যভিচার ইত্যাদির নিকটও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে যেমন কিসাস, মুরতাদ বা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ, বিবাহিত ব্যভিচারীর রাজম বা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা ইত্যাদি ব্যতিরেকে [তাকে হত্যা করবে না। এই] অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশ তোমাদেরকে তিনি দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর চিন্তা কর।

١٥٢. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَيْ بِالْخَصْلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَهِيَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ج بِأَنْ يَحْتَلِمَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ج بِالْعَدْلِ وَتَرْكِ الْبَخْسِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج طَاقَتَهَا فِي ذَٰلِكَ فَإِنْ أَخْطَأَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ صِحَّةَ نِيَّتِهِ فَلَا مُؤَاخَذَةَ عَلَيْهِ كَمَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ وَإِذَا قُلْتُمْ فِي حُكْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَاعْدِلُوا بِالصِّدْقِ وَلَوْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ ذَا قُرْبَىٰ ج قَرَابَةٍ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ط ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ بِالتَّشْدِيدِ تَتَّعِظُونَ وَالسُّكُونِ.

১৫২. পিতৃহীন বুদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎভাবে ছাড়া অর্থাৎ এমন বিষয় যাতে তার কল্যাণ নিহিত সেই বিষয় ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে দেবে। ন্যায়নুসারে দেবে ও মাপে কম প্রদান বর্জন করবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ও শক্তির বাহিরে ভার অর্পণ করি না। সুতরাং যদি পরিমাণ ও ওজনের বেলায় ভুল করে বসে আর আল্লাহ তার সৎ নিয়ত দেখেন তবে এটার কারণে সে অভিযুক্ত হবে না বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যখন তোমরা কোনো ফয়সালা প্রদান বা অন্য বিষয়ে কথা বলবে তখন যার পক্ষে বা বিরুদ্ধে কথা হবে সে স্বজন হলেও ন্যায্য কথা বলবে। আত্মীয়তার অধিকারী হলেও সত্য কথা বলবে। আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করবে। এ ধরনের নির্দেশ তোমাদেরকে আল্লাহ দেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, নসিহত গ্রহণ কর। تذكرون এটা তাশদীদ ও সাকিন উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে।

١٥٣. وَاَنَّ بِالْفَتْحِ عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ وَالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا هٰذَا الَّذِىْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا حَالٌ فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الطُّرُقَ الْمُخَالِفَةَ لَهٗ فَتَفَرَّقَ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ تَمِيْلُ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط دِيْنِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

১৫৩. আর নিশ্চয়ই এই পথ اَنَّ-এর পূর্বে একটি لَامٌ উহ্য ধরা হলে এটা ফাতাহ সহকারে পঠিত হবে। আর কাসরা সহ পাঠ করা হলে এটাকে مُسْتَانِفَةٌ অর্থাৎ নববাক্য বলে গণ্য করা হবে। যে পথের নির্দেশ দিয়েছি সেই পথ আমার সরল পথ। مُسْتَقِيْمًا এটা حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। সুতরাং তোমরা এটারই অনুসরণ করবে এবং ভিন্নপথসমূহ অর্থাৎ এটার বিপরীত কোনো পথ অনুসরণ করবে না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে তাঁর দীন হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, বিমুখ করে ফেলবে। تَفَرَّقَ এতে একটি ت উহ্য রয়েছে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।

١٥٤. ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ وَثُمَّ لِتَرْتِيْبِ الْاَخْبَارِ تَمَامًا لِلنِّعْمَةِ عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ بِالْقِيَامِ وَتَفْصِيْلًا بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِى الدِّيْنِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ اَىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ يُؤْمِنُوْنَ.

১৫৪. এবং মূসাকে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ; ثُمَّ এটাকে এ স্থানে تَرْتِيْبُ الْاَخْبَارِ অর্থাৎ বিবরণ ক্রম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দিয়েছিলাম যা ছিল সৎকর্মপরায়ণের জন্য অর্থাৎ যারা এতদনুসারে আমল প্রতিষ্ঠা করে তাদের জন্য সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহের পূর্ণতা স্বরূপ এবং ধর্ম বিষয়ে যা কিছুর প্রয়োজন ছিল সেই সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ রহমত স্বরূপ যেন তারা অর্থাৎ বনী ইসরাঈল তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مُفَسِّرَةٌ : اِلَّا-এর মধ্যে اَنْ টা اَنْ تِلَاوَتْ -এর জন্য فِعْلِ মُفَسِّرْ উর্দূতে يَعْنِىْ শব্দটি এর সমার্থবোধক। এটা اَنْ نَاصِبَةٌ নয়। কেননা نَاصِبَةٌ হওয়ার সুরতে عَطْفُ طَلَبْ عَلَى الْخَبَرِ আবশ্যক হওয়ার কারণে عَطْفُ বৈধ হবে না, উল্লিখিত اَنْ-এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পছন্দনীয়–

১. اَنْ-টা مُفَسِّرَةٌ হবে। কেননা তার পূর্বে اَتْلُ রয়েছে যা قَوْلٌ-এর অর্থে হয়েছে। কেননা اَنْ مُفَسِّرَةٌ-এর জন্য قَوْلٌ বা قَوْلٌ-এর সমার্থবোধক হওয়া জরুরি। لَا হলো نَاهِيَةٌ আর تُشْرِكُوْا ফে'লটি হলো مُضَارِعْ مَجْزُوْم

২. اَنْ টা মাসদারিয়া হবে। এ সুরতে اَنْ এবং তার অধীনস্থ বাক্যটি مَا حَرَّمَ থেকে بَدَلْ হবে।

قَوْلُهٗ اِمْلَاقٌ : এর অর্থ হলো– দরিদ্রতা, ক্ষুধার্ত, অভাব, হতদরিদ্র।

قَوْلُهٗ بِالْخَصْلَةِ : এর দ্বারা الَّتِىْ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ ثُمَّ لِتَرْتِيْبِ الْاَخْبَارِ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. ثُمَّ اٰتَيْنَا-এর আতফ হয়েছে وَصّٰكُمْ-এর উপর যা اِعْطَاءُ كِتَابٍ لِمُوْسٰى-এর مُؤَخَّرْ হওয়াকে বুঝায়। অথচ اِيْتَاءُ كِتَابٍ এটা অসিয়ত এর উপর مُقَدَّمْ

উত্তর. এখানে ثُمَّ টা تَرْتِيْبُ اَخْبَارِىْ-এর জন্য, تَرْتِيْبُ وُجُوْدِىْ-এর জন্য নয়।

قَوْلُهُ لِلنِّعْمَةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَمَامًا টা مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। تَمَامًا টা اِتْمَامْ -এর অর্থে হওয়ার কারণে لَامْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ : এটা يُؤْمِنُوْنَ -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে। فَوَاصِلْ -এর প্রতি লক্ষ্য রেখে مُقَدَّمْ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দুতিন রুকূ'ত অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফিল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোনো কোনো বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং স্ত্রীদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোনো কোনো বস্তুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ, মকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে; নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কুরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা হারাম। [কাশ্শাফ] এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই–

১. আল্লাহ তা'আলার সাথে ইবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা; ২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা; ৩. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা; ৪. নির্লজ্জতার কাজ করা; ৫. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা; ৬. এতিমের ধনসম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা; ৭. ওজন ও মাপে কম দেওয়া; ৮. সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা; ৯. আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং ১০ আল্লাহ তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিকে-ওদিকে অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : তাওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার পূর্বে ইহুদি ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাব তাওরাত বিসমিল্লাহর পর কুরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সূরা আলে ইমরানে মুহকাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরিয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোনো ধর্ম ও শরিয়তে এগুলোর কোনোটিই মনসূখ বা রহিত হয়নি। –[তাফসীরে বাহরে-মুহীত]

এসব আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসিয়তনামা : তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোহরাঙ্কিত অসিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ অসিয়ত বিদ্যমান, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কে আছে, আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তাফসীর লক্ষ্য করুন।

আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ এতে تَعَالَوْا শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদের নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন, এস, যাতে আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোনো প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন; মু'মিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর।

–[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে : এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে- أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরিকদের মতো দেবদেবীদের বা মূর্তিকে আল্লাহ মনে করো না। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতো পয়গম্বরদের আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলো না। অন্যদের মতো ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না। মূর্খজনগণের মতো পয়গাম্বর ও ওলীদের জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এখানে شَيْئًا-এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক; এ প্রকারদ্বয়ের মধ্যে থেকে কোনোটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, ইবাদত, আনুগত্য অথবা অন্য কোনো বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজকর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করা ও কার্যত অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এ ছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ ইত্যাদি ঠিকমতো পড়া, নামযশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শেখ সাদী (র.) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন–

درین نوعے از شرک پوشیدہ است

کہ زیدم بخشید وعموم بخست

অর্থাৎ যায়েদ আমাকে দান করেছে এবং ওমর আমার ক্ষতি করেছে এমন বলার মধ্যেও একপ্রকার প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান। সত্য এই যে, দান ও ক্ষতি সব সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। যায়েদ কিংবা ওমর হচ্ছে পর্দা, যার ভেতর থেকে দান ও ক্ষতি প্রকাশ পায়। উদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী যদি সারা বিশ্বের জিন ও মানব একত্রিত হয়ে তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ তোমার জন্য অবধারিত করেননি, তবে তাদের তা করার সাধ্য নেই। পক্ষান্তরে যদি সারা বিশ্বের জিন ও মানব একজোট হয়ে তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়, তবে তা কারও পক্ষ সম্ভবপর নয়।

মোটকথা, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গাম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ না করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয় তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কুরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নেই। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহর ক্ষমা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এ কারণেই হাদীসে ওবাদা ইবনে সামেত ও আবুদ্দারদা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, যদিও তোমাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলা হয় অথবা শূলিতে চড়ানো হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় গুনাহ পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার : এরপর দ্বিতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে- وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতামাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতামাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরজ। কুরআন পাকের অন্যত্র একথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ এ আয়াতে পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়াকে শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখ বিধানকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে- وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে- اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতামাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, নামাজ মোস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এরপর কোনটি? উত্তর হলো, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হলো, এরপর কোনটি? উত্তর হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, رَغِمَ اَنْفُهٗ، رَغِمَ اَنْفُهٗ، رَغِمَ اَنْفُهٗ অর্থাৎ সে লাঞ্ছিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে লাঞ্ছিত হয়েছে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

উদ্দেশ্য এই যে, বার্ধক্যাবস্থায় পিতামাতার সেবা-যত্ন দ্বারা জান্নাত লাভ নিশ্চিত। ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত, যে জান্নাত লাভের এমন সহজ সুযোগ হাত ছাড়া করে : সহজ সুযোগ এজন্য যে, পিতামাতা সন্তানের প্রতি স্বভাবতই মেহেরবান হয়ে থাকেন, সামান্য সেবা-যত্নেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিরাট কিছু করার দরকার হয় না। বার্ধক্যের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পিতামাতা যখন শক্ত-সমর্থ ও সুস্থ থাকেন, নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারেন বরং সন্তানদেরও আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য করেন, তখন তাঁরা সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী নন এবং এ সেবা-যত্নের বিশেষ কোনো মূল্যও নেই। তাঁরা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, তখনকার সেবা-যত্নই মূল্যবান হতে পারে।

তৃতীয় হারাম সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতঃপূর্বে পিতামাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতামাতার দায়িত্ব। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে রাখা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদের এবং তাদের উভয়কে জীবিকা দান করব।

জাহিলি যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষাণ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কুরআন পাক এ কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হতো। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়। এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তা'আলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতামাতা এ কাজ করতে পারে কি? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। এ কাজে মানুষের কোনো হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব পিতামাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিজিক দান করে। বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতামাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতামাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরও রিজিক দেব

এবং তাদেরও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদের রিজিক এজন্য দেওয়া হয় যাতে তোমরা সন্তানদের পৌঁছে দাও; এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিজিক দান করেন।

সূরা ইসরায়ও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিজিকের ব্যাপারে প্রথমে সন্তানদের উল্লেখ করে বলা হয়েছে- نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরও রিজিক দেব এবং তোমাদেরও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিজিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরও দেওয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও একপ্রকার সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গুনাহ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেওয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা যদ্দরুন সে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কুরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহকে চেনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে, যারা সন্তানদের কাজকর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামি চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ : আয়াতে বর্ণিত হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনে যে কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

فَوَاحِشْ শব্দটি فَاحِشَةٌ-এর বহুবচন। فُحْشٌ، فَحْشَاءُ ও فَاحِشَةٌ সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণত অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হয়। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ যার অনিষ্টতা ও খারাবি সুদূরপ্রসারী। ইমাম রাগেব (র.) 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ গ্রন্থে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজেরও নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে- يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অন্যত্র বলা হয়েছে- حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

যাবতীয় বড় গুনাহ فُحْشٌ ও فَحْشَاءُ-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কুরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলো যাবতীয় বদভ্যাস, মুখ, হাত-পা ও অন্তরের যাবতীয় গুনাহই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেওয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই فَوَاحِشْ-এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে- مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فَوَاحِشْ-এর অর্থ হবে হাত-পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গুনাহ এবং অভ্যন্তরীণ فَوَاحِشْ-এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গুনাহ। যেমন- হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فَوَاحِشْ-এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর অভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কু-নিয়তে পরনারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন অভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং অভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজকর্ম, যদিও সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণত স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেওয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ বিবাহ করা।

মোটকথা এই যে, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত গুনাহকে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাক, যেখানে গেলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্দ্বারা এসব গুনাহের পথ খুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ حَامَ حَوْلَ حِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়। অতএব নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা না করাই হলো সতর্কতা।

পঞ্চম হারাম অন্যায় হত্যা : পঞ্চম হরাম বিষয় হচ্ছে অন্যায় হত্যা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে। এ 'ন্যয়ভাবের' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানের খুন হালাল নয়। ১. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং ৩. সত্য ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলিফা হযরত উসমান গনী (রা.) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন আল্লাহর রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা জাহেলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোনো খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করব এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনো জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও?

বিনা কারণে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোনো অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম যে, কোনো ইসলামি দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো জিম্মি অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে। এ একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে- ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জোড় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম এতিমদের ধনসম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা : দ্বিতীয় আয়াতে এতিমদের ধনসম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্তবয়স্ক এতিম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন এতিমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা এতিমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে। তবে এতিমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবত লোকসানের আশঙ্কা নেই- এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরি পন্থা। এতিমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর এতিমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে।

اَشُدٌّ শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমদের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরিয়ত মতে তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা দেখলে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধনসম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধনসম্পদ হেফাজত করার দায়িত্ব অভিভাবকের। ইতোমধ্যে যখনই ধনসম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে তখনই তার ধনসম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে ঐ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোনো কোনো ইমামের

মতে তখনও তার মাল তাকে দেওয়া যাবে না, বরং শরিয়তের কাজী [বিচারক] তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন। এ বিষয়টি কুরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ অর্থাৎ এতিমদের মধ্যে বয়স্কপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমরা যদি এরূপ সুমতি দেখ যে, তারা স্বয়ং মালের হেফাজত করতে পারবে এবং কোনো কারবারে নিয়োগ করতে পারবে, তবে তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করে দাও। এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াই মাল সমর্পণের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং মালের হেফাজত ও কাজ কারবারের যোগ্যতাও শর্ত।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করা : এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশি নেবে না। -[রূহুল মা'আনী]

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপ কমবেশি করাকে কুরআন কঠোরভাবে হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহর আজাবে পতিত হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। -[ইবনে কাসীর]

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম : বলা হয়েছে- وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى অর্থাৎ 'তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদিও সে আত্মীয় হয়।' এখানে বিশেষ কোনো কথার উল্লেখ নেই। তাই সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশি না করে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া- অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোনো কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও লোকসানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। মকদ্দমার ফয়সালায় সাক্ষীদের শরিয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার মকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে "মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকীয় সমতুল্য।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বাক্য তিনবার বলে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ অর্থাৎ মূর্তিপূজার কুৎসিত বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে দূরে সরে থাকে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা অবস্থায়।

এমনিভাবে অসত্য ফয়সালা সম্পর্কে আবূ দাউদ হযরত বরীদা (রা.)-এর রেওয়ায়েত ক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি বর্ণনা করেন। কাজি [অর্থাৎ মকদ্দমার বিচারক] তিন প্রকার। তন্মধ্যে একপ্রকার জান্নাতে ও দু প্রকার জাহান্নামে যাবে। যে কাজি শরিয়তের নীতি অনুযায়ী মামলার তদন্ত করে সত্য ঘটনার জ্ঞান অর্জন করে অতঃপর তদনুযায়ী ফয়সালা করে সে জান্নাতি। পক্ষান্তরে যে তদন্ত করে সত্য অবগত হওয়ার পর জেনেশুনে অসত্য ফয়সালা করে, সে জাহান্নামি। এমনিভাবে যার কোনো জ্ঞান নেই কিংবা তদন্ত ও চিন্তাভাবনায় ত্রুটি করে এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকেই ফয়সালা করে, সেও জাহান্নামে যাবে।

সাক্ষাৎ কিংবা ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতার কোনো প্রভাব থাকা উচিত নয়; এ বিষয়টি কুরআনের অন্যান্য আয়াতে আরও পরিষ্কার ও তাকিদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ যদিও তোমার নিজের অথবা পিতামাতার ও আত্মীয়স্বজনের বিপক্ষে যায়, তবুও সত্য কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوْا অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের অসত্য সাক্ষ্য দিতে কিংবা অন্যায় ফয়সালা করতে উদ্বুদ্ধ না করে। পারস্পরিক কথাবার্তায় ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ মিথ্যা না বলা, অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা এবং কষ্টদায়ক কিংবা আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতিকারক কথাবার্তা না বলা।

নবম নির্দেশ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা : এ আয়াতে নবম নির্দেশ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং তা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কিত। বলা হয়েছে- وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوْا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে । তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল- أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল- بَلٰى অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক। এ অঙ্গীকারের দাবি হলো এই যে, প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর তাফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকিদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন, নযর, মানত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ অর্থাৎ আল্লাহর সৎ বান্দারা মানত পূর্ণ করে। মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে- ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

তৃতীয় আয়াতে দশম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ এ শরিয়তে মুহাম্মাদী আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোনো পথে চল না। কেননা সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এখানে هٰذَا শব্দ দ্বারা দীনে ইসলাম অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আন'আমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা এতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি তওহীদ, রিসালত এবং মূল বিধিবিধান ব্যক্ত হয়েছে। مُسْتَقِيْمًا শব্দটি صِرَاطٌ-এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে حَالٌ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে- فَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ তখন মনযিলে মকসুদের সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

এরপর বলা হয়েছে- وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ - سُبُلْ শব্দটি سَبِيْلٌ -এর বহুবচন। এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা এসব পথে চলো না। কেননা এসব পথ বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে, সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়বে।

তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে, কুরআন পাক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যানধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কুরআন ও সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে নিক এবং জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, মানুষ কুরআন ও সুন্নাহকে নিজ নিজ ধ্যানধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীত দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুসনাদে দারেমীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সরল রেখা টেনে বললেন, এটা আল্লাহর পথ। অতঃপর এর ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন, এগুলো سُبُلٌ [অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথসমূহ]। তিনি আরও বললেন, এর প্রত্যেকটি পথে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। এরা মানুষকে সরল পথ থেকে সরিয়ে এদিকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ বিষয়ে জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযমী হও। আয়াতদ্বয়ের তাফসীর এবং এগুলোতে বর্ণিত দশটি নির্দেশের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হলো। উপসংহারে কুরআন পাকের এ বর্ণনা পদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য করুন যে, উল্লিখিত দশটি নির্দেশকে বর্তমান কালে প্রচলিত আইন গ্রন্থের মতো দশ দফায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি; বরং প্রথমে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণনা করার পর বলেছেন- ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অতঃপর চারটি নির্দেশ ব্যক্ত করার পর এ تَعْقِلُوْنَ এর স্থলে تَذَكَّرُوْنَ -এর পরিবর্তন সহ উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ নির্দেশটি একটি স্বতন্ত্র আয়াত উল্লেখ করে এ বাক্যটিকেই আবার تَذَكَّرُوْنَ -এর স্থলে تَتَّقُوْنَ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন পাকের এ বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনা ভঙ্গিতে বহু তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। প্রথমত এই যে, কুরআন পাক জগতের সাধারণ আইনসমূহের মতো একটি শাসকসুলভ আইন নয়, বরং সহৃদয় আইন। তাই প্রত্যেক আইনের সাথে তাকে সহজসাধ্য করার কৌশলও ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পরিচয়জ্ঞান ও পরকাল চিন্তাই মানুষকে নির্জনে ও জনসমক্ষে আইনের অনুগামী হতে বাধ্য করে। এ কারণেই তিনটি আয়াতের শেষভাগেই এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের চিন্তাধারণাকে বস্তুজগৎ থেকে আল্লাহ ও পরকালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

প্রথম আয়াতে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে- ১. শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা, ২. পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা, ৩. সন্তান হত্যা থেকে বিরত থাকা, ৪. নির্লজ্জ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং ৫. অন্যায় হত্যা থেকে বিরত হওয়া। এগুলোর শেষে تَعْقِلُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা জাহিলি যুগে এগুলোকে কেউ দোষ বলে মনে করত না। তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৈতৃক কুপ্রথা ও ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করে বুদ্ধিকে কাজে লাগাও

দ্বিতীয় আয়াতে চারটি নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে- ১. এতিমের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা, ২. ওজন ও মাপে ত্রুটি না করা, ৩. কথাবার্তায় ন্যায় ও সততার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ৪. আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করা [যার সাথে তোমরা অঙ্গীকৃত।]

এসব বিষয় পূরণ করা যে জরুরি, তা যে কোনো অজ্ঞ লোকও জানে এবং জাহিলি যুগের কিছু লোক তা পালন করত কিন্তু অধিকাংশই ছিল গাফিল। এ গাফলতির প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ ও পরকালকে স্মরণ রাখা। তাই এ আয়াতের শেষে تَذَكَّرُوْنَ ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সরল পথ অবলম্বন করা এবং এর বিপরীত অন্য সব পথ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র আল্লাহভীতিই মানুষকে রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হতে পারে। তাই এর শেষে تَتَّقُوْنَ বলা হয়েছে। তিন জায়গাতেই وَصّٰىكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ জোর নির্দেশ। এ কারণেই কোনো কোনো সাহাবী বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোহরাঙ্কিত অসিয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ তিনটি আয়াত পাঠ করে।

١٥٥. وَهٰذَا الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ يَآ اَهْلَ مَكَّةَ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ وَاتَّقُوا الْكُفْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

١٥٦. اَنْزَلْنٰهُ لِ اَنْ لَّا تَقُوْلُوْآ اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى مِنْ قَبْلِنَا ص وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّا كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ قِرَاءَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِنَا لَهَا اِذْ لَيْسَتْ بِلُغَتِنَا .

١٥٧. اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ ج لِجَوْدَةِ اَذْهَانِنَا فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ بَيَانٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ اَعْرَضَ عَنْهَا ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ اَىْ اَشَدَّهُ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ .

١٥٨. هَلْ يَنْظُرُوْنَ مَا يَنْتَظِرُ الْمُكَذِّبُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلٰٓئِكَةُ لِقَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَىْ اَمْرُهُ بِمَعْنٰى عَذَابِهِ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ط اَىْ عَلَامَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى السَّاعَةِ .

অনুবাদ :

১৫৫. এ কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন আমি অবতারণ করেছি। এটা কল্যাণময়। সুতরাং হে মক্কাবাসী! এতে যা আছে তা অনুসারে আমল করত তারই অনুসরণ কর এবং কুফরি হতে বেঁচে থাক। হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।

১৫৬. আমি এটা অবতারণ করেছি এজন্য যে, তোমরা যেন বলতে না পার যে, اَنْ এটা এ স্থানে হেতুবোধক। تَقُوْلُوْا -এর পূর্বে একটি 'না' বাচক لَا উহ্য রয়েছে। কিতাব তো আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা তো তাদের অধ্যয়ন সম্বন্ধে পঠন-পাঠন সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম। اَنْ এটা مُثَقَّلَةٌ অর্থাৎ তাশদীদসহ রূঢ়রূপ হতে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে রূপান্তরিত। এটার اِسْم অর্থাৎ উদ্দেশ্য এ স্থানে উহ্য। মূলত ছিল اِنَّا অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা। কেননা তা আমাদের ভাষায় না হওয়ায় আমরা এ সম্পর্কে জানতাম না।

১৫৭. কিংবা যেন তোমরা না বলতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা মেধার উৎকৃষ্টতার কারণে তাদের অপেক্ষা অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম। এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ, বিবরণ পথ নির্দেশ, এবং যে ব্যক্তি এটার অনুসরণ করে তার জন্য রহমত এসেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় বিমুখ হয় তা অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? না কেউ নেই। যারা আমার নিদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এই সত্য বিমুখতার জন্য আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট কঠিন শাস্তি দেব।

১৫৮. তারা কেবল এটারই লক্ষ্য করছে যে অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারীরা কেবল এটারই অপেক্ষা করে যে তাদের প্রাণ সংহারের জন্য তাদের নিকট ফেরেশতাগণ আসবে تَاْتِيَهُمْ শব্দটি تَاء এবং يَاء উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অথবা তোমার প্রতিপালক তাঁর নির্দেশ ও কুদরতের নিশানী নিয়ে আসবেন অথবা তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন অর্থাৎ কিয়ামতের ইঙ্গিতবহ চিহ্নাদি আসবে।

يَوْمَ يَأْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ وَهُوَ طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا كَمَا فِىْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ الْجُمْلَةُ صِفَةُ نَفْسٍ اَوْ نَفْسًا لَمْ تَكُنْ كَسَبَتْ فِىْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ط طَاعَةً اَىْ لَا تَنْفَعُهَا تَوْبَتُهَا كَمَا فِى الْحَدِيْثِ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اَحَدَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ذٰلِكَ.

যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন আসবে সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে যে, এই নিদর্শন হলো পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া সেদিন যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি তার বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ এ বাক্যটি نَفْس -এর صِفَتْ অর্থাৎ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমানে কোনো কল্যাণকর কাজ অর্থাৎ আনুগত্যের কাজ করেনি। সেদিন তার তওবা কবুল করা হবে না বলে হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। বল এগুলোর যে কোনো একটির তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তার প্রতীক্ষা করছি।

١٥٩. اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِيْهِ فَاَخَذُوْا بَعْضَهٗ وَتَرَكُوْا بَعْضَهٗ وَكَانُوْا شِيَعًا فِرَقًا فِىْ ذٰلِكَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَارَقُوْا اَىْ تَرَكُوْا دِيْنَهُمُ الَّذِىْ اُمِرُوْا بِهٖ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى لَسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ط فَلَا تَتَعَرَّضْ لَهُمْ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ.

১৫৯. যারা দীন সম্পর্কে মতবিরোধ করে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তারা তো তার কিছু অংশ গ্রহণ করেছে। আর তার কতক অংশ বর্জন করে বসেছে ফলে এ বিষয়ে নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে فَرَّقُوْا এটা অপর এক কেরাতে فَارَقُوْا রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে, যারা নির্দেশিত ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। এরা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের কোনো কাজের জবাবদিহি তোমার উপর নেই সুতরাং তুমি এদের পিছনে পড়িও না, তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত। তিনিই এদের তত্ত্বাবধায়ক অতঃপর তাদেরকে তিনি পরকালে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। অনন্তর তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন। অস্ত্রধারণ সম্পর্কিত আয়াতের মাধ্যমে এ আয়াতোক্ত বিধান مَنْسُوْخٌ অর্থাৎ রহিত হয়ে গেছে।

١٦٠. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ اَىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ج اَىْ جَزَاءُ عَشْرِ حَسَنَاتٍ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰىٓ اِلَّا مِثْلَهَا اَىْ جَزَاؤُهٗ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ يَنْقُصُوْنَ مِنْ جَزَائِهِمْ شَيْئًا.

১৬০. কেউ কোনো সৎকর্ম করলে অর্থাৎ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করলে সে তার দশগুণ পাবে অর্থাৎ দশটি সৎকাজের পরিমাণ প্রতিদান পাবে। এবং কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে অনুরূপ অর্থাৎ কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হবে আর তারা অত্যাচারিতও হবে না। অর্থাৎ তাদের প্রতিদান হতে কিছুই হ্রাস করা হবে না।

١٦١. قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج وَيُبْدَلُ مِنْ مَحَلِّهٖ دِيْنًا قِيَمًا مُسْتَقِيْمًا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

১৬১. বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরলপথে পরিচালিত করেছেন, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত دِيْنًا এটা صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -এর مَحَلّ হতে بَدَل রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সরল ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

١٦٢. قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ عِبَادَتِىْ مِنْ حَجٍّ وَغَيْرِهٖ وَمَحْيَاىَ حَيَاتِىْ وَمَمَاتِىْ مَوْتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৬২. বল, আমার সালাত, আমার নুসুক অর্থাৎ হজ ও অন্যান্য সকল ইবাদত আমার জীবন হায়াত আমার মরণ মওত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

١٦٣. لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج فِىْ ذٰلِكَ وَبِذٰلِكَ اَىِ التَّوْحِيْدِ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ـ

১৬৩. এতে তাঁর কেউ শরিক নেই। আমি তারই অর্থাৎ তাওহীদেরই আদিষ্ট হয়েছি এবং এই উম্মতের আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।

١٦٤. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا اِلٰهًا اَىْ لَا اَطْلُبُ غَيْرَهٗ وَهُوَ رَبُّ مَالِكُ كُلِّ شَىْءٍ ط وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ذَنْبًا اِلَّا عَلَيْهَا ج وَلَا تَزِرُ تَحْمِلُ نَفْسٌ وَازِرَةٌ اٰثِمَةٌ وِزْرَ نَفْسٍ اُخْرٰى ج ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ـ

১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে প্রতিপালক অর্থাৎ ইলাহ অন্বেষণ করব? না, আর কাউকেও আমি ইলাহ হিসাবে অন্বেষণ করব না। তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক, মালিক। প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অর্থাৎ পাপাচারের জন্য দায়ী এবং কেউ কোনো প্রাণী অন্য কোনো প্রাণীর পাপের ভার নেবে না, وَازِرَةٌ অর্থ- পাপী। পাপের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন অতঃপর যে বিষয়ে তোমরা মতান্তর ঘটিয়েছিলে সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

١٦٥. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ جَمْعُ خَلِيْفَةٍ اَىْ يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِيْهَا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ بِالْمَالِ وَالْجَاهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اَعْطَاكُمْ لِيَظْهَرَ الْمُطِيْعُ مِنْكُمْ وَالْعَاصِىْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ لِمَنْ عَصَاهُ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمٌ بِهِمْ ـ

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন خَلٰٓئِفَ এটা خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ এখানে তোমরা একজন অপর জনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাক এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন প্রদান করেছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে অনুগত আর কে অবাধ্য তা যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে বিত্ত-বৈভব, মান-সম্মান ইত্যাদিতে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। তোমার প্রতিপালক পাপীদের ক্ষেত্রে শাস্তি দানে সত্বর। আর তিনি মু'মিনদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে দয়াময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِ اَنْ لَا تَقُوْلُوْا : لَامْ এবং لَا উহ্য মানার দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সামাধান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. اَنْ تَقُوْلُوْا টা اَنْزَلْنَاهُ-এর مَفْعُوْل لَهٗ হওয়া অর্থগতভাবে বৈধ নয়, বরং عَدَمِ قَوْل হলো مَفْعُوْل لَهٗ

উত্তর. এ প্রশ্নের সমাধান কল্পেই মুসান্নেফ (র.) হরফে জার لَامْ উহ্য মেনে اَنْزَلْنَاهُ-এর বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন এবং এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ টা হলো মাসদারিয়া, এ কারণেই تَقُوْلُوْا থেকে نُوْن পড়ে গেছে। কিসায়ী এবং ফাররা বলেন যে, اَنْ تَقُوْلُوْا মূলত ছিল لِاَنْ لَا تَقُوْلُوْا হরফে জর এবং حَرْفِ نَفِى -কে ফেলে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর বাণী- يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا-এর মূল হলো لِئَلَّا تَضِلُّوْا ; এমনি ভাবে আল্লাহর বাণী- رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ মূলত لِئَلَّا تَمِيْدَ بِكُمْ ছিল ব্যাখ্যাকার (র.) এ ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন। আর বসরীগণ মুযাফ উহ্য হওয়াকে গ্রহণ করেছেন। উহ্য ইবারত হলো- اَنْزَلْنَاهُ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَقُوْلُوْا বসরীগণ বলেন যে, لَا -কে ফেলে দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা جِئْتُ اَنْ اُكْرِمَكَ -এর অর্থ [illegible] নেই اَنْ لَا اُكْرِمَكَ

قَوْلُهُ اَوْ تَقُوْلُوْا : এর عَطْف হলো পূর্বের اَنْ تَقُوْلُوْا-এর উপর, কাজেই এখানেও لَامْ এবং لَا উহ্য হবে।

قَوْلُهُ الْجُمْلَةُ صِفَةُ نَفْسًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ لَكُمْ مِنْ قَبْلُ বাক্যটি نَفْسًا-এর সিফত [illegible]-এর নয়, যেমন নাকি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে প্রকাশ্যত সন্দেহ হয়। কেননা ঈমানের জন্য ঈমান আবশ্যক হবে, যা অসম্ভব।

قَوْلُهُ اَوْ نَفْسًا لَمْ تَكُنْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَوْكَسَبَتْ-এর আতফ اٰمَنَتْ -এর উপর হয়েছে اِيْمَانُهَا -এর উপর নয়।

قَوْلُهُ اَىْ لَا تَنْفَعُهَا تَوْبَتُهَا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. এ আয়াত মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের মাযহাবের সত্যায়ন করে। কেননা তাদের মতে اِيْمَانٌ مُجَرَّدٌ عَنِ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ উপকারী হবে না।

উত্তর. উত্তরের সার হলো, আয়াতটা لَفْ تَقْدِيْرِى -এর অন্তর্গত অর্থাৎ

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُ وَلَا كَسْبُهَا فِى الْاِيْمَانِ لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْهِ خَيْرًا

قَوْلُهُ جَزَاءُ عَشْرِ حَسَنَاتٍ : এ ইবারতে মুফাসসির (র.) فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا -এর মধ্যস্থ عَشَر শব্দের মধ্যে تَاء [illegible] করার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা প্রকাশ্য দিক থেকে عَشَرَةُ اَمْثَالِهَا হওয়া সমীচীন মনে হয়। কেননা مِثْل হলো مُذَكَّر বা পুংলিঙ্গ।

[illegible] হলো, اَمْثَال টা অর্থগত দিক থেকে مُؤَنَّث বা স্ত্রীলিঙ্গ।

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْ مَحَلِّهِ : هَدَانِىْ-এর প্রথম মাফউল হলো هَدَانِىْ-এর শেষের يَاء টি আর اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর دِيْنًا قِيَمًا টা صِرَاط-এর مَحَل থেকে بَدَل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে مَفْعُوْل ثَانِىْ হওয়ার কারণে নয় যেমনটি কেউ কেউ এ ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছেন।

قَوْلُهُ اَعْطَاكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اٰتَاكُمْ এটা اِيْتَاء হতে اِتْيَان থেকে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আনআমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে

[illegible] সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, [illegible] এর যুক্তি ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে

নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মু'জিযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়ের আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌঁছবে। নাকি হাশরের ময়দানের জন্য অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে? ফয়সালার জন্য কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় এ বিষয় সম্পর্কিত একটি আয়াত এরূপ- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ অর্থাৎ তারা কি এজন্য অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় তাদের কাছে এসে যাবেন, ফেরেশতাগণ উপস্থিত হবে এবং মানুষের জন্য জান্নাত ও দোজখের যা ফয়সালা হওয়ার, তা হয়ে যাবে।

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণত এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোন দিকে অবস্থান করবেন এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর এ আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا এতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, এখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তিই পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু কোনো সৎকর্ম করেনি, সে এখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবা কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহর শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন পাকের অনেক আয়াতে বর্ণিত আছে যে, দোজখীরা দোজখে পৌঁছে ফরিয়াদ করবে এবং মুখ ভরে ওয়াদা করবে যে, আমাদেরকে পুনর্বার দুনিয়ার ফেরত পাঠানো হলে আমরা ঈমান আনব এবং সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই করব না। কিন্তু সবার উত্তরে বলা হবে যে, ঈমান ও সৎকর্মের সময় ফুরিয়ে গেছে। এখন যা বলছ অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে বলছ! কাজেই তা ধর্তব্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ সূর্য পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নিদর্শনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। -[বগভী]

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কিয়ামতের কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোনো কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোনটি কুরআন পাক তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এ নিদর্শন দেখার পর জগতের সব মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ সময় সম্পর্কেই কুরআন পাকে বলা হয়েছে তখনকার বিশ্বাস স্থাপন কারও জন্য ফলপ্রসূ হবে না।

সহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হযরত হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর কিয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, ২. বিশেষ একপ্রকার ধোঁয়া, ৩. দাব্বাতুল-আরদ, ৪.

ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ৬. দাজ্জালের অভ্যুদয়, ৭. ৮. ও ৯. প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং ১০. আদন থেকে একটি আগুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুসনাদে-আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-আরদের আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী (র.) তাযকেরা গ্রন্থে এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ ঘটনার অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ' বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পর সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এবং মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় নাকি?

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে; হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

আল্লামা বুলকিনী প্রমুখ বলেন, এটাও অসম্ভব নয় যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় না হওয়ার এ নির্দেশটি শেষ জমানা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে না, বরং কিছুদিন পর এ নির্দেশ বদলে যাবে এবং ঈমান ও তওবা আবার কবুল হতে থাকবে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

সারকথা, আলোচ্য আয়াতে যদিও নিদর্শন ব্যক্ত করা হয়নি, যা প্রকাশিত হওয়ার পর তওবা কবুল হবে না, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা দ্বারা ফুটে উঠেছে যে, এ নিদর্শন হচ্ছে সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয়। কুরআন স্বয়ং একথা ব্যক্ত করল না কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে কুরআনের অস্পষ্টতাই গাফেল মানুষকে হুঁশিয়ার করার ব্যাপারে অধিক সহায়ক। ফলে তারা যে কোনো নতুন ঘটনা দেখেই হুঁশিয়ার হবে এবং দ্রুত তওবা করবে।

এছাড়া এ অস্পষ্টতার আরও একটি উপকারিতা এই যে, মানুষ আরও একটি ব্যাপারে সাবধান হতে পারবে। তা এই যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ফলে যেমন সমগ্র বিশ্বের জন্য তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তেমনি এর একটি নমুনা হিসেবে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগতভাবে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা তার মৃত্যুর সময় ঘটে।

কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এ বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল হয় না, যারা গুনাহ করতে থাকে, এমনকি যখন তাদের কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন বলে আমি এখন তওবা করছি। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِنَّ تَوْبَةَ الْعَبْدِ يُقْبَلُ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ অর্থাৎ বন্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয়, যতক্ষণ না তার আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে [illegible] করে।

এতে বোঝা গেল যে, অন্তিম নিশ্বাসের সময় যখন মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে যায়, তখন তওবা কবুল হয় না। এ পরিস্থিতিও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। তাই আলোচ্য আয়াতে بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ বাক্যে মৃত্যুর সময়কেও [illegible] হয়েছে। তাফসীর বাহরে মুহীতে কোনো কোনো আলেমের এ উক্তি বর্ণিতও হয়েছে যে, مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার কিয়ামত তখনই অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। কেননা কর্মজগৎ সমাপ্ত হওয়ার পর কর্মের [illegible] নমুনা কবর থেকেই শুরু হয়!

[illegible] এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে- أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ [illegible] পুনরুক্তি করে বলা হয়েছে- يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا এখানে সর্বনাম [illegible] সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। এতে বোঝা গেল যে, প্রথম বাক্যের কোনো কোনো নিদর্শন ভিন্ন এবং দ্বিতীয় বাক্যের [illegible] নিদর্শন ভিন্ন। এ দ্বারা পূর্ববর্ণিত হযরত হুযায়ফা ইবনে ওসায়েদের রেওয়ায়েতে বর্ণিত বিবরণের দিকে ইঙ্গিত [illegible] প্রধান নিদর্শন দশটি। তন্মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় সর্বশেষ নিদর্শন যা তওবার দরজা বন্ধ

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে- قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহর প্রমাণাদি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও যদি তোমরা মৃত্যু অথবা কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকতে চাও তবে থাক, আমরাও এজন্য অপেক্ষা করব যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হয়।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ الخ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। আর তাদের আল্লাহর সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের পথিকদের সাথে আপনার কোনোরূপ সম্পর্কে থাকা উচিত নয়। এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে; যেমন, মুশরিক, আহলে কিতাবদের অনুসৃত পথ আর কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত ও বিদ'আতের পথ। এগুলো মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়। বলা হয়েছে-

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

অর্থাৎ যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে ভ্রান্ত পথের অনুসারীদের সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল তাদের থেকে মুক্ত। তাঁর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অতঃপর তাদেরকে এই কঠোর শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে যে, তাদের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পিত রয়েছে। তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেবেন।

আয়াতে উল্লিখিত 'ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং 'বিভন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যানধারণা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোঁকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেওয়া।

ধর্মে বিদ'আত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে- কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নেজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উম্মতের বিদ'আতিরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন, বনী ইসরাঈলরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উম্মতও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কুকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উম্মতও তেমনি হবে। বনী ইসরাঈলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মতে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই দোজখে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তর হলো যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারাই মুক্তি পাবে। -[তিরমিযী, আবূ দাঊদ]

তাবারানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারূকে আযম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, এ আয়াতে বিদ'আতি, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত রয়েছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

قَوْلُهُ اِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ الخ : আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কমবেশি করে এক ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবিলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্য ধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু-আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লিখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আপনি বলে দিন আমাকে আমার পালনকর্তা একটি সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মতো নিজ ধ্যানধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথার অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন। [পালনকর্তা] শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবি। তোমরাও ইচ্ছা করলে হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যও বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এখানে قِيَمٌ শব্দটি قِيَامٌ ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সুদৃঢ়। অর্থাৎ এ দীন সুদৃঢ় যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মজবুত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; কারও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা নয় এবং যাতে সন্দেহ হতে পারে এমন কোনো নতুন ধর্মও নয়, বরং এটিই ছিল পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের ধর্ম। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, জগতের প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাঁর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী। বর্তমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান ও আরবের মুশরিকরা পরস্পর যতই ভিন্ন মতাবলম্বী হোক না কেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাহাত্ম্যে ও নেতৃত্ব সবাই একমত। নেতৃত্বের এ মহান পদমর্যাদা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছেন। বলা হয়েছে- اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا [আমি তোমাকে মানবজাতির নেতারূপে বরণ করব।]

তাদের মধ্যে প্রতিটি সম্প্রদায়ই একথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকত যে, তারা ইবরাহিমী ধর্মেই অটল রয়েছে এবং তাদের ধর্মই মিল্লাতে ইবরাহীম। তাদের এ বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ.) আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা থেকে বেঁচে থাকতেন এবং শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন। এটাই তাঁর সর্ববৃহৎ ও অক্ষয় কীর্তি। তোমাদের মধ্যে যখন ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে এবং আরবের মুশরিকরা হাজারো ধরনের পাথরকে আল্লাহর অংশীদার করে নিয়েছে, তখন কারও একথা বলার অধিকার নেই যে, তারা ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী। অবশ্য বুক ফুলিয়ে একথা বলার অধিকার একমাত্র মুসলমানদেরই আছে। কারণ তারা যাবতীয় শিরক ও কুফরের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এখানে نُسُكٌ শব্দের অর্থ কুরবানি। হজের ক্রিয়া-কর্মকেও نُسُكٌ বলা হয়। এ শব্দটি সাধারণ ইবাদত-উপাসনার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই نَاسِكٌ শব্দটি عابد [ইবাদতকারী] অর্থেও বলা হয়। আয়াতে এ সবকটি অর্থই নেওয়া যেতে পারে। তাফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকেও এসব তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তবে এখানে সব ধরনের ইবাদত অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত মনে হয়। আয়াতের অর্থ এই- আমার নামাজ, আমার সমগ্র ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

এখানে দীনের শাখাগত কাজকর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটি যাবতীয় সৎকর্মের প্রাণ ও দীনের স্তম্ভ। এরপর অন্য সব কাজ ও ইবাদত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর আরও অগ্রসর হয়ে সমগ্র জীবনের কাজকর্ম ও অবস্থা এবং সবশেষে মরণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কিছুই একমাত্র বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত যাঁর কোনো শরিক নেই। এটিই হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ আন্তরিকতার ফল। মানুষ জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় একথা মনে রাখবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর দাস এবং সর্বদা তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছি। আমার অন্তর, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা, কলম ও পদক্ষেপ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়। মানুষ যদি অন্তরে ও মস্তিষ্কে এ মোরাকাবা ও ধ্যানকে সদাসর্বদা উপস্থিত রাখে তবে সে বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে পারে এবং যাবতীয় পাপ ও অপরাধ থেকে নির্মল ও পূত-পবিত্র জীবনযাপন করতে পারে।

তাফসীরে দুররে-মানসূরে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, প্রত্যেক মুসলমান এ আয়াতটি বারবার পাঠ করুক এবং একে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করুক।

এ আয়াতে বর্ণিত 'নামাজ এবং সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য নিবেদিত' কথাটির অর্থ এই যে, এগুলোতে শিরক, রিয়া অথবা কোনো পার্থিব স্বার্থের প্রভাব না থাকা চাই। জীবন ও মরণ আল্লাহর জন্য হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আমার জীবন ও

মরণ তাঁরই করায়ত্ত। কাজেই জীবনের কাজকর্ম ও ইবাদত তাঁরই জন্য হওয়া অপরিহার্য। এ অর্থও হতে পারে যে, যেসব কাজকর্ম জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য যেমন– নামাজ, রোজা, অপরের সাথে লেনদেনের অধিকার ইত্যাদি এবং যেসব কাজকর্ম মৃত্যুর সাথে জড়িত অর্থাৎ অসিয়ত ও মৃত্যু-পরবর্তী ব্যবস্থা, তা সবই বিশ্ব-পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই বিধিবিধানের অনুগামী।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ ঘোষণা করার এবং আন্তরিকতা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি সর্বপ্রথম অনুগত মুসলমান। উদ্দেশ্য এই যে, এ উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান আমি। কেননা প্রত্যেক উম্মতের প্রথম মুসলমান স্বয়ং ঐ পয়গাম্বরই হন যার প্রতি ওহী অবতারণ করা হয়। প্রথম মুসলমান হওয়া দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সৃষ্টজগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর সমস্ত নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও অন্যান্য সৃষ্টজগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে– اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। –[রূহুল মা'আনী]

একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করতে পারে না : চতুর্থ আয়াতে মক্কার মুশরিক ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখের উত্তর দেওয়া হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলত তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে এলে আমরা তোমাদের যাবতীয় পাপের বোঝা বহন করব। বলা হয়েছে– قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা কি আমার কাছ থেকে এমন আশা কর যে, তোমাদের মতো আমিও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো পালনকর্তা অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই সারা জাহান ও সমগ্র সৃষ্টজগতের পালনকর্তা। আমার কাছে থেকে এরূপ পথভ্রষ্টতার আশা করা বৃথা। আমাদের পাপের বোঝা বহন করার যে কথা তোমরা বলছ, তা একান্তই একটি নির্বুদ্ধিতা। যে ব্যক্তি পাপ করবে, তারই আমলনামায় তা লেখা হবে এবং সে-ই এর শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের এ কথার কারণে পাপ তোমাদের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে, হিসাব ও আমলনামায় তো তাদেরই থাকবে; কিন্তু হাশরের ময়দানে এর যে শাস্তি নির্ধারিত হবে তা আমরা ভোগ করে নেব, তবে এ ধারণাও পরবর্তী আয়াত নাকচ করে দিয়েছে। বলা হয়েছে– لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

এ আয়াত মুশরিকদের অর্থহীন উক্তির জওয়াব তো দিয়েছেই; সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদেরকেও এ নীতি বলে দিয়েছে যে, কিয়ামতের আইনকানুন দুনিয়ার মতো নয়। দুনিয়াতে কেউ অপরাধ করে তার দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাতে পারে, যখন অপর পক্ষ তাতে সম্মত হয়। কিন্তু আল্লাহর আদালতে এর কোনো অবকাশ নেই। সেখানে একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে কিছুতেই দায়ী বা ধৃত করা হবে না। আয়াত দৃষ্টেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার উপর পিতামাতার অপরাধের কোনো দায়দায়িত্ব পতিত হবে না। এ হাদীসটি হাকেম হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বিশুদ্ধ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এক মৃত ব্যক্তির জানাজায় একজনকে কাঁদতে দেখে বললেন, জীবিতদের কাঁদার কারণে মৃতরা শাস্তি ভোগ করে। ইবনে আবী মুলায়কা (রা.) বলেন, আমি এ উক্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি এমন ব্যক্তির এ উক্তি বর্ণনা করছ যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না এবং তাঁর নির্ভরযোগ্যতায়ও কোনোরূপ সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু মাঝে শুনতেও ভুল হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের সুস্পষ্ট ফয়সালাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তাহলো لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ একের পাপ অপরের ঘাড়ে চাপতে পারে না। অতএব জীবিত ব্যক্তির কাঁদার কারণে নিরপরাধ মৃত ব্যক্তি কেমন করে আজাবে থাকতে পারে? –[দুররে-মানসূর]

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে অবশেষে তোমাদের সবাইকে পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখানে তোমাদের সব মতবিরোধেরই ফয়সালা শোনানো হবে। উদ্দেশ্য এই যে, বাকপটুতা ও জটিল আলোচনা পরিহার করা এবং পরিণাম চিন্তা করা।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ দিয়ে সূরা আন'আম সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অতীত ইতিহাস ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিবৃত্তান্ত উপস্থিত করে ভবিষ্যতের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ : خَلَائِفُ শব্দটি خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কারও স্থলাভিষিক্ত ও গদিনশীন। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের স্থলে অভিষিক্ত করেছেন। তোমরা আজ যে গৃহ ও সম্পত্তিকে নিজ মালিকানাধীন বল ও মনে কর, এরূপ নয় যে, কাল তাই তোমাদের মতো অন্য মানুষের মালিকানাধীন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সরিয়ে তোমাদেরকে তাদের স্থলে বসিয়েছেন। এ ছাড়া এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, তোমাদের মধ্যে সবাই সমান নয়; কেউ নিঃস্ব, কেউ সম্পদশীল, কেউ লাঞ্ছিত এবং কেউ সম্মানিত। এটাও জানা কথা যে, ধনাঢ্যতা ও মান-সম্মান মানুষের ক্ষমতাধীন ব্যাপার হলে কেউ নিঃস্ব ও লাঞ্ছিত হতে সম্মত হতো না। পদমর্যাদার এ পার্থক্যও তোমাদেরকে এ কথাই অবহিত করছে যে, ক্ষমতা অন্য কোনো সত্তার হাতে রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব করেন, যাকে ইচ্ছা ধনী এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছনা দেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- لِيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتَاكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে অন্যের স্থলে অভিষিক্ত করা তাদের ধন-সম্পত্তির মালিক করা এবং সম্মান ও লাঞ্ছনার বিভিন্ন স্তরে রাখার উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের চক্ষু খুলুক এবং এ বিষয়ের পরীক্ষা হোক যে, অন্যদেরকে হটিয়ে যেসব নিয়ামত তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, তোমরা সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ ও অনুগত হও, না অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হও।

ষষ্ঠ আয়াতে উভয় অবস্থার পরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে- اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অবাধ্যকে দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী এবং অনুগতদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

সূরা আন'আমের শুরু হামদ দ্বারা হয়েছে এবং সমাপ্তি মাগফেরাতের দ্বারা হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হামদের তওফীক এবং মাগফেরাতের গৌরবে ভূষিত করুন।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূরা আন'আম সবটাই একবারে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এমন জাঁকজমকের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে যে, সত্তর হাজার ফেরেশতা এর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে করতে আগমন করেছেন। এ কারণেই হযরত ফারূকে আযম (রা.) বলেন, সূরা আন'আম কুরআন পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ সূরাসমূহের অন্যতম।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে রোগীর উপর সূরা আন'আম পাঠ করা হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিরাময় করেন। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আ'রাফ মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الثَّمَانِ اَوِ الْخَمْسِ اٰيَاتٍ مِائَتَانِ وَخَمْسٌ اَوْ سِتُّ اٰيَاتٍ

কিন্তু وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ থেকে ৮ আয়াত অথবা ৫ আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ : আয়াত– ২০৫/২০৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. الٓمٓصٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذٰلِكَ.

১. আলিফ, লাম, মী, সাদ। এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত।

٢. هٰذَا كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ ضِيْقٌ مِّنْهُ اَنْ تُبَلِّغَهٗ مَخَافَةَ اَنْ تُكَذَّبَ لِتُنْذِرَ مُتَعَلِّقٌ بِاُنْزِلَ اَىْ لِلْاِنْذَارِ بِهٖ وَذِكْرٰى تَذْكِرَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بِهٖ.

২. এ একটি কিতাব যা তোমার নিকট অবতীর্ণ করা হয়েছে اِلَيْكَ [তোমার প্রতি] এ স্থানে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে তুমি এটা দ্বারা সতর্ক কর এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ। অর্থাৎ এটার সাহায্যে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং এটা একটি উপদেশ স্বরূপ এটাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অনন্তর তোমার মনে এটার সম্পর্কে অর্থাৎ এটার প্রচার সম্পর্কে তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে এ আশঙ্কায় কোনোরূপ দ্বিধা যেন না থাকে। لِتُنْذِرَ এটা اُنْزِلَ [অবতীর্ণ করা হয়েছে] ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٣. قُلْ لَّهُمْ اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَىِ الْقُرْاٰنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَىِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ اَوْلِيَآءَ ط تُطِيْعُوْنَهُمْ فِىْ مَعْصِيَتِهٖ تَعَالٰى قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَتَّعِظُوْنَ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِهَا وَمَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ الْقِلَّةِ.

৩. এদের বলে দাও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ তাকে ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবকের অনুসরণ করো না। অর্থাৎ অন্য কাউকে এমন অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ পূর্বক তাদের অনুসরণ করতে শুরু করবে। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। تَذَكَّرُوْنَ এটা ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন ও ى অর্থাৎ নাম পুরুষ বহুবচন উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। এতে মূলত ذ অক্ষরে ت -এর اِدْغَامٌ অর্থাৎ সন্ধি হয়েছে। অপর এক কেরাতে ذ সাকিনসহও পঠিত রয়েছে। مَا -এটা زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। স্বল্পতার تَاكِيْد বা জোর বুঝাতে এ স্থানে এটার ব্যবহার হয়েছে।

٤. وَكَمْ خَبَرِيَّةٌ مَفْعُوْلٌ مِّنْ قَرْيَةٍ اُرِيْدَ اَهْلُهَا اَهْلَكْنٰهَا اَرَدْنَا اِهْلَاكَهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا عَذَابُنَا بَيَاتًا لَيْلًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ.

৪. আর কত জনপদকে অর্থাৎ তার অধিবাসীকে; كَمْ এটা خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক। এ স্থানে মূলত مَفْعُوْل রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি ধ্বংস করছি। অর্থাৎ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেছি। অনন্তর তাদের উপর আমার পরাক্রম অর্থাৎ আমার শাস্তি আপতিত হলো রাত্রিতে অথবা তারা যখন বিশ্রামরত ছিল।

نَائِمُوْنَ بِالظَّهِيْرَةِ وَالْقَيْلُوْلَةُ اِسْتِرَاحَةُ نِصْفِ النَّهَارِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ اَىْ مَرَّةً جَاءَهَا لَيْلًا وَمَرَّةً نَهَارًا .

অর্থাৎ দ্বিপ্রহরে শয়নরত ছিল। অর্থাৎ আমার শাস্তি কখনো বা রাত্রিতে আপতিত হয়েছে আর কখনো বা দিনে আপতিত হয়েছে। قَائِلُوْنَ দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত। قَيْلُوْلَةٌ অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম গ্রহণ করা। এটার সাথে নিদ্রা বিজড়িত হওয়া জরুরি নয়।

٥. فَمَا كَانَ دَعْوٰهُمْ قَوْلُهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ .

৫. যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছে তখন তাদের ডাক অর্থাৎ কথা শুধু এটাই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী।

٦. فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ اَىِ الْاُمَمَ عَنْ اِجَابَتِهِمُ الرُّسُلَ وَعَمَلِهِمْ فِيْمَا بَلَّغَهُمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ عَنِ الْاِبْلَاغِ .

৬. অতঃপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে অর্থাৎ উম্মতগণকে আমি জিজ্ঞাসা করবই অর্থাৎ তারা রাসূলগণের আহ্বানের কি জওয়াব প্রদান করেছে, কতটুকু তা কবুল করেছে এবং তাদের নিকট যা পৌঁছেছে তদনুসারে কতটুকু তারা আমল করেছে এতদসম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করবই এবং রাসূলগণকেও তাদের প্রচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব।

٧. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ لَنُخْبِرَنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ بِمَا فَعَلُوْهُ وَمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ عَنْ اِبْلَاغِ الرُّسُلِ وَالْاُمَمِ الْخَالِيَةِ فِيْمَا عَمِلُوْا .

৭. অনন্তর তাদের নিকট সজ্ঞানে বিবৃত করবই। অর্থাৎ তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবই। আর আমি তো রাসূলগণের প্রচার ও অতীত উম্মতগণের কার্যকলাপ হতে অনুপস্থিত ছিলাম না।

٨. وَالْوَزْنُ لِلْاَعْمَالِ وَلِصَحَائِفِهَا بِمِيْزَانٍ لَهُ لِسَانٌ وَكِفَّتَانِ كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ كَائِنٌ يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ السُّؤَالِ الْمَذْكُوْرِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ نِ الْحَقُّ الْعَدْلُ صِفَةُ الْوَزْنِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ بِالْحَسَنَاتِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ .

৮. সেদিন অর্থাৎ উল্লিখিত জিজ্ঞাসাবাদের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমলসমূহের অথবা আমলনামাসমূহের ওজন ঠিকভাবেই অর্থাৎ ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে করা হবে। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, তা মীযান ও দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করা হবে। তার একটি জিহ্বা [অগ্রভাগ, নোক] ও দুটি পাল্লা হবে। যাদের পাল্লা সৎকর্মাবলির কারণে ভারী হবে তারাই কল্যাণের অধিকারী হবে। সফলকাম হবে। يَوْمَئِذٍ -এর পূর্বে كَائِنٌ শব্দটি উল্লেখ করে মাননীয় তাফসীরকার এদিকে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে তা এ স্থানে خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْحَقُّ এটা اَلْوَزْنُ -এর صِفَتٌ অর্থাৎ বিশেষণ।

٩. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ بِالسَّيِّئَاتِ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ بِتَصْيِيْرِهَا اِلَى النَّارِ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ يَجْحَدُوْنَ .

৯. আর যাদের পাল্লা অসৎকর্মের দরুন হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করত। অর্থাৎ ঐসমস্ত প্রত্যাখ্যান করত।

١٠. وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ بِالْيَاءِ اَسْبَابًا تَعِيْشُوْنَ بِهَا جَمْعُ مَعِيْشَةٍ قَلِيْلًا مَّا لِتَاكِيْدِ الْقِلَّةِ تَشْكُرُوْنَ .

১০. হে আদম সন্তান! আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি مَعَايِشَ এটা ش -এর পূর্বে ى সহ পঠিত রয়েছে। এটা مَعِيْشَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ জীবনোপকরণসমূহ। তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। مَا تَشْكُرُوْنَ -এর مَا টি স্বল্পতার تَاكِيْد অর্থাৎ জোর বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِلْاِنْذَارِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِتُنْذِرَ-এর মধ্যে لَامْ-এর পরে اَنْ مَصْدَرِيَّةْ উহ্য রয়েছে। কাজেই এ সংশয়েরও নিরসন হয়ে গেল যে, لِتُنْذِرَ-এর মধ্যে فِعْل-এর উপর حَرْفُ جَارْ এসেছে। এ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ বাক্যটি عِلَّتْ-এর مَعْلُوْل-এর মাঝে جُمْلَهْ مُعْتَرِضَهْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَذِكْرٰى : এটা كِتَابٌ-এর উপর مَعْطُوْف হওয়ার কারণে উহ্যভাবে مَرْفُوْع হয়েছে। এটা اِسْمُ مَصْدَرْ উহ্য ইবারত হলো- هٰذَا كِتَابٌ وَتَذْكِرَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

قَوْلُهُ قُلْ لَهُمْ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করেছে যে, ইতঃপূর্বে সম্বোধন রাসূল ﷺ-এর দিকে ছিল এরপর হঠাৎ অন্যদের দিকে সম্বোধনকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো, যার জন্য প্রকাশ্যত কোনো কারণ বা করীনা ও বিদ্যমান নেই। এর উত্তরের জন্যই قُلْ لَهُمْ-কে উহ্য মেনে اِلْتِفَاتْ-কে বিশুদ্ধ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ خَبَرِيَّةٌ مَفْعُوْل : অর্থাৎ كَمْ خَبَرِيَّةْ টা উহ্য ফে'লের মাফউল হয়েছে এবং এটা عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর অন্তর্গত। উহ্য ইবারত হলো- اَوْ اَهْلَكْنَا كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا

قَوْلُهُ اَرَدْنَا : প্রশ্ন. اَهْلَكْنَا-এর পূর্বে اَرَدْنَا উহ্য মানার মধ্যে কি উপকারিতা রয়েছে?

উত্তর. মুফাসসির (র.) اَرَدْنَا উহ্য মেনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রশ্নের সারকথা হলো আল্লাহর বাণী- كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَائَنَا দ্বারা বুঝা যায় যে, اِهْلَاكْ বা ধ্বংস করা مُقَدَّمْ হবে আর فَجَاءَ بَأْسُنَا মুয়াখখার হবে। অর্থাৎ اهلاك যা হলো مُسَبَّبْ তা مُقَدَّمْ এবং مَجِيْئَتْ যা سَبَبْ তা مُؤَخَّرْ হয়েছে। অথচ سَبَبْ টা مُسَبَّبْ-এর مُقَدَّمْ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শাস্তির আগমন مُقَدَّمْ হয় আর ধ্বংস পরে হয়ে থাকে। আয়াত দ্বারা এর বিপরীত বুঝা যায়। মুফাসসির আলিমগণ এর বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। তন্মধ্য হতে একটি উত্তর মুফাসসির (র.) اَرَدْنَا উহ্য মেনে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আমি তাদেরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছি তখন তাদের উপর আমার শাস্তি নিপতিত হলো। উহ্য ইবারত হলো- اَرَدْنَا اِهْلَاكَهَا فَجَائَهَا بَأْسُنَا

প্রশ্ন. কিন্তু এখানে এখনও একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে যায়। তা এই যে, فَجَائَنَا-এর মধ্যে فَاءْ টি হলো تَعْقِيْبِيَّةْ যা শাস্তি ধ্বংসের পরে আসাকে বুঝায়। কাজেই পূর্বোক্ত প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে।

উত্তর. এই যে, فَاءْ কখনো তাফসীরের জন্যও ব্যবহৃত হয়। কেননা ধ্বংসের বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন কখনো মৃত্যু طَبْعِىْ-এর কারণে হয়ে থাকে। কখনো আগুনে পুড়ে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। কখনো পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। فَجَائَنَا بَأْسُنَا বলে মৃত্যুর কারণের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আমার শাস্তির কারণেই হয়েছে।

قَوْلُهُ مَرَّةً جَاءَ لَيْلًا وَمَرَّةً نَهَارًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَوْ টা تَنْوِيْع-এর জন্য, সংশয়ের জন্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সন্দেহ-সংশয় মুক্ত।

প্রশ্ন. একটি حَالْ-কে যখন অপর একটি حَالْ-এর উপর عَطْف করা হয় তখন وَاوْ عَاطِفَهْ নেওয়া জরুরি হয়। আর এখানে اَوْ هُمْ قَائِلُوْنَ-এর আতফ بَيَاتًا-এর উপর হয়েছে। কাজেই এর মাঝে وَاوْ عَاطِفَهْ নেওয়া জরুরি ছিল।

উত্তর. اَوْ-টা تَنْوِيْع-এর জন্য যা মূলত হরফে আতফের মতোই। যদি وَاوْ عَاطِفَهْ নেওয়া হতো তবে উহ্য ইবারত এরূপ হতো যে, اَوْ وَهُمْ قَائِلُوْنَ দুটি হরফে আতফ-এর একত্রিত হওয়া কঠিন হওয়ার কারণে وَاوْ-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوْ لِصَحَائِفِهَا : اَعْمَالْ-এর পরে صَحَائِفُ اَعْمَالْ-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ঐ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, اَعْمَالْ যেহেতু اَعْرَاضْ কাজেই তার ওজন সম্ভব নয়। জবাবের সার হলো, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো, صَحَائِفُ اَعْمَالْ আর صَحَائِفُ اَعْمَالْ-এর ওজনের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ لِسَانُ الْمِيْزَانِ : لِسَانُ الْمِيْزَانِ দ্বারা সাধারণত সেই সুচ বা কাটা উদ্দেশ্য হয় যা উভয় পাল্লার সমতাকে জানিয়ে দেয়। যখন উভয় পাল্লা পরিপূর্ণ রূপে সমান সমান হয়ে যায় তখন ঐ لِسَانْ বা কাটা একেবারে ঠিক মাঝখানে এসে যায়।

قَوْلُهُ كَائِنٌ : এটাকে উহ্য মানার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْوَزْنُ হলো মুবতাদা আর يَوْمَئِذٍ টা كَائِنٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ صِفَةُ الْوَزْنِ : এতে সে সকল লোকদের উপর খণ্ডন করা হয়েছে যারা اَلْحَقُّ -কে اَلْوَزْنُ মুবতাদার খবর স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা সে সুরতে অর্থ এই হবে যে, ওজন সেদিন সত্য তা ব্যতীত নয়। আর এটা হলো ভুল বা অশুদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আরাফ প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ২০৬ আয়াত এবং ২৪ রুকূ' রয়েছে। এ সূরায় আটটি আয়াত وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ থেকে وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ পর্যন্ত মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সঙ্গে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার এবং তার অনুসরণের কথা ছিল, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের আলোচনা দ্বারা। তাই ইরশাদ হয়েছে- الٓمّٓصٓ ـ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ

এতদ্ব্যতীত বিগত সূরায়ে তাওহীদের বিবরণ ছিল অধিকতর, আর এ সূরায় রিসালাত বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে অধিক পরিমাণে। এ সূরার শুরুতে হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হযরত হুদ (আ.), হযরত সালেহ (আ.), হযরত লূত (আ.) এবং হযরত শুআইব (আ.)-এর ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। তাদের উম্মতদের অন্যায় আচরণের শাস্তিস্বরূপ তাদের প্রতি আল্লাহর যে আজাব আপতিত হয়েছিল, তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ জানতে পারে যে, নবী-রাসূলগণের বিরোধিতার পরিণতি কত ভয়াবহ হয়। এরপর হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ফেরাউনের সাথে তাঁর যে মোকাবিলা হয়েছে তার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক মানবজাতি থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে, যা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন। এরপর এ সূরার শেষে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণের তাগিদ রয়েছে।

সম্পূর্ণ সূরার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার বিষয়বস্তুর অধিকাংশই পরকাল ও নবুয়তের সাথে সম্পৃক্ত। শুরু থেকে ষষ্ঠ রুকূ' পর্যন্ত বেশির ভাগেই পরকালের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকূ' থেকে একুশতম রুকূ' পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা এবং তাঁদের উম্মতদের ঘটনাবলি, প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

الٓمّٓصٓ : আলিফ লাম মীম সোয়াদ এ অক্ষরগুলো সম্পর্কে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি তাই এ সম্পর্কে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নেই। -[তাফসীরে নূরুল কুরআন খ. ১ পৃ. ১৯৩]

অবশ্য এস্থানে الٓمّٓصٓ -এর অর্থ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রায় সকল তাফসীরকারগণ। ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ অক্ষরগুলোর অর্থ বলেছেন- اَنَا اللّٰهُ اَفْضَلُ আমি আল্লাহ উত্তম। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ وَاَفْصِلُ আমি আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। আল্লামা আলূসী (র.) পূর্বোল্লিখিত কথাগুলোর বিবরণ দেওয়ার পর আরো লিখেছেন- তাফসীরকার যাহহাক বলেছেন, এর অর্থ হলো- اَنَا اللّٰهُ الصَّادِقُ আমি আল্লাহই সত্যবাদী। আর মুহাম্মাদ ইবনে কাআবুল কারাজী বলেছেন, এ অক্ষরগুলোর মধ্যে আলিফ এবং লাম আল্লাহ শব্দ থেকে এবং মীম রহমান শব্দ থেকে এবং সোয়াদ সামাদ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার এ অক্ষরগুলোর আরো অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাকই এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। -[তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ৮ ; পৃ. ৭৪]

قَوْلُهُ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ : প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; এ কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোনো সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরে সংকোচ অর্থ হলো কুরআন পাক ও এর নির্দেশনাবলি প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। -[মাযহারী]

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাজিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাজতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন? কারও কারও মতে এখানে অন্তরের সংকোচনের অর্থ এই যে, কুরআন ও ইসলামি বিধিবিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দয়ার কারণে মর্মাহত হতেন। একেই অন্তরের মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে- আপনার কর্তব্য শুধু দীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না- এ দায়িত্ব আপনার নয়। অতএব আপনি অহেতুক মর্মাহত হবেন কেন?

قَوْلُهُ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে– যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কিনা? –[মাযহারী]

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছিয়েছি কিনা? তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন আমরা বলব, আপনি আল্লাহর পয়গাম আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কিনা। আমি উত্তরে বলব, পৌঁছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়। –[তাফসীরে মাযহারী]

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সে যুগে বর্তমান ছিল, কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না এবং সেসব বংশধর যারা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পয়গাম পৌঁছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌঁছে যায়।

قَوْلُهُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ الخ : প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে– وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ অর্থাৎ সেদিন যে ভালোমন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিকভাবেই হবে। এতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভালোমন্দ কাজকর্ম কোনো জড়বস্তু নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমত পরম প্রভু আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছুই করতে পারেন। অতএব আমরা যা ওজন করতে পারি না, আল্লাহ তা'আলা তাও ওজন করতে পারবেন না, এমনটা কল্পনা করা যায় না। দ্বিতীয়ত আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যাতে দাঁড়িপাল্লা স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়। এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এতদ্ব্যতীত স্রষ্টার এ শক্তিও রয়েছে যে, তিনি আমাদের কাজকর্মকে জড় আকার আকৃতি দান করতে পারেন। অনেক হাদীসে এর প্রমাণও রয়েছে যে, বরযখ ও হাশরের ময়দানে মানুষের কাজকর্ম বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি ধারণ করে উত্থিত হবে। কবরে মানুষের সৎকর্মসমূহ সুশ্রী আকারে তাদের সহচর হবে এবং অসৎ কর্মসমূহ সাপ-বিচ্ছু হয়ে গায়ে জড়িয়ে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জাকাত দেয়নি, তার ধনসম্পদ বিষাক্ত সাপের আকারে কবরে পৌঁছবে এবং তাকে দংশন করতে করতে বলবে– আমি তোমার ধনসম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার।

এমনিভাবে কতিপয় নির্ভরযোগ্য হাদীসে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মানুষের সৎ কর্মসমূহ তাদের যানবাহন হবে এবং অসৎ কর্মসমূহ বোঝা হয়ে মাথায় চেপে বসবে। এক সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– কুরআন পাকের সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান হাশরের ময়দান দুটি ঘন মেঘের আকারে এসে সেসব লোককে ছায়া দেবে, যারা এ সূরাগুলো পাঠ করত।

এমনি ধরনের নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ জগৎ ছেড়ে যাওয়ার পর আমাদের সব ভালোমন্দ কাজকর্ম বিশেষ আকার ও আকৃতি ধারণ করবে এবং এক একটি পদার্থ-সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত থাকবে কুরআন পাকের অনেক বক্তব্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে– وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু করেছিল, তাকে সেখানে উপস্থিত পাবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ অর্থাৎ যে এক কণা পরিমাণও সৎকাজ করবে, কিয়ামতে তা দেখতে পাবে এবং যে এক কণা পরিমাণও অসৎকাজ করবে কিয়ামতে তাও দেখতে পাবে। এসবের বাহ্যিক অর্থ এই যে, মানুষের কাজকর্ম পদার্থ সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে সামনে আসবে। কাজকর্মের প্রতিদান উপস্থিত পাবে এবং দেখবে এতে কোনো রূপক অর্থ করার প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় কাজকর্মসমূহকে ওজন করা কোনো অসম্ভব অথবা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সব কিছুকে উপস্থিত ও বাহ্যিক অবস্থার কষ্টিপাথরে যাচাই করতে অভ্যস্ত। কুরআন পাক মানুষের এ অবস্থা বর্ণনা করে বলে–

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ : অর্থাৎ তারা শুধু পার্থিব জীবনের পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। বাহ্যিক ও পার্থিব জীবনে তারা আকাশ-পাতালের খবর রাখে, কিন্তু যেসব বিষয়ের বাস্তব স্বরূপ বিশুদ্ধরূপে উদ্‌ঘাটিত হবে সেগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ওজন সংক্রান্ত বিষয়টিকে অস্বীকার করে না বসে তাই وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ কথাটি একান্ত গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে, যাতে বাহ্যদর্শী মানুষ বুঝতে পারে যে, পরকালে আমাদের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিয়ামতে আমলের ওজন সংক্রান্ত বিষয়টি কুরআনের বহু আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিশদ বর্ণনায় হাদীসের সংখ্যাও প্রচুর।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর : আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র ওজন হবে সবচাইতে বেশি। এ কালেমা যে পাল্লায় থাকবে তা সর্বাধিক ভারী হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– হাশরের ময়দানে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সব আমলনামাই অসৎ কাজ এবং গুনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে– এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না আমলনামা লেখক ফেরেশতা তোমার প্রতি কোনো অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোনো কোথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে– হায় পরওয়ারদিগার, এতে যা কিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কালেমা 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না-মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে– ইয়া রব, অত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবিলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ঈমানের কালেমা সংবলিত পাতাটি রাখা হবে। এতে কালেমার পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হাল্কা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর নামের তুলনায় কোনো বস্তুই ভারী হতে পারে না। –[তাফসীরে মাযহারী]

মুসনাদে বাযযার ও মুস্তাদরাক হাকেমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন, আমি তোমাদেরকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র অসিয়ত করছি। কেননা যদি সাত আসমান ও জমিন এক পাল্লায় এবং কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কালেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবুদ্দারদা (রা.) থেকে নির্ভরযোগ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিনের পাল্লা সবসময়ই ভারী হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য আয়াত এবং অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপ কর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এবং কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণত কুরআন পাকের এক আয়াতে আছে– وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ইনসাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। যদি একটি রাইদানা পরিমাণও ভালোমন্দ কাজ কেউ করে তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্য যথেষ্ট। সূরা কারিয়াতে বলা হয়েছে– فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে এবং যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে দোজখ।

এসব আয়াতের তাফসীরে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে মু'মিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে স্বীয় আমলসহ জান্নাতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। –[তাফসীরে মাযহারী]

আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোনো বান্দার ফরজ কাজসমূহে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল আলামীন বলবেন দেখ, তার নফল কাজও আছে কিনা। নফল কাজ থাকলে ফরজের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

এসব আয়াত ও হাদীসের মর্ম এই যে, মু'মিন মুসলমানদের পাল্লাও কোনো সময় ভারী এবং কোনো সময় হাল্কা হবে। তাই তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, এতে বোঝা যায় যে, হাশরে দু'বার ওজন হবে। প্রথমে কুফর ও ঈমানের ওজন হবে। এর ফলে মু'মিন ও কাফের পৃথক হয়ে যাবে। এ ওজনে যার আমলনামায় শুধু ঈমানের কালেমাও থাকবে, তার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে এবং তাকে কাফেরদের দল থেকে পৃথক করা হবে। দ্বিতীয়বার নেকী ও পাপের ওজন হবে। তাতে কোনো মুসলমানের নেকী এবং কোনো মুসলমানের পাপ ভারী হবে এবং তদনুযায়ী তাকে প্রতিদান ও শাস্তি দেওয়া হবে। এমনিভাবে সব আয়াত ও হাদীসের বিষয়বস্তু স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। −[বয়ানুল কুরআন]

আমলের ওজন কিভাবে হবে : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহর কাছে মশার পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কুরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন− فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ الْقِيَامَةَ وَزْنًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোনো ওজন স্থির করব না। −[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাঁর পা দুটি বাহ্যত যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর ওজন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশি হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে− দুটি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দুটি এই− سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন− 'সুবহাল্লাহ' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায়, আর 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে বাকি অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যাবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্য উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

এসব হাদীস দৃষ্টে আমলের ওজনের অবস্থা বিভিন্ন রূপ মনে হয়। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আমলকারী মানুষের ওজন হবে। তারা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী হাল্কা কিংবা ভারী হবে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আমলনামারই ওজন করা হবে। আবার কোনো কোনো হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, আমলসমূহ বস্তুসত্তা বিশিষ্ট হবে এবং সেগুলোর ওজন করা হবে। ইবনে কাসীর এসব হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, বিভিন্ন রূপে একাধিকবার ওজন হওয়াও বিচিত্র নয়। এসব বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমল করার জন্য এ স্বরূপ জানা আদৌ জরুরি নয়; বরং এতটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আমাদের আমলেরও ওজন হবে। নেক আমলের পাল্লা হালকা হলে আমরা আজাবের যোগ্য হবো। তবে আল্লাহ তা'আলা কাউকে স্বীয় কৃপায় কিংবা কোনো নবী অথবা ওলীর সুপারিশে ক্ষমা করে দিলে তা ভিন্ন কথা।

যেসব হাদীসে বলা হয়েছে যে কোনো কোনো ব্যক্তি শুধু কালেমার বদৌলতে মুক্তি পাবে এবং সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সেগুলো উপরিউক্ত ব্যতিক্রম অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তারা সাধারণ নিয়েমের বাইরে কৃপা ও অনুকম্পার কারণে মুক্তি পাবে।

আলোচ্য দুটি আয়াতে পাপীদেরকে হাশরে লাঞ্ছনা ও আজাবের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সত্য গ্রহণ করতে ও তদনুযায়ী কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য এবং মালিকসুলভ ক্ষমতা দান করেছি। অতঃপর তোমাদের জন্য ভোগ সামগ্রী উপার্জন করার হাজারো পথ খুলে দিয়েছি। রাব্বুল আলামীন যেন পৃথিবীকে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে চিত্তবিনোদনের আসবাবপত্র পর্যন্ত সব কিছুর একটা বিরাট গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এর ভেতরে সৃষ্টি করেছেন। এখন মানুষের কাজ শুধু এতটুকু যে, গুদাম থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বের করে নিয়ে তা ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা করে নেওয়া। সত্য বলতে কি, ভূপৃষ্ঠে গুদামে সংরক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী সুষ্ঠুরূপে বের করা এবং বিশুদ্ধ পন্থায় তা ব্যবহার করাই মানুষের যাবতীয় জ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মূল লক্ষ্য। যেসব বোকা ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ এ গুদাম থেকে মাল বের করার পদ্ধতি জানে না, কিংবা বের করার পর নিয়ম বুঝে না, তারা এর উপকার থেকে বঞ্চিত থাকে। বুদ্ধিমান মানুষ এসব নিয়ম-পদ্ধতি বুঝে এ গুদাম থেকে লাভবান হয়।

মোট কথা মানুষের যাবতীয় আসবাবপত্র আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে এবং পার্থিব দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছে قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা খুব কম লোকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

অনুবাদ :

١١. وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ اَىْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ اَىْ صَوَّرْنَاهُ وَاَنْتُمْ فِىْ ظَهْرِهٖ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبَا الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰٓئِكَةِ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ .

১১. আমিই তোমাদেরকে অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের অর্থাৎ তাঁকে ও তোমাদেরকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে রেখে রূপ দান করি, তৎপর ফেরেশতাগণকে আদমের সেজদা করতে বলি। এটা ছিল আনত হয়ে অভিবাদনমূলক সেজদা। ইবলিস জিন জাতির আদি পিতা, সে তখন ফেরেশতাগণের মাঝে ছিল ব্যতীত সকলেই সেজদা করে। সে ইবলিস সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

١٢. قَالَ تَعَالٰى مَا مَنَعَكَ اَلَّا زَائِدَةٌ تَسْجُدَ اِذْ حِيْنَ اَمَرْتُكَ ط قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ .

১২. আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল اَلَّا-এর لَا শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। যে তুমি সেজদা করলে না? اِذْ এটা এ স্থানে حِيْنَ অর্থাৎ যখন, যে সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে বলল, 'আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমাকে তুমি অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কর্দম হতে সৃষ্টি করেছ।'

١٣. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا اَىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ فَمَا يَكُوْنُ يَنْبَغِىْ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ مِنْهَا اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ الذَّلِيْلِيْنَ .

১৩. তিনি বললেন, 'এ স্থান হতে অর্থাৎ জান্নাত হতে কেউ কেউ বলেন, আকাশ হতে নেমে যাও, এ স্থানে থেকে তুমি অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। অর্থাৎ এ স্থানে তোমার অহংকার করা উচিত নয়। সুতরাং এ স্থান হতে বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি অধমদের লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

١٤. قَالَ اَنْظِرْنِىْٓ اَخِّرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ اَىِ النَّاسُ .

১৪. সে বলল, 'যেদিন। মানুষ পুনরুত্থিত হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে সময় দাও, অবকাশ দাও।

١٥. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ اَىْ وَقْتِ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى .

১৫. তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে। অপর একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তুমি নির্দিষ্ট একটা সময় অর্থাৎ নাফখা-এ-উলা বা ইসরাফীলের প্রথম ফুৎকার পর্যন্ত অবকাশ প্রাপ্ত হলে।"

١٦. قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ اَىْ بِاِغْوَائِكَ لِىْ وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَجَوَابُهٗ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ اَىْ لِبَنِىْ اٰدَمَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ اَىْ عَلَى الطَّرِيْقِ الْمُوْصِلِ اِلَيْكَ .

১৬. সে বলল, তুমি আমার সর্বনাশ করলে অর্থাৎ তোমা কর্তৃক আমার সর্বনাশের শপথ করে বলছি যে ; فَبِمَا -এর ب অক্ষরটি قَسَمِيَّةٌ বা শপথ অর্থ ব্যঞ্জক। সেহেতু আমি তোমার সরল পথে অর্থাৎ যে পথ তোমার সমীপে নিয়ে যায় সেই পথ তাদের জন্য আদম-সন্তানদের জন্য নিশ্চয়ই ওত পেতে থাকবে। لَاَقْعُدَنَّ এটা কসমের জওয়াব।

١٧. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ط اَىْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَاَمْنَعُهُمْ عَنْ سُلُوْكِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّاْتِىَ مِنْ فَوْقِهِمْ لِئَلَّا يَحُوْلَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ ـ

১৭. অতঃপর আমি তাদের উপর চড়াও হবোই, তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম সকল দিক হতে। অনন্তর এ সরল পথে চলতে তাদেরকে বাধা প্রদান করব। এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ অর্থাৎ বিশ্বাসী পাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বান্দার মধ্যে যেন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় সেহেতু ইবলিস মানুষের মাথার উপর দিয়ে এসে কোনো প্রকার চক্রান্ত করতে পারবে না।

١٨. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا بِالْهَمْزَةِ مَعِيْبًا اَوْ مَمْقُوْتًا مَّدْحُوْرًا ط مُبْعَدًا عَنِ الرَّحْمَةِ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ مِنَ النَّاسِ وَاللَّامُ لِلْاِبْتِدَاءِ اَوْ مُوَطِّئَةٌ لِلْقَسَمِ وَهُوَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ اَىْ مِنْكَ بِذُرِّيَّتِكَ وَمِنَ النَّاسِ وَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ وَفِى الْجُمْلَةِ مَعْنٰى جَزَاءِ مَنِ الشَّرْطِيَّةِ اَىْ مَنِ اتَّبَعَكَ اُعَذِّبُهُ ـ

১৮. তিনি বললেন, এ স্থান হতে দোষী ও বিতাড়িত অবস্থায় অর্থাৎ আল্লাহর রহমত হতে বিদূরিত অবস্থায় বের হয়ে যাও مَذْءُوْمًا এটার ذ অক্ষরটির পর হামযাসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ দোষী হওয়া, ক্রোধ নিপতিত অবস্থায়। এদের অর্থাৎ মানুষের; لَمَنْ -এর لَامْ অক্ষরটি اِبْتِدَاء অর্থাৎ مُبْتَدَا -এর অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা কসমের উপর ইঙ্গিতবহ। আর উক্ত কসম হলো لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা অর্থাৎ তোমার সন্তানসন্ততিসহ তুমি ও তোমার অনুসারী মানুষ সকলের দ্বারা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। مِنْكُمْ এ স্থানে [كُمْ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন অর্থবোধক সর্বনাম উল্লেখ করত] تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ অর্থাৎ অনুপস্থিতের উপর উপস্থিতদের প্রাধান্য দেওয়ার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ এ বাক্যটিতে পূর্বোল্লিখিত শর্তবাচক مَنْ -এর جَزَاء বা জওয়াবের অর্থ বিদ্যমান। আয়াতটির সারমর্ম হলো, যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি প্রদান করব।

١٩. وَ قَالَ يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ تَاكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ فِى اُسْكُنْ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ وَزَوْجُكَ حَوَّاءُ بِالْمَدِّ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ بِالْاَكْلِ مِنْهَا وَهِىَ الْحِنْطَةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

১৯. এবং তিনি বলেছেন, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী হাওয়া; এটা مَدّ অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরে উচ্চারিত হয় জান্নাতে বসবাস কর. اَنْتَ এটা اُسْكُنْ [বসবাস কর] ক্রিয়াস্থিত উহ্য সর্বনাম [তুমি]-এর تَاكِيْد [অর্থাৎ জোর সৃষ্টি] রূপে এবং পরবর্তী শব্দ [زَوْجُكَ] টিকে তার সাথে عَطْف বা অন্বয়ের উদ্দেশ্য ব্যবহার করা হয়েছে। এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এ বৃক্ষের অর্থাৎ এটা এতে কিছু আহারের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমার সীমালজ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই বৃক্ষ ছিল গমের।

٢٠. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ اِبْلِيْسُ لِيُبْدِىَ يُظْهِرَ لَهُمَا مَا وُرِىَ فُوْعِلَ مِنَ الْمُوَارَةِ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا ـ

২০. অনন্তর শয়তান ইবলিস তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল যেন সে গোপন করে রাখা তাদের লজ্জাস্থান উদ্ঘটিত করে দিতে পারে। প্রকাশ করে দিতে পারে।

وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا كَرَاهَةَ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ وَقُرِئَ بِكَسْرِ اللَّامِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ اَىْ وَذٰلِكَ لَازِمٌ عَنِ الْاَكْلِ مِنْهَا كَمَا فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلٰى .

সে বলল, পাছে তোমারা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা এ স্থানে স্থায়ী হও সেই বিষয় পছন্দ না করার দরুন তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। ঐ বৃক্ষ হতে কিছু আহার করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এটাই অর্থাৎ ফেরেশতা হওয়া বা স্থায়ী হওয়া। অপর একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, শয়তান বলেছিল, هَلْ اَدُلُّكُمَا عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلٰى অর্থাৎ আমি তোমরা উভয়কে সন্ধান দেব কি স্থায়িত্ব লাভ হওয়ার বৃক্ষের এবং এমন এক সাম্রাজ্যের যা কখনো জীর্ণ হবে না? وُرِىَ এটা مُوَارَاةٌ হতে গঠিত مَجْهُوْل বা কর্মপদবাচ্য ক্রিয়া। অর্থ যা গোপন রাখা হয়েছে। مَلَكَيْنِ এ শব্দটি لام -এর কাসরাসহও পঠিত রয়েছে। অর্থ রাষ্ট্রপতি।

২১. وَقَاسَمَهُمَا اَىْ اَقْسَمَ لَهُمَا بِاللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ فِىْ ذٰلِكَ .

২১. সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করল অর্থাৎ তাদের উভয়ের নিকট সে আল্লাহর নামে শপথ করে বলল নিশ্চয় আমি এ বিষয়ে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদেরই একজন।

২২. فَدَلّٰهُمَا حَطَّهُمَا عَنْ مَنْزِلَتِهِمَا بِغُرُوْرٍ مِنْهُ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ اَىْ اَكَلَا مِنْهَا بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا اَىْ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قُبُلُهُ وَقُبُلُ الْاٰخَرِ وَدُبُرُهُ وَسُمِّىَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَوْأَةً لِاَنَّ انْكِشَافَهُ يَسُوْءُ صَاحِبَهُ وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ اَخَذَا يَلْزِقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ لِيَسْتَتِرَا بِهِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ .

২২. অনন্তর সে তৎপ্রবঞ্চনার মাধ্যমে তাদের উভয়কে নামিয়ে দিল, মর্যাদাচ্যুত করল। তারা যখন সেই বৃক্ষের অস্বাদ গ্রহণ করল অর্থাৎ তা হতে আহার করল। তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকটিত হয়ে পড়ল। অর্থাৎ নিজের ও অপরজনের লজ্জাস্থান পরস্পরের সামনে অনাবৃত হয়ে পড়ল। লজ্জাস্থানকে আরবিতে سَوْأَةٌ [খারাপ, কষ্টকর] বলার কারণ হলো, তা অনাবৃত হওয়া সকলের নিকটই খারাপ লাগে। এবং তারা নিজেদের আচ্ছাদিত করার মানসে জান্নাতপত্র দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল। অর্থাৎ নিজেদের অঙ্গে তা চাপিয়ে ধরতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অর্থাৎ তার শত্রুতা যে সুস্পষ্ট একথা তোমাদেরকে বলিনি? اَلَمْ এ স্থানে تَقْرِيْر অর্থাৎ বক্তব্যটিকে সুসাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে اِسْتِفْهَامٌ বা প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

২৩. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا بِمَعْصِيَتِنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

২৩. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা অবাধ্যাচারের মাধ্যমে আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

٢٤. قَالَ اهْبِطُوْا أَيْ آدَمَ وَحَوَّاءَ بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا بَعْضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَكَانُ اسْتِقْرَارٍ وَّمَتَاعٌ تَمَتُّعٌ إِلَى حِيْنٍ تَنْقَضِيْ فِيْهِ آجَالُكُمْ.

২৪. তিনি বললেন, কতকজন অন্য কতকজনের উপর জুলুম করায় তোমরা হে আদম ও হাওয়া তোমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সন্তানসন্ততিসহ একে অন্যের অর্থাৎ কতক আদম সন্তান অন্য কতকজনের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং পৃথিবীতে নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য অর্থাৎ জীবনের সময়সীমার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তোমাদের বসবাস অবস্থানস্থল ও জীবিকা রইল। যা তোমরা ভোগ করবে।

٢٥. قَالَ فِيْهَا أَيِ الْأَرْضِ تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ بِالْبَعْثِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ.

২৫. তিনি বললেন, সেখানেই অর্থাৎ পৃথিবীতেই তোমরা জীবনযাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে তথা হতে তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। تُخْرَجُوْنَ এটা بِنَاءٌ لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ مَعْرُوْف বা কর্তৃবাচ্য ও بِنَاءٌ لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্য উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ : প্রশ্ন. خَلَقْنٰكُمْ-এর মধ্যে সম্বোধন ছিল বনী আদমের দিকে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, خَلْق এবং تَصْوِيْر-এর সম্পর্ক বনী আদমের সাথে। অথচ خَلَقْنٰكُمْ -এর তাফসীর اَىْ اَبَاكُمْ اٰدَمَ করার দ্বারা জানা যায় যে, خَلْق এবং تَصْوِيْر -এর সম্পর্ক হযরত আদম (আ.)-এর সাথে।

উত্তর. যেহেতু পূর্বে ফেরেশতাগণকে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি خَلَقْنٰكُمْ-এর মধ্যস্থ كُمْ দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য না হন তবে تَخْلِيْق এবং اَمْرٌ بِالسَّجْدَةِ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ تَخْلِيْق দ্বারা ذُرِّيَّة -এর বর্ণনা করা হচ্ছে আর তার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-কে এই সংশয়কে দূরীভূতকরণের জন্যই مُضَاف উহ্য মানার প্রয়োজন হয়েছে।

قَوْلُهُ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ : প্রশ্ন. এ ইবারত বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো اِلَّا اِبْلِيْسَ-এর ইস্তেছনাকে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া।

প্রশ্ন. اِلَّا اِبْلِيْسَ দ্বারাই তো ইবলিসের সেজদা না করার বিষয়টি বুঝে আসে এরপরও لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ বলার হেতু কি?

উত্তর. اِلَّا اِبْلِيْسَ দ্বারা মুতলাক সেজদার نَفِىْ বুঝে আসে না, বরং শুধুমাত্র সেজদার হুকুম করার সময়কার نَفِىْ বুঝাচ্ছে। এমনও হতে পারে যে, সে সময় সেজদা করেনি পরবর্তী সেজদা করেছে। যেমন– لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ বৃদ্ধি করা হলো তখন তার দ্বারা মুতলাক সেজদার نَفِىْ হয়ে গেল, অর্থাৎ ইবলিস সেজদার হুকুম কালেও সেজদা করেনি এবং পরেও সেজদা করেনি।

قَوْلُهُ زَائِدَةٌ : অর্থাৎ اِلَّا-এর মধ্যে لَا হলো অতিরিক্ত। অন্যায় উদ্দেশ্য হবে সেজদা করা থেকে নিষেধ করেছে কেননা نَفِىْ-এর نَفِىْ দ্বারা اِثْبَات সাব্যস্ত হয়। অথচ এটা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اَخِّرْنِىْ : اَنْظِرْنِىْ-এর তাফসীর اَخِّرْنِىْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْظِرْنِىْ অর্থ হলো অপেক্ষা করা, দেখা নয়। অন্যথায় অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি সংশয়ের অপনোদন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : সংশয় হলো এই যে, أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ বলে দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত জীবিত থাকার আবেদন করেছে, এরপর মৃত্যু নেই। এ আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তা إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ বলে ইবলিসের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এর অর্থ হলো ইবলীস মৃত্যু থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে। তার উপর মৃত্যু আসবে না। কেননা প্রথম ফুৎকার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকুল বিনাস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকুল জীবিত হয়ে যাবে। যেহেতু ইবলিস দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত জীবিত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল তার তা মঞ্জুরও হয়েছে। এজন্য যে আল্লাহর বাণী إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

উত্তর : উত্তরের সার হলো إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ দ্বারা যদিও ইবলিসের আবেদন গ্রহণীয় হওয়া বুঝা যায়; কিন্তু অন্য আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, প্রথম ফুৎকার যা সব কিছু বিনাশ হয়ে যাওয়ার ফুৎকার। কাজেই বুঝা গেল যে, ইবলিসও ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ مَذْءُوْفٌ بِالْهَمْزَةِ : অর্থ হলো مَعِيْبًا এক কেরাতে مَذْمُوْمًاও রয়েছে।

قَوْلُهُ وَ اللَّامُ لِلْإِبْتِدَاءِ : لَمَنْ تَبِعَكَ -এর لَامْ টি لَامِ اِبْتِدَائِيَّة তাকিদের জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ وَفِي الْجُمْلَةِ مَعْنَى الْجَزَاءِ : এ বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের জবাবে হয়েছে যে, لَمَنْ تَبِعَكَ টা جَزَاء বিহীন শর্ত হয়ে গেছে। উত্তরের সার হলো– لَأَمْلَئَنَّ বাক্যটি جَزَاء -এর স্থলাভিষিক্ত। কাজেই شَرْطٌ بِدُوْنِ الْجَزَاءِ -এর প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল।

প্রশ্ন : উল্লিখিত বাক্যটিকে جَزَاء-এর স্থাভিষিক্ত না বলে সরাসরি جَزَاء বলা হলো কেন?

উত্তর : جُمْلَة قَسَمِيَّة টা যখন جَزَاء হয় তখন তাতে لَامْ আসে না। অথচ এখানে لَامْ এসেছে। এ কারণেই এ বাক্যকে جَزَاء না বলে جَزَاء -এর স্থলাভিষিক্ত বলা হয়েছে। (تَرْوِيْحُ الْأَرْوَاحِ)

قَوْلُهُ اَوْ مَوْطِئَةٌ لِلْقَسَمِ : অর্থাৎ لَامْ টি উহ্য قَسَمْ -কে বুঝানোর জন্য হয়েছে। আর তা হলো لَأَمْلَئَنَّ অর্থাৎ أُقْسِمُ لَأَمْلَئَنَّ الخ

قَوْلُهُ وُوْرِيَ : এটা فُوْعِلَ -এর ওযনে اَلْمُوَارَاةُ থেকে। এতে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন : যখন শব্দের শুরুতে দুটি وَاوْ একত্রিত হয়ে যায় এবং তাতে প্রথমটি مَضْمُوْم হয় তবে তাকে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা ওয়াজিব। যেমন وُوَيْصِلٌ যা وَاصِلٌ-এর তাসগীর। প্রথম وَاوْ -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করে أُوَيْصِلٌ করা হয়েছে।

উত্তর : এ নিয়ম সেই দুই وَاوْ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাতে উভয়টি হরকতযুক্ত হয় আর এখানে দ্বিতীয় وَاوْ টি سَاكِنْ বিধায় এখানে উক্ত নীতি প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ حَطَّهُمَا : এ তাফসীর لَازِمْ অর্থকে বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। কেননা إِرْسَالُ الشَّيْءِ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ -কে تَدْلِيَة বলে।

قَوْلُهُ أَيْ آدَمُ وَحَوَّاءُ بِمَا اشْتَمَلْتُمَا : এটা দ্বারা একটি সংশয়ের আপনোদন করা হয়েছে।

সংশয় : اهْبِطُوْا হলো বহুবচনের সীগাহ, অথচ সম্বোধিত ব্যক্তি মাত্র দুজন তথা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.), কাজেই اهْبِطَا হওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল।

নিরসন : এর নিরসনকল্পে বলা হয় যে, এখানে হযরত আদম ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে তাদের সন্তানসন্ততিসহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কাজেই কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ : خَلَقْنٰكُمْ -এর মধ্যে বহুবচনের যমীর থাকলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হযরত আদম (আ.)। বহুবচনের যমীর এ জন্য যে, যেহেতু তিনি সকল সন্তানাদি সংবলিত এবং আবুল বাশার বা সকল মানুষের পিতা এ কারণেই তাঁকে বহুবচনের যমীর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। ইমাম আখফাশ (র.) বলেন, ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ -এর মধ্যে ثُمَّ টা وَاوْ অর্থে হয়েছে। لَا تَسْجُدَ -এর মধ্যে لَا হরফে অতিরিক্ত অর্থাৎ أَنْ تَسْجُدَ অর্থাৎ তোমাকে সেজদা করা হতে কে বারণ করল? অথবা ইবারত উহ্য রয়েছে অর্থাৎ কোন জিনিস তোমাকে বাধ্য করল যে, তুমি সেজদা করলে না? –[ইবনে কাছীর, ফতহুল কাদীর]

আরো বলা হয়েছে যে, مَنَعَ অর্থ হলো قَالَ অর্থাৎ إِلَى مَنْ قَالَ لَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ এবং এটাও বলা হয়েছে যে, مَنَعَ টা دَعَا অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مَا دَعَاكَ إِلَى اَنْ لَا تَسْجُدَ

শয়তান ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না; বরং স্বয়ং কুরআনের ভাষ্য মতেই সে জিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু আকাশে ফেরেশতাদের সাথে অবস্থানের কারণে সে ফেরেশতাগণকে প্রদত্ত সেজদার বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। আর এ কারণেই সে সেজদা না করায় তার থেকে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। আর যদি সে উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হতো তবে তার থেকে কৈফিয়ত ও তলব করা হতো না এবং তাকে তথা হতে বিতাড়িতও করা হতো না

এখানে উল্লিখিত হযরত আদম (আ.) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারায় চতুর্থ রুকূতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলিসের দোয়া কবুল হয়েছে কিনা। কবুল হয়ে থাকলে দুটি পরস্পর বিরোধী আয়াতের সামঞ্জস্য বিধান : ইবলিস ঠিক ক্রোধ ও গজবের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে- إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ অর্থাৎ তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো। দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিত এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেওয়া হয়েছে। কারণ সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলিসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, নাকি অন্য কোনো মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ শব্দাবলিও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ইবলিসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহর জ্ঞানে সংরক্ষিত। অতএব সারকথা এই যে, ইবলিসের দোয়া কবুল হলেও আংশিক কবুল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

তাফসীরে ইবনে জারীরে সুদ্দী থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে-

فَلَمْ يُنْظِرْهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ وَلٰكِنْ اَنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَهُوَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ فَمَاتَ .

আল্লাহ তা'আলা ইবলিসকে হাশর দিবস পর্যন্ত অবসর দেননি বরং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সময়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল, দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত, যখন সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একেই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া হুবহু কবুল হলে সে সময় একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলিস তখনও জীবিত থাকত। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া পর্যন্ত কবুল করা হয়েছে। এর ফলে যে সময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলিসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে।

ইবলিসের এ দোয়া ও كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ [পৃথিবীস্থ সবকিছু ধ্বংসশীল] আয়াতের মধ্যে বাহ্যত যে পরস্পর বিরোধি ছিল, উপরিউক্ত বিশ্লেষণের ফলে তাও বিদূরিত হয়ে গেল।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, يَوْمُ الْبَعْثِ [পুনরুত্থান দিবস] ও يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ [নির্দিষ্ট দিবস] দুটি পৃথক পৃথক দিন। ইবলিস يَوْم يُبْعَثُ পর্যন্ত অবসর চেয়েছিল। তা সম্পূর্ণ কবুল হয়নি; বরং একে পরিবর্তন করে يَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ অবসর পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ দুটি পৃথক পৃথক দিন। প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় থেকে জান্নাত ও দোজখে প্রবেশ পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ দিন হবে। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হবে। এসব বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পর্ক রেখে এ দিনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যেতে পারে। উদাহরণত একে يَوْم نَفْخِ صُوْر [শিঙ্গা ফুঁকার দিন] ও يَوْم فَنَاء [ধ্বংসের দিন]ও বলা যায় এবং يَوْمُ الْبَعْثِ [পুনরুত্থান দিবস] ও يَوْم جَزَاء [প্রতিদান দিবস] নামেও অবিহিত করা যায়। এতে সব খটকা দূর হয়ে যায়।

٢٦. يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا اَيْ خَلَقْنَاهُ لَكُمْ يُّوَارِيْ يَسْتُرُ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط هُوَ مَا يَتَجَمَّلُ بِهٖ مِنَ الثِّيَابِ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الْحَسَنُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى لِبَاسًا وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ دَلَائِلِ قُدْرَتِهٖ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ .

٢٧. يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ يُضِلَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ اَيْ لَا تَتَّبِعُوْهُ فَتَفْتَتِنُوْا كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ بِفِتْنَتِهٖ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ حَالٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط اِنَّهٗ اَيِ الشَّيْطٰنَ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ جُنُوْدُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط لِلَطَافَةِ اَجْسَادِهِمْ اَوْ عَدَمِ اَلْوَانِهِمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ اَعْوَانًا وَقُرَنَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

٢٨. وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً كَالشِّرْكِ وَطَوَافِهِمْ بِالْبَيْتِ عُرَاةً قَائِلِيْنَ لَا نَطُوْفُ فِيْ ثِيَابٍ عَصَيْنَا اللّٰهَ فِيْهَا فَنُهُوْا عَنْهَا قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا فَاقْتَدَيْنَا بِهِمْ وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ط اَيْضًا قُلْ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ قَالَهٗ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ .

অনুবাদ :

২৬. হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান গোপন করার অর্থাৎ আচ্ছাদিত করার ও বেশ-ভূষার জন্য তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। رِيْشًا অর্থ ঐ সমস্ত পোশাক যেগুলো সৌন্দর্য বিধানের উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয়। অর্থাৎ তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তাকওয়ার পরিচ্ছদই অর্থাৎ সৎকর্ম ও সদাচারই– لِبَاسُ এটা পূর্বোল্লিখিত لِبَاسًا শব্দটির عَطْف অন্বয় রূপে نَصْب সহকারে পাঠ করা যায়। আর رَفْع সহকারে পাঠ করা হলে এটা এস্থানে مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্যে রূপে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ذٰلِكَ خَيْرٌ এ বাক্যটি এটার خَبَر বলে গণ্য হবে। সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অর্থাৎ তাঁর কুদরতের নিশানী ও চিহ্নসমূহের অন্যতম; যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অনন্তর বিশ্বাস স্থাপন করে। لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ এ স্থানে [هُمْ ও يَذَّكَّرُوْنَ স্থিত সর্বনাম هُمْ -এ] خِطَاب বা সম্বোধনবোধক দ্বিতীয় পুরুষ হতে সংঘটিত হয়েছে।

২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলোভিত না করে। তোমাদেরকে প্রতারিত ও পথভ্রষ্ট না করে। অর্থাৎ তোমরা এটার অনুসরণ করো না, যদি কর তবে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে পড়বে। যেমন তোমাদের পিতামাতাকে সে তদীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল। يَنْزِعُ বাক্যটি এ স্থানে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান প্রদর্শনের জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে অর্থাৎ শয়তান নিজে এবং তার দল তার বাহিনী তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। কেননা এরা অতি সূক্ষ্ম শরীরের অধিকারী বা এটার কারণ হলো এরা বর্ণহীন আকৃতিবিশিষ্ট। যারা বিশ্বাস করে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক সাথী ও সাহায্যকারী করেছি।

২৮. যখন তারা কোনো অশ্লীল আচারণ করে যেমন শিরক, উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তওয়াফ; তারা বলত 'যে কাপড় পরিধান করে আমরা পাপকার্য করেছি তা শরীরে জড়িয়ে তওয়াফ করতে পারি না।' অনন্তর এটা হতে তাদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে এটা করতে দেখছি এ বিষয়ে তাদেরকেই আমরা অনুসরণ করি। আর আল্লাহও আমাদেরকে এটার নির্দেশ দিয়েছেন। এদেরকে বল, আল্লাহ অশ্লীল আচরণেরই নির্দেশ দেন না। যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে তেমন কিছুই বলছ? اَتَقُوْلُوْنَ [তোমরা কি বলছ?] এ স্থানে اِنْكَارٌ বা অস্বীকার ও নিষেধার্থে اِسْتِفْهَامٌ বা প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

২৯. قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ اَلْعَدْلِ وَاَقِيْمُوْا مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَعْنٰى بِالْقِسْطِ اَيْ قَالَ اَقْسِطُوْا اَوْ اَقِيْمُوْا اَوْ قَبْلَهُ فَاَقْبِلُوْا مُقَدَّرًا وُجُوْهَكُمْ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اَيْ اَخْلِصُوْا لَهُ سُجُوْدَكُمْ وَّ ادْعُوْهُ اُعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط مِنَ الشِّرْكِ كَمَا بَدَاَكُمْ خَلَقَكُمْ وَلَمْ تَكُوْنُوْا شَيْئًا تَعُوْدُوْنَ اَيْ يُعِيْدُكُمْ اَحْيَاءً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

২৯. বল, আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন সুবিচার অর্থাৎ ন্যায় প্রতিষ্ঠার। প্রত্যেক সালাত তোমাদের দিক আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঠিক রাখবে। وَاَقِيْمُوْا পূর্বোল্লিখিত শব্দ اَلْقِسْطِ -এর মর্মবোধক একটি শব্দের সাথে এটার عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। এটা ছিল اَقْسِطُوْا وَاَقِيْمُوْا অর্থাৎ তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর এবং সালাতে লক্ষ্য স্থির রাখ। কিংবা এটার পূর্বে اَقْبِلُوْا [সামনে লক্ষ্য কর, অগ্রসর হও] শব্দটি উহ্য রয়েছে। তার সাথে এটার عَطْف বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যেই কেবল তোমাদের সেজদা ও সালাত নির্ধারিত করে নাও এবং তাঁরই আনুগত্যে শিরক হতে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাকবে, তাঁর ইবাদত করবে। তিনি যেভাবে তোমাদের সম্পর্কে প্রথমে শুরু করেছিলেন অর্থাৎ প্রথমে যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করছিলেন। অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না তেমনি তোমরা সেভাবে প্রত্যর্পণ করবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সেভাবে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করত ফিরিয়ে আনবেন।

৩০. فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ط اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

৩০. তোমাদের একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের পথ-ভ্রান্তি সঙ্গতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে অর্থাৎ তাঁকে ব্যতীত শয়তানদের অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, অথচ নিজেদেরকে তারা সৎপথপ্রাপ্ত বলে মনে করে।

৩১. يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ عِنْدَ الصَّلٰوةِ وَالطَّوَافِ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا مَا شِئْتُمْ وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

৩১. হে আদম-সন্তান! প্রত্যেক মসজিদের অর্থাৎ সালাত ও তওয়াফের সময় তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর যা দ্বারা তোমাদের সতর আচ্ছাদিত করবে এবং যা তোমাদের ইচ্ছা হয় পানাহার কর কিন্তু অমিতাচার করবে না, তিনি অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَبَرُهُ جُمْلَةٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, একাকী خَيْرٌ শব্দটি খবর নয়; বরং বাক্য হয়ে خَبَرٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, لِبَاسُ التَّقْوٰى এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوٰى তথা سَتْرُ الْعَوْرَةِ لِبَاسُ التَّقْوٰى এরপর বলেছেন– ذٰلِكَ خَيْرٌ

قَوْلُهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ : অর্থাৎ প্রকাশ্যের চাহিদা لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ছিল। কিন্তু বাক্যে ভারত্বকে দূর করার জন্য حَاضِرٌ থেকে غَيْبٌ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ করেছেন।

قَوْلُهُ يَنْزِعُ حَالٌ : এটা حَال حِكَائِيْ যা তোমাদের পিতামাতার পূর্বের অবস্থাকে বর্ণনা করছে। কেননা نَزْعِ لِبَاسْ বা পোশাক খুলে ফেলা বের করার পূর্বে ছিল। উদ্দেশ্য হলো تَنْزِعُ টা اَبَوَيْكُمْ থেকে حَالْ হয়েছে, সিফত নয়। কেননা يَنْزِعُ হওয়াটা نَكِرَة হওয়ার কারণে اَبَوَيْكُمْ -এর সিফত হতে পারে না। এজন্যই اَبَوَيْكُمْ থেকে حَالْ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَعْنَى الْقِسْطِ : এই قِسْط -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف হয়েছে কাজেই عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمُفْرَدِ -এর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

قَوْلُهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَكُمْ : অর্থাৎ حَالّ বলে مَحَلّ উদ্দেশ্য। কাজেই এখন এ সংশয় হবে না যে, اَخْذ زِيْنَتْ বা সৌন্দর্য গ্রহণ সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ عِنْدَ الصَّلٰوةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসজিদ বলে مَا يُفْعَلُ فِى الْمَسْجِدِ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ حَالّ বলে مَحَلّ উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইতঃপূর্বে পূর্ণ এক রুকু'তে হযরত আদম (আ.) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শয়তানি প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জান্নাতি পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমাদের পোশাক আল্লাহ তা'আলার একটি মহান নিয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়নি– সমগ্র বনী আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ এখানে يُوَارِىْ শব্দটি مُوَارَاةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা। سَوْاٰتٌ শব্দটি سَوْءَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবগতভাবেই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যা দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে, وَرِيْشًا সাজসজ্জার জন্য মানুষ যে পোশাক পরিধান করে, তাকে رِيْش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয় কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তা দ্বারা সাজসজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার।

কুরআন পাক এ স্থলে اَنْزَلْنَا অর্থাৎ 'অবতারণ করা' শব্দ ব্যবহার করেছে। উদ্দেশ্য, দান করা। এটা জরুরি নয় যে, আকাশ থেকে তৈরি পোশাক অবতীর্ণ হবে। যেমন অন্যত্র اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি লোহা অবতারণ করেছি। অথচ লোহা ভূগর্ভস্থ খনি থেকে বের হয়। উভয়স্থলে اَنْزَلْنَا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে যেমন মানুষের কোনো কলাকৌশল ও কারিগরির প্রভাব থাকে না, তেমনি পোশাকের আসল উপাদান তুলা বা পশমের মধ্যে কোনো মানবীয় কলা-কৌশলের বিন্দুমাত্রও প্রভাব নেই। এটা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার দান। তবে এগুলো দ্বারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য পছন্দসই পোশাক তৈরি করার মধ্যে মানবীয় কারিগরি অবশ্যই কাজ করে। এ কারিগরিও আল্লাহ তা'আলারই এমন দান, যার মূল সূত্র আল্লাহর তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা : আয়াতে পোশাকের দুটি উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। ১. গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং ২. শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গসজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জন্তু-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষাই নয়, অঙ্গসজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম-হওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানি প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নির্লজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকাবিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা : মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজ শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা : শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরিয়তে গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামাজ, রোজা ইত্যাদি সবই এর পরবর্তী করণীয়।

হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্তাঙ্গ আবৃত করি এবং সাজসজ্জা করি।

নতুন পোশাক তৈরির সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেওয়ার ছওয়াব : তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকির-মিসকিনকে দান করে দেয়, সে জীবন ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে। -[ইবনে কাসীর]

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় এ দুটি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষের স্বভাবগত কর্ম ক্রমোন্নতির নতুন দর্শন ভ্রান্ত : হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা এবং কুরআন পাকের এ বক্তব্য থেকে এ কথাও ফুটে উঠেছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন এবং পোশাক মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং জন্মগত প্রয়োজন। প্রথম দিন থেকেই এটি মানুষের সাথে রয়েছে। আজকালকার কোনো কোনো দার্শনিকের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন যে, মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা করত অতঃপর ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পোশাক আবিষ্কৃত হয়েছে।

পোশাকের একটি তৃতীয় প্রকার : গুপ্তাঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজসজ্জার জন্য দু-প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কুরআন পাক তৃতীয় একপ্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে- وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ কোনো কোনো কেরাতে যবর দিয়ে لِبَاسُ التَّقْوٰى পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় اَنْزَلْنَا-এর مَفْعُوْل হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু-প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোশাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহভীরুতাকে বোঝানো হয়েছে। -[রুহুল মা'আনী]

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্তাঙ্গের জন্য আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজসজ্জার উপায় হয়, তেমনি সৎকর্ম ও আল্লাহভীরুতারও একটি অভ্যন্তরীণ পোশাক রয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীতি ও সৎ কর্মবিহীন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যত পর্দার ভিতরেই আত্মগোপন করুক না কেন, পরিণামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে। ইবনে জারীর হযরত উসমান (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! যে ব্যক্তি কোনো কাজ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে সে কাজের চাদর পরিধান করিয়ে তা প্রমাণ করে দেন। সৎকাজ হলে সৎকাজের কথা এবং অসৎকাজ হলে অসৎকাজের কথা প্রকাশ করেন। 'চাদর পরিধান করানোর' অর্থে এই যে, দেহে পরিহিত চাদর যেমন সবার দৃষ্টির সামনে থাকে, তেমনি মানুষের কাজ যতই গোপন হোক না কোন, তার ফলাফল ও চিহ্ন তার মুখমণ্ডল ও দেহে আল্লাহ তা'আলা ফুটিয়ে দেন। এ বক্তব্যের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত পাঠ করেন- وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

বাহ্যিক পোশাকেরও আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা : لِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোশাক দ্বারা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ও সাজসজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এ আল্লাহভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত, যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাঁটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মতো দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই। বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপব্যয় না হওয়া চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিজাতির অনুসরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

এতদসত্ত্বেও পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যেন আবার তোমাদেরকে ফ্যাসাদে ফেলে না দেয়, যেমন তোমাদের পিতামাতা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করেছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

আয়াতের শেষে বলেছেন– اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ এখানে قَبِيْلٌ শব্দের অর্থ– দলবল। এক পরিবারভুক্ত দলকে قَبِيْلَةٌ বলা হয় এবং সাধারণ দলকে قِسْطٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান তোমাদের এমন শত্রু যে, সে এবং তার দলবল তো তোমাদেরকে দেখে কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না। কাজেই তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা তোমাদের উপর কার্যকরী হওয়ার আশঙ্কা বেশি।

কিন্তু অন্যান্য আয়াতে একাথাও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে এবং শয়তানি চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকে, তাদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।

এ আয়াতের শেষে যে বলা হয়েছে– আমি শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক নিযুক্ত করি, যারা ঈমান অবলম্বন করে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানদারদের জন্য শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করা মোটেই কঠিন নয়।

কোনো কোনো মনীষী বলেছেন, যে শত্রু আমাদেরকে দেখে এবং আমরা তাকে দেখি না, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করাই তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ পাক শয়তান ও তার দলবলের গতিবিধি দেখেন কিন্তু শয়তানরা তাঁকে দেখে না।

মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না একথাটি সাধারণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। অলৌকিকভাবে কোনো মানুষ শয়তানকে দেখলে তা এর পরিপন্থি নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জিনদের আগমন করা, প্রশ্ন করা, ইসলাম গ্রহণ করা ইত্যাদি সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً الخ : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশদের ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোনো কুরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো। এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেওয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণত রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানি কাজের কারণ এই বর্ণনা করত যে, যেসব পোশাক পরে আমরা পাপ কাজ করি সেগুলো পরিধানর করে আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবি। [এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশি বেআদবির কাজ। হেরেমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল]।

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে–তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করত তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত, আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরো বলত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফকেই বোঝানো হয়েছে। فُحْش, فَحْشَاءُ ও فَاحِشَة এমন প্রত্যেক মন্দকাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণ মাত্রায় সুস্পষ্ট। –[তাফসীরে মাযহারী]

এ স্তরে ভালো ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। –[রূহুল মা'আনী]

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্য দুটি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। এক. বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ বাপ-দাদার তরিকা কায়েম রাখার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। মূর্খ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোনো তরিকার বৈধতার পক্ষে এটা কোনো প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদারা এরূপ করত। কেননা বাপ-দাদার তরিকা হওয়া যদি কোনো তরিকার বিশুদ্ধতার জন্য যথেষ্ট

হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও বৈধ ও বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে যায়।

[illegible] মূর্খদের এ প্রমাণ ভ্রূক্ষেপযোগ্য ছিল না বলেই কুরআন পাক এখানে এর উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করেনি। তবে অন্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোনো মূর্খতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হতে পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সরাসরি মিথ্যা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ অর্থাৎ 'আপনি বলে দিন আল্লাহ তা'আলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।' কেননা এরূপ নির্দেশ দেওয়া আল্লাহর প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থি। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে– أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো কিছুর সম্বন্ধ করে দেওয়া মহা ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহর প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কুরআনের আয়াত থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতেই এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ অর্থাৎ যেসব মূর্খ উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন, আল্লাহ তা'আলা সর্বদা قِسْط -এর নির্দেশ দেন। قِسْط -এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমায় লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত শরিয়তের সব বিধিবিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قِسْط শব্দের অর্থ যাবতীয় ইবাদত, আনুগত্য ও শরিয়তরে সকল বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এ আয়াতে ন্যায়বিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পথভ্রষ্টতার উপযোগী দু'ট বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এবং ২. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে প্রথম বিধান مَسْجِد শব্দটি সিজদা ও ইবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক ইবাদত ও নামাজের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাজের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে পালনকর্তার নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাজের জন্য হবে না, বরং যাবতীয় ইবাদত ও লেনদেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়, এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে। এমনকি গোপন শিরক অর্থাৎ লোক দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। এ বিধান দুটি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু আন্তরিকতা বাহ্যিক শরিয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না; বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরিয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখা একান্ত জরুরি। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরিয়ত ও তরিকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরিকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট, তাতে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোনো দোষ নেই। বলাবাহুল্য, এটা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

[illegible] বলা হয়েছে– كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, [illegible] পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোনো কঠিন [illegible] এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য يُعِيدُكُمْ -এর পরিবর্তে تَعُودُونَ বলেছেন। অর্থাৎ [illegible] কোনো হস্তক্ষেপ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না। –[রূহুল মা'আনী]

[illegible] একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরিয়তের বিধানাবলিতে পূর্ণরূপে কায়েম থাকা মানুষের [illegible] কেননা পরকাল ও কিয়ামত এবং তথায় ভালোমন্দ কর্মের প্রতিফল ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্য

প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোনো আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– একদল লোককে তো আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে; অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর হেদায়েত যদিও সবার জন্য ছিল কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে– হে আদম সন্তানেরা! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর– সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না জাহিলি যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাগৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ ইবাদত এবং কা'বাগৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলে মনে করত, তেমনি তারা হজের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষত ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। –[তাফসীরে ইবনে জারীর]

তাদের এ অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের অসারতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বেআদবি বিধায় বর্জনীয়। এমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোনো ধর্ম কর্ম নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্তুসমূহকে হারাম করে নেওয়া ধৃষ্টতা এবং ইবাদতে সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজের দিনগুলোতে তৃপ্তির সাথে খাও, পান কর। তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাজের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে পানাহারে মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত

এ আয়াতটি যদিও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্য জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহ তা'আলার গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তাফসীরবিদ ও ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোনো বিশেষ ঘটনায় কোনো নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাজে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরজ : তাই সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামাজ পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ [বায়তুল্লাহর তওয়াফও একপ্রকার নামাজ] এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তাফসীরবিদগণের মতে যখন مَسْجِدٌ বলে সিজদা বুঝানো হয়েছে, তখন সিজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সিজদায় যখন নিষিদ্ধ হলো, তখন নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন, চাদর পরিধান ব্যতীত কোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামাজ জায়েজ নয়। –[তিরমিযী]

নামাজের জন্য উত্তম পোশাক : আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা, পোশাককে زِيْنَةٌ [সাজসজ্জা] শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই যথেষ্ট নয়, বরং এতদসঙ্গে সামর্থ্য অনুযায়ী সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করা কর্তব্য।

হযরত হাসান (রা.) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন তাই আমি পালনকর্তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন– خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ অর্থাৎ তোমরা মসজিদে যাওয়ার সময় সাজসজ্জা গ্রহণ কর। বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাজে সতর আবৃত করা ফরজ বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফজিলতও প্রমাণিত হয়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্খতা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতা দৃষ্টে তা থেকে অনেক বিধান ও মাসআলাও জানা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا বাক্যটিও আরবদের হজের

নেয়ামতে উৎকৃষ্ট পানাহারের জন্যই মনে করা হয়েছে মানুষের জন্য অবতীর্ণ হলেও অন্যরা তা থেকে অনেক বঞ্চিত ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত হয়।

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরজ : প্রথমত শরিয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্য ফরজ ও জরুরি। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরজ কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আল্লাহর কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছু অবৈধ হয় না : আহকামুল কুরআন জাসসাসের বর্ণনা মতে এ আয়াত থেকে একটি মাসআলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিশেষ বস্তু অবৈধ ও নিষিদ্ধতা শরিয়তের কোনো প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। كُلُوْا وَاشْرَبُوْا বাক্যে مَفْعُوْل অর্থাৎ কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। আরবি ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এরূপ স্থলে مَفْعُوْل উল্লেখ না করে مَفْعُوْل-এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার ঐসব দ্রব্যসামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালঙ্ঘন বৈধ নয় : আয়াতের শেষ বাক্য وَلَا تُسْرِفُوْا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারে অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত اِسْرَافٌ শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। সীমালঙ্ঘন দুরকম প্রকারের হতে পারে।

১. হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালঙ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

২. আল্লাহর হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরিয়তসম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গুনাহ, তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহর আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গুনাহ।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফিকহবিদগণ উদরপূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে নাজায়েজ লিখেছেন। [আহকামুল কুরআন] এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরজ কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা এটাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লিখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে– اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ অর্থাৎ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে– وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে প্রয়োজনের চাইতে বেশি ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্যপন্থাই দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী : হযরত ওমর (রা.) বলেন, বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। এটি দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে মুক্ত। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্থূলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না [অর্থাৎ যে বেশি পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থূলদেহী হয়]। আরও বলেন, মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে দীনের উপর অগ্রাধিকার দান করে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এক আয়াত দ্বারা ৭টি মাসআলা : আলোচ্য আয়াত দ্বারা শরিয়তের ৭টি মাসআলা প্রমাণিত হচ্ছে–

১. প্রয়োজন পরিমাণে পানাহার ফরজ।

২. যতক্ষণ শরিয়তের কোনো দলিল দ্বারা কোনো জিনিসের হারাম হওয়া প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা হালাল।

৩. যেসব জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ হারাম ঘোষণা করেছেন সেগুলোর ব্যবহার ইসরাফের অন্তর্ভুক্ত এবং অবৈধ।

৪. যেসব বস্তু আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম মনে করা ইসরাফ এবং অত্যন্ত বড় গুনাহ।

৫. পেট পরিপূর্ণ হওয়ার পরও খানা গ্রহণ অনুচিত।

৬. এতই কম পরিমাণ খানা গ্রহণের ফলে দুর্বল হওয়া এবং ফরজ ওয়াজিব আদায়ে অক্ষম হওয়া।

৭. সর্বদা খাওয়া-দাওয়ার ফিকির থাকাও ইসরাফ

অনুবাদ :

٣٢. قُلْ اِنْكَارًا عَلَيْهِمْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ مِنَ اللِّبَاسِ وَالطَّيِّبٰتِ الْمُسْتَلَذَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِالْاِسْتِحْقَاقِ وَاِنْ شَارَكَهُمْ فِيْهَا غَيْرُهُمْ خَالِصَةً خَاصَّةً بِهِمْ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ حَالٌ يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ نُبَيِّنُهَا مِثْلَ ذٰلِكَ التَّفْصِيْلِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ فَاِنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا ـ

৩২. এদের দাবি অস্বীকার করে বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু অর্থাৎ পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিশুদ্ধ সুস্বাদু জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বল, জাগতিক জীবনে অন্যরা শরিক থাকলেও অধিকার হিসাবে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। আর কিয়ামতের দিন তো বিশেষ করে এই সমস্ত কেবল মাত্র তাদেরই। خَالِصَةٌ এটা رَفع সহকারে পঠিত রয়েছে। حَال রূপে نَصْب সহও এটার পাঠ রয়েছে। এরূপে অর্থাৎ যেমনি এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি সেভাবে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীলদের জন্য, আর এরাই মূলত এটা দ্বারা উপকৃত হয় নির্দেশসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেই।

٣٣. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ الْكَبَائِرَ كَالزِّنَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اَىْ جَهْرُهَا وَسِرُّهَا وَالْاِثْمَ الْمَعْصِيَةَ وَالْبَغْىَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ هُوَ الظُّلْمُ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ بِاِشْرَاكِهٖ سُلْطٰنًا حُجَّةً وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ مِنْ تَحْرِيْمِ مَا لَمْ يُحَرَّمْ وَغَيْرِهٖ ـ

৩৩. বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন ভিতর ও বাহির সকল প্রকার অশ্লীলতা কবীরা গুনাহসমূহ যেমন ব্যভিচার আর পাপ অবাধ্যচার এবং মানুষের উপর অন্যায় সীমালঙ্ঘন, অর্থাৎ জুলুম করা, আল্লাহর সাথে শরিক করা যার সম্পর্কে অর্থাৎ যে শিরক সম্পর্কে কোনো সনদ কোনো প্রমাণ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জানা নাই। যেমন, যা তিনি নিষিদ্ধ করেননি তা নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি।

٣٤. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ج مُدَّةٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ عَلَيْهِ ـ

৩৪. প্রত্যেক জাতির এক মেয়াদ অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা তা হতে মুহূর্তকালও বিলম্ব এবং তার অগ্রে করতে পারবে না।

٣٥. يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الْمَزِيْدَةِ يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَمَنِ اتَّقٰى الشِّرْكَ وَاَصْلَحَ عَمَلَهٗ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হতে কোনো রাসূল তোমাদের নিকট এসে নিদর্শন বিবৃত করে তখন যারা اِمَّا এটা মূলত ছিল اِنْ مَا শর্তবাচক اِنْ-এর نُوْن অক্ষরটিকে অতিরিক্ত مِيْم-এ اِدْغَام করে দেওয়া হয়েছে। শিরক হতে সাবধান হবে এবং স্বীয় আমল ও ক্রিয়াকলাপ সংশোধন করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তার পরকালে কোনোরূপ দুঃখিত হবে না।

٣٦. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا عَنْهَا فَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهَا اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

৩৬. যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তা হতে নিজকে বড় মন করেছে অর্থাৎ অহংকার প্রদর্শন করেছে ফলে বিশ্বাস স্থাপন করেনি তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٣٧. فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط الْقُرْاٰنَ اُولٰۤئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ حَظُّهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ط مِمَّا كُتِبَ لَهُمْ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْاَجَلِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا الْمَلٰۤئِكَةُ يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْۤا لَهُمْ تَبْكِيْتًا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالُوْا ضَلُّوْا غَابُوْا عَنَّا فَلَمْ نَرَهُمْ وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ عِنْدَ الْمَوْتِ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ .

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অংশীদারিত্ব ও সন্তান আরোপ করতে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং তাঁর নিদর্শন আল-কুরআন অস্বীকার করে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে? না, আর কেউ নেই। তাদের নিকট তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ লওহে মাহফূজে তাদের রিজিক, জীবিকা, জীবনের মেয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার অংশ হিস্যা পৌছবেই, শেষে আমার প্রেরিতরা অর্থাৎ ফেরেশতারা যখন প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট আসবেও লা-জওয়াবকরণার্থে বলবে, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে অর্থাৎ যাদের তোমরা উপাসনা করতে তারা কোথায়? তারা তখন বলবে, তারা হারিয়ে গেছে অন্তর্হিত হয়েছে, এদেরকে আমরা দেখি না এবং মৃত্যুর সময় তারা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা ছিল সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী

٣٨. قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ادْخُلُوْا فِىْ جُمْلَةِ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ط مُتَعَلِّقٌ بِادْخُلُوْا كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ النَّارَ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ط الَّتِىْ قَبْلَهَا لِضَلَالِهَا بِهَا حَتّٰۤى اِذَا ادَّارَكُوْا تَلَاحَقُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ وَهُمُ الْاَتْبَاعُ لِاُوْلٰىهُمْ اَىْ لِاَجْلِهِمْ وَهُمُ الْمَتْبُوْعُوْنَ رَبَّنَا هٰۤؤُلَاۤءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مُضَعَّفًا مِّنَ النَّارِ ط

৩৮. কিয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ দল গত হয়েছে তাদের মাঝে শামিল হয়ে তোমরাও অগ্নিতে প্রবেশ কর।' فِى النَّارِ এটা اُدْخُلُوْا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। যখনই কোনো দল অগ্নিতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দল যারা এদের পূর্বে ছিল তাদেরকে অভিসম্পাত করবে। কেননা এদের দ্বারা এরা পথ-ভ্রান্ত হয়েছিল। শেষে সকলে যখন তাতে একত্রিত হবে সমবেত হবে তখন তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ অনুসারীগণ পূর্ববর্তীগণের জন্য অর্থাৎ এদের অনুসৃতদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং এদেরকে দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুগুণ জাহান্নামের শাস্তি দাও।

قَالَ تَعَالَى لِكُلٍّ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ ضِعْفٌ عَذَابٌ مُضَعَّفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مَا لِكُلِّ فَرِيقٍ.

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা ও তারা প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ অর্থাৎ বহুগুণ শাস্তি রয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকের জন্য কি রয়েছে সেই সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও। لَا يَعْلَمُونَ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٣٩. وَقَالَتْ أُولَٰهُمْ لِأُخْرٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ لِأَنَّكُمْ لَمْ تَكْفُرُوا بِسَبَبِنَا فَنَحْنُ وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ قَالَ تَعَالَى لَهُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.

৩৯. তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদেরকে বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কেননা আমাদের কারণে তোমরা সত্যপ্রত্যাখ্যান করনি। সুতরাং আমরা ও তোমরা তো সমান। আল্লাহ তা'আলা এদের সকলকেই বলবেন, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের দরুন শাস্তির স্বাদ ভোগ করে নাও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنْكَارًا عَلَيْهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَنْ حَرَّمَ-এর মধ্যে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ اللِّبَاسِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছে যে, زِيْنَة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذَرِيْعَه زِيْنَتْ বা সৌন্দর্য গ্রহণের মাধ্যম।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ : خَالِصَةً-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে– ১. رَفْع এবং ২. نَصْب রফার সুরতে هِىَ মুবতাদার দ্বিতীয় খবর হবে, উহ্য ইবারত হবে– هِىَ ثَابِتَةٌ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আর حَالْ হওয়ার কারণে نَصْب হবে। উহ্য ইবারত হবে اِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا حَالَ كَوْنِهَا خَالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - ثَابِتَةٌ যরফের উহ্য যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ : এটা اَلْبَغْى-এর তাকিদ। অন্যথায় জুলুম তো অন্যায়ভাবেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ جُمْلَةً : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِىْ اُمَمٍ টা جَارْ এবং مَجْرُوْر মিলে اُدْخُلُوْا-এর مُتَعَلِّقْ নয়; বরং উহ্য كَائِنِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে اُدْخُلُوْا-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِضَلَالِهَا بِهَا : ضَلَالِهَا-এর যমীর اُمَّةٌ-এর দিকে এবং بِهَا-এর যমীর اُخْتٌ-এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ تَلَاحَقُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِدَّارَكُوْا এটা বাবে تَفَاعُلْ হতে, تَا-কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে دَالْ-কে دَالْ-এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে এবং শুরুতে একটি هَمْزَه وَصْل যুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَجْلِهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِاُوْلٰهُمْ-এর لَامْ টা اَجَلْ-এর জন্য, قَالَتْ-এর صِلَه নয়। কেননা সম্বোধন আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সাথে নয়। কাজেই এ প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল যে, لَامْ যখন قَوْل-এর সেলাহ হয় তখন তার مَدْخُوْل টা قَوْل-এর مُخَاطَبْ হয়। অথচ هٰؤُلَاءِ এবং اَضَلُّوْنَا উভয়টি غَائِبْ-এর সীগাহ তার نَفِى করে।

قَوْلُهُ مَا لِكُلِّ فَرِيْقٍ : এটা يَعْلَمُوْنَ-এর মাফউল।

قَوْلُهُ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ : হয়তো এটা সর্দারগণের বাক্য অথবা পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার বাক্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব **লোককে হুঁশিয়ার** করা হয়েছে, যারা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা **কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে** বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে ইবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরিকরা **হজের দিনগুলোতে তওয়াফ করার** সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত ও **উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন** করাকে ইবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসনের ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্য সৃজিত আল্লাহর زينت অর্থাৎ উত্তম পোশাক এবং **আল্লাহ প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয়** খাদ্যকে হারাম করেছে?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় : উদ্দেশ্য এই যে, কোনো বস্তু হালাল অথবা **হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই** কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক **দণ্ডনীয় যারা আল্লাহর হালালকৃত** উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় **থাকা ইসলামের শিক্ষা** নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয় যেমন অনেক অজ্ঞ লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক **পরিধান করতেন**। দু'জাহানের সরদার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ **করেছিলেন**। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ির বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার **মূল্য ছিল** এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) চারশ' গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (র.) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্য জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি সারা বছরের জন্য ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিলেন। যে বস্ত্র জোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার তা আর ব্যবহার করতেন না, মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোনো দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে নিয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ নিয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা নিয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছিন্নবস্ত্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি : ১. রিয়া ও নামযশ এবং ২. গর্ব ও অহংকার। অর্থাৎ শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুষী প্রকাশ করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দুটি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) এবং আরও কয়েকজন সাহাবীর মামুলি পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকির-মিসকিনদের দান ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, যা দ্বারা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকিরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সুফি-বুজুর্গগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা ছওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য প্রথম পর্যায়ে আত্মার চিকিৎসা ও অহংবোধের প্রতিকারার্থে এ ধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সুফি-বুজুর্গই

পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্য অধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অধিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

খোরাক ও পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত : খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবী ও তাবেয়ীদের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য। তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোনো উপায়ে এমনকি কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনেশুনে খারাপ করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পেছনে লেগে থাকা যেমন লৌকিকতা তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মু'মিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নিয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালোমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দস্তরখান সবার জন্য সমভাবে বিছানো রয়েছে; বরং এখানে আল্লাহর রীতি এই যে, মু'মিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে অন্যরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নিয়ামতের ভাণ্ডার অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করালগ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নিয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে- قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ আপনি বলে দিন সব পার্থিব নিয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনও মু'মিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শাস্তির কারণ হবে না, এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মু'মিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচার অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নিয়ামত তারাও পায়, বরং আরও বেশি পায়; কিন্তু এসব নিয়ামত পরকালে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আজাবের কারণ হবে, কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নিয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নিয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানা রকম দুঃখকষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নিয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নিয়ামত লাভ করবেন, তাঁরা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবেন। এগুলোর সাথে কোনোরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোনো চিন্তাভাবনা থাকবে না। উপরিউক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলি জ্ঞানবানদের জন্য এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়। ভালো পোশাক ও ভালো খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্খতাসুলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মূর্খতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ তা'আলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্তুসমূহকে নিজেদের জন্য অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং

অপরদিকে যেসব বস্তু প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহর গজব ও পরকালের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দুকূলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে–

إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَّأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ যেসব বস্তুকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো তো হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব নির্লজ্জ কাজ হরাম করেছেন তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপ কাজ, অন্যায় উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করা এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোনো সনদ তোমাদের কাছে নেই।

এখানে إِثْم [পাপ কাজ] শব্দের আওতায় সেসব গুনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং بَغْي [উৎপীড়ন] শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পর্কিত গুনাহ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বাসগত মহাপাপ।

এ বিশেষ বিবরণ উল্লেখ করার কারণ দ্বিবিধ :

১. এতে প্রায় সব রকম হারাম কাজ ও গুনাহ পুরোপুরি এসে গেছে, তা বিশ্বাসগত হোক কিংবা কর্মগত, ব্যক্তিগত কর্মের গুনাহ হোক কিংবা অপরের অধিকার হরণ সম্পর্কিত হোক।

২. জাহিলি যুগের আরবরা এসব অপরাধ ও হারাম কাজে লিপ্ত ছিল। এভাবে তাদের মূর্খতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, তারা হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকে এবং হারাম বস্তু ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না।

ধর্মে বাড়াবাড়ি এবং স্বকল্পিত বিদ'আতের এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে, যে ব্যক্তি এগুলোতে লিপ্ত হয়, সে ধর্মের মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে স্বাভাবতই গাফিল হয়ে যায়। তাই বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতের ক্ষতি দ্বিমুখী হয়ে থাকে। ১. স্বয়ং বাড়াবাড়ি ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া গুনাহ এবং ২. এর বিপরীত বিশুদ্ধ ধর্ম ও সুন্নত থেকে বঞ্চিত হওয়া।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় আয়াতে মুশরিকদের দুটি ভ্রান্ত কাজ বর্ণিত হয়েছিল। ১. হালালকে হারাম করা এবং ২. হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আজাব বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ যেসব অপরাধী সর্বপ্রকার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যত তাদের উপর কোনো আজাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে কৃপাবশত অবকাশ দিতে থাকেন, যাতে কোনো রকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে এ অবকাশেরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ শেষ হয়ে আসে, তখন এক মুহূর্তও আগপাছ হয় না এবং তাদেরকে আজাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আজাব এসে যায় এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথে আজাবে প্রবিষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে মূল্য কিছু কমবেশি হতে পারবে কিনা? এখানে জানা কথা যে, বেশি মূল্য তার কাম্য নয়– কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু কমের অনুগামী করে বেশিও উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٤٠. اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا عَنْهَا فَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ اِذَا عُرِجَ بِاَرْوَاحِهِمْ اِلَيْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُهْبَطُ بِهَا اِلٰى سِجِّيْنٍ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ فَتُفْتَحُ لَهٗ وَيُصْعَدُ بِرُوْحِهٖ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثٍ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ يَدْخُلَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط ثُقْبِ الْاِبْرَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فَكَذَا دُخُوْلُهُمْ وَكَذٰلِكَ الْجَزَاءُ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ بِالْكُفْرِ ـ

৪০. যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেকে বড় মনে করে এতদসম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করে, অনন্তর এটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না। মৃত্যুর পর যখন তাদের রূহ নিয়ে আকাশের দিকে আরোহণ করা হবে তখন এ অবস্থা হবে। অনন্তর এগুলো সিজ্জীনে রক্ষিত করা হবে। পক্ষান্তরে হাদীসে যে মু'মিন বান্দাদের রূহের উদ্দেশ্যে আকাশের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং তা নিয়ে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত উঠা হবে। এবং তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না সুচের ছিদ্র-পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। يَلِجَ অর্থ– প্রবেশ করবে। سَمِّ الْخِيَاطِ অর্থ– সুচের ছিদ্র পথ। অর্থাৎ এটা [সুচের ছিদ্র-পথে উষ্ট্রের প্রবেশ] যেমন অসম্ভব তেমনি এদের জান্নাত প্রবেশও অসম্ভব। এরূপ প্রতিফল আমি অপরাধীদেরকে তাদের সত্যপ্রত্যাখ্যানের কারণে বিনিময় দেব।

٤١. لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ فِرَاشٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط اَغْطِيَةٌ مِنَ النَّارِ جَمْعُ غَاشِيَةٍ وَتَنْوِيْنُهٗ عِوَضٌ مِنَ الْيَاءِ الْمَحْذُوْفَةِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ـ

৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপর আচ্ছাদনও জাহান্নামের। مِهَادٌ অর্থ– শয্যা। غَوَاشٍ এটা মূলত ছিল غَوَاشِيٌ এটা غَاشِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– আচ্ছাদান। এটার শেষে উহ্য ى -এর পরিবর্তে তানবীন ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে শাস্তি দেব।

٤٢. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهٗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ز طَاقَتَهَا مِنَ الْعَمَلِ اِعْتِرَاضٌ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ خَبَرِهٖ وَهُوَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

৪২. আমি কাউকে তার সাধ্যায়ত ব্যতীত অর্থাৎ তার কাজের সামর্থ্যাতীত কিছুর ভার অর্পণ করি না; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। اَلَّذِيْنَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اُولٰئِكَ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। لَا نُكَلِّفُ এটা উক্ত مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ -এর মাঝে مُعْتَرِضَةٌ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٣. وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ حِقْدٍ كَانَ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ تَحْتَ قُصُوْرِهِمُ الْاَنْهٰرُ ج

৪৩. তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের পরস্পরে যে সাধারণ বিদ্বেষ ছিল তা দূর করে দেব। তাদের প্রাসাদসমূহের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী।

وَقَالُوا عِنْدَ الْاِسْتِقْرَارِ فِي مَنَازِلِهِمْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا الْعَمَلِ هٰذَا جَزَاؤُهُ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ ط حُذِفَ جَوَابُ لَوْلَا لِدَلَالَةِ مَا قَبْلِهِ عَلَيْهِ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ط وَنُوْدُوْآ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اَنَّهُ اَوْ مُفَسِّرَةٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

এবং তারা তাদের আবাস-কুটিরে অবস্থান গ্রহণ করার পর বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এটার এই কাজের পথ দেখিয়েছিলেন। এটা তারই প্রতিদান ফল। আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখালে আমরা কখনও পথ পেতাম না। لَوْلَا -এর জওয়াব এ স্থানে উহ্য। পূর্ববর্তী বাক্য مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ -এর প্রতি ইঙ্গিতবহ। আমাদের প্রভুর রাসূলগণ তো সত্যসহ আগমন করেছিলেন। তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। اَنْ একে এ স্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন রূপে লঘুকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা মূলত ছিল اَنَّهُ কিংবা এটা مُفَسِّرَه অর্থাৎ ভাষ্যমূলক। পরবর্তী পাঁচটি স্থানেও [৫০ নং আয়াতে اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا পর্যন্ত।] এটার ব্যবহার তদ্রূপ।

٤٤. وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ تَقْرِيْرًا وَتَبْكِيْتًا اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا مِنَ الثَّوَابِ حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ كُمْ رَبُّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ حَقًّا ط قَالُوْا نَعَمْ ج فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ نَادٰى مُنَادٍ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ اَسْمَعَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ .

৪৪. জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে নিজেদের দাবির প্রতিষ্ঠা ও তাদের লা-জওয়াব করার উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ছওয়াব ও পুণ্যফল দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক আজাব ও শাস্তি দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি? তারা বলবে, হ্যাঁ। অতঃপর তাদের অর্থাৎ উভয় দলের মধ্যে জনৈক আজান দানকারী আজান দেবে অর্থাৎ তাদেরকে শুনিয়ে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দেবে নিশ্চয় জালেমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

٤٥. الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهِ وَيَبْغُوْنَهَا اَيْ يَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ عِوَجًا ج مُعْوَجَّةً وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ .

৪৫. যারা লোককে আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর ধর্মমত হতে বাধা দিত এবং তাতে উক্ত পথে দোষ-ত্রুটি অর্থাৎ বক্রতা অনুসন্ধান করতে তারাই ছিল পরকাল সম্পর্কে অস্বীকারকারী। يَبْغُوْنَ অর্থ– তালাশ করে, অনুসন্ধান করে।

٤٦. وَبَيْنَهُمَا اَيْ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حِجَابٌ ج حَاجِزٌ قِيْلَ هُوَ سُوْرُ الْاَعْرَافِ وَعَلَى الْاَعْرَافِ وَهُوَ سُوْرُ الْجَنَّةِ رِجَالٌ اِسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ يَعْرِفُوْنَ كُلًّا مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .

৪৬. আর উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদের মধ্যে রয়েছে পর্দা প্রাচীর, কেউ কেউ বলেন, এটা হচ্ছে আ'রাফের দেয়াল। এবং আ'রাফে এটা হলো জান্নাতের প্রকার অবস্থানরত কিছু লোক থাকবে। হাদীস উল্লেখ আছে যে, এরা হলো তারা যাদের সৎ ও অসৎ কর্ম এক সমান হবে। তারা প্রত্যেককে অর্থাৎ জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদেরকে।

يَسِيمُهُمْ ج بِعَلَامَتِهِمْ وَهِيَ بَيَاضُ الْوُجُوهِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوَادُهَا لِلْكَفِرِيْنَ لِرُؤْيَتِهِمْ لَهُمْ إِذْ مَوْضِعُهُمْ عَالٍ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قَالَ تَعَالٰى لَمْ يَدْخُلُوْهَا اَيْ اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ الْجَنَّةَ وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ فِيْ دُخُوْلِهَا قَالَ الْحَسَنُ لَمْ يُطْمِعْهُمْ اِلَّا لِكَرَامَةٍ يُرِيْدُهَا بِهِمْ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ بَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ فَقَالَ قُوْمُوْا اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ .

তাদের চিহ্ন দ্বারা লক্ষণ দ্বারা চিনবে। লক্ষণ হলো, মু'মিনদের চেহারা হবে ফর্সা ধবধবে। আর কাফেরদের চেহারা হবে কালো মিসমিসে। এরা যেহেতু উঁচুতে অবস্থান করবে সেহেতু প্রত্যেককে দেখে চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর সালাম ও শান্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা অর্থাৎ এই আ'রাফবাসীরা তখনও তাতে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তাতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষারত। হযরত হাসান বলেন, আল্লাহ এদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করার অভিপ্রায় করবেন বলেই তারা তখন জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করবে। হাকেম হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, এরূপই চলতে থাকবে। এর মধ্যে হঠাৎ আল্লাহ তাদের সামনে উদয় হবেন। বলবেন, চল, সকলেই তোমরা জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ কর। তোমাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

٤٧. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ اَيْ اَصْحٰبِ الْاَعْرَافِ تِلْقَآءَ جِهَةَ اَصْحٰبِ النَّارِ ج قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي النَّارِ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

৪৭. যখন তাদের অর্থাৎ আ'রাফবাসীদের দৃষ্টি জাহান্নামবাসীদের সমক্ষে অর্থাৎ দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জাহান্নাম জালেমদের সঙ্গী করো না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْيَاءِ : প্রশ্ন. غَوَاشٍ এটা غَيْرُ مُنْصَرِفٌ এতে তানবীন হয় না।

উত্তর. এটা ইমাম সীবাওয়াইহ -এর নিকট কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না। প্রতিহত করার দলিল এই যে, غَيْرُ مُنْصَرِفٌ -এর উপর تَنْوِيْنُ تَمَكُّنْ تَنْوِيْنُ عِوَضٍ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ নয়।

প্রশ্ন. غَوَاشٍ এটা جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ -এর সীগাহ নয়। কাজেই এটা غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হতে পারে না।

উত্তর. غَوَاشٍ যদিও فِي الْحَالِ চূড়ান্ত বহুবচন বা جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ -এর সীগাহ নয়; কিন্তু মূলত تَعْلِيْل-এর পূর্বে جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ-এর সীগাহ ছিল। আর غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হওয়া تَعْلِيْل-এর উপর مُقَدَّمٌ বা অগ্রগামী। কাজেই تَعْلِيْل -এর পূর্বের অবস্থাই ধর্তব্য হবে।

قَوْلُهُ حَرْفُ جَوَابِ لَوْلَا : উহ্য ইবারত হবে এরূপ- لَوْلَا هِدَايَةُ تَعَالٰى لَنَا مَوْجُوْدَةٌ لَشَقِيْنَا وَمَا كُنَّا مُهْتَدِيْنَ

قَوْلُهُ اَوْ مُفَسِّرَةٌ : প্রশ্ন. اَنْ مُفَسِّرَةٌ-এর জন্য পূর্বে قَوْل হওয়া জরুরি যা এখানে বিদ্যমান নেই।

উত্তর. قَوْل বা قَوْل -এর সম অর্থ হওয়া জরুরি, আর এখানে نُوْدُوْا হলো قَوْل -এর সমার্থক। কাজেই কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهُ فِى الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ : এর মধ্যে প্রথম হলো ان تلكم الجنة আর শেষ হলো اَنْ اَفِيْضُوْا

قَوْلُهُ لَمْ يَدْخُلُوْهَا : এটা نَادَوْا-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অঙ্গীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা-জগতে নেওয়া হয়েছিল। অঙ্গীকারটি ছিল এই– যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে আমার নির্দেশাবলি নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদানুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলি অমান্য করবে, তাদের জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমাণ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আজাব ও ছওয়াব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মু'মিনদের কথা আলোচিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলির প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। তাফসীরে বাহরে-মুহীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের এক তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেওয়া হবে না, যেখানে আল্লাহর নেক বান্দাগণের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কুরআনের সূরা মুতাফফিফীনে এ স্থানটির নাম 'ইল্লিয়্যীন' বলা হয়েছে। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে– اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ অর্থাৎ মানুষের পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে। অর্থাৎ মানুষের সৎকর্মসমূহ পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহর বিশেষ দরবারে পৌঁছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই :

'রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাজায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেন, মু'মিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করেন। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যান। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল (আ.) আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন, হে নিশ্চিন্ত আত্মা! পালনকর্তার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পণ করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হতো এবং বলে ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে এবং দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রাখ এবং তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা এবং ধর্ম ইসলাম। এরপর প্রশ্ন হয়– এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে, ইনি আল্লাহর রাসূল! তখন একটি গায়েবি আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও,

জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার কাছে এসে যায়।

'এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যু উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কালো রঙ্গের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোনো কাঁটাবিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক । অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মু'মিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর কেবল هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ [হায়, হায়, আমি জানি না] বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোশাক দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়।

মোটকথা, কাফেরদের আত্মা আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। ফলে সেখান থেকেই নিচে ফেলে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, মৃত্যুর সময় তাদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ

يَلِجَ শব্দটি وُلُوْجٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। جَمَلٌ-এর অর্থ উট এবং سَمٌّ -এর অর্থ সুচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মতো বিরাট বপু জন্তু সুচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সুচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবত অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও হবে অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আজাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে- لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ - مِهَادٌ শব্দের অর্থ- বিছানা এবং غَوَاشٍ শব্দটি غَاشِيَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্তু। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাদের শেষে كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ বলা হয়েছে। কেননা এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর নির্দেশাবলি যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরিয়তের নির্দেশাবলি সহজ করা হয়েছে কিন্তু তাদের জন্য সেখানে বিশ্বাস স্থাপন করা ও সৎকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কৃপাবশত এ কথাও বলা হয়েছে- لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যেসব সৎকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরিয়তের নির্দেশাবলি নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তাফসীরে বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে, সৎকর্মের আদেশ দেওয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সৎকর্ম সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলা হয়েছে- আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্বাবস্থায় সব সময় ও সব জায়গার জন্য উপযুক্ত নির্দেশাবলি প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাতিদের মন থেকে পারস্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে : চতুর্থ আয়াতে জান্নাতিদের দুটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

১. نَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ জান্নাতিদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোনো মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মু'মিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেওয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোনো কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্কে পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যত পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সংলগ্ন। আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবি করা হবে, সেগুলো টাকা-পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সৎকর্ম দ্বারা এসব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সৎকর্ম এভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকি থাকে, তবে প্রাপকের গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃস্ব আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সৎকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সৎকর্ম থেকে রিক্তহস্ত হয়ে পড়বে।

এক হাদীসে পাওনা পরিশোধ ও প্রতিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরি নয়। ইবনে কাসীর ও তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব। যেমন, কোনো কোনো হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝরনার কাছে পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পরস্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধুয়ে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতুবী (র.) কুরআন পাকের وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا আয়াতের তাফসীরেও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানির দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা.) একবার এ আয়াত পাঠ করে বললেন, আমি আশা করি, ওসমান, তালহা ও যুবায়র ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের বক্ষ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। [ইবনে কাসীর] বলা বাহুল্য, দুনিয়াতে তাঁদের পরস্পরিক মতবিরোধ দেখা দেওয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

২. আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতিদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে– যদি আল্লাহ তা'আলা কৃপা না করতেন, তবে এখানে পৌঁছার সাধ্য আমাদের ছিল না। এতে বোঝা যায় যে, কোনো মানুষ কেবল নিজ প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কৃপা হয়। স্বয়ং প্রচেষ্টটুকুও তো তার [illegible] নয় এটাও শুধু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহেই অর্জিত হয়ে থাকে।

হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর : ইমাম রাগিব ইস্পাহানী 'হেদায়েত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা [illegible] এই যে, 'হেদায়াত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ [illegible] তাই আল্লাহর নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হেদায়েতের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি এবং ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা ভ্রান্ত পথ থেকে সরে আল্লাহমুখী হয়ে যায়। [illegible] ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তর হেদায়েত। তাই হেদায়েত [illegible] কোনো মানব এমনকি নবী-রাসূল পর্যন্ত নির্লিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনের

শেষ পর্যন্ত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্ন সহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা আল্লাহর নৈকট্যের স্তরের কোনো শেষ নেই। এমনকি আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হেদায়েত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা এটি হচ্ছে হেদায়েতের সর্বশেষ স্তর।

আ'রাফবাসী কারা? জান্নাতি ও দোজখিদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোজখ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে।

১. সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসিরাত চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগে জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।

২. মু'মিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে।

৩. মুনাফিকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে সংযুক্ত থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে তাদের সাথে সংযুক্ত থাকবে এবং পুলসিরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মু'মিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে অগ্রসর হবে। মুনাফিকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা বলবে পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলোর তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঐ সৎকর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আজাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মু'মিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতে মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই–

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ .

এ আয়াতে জান্নাতি ও দোজখিদের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীকে سُوْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি আসলে শহর-প্রাচীরের অর্থে বলা হয়। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বড় বড় শহরের চারদিকে খুব মজবুত ও অজেয় করে এ প্রাচীর তৈরি করা হয়। এসব প্রাচীরে রক্ষী সেনাদলের গোপন অবস্থানও তৈরি করা হয়। তারা আক্রমণকারীদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করে।

قَوْلُهٗ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ : ইবনে জারীর ও অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতে حِجَاب বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বুঝানো হয়েছে, যা সূরা হাদীদে سُوْر শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নাম আ'রাফ। কেননা আ'রাফ 'ওরফে'র বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ দূর থেকে এ ভাগই 'মারূফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোজখের মধ্যবর্তী প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছু সংখ্যক লোক থাকবে তারা জান্নাত ও দোজখ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয় পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এরা কারা এবং এ মধ্যবর্তী স্থানে এদেরকে কেন আটক করা হবে? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন উক্তি এবং একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে। তবে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে বিশুদ্ধ ও অগ্রগণ্য উক্তি এই যে, এরা ঐসব লোক, যাদের পাপ ও পুণ্য ওজনে সমান সমান হবে। তারা পুণ্যের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, কিন্তু পাপের কারণে তখনও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে না। তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারাও জান্নাত প্রবেশ করবে।

অনুবাদ :

٤٨. وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ يَعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ مِنَ النَّارِ جَمْعُكُمْ اَلْمَالُ اَوْ كَثْرَتُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ اَىْ وَاسْتِكْبَارُكُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ ـ

৪৮. আ'রাফবাসীগণ জাহান্নামবাসী যাদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে সেই লোকদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের সমাবেশ অর্থাৎ বিত্ত-বৈভব বা লোক সংখ্যাধিক্য এবং তোমাদের অহংকার অর্থাৎ ঈমান সম্পর্কে তোমাদের ঔদ্ধত্য জাহান্নাম হতে বাঁচার ব্যাপারে তোমাদের কোনো কাজ আসল না।

٤٩. وَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مُشِيْرِيْنَ اِلٰى ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ط قَدْ قِيْلَ لَهُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ وَقُرِئَ اُدْخِلُوْا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَدَخَلُوْا فَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ اَىْ مَقُوْلًا لَهُمْ ذٰلِكَ ـ

৪৯. দুর্বল শ্রেণির মুসলিমদের প্রতি ইঙ্গিত করে এদেরকে তারা বলবে দেখ, এদের সম্বন্ধেই কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না? অথচ এদেরই বলা হয়েছে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। اُدْخِلُوْا এটা بِنَاءٌ لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে এবং دَخَلُوْا রূপেও পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় نَفْى অর্থাৎ না-বোধক বাক্যটি حَالْ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এই বলে তাদেরকে জান্নাত প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে।

٥٠. وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ط مِنَ الطَّعَامِ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا مَنَعَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ـ

৫০. আর জাহান্নামবাসীগণ জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা যেসব আহার্য বস্তু দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও। তারা বলবে আল্লাহ তা'আলা এ দুটি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য হারাম নিষেধ করে দিয়েছেন।

٥١. الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ نَتْرُكُهُمْ فِى النَّارِ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا بِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ لَهٗ وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ اَىْ وَكَمَا جَحَدُوْا ـ

৫১. যারা তাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল, আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব জাহান্নামেই এদের পরিত্যাগ করে রাখব যেভাবে তারা সৎ আমল পরিত্যাগ করত এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করছিল। অর্থাৎ তারা যেমন অস্বীকার করেছিল [তেমন আমিও তাদেরকে ভুলে গেছি।]

٥٢. وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ بِكِتٰبٍ قُرْاٰنٍ فَصَّلْنٰهُ بَيَّنَّاهُ بِالْاَخْبَارِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ عَلٰى عِلْمٍ حَالٌ اَىْ عَالِمِيْنَ بِمَا فُصِّلَ فِيْهِ هُدًى حَالٌ مِنَ الْهَاءِ وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بِهٖ ـ

৫২. অবশ্য তাদেরকে অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে পৌঁছিয়েছি এক কিতাব আল-কুরআন বিশদভাবে অবহিতিসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুতি ও কাফেরদের প্রতি হুমকি ও বিভিন্ন কাহিনী এতে বিবৃত করে দিয়েছিলাম এবং যা ছিল এতদসম্পর্কে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও অনুকম্পা। عَلٰى عِلْمٍ এটা এ স্থানে حَالْ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। هُدًى এটা نَصَّلْنٰهُ -এর কর্মবাচক সর্বনাম, হতে حَالْ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٣. هَلْ يَنْظُرُوْنَ مَا يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا تَأْوِيْلَهُ ط عَاقِبَةَ مَا فِيْهِ يَوْمَ يَأْتِيْ تَأْوِيْلُهُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ تَرَكُوا الْاِيْمَانَ بِهِ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ج فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا أَوْ هَلْ نُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ نُوَحِّدُ اللّٰهَ وَنَتْرُكُ الشِّرْكَ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا قَالَ تَعَالٰى قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ اِذْ صَارُوْا اِلَى الْهَلَاكِ وَضَلَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ مِنْ دَعْوَى الشَّرِيْكِ.

৫৩. তাঁরা কেবল তার তাবীল অর্থাৎ তার শেষ পরিণাম লক্ষ্য করছে প্রতীক্ষা করছে। যেদিন তার পরিণাম বাস্তবায়িত হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সেদিন যারা পূর্বে তার কথা ভুলে গিয়েছিল অর্থাৎ সম্পর্কে ঈমান আনয়ন পরিহার করেছিল তারা বলবে, আমাদের প্রভুর রাসূলগণ তো সত্য সত্যই আগমন করেছিলেন। আমাদের কি এমন কোনো সুফারিশকারী আছে যে, আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে? যেন পূর্বে যা করতাম তা হতে ভিন্ন কিছু করতে পারি, আল্লাহর একত্ব স্বীকার এবং শিরক পরিত্যাগ করতে পারি। এ কথার উত্তরে তাদেরকে বলা হবে, না, কিছুই করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে কারণ তারা ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হয়েছে এবং শিরকের দাবি করে তারা যে মিথ্যা রচনা করত তাও উধাও হয়ে গেছে, অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ : অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ كَانُوْا عُظَمَاءَ فِى الدُّنْيَا فَيُنَادُوْنَهُمْ يَا اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَيَا وَلِيْدَ بْنَ مُغِيْرَةَ وَيَا فُلَانُ وَيَا فُلَانُ وَهُمْ فِى النَّارِ আসহাফে আ'রাফ সে সকল লোকদের নাম ডেকে ডেকে বলবেন যে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে নেতা বলা হতো, তোমাদের একতা, ধনসম্পদ, মান-মর্যাদার কি হলো? যা নিয়ে তোমরা গর্ব-অহংকারে লিপ্ত ছিলে, আজকে সেগুলো তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি।

قَوْلُهُ مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ : এখানে مَا টি হলো اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخِىْ অর্থাৎ اَىُّ شَيْءٍ اَغْنٰى আবার مَا টা نَافِيَه ও হতে পারে। অর্থাৎ সেগুলো তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি।

قَوْلُهُ اِسْتِكْبَارًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا كُنْتُمْ -এর مَا টি মাসদারিয়া, কাজেই عَدَم عَائِدْ -এর সংশয় শেষ হয়ে গেল। আবার কেউ কেউ اِسْتِكْبَارًا -এর অর্থ নিয়েছেন খারাপ মনে করা। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আল্লামা সুয়ূতী (র.) দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَهٰٓؤُلَاءِ الَّذِيْنَ الخ এটাও আ'রাফবাসীদের উক্তি।

قَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ বাবে اِفْعَال হতে مَاضِى مَجْهُوْل এবং دَخَلُوْا বাবে نَصَرَ হতে مَاضِىْ مَعْرُوْف এ উভয় কেরাতই شَاذٌّ -এর অন্তর্ভুক্ত। যার প্রতি قُرِئَ বলে ইঙ্গিত করেছেন। এ উভয় কেরাতের বিশুদ্ধতার জন্য قَوْل উহ্য মানার প্রয়োজন নেই। কেননা তখন কোনো تَاوِيْل ব্যতীতই খবর হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَجُمْلَةُ النَّفْيِ حَالٌ : উদ্দেশ্য হলো لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ বাক্য এবং اُدْخُلُوْا -এর ফায়েলের ضَمِيْر থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنَعَهُمَا : حَرَّمَهُمَا-এর তাফসীর مَنَعَهُمَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, حَرَّمَ টা مَنَعَ-এর অর্থে হয়েছে। কেননা হালাল ও হরামের স্থান হলো পৃথিবী পরকাল নয়।

قَوْلُهُ نَتْرُكُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نِسْيَانٌ দ্বারা তার لَازِمِىْ অর্থ তথা পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার জন্য نِسْيَانٌ অসম্ভব।

قَوْلُهُ اَىْ وَكَمَا جَحَدُوْا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান প্রদান করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ-এর আতফ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ-এর উপর করা ঠিক নয়। কেননা مَعْطُوْف عَلَيْه হলো مَاضِىْ আর مَعْطُوْف হলো মুযারে'।

উত্তর. مُضَارِعْ-এর উপর যখন كَانَ প্রবিষ্ট হয় তখন তা মাযীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাজেই عَطْف সঠিক হবে।

قَوْلُهُ عَاقِبَةُ مَا فِيْهِ : এখানে فِيْه-এর যমীরের مَرْجِعْ হলো কুরআন। অর্থাৎ এখন তাদেরকে শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত অঙ্গীকার এবং ভীতির পরিণামের সত্যতারই অপেক্ষা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ "যখন আ'রাফবাসীর চোখ দোজখীদের দিকে ফেরানো হবে" তাই আলোচ্য আয়াতে আ'রাফবাসীগণ দোজখীদের সঙ্গে যে কথা বলবেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ অর্থাৎ আ'রাফবাসীগণ দোজখীদের মধ্যে যাদেরকে চিনতে পারবে তাদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের দলবল, তোমাদের অর্থসম্পদ এবং তোমাদের অহংকার আজ তোমাদের কোনো কাজে লাগল না। এই মহাবিপদের মুহূর্তে তোমাদের কোনো উপকারেই আসল না।

يَعْرِفُوْنَهُمْ মূলত দোজখীদের চোখে-মুখে দোজখের জ্বালা-যন্ত্রণা এবং পরিচয় প্রকাশ পাবে এবং তাদেরকে চিনতে আদৌ কোনো কষ্ট হবে না। তাই ইরশাদ হয়েছে- আ'রাফবাসীগণ তাদেরকে দেখেই চিনবে। কেননা, যারা কোপগ্রস্ত তাদের চেহারায় তার চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে।

সাধারণত মানুষ অর্থসম্পদ তথা ধনবল বা জনবল অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কারণে অহংকার করে, কিন্তু ধনবল বা জনবল এবং ক্ষমতা মানব জীবনে নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। জীবন যখন ক্ষণস্থায়ী, জীবনের সামগ্রী ও ক্ষণস্থায়ী। অতএব, এসবের উপর ভিত্তি করে অহংকার করা বোকামি ব্যতীত আর কিছু নয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম যখন দীন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতেন তখন যাদের কাছে ধনবল বা জনবল থাকত তারা অহংকারী হয়ে দীন ইসলামের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করত। প্রিয়নবী ﷺ যখন মক্কা মুয়ায্‌যমায় মক্কাবাসীকে দীন ইসলামের আহ্বান জানালেন তখনও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল, যারা ছিল ধনসম্পদের অধিকারী অথবা নেতৃত্বের দাবিদার, তারা সত্য ধর্ম গ্রহণে অস্বীকার করল। দীন ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, তাদের দলবল এবং অর্থসম্পদের কারণে তারা অহংকারী হলো, যারা সমাজে দুর্বল শ্রেণি ছিল তাঁরাই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করলেন। যেমন হযরত সালমান ফারসী (রা.), হযরত সোহায়েব রুমী (রা.), হযরত বেলাল (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম, মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে দেখে বিদ্রূপ করত এবং বলত এ দুর্বল লোকেরাই কি আল্লাহর রহমত পাবে?

আরাফবাসীগণ তাই দোজখীদেরকে স্মরণ করিয়ে বলবেন যে, দরিদ্র লোকেরা সেদিন দীন ইসলাম কবুল করেছিল তোমরা তাদের সম্পর্কে শপথ করে বলতে যে, তারা কোনোদিন আল্লাহর রহমত পাবে না। তদানীন্তন সমাজ জীবনে তারাই ছিল অবহেলিত, উপেক্ষিত। তাদের কাছে ধনবল, জনবল বলতে কিছুই ছিল না, কিন্তু আজ তারা ভাগ্যবান। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতে তাঁরা ধন্য, তাঁদেরকে বলা হয়েছে- اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে, তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখ নেই। অথচ হে দোজখবাসী! তোমাদের ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কারণে, তোমাদের জনবলের গরিমায় তোমরা অহংকারী ছিলে, সত্য গ্রহণে অস্বীকার করেছিলে, তাই আজ তোমরা দোজখে নিক্ষিপ্ত এবং কোপগ্রস্ত।

আলোচ্য আয়াতে جَمْعُكُمْ শব্দটি সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক. তোমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সাহায্যকারী ও সমর্থকদের দল, অথবা তোমাদের সঞ্চিত সম্পদ। কালবী (র) লিখেছেন যে, আ'রাফবাসীগণ মক্কার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং আবূ জাহল ইবনে হেশাম সহ অন্যান্য কাফেরদের নাম ধরে ডাকবেন এবং এ সকল কথা বলবেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ কথাটি ফেরেশতাগণ আ'রাফবাসীদেরকে বলবে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পৌঁছে গেছে, দোজখীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। অতএব, হে আ'রাফবাসী! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন তা হলো এই যে, আ'রাফবাসীগণ যখন দোজখীদের সঙ্গে কথা বলবেন তখন দোজখীরা জবাব দেবে ঐ দুর্বল লোকেরা যদি জান্নাতে গমন করে থাকে তবে তোমাদের কি? তোমরা তো জান্নাতে যেতে পারবে না। দোজখীরা শপথ করে বলবে, তোমরা অবশ্যই দোজখে আসবে। একথা শ্রবণ করে পুলসিরাতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ দোজখীদেরকে বলবেন, তোমরাই আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলেছ তারা আল্লাহর রহমত লাভ করবে না।

এরপর আ'রাফবাসীর দিকে ইঙ্গিত করে তারা বলবেন, তোমরা নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত মনে বেহেশতে চলে যাও। আল্লামা বগভী (র.) হযরত আতা (র.)-এর সূত্রে আরো লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন আ'রাফবাসী চলে যাবে তখন দোজখীদের অন্তরেও একটু লোভ হবে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করবে– হে আমাদের পরওয়াদেরগার! আমাদের বন্ধু আত্মীয়স্বজন জান্নাতে রয়েছে আমাদেরকে তাদের সাথে কথা বলার এবং দেখা করার অনুমতি দান করুন! আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে অনুমতি দান করবেন। তখন তারা তাদের জান্নাতি আপনজনদের অবস্থা দেখতে পারবে এবং আল্লাহ পাকের যে অনন্ত-অসীম নিয়ামত তারা ভোগ করছে তাও প্রত্যক্ষ করবে।

দোজখীরা তাদের জান্নাতি আপনজনদের চিনতে পারবে কিন্তু দোজখের শাস্তি ও পরিণামে তাদের চেহারা বিকৃত হওয়ার কারণে বেহেশতবাসীগণ তাদেরকে চিনতে পারবে না। দুনিয়াতে যারা তাদের আপনজন ছিল; ঈমান ও নেক আমলের বরকতে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে তারা আজ জান্নাতের অধিবাসী, আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে দোজখীরা জান্নাতিদের সঙ্গে কথা বলবে এবং পানাহারের ছিটেফোঁটা দান করার জন্য আবেদন করবে। সেই আবেদনের কথাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে।

দোজখীদের আবেদন– وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ -

অর্থাৎ দোজখীরা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে [নিজেদের আত্মীয়দের কথা মনে করিয়ে দিয়ে] আবেদন করবে আমাদের দিকে সামান্য পানি ফেলে দাও, [আমরা বড় তৃষ্ণার্ত] আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে রিজিক দান করেছেন তা থেকে ছিটেফোঁটা হলেও আমাদের দিকে নিক্ষেপ কর। [আমরা বড় ক্ষুধার্ত]

দোজখীদের এ আবেদনের জবাবে জান্নাতবাসীগণ বলবেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্যে দানাপানি হারাম করে দিয়েছেন। এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন– জান্নাতিদের আপন আত্মীয়স্বজন যেমন– পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী যদি দোজখে যায় এমন আপনজনেরাই তাদের বেহেশতবাসী আত্মীয়স্বজনের নিকট দানাপানির আবেদন করবে। আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে জান্নাতবাসীগণ জবাব দেবেন, দানাপানি কাফেরদের জন্যে হারাম, তাই আমরা কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারব না।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আরো লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন জিনিসের সদকা উত্তম? তিনি বলেন, হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সবচেয়ে উত্তম দান হলো পানি। দেখ, দোজখীরা জান্নাতবাসীদের নিকট পানির জন্য আবেদন করবে।

বর্ণিত আছে, আবূ তালেব যখন তার মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয় তখন কুরাইশ গোত্রের কিছু লোক তাঁকে বলে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কারো মাধ্যমে অনুরোধ কর যেন তিনি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য বেহেশতের আঙ্গুর পাঠিয়ে দেন। আবূ তালেবের প্রেরিত লোক যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয় তখন তাঁর খেদমতে হযরত আবূ বকর (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আবূ তালেবের জন্যে বেহেশতের আঙ্গুরের আবেদন পেশ করা হলে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক *জান্নাতের পানাহারের বস্তু কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।* –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ৯ পৃ. ৬২]

ইবনে আবিদ্দুনিয়া যায়েদ ইবনে রাফীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দোজখীরা দোজখে প্রবেশ করে বহুদিন ক্রন্দন করবে, তাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে, এরপর অশ্রুর বদলে রক্ত বের হতে থাকবে, দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবে, হে হতভাগার দল! তোমরা দুনিয়াতে ক্রন্দন করনি আজ কার নিকট ফরিয়াদ করছ? তখন তারা চিৎকার করে জান্নাতবাসী আত্মীয়স্বজনকে ডাকবে, কেউ পিতাকে, কেউ মাতাকে, কেউ সন্তানসন্ততিকে ডাকবে এবং বলবে, আমরা কবর থেকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় বের হয়েছি। হাশরের ময়দানেও আমরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পিপাসাগ্রস্ত রয়েছি, অতএব, আমাদের প্রতি সদয় হও, তোমাদেরকে প্রদত্ত পানি এবং আহার্য থেকে সামান্য পরিমাণ আমাদেরকেও দাও। [চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর] যন্ত্রণাকতর দোজখীরা এভাবে মিনতি জানাতে থাকবে কিন্তু তাদেরকে কোনো জবাব দেওয়া হবে না। অবশেষে তাদেরকে উপরিউক্ত জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমরা তোমাদেরকে কোনো কিছু দান করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কেননা আল্লাহ পাক কাফেরদের জন্য বেহেশতের দানাপানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : অর্থাৎ এ কাফেররাইতো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধান নিয়ে উপহাস করেছে, যারা দীন ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি বিদ্রূপ করেছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতকে ভুলে গেছে, দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে মত্ত হয়ে বেহেশতবাসীর চিরস্থায়ী জিন্দেগির সুখ-শান্তির কথা বিস্মৃত হয়েছে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছে এবং আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা করেছে, তাই তাদের এ পরিণাম। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا অর্থাৎ আজ আমি তাদেরকে ভুলে থাকব যেমন তারা এদিন হাজির হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। আর যেহেতু তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল তাই আজ তাদের জন্যে হবে কঠিন কঠোর শাস্তি। আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন- "আজ আমি তাদেরকে ভুলে থাকব" এর অর্থ হলো তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আর দুনিয়াতে তারা একথা ভুলে গিয়েছিল যে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে- এর তাৎপর্য হলো এমন নেক আমল পরিত্যাগ করা, যা কেয়ামতের দিন উপকারী হবে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ الخ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতবাসী এবং দোজখীদের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর আ'রাফে অবস্থানকারীদের কথাও উল্লিখিত হয়েছে, এ তিনটি দলের মধ্যে যে কথাবার্তা হবে তারও আলোচনা রয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের কথা রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- আমি তোমাদেরকে এমন কিতাব প্রদান করেছি যার মধ্যে তোমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের বিষয় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রয়েছে মু'মিনদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত। যারা বুদ্ধিমান ও যারা ঈমানদার, তারা মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তারা নিজেদের বর্তমানকে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করেছে, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও করেছে। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যহত, যারা অপরিণামদর্শী, তারা আল্লাহর কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং নিজেরা নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন- بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআনে **হালাল-হারামকে** বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, আকীদা এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ করেছেন। عَلٰى عِلْمٍ অর্থাৎ **মানুষের কল্যাণের** পথ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন। তাই মানুষের জন্য যা কল্যাণকর তা করতে নির্দেশ **দিয়েছেন এবং যা** অকল্যাণকর তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। -[তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ৩১৩]

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাজিল **করেছেন এবং এ মহান গ্রন্থে** বিস্তারিতভাবে মানব জাতির কল্যাণের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা কাফেরদের এই ওজর **আপত্তি যে, আমরা বুঝতে** পারিনি, জানতে পারিনি বা সত্যের সন্ধান পাইনি, এ ধরনের কথার পথ বন্ধ হয়ে গেল, আখেরাতে **তাদের যে কঠোর কঠিন শাস্তি** হবে এ ব্যাপারে তাদের আর কোনো বক্তব্য থাকবে না। কেননা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا "আমি যে পর্যন্ত রাসূল প্রেরণ না করি সে পর্যন্ত কোনো সম্প্রদায়কে কোপগ্রস্ত করি না" অথচ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল আগমন করেছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রয়েছে মানব জাতির জন্যে পরিপূর্ণ হেদায়েত এবং রহমত। কিন্তু যারা হতভাগা, তারা এ হেদায়েত কবুল করে না এবং রাহমাতুললিল আলামীন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর অনুসারী হয় না। আলোচ্য আয়াতে هُدًى শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লিখেছেন, হেদায়েত হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা। যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভের অনেক স্তর রয়েছে তাই হেদায়েতেরও অনেক স্তর রয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম স্তর হলো কুফর এবং শিরক থেকে নাজাত লাভ করা এবং তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং রেসালত ও আখেরাতে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। যারা হেদায়েতের এই স্তর পার হতে পারে তাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ইতঃপূর্বে দিশেহারা ছিল, সে যদি দিশারীর মাধ্যমে পথের সন্ধান পায় তবে বলা হবে যে সে হেদায়েতও পেয়েছে। এজন্যে হেদায়েতের অন্বেষণ করতে হয় সর্বক্ষণ এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

এ কারণেই সূরা ফাতেহায় আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল সঠিক পথের হেদায়েত কর। সূরা ফাতেহা প্রত্যেক নামাজে অবশ্য পাঠ্য। এর অর্থ হলো, প্রত্যেককে প্রতি দিন বারে বারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হেদায়েতের জন্যে মিনতি জানাতে হয়। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের অগণিত স্তর রয়েছে তাই বান্দাকে প্রত্যেক স্তরে পৌছার পর পরবর্তী স্তরের উন্নতি লাভের জন্যে আরজি পেশ করতে হয়। আর যে মকাম বা স্তরে সে থাকে তার উপরের স্তর সে লাভ করে। এ পর্যায়ের সর্বশেষ স্তর হলো জান্নাতে পৌছা। অতএব, আল্লাহ পাকের নৈকট্য অন্বেষণকারীকে দরবারে ইলাহীতে হেদায়েতের জন্যে মুনাজাত করতে হয়।

قَوْلُهُ يَوْمَ يَأْتِىْ تَأْوِيْلُهُ يَقُوْلُ : অর্থাৎ যেদিন তাদের পরিণাম দেখা যাবে– সেদিন মৃত্যুর দিন, অথবা কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষ সারা জীবনের সাধনার শুভ পরিণতি অথবা শাস্তি দেখতে পাবে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও নাফরমান হয়ে জীবনযাপন করে তারা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের সর্বনাশের জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী হবে, তারা সেই কঠিন বিপদের মুহূর্তে কোনো সুপারিশকারী বা সাহায্যকারী পাবে না এবং পুনরায় পৃথিবীতে এসে সৎ কাজের অঙ্গীকার করলে তার অনুমতি পাবে না, বরং চিরদিন তাদেরকে কঠোর কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ : তাদের মিথ্যা রচনা তখন হারিয়ে যাবে। ইমাম রাযী (রা.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, দুনিয়াতে কাফের মুশরিকরা হাতের বানানো মূর্তিপূজা করতো এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সামনেই মাথা নিচু করতো, কিন্তু এই সব মূর্তি তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। অথবা এর অর্থ হলো তারা যে বাতিল ধর্মে বিশ্বাস করত সেই ধর্ম তাদের জন্য উপকারী হবে না। ইমাম রাযী (র.) আরও বলেছেন যে, এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তারা দুনিয়াতে এ অবস্থায় ছিল যে, ইচ্ছা করলে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে পারত। এজন্যই তারা এ আবেদন করবে যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে আসার সুযোগ দেওয়া হয় তবে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে। যদি দুনিয়াতে ঈমান আনয়নের শক্তি তাদের না থাকত তবে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আশার আকাঙ্ক্ষা করত না। –[তাফসীরে কবীর খ. ১৪ পৃ. ৯৫, ৯৬]

٥٤. إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيْ فِيْ قَدْرِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَمْسٌ وَلَوْ شَاءَ خَلَقَهُنَّ فِيْ لَمْحَةٍ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ لِتَعْلِيْمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ هُوَ فِي اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا أَيْ يُغَطِّيْ كُلًّا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ يَطْلُبُهُ يَطْلُبُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ طَلَبًا حَثِيْثًا سَرِيْعًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مُسَخَّرَاتٍ مُذَلَّلَاتٍ بِأَمْرِهِ ط بِقُدْرَتِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ جَمِيْعًا وَالْأَمْرُ ط كُلُّهُ تَبٰرَكَ تَعَاظَمَ اللّٰهُ رَبُّ مَالِكُ الْعٰلَمِيْنَ.

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী দুনিয়ার দিনের পরিমাণানুসারে ছয়দিনে সেই সময় সূর্য ছিল না, সুতরাং দিন নির্ধারণের প্রশ্ন উঠে না। [সৃষ্টি করেছেন।] আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু সৃষ্টি করে ফেলতে পারতেন। তা সত্ত্বেও মানুষ জাতিকে ধীরতা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য তিনি তা হতে বিরত রইলেন এবং সময় নিয়ে তা করলেন। অতঃপর তিনি আরশে اَلْعَرْشِ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– রাজসিংহাসন সমাসীন হন। যেমনিভাবে সমাসীন হওয়া তাঁর উপযোগী সেভাবে। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অর্থাৎ একটি অপরটি দ্বারা আবৃত করে দেন। يُغْشِ এটা ش অক্ষর তাশদীদ সহ بَاب تَفْعِيْل ও তাখফীক অর্থাৎ তাশদীদহীন بَاب إِفْعَال -এও পঠিত রয়েছে। ফলে একটি অপরটিকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। حَثِيْثًا অর্থ দ্রুতগতিতে। এটা এ স্থানে উহ্য طَلَبًا -এর صِفَتْ বা বিশেষণ এদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে মাননীয় তাফসীরকার এর পূর্বে طَلَبًا শব্দটির উল্লেখ করেছেন। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই নির্দেশের وَالشَّمْسَ ...النُّجُوْمَ এটা পূর্বোল্লিখিত السَّمٰوَاتِ -এর সাথে عَطْف হিসেবে نَصْب সহ পঠিত রয়েছে। مُبْتَدَأ অর্থাৎ উদ্দেশ্যরূপে এটাকে رَفْع সহও পাঠ করা যায়। এমতাবস্থায় এর خَبَر হলো مُسَخَّرَاتٍ কুদরত ও শাস্তির অধীন অজ্ঞাবহ। জেনে রাখ সকল সৃজন কাজ ও সর্বপ্রকার আজ্ঞা ও নির্দেশ তাঁরই। বিশ্ব জগতের প্রভু মালিক আল্লাহ মহিমাময় অতি মহান।

٥٥. اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا حَالٌ تَذَلُّلًا وَّخُفْيَةً ط سِرًّا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ فِي الدُّعَاءِ بِالتَّشَدُّقِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ.

৫৫. তোমরা মিনতি সহকারে বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি দোয়ার মধ্যে অসতর্ক শব্দযোজনা ও স্বর মাত্রা চড়িয়ে সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। تَضَرُّعًا এটা এ স্থানে حَال রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। خُفْيَةً অর্থ সঙ্গোপনে।

٥٦. وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بِالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِيْ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بِبَعْثِ الرُّسُلِ وَادْعُوْهُ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ وَّطَمَعًا ط فِيْ رَحْمَتِهِ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُطِيْعِيْنَ وَتَذْكِيْرُ قَرِيْبٍ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ رَحْمَةٍ لِإِضَافَتِهَا إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

৫৬. রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে দুনিয়ার সংশোধনের পর শিরক ও অবাধ্যাচারের মাধ্যমে তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না। তাঁকে তাঁর শাস্তির ভয় ও রহমতের আশার সাথে ডাকবে। আল্লাহর রহমত সৎকর্মপরায়ণদের অর্থাৎ তাঁর বাধ্যগতদের নিকটবর্তী قَرِيْبٌ-শব্দটি এ স্থানে যদিও رَحْمَة -এর خَبَر আর এ হিসাবে এটাকে مُؤَنَّث অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার করা সঙ্গত ছিল বটে তবুও رَحْمَة শব্দটিকে اَللّٰه -এর প্রতি إِضَافَت বা সম্বন্ধ করায় তাকে [قَرِيْب শব্দটিকে] مُذَكَّر রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

٥٧. وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط اَىْ مُتَفَرِّقَةً قُدَّامَ الْمَطَرِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ تَخْفِيْفًا وَفِىْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا وَفَتْحِ النُّوْنِ مَصْدَرًا وَفِىْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ النُّوْنِ اَىْ مُبَشِّرًا وَمُفْرَدُ الْاُوْلٰى نُشُوْرٌ كَرَسُوْلٍ وَالْاَخِيْرَةُ بَشِيْرٌ حَتّٰىٓ اِذَآ اَقَلَّتْ حَمَلَتِ الرِّيْحُ سَحَابًا ثِقَالًا بِالْمَطَرِ سُقْنٰهُ اَىِ السَّحَابَ وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ لَانَبَاتَ بِهٖ اَىْ لِاِحْيَائِهٖ فَاَنْزَلْنَا بِهِ بِالْبَلَدِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط كَذٰلِكَ الْاِخْرَاجُ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى مِنْ قُبُوْرِهِمْ بِالْاِحْيَاءِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে অর্থাৎ বৃষ্টির প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বিক্ষিপ্তভাবে বায়ু প্রেরণ করেন। بُشْرًا এটা অপর এক পাঠ অনুসারে تَخْفِيْف বা লঘুকরণার্থে [প্রথমাক্ষর نُوْن ও] ش-এ সাকিন সহ পঠিত রয়েছে। অপর এক কেরাতে مَصْدَرْ অর্থাৎ ক্রিয়ার মূলরূপে نُوْن-এ যবর ও ش -এ সাকিন সহ পঠিত রয়েছে। অর্থ হবে বিক্ষিপ্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে। অপর এক কেরাতে ش-এ সাকিন এবং نون-এর পরিবর্তে ب -এর পেশসহ [بُشْرًا] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে مُبَشِّرًا সুসংবাদবাহীরূপে। প্রথম কেরাত অনুসারে তার مُفْرَدْ বা একবচন হলো نُشُوْر যেমন- رَسُوْل। আর দ্বিতীয় পাঠ অনুসারে এটার مُفْرَدْ বা একবচন হবে بَشِيْر। যখন তা অর্থাৎ বায়ু বৃষ্টির ফোঁটায় পরিপূর্ণ ভারী মেঘ বহন করে তখন তা অর্থাৎ ঐ মেঘকে মৃত ভূমিতে অর্থাৎ যে স্থানে কোনো গাছপালা নেই সেই ভূখণ্ডকে সজীব করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি অনন্তর اَقَلَّتْ অর্থ এটা বহন করে। سُقْنٰهُ এ স্থানে غَيْب অর্থাৎ নাম পুরুষবাচক রূপ হতে اِلْتِفَاتْ বা রূপান্তর হয়েছে। সেই ভূখণ্ডে বারি বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা অর্থাৎ বৃষ্টির পানি দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এই উদগম করার মতো পুনর্জীবনদানের মাধ্যমে কবর হতে মৃতদেরকে জীবিত করব, যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর।

٥٨. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ الْعَذْبُ التُّرَابُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ حَسَنًا بِاِذْنِ رَبِّهٖ هٰذَا مَثَلٌ لِلْمُؤْمِنِ يَسْمَعُ الْمَوْعِظَةَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا وَالَّذِىْ خَبُثَ تُرَابُهٗ لَا يَخْرُجُ نَبَاتُهٗٓ اِلَّا نَكِدًا عُسْرًا بِمَشَقَّةٍ وَهٰذَا مَثَلٌ لِلْكَافِرِ كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ نُصَرِّفُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ اللّٰهَ فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

৫৮. এবং উৎকৃষ্ট ভূমি উর্বর ও মিঠা পানির মাটি তার প্রতিপালকের অনুমোদনে ভালো ফসল উৎপন্ন করে। এটা হলো মু'মিনের উদাহরণ, সে উপদেশ শুনে এবং এটা দ্বারা উপকৃত হয়। এবং যে মাটি নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। نَكِدًا অর্থ, অতি কঠিন পরিশ্রম। এটা হলো কাফেরের উদাহরণ। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি। ফলে তারা ঈমান আনয়ন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এটা مُتَشَابِهَاتٌ-এর অন্তর্গত। এর প্রকৃত রহস্য আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। يُغْشِىْ অর্থাৎ يُغَطِّىْ অর্থ হলো– ছেয়ে যাওয়া, ঢেকে ফেলা, এখান থেকেই غَشِيَتْهُ الْحُمّٰى অর্থ– তার জ্বর এসে গেছে।

قَوْلُهُ حَثِيْثًا : এটা حَثٌّ হতে নির্গত। আর এটা طَلَبًا উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالتَّشَدُّقِ : অর্থাৎ اِظْهَارُ الْفَصَاحَةِ بِالتَّكَلُّفِ ফাসাহাত প্রকাশ করার জন্য কৃত্রিমভাবে টেনে টেনে কথা বলা। تَشَدُّقٌ بِالْكَلَامِ وَفِيْهِ অর্থ হলো– কোনো সতর্কতা ব্যতিরেকে সব ধরনের কথা বলা।

قَوْلُهُ مُتَفَرِّقَةً : এ শব্দের সম্পর্ক نُشُرًا কেরাতের সাথে। এটা সেই সুরতে হবে যখন نُشُرًا-কে اَلرِّيْحَ থেকে حَالٌ স্বীকৃতি দেওয়া হবে। حَالٌ এর ذُوالْحَالِ-এর উপর حَمْل ঠিক রাখার জন্য এই تَاوِيْل-এর প্রয়োজন হয়েছে। তবে অন্যান্য মুফাসসিরগণ এতে একমত নন। কতিপয় মুফাসসির نُشُرًا-কে نَاشِرَةً لِلْحِسَابِ অর্থে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ مَنْشُوْرَةً অর্থে নিয়েছেন। نُشُرًا টা نُشُوْرٌ-এর এবং بُشْرًا টা بَشِيْرٌ-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ وَتَذْكِيْرُ قَرِيْبِ الْمُخْبَرِ بِهٖ عَنْ رَحْمَتِهٖ لِاِضَافَتِهَا اِلَى اللّٰهِ : উল্লিখিত ইবারতের বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে

প্রশ্ন. رَحْمَتَ اللّٰهِ হলো اِنَّ-এর ইসিম। আর قَرِيْبٌ হলো তার খবর। اِسْمٌ হলো مُؤَنَّثٌ আর খবর হলো مُذَكَّرٌ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। কাজেই قَرِيْبَةٌ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর. رَحْمَتَ اللّٰهِ-এর মধ্যে مُضَافٌ اِلَيْهِ তথা اَللّٰهُ শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে مُذَكَّرٌ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ مُضَافٌ-কে مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর হুকুম দিয়ে দিয়েছে। অন্যান্য ভাষা ও اِعْرَابٌ-এর ইমামগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. ইমাম যুজায (র.) বলেছেন, رَحْمَتَهٗ টা عَفْو এবং غُفْرَانٌ অর্থে হওয়ার কারণে رَحْم অর্থে হয়েছে। ইমাম নুহাস এই ব্যাখ্যাকে পছন্দ করেছেন।

২. নযর ইবনে শুমায়ল বলেন, رَحْمَةٌ মাসদার যা تَرَحُّمٌ অর্থে হয়েছে।

৩. আখফাশ সাঈদ বলেন, رَحْمَةٌ দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেন, رَحْمَةٌ যেহেতু مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِىْ এ কারণে مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ উভয়ই ব্যবহার হতে পারে।

–[ফতহুল কাদীর শওকানী]

قَوْلُهُ اَقَلَّتْ : অর্থাৎ حَمَلَتْ এবং رَفَعَتْ-এর مَاخَذ اِشْتِقَاقٌ হলো اِقْلَالٌ

قَوْلُهُ نَكِدًا : অর্থাৎ اَلَّذِىْ لَا خَيْرَ فِيْهِ অথবা اَلَّذِىْ اِشْتَدَّ وَعَسُرَ

قَوْلُهُ ثِقَالًا : **প্রশ্ন.** ثِقَالًا-কে বহুবচন নেওয়ার কারণ কি?

উত্তর. যেহেতু سَحَابًا টা سَحَابَةٌ-এর বহুবচনের অর্থে। কেননা এটা অর্থগত দিক থেকে سَحَائِبُ অর্থে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য প্রথম আয়াতে নভোমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্বকে সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাধীনে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কিয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই ইবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পঙ্কিলতা থেকে বের হয়ে সত্যকে চেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ : এখানে প্রশ্ন হয় যে. আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বারবার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে- وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়। কোথাও বলা হয়েছে- إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন 'হয়ে যা'। আর সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয়দিন লাগার কারণ কি? তাফসীরবিদ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সবকিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্বতা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চিন্তাভাবনা, ধীরস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা সহকারে কাজ করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয় আর তড়িঘড়ি কাজ করা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। –[তাফসীরে মাযহারী]

উদ্দেশ্য এই যে, তড়িঘড়ি কাজ করলে মানুষ কাজের সব দিক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারে না। ফলে প্রায়ই সে কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনুতাপ করতে হয়। পক্ষান্তরে যে কাজ চিন্তাভাবনা ও ধীরে-সুস্থে করা হয়, তাতে বরকত হয়ে থাকে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবারাত্রির পরিচয় কি ছিল? : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হলো?

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, ছয়দিন বলে এতটুকু সময় বুঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয়দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে দিবারাত্রির পরিচয়ের অন্য কোনো লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে, যেমন জান্নাতের দিবারাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবে না।

এতে আরও জানা যাচ্ছে যে, যে ছয়দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমাদের ছয়দিনের সমান হওয়া জরুরি নয়; বরং এর চাইতে বড়ও হতে পারে যেমন, পরকালের দিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে যে, একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে।

আবূ আব্দুল্লাহ রাযী (র.) বলেন, সপ্তম আকাশের গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় এত বেশি দ্রুত যে, দ্রুত ধাবমান একটি লোকের একটি পা তুলে তা পুনরায় মাটিতে রাখার পূর্বেই সপ্তম আকাশ তিন হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলে। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

সে জন্যই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুজাহিদ (র.) বলেন যে, এ ছয় দিনের অর্থ পরকালের ছয় দিন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতেও তাই বর্ণিত রয়েছে।

সহীহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী যে ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোনো কোনো আলেম বলেন, سَبْتٌ -এর অর্থ কর্তন করা। এ দিন কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এ দিনকে يَوْمُ السَّبْتِ [শনিবার] বলা হয়। –[ইবনে কাসীর]

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয়দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হা-মীম-সিজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দুদিনে ভূমণ্ডল, দুদিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হলো। বলা হয়েছে- خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ আবার বলা হয়েছে- قَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِيْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ যে দুদিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দুদিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজসরঞ্জাম, পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে। বাহ্যত এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়দিন হলো।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। إِسْتَوٰى -এর শাব্দিক অর্থ- অধিষ্ঠিত হওয়া। আরশ রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহর আরশ কিরূপ এবং কি? এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাযহাব সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সুফি-বুজুর্গদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলির

স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া অর্থহীন বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোনো অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মালিক (রা.)-কে কেউ اِسْتِوَاءٌ عَلَى الْعَرْشِ-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, اِسْتِوَاء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে, কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানববুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান ছওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র.) প্রমুখ বলেছেন, যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে কোনোরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। -[তাফসীরে মাযহারী]

এরপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবারাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়- মোটেই দেরি হয় না। এরপর বলা হয়েছে- وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছে যে, সবাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড় বিশেষজ্ঞের তৈরি মেশিনসমূহে প্রথমত কিছু না কিছু দোষত্রুটি থাকে। যদি দোষত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইস্পাতের মেশিন ও কলকব্জাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এক সময় ঢিলে হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত দরকার হয়। এ জন্য কয়েকদিন শুধু নয়, অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকেজো পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোনো কলকজা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং কখনও কোথাও মেরামতের জন্য পাঠাতে হয় না। কারণ এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে চলছে। অর্থাৎ এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়, না কোনো ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়; বরং শুধু আল্লাহর আদেশের শক্তি বলেই চলছে। চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও সম্ভব নয়। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলো ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর এরই নাম হলো কিয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে- اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ - خَلْق শব্দের অর্থ- সৃষ্টি করা এবং اَمْر শব্দের অর্থ- আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে আর না কউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে কোনো বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুত আল্লাহ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তা'আলারই অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

সুফি-বুজুর্গরা বলেন, خَلْق ও اَمْر দুটি জগৎ। خَلْق-এর সম্পর্ক বস্তুজগতের সাথে এবং اَمْر-এর সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও অজড় বিষয়াদির সাথে। قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ আয়াতে 'আত্মা'কে পালনকর্তার আদেশ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। خَلْق ও اَمْر দুই-ই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ তখন এই হবে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই বস্তুজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকেই خَلْق বলা হয়েছে এবং নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে যা কিছু আছে, সব অবস্তুজগৎ। এগুলোর সৃষ্টিকে اَمْر শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এখানে تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ [বরকত] থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া, কায়েম থাকা ইত্যাদি। তবে এখানে تَبَارَكَ শব্দের অর্থ উচ্চ ও মহান হওয়া। এটা বৃদ্ধি প্রাপ্তি এবং কায়েম থাকা উভয় অর্থেই হতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেমন কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত, তেমনি মহান ও উচ্চও বটে। হাদীসের এক বাক্যেও উচ্চ হওয়া অর্থের দিকেই করা হয়েছে। বলা হয়েছে- تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ এখানে تَبَارَكْتَ শব্দের তাফসীর تَعَالَيْتَ শব্দ দ্বারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً الخ : আরবি ভাষায় دُعَاء [দোয়া শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ। ১. বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা এবং ২. যে কোনো অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছে– اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটন একমাত্র আল্লাহর কাছেই ব্যক্ত কর। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তাফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তাফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে– تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً - تَضَرُّعٌ শব্দের অর্থ– অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خُفْيَةٌ শব্দের অর্থ– গোপন।

এ দুটি শব্দে দোয়া ও স্মরণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত অপারগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, এটা কবুল হওয়ার জন্য জরুরি শর্ত। দোয়ার ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় ও নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বুঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমত একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না, বরং দোয়া পাঠ করা বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, সেগুলোর অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবি বাক্য মুখস্থ থাকে এবং নামাজ শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা অর্থ না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যাবলির সাথে সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিষ্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বুঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনার বিষয়, পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এছাড়া যদি কারও নিজের উচ্চারিত বাক্যাবলির অর্থও জানা থাকে এবং তা বুঝেসুঝে বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবিতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোনো বান্দারই নেই।

মোটকথা, প্রথম শব্দে দোয়ার প্রাণ এরূপ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতাহীনতা এবং এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপি চুপি ও সংগোপনে দোয়া করা। এটাই উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী। কারণ উচ্চৈঃস্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়ত এতে রিয়া ও সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকার আশঙ্কাও রয়েছে। তৃতীয়ত এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কোনো বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন সূক্ষ্ম শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জনৈক সৎকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন– إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا অর্থাৎ যখন সে পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চস্বরে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - مُعْتَدِيْنَ শব্দটি اِعْتِدَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– সীমা অতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। তা দোয়ার সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোনো কাজে, কোনোটিই আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলি পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরিয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদতের পরিবর্তে গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ার সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকার হতে পারে।

১. দোয়ার শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়।

২. দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন– 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাতে সাদা রঙের ডানদিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি।' তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন, দোয়ায় এ ধরনের শর্ত যুক্ত করা সীমা অতিক্রম, কুরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ। –[তাফসীরে মাযহারী]

৩. মুসলমান জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা কিংবা এমন কোনো বিষয় কামনা করা, যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং এমনিভাবে এখানে উল্লিখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও একপ্রকার সীমা অতিক্রম।

–[তাফসীরে মাযহারী, আহকামুল কুরআন]

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا এখানে صَلَاحٌ ও فَسَادٌ দুটি পরস্পরবিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। صَلَاحٌ শব্দের অর্থ সংস্কার এবং فَسَادٌ শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগিব মুফারাদাতুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই فَسَادٌ বলা হয়, তা সামান্য বের হোক কিংবা বেশি। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশি বের হলে বেশি ফাসাদ হবে। اِفْسَادٌ শব্দের অর্থ– অনর্থ সৃষ্টি করা এবং اِصْلَاحٌ শব্দের অর্থ– সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগিব বলেন, আল্লাহ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকারে হতে পারে। ১. প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন বলা হয়েছে– وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ২. অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন– وَيُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ৩. সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দুটি অর্থ হতে পারে।

১. বাহ্যিক সংস্কার অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।
২. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর, গ্রন্থ ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শিরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে গুনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূপৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম : সংস্কার যেমন দু-রকম– বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু-রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ তা'আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মতো নরমও নয় যে, যাতে কোনো কিছু স্থিতাবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মতো শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না; বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের মাধ্যমে নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরি করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে শস্য, তরিতরকারি, উদ্ভিদ ও ফলফুল উৎপন্ন হয়। বাইরে বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মেঘমালার মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফুলে ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা দ্বারা সে মৃত্তিকাজাত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদিকে জোড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলতা। এর জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি সূক্ষ্ম প্রেরণা নিহিত রেখেছেন– فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰاهَا [আল্লাহ মানুষকে পাপাচার ও আল্লাহ-ভীতি এতদুভয়েরই অনুপ্রেরণা দান করেছেন]। মানুষের চারপাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিও বলে উঠে– فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ [সমুচ্চ হোন সুন্দরতম স্রষ্টা]। এছাড়া রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাজিল করেছেন। এভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূপৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে– আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না।

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ বা অনর্থ সৃষ্টির বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং অভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির

ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শরিয়ত অভ্যন্তরীণ ফাসাদের দ্বার যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ জগতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং অপরাধমূলক সকল আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপকাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও অভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ অভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

قَوْلُهُ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا : বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গুনাহ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে- وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দুটি বাহু। এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদমর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোনো কোনো আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন; যাতে আনুগত্যে ত্রুটি না হয়। আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ।

-[তাফসীরে বাহ্‌রে-মুহীত]

কোনো কোনো সূক্ষ্মদর্শী আলেম বলেন, ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্ন রূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্য যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে সচেষ্ট হবে।

মোটকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দুটি আদব বর্ণিত হয়েছে। ১. বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং ২. মৃদু স্বরে ও সংগোপনে দোয়া করা। এ দুটি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা বিনয়ের অর্থ হলো দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারগ ও ফকিরের মতো করে নেওয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মতো না হওয়া। দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহ্বার সাথে যুক্ত।

এ আয়াতে দোয়ার আরও দুটি অভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হলো এই যে, দোয়াকারীর মনে এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবত দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা পাপ ও গুনাহ থেকে নিশ্চিত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থি। অপর দিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয় কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব-পালনকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে কোনো ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র স্বীয় কুকর্ম ও গুনাহর অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে স্বীয় বেশভূষা ফকিরের মতো করে আল্লাহর সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে কিন্তু তাদের খাদ্য ও পোশাক সবই হারাম দ্বারা সংগৃহীত- এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?

-[মুসলিম, তিরমিযী]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দা যতক্ষণ কোনো গুনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ হলো, এরূপ ধারণা করা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবুল হলো না! অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। -[মুসীলিম, তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তখন কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে। অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনকে মজবুত করা। এমন মনে করা গুনাহের কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করার পরিপন্থি নয়।

অনুবাদ :

٥٩. لَقَدْ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوْفٍ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِاِلٰهٍ وَالرَّفْعُ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّهٖ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنْ عَبَدْتُمْ غَيْرَهٗ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ .

৫৯. আমি তো নূহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। لَقَدْ এটা এ স্থানে কসমের জওয়াব। غَيْرُهٗ এটা جَرّ সহকারে পঠিত হলে اِلٰهٍ-এর صِفَتْ অর্থাৎ বিশেষণ রূপে গণ্য হবে। আর তার مَحَلّ বা অবস্থান হতে بَدَلْ বা স্থলাভিষিক্ত পদরূপে এটা رَفْع সহও পাঠ করা যায়। যদি তোমরা অন্য কারো ইবাদত কর, তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

٦٠. قَالَ الْمَلَاُ الْاَشْرَافُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ .

৬০. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ গন্যমান্যগণ বলেছিল, আমরা তো তোমাকে নিঃসন্দেহে পরিষ্কার সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

٦١. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ هِىَ اَعَمُّ مِنَ الضَّلَالِ فَنَفْيُهَا اَبْلَغُ مِنْ نَفْيِهٖ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

৬১. তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোনো ভ্রান্তি নেই, বরং আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসূল। ضَلَالَةٌ শব্দটি ضَلَالٌ হতে عَامٌ। সুতরাং তা হতে এটার نَفْى বা না থাকার কথা বলা অধিকতর অলংকার সমৃদ্ধ এবং এতে জোর বেশি।

٦٢. اُبَلِّغُكُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ اُرِيْدُ الْخَيْرَ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেই ও তোমাদের হিত কামনা করি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর নিকট হতে অবহিত। اُبَلِّغُكُمْ এটা তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] ও تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদ ব্যতিরেকে উভয়ভাবে পাঠ করা যায়। اَنْصَحُ অর্থ, আমি হিত কামনা করি।

٦٣. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى لِسَانِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ الْعَذَابَ اِنْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلِتَتَّقُوا اللّٰهَ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ بِهَا .

৬৩. তোমরা কি অস্বীকার কর এবং বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের বাচনিক তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে তোমাদের নিকট জিকির অর্থাৎ উপদেশ এসেছে যাতে তিনি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদেরকে আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেন আর তোমরা যাতে আল্লাহর ভীতির অধিকারী হতে পার এবং তোমরা যাতে এটার মাধ্যমে অনুগ্রহীত হতে পার।

٦٤. فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ مِنَ الْغَرَقِ فِى الْفُلْكِ السَّفِيْنَةِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط بِالطُّوْفَانِ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ عَنِ الْحَقِّ .

৬৪. অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করে। অনন্তর তাকে ও তার সাথে যারা তরণিতে ছিল আমি তাদেরকে নিমজ্জন হতে রক্ষা করি এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে তুফান ও বন্যায় নিমজ্জিত করি। তারা ছিল সত্য সম্পর্কে অন্ধ এক সম্প্রদায়। اَلْفُلْكِ অর্থ তরণি, জলযান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوْفٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لَقَدْ-এর মধ্যকার لَامْ টি جَوَاب قَسَمْ-এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالرَّفْعُ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّهِ : উহ্য ইবারত হলো এই مَا لَكُمْ اِلٰهٌ এখানে مِنْ হলো অতিরিক্ত اِلٰهٌ হলো মুবতাদা, আর لَكُمْ হলো তার খবরে মুকাদ্দাম।

قَوْلُهُ هِيَ اَعَمُّ مِنَ الضَّلَالِ فَنَفْيُهَا اَبْلَغُ مِنْ نَفْيِهِ : হযরত নূহ (আ.) -এর দিকে সকল প্রকার ভ্রষ্টতার নিসবত করেছেন এর জবাবে হযরত নূহ (আ.) لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ বলে প্রত্যেক প্রকার ভ্রষ্টতার نَفْى করে দিয়েছেন। আর শুধুমাত্র প্রত্যেক প্রকার ভ্রষ্টতার نَفْى করেই ক্ষান্ত হননি; বরং وَلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে এ দাবিও করেছেন যে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদা রিসালতও প্রাপ্ত হয়েছি।

اَلضَّلَالَةُ اَعَمُّ مِنَ الضَّلَالِ : কেননা ضَلَالَة টা অনির্দিষ্ট একককে বুঝায়। আর অনির্দিষ্ট এককের نَفْى করা হলো عَامّ এটা ضَلَال-এর বিপরীত। কেননা এটা মাসদার যা একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনকে অন্তর্ভুক্ত করে। মাসদারের نَفْى করা দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, নিশ্চিতভাবে عَامّ-এর نَفْى করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ضَلَالَة-এর نَفْى করা দ্বারা ضَلَال-এর نَفْى-কে আবশ্যক করে, এর বিপরীত নয়। কেননা عَامّ-এর نَفْى দ্বারা خَاصّ-এর نَفْى-কে আবশ্যক করে। এর বিপরীত নয়। আর لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ-এর মধ্যে نَكِرَه টা نَفْى-এর অধীনে আসার কারণে عُمُوْم-এর ফায়দা দিচ্ছে।

قَوْلُهُ بِهَا : অর্থাৎ بِالتَّقْوٰى

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আ'রাফের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিরোনাম ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত ও পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। মানুষকে তার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি এবং এ প্রসঙ্গে শয়তানের চক্রান্ত ও প্রতারণা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এখন অষ্টম রুকূ' থেকে প্রায় সূরার শেষ পর্যন্ত কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সব পয়গম্বরের সর্বসম্মতভাবে উল্লিখিত মূলনীতি, একত্ববাদ, রিসালত, পরকালের প্রতি নিজ নিজ উম্মতকে আহ্বান জানানো, মান্যকারীদের প্রতিদান ও পুরস্কার এবং অমান্যকারীদের উপর নানা রকম আজাব ও তাদের অশুভ পরিণাম বিস্তারিতভাবে প্রায় চৌদ্দ রুকূ'তে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে শত শত মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও ব্যক্ত হয়েছে। এভাবে বর্তমান জাতিসমূহকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সান্ত্বনা লাভেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের সাথেও এমনি ধরনের ব্যবহার হয়ে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ সূরা আ'রাফের পূর্ণ অষ্টম রুকূ। এতে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর উম্মতের অবস্থা ও সংলাপের বিবরণ রয়েছে। নবীগণের পরম্পরায় হযরত আদম (আ.) যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তাঁর আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহির মোকাবিলা ছিল না। তাঁর শরিয়তের অধিকাংশ বিধানই পৃথিবী আবাদকরণ ও মানবীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালত ও শরিয়তের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচেছিল, তারা হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথি; তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এ কারণেই তাঁকে 'ছোট আদম' বলা হয়। বলা বাহুল্য, এ কারণেই পয়গম্বরদের কাহিনীর সূচনা তাঁর দ্বারাই করা হয়েছে। এ কাহিনীতে সাড়ে নশ' বছরের সুদীর্ঘ জীবনে তাঁর পয়গম্বরসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ–

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ হযরত নূহ (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর অষ্টম পুরুষ। মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত আবূ যর (রা.)-এর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

একশ' বছরে এক শতাব্দী হয়। তাই এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে যায়। ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জন্ম হযরত আদম (আ.)-এর আটশত ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কুরআনের

বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নশ' পঞ্চাশ বছর। হযরত আদম (আ.)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদীসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে হযরত আদম (আ.)-এর জন্ম থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর ওফাত পর্যন্ত মোট দু'হাজার আট শ' ছাপান্ন বছর হয়। -[মাযহারী]

হযরত নূহ (আ.)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সাকান' এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আব্দুল গাফ্ফার বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তাঁর যুগটি হযরত ইদরীস (আ.)-এর পূর্বে ছিল, না পরে? অধিকাংশ সাহাবীর মতে তিনি পূর্বে ছিলেন। -[তাফসীরে বাহরে-মুহীত]

মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত নূহ (আ.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত নূহ (আ.) শুধু স্বজাতির জন্যই নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন; তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় বর্তমান ইরাকের এলাকায় বসবাস করত এবং বাহ্যত সভ্য হলেও শিরকে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেন-

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنِّىٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। এর প্রথম বাক্যে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। দ্বিতীয় বাক্যে শিরক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৃতীয় বাক্যে ঐ মহাশাস্তির আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এর অর্থ পরকালের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং জগতে প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। -[তাফসীরে কবীর]

قَوْلُهُ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ : مَلَأٌ শব্দের অর্থ সম্প্রদায়ের সরদার ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আমরা মনে করি যে, আপনি প্রকাশ্যে ভ্রান্তিতে পতিত রয়েছেন। কারণ আপনি আমাদেরকে বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে বলছেন। কিয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদির ধারণা কুসংস্কার বৈ নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে হযরত নূহ (আ.) পয়গম্বরসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সরল ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেন- يَا قَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلَالَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক ধর্মের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব-পালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর। আমি যা কিছু বলি, মহান পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ তা'আলার পয়গামই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদের মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোনো লাভ আছে এবং না আমার কোনো স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ [বিশ্বপালক] শব্দটি শিরকের মূলে কুঠারাঘাত স্বরূপ। এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোনো দেবদেবী কিংবা ইয়াযদা ও আহরিমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেন, কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যা সূরা মু'মিনূনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে-

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً.

অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত শুনে তাঁর কওম এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমাদেরই মতো পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসরণীয় বলে মেনে নিতে পারি! আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কাছে কোনো পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদের প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হতো। এখন এছাড়া আর কোনো কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এর উত্তরে তিনি বললেন- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদেরই মধ্যে থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও;

অর্থাৎ তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাজিল হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রাসূলরূপে মনোনীত করা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রিসালত দান করবেন। এতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যাবে যে, মানুষের প্রতি রিসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ রিসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলির বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদের দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শান্তি কিছুই নেই, আমরা তাদের মতো হবো কেমন করে? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশাবলির পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোনো অজুহাত থাকতে পারে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই বলা হয়েছে- لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا অর্থাৎ মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে, অন্য কারও ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফেররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোনো মানুষের পক্ষে নবী ও রাসূল হওয়া উচিত নয়। কুরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কুরআনের এতসব সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোককে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ মোটেও মানুষ ছিলেন না' এরূপ একটি অর্থহীন তথ্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট দেখা যায়। এরূপ ধারণা যে কুরআনে উল্লিখিত নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ও বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত- এ সরল সত্যটুকুও তারা বুঝে না। তারা কোনো সমজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মূর্খরা সব সময়ই সমসাময়িক ওলী ও আলিমেদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণেই ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির দুঃখজনক কথাবার্তার জওয়াবে হযরত নূহ (আ.)-এর দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছে- فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর জালিম সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়াও করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীদের একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ জনগোষ্ঠী।

হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ ও সূরা হূদে বর্ণিত হবে। এ স্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, যে সময় হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আজাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পার্বত্য এলাকায়ও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদের অবকাশ দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবি হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশিজন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবি ভাষায় কথা বলত। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মুসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানূন' [অর্থাৎ আশি] নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোটকথা, এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ১. পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। ২. আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে, পাহাড়ের শৃঙ্গ পর্যন্ত সুউচ্চ প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত হয় না। ৩. পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহর আজাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আজাবে নিপতিত হয়েছে এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

অনুবাদ :

٦٥. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى عَادٍ الْاُوْلٰى اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ تَخَافُوْنَهٗ فَتُؤْمِنُوْنَ .

৬৫. এবং প্রেরণ করছিলাম প্রথম আদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা হুদকে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর তোমাদের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না? তাঁকে ভয় করবে না এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

٦٦. قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰكَ فِىْ سَفَاهَةٍ جَهَالَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ فِىْ رِسَالَتِكَ .

৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা বলেছিল, আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ মূর্খ এবং তোমাকে আমরা তোমার রাসূল হওয়ার বিষয়ে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

٦٧. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

৬৭. সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে নির্বুদ্ধিতা নেই; বরং আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একজন রাসূল।

٦٨. اُبَلِّغُكُمْ بِالْوَجْهَيْنِ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ مَامُوْنٌ عَلَى الرِّسَالَةِ .

৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাই اُبَلِّغُكُمْ এটা এস্থানেও উক্ত দুভাবে অর্থাৎ ل -এ তাশদীদসহ ও তাশদীদ ব্যতিরেকে পাঠ করা যায়। এবং আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত, রাসূল হওয়ার বিষয়ে আমি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, উপদেশ দানকারী।

٦٩. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى لِسَانِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ط وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً ج قُوَّةً وَّطُوْلًا وَكَانَ طَوِيْلُهُمْ مِائَةَ ذِرَاعٍ وَقَصِيْرُهُمْ سِتِّيْنَ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ نِعَمَهٗ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ .

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদেরই একজনের বাচনিক তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? স্মরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে নূহ সম্প্রদায়ের পর পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে শারীরিক কাঠামোতে অধিকতর শক্তিশালী করেছেন। শারীরিক শক্তি ও সুদীর্ঘ গঠনে তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন। এদের সর্বাপেক্ষা লম্বাজন ছিল একশত হাত এবং সর্বাপেক্ষা ছোটজন ছিল ষাট হাত। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অনুগ্রসমূহ স্মরণ কর হয়তো তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে, সফলকাম হবে।

٧٠. قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ نَتْرُكَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِكَ .

৭০. তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তা পরিত্যাগ করি। বর্জন করি। সুতরাং তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক তবে আমাদেরকে যে আজাবের ভয় প্রদর্শন করছ তা নিয়ে আস।

٧١. قَالَ قَدْ وَقَعَ وَجَبَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ عَذَابٌ وَّغَضَبٌ ط اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَىْ سَمَّيْتُمْ بِهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ اَصْنَامًا تَعْبُدُوْنَهَا مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا اَىْ بِعِبَادَتِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ فَانْتَظِرُوا الْعَذَابَ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ذٰلِكَ بِتَكْذِيْبِكُمْ لِىْ فَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الرِّيْحُ الْعَقِيْمُ .

৭১. সে বলল, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর আপতিত হয়ে আছে তা নির্ধারিত হয়েই আছে। তবে কি তোমরা আমার সাথে এমন কতগুলো নাম সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যেগুলোর নামকরণ করেছে? প্রতিমারূপে আর যেগুলোর তোমরা উপসনা কর? যেগুলোর উপাসনা সম্পর্কে আল্লাহ কোনো সনদ দলিল ও প্রমাণ পাঠাননি। সুতরাং আজাবের প্রতীক্ষা কর আর আমাকে অস্বীকার করার কারণে আমিও তোমাদের সাথে তার প্রতীক্ষা করছি। অনন্তর এদের উপর মারাত্মক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাত্যা প্রেরিত হয়। رِجْسٌ অর্থ এ স্থানে আজাব, শাস্তি। سَمَّيْتُمُوْهَا এটা মূলত سَمَّيْتُمْ بِهَا [এতদরূপে এর নামকরণ করেছে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٢. فَاَنْجَيْنٰهُ اَىْ هُوْدًا وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اَىْ اِسْتَاْصَلْنٰهُمْ وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ عَطْفٌ عَلٰى كَذَّبُوْا .

৭২. অনন্তর তাকে অর্থাৎ হূদকে ও তার বিশ্বাসী [সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করছিলাম আর আমার নিদর্শনসমূহকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং যারা বিশ্বাসী ছিল না তাদের পশ্চাৎদেশ কেটে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে সমূলে উৎপটিত করে দিয়েছিলাম। وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ পূর্ববর্তী كَذَّبُوْا ক্রিয়ার সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَرْسَلْنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَاِلٰى عَادٍ -এর আতফ نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ -এর উপর হয়েছে। আর এটা عَطْفُ قِصَّةٍ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ الْاُوْلٰى : عَادٌ -এর সিফত اَلْاُوْلٰى নিয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَاد ثَانِيَه উদ্দেশ্য নয়। কেননা عَاد ثَانِيَة হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নাম।

قَوْلُهُ اَخَاهُمْ هُوْدًا : هُوْدًا এটা اَخَاهُمْ থেকে بَدَلْ হয়েছে। যারা عَادٌ -কে মহল্লার নাম বলেছেন তারা এটাকে مُنْصَرِفٌ বলেছেন। আর যারা এটাকে কবীলা বা গোত্রের নাম বলেছেন তারা এটাকে تَانِيْثٌ এবং عَلَمِيَّتٌ-এর কারণে غَيْر مُنْصَرِفٌ বলেছেন, আর عَادٌ মূলত আদ সম্প্রদায়ের جَدِّ اَكْبَرُ [পর-দাদা] -এর নাম। এর বংশধারা হলো এরূপ–

আদ ইবনে আউস ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে হযরত নূহ (আ.)।

প্রশ্ন. হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনায় فَقَالَ يَا قَوْمِ তথা فَاء -এর সাথে বলেছেন, আর এখানে فَاء ব্যতীত বলেছেন এর হেতু কি?

উত্তর. হযরত নূহ (আ.) অলসতা বিনে বিরামহীন ভাবে স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে ব্যাপৃত ছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর বাণী– قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا দ্বারা বুঝা যায়। কাজেই এর জন্য فَاء تَعْقِيْبِيَّه নেওয়া যথাযথ হয়েছে। আর হযরত হূদ (আ.)-এর অবস্থা এরূপ ছিল না, তাই এখানে فَاء -কে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْعَذَابِ : এটা উহ্য عَائِذٌ -এর বর্ণনা এবং تَعِدُنَا এটা বাক্য হয়ে সেলাহ হয়েছে। আর সেলাহ যখন বাক্য হয় তখন عَائِدٌ হওয়া আবশ্যক হয়। মুফাসসির (র.) بِهِ বলে عَائِدٌ -কে প্রকাশ করে দিয়েছেন, আর مِنَ الْعَذَابِ ঐ যমীরেরই বর্ণনা।

قَوْلُهُ وَجَبَ : প্রশ্ন. وَقَعَ -এর তাফসীর وَجَبَ দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর. যাতে করে আল্লাহ তা'আলার খবরের মধ্যে মিথ্যা আবশ্যক না হয়। যেহেতু সে সময় শাস্তি পতিত হয়নি।

قَوْلُهُ سَمَّيْتُمُوْهَا : প্রশ্ন. سَمَّيْتُمُوْهَا -এর তাফসীর سَمَّيْتُمْ بِهَا দ্বারা করা হলো কেন?

উত্তর. سَمَّيْتُمُوْهَا -এর মধ্যে أَسْمَاء -এর জন্য أَسْمَاء হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। কেননা هَا যমীরটি أَسْمَاء -এর দিকে ফিরেছে। উদ্দেশ্য এটা হবে যে, তোমরা নামসমূহের নাম রেখে দিয়েছে। অথচ এটা অহেতুক কথা। আর যখন هَا-এর সাথে بَاء -কে সংযুক্ত করে দিলে তখন এ প্রশ্ন আর উত্থাপিত হবে না। যেহেতু هَا যমীর أَسْمَاء -এর দিকে ফিরবে এবং سَمَّيْتُمْ-এর মাফঊল উহ্য হবে। অর্থাৎ سَمَّيْتُمْ مُسَمَّيَاتِ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ بِهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'আদ ও সামূদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : 'আদ' প্রকৃতপক্ষে হযরত নূহ (আ.)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তাঁর বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কুরআন পাকে 'আদের সাথে কোথাও 'আদে উলা' [প্রথম আদ] এবং কোথাও إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, 'আদ সম্প্রদায়কে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোনো দ্বিতীয় 'আদও রয়েছে এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবেত্তাদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। তার এক পুত্র আওসের বংশধররাই 'আদ। তাদেরকে প্রথম 'আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে 'সামূদ'। তার বংশধরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, 'আদ' ও 'সামূদ' উভয়ই ইরামের দু-শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ' এবং অপর শাখাকে 'সামূদ' অথবা দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। ইরাম শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

'আদ সম্প্রদায়ের তেরোটি বংশ-শাখা ছিল। অম্মান থেকে শুরু করে হযরামাউত ও ইয়েমেন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুবিশিষ্ট। আয়াতে زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً বাক্যের মর্ম তা-ই। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণে এসব নিয়ামতই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً [আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?] এ ধরনের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে। যে বিশ্ব-পালকের নিয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, 'আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আজাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তাদেরকে দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। –[তাফসীরে বায়ানুল কুরআন]

'হূদ' একজন পয়গম্বরের নাম। তিনিও হযরত নূহ (আ.) -এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। 'আদ' সম্প্রদায় এবং 'হূদ' (আ.)-এর বংশ তালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত এক হয়ে যায়। তাই হযরত হূদ (আ.) তাদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে أَخَاهُمْ هُوْدًا [তাদের ভাই হূদ] বলা হয়েছে।

হযরত হূদ (আ.)-এর বংশ তালিকা ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত : আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত হূদ (আ.)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ-বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন– হযরত হূদ (আ.)-এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহ্তান ইয়েমেনে পৌঁছে বসতি স্থাপন করে। ইয়েমেনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবি ভাষার সূচনা তার থেকে হয়েছে এবং তার নামানুসারে ভাষার নাম আরবি এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব। –[বাহ্রে মুহীত]

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবি ভাষা হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকেই প্রচলিত ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার একজন আরোহী জুরহাম আরবি ভাষায় কথা বলতেন। [বাহ্‌রে মুহীত]। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়েমেনে আরবি ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহ্‌তান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও হয়তো তাই।

হযরত হুদ (আ.) 'আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আজাব নাজিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর ঘূর্ণিঝড়ের আজাব আপতিত হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালানকোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে- وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا অর্থাৎ আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোনো কোনো তাফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন 'আদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যও 'আদ জাতিকে নির্বংশ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত হুদ (আ.)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন 'আদ জাতির উপর আজাব নাজিল হয়, তখন হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুঁড়েঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়েঘরটিতে বাতাস খুব সষম পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আজাবের মুহূর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোনো কষ্ট হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

'আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আজাব আসা কুরআন পাকে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সূরা মু'মিনূনে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে- ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহ্যত এরাই হচ্ছে 'আদ জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও বাক্যালাপ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ অর্থাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে সঠিকভাবে আচ্ছন্ন করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আজাব আপতিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় দুটিই হয়েছিল।

অনুবাদ :

٧٣. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ بِتَرْكِ الصَّرْفِ مُرَادًا
بِهِ الْقَبِيْلَةَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ
جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مُعْجِزَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ عَلٰى
صِدْقِىْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً حَالٌ
عَامِلُهَا مَعْنَى الْاِشَارَةِ وَكَانُوْا سَاَلُوْهُ اَنْ
يُخْرِجَهَا لَهُمْ مِنْ صَخْرَةٍ عَيَّنُوْهَا
فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا
تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ بِعَقْرٍ اَوْ ضَرْبٍ فَيَاْخُذَكُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

৭৩. সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে ثَمُوْد এটা একটি গোত্রের নাম বিধায় একে مَنْع صَرْف রূপে পাঠ করা হয়। প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট আমার সত্য হওয়া সম্পর্কে বিশদ প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা এসেছে। আল্লাহর এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। اٰيَةً এটা এ স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। ইঙ্গিতবাচক শব্দ ও هٰذِهٖ [এই]-এর মর্মবোধক ক্রিয়া اُشِيْرُ তার عَامِل রূপে গণ্য। একে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও এবং একে হত্যা বা আঘাত করত কোনো ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। একটি পাথর নির্দিষ্ট করত তা হতে একটি উষ্ট্রী বের করতে হযরত সালেহ (আ.)-কে তারা বলেছিল। তখন তিনি মু'জিযারূপে তা করেছিলেন।

٧٤. وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ فِى الْاَرْضِ
مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ اَسْكَنَكُمْ فِى
الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا
تَسْكُنُوْنَهَا فِى الصَّيْفِ وَّتَنْحِتُوْنَ
الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ تَسْكُنُوْنَهُ فِى الشِّتَاءِ
وَنَصْبُهٗ عَلَى الْحَالِ الْمُقَدَّرَةِ فَاذْكُرُوْٓا
اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ـ

৭৪. স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে দুনিয়ায় আশ্রয়স্থল দিয়েছেন। বসবাস করার ব্যবস্থা করেছেন। এর সমতল ভূমিতে তোমরা প্রাসাদ তৈরি কর এতে গ্রীষ্মকালে তোমরা বসবাস কর এবং পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ কর এতে তোমরা শীতকালে বসবাস কর। بُيُوْتًا এটা حَالٌ مُقَدَّرَة রূপে نَصْب সহ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

٧٥. قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
تَكَبَّرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ لِلَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَىْ مِنْ
قَوْمِهٖ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهٗ بِاِعَادَةِ الْجَارِ
اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ
اِلَيْكُمْ قَالُوْٓا نَعَمْ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ

৭৫. তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা অর্থাৎ যারা ঈমান সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করেছিল তারা তাদের মধ্যে অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ের দুর্বল শ্রেণির যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি জান যে সালেহ مِنْهُمْ এটা جَرّ বাচক শব্দ [مِنْ] -এর পুনরাবৃত্তিসহ পূর্বোল্লিখিত لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا -এর بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা বলল, হ্যাঁ, তাঁর প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী।

٧٦. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ .

৭৬. দাম্ভিকেরা বলল, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

٧٧. وَكَانَتِ النَّاقَةُ لَهَا يَوْمٌ فِى الْمَاءِ وَلَهُمْ يَوْمٌ فَمَلُّوْا ذٰلِكَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ عَقَرَهَا قُدَارٌ بِاَمْرِهِمْ بِاَنْ قَتَلَهَا بِالسَّيْفِ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ عَلٰى قَتْلِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .

৭৭. ঐ উষ্ট্রীটির জন্য একদিন পানি পান নির্ধারিত ছিল আর তাদের সকলের জন্য ছিল একদিন। শেষে এতে তারা বিরক্ত হয়ে উঠে। ফলে তারা সেই উষ্ট্রীটিকে বধ করে। এদের নির্দেশে কুযার নামক এক ব্যক্তি তলোওয়ার দিয়ে তা বধ করেছিল। এবং তাদের প্রভুর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালেহ! তুমি সত্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে এটা বধ করলে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস।

٧٨. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ مِنَ الْاَرْضِ وَالصَّيْحَةُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ .

৭৮. অতঃপর তারা রাজফা অর্থাৎ ভীষণ ভূকম্পন ও আকাশ হতে ভীষণ গর্জন দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। جَاثِمِيْنَ অর্থ নতজানু হয়ে মরে রইল।

٧٩. فَتَوَلّٰى اَعْرَضَ صٰلِحٌ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ .

৭৯. অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত সালেহ এদের থেকে ফিরে গেলেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তো উপদেশদাতাগণকে পছন্দ কর না।

٨٠. وَ اذْكُرْ لُوْطًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ اَىْ اَدْبَارَ الرِّجَالِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ .

৮০. আর স্মরণ কর লূত-এর কথা সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমরা এমন কুকর্মে সমকামে লিপ্ত যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে জিন ও মানুষ কেউ করেনি। اِذْ قَالَ -এটা لُوْطًا-এর بَدَلْ বা স্থলাভিষিক্ত বাক্য।

٨١. ءَاِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ

৮১. তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর? বরঞ্চ তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের দিকে যাত্রী সম্প্রদায় أَاِنَّكُمْ -এ হামযাদ্বয়কে আলাদা স্পষ্টভাবে বা দ্বিতীয়টিকে تَسْهِيْل করত বা উক্ত উভয়

٨٢. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ اَىْ لُوْطًا وَاَتْبَاعَهٗ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ مِنْ اَدْبَارِ الرِّجَالِ .

৮২. তার সম্প্রদায়ের এটা ব্যতীত আর কোনো উত্তর ছিল না যে, এদেরকে হযরত লূত ও তাঁর অনুসারীদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর। এরা সমকাম হতে পবিত্রতাকামী লোক।

٨٣. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ .

৮৩. অনন্তর তাঁর স্ত্রী ব্যতীত তাঁর পরিজনবর্গ ও তাঁকে আমি রক্ষা করেছিলাম। তাঁর স্ত্রী ছিল অবশিষ্টদের অর্থাৎ আজাবের মধ্যে নিপতিত অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।

٨٤. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ط هُوَ حِجَارَةُ السِّجِّيْلِ فَاَهْلَكْتُهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ .

৮৪. আর তাদের উপর মুষলধারে কঙ্কর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। এটা তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল দেখ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا : এর আতফও পূর্বের উপর হয়েছে এবং এটাও عَطْفُ قِصَّةٍ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্গত। ছামূদ একটি গোত্রের নাম যা তাদের جَدِّ اَكْبَرْ [পরদাদা] -এর নাম ছিল। এ কারণেই ثَمُوْدُ শব্দটি غَيْر مُنْصَرِفْ হয়েছে। তার বংশ পরম্পরা হলো এরূপ– ছামূদ ইবনে আদ ইবনে ইরাম ইবনে শালেখ ইবনে কাহশন্দ ইবনে সাম ইবনে হযরত হযরত নূহ (আ.)।

صَالِح শব্দটি اَخَاهُمْ -এর عَطْف بَيَانْ হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) -এর বংশ পরম্পরা এভাবে রয়েছে যে, সালেহ ইবনে উবায়দা ইবনে আসিফ ইবনে মাশিহ ইবনে ওবায়দ ইবনে হাযির ইবনে ছামূদ যারা ثَمُوْدُ -কে কবীলার নাম বলেন, তারা এটাকে عَلَمِيَّتْ এবং تَانِيْث -এর কারণে غَيْر مُنْصَرِفْ পড়েন আর যারা ثَمُوْدُ -কে ব্যক্তির নাম বলেছেন তারা এটাকে مُنْصَرِفْ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه উদ্দেশ্য হলো মু'জিযার كَيْفِيَّتْ বর্ণনা করা। কেমন যেন বলা হলো مَا هٰذِهِ الْبَيِّنَةُ তখন উত্তরে বলা হয়েছে যে, هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

قَوْلُهٗ حَالٌ عَامِلُهَا مَعْنَى الْاِشَارَةِ : এখানে اٰيَةً টা نَاقَةُ থেকে حَالْ হয়েছে। তার আমেল হলো هٰذِهٖ যা اُشِيْرَ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهٗ سُهُوْلِهَا : سُهُوْلٌ শব্দটি سَهْلٌ -এর বহুবচন, নরম ভূমিকে বলা হয়।

قَوْلُهٗ نَصْبُهٗ عَلَى الْمُقَدَّرَةِ : بُيُوْتًا টা تَنْحِتُوْنَ থেকে حَال مُقَدَّرَه হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা এজন্য পাহাড়কে খোদাই কর যাতে তোমরা তথায় বসবাস করতে পার। কেননা খোদাই করা বাসস্থান গ্রহণের উপর মুকাদ্দাম। অথচ حَالْ এবং ذُوالْحَالِ -এর সময়কাল একই হয়।

قَوْلُهٗ لَا تَعْثَوْا : এ শব্দটি বাবে سَمِعَ -এর عَثِىَ বা عَثْى হতে جَمْع مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর।

قَوْلُهٗ اَلْمَلَاُ : এটা اسم جمع যা معرف باللام হয়েছে। বহুবচনে اَمْلَاءٌ অর্থ– নেতা, বড়লোক।

قَوْلُهٗ بِاَمْرِهِمْ : এ বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের উত্তর দান কল্পে হয়েছে যে, হত্যাকারী قَدَّارٌ নামীয় এক ব্যক্তি ছিল। আর عَقَرُوْا-এর মধ্যে হত্যার সম্পর্ক সমগ্র জাতির দিকেই করা হয়েছে।

এর উত্তর হলো এখানে إِسْنَاد مَجَازِيْ হয়েছে। যেহেতু قُدَارْ-এর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সমগ্র জাতি ঐকমত্য ছিল এ কারণে সমগ্র সম্প্রদায়ের দিকেই হত্যার সম্বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ حِجَارَةُ السِّجِّيْلِ : এমন পাথর যাতে মাটির সংমিশ্রণ রয়েছে। যাকে কঙ্কর বলা হয়। বলা হয়েছে যে, এটা سنگ گل -এর আরবিকৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ইতঃপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে- وَإِلَىٰ ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ইতঃপূর্বে 'আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, 'আদ ও ছামূদ একই দাদার বংশধরের দু'ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি 'আদ সম্প্রদায়, আর একটি ছামূদ সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণত 'মাদায়েনে সালেহ' বলা হয়। 'আদ' জাতির মতো সামূদ জাতিও সম্পদ, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশাল এলাকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান লিখেছেন, তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলি আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালায় শিলালিপি খোদিত রয়েছে।

পার্থিব বিত্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। ছামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শাস্তির ঘটনাবলি তখনও লোকমুখে আলোচিত হতো এবং 'আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেমন সাম্প্রতিককালের ঘটনা বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথমজনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। 'আদ জাতির ধ্বংসের পর ছামূদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যেসব জায়গায় নিজেদের বিলাসবহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই যে তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল তা বেমালুম ভুলে যায়। তারা 'আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয়ে শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত সালেহ (আ.)-কে পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে ছামূদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে তাঁকে أَخَاهُمْ صَالِحًا অর্থাৎ ছামূদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর নিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত করার ও মূর্তিপূজা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় হযরত সালেহ (আ.)-ও তাঁর জাতিকে একথাই বললেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায় يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ এতদসঙ্গে আরও বললেন- قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতেও এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রীর ঘটনা এই যে, হযরত সালেহ (আ.) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজ করতে করতেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বারবার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবি করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁকে স্তব্ধ করে দিতে পারব। সেমতে তারা দাবি করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে 'কাতেবা' পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

হযরত সালেহ (আ.) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবি পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কিনা? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন হযরত সালেহ (আ.) প্রথমে দু-রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "ইয়া পরওয়ারদেগার! আপনার জন্য কোনো কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবি পূরণ করে দিন।" দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দনে দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবির অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

হযরত সালেহ (আ.)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টরাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরনের কিছু সরদার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আজাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন, এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনোরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়তো তোমরা আজাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আজাবে পতিত হবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে- هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না নতুবা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে 'আল্লাহর উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন এবং হযরত সালেহ (আ.)-এর মু'জিযা হিসাবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রুহুল্লাহ [আল্লাহর আত্মা] বলা হয়েছে। تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। জমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর জমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও যাতে সাধারণভাবে চারণক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

ছামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নেবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অন্যরা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কুরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বণ্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে- وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ অর্থাৎ হে সালেহ, তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বণ্টন হবে- একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বণ্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে, যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে- هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

দ্বিতীয় আয়াতে এ অবাধ্য ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির প্রতি শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য পুনরায় আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অবাধ্যতা পরিহার করে। বলা হয়েছে-

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا

এতে خُلَفَآءَ শব্দটি خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قُصُوْرٌ শব্দটি قَصْر-এর বহুবচন। এর অর্থ- উচ্চ অট্টালিকা ও প্রাসাদ। تَنْحِتُوْنَ শব্দটি نَحْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- প্রস্তর খোদাই করা। جِبَالٌ শব্দটি جَبَلٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- পাহাড়। بُيُوْتًا শব্দটি بَيْتٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- প্রকোষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদের অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ি ও সাহায্য-সম্পত্তি তোমাদের দান করেছেন এবং তাদের এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরি কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়–

১. ধর্মের মূলবিশ্বাসসমূহে সব পয়গম্বরই একমত এবং তাঁদের সবার শরিয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

২. পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গম্বরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

৩. তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করা হয় যেমন 'আদ ও ছামূদ জাতির সামনে আল্লাহ তা'আলা ধনসম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

৪. তাফসীর কুরতুবীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং বৈধ।

এটা ভিন্ন কথা যে, কোনো নবী-রাসূল ও ওলীগণ অট্টালিকা পছন্দ করেননি। কারণ এগুলো মানুষকে গাফিল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এ ধরনেরই।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে ছামূদ জাতির দু-দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে–

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হতো অর্থাৎ যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বলেন, এখানে দু-দলের দুটি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি صِيْغَه مَعْرُوْف -এ اِسْتَكْبَرُوْا বলা হয়েছে এবং মু'মিনদের গুণটি صِيْغَه مَجْهُوْل -এ اُسْتُضْعِفُوْا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহংকার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ, যা দণ্ডনীয় ও তিরস্কৃত, পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকৃষ্ট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মু'মিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মু'মিনদের বলল, তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, হযরত সালেহ (আ.) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল?

উত্তরে মু'মিনরা বলল, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে, ছামূদ জাতির মু'মিনরা কি চমৎকার অলঙ্কারপূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কিনা। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্জ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আনীত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না। আল্লাহর ফযলে আমরা তাঁর আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও ছামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বলল, যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধনসম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখুন! এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্জ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

قَوْلُهُ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.)-এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বিস্ফারিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীবজন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই হযরত সালেহ (আ.) তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্যদিন জনপদের অধিবাসীরা।

সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে ছামূদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আজাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হতো না। যে সর্ববৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়,

তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সুতরাং সম্প্রদায়ের পরমাসুন্দরী কতিপয় নারী বাজি রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রীকে হত্যা করবে, সে আমাদের কন্যাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দুজন যুবক 'মিসদা' ও 'কুযার' এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রীর পথে একটি বড় আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রী সামনে আসতেই 'মিসদা' তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং 'কুযার' তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল। কুরআন পাক তাকেই ছামূদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে- إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا। কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আজাবে পতিত হয়। উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর হযরত সালেহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবনকাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে।

فَتَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ অর্থাৎ আরও তিন দিন আরাম করে নাও [এরপরই আজাব নেমে আসবে]। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোনো উপদেশ ও হুঁশিয়ারি কার্যকর হয় না। সুতরাং হযরত সালেহ (আ.)-এর একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলল, এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

হযরত সালেহ (আ.) বললেন, তাহলে আজাবের লক্ষণও শুনে নাও- আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি এ কথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং হযরত সালেহ (আ.)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আজাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভাবলীলাই সাঙ্গ করে দিই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। ছামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কুরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা হযরত সালেহ (আ.)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

فَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ অর্থাৎ তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তার তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে হযরত সালেহ (আ.)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালিমরা ঈমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে এর প্রতি আরো চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাঁর গজবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন-মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কালো হয়ে গেল, তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে, কোন দিক থেকে কিভাবে আজাব আসে। এমতাবস্থায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধোমুখী হয়ে ধরাশায়ী হলো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লিখিত রয়েছে। فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ। এখানে رَجْفَةٌ শব্দের অর্থ ভূমিকম্প। অন্যান্য আয়াতে أَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ।ও বলা হয়েছে। صَيْحَةٌ শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আজাবই এসেছিল, নিচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তারা فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ -এ পরিণত হয়েছিল। جَاثِمٌ শব্দটি جُثُومٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। [কামূস] অর্থাৎ যে যে অবস্থায় ছিল, সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ قَهْرِهِ وَعَذَابِهِ)

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কুরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমন রয়েছে, যা তাফসীরবিদরা ইসরাঈলী [অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের] বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সেসব বর্ণনার উপর কোনো ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে ছামূদ জাতির উপর আজাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আজাববিধ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে। -[তাফসীরে মাযহারী]

কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ছামূদ জাতির উপর আপতিত আজাব থেকে আবূ রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কায় হেরেমের সম্মানার্থ আল্লাহ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন ছামূদ জাতির আজাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবূ রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেন, তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়ায়েত আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী সকীফ গোত্র আবূ রেগালেরই বংশধর। –[তাফসীরে মাযহারী]

এসব আজাববিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআন পাক আরবদেরকে বারবার হুঁশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে– لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا

আজাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে– فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ .... وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব নাজিল হওয়ার পর হযরত সালেহ (আ.) ও ঈমানদাররা সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর সাথে চার হাজার মু'মিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে ইয়েমেনের 'হাজরামাওতে' চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে তাঁর মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, হযরত সালেহ (আ.) প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদের পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদের সম্বোধন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরাইশ সরদারদের এমনিভাবে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া হযরত সালেহ (আ.)-এর এ সম্বোধন আজাব অবতরণের পূর্বে হতে পারে যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ الخ : পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী।

হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত পড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিণী হযরত সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলমান হন। فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) দেশ ছেড়ে শাম দেশে হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেনানে গিয়ে অবস্থায় করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দসের অদূরেই অবস্থিত। হযরত লূত (আ.)-কেও আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদূম, আমুরা, উমা, সাবুবিম, বালে, অথবা সূগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাফেকা' ও মু'তাফেকাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হতো। হযরত লূত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। [এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মাযহারী, ইবনে কাসীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।]

কুরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে– كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনৈশ্বর্যের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে এমনভাবে আবদ্ধ

হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভালমন্দের স্বাভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গুনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে হুঁশিয়ার করে বলেন- أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি? জেনা তথা ব্যভিচার সম্পর্কে কুরআন পাক إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই فَاحِشَةً শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে আলিফ-লামসহ اَلْفَاحِشَةَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং জেনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে, এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমর ইবনে দীনার বলেন, এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি। -[মাযহারী] ছামূদবাসীদের পূর্বে কোনো ঘোরতর মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বলেন, কুরআনে হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লিখিত না হলে আমি কল্পনাও করতে পারতাম না যে, কোনো মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দুদিক দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। ১. অনেক গুনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায় যদিও তা কোনো শরিয়তসম্মত ওজর নয়; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোনো না-কোনো স্তরে ক্ষমাযোগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গুনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোনো কারণও নেই, তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। ২. যে ব্যক্তি কোনো মন্দকাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গুনাহ ও শাস্তি তো চাপেই, সাথে সাথে ঐসব লোকের শাস্তিও তার গর্দানে চেপে বসে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে- তোমরা নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি হালাল ও জায়েজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদের বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদরা এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতে অধিক গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যারা এ কাজ করে, তাদের ঐ রকম শাস্তিই দেওয়া উচিত, যেমন হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোনো উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন- اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ অর্থাৎ এ কাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর। -[ইবনে কাসীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ডিঙিয়ে স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ।

তৃতীয় আয়াতে হযরত লূত (আ.)-এর উপদেশের জবাবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে- তাদের দ্বারা যখন কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব দেওয়া সম্ভবপর হলো না, তখন রাগের বশবর্তী হয়ে পরস্পরে বলতে লাগল- এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবি করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে ছামূদ সম্প্রদায়ের বক্রতা ও বেহায়াপনার আসমানি শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহর আজাবে পতিত হলো শুধু হযরত লূত (আ.) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আজাব থেকে বেঁচে রইলেন। কুরআনের ভাষায় 'اَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهٗ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি হযরত লূত ও তাঁর পরিবারকে আজাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। 'আহল' সন্তানাদি তথা পরিবারকে বলা হয়। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, তাঁর পরিবারের মধ্যে দুটি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী মুসলমান হয়নি। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোনো মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, হযরত লূত

(আ.)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আজাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত

ছিল না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আহলের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বুঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদের আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-কে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোকদের নিয়ে শেষরাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পেছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আজাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আ.) এ নির্দেশ মতো স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদের নিয়ে শেষ রাত্রে সাদূম ত্যাগ করেন। তাঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে দু-রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দুর সঙ্গে চলার পর আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে পেছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আজাব এসে তাকেও স্পর্শ করল। কুরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী আজাবে লিপ্ত হয়ে গেছে। শেষ রাত্রে বস্তি ত্যাগ করা এবং পিছনে ফিরে না দেখার নির্দেশ কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আজাব সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আজাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۔ অর্থাৎ যখন আমার আজাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার পালনকর্তার নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশি দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নিচে থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা ভূখণ্ডকে উপর তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্য পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আজাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে– فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট চিৎকার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য আজাব এসেছে। বাহ্যত বোঝা যায় যে, চিৎকার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্ছিত করার জন্য উপর থেকে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়। কারণ কুরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয় তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আজাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়ার আজাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। সূরা হূদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কুরআন পাক আরবদের হুঁশিয়ার করে একথাও বলেছে যে, وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ উল্টে দেওয়া বস্তিগুলো জালেমদের কাছ থেকে বেশি দূরে অবস্থিত নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কুরআন অবতরণের সময় নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি 'লূত সাগর' অথবা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ

অনুবাদ :

٨٥. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مُعْجِزَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى صِدْقِىْ فَاَوْفُوا اَتِمُّوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوْا تَنْقُصُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ط بِبَعْثِ الرُّسُلِ ذٰلِكُمْ اَلْمَذْكُوْرُ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ مُرِيْدِى الْاِيْمَانَ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ.

৮৫. মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার সত্য হওয়ার বিশদ প্রমাণ মু'জিযা এসেছে। সুতরাং মাপ ও ওজন ঠিকভাবে পুরোপুরিভাবে দেবে। লোকদেরকে তাদের বস্তু হ্রাস করে দেবে না, কম দেবে না। রাসূল প্রেরণ করে সংশোধন করার পর কুফরি ও অবাধ্যাচার করত পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমরা বিশ্বাসী হলে অর্থাৎ ঈমান আনয়নের ইচ্ছা পোষণ করলে তোমাদের জন্য তা উল্লিখিত বিষয়টিই কল্যাণকর। সুতরাং এ দিকেই তোমরা অগ্রবর্তী হও।

٨٦. وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ طَرِيْقٍ تُوْعِدُوْنَ تُخَوِّفُوْنَ النَّاسَ بِاَخْذِ ثِيَابِهِمْ اَوِ الْمَكْسِ مِنْهُمْ وَتَصُدُّوْنَ تَصْرِفُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهٖ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ بِتَوَعُّدِكُمْ اِيَّاهُ بِالْقَتْلِ وَتَبْغُوْنَهَا تَطْلُبُوْنَ الطَّرِيْقَ عِوَجًا ج مُعْوَجَّةً وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ قَبْلَكُمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ اَىْ اٰخِرُ اَمْرِهِمْ مِّنَ الْهَلَاكِ.

৮৬. পথে বসে থাকবে না হুমকি দিতে صِرَاطٍ অর্থ পথ অর্থাৎ লোকদের উপর নিপীড়নমূলক টোল আদায় করতে ও তাদের কাপড়-চোপড় ছিনতাই করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে, আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর ধর্ম হতে বিশ্বাসীকে হত্যার হুমকি দিয়ে বিরত রাখতে ফিরিয়ে রাখতে। আর এতে অর্থাৎ আল্লাহর পথে দোষত্রুটি বক্রতা অনুসন্ধান করবে না। تَبْغُوْنَ -এর মূল অর্থ, অনুসন্ধান করা। স্মরণ কর, তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে অনন্তর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। রাসূলগণকে অস্বীকার করে তোমাদের পূর্বে যারা বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল দেখ। অর্থাৎ শেষে কি ধ্বংসকর পরিণাম এদের ঘটেছিল দেখ।

٨٧. وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ فَاصْبِرُوْا اِنْتَظِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ج وَبَيْنَكُمْ بِاِنْجَاءِ الْمُحِقِّ وَاِهْلَاكِ الْمُبْطِلِ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ اَعْدَلُهُمْ.

৮৭. আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোনো দল বিশ্বাস করে আর কোনো দল এতে বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্যধারণ কর অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ সত্যপন্থিকে মুক্তি দান করে ও বাতিলপন্থিদের ধ্বংস করে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান মীমাংসাকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَدْيَنَ : مَدْيَانْ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার গর্ভ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সন্তান, সে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা বনী ইসরাঈলের বংশ সূত্র হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র ইয়াকূব ইবনে ইসহাক থেকে হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এক নাম ছিল ইসরাঈল, এজন্যই তাঁর বংশধরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়- مَدْيَنَ একটি গ্রামের বসতির নাম এবং مَدْيَانْ -এর বংশধরকেও বনী মাদইয়ান বলা হয় হযরত শোয়ায়েব (আ.)ও এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হযরত শোয়ায়েব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর শ্বশুর ছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) মিশর থেকে হিজরত করে মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন এবং তথায় দশ বছর অতিবাহিত করেন, আর এ সময়ের ভিতর হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কন্যার সাথে হযরত মূসা (আ.) বিবাহ হয়।

قَوْلُهُ مُرِيْدِى الْإِيْمَانَ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. হযরত শুআয়ব (আ.)-এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ মু'মিন ছিল না তথাপিও إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ মাযীর সীগাহ দ্বারা কেন সম্বোধন করা হলো?

উত্তর. উত্তরের সার হলো, যেহেতু হরফে শর্ত ও মাযীর সীগাহকে মাযী থেকে বের করে না, এজন্যই مُرِيْدِىْ শব্দটি উহ্য মানতে হয়েছে, যাতে করে অর্থ সঠিক হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হলো যদি তোমাদের ঈমান আনয়নের ইচ্ছা থাকে তবে উল্লিখিত কর্ম হতে ফিরে এস।

قَوْلُهُ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ শর্তের جَزَاء উহ্য রয়েছে, পূর্বের বাক্য তার جَزَاء নয় (تَزْوِيْحُ الْأَزْوَاحِ)

قَوْلُهُ اَلْمَكْسِ : খেরাজ, ট্যাক্স, ওশর। ওশর আদায়কারীকে اَلْمَكَّاسُ الْعَشَّارُ বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا الخ : পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। হযরত লূত (আ.)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদাইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে জনপদে তারা বসবাস করতে, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব, 'মাদইয়ান' একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর 'মায়ানের' অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন পাকের অন্যত্র হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে- وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ এতে এ জনপদটিকেই বুঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে চমৎকার বাগ্মিতার কারণে 'খতীবুল আম্বিয়া' বলা হয়। -[ইবনে কাসীর, বাহরে মুহীত] হযরত শোয়ায়েব (আ.) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআন পাকে কোথাও তাদেরকে 'আহলে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে মাদইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোথাও 'আসহাবে আইকা' নামে। 'আইকা' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আ.) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আজাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। 'আসহাবে মাদইয়ানের' উপর কোথাও صَيْحَة এবং কোথাও رَجْفَة এবং 'আসহাবে আইকার' উপর কোথাও ظُلَّة -এর আজাব উল্লেখ করা হয়েছে। صَيْحَه শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رَجْفَه শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং ظُلَّة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকার উপর এভাবে নাজিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের এলাকায় ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে আল্লাহর অপরাধীরা কোনোরূপ গ্রেফতারী

পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নিচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, 'আসহাবে মাদইয়ান' ও 'আসহাবে আইকা' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লিখিত তিন প্রকার আজাবই তাদের উপর নাজিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চিৎকার শোনা যায় এবং সর্বশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাসীর এ অভিমতেরই প্রবক্তা।

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন থেকে হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু-নাম হোক, হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিন যে, ইসলামই সব পয়গম্বরের অভিন্ন দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু প্রকার : ১. সরাসরি আল্লাহর হক, যা করা না করার সাথে অন্য মানুষের কোনো উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়। যেমন– ইবাদত, নামাজ, রোজা ইত্যাদি। ২. বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহর হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়বিক্রয়ের মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের ধনসম্পদ লুটে নিত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু-আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্য হযরত শোয়ায়েব (আ.) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গম্বর দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও হক সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে– قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' -এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মু'জিযার বিভিন্ন প্রকার তাফসীর বাহরে মুহীত উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ এতে كَيْل শব্দের অর্থ মাপ এবং مِيْزَانْ শব্দের অর্থ ওজন করা। بَخْس শব্দের অর্থ কারও প্রাপ্য হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করে এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না

এতে প্রথম একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হতো। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ বলে সর্বপ্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা ধন-সম্পদ ইজ্জত-আবরু অথবা অন্য যে কোনো বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরি তাদের আনুগত্যে ত্রুটি করা অথবা যার সম্মান করা ওয়াজিব, তার সম্মানে ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের ইজ্জত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কুরআন পাকে مُطَفِّفِيْنَ ও تَطْفِيْف -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরিউক্ত সব বিষয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকু-সিজদা করতে দেখে বললেন, قَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি মাপ ও ওজনে ত্রুটি করেছ। –[মুয়াত্তা ইমাম মালেক] অর্থাৎ তুমি নামাজের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাজের হক পূর্ণ করাকে تَطْفِيْف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا অর্থাৎ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাফে পূর্বে ও উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হলো, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুত তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর অভ্যন্তরীণ সংস্কার হলো, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলি পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপক্ষো প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সবরকম অনর্থ বিরাজমান ছিল. তাই তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে– ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ এটি আল্লাহর আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাব জড়িত। ইহকালের, মঙ্গল এজন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথে বাধা দান করার জন্য পথে-ঘাটে ওঁৎ পেতে বসে থেকো না। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক অর্থাৎ তারা রাস্তাঘাটে বসে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কাছে আগমনকারীদের ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দুটি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাট করত এবং হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। 'বাহরে, মুহীত' প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরিয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করার জন্য রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, যারা পথে বসে শরিয়ত বিরোধী অবৈধ কর আদায় করে, তারাও হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে বক্রতার অন্বেষণে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অঙ্গুলি রাখার জায়গা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের ঝড় সৃষ্টি করে মানুষকে সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়। এরপর বলা হয়েছে– وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

এখানে তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধনসম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তা'আলা ঐশ্বর্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে: পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর– কওমে নূহ, 'আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আজাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ কর।

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যাক মুসলমান হয় এবং কিছুসংখ্যক কাফেরই থেকে যায়; কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে– فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তাড়াহুড় কিসের? আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যায়, তখন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আজাব নাজিল হয়ে যাবে।

اَلْجُزْءُ التَّاسِعُ : নবম পারা

অনুবাদ :

٨٨. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ عَنِ الْاِيْمَانِ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ تَرْجِعُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط دِيْنِنَا وَغَلَّبُوْا فِي الْخِطَابِ الْجَمْعَ عَلَى الْوَاحِدِ لِاَنَّ شُعَيْبًا لَمْ يَكُنْ فِيْ مِلَّتِهِمْ قَطُّ وَعَلٰى نَحْوِهٖ اَجَابَ قَالَ اَنَعُوْدُ فِيْهَا وَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ لَهَا اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ .

৮৮. তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ অর্থাৎ যারা ঈমান আনয়ন সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করেছিল বলল, তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ধর্মাদর্শে প্রত্যাগমন করতে হবে ফিরে আসতে হবে অন্যাথায় হে শুআইব! *তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান আনয়ন করেছে* সকলকে আমাদের গ্রাম থেকে বহিষ্কার করে ছাড়ব। لَتَعُوْدُنَّ [তোমরা ফিরে আসবে] এ ক্রিয়াটিতে সম্বোধনের বেলায় একবচন ব্যবহার না করে বহুবচনের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ হযরত শুআইব কোনো কালেই তাদের মিল্লাতভুক্ত ছিলেন না [যে আজ পুনরায় ফিরে আসার কথা হবে।] হযরত শুআইবও পরে اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ বলে এই হিসাবেই জওয়াব দিয়েছিলেন। সে বলল, কি আমরা তা ঘৃণা করলেও এতে ফিরে আসব? اَوَلَوْ كُنَّا এ স্থানে اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ অর্থাৎ অস্বীকারসূচক প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।

٨٩. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ يَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط ذٰلِكَ فَيَخْذُلُنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط اَيْ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَيْءٍ وَمِنْهُ حَالِيْ وَحَالُكُمْ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ اَحْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ الْحَاكِمِيْنَ .

৮৯. *তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার* পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আল্লাহর উপর আমাদের মিথ্যারোপ করা হবে; আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তার ইচ্ছা না করলে এবং এরূপে আমাদের লাঞ্ছনা না চাইলে আর তাতে ফিরে আসা আমাদের কাজ নয় আমাদের জন্য তা উচিত নয়; সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত অর্থাৎ সকল কিছুতেই তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। আমার ও তোমাদের অবস্থাও তাঁর জ্ঞানের ভিতরে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও। তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। اِفْتَحْ এ স্থানে এটার অর্থ ফয়সালা করে দাও। فَاتِحِيْنَ এ স্থানে অর্থ মীমাংসাকারী, ফয়সালাকারী।

٩٠. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اَيْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ .

৯০. তার সম্প্রদায়ের প্রধান অবিশ্বাসীগণ একজন অপরজনকে বলল, তোমরা যদি শুআইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। لَئِنْ -এর لَامْ টি قَسَمِيَّةٌ বা শপথ ব্যঞ্জক।

৯১. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ -

৯১. অনন্তর তারা রাজফা অর্থাৎ প্রবল ভূ-কম্পন দ্বারা আক্রান্ত হলো, ফলে তারা নিজগৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল, নতজানু হয়ে মরে পড়ে রইল।

৯২. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا يُقِيْمُوْا فِيْهَا ج فِىْ دِيَارِهِمْ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ اَلتَّاكِيْدُ بِاِعَادَةِ الْمَوْصُوْلِ وَغَيْرِهِ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ فِىْ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ -

৯২. শোয়ায়েবকে যারা অস্বীকার করেছিল তারা যেন সেখানে তাদের আবাস অঞ্চলে কোনো সময় বসবাসই করেনি শুআইবকে যারা অস্বীকার করেছিল তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। كَاَنْ এটা مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুভাবে উচ্চারিত। এর اِسْم এ স্থানে উহ্য। এটা মূলত ছিল كَاَنَّهُ [যেন এটা]। لَمْ يَغْنَوْا এ স্থানে অর্থ বসবাস করেনি। اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا এ স্থানে اِسْم مَوْصُوْل অর্থাৎ সংযোজক বিশেষ্য الذين ইত্যাদির উল্লেখসহ তার সম্প্রদায়ের উপরোল্লিখিত কথার প্রত্যুত্তর স্বরূপ এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে تَاكِيْد বা অর্থে জোর সৃষ্টি করা হলো উদ্দেশ্য।

৯৩. فَتَوَلّٰى اَعْرَضَ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ج فَلَمْ تُؤْمِنُوْا فَكَيْفَ اٰسٰى اَحْزَنُ عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْىِ -

৯৩. সে এদের নিকট হতে ফিরে গেল মুখ ফিরিয়ে নিল বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশও করেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করনি। অনন্তর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি কি করে আক্ষেপ করি দুঃখিত হই। فَكَيْفَ এ স্থানে اِسْتِفْهَام অর্থাৎ প্রশ্নবোধক শব্দটি نَفِىْ অর্থাৎ না-বাচক অর্থরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَغَلَّبُوْا فِى الْخِطَابِ الْجَمْعَ عَلَى الْوَاحِدِ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের উক্তি اَوْ لَتَعُوْدُنَّ দ্বারা জানা যায় যে, হযরত শোয়ায়েব (আ.) নবুয়তের দাবি করার পূর্বে স্বীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শের উপর স্থির ছিলেন। কেননা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়াকেই তো عَوْد বলা হয় অথচ নবীর থেকে কুফরি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।

উত্তর. জবাবের সার হলো– যে সকল লোকেরা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তারা যেহেতু ঈমান গ্রহণের পূর্বে স্বীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শ তথা মূর্তিপূজার উপর ছিল এ কারণেই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে تَغْلِيْبًا তাদের সাথে শরিক করে لَتَعُوْدُنَّ বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করেছেন। অন্যথায় হযরত শোয়ায়েব (আ.) থেকে কখনোই কুফরি প্রকাশ পায়নি।

قَوْلُهُ وَعَلٰى نَحْوِهِ اَجَابَ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. হযরত শোয়ায়েব (আ.) اِنْ عُدْنَا বলে নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তিনি নিজেও সম্প্রদায়ের মতাদর্শভুক্ত ছিলেন।

উত্তর. মুফাসসির (র.) وَعَلٰى نَحْوِهِ اَجَابَ বলে এর উত্তর দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যেভাবে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে تَغْلِيْبًا কওমের অন্তর্ভুক্ত করে لَتَعُوْدُنَّ বলেছিল, অনুরূপভাবে হযরত শোয়ায়েব (আ.) ও تَغْلِيْبًا বলেছেন اِنْ عُدْنَا -

قَوْلُهُ فَيَخْذُلُنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يَشَاءُ -এর মাফঊল উহ্য রয়েছে। আর তা خُذْلَانٌ হবে مُطْلَقُ شَيْءٍ হবে না।

قَوْلُهُ اَىْ وَسِعَ عِلْمُهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عِلْمًا টা ফায়েল হতে مَنْقُولٌ হয়ে تَمْيِيْز হয়েছে।

قَوْلُهُ التَّاكِيْدُ بِاِعَادَةِ الْمَوْصُوْلِ : এই ইবারতের মাধ্যমে সেই সন্দেহকে বিদূরিত করা হয়েছে যে, اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا বলার পরিবর্তে اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرُوْنَ বললে অধিক ভালো হতো। مَوْصُوْل কে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন ছিল না। যমীরই যথেষ্ট ছিল।

উত্তরের সার হলো তাদের صِفَتْ كُفْر -এর তাকিদের জন্য مَوْصُوْل -এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যমীরের মধ্যে এটা হয় না।

قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ لِلرَّدِّ عَلَيْهِمْ فِىْ قَوْلِهِمُ السَّابِقِ : অর্থাৎ مَوْصُوْل কে পুনরায় আনার কারণে তাদের صِفَتْ كُفْر -এর تَاكِيْد হয়েছে। এমনিভাবে পূর্ববর্তী বাক্যের মতো এ বাক্যকেও স্বতন্ত্র ও شُبْهَة নিয়ে পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয় বস্তুর تَاكِيْد বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا الخ : হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, আপনি যদি সত্যপন্থি হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হতো এবং অমান্যকারীদের উপর আজাব আসত। কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থি বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে হযরত শোয়ায়েব (আ.) বললেন, তাড়াহুড়া কিসের? অতিসত্বর আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহংকারী সরদাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল– হে শোয়ায়েব! হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মু'মিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদের বস্তি থেকে উচ্ছেদ করে দেব।

তাদের ধর্ম ফিরে আসা কথাটি মু'মিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে হযরত শু'আইব (আ.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু হযরত শু'আইব (আ.) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহর কোনো পয়গম্বর কখনও কোনো মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আ.) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চুপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার পর তারা জানতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। হযরত শু'আইব (আ.) উত্তরে বললেন– اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হলো।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত শু'আইব (আ.) জাতিকে বললেন, তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা। কেননা প্রথমত কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তা-ই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শু'আইব (আ.)-এর এ উক্তিতে একপ্রকার দাবি ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবি করা বাহ্যত আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের পরিপন্থি এবং নৈকট্যশীল ও অধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন, তাই পরে বলেছেন– مَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি [আল্লাহ না করুন] আমাদের পালনকর্তাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের পালনকর্তার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করেছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোনো কাজ করা অথবা না করার কে? কোনো সৎ কাজ করা অথবা মন্দকাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর মেহেরবানিতেই হয়ে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا অর্থাৎ আল্লাহর কৃপা না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না, সদকা-খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামাজ পড়তেও সক্ষম হতাম না।

জাতির অহংকারী সরদারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন হযরত শোয়ায়েব (আ.) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোনো কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথাবার্তা ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন- رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَتْح শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই فَاتِح শব্দটি قَاضِىْ অর্থাৎ বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়। -[বাহরে মুহীত]

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে হযরত শু'আইব (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদের ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তৃতীয় আয়াতে অহংকারী সরদারদের একটি ভ্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পরে অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল- যদি তোমরা শু'আইবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেকুব মূর্খ প্রতিপন্ন হবে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

চতুর্থ আয়াতে তাদের উপর আপতিত আজাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ অর্থাৎ তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে اَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাদেরকে ছায়া-দিবসের আজাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া-দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কালো মেঘের ছায়া পতিত হয়। এর নিচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন, হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমনকি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশি গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হলো। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নিচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হলো এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হলো। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আজাব দুই-ই আসে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশ ছায়ার আজাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের ঘটনা থেকে অন্যান্যকে শিক্ষার সবক দেওয়া হয়েছে, যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا - غَنِىْ শব্দের এক অর্থ কোনো স্থানে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব গৃহে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করত, আজাবের পর এমন অবস্থা হলো, যেন এখানে কোনোদিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ যারা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা হযরত শোয়ায়েব (আ.) ও তাঁর মু'মিন সঙ্গীদের বস্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়েই চেপেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ অর্থাৎ স্বজাতির উপর আজাব আসতে দেখে হযরত শোয়ায়েব (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তাফসীরবিদরা বলেন যে, তাঁরা মক্কা মুয়াযযমায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে হযরত শোয়ায়েব (আ.) বদদোয়া করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যখন আজাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরসুলভ দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হলো। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোনো ত্রুটি করিনি কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি?

অনুবাদ :

٩٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ فَكَذَّبُوْهُ اِلَّآ اَخَذْنَا عَاقَبْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ شِدَّةِ الْفَقْرِ وَالضَّرَّآءِ الْمَرَضِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ يَتَذَلَّلُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ .

৯৪. আমি কোনো জনপদে নবী প্রেরণ করলে আর তারা তাঁকে অস্বীকার করলে তার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ, চরম দারিদ্র্য ক্লেশ, পীড়া দ্বারা আক্রান্ত করি অর্থাৎ তাদেরকে তা দ্বারা শাস্তি দেই যাতে তারা আনত হয়, নতি স্বীকার করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে।

٩٥. ثُمَّ بَدَّلْنَا اَعْطَيْنَاهُمْ مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْعَذَابِ الْحَسَنَةَ الْغِنٰى وَالصِّحَّةَ حَتّٰى عَفَوْا كَثُرُوْا وَقَالُوْا كُفْرًا لِلنِّعْمَةِ قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ كَمَا مَسَّنَا وَهٰذِهٖ عَادَةُ الدَّهْرِ وَلَيْسَتْ بِعُقُوْبَةٍ مِنَ اللّٰهِ فَكُوْنُوْا عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ بَغْتَةً فُجَاَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ مَجِيْئِهٖ قَبْلَهٗ .

৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে অর্থাৎ আজাবের অবস্থাকে কল্যাণ সচ্ছলতা ও স্বাস্থ্যে পরিবর্তিত করি অর্থাৎ তার স্থলে এটা দান করি শেষ তারা অধিক্যের প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং এ সমস্ত নিয়ামত ও আল্লাহর অনুগ্রসমূহের নাশুকরি ও অকৃতজ্ঞতা করত বলে, আমাদের পূর্বপুরুষও তো দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করেছে যেমন আমরা করেছি। এটা কালের রীতি। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ নয়। সুতরাং তোমরা যেভাবে ছিলে সেভাবেই থাক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন অনন্তর, অকস্মাৎ আমি এমনভাবে তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করি যে তারা পূর্ব হতে এটার আগমনের সময় উপলব্ধিও করতে পারে না। بَغْتَةً অর্থ, অকস্মাৎ।

٩٦. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى الْمُكَذِّبِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِمْ وَاتَّقَوْا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ لَفَتَحْنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ بِالْمَطَرِ وَالْاَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا الرُّسُلَ فَاَخَذْنٰهُمْ عَاقَبْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

৯৬. যদি জনপদের অবিশ্বাসীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করত এবং কুফরি ও অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকত তবে তাদের জন্য বৃষ্টির মাধ্যমে আকাশমণ্ডলীর ও উদ্ভিদ জন্মিয়ে পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করতাম। কিন্তু তারা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল; সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি, শাস্তিদান করেছি। لَفَتَحْنَا এটা তাশদীদসহ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٩٧. اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى الْمُكَذِّبُوْنَ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا عَذَابُنَا بَيَاتًا لَيْلًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ غَافِلُوْنَ عَنْهُ .

৯৭. তবে কি অবিশ্বাসী জনপদবাসীগণ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর রাত্রিতে চড়াও হবে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন অর্থাৎ এ সম্পর্কে তারা অসচেতন بَاْسُنَا অর্থ, আমার শাস্তি। بَيَاتًا অর্থ রাত্রি

٩٨. اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى نَهَارًا وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ـ

৯৮. অথবা জনপদ অধিবাসীগণ ভয় রাখে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর নিপতিত হবে পূর্বাহ্নে দিনে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত।

٩٩. اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ج اِسْتِدْرَاجَهُ اِيَّاهُمْ بِالنِّعْمَةِ وَاَخْذَهُمْ بَغْتَةً فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

৯৯. তারা কি আল্লাহর কৌশলের অর্থাৎ নিয়ামত প্রদান করত প্রথমে সুযোগ দানের পরে অকস্মাৎ পাকাড়াও করার যে কৌশল সেই সম্পর্কে কি ভয় রাখে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহর কৌশল হতে আর কেউই নিশ্চিন্ত হয় না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ : এটা جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ হয়েছে, বিশেষ উম্মতদের ঘটনার বিবরণ দানের পর এখন থেকে আল্লাহর সাধারণ অভ্যাস ও ব্যাপক নীতিমালার বিবরণ প্রদান করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ يَضَّرَّعُوْنَ : এ সীগাহটি মূলত ছিল يَتَضَرَّعُوْنَ এরপর تَاءْ -কে ضَادْ দ্বারা পরিবর্তন করে ضَادْ -কে ضَادْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে ফলে يَضَّرَّعُوْنَ গঠিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِسْتِدْرَاجَهُ اِيَّاهُمْ : اِسْتِدْرَاجْ বলা হয় কোনো কাজকে ধীরে ধীরে করাকে। مَكْرٌ শব্দের অর্থ হলো– ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা। আল্লাহর দিকে এর সম্বন্ধ করা ঠিক নয়। এখানে مَكْرٌ দ্বারা اِسْتِدْرَاجْ بِالْاِسْتِعَارَةِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ধীরে ধীরে নিয়ামত ও সুস্থতার মাধ্যমে অবকাশ দিয়ে আটক করা গ্রেফতারকৃত তা অনুভবও করতে পারে না।

قَوْلُهُ عَفَوْا : এটা বাবে نَصَرَ -এর عَفْو মাসদার হতে جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, এর অর্থ স্বল্প হওয়াও আসে। এটা اَضْدَادْ -এর অন্তর্ভুক্ত। عَفَوْا ، كَثُرُوْا نَمَوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يُقَالُ عَفَا النَّبَاتُ وَعَفَا الشَّحْمُ وَالْوَبَرُ اِذَا كَثُرَتْ وَيُقَالُ عَفَا كَثُرَ وَعَفَا : دَرَسَ هُوَ مِنْ اَسْمَاءِ الْاَضْدَادِ (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ الْبَاْسُ : اَلْبَاْسُ এবং بُؤْسٌ অর্থ-দরিদ্রতা, ক্ষুধার্ত, ضَرٌّ এবং ضَرَّاءٌ অর্থ হলো শারীরিক কষ্টদায়ক রোগ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ الخ : পূর্ববর্তী নবীরা (আ.) তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও স্মরণীয় ঘটনাবলি, যার বর্ণনাধারা কয়েক রুকূ পূর্ব থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচজন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের। এ কাহিনীর আলোচনা পরবর্তী নয়টি আয়াতের পর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতে যাচ্ছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কুরআনে করীম বিশ্ব-ইতিহাস এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তাঁর বর্ণনারীতি হলো এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মতো আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ' জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এ বিপদাপদের চাপে তারা নিজেদের গতিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহর কথা স্মরণ হয় বেশি। আর এ বাহ্যিক দুঃখকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাহমানুর-রাহীমেরই দান।

উল্লিখিত আয়াতে أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ বাক্যটির মর্মও তাই। بَأْسَاءُ ও بُؤْسٌ শব্দ দুটির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضَرَّاءُ ও ضُرٌّ শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো অভিধানবিদ অবশ্য بُؤْسٌ ও بَأْسَاءُ শব্দ দুটির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضُرٌّ ও ضَرَّاءُ অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত উভয়বিদ অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রাসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অবাধ্য লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেওয়া যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে এবং পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে একগুঁয়েমি- ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا এখানে سَيِّئَةٌ শব্দে পূর্বোল্লিখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দুরবস্থাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর حَسَنَةٌ শব্দে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দারিদ্র্য-ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক; ধনসম্পদের বিস্তৃতি ও সচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। পরবর্তী عَفَوْا শব্দটি عَفْو থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করা। বলা হয় عَفَا النَّبَاتُ ঘাস বা বৃক্ষের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। عَفَا الشَّحْمُ وَالْوَبَرُ অর্থাৎ পশুর মেদ ও লোম বেড়ে গেছে। এ অর্থেই এখানে عَفَوْا শব্দের অর্থ হবে বেড়ে গেছে বা উন্নতি করেছে।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছে তাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে আকৃতকার্য হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেওয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধনসম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখকষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি, বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ অর্থাৎ এটা কোনো নতুন বিষয় নয়, সৎ কিংবা অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়, বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ; কখনও রোগ, কখনও স্বাস্থ্য কখনও দারিদ্র্য, কখনও সচ্ছলতা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্বপুরুষেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সারকথা, প্রথম পরীক্ষাটি নেওয়া হয়েছে বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টের মাধ্যমে। তাতে তারাও আকৃতকার্য হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেওয়া হলো, আরাম-আয়েশে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধনসম্পদের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে। কিন্তু তাতেও তারা তেমনি আকৃতকার্য রয়ে গেল। কোনোমতেই নিজেদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে এলো না। আর তখনই ধরা পড়ল আকস্মিক আজাবের মধ্যে। أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بَغْتَةً [বাগতাতান] হঠাৎ, সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ- যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই আকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদের আকস্মিক আজাবের মাধ্যম ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনো খবরই ছিল না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرٰى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ সে জনপদের অধিবাসীরা! যদি ঈমান আনত এবং নাফরমানি থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আসমান ও জমিনের সমস্ত বরকত খুলে দেওয়া বলতে উদ্দেশ্য হলো সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেওয়া অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতো আর জমিন থেকে যে কোনো বস্তু তাদের মনোমত উৎপাদিত হতো এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। তাতে তাদেরকে এমন কোনো চিন্তাভাবনা কিংবা টানাপড়েনের সম্মুখীন হতে হতো না, যার দরুন বড় বড় নিয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু-রকমে। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া কিংবা সামান্য খাদ্যদ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া, যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, আবার কোনো কোনো সময় মূল বস্তুতে বাহ্যত কোনো বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ যা ছিল তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এত বেশি কাজ হয় যা এমন

দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণত সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোনো একটা পাত্র কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোনো আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে. মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরি করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোনো সুযোগ আসে না অথবা উপকার আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই বরকত মানুষের ধনসম্পদেও হতে পারে, মন-মস্তিষ্কেও হতে পারে, আবার কাজকর্মেও হতে পারে। কোনো কোনো সময় মাত্র এক গ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোনো কোনো সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ওষুধও কোনো কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোনো সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘণ্টায়ও করা যায় না। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহু গুণ বেশি।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তুরাজির বরকত ঈমান ও পরহেজগারির উপরই নির্ভরশীল। ঈমান ও পরহেজগারির পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহেজগারি পরিহার করলে সেগুলো কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতে হয়, বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা সেদিকে লক্ষ্য করলে বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে সামনে এসে যায়। এখন বাহ্যিক দিক দিয়ে জমির উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। তাছাড়া ব্যবহার্য দ্রব্যাদির আধিক্য এবং নতুন নতুন আবিষ্কার এত বেশি যা পূর্ববর্তী বংশধরেরা ধারণা বা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সমুদয় বস্তু উপকরণের প্রাচুর্য ও আধিক্য সত্ত্বেও আজকের মানুষকে নিতান্তই হতবুদ্ধি, রুগ্ণ ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখা যায়। সুখ ও শান্তি কিংবা মানসিক প্রশান্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। এর কারণ এ ছাড়া আর কি বলা বলা যায় যে, উপকরণ সবই বর্তমান এবং প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান, কিন্তু এ সবের মধ্যে যে বরকত ছিল তা শেষ হয়ে গেছে?

এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, সূরা আন'আমের এক আয়াতে কাফের ও দুরাচারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ যখন তারা আল্লাহর নির্দেশসমূহে বিস্মৃত হয়ে গেছে, তখন আমি তাদের উপর যাবতীয় বিষয়ের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছি এবং অতঃপর আকস্মিকভাবে তাদেরকে আজাবে নিপতিত করেছি। এতে বোঝা যায়, পৃথিবীতে কারো জন্য সব বিষয়ের দরজা খুলে যাওয়াটা প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র অনুগ্রহই নয়; বরং তা আল্লাহর এক প্রকার গজবও হতে পারে। আর এখানে বলা হয়েছে যে, যদি তারা ঈমান ও পরহেজগারি অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও জমিনের বরকত লাভ করতে পারা আল্লাহর দান ও সন্তুষ্টির পরিচায়ক।

কথা হলো এই যে, পৃথিবীর বরকত ও নিয়ামাতসমূহ কখনও পাপাচার ও ঔদ্ধত্যের সীমা অতিক্রম করার পর মানুষের পাপকে অধিকতর স্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে এবং তা একান্তই সাময়িক হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তা গজব ও অভিশাপেরই লক্ষণ! আবার কখনও এ নিয়ামত ও বরকত আল্লাহর দান এবং রহমত হিসাবে স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। তখন তা হয় ঈমান ও পরহেজগারির ফল। বাহ্যিক আকারের দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পরিণতি ও ভবিতব্য সম্পর্কে কারোই কিছু জানা নেই। তবে যাঁরা আল্লাহর ওলী, তাঁরা লক্ষণ-নির্দেশনের আলোকে এরূপ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন যে, যখন ধনসম্পদ এবং আরাম-আয়েশের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর শুকরিয়া ও ইবাদতের অধিকতর তৌফিক লাভ হয়, তখনই বোঝা যায় যে, এটা রহমত। আর যদি ধনসম্পদ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অমনোযোগ এবং পাপাচার বৃদ্ধি পায়, তাহলে তা আল্লাহর গজবের লক্ষণ। আমরা তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

চতুর্থ আয়াতে পুনরায় পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, সেই জনপদের অধিবাসীরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমার আজাব এমনি অবস্থায় এসে আঘাত করবে, যখন হয়তো তারা রাতের নিদ্রায় মগ্ন থাকবে? তাছাড়া এ জনপদবাসীরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, আজাব তাদেরকে এমন অবস্থায় এসে আঘাত করে বসবে, যখন তারা মধ্য-দিবসে খেলাধুলায় মত্ত থাকবে। এরা কি আল্লাহর অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে? তাহলে যথার্থই জেনে রাখ, আল্লাহর সে অদৃশ্য ব্যবস্থা ও নিয়মিতির ব্যাপারে সে জাতিই কেবল নিশ্চিন্ত হতে পারে, যারা অনিবার্যভাবেই সর্বনাশের সম্মুখীন।

সারমর্ম হলো এই যে, এসব লোক যারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত নয় যে, তাদের প্রতি আল্লাহর আজাব রাতে কিংবা দিনের বেলায় যে কোনো অবস্থায় এসে যেতে পারে। যেমন বিগত জাতিসমূহের প্রতি অবতীর্ণ আজাবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে অন্যের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং যেসব কাজ অন্যের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছে সেসব কাজের ধারে-কাছেও না যাওয়া।

অনুবাদ :

١٠٠. اَوَلَمْ يَهْدِ يَتَبَيَّنْ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ بِالسُّكْنٰى مِنْۢ بَعْدِ هَلَاكِ اَهْلِهَا اَنْ فَاعِلٌ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهٗ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ بِذُنُوْبِهِمْ ج كَمَا اَصَبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ وَالْهَمْزَةُ فِى الْمَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ لِلتَّوْبِيْخِ وَالْفَاءُ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْوَاوِ فِى الْمَوْضِعِ الْاَوَّلِ عَطْفًا بِاَوْ وَ نَحْنُ نَطْبَعُ نَخْتِمُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ الْمَوْعِظَةَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ .

১০০. কোনো অঞ্চলের জনগণের ধ্বংসের পর যারা তার বসবাসের উত্তরাধিকারী হয় তাদের নিকট এটা কি প্রতীয়মান হয়নি সুস্পষ্ট হয়নি। যে আমি ইচ্ছা করলে এদের পূর্ববর্তীদেরকে যেমন শাস্তিভোগ করিয়েছি এদের পাপের দরুন এদেরকে বিপদাপন্ন করতে পারি। শাস্তি দিতে পারি। اَنْ এটা مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ লঘুকৃত ও তাশদীদহীনরূপে পঠিত। এটার اِسْم এ স্থানে উহ্য। মূলত ছিল اَنَّهٗ এটা এ স্থানে [لَمْ يَهْدِ ক্রিয়ার] فَاعِل অর্থাৎ কর্তারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরিউক্ত চারটি স্থানে অর্থাৎ ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০ নং আয়াতের শুরুতে হামযাটিকে [যথাক্রমে اَفَاَمِنَ ، اَوَ اَمِنَ ، اَفَاَمِنُوْا ، اَوَلَمْ يَهْدِ] تَوْبِيْخ অর্থাৎ হুমকি ও তিরস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর পরবর্তী ف এবং و অক্ষর দুটি عَطْف বা অন্বয়সূচক অক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে প্রথমোক্ত اَوْ সাকিনরূপে عَطْف বা অন্বয়সূচক অক্ষর او হিসাবে পঠিত রয়েছে। আর আমরা তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেব সিল মেরে দেব ফলে তারা চিন্তা করার মতো উপদেশ শুনবে না।

١٠١. تِلْكَ الْقُرٰى الَّتِىْ مَرَّ ذِكْرُهَا نَقُصُّ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ اَنْۢبَائِهَا ج اَخْبَارِ اَهْلِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا عِنْدَ مَجِيْئِهِمْ بِمَا كَذَّبُوْا كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ط قَبْلَ مَجِيْئِهِمْ بَلِ اسْتَمَرُّوْا عَلَى الْكُفْرِ كَذٰلِكَ الطَّبْعُ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ .

১০১. এ জনপদসমূহের অর্থাৎ পূর্বে যেগুলোর উল্লেখ করা হলো সেগুলোর অধিবাসীদের কিছু বৃত্তান্ত হে মুহাম্মদ! আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি। তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসহ সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ এসেছিল কিন্তু এদের আগমনের পূর্বে যা তারা অস্বীকার করেছিল এদের আগমনের পরও তাতে তারা বিশ্বাস করার ছিল না বরং তারা কুফরির উপরই স্থায়ী হয়ে রইল। এরূপ মোহর করার মতো আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয় মোহর করে দেন।

١٠٢. وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ اَىِ النَّاسِ مِنْ عَهْدٍ ج اَىْ وَفَاءٍ بِعَهْدِ يَوْمَ اَخْذِ الْمِيْثَاقِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ وَجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ .

১০২. আমি তাদের অর্থাৎ লোকদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থাৎ তাদের নিকট হতে যে ওয়াদা নেওয়া হয়েছিল তা পালন করতে পাইনি। তাদের অধিকাংশকে অবশ্য সত্যত্যাগীই পেয়েছি। وَاِنْ এ اِنْ টি এ স্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ লঘুকৃত ও তাশদীদহীনভাবে রূপান্তরিত।

١٠٣. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ أَيِ الرُّسُلِ الْمَذْكُوْرِيْنَ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا التِّسْعِ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ قَوْمِهٖ فَظَلَمُوْا كَفَرُوْا بِهَا ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ بِالْكُفْرِ مِنْ إِهْلَاكِهِمْ.

১০৩. তাদের অর্থাৎ উল্লিখিত রাসূলগণের পর মূসাকে আমার নয়টি নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার দল সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করি কিন্তু তারা এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে তা অস্বীকার করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যান করত বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল। কিভাবে এদের ধ্বংস হয়েছিল।

١٠٤. وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ إِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ إِلَيْكَ فَكَذَّبَهٗ.

১০৪. হযরত মূসা (আ.) বলল, হে ফেরাউন! আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছি।

١٠٥. فَقَالَ أَنَا حَقِيْقٌ جَدِيْرٌ عَلٰى أَنْ أَيْ بِأَنْ لَا أَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ط وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الْيَاءِ فَحَقِيْقٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ أَنْ وَمَا بَعْدَهٗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ إِلَى الشَّامِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَكَانَ اسْتَعْبَدَهُمْ.

১০৫. কিন্তু সে তা অস্বীকার করল তখন তিনি বললেন, আমি এতে দৃঢ় যে, علی ان -এর علی শব্দটি এ স্থানে ب অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য মাননীয় তাফসীরকার এটার তাফসীরে بان উল্লেখ করেছেন। এর যোগ্য যে, আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলব না। علی অপর এক কেরাতে এটার ی অক্ষরটি তাশদীদসহ [علیّ রূপে] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় حقیق শব্দটি مبتدأ এবং ان ও এর পরবর্তী শব্দসমূহ خبر রূপে গণ্য হবে। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমদের নিকট এসেছি। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে সিরিয়া যেতে দাও। সে [ফেরাউন] তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল।

١٠٦. قَالَ فِرْعَوْنُ لَهٗ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ عَلٰى دَعْوَاكَ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْهَا.

১০৬. সে ফেরাউন তাঁকে বলল যদি তুমি তোমার দাবির উপর কোনো নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি এতে সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।

١٠٧. فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ.

১০৭. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন এটা এক সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল, বিরাট এক সাপে পরিণত হলো।

١٠٨. وَنَزَعَ يَدَهٗ أَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهٖ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ذَاتُ شُعَاعٍ لِلنّٰظِرِيْنَ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأُدْمَةِ.

১০৮. এবং তিনি তাঁর হাত জামার ফোকর হতে টানলেন বের করলো তৎক্ষণাৎ তা নিজের স্বাভাবিক গৌরবর্ণের বিপরীত দর্শকদের দৃষ্টিতে সুউজ্জ্বল শুভ্র প্রতিভাত হলো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَتَبَيَّنَ : প্রশ্ন. يَهْدِ-এর সেলাহ لَامْ আসে না। এখানে لِلَّذِيْنَ -এর মধ্যে يَهْدِ-এর সেলাহ لَامْ ব্যবহার হলো কেন?

উত্তর. মুফাসসির (র.) يَهْدِ -এর তাফসীর يَتَبَيَّنَ দ্বারা করে এ সংশয়েরই নিরসন করেছেন। অর্থাৎ يَهْدِ টা يَتَبَيَّنْ -এর অর্থে হয়েছে। আর يَتَبَيَّنَ -এর সেলাহ لَامْ আসে।

قَوْلُهُ بِالسُّكْنٰى : প্রশ্ন. কোন উদ্দেশ্যে اَلسُّكْنٰى শব্দটিকে বৃদ্ধি করা হয়েছে?

উত্তর. مِلْك বা মালিকানা বাস্তবায়ন শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের দ্বারাই হয় না। এর জন্য سُكُوْنَتْ -এর করায়ত্ত জরুরি। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই মুফাসসির (র.) اَلسُّكْنٰى শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ اِنْ فَاعِلٌ : اِن টা তার পরবর্তীর সাথে মিলে يَهْدِ -এর فَاعِلْ হয়েছে। نَهْدِ তথা يَاءْ -এর পরিবর্তে نُوْن দ্বারাও نَهْدِ পঠিত রয়েছে। আর نُوْن যোগে পঠিত কেরাতে আল্লাহ فَاعِلْ হবে। আর اِنْ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ বাক্যটিকে ফে'লের মাফউল হবে। অর্থাৎ اِنَّ الشَّاْنَ هُوَ هٰذَا

আর يَهْدِ তথা يَاءْ যোগে পঠিত কেরাতে فَاعِلْ হবে اِنْ لَوْ نَشَاءُ بِذُنُوْبِهِمْ বাক্যটি (تَسْهِيْل) আর اِنْ টা হলো مُخَفَّفَةْ عَنِ الثَّقِيْلَةِ -এর اِسْم হলো ، যা ضَمِيْر شَان উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ انه আর لَوْ نَشَاءُ বাক্যটি তার খবর, আর তার পরবর্তী অংশ يَهْدِ -এর ফায়েল। আবার يَهْدِ -এর ফায়েল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীরও হতে পারে এবং ঐ যমীরের মারজি' তা হবে যা بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ سِيَاقْ كَلَامْ দ্বারা বুঝা যায়। অর্থাৎ اَوَ لَمْ يَهْدِ مَا جَرٰى لِلْاُمَمِ السَّابِقَةِ এ সুরতে اِنْ এবং তার পরবর্তী অংশ مَحَلًّا হয়ে মাফউল হবে। প্রথম সুরতে উহ্য ইবারত হলো– اَوَ لَمْ يَهْدِ اللّٰهُ وَيُبَيِّنُ لِلْوَارِثِيْنَ مَالَهُمْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِهِمْ اَصَابَتْنَا اِيَّاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَيَكُوْنُ الْمَفْعُوْلُ بِهِ مَحْذُوْفًا كَمَا قَدَّرْنَا

আর দ্বিতীয় সুরতে উহ্য ইবারত এরূপ হবে– اَوَلَمْ يُبَيِّنْ فِىْ وَضْعِ اللّٰهِ مَا جَرٰى لِلْاُمَمِ اَصَابَتْنَا اِيَّاهُمْ لَوْ نَشَاءُ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ فِىْ مَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ : যার মধ্যে প্রথম তিনটি পূর্বের রুকূতে রয়েছে আর চতুর্থটি এ রুকূর শুরুতে রয়েছে। এ স্থানগুলোতে হামযা فَاءْ ও وَاوْ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হলো اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى আর শেষটি হলো اَوَ لَمْ يَهْدِ দুটি হলো فَاءْ -এর সাথে এবং দুটি وَاوْ -এর সাথে।

قَوْلُهُ الْوَاوُ دَاخِلَةٌ عَلَيْهَا لِعَطْفٍ : প্রশ্ন. হরফে আতফের উপর প্রশ্নবোধক হামযা প্রবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ।

উত্তর. নিষিদ্ধ তো রয়েছে عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ -এর ক্ষেত্রে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ -এর ক্ষেত্রে নয়। কেননা جُمْلَةْ بَعْدَ الْجُمْلَةِ এটা كَلَامْ مُسْتَانِفْ হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ الخ : উল্লিখিত আয়াতসমূহেও বিগত জাতিসমূহের ঘটনাবলি এবং অবস্থার কথা শুনিয়ে বর্তমান আরব-আজমের সমস্ত জাতিকে এ বিষয় জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব ঘটনায় তোমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় সতর্কবাণী রয়ে গেছে। যেসব কর্মের ফলে বিগত দিনের লোকদের উপর আল্লাহ গজব ও আজাব নাজিল হয়েছে, সেগুলোর কাছেও যাবে না। আর যেসব কর্মের দরুন নবী-রাসূল (আ.) ও তাঁদের অনুসারীরা সাফল্য লাভ করেছেন সেগুলো অবলম্বন করবে। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ

هَدٰى يَهْدِىْ অর্থ– চিহ্নিতকরণ এবং বাতলে দেওয়া। এখানে এর কর্তা হলো সে সমস্ত ঘটনাবলি যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূসম্পত্তি ও ঘরবাড়ির উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় যেসব অতীত ঘটনাবলি একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরি ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা [অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ] ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ তা'আলার আজাব ও গজব আসতে পারে।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ শব্দের অর্থ– ছাপা এবং মোহর লাগানো। তার মানে, এরা অতীত ঘটনাবলি থেকেও কোনো রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না। ফলে আল্লাহর গজবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায় তারা তখন কিছু শুনতে পায় না। হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছে যে, কোনো লোক যখন প্রথম প্রথম পাপ করে, তখন তার অন্তরে কালির একটা বিন্দু লেগে যায়। দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে, আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি

লেগে যায়। এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে তওবা না করে, তাহলে এ কালির বিন্দু তার সমগ্র অন্তকে ঘিরে ফেলে ও মানুষের অন্তরে ভালো-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত, না হয় পরাভূত হয়ে যায়। আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সে ভালোকে মন্দ: মন্দকে ভালো এবং ইষ্টকে অনিষ্ট, অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থাটিকেই কুরআনে رَانَ অর্থাৎ অন্তরের মরচে বলে অবহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকে আলোচ্য আয়াতে এবং আরও বহু আয়াতে طَبْع অর্থাৎ মোহর এঁটে দেওয়া বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় যে, মোহর লেগে যাওয়ার পরিণতি তো জ্ঞান-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, কানের দ্বারা শ্রবণের উপর তো তার কোনো প্রতিক্রিয়া স্বাভাবত হওয়ার কথা নয়। কাজেই উক্ত আয়াতের এ স্থানটিতে فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ অর্থাৎ 'তারা বোঝে না' বলাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কুরআনে কারীমে এ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তারা শোনে না। এর কারণ হলো এই যে, এখানে শোনা অর্থ মান্য করা এবং অনুসরণ করা, যা বোঝা বা উপলব্ধি করারই ফল। কাজেই প্রকৃত মর্ম দাঁড়ায় এই যে, অন্তরে মোহর এঁটে যাবার দরুন তারা কোনো সত্য ও ন্যায় বিষয়কে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের অন্তর হলো তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অনুভূতিসমূহের কেন্দ্র। অন্তরের ক্রিয়ায় যখন কোনো রকম গোলযোগ দেখা দেয়, তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় কার্যকলাপও গোলযোগপূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরে যখন কোনো বিষয়ের ভালো কিংবা মন্দ বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন চোখেও তাই দেখা যায় এবং কানেও তাই শোনা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤئِهَا এখানে اَنْبَاۤءُ শব্দটি نَبَأٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ- কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। অর্থাৎ বিধ্বস্ত জনপদসমূহের কোনো কোনো ঘটনা আপনাকে বলছি। এখানে مِنْ বিশেষণের মাধ্যমে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের যে ঘটনাবলি আলোচনা করা হলো, এগুলোই শেষ নয় বরং এমন হাজারো ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাত্র।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ এসব লোকদের প্রতি প্রেরিত নবী ও রাসূলরা তাদের কাছে মু'জিযা [অলৌকিক নিদর্শন]-সমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়, কিন্তু তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার এমনি অবস্থা ছিল যে, যে বিষয় সম্পর্কে একবার তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত যে, এটা ভুল এবং মিথ্যা, তখন আর সে বিষয়ের যথার্থতা ও সত্যতার পক্ষে যতই মু'জিযা এবং দলিল-প্রমাণ উপস্থিত হোক না কেন, কিছুতেই তারা আর তাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ হতো না।

এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় এই জানা গেল যে, সমস্ত নবী-রাসূলকেই মু'জিযা দান করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনো নবী (আ.)-এর মু'জিযার আলোচনা কুরআনে এসেছে, অনেকের আসেওনি। এতে এমন কোনো ধারণা করা যথার্থ হতে পারে না যে, যাদের মু'জিযার বিষয় কুরআনে আলোচিত হয়নি, আদৌ তাদের কোনো মু'জিযাই ছিল না। আর সূরা হুদ-এ হযরত হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে- مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ অর্থাৎ আপনি কোনো মু'জিযা উপস্থিত করেননি। এই আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের উক্তিটি ছিল শুধুমাত্র হঠকরিতা ও একগুঁয়েমি, কিংবা তাঁর মু'জিযাগুলোকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করে এ কথা বলেছিল।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে তাদের যে কোনো ভুল কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে তারা তাই পালন করত; তার বিপরীতে যতই প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ আসুক না কেন তারা নিজের ধ্যানধারণায় অটল থাকত। আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ও কাফের জাতিসমূহের এমনি অবস্থা। বহু মুসলমান এমনকি আলিম-ওলামা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাধিতে ভুগছেন। প্রথম ধাক্কায় একবার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা ভুল বলে উচ্চারণ করে ফেললে পরে বিষয়টির সত্যতার হাজারো প্রমাণ উপস্থিত হলেও তাঁরা নিজের সে ধারণারই অনুসরণ করতে থাকেন। সুফিতত্ত্ব মতে এ অবস্থাটি আল্লাহর গজবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর বলা হয়েছে- كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ কাফের ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট না থাকে। তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই আমি প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী রূপে পাইনি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা বলতে عَهْدَ اَلَسْتُ [আহদে-আলাস্তু] বুঝানো হয়েছে যা সৃষ্টির আদিলগ্নে সমস্ত সৃষ্টির জন্মের পূর্বে যখন তাদের আত্মাগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন আল্লাহ সেগুলোর কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ। অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পরওয়ারদিগার নই? তখন সমস্ত রূহ বা মানবাত্মা প্রতিজ্ঞা ও স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তর দিয়েছিল بَلٰى অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পরওয়ারদিগার। কিন্তু পৃথিবীতে আসার পর অধিকাংশ লোকেই সে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেছে। আল্লাহকে পরিত্যাগ করে সৃষ্টবস্তুর পূজার অভিশাপে জড়িয়ে পড়েছে। সে জন্যই এ আয়াতে আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল পাইনি। অর্থাৎ ওয়াদা পূরণে তাদেরকে যথাযথ পাইনি।
−[তাফসীরে কাবীর]

আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, 'ওয়াদা' বলতে ঈমানের ওয়াদা বুঝানো উদ্দেশ্য। কুরআনে বলা হয়েছে− اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا। এক্ষেত্রে 'আহদ' বা প্রতিজ্ঞা অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা। কাজেই আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, তাদের অধিকাংশই আমার সাথে ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া অর্থ হলো এই যে, সাধারণত মানুষ যখন কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, যত মন্দ লোকই হোক না কেন, তখন সে একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনে বা মুখে এমন প্রতিজ্ঞা করে নেয় যে, বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে আল্লাহর আনুগত্য এবং উপাসনায় আত্মনিয়োগ করব, নাফরমানি বা অন্যায় থেকে বেঁচে থাকব। যেমন, কুরআন মাজীদেও এমনি বহু লোকের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা বিপদমুক্ত হয়ে যখন শান্তি ও স্থিতিশীলতায় ফিরে আসে, তখন আবার রিপুজনিত কামনা-বাসনায় জড়িয়ে পড়ে এবং কৃত ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়।

উল্লিখিত আয়াতের اَكْثَرُ। শব্দটি দ্বারা সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা বহু লোক এমন হতভাগাও রয়েছে যে, বিপদের সময়েও এরা আল্লাহকে স্মরণ করে না, তখনও এরা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করে না। কাজেই তাদের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগের কোনো মানেই হয় না। আর এমনও অনেক লোক রয়েছে, যারা প্রতিজ্ঞাও পূরণ করে এবং ঈমান ও আনুগত্যের দাবিও সম্পাদন করে। কাজেই বলা হয়েছে− وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশকে প্রতিজ্ঞা পূরণকারী পাইনি। তারপর বলা হয়েছে− وَاِنْ وَّجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি। এ পর্যন্ত অতীতের নবী-রাসূল (আ.) এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উম্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশ সংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। সে জন্যই কুরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

قَوْلَهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى الخ : এ সূরায় নবী-রাসূল এবং তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে যত কাহিনী ও ঘটনাবলি আলোচনা করা হয়েছে, এ হলো সেগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ বিগত অন্য নবী-রাসূলদের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশি, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনিভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলেন মূর্খতা এবং হঠকারিতাও বিগত উম্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশি কঠিন। তদুপরি এ কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহকামের কথা এসেছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ হযরত নূহ, হূদ, সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আ.)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি হযরত মূসা (আ.)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা 'আয়াত' বলতে আসমানি কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফেরাউন' হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার নাম 'কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয়। −[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَظَلَمُوْا بِهَا : এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হলো নিদর্শন। অর্থাৎ তারা আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হলো এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনের কোনো মর্যাদা বুঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞান করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অবলম্বন করেছে। কারণ জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীতে ব্যবহার করা। অতঃপর বলা হয়েছে– فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ চেয়ে দেখ না, সেই দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এর মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) ফেরাউনকে বললেন, আমি বিশ্ব-পালক আল্লাহ তা'আলার রাসূল। আর আমার অবস্থা এই যে, আমার যে নবুয়তি মর্যাদা তার দাবি হলো, যাতে আমি আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোনো বিষয় আরোপ না করি। কারণ নবীগণের আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তা তাঁদের কাছে আল্লাহর আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত নিষ্পাপ। সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবির সপক্ষে আমার মু'জিযাসমূহও প্রমাণ হিসাব রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শোন, আমার কথা মান। বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোনো কথাই লক্ষ্য করল না; মু'জিযা দেখাবার দাবি করতে লাগল এবং বলল– اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ বাস্তবিক যদি তুমি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক। হযরত মূসা (আ.) তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ 'ছু'বান' বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُبِيْنٌ [মুবীন] শব্দ উল্লেখ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে লাঠিটি সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোনো ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না– সাধারণত যা জাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হলো প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফিরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হলো; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। –[তাফসীরে কবীর]

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোনো ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জিযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না তা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেওয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোনো ঐশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মতো কোনো বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে– وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ – نَزْعٌ [নায্‌উন] অর্থ হচ্ছে কোনো একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভিতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভিতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দুটি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে– اُدْخُلْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ যার অর্থ হলো, স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে থেকে অর্থাৎ কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে দাবিয়ে সেখানে থেকে বের করে আনলে এ মু'জিযা প্রকাশ পেত– فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ সেই হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকত।

بَيْضَاءُ [বাইদাউন]-এর শাব্দিক অর্থ– সাদা। আর হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোনো সময় শ্বেতি রোগের কারণও হতে পারে। তাই অন্য এক আয়াতে এক্ষেত্রে مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ শব্দটিও সংযোজিত করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ হাতের সাদা হয়ে যাওয়াটা কোনো উপসর্গের কারণে ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের দ্বারা জানা যায় যে, এ শুভ্রতাও সাধারণ শুভ্রতা ছিল না; বরং তার সঙ্গে এমন দীপ্তিও থাকত, যার ফলে সমগ্র পরিবেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠত! –[কুরতুবী]

এখানে لِلنَّظِرِيْنَ [দর্শকদের জন্য] কথাটা বাড়িয়ে উল্লিখিত প্রদীপ্তির বিস্ময়করতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে দীপ্তি এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ছিল যে, তা দেখার জন্য দর্শকরা এসে সমবেত হতো।

তখন ফেরাউনের দাবিতে হযরত মূসা (আ.) দুটি মু'জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া, আর অপরটি হলো হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নিচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জিযাটি ছিল বিরোধীদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। আর দ্বিতীয়টি তাদের আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি রয়েছে আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন : মিশর সম্রাটগণের উপাধি ছিল ফেরাউন, এটি কোনো নির্দিষ্ট বাদশাহের নাম ছিল না। ফেরাউন শব্দের অর্থ হলো সূর্য দেবতার সন্তান। পূর্বযুগে মিশরবাসীরা সূর্যকে [যা তাদের মহাদেবতা বা رَبِّ اَعْلٰى ছিল] رَعْ বলত। আর فِرْعَوْنُ শব্দটি সেদিকেই مَنْسُوْبٌ ছিল। মিশর অধিপতিরা নিজেদেরকে তার শারীরিক বহিঃপ্রকাশ ও মুখপাত্র হওয়ার দাবিদার ছিল। এজন্যই যারাই মিশরের শাসনকর্তা হতো তারাই নিজেদেরকে সূর্যসন্তান রূপে উপস্থাপন করত। যেমন হিন্দুস্তানেও অনেক বংশ নিজেদেরকে সূর্যসন্তান বলে দাবি করে থাকে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৯৪৮ বছর পূর্ব হতে নিয়ে সিকান্দারের যুগ পর্যন্ত ৩১টি বংশধর মিশরের শাসনকর্তা ছিল। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন কে ছিল? সাধারণ আরব ঐতিহাসিকগণ ও মুফাসসিরগণ তাকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কেউ তার নাম ওলীদ ইবনে রাইয়ান কেউ মুসআব ইবনে রাইয়ান বলে থাকেন। মুহাক্কিকগণের মতে তার নাম 'রাইয়ান' ছিল। ইবনে কাছীর বলেন যে, তার কুনিয়ত اَبُوْمُرَّةَ ছিল। এ সকল উক্তি পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নব্য মিশরীয় গবেষণা ও শিলালিপির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মতামত হলো– হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন হলো দ্বিতীয় রামীসাসের পুত্র مِنْفَتَاحْ, যার রাজত্ব কাল খিস্টপূর্ব ১২৯২ হতে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ১২২৫ সালে এসে শেষ হয়।

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার সূত্রে দুজন ফেরাউনের আলোচনা এসে যায়। প্রথমজন হলো সেই ফেরাউন যার যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যার ঘরে থেকে লালিত-পালিত হয়েছেন। আর দ্বিতীয়জন হলো ঐ ফেরাউন যার নিকট হযরত মূসা (আ.) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন এবং বনী ইসরাঈলকে নিষ্কৃতি দেওয়ার ফরমান জারি করেছেন। সর্বশেষ সে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে। আধুনিক গবেষকদের মতামত হলো, প্রথম ফেরাউন হলো দ্বিতীয় রামিসাস, আর দ্বিতীয় ফেরাউন হলো যার আলোচনা তাফসীরের কিতাবে এসেছে সে ছিল দ্বিতীয় রামিসাসের ছেলে مِنْفَتَاحْ; এই শাসকই বনী ইসরাঈলকে ভৃত্যে রূপান্তরিত করেছিল। তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাত। যার বিস্তারিত আলোচনা সূরায়ে বাকারাতে করা হয়েছে।
–[তাফসীরে জামালাইন খ. ২, পৃ. ৪০৯-৪১০]

অনুবাদ :

١٠٩. قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ فَائِقٌ فِىْ عِلْمِ السِّحْرِ وَفِى الشُّعَرَاءِ اَنَّهٗ مِنْ قَوْلِ فِرْعَوْنَ نَفْسِهٖ فَكَاَنَّهُمْ قَالُوْا مَعَهٗ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشَاوُرِ ـ

১০৯. ফেরাউন প্রধানগণ বলল, এতো একজন সুদক্ষ জাদুকর, জাদুবিদ্যায় সে অতীব পারদর্শী। সূরা আশ-শুআরা [اَلشُّعَرَاءِ] -এ আছে যে ফেরাউন নিজেই এ উক্তি করেছিল। এমতাবস্থায় সম্ভবত তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণও পরামর্শ রূপে তার সাথে সাথে এ উক্তি করেছিল।

١١٠. يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ـ

১১০. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে চায় এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?

١١١. قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ اَخِّرْ اَمْرَهُمَا وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ جَامِعِيْنَ ـ

১১১. তারা বলল, তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দিন অর্থাৎ তারা উভয়ের বিষয় সম্পর্কে বিলম্ব করুন এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে একত্রকারীগণকে প্রেরণ করুন।

١١٢. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ يَفْضُلُ مُوْسٰى فِىْ عِلْمِ السِّحْرِ فَجَمَعُوْا ـ

১১২. যেন তারা আপনার নিকট সুঅভিজ্ঞ জাদুকরদেরকে যারা জাদুবিদ্যায় মূসা হতেও অধিক পারদর্শী হবে তাদেরকে এনে উপস্থিত করে। অনন্তর তারা এতদানুসারে সকলকে একত্রিত করল।

١١٣. وَجَاۤءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اَئِنَّ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ـ

১১৩. জাদুকরেরা ফেরাউনের নিকট এসে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? اَئِنَّ এ হামযাদ্বয় আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে বা দ্বিতীয়টিকে تَسْهِيْل করে বা উভয় অবস্থায় এ দুটির মাঝে একটি অতিরিক্ত اَلِفْ সহও পঠিত রয়েছে।

١١٤. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ

১১৪. সে বলল, হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

١١٥. قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ عَصَاكَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ مَا مَعَنَا ـ

১১৫. তারা বলল, হে মূসা! তুমিই কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, না আমরা আমাদের সাথে যা আছে তা নিক্ষেপ করব?

١١٦. قَالَ اَلْقُوْا ج اَمْرٌ لِلْاِذْنِ بِتَقْدِيْمِ اِلْقَائِهِمْ تَوَسُّلًا بِهٖ اِلَى اِظْهَارِ الْحَقِّ فَلَمَّآ اَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ صَرَفُوْهَا عَنْ حَقِيْقَةِ اِدْرَاكِهَا وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ خَوَّفُوْهُمْ حَيْثُ خَيَّلُوْهَا حَيَّاتٍ تَسْعٰى وَجَاۤءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ـ

১১৬. সে বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা তাদের দড়াদড়ি ও লাঠি-সোঠা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে ধাঁধার সৃষ্টি করে দিল, এগুলো মূলে যে কি তা অনুধাবন করা হতে চোখের দৃষ্টিতে বিভ্রম ঘটিয়ে দিল এবং তাদেরকে আতঙ্কিত করে ফেলল, ভীত করে ফেলল। কারণ তাদের ধারণা হচ্ছিল যে, এগুলো সঞ্চারমান সাপ। মোটকথা তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল। হযরত মূসা কর্তৃক জাদুকরদেরকে তাদের কৃতিত্ব অগ্রে প্রদর্শন করতে এবং তাদেরকে অগ্রে নিক্ষেপ করতে অনুমতি দেওয়ার কারণ হলো যে, এর মাধ্যমে তিনি সত্য প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।

١١٧. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ج فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ تَبْتَلِعُ مَا يَاْفِكُوْنَ يُقَلِّبُوْنَ بِتَمْوِيْهِهِمْ .

১১৭. মূসার প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে তাদের ভেলজিবাজীর দরুন যেগুলো ছুটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছিল সেগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। تَلْقَفُ এতে মূলত একটি تَ উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– গ্রাস করতে লাগল।

١١٨. فَوَقَعَ الْحَقُّ ثَبَتَ وَظَهَرَ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ السِّحْرِ .

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হলো এবং তারা যা যে জাদু করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো।

١١٩. فَغُلِبُوْا اَىْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ صَارُوْا ذَلِيْلِيْنَ .

১১৯. সেখানে তারা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় পরাভূত হলো এবং অপমানিত হয়ে ফিরল, লাঞ্ছিত হলো।

١٢٠. وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ .

১২০. এবং জাদুকরেরা সেজদাবনত হলো।

١٢١. قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১২১. তারা বলল, আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

١٢٢. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ مَا شَاهَدُوْهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَتَاَتّٰى بِالسِّحْرِ .

১২২. যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক। তারা এ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছিল যে, মূসার লাঠিকে যা করতে দেখা গেল তা জাদু দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। ফলে তারা সিজদাবনত হয়ে পড়েছিল।

١٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا بِهِ بِمُوْسٰى قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ اَنَا لَكُمْ ج اِنَّ هٰذَا الَّذِىْ صَنَعْتُمُوْهُ لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ج فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَا يَنَالُكُمْ مِنِّىْ .

১২৩. ফেরাউন বলল, কি! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা তাতে أَأَمَنْتُمْ এ হামযাদ্বয়কে স্পষ্ট করে আলাদাভাবে বা দ্বিতীয়টিকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তিত করেও পাঠ করা যায়। মূসা সম্পর্কে বিশ্বাস করলে? নিশ্চয় এটা অর্থাৎ তোমরা যা করলে তা একটি চক্রান্ত। নগরবাসীদেরকে তা হতে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে তোমরা এ চক্রান্ত করেছ। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, এজন্যে আমার পক্ষ হতে তোমাদের কি কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

١٢٤. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَىْ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ الْيُمْنٰى وَرِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ .

১২৪. আমি নিশ্চয় তোমাদের হস্তপদ বিপরীতভাবে অর্থাৎ প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা কর্তন করব। অতঃপর তোমাদের সকলকে শূল-বিদ্ধও করব।

١٢٥. قَالُوْآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا بَعْدَ مَوْتِنَا بِاَىِّ وَجْهٍ كَانَ مُنْقَلِبُوْنَ رَاجِعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ .

১২৫. তারা বলল যেভাবেই মরিনা কেন মৃত্যুর পর আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই পরকালে প্রত্যাবর্তন করব, ফিরে যাব।

١٢٦. وَمَا تَنْقِمُ تُنْكِرُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ط رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا عِنْدَ فِعْلِ مَا تَوَعَّدَهُ بِنَا لِئَلَّا نَرْجِعَ كُفَّارًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ .

১২৬. তুমি তো আমাদের উপর এ কারণেই দোষারোপ করছ যে, প্রতিহিংসা ও ক্রোধ প্রকাশ করছ আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি যখন তা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এরা যে হুমকি প্রদর্শন করেছে তা বাস্তবায়নকালে আমাদেরকে ধৈর্য দান কর। যেন আমরা নিগ্রহের সম্মুখীন হয়ে পুনরায় কাফের না হয়ে যাই। এবং মুসলিম আত্মসমর্পণকারীরূপে আমাদের মৃত্যু দাও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّشَاوُرِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরায়ে শু'আরা এবং এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে দ্বন্দ্বের নিরসন করা। اَخِرْ اَمْرِهِمَا اَىْ لَا تَعْجَلْ فِىْ قَتْلِهِ

قَوْلُهُ مَا مَعَنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْمُلْقِيْنَ-এর মাফঊল উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ تَوَسُّلًا : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, জাদু যা নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় বস্তু। হযরত মূসা (আ.) তার নির্দেশ কেন দিলেন?

উত্তর. উত্তরের সার হলো এই যে, এই নির্দেশ আদরের দিক থেকেও নয় এবং নির্দেশের দিক থেকেও নয়; বরং এটা ছিল শুধুমাত্র অনুমতির জন্য। আর এই অনুমতির উদ্দেশ্য ছিল বাতিলের বাতুলতা ও সত্য প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ اَرْجِهْ : এটা اِرْجَاءٌ থেকে وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ, অর্থ তাকে অবকাশ দাও। এতে ه হলো ضَمِيْرْ مَفْعُوْلِىْ যা হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ الْمَلَاءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ : مَلَاءٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোনো সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু'জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে বড় পারদর্শী জাদুকর! তার কারণ, فكر هر كس بقدر همت اوست [প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে]। সে হতভাগারা আল্লাহর পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা আর জাদুকরদের নিজেদের পথ প্রদর্শক মনে করেছে এবং জাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে! কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাজাদু। কিন্তু তারাও এখানে سَاحِرٌ-এর সাথে عَلِيْمٌ শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ জাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজনই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তিনি বড় পারদর্শী জাদুকর।

মু'জিযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য : বস্তুত আল্লাহ তা'আলা সর্বযুগেই নবী-রাসূলদের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জিযা ও জাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। জাদুকররা সাধারণত অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যতবেশি হবে, তাদের জাদুও ততবেশি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হলো নবী-রাসূলদের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই নবুয়তের দাবির পর কারও কোনো জাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানেন যে, জাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, এ

কাজটি বাহ্যিক কোনো কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জিযাত বাহ্যিক বা মানসিক কোনো বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কাজ। তাই কুরআন মাজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى [বরং আল্লাহ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন]।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'জিযা এবং জাদুর প্রকৃতি ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তত্ত্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোনো কারণই নেই। তবে সাধারণত মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ বিভ্রান্তিটি দূর করার উদ্দেশ্য এমন সব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোঁকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাকে নিজেদের জাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ জাদুকর, সাধারণ জাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

قَوْلُهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ : অর্থাৎ এ বিজ্ঞ জাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া। এবার বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

قَوْلُهُ قَالُوْآ اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ الخ : এ আয়াতগুলোতে হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল, লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ ঐশী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনামে লাগিয়ে থাকে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদের বের করে দেওয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ এ বাক্যটিতে اَرْجِهْ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত– যার অর্থ ঢিলা দেওয়া, শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مَدَآئِنُ শব্দটি مَدِيْنَةٌ-এর বহুবচন, যা যে কোনো বড় শহরকে বলা হয়। حٰشِرِيْنَ শব্দটি حَاشِرٌ-এর বহুবচন যার অর্থ হলো– আহ্বানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হলো সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জাদুকরদের তুলে এনে একত্রিত করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ জাদুকর রয়েছে যারা তাঁকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে জাদুকরদের ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল এই যে, তখন জাদু-মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর জাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেওয়া হয়েছিল যাতে জাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জিযার মোকাবিলায় জাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রতিটি যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল অলঙ্কারশাস্ত্র ও বাগ্মিতায়। তাই হুজুরে আকরাম ﷺ -এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা হলো কুরআন যার মোকাবিলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ .... وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ : অর্থাৎ পরিষদবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী জাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা যদি মূসার উপর জয়লাভ করতে পারি তাহলে আমরা তার পারিশ্রমিক এবং পুরস্কার পাব তো? ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, পুরস্কার-পারিশ্রমিক তো পাবেই, তদুপরি তোমরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ সহচরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে যেসব জাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপেও ছিল যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল। -[তাফসীরে কুরতুবী]

ফেরাউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই দর কষাকষি করতে শুরু করতে শুরু করল যে,আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাব? তার কারণ, যারা ভ্রান্তবাদী, পার্থিব লাভই হলো তাদের মুখ্য। কাজেই যে কোনো কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রাসূলরা এবং তাঁদের যাঁরা নায়েব বা প্রতিনিধি, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান কামনা করি না! আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীন নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। ফেরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেওয়ার পর জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হলো। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে- قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় জাদুকরদের সরদারের সাথে হযরত মূসা (আ.) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয়লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? সে বলল, আমাদের কাছে এমন জাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর সত্যিই যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব। -[তাফসীরে মাজহারী, কুরতুবী]

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ : এখানে اِلْقَاءٌ-এর অর্থ নিক্ষেপ করা অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। জাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্য যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কারণ আমরা নিজেদের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথম আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল, কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞেস করে নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মূসা (আ.) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু'জিযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশ্বস্ততার দরুন প্রথমে তাদেরকে সুযোগ দিলেন। বললেন, اَلْقُوْا অর্থাৎ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একে তো জাদু হলো একটা হারাম কাজ, তদুপরি তা যখন কোনো একজন নবীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে, তখন নিঃসন্দেহে তা ছিল কুফরি। এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ.) কেমন করে তাদেরকে সে অনুমতি দিয়ে বললেন, اَلْقُوْا অর্থাৎ তোমরা নিক্ষেপ কর। কিন্তু বাস্তব বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। কারণ এ ক্ষেত্রে এ বিষয় নিশ্চিতই ছিল যে, এরা নিজেদের জাদু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশ্যই উপস্থাপন করবে। কথাটি হচ্ছিল

শুধু প্রথমে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে, আর পরে কে নামবে, তাই নিয়ে। কাজেই এখানে হযরত মূসা (আ.) তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে প্রথম সুযোগ তাদেরকেই দিলেন। এতে আরও একটি উপকারিতা ছিল এই যে, প্রথমে জাদুকররা তাদের লাঠি ও দড়িগুলোকে সাপ বানিয়ে নিক; আর তারপর আসুক হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মু'জিযা। শুধু তাই নয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠিও সাপই হোক; বরং এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করুক যে, জাদু বলে বানানো সমস্ত সাপকে গিলে খাক যাতে জাদুর প্রকাশ্য পরাজয় প্রথম ধাপেই সবার সামনে এসে যেতে পারে। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

আরও বলা যেতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর অনুমতি দান জাদুর জন্য ছিল না; বরং তাদের অপমানকে প্রকাশ করার জন্য ছিল। এর মানে তোমরাই নিজেদের দড়ি-লাঠি নিক্ষেপ করে দেখে নাও তোমাদের জাদুর পরিণতিটা কি দাঁড়ায়।

قَوْلُهُ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْا .... بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ : অর্থাৎ জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এ লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, জাদু এ প্রকারেই সীমবদ্ধ এবং জাদুর মাধ্যমে বস্তুর বিষয়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে না। কারণ শরিয়তের বা যুক্তির কোনো প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি বরং বিভিন্ন প্রকার জাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সম্মোহনী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাথর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরিয়ত বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى .... مَا يَاْفِكُوْنَ : অর্থাৎ আমি হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি [মাটিতে] ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো জাদুকররা জাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার জাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়ি যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দশকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি যখন এক বিরাট অজদাহা বা অজগরের আকার ধরে এল, তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

قَوْلُهُ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল আর জাদুকররা যা কিছু বানিয়েছিল সে সবই মিথ্যায় পরিণত হলো।

قَوْلُهُ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ : অর্থাৎ তখনই সবাই হেরে গেল এবং অত্যন্ত অপদস্থ হলো।

قَوْلُهُ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ .... رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ : অর্থাৎ জাদুকরদের সিজদায় পতিত করে দেওয়া হলো এবং তারা বলতে লাগল যে, আমরা রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ মূসা ও হরুনের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। 'সিজদায় পতিত করে দেওয়া হলো' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে এরা এমনি হতভম্ভ ও বাধ্য হয়ে গেল যে, একান্ত অজান্তেই সিজদায় পড়ে গেল। এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান আনার তৌফিক করে সিজদায় নিপতিত করে দিলেন। আর 'রব্বুল আলামীন' -এর সাথে 'মূসা ও হারুনের রব' যোগ করে তারা নিজেদের বিষয়টি ফিরাউনের জন্য পরিষ্কার করে দিল। কারণ সে বোকা যে নিজেকেই 'রাব্বুল আলামীন' বলত। কাজেই 'রব্বি মূসা ও হারুন' বলে তাকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, আমরা আর তোমার আল্লাহতে বিশ্বাসী নই।

১২৭. وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لَهُ اَتَذَرُ
تَتْرُكُ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ
بِالدُّعَاءِ اِلٰى مُخَالَفَتِكَ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط
وَكَانَ صَنَعَ لَهُمْ اَصْنَامًا صِغَارًا
يَعْبُدُوْنَهَا وَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ وَرَبُّهَا وَلِذَا قَالَ
اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى قَالَ سَنُقَتِّلُ بِالتَّشْدِيْدِ
وَالتَّخْفِيْفِ اَبْنَاءَهُمُ الْمَوْلُوْدِيْنَ
وَنَسْتَحْيِىْ نَسْتَبْقِىْ نِسَاءَهُمْ كَفِعْلِنَا
بِهِمْ مِنْ قَبْلُ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ قَادِرُوْنَ ـ

১২৮. فَفَعَلُوْا بِهِمْ ذٰلِكَ فَشَكَا بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ
قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ
وَاصْبِرُوْا ج عَلٰى اَذَا هُمْ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ
يُوْرِثُهَا يُعْطِيْهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط
وَالْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ اللّٰهَ ـ

১২৯. قَالُوْا قَوْمُ مُوْسٰى اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسٰى
رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى
الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فِيْهَا ـ

অনুবাদ :

১২৭. ফেরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ তাকে বলল, আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে আপনার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে ছেড়ে দেবেন? ফেরাউন ছোট ছোট প্রতিমা নির্মাণ করেছিল। তার সম্প্রদায় এগুলির পূজা করতে। সে বলত, আমি তোমাদের এবং এই মূর্তিগুলোর প্রভু। তাই সে নিজেকে اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমি তোমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রভু!' বলে অভিহিত করত। এ স্থানে আপনার দেবতা বলতে ঐ ছোট ছোট প্রতিমাসমূহের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে বলল, পূর্বে যেমন করেছিলাম এবারও তাদের ভূমিষ্ঠ পুত্রগণকে হত্যা করব سَنُقَتِّلُ এটা তাশদীদ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং তাদের নারীগণকে জীবিত ছেড়ে দেব, বাকি রেখে দিব। আমরা তো তাদের উপর প্রবল ক্ষমতাধিকারী।

১২৮. অনন্তর তারা তাই করল। ফলে বনী ইসরাঈলরা এ সম্পর্কে অভিযোগ করে তখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এদের অত্যাচারের মুখে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয় ভূমি আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন তা দান করেন। এবং শুভ পরিণাম তো যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের।

১২৯. তারা অর্থাৎ মূসার সম্প্রদায় বলল, তোমার আগমনের পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আগমনের পরও। সে বলল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি রাজ্যে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমরা এতে কি কর তিনি তা লক্ষ্য করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَذَرَكَ : এর আতফ হয়েছে يُفْسِدُوْا-এর উপর। اَتَذَرُ مُوْسٰى-এর মধ্যে اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِىْ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো ফেরাউনকে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে উত্তেজিত করে দেওয়া। আর وَيَذَرَكَ-এর মধ্যে وَاو টা হলো مَعِيَّتْ-এর জন্য আর يَذَرَكَ এটা وَاو-এর পরে اَنْ উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। اِسْتِفْهَام-এর জবাব হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ يَذَرُ : يَذَرُ টা وَذْر মাসদার হতে مُضَارِعْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। মূলত يَوْذِرُ ছিল বাবে ضَرَبَ হতে। তবে সাধারণত এ শব্দটির ব্যবহার বাবে سَمِعَ থেকে হয়ে থাকে। অর্থ– ছেড়ে দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মূসা (আ.)-এর এক বিরাট মু'জিযা : পরিতাপের বিষয়, ইদানীং মুসলমানরা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের জাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝে নিয়েছিল। আর তা সারাজীবন আল্লাহর পরিচয়বিমুখ নাস্তিক কাফেরদের মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মূসা (আ.)-এর এ মু'জিযা লাঠি এবং জ্যোতির্ময় হাতের মু'জিযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফেরাউনের উপর হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর ভীতিজনক প্রতিক্রিয়া : ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মূর্খ জাতিকে তার সাথে পুরাতন পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মতো ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোষনল জাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না, অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হলো– أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ অর্থাৎ তাহলে কি তুমি হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদের পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করতে থাকবে?

এতে বাধ্য হয়ে ফেরাউন বলল, سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ অর্থাৎ তাঁর বিষয়টিকে আমাদের পক্ষে তেমনি চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোনো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা সন্তানদের বাঁচতে দেব, যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে; যা ইচ্ছা তাই করব। এবং আমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।

তাফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরাউন এ কথাই বলল যে, আমরা বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করব, কিন্তু হযরত মূসা ও হারূন (আ.) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোনো কথাই এল না। তার কারণ, হযরত মূসা (আ.)-এর এই মু'জিযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মনমস্তিষ্কে হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করেছিল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মূসা (আ.)-কে দেখত, তখনই অবচেতন অবস্থায় তার পেশাব বেরিয়ে যেত। আর এটা একান্তই সত্য, সত্যভীতির এমনি অবস্থা হয়ে থাকে।

هیبت حق است این از خلق نیست

[আর এটা হলো আল্লাহর ভীতি, মানুষের পক্ষ থেকে নয়।]

আর মাওলানা রুমী (র.) বলেন–

هر کے ترسید از حق وتقوی گزید

ترسد ازوے جن وانس وهرکه دید

অর্থাৎ আল্লাহকে যে ভর করে, সমগ্র সৃষ্টি তাকে ভয় করতে থাকে।

এক্ষেত্রে ফেরাউনের সম্প্রদায় যে বলেছে, "হযরত মূসা (আ.) আপনাকে এবং আপনার উপাস্যদের পরিহার করে দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে" এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ফেরাউন যদিও তার সম্প্রদায়ের সামনে স্বয়ং খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ বলে থাকত, কিন্তু নিজেও মূর্তির আরাধনা-উপাসনা করত।

আর বনী ইসরাঈলদের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে পুত্র সন্তানদের হত্যা করার উৎপীড়নমূলক নৃশংস আইনের এ প্রবর্তন ছিল দ্বিতীয়বারের প্রবর্তন। এর প্রথম পর্যায় প্রবর্তিত হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে। যার অকৃতকার্যতার ব্যাপারে

তখনও সে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে অপদস্থ করতে চান, তার এমনি ব্যবস্থা হয়ে যায়, যার পরিণতি দাঁড়ায় একান্ত ধ্বংসাত্মক। অতঃপর পরবর্তীতে জানা যাবে, ফেরাউনের এ অত্যাচার-উৎপীড়ন কিভাবে তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছে।

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ الخ : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী ইসরাঈলদের প্রতি তার রাগ বাড়ল যে, তাদের ছেলেদের হত্যা করে মেয়েদের জীবিত রাখার আইন তৈরি করে দিল। এতে বনী ইসরাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে ফেরাউন তাদের উপর যে আজাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর হযরত মূসা (আ.)-ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূলজনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহিত লাভের জন্য তাদেরকে দুটি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। ১. শত্রুর মোকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং ২. কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্যধারণ। সেই সঙ্গে এ কথাও বাতলে দিলেন যে, এ অবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছে– اِسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে– اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র ভূমি আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা এ ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকী-পরহেজগাররাই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেজগারি অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্যধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা : হযরত মূসা (আ.) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী ইসরাঈলদের যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার দীক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এ ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হলো এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশ্বস্রষ্টা যার সহায় থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশ্বের সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মোকাবিলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কাজ লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, এ সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, শুধু মুখে কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, 'সবর'-এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর-এর প্রকৃত অর্থ হলো ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীরস্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোনো বিপদে ধৈর্যধাবণকেও সে জন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোনো অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোনো বৃহতোদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সত্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নিয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোনো নিয়ামত কেউ পায়নি। –[আবূ দাঊদ]

হযরত মূসা (আ.)-এর বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল– اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেওয়া হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, তাহলে আমরা কি করব।

সে জন্য আবারও হযরত মূসা (আ.) বাস্তব বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ বিষয়টি দূরে নয় যে, যদি তোমরা আমার উপদেশ মান্য কর, তাহলে শীঘ্রই তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর দেশের উপর স্থাপিত হবে তোমাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা। কিন্তু সাথে সাথে তিনি একথাও বলে দিলেন– فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ তার মানে এ দুনিয়ার পার্থিব কোনো রাজ্য বা প্রভুত্ব মুখ্য বিষয় নয়, বরং পৃথিবীতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত সততার বিস্তার এবং সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার প্রতিহত করার জন্য কাউকে কোনো রাজ্য বা প্রভুত্ব দান করা হয়। তাই তোমরা যখন মিসর দেশের আধিপত্য লাভ করবে, তখন সতর্ক থেকো, যাতে তোমরা রাজ্য ও শাসন ক্ষমতার নেশায় তোমাদের পূর্বর্তীদের পরিণতির কথা ভুলে না যাও।

রাষ্ট্রক্ষমতা রাষ্ট্রনায়ক শ্রেণির জন্য পরীক্ষাস্বরূপ : এ আয়াতে যদিও বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা সমগ্র শাসক শ্রেণিকেই এতদ্বারা সতর্ক করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে রাজ্য হোক বা প্রভুত্ব, তাতে একচ্ছত্র অধিকার হলো আল্লাহর। তিনিই মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেন এবং যখন ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নিয়ে যান। تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ আয়াতের মর্মও তাই। তদুপরি যাদেরকে পার্থিব রাজ্য দান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা শাসক ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য একটা পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে যে, সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উদ্দেশ্য– ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং নির্দেশিত কাজের প্রতি উৎসাহ দান ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব কতটা বাস্তবায়িত্ব করে।

'বাহরে মুহীত' নামক তাফসীরে এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, বনী আব্বাসের দ্বিতীয় খলিফা মনসূরের খেলাফত প্রাপ্তির পূর্বে একদিন হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (র.) এসে উপস্থিত হলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন– عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ যাতে তাঁর [মনসূরের] খেলাফত প্রাপ্তির সুসংবাদ ছিল। ঘটনাক্রমে এরপরে পরেই মনসূর খলিফা হয়ে যান; আর হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (রা.)-এর নিকট গিয়ে হাজির হন এবং আয়াতের মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন হযরত আমর ইবনে ওবায়েদ (রা.) জবাব দেন যে, হ্যাঁ, খলিফা হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু একটা বিষয় এখনও বাকি রয়েছে। অর্থাৎ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ এর মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, দেশের খলিফা অথবা আমির হয়ে যাওয়া কোনো গৌরবের বা আনন্দের বিষয় নয়। কেননা এরপরে আল্লাহ তা'আলা লক্ষ্য করেন যে, খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রীতিনীতি কি ও কেমনভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে। এখন হলো তার সে দেখার ও লক্ষ্য করার সময়।

অনুবাদ :

١٣٠. وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ بِالْقَحْطِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ .

১৩০. আমি তো ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের [উৎপাদন] হ্রাস করত পাকড়াও করেছি যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করে,] উপদেশ গ্রহণ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। اَلسِّنِيْنَ অর্থ, দুর্ভিক্ষ।

١٣١. فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ الْخِصْبُ وَالْغِنٰى قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ج اَىْ نَسْتَحِقُّهَا وَلَمْ يَشْكُرُوْا عَلَيْهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ جَدْبٌ وَبَلَاءٌ يَّطَّيَّرُوْا يَتَشَاءَمُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ط مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلَآ اِنَّمَا طٰۤئِرُهُمْ شُؤْمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ يَاْتِيْهِمْ بِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّ مَا يُصِيْبُهُمْ مِنْ عِنْدِهٖ .

১৩১. যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতে ফল-ফসলের বৃদ্ধি ও সচ্ছলতা দেখা দিত তারা বলত, এটাতো আমাদের প্রাপ্য অধিকার এবং এতদ্বিষয়ে তারা কোনোরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত না আর যখন কোনো অকল্যাণ হতো খরা ও বিপদ-আপদ দেখা দিত তখন তা মূসা ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের উপর আরোপ করত তাদের অশুভতার ফল বলে ঘোষণা দিত। শোন, তাদের শুভাশুভ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ এদের অশুভতা আল্লাহর নিকট বিদ্যমান। তাই তাদের উপর আপতিত হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতেই যে তাদের উপর বিপদ আপতিত হয় তা জানে না!

١٣٢. وَقَالُوْا لِمُوْسٰى مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ .

১৩২. তারা হযরত মূসাকে বলল, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোনো নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করব না।

١٣٣. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَهُوَ مَاءٌ دَخَلَ بُيُوْتَهُمْ وَوَصَلَ اِلٰى حُلُوْقِ الْجَالِسِيْنَ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَالْجَرَادَ فَاَكَلَ زَرْعَهُمْ وَثِمَارَهُمْ كَذٰلِكَ وَالْقُمَّلَ السُّوْسَ اَوْ نَوْعٌ مِنَ الْقِرَادِ فَتَتَبَّعَ مَا تَرَكَهُ الْجَرَادُ وَالضَّفَادِعَ فَمَلَأَتْ بُيُوْتَهُمْ وَطَعَامَهُمْ وَالدَّمَ فِىْ مِيَاهِهِمْ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ مُبَيِّنَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ .

১৩৩. অনন্তর হযরত মূসা (আ.) এদের সম্পর্কে বদদোয়া করলেন ফলে তাদের উপর প্লাবন পানি একেবারে তাদের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল এবং একজন উপবেশনরত ব্যক্তির কণ্ঠনালী পর্যন্ত গিয়ে প্রবেশ করেছিল। সাত দিন পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। পঙ্গপাল তা তাদের ফল ও ফসল খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। উকুন গম ইত্যাদি শস্যে সৃষ্ট পোকা বা পশুর শরীরে সৃষ্ট একপ্রকার উকুন জাতীয় কীটবিশেষ। পঙ্গপালের ধ্বংসের পর যা বেঁচেছিল এগুলো তাও শেষ করে দেয়। ভেক এটা তাদের ঘরবাড়ি ও আহার্য বস্তুতে ভরে থাকত। রক্ত এদের পানীয় জল রক্তে পরিণত হয়ে যেত। -এর আজাব প্রেরণ করি এগুলো বিশদ সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে অহংকার প্রদর্শন করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

١٣٤. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ الْعَذَابُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج مِنْ كَشْفِ الْعَذَابِ عَنَّا اَنْ اٰمَنَّا لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ .

১৩৪. এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আপতিত হতো বলত, হে মূসা, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; اَلرِّجْزُ অর্থ আজাব, শাস্তি। আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলে আমাদের হতে আজাব অপসৃত করে নেওয়া হবে এই সম্পর্কে তোমার সাথে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে সেই অনুসারে। যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস স্থাপন করব এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দেব। لَئِنْ-এর لَامْ টি قَسَمِيَّةٌ অর্থাৎ কসম ব্যাঞ্জক।

١٣٥. فَلَمَّا كَشَفْنَا بِدُعَاءِ مُوْسٰى عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَاهُمْ يَنْكُثُوْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ وَيُصِرُّوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ .

১৩৫. অতঃপর মূসার দোয়ায় যখনই তাদের উপর হতে শাস্তি অপসৃত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল তখনই তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত না বরং পূর্বের কুফরির উপরই জেদ ধরে থাকত।

١٣٦. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ الْبَحْرِ الْمِلْحِ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ لا يَتَدَبَّرُوْنَهَا .

১৩৬. সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সাগরে লবণাক্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি কারণ بِاَنَّهُمْ-এর بَاءٌ টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত এবং এ সম্পর্কে তারা ছিল অনাগ্রহী। এ সমস্তে তারা চিন্তা-গবেষণা করত না।

١٣٧. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ بِالْاِسْتِعْبَادِ وَهُوَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط بِالْمَاءِ وَالشَّجَرِ صِفَةٌ لِلْاَرْضِ وَهِىَ الشَّامُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى وَهِىَ قَوْلُهٗ وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الخ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا ط عَلٰى اَذٰى عَدُوِّهِمْ وَدَمَّرْنَا اَهْلَكْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ مِنَ الْعِمَارَةِ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا يَرْفَعُوْنَ مِنَ الْبُنْيَانِ .

১৩৭. দাসরূপে পরিগণিত করত যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হতো অর্থাৎ বনী ইসরাঈল তাদেরকে আমি পানি ও বৃক্ষলতাদি দ্বারা– اَلَّتِىْ بَارَكْنَا এটা اَلْاَرْض-এর صِفَتْ বা বিশেষণ। আমার কল্যাণপ্রাপ্ত অঞ্চলের অর্থাৎ শামের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী। তা হলো نُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الخ অর্থাৎ যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয় তাদের উপর আমি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেছি। সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা শত্রুর নিগ্রহের মুখে ধৈর্যধারণ করেছিল আর ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করে দিয়েছি। دَمَّرْنَا অর্থ, ধ্বংস করে দিয়েছি। يَعْرِشُوْنَ এটা ر অক্ষরটিতে কাসরা ও পেশ উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। অর্থ যে সমস্ত দালান-কোঠা তারা তুলত।

١٣٨. وَجَاوَزْنَا عَبَرْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا فَمَرُّوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكِفُوْنَ بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ج يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عِبَادَتِهَا قَالُوْا يٰمُوْسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا صَنَمًا نَعْبُدُهٗ كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ط قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ حَيْثُ قَابَلْتُمْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ بِمَا قُلْتُمُوْهُ.

১৩৮. এবং বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই অতিক্রম করিয়ে দেই অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত- يَعْكِفُوْنَ -এর ك অক্ষরে পেশ ও কাসরা উভয়রূপে পাঠ করা যায়। তার উপাসনায় দণ্ডায়মান এক জাতির কাছে আসে। অর্থাৎ তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে। তখন তারা বলল, হে মূসা এদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্য এক উপাস্য এক প্রতিমা গড়ে দাও। আমরা তার উপাসনা করব। তিনি বললেন, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। আর তাই তোমাদের উপর আল্লাহর যে অনুগ্রহ হয়েছে তার সাথে তোমাদের এ প্রস্তাবের বিনিময় করছ।

١٣٩. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ هَالِكٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

১৩৯. এসব লোক যাতে লিপ্ত তা তো বিধ্বস্ত হয়েছে এবং তারা যা করতেছে তাও অমূলক। مُتَبَّرٌ অর্থ, ধ্বংস হয়েছে।

١٤٠. قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا مَعْبُوْدًا وَاَصْلُهٗ اَبْغِيْ لَكُمْ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ فِيْ زَمَانِكُمْ بِمَا ذَكَرَهٗ فِيْ قَوْلِهٖ.

১৪০. তিনি বললেন, আল্লাহকে ছেড়ে আমি তোমাদের জন্য অন্য ইলাহের উপাস্যের অনুসন্ধান করব? অথচ তোমাদেরকে তিনি তোমাদের যুগের জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। اَبْغِيْكُمْ এটা এ স্থানে মূলত اَبْغِيْ لَكُمْ [তোমাদের জন্য অনুসন্ধান করব?] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لَكُمْ-এর لام টি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী উক্তিসমূহে শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে

١٤١. وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اَنْجَاكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ يُكَلِّفُوْنَكُمْ وَيُذِيْقُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ج اَشَدَّهٗ وَهُوَ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ يَسْتَبْقُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمُ الْاِنْجَاءِ اَوِ الْعَذَابِ بَلَآءٌ اِنْعَامٌ اَوِ ابْتِلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ اَفَلَا تَتَّعِظُوْنَ فَتَنْتَهُوْنَ عَمَّا قُلْتُمْ.

১৪১. এবং স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের অনুসরীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে মন্দ রকম শাস্তি দিত। اَنْجَيْنَاكُمْ এটা অপর এক কেরাতে اَنْجَاكُمْ রূপে পঠিত রয়েছে। সুকঠিন শাস্তির বোঝা বহন করাত; তার আস্বাদ ভোগ করাত। তা হলো, তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত, বাকি রেখে দিত। এতে অর্থাৎ মুক্তিদানে কিংবা শাস্তিতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহা পরীক্ষা যথাক্রমে পুরস্কার বা যাচাই সুতরাং এটা হতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর না এবং তোমাদের এ প্রস্তাব ও কথা হতে বিরত হও না? بَلَاءٌ অর্থ পুরস্কার ও পরীক্ষা উভয়টাই। সুতরাং এ স্থানে ذٰلِكُمْ [এতে] -এর দ্বারা যদি মুক্তিদানের প্রতি ইঙ্গিত হয় তবে بلاء অর্থ হবে পুরস্কার। আর এটা যদি ঐ শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত বহ হয় তবে بَلَاءٌ অর্থ হবে পরীক্ষা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ سِنِيْنَ : এটা سَنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি।

قَوْلُهٗ نَسْتَحِقُّهَا : অর্থ আমরা এর উপযুক্ত/ হকদার। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَنَا هٰذِهٖ -এর মধ্যস্থ لَامْ টি اِسْتِحْقَاقْ -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ مَهْمَا : মূলত ছিল مَامَا প্রথম مَا টি شَرْطِيَّة আর দ্বিতীয়টি تَاكِيْد -এর জন্য। কঠিনতাকে দূরীভূত করার জন্য প্রথম مَا-এর اَلِفْ -কে هَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়ার ফলে مَهْمَا হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ يَتَشَاءَمُوْنَ : يَطَّيَّرُ-এর তাফসীর يَتَشَاءَمُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَتَطَيَّرُ এটা طَيَرَانٌ থেকে নিষ্পন্ন নয়; বরং تَطَيُّرٌ থেকে নিষ্পন্ন। এর দুটি অর্থ ব্যবহৃত হয়।

১. নসিব বা ভাগ্য। চাই ভালো হোক বা খারাপ হোক। অর্থাৎ খোশনসিব এবং বদনসিব উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

২. এর দ্বিতীয় অর্থ হলো অশুভ ব্যাপার, দুর্বিপাক, অমঙ্গলজনক, কুলক্ষণ। মুফাসসির (র.) يَطَّيَّرُ-এর তাফসীর تَشَاؤُمٌ দ্বারা করে অর্থ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ هُمْ بَالِغُوْهُ : অর্থাৎ اِلٰى نِهَايَةٍ مِنَ الزَّمَانِ

قَوْلُهُ اِذَا هُمْ : এটা لَمَّا-এর জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ عَبَرْنَا : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন. হলো جَاوَزَ-এর সেলাহ بَاءٌ আসে না কেননা جَاوَزَ টা مُتَعَدِّيْ بِنَفْسِه অথচ بِهَا-এর মধ্যে بَاءٌ সেলাহ হয়েছে।

উত্তর. উত্তর হচ্ছে, এখানে جَاوَزَ টা عَبَرَ অর্থে হয়েছে। কাজেই এর সেলাহ بَاءٌ নেওয়া বৈধ হয়ে গেল

قَوْلُهُ هُوَ : هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, يُقَتِّلُوْنَ এটা خَبَر مُسْتَانِفَة হয়েছে পূর্বের উপর এর আতফ হয়নি

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ الخ : অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে কৃত ওয়াদার সম্পাদন এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নানা রকম আজাবের সম্মুখীন এবং শেষ পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো কিছুটা সবিস্তারে বলা হয়েছে। তার মধ্য সর্বপ্রথম আজাবটি হলো দুর্ভিক্ষ, পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্মূল্য, ফেরাউনের সম্প্রদায় যার সম্মুখীন হয়েছিল।

তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ দুর্ভিক্ষ তাদের উপর ক্রমাগত সাত বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। এ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গেই দুটি শব্দ سِنِيْنَ ও نَقْصُ ثَمَرَاتٍ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত কাতাদাহ (র.) প্রমুখ বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষ ও খরাসংক্রান্ত আজাব ছিল গ্রামবাসীদের জন্য আর ফলমূলের স্বল্পতা ছিল শহরবাসীদের জন্য। কেননা সাধারণত গ্রাম এলাকায়ই শস্যের উৎপাদন হয় বেশি এবং শহরে বেশি থাকে ফলমূলের বাগবাগিচা। তাতে এদিকেই ইঙ্গিত হয় যে, খরার কবল থেকে শস্যক্ষেত্র ও ফলের বাগান, কোনোটাই রক্ষা পায়নি।

কিন্তু কোনো জাতির উপর যখন আল্লাহর কহর বা প্রচণ্ড কোপদৃষ্টি পতিত হয়, তখন সঠিক বিষয় তাদের উপলব্ধিতে আসে না। ফেরাউনের সম্প্রদায়ও এ কহরেই পতিত হয়েছিল। আজাবের এ প্রাথমিক প্রচণ্ডতায় তাদের হুঁশ ফেরেনি। তারা এতটুকু সতর্ক হলো না, বরং এ দুর্ভিক্ষ এবং এ ধরনের অন্যান্য যে কোনো আগত বিপদ-আপদকে তারা বলতে লাগল যে, এগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর কওমের অমঙ্গল। فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ অর্থাৎ যখন তারা কোনো কল্যাণ ও আরাম-আয়েশ প্রাপ্ত হয়, তখন বলে যে, এগুলো আমাদের প্রাপ্য; আমাদের পাওয়াই উচিত। আর যখন কোনো বিপদ বা অকল্যাণের সম্মুখীন হয়, তখন বলে, এসবই হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের দুর্ভাগ্যের প্রতিক্রিয়া। আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেন– اَلَا اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ এখানে طَائِرٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ- উড়ন্ত জীব বা পাখি। আরবরা পাখির ডান কিংবা বাঁ দিকে উড়াল দ্বারা ভবিষ্যৎ ভাগ্যলক্ষণ ও মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করত। সেজন্যই শুধু মঙ্গলামঙ্গল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কথনকেও 'তায়ের' বলা হয়ে থাকে। এ আয়াতে طَائِرٌ অর্থও তাই। কাজেই আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, ভাগ্যলক্ষণ ভালো হোক বা মন্দ, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এ পৃথিবীতে যা কিছু প্রকাশ পায়, তা আল্লাহর কুদরতে ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তাতে না আছে কারও নহুছতের হাত, না আছে বরকতের। আর পাখিদের ডানে কিংবা বামে উড়িয়ে যে 'ফাল' বা ভবিষ্যৎ ভাগ্যপরীক্ষা করা হয় এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তি রচনা করা হয়, তা সবই তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও মূর্খতা।

আর শেষ পর্যন্ত ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর সমস্ত মু'জিযাকে জাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে ঘোষণা করল– مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আপনি যত রকম নিদর্শন উপস্থাপন করে আমাদের উপর স্বীয় জাদু চালাতে চেষ্টা করুন না কেন, আমরা কখনও আপনার উপর ঈমান আনব না।

قَوْلُهٗ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ الخ : আলোচ্য আয়াতগুলোত ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত্য ও কুফরিতে আঁকড়ে রয়েছে।

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) বিশ বছর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদের আল্লাহর বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্যপথে আনা। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ আয়াতে এ নয়টি মু'জিযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এ নয়টি মু'জিযার মধ্যে সর্বপ্রথম দুটি মু'জিযা অর্থাৎ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং হাত কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মু'জিযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন, যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা (আ)-এর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তাহলো আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে পরবর্তী ছয়টি মু'জিযার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুণ পোকা, বেঙ এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আজাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হলো এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আজাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছুসময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আজাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুনযির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আজাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আজাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেওয়া হতো।

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব চেপে বসে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় তা রহিত হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! এরা এতই উদ্ধত যে, দুর্ভিক্ষের আজাবেও প্রভাবিত হয়নি; বরং নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। এবার তাদের উপর এমন কোনো আজাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পরবর্তীদের জন্য যা হবে ভর্ৎসনামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ প্রথমে তাদের উপর নাজিল করেন তুফানজনিত আজাব। প্রখ্যাত মুফাসসিরদের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান; অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসের আবর্তে এসে যায়। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে চাষ-বাসের কোনো ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই ছিল বনী ইসরাঈলের জমিজমা ও ঘরবাড়ি। অথচ বনী ইসরাঈলদের ঘরবাড়ি, জমিজমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ জলের নিচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন করল, আপনার পরওয়ারদিগারের দরবারে দোয়া করুন তিনি যেন আমাদের থেকে এ আজাব দূর করে দেন, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করে দেব। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল অধিকতর সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আদতে এ তুফান তথা জলোচ্ছ্বাস কোনো আজাব ছিল না; বরং আমাদের ফায়দার জন্যেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) -এর এতে কোনো দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

এভাবে এরা মাসাধিক কাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ তাদের চিন্তাভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হলো না। তখন দ্বিতীয় আজাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। এ পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য-ফসল ও বাগানের ফল-ফলারি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আজাবের ক্ষেত্রেও হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা পরিলক্ষিত হয় যে, এ সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিবতী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘরবাড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। সংলগ্ন ইসরাঈলীদের ঘরবাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চিৎকার করতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন জানাল, এবার আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করে আজাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা ওয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলদের মুক্তি দিয়ে দেব। তখন হযরত মূসা (আ.) আবার দোয়া করলেন এবং এ আজাবও সরে গেল আজাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য মওজুদ রয়েছে, যা আমরা আরও বৎসরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলো ঈমানও আনল না, বনী ইসরাঈলদেরও মুক্তি দিল না।

আবার আল্লাহ তা'আলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এ অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আজাব قُمَّلٌ [কুম্মালা] قُمَّلٌ সেই উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুল বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোনো কোনো সময় খাদ্যশস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘুণ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কুম্মালের এ আজাবে সম্ভবত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশষ্যেও ঘুণ ধরেছিল এবং শরীরে, মাথায়ও উকুন পড়ে ছিল বিপুল পরিমাণে।

সে ঘুণের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-ভ্রু পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল। শেষে আবার ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা ওয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় এ আজাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য, এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে! তারা অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার এক মাসের সময় দেওয়া হলো, যাতে প্রচুর আরাম-আয়েশে কাটাল। কিন্তু যখন এ অবকাশের কোনো সুযোগ নিল না, তখন চতুর্থ আজাব হিসেবে এসে হাজির হলো বেঙ। এত অধিকসংখ্যায় বেঙ তাদের ঘরে জন্মাল যে, কোনোখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত বেঙের স্তূপ। শুইতে গেলে বেঙের স্তূপের নিচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সবকিছুই বেঙে ভরে যেত। এ আজাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকা-পাকি ওয়াদার পর হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ায় এ আজাবও সরল।

কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহর গজব চেপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোনো কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আজাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.) মহাজাদুকর, আর এসবই তাঁর জাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোনো সুযোগ নিল না। তখন এলো পঞ্চম আজাব রক্ত। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউজ থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আজাবের বেলায়ই হযরত মূসা (আ.)-এর এ মু'জিযা বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোনো আজাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। রক্তের আজাবের সময় ফেরাউনের সম্প্রদায়ের লোকেরা বনী ইসরাঈলদের বাড়ি থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের

হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে বসে কিবতী ও বনী ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী ইসরাঈলেরা তুলত তা যথারূপ থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঘোট কোনো কিবতী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আজাবও পূর্বরীতি-নিয়ম অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী জাতি চিৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আজাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহিতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কুরআন বলেছে–

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ অর্থাৎ এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আজাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে رِجْز -এর নাম বলা হয়েছে। এ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رِجْز বলা হয়। তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাদের ৭০.০০০ [সত্তর হাজার] লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আজাবও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আজাব। তাহলো এই যে, তারা নিজেদের ঘরবাড়ি, জমিজামা ও আসবাবপত্র ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে–

فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ

قَوْلُهُ وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের ক্রমাগত ঔদ্ধত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন আজাবের মাধ্যমে তাদের সতর্কীকরণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। অতঃপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে তাদের অশুভ পরিণতি এবং বনী ইসরাঈলদের বিজয় ও কৃতকার্যতার আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا অর্থাৎ যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কুরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে "যে জাতিকে ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল," বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, 'যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোনো সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে! কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে– تُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ

আর জমিনের মালিক বানিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে اَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'ওয়ারেস' বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্বপুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধনসম্পদের মালিক তাঁর সন্তানরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহর জানা মতে বনী ইসরাঈলরা পূর্ব থেকে কওমে ফেরাউনের ধনসম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقْ শব্দটি مَشْرِقْ-এর বহুবচন। আর مَغَارِبْ হচ্ছে مَغْرِبْ-এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' [উদয়াচলসমূহ] এবং 'মাগরিব' [অস্তাচলসমূহ] বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও জমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা কওমে-ফেরাউন ও কওমে-আমালেকাহকে ধ্বংস করার পর বনী ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

আর اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا বলে একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছেন যে, এ ভূমিতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বরকত ও আশীর্বাদ নাজিল করেছেন। শাম-সিরিয়া সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনেরই বিভিন্ন আয়াতে তার বরকময় স্থান হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। اَلَّتِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهَا তেও একথাই বলা হয়েছে। এমনিভাবে মিসরভূমির অসাধারণ উর্বরতা বরকতময়তাও বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এবং প্রত্যক্ষতার দ্বারা প্রমাণিত হয়। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেছেন, "মিসরের নীল দরিয়া হলো নদীসমূহের সর্দার"।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন যে, বরকতের দশ ভাগের নয় ভাগই রয়েছে মিসরে আর বাকি এক ভাগ রয়েছে সমগ্র ভূভাগে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

সারকথা, যে জাতি অহংকার ও ঔদ্ধত্যে নেশাগ্রস্ত, সে জাতি নিজেদের সংকীর্ণতার দরুন অপর জাতিকে হীন ও দুর্বল মনে করে রেখেছিল, আমি তাদেরকেই সেই উদ্ধত অহংকারীদের ধনসম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানিয়ে প্রতীয়মান করেছি যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের ওয়াদা অবশ্যই সত্য হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ অর্থাৎ আপনার পরওয়ারদিগারের ভালো ও মঙ্গলজনক ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের অনুকূলে পূর্ণ হয়েছে।

এই ভালো বা মঙ্গলজনক ওয়াদা বলতে হয় عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে নিধন করে তোমাদেরকে তাদের ভূমির মালিক বানিয়ে দেবেন' বলে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা বোঝানো হয়েছে। অথবা কুরআনের অন্যত্র স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, সেটিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ.

অর্থাৎ আমি চাই সে জাতির প্রতি সহায়তা দান করতে, যাকে এ দেশে হীন ও দুর্বল বলে মনে করা হয়েছে, আর তাদেরই সর্দার ও শাসক বানিয়ে দিতে তাদেরকেই এ জমির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতে এবং জমিতে তাদেরকেই এ হস্তক্ষেপের অধিকার দান করতে চাই। পক্ষান্তরে ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য সেনাকে সে বিষয়টি অনুষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিতে চাই, যার ভয়ে ওরা হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা করে চলছে।

প্রকৃতপক্ষে এতদুভয় ওয়াদাই এক। আল্লাহর ওয়াদার ভিত্তিতেই হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে ওয়াদা করেছিলেন। এ আয়াতে সে ওয়াদা পূরণের কথা تَمَّتْ শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ ওয়াদার সমাপ্তি বা পূর্ণতা তখনই হয়, যখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। এরই সঙ্গে বনী ইসরাঈলের প্রতি এই দান এবং অনুগ্রহের কারণ ব্যক্ত করে দিয়েছেন بِمَا صَبَرُوْا বলে। অর্থাৎ যেহেতু তারা আল্লাহর পথে কষ্ট সয়েছে এবং তাতে অটল রয়েছে।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমার এই দান ও অনুগ্রহ শুধু বনী ইসরাঈলদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং তা ছিল তাদের সবর ও দৃঢ়তার ফলশ্রুতি। যে ব্যক্তি কিংবা জাতিই এরূপ করবে, স্থান-কাল নির্বিশেষে তার জন্য আমার এ দান ও অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকবে।

قضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

হযরত মূসা (আ.) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে এ কথাই বলেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবিলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোনো লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হলো তার মোকাবিলা না করে, বরং সবর করা। তিনি বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবিলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, কি অকৃতকার্য হোক-সে ব্যাপারে তাঁর কোনো দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোনো লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবিলা ধৈর্য বা সবর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য পথ খুলে দেন।

আর যেভাবে আল্লাহ বনী ইসরাঈলের সাথে তাদের সবর ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় এবং জমিনের উপরে শাসন-ক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী ﷺ -এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন। وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ আর যেভাবে বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, মহানবী ﷺ -এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে; সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

এখানে এ প্রশ্ন করা যায় না যে, বনী ইসরাঈলরা তো ধৈর্যের সাথে কাজ করেনি; বরং হযরত মূসা (আ.) যখন ধৈর্যের উপদেশ দেন, তখন রুষ্ট হয়ে বলে উঠল– أُوذِيْنَا সব সময়ই আমরা দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন রয়েছি। তার কারণ, প্রথমত ফেরাউনের উৎপীড়নের মোকাবিলায় তাদের ধৈর্য এবং ঈমানের উপর তাদের দৃঢ়তা সর্বক্ষণই প্রতীয়মান। যদি কখনও হঠাৎ একআধটা অনুযোগ বেরিয়েও যায়, তবে তা ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলদের এ কথটিতে অভিযোগ অনুযোগ ছিলই না, বরং দুঃখ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য বলে থাকতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে– وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি সে সমস্ত বস্তু, যা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তৈরি করে থাকত এবং সেই প্রাসাদ ও বৃক্ষরাজি যেগুলোকে তারা উঁচিয়ে তুলত। ফেরাউন ও ফেরাউনের সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা, ব্যবহার্য আসবাবপত্র এবং মূসার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত। আর وَمَا كَانُوا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ যা কিছু তারা উঁচিয়ে তুলত। এতে উচ্চ প্রাসাদ এবং দালান-কোঠাও যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে বড় বড় বৃক্ষরাজি এবং আঙ্গুরের লতা যা মাচা দিয়ে ছাদের উপর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো এসবও অন্তর্ভুক্ত।

এ পর্যন্ত ছিল কওমে ফেরাউনের ধ্বংসের আলোচনা। তারপর থেকে শুরু হচ্ছে বনী ইসরাঈলের বিজয় ও কৃতকার্যতা লাভের পর তাদের ঔদ্ধত্য, মূর্খতা ও দুষ্কর্মের বিবরণ, যা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত প্রত্যক্ষ করার পরেও তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দান যে, পূর্ববর্তী রাসূলরাও স্বীয় উম্মতের দ্বারা ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বর্তমান ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়ন কিছুটা লাঘব হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَاءِيْلَ الْبَحْرَ : অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলদের সাগর পার করে দিয়েছি।

ঘটনাটি হলো এই যে, এ জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতি-নীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদত-উপাসনা করতে পারি। আল্লাহর সত্তা তো আর সামনে আসে না। হযরত মূসা (আ.) বললেন– إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে বড় মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে! এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব ভ্রান্ত রীতিনীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদের দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বাবাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ তখন হযরত মূসা (আ.)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশি মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম।

অতঃপর বনী ইসরাঈলদের তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কওমের হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদের হত্যা করে নারীদের অব্যাহতি দেওয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আজাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এ অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এ যে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

١٤٢. وَوٰعَدْنَا بِأَلِفٍ وَدُوْنَهَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً نُكَلِّمُهُ عِنْدَ انْتِهَائِهَا بِأَنْ يَّصُوْمُهَا وَهِىَ ذُو الْقَعْدَةِ فَصَامَهَا فَلَمَّا تَمَّتْ اَنْكَرَ خُلُوْفَ فَمِهِ فَاسْتَاكَ فَأَمَرَ اللّٰهُ بِعَشَرَةٍ اُخْرٰى لِيُكَلِّمَهُ بِخُلُوْفِ فَمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى وَاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ وَقْتَ وَعْدِهِ بِكَلَامِهِ اِيَّاهُ اَرْبَعِيْنَ حَالٌ لَيْلَةً ـ تَمْيِيْزٌ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ عِنْدَ ذِهَابِهِ اِلَى الْجَبَلِ لِلْمُنَاجَاةِ اخْلُفْنِىْ كُنْ خَلِيْفَتِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ اَمْرَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ بِمُوَافَقَتِهِمْ عَلَى الْمَعَاصِىْ ـ

অনুবাদ :

১৪২. মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি وَاعَدْنَا এটা وَاوْ-এর পর اَلِفْ সহ ও اَلِفْ ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে। যে তার সমাপ্তির পর আমি তার সাথে কালাম করব। এ দিনগুলোতে তাকে রোজা রাখতে বলা হয়। ঐ মাসটি ছিল চান্দ্রমাস জিলকদ। তিনি তখন এ মাসের রোজা রাখেন। ঐ মেয়াদ শেষ হয়ে আসলে মুখের গন্ধ তাঁর নিকট অতিশয় খারাপ বলে বোধ হলো। ফলে তিনি মিসওয়াক করে ফেলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো দশ দিন বৃদ্ধির নির্দেশ দেন। যাতে রোজাজনিত গন্ধ বিদ্যমান থাকাবস্থায় তার সাথে কথা বলতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– এবং আর দশ দ্বারা অর্থাৎ জিলহজ মাসের আর দশ রাত্রিসহ উহা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের তার সাথে কথা বলার প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। اَرْبَعِيْنَ এটা এ স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ لَيْلَةً এটা تَمْيِيْزٌ। এবং মূসা আল্লাহর সাথে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে যাওয়ার কালে তার ভ্রাতা হারূনকে বলেছিলেন আমার অনুপস্থিতিতে তুমি আমার সম্প্রদায়ে প্রতিনিধিত্ব করবে অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে তুমি প্রতিনিধিত্ব কর, এবং তাদের বিষয়সমূহের সংশোধন ও দেখা-শুনা করবে আর অবাধ্যচারের কাজেহ সহযোগিতা সমর্থন দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না।

١٤٣. وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا اَىْ لِلْوَقْتِ الَّذِىْ وَعَدْنَاهُ بِالْكَلَامِ فِيْهِ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ بِلَا وَاسِطَةٍ كَلَامًا يَسْمَعُهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ نَفْسَكَ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ط قَالَ لَنْ تَرٰنِىْ اَىْ لَا تَقْدِرُ عَلٰى رُؤْيَتِىْ وَالتَّعْبِيْرُ بِهٖ دُوْنَ لَنْ اُرٰى يُفِيْدُ اِمْكَانَ رُؤْيَتِهٖ تَعَالٰى وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ الَّذِىْ هُوَ اَقْوٰى مِنْكَ فَاِنِ اسْتَقَرَّ ثَبَتَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِىْ ج اَىْ تَثْبُتُ لِرُؤْيَتِىْ وَاِلَّا فَلَا طَاقَةَ لَكَ ـ

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময় অর্থাৎ তার সাথে কথোপকথনের জন্য যে সময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সেই সময় উপস্থিত হলো এবং তার প্রতিপালক কোনোরূপ মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি তার সাথে কথা বললেন। এটা নির্দিষ্ট কোনো এক দিক নয় বরং সকল দিক হতেই শুনা যাচ্ছিল। তখন সে মূসা আবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিজ সত্তার দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, আমাকে কখনই দেখবে না অর্থাৎ আমাকে দেখার ক্ষমতা তোমার নেই। لَنْ تَرٰنِىْ এ স্থানে لَنْ اُرٰى অর্থাৎ আমাকে দর্শন করা যায় না, এইভাবে না বলে বক্তব্যটি لَنْ تَرٰنِىْ অর্থাৎ তুমি আমাকে দেখবে না, রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে মূলত আল্লাহর দর্শন লাভ অসম্ভব নয়। তুমি বরং তোমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী পাহাড়টির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে দৃঢ় থাকে তবে শীঘ্র তুমি আমাকে দেখবে, তবে আমার দর্শনে তুমি স্থির থাকতে পারবে। আর তা না হলে [বুঝবে] আমাকে দর্শন করার কোনো শক্তি তোমার নেই।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ اَىْ ظَهَرَ مِنْ نُوْرِهٖ قَدْرُ نِصْفِ اَنْمِلَةِ الْخِنْصَرِ كَمَا فِىْ حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ اَىْ مَدْكُوْكًا مُسْتَوِيًا بِالْاَرْضِ وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ج مَغْشِيًّا عَلَيْهِ لِهَوْلِ مَا رَاٰى فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْ سُؤَالِ مَا لَمْ اُوْمَرْ بِهٖ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ زَمَانِىْ ـ

অনন্তর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন একটি হাদীসে আছে যে, কনিষ্ঠা অঙ্গুলীর অগ্রভাগের অর্ধেক পরিমাণ নূর তিনি প্রকাশ করেছিলেন। হাকিম এই হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন। তা পাহাড়টিকে চূর্ণবিচূর্ণ করল, চূর্ণবিচূর্ণ করে একেবারে ভূপৃষ্ঠের সমান করে দিল। আর মূসা দৃশ্যপটের এই ভীষণতা প্রত্যক্ষ করত সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। হুঁশ হারিয়ে ফেলল। دَكًّا এটা قَصْر অর্থাৎ হ্রস্বস্বরে [মদ ব্যতিরেকে] ও مَدّ অর্থাৎ দীর্ঘস্বরে পঠিত রয়েছে। অর্থ চূর্ণবিচূর্ণ করত ভূমির সমান করে দিল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, বলল, মহিমাময় তুমি সকল পবিত্রতা তোমার। যে বিষয়ে নির্দেশিত হইনি সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হতে তোমার দরবারেই আমি তওবা করলাম এবং আমার যুগে বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।

١٤٤. قَالَ تَعَالٰى لَهٗ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ اخْتَرْتُكَ عَلَى النَّاسِ اَهْلَ زَمَانِكَ بِرِسٰلٰتِىْ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ وَبِكَلَامِىْ اَىْ تَكْلِيْمِىْ اِيَّاكَ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ مِنَ الْفَضْلِ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ لِاَنْعُمِىْ ـ

১৪৪. তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার পয়গাম ও কথা দ্বারা رِسَالَتِىْ এটা একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে অর্থাৎ তোমার সাথে আমার বাক্যালাপ করা দ্বারা তোমার যুগের লোকের মধ্যে নির্বাচিত করে নিয়েছি, গ্রহণ করে নিয়েছি আমি তোমাকে যে মর্যাদা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং আমার অনুগ্রসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হও।

١٤٥. وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ اَىْ اَلْوَاحِ التَّوْرٰةِ وَكَانَتْ مِنْ سِدْرِ الْجَنَّةِ اَوْ زَبَرْجَدٍ اَوْ زُمُرُّدٍ سَبْعَةً اَوْ عَشَرَةً مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِى الدِّيْنِ مَوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا تَبْيِيْنًا لِكُلِّ شَىْءٍ ج بَدَلٌ مِنَ الْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ قَبْلَهٗ فَخُذْهَا قَبْلَهٗ قُلْنَا مُقَدَّرًا بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ط سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ فِرْعَوْنَ وَاَتْبَاعِهٖ وَهِىَ مِصْرُ لِتَعْتَبِرُوْا بِهِمْ ـ

১৪৫. আমি তার জন্য ফলকে اَلْوَاح তাওরাতের ফলকসমূহ। তা ছিল জান্নাতের বদরী কাঠের তৈরি। মতান্তরে যবরজাদ কিংবা যমরূদ পাথরের তৈরি। তা সখ্যায় ছিল সাত বা দশটি। অর্থাৎ তাওরাতের ফলকসমূহে ধর্ম বিষয়ে যা কিছু প্রয়োজন সেই সব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের বিশদ ও সুস্পষ্ট বিবরণ লিখে দিয়েছি; مَوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا এটা পূর্বোল্লিখিত جَارٌ مَجْرُوْرٌ অর্থাৎ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ হতে بَدَلٌ বা তার স্থলাভিষিক্ত শব্দ সমষ্টি। সুতরাং এগুলো শক্তভাবে অর্থাৎ চেষ্টা ও শ্রম সহকারে ধারণ কর خُذْهَا -এর পূর্বে قُلْنَا ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বললাম তা ধারণ কর। এবং তোমার সম্প্রদায়কে তার মধ্যে সুন্দরতম বিষয়সমূহ গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র তোমাদেরকে সত্য-ত্যাগীদের অর্থাৎ ফেরাউন এবং তার অনুসারীদের বাসস্থান অর্থাৎ মিশর দর্শন করাব। যাতে তোমরা এদের অবস্থা দর্শন করে শিক্ষা লাভ করতে পার।

١٤٦. سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ دَلَائِلِ قُدْرَتِىْ مِنَ الْمَصْنُوْعَاتِ وَغَيْرِهَا الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط بِاَنْ اَخْذُلَهُمْ فَلَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ طَرِيْقِ الرُّشْدِ الْهُدَى الَّذِىْ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا يَسْلُكُوْهُ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ الضَّلَالِ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ج ذٰلِكَ الصَّرْفُ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ تَقَدَّمَ مِثْلُهٗ .

১৪৬. পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে অর্থাৎ সৃষ্ট জিনিসসমূহে ও অন্যান্য বিষয়ে আমার কুদরতের যে প্রমাণ বিদ্যমান তা হতে ফিরিয়ে নেব। অর্থাৎ এদের আমি লাঞ্ছিত করব। সেহেতু এরা আর তাতে চিন্তাভাবনা করবে না। তারা আমার নিদর্শনের প্রত্যেকটি দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, যদি তারা সৎপথ অর্থাৎ যে হেদায়েত আল্লাহর তরফ হতে এসেছে সেই পথ দেখে তবে তাকে পথ বলে চলার জন্য গ্রহণ করবে না; কিন্তু তারা ভ্রান্ত-পথ গোমরাহির পথ দেখলে তাকে পথ বলে গ্রহণ করে। তা অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া এ হেতু যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা অনবধান। এ ধরনের আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

١٤٧. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ الْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ ط مَا عَمِلُوْهُ فِى الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ كَصِلَةِ رَحِمٍ وَصَدَقَةٍ فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ لِعَدَمِ شَرْطِهٖ هَلْ مَا يُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ التَّكْذِيْبِ وَالْمَعَاصِىْ .

১৪৭. যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে পুনরুত্থান ইত্যাদিকে অস্বীকার করে তাদের কার্যাবলি অর্থাৎ দুনিয়াতে যে সমস্ত ভালো কাজ করেছে যেমন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, দান করা ইত্যাদি বিনষ্ট হয়ে যাবে নিষ্ফল হবে। এগুলোর কোনো ছওয়াব বা পুণ্যফল তারা পাবে না। যেহেতু তা কবুল হওয়ার শর্ত ঈমান তাদের নেই। তারা সত্য-প্রত্যাখ্যান ও অবাধ্যাচার ইত্যাদি যা করে তাদেরকে কেবল এদেরই প্রতিদান দেওয়া হবে। هَلْ এ প্রশ্নবোধক শব্দটি এ স্থানে نَفِىْ অর্থাৎ না বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে এটার তাফসীরে না অর্থবোধক مَا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بِاَلِفٍ وَدُوْنَهَا : যখন اَلِفْ সহ হবে তখন এটা বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে হবে। وَاعَدْنَا -এর وَاوْ -টি اِسْتِيْنَافِيَةٌ অর্থাৎ এটি হলো مُسْتَانِفْ বাক্য, সূরা বাকারাতে যেই وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً বলেছিলেন, এটা তার বিস্তারিত বিবরণ। وٰعَدْنَا مُوْسٰى হলো ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউলে বিহী। আর ثَلٰثِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। আর ثَلٰثِيْنَ -এর মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো تَمَامَ ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً আর لَيْلَةً হলো تَمْيِيْز ; আর اَتْمَمْنٰهَا -এর আতফ হয়েছে وٰعَدْنَا -এর উপর।

قَوْلُهٗ وَقْتَ وَعْدِهٖ : مِيْقَاتُ -এর তাফসীর وَقْتٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِيْقَاتُ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ : وَاوْ টা تَرْتِيْب এবং تَعْقِيْب -এর জন্য নয়। কেননা উল্লিখিত উক্তি পাহাড়ে গমনের পূর্বের।

قَوْلُهُ بِكَلَامِهِ اِيَّاهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. مِيْقَاتُ رَبِّهِ দ্বারা জানা যায় যে, رَبٌّ-এর وَقْتٌ রয়েছে অথচ رَبٌّ-এর কোনো وَقْتٌ নেই।

উত্তর. উত্তরের সার হলো, মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- وَقْتُ كَلَامِ رَبِّهِ اِيَّاهُ

قَوْلُهُ حَالٌ : উহ্য ইবারত হবে- فَتَمَّ بَالِغًا هٰذَا الْعَدَدِ কাজেই حَمْل বৈধ না হওয়ার আপত্তি চুকে গেল।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَلَامْ قَدِيْم এবং كَلَامْ حَادِثْ-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা যে, كَلَامْ حَادِثْ-এর জন্য جِهَتٌ বা দিক থাকে, আর كَلَامْ قَدِيْم-এর জন্য নয়। কেননা قَدِيْمْ-এর কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, তা সর্বদিকেই বিরাজমান।

قَوْلُهُ نَفْسَكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَرِنِىْ-এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে। কাজেই فِعْل قَلْب-এর মাফউলের উপর সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيْرُ بِهِ دُوْنَ لَنْ اَرٰى يُفِيْدُ اِمْكَانَ رُؤْيَتِهِ تَعَالٰى : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, لَنْ تَرَانِىْ এবং لَنْ اَرٰى-এর মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? পার্থক্য হচ্ছে- لَنْ تَرَانِىْ এটা رُؤْيَةُ بَارِىْ تَعَالٰى-এর সম্ভাব্যতাকে বুঝায়। কেননা لَنْ تَرَانِىْ দ্বারা জানা যায় যে, না দেখার ইল্লত رَائِىْ-এর মধ্যে রয়েছে مَرْئِىْ-এর মধ্যে নয়। আর সেই ইল্লত হলো শক্তি এবং যোগ্যতা না থাকা। আর যদি لَنْ تَرَانِىْ-এর পরিবর্তে لَنْ اَرٰى হয়, তখন উদ্দেশ্য এই হবে যে, না দেখার ইল্লত مَرْئِىْ-এর মধ্যে রয়েছে رَائِىْ-এর যোগ্যতাহীনতাকে যোগ্যতার মধ্যে এবং শক্তিহীনতাকে শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। কেননা رَائِىْ টা حَادِثْ এবং مُمْكِنْ আর حَادِثْ এবং مُمْكِنْ টা تَصَرُّفْ-কে গ্রহণ করে, এটা مَرْئِىْ-এর বিপরীত যে তা قَدِيْمْ হওয়ার কারণে تَصَرُّفْ-কে কবুল করে না।

قَوْلُهُ مَدْكُوْكًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, دَكًّا মাসদারটা مَدْكُوْكًا অর্থে হয়েছে। কাজেই جَبَل-এর উপর دَكًّا-এর حَمْل বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَكْلِيْمِىْ اِيَّاكَ : এর উদ্দেশ্য হলো تَخْصِيْص-কে বর্ণনা করা। কেননা مُطْلَقْ كَلَامْ হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে خَاصْ নয়।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنَ الْجَارِ وَالْمَجْرُوْرِ قَبْلَهُ : অর্থাৎ مَوْعِظَةً এটা مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَفْصِيْلًا-এর مَحَلْ থেকে بَدَلْ হয়েছে। কেননা مِنْ كُلِّ شَيْءٍ হলো كَتَبْنَا-এর মাফউল, যার কারণে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَحْسَنِهَا : অর্থাৎ আযীমতের উপর আমলকে আবশ্যক রূপে গ্রহণ কর। রুখসতের উপর নয়। উদ্দেশ্যে হলো تَوَارُتْ-এর মধ্যে আযীমত, রুখসত, মুবাহ, ফরজ, ওয়াজিব সবই রয়েছে, তবে তোমাদের উচিত হলো রুখসত-এর উপর আমল না করে عَزِيْمَتْ-এর উপর আমল করা। যেমন- ধৈর্য, সৈহ্য, ক্ষমা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা মুবতাদা, আর بِاَنَّهُمْ তার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً الخ : এ আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসারাঈলের সেই ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে, যা ফেরাউনের জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার ফলে বনী ইসরাঈলদের নিশ্চিন্ত হওয়ার পর সংঘটিত হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, তখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আবেদন করেছিল যে, এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এবার যদি আমাদের কোনো কিতাব এবং শরিয়ত দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিন্ত মনে সে মতে আমল করতে পারি। তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। এতে وَاعَدْنَا শব্দটি وَعْدَةً থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হলো এই যে, কাউকে লাভজনক কোনো কিছু দেওয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেওয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাজিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) ত্রিশ রাত তূর পর্বতে ই'তিকাফ ও আল্লাহর ইবাদত-আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাতের উপর আরও দশ রাত বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وَاعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো– দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি; আর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত যাবৎ ই'তিকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَعَدْنَا না বলে وَاعَدْنَا বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয় : প্রথমত চল্লিশ রাত ই'তিকাফ করানোই যখন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের ই'তিকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহর হিকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে? তবুও আলেম সমাজ এর কিছু হিকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হলো ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোনো কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়; বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তাফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদের শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে আরও সময় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে হয়েছে– ত্রিশ রাতে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্যে ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ এ দশ রাত বৃদ্ধির ব্যাপারে তাফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাতের ই'তিকাফের সময় হযরত মূসা (আ.) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোজাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোনো ইফতার করেননি। ত্রিশ রোজা শেষ করার পর ইফতার করে তূর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাজির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোজাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মিসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন। কাজেই আরও দশটি রোজা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোজার পর হযরত মূসা (আ.) মিসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোজাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোজাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ প্রথমত এই রেওয়ায়েতের কোনো সনদ নেই। দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোজার সময় মিসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মাদীয়া বা মহানবী ﷺ -এর শরিয়তে রোজা অবস্থায় মিসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুজুরে আকরাম ﷺ বলেছেন– خَيْرُ خَصَائِلِ الصِّيَامِ السِّوَاكُ অর্থাৎ রোজাদারের সর্বোত্তম কাজ হলো মিসওয়াক করা। এ রেওয়ায়েতটি জামিউস সাগীরে উদ্ধৃত করে একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এ রেওয়ায়েতের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিযিরের সন্ধানে যখন সফর করেছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতেও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি এবং নিজের ভ্রমণসঙ্গীকে বলেছেন যে, آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا অর্থাৎ আমাদের নাশতা বের কর। কারণ এ ভ্রমণ আমাদের পরিশ্রান্তির সম্মুখীন করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তূর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে ত্রিশ রোজা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোনো ইফতার করা যাবে না। বিস্ময়ের ব্যাপার নয় কি?

তাফসীরে রূহুল-বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এ পার্থক্যটা ছিল এতদুভয় সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তূর পর্বতের এ সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদিগারের অন্বেষায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে এবং পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোজা পর্যন্ত কোনো কষ্টই তিনি অনুভব করেননি।

ইবাদতের বেলায় চান্দ্র হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ : আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলদের শরিয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী-রাসূলদের শরিয়তে চান্দ্রমাস গ্রহণীয়। আর চান্দ্রমাস শুরু হয় চাঁদ দেখা থেকে এবং তা রাতের বেলাতেই হতে পারে। সেজন্যই মাস শুরু হয় রাত থেকে এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। আসমানি যত ধর্ম রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দ্রমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে-আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حِسَابُ الشَّمْسِ لِلْمَنَافِعِ وَحِسَابُ الْقَمَرِ لِلْمَنَاسِكِ অর্থাৎ সৌর হিসাব হলো পার্থিব লাভের জন্য আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদত-উপাসনার জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর তাফসীর অনুসারে এ ত্রিশ রাত্রি ছিল জিলকদ মাসের রাত্রি আর এরই উপর জিলহজ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ.) তওরাতের উপঢৌকনটি লাভ করেছিলেন কুরবানির দিনে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

আত্মশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য : এ আয়াতের ইঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তার অন্তর থেকে জ্ঞান ও হিকমতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দেন। -[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীর-স্থিরতা ও ক্রমান্বয়ের শিক্ষা : এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেওয়া এবং তা ধীরস্থিরতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ তা'আলার রীতি। কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহর পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর পক্ষে আসমান-জমিন তথা সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যখনই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণের এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই ছিল উদ্দেশ্য যে, তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করার জন্যও যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হলো সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন বনী ইসরাঈলদের গোমরাহির সম্মুখীন হতে হয়। কারণ হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়ির দেওয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন বলতে শুরু করে যে, মূসা তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোনো নেতা নির্ধারণ করে নেওয়াই উচিত। তার ফলে তারা সহসাই 'সামেরী'-এর ফাঁদে আটকে গিয়ে 'বাছুর'-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তাভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীরস্থিরতা ও পর্যায়ক্রমিকতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হতো না। -[তাফসীরে কুতরতুবী]

আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটিতে বলা হয়েছে- وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ। এ বাক্য থেকেও কয়েকটি বিষয় ও আহকাম উদ্ভাবিত হয়।

প্রয়োজনবশত স্থালাভিষিক্ত নির্ধারণ : প্রথমত হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারূন (আ.)-কে বললেন, اُخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ। অর্থাৎ আমার পেছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও সফরে যাবেন, তখন নিজের কোনো লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদিনার বাইরে যেতে হতো, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মূর্তজা (রা.)-কে খলিফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে খলিফা নিযুক্ত করে। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রা.)-কে মদিনায় খলিফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) হারূন (আ.)-কে খলিফা নিযুক্ত করা সময় তাঁকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এ হেদায়েত বা নির্দেশাবলির মধ্যে প্রথম নির্দেশ হলো اَصْلِحْ ; এখানে اَصْلِحْ -এর কোনো কর্ম উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও ইসলাহ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলা বাহুল্য, হযরত হারূন (আ.) হলেন আল্লাহর নবী, তাঁর নিজের পক্ষে ফ্যাসাদে পতিত হওয়ার কোনো আশঙ্কাই ছিল না। কাজেই এ হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোনো সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সুতরাং হযরত হারূন (আ.) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় 'সামেরী'-এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথামতো 'বাছুরের' পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামি থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে হযরত মূসা (আ.) যখন ধারণা করলেন যে, হারূন (আ.) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিশ্চিন্ততাকেই সবচেয়ে বড় বুজুর্গি বলে মনে করে থাকেন।

قَوْلُهُ لَنْ تَرَانِيْ : [অর্থাৎ আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না।] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে [অর্থাৎ মূসা (আ.)] বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে لَنْ تَرَانِيْ না বলে বলা হতো, لَنْ اُرٰى 'আমার দর্শন হতে পারে না।' -[মাযহারী]

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহর দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হলো অধিকাংশ আহলে সুন্নাহর অভিমত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহর দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে- لَنْ يَرٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهٗ حَتّٰى يَمُوْتَ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদিগারকে দেখতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ : এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রোতা আল্লাহর দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটাবিকিরণ করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়। মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

قَوْلُهُ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ : আরবি অভিধানে تَجَلّٰى অর্থ প্রকাশিত হওয়া ও বিকশিত হওয়া। সুফি সম্প্রদায়ের পরিভাষায় 'তাজাল্লী' অর্থ হলো কোনো বিষয়কে কোনো কিছুর মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোনো বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ তা'আলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেননি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ও হাকেম-এর সনদকে যথার্থ বলেও উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ জাল্লা-শানুহুর এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহর তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কালাম বা বাক্য বিনিময় : এ বিষয়টি তো কুরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সরাসরিই বাক্যবিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমত সেসব কালাম যা নবুয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত সেসব কালাম, যা তওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময় প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য কি ছিল এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউই জানতে পারে না। তবে এতে শরিয়তের পরিপন্থি নয় এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর কোনো একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েজ হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতামতই সবচেয়ে উত্তম যে, এ বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়া এবং নানা ধরনের সাম্ভাব্যতা খুঁজে বেড়ানোর পেছনে না পড়াই বাঞ্ছনীয়। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এ ক্ষেত্রে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ কি? এতে দুটি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল-ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালিকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসিকদেরই আবাসভূমি। এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হলো এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর বনী ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কিনা? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে, যেমন আয়াত اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ-এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

قَوْلُهُ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَاحِ : এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মূসা (আ.)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো 'তাওরাত'।

১৪৮. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ ذَهَابِهٖ اِلَى الْمُنَاجَاةِ مِنْ حُلِيِّهِمُ الَّذِىْ اِسْتَعَارُوْهَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لِعِلَّةِ عُرْسٍ فَبَقِىَ عِنْدَهُمْ عِجْلًا صَاغَهٗ لَهُمْ مِنْهُ السَّامِرِىُّ جَسَدًا بَدَلٌ لَحْمًا وَدَمًا لَّهٗ خُوَارٌ ط اَىْ صَوْتٌ يُسْمَعُ اِنْقَلَبَ كَذٰلِكَ بِوَضْعِ التُّرَابِ الَّذِىْ اَخَذَهٗ مِنْ حَافِرِ فَرَسِ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ فَمِهٖ فَاِنَّ اَثَرَهُ الْحَيَاةُ فِيْمَا يُوْضَعُ فِيْهِ وَمَفْعُوْلُ اتَّخَذَ الثَّانِىْ مَحْذُوْفٌ اَىْ اِلٰهًا اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا فَكَيْفَ يَتَّخِذُ اِلٰهًا اِتَّخَذُوْهُ اِلٰهًا وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ بِاتِّخَاذِهٖ.

১৪৯. وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ اَىْ نَدِمُوْا عَلٰى عِبَادَتِهٖ وَرَاَوْا عَلِمُوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا بِهَا وَذٰلِكَ بَعْدَ رُجُوْعِ مُوسٰى قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيْهِمَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

১৫০. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ مِنْ جِهَتِهِمْ اَسِفًا شَدِيْدَ الْحُزْنِ قَالَ بِئْسَمَا اَىْ بِئْسَ خِلَافَةً خَلَفْتُمُوْنِىْ هَا مِنْۢ بَعْدِىْ ج خِلَافَتُكُمْ هٰذِهٖ حَيْثُ اَشْرَكْتُمْ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ج وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ اَلْوَاحَ التَّوْرٰةِ غَضَبًا لِرَبِّهٖ فَتَكَسَّرَتْ.

অনুবাদ :

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কথোপকথনের উদ্দেশ্যে তার গমনের পর নিজেদের অলঙ্কার দ্বারা কোনো এক আনন্দ উৎসব উপলক্ষে এ অলঙ্কারগুলো তারা ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট হতে ব্যবহার করার জন্য নিয়েছিল। পরে এগুলো তাদের নিকটই থেকে যায়। ঐ অলঙ্কার দ্বারা গড়ল একটি গো-বৎস, جَسَدًا এটা এ স্থানে بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। রক্ত ও মাংসের একটি অবয়ব যা হাম্বা রব করত এমন শব্দ করত যা শ্রুত হতো। সামিরী নামক জনৈক ব্যক্তি তাদেরকে তা বানিয়ে দিয়েছিল। সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের মাটি সংরক্ষণ করে রেখেছিল। তা উক্ত গো-বৎসের মুখে রাখায় উক্তরূপ ধারণ করেছিল। কারণ, ঐ মাটির বৈশিষ্ট্য ছিল তা যে বস্তুতেই লাগানো হতো তা জীবন্ত রূপ ধারণ করত। اِتَّخَذَ -এর مَفْعُوْلٌ ثَانِىْ অর্থাৎ দ্বিতীয় কর্ম পদ এ স্থানে উহ্য। তা হলো اِلٰهًا অর্থাৎ গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল। তারা কি লক্ষ্য করল না যে তা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না। এটার পরও কেমন করে তারা এটাকে ইলাহ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করল! তারা তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তা করায় তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

১৪৯. তারা যখন তাদের হস্তের মাঝে লুটিয়ে পড়ল অর্থাৎ তার উপাসনা করার বিষয়ে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলো এবং দেখল অর্থাৎ বুঝল যে, তারা তার কারণে বিপথগামী হয়ে গিয়েছে তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রত্যাবর্তনের পর তাদের এ অবস্থা হয়েছিল। يَرْحَمْنَا يَغْفِرْلَنَا এ ক্রিয়া দুটির ت [দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى [নাম পুরুষ] উভয়রূপ পাঠই রয়েছে।

১৫০. মূসা যখন এদের আচরণের কারণে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল তখন তাদেরকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। اَسِفًا অর্থ অতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত। তোমাদের এ প্রতিনিধিত্ব কতই না মন্দ হয়েছে যে তোমরা শিরক ও অংশীদারিত্বের আকীদায় লিপ্ত হলে। তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ তোমরা ত্বরান্বিত করে নিলে? সে ফলকসমূহ অর্থাৎ তাওরাতের ফলকসমূহ তার প্রভুর খাতিরে ক্রোধ বশতঃ ফেলে দিল ফলে সেগুলো টুকরা হয়ে গেল।

وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخِيْهِ اَىْ بِشَعْرِهِ بِيَمِيْنِهِ وَلِحْيَتِهِ بِشِمَالِهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ ط غَضَبًا قَالَ يَابْنَ اُمَّ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَرَادَ اُمِّىْ وَذِكْرُهَا اَعْطَفُ لِقَلْبِهِ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا قَارَبُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ فَلَا تُشْمِتْ تَفْرَحْ بِىَ الْاَعْدَاءَ بِاِهَانَتِكَ اِيَّاىَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ فِى الْمُؤَاخَذَةِ ـ

আর ক্রোধে স্বীয় ভ্রাতার মাথায় ধরে ডান হাতে তার চুলে ও বাম হাতে তার শ্মশ্রুতে ধরে নিজের দিকে টানিয়া আনল। [ভ্রাতা হারুন] বলল, হে আমার সহোদর! লোকেরা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল, আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলল। সুতরাং اُمَّ এটার مِيْم অক্ষরটি কাসরা ও ফাতাহ উভয় রূপই পঠিত রয়েছে। এটা দ্বারা اِبْنَ اُمِّىْ [আমার মাতার পুত্র] অর্থ বুঝানো হয়েছে। এ স্থানে হযরত মূসার অন্তরে তার প্রতি করুণা উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে বক্তব্যটিকে এভাবে [যার সাথে সম্বন্ধ করে] উল্লেখ করা হয়েছে। كَادُوْا অর্থ প্রায় তারা। আমাকে তুমি অপমান করে আমার সম্পর্কে শত্রুকে হাসাইও না, আনন্দিত করো না। এবং যে সম্প্রদায় গো-বৎসের উপাসনা করে সীমালঙ্ঘন করেছে শাস্তির ক্ষেত্রে তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো না

١٥١. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ مَا صَنَعْتُ بِاَخِىْ وَلِاَخِىْ اَشْرِكْهُ فِى الدُّعَاءِ اِرْضَاءً لَهُ وَدَفْعًا لِلشَّمَاتَةِ بِهِ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

১৫১. মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আমার ভ্রাতার সাথে যে আচরণ করেছি সেই অপরাধ ক্ষমা করে দাও এবং আমার ভ্রাতাকেও ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। আর তুমিই সকল দয়ালুর দয়ালু। ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করার এবং তার সম্পর্কে শত্রুদের আনন্দকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) এ দোয়ার মধ্যে তাকেও শামিল করে নিয়েছিলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حُلِيِّهِمْ : حُلِىٌّ শব্দটি حَلْىٌ-এর বহুবচন, যেমন ثَدْى শব্দটি ثُدِىٌّ-এর বহুবচন। حُلِىٌّ মূলে ছিল حُلُوْىٌ এখানে وَاو এবং يَاء একত্রিত হওয়ায় وَاو-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে يَاء-কে يَاء-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর يَاء-এর মুনাসাবাতের কারণে لَام-এর পেশকে كَسْرَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় حُلِىٌّ হয়েছে।

قَوْلُهُ صَاغَهُ لَهُمْ مِنْهُ السَّامِرِىُّ : এখানে سَامِرِىُّ হলো صَاغَ-এর ফায়েল আর ه যমীর عِجْلًا-এর দিকে ফিরেছে। আর لَهُمْ-এর যমীর قَوْمٌ-এর দিকে ফিরেছে আর مِنْهُ-এর যমীর স্বর্ণালঙ্কারের দিকে ফিরেছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, সামেরী স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা সম্প্রদায়ের জন্য একটি গো-বৎস / বাছুর বানিয়ে দিল।

সতর্কীকরণ : জালালাইনের কপিতে صَاغَهُ-এর পরিবর্তে صَاغَهُمْ রয়েছে যা কলমের পদস্খলন বলে মনে হয়। তবে ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা-এর পক্ষ থেকে মুদ্রিত জালালাইনের কপিতে সেই ভুলটি সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ جَسَدًا بَدَلٌ : প্রশ্ন. عِجْلًا-এর بَدَل টা جَسَدًا নেওয়ার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. এর দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে। আর তা হলো হতে পারে عِجْلٌ نَقْشٌ عَلَى الْحَائِطِ তথা দেয়ালে বাছুরের ছবি এঁকে দিয়েছিল। আর যখন তার بَدَل হিসেবে جَسَدًا চলে আসল তখন বুঝা গেল যে, সে গো-বৎসের পুতুল বানিয়েছিল, দেয়ালে অঙ্কন করেনি।

قَوْلُهُ لَحْمًا وَدَمًا : এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই গো-বৎস প্রকৃত গো-বৎসের মতোই রক্ত মাংস ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তবে এই তাফসীর টি ... فَجْ

قَوْلُهُ مَفْعُوْلُ اِتَّخَذَ الثَّانِىْ اَىْ اِلٰهًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِتَّخَذَ টা صَنَعَ অর্থে হয়নি যে, এক মাফউলের উপর সীমাবদ্ধকরণ বৈধ হবে। কেননা مُطْلَقُ صَنَعَ উহাকে উপাস্য বানানো ব্যতিরেকে উল্লিখিত শাস্তির উপযুক্ত হতে পারে না। কাজেই اَخَذَ -এর দ্বিতীয় মাফউল যা اِلٰهًا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ نَدِمُوْا : سُقِطَ فِىْٓ اَيْدِيْهِمْ বাক পদ্ধতির পরিভাষায় এর অর্থ আসে লজ্জিত হওয়া وَلَمَّا سُقِطَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ نَدِمُوْا [তারা লজ্জিত হলো] تَقُوْلُ الْعَرَبُ لِكُلِّ نَادِمٍ عَلٰى اَمْرٍ ، قَدْ سُقِطَ فِىْ يَدِهٖ

قَوْلُهُ بِئْسَ خِلَافَةً : এ بِئْسَمَا -এর মধ্যে مَا টা نَكِرَةْ-এর تَمْيِيْز হয়েছে।

قَوْلُهُ خَلَفْتُمُوْنِىْ هَا : প্রশ্ন. هَ উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর. এটা ঐ সংশয়ের নিরসন যে, مَا টা হয়তো مَوْصُوْلَهْ বা مَوْصُوْفَهْ আর خَلَفْتُمُوْنِىْ তার صِلَهْ বা صِفَتْ অথচ صِلَهْ এবং صِفَتْ যখন বাক্য হয় তখন عَائِدْ হওয়া জরুরি হয়। هَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَائِدْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَافَتُكُمْ هٰذِهٖ : এটা مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ غَضَبًا لِرَبِّهٖ : এটা غَضَبْ নিষিদ্ধ থেকে ওজর পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ مُطْلَقُ غَضَبْ নিষিদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জন্য عَدَاوَتْ বা শত্রুতা প্রিয়। বলা হয়েছে- اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা।

قَوْلُهُ ذِكْرُهَا اَعْطَفُ لِقَلْبِهٖ : এটা ঐ প্রশ্নের উত্তর যে, يَا ابْنَ اُمَّ দ্বারা বুঝা যায় হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর প্রকৃত ভাই নয়, অথচ তাঁরা উভয়েই আপন ভাই।

এর জবাব হচ্ছে যে, মায়ের ছেলে বলাটা হৃদয়কে অধিক নরমকারী, এর বিপরীতটির চেয়ে। অর্থাৎ يَا ابْنَ اَبِىْ বলার চেয়ে يَا ابْنَ اُمَّ বলার মধ্যে অধিক নৈকট্যতা ও স্নেহপরায়ণতা বুঝা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী রুকূতে বর্ণিত হয়েছে, বনী ইসরাঈল যখন ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত লাভের পর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন একদল লোককে মূর্তি পূজা করতে দেখে তারা বলেছিল- اِجْعَلْ لَنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ "আমাদের জন্যও একটি দেবতা তৈরি করুন যেমন তাদের জন্য রয়েছে দেবতা।" এটি ছিল তাদের মূর্খতাপূর্ণ অন্যায় আবদার। আলোচ্য আয়াতেও বনী ইসরাঈলের এমনি একটি অন্যায় আচরণের উল্লেখ রয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ১২. পৃ. ২৪]

হযরত মূসা (আ.) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে গিয়ে ধ্যানে বসলেন এবং ইতঃপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল, সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব; সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী ইসরাঈলের লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলঙ্কারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলঙ্কারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে; কাজেই এগুলো তোমাদের জন্য হালাল নয়। কারণ তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনী ইসরাঈলরা তার কথামতো সমস্ত অলঙ্কার তার কাছে [সামেরীর কাছে] এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরি করল এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনারূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে মাটি তাতে মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভেতর থেকে গাভীর মতো হাম্বা রব বেরোতে লাগল। এক্ষেত্রে عِجْلًا শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাচিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বনী ইসরাঈলদের কুফরির প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। হযরত মূসা (আ.) তো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তুর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ [নাউযুবিল্লাহ] সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে গেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনী ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং গাভীকে আল্লাহ মনে করে তারই উপাসনা-ইবাদতে প্রবৃত্ত হলো।

উল্লিখিত তিনটি আয়াতে এ বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অন্যত্র বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সতর্কীকরণের পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বনী ইসরাঈলদের তওবার কথা বলা হয়েছে। এতে আরবি প্রবাদ অনুযায়ী سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ অর্থ হচ্ছে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।

পঞ্চম আয়াতে এ ঘটনারই বিস্তারিত বর্ণনা যে, হযরত মূসা (আ.) যখন কূহে-তূর থেকে তাওরাত নিয়ে ফিরে এলেন এবং নিজের সম্প্রদায়কে বাছুরের পূজায় লিপ্ত দেখতে পেলেন, তখন তাঁর রাগের সীমা রইল না। আল্লাহ তা'আলা যদিও ইসরাঈলীদের এ গোমরাহির কথা কূহে-তূরেই ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শোনা এবং দেখার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। কাজেই তাদের এহেন গোমরাহি এবং বাছুরের পূজাপাঠ সচক্ষে দেখার পর অধিকতর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

তিনি প্রথমে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন- بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْ بَعْدِىْ অর্থাৎ তোমরা আমার অবর্তমানে এটা একান্তই মূর্খজনোচিত কাজ করেছ। اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নির্দেশ আনার চেয়েও তাড়াহুড়া করলে? অর্থাৎ অন্তত আল্লাহর কিতাব তাওরাতের আসা পর্যন্তই না হয় অপেক্ষা করতে তোমরা তার চেয়েও তাড়াহুড়া করে এহেন গোমরাহি অবলম্বন করে নিলে? এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো মুফাসসির এ বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন যে, তোমরা তাড়াহুড়া করে কি এটাই সাব্যস্ত করে নিলে যে, আমার মৃত্যু ঘটে গেছে?

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি এগিয়ে গেলেন যে, তাঁকে যখন নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এই গোমরাহির সময় কেন বাধা দিলেন না? তাঁকে ধরার জন্য হাত খালি করার প্রয়োজন হলে তাওরাতের তখতীগুলো যা হাতে করে নিয়েই এসেছিলেন, তড়িঘড়ি রেখে দিলেন। কুরআন মাজীদ এ কথাটিই এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ - اِلْقَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ- ফেলে দেওয়া। আর اَلْوَاحٌ হলো لَوْحٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো তখতী। এখানে اِلْقَاءٌ শব্দে সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.) হয়তো রাগের বশে তওরাতের তখতীসমূহের অমর্যাদা করে ফেলে দিয়ে থাকবেন।

কিন্তু একথা সবারই জানা যে, তাওরাতের তখতীসমূহকে অমর্যাদা করে ফেলে দেওয়া মহাপাপ। পক্ষান্তরে সমস্ত নবী রাসূল (আ.) যাবতীয় পাপ থেকে পবিত্র ও মা'সূম। কাজেই এক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম হলো এই যে, আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত হারূন (আ.)-কে ধরার জন্য হাত খালি করা। আর রাগান্বিত অবস্থায় তাড়াতাড়ি সেগুলোকে যেভাবে রাখলেন, তা দেখে আপাতত দৃষ্টিতে মনে হলো যেমন সেগুলোকে বুঝি ফেলেই দিয়েছেন। কুরআন মাজীদ একেই সতর্কতার উদ্দেশ্যে ফেলে দেওয়া শব্দে উল্লেখ করেছে। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

তারপর এ ধারণাবশত হযরত হারূন (আ.)-কে মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন যে, হয়তো তিনি প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে থাকবেন। তখন হযরত হারূন (আ.) বললেন, ভাই এক্ষেত্রে আমার কোনো দোষ নেই। সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কথার কোনোই গুরুত্ব দেয়নি। আমার কথা তারা শোনেনি। বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। কাজেই আমার সাথে এমন ব্যবহার করবেন না, যাতে আমার শত্রুরা খুশি হতে পারে। আর আমাকে এ পথভ্রষ্টদের সাথে রয়েছি বলেও ভাববেন না। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর রাগ পড়ে গেল এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন- رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার ভাইকেও ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের আপনার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যে সমস্ত করুণাকারীর মধ্যে সবচেয়ে মহান করুণাময়।

এখানে স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ.)-এর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা হয়তো এ জন্য করলেন যে, হয়তো বা সম্প্রদায়কে তাদের গোমরাহি থেকে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। আর নিজের জন্য হয়তো এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে তাওরাতের তখতীগুলোকে এমনভাবে রেখে দেওয়া, যাকে কুরআন মাজীদ 'ফেলে দেওয়া' শব্দে উল্লেখ করে তা ভুল হয়েছে বলে সতর্ক করেছে- তারই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। অথবা এটা প্রার্থনারই একটা রীতি যে, অন্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করার সময় নিজেকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় যাতে এমন বোঝা না যায় যে, নিজকে দোয়ার মুখাপেক্ষী মনে করা হয়নি।

অনুবাদ :

١٥٢. قَالَ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ إِلٰهًا سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ عَذَابٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعُذِّبُوْا بِالْأَمْرِ بِقَتْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنٰهُمْ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ عَلَى اللّٰهِ بِالْإِشْرَاكِ وَغَيْرِهِ.

১৫২. বলেন, যারা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ শাস্তি ও লাঞ্ছনা আপতিত হবে অনন্তর নিজেদেরকে [অপরাধীর নিকটতম আত্মীয়দের] নিজেরাই হত্যা করার নির্দেশের মাধ্যমে এবং কিয়ামত পর্যন্তের জন্য এদের উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননার মোহর করার মাধ্যমে দুনিয়াতেই তারা সাজা লাভ করে। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে এদেরকে আমি প্রতিফল দিয়েছি সেভাবে শিরক ইত্যাদি আরোপ করত যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

١٥٣. وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا رَجَعُوْا عَنْهَا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا أَيِ التَّوْبَةِ لَغَفُوْرٌ لَّهُمْ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

১৫৩. যারা অসৎ কাজ করে পরে তওবা করে অর্থাৎ তা হতে ফিরে যায় ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে অতঃপর অর্থাৎ এ তওবার পর তোমার প্রতিপালক তো তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

١٥٤. وَلَمَّا سَكَتَ سَكَنَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ج الَّتِيْ أَلْقَاهَا وَفِيْ نُسْخَتِهَا أَيْ مَا نُسِخَ فِيْهَا أَيْ كُتِبَ هُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ يَخَافُوْنَ وَأَدْخَلَ اللَّامَ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لِتَقَدُّمِهِ.

১৫৪. যখন মূসা হতে তা নীরব হলো তখন সে ফলগুলো অর্থাৎ তার ক্রোধ প্রশমিত হলে যে ফলকগুলো ফেলে দিয়েছিল তা তুলে নিল। তার লিপিতে ছিল অর্থাৎ তাতে লিখিত ছিল যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রহমত ও গোমরাহি থেকে হেদায়েতের কথা يَرْهَبُوْنَ অর্থ, ভয় করে। لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ এ স্থানে يَرْهَبُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل অর্থাৎ কার্যপদ যে পূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় এটার [رَبِّهِمْ] পূর্বে رَبِّهِمْ ব্যবহার করা হয়েছে।

١٥٥. وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهُ أَيْ مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِيْنَ رَجُلًا مِّمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْلَ بِأَمْرِهِ تَعَالٰى لِمِيْقَاتِنَا أَيْ لِلْوَقْتِ الَّذِيْ وَعَدْنَاهُ بِإِتْيَانِهِمْ فِيْهِ لِيَعْتَذِرُوْا مِنْ عِبَادَةِ أَصْحَابِهِمُ الْعِجْلَ فَخَرَجَ بِهِمْ.

১৫৫. মূসা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তার সম্প্রদায়কে অর্থাৎ তার সম্প্রদায় হতে- قَوْمَهُ -এর পূর্বে একটি مِنْ উহ্য রয়েছে। তাফসীরে مِنْ قَوْمِه উল্লেখ করে ঐদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা গো-বৎস পূজায় শরিক হয়নি এমন সত্তরজন লোককে স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের কর্তৃক গো-বৎস পূজা সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমার নির্ধারিত সময়ে যে সময়ে উপস্থিত হতে আমি তার সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম সেই সময়ে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। অনন্তর তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হলেন

فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ قَالَ ابْنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رض لِاَنَّهُمْ لَمْ يُزَايِلُوْا قَوْمَهُمْ حِيْنَ عَبَدُوْا الْعِجْلَ قَالَ وَهُمْ غَيْرُ الَّذِيْنَ سَأَلُوْا الرُّؤْيَةَ وَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ قَالَ مُوْسٰى رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ خُرُوْجِىْ بِهِمْ لِيُعَايِنَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ ذٰلِكَ وَلَا يَتَّهِمُوْنِىْ وَاِيَّاىَ ط اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ج اِسْتِفْهَامُ اِسْتِعْطَافٍ اَىْ لَا تُعَذِّبْنَا بِذَنْبِ غَيْرِنَا اِنْ مَا هِىَ اَىِ الْفِتْنَةُ الَّتِىْ وَقَعَتْ فِيْهَا السُّفَهَآءُ اِلَّا فِتْنَتُكَ ط اِبْتِلَاؤُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ اِضْلَالَهُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَآءُ ط هِدَايَتَهُ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ـ

তারা যখন ভূ-কম্পন দ্বারা আক্রান্ত হলো। اَلرَّجْفَةُ তথা ভীষণ ভূমিকম্প। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণ হলো, তাদের স্বসম্প্রদায় যখন গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল তখন তারা তাদেরকে বাধা প্রধান করেনি ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকর্ম হতে নিষেধের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়নি। আরো বলেন, যারা আল্লাহকে চাক্ষুষ দর্শনের দাবি করেছিল এবং পরিণামে যাদেরকে বজ্র হুংকারের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল এরা তারা ছিল না। এরা ছিল অন্য এক দল। তখন মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই অর্থাৎ এদের নিয়ে আমার বের হওয়ার পূর্বেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে আর তখন ইসরাঈলী গোত্রের বাকিরাও তা প্রত্যক্ষ করত, ফলে তারা আমাকে আর কোনোরূপ দোষারোপ করতে পারত না। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তাদের কর্মের জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? اَتُهْلِكُنَا এ স্থানে اِسْتِعْطَافٌ বা করুণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশ্নোবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মেহেরবানি পূর্বক তুমি আমাদের পাপের কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিও না। এটা অর্থাৎ নির্বোধগণ যে ফিতনায় লিপ্ত হয়েছে তা তো তোমার একটি পরীক্ষা। اِلَّا فِتْنَتُكَ এ স্থানে فِتْنَةٌ শব্দটির অর্থ পরীক্ষা। এটা দ্বারা যাকে বিপথগামী করার ইচ্ছা তাকে বিপথগামী কর এবং যাকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর। আমাদের প্রতি দয়া কর। আর ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

١٥٦. وَاكْتُبْ اَوْجِبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً اِنَّا هُدْنَا تُبْنَا اِلَيْكَ ط قَالَ تَعَالٰى عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ج تَعْذِيْبَهُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ عَمَّتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فِى الدُّنْيَا فَسَاَكْتُبُهَا فِى الْاٰخِرَةِ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

১৫৬. আমাদের জন্য লিখিয়ে দাও নির্ধারণ করে দাও ইহকালের কল্যাণ ও পরকালেরও কল্যাণ আমরা তোমার দিকেই প্রদর্শিত হয়েছি। তওবা করতে প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার শাস্তি যাকে আমি শাস্তি দানের ইচ্ছা করি, দিয়ে থাকি; আর আমার দয়া-সে তো ইহজগতে প্রত্যেক বস্তুতে বিস্তৃত ব্যাপ্ত। আমি শীঘ্রই অর্থাৎ পরকালে তা নির্ধারিত করব তাদের জন্য যারা তাকওয়া গ্রহণ করে, জাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

١٥٧. اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ مُحَمَّدًا ﷺ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز بِاِسْمِهِ وَصِفَتِهِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ مِمَّا حُرِّمَ فِيْ شَرْعِهِمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ ثِقْلَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الشَّدَائِدَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ء كَقَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَقَطْعِ اَثَرِ النَّجَسَةِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ مِنْهُمْ وَعَزَّرُوْهُ وَقَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اَيِ الْقُرْاٰنَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

১৫৭. যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক নিরক্ষর রাসূলের অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ -এর যার নাম ও গুণাবলিসহ উল্লেখ তাদের নিকটস্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে তারা লিপিবদ্ধ পায়। যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করেন। যে সমস্ত পবিত্র বস্তু তাদের শরিয়তে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি বৈধ করেন এবং অপবিত্র ও ঘৃণ্য বস্তু যেমন মৃত শব ইত্যাদি অবৈধ করেন এবং যিনি তাদের ভার ও যে সমস্ত বন্ধন অর্থাৎ কঠোর বিধান তাদের উপর ছিল তা যেমন তওবার ক্ষেত্রে নিজেকে হত্যা করা, অপবিত্র জিনিস লাগলে সেই স্থানটিকে কেটে ফেলা ইত্যাদির বিধান লাঘব করেন। সুতরাং এদের মধ্য হতে যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তার শক্তি যোগায় অর্থাৎ তার সম্মান করে ও তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে আলো অবতীর্ণ হয়েছে তার অর্থাৎ আল-কুরআনের অনুসরণ করে তারাই সফলকাম। اِصْرَهُمْ অর্থ তাদের ভার, বোঝা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا نُسِخَ فِيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মাসদারটা মাফঊলের অর্থে হয়েছে। যেমন خُطْبَةٌ-এর অর্থ হলো مَخْطُوْبٌ কাজেই অর্থ ঠিক রয়েছে।

قَوْلُهُ كُتِبَ : অর্থ সুনির্দিষ্টকরণার্থে এ শব্দের প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। কেননা نُسِخَ-এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন– উঠানো, মিটানো, পরিবর্তন করা, স্থানান্তর করা। এখানে লেখার অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاُدْخِلَ اللَّامُ عَلَى الْمَفْعُوْلِ : এ বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দান কল্পে এসেছে। প্রশ্ন হলো, رَهْبٌ ফে'লটি নিজে নিজেই مُتَعَدِّيْ হয়। কাজেই তার মাফঊলের উপর لَامْ প্রবিষ্ট করার কোনোই প্রয়োজন নেই। অথচ এখানে তার মাফঊল তথা لِرَبِّهِمْ-এর উপর لَامْ প্রবিষ্ট হয়েছে।

উত্তর: উত্তরের সার হলো, ফে'লের মাফঊল যখন ফে'লের উপর مُقَدَّمْ হয় তখন ফে'লটি আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে যায়। আর এ কারণেই তার মাফঊলের উপর لَامْ প্রবিষ্ট করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ قَوْمِهِ : এটা একটি আপত্তির জবাব। আপত্তি হলো, اِخْتَارَ হলো لَازِمْ মুতা'আদ্দী বিনাফসিহী নয়, আর اِخْتَارَ-এর মধ্যে مُتَعَدِّيْ بِنَفْسِهِ ব্যবহৃত হয়েছে مِنْ قَوْمِهِ বলে তার জবাব দিয়েছেন যে, এটা حَذْف এবং اِيْصَالْ-এর অন্তর্গত। হরফে জরকে উহ্য করে ফে'লকে قَوْم-এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছে এবং এ পদ্ধতি যা শুধুমাত্র কয়েকটি ফে'লের মধ্যে পাওয়া গেছে। সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত হলো– اِخْتَارَ، اَمَرَ، زَوَّجَ ، اِسْتَغْفَرَ، صَدَقَ، عَادَ، اَنْبَاَ

قَوْلُهُ وَاِيَّايَ : এর আতফ হয়েছে اَهْلَكْتَهُمْ-এর هُمْ যমীরের উপর।

قَوْلُهُ تُبْنَا : মুফাসসির (র.) هُدْنَا -এর তাফসীর تُبْنَا দ্বারা করে বলে দিয়েছেন যে, هُدْنَا এটা هَادَ يَهُوْدُ থেকে নির্গত, যার অর্থ ফিরে আসা, তওবা করা। هَدٰى يَهْدِيْ هِدَايَةً নয়। যার অর্থ বুঝানো, দেখানো, পথ প্রদর্শন করা।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ : এতে তিনটি তারকীব রয়েছে–

প্রথম : اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ হলো মুবতাদা, يَأْمُرُهُمْ হলো তার খবর

দ্বিতীয় : اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হবে– هُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

তৃতীয় : اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ এটা اَلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ থেকে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এটা সূরা আ'রাফের ১৯তম রুকূ'। এ রুকূ'র প্রথম আয়াতে গোবৎসের উপাসনাকারী এবং তারই উপর যারা স্থির ছিল সেসব বনী ইসরাঈলের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গজবের সম্মুখীন হতে হবে, যার পরে আর পরিত্রাণের কোনো জায়গা নেই। তদুপরি পার্থিব জীবনে তাদের ভাগ্যে জুটবে অপমান ও লাঞ্ছনা।

কোনো কোনো পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় : সামেরী ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ-অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে হযরত মূসা (আ.) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে। সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিভাবে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোনো মানুষ তার সংস্পর্শে আসত না।

তাফসীরে-কুরতুবীতে হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর এমন আজাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত। –[তাফসীরে কুরতুবী]

তাফসীরে রূহুল বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধরদের মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে– وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হযরত সুফাইয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র.) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিদ'আত অবলম্বন করে [অর্থাৎ ধর্মে কোনো রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,] তারাও আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে। –[তাফসীরে মাযহারী]

ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করে বলেছেন যে, ধর্মীয় ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তওবা করে নিয়েছেন এবং তওবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কঠোরতার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে। তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এ হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, সেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরিও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবি অনুসারী নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোনো পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর রাগ যখন প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তাওরাতের তখতীগুলো আবার উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহ ত'আলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য সে 'সংকলন' -এ হেদায়েত ও রহমত ছিল। نُسْخَة বা 'সংকলন' বলা হয় সে লেখাকে যা কোনো গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাগের মাথায় যখন তাওরাতের তখতীগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো কিছুতে লেখা [illegible] 'নোসখা' বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্তরজন বনী ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা : চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহর কিতাব তওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদের দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুতার দরুন বলতে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহরই কালাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। হযরত মূসা (আ.) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদের তূরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কালাম শুনিয়ে দেব। তাহলেই বিষয়টিই তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ.) তাদের মধ্যে থেকে সত্তরজনকে নির্বাচিত করে তূরে নিয়ে গেলেন। ওয়াদা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহর কালামও শুনল। এ প্রমাণও যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তখন তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহরই না অন্য কারও! আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহকে যখন প্রকাশ্যে আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবি যেহেতু একান্তই হঠকারিতা ও মূর্খতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাএদর উপর ঐশী রোষাণল বর্ষিত হলো। ফলে, তাদের নিচের দিক থেকে এল ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হলো বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যত মৃতে পরিণত হলো। এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাকারায় এক্ষেত্রে صَاعِقَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رَجْفَة। 'সায়েকা' অর্থ বজ্র গর্জন। আর 'রাজফাহ' অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

যাহোক, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃত্যুর মতো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যত মৃত বলেই মনে হতে পারে। এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কারণ একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা [বুদ্ধিজীবী] লোক, দ্বিতীয়ত জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছেন। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ঘাৎ হত্যা করবে। সেজন্যই তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া পরওয়ারদিগার, আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ তাই যদি হতো, তবে ইতঃপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত, ফেরাউনের সাথে তাদের সলিল সমাধি হতে পারত, কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেওয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া উদ্দেশ্যে নয়; বরং উদ্দেশ্যে হলো শাস্তি দেওয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ই-বা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! এ ক্ষেত্রে 'নিজেকে নিজে ধ্বংস করা' এ জন্য বলা হয়েছে যে, এ সত্তরজনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে হযরত মূসা (আ.)-এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন এই যে, আমি জানি, এটা একান্তই আপনার পরীক্ষা, যাতে আপনি কোনো কোনো লোককে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার না-শোকর বা কৃতঘ্ন হয়ে উঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহকে উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট! তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক- আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুত [এ প্রার্থনার পর] তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, এই সত্তরজন লোক, যাদের অলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে এরা أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً [আল্লাহকে আমরা প্রকাশ্যে দেখতে চাই]-এর নিবেদনকারী ছিল না, যারা বজ্র গর্জনের দরুন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এরা ছিল সেইসব লোক, যারা গো-বৎসের উপাসনায় নিজেরা অংশগ্রহণ না করলেও জাতি বা সম্প্রদায়কে তা থেকে বিরত রাখারও চেষ্টা করেনি। এরই শাস্তি হিসাবে তাদের উপর নেমে এসেছে বজ্র গর্জন যার দরুন তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল। যাহোক, এরা সবাই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনায় পুনরায় জীবিত হয়ে উঠে।

পঞ্চম আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সে দোয়ার উপসংহারে উল্লেখ করা হয়েছে- وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এই পার্থিব জীবনেও আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন। কারণ আমরা আপনার প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্য সহকারে ফিরে আসছি

এরই প্রতিউত্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন– عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِنَا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ হে মূসা (আ.)! একে তো আমার করুণা ও রহমত সাধারণভাবেই আমার গজব বা রোষানলের অগ্রবর্তী, কাজেই আমি আমার আজাব ও গজব শুধুমাত্র তাদের উপরই আরোপিত করে থাকি, যার উপর ইচ্ছা করি, যদিও সব কাফের বা কৃতঘ্নই এর যোগ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তথাপি সবাইকে এ আজাবে পতিত করি না, বরং তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লোকদের উপরই আজাব আরোপ করি, যারা একান্তভাবেই চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য অবলম্বন করে। পক্ষান্তরে আমার রহমত এমনই ব্যাপক যে, তা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকেই পরিবেষ্টিত, অথচ তাদের মধ্যেও বহু লোক রয়েছে, যারা এর যোগ্য নয়; যেমন, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্ট-না-ফরমান। কিন্তু তাদের প্রতিও আমার একরকম রহমত রয়েছে, তা যদিও দুনিয়ার জন্য। কাজেই আমার রহমত অযোগ্যদের জন্যও ব্যাপক। তবে এ রহমত পরিপূর্ণভাবে তাদেরই জন্য নিশ্চিতভাবে লিখে দেব, যারা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যেমন এর যোগ্য তেমনিভাবে আনুগত্যও পোষণ করে; তারা আল্লাহকে ভয় করে, জাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। এরা তো প্রথমাবস্থাতেই রহমতের অধিকারী। কাজেই আপনাকে আপনার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলার এ প্রতিউত্তরের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরীন মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তার কারণ, এ ক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাষায় দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে বলা হয়নি, যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে– قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ অর্থাৎ হে মূসা (আ.) আপনার প্রার্থনা পূরণ করে দেওয়া হলো। আর অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে– أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ হে মূসা (আ.) তোমাদের উভয়ের দোয়াই গৃহীত হয়েছে। এভাবে আলোচ্য ক্ষেত্রেও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়নি। সে জন্য কোনো কোনো মনীষী এ আয়াতের এ মর্মই সাব্যস্ত করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা যদিও তার উম্মতের বেলায় গৃহীত হয়নি, কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতের জন্য গৃহীত হয়েছে যার আলোচনা পরবর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আসবে। কিন্তু তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ সম্ভাবনাকে অসম্ভব বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে বর্ণিত প্রতিউত্তরের সঠিক বিশ্লেষণ এই যে, হযরত মূসা (আ.) যে প্রার্থনা করেছিলেন, তার দুটি অংশ ছিল। একটি হলো এই যে, যাদের প্রতি আজাব ও অভিসম্পাত হয়েছিল তাদের প্রতি ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা হোক। আর দ্বিতীয় দিকটি ছিল এই যে, আমার ও আমার সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ পরিপূর্ণভাবে লিখে দেওয়া হোক। প্রথম অংশের প্রতিউত্তর এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় অংশের প্রতিউত্তর দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক পাপের জন্য শাস্তি না দেওয়াই আমার রীতি। অবশ্য [চরম ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার দরুন] শুধু তাদেরকেই শাস্তি দেই, যাদেরকে একান্তভাবেই শাস্তি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে রইল রহমতের ব্যাপার। আমার রহমত তো সব কিছুতেই ব্যাপক তা সে মানুষ হোক বা অমানুষ, মু'মিন হোক বা কাফের, অনুগত হোক বা কৃতঘ্ন এমনকি পৃথিবীতে যাদেরকে কোনো শাস্তি ও কষ্টের সম্মুখীন করা হয়, তারাও সম্পূর্ণভাবে আমার রহমত বর্জিত হয় না। অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই যে, যেটুকু বিপদে তাকে ফেলা হলো, তার চেয়েও বড় বিপদে ফেলা হয়নি, অথচ আল্লাহ তা'আলার সে ক্ষমতাও ছিল।

মহামান্য ওস্তাদ আন্‌ওয়ার শাহ (র) বলেছেন যে, রহমতের ব্যাপকতর অর্থ হলো যে, রহমতের পরিধি কারো জন্যই সংকুচিত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতিই রহমত হবে– যেমন ইবলীসে-মালউন বলছে যে, আমিও তো একটা বস্তু, আর প্রত্যেকটি বস্তুই যখন রহমতযোগ্য, কাজেই আমিও রহমতের যোগ্য। বস্তুত কুরআন মাজীদের শব্দেই ইঙ্গিত রয়েছে তা বলা হয়নি যে প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিই রহমত করা হবে। বরং বলা হয়েছে, রহমত বা করুণা সংক্রান্ত আল্লাহর গুণ সংকুচিত নয়; অতি প্রশস্ত ও ব্যাপক। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা রহমত করতে পারেন। কুরআন মাজীদের অন্যত্র এর সাক্ষ্য এভাবে দেওয়া হয়েছে– فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُۥ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ অর্থাৎ এরা যদি আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিন যে, তোমাদের প্রতিপালক ব্যাপক রহমতের অধিকারী, কিন্তু যারা অপরাধী তাদের উপর থেকে তার আজাবকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। এখানে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, রহমতের ব্যাপকতা অপরাধীদের আজাব বা শাস্তির পরিপন্থি নয়।

সারকথা, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা সেসব লোকের পক্ষে কোনো রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই কবুল করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে ক্ষমাও করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি রহমতও করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় যে প্রার্থনায় দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ লিখে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছিল, তা কবুল করার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হলো। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো মু'মিন-কাফের নির্বিশেষে সবার প্রতিই ব্যাপকভাবে রহমত হতে পারে, কিন্তু আখেরাত হলো ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের স্থান। সেখানে রহমত লাভের অধিকারী শুধুমাত্র তারাই হতে পারবে, যারা কয়েকটি শর্ত পূরণ করবে। আর তা হলো **প্রথমত** তাদেরকে তাকওয়া ও পরহেজগারি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ শরিয়ত কর্তৃক আরোপিত যাবতীয় কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করবে এবং সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকবে। **দ্বিতীয়ত** তাদেরকে নিজেদের ধনসম্পদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য জাকাত বের করতে হবে। **তৃতীয়ত** আমার সমস্ত আয়াত ও নির্দেশসমূহের প্রতি কোনো রকম ব্যতিক্রম বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। বর্তমান আলোচ্য লোকগুলোও যদি এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে নেয়, তাহলে তাদের জন্যও দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ লিখে দেওয়া হবে।

কিন্তু এর পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরিপূর্ণভাবে এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তারাই, যারা এদের পরবর্তী যুগে আসবে ও উম্মীনবী'র অনুসরণ করবে এবং তার ফলে তারা পরিপূর্ণ কল্যাণের অধিকারী হবে।

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, যখন رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন ইবলীস বলল, আমিও এ রহমতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তী বাক্যেই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, পরকালীন রহমত ঈমান প্রভৃতি শর্তসাপেক্ষ। এ কথা শুনে ইবলীস নিরাশ হয়ে পড়ল। কিন্তু ইহুদি ও নাসারারা দাবি করল যে, আমাদের মধ্যে তো এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। অর্থাৎ পরহেজগারি, জাকাত দান এবং ঈমান। কিন্তু এর পরেই যখন নবীয়ে উম্মী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা হলো, তখন তাতে সে সমস্ত ইহুদি-খ্রিস্টান পৃথক হয়ে গেল, যারা মহানবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি। যাহোক, অনন্য এ বর্ণনাভঙ্গির ভেতর দিয়েই হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া মঞ্জুরির বিষয়টিও আলোচিত হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে মহানবী ﷺ -এর উম্মতদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হলো।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الخ : খাতিমুন্নাবিয়্যীন মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণত আল্লাহর রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয়-সামগ্রীতে ব্যাপক। আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নিয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া-পরহেজগারি ও জাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, উল্লিখিত শর্তসমূহের যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর যথাযথ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনেই নয় বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে শরিয়ত ও সুন্নাহর আনুগত্য-অনুসরণও একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ اَلرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ : এখানে মহানবী ﷺ -এর পদবি 'রাসূল' ও 'নবী'-এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। اُمِّيٌّ [উম্মী] শব্দের অর্থ হলো নিরক্ষর। যে লেখাপড়া কোনোটাই জানে না। সাধারণ আরবদের সে কারণেই কুরআন اُمِّيِّيْنَ [উম্মীয়্যীন] বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল; তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কোনো মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়, বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ -এর জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণ-বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কেননা, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোনো লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোনো একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে। যা কোনো প্রথম শ্রেণির বিদ্বেষীও অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী ﷺ -এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সবার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহসা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঝরনাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মতো একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত রাসূল হওয়ার এবং কুরআন মাজীদের আল্লাহর কালাম হওয়ারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

অতএব, উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কোনো প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু মহানবী হুজুরে আকরাম ﷺ -এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ এবং পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো মানুষের জন্য যেমন 'অহংকারী' শব্দটি কোনো প্রশংসাবাচক গুণ নয়; বরং ক্রটি বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এটি বিশেষভাবেই প্রশংসাবাচক সিফত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী ﷺ -এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা [অর্থাৎ ইহুদি নাসারারা] আপনার সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কুরআন মাজীদ এ কথা বলেনি যে, 'আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহে তাতে লেখা পাবে'। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী ﷺ -এর অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করা স্বয়ং হুজুর আকরাম ﷺ -কে দেখারই শামিল। আর এখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বনী ইসরাঈলরা এ দুটি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী ﷺ -এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যাবূর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মূসা (আ.)। এতে তাঁকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার উম্মতের মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী নবী ও খাতিমুল আম্বিয়া আলায়হিসসালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন : বর্তমানকালের তাওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সাধনের ফলে বিশ্বসযোগ্য রয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখান পর্যন্তও তাতে এমন সব বাক্য বর্ণনা রয়েছে যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কুরআন মাজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন এ কথাটি যদি বাস্তবতা বিরোধী হতো, তবে সে যুগের ইহুদি ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে [সহজেই] কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তাওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে উম্মী ﷺ সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদি বা নাসারারা কুরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূলে কারীম ﷺ -এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ।

খাতিমুন্নাবিয়্যীন [সমস্ত নবীর শেষ নবী] ﷺ -এর যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কুরআন মাজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন সচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (র.) 'দালায়েলুন্ নবুয়ত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন যে, কোনো এক ইহুদি বালক নবী করীম ﷺ -এর খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হুজুর ﷺ তার অবস্থা জানার জন্য তশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তিলাওয়াত করছে। হুজুর ﷺ বললেন, হে ইহুদি, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সেই মহান সত্তার, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাজিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি [ছেলেটির পিতা] ভুল বলেছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর হুজুরে আকরাম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার পিতার হাতে দেওয়া হবে না। -[তাফসীরে মাজহারী]

আর হযরত আলী (রা.) বলেন যে, হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নিকট জনৈক ইহুদির কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। হুজুর ﷺ বললেন, এ মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদি কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হুজুর ﷺ বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে– আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হুজুর ﷺ -সেখানেই বসে পড়লেন এবং জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজ সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাজও সেখানেই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন আর ইহুদিকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন, যাতে সে হুজুর ﷺ -কে ছেড়ে

দেয়। হুজুর ﷺ বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীদের বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদি আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হুজুর ﷺ বললেন, "আমার পরওয়ারদিগার কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।" ইহুদি এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল।

ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদি বলল– أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।] এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তাওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কিনা। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি–

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়। তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল। আর এই হলো আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারেন। সে ইহুদি বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ। [বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুন্নবুয়ত' গ্রন্থের বরাত দিয়ে 'তাফসীরে মাযহারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

পূর্ববর্তী আয়াতে মহানবী ﷺ-এর সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের সবিস্তর আলোচনা ছিল যা তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূরে লেখা ছিল। আয়াতে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর কিছু অতিরিক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য আলোচিত হচ্ছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম গুণটি হলো, সৎ কাজের উপদেশ দান ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত করা مَعْرُوْف [মা'রূফ]-এর শব্দার্থ হলো জানাশোনা, প্রচলিত। আর مُنْكَرٌ [মুনকার] অর্থ– অজানা, বহিরাগত, যা চেনা যায় না। এক্ষেত্রে 'মা'রূফ' বলতে সেসব সৎকাজকে বুঝানো হয়েছে, যা ইসলামি শরিয়তে জানাশোনা ও প্রচলিত আর 'মুনকার' বলতে যেসব মন্দ ও অসৎকাজ, যা শরিয়তবহির্ভূত।

এখানে সৎকাজসমূহকে مَعْرُوْف [মা'রূফ] এবং মন্দ ও অন্যায় কাজসমূহকে مُنْكَرٌ [মুনকার] শব্দের মাধ্যমে বুঝাতে গিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দীনে ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকাজ শুধু সেই সমস্ত কাজকেই বলা যাবে, যা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং যা এরূপ হবে না, সেটাকে 'মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ বলা হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (র.) ও তাবেয়ীন (র.) যেসব কাজকে সৎকাজ বলে মনে করেননি, সে সমস্ত কাজ যতই ভালো মনে হোক না কেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে সেগুলো ভালো কাজ নয়। এজন্যই সহী হাদীসসমূহে সে সমস্ত কাজকেই কুসংস্কার ও বিদ'আত সাব্যস্ত করে গোমরাহি বলা হয়েছে। যার শিক্ষা মহানবী ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম কিংবা তাবেয়ীগণের কাছ থেকে আসেনি। আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটির অর্থ হলো এই যে, হুজুর ﷺ মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেবেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ করবেন।

এ গুণটি যদিও সমস্ত নবী (আ.)-এর মধ্যেই ব্যাপক এবং হওয়া উচিতও বটে। কারণ প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে এ কাজের জন্যই পাঠানো হয়েছে যে, তাঁরা মানুষকে সৎকাজের প্রতি পথনির্দেশ করবেন এবং অন্যায় ও মন্দকাজ থেকে বারণ করবেন, কিন্তু এখানে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এর বর্ণনা করাতে সন্ধান দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -কে এ গুণটিতে অন্যান্য নবী-রাসূল অপেক্ষা কিছুটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। আর এ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত হওয়ার কারণ একাধিক। প্রথমত এ কাজের সেই বিশেষ প্রক্রিয়া যাতে প্রতিটি শ্রেণির লোককে তাদের অবস্থার উপযোগী পদ্ধতিতে বুঝানো, যাতে করে প্রতিটি বিষয় তাদের মনে বসে যায়; কোনো বোঝা বলে মনে না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এ বিষয়ে অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার অধিকারী করেছিলেন। আরবের যে মরুবাসীরা উট, আর ছাগল চরানো ছাড়া কিছুই জানত না, তাদের সাথে তিনি তাদের বোধগম্য আলোচনা করতেন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানগত বিষয়কেও এমন সরল-সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন, যাতে অশিক্ষিত মূর্খজনেরও তা হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো অসুবিধা না হয়। আবার অপরদিকে কায়সার ও কিসরা হেন অনারব সম্রাট এবং তাদের পাঠানো বিজ্ঞ ও পণ্ডিত দূতদের সাথে তাদেরই যোগ্য আলোচনা চলত। অথচ সবাই সমানভাবে তার সে আলোচনায় প্রভাবিত

হতো। দ্বিতীয়ত হুজুর ﷺ ও তাঁর বাণীর মাঝে আল্লাহ-প্রদত্ত জনপ্রিয়তা এবং মানব মনের গভীরতম প্রদেশে প্রভাব বিস্তারের একটা মু'জিযাসুলভ ধারা ছিল। বড়র চেয়ে বড় শত্রুও যখন তাঁর বাণী শুনত, তখন প্রভাবিত না হয়ে থাকতে পারত না।

উপরে তাওরাতের উদ্ধৃতিতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন আর বন্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা أَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ [সৎ কাজের নির্দেশ দান] এবং نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ [অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা] -এর জন্য যে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এসব গুণও হয়তো তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, রাসূলে কারীম ﷺ সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন! উদাহরণত পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী ইসরাঈলদের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেওয়া হয়েছিল, মহানবী ﷺ সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ্য ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতীয় হারাম উপায়ের আয় যথা– সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। [আস্‌সিরাজুল-মুনীর] কোনো কোনো মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসকেও পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ মহানবী ﷺ মানুষের উপর থেকে সেই বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল।

"إِصْر" শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা, যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর أَغْلٰلٌ টা غُلٌّ-এর বহুবচন। 'গুল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যা দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

إِصْر ও أَغْلَالٌ অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধিবিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, কাপড় নাপাক হয় গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী ইসরাঈলদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জিহাদ করে গনিমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোনো অঙ্গ দ্বারা কোনো পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সেই অঙ্গটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য ওয়াজিব : কারো হত্যা, চাই তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, খুনের ক্ষতিপূরণের কোনো বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধান যা বনী ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কুরআনে সেগুলোকে "إِصْر" ও "أَغْلَالٌ" বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এসব কঠিন বিধিবিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধিবিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী ﷺ এ বিষয়টিই বলেছেন, আমি তোমাদের একটি সহজ ও সাবলীল শরিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। তাতে না আছে কোনো পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোনো ভয়ভীতি।

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাৎ ধর্ম সহজ। কুরআনে কারীম বলেছে– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। উম্মী নবী ﷺ -এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যর আলোচনার পর বলা হয়েছে– فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী ﷺ -এর প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেওয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কুরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হলো কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। **প্রথমত** মহানবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমান আনা, **দ্বিতীয়ত** তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, **তৃতীয়ত** তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করা এবং **চুতর্থত** কুরআন অনুযায়ী চলা।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য عَزَّرُوْهُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تَعْزِيْرٌ থেকে উদ্ভূত। تَعْزِيْرٌ অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) عَزَّرُوْهُ -এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تَعْزِيْرٌ।

তার অর্থ, যারা মহানবী ﷺ -এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ত্ববোধ-সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারাই হবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম ﷺ -এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সত্তার সাথে। কিন্তু হুজুর ﷺ -এর তিরোধানের পর তাঁর শরিয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবীর সাহায্য-সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কুরআন করীমকে 'নূর' বলে অভিহিত করা হায়েছে। তার কারণ এই যে, 'নূর' বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোনো দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কুরআন করীমও নিজেই আল্লাহর কালাম ও সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালঙ্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোনো উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারগ হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কুরআন করীমের আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কুরআন করীমও ঘোর অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে

কুরআনের সাথে সাথে সুন্নাহর অনুসরণও ফরজ : এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে- يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ - এর প্রথম বাক্যে 'উম্মী নবী'র অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কুরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কুরআন ও সুন্নাহ দুটিরই অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। কারণ উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সুন্নাহর অনুসরণের মাধ্যেমেই সম্ভব হতে পারে।

শুধু রাসূলের অনুসরণেই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং মহব্বত থাকাও ফরজ : উল্লিখিত বাক্য দুটির মাঝে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ শীর্ষক দুটি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত বিধিবিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণত দুনিয়ার শাসকদের বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়; বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার ফলশ্রুতি অর্থাৎ অন্তরে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহত্ত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধিবিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রাসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একেতো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়ত তিনি হলেন প্রেমাস্পদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রাসূলে কারীম ﷺ জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপনকারী একক মহত্ত্বের আধার আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীন ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী ﷺ -এর মাঝে যাবতীয় মহত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্ত্বের দাবি পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল হিসেবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মানব ও হাকেম হিসেবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসেবে তাঁর সাথে গভীরতর প্রেম ও ভালোবাসা রাখতে হবে এবং নবুয়তের ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরজ হওয়াই উচিত। কেননা এছাড়া নবী রাসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের রাসূলে-মকবুল ﷺ সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনুসরণের উপর ক্ষান্ত করেননি বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি-নীতির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতে عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ বাক্যে সেদিকে হেদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ অর্থাৎ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যা তাঁর স্বর হতে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না, অর্থাৎ যদি মজলিসে হুজুর আকরাম ﷺ উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোনো কথা বলো না।

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, হুজুর ﷺ -এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোনো কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কুরআনের একে আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ -কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ; এমনভাবে ডাকবে না, নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে– لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের পরিপন্থি কোনো অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্মও বরবাদ হয়ে যাবে।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী ﷺ -এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে, তবুও তাঁদের অবস্থায় এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যখন মহানবী ﷺ -এর খেদমতে কোনো বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন যেন কোনো গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলেছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এরও। –[শেফা]

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা আমার কোনো প্রিয়জন সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এজন্য অপারগ যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, সাহাবীদের মজলিসে যখন হুজুর আকরাম ﷺ তাশরিফ আনতেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আ'যম (রা.) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন আর তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদিনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে হুজুর ﷺ -এর প্রতি এমন নিবেদিতপ্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল– "আমি কিস্রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজাশীর সাথেও সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবিলায় জয়ী হতে পারবে না।"

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুজুরে আকরাম ﷺ যখন ঘরের ভিতরে অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম বেআদবি মনে করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশি জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী ﷺ -এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে-নববীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা, কোনো ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈঃস্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রা.)-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হুজুরে আকরাম ﷺ -এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন। এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুয়তি ফয়েয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও এ কারণেই তাঁদেরকে আম্বিয়া (আ.)-এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

অনুবাদ :

١٥٨. قُلْ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ الْقُرْاٰنِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ تَرْشُدُوْنَ .

১৫৮. বল এ স্থানে সম্বোধন হলো রাসূল ﷺ -এর প্রতি হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি ও তাঁর নিরক্ষর বার্তাবাহক রাসূলের প্রতি যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহ ও তাঁর বাণী আল-কুরআনের উপর আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও, সঠিক পথে পরিচালিত হতে পার।

١٥٩. وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ جَمَاعَةٌ يَّهْدُوْنَ النَّاسَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ فِى الْحُكْمِ .

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন গোষ্ঠী, এমন দল রয়েছে যারা মানুষকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ফয়সালা দানের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রদর্শন করে।

١٦٠. وَقَطَّعْنٰهُمْ فَرَّقْنَا بَنِىْ اِسْرَاۤءِيْلَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ حَالٌ اَسْبَاطًا بَدَلٌ مِنْهُ اَىْ قَبَائِلَ اُمَمًا ط بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهٗ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗ فِى التِّيْهِ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ج فَضَرَبَهٗ فَانْبَجَسَتْ اِنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ عَيْنًا ط بِعَدَدِ الْاَسْبَاطِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ سِبْطٍ مِنْهُمْ مَّشْرَبَهُمْ ط وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ فِى التِّيْهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط هُمَا التَّرَنْجَبِيْنُ وَالطَّيْرُ السَّمَانٰى بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ .

১৬০. তাদেরকে অর্থাৎ ইসরাঈল বংশীয়দেরকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিচ্ছিন্ন করেছি, বিভক্ত করেছি। اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ এটা এ স্থানে حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। اَسْبَاطًا এটা بَدَلٌ এ স্থানে অর্থ গোত্রসমূহ। اُمَمًا এটা পূর্ববর্তী শব্দ [اَسْبَاطًا] -এর بَدَلٌ মূসার সম্প্রদায় যখন তীহ প্রান্তরে তার নিকট পানি প্রার্থনা করল তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম তোমরা লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর অনন্তর তিনি তাতে আঘাত করলেন ফলে তা হতে তাদের গোত্রসমূহের সংখ্যানুসারে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হলো ফেটে বের হলো। প্রত্যেক মানুষ অর্থাৎ তাদের প্রত্যেক গোত্র স্ব-স্ব পান-স্থান চিনে নিল। এবং তীহ প্রান্তরে মার্তণ্ড তাপ হতে রক্ষার জন্য মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছিলাম; তাদের নিকট মান্ন ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। এ দুটি হলো যথাক্রমে তরানজীন [একপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য] ও সমানী [اَلسَّمَانٰى মীম অক্ষর তাশদীদবিহীন এবং قَصْر অর্থ, হ্রস্বস্বরে পঠিত] পক্ষীবিশেষ। এবং তাদেরকে বলেছিলাম তোমাদেরকে যে সমস্ত পবিত্র জিনিস দিয়েছি তা আহার কর। তারা আমার প্রতি কোনোরূপ জুলুম করেনি কিন্তু তারা নিজেদের উপরই জুলুম করতেছিল।

١٦١. وَ اذْكُرْ اِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا اَمْرُنَا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ اَىْ بَابَ الْقَرْيَةِ سُجَّدًا سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ تَغْفِرْ بِالنُّوْنِ وَبِالتَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ لَكُمْ خَطِيْئٰتِكُمْ ط سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا.

১৬১. আর স্মরণ কর তাদেরকে বলা হয়েছিল এ জনপদে অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে তোমরা বাস কর এবং এর যেথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল আমাদের বিষয় হলো ক্ষমা এবং উক্ত জনপদের দ্বারে নতশিরে নত মস্তকে ঝুঁকে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেব। আনুগত্য পরায়ণতার মাধ্যমে যারা সৎকর্ম করে তাদের ছওয়াব ও পুণ্যফল আরো বৃদ্ধি করে দেব। نَغْفِرْ এটা نُوْن [প্রথম পুরুষ, বহুবচন] এবং কর্মবাচ্য [مَجْهُوْل] রূপে ت [নাম পুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ] সহ পঠিত রয়েছে।

١٦٢. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَقَالُوْا حَبَّةٌ فِىْ شَعْرَةٍ وَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اِسْتَاهِهِمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا عَذَابًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ.

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। তারা বলেছিল, 'গমের দানা' আর নিতম্বের উপর ভর দিয়ে হিঁচড়িয়ে উক্ত নগরীতে তারা প্রবেশ করেছিল। ফলে আমি আকাশ হতে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম যেহেতু তারা সীমালঙ্ঘন করতেছিল। رِجْز অর্থ আজাব, শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا : এখানে جَمِيْعًا এটা اِلَيْكُمْ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ : এটা لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে بَدَلْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَسْبَاطًا بَدَلٌ : এখানে اَسْبَاطًا টা بَدَلْ হয়েছে পূর্ববর্তী اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ থেকে, تَمْيِيْز নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। কেননা দশের উপরের تَمْيِيْز টা مُفْرَدْ হয়ে থাকে

قَوْلُهُ فَضَرَبَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যে সঙ্কোচন বা সংক্ষিপ্তকরণ রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ যখনই পাথরের গায়ে লাঠি মারার নির্দেশ দিলেন তখন তাৎক্ষণিকভাবেই হযরত মূসা (আ.) স্বীয় লাঠি পাথরে মারলেন।

قَوْلُهُ سِبْطٍ مِنْهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা যে, قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলের প্রতিটি ব্যক্তির জন্যই ঝরনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রত্যেকেই স্বীয় ঝরনা নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়

এর উত্তর হলো, اُنَاسٍ দ্বারা বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র উদ্দেশ্য, প্রত্যেক গোত্রই স্বীয় ঝরনা নির্দিষ্ট করে নিল।

قَوْلُهُ وَقُلْنَا لَهُمْ : যদি এ বাক্যকে উহ্য মানা না হয় তবে অকারণেই مُتَكَلِّمْ থেকে غَيْبَتْ-এর দিকে اِلْتِفَاتْ করা আবশ্যক হবে। অথচ এর কোনোই প্রয়োজন নেই। এ اِلْتِفَاتْ থেকে বেঁচে থাকার জন্য قُلْنَا لَهُمْ -কে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ اَمْرُنَا : এখানে اَمْرُنَا-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. قَالَ-এর مَقُوْلْ বাক্য হয়ে থাকে। অথচ এখানে حِطَّةٌ মুফরাদ হয়েছে। এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে।

উত্তর. حِطَّةٌ টি উহ্য মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে مَقُوْل হয়েছে। কাজেই কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু এখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, أَمْرُنَا উহ্য মানার পরিবর্তে مَسْئَلَتُنَا উহ্য মানা উচিত ছিল। কেননা أَمْرُنَا উহ্য মানার সুরতে উহ্য ইবারত হবে- أَمْرُنَا أَنْ نَحُطَّ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ এর অনুবাদ হবে- আমাদের কাজ এ গ্রামে প্রবেশ করা। আগে ক্ষমার উল্লেখ রয়েছে। অথচ গ্রামে প্রবেশ করা এবং ক্ষমার কোনো বন্ধন বুঝা যায় না, কাজেই أَمْرُنَا উহ্য মানার পরিবর্তে مَسْئَلَتُنَا উহ্য মানলে উত্তম হতো। তখন উহ্য ইবারত হতো- مَسْئَلَتُنَا حِطَّةٌ এর অর্থ হবে- আমাদের আবেদন হলো ক্ষমার।

قُوْلُوْا -এর قَائِلْ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা। কাজেই حِطَّةٌ তার مَقُوْلَه হবে। এখন অর্থ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করে বিনয় ও মাথানত করে শাম দেশে প্রবেশ কর তবে আমি তোমাদের পদস্খলনকে ক্ষমা করে দেব। কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ ঐ দিকনির্দেশনাকে আমলে নেয়নি এবং আল্লাহর শেখানো বুলিকে পরিবর্তন করে ফেলল, حِطَّةٌ -এর পরিবর্তে حَبَّةٌ فِيْ شَعِيْرَةٍ এবং মাথানত করে প্রবেশের পরিবর্তে নিতম্ব ঘষতে ঘষতে প্রবেশ করল।

قَوْلُهُ بِالتَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ تَغْفِرْ -এর মধ্যে এক কেরাত تُغْفَرْ মজহুলের সীগাহ দ্বারাও রয়েছে। তবে এ সুরতে خَطِيْئَتُكُمْ নায়েব ফায়েল হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হবে।

قَوْلُهُ يَزْحَفُوْنَ : এটা বাবে فَتَحَ হতে অর্থ হলো- ধীরে ধীরে নিতম্বের কুঞ্চন সরানো।

قَوْلُهُ اِسْتَاهِهِمْ : اِسْتَاهٌ শব্দটি سَتَهٌ -এর বহুবচন, নিতম্বকে বলা হয়।

قَوْلُهُ فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ : تَبْدِيْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটির স্থানে অন্যটি রেখে দেওয়া। تَبْدِيْلْ -এর জন্য দুটি হওয়া জরুরি। তন্মধ্য হতে একটি পরিত্যক্ত হবে। আর দ্বিতীয়টি গৃহীত, যা পরিত্যক্তটির উপরে প্রবিষ্ট হয়। আর مَأْخُوْذ -এর উপর بَاء প্রবেশ করে না, অথবা এভাবে বলতে পার যে, بَدَّلْ শব্দটি দুটির দিকে مُتَعَدِّيْ হয়। একটির দিকে بَاء -এর মাধ্যমে আর অন্যটির প্রতি بَاء বিহীনভাবে। যার উপর بَاء প্রবষ্টি হয় তা পরিত্যক্ত হয়, আর অন্যটি গৃহীত হয়। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বাক্যে কিছু উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الخ : এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি মানুষকে বলে দিন আমি তোমাদের সবার প্রতি নবী রূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুয়ত লাভ ও রিসালত প্রাপ্তি বিগত নবীদের মতো কোনো বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড অথবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। আর মানব জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই নবুয়তের ধারাও সমাপ্ত: নবুয়ত সমাপ্তির এটাই হলো প্রকৃত রহস্য। কারণ মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোনো নবী বা রাসূলের আবির্ভাবের না কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, না তার কোনো অবকাশ আছে। আর এই হলো মহানবীর উম্মতের সে বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম ﷺ -এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট যাবতীয় ফিতনা-ফ্যাসাদের মোকাবিলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তা প্রাপ্ত হবে, যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী ﷺ -এর রিসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত [নায়েব]।

ইমাম রাযী (র.) كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এ উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা না হলে বিশ্বাবাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেওয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (র.) সর্বযুগে ইজমায়ে উম্মত বা মুসলমান জাতির ঐকমত্যকে শরিয়তের দলিল বলে প্রমাণ করেছেন। তার কারণ সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোনো ভুল বিষয় কিংবা কোনো পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতে মাহানবী ﷺ -এর খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ হুজুর ﷺ -এর আবির্ভাব ও রিসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোনো নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুয়ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রবর্তিত শরিয়তের উপরই আমল করবেন। [হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরিয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন।] বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাব এবং তাঁর রিসালত যে কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক, এ আয়াতটি তো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছেই; তাছাড়া কুরআন মাজীদে আরও কতিপয় আয়াত তার প্রমাণ বহন করে। যেমন বলা হয়েছে- وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি এ কুরআন ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে আমি তোমাদের আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি এবং তাদেরকেও ভীতিপ্রদর্শন করি যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছবে আমার পরে। [অর্থাৎ হুজুর ﷺ -এর তিরোধানের পরে।]

মহানবী ﷺ -এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে তাবুকের [তাবুক যুদ্ধের] সময় রাসূলে কারীম ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শত্রুরা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা হুজুর ﷺ -এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হুজুর ﷺ নামাজ শেষ করে ইরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোনো নবী-রাসূলকে দেওয়া হয়নি। তার **একটি হলো এই যে,** আমার রিসালত ও নবুয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। **দ্বিতীয়ত** আমাকে আমার শত্রুর মোকাবিলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। **তৃতীয়ত** কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না; বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হতো। তাদের গনিমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে খাক করে দিয়ে যাবে। **চতুর্থত** আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামাজ যে কোনো জমি, যে কোনো জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোনো বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মতদের ইবাদত শুধু তাদের উপাসনালয়ে হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের নামাজ বা ইবাদত হতো না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোনো রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেওয়াই পবিত্রতা ও অজুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন, **আর পঞ্চমটির** কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো আপনি কোনো একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত لا اله الا الله কালেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহমদ (র.)-এর এক রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদি খ্রিস্টান হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বুখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কোনো এক বিষয়ে মতবিরোধ হওয়াতে হযরত ওমর (রা.) নারাজ হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.)-ও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কিছুতেই রাজি হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী ﷺ -এর দরবারে গিয়ে হাজির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রা.) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে যান এবং তিনিও ঘর থেকে বেরিয়ে মহানবী ﷺ -এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা.) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দোষ আমারই বেশি। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا
তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে, শুধু এই আবূ বকর (রা.)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, প্রতিটি দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী ﷺ -এর ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একাথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হুজুরে আকরাম ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না সে লোক কোনো সাবেক শরিয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোনো ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

আয়াতের শেষাংশে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে পবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, সমস্ত আসমান-জমিন যার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
অর্থাৎ এখন যখন জানা হয়ে গেছে যে, মহানবী ﷺ সমস্ত বিশ্ব-সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত রাসূল, তাঁর আনুগত্য ছাড়া কোনো উপায় নেই, তখন আল্লাহ ও তাঁর সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনাও অপরিহার্য হয়ে গেছে, যিনি নিজেও আল্লাহর উপর এবং তাঁর বাণীসমূহের উপর ঈমান আনেন। আর তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন কর, যাতে তোমরা সঠিক পথে থাকতে পার।

আল্লাহর 'কালেমাত' বা বাণীসমূহ বলার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কিতাব তওরাত, ইঞ্জীল, কুরআন প্রভৃতি আসমানি গ্রন্থ। ঈমানের নির্দেশ দেওয়ার পর আবার আনুগত্যের নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মহানবী ﷺ -এর শরিয়তের আনুগত্য ছাড়া শুধুমাত্র ঈমান আনা কিংবা মৌখিক সত্যায়ন করাই হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছার জন্য নবী করীম ﷺ কর্তৃক বাতলানো পথ ছাড়া অন্য সমস্ত পথই বন্ধ।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল : দ্বিতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচার, কূট তর্ক এবং গোমরাহির বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয় তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালোও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনী ইসরাঈলদের এ সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কুরআন মাজীদে বরংবারই করা হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে- مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্যনিষ্ঠ, সারারাত ধরে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং সেজদা করে। অন্যত্র রয়েছে- الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ যাদেরকে মহানবী ﷺ -এর পূর্বে কিতাব [তওরাত ও ইঞ্জীল] দান করা হয়েছিল, তারা মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনে।

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী ইসরাঈলদের গোমরাহি, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী ইসরাঈলদের বারোটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদিগারে আলম! আমাদের এদের থেকে সরিয়ে কোনো দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন, যাতে আমরা আমাদের দীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে পারি। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দেড়শ বছরের দূরত্বে দূর-প্রাচ্যের কোনো ভূখণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহর মহিমায় তাদের মুসলমান হওয়ার এ ব্যবস্থা হয় যে, মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) হুজুর ﷺ -কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা মহানবী ﷺ -এর উপর ঈমান আনে। রাসূলে করীম ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি মাপ-জোখের কোনো ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল, আমরা জমিতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্তূপীকৃত করে দিই। সেই স্তূপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমতো নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপ-জোখের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল, না। কারণ কেউ যদি তা করে তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবার ঘরবাড়িগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, তা এজন্য যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর হুজুর ﷺ যখন মি'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে এলেন তখন এ আয়াতটি নাজিল হলো- وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ তাফসীরে কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাসীরে একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবত এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ নয়।

যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা হুজুর ﷺ -এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্রই হোক, যাকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর কোনো বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন, যেখানে যাওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। [আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী।]

অনুবাদ :

١٦٣. وَاسْئَلْهُمْ يَا مُحَمَّدُ تَوْبِيْخًا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ مُجَاوِرَةً بَحْرَ الْقُلْزُمِ وَهِىَ اَيْلَةُ مَا وَقَعَ بِاَهْلِهَا اِذْ يَعْدُوْنَ يَعْتَدُوْنَ فِى السَّبْتِ بِصَيْدِ السَّمَكِ الْمَامُوْرِيْنَ بِتَرْكِهٖ فِيْهِ اِذْ ظَرْفٌ لِيَعْدُوْنَ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ظَاهِرَةً عَلَى الْمَاءِ وَّيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَا يُعَظِّمُوْنَ السَّبْتَ اَىْ سَائِرَ الْاَيَّامِ لَا تَاْتِيْهِمْ ج اِبْتِلَاءً مِنَ اللّٰهِ كَذٰلِكَ ج نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ وَلَمَّا صَادُوا السَّمَكَ اِفْتَرَقَتِ الْقَرْيَةُ اَثْلَاثًا ثُلُثٌ صَادُوْا مَعَهُمْ وَثُلُثٌ نَهَوْهُمْ وَثُلُثٌ اَمْسَكُوْا عَنِ الصَّيْدِ وَالنَّهْيِ .

১৬৩. হে মুহাম্মদ! ভর্ৎসনা স্বরূপ তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী বাহরে কুলযুম-ভূমধ্য সাগরের কুলে অবস্থিত জনপদ আয়লা সম্বন্ধে অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীদের কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর। তারা শনিবার সম্বন্ধে অর্থাৎ সেদিন মৎস শিকার বর্জনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা অমান্য করত মৎস্য শিকার পূর্বক সীমালঙ্ঘন করত يَعْدُوْنَ অর্থ সীমালঙ্ঘন করে। اِذْ এটা يَعْدُوْنَ ক্রিয়ার ظَرْف রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। শনিবার উদ্‌যাপনের দিন মাছ প্রকাশ্যে অর্থাৎ পানির উপরে ভেসে তাদের নিকট আসত কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদ্‌যাপন করত না সেদিন যেদিন শনিবারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ছিল না অর্থাৎ সপ্তাহের অন্যান্য দিন আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষা হিসেবে তারা তাদের নিকট আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম যেহেতু তারা অবাধ্যাচরণ করত। নিষেধ অমান্য করে মৎস শিকারে লিপ্ত হলে এরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল তো উক্ত অপরাধে শামিল হলো। আরেক দল তাদেরকে এ কাজ হতে নিষেধ করল। আরেক দল মৎস্য শিকারের অপরাধে লিপ্ত হয়নি বটে তবে অপরাধীদেরকে নিষেধ করার দায়িত্বও পালন করেনি।

١٦٤. وَاِذْ عَطْفٌ عَلٰى اِذْ قَبْلَهٗ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَمْ تَصِدْ وَلَمْ تَنْهَ لِمَنْ نَهٰى لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَا ن اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط قَالُوْا مَوْعِظَتُنَا مَعْذِرَةٌ نَعْتَذِرُ بِهَا اِلٰى رَبِّكُمْ لِئَلَّا نُنْسَبَ اِلٰى تَقْصِيْرٍ فِىْ تَرْكِ النَّهْىِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الصَّيْدَ .

১৬৪. স্মরণ কর, وَاِذْ এটি পূর্ববর্তী اِذْ -এর সাথে عَطْف হয়েছে। তাদের একদল যারা নিজেরা মৎস শিকার করেনি বটে তবে অন্যদেরকে এ কাজ হতে নিষেধও করেনি তারা বলেছিল, আল্লাহ যেই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তারা বলেছিল আমাদের এই সদুপদেশদান তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ খণ্ডনের জন্য অর্থাৎ এটা তাঁর দরবারে আমাদের পক্ষে কৈফিয়ত স্বরূপ হবে। ফলে নিষেধ করা বর্জনের অপরাধ আমাদের উপর আরোপিত হবে না। আর যাতে তারা মৎস শিকার হতে বেঁচে থাক সেজন্য এই উপদেশ দেই।

١٦٥. فَلَمَّا نَسُوْا تَرَكُوْا مَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِهٖ ج فَلَمْ يَرْجِعُوْا اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالْاِعْتِدَاءِ بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ شَدِيْدٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ .

১৬৫. যে শিক্ষা উপদেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হলো পরিত্যাগ করল এবং সত্যের দিকে আর ফিরিয়ে আসল না তখন অসৎ কাজ হতে যারা নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি আর যারা সীমালঙ্ঘন করত নিজেদের উপর জুলুম করেছিল তারা অবাধ্যাচরণ করত বিধায় তাদেরকে আমি মারাত্মক কঠোর শাস্তিতে পাকড়াও করি।

١٦٦. فَلَمَّا عَتَوْا تَكَبَّرُوْا عَنْ تَرْكِ مَا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ صَاغِرِيْنَ فَكَانُوْهَا وَهٰذَا تَفْصِيْلٌ لِمَا قَبْلَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض مَا اَدْرِىْ مَا فُعِلَ بِالْفِرْقَةِ السَّاكِتَةِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَمْ تَهْلِكْ لِاَنَّهَا كَرِهَتْ مَا فَعَلُوْهُ وَقَالَتْ لِمَ تَعِظُوْنَ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ رَجَعَ اِلَيْهِ وَاَعْجَبَهُ.

১৬৬. তারা যখন নিষিদ্ধ কাজে বাড়াবাড়ি করতে লাগল অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার বিষয়ে অহংকার প্রদর্শন করল তখন তাদেরকে বললাম, লাঞ্ছিত ঘৃণিত বানরে পরিণত হও। ফলে তারা তাই হয়ে গেল। فَلَمَّا عَتَوْا এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত [... اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا] -এর বিবরণ স্বরূপ। সুতরাং ف টি বিবরণমূলক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এদের যে দলটি নীরব ছিল তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কি করেছিলেন এই সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইকরিমা বলেন, এদের আজাব দেওয়া হয়নি। কারণ, তারা এ অপরাধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছিল এবং বলেছিল ..... لِمَ تَعِظُوْنَ হাকিম বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পরে ইকরিমার এ অভিমত গ্রহণ করেন এবং এতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

١٦٧. وَاِذْ تَاَذَّنَ اَعْلَمَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اَيِ الْيَهُوْدِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ ط بِالذُّلِّ وَاَخْذِ الْجِزْيَةِ فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَعْدَهُ بُخْتَنَصَّرَ فَقَتَلَهُمْ وَسَبَاهُمْ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ فَكَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلَى الْمَجُوْسِ اِلٰى اَنْ بُعِثَ نَبِيُّنَا ﷺ وَضَرَبَهَا عَلَيْهِمْ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ج لِمَنْ عَصَاهُ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ لِاَهْلِ طَاعَتِهِ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

১৬৭. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন تاذن অর্থ ঘোষণা দিলেন। যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোককে তাদের উপর ইহুদিদের উপর আধিপত্য দেবেন যারা তাদেরকে লাঞ্ছিত পদদলিত এবং তাদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করে কঠিন শাস্তি দেবে। প্রথমত হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। এরপর সম্রাট বুখতনাস্‌সার এসে তাদেরকে বন্দী ও হত্যা করে এবং তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করে। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব পর্যন্ত তারা অগ্নিপূজকদেরও তা প্রদান করে। রাসূল ﷺ ও তাদের উপর জিজিয়া ধার্য করেছিলেন। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অবাধ্যাচারীদেরকে শাস্তিদানে সত্বর এবং আনুগত্যপরায়ণদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু।

١٦٨. وَقَطَّعْنٰهُمْ فَرَّقْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ج فِرَقًا مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ نَاسٌ دُوْنَ ذٰلِكَ ز الْكُفَّارِ وَالْفَاسِقُوْنَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ بِالنِّعَمِ وَالسَّيِّاٰتِ النِّقَمِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ عَنْ فِسْقِهِمْ.

১৬৮. দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে ফেরকায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি, বিভিক্ত করে দিয়েছি। তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং তাদের কতক লোক অন্যরূপ অর্থাৎ কাফের ও অবাধ্যাচারী। মঙ্গল অর্থাৎ নিয়ামত প্রদান করত অমঙ্গল অর্থাৎ আমার শাস্তি ও ক্রোধে নিপতিত করে তাদেরকে আমি পরীক্ষা করি যেন তারা তাদের অবাধ্যাচরণ হতে ফিরে আসে।

١٦٩. فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ عَنْ اٰبَائِهِمْ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى اَىْ حُطَامَ هٰذَا الشَّىْءِ الدَّنِىِّ اَىِ الدُّنْيَا مِنْ حَلَالٍ وَّحَرَامٍ وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ج مَا فَعَلْنَاهُ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ط اَلْجُمْلَةُ حَالٌ اَىْ يَرْجُوْنَ الْمَغْفِرَةَ وَهُمْ عَائِدُوْنَ اِلٰى مَا فَعَلُوْهُ مُصِرُّوْنَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِى التَّوْرٰةِ وَعْدُ الْمَغْفِرَةِ مَعَ الْاِصْرَارِ اَلَمْ يُؤْخَذْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَلْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى فِىْ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا عَطْفٌ عَلٰى يُؤْخَذْ قَرَءُوْا مَا فِيْهِ ط فَلِمَ كَذَبُوْا عَلَيْهِ بِنِسْبَةِ الْمَغْفِرَةِ اِلَيْهِ مَعَ الْاِصْرَارِ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط الْحَرَامَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَنَّهَا خَيْرٌ فَيُؤْثِرُوْهَا عَلَى الدُّنْيَا .

১৬৯. অতঃপর এমন উত্তর পুরুষ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যারা তাদের পিতৃপুরুষদের নিকট হতে কিতাবেরও তাওরাতেরও উত্তরাধিকারী হয়; তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী অর্থাৎ এ ঘৃণিত দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রী হালাল ও হারামের কোনো প্রভেদ না করে গ্রহণ করে। তারা বলে, আমরা যা করি সে বিষয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তার অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আসলে তাও তারা গ্রহণ করে। وَاِنْ يَّاْتِهِمْ এ বাক্যটি এ স্থানে حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমার আশা করে অথচ তারা তাদের ঐ ঘৃণিত কর্মেরই পুনরাবৃত্তি করে তাতে জেদ ধরে থাকে। পাপের পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও তা ক্ষমা করা হবে বলে কোনো প্রতিশ্রুতি তাওরাতে নেই। কিতাবের অর্থাৎ কিতাবের মধ্যে উল্লেখিত অঙ্গীকার কি তাদের নিকট হতে নেওয়া হয়নি যে তারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলবে না? আর তারা তো তাতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে। اَلَمْ يُؤْخَذْ [গ্রহণ করা হয়নি?] এ স্থানে اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ অর্থাৎ বক্তব্যটিকে সুসাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। مِيْثَاقُ-এর এ স্থানে اَلْكِتَابِ-এর প্রতি مِيْثَاقُ-এর اِضَافَةٌ অর্থাৎ সম্বন্ধ فِىْ অর্থবোধক। وَدَرَسُوْا এটা يُؤْخَذْ-এর সাথে عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। অর্থাৎ অধ্যায়ন করে। يَعْقِلُوْنَ-এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষরূপেও পঠিত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা কেমন করে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে যে তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি ও জেদ প্রদর্শনের পরও তা ক্ষমা করে দেবেন! যারা হারাম হতে বেঁচে থাকে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়। তারা কি এটা অর্থাৎ এটা যে শ্রেয় তা অনুধাবন করে না? এবং এটাকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয় না?

١٧٠. وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِالْكِتٰبِ مِنْهُمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ الْجُمْلَةُ خَبَرُ الَّذِيْنَ وَفِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اَىْ اَجْرَهُمْ .

১৭০. এদের মধ্যে যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে يُمَسِّكُوْنَ এটা س অক্ষরে তাশদীদসহ [بَاب تَفْعِيْل] ও تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপেও পঠিত রয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ আমি তো তাদের ন্যায় সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। اِنَّا لَا نُضِيْعُ এ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ-এর خَبَر বা বিধেয়। এ স্থানে সর্বনাম [هُمْ]-এর স্থলে اَلظَّاهِرُ অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বিশেষ্য [اَلْمُصْلِحِيْنَ]-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মূলত ছিল اَجْرَهُمْ অর্থাৎ তাদের শ্রমফল।

১৭১. وَ اذْكُرْ اِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَاهُ مِنْ اَصْلِهِ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَيْقَنُوْا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ج سَاقِطٌ عَلَيْهِمْ بِوَعْدِ اللّٰهِ اِيَّاهُمْ بِوُقُوْعِهِ اِنْ لَمْ يَقْبَلُوْا اَحْكَامَ التَّوْرٰةِ وَكَانُوْا اَبَوْهَا لِثِقْلِهَا فَقَبِلُوْا وَقُلْنَا لَهُمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ بِجِدٍّ وَّاجْتِهَادٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ بِالْعَمَلِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

১৭১. আর স্মরণ কর আমি পর্বতকে যেমন একটি চন্দ্রাতপ সেইভাবে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি। সমূল উৎপাটিত করে তাদের উপর তাকে তুলে ধরি তারা তখন মনে করল তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে তা তাদের উপর পতিত হবে। তাওরাতের বিধানসমূহ কঠোর ও কঠিন ছিল বলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত বিধানসমূহ গ্রহণ না করলে উক্ত পাহাড় তাদের উপর পতিত করবেন বলে হুমকি দেন। এতদনুসারে তা সংঘটিত হয়। অনন্তর তারা তা গ্রহণ করে। আমি তাদেরকে বললাম, আমি তোমাদেরকে যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে চেষ্টা ও শ্রম সহকারে ধারণ কর এবং এতদনুসারে কাজ করত তাতে যা আছে তা স্মরণ কর যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার। وَاقِعٌ بِهِمْ অর্থ, তাদের উপর নিপতিত হবে। بِهِمْ -এর ب টি এ স্থানে عَلٰى [উপর] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ : যেহেতু রাসূল ﷺ গ্রামবাসী সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই عِلْم-এর জন্য প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য ছিল না, এ কারণেই এ প্রশ্নকে سُؤَال تَوْبِيْخ এবং تَقْرِيْع বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ : অর্থাৎ بِجَوَارِ الْبَحْرِ এ গ্রামের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ আইলা বলেছেন; কেউ কেউ طَبَرِيَة বলেছেন; কেউ কেউ مَدْيَنْ বলেছেন; কেউ কেউ اِيْلِيَا বলেছেন এবং বলা হয়েছে যে, শাম দেশের সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকা উদ্দেশ্য, বলা হয়– كُنْتُ بِحَضْرَةِ الدَّارِ অর্থাৎ بِقُرْبِهَا

قَوْلُهُ شُرَّعًا : এটা شَارِعٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রকাশ হওয়া।

قَوْلُهُ مَوْعِظَتُنَا : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো مَعْذِرَةً এটা قَالُوْا -এর مَقُوْلَه আর مَقُوْلَه টা বাক্য হওয়া জরুরি। অথচ مَعْذِرَةً টি মুফরাদ হয়েছে।

এর উত্তরে হচ্ছে, এটা قَالُوْا -এর مَقُوْلَه নয়; বরং উহ্য মুবতাদার খবর, আর তা হলো مَوْعِظَتُنَا আর এটা হলো مَعْذِرَةً -এর رَفْع-এর কেরাতের সুরতে। আর نَصْب -এর কেরাতের সুরতে উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل لَهُ হবে। উহ্য ইবারত হবে– لِمَعْذِرَةٍ অর্থাৎ عِظْنَاهُمْ مَعْذِرَةً

قَوْلُهُ وَهٰذَا تَفْصِيْلٌ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন হলো, فَلَمَّا عَتَوْا -এর উপর فَاء প্রবিষ্ট হওয়ার দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তারা এরপরও অবাধ্যাচরণ করেছে এবং তার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে শুধুমাত্র আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তিই প্রদান করা হয়েছিল, এটা ছাড়া অন্য কোনো শাস্তিই তাদেরকে প্রদান করা হয়নি।

এর জবাবে বলা হয় যে, فَلَمَّا -এর মধ্যকার فَاء টি تَفْصِيْلِيَّة হয়েছে تَعْقِيْبِيَّة নয়।

قَوْلُهُ اُمَمًا : এটা হয়তো قَطَّعْنَا -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে অথবা قَطَّعْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاسٌ مِنْهُمْ : এটা خَبَر مُقَدَّم হয়েছে আর دُوْنَ ذٰلِكَ উহ্য মাওসূফের সিফত হয়েছে। আর তা হলো মুবতাদা উহ্য ইবারত হলো– وَمِنْهُمْ نَاسٌ قَوْمٌ دُوْنَ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ اَلْجُمْلَةُ حَالٌ : এখানে وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَاْخُذُوْهُ এ বাক্যটি يَقُوْلُوْنَ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে আর يَقُوْلُوْنَ টা يَعْتَقِدُوْنَ -এর অর্থে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : বিগত আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈল জাতির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির পূর্বপুরুষদের অবাধ্যতা ও নাফরমানির একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, আল্লাহ পাকের নাফরমানি এবং অবাধ্যতা বনী ইসরাঈল তথা ইহুদিদের মজ্জাগত। তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং অবাধ্যতা তারা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছে। সেজন্য যুগে যুগে তারা তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তিও ভোগ করেছে। তাদেরকে বানর এবং শূকরে পরিণত হতে হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাকের নাফরমানি এবং অবাধ্যতার শাস্তি চির অপরিহার্য। আল্লাহ পাককে ফাঁকি দেওয়া যায় না। মানুষের কোনো কাজই ছোট হোক বা বড় তাঁর নিকট গোপন নেই। বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনে শুধু অবহেলাই করেনি; বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশকে অমান্য করেছে। আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তা হলো এই যে, লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত "আইলা" নগরীতে এক দল বনী ইসরাঈল বাস করত। মাদায়ান এবং তূর পর্বতের মধ্যস্থলে এ স্থানটি অবস্থিত। তাদের পেশা ছিল মৎস্য শিকার। তাদেরকে শনিবার দিন মাছ ধরতে নিষেধ করা হয়; কিন্তু তারা সে নিষেধ অমান্য করে। তাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে শনিবার দিনই মাছ ভেসে উঠত এবং তাদের নাগালে চলে আসত। অথচ অন্যদিন মাছ কাছেও আসতো না। তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল। আর এজন্যে একটি কৌশল অবলম্বন করল এভাবে যে, যেখানে মাছের সমাগম হতো তার কাছাকাছি একটি জলাধার তৈরি করল এবং সাগরের সঙ্গে তার যোগাযোগ করে দিল। শনিবারে যখন মাছ ভেসে উঠত এবং জলাধারে মাছ প্রবেশ করলে তারা তার মুখ বন্ধ করে দিত। পরের দিন ঐ মাছ ধরে আনত। এভাবে আল্লাহর বিধান অমান্য করার কৌশল আবিষ্কার করল। এ আইলাবাসীর শাস্তি হয়েছে বড় কঠোর। তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়েছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, বনী ইসরাঈলের যেসব লোক শনিবারের নির্দেশ সম্পর্কে নাফরমানি করেছিল তাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে, শয়তান হয়তো তাদের অন্তরে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, আল্লাহ পাক শনিবার দিন মৎস শিকার করা নিষেধ করেননি; বরং মৎস্য খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। এজন্যে তারা শনিবারে মৎস্য শিকার করে। অথবা শয়তান তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করেছে, শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ হয়েছে, শনিবারে মৎস্য শিকার করব না তবে তাদের তৈরি জলাধারগুলোতে মাছ যেতে পারে তার ব্যবস্থা করে এবং রবিবারে ধরে নিয়ে আসে। এ কৌশলের মাধ্যমে তাদের অপরাধ শুরু হয়। কিছুদিন পর তাদের আস্পর্ধা বেড়ে যায় এবং তারা শনিবারেও মাছ ধরা শুরু করে। শুধু তাই নয়; বরং ক্রয়বিক্রয়ও শুরু করে এবং শনিবার দিন তাদের খাবারে মৎস রাখতে তারা আর ইতস্তত করতো না। আইলাবাসীর এক তৃতীয়াংশ এ অপরাধে শরিক হয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ৪০৮]

আল্লামা শওকানী (র.) লিখেছেন– তাফসীরকারদের মতে, আইলাবাসী বনী ইসরাঈল তিনভাগে বিভক্ত হয়–

১. যারা এ অপরাধে লিপ্ত ছিল।

২. যারা এ অপরাধ করেনি কিন্তু অপরাধীদেরকে বাধাও দেয়নি এবং তাদের থেকে দূরেও সরে যায়নি।

৩. যারা এ অপরাধ করেনি; বরং অপরাধীদেরকে বাধা দিয়েছে এমনকি অবশেষে তাদের থেকে আল্লাহর গজবের ভয়ে দূরে সরে পড়েছে। অপরাধীদের মাঝে এবং তাদের বাড়িঘরের মাঝে দেয়াল দিয়েছে এবং তাদের সাথে উঠাবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। –[তাফসীরে ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ২৫৭]

قَوْلُهُ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ : তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।

আল্লাহ পাক সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর নীতি ঘোষণা করেছেন– إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা হলো এই, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও' আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতাংশেও আইলাবাসী অপরাধীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন– "তোমরা ঘৃণিত বানরে পরিণত হও।" তাই সঙ্গে সঙ্গে তারা বানরে পরিণত হয়। তাদের পুরুষগুলো নর বানর এবং স্ত্রীরা মাদি বানরে পরিণত হয়। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৫, পৃ. ৩৯-৪০]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন– আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা শৈলী দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের নাফরমানির কারণে কোনো কঠিন শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা এবং মন্দ আচারণ থেকে বিরত হয়নি তাই তাদেরকে ঘৃণিত বানরে পরিণত করা হয়।

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, নেককার লোকদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে বলেছিলেন, তোমরা কেন এ হতভাগাদেরকে উপদেশ দান কর? কেননা, তারা মনে করত এই দুর্বৃত্তদেরকে উপদেশ দান করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। তখন তাদের কথার জবাবে উপদেশ দানকারীগণ বলেন, আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে আমাদের ওজর হিসেবে পেশ করার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকি যেন উপদেশ না দেওয়ার অপরাধ আমাদের উপর না বর্তায়।

অথবা এর ব্যাখ্যা হলো এই, যারা শনিবারে মৎস শিকার করার ব্যাপারে অপরাধীদেরকে নসিহত করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং নসিহত করা থেকে বিরত হয়েছিলেন, তারা একে অন্যকে বললেন, আর এদেরকে নসিহত করে কি হবে? কেন এদেরকে নসিহত করছ? তখন তারা বলল, আল্লাহ পাকের দরবারে কর্তব্য পালনের আরজি পেশ করার জন্যে এ মর্মে যে, আমরা তাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং অন্যায় থেকে তাদেরকে বিরত রাখার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি।

বর্ণিত আছে যে, উপদেশ প্রদানকারীগণ যখন শনিবারের ব্যাপারে সীমালজ্ঘনকারীদের হেদায়েত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন তখন তারা অপরাধীদের সাথে বাস করা অনুচিত মনে করলেন। বস্তিকে তারা ভাগ করে নিলেন। মুসলমানদের এলাকার প্রবেশদ্বার ভিন্ন করা হলো এবং পাপিষ্ঠদের প্রবেশদ্বার ভিন্ন হলো। দু-দলের মধ্যখানে একটি দেয়াল দিয়ে দেওয়া হলো।

হযরত দাউদ (আ.) পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে বদদোয়া করলেন। একদিনের সকালে নেককারগণ লক্ষ্য করলেন, পাপিষ্ঠদের এলাকা থেকে কেউ বের হচ্ছেনা, তখন তারা প্রমাদ গুণলেন। তারা বললেন, হয়তো আজ রাতে তাঁদের উপর কোনো বিপদ নিপতিত হয়েছে। তাই তাদের এলাকায় গিয়ে দেখলেন, সকলেই বানরে পরিণত হয়েছে। এরা তাদের আত্মীয়স্বজনকে চিনতে পারে না। কিন্তু বানররা তাদেরকে চিনতে পেরেছে এবং আত্মীয়স্বজনের নিকটে এসে তারা ক্রন্দন করতে থাকে, তখন নেককার আত্মীয়স্বজন তাদেরকে বলে, আমরা কি তোমাদের নসিহত করিনি, তোমাদেরকে বারবার মৎস শিকারে আমরা কি বাধা দেইনি? তখন তারা মাথা ঝুকিয়ে হ্যাঁ সূচক জবাব দেয়। তিন দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকে। লোকেরা এসে তাদেরকে দেখত, এরপর তাদের মৃত্যু হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ৪১০]

قَوْلُهُ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ الخ : আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত [ইহুদি]-এর অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অশুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দুটি শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হলো প্রথমত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন কোনো ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদিরা সব সময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অসহায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জানা আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা ঘাঁটি মাত্র। এর চেয়ে বেশি কোনো গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদিরা তাদেরই অধীন ও আজ্ঞাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, তখনই ইসরাঈলদের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদিদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এ পৃথিবীতেই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কোথাও কোনো এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا-এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تَقْطِيْعٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ- খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়া। আর اُمَمٌ হলো اُمَّةٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণি। মর্ম হলো এই যে, আমি ইহুদি জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বোঝা গেল যে, কোনো জাতিবিশেষের কোনো এক স্থানে সমবেত জীবনযাপন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত; পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিছিন্ন হয়ে পড়া এক রকম ঐশী আজাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর এ নিয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেও কিয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। মদিনা থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ার বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদিরা সব সময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

য়েক বছর থেকে ফিলিস্তিনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায় পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ সদাসত্য রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তাই ঘটবে। শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদিদের সাথে জিহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহর অপরাধীকে সমন জারি করে এবং পুলিশের মাধ্যমে ধরে হাজির করা হবে না; বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করেন যাতে অপরাধী পায়ে হেঁটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হাজির হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ঘটবে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদিদের সাথে তাঁর যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, যাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করে দেওয়া সহজ হয়। আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করেছেন। অতঃপর শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এ সমবেত হওয়া বর্ণিত আজাবের পরিপন্থি নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুত এটা এমন একটা ধোঁকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সভ্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে সজাগ কোনো ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না। কারণ অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অবিহিত করা হয়, প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের একটা যৌথ ছাউনির অতিরিক্ত কোনো গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই বেঁচে আছে এবং এদের বশংবদ থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের রহস্য। বলা বাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে অভিহিত করে দেওয়ায় এ জাতির কোনো ক্ষমতালাভ ঘটে না। কুরআনে কারীম তাদের সম্পর্কে কিয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাজনিত যে শাস্তির কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে তারই আলোচনা এভাবে করা হয়েছে। وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা যখন সুদৃঢ় ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন এক শক্তিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকৃষ্ট আজাবের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর হাতে, পরে বুখতানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে আর বাদবাকি হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর মাধ্যমে সব জায়গা থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদিদের বহিষ্কার করা একান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হলো এই- مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ অর্থাৎ "এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" "অন্য রকম" -এর মর্ম হলো এই যে, কাফের দুষ্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ ইহুদিদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়। কিছু সৎও আছে। এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের নির্দেশাবলির পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আর না কোনো রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

এ ছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারে, যারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সেই সমস্ত লোক, যারা তাওরাতকে আসমানি গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহকাম ও বিধিবিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের পরকালকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে- وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ অর্থাৎ আমি ভালো-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে। 'ভালো অবস্থার দ্বারা'- এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সেই অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোনো কোনো সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। যাহোক, সারমর্ম হলো এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দুটি প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হলো দান ও অনুগ্রহের মাধ্যমে পরীক্ষা করা যে, তারা দাতা ও অনুগ্রহকারীর কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার সম্পাদন করে কিনা? দ্বিতীয়ত তাদেরকে বিভিন্ন কষ্ট ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন [করে পরীক্ষা] করা হয় যে, তারা নিজেদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের মন্দ ও অসদাচরণ থেকে তওবা করে কিনা।

কিন্তু ইহুদি সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের জন্য নিয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, ধনসম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে– إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ অর্থাৎ [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ হলেন ফকির আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে– يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল যে, কোনো জাতির একত্র বাস আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তার বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হলো একটা শাস্তি। দ্বিতীয়ত পার্থিব আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এখানকার যে দুঃখকষ্ট, তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা কান্নাকাটির বিষয় নয়; তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও অহংকারী হয়ে উঠার মতো কোনো উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধিমানের জন্য এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ -এর প্রথম শব্দ خَلَفَ [খলাফা] خِلَافٌ ধাতু থেকে নির্গত অতীতকালবাচক বচন। এর অর্থ– 'স্থলাভিষিক্ত কিংবা প্রতিনিধি হয়ে গেল'। আর দ্বিতীয় শব্দ خَلْفٌ হলো ধাতু যা স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একবচন ও বহুবচনে একইভাবে বলা যায়। خَلْفٌ [খলাফুন] লামের সাকিন যোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অসৎ খলিফা বা প্রতিনিধি অর্থে! যারা কিনা নিজেদের বড়দের রীতিবিরুদ্ধভাবে অপকর্মে লিপ্ত হয়! আর خَلَفٌ [খালাফুন] লামের ফাতাহ যোগে হলে শব্দটি ব্যবহৃত হয় সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধির ক্ষেত্রে। যারা নিজেদের বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধন করে! এ শব্দটির সাধারণ ব্যবহার তাই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়।

قَوْلُهٗ وَرِثُوا الْكِتٰبَ : وَرِثُوْا শব্দটি وَرَاثَةٌ ধাতু থেকে গঠিত। যে বস্তু বা সামগ্রী মৃতের পরে জীবিত ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয়, তাকেই বলা হয় 'মীরাস' বা 'ওয়ারাসাত'। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তাওরাত গ্রন্থখানি নিজেদের বড়দের পক্ষ থেকে তারা প্রাপ্ত হয়েছে কিংবা তাদের মৃত্যুর পর তাদের হাতে এসেছে।

عَرَضٌ [আরাদ] শব্দটি ব্যবহৃ হয় বস্তু-সামগ্রী অর্থে, যা নগদ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। আবার কখনও এ শব্দটি সাধারণভাবে বস্তুসামগ্রী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, তা নগদ অর্থ হোক বা অন্যান্য সামগ্রী। তাফসীরে-মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, এখানে শব্দটি সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এখানে সাধারণ বস্তু-সামগ্রীকে عَرَضٌ শব্দে উল্লেখ করে এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পদ তা যতই হোক না কেন, একান্তই অস্থায়ী। কারণ عَرَضٌ [আরাদ] শব্দটি প্রকৃতপক্ষে মৌল উপাদানের তুলনায় অল্প স্থায়ী বিষয়কে বুঝাবার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, যার নিজস্ব কোনো স্থায়ী অস্তিত্ব থাকে না, বরং সে তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সে কারণেই عَارِضٌ [আরিদ] শব্দটি 'মেঘ' অর্থে বলা হয়। কারণ তার অস্তিত্বও স্থিতিশীল নয়। শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়ে যায়। কুরআনে কারীমে এ অর্থেই বলা হয়েছে– هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

هٰذَا الْاَدْنٰى -তে- اَدْنٰى শব্দটি 'নৈকট্য' دُنُوٌّ ধাতু থেকে গঠিত বলেও বলা যায়। তখন اَدْنٰى [আদনা] অর্থ হবে 'নিকটতর'। এরই স্ত্রীলিঙ্গ হলো دُنْيَا [দুনইয়া] যার অর্থ নিকটবর্তী। আখেরাতের তুলনায় এ পৃথিবী মানুষের অধিক নিকটে বলেই একে اَدْنٰى বা دُنْيَا বলা হয়। এছাড়া 'তুচ্ছ' ও 'হীন' অর্থে ব্যবহৃত دَنَاءَةٌ থেকেও গঠিত হতে পারে। তখন অর্থ হবে– হীন ও তুচ্ছ। দুনিয়া এবং তার যাবতীয় বিষয় সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় হীন ও তুচ্ছ বলেই তাকে دُنْيَا ও اَدْنٰى বলা হয়েছে।

আয়াতের অর্থ এই যে, প্রথম যুগের ইহুদিদের মধ্যে দু-রকমের লোক ছিল– কিছু ছিল সৎ এবং তাওরাতে বর্ণিত শরিয়তের অনুসারী, আর কিছু ছিল কৃতঘ্ন-পাপী। কিন্তু তারপরে এদের বংশধরদের মধ্যে যারা তাদের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসাবে তাওরাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এমনি আচরণ অবলম্বন করেছে যে, আল্লাহর কিতাবকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করে দিয়েছে, স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে আল্লাহর কালামকে তাদের মতলব অনুযায়ী বিকৃত করতে শুরু করেছে।

قَوْلُهٗ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا : তদুপরি এ ধৃষ্টতা যে, তারা বলতে থাকে, যদিও আমরা পাপ করে থাকি, কিন্তু আমাদের সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন বিভ্রান্তি সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে এভাবে সতর্কতা উচ্চারণ করেছেন– وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ অর্থাৎ তাদের অবস্থা হলো এই যে, এখনও যদি আল্লাহর কালামের বিকৃতি সাধনের

বিনিময়ে এরা কিছু অর্থ লাভ করতে পারে, তাহলে এরা এখনও তা নিয়ে কালামের বিকৃতি সাধনে বিরত থাকবে না। সারার্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও মার্জনা যথাস্থানে সত্য ও নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা শুধুমাত্র সেই সব লোকের জন্যই নির্ধারিত, যারা নিজেদের কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে তা পরিহার করার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেবে যার পারিভাষিক নাম হলো 'তওবা'।

এরা নিজেদের অপরাধে অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও মাগফিরাত বা ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করে, অথচ এখনও পয়সা পেলে কালামুল্লার বিকৃতি সাধনে এতটুকু দ্বিধা করবে না। পাপের পুনরাবৃত্তি করেও ক্ষমার আশা করতে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া তার আর কোনোই তাৎপর্য থাকতে পারে না।

তারা কি তাওরাতে এ প্রতিজ্ঞা করেছিল না যে, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আরোপ করে এমন কোনো কথাই বলবে না, যা সত্য নয়। আর তারা এ প্রতিজ্ঞার বিষয়ে তাওরাতে পড়েও ছিল। এসবই হলো তাদের অদূরদর্শিতা। কথা হলো, শেষ বিচারের দিনেই যে পরহেজগারদের জন্য অতি উত্তম ও অন্তহীন সম্পদ রয়েছে তারা কি একথাটিও বুঝে না?

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষত বনী ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাওরাত সম্পর্কে নেওয়া হয়েছিল যে, এতে কোনো রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান পরওয়ারদিগারের প্রতি অন্য কোনো বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লিখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাওরাতের বিধিবিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এ আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসেবে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের সব আলেমই এমন নয়; কোনো কোনো আলেম এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিধিবিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সৎকাজের ও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাজ ও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– আল্লাহ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরজ আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমত এই যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্যে যার আলোচনা ইতঃপূর্বে এসে গেছে অর্থাৎ তাওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানি কিতাবই উদ্দেশ্যে। যেমন তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন।

দ্বিতীয়ত এ আয়াতের দ্বারা বুঝা গেছে যে, আল্লাহর কিতাবকে একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্নসহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধিবিধান ও নির্দেশাবলির অনুবর্তীও হতে হবে। আর এ কারণেই হয়তো এ আয়াতে কিতাবকে গ্রহণ করা কিংবা পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। অন্যথায় يَأْخُذُوْنَ কিংবা يَقْرَءُوْنَ শব্দ ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, يُمَسِّكُوْنَ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা অর্থাৎ তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা।

তৃতীয় লক্ষণীয় হলো এই যে, এখানে তাওরতের বিধিবিধানের অনুবর্তিতার কথা বলা হয়েছিল আর তাওরাতের বিধি-নিষেধ একটি দুটি নয় শত শত। সেগুলোর মধ্যে এখানে একটিমাত্র বিধান নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাবের বিধিবিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো নামাজ। তদুপরি নামাজের অনুবর্তিতাই সকল বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন।

তবে এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক নামাজে নিয়ামনুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধিবিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে লোক নামাজের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধিবিধানের অনুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ-এর ইরশাদ রয়েছে– "নামাজ হলো দীনের স্তম্ভ, যার উপর দীনের ইমারত নির্মিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এ স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।"

এ কারণেই এ আয়াতে وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ -এর পরে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ বলে এ কথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, দৃঢ়তার সাথে কিতাব অবলম্বনকারী এবং তার অনুবর্তী তাকেই বলা যাবে যে সমুদয় শর্ত মোতাবেক নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামাজ আদায় করে। আর যে নামাজের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তাসবীহ-অজিফাই পড়ুক কিংবা যত মুজাহাদা-সাধনাই

করুক না কেন আল্লাহর নিকট সে কিছুই নয়। এমনকি তার যদি কারামত-কাশফও হয় তবুও তার কোনো গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই।

এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং তাওরাতের বিধি-নিষেধে তাদের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে তাদের সতর্কীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। এরপর দ্বিতীয় আয়াতে বনী ইসরাঈলেরই একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে, যা তাওরাতের হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতার জন্য তাদেরকে নানা রকম ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। এর বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় এসে গেছে।

এ আয়াতে نَتَقْنَا শব্দটি نَتْقٌ থেকে গঠিত, যার অর্থ হলো– টেনে নেওয়া এবং উত্তোলন করা। সূরা বাকারায় এ ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে رَفَعْنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) نَتَقْنَا [নাতাকনা]-এর ব্যাখ্যা رَفَعْنَا শব্দের দ্বারাই করেছেন।

رَفَعْنَا আর ظُلَّةٌ শব্দটি ছায়া অর্থে ظِلٌّ [যিল্লুন] থেকে গৃহীত। এর অর্থ সামিয়ানা। কিন্তু প্রচলিত অর্থে এমন বস্তুকেই সামিয়ানা বলা হয়, যার ছায়া মাথার উপর পড়ে, কিন্তু তা কোনো খুঁটিতে টাঙ্গানো হয়। আর এ ঘটনায় তাদের মাথার উপর পাহাড়কে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা সামিয়ানার মতোই ছিল না। সে জন্যই বিষয়টি উদাহরণবাচক শব্দ সহযোগে বলা হয়েছে

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সে সময়টিও স্মরণ করার মতো, যখন আমি বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড়কে তুলে এনে টাঙিয়ে দিলাম, যাতে তারা মনে করতে লাগল, এই বুঝি আমাদের উপর পাহাড়টি ছুটে পড়ল! এমনি অবস্থায় তাদেরকে বলা হলো– خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আমি যেসব বিধিবিধান তোমাদের দান করছি সেগুলোকে সুদৃঢ় হাতে ধর। আর তাওরাতের হেদায়েতগুলো মনে রেখো, যাতে তোমরা মন্দ কাজ ও আচরণ হতে বিরত থাকতে পার।

ঘটনাটি হলো এই যে, বনী ইসরাঈলদের ইচ্ছা ও অনুরোধের ভিত্তিতে হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে কিতাব ও শরিয়তপ্রাপ্তির আবেদন করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এ ব্যাপারে তূর পাহাড়ে চল্লিশ রাত ই'তিকাফ করার পর আল্লাহর এ গ্রন্থ পেলেন এবং তা নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলদের শোনালেন, তখন তাতে এমন বহু বিধিবিধান ছিল, যা ছিল তাদের মন-মানসিকতা ও সহজতার পরিপন্থি। সেগুলো শুনে তারা অস্বীকার করতে লাগল যে, আমাদের দ্বারা এসবের উপর আমল করা চলবে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত জিবরাঈলকে হুকুম করলেন এবং তিনি গোটা তূর পাহাড়কে তুলে এনে সেই জনপদের উপর টাঙিয়ে দিলেন যেখানে বনী ইসরাঈলরা বাস করত। এভাবে তারা যখন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে মাথার উপর দাঁড়ানো দেখতে পেল, তখন সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাওরাতের যাবতীয় বিধিবিধানে যথাযথ আমল করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারবার তার বিরুদ্ধাচরণই করতে থাকল।

ধর্মের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা না থাকার প্রকৃত মর্ম ও কয়েকটি সন্দেহের উত্তর : এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন মাজীদে পরিষ্কার ঘোষণা রয়েছে যে, لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তী বা বাধ্যবাধকতা নেই, যার ভিত্তিতে কাউকে বাধতামূলকভাবে সত্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। অথচ আলোচ্য এ ঘটনায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, দীন কবুল করার জন্য বনী ইসরাঈলদের বাধ্য করা হয়েছে।

কিন্তু সামান্য একটু চিন্তা করলেই পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোনো অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে কোথাও কখনও বাধ্য করা হয়নি। কিন্তু যে, ব্যক্তি মুসলমান হয়ে ইসলামি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অনুবর্তী হয়ে যায় এবং তারপরে সে যদি তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করে, তাহলে অবশ্যই তার উপর জবরদস্তী করা হবে এবং এই বিরুদ্ধাচরণের দরুন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে ইসলামি শাস্তি বিধানে এ ব্যাপারে বহুবধি শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটির সম্পর্ক হলো অমুসলিমদের সাথে। তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে বা জবরদস্তি মুসলমান বানানো যাবে না। আর বনী ইসরাঈলদের এ ঘটনায় কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়নি, বরং তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাওরাতের বিধিবিধানের অনুবর্তিতায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল বলেই তাদের উপর জবরদস্তি আরোপ করে অনুবর্তী করায় لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -এর পরিপন্থি কিছুই হয়নি।

অনুবাদ :

١٧٢. وَ اذْكُرْ إِذْ حِيْنَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ مِمَّا قَبْلَهُ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ ذُرِّيَّتَهُمْ بِأَنْ أَخْرَجَ بَعْضَهُمْ مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ كَنَحْوِ مَا يَتَوَالَدُوْنَ كَالذَّرِّ بِنُعْمَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَنَصَبَ لَهُمْ دَلَائِلَ عَلٰى رُبُوْبِيَّتِهٖ وَرَكَّبَ فِيْهِمْ عَقْلًا وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ ج قَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج أَنْتَ رَبُّنَا شَهِدْنَا ج بِذٰلِكَ وَالْإِشْهَادُ لِ أَنْ لَّا تَقُوْلُوْا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَيِ الْكُفَّارُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا التَّوْحِيْدِ غٰفِلِيْنَ لَا نَعْرِفُهُ.

১৭২. আর স্মরণ কর তোমার প্রতিপালক আদম-সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করেন। مِنْ ظُهُوْرِهِمْ এটা পূর্ববর্তী শব্দ [مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ]-এর جَرّ বাচক শব্দ [مِنْ]-এর পুনরুল্লেখসহ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে বের করার পর পৃথিবীতে যে অনুসারে তাদের জন্ম হবে সেই ক্রমঅনুসারে আল্লাহ তা'আলা এক একজনের পৃষ্ঠদেশ হতে তার উত্তরাধিকারীগণকে আরাফার দিন না'মান নামক স্থানে [আরাফার নিকটস্থ একটি উপত্যকা] পিপীলিকার ন্যায় সমবেত করেন। তাদেরকে 'আকল' দান করেন এবং তাঁর রব হওয়ার প্রমাণসমূহ প্রদর্শন করেন। এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন। বললেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব-প্রতিপালক। আমরা এটার সাক্ষী করলাম; এ সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য যে তারা অর্থাৎ কাফেরগণ যেন কিয়ামতের দিন না বলে, تَقُوْلُوْا এটা উভয় স্থানে [পরবর্তী أَوْ تَقُوْلُوْا তেও] ي অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষরূপে পঠিত রয়েছে। আমরা তো এ বিষয়ে অর্থাৎ তাওহীদের সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম, এ সম্পর্কে আমরা জানতাম না কিছুই।

١٧٣. أَوْ تَقُوْلُوْٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ اٰبَاۤؤُنَا مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَنَا وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ج فَاقْتَدَيْنَا بِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا تُعَذِّبُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ مِنْ اٰبَائِنَا بِتَأْسِيْسِ الشِّرْكِ الْمَعْنٰى لَا يُمْكِنُهُمُ الْاِحْتِجَاجُ بِذٰلِكَ مَعَ إِشْهَادِهِمْ عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ وَالتَّذْكِيْرِ بِهٖ عَلٰى لِسَانِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَةِ قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهٖ فِي النُّفُوْسِ.

১৭৩. কিংবা যেন না বলে, আমাদের পিতৃপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছে। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর আমরা এতে তাদেরই অনুসরণ করেছি। তবে কি শিরকের ভিত্তি স্থাপন করত আমাদের পিতৃপুরুষদের যারা মিথ্যাশ্রয়ী হয়েছে তাদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? শাস্তি দেবে? অর্থাৎ নিজ সম্পর্কে তাওহীদের সাক্ষ্য ও স্বীকৃতিদানের পর তাদের পক্ষে এ ধরনের যুক্তির অবতারণা সম্ভব হবে না। মু'জিযার অধিকারী নবী কর্তৃক উক্ত অঙ্গীকার সম্পর্কে এভাবে স্মরণ করে দেওয়া খোদ নিজেরেই স্মরণ হওয়ার মর্যাদা রাখে।

١٧٤. وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ نُبَيِّنُهَا مِثْلَ مَا بَيَّنَّا الْمِيْثَاقَ لِيَتَدَبَّرُوْهَا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ عَنْ كُفْرِهِمْ.

১৭৪. এভাবে অর্থাৎ উক্ত অঙ্গীকারের কথা যেভাবে স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছি সেভাবে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যেন তাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে এবং যাতে তারা কুফরি হতে ফিরে যায়।

١٧٥. وَاتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ اَيِ الْيَهُوْدِ نَبَاَ خَبَرَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا خَرَجَ بِكُفْرِهٖ كَمَا تَخْرُجُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا وَهُوَ بَلْعَمُ بْنُ بَاعُوْرَا مِنْ عُلَمَاءِ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ سُئِلَ اَنْ يَدْعُوَ عَلٰى مُوْسٰى وَمَنْ مَعَهٗ وَاُهْدِىَ اِلَيْهِ شَىْءٌ فَدَعَا فَانْقَلَبَ عَلَيْهِ وَانْدَلَعَ لِسَانُهٗ عَلٰى صَدْرِهٖ فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَاَدْرَكَهٗ فَصَارَ قَرِيْنَهٗ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ.

১৭৫. হে মুহাম্মদ! তাদেরকে অর্থাৎ ইহুদিদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত সংবাদ পাঠ করে শুনাও যাকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম অতঃপর সে তাকে বর্জন করে, অর্থাৎ সাপ যেমন তার খোলস হতে বের হয়ে আসে তেমান ঐ ব্যক্তি তার কুফরিসহ আমার নিদর্শনসমূহ পরিত্যাগ করে বের হয়ে আসে, শয়তান তার পিছনে লাগে। তাকে শয়তান পেয়ে বসে এবং তার একান্ত সহচর হয়ে দাঁড়ায়, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ব্যক্তিটি ছিল বালআম ইবনে বাউরা নামক জনৈক ইসরাঈলী আলেম পণ্ডিত। তাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করত হযরত মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে বলা হলে সে অনুরূপ বদদোয়া করে। কিন্তু তা বুমেরাং হয়ে তার দিকেই ফিরিয়ে আসে, ফলে আজাব স্বরূপ তার জিহ্বা বের হয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়ে।

١٧٦. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ اِلٰى مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ بِهَا بِاَنْ نُوَفِّقَهٗ لِلْعَمَلِ وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ سَكَنَ اِلَى الْاَرْضِ اَيِ الدُّنْيَا وَمَالَ اِلَيْهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فِىْ دُعَائِهٖ اِلَيْهَا فَوَضَعْنَاهُ فَمَثَلُهٗ صِفَتُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالزَّجْرِ يَلْهَثْ يَدْلَعُ لِسَانَهٗ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ط وَلَيْسَ غَيْرُهٗ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كَذٰلِكَ وَجُمْلَتَا الشَّرْطِ حَالٌ اَىْ لَاهِثًا ذَلِيْلًا بِكُلِّ حَالٍ وَالْقَصْدُ التَّشْبِيْهُ فِى الْوَضْعِ وَالْخِسَّةِ بِقَرِيْنَةِ الْفَاءِ الْمُشْعِرَةِ بِتَرْتِيْبِ مَا بَعْدَهَا عَلٰى مَا قَبْلَهَا مِنَ الْمَيْلِ اِلَى الدُّنْيَا وَاتِّبَاعِ الْهَوٰى بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهٖ ذٰلِكَ الْمَثَلُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج فَاقْصُصِ الْقَصَصَ عَلَى الْيَهُوْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ فِيْهَا فَيُؤْمِنُوْنَ.

১৭৬. আমি ইচ্ছা করলে এটা দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম আমল করার তাওফীক প্রদান করত এ সমস্ত নিদর্শনের মাধ্যমে তাকে আলেমগণের মর্যাদায় বিভূষিত করতাম কিন্তু সে মাটির দিকে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে এটা নিয়ে সে শান্ত হয়ে পড়ে এবং এদিকেই সে অনুরক্ত হয়ে পড়ে ও তার খাতিরে দোয়া করে তার কামনারই সে অনুসরণ করে। ফলে তাকে আমি অধঃগতি করে দিলাম। তার উদাহরণ অবস্থা কুকুরের ন্যায়; এটাকে তুমি তাড়িয়ে ও ধমক দিয়ে ক্লেশ দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি ক্লেশ না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়। এ অবস্থা আর কোনো প্রাণীর নেই। اِنْ تَحْمِلْ শর্তযুক্ত এ দুটি বাক্য [اِنْ تَحْمِلْ.. ও تَتْرُكْهُ] এ স্থানে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ক্লেশ দেওয়া হোক বা না হোক সর্বাবস্থায়ই সে হাঁপায় এবং সে ঘৃণিত। নিকৃষ্টতা ও তুচ্ছতার মধ্যে তুলনা করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কারণ ف অক্ষরের সাহায্যে এ উপমাটি আরম্ভ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতের মর্ম দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়াও কামনার অনুসরণ করার সাথে এর ক্রম সংশ্লিষ্ট। পরবর্তী বাক্যটিও এর ইঙ্গিতবহ। এটা এ উদাহরণ হলো যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের উপমা। ইহুদিদের নিকট তুমি কাহিনী বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে। তাতে গবেষণা করে এবং ঈমান আনয়ন করে।

١٧٧. سَآءَ بِئْسَ مَثَلًا ن الْقَوْمُ أَيْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ بِالتَّكْذِيْبِ .

১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এ প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করে কতই না মন্দ উপমা সেই সম্প্রদায়। অর্থাৎ সেই সম্প্রদায়ের উপমা কতই না মন্দ। سَآءَ অর্থ, কতই না মন্দ।

١٧٨. مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

১৭৮. আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

١٧٩. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا خَلَقْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز الْحَقَّ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز دَلَائِلَ قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَصَرَ اِعْتِبَارٍ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط الْاٰيَاتِ وَالْمَوَاعِظَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَاتِّعَاظٍ أُولٰٓئِكَ كَالْأَنْعَامِ فِيْ عَدَمِ الْفِقْهِ وَالْبَصَرِ وَالْاِسْتِمَاعِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ مِنَ الْأَنْعَامِ لِأَنَّهَا تَطْلُبُ مَنَافِعَهَا وَتَهْرُبُ مِنْ مَضَارِهَا وَهٰٓؤُلَآءِ يُقْدِمُوْنَ عَلَى النَّارِ مُعَانَدَةً أُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ .

১৭৯. আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা ذَرَأْنَا অর্থ, সৃষ্টি করেছি। সত্য উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের প্রমাণসমূহ দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তা দ্বারা চিন্ত-গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণ করার মতো নিদর্শসমূহ ও উপদেশাবলি শ্রবণ করে না। এরা উপলব্ধি না করা, দর্শন ও শ্রবণ না করার ক্ষেত্রে পশুর ন্যায়, না, তা অপেক্ষাও অর্থাৎ পশু অপেক্ষাও অধিক মূঢ়। কারণ পশুও তার জন্য উপকারী বস্তুর প্রতি আগ্রহী হয় এবং অনিষ্ট হতে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে এরা শুধুমাত্র জিদের বশবর্তী হয়ে জাহান্নামের দিকে [যা তাদের জন্য ক্ষতিকর সেই দিকে] এগিয়ে চলছে। এরাই উদাসীন।

١٨٠. وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُوْنَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالْحُسْنٰى مُؤَنَّثُ الْأَحْسَنِ فَادْعُوْهُ سَمُّوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا اُتْرُكُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ مِنْ أَلْحَدَ وَلَحَدَ يَمِيْلُوْنَ عَنِ الْحَقِّ فِيْٓ أَسْمَآئِهٖ ط حَيْثُ اشْتَقُّوْا مِنْهَا أَسْمَآءً لِاٰلِهَتِهِمْ كَاللَّاتِ مِنَ اللّٰهِ وَالْعُزّٰى مِنَ الْعَزِيْزِ وَمَنَاتِ مِنَ الْمَنَّانِ سَيُجْزَوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ جَزَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ .

১৮০. উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। হাদীসে আছে তা হলো নিরান্নব্বইটি নাম। তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। নামকরণ করবে যারা তার নাম বিকৃত করে, يُلْحِدُوْنَ এটা اَلْحَدَ ও لَحَدَ উভয় ক্রিয়া হতে গঠিত। অর্থ, সত্য হতে ফিরে থাকে। সত্য হতে বিচ্যুত হয়; ঐ সমস্ত নাম বিকৃত করে তারা তাদের দেবতাদের নাম গঠন করে যেমন আল্লাহ হতে লাত, আযীম হতে উয্যা, মান্নান হতে মানাত নাম বানিয়ে নিয়েছে তাদেরকে পরিত্যাগ কর বর্জন কর। শীঘ্রই আখেরাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। এ নির্দেশ ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশের পূর্বের।

১৮১. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ هُمْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا فِي حَدِيثٍ.

১৮১. যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল এমনও আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এনং ন্যায় বিচার করে। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, এরা হলো রাসূল ﷺ -এর উম্মত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ مِمَّا قَبْلَهُ : অর্থাৎ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ টা بَنِىْ اٰدَمَ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। কাশশাফ গ্রন্থকার বলেন যে, এটা بَدَلُ الْبَعْضِ عَنِ الْكُلِّ হয়েছে। আর এটাই সুস্পষ্ট। যেমন- ضَرَبْتُ زَيْدًا ظَهْرَهُ একে কেউ بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ বলেনি। উহ্য ইবারত হবে- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ظُهُوْرِ بَنِىْ اٰدَمَ

قَوْلُهُ مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ : এখানে مِنْ صُلْبِ بَعْضٍ হলো মওসূফ আর مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ হলো সিফত।

قَوْلُهُ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ : অর্থাৎ এ ধারাবাহিকতায়ই পৃথিবীতে প্রকাশ পাচ্ছিল, অর্থাৎ প্রথমে হযরত আদম (আ.)-এর পিঠ থেকে কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকে আদম সন্তানদেরকে বের করেছেন। এরপর আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ : যেন বিনা প্রয়োজনে اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُّمِ আবশ্যক না হয় এজন্য قَالَ শব্দকে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ اَنْتَ رَبُّنَا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো بَلٰى টা قَالُوْا-এর مَقُوْلَه হয়েছে। আর مَقُوْلَه-এর জন্য জুমলা হওয়া আবশ্যক। অথচ بَلٰى হলো হরফ।

উত্তর : এর জবাব হলো এই যে, এখানে ইবারত উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- بَلٰى اَنْتَ رَبُّنَا কাজেই আর কোনো আপত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

قَوْلُهُ وَالْاِشْهَادُ لِ : এখানে اِشْهَادٌ এবং لَامٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْ تَقُوْلُوْا এটা شَهِدْنَا -এর مَفْعُوْلٌ لَهُ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَهِدْنَا : এতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে-

১. এটা ফেরেশতাদের বাক্য যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষী বানিয়েছেন। এ সুরতে بَلٰى -এর উপর وَقْف হবে।

২. এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা আদম সন্তানের বাক্য, হবে। এ সুরতে অর্থ হবে আমরা তাঁর স্বীকারোক্তি করে সাক্ষ্য দিয়েছি, এ সুরতে بَلٰى-এর উপর وَقْف ঠিক হবে না; বরং شَهِدْنَا -এর উপর হবে।

৩. এটা আল্লাহ তা'আলার কালাম, অর্থাৎ شَهِدْنَا عَلٰى اِقْرَارِكُمْ كَرَاهَةَ اَنْ تَقُوْلُوْا اَوْ لِئَلَّا تَقُوْلُوْا অর্থাৎ আমি তোমাদের থেকে এজন্য স্বীকারোক্তি নিয়েছি যাতে তোমরা অজ্ঞানতার ওজর পেশ করতে না পার। অথবা এ কথাকে অপছন্দ করে যে, তোমরা অজ্ঞানতার ওজর পেশ কর।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى لَا يُمْكِنُهُمُ الْاِحْتِجَاجُ بِذٰلِكَ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, আদম সন্তানদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর তাদের নিকট অজ্ঞানতা ও গাফলতের অজুহাত অবশিষ্ট থাকবে না। সে এটা বলতে পারবে না যে, হে আল্লাহ এ অঙ্গীকারের ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। যার কারণে আমরা গাফলতের মধ্যে রয়েছি।

قَوْلُهُ وَالتَّذْكِيْرُ بِهِ عَلٰى لِسَانِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَةِ قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهِ فِى النُّفُوْسِ : এ ইবারত দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, রোজে আযলে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি পৃথিবীতে আগমনের পর একেবারেই ভুলে গেছে। এখন কারো اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ নেই। তাহলে এ জাতীয় অঙ্গীকারের উপকারিতা কি? যা মনেই থাকে না এবং এর কারণে ধরপাকড় হওয়া অনুচিত?

উত্তর. এই ভুলে যাওয়া অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই তো আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছেন। যারা বিরামহীনভাবে এ বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই ধরপাকড় না হওয়ার তো কোনো কারণই থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ اَلتَّذْكِيْرُ : اَلتَّذْكِيْرُ হলো মুবতাদা এবং قَائِمٌ مَقَامَ ذِكْرِهِ فِى النُّفُوْسِ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ سَكَنَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَخْلَدَ টা خُلُوْدٌ হতে নিষ্পন্ন যার অর্থ হলো دَوَامٌ [সর্বদা]। বরং اَخْلَدَ টা مَالَ অর্থে اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ অর্থ হলো مَالَ اِلَيْهَا

قَوْلُهُ فِىْ دُعَائِهِ اِلَيْهَا : অর্থাৎ دُعَاءِ الْهَوٰى اِيَّاهُ তথা মনের কুপ্রবৃত্তি বালআমকে দুনিয়ার প্রতি আহ্বান করেছে। এতে مَصْدَر مُضَافْ টা فَاعِلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَوَضَعْنَاهُ : অর্থাৎ ذَلَّلْنَاهُ

قَوْلُهُ اَوْ اِنْ تَتْرُكْهُ : কোনো কোনো নুসখায় اِنْ-এর উল্লেখ নেই। এটা লেখকের ভ্রান্তি হয়েছে। মুফাসসির (র.) اَنْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, তার আতফ تَحْمِلْ -এর উপর ; اِنْ تَحْمِلْ-এর উপর নয়। কাজেই تَتْرُكْهُ -এর জযম সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

قَوْلُهُ جُمْلَتَا الشَّرْطِ حَالٌ : অর্থাৎ মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি উভয় বাক্যই حَالْ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, কুকুর সর্বাবস্থায় জিহ্বা বের করে হাপাতে থাকে, চাই সে আরামের অবস্থায় হোক বা কষ্টের মধ্যেই হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَسْتُ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ : আয়াতগুলোতে মহাপ্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং দাস ও মানবের মাঝে সে সময় হয়েছিল, যখন এ দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টি আসেওনি যাকে বলা হয় عَهْد اَزَلْ বা عَهْد اَلَسْتُ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও অধিপতি। আকাশ ও ভূমণ্ডলের মাঝে অথবা এসবের বাইরে যা কিছুই রয়েছে সবই তাঁর সৃষ্টি ও অধিকারভুক্ত। তিনিই এসবের মালিক। না তাঁর উপর কারো বিধান চলতে পারে, আর নাইবা থাকতে পারে তাঁর কোনো কাজের উপর কারো কোনে প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাঁদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্য রয়েছে সব রকমের আজাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় কাজকর্ম; এমনকি মনের গোপন ইচ্ছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোনো পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরি করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেওয়া এবং সেজন্য সাক্ষীসাবুদ দাঁড় করানোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোনো লোককে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লিখিত-পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষীসাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায় যেন সে নিজেও নিজকে অপরাধী বলে স্বীকার করে নেয় এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ এমন কোনো বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে– كُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থাৎ মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে। অতঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেওয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আজাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহাবিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজকর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোনো কোনো অপরাধী সাক্ষীদের মিথ্যা বলে দাবি করবে, তখন তারই হাত-পা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা বাতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোনো সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে– فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হননি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মতো নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্যসাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থা' সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তৈরি করেন যে, যে-ই এর বিরুদ্ধাচরণ করবে সেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার [পিতার] স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয়ে বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহু গুণ বেশি। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসেবেই তৈরি করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানি নির্দেশনামা। এক বিরাটসংখ্যক ফেরেশতাকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সৎকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এ ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান প্রতিপালককে স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে দেওয়া, আসমান ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো এমন সব নির্দেশ স্থাপন করে দেওয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে কোনো সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে- وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও [নিদর্শন রয়েছে]। তারপরও কি তোমরা দেখছ না? তাছাড়া যারা গাফেল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সৎকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাব্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এও করেছেন যে, ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কুরআন মাজীদের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোনো আশঙ্কাই তাঁদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহর এ পবিত্র দল নিজেদের এ প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রিসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কুরবান করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজ নিজ নবী-রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ পূরণ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি, যা আমাদের রাসূল ﷺ সম্পর্কে সমস্ত নবী-রাসূলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে যে, তাঁর 'নবীয়ে-উম্মী' খাতামুল আম্বিয়া ﷺ-এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করবেন যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছে-

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেদের কর্তব্য কর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বারবার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়'আত গ্রহণের তাৎপর্য : নবী-রাসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি ওলামা ও মাশায়েখদের মাঝে বায়'আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এ ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়'আতের মধ্যে 'বায়'আতে রিদওয়ান'-এর কথা কুরআন কারীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বিশেষ গাছের নিচে আপনার হাতে 'বায়'আত' নিয়েছেন। হিজরতের পূর্বে মদিনার আনসারদের বায়'আতে 'আকাবা-'ও এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর কাছ থেকে ঈমান ও সৎকর্মে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়'আত নেওয়া হয়েছে। মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ে যে বায়'আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান ও সৎকর্মে নিয়মানুবর্তিতা এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ ও নবী-রাসূলদের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরিয়তের নির্দেশাবলি যথাযথ পালনের সৎসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়'আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়'আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোনো বুজুর্গের হাতে হাত রেখে দেওয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয় তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়'আত হলো একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। না হলে এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা বনী ইসরাঈলদের কাছ থেকে তাওরাতের বিধিবিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে এ দুনিয়ার আসারও পূর্বে সৃষ্টি লগ্নে নেওয়া হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় عَهْدِ اَلَسْتُ [আহদে-আলাস্তু] বলে প্রসিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ .... عَلٰى اَنْفُسِهِمْ : এ আয়াতগুলোতে আদম সন্তানদের বুঝাবার জন্য ذُرِّيَّتَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইস্‌ফাহানী (র.) বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذَرْءٌ [যারউন] থেকে গঠিত। যার অর্থ– সৃষ্টি করা। কুরআনে কারীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا প্রভৃতি। কাজেই 'যুররিয়্যাত'-এর শাব্দিক তরজমা হলো সৃষ্টি। এ শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়ায়েতে এ আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা– ইমাম মালিক, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (র.) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত ফারুক আ'যম (রা.)-এর কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হলো এই–

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরসে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোজখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোজখে যাবার মতোই কাজ করবে। সাহাবীদের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথমেই যখন জান্নাতি ও দোজখি সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে? হুজুর ﷺ বললেন, "যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে জান্নাতবাসীর কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ যখন কাউকে দোজখের জন্য তৈরি করেন, তখন সে দোজখের কাজেই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোনো কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।"

অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন্ শ্রেণিভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (র.)-এর রেওয়ায়েতে এ বিষয়টিই হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা হযরত আদম (আ.)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মতো যত আদম সন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল!

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুররিয়াত'-এর আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেওয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কুরআনের শব্দে 'বনী-আদম' অর্থাৎ আদম সন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, হযরত আদম (আ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে করা হয়েছে, যারা সরাসরি হযরত আদম (আ.)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যদের। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে আদম সন্তানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, হযরত আদম (আ.) থেকে তাঁর সন্তানদের, অতঃপর এ সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদের অনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কুরআন মাজীদে সমস্ত আদম সন্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদম-সন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের সূক্ষ্মতার অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। কারণ প্রতিপালক, বিদ্যমানতা এবং

লালনপালনের প্রয়োজন বেশির ভাগ সেই ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কালো বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দীপ্তির বর্ণনা রয়েছে, তাতেও বুঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরী আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোনো রং বা বর্ণ নেই, শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই যে, কিয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ রয়ে গেছে যে, তখন যে আদম সন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মতো। তাছাড়া বিজ্ঞানে বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোনো সমঝদার লোকের মনে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নেরই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকারে-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিঁপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অণুর ভেতরে গোটা সৌরমণ্ডলীর ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড়র চেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যদি এ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদম সন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তা আর তেমন কঠিন হবে কেন?

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এ আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমত এ প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেওয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোনো মানুষের জন্মই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কেমন করে হলো, যাতে তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে এবং তাঁর প্রতিপালক হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ প্রতিপালকের কথা সেই স্বীকার করতে পারে, যে প্রতিপালক সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এ প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেওয়া হয়েছিল– এ সম্পর্কে মুফাস্সিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (র.) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, এ প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেওয়া হয়, যখন হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হলো, 'ওয়াদিয়ে নু'মান' যা পরবর্তীকালে আরাফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধ ও খ্যাতি লাভ করেছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

থাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এ নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোনো স্রষ্টা ও প্রতিপালক রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে! এর উত্তর হলো এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখন প্রয়োজনুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি দেওয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল! আর প্রকৃতপক্ষে হয়েও ছিল তাই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও কুদরতের এমন সব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য করবে, সে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কুরআনে রয়েছে– وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ অর্থাৎ বিজ্ঞজনদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও [নিদর্শন রয়েছে], তবুও কি তোমরা দেখছ না?

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি [আহদে আলাস্তু] যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অন্তত সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোরই স্মরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হলো?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদম সন্তানদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন যারা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এ প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (র.) বলেছেন, এ প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে স্মরণ আছে, যেমন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এ স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার

আশেপাশে কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার স্মরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হলো এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্টগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো স্মরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এ প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এ স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে আল্লাহ-পরিচিতির একটা বীজ রোপণ করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জানা থাক কিংবা না থাক। আর এ বীজেরই ফুল-ফসল এই যে, প্রত্যকটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্ত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে; তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং সৃষ্টি-পূজার কোনো ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনোভাবে। সেই কতিপয় হতভাগ্য যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহর ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমান্বিত অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোনো গোমরাহ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে- عَلٰى هٰذِهِ الْمِلَّةِ [বুখারী মুসলিম] অর্থাৎ প্রতিটি সন্তান স্বভাবধর্ম অর্থাৎ ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতামাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ বলেন যে, আমি আমার বান্দাদের 'হানীফ' অর্থাৎ এক আল্লাহতে বিশ্বাসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে যা এ পৃথিবীতে নবী-রাসূল ﷺ -এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক, সেগুলো কিন্তু যে-কোনো অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আজান আর বাম কানে ইকামত ও তাকবীর বলার যে সুন্নতটি সব মুসলমানই জানে এবং [আলহামদুলিল্লাহ] সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে; যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তা হলো এই যে, এতে করে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে করে। এমনিভাবে যারা কুরআনের ভাষা জানে তাদের প্রতিও কুরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয়তো এই যে, এতে করে অন্তত এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সে জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোনো অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاۤؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ। অর্থাৎ এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কিয়ামতের দিন এমন কোনো ওজর-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি, ভুল-শুদ্ধ কোনোটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই গ্রহণ করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদের দেওয়া হবে কেন? আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদের দেওয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয়ে বুঝতে পারা কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আগুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোনো মানুষ প্রভৃতির কোনো একটিও এমন নয়, যাকে কোনো মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি এভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছিল। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করবে।

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ الخ : উল্লিখিত আয়াতে বনী ইসরাঈলের জনৈক বড় আলেম অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি নিদর্শনমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত করা হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা আদি লগ্নে সমস্ত আদম-সন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদি-খ্রিস্টান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেকেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদিরা খাতিমুন্নাবিয়্যীন ﷺ -এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকারে-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

বনী ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পথভ্রষ্টতার নিদর্শনমূলক ঘটনা : এ আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা পড়ে শুনিয়ে দিন, যাতে বনী ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরেফ এবং প্রখ্যাত নেতার এমনি উত্থানের পর পতন ও হেদায়েতের পর গোমরাহির কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মা'রেফাত হাসিল করার পর, যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হলো।

কুরআন মাজীদে সে লোকের নাম বা কোনো পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরবিশারদ, সাহাবী ও তাবেঈনদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হযরত ইবনে মারদুইয়াহ (র.) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বাল'আম ইবনে বা'উরা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্‌আনের অধিবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহর কোনো কোনো কিতাবের ইলম তার ছিল। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআনে কারীমে اَلَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا বলা হয়েছে, তাতে সে ইলমের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরাউনের জলমগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর তখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলদের 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম হলো এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, হযরত মূসা (আ.) সমগ্র বনী ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন পক্ষান্তরে তাদের মোকাবিলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জলমগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হলো। তারা সবাই মিলে বাল'আম ইবনে বা'উরার কাছে সমবেত হয়ে বলল, হযরত মূসা (আ.) অতি কঠিন লোক, তদুপরি তাঁর সাথে সৈন্যও বিপুল– তারা এসেছে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবিলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বাল'আম ইবনে বা'উরা ইস্‌মে আ'যম জানত এবং সেই ইসমের মাধ্যমে যে দোয়া করতো তাই কবুল হতো।

বাল'আম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ? তিনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি! আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

জাব্বারীনরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাল'আম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট জেনে সেই এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা। সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য ইস্তেখারা কিংবা অন্য কোনো আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেওয়া হলো, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে

বারণ করা হয়েছে। তখন 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় তাকে একটা বিরাট উপঢৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচবিশেষ। সে যখন সেই উপঢৌকন গ্রহণ করে নিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি এ কাজটি করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল, ফলে সে হযরত মূসা (আ.) এবং বনী ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহূর্তে আল্লাহর মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিস্ময় দেখা দেয়– হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চিৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বল'আম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচারণে সমর্থ নয়। ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস অবতীর্ণ হলো। আর বাল'আমের শাস্তি হলো এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদের একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদের সাজিয়ে বনী ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভালো করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলদের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোনো রকম বাধ যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয়তো বা এরা এ ব্যবস্থায় হারামকারীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে আর আল্লাহর নিকট হারামকারী অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, অবশ্য তাতে গজব ও অভিসম্পাত নাজিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না। বাল'আমের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হলো এবং সেমতেই কাজ করা হলো। বনী ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত হতে বললেন। কিন্তু সে বিরত হলো না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমনকি যে লোক অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছিল তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল যাতে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হলো।

কুরআন মাজীদে উল্লিখিত এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا অর্থাৎ আমি আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান-পরিচয় সে লোককে দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে। اِنْسِلَاخٌ [ইনসেলাখুন] শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে পড়েছে।

فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ [শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।] অর্থাৎ যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহর স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোনো রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল। فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ [অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত।] অর্থাৎ শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে اَخْلَدَ শব্দটি اِخْلَادٌ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ হলো কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোনো স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর اَرْض-এর প্রকৃত অর্থ হলো– ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যা কিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমি সংক্রান্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাখো-কোটি বস্তু-সামগ্রী, যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েশ নির্ভরশীল। সুতরাং "اَرْض" [আরদ] শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বুঝানো হয়েছে। আয়াতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এ জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এ বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে- فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ - لهث শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো জিহ্বা বের করে জোরে শ্বাস নেওয়া। প্রতিটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভিতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভিতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ তা'আলাও প্রতিটি জীবের জন্য এ কাজটি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোনো ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভিতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভিতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোনো শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ কাজটি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীবজন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহবা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয় যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়।

কুরআনে কারীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল! তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করুক আর না-ই করুক, সে যে কোনো অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ এই হলো সে সমস্ত জাতির উদাহরণ, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এর মর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এরাই হলো সেই সমস্ত মক্কাবাসী, যারা কোনো একজন পথপ্রদর্শকের আগমন কামনা করত, যিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং আনুগত্যের সঠিক পন্থা বাতলে দেবেন। কিন্তু যখন সেই পথপ্রদর্শক আগমন করলেন এবং এমন সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এলেন যাতে তাঁর সত্যতা ও সঠিকতার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশও থাকতে পারে না, তখন তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অমান্য করতে থাকে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এতে উদ্দেশ্য হলো, বনী ইসরাঈল, যারা মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাঁর নিদর্শন ও লক্ষণাদি এবং তাঁর গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাওরাতে পাঠ করে মানুষকে বলত এবং তারা নিজেরাও তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তাঁর আগমনের পর তারাই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা ও শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাওরাতের বিধিবিধান থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যায়, যেমন করে বেরিয়ে গিয়েছিল বাল'আম ইবনে বা'উরা।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আপনি সে সমস্ত লোকদের কাহিনী তাদেরকে শুনিয়ে দিন। হয়তো তাতে তারা কিছুটা চিন্তা করবে এবং এ ঘটনার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের অবস্থা একান্তই নিকৃষ্ট। আর এসব লোক নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করছে অন্য কারোই কিছু অনিষ্ট করছে না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং তাতে বিবৃত ঘটনায় চিন্তাশীলদের জন্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

প্রথমত কারো পক্ষে নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে বিলম্ব হয় না। যেমন হয়েছিল বাল'আম ইবনে বা'উরার পরিণতি। ইবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহর শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত এমন সব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, বিশেষ করে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ ভ্রান্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বাল'আম ইবনে বা'উরা এই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চতুর্থত অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হলো নিজ জাতিকে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রকোপ হতে বিরত রাখা। অন্যাথায় আল্লাহ তা'আলার আজাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমত আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ করলে মানুষ আজাবে পতিত হয় এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ তা'আলা দীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমতো সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্য বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا : 'আসমায়ে-হুসনা' বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ : উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলা বাহুল্য, কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর, যার উর্ধ্বে আর কোনো স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্টির পক্ষে এ স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ যে কোনো পূর্ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতর এবং জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ -এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহর সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহকে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহ্বান করা হলো 'দোয়া' শব্দের অর্থ। আর 'দোয়া' শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো আল্লাহর জিকির, প্রশংসা ও তাসবীহ-তাহলীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হলো নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ بِهَا শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হলো এই যে, হামদ, ছানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তাসবীহ-তাহলীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে। আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা আল্লাহর নাম বলে প্রমাণিত।

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা : এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দুটি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্তাই প্রকৃত হামদ-ছানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোনো শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ পরবশ হয়ে আমাদের যেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদের বাধ্য করে দিয়েছেন, যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের উর্ধ্বে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (র.) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর নিরানব্বই নাম পাঠ করে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হয়। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন- اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধ কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোনো পন্থা এমন নেই, যাতে কোনো না কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফল লাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হলো এই যে, দোয়া যে একটি ইবাদত তার ছওয়াব দোয়াকারীর আমল-নামায় তখনই লেখা হয়ে যায়।

অনুবাদ :

١٨٢. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَاْخُذُهُمْ قَلِيْلًا قَلِيْلًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ.

১৮২. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা আমার নিদর্শন আল-কুরআন কে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদেরকে এমনভাবে অবকাশ দিয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব ক্রমে ক্রমে পাকড়াও করব যে তারা জানতেও পারবে না।

١٨٣. وَاُمْلِيْ لَهُمْ ط اَمْهِلُهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ شَدِيْدٌ لَا يُطَاقُ.

১৮৩. আমি তাদেরকে সময় দেই, ঢিল দেই। আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ, মজবুত, তা বিনষ্ট করার শক্তি কারো নাই।

١٨٤. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فَيَعْلَمُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِّنْ جِنَّةٍ ط جُنُوْنٍ اِنْ مَا هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ.

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না? তাহলে জানতে পারত তাদের সাথি মুহাম্মদ ﷺ -এর মধ্যে উন্মাদ হওয়ার কিছু নেই। তিনি উন্মাদ নন। তিনি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। যার সতর্কীকরণ অতি স্পষ্ট। اِنْ এটা এ স্থানে مَا বা না-বাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٨٥. اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ مُلْكِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ فِيْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ بَيَانٌ لِمَا فَيَسْتَدِلُّوْا بِهِ عَلٰى قُدْرَةِ صَانِعِهِ و وَحْدَانِيَّتِهِ وَ فِيْ اَنْ اَيْ اَنَّهُ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ قَرُبَ اَجَلُهُمْ ط فَيَمُوْتُوْا كُفَّارًا فَيَصِيْرُوْا اِلَى النَّارِ فَيُبَادِرُوْا اِلَى الْاِيْمَانِ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ اَيِ الْقُرْاٰنِ يُؤْمِنُوْنَ.

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতি সুবিশাল রাজ্যের প্রতি এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি। مِنْ شَيْءٍ এটা مَا خَلَقَ -এ উক্ত مَا -এর بَيَانٌ অর্থাৎ বিবরণ। যদি লক্ষ্য করত তবে তার মাধ্যমে এ সকলের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর একত্বের প্রমাণ পেত। আর হয়তো তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী আর কাফের হিসাবে ইহলীলা সংবরণ করে তারা জাহান্নামের দিকে যাবে সুতরাং ঈমান আনয়নের প্রতি যেন এরা এগিয়ে আসে এটার পর অর্থাৎ আল-কুরআনের পর তারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে! اَنْ এটা এ স্থানে مُثَقَّلَة অর্থাৎ তাশদীদসহ রূঢ় রূপ হতে مُخَفَّفَة অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে রূপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এদিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য এটার তাফসীরে اَنَّهُ উল্লেখ করা হয়েছে। اِقْتَرَبَ অর্থ قَرُبَ সন্নিকট।

١٨٦. مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ط وَيَذَرُهُمْ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ مَعَ الرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا وَالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ تَحَيُّرًا.

১৮৬. আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোনো পথ প্রদর্শক নেই। আর তাদেরকে তিনি তাদের অবাধ্যতায় অস্থির অবস্থায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন। يَذَرُ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ن অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচনরূপে বহুবচন পঠিত রয়েছে। এটার শেষ অক্ষর ر -এ رَفْع হলে এটা مُسْتَانِفَة অর্থাৎ নবগঠিত বাক্য ও جَزْم হলে ف -এর পরবর্তী مَحَلّ -এ عَطْف হয়েছে বলে গণ্য হবে।

١٨٧. يَسْـئَلُوْنَكَ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ الْقِيَامَةِ اَيَّانَ مَتٰى مُرْسٰهَا ط قُلْ لَهُمْ اِنَّمَا عِلْمُهَا مَتٰى تَكُوْنُ عِنْدَ رَبِّىْ ج لَا يُجَلِّيْهَا يُظْهِرُهَا لِوَقْتِهَآ اَللَّامُ بِمَعْنٰى فِىْ اِلَّا هُوَ م ثَقُلَتْ عَظُمَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط عَلٰى اَهْلِهَا لِهَوْلِهَا لَاتَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ط فُجْاَةً يَسْـئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ مُبَالِغٌ فِى السُّؤَالِ عَنْهَا ط حَتّٰى عَلِمْتَهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَاكِيْدٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ اَنَّ عِلْمَهَا عِنْدَهٗ تَعَالٰى ـ

১৮৭. তারা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত কখন ঘটবে?' اَلسَّاعَة এ স্থানে অর্থ কিয়ামত। اَيَّانَ অর্থ, কখন। এদেরকে বলে দাও এ বিষয়ের অর্থাৎ তা কবে ঘটবে সেই জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। তিনি ব্যতীত তার সময় আর কেউ স্পষ্ট করবে না, প্রকাশ করতে পরাবে না। لِوَقْتِهَا এটার لَام টি এ স্থানে فِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অর্থাৎ তার অধিবাসীদের জন্য এর ভয়ঙ্করতার কারণে এটা ভীষণ বোঝা সাংঘাতিক এক বিষয়! আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। তুমি এ বিষয়ে অবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল এ বিষয়ে জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটই আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জ্ঞাত নয়। যে এটার জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে। بَغْتَةً -অর্থ, অকস্মাৎ। حَفِىٌّ অর্থ- যে বারবার খুব প্রশ্ন করে জেনে নেয়। قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا এটা এ স্থানে تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

١٨٨. قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا اَجْلِبُهٗ وَّلَا ضَرًّا اَدْفَعُهٗ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِّىْ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ج مِنْ فَقْرٍ وَغَيْرِهٖ لِاِحْتِرَازِىْ عَنْهُ بِاجْتِنَابِ الْمَضَارِ اِنْ مَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ بِالنَّارِ لِلْكٰفِرِيْنَ وَبَشِيْرٌ بِالْجَنَّةِ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

১৮৮. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কল্যাণ করা এবং অকল্যাণ প্রতিহত করারও আমি মালিক নই। আমি যদি গায়েবের অর্থাৎ যা আমা হতে অদৃশ্য তার খবর জানতাম তবে তো আমি বেশি করে কল্যাণই লাভ করে নিতাম এবং এই ভবিষ্যৎ জ্ঞানের মাধ্যমে পূর্ব থেকেই আমার ক্ষতি হতে বেঁচে থাকার দরুন কোনো অকল্যাণ দারিদ্র্য ইত্যাদি আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের বেলায় জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদবাহী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ نَاْخُذُ : এখানে نَسْتَدْرِجُ-এর তাফসীর نَاْخُذُ দ্বারা করে مَعْنٰى مُرَادِىْ-এর দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। اِسْتِدْرَاجٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো ধাপে ধাপে আরোহণ করা। (اَلْاِسْتِصْعَادُ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةٍ) যেহেতু কাফেরদের জন্য কোনো اِصْعَادٌ বা উচ্চ মর্যাদায় আরোহণ নেই, তাই তার مُرَادِىْ অর্থ উদ্দেশ্য হবে, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার করা।

قَوْلُهٗ اَمْهِلُهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ مُرَادِىْ অর্থকে বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। কেননা اُمْلِىْ-এর অর্থ اِمْلَا করানো যা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ فَيَعْلَمُوْنَ : প্রশ্ন. فَيَعْلَمُوْنَ উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর. فَيَعْلَمُوْنَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَا بِصَاحِبِهِمْ টা উহ্য يَعْلَمُوْنَ-এর মাফঊল হয়েছে; يَتَفَكَّرُوْا -এর নয়। কেননা يَتَفَكَّرُوْنَ হলো লাযেম। এর মাফঊলের প্রয়োজন হয় না। অথচ মাফঊল বিদ্যমান রয়েছে, কাজেই আপত্তি নিঃশেষ হয়ে গেল যে يَتَفَكَّرُوْا টা مَفْعُوْل -এর দিকে مُتَعَدِّيْ নয়।

قَوْلُهُ جُنُوْنٍ : جِنَّةٍ -এর তাফসীর جُنُوْنٍ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, جِنَّةٍ দ্বারা জিন সম্প্রদায় উদ্দেশ্য নয়; কেননা এটা কাফেরদের জবাবে পতিত হয়েছে। কাফেররা বলত– إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَمَجْنُوْنٌ যদি جِنَّةٍ দ্বারা জিন জাতি উদ্দেশ্য নেওয়া হতো; তবে প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সামঞ্জস্য থাকবে না।

قَوْلُهُ وَفِيْ : এটা উহ্য মানার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, مَا خَلَقَ اللّٰهُ -এর আতফ مَلَكُوْت-এর উপর হয়েছে, নিকটবর্তী (اَلْاَرْض) -এর উপর নয়। কেননা এ সুরতে অর্থ ঠিক থাকবে না।

قَوْلُهُ اَىْ اَنَّهُ : এটা উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে اَنْ টা হলো مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ তবে এটা مَصْدَرِيَّة নয়, যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করেছেন। কেননা اَنْ مَصْدَرِيَّة টা اَفْعَال غَيْر مُتَصَرِّفَه -এর মধ্যে প্রবেশ করে না। যেহেতু তাদের মাসদার হয় না।

قَوْلُهُ فَيَتَبَادَرُوْا : এটা اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا -এর জবাব হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে

قَوْلُهُ مَعَ الرَّفْعِ اِسْتِيْنَافًا : অর্থাৎ وَهُوَ نَذَرُهُمْ

قَوْلُهُ وَبِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ مَا بَعْدَ الْفَاءِ : এটা نَذَرُهُمْ-এর মধ্যে অন্য আরেকটি তারকীবের দিকে ইঙ্গিত করেছে। نَذَرُ -এর মধ্যে দুটি اِعْرَابٌ হতে পারে– جُمْلَه مُسْتَانِفَه হওয়ার কারণে رَفْع হবে جَوَاب شَرْط হওয়ার কারণে جَزْم হবে। لَا هَادِىَ لَهٗ এটা جَوَاب شَرْط হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে।

প্রশ্ন. مَحَل -এর উপর عَطْف করেছে শব্দের উপর করেনি, এর কারণ কি?

উত্তর. কেননা এ সুরতে ফে'ল এর اِسْم -এর উপর আতফ করা আবশ্যক হয় যা مُسْتَحْسِنْ নয়। উহ্য ইবারত হলো– مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ لَا يَهْدِيهِ اَحَدٌ وَنَذَرُهُمْ

قَوْلُهُ مُرْسٰهَا : اِرْسَاءٌ হতে মাসদার হতে পারে। অর্থ– اِسْتَقَرَّ এবং اِثْبَاتٌ মুজাররাদ হতে رَسَا অর্থ ثَبَتَ আর رَسَتِ السَّفِيْنَةُ অর্থ হলো وَقَفَتْ عَنِ الْجَرْيِ

قَوْلُهُ حَفِيٌّ : প্রশ্নের মধ্যে মুবালাগা বা অতিরঞ্জনকারী অর্থাৎ মাসআলার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছার চেষ্টাকারী। যে এরূপ করে সে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। আর এর থেকেই اِحْفَاءُ الشَّارِبِ তথা গোঁফ খুবই ছোট করে কর্তন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا : আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, যারা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার আদর্শের বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করেছে তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নীতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অতীব ভয়ানক। কেননা তাদেরকে তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় না; বরং তাদেরকে আল্লাহ পাক অবকাশ দেন, প্রথমেই কোনো আজাব দেওয়া হয় না; বরং সুখ-সামগ্রীর দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাদের দুর্নীতি এবং দৌরাত্মের শাস্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল এবং নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে– এভাবে তারা অধিকতর অন্যায় আচরণের লিপ্ত হয়, তাদের অন্যায়ের ঘটা পূর্ণ হয়ে যায় তারা সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক অবস্থায় জুলুম অত্যাচারে গা ভাসিয়ে দেয় এরপর একদিন অতর্কিতভাবে তাদের উপর আজাব আসে।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করেছে, যেমন আবূ জাহল ও তার সঙ্গীরা তাদেরকে ধীরে ধীরে শাস্তি দেওয়া হবে। –[তানবীরুল মেকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃ. ১৪২]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে, কেননা তারাই আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব, এভাবে যে, তারা বুঝতেও পারবে না, যে তারা পায়ে পায়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হযরত আতা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি তাদের শাস্তির ব্যাপারে এমন গোপন ও সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করব যে, তাদের কোনো কিছুর খবরই হবে না। কালবী (র.) বলেছেন, ধীরে ধীরে শাস্তি দেওয়ার তাৎপর্য হলো এই যে, তাদের অন্যায় অনাচার তাদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয় এবং মোহনীয় হবে এরপর তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।

হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো কাফেররা যত নতুন নতুন পাপকাজে লিপ্ত হবে আমি তাদেরকে তত নতুন নতুন নিয়ামত দিতে থাকব। যখন তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হবে তখন তাদেরকে ধ্বংস করা হবে।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, আমি তাদেরকে দুনিয়ার নিয়ামত এবং সম্পদে সমৃদ্ধ করব এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলিয়ে দেব। এরপর কঠোর শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে। –[তাফসীরে মাজহারী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫]

قَوْلُهُ وَأُمْلِي لَهُمْ : অর্থাৎ আমি তাদের বয়স বাড়িয়ে দেব এবং তাদের অন্যায় কাজগুলো তাদের নিকট পছন্দনীয় করে দেব এবং তাদের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে তারা পাপাচারে লিপ্ত থাকবে। অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে

قَوْلُهُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ : অর্থাৎ আমার ধরা বড় শক্ত ধরা। অথবা এর অর্থ হলো, আমার কৌশল হলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুদৃঢ়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, তাদের বিরুদ্ধে আমার গোপন তদবির অত্যন্ত শক্ত এবং কঠিন। বর্ণিত আছে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সেই সব দুরাত্মাদের সম্পর্কে যারা আল্লাহ পাকের শানে বেআদবি করত এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করত এবং মু'মিনদের প্রতিও ঠাট্টা করত, অবশেষে আল্লাহ পাক এক রাত্রেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৫]

قَوْلُهُ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল তথা আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং নাফরমান লোকদের অবস্থা ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে আর তা হলো এই যে, এ কাফেররা সত্য সম্পর্কে চিন্তা করে না, তাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারেও তথা আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও তারা এতটুকু চিন্তিত হয় না। এজন্যে তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালতকে অস্বীকার করে এমনকি আল্লাহ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদেও বিশ্বাস করে না। যদি তারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অবস্থা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এবং তাঁর মু'জিযা সম্পর্কে চিন্তা করত তবে তাঁর রেসালত সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ থাকত না। এমনভিাবে, যদি পরিবর্তনের ব্যাপারে চিন্তা করত তবে তারা আল্লাহ পাকে একত্ববাদকে অস্বীকার করতে পারত না। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো এসব বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা। আর এ বিষয়ে চিন্তা করাও তাদের কর্তব্য– যে কোনো সময়ই মৃত্যুর অলজ্ঘনীয় বিধান তাদের উপর কার্যকর হতে পারে এবং তাদের জীবনের অবসান ঘটতে পারে। অতএব, মৃত্যুর পরের জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করাও তাদের কর্তব্য।

এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার একথাও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সত্য-বিমুখ কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারা প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে তথা দীন ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। এ দুরাত্মারা প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে এ সন্দেহ প্রকাশ করত যে, যিনি নবুয়তের দাবিদার তিনি পাগল নন তো? [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক] এতদ্ব্যতীত, তারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ ভিত্তিহীন সন্দেহের জবাব দিয়েছেন।

–[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কান্দলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ১৭০; তাফসীরে কাবীর, খ. ১৫, পৃ. ৭৫]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম এবং আবুশ শেখ হযরত কাতাদা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা মুয়াযযামার সাফা নামক পাহাড়ে আরোহণ করে কুরায়েশের প্রত্যেক খানদানের লোকদের নাম ধরে ডাক দিয়ে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষার আহ্বান জানান। আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং আখেরাতের আজাব থেকে নাজাত লাভের তাগিদ দেন। কিন্তু দুরাত্মা পৌত্তলিকরা তাঁর ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত হয়নি; বরং তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত অশালীন এবং বেআদবিপূর্ণ মন্তব্য করে বলে, তোমাদের সাথি কি উন্মাদ হয়ে গেছে যে রাতভর চিৎকার দিচ্ছে? [নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক] তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফফার ও মুনকেরীনদের হঠকারিতা এবং আল্লাহ তা'আলার মহা কুদরতের প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ঈমান না আনার আলোচনা ছিল। আর বর্তমান বিষয়টি রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য উম্মত এবং সাধারণ সৃষ্টির সাথে তাঁর অসাধারণ প্রীতি ও দয়ার কারণে তাঁর চরম মনোবেদনা ও দুঃখের কারণ হতে পারত বলে আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে- যাদেরকে আল্লাহ নিজে পথভ্রষ্ট করে দেবেন, তাদেরকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের লোকদের পথভ্রষ্টতায় উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায়ই ছেড়ে দেন।

সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন। কারণ, সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হলো একান্ত ভাগ্য সংক্রান্ত। এতে তাঁর কোনো হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন।

এ সূরায় বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১. তওহীদ, ২. রিসালত ও ৩. আখেরাত। আর এ তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তাওহীদ ও রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত ও কিয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাজিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। তাই তাফসীরে ইমাম ইবনে জারীর (র.) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (র.) হযরত কাতাদাহ (র.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশরা হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞেস করলে যে, আপনি কিয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন- এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কিয়ামত কোন সনের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরি হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্কে বিদ্যমান তার দাবিও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদের বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্তত আমাদের বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাজিল হয় يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতটি।

এখানে উল্লিখিত سَاعَةَ শব্দটি আরবি ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোনো বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় سَاعَة [সাআত] যাকে বাংলায় ঘণ্টা নামে অভিহিত করা হয়। কুরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সেই দিবসকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যু দিবস এবং সে দিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। اَيَّانَ [আইয়ানা] অর্থ কবে। আর مُرْسٰى [মুরসা] অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া।

قَوْلُهُ لَا يُجَلِّيْهَا : শব্দটি تَجْلِيَة থেকে গঠিত। এর অর্থ- প্রকাশিত এবং খোলা। بَغْتَةً [বাগতাতান] অর্থ অকস্মাৎ। حَفِيٌّ [হাফিয়্যুন] অর্থ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকেরই আছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারও জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পরবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোনো মাধ্যম থাকবে না। কিয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও জমিনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাগাদা। তা না হলে যারা বিশ্বাসী তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকির তারা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে- لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ কিয়ামত তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবেই এসে উপস্থিত হবে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে [সওদার] এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউস মেরামত করতে থাকবে তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয়তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেওয়ার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কিয়ামতও, যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশ্বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে এবং পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সুদীর্ঘ সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুযোগ পাবে এবং তাদের ঔদ্ধত্য অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হিকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-ক্ষণকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে যে, কোনো একদিন কিয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহর সমীপে সবারই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভালো-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাশ নেওয়া হবে, যার ফলে হয় জান্নাতের অকল্পনীয় ও অনন্ত ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা করতেও পিত্ত পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোনো বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমলের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবি হলো বয়সের অবকাশকে গনিমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরি হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে- يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদের তার যথাথ ও সঠিক তারিখ, দিন-ক্ষণ ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। তারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বোকামি প্রসূত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের আজাবের ভয় করে নেক-আমল অবলম্বন করার এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

আর এ দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো তাদের কথা বোঝা যে, মহানবী ﷺ অবশ্যই কিয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে এ বিষয় অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোনো বিশেষ কারণে সে কথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদের কিয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আপনি লোকদের বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কিয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূলদেরও জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে যে, বহু জ্ঞান আল্লাহ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন, যা কোনো ফেরেশতা কিংবা নবী-রাসূল পর্যন্ত জানতে পারেন না। মানুষ নিজেদের মূর্খতাবশত মনে করে যে, কিয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা রাসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিত আবিষ্কার করে যে, মহানবী ﷺ -এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইলম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ [নাঊযুবিল্লাহ]। কিন্তু উপরোল্লিখিত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হলো এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্হিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হ্যাঁ, মহানবী ﷺ -কে কিয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী ﷺ বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- "আমার আবির্ভাব এবং কিয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দুটি আঙ্গুল।" -[তিরমিযী]

কোনো কোনো ইসলামি কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুজুরে আকরাম ﷺ-এর কোনো হাদীস নয়; বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেওয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতরা আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কুরআনের কোনো আয়াত কিংবা কোনো বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোনো বিরোধ ঘটে না। ইসলামি রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হয়তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন যে, "পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন, যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।" এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুজুর ﷺ -এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেজ ইবনে হায্ম উন্দুলুসী বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা করা যায় না। তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে। -[মুরাগী]

١٨٩. هُوَ أَيِ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ أَيْ اٰدَمَ وَّجَعَلَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج وَيَأْلِفُهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا جَامَعَهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا هُوَ النُّطْفَةُ فَمَرَّتْ بِهٖ ج ذَهَبَتْ وَجَاءَتْ لِخِفَّتِهٖ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ بِكِبَرِ الْوَلَدِ فِيْ بَطْنِهَا وَاَشْفَقَا اَنْ يَّكُوْنَ بَهِيْمَةً دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا وَلَدًا صَالِحًا سَوِيًّا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ لَكَ عَلَيْهِ .

অনুবাদ :

১৮৯. তিনিই আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। প্রেম ও ভালোবাসাপূর্ণ হয় তাদের সম্পর্ক। অতঃপর যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। অর্থাৎ তার সাথে সঙ্গত হয় তখন সে [স্ত্রী] হালকা গর্ভ অর্থাৎ শুক্রকীট ধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে কাল অতিবাহিত করে হালকা হওয়ায় তা নিয়ে চলাফেরা করে। পেটে শিশুটির বৃদ্ধির দরুন গর্ভ যখন গুরুভার হয় এবং উভয়ের আশঙ্কা হয় যে গর্ভটি পঙ্গু হয়ে পড়ে নাকি তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। যদি তুমি আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত সন্তান দাও তবে আমরা এ কারণে তোমার কৃতজ্ঞ থাকব। جَعَلَ অর্থ এ স্থানে خَلَقَ সৃষ্টি করেছেন।

١٩٠. فَلَمَّا اٰتٰهُمَا وَلَدًا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الشِّيْنِ وَالتَّنْوِيْنِ اَيْ شَرِيْكًا فِيْمَا اٰتٰهُمَا ج بِتَسْمِيَتِهٖ عَبْدَ الْحَارِثِ وَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا اِلَّا لِلّٰهِ وَلَيْسَ بِاِشْرَاكٍ فِي الْعُبُوْدِيَّةِ لِعِصْمَةِ اٰدَمَ وَرَوٰى سَمُرَةُ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا اِبْلِيْسُ وَكَانَ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيْهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَاِنَّهٗ يَعِيْشُ فَسَمَّتْهُ فَعَاشَ فَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَاَمْرِهٖ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيْبٌ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ بِهٖ مِنَ الْاَصْنَامِ وَالْجُمْلَةُ مُسَبَّبَةٌ عَطْفٌ عَلٰى خَلَقَكُمْ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ .

১৯০. তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তাদেরকে যা দেওয়া হলো সে সম্বন্ধে তারা আব্দুল হারিছ [হারিছ শয়তানের অন্যতম নাম। সুতরাং এটার অর্থ দাঁড়ায় শয়তানের দাস] নামকরণ করে আল্লাহর শরিক করে। شُرَكَاءَ এটা অপর এক কেরাতে ش-এ কাসরা ও শেষে তানবীনসহ পঠিত রয়েছে। কারণ, কেউ আল্লাহ ব্যতীত আর কারোও দাস হতে পারে না; তবে এটা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শরিক করার মতো ছিল না কেননা হযরত আদম ছিলেন মাসুম বা এ ধরনের কাজ হতে মুক্ত ও নিষ্পাপ। হযরত সামুরা বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান বাঁচত না। তখন একবার শয়তান [সাধুবেশে] তার নিকট এসে বলল, এবার সন্তান হলে তার নাম আব্দুল হারিছ [অর্থ শয়তানের দাস] রেখ, তাহলে সে বাঁচবে। যাহোক অতঃপর হযরত হাওয়া (আ.)-এর সন্তান হলে তিনি তাই করেন। এতে সন্তাটি বেঁচে থাকে। এ কাজটি শয়তানের পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে হয়েছিল। হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করে তা সহীহ বলে মত দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান গরীব [মন্দ নয় তবে অপ্রসিদ্ধ] বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মক্কাবাসীগণ আল্লাহর সাথে যা যে সমস্ত প্রতিমা শরিক করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। فَتَعٰلَى اللّٰهُ। এই مُسَبَّبَة অর্থাৎ হেতুবোধক বাক্যটির উপরোল্লিখিত خَلَقَكُمْ-এর সাথে عَطْف হয়েছে। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বাক্যসমূহ হলো جُمْلَة مُعْتَرِضَة অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বাক্য।

١٩١. أَيُشْرِكُوْنَ بِهِ فِي الْعِبَادَةِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ.

১৯১. তারা ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরিক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট? أَيُشْرِكُوْنَ এ স্থানে تَوْبِيْخ অর্থাৎ ভর্ৎসনা অর্থে প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

١٩٢. وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ اَيْ لِعَابِدِيْهِمْ نَصْرًا وَلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ بِمَنْعِهَا مِمَّنْ اَرَادَ بِهِمْ سُوْءً مِنْ كَسْرٍ اَوْ غَيْرِهِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيْخِ.

১৯২. আর তারা তাদেরকে অর্থাৎ নিজেদের উপাসকদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং কেউ যদি ভেঙ্গে বা অন্য কিছু করে এদের সাথে খারাপ কিছু করার ইচ্ছা করে তবে তা প্রতিহত করে নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

١٩٣. وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اَيِ الْاَصْنَامَ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ط بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اِلَيْهِ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ عَنْ دُعَائِهِمْ لَا يَتَّبِعُوْهُ لِعَدَمِ سِمَاعِهِمْ.

১৯৩. তোমরা তাদেরকে অর্থাৎ এ প্রতিমাসমূহকে হেদায়েতের আহ্বান করলে তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না। তাদেরকে لَا يَتَّبِعُوْكُمْ এটা তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। এটার প্রতি ডাক বা তাদেরকে ডাকা হতে চুপ থাকে তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তারা ঐ আহ্বানের অনুসরণ করবে না। কারণ এরা আসলেই শুনতে পায় না।

١٩٤. اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ مَمْلُوْكَةٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ دُعَاءَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْ اَنَّهَا اٰلِهَةٌ.

১৯৪. আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর উপাসনা কর তারা তো তোমাদের ন্যায়ই মালিকানাভুক্ত দাস। তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক এরা উপাস্য তবে তাদেরকে ডাক তো দেখি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।

١٩٥. ثُمَّ بَيَّنَ غَايَةَ عَجْزِهِمْ وَفَضْلَ عَابِدِيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَا ز اَمْ بَلْ لَهُمْ اَيْدٍ جَمْعُ يَدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَا ز اَمْ بَلْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَا ز اَمْ بَلْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ اَيْ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا هُوَ لَكُمْ فَكَيْفَ تَعْبُدُوْنَهُمْ وَاَنْتُمْ اَتَمُّ حَالًا مِنْهُمْ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ اُدْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ اِلٰى هَلَاكِيْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ تُمْهِلُوْنِ فَاِنِّيْ لَا اُبَالِيْ بِكُمْ.

১৯৫. অতঃপর আল্লাহ ত'আলা এদের চরম অসহায়তা এবং উপাসকরাই যে, এদের উপর অধিক মর্যাদার অধিকারী সে কথার বিবরণ দিচ্ছেন। ইরশাদ করেন; তাদের কি চলাফেরা করার পা আছে? তাদের কি ধরবার হাত আছে? তাদের কি দেখবার চক্ষু আছে? কিংবা তাদের কি শ্রবণ করার কর্ণ আছে? أَمْ -এ আয়াতের সবগুলো أَمْ এ স্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَيْدٍ এটা يَدٌ [হস্ত]-এর বহুবচন; أَلَهُمْ এ আয়াতে اِنْكَارٌ বা অস্বীকৃতি অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের যা আছে তাদের তো এগুলোর একটিও নেই। এতদসত্ত্বেও কেমন করে তোমরা এদের উপাসনা কর। অথচ তোমাদের অবস্থা তো এদের চেয়েও ভালো। হে মুহাম্মদ এদের বলে দাও। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরিক করেছ। আমাকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আর আমাকে অবকাশ দিও না ফুরসত দিও না। আমি তোমাদের কাউকে পরোয়া করি না

١٩٦. إِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ يَتَوَلّٰى أُمُوْرِي الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ بِحِفْظِهِ .

১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ অর্থাৎ তিনিই আমার অভিভাবকত্ব করেন যনি কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআন [অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনিই] তাঁর সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে [সৎকর্ম পরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।]

١٩٧. وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ فَكَيْفَ أُبَالِيْ بِهِمْ .

১৯৭. আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। এরপরও কেমন করে এদের পরোয়া করব।

١٩٨. وَإِنْ تَدْعُوْهُمْ أَيِ الْأَصْنَامَ إِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ط وَتَرٰهُمْ أَيِ الْأَصْنَامَ يَا مُحَمَّدُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ أَيْ يُقَابِلُوْنَكَ كَالنَّاظِرِ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ .

১৯৮. যদি তাদেরকে অর্থাৎ প্রতিমাসমূহকে হেদায়েতের দিকে আহ্বান কর তবে তারা শ্রবণ করবে না এবং হে মুহাম্মদ! তুমি দেখতে পাইবে যে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তোমার সামনে এভাবে পড়বে যে তোমার মনে হবে চেয়ে আছে, কিন্তু মূলত তারা দেখে না।

١٩٩. خُذِ الْعَفْوَ أَيِ الْيُسْرَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ وَلَا تَبْحَثْ عَنْهَا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ الْمَعْرُوْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ فَلَا تُقَابِلْهُمْ بِسَفَهِهِمْ .

১৯৯. তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর অর্থাৎ মানব চরিত্রের সহজ সরল দিক অবলম্বন কর। তাদেরকে কঠিন অবস্থায় ফেলার কোনো পথ তালাশ করো না। ভালো কাজের সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর। এদের মূর্খতার মোকাবিলা করতে যাবে না।

٢٠٠. وَإِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ نُوْنِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الزَّائِدَةِ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ أَيْ إِنْ يَّصْرِفْكَ عَمَّا أُمِرْتَ بِهِ صَارِفٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط جَوَابُ الشَّرْطِ وَجَوَابُ الْأَمْرِ مَحْذُوْفٌ أَيْ يَدْفَعُهُ عَنْكَ إِنَّهُ سَمِيْعٌ لِلْقَوْلِ عَلِيْمٌ بِالْفِعْلِ .

২০০. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে নির্দেশিত পথ হতে যদি বিচ্যুত করার প্রয়াস পায় তবে আল্লাহর শরণাই নিয়ে তিনি সকল উক্তির শ্রোতা ও সকল কাজ সম্পর্কে অবহিত। إِمَّا এতে শর্তবাচক শব্দ إِنْ -এর অতিরিক্ত مَا -এর মধ্যে -এ إِدْغَام অর্থাৎ সন্ধি সাধিত হয়েছে فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ এটা উপরিউক্ত শর্তের জওয়াব। এ স্থানে أَمْر বা নির্দেশাত্মক বাক্যটির জওয়াব مَحْذُوْف বা উহ্য . এর মর্ম হলো, তখন তাকে তোমা হতে প্রতিহত করবে।

٢٠١. إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ أَصَابَهُمْ طَيْفٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ طٰٓئِفٌ أَيْ شَيْءٌ أَلَمَّ بِهِمْ مِنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا عِقَابَ اللّٰهِ وَثَوَابَهُ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ الْحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ فَيَرْجِعُوْنَ .

২০১. যারা তাকওয়ার অধিকারী তাদেরকে যখন শয়তান কোনো প্ররোচনা দানের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করে অর্থাৎ কোনো কিছু পৌছায় তখন তাদের আল্লাহর আজাব ও ছওয়াবের কথা স্মরণ হয় এবং সত্যকে অসত্য হতে পৃথক দেখতে পায়। ফলে তারা ফিরে আসে। طَيْفٌ এটা অপর এক কেরাতে طَائِفٌ রূপেও পঠিত রয়েছে।

٢٠٢. وَاِخْوَانُهُمْ اَىْ اِخْوَانُ الشَّيَاطِيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ يَمُدُّوْنَهُمْ الشَّيٰطِيْنَ فِى الْغَيِّ ثُمَّ هُمْ لَا يُقْصِرُوْنَ يَكُفُّوْنَ عَنْهُ بِالتَّبَصُّرِ كَمَا يَتَبَصَّرُ الْمُتَّقُوْنَ.

২০২. এবং তাদের ভ্রাতাগণ, অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রাতা ও সঙ্গী-সাথী শয়তানের রয়েছে তাদেরকে শয়তানরা ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয়। অতঃপর এতে তারা কোনোরূপ ত্রুটি করে না। অর্থাৎ তাকওয়ার অধিকারীগণ যেমন সত্য-দর্শন করত ফিরে যায় তারা তেমন সত্য-দর্শনের মাধ্যমে ফিরতে পারে না।

٢٠٣. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ بِاٰيَةٍ مِمَّا اقْتَرَحُوْهُ قَالُوْا لَوْلَا هَلَّا اجْتَبَيْتَهَا ط اَنْشَأْتَهَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ قُلْ لَهُمْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج لَيْسَ لِىْ اَنْ اٰتِىَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِىْ بِشَيْءٍ هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَصَائِرُ حُجَجٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

২০৩. তুমি যখন তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট তাদের দাবি ও অভিপ্রায় অনুসারে নিদর্শন উপস্থিত কর না তখন তারা বলে, তুমি নিজেই একটা বেছে নাও না কেন। তুমি নিজে একটা বানিয়ে নাও না কেন? এদের বলে দাও, আমার প্রতিপালকের তরফ হতে আমার প্রতি যে ওহী হয় আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। আমার নিজের পক্ষ হতে কিছু আনয়নের অধিকার আমার নেই। এটা অর্থাৎ আল-কুরআন তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন, প্রমাণ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও রহমত। لَوْلَا এটা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٠٤. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا عَنِ الْكَلَامِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ نَزَلَتْ فِىْ تَرْكِ الْكَلَامِ فِى الْخُطْبَةِ وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالْقُرْاٰنِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ وَقِيْلَ فِىْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ مُطْلَقًا.

২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে এটা শ্রবণ করবে এবং বাক্যালাপ হতে নিশ্চুপ হয়ে থাকবে যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। খুতবার সময় কথাবার্তা বর্জন করার বিষয়ে এ আয়াতটি নাজিল হয়। খুতবাতে যেহেতু কুরআনও অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু এ আয়াতে এটাকে কুরআন বলে প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায় এ বিধান প্রযোজ্য।

٢٠٥. وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ اَىْ سِرًّا تَضَرُّعًا تَذَلُّلًا وَّخِيْفَةً خَوْفًا مِنْهُ وَ فَوْقَ السِّرِّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اَىْ قَصْدًا بَيْنَهُمَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ اَوَائِلِ النَّهَارِ وَاَوَاخِرِهِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

২০৫ তোমার প্রতিপালককে তোমার মনে গোপনে সকাতর সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে চুপিসার হতে একটু উচ্চে একেবারে সশব্দে না করে অর্থাৎ এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ দিনের শুরুতে ও শেষ ভাগে স্মরণ করবে। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের জিকর হতে উদাসীন হয়ো না।

٢٠٦. إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ أَيِ الْمَلٰئِكَةَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ يُنَزِّهُوْنَهٗ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ أَيْ يَخُصُّوْنَهٗ بِالْخُضُوْعِ وَالْعِبَادَةِ فَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ.

২০৬. যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাঁর ইবাদতে অহংকার প্রদর্শন করে না। لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ অহংকার করে না। যা তাঁর উপর আরোপ করার অযোগ্য তা হতে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। পবিত্রতা ঘোষণা করে। এবং তাঁরই নিকট সিজদা নত হয়। ইবাদত ও আনত হওয়া কেবল তাঁর জন্যই বিশেষ করে রেখেছে। সুতরাং তোমরাও তাদের মতো হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَجَعَلَ مِنْهَا : এখানে مَجْرُوْر-এর যমীর نَفْس-এর দিকে ফিরেছে শব্দের হিসেবে। আর لِيَكُنْ-এর যমীরও نَفْس-এর দিকে ফিরেছে অর্থের হিসেবে। আর نَفْس দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الشِّيْنِ وَالتَّنْوِيْنِ أَيْ شِرْكًا بِمَعْنٰى شَرِيْكًا : এটা شُرَكَاءُ-এর অপর একটি কেরাতে বর্ণনা। شُرَكَاءُ এটা شَرِيْك-এর বহুবচন তবে এর দ্বারা مُفْرَدْ-ই উদ্দেশ্য। তার قَرِيْنَة হলো অপর একটি কেরাত। আর তা হলো شِرْكًا [شِيْن যেরযুক্ত এবং رَاءْ সাকিন আর كَافْ-টি তানভীন সহকারে।]

قَوْلُهٗ أَيْ شَرِيْكًا : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شِرْكًا মাসদারটি شَرِيْكًا ইসমে ফায়েল অর্থে হয়েছে, যাতে করে حَمْل বৈধ হয়।

قَوْلُهٗ جَعَلَا لَهٗ : جَعَلَا-এর মধ্যে দ্বিবচনের যমীর কোন দিকে ফিরেছে? কতিপয় মুফাসসিরের মতে এটা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। তবে গবেষক আলেমগণের মতে এর যমীর প্রত্যেক আদম সন্তান ও তার স্ত্রীর দিকে ফিরেছে। কতিপয় তাবেয়ী থেকেও এটা বর্ণিত রয়েছে–

قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ اَلضَّمِيْرُ فِيْ جَعَلَا عَائِدٌ إِلَى النَّفْسِ وَزَوْجَةٍ مِنْ وَلَدِ اٰدَمَ لَا إِلٰى اٰدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (جَصَّاص)

جَعَلَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ شُرَكَاءَ (كَبِيْر عَنِ الْقَفَالِ) ইমাম রাযী (র.) কাফাল -এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন এ ঘটনা উপমার ভিত্তিতে মুশরিকদের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করছে এবং এ তাফসীরকে খুবই পছন্দ করেছেন।

هٰذَا جَوَابٌ فِيْ غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالسَّدَادِ (كَبِيْر) গবেষকগণ এটাও বলেছেন যে, আয়াতের যমীরকে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) -এর দিকে ফিরানোর কোনো সমর্থন কুরআন এবং সহীহ হাদীস দ্বারা পাওয়া যায় না, আর এ ধরনের কাহিনী পয়গম্বরগণের উপযোগী নয়। –[বাহর, বায়যাবী]

قَوْلُهٗ وَلَيْسَ بِإِشْرَاكٍ فِي الْعُبُوْدِيَّةِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবীগণের عِصْمَت-এর دِفَاعْ [প্রতিরোধ] করা।

قَوْلُهٗ الْعُبُوْدِيَّةُ : যদি اَلْعُبُوْدِيَّةُ-এর পরিবর্তে اَلْعِبَادَةُ বা مَعْبُوْدِيَّةٌ বলত তবে অধিক ভালো হতো।

قَوْلُهٗ أَهْلُ مَكَّةَ : এতে এ কথার সমর্থন রয়েছে যে, جَعَلَا-এর মারজি' হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) নন; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী উদ্দেশ্য। এর قَرِيْنَة হলো আল্লাহর বাণী– فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ এখানে يُشْرِكُوْنَ বহুবচনের সীগাহ -এর সাথে আনা হয়েছে। অথচ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) বহুবচন নন।

قَوْلُهٗ وَالْجُمْلَةُ مُسَبَّبَةٌ : অর্থাৎ فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ-এর আতফ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ-এর উপর হয়েছে। মা'তূফ আলাইহ টা মা'তূফের سَبَبْ হয়েছে, অর্থাৎ যে সকল বস্তুসমূহকে তোমরা তার অংশীদার সাব্যস্ত করছ, তিনি

তা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। কেননা তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টজীব স্রষ্টার অংশীদার হতে পারে না। মনে হয় যেন তাতে فَاءْ টা تَعْقِيْبِيَّةْ -এর ফায়দার প্রতি ইঙ্গিত করছে। মাঝে جُمْلَةْ مُعْتَرِضَةْ হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقَابِلُوْنَكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যটি তাশবীহ -এর ভিত্তিতে হয়েছে। কাজেই এখন এ আপত্তি উত্থাপিত হবে না যে, মূর্তিসমূহ হতে দেখা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ طَيْفٌ: এর দ্বারা এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, طَيْف টা طَيْفًا থেকে اِسْمُ فَاعِلْ হবে অর্থাৎ طَافَ بِهِ الْخَيَالُ আর طَائِفٌ হলো ওয়াসওয়াসা, বিপদাশঙ্কা।

قَوْلُهُ الَمَّ بِهِمْ : অর্থাৎ مَسَّ بِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত, হেকমত, নিয়ামত এবং সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের উল্লেখ ছিল। তিনিই আলিমুল গায়ব তথা অদৃশ্য জ্ঞান বা ভবিষ্যৎ-জ্ঞান শুধু তাঁরই, একথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সূরার প্রারম্ভে হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সূরার সমাপ্তি পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে পুনরায় হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে এর উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের কথা প্রমাণ করা এবং শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করা। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের কথা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে বিস্তারিতভাবে তাওহীদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। –[মাআরেফুল কুরআন; আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী, খ. ২৩, পৃ. ১৭২]

সর্বপ্রথম মানব জাতির সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের সকলকে একজন থেকে তথা আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শান্তির জন্যে তাঁর জীবন সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আ.)-কেও আদম (আ.)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। এরপর আল্লাহ পাকের কুদরতে, তাঁর মর্জিতে পিতামাতার মাধ্যমে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। যদিও আয়াতের শুরুতে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সমগ্র বিশ্ব মানবের সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটিত এবং চিত্রিত করা হয়েছে, যেন মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে ভুলে না যায়, তাঁর অকৃতজ্ঞ না হয়। মানব-সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অবদানকে স্মরণ করে তাঁর তাওহীদ বা একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই মানুষের একান্ত করণীয় কাজ।

قَوْلُهُ اِنَّ وَلِيِّىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ : এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী; সাহায্যকারী। আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন। 'সালেহীন' অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষায় সেই সমস্ত লোক, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে সমান করে না। এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত আয়াতের অর্থ হলো এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোনো ভয় আমার এ কারণে নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ, যিনি আমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণের মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদের কুরআনের শিক্ষা দেই এবং কুরআনের প্রতি আহ্বান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কুরআন নাজিল করেছেন, তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলদের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য করেন বলেই কোনো শত্রুর শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রুর উপর জয়ী করে দেওয়া হয়। আর যদি কখনও কোনো বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ, সৎকর্মশীল মু'মিনের প্রতিটি কাজ হয়

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোনো কারণে পার্থিব জীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুত এটাই হলো সত্যিকার কৃতকার্যতা।

কুরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামা : আলোচ্য আয়াতগুলো কুরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও হেদায়েতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে 'মহান চরিত্রবান' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চালচলন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এ আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী ﷺ -কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُذِ الْعَفْوَ আরবি অভিধান মোতাবেক عَفْو [আফ্‌বুন]-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সবক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হলো এই যে, عَفْو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোনো রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে! অর্থাৎ শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবি করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাজের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে, যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলি বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোনো প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবারে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখো নামাজির মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে, তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য ইবাদত– জাকাত, রোজা, হজ এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরিয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে। সহীহ বুখারী শরীফেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উল্লিখিত আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াতটি নাজিল হলে হুজুর ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামদের এক বিরাট জমাত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা [রাযিয়াল্লাহু আনহুম] এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লিখিত অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

عَفْو -এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেওয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলেমদের একদল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে জারীর (র.) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়, তখন মহানবী ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী ﷺ -কে জানান যে, এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে [অর্থাৎ হুজুর ﷺ -কে] নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুবিয়াহ (র.) হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন হুজুর ﷺ -এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী ﷺ লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা

হামযা (রা.)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হুজুর ﷺ -কে বাতলে দেওয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

عَفْو শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে যদিও পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উভয় অর্থের মূল বক্তব্য এক। তা হলো এই যে, মানুষের হালকা ও অগভীর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীকেই গ্রহণ করে নিন; অধিকতর যাচাই-অনুসন্ধানের পেছনে পড়বে না এবং তাদের কাছে থেকে অতি উচ্চস্তরের আনুগত্য কামনা করবেন না। তা ছাড়া তাদের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ ক্ষমা করে দিন। অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে যাবেন না। সুতরাং মহানবী ﷺ -এর কাজকর্ম ও মহান স্বভাব সর্বদা এ ছাঁচেই ঢেলে সাজানো ছিল। আর তারই বিকাশ ঘটেছিল সে সময় যখন মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে তাঁর প্রাণের শত্রুরা তাঁর হাতের মুঠোয় এসে হাজির হয়েছিল। তখন তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিশোধ তো দূরের কথা, আজ আমি তোমাদের বিগত দিনের আচার-ব্যবহারের জন্য তোমাদের ভর্ৎসনাও করছি না।

আলোচ্য হেদায়েতনামার দ্বিতীয় বাক্যটি হলো- وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ مَعْرُوفٌ অর্থে عُرْف বলা হয় যে কোনো ভালো ও প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

তৃতীয় বাক্যটি হলো- وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ এর অর্থ হলো এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ তাদের কাছে থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না দিয়ে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না: বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খজনোচিত কথাবার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মতো ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র.) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়েতও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রিসালত ও নবুয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়। সহীহ বুখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর খেলাফত আমলে উয়ায়নাহ ইবনে হিসন একবার মদিনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়েস ছিলেন সেই সমস্ত বিজ্ঞ আলেমের একজন যারা হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়ায়নাহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুরকে বলল; তুমি তো আমীরুল মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এস। হুর ইবনে কায়েস (রা.) ফারূকে আ'যম (রা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়ায়নাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়ায়নাহ ফারূকে আ'যম (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যে, "আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ।" হযরত ফারূকে আযম (রা.) তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবনে কায়েস নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ আর এ লোকটিও জাহিলদের একজন।" এ আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোনো কিছুই বললেন না। হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল كَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

যাহোক, এ আয়াতটি বলিষ্ঠ ও সচ্চারিত্রিকতা সম্পর্কে একটি অতি ব্যাপক আয়াত। কোনো কোনো আলেম এর সারমর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষ দু-রকম। ১. সৎকর্মশীল এবং ২. অসৎকর্মশীল। এ আয়াত উভয় শ্রেণির সাথেই সদ্ব্যবহার করার হেদায়েত দিয়েছে যে, যারা নেক কাজ করে, তাদের বাহ্যিক নেকীকে কবুল করে নাও, তাদের ব্যাপারে বেশি তদন্ত-অনুসন্ধান করতে যেও না কিংবা অতি উচ্চমানের সৎকর্ম তাদের কাছে দাবি করো না; বরং যতটুকু সৎকর্ম তারা সহজভাবে করতে পারে, তাকেই যথেষ্ট বলে বিবেচনা কর। আর যারা বদকার বা অসৎকর্মী তাদের ব্যাপারে এ আয়াতের হেদায়েত হলো এই যে,

তাদেরকে সৎকাজের শিক্ষাদান কর এবং কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে থাক। যদি তারা তা গ্রহণ না করে নিজেদের গোমরাহি ও ভ্রান্তিতে আঁকড়ে থাকে এবং মূর্খজনোচিত কথাবার্তা বলতে থাকে, তবে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং তাদের সেসব মূর্খতাসুলভ কথার কোনো উত্তরই দেবে না। এতে হয়তোবা কখনও তাদের চেতনার উদয় হবে এবং নিজেদের ভুল থেকে ফিরে আসতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো ওয়াসওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তাহলে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটিও পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানবপ্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভালো মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লাড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সেজন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবে শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হলো আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দুজন লোক মহানবী ﷺ -এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করেছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থা দেখে হুজুর ﷺ বললেন, 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এ উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হলো এই– أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ সে লোক হুজুর ﷺ -এর কাছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল।

বিস্ময়কর উপকারিতা : তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে কাসীর (র.) এ প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। তা হলো এই যে, সমগ্র কুরআন মাজীদে বলিষ্ঠ ও উচ্চতর চারিত্রিক শিক্ষাদানকল্পে তিনটি ব্যাপকভিত্তিক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ তিনটির শেষেই শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার একটি হলো, সূরা আ'রাফের আলোচ্য আয়াত, দ্বিতীয়টি সূরা মু'মিনূনের আয়াত اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ অর্থাৎ "অকল্যাণকে কল্যাণের দ্বারা প্রতিহত কর। আমি ভালো করেই জানি, যা কিছু তারা বলে থাকে। আর আপনি এভাবে দোয়া করুন যে, হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি আপনার নিকট শয়তানের প্ররোচনার চাপ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আর হে আমার পালনকর্তা, শয়তান আমার নিকট আসবে– আমি এ ব্যাপারেও আপনার নিকট পানাহ চাই।"

তৃতীয় সূরা হা-মীম সাজদার আয়াত– وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ . وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

অর্থাৎ নেকী আর বদী, ভালো ও মন্দ সমান হয় না। আপনি নেকীর মাধ্যমে বদী প্রতিহত করুন, তাহলে আপনার মধ্যে এবং যে লোকের মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান সহসাই সে এমন হয়ে যাবে, যেমন হয় একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এ বিষয়টি সে সমস্ত লোকের ভাগ্যেই জোটে, যারা একান্ত স্থিরচিত্ত হয়ে থাকে এবং বিষয়টি যারই ভাগ্যে জোটে সে লোক বড়ই ভাগ্যবান। আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনার মনে কোনো রকম সংশয় বা ওয়াসওয়াসা আসতে আরম্ভ করে, তবে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়ে নিন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা এবং অত্যন্ত জ্ঞানী।

এ তিনটি আয়াতেই সেসব লোকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন এবং মন্দের বিনিময়ে কল্যাণের মাধ্যমে দেওয়ার হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, যাদের আচরণ রাগের সঞ্চার করে। আর সাথে সাথে শয়তানের প্রতারণা থেকে পানাহ চাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ঝগড়া-বিবাদের সাথে শয়তানেরও একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেখানেই বিবাদ-বিসংবাদের সূত্রপাত দেখা দেয়, শয়তান সে স্থানটিকে নিজের রণক্ষেত্র বানিয়ে নেয় এবং বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোককেও ক্রোধান্বিত করে উন্মত্ততায় প্ররোচিত করতে প্রয়াস পায়। এর প্রতিকার এই যে, যখন দেখবে রাগ প্রশমিত হচ্ছে না, তখন বুঝবে শয়তান

আমার উপর জয়ী হয়ে যাচ্ছে এবং তখনই আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে তাঁর কাছে পানাহ চাইবে। তবেই চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জিত হবে। সে জন্যই পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ الخ : নীরব ও সরব জিকিরের বিধিবিধান : জিকিরের প্রথম আদব হলো নিঃশব্দ জিকির কিংবা সশব্দ জিকিরসংক্রান্ত। এ আয়াতে কুরআন করীম নিঃশব্দ জিকির কিংবা সশব্দ জিকির দু-রকম জিকিরের স্বাধীনতা দিয়েছে। নিঃশব্দ জিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ অর্থাৎ স্বীয় পরওয়ারদিগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দুটি উপায় রয়েছে- ১. জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহর 'যাত' [সত্তা] ও গুণাবলির ধ্যান করবে, যাকে 'জিকরে কলবী' [আত্মিক জিকির] বা 'তাফাক্কুর' [নির্বিষ্ট চিন্তা] বলা হয়। ২ তৎসঙ্গে মুখেও ক্ষীণ শব্দে আল্লাহ তা'আলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হলো জিকিরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের জিকির করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্যান করবে এবং মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ এভাবে অন্তরের সাথে মুখেও জিকিরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোনো অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতে যথেষ্ট ছওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হলো শুধু মুখে মুখে জিকির করা, অন্তরাত্মার তা থেকে বিমুখ থাকা। এমনি জিকির সম্পর্কে মাওলানা রূমী (র.) বলেছেন-

بر زبان تسبیح ودر دل گاؤخر # این چنین تسبیح کے دارد اثر

অর্থাৎ মুখে জপতাপ, আর অন্তরে গাধা-গরু: এহেন জপতাপে কেমন করে আছর হবে।

এতে মাওলানা রূমীর উদ্দেশ্য হলো এই যে, গাফেল মনে জিকির করাতে জিকিরের পরিপূর্ণ ক্রিয়া ও বরকত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, এ মৌখিক জিকিরও পুণ্য ও উপকারিতা বিবর্জিত নয়। কারণ অনেক সময় এ মৌখিক জিকিরই আন্তরিক জিকিরের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, মুখে বলতে বলতেই এক সময় মনেও তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া অন্তত একটি অঙ্গ তো জিকিরে নিয়োজিত থাকেই। তাই তাও পুণ্যহীন নয়। অতএব, জিকির-আযকারে যাদের মন বসে না এবং ধ্যানের মাঝে আল্লাহর গুণাবলি প্রতিফলিত করা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তারাও এই মৌখিক জিকিরকে নিরর্থক ভেবে পরিহার করবেন না; চালিয়ে যাবেন এবং মনে তার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করতে থাকবেন।

দ্বিতীয় জিকিরের পন্থা। এ আয়াতেই বলা হয়েছে- وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ সুউচ্চ স্বরের চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ তা'আলার জিকির করবে তার সশব্দ জিকির করারও অধিকার রয়েছে, তবে তার আদব হলো এই যে, অত্যন্ত জোরে চিৎকার করে জিকির করবে না। মাঝামাঝি আওয়াজে করবে যাতে আদব এবং মর্যদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চৈঃস্বরে জিকির বা তেলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশ্যে জিকির করা হচ্ছে, তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। যে সত্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সামনে স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহর সাধারণ জিকিরই হোক, কিংবা কুরআনের তেলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াজের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশি উচ্চৈঃস্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর জিকির বা কুরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমত আত্মিক জিকির। অর্থাৎ কুরআনের মর্ম এবং জিকিরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে, যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়ত যে জিকিরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশি উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শুনবে। এ দুটি পদ্ধতিই আল্লাহর বাণী وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো অন্তরে উদ্দিষ্ট সত্তার উপস্থিত ও ধ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হলো আওয়াজকে অধিক উচ্চ না করা। মাঝামাঝি সীমার বাইরে যাতে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। জিকিরের এ পদ্ধতিটিই وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ আয়াতে শেখানো হয়েছে। কুরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কেরাত পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈঃস্বরেও পড়া না হয় এবং একবারে মনে মনেও নয়; বরং কেরাতে যেন মাঝামাঝি আওয়াজ অবলম্বন করা হয়।

নামাজের মাঝে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে মহনবী ﷺ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-কে হেদায়েতেই দিয়েছেন।

সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রাসূলে কারীম ﷺ শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি নামাজ পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ শব্দহীনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি [হুজুর ﷺ] সেখান থেকে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা.) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সত্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শুনে নিয়েছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-কে লক্ষ্য করে হুজুর ﷺ বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম না আসে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর হুজুরে আকরাম ﷺ মীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারূকে আ'যম (রা.)-কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত করতে বললেন। −[আবূ দাঊদ]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, কিছু লোক হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট হুজুর আকরাম ﷺ -এর তেলাওয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন, না আস্তে। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, কখনও জোরে, আবার কখনও আস্তে আস্তে তেলাওয়াত করতেন।

রাত্রিকালীন নফল নামাজে এবং নামাজের বাইরে তেলাওয়াতে কোনো কোনো মনীষী জোরে তেলাওয়াত করাকে পছন্দ করেছেন আর কেউ কেউ আস্তে পড়াকে পছন্দ করেছেন। সে জন্যই ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানাফী (র.) বলেছেন যে, যে লোক তেলাওয়াত করবে তার যেকোনোভাবে তেলাওয়াত করার অধিকার রয়েছে তবে সশব্দে তেলাওয়াত করার জন্য সবার মতেই কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত রয়েছে। প্রথমত তাতে নাম-যশ এবং রিয়াকারী বা লোক-দেখানোর কোনো আশঙ্কা থাকবে না। দ্বিতীয়ত তার শব্দে অন্য লোকদের ক্ষতি কিংবা কষ্ট হবে না। অন্য কোনো লোকের নামাজ, তেলাওয়াত কিংবা কাজকর্মে অথবা বিশ্রামে কোনো রকম ব্যাঘাত যেন না হয়। যেখানে নাম-যশ ও রিয়াকারী কিংবা অন্যান্য লোকের কাজকর্ম অথবা আরাম বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে, সে ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে তেলাওয়াত করাই সবার মতে উত্তম।

আর কুরআন তেলাওয়াতের যে হুকুম অন্যান্য জিকির-আজকার ও তাসবীহ-তাহলীলেরও একই হুকুম। অর্থাৎ আস্তে আস্তে কিংবা শব্দ করে উভয়ভাবে পড়াই জায়েজ রয়েছে। অবশ্য আওয়াজ এমন উচ্চ হবে না যা বিনয়, নম্রতা ও আদবের খেলাফ হবে। তাছাড়া তার সে আওয়াজে অন্য লোকের কাজকর্ম কিংবা আরাম-বিশ্রামেরও যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

তবে সরব ও নীরব জিকিরের মধ্যে কোনটি বেশি উত্তম তার ফয়সালা ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারো জন্য জোরে জিকির করা উত্তম; আর কারো জন্য আস্তে করা উত্তম। কোনো সময় জোরে করা উত্তম আবার কোনো সময় আস্তে করা উত্তম। তেলাওয়াত ও জিকিরের দ্বিতীয় আদব হলো, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে জিকির করা। তার মর্ম এই যে, মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও মহিমা উপস্থিত থাকতে হবে এবং যা কিছু জিকির করা হবে, তার অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।

আর তৃতীয় আদব আলোচ্য আয়াতের خِيفَةً শব্দের দ্বারা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তেলাওয়াত ও জিকিরের সময় মানব মনে আল্লাহর ভয়ভীতির অবস্থা সঞ্চারিত হতে হবে। ভয় এ কারণে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও মহত্ত্বের পুরোপুরি হক আদায় করতে পারছি না, আমাদের দ্বারা না জানি বেআদবি হয়ে যায়। তাছাড়া স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহর আজাবের ভয়; শেষ পরিণতি কি হয়, কোন্ অবস্থায় না জানি আমাদের মৃত্যু ঘটে। যাহোক, জিকির ও তেলাওয়াত এমনভাবে করতে হবে যেমন কোনো ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি করে থাকে।

দোয়া প্রার্থনার এ সমস্ত আদব-কায়দাই উক্ত সূরা আ'রাফের প্রারম্ভে اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً আয়াতে আলোচিত হয়েছে। তাতে خِيْفَةً -এর পরিবর্তে خُفْيَةً শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে তার অর্থ হলো নীরবে বা নিঃশব্দে জিকির করা। এতে বোঝা যায় নিঃশব্দে এবং আস্তে আস্তে জিকির করাও জিকিরের একটি আদব। কিন্তু এ আয়াতে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যদিও সশব্দে জিকির করা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে করবে না এবং এমন উচ্চৈঃস্বরে করবে না, যাতে বিনয় ও নম্রতা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জিকির ও তেলাওয়াতের সময় বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তা হবে সকাল ও সন্ধ্যায়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দৈনিক অন্তত দু-বেলা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকিরে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। আর এ অর্থও হতে পারে যে, সকাল সন্ধ্যায় বলে দিবা-রাত্রির সব সময়কে বুঝানো হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম বলে যেমন সারা দুনিয়াকে বুঝানো হয়। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সর্বদা, সর্বাবস্থায় জিকির ও তেলাওয়াতে নিয়মানুবর্তী হওয়া মানুষের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হুজুরে আকরাম ﷺ সর্বদা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত থাকতেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ ত্যাগ করে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেও না। কারণ এটি বড়ই ক্ষতিকারক।

দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের শিক্ষা ও উপদেশের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে নৈকট্য লাভকারীদের এক বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছে তারা তাঁর ইবাদতের ব্যাপারে গর্ব বা অহংকার করে না। এখানে আল্লাহ নিকটে থাকা অর্থ আল্লাহর প্রিয় হওয়া। এতে সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত নবী-রাসূল এবং সমস্ত সৎকর্মশীল লোকই অন্তর্ভুক্ত। আর তাকাব্বুর বা অহংকার না করা অর্থ হলো এই যে, নিজে নিজেকে বড় মনে করে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি না করা। বরং নিজেকে অসহায়, মুখাপেক্ষী মনে করে সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণে ও ইবাদতে নিয়োজিত থাকা, তাসবীহ-তাহলীল করতে থাকা এবং আল্লাহকে সিজদা করতে থাকা।

এতে এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সার্বক্ষণিক ইবাদত ও আল্লাহকে স্মরণ করার তাওফীক যাদের ভাগ্যে হয়, তারা সর্বক্ষণ আল্লাহর কাছে রয়েছে এবং তাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্য হাসিল হয়েছে।

সেজদার কতিপয় ফজিলত ও আহকাম : এখানে নামাজ সংক্রান্ত ইবাদতের মধ্যে থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফজিলত রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোনো এক লোক হযরত ছাওবান (র.)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল দিন, যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। হযরত ছাওবান (রা.) নীরব রইলেন, কিছুই বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটি রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে অসিয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে থাক। কারণ তোমরা যখন একটি সেজদা কর, তখন তার ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। লোকটি বললেন, হযরত ছাওবান (রা.)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদ্দাদারদা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদিগারের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সেজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজদারত অবস্থায় খুব বেশি করে দোয়া প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসাবে কোনো ইবাদত নেই। কাজেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে অধিক পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামাজ পড়া। নফল যত বেশি হবে সেজদাও ততই বেশি হবে। কিন্তু কোনো লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত শুধু নফল নামাজের সাথেই সম্পৃক্ত; ফরজ নামাজে নয়।

সূরা আ'রাফ শেষ হলো। এর শেষ আয়াতটি হলো আয়াতে সেজদা। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোনো আদম সন্তান যখন কোনো সেজদার আয়াত পাঠ করে, অতঃপর সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার হুকুম হলো আর সে তা আদায়ও করল, ফলে তার ঠিকানা হলো জান্নাত, আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম রয়েছে, কিন্তু আমি তার নাফরমানি করেছি বলে আমার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-আনফাল মদিনায় অবতীর্ণ

اَوْ اِلَّا وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الْاٰيَاتُ السَّبْعُ فَمَكِّيَّةٌ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ اَوْ سَبْعٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً

তবে وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ হতে সাতটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ

৭৫ বা ৭৬ বা ৭৭ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. لَمَّا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فِىْ غَنَائِمِ بَدْرٍ فَقَالَ الشُّبَّانُ هِىَ لَنَا لِاَنَّا بَاشَرْنَا الْقِتَالَ وَقَالَ الشُّيُوْخُ كُنَّا رِدْأً لَّكُمْ تَحْتَ الرَّايَاتِ وَلَوْ انْكَشَفْتُمْ لَفِئْتُمْ اِلَيْنَا فَلَا تَسْتَاْثِرُوْا بِهَا نَزَلَ يَسْئَلُوْنَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنِ الْاَنْفَالِ ط اَلْغَنَائِمِ لِمَنْ هِىَ قُلْ لَهُمْ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج يَجْعَلَانِهَا حَيْثُ شَاءُوْا فَقَسَّمَهَا ﷺ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص اَىْ حَقِيْقَةَ مَا بَيْنَكُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَتَرْكِ النِّزَاعِ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ حَقًّا .

১. বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত সামগ্রী সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। যুবক ও সমর্থ ব্যক্তিরা বলল, সাকুল্য গনিমত সামগ্রী আমাদের। কেননা আমরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। বৃদ্ধগণ বলল, ঝাণ্ডার নিচে আমরা তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং সহযোগী হিসাবে ছিলাম। তোমরা যদি বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে ও পরাজিত হতে আমাদের নিকটই তোমাদের ফিরে আসতে হত। সুতরাং এ বিষয়ে তোমাদের প্রাধান্যমূলক কোনো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, হে মুহাম্মাদ! লোক তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে الانفال। এ স্থানে অর্থ যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী। যে এটা কার? এদের বলে দাও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের তাঁরা যেভাবে ইচ্ছা তা বণ্টন করতে পারেন হাকেম তৎপ্রণীত 'মুস্তাদরাক' নামক হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাসূল ﷺ এটা সমহারে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ বর্জন করত সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে পরস্পরে যথার্থভাবে সদ্ভাব স্থাপন কর যদি সত্যই তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য কর।

٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَامِلُوْنَ الْاِيْمَانِ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ اَىْ وَعِيْدُهُ وَجِلَتْ خَافَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ بِهِ يَثِقُوْنَ لَا بِغَيْرِهِ .

২. বিশ্বাসী অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তো তারাই যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় শিহরিত হয় যখন আল্লাহকে অর্থাৎ তাঁর আজাবের হুমকি স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন তা তাদের বিশ্বাস ও অন্তরের প্রত্যয় বৃদ্ধি করে এবং তারা অন্য কারও উপর নয় কেবল তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে তার উপরই ভরসা করে।

٣. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ يَاْتُوْنَ بِهَا بِحُقُوْقِهَا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اَعْطَيْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ فِيْ طَاعَةِ اللّٰهِ ـ

৩. যারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ যথাযথভাবে তার হক ও দাবিসহ তা সমাধা করে এবং আমি যা রিজিক দিয়েছি অর্থাৎ তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে।

٤. اُولٰٓئِكَ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط صِدْقًا بِلَا شَكٍّ لَهُمْ دَرَجٰتٌ مَنَازِلُ فِي الْجَنَّةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ فِي الْجَنَّةِ ـ

৪. উল্লিখিত গুণাবলিতে যারা বিভূষিত তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী নিঃসন্দেহে সত্যানুসারী। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন মানজিল ক্ষমা এবং জান্নাতের মধ্যে সম্মানজনক জীবিকা।

٥. كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ط مُتَعَلِّقٌ بِاَخْرَجَ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ الْخُرُوْجَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ كَافِ اَخْرَجَكَ وَكَمَا خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مَحْذُوْفٍ اَيْ هٰذِهِ الْحَالُ فِيْ كَرَاهَتِهِمْ لَهَا مِثْلُ اِخْرَاجِكَ فِيْ حَالِ كَرَاهَتِهِمْ وَقَدْ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَكَذٰلِكَ اَيْضًا وَذٰلِكَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ قَدِمَ بِعِيْرٍ مِنَ الشَّامِ فَخَرَجَ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِيَغْتَنِمُوْهَا فَعَلِمَتْ قُرَيْشٌ فَخَرَجَ اَبُوْجَهْلٍ وَمُقَاتِلُوْ مَكَّةَ لِيَذُبُّوْا عَنْهَا وَهُمُ النَّفِيْرُ وَاَخَذَ اَبُوْ سُفْيَانَ بِالْعِيْرِ طَرِيْقَ السَّاحِلِ فَنَجَتْ فَقِيْلَ لِاَبِيْ جَهْلٍ اِرْجِعْ فَاَبٰى وَسَارَ اِلٰى بَدْرٍ فَشَاوَرَ ﷺ اَصْحَابَهُ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَنِيْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ فَوَافَقُوْهُ عَلٰى قِتَالِ النَّفِيْرِ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ وَقَالُوْا لَمْ نَسْتَعِدَّ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالٰى ـ

৫. এটা এরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হতে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল এটা পছন্দ করেনি। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ অবস্থাটি তাদের পছন্দ না হওয়ার মধ্যে বদরের যুদ্ধে তাদেরকে মদিনা হতে বের করে নিয়ে আসার মতোই। তাও তারা পছন্দ করেনি অথচ পরিণামে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হয়েছিল। এমনিভাবে এটাও [অর্থাৎ আনফাল বা গনিমত সামগ্রীর বণ্টন ব্যবস্থাও] তাদের জন্য মঙ্গলজনকই হবে। كَمَا এটা এ স্থানে উহ্য مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ। بِالْحَقِّ এটা اَخْرَجَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। وَاِنَّ فَرِيْقًا এ বাক্যটি এ স্থানে اَخْرَجَكَ-এর كَ [ضَمِيْر সর্বনাম]-এর حَال হয়েছে। আয়াতোক্ত ঘটনাটি ছিল এই যে, কুরাইশ সর্দার আবূ সুফিয়ান একটি কাফেলাসহ সিরিয়া হতে মক্কার দিকে আসতেছিল, রাসূল ﷺ কতিপয় সাহাবীসহ তাকে প্রতিহত করতে রওয়ানা হন। মক্কার কুরাইশরা এটা জানতে পারে এবং আবূ জাহলের নেতৃত্বে মক্কার বিরাট এক যোদ্ধাদল তাকে বাধা দিতে যাত্রা করে। এই দল 'নফীর' [যোদ্ধাদল] নামে অভিহিত হয়েছে। এদিকে আবূ সুফিয়ান কাফেলাসহ সমুদ্র-তীরের পথ ধরে নিরাপদে চলে যায়, তখন আবূ জাহলকে বলা হলো ফিরিয়ে চল। [কারণ উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে।] আবূ জাহল ফিরে যেতে অস্বীকার করে এবং এ বাহিনী নিয়ে বদর প্রান্তরে উপনীত হয়। তখন রাসূল ﷺ এ বিষয়ে সাহাবীগণের সাথে দুই দল সম্পর্কে পরামর্শ করেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে দুই দলের [কাফেলা ও নফীরের] একটির ওয়াদা করেছেন। সাহাবীগণ [নিজেদের পূর্ণ প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও] অস্ত্র ও লোক বলে বলীয়ান এ নফীর বা যোদ্ধাদলের সাথে লড়তে রাসূল ﷺ -এর সাথে ঐকমত্য ব্যক্ত করেন। গুটি কয়েকজন এটা পছন্দ করতে পারেননি। তারা বললেন, আমরা তো এটার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

٦. يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ الْقِتَالِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ظَهَرَ لَهُمْ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ عِيَانًا فِىْ كَرَاهِيَتِهِمْ لَهُ .

৬. এদের সামনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পরও সত্য সম্পর্কে অর্থাৎ যুদ্ধ করার বিষয়ে তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এটা না পছন্দ করায় মনে হচ্ছিল তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে আর তারা যেন তা সমক্ষে প্রত্যক্ষ করছে।

٧. وَ اُذْكُرْ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الْعِيْرَ اَوِ النَّفِيْرَ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ تُرِيْدُوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ اَىِ الْبَاْسِ وَالسِّلَاحِ وَهِىَ الْعِيْرُ تَكُوْنُ لَكُمْ لِقِلَّةِ عَدَدِهَا وَعُدَدِهَا بِخِلَافِ النَّفِيْرِ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ يُظْهِرَهُ بِكَلِمٰتِهِ السَّابِقَةِ بِظُهُوْرِ الْاِسْلَامِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ اٰخِرَهُمْ بِالْاِسْتِئْصَالِ فَاَمَرَكُمْ بِقِتَالِ النَّفِيْرِ .

৭. আর স্মরণ কর আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই দলের অর্থাৎ কাফেলা ও নফীরের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে অথচ তোমরা পছন্দ করছিলে চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি অর্থাৎ ঈর বা কাফেলাটি। غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ অর্থ শক্তি ও অস্ত্রহীন। কারণ এদের সংখ্যাও ছিল কম আর অস্ত্রবলও ছিল নগণ্য। পক্ষান্তরে নফীর বা যোদ্ধাদলের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন তার বাণী দ্বারা অর্থাৎ ইসলামের বিজয় প্রদানের পূর্ববর্তী ওয়াদার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে তার প্রকাশ ঘটাতে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শেষটিকে পর্যন্ত উৎপাটিত করে দিয়ে তাদেরকে নির্মূল করতে। আর সেহেতুই তিনি তোমাদেরকে নফীর অর্থাৎ যোদ্ধাদলের সাথে লড়তে নির্দেশ দান করেছেন।

٨. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ يُمْحِقَ الْبَاطِلَ الْكُفْرَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ الْمُشْرِكُوْنَ ذٰلِكَ .

৮. এজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অর্থাৎ কুফরিকে অসত্যে প্রতিপন্ন করেন। অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। যদিও অপরাধীগণ তা পছন্দ করে না।

٩. اُذْكُرْ اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ تَطْلُبُوْنَ مِنْهُ الْغَوْثَ بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ مُمِدُّكُمْ مُعِيْنُكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ مُتَتَابِعِيْنَ يُرْدِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَعَدَهُمْ بِهَا اَوَّلًا ثُمَّ صَارَتْ ثَلَاثَةَ اٰلَافٍ ثُمَّ خَمْسَةً كَمَا فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ وَقُرِئَ بِاٰلُفٍ كَاَفْلُسٍ جَمْعٌ .

৯. স্মরণ কর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর প্রার্থনা করছিলে তাদের [শত্রুদের] বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য তোমরা তাঁর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছিলে। অনন্তর তিনি তা কবুল করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা শক্তি যোগাব সাহায্য করব যারা ধারাবাহিকভাবে আসবে যারা পর পর একদলের পিছনে আরেক দল আসবে। প্রথমে এ সংখ্যার ওয়াদা করা হয়েছিল। পরে তা তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানে এটার উল্লেখ রয়েছে। اَنِّىْ এটা بِاَنِّىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এ স্থানে اَنِّىْ-এর পূর্বে একটি بَاتَصْوِيْرِيَّةٌ উহ্য রয়েছে।

١٠. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اَىِ الْاِمْدَادَ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ط وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

১০. আল্লাহ এটা অর্থাৎ ঐ সাহায্য করেছিলেন কেবল শুভ সংবাদ হিসাবে এবং এ উদ্দেশ্যে যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর নিকট হতেই। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ : এটা مُرَكَّبْ اِضَافِىْ মুবতাদা হয়েছে। এর খবর হলো দুটি– একটি **হলো مَدَنِيَّةٌ আর অপরটি** হলো وَيَمْكُرُ بِكَ এবং حَرْفِ اِسْتِثْنَاءْ হলো اِلَّا আর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এখন মুবতাদা খবর মিলে خُمُسُ الخ হলো مُسْتَثْنٰى আর اَوْ হলো মতবিরোধ বর্ণনা করার জন্য। যদিও সূরার শিরোনামে সাত আয়াত মাক্কী বলা হয়েছে, **তবে বিশুদ্ধ কথা** হলো এই যে, পূর্ণ সূরাটাই মাদানী।

قَوْلُهُ عَنِ الْاَنْفَالِ : اَنْفَالْ শব্দটি نَفَلْ [যা سَبَبْ -এর ওজনে হয়েছে] -এর বহুবচন, অর্থ অতিরিক্ত। আর نَفْلْ **শব্দটির** فَاءْ বর্ণে সাকিন সহও পাঠ রয়েছে। এর অর্থও অতিরিক্ত। গনিমতের সম্পদ যেহেতু পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্য বৈধ **ছিল** না, বিশেষভাবে শুধুমাত্র এ উম্মতের জন্য বৈধ করা হয়েছে। এজন্যই এটাকে نَفْلْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন. يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ -এর মধ্যে يَسْئَلُوْنَكَ -এর সেলাহ عَنْ নেওয়া হয়েছে। অথচ প্রশ্ন مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হয়েছে। যেমন বলা হয়– سَالْتُ زَيْدًا مَالًا

উত্তর. যদি প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ ও ব্যাখ্যাকরণের জন্য হয় তবে প্রশ্ন مُتَعَدِّىْ عَنْ -এর সাথে হবে। আর طَلَبْ অর্থে হয় তবে مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হবে। যারা এখানে প্রশ্নকে طَلَبْ -এর জন্য মনে করেন তারা عَنْ -কে অতিরিক্ত মনে করেন।

قَوْلُهُ لَوْ اِنْكَشَفْتُمْ : অর্থাৎ اِنْهَزَمْتُمْ وَانْتَشَرْتُمْ যদি তোমরা পরাজিত হও এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়।

قَوْلُهُ فَلَا تَسْتَاثِرُوْا : অর্থাৎ فَلَا تَخْتَارُوْا অর্থাৎ তোমাদের **বর্ণিত** দলিলের কারণে তোমাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া যাচ্ছে না। اِيْثَارْ অর্থ হলো প্রাধান্য দেওয়া। গনিমতের সম্পদকে نَفْلْ **বলার** এটাও একটি কারণ যে, জিহাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা। আর মাল উপার্জন করা **একটি** অতিরিক্ত বিষয়।

قَوْلُهُ اَىْ حَقِيْقَةَ مَا بَيْنَكُمْ : এটা ذَاتَ بَيْنِكُمْ -এর তাফসীর। এতে এটা বলা হয়েছে যে, ذَاتْ টা হলো حَقِيْقَتْ অর্থে এবং بَيْنْ হলো وَصْلْ অর্থে এবং لُغَتْ **-এর অনুযায়ী** হয়েছে।

قَوْلُهُ الْكَامِلُوْنَ : এ কয়েদ বৃদ্ধি করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান করা।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা اِنَّمَا টা كَلِمَةُ حَصْرْ -এর সাথে বলেছেন যে, মুমিন তো সেই যার সম্মুখে আল্লাহর জিকির করা হলে তাদের হৃদয় আল্লাহভীতিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠে। তবে এরূপ ব্যক্তি তো খুবই কম হবে।

উত্তর. এটা পূর্ণাঙ্গ মুমিনের সিফত। সাধারণ **মুমিনের** নয়।

قَوْلُهُ تَصْدِيْقًا : এ বৃদ্ধিকরণ **দ্বারা** একটি **উহ্য প্রশ্নের** উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো, আপনার অভিমত হলো ঈমানের মধ্যে কমবেশি হয় না। অথচ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا **দ্বারা বুঝা যায়** যে, ঈমানের মধ্যে কমবেশি হয়ে থাকে।

উত্তর. জবাবের সার হলো, এখানে ঈমান দ্বারা تَصْدِيْقْ এবং طَمَانِيْنَتْ قَلْبْ উদ্দেশ্য এবং এতে কমবেশি হয়।

قَوْلُهُ بِهٖ يَتَّقُوْنَ لَا بِغَيْرِهٖ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَقْدِيْمْ مُتَعَلِّقْ-এর নীতিমালা বর্ণনা করা যা حَصْرْ হয়েছে অর্থাৎ তোমার উপরই ভরসা করে অন্য কারো উপর নয়।

قَوْلُهُ الْخُرُوْجِ اَىْ خُرُوْجُكَ وَخُرُوْجُهُمْ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো, حَالْ টা যখন **জুমলা হয়** তখন তাতে عَائِدْ হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ এখানে কোনো عَائِدْ নেই।

জবাবের সার হলো, উহ্য ইবারত হলো خُرُوْجُكَ وَخُرُوْجُهُمْ কাজেই আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قَوْلُهُ وَكَمَا، خَبَرُ مُبْتَدَأ مَحْذُوْفٍ : এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো উভয় বাক্যের মধ্যকার সামঞ্জস্য বর্ণনা করা। অর্থাৎ গনিমতের মাল বণ্টন নারাজি প্রকাশ করা সেরূপ যেরূপ خُرُوْجُ اِلَى النَّفِيْرِ [সৈন্যের দিকে বের হওয়া] **অপছন্দ** ছিল। অথচ যেভাবে তাদের ব্যাপারে বের হওয়া উত্তম ছিল। গনিমতলব্ধ সম্পদ বণ্টনেও কল্যাণ রয়েছে।

قَوْلُهُ عَدَدُهَا : অর্থাৎ اَسْبَابُهَا

قَوْلُهُ بِالْفٍ : অর্থাৎ اَلْف -কে اَلِف -এর সাথে অর্থাৎ اَلُفْ পড়া হয়েছে اَلُفْ -এর উপর মদ এবং لَامْ **-এর উপর পেশ** সহকারে اَفْلُسْ -এর ওজনে। অর্থাৎ যেভাবে فَلْسْ -এর বহুবচন اَفْلُسْ আসে, এমনিভাবে اَلِفْ -এর **বহুবচনও اَلُفْ** আসে। اُلُفْ মূলত اَاْلُفْ ছিল। দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করায় اَلُفْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার বিষয়বস্তু : সূরা আনফাল এখন যা আরম্ভ হচ্ছে, এটি মদিনায় অবতীর্ণ সূরা। এর পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরিকীন [অংশীবাদী] এবং আহলে কিতাবের মূর্খতা, বিদ্বেষ, কুফরি ও ফিতনা-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই গযওয়ায়ে বদর বা বদরের যুদ্ধকালে সেই কাফের, মুশরিক ও আহলে কিতাবের অশুভ পরিণতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মোকাবিলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা ও দান এবং কাফেরদের জন্য ছিল আজাব ও প্রতিশোধস্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারম্ভেই তাকওয়া, পরহেজগারি এবং আল্লাহর আনুগত্য, জিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের উম্মতদের অবস্থা এবং তাদের মোকাবিলায় আম্বিয়ায়ে কেরামের বিজয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধে যে সাহায্য করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম জিহাদ। এ জিহাদে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে বিজয় দান করেছেন।

যেহেতু এ সূরায় বদরের যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে তাই এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তভাবে এর নেপথ্য ঘটনা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করি। প্রিয়নবী ﷺ মক্কা মুয়াযযামার সুদীর্ঘ ১৩টি বছর দীন ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু মক্কাবাসী শুধু যে ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই নয়, শুধু যে তাঁর বিরোধিতা করেছে তাও নয়; বরং তারা প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম জুলুম-অত্যাচার করে। জুলুম-অত্যাচারের ইতিহাসে এমন জুলুমের ঘটনা বিরল। এতদসত্ত্বেও মুসলমানগণ জালেমদের মোকাবিলা করেননি; বরং ধৈর্যধারণ করেছেন। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে এ কঠিন মুহূর্তে সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا [সূরা মুযযাম্মিল] হে রাসূল! তারা যা বলে তাতে আপনি সবর অবলম্বন করুন এবং সৌজন্য সহকারে তাদের থেকে দূরে থাকুন। যেমন সূরা কাফে ইরশাদ হয়েছে– وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ হে রাসূল! কাফেররা যা বলে তার উপর সবর অবলম্বন করুন এবং আপনার প্রতিপালকের হামদের তাসবীহ পাঠ করুন সকাল এবং সন্ধ্যায়।

বস্তুত মক্কা মুয়াযযামায় প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সবর ও ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, অবশেষে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণে সাহাবায়ে কেরামকে প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করতে হয়। তাঁরা হিজরত করেন নির্যাতিত-উৎপীড়িত অবস্থায়, নিঃস্ব হৃতসর্বস্ব হয়ে। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম ঈমানী শক্তির পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যেহেতু দুশমনের মোকাবিলার অনুমতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পাওয়া যায়নি, তাই জালেম দুশমনদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ অস্ত্রধারণ করেননি, অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত অবস্থায়ই ১৩ টি বছরের সুদীর্ঘ জীবনযাপন করেছেন।

হিজরতের পর মজলুম মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাক জালেম দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দান করে সূরা হজে ঘোষণা করলেন– أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। হিজরি দ্বিতীয় সনে হুজুরে আকরাম ﷺ জানতে পারেন যে, মক্কার মুশরিকদের এক বিরাট বাণিজ্য-কাফেলা সিরিয়া থেকে মালপত্র নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে। শত্রুর অর্থবল ভেঙ্গে দেওয়া এ মুহূর্তে একান্ত জরুরি, তাই ৩১৩ জন সঙ্গী নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ মদিনা শরীফ থেকে রওয়ানা হলেন। আবূ সুফিয়ান এ খবর পেয়ে মক্কায় সাহায্যের জন্যে লোক পাঠায়। আবূ জাহলের নেতৃত্বে ১০০০ সৈন্যের এক বাহিনী মদিনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হয়। আবূ সুফিয়ান পথ পরিবর্তন করে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে মদিনা শরীফ থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে বদর নামক স্থানে আবূ জাহলের নেতৃত্বাধীন সৈন্যের মোকাবিলা হয়।

মুসলমানদের নিকট মাত্র দুটি অশ্ব ছিল এবং প্রতি নয়জনের জন্যে একখানা তলোয়ার ছিল। আর ১০০০ অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী কাফের মুসলমানদের ৩১৩ জনের মোকাবিলায় উপস্থিত ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ দানে প্রিয়নবী ﷺ -এর নেতৃত্বাধীন সাহাবায়ে কেরামকে বিজয় দান করলেন এবং কুফর ও নাফরমানির বিষ দাঁত চিরতরে ভেঙ্গে দিলেন। কাফেরদের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হলো আর ৭০ জন বন্দী হলো।

শানে নুযূল : তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে 'আনফাল' শব্দের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, এ আয়াত আমাদের বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছু মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ আয়াতের মাধ্যমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আমাদের হাত থেকে নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সোপর্দ করেন। তিনি বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তা সমানভাবে বিতরণ করে দেন। ঘটনাটি ছিল এই, আমরা সকলে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গে বদর রণাঙ্গনে উপস্থিত হই। উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে আল্লাহ পাক দুশমনদেরকে পরাজিত করেন। তখন আমাদের লোকজন তিনভাগে বিভক্ত হয়। একদল দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করেন যেন দুশমন ফিরে না আসতে পারে। আর কিছু লোক দুশমনের পরিত্যক্ত সম্পদ একত্রিত করতে থাকেন। আর কিছু লোক হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর চারিপার্শ্বে একত্রিত থাকেন যেন কোনো আত্মগোপনকারী দুশমন তাঁর উপর হঠাৎ হামলা না করে বসে। রাতে যখন সকালে নিজ নিজ স্থানে পৌছেন তখন যারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করেছিলেন তাঁরা বললেন, এ সম্পদ আমদের। কেননা আমরাই এগুলো একত্রিত করেছি। এতে আর কারো অংশ নেই। যারা দুশমনের পিছু ধাওয়া করেছিলেন তাঁরা বললেন, তোমরা আমাদের চেয়ে এ সম্পদের অধিকতর হকদার নও, কেননা আমরা দুশমনকে ধাওয়া করেছি বলেই তোমরা এ সব দ্রব্য সামগ্রী একত্রিত করতে পেরেছ।

আর যারা হুজুর ﷺ -এর চারিপার্শ্বে তাঁর হেফাজতের জন্য একত্রিত ছিলেন তাঁরা বললেন, আমরা ইচ্ছা করলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রি করতে পারতাম। কিন্তু আমরা প্রিয়নবী ﷺ -এর হেফাজতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছি। অতএব, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আমরাও অধিকারী। বিভিন্ন মত পোষণকারীদের এসব কথার বিবরণ যখন হুজুর ﷺ -এর নিকট পৌছল, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন যে, এ সম্পদ আল্লাহ পাকের এছাড়া এর কোনো মালিক নেই। তবে আল্লাহর রাসূল যাকে দান করেন। তাই হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে গনিমতের মাল সমানভাবে বিতরণ করে দিলেন। এতে সকলেই সন্তুষ্ট হলেন। পূর্বে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কারণে তাঁরা অনুতপ্ত হলেন।

–[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ২০২; তাফসীরে নেকাতুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ২০-২৪]

قَوْلُهُ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ : হে রাসূল! তারা আপনার নিকট গনিমতের মাল তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ সম্পদের মালিকানা আল্লাহ পাকের আর তা ব্যয় করার অধিকার হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর, যিনি আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক মানুষের মধ্যে তা বিতরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অধিকার আল্লাহ পাক মানুষের হাত থেকে নিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করেছেন।

اَنْفَال শব্দটি نَفَل -এর বহুবচন। এর অর্থ– অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামাজ, রোজা, সদকা প্রভৃতিকে 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশিতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় نَفَل ও اَنْفَال [নফল ও আনফাল] গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআন মাজীদে এতদর্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে– ১. আনফাল, ২. গনিমত এবং ৩. ফায়। اَنْفَال শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غَنِيْمَة [গনিমত] শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فَيْئ এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশেরের আয়াত وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনিমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। اَنْفَال [গনিমত] সাধারণত সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فَيْئ [ফায়] বলা হয় সে মালকে, যা কোনো রকম যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজি হোক। আর نَفَل ও اَنْفَال [নফল ও আনফাল] শব্দটি অধিকাংশ সময় ইনাম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নায়ক কোনো বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনিমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাফসীরে ইবনে জারীর গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।– [ইবনে কাসীর] আবার কখনও 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা

হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ [اَنْفَالٌ] শব্দটি সাধারণ, অসাধারণ– উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোনো মতবিরোধ নেই। বস্তুত এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হলো সেটাই, যা ইমাম আবূ ওবাইদ (র.) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আমওয়াল'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এ উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মালসামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এ প্রচলন ছিল না; বরং গনিমতের মালের ক্ষেত্রে আইন ছিল এই যে, তা কারো জন্য হালাল ছিল না; সমস্ত গনিমতের মালামাল কোনো এক জায়গায় জমা করা হতো। অতঃপর আসমান থেকে এক অনল-বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত। আর এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার নিকট জিহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন। পক্ষান্তরে গনিমতের মাল-সামান একত্রিত করে রাখার পর যদি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে না জ্বালাত, তবে তা-ই ছিল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণ। এতে বুঝা যেত, এ জিহাদ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে গনিমতের সে মাল-সামানকেও প্রত্যাখ্যাত ও অলক্ষুণে মনে করা হতো এবং সেগুলো কোনো প্রকার ব্যবহারে আনা হতো না।

قَوْلُهُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ الخ : মু'মিনের বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য : এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যা প্রতিটি মু'মিনের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি মু'মিন নিজের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার পর্যালোচনা করে দেখবে, যদি তার মধ্যে এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করবে যে, তিনি তাকে মু'মিনের গুণাবলিতে মণ্ডিত করেছেন। আর যদি এগুলোর মধ্যে কোনো একটি গুণ তার মধ্যে না থাকে, কিংবা থাকলেও তা একান্ত দুর্বল বলে মনে হয়, তাহলে তা অর্জন করার কিংবা তাকে সবল করে তোলার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর ভয় : আয়াতে প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে। অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও প্রেমে ভরপুর, যার দাবি হলো ভয় ও ভীতি। কুরআনে কারীমের অন্য এক আয়াত তারই আলোচনাক্রমে আল্লাহ-প্রেমিকদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ [হে নবী] সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদের, যাদের অন্তর তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আলোচনা করা হয়। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহর আলোচনা ও স্মরণের একটা বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো ভয় ও ত্রাস। আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহর জিকিরের এ বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে– اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ আল্লাহর জিকিরের দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতে যে ভয় ও ভীতির কথা বলা হয়েছে, তা মনের প্রশান্তি এবং স্বস্তির পরিপন্থি নয়, যেমন হিংস্র জীবজন্তু কিংবা শত্রুর ভয় মানুষের মানের শান্তিকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর জিকিরের দরুন অন্তরে সৃষ্ট ভয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেজন্য এখানে خَوْف শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি; وَجَل শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ সাধারণ ভয় নয় বরং এমন ভয়, যা বড়দের মহত্ত্বের কারণে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ অর্থ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হতে ইচ্ছা করছিল, তখনই আল্লাহর কথা তার স্মরণ হয়ে গেল এবং তাতে সে আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল এবং সে পাপ থেকে বিরত রইল। এ ক্ষেত্রে ভয় অর্থ হবে আজাবের ভয়। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঈমানের উন্নতি : মু'মিনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তার সামনে যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন ঈমান বৃদ্ধি পায়। সমস্ত আলেম, তাফসীরবিদ ও হাদীসবিদদের সর্বসম্মত মতে ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো ঈমানের শক্তি, অবস্থা এবং ঈমানী জ্যোতির উন্নতি। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, তাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোনো এক কবি ছান্দিক ভাষায় এভাবে বলেছেন–

وَاِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا ✱ نَشَطَتْ فِى الْعِبَادَةِ الْاَعْضَاءُ অর্থাৎ অন্তরে যখন ঈমানের মাধুর্য বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর ইবাদতের মাঝে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করতে আরম্ভ করে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হবে, তখন

তার ঈমানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, সাধারণ মুসলমানেরা যেভাবে কুরআন পাঠ করে এবং শোনে, যাতে না থাকে কুরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোনো খেয়াল, না থাকে আল্লাহ জাল্লাশানুহুর মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের তেলাওয়াত উদ্দেশ্যও নয় এবং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পুণ্য বিবর্জিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রতি ভরসা : মু'মিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে। তাওয়াক্কুল অর্থ হলো আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ নিজের যাবতীয় কাজকর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তা'আলার উপর। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী ﷺ বলছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে; বরং এর অর্থ হলো এই যে, বাহ্যিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে; বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে করবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুত হবেও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে- اَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ স্বীয় জিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মাঝামাঝি পর্যায়ের অন্বেষণ এবং জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন-মস্তিষ্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড়-উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখো না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামাজ প্রতিষ্ঠা করা : মু'মিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামাজ' পড়ার কথা নয় বরং নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। اِقَامَتْ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই اِقَامَتْ صَلٰوةْ -এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাজের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতিনীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোনো রকম ত্রুটি হলে তাকে নামাজ পড়া বলা গেলেও নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কুরআন মাজীদে নামাজের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে, যেমন- اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ [অর্থাৎ নামাজ অশ্লীল ও পাপ থেকে বিরত রাখে] তা এ নামাজ প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাজের আদবসমূহে যখন কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাজকে জায়েজ বলা হলেও ত্রুটির পরিমাণ হিসাবে নামাজের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। কোনো কোনো অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রাহে ব্যয় করা : মর্দে-মু'মিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে যে রিজিক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর রাহে খরচ করবে। আল্লাহর রাহে এ ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরিয়ত নির্ধারিত জাকাত-ফিতরা প্রভৃতি, নফল দান-খয়রাতসহ মেহমানদারি, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত। মর্দে মু'মিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا অর্থাৎ এমনসব লোকই হলো সত্যিকার মু'মিন যাঁদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বললেও তাদের অন্তরে না থাকে তাওহীদের রং আর না থাকে রাসূলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোনো এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবূ সাঈদ! আপনি কি মু'মিন? তখন তিনি বললেন, ভাই, ঈমান দু-প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং বেহেশত, দোজখ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কিনা? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মু'মিন। পক্ষান্তরে সূরা আনফালের আয়াতে যে মু'মিনে কামিল বা পরিপূর্ণ মু'মিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মু'মিন কিনা? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কিনা। সূরা আনফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলোই উদ্দেশ্য যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মু'মিনর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ এতে মু'মিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে- ১. সুউচ্চ মর্যাদা, ২. মাগফিরাত বা ক্ষমা এবং ৩ সম্মানজনক রিজিক। তাফসীরে বাহরে মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম- ১. সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন- ঈমান, আল্লাহভীতি, আল্লাহর উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা। ২. যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন- নামাজ, রোজা প্রভৃতি। ৩. যার সম্পর্কে ধনসম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলির জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা কাজকর্মের জন্য 'মাগফিরাত' বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন- নামাজ, রোজা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাজে পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর 'সম্মানজনক রিজিক'-এর ওয়াদা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্য। মু'মিন এ পথে যা ব্যায় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশি প্রাপ্ত হবে।

قَوْلُهُ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ الخ : এ সূরায় রয়েছে বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। আলোচ্য আয়াত থেকেই তার সূচনা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধের সময় কোনো কোনো মুসলমান জিহাদের অভিযান পছন্দ করেননি; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রাসূলে কারীম ﷺ -কে জিহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তাঁরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন, যাঁরা ইতঃপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করেছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে কারীম এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত এই যে, আয়াতটি আরম্ভ করা হয়েছে كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ বাক্য দিয়ে। এতে كَمَا এমন একটি বাক্যাংশ, যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তাফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হাইয়্যান (র.) এ ধরনের পনেরোটি বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনটি সম্ভাবনা প্রবল।

১. এ তুলনার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনিমতের মালামাল বণ্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবিক সবাই মহানবী ﷺ -এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জিহাদের প্রারম্ভে কারো কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফার্‌রা ও মুবার্‌রাদ-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল কুরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. দ্বিতীয়ত এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মু'মিনদের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির অবশ্যম্ভাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে, তেমনভাবে আখেরাতের ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। -[কুরতুবী]

৩. তৃতীয়ত এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবূ হাইয়্যান (র.) মুফাসসিরীনদের পনেরোটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির কোনোটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একাদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্কবিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোনো একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে, এখানে نَصَرَكَ [নাসারাকা] শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপূত ও পছন্দ হলো এবং যার সাথে তর্ক করেছিলাম সেও পছন্দ করল। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ এ ক্ষেত্রে كَمَا শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কারণ বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি হয়েছিল, তার কারণ ছিল এই যে, এ জিহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন, তার কোনো কিছুই নিজের মতে করেননি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এবং আল্লাহর হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহর আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়।

বদর যুদ্ধের ঘটনা : ইবনে আকাবাহ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট মদিনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, আবূ সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এ বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবনে আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোনো কুরাইশ নারী বা পুরুষ ছিল না, যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিস্‌কাল [সাড়ে চার মাশা] পরিমাণ সোনা থাকলে সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এ কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দিনার ছিল। দিনার হলো একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের বর্তমান দর অনুযায়ী এর মূল্য হয় বায়ান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ'শ বছর পূর্বেকার ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমানে ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশি হতে পারে। এ বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কুরাইশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশজন ঘোড়সওয়ার সর্দার, যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস ও মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কুরাইশদের এ বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এ পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুজুর ﷺ যখন সিরিয়া থেকে এ কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবিলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমজান মাস। যুদ্ধেরও কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুজুর ﷺ ও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসাবে সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারির ব্যবস্থা রয়েছে, তাঁরা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সওয়ারি ছিল গ্রাম এলাকায়, তারা গ্রাম থেকে সওয়ারি এনে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মতো সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাঁদের কাছে এ মুহূর্তের সওয়ারি উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন; বাইরে থেকে সওয়ারি এনে নেবার মতো সময় এখন নেই। কাজেই হুজুর ﷺ -এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরি হতে পারলেন। বস্তুত যারা এ জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল। তা এই যে, মহানবী ﷺ এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোনো যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবিলা করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীদের খুব বেশি পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

মহানবী ﷺ 'বি'রে সুক্ইয়া' নামক স্থানে পৌছে যখন কায়েস ইবনে সা'সা'আ (রা.)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তেরো জন রয়েছে। মহানবী ﷺ এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালূতের সৈন্য সংখ্যাও এই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারি করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে অপর দুজন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবূ লুবাবাহ ও হযরত আলী (রা.)। যখন হুজুর ﷺ -এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসত তখন তারা বলতেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহমাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত, না, তোমরা আমার চাইতে বেশি বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের ছওয়াবে

আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার ছওয়াবের সুযোগটি তোমাদের দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী ﷺ-ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে -যোরকায়' পৌঁছে কোনো এক লোক কুরাইশ কাফেলার নেতা আবূ সুফিয়ানকে এ সংবাদ জানিয়ে দিল যে রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন, তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবূ সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি ইজাযের সীমানায় গিয়ে পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দম্‌দম ইবনে ওমরকে (ضَمْضَمُ ابْنُ عُمَرَ) কুড়ি মিসকাল স্বর্ণ অর্থাৎ প্রায় ছয় হাজার টাকা মজুরি দিয়ে এ ব্যাপারে রাজি করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকাররামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দেবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

দম্‌দম্ ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনের ও পিছনের অংশ ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালের ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈচৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে পড়ল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোনো কারণে অপারগ ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরনের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধ অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোনো অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করেছিলেন, তাঁদেরকে এবং বনূ হাশিম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি এমন ধারণা হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাঁদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) এবং আবূ তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যাহোক, এভাবে সব মিলিয়ে এ বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ ঘোড়া ছ'শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদিদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদি সহ বদর অভিমুখে রওনা হলো। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো। অপরদিকে রাসূলে কারীম ﷺ শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবিলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমজান শনিবারে মদিনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌঁছে দুজন সাহাবীকে আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। -[তাফসীরে মাযহারী]

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবূ সুফিয়ানের কাফেলা মহানবী পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে ! -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

বলা বাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূলে কারীম ﷺ সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারুকে আযম (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেকদাদ (রা.) উঠে নিবেদন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-কে। তারা বলেছিল- اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ 'যান, আপনি আপনার রব [পালনকর্তাই] গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম।' সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুলগিমাদ' নামক স্থান পর্যন্ত নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব।"

মহানবী ﷺ হযরত মেকাদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুজুরে আকরাম ﷺ -এর সাথে আনসারদের যে সহযোগিতা-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদিনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদিনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী ﷺ সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এ জিহাদে মদিনার বাইরে এগিয়ে যাব কিনা? এ সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসাররা। হযরত সা'দ ইবনে মু'আয আনসারী (রা) হুজুর ﷺ -এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইবনে মু'আয (রা.) বললেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে, যে কোনো অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে দীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে থেকে কোনো একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদের শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদের যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।"

এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত খুশি হলেন এবং স্বীয় কাফলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দুটি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দুটি দল বলতে একটি হলো আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। [এ সমুদয় ঘটনা তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।]

ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার পর আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রথম আয়াতে وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ মুসলমানদের একটি দল এ জিহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ আয়াতে। অর্থাৎ এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। সাহাবায়ে কেরাম যদিও কোনো রকম নির্দেশ লঙ্ঘন করেননি; বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পছন্দ ছিল না। কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোতে গযওয়ায়ে বদরের ঘটনা এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সাহায্য ও বিশেষ অনুগ্রহ মুসলমানদের প্রতি হয়েছিল, তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যখন এ সংবাদ জানতে পারেন যে, কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে, তখন মুসলমানদের সামনে ছিল দুটি দল। একটি হলো বাণিজ্যিক কাফেলা যাকে হাদীসে عِيْرٌ [ঈর] বলা হয়েছে এবং অপরটি ছিল সুসজ্জিত সেনাদল যাকে نَفِيْرٌ [নাফীর] নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাথে যুক্ত সমস্ত মুসলমানদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, এ দুটি দলের কোনো একটির উপর তোমাদের পরিপূর্ণ দখল লাভ হবে। ফলে তাদের ব্যাপারে যা খুশি তা করতে পারবে।

বলা বাহুল্য যে, বাণিজ্যিক কাফেলাটি হস্তগত করা ছিল সহজ ও ভয়হীন। আর সশস্ত্র বাহিনী হস্তগত করা ছিল কঠিন ও আশঙ্কাপূর্ণ। কাজেই এহেন অস্পষ্ট ওয়াদার কথা শুনে অনেক সাহাবীর কাম্য হয় যে, যে দলটির উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সেটি যেন নিরস্ত্র বাণিজ্যিক দলই হয়। কিন্তু আল্লাহর ইঙ্গিতে রাসূলে কারীম ﷺ ও অন্যান্য বড় বড় সাহাবীর বাসনা ছিল যে, সশস্ত্র দলটির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেই উত্তম হবে।

এ আয়াতে নিরস্ত্র দলের উপর বিজয় বা অধিকার প্রত্যাশী মুসলমানদের অবহিত করা হয়েছে যে, তোমরা তো নিজেদের আরামপ্রিয়তা ও আশঙ্কামুক্ততার প্রেক্ষিতে নিরস্ত্র দলের উপর অধিকার লাভ করাই পছন্দ করছ, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হলো ইসলামের আসল উদ্দেশ্য অর্জন। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের যথার্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং কাফেরদের মূল কর্তন। বলা বাহুল্য এটা তখনই হতে পারত, যখন সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মোকাবিলা এবং তাদের উপর মুসলমানদের বিজয় ও পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা হতো।

এর সারমর্ম হলো, মুসলমানদের এ বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া যে, তোমরা যে দিকটি পছন্দ করছে তা একান্ত কাপুরুষতা, আরামপ্রিয়তা ও সাময়িক লাভের বিষয়। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়টিকে আরো কিছুটা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার খোদায়ী ক্ষমতার আওতা থেকে কোনো কিছু মুক্ত ছিল না; তিনি ইচ্ছা করলে বাণিজ্যিক কাফেলার উপরেও মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করে বিজয় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকেই রাসূলে কারীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার উপযোগী বিবেচনা করেছেন, যাতে সত্যের ন্যায়সঙ্গতা ও মিথ্যার অসারতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা তো মহাজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত এবং সর্ব কর্মের আদ্যোপান্ত সম্পর্কে অবগত। কাজেই তাঁর পক্ষ থেকে এহেন অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির মাঝে এমন কি কল্যাণ নিহিত ছিল যে, দুটি দলের যে কোনো একটির উপর মুসলমানদের বিজয় ও অধিকার লাভ হবে? তিনি তো যে কোনো একটির ব্যাপারে নির্দিষ্ট করেও বলতে পারতেন যে, অমুক দলের উপর অধিকার লাভ হয়ে যাবে? এই অস্পষ্টতার কারণ আল্লাহই জানেন। তবে মনে হয় এতে সাহাবায়ে কেরামকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা সহজ কাজটিকে পছন্দ করেন, নাকি কঠিন কাজকে। তাছাড়া এতে তাঁদের চারিত্রিক বলিষ্ঠতারও অনুশীলন ছিল। এভাবে তাঁদেরকে সৎসাহস ও উচ্চতর উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টায় কোনো রকম ভয় বা আশঙ্কা না করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে রয়েছে সেই ঘটনার বিবরণ, যা সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমর সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর ঘটেছিল। রাসূলে কারীম ﷺ যখন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গী মাত্র তিনশ তেরো জন, তাও আবার অধিকাংশই নিরস্ত্র, অথচ তাদের মোকাবিলায় রয়েছে এক হাজার জওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী, তখন তিনি আল্লাহ জাল্লাশানহুর দরবারে সাহায্য ও সহায়তার জন্য প্রার্থনার হাত উঠালেন। তিনি দোয়া করছিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে 'আমীন' বলে যাচ্ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মহানবী ﷺ -এর প্রার্থনার নিম্নলিখিত বাক্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন।

'ইয়া আল্লাহ, আমার সাথে যে ওয়াদা আপনি করেছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন। ইয়া আল্লাহ, মুসলমানদের এ সামান্য দলটি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না [কারণ, গোটা বিশ্ব কুফরি ও শিরকিতে ভরে গেছে। এই কয়েকজন মুসলমানই আছে যারা ইবাদত-বন্দেগি সম্পাদন করে থাকে]।'

মহানবী ﷺ অনর্গল এমনিভাবে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দোয়ায় তন্ময় হয়ে থাকেন। এমনকি তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। হযরত আবূ বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে সে চাদর তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন এবং নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিশেষ চিন্তা করবেন না, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনার দোয়া কবুল করবেন এবং যে ওয়াদা তিনি করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

আয়াতে إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ বাক্যের দ্বারা এ ঘটনাই উদ্দেশ্য। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই সময়ের কথা মনে রাখার মতো, যখন আপনি স্বীয় পরওয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করছিলেন এবং তাঁর সাহায্য কামনা করছিলেন। এ প্রার্থনাটি যদিও রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কেরামও যেহেতু তাঁর সাথে 'আমীন আমীন' বলেছিলেন, তাই সমগ্র দলের সাথেই একে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর এ প্রার্থনা মঞ্জুরির বিষয়টি এমনভাবে বিবৃত হয়েছে- فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব, যারা একের পর এক করে কাতারবন্দী অবস্থায় আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাগণকে যে অসাধারণ শক্তি -সামর্থ্য দান করেছেন তার কিছুটা অনুমান করা যায় সেই ঘটনার দ্বারা, যা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে উল্টে দেওয়ার সময় ঘটেছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি মাত্র পাখার [ঝাপ্টার] মাধ্যমে তা উল্টে দিয়েছিলেন। কাজেই এহেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতাদের এত বিপুল সংখ্যককে এ মোকাবিলার জন্য পাঠানোর কোনোই প্রয়োজন ছিল না। একজনই যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থই অবগত-তারা যে সংখ্যার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই প্রতিপক্ষের সংখ্যানুপাতেই সমসংখ্যক ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন, যাতে তাঁদের মন পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়ে যায়!

চতুর্থ আয়াতেও একই বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ ত'আলা এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র এ জন্য করেছেন, যাতে তোমরা সুসংবাদপ্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়ে যায়।

গয্ওয়ায়ে বদরের সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সমস্ত ফেরেশতা সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছিল, এখানে তাদের সংখ্যা এক হাজার ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা আলে ইমরানে তিন হাজার এবং পাঁচ হাজারেরও উল্লেখ রয়েছে। এর কারণ, প্রকৃতপক্ষে তিনটি ওয়াদার বিভিন্নতা, যা বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। প্রথম ওয়াদাটি ছিল এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের যার কারণ ছিল মহানবী ﷺ -এর দোয়া এবং সাধারণ মুসলমানদের ফরিয়াদ। দ্বিতীয় ওয়াদা, যা তিন হাজার ফেরেশতার ব্যাপারে করা হয় এবং যা ইতঃপূর্বে সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সেই সময় করা হয়েছিল, যখন মুসলমানদের কাছে এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, কুরাইশ বাহিনীর জন্য আরও বর্ধিত সাহায্য আসছে। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে মুনযির কর্তৃক শা'বীর উদ্ধৃতিক্রমে উল্লেখ রয়েছে যে, বদরের দিনে মুসলমানদের কাছে এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে, কুর্য ইবনে জাবের মুহারেবী মুশরিকদের সহায়তার উদ্দেশ্য আরো সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। এ সংবাদে মুসলমানদের মাঝে এক ত্রাসের সৃষ্টি হয়ে যায়। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আলে ইমরানের আয়াত اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ অবতীর্ণ হয়। এতে তিন হাজার ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্য কল্পে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করার ওয়াদা করা হয়। আর তৃতীয় ওয়াদা ছিল পাঁচ হাজারের। তা ছিল এই শর্তাযুক্ত যে, বিপক্ষে দল যদি প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসে, তবে পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য পাঠানো হবে। আর তা আলে ইমরানে উল্লিখিত পরবর্তী আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন কর, তাকওয়ার উপর স্থির থাক এবং যদি প্রতিপক্ষীয় বাহিনী তোমাদের উপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তোমাদের পরওয়ারদিগার তোমাদের সাহায্য করবেন পাঁচ হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে, যারা বিশেষ চিহ্নে অর্থাৎ উদিতে সজ্জিত থাকবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এ ওয়াদার শর্ত ছিল তিনটি। ১. দৃঢ়তা অবলম্বন, ২. তাকওয়ার উপর স্থির থাকা এবং ৩. প্রতিপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ। প্রথম দুটি শর্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমনিতেই বিদ্যমান ছিল এবং তাঁদের এ আশায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু পার্থক্য আসেনি। কিন্তু তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ ব্যাপক আক্রমণের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়নি। কাজেই পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমনের প্রয়োজন হয়নি। আর সে জন্যই বিষয়টি এক হাজার ও তিন হাজারের মাঝেই সীমিত থাকে। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. তিন হাজার বলতে উদ্দেশ্য হলো প্রথমে প্রেরিত এক হাজারের সঙ্গে অতিরিক্ত দু হাজারকে অন্তর্ভুক্ত করে তিন হাজারে বর্ধিত করে দেওয়া, কিংবা ২. প্রথমোক্ত এক হাজারের বাইরে তিন হাজার পাঠানো।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, উক্ত তিনটি আয়াতে ফেরেশতাদের তিনটি দল প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি দলের সাথেই একেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। সূরা আনফালের যে আয়াতে এক হাজারের ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে مُرْدِفِيْنَ শব্দ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো পেছনে লাগোয়া। হয়তো এতে এ ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে যে, এদের পেছনে আরও ফেরেশতা আসবে। পক্ষান্তরে সূরা আলে ইমরানের প্রথম আয়াতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য مُنْزَلِيْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সমস্ত ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতারণ করা হবে। এতে একটি গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্ব থেকে যেসব ফেরেশতা পৃথিবীতে অবস্থান করছেন, তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করার পরিবর্তে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এ কাজের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতারণ করা হবে। বস্তুত সূরা আলেইমরানের দ্বিতীয় আয়াতে যেখানে পাঁচ হাজারের কথা উল্লেখ রয়েছে, তাতে ফেরেশতাদের مُسَوِّمِيْنَ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা হবেন বিশেষ চিহ্ন এবং বিশেষ পোশাকে ভূষিত। হাদীসের বর্ণনায় তাই রয়েছে যে, বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের পাগড়ি ছিল সাদা, আর হুনাইনের যুদ্ধে সাহায্যের জন্য আগত ফেরেশতাদের পাগড়ি ছিল লাল।

শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ এতে মুসলমানদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, কোনোখান থেকে যে সাহায্যই আসুক না কেন, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপন, সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তাঁরই আয়ত্তে রয়েছে ফেরেশতাদের সাহায্যও। সবই তাঁর আজ্ঞাবহ। অতএব, তোমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র সেই ওয়াহদাহু লা-শরীক সত্তার প্রতিই নিবদ্ধ থাকা কর্তব্য। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমতাশীল, হিকমতওয়ালা ও সুকৌশলী।

١١. اُذْكُرْ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً اَمْنًا مِمَّا حَصَلَ لَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ مِنْهُ تَعَالٰى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالْجَنَابَاتِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَسْوَسَتَهُ اِلَيْكُمْ بِاَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ مَا كُنْتُمْ ظَمَاءً مُحْدِثِيْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ عَلَى الْمَاءِ وَلِيَرْبِطَ يَحْبِسَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ بِالْيَقِيْنِ وَالصَّبْرِ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ اَنْ تَسُوْخَ فِى الرَّمْلِ ـ

অনুবাদ :

১১. স্মরণ কর তিনি তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য অর্থাৎ যে ভীতি তোমাদের পেয়ে বসেছিল তা হতে স্বস্তিদানের জন্য আমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে হাদাছ অর্থাৎ বেঅজুজনিত নাপাকী ও জানাবাত অর্থাৎ গোসল ফরজজনিত নাপাকী হতে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের নিকট হতে শয়তান যে পাপের প্ররোচনা দেয় তা অর্থাৎ সে যে তোমাদেরকে কুমন্ত্রণা ও ওয়াসওয়াসা দেয় যে, তোমরা যদি সত্যপন্থি হতে তবে তোমাদেরকে এমন পিপাসার্ত ও অজুহীন থাকতে হতো না আর মুশরিকরা এ ধরনের পর্যাপ্ত পানি পেত না, সেই কুমন্ত্রণার পাপ অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় প্রত্যয় ও ধৈর্যধারণের মাধ্যমে দৃঢ় করার জন্য, সত্যের উপর দৃঢ় বাধনে বেঁধে রাখার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখার জন্য। অর্থাৎ বালিতে যেন তা ঢুকে না যায় তজ্জন্য ঐ ব্যবস্থা করেন।

١٢. اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰۤئِكَةِ الَّذِيْنَ اَمَدَّ بِهِمُ الْمُسْلِمِيْنَ اَنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ مَعَكُمْ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط بِالْاِعَانَةِ وَالتَّبْشِيْرِ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ الْخَوْفَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ اَىِ الرُّؤُوْسِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اَىْ اَطْرَافِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقْصِدُ ضَرْبَ رَقَبَةِ الْكَافِرِ فَتَسْقُطُ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ سَيْفُهُ اِلَيْهِ وَرَمَاهُمْ ﷺ بِقَبْضَةٍ مِنَ الْحَصٰى فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ اِلَّا دَخَلَ فِىْ عَيْنَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ فَهُزِمُوْا ـ

১২. স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি অর্থাৎ যাদেরকে তিনি মুসলিমদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছিলেন তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, 'আমি তোমাদের সাথে সাহায্য-সহযোগিতাসহ اَنِّىْ এটা এ স্থানে بِاَنِّىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে রয়েছি, সুতরাং মু'মিনদেরকে সাহায্য ও সুসংবাদ দান কর ও অবিচলিত রাখ; যারা কুফরি করেছে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে দেব। সুতরাং তাদের ঘরের উপর অর্থাৎ মস্তক দেশে এবং সর্বাঙ্গে আঘাত কর। اَلرُّعْبَ। অর্থ ভয়, ভীতি। بَنَانٍ অর্থ হাত ও পায়ের অগ্রভাগ। এর ফলে এমন হয়েছিল যে, কোনো মু'মিন কোনো একজন কাফেরকে মারতে চাইলে তার স্কন্ধে তলোয়ারের আঘাত লাগার পূর্বেই সে মাথা কেটে পড়ে যেত। তদুপরি রাসূল ﷺ ঐ সময় কাফেরদের প্রতি এক মুঠি নুড়ি নিক্ষেপ করেছিলেন। প্রতি কাফেরেরই চক্ষে গিয়ে তা পড়েছিল। ফলে পরাজিত হয়।

١٣. ذٰلِكَ الْعَذَابُ الْوَاقِعُ بِهِمْ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا خَالَفُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهٗ .

১৩. এটা অর্থাৎ তাদের উপর আপতিত এ শাস্তি এই হেতু যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দানে কঠোর। شَاقُّوْا অর্থ তারা বিরোধিতা করে।

١٤. ذٰلِكُمُ الْعَذَابُ فَذُوْقُوْهُ اَىْ اَيُّهَا الْكُفَّارُ فِى الدُّنْيَا وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ .

১৪. এই শাস্তি। সুতরাং হে কাফেরগণ! দুনিয়ায় তোমরা এটার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফেরগণের জন্য পরকালে রয়েছে অগ্নির শাস্তি।

١٥. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا اَىْ مُجْتَمِعِيْنَ كَاَنَّهُمْ لِكَثْرَتِهِمْ يَزْحَفُوْنَ فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ مُنْهَزِمِيْنَ .

১৫. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সমাবেশের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। زَحْفًا অর্থ ভিড়, সমাবেশ, এত ভিড় যে সংখ্যাধিক্যেয় দরুন সকলকেই যেন নিতম্ব ছেচড়িয়ে চলতে হচ্ছে। زَحْف ছেচড়িয়ে চলা।

١٦. وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ لِقَائِهِمْ دُبُرَهٗ اِلَّا مُتَحَرِّفًا مُنْعَطِفًا لِقِتَالٍ بِاَنْ يُّرِيَهُمُ الْفَرَّةَ مَكِيْدَةً وَهُوَ يُرِيْدُ الْكَرَّةَ اَوْ مُتَحَيِّزًا مُنْضَمًّا اِلٰى فِئَةٍ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَسْتَنْجِدُ بِهَا فَقَدْ بَاۤءَ رَجَعَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِىَ وَهٰذَا مَخْصُوْصٌ بِمَا اِذَا لَمْ يَزِدِ الْكُفَّارُ عَلَى الضِّعْفِ .

১৬. সেদিন অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধে সম্মুখীন হওয়ার দিন যুদ্ধকৌশল ফিরিয়া আক্রমণের কৌশল অবলম্বন যেমন শত্রুদের দেখাল যে পলায়ন করছে অথচ তার ইচ্ছা হলো তাদেরকে কৌশলে অসতর্ক করে পুনরায় আক্রমণ করা কিংবা স্বীয় দলে অর্থাৎ সাহায্য লাভের জন্য মুসলিম জামাতে স্থান নেওয়া একত্রে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত যে-কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল সে আল্লাহর বিরাগভাজন হলো। তাঁর ক্রোধে নিপতিত হয়ে ফিরল। তার আবাস হলো জাহান্নাম; আর তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। কাফেরগণ যদি সংখ্যায় মুসলিমদের দ্বিগুণ না হয় তবেই কেবল এ বিধান প্রযোজ্য। بَاۤءَ -অর্থ প্রত্যাবর্তন করল। اَلْمَصِيْرُ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٧. فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ بِبَدْرٍ بِقُوَّتِكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ص بِنَصْرِهٖ اِيَّاكُمْ وَمَا رَمَيْتَ يَا مُحَمَّدُ اَعْيُنَ الْقَوْمِ اِذْ رَمَيْتَ بِالْحَصٰى لِاَنَّ كَفًّا مِنَ الْحَصَا لَا يَمْلَأُ عُيُوْنَ الْجَيْشِ الْكَثِيْرِ بِرَمْيَةِ بَشَرٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ج بِاِيْصَالِ ذٰلِكَ اِلَيْهِمْ فَعَلَ ذٰلِكَ لِيَقْهَرَ الْكٰفِرِيْنَ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاۤءً عَطَاۤءً حَسَنًا ط هُوَ الْغَنِيْمَةُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِهِمْ عَلِيْمٌ بِاَحْوَالِهِمْ .

১৭. বদর ময়দানে তোমরা তোমাদের শক্তিতে তাদেরকে বধ করনি, আল্লাহই তোমাদেরকে সাহায্য করত তাদেরকে বধ করেছেন। হে মুহাম্মদ! তুমি যখন কাফের সম্প্রদায়ের চোখে নুড়ি নিক্ষেপ করেছিল তখন মূলত তুমি নিক্ষেপ করনি কেননা একজন মানুষের এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ দ্বারা এত বিরাট এক বাহিনীর সকলের চক্ষু ভরে যাওয়া কখনো সম্ভব নয়; সুতরাং সকলের চোখে তা পৌঁছিয়ে দিয়ে তা আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। এরূপ করা হয়েছিল কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করার জন্য এবং মু'মিনগণকে উত্তম প্রতিদান পুরস্কার অর্থাৎ গনিমত সামগ্রী প্রদানের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সকল কথা শ্রবণকারী এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে খুবই অবহিত।

١٨. ذٰلِكُمُ الْاَبْلَاءُ حَقٌّ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ مُضْعِفُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ.

১৮. এই পুরস্কার প্রদান সত্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করেন। مُوْهِنُ অর্থ যিনি দুর্বল করেন।

١٩. اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا اَيُّهَا الْكُفَّارُ تَطْلُبُوا الْفَتْحَ اَىِ الْقَضَاءَ حَيْثُ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ مِنْكُمُ اَللّٰهُمَّ اَيُّنَا كَانَ اَقْطَعَ لِلرَّحِمِ وَاَتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفُ فَاحِنْهُ الْغَدَاةَ اَىْ اَهْلِكْهُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ج الْقَضَاءُ بِهَلَاكِ مَنْ هُوَ كَذٰلِكَ وَهُوَ اَبُوْ جَهْلٍ وَمَنْ قُتِلَ مَعَهُ دُوْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ تَنْتَهُوْا عَنِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَاِنْ تَعُوْدُوْا لِقِتَالِ النَّبِيِّ نَعُدْ ج لِنَصْرِهِ عَلَيْكُمْ وَلَنْ تُغْنِىَ تَدْفَعَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ جَمَاعَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِكَسْرِ اِنْ اِسْتِئْنَافًا وَفَتْحِهَا عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ.

১৯. হে কাফেরগণ, তোমরা ফাত্হ চেয়েছিলে ফাত্হ অর্থাৎ মীমাংসা তলব করেছিলে। এ হিসাবেই তোমাদের মধ্য হতে বদর যুদ্ধের পূর্বের দিন কুরাইশ সর্দার আবূ জাহল বলেছিল, হে আল্লাহ! আমরা এ উভয় দলের মধ্যে যে দল অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং যে ব্যক্তি অসত্যের প্রচলনকারী তাদেরকে আগামী ভোরে ধ্বংস কর। ফাত্হ তো অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের নয়; বরং আবূ জাহল ও তার সঙ্গীদের বধ করত ঐরূপ দল ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে ঐ মীমাংসা তো তোমাদের নিকট এসেছে। যদি তোমরা কুফরি ও যুদ্ধ হতে বিরত হও তবে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি তোমরা রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও তাকে তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্যে প্রদানের পুনরাবৃত্তি করব। তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না, কোনো উপকারে আসবে না। আর আল্লাহ মু'মিনদের সাথেই রয়েছেন। فِئَتُكُمْ অর্থ তোমাদের দল। اِنَّ اللّٰهَ এটা مُسْتَانِفَةٌ অর্থাৎ নব গঠিত বাক্যরূপে বিবেচিত হলে হামযায় কাসরাসহ (اِنْ) আর এর পূর্বে একটি (لِ) উহ্য ধরা হলে ফাতাহসহ (اَنْ) পঠিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذْ يُغَشِّيْكُمْ : এটা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের ظَرْف হয়েছে অথবা পূর্ববর্তী اِذْ يَعِدُكُمْ হতে بَدَل হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمْنًا : اَمَنَةً -এর তাফসীর اَمْنًا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَمَنَةً-এটা মাসদার বলা হয় اَمَنَةً، اَمْنًا، اَمَانَةً বহুবচন নয়। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন। আর اَمَنَةً টা يُغَشِّيْكُمْ-এর مَفْعُوْل لَهُ ও হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রশান্তির জন্য তোমাদের উপর তন্দ্রা ঢেলে দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ مِنْهُ : مِنْهُ -এর যমীর আল্লাহর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ بِهٖ : অর্থাৎ بِالْمَاءِ

قَوْلُهُ اَنْ تَسُوْخَ : অর্থাৎ مِنْ اَنْ تَسُوْخَ তথা تَدْخُلُ

قَوْلُهُ لَهُ : প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) له উহ্য মানলেন কেন?

উত্তর. مَنْ হলো مُبْتَدَأ যা شَرْط -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ বাক্য হয়ে মুবতাদার খবর। আর খবর যখন বাক্য হয় তখন তাতে একটি যমীর عَائِدْ থাকা জরুরি হয়, যা এখানে নেই। এ কারণেই মুফাসসির (র.) لَهُ -কে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ الْعَذَابُ : ذَالِكُمْ হলো মুবতাদা আর اَلْعَذَابُ তার খবর যা উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) اَلْعَذَابُ উহ্য মেনে এ তারকীবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর ইসমে ইশারা ذَالِكُمْ -কে উহ্য মুবতাদার খবরও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ اَلْعَذَابُ ذَالِكُمْ কাজেই ذَالِكُمْ فَذُوْقُوْهُ-এর মধ্যে اِنْشَاءْ -এর খবর হওয়ার আপত্তি শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ فَذُوْقُوْهُ : এখানে فَاءْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর ذُوْقُوْهُ উহ্য শর্তের جَزَاءْ অর্থাৎ اِنْ كَانَ كَذَالِكَ فَذُوْقُوْهُ

قَوْلُهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ : এর আতফ হয়েছে ذَالِكَ -এর উপর এবং وَاعْلَمُوْا উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْبٌ ও হতে পারে।

قَوْلُهُ زَحْفًا : এটা বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। অর্থ– ভিড়ের কারণে আস্তে আস্তে চলা, বাচ্চার মতো হামাগুড়ি দেওয়া, সরানো।

قَوْلُهُ مُتَحَرِّفًا مُنْعَطِفًا : চক্কর মেরে আক্রমণ করা। অর্থাৎ اَلْكُرُّبَعْدَ الْفَرِّ

قَوْلُهُ مُتَحَيِّزً : এটা বাবে تَفَعُّلْ থেকে ইসমে ফায়েল -এর সীগাহ। অর্থ– প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় কালের দিকে আগমনকারী। যাতে করে সাথীদের সাহায্য নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে পারে। মূলবর্ণ হলো حَوْزٌ

قَوْلُهُ يَسْتَنْجِدُ : اِسْتِنْجَادْ অর্থ হলো– সাহায্য প্রার্থনা করা।

قَوْلُهُ هِيَ : এটা مَخْصُوْص بِالذَّم হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ : এখানে فَاءْ টা হলো جَزَائِيَّهْ এটা উহ্য شَرْط ; উহ্য ইবারত হলো–
اِنِ افْتَخَرْتُمْ بِقَتْلِهِمْ فَاَنْتُمْ لَمْ تَقْتُلُوْهُمْ

قَوْلُهُ لِيُبْلِيَ : অর্থাৎ يُعْطِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمُؤْمِنِيْنَ اِعْطَاءً حَسَنًا

قَوْلُهُ حَقٌّ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ذَالِكُمُ الْاِبْلَاءُ হলো মুবতাদা حَقٌّ হলো উহ্য খবর

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আনফালের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলার সে সমস্ত নিয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়েবদরের ঘটনাগুলো সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গওয়ায়েবদরে যেসব নিয়ামত আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল। এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা وَاِذْ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নিয়ামত হলো ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নিয়ামত দোয়ার মঞ্জুরি ও সাহায্যের ওয়াদা পূরণ। আর তারই আলোচনা করা হয়েছে اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ আয়াতে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দুটি নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হলো সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেওয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্বপ্রথম এই সমর যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন মক্কায় কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয়, যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌছলে তাঁদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কুরআনে কারীম এ যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى -এর সবিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

রাসূলে কারীম ﷺ প্রথম যেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপযোগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি ... নির্দেশ গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোনো অধিকার নেই, নাকি শুধুমাত্র নিজের মতো ও

যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে মুনযির (রা.) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মক্কী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী ﷺ তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির জায়গাটি মুসলমানদের অধিকার নিয়ে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার জন্য কোনো একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারিগুলোও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করব। আল্লাহ যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন, তাবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি খোদানাখাস্তা অন্য কোনো অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারিতে সওয়ার হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে মিশবেন, যারা মদিনা-তাইয়্যেবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আপনার মদিনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসিজ্জত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদিনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী ﷺ তাঁর এ বীরোচিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। তাতে মহানবী ﷺ এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মু'আয (রা.) তাঁদের হেফাজতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তেরো জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবিলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানি ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল। কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারাণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামাজে ব্যাপৃত রয়েছ। অথচ সব দিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভালো অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোনো প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেজ হাদীস আবূ ইয়ালা উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তযা (রা.) বলেছেন, বদর যুদ্ধের এই রাতে এমন কেউ ছিল না, যে ঘুমায়নি। শুধু রাসূলে কারীম ﷺ সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাজে নিয়োজিত থাকেন।

ইবনে কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ সামিয়ানার নিচে তাহাজ্জুদ নামাজে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখে সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠে বলেন, হে আবূ বকর! সুসংবাদ শুন এই যে জিবরাইল (আ.) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পশ্চাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবূ জাহলের হত্যা স্থান, এটা অমুকের, সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে। –[তাফসীরে মাযহারী] আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লান্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

সুফিয়ান ছওরী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাজের সময় ঘুম আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এ রাতে মুসলমানরা দ্বিতীয় যে নিয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাঙ্গণের চেহারাই পাল্টে যায়। কুরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর বৃষ্টি এখানে অল্প হয়, যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আয়াতে এ দুটি নিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে– ১ নিদ্রা ও ২. বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিচিত্ত মন থেকে সে সমস্ত শয়তানি ওয়াসওয়াসা ধুয়ে-মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদের প্রশান্তি দান করার জন্য; যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাঙ্গণে মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। তা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদের সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুত তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের মার দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদের দুটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমত মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। এ কাজটি ফেরেশতা কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবৃদ্ধি করা কিংবা তাঁদের সাথে মিশে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈব ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। যাহোক, তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতারা নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতারা উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈব ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধিও করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কতিপয় হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তাফসীরে দুররে মানসূর ও মাযহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটেছে তার কারণ ছিল কুফ্ফার কর্তৃক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ তা'আলার সুকঠিন আজাব। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাজিল হয়েছে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি, অপরদিকে কাফেরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আজাব নাজিল করে তাদেরই অসদাচরণের যৎসামান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে আখেরাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে– ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ এটা হলো আমার যৎসামান্য আজাব; এর আস্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরে কাফেরদের জন্য আরো আজাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কল্পনাতীত।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : উল্লিখিত আয়াতের প্রথম দুটিতে ইসলামের একটি সমরনীতি বাতলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে زَحْفٌ শব্দের মর্মার্থ হলো, উভয় বাহিনীর মোকাবিলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে এ হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং নাজায়েজ পন্থায় পালনকারীদের সুকঠিন আজাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে– اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েজ রয়েছে। **প্রথমত** যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কবাস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্যে। এটাই হলো اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ-এর অর্থ। কারণ, تَحَرُّفٌ অর্থ হয় কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়া। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

দ্বিতীয়ত বিশেষ কোনো অবস্থা যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে। তা হলো এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্য পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদরা অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয় اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ-এর অর্থ তাই। কারণ تَحَيُّزٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো মিলিত হওয়া এবং فِئَةٌ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েজ। এই স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এ স্বতন্ত্রাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। ইরশাদ হয়েছে- فَقَدْ بَاۤءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায়, তারা আল্লাহ তা'আলার গজব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর সেটি হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দুটির দ্বারা এ নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যতই বেশিই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য তাদের মোকাবিলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দুটি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হলো এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ্যে হবে না; বরং তা হবে পাঁয়তারা পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুনরাক্রমণের উদ্দেশ্যে। বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাজিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোনো তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েজ নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ তেরো জনকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তিন গুণ অর্থাৎ এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এ হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আনফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাজিল করা হয়। ৬৫ তম আয়াতে বিশজন মুসলমানকে দু'শ কাফেররের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হয়। তারপর ৬৬তম আয়াতে তা আরো শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয় اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ، فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ অর্থাৎ এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এ বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ হয় তবে তারা দু'শ কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজেদের দ্বিগুণ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েজ নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে ত্যাগ করা জায়েজ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবিলা থেকে পালিয়ে যায়, তার পলায়ন পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দুজনের মোকাবিলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে। -[রূহুল বায়ান] এখন এ হুকুমই কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরিয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গুনাহে কবীরা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলে বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গযওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কুরআনে করীম একটি শয়তানি পদস্খলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলিল। ইরশাদ হয়েছে اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ

তাছাড়া তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদিনায় এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী ﷺ অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সান্ত্বনা দান করলেন। বললেন- بَلْ اَنْتُمُ الْعَكَّارُوْنَ وَاَنَا فِئَتُكُمْ অর্থাৎ "তোমরা পলাতক নও; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে পুনর্বার আক্রমণকারী, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সে অতিরিক্ত শক্তি।" এতে মহানবী ﷺ এ বাস্তবতাকেই পরিষ্কার

করে দিয়েছেন যে, তাঁদের পালিয়ে এসে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ সেই স্বাতন্ত্র্যের অন্তর্ভুক্ত, যাতে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গণ ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আল্লাহ তা'আলার ভয়ভীতি ও মহত্ত্ব-জ্ঞানের যে সুউচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই ভিত্তিতে তিনি এ বাহ্যিক পশ্চাদপসরণেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেজন্যই নিজেকে অপরাধী হিসাবে মহানবী ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করেছিলেন।

তৃতীয় আয়াতে গযওয়ায়ে বদরের অপরাপর ঘটনা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে অধিকের সাথে অল্পের এবং সবলের সাথে দুর্বলের অলৌকিক বিজয়কে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফসল বলে মনে করো না; বরং সে মহান সত্তার প্রতি লক্ষ্য কর, যাঁর সাহায্য-সহায়তা গোটা যুদ্ধেরই চেহারা পাল্টে দিয়েছে।

এ আয়াতে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইবনে জারীর, তাবারী, হযরত বায়হাকী (র.) প্রমুখ মনীষী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিন যখন মক্কার এক হাজার জওয়ানের বাহিনী টিলার পেছন দিক থেকে ময়দানে এসে উপস্থিত হয়, তখন মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা একান্ত গর্বিত ও সদম্ভ ভঙ্গিতে উপস্থিত হয়। সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ দোয়া করেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনাকে মিথ্যা জ্ঞানকারী এই কুরাইশরা গর্ব ও দম্ভ নিয়ে এগিয়ে আসছে, আপনি বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন।" –[রূহুল বয়ান] তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে নিবেদন করেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ] আপনি একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করুন। তিনি তাই করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে হাতেম হযরত ইবনে যায়েদের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ তিনবার মাটি ও কাঁকরের মুঠো তুলে নেন এবং একটি শত্রু বাহিনীর ডান অংশের উপর, একটি বাম অংশের উপর এবং একটি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই এক কিংবা তিন মুষ্টি কাঁকরকে আল্লাহ একান্ত ঐশীভাবে এমন বিস্তৃত করে দেন যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যদের এমন একটি লোকও বাকি ছিল না, যার চোখে অথবা মুখমণ্ডলে এই ধূলি ও কাঁকর পৌঁছেনি। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় গোটা শত্রু বাহিনীর মাঝে এক ভীতির সঞ্চার হয়ে যায়। আর এ সুযোগে মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে; ফেরেশতারা পৃথকভাবে তাঁদের যুদ্ধে শরিক ছিলেন।

–[তাফসীরে মাযহারী, রূহুল বয়ান]

শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের কিছু লোক নিহত হয়, কিছু হয় বন্দী; আর বাকি সবাই পালিয়ে যায় এবং ময়দান চলে আসে মুসলমানদের হাতে।

সম্পূর্ণ নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে মুসলমনারা এ মহান বিজয় লাভে সমর্থ হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর তাদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সাহাবায়ে কেরাম একে অপরের কাছে নিজের নিজের কৃতিত্বের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নাজিল হয়– فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ আয়াত। এতে তাঁদেরকে হেদায়েত দান করা হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু ঘটেছে তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে যেসব শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি বরং আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ আপনি যে কাঁকরের মুঠো নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, স্বয়ং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে যে, কাঁকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাব হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ گفت حق

کار ما بر کارها دارد سبق

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জিহাদে বিজয় লাভের চাইতে অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি, যা তাদের মনমানসকে উপকরণ থেকে ফিরিয়ে উপকরণের স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাঁদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণত বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেওয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

অতঃপর বলা হয়েছে- وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا অর্থাৎ আমি মু'মিনদের এ মহাবিজয় দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। بَلَاءٌ শব্দের শব্দগত অর্থ হলো পরীক্ষা। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা কখনো বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো ধন-দৌলত ও সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে হয়। بَلَاءٌ حَسَنٌ বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আয়েশ-আরাম, ধনসম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেওয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে কারও গর্বাহংকারের কোনো অবকাশ নেই।

চতুর্থ আয়াতে এর পাশাপাশি এ বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের এ বিজয় এ কারণেও দেওয়া হয়েছে যেন এর মাধ্যমে কাফেরদের পরিকল্পনা ও কলা কৌশলসমূহকে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় এবং যাতে কাফেররা এ কথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তা'আলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোনো কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে পরাজিত কুরাইশী কাফেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে কুরাইশী বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কুরাইশ কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেওয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে বাহিনী প্রধান আবূ জাহল প্রমুখ বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপারে এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্যে এভাবে দোয়া করেছিল-

"ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশি হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশি ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান কর।" -[মাযহারী]

এই নির্বোধরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছি, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এ দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতিল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা এ কথা জানত না যে, এ দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কুরআনে কারীম তাদের বাতলে দিল اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ অর্থাৎ তোমরা যদি ঐশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ আর যদি তোমরা এখনও কুফরিজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ আর তোমরা যদি আবারো নিজেদের দুষ্টুমি ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাবে। وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ অর্থাৎ তোমাদের দল ও জোট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্যের মোকাবেলায় তা তোমাদের কোনো কাজেই লাগবে না। وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোনো দল তোমাদের কিইবা কাজে লাগতে পারে?

অনুবাদ :

٢٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا تُعْرِضُوْا عَنْهُ بِمُخَالَفَةِ اَمْرِهٖ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَالْمَوَاعِظَ ـ

২০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তোমরা যখন কুরআন ও উপদেশাবলি শ্রবণ করছ তখন তাঁর নির্দেশবালির বিরুদ্ধাচরণ করত তা হতে বিমুখ হয়ো না।

٢١. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَّاتِّعَاظٍ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ ـ

২১. এবং তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা বলে 'শ্রবণ করলাম' অথচ তারা চিন্তা-গবেষণা ও উপদেশ গ্রহণের জন্য শ্রবণ করে না। এরা হলো মুনাফিক ও মুশরিকগণ।

٢٢. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ عَنْ سِمَاعِ الْحَقِّ الْبُكْمُ عَنِ النُّطْقِ بِهِ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ

২২. আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব হলো সত্য বিষয় শ্রবণ করা সম্পর্কে যারা বধির এবং সত্য কথা বলা হতে যারা মূক, যারা কিছুই বুঝে না।

٢٣. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا اِصْلَاحًا بِسِمَاعِ الْحَقِّ لَاَسْمَعَهُمْ ط سِمَاعَ تَفَهُّمٍ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ فَرْضًا وَقَدْ عَلِمَ اَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِمْ لَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ عَنْ قَبُوْلِهٖ عِنَادًا وَجُحُوْدًا ـ

২৩. আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু আছে বলে অর্থাৎ সত্য সম্পর্কে শ্রবণ করত কল্যাণ লাভের যোগ্যতা আছে বলে জানতেন তবে তাদরেকেও তিনি নিশ্চয় বুঝবার কানে শুনাতেন। কিন্তু এদের মাঝে ভালো কিছু নেই জানো যদি তাদেরকে তিনি শুনাতেন তবে তারা তা উপেক্ষা করে জিদ ও অস্বীকার করার প্রবণতা বশত তা গ্রহণ করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিত।

٢٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ بِالطَّاعَةِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ج مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ لِاَنَّهٗ سَبَبُ الْحَيَاةِ الْاَبَدِيَّةِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ فَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّؤْمِنَ اَوْ يَكْفُرَ اِلَّا بِاِرَادَتِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ ـ

২৪. হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে ধর্ম বিষয়ে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে আর ইসলাম ধর্মই মানুষকে অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী জীবনদানের চাবিকাঠি তখন আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে। জেনে রাখ! আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের অন্তর্বর্তীস্থানে অবস্থান করেন সুতরাং তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত একজন মুমিনও হতে পারে না বা কাফেরও হতে পারে না। এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন।

٢٥. وَاتَّقُوْا فِتْنَةً اِنْ اَصَابَتْكُمْ لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ج بَلْ تَعُمُّهُمْ وَغَيْرَهُمْ وَاتِّقَاؤُهَا بِاِنْكَارِ مُوْجِبِهَا مِنَ الْمُنْكَرِ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ خَالَفَهُ .

২৫. তোমরা এমন এক আজাব ও শাস্তি সম্পর্কে সাবধান হও যে তা যদি তোমাদের উপর আপতিত হয় তবে বিশেষ করে যারা সীমালঙ্ঘনকারী কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না বরং এরা এবং অন্য সকলের উপরই তা ব্যাপকভাবে এসে নিপতিত হবে। জেনে রাখ যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিদানে অতি কঠোর। উক্ত শাস্তি হতে বাঁচার উপায় হলো তার মূল কারণ পাপকার্য হতে বিরত থাকা ও তা নিষেধ করা।

٢٦. وَاذْكُرُوْآ اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مَكَّةَ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ يَاْخُذُكُمُ الْكُفَّارُ بِسُرْعَةٍ فَاٰوٰكُمْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاَيَّدَكُمْ قَوَّاكُمْ بِنَصْرِهٖ يَوْمَ بَدْرٍ بِالْمَلٰئِكَةِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ الْغَنَائِمِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نِعَمَهُ .

২৬. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, ভূপৃষ্ঠে অর্থাৎ মক্কা ভূমিতে তোমরা ছিলে দুর্বলরূপে গণ্য; আশঙ্কা করত লোকেরা অর্থাৎ কাফেরগণ তোমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে অর্থাৎ আকস্মাৎ অতি দ্রুত ধরে নিয়ে যাবে; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মদিনায় আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতাগণ দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং পবিত্র বস্তু হতে اَيَّدَكُمْ অর্থ তিনি তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন। অর্থাৎ গনিমত ও জেহাদলব্ধ সম্পদ হতে তোমাদেরকে জীবিকা দান করেন; যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

٢٧. وَنَزَلَ فِىْ اَبِىْ لُبَابَةَ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَقَدْ بَعَثَهُ ﷺ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ لِيَنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِهٖ فَاسْتَشَارُوْهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنَّهُ الذَّبْحُ لِاَنَّ عِيَالَهُ وَمَالَهُ فِيْهِمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَلَا تَخُوْنُوْآ اَمٰنٰتِكُمْ مَا اُؤْتُمِنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ وَغَيْرِهٖ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

২৭. রাসূল ﷺ মদিনার বনূ কুরাইযা নামক ইহুদিগোত্রকে তাদের বিশ্বাসভঙ্গের কারণে অবরোধ করে রেখেছিলেন। ঐ সময়ে একবার তিনি সাহাবী আবূ লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযিরকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন যেন তারা তাঁর নির্দেশ অনুসারে আত্মসমর্পণ করে। তখনো আবূ লুবাবার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পত্তি তাদের [ইহুদিদের] মহল্লার কাছেই ছিল। তাই এরা তার নিকট এ বিষয়ের পরামর্শ চাইলে তিনি গলার দিকে ইশারা করে দেখালেন যে, আত্মসমর্পণ করলে তাদেরকে জবাই করে ফেলা হবে। [কিন্তু এটা গোপন করে রাখার কথা ছিল।] এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের গচ্ছিত বিষয়াদি সম্পর্কেও অর্থাৎ ধর্ম বা অন্য যে সমস্ত বিষয়াদি তোমাদের নিকট আমানত হিসাবে সেই সম্পর্কে খেয়ানত করো না।

٢٨. وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا لَكُمْ صَادَّةٌ عَنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ فَلَا تُفَوِّتُوْهُ بِمُرَاعَاةِ الْاَمْوَالِ

২৮. এবং জেনে রাখ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি একটি পরীক্ষাবিশেষ। এরা পরকাল গঠনের আমল হতে বাধা দিয়ে রাখে। আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহা প্রতিদান। সুতরাং বিত্ত-বৈভব ও সন্তানসন্ততির লক্ষ্য করতে গিয়ে এবং তাদের জন্য খেয়ানত কর্মে লিপ্ত হয়ে তা হারিয়ে

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعْرِضُوا : এখানে تَوَلَّوْا-এর তাফসীর تُعْرِضُوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, تَوَلَّوْا-এর মধ্যে একটি تَاءٌ উহ্য রয়েছে যা مُضَارِعْ -এর সীগাহ; مَاضِىْ -এর সীগাহ নয়। কাজেই এ প্রশ্নও শেষ হয়ে গেলে যে, مَاضِىْ-এর উপর لَا -কে تَكْرَارْ নেওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ لَا يَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ اَلْحَقَّ

قَوْلُهُ قَدْ عَلِمَ اَنْ لَّا خَيْرَ فِيْهِمْ : এ বৃদ্ধিকরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি আপত্তির নিরসন করা। আপত্তি হলো উল্লিখিত আয়াতে لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَتَوَلَّوْا قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন। যার ফলাফল দাঁড়ায় এই যে, আর এটা অসম্ভব।

প্রশ্ন. لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا قِيَاسْ اِقْتِرَانِىْ হলো ফলাফল বের হবে لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ خَيْرًا لَتَوَلَّوْا অর্থাৎ যদি তাদের মধ্যে আল্লাহর ইলমে কোনো কল্যাণ হতো তবে সে নিশ্চয়ই ফিরে যেত। আর এটা مُحَالْ বা অসম্ভব।

উত্তর. বিশুদ্ধ ফলাফলের জন্য حَدْ اَوْسَطْ একই রকম হওয়া জরুরি। এখানে حَدْ اَوْسَطْ বিভিন্ন ধরনের হয়েছে। কেননা এখানে প্রথম اِسْمَاعْ দ্বারা اِسْمَاعْ مُجَرَّدْ উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় اِسْمَاعْ দ্বারা سِمَاعْ فِيْهِمُ الْمُوْجِبُ لِلْهِدَايَةِ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اِنْ اَصَابَتْكُمْ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ الخ উহ্য شَرْط-এর জবাব এবং এর দ্বারা সে সকল লোক জনের জবাব দেওয়া হয়েছে যারা বলে যে, لَا تُصِيْبَنَّ এটা فِتْنَةً-এর সিফত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বদর যুদ্ধের যে সমস্ত ঘটনা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মুসলমান ও কাফের উভয়ের জন্যই বহু তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। ঘটনার মধ্যভাগে সেগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণত বিগত আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের বিবরণ দেওয়ার পর বলা হয়েছে– ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান জমিনের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে কিংবা আল্লাহর না-ফরমানি করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের ভ্রান্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লিখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিকে মুসলমানদের সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হলো এই যে, মুসলমানরা তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হলো আল্লাহর প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ "ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতঃপর এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে– وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ কুরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেওয়ার পরেও তোমরা আনুগত্য বিমুখ হয়ো না।

শুনে নেওয়ার অর্থ সত্য বিষয়টি শুনে নেওয়া। শোনার চারটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে– ১. কোনো কথা কানে নিল সত্য, কিন্তু না বুঝতে চেষ্টা করল, না বুঝল এবং নাই-বা তাতে বিশ্বাস করল আর না সে মতে আমল করল। ২. কানে শুনল এবং তা বুঝলও, কিন্তু না করল তাতে বিশ্বাস, না করল আমল। ৩. শুনল, বুঝল এবং বিশ্বাসও করল, কিন্তু তাতে আমল করল না। ৪. শুনল, বুঝল বিশ্বাস করল এবং সেমতে আমলও করল।

বলা বাহুল্য, শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয় শুধুমাত্র চতুর্থ পর্যায়ে যা পরিপূর্ণ মু'মিনদের স্তর। বস্তুত প্রাথমিক তিনটি পর্যায়ে শ্রবণ থাকে অসম্পূর্ণ। কাজেই এ রকম শোনাকে একদিক দিয়ে না শোনাও বলা যেতে পারে, যা পরবর্তী আয়াতে আলোচিত হবে। যাহোক, ততীয় পর্যায়ে শ্রবণ, যাতে সত্যকে শোনা, বোঝা এবং বিশ্বাস বর্তমান থাকলেও তাতে আমল নেই।

এতে যদিও শোনার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না, কিন্তু বিশ্বাসেরও একটা বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাও সম্পূর্ণভাবে বেকার যাবে না, এ স্তরটি হলো গুনাহগার মুসলমানদের স্তর। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যাতে শুধু শোনা ও বুঝা বিদ্যমান, কিন্তু না আছে তাতে বিশ্বাস, না আছে আমল– এটা মুনাফিকদের স্তর। এরা কুরআনকে শুনে, বুঝে এবং প্রকাশ্যভাবে বিশ্বাস ও আমলের দাবিও করে, কিন্তু বাস্তবে তা বিশ্বাস ও আমলহীন। আর প্রথম পর্যায়ের শ্রবণ হলো কাফের-মুশরিকদের, যারা কুরআনের আয়াতগুলো কানে শুনে সত্যই, কিন্তু কখনও তা বুঝতে কিংবা তা নিয়ে চিন্তা করার প্রতি লক্ষ্য করে না।

উল্লিখিত আয়াতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সত্য কথা শুনছ, বুঝছ এবং তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসও রয়েছে, কিন্তু তারপর তাতে পুরোপুরিভাবে আমল কর, আনুগত্যে অবহেলা করো না। তাই শ্রবণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়েই অধিকতর তাগিদ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ অর্থাৎ তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা মুখে একথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কিছুই শোনেনি। সে সমস্ত লোক বলতে উদ্দেশ্য হলো সাধারণ কাফেরকুল, যারা শোনার দাবি করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবি করে না এবং এতে মুনাফিকও উদ্দেশ্য যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবিদার। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে এরূপ সম্প্রদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এ শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদের এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবুলও করে না। এহেন লোককে কুরআনে কারীম চতুষ্পদ জীবজন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেছে। ইরশাদ করেছে– إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

الدَّوَابِّ শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। [illegible]

প্রচলন ও পরিভাষায় دَابَّةٌ বলা হয় শুধুমাত্র চতষ্পদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও চতুষ্পদ জীব তুল্য, যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মূক। বস্তুত মূক ও বধিরদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত-ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মূক ও বধির হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে। বলা বাহুল্য, যে মূক-বধির বুদ্ধি বিবর্জিতও হবে, তাকে বুঝবার এবং বোঝবার কোনোই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [সুগঠিত অঙ্গ সৌষ্ঠব] দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশ্বের বরেণ্য করা হয়েছে এ যাবতীয় ইনাম ও কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে শুনতে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এ সমুদয় পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তাফসীরে রূহুল-বায়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানেয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয় তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

চতুর্থ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক তথা সৎচিন্তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সামর্থ্য দান করতেন। কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ তা'আলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিয়ে দেন, তাহলে তারা অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সৎচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বুঝানো হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তাভাবনা ও উপলব্ধির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে যেন কোনো রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যদি কোনো রকম কল্যাণ থাকত, তবে তা আল্লাহ তা'আলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ তা'আলার জানা মতে তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণের চিন্তা তথা সৎচিন্তা নেই, [illegible] বস্তুতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এ প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি

মুখ ফিরিয়ে নেবে। অর্থাৎ তাদের এ বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দীনের মধ্যে কোনো আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোনো লক্ষ্যই করেনি।

এ বিবৃতির দ্বারা সেই তার্কিক সন্দেহটি দূর হয়ে যায়, যা শিক্ষিত লোকদের মনে উদয় হয়। তা হলো এই যে, একটা কিয়াসের শেক্‌লে-আউয়াল। এর মধ্যে থেকে হদ্দে আওসাতকে ফেলে দিলে ভুল ফলোদয় হয়। তার উত্তর এই যে, এখানে হদ্দে আওসাতের পুনরাবৃত্তি নেই। কারণ, এখানে প্রথমোক্ত لَأَسْمَعَهُمْ এবং দ্বিতীয় أَسْمَعَهُمْ -এর মর্ম পৃথক পৃথক। প্রথমোক্ত سَمَاعٌ [শ্রবণ] বলতে গ্রহণসহ শ্রবণ ও উপকারী শ্রবণ উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় سَمَاعٌ [শ্রবণ] বলতে শুধু নিষ্ফল শ্রবণ বুঝানো হয়েছে।

পঞ্চম আয়াতে পুনরায় ঈমানদারদের সম্বোধন করে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালন ও তাঁদের আনুগত্যের প্রতি এক বিশেষ ভঙ্গিতে হুকুম করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের যেসব বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, তাতে আল্লাহ ও রাসূলের নিজস্ব কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, বরং সমস্ত হুকুমেই তোমাদের কল্যাণ ও উপকারার্থে দেওয়া হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের কথা মান, যখন রাসূল তোমাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, যা তোমাদের জন্য সঞ্জীবক।

এ আয়াতে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, তাতে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই কারণেই তাফসীরকার আলেমরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন। আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেছেন, সেই সঞ্জীবক বস্তুটি হলো ঈমান। কারণ, কাফেররা হলো মৃত। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, সেটি কুরআন, যাতে দুনিয়া এবং আখেরাতে জীবন ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মুজাহিদের মতে তা হলো সত্য। ইবনে ইসহাক বলেন যে, সেটি হচ্ছে 'জিহাদ' যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। বস্তুত এ সমুদয় সম্ভাবনাই স্ব-স্ব স্থানে যথার্থ। এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ 'ঈমান', 'কুরআন' অথবা 'সত্যানুগত্য, প্রভৃতি এমনই বিষয় যা দ্বারা মানুষের আত্মা সঞ্জীবিত হয়। আর আত্মার জীবন হলো বান্দা ও আল্লাহর মাঝে শৈথিল্য ও রিপু প্রভৃতির যে সমস্ত যবনিকা অন্তরায় থাকে সেগুলো সরে যাওয়া এবং যবনিকার তমসা কেটে গিয়ে নূরে মা'রেফাতে নূর -এ স্থান লাভ।

তিরমিযী ও নাসায়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন রাসূলে কারীম ﷺ উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তখন উবাই ইবনে কা'আব (রা.) নামাজ পড়ছিলেন। তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে হুজুর ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন। হুজুর ﷺ বললেন, আমার ডাক সত্ত্বেও আসতে দেরি করলে কেন? হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.) নিবেদন করলেন, আমি নামাজে ছিলাম। হুজুর ﷺ বললেন, তুমি اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ আল্লাহ তা'আলার বাণীটি শোননি? উবাই ইবনে কা'আব (রা.) নিবেদন করলেন, আগামীতে এরই অনুসরণ করব, নামাজের অবস্থায়ও যদি আপনি ডাকেন, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে।

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ফুকাহা বলেছেন, রাসূলের হুকুম পালন করতে গিয়ে নামাজের মধ্যে যে কোনো কাজই করা হোক, তাতে নামাজে ব্যাঘাত ঘটে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদিও নামাজের পরিপন্থি কাজ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে তা কাজা করতে হবে, কিন্তু রাসূল যখন কাউকে ডাকেন, তখন সে নামাজে থাকলেও তা ছেড়ে রাসূলের হুকুম তামিল করবেন।

এ হুকুমটি তো বিশেষভাবে রাসূল ﷺ -এর সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু অপরাপর এমন কোনো কাজ যাতে বিলম্ব করতে গেলে কোনো কঠিন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তখনও নামাজ ছেড়ে দেওয়া এবং পরে কাজা করে নেওয়া উচিত। যেমন, নামাজে থেকে যদি কেউ দেখতে পায় যে, কোনো অন্ধ ব্যক্তি কুয়ায় পড়ে যাবার কাছাকাছি চলে গেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে নামাজ ছেড়ে তাকে উদ্ধার করা কর্তব্য।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ অর্থা ৎ জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোনো সৎকাজ করার কিংবা পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেল; এতটুকু বিলম্ব করো না এবং অবকাশকে গনিমত জ্ঞান কর। কারণ কোনো কোনো সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ নির্ধারিত কাযা বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোনো রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোনো কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং

মানুষের কর্তব্য হলো আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গনিমত মনে করা। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ তা'আলা যে বান্দার অতি সন্নিকটে তাই বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াত نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -এ আল্লাহ তা'আলা যে মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখনই তিনি কোনো বান্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি তাঁর অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কারও ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সৎকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন- يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ হে অন্তরসূহের ওলটপালটকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এর সারমর্মও এই যে, আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ পালনে আদৌ বিলম্ব করো না এবং সময়ের অবকাশকে গনিমত মনে করে তৎক্ষণাৎ তা বাস্তবায়িত করে ফেল। একথা কারোই জানা নেই যে, অতঃপর সৎকাজের এ প্রেরণা ও আগ্রহ বাকি থাকবে কিনা।

قَوْلُهُ وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الخ : কুরআনে কারীম বদর যুদ্ধের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমানদের প্রতি নাজিলকৃত ইনামসমূহের কথা উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে। يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটি এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে হেদায়েত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আজাব শুধু পাপীদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদ ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী বলেন, 'আমর বিল মা'রূফ' তথা সৎকাজের নির্দেশ দান এবং 'নাহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হলো এ পাপ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা নিজের এলাকায় কোনো অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকাজ সংঘটিত হতে দেখে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ স্বীয় আজাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোনো গুনাহগার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে 'নিরাপরাধ' বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হচ্ছে, যারা মূল পাপে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও 'আমর বিল মা'রূফ' বর্জন করার পাপে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোনো সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আজাব করাটা অবিচার এবং কুরআনী সিদ্ধান্ত- لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -এর পরিপন্থি। কারণ, এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এবং নিরপরাধরা তাদের 'আমর বিল মা'রূফ' থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি। ইমাম বগভী (র.) 'শরহুস সুন্নাহ' ও 'মাআলিম' নামক গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দিষ্ট দলের পাপের আজাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোনো অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম সংঘটিত হতে দেখে তা প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয়নি। তবেই আল্লাহর আজাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবূ দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোনো অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবার উপর ব্যাপক আজাব নাজিল করবেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যারা আল্লাহর কানুনের সীমালঙ্ঘনকারী গুনাহগার এবং যারা তাদের দেখেও মৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদুভয় শ্রেণির উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মতো যাতে দুটি শ্রেণি রয়েছে এবং নিচের শ্রেণির লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নিচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের তলায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সংগ্রহ করতে শুরু

করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও বারণ করে না। এতে বলাই বাহুল্য যে, গোটা জাহাজেই পানি ঢুকে পড়বে আর তাতে নিচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও বাঁচতে পারবে না।

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে অনেক তাফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে فِتْنَةً [ফিতনাহ] বলতে এ পাপ অর্থাৎ "সৎকাজে নির্দেশ দান অসৎকাজে বাধা দান" বর্জনকেই বুঝানো হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ বলার উদ্দেশ্য হলো জেহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জিহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমিরুল মু'মিন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং ইসলামি 'শেয়ার' সমূহের হেফাজতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জিহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জিহাদ বর্জনকারীদের উপরেই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাফেরদের বিজয়ের ফলে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জানমাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আজাব' অর্থ হবে পার্থিব বিপদাপদ।

এ ব্যাখ্যা ও তাফসীরের সামঞ্জস্য হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জিহাদ বর্জনকারীদের প্রতি ভর্ৎসনা করা হয়েছে– يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ এবং وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ প্রভৃতি পরবর্তী আয়াতগুলোও এরই বর্ণনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। গযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন কতিপয় মুসলমানের পদস্খলন হয়ে যায় এবং ঘাঁটি ছেড়ে নিচে নেমে আসেন, তখন তার বিপদ শুধু তাদের উপরই আসেনি, বরং সমগ্র মুসলিম বাহিনীর উপরই আসে। এমনকি স্বয়ং মহানবী ﷺ -কেও সে যুদ্ধে আহত হতে হয়।

দ্বিতীয় আয়াতেও আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যকে সহজ করার জন্য এবং তাঁর প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের তাদের বিগত দিনের দুরবস্থা, দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব এবং পরে স্বীয় অনুগ্রহ ও নিয়ামতের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে শক্তি ও শান্তিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা সে অবস্থার কথা স্মরণ কর, যা হিজরতের পূর্বে মক্কা মুআয্যমায় ছিল। তখন তোমরা সংখ্যায় যেমন অল্প ছিলে তেমনি শক্তিতেও। সর্বক্ষণ আশঙ্কা লেগেই থাকত যে, শত্রুরা তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মদিনায় উত্তম অবস্থান দান করেছেন। শুধু অবস্থান বা আশ্রয় দান করেননি; বরং স্বীয় সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে দান করেছে শক্তি, শত্রুর উপর বিজয় এবং বিপুল মালামাল। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার এহেন পরিবর্তন, আল্লাহর উপঢৌকন এবং নিয়ামতরাজি দানের উদ্দেশ্য হলো, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশও তাঁর নির্দেশ বা হুকুম-আহকাম পালনের উপরেই নির্ভরশীল।

তৃতীয় আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হকসমূহ কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহের খেয়ানত করো না, হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও অন্য কোনো রকম শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষ ভাগে وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ বলে একথাই বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জানই। তারপরেও সেদিকে পদক্ষেপ নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমত্তার কথা নয়। আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানুষের ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে– وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আজাবও হয়। তাছাড়া এমন সব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয়, যা আজাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এ তিন অর্থেই 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোনো কোনো সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আজাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃতজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিই তোমাদের জন্য আজাব হয়ে দাঁড়াবে।

কোনো সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততি কে আজাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় এ কথাটি অপরিহার্য যে, যে ধনসম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখেরাতে তার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও আগুনে পোড়ার কারণ হবে। যেমন কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আজাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহর প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আজাবের কারণ হয়ে যায়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে- وَأَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

এ আয়াতের বিষয়বস্তু মুসলমানদের জন্যই ব্যাপক ও বিস্তৃত। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ মনীষীর মতে আয়াতটি গযওয়ায়ে 'বনূ কুরায়যা' -এর ঘটনার প্রেক্ষিতে হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছিল। মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম বনূ কুরায়যার দুর্গটিকে দীর্ঘ একুশ দিন যাবৎ অবরোধ করে রেখেছিলেন। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা দেশ ত্যাগ করে শাম দেশে [সিরিয়ায়] চলে যাবার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু তাদের দুষ্টমির প্রেক্ষিতে তিনি তা অগ্রাহ্য করেন এবং বলে দেন, যে সন্ধির একটি মাত্র উপায় আছে যে, সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) তোমাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করবেন তোমরা তাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করবে। তারা আবেদন জানাল, সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর পরিবর্তে বিষয়টি আবূ লুবাবা (রা.)-এর উপর অর্পণ করা হোক। তার কারণ আবূ লুবাবা (রা.)-এর আত্মীয়স্বজন ও কিছু বিষয়-সম্পত্তি বনূ কুরায়যার মধ্যে ছিল। কাজেই তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি আমাদের ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন। যাহোক, হুজুরে আকরাম ﷺ তাদের আবেদনক্রমে হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-কেই পাঠিয়ে দিলেন। বনূ কুরায়যার সমস্ত নারী-পুরুষ তাঁর চারদিকে ঘিরে কাঁদতে আরম্ভ করল এবং জিজ্ঞেস করল, যদি আমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর হুকুমমতো দুর্গ থেকে নেমে আসি, তাহলে তিনি আমাদের ব্যাপারে কিছুটা দয়া করবেন কি? আবূ লুবাবা (রা.) এ বিষয়ে অবগত ছিলেন যে, তাদের এ ব্যাপারে সদয়াচরণের কোনো পরিকল্পনা নেই। কিন্তু তিনি তাদের কান্নাকাটিতে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনের মায়ায় কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং নিজের গলায় তলোয়ারের মতো হাত ফিরিয়ে ইঙ্গিতে বললেন, তোমাদের জবাই করা হবে। এভাবে মহানবী ﷺ -এর পরিকল্পনার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়া হলো

ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসায় এ কাজ তিনি করে বসলেন বটে, কিন্তু সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে অনুভব করলেন যে, তিনি খেয়ানত করে ফেলেছেন। সেখান থেকে যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন লজ্জা ও অনুতাপ তাঁর উপর এমন কঠিনভাবে চেপে বসে যে, হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হওয়ার পরিবর্তে সোজা গিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লেন এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে নিজেকে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেন। তারপর এরূপ কসম খেয়ে নেন যে, যতক্ষণ না আমার তওবা কবুল হবে, এভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকব; এভাবে যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবুও। সুতরাং এভাবে সাত দিন পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তাঁর দেখাশোনা করেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং নামাজের সময় হলে বাঁধন খুলে দিতেন, আর তা থেকে ফারেগ হওয়ার পর আবার বেঁধে দিতেন। কোনো রকম খানাপিনার ধারে কাছেও যেতেন না। এমনকি ক্ষুধায় একেক সময় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন বললেন, সে যদি প্রথমেই আমার কাছে চলে আসত, তবে আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করতাম। কিন্তু এখন তাঁর তওবা কবুলের নির্দেশের জন্যই অপেক্ষা করতে হবে।

অতএব, সাতদিন অন্তে শেষ রাতে তাঁর তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে হুজুর ﷺ -এর উপর আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। কোনো কোনো লোক তাঁকে এ সুসংবাদ জানান এবং বাঁধন খুলে দিতে চান। তাতে তিনি [আবূ লুবাবা] বলেন, যতক্ষণ না স্বয়ং মহানবী ﷺ নিজ হাতে আমাকে বাঁধন-মুক্ত করবেন, আমি মুক্ত হতে চাই না। অতএব, হুজুর ﷺ ভোরে যখন নামাজের সময় মসজিদে তাশরিফ আনেন, তখন স্বহস্তে তাঁকে মুক্ত করেন। উল্লিখিত আয়াতে খেয়ানত ও ধনদৌলত এবং সন্তানসন্ততির মায়ার সামনে নতি স্বীকার করার যে নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, এ ঘটনাটিই ছিল তার কারণ।

অনুবাদ :

٢٩. وَنَزَلَ فِىْ تَوْبَتِهِ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ بِالْاَمَانَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا تَخَافُوْنَ فَتَنْجُوْنَ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

২৯. তাঁর [হযরত আবূ লুবাবার] তওবা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়। হে মু'মিনগণ! আমানত ইত্যাদির বিষয়ে যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ফুরকান অর্থাৎ তোমরা যা আশঙ্কা কর তার এবং তোমাদের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী একটি উপায় দেবেন ফলে তোমরা তা হতে মুক্তি পেতে পারবে এবং তোমাদের হতে তোমাদের পাপ অপসৃত করে দেবেন এবং তোমাদের অন্যায় কর্মসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অতিমহান, অনুগ্রহশীল।

٣٠. وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَدِ اجْتَمَعُوْا لِلْمُشَاوَرَةِ فِىْ شَانِكَ بِدَارِ النَّدْوَةِ لِيُثْبِتُوْكَ يُوْثِقُوْكَ وَيَحْبِسُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ كُلُّهُمْ قَتْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط مِنْ مَكَّةَ وَيَمْكُرُوْنَ بِكَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط بِهِمْ بِتَدْبِيْرِ اَمْرِكَ بِاَنْ اَوْحٰى اِلَيْكَ مَا دَبَّرُوْهُ وَاَمَرَكَ بِالْخُرُوْجِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ اَعْلَمُهُمْ بِهِ -

৩০. আর হে মুহাম্মদ! স্মরণ কর কাফেরগণ তোমাকে বন্দী করার জন্য বা তারা সকলে মিলে যেন এক ব্যক্তিকে হত্যা করছে সেরূপভাবে তোমাকে হত্যা করার জন্য অথবা মক্কা হতে তোমাকে নির্বাসিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। তারা তাদের পরামর্শ সভা দারুন নাদওয়ায় তোমার সম্পর্কে পরামর্শের জন্য একত্রিত হয়েছিল। তারা তো তোমার সম্পর্কে ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহ তা'আলাও এদিকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করত এবং তোমাকে হিজরত করে যেতে নির্দেশ প্রদান করতে তোমার জন্য উপায় উদ্ভাবন করে এদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ কৌশলী। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি সর্বাপেক্ষা অবহিত। لِيُثْبِتُوْكَ অর্থাৎ এখানে তোমাকে বন্দী করে রাখতে, বেঁধে রাখতে।

٣١. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاۤءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ لِاَنَّهُ كَانَ يَاْتِىْ الْحِيْرَةَ يَتَّجِرُ فَيَشْتَرِىْ كُتُبَ اَخْبَارِ الْاَعَاجِمِ وَيُحَدِّثُ بِهَا اَهْلَ مَكَّةَ اِنْ مَا

৩১. যখন তাদের নিকট আমার আয়াত অর্থাৎ আল-কুরআন পাঠ করা হয় তারা যখন বলে আমরা তো শ্রবণ করলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও তার অনুরূপ বলতে পারি। এটা তো আল-কুরআন তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা। মিথ্যা কাহিনী মাত্র। নজর ইবনুল হারিস নামক জনৈক কাফের এ উক্তি করেছিল। সে ব্যবসা ব্যাপদেশে হীরা নগরীতে যাতায়াত করত এবং সে স্থান হতে অনারব উপ-কাহিনীর পুস্তক ক্রয় করে নিয়ে আসত আর তা মক্কাবাসীদের নিকট বর্ণনা করে শুনাত। اِنْ এটা এ স্থানে

٣٢. وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا الَّذِيْ يَقْرَؤُهُ مُحَمَّدٌ هُوَ الْحَقُّ الْمُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ عَلٰى إِنْكَارِهِ قَالَهُ النَّضْرُ أَوْ غَيْرُهُ اسْتِهْزَاءً أَوْ إِيْهَامًا أَنَّهُ عَلٰى بَصِيْرَةٍ وَجَزْمٍ بِبُطْلَانِهِ.

৩২. স্মরণ কর, তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! এটা অর্থাৎ মুহাম্মদ যা পাঠ করে তা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্যই অবতীর্ণ হয়ে থাকে তবে এটা অস্বীকার করায় আমাদের উপর আকাশ হতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাময় শাস্তি দাও। উক্ত নাজর বা অন্য কেউ উপহাস করে বা তার ধারণায় স্বীয় মতের যথার্থতা ও রাসূল ﷺ -কে বাতিল বলে ধারণা করে [নাউযুবিল্লাহ] এ ধরনের উক্তি করেছিল।

٣٣. قَالَ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا سَأَلُوْهُ وَأَنْتَ فِيْهِمْ ط لِأَنَّ الْعَذَابَ إِذَا نَزَلَ عَمَّ وَلَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ إِلَّا بَعْدَ خُرُوْجِ نَبِيِّهَا وَالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ حَيْثُ يَقُوْلُوْنَ فِيْ طَوَافِهِمْ غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ وَقِيْلَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْمُسْتَضْعِفُوْنَ فِيْهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالٰى لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

৩৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ এরূপ নন যে তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে তারা যেমন চায় তেমন আজাব দেবেন। কেননা আজাব যখন আসে তখন তা ব্যাপক আকারেই আপতিত হয়। তাই নবী ও মু'মিনগণকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হতে সরিয়ে নেওয়ার পরই কেবল সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর আজাব আপতিত হয়। এবং তিনি এরূপও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এরা কা'বা শরীফে তাওয়াফের সময় বলত غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ হে আল্লাহ! তোমার দরবারেই ক্ষমা ভিক্ষা চাই। কেউ কেউ বলেন- اَلْمُسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ ক্ষমা-ভিক্ষাকারী বলতে এ স্থানে তাদের [কাফেরদের] মাঝে অবস্থানরত দুর্বল শ্রেণির মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا অর্থাৎ তারা যদি দূরে সরে যেত তবে কাফেরদেরকে আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম।

٣٤. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ بِالسَّيْفِ بَعْدَ خُرُوْجِكَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ هِيَ نَاسِخَةٌ لِمَا قَبْلَهَا وَقَدْ عَذَّبَهُمْ بِبَدْرٍ وَغَيْرِهِ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ يَمْنَعُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمُسْلِمِيْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يَطُوْفُوْا بِهِ وَمَا كَانُوْا أَوْلِيَآءَهُ ط كَمَا زَعَمُوْا إِنْ مَا أَوْلِيَآؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ أَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ.

৩৪. তাদের কি-বা বলার আছে যে, তোমার ও দুর্বল মুমিনদের বের হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে অস্ত্র দ্বারা [যুদ্ধের মাধ্যমে] শাস্তি দেবেন না অথচ তারা রাসূল ﷺ ও মুসলিমগণকে মসজিদুল হারাম কা'বা হতে অর্থাৎ তার তওয়াফ করা হতে [নিবৃত্ত করে] বাধা প্রদান করে। প্রথমোক্ত বক্তব্যানুসারে অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়াতটির ভাষ্য কাফেরগণ হলে এ আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াতটির বিধান نَاسِخٌ বা রহিতকারী নির্দেশ বলে বিবেচ্য হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এদেরকে বদর প্রভৃতি সমরে আজাব দিয়েছেন। আর তারা যেমন ধারণা করে তারা তার তত্ত্বাধায়ক নয়। মুত্তাকীগণই এটার তত্ত্বাধায়ক; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়। যে তার উপর তাদের কোনো তত্ত্বাবধান অধিকার নেই। إِنْ এটা এ স্থানে না-বাচক শব্দ مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٥. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً صَفِيرًا وَتَصْدِيَةً ط تَصْفِيقًا أَيْ جَعَلُوا ذٰلِكَ مَوْضِعَ صَلَاتِهِمُ الَّتِيْ أُمِرُوْا بِهَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِبَدْرٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

৩৫. কা'বা গৃহের নিকট শিস ও করতালি দেওয়া ব্যতীত তাদের সালাত কিছুই নয় অর্থাৎ সালাত আদায়ের যে নির্দেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে এতদস্থলে তারা তা করে। সুতরাং সত্য-প্রত্যাখ্যানের দরুন তোমরা বদর যুদ্ধে শাস্তি ভোগ কর। مُكَاءً অর্থ শিস। تَصْدِيَةً অর্থ করতালি।

٣٦. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ حَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ط فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ فِيْ عَاقِبَةِ الْأَمْرِ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً نَدَامَةً لِفَوَاتِهَا وَفَوَاتِ مَا قَصَدُوْهُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ط فِي الدُّنْيَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ فِي الْآخِرَةِ يُحْشَرُونَ يُسَاقُونَ .

৩৬. কাফেরগণ আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করার জন্য রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। অনন্তর ভবিষ্যতেও তারা তা ব্যয় করবে আর অতঃপর তা পরিণামে অর্থসম্পদ ও তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ও বিনষ্ট হওয়ায় তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। অতঃপর حَسْرَةً অর্থ মনস্তাপ। দুনিয়ার তারা পরাভূত হবে এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে পরকালে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। জাহান্নামে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

٣٧. لِيَمِيزَ مُتَعَلِّقٌ بِتَكُونُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ أَيْ يَفْصِلَ اللّٰهُ الْخَبِيثَ الْكَافِرَ مِنَ الطَّيِّبِ الْمُؤْمِنِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا يَجْمَعَهُ مُتَرَاكِبًا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَجْعَلَهُ فِيْ جَهَنَّمَ ط أُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ .

৩৭. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ কুজনকে অর্থাৎ কাফেরকে সুজন অর্থাৎ মুমিন হতে স্বতন্ত্র করবেন لِيَمِيزَ এটা পূর্বোক্ত تَكُونُ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। এটা [يُمَيِّزَ] তাশদীদ (بَابُ تَفْعِيلٍ) ও তাখফীফ অর্থাৎ তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। পৃথক করবেন এবং কুজনদের একজনকে অপরজনের উপর রাখবেন; অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করে একজনকে অপরজনের উপর সারিসারিভাবে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِدَارِ النَّدْوَةِ : দারুন নদওয়া কুরাইশগণের দূরবর্তী দাদা কুসাই ইবনে কিলাব নির্মাণ করেছিল।

قَوْلُهُ بِتَدْمِيرِ أَمْرِكَ : এতে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يَمْكُرُ اللّٰهُ এটা مَجَازٌ مُرْسَلٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ هِيَ نَاسِخَةٌ : কাজেই পূর্ববর্তী আয়াত এবং বর্তমান আয়াতে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি একটি ফিতনাবিশেষ। অর্থাৎ এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ, এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণত আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। অথচ এ মহানিয়ামতের যৌক্তিক দাবি ছিল– আল্লাহর এহেন মহাঅনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলোচ্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এ পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করবে– যাকে কুরআন ও শরিয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয় তাহলে সে এর বিনময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে– ১. ফুরকান, ২. পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও ৩. মাগফিরাত বা পরিত্রাণ।

فُرْقَانٌ ও فَرْقٌ দুটি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে فُرْقَانٌ [ফুরকান] এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয়, যা দুটি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোনো বিষয়ের মীমাংসাকে ফুরকান বলা হয়। কারণ তা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকেও ফুরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারাও সত্যপন্থিদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কুরআনে কারীমে গযওয়ায়ে-বদরকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত তাকওয়া অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফুরকান' দান করা হবে– কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাজত করেন। কোনো শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্যে তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

তাফসীরে-মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবূ লুবাবা (রা.) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে যে পদস্খলন ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তা হলেই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি সবই আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে চলে আসত। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এ আয়াতে ফুরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও খাঁটি-মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায় এই যে, যারা 'তাকওয়া' অবলম্বন করেন, আল্লাহ তাদেরকে এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন যাতে তাদের পক্ষে ভালোমন্দের পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত তাকওয়ার বিনিময়ে যা লাভ হয়, তা হলো পাপের মোচন। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে মানুষের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় দুনিয়াতে সেগুলোর কাফফারা ও বদলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক তার হয় যা তার সমুদয় ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর প্রবল হয়ে পড়ে। তাকওয়ার প্রতিদানের তৃতীয় যে জিনিসটি লাভ হয়, তা হলো আখেরাতের মুক্তি ও যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহশীল ও করুণাময়। এতে ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে যে, আমলের যে প্রতিদান তা তো আমলের পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। এখানেও তাকওয়ার প্রতিদানে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা তারই বদলা বা প্রতিদান। কিন্তু আল্লাহ হচ্ছেন বিরাট অনুগ্রহ ও ইহসানের অধিকারী। তাঁর দান ও দয়া কোনো পরিমাপের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় এবং তাঁর দান ও ইহসানের অনুমান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তিনটি নির্ধারিত প্রতিদান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আরও বহু দান ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা কর্তব্য।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ এক অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা রাসূলে মকবুল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম তথা সমগ্র বিশ্বের উপরই হয়েছে। তা হলো এই যে, হিজরত-পূর্বকালে মহানবী ﷺ যখন কাফেরদের দ্বারা বেষ্টিত ছিলেন এবং তারা তাঁকে হত্যা কিংবা বন্দী করার ব্যাপারে সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ অপবিত্র হীন চক্রান্তকে ধূলিসাৎ করে দেন এবং মহানবী ﷺ -কে নিরাপদে মদিনায় পৌঁছে দেন।

তাফসীরে ইবনে কাছীর ও মাযহারীতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইমাম আহমদ ও ইবনে জারীর (র.) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে এ ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মদিনা থেকে আগত আনসারগণের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি যখন মক্কায় জানাজানি হয়ে যায়, তখন মক্কার কুরাইশরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে যে, এ পর্যন্ত তো তাঁর ব্যাপারটি মক্কার ভেতরেই সীমিত ছিল, যেখানে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই ছিল আমাদের হাতে। কিন্তু এখন যখন মদিনাতেও ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং বহু সাহাবী হিজরত করে মদিনায় চলে গেছেন, তখন এঁদের একটি কেন্দ্র মদিনাতেও স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় এঁরা যে কোনো রকম শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর আক্রমণও করে বসতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, এ পর্যন্ত সামান্য কিছু সাহাবীই হিজরত করে মদিনায় গিয়েছেন, কিন্তু এখন প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ -ও সেখানে চলে যেতে পারেন। সে কারণেই মক্কার নেতৃবর্গ এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে 'দারুন-নদওয়া' -এ এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করে। 'দারুন-নদওয়া' ছিল মসজিদে-হারাম সংলগ্ন কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ি। বিশেষ জটিল বিষয় ও সমস্যাদির ব্যাপারে সলা-পরামর্শ ও বৈঠকের জন্য তারা এ বাড়িটিকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। অবশ্য ইসলামি আমলে এটিকে মসজিদে-হারামের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। কথিত আছে যে, বর্তমান 'বাবুজ-যিয়াদাতই' সে স্থান' যাকে তৎকালে 'দারুন-নদওয়া' বলা হতো।

প্রচলিত নিয়মানুযায়ী এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ দরুন-নদওয়াতেই সমবেত হয়েছিল, যাতে আবূ জাহল, নজর ইবনে হারেস, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবূ সুফিয়ান প্রমুখসহ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি মোকাবিলায় উপায় ও ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়। পরামর্শ সভা আরম্ভ হতে যাচ্ছিল। এমন সময় ইবলীসে লা'ঈন এক বর্ষীয়ান আরব শেখের রূপ ধরে 'দারুন-নদওয়া'র দরজায় এসে দাঁড়াল। উপস্থিত লোকেরা জানতে চাইল যে, তুমি কে এবং এখানে কেন এসেছ। সে জানাল, আমি নজদের অধিবাসী। আমি জানতে পেরেছি, আপনারা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পরামর্শ করছেন। কাজেই প্রবল সহানুভূতির কারণে আমিও এসে উপস্থিত হয়েছি। হয়তো এ ব্যাপারে আমিও কোনো উপকারী পরামর্শ দিতে পারব।

একথা শোনার পর তাকেও ভেতরে ডেকে নেওয়া হয়। তারপর যখন পরামর্শ আরম্ভ হয়– সুহায়লীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী– তখন আবূল বুখতারী ইবনে হিশাম এ প্রস্তাব উত্থাপন করে যে, তাঁকে অর্থাৎ মহানবী ﷺ -কে লোহার শিকলে বেঁধে কোনো ঘরে বন্দী করে এমনভাবে তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে তিনি [নাঊযুবিল্লাহ] নিজে নিজেই মৃত্যুবরণ করেন। একথা শুনে নজদী শেখ ইবলীসে লা'ঈন বলল, এ মত যথার্থ নয়। কারণ তোমরা যদি এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ কর, তবে বিষয়টি গোপন থাকবে না, দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আর তাঁর সাহাবী ও সঙ্গী-সাথীদের আত্মনিবেদনমূলক কীর্তি সম্পর্কে তো তোমরা সবাই অবগত। হয়তোবা তারা সবাই সমবেত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণই করে বসবে এবং তাদের বন্দীকে মুক্ত করে নেবে। চারদিক থেকে সমর্থনের আওয়াজ উঠল. নজদী শেখ যথার্থ বলেছেন। তারপর আবূ আসওয়াদ মত প্রকাশ করল যে, তাঁকে মক্কা থেকে বরে করে দেওয়া হোক। তিনি বাইরে গিয়ে যা খুশি তাই করুন। তাতে আমাদের শহর তাঁর ফিতনা-হাঙ্গামা থেকে বেঁচে থাকবে এবং আমাদেরকে যুদ্ধবিগ্রহেরও ঝুঁকি নিতে হবে না।

এ কথা শুনে নজদী শেখ আবার বলল, এ মতটিও সঠিক নয়। তিনি যে কেমন মিষ্টভাষী তোমরা কি সে কথা জান না? মানুষ তাঁর কথা শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। তাঁকে এভাবে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হলে অতিশীঘ্রই তিনি এক শক্তিশালী দল সংগঠিত করে ফেলবেন এবং আক্রমণ চালিয়ে তোমাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলবেন। এবার আবূ জাহ্‌ল বলল, করার যে কাজ তোমাদের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারনি। একটি কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তা হলো এই যে, আমরা সমস্ত আরব গোত্র থেকে একেক জন যুবককে বেছে নেব এবং তাদেরকে একটি করে উত্তম ও কার্যকর তলোয়ার দিয়ে দেব। আর সবাই মিলে সমবেত হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এভাবে আমরা তাঁর ফিতনা-হামলা থেকে প্রথমে অব্যাহতি লাভ করি। তারপর থাকল তাঁর গোত্র বনূ আবদে মানাফ-এর দাবিদাওয়া, যা তারা তাঁর হত্যার কারণে আমাদের উপর আরোপ করবে। বস্তুত এককভাবে যখন তাঁকে কেউ হত্যা করেনি বরং সব গোত্রের একেক জন মিলে করেছে, তখন কিসাস অর্থাৎ জানের বদলা জান নেওয়ার দাবি তো থাকতেই পারে না। শুধু থাকবে হত্যার বিনিময়ের দাবি। তখন তা আমরা সব কবীলা বা গোত্র থেকে জমা করে নিয়ে তাদেরকে দিয়ে দেব এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাব।

নজদী শেখ তথা ইবলীসে-লা'ঈন একথা শুনে বলল, ব্যাস, এটাই হলো শত কথার এক কথা, মতের মতো মত। আর এছাড়া অন্য কোনো কিছুই কার্যকর হতে পারে না। অতঃপর গোটা বৈঠক এ মতের পক্ষেই সমর্থন দান করে এবং আজকের রাতের ভেতরেই নিজেদের ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দৃঢ়সংকল্প করে নেয়। কিন্তু নবী-রাসূলদের গায়েবী শক্তি সম্পর্কে এ মূর্খের দল কেমন করে জানবে! সেদিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের পরামর্শ কক্ষের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ-কে অবহিত করে এ ব্যবস্থা বাতলে দেন যে, আজকের রাতে আপনি নিজের বিছানায় শয়ন করবেন না। সেই সাথে এ কথাও জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করারও অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে পরামর্শ অনুযায়ী কুরাইশী নওজওয়ানরা সন্ধ্যা থেকেই সরওয়ারে দু-আলম ﷺ -এর বাড়িটি অবরোধ করে ফেলে। রাসূলে কারীম ﷺ বিষয়টি লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবীর বিছনায় রাত্রি যাপন করবেন এবং সাথে সাথে এ সংবাদ শুনিয়ে দিলেন যে, এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাণের ভয় থাকলেও শত্রুরা কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত আলী (রা.) এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলেন এবং মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে, হুজুর ﷺ এ অবরোধ ভেদ করে বেরোবেন কেমন করে! বস্তুত স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এক মু'জিযার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করে দেন। তা হলো এই যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে মহানবী ﷺ একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং অবরোধকারীরা তাঁর ব্যাপারে যে আলাপ-আলোচনা করছিল, তার উত্তর দান করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি; অথচ তিনি সবার মাথায় মাটি দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর কোনো এক আগন্তুক এসে অবরোধকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছ? তারা জানাল, মুহাম্মাদ ﷺ -এর অপেক্ষায়। আগন্তুক বলল, কোন স্বপ্নে পড়ে রয়েছ; তিনি এখান থেকে বেরিয়ে চলেও গিয়েছেন এবং যাবার সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি দিয়ে গিয়েছেন! তখন তারা সবাই নিজেদের মাথার হাত দিয়ে বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ পেল। সবার মাথায় মাটি পড়েছিল।

হযরত আলী (রা.) মহানবী ﷺ -এর বিছানায় শুয়েছিলেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাঁর পাশ ফেরার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারল, তিনি মুহাম্মাদ ﷺ নন। কাজেই তাঁকে তারা হত্যা করতে উদ্যোগী হলো না। ভোর পর্যন্ত অবরোধ করে রাখার পর এরা লজ্জিত-অপদস্থ হয়ে ফিরে গেল। এ রাত এবং এতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন করার বিষয়টি হযরত আলী (রা.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর সম্পর্কে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে দীন ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা এবং চক্রান্তের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।

শানে নুযূল : ইবনে জারীর সাঈদ ইবনে জুরাইর-এর সূত্রে লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন অন্যান্য কাফেরদের সঙ্গে আকাবা ইবনে আদি এবং নজর ইবনে হারেস বন্দী হয় এবং মারা যায়। নজর ইবনে হারেসকে বন্দী করেছিলেন হযরত মেকদাদ (রা.)। তার সম্পর্কে যখন মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তখন হযরত মেকদাদ (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমার কয়েদি। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন সে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করত তাই তার শাস্তি একান্ত জরুরি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৫, পৃ. ৮৯]

قَوْلُهُ وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরির ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানি আজাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপস্থিতি ব্যাপক আজাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায় দুর্বল মুসলমানের কারণে এমন আজাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আজাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আজাবের যোগ্যই নয়। বরং তাদের আজাবের যোগ্য

হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরি ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমন সব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আজাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দুটিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত এরা নিজেরা তো মসজিদে-হারাম অর্থাৎ খানায়ে কা'বায় ইবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে ইবাদত-বন্দেগী ও নামাজ, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে আগমনে বাধাদান করে। এতে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরি সালে যখন রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হলো এই যে, এ নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না।

তাদের এ ধারণা ছিল দুটি ভুল বোঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমত এই যে, তারা নিজেদের মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী বলে মনে করেছিল। অথচ কোনো কাফের কোনো মসজিদের মুতায়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাদের এ ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর, সুতরাং এতে আসতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্য নামাজিদের কষ্টের আশঙ্কা থাকে। যেমন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।" ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং নামাজিদের কষ্টেরও আশঙ্কা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাজিদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মুতাওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেওয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেওয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোনো মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। কুরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে হারামের মুতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেজগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মুতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মুতাওয়াল্লী দীনদার ও পরহেজগার বক্তিরাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো মুফাসসির إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ-এর সর্বনামটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেজগার ব্যক্তিরাই হতে পারেন।

এ তাফসীরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরিয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবি করে, তারা সর্বৈব মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলী আল্লাহ বলে মনে করে, তারা [একান্তভাবেই] ধোঁকায় পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শিরকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ, এরা নিজেদের যে কাজকে 'নামাজ' নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেওয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, যার সামান্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এ ধরনের কার্যকলাপকে ইবাদত কিংবা নামাজ তো দূরের কথা, সঠিক কোনো মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ তোমাদরে কুফরি ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহর আজাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। আজাব বলতে এখানে আখেরাতের আজাব হতে পারে এবং পার্থিব আজাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাজিল হয়। এর পরে ৩৬ নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের অন্য একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যাতে তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অধিক মাল একত্র করেছিল এবং তা দীনে হক এবং মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তা ব্যয় করেছিল কিন্তু পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, এ সম্পদও তাদের হাত থেকে চলে গেল এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়র পরিবর্তে তারা নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল।

অনুবাদ :

٣٨. قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَاَبِىْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهٖ اِنْ يَّنْتَهُوْا عَنِ الْكُفْرِ وَقِتَالِ النَّبِىِّ ﷺ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ج مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَاِنْ يَّعُوْدُوْا اِلٰى قِتَالِهٖ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَىْ سُنَّتُنَا فِيْهِمْ بِالْاِهْلَاكِ فَكَذَا نَفْعَلُ بِهِمْ .

৩৮. যারা কুফরি করে যেমন আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীগণ তাদেরকে বল, যদি তারা কুফরি এবং রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হতে বিরত হয় তবে তাদের যে দুষ্কর্ম পূর্বে হয়ে গেছে তা ক্ষমা করা হবে। কিন্তু তারা যদি তার সাথে যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো আছেই অর্থাৎ এ বিষয়ে পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্পর্কে আমার অনুসৃত নীতি তো বিদ্যমান। সুতরাং এদের সাথেও আমি তদ্রূপ আচরণ করব।

٣٩. وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ تُوْجَدَ فِتْنَةٌ شِرْكٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ج وَحْدَهٗ وَلَا يُعْبَدَ غَيْرُهٗ فَاِنِ انْتَهَوْا عَنِ الْكُفْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْهِمْ بِهٖ .

৩৯. এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফিতনা অর্থাৎ শিরক দূরীভূত হয়েছে, তার শেষ হয়েছে এবং সমস্ত দীন একক আল্লাহর না হয়েছে। তিনি ব্যতীত আর কারও যেন উপাসনা না হয়। যদি তারা কুফরি হতে বিরত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কাজের সম্যক দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি তাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন।

٤٠. وَاِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ ط نَاصِرُكُمْ وَمُتَوَلِّىْ اُمُوْرِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى هُوَ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ اَىِ النَّاصِرُ لَكُمْ .

৪০. আর যদি ঈমান হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক ও তোমাদের জন্য কত উত্তম সাহায্যকারী। اَلنَّصِيْرُ এটা এ স্থানে نَاصِرٌ [সাহায্যকারী] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَىْ سُنَّتُنَا فِيْهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ -এর মধ্যে মাসদারে ইযাফত মাফঊলের দিকে হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে سُنَّتُنَا فِيْهِمْ রয়েছে।

قَوْلُهٗ تُوْجَدُ : এখানে تَكُوْنَ -এর তাফসীর تُوْجَدُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كَانَ টা হলো كَانَ تَامَّةٌ কাজেই তার খবরের প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে যত ধনবল এবং জনবলই ব্যবহার করুক না কেন, অবশেষে ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তারা হবে তখন অনুতপ্ত, লজ্জিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত, আর আখেরাতে হবে কোপগ্রস্ত। আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে কিভাবে এ ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায় তার পন্থা, সে পন্থা হলো ইসলামের বিরোধিতা বর্জন করা এবং ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত হওয়া। যদি তা করে তবে অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। তাই আল্লাহ পাক

ঘোষণা করেছেন- قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ج হে রাসূল! আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন যদি তারা কুফরি ও নাফরমানি পরিহার করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আল্লাহ পাক তাঁর হক মাফ করে দেবেন। কিন্তু বান্দার হক থাকবে অর্থাৎ মানুষের দেনা-পাওনা মাফ হবে না তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। যেমন হাদীসে আছে- اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ইসলাম গ্রহণের পূর্বের কৃত গুনাহ ইসলাম বিনষ্ট করে দেয়। কিন্তু তারা যদি এখনও কুফর ও নাফরমানি বর্জন না করে তবে সত্যদ্রোহীতার জন্যে পূর্বকালের লোকেরা যে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করেছে সেই পরিণাম এ কাফেরদের জন্যও প্রস্তুত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ الخ : এটি হলো সূরা আনফালের উনচল্লিশতম আয়াত। এতে দুটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১. ফিতনা, ২. দীন। আরবি অভিধান অনুযায়ী শব্দ দুটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের নিকট থেকে এখানে দুটি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন- ১. ফিতনা অর্থ কুফর ও শিরক আর ২. দীন অর্থ ইসলাম ধর্ম নিতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদের কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব যতক্ষণ না বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এ নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোনো ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দীন ইসলামের জন্য তা হবে আশঙ্কাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কুরআনে কারীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই যে, এতে 'ফিতনা' অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থা করছিলেন। প্রতি মুহূর্ত তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদিনার দিকে হিজরত করেন, তখন তারা প্রতিটি মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুণ্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদিনায় পৌঁছার পরও গোটা মদিনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দীন' শব্দের অর্থ হলো প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানদের কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তা হলো এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয় পক্ষে মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দুজন লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এখন মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, তিনি কোনোক্রমেই এহেন ফিতনা-ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফিতনার সমাধান করার উদ্দেশ্যে কি কারণে এগিয়ে আসেন না! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মুসলমানের রক্তাপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দুজন আরজ করলেন, আপনি কি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে দীন ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ

যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফিতনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পরস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ -এর হেদায়েত হচ্ছে যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফিতনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কিয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদের পরিণতিতে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত এই যে, তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করা থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে থেকেই আনুগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয়ত এতদুভয় অবস্থায় কোনোটি গ্রহণ না করে অব্যাহত মোকাবিলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এ উভয় অবস্থার হুকুমেই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ যথার্থভাবেই অবলোকন করেন।

সে অনুযায়ীই তিনি তাদের সাথে ব্যবহার করবেন। সারমর্ম এই যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য এমন আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, যুদ্ধবিগ্রহের পর কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন কিংবা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করাটা শুধুমাত্র যুদ্ধের চাল এবং ধোঁকাও হতে পারে। এমতাবস্থায় যুদ্ধবিরতি করা মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং এরই উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা তো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেরই অনুবর্তী থাকবে। আর সে আচার-অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে জানেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কাজেই যখন তারা মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করবে এবং সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে নেবে, তখন মুসলমানরা তা মেনে নিয়ে জিহাদ-যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য। কথা হলো এই যে, তারা অকপট ও সত্য মনে ইসলাম কিংবা সন্ধিচুক্তিকে গ্রহণ করল এবং তাতে কোনো প্রতারণা নিহিত রয়েছে কিনা সে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা যথার্থভাবেই দেখেন ও অবগত রয়েছেন। তারা যদি এমনটি করে তবে তার জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুসলমানদের এ ধরনের ধারণা ও শঙ্কা-সংশয়ের উপর কোনো বিষয়ের ভিত্তি রচনা করা উচিত নয়।

ইসলাম গ্রহণ কিংবা সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের কথা প্রকাশ করার পরেও যদি তাদের উপর হাত তোলা হয়, তবে যারা জিহাদ করেছে তারা অপরাধী হয়ে পড়বে। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দান করা হয়েছে, যেন আমি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকি যতক্ষণ না তারা কালেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। [একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই। আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।] এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত দেবে এবং যখন তারা তা বাস্তবায়িত করবে, তখন তাদের রক্ত, তাদের ধনসম্পদ সবই নিরাপদ হয়ে যাবে। অবশ্য ইসলামি বিধান মতে কোনো অপরাধ করলে সেজন্য তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে। বস্তুত তাদের মনের হিসাব-নিকাশের ভার থাকবে আল্লাহর উপর। তিনি জানবেন, তারা সত্য মনে এই কালেমা এবং ইসলামি আমলসমূহকে কবুল করেছে কি প্রতারণা করেছে।

অপর একটি হাদীস যা হযরত আবূ দাঊদ (র.) বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন তা হলো এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ লোকের উপর অর্থাৎ এমন কোনো লোকের উপর কোনো অত্যাচার-উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, যে ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্যের চুক্তি করে নিয়েছে, কিংবা যদি তার কোনো ক্ষতিসাধন করে অথবা তার দ্বারা এমন কোনো কাজ আদায় করে যা তার ক্ষমতার চেয়ে বেশি কিংবা যদি তার কোনো বস্তু তার মানসিক ইচ্ছায় বাইরে নিয়ে নেয়, তবে কিয়ামতের দিন আমি সে মুসলমানের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির সমর্থন করব।

কুরআনে-হাকীমের আয়াত ও উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা বাহ্যত মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক আশঙ্কার সম্মুখীন করে দিয়েছে। তা হলো এই যে, ইসলামের কোনো মহাশত্রুও যখন মুসলমানদের কবলে পড়ে এবং শুধুমাত্র জান বাঁচাবার উদ্দেশ্য ইসলামের কালেমা পড়ে নেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতকে সংযত করে নেওয়া মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুসলমানদের পক্ষে কোনো শত্রুকেই বশ করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন রহস্যাদির ভার নিজের দায়িত্বে রেখে একান্ত মু'জিযাসুলভ ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কার্যত মুসলমানদের কোনো সমরক্ষেত্রেই এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। অবশ্য সন্ধি অবস্থায় শত শত মুনাফেক সৃষ্টি হয়েছে যারা ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে এবং বাহ্যত নামাজ-রোজাও পালন করেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো সংকীর্ণ ও নিম্নশ্রেণির লোকদের তো এ উদ্দেশ্যই ছিল যে, মুসলমানদের থেকে কিছু ফায়দা হাসিল করে নেবে এবং শত্রুতা সত্ত্বেও তাদের প্রতিশোধের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবে। আবার অনেক ছিল যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার জন্য, বিরোধীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার জন্য এমনটি করত। কিন্তু আল্লাহর আইনের সে সমস্ত ব্যাপারেই মুসলমানদের হেদায়তে দেওয়া হয়েছে, তারা যেমন তাদের সাথেও মুসলমানদের মতোই আচরণ করে যতক্ষণ না তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রতি শত্রুতা এবং চুক্তি লঙ্ঘনের বিষয় প্রমাণিত হয়ে যায়।

কুরআনে কারীমের এ শিক্ষা ছিল সে অবস্থার জন্য যখন ইসলামের শত্রু নিজেদের শত্রুতা পরিহারের অঙ্গীকার করবে এবং এ ব্যাপারে কোনো চুক্তি সম্পাদন করে নেবে। এছাড়া আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের জেদ ও শত্রুতা বজায় রাখতে প্রয়াস পায়। এ সম্পর্কিত হুকুম এর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ অর্থাৎ যদি তারা কথা না মানে, তবে তোমরা এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী, আর তিনি অতি উত্তম সাহায্যকারী এবং অতি উত্তম সমর্থনকারী।

সারকথা এই যে, যদি নিজেদের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও কুফরি-শিরকি থেকে বিরত না হয়, তবে মুসলমানদের জন্য সে নির্দেশই বহাল থাকবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। আর জিহাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ যেহেতু স্বাভাবত বড় রকম সৈন্যবাহিনী, বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের উপরই নির্ভরশীল এবং মুসলমানদের কাছে পরিমাণে এসব বিষয় ছিল অল্প, কাজেই এমনটি হয়ে যাওয়া বিচিত্র ছিল না যে, জিহাদের হুকুমটি মুসলমানদের কাছে ভারী বলে মনে হবে কিংবা তারা নিজেদের সংখ্যা ও সাজসরঞ্জামের স্বল্পতার দরুন এমন মনে করতে আরম্ভ করবেন যে, আমরা মোকাবিলায় সফল হতে পারব না। কাজেই এর প্রতিকার কল্পে মুসলমানদের বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাছে যদিও মুসলমানদের চেয়ে সাজসরঞ্জাম বেশি রয়েছে, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার গায়েবি সাহায্য-সহায়তা কোথায় পাবে যা মুসলমানরা পাচ্ছে এবং তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের মাঝে প্রত্যক্ষ করে থাকে। আরো বলা হয়েছে যে, এমনিতে তো দুনিয়ার সব পক্ষই করো না কারো কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা অর্জন করেই নেয় কিন্তু কার্যসিদ্ধি হয় সেই সাহায্যদাতার শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞান-অভিজ্ঞানের উপর। একথা বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য এবং সূক্ষ্মদর্শিতার চেয়ে বেশি তো দূরের কথা এর সমান সারা বিশ্বেরও হতে পারে না। কেননা তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যদাতা ও পক্ষ সমর্থনকারী।

اَلْجُزْءُ الْعَاشِرُ : দশম পারা

٤١. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ اَخَذْتُمْ مِنَ الْكُفَّارِ قَهْرًا مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ يَاْمُرُ فِيْهِ بِمَا يَشَآءُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى قَرَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَالْيَتٰمٰى اَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ هَلَكَتْ اٰبَاؤُهُمْ وَهُمْ فُقَرَاءُ وَالْمَسٰكِيْنِ ذَوِى الْ[illegible] الْمُسْلِمِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ الْمُنْقَطِعِ فِىْ سَفَرِهٖ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَىْ يَسْتَحِقُّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَالْاَصْنَافُ الْاَرْبَعَةُ عَلٰى مَا كَانَ يَقْسِمُهٗ مِنْ اَنَّ لِكُلٍّ خُمُسَ الْخُمُسِ وَالْاَخْمَاسُ الْاَرْبَعَةُ الْبَاقِيَةُ لِلْغَانِمِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَاعْلَمُوْٓا ذٰلِكَ وَمَآ عَطْفٌ عَلٰى بِاللّٰهِ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْاٰيٰتِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ اَىْ يَوْمَ بَدْرٍ الْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط الْمُسْلِمُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ نَصْرُكُمْ مَعَ قِلَّتِكُمْ وَكَثْرَتِهِمْ .

অনুবাদ :

৪১. আরো জানিয়ে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা কাফেদের নিকট হতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ কর হস্তগত কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তিনি এতদসম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন তাঁর রাসূলের স্বজনদের। অর্থাৎ বনূ হাশেম ও মুত্তালিব গোত্রের, রাসূল ﷺ -এর নিকটাত্মীয়বর্গের এতিমগণের অর্থাৎ ঐ সমস্ত দরিদ্র মুসলিম শিশু যাদের পিতা গত হয়েছে ও দরিদ্রদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত তাদের এবং পথচারীদের অর্থাৎ পর্যটনরত মুসলিম ব্যক্তিগণের জন্য। অর্থাৎ রাসূল ﷺ এবং উক্ত চার ধরনের ব্যক্তিগণ তার অধিকার রাখেন। এদের প্রত্যেক শ্রেণি সাকুল্য সম্পদের এ পঞ্চমাংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর সাকুল্য যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর অবশিষ্ট চারভাগ যোদ্ধাদলে শরিক ব্যক্তিগণের মধ্যে বণ্টিত হবে। যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহর উপর এবং সেই বিষয়ের উপর মীমাংসার দিন অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন যেদিন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা করা হয়েছিল সেই দিন যা অর্থাৎ যে সমস্ত নিদর্শন ও ফেরেশতা وَمَآ اَنْزَلْنَا -পূর্বোক্ত بِاللّٰهِ শব্দটির সাথে এটার عَطْفٌ বা অন্বয় হয়েছে। আমি আমার বান্দা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করেছিলাম যখন দু'দল অর্থাৎ মুসলিম ও কাফের এই দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল তবে তা তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ তাদেরকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান সুতরাং তোমাদের সংখ্যাল্পতা ও তাদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তোমাদের সাহায্য করা ও জয়দান করা তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত নয়।

٤٢. اِذْ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ اَنْتُمْ كَائِنُوْنَ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا الْقُرْبٰى مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَهِىَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا جَانِبُ الْوَادِىْ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى الْبُعْدٰى مِنْهَا وَالرَّكْبُ الْعِيْرُ كَائِنُوْنَ بِمَكَانٍ اَسْفَلَ مِنْكُمْ مِمَّا يَلِى الْبَحْرَ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ اَنْتُمْ وَالنَّفِيْرُ لِلْقِتَالِ لَاخْتَلَفْتُمْ فِى الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ جَمَعَكُمْ بِغَيْرِ مِيْعَادٍ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ فِىْ عِلْمِهٖ وَهُوَ نَصْرُ الْاِسْلَامِ وَمَحْقُ الْكُفْرِ فَعَلَ ذٰلِكَ لِيَهْلِكَ يَكْفُرَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ اَىْ بَعْدَ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ وَهِىَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ قِلَّتِهِمْ عَلَى الْجَيْشِ الْكَثِيْرِ وَيَحْيٰى يُؤْمِنَ مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

৪২. স্মরণ কর, তোমরা ছিলে মদিনার নিকট প্রান্তে এবং তারা ছিল তার দূরবর্তী প্রান্তে আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে, সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল। যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ তোমরা ও কাফেরদের এই যোদ্ধাদলের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে তবে এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে নিশ্চয় তোমাদের মতভেদ ঘটত; কিন্তু তাঁরা জ্ঞানানুসারে যা ঘটার ছিল অর্থাৎ ইসলামের সাহায্য ও বিজয় এবং কুফরির বিনাশ আল্লাহ তা সম্পন্ন করার জন্য কোনোরূপ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছাড়াই তোমাদেরকে একত্র করলেন। আর তা এই জন্যও করলেন যে, যে কেউ ধ্বংস হবে কুফরি করবে সে যেন সত্যাসত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পর সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যেমন মু-মিনগণ সংখ্যায় অল্প হওয়ার সত্ত্বেও বিরাট এক বাহিনীর উপর জয়লাভ করল এই প্রমাণ দর্শনের পরও ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করবে সে যেন সত্যাসত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পর জীবিত থাকে। আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। اِذْ -এটা يَوْمَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত বাক্য। بِالْعُدْوَةِ -এটা এইস্থানে উহ্য كَائِنُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। এইদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে এটার পূর্বে ঐ শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। اَلْعُدْوَةُ -এটা ع-এ পেশ ও কাসরা উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ– এক প্রান্ত। اَلْقُصْوٰى -অর্থ দূরবর্তী। اَسْفَلَ مِنْكُمْ -এটা এইস্থানে উহ্য مَكَانٌ -এর বিশেষণ। এইদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে بِمَكَانٍ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

٤٣. اُذْكُرْ اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ اَىْ نَوْمِكَ قَلِيْلًا ط فَاَخْبَرْتَ بِهٖ اَصْحَابَكَ فَسُرُّوْا وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَفَشِلْتُمْ جَبُنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ اِخْتَلَفْتُمْ فِى الْاَمْرِ اَمْرِ الْقِتَالِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ط كُمْ مِنَ الْفَشْلِ وَالتَّنَازُعِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ ـ

৪৩. স্মরণ কর আল্লাহ তোমাকে নিদ্রায় স্বপ্নে তাদেরকে সংখ্যায় অল্প দেখয়েছিলেন। আর তদনুসারে তুমি তোমার সাহাবীদের এই সংবাদ প্রদান করলে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। আর তাদেরকে যদি অধিক করে তোমাকে দেখাইতেন তবে তোমরা হতবল হয়ে যেতে সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে বিরোধ করতে, বিবাদ করতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে সাহসহারা ও বিবাদ করা হতে রক্ষা করেছেন এবং বক্ষে যা আছে অর্থাৎ অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

٤٤. وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا نَحْوَ سَبْعِيْنَ اَوْ مِائَةٍ وَهُمْ اَلْفٌ لِتَقْدَمُوْا عَلَيْهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْدَمُوْا وَلَا يَرْجِعُوْا عَنْ قِتَالِكُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ فَلَمَّا الْتَحَمَ اَرٰهُمْ اِيَّاهُمْ مِثْلَيْهِمْ كَمَا فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ.

৪৪. আর বস্তুত যা ঘটারই ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য হে মুমিনগণ! তোমরা যখন পরস্পরে সম্মুখীন হয়েছিলে তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে সল্পসংখ্যক সত্তর বা একশত জন হিসেবে দেখিয়েছিলেন। অথচ তারা ছিল এক হাজার। তোমরা যেন এদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হও সেই জন্য তা করা হয়েছিল। এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে সল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন। যাতে তারা অগ্রসর হয় এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে যেন ফিরে না যায়। এটাই ছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বের অবস্থা। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এদের চোখে তাদেরকে দ্বিগুণ সংখ্যক প্রদর্শন করা হয়েছিল। সূরা আলে-ইমরানে এর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর দিকেই সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর পক্ষ হতেই সকল বিষয় সাব্যস্ত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَاعْلَمُوْا ذٰلِكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِنْ شَرْطِيَّةٌ-এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে, আর তা হলো اِعْلَمُوْا ذٰلِكَ-এর উহ্য হওয়ার উপর পূর্বের فَاعْلَمُوْا দিক নির্দেশনা দিচ্ছে, আবার কেউ কেউ فَامْتَثِلُوْا-কে উহ্য جَزَاءٌ মনে করেছেন। আর এটাই অধিক সমীচীন। কেননা এখন অর্থ হবে- اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ مَسْئَلَةَ الْخُمُسِ فَامْتَثِلُوْا ذٰلِكَ কেননা ইলমের ক্ষেত্রে নব মুমিন ও কাফের উভয় একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ : এখানে فَاءٌ টা হলো جَزَائِيَّةٌ আর اِنَّمَا-এর মধ্যে مَا-টা হলো مَوْصُوْلَةٌ যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর فَاَنَّ لِلّٰهِ হলো مُتَضَمِّنٌ بِمَعْنٰى جَزَاءٌ ইমাম নখয়ী (র.) اِنَّ-এর হামযাকে যের দ্বারা পড়েছেন। আবূ বাকুন (র.) যবর দ্বারা পড়েছেন। এই সুরতে اَنَّ এবং তার পরবর্তী অংশ মুবতাদা হবে আর তার খবর উহ্য হবে। উহ্য ইবাতর এরূপ হবে যে فَوَاجِبٌ اَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ

অন্য তারকীব এটাও হতে পারে যে, خُمُسَهُ হলো মুবতাদা আর তার খবর উহ্য হবে। অর্থাৎ- ثَابِتٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরুতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সাথে বলা হয়েছে, আর এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে জিহাদের জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং দুশনের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ যুদ্ধের পর দুশমনদের থেকে 'মালে গনিমত' তথা যুদ্ধ সম্পদ অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের বিধান পেশ করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদিয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ : পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল ছিল না; বরং তাদের জন্য এই বিধান ছিল যে, মালে গণিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে রেখে দেওয়া হতো, আসমান থেকে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে রেখে দেওয়া হতো, আসমান থেকে অগ্নি এসে সে সম্পদ নিয়ে যেত। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্যে হালাল করে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। সূরার শুরুতে قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ বাক্য দ্বারা যে বিধান পেশ করা হয়েছে তার কিছুটা বিরবণ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন, : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ২৩৫]

যে ধন সম্পদ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধের পর পাওয়া যায় তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের জন্যে, রাসূলের আত্মীয় স্বজনের জন্যে, আর এতিম ও মিসকিনের জন্যে ও পথিক মুসাফিরের জন্যে আর অবশিষ্ট চার পঞ্চামাংশ মুজাহিদদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

ইমাম আযম আবূ হানিফার (র.) মতে, যে অশ্বারোহী সে পাবে দু'ভাগ, আর যে পদব্রজে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে তাকে দেওয়া হবে এক ভাগ। এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের যে পাঁচটি ক্ষেত্র বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রথম দু'টি ক্ষেত্র এখন আর নেই। প্রিয়নবী ﷺ -এর অবর্তমানে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন নেই, তাই তাঁর ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের কোনো ভাগ নেই বলে হানাফী মাযহাবের অভিমত। অবশ্য এতিম মিসকিন বা দরিদ্র হিসেবে অন্যান্যদের উপর তাঁদের অগ্রাধিকার সর্বদা থাকবে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, প্রিয়নবী ﷺ -এর অবর্তমানে তাঁর খলিফাগণ উক্ত এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করবেন।

মালে গনিমতের তাৎপর্য : গনিমত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সেই সম্পদ যা দুশমন থেকে অর্জন করা হয়। আর শরিয়তের পরিভাষায় যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে দুশমন থেকে যে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা হয় তাকে গনিমত বলা হয়। পক্ষান্তরে পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যে সম্পদ অর্জিত হয় যেমন– জিজিয়া, খেরাজ তাকে 'ফাই' বলা হয়। কুরআনে করীমে গনিমত এবং ফাই এ দু'টি শব্দ দ্বারাই দুশমন থেকে অর্জিত সম্পদের বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রনিধাণযোগ্য যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, আল্লাহ পাকের কোনো বন্দাকে তিনি কোনো সম্পদের সাময়িক মালিকানা দান করে থাকেন। তাঁর বিধি মোতাবেক এ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনো সম্প্রদায় যদি আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হয়, কুফর ও শিরক করে তখন আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং আসমানি কিতাব নাজিল হয়। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা আল্লাহর তরফ থেকে আগত হেদায়েত গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ পাক তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ দেন, যার তাৎপর্য হলো এই, যারা আল্লাহর বিদ্রোহী তাদের জান এবং মাল আল্লাহর পথের সৈনিকদের জন্য হালাল করা হয়। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোনো অধিকার তাদের থাকে না, বরং তাদের ধন-সম্পদ সরকার তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জব্দ করা হয়। মুসলমান সৈনিকগণ কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যে সম্পদ জব্দ করেন তাকেই শরিয়তের ভাষায় গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বলা হয়, যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বের হয়ে মূল মালিক আল্লাহ পাকের মালিকানায় ফিরে আসে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে এ বিধান ছিল যে, কাফেরদের থেকে যা কিছু অর্জিত হতো তা ব্যবহার করা কারো জন্যই বৈধ হতো না, বরং উক্ত সম্পদ উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেওয়া হতো। আসমান থেকে অগ্নি এসে ঐ সম্পদকে জ্বালিয়ে ফেলতো। এটা ঐ জিহাদ কবুল হওয়ার নিদর্শন হতো। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে তাঁর উম্মতের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ الخ অর্থাৎ আর তোমরা জেনে রাখ তোমরা যুদ্ধের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় যা কিছু লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ পাকের জন্যে এবং তাঁর রাসূলের জন্যে এবং রাসূলের নিকট আত্মীয়স্বজনের জন্যে ও এতিম, মিসকিন, মুসাফিরদের জন্যে।

মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর এক-পঞ্চমাংশের বণ্টন : অধিকাংশ ইমামের মতে গনিমতের এক-পঞ্চমাংশের মধ্য থেকে যে অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য রাখা হয়েছিল তা তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের সুউচ্চ মর্যাদার ভিত্তিতে তেমনি ছিল যেমন করে তাঁকে বিশেষভাবে এ অধিকারও দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে নিজের পছন্দ মতো যে কোনো বস্তুত নিতে পারতেন। সে অধিকারবলে কোনো কোনো গনিমতের মধ্য থেকে মহানবী ﷺ কোনো কোনো বস্তু নিয়েও ছিলেন। আর গনিমতের পঞ্চমাংশ থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ভাতাও গ্রহণ করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই অংশ নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায়। কারণ, তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল নেই।

জাবিল কুরবার পঞ্চমাংশ : এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই যে, গনিমতের এক পঞ্চমাংশে দরিদ্র নিকটাত্মীয়ের অধিকার বা হক এর অন্যান্য প্রাপক তথা এতিম মিসকিন ও মুসাফিরের অগ্রবর্তী। কারণ নিকটাত্মীয়কে সদকা-জাকাত প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা যায় না, অথচ অন্যান্যের ক্ষেত্রে জাকাত-ফেতরার দ্বারা সাহায্য করা যায়। অবশ্য ধনী নিকটাত্মীয়কে এর মধ্য থেকে দেওয়া যাবে কিনা, এ প্রশ্নে হযরত ইমাম আযম আবূ-হানীফা (র.) বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নিকটাত্মীয়দের দান করতেন তার

দু'টি ভিত্তি ছিল। ১. তাঁদের দরিদ্র ও অসহায় এবং ২. দীনের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহায্য-সহায়তা। দ্বিতীয় ভিত্তিটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট থাকতে পারে শুধু দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিষয়টি। আর এই ভিত্তিতে কিয়ামত অবধি প্রত্যেক ইমামই তাঁদেরকে অন্যান্যের তুলনায় অগ্রবর্তী গণ্য করবেন। -[হিদায়া, জাস্সাস] ইমাম শাফেয়ী (র.) হতেও এ বক্তব্যই উদ্ধৃত রয়েছে। -[কুরতুবী]

কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে যাবিল-কোরবার অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নৈকট্যের ভিত্তিতে চিরকাল বলবৎ থাকবে এবং তাতে ধনী-গরিব সবাই শরিক থাকবে। তবে সমকালীন আমীর [শাসক] নিজ বিবেচনায় তাদেরকে অংশ দেবেন। -[মাযহারী]

এ ব্যাপারে আদত বিষয়টি হলো খোলাফায়ে-রাশেদীনের অনুসৃত রীতি। দেখতে হবে, তাঁরা মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর কি করেছেন। হেদায়া গ্রন্থকার এ ব্যাপারে লিখেছেন। إِنَّ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ الرَّاشِدِيْنَ قَسَّمُوْهُ عَلٰى ثَلٰثَةِ أَسْهُمٍ অর্থাৎ চার জন খোলাফায়ে-রাশেদীনই মহানবী ﷺ -এর ওফাতের পর গনিমতের এক পঞ্চমাংশকে মাত্র তিন ভাগে বিভক্ত করে এতিম, মিসকিন ও ফকিরদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

অবশ্য ফারুকে আযম হযরত ওমর (রা.) থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি হুজুর ﷺ -এর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যারা গরিব ও অভাবী ছিলেন, তাঁদেরকেও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করতেন। -[আবূ দাউদ] বলা বাহুল্য, এটা শুধুমাত্র হযরত ওমর ফারুকের রীতি ছিল না, অন্য খলীফারাও তাই করতেন।

আর যেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রা.) ও হযরত ফারুকে আযম (রা.) তাঁদের খেলাফতের শেষকাল পর্যন্তই যাবিল কোরবার হক সে মাল থেকে পৃথক করে নিতেন এবং হযরত আলী (রা.)-কে তার মুতাওয়াল্লী বানিয়ে যাবিল-কোরবার মধ্যে বিতরণ করাতেন। [যেমনটি বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবূ ইউসুফ রচিত 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে।] তবে এটা তার পরিপন্থি নয় যে, তা দরিদ্র যাবিল-কোরবার মাঝে বণ্টন করার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

বদর যুদ্ধের দিনটিই ইয়াওমুল ফুরকান : আলোচ্য আয়াতে বদরের দিনটিকেই 'ইয়াওমুল ফুরকান' বলে অতিবাহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম বাহ্যিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয় এবং কাফেদের নিদর্শনমূলক পরাজয় এ দিনটিতেই সূচিত হয় এবং এরই ভিত্তিতে দিনটিতে কুফর ও ইসলামের বাহ্যিক পার্থক্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

قَوْلُهُ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ : অর্থাৎ বদরের ঘটনায় ইসলামের সুস্পষ্ট সত্যতা এবং কুফরের অসত্য ও বর্জনীয় হওয়ার বিষয়টি এজন্য খুলে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে যারা ধ্বংসের সম্মুখীন হতে চায়, তারা যেন দেখে শুনেই তাতে পা বাড়ায়, আর যারা বেঁচে থাকতে চায় তারাও যেন দেখে-শুনেই বেঁচে থাকে কোনোটাই যেন অন্ধকার এবং ভুল বোঝাবুঝির মাঝে না হয়।

এ আয়াতের শব্দগুলোর মধ্যে 'হালাক' বা ধ্বংসের দ্বারা কুফরিকে এবং 'হায়াত' বা জীবন শব্দের দ্বারা ইসলামকে বোঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সত্য বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা এবং ওজর-আপত্তির কারণ শেষ হয়ে গেছে। এমন যে লোক কুফরি অবলম্বন করবে সে চোখে দেখেই ধ্বংসের দিকে যাবে আর যে লোক ইসলাম অবলম্বন করবে সে দেখে শুনেই চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন গ্রহণ করবে। অতঃপর বলা হয়েছে- إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট শ্রবণকারী, সবার মনের গোপন কুফরি ও ঈমান পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর সামনে রয়েছে এবং এগুলোর শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কেও তিনি পরিজ্ঞাত।

৪৩ ও ৪৪ তম আয়াতে প্রকৃতির এক অপূর্ব বিস্ময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা বদর যুদ্ধের ময়দানে এই উদ্দেশ্যে কার্যকর করা হয়, যাতে উভয় বাহিনীর কোনো একটিও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধের অনুষ্ঠানকেই না শেষ করে দেয়। কারণ, এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বস্তুগত দিক দিয়েও ইসলামের সত্যতার বিকাশ ঘটানো ছিল নির্ধারিত।

বস্তুত প্রকৃতির সে বিস্ময়টি ছিল এই যে, কাফের বাহিনী যদিও তিন গুণ বেশি ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমা ও কুদরতবলে তাদের সংখ্যাকে মুসলমানদের চোখে কম করে দেখিয়েছেন, যাতে মুসলমানদের মধ্যে কোনো দুর্বলতা ও

বিরোধ সৃষ্টি হয়ে না যায়। আর এ ঘটনাটি ঘটে দু'বার। একবার মহানবী ﷺ -কে স্বপ্নযোগে দেখানো হয় এবং তিনি বিষয়টি মুসলমানদের কাছে বলেন। তাতে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয়বার ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষ সামনা-সামনি হয়, তখন মুসলমানদেরকে কাফেরদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়। সুতরাং ৪৩ তম আয়াতে স্বপ্নের ঘটনা এবং ৪৪ তম আয়াতে প্রত্যক্ষ জাগ্রত অবস্থার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষীয় বাহিনীকে এমন দেখাচ্ছিল যে, আমি আমার নিকটবর্তী একজনকে বললাম, এরা গোটা নব্বইয়েক লোক হতে পারে। পাশের লোকটি বলল, না, তা নয়– শতেক হতে পারে হয়তো।

শেষ আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে يُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। এর অর্থ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সে সংখ্যাই তাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষেই অল্প ছিল। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সংখ্যা মুসলমানদের ছিল, তার চেয়েও কম করে দেখিয়েছেন। যেমন, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু-জাহল মুসলমানদের বাহিনী দেখে তার সাথীদের বলেছিল যে, তাদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে না, যাদের খোরাক একটি উট হতে পারে। আরবে কোনো বাহিনীর সংখ্যা কতটি জীব তাদের খাবার জন্য জবাই করা হয় তারই ভিত্তিতে অনুমান করা হতো। একশ লোকের খোরাক ধরা হতো একটি উট। রাসূলে কারীম ﷺ নিজেও বদর সমরাঙ্গনে মক্কার কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা জানার জন্য সেখানকার কতিপয় লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের বাহিনীতে দৈনিক ক'টি উট জবাই করা হয়? তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, দশটি উট জবাই করা হয়। তাতেই তিনি সৈন্যসংখ্যা এক হাজার বলে অনুমান করে নেন। সারকথা, আবূ জাহলের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা মোট শতেক দেখানো হয়। এখানেও কম করে দেখানোর তাৎপর্য এই যে, কাফেরদের মনে মুসলিম ভীতি যেন পূর্বে থেকে আচ্ছন্ন হয়ে না যায়, যার ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : যা হোক, আয়াতটির দ্বারা এ কথাও বোঝা গেল যে, কোনো কোনো সময় মুজেযা ও অলৌকিকতা স্বরূপ চোখের দেখাও ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমনটি এক্ষেত্রে হয়েছে।

সেজন্যই এখানে পূনর্বার বলা হয়েছে– لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا অর্থাৎ এহেন কুদরতি বিস্ময় এবং চোখের দৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ এ কারণে প্রকাশ হয় যাতে সে কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে, যা আল্লাহ করতে চান। অর্থাৎ মুসলমানদের তাদের সংখ্যাল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও বিজয় দান করে ইসলামের সত্যতা এবং তার প্রতি অদৃশ্য সমর্থন প্রকাশ পায়। বস্তুত এ যুদ্ধের যা উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা'আলা এভাবে তা পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সব বিষয়ই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি যা ইচ্ছা করবেন এবং যেমন ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন। তিনি অল্পকে অধিকের উপর এবং দুর্বলকে শক্তিশালীর উপর বিজয়ী করে দিতে পারেন; তিনি অল্পকে অধিক, অধিককে অল্পে পরিণত করতে পারেন।

٤٥. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً جَمَاعَةً كَافِرَةً فَاثْبُتُوْا لِقِتَالِهِمْ وَلَا تَنْهَزِمُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا اُدْعُوْهُ بِالنَّصْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ.

٤٦. وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا تَخْتَلِفُوْا فِيْمَا بَيْنَكُمْ فَتَفْشَلُوْا تَجْبُنُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ قُوَّتُكُمْ وَدَوْلَتُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ.

٤٧. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ لِيَمْنَعُوْا غَيْرَهُمْ وَلَمْ يَرْجِعُوْا بَعْدَ نَجَاتِهَا بَطَرًا وَرِئَآءَ النَّاسِ حَيْثُ قَالُوْا لَا نَرْجِعُ حَتّٰى نَشْرَبَ الْخُمُوْرَ وَنَنْحَرَ الْجَزُوْرَ وَتَضْرِبَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ بِبَدْرٍ فَيَتَسَامَعُ بِذٰلِكَ النَّاسُ وَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مُحِيْطٌ عِلْمًا فَيُجَازِيْهِمْ بِهِ.

٤٨. وَاذْكُرْ اِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اِبْلِيْسُ اَعْمَالَهُمْ بِاَنْ شَجَّعَهُمْ عَلٰى لِقَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ لَمَّا خَافُوا الْخُرُوْجَ مِنْ اَعْدَاءِ هُمْ بَنِيْ بَكْرٍ.

অনুবাদ :

৪৫. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোনো দলের অর্থাৎ কাফের দলের সম্মুখীন হবে তখন তাদের সাথে যুদ্ধে অবিচল থাকবে হারবে না এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে যাতে তোমরা কৃতকার্য হও। সফলকাম হও।

৪৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, পরস্পরে বিরোধ সৃষ্টি করবে না, করলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়বে এবং তোমাদের দৃঢ়তা শক্তি ও সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতাসহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

৪৭. তোমরা তাদের ন্যায় হবে না যারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজেদের উষ্ট্রারোহী দল রক্ষাকল্পে স্বীয় গৃহ হতে বের হয়। কিন্তু তা রক্ষা পাওয়ার পরও তারা ফিরে গেল না। তারা বলেছিল, বদরে গিয়ে যতক্ষণ না আমরা মদ্যপান, উষ্ট্রবধ এবং গায়িকা নর্তকীদের নিয়ে উল্লাস করেছি, ততক্ষণ আমরা ফিরে যাব না। আর তখন বিশ্বময় আমাদের বিজয় উৎসবের কথা ছড়িয়ে পড়বে। তারা লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আল্লাহ তাঁর জ্ঞান দ্বারা তাদের সকল কর্ম পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অনন্তর তিনি তার প্রতিফল দিবেন। تَعْمَلُوْنَ -এটা ت সহ [দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى সহ [প্রথম পুরুষ] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

৪৮. আর স্মরণ কর শয়তান ইবলীস তাদের কার্যাবলি তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে তুলে ধরছিল অর্থাৎ কুরাইশরা যখন তাদের শত্রু বনূ বকরের আক্রমণের আশঙ্কা করতেছিল, তখন–

وَقَالَ لَهُمْ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ مِنْ كِنَانَةَ وَكَانَ أَتَاهُمْ فِيْ صُوْرَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ سَيِّدِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْتَقَتْ الْفِئَتٰنِ الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ وَرَاٰى الْمَلٰئِكَةَ وَكَانَ يَدُهُ فِيْ يَدِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ نَكَصَ رَجَعَ عَلٰى عَقِبَيْهِ هَارِبًا وَقَالَ لَمَّا قَالُوْا لَهُ أَتَخْذُلُنَا عَلٰى هٰذِهِ الْحَالِ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ مِنْ جِوَارِكُمْ إِنِّيْ أَرٰى مَالَا تَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ ط أَنْ يُهْلِكَنِيْ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

এবং তাদেরকে বলেছিল, আজ মানুষের মধ্যে কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার নাই। কিনানা [বনূ বকর] -এর পক্ষ হতে আমিই তোমাদের সাহায্যকারী। ইবলিস উক্ত অঞ্চলের সর্দার সুরাকা ইবনে মালিকের চেহারা ধারণা করে এসে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ যুগিয়েছিল। অতঃপর দু'দল অর্থাৎ মুসলিম ও কাফেররা যখন একত্র হলো পরস্পর সম্মুখীন হলো, আর সে ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষ করল, ঐ সময় তার হাত কুরাইশ সর্দার হারিস-ইবনে হিশামের হাতে ছিল তখন সে পলায়নপর হয়ে সরে পড়ল, ফিরে গেল। তাকে এরা বলল, এই অবস্থায় তুমি আমাদের লাঞ্ছিত করতে চাও? সে বলল, আমি তোমাদের বিষয়ে অর্থাৎ তোমাদেরকে আশ্রয়দানের বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত। তোমরা যা দেখতে পাও না অর্থাৎ ফেরেশতা আমি তা দেখি। আমি আল্লাহকে ভয় করি যে, তিনি আমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আর আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِئَةٌ : فِئَةٌ শব্দের অর্থ- জামাত, দল, গ্রুপ। এটা اِسْمُ جَمْعٍ : এর শাব্দিক কোনো একবচন নেই। বহুবচনে- فِئَاتٌ

قَوْلُهُ قُوَّتُكُمْ وَدَوْلَتُكُمْ : এখানে رِيْحٌ শব্দটি قُوَّةٌ এবং دَوْلَةٌ-এর জন্য ধারকৃত। دَوْلَةٌ অর্থ- যুদ্ধ এটা دُوَلٌ রূপে অধিক ব্যবহৃত হয়। دُوْلَةٌ তথা دَالٌ বর্ণে পেশ সহকারে অর্থ-সম্পদ, ধন, মাল। বহুবচনে دُوَلٌ [دَالٌ বর্ণে পেশ]

قَوْلُهُ تَضْرِبُ عَلَيْنَا الْقِيَانِ : ضَرْبُ الْعُوْدِ وَالطُّنْبُوْرِ অর্থ- তবলা এবং সেতারা বাজানো।

قَوْلُهُ قِيَانٌ : একবচনে قَيْنَةٌ অর্থ- اَلْجَوَارِى الْمُغَنِّيَاتِ তথা গায়িকা বাঁদি।

قَوْلُهُ بَدْرٍ : এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী তিনোটি ফে'লের সাথে।

قَوْلُهُ فَيَتَسَامَعُ بِذٰلِكَ : অর্থাৎ فَيُثْنُوْا عَلَيْهِمْ بِالشُّجَاعَةِ তথা ফলে তারা তাদের বীরত্বের প্রশংসা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যুদ্ধ-জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কুরআনের হেদায়েত : প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য এবং শত্রুর মোকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনের কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল। আর তা হলো নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়-

প্রথমত দৃঢ়তা : অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা দুই-ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো মন দৃঢ় এটা এমন বিষয় যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর জিকির : এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদাররা ছাড়া সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনী সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এ নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মুতাবিক যে কোনো অঙ্গনে যে কোনো জাতির সাথে মোকাবিলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর জিকিরের নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোনো ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি, যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিন হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ সেগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

এখানে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় স্বভাবত এমন এক সময়, যখন কেউ কাউকে স্মরণ করে না; সবাই শুধুমাত্র নিজেদের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। সেজন্যই জাহিলিয়া আমলের আরব কবিরা যুদ্ধের ময়দানেও নিজেদের প্রেমাস্পদ প্রেয়সীদের স্মরণ করে গর্ববোধ করত যে, এটা যথার্থই বলিষ্ঠ মনোবল ও প্রেমে পরিপক্কতার প্রমাণ বটে। জাহিলিয়া আমলের কোনো এক কবি বলেছেন– ذَكَرْتُكَ وَالْخَطِّىُّ يَخْطُرُ بَيْنَنَا অর্থাৎ আমি তখনো তোমার কথা স্মরণ করেছি, যখন আমাদের মাঝে বর্শা বিনিময় চলছিল। কুরআনে কারীম এহেন শংকাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদের আল্লাহর স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাগিদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কুরআনে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম নেই। صَلٰوةً كَثِيْرًا অথবা صِيَامًا كَثِيْرًا কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত যে, তাতে না তেমন কোনো বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং না এতে অন্য কোনো কাজের কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহর জিকিরের জন্য কোনো শর্তাশর্ত, কোনো বাধ্যবাধকতা, অজু কিংবা পবিত্রতা পোশাকাশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোনো নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোনো মানুষ যে কোনো অবস্থায় অজুর সাথে, বিনা অজুতে দাঁড়িয়ে বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে-হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর জিকির শুধু মুখে কিংবা মনে মনে জিকির করাকেই বলা হয় না; বরং প্রতিটি জায়েজ বা বৈধ কাজ আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই জিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী জিক্রুল্লাহর মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও জাকের বলা যেতে পারে। যেমন, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে– نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ অর্থাৎ আলেম ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ যে আলেম তার ইলমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবই আল্লাহর আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেওয়া হলো বলে মনে হয় যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর জিকিরের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনো কোনো পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত

হতে থাকে, যা মানুষের কাজকর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোনো একটা বাক্য কিংবা কোনো গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কুরআনে কারীমে মুসলমানদেরকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ অর্থাৎ তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর জিকরের দু'টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি জিকির তো হলো তাই, যা সাধারণত 'না'রায়ে তাকবীর'-এর শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই 'জিক্রুল্লাহর'-এর অন্তর্ভুক্ত। ৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- أَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর। কারণ আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চনার কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কুরআনী হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হলো ثَبَاتْ - ذِكْرُ اللّٰه ও اِطَاعَتْ অর্থাৎ দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহর জিকির ও আনুগত্য। অতঃপর বলা হয়েছে لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا এতে ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে- وَلَا تَنَازَعُوا অর্থাৎ তোমরা পরস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ো না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের বল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

এতে বিবাদ-বিসংবাদের দু'টি পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে- ১. তোমরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়বে এবং ২. তোমাদের বল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা শত্রুর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে। পারস্পরিক ঝগড়া ও বিবাদ-বিসংবাদের দরুন অন্যের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়া একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, কিন্তু এতে নিজের শক্তির উপর এমন কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে যার কারণে দুর্বল ও ভীরু হয়ে পড়তে হবে? এর উত্তর এই যে, পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে গোটা দলের শক্তি সংযুক্ত থাকে। ফলে এককভাবে ব্যক্তি ও নিজের মাঝে গোটা দলের সমপরিমাণ শক্তি অনুভব করে। পক্ষান্তরে যখন পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাস থাকবে না, তখন ব্যক্তির একার ক্ষমতাই থেকে যায়, যা যুদ্ধ-বিদ্রোহের বেলায় কোনো কিছুই নয়।

সূরা আন্‌ফালের প্রথম থেকেই চলে আসছে বদর যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলি, উপস্থিত পরিস্থিতি, তাতে অর্জিত শিক্ষা ও উপদেশাবলি এবং আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত আলোচনা। সেসব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা হচ্ছে শয়তান কর্তৃক মক্কার কুরাইশদের প্রতারিত করে মুসলমানদের মোকাবিলায় নামানো এবং ঠিক যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তার পালিয়ে যাওয়া। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে সে কথাই বলা হয়েছে। শয়তানের এই প্রতারণা ছিল কুরাইশদের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টির আকারে কিংবা মানুষের আকৃতিতে সরাসরি সামনে এসে কথাবার্তা বলার মাধ্যমে। এতে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। তবে কুরআনের শব্দাবলিতে দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রতিই অধিকতর সমর্থন বোঝা যায় যে, সে মানুষের আকৃতিতে সামনাসামনি এসে প্রতারিত করেছিল।

ইমাম ইবনে জারীর (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কুরাইশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশংকা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশি বনূ বকর গোত্রও আমাদের শত্রু আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগ এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ি-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে!! সুতরাং কাফেলার নেতা আবূ সুয়িানের ভয়ার্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ি হয়ে রইল। এমনি সময়ে শয়তান সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হলো যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তার সাথে রয়েছে বীর সৈনিকদের একটি খণ্ডদল। সুরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় [illegible] আক্রমণের আশংকা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কুরাইশ জওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক

প্রথমত– لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আজকের দিনে এমন কেউ নেই, যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষের সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তিসামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি- কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবিলায় বিজয় অর্জন করবে– এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়ত– إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ অর্থাৎ বনূ বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপারে তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এমন টি হবে না, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কুরাইশরা সুরাকা ইবনে মালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিল, কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে গেল এবং বনূ বকর গোত্রের আক্রমণাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ হলো।

এই দ্বিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে দাবড়ে দিল। কিন্তু فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ অর্থাৎ যখন মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের উভয় দল [বদর প্রাঙ্গণে] সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে গেল, তখন শয়তান পেছনে ফিরে পালিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরিকদের সহায়তার একটি শয়তানি বাহিনীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মোকাবিলায় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.)-এর নেতৃত্বে ফেরেশতাদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন মানবাকৃতিতে সুরাকা ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় শয়তানি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল তখন সে হযরত জিবরাঈল আমীন এবং তাঁর সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাতে এক কুরাইশী যুবক হারেস ইবনে হিশামের হাতে ধরা ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, একি করছ! তখন সে বুকের উপর এক প্রবল ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের শয়তানি বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেস তাকে সুরাকা মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সুরাকা! তুমি তো বলেছিলে "আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি" অথচ ঠিক যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ। তখন শয়তান সুরাকা বেশেই উত্তর দিল– إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি হতে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই আমি তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। তবে তার বাক্য 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সম্পর্কে তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম কাতাদা (র.) বলেন, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যিই যদি সে আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে নাফরমানি করবে কেন? কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন আজাব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করায় কোনো লাভ নেই।

সুরাকা এবং তার বাহিনীর পশ্চাদপসরণের দরুন স্বীয় বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে দেখে আবূ জাহল কথাটি ঘুরিয়ে বলল, সুরাকা পালিয়ে যাওয়ায় তোমরা ঘাবড়িয়ো না, সে তো মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। যা-হোক, শয়তানের পশ্চাদপসরণের পর তাদের যা পরিণতি হওয়ার ছিল তা-ই হলো। তারপর যখন মক্কায় ফিরে এলো এবং সুরাকা ইবনে মালিকের সঙ্গে তাদের একজনের দেখা হলো, তখন সে সুরাকার প্রতি ভর্ৎসনা করে বলল, "বদর যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ও যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির সমস্ত দায়-দায়িত্ব তোমারই উপর অর্পিত হবে। তুমি ঠিক যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সমরাঙ্গন থেকে

পশ্চাদপসরণ করে আমাদের জওয়ানদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছ।" সে বলল, "আমি তো তোমাদের সাথেও যাইনি, তোমাদের কোনো কাজেও অংশগ্রহণ করনি। তোমাদের পরাজয়ের সংবাদও তো আমি তোমাদের মক্কায় ফিরে আসার পরেই শুনেছি।"

এসব রেওয়ায়েত ইমাম ইবনে কাসীর (র.) তাঁর তাফসীরে উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, অভিশপ্ত শয়তানের এটি একটি সাধারণ অভ্যাস যে, সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে দিয়ে ঠিক সময় মতো আলাদা হয়ে যায়। তার এ অভ্যাস সম্পর্কে কুরআনে কারীমও বার বার আলোচনা করেছে। এক আয়াতে রয়েছে–

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

শয়তানের ধোঁকা প্রতারণা এবং তা থেকে বাঁচার উপায় : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে

১. শয়তান মানুষের জাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোনো কোনো সময় শুধু মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামনাসামনি এসে ধোঁকা দেয়।

২. শয়তানকে আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফিকহবিদের গ্রন্থ 'আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান'-এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সূফী মনীষীবৃন্দ যারা আধ্যাত্মিক কাশ্‌ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তাঁরা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোনো লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোনা রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে এমন কি কাশ্‌ফ ও ইলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য :

৩. যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোনো অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসেবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্ককে ন্যায় ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়কেই ন্যায় এবং মন্দকেই ভালো মনে শুরু করে দেয়। ন্যায়পন্থিদের মতো তারাও নিজেদের অন্যায় অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরি হয়ে যায়। সেজন্য বায়তুল্লাহর সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল– اَللّٰهُمَّ انْصُرْ اَهْدَى الطَّائِفَتَيْنِ অর্থাৎ "আয় আল্লাহ! উভয় দলের যেটি অধিকতর সৎপন্থি তারই সাহায্য কর, তাকেই বিজয় দান কর।" এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থি বলে মনে করতো। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জানমাল কোরবান করে দিতো।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি-প্রকৃতি সঠিক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অনুবাদ :

٤٩. اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ ضُعْفُ اِعْتِقَادٍ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ اَىِ الْمُسْلِمِيْنَ دِيْنُهُمْ ط اِذْ خَرَجُوْا مَعَ قِلَّتِهِمْ يُقَاتِلُوْنَ الْجَمْعَ الْكَثِيْرَ تَوَهُّمًا اَنَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ بِسَبَبِهٖ قَالَ تَعَالٰى فِىْ جَوَابِهِمْ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ يَثِقْ بِهٖ يَغْلِبْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ .

৪৯. মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি অর্থাৎ যাদের ঈমান দুর্বল তারা বলে, এদের ধর্ম এদেরকে অর্থাৎ মুসলমানদের দীন তাদেরকে ছলনায় রেখেছে। সুতরাং এই কারণে তাদেরকে সাহায্য করা হবে বলে কল্পনা করত এত অল্প সংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও এত বিরাট এক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে বের হয়ে এসেছে। এদের প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করলে আস্থা স্থাপন করলে সে জয়ী হবে। আল্লাহ তো পরাক্রান্ত, তাঁর বিষয়ে তিনি পরাক্রমশালী ও তাঁর ক্রিয়াকর্মে তিনি প্রজ্ঞাময়।

٥٠. وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ اِذْ يَتَوَفَّى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ حَالٌ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ج بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيْدٍ وَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ اَىِ النَّارِ وَجَوَابُ لَوْ لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا .

৫০. কাফেরদের যখন ফেরেশতাগণ মৃত্যু ঘটাচ্ছিল তখন হে মুহাম্মদ! يَتَوَفّٰى -এটা ي প্রথম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت প্রথম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তুমি যদি দেখতে ফেরেশতাগণ লোহার গদা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে মারতেছিল এবং يَضْرِبُوْنَ -এটা حَالٌ বা অবস্থাবাচক পদ। তাদেরকে বলতেছিল তোমরা জাহান্নামের দহন শাস্তির স্বাদ ভোগ কর তবে সাংঘাতিক এক বিষয় প্রত্যক্ষ করতে। لَوْ تَرٰى -এটার جَوَابٌ এইস্থানে উহ্য। তা হলো لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا অর্থাৎ যদি দেখতে তবে সাংঘাতিক এক বিষয় দেখতে।

٥١. ذٰلِكَ التَّعْذِيْبُ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ عَبَّرَ بِهَا دُوْنَ غَيْرِهَا لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اَىْ بِذِىْ ظُلْمٍ لِّلْعَبِيْدِ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ .

৫১. এই শাস্তি তোমাদের কর্মফল আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচারী। অর্থাৎ মোটেই অত্যাচারী নন যে তিনি তাদেরকে বিনা অপরাধে শাস্তি প্রদান করবেন। بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ -[তোমাদের হাত যা পূর্বে করেছে অর্থাৎ তোমাদের কর্মফল] এই স্থানে কেবল হাত উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, অধিকাংশ কাজ হাতের সাহায্যেই সমাধা হয় ظَلَّامٌ -[অতিশয় জুলুমকারী]-এটা যদিও مُبَالَغَةٌ বা অতিশয়োক্তিবাচক শব্দ; কিন্তু এই স্থানে সাধারণ অর্থ জুলুমকারী ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٢. دَاْبُ هٰٓؤُلَآءِ كَدَاْبِ كَعَادَةِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِالْعِقَابِ بِذُنُوْبِهِمْ ط جُمْلَةُ كَفَرُوْا وَمَا بَعْدَهَا مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَلٰى مَا يُرِيْدُهٗ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

৫২. এদের আচরণ ফেরাউনগোষ্ঠী ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের আচরণের ন্যায়। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ এদেরকে এদের পাপের জন্য শাস্তিতে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তার উপর শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর। كَفَرُوْا -এটা এবং তৎপরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যটির ব্যাখ্যা স্বরূপ।

٥٣. ذٰلِكَ اَىْ تَعْذِيْبُ الْكَفَرَةِ بِاَنْ اَىْ بِسَبَبِ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ مُبَدِّلًا لَهَا بِالنِّقْمَةِ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ يُبَدِّلُوْا نِعْمَتَهُمْ كُفْرًا كَتَبْدِيْلِ كُفَّارِ مَكَّةَ اِطْعَامَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَاَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَبَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالصَّدِّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقِتَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

৫৩. এটা অর্থাৎ কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান এই জন্য যে, আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন তা আজাব দ্বারা পরিবর্তন করেন না, বদলান না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। অর্থাৎ তাদের উপর কৃত অনুগ্রহের বদলে কুফরি গ্রহণ করে। যেমন মক্কার কাফেররা ক্ষুধায় অন্ন, ভয় হতে নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের প্রতি রাসূল ﷺ -এর প্রেরণ প্রভৃতি অনুগ্রহের স্থলে কুফরি, আল্লাহর পথে বাধা প্রদান ও মুমিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করা গ্রহণ করে নিয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ بِاَنْ -এর ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

٥٤. كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ ج قَوْمَهُ مَعَهُ وَكُلٌّ مِنَ الْاُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ.

৫৪. ফেরাউন গোষ্ঠী ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের ন্যায় এরা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে অনন্তর তাদের পাপের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের স্বজনকে অর্থাৎ তৎসহ তার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছি এবং তারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

٥٥. وَنَزَلَ فِىْ قُرَيْظَةَ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

৫৫. বনু কুরাইযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরি করে এবং ঈমান আনে না।

٥٦. اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ اَنْ لَا يُعِيْنُوا الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ عَاهَدُوْا فِيْهَا وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ فِىْ غَدْرِهِمْ.

৫৬. তাদের মধ্যে তুমি যাদের সাথে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ যে তারা মুশরিকদেরকে কোনোরূপ সাহায্য করবে না তারা যতবারই চুক্তিবদ্ধ হয়েছে প্রতিবারই চুক্তিভঙ্গ করেছে এবং তারা এই বিশ্বাসঘাতকতায় আল্লাহকে ভয় করে না।

٥٧. فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ تَثْقَفَنَّهُمْ تَجِدَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ فَرِّقْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ مِنَ الْمُحَارِبِيْنَ بِالتَّنْكِيْلِ بِهِمْ وَالْعُقُوْبَةِ لَعَلَّهُمْ اَىِ الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ بِهِمْ.

৫৭. যুদ্ধে তোমরা যদি তাদেরকে তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা ও শাস্তি দিয়ে [যারা] অর্থাৎ যে সমস্ত যোদ্ধা তাদের পশ্চাতে রয়েছে তাদের হতে এদেরকে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিবে যাতে তারা অর্থাৎ যারা পশ্চাতে রয়েছে। তারা শিক্ষা লাভ করে, এদের মাধ্যমে উপদেশ লাভ করে। اِمَّا -এতে শর্তবাচক শব্দ اِنْ -এর نُوْن অতিরিক্ত مَا -এর مِيْم -এ اِدْغَام বা সন্ধি হয়েছে। تَثْقَفَنَّهُمْ -এর অর্থ– এদেরকে যদি পাও। شَرِّدْ অর্থ– বিচ্ছিন্ন করে দাও।

٥٨. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ عَاهَدُوكَ خِيَانَةً فِي الْعَهْدِ بِأَمَارَةٍ تَلُوحُ لَكَ فَانْبِذْ اِطْرَحْ عَهْدَهُمْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ط حَالٌ أَيْ مُسْتَوِيًا أَنْتَ وَهُمْ فِي الْعِلْمِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ بِأَنْ تُعْلِمَهُمْ بِهِ لِئَلَّا يَتَّهِمُوكَ بِالْغَدْرِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ.

৫৮. যারা তোমার সাথে চুক্তিবদ্ধ তাদের মধ্যে কোনো সম্প্রদায়ের যদি তুমি কোনো আলামত পেয়ে চুক্তিতে বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা কর তবে তুমি তাদের সাথে কৃত চুক্তি এমনভাবে নিক্ষেপ কর যে চুক্তি বাতিলের সংবাদ অবহিত হওয়ার বিষয়ে তোমরা উভয়েই এক সমান। অর্থাৎ চুক্তি বাতিলের কথা তাদেরকে জানিয়ে দাও যেন তারা আর তোমাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিতে না পারে। আল্লাহ বিশ্বাসভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না। فَانْبِذْ -অর্থ নিক্ষেপ কর। عَلَى سَوَاءٍ -এটা এই স্থানে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَغْلِبُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَنْ يَتَوَكَّلْ -এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো يَغْلِبُ : এই উহ্য থাকার উপর পরবর্তী বাক্য فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ দিক নির্দেশনা দিচ্ছে

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَى يَا مُحَمَّدُ : প্রশ্ন. تَرَى হলো مُضَارِعٌ -এর সীগাহ্ যা বর্তমান ও ভবিষ্যতকালকে বুঝায়। আর إِذْ يَتَوَفَّى -টা مَاضِىْ -এর উপর দালালত করে কেননা إِذْ টা মুযারেকে مَاضِىْ -এর অর্থে করে দেয়। কাজেই উভয় বাক্যের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে।

উত্তর. لَوْ -টা مُضَارِعٌ -কে مَاضِىْ -এর অর্থে নিয়ে যায়। কাজেই উভয় বাক্যের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهُ مَقَامِعُ : এটা مِقْمَعَةٌ -এর বহুবচন অর্থ- হাতুড়ি। লৌহগদা। এটা مِكْنَسَةٌ -এর ওযনে হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ : এতে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন. ذُوْقُوْا -এর আতফ يَضْرِبُوْنَ -এর উপর হয়েছে আর خَبَرٌ -এর উপর اِنْشَاءٌ -এর আতফ مُسْتَحْسَنٌ নয়। অন্য আরেকটি আপত্তি হলো একই বাক্যে غَائِبٌ এবং حَاضِرٌ একত্র হচ্ছে আর এটাও مُسْتَحْسَنٌ নয়।

উত্তর. ذُوْقُوْا -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য রয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই উভয় আপত্তিরই নিরসন হয়ে গেল। لَوْ -এর জবাবকে ভয়ানকের বড়ত্ব প্রমাণ করার জন্য উহ্য করে দিয়েছেন। যেটাকে মুফাসসির (র.) لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيْمًا বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন

قَوْلُهُ دَأْبُ هٰؤُلَاءِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে رَفْعٌ -এর مَحَلٌّ এ হয়েছে। কাজেই বাক্য অপূর্ণাঙ্গ হওয়ার আপত্তি শেষ হয়ে গেল এবং এই আপত্তিও শেষ হয়ে গেল যে, এখানে সন্দেহ ব্যতীত তাশবীহ লাজেম আসে।

قَوْلُهُ جُمْلَةُ كَفَرُوْا مُفَسِّرَةٌ لِمَا قَبْلَهَا : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন হলো ধারাবাহিক বাক্যের মাঝে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ -কে কোন উদ্দেশ্যে فَاصِلٌ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর হলো এটা পূর্বের বাক্যের তাফসীর হয়েছে। কাজেই এই উপরিউক্ত ফসল جِنْسِىْ নয়, যার আপত্তি হতে পারে।

قَوْلُهُ بِالنِّعْمَةِ : এটা اِسْمٌ اِنْتِقَامٌ হতে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِطْعَامُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا بِأَنْفُسِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিয়ামতসমূহ। যেমন- খাবার দাবার ইত্যাদি উদ্দেশ্য; অবস্থা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এই আপত্তি শেষ হয়ে গেল যে, কুরাইশ এবং ফেরাউন পরিবারের জন্য সন্তোষজনক অবস্থাই ছিল না যে, তাদেরকে অসন্তোষজনক অবস্থার দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। -(تَرْوِيْحُ الْأَرْوَاحِ)

قَوْلُهُ تَجِدَنَّهُمْ : অর্থাৎ- تَظْفُرَنَّهُمْ وَتَغْلِبَنَّهُمْ

قَوْلُهُ بِالتَّنْكِيْلِ : এর অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া।

قَوْلُهُ اَنْتَ وَهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُسْتَوِيًا টা نَابِذٌ এবং مَنْبُوْذٌ তথা فَاعِلٌ এবং مَفْعُوْلٌ উভয়টি হতে حَالٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ الخ : বদরের রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১০০০। কাফেররা সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। নগণ্য সংখ্যক নিরস্ত্র প্রায় মুসলমানদের মনোবল দেখে মদিনাবাসী মুনাফিকরা বলতে লাগলো, এই মুসলমানগণ আসলে ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মোকাবিলায় তারা রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে গেছে। তারা নিজেদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। কেননা নিজেদের চেয়ে অনেক বেশি সৈন্যের মোকাবিলা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ : একথা শুধু মুনাফিকরাই বলেনি; বরং সেসব লোকেরাও একথা বলেছে যাদের চিত্ত ছিল দুর্বল, অন্তরে ছিল সন্দেহ, যাদের ঈমান খাঁটি ছিল না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা মুশরিক ছিল। আর কেউ বলেছেন, তারাও মুনাফিকই ছিল। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, রুগ্ণ অন্তর বিশিষ্ট লোক যাদেরকে বলা হয়েছে তারা হলো সেসব লোক, যারা মক্কায় ইসলাম কবুল করেছিল; কিন্তু হিজরত করেনি। যখন পৌত্তলিকরা বদরের ময়দানে গমন করে তখন তাদেরও সঙ্গে যেতে বাধ্য করে। রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে তাদের মনে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। ফলে তারা মুরতাদ হয়ে যায় তখন বলে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ [মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম ধোঁকা দিয়েছে] যারা সেদিন এই সব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে তারা সকলেই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তারা ছিল কায়েস ইবনে ওলীদ ইবনে মুগীরা মাখযূমী, আবূ কায়েস ইবনে ফাকিহ ইবনে মুগীরা মাখযূমী, হারেস ইবনে জুমায়া ইবনে আসওয়াদ, আলী ইবনে উমাইয়া, আস ইবনে মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ। -[তাফসীরে কাবীর খ. ১৫, পৃ. ১৭৬]

ইমাম রাযী (র.) এই আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক বলা হয়েছে মদিনার আউস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে, আর যাদের চিত্ত রুগ্ণ বলা হয়েছে তারা হলো মক্কার সেসব লোক যারা ইসলাম কবুল করেছিল; কিন্তু তাদের ঈমান দুর্বল ছিল বলে তারা হিজরত করেনি। মক্কা থেকে যখন মুশরিকরা বদরের জন্য রওয়ানা হয় তখন তারাও সঙ্গী হয় এই ধারণায় যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গীদের সংখ্যা বেশি হয় তবে তাঁর নিকট চলে যাবে আর যদি মুসলমানদের সংখ্যা কম হয় তবে নিজেদের সম্প্রদায়ের সাথেই থাকবে। ইবনে ইসহাক বলেছেন, এই সব লোক বদরের যুদ্ধের দিন নিহত হয়। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, দুশমনের বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যক মুসলমানদের মনোবল তাদের ধর্মান্ধতা নয়; বরং প্রকৃত অবস্থা হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি মুসলমানদের যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা রয়েছে এটি হলো তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতিটি মুসলমানের অন্তরে এই অটুট বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করেন। সবলকে দুর্বল করা দুর্বলকে সবল প্রমাণিত করা আল্লাহ পাকের পক্ষে সর্বদা সহজ এবং সম্ভব। আর আল্লাহ পাক স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ "যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।"

قَوْلُهُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : আর যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে সে অপমানিত হয় না, সে দুর্বল হয় না। আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময় তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। তিনি সকল অবস্থায়ই তাঁর প্রতি নির্ভরশীল লোকদেরকে বিজয় দান করতে পারেন। কিন্তু যদি কোনো সময় তিনি বিজয় দান না করেন, তবে তা হয় কোনো বিশেষ হিকমতের কারণে।

-[ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ২৩৭, তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৩৮৬]

ইমাম রাযী (র.) এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে আর যে, আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তথা যে নিজের বিষয় আল্লাহ পাকের উপর সম্পূর্ণ করে আল্লাহ পাকই তাকে হেফাজত করেন এবং সাহায্য করেন। কেননা তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর কর্তৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর দুশমনদেরকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের দান করে থাকেন ছওয়াব এবং রহমত। −[তাফসীরে কবীর খ. ১৫, পৃ. ১৭৭]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখে সে কোনো দিনও অপমানিত হয় না। কেননা আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আর তিনি বিজ্ঞানময় হিকমতওয়ালা, তিনি তাঁর হিকমতের কারণে এমন কাজ করেন, যা মানুষের জন্য কল্পনাতীত। এজন্য বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে যা তাদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়

দুনিয়াতে কাফেরদের অপমান পরাজয় এবং নিহত হওয়ার বর্ণনার পর আখিরাতে তাদের যে কঠোর শাস্তি হবে তা উল্লেখ রয়েছে পরবর্তী আয়াতে- وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ

অর্থাৎ হে রাসুল! যদি আপনি কাফেরদের মৃত্যুকালীন মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতেন যখন তাদেরকে ফেরেশতারা তাদের মুখ এবং পিঠে প্রহার করে তাদের রূহ কবজ করে তখন ফেরেশতাগণ বলে এই শাস্তিতো শুধু সূচনা মাত্র এরপর আলমে বরজখ বা মধ্যলোকের শাস্তি এবং আখিরাতের তথা পরকালের শাস্তি তোমাদের জন্য রয়েছে অবধারিত বদরের যুদ্ধে কাফেররাও এই শাস্তি ভোগ করেছে। বস্তুত কাফেরদের মৃত্যুকালীন অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।

قَوْلُهُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ : অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কাফেরদেকে অগ্নির কোড়া দিয়ে তাদের মুখ এবং পৃষ্ঠে প্রহার করে থাকেন। তাফসীরকার সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেছেন। আলোচ্য আয়াতে اَدْبَارَهُمْ শব্দটির দ্বারা তাদের নিতম্ব উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এর দ্বারা তাদের কঠোর শাস্তির কথাই ঘোষণা করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যে শাস্তির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তা বদরের যুদ্ধের ঘটনা। মধ্যলোকের বিষয় নয় বদরের যুদ্ধে যখন মুশরিকরা মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হতো তখন ফেরেশতাগণ তাদের মুখের উপর তরবারি দিয়ে আঘাত দিতেন আর যখন তারা পলায়ন করতো তখন তাদের পৃষ্ঠে প্রহার করতেন। এভাবে ফেরেশতাগণ কাফেরদেরকে হত্যা করেন তখন ফেরেশতাগণ একথাও বলেছেন, ভবিষ্যতে অগ্নির শাস্তি ভোগ করবে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ফেরেশতাদের লোহার বুরুজ দ্বারা কাফেরদেরকে প্রহার করতেন। এজন্য ফেরেশতাদের প্রহারের কারণেই তাদের দেহ অগ্নিদগ্ধ হতো −[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৪৮]

এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, কাফেরদের রূহ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, যখন তাদের দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটে তখন সে চরম কষ্ট পায় এ দিকে যখন সম্মুখে তাকায় তখন অন্ধকার ছাড়া সে কিছুই দেখে না, তখন দু'দিক থেকেই সে কষ্ট ভোগ করে। এই নিষ্ঠুর পরিণাম প্রত্যেক কাফেরের জন্য অপেক্ষা করেছে। −[তাফসীরে কবীর খ. ১৫, পৃ. ১৭৮]

قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ : আর কাফেরদের এই শাস্তির জন্যে তারা নিজেরাই দায়ী। তাই ইরশাদ হয়েছে যে, এই শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যার অনন্ত আসীম নিয়ামত তোমরা সারাজীবন ভোগ করেছ তাঁর একত্ববাদকে তোমরা অস্বীকার করেছো, তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছ তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছ; তিনি দয়া করে তোমাদের হেদায়েতের জন্যে নাজিল করেছেন পবিত্র কুরআন তোমরা তাকে অবিশ্বাস করেছ, তিনি তোমাদের হেদায়তের জন্যে তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে প্রেরণ করেছেন, তোমরা তাঁকে ভক্তি ও বিশ্বাস করনি। অতএব, এই শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি। আর এর দ্বারা তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও অবিচার করা হয়নি, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে অবিচার নেই, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি আদৌ অবিচার করেন না।

قَوْلُهُ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : বদরের যুদ্ধে কাফেরদের ব্যাপারে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়; বরং ফেরাউন এবং তার দলবল যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হেদায়েতের জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলেন।' কিন্তু ফেরাউন এবং তার দলবল আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীকে অস্বীকার করে এবং তারও পূর্বে আদজাতি, সামুদ জাতি পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল আল্লাহর নাফরমান হয়েছিল, আল্লাহ পাক যথারীতি তাদের হেদায়েতের জন্যও নবী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা যে তিমিরেই রয়ে গেল। এমন কি তাদের অবাধ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। পরিণামে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শাস্তি নেমে এলো। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সলীল সমাধি হলো। আদ জাতি এবং সামুদ জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অতএব, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গে যা হয়েছে তা আল্লাহ পাকের চির শাশ্বত নীতি, নতুন কিছু নয়, যুগ যুগ ধরে এই নীতিই কার্যকর রয়েছে। এই পৃথিবীতে যখনই কোনো জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয় তখন তাদেরকে কিছু দিন অবকাশ দেওয়া হয়। এই অবকাশের সুযোগে আল্লাহর অবাধ্য লোকেরা আরো বেশি পাপাচারে লিপ্ত হয়।

অবকাশের সুযোগে তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়। তখন তারা ধরাকে সরা মনে করে। এরপর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়। অবশেষে তাদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। কুরআনে কারীমের সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে ঘোষণা করেছেন—

وَاِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا

আর আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদের সৎকাজের আদেশ প্রদান করি; কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে এরপর তাদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়, অবশেষে আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত শক্তিশালী, শাস্তি প্রদানে কঠোর। কেউ তাঁর শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে না। নাফরমানদের জন্যে তাঁর শাস্তি অবধারিত।

—[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন। আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৩, পৃ. ২৫০, তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৪৮-৪৯]

قَوْلُهُ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ আলোচ্য আয়াতে উদ্দেশ্য হলো এ কথা ব্যক্ত করা যে, যখন কোনো জাতির উপর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি দান করা হয়, কিন্তু তারা তার মূল্য বুঝে না এবং আল্লাহর দরবারে প্রণত হয় না, তখন সে নিয়ামতসমূহকে বালা-মসিবতে রূপান্তরিত করে দেওয়াই হলো আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম। সুতরাং ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীরাও যখন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মূল্য দেয়নি, তখন তাদের কাছ থেকে নিয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তদস্থলে তাদেরকে আজাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হয়েছে। এছাড়া কোথাও শব্দের কিছু পরিবর্তন করে বিশেষ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, প্রথম আয়াতে ছিল— كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আর এখানে বলা হয়েছে— بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ এতে 'আল্লাহ' পরিবর্তে 'রব' শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা বড় জালিম ও ন্যায়বিমুখ যে, যে সত্তা তাদের 'রব' তথা পালনকর্তা তাদেরকে প্রাথমিক অস্তিত্ব থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত যার নিয়ামত প্রতিপালন করেছে, এরা তাঁরই নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করেছে।

তাছাড়া পূর্ববর্তী আয়াতে فَاَخَذَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ বলা হয়েছিল, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ এতে পূর্বের সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ হয়ে গেছে। কারণ প্রথম আয়াতে তাদেরকে আজাবে নিপতিত করার কথাই বলা হয়েছিল যার বিভিন্ন রূপ হতে পারত। জীবিত অবস্থায়ও নানা রকম বিপদাপদের সম্মুখীন করে কিংবা সম্পূর্ণভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়ে আজাবে পাকড়াও করা যেতে পারত। কাজেই এ আয়াতে اَهْلَكْنٰهُمْ বলে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, সে সমস্ত জাতির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছি। প্রত্যেক জাতির ধ্বংসের রূপও ছিল বিভিন্ন। ফেরাউন যেহেতু খোদায়ীর দাবিদার ছিল এবং তার সম্প্রদায়ও তার সত্যতা স্বীকার করতো, সেজন্য বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ আমি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছি। অন্যান্য জাতির ধ্বংসের বিধৃত রূপ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়নি। তবে অন্য আয়াতে তার বিচরণও হয়েছে। কারো উপর ভূমিকম্প নাজিল হয়েছে কেউ মাটিতে ধসে গেছে, কারো আকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে আবার কারো উপর তুফান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সবশেষে মক্কার মুশরিকদের উপর বদর প্রাঙ্গনে মুসলমানদের মাধ্যমে আজাব এসেছে।

এর পরবর্তী আয়াতে সেসব কাফের সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এতে دَوَابٌ শব্দটি دَابَّةٌ-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী। মানুষসহ যত প্রাণী ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্বুদ্ধিতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যহার করা হয়েছে আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্টতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে- فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের মতো খানাপিনা ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদি সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

তদুপরি বাক্যটিতে সে সমস্ত লোককে আজাব থেকে বাদ দেওয়াও উদ্দেশ্য, যারা যদিও তখন কাফেরদের সাথে মিলে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কোনো সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে নিজেদের সাবেক ভ্রান্ত কাজ থেকে তওবা করে নেয়। বস্তুত হয়েছেও তাই। তাদের মধ্য থেকে বিরাট একদল মুসলমান হয়ে শুধু যে নিজেই সৎ ও পরহেজগার হয়েছে তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণব্রত ও পরহেজগারীর আহ্বায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় আয়াত : اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ এ আয়াতটি মদিনার ইহুদি এবং বনূ কোরায়জা ও বনূ নযীর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে জালিম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আস্তীনের সাপে পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবিদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো, ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদি। মক্কায় মুশরিকদের মাঝে আবূ জাহল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদিনার ইহুদিদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে আশরাফ।

রাসূলে কারীম ﷺ হিজরত করে মদিনায় চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্যে করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল। এদিকে ইসলামি রাজনীতির তাকাদা ছিল এই যে, যতটা সম্ভব মদিনার ইহুদিদেরকে কোনো না কোনো চুক্তি-প্রতিশ্রুতির আওতায় নিজেদের সাথে জড়িয়ে রাখা, যাতে তারা মক্কাবাসীদের মদীনায় এনে না তুলে। তাছাড়া ইহুদিরাও নিজেদের ভয়ের দরুন এরই আগ্রহী ছিল।

ইসলামি রাজনীতির প্রথম ধাপ : ইসলামি জাতীয়তা : রাসূলে কারীম ﷺ মদিনায় আগমনের পর ইসলামি রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজিরীন ও আনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হুজুর ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। পারস্পরিকভাবে এবং মুহাজিরীনদের সাথেও তিনি ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।

দ্বিতীয় ধাপ : ইহুদিদের সাথে মৈত্রী চুক্তি : এ রাজনীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দুটি। ১. মক্কার মুশরিকীন, যাদের অত্যচার উৎপীড়ন মুসলমানদেরকে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল এবং ২. মদিনার ইহুদিবর্গ, যারা তখন মুসলমানদের প্রতিবেশি হয়েছিল। এদের মধ্যে থেকে ইহুদিদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, যার একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞাও লেখা হয় এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদিনা এলাকার সমস্ত ইহুদি, মুসলমান, আনসার ও মুহাজিরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য তাফসীরে ইবনে কাসীর, 'আল্ বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' এবং সীরাতে ইবনে হিশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুত এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদিনায় ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে প্রকাশ্য বা গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করে মক্কার মুশরিকদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে। তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদের অপমানসূচক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও ভীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে ওজর পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লঙ্ঘন করব না।

মহানবী ﷺ ইসলামি গাম্ভীর্য, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাবের বাধ্য ছিল। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ততার কথা জানতে পেয়ে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে মক্কার মুশরিকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনায় ইহুদিরা তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারের চুক্তির লঙ্ঘন, যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। উল্লিখিত আয়াতে এভাবে বারবার চুক্তি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে- وَهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ এরা ভয় করে না এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখিরাতের কোনো চিন্তা নেই। কাজেই এরা আখিরাতের আজাব থেকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অশুভ পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে, এরা নিজেদের গাফলতি ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশ্বই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবূ জাহলের মতো কা'আব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদিদের দেশ ছাড়া করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে সেসব চুক্তি লঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে একটি হেদায়েতনামা দিয়েছেন, যার শব্দ নিম্নরূপ- فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ এতে تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দটির অর্থ তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شَرِّدْ মূলধাতু تَشْرِيْد থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোনো যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদের এমন কঠোর শাস্তি দিন, যা অন্যদের জন্যও নিদর্শন হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হলো এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেওয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরিকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবিলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ বলে রাব্বুল আলামীনের ব্যাপক রহতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন নিদর্শনমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়; বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থায় দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় : পঞ্চম আয়াতে রাসূলে মকবুল ﷺ -কে যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাতলে দেওয়া হয়েছে। এতে চুক্তির অনুবর্তিতার গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কোনো সময় যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েজ নয়। বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হলো এই যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদের সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের কথাগুলো হলো এই- وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ অর্থাৎ আপনার যদি কোনো চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন, যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ আল্লাহ খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না। অর্থাৎ যে জাতির সাথে কোনো সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মোকাবিলায় কোনো রকম সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাফের শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েজ নয়। অবশ্য যদি অপর পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপর পক্ষ এতে সমান সমান হয়, অর্থাৎ এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না; বরং যে কোনো প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

এই হলো ইসলামের ন্যায় পরায়ণতা ও সুবিচার যে, এতে বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের হক বা অধিকারেরও হেফাজত করা হয় এবং মুসলমানদের উপরও তাদের মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় যে, চুক্তি প্রত্যাহারের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রস্তুতিও যেন গ্রহণ না করে। -[তাফসীরে মাযহারী]

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা : আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ সুলায়মান ইবনে আমের-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মু'আবিয়া (রা.) এবং কোনো এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা.) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর পর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মু'আবিয়ার সৈন্যদল সেদিকে রওয়ানা হচ্ছিল। দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চস্বরে এ শ্লোগান দিয়ে আসছেন যে- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدْرًا অর্থাৎ না'রায়ে তাকবীরের সাথে তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য, এর বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে জাতি বা সম্প্রদায়ের সাথে কোনো সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে কোনো গিঁঠ খোলা অথবা বাঁধাও চাই না। যা হোক, হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আম্বাসাহ। হযরত মু'আবিয়া (রা.) ততক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

অনুবাদ :

٥٩. وَنَزَلَ فِيْمَنْ اَفْلَتَ يَوْمَ بَدْرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ يَا مُحَمَّدُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ط اللّٰهَ اَىْ فَاتُوْهُ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ لَا يَفُوْتُوْنَهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ التَّحْتَانِيَّةِ فَالْمَفْعُوْلُ الْاَوَّلُ مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنْفُسَهُمْ وَفِىْ اُخْرٰى بِفَتْحِ اَنَّ عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ.

৫৯. বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের যারা পলায়ন করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। হে মুহাম্মাদ! কখনো মনে করবেন না যে কাফেররা আল্লাহকে অতিক্রম করে চলে যেতে পেরেছে, অর্থাৎ এরা পরিত্রাণ পেয়েছে। তারা কখনো তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না, এড়িয়ে যেতে পারবে না। لَا تَحْسَبَنَّ -এটা অপর এক কেরাতে ى অর্থাৎ প্রথমপুরুষরূপে পঠিত রয়েছে, এমতাবস্থায় এর مَفْعُوْل اَوَّل অর্থাৎ প্রথম কর্মপদ اَنْفُسَهُمْ শব্দটি উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে। اَنَّهُمْ -এটা অপর এক কেরাতে اَنَّهُمْ [ফাতাহসহ] পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার পূর্বে একটি ل উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে।

٦٠. وَاَعِدُّوْا لَهُمْ لِقِتَالِهِمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قَالَ ﷺ هِىَ الرَّمْىُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى حَبْسِهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُرْهِبُوْنَ تُخَوِّفُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج اَىْ غَيْرِهِمْ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ اَوِ الْيَهُوْدُ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ جَزَاؤُهٗ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ تُنْقَصُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا.

৬০. তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত রাখবে। এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে ভীত করবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু মক্কার কাফেরদেরকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। এরা হলো মুনাফিক বা ইহুদি সম্প্রদায়। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় কর তোমাদেরকে তা পূর্ণ করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ তার প্রতিদান হতে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না। قُوَّةٌ অর্থ– শক্তি। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, এটা হলো তীরন্দাযীর শক্তি।

٦١. وَاِنْ جَنَحُوْا مَالُوْا لِلسَّلْمِ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا الصُّلْحِ فَاجْنَحْ لَهَا وَعَاهِدْهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ وَمُجَاهِدٌ مَخْصُوْصٌ بِاَهْلِ الْكِتَابِ اِذْ نَزَلَتْ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط ثِقْ بِهٖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ.

৬১. তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে অর্থাৎ তার প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করে اَلسَّلْم -এটার س কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিও এবং তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করিও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতটির এই বিধান কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ দ্বারা মানসুখ বা রহিত বলে বিবেচ্য। মুজাহিদ (র.) বলেন, এই আয়াতের বিধান কেবলমাত্র কিতাবীদের বেলায় প্রযোজ্য। কারণ, কিতাবী ইহুদি সম্প্রদায় বনূ কুরাইযাকে উপলক্ষ করে এই আয়াত নাজিল হয়েছিল। আর আল্লাহর উপর নির্ভর করিও। ভরসা রাখিও, তিনিই সকল কথা শুনেন, সকল কাজ সম্পর্কে জানেন।

٦٢. وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ بِالصُّلْحِ لِيَسْتَعِدُّوْا لَكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ كَافِيْكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ .

৬২. যদি তারা সন্ধির মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার অবকাশ নিয়ে প্রতারিত করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসীগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। حَسْبَكَ অর্থ– তোমার জন্য যথেষ্ট।

٦٣. وَاَلَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ بَعْدَ الْاِحَنِ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط بِقُدْرَتِهٖ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ حِكْمَتِهٖ .

৬৩. এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ে শত্রুতা ও বিদ্বেষের পর প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন, তাদের একত্র করে দিয়েছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতিবন্ধন স্থাপন করতে পারতে না আল্লাহ তাঁর কুদরতে তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর বিষয়ে পরাক্রমশালী, প্রবল প্রজ্ঞাময়, কিছুই তাঁর প্রজ্ঞার বাইরে নয়।

٦٤. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَحَسْبُكَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৬৪. হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট, আর, যথেষ্ট তোমার জন্য তোমার অনুসারী মুমিনগণ। وَمَنِ اتَّبَعَكَ এ বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী শব্দ اَللّٰهُ -এর সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে, এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে حَسْبُكَ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفْلَتَ : এটা বাবে اِنْفِعَالٌ হতে অর্থ– মুক্ত হওয়া, ছেড়ে দেওয়া, পলায়নের পথ অবলম্বন করা। اَنْفَلَاةُ الْبَطْنِ অর্থ হলো ডায়রিয়া হওয়া। اِنْفِلَاتُ الرِّيْحِ অর্থ– বায়ু নির্গত হওয়া। اِنْفَلَاةُ الشَّيْءِ فَلْتَةً অর্থাৎ بَغْتَةً অর্থ– আকস্মিক বের হওয়া।

قَوْلُهُ لَا تَحْسَبَنَّ : এটা দ্বারা রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে দুই মাফঊল দ্বারা مُتَعَدِّيْ হয়েছে। প্রথমটি হলো اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর দ্বিতীয়টি হলো سَبَقُوْا বাক্য হয়ে। اَللّٰهُ হলো سَبَقُوْا -এর মাফঊল قَرِيْنَةُ مَقَامٍ -এর কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে যাকে মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আর এক কেরাতে يَحْسَبَنَّ টা يَاءٌ -এর সাথে রয়েছে। এই সুরতে يَحْسَبَنَّ -এর মাফঊল উহ্য হবে। অর্থাৎ– لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْفُسَهُمْ سَابِقِيْنَ اللّٰهَ এক কেরাতে اِنَّهُمْ -এর হামযা فَتْحٌ -এর সাথে রয়েছে এই সুরতে لَامْ উহ্য হবে অর্থাৎ– لِاَنَّهُمْ

قَوْلُهُ مَصْدَرٌ : رِبَاطُ الْخَيْلِ -এর মধ্যে رَبْطٌ মাসদারটা মাফঊল অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ– اَلْخَيْلُ الْمَرْبُوْطُ [জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়া] رِبَاطٌ -এর عَطْف হয়েছে عَطْفُ الْمَصْدَرِ عَلَى الْمَصْدَرِ রূপে।

قَوْلُهُ فَاجْنَحْ لَهَا : প্রশ্ন. لَهَا -এর যমীর سَلْمٌ -এর দিকে ফিরেছে। যা مُذَكَّرٌ আর যমীর হলো مُؤَنَّثٌ ; এখানে ضَمِيْرٌ এবং مَرْجِعٌ -এর মধ্যে তো مُطَابَقَتْ নেই। এর কারণ কি?

উত্তর. سَلْمٌ -এর নকীয অর্থাৎ حَرْبٌ -এর হিসেবে যমীরকে مُؤَنَّثٌ আনা হয়েছে। حَرْبٌ হলো مُؤَنَّثٌ سِمَاعِيْ

قَوْلُهُ كَافِيْكَ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো حَسْبُكَ اللّٰهُ -এর মধ্যে মাসদারের حَمْلٌ টা ذَاتٌ -এর উপর করা আবশ্যক হচ্ছে, যা বৈধ নয়।

উত্তর. এখানে মাসদারটা اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে হয়েছে। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না। মুফাসসির (র.) حَسْبُكَ -এর তাফসীর كَافِيْكَ দ্বারা করার মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَصْدَرٌ টা اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاِحَنُ : এটা اَلْاِحْنَةُ -এর বহুবচন। অর্থ– গোপন শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا الخ : উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফেরদের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে, এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক আল্লাহর আজাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে– إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ অর্থাৎ এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না, তিনি যখনই তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো-বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখিরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোনো অপরাধী পাপী যদি কোনো বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যই মুক্তি পেয়ে গেছে; বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহর হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা ফরজ : দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হচ্ছে। বলা হয়েছে– وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরি করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ -এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের ততটাই অর্জন করতে হবে; বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ যোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকু যথেষ্ট; আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে– مِنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও সমর-বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোনো উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোনো বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হয় যদি তা এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবিলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ ; رِبَاطٌ শব্দটি ব্যাপকার্থে উল্লেখ করার পর প্রকৃষ্টভাবে বিশেষ قُوَّتٌ বা শক্তির কথাও বলা হয়েছে– قُوَّتٌ শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর رَبُوْطٌ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে ঘোড়া বাঁধা, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে বাঁধা ঘোড়া। তবে দু'এরই মর্ম এক। অর্থাৎ জিহাদের নিয়মে ঘোড়া পালা এবং সেগুলোকে বাঁধা কিংবা পালিত ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় এনে সমবেত করা। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে বিশেষ করে ঘোড়ার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তখনকার যুগে কোনো দেশ ও জাতিকে জয় করার জন্য ঘোড়াই ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও উপকারী। তাছাড়া এ যুগেও বহু জায়গা রয়েছে, যা ঘোড়া ছাড়া জয় করা যাবে না। সে কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার ললাট দেশে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিয়েছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। তীর বানানো এবং চালানোর জন্য বিরাট বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বযুগে ও সব জাতিতে আলাদা রকমে, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ অর্থাৎ মুশরিকীনদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখে জিহাদ কর।' –[আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও দারেমী গ্রন্থে হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করা হয়েছে।] এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোনো কোনো সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই হুকুম রাখে। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফের ও

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশদানের পর সেসব সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেওয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরজ।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য হয় তাদের মধ্যে অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হলো সেসব লোক, যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবিলা চলছে। অর্থাৎ মক্কার কাফের ও মদিনার ইহুদিরা। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে, যাদেরকে এখনো মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হলো সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিকরা যারা এখনো মুসলমানদের মোকাবিলায় আসেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কুরআন কারীমের এ আয়াতটিতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু তাদের উপরই পড়বে না; বরং দূর দূরান্তের কাফের তথা কিসরা ও কায়সার প্রমুখের উপরেও পড়বে। বস্তুত হয়েছেও তাই। খেলাফতে রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরি করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর রাহে মাল বা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফজিলত এবং তার মহা প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেওয়া হবে। কোনো কোনো সময় দুনিয়াতেই গনিমতের মালের আকারে এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই- বলা বাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا : سَلْم সীন বর্ণের উপর যবর(-) এবং سِلْم সীন বর্ণের নীচে যের (-) উভয় উচ্চারণেই সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাফেরা রা কোনো সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনাকেও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফেররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর اِنْ جَنَحُوْا -এর শর্ত আরোপ করাতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানরা সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফিকহ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও জায়েজ।

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোনো সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রাসূলে কারীম ﷺ -কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন! কারণ তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না; এসব আশঙ্কার বিষয়গুলোকে আল্লার উপর ছেড়ে দিন!

তারপর চতুর্থ আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন- وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবু আপনি কোনো পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য-সমর্থনেই আপনার কার্যসিদ্ধ হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাতকে সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

এ আল্লাহর ওয়াদার প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত অবতরণের পর থেকে মহানবী ﷺ -কে সমগ্র জীবনে এমন কোনো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি, যাতে শত্রুদের ধোঁকা-প্রাতারণার দরুন তাঁর কোনো রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন, ওয়াদাটি মহানবী ﷺ -এর জন্য وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ওয়াদারই অনুরূপ। কাজেই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাঁর রক্ষাণাবেক্ষণে নিয়োজিত সাহাবায়ে কেরামকে নিশ্চিন্তভাবেই অব্যাহতি দিয়ে দেন। এতে এ কথাও বোঝা যায় যে, এ ওয়াদাটি বিশেষভাবে মহানবী ﷺ -এর জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। -[বয়ানুল কুরআন] অন্যান্য লোকদের পক্ষে বাহ্যিক ব্যবস্থা ও অগ্রপশ্চাৎ অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

قَوْلُهُ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ : আর আল্লাহ পাকই তাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। যদি সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা হতো তবুও তাদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু আল্লাহ পাক দয়া করে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে তিনভাবে নিশ্চিন্ত করেছেন। যথা-

১. প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ফয়েজ ও বরকত নাজিল হওয়ার মাধ্যমে।

২. মুমিনদের সাহায্য করার মাধ্যমে।

৩. মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে। -[খোলাসাতুত তাফাসীর খ. ২, পৃ. ১৮২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْمُؤْمِنِيْنَ শব্দ দ্বারা আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এই দুই গোত্রের মধ্যে শত্রুতা এবং কলহ-দ্বন্দ্ব সর্বদাই লেগে থাকতো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, তিনি এত শক্তিশালী যে তাঁর ইচ্ছাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আর তিনি এত বিজ্ঞানময় যে তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, ইচ্ছা মোতাবেক কখন কি করতে হয় এবং তাঁর প্রতিটি কর্ম হিকমতপূর্ণ।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ পাক এবং আপনার অনুসারী মুমিনগণই যথেষ্ট।

২. হে নবী! আপনার এবং আপনার অনুসারী মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। অর্থাৎ দুনিয়া, আখিরাত উভয় জাহানে যে কোনো প্রয়োজনে আল্লাহ পাকই আপনার জন্য যথেষ্ট। ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে বায়দা নামক স্থানে। আর মুমিনদের মধ্যে 'আপনার অনুসারী' বলতে আনসার সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তেত্রিশজন পুরুষ এবং ছয়জন নারী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত ওমর (রা.)। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চল্লিশতম ব্যক্তি। আবূ শেখ হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আল্লাহ পাক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল করেন।

বাযযার (র.) ইকরিমার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ওমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন মুশরিকরা বলল, আজ আমাদের সম্প্রদায়ের অর্ধেক শক্তি কমে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। এই হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এ আয়াত মক্কায় নাজিল হয়েছে। কিন্তু আয়াতের বর্ণনাশৈলী দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়াত মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে কবীর খ. ৫, পৃ. ১৬০]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) আরেকটি ব্যাখ্যাও করেছেন তা হলো "হে নবী! যদি আপনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, এক আল্লাহ পাকই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর যদি আপনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখেন, এর কারণ উপকরণের প্রতি লক্ষ্য করেন তবে আপনার অনুসারী মুমিনগণ আপনার জন্য এবং আপনার দীনের জন্য যথেষ্ট। আপনার অনুসরণের বরকতে মুসলমানদের নগণ্য সংখ্যক দলও কাফেরদের বিরাট দলকে পরাজিত করতে পারে। যেমন বদরের যুদ্ধের ঘটনা এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৬, পৃ. ২৬০]

٦٥. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ حَثِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط لِلْكُفَّارِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج مِنْهُمْ وَاِنْ يَّكُنْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِّنْكُمْ مِائَةٌ يَّغْلِبُوْآ اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ اَىْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ وَهٰذَا خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ لِيُقَاتِلِ الْعِشْرُوْنَ مِنْكُمُ الْمِائَتَيْنِ وَالْمِائَةُ الْاَلْفَ وَيَثْبُتُوْا لَهُمْ ثُمَّ نُسِخَ لَمَّا كَثُرُوْا بِقَوْلِهٖ .

٦٦. اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضُعْفًا ط بِضَمِّ الضَّادِ وَفَتْحِهَا عَنْ قِتَالِ عَشْرَةِ اَمْثَالِكُمْ فَاِنْ يَّكُنْ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج مِنْهُمْ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْآ اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِاِرَادَتِهٖ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ لِتُقَاتِلُوْا مِثْلَيْكُمْ وَتَثْبُتُوْا لَهُمْ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بِعَوْنِهٖ .

٦٧. وَنَزَلَ لَمَّا اَخَذُوا الْفِدَاءَ مِنْ اَسْرٰى بَدْرٍ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ تَكُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ط يُبَالِغَ فِىْ قَتْلِ الْكُفَّارِ تُرِيْدُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا حِطَامَهَا بِاَخْذِ الْفِدَاءِ .

অনুবাদ :

৬৫. হে নবী! কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন, উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে একশতজন থাকলে এক সহস্র কাফেরের বিরুদ্ধে জয়ী হবে। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। এই আয়াতটির ভঙ্গি خَبَرِيَّةٌ বা বিবরণমূলক হলেও এই স্থানে এটা اَمْرٌ বা নির্দেশবাচক। অর্থাৎ বিশজন মুসলিমকে দুইশত কাফেরের আর একশত জনকে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং অবিচলিত হয়ে থাকতে হবে। পরে মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে এটা مَنْسُوْخٌ বা রহিত করে দেওয়া হয়। পরবর্তী আয়াতটিতে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। يَكُنْ -এটা ى [প্রথমপুরুষ পুংলিঙ্গ] ও ت [প্রথমপুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। بِاَنَّهُمْ -এটার ب -টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতুবোধক।

৬৬. আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দশগুণ বেশি সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দুর্বলতা বিদ্যমান। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশতজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা তাদের অর্থাৎ কাফেরদের দুইশতজনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকলে আল্লাহর অনুজ্ঞাক্রমে তারা অভিপ্রায়ে দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ তাঁর সাহায্য সহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রয়েছেন। اِنْ يَكُنْ ..... এটা خَبَرِيَّةٌ হলেও اَمْرٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা দ্বিগুণ সংখ্যকের মোকাবিলায়ও লড়বে এবং তাদের সম্মুখে অবিচল হয়ে থাকবে। ضُعْفًا -এটা ض -এ পেশ ও ফাতাহ সহকারে পঠিত রয়েছে। অর্থ– দুর্বলতা। يَكُنْ -এটা ى [প্রথমপুরুষ পুংলিঙ্গ] ও ت [প্রথমপুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

৬৭. বদর যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হতে মুক্তিপণ গ্রহণ করলে এই আয়াত নাজিল হয় যে, পৃথিবীতে ভালোভাবে রক্ত প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কাফের-বধ না হওয়া পর্যন্ত تَكُوْنَ -এটা ى [প্রথমপুরুষ, পুংলিঙ্গ] ও ت [প্রথমপুরুষ, স্ত্রীলিঙ্গ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। বন্দী রাখা কোনো নবীর জন্য সঙ্গত নয়। হে মুমিনগণ! মুক্তিপণ গ্রহণ করে তোমরা পার্থিব সম্পদ তার তুচ্ছ সামগ্রী কামনা কর,

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ لَكُمُ الْاٰخِرَةَ ؕ اَىْ ثَوَابَهَا بِقَتْلِهِمْ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهٖ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً -

আর আল্লাহ তোমাদের জন্য পরকাল অর্থাৎ এদের বধ করার মাধ্যমে পরকালের পুণ্যফল দিতে চান আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এই আয়াতটির বিধান فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً [অর্থাৎ হয় অনুকম্পা প্রদর্শন কর বা মুক্তিপণ গ্রহণ কর!] এই আয়াতটির মাধ্যমে মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে।

٦٨. لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ بِاِحْلَالِ الْغَنَائِمِ وَالْاَسْرٰى لَكُمْ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ مِنَ الْفِدَاءِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

৬৮. গণীমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী ও বন্দী রাখা তোমাদের জন্য বৈধ হওয়া সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা মুক্তিপণরূপে যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আপতিত হতে।

٦٩. فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

৬৯. যুদ্ধে যা তোমরা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ : এটা হলো একটি আপত্তির উত্তর আপত্তি হলো এই যে- يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর মধ্যে খবর দেওয়া হলো যে একশত ধৈর্যশীল মুসলমান এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। আর আল্লাহ তা'আলার খবরের মধ্যে মিথ্যা তথা ঘটনার বিপরীত সম্ভাবনা নেই, অথচ কোনো কোনো সময় সমপর্যায়ের হওয়ার পরও কাফেররা বিজয় লাভ করে ফেলে?

উত্তর. খবরটা اَمْر অর্থে হয়েছে। আর اَمْر -এর মধ্যে মিথ্যার সম্ভাবনা হয় না।

قَوْلُهُ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে- عَلِمَ بِالضَّعْفِ -কে اَلْاٰنَ -এর সাথে مُقَيَّدٌ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার عِلْمٌ بِالْحَادِثِ নেই।

উত্তর. আল্লাহ তা'আলার عِلْم حَادِثٌ -এর সাথে অনেক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু قَبْلَ الْوُقُوْعِ এ হিসেবে যে, اِنَّهٗ سَيَقَعُ আর সংঘটিত হওয়ার পর এ হিসেবে যে بِاَنَّهٗ يَقَعُ আর সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এ হিসেবে যে بِاَنَّهٗ وَاقِعٌ

قَوْلُهُ اَلْحُطَامَ : অর্থ তুচ্ছ বস্তু, স্বল্প সম্পদ। টুকরো টুকরো ও ছেঁড়া ফাঁটা।

قَوْلُهُ اَىْ ثَوَابَهَا : উহ্য মুযাফের মধ্যে এই প্রশ্নের জবাব রয়েছে যে, نَفْس اٰخِرَةٌ তো প্রত্যেকের জন্যই প্রমাণিত এরপরও يُرِيْدُ بِكُمُ الْاٰخِرَةَ -কে নির্দিষ্ট করার কারণ কি?

উত্তর. আখিরাত তো সকলের জন্য রয়েছে; কিন্তু আখিরাতের প্রতিদান শুধুমাত্র মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ : এ আয়াতে মুসলমানদের জন্য একটি যুদ্ধনীতির আলোচনা করা হয়েছে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় তাদেরকে কতটা দৃঢ়তা অবলম্বন করা ফরজ এবং কোন পর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করা পাপ। পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার বিবরণে এর বিশদ আলোচনা এসে গেছে যে, আল্লাহর গায়বি সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকে বলে তাদের ব্যাপারটি পৃথিবীর সাধারণ জাতি সম্প্রদায়ের মতো নয়, এদের অল্প সংখ্যকও অধিক সংখ্যকের উপর বিজয় অর্জন করতে পারে। যেমন, কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে- كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ বহু স্বল্প সংখ্যক দল আল্লাহর হুকুমে অধিক সংখ্যক প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণার

সত্যতার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। প্রকৃতপক্ষে বিগত দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে অমুসলমানদের সাথে যত যুদ্ধ হয়েছে তাতে কোনো দিনই মুসলমানদের সংখ্যা শত্রু সৈন্য থেকে অধিক ছিল না; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বিজয়মালা শোভা পেয়েছে মুসলমানদের কণ্ঠে। এ পর্যায়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না–

যুদ্ধ	মুসলমানদের সংখ্যা	শত্রুসৈন্য	বিজয়
বদর	৩১৩	১০০০	মুসলমানদের
ওহুদ	৭০০	৩, ০০০	,,
খন্দক	৩.০০০	১২.০০	,,
মুতা.	৩,০০০	১০,০০০	,,
ইয়ারমুক	৪০, ০০০	২.৪০.০০০	,,
কাদেসিয়া	৮.০০০	৬০.০০০	,,
স্পেন	৭. ০০০	১.০০.০০০	,,
সিন্ধু	৬.০০০	৫০. ০০০	,,

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমান কোনোদিন জনবল বা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী হয়ে লড়াই করে না; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি যুদ্ধে জয়লাভ হয়, তবে তা আরো বড় সফলতা।

সেজন্যই ইসলামের সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধে দশজন মুসলমানকে একশ লোকের সমান সাব্যস্ত করে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়চিত্ত লোক থাকো, তাহলে দু'শ শত্রুর উপর জয়ী হতে পারবে। আর তোমরা যদি একশ জন হও, তবে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।"

এতে সংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একশ মুসলমান এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্যে হলো এই নির্দেশ দান যে, একশ মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের মোকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া জায়েজ নয়। এর কারণ যাতে মুসলমানদের মন এ সুসংবাদে দৃঢ় হয়ে যায় যে, আল্লাহ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। যদি নির্দেশাত্মক বাক্যের মাধ্যমে এ হুকুম দেওয়া হতো, তবে প্রকৃতগতভাবেই তা ভারি বলে মনে হতে পারত।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধ গাযওয়ায়ে বদর এমন এক অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। তাও আবার সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না; বরং জরুরি ভিত্তিতে যারা তৈরি হতে পেরেছিলেন শুধু তাঁরাই এ যুদ্ধের সৈনিক হয়েছিলেন। কাজেই এ যুদ্ধে এক'শ মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে মোকিবলা করার নির্দশ দেওয়া হয় এবং এমনই ভঙ্গিতে দেওয়া হয়, যার সাথে সাহায্যের ওয়াদাও বিদ্যমান থাকে।

قَوْلُهُ اَلْـئٰـنَ خَـفَّـفَ اللّٰـهُ الـخ : আয়াতে পরবর্তীকালের জন্য এ নির্দেশ রহিত করে দ্বিতীয় নির্দেশ জারী করা হয় যে– "এখন আল্লাহ তা'আলা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের কমতি দেখা দিয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক দৃঢ়চিত্ত থাকে, তবে তারা দু'শ লোকের উপর জয়ী হবে।"

এখানেও উদ্দেশ্য হলো এই যে একশ' মুসলমানের পক্ষে দু'শ কাফেরের মোকাবিলা করতে গিয়ে পালিয়ে আসা জায়েজ নয়। প্রথম আয়াতে একজন মুসলমানের জন্য দশজন অমুসলমানদের মোকাবিলা থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আর এ আয়াতে একজন মুসলমানকে দু'জন অমুসলমানের মোকাবিলা থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এটাই হলো এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নির্দেশ যা সর্বকালেই বলবৎ থাকবে।

এখানেও নির্দেশকে নির্দেশ আকারে নয়; বরং সংবাদ ও সুসংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলমানের জন্য দু'জন কাফেরের বিরুদ্ধে অটল থাকার নির্দেশ দান [নাউযুবিল্লাহ] কোনো রকম অন্যায় কিংবা জবরদস্তিমূলক নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে তাদের ঈমানের দৌলতে এমন শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, তারা একজনই দুজনের সমান হয়ে থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য-সহায়তা দানের সুসংবাদটি এই শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, এসব মুসলমানকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রাণকে বিপদের সম্মুখীন করে দিয়েও দৃঢ়চিত্ত থাকা শুধুমাত্র তাদেরই পক্ষে সম্ভব, যাদের পরিপূর্ণ ঈমান থাকবে। কারণ পরিপূর্ণ ঈমান মানুষকে শাহাদাতের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে আর এই অনুপ্রেরণা তাদের শক্তিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে- إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরিয়তের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যেই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গদানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই আল্লাহর সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদিগারের সঙ্গলাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ يَّكُوْنَ لَهُ أَسْرٰى حَتّٰى الخ : উল্লিখিত আয়াতটি গাযওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তাফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হলো এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ, যা একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনো জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোনো বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জিহাদ করতে গিয়ে গনিমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রুসৈন্য নিজেদের আয়ত্তে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েজ হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচারণ করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে ইতিপূর্বে কুরআনে আলোচনা করা হয়নি।

পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়া (আ.)-এর শরিয়তে গনিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়া কিংবা সেগুলো ব্যবহার করা হালাল ছিল না; বরং গনিমতের যাবতীয় মালামাল একত্র করে কোনো ময়দানে রেখে দিতে হতো। আর আল্লাহর রীতি অনুযায়ী একটি আগুন এসে সেগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিত। একেই মনে করা হতো জিহাদ কবুল হওয়ার লক্ষণ। গনিমতের মালামাল জ্বালানোর জন্য যদি আসমানি আগুন না আসত, তাহলে বোঝা যেত যে, জিহাদে এমন কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেওয়া হয়েছে। গনিমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তো জানা ছিল, কিন্তু গযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী ﷺ -এর উপর কোনো ওহী নাজিল হয়নি। অতচ গাযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনিমত হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তরজন সর্দারও মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ে বৈধতা সম্পর্কে কোনো ওহী তখনো আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন ত্বরান্বিত পদক্ষেপের দরুন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যত দুটি অধিকার মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়! তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মূর্তাজা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল আমীন রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহর এ নির্দেশ শোনান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে এ কথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে, এর বদলা হিসেবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দুটি থেকে একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ এটি যদি পছন্দসই হতো তবে এর ফলে সত্তরজন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয়ই যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পেশ করা হলো, তখন কোনো কোনো সাহাবীর ধারণা হলো যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোনো সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হলো জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়ত এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানরা যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদতের

বিষয়! প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআজ (রা.) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত প্রদান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবিলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে, সে ধারণাই প্রবল।

রাসূলে কারীম ﷺ যিনি রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া। তিনি সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন لو اتفقتما ما خالفتكما অর্থাৎ তোমরা উভয়ে যদি কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। –[মাযহারী]

তাঁদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাগাদা। অতএব, তাই হলো। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর আল্লাহর বাণী মোতাবেক সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো।

قوله تريدون عرض الدنيا : আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে, তোমরা আমার রাসূলকে অসংগত পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদের বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেওয়া কোনো নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حتى يثخن في الأرض বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। إثخان-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতার ব্যবস্থা দেওয়া। এ অর্থের তাকিদ বোঝাবার জন্য في الأرض বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হলো এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধূলিসাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ– সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনো পর্যন্ত কোনো সরাসরি 'নস' বা আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদণ্ডের উপর গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশি হবে, তাদের পক্ষে গনিমতের সে মাল-সমান বা দ্রব্যসামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যেকাজে বৈধাবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে– تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ চান তোমরা যেন আখিরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসেবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে– গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্ককরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যদিও রাসূলে কারীম ﷺ নিজেও তাদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামিন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে والله عزيز حكيم বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশীল, হিকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় আগ্রহে পরবর্তী বিজয়ে আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন। দ্বিতীয় আয়াতটিতেও এই ভর্ৎসনারই উপসংহারস্বরূপ বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক যদি নিয়তি নির্ধারিত হয়ে না যেত, তবে তোমরা যে কাজ করেছ, অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, সেজন্য তোমাদের উপর কোনো বড় রকমের শাস্তি সংঘটিত হতো।

উল্লিখিত নির্ধারিত নিয়তির তাৎপর্য সম্পর্কে তিরমিযী গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্বে কোনো উম্মতের জন্য গনিমতের মালামাল হালাল ছিল না, বদরের যুদ্ধে ঘটনাক্রমে মুসলমানরা যখন গনিমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে, অথচ তখনো তার বৈধতার কোনো নির্দেশ নাজিল হয়নি, তখন ভর্ৎসনাসূচক এই আয়াতে অবতীর্ণ হয় যে, গনিমতের মালামালের বৈধতাসূচক নির্দেশ আসার প্রাক্কালে মুসলমানদে এহেন পদক্ষেপ এমনই পাপ ছিল, যার দরুন আজাব নেমে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলার এই হুকুম 'লওহে মাহফূজে' লিপিবদ্ধ ছিল যে, এই উম্মতের জন্য গনিমতের মালকে হালাল করে দেওয়া হবে, সেহেতু মুসলমানদের ভুলের জন্য আজাব নাজিল হয়নি। -[মাযহারী]

কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আয়াতটি নাজিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহ তা'আল আজাব একেবারেই সামনে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তা থামিয়ে দেন। সে আজাব যদি আস তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুআজ ছাড়া কেউই তা থেকে অব্যাহতি পেত না।" এতে প্রতীয়মান হয়, মুক্তিপ নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়াই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। অথচ তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুসারে বোঝা যাচ্ছে যে, গনিমতের মালাম সংগ্রহ করাই ছিল ভর্ৎসনার হেতু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ বা পার্থক্য নেই। বন্দীদের কাছ থে মুক্তিপণ গ্রহণ করাও ছিল গনিমতের মাল সংগ্রহেরই অংশবিশেষ।

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাকের একটি সিদ্ধান্ত পূর্বে গৃহীত না থাকতো ত তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর ভয়াবহ আজাব আপতিত হতো। অপরাধ যত সঙ্গীন হয় শাস্তিও তত ভয় হয়। বহু পূর্বে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত যদি লিপিবদ্ধ না থাকতো, তবে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য ভয়াবহ আজাব তোমা প্রতি আপতিত হতো।

এখন প্রশ্ন হলো পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তটি কি? এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় কোনো কিছু ঘোষণা করা হয়নি. ত তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. মুজতাহিদের এমন ভুলের শাস্তি দেওয়া হবে না। যেমন, বদরের বন্দীদের যদি হত্যা করা হতো তবে কাফেররা ভীত স হতো এবং ইসলামের শক্তি এবং প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ হতো। মুসলমানগণ এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারেননি; বরং ধারণা করেছেন যদি মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে দু'টি উপকার হবে। ক. বন্দীরা হয়তো কোনে ইসলাম গ্রহণ করবে, বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য তাই হয়েছিল। অধিকাংশ বন্দী অবশেষে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল মুক্তিপণ হিসেবে যে সম্পদ লাভ হবে তা দ্বারা মুসলমানদের আর্থিক সংকট দূরীভূত হবে; বিশেষত অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের মা জিহাদী শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এটি ছিল মুসলমানদের ইজতেহাদী ভুল। আর এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ই হয়েছে- لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ লওহে মাহফূজে আল্লাহ পাক পূর্বেই লিখে রেখেছেন, যদি কেউ ইজতেহ ব্যাপারে ভুল করে তবে এজন্যে তার উপর আজাব হবে না। যদি ইতিপূর্বে এ সিদ্ধান্ত না হতো তবে বদরের যুদ্ধের বন্দী ব্যাপারে যে ভুল হয়েছে তার পরিণাম স্বরূপ আল্লাহর আজাব আপতিত হতো।

২. কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন যে, লওহে মাহফূজে আল্লাহপাক একথা পূর্বেই লিখে রেখেছেন যে, বদরে অংশ গ্রহণকারীদের উপর আজাব নাজিল করবেন না। যদি পূর্বে এ সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের উপর আজাব আ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ তোমরা আল্লাহর হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বেই নিজেদের বিবেচনায় বান্দাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তা ছেড়ে দিয়েছ। এ কারণে তোমাদের উপর আজাব আসত; কিন্তু যদি আজাব না দেওয়ার পূর্ব-সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে আপতিত হতো।

৩. কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ পাক অপরাধীকে শাস্তি দেন না।

৪. মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীমুক্তি অচিরেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বৈধ ঘোষণা করা হবে। যদি পূর্বে এ সিদ্ধান্ত ন তবে আল্লাহর আজাব আপতিত হতো।

৫. আল্লাহ পাকের একথা জানা ছিল যে, বন্দীদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করবে। যদি এমন কথা না হতো, তবে তোমাদে আজাব আসত।

৬. আল্লাহ পাক পূর্বেই সিদ্ধান্ত করেছেন প্রিয়নবী ﷺ -এর বর্তমানে এবং মানুষ যদি ইস্তেগফাররত থাকে তবে এমন আজাব দিবেন না। যদি এমন সিদ্ধান্ত পূর্বে গৃহীত না হতো, তবে অবশ্যই আজাব নাজিল হতো।

৭০. يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسَارٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ مِنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا اِيْمَانًا وَاِخْلَاصًا يُّؤْتِكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ مِنَ الْفِدَاءِ يُضَعِّفُهُ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيُثِيْبَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

৭১. وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَيِ الْاَسْرٰى خِيَانَتَكَ بِمَا اَظْهَرُوْا مِنَ الْقَوْلِ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ قَبْلَ بَدْرٍ بِالْكُفْرِ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ط بِبَدْرٍ قَتْلًا وَاَسْرًا فَلْيَتَوَقَّعُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ اِنْ عَادُوْا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهِ.

৭২. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا النبي وَّنَصَرُوْا وَهُمُ الْاَنْصَارُ اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط فِي النُّصْرَةِ وَالْاِرْثِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا مِّنْ شَيْءٍ فَلَا اِرْثَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَلَا نَصِيْبَ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰخِرِ السُّوْرَةِ.

অনুবাদ :

৭০. হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভালো কিছু ঈমান ও ইখলাছ বা আন্তরিকতা দেখেন তবে তোমাদের নিকট হতে মুক্তিপণরূপে যা নেওয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু আল্লাহ তোমাদেরকে দান করবেন। যেমন, পৃথিবীতে তিনি তোমাদের সম্পদ দ্বিগুণ করে দিবেন এবং পরকালে আরো পুণ্যফল দান করবেন। এবং তোমাদের পাপকর্মসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭১. তবে অর্থাৎ বন্দীরা তোমার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে চাইলে তাদের কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেলে এরা তো পূর্বে অর্থাৎ বদর যুদ্ধের পূর্বে কুফরি করত আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে বদরে তাদের উপর হত্যা ও বন্দী করার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং পুনর্বার যদি তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তবে তাতে বিচিত্র কি? আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন এবং তিনি তার কাজে প্রজ্ঞাময়।

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে অর্থাৎ মুহাজির সাহাবীগণ এবং যারা নবী করীম ﷺ -কে আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে অর্থাৎ আনসারগণ তারা সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকারত্বে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে ; কিন্তু দীনের জন্য হিজরত করে নেই। হিজরত না করা পর্যন্ত তোমাদের উপর তাদের অভিভাবকত্বের কিছুই নেই। অর্থাৎ তোমরা ও তাদের পরস্পরে কোনোরূপ উত্তরাধিকারত্ব নাই এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদেও এদের কোনো অংশ হবে না। এ বিধানটি অবশ্য এই সূরার শেষ আয়াতটির মাধ্যমে মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لَهُمْ عَلَى الْكُفَّارِ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ط عَهْدٌ فَلَا تَنْصُرُوْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَنْقُضُوْا عَهْدَهُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

আর দীন সম্বন্ধে যদি তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে কাফেরদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে অঙ্গীকার চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। অর্থাৎ এই ধরনের সম্পদের সাথে তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করিও না এবং তাদের বিরুদ্ধে এদের সাহায্য করিও না। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। وِلَايَتِهِمْ এটা وَاوْ -এ কাসরা বা ফাতাহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٧٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط فِى النَّصْرِ وَالْاِرْثِ فَلَا اِرْثَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ اَىْ تَوَلِّى الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَطْعِ الْكُفَّارِ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ بِقُوَّةِ الْكُفْرِ وَضُعْفِ الْاِسْلَامِ -

৭৩. যারা কুফরি করেছে তারা সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার বিধিতে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। সুতরাং তোমরাও তাদের মধ্যে কোনোরূপ উত্তরাধিকারত্ব হতে পারো না। যদি তোমরা তা অর্থাৎ মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক বর্জন না কর তবে কুফরির শক্তি বৃদ্ধি ও ইসলাম দুর্বল হয়ে যাওয়ার দরুন পৃথিবীতে ফেতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

٧٤. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ فِى الْجَنَّةِ -

৭৪. যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতে সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

٧٥. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ اَىْ بَعْدَ السَّابِقِيْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰئِكَ مِنْكُمْ ط اَيُّهَا الْمُهٰجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ ذَوُوالْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِى الْاِرْثِ مِنَ التَّوَارُثِ بِالْاِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِى الْاٰيَةِ السَّابِقَةِ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ حِكْمَةُ الْمِيْرَاثِ -

৭৫. এবং যারা ঈমান ও হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের পরে ঈমান এনেছে, দীনের জন্য হিজরত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছে। হে মুহাজির ও আনসারগণ! তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর জ্ঞাতিবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ নিকট আত্মীয়তার অধিকারী ব্যক্তিগণ আল্লাহর কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফূজে উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত ঈমান ও হিজরতের সম্পর্কে উত্তরাধিকার হওয়ার তুলনায় তারা মীরাছের ক্ষেত্রে একে অন্যের হকদার। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। উত্তরাধিকার স্বত্ব-বিধি দানের হিকমত-গূঢ় তত্ত্বও তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِآخِرِ السُّوْرَةِ : অর্থাৎ- وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدُ : অর্থাৎ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَبْلَ الْفَتْحِ তথা হুদায়াবিয়ার সন্ধির পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْ اَيْدِيْكُمْ الخ : গায্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোনো ত্রুটি করেনি; যখনই কোনো রকম সুযোগ পেয়েছে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেওয়াটা সাধারণ ব্যাপার ছিল না; এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও করুণা। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসেবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ তা'আলার একান্ত মেহেরবানি ও নয় যে, এই সাধারণ অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয় তাও তিনি কি চমৎকারভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোনো রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপরি তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে خَيْر অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। অর্থাৎ মুক্তিলাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু পেয়ে যাবে। বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার সাথে সাথে তাদের এমনভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তিলাভের পর নিজেদের লাভ-ক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং বাস্তব ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান ছাড়াও পার্থিব জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেওয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল

অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তিনিও বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেওয়া হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় 'সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই গ্রেফতার হয়ে যান।

যখন মুক্তিপণ দেওয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুজুর আকরাম ﷺ -এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকে আমার মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য করা হোক। হুজুর ﷺ বললেন, যে সম্পদ আপনি কুফরির সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমানদের গনিমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে-ইবনে তালেব এবং নওফল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রা.) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কুরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে; আমি সম্পূর্ণভাবে ফকির হয়ে যাব। মহানবী ﷺ বললেন, কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফজ্লের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো লোকেই অবগত নয়! হুজুর ﷺ বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদিগার আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রা.)-এর নবুয়তের সত্যতা

সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুজুর ﷺ -এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল, যা এ সময় আল্লাহ তা'আলা দূর করে দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তাঁর বহু টাকা-কড়ি মক্কার কুরাইশদের নিকট ঋণ হিসেবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সেই টাকাগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন না। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ - ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহনবী ﷺ -এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ সমস্ত কথোপকথনের প্রেক্ষিতে রাসূলে কারীম ﷺ উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ ও বাস্তবতা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ উকিয়া সোনা নেওয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম [ক্রীতাদাস] বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দিরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজের সময় হাজীদের পানি খাওয়ানোর খিদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এ তুলনায় তুচ্ছ বলে মনে হয়।

গায্ওয়ায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা খট্কা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোনো-না -কোনো ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ খট্কাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন।

إِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ অর্থাৎ যদি আপনার সাথে খেয়ানত করার সংকল্পই তারা করে, তবে তাতে আপনার কোনো ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথেও খেয়ানত করেছে। অর্থাৎ সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীন তথা বিশ্ব প্রতিপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই খেয়ানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্থ, পদদলিত, লাঞ্ছিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মনের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন। তিনি বড়ই সুকৌশলী, হিকমতওয়ালা। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাবে কোথায়? তিনি এমনিভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের একান্ত উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ তাদের বন্দীদশা ও মুক্তি দান এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম। কারণ কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজি হবে না। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ হলো হিজরত। অর্থাৎ এ নগরী বা দেশ ছেড়ে অন্য কোনো নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামি হুকুম-আহকামের উপর আমল করা যাবে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ الخ : আলোচ্য আয়াতগুলো সূরা আন্‌ফালের শেষ চারটি আয়াত। এগুলোতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজিরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজির মুসলমান ও অমুসলমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহকামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরিয়তের বিধি-বিধান বর্তায় তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত মুসলমান ও কাফের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম। যথা– ১. মুহাজির, যারা হিজরত ফরজ হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদিনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। ২. যারা কোনো বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোনো কারণে মক্কাতেই থেকে যান। পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্কে এ সবরকম লোকের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন; কিন্তু পিতা কাফেরই রয়ে গেল। কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন; কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাফের। তেমনিভাবে ভাই-ভাতিজা, নানা-মামা প্রমুখের অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজির-অমুহাজির মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো বলাই বাহুল্য।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তারই নিকটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন, অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর মালিকানাই আল্লাহ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সবকিছু আল্লাহ তা'আলার অধিকারে চলে যাওয়াটাই ছিল ন্যায়বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকর রূপ ছিল ইসলামি বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তা দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হতো। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার সন্তানসন্ততি, না পাবে আমার পিতামাতা, আর না পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াত এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোনো মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করতো। তার বেশি কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হতো না। বলা বাহুল্য, এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার আত্মীয়-স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হতো। এরই সঙ্গে সাথে ইসলাম সেই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতিও মীরাসের বণ্টনের ব্যাপারে লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানবজাতির সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত। এদিকে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, মু'মিন ও কাফের। কুরআনে উল্লিখিত আয়াত– خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ -এর মর্মও তাই।

এ দ্বি-বিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্ককে মিরাসের পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলমান কোনো কাফের আত্মীয়ের মিরাসের কোনো অংশ পাবে না এবং কোনো কাফেরেরও তার কোনো মুসলমান আত্মীয়ের মিরাসে কোনো অধিকার থাকবে না। প্রথমোক্ত দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বস্তুত এ নির্দেশটি চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজির ও আনসারদের মিরাস সংক্রান্ত অন্য একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানরা যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোনো মুহাজির মুসলমান তার অমুহাজির মুসলমান আত্মীয়দের উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজির কোনো মুসলমান মুহাজির মুসলমানের মিরাসের কোনো অংশ পাবে। বলা বাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্ত কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ঘোষণা করে দেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরতের হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটিও চিরস্থায়ী ও গায়রে মনসূখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কুরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি নাজিল হয়েছিল, যদি কোনো কালে কোনো দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেখানেও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরজে আইন' তথা অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে হাতেগোনা কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকি সব মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এরই লক্ষণ হয়ে পড়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজিরদের ইসলামও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজির অমুহাজিরদের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোনো দেশে আবারো এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে বসবাস করে যদি ইসলামি ফরায়েজ সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরজ হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোনো ওজর ব্যতীত হিজরত না করা নিশ্চিতভাবে যদি কুফরির লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই আরোপিত হবে। মুহাজির ও অমুহাজিরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজির ও অমুহাজিরদের মাঝে মিরাসী স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃত পক্ষে পৃথক কোনো হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানদের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এ কুফরির লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে কুফরির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজির মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজির মুসলমানদের নিকট কোনো রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজির মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজির মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে কাফেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি; বরং তাদের এই ইসলামি অধিকার এখনো বলবৎ রয়ে গেছে যে, তারা সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে-নুযূল মক্কা থেকে মদীনায় বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজির মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং কাফেরদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিল তা বলাই বাহুল্য। আর কুরআনে কারীম যখন মুহাজির মুসলমানদের প্রতি তাদের [অমুহাজির মক্কাবাসী মুসলমানদের] সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, যে কোনো অবস্থায়, যে কোনো জাতির মোকাবিলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে। এমন কি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কোনো যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামি নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজির মুসলমান যদি মুহাজির মুসলমানের নিকট এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে, তবে চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের মোকাবিলায় নিজেদের ভাইদের সাহায্য করাও জায়েজ নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে তুলনা করে দেখা যাক। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا .

অর্থাৎ সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের মুজাহিদবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে অর্থাৎ মদিনার আনসার মুসলমানগণ, এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে; কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোনোই সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কুরআনে কারীম وَلِيٌّ ও وِلَايَتٌ শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হলো বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত হাসান, কাতাদা ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে وِلَايَتٌ অর্থ উত্তরাধিকার এবং وَلِيٌّ অর্থ উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য-সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তাফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজির ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিশ হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে, আর না থাকবে সে সমস্ত মুসলমানদের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দীনি পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরীত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকি থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি, তখন মুহাজির ও অমুহাজিরদের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোনো কোনো ফিকহবিদ প্রমাণ করেছেন যে, দীনের পার্থক্যও যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ, তেমনিভাবে দেশের পার্থক্য তথা ভিনদেশী হওয়াও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফিকহ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ অর্থাৎ এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোনো অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দীনের হেফাজতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের সেসব মুসলমানের সাহায্য করা জায়েজ নয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদিনায় চলে যাবে হুজুর ﷺ তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সন্ধি-চুক্তিকালেই আবূ জান্দাল (রা.) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করেছিল, কোনো রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রাসূলুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মাপীড়া সত্ত্বেও উল্লিখিত আয়াতের হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারগতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত পীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত ﷺ আল্লাহর নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশি দিন নেই। তাছাড়া আর কটি দিন ধৈর্য ধারণের ছওয়াবও আবূ জান্দালের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী ﷺ কুরআনী নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। এটাই হলো ইসলামি শরিয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেওয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামন্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। وَلِيٌّ শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈষয়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদেরকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বণ্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইন প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতিম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্যে থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামি রাষ্ট্রেও সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাগে ইরশাদ হয়েছে- إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজির ও আনসারদের একে অপরের অভিভাবক হতে হবে, যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। **দ্বিতীয়ত** এখানকার মুহাজিরীন ও অমুহাজিরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকারের সম্পর্কে বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মুতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। **তৃতীয়ত** কাফেররা একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবকত্ব ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়।

বস্তুত এ সমস্ত নির্দেশের উপর যদি আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবত এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ এসব আয়াতের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কের চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোনো কাফের কোনো মুসলমানের এবং কোনো মুসলমান কোনো কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্খতাজনিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েজ নয়। এমনিভাবে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, কাফেররা একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃশ্যত এগুলোকে কতিপয় আনুষঙ্গিক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশান্তির জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহকাম তথা বিধিবিধান বর্ণনার পর এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণত অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হলো এই যে, তোমরা যদি এসব আহকামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্বময় বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিতও বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলারোধে এসব বিধিবিধানের বিশেষ প্রভাব ও অবদান রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদিনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফিরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো বা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করছে। তারপরেই বলা হয়েছে لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাঁদের জন্য মাগফিরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে- اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

চতুর্থ আয়াতে মুহাজিরদের বিভিন্ন শ্রেণির নির্দেশাবলি বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন এবং কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজির, যারা হুদায়িবিয়ার সন্ধির পরে হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্থিব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারিশ তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে- فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজিররাও তোমাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম সাধারণ মুহাজিরদেরই মতো।

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল। বলা হয়েছে-

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ আরবী অভিধানে أُولُو শব্দটি 'সাথী' অর্থে ব্যবহৃত হয়, যার বাংলা অর্থ হলো 'সম্পদ'। যেমন أُولُو الْعَقْلِ বুদ্ধিসম্পন্ন। أُولُوا الْأَمْرِ দায়িত্বসম্পন্ন। কাজেই أُولُوا الْأَرْحَامِ অর্থ হয়– গর্ভ-সাথী তথা সহোদর বা একই গর্ভসম্পন্ন; أَرْحَامٌ শব্দটি رَحِمٌ শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হলো সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই أُولُوا الْأَرْحَامِ আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুত আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয়; কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে فِي كِتَابِ اللَّهِ অর্থ فِي حُكْمِ اللَّهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নির্দেশবলে এ বিধান জারি হয়েছে। এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বণ্টন করা কর্তব্য। আর أُولُو الْأَرْحَامِ সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কুরআনে কারীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মিরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহলে ফারায়েজ' বা 'যাবিল ফুরূজ'। এদেরকে দেওয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করা কর্তব্য। তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোনো সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশ্বমানুষের মাঝেই বর্তমান, তাতে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দের দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মিরাস বণ্টনের কার্যকর ও বাস্তব রূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যাবিল ফুরূয'-এর অংশ দিয়ে দেওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির 'আসাবাগণ' অর্থাৎ পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর 'আসাবা'-এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়েজ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য 'যাবিল আরহাম' শব্দ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কুরআনে কারীমে বর্ণিত أُولُو الْأَرْحَامِ শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফুরূজ, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেওয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ তা'আলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মিরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'যাবিল ফুরূজ' বলা হয়। এছাড়া অন্যদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ অর্থাৎ যাদের অংশ স্বয়ং কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকে দিতে হবে যারা মৃত্যুর ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মিরাসের পরিভাষায় 'আসাবা'(عَصَبَة) বলা হয়। যদি কোনো মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর বাণী অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় 'যাবিল আরহাম'। যেমন মামা, খালাপ্রমুখ। সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামি উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজিরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোনো বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম, যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেওয়া ছিল।

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা তওবা, মদিনায় অবতীর্ণ

إِلَّا الْاٰيَتَيْنِ اٰخِرِهَا مِائَةٌ وَّثَلٰثُوْنَ اَوْ اِلَّا اٰيَةً

তবে শেষের দুই আয়াত বা এক আয়াত ব্যতীত সূরাটি মাদানী আয়াত ১৩০/১২৯

وَلَمْ تُكْتَبْ فِيْهَا الْبَسْمَلَةُ لِاَنَّهُ ﷺ لَمْ يَاْمُرْ بِذٰلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَاُخْرِجَ فِىْ مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْبَسْمَلَةَ اَمَانٌ وَهِىَ نَزَلَتْ لِرَفْعِ الْاَمْنِ بِالسَّيْفِ وَعَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّكُمْ تُسَمُّوْنَهَا سُوْرَةَ التَّوْبَةِ وَهِىَ سُوْرَةُ الْعَذَابِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّهَا اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ هٰذِهِ .

অনুবাদ :

এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি। কারণ হাকিম (র.) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল ﷺ এটার নির্দেশ দেননি। এই মর্মে একটি হাদীস হযরত আলী (রা.) হতেও বর্ণিত আছে যে, বিসমিল্লাহ হলো নিরাপত্তা মূলক আয়াত পক্ষান্তরে এই সূরা নাজিল হয়েছে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে কাফেরদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার বিষয়ে। হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই সূরাটিকে তোমরা সূরা তওবা নামে অভিহিত করে থাক; মূলত এটা হচ্ছে 'সূরাতুল আজাব'। বুখারী শরীফে হযরত বার্‌রা (রা) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা হলো কুরআন শরীফের সর্বশেষ নাজিল কৃত সূরা।

١. بَرَاۤءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاصِلَةٌ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ط عَهْدًا مُطْلَقًا اَوْ دُوْنَ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ اَوْ فَوْقَهَا وَنَقْضُ الْعَهْدِ بِمَا يُذْكَرُ فِىْ قَوْلِهٖ .

১. এটা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেই সমস্ত অংশীবাদীদের সাথে যাদের সাথে তোমরা সাধারণ বা অনির্ধারিত সময়ের বা চার মাসের কম সময়ের মেয়াদে বা তা অপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এদের সাথে নিম্নোক্ত বিবরণ অনুসারে চুক্তি বাতিল করা হলো।

٢. فَسِيْحُوْا سِيْرُوْا اٰمِنِيْنَ اَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَوَّلُهَا شَوَّالٌ بِدَلِيْلِ مَا سَيَاْتِىْ وَلَا اَمَانَ لَكُمْ بَعْدَهَا وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ لا اَىْ فَائِتِىْ عَذَابِهٖ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ مُذِلُّهُمْ فِى الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاُخْرٰى بِالنَّارِ .

২. অতঃপর হে মুশরিকগণ তোমরা পৃথিবীতে চারিমাস কাল নিরাপদে পরিভ্রমণ কর চলাফেরা কর। এর পর আর তোমাদের নিরাপত্তা নেই। নিম্ন বর্ণিত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই চারিমাসের শুরু হলো শাওয়াল হতে। জেনে রাখ যে তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না অর্থাৎ তাঁর আজাব ও শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারবে না। আর আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন। তিনি দুনিয়ায় তাদেরকে বধ করত এবং পরকালে জাহান্নামাগ্নিতে নিক্ষেপ করত লাঞ্ছিত করেন।

٣. وَأَذَانٌ إِعْلَامٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنَّ أَيْ بِأَنَّ اللّٰهَ بَرِيْءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَعُهُوْدِهِمْ وَرَسُوْلُهٗ بَرِيْءٌ أَيْضًا وَقَدْ بَعَثَ ﷺ عَلِيًّا مِنَ السَّنَةِ وَهِيَ سَنَةُ تِسْعٍ فَأَذَّنَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى بِهٰذِهِ الْاٰيَاتِ وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِنْ تُبْتُمْ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الْإِيْمَانِ فَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ وَبَشِّرِ أَخْبِرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ وَهُوَ الْقَتْلُ وَالْأَسْرُ فِي الدُّنْيَا وَالنَّارُ فِي الْاٰخِرَةِ.

৩. মহান হজের দিবসে অর্থাৎ ইয়াউমুননাহর জিলহজ মাসের দশম তারিখে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে মানুষের প্রতি এটা এক ঘোষণা যে, অংশীবাদীদের সম্পর্কে এবং তাদের চুক্তিসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও এই বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত। أَنَّ -এর পূর্বে একটি ب উহ্য রয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতসমূহ যে বৎসর অবতীর্ণ হয় সেই বৎসর অর্থাৎ হিজরি নবম বৎসরে রাসূল ﷺ এই ঘোষণা প্রদানের জন্য মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। তখন তিনি ইয়াউমুন নাহর দশম দিবসে মীনা ময়দানে এই আয়াতসমূহের ঘোষণা দেন। তিনি আরো ঘোষণা দেন যে, এই বৎসরের পর আর কোনো মুশরিক হজ করতে আসতে পারবে না এবং কেউ আর উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না। তোমরা যদি কুফরি হতে তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর তোমরা যদি ঈমান গ্রহণ করা হতে মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তির অর্থাৎ দুনিয়ার বধ ও বন্দী হওয়ার পর পরকালে জাহান্নামের সুসংবাদ অর্থাৎ সংবাদ দাও।

٤. إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا مِنْ شُرُوْطِ الْعَهْدِ وَلَمْ يُظَاهِرُوْا يُعَاوِنُوْا عَلَيْكُمْ أَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ فَأَتِمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلٰى انْقِضَاءِ مُدَّتِهِمْ الَّتِيْ عَاهَدْتُّمْ عَلَيْهَا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ بِإِتْمَامِ الْعُهُوْدِ.

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাফেরদের মধ্যে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের সাথে কৃত চুক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ রাখবে। আল্লাহ চুক্তি পূরণ করত যারা তাঁকে ভয় করে তাদেরকে ভালোবাসেন। لَمْ يُظَاهِرُوْا অর্থ– সাহায্য করেনি।

٥. فَإِذَا انْسَلَخَ خَرَجَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ وَهِيَ آخِرُ مُدَّةِ التَّأْجِيْلِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ فِيْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ وَخُذُوْهُمْ بِالْأَسْرِ وَاحْصُرُوْهُمْ فِي الْقِلَاعِ وَالْحُصُوْنِ حَتّٰى يَضْطَرُّوْا إِلَى الْقَتْلِ أَوِ الْإِسْلَامِ.

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে اِنْسَلَخَ অর্থ– অতিবাহিত হলো, চামড়া খসে পড়ল। অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদের শেষ হলে অংশীবাদীদেরকে হেরেম শরীফ বা তার বাইরে যে স্থানে পাবে বধ করবে, তাদেরকে বন্দী হিসেবে পাকড়াও করবে, কিল্লা ও দুর্গসমূহে অবরোধ করে রাখবে, যাতে তারা ইসলাম বা নিহত হওয়া এই দুইটির একটি গ্রহণের জন্য বাধ্য হয়ে উঠে।

وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ج طَرِيْقٍ يَسْلُكُوْنَهُ وَنُصِبَ كُلَّ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ فَإِنْ تَابُوْا مِنَ الْكُفْرِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ط وَلَا تَتَعَرَّضُوْا لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ لِمَنْ تَابَ .

كُلَّ مَرْصَدٍ প্রত্যেক ঘাটিতে অর্থাৎ তাদের চলার পথে মَنْصُوْبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ-এই স্থানে كُلَّ শব্দটি অর্থাৎ جَرّ কাসরা দানকারী অক্ষরটির প্রত্যাহারের ফল مَنْصُوْب অর্থাৎ ফাতাহযুক্ত হয়েছে। তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে। তবে তারা যদি কুফরি হতে তওবা করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে। এদের পিছনে পড়বে না। যারা তওবা করে তাদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٦. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ اسْتَجَارَكَ اِسْتَامَنَكَ مِنَ الْقَتْلِ فَأَجِرْهُ أَمِنْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ط أَيْ مَوْضِعَ أَمْنِهِ وَهُوَ دَارُ قَوْمِهِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنْ لِيَنْظُرَ فِيْ أَمْرِهِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُوْنَ دِيْنَ اللّٰهِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ سَمَاعِ الْقُرْاٰنِ لِيَعْلَمُوْا .

৬. অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে হত্যা হতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে إِنْ أَحَدٌ-এটা مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ অর্থাৎ এমন একটি উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্থানে مَرْفُوْعٌ অর্থাৎ পেশযুক্ত হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়া اِسْتَجَارَكَ যার প্রতি ইঙ্গিতবহ। তুমি তাকে আশ্রয় দিবে নিরাপত্তা দিবে যাতে সে আল্লাহর বাণী আল-কুরআন শুনতে পায়। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে অর্থাৎ সে যদি ঈমান গ্রহণ না করে তবে স্বীয় বিষয়ে বিবেচনা করে দেখার জন্য তাকে তার কবীলার মাঝে পৌছিয়ে দিবে। তা উল্লিখিত বিধান এই জন্য যে, তারা আল্লাহর দীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোক। সুতরাং জানার জন্য কুরআনের পাঠ শ্রবণ তাদের কর্তব্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আলী (রা.)-এর উক্তির সমর্থন করা।

قَوْلُهُ هٰذِهِ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, بَرَاءَةٌ টা هٰذِهِ উহ্য মুবতাদার খবর। এর দ্বারা সে সকল লোকের অভিমতের খণ্ডন হয়ে গেল যারা বলেন যে, بَرَاءَةٌ হলো মুবতাদা। আর إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ الخ হলো بَرَاءَةٌ-এর খবর। কেননা بَرَاءَةٌ হলো نَكِرَه; যার মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَاصِلَةٌ : মুফাসসির (র.) وَاصِلَةٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنَ اللّٰهِ-এর مِنْ টা হলো اِبْتِدَائِيَّة যা উহ্য وَاصِلَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ- هٰذِهِ بَرَاءَةٌ وَاصِلَةٌ إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

قَوْلُهُ فَسِيْحُوْا الخ : এখানে قُوْلُوْا উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- فَقُوْلُوْا لَهُمْ سِيْحُوْا ; سِيْحُوْا-এর মধ্যে أَمْر-টা ইজাজতের জন্য। অর্থাৎ তোমাদের শুধুমাত্র চার মাস পর্যন্ত নিরাপত্তার সাথে এখানে অবস্থানের অনুমতি রয়েছে।

قَوْلُهُ بِدَلِيْلِ مَا سَيَاتِيْ : এখানে أَمْر-টা ইজাজত ও ইবাহাতের জন্য। তার দলিল হলো আগত আয়াত فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ কেননা আল্লাহর বাণী- فَسِيْحُوْا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ এটা শাওয়াল মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর হারাম মাসসমূহের শেষ মাস হলো মুহাররম। শাওয়ালের শুরু হতে মুহাররমের শেষ পর্যন্ত চার মাস হয়।

قَوْلُهُ يَوْمَ النَّحْرِ : প্রশ্ন. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ-এর তাফসীর يَوْمَ النَّحْرِ দ্বারা কেন করা হলো?

উত্তর. ওমরাকে যেহেতু حَجٌّ اَصْغَرٌ বলে তাই হজকে ওমরা থেকে পৃথক করার জন্য حَجّ -এর তাফসীর يَوْمَ النَّحْرِ দ্বারা করে দিয়েছেন। কেননা يَوْمَ النَّحْرِ হজের মধ্যেই হয়ে থাকে, ওমরাতে নয়। তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, حَجّ اَكْبَرْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজ।

قَوْلُهُ بَرِئٌ اَيْضًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رَسُوْلُهٗ হলো মুবতাদা আর بَرِئٌ তার খবর উহ্য রয়েছে। اَيْضًا শব্দ দ্বারা এই উপকার হলো যে, رَسُوْلُهٗ -এর আতফ بَرِئٌ -এর উহ্য যমীরের উপর হয়েছে। اَنَّ -এর اِسْم -এর مَحَلّ -এর উপর হয়নি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, اَنَّ -এর اِسْم -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف হয়েছে। আর তা উহ্য بَاء -এর অধীনে হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে। মূলত তা مَرْفُوْع

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ : এতে দু'টি সুরত রয়েছে। প্রথম সুরত হলো اِلَّا الَّذِيْنَ -কে مُسْتَثْنٰى স্বীকৃতি দেওয়া হবে আর اِلَّا টা لٰكِنْ অর্থে হবে। এই সুরতে فَالَّذِيْنَ হলো মুবতাদা এবং فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ বাক্য হয়ে মুবাতাদার খবর হবে। দ্বিতীয় সুরত হলো اِلَّا الَّذِيْنَ -কে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ বলা হবে তখন এই সুরতে بَرَاۤءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -এর মধ্যে উল্লিখিত اَلْمُشْرِكِيْنَ থেকে مُسْتَثْنٰى হবে। কিন্তু এই সুরতে مُشْرِكِيْنَ خَاصّ فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيْ আবশ্যক হবে, যা নিষিদ্ধ। আর যদি اَلْمُشْرِكِيْنَ -এর اَلِفْ وَلَامْ -কে عَهْدِيْ ধরা হয় তবে দ্বারা ঐ মুশরিকগণ উদ্দেশ্য হবে যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনি।

قَوْلُهُ وَهِيَ مُدَّةُ التَّاجِيْلِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَشْهُرٌ حُرُمٌ দ্বারা প্রসিদ্ধ اَشْهُرُ الْحُرُمِ উদ্দেশ্য নয়। যা হলো রজব, জিলকদ; জিলহজ এবং মুহাররম; বরং اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ দ্বারা সেই চার মাস উদ্দেশ্য যাতে মুশরিকদের অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, উদ্দেশ্য হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণের সময় যে চারমাস পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এভাবে যে, শাওয়াল থেকে নিয়ে মুহাররমের শেষ পর্যন্ত মক্কার মুশরিকদের অবস্থানের অনুমতি রয়েছে। এরপর যদি কাউকে পাওয়া যায় তবে তাকে গ্রেফতার করা হবে এবং হত্যা করা হবে। اَشْهُرٌ حُرُمٌ দ্বারা এই চার মাসই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَرْفُوْعٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهٗ اسْتَجَارَكَ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ -এর মধ্যে اِنْ -টা اِسْم -এর উপর প্রবেশ করেছে। অথচ اِنْ টা اِسْم -এর উপর প্রবেশ করে না

উত্তর. এখানে اِنْ -এর পরে اِسْتَجَارَكَ ফে'ল উহ্য রয়েছে এবং এর তাফসীর করছে পরবর্তী وَاِلَّا اسْتَجَارَكَ বাক্যটি। সুতরাং এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা তওবা প্রসঙ্গে : আবূ আতীয়া হামদানী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) একটি ফরমানে লিখেছিলেন, "তোমরা নিজেরা সূরা তওবা শিখ আর তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও।" এর কারণ, সূরা তওবাতে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, আর সূরা নূরে পর্দা প্রথা প্রচলনের তাগিদ করা হয়েছে। প্রথমে পুরুষদের, পরে স্ত্রীলোকদের কর্তব্য পালনের নির্দেশ রয়েছে।

এই সূরার নাম : এই সূরার একাধিক নাম রয়েছে–

১. বারাআত : কেননা এই সূরায় কাফেরদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

২. তওবা : কেননা এই সূরায় মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার কথা রয়েছে।

৩. মোকাশকাশা : অর্থাৎ মুনাফেকী থেকে ঘৃণা সৃষ্টিকারী, আবূ শেখ এবং ইবনে মরদবিয়া জায়েদ ইবনে আসলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন মোকাশকাশা নামকরণের কারণ হলো এই সূরায় মুনাফিকীর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে।

৪. মুবায়ছিরা : এই নামকরণের কারণ সম্পর্কে ইবনুল মুনজের মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন : যেহেতু মানুষের মনের গোপন রহস্য এতে প্রকাশ করা হয়েছে এই জন্য তাকে মুবায়ছিরা বলা হয়েছে।

৫. আল বাহুস : এই নাম ইবনে আবী হাতেম তাবারানী এবং হাকেম আবূ রুশদ হাব্বানীর সূত্রে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের তরফ থেকে লিখেছেন।

৬. আল মাসীরা : এই নাম ইবনুল মুনযির আবুশ শেখ এবং ইবনে আবী হাতেম কাতাদার সূত্রে লিখেছেন। এই নামকরণের কারণ হলো এই সূরায় মুনাফিকদের রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে।

৭. মুনকিল : [আজাব বিশিষ্ট]।

৮. মুদামদিমা [ধ্বংস আনয়নকারী]

৯. সূরাতুল আজাব : এই নামকরণ করেছেন হযরত হুযায়ফা (রা.)। তিনি বলেছেন, তোমরা যে সূরাকে সূরা তওবা বল তা আসলে সূরাতুল আজাব, আল্লাহর শপথ! এমন কেউ নেই যার উপর এই সূরা প্রতিক্রিয়া করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর (রা.) এই সূরাকে সূরাতুল আজাব বলতেন।

১০. আলফাদিহা : [মুনাফিকদেরকে] অবমাননাকারী। আল্লামা বগভী (রা.) লিখেছেন, সাঈদ ইবনে যোবাইর (রা.) বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললাম, সূরা "তওবা", তিনি বললেন, এই সূরায় মানুষকে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৭৯-৮০]

১১. মুশাররিদাহ

১২. মুখযিয়াহ

এই সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' নেই কেন? : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ওসমান (রা.) -কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, সূরা তওবার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" নেই কেন? হযরত ওসমান (রা.)-এর কারণ বর্ণনা করলেন যে, সূরা আনফাল হিজরতের প্রথম দিকে নাজিল হয় আর সূরা তওবা শেষের দিকে নাজিল হয়। পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা বা কোনো আয়াত যখন নাজিল হতো তখন প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই আদত মোবারক ছিল যে, তিনি বলতেন– অমুক সূরার পর এই সূরা এবং অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর এই আয়াত বসবে। আর বিভিন্ন সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিপিবদ্ধ করার কথাও বলতেন।

সূরা আনফাল এবং সূরা তওবার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য। আর এ কারণে সূরা আনফালের পাশে রাখা হয়েছে সূরা তওবা। হুজুর ﷺ সুস্পষ্ট ভাষায় বলেননি যে, এর শুরুতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ কর। এ কারণে সাধারণত মনে করা হয়েছে সূরা তওবা কোন স্বতন্ত্র সূরা নয়; বরং সূরা আনফালেরই পরিশিষ্ট। কিন্তু সূরা তওবার আয়াতসমূহ কোন সূরার কোন আয়াতের পর বসবে? এ নির্দেশও প্রিয়নবী ﷺ দেননি। ফলে ধারণা করা হয়েছে যে, এটি একটি স্বতন্ত্র সূরা। এ কারণে সূরা তওবা এবং সূরা আনফালের মধ্যস্থলে ফাঁক রাখা হয়েছে, যেন এই সূরাকে সূরা আনফালের অংশ মনে না করা হয়। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এই দু'টি সূরার ব্যাপারে মতভেদ ছিল। কেউ বলেছেন, দু'টি স্বতন্ত্র সূরা আর কেউ এই অভিমতও প্রকাশ করেছেন দু'টি মিলে এক সূরা। অতএব, যারা বলেন যে, তওবা এবং আনফাল দু'টি সূরা তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দু' সূরার মধ্যে ফাঁক রাখা হয়েছে। আর যারা বলেন যে, উভয়টিই আসলে এক সূরা তাদের মতের প্রতি লক্ষ্য করে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি আপনারা সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ কেন লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি বলেছেন, বিসমিল্লাহতে রয়েছে শান্তি এবং নিরাপত্তা, আর এই সূরাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারি ব্যবহারের আদেশ রয়েছে এজন্য বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হয়নি যেন আল্লাহ পাকের গজবের নিদর্শন প্রতিভাত হয়।

ইমাম কুসাইরী বর্ণনা করেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, এই সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ এ জন্য লিপিবদ্ধ হয়নি যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নিয়ে অবতরণ করেননি যা সাধারণত নিয়ম ছিল। প্রত্যেক সূরার শুরুতেই বিসমিল্লাহ নাজিল হতো যেন অন্য সূরা থেকে পার্থক্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ নাজিল হয়নি, তাই পবিত্র কুরআন সংকলনের সময় সূরা তওবার শুরুতে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের তরফ থেকে বিসমিল্লাহ সংযোজন করেননি। অন্য সূরার শুরুতে প্রিয়নবী ﷺ বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করার আদেশ দিতেন, কিন্তু সূরা তওবার ব্যাপারে বিসমিল্লাহ লেখার আদেশ দেননি।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, সমস্ত আয়াত এবং সূরার তরতীব অর্থাৎ কোন সূরার পরে কোন সূরা বসবে এবং কোন আয়াতের পরে কোন আয়াত থাকবে এই সবও আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর তরফ থেকেই হয়েছে ; এ সম্পর্কে অন্য কারো মত বা ইচ্ছার কোনো প্রশ্নই উত্থিত হয় না। এজন্যই হুজুর ﷺ সূরা আনফালের পরে সূরা তওবা লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সূরা তওবার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ না হওয়াও আল্লাহ পাকের ওহী মোতাবেকেই হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম তারই অনুসরণ করেছেন। −[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ২৭৭, ফাতহুল বারী খ. ৮, পৃ. ২৩৫]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আনফালে বদর যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত এবং বনু কোরায়যার ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এই সূরার শেষে কাফেরদের সাথে সন্ধি করার অনুমতির বিবরণ রয়েছে। এর পাশাপাশি জেহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ও অস্ত্রসস্ত্র সংগ্রহেরও নির্দেশ রয়েছে।

কাফেরদের সাথে সন্ধি করার অনুমতি থাকলেও জিহাদ অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুসলমানদের পরস্পরের সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বভাবকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ রয়েছে। জাতীয় ঐক্য, সংহতি এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে অটুট রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আর এই সূরায় মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা রয়েছে। এর পাশাপাশি ইসলামের দুশমনদের ব্যাপারে বিশেষত চুক্তি ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে কিছু বিধান পেশ করা হয়েছে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এরপর মক্কা বিজয় এবং তাবুকের যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের প্রতি তিরস্কারও রয়েছে। মোটকথা হলো সূরা আনফাল ও সূরা তওবা উভয় সূরায়ই জিহাদের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। তাই উভয় সূরার বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ সামঞ্জস্য।

দ্বিতীয়ত সূরা আনফালের শেষে মুমিনদের পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের কথা বলা হয়েছে, আর সূরা তওবার শুরুতেই ইসলামের দুশনদের ব্যাপারে অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুশরিকরা হলো নিতান্ত অপবিত্র। তাই মসজিদুল হারামের নিকটেও যেন তারা না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা মুসলমানদের কর্তব্য। সূরা আনফালের শেষে মুসলমানদের প্রতি এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যেন তারা পরস্পরে এক, অভিন্ন অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে। আর সূরা তওবার শুরুতে এই আদেশ হয়েছে− মুসলিম জাতির কর্তব্য হলো কাফের মুশরিকের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কুফর ও শিরকের উপর অসন্তুষ্টি এবং ঘৃণা সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

শানে নুযূল : এই সূরা তাবুকের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাবুকের যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হন তখন মুনাফিকরা বিভিন্ন প্রকার ভিত্তিহীন খবর এবং গুজব রটাতে থাকে যেন মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ -এর সাথে যেসব চুক্তি করেছিল এই সুযোগে তারা ঐ চুক্তিসমূহ ভঙ্গ করা শুরু করে। মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মুসলমানগণ তাবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না। প্রিয়নবী ﷺ মদিনা শরীফ থেকে প্রায় চার'শ মাইল দূরে অত্যন্ত গরমের মৌসুমে রমজান মাসে ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে তাবুকের দিকে রওয়ানা হন। তখন এই সূরা নাজিল হয়। আল্লাহ পাক এই সূরায় তাঁর প্রিয়নবী ﷺ -কে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদের এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেন এবং তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারনামা তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন− وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ অর্থাৎ যদি কোনো সম্প্রদায়ের তরফ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের ভয় করা হয় তবে তাদেরকে অঙ্গীকারনামাটি ফেরত দাও।

সূরা তাওবার বৈশিষ্ট্য : সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআন মজীদে এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয় না, অথচ অন্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়। এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন মজীদ তেইশ বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাজিল হয়। এমন কি একই সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হযরত জিবরীলে আমীন 'ওহী নিয়ে এলে আল্লাহর আদেশ মতে কোন সূরার কোন আয়াতের পর অত্র আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী লেখকদের দ্বারা তা লিখিয়ে নিতেন।

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাজিল হতো। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হলো, অতঃপর অপর সূরা শুরু হলো। কুরআন মাজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা

তওবা সর্বশেষে নাজিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ নাজিল হয়, আর না রাসূলুল্লাহ ﷺ তা লিখে নেওয়ার জন্য ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়।

কুরআন সংগ্রাহক হযরত উসমান গনী (রা.) স্বীয় শাসনামলে যখন কুরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখেলাফ সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোনো সূরা নয়; বরং অন্য কোনো সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সূরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আন্‌ফালের অংশ বলাই সঙ্গত।

হযরত উসমান (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ -এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাতাইন বা মিলিত সূরা বলা হতো। -[মাযহারী] সেজন্য একে সূরা আন্‌ফালের পর স্থান দেওয়া হয়। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আনফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কুরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আনফালের শেষে এবং সূরা তওবার শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ'-এর স্থান হয়।

সূরা বারাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার এ তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবূ দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইমাম আহমদে স্বয়ং হযরত উসমান গনী (রা.) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসিরে কুরআন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত উসমান গনী (রা.)-কে প্রশ্নও করেছিলেন যে, যে নিয়মে কুরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসম্বলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়। পরিভাষায় যাদের বলা হয় 'মিঃঈন' অতঃপর রাখা হয় শতের কম আয়াত সম্বলিত সূরাগুলো যাদের বলা 'মাসানী' এরপর স্থান দেওয়া হয় ছোট সূরাগুলোকে যাদের বলা হয় 'মুফাস্‌সালাত'। কুরআন সংকলনের এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আনফালের আগে স্থান দেওয়া কি উচিত ছিল না? কারণ, সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের অধিক। আর সূরা আনফালের আয়াতসংখ্যা শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে আয়াতের সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে, যাদের سَبْعِ طِوَالْ বলা হয়, তদনুসারে আনফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখেলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত উসমান গনী (রা.) বলেন, কথাগুলো সত্য কিন্তু কুরআনের বেলায় যা করা হলো, তা সাবধানতার খাতিরে। কারণ বাস্তবে সূরা তওবা যদি স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আনফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই ওহীর ইঙ্গিত ব্যতীত আনফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেওয়া আমাদের পক্ষে বৈধ হবে না। আর এ কথাও সত্য যে ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসেনি। তাই আনফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোনো সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা। এ কারণেই আমাদের ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আনফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, সেই বিসমিল্লাহ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াতকালে কোনো অবস্থায় বিসমিল্লাহ পাঠ জায়েজ নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু, এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ-এর স্থলে তারা اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ। পাঠ করে। এর কোনো প্রমাণ হুজুর ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক হযরত আলী (রা.) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহতে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম, কিন্তু সুরা তওবায় কাফেরদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সূক্ষ্ম তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থি নয়। মূল কারণ হলো, তওবা ও আনফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হ্যাঁ, উপরিউক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে যে, এ সূরায় কাফেরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেওয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ' সঙ্গত নয়। তাই কুদরতের পক্ষ থেকে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করে দেওয়া হয় যাতে বিসমিল্লাহ লিখিত হয়।

সূরা তওবার উপরিউক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্মোপলব্ধির জন্য যে ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেওয়া আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো–

১. সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলি এবং এ প্রসঙ্গে অনেক হুকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হলো অষ্টম হিজরি সালের মক্কা বিজয়। অতঃপর এ বছরেই সংঘটিত হয় হুনাইন যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরির রজব মাসে। তারপর এ সালের জিলহজ্ব মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

২. চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলো আয়াতে উল্লিখিত আছে, তার সারমর্ম হলো, ষষ্ঠ হিজরি সালে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত ﷺ -কে মক্কা প্রবেশ বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হুদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। তাফসীরে 'রূহুল-মাআনীর বর্ণনা মতে এই মেয়াদকাল ছিল দশ বছর। মক্কার কুরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কুরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কুরাইশদের মিত্র অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিত্র হয়ে তার সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে খোযাআ গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এবং বনূবকর গোত্র কুরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হলো, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোনো যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরিতে। সপ্তম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গত বছরের ওমরা কাজা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিনদিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মুতাবিক মদিনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোনো পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনূবকর গোত্র বনূ খোযাআর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কুরাইশরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থান বহুদূরে, তদুপরি এ হলো নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনূবকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে, যা কুরাইশরাও স্বীকার করে নিয়েছিল, হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি ছিল।
ওদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিত্র বনূ খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহুদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়বি সাহায্য লাভের বিষয়টি কুরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তিভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। চুক্তিভঙ্গের সংবাদ নবীজী ﷺ -এর কাছে পৌঁছার পর পূর্ণ নীরবতা লক্ষ্য করে এ আশঙ্কা আরো ঘনিভত হলো। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মদিনায় প্রেরণ করে। যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবূ সুফিয়ান মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুদ্ধ-প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হুজুর ﷺ -এর কাছে চুক্তিটি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাঁদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলির তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথাটি নাকচ করে দেন। ফলে আবূ সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

'বিদায়া' ও ইবনে কাসীর' -এর বর্ণনা মতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ অষ্টম হিজরির দশই রমজান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

মক্কা বিজয়কালের উদারতা : কুরাইশদের যে সকল নেতা ইসলামের সততায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু লোকজনের ভয়ে তা প্রকাশ করতেন না, তারা মক্কা বিজয়ের এ সুযোগ ইসলাম গ্রহণ করে নেন, যারা সেসময়ও নিজেদের পূর্বতন কুফরি ধর্মের উপর অবিচল ছিল, তাদের মধ্যে থেকে কতিপয় লোক ছাড়া বাকি সকলের জানমালের নিরাপত্তা দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গাম্বরী আদর্শের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা প্রতিপক্ষ থেকে মোটেই আশা করা যায় না। তিনি সেদিন কাফেরদের সকল শত্রুতা, জুলুম ও অত্যাচারের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন, আজ তোমাদের সে কথাই বলব, যা হযরত ইউসুফ (আ.) আপন ভাইদের বলেছিলেন, যখন তারা পিতামাতা সহকারে ইউসুফের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে মিশর পৌঁছেন। তিনি তখন বলেছিলেন– لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। [প্রতিশোধ নেওয়া তো পরের কথা]।

মক্কা বিজয়কালে মুশরিকদের চার শ্রেণি ও তাদের ব্যাপারে হুকুম আহকাম : সারকথা, মক্কা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ে। মক্কা ও তার আশপাশে অবস্থানকারী অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু সে সময় অমুসলমানেরা ছিল অবস্থানপাতে বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত। এদের এক শ্রেণি হলো, যাদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয় এবং যারা পরে চুক্তি লঙ্ঘন করে। বস্তুত এ চুক্তি লঙ্ঘনই মক্কা আক্রমণ ও বিজয়ের কারণ হয়। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো যাদের সাথে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। এরা সে চুক্তির উপর বহাল থাকে। যেমন বনূ কিনানার দু'টি গোত্র, বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ। তাফসীরে খাযিন-এর বর্ণনা মতে সূরা বারাআত নাজিল হওয়ার সময় এদের চুক্তির মেয়াদকাল আরো নয় মাস বাকি ছিল। তৃতীয় শ্রেণি হলো, যাদের সাথে সন্ধি হয়েছিল কোনো মেয়াদকাল নির্দিষ্ট করা ব্যতীত। চতুর্থ হলো, যাদের সাথে আদৌ কোনো চুক্তি হয়নি।

মক্কা বিজয়ের আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিক বা আহলে কিতাবদের সাথে যতগুলো চুক্তি করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে তিনি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে, ওরা গোপনে ও প্রকাশ্যে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে এবং শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল ধারাবাহিক তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ও আল্লাহর ইঙ্গিতে এ সিদ্ধান্ত নেন যে, ভবিষ্যতে এদের সাথে সন্ধির আর কোনো চুক্তি সম্পাদন করবেন না এবং আরব উপদ্বীপটিকে ইসলামের দুর্গ হিসেবে শুধু মুসলমানদের আবাসভূমিতে পরিণত করবেন। এ উদ্দেশ্যে মক্কা নগরী তথা আরব ভূখণ্ড মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর অমুসলমানদের প্রতি আরব ভূমি ত্যাগের নোটিশ দেওয়া যেত। কিন্তু ইসলামের উদার ও ন্যায়নীতি সর্বোপরি রাহমাতুললীল আলামীন ﷺ -এর অপরিসীম দয়া ও সহিষ্ণুতার প্রেক্ষিতে তাদের সময় দেওয়া ব্যতীত ভিটামাটি ত্যাগের নির্দেশ দান ছিল বেমানান। সে কারণে সূরা বারাআতের শুরুতে উপরিউক্ত চার শ্রেণির অমুসলমানদের জন্য পৃথক পৃথক হুকুম-আহকাম নাজিল হয়।

কুরাইশ বংশীয় লোকেরা হলো প্রথম শ্রেণিভুক্ত। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিকে এরাই লঙ্ঘন করেছে। তাই ওরা অধিক সময় পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু সময়টি ছিল নিষিদ্ধ মাসগুলোর, যাতে কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহ অবৈধ। তাই সূরা তওবার পঞ্চম আয়াতে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়– فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ যার সারকথা হলো, এরা চুক্তি লঙ্ঘন করে নিজেদের কোনো অধিকার বাকি রাখেনি। তবে নিষিদ্ধ মাসের মর্যাদা আবশ্যক। অতএব এরা নিষিদ্ধ মাস শেষ হতেই যেন আরব ভূখণ্ড ত্যাগ করে কিংবা মুসলমান হয়ে যায়। নতুবা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

যে লোকদের সাথে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি হয় এবং তারা এর উপর অবিচলও থাকে, তারা হলো দ্বিতীয় শ্রেণির। তাদের সম্পর্কে সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে–

اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ الخ .

"কিন্তু যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ এবং যারা চুক্তি পালনে কোনো ত্রুটি করেনি, আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো লোকের সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি পালন করে চল তাদের মেয়াদকাল পর্যন্ত, 'নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।' এরা হলো বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ গোত্রীয় লোক। এ আদেশ বলে তারা নয় মাসের সময় লাভ করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ব্যাপারে হুকুম আছে এ সূরার প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে। সেখানে বলা হয়– بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ الخ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ। তাদের জানিয়ে দাও যে, তোমরা এ দেশে আর মাত্র চার মাসকাল বিচরণ কর আর মনে রেখ, তোমরা কখনো আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না। আর আল্লাহ নিশ্চয় কাফেরদের লাঞ্ছিত করে থাকেন।

সারকথা, প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াত মতে মেয়াদ ধার্য করা ব্যতীত যাদের সাথে চুক্তি হয়, কিংবা যাদের সাথে কোনো চুক্তিই হয়নি, তারা চার মাসকাল সময় লাভ করে। চতুর্থ আয়াত মতে যাদের সাথে মেয়াদ ধার্য করে চুক্তি হয় তারা মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সময় পায়। আর পঞ্চম আয়াত মতে নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত মক্কার মুশরিকদের সময় দেওয়া হয়।

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় দেওয়ার উদারনীতি : ইসলামের উদারনীতি মতে উপযুক্ত আদেশাবলির প্রয়োগ ও সময় দান এ দু'য়ের শুরু সাব্যস্ত করা হয়। আরবের সর্বত্র এ সকল ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর থেকে, আর এগুলোর

প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয় নবম হিজরির হজের মৌসুমে মিনা আরাফাতের সাধারণ সম্মেলনসমূহে। সূরা তওবার তৃতীয় আয়াতে কথাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়। أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ الخ অর্থাৎ আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও, যদি তোমরা তওবা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখ তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর এই কাফেরদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

চুক্তি বাতিলের খোলা প্রচার ও হুঁশিয়ারি দান ব্যতীত কাফেরদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না : আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ নবম হিজরির হজ মৌসুমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করে আরাফাতের মাঠ ও মিনাপ্রান্তরে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর সম্মেলনে আল্লাহর ঘোষণাটি প্রচার করেন। এ বিরাট সম্মেলনে যে কথা প্রচারিত হয়, তা আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যায়। এ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.)-এর মাধ্যমে ইয়েমেনে তা পুনঃ প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এ সাধারণ ঘোষণার পর প্রথম শ্রেণিভুক্ত মক্কার মুশরিকদের পক্ষে নিষিদ্ধ মাসগুলোর শেষ অর্থাৎ দশম হিজরির মহররম মাস, দ্বিতীয় শ্রেণির পক্ষে একই হিজরির রমজান মাস এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পক্ষে উক্ত হিজরির রবিউস্‌সানী গত হলে আরবভূমি ত্যাগ করার বিধান ছিল। নতুবা তারা যুদ্ধের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ আদেশ অনুযায়ী হজের আগামী মৌসুমে আরবের সীমানায় কোনো কাফের মুশরিকের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। এ কথাটি সূরা তওবার ২৮ তম আয়াতে ব্যক্ত করা হয় এরূপে فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا অর্থাৎ চলতি সনের পর এরা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ "এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করবে না" এর মর্মার্থও তাই। এ পর্যন্ত সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতের তাফসীর ঘটনাবলির আলোকে বর্ণিত হলো।

উক্ত আয়াতসমূহের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কুরাইশ ও অপরাপর শত্রু ভাবাপন্ন গোত্রের সাথে ক্ষমা মার্জনা ও দয়া-মায়ার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার দ্বারা মুসলমানদের এ শিক্ষা দেন যে, যখন তোমাদের কোনো শত্রু তোমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন তার থেকে বিগত শত্রুতার প্রতিশোধ নেবে না; বরং তাকে ক্ষমা করে ইসলামি আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। শত্রুর সাথে ক্ষমার আচরণে যদিও মন সায় দেয় না, তথাপি এতে লুক্কায়িত আছে বড় ধরনের কতিপয় মঙ্গল এ মঙ্গল প্রথমে নিজের জন্য। কারণ প্রতিশোধ নেওয়ার মাঝে নফসের আনন্দ থাকলেও তা ক্ষণিকের। কিন্তু ক্ষমার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যে উচ্চ দরজা লাভ করা যায় তা স্থায়ী, এর মূল্যও অসীম। স্থায়ী ক্ষণস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

২. শত্রুকে কাবু করার পর নিজের রাগ সংবরণ একথা প্রমাণ করে যে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, বরং তা শুধু আল্লাহর জন্য। এ মহান উদ্দেশ্য ইসলামি জিহাদ ও ফাসাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়ার বুকে তাঁর শাসন জারি করার জন্য যে যুদ্ধ, তার নাম জিহাদ, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই ফাসাদ।

৩. শত্রু পরাস্ত হওয়ার পর সে যদি মুসলমানদের ক্ষমা-মার্জনার এ অনুপম আদর্শ প্রত্যক্ষ করে তবে সে ভদ্রতার খাতিরে হলেও মুসলমানদের ভালোবাসবে। আর এ ভালোবাসা দেবে তাকে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা, যা হবে তার জন্য সফলতার চাবিকাঠি। মূলত এটিই জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ক্ষমা করার অর্থ নিরাপত্তাবিহীনতা হওয়া নয় : দ্বিতীয় যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হলো, ক্ষমা-মার্জনার অর্থ এই নয় যে, শত্রুকে শত্রুতার সুযোগ দেবে এবং নিজের জন্য নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেবে না; বরং বিচক্ষণতা হলো, ক্ষমা-মার্জনার সাথে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ ও শত্রুতার সকল ছিদ্র বন্ধকরণ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বড় হিকমতপূর্ণ ইরশাদ করেছে- لَا يُلْدَغُ الْمَرْءُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ "বুদ্ধিমান মানুষ এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না।" নবম হিজরি সালে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা এবং হরম শরীফের সীমানা ত্যাগের জন্য তাদের সময় এ সুযোগদান উপরিউক্ত প্রজ্ঞাসম্মত কার্যক্রমের প্রমাণ বহন করে। তৃতীয় বিষয় হলো, সময় সুযোগ দান ব্যতীত দুর্বল মানুষের প্রতি হঠাৎ দেশত্যাগের আদেশ দেওয়া কাপুরুষতা ও চরম অভদ্রতা। তাই কাউকে দেশত্যাগের আদেশ দিতে

গেলে প্রথমে তার প্রচার আবশ্যক এবং তাকে সময়ও সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে সে আমাদের আইন-কানুন মেনে নিতে রাজি না হলে যেখানে ইচ্ছা সহজে চলে যেতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত নবম হিজরির সাধারণ ঘোষণা এবং সকল শ্রেণিকে সময় দানের দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

৪. কোনো জাতির সাথে সন্ধি চুক্তি করার পর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তা বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে তা বাতিল অবশ্য করা যায়, কিন্তু উত্তম হলো চুক্তি তার নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত পালন করে যাওয়া। যেমন– সূরা তওবার চতুর্থ আয়াতে বনূ যমারা ও বনূ মুদলাজ গোত্রের সাথে কৃত চুক্তি নয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ করার বর্ণনা রয়েছে।

৫. শত্রুদের সাথে প্রতিটি আচরণ মনে রাখতে হবে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, শত্রুতা তাদের সেই কুফরি আকিদা বিশ্বাসের সাথে, যা তাদের ইহ-পরকাল ধ্বংসের কারণ। বস্তুত এর মূলে রয়েছে তাদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি ও সহমর্মিতা। তাই যুদ্ধ বা সন্ধির যে কোনো অবস্থায় সহানুভূতিভাব ত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন এ সকল আয়াতে বারংবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি তওবা কর, তবে তা হবে তোমাদের জন্য উভয় জাহানে কল্যাণকর। কিন্তু তওবা করা না হলে শুধু দুনিয়ায় নিহত ও ধ্বংস হবে যাকে বহু কাফের জাতি কৃতিত্ব হিসেবেও গ্রহণ করে নেয়, তা নয়; বরং নিহত হওয়ার পর পরকালীন আজাব থেকে নিস্তার পাবে না। উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে সতর্কতার ঘোষণার সাথে নসিহত এবং হিতাকাঙ্খারও আমেজ রয়েছে।

৬. চুতর্থ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি যেমন মেয়াদকাল পর্যন্ত সন্ধিচুক্তি পালনের আদশে রয়েছে, তেমনি তার শেষ ভাগে রয়েছে إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ অবশ্য সাবধানীদের পছন্দ করেন।" এতে চুক্তি পালনে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য জাতির মতো তোমরা ছলে-বলে-কৌশলে যেন চুক্তিভঙ্গের পাঁয়তারা না কর।

৭. পঞ্চম আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সঠিক উদ্দেশ্যে কোনো জাতির সাথে জিহাদ আরম্ভ হলে তাদের মোকাবিলায় নিজেদের সকল শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক তখন দয়া-বাসনা বা নম্রতা হবে কাপুরুষতার নামান্তর।

৮. পঞ্চম আয়াত প্রমাণ করে যে, কোনো অমুসলমানের ইসলাম গ্রহণকে তিন শর্তে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। যথা– ক. তওবা খ. নামাজ কায়েম, গ. জাকাত আদায়। এ তিন শর্ত যথাযথ পূরণ না হলে নিছক কলেমা পাঠ যুদ্ধ স্থগিত রাখা যাবে না। রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর যারা জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সাহাবাদের সামনে এ আয়াতটি পেশ করে তাঁদের ইতস্তত ভাব দূর করেন।

৯. দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ওমর ফারূক (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রমুখ সাহাবা বলেন– يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ -এর অর্থ– আরাফাতের দিন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীস শরীফে ইরশাদ করেছেন– اَلْحَجُّ عَرَفَةُ 'হজ হলো আরাফাতের দিন'। –[আবূ দাউদ]। আর কেউ বলেন, এর অর্থ হলো কুরবানির দিন বা দশই জিলহজ্জ।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র.) এবং অপরাপর ইমাম এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য বলেন, হজ্জের পাঁচ দিন হলো হজ্জে আকবারের দিন। এতে আরাফাত ও কুরবানির দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে يَوْمٌ [দিন] শব্দের একবচন আরবি বাকরীতির বিরুদ্ধে নয়। কুরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে يَوْمُ الْفُرْقَانِ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা يَوْمِ أُحُدٍ ، يَوْمِ بُعَاثٍ প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। অনেক দিন ব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা'ছাড়া ওমরার অপর নাম হলো হজ্জে আসগর বা ছোট হজ। এর থেকে হজকে পৃথক করার জন্য বলা হয় হজ্জে আকবর অর্থাৎ বড় হজ। তাই কুরআনের পরিভাষা মতে প্রতি বছরের হজকে হজ্জে আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ হলো হজ্জে আকবর তাদের ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথা বলা আছে যে, হুজুর ﷺ -এর বিদায় হজ্জে আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবত এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফজিলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাস্‌সাস (র.) 'আহকামুল-কুরআন' গ্রন্থে বলেন, হজের দিনগুলোকে 'হজ্জে আকবর' নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি বের হয় যে, হজের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা কুরআন মাজীদ এ দিনগুলোকে হজ্জে আকবরের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছেন।

অনুবাদ :

٧. كَيْفَ اَىْ لَا يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖ وَهُمْ كَافِرُوْنَ بِهِمَا غَادِرُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ قُرَيْشٌ الْمُسْتَثْنَوْنَ مِنْ قَبْلُ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ اَقَامُوْا عَلَى الْعَهْدِ وَلَمْ يَنْقُضُوْهُ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ ط عَلَى الْوَفَاءِ بِهٖ وَمَا شَرْطِيَّةٌ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ وَقَدِ اسْتَقَامَ ﷺ عَلَى عَهْدِهِمْ حَتّٰى نَقَضُوْا بِاِعَانَةِ بَنِىْ بَكْرٍ عَلٰى خُزَاعَةَ .

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট অংশীবাদীদের চুক্তি কেমন করে বলবৎ থাকবে? না, থাকতে পারে না, কারণ এরা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী। كَيْفَ -এটা এই স্থানে না-বোধক শব্দ لَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যাদের সাথে হুদাইবিয়ার ঘটনাকালে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে। অর্থাৎ কুরাইশ সম্প্রদায়, তাদের কথা উল্লিখিত বিধান হতে স্বতন্ত্র। যাবত তারা স্থির থাকবে অর্থাৎ তোমাদের সাথে কৃত চুক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে, তা ভঙ্গ করবে না [তোমরাও ততদিন তা পূরণে স্থির থাকবে। আল্লাহ সাবধানীদেরকে ভালোবাসেন। রাসূল ﷺ ঐ চুক্তি পালনে স্থির ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুরাইশরাই তাদের বন্ধুগোত্র বনূ বকরকে মুসলিমদের বন্ধুগোত্র খুজাআর বিরুদ্ধে সাহায্য করত ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে। مَا اسْتَقَامُوْا -এর مَا শব্দটি شَرْطِيَّةٌ বা শর্তবাচক

٨. كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُمْ عَهْدٌ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَظْفَرُوْا بِكُمْ لَا يَرْقُبُوْا يُرَاعُوْا فِيْكُمْ اِلًّا قَرَابَةً وَّلَا ذِمَّةً ط عَهْدًا بَلْ يُؤْذُوْكُمْ مَا اسْتَطَاعُوْا وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ حَالٌ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ بِكَلَامِهِمُ الْحَسَنِ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ج الْوَفَاءَ بِهٖ وَاَكْثَرُهُمْ فَاسِقُوْنَ نَاقِضُوْنَ لِلْعَهْدِ .

৮. কেমন করে তাদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকবে? তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় সফল হয় তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দিবে না; বরং তাদের ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় তোমাদেরকে তারা ক্লেশ দানে তৎপর থাকবে। তারা মুখে অর্থাৎ মিষ্টি কথা বলে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা পালনে অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গকারী। اِنْ يَّظْهَرُوْا -এই শর্তবাচক বাক্যটি এই স্থানে حَالٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لَا يَرْقُبُوْا অর্থ– পরওয়া করবে না। اِلًّا অর্থ– আত্মীয়তা। ذِمَّةً অর্থ– চুক্তি, দায়িত্ব।

٩. اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا اَىْ تَرَكُوْا اِتِّبَاعَهَا لِلشَّهَوَاتِ وَالْهَوٰى فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ط دِيْنِهٖ اِنَّهُمْ سَاءَ بِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ عَمَلُهُمْ هٰذَا .

৯. তারা আল্লাহর আয়াত আল-কুরআন দুনিয়ার নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে অর্থাৎ প্রবৃত্তির কামনা ও রিপু বাসনার পিছনে পড়ে তারা কুরআনের অনুসরণ পরিহার করে বসেছে; এবং তাঁর পথ হতে তাঁর ধর্ম হতে লোকদেরকে নিবৃত্ত করে তারা যা করে অর্থাৎ তাদের এই কাজ [কত মন্দ] কত নিকৃষ্ট।

١٠. لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ .

১০. তারা কোনো মুমিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

١١. فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ اَىْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ط وَنُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ .

১১. অতঃপর তারা যদি তওবা করে, সালাম কায়েম করে ও জাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে দেই। স্পষ্ট বর্ণনা করে দেই।

١٢. وَاِنْ نَّكَثُوْٓا نَقَضُوْا اَيْمَانَهُمْ مَوَاثِيْقَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ عَابُوْهُ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ رُؤَسَاءَهُ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ عُهُوْدَ لَهُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ .

১২. তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর তারা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে দোষ বের করে তবে কাফেরদের প্রধানদের অর্থাৎ তাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরা তো এমন যে, তাদের কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই। এদের অঙ্গীকার কোনো অঙ্গীকারই নয়। সম্ভবত তারা কুফরী হতে নিরস্ত হতে পারে। نَكَثُوْٓا অর্থ– তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। اَيْمَانَهُمْ অর্থ– তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ। اَئِمَّةَ الْكُفْرِ-এই স্থানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্যের ব্যবহার হয়েছে। اَيْمَانَ শব্দটি অপর এক কেরাতে কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ– এদের কোনো ঈমান নেই।

١٣. اَلَا لِلتَّحْضِيْضِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا نَقَضُوْا اَيْمَانَهُمْ عُهُوْدَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ مِنْ مَكَّةَ لَمَّا تَشَاوَرُوْا فِيْهِ بِدَارِ النَّدْوَةِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ بِالْقِتَالِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط حَيْثُ قَاتَلُوْا خُزَاعَةَ حُلَفَاءَكُمْ مَعَ بَنِيْ بَكْرٍ فَمَا يَمْنَعُكُمْ اَنْ تُقَاتِلُوْهُمْ اَتَخْشَوْنَهُمْ ج اَتَخَافُوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ فِيْ تَرْكِ قِتَالِهِمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের অঙ্গীকার চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং পরামর্শসভায় পরামর্শ করত মক্কা হতে রাসূলের বহিষ্করণের সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে। তোমাদের আশ্রিত বন্ধুগোত্র খুযা'আর বিরুদ্ধে বনূ বকরের সহায়তা করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তোমাদেরকে কি জিনিস বাধা দেয়? তোমরা কি তাদের আশঙ্কা কর ভয় কর? তোমরা যদি মুমিন হও তবে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করার বিষয়ে আল্লাহকেই তোমাদের অধিক ভয় করা কর্তব্য।

-এটা تَحْضِيْض বা উদ্দীপনাব্যঞ্জক অব্যয়।

١٤. قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ يَقْتُلُهُمْ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ يُذِلُّهُمْ بِالْاَسْرِ وَ الْقَهْرِ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ لا مِمَّا فُعِلَ بِهِمْ هُمْ بَنُوْ خُزَاعَةَ .

১৪. এদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই চলাবে। তোমাদের হস্তে এদের হত্যা করত আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন পরাজিত ও বন্দী করত অপমানিত করবেন লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে জয়ী করবেন এবং তাদের বিপক্ষে কৃত আচরণের মাধ্যমে তিনি মুমিনদের অর্থাৎ বনূ খুযা'আর চিত্ত প্রশান্ত করবেন।

১৫. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ط كَرْبَهَا وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط بِالرُّجُوْعِ إِلَى الْإِسْلَامِ كَأَبِىْ سُفْيَانَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

১৫. এবং তাদের চিত্তের ক্ষোভ দুঃখ বিদূরিত করবেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ইসলামের দিকে ফিরে আসার তাওফীক প্রদানের মাধ্যমে তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হন। এর একটি উদাহরণ হলেন হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬. أَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا لَمْ يَعْلَمِ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرِ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ بِإِخْلَاصٍ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط بِطَانَةً وَأَوْلِيَاءَ الْمَعْنٰى وَلَمْ يَظْهَرِ الْمُخْلِصُوْنَ وَهُمُ الْمَوْصُوْفُوْنَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দিবেন অথচ আল্লাহ এখনো জানলেন না প্রকাশ করলেন না - أَمْ -এটা এইস্থানে إِنْكَارٌ অর্থাৎ অসম্মতিসূচক প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لَمَّا -এটা এইস্থানে নাবোধক لَمْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের মধ্যে কারা ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। অর্থাৎ উল্লিখিত বিশ্লেষণে **গুণান্বিত ও মুখলিছ এবং আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অন্যদের হতে এখনো সুস্পষ্ট হয়নি। সুতরাং এর পূর্বে কেমন করে তোমাদেরকে ছাড়া যেতে পারে? তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।** وليجة **অর্থ**- অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أَىْ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَيْفَ টা اِسْتِفْهَام تَعَجُّبِىْ যা - نَفْى -এর অর্থে হয়েছে। এ কারণেই **তার পরে** إِلَّا দ্বারা اِسْتِثْنَاء **করা** বৈধ হয়েছে। كَيْفَ হলো يَكُوْنُ -এর خَبَر مُقَدَّمٌ আর عَهْدٌ হলো اِسْم مُؤَخَّر আর كَيْفَ টা صَدَارَت كَلَام **তথা বাক্যের প্রারম্ভিকা** চাওয়ার কারণেই مُقَدَّمٌ করে দেওয়া হয়েছে। لِلْمُشْرِكِيْنَ টা ثَابِتًا বা بَاقِيًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ **হয়ে** عَهْد -এর حَال مُقَدَّمٌ হয়েছে। আর যদি لِلْمُشْرِكِيْنَ টা عَهْدٌ থেকে مُؤَخَّرٌ হয় তবে তার সিফত হয়। আবার **এটাও হতে পারে যে,** يَكُوْنُ টা تَامَّه হবে আর كَيْفَ টা حَالٌ হওয়ার কারণে মানসূবের مَحَلّ -এ হবে।

قَوْلُهُ مَا شَرْطِيَّةٌ : এখানে مَا টা হলো شَرْطِيَّه ; এটা مَوْصُوْلَه নয়। আর فَاسْتَقَامُوْا لَهُمْ এটা جَزَاء হয়েছে।

قَوْلُهُ كَيْفَ : كَيْفَ -এর পরে يَكُوْنُ ফে'ল উহ্য রয়েছে, যাকে মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। পূর্বের قَرِيْنَة -এর কারণে فِعْل -কে উহ্য করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. كَيْفَ -কে কেন تَكْرَارٌ আনা হয়েছে?

উত্তর. মুশরিকদের অঙ্গীকারের উপর স্থিতিশীল থাকার দুর্বোধ্যতাকে প্রকাশ করার জন্য এবং সুদৃঢ় না থাকার ইল্লত বর্ণনা করার জন্য। আর عِلَّتْ হলো وَإِنْ يَظْهَرُوْا

قَوْلُهُ اَلًّا : إل -এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে- নৈকট্যতা, অঙ্গীকার, প্রতিবেশী, শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ।

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ حَالٌ : অর্থাৎ وَإِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ হলো শর্ত আর لَا يَرْقُبُوْا الخ হলো جَزَاء আর جُمْلَه شَرْطِيَّه -টা كَيْفَ يَكُوْنُ لَهُمْ -থেকে حَالٌ হয়েছে। কাজেই এখন এই প্রশ্নের পরিসমাপ্তি ঘটলো যে, جُمْلَه شَرْطِيَّه -**এর** আতফ جُمْلَه حَمْلِيَّه -এর উপর বৈধ নয়।

قَوْلُهُ اَىْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন হলো- فَهُمْ উহ্য মানার কি প্রয়োজন পড়ল?

উত্তর. اِخْوَانُكُمْ যেহেতু فَاِنْ تَابُوْا -এর جَزَاء আর جَزَاء -এর জন্য বাক্য হওয়া শর্ত। তাই মুফাসসির (র.) هُمْ উহ্য মেনে পরিপূর্ণ বাক্য বানিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ خُزَاعَةَ حُلَفَاءَ كُمْ : এখানে خُزَاعَةَ হলো মাওসূফ আর حُلَفَاءَكُمْ হলো তার সিফত।

قَوْلُهُ هُمْ بَنُوْ خُزَاعَةَ : এর উদ্দেশ্য হলো مُؤْمِنِيْنَ -এর مِصْدَاقٌ নির্ধারণ করা। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বনূ খোযা'আ অদৃশ্যভাবে ঈমান এনেছিল।

قَوْلُهُ وَلِيْجَةً : এটা وُلُوْجٌ হতে নির্গত। অর্থ হলো প্রবেশ করা, গোপন রহস্যধারী বন্ধু। মুফাসসির (র.) وَلِيْجَةً -এর অনুবাদ بِطَانَةً দ্বারা করেছেন। আর بِطَانَةً আস্তরকে বলে, যা গোপন থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ الخ : সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তার আশপাশের সকল কাফের-মুশরিকের জানমালের সার্বিক নিরাপত্তাদানের বিষয়টি উল্লিখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোনো চুক্তি না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া অবাধ চুক্তি রক্ষার জন্য এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেওয়া হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, ত্বরিত মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে, তাদের চারমাসের দীর্ঘ সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা হয় আরামের সাথে যেতে পারে অথবা এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হলো, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাত্তার জন্য নেওয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা হয়। ষষ্ঠ আয়াতে এ কথারই প্রতি ধ্বনি রয়েছে। যার সারবস্তু হলো, হে রাসূল মুশরিকদের কেউ আপনার আশ্রয় নিতে চাইলে তাকে আশ্রয় দেওয়া দরকার। এতে সে আপনার নিকটবর্তী হয়ে আল্লাহর কালাম শুনতে ও ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। তাকে শুধু সাময়িক আশ্রয় দেওয়া নয়; বরং যথার্থ নিরাপত্তার সাথে তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেওয়াও মুসলমানদের কর্তব্য। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয় যে, এ আদেশ এজন্য যে, এরা পূর্ণ জ্ঞান রাখে না, তাই আপনার পাশে থাকলে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে।

ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র.) এ আয়াত থেকে কতিপয় মাসায়েল ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, যা এখানে তুলে ধরছি।

ইসলামের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা আলেমদের কর্তব্য : প্রথমত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো বিধর্মী যদি ইসলামের সত্যতার দলিল তলব করে, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত কোনো বিধর্মী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলি হাসিলের জন্য যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দানও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিব্রত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহর কালাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশ্য হয়। ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকদের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেবে।

ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেওয়া যায় না : তৃতীয়ত বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোনো চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেওয়া যাবে না। কারণ এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান ও অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ অর্থাৎ এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহর কালাম শুনতে পায়।

চতুর্থত মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোনো অমুসলমান তার প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি [ভিসা] নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যর্পণ করা।

সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত চার আয়াতের প্রথম আয়াতে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার কিছু কারণ দর্শানো হয়। এতে মুশরিকদের দুষ্ট প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার আশা বাতুলতা মাত্র। তবে মসজিদুল-হারামের পাশে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় তাদের কথা ভিন্ন। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে ওদের অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, যারা একটু সুযোগ পেলেই প্রতিশ্রুতি বা আত্মীয়তা কোনোটিরই ধার ধারবে না। কারণ, চুক্তি সই করলেও চুক্তি পালনের কোনো ইচ্ছা তাদের অন্তরে নেই। তারা শুধু মুখের ভাষায় তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়। তাদের অধিকাংশই চুক্তি ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক।

সদা ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা : কুরআন মাজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোনো অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন নগণ্য সংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকি সবাই চুক্তিভঙ্গ করেছে। সাধারণত এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যাগুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কুরআন اِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল-হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ" বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি এবং আদেশ দেওয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভঙ্গ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশবশত এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয় وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ "এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী" অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কুরআন মাজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে- وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا "কোনো জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে"। -[সূরা মায়িদা]

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্মপীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুঁশিয়ার করা হয় যে, এরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান! তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হলো দুনিয়াপ্রীতি। মূলত দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহর আদেশাবলি ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই পূতিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেওয়া হয়- لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً অর্থাৎ এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, তা নয়; বরং তারা যে কোনো অমুসলমানদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরিউক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কুরআন যে আদর্শ ও ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হেদায়েত দেয় فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ তবে তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন

সে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবি পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য ।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব লাভের তিন শর্ত : এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা– ১. কুফর ও শিরক থেকে তওবা। ২. নামাজ, ৩. জাকাত। কারণ ঈমান ও তওবা হলো গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়; আর সেগুলো হলো নামাজ ও জাকাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত নামাজ ও জাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য, তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফিকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্র ধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

একাদশ আয়াতের শেষ বাক্যে চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশাবলি পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয় وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ "আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।"

قَوْلُهُ وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ الخ : ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ায় মক্কার যে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরুর আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামাজ ও জাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়া ও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল তখন এদের মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। ইরশাদ হয়– وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ অর্থাৎ "এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।"

فَقَاتِلُوْهُمْ -এখানে লক্ষণীয় যে, এখানে আপাত দৃষ্টিতে বলা সঙ্গত ছিল,"সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর"। কিন্তু তা না বলে বলা হয়– فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ "সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।" তার কারণ, এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানে পরিণত হয়ে যুদ্ধের উপযুক্ত হয়। এ বাক্যরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় মক্কার ঐ সকল কুরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উস্কানি দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষত এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্য দেওয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হলো এরা। তা'ছাড়া এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার ফলে এরা হয়তো প্রশ্রয় পেয়ে বসতো। –[তাফসীরে মাযহারী]

যিম্মিদের বিদ্রূপ অসহ্য : وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ "এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে" বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামি শরিয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রূপ হলো তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামি আইন কানুনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রূপের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রূপ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থানকারী যিম্মীদের জন্য সমালোচনার অনুমতি দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের অনুমতি দেওয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হলো إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ অর্থাৎ "এদের কোনো শপথ নেই" কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোনো মূল্য মান নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ অর্থাৎ "যাতে তারা ফিরে আসে।" এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে অপরাপর জাতির মতো শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ-স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কদের মতো নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই; বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

অতঃপর ত্রয়োদশ আয়াতে মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলা হয়, তোমরা সেই জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না কেন, যারা তোমাদের নবীকে দেশান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে? এরা হলো মদিনার ইহুদি অধিবাসী। এদের সদম্ভ ঘোষণা হলো- لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ অর্থাৎ "সম্মানী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অবশ্যই মদিনা থেকে নিচু লোকদের বহিষ্কার করবে"। এদের দৃষ্টিতে সম্মানী লোক হলো তারা আর নীচু ও দুর্বল লোক হলো মুসলমান। যার পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরই দম্ভোক্তিকে অচিরেই এভাবে সত্য করে দেখান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীরা মদিনা থেকে ইহুদিদের সমূলে উৎখাত করেন। এতে দেখানো হয় যে, সম্মানী ও শক্তিবান হলো মুসলমান এবং নীচু প্রকৃতির হলো ইহুদিরা।

قَوْلُهُ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ : 'তারাই প্রথমে বিবাদের সূত্রপাত করেছে' বাক্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ বিবাদের সূত্রপাত যখন তারা করেছে, তখন তোমাদের কাজ হবে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তোলা। আর এটি সুস্থ বিবেকেরই দাবি।

এর পর মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফেরদের ডর-ভয় দূর করার জন্য বলা হয়েছে- أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা উচিত। যার আজাব রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। পরিশেষে إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ অর্থাৎ "যদি তোমরা মুমিন হও" বাক্য সংযোজন করে বলা হয় যে, শরিয়তের হুকুম তা'মিলে বাধা হয় গায়রুল্লাহর এমন ভয় অন্তরে স্থান দেওয়া মুসলমানদের শান নয়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ আয়াতে ভিন্ন কায়দায় মুসলমানদের প্রতি জিহাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এতে কতিপয় জানার বিষয় রয়েছে।

প্রথমত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই এসে পড়বে, আর এই কাফের জাতি নিজেদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহর আজাবের উপযুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী উম্মতদের মতো তাদের উপর আসমান বা জমিন থেকে আল্লাহর আজাব আসবে না; বরং يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের হস্তেই আল্লাহ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।"

দ্বিতীয়ত এই যুদ্ধের ফলে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অন্তর থেকে সে সমুদয় চিন্তা-ক্লেশ দূর করবেন, যা কাফেরদের দ্বারা প্রতিনিয়ত পৌঁছুচ্ছিল।

তৃতীয়ত কাফেরদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলমানদের মনে যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, আল্লাহ তা প্রশমিত করবেন তাদের দ্বারা শাস্তি দিয়ে।

পূর্ববর্তী আয়াতে لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ [যাতে তারা ফিরে আসে] বাক্য দ্বারা মুসলমানদের হেদায়েত করা হয় যে, নিছক প্রতিশোধের নেশার উদ্দেশ্যে যেন কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়; বরং উদ্দেশ্য হবে তাদের আত্মশুদ্ধি ও সৎপথ প্রদর্শন। আর এ আয়াতে বলা হয় যে, মুসলমানেরা যদি নিজেদের নিয়তকে আল্লাহর জন্য শুদ্ধ করে নেয় এবং শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করে, তবে আল্লাহ নিজ গুণে তাদের ক্রোধ প্রশমনের কোনো ব্যবস্থা করবেন।

চতুর্থত আয়াতে একটি বাক্য হলো- وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ "আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন। অর্থাৎ তাদের তওবা কবুল করবেন। এ বাক্য দ্বারা জিহাদের আর একটি উপকার প্রতীয়মান হয়। তা' হলো শত্রুদের অনেকের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হবে এবং তারা মুসলমান হবে। তাই দেখা যায়, মক্কা বিজয়কালে সেখানে অনেক দুষ্ট কাফের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে যে সকল অবস্থা ও ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী একের পর এক সকল ঘটনা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। সে জন্য এ আয়াতগুলো বহু মুজেযাসম্বলিত রয়েছে- এতে সন্দেহ নেই।

অনুবাদ :

١٧. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ بِالْاِفْرَادِ وَالْجَمْعِ بِدُخُوْلِهٖ وَالْقُعُوْدِ فِيْهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط اُولٰۤئِكَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ اَعْمَالُهُمْ ج لِعَدَمِ شَرْطِهَا وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ .

১৭. অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে সত্য-প্রত্যাখ্যানের **সাক্ষ্য** দেয়, তখন তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে **সেখানে প্রবেশ** করবে, বসবে তা হতে পারে না আমল **গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত** [ঈমান] না থাকায় তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ **বাতিল বলে** গণ্য এবং তারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

١٨. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ .

১৮. তারাই তো আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। তারাই সৎপথপ্রাপ্তদের মধ্যে হতে পারে।

١٩. اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاۤجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ اَهْلَ ذٰلِكَ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط فِى الْفَضْلِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ اَلْكَافِرِيْنَ نَزَلَتْ رَدًّا عَلٰى مَنْ قَالَ ذٰلِكَ وَهُوَ الْعَبَّاسُ اَوْ غَيْرُهٗ .

১৯. হাজীদের পানীয় জল সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষাণাবেক্ষণ করা অর্থাৎ যারা উক্তরূপ কাজ করে **তাদেরকে তোমরা কি তাদের সমজ্ঞান কর যারা** আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? মর্যাদার ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ কাফেরদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। হযরত আব্বাস বা অন্যান্য যারা তাদের সমতুল্য হওয়ার কথা বলত তাদের প্রত্যুত্তরে এই আয়াত নাজিল হয়।

٢٠. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً رُتْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط مِنْ غَيْرِهِمْ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفَاۤئِزُوْنَ الظَّافِرُوْنَ بِالْخَيْرِ .

২০. যারা ঈমান আনে, হিজরত করে জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর নিকট অন্যদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান বস্তুত তারাই সফলকাম, কল্যাণ লাভে জয়ী। دَرَجَةً অর্থ– এই স্থানে মর্যাদা।

٢١. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ لا دَاۤئِمٌ .

২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া, সন্তোষ এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নিয়ামতসমূহ। مُقِيْمٌ অর্থ– এই স্থানে চিরস্থায়ী।

٢٢. خٰلِدِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ فِيْهَآ اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ .

২২. সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। خٰلِدِيْنَ শব্দটি এই স্থানে حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ তাদের জন্য এই অবস্থা সুনির্ধারিত এই ভাব বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٣. وَنَزَلَ فِيْمَنْ تَرَكَ الْهِجْرَةَ لِاَجْلِ اَهْلِهٖ وَتِجَارَتِهٖ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوْا اِخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

২৩. পরিবার পরিজন ও ব্যবসায়ের কারণে যারা হিজরত করা পরিত্যাগ করেছিল তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়– হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে ভালোবাসে অর্থাৎ তা তারা গ্রহণ করে লয় তবে তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে তারাই সামালঙ্ঘনকারী।

٢٤. قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ اَقْرِبَاؤُكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَشِيْرَاتُكُمْ وَاَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا اِكْتَسَبْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا عَدَمَ نَفَاقِهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَقَعَدْتُمْ لِاَجْلِهٖ عَنِ الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فَتَرَبَّصُوْا اِنْتَظِرُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ .

২৪. বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, **আত্মীয় স্বজন** عَشِيْرَتُكُمْ শব্দটি অপর এক কেরাতে عَشِيْرَاتُكُمْ রূপে পঠিত রয়েছে। তোমাদের সম্পদ, তোমরা অর্জন কর কামাই কর, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস অধিক প্রিয় হয় **আর এগুলোর জন্য জিহাদ ও হিজরত করা পরিত্যাগ করে বসে থাক** তবে তোমরা আল্লাহর আজাবের নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। এই আয়াতটি এই সমস্ত লোকদের জন্য হুমকি স্বরূপ। كَسَادٌ অর্থ– মন্দা পড়া। تَرَبَّصُوْا অর্থ– তোমরা অপেক্ষা কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ : এখানে كَانَ হলো فِعْل نَاقِص আর لِلْمُشْرِكِيْنَ **এটা উহ্য** يَنْبَغِىْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَر مُقَدَّمْ হয়েছে আর مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يَّعْمُرُوْا এটা বাক্য হয়ে كَانَ -এর اِسْم مُؤَخَّرْ **হয়েছে, আর** شَاهِدِيْنَ টা يَعْمُرُوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর شَاهِدِيْنَ হলো عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -এর **প্রথম** مُتَعَلِّقْ **আর** بِالْكُفْرِ **হলো দ্বিতীয়** مُتَعَلِّقْ অর্থাৎ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ; **জমহুরের নিকট** يَعْمُرُوْا হলো عَمَرَ يَعْمُرُ তথা বাবে نَصَرَ থেকে; **অর্থ– আবাদ করবে। আর** اِبْنُ السَّمَيْفَعِ পড়েছেন يُعْمِرُوْا বাবে اِفْعَالٌ থেকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও অন্যান্যরা مَسْجِدَ -কে একবচনের সাথে পড়েছেন। আর بَاقُوْنَ رحـ এটা বহুবচনের সাথে مَسَاجِدَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ اَىْ اَهْلَ ذَالِكَ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন. عِمَارَ এবং سِقَايَةَ উভয়টি মাসদার যা একটি مَعْنَوِىْ বস্তু, কাজেই একে جِسْم -এর شَئْ -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া ঠিক হয়নি। যেমন উল্লিখিত উভয় مَصَادِرْ -কে مَنْ -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে যা হলো شَئْ مُجَسَّمْ

উত্তর. اَلْعِمَارَةَ এবং اَلسِّقَايَةَ -এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে আর তা হলো اَهْلَ অর্থাৎ- اَهْلُ الْعِمَارَةِ এবং اَهْلَ السِّقَايَةِ কাজেই আর কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ نَزَلَتْ رَدًّا عَلٰى مَنْ قَالَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ-এর মধ্যে হামযাটি হলো هَمْزَه اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ এবং এর দ্বারাই আগত আয়াতের শানে নুযূলের দিকেও ইঙ্গিত করছেন।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এর مُشَارٌ اِلَيْهِ মুহাজির এবং মুজাহিদগণকে অন্যদের সমপর্যায়ের স্বীকৃতি দেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِمْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য সেই সকল লোক যারা উল্লিখিত গুণাবলিকে একত্রকারী। যাদের মধ্যে اَهْلِ سِقَايَةَ এবং اَهْلِ عِمَارَةَ -ও অন্তর্ভুক্ত। اَعْظَمُ দ্বারা সন্দেহ হয় যে, اَهْلِ سِقَايَةَ এবং اَهْلِ عِمَارَه যদি মহামর্যাদার অধিকারী না হয় তবে বড় মর্যাদার অধিকারী হবে। অথচ ঈমান ব্যতীত কারোও সৎকাজের বিনিময়ে পরকালে কোনো মর্যাদা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরুতে মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং মুসলমানদের সাথে যাবতীয় সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর তাদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ পেশ করা হয়েছে, যাতে করে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তাদের অন্যায় আচরণই তাদের সম্পর্কে এ চরম সিদ্ধান্তের কারণ। এতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের দরবারে এই নাফরমানদের কোনো স্থান নেই। তখন মক্কার মুশরিকরা নিজেদের ফজিলত এবং মর্তবা প্রমাণ করার জন্য স্বদম্ভে বলতে লাগলো, আমাদের মধ্যে অনেক গুণাবলি রয়েছে এবং আমরা অনেক ভালো কাজও করে থাকি। মক্কা মোয়াজ্জামায় হজের জন্য যারা আগমন করে আমরা তাদের খেদমতে নিয়োজিত হই এবং তাদেরকে পানি সরবরাহ করি। সমজিদে হারামের মেরামতের কাজ, তার দেখাশোনাও আমরা করে থাকি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ২৯৮, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৬]

এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের আস্ফালনের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কাজ তখন গ্রহণযোগ্য হবে যখন তোমরা ঈমান আনবে। যেহেতু তোমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাস কর না, সেজন্য তোমাদের এসব কাজের কোনো গুরুত্ব নেই।

শানে নুযূল : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রা.) যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন তখন মুসলমানগণ তাকে কাফের থাকার কারণে বিশেষত, প্রিয়নবী ﷺ -এর এত নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না আনার লজ্জা দেন। হযরত আলী (রা.) এ পর্যায়ে অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। তখন হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ আচরণের কথাই উল্লেখ কর আমাদের দোষত্রুটির বিবরণই দিতে থাক, আমাদের গুণাবলির কথা কেন উল্লেখ কর না? হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে কোনো গুণ আছে কি? জবাবে হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আমরা মসজিদুল হারামের মেরামত কাজ সুসম্পন্ন করি, আমরা কা'বা শরীফের দেখাশোনা করি এবং হাজীদেরকে পানি সরবরাহ করি। হযরত আব্বাস (রা.)-এর এই বক্তব্যের বাতুলতা ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ১৯৬, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৭, তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১০, পৃ. ৬৫]

ইরশাদ হয়েছে- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ করা মুশরিকের কাজ নয়। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে না, তাদের মসজিদের খেদমত করা বা তাকে আবাদ করার কোনো অধিকার নেই। মসজিদ পবিত্র স্থান যারা মুশরিক তারা অপবিত্র, তাই কোনো মুশরিকের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুটি আলামত : ১. শুধু আল্লাহর জন্য কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। ২. কোনো অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয়- وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ "আর আল্লাহ তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" তাই তাঁর কাছে কোনো হীলা-বাহানা চলবে না।

এ বিষয়টি কুরআনের অপর আয়াতে এরূপে ব্যক্ত হয়- اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ অর্থাৎ "লোকেরা কি মনে করে যে, ঈমানের দাবি করার পর কোনো পরীক্ষায় নিপতিত করা ব্যতীত তাদের এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?"

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েজ নয় : ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লিখিত শব্দ وَلِيْجَةً এর অর্থ- অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে بِطَانَةً শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ- কাপড়ের ঐ স্তর, যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেটে বা শরীরের স্পর্শে থাকে। আয়াতটি হলো- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত, আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধ্বংসসাধনে কোনো ত্রুটি বাকি রাখবে না।"

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল হারাম ও অন্যান্য মসজিদকে বাতিল উপাসনা থেকে পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুলযোগ্য তরীকায় ইবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো- মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারামের অভ্যন্তরে অবস্থিত মুশরিকদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে বাইরে নিক্ষেপ করেন। এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মসজিদুল হারাম তো পবিত্র, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও মুশরিকদের নিরাপত্তা বিধানে তারা এখনো বাতিল তরীকায় হারাম শরীফে তওয়াফ ও উপাসনা করে চলে।

অথচ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যেরূপ মূর্তি থেকে হারাম শরীফকে পবিত্র করা হয়, সেরূপ মূর্তিপূজা ও অন্য সকল বাতিল উপাসনা থেকেও পবিত্র করা। এ উদ্দেশ্যে হারাম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশ বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তা হতো সাধারণ ক্ষমার বরখেলাফ। যার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে ইসলাম সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। তাই ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হলো। তবে মক্কা বিজয়ের পরের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত আলী (রা.)-এর দ্বারা মিনা ও আরাফাতের সমাবেশে ঘোষণা করান যে, ভবিষ্যতে হারাম শরীফে মুশরিকী তরীকায় কোনো ইবাদত-উপাসনা এবং হজ ও তওয়াফের অনুমতি থাকবে না। জাহেলী যুগে কা'বা শরীফে উলঙ্গ তওয়াফের যে ঘৃণ্য প্রথা চলে আসছে আগামীতে এর অনুমতি দেওয়া হবে না। হযরত আলী (রা.) মিনার সামাবেশে নিম্নোক্ত ভাষায় ঘোষণাটি প্রচার করেন- لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ অর্থাৎ "চলতি বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না।"

এক বছরের এই যে সময় দেওয়া হলো, তার কারণ, এদের মধ্যে আছে এমন অনেকে, যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি সাধিত হয় এবং এরা চুক্তি পালন করেও চলছে। তাই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন কোনো আইন পালনে বাধ্য করা ইসলামি উদারনীতির খেলাফ। এজন্য এক বছর আগেই ঘোষণা করা হয় যে, হারাম শরীফকে মুশরেকী তরিকায় ইবাদত, উপাসনা ও আচার-প্রথা থেকে পবিত্র কারার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ এ ধরনের ইবাদত প্রকৃতপক্ষে ইবাদত নয় এবং এর দ্বারা মসজিদ আবাদ করা হলো তা বিরান করার নামান্তর।

মক্কার মুশরিকগণ শিরকী আচার-অনুষ্ঠানকে ইবাদত ও মসজিদুল হারামের হেফাজত ও আবাদ রাখার মাধ্যম মনে করতো। আর এ জন্য তাদের গর্বেরও অন্ত ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, একমাত্র তারাই বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ও হেফাজতকর্তা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমার পিতা আব্বাস যখন ইসলাম গ্রহণের আগে বদর যুদ্ধ চলাকালে বন্দী হন এবং মুসলমানরা তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোককে কুফর ও শিরকের উপর অবিচল থাকার জন্য বিদ্রূপ ও লজ্জা দান করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ দিকগুলো দেখ, ভালোগুলো দেখ না। তোমাদের কি জানা নেই

যে, যাবতীয় ইন্তেযাম তথা হাজীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি রয়েছে আমাদের দায়িত্ব। তাই আমরাই এর মুতাওয়াল্লী। মসজিদের তা'মীর বা আবাদ করার একাধিক অর্থ রয়েছে। যথা- ১ গৃহ নির্মাণ। ২. রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা। ৩. ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিতি। 'ইমারত' থেকে ওমরা শব্দের উৎপত্তি। ওমরা পালনকালে 'বায়তুল্লাহ'এর জিয়ারত ও তথায় ইবাদতের জন্য উপস্থিত হতে হয়।

মক্কার মুশরিকরা এই তিন অর্থে নিজেদেরকে বায়তুল্লাহ ও মসজিদুল হারামের আবাদকারী মনে করতো এবং তাদের গর্ব ছিল প্রচুর। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবি নাকচ করে বলেন যে, কুফর ও শিরকের উপর তাদের স্বীকৃতি ও সুদৃঢ় থাকার প্রেক্ষিতে আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার কোনো অধিকার তাদের নেই; বরং এ বিষয়ে তারা অনুপযুক্ত। এ কারণে তাদের আমলগুলো নিষ্ফল এবং তাদের স্থায়ী বসবাস হবে জাহান্নামে।

কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি কথাটির এক অর্থ হলো, তারা শিরক ও কুফরি কার্যকলাপের দ্বারা তার স্বীকৃতি দিচ্ছে। অপর অর্থ হলো, কোনো খ্রিস্টান বা ইহুদির পরিচয় চাওয়া হলে তারা নিজেদের খ্রিস্টান বা ইহুদি বলে পরিচয় দেয়। অনুরূপ, অগ্নি উপাসক ও মূর্তিপূজকদের পরিচয় চাওয়া হলে নিজেদের কুফরি নামের দ্বারা পরিচয় প্রদান করে। এটিই হলো তাদের কুফর ও শিরকের স্বীকৃতি। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মসজিদ আবাদকরণে কাফেরদের অনুপযুক্ততা এবং দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের উপযুক্ততা প্রমাণ করা হয়েছে। এর তাফসীর হলো, মসজিদের প্রকৃত আবাদ তাদের দ্বারা সম্ভব, যারা আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে হুকুমে ইলাহীর অনুগত; যাদের পাকাপোক্ত বিশ্বাস রয়েছে আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি। যারা নিয়মিত নামাজের পাবন্দী করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ভয় অন্তরে স্থান দেয় না।

এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রোজ-কিয়ামতের উল্লেখ করা হলো মাত্র। রাসূলের উল্লেখ এ জন্য করা হলো না যে, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর আনীত শরিয়তের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অসম্পূর্ণই থেকে যায়, ঈমান বির-রাসূল, 'ঈমান বিল্লাহ'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথা বোঝানোর জন্যই একদিন হুজুর ﷺ সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পার, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ কি? তাঁরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। হুজুর ﷺ বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো, মানুষ অন্তরের সাথে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের আর কেউ যোগ্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ঈমান বিররসুল 'ঈমান-বিল্লাহ'-এ শামিল রয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

"আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না" বাক্যের মর্ম হলো কারো ভয়ে আল্লাহর হুকুম পালন থেকে বিরত না থাকা। নতুবা, প্রত্যেক ভয়ঙ্কর বস্তুকে ভয় করা তো মানুষের স্বভাব। এজন্যই হিংস্র জন্তু, বিষাক্ত সর্প ও চোর-ডাকাত প্রভৃতিকে মানুষ ভয় করে। হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে যখন যাদুকরেরা রশিগুলোকে সর্পে পরিণত করে, তখন তিনিও ভীত হন। তাই কষ্টদায়ক বস্তুগুলোর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভয় উপরিউক্ত কুরআনী আদেশের পরিপন্থী নয় এবং তা রিসালত বিরোধীও নয়। তবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে বিরত থাকা মুমিনের শান নয়। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

কতিপয় মাসায়েল : আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হলো, কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরো ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোনো কাফেরকে কোনো ইসলামি ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েজ নয়। তবে নির্মাণ কাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। -[তাফসীরে মুরাগী]

কোনো অমুসলিম যদি ছওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয় তবে কোনো প্রকার দীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি তার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেওয়ার আশঙ্কা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েজ রয়েছে। -[শামী]

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরিউক্ত গুণাবলিসম্বলিত নেককার মুসলমানদের। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির বা দীনি ইলমের শিক্ষাদানে কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামিল মুমিন

হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন– إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ "তারাই আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করে, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি।"

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ তাঁর জন্যে জান্নাতের একটি মাকাম প্রস্তুত করেন।" হযরত সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর জিয়ারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হলো মেহমানরে সম্মান করা।"
–[তাফসীরে মাযহারী, তাবারানী, ইবনে জারীর ও বায়হাকী প্রভৃতি]

কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার শামিল। যেমন মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজে কবিতা পাঠ, ঝগড়া বিবাদ ও হৈ-হুল্লোড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ। –[তাফসীরে মাযহারী]

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা' হলো মক্কার অনেক কুরাইশ মুসলমানদের মোকাবিলায় গর্ব সহকারে বলতো, মসজিদুল হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোনো আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আববাস (রা.) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়রা তাঁকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্রূপের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত [দেশত্যাগ]-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে ফজীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরেও রাত যাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল হারামের শাসনক্ষমতা আমার নিয়ন্ত্রণে। অতঃপর হযরত আলী (রা.) বলেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হলো, আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহর দিকে রুখ করে নামাজ আদায় করেছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধেও অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। তাতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোনো আমল তা যতই বড় হোক আল্লাহ কাছে কোনো মূল্য রাখে না। আর না শিরক অবস্থায় অনুরূপ আমলকারী আল্লাহর মকবুল বান্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নুমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমার দিন তিনি কতিপয় সাহাবীর সাথে মসজিদে নববীতে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মতো মর্যাদাসম্পন্ন আর কোনো আমল নেই এবং এর মোকাবিলায় আর কোনো আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে অপরজন বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করার মতো উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দুজনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওমর ফারূক (রা.) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুমার নামাজের পরে স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথা মতো প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জিহাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঘটনা যা হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলত মুশরিকদেরও অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় এ সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতারা ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাজিল হয়।

সে যা হোক, উপরিউক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হলো, শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোনো মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের

মোকাবিলায় ফজিলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জিহাদের মর্যাদা মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জিহাদে অগ্রগামী সে জিহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। এ পর্যন্ত ভূমিকার পর উল্লিখিত আয়াতের শব্দ ও অর্থের প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। ইরশাদ হয়–

"তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে সেই লোকের [আমলের] সমান মনে কর যার ঈমান রয়েছে আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি এবং সে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে। এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়।"

পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা আয়াতের এ উদ্দেশ্য নির্ণয় করা যায় যে, ঈমান ও জিহাদ উভয়েই মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পানি সরবরাহের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে মুশরিকের অসার দাবির খন্ডন রয়েছে। আর জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা মুসলমানদের সেই ধারণার বিলোপ সাধন করা হচ্ছে, যাতে তারা মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহকে জিহাদের চাইতেও পুণ্যকাজ মনে করতো।

আল্লাহর জিকির জিহাদের চেয়ে পুণ্যকাজ : তাফসীরে মাযহারীতে কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেন, এ আয়াতে মসজিদ আবাদ করার উপর জিহাদের যে ফজিলত রয়েছে তা তার যাহেরী অর্থানুসারে। অর্থাৎ মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তবে তার চাইতে জিহাদের ফজিলত স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু মসজিদ আবাদ করার অর্থ যদি ইবাদত ও আল্লাহর জিকির উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনাগমন হয় আর এটিই হলো মসজিদের প্রকৃত আবাদকরণ; তবে রাসূলে করীম ﷺ -এর স্পষ্ট হাদীসের আলোকে তা হবে জিহাদের চাইতেও উত্তম কাজ। যেমন মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের এমন আমলের সন্ধান দেব, যা তোমাদের অন্যান্য আমল থেকে উত্তম, তোমাদের প্রভুর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, তোমাদের মর্যাদা সমুন্নতকারী এবং যা আল্লাহর রাহে সোনা-রূপা দান করার চাইতেও উত্তম। এমন কি সেই জিহাদের চাইতেও উত্তম, যেখানে তোমরা শত্রুর সাথে শক্ত মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে এবং তোমরা তাদেরকে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ , তা অবশ্যই বলবেন। হুজুর ﷺ বলেন, তা হলো আল্লাহর জিকির। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, জিকিরের ফজিলত জিহাদের চাইতেও বেশি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মসজিদ আবাদের অর্থ যদি জিকরুল্লাহ নেওয়া হয় তবে তা জিহাদ থেকে আফজল হবে। কিন্তু মুশরিকদের গর্ব অহংকার জিকির ও ইবাদতের ভিত্তিতে ছিল না; বরং তা ছিল রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে। তাই আয়াতে জিহাদকে অধিক ফজিলতের কাজ বলে অভিহিত করা হয়।

তবে কুরআন ও হাদীসের সম্মিলিত আদেশ-উপদেশের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থার তারতম্যে আমলের ফজিলতেও তারতম্য ঘটে। এক অবস্থায় কোনো বিশেষ আল অপর আমলের চাইতে অধি পুণ্যের হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে তা লঘু আমলে পরিণত হয়। যে অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য আত্মরক্ষা যুদ্ধের তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, সে অবস্থায় জিহাদ নিঃসন্দেহে সকল ইবাদত থেকে উত্তম। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূলে কারীম ﷺ -এর চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছিল। আর যখন যুদ্ধের এমন প্রয়োজন থাকে না তখন আল্লাহর জিকির হবে জিহাদের তুলনায় অধিক ফজিলতসম্পন্ন ইবাদত।

আয়াতের শেষ বাক্য হলো وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ "আর আল্লাহ জালিম লোকদের হেদায়েত করেন না।" অর্থাৎ ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল ইবাদত থেকে উত্তম এবং জিহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম তা কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা; কিন্তু আল্লাহ জালিম লোকদের হেদায়েত ও উপলব্ধি-শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিংশতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লিখিত শব্দ لَا يَسْتَوُنَ ['সমান নয়'] -এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ "যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম।" পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোনো সফলতা আল্লাহ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানরা এ সফলতার অংশীদার; কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদদের সফলতা সবার ঊর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হলো তারা।

২১ তম ও ২২ তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয়- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّٰتٍ الخ তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার।"

উপরিউক্ত আয়াতে হিজরত ও জিহাদের ফজিলত বর্ণিত হয়। সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায় জানাতে হয়। আর এটি হলো মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসার নিন্দা করে হিজরত ও জিহাদের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। ইরশাদ হয়- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ الخ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইয়ের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমানের বদলে কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।"

মাতা-পিতা-ভাই-ভগ্নি এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কুরআনের বহু আয়াতে রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বলা হয়ে যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে এবং এ সকল সম্পর্ক, তা মাতা-পিতা, ভাই-ভগ্নি ও আত্মীয়-স্বজন যার বেলাতেই হোক, আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেওয়ার উপযুক্ত। যেখানে এই দুই সম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ককেই বহাল রাখা আবশ্যক।

আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় : উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত থেকে আরো কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়। প্রথমত ঈমান হলো আমলের প্রাণ। ঈমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মতো যা কবুলিয়তের অযোগ্য। আখিরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোনো দাম নেই। তবে আল্লাহ যেহেতু বে-ইনসাফ নন, সেহেতু কাফেরদের নিষ্প্রাণ নেক আমলগুলোকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও অর্থ সম্পদ দান করে হিসাব পরিষ্কার করে নেন। কুরআনের আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : গুনাহ ও পাপাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। উনবিংশতম আয়াতের শেষ বাক্য إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ "আল্লাহ জালিম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না" থেকে কথাটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়- إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا "তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তবে তিনি ভালোমন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।" অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া পরহিজগারীর ফলে বিবেক প্রখর হয়, সুষ্ঠ বিচার-বিবেচনার শক্তি আসে। তাই সে ভালোমন্দের পার্থক্যে ভুল করে না।

তৃতীয়ত : নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ সকল আমলকারীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হলো, আমলের আধিক্যের উপর ফজিলত নির্ভরশীল নয়; বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর তা নির্ভরশীল। সূরা মুলকের শুরুতে আছে- لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ "যাতে আল্লাহ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।"

চতুর্থত : আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক। যথা- ১. নিয়ামতের স্থায়িত্ব। ২. নিয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহর মকবুল বন্দাদের জন্য আয়াতে এ দু'টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। نَعِيمٌ مُّقِيمٌ [স্থায়ী শান্তি] এতে আছে প্রথম বিষয়, আর خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا [তথায় চিরদিন বসবাস করবে] বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চমত: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা হলো, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ক অগ্রগণ্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সংঘাত দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কুরবানি। তাঁর সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের সম্পর্ককেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বিলাল (রা.), রোমের হযরত সোহাইব (রা.), পারস্যের হযরত সালমান (রা.), মক্কার কুরাইশ ও মদিনার আনসাররা গভীর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ওহুদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার এই প্রমাণ বহন করে।

অনুবাদ :

٢٥. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ لِلْحَرْبِ كَثِيْرَةٍ كَبَدْرٍ وَقُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ وَ اذْكُرْ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَادٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ اَيْ يَوْمَ قِتَالِكُمْ فِيْهِ هَوَازِنَ وَذٰلِكَ فِيْ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ اِذْ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَقُلْتُمْ لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ وَكَانُوْا اِثْنَيْ عَشَرَ اَلْفًا وَالْكُفَّارُ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ مَا مَصْدَرِيَّةٌ اَيْ مَعَ رَحْبِهَا اَيْ سَعَتِهَا فَلَمْ تَجِدُوْا مَكَانًا تَطْمَئِنُّوْنَ اِلَيْهِ لِشِدَّةِ مَا لَحِقَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ج مُنْهَزِمِيْنَ وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ بِغَلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِرِكَابِهٖ ـ

২৫. নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন বদর, কুরাযা, নজীর ইত্যাদি আর তোমরা স্মরণ কর হুনাইন দিবসের কথা। অর্থাৎ হাওয়াজিন গোত্রের বিরুদ্ধে সেই দিন তোমাদের যুদ্ধের কথা। তা অষ্টম হিজরি সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হুনাইন মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। সেদিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে গর্বিত করে তুলেছি। তোমরা বলেছিলে, সংখ্যাল্পতার কারণে আজ আর আমরা পরাজিত হব না। সেইদিন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল বার হাজার আর কাফেররাও ছিল বার হাজার কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসল না এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। যে ভীষণ ভীতি তোমাদেরকে পেয়ে বসেছিল সেই কারণে স্বস্তিপূর্ণ ও নিরাপদ কোনো স্থান তোমরা পেতে ছিলে না। অতঃপর তোমরা পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলায়ন করেছিলে। রাসূল ﷺ এই অবস্থায় তাঁর সাদা খচ্চরটিতে স্থির হয়ে রয়েছিলেন। তাঁরা সাথে তখন হযরত আব্বাস (রা.) ও রেকাব ধারণরত হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) ভিন্ন আর কেউ ছিল না। اِذْ -এটা পূর্বোল্লিখিত يَوْمَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ। مَا رَحُبَتْ এটার مَا -টি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ামূল অর্থজ্ঞাপক। অর্থ– তার বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা সত্ত্বেও।

٢٦. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ طَمَانِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَرَدُّوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا نَادَاهُمُ الْعَبَّاسُ بِاِذْنِهٖ وَقَاتَلُوْا وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ج مَلَائِكَةً وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ ـ

২৬. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর সাকীনা অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে প্রশান্তি নাজিল করেন। ফলে হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর অনুমতিক্রমে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলে তারা সকলেই রাসূল ﷺ -এর দিকে ফিরে আসেন এবং পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করেন। [এবং তিনি এমন এক সেনাদল] অর্থাৎ ফেরেশতা অবতীর্ণ করে যা তোমরা দেখনি। আর তিনি হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল।

٢٧. ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ
يَّشَاءُ ط مِنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ـ

২৭. অতঃপর এদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা ইসলামের তাওফীক প্রদান করত ক্ষমাপরবশ হবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٢٨. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ
نَجَسٌ قَذِرٌ لِخُبْثِ بَاطِنِهِمْ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اَىْ لَا يَدْخُلُوا الْحَرَمَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ج عَامَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ
وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَقْرًا بِانْقِطَاعِ تِجَارَتِهِمْ
عَنْكُمْ فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ
اِنْ شَاءَ ط وَقَدْ اَغْنَاهُمْ بِالْفُتُوْحِ وَالْجِزْيَةِ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

২৮. হে মুমিনগণ! মুশরিকরা নিশ্চয় অপবিত্র অর্থাৎ যেহেতু তাদের অভ্যন্তর কলুষপূর্ণ সুতরাং তারা ময়লাকীর্ণ অতএব এই বৎসরের পর অর্থাৎ নবম হিজরির পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে অর্থাৎ হারাম শরীফে যেন তারা প্রবেশ না করে। যদি তোমরা তাদের সাথে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার দরুন দারিদ্র্যের অভাবের আশঙ্কা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ চাইলে তার অনুগ্রহে শীঘ্র তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। বিজয়দান ও জিযিয়া আয়ের মাধ্যমে অচিরেই তিনি তাদের অভাব বিদূরিত করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

٢٩. قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاِلَّا لَاٰمَنُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ وَلَا
يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَالْخَمْرِ
وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ الثَّابِتِ النَّاسِخِ
لِغَيْرِهٖ مِنَ الْاَدْيَانِ وَهُوَ الْاِسْلَامُ مِنْ بَيَانٌ
لِلَّذِيْنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اَىِ الْيَهُوْدُ
وَالنَّصٰرٰى حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ الْخَرَاجَ
الْمَضْرُوْبَ عَلَيْهِمْ كُلَّ عَامٍ عَنْ يَّدٍ حَالٌ
اَىْ مُنْقَادِيْنَ اَوْ بِاَيْدِيْهِمْ لَا يُوَكِّلُوْنَ بِهَا
وَهُمْ صٰغِرُوْنَ اَذِلَّاءُ مُنْقَادُوْنَ لِحُكْمِ
الْاِسْلَامِ ـ

২৯. যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না কারণ, বস্তুতই যদি এতদুভয়ে তাদের বিশ্বাস থাকতো, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করতো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না, সত্য দীন অর্থাৎ ইসলাম যা সুদৃঢ় ও অন্যান্য সকল ধর্মমত রহিতকারী তা [অনুসরণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে ইসলামের হুকুমের সামনে অবনমিত হয়ে অনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় জিযিয়া অর্থাৎ প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট হারে তাদের উপর আরোপিত কর প্রদান না করে। مِنَ الَّذِيْنَ -এটা পূর্বোল্লিখিত اَلَّذِيْنَ -এর بَيَانٌ বা বিবরণ। عَنْ يَدٍ -এটা এই স্থানে حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ; অর্থ আনুগত্য প্রদর্শনপূর্বক বা এর অর্থ হলো স্বহস্তে তা পরিশোধ করতে হবে। অন্য কাউকেও তারা এই বিষয়ে উকিল বানাতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَوَاطِنَ : এটা مَوْطِنٌ -এর বহুবচন। অর্থ স্থান জায়গা, অবস্থান স্থল। মুফাসসির (র.) لِلْحَرْبِ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَوْطِنٌ দ্বারা অবস্থান স্থল উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো রণাঙ্গন।

قَوْلُهُ اُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন يَوْمَ টা হলো উহ্য ফে'লের মাফঊল مواطن -এর উপর আতফ হয়নি। যেমন বলা হয়েছে, এ কারণে يَوْمَ حُنَيْنٍ হলো ظَرْف زَمَانٌ আর مَوَاطِنَ হলো ظَرْف مَكَانٌ আর زَمَانٌ -এর আতফ مَكَانٌ উপর আতফ বৈধ নয়।

দ্বিতীয় কারণ হলো اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ টা يَوْمَ حُنَيْنٍ -হতে بَدَلٌ হয়েছে, যদি يَوْمَ حُنَيْنٍ -এর আতফ مَوَاطِنَ -এর উপর করা হয় তবে اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ -কেও مَوَاطِنَ হতে بَدَلٌ মানা হবে আর এটা বাতিল। কেননা এর অর্থ হবে যে, সকল স্থানেই আশ্চর্যবোধ হয়েছিল।

قَوْلُهُ هَوَازِنَ : তীরন্দাযীতে প্রসিদ্ধ এক সম্প্রদায় যারা রাসূল ﷺ -এর দুধ মা হযরত হালীমা সাদিয়া (রা.)-এর গোত্র

قَوْلُهُ حُنَيْنٍ : হুনাইন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী মক্কা হতে আঠারো মাইল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম।

قَوْلُهُ بِمَا رَحُبَتْ : رَحُبَتْ -এর رَاء বর্ণটি পেশ যুক্ত হলে অর্থ হবে প্রশস্ততা, আর যবর যুক্ত হলে অর্থ হবে প্রশস্ত বাড়ি/ঘর। আর بِمَا -এর بَاء -টি مَعَ অর্থে। আর مَا হলো مَصْدَرِيَّة কাজেই عَائِدٌ না হওয়ার আপত্তি উত্থাপন করা হবে।

قَوْلُهُ فَلَمْ تَجِدُوْا مَكَانًا : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হলো এই ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ দ্বারা বুঝা গেল যে, জমিন স্বীয় প্রশস্ততা সত্ত্বেও তা সংকীর্ণ হয়ে গেল। অথচ জমিন তার অবস্থায়ই রয়ে গেছে।

উত্তর. উত্তর এই যে, জমিনের প্রশস্ততার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَجَازًا عَدَمُ وُجُوْدِ الْمَكَانِ الْمُطْمَئِنِّ

قَوْلُهُ لِخُبْثِ بَاطِنِهِمْ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. نَجَسٌ হলো মাসদার আর মাসদারের حَمْل জাতের উপর বৈধ নয়।

উত্তর. نَجَسٌ মাসদার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذُوْ نَجَسٍ অথবা مُبَالَغَه -এর ভিত্তিতে حَمْل হয়েছে। নাজাসাতের বর্ণনার ক্ষেত্রে মুবালাগা করার জন্য। মনে হয় যেন মুশরিক হলো প্রকৃত নাপাক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো– اَلْمُشْرِكُوْنَ হলো বহুবচন আর نَجَسٌ হলো একবচন যার কারণে মুবতাদা এবং খবরের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধান হচ্ছে না।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হচ্ছে نَجَسٌ টা মাসদার হওয়ার কারণে একবচন দ্বিবচন ও বহুবচন সর্বক্ষেত্রেই এটার প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– رَجُلٌ نَجَسٌ ، رَجُلَانِ نَجَسٌ ,رِجَالٌ نَجَسٌ কতিপয় জাহিরিয়্যাহ এবং যায়দিয়্যায়হ মুশরিককে نَجَسٌ الْعَيْنِ গণ্য করে থাকেন।

قَوْلُهُ عَيْلَةً : এর অর্থ হলো দরিদ্রতা এটা عَالَ يَعِيْلُ তথা বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার, অর্থ হলো মুখাপেক্ষী হওয়া।

قَوْلُهُ وَاِلَّا لَاٰمَنُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -এর দ্বারা আহলে কিতাবদের থেকে اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ এবং اِيْمَانٌ بِالْاٰخِرَةِ -এর نَفْى করা হয়েছে। অথচ এই দলই আল্লাহ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে।

উত্তর. উত্তররের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এই লোকেরা যদি সত্যিকারার্থে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হতো, তবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর অবশ্যই ঈমান আনায়ন করত। যখন তারা রাসূল ﷺ -এর প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করেনি, কাজেই তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

قَوْلُهُ دِيْنَ الْحَقِّ اَىْ اَلدِّيْنَ الْحَقَّ : এখানে اِضَافَةُ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ عَنْ يَدٍ এটা **يُعْطُوْا-এর** যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। يَدٍ -এর তাফসীর مُنْقَادِيْنَ দ্বারা করাটা **تَفْسِيْرٌ بِاللَّازِمِ** হয়েছে। বলা হয়– **اَعْطٰى فُلَانٌ بِيَدِهٖ** অর্থাৎ اَسْلَمَ وَانْقَادَ

قَوْلُهُ بِاَيْدِيْكُمْ : এতে ইঙ্গিত **রয়েছে যে, عَنْ يَدٍ** -এর মধ্যে عَنْ টা بَاء অর্থে হয়েছে। আর এটা عَنْ يَدٍ -এর দ্বিতীয় বা অন্য তাফসীর।

قَوْلُهُ يُوَكِّلُوْنَ : এটা **বাবে تَفْعِيْلٌ এর** تَوْكِيْلٌ মাসদার থেকে মুযারের جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো সোপর্দ করা, উকিল **বানানো।**

قَوْلُهُ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ : একাবস্থায় যে, সে স্বীয় আপদস্থতার কথা অনুভব করে। اَلصَّاغِرُ الرَّاضِىُ بِالْمَنْزِلَةِ الدَّنِيَّةِ (راغب) ইমাম **শাফেয়ী (র.) বলেন, صِغَارٌ হলো** ইসলামি নীতিমালার অধীনস্থতা স্বীকার করা/গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে **কাফেরদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা** হয়েছে, এমন কি যদি সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, ইসলামের জন্যে স্ত্রী, পুত্র পরিবার, **বাড়ি-ঘর ব্যবসা-**বাণিজ্য ছেড়ে দিতে হয় তবুও অকুণ্ঠচিত্তে এমন ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দেওয়া মর্দে মুমিনের কর্তব্য বলে **ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা** এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পার্থিব জীবনের লোভনীয় বিষয়সমূহ যারা দীনের প্রয়োজনে পরিত্যাগ করে **আল্লাহ পাক তাদেরকে দীন দুনিয়া** উভয়টিই দান করেন।

পক্ষান্তরে, যখন **মানুষ দুনিয়ার দ্রব্যসম্ভারের উপর** ভরসা করে তখন দীন দুনিয়া উভয়টিই তার বিনষ্ট হয়। যেমন হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা **ছিল বার হাজার, ইসলামের** ইতিহাসে এত অধিক সংখ্যক লোক ইতিপূর্বে কোনো দিনও মুসলিম বাহিনীতে শরিক হয়নি। তাই **মুসলমানদেরকে এই অভূতপূর্ব** দৃশ্য উৎফুল্ল করে। আর আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভরতার স্থলে সংখ্যা-নির্ভরতার ভাব **পরিলক্ষিত হয় যা আল্লাহ পাক পছন্দ করেননি।** তাই মুসলমানদেরকে সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ পাক অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফেরদের **মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে বিপদগ্রস্ত** করেন। সংখ্যায় অধিক থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের অতর্কিত তীর বর্ষণের কারণে মুসলমানদের **পক্ষে রণাঙ্গনে টিকে থাকা কঠিন** হয়ে পড়ে। শুধু প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং তাঁর নৈকট্যধন্য অল্প সংখ্যক সাহাবায়ে **কেরামই রণাঙ্গনে অটল** অবিচল ছিলেন। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

–[তাফসীরে কবীর খ. ১১৬, পৃ. ২০]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে হুনাইন যুদ্ধের জয়-পরাজয় এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল এবং কিছু **দরকারী বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতিপূর্বের** সূরায় মক্কা বিজয় ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদির বিবরণ ছিল।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহর সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতিক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয়: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ **"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য** করেছেন অনেক ক্ষেত্রে।" এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হুনাইন **যুদ্ধের কথা। কারণ,** সে যুদ্ধে **এমন সব ধারণাতীত** অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী **শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা** বৃদ্ধি পায়। **সেজন্য আয়াতের** শাব্দিক তাফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত এ **যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য** ঘটনার **বিবরণ দেওয়া** সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তাফসীর অনুধাবন হবে সহজ এবং সে **সকল হিতকর বিষয়ের** উদ্দেশ্যে ঘটনার **বর্ণনা** দেওয়া হয় তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তাফসীরে **মাযহারী থেকে নেওয়া হয়েছে,** যাতে হাদীস ও ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম, যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। অষ্টম হিজরির **রমজান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয়** আর মক্কার কুরাইশরা অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজিন **গোত্রে– যার একটি শাখা তায়েফের বনূ** সাকীফ নামে পরিচিত, হৈ চৈ পড়ে যায়। ফলে তারা একত্র হয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করতে **থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের** বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের শিকার হবো আমরা। তাই **তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের** কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশ্যে হাওয়াজিন গোত্র মক্কা থেকে

তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখা গোত্রগুলোকে একত্র করে। আর সে গোত্রের মুষ্টিমেয় শ' খানেক লোক ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়।

এখানে আন্দোলনের নেতা ছিলেন মালিক ইবনে আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা বনূ কা'আব ও বনূ কিলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। এজন্য তারা বলে "পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াটাও যদি মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে একত্র হয়, তথাপি, তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।"

যা হোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকি সবাই যুদ্ধ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং যার যার সহায়-সম্পত্তিও সাথে রাখবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায় সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। এ কৌশলের ফলে যেন কারো পক্ষে পলায়নের সুযোগ না থাকে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর (র.) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা শরীফে অবহিত হন তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব ইবনে আসাদ (রা.)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং মোআজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে লোকদের ইসলামি তালিম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্রশস্ত্র ধার স্বরূপ সংগ্রহ করেন। কুরাইশের সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত ﷺ বলেন, না, না, বরং ধার স্বরূপ নিচ্ছি, যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেবো। একথা শুনে সে একশ লৌহবর্ম এবং নওফেল ইবনে হারিস তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম জুহরী (র.)-এর মতে, চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত ﷺ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদিনার বার হাজার আনসার যারা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকি দু'হাজার ছিলেন আশেপাশের অধিবাসী, যাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন; যাঁদের বলা হতো 'তোলাকা'। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনী কিনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও রণদৃশ্য উপভোগের জন্য বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার একটা ভালো সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা বিন উসমানও ছিলেন, যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত শোনান। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রা.)-এর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে মারা পড়েন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আইম তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিতবেগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পৌছি। কিন্তু দেখি যে ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবূ সুফিয়ান বিন হারিস হুজুর ﷺ -এর হেফাজতে আছে। এজন্য পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌছি এবং সংকল্প নিই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁর আয়ূ শেষ করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এসো। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বক্ষের উপর রাখেন আর দোয়া করে, "হে আল্লাহ! এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।" অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আর চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হুজুর ﷺ -কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হুজুর ﷺ -এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও আমি প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হুজুর ﷺ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাজির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধিকে প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে

মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে আর আমাকে হত্যার জন্য আশেপাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো। পরিশেষে তাই হলো।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নজর বিন হারেসের সাথে। তিনিও এ উদ্দেশ্যে হুনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ তাঁর অন্তরে হুজুর ﷺ -এর ভালোবাসা প্রবিষ্ট করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবিলা করে চলেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুরদা বিন নায়ার (রা.)-এর সাথে। তিনি 'আউতাস' নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত ﷺ বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার মাথার পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ আমার হেফাজতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবূ বুরদা (রা.) বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আল্লাহর এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রু দলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। রাসূল ﷺ বললেন, চুপ কর, আমার দীন অপরাপর দীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ আমার হেফাজত করে যাবেন। এই বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যা হোক, মুসলিম সেনাদল হুনাইন নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল বিন হানযালা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রু দলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিত হাস্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চিন্তা করো না! ওদের সবকিছু গনিমতের মালামল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হাদ্দাদ (রা.)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা রূপে পাঠান তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রুসেনা-নায়ক মালিক বিন আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, "মুহাম্মদ এখনো কোনো সাহসী যুদ্ধবাজ জাতির পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবিলা? আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে।" বস্তুত এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হলো শত্রুদের রণ-প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসেবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের ওহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিনশ তেরজন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সেনা। তাই হুনাইনের বিরাট যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে 'হাকিম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনা মতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবি করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর না-পছন্দ যে, কোনো মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসা করে থাকুক। তাই মুসলমানদের আল্লাহ এ কথাটি বুঝিয়ে দিতে চান।

হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলতি আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধুলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবীদের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হলো না। ফলে তাঁরা পালাতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী, যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ, অন্য রেওয়ায়েত মতে একশ কিংবা তারও কম, যারা হুজুর ﷺ -এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নিচে জিহাদের বায়'আত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাকারাওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসাররাই বা কোথায়? সবাই ফিরে এসো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে আছেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর এ আওয়াজ রণাঙ্গনকে প্রকম্পিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীরা ফিরে দাঁড়ায় এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধে করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ এদের সাহায্যে ফেরেশতা দল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়, কাফের সেনানায়ক মালিক বিন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দুর্গে আত্মগোপন করে। এর পর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তরজন কাফের নেতা মারা পড়ে।

কতিপয় মুসলমানের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রোপ্য।

আলোচ্য প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে যুদ্ধের এ দিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে এলো না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তার পর তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন দ্বিতীয় আয়াতে বলেন- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "অতঃপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর" এ বাক্যের অর্থ হলো হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যেসব সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা আল্লাহর প্রশান্তি লাভের পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি প্রশান্তি প্রেরণের অর্থ হলো, তাঁরা বিজয়কে খুব নিকটে দেখেছিলেন। এতে বোঝা গেল, আল্লাহর সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। যথা- ১. পলায়নরত সাহাবীদের জন্য। ২. হুজুর ﷺ -এর সাথে যারা সুদৃঢ় রয়েছেন, তাঁদের জন্য। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্য عَلٰى [উপর] শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন- "অতঃপর আল্লাহ প্রশান্তি নাজিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর।"

অতঃপর বলা হয় وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল, যাদের তোমরা দেখনি। এটি হলো সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণনা আছে তা উপরিউক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হলো- وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ "আর শাস্তি দিলেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের পরিণাম।" এ শাস্তি বলতে বোঝায় মুসলমাদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হলো। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হলো। পরবর্তী আয়াতে আখিরাতের ব্যাপারে উল্লেখ হয় নিম্নরূপে- ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ "অতঃপর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু।" এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরি আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ ঈমানের তাওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হলো।

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার মারা পড়ে; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল গনিমত রূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে। এর মধ্যে ছিল ছ' হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র , চল্লিশ হাজারেরও অধিক বকরি এবং চার হাজার উকিয়া রূপা, যার ওজন চার মণের সমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ সুফিয়ান বিন হারবকে গনিমতের এসব মালামালের তত্ত্বধায়ক নিয়োগ করেন।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলে কারীম ﷺ পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে থাকেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্য হেদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'জি'ইররানা' নামক স্থানে পৌঁছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদিনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধ প্রাঙ্গণে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'ইররানা নামকস্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

এখানে মালে গনিমত রূপে প্রাপ্ত শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঠিক ভাগ-বাটোয়ারার সময় হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দ সদস্যের এক প্রতিনিধি যোহাইর বিন ছরদের নেতৃত্বে হুজুর ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্পর্কীয় চাচা আবূ ইয়ারকানও ছিলেন। তারা এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের অনুরোধ, আমাদের পরিবার-পরিজন ও অর্থ সম্পদ আমাদের ফিরিয়ে দিন। আমরা আবূ ইয়ারকান সূত্রে আপনার আত্মীয়ও হই। আমরা যে দুর্দশায় পতিত হয়েছি, তা আপনার অজানা নয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হোন। প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনি দুর্দশার প্রেক্ষিতে যদি আমরা রোমান

বা ইরাক সম্রাটের কাছে কোনো অনুরোধ পেশ করি, তবে আশা করি যে, তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিন্তু আল্লাহ আপনার আদর্শ চরিত্রকে সবার ঊর্ধ্বে রেখেছেন। তাই আপনার কাছে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত।

রাহমাতুললিল আলামীনের জন্য এ অনুরোধ ছিল উভয় সঙ্কটের কারণ। তাঁর দয়া ও উদার নীতির দাবি ছিল ওদের সকল বন্দী ও মালামাল ফিরিয়ে দেওয়া। অপর দিক শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের উপর রয়েছে মুজাহিদদের ন্যায্য দাবি। তাদের সে দাবি থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তাই বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে হুজুর ﷺ যে জবাব দিয়েছিলেন তা হলো–

"আমার সাথে আছে অসংখ্য মুসলিম সেনা, এরা এ সকল মালামালের দাবিদার। আমি সত্য ও স্পষ্ট কথা পছন্দ করি। তাই তোমাদের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিচ্ছি দু'টির একটি হয় বন্দীদের ফেরত নাও, নয়তো মালামাল নিয়ে যাও।" যে'টি চাইবে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। তারা বন্দী মুক্তি গ্রহণ করল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল সাহাবীকে একত্র করে একটি খুৎবা পাঠ করেন। খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন।

"তোমাদের এই ভায়েরা তওবা করে এখানে এসেছে। তাদের বন্দীদের মুক্তিদান সঙ্গত মনে করছি। তোমাদের যারা সন্তুষ্ট মনে নিজেদের অংশ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হতে পার, তারা যেন এদের প্রতি দয়াবান হয়। আর যারা প্রস্তুত হতে না পারে, ভবিষ্যতের 'মালে ফাই' থেকে তাদের উপযুক্ত বদলা দেব।"

রাসূলে করীম ﷺ -এর এ খুতবার পর সর্বস্তর থেকে আওয়াজ আসে 'বন্দী প্রত্যর্পণে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে রাজি।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ন্যায়নীতি ও পরের হকের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক আছে বিধায় সমস্বরে তাদের এ সন্তুষ্টি প্রকাশকে যথেষ্ট মনে করলেন না। তাই বললেন, আমি বুঝতে পারছি না তোমাদের কে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের প্রাপ্য ত্যাগ করতে রাজি হয়েছ, কে লজ্জার খাতিরে নীরব রয়েছ। এটি মানুষের পারস্পরিক হক। সুতরাং গোত্র ও দলের সরদারগণ আপন লোকদের সঠিক রায় নিয়ে আমাকে যেন অবহিত করেন।

সেমতে তারা নিজ লোকদের ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে হুজুর ﷺ-কে জানান যে, প্রত্যেকে নিজেদের অধিকার ছাড়তে রাজি আছে। একথা জানার পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান করেন। এই লোকদের কথা আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ অঃপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তাদেরকে তওবার তাওফীক দেবেন। হুনাইন যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো, তার কিছু অংশ কুরআন থেকে এবং বাকি অংশ নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, ইবনে কাসীর]

আহকাম ও মাসায়েল : উপরিউক্ত ঘটনাবলি থেকে বিভিন্ন আহকাম ও মাসায়েল এবং প্রাসঙ্গিক কিছু জরুরি বিষয় প্রমাণিত হয়। মূলত এগুলোর বর্ণনার জন্য ঘটনাগুলোর উল্লেখ করা হলো।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য : উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত হলো মুসলমানদের কোনো অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহর সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

হুনাইন যুদ্ধে পর্যাপ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও মুসলিম সেনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, তা আল্লাহর নিকট তাঁর প্রিয় বান্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহর গায়েবি সাহায্য পেয়ে তাঁরা এ যুদ্ধে জয়ী হন।

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণের ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেওয়া : দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ এবং প্রত্যার্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ এরা ছিল বিজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই জোর করেও সমর্থন আদায় করা যেত। কিন্তু হুজুর ﷺ তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদ্ব্যবহারের হেদায়েত।

তৃতীয় হেদায়েত : রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের সেখানে, যেখানে মক্কার কুরাইশরা মুসলমাদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, তাহলো, আল্লাহ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহর শোকর আদায় করে। দুর্গে আশ্রয় নেওয়া হাওয়াযিন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদদোয়ার পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া রাসূল ﷺ করেছেন তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিছক পরাভূত করা নয়, বরং উদ্দেশ্যে হলো হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ হেদায়েত : পরাজিত শত্রুদেরও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়াযিন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লজ্জা বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফিকহশাস্ত্রবিদরা এ থেকে এই মাসআলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনের চাঁদা আদায় করাও জায়েজ নয়। কারণ অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভদ্রলোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে অথচ, অন্তর এতে পূর্ণ সায় দেয় না। এ ধরনের অর্থকড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ الخ : সূরা বারাআতের শুরুতে কাফের মুশরিকদের সাথে সম্পর্কছেদের কথা ঘোষণা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে সম্পর্কচ্ছেদ সম্পর্কিত বিধিবিধানের উল্লেখ করা হয়। সম্পর্কচ্ছেদের সারকথা ছিল বছরকালের মধ্যে কাফেরদের সাথে কৃত চুক্তিসমূহ বাতিল বা পূর্ণ করে দেওয়া হোক এবং এ ঘোষণার এক বছর পর কোনো মুশরিক যেন হেরমের সীমানায় না থাকে।

আলোচ্য আয়াতে এক বিশেষ কায়দায় বিষয়টির বিবরণ দেওয়া হয়। এতে রয়েছে উপরিউক্ত আদেশের হিকমত ও রহস্য এবং তজ্জনিত কতিপয় মুসলমানের অহেতুক আশঙ্কার জবাব। এ আয়াতে উল্লিখিত نَجَسٌ [নাজাস] শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ব্যাপক অর্থে পঙ্কিলতা যার প্রতি মানুষের ঘৃণাবোধ থাকে, ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র.) বলেন, 'নাজাস. বলতে চোখ, নাক ও হাত দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহের যেমন, তেমনি জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা অনুভূত বস্তুসমূহের অপবিত্রতা বোঝানো হয়। তাই 'নাজাস' বলতে দৃশ্যমান ঘৃণিত বস্তুকেও বোঝায় এবং অদৃশ্য অপবিত্রতা যার ফলে শরিয়তে অজু বা গোসল ওয়াজিব হয় তাও বুঝায়। যেমন জানাবত, হায়েজ, নেফাস পরবর্তী অবস্থা এবং ঐ সকল বাতেনী নাজাসত যার সম্পর্ক অন্তরের সাথে রয়েছে যেমন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ ঘৃণিত স্বভাব।

উল্লিখিত আয়াতের শুরুতে اِنَّمَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা حَصْر বা কোনো বস্তুর সার্বিক মর্মকে সীমিত করা হয়। তাই اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ-এর মর্ম হবে মুশরিকরা সঠিক অর্থেই অপবিত্র। কারণ এদের মধ্যে সাধারণত তিন ধরনের অপবিত্র থাকে। তারা অনেকগুলো দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তুকেও অপবিত্র মনে করে না। যেমন মদ ও মাদক দ্রব্যাদি। আর অদৃশ্য অপবি বস্তুতেও অপবিত্র কিছু আছে বলে তারা বিশ্বাসও করে না। যেমন স্ত্রীসঙ্গম ও হায়েজ-নেফাস পরবর্তী অবস্থা সে জন্য এ মন্দ স্বভাবগুলোকেও তারা দূষণীয় মনে করে না।

তাই আয়াতে মুশরিকদের প্রকৃত খাঁটি অপবত্রি রূপে চিহ্নিত করে আদেশ দেওয়া হয়- فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল হারাম' বলতে সাধারণত বুঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙিনাকে, যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কুরআন ও হাদীসের কোনো কোনো স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হেরেম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা কয়েক বর্গমাইল এলাকা ব্যাপী, যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.) যেমন মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামদের ঐকমতে এখানে মসজিদুল হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ মেরাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম-এর উল্লেখ রয়েছে الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তার অর্থও পূর্ণ হারাম শরীফ। কারণ এখানে উল্লিখিত সন্ধির স্থান হলো 'হুদয়বিয়া' যা হারাম শরীফের সীমানার বাইরে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। -[জাস্‌সাস] এ বছরের পর মুশরিকদের জন্য পূর্ণ হেরেম শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হলো।

তবে এ বছর বলতে কোনটি, বোঝায় তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরি। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তা হলো নবম হিজরি। কারণ নবী করীম ﷺ নবম হিজরির হজের মৌসুমে হযরত আলী ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরি থেকে দশম হিজরি পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরির পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

কতিপয় প্রশ্ন : উল্লিখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরির পর মসিজদুল হারামের মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিন প্রশ্ন আসে। যথা- ১. এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল হারামের জন্য, না অন্যান্য মসজিদের জন্যও? ২. মসজিদুল হারামের

হয়ে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্য, না শুধু হজ ও ওমরার জন্য? ৩. এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্য, না আহলে-কিতাব কাফেরদের জন্যও?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কুরআন নীরব, তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কুরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হুজুর ﷺ -এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোচনা করতে হয়, কুরআন মাজীদ মুশকিদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রতা হেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরজ হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে কথাটি যদি কুফর-শিরকের বাতেনী অপবত্রিতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবত এর হুকুম হবে ভিন্ন।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, মদীনার ফিকহশাস্ত্রবিদরা তথা ইমাম মালেক (র.) ও অন্য ইমামদের মতে মুশরিকরা যে কোনো দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি জানাবতের গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর-শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্য হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)-এর একটি ফরমানকে দলিলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকদের লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, "মসজিদসমূহে কাফেরদের প্রবেশ করতে দেবে না।" এ ফরমানে তিনি উপরিউক্ত আয়াতটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলিল হলো নবী করীম ﷺ -এর এই হাদীস।

"কোনো ঋতুমতী মহিলা বা জানাবতের কারণে যার জন্য গোসল ফরজ হয়েছে, তার পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েজ মনে করি না।" আর এ কথা সত্য যে,. কাফের-মুশরিকরা জানাবতের গোসল সাধারণত করে না। তাই তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হুকুমটি কাফের-মুশরিক এবং আহলে-কিতাব সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল হারামের জন্য নির্দিষ্ট। অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশাদি নিষিদ্ধ নয়। –[কুরতুবী]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো ছুমামা ইবনে উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে এক স্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম ﷺ তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উপরিউক্ত মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য মুশরিকদের প্রতি যে, আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হলো আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্বীয় রীতি অনুযায়ী হজে ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাঁর দলিল হলো, হজের যে মৌসুমে হযরত আলী (রা.)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয় তাতে একথা উল্লেখ ছিল– لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ অর্থাৎ "এ বছর পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না।" তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াতে? فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ "মুশরিকগণ মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হবে না।" এর অর্থ হবে আগামী বছর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র.) অতঃপর বলেন, হজ ও ওমরা ছাড়া মুশরিকরা অন্য কোনো প্রয়োজনে আমীরুল মুমিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাদের দলিল হলো মক্কা বিজয়ের পর সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো মসজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ এরা তখন ও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামও আপত্তি তুলেছিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এরা তো অপবিত্র। রাসূল ﷺ তখন বলেছিলেন, মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না।
–[জাসসাস]

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয় যে, কুরআন মাজীদে মুশকিরদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন, "কোনো মুশরিক মসজিদের নিকটবর্তী হবে না।" তবে সে কোনো মুসলমানদের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন বোধে প্রবেশ করতে পারে। –[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হলো কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশঙ্কা। এ আশঙ্কা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেওয়া হলো। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানরাও মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এখানে মসজিদুল হারাম বলতে যখন পূর্ণ হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য। তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কুফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সঙ্গত। এজন্য শুধু মসজিদুল হারামের নয়; বরং পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি হলো ইসলামের দুর্গ। কোনো অমুসলিম থাকতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উপরিউক্ত তত্ত্বের সারকথা হলো, কুরআন ও হাদীস মতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক এবং এটি জরুরি বিষয় কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদি হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বারাআতের শুরুতে। অর্থাৎ অচিরেই হেরেম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হেরেম শরিফ ত্যাগের আদেশ দেওয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এবং অন্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এ আদেশ কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, "এ বছরের পর পূর্ণ হেরেম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না।" তারা শিরকী প্রথামতে হজ ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয় যে, নবম হিজরির পর কোনো মুশরিক হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। রাসূলে কারীম ﷺ এ আদেশকে আরো ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোনো কাফের-মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হুজুর ﷺ নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন।

বাকি থাকল কাফেরদের অপবিত্রতা এবং মসজিদগুলোকে নাপাকী থেকে পবিত্র করার মাসআলা। এ সম্পর্কে ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, কোনো মুসলমান প্রকাশ্য নাপাকী নিয়ে এবং গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় কোনো মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যদিকে কাফের-মুশরিক হোক বা আহলে-কিতাব তারাও সাধারণত উল্লিখিত নাপাকী থেকে পবিত্র নয়, তাই বিশেষ প্রয়োজন না হলে তাদের জন্যও কোনো মসজিদে প্রবে জায়েজ নয়।

উক্ত আয়াত মতে, হেরেম শরীফে কাফের-মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে মুসলমানদের জন্য এক নতুন অর্থনৈতি সমস্যার সৃষ্টি হলো। কারণ মক্কা হলো অনুর্বর জায়গা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন এখানে হয় না। বহিরাগত লোকেরা এখানে খাদ্যের চালান নিয়ে আসতো। এভাবে হজের মৌসুমে মক্কাবাসীদের জন্য জীবিকার প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাড় হয়ে যেত। কিন্তু হেরেম শরীফে ওদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে পূর্বাবস্থা আর বাকি থাকবে না। এ প্রশ্নের উত্তর আয়াতের এ বাক্যে আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً الخ অর্থাৎ "তোমরা যদি অভাব-অনটনের ভয় কর তবে মনে রেখ যে, রিজিকের সকল ব্যবস্থা আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে কাফেরদের থেকে তোমাদের বেনিয়াজ করে দেবেন। "আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাক্য দ্বারা সন্দেহের উদ্রেক করা উদ্দেশ্য নয়; বরং বাক্যটি এ কথার ইঙ্গিতবহ যে, পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা যদিও মনে করবে যে, কাফেরদের হেরেম শরীফে আসতে না দেওয়ার ফলে আর্থিক সঙ্কট অনিবার্য; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উপকরণের মুখাপেক্ষী নন। বরং বিলম্ব তাঁর ইচ্ছার। তিনি ইচ্ছা করলেই সবকিছু অনায়াসে হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে, "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের অভাব দূর করে দেবেন।"

قَوْلُهُ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের এবং তাদেরকে আরব ভূ-খণ্ড থেকে বহিষ্কার করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ রয়েছে।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লমা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৯৮, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ২৭]

আর এ জিহাদ কত দিন চলবে তার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তারা আপমানিত হয়ে অমুসলিম কর আদায় না করে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত থাকবে, আরবের মুশরিকদের ব্যাপারে বিধান হলো হয় ইসলাম গ্রহণ করবে, অথবা তরবারি দ্বারা মীমাংসা করা হবে।

প্রিয়নবী ﷺ যখন আরবদের সঙ্গে জিহাদ শেষ করলেন তখন আল্লাহ পাক আহলে কিতাবদের সঙ্গে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন, হযরত হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ আরবদের সঙ্গে জিহাদ করেন আর তাদের নিকট থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেননি, তবে আহলে কিতাবদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় তাদের থেকে জিজিয়াও গ্রহণ করেছেন। জিজিয়া হলো অমুসলিম কর। সর্বপ্রথম নাজরানবাসী জিজিয়া আদায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

وَقَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না, আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

মুজাহিদ (র.) বলেছেন যখন রুমীয়দের সাথে প্রিয়নবী ﷺ -কে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরই প্রিয়নবী ﷺ তাবুকের যুদ্ধে তাশরিফ নিয়ে যান।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩০৮, তাফসীরে মাযহারী খ. ৫ পৃ. ২৩৫]

আহলে কিতাব তথা ইহুদি নাসারাদের মধ্যে যখন চারটি দোষ পাওয়া যায় তখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। যথা–

১. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না। কেননা তারা হযরত ঈসা (আ.) ও ওজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করে [নাউজুবিল্লাহ] এটি ঈমান বিরোধী কাজ, আল্লাহ পাকের একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করে না।

২. وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আর তারা আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না। ইহুদিরা মনে করে তারাই জান্নাতে যাবে, আর নাসারারা মনে করে জান্নাতের আধিকারী একমাত্র তারাই। ইহুদিরা দাবি করে সামান্য কয়েক দিন দোজখ তাদেরকে স্পর্শ করবে, এরপর তারা নাজাত পাবে। আর ইহুদি নাসারারা এ কথাও বলে যে, জান্নাতের নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের ন্যায়ই হবে। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, জান্নাত চিরস্থায়ী না সাময়িক, এসব কারণে আখিরাতের প্রতি তাদের ঈমান নেই এ কথাই প্রমাণিত হয়।

৩. وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ যে সব বিষয়কে হারাম ঘোষণা করেছেন তারা সেগুলোকে হারাম মনে করে না। এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। ক. পবিত্র কুরআনে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর মহান আদর্শে যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে তারা সেগুলোকে হারাম বলে মনে করে না। খ. তাওরাত ইঞ্জিলে যা হারাম বলে ঘোষিত হয়েছে তারা সেগুলোও মানে না; বরং তাওরাত ইঞ্জিলে তারা পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদের ইচ্ছা মতো বিধান তৈরি করেছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে رَسُوْلُهٗ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেই রাসূল, যার অনুসরণের দাবি করে তারা, অথচ সে রাসূলেরও অনুসরণ তারা করে না। কেননা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) আদেশ দিয়ে গেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসরণ করতে, কিন্তু তারা তা করে না।

৪. وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের 'হক্ব' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এমন অবস্থায় এর অর্থ হবে যারা আল্লাহর দীন সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না। কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ "আল্লাহ পাকের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হলো ইসলাম" আর তারা ইসলাম গ্রহণ করে না।

জিযিয়া ও খেরাজ : জিযিয়া বলা হয় সে করকে, যা কাফেরদের জীবনের বদলে আদায় করা হয়। যিজিয়া শব্দটি "জাযা" থেকে নিষ্পন্ন অর্থাৎ তুমি মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধী ব্যক্তি। কিন্তু তোমাকে এ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমার উপর এ দণ্ড জারি হচ্ছে না এবং দারুল ইসলামে নিরাপত্তার সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তোমাকে হত্যাও করা হয়নি এবং তোমাকে গোলামও বানানো হয়নি। যেভাবে মুক্তিপণ আদায় করলে মৃত্যুদণ্ড বাতিল হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে জিযিয়া আদায় করলেও হত্যার বিধান কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয়ত ইসলামি রাষ্ট্র আর একটি উপকার করে তা হলো, ঠিক মুসলমানদের ন্যায় তোমাদের জানমাল, ইজ্জত আবরুর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে জান মালের হেফাজত মুসলিম অমুসলিম সকলের ব্যাপারে সমভাবে করা হয়, এটি ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর ইসরামি রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রকে বলা হয় যার সংবিধান ইসলামি শরিয়তের ভিত্তিতে তৈরি হয় যাতে ইসলামি আইন কানুন কার্যকর হয়। আর খেরাজ হলো সে কর যা অমুসলিম প্রজাদের জমিনের উপর ধার্য করা হয়।

قَوْلُهٗ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ : অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান আনে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত তারা অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া বা অমুসলিম কর আদায় করে। আলোচ্য আয়াতে عَنْ يَّدٍ "আন্ ইয়াদীন" শব্দ দ্বারা আনুগত্য বুঝানো হয়েছে অথবা এর অর্থ হলো অমুসলিমরা এ জিযিয়া স্বহস্তে আদায় করবে অন্য কারো হাতে নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করেছেন। এজন্য জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারে আদায়কারীর নিজের কোনো প্রতিনিধি নিযুক্ত করা বৈধ নয়। অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অপমানিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় করা। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো নগদ আদায় করা, বাকি না রাখা। আর তাফসীরকারদের মধ্যে কেউ এ কথাও বলেছেন যে, এর অর্থ হলো মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ হয়ে জিযিয়া আদায় করা এই মর্মে যে, মুসলমানগণ তাকে হত্যা করেনি, কিছু অর্থ সম্পদ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

صٰغِرُوْنَ -এর অর্থ হলো অপমানিত এবং পরাজিত অবস্থায় জিযিয়া আদায় করা। এজন্য তাফসীরকার ইকরিমা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে জিযিয়ার অর্থ গ্রহণ করবে সে উপবিষ্ট থাকবে, আর যে প্রদান করবে সে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামি বিধান কার্যকর করাই তাদের জন্য অবমাননা।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আহলে কিতাবদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে, আরব হোক বা অনারব এবং অনারব মুশরিকদের নিকট থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হবে সে মূর্তিপূজক হোক বা অগ্নিপূজক। তবে মুরতাদ [ধর্মত্যাগী] লোকদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না, এমনিভাবে কুরাইশের মুশরিকদের থেকেও জিযিয়া গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, জিযিয়া ধর্মের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয় ব্যক্তিত্বের ভিত্তিতে নয়। এজন্যে শুধু আহলে কিতাবদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হবে সে আরব হোক বা অনারব।

ইমাম মালেক (র.) মুয়াত্তায় এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) 'আল উম্ম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমি জানি না অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে কি করবো? তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তাদের সাথে আহলে কিতাবদের ন্যায় ব্যবহার কর।"

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আমাকে সুফিয়ান সাঈদ ইবনে মরজবানের সূত্রে বলেছেন, ফারেয়া ইবনে নওফল এই মন্তব্য করেন যে, অগ্নিপূজকদের থেকে কোনো ভিত্তিতে জিযিয়া গ্রহণ কর, অথচ তারাতো আহলে কিতাব নয়, এ মন্তব্য শ্রবণ করে 'মোস্তাওরাদ' রাগান্বিত যে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি হযরত আবূ বকর (রা.), হযরতর ওমর (রা.) এবং আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি দোষারোপ করছ, তাঁরা অগ্নিপূজক থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। এরপর মোস্তাওরাদ খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হাজির হন এবং বলেন, আমি অগ্নিপূজকদের অবস্থা সর্বাধিক জানি; তাদের নিকট দীনি ইলম এবং কিতাব ছিল, যা তারা পাঠ করতো।

একবার তাদের বাদশাহ মাতাল অবস্থায় তার কন্যা বা মাতার সঙ্গে কুকর্মে লিপ্ত হয়। তার এ ঘৃণ্য কাজ কেউ দেখে ফেলে। যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন লোকেরা তাকে কিতাবে এই অন্যায়ের যে শাস্তি আছে তা দিতে চায়। তখন সে তার প্রজাসাধারণকে একত্র করে বলে, আদমের দীনের চেয়ে কোনো উত্তম দ্বীন হতে পারে কি? আদম তো নিজের পুত্রদের সঙ্গে তার কন্যাদের বিয়ের ব্যবস্থা করতেন। আমি আদমের ধর্ম গ্রহণ করেছি। তোমাদেরও এ ধর্ম পরিত্যাগ করার কোনো কারণ নেই। এ কথা শ্রবণ করে লোকেরা তাদের বাদশাহর ধর্ম গ্রহণ করলো। আর যে বিরোধিতা করল তাকে হত্যা করল। এর পরিণাম স্বরূপ একই রাত্রে সমস্ত আলেমদের দিল থেকে ইলম বিদায় নিল।

এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, অগ্নিপূজকরা আহলে কিতাব। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করেছেন। এ ঘটনা ইবনে জওযী তাঁর 'আত-তাহকীক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৩৭-৩৮]

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, পরস্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমে জিযিয়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। হুজুরে আকরাম ﷺ [ইয়েমেনের] নাজরানীদের থেকে দু' হাজার জোড়া কাপড় আদায়ের শর্তে মীমাংসা করেছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) সূত্রে লিখেছেন যে, হুজুর ﷺ নাজরানবাসী থেকে দু'হাজার জোড়া কাপড় আদায়ের শর্তে মীমাংসা করেছিলেন, যার অর্ধেক সফর মাসে, আর অবশিষ্ট অর্ধেক রজব মাসে আদায় করার কথা ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) লিখেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীকে একটি লিখিত দলিল দিয়েছিলেন, তাতে লিখা ছিল নাজরানবাসী দু'হাজার জোড়া পোশাক আদায় করবে।

অনুবাদ :

٣٠. وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ نِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج لَا مُسْتَنَدَ لَهُمْ عَلَيْهِ بَلْ يُضَاهِئُوْنَ يُشَابِهُوْنَ بِهِ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط مِنْ اٰبَائِهِمْ تَقْلِيْدًا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ط اَنّٰى كَيْفَ يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيْلِ ـ

৩০. ইহুদিরা বলে ওজাইর আল্লাহর পুত্র আর খৃস্টানরা বলে মসীহ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র। তা তাদের মুখের কথা। এই বিষয়ে তাদের কোনো সনদ নেই; বরং তাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে পূর্বে যারা কুফরি করেছিল তাদের অনুকরণে তারা তাদের মতো তাদের কথার অনুরূপ কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন তাঁর রহমত হতে এদেরকে বিতাড়িত করুন কেমন করে তারা সত্য-বিমুখ হয়! অর্থাৎ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেমন করে তারা ন্যায় ও সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়! اَنّٰى -এটা এইস্থানে كَيْفَ [কেমন করে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣١. اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ عُلَمَاءَ الْيَهُوْدِ وَرُهْبَانَهُمْ عُبَّادَ النَّصٰرٰى اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَيْثُ اِتَّبَعُوْهُمْ فِيْ تَحْلِيْلِ مَا حُرِّمَ وَتَحْرِيْمِ مَا اُحِلَّ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اَيْ بِاَنْ يَّعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ

৩১. তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সন্ন্যাসীগণকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে, তাই তো তারা হারাম বস্তু হালাল করা এবং হালাল বস্তু হারাম করার কাজে তাদেরই অনুসরণ করে আর মারইয়াম-তনয় মসীহকেও। অথচ তাওরাত বা ইঞ্জীলে এক আল্লাহর ইবাদত করতেই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাদেরকৃত শরিক হতে তিনি কত ঊর্ধ্বে! তাঁর জন্যই তো সকল পবিত্রতা। اَحْبَارَهُمْ অর্থ– ইহুদিদের ধর্ম-পণ্ডিতগণ। رُهْبَانَ অর্থ– খ্রিস্টানদের সন্ন্যাসী, ইবাদতকারীগণ।

٣٢. يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ شَرْعَهٗ وَبَرَاهِيْنَهٗ بِاَفْوَاهِهِمْ بِاَقْوَالِهِمْ فِيْهِ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ يُظْهِرَ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ذٰلِكَ ـ

৩২. তারা তাদের মুখ দ্বারা অর্থাৎ কথা দ্বারা আল্লাহর জ্যোতি অর্থাৎ তাঁর শরিয়ত ও প্রমাণাদি নির্বাপিত করতে চায়। আর আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত কিছু চান না যদিও কাফেরগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে।

٣٣. هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ مُحَمَّدًا بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ يُغْلِبَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ الْمُخَالِفَةِ لَهٗ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ذَالِكَ ـ

৩৩. অপর সমস্ত বিরুদ্ধে দীনের উপর প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ তাকে জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথ নির্দেশ ও সত্যদীনসহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন। যদিও অংশীবাদীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

٣٤. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ يَاْخُذُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ كَالرُّشٰى فِى الْحُكْمِ وَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط دِيْنِهٖ وَالَّذِيْنَ مُبْتَدَأٌ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا اَىِ الْكُنُوْزَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ لَا يُؤَدُّوْنَ مِنْهَا حَقَّهٗ مِنَ الزَّكٰوةِ وَالْخَيْرِ فَبَشِّرْهُمْ اَخْبِرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُّؤْلِمٍ ـ

৩৪. হে মুমিনগণ! ইহুদি পণ্ডিত ও খৃস্টান সন্ন্যাসীদের অনেকে লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে গ্রহণ করে। যেমন– বিধান দানের বেলায় তাদের ঘুষ গ্রহণ এবং লোককে আল্লাহর পথ হতে অর্থাৎ তাঁর দীন হতে নিবৃত্ত করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা অর্থাৎ উক্ত পুঞ্জীভূত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে না অর্থাৎ জাকাত ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মে ব্যয় করত তার হক আদায় করে না। তাদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তির সংবাদ দাও। اَلَّذِيْنَ–এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য।

٣٥. يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى تُحْرَقُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط تُوَسَّعُ جُلُوْدُهُمْ حَتّٰى تُوْضَعَ عَلَيْهِ كُلُّهَا وَيُقَالُ لَهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ اَىْ جَزَاۤؤُهٗ ـ

৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে পুড়ানো হবে। তাদের চামড়া বহু বিস্তৃত করে দেওয়া হবে এবং সমস্ত পুঞ্জীভূত সম্পদ তাতে রাখা হবে। তাদেরকে বলা হবে এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করেছিলে। সুতরাং তোমর যা পুঞ্জীভূত করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর। তার প্রতিফল ভোগ কর।

٣٦. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ الْمُعْتَدِّ بِهَا لِلسَّنَةِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَىِ الشُّهُوْرِ ـ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ مُحَرَّمَةٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُوا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَ رَجَبُ ذٰلِكَ اَىْ تَحْرِيْمُهَا الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا الْمُسْتَقِيْمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَىِ الْاَشْهُرِ الْحُرُمِ اَنْفُسَكُمْ بِالْمَعَاصِىْ فَاِنَّهَا فِيْهَا اَعْظَمُ وِزْرًا وَ قِيْلَ فِى الْاَشْهُرِ كُلِّهَا ـ

৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফূজে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় বৎসরে তার সংখ্যা বিরাট। তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ। ঐগুলো হলো যিলকদ, জিলহজ, মহররম ও রজব। এটাই অর্থাৎ তার নিষিদ্ধ হওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় দীন, সুতরাং এটার মধ্যে অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহের মধ্যে। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ সকল মাসের মধ্যে তোমরা পাপকার্য করে নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না। কেননা এই মাসের মধ্যে পাপকার্য আরো অধিক অন্যায়।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً أَيْ جَمِيْعًا فِيْ كُلِّ الشُّهُوْرِ كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً ط وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ .

তোমরা অংশীবাদীদের সাথে সমবেতভাবে সকল মাসেই যুদ্ধ করবে যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে থাকে। জেনে রাখ, আল্লাহ সাহায্য ও সহযোগিতাসহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন। حُرُمٌ অর্থ– مُحَرَّمٌ তথা নিষিদ্ধ।

٣٧. إِنَّمَا النَّسِيْءُ أَيِ التَّاخِيْرُ لِحُرْمَةِ شَهْرٍ إِلٰى أُخَرَ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ مِنْ تَاخِيْرِ حُرْمَةِ الْمُحَرَّمِ إِذَا أَهَلَّ وَهُمْ فِي الْقِتَالِ إِلٰى صَفَرٍ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ لِكُفْرِهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ فِيْهِ يُضَلُّ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ أَيِ النَّسِيْءَ عَامًا وَيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا يُوَافِقُوْا بِتَحْلِيْلِ شَهْرٍ وَتَحْرِيْمِ أُخَرَ بَدَلَهُ عِدَّةَ عَدَدَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ مِنَ الْأَشْهُرِ فَلَا يَزِيْدُوْنَ عَلٰى تَحْرِيْمِ أَرْبَعَةٍ وَلَا يَنْقُصُوْنَ وَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلٰى أَعْيَانِهَا فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ط زُيِّنَ لَهُمْ سُوْءُ أَعْمَالِهِمْ فَظَنُّوْهُ حَسَنًا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ .

৩৭. নিশ্চয় পিছিয়ে দেওয়া অর্থাৎ নিষিদ্ধকাল একমাস হতে অন্যমাসে পিছিয়ে নেওয়া যায়, যেমন, জাহেলীযুগে এমন ছিল যে, যুদ্ধরত অবস্থায় যদি মুহাররম মাস এসে পড়তো তবে ঐ বৎসরের জন্য মুহাররাম মাসের নিষিদ্ধতা সফর মাসে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, কুফরির অর্থাৎ এটা আল্লাহর বিধান ও নির্দেশের অবাধ্যতার মাত্রা বৃদ্ধি করা মাত্র যা দ্বারা কাফেররা বিভ্রান্ত করে। তারা তাকে পিছিয়ে দেওয়াকে يُضَلُّ -এর يَاء বর্ণটি পেশও যবর উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। কোনো বৎসর বৈধ করে এবং কোনো বৎসর অবৈধ করে যাতে অর্থাৎ একমাস বৈধ করতে তদস্থলে অন্য মাসকে অবৈধ করার মাধ্যমে তারা যে সমস্ত মাস আল্লাহ অবৈধ করেছেন তার গণনা অর্থাৎ সংখ্যার সাযুজ্য বিধান করতে পারে। অনুরূপ করতে পারে। তারা সংখ্যা হিসেবে চারমাস হতে অতিরিক্তও করতে না এবং তা হতে হ্রাসও করত না, বটে তবে নির্দিষ্ট মাসসমূহ বজায় রাখার প্রতি তারা দৃষ্টি দিত না। এবং যাতে তারা আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা বৈধ করতে পারে। তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে ফলে এগুলোকেই তারা ভালো ধারণা করে। আল্লাহ সত্য-প্রত্যাখানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عُزَيْرٌ : একজন প্রসিদ্ধ ইসরাঈলী বুযুর্গের নাম। যার সম্পর্কে কতিপয় আরবের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আল্লাহর সন্তান। عُزَيْرٌ শব্দটিকে কেউ مُنْصَرِفٌ আবার কেউ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ পড়েছেন। তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। রূহুল মা'আনীতে রয়েছে إِخْتَلَفَ فِيْ عُزَيْرٍ هَلْ هُوَ نَبِيٌّ أَمْ لَا وَالْأَكْثَرُوْنَ عَلَى الثَّانِيْ আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) الْإِتْقَانُ فِيْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ -এর মধ্যে এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.) লিখেছেন যে, عُزَيْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَاهِنٌ عَزْرَاء যিনি স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা বলে তাওরাতকে পুনরায় জীবন দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ يُضَاهِئُوْنَ : এটা বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর مُضَاهَاةٌ মাসদার থেকে مُضَارِعٌ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ হলো সাদৃশ্য সৃষ্টি করতেছে। ضَهْىٌ অর্থ- দৃষ্টান্ত, মতো, সদৃশ। ضَهْيًا মাসদার, বাবে سَمِعَ হতে জিনসে نَاقِص يَائِي অর্থ নারীর পুরুষের মতো হয়ে যাওয়া ঋতুস্রাব না হওয়া, স্তন ফুলে না উঠা এবং গর্ভধারণ না করা। ضَهْيَاءُ অর্থ– পুরুষরূপী নারী।

قَوْلُهُ يُؤْفَكُوْنَ : এটা বাবে ضَرَبَ -এর أَفْكٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ অর্থ– কোথায় ফিরে যাচ্ছে।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَعْبُدُوْنا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِيَعْبُدُوْا -এর মধ্যে لَامْ -টি بَاء -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গেল যে, اِلَّا -এর সেলাহ لَامْ আসে না।

প্রশ্ন. اَنْ -কে কেন উহ্য মানা হলো?

উত্তর. যাতে হরফে জার প্রবেশ করা বৈধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ شَرْعَهُ : **প্রশ্ন.** نُوْر -এর তাফসীর শরিয়ত এবং بُرْهَانٌ দ্বারা করার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে?

উত্তর. এর দ্বারাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. হলো এই যে, نُوْر তো আল্লাহ তা'আলার ذَاتٌ -এর সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহলে সে ঐ নূরকে নির্বাপিত করতে চায় কিভাবে? অথচ সে জ্ঞান সম্পন্নদের অন্তর্গত।

উত্তর. এই যে, নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শরিয়ত।

قَوْلُهُ بِاَقْوَالِهِمْ فِيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে مَحَلّ বলে حَالْ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা মুখ দ্বারা শরিয়তকে নির্বাপিত করার কোনো অর্থই হয় না। উদ্দেশ্য হলো اَقْوَالْ অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষণ করা ও অপবাদ আরোপ করা।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : ذَالِكَ এটা كَرِهَ -এর উহ্য মাফঊল হয়েছে।

قَوْلُهُ يَاْخُذُوْنَ : يَاْكُلُوْنَ -এর তাফসীর يَاْخُذُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাক্যের মধ্যে اِسْتِعَارَه রয়েছে। অর্থাৎ اَكْل দ্বারা اَخْذ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। مَقْصُوْد اَعْظَمْ হওয়ার কারণে اَكْل -এর নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيِ الْكُنُوْزُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يُنْفِقُوْنَهَا -এর যমীর كُنُوْز -এর দিকে ফিরেছে, যা يَكْنِزُوْنَ -এর দ্বারা বুঝা যায় এই সন্দেহ শেষ হয়ে গেল যে, পূর্বে ذَهَبْ -এবং فِضَّة দুটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে কাজেই يُنْفِقُوْنَهُمَا হওয়া উচিত ছিল।

قَوْلُهُ اَيْ لَا يُؤَدُّوْنَ مِنْهَا حَقَّهُ مِنَ الزَّكٰوةِ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর মধ্যে مُطْلَقًا আল্লাহর পথে ব্যয় না করার উপর ধমক রয়েছে। এতে اِنْفَاقْ -এর পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। বুঝা গেল যে, সমস্ত সম্পদ ব্যয় না করার প্রতি ধমক এসেছে। অথচ সকল মাল ব্যয় করা জরুরি নয়। এই প্রশ্নের জবাবের প্রতিই لَا يُؤَدُّوْنَ الخ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كُلّ বলে جُزْء উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ : অর্থাৎ اِنَّ النَّارَ تُوْقَدُ عَلَيْهَا وَهِيَ ذَاتُ حَمِيٍّ وَحَرٍّ شَدِيْدٍ وَلَوْ قَالَ يَوْمَ يُحْمٰى اَيِ الْكُنُوْزُ لَمْ يُعْطِ هٰذَا الْمَعْنٰى فَجَعَلَ الْاِحْمَاءَ لِلنَّارِ مُبَالَغَةً ثُمَّ حَذَفَ النَّارَ وَاَسْنَدَ الْفِعْلَ اِلَى الْجَارِ

قَوْلُهُ اَخْبِرْهُمْ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য যে, فَبَشِّرْهُمْ এটা মুবতাদার খবর হয়েছে। অথচ اِنْشَاء -এর খবর হওয়া ঠিক নয়।

জবাবের সারকথা হলো যেদিকে মুফাসসির (র.) وَاَخْبِرْهُمْ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা فَبَشِّرْهُمْ فِيْ حَقِّهِمْ -এর তাবীল -এর মধ্যে হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : জালালাইনের নোসখায় اَلْخَبَرُ লেখা রয়েছে যা মূলত অনুলেখকের ভ্রান্তি।

قَوْلُهُ تُكْوٰى : تُكْوٰى অর্থ– দাগ দেওয়া হবে। এটা বাবে ضَرَبَ -এর كَيٌّ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهُ اَيْ جَزَاؤُهُ : উহ্য مُضَافْ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كَنْز এটা স্বাদ গ্রহণের বস্তু নয়। উদ্দেশ্য হলো-**ব্যয়** না করার শাস্তি ভোগ করা।

قَوْلُهُ لِلسَّنَةِ : অর্থাৎ اَلْمُعْتَدُّ بِهَا لِحِسَابِ السَّنَةِ এখানে মূলত اَلْحِسَابُ মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মাস ১২ টি। যার মাধ্যমে বছরের হিসাব হয়ে থাকে। চান্দ্র বছর ৩৫৫ দিনে হয়। আর সৌর বছর ৩৬৫ দিনে হয়। চান্দ্র বছর সৌর বছরের তুলনায় দশ দিন কম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مُحَرَّمَةٌ : প্রশ্ন : حُرُمٌ মাসদার কাজেই أَرْبَعَةٌ -এর উপর এর حَمْل বৈধ হবে না।

উত্তর. حُرُمٌ এটা مُحَرَّمَةٌ ইসমে মাফঊলের অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قَوْلُهُ اَلنَّسِيْءُ : এটা نَسَأَ -এর মাসদার অর্থ– পিছনে ফেলা, হটিয়ে দেওয়া, বলা হয়– نَسَأَهُ نَسْأً وَنَسِيْئًا وَنَسَاءً অর্থাৎ তাকে পেছনে করল। যেমন বলা হয়– مَسَّهُ مَسًّا وَمِسَاسًا وَمَسِيْسًا অর্থাৎ স্পর্শ করা। কেউ কেউ نَسِيْءٌ যা مَنْسَوَاءُ অর্থে এটা فَعِيْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُوْلٍ ওজনে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের **মন্দ আচরণের বিবরণ ছিল, আর** আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের বাতিল আকিদা এবং পথভ্রষ্টতা ও শিরকি কীর্তিকলাপের **বর্ণনা রয়েছে। আর এ কথাও ঘোষণা করা** হয়েছে যে, মুশরিকদের ন্যায় আহলে কিতাবরাও পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত, **আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ।**

পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "আহলে কিতাবরা আল্লাহর প্রতি **ঈমান আনে না"** আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাস করে না এবং সত্য **দীন গ্রহণ করে না। এ কথাগুলোর** কিছু বিস্তারিত বিবরণ আলোচ্য আয়াতসমূহে রয়েছে।

সর্ব প্রথম ইহুদিদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা হযরত ওয়ায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করতো। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ বাতিল আকিদায় সকল ইহুদি বিশ্বাসী ছিল না; বরং তাদের মধ্যে কিছুলোক এ কথায় বিশ্বাস করতো। যেমন– মদিনা শরীফের ইহুদি বনূ কুরায়জা এবং সিরিয়ার কিছু ইহুদিও এ কথা বলতো। আলোচ্য আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, সাল্লাম ইবনে মাসকাম, নোমান ইবনে আওফা এবং আবূ উনস এবং শাস ইবনে কায়েশ হুজুর আকরাম ﷺ -এর নিকট এসে বলেছিল– كَيْفَ نَتَّبِعُكَ অর্থাৎ আমরা কিভাবে আপনার অনুসরণ করবো, অথচ আপনি আমাদের কেবলা [বায়তুল মোকাদ্দাস] -কে পরিত্যাগ করেছেন এবং আপনি ওয়ায়েরকে আল্লাহর সূত্র বলে মনে করেন না। এর দ্বারা এ কথা জানা যায় যে, হুজুর ﷺ -এর যুগে যারা মদিনা শরীফে বাস করতো তাদের মধ্যেও কিছু লোক এই বাতিল আকিদায় বিশ্বাসী ছিল যে, হযরত ওয়ায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র। [নাউযুবিল্লাহ মিন জালিক] ইবনে জওযী (র.) লিখেছেন, হুজুর ﷺ -এর যুগে একদল লোক বর্তমান ছিল যারা এমন অন্যায় কথা বিশ্বাস করতো।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ৩১১-১২, তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ.-৩৩]

এজন্যই যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন কোনো ইহুদি এর প্রতিবাদ করেনি। ইমাম আবূ বকর রাযী (র.) আহকামুল কুরআন **গ্রন্থে** লিখেছেন, ইহুদিদের একটি ফেরকা হযরত ওয়ায়ের (আ.) সম্পর্কে এ আপত্তিকর কথায় বিশ্বাস করতো।

–[আকামুল কুরআন: ইমাম জাসসাস (র.) খ. ৩, পৃ. ১০৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই অভিমতই বর্ণিত আছে। ইহুদি ও নাসারারা শুধু যে হযরত ওয়ায়ের (আ.) **এবং হযরত মসীহ** (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বানাবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে তাই নয়; বরং তাদের ধর্মযাজক এবং সাধুদেরকেও এই **মর্যাদায় আসীন করেছে,** এই মর্মে যে, তাদের ধর্মযাজকরা যে আদেশ দিত সে আদেশকে তারা আল্লাহ পাকের আদেশের সমান **মর্যাদা দিত। আর তাদের** জারি-করা বিধি-নিষেধকে আল্লাহর বিধি-নিষেধের স্থলাভিষিক্ত মনে করতো। ধর্মযাজকরা যা **বলতো তাই তারা মানতো, আর যা** নিষেধ করতো তা থেকে বিরত থাকতো।

আলোচ্য **আয়াতে ইহুদি ও খ্রিস্টান**দের অমার্জনীয় অপরাধের যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে তন্মধ্যে **সর্বপ্রথম হলো তারা আল্লাহ** পাকের প্রতি এবং **তাঁর রাসূল** ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি, আল্লাহ পাকের বিধানকে **অমান্য করেছে।**

দ্বিতীয় অপরাধ হলো, ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে এবং নাসারারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করেছে। আর তৃতীয় অপরাধ হলো তারা তাদের ধর্মযাজকদেরকে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী করেছে। আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে তার স্থলে তাদের ইচ্ছানুযায়ী শরিয়ত তৈরি করার অধিকার দিয়েছে তাদের ধর্মযাজকদেরকে, অথচ তাদের প্রতি আদেশ হয়েছে যে, তারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ : হযরত ওযায়ের (আ.) সম্পর্কে ইহুদিদের বাতিল আকিদার ইতিহাস : আল্লামা বগভী আতিয়া উফির সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইহুদিদের মধ্যে হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বানাবার যে বাতিল আকিদা প্রচলিত হয়েছে তা এভাবে শুরু হয় যখন হযরত ওযায়ের (আ.) বর্তমান ছিলেন এবং তাওরাতও ছিল, আর ইহুদিদের নিকট তাবুতও ছিল তখন ইহুদিরা তাওরাতের উপর আমল করা বর্জন করলো। তারা এবং তাওরাত হারিয়ে ফেলল। পরিণামে আল্লাহ পাক তাওরাতকে সরিয়ে দিলেন এবং তাবুতকে উঠিয়ে নিলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওযায়ের (আ.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাওরাত তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিলেন অর্থাৎ ভুলে যাওয়া তাওরাত তিনি আবার স্মরণ করতে পারলেন। এরপর তিনি বনী ইসরাইলকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে তাওরাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। চতুর্দিক থেকে লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাওরাত পাঠ করতে লাগলো। এরপর অনেক সময় অতিবাহিত হলো। তখন আল্লাহ পাক তাবুত ফেরত দিলেন। তাবুতের মধ্যে তাওরাত বন্ধ ছিল। হযরত ওযায়ের (আ.) যে তাওরাতের শিক্ষা দিয়েছেন তার সঙ্গে তাবুতে যে তাওরাত এসেছে তাকে মিলিয়ে দেখলেন যে, একই তাওরাত। তখন লোকেরা বলতে লাগলো ওযায়েরকে যে দ্বিতীয়বার তাওরাত দেওয়া হয়েছে তার কারণ হলো ওযায়ের হলেন আল্লাহর পুত্র। [নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক]

এ পর্যায়ে কালবী (র.) উল্লেখ করেছেন, বখত নসর যখন বনী ইসরাঈলদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল তখন সে এমন সব লোকদেরকে হত্যা করল যারা তাওরাত পাঠ করতো। হযরত ওযায়ের (আ.) সে সময় শিশু ছিলেন, তাই তাঁকে হত্যা করলো না না। ৭০ বা ১০০ বছর পর বনী ইসরাঈল যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে পুনরায় আসলো তখন তাওরাত কারোই স্মরণ ছিল না। আল্লাহ পাক হযরত ওযায়ের (আ.)-কে প্রেরণ করলেন যেন তিনি বনী ইসরাঈলকে নতুন করে তাওরাতের শিক্ষা দেন। তিনিই যে ওযায়ের (আ.) এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তিনি লোকদেরকে তাওরাত শুনিয়ে দেন। কেননা ১০০ বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর আল্লাহ পাক তাঁকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, একজন ফেরেশতা একটি পাত্রে পানি এনে হযরত ওযায়ের (আ.)-কে পান করালেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অন্তরে তাওরাত স্থান পেল। এরপর হযরত ওযায়ের (আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট এসে বললেন, আমি ওযায়ের লোকেরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান করলো এবং বলল তুমি যদি সত্য নবী হও তবে আমাদেরকে তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দাও। হযরত ওযায়ের (আ.) তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দিলেন।

এর কিছুদিন পর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাকে আমার পিতা আমার পিতামহের কথা বলেছেন যে, তাওরাতকে একটি বড় পাত্রের ভেতরে রেখে আঙ্গুর বৃক্ষের গোড়ায় দাফন করা হয় যেন বখত নসরের আক্রমণের সময় তাওরাতের একটি কপি সংরক্ষিত থাকে। এ ব্যক্তির সংবাদের ভিত্তিতে লোকেরা নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে সেখান থেকে তাওরাত বের করে আনলো। তখন হযরত ওযায়ের (আ.)-এর লিপিবদ্ধ কপি প্রাচীন কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল যে, একটি অক্ষরেরও পার্থক্য নেই। তখন লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হলো যে, একই ব্যক্তির অন্তরে পূর্ণ তাওরাত আল্লাহ পাক অবতরণ করেছেন! তারা বলতে লাগল, এর একমাত্র কারণ হলো এই ব্যক্তি আল্লাহর পুত্র। তখন থেকেই ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলতে থাকে। −[তাফসীরে নূরুল কুরআন খ. ৩ পৃ. ৫৩]

قَوْلُهُ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ : হযরত ঈসা (আ.)-কে পুত্র বানাবার বাতিল আকিদা যেভাবে প্রচলি হলো : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উত্তোলনের পর ৮১ বছর পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা সঠিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে লড়াই শুরু হলো, ইহুদিদের মধ্যে পুলুস নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীদের এক দলকে হত্যা করে। সে নাসারাদের অত্যন্ত জঘন্য শত্রু ছিল। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্যে সে একটি ষড়যন্ত্র করল।

একদিন সে ইহুদিদেরকে বলল, যদি হযরত ঈসা (আ.) সত্য নবী হন তবে আমাদের কাফের এবং দোজখী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না, আর যদি নাসারারা জান্নাতে যায় আমরা দোজখে গমন করি তবে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আমি চাই এমন কোনো ষড়যন্ত্র করি যার দ্বারা তারা পথভ্রষ্ট হয় এবং আমাদের সঙ্গে তারাও দোজখে যায়। এরপর সে তার সে অশ্বটির উপর আরোহণ করে, যার উপর আরোহী হয়ে সে যুদ্ধ করতো, সে তার মাথার উপর মাটি রাখে এবং অত্যন্ত লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে তওবার কথা প্রকাশ করে, ক্রন্দনরত অবস্থায় নাসারাদের মজলিসে উপস্থিত হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমাদের শত্রু পুলুস। আমি আসমান থেকে এ বাণী পেয়েছি যে, যে পর্যন্ত তুমি নাসারা না হবে, সে পর্যন্ত তোমার তওবা কবুল হবে না। তাই আমি ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করে তোমাদের নিকট চলে এসেছি। তারা তাকে গির্জায় নিয়ে নাসারা বানিয়ে নেয় এবং একটি কক্ষে থাকতে দেয়। এক বছর সে ঐ কক্ষে অতিবাহিত করে এবং ইঞ্জীল গ্রন্থের শিক্ষা লাভ করে। এক বছর পর সে বলে, আসমান থেকে আমি এ বাণী পেয়েছি যে, আল্লাহ পাক আমার তওবা কবুল করেছেন।

নাসারারা তার এ কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের অন্তরে তার জন্য অত্যন্ত ভক্তি ও মহব্বত সৃষ্টি হয়। তারা তাকে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতে থাকে। তখন সে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করে। সেখানে সে গোপনে তিনটি লোককে নির্বাচন করে, যারা তার শিক্ষার প্রচার কাজ করবে। এ তিন ব্যক্তির নাম ছিল নাস্তুর, ইয়াকুব, মালাকান। নাসতুরকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসা, মারইয়াম এবং খোদা এভাবে তিন খোদা [নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক] আর ইয়াকুবকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসা মূলত মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর পুত্র। [নাউজুবিল্লাহ] আর মালাকানকে এ শিক্ষা দেয় যে, ঈসাই তো প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। [নাউযুবিল্লাহ] এরপর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে ডেকে বলে, তুমি আমার বিশেষ বন্ধু ও দূত। তুমি অমুক দেশে যাও এবং মানুষকে এ শিক্ষা দান কর। আর ইঞ্জীল কিতাবের দিকে মানুষকে ডাকো। সে বলে, আমি ঈসা (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। এরপর সে বলল, আমি ঈসার নামে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করবো। এ কথা বলে সে আত্মহত্যা করে এবং তার তিন শিষ্য তিন দেশে চলে যায়। একজন রোমে একজন বায়তুল মুকাদ্দাসে, আর একজন অন্যত্র। আর তারা প্রত্যেকে সে বাতিল আকিদা প্রচার করতে থাকে, যা পুলুস তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। এভাবে নাসারাদের মধ্যে তিনটি ফেরকার সৃষ্টি হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৫৬-২৫৭, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩১৪-১৫]

قَوْلُهُ اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ الخ : উপরিউক্ত আয়াত চতুষ্টয়ে ইহুদি-খ্রিস্টান আলেম ও পীর-পুরোহিতদের কুফরি উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। اَحْبَارٌ শব্দটি حِبْرٌ -এর এবং رُهْبَانٌ শব্দটি رَاهِبٌ -এর বহুবচন। حِبْرٌ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের আলেমকে এবং رَاهِبٌ তাদের সংসার -বিরাগীদেরকে বলা হয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণিকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হযরত ঈসা (আ.)-কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম ও যাজক শ্রেণিকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হলো, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণির জন্য উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা সর্বাবস্থায় যাজক শ্রেণির আনুগত্য করে চলে তা আল্লাহ রাসূলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? বলা বাহুল্য, পীর পুরোহিতগণের আল্লাহ- রাসূল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হলো প্রকাশ্য কুফরি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, শরিয়তের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের মতামতের অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, এদের অনুসরণ হলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ-রাসূলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হলো, ইমাম ও আলেমরা আল্লাহ-রাসূলের আদেশ নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস করে তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামদের অনুকরণ করেন। এই অনুকরণ হলো কুরআনের নির্দেশক্রমে, কাজেই তা মূলত আল্লাহরই অনুকরণ। কুরআনে ইরশাদ হয়- فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদি খ্রিস্টানরা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, "এরাই গোমরাহী অবলম্বন করেছে বটে; কিন্তু আল্লাহর আদেশ হলো একমাত্র তাঁর ইবাদত করার এবং তিনি তাদের শিরকী কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র"।

ইহুদি খৃস্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহর অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটির শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না; বরং আল্লাহর সত্য দীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্য অসম্ভব; বরং আল্লাহর অমোঘ ফয়সালা যে, তিনি নিজের নূর তথা দীনে ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, তা কাফের মুশরিকদের যতই মর্মপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর তৃতীয় আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ আপন রাসূলকে হেদায়েতের উপকরণ কুরআন এবং সত্য দীন-ইসলাম সহকারে এজন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরো কতিপয় আয়াত কুরআনে রয়েছে যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দীনের উপর দীনে ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিক্দাদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "এমন কোনো কাঁচা ও পাকা ঘর দুনিয়ার বুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীদের সম্মানের সাথে এবং লাঞ্ছিতদের লাঞ্ছনার সাথে, আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রের অনুগত প্রজায় পরিণত হবে।" আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

রাসূলে কারীম ﷺ ও সলফে সালেহীনের পবিত্র যুগে আল্লাহর নূরের পূর্ণ বিকাশের দৃশ্য গোটা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে। ভবিষ্যতের জন্যও দীন ইসলাম দলিল-প্রমাণ ও মৌলকতার দিক দিয়ে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ধর্ম যার খুঁত ধরার সুযোগ কোনো বিবেকবান মানুষের হবে না। তাই কাফেরদের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই দীন দলিল-প্রমাণে চির ভাস্বর। এ জন্য মুসলমানরা যতদিন ইসলামের পূর্ণ অনুগত থাকবে, ততদিন তাদের শৌর্য বীর্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যও তাই। মুসলমানরা যতদিন কুরআন ও হাদীসের পূর্ণ অনুগত ছিল, ততদিন পাহাড় কি সমুদ্র কোনটাই তাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এভাবে গোটা দুনিয়ার কর্তৃত্ব একদিন তাদের হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু যেখানে মুসলমানরা পরাভূত ও হীনবল হয়ে পড়েছিল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সেই বিপর্যয়ের মূলে ছিল কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ এবং তৎপ্রতি অবহেলা। কিন্তু এ দুর্গতি মুসলমানদের, ইসলামের নয়। ইসলাম আপন জ্যোতিতে সদা ভাস্বর।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্বোধন করে ইহুদি-খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকীর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদি-খৃস্টানের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্বোধন করা হয় যে, তাদের অবস্থাও যেন ওদের মতো না হয়। আয়াতে ইহুদি খ্রিস্টান পীর-পুরোহিতদের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামাল গলধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতের যেখানে এ অবস্থা সেখানে সাধারণত সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কুরআন মাজীদ তা না করে كَثِيْرًا [অধিকাংশ] শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদের এ কথা শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্যে যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনোরূপ বাড়াবাড়ির আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হলো, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তাওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তাওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হলো যে, তারা নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট নয়, বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকি থাকে না। তাছাড়া পীর-পুরোহিতদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

ইহুদি-খ্রিস্টান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ-লালসা থেকে। এ জন্য আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় বর্ণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ দিন!"

"আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে" বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধান মতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থসম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে মালামালের জাকাত দেওয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" –[আবূ দাউদ, আহমদ] এ থেকে বোঝা যায় যে, জাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গুনাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম এ মতের অনুসারী।

وَلَا يُنْفِقُونَهَا ["আর তা খরচ করে না"] বাক্যের 'তা' সর্বনামের উদ্দিষ্ট বস্তু হলো বর্ণনাভঙ্গিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে জাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাব মতে জাকাত প্রদান করবে। শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনের উত্তপ্ত করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংকৃত আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ যে অর্থসম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায় জমা করলেও তার জাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য আজাবের রূপ ধারণ করে। এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার কথা উল্লেখ রয়েছে, তার অর্থ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোনো ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা জাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রূকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্য বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আজাব দানের উল্লেখ করা হয়।

قَوْلُهُ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের কুফর ও শিরক এবং গোমরাহী ও অপকর্মসমূহের বিবরণ ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয় এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়, জাহেলী যুগের এক কুপ্রথার বর্ণনা এবং এর থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মুসলমানদের তাগিদ দেওয়া হয়। যার বিবরণ হলো এই যে, প্রাচীনকাল থেকে পূর্ববর্তী সকল নবীর শরিয়তসমূহে বার চান্দ্রমাসকে এক বছর গণনা করা হতো এবং তন্মধ্যে চারটি মাস জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম ও রজব মাসকে বড়ই বরকতময় ও সম্মানিত মনে করা হতো।

সকল নবীর শরিয়ত এ ব্যাপারে একমত যে, এ চার মাসে যে কোনো ইবাদতের ছওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তেমনি এ সময়ে পাপাচার করলে তার পরিণাম এবং আজাবও কঠোরভাবে ভোগ করতে হবে। পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে এ চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহও নিষিদ্ধ ছিল। মক্কার অধিবাসী আরবগণ ছিল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নবুয়তের প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর শরিয়ত অনুসরণের দাবিদার। বলা বাহুল্য, ইব্রাহীমী শরিয়ত মতেও এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এমনকি জন্তু শিকারও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা জাহেলী আরববাসীদের স্বভাবে পরিণত হওয়ার উপরিউক্ত হুকুম তামিল করা ছিল তাদের জন্য বড়ই দুষ্কর। তাই তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা টালবাহানার আশ্রয় নিত। কখনো এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মনস্থ করলে, কিংবা যুদ্ধের সিলসিলা নিষিদ্ধ মাসেও প্রসারিত হলে তারা বলত, বর্তমান বছরে এ মাস নিষিদ্ধ নয়, আগামী মাস থেকেই নিষিদ্ধ মাসের শুরু। যেমন, যুদ্ধ চলাকালে মুহররম মাস এসে পড়লে বলত, এ বছরের মুহররম নিষিদ্ধ মাস নয়, বরং তা হবে সফর বা রবিউল আউয়াল মাস। অথবা বলত, এ বছরের প্রথম মাস হলো সফর, মুহররম হবে দ্বিতীয় মাস। সারকথা, আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মের বিরুদ্ধে বছরের যে কোনো চার মাসকে তাদের সুবিধা মতো নিষিদ্ধরূপে গণ্য করে নিত। যে মাসকে ইচ্ছা, যিলহজ বা রমজান নামে অভিহিত করত। এমন কি অনেক সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে দশটি মাস অতিবাহিত হলে বর্ষপূর্তির জন্য আরো কয়টি মাস বাড়িয়ে দিয়ে বলত, এ বছরটি হবে চৌদ্দ মাস সম্বলিত। অতঃপর অতিরিক্ত চার মাসকে সে বছরের নিষিদ্ধ মাসরূপে গণ্য করত।

সারকথা, দীনে ইবরাহীমীর প্রতি তাদের এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ ছিল যে, বছরের চারটি মাসের হুরমত অনুধাবন করে তাতে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মাসের যে ধারাবাহিকতা নির্ধারিত রেখেছেন এবং সে মতে যে চার

মাসকে নিষিদ্ধ করেছেন, তাতে নানা হেরফের করে তারা নিজেদের স্বার্থ পূরণ করে নিত। ফলে সে সময় কোন মাস প্রকৃত রমজান বা শাওয়ালের এবং এবং কোন মাস জিলকদ বা রজবের তা নির্ধারণ করা দুষ্কর হয় পড়েছিল। অষ্টম হিজরি সালে যখন মক্কা বিজিত হয় এবং নবম সালে রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজের মৌসুমে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার জন্য প্রেরণ করছিলেন, সে মাসটি প্রকৃত প্রস্তাবে যদিও ছিল জিলহজের; কিন্তু জাহেলী যুগের সেই পুরাতন প্রথানুসারে তা জিলকদই সাব্যস্ত হলো এবং সে বছরের হজের মাস ছিল জিল হজের স্থলে জিলকদ। অতঃপর দশম হিজরি সালে যখন নবী করীম ﷺ বিদায় হজের জন্য মক্কায় আগমন করেন, তখন অবলীলাক্রমে এমন ব্যবস্থাও হয়ে যায় যে, প্রকৃত জিলহজ জাহেলী হিসাব মতেও জিলহজেই সাব্যস্ত নয়। সেজন্য রাসূলে কারীম ﷺ মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় ইরশাদ করেছিলেন– أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ অর্থাৎ "কালের চক্র ঘুরে ফিরে সেই নিয়মের উপর এসে গেল, যার উপর আল্লাহ আসমান ও জমিনের সৃষ্টি করেছিলেন।" অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে যে মাসটি জিলহজ, তা জাহেলী প্রধানুসারেও জিলহজই সাব্যস্ত হলো।

জাহেলী প্রথায় মাস গণনার এই রদবদল ও বিনিময়, তার ফলে কোনো মাস বা দিন বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত ও শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালনেও বিস্তর জটিলতা সৃষ্টি হতো। যেমন, জিলহজের প্রথম দশকে রয়েছে হজের আহকাম, দশই মুহররমের রোজা এবং বছরের শেষে জাকাত আদায়ের হুকুম প্রভৃতি।

মাসের নাম পরিবর্তন ও অদল-বদলে যথা– মুহরমের সফরও সফরের মুহররম নামকরণ প্রভৃতি বাহ্যত বড় কিছু নয়; কিন্তু এর ফলে শরিয়তের অসংখ্য হুকুমের বিকৃতি ঘটে আমল যে নষ্ট হয়ে যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আলোচ্য প্রথম দু'আয়াতে সেই জাহেলী প্রথার মন্দ দিকের উল্লেখ করে তৎপ্রতি মুসলমানদেরকে সাবধানতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মাস-গণনার ক্ষেত্রে মাস হলো বারটি।" এখানে উল্লিখিত عِدَّةٌ অর্থ– গণনা। شُهُوْرٌ হলো شَهْرٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ মাস। বাক্যের সারমর্ম হলো আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত; এতে কম বেশি কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর كِتَابِ اللّٰهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আজল অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে। এরপর يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে আজলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ হয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে। তারপর বলা হয়– مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ তন্মধ্যে চার মাস হলো নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হলো, এই চারটি মাস সম্মানিত, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে ইবাদতের ছওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা' ইসলামি শরিয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং ইবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বহাল রয়েছে।

বিদায় হজের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খুতবায় নবী করীম ﷺ সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, "তিনটি মাস হলো যথাক্রমে জিলকদ, জিলহজ ও মুহররম, অপরটি হলো রজব। তবে রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে, রজব হলো রমজান । আর মুযার গোত্রের ধারণা মতে রজব হলো জমাদিউসসানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই রাসূলে কারীম ﷺ খুতবায় মুযার গোত্রের রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ : "এটিই হলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।" অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ এবং সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হলো দীনে মুস্তাকীম। এতে কোনো মানুষের কম বেশি কিংবা পরিবর্তন পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত।

قَوْلُهُ فَلَا تَظْلِمُوْنَ فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ : "সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের প্রতি অবিচার করো না" **অর্থাৎ** এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ আদব রক্ষা না করে এবং ইবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি করো না।

ইমাম জাস্‌সাস (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, কুরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে ইবাদত করা হলে বাকি মাসগুলোতেও ইবাদতের তাওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ

কেউ এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকি মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

এ পর্যন্ত ছিল জাহেলী প্রথার বর্ণনা ও তার নিন্দাবাদ। আয়াতের শেষ বাক্যে সূরা তওবার শুরুতে প্রদত্ত আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয় অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সমস্ত কাফের ও মুশরিকের সাথে জিহাদ করাই ওয়াজিব। দ্বিতীয় আয়াতেও সেই জাহেলী প্রথার উল্লেখ করা হয় নিম্নরূপে– إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ। নিষিদ্ধকাল অন্য মাসে পিছিয়ে দেওয়া কেবল কুফরির মাত্রাকেই বৃদ্ধি করে। نَسِيٓءٌ অর্থ– পিছিয়ে দেওয়া এবং পরে আনা।

মুশরিকদের ধারণা ছিল যে, মাসের এই ওলট-পালট করার ফলে একদিকে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে এবং অন্যদিকে আল্লাহর হুকুমেরও তা'মিল হবে। কিন্তু আল্লাহ বলেন যে, এর ফলে তাদের কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তাদের গোমরাহী উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে অর্থাৎ কোন বছরে নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হারাম করে এবং আর কোনো বছরে হালাল করে। لِيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ "যাতে শুমার পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলো" বাক্যের মর্ম হলো শুধু গণনা পূরণ দ্বারা হুকুমের তামিল হয় না; বরং যে হুকুম যে মাসের সাথে নির্দিষ্ট, তা সে মাসেই করতে হবে।

আহকাম ও মাসায়েল : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামি শরিয়তে প্রচলিত তা মানবরচিত পরিভাষা নয়; বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তারতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরিয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চান্দ্রমাসের হিসাব মতেই রোজা, হজ ও জাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কুরআন মাজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে– لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ [যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর]। অতএব চন্দ্র ও সূর্য এই দুয়ের মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরিয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্য চান্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরজে কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গুনাহগার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তবে তা আল্লাহ ও পরবর্তীদের তরিকার বরখেলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও নাজায়েজ মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরিয়তের বিধানের কোনো সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চান্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরিয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু কোনো হুকুম পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুবাদ :

٣٨. وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ اِلٰى غَزْوَةِ تَبُوْكٍ وَكَانُوْا فِىْ عُسْرَةٍ وَشِدَّةِ حَرٍّ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الْمُثَلَّثَةِ وَاجْتِلَابِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ اَىْ تَبَاطَئْتُمْ وَمِلْتُمْ عَنِ الْجِهَادِ اِلَى الْاَرْضِ ط وَالْقُعُوْدِ فِيْهَا وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّوْبِيْخِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا مِنَ الْاٰخِرَةِ اَىْ بَدَلَ نَعِيْمِهَا فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِىْ جَنْبِ مَتَاعِ الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ حَقِيْرٌ ۔

৩৮. তাবুক যুদ্ধের সময় সাহাবীগণ খুবই কষ্ট ও অনটনে ছিলেন। তদুপরি গরমও ছিল মারাত্মক। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ **যুদ্ধের আহ্বান জানালে** তাদের নিকট তা খুবই কঠিন **বলে মনে হয়। এই সম্পর্কে** আল্লাহ তা'আলা নাজিল **করেন–** হে মুমিনগণ! তোমাদের হলো কি যে তোমাদেরকে যখন আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা মাটিতে চেপে থাক। অর্থাৎ ঘরে বসে থাক জিহাদ হতে বিমুখ হয়ে গড়িমসি কর। তোমরা কি পরকালের তুলনায় অর্থাৎ তাঁর নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে পার্থিব জীবন ও এটার ভোগ বিলাস নিয়েই পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? পরকালের ভোগ-উপকরণের তুলনায় পার্থিব জীবনের সম্পদ তো খুবই সামান্য, অতি তুচ্ছ। اِثَّاقَلْتُمْ -এতে ث -এ ت -এর اِدْغَامْ **বা সন্ধি সংঘটিত** হয়েছে এবং এটার পূর্বে একটি হাম্যা ওসল [অর্থাৎ এমন হামযা যা মিলিয়ে পড়াকালে উহ্য থাকে] আনা হয়েছে। مَا لَكُمْ -এইস্থানে প্রশ্নবোধক রূপটি تَوْبِيْخ অর্থাৎ ভর্ৎসনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٩. اِلَّا بِاِدْغَامِ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ لَا فِى الْمَوْضِعَيْنِ تَنْفِرُوْا تَخْرُجُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لِلْجِهَادِ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اَىْ يَاْتِ بِهِمْ بَدَلَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ اَىِ اللّٰهَ اَوِ النَّبِىَّ شَيْئًا ط بِتَرْكِ نَصْرِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ نَاصِرُ دِيْنِهٖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ نَصْرُ دِيْنِهٖ وَنَبِيِّهٖ ۔

৩৯. যদি তোমরা اِلَّا -এটা মূলত ছিল اِنْ لَا উভয় স্থানে [অর্থাৎ এই খানে এবং পরবর্তী আয়াতে] শর্তবাচক শব্দ اِنْ -এর ن টিকে لَا -এ اِدْغَامْ অর্থাৎ সন্ধিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমাদের পরিবর্তে তিনি অন্যদের নিয়ে আসবেন। আর তোমরা সাহায্য-সহযোগিতা পরিত্যাগ করত তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর বা রাসূল ﷺ -এর কোনো রূপ ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তাঁর দীনের সাহায্যকারী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান তাঁর দীন ও নবীকে সাহায্য করাও তাঁর শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

٤٠. اِلَّا تَنْصُرُوْهُ اَىِ النَّبِىَّ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ حِيْنَ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَكَّةَ اَىْ اَلْجَئُوْهُ اِلَى الْخُرُوْجِ لَمَّا اَرَادُوْا قَتْلَهٗ اَوْ حَبْسَهٗ اَوْ نَفْيَهٗ بِدَارِ النَّدْوَةِ ۔

৪০ যদি তোমরা তাকে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -কে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তখন, যখন কাফেররা তাকে মক্কা হতে বহিষ্কার করেছিলেন অর্থাৎ তাদের পরামর্শভবন 'দারুন নাদওয়া'য় বসে তারা রাসূল ﷺ -কে নির্বাসন বা বন্দী বা হত্যা করার সংকল্প করত মক্কা হতে বের হয়ে যেতে যখন তাঁকে বাধ্য করেছিল।

ثَانِىَ اثْنَيْنِ حَالٌ اَىْ اَحَدُ اثْنَيْنِ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ بَكْرٍ رض اَلْمَعْنٰى نَصَرَهُ فِىْ مِثْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَخْذُلُهُ فِىْ غَيْرِهَا اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ هُمَا فِى الْغَارِ نَقْبٌ فِىْ جَبَلِ ثَوْرٍ اِذْ بَدَلٌ ثَانٍ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ اَبِىْ بَكْرٍ وَقَدْ قَالَ لَهٗ لَمَّا رَاٰى اِقْدَامَ الْمُشْرِكِيْنَ لَوْ نَظَرَ اَحَدُهُمْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج بِنَصْرِهٖ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ طُمَانِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ قِيْلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقِيْلَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رض وَاَيَّدَهٗ اَىِ النَّبِىَّ ﷺ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا مَلٰئِكَةٌ فِى الْغَارِ وَمَوَاطِنِ قِتَالِهٖ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَىْ دَعْوَةَ الشِّرْكِ السُّفْلٰى ط الْمَغْلُوْبَةَ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ اَىْ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ هِىَ الْعُلْيَا ط الظَّاهِرَةُ الْغَالِبَةُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ فِىْ مُلْكِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ ـ

এবং তারা যখন ছওর পাহাড়ের একটি গুহায় ছিল। তখন তিনি ছিলেন দুইজনের একজন। ثَانِىَ اثْنَيْنِ -এটা حَالٌ অর্থাৎ ভাব বা অবস্থাবাচক পদ। অপর জন ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। এই বক্তব্যটির মর্ম হলো, এরূপ কঠিন অবস্থায়ও আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছে। সুতরাং তিনি তাঁকে অপর কোনো অবস্থায়ও লাঞ্ছিত হতে দিবেন না। তিনি তখন তার সঙ্গী হযরত আবূ বকরকে বলেছিলেন, চিন্তিত হয়ো না আল্লাহ তাঁর সাহায্যসহ আমাদের সঙ্গে আছেন। اِذْ هُمَا -এটা পূর্বোল্লিখিত اِذْ -এর بَدَلٌ অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ। اِذْ يَقُوْلُ -এটা بَدَلٌ ثَانٍ বা দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত পদ। হযরত আবূ বকর গুহা হতে তাঁদের সন্ধানরত মুশরিকদের পা দেখতে পেয়ে তাঁকে বলেছিলেন, এদের কেউ যদি পায়ের নীচে তাকায় তবে নিঃসন্দেহে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এই সময় রাসূল ﷺ উক্ত উক্তি করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাসূল ﷺ -এর উপর, কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো হযরত আবূ বকরের উপর সকীনা তৎপ্রদত্ত প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে অর্থাৎ রাসূল ﷺ -কে উক্ত গুহায় এবং অন্যান্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে এমন এক বাহিনীর দ্বারা শক্তিশালী করেন যা তোমরা দেখনি অর্থাৎ ফেরেশতাগণের সাহায্যে তাকে তিনি শক্তিশালী করেন। তিনি কাফেরদের কথাকে অর্থাৎ তাদের শিরকের দাবিকে হেয় করেন পরাজিত করেন আর আল্লাহর কালেমা একত্বের কালেমাই সর্বোপরি তাই সকলের উচ্চ এবং সকল কিছুরই উপর জয়ী। এবং আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী তিনি তাঁর কাজে প্রজ্ঞাধিকারী।

٤١. اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا نَشَاطًا وَغَيْرَ نَشَاطٍ وَقِيْلَ اَقْوِيَاءَ وَضُعَفَاءَ اَوْ اَغْنِيَاءَ وَفُقَرَاءَ وَهِىَ مَنْسُوْخَةٌ بِاٰيَةِ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ الخ وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ خَيْرٌ لَّكُمْ فَلَا تَثَاقَلُوْا ـ

৪১. তোমরা লঘুভার হও বা গুরুভার অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত থাক বা না থাক; কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হলো দুর্বল হও বা সবল; অথবা এর অর্থ হলো, ধনী হও বা নির্ধন- সর্বাবস্থায়ই অভিযানে বের হয়ে পড়। لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ [অর্থাৎ যারা দুর্বল তাদের জন্য কোনো দোষ নেই] আয়াতটির মর্মানুসারে উক্ত আয়াতটির এই বিধান مَنْسُوْخٌ বা রহিত বলে বিবেচ্য। আর তোমরা জান-মালসহ আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে যে, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর তবে তোমরা গড়িমসি করতে না।

٤٢. وَنَزَلَ فِى الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا لَوْ كَانَ مَا دَعَوْتَهُمْ اِلَيْهِ عَرَضًا مَتَاعًا مِنَ الدُّنْيَا قَرِيْبًا سَهْلَ الْمَاخَذِ وَّسَفَرًا قَاصِدًا وَسَطًا لَّا تَّبَعُوْكَ طَلَبًا لِلْغَنِيْمَةِ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ط الْمَسَافَةُ فَتَخَلَّفُوْا وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرُوْجَ لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِىْ قَوْلِهِمْ ذٰلِكَ .

৪২. যে সমস্ত মুনাফিক যুদ্ধে শরিক না হয়ে পিছনে থেকে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– আশু অর্থাৎ সহজলভ্য জাগতিক কোনো সম্পদ অর্থাৎ উপভোগ্য বস্তু লাভের সম্ভাবনা থাকলে ও যাত্রাপথ নাতিদীর্ঘ মধ্যম ধরনের হলে অর্থাৎ তুমি যে দিকে তাদেরকে আহবান জানাও তা যদি উক্তরূপ হতো, তবে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের আশায় নিশ্চয় তারা তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ অর্থাৎ তার দূরত্ব সুদীর্ঘ মনে হলো। ফলে তারা পিছনে পড়ে থাকল। যখন তুমি প্রত্যাবর্তন করবে তখন অচিরেই তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, বের হওয়ার আমাদের সামর্থ্য থাকলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে বের হতাম। মিথ্যা শপথ করত এরা নিজদেরকে ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ জানেন নিশ্চয় এরা এদের এই কথায় মিথ্যাবাদী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِادْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الْمُثَلَّثَةِ : প্রকৃত পক্ষে ইদগামের উদ্দেশ্যে হলো تَعْلِيْل -এর পূর্বে تَاء -কে ثَاء করেছে এবং ثَاء কে ثَاء -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে এবং শুরুতে সাকিন আসার কারণে প্রথমে একটি هَمْزَه وَصْل যুক্ত করা হয়েছে। اِثَّاقَلْتُمْ মূলত ছিল تَثَاقَلْتُمْ ; উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِثَّاقَلْتُمْ -এর মধ্যে ثَاء -এর তাশদীদ এবং শুরুতে হামযা নেওয়ার কারণ বর্ণনা করা, যদিও এটা বাবে تَفَاعُلْ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ تَبَاطَئْتُمْ : এটা بُطُوْءٌ হতে নিষ্পন্ন। অর্থ- অলসতা করা এটা سُرْعَة -এর বিপরীত।

প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) اِثَّاقَلْتُمْ -এর তাফসীর مِلْتُمْ দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর. যেহেতু تَثَاقُلْ -এর সেলাহ اِلٰى আসে না এজন্যই মুফাসসির (র.) مِلْتُمْ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَثَاقُلْ -টা مَيْل -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ وَالْقُعُوْدِ فِيْهَا : প্রশ্ন. اَلْقُعُوْدِ فِيْهَا -এর বৃদ্ধিকরণের উপকারিতা কি?

উত্তর : এই বৃদ্ধিকরণের উপকারিতা হলো এই যে, যদি জিহাদের অংশগ্রহণ করত তবুও জমিনের উপরই হতো। জিহাদে অংশগ্রহণ না করার সুরতে জমিনের উপর থাকার অর্থ হলো–

মুফাসসির (র.) اَلْقُعُوْدِ فِيْهَا -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে اِثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ -এর অর্থ হলো ভীরুতা দেখানো।

قَوْلُهُ اَىْ بَدَلَ نَعِيْمِهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, مِنَ الْاٰخِرَةِ -এর মধ্যে مِنْ -টি مُقَابَلَه - এর জন্য اِبْتِدَائِيَّة নয়। কাজেই এই আপত্তির অবসান হলো যে, আখিরাত দ্বারা পার্থিব জিন্দেগি শুরু করার কোনো অর্থ হয় না। نَعِيْمِهَا -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مُطْلَقًا আখিরাতকে ছেড়ে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তার নিয়ামতসমূহ পরিত্যাগ করাই হলো উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ جَنْبِ مَتَاعِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَمَا -এর মধ্যস্থ فَاء -টি مُقَابَلَة -এর জন; ظَرْفِيَّتْ -এর জন্য নয়। কাজেই দুনিয়ার উপভোগের জন্য আখিরাতের ظَرْف হওয়ার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ ثَانِيَ اثْنَيْنِ রাসূল ﷺ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قوله اى اَحَدُ الْاِثْنَيْنِ : এটা হলো এই প্রশ্নের উত্তর যে, যখন ثَانِيَ -এর ইযাফত عَدَدٌ -এর দিকে করা হয় غَيْر مُضَافْ اِلَيْه উদ্দেশ্য হয়। এই নীতিমালা দ্বারা জানা গেল যে, তিনি দুজন ব্যতীত তৃতীয়জন ছিলেন, অথচ বাস্তবতা এরূপ নয়। اَحَدُ الْاِثْنَيْنِ বলে বলে দিয়েছে যে, উদ্দেশ্য হলো দুজনের মধ্য হতে একজন, দুয়ের তৃতীয়জন উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ جَبَلِ ثَوْرٍ : জাবালে ছওর মক্কার ডান দিকে এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত একটি পাহাড়।

قَوْلُهُ اَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ : এটা تَعْلَمُوْنَ -এর উহ্য মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا تَثَاقَلُوْا : এটা شَرْط -এর جَزَاء হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : সূরার শুরু থেকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ছিল। এই পর্যায়ে মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কিতাবীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাবুক যুদ্ধের বিবরণ স্থান পেয়েছে, এতে রোমের বাদশাহ কায়সারের মোকাবিলায় অভিযান করা হয়। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৩১]

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত সমূহ তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সিরিয়ার রাজা রোম সম্রাটের সহযোগিতায় মদিনা মোনাওয়ারা আক্রমণের পায়তারা করছে, এই খবর যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট পৌছল তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, হামলায় উদ্যত শত্রুকে তার দেশেই মোকাবিলা করা উচিত। প্রিয়নবী ﷺ আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন হানাদার দুশমন মদিনা মুনাওয়ারা পৌছার পূর্বেই তাবুক নামক স্থানে গমন করে তাদের মোকাবিলা করবে। অথচ তিনি মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধ শেষ করে সবে মাত্র মদিনা মুনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু যারা প্রাণের মদিনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তাদের মোকাবিলা করা যে একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তাবুক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিলেন। এটি নবম হিজরির ঘটনা। সাহাবায়ে কেরামের নিকট নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে এই জিহাদ কঠিন মনে হলো–

১. তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, প্রচণ্ড গরম ছিল। ২. মদিনা শরীফে অভাব অনটন ছিল। ৩. মদিনা শরীফ থেকে তাবুকের দূরত্বও অনেক বেশি ছিল। সুদীর্ঘ সফর, দুর্গম পথ। ৪. তখন মদিনা শরীফে খেজুর বাগানের খেজুর প্রায় পেকেছে, খেজুর কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে। ৫. রোমের কায়সারের সুসজ্জিত বিরাট বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করা -এসব কারণে এমন অবস্থায় জিহাদ স্বাভাবিক কারণেই কঠিনতর মনে হয়। তখন জিহাদের জন্যে বের হওয়া তাঁদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের ঈমান সুদৃঢ় যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, অন্যের পক্ষে এ অভিযানে অংশ গ্রহণ নিঃসন্দেহে কষ্টকর। এ সময় জিহাদে অনুপ্রাণিত করে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

–[তাফসীরে কবীর খ. ১৩, পৃ. ৫৯, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৩১]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا الخ : উপরিউক্ত আয়াতসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ কর্তৃক পরিচালিত এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম ও পথনির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো তাবুক যুদ্ধ, মহানবী ﷺ -এর প্রায় সর্বশেষ যুদ্ধ।

'তাবুক' মদিনার উত্তর দিকে অবস্থিত সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। সিরিয়া ছিল তৎকালে রোমান সম্রাজ্যের একটি প্রদেশ! রাসূলে কারীম ﷺ অষ্টম হিজরিতে মক্কা ও হোনাইন যুদ্ধ সমাপন করে যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আরব ব'দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে একটানা আট বছর যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু যে রাব্বুল আলামীন ইতিপূর্বে সকল দীনের উপর ইসলামের বিজয় সম্বলিত আয়াত– لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ নাজিল করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে অবসর যাপনের সময় কোথায়? মহানবী ﷺ

মদিনা পৌঁছা মাত্র সিরিয়া প্রত্যাগত যয়তুন তৈল ব্যবসায়ী দলের মুখে সংবাদ পেলেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়া সীমান্তবর্তী তাবুকে তার সেনাবাহিনীর সমাবেশ করছে এবং এক বছরের অগ্রীম বেতন দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট রেখেছে। আরো সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরবের কতিপয় গোত্রের সাথেও তাদের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, মদিনায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেবে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম ﷺ তাদের আক্রমণের আগে ঠিক তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সংকল্প নিলেন। –[তাফসীরে মাযহারী, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ-এর সৌজন্যে] ঘটনাচক্রে তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। মদিনার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষিজীবি। তখন তাদের ফসল কাটার সময়– যা ছিল তাদের গোটা বছরের জীবিকা। বলা বাহুল্য, চাকুরীজীবীদের অর্থকড়ি যেমন মাস শেষে ফুরিয়ে আসে, তেমনি নতুন মৌসুমের আগে কৃষিজীবীদের গোলাও খালি হয়ে যায়! তাই একদিকে অভাব-অনটন অন্যদিকে ঘরে ফসল তোলার আশা, তদুপরি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরা দীর্ঘ আট বছরের রণক্লান্ত মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট পরীক্ষার বিষয়।

কিন্তু সময়ের দাবি উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষত এ যুদ্ধ হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। আগেকার যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে; কিন্তু বর্তমান যুদ্ধটি হবে রোমান সম্রাটের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার সকল মুসলমানকে যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দেন এবং আশপাশের অন্যান্য গোত্রগুলোকেও এতে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের এ সাধারণ আহ্বান ছিল মুসলমানদের জন্য অগ্নি-পরীক্ষা এবং ইসলামের মৌখিক দাবিদার মুনাফিকদের শনাক্ত করার মোক্ষম উপায়। তাই এদের কথা বাদ দিলেও খোদ মুসলমানরাও অবস্থা বিশেষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল হলো যারা কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অপর দল কিছু দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে প্রথম দলের সাথে শামিল হয়। এ দু'দল সম্পর্কে কুরআন বলে اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ "তা প্রশংসার যোগ্য, যারা তীব্র সঙ্কটকালে তাঁর আনুগত্য করেছে তাদের একদলের অন্তরসমূহ বিচ্যুতির কাছাকাছি হওয়ার পরেও।"

তৃতীয় দল যারা প্রকৃত কোনো ওজরের ফলে যুদ্ধে শরিক হতে পারেনি। কুরআন তাদের সম্পর্কে বলে– لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاۤءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى অর্থাৎ দুর্বল ও পীড়িত লোকদের জন্য গুনাহের কিছু নেই। একথা বলে তাদের ওজর কবুল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়।

চতুর্থ দল হলো, যারা কোনো ওজর-অসুবিধা ছাড়াই নিছক অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। এদের ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন– وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ 'যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ইত্যাদি।

আয়াতগুলোতে উক্ত দলে অলসতার দরুন শাস্তির হুমকি এবং পরিশেষে তাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ রয়েছে।

পঞ্চম দল হলো মুনাফিকদের। এরা পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে নিজেদের আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এরা যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকে। কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে এদের বর্ণনা রয়েছে।

ষষ্ঠ দল হলো মুনাফিকদের সেই উপদল, যারা গোয়েন্দা বৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ [আয়াত : ৪৭] وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ [আয়াত : ৬৫] এবং وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا [আয়াত :৭৪] -এর মাঝে এ মুনাফিকদের বর্ণনা দেওয়া হয়।

কিন্তু এ সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। বিপুল সেই মুসলমানদের সংখ্যায় ছিল, যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাই এ যুদ্ধে ইসলামি সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার, যা ইতিপূর্বে কারো কোনো যুদ্ধে দেখা যায়নি।

এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ রোম সম্রাটের কানে গেলে সে ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে কয়েক দিন রণক্ষেত্রে অবস্থান করার পর তাদের মোকাবিলার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। উল্লিখিত আয়াতগুলোর সম্পর্ক বাহ্যত সেই চতুর্থ দলের সাথে, যারা ওজর-আপত্তি ছাড়া শুধু অলসতার দরুন যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিল। প্রথম আয়াতে অলসতার জন্য সাজার হুমকি, তৎসঙ্গে অলসতার মূল কারণ এবং পরে তার প্রতিকারের উপায় কি, তা' বর্ণিত হয়। এ বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়েছে তা হলো–

দুনিয়ার মোহ ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল : অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা, এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দীনের ব্যাপারে সকল আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গুনাহর মূলে রয়েছে দুনিয়াপ্রীতি এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে– حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয়েছে– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর [চলাফেরা করতে চাও না]। আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।" রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার এই বলে উল্লেখ করা হয় "দুনিয়ার জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।" যার সারকথা হলো, আখিরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুত আখিরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

ইসলামি আকীদার মৌলিক বিষয় তিনটি : তাওহীদ, রিসালত ও পরকালে বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হলো বিশুদ্ধ আমলের রূহ এবং গুনাহ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর চিন্তা করলে পরিষ্কার হবে যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা আখিরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরাধ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থাসমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সবই আছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুত এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, দুনিয়াবী ব্যস্ততা এবং আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশ্বাস, এর একমাত্র প্রতিকার হলো, আল্লাহর জিকির ও স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্তপ্রতীক হয়ে ফেরেশতাদেরও ঈর্ষার পাত্র হয়। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ-যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশ্ব অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ ও আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরিউক্ত কুরআনি প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায় দ্বিতীয় আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেওয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোনো মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমনটা হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

قَوْلُهُ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا : অর্থাৎ "চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।" আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা.) বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলেছিলেন, তুমি আমার গারে সওরের সাথী এবং হাউজে [কাউসারেও] আমার সাথী থাকবে।

ইমাম মুসলিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস লিখেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি আমি [আল্লাহ পাক ব্যতীত আর] কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু এখন তিনি আমার ভাই ও সাথী। আর আল্লাহ পাক তোমাদের সাথীকে [অর্থাৎ আমাকে] বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে প্রিয়নবী ﷺ -এর সে কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা তিনি 'গারে সওরে' তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ "চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।" এই আয়াত সম্পর্কে হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (র.) বলেছেন, এই বাক্যে হুজুর ﷺ এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ পাক 'আমার সঙ্গে রয়েছেন; বরং বলেছেন, আল্লাহ পাক 'আমাদের' সঙ্গে রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক সঙ্গে থাকার ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা.)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জন্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ফজিলত। অতএব, যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদাকে অস্বীকার করে, সে এ আয়াতকে অস্বীকার করে। আর যে এ আয়াতকে অস্বীকার করে, সে কাফের।

এতদ্ব্যতীত, হযরত আবূ বকর (রা.) নিজের জন্য চিন্তিত ছিলেন না। তিনি চিন্তিত ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যে। তিনি ভেবেছিলেন, যদি আমার মৃত্যু হয় তবে একটি মানুষের মৃত্যু হবে, পক্ষান্তরে যদি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শহীদ করা হয় তবে উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে, এটিই ছিল হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দুশ্চিন্তার কারণ।

হিজরতের ঘটনা : বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.)-এর যে বর্ণনা সংকলিত হয়েছে তা হলো এরূপ– যখন থেকে আমার হিতাহিত জ্ঞান হয়েছে, আমি দেখেছি আমার পিতা-মাতা একই দীনের অনুসারী ছিলেন। এমন কোন দিন অতিবাহিত হতো না যে, সকাল এবং সন্ধ্যায় হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের গৃহে আগমন করতেন না। যখন [মক্কায়] মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন এবং উৎপীড়ন হচ্ছিল তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, আমি স্বপ্নে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখেছি। সেখানে অনেক খেজুর-বৃক্ষ রয়েছে। এরপর মুসলমানগণ মদীনা তৈয়্যবায় হিজরত করেন। আর যারা মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলেন তারাও মদীনা শরীফ পৌঁছেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু হুজুর ﷺ তাঁকে বললেন, একটু অপেক্ষা কর, [এখনো আমার জন্য অনুমতি হয়নি] আশা করি যে, আমার জন্যেও [হিজরতের] অনুমতি হবে। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! আপনারও অনুমতির আশা আছে। তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। হযরত আবূ বকর (রা.) হুজুর ﷺ -এর সঙ্গে সফরের উদ্দেশ্যে নিজের হিজরত মুলতবি রাখলেন। তিনি দুটি উষ্ট্র ক্রয় করলেন। চার মাস পর্যন্ত উষ্ট্রগুলোকে লালন-পালন করলেন। আমরা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ঘরে ঠিক দুপুরের সময় বসা ছিলাম। তখন হযরত আসমা বললেন, আব্বা! রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন। তিনি তখন মাথায় কাপড় রেখে এমন সময় আগমন করছিলেন যে সময় সাধারণত তাঁর আগমন হতো না। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক, এ সময় যে আপনি আগমন করেছেন এর অর্থ হলো [হিজরতের] অনুমতি হয়ে গেছে। প্রিয়নবী ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি নিলেন। ঘরে প্রবেশ করে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেনঃ যারা তোমার নিকট রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, এখানে খবর প্রকাশ করার মতো কেউ নেই, শুধু আমার দুটি মেয়ে রয়েছে।

হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আমাকে এখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, আমাকে সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দান করুন। তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ তুমি আমার সঙ্গে যাবে। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন ক্রন্দন করতে লাগলেন। এ ক্রন্দন ছিল আনন্দের, ইতিপূর্বে আমি কাউকে খুশি বা আনন্দের জন্য কাঁদতে দেখিনি।

হযরত আবূ বকর (রা.) তখন আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আমার এ দু'টি উষ্ট্রীর মধ্যে একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি ইরশাদ করলেন, মূল্য আদায় করে গ্রহণ করবো। আর যে উষ্ট্রী আমার হবে না তার উপর আমি আরোহণ করবো না। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, এ উষ্ট্রীটি আপনার।

নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন, কত মূল্যে তুমি ক্রয় করেছ? হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, এত মূল্যে আমি খরিদ করেছিলাম। তিনি ইরশাদ করলেন আমি এই মূল্যে তোমার থেকে গ্রহণ করলাম। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন বললেন, এখন এটি আপনার হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী (র.) 'গাযওয়ায়ে রাজী'র বর্ণনায় লিখেছেন, এটি ছিল জাদআ নামক উষ্ট্রী। ওয়াকেদী এর মূল্য লিখেন, ৮০০ দিরহাম। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা দু'টি উষ্ট্রীর জন্যে উত্তম আসবাবপত্র-সহ একটি বাটিতে খাবার এবং একটি পানির পাত্রও দিয়ে দেই।

মুহাম্মদ ইউসুফ সালেহী বর্ণনা করেন, হযরত আসমা (রা.) তাঁর কোমরবন্দের কাপড়কে টুকরা করে এক টুকরা দিয়ে পাথেয় বেঁধে দেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকর (রা.) বনী ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি তখন কাফের ছিল, পরে মুসলমান হয়। সে অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক ছিল। তাকে উষ্ট্রী দু'টি দিয়ে দেওয়া হয় এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিন দিন পর গারে সওরে হাজির থেকো। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর সফরের ব্যাপারে অবগত করে এ নির্দেশ দেন যে, আমার স্থলে তুমি এখানে থাকবে। মানুষের যেসব আমানত আমার নিকট রয়েছে তা মানুষকে পৌঁছিয়ে দেবে। এরপর তুমি আমার নিকট চলে আসবে। [মক্কাবাসী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুতা করতো এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও চরম জুলুম অত্যাচার করতো। তাদের অন্যায়-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে একে একে মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। অবশেষে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কি বিস্ময়কর বিষয় এতদসত্ত্বেও] মক্কাবাসী কোনো মূল্যবান জিনেসের হেফাজত করার ইচ্ছা হলে তা আমানত করতো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট।

মক্কাবাসীদের পূর্ণ আস্থা ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর সততা এবং আমানতদারীর উপর। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং আমানতদার। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) সওর নামক পাহাড়ের সে গুহায় পৌছেন। বায়হাকী হযরত ওমর (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, তাঁরা রাত্রিকালে রওয়ানা হয়েছিলেন।

আবূ নাঈম আয়শা বিনতে কোদামা'এর সূত্রে লিখেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছে সর্বপ্রথম আমার সম্মুখে আবূ জেহেল এসেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই সে আমাকে এবং আবূ বকরকে দেখতে পারেনি।

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত নগদ অর্থ তথা পাঁচ হাজার দিরহাম সঙ্গে নিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হুজুর ﷺ -এর সঙ্গে সওর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন পথে আবূ বকর (রা.) কখনো হুজুর ﷺ -এর সামনে কখনো ডানে কখনো বামে চলতে লাগলেন। হুজুর ﷺ -এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমার আশঙ্কা হয় যে, দুশমন সম্মুখে ওঁৎ পেতে আছে তখন আমি সম্মুখে চলে যাই। আর যখন দুশ্চিন্তা হয় যে, হয়তো পেছন থেকে হামলা হবে তখন পেছনে চলে যাই, আর এ কারণেই ডানে-বামে থাকি। যখন তাঁরা সওর নামক গুহার মুখে পৌছলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ সে আল্লাহ পাকের শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি গুহার ভেতর তাশরিফ নেবেন না। আপনার পূর্বে আমি গমন করে দেখি যদি সেখানে কোনো কষ্টদায়ক প্রাণী থাকে তবে তার প্রথম হামলা আমার উপর হবে। এ কথা বলে হযরত আবূ বকর (রা.) গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং হাত দিয়ে তদারক করে সেখানে গর্ত লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তাঁর কাপড় দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করলেন। এভাবে সবগুলো গর্তের মুখ বন্ধ হলো। এরপর হযরত রাসূলে কারীম সওর গুহায় প্রবেশ করলেন।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পদচিহ্নের অনুসরণে মুশরিকরা পাহাড় পর্যন্ত পৌছে, কিন্তু পাহাড়ের উপর পদচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা পাহাড়ের উপর আরোহন করে সওর নামক গুহার উপরে মাকড়সার জাল দেখে বলে, যদি এর ভেতরে কেউ গমন করতো, তবে মাকড়সার জাল এভাবে থাকতো না। যাহোক, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করেন।

কাযী হাফেজ আবূ বকর ইবনে সাঈদ হযরত হাসান বসরী (র.) -এর বর্ণনা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কুরাইশরা যখন হুজুর ﷺ -এর অনুসন্ধানে সওর নামক গুহার নিকটে পৌছে, গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা বলতে থাকে, যদি এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতো তবে গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকতো না। তখন হুজুর ﷺ দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাজ আদায় করছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) প্রহরায় রত ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার অনুসন্ধানে এসে গেছে। আল্লাহর শপথ! আমার নিজের জন্য কোনো চিন্তা নেই, চিন্তা হলো শুধু এর জন্যে যে, আপনার ব্যাপারে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়, তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! কোনো চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।

বুখারী শরিফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গুহার মধ্যে আছি, আর কুরাইশরা উপরে আছে, যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায় তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! সে দু'ব্যক্তির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন [অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আছেন।]

قَوْلُهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের তরফ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করলেন, আর তিনি হযরত আবূ বকরকে বললেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

ইবনে আবূ হাতেম, আবূ শেখ ইবনে মরদূইয়া, বায়হাকী এবং ইবনে আসাকের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, عَلَيْهِ -এর সর্বনামটি দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত আবূ বকর (রা.) -এর প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করেছেন। কেননা প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, হে আবূ বকর! চিন্তা করো না। আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এ কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.) এর মনে সান্ত্বনা এসেছে। কেননা হুজুর ﷺ -এর অন্তর তো পূর্বেই ছিল শান্ত– নিশ্চিত, তাঁর কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.)-ও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

قَوْلُهُ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا : "আর আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন এমন সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও না।" অর্থাৎ ফেরেশতাদের ফৌজ প্রেরিত হলো যারা কাফেরদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল।

মক্কাবাসীদের পূর্ণ আস্থা ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর সততা এবং আমানতদারীর উপর। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সত্যবাদী এবং আমানতদার। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এরপর হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) সওর নামক পাহাড়ের সে গুহায় পৌঁছেন। বায়হাকী হযরত ওমর (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, তাঁরা রাত্রিকালে রওয়ানা হয়েছিলেন।

আবূ নাঈম আয়শা বিনতে কোদামা'এর সূত্রে লিখেছেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছে সর্বপ্রথম আমার সম্মুখে আবূ জেহেল এসেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাই সে আমাকে এবং আবূ বকরকে দেখতে পারেনি।

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত নগদ অর্থ তথা পাঁচ হাজার দিরহাম সঙ্গে নিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) হুজুর ﷺ -এর সঙ্গে সওর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন পথে আবূ বকর (রা.) কখনো হুজুর ﷺ -এর সামনে কখনো ডানে কখনো বামে চলতে লাগলেন। হুজুর ﷺ -এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমার আশঙ্কা হয় যে, দুশমন সম্মুখে ওঁৎ পেতে আছে তখন আমি সম্মুখে চলে যাই। আর যখন দুশ্চিন্তা হয় যে, হয়তো পেছন থেকে হামলা হবে তখন পেছনে চলে যাই, আর এ কারণেই ডানে-বামে থাকি। যখন তাঁরা সওর নামক গুহার মুখে পৌঁছলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ﷺ সে আল্লাহ পাকের শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি গুহার ভেতর তাশরিফ নেবেন না। আপনার পূর্বে আমি গমন করে দেখি যদি সেখানে কোনো কষ্টদায়ক প্রাণী থাকে তবে তার প্রথম হামলা আমার উপর হবে। এ কথা বলে হযরত আবূ বকর (রা.) গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং হাত দিয়ে তদারক করে সেখানে গর্ত লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তাঁর কাপড় দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করলেন। এভাবে সবগুলো গর্তের মুখ বন্ধ হলো। এরপর হযরত রাসূলে কারীম সওর গুহায় প্রবেশ করলেন।

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পদচিহ্নের অনুসরণে মুশরিকরা পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু পাহাড়ের উপর পদচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যায়। তারা পাহাড়ের উপর আরোহন করে সওর নামক গুহার উপরে মাকড়সার জাল দেখে বলে, যদি এর ভেতরে কেউ গমন করতো, তবে মাকড়সার জাল এভাবে থাকতো না। যাহোক, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তিন রাত অতিবাহিত করেন।

কাযী হাফেজ আবূ বকর ইবনে সাঈদ হযরত হাসান বসরী (র.) -এর বর্ণনা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কুরাইশরা যখন হুজুর ﷺ -এর অনুসন্ধানে সওর নামক গুহার নিকটে পৌঁছে, গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা বলতে থাকে, যদি এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতো তবে গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকতো না। তখন হুজুর ﷺ দণ্ডায়মান অবস্থায় নামাজ আদায় করছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) প্রহরায় রত ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার অনুসন্ধানে এসে গেছে। আল্লাহর শপথ! আমার নিজের জন্য কোনো চিন্তা নেই, চিন্তা হলো শুধু এর জন্যে যে, আপনার ব্যাপারে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে যায়, তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! কোনো চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন।

বুখারী শরিফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা গুহার মধ্যে আছি, আর কুরাইশরা উপরে আছে, যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায় তবে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর! সে দু'ব্যক্তির সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন [অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের সাথে আছেন।]

قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজের তরফ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করলেন, আর তিনি হযরত আবূ বকরকে বললেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

ইবনে আবূ হাতেম, আবূ শেখ ইবনে মরদূইয়া, বায়হাকী এবং ইবনে আসাকের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, عَلَيْهِ -এর সর্বনামটি দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত আবূ বকর (রা.) -এর প্রতি সান্ত্বনা নাজিল করেছেন। কেননা প্রিয়নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, হে আবূ বকর! চিন্তা করো না। আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এ কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.) এর মনে সান্ত্বনা এসেছে। কেননা হুজুর ﷺ -এর অন্তর তো পূর্বেই ছিল শান্ত- নিশ্চিত, তাঁর কথার কারণে হযরত আবূ বকর (রা.)-ও নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

قَوْلُهُ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا : "আর আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন এমন সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও না।" অর্থাৎ ফেরেশতাদের ফৌজ প্রেরিত হলো যারা কাফেরদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল।

উম্মে মা'বাদের ঘটনা : তাবারানী, হাকেম, আবূ নাঈম এবং আবূ বকর শাফেয়ী হযরত সোলায়েত ইবনে আমর আনসারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন : হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) এবং তাদের পথ প্রদর্শক আমের ইবনে ফাহীরা মদিনা শরীফ গমনের পথে উম্মে মা'বাদ খাজায়ীর তাঁবু অতিক্রম করেন। উম্মে মা'বাদ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চিনত না, বয়সে সে প্রৌঢ়া ছিল, সে পর্দা করত না, এ অতিথিপরায়ণা মহিলা তার তাঁবুর আঙ্গিনায় বসত এবং পথিক মুসাফিরদের মেহমানদারী করত। মদিনাগামী এ পবিত্র কাফেলা উম্মে মা'বাদের নিকট থেকে গোশত এবং খেজুর ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তখন তাদের খুব অভাব অনটনের সময়। উম্মে মা'বাদের নিকট খেজুর বা গোশত কিছুই ছিল না। উম্মে মা'বাদ বলল, আল্লাহর শপথ। যদি আমাদের কাছে এসব কিছু থাকত তবে আমরা তোমাদেরকে দুঃখিত অবস্থায় রাখতাম না। তাঁবুর এক কোনে একটি বকরি দেখা গেল। হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, এ বকরিটির কি অবস্থা? উম্মে মা'বাদ বলল, এটি দুর্বলতার কারণে অন্য বকরীর সঙ্গে [জঙ্গলে] যেতে পারেনি।

হুজুর ﷺ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, ওর কাছে কি দুধ আছে? উম্মে মা'বাদ বলল, এ বকরিটি অত্যন্ত দুর্বল। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি এ বকরি থেকে দুগ্ধ দোহন করতে পারি। উম্মে মা'বাদ আরজ করল, আমার পিতা-মাতা কুরবান, তার নিকট থেকে কখনো দুগ্ধ দোহন করা হয়নি, কোনো নর ছাগলের সঙ্গে তার মেলামেশাও হয়নি। যদি আপনি মনে করেন, তার কাছে দুধ আছে তবে আপনি চেষ্টা করতে পারেন। হুজুর ﷺ বকরিটি কাছে এনে তার পৃষ্ঠদেশে এবং বাঁটের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করলেন, এরপর উম্মে মা'বাদের জন্যে এবং বকরির জন্যে দোয়া করলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বকরি থেকে দুগ্ধ প্রবাহিত হতে লাগল।

হুজুর ﷺ একটি পাত্র আনিয়ে নিলেন। পাত্রটি এত বড় ছিল যে তা থেকে সকলে দুগ্ধ পান করে তৃপ্তি লাভ করতে পারতেন । তিনি ঐ পাত্রেই দুগ্ধ দোহন করলেন। পাত্রটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হুজুর ﷺ সর্বপ্রথম উম্মে মা'বাদকে দুগ্ধ পান করালেন। সে তৃপ্তি লাভ করল। এরপর তিনি তাঁর সাথীদের দুধ পান করালেন। তাঁরাও তৃপ্ত হলো। তিনি নিজে এরপর দুধ পান করলেন এবং ইরশাদ করলেন "যে পান করাবে তার সর্বশেষে পান করা উচিত।" এরপর তিনি দ্বিতীয়বার দুগ্ধ দোহন করলেন এবং পাত্রটি পুনরায় পরিপূর্ণ হলো এবং তা উম্মে মা'বাদের নিকট রেখে তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন।

ইবনে সা'দ এবং আবূ নাঈম উম্মে মা'বাদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে বকরিটির উপর হুজুর ﷺ হাত বুলিয়ে দিয়েছেন সে বকরিটি আমার নিকট আঠার হিজরি পর্যন্ত ছিল। তা ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের যুগ। সে বছরটি ছিল অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের; সবুজ বলতে কোনো কিছু তখন ছিল না। কিন্তু আমরা সকাল সন্ধ্যায় ঐ বকরীটির দুগ্ধ দোহন করতাম। সে সর্বদা দুধ দিত তার দুধ কোনো সময় বন্ধ হয়নি।

হিশাম ইবনে হাবশ বর্ণনা করেন [হুজুর ﷺ -এর রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ পর] মা'বাদের পিতা কয়েকটি দুর্বল বকরি নিয়ে বাড়ি পৌঁছল। ঘরে দুধ দেখে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, মা'বাদের মা এ দুধ কোথা থেকে আসলো? বকরিগুলো-তো দূরে জঙ্গলে ছিল। বাড়িতে দুধ দেওয়ার মতো কোনো বকরিও ছিল না। মা'বাদের মা বলল, এই দুধ হলো একজন অত্যন্ত বরকতময় মানুষের বরকত, যার ঘটনা এভাবে ঘটেছে। মা'বাদের পিতা বলল, তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা কর। উম্মে মা'বাদ বলল, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উজ্জ্বল চমৎকার সুন্দর এবং উত্তম স্বভাবের অধিকারী।

তাঁর অবয়ব ছিল অতি আকর্ষণীয়, সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত। চক্ষুদ্বয় হলো কালো, ভ্রু প্রশস্ত এবং ঘন, আর কণ্ঠস্বরও ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যখন নিরব থাকতেন তখন অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ মনে হতো, আর যখন কথা বলতেন তখনও অত্যন্ত সুন্দর মনে হতো। দূর থেকে অত্যন্ত সুন্দর এবং আকর্ষণীয় দেখা যেত। আর নিকট থেকে বড় মধুর লাগতো। কথাবার্তা ছিল অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কমও নয়, বেশিও নয়। কথাগুলো যেন সাজানো গুছানো মুক্তার হারের মতো। তাঁর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। এত লম্বাও নয় যে দেখতে খারাপ লাগে, আর এত খাটোও নয় যে দেখতে ছোট মনে হয়, অতীব আকর্ষণীয়, অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সাথীরা সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে থাকেন। তিনি যখন "শ্রবণ কর" বলতেন, তখন সকলে মনযোগ সহকারে শ্রবণ করতো। আর যখন কোনো আদেশ দিতেন তখন আদেশ পালনের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করতো। অতীব ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর খেদমত এবং আদেশ পালন করা হতো, তিনি কঠোর মেজাযের অধিকারী ছিলেন না।

আবূ মা'বাদ বলল, আল্লাহর শপথ! এতো সে কুরাইশী, মক্কায় যাঁর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা শ্রবণ করেছি আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার এবং যদি সুযোগ হয় তবে আমি ভবিষ্যতে অবশ্যই তা করবো।

ইমাম বায়হাকী অন্য সূত্র থেকে একটু পার্থক্যসহ এ ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সন্ধ্যাকালে উম্মে মা'বাদের পুত্র বকরি নিয়ে যখন আসল, তখন উম্মে মা'বাদ একটি ছুরি এবং বকরি প্রেরণ করল। সে তার পুত্রকে বলল, তাদেরকে বল এই বকরি জবাই করে [ভুনে] খেয়ে নিন। হুজুর ﷺ ঐ ছেলেটিকে বললেন, তুমি ছুরি নিয়ে যাও এবং একটি বড় পাত্র নিয়ে এসো! সে বলল, এটি

বন্ধ্যা, এর দুধ নেই। এরপর হুজুর ﷺ বকরিটির বাঁটগুলোর উপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দুধ দোহন করে পাত্র পূর্ণ করে নিলেন। এই বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমরা দু'রাত সেখানে ছিলাম, এরপর রওয়ানা হলাম। উম্মে মা'বাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'মোবারক' বলতে লাগলো। তার অনেক বকরী হয়েছিল। এমন কি সে কিছুদিন পর ঐ বকরিগুলো নিয় মদিনা শরিফ এসেছিল। তার পুত্র হযরত আবূ বকর (রা.)-কে দেখে চিনে ফেলে এবং তার মাকে বললো, মা! এ ব্যক্তি 'মোবারকের' সঙ্গে ছিল। উম্মে মা'বাদ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট এসে বললো, হে আব্দুল্লাহ [আল্লাহর বান্দা] যিনি তোমার সঙ্গে ছিলেন তিনি কে?

হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তিনি আল্লাহ পাকের নবী। সে বলল, আমাকে তাঁর নিকট নিয়ে চল। হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির করলেন। হুজুর ﷺ তাকে খাদ্য ও পোশাক দান করলেন এবং সে পরে মুসলমান হয়েছিল। হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকর (রা.) যখন চলে গেলেন তখন আমাদের নিকট কুরাইশের কিছুলোক আসলো, তাদের মধ্যে আবূ জাহলও ছিল। তারা গৃহের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল, আমি ঘর থেকে বের হলাম তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার পিতা কোথায়?

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না আমার পিতা কোথায়, আবূ জাহল অত্যন্ত বদমেজাযী এবং খবিস লোক ছিল, সে আমার গণ্ডদেশে একটি চাপড় মারলো যে কারণে আমার বালি পর্যন্ত পড়ে গেল। এরপর তারা চলে গেল। তিন দিন পর্যন্ত এ অবস্থাই রইল। আমরা কিছু জানতে পারলাম না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিকে গমন করলেন। তিনদিন পর মক্কার নিচু এলাকার দিক থেকে একটি জিন আরবদের গানের মতো গান গেয়ে গেল। মানুষ তার পেছনে ছুটলো। কিন্তু কেউ তাকে দেখতে ফেল না। জিনের আবৃত্তি করা কবিতার অর্থ হলো "মহান আরশের মালিক উত্তম বিনিময় দান করুন সেই দু' সাথীকে, যারা উম্মে মা'বাদের তাবুতে দ্বি-প্রহরে অবস্থান করেছেন, তাঁরা উভয়ে সঠিক পথে গমন করেছেন; যার কাছ থেকে আমি হেদায়েত পেয়েছি, আর যে মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথী হয়েছে, সে সফলকাম হয়েছে। হে বনী কোসাই! আল্লাহ পাক মুহাম্মদ ﷺ -এর সৌজন্যে তোমাদের বৈশিষ্ট্য এবং নেতৃত্বকে বিলুপ্ত করেননি।

বনী কাবকে মোবরক হোক যে একজন স্ত্রীলোক মুসলমানদের পথে অবস্থান করতো, তার ভগ্নি থেকে তার বকরি এবং পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তোমরা যদি বকরিকে জিজ্ঞাসা কর তবে সেও সাক্ষ্য দেবে মুহাম্মদ ﷺ সে বকরি ঐ মহিলার নিকট রেখে যান, যেন দুগ্ধ দোহনকারী তার থেকে দুগ্ধ দোহন করে।" বায়হাকী লিপিবদ্ধ করেন যে, কুরাইশরা হুজুর ﷺ -এর অনুসরণ করতে করতে অবশেষে উম্মে মা'বাদের নিকট পৌঁছে তাকে হুজুর ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁর আকৃতির বিবরণ দেয়। উম্মে মা'বাদ জবাব দিল, তোমরা কি বলছ? একজন মেহমান আমার এখানে অবস্থান করেছিলেন, তিনি একটি বন্ধ্যা বকরির দুধ দোহন করেছিলেন।

কুরাইশরা বলল, আমরাও সে ব্যক্তিরই সন্ধান করেছি। বায়হাকী ঘটনার দুটি বর্ণনায় মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁবুর কোণে বকরি দেখছিলেন। তার পুত্র বকরি নিয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট এসেছিল আর উম্মে মা'বাদ তার স্বামী আসলে তার নিকট হুজুর ﷺ -এর গুণাবলি বর্ণনা করেছিল। আর এ কারণেই কুরাইশরা হুজুর ﷺ -এর অনুসন্ধানে উম্মে মা'বাদের নিকট পৌঁছেছিল। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৮৬-৮৭]

সোরকার ঘটনা : বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, সোরকা নিজে বর্ণনা করেন, কুরাইশের প্রতিনিধি আমাদের কাছে আসে, যে হুজুর ﷺ এবং হযরত আবূ বকরকে হত্যা অথবা গ্রেফতার করবে তার জন্য ১০০ উষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। আমি বনী মোদালাজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাজির হলো। সে বলল, সোরাকা! আমি সমুদ্র তীরে কিছু লোক দেখেছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনজন আরোহী দেখেছি, আমার ধারণা তাঁরা মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথী। এ কথাটি শ্রবণ করা মাত্র আমি বুঝলাম তাঁরাই হবে। আমি ঐ ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলাম যে নিরব থাক, সে নীরব হলে আমি উঠে বাড়ি গমন করলাম। বাঁদিকে আদেশ দিলাম, আমার অশ্বটি 'বতনে ওয়াদী' নামক স্থানে পৌঁছিয়ে দাও, আর নিজে তাঁবুর পিছনে দিয়ে হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে গেলাম। বর্শাটা টেনে নিয়ে গেলাম বল্লমের উপরের অংশটা নিচু করে রাখলাম এভাবে অশ্ব পর্যন্ত পৌঁছলাম। অশ্বে আরোহণ করে দ্রুত বেগে অগ্রসর হলাম। এর মধ্যে ঐ দু' ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, আমি কাছেই পৌঁছে গেলাম। কিন্তু আমার অশ্ব হোঁচট খেলে, আমি নিচে পড়ে গেলাম, এরপর উঠে দাঁড়িয়ে তীর দ্বারা এ বিষয়টি পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবো কিনা? যে ফল পাওয়া গেল তা আমার পছন্দনীয় ছিল না। অর্থাৎ আমি তাঁদের ক্ষতি করতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে একটি আশা ছিল যে, আমি এ অবস্থার পরিবর্তন করে ১০০ উষ্ট্রের পুরস্কার পেয়ে যাব। তাই পুনরায় অশ্বে আরোহণ করে দ্রুত এগিয়ে গেলাম, এমন কি তাদের নিকটে পৌঁছলাম। আমি এতো নিকটবর্তী হলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র কুরআন পাঠের শব্দ শ্রবণ করলাম। আমার

দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) আমার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন, এই অবস্থায় আমার অশ্বের দু'টি পা মাটিতে ধ্বসে যায়। আমি নিচে পড়ে যাই এবং পরে উঠে গেলাম। কিন্তু অশ্ব তার পা বের করতে পারল না। যখন সে এজন্য চেষ্টা করতো লাগলো তখন ধুলাবালু উঠে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে গেল। আমি তীর দ্বারা পুনরায় পরীক্ষা করলাম দেখা গেল যে, আমি তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারব না, তখন আমি এ সত্য উপলব্ধি করলাম যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হেফাজত করা হয়েছে আর তিনি বিজয়ী হবেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁর নিকট আমি আমার নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলাম যে, আপনারা আমার অবস্থা দেখুন, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি সাধন করবো না। তখন প্রিয়নবী ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো সে কি চায়? আমি বললাম, আপনার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যা হোক, আমি আপনাকে এ খবরটি জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে কোনো কষ্ট দেননি, শুধু এতটুকু কথা বললেন যে "আমাদের খবর মানুষকে জানাবে না" আমি তাঁর নিকট আবেদন করলাম [ভবিষ্যতের জন্য] আমাকে একটি নিরাপত্তা বাণী লিখে দিন। তখন তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে লিখে দেওয়ার আদেশ দিলেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,তিনি আমের ইবনে ফুহায়রাকে আদেশ দিলেন, "লিখে দাও"! তখন আমের চামড়ার একটি টুকরায় লিখে দিল।

এরপর প্রিয়নবী ﷺ অগ্রসর হলেন। মদিনা মোনাওয়ারা প্রবেশের সময় তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, দেখ, নবীর জন্য মিথ্যা কথা বলা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়। আমাকে যদি কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে [আমাকে তো সুস্পষ্ট ভাষায়] সঠিক কথা বলতেই হবে। অতএব, তুমি কোনোভাবে মানুষকে জবাব দেবে [এর কারণ হলো পথে যদি তাঁর পরিচয় প্রকাশ পায় তাহলে দুশমন তাঁর ক্ষতি করতে পারে] তাই যখন হযরত আবূ বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সাথী ইনি কে? তখন হযরত আবূ বকর (রা.) জবাব দিলেন, পথপ্রদর্শক; যিনি আমাকে পথ দেখান। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনা শরিফের নিকটে পৌঁছলেন তখন আবূ কোরায়যা আসলামী ৭০ জন লোক নিয়ে হুজুর ﷺ -কে সম্বর্ধনা জানালেন। হুজুর ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, বুরায়দা।

হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আবূ বকর আমাদের কাজ সঠিক হয়েছে। কারণ বোরায়দা অর্থ– ঠাণ্ডা। এর তাৎপর্য হলো কলহের অগ্নি নিভে গেছে, আর কাজ সঠিক হয়েছে। হুজুর ﷺ বোরায়দা নামের অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এর দলিল পেশ করলেন। অতঃপর তিনি তাকে [বোরায়দাকে] জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক? তিনি বললেন, বনী আসলাম গোত্রের।

হুজুর ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, আমাদের জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে। আসলাম শব্দটি থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা অর্থ গ্রহণ করেছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বনী আসলামের কোন শাখা?

তিনি বললেন, বনী সাহাম। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে। সকাল হলে বোরায়দা প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলেন, মদিনা মুনাওয়ারা প্রবেশ করার সময় আপনার একটি পতাকা থাকা দরকার। তাই তিনি নিজের পাগড়ি খুলে পতাকা বানালেন এবং বর্শার মাথায় বেঁধে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলেন।

হাকেম (র.) লিখেছেন, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার দিন মক্কা মোয়াজ্জামা থেকে বের হয়েছিলেন এবং সোমবার দিনই মদিনা তৈয়্যেবায় প্রবেশ করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى : অর্থাৎ "আর আল্লাহ পাক কাফেরদের কথাটি নীচ করে দেন।"

'কাফেরদের কথা হলো শিরক ও কুফরের কথা, যা আল্লাহ পাক ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ পর্যন্ত এ সুদীর্ঘ পথে প্রিয়নবী ﷺ -এর হেফাজত করেছেন, আর তাঁর বিরুদ্ধে কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্রকে বাতিল করেছেন। বিভিন্ন স্থানে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য নেমে এসেছে এবং দুশমনের সকল অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে হেফাজত করেছেন। ঠিক এমনভিাবে বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন, এভাবে তাদের শিরকের কথাকে নীচ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর কথাকে চির উর্ধ্বে রেখেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا অর্থাৎ "আর আল্লাহর বাণী তো চির উর্ধ্বে।" আল্লাহর বাণী হলো তাওহীদ অথবা ইসলামের দাওয়াত।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের কথার অর্থ হলো তারা প্রিয়নবী ﷺ -কে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং মক্কার দারউন নদওয়ার পরামর্শ করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল আল্লাহ পাক তাদের সে সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কালেমা বলতে উদ্দেশ্যে হলো আল্লাহ পাকের সে ওয়াদা যে, তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য করবেন। সে ওয়াদা তিনি পূর্ণ করেছেন।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ : আর আল্লাহ পাক সববিষয়ে পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়। প্রিয়নবী ﷺ -এর ব্যাপারে আল্লাহ পাকের প্রতিটি সিদ্ধান্তই হিকমতপূর্ণ। তাঁর ব্যাপারে গৃহিত যাবতীয় কর্মসূচী নিখুঁত এবং নির্ভুল।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ২৮৮-৯০ তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৯৮-৯৯]

অনুবাদ :

٤٣. وَكَانَ ﷺ اَذِنَ لِجَمَاعَةٍ فِى التَّخَلُّفِ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ فَنَزَلَ عِتَابًا لَهُ وَقَدَّمَ الْعَفْوَ تَطْمِيْنًا لِقَلْبِهِ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ فِى التَّخَلُّفِ وَهَلَّا تَرَكْتَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِى الْعُذْرِ وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ فِيْهِ .

৪৩. রাসূল ﷺ স্বীয় বিবেচনানুসারে কিছু সংখ্যক লোককে [তাবুক] যুদ্ধে শরিক না হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁকে 'ইতাব' বা বন্ধুসুলভ তিরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। তবে তাঁর হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্য ক্ষমার কথা অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। অজুহাতের বেলায় কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং এতে কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন তাদেরকে পশ্চাতে থেকে যেতে অনুমতি দিলে? তাদের বিষয়টি কেন আমার উপর ছেড়ে রাখলে না?

٤٤. لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فِى التَّخَلُّفِ عَنْ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ .

৪৪. যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তোমার নিকট তারা নিজ জানমাল দ্বারা জিহাদ করা হতে পশ্চাতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

٤٥. اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ فِى التَّخَلُّفِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ شَكَّتْ قُلُوْبُهُمْ فِى الدِّيْنِ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ يَتَحَيَّرُوْنَ .

৪৫. যুদ্ধ হতে পশ্চাতে থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তোমার নিকট কেবল তারাই অনুমতি প্রার্থনা করে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যাদের হৃদয় দীন সম্পর্কে সংশয়যুক্ত। তারা তো আপন সংশয়ে অস্থির। দুদোল্যমান। اِرْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থ– তাদের হৃদয় সংশয়যুক্ত।

٤٦. وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ مَعَكَ لَاَعَدُّوْا لَهُ عُدَّةً اُهْبَةً مِنَ الْاٰلَةِ الزَّادِ وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ اَىْ لَمْ يُرِدْ خُرُوْجَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ كَسَّلَهُمْ وَقِيْلَ لَهُمُ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ الْمَرْضٰى وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ اَىْ قَدَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ .

৪৬. তারা আপনার সাথে অভিযানে বাস্তবিকই যদি বের হতে ইচ্ছা পোষণ করতো তবে নিশ্চয় এটার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত, অস্ত্রশস্ত্র ও পাথেয় যোগাড় করত কিন্তু আল্লাহ তাদের উত্থান পছন্দ করেননি। অর্থাৎ এদের বাহির-যাত্রা তিনি চাননি ফলে, তিনি এদেরকে বিরত রাখেন নিরুদ্যম করে দিলেন, এবং এদেরকে বলা হলো, নারী, শিশু ও অন্ধ প্রমুখ যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক। আল্লাহ তোমাদের জন্য এই হেয় অবস্থাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

٤٧. لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا فَسَادًا بِتَخْذِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৪৭. তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করত মুমিনগণকে অপমানিত করার চক্রান্ত করত বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি করতো।

وَلَاَ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ اَيْ اَسْرَعُوْا بَيْنَكُمْ بِالْمَشْيِ بِالنَّمِيْمَةِ يَبْغُوْنَكُمْ اَيْ يَطْلُبُوْنَ لَكُمُ الْفِتْنَةَ ج بِاِلْقَاءِ الْعَدَاوَةِ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط مَا يَقُوْلُوْنَ سِمَاعَ قَبُوْلٍ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ .

এবং তোমাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করত ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত। একজনের নিকট অপরজনের বদনাম গেয়ে বেড়াতে খুবই তৎপর থাকত। তোমাদের মধ্যে তাদের শ্রবণকারী বিদ্যমান। অর্থাৎ এমন লোক বিদ্যমান যারা তাদের কথা পালনের জন্য শুনে। আল্লাহ সীমলঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। يَبْغُوْنَكُمْ অর্থ– তোমাদের জন্য চায়।

٤٨ . لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ ج لَكَ مِنْ قَبْلُ اَوَّلَ مَا قَدِمْتَ الْمَدِيْنَةَ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ اَيْ اَجَالُوا الْكُفْرَ فِيْ كَيْدِكَ وَاِبْطَالِ دِيْنِكَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ النَّصْرُ وَظَهَرَ عَزَّ اَمْرُ اللّٰهِ دِيْنُهٗ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ لَهٗ فَدَخَلُوْا فِيْهِ ظَاهِرًا .

৪৮. পূর্বেও অর্থাৎ প্রথম যখন মদিনায় এসেছিলেন তখনই তারা তোমাদের জন্য ফেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এবং তোমার কর্ম পণ্ড করার জন্য গণ্ডগোল করেছিল। আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও আপনার দীনকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এরা সব সময় পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হক অর্থাৎ সাহায্য আসল এবং আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ তার ধর্ম প্রকাশিত হলো শক্তিশালী হলো। যদিও তা তাদের মনঃপূত ছিল না। ফলে তারা কেবল বাহ্যত এটার অন্তর্ভুক্ত হয়।

٤٩ . وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ فِي التَّخَلُّفِ وَلَا تَفْتِنِّيْ ط وَهُوَ الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ هَلْ لَكَ فِيْ جِلَادِ بَنِي الْاَصْفَرِ فَقَالَ اِنِّيْ مُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ وَاَخْشٰى اِنْ رَاَيْتُ نِسَاءَ بَنِي الْاَصْفَرِ اَنْ لَّا اَصْبِرَ عَنْهُنَّ فَافْتَتِنَ قَالَ تَعَالٰى اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا بِالتَّخَلُّفِ وَقُرِئَ سُقِطَ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ لَا مَحِيْصَ لَهُمْ عَنْهَا .

৪৯. এবং তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে পশ্চাতে থেকে যেতে অনুমতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না। এই ব্যক্তিটি হলো অন্যতম মুনাফিক জাদ্দ ইবনে কায়েস। রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, বানুল আছফারের [অর্থাৎ রোমক জাতি, তাবুক যুদ্ধ এদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল।] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তুমি ইচ্ছা রাখ? সে তখন উত্তর দিয়েছিল, নারীদের বিষয়ে আমি বড় দুর্বল। সুন্দরী রোমক রমণীদের দেখলে আমি আত্মসংবরণ করতে পারব না। ফলে, ফেতনায় লিপ্ত হয়ে পড়ব। আল্লাহ তা'আলা এর সম্পর্কে ইরশাদ করেন, শুনে রাখ, পশ্চাতে থেকে এরা তো ফেতনায় পড়ে আছে। আর জাহান্নাম তো সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বেষ্টন করেই আছে। এটা হতে রক্ষা পাওয়ার কোনো স্থান নেই। سَقَطُوْا শব্দটি سُقِطَ রূপেও পঠিত রয়েছে।

٥٠ . اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ كَنَصْرٍ وَغَنِيْمَةٍ تَسُؤْهُمْ ط وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ شِدَّةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا بِالْحَزْمِ حِيْنَ تَخَلَّفْنَا مِنْ قَبْلُ قَبْلَ هٰذِهِ الْمُصِيْبَةِ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُوْنَ بِمَآ اَصَابَكَ .

৫০. তোমার মঙ্গল হলে বিজয় ও গনিমত সামগ্রী লাভ হলে তা তাদেরকে পীড়া দেয় আর তোমার বিপদ ঘটলে কঠিন অবস্থায় পড়লে তারা বলে, আমরা তো পূর্বাহ্নেই অর্থাৎ এই বিপদ আসার আগেই যুদ্ধ হতে পশ্চাতে থেকে আমাদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। আর তারা তোমাকে বিপদে দেখে উৎফুল্ল চিত্তে সরে পড়ে।

٥١. قُلْ لَّهُمْ لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج اِصَابَتَهٗ هُوَ مَوْلٰنَا ج نَاصِرُنَا وَمُتَوَلِّى اُمُوْرِنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

৫১. এদেরকে বল, আমাদের জন্য আল্লাহ যা অর্থাৎ যে বিপদ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা ব্যতীত আমাদের জন্য কিছু হবে না। তিনি আমাদের কর্ম বিধায়ক সাহায্যকর্তা ও আমাদের তত্ত্বাবধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।

٥٢. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الْاَصْلِ اَىْ تَنْتَظِرُوْنَ اَنْ يَّقَعَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْعَاقِبَتَيْنِ الْحُسْنَيَيْنِ تَثْنِيَةُ حُسْنٰى تَانِيْثُ اَحْسَنَ النَّصْرِ اَوِ الشَّهَادَةِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ نَنْتَظِرُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ بِقَارِعَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ز بِاَنْ يَّاْذَنَ لَنَا بِقِتَالِكُمْ فَتَرَبَّصُوْا بِنَا ذٰلِكَ اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ عَاقِبَتَكُمْ .

৫২. বল, তোমরা তো আমাদের সম্পর্কে দুটি ভালো আল্লাহর উপরই মুমিনদেরকে নির্ভর করা বা শাহাদাত লাভ করা– এই দুইটির একটি আপতিত হওয়ার প্রতীক্ষা করতেছ। আর আমরা প্রতীক্ষা করতেছি যে আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে تَرَبَّصُوْنَ -এতে মূলত একটি ت বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– তোমরা প্রতীক্ষা করতেছ। الْحُسْنَيَيْنِ শব্দটি اَحْسَنَ –এর স্ত্রীলিঙ্গ حُسْنٰى -এর تَثْنِيَةٌ বা দ্বিবচন। تَتَرَبَّصُ অর্থ– আমরা প্রতীক্ষা করতেছি। আকাশের ভীষণ নিনাদের মাধ্যমে কিংবা আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি প্রদান করে আমাদের হস্ত দ্বারা তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। অতএব তোমরা আমাদের সম্পর্কে তার প্রতীক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে তোমাদের পরিণামের প্রতীক্ষা করতেছি।

٥٣. قُلْ اَنْفِقُوْا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط مَآ اَنْفَقْتُمُوْهُ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ وَالْاَمْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْخَبَرِ .

৫৩. বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্যে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই অর্থ ব্যয় কর না কেন তা অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় করেছ তা কখনো গৃহীত হবে না। তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। اَنْفِقُوْا-اَمْر-এটা বা নির্দেশবাচক বাক্য হলেও এই স্থানে خَبَرٌ বা বিবরণমূলক বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٤. وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ يُّقْبَلَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ فَاعِلُ مَنَعَهُمْ وَاَنْ تُقْبَلَ مَفْعُوْلُهٗ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى مُتَثَاقِلُوْنَ وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ النَّفَقَةَ لِاَنَّهُمْ يَعُدُّوْنَهَا مَغْرَمًا .

৫৪. তাদের অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা হতে কেবল এ কারণেই নিষেধ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করে, শৈথিল্যের সাথে ভারবাহী অবস্থায় তারা সালাতে শরিক হয় আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে বটে; কিন্তু তারা এই অর্থ ব্যয় অপছন্দ করে। কেননা তারা তাকে ট্যাক্স বলে মনে করে। يُقْبَلَ শব্দটি ت ও ی উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اِلَّآ اَنَّهُمْ -এটা আয়াতোক্ত مَنَعَهُمْ ক্রিয়ার فَاعِلٌ বা কর্তা, আর তার مَفْعُوْلٌ বা কর্মকারক হলো اَنْ يُّقْبَلَ -

৫৫. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اَىْ لَا تَسْتَحْسِنْ نِعَمَنَا عَلَيْهِمْ فَهِىَ اِسْتِدْرَاجٌ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اَىْ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِمَا يَلْقَوْنَ فِىْ جَمْعِهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ وَفِيْهَا مِنَ الْمَصَائِبِ وَتَزْهَقَ تَخْرُجَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ فَيُعَذِّبُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

৫৫. তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন আশ্চর্যান্বিত না করে। অর্থাৎ তাদেরকে আমার নিয়ামত প্রদান ভালো বলে মনে করবে না; এটা আমার পক্ষ হতে অবকাশ প্রদান মাত্র। আল্লাহ তো এদেরকে তা দ্বারাই পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। এইগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে কত ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয় এবং এতে আবার কত ধরনের বিপদ-আপদ রয়েছে। আর কুফরি অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে। অনন্তর পরকালে আরো কঠিন শাস্তির মধ্যে তাদেরকে নিপতিত করা হবে। لِيُعَذِّبَهُمْ -এই স্থানে لِ-এর পর اَنْ শব্দটি উহ্য রয়েছে। তাফসীরে اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ উল্লেখ করে ঐদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। تَزْهَقَ অর্থ- বের হয়ে যাবে।

৫৬. وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط اَىْ مُؤْمِنُوْنَ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ تَفْعَلُوْا بِهِمْ كَالْمُشْرِكِيْنَ فَيَحْلِفُوْنَ تَقِيَّةً ـ

৫৬. তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শপথ করে বলে যে, তারা মুমিন। কিন্তু আসলে তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বস্তুত তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা ভয় করে। অর্থাৎ এই ভয় করে যে, এদের সাথেও মুশরিকদের ন্যায় আচরণ করা হবে। সুতরাং নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে তারা ঐ ধরনের শপথ করে।

৫৭. لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً يَلْجَؤُوْنَ اِلَيْهِ اَوْ مَغٰرٰتٍ سَرَادِيْبَ اَوْ مُدَّخَلًا مَوْضِعًا يَدْخُلُوْنَهُ لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ يُسْرِعُوْنَ فِىْ دُخُوْلِهِ وَالْاِنْصِرَافِ عَنْكُمْ اِسْرَاعًا لَا يَرُدُّهُ شَىْءٌ كَالْفَرَسِ الْجَمُوْحِ ـ

৫৭. তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল পেত যেখানে তারা আশ্রয় নিবে বা কোনো গিরি-গুহা সুড়ঙ্গ বা কোনো প্রবেশস্থল যেখানে তারা প্রবেশ করবে তবে তারা তাতে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করত। অর্থাৎ দ্রুত গিয়ে তারা তাতে প্রবেশ করত। তোমাদের হতে ক্ষিপ্রগতি একরোখা ঘোড়ার মতো এমনভাবে তারা পালিয়ে যেত যে, কিছুই তাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে পারত না।

৫৮. وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ يُعِيْبُكَ فِىْ قَسْمِ الصَّدَقٰتِ ج فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ـ

৫৮. তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে সদকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। এটা হতে তাদেরকে কিছু দেওয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয় এবং তার কিছু তাদেরকে দেওয়া না হলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়। يَلْمِزُكَ অর্থ- তোমাকে দোষারোপ করে।

৫৯. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنَ الْغَنَائِمِ وَنَحْوِهَا وَقَالُوْا حَسْبُنَا كَافِيْنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ غَنِيْمَةٍ اُخْرٰى مَا يَكْفِيْنَا اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ اَنْ يُّغْنِيَنَا وَجَوَابُ لَوْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

৫৯. ভালো হতো যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গনিমত সামগ্রী বা অন্যান্য যা কিছুই দেন তাতে পরিতুষ্ট হতে এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অচিরেই আমাদেরকে তাঁর করুণা দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও অন্যান্য সময়ের যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী হতে এমন দিবেন যে, তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহর প্রতি অনুরাগ রাখি। তিনিই আমাদেরকে আনপেক্ষ করে দিবেন। حَسْبُنَا অর্থ- আমাদের জন্য যথেষ্ট। لَوْ -এই স্থানে এটার জওয়াব উহ্য। তা হলো- لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ [তবে তাদের জন্য এটা ভালো হতো।]

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ : এটা جُمْلَة دُعَائِيَّة অসন্তুষ্টির স্থানে স্নেহ মমতা প্রকাশের জন্য অগ্রবর্তী করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِمَ : এটা মূলত لِمَا জার-মাজরূর ছিল। একটি মূলনীতি রয়েছে যে, যখন হরফে জর مَا-ئِ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ -এর উপর প্রবেশ করে তখন اَلِفْ পড়ে যায়। এ কারণেই এখানে اَلِفْ পড়ে গেছে। لَمْ -এর মধ্যে لَا -টি হলো تَعْلِيْلِيَّةٌ আর لَهُمْ -এর মধ্যে تَبْلِيْغِيَّةٌ কাজেই উভয়টি اَذِنْتَ -এর مُتَعَلِّقٌ হওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا : এটা يَتَبَيَّنُ -এর فَاعِلْ হয়েছে صَدَقُوْا বাক্যটি সেলাহ হয়েছে। تَعْلَمَ -এটা يَتَبَيَّنَ -এর উপর আতফ হয়েছে। كَاذِبِيْنَ মাফঊলে লাহু হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ خُرُوْجَهُمْ : كَرَاهَةْ বলা হয়- اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ لِلْعِلْمِ بِنُقْصَانِهِ -কে। আর এটা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কাজেই كَرِهَ اللّٰهُ -এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দিকে কারাহাতের সম্বন্ধ করা তো জায়েজ নয়!

উত্তর. মুফাসসির (র.) كَرِهَ -এর তাফসীর لَمْ يُرِدْ خُرُوْجَهُمْ দ্বারা করে এই প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন এখানে كَرَاهَتْ -এর লাযেমী অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা যে বস্তু অপছন্দনীয় হয় তার ইচ্ছা করা হয় না।

قَوْلُهُ ثَبَّطَهُمْ : এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَثْبِيْطًا মাসদার হতে মাযী -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ- বিরত রাখা, ফিরিয়ে রাখা। هُمْ হলো جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর যমীর।

প্রশ্ন. تَثْبِيْط -এর অর্থ হলো বিরত রাখা। আর আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনোভাবেই এটা সমীচীন নয় যে, বান্দাগণকে ফরজ বিষয়গুলো হতে ফিরিয়ে রাখবেন। কাজেই রূপকভাবে বিরত রাখার নিসবত অলসতার দিকে করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা অনুপাতে তাদের অলসতা তাদেরকে বিরত রেখেছেন।

قَوْلُهُ اَىِ اللّٰهُ ذٰلِكَ : প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اُقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ; এতে قُعُوْدٌ عَنِ الْجِهَادِ -এর হুকুম প্রদান করা হয়েছে। আর নির্দেশিত বিষয়টি প্রশংসিত হয়; তিরস্কৃত হয় না।

উত্তর. উত্তরের সারকথা বা উদ্দেশ্য হলো تَقْدِيْرِ اَزَلِىْ আর এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই قَدَّرَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذَالِكَ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন যে, এটা اَمْرِ تَهْدِيْدِىْ যা اِعْلَمُوْا مَا شِئْتُمْ -এর অন্তর্গত। আর قَرِيْنَةٌ হলো مَعَ الْقَاعِدِيْنَ

قَوْلُهُ اِلَّا خَبَالًا : এটা مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغْ হয়েছে। অর্থাৎ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- مَا زَادُوْكُمْ شَيْئًا اِلَّا خَبَالًا خَبَالًا অর্থ হলো বিশৃঙ্খলা, অনিষ্ট। এটা خَبَلَ يَخْبُلُ তথা বাবে نَصَرَ হতে নির্গত। এরূপ অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা যার কারণে কোনো প্রাণীর মধ্যে পাগলামি বা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়ে যায়। خَبَالًا হলো مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ

قَوْلُهُ اَوْضَعُوْا : অর্থাৎ لَسَعَوْا بَيْنَكُمْ بِالنَّمِيْمَةِ আর اِيْضَاعٌ অর্থ হলো اِسْرَاعٌ দ্রুত করা। বলা হয়- وَضَعَ الْبَعِيْرُ وَضْعًا اِذَا اَسْرَعَ বুঝা গেল যে, এখানে وَضْع অর্থ- نِهَادَنْ বা রাখা নয়।

قَوْلُهُ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ : سَمَّاعُوْنَ অর্থ- খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারী, গুপ্তচর। سَمَّاعٌ শব্দটি কখনো গুপ্তচর অর্থে আবার কখনো অনুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এই উভয় অর্থই উদ্দেশ্য হতে পারে।

قَوْلُهُ بَنِى الْاَصْفَرِ : রোমের আশপাশের কোনো এক এলাকার সর্দারের নাম ছিল اَصْفَرْ ; সে একজন রোমীয় নারী বিয়ে করেছিল। তার থেকে যে সকল সন্তান জন্ম গ্রহণ করত, তাদেরকে بَنِىْ اَصْفَرْ বলা হতো। এ বংশ যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করে। এটা সেই বংশের দিকেই ইঙ্গিতবহ।

قَوْلُهُ جَلَّادٌ : চাবুক দ্বারা আঘাত/ প্রহারকারী, তরবারি দ্বারা হত্যাকারী। এর থেকেই জল্লাদ শব্দটি এসেছে। এখানে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য। কোনো কোনো নোসখায় جَلَّادٌ -এর পরিবর্তে جِهَادٌ রয়েছে, যা সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ اَنْفِقُوْا طَوْعًا وَّكَرْهًا الخ : এটা أَمْر بِمَعْنَى خَبَر হয়েছে। এর অর্থ হলো–
نَفَقَتُكُمْ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ

قَوْلُهُ فَاعِلُ مَنَعَهُمْ : অর্থাৎ اَلَّا اَنَّهُمْ হলো مَنَعَ -এর ফা'য়েল। উহ্য ইবারত হলো **এরূপ**– مَا مَنَعَهُمْ قَبُوْلَ نَفَقَاتِهِمْ اِلَّا كُفْرَهُمْ ; আর قَبُوْلَ হলো مَفْعُوْل ثَانِىْ আর مَنَعَهُمْ -এর মধ্যকার هُمْ হলো مَفْعُوْل اَوَّل

قَوْلُهُ اِسْتِدْرَاجٌ : এর অর্থ– ধীরে ধীরে নিকটবর্তী করা, ধীরে ধীরে অবকাশ দেওয়া।

قَوْلُهُ تَقِيَّةٌ : বাতিনের বিপরীত প্রকাশ করা। এ শব্দটি اَهْل تَشَيُّع -এর পরিভাষা। অর্থাৎ স্বীয় ধর্মীয় **বিশ্বাসের বিপরীত** প্রকাশ করা।

قَوْلُهُ سَرَادِيْبُ : এটা سِرْدَابٌ -এর বহুবচন। অর্থ– বাংকার, হিমাগার, ভূগর্ভস্থ ঘর। গহবর, সুরঙ্গ।

قَوْلُهُ مُدَّخَلًا : মূলে ছিল مُدْتَخَلًا ; এখানে تَاءٌ -কে دَال দ্বারা পরিবর্তন করে دَال -কে دَال -এর মধ্যে ইদগাম **করে** দেওয়া হয়েছে। অর্থ– প্রবেশ করার জায়গা।

قَوْلُهُ يَجْمَحُوْنَ : এটা جَمْح থেকে নির্গত। جَمْح ঐ অবাধ্য ঘোড়াকে বলে যা লাগাম দ্বারাও আয়ত্তে আসে না এবং খুব দ্রুত দৌড়িয়ে চলে। এখানে উদ্দেশ্য হলো দ্রুত চলা, দৌড়ানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ اَذِنْتَ لَهُمْ الخ : এ রুকূর সতেরটি আয়াতের অধিকাংশ স্থান জুড়ে সেই মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে, যারা মিথ্যা বাহানা দাঁড় করে তাবুক যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ -এর অনুমতি নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মাসায়েল, আহকাম ও হেদায়েতের সমাবেশ রয়েছে। প্রথম আয়াতে এক অপূর্ব সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অভিযোগ করা হয় যে, মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর দেখিয়ে নিজেদের মা'যুর বলে প্রকাশ করেছিল বটে, কিন্তু তাদের সত্য -মিথ্যা যাচাইয়ের আগে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো কেন? যাতে এরা উল্লাস প্রকাশ করে বলছে যে, তারা আল্লাহর রাসূলকে সহজে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে দেন যে, নিছক বাহানা তালাশের জন্যই তাদের ওজর প্রকাশ, নতুবা অব্যাহতি না পেলেও তারা যুদ্ধে শরিক হতো না। আলোচ্য আয়াতে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যে, তারা যুদ্ধে শরিক হলেও মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হতো না। তবে এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধ থেকে তাদের অব্যাহতি না দিলেও তারা অবশ্য যেত না; কিন্তু এতে তাদের মনের কুটিলতা প্রকাশ হয়ে পড়ত এবং মুসলমানদের প্রতারিত করে উল্লাস প্রকাশের সুযোগ পেত না। আয়াতের শুরুতে অভিযোগের যে ভাব, তার উদ্দেশ্য তিরস্কার করা নয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কীকরণ। বাহ্যত এক প্রকারের তিরস্কার মনে হলেও কত স্নেহমমত্বের সাথে তার প্রকাশ ঘটে। কি সুন্দর বাচনভঙ্গি? لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ ["কেন আপনি অনুমতি প্রদান করলেন"] -এর আগে বলে দেওয় হয়– عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ["আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।"]– অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুউচ্চ মর্যাদা ও শান এবং আল্লাহর পথে তাঁর গভীর সম্পর্কের প্রতি যাদের দৃষ্টি, তারা বলেন যে, আল্লাহর সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে কোনো কাজের জবাব তলব ছিল তাঁর বরদাশতের বাইরে। প্রথমেই যদি "কেন অব্যাহতি দিলেন" বলা হতো, তবে রাসূল ﷺ -এর কলব মোবারকের পক্ষে তা সহ্য করা দুষ্কর হতো। তাই প্রথমেই "আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন" বলে এক দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হলো যে, এমন কিছু হয়ে গেল, যা আল্লাহর অপছন্দ। অন্য দিকে ক্ষমা করার আশ্বাসবাণী শোনানো হয়েছে, যাতে তাঁর কলব মোবারক ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়ে।

প্রশ্ন আসতে পারে, রাসূলে কারীম ﷺ ছিলেন নিষ্পাপ। অতএব এখানে 'ক্ষমা' শব্দের ব্যবহার কেন? ক্ষমা তো গুনাহ ও অপরাধের জন্য হয়ে থাকে। এর উত্তর হলো, 'ক্ষমা' শব্দটির প্রয়োগ যেমন গুনাহের জন্য, তেমনি অপছন্দ ও উত্তম নয়– এমন ব্যাপারেও করা যেতে পারে। আর এটি নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য দেখানো হয়েছে যে, মুমিনগণ জান ও মালের মোহে পড়ে জিহাদ থেকে বাঁচার জন্য আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করে না:

বরং এ হলো তাদের কাজ, আল্লাহ ও রোজ কিয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান বিশুদ্ধ নয়। আর আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করে জানেন।

চতুর্থ আয়াতে মুনাফিকদের পেশকৃত ওজর যে মিথ্যা তার একটি আলামত দেখিয়ে বলা হয়েছে- وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً "জিহাদের জন্য বের হওয়ার সংকল্প এদের থাকলে নিশ্চয় এর কিছু প্রস্তুতিও নিত" কিন্তু দেখা যায় যে, তাদের কোনো প্রস্তুতিই নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাদের ওজর মিথ্যা বাহানা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত জিহাদে বের হবার কোনো ইচ্ছাই তাদের ছিল না।

গ্রহণযোগ্য ওজর ও জিহাদে বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত ওজর ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তা হলো সেই লোকদের ওজর প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযুরগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে; কিন্তু আদেশ পালনে যার কোনো ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোনো ওজরও উপস্থিত হয়, তবে গুনাহের এ ওজর হবে গুনাহের চাইতে নিকৃষ্ট। সুতরাং এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- কেউ জুম'আর নামাজে শরিক হওয়ার প্রস্ততি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের ওজর গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ মা'যুর লোককে পূর্ণ ছওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুম'আর কোনো প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোনো ওজর উপস্থিত হলে তা হবে বাহানার নামান্তর। উদাহরণত দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাতে শরিক হওয়ার প্রস্তুতি স্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময় মতো জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে; কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামাজ কাযা হয়ে যায়। যেমন- রাসূলে কারীম ﷺ -এর লায়লাতুত তা'রীজের ঘটনা। সময় মতো জেগে উঠার জন্য তিনি হযরত বিলাল (রা.)-কে নিয়োজিত রাখেন, যেন প্রত্যুষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলে চোখ খোলে- এ ওজর প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন- لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ অর্থাৎ "ঘুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর । তাই এটি হলো যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।" সান্ত্বনার কারণ হলো, সময় মতো জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি-অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য কিনা? তা জানা যাবে। নিছক মৌখিক জমাখরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

পঞ্চম আয়াতে মিথ্যা ওজর দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জিহাদ থেকে এদের নিবৃত্ত থাকাই উত্তম। কারণ, ওখানে গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ফাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয়- وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আছে এমন অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান, যারা তাদের মিথ্যা গুজবে বিভ্রান্ত হতো।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ 'ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। যেমন- ওহুদ যুদ্ধে প্রভৃতিতে। وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ অর্থাৎ "আল্লাহর বিজয় হলো, যাতে মুনাফিকরা মর্মপীড়া বোধ করছিল।" এর দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমনভাবে ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধেও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়েস নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেওয়া হয়। সে জিহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ওজর পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কুরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলে- اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا 'ভালো করে শোন' এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশঙ্কার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশঙ্কা অর্থাৎ রাসূলের অবাধ্যতা ও জিহাদ পরিত্যাগের অপরাধের দ্বারা এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল। وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ "আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে আছে।" তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখিরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌঁছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ মতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যত মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ ... هُمْ خَرِجُوْا ["আপনার কোনো মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়।"]

[এবং কোনো বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জানতাম যে, **মুসলমানরা** বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্য যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।]

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ পাক মহানবী ﷺ ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে **আসল সত্য**কে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে- قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا **অর্থাৎ** "আপনি ঐ বস্তুপূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্থিব উপকরণ হলো এক যবনিকা **বিশেষ**। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহরই। আমরা যে সকল অবস্থায় সম্মুখীন হই তা আগেই **আল্লাহ আমা**দের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি **ভালোবাসা** রাখা এবং পার্থিব উপায় উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভালোমন্দ নির্ভলশীল নয়।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য এবং বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুল : আলোচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের মূল তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল [আল্লাহর প্রতি ভরসা] -এর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে; বরং তার অর্থ হলো, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের সাধ্যমতো চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে আর দৃষ্টি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল দানের মালিক হবেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। ধর্মবিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্থিব উপায় উপকরণকেই আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অপর দিকে কিছু মূর্খ লোক নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপা দেওয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জিহাদের জন্য নবী করীম ﷺ -এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ এ সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি? তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে- برتوكل زانوے اشتر به بند অর্থাৎ "তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও।" অর্থাৎ দুনিয়ার উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয়; বরং আল্লাহর হুকুমের যে অধীন সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মুমিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং তা আমাদের জন্য শান্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ মুমিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী ছওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূল কথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হলো هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ অর্থাৎ "তোমরা কি আমাদের দু'টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থা হলো তার বিপরীত। আজাব থেকে কোনো অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোনো প্রকারে নিষ্কৃতি পেয়েও যায়, তবে আখিরাতের আজাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই; তা অবশ্যই ভোগ করবে।

قَوْلُهُ قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا الخ : শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে জদ ইবনে কায়েস সম্পর্কে। সে ভিত্তিহীন ওজর আপত্তি পেশ করে তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিল। তখন এ কথাও বলেছিল, আমি এ যুদ্ধে যেতে পারব না তবে অর্থ সম্পদ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব। পূর্ববর্তী আয়াতে তার প্রথম কথার জবাব দেওয়া হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে তার দ্বিতীয় কথার জবাব দেওয়া হয়েছে।

-[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৮৮, তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ১০, পৃ. ১১৬]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কুস্বভাব ও মন্দ আচরণের আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের সারকথাও অনেকটা তাই। আর اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا ["আল্লাহর ইচ্ছা হলো, এগুলোর দ্বারা তাদের আজাবে রাখা"] বাক্যে মুনাফিকদের জন্য তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে যে আজাব বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ হলো, দুনিয়ার মোহে উন্মুক্ত থাকা মানুষের জন্য পার্থিব জীবনেও এক বড় আজাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীব্র কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্য নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিনের আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফাজত আর না পরিবার-পরিজনের সাথে আমোদ-আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হলো একেকটি স্বতন্ত্র আজাব। এরপর যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাধির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদা মতো

অর্থকড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন সে চিন্তা ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

পরিশেষে এ সকল অর্থসম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হাতছাড়া হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুত এসবই হলো আজাব। অজ্ঞ মানুষ একে শান্তি ও আরামের সম্বল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির এই উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা নিয়েই দিবানিশি ব্যস্ত থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং আখিরাতের আজাবের পটভূমি।

কাফেরদের সদকা দেওয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদ্কার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমতো না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করতে। এখানে যদি সদ্কার সাধারণ অর্থ নেওয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল ওয়াজিব ও নফল সদকা বোঝায়, তবে কোনো প্রশ্ন থাকে না। কারণ অমুসলিমদের নফল সদকা দান ইমামদের ঐকমত্যে জায়েজ এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর যদি সদকা বলতে ফরজ সদকা যথা– জাকাত ও ওশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্য দেওয়া হতো যে, তারা নিজেদের মুসলমান রূপেই প্রকাশ করত এবং কুফরির কোনো প্রকাশ্য প্রমাণও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে আদেশ দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা হোক। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَايَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى : অর্থাৎ "তারা নামাজে আসে না, কিন্তু আলস্যভরে" আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাজে আলস্য ও দান খয়রাতে কুণ্ঠাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি হুঁশিয়ারি প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার অভ্যাস থেকে দূরে থাকে।

খারিজী পরিচিতি ও তাদের মতবাদ : এ সম্প্রদায় উৎপত্তির ঘটনা হলো এই যে, হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের দ্বিতীয় দিন যখন লোকজন হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন, সে সময় হযরত আয়েশা (রা.) হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনকালে কতিপয় লোক হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ মর্মে উত্তেজিত করে তুলল যে, হযরত আলী (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শনাক্তকরণে বাধ্য করা হবে। হযরত আলী (রা.) যদি এতে অস্বীকার করেন তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। এরা হযরত আয়েশা (রা.)-কে বসরায় নিয়ে গেল। বসরাতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে অনেক লোক সমবেত হলো। হযরত আলী (রা.) এ সংবাদ শ্রবণে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বসরা পানে বেরিয়ে পড়লেন। ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো, যা ইতিহাসে 'জঙ্গে জামাল' নামে সুপ্রসিদ্ধ। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.) এ যুদ্ধে উষ্ট্রে আরোহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর উটকে আরবিতে 'জামাল' বলা হয়। এ কারণে এ যুদ্ধ 'জঙ্গে জামাল' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। একটি ইজতিহাদী ভুলের ভিত্তিতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এতে হযরত আলী (রা.) বিজয় লাভ করেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণের পর হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। যেহেতু হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন, তাই তিনি এর প্রতিশোধ নেওয়াকে নিজের দায়িত্ব মনে করলেন।

সিফফীনের যুদ্ধ : ৩৭ হিজরিতে হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা ইতিহাসে জঙ্গে সিফফীন নামে প্রসিদ্ধ। ইরাক ও শামের মাঝামাঝি একটি জায়গার নাম হলো সিফফীন। এ যুদ্ধ প্রায় এক মাস যাবৎ অব্যাহতভাবে চলছিল। জয়ের পাল্লা হযরত আলী (রা.)-এর দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এরপরামর্শক্রমে সন্ধির জন্য 'সালিশ বোর্ড' গঠন করা হলো। হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ হতে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর পক্ষে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) সালিশ নিযুক্ত হলেন। এ পঞ্চায়েতের সন্ধি হতে অসন্তুষ্ট হয়ে اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ বলে আট হাজার লোকের একটি দল হযরত আলী (রা.) হতে বিমুখ হয়ে তার সেনাবাহিনী হতে পৃথক হয়ে গেল। এরাই ইতিহাসে খারেজী নামে পরিচিত। তারা হযরত আলী (রা.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মনে করে। এ দলটিকে হারূরিয়াহও বলা হয়। হারূর নামক স্থানের দিকে সম্বোধন করে এটা বলা হয়। আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম এ দলেরই সদস্য ছিল, যে ব্যক্তি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করে দেয়।

٦٠. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الزَّكٰوٰتُ مَصْرُوْفَةٌ لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ وَالْمَسَاكِيْنِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يَكْفِيْهِمْ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا اَىْ اَلصَّدَقَاتِ مِنْ جَابٍ وَقَاسِمٍ وَكَاتِبٍ وَحَاشِرٍ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ لِيُسْلِمُوْا وَ يَثْبُتَ اِسْلَامُهُمْ اَوْ يُسْلِمَ نُظَرَاؤُ هُمْ اَوْ يَذُبُّوْا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ اَقْسَامٌ وَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِيْرُ لَا يُعْطَيَانِ الْيَوْمَ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ لِعِزِّ الْاِسْلَامِ بِخِلَافِ الْاٰخِرَيْنِ فَيُعْطَيَانِ عَلَى الْاَصَحِّ وَفِىْ فَكِّ الرِّقَابِ اَىِ الْمُكَاتَبِيْنَ وَالْغَارِمِيْنَ اَهْلِ الدَّيْنِ اِنِ اسْتَدَانُوْا لِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ اَوْ تَابُوْا وَلَيْسَ لَهُمْ وَفَاۤءٌ اَوْ لِاِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ اَغْنِيَاۤءَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىِ الْقَائِمِيْنَ بِالْجِهَادِ مِمَّنْ لَا فَيْئَ لَهُمْ وَلَوْ اَغْنِيَاءَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط اَلْمُنْقَطِعِ فِىْ سَفَرِهٖ فَرِيْضَةً نُصِبَ لِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ فَلَا يَجُوْزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِ هٰؤُلَاءِ وَلَا مَنْعُ صِنْفٍ مِنْهُمْ اِذَا وُجِدَ .

অনুবাদ :

৬০. সাদাকাত অর্থাৎ জাকাত তো কেবল ব্যয়িত হবে দরিদ্র, অর্থাৎ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণেরও যার অর্থ নেই, মিসকিন, অর্থাৎ যাদের যথেষ্ট অর্থ নেই, তার অর্থাৎ জাকাত সংগ্রহকারী, বণ্টনকারী, খাতা লিখক, জমাকারী প্রভৃতি কর্মচারীগণ, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করতে বা তাতে দৃঢ় রাখার জন্য বা এদের দেখিয়ে অন্যরাও যাতে ঈমান গ্রহণ করে সেই জন্য বা মুসলমানদের পক্ষ হতে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হলো, বর্তমানে প্রথম ও শেষ ধরনের লোকদেরকে জাকাত হতে প্রদান করা যাবে না। কারণ ইসলাম বর্তমানে যথেষ্ট শক্তিশালী। তাঁর অধিকতর সহীহ অভিমত হলো, বাকি দুই ধরনের লোকদের অবশ্য বর্তমানেও দেওয়া যেতে পারে। এবং দাসদের অর্থাৎ মুকাতিব গোলামদের মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, অর্থাৎ যে কাজে পাপ নেই এমন কাজ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়েছে বা পাপকার্যে ঋণ করেছিল বটে কিন্তু তা হতে সে তওবা করেছে আর ঐ ঋণ আদায় করার তার কোনো ব্যবস্থা নেই তবে জাকাতের অর্থ হতে এই ধরনের ব্যক্তিকেও দেওয়া যেতে পারে। কিংবা বিবদমান দুই মুসলিম দল বা ব্যক্তির মধ্যে আপোস করতে গিয়ে যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয় তবে সে বিত্তশালী হলেও জাকাতের অর্থ হতে তাকে তা দেওয়া যায়। আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য, এরা বিত্তশালী হলেও তাদেরকে তা প্রদান করা যায়। তবে এমতাবস্থায় ফাই সম্পদে উহাদের কোনো হিস্যা নেই এবং পথ সন্তানদের জন্য। অর্থাৎ মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ فَرِيْضَةً এটা এই স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে مَنْصُوْب হয়েছে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে খুবই অবহিত এবং স্বীয় কার্য সম্পর্কে প্রজ্ঞাময়। সুতরাং উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত অন্য কোথাও এটা ব্যয় করা জায়েজ নয়। পাওয়া গেলে তাদের কোনো একটি প্রকারকেও তা হতে বঞ্চিত করা যাবে না।

فَيَقْسِمُهَا الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ اٰحَادِ الصِّنْفِ عَلٰى بَعْضٍ وَاَفَادَتِ اللَّامُ وُجُوْبُ اِسْتِغْرَاقِ اَفْرَادِهٖ لٰكِنْ لَا يَجِبُ عَلٰى صَاحِبِ الْمَالِ اِذَا قَسَمَ لِعُسْرِهٖ بَلْ يَكْفِيْ اِعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَلَا يَكْفِيْ دُوْنَهَا كَمَا اَفَادَتْهُ صِيْغَةُ الْجَمْعِ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ شَرْطَ الْمُعْطٰى مِنْهَا الْاِسْلَامُ وَاَنْ لَا يَكُوْنَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا.

ইমাম বা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান সকল প্রকারের মধ্যে তা সমভাবে বণ্টন করবেন। তবে একই প্রকারভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অবশ্য তিনি তারতম্য করতে পারবেন। খাতসমূহ বর্ণনায় শব্দগুলোকে لَامْ ও اَلِفْ যুক্ত করে ব্যবহার করায় [যেমন اَلْمَسَاكِيْنِ الْفُقَرَاءُ] যদিও বুঝা যায় যে, ঐ জাতীয় সকলেই এটার অন্তর্ভুক্ত, তবে প্রত্যেক প্রকারের সকলজনকেই তা আদায় করতে হবে তেমন নয়। কারণ তা খুবই কঠিন। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের তিনজন করে দিলেই তা আদায় হয়ে যাবে এটার কম হলে হবে না। কারণ এই শব্দসমূহ বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। আর আরবি ভাষায় বহুবচন হতে হলে ন্যূনপক্ষে তিন-এর প্রয়োজন হয়। হাদীসে বিবৃত হয়েছে যে, যাকে তা প্রদান করা হবে তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে, আর সে হাশেমী ও মুত্তালেবীয় বংশের হতে পারবে না।

٦١. وَمِنْهُمْ اَيِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ بِعَيْبِهٖ وَنَقْلِ حَدِيْثِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا نُهُوْا عَنْ ذٰلِكَ لِئَلَّا يَبْلُغَهُ هُوَ اُذُنٌ ط اَيْ يَسْمَعُ كُلَّ قِيْلٍ وَيَقْبَلُهُ فَاِذَا حَلَفْنَا لَهُ اِنَّا لَمْ نَقُلْ صَدَّقَنَا قُلْ هُوَ اُذُنُ مُسْتَمِعُ خَيْرٍ لَّكُمْ لَا مُسْتَمِعَ شَرٍّ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ يُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَا اَخْبَرُوْهُ بِهٖ لَا لِغَيْرِهِمْ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ اِيْمَانِ التَّسْلِيْمِ وَغَيْرِهٖ وَرَحْمَةٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى اُذُنٌ وَالْجَرِّ عَطْفًا عَلٰى خَيْرٍ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ط وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

৬১. এবং তাদের মধ্যে অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা নবীকে ক্লেশ দেয়। অর্থাৎ তাঁকে দোষারোপ করে এবং তাঁর কথা শত্রুর নিকট বলে দেয়, যখন তাদেরকে এটা হতে এই আশঙ্কায় নিষেধ করা হয় যে না জানি তাঁর কানে এই কথা পৌঁছে যায় তখন তারা বলে, তিনি তো কর্ণধারক অর্থাৎ তিনি সকল কথাই শুনেন এবং তা গ্রহণ করে নেন। সুতরাং আমরা তাঁর নিকট যদি শপথ করে বলি যে আমরা ঐরূপ বলিনি তবেই তিনি তা বিশ্বাস করে ফেলবেন। বল, তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তার তিনি কর্ণধারক অর্থাৎ তাই তিনি শুনেন। ক্ষতিকর যা তা তিনি শুনেন না। তিনি আল্লাহে বিশ্বাস করেন এবং মুমিনগণকে অর্থাৎ তারা তাঁকে যে সংবাদ দেয় তা বিশ্বাস করেন সত্য বলে জানেন। অন্য কারো কথা তিনি শুনেই বিশ্বাস করে ফেলেন না। তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন তিনি তাদের জন্য রহমত। আর যারা আল্লাহকে ক্লেশ দেয় তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। لِلْمُؤْمِنِيْنَ -এই স্থানে ل -টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। আল্লাহর উপর ঈমান এবং কোনো কিছু সত্য জানা অর্থে ঈমান এতদুভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করার উদ্দেশ্য এই স্থানে এটার ব্যবহার করা হয়েছে। رَحْمَةٌ -এটা اُذُنٌ -এর عَطْف বা অন্বয় রূপে مَرْفُوْع আর خَيْرٍ -এর সাথে عَطْف বা অন্বয় রূপে مَجْرُوْر উভয় রূপে পঠিত রয়েছে।

٦٢. يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فِيْمَا بَلَغَكُمْ عَنْهُمْ مِنْ اَذَى الرَّسُوْلِ اَنَّهُمْ مَا اَتَوْهُ لِيُرْضُوْكُمْ ج وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ بِالطَّاعَةِ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ حَقًّا وَتَوْحِيْدُ الضَّمِيْرِ لِتَلَازُمِ الرِّضَائَيْنِ اَوْ خَبَرُ اللّٰهِ اَوْ رَسُوْلِهٖ مَحْذُوْفٌ.

৬২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা রাসূল ﷺ-কে ক্লেশ দেয় বলে তোমরা যা শুনতে পাও সেই সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে যে, তারা তা করেনি। অথচ এরা যদি সত্যই মুমিন হয়ে থাকে তবে আনুগত্য প্রদর্শন ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক হক রাখেন। يُرْضُوْهُ এই স্থানে مَفْعُوْل বা কর্মবাচক ضَمِيْر বা সর্বনাম ه এক বচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এই স্থানে اَللّٰهُ ও رَسُوْل-এর প্রতি লক্ষ্য করলে দ্বিবচন রূপেই উক্ত সর্বনামটির ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল। তবুও তা একবচন রূপে ব্যবহার করার কারণ হলো, আল্লাহ ও রাসূলের যে কোনো একজনের সন্তুষ্টি অন্যজনের সন্তুষ্টির সাথে অব্যশম্ভাবী রূপে বিজড়িত। সুতরাং এই বিষয়ে যেন তাঁরা একই। অথবা বলা যেতে পারে যে اَللّٰهُ কিংবা رَسُوْلُهٗ-এর خَبَرٌ বা বিধেয় এই স্থানে উহ্য। সুতরাং আর কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে না।

٦٣. اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ اَىِ الشَّاْنَ مَنْ يُّحَادِدِ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ جَزَاءً خَالِدًا فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ.

৬৩. তারা কি জানে না যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি? এই প্রতিফল সেই স্থানে স্থায়ী হবে। তাই চরম লাঞ্ছনা। اَنَّهٗ-এটার ضَمِيْر বা সর্বনামটি شَانٌ বা অবস্থাব্যঞ্জক। يُحَادُّ অর্থ- বিরোধিতা করে।

٦٤. يَحْذَرُ يَخَافُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط مِنَ النِّفَاقِ وَهُمْ مَعَ ذٰلِكَ يَسْتَهْزِءُوْنَ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ج اَمْرُ تَهْدِيْدٍ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مُظْهِرٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ اِخْرَاجَهٗ مِنْ نِفَاقِكُمْ.

৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে যে, আশঙ্কা করে যে, মুমিনদের নিকট এমন এক সূরা নাজিল না হয়ে যায় যা তাদের অন্তরের মুনাফিকীর কথা ব্যক্ত করে দেবে। এতদসত্ত্বেও তারা আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত। আল্লাহ ইরশাদ করেন, বল, বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর অর্থাৎ তোমাদের মুনাফিকীর কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার যে আশংকা তোমরা কর আল্লাহ তা বের করে দিবেন, প্রকাশ করে দিবেন। اِسْتَهْزِئُوْا অর্থ- বিদ্রূপ করতে থাক। এই اَمْرٌ বা নির্দেশবাচক শব্দটি এই স্থানে تَهْدِيْدٌ বা হুমকি প্রদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٥. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ عَنِ اسْتِهْزَائِهِمْ بِكَ وَالْقُرْاٰنِ وَهُمْ سَائِرُوْنَ مَعَكَ اِلٰى تَبُوْكَ لَيَقُوْلُنَّ مُعْتَذِرِيْنَ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ط فِى الْحَدِيْثِ لِنَقْطَعَ بِهِ الطَّرِيْقَ وَلَمْ نَقْصِدْ ذٰلِكَ قُلْ لَهُمْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ.

৬৫. তারা তোমার সাথে তাবুকে যেতেছে এই অবস্থায়ও তোমাকে ও আল কুরআনকে বিদ্রূপ করা সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা কৈফিয়ত হিসেবে নিশ্চয় বলবে, আমরা তো পথের একঘেয়েমী কাটাবার উদ্দেশ্যে এই একটু আলাপ-সালাপ ও ক্রীড়া-কৌতুক করতেছিলাম এই স্থানে প্রকৃত মর্ম আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করতেছিলে?

٦٦. لَا تَعْتَذِرُوْا عَنْهُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اَيْ ظَهَرَ كُفْرُكُمْ بَعْدَ اِظْهَارِ الْاِيْمَانِ اِنْ نَّعْفُ بِالْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُوْلِ وَالنُّوْنِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ بِاِخْلَاصِهَا وَتَوْبَتِهَا كَمَخْشِيِّ بْنِ حُمَيْرٍ نُعَذِّبْ بِالتَّاءِ وَالنُّوْنِ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ مُصِرِّيْنَ عَلَى النِّفَاقِ وَالْاِسْتِهْزَاءِ .

৬৬. এই সম্পর্কে তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফরি করেছ। অর্থাৎ বাহ্যত ঈমান প্রকাশের পর তোমাদের কুফরি প্রকাশ পেয়েছে। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে তাদের আন্তরিকতা ও তওবা অনুশোচনার কারণে ক্ষমা করলেও যেমন মাখশী ইবনে হুমাইরকে ক্ষমা করা হয়েছিল অন্য দলকে শাস্তি দিব, কারণ মুনাফিকী ও সত্যকে বিদ্রূপ করার কাজে জেদ ধরে থাকায় তারা অপরাধী। يَعْفُ- এটা ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে পঠিত হলে مَبْنِيَّةٌ لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ কর্মবাচ্যরূপে বিবেচ্য হবে। আর ن সহ অর্থাৎ উত্তম পুরুষ বহুবচনরূপে হলে مَبْنِيَّةٌ لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য রূপে গণ্য হবে। نُعَذِّبْ -এটাও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গরূপে এবং ن অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ : এখানে اِنَّمَا টা كَلِمَةُ حَصْرٍ এখানে قَصْر مَوْصُوْف عَلَى الصِّفَةِ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ সদকা তথা জাকাতের খাত শুধুমাত্র উল্লিখিত খাতগুলোই। এগুলো ব্যতীত অন্য গুলো নয়। لِلْفُقَرَاءِ -এর মধ্যেকার لام -এর ব্যাপারে অনেক কথোপকথন হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, لَامْ টা تَمْلِيْك -এর জন্য। যেমনটি বলেন যে, এটা اِخْتِصَاص এবং اِسْتِحْقَاق -এর জন্য। এর প্রবক্তা হলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) اَلْفُقَرَاءُ এবং اَلْمَسَاكِيْن -এর তাফসীরে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হানাফীগণ বলেন যে, ফকির হলো সেই নিঃস্ব ব্যক্তি যে কারো নিকট প্রার্থনা করে না। আর মিসকিন হলো সেই নিঃস্ব ব্যক্তি যে, মানুষের নিকট প্রার্থনা করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী, জাবের ইবনে যায়েদ মুজাহিদ যুহরী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবূ হানীফার উক্তি তাদের উক্তির অনুরূপ। -[জাসসাস] ফকির ও মিসকিনের ব্যাখ্যায় যতই মতভেদ থাকুক না কেন এতে জাকাতের মাসআলায় কোনোই প্রভাব পড়বে না। মাসআলায় পার্থক্য হবে। যদি শুধুমাত্র ফকিরদের জন্য অসিয়ত করা হয় তবে তারা এর হকদার হবে। আর যদি মিসকিনদের জন্য অসিয়ত করা হয় তবে শুধুমাত্র তারাই এর অধিকারী হবে।

জাকাতের খাত সম্পর্কীয় বিশদ আলোচনা : জাকাতের খাত ৮টি। যথা–

১. ফকির, অর্থাৎ যে ব্যক্তির জন্য তার প্রয়োজন পূর্ণ করার মতো সম্পদ নেই। এভাবে যে, তার প্রয়োজনের পরিমাণ থেকে অর্ধেকের কম সম্পদের মালিক হয়। যেমন তার প্রয়োজন একশত টাকার কিন্তু তার নিকট বিশ বা ত্রিশ টাকা রয়েছে।

২. মিসকিন, অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ নেই। যেমন– তার একশত টাকার প্রয়োজন কিন্তু তার নিকট রয়েছে সত্তর টাকা।

৩. اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا অর্থাৎ জাকাত আদায়ের কর্মচারী যেমন– জাকাত উসুলকারী, হিসাব রক্ষক প্রমুখ।

৪. اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ এমন নও মুসলিম, যাদের হৃদয়ে এখানো ইসলাম সুদৃঢ় হয়নি। অথবা এমন লোক যার মনোতুষ্টির জন্য দেওয়ার কারণে অন্যদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়।

৫. اَلرِّقَابُ অর্থাৎ মুকাতাবকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে।

৬. اَلْغَارِمُ অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে বৈধ সমস্যার সমাধানকল্পে ঋণ নিয়েছে; কিন্তু এখন ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছে। অথবা اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ -এর কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যদিও সে ধনী হয়।

৭. اَهْلُ السَّبِيْلِ অর্থাৎ সেই সম্পদশালী ব্যক্তি, যিনি জিহাদে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক।

৮. اِبْنُ السَّبِيْلِ অর্থাৎ মুবাহ সফরের মুসাফির যে, স্বীয় শহর হতে বহুদূরে অবস্থান করছে, কিন্তু তার পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। এমন ব্যক্তিকে তার বাড়িতে পৌঁছার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সে পরিমাণ জাকাত দেওয়া যেতে পারে। -[ই'রাবুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুনাফিকরা হুজুর ﷺ -এর প্রতি এই অভিযোগ করেছে যে, তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে সদকার অর্থ বিতরণ করেননি। তাই আলোচ্য আয়াতে জাকাত, সদকা বিতরণের বিধান পেশ করা হয়েছে। আর সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এর বিতরণ বিধি স্বয়ং আল্লাহ পাকের দ্বারা নির্ধারিত। এমন কি, এতে আল্লাহর নবীরও কোনো এখতিয়ার নেই। এর বিতরণের জন্য আল্লাহ পাক আটটি খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐ নির্ধারিত খাতেই জাকাত সদকা বিতরণ করতে হবে।

মুনাফেকদের অভিযোগের মূল কারণ হলো তারা ছিল অর্থলোভী, তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্য তারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অধিক পরিমাণে অর্থ দাবি করতো এবং বলতো, আমাদের চাহিদা মোতাবেক আমাদেরকে দিয়ে দিন। কিন্তু তিনি যখন তাদের চাহিদা মোতাবেক দিতেন না তখন তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ করতো। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন যেন একথা সুস্পষ্টভাবে সকলেই জানতে পারে যে, যারা অধিক পরিমাণে অর্থ লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করে তারা সদকার অর্থ লাভের যোগ্যই নয়।

দ্বিতীয়ত, এ আয়াত দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হলো যে, জাকাত ও সদকার বিতরণ একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেকই হয়। এতদ্ব্যতীত, জাকাত সদকা প্রিয়নবী ﷺ, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর বংশীয় লোকজন এমন কি তাঁর আজাদ করা গোলামদের জন্যও হারাম। এমনি অবস্থায় এ ব্যাপারে কোনো প্রকার স্বজন-প্রীতির আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই, মুনাফিকরা হুজুর ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার জন্য এবং তাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যেই এমনি বানোয়াট ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট জাকাত ও সদকার যে অর্থ-সম্পদ আসতো তা তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক বিতরণ করে দিতেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন এ আয়াতের মর্ম হলো একথা প্রকাশ করা যে জাকাত সদকার যোগ্য হলো শুধু মিসকিন কপর্দকহীন লোকেরা, আর ফকির তাকে বলা হবে যে ধনী নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ফকির সেই ব্যক্তি যার নিকট জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো সম্পদ না থাকে। এর দলিল স্বরূপ হযরত মা'আজ (রা.)-এর ঘটনা পেশ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুরে আকরাম ﷺ হযরত মা'আজ (রা.)-কে ইয়েমেন প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, তুমি এমন লোকদের নিকট গমন করছো যারা আহলে কিতাব, সর্বপ্রথম তাদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের জন্যে আহ্বান জানাও, যদি তারা একথা মেনে নেয় তবে তাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ, যদি তারা একথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জাকাত ফরজ করেছেন যা তাদের ধনী লোকদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই দারিদ্রপীড়িত লোকদের মাঝে বণ্টন করা হবে। জাকাতে সর্বোত্তম জন্তুটি নিয়ে নিবে না, মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করতে থাকবে, মজলুমের বদদোয়া সরাসরি আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছে, তার মধ্যে এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোনো বাধা থাকে না।

এ হাদীসের আলোকে একথা প্রমাণিত হয় যে, জাকাত গ্রহণকারী মুসলমান হতে হবে, অমুসলিমকে কোনো অবস্থাতেই জাকাত দেওয়া যাবে না।

জাকাতের পাত্র বা ক্ষেত্র আটটি : যথা– ১. ফকির- যার কিছুই নেই, তথা কপর্দকহীন। ২. মিসকিন, যার নিকট একান্ত প্রয়োজনীয় ধন সম্পদ নেই। ৩. যারা ইসলামি রাষ্ট্রের তরফ থেকে জাকাত উসুল করে। ৪. নওমুসলিম, যাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, জাকাত দেওয়া হয়। ৫. গোলামের মুক্তিপণ আদায়ের জন্য। ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ আদায়ের জন্য। ৭. আল্লাহর রাহে যারা জিহাদ করেন, তাদের সাহায্যার্থে। ৮. পথিক-মুসাফির, যার অর্থ-সম্পদ থাকলেও সঙ্গে নেই, ফলে সে বিপদগ্রস্থ। তবে এদের সকলকে জাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দিতে হবে; জাকাত আদায়ের জন্য এটি পূর্বশর্ত।

قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ : আলোচ্য আয়াতে জাকাত প্রদানের জন্যে সর্বপ্রথম ফকিরদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ফকির বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কপর্দকহীন, যাদের কিছুই নেই। এরপর উল্লিখিত হয়েছে মিসকিনের কথা। মিসকিন সে ব্যক্তি যার নিকট কিছু আছে; কিন্তু প্রয়োজন মোতাবেক নেই। ফকির মিসকিন উভয়ই অভাবগ্রস্ত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তবে মিসকিনের চেয়ে ফকিরের অভাব অধিকতর, এজন্যে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম ফকিরের নাম উল্লেখ করেছেন, এরপর মিসকিনের।

قَوْلُهُ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا : অর্থাৎ যাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্র জাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত করে তাদের ব্যয়ভার বহন করা হবে জাকাতের তহবিল থেকে, তবে জাকাত হিসেবে তাদেরকে দেওয়া হবে না; বরং যেহেতু তারা জাকাত আদায়ের খেদমতে নিয়োজিত। তাই এ খেদমতের বিনিময়ে তাদেরকে যথা প্রয়োজনে প্রদান করা হবে আর তাও তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে নয়; বরং তাদের দ্বীনি খেদমতের পুরস্কার হিসেবে।

জাকাত উসুলকারীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে : এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, জাকাত উসুলকারীর কাজ কম হোক বা অধিক সকল অবস্থায় অর্জিত জাকাতের ৮ ভাগের একভাগ তাদের জন্যে ব্যয় করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, জাকাতের জন্যে পবিত্র কুরআনে যে ৮টি খাত নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতে সমুদয় অর্থ সমান আট ভাগে ভাগ করে আদায় করতে হবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, জাকাত উসুলকারী ব্যক্তি যে পরিমাণ সময় এ কাজে ব্যয় করেছে সে সময়ের বিনিময় তাকে দেওয়া হবে। কোনো ব্যক্তি জাকাত উসুল করার কাজে একদিন ব্যয় করেছে, এই একদিনের মেহনতের জন্যে যা সমীচীন মনে করা হয় তাই দেওয়া হবে। আর যদি সে এক বছরকাল জাকাতের তহশীল কাজে ব্যয় করে সে এক বছরে যা তার প্রাপ্য বিবেচিত হয় তা দেওয়া হবে। কেননা জাকাতে ধনীদের কোনো অংশ নেই, জাকাত ফকিরদের হক, তাই ফকিরদের হক থেকে তাকে যা দেওয়া সমীচীন মনে হবে তাই দেওয়া হবে। যদি জাকাত হিসেবে যা সে উসুল করেছে, সে সমুদয় অর্থই তার প্রাপ্য হয় তবে সম্পূর্ণ অর্থ তাকে দেওয়া হবে না, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত; তাকে অর্ধেক দেওয়া হবে। অর্ধেক থেকে একটু বেশিও দেওয়া হবে না। যদি অর্ধেকের চেয়ে বেশি দেওয়া হয় তবে এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হবে যে, সে ফকিরদের জন্যে নয়; বরং নিজের জন্যেই উসুল করেছে আর এভাবে আসল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হবে।

قَوْلُهُ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ : অর্থাৎ সে নওমুসলিম যারা ইসলাম কবুল করেছে, কিন্তু এখনো ইসলামের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল এবং যেহেতু তারা দারিদ্র পীড়িত, এজন্য তাদেরকে জাকাত থেকে দেওয়া হয় যেন ইসলামের উপর কায়েম থাকে। অধিকাংশ আলেমের মতে হুজুর ﷺ -এর ইন্তেকালের পথের 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূবে'র অংশ বাতিল হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) লিখেছেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, জাকাতের এ ক্ষেত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৬০, তাফসীরে কুরতুবী খ. ৮, পৃ. ১৮১]

অবশ্য নওমুসলিম যদি অভাবগ্রস্ত হয় তবে ফকির মিসকিন হিসেবে তাকেও জাকাত দেওয়া যেতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জাকাত উসুলকারী ব্যক্তিদের ছাড়া অবশিষ্ট সকল খাতেই জাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য তাদের অভাবগ্রস্ত হওয়া পূর্বশর্ত।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব' অর্থাৎ যাদেরকে চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, তারা দু' প্রকার। যথা- মুসলমান ও কাফের। যারা মুসলমান তাদেরকেও দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু গ্রহণের সময় ঈমান দুর্বল ছিল। যেমন উয়াইনা ইবনে বদর ফাজারী, আকরা ইবনে হাবেছ এবং আব্বাস ইবনে মারদাস। ২. সেই মুসলমান ইসলাম গ্রহণের সময় যাদের ঈমান মজবুত ছিল; কিন্তু তারা তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। দলের মধ্যে কিছু দুর্বল ঈমানের লোক ছিল। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় দলকেই দান করতেন। প্রথম দলকে তাদের ঈমান মজবুত করার জন্য, দ্বিতীয় দলকে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে। যেমন- হযরত আদী ইবনে হাতেম এবং হযরত জরকান ইবনে বদরকে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের মন আকৃষ্ট করার জন্যে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বিভিন্ন সময় অর্থ-সম্পদ দান করেছেন। তবে তিনি তাদেরকে জাকাতের তহবিল থেকে দান করেনি; বরং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে দান করেছেন, আর কাফেরদের থেকে অর্জিত সম্পদের যে অংশটুকু হুজুর ﷺ -এর জন্যে সংরক্ষিত থাকত, তা থেকেও তিনি এমন সব লোকদেরকে দান করতেন।

মুয়াল্লাফাতুল কুলূবের আরেকটি শাখা হলো, সেই মুসলমান, যাদের এলাকায় মুসলমান সৈন্য কাফেরদের মোকাবিলার জন্যে পৌঁছেছে, আর স্থানীয় মুসলমানদের সাহায্য ব্যতীত মুজাহিদগণ অগ্রসর হতে পারেন না। অথচ অভাব অনটনের কারণে অথবা ঈমানের দুর্বলতার কারণে স্থানীয় মুসলমানগণ জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না। এমন অবস্থায় মুসলিম শাসনকর্তার জন্যে ইসলামি শরিয়ত অনুমতি দেয় যে, মুজাহিদদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ থেকে এবং মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের জাকাতের অংশ থেকে ঐ মুসলমানদের দান করবেন।

বর্ণিত আছে যে, হযর আদী ইবনে হাতেম তার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে জাকাত বাবদ তিনশত উষ্ট্র নিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেদমতে হাজির হন। হযরত আবূ বকর (রা.) তন্মধ্য ৩০ টি উষ্ট্র তাকে দান করেন। অমুসলিম মোয়াল্লাফাতুল কুলূব বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তরফ থেকে মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অথবা যাদের ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়। ইমামুল মুসলিমীনের জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তাদেরকে কিছু দিয়ে দিতে পারেন যেন তাদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। অথবা তাদের মুসলমান হওয়ার আশা পূর্ণ হয়। এমন লোকদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দান করেছেন। যেমন– সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট দেখে তাকে দান করেছিলেন।

কিন্তু এখন আর অমুসলিমকে এমননিভাবে জাকাত সদকা প্রভৃতি থেকে দান করা বৈধ নয়। আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। অতএব, বর্তমান অবস্থায় এমন পন্থা গ্রহণের অনুমতি নেই। এজন্যে ইকরিমা, শাবী, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মুয়াল্লাফাতুল কুলূবের অমুসলিম খাঁত সম্পূর্ণ বাতিল হয়েছে।

ইমাম মালেক (র.) বলেছেন, যদি কোনো এলাকায় বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় মুসলমানগণ চিত্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে কোনো কাফেরকে অর্থ-সম্পদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তবে জাকাতের খাত থেকে দেওয়া যেতে পারে যদি এর যুক্তিসঙ্গত কারণ সৃষ্টি হয়। ইমাম আহমদও (র.) এই মত পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে আর ইসলাম গ্রহণের সময় তার ঈমান দুর্বল ছিল অথবা এমন প্রভাবশালী লোক, যাকে কিছু দিলে অন্যরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে তবে এমন লোকদেরকে জাকাতের অর্থ দেওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ وَفِى الرِّقَابِ : অর্থাৎ গোলাম বাঁদিদেরকে আজাদ করার জন্যে জাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। ইমাম আবূ হানিফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.) এ মতই পোষণ করতেন। মোকাতাব অর্থাৎ যে গোলাম বাঁদিকে তার মালিক মুক্তি দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করার শর্তারোপ করে এমন ব্যক্তি অর্থ লাভ করলে আজাদ হতে পারে। তাই ইসলামি শরিয়ত এমন লোককে জাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করার বিধান পেশ করেছে। এমন কি যদি তার কাছে অর্থ সম্পদ থাকেও; কিন্তু তার মুক্তি লাভের জন্য তা যথেষ্ট না হয় এমন অবস্থায় তাকে জাকাতের অর্থ দিয়ে তার মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, নিজের জাকাতের টাকা দিয়ে বাঁদি গোলাম ক্রয় করে আজাদ কর। মায়মুন (র.) বর্ণনা করেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, যদি কেউ তারা জাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে আজাদ করে অথবা মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করে তবে তার কি হুকুম? আবূ আব্দুল্লাহ বলেন, তা জায়েজ আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই মত পোষণ করতেন। আর এর বিরোধিতা করার কোনো কারণ নেই।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, জাকাতের টাকা দিয়ে যে বাঁদি গোলামকে আজাদ করা হয় তার হক্ক মুসলমানদের হবে অর্থাৎ এই আজাদ করা গোলামের মৃত্যুর পর তার যদি কোনো ওয়ারিশ না থাকে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মাল তথা ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা হবে। اَلرِّقَابُ-এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের আরো একটি অভিমত রয়েছে, জাকাতের সম্পদের যে অংশটুকু এ পর্যায়ে ব্যয় হবে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্ধেক মুসলিম মোকাতাবেদের মুক্ত করার কাজে ব্যয় হবে, আর অর্ধেক দ্বারা মুসলিম গোলাম বাঁদিদের ক্রয় করে আজাদ করা হবে। ইবনে আবি হাতেম এবং 'কিতাবুল আমওয়ালে' আল্লামা আবূ ওয়ায়েদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম জুহরী (র.) হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজকে এ কথাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) জুমার খোতবা দিচ্ছিলেন, তখন একজন মোকাতাব তাকে সম্বোধন করে বলল, আমার মুক্তি লাভের জন্যে অর্থ সম্পদ সাহায্যের আবেদন করুন, তিনি আবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা দান করতে লাগল। কেউ মাথার পাগড়ি দিয়ে দিলেন, কেউ হার, কেউ আংটি কেউ নগদ। অল্পক্ষণের মধ্যে অনেক

কিছু জমা হয়ে গেল। হযরত মূসা আশ'আরী (রা.) সবকিছু একত্র করে বিক্রি করে দিলেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঐ মোকাতাবের মুক্তিপণ আদায় করলেন। আর অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা গোলাম বাঁদি ক্রয় করে মুক্ত করলেন।

قَوْلُهُ وَالْغَارِمِيْنَ : অর্থাৎ ঋণগ্রস্তদের জন্য। ওলামায়ে কেরাম এ শব্দটির এই ব্যাখ্যাই করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীগণ ঋণগ্রস্তদেরকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– ১. সেই ঋণগ্রস্ত, যে ঋণ নিয়ে পাপকর্মে ব্যয় করেনি, এমন ঋণগ্রস্ত লোকের নিকট যদি ঋণ আদায়ের টাকা না থাকে তবে ঋণ আদায়ের পরিমাণ জাকাতের টাকা থেকে দেওয়া যেতে পারে। ২. সেই ঋণগ্রস্ত, যে ঋণ গ্রহণ করে কোনো নেক কাজে বা মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করার কাজে ব্যয় করেছে সে ব্যক্তিগতভাবে ধনী হলেও তার ঋণ জাকাতের খাত থেকে আদায় করা যেতে পারে। ৩. সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যে পাপাচারে ব্যয় করার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছে, অথবা অপচয়ের জন্য, এমন ব্যক্তির ঋণ আদায়ের জন্য জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত হলো, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট যদি ঋণ আদায়ের জন্য টাকা না থাকে সে যেমনই হোক না কেন তাকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে। ইমাম আযম (র.) বলেছেন– اَلْغَارِمِيْنَ শব্দটির মধ্যে এমন কোনো শর্ত আরোপের ব্যবস্থা নেই। اَلْغَارِمِيْنَ অর্থ– ঋণগ্রস্ত। ঋণগ্রস্ত নেককার কি বদকার এমন কোনো শর্ত কুরআনে কারীমে নেই।

অনুরূপ মতভেদ ইমাম আযম (র.) এবং অন্য ইমামদের মধ্যে সফরের মাসায়েল সম্পর্কেও রয়েছে। সফর তিন প্রকার হতে পারে। যথা– ১. নেককাজের জন্য ২. বৈধ কাজের জন্য। ৩. পাপকর্মের জন্য সফর। মুসাফিরের জন্য নামাজের কসর করা এবং রোজা কাজা করার যে সুযোগ রয়েছে অন্য ইমামদের মতে প্রথম দুই প্রকার সফরকারী তা ভোগ করবে। যার সফর গুনাহর কাজে হয় সেই মুসাফির এই সুযোগ ভোগ করবে না। কিন্তু ইমাম আযম (র.) বলেন, সকল মুসাফিরই এই সুযোগ ভোগ করবে।

যদি কোনো ব্যক্তির নিকট তার ঋণ আদায়ের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক টাকা থাকে তবে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, এমন ব্যক্তিকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি ঐ ব্যক্তি ছওয়াবের কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে আর তার নিকট ঋণ আদায়ের টাকাও থাকে তবুও তাকে জাকাতের টাকা দেওয়া যেতে পারে।

قَوْلُهُ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ : যারা আল্লাহর রাহে জিহাদের জন্য বের হন তাদেরকেও জাকাতের টাকা দেওয়া যেতে পারে। আর কারো নিকট বাড়িতে অর্থ-সম্পদ আছে; কিন্তু সে ভ্রমণরত অবস্থায় থাকার কারণে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছে। তার কাছে এমন টাকা নেই যার দ্বারা সে বাড়ি পৌঁছতে পারে, এমন ব্যক্তিকে اِبْنُ السَّبِيْلِ বলা হয়। আর এমন ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া যায়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, জাকাতের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দারিদ্র। যেখানে দারিদ্র থাকে সেখানেই জাকাতের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়; শুধু যারা জাকাত উসুল করে তারা এর ব্যতিক্রম। কেননা তাদের ব্যাপারে দরিদ্র হওয়া শর্ত নয়। তবে তারা দরিদ্রদের প্রতিনিধি আর প্রতিনিধি জাকাতের খাত থেকে নিজেদের অংশ গ্রহণ করে।

জাকাত প্রদানের ব্যাপারে প্রাধান্য কার? মূলত কপর্দকহীন ব্যক্তিই জাকাতের উপযুক্ত। এজন্য সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ফকিরদের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য যারা জাকাতের যোগ্য তাদের ব্যাপারে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার বিধানও আছে। যেমন যে মিসকিন কারো নিকট কিছু চায় না তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে সেই মিসকিনের উপর যে ভিক্ষা করে বেড়ায় এমনিভাবে মুসাফির ফকিরকে বাড়ি ঘরে অবস্থানকারী ফকিরের উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে।

ঠিক এমনভিাবে গোলামকে আজাদ করার জন্যে ব্যয় করার মাধ্যমে অনেক কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। এমনিভাবে আত্মীয়তার বন্ধনও প্রাধান্য দেওয়ার একটি কারণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উত্তম সদকা হচ্ছে যা প্রদানের পর কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় না আর দান খয়রাত শুরু করো তোমরা আপন পরিবারবর্গ থেকে। –[সহীহ বুখারী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি দিনার হলো এমন যা তুমি আল্লাহ রাহে ব্যয় করেছ, আর একটি দিনার তুমি গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে ব্যয় করেছ, আর একটি দিনার তুমি কোনো মিসকিনকে দান করেছে, আর একটি দিনার তুমি তোমার পরিবারভুক্ত লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। সর্বাধিক ছওয়াব সেই দিনারটির জন্য হবে যা তুমি তোমার পরিবারভুক্ত লোকদের জন্য ব্যয় করেছ। –[সহীহ মুসলিম]

হযরত মায়মূনা বিনতে হারেস বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ -এর যুগে আমি বাঁদি আজাদ করেছিলাম। আমি হুজুর ﷺ -এর দরবারে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি যদি তোমার মামাদেরকে দিতে তবে অনেক ছওয়াব হাসিল করতে। –[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত সুলায়মান ইবনে আমের বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, মিসকিনকে খয়রাত দেওয়া একটি খয়রাত, আর আত্মীয়-স্বজনকে দানের মাধ্যমে দু'টি খয়রাত হয়। একটি [সাধারণ খয়রাত] আরেকটি হলো আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করা।

–[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী]

হযরন আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ তালহা (রা.) আরজ করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেরোহা [এর বাগান] আমার সর্বাধিক পছন্দনীয় সম্পত্তি, আর এ বাগানটি আমি আল্লাহর রাহে দান করছি। আমি আশা করি, এর নেকী আমার জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট সঞ্চিত থাকবে। এখন আপনি আল্লাহর পাকের নির্দেশ মোতাবেক তা বিতরণ করুন। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আমি সমীচীন মনে করি যে, তুমি বাগানটি নিজের আত্মীয়-স্বজনকে দান কর। হুজুর ﷺ -এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত আবূ তালহা (রা.) বাগানটি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইয়ের মাঝে বিতরণ করে দেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, পিতা তার সন্তাদেরকে এবং সন্তান তার পিতা মাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে জাকাত দিতে পারে না। কেননা জাকাতের জন্যে শর্ত হলো জাকাত গ্রহীতাকে মালিকানা প্রদান করা আর উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে মালিকানা যৌথ থাকে। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রদেয় জাকাতের মালিকানা শুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সম্পদ একজনের মালিকানা থেকে বের হয়ে অন্যজনের মালিকানায় পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে না। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।" তবে এ ছাড়া অন্য আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া যায়; বরং আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া উত্তম। কেননা এতে আত্মীয়তার হক্ব আদায় হয়, এর পাশাপাশি দান করাও হয়। এজন্য ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা সকলকেই জাকাত দেওয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যদি তার কোনো দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করে অথচ কাজী তার প্রতি এ দায়িত্ব অর্পণ করেনি, এমন অবস্থায় সে যদি ঐ দরিদ্র আত্মীয়ের ব্যাপারে সমস্ত ব্যয় জাকাতের নিয়তে করে তবে জাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কাজী যদি ঐ ব্যক্তির ব্যয়ভারের দায়িত্ব সম্পদশালী লোকটির উপর অর্পণ করে আর সে তাকে লালন পালন করে তবে এমন ক্ষেত্রে তার ব্যাপারে প্রদেয় খরচ জাকাত হিসেবে আদায় হবে না। কেননা কাজী বা বিচারক যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তার উপর আমল করা একটি কর্তব্য, আর জাকাত আদায় কবা আরেকটি কর্তব্য। একটি কর্তব্যের মাধ্যমে আর একটি কর্তব্য আদায় করা সম্ভব নয়।

ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, এমন আত্মীয়-স্বজনকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নয়, যাদের লালন পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় জাকাতদাতাদের প্রতি, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র.) এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে একমত যে, যৌথ মালিকানা জাকাত আদায়ের ব্যাপারে বাঁধাস্বরূপ, তবে তাঁরা একখানি হাদীসের অনুসরণে এ মত পোষণ করেন। হযরত যয়নব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর ﷺ -কে মসজিদে দেখলাম, তিনি ইরশাদ করছিলেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকা দিতে থাক এমন কি, যদি নিজের অলংকার দিয়ে হয় তবুও। আমি [আমার স্বামী] আব্দুল্লাহর ব্যয়ভারও বহন করতাম এবং কিছু এতিমের দায়িত্ব আমার উপর ছিল। আমি আব্দুল্লাহকে বললাম, আপনি হুজুর ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করুন যয়নব আব্দুল্লাহর এবং কিছু এতিমের প্রতি যে ব্যয় করে তা দ্বারা কি তার জাকাত আদায় হবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, তুমি নিজেই হুজুর ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। তখন আমি তাঁর নিকট হাজির হলাম। সেখানে গিয়ে আরেকজন আনসারী মহিলাকে পেলাম, তারও একই সমস্যা। এমন সময় হযরত বেলাল (রা.)-কে অতিক্রম করতে দেখলাম। আমি তাঁকে বললাম, হুজুর ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি আমার স্বামী এবং যেসব এতিমদেরকে লালন পালন করি তাদেরকে যদি আমার সম্পদের সদকা দান করি তবে তা কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? কিন্তু আমাদের নাম বলবেন না। হযরত বেলাল (রা.) হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে মাসয়ালা জানতে চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুজন মহিলা কে? হযরত বেলাল (রা.) আরজ করলেন, একজন যয়নব। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন যয়নব? হযরত বেলাল (রা.) আরজ করলেন, আব্দুল্লাহর স্ত্রী। তখন তিনি ইরশাদ করলেন হ্যাঁ, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব হবে। একটি আত্মীয়তার জন্য আর অপরটি সদকার জন্য।

প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর আল-আওলাদের জন্য জাকাত সদকা হারাম : এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর আল-আওলাদের জন্য জাকাত সদকা অবৈধ ছিল এমন কি, তাঁর খান্দান বনী হাশেমের জন্যও জাকাত হারাম ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুর ﷺ -এর খেদমতে কোনো খাবার পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, এগুলো হাদিয়া নাকি সদকা? যদি বলা হতো সদকা, তখন তিনি ইরশাদ করতেন, তোমরা খাও। তিনি নিজে সেগুলো গ্রহণ করতেন না, আর যদি বলা হতো হাদিয়া, তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং সাথীদের সাথে নিজেও আহার করতেন। এমনিভাবে তাঁর পরিবারবর্গের জন্যও সদকা হালাল ছিল না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) একটি সদকার খেজুর মুখে দিয়ে ফেলেছিলেন। তখন হুজুর ﷺ সঙ্গে সঙ্গে তা মুখ থেকে বের করে দেওয়ার আদেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন, "আমরা সদকা খেতে পারি না" আর এমনিভাবে হুজুর ﷺ -এর খানদান তথা বনী হাশেমের জন্য জাকাত হারাম ছিল অন্তর্ভুক্ত। বনী হাশেমের মধ্যে আলে-আলী, আলে-আব্বাস, আলে-জাফর, আলে-আকীল, আলে-হারেস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব অন্তর্ভুক্ত। এই মত হলো ইমাম আযম (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বনী মোত্তালিবও বনূ হাশেমের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, প্রিয়নবী ﷺ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ থেকে নিকটাত্মীয় হিসেবে বনী মোত্তালিবকেও অংশ দান করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বনী হাশেমের গোলামদের জন্য জাকাত হারাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের জন্য সদকা হালাল নয় এবং কোনো সম্প্রদায়ের গোলামও ঐ সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হয়।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ৩৪১]

একটি রহস্য : জাকাতের খাত হলো আটটি। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় এ আটটি খাতের উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথম চারটি খাতকে 'আলিফ লাম' দ্বারা সুনির্দিষ্ট করেছেন আর পরের চারটি খাতে 'আলিফ লামের স্থলে فِيْ অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এর কারণ এই প্রথম চারটি খাত তথা لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ ফকির, মিসকিন এবং জাকাত তহশীলের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী আর যাদের চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্যে। এর তাৎপর্য হচ্ছে, এ চারটি দল লোক জাকাতের হকদার, তাই হকদার হিসেবে তাদেরকে 'আলিফ লাম' দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আর এরপর যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে কি কারণে জাকাত দেওয়া হবে তা فِيْ অব্যয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে। যেমন গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করা ও ঋণের বোঝা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করা ও অসহায় পথিক মুসাফিরের সফর সম্পূর্ণ করা। এসব কারণে তারা জাকাত পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এসব কারণ না থাকলে তারা জাকাত লাভের যোগ্যতা হারাবে। পক্ষান্তরে, ফকির মিসকিন, জাকাত তহশীলদার এবং যাদেরকে তাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য জাকাত প্রদান করা হয়, তারা প্রকৃত পক্ষেই জাকাত লাভের যোগ্য।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ الخ : আয়াতে এ খবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে মুনাফিকদের গোপন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ করে থাকেন তারই একটি হলো গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা, যখন কিছু মুনাফিক মহানবী ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে অবহিত করে সে পথ থেকে সরিয়ে দেন, যেখানে মুনাফিকরা এ কাজের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছিল।

-[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ ﷺ -কে সত্তর জন মুনাফিকের নাম, তাদের পিতৃপরিচয় ও পূর্ণ ঠিকানা-চিহ্নসহ বাতলে দিয়েছিলেন, কিন্তু রাহমাতুললিল আলামিন তা লোকদের সামনে প্রকাশ করেননি। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ : অর্থাৎ হে রাসূল! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন হবে তারা বলবে, আমরা তো শুধু কথাবার্তা বলছিলাম এবং শুধু তামাশা করছিলাম। আপনি বলুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রূপ করছিলে।

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল আমরা এই কুরআন পাঠকদের ন্যায় আর কাউকে দেখিনি, যারা খাওয়ার প্রতি লোভী, মিথ্যাবাদী এবং ভীরু। একজন মুসলমান একথা শ্রবণ করে বললেন, তুই মিথ্যা কথা বলেছিস, তোর এ কথার খবর আমি হুজুর ﷺ -এর কাছে পৌছাব। এরপর হুজুর ﷺ -এর কাছে এ খবর পৌছে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, ঐ সাহাবী হুজুর ﷺ -কে সংবাদ দেওয়ার পূর্বেই এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (র.) লিখেছেন, শুরাইহ ইবনে ওবায়েদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আবুদ দারদা (রা.)-কে বলেছিল, হে কোরআন পাঠকের দল! এর কি কারণ যে, তোমরা আমাদের চেয়ে অধিকতর ভীরু, তোমাদের কাছে কিছু চাওয়া হলে তোমরা কার্পণ্য কর, আহার করার সময় বড় বড় লোকমা ধর। হযরত আবুদ দারদা (রা.) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কোনো জবাব দিলেন না এবং হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে এই খবর দিলেন। হযরত ওমর (রা.) ঐ লোকটিকে তার গলায় কাপড় পেচিয়ে টেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে হাজির করলেন। সে বলল, আমরা শুধু গল্প গুজবের স্থলে এসব বলেছি।

ইবনে জারীর কাতাদার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েক জন মোনাফেক তাবুকের যুদ্ধের সময় প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করে বলে, এই লোকটি কি মনে করেছে যে, আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা যত সহজ সিরিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা কি তত সহজ হবে ? তারা বলেছে, আমরা মনে করি আমরা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী দেখবো। আল্লাহ পাক তাদের এ কথা প্রিয়নবী ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন। প্রিয়নবী ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এমন কথা বলেছিলে? তারা বলল, আমরা গল্পগুজব করছিলাম এবং নিতান্ত খেলার ছলেই এমন কথা বলেছিলাম। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল কালবী, মোকাতিল এবং কাতাদার মতানুসারে এভাবে লিখেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুক অভিযানে গমন করছিলেন তখন তাঁর সম্মুখে তিনজন মুনাফিকও চলছিল। যাদের মধ্যে দু'জন পবিত্র কুরআন এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করছিল আর তৃতীয় ব্যক্তি উপহাস করে হাসছিল।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তারা বলেছিল, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথীরা মনে করেন যে, কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে; অথচ এটিতে তাঁরই কথা, আল্লাহ পাক তাদের এসব কথা প্রিয়নবী ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি আদেশ দিলেন এই উষ্ট্রের আরোহীদেরকে আমার নিকট নিয়ে আস যখন তারা হাজির হলো তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা এমন কথা বলেছিলে? তখন তারা বলল, আমরা নিতান্ত গল্প গুজবের স্থলেই এসব কথা বলেছি, আমরা মূলত এসব কথায় বিশ্বাস করি না। –[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ১২২ তাফসীরে মাজহারী খ. ৫, পৃ. ৩৫০-৫১]

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ : অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলুন তোমরা কি আল্লাহ পাক ও তাঁর নিদর্শনসমূহের সঙ্গে বিদ্রূপ করছিলে, বিদ্রূপ বা তামাশার জন্য তোমরা আর কোনো স্থান পাওনি অতএব, মিথ্যা ওজর আপত্তি করোনা, টালবাহানা করো না, নিজেদেরকে নির্দেশ প্রমাণ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিবে না।

قَوْلُهٗ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ : যদি আমরা তোমাদের কিছু লোককে ক্ষমাও করি, কিন্তু কিছু লোককে অবশ্যই শাস্তি দেব, কেননা, তারা ছিল অপরাধী। অর্থাৎ খাঁটি তওবা করার কারণে, নিয়ত সঠিক হওয়ার জন্য কিছু লোককে মাফ করা হবে। কিন্তু অন্য মুনাফিকরা খাঁটি তওবা করেনি, অবশ্যই তাদের শাস্তি হবে। কেননা তারা মুনাফেকীর, প্রিয়নবী ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার, প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্রূপ করার ন্যায় জঘন্য অপরাধে অপরাধী, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেছেন, মখশী ইবনে হুমাইর আশ'আরীর অপরাধ মাফ করা হয়েছে। মখশী মুনাফিকদের সাথে মিলে-মিশে হাসতো। নিজে কোনো মন্তব্য করতো না এবং অন্যদের থেকে ভিন্ন হয়ে চলাফেরা করতো; বরং মুনাফিকদের কোনো কোনো কথা অপছন্দ করতো, যখন এ আয়াত নাজিল হয় তখন সে মুনাফিকী থেকে তওবা করে এবং দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি এমন আয়াত শ্রবণ করছি যার কারণে আমার নয়ন-মন শীতল হয়। হে আল্লাহ! তোমার পথে আমাকে প্রাণ উৎসর্গ করার তাওফীক দান কর, যেন কেউ আমাকে গোসল না দেয় কাফনও না পরায়। [তাঁর এই দোয়া কবুল হয়েছিল, ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন, আর কেউ জানতে পারেনি যে, তিনি কোথায় শহীদ হয়েছেন এবং কোথায় দাফন হয়েছেন।

মখশী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে আরজ করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নাম পরিবর্তন করে দিন যেন কুফরি যুগের নামও তাঁর নিকট অপছন্দনীয় ছিল। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর নামকরণ করেছিলেন আব্দুর রহমান বা আব্দুল্লাহ।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ৩৫৩]

অনুবাদ :

٦٧. اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ـ اَىْ مُتَشَابِهُوْنَ فِى الدِّيْنِ كَاَبْعَاضِ الشَّىْءِ الْوَاحِدِ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ اَلْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط عَنِ الْاِنْفَاقِ فِى الطَّاعَةِ نَسُوا اللّٰهَ تَرَكُوْا طَاعَتَهٗ فَنَسِيَهُمْ ط تَرَكَهُمْ مِنْ لُطْفِهٖ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

৬৭. মুনাফিক নরনারী একজন অন্যজন হতে অর্থাৎ একই বস্তুর অঙ্গসমূহের মতো এরাও ধর্মের ব্যাপারে একজন অপরজনের অনুরূপ। এরা অসৎকর্মের অর্থাৎ কুফরিও অবাধ্যতার নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম অর্থাৎ ঈমান ও আনুগত্যের কাজ হতে নিষেধ করে। আর আনুগত্যে ও বন্দেগীর কাজে অর্থ ব্যয় করা হতে হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য পরিত্যাগ করেছে ফলে তিনিও তাদেরকে বিস্মৃত হয়ছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ হতে এদেরকে বাদ দিয়েছেন। মুনাফিকরা তো সত্যত্যাগী।

٦٨. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط هِىَ حَسْبُهُمْ ج جَزَآءً وَعِقَابًا وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ج اَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهٖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ دَائِمٌ ـ

৬৮. আল্লাহ মুনাফিক নর-নারী এবং কাফেদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির। সেথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই তাদের শাস্তি ও পরিণাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। তাঁর রহমত হতে এদেরকে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শাস্তি।

٦٩. اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُنَافِقُوْنَ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ط فَاسْتَمْتَعُوْا تَمَتَّعُوْا بِخَلَاقِهِمْ نَصِيْبِهِمْ مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ اَيُّهَا الْمُنَافِقُوْنَ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ فِى الْبَاطِلِ وَالطَّعْنِ فِى النَّبِىِّ ﷺ كَالَّذِىْ خَاضُوْا ط اَىْ كَخَوْضِهِمْ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

৬৯. হে মুনাফিকবৃন্দ! তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো। তারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন সম্পত্তিও ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক। তারা দুনিয়ার যা তাদের হিস্যায় ছিল ভাগ্যে ছিল তা ভোগ করেছে। اِسْتَمْتَعُوْا অর্থ– তারা ভোগ করেছে। হে মুনাফিকগণ! তোমাদের ভাগ্যে যা আছে তোমরাও তা ভোগ করলে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাদের ভাগ্যে যা ছিল ভোগ করেছে। তোমরাও বাতিল, অসত্য এবং রাসূল ﷺ -এর দোষারোপ বিষয়ে এমন মগ্ন হয়েছ যেমন তারা মগ্ন হয়েছিল। অর্থাৎ এই বিষয়ে তাদেরই মতো তোমাদের বর্তমান মগ্নতা। তাদেরই কর্ম দুনিয়া ও আখিরাতে ব্যর্থ এবং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٧٠. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ خَبَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَثَمُودَ لا قَوْمِ صَالِحٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ قَوْمِ شُعَيْبٍ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ط قُرَى قَوْمِ لُوطٍ أَيْ أَهْلُهَا أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج بِالْمُعْجِزَاتِ فَكَذَّبُوهُمْ فَأُهْلِكُوا فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ بِأَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلٰكِنْ كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بِارْتِكَابِ الذُّنُوبِ.

৭০. তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ অর্থাৎ হযরত হুদের সম্প্রদায় ও সামুদ জাতি অর্থাৎ হযরত সালেহের কওম ইবরাহীমের সম্প্রদায়, মাদ্ইয়ান অধিবাসী অর্থাৎ হযরত শুয়াইবের সম্প্রদায় ও বিধ্বস্ত নগরের অর্থাৎ হযরত লূতের সম্প্রদায়ের জনপদসমূহের অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের নিকট আসেনি? তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ মুজেযাসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন। অনন্তর এরা তাঁদেরকে অস্বীকার করে। ফলে, তারা ধ্বংস হয়। আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করার নন। তিনি এমন নন যে, বিনা অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। বরং পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতি জুলুম করতেছিল। نَبَأٌ অর্থ– সংবাদ।

٧١. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ط أُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ إِنْجَازِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ حَكِيمٌ لَا يَضَعُ شَيْئًا إِلَّا فِي مَحَلِّهِ.

৭১. মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকর্ম হতে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্র রহমত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী। তার প্রতিশ্রুতি পূরণে বা হুমকির বাস্তবায়নে কেউ তাকে অক্ষম করতে পারবে না, প্রজ্ঞাময় সুতরাং সকল জিনিসকে তিনি যথাস্থানেই স্থাপন করেন।

٧٢. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰتِ عَدْنٍ ط إِقَامَةٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ط أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

৭২. মুমিন নর ও নারীকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই বড় এটাই সবকিছু হতে শ্রেষ্ঠ এবং তা-ই মহা সাফল্য عَدْنٍ অর্থ– চিরস্থায়ী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ : এখানে بَعْضُهُمْ হলো মুবতাদা আর مِنْ بَعْضٍ হলো তার খবর। আর مِنْ হলো اِتِّصَالِيَّة

قَوْلُهُ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ : এখানে قَبْضِ يَد দ্বারা কৃপণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাস্তবিক মুষ্ঠিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। মুফাসসির (র.) عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَةِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ تَرَكُوْا اِطَاعَتَهُ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, نِسْيَانٌ-এর উপরে কারো থেকে مُؤَاخَذَة হয় না এবং نِسْيَانٌ-টা তিরস্কারের যোগ্যও নয়। কেননা এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। এরপরও একে তিরস্কারের স্থানে কেন উল্লেখ করলেন?

উত্তর. এখানে এবং পরবর্তী স্থানে نِسْيَانٌ দ্বারা তার লাযেমী অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা نِسْيَانٌ-এর জন্য تَرْك আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা ভুলিয়ে দেওয়া অর্থ হলো স্বীয় বিশেষ রহমত হতে বঞ্চিত করে দেওয়া।

قَوْلُهُ اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُنٰفِقُوْنَ : এখানে اَنْتُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ বাক্যাংশটি উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب নয়। কেননা এই সুরতে বহু উহ্য থাকা আবশ্যক হবে। অথচ উহ্য থাকার ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণ থাকাই অধিক উত্তম।

قَوْلُهُ نَصِيْبِهِمْ : এতে خَلَاقٌ-এর অর্থের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এটা خَلْق হতে নির্গত। যার অর্থ হলো তাকদীর বা ভাগ্যলিপি।

প্রশ্ন. فَكَذَّبُوْهُمْ-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ফায়দা কি?

উত্তর. যাতে করে فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ-এর আতফ فَاء تَعْقِيْبِيَّه-এর মাধ্যমে বৈধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِقَامَةٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عَدْنٍ অর্থ হলো خُلُوْد কাজেই تَكْرَار-এর প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

قَوْلُهُ رِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ : رِضْوَانٌ-এর মধ্যে تَنْوِيْن تَنْكِيْر হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সামান্য সন্তুষ্টি ও বিরাট বিষয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقَاتُ بَعْضُهُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুরাত্মা মুনাফিকদের ছলচাতুরী এবং দূরভিসন্ধির বিবরণ ছিল, আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন কপটচিত্ত সকল মুনাফিক কি নারী কি পুরুষ সকলে আল্লাহর নাফরমানি এবং অবাধ্যতায় একই প্রকার। যে মন্দ আচরণ তাদের পুরুষের মধ্যে রয়েছে তা তাদের নারীদের মধ্যেও রয়েছে। তারা মুখে ইসলামের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু ইসলামের ক্ষতি সাধনে সর্বদা তৎপর থাকে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাদের এই যে, মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে এবং ভালো কাজে বাধা দেবে অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে শিরক করার এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে এবং সৎকাজে বাঁধা দিয়ে থাকে যেমন তারা বলে, গরমে জিহাদে যেয়ো না।

এ আয়াতে মুনাফিকদের একটি দাবির মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়েছে। তারা মুসলমানদেরকে বলত, আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। কিন্তু আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– وَمَا هُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ "আর তারা তোমাদের মধ্যে থেকে নয়।" বরং মুনাফিকরা পরস্পর একে অন্যের অনুরূপ। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনো মিল হতেই পারে না, মুনাফিকরা পুরুষ হোক কি নারী মুনাফিকীতে তারা এক ও অভিন্ন। তাদের আরেকটি অন্যায় আচরণ হলো তারা কৃপণ।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমটিতে মুনাফিকদের একটি অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ অর্থাৎ "তারা নিজেদের হাতকে বন্ধ করে রাখে।" তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত রয়েছে যে, হাত বন্ধ রাখার অর্থ জিহাদ বর্জন ও ওয়াজিব হক আদায় না করা। نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ-এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তারা যখন আল্লাহকে ভুলে গেছে, তখন আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। কিন্ত আল্লাহ ভুল বা বিস্মৃতির দোষ থেকে পাক। কাজেই এখানে এর মর্ম এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকামকে এমনভাবে বর্জন করেছে যেন একবারে ভুলেই গেছে, তাই আল্লাহ তা'আলাও আখিরাতের ছওয়াবের ব্যাপারে তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন যে, নেকী ও ছওয়াবের তালিকায় তাদের নাম থাকেনি।

৬৯ তম আয়াত– كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ; এক তাফসীর অনুযায়ী এতে মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে যেমনটা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় তাফসীর মতে মুসলমানগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। [অর্থাৎ اَنْتُمْ كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ] মর্ম

এই যে, তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরই মতো। তারা যেমন পার্থিব ভোগ-বিলাসে মজে গিয়ে আখিরাতকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছিল এবং নানাবিধ পাপ ও অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তেমনিভাবে তোমরাও তাই করবে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তোমরাও সে পন্থা অবলম্বন করবে যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা করেছে- হাতের মধ্যে হাত, বিঘতের মধ্যে বিঘত। অর্থাৎ হুবহু তাদের নকল করবে। এমন কি তাদের মধ্যে যদি কেউ গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও ঢুকবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন যে, এই হাদীসের সত্যায়নকল্পে যদি তোমাদের মন চায়, তবে কুরআনের كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াত পাঠ করে নাও। একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ অর্থাৎ আজকের রাতটির গত রাতের সাথে কতই না মিল রয়েছে এবং এর সাথে কতই না সামঞ্জস্যশীল! ওরা ছিল বনী ইসরাঈল, আমাদেরকে তাদের তুলনা করা হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

হাদীসের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট যে, শেষ জমানার মুসলমানরাও ইহুদি-নাসারাদেরই মতো পথ চলতে আরম্ভ করবে। আর মুনাফিকদের আজাবের বর্ণনার পরে এ বিষয়টির আলোচনায় এ ইঙ্গিতও বোঝা যায় যে, ইহুদি-নাসারাদের মত ও পথের অনুসারী মুসলমান তারাই হবে যাদের অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমান নেই। নেফাকের জীবাণু তাদের মধ্যে বিদ্যমান। উম্মতের সৎলোকদের তা থেকে বাঁচার জন্য এ আয়াতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের অবস্থা তাদের ষড়যন্ত্র ও কষ্ট দেওয়া এবং সেজন্য তাদের আজাবের বিষয় আলোচিত হয়েছে। কুরআনের বর্ণনারীতি অনুযায়ী এখানে নিষ্ঠাবান মুমিনদের অবস্থা এবং তাদের ছওয়াবের বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত। কাজেই আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাই বিবৃত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে মুনাফিকীন ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু একটি জায়গায় মুনাফিকদের বেলায় بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ বলা হলেও এর তুলনা করতে গিয়ে মুমিনদের আলোচনা এলে সেখানে بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ শুধুমাত্র বংশগত সমন্বয় ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কাজেই তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ নয় এবং তাতে সে ফল লাভ সম্ভব হতে পারে না, যা আন্তরিক ভালোবাসা ও আত্মিক সহানুভূতির মাধ্যমে হতে পারে। পক্ষান্তরে মুমিনগণ একে অপরের আন্তরিক বন্ধু এবং সত্যিকার মহানুভব। -[কুরতুবী]

আর তাদের এ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি যেহেতু একান্তভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে হয়ে থাকে, কাজেই তা প্রকাশ্যে, গোপনে এবং উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে একই রকম হয় এবং চিরকাল স্থায়ী হয়। নিষ্ঠাবান মুমিনের লক্ষণও এটিই। ঈমান ও নেক আমলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাতে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারেই কুরআন কারীম বলেছে- سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলের পাবন্দী অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পারিক আন্তরিক গভীর বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দেন। বর্তমানকালে আমাদের ঈমান ও সৎকর্মের ক্রটির কারণেই মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কে এমনটি দেখা যায় না; বরং তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে পড়েছে।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য : এ আয়াত দ্বারা মুমিনদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হলো যথা–

১. মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে থাকবে ভ্রাতৃত্বভাব এবং মমত্ববোধ, কেননা তাদেরকে পরস্পরের বন্ধু বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

২. মুমিনের কাজ হলো ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া, ঈমান ও নেক আমলের দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

৩. এমনিভাবে মুমিনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

৪. সঠিকভাবে নামাজ কায়েম করা।

৫. যথানিয়মে জাকাত আদায় করা, তথা বান্দার হক্বের প্রতি দায়িত্ব পালনে সদা সক্রিয় থাকা।

৬. সব বিষয়ে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এ কথাটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ফরজ আদায় করাই যথেষ্ট নয়; বরং সকল অবস্থায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি আনুগত থাকা একান্ত কর্তব্য। আর এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের হক রয়েছে। এমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে কর্তব্য পালন করাও ঈমানের নিদর্শন। এতিম-মিসকিন, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করাও মুমিনের বৈশিষ্ট্য, আর কোনো মুমিনকে কথায় বা কাজে কষ্ট দেওয়া মুমিনের জন্য বৈধ নয়। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান সে ব্যক্তি যে অন্য মুসলমানকে তার কথায় ও আচরণে কষ্ট দেয় না।

–[খোলাসাতুততাফাসীর খ. ১, পৃ. ২৫৭]

٧٣. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بِالسَّيْفِ وَالْمُنٰفِقِيْنَ بِاللِّسَانِ وَالْحُجَّةِ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط بِالْاِنْتِهَارِ وَالْمَقْتِ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِيَ -

٧٤. يَحْلِفُوْنَ اَيِ الْمُنٰفِقُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ط مَا بَلَغَكَ عَنْهُمْ مِنَ السَّبِّ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ اَظْهَرُوا الْكُفْرَ بَعْدَ اِظْهَارِ الْاِسْلَامِ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ج مِنَ الْفَتْكِ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ عِنْدَ عَوْدِهٖ مِنْ تَبُوْكَ وَهُمْ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَضَرَبَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وُجُوْهَ الرَّوَاحِلِ لَمَّا غَشُوْهُ فَرُدُّوْا وَمَا نَقَمُوْا اَنْكَرُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ط بِالْغَنَائِمِ بَعْدَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ اَلْمَعْنٰى لَمْ يَنَلْهُمْ مِنْهُ اِلَّا هٰذَا وَلَيْسَ مِمَّا يُنْقَمُ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا عَنِ النِّفَاقِ وَيُؤْمِنُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاٰخِرَةِ ط بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ يَحْفَظُهُمْ مِنْهُ وَّلَا نَصِيْرٍ يَمْنَعُهُمْ -

অনুবাদ :

৭৩. হে নবী! কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ কর এবং যবান ও যুক্তি প্রমাণাদির মাধ্যমে মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও; আর হুমকি ও ক্রোধ প্রদর্শন করত তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম প্রত্যাবর্তনস্থল।

৭৪. তারা অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, এরা গালি-গালাজ ও নিন্দাবাদ করে বলে আপনার নিকট যা পৌঁছেছে তার তারা কিছু বলেনি অথচ তারা তো সত্যপ্রত্যাখ্যানের কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি করেছে। অর্থাৎ বাহ্যত ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করার পর তারা কুফরির কথা প্রকাশ করেছে। তারা যা কামনা করেছিল তাতে সফল হয়নি। তাবূক হতে ফেরার পথে একটি গিরিপথের সংকীর্ণ স্থানে কিঞ্চিৎ অধিক দশজন মুনাফিকের একটি দল অকস্মাৎ হামলা চালিয়ে রাসূল ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। শেষে তারা পরিকল্পনানুযায়ী তাঁর উপর মুখোশ পরিহিত অবস্থায় আক্রমণ করলে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির এদের সওয়ারীর মুখে আঘাত করে এদেরকে প্রতিহত করেন। ফলে তারা নিষ্ফল হয়ে ফিরে যায়। বর্ণিত বাক্যটিতে আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনাটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় গণিমতসামগ্রী প্রদান করত এদের অভাবগ্রস্ততার পর তাদেরকে অভাবমুক্ত করছিলেন বলেই এরা দোষারোপ করে। অর্থাৎ অস্বীকার করে। তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট হতে এটা ব্যতীত অন্য কিছু লাভ করেনি। আর এটা কোনোদিন দোষের কারণ হতে পারে না। এরা যদি মুনাফিকী হতে তওবা করত এবং ঈমান আনয়ন করতো তবে তা তাদের জন্য ভালো হতো। আর যদি ঈমান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আল্লাহ এদেরকে দুনিয়াতে হত্যার এবং পরকালে অগ্নির মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। পৃথিবীতে এদের কোনো অভিভাবক নেই যে এদেরকে আল্লাহ হতে হেফাজত করবে এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই। যে তাদের তরফ হতে উক্ত আজাব ঠেকিয়ে রাখবে।

٧٥. وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ وَهُوَ ثَعْلَبَةُ ابْنُ حَاطِبٍ سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَنْ يَّدْعُوَ لَهٗ اَنْ يَرْزُقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَيُؤَدِّىْ مِنْهُ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَدَعَا لَهٗ فَوُسِّعَ عَلَيْهِ فَانْقَطَعَ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَنَعَ الزَّكٰوةَ ـ

৭৫. এদের মধ্যে কেউ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করেছিল যে, আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদেরকে দান করলে আমরা নিশ্চয় সদকা দিব এবং সৎ হবো। এই ব্যক্তিটি ছিল সা'লাবা ইবনে হাতিব। সে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট দোয়ার অনুরোধ করে। [এবং বলে, ধন হলে] সে প্রত্যেক হকদারের হক যথাযথভাবে আদায় করে দিবে। নবীজী ﷺ দোয়া করলেন। ফলে তার রিজিকে বহু বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু তখন সে জুমা ও জামাতে শরিক হওয়া পরিত্যাগ করে বসে এবং জাকাত পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায়। نَصَّدَّقَنَّ -তে মূলত ص -এ تَاء -এর اِدْغَامْ বা সন্ধি হয়েছে।

٧٦. كَمَا قَالَ تَعَالٰى فَلَمَّا اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ـ

৭৬. ঐ লোকটির কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে দান করলেন দান তখন তারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নিল।

٧٧. فَاَعْقَبَهُمْ اَىْ فَصَيَّرَ عَاقِبَتَهُمْ نِفَاقًا ثَابِتًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ اَىِ اللّٰهَ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ فِيْهِ فَجَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِزَكَاتِهٖ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ مَنَعَنِىْ اَنْ اَقْبَلَ مِنْكَ فَجَعَلَ يَحْثُوا التُّرَابَ عَلٰى رَأْسِهٖ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ثُمَّ اِلٰى عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا ثُمَّ اِلٰى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْبَلْهَا وَمَاتَ فِىْ زَمَانِهٖ ـ

৭৭. ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিণাম এই করলেন যে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থায়ী হয়ে রইল। কারণ, তারা আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং এতে তারা ছিল মিথ্যাচারী। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর উক্ত সা'লাবা জাকাত নিয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তোমার নিকট হতে তা গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ করে দিয়েছেন। এটা শুনে সে নিজের মাথায় মাটি ফেলতে শুরু করে। পরে হযরত আবূ বকরের আমলেও সে তা নিয়ে তাঁর নিকটও আসে; তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পরে হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে তাঁর নিকটও তা নিয়ে আসে। তিনিও তা গ্রহণ করলেন না। অতঃপর হযরত উসমানের যুগে তাঁর নিকটও সে তা নিয়ে আসে তিনিও তা গ্রহণ করেননি অবশেষে তাঁর আমলেই সে মারা যায়। فَاَعْقَبَهُمْ অর্থ– অনন্তর তিনি তাদের এই পরিণাম করলেন।

٧٨. اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَيِ الْمُنَافِقُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ مَا اَسَرُّوْهُ فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَنَجْوٰىهُمْ مَا تَنَاجَوْا بِهٖ بَيْنَهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا غَابَ عَنِ الْعِيَانِ -

৭৮. তারা মুনাফিকরা কি জানত না যে, তাদের গোপন বিষয় অর্থাৎ তাদের অন্তরে যা গোপন করে রাখে এবং তাদের গোপন পরামর্শ অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে যে গোপন সলা-চক্রান্ত করে তাও আল্লাহ জানেন। আর নিশ্চয় তিনি গায়েব সম্পর্কে খুবই অবহিত। اَلْغُيُوْبِ অর্থ– যা দৃশ্যপট হতে অপসৃত, অদৃশ্য।

٧٩. وَلَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا فَنَزَلَ اَلَّذِيْنَ مُبْتَدَأٌ يَلْمِزُوْنَ يَعِيْبُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ الْمُتَنَفِّلِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ فَيَاْتُوْنَ بِهٖ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط وَالْخَبَرُ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز جَازَاهُمْ عَلٰى سُخْرِيَّتِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

৭৯. সদকা সম্পর্কিত আয়াত নাজিল হলে জনৈক ব্যক্তি [সাহাবী] বহু পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সদকা করার জন্য নিয়ে আসেন। এতে মুনাফিকরা বলতে লাগল, রিয়াকার লোক দেখবার উদ্দেশ্যে সে তা নিয়ে এসেছে। অপর একজন সাহাবী স্বীয় সাধ্যানুযায়ী সামান্য এক ছা' [পৌনে দুই সের] খর্জুর নিয়ে আসলে মুনাফিকরা বলতে লাগল, "এত সামান্য সদকার প্রয়োজন আল্লাহর নেই।" এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– মুমিনদের মধ্যে যারা নফল সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কায়িক শক্তি ব্যয় ব্যতীত কিছুই পায় না আর তা নিয়েই তারা হাজির হয় তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদের বিদ্রূপ করেন অর্থাৎ তিনি তাদের বিদ্রূপের প্রতিফল দিবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। اَلَّذِيْنَ-এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। سَخِرَ اللّٰهُ-এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। يَلْمِزُوْنَ অর্থ– তারা দোষারোপ করে।

٨٠. اِسْتَغْفِرْ يَا مُحَمَّدُ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط تَخْيِيْرٌ لَهُ فِي الْاِسْتِغْفَارِ وَتَرْكِهٖ قَالَ ﷺ اِنِّيْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ يَعْنِي الْاِسْتِغْفَارَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط -

৮০. হে মুহাম্মদ! তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর একই কথা। এই বাক্যটিতে রাসূল ﷺ -কে এদের জন্য ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করার এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। সুতরাং ইস্তিগফার অর্থাৎ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমি গ্রহণ করে নিলাম। তুমি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।

قِيْلَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِيْنَ الْمُبَالَغَةُ فِيْ كَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ وَفِي الْبُخَارِيِّ حَدِيْثٌ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّيْ لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ غُفِرَ لَزِدْتُ عَلَيْهَا وَقِيْلَ الْمُرَادُ الْعَدَدُ الْمَخْصُوْصُ لِحَدِيْثِهِ أَيْضًا وَسَأَزِيْدُ عَلَى السَّبْعِيْنَ فَبُيِّنَ لَهُ حَسْمُ الْمَغْفِرَةِ بِآيَةِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اِسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

কেউ কেউ বলেন, আধিক্য বুঝার উদ্দেশ্যে এই স্থানে সত্তর বার সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সত্তর বারের অধিক করা হলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে বলে যদি জানতে পারতাম, তবে নিশ্চয় আমি এরও অধিকবার তাদের জন্য ইস্তিগফার করতে প্রয়াস পেতাম। কেউ কেউ বলেন, এই স্থানে উক্ত সত্তর সংখ্যাটিকে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে। কারণ একটি হাদীসে আছে রাসূল ﷺ-ইরশাদ করেন, সত্তর বারেরও অধিক বার আমি [এদের জন্য] ইস্তিগফার করব। শেষে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اِسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [অর্থাৎ এদের জন্য ইস্তেগফার কর বা না কর একই কথা] এই আয়াতের মাধ্যমে এদের ক্ষমার আশা না করার কথা তাঁকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمُنٰفِقُوْنَ : এটা বাবে مُفَاعَلَة হতে اِسْم فَاعِل -এর جَمْع مُذَكَّرٌ -এর সীগাহ। অর্থ– দ্বিমুখী নীতি গ্রহণকারী। শরিয়েতের পরিভাষায় মুনাফিক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে মুখে ইসলামের স্বীকারোক্তি প্রদান করে; কিন্তু অন্তরে এর বিপরীত ভাব পোষণ করে। نَفَقٌ-এর মূল অর্থ হলো খরচ হয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া। نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ অর্থ– টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেল। نَافِقَاءُ অর্থ– গুইসাপের প্যাঁচ, গর্ত। যার কমপক্ষে দুটো মুখ থাকে, এক মুখ দিয়ে প্রবেশ করে, শিকারী সেদিকে মনোযোগী হয়। আর অন্য মুখ দিয়ে গুইসাপ বেরিয়ে চলে যায়। মুনাফিকও মৌখিক স্বকিারোক্তি দ্বারা ইসলামে প্রবেশ করে আর আন্তরিক বিশ্বাস না থাকার কারণে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। রাসূল ﷺ -এর যুগে মুনাফিক পুরুষের সংখ্যা ছিল তিনশত জন। আর মুনাফিক নারীর সংখ্যা ছিল একশত সত্তর জন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের গুণাবলি এবং তাদের জন্যে সংরক্ষিত নিয়ামতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে কাফের এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং কঠোর নীতি অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে ছওয়াব এবং আজাবের কথা পাশাপাশি থাকে। সৎকাজের ছওয়াব বা শুভ পরিণতির আশা যেখানে থাকে, সেখানেই অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে কাফের ও মুনাফিকদের জন্য দোজখের কঠোর শাস্তির ঘোষণা করা রয়েছে। যেহেতু প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা এবং মহানুভবতার কারণে মুনাফিকদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করতেন, তাই এ আয়াতে মুনাফিকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে।

মুনাফিকরা মুখে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতো; কিন্তু অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ পুষে ষড়যন্ত্র করতো, তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছেন, হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের সঙ্গে কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। বিনম্র ও ভদ্র ব্যবহারের যোগ্য তারা নয়, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন, তাই তাদের সাথে দুশমনের ন্যায় ব্যবহার করুন। তাদের ঠিকানা হলো দোজখ আর তা হলো অত্যন্ত মন্দ ও নিকৃষ্ট ঠিকানা।

এ পর্যায়ে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জিহাদ অর্থ হলো কেনো অপ্রিয় বিষয়কে প্রতিরোধ করা বা তাকে অপসারণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ জিহাদ শুধু যে অস্ত্র দ্বারা হয় তা নয়, কখনো হাতে, কখনো কলমে, কখনো মুখে কখনো অস্ত্রের মাধ্যমে। আলোচ্য আয়াতে জিহাদকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে বলে তাফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন।

–[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ১৩৫]

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হলো মৌখিক জিহাদ অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এতে غَلْظ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এই যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণের যোগ্য হবে তাতে কোনো রকম ছাড় বা কোমলতা যেন প্রদর্শন না করা হয়। এ শব্দটি رَأْفَتْ -এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হলো কোমলতা ও করুণা। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غَلَظَتْ শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও কার্যকর কঠোরতাই বুঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরিয়তের হুকুম জারি করতে গিয়ে কোনো রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ তা নবী-রাসূলগণের রীতিবিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি করতেন না। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন- إِذَا زَنَتْ اَمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا "যদি তোমাদের কোনো ক্রীতদাসী জেনায় লিপ্ত হয়, তবে শরিয়ত অনুযায়ী তার উপর শাস্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভর্ৎসনা বা গালাগালি করো না।" -[তাফসীরে কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ "আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।" তাছাড়া স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রীতিনীতিতেও কোথাও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

জ্ঞাতব্য : একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলাম যেখানে কাফেরদের বিরুদ্ধে غَلَاظَتْ বা কটুবাক্য অবলম্বন করেনি, ইদনীংকালে মুসলমান অপর মুসলমানদের সম্পর্কে অবলীলাক্রমে তাই ব্যবহার করে চলেছে এবং কিছুলোক তো এমনও রয়েছে, যারা একে দীনের খিদমত বলে মনে করে আনন্দিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াত يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ -তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরি সব কথাবার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে নিজেদের শুচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের শানেনুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ গযওয়ায়ে তাবুকের ক্ষেত্রে এক ভাষণ দান করেন, যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজে বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু বলেন, তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা [মুনাফিকরা] গাধার চাইতেও নিকৃষ্ট আর এ বাক্যটি আমের ইবনে কায়েস (রা.) নামক এক সাহাবী শুনে ফেলেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমের ইবনে কায়েস (রা.) এ ঘটনা মহানবী ﷺ -কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমের ইবনে কায়েস (রা.) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে [আমি এমন কথা বলিনি]। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ উভয়কে 'মিম্বরে নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, "আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে।" হযরত আমের (রা.)-এর পালা এলে তিনিও [নিজের বক্তব্য সম্পর্কে] কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বলেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীল আমিন ওহী নিয়ে হাজির হন, যাতে উল্লিখিত আয়াতখানি নাজিল হয়। জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি স্বীকার করছি যে এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল। আমের ইবনে কায়েস (রা.) যা কিছু বলেছেন, তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়। -[তাফসীরে মাযহারী]

কোনো কোনো তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষত এজন্য যে. আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে- وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا "অর্থাৎ তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা

কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোনো ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, যাতে মুনাফিকরা মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করেছিল; যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গযওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বারজন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে ছিল যে, মহানবী ﷺ যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এ ব্যাপারে হযরত জিবরীল আমিন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীন চক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াত- وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ ; এটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবা ইবনে হাতেব আনসারী রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করল যে, হুজুর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরিকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদিনার পাহাড় সোনা হয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল। এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করে দিলেন, যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমন কি মদিনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে জোহর ও আসরের নামাজ মদিনায় এসে মহানবী ﷺ -এর সঙ্গে আদায় করতো এবং অন্যান্য নামাজ সেখানেই পড়ে নিত, যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদিনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোনো একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাজের জন্য সে মদিনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাজ সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদিনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুমা ও জামাআত সবকিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালমাল এত বেশি বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করেছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রাসূলে কারীম ﷺ একথা শুনে তিনবার বললেন- يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ অর্থাৎ সা'লাবার প্রতি আফসোস! সা'লাবার প্রতি আফসোস! সা'লাবার প্রতি আফসোস!

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদ্কার আয়াত নাজিল হয়, যাতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদ্কা আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ; তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করে দু'জন লোককে সদকা উসুলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবার কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছাল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা'লাবা বলতে লাগল, এতো জিযয়া' কর হয়ে গেল যা অমুসলমানদের কাছে থেকে আদায় করা হয়! তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। তারা চলে গেলেন।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী ﷺ -এর ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত তথা পশু উট-বকরিসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদকার নিসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রাসূল ﷺ -এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হাজির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি তো নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বারবার বিনয় প্রকাশ করে বললেন, আমি নিজের খুশিতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন!

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানের সদকা আদায় করে সা'লাবার কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এতো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল, যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয়। যাহোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে চিন্তা করে একটি সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদিনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন যা পূর্বে বলেছিলেন। অর্থাৎ- يَاوَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ [অর্থাৎ সা'লাবার উপর আফসোস!] কথাটি তিন তিন বার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশি হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়- وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমনও রয়েছে, যারা

আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ যদি তাদের ধনসম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মতের সৎকর্মশীলদের মতো সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজনও গরিব-মিসকিনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অপকর্ম ও অঙ্গীকার লঙ্ঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিকী বা কুটিলতাকে আরা পাকাপোক্ত করে বসিয়ে দেন যাতে তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

জ্ঞাতব্য : এতে বোঝা যায় যে, কোনো কোনো অসৎ কর্মের এমন অশুভ পরিণতি ঘটে যে, তাতে তওবা করার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। 'নাউযুবিল্লাহ মিনহু' [এহেন অবস্থা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই]।

হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সেই বিস্তারিত রেওয়ায়েতের পর যা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো, ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সা'লাবার ব্যাপারে يَا وَيْحَ ثَعْلَبَةَ তিন তিন বার বলেন, তখন সে মজলিসে সা'লাবার কতিপয় আত্মীয় এবং আপনজনও উপস্থিত ছিল। হুজুর ﷺ -এর এ বাক্যটি শুনে তাদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, তোমার সম্পর্কে কুরআনে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সা'লাবা ঘাবড়ে গেল এবং মদীনায় হাজির হয়ে নিবেদন করল, হুযুর! আমার সদকা কবুল করে নিন। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার সদকা কবুল করতে বারণ করে দিয়েছেন। এ কথা শনে সা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। হুজুর ﷺ বললেন, এটা তো তোমার নিজেরই কৃতকর্ম। আমি তোমাকে হুকুম করেছিলাম, কিন্তু তুমি তা মান্য করনি। এখন আর তোমার সদকা কবুল হতে পারে না। তখন সা'লাবা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেল এবং এর কিছুদিন পরই মহানবী ﷺ -এর ওফাত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) খলীফা হলে সা'লাবা সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে তার সদকা কবুল করার আবেদন জানাল। সিদ্দীকে আকবর (রা.) উত্তর দিলেন, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই কবুল করেননি, তখন আমি কেমন করে কবুল করব!

তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর ওফাতের পর সা'লাবা ফারুকে আযম (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয় এবং সেই আবেদন জানায় এবং একই উত্তর পায়, যা সিদ্দীকে আকবর (রা.) দিয়েছিলেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলেও সে এ নিবেদন করে। কিন্তু তিনিও অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালেই সা'লাবার মৃত্যু হয়। -[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهُ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ : অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন একই কথা, যদি আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবুও আল্লাহ পাক কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

শানে নুযূল : আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক সর্দার। কিন্তু তার পুত্র ছিল প্রকৃত মুমিন, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যু শয্যায় ছিল তখন তার মুমিন পুত্র আব্দুল্লাহ প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করার আরজি পেশ করলেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৫, পৃ. ৭০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন মুনাফিকদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হয় তখন তারা বলে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। হুজুর ﷺ বলেন, অচিরেই আমি তোমাদের জন্য ইস্তেগফার করবো। এরপর প্রিয়নবী ﷺ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা শুরু করলেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ الخ এরপর মহানবী ﷺ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা পরিত্যাগ করলেন। হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেছেন, মুনাফিকরা হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তাদের নানা ওজর আপত্তির কথা বলতো এবং এ কথাও বলতো যে, আমাদের নিয়ত ছিল মহৎ, আমরা আপনাদের সাথে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করি না তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যখন মদিনায় মসজিদে নববীতে হুজুর ﷺ খুৎবা দিতেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দাঁড়িয়ে বলতো, ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মানিত করেছেন, মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন এবং তাঁকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের দিন এই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল বিশ্বাসঘাতকতা করে তার তিনশ লোক নিয়ে রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করেছে। ওহুদের যুদ্ধের পরও সে পূর্বের ন্যায় প্রিয়নবী ﷺ -এর ভাষণের পর বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্য দাঁড়ালো। তখন হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহর দুশমন! বসে পড় তোমার কুফুরি ও নাফরমানি সবদিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তখন সে মসজিদে নববী থেকে বের হয়ে পড়লো। তার সম্প্রদায়ের একজনের সাথে তার দেখা হলে সে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি হয়েছে? সে ঘটনা বর্ণনা করল। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, তুমি আল্লাহর রাসূলের নিকট ফিরে যাও তিনি তোমার জন্য ইস্তেগফার করবেন। সে বলল, তিনি আমার জন্য ইস্তেগফার করুক বা না করুক, আমি পরোয়া করি না। তখন নাজিল হলো- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয় এসো! তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ইস্তেগফার করবেন, তখন তারা ঘাড় বাঁকা করে চলে যায়। -[তাফসীরে কাবীর খ. ১৬, পৃ. ১৪৬, তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১০, পৃ. ১৪৮]

অনুবাদ :

٨١. فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ عَنْ تَبُوْكَ بِمَقْعَدِهِمْ بِقُعُوْدِهِمْ خِلَافَ اَىْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا اَىْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَا تَنْفِرُوْا لَا تَخْرُجُوْا اِلَى الْجِهَادِ فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط مِنْ تَبُوْكَ فَلَاَوْلٰى اَنْ تَتَّقُوْهَا بِتَرْكِ التَّخَلُّفِ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا تَخَلَّفُوْا ـ

৮১. যারা তাবুক যুদ্ধ হতে পশ্চাতে রয়েছিল তারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করত مَقْعَدِهِمْ -অর্থ এদের বসে থাকা। তাঁরা চলে যাওয়ার পর ঘরে বসে থাকতেই আনন্দ লাভ করেছে এবং নিজেদের জান-মালসহ আল্লাহর পথে জিহাদ করা তারা পছন্দ করেনি। তারা বলেছিল, একজন অপরজনকে বলেছিল, গরমের মধ্যে জেহাদের অভিযানে বের হয়ো না। বল, জাহান্নামের আগুন তাবূক প্রান্তর হতে আরো অধিক উত্তপ্ত। সুতরাং তাবূক যুদ্ধ হতে পশ্চাতে না থেকে জাহান্নামাগ্নি হতে মুক্তিলাভের প্রয়াস পাওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি তারা তা বুঝতো জানতো তবে আর তারা পশ্চাতে পড়ে থাকতো না।

٨٢. فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا فِى الدُّنْيَا وَلْيَبْكُوْا فِى الْاٰخِرَةِ كَثِيْرًا ج جَزَاۤءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ خَبَرٌ عَنْ حَالِهِمْ بِصِيْغَةِ الْاَمْرِ ـ

৮২. তারা দুনিয়ায় কিঞ্চিত হেসে নিক পরকালে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাঁরা প্রচুর কাঁদবে। এই স্থানে اَمْر বা নির্দেশবাচক শব্দ [فَلْيَضْحَكُوْا، فَلْيَبْكُوْا] দ্বারা মূলত তাদের বাস্তব অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

٨٣. فَاِنْ رَّجَعَكَ رَدَّكَ اللّٰهُ مِنْ تَبُوْكَ اِلٰى طَاۤئِفَةٍ مِّنْهُمْ مِمَّنْ تَخَلَّفَ بِالْمَدِيْنَةِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ مَعَكَ اِلٰى غَزْوَةٍ اُخْرٰى فَقُلْ لَّهُمْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ط اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ عَنِ الْغَزْوِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ ـ

৮৩. আল্লাহ যদি তোমাকে তাবূক হতে তাদের অর্থাৎ যে সমস্ত মুনাফিক মদিনায় রয়ে গেছে তাদের কোনো দলের নিকট ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার সাথে অন্য কোনো অভিযানে বের হতে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন এদেরকে বলবে, তোমরা তো আমার সাথে কখনো বের হবে না এবং তোমরা আমার সঙ্গী হয়ে কখনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। তোমরা তো প্রথমবারই বসে থাকা পছন্দ করেছিলে সুতরাং যারা পিছনে থাকে অর্থাৎ শিশু, নারী ইত্যাদি যারা যুদ্ধ হতে পিছনে থাকে তাদের সাথেই তোমরা বসে থাক। رَجَعَكَ -অর্থ তোমাকে ফিরিয়ে নেন।

٨٤. وَلَمَّا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَى ابْنِ اُبَىٍّ نَزَلَ وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ط لِدَفْنٍ اَوْ زِيَارَةٍ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ كٰفِرُوْنَ ـ

৮৪. মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে রাসূল ﷺ তাঁর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জানাজা আদায় করবে না এবং তার কবরে] দাফন বা জিয়ারতের উদ্দেশ্যেও দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং সত্যত্যাগী অবস্থায় কাফের অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।

٨٥. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ تَخْرُجَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ـ

৮৫. তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে। আল্লাহ তো তার মাধ্যমেই তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান আর কাফের অবস্থায় যেন তাদের আত্মা বের হয়। দেহত্যাগ করে।

٨٦. وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَىْ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَنْ اَىْ بِاَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ ذَوُو الْغِنٰى مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ـ

৮৬. আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর এই মর্মে যখন কোনো সূরা অর্থাৎ কুরআনের কোনো অংশ নাজিল হয়, তখন তাদের মধ্যে যাদের শক্তি আছে অর্থাৎ যারা অর্থ ও সামর্থ্যের অধিকারী তারা তোমার নিকট অব্যাহতি চায় এবং বলে, আমাদেরকে রেহাই দিন, যারা বসে থাকে, আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব। اَنْ -এটা এই স্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٧. رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ جَمْعُ خَالِفَةٍ اَىِ النِّسَاءِ اللَّاتِىْ تَخَلَّفْنَ فِى الْبُيُوْتِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ الْخَيْرَ ـ

৮৭. এরা অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গে অবস্থান করাই পছন্দ করেছে। তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা মঙ্গল কি তা বুঝতে পারে না। اَلْخَوَالِفُ শব্দটি خَالِفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- ঐ সমস্ত নারী যারা ঘরে অবস্থান করে।

٨٨. لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

৮৮. তবে রাসূল এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা নিজ জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তাদের জন্য রয়েছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। আর তারাই সফলকাম।

٨٩. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্ন দেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এটাই মহা সাফল্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَلْمُخَلَّفُوْنَ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে اِسْم مَفْعُوْل -এর جَمْع مُذَكَّر -এর সীগাহ, অর্থ- পিছনে ফেলে আসা লোকজন। تَخْلِيْف বলা হয় কোনো কিছুকে পেছনে করে দেওয়া, পিছনে ফেলে দেওয়া। এখানে উদ্দেশ্যে সেই বারো জন লোক যারা স্বীয় অলসতা ও নেফাকের কারণে রাসূল ﷺ -এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি।

قَوْلُهٗ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَىْ خَلْفَهٗ : এখানে خِلٰفَ শব্দটি مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ- قَعَدُوْا لِمُخَالَفَتِهٖ অথবা حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ- مُخَالِفِيْنَ لَهٗ ; আবার উহ্য ফে'লের কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। অর্থাৎ- تَخَلَّفُوْا خِلَافَ رَسُوْلِ اللّٰهِ আবার এটা ظَرْفِيَّةٌ -এর কারণে مَنْصُوْب হওয়াও জায়েজ। অর্থাৎ- بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ; আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ মতটিকেই পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهٗ بِمَقْعَدِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَقْعَد -এর مِيم -টি হলো مَصْدَر مِيْمِى ; এটা ظَرْف -এর مِيْم নয়।

قَوْلُهٗ وَكَرِهُوْا اَنْ يُّجَاهِدُوْا : এর আতফ হয়েছে فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ -এর উপর এবং اَنْ يُّجَاهِدُوْا বাক্যটি كَرِهُوْا -এর مَفْعُوْل হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا تَخَلَّفُوْا : এটা لَوْ -এর জবাব, যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ خَبَرٌ عَنْ حَالِهِمْ : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, আল্লাহ তা'আলা হাসির নির্দেশ দেন না, অথচ এখানে فَلْيَضْحَكُوْا আমরের সীগাহ ব্যবহার হয়েছে; যার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তর. এখানে أَمْر টা خَبَر অর্থে হয়েছে; অর্থাৎ তাদের অবস্থার সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য। ضِحْك -এর নির্দেশ দেওয়া উদ্দেশ্যে নয়।

قَوْلُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ : এটা দ্বারা ঐ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে সূরা দ্বারা পূর্ণ সূরা উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআনের একটা অংশ উদ্দেশ্য। এতে পূর্ণ এবং তার চেয়ে কম সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ الخ : এখানে উপর থেকেই মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, যারা সাধারণ নির্দেশ আসার পরেও তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। আলোচ্য আয়াতগুলোতেও তাদেরই এক বিশেষ অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এ কারণে তাদের প্রতি আখিরাতের শাস্তি, দুনিয়াতে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নাম মুজাহিদীনের তালিকা থেকে কেটে দেওয়া এবং পরবর্তী কোনো জিহাদে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। مُخَلَّفُوْنَ শব্দটি مُخَلَّفٌ -এর বহুবচন। অর্থ– 'পরিত্যক্ত'। অর্থাৎ যাকে পরিহার করা বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরা নিজেরা একথা মনে করে আনন্দিত হচ্ছে যে, আমরা নিজেদেরকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিতে পেরেছি এবং জিহাদে শামিল হতে হয়নি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন সম্মান পাবার যোগ্য মনে করেননি। কাজেই এরা জিহাদ বর্জনকারী' নয়; বরং জিহাদ থেকে 'বর্জিত'। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই তাদেরকে বর্জনযোগ্য মনে করেছেন।

قَوْلُهُ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ : এতে خِلَافَ অর্থ– 'পেছনে বা 'পরে'। আবূ ওবায়দা (র.)-এর অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাতে এর মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, এরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জিহাদে চলে যাবার পর তাঁর পেছনে রয়ে যেতে পারল বলে আনন্দিত হচ্ছে, যা বাস্তবিকপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। بِمَقْعَدِهِمْ শব্দটি এখানে قُعُوْدٌ [বসে থাকা] –এর মূলধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থে এক্ষেত্রে خِلَافٌ অর্থ– مُخَالَفَتٌ তথা বিরোধিতাও হতে পারে। অর্থাৎ এরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নির্দেশের বিরোধিতা করে ঘরে বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্য লোকদেরকেও একথাই বুঝাল যে– لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ অর্থাৎ [এমন] গরমের সময় জিহাদে বেরিয়ো না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময় সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন– قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। বস্তুত এর ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানির দরুন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা ভাবছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশি? অতঃপর বলেন– فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, 'হাসো কম' কাঁদো বেশি'। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাফসরিবিদ মনীষীবৃন্দ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারবের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমনটি ঘটা অবধারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তারা আনন্দ ও হাসি প্রকাশ করবে, তবে সেটা অতি সাময়িক। এরপর আখিরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে– اَلدُّنْيَا قَلِيْلٌ فَلْيَضْحَكُوْا فِيْهَا مَا شَاءُوْا فَاِذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَصَارُوْا اِلَى اللّٰهِ فَلْيَسْتَأْنِفُوا الْبُكَاءَ بُكَاءً لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا অর্থাৎ দুনিয়া সামান্য কয়েকদিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে, যা আর বন্ধ হবে না। –[তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয় আয়াতে لَنْ تَخْرُجُوْا বলা হয়েছে। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এর মর্মার্থ নেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না, যখন রওয়ানা হওয়ার সময় হবে, পূর্বেকার মতোই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী ﷺ -এর প্রতি নির্দেশ হলো যে, তারা নিজেরাও যখন কোনো জিহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতলে দিন যে, তোমাদের কোনো কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। বস্তুত তোমরা না যাবে জিহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্থিব শাস্তি হিসেবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোনো জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া না হয়।

قَوْلُهُ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের জন্য ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুনাফিকদের উপর নামাজে জানাজা আদায় না করার নির্দেশ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মৃত্যু হলে তার পুত্র হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজের পিতার জন্য তার একটি জামা দানের আরজি পেশ করে। হুজুর ﷺ তাকে তা দান করেন। এরপর তাকে জানাজা পড়াবার জন্যে আবেদন করলে তিনি জানাজা পড়াবার জন্য তৈরি হন। তখন হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহ পাক মুনাফিকদের জানাজা পড়াবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি বা না করি সবই সমান। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যদি সত্তর বারও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি তবুও আল্লাহ পাক তাকে মাফ করবেন না। আমি তার জন্যে সত্তর বারের চেয়েও অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে সহীহ হাদীসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ আয়াতটি মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাজা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সহীহাইন [অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম] -এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তার জানাজায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়েন। নামাজ পড়ার পরই এ আয়াত নাজিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোনো মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়েননি।

উল্লিখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রথমত প্রশ্ন উঠে এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল, যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মুবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন?

উত্তর. এর দু'টি কারণ থাকতে পারে। যথা- ১. তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠবান সাহাবী ছিলেন, তাঁর আবেদন। অর্থাৎ শুধুমাত্র তাঁর মনতুষ্টির জন্য তিনি এমনটি করেছিলেন। ২. অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গাযওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কুরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী ﷺ -এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। হুজুর ﷺ দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদেরকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেওয়া হোক। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মতো লাগছিল না। ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সে ইহসানের বদলা হিসেবেই মহানবী ﷺ নিজের জামা মুবারক তাকে দিয়ে দেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় প্রশ্ন. এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারূকে আযম (রা.) যে মহানবী ﷺ -কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মুনাফিকদের নামাজ পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোনো আয়াতে পরিষ্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর (রা.) বারণের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আবারো প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাজের বারণের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী ﷺ এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না কেন; বরং তিনি তো বললেন যে, এ আয়াতটিতে আমাকে মুনাফিকদের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

উত্তর. প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলির বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সত্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়; বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফিরাত হবে না যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুজুরকে বারণও করা হয়নি। কুরআনে কারীমের সূরা ইয়াসিনের এক আয়াতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ; এ আয়াতে মহানবী ﷺ -কে দীনের তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি; বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়। যেমন- اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অথবা بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ প্রভৃতি।

সারকথা এই যে, ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ আয়াতের দ্বারা তো মহানবী ﷺ -কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলিলের মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী ﷺ উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের মাগফেরাত হবে না! কিন্তু অপর কোনো আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাঁকে ভীতি প্রদর্শনে বাধাও দেওয়া হয়নি। আর মহানবী ﷺ জানতেন যে, আমার কামীসের কারণ কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফেরাত তো হবে না; কিন্তু এতে অন্যান্য দীনি কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্য কাফেররা যখন হুজুর ﷺ -এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে তখন

তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তা ছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু [মুনাফিকের] জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়ে নেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যেও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সত্তর বারের বেশি দোয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম। -[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, সে হাদীস যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না, তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোনো কোনো তাফসীরগ্রন্থে রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খাজরাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হুজুর ﷺ -এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের এ কাজের দরুন এই মুনাফিকের মাগফিরাত তথা পাপমুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলিতে বাহ্যত এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল অন্য কোনো আয়াতের মাধ্যমে নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপরদিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামাজ পড়াকেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারূকে আযম (রা.) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফিরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাজে জানাযা পড়ে মাগফিরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসেবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রাসূলে মকবুল ﷺ যদিও এ কাজটি মূলত কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাজের উপর কোনো আপত্তি থাকে, না ফারূকে আযম (রা.)-এর কথায় কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

অবশ্য পরিষ্কারভাবে যখন لَا تُصَلِّ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল, তখন প্রতীয়মান হলো যে, যদিও জানাজার নামাজ পড়ার পেছনে একটি দীনী কল্যাণ নিহিত ছিল; কিন্তু এতে একটি অপকারিতাও বিদ্যমান ছিল। সেদিকে মহানবী ﷺ -এর খেয়াল হয়নি। তা ছিল এই যে, স্বয়ং নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনে এ কাজের দরুন উৎসাহহীনতা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর নিকট নিষ্ঠাবান মুসলমান ও মুনাফিক সবাইকে একই পাল্লায় মাপা হয়। এ আশঙ্কার প্রেক্ষিতে কুরআনে এই নিষেধাজ্ঞা নাজিল হয়। অতঃপর মহনবী ﷺ কোনো মুনাফিকের জানাযার নামাজ পড়েননি।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কোনো কাফেরের জানাযার নামাজ পড়া এবং তার জন্য মাগফেরারেত দোয়া করা জায়েজ নয়।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দাঁড়ানো কিংবা তা জেয়ারত করতে যাওয়া জায়েজ নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থি নয়। যেমন হিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোনো মুসলমানের কোনো কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোনো ওলী-ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান আত্মীয় সুন্নত নিয়মের লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁততে পারে। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে; যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহর নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নিয়ামত পাবে?

এর উত্তরে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো রহমত ও নিয়ামত নয়; বরং পার্থিব জীবনেও এগুলো তাদের জন্য আজাব বিশেষ। আখিরাতের আজাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আজাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধনসম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধনসম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখিরাত সম্পর্কে গাফিল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আজাবের কারণ হিসেবেও এগুলোকে আজাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায় لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত ধন সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولُوا الطَّوْلِ শব্দটি সক্ষম লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সক্ষম নয় অর্থাৎ যারা অক্ষম এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক ওজরও ছিল [যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত]।

অনুবাদ :

٩٠. وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَيِ الْمُعْتَذِرُوْنَ بِمَعْنَى الْمَعْذُوْرِيْنَ وَقُرِئَ بِهِ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ فِي الْقُعُوْدِ لِعُذْرِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ط فِي ادِّعَاءِ الْإِيْمَانِ مِنْ مُنَافِقِي الْأَعْرَابِ عَنِ الْمَجِيْءِ لِلْاِعْتِذَارِ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ -

৯০. মরুবাসীদের মধ্যে কিছু অজুহাত পেশকারীরা তাদের ওজর-অসুবিধার কারণে তাদেরকে বসে থাকতে অনুমতি প্রদানের জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট এসেছিলেন। অনন্তর তিনি তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন আর যারা অর্থাৎ মরুবাসী মুনাফিকদের যারা অজুহাত পেশ করতে এসে ঈমানের বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা কথা বলেছিল তারা বসে রইল। তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। اَلْمُعَذِّرُوْنَ শব্দটি মূলত ছিল اَلْمُعْتَذِرُوْنَ ; এটার ذ বর্ণে تَاء -এর إِدْغَام অর্থাৎ সন্ধি সাধিত হয়েছে। اَلْمَعْذُوْرُوْنَ অর্থ- অজুহাত ওয়ালাগণ, অপারগতা প্রকাশকারীগণ, কৈফিয়তদাতাগণ। অপর এক কেরাতে এইরূপেই পঠিত রয়েছে।

٩١. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ كَالشُّيُوْخِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى كَالْعُمْيِ وَالزَّمْنٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ فِي الْجِهَادِ حَرَجٌ إِثْمٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهُ إِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ط فِي حَالِ قُعُوْدِهِمْ بِعَدَمِ الْإِرْجَافِ وَالتَّثْبِيْطِ وَالطَّاعَةِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ بِذٰلِكَ مِنْ سَبِيْلٍ ط طَرِيْقٍ بِالْمُؤَاخَذَةِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لَهُمْ رَحِيْمٌ بِهِمْ فِي التَّوْسِعَةِ فِيْ ذٰلِكَ -

৯১. বসে থাকাকালে মন্দকাজ ও জিহাদ হতে শৈথিল্য প্রদর্শন না করে এবং আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে যারা দুর্বল, যেমন বৃদ্ধগণ, যারা পীড়িত যেমন অন্ধ ও বিকলাঙ্গগণ এবং যারা জিহাদের ব্যয় নিবাহ করতে অসমর্থ জিহাদ হতে পশ্চাতে থাকায় এদের কোনো অসুবিধা নেই, অপরাধ নেই। এতদ্বিষয়ে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অভিযুক্ত করার কোনো কারণ নেই, কোনো পথ নেই। এই সম্পর্কে উদারতা প্রদর্শনে আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল এদের সম্পর্কে পরম দয়ালু।

٩٢. وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ مَعَكَ إِلَى الْغَزْوِ وَهُمْ سَبْعَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقِيْلَ بَنُوْ مُقَرِّنٍ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص حَالٌ تَوَلَّوْا جَوَابُ إِذَا أَيِ انْصَرَفُوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ تَسِيْلُ مِنَ لِلْبَيَانِ الدَّمْعِ حَزَنًا لِأَجْلِ أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ فِي الْجِهَادِ -

৯২. তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগের কোনো হেতু নেই যারা তোমার সাথে যুদ্ধ যাত্রার জন্য তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে "তোমাদেরকে আরোহণ করার মতো কিছু তো পাচ্ছি না। জিহাদ অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে তারা অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরে গেল। এরা ছিলেন সাতজন আনসারী সাহাবী। কেউ বলেন, এরা হলেন বনূ মুকরিনের কতিপয় লোক। قُلْتَ -এটা حَالٌ -বাচক বাক্য; تَوَلَّوْا -এটা পূর্বোল্লিখিত إِذَا -এর জওয়াব। অর্থ- তখন তারা ফিরে গেল। تَفِيْضُ অর্থ- প্রবাহিত হচ্ছিল। مِنَ -এটা এই স্থানে بَيَانٌ বা বিবরণব্যঞ্জক। أَلَّا يَجِدُوْا -এই বাক্যটি হেতুবোধক। তাই এটার পূর্বে তাফসীরে لِأَجْلِ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

৯৩. وَإِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ فِى التَّخَلُّفِ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ لا وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ .

৯৩. যারা সামর্থ্যশালী হয়েও তোমার নিকট পশ্চাতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের হেতু রয়েছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সাথে অবস্থান করাই পছন্দ করে নিয়েছে; আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন। ফলে, তারা বুঝতে পারে না। এই ধরনের আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمُعَذِّرُوْنَ : এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَعْذِيْرٌ মাসদার থেকে اِسْم فَاعِلْ -এর جَمْع مُذَكَّرْ -এর সীগাহ; অর্থ হলো ছোট ওজর পেশকারী। মুফাসসির (র.) مُعَذِّرُوْنَ -এর মূল مُعْتَذِرُوْنَ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مُعَذِّرُوْنَ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ থেকে এসেছে। تَفْعِيْل থেকে নয়। তখন এর অর্থ হবে বাস্তবিক পক্ষেই মাজুর।

قَوْلُهُ اَلزَّمْنٰى : এটা زَمَانَةٌ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো- বিকলাঙ্গ, অক্ষম।

قَوْلُهُ اِرْجَافٌ : এর অর্থ হলো গুজব ছাড়ানো, বিপর্যয় ছড়িয়ে দেওয়া, মুমিনদের মধ্যে খারাপ সংবাদ প্রচার করা। بِعَدَمِ الْاِرْجَافِ এটা نَصَحُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلتَّثْبِيْطِ : অর্থ- বাধা দেওয়া, বিরত রাখা।

قَوْلُهُ وَالطَّاعَةِ : এর আতফ হয়েছে عَدَمِ الْاِرْجَافِ -এর উপর। শুধু اِرْجَافٌ -এর উপর নয়। কাজেই এখন অর্থ ঠিক হয়ে গেল।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ قُلْتَ لَا اَجِدُ এটা اَتَوْكَ -এর كَافْ থেকে قَدْ উহ্য থাকার সাথে حَالٌ হয়েছে। কাজেই এ প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল যে, قَدْ -বিহীন مَاضِىْ -টা حَالٌ হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মদিনা শহরের মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে গ্রাম্য এলাকার মুনাফিকদের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

–[তাফসীরে কবীর খ. ১৬, পৃ. ৫৮, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৩৯১]

প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করলেন, তখন যারা ইসলামের বিরোধিতা করতে সাহস পেলো না, তারা প্রকাশ্যে ইসলামের দাবিদার হলো; কিন্তু গোপনে ইসলামের দুশমনই রয়ে গেল। এরাই মুনাফিক। এদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। মদিনা শহরে যেমন খাঁটি মুসলমানগণ বাস করতেন, তাঁদের সঙ্গে এ মুনাফিকরাও থাকত, ঠিক তেমনিভাবে গ্রাম্য এলাকায় যেখানে বেদুঈনরা বাস করতো, সেখানেও খাঁটি মুসলমানদের পাশাপাশি মুনাফিকরাও থাকত। আলোচ্য আয়াতে তাদের কথাই ইরশাদ হয়েছে। তারা অভাব-অনটনের ওজর আপত্তি পেশ করে বলেছে যে, আমরা অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, আমাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি দিন!

মুহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, কিছু মুনাফিক হুজুর ﷺ -এর খেদমতে জিহাদ থেকে অব্যাহিত লাভের আবেদন করে, অথচ তাদের কোনো ওজর ছিল না, তিনি তাদেরকে অনুমতি দান করেন। ইবনে মরদূবিয়া হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদের জন্যে আহ্বান করলেন, তখন ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তি জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি তাকে অনুমতি দান করেন। এরপর আরো কিছু মুনাফিক আসে, তিনি তাদেরকেও অনুমতি দান করেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এরা বনূ গিফার গোত্রের লোক। এদের সংখ্যা দশের কম ছিল। যাহহাক (র.) লিখেছেন, যাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, তারা হলো আমের ইবনে তোফায়েলের সম্প্রদায়। তারা এসে এভাবে আরজ করেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি আমরা জিহাদে যেতাম, তবে তাঈ গোত্রের জঙ্গী লোকেরা আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার এবং জন্তুগুলো লুট করে নিয়ে যেত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন "আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নে আমাকে তোমাদের খবর দিয়েছেন, ভবিষ্যতে তোমাদের আর প্রয়োজন হবে না, আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যারা টালবাহানা করে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, হুজুর ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ : যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, সেই মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ করে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে, যারা আল্লাহর রাসূলের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহ হয়েছে, তাদের সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে বিশেষ শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যারা কুফর ও নাফরমানির কারণে জিহাদে শরিক হয়নি, তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পৌঁছবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যারা নিতান্ত গাফলতের কারণে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে, তাদের জন্যে শাস্তির ঘোষণা নয়; বরং যারা কুফর ও নাফরমানি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে, তাদের সম্পর্কেই এ শাস্তির ঘোষণা।

ইবনে আবি হাতেম (র.) লিখেছেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লেখক ছিলাম আর সূরা বারাআত লিখছিলাম, কলমকে আমার কানের উপর রেখেছিলাম। হুজুর ﷺ ওহীর অপেক্ষা করেছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ লোক এসে আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি অন্ধ, আমার সম্পর্কে কি আদেশ রয়েছে? ঠিক তখনই নাজিল হলো- لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى অর্থাৎ যারা দুর্বল, অসুস্থ এবং যাদের নিকট ব্যয় করার মতো কিছু নেই, তাদের কোনো দোষ নেই, যদি আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মন পরিষ্কার থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে যারা জিহাদের ব্যাপারে মিথ্যা ওজর আপত্তি পেশ করে অব্যাহতি চেয়েছে তাদের কথা ছিল, আর এ আয়াতে যারা সত্যিই অপারগ, অক্ষম তাদের কথা ইরশাদ হয়েছে। শারীরিক বা আর্থিক অসুবিধার কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে যারা অপারগ, তাদের গুনাহ হবে না বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ضُعَفَاءُ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো পঙ্গু, বৃদ্ধ, দুর্বল এবং অসহায়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো শিশু। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো মহিলা। এমনিভাবে, যারা অন্ধ তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। এসব লোক জিহাদে শরিক না হলে কোনো গুনাহ নেই। তবে শর্ত হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং আনুগত্য থাকতে হবে এবং তারা রসনা ও আমলের মাধ্যমে যথাসম্ভব ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণ সাধন করবে।

জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে সাহাবায়ে কেরামের ক্রন্দন : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র.) বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট আরজি পেশ করে বলেছিলেন, আমাদের জন্যে কিছু যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিন! যখন তাদেরকে প্রিয়নবী ﷺ জানিয়ে দিলেন যে, যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা আপতত সম্ভব নয়, তখন তারা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। এমন কি, তাদের নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তারা অবশেষে এ কথাও বলেছিলেন, আমাদের জন্যে জুতা মোজার ব্যবস্থা করে দিন যেন আমরা আপনাদের পাশাপাশি পদব্রজে দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে পারি। অবশেষে কোনো ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে গেলেন।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মরদূবিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের এক দল হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে যানবাহনের আবেদন পেশ করলেন। এ সাহাবীগণ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু হুজুর আকরাম ﷺ -এর সঙ্গী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যথিত হয়ে ফেরত গেলেন এজন্যে যে, ব্যয় করার মতো তাদের কাছে কিছুই ছিল না।

ইবনে ইসহাক ইউনুস এবং ইবনে ওমরের সূত্রে লিখেছেন, আলীয়া ইবনে যায়েদ যখন কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেন না এবং হুজুর ﷺ -এর নিকটও কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তখন তিনি রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। এরপর এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি জিহাদের আদেশ দিয়েছে এবং এজন্য অনুপ্রাণিত করেছ, অথচ আমার নিকট কোনো যানবাহন নেই। এখন আমি আমার যা কিছু রয়েছে সবই মুসলমানদের জন্যে সদকা করব, সে হকের জন্যে যা আমার উপর বর্তায়। আর এ দায়িত্ব পালনে আমার সম্পদ অথবা দেহ অথবা সম্মান সবই ব্যয় করবো। যখন সকাল হলো, তখন অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আলীয়া (রা.)ও হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আজ রাতে সদকা দানের অঙ্গীকারকারী কোথায়? সমস্ত লোক নীরব ছিলেন, এমন সময় আলীয়া দণ্ডায়মান হয়ে হুজুর ﷺ -কে তাঁর কথা জানিয়ে দিলেন। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার জন্যে সুসংবাদ, শপথ সে আল্লাহ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! তোমার সদকা কবুল হয়েছে এবং তা জাকাত হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, যানবাহনের ব্যবস্থা না হওয়ায় কয়েকজন সাহাবী ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবার থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাদের মধ্যে আবু ইয়ালা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফালও ছিলেন। পথে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলো ইয়ামিন ইবনে আমর নাজারীর সঙ্গে। তাদেরকে ক্রন্দনরত দেখে তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললেন, আমরা যানবাহনের অভাবে তাবুকের জিহাদে শরিক হতে পারছি না। হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়েছিলাম, তাঁর নিকটও কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, এ অভিযানে তাঁর সঙ্গী না হতে পারা আমাদের জন্যে অসহনীয়। ইয়ামিন তাঁদের ক্রন্দনের কারণ জানতে পেরে তাঁদেরকে একটি উষ্ট্র এবং প্রত্যেককে আট সের করে খেজুর দিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আমর বর্ণনা করেন, হযরত আব্বাস (রা.) দু' ব্যক্তির জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করেন এবং হযরত ওসমান (রা.) আরো তিনজনের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন যাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা হয়নি, তাদের সংখ্যা ছিল ষোল। তাদের কয়েকজনের এভাবে ব্যবস্থা হয় যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শুধু সাতজন এমন রয়েছেন যারা জিহাদে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল ছিলেন। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে– وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ অর্থাৎ তাদের দোষ নেই, যারা আপনার নিকট যানবাহনের জন্যে হাজির হলে আপনি বলেছিলেন, আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাতে পারি।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

اَلْجُزْءُ الْحَادِىْ عَشَرَ : একাদশ পারা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٤. يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ فِى التَّخَلُّفِ اِذَا
رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ قُلْ لَهُمْ لَا
تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ نُصَدِّقُكُمْ قَدْ
نَبَّانَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ط اَىْ اَخْبَرَنَا
بِاَحْوَالِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ بِالْبَعْثِ اِلَى عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَىِ اللّٰهِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ .

٩٥. سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ
رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ مِنْ تَبُوْكَ اَنَّهُمْ مَعْذُوْرُوْنَ
فِى التَّخَلُّفِ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط بِتَرْكِ
الْمُعَاتَبَةِ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط اِنَّهُمْ
رِجْسٌ قَذَرٌ لِخُبْثِ بَاطِنِهِمْ وَمَاْوٰهُمْ
جَهَنَّمُ ج جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

٩٦. يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَاِنْ
تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ
الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ اَىْ عَنْهُمْ وَلَا يَنْفَعُ
رِضَاكُمْ مَعَ سَخَطِ اللّٰهِ .

অনুবাদ :

৯৪. তোমরা তাদের নিকট যুদ্ধ হতে ফিরে আসলে তারা তোমাদের নিকট পশ্চাতে থাকার ব্যাপারে অজুহাত পেশ করবে তাদেরকে বল, তোমরা আর অজুহাত দাড় করো না। আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না। অর্থ– কখনোই তোমাদেরকে আমরা বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন। অতঃপর যিনি অদৃশ ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট পুনরুত্থানের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন। অর্থাৎ অতঃপর তোমাদেরকে তিনি তার প্রতিফল দিবেন।

৯৫. তোমরা তাবুক হতে তাদের নিকট ফিরে আসলে অর্থ– তোমরা ফিরে গেলে। পশ্চাতে রয়ে যাওয়ার অজুহাত বর্ণনা করতে গিয়ে তারা আল্লাহর শপথ করবে যেন তোমরা শাস্তি প্রদান না করে তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেহেতু তাদের অন্তর আবিলতাপূর্ণ সেহেতু তারা ঘৃণ্য অপবিত্র। আর তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম হলো তাদের আবাসস্থল।

৯৬. তোমাদের নিকট শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা তাদের প্রতি তুষ্ট হলেও আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থাৎ তাদের প্রতি তুষ্ট হবেন না। আর আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিতে তোমাদের সন্তুষ্টি কোনো উপকারে আসবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٧. اَلْاَعْرَابُ اَهْلُ الْبَدْوِ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا
مِنْ اَهْلِ الْمُدُنِ لِجَفَائِهِمْ وَغِلَظِ
طِبَاعِهِمْ وَبُعْدِهِمْ عَنْ سِمَاعِ الْقُرْاٰنِ
وَاَجْدَرُ اَوْلٰى اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنَ الْاَحْكَامِ
وَالشَّرَائِعِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ حَكِيْمٌ
فِىْ صُنْعِهٖ بِهِمْ ـ

৯৭. মরুবাসীরা অর্থাৎ গ্রামবাসী বেদুঈনরা কুফরি ও মুনাফিকীতে রুক্ষতা, কর্কশতা এবং কুরআন শ্রবণ হতে দূরে থাকার দরুন নগরবাসীদের তুলনায় কঠোরতর এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ যে সমস্ত হুকুম-আহকাম ও শরিয়তের বিধিবিধান অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখার জ্ঞান লাভ না করারই অধিক উপযুক্ত। اَجْدَرُ অর্থ– অধিক উপযুক্ত। اَنْ এ স্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে খুব অবহিত তাদের সাথে তাঁর কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়।

٩٨. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ مَغْرَمًا غَرَامَةً وَّخُسْرَانًا
لِاَنَّهٗ لَا يَرْجُوْ ثَوَابَهٗ بَلْ يُنْفِقُهٗ خَوْفًا
وَهُمْ بَنُوْ اَسَدٍ وَّغَطْفَانُ وَيَتَرَبَّصُ
يَنْتَظِرُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ دَوَائِرَ الزَّمَانِ اَنْ
يَّنْقَلِبَ عَلَيْكُمْ فَيَتَخَلَّصَ عَلَيْهِمْ
دَائِرَةُ السَّوْءِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ اَىْ يَدُوْرُ
الْعَذَابُ وَالْهَلَاكُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْكُمْ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِاَقْوَالِ عِبَادِهٖ عَلِيْمٌ
بِاَفْعَالِهِمْ ـ

৯৮. মরুবাসীদের কেউ কেউ এমন যে আল্লাহ তা'আলার পথে যা ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক করে অর্থাৎ দায় ও ক্ষতি বলে মনে করে। কেননা তারা তার ছওয়াবের আশা রাখে না। কেবলমাত্র ভয়ে ও আশঙ্কায় তারা তা ব্যয় করে। আর তারা তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়েরই অপেক্ষা করে। অর্থাৎ তারা এ প্রতিক্ষায় আছে যে, কালের আবর্তনে তোমাদের উপর বিপদ নেমে আসবে আর তারা রেহাই পাবে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই اَلسَّوْءُ -এর س -এ পেশ ও ফাতাহ উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের উপর নয় বরং তাদের উপরই ধ্বংস এবং আজাব নেমে আসুক। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কথাবার্তা শুনেন, তাদের ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে জানেন। এ আরবরা হলো আসাদ এবং গাতফান গোত্র।

٩٩. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ كَجُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ وَيَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ فِىْ سَبِيْلِهٖ قُرُبٰتٍ تُقَرِّبُهٗ عِنْدَ
اللّٰهِ وَ وَسِيْلَةً اِلٰى صَلَوٰتِ دَعَوَاتِ
الرَّسُوْلِ ط لَهُمْ اَلَا اِنَّهَا اَىْ نَفَقَتُهُمْ
قُرْبَةٌ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِهَا ط لَّهُمْ عِنْدَهٗ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط جَنَّتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ لِاَهْلِ طَاعَتِهٖ رَحِيْمٌ بِهِمْ ـ

৯৯. মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে যেমন জুহাইনা এবং মুযাইনা গোত্র। তারা তাঁর [আল্লাহর] পথে যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এবং তাদের স্বপক্ষে রাসূলের সালাওয়াত অর্থাৎ দোয়া পাওয়ার অসিলা হিসেবে মনে করে। শুনে রাখ! বাস্তবিকই তা অর্থাৎ তাদের এ ব্যয় তাদের জন্য তাঁর সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন। আল্লাহ তাদেরকে অচিরেই তাঁর রহমত জান্নাতে প্রবেশ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর অনুগতদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের বিষয়ে পরম দয়ালু। قُرُبٰتٍ অর্থ– সান্নিধ্য লাভের অবলম্বন। قُرْبَةٌ এর ر অক্ষরটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ : এ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের আগাম অবস্থা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, যখন মুনাফিকদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের ওজর পেশ করবে। এখানে قُلْ -এর মুখাতাব যদি রাসূল ﷺ হন যেমনটি সুস্পষ্ট; তবে كُمْ বহুবচনের যমীর আনা হয়েছে সম্মানার্থে আর যদি كُمْ যমীর দ্বারা রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণ উদ্দেশ্য হন তবে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সর্বাধিনায়ক বা মহাপরিচালক হিসেবে।

قَوْلُهُ تُصَدِّقُكُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَكُمْ -এর মধ্যে لَامْ টি অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ وَرَسُوْلُهُ : এর আতফ হলো اَللّٰهُ শব্দের উপর। আর মাঝখানে رُؤْيَتْ -এর মাফঊলকে এটা প্রকাশ করার জন্য নিয়েছেন যে, প্রতিদান ও ছওয়াব এবং ধমক ও শাস্তির সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার رُؤْيَتْ -এর সাথে।

قَوْلُهُ الْاَعْرَابُ : এটা اِسْم جَمْع যা বহুবচনের সুরতে হয়েছে। এটা عَرَبٌ -এর বহুবচন নয়। কেননা عَرَبٌ আরবি ভাষীকে বলে চাই সে গ্রাম্য হোক বা শহুরে হোক। আর اَعْرَابٌ টা اَعْرَابِيٌّ -এর বহুবচন। যার অর্থ গ্রাম্য ব্যক্তি।

قَوْلُهُ جَفَاءٌ : এর অর্থ হলো– হৃদয়ের কাঠিন্য, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন।

قَوْلُهُ الدَّوَائِرُ : এটা دائرة -এর বহুবচন। অর্থ হলো– বালামসিবত। دَوَائِرُ الزَّمَانِ অর্থ– কালের দুর্যোগ, মসিবত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফিকদের আলোচনা ছিল যারা গাযওয়ায়ে তাবুকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জিহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদিনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদিনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফিকরা ওজর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুত ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–

১. যখন এরা আপনার কাছে ওজর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, অযথা মিথ্যা ওজর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দৌরাত্ম্য এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোনো রকম ওজর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তারপর বলা হয়েছে– وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ। এতে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে, এখনো যেন তারা মুনাফিকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় তা তোমাদের কোনো উপকারই সাধন করবে না।

২. দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি যেন তাদের জিহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং এবং সেজন্য যেন কোনো ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বাসনা পূরণ করে দিন। فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভর্ৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ ভর্ৎসনা করে কোনো ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। অযথা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

৩. তৃতীয় আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাজি করাতে চাইবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাজি হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাজি হয়ে গেলেন বলে যদি ধরেও নেওয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোনো লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজি নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরি ও মুনাফিকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ তা'আলা কেমন করে রাজি হবেন!

قَوْلُهُ الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا الخ : বিগত আয়াতগুলোতে মদিনার মুনাফিকদের আলোচনা ছিল। আর বর্তমান আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সমস্ত মুনাফিকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মদিনার উপকণ্ঠে এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত।

اَعْرَابُ শব্দটি عَرَبٌ শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদবিশেষ যা শহরের বাইরের অধিবাসীদের বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একক করতে হলে اَعْرَابِىٌّ বলা হয়। যেমন– اَنْصَارٌ-এর একবচন اَنْصَارِىٌّ হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরি ও মুনাফিকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশি কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা ইলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। اَجْدَرُ اَنْ لَا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ। অর্থাৎ এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ না কুরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা জাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে একপ্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরিকে লুকাবার জন্য নামাজও পড়ে নেয় এবং ফরজ জাকাত দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোনো রকমে মুসলমানদের উপর কোনো বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। اَلدَّوَائِرُ শব্দটি دَائِرٌ-এর বহুবচন। আরবি অভিধান অনুযায়ী دَائِرَةٌ [দায়েরাহ] এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভালো অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কুরঅন কারীম তাদের উত্তরে বলেছে– عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজকর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনার কুরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সঙ্গত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে, তাঁদের অবস্থা হলো এই যে, তাঁরা যে সদকা-জাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়া প্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে। সদকা যে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কুরআন কারীমে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মুসলমানদের কাছ থেকে জাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সদকা উসুল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صَلٰوةٌ শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দোয়াকে صَلٰوةٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

١٠٠. وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ
وَالْاَنْصَارِ وَهُمْ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا اَوْ جَمِيْعُ
الصَّحَابَةِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ بِاِحْسَانٍ فِى الْعَمَلِ رَضِىَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ بِطَاعَتِهٖ وَرَضُوْا عَنْهُ بِثَوَابِهٖ
وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ
وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِزِيَادَةِ مِنْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অনুবাদ :

১০০. মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রবর্তী অর্থাৎ যারা বদর যুদ্ধে শরিক ছিলেন তারা বা সকল সাহাবীই তার অন্তর্ভুক্ত এবং যারা কিয়ামত পর্যন্ত কাজেকর্মে উত্তমত ও একনিষ্ঠতাসহ তাদেরকে অনুগমন করে আল্লাহ তাঁর প্রতি আনুগত্যের কারণে তাদের প্রতি প্রসন্ন ও তারাও তৎপ্রদত্ত ছওয়াব ও পুণ্যফল দর্শনে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। অপর এক কেরাতে تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ-এর পূর্বে একটি مِنْ সহ পঠিত রয়েছে। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা সাফল্য।

١٠١. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ مِّنَ
الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ط كَاَسْلَمَ وَاَشْجَعَ
وَغِفَارٍ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قف مُنٰفِقُوْنَ
اَيْضًا مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَجُّوْا فِيْهِ
وَاسْتَمَرُّوْا لَا تَعْلَمُهُمْ ط خِطَابٌ لِلنَّبِىِّ
ﷺ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ط سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ
بِالْفَضِيْحَةِ اَوِ الْقَتْلِ فِى الدُّنْيَا
وَعَذَابِ الْقَبْرِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ اِلٰى
عَذَابٍ عَظِيْمٍ هُوَ النَّارُ.

১০১. হে মদিনাবাসীগণ, মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে রয়েছে তাদের কেউ কেউ মুনাফিক যেমন আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্র এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক। তারা মুনাফিকীতে সিদ্ধ। তাতেই তারা মত্ত এবং তাতেই তারা কালাতিপাত করে। তুমি তাদেরকে জান না لَا تَعْلَمُ এ শব্দটিতে তুমি বলে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত বা নিহত করে আর কবরে আজাব দিয়ে দু-বার শাস্তি দেব। অতঃপর তারা পরকালে প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তি অর্থাৎ মহাগ্নির দিকে।

١٠٢. وَ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ مُبْتَدَاٌ اعْتَرَفُوْا
بِذُنُوْبِهِمْ مِنَ التَّخَلُّفِ نَعْتُهُ وَالْخَبَرُ
خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَهُوَ جِهَادُهُمْ
قَبْلَ ذٰلِكَ اَوِ اعْتِرَافُهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ اَوْ
غَيْرُ ذٰلِكَ وَّاٰخَرَ سَيِّئًا وَهُوَ تَخَلُّفُهُمْ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

১০২. এবং অপর কতক সম্প্রদায় اٰخَرُوْنَ এটা مُبْتَدَاٌ বা উদ্দেশ্য। নিজেদের পশ্চাতে থাকার অপরাধ স্বীকার করেছে। اِعْتَرَفُوْا এটা উক্ত مُبْتَدَاٌ-এর نَعْت বা বিশেষণ আর خَلَطُوْا টি خَبَرٌ বা বিধেয়। তারা সৎকর্মের সাথে অর্থাৎ পূর্বের জিহাদসমূহে অংশগ্রহণ করা বা এ অপরাধের স্বীকার করে নেওয়া বা ইত্যাদি অন্যান্য যে সৎ আমলসমূহ রয়েছে তার সাথে অপকর্মের অর্থাৎ এ জিহাদ হতে পশ্চাতে থাকার মিশ্রণ করে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَزَلَتْ فِي أَبُو لُبَابَةَ وَجَمَاعَةٍ أَوْثَقُوا
أَنْفُسَهُمْ فِي سَوَارِي الْمَسْجِدِ لَمَّا
بَلَغَهُمْ مَا نَزَلَ فِي الْمُتَخَلِّفِيْنَ
وَحَلَفُوْا أَنْ لَا يَحُلَّهُمْ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ
فَحَلَّهُمْ لَمَّا نَزَلَتْ .

যারা এ জিহাদ হতে পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তাদের সম্পর্কে যে হুমকিপূর্ণ আয়াত নাজিল হয়েছে তা জানতে পেরে হযরত আবূ লুবাবা এবং তাঁর মতো আরো কতিপয় সাহাবী [যাঁরা এ যুদ্ধে শরিক হননি।] নিজেদেরকে মসজিদের স্তম্ভে বেঁধে রাখেন এবং শপথ করেন, রাসূলে কারীম ﷺ নিজের হস্তে খুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা এ বন্ধন খুলব না। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। তা নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাঁদের বন্ধন খুলে দেন।

١٠٣. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا مِنْ ذُنُوْبِهِمْ فَأَخَذَ ثُلُثَ
أَمْوَالِهِمْ وَتَصَدَّقَ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
أُدْعُ لَهُمْ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ رَحْمَةٌ لَّهُمْ
وَقِيْلَ طَمَانِيْنَةٌ بِقَبُوْلِ تَوْبَتِهِمْ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

১০৩. তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করবে। তার মাধ্যমে তুমি তাদরকে পাপ হতে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। এটা নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ তাদের সম্পদ হতে এক তৃতীয়াংশ নিয়ে সদকা করে দিয়েছিলেন। তুমি তাদের উপর সালাত বর্ষণ করবে অর্থাৎ তাদের জন্য দোয়া করবে। তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তিকর, অর্থাৎ রহমতস্বরূপ। কেউ কেউ বলেন, তার [سَكَنٌ -এর] অর্থ হলো, তাদের তওবা কবুল করার মাধ্যমে তা তাদের চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

١٠٤. أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ يَقْبَلُ الصَّدَقٰتِ وَأَنَّ
اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ عَلٰى عِبَادِهِ بِقَبُوْلِ
تَوْبَتِهِمْ الرَّحِيْمُ بِهِمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ
لِلتَّقْرِيْرِ وَالْقَصْدُ بِهِ تَهْيِيْجُهُمْ إِلَى
التَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ .

১০৪. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদকা গ্রহণ করেন, তা কবুল করেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করত তাদের প্রতি অতি ক্ষমা পরবশ, তাদের সম্পর্কে পরম দয়ালু। أَلَمْ এ প্রশ্নবোধকটি এ স্থানে تَقْرِيْر বা বিষয়টিকে সুসাব্যস্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হলো, তওবা ও সদকার প্রতি মানুষকে আরো উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

١٠٥. وَقُلِ لَهُمْ أَوْ لِلنَّاسِ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ
فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ بِالْبَعْثِ إِلٰى
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَيِ اللّٰهِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .
فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ .

১০৫. তাদেরকে বা সকল মানুষকে বল, যা ইচ্ছা তোমরা কর; আল্লাহ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণও করবে। পুনরুত্থানের মাধ্যমে অচিরেই তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল কিছুর পরিজ্ঞাতার নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠٦. وَاٰخَرُوْنَ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ مُرْجَوْنَ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهِ مُؤَخَّرُوْنَ عَنِ التَّوْبَةِ لِاَمْرِ اللّٰهِ فِيْهِمْ بِمَا يَشَاءُ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ بِاَنْ يُمِيْتَهُمْ بِلَا تَوْبَةٍ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيْمٌ فِيْ صُنْعِهِ بِهِمْ وَهُمُ الثَّلَاثَةُ الْاٰتُوْنَ بَعْدُ مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَهِلَالُ بْنُ اُمَيَّةَ تَخَلَّفُوْا كَسَلًا وَمَيْلًا اِلَى الدَّعَةِ لَا نِفَاقًا وَلَمْ يَعْتَذِرُوْا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَغَيْرِهِمْ فَوُقِّفَ اَمْرُهُمْ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَهَجَرَهُمُ النَّاسُ حَتّٰى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ بَعْدُ.

১০৬. আর পশ্চাতে যারা রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অপর কতক এমন যাদের বিষয়টি আল্লাহর যদৃচ্ছা সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় স্থগিত রইল। مُرْجَوْنَ শব্দটির ج -এর পরে হামযাসহ ও তা ব্যতিরেকে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তাদের তওবা কবুল করা বিলম্বিত করা হলো। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তওবাহীন অবস্থায় তাদের মৃত্যুদান করত তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর নয়তো ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত এবং তাদের বিষয়ে তাঁর কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়। তারা হলেন ঐ তিনজন যাদের কথা পরে আসছে। অর্থাৎ হযরত মুরারা ইবনুর রবী, হযরত কা'ব ইবনে মালেক এবং হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া। তাঁরা মুনাফিকীতে নয়; বরং অলসতা এবং আরামের খেয়ালে পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ -এর প্রত্যাবর্তনের পর অন্যান্য [মুনাফিকদের মতো মিথ্যা] অজুহাতও তাঁরা প্রদর্শন করেননি। তাদের তওবার বিষয়টি পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত স্থগিত ছিল। লোকেরা তাদের সাথে বয়কট করেছিল। শেষ পর্যন্ত পরে তাদের তওবা কবুল হওয়ার আয়াত নাজিল হয়।

١٠٧. وَ مِنْهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا وَهُمْ اِثْنَا عَشَرَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ ضِرَارًا مُضَارَّةً لِاَهْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكُفْرًا لِاَنَّهُمْ بَنَوْهُ بِاَمْرِ اَبِيْ عَامِرِ الرَّاهِبِ لِيَكُوْنَ مَعْقِلًا لَهُ يَقْدَمُ فِيْهِ مَنْ يَاْتِيْ مِنْ عِنْدِهِ وَكَانَ ذَهَبَ لِيَاْتِيَ بِجُنُوْدٍ مِنْ قَيْصَرَ لِقِتَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّوْنَ بِقُبَاءٍ بِصَلٰوةِ بَعْضِهِمْ فِيْ مَسْجِدِهِمْ وَاِرْصَادًا تَرَقُّبًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ ط اَيْ قَبْلَ بِنَائِهِ.

১০৭. এবং তাদের মধ্যে একদল এমন যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে তারা ছিল বারোজন মুনাফিকের একটি দল। ক্ষতিসাধন অর্থাৎ কুবাবাসীদের ক্ষতি করা, কুফরি মু'মিনদের মধ্যে অর্থাৎ যারা কুবা মসজিদে নামাজ পড়তেন তাদের কিছু সংখ্যাককে এ তথাকথিত মসজিদে নিয়ে এসে পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ তথাকথিত মসজিদটি আবূ আমির নামক ইসলামের দুশমন জনৈক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর নির্দেশে নির্মাণ করেছিল। এটা ছিল তার চক্রান্তের ঘাঁটি। যারা তাঁর নিকট হতে গোপন সংবাদ নিয়ে আসত তারা এখানে অবস্থান করত। সে নিজে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য রোম সম্রাট কায়সারের নিকট সৈন্য সাহায্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। এবং ইতঃপূর্বে অর্থাৎ তা নির্মাণের পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে অর্থাৎ তাদের নেতা আবূ আমীরের গোপন ঘাঁটিস্বরূপ মুসলিমদের গতিবিধি ও তৎপরতা লক্ষ্য রাখার ঘাঁটিস্বরূপ। তারা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَهُوَ اَبُو عَامِرِ الْمَذْكُوْرُ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ مَا اَرَدْنَا بِبِنَائِهِ اِلَّا الْفِعْلَةَ الْحُسْنٰى مِنَ الرِّفْقِ بِالْمِسْكِيْنِ فِى الْمَطَرِ وَالْحَرِّ وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ ـ

অবশ্যই শপথ করে বলবে, এর নির্মাণে ভালো ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। اِنْ টি এই স্থানে না-বাচক শব্দ مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْحُسْنٰى -এর পূর্বে اَلْفِعْلَةَ [কাজ] শব্দটি উহ্য। তা [اَلْحُسْنٰى-ভালো] এর বিশেষণ। অর্থাৎ তারা বলবে, গরম ও বৃষ্টির সময় দরিদ্র লোকদের জন্য কিছু সুবিধা এবং মুসলিমদের স্থান সংকুলানের কিছুটা ব্যবস্থা করা ভিন্ন তাতে আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা এ কথায় বাস্তবিকই মিথ্যাবাদী।

١٠٨. وَكَانَ سَأَلُوا النَّبِىَّ ﷺ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ فَنَزَلَ لَا تَقُمْ تُصَلِّ فِيْهِ اَبَدًا ـ فَاَرْسَلَ جَمَاعَةً هَدَمُوْهُ وَ حَرَّقُوْهُ وَجَعَلُوْا مَكَانَهُ كُنَاسَةً تُلْقٰى فِيْهَا الْجِيَفُ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ بُنِيَتْ قَوَاعِدُهُ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ يَوْمَ حَلَلْتَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ كَمَا فِى الْبُخَارِىِّ اَحَقُّ مِنْهُ اَنْ اَىْ بِاَنْ تَقُوْمَ تُصَلِّىَ فِيْهِ ـ فِيْهِ رِجَالٌ هُمُ الْاَنْصَارُ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا ـ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ـ اَىْ يُثِيْبُهُمْ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الطَّاءِ ـ رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ اَنَّهُ ﷺ اَتَاهُمْ فِىْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ ـ

১০৮. তারা রাসূল ﷺ-কে এ তথাকথিত মসজিদটিতে নামাজ পড়তে অনুরোধ জানিয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তুমি তাতে কখনো দাঁড়াইও না অর্থাৎ সালাত পড়ো না। অনন্তর রাসূল ﷺ একদল সাহাবী প্রেরণ করেন। তাঁরা এ তথাকথিত মসজিদটি বিধ্বস্ত করে দেন এবং জ্বালিয়ে দেন। পরে ঐ স্থানটিকে আবর্জনা ফেলার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মরা পশু ইত্যাদি সেই স্থানে ফেলা হতো। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে اُسِّسَ অর্থ– ভিত স্থাপন করা হয়েছে। তাকওয়ার উপর তাতেই তোমার দাঁড়ানো اَنْ এ স্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সালাত আদায় করা এ ক্ষতিকর মসজিদটির তুলনায় অধিক সমুচিত। যেদিন রাসূল ﷺ প্রথম হিজরত করে আসেন তখন এ মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বুখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ মসজিদটিই হলো কুবার মসজিদ। তাতে এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্রতা ভালোবাসে। তারা হলেন আনসার সাহাবীগণ। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে তার বিনিময় দান করবেন। اَلْمُطَّهِّرُوْنَ তাতে মূলত ط -এ ت অক্ষরের اِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে। ইবনে খুযাইমা তৎসংকলিত সহীহ উআইমার ইবনে সায়িদা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ﷺ মসজিদে কুবায় তশরিফ নিয়ে আসলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ فِى الطُّهُوْرِ فِىْ قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ فَمَا هٰذَا الطُّهُوْرُ الَّذِىْ تَطَّهَّرُوْنَ بِهٖ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَعْلَمُهُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْيَهُوْدِ وَكَانُوْا يَغْسِلُوْنَ أَدْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوْا وَفِىْ حَدِيْثٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فَقَالُوْا كُنَّا نَتْبَعُ الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ فَقَالَ هُوَ ذٰلِكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ.

এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তোমাদের পবিত্রতা সম্পর্কেও খুব সুন্দর প্রশংসা করেছেন। বল তো, তোমরা কি ধরনের পবিত্রতা অর্জন করে থাক? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহর শপথ! বিশেষ কিছু তো আমাদের জানা নেই, তবে এতটুকু বলতে পারি যে, আমাদের কতিপয় ইহুদি প্রতিবেশী ছিল। তারা শৌচকার্যে পানি ব্যবহার করত। তাদের মতো আমরাও তা করে থাকি। বায্যার বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, তারা বলেছিলেন, আমরা শৌচকার্যে ঢিলা ব্যবহার করার সাথে সাথে পানিও ব্যবহার করে থাকি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আসলে তাই ঐ প্রশংসার কারণ। তোমরা এ আমল দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক।

---

١٠٩. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى تَقْوٰى مَخَافَةً مِنَ اللّٰهِ وَرَجَاءَ رِضْوَانٍ مِنْهُ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى شَفَا طَرَفِ جُرُفٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِهَا جَانِبٍ هَارٍ مُشْرِفٍ عَلَى السُّقُوْطِ فَانْهَارَ بِهٖ سَقَطَ مَعَ بَانِيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ط خَيْرٌ تَمْثِيْلٌ لِلْبِنَاءِ عَلٰى ضِدِّ التَّقْوٰى بِمَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ وَالْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ أَىِ الْأَوَّلُ خَيْرٌ وَهُوَ مِثَالُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالثَّانِىْ مِثَالُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

১০৯. যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া তাঁর ভয় [ও] তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশার উপর স্থাপন করে সে উত্তম না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাতের ধসনুখ কিনারায়। شَفَا অর্থ– কিনারা। جُرُفٍ তার ر অক্ষরটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপে পাঠ করা যায়। অর্থ এক কিনারা। هَارٍ অর্থ– ধসনুখ। ফলে যা তাকে তার নির্মাতাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? খসে পড়ে। তা তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির বিপরীত বস্তুর উপর ভিত্তি করত গৃহ নির্মাণের মারাত্মক পরিমাণের একটি উদাহরণ। تَقْرِيْر বা বিষয়টির সুসাব্যস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠা অর্থে, এ স্থানে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার করা হয়েছে, তার মর্ম হলো যে প্রথম ধরনের গৃহই উত্তম। প্রথমটি হলো মসজিদে কুবার উদাহরণ। আর দ্বিতীয়টি হলো মসজিদে জিরার বা ঐ ক্ষতিকর মসজিদটির উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

Free@www.e-ilmweebly.com

١١٠. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِىْ بَنَوْا رِيْبَةً شَكًّا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلَّا اَنْ تَقَطَّعَ تَنْفَصِلَ قُلُوْبُهُمْ ط بِاَنْ يَمُوْتُوْا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهِ بِهِمْ

১১০. তাদের গৃহ যা তারা নির্মাণ করেছে তা তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে رِيْبَةً অর্থ- সন্দেহ। যে পর্যন্ত না তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ মরে আলাদা হয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর কার্যে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ : এ বাক্যের সর্বোৎকৃষ্ট তারকীব হলো এই যে, مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ হলো صِفَتٌ; সিফত ও মওসূফ মিলে মুবতাদা। اَلسّٰبِقُوْنَ হলো مَوْصُوْف আর اَلْاَوَّلُوْنَ হলো মা'তূফ وَالَّذِيْنَ আর اَلسّٰبِقُوْنَ-এর উপর। আর اِتَّبَعُوْهُمْ হলো اَلَّذِيْنَ-এর সেলাহ। আর بِاِحْسَانٍ টা উভয়ের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে حَالٌ হয়েছে। رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এটা জুমলা হয়ে اَلسّٰبِقُوْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। এই তারকীব ছাড়াও কেউ কেউ আরো দুটি তারকীব করেছেন। কিন্তু اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ প্রণেতা সেগুলো দুর্বল বরং ভুল বলেছেন। প্রথম তারকীব হলো اَلسّٰبِقُوْنَ মুবতাদা আর اَلْاَوَّلُوْنَ হলো তার খবর। দ্বিতীয় তারকীব হবে اَلسّٰبِقُوْنَ হলো মুবতাদা আর مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَجَمِيْعُ الصَّحَابَةِ : এ ইবারতের মধ্যে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ-এর মধ্যকার দুটি উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِزِيَادَةِ مِنْ : অর্থাৎ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

قَوْلُهُ مَرَدُوْا : এ শব্দটি مَاضِى- جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থাৎ تَمَرَّنُوْا عَلَيْهِ দক্ষ ও নিপুণ হয়ে গেল। প্রত্যেক কল্যাণ শূন্য হয়ে পড়ল। এর থেকেই اَلشَّيْطَانُ التَّمَارِدُ মন্দের উপর জমে বসে গেছে।

قَوْلُهُ قَوْمٌ : قَوْمٌ শব্দটি উহ্য মেনে এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন যে, মুবদাতার জন্য ذَاتٌ হওয়া জরুরি। অথচ اٰخَرُوْنَ টা ذَاتٌ নয়; বরং তা وَصْفٌ তাই قَوْمٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَلْاٰخَرُوْنَ হলো সিফত আর তার মওসূফ যা মুবতাদা তা হলো উহ্য قَوْمٌ কাজেই কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ نَعْتُهُ : এটা সেই সংশয়ের জবাব যে, قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ হলো نَكِرَةٌ আর نَكِرَةٌ মুবতাদা হতে পারে না। এর জবাব দিয়েছেন যে, اِعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ এটা قَوْم-এর সিফত যার কারণে قَوْمٌ টি نَكِرَةٌ থাকেনি। কাজেই قَوْمٌ টা মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْمٌ سَوَارِىْ : এটা سَارِيَةٌ-এর বহুবচন, স্তম্ভকে বলা হয়।

قَوْلُهُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ : এখানে تُطَهِّرُ টা صَدَقَةً-এর সিফত تُطَهِّرُ-এর যমীরের দিকে ফিরেছে। تُطَهِّرُ টা مُضَارِعٌ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبٌ-এর সীগাহ। আর যদি تُطَهِّرُ টা حَاضِر-এর সীগাহ হয় আর مُخَاطَبٌ হন রাসূল ﷺ-তবে بِهَا-এর সম্পর্ক تُطَهِّرُ এবং تُزَكِّيْهِمْ উভয়ের সাথে হবে। অর্থাৎ تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

قَوْلُهُ مُرْجَؤُوْنَ : এখানে হামযা ব্যতীতও একটি কেরাত রয়েছে অর্থাৎ مُرْجَوْنَ তথা مُؤَخَّرُوْنَ এবং مَوْقُوْفُوْنَ। এটা اِرْجَاءٌ হতে اِسْم مَفْعُوْل- جَمْع مُذَكَّر-এর সীগাহ। অর্থ সে সকল লোক যাদের লেনদেন পরিহার করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَبِىْ عَامِرٍ : সে ছিল গাসীলুল মালাইকা হযরত হানযালা (রা.)-এর পিতা। সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। যখন রাসূল ﷺ মদিনায় আগমন করলেন তখন সে মহানবী ﷺ-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।

قَوْلُهُ مَعْقِلًا : অর্থ- ঠিকানা, আশ্রয়স্থল।

قَوْلُهُ الْفَعْلَةَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْحُسْنٰى হলো সিফত আর তার মওসূফ হলো اَلْفَعْلَةَ বা اَلْخَصْلَةَ ইত্যাদি যা উহ্য রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِالْمِسْكِيْنِ : কোনো কোনো নুসখায় بِالْمِسْكِيْنِ-এর স্থলে بِالْمُسْلِمِيْنَ রয়েছে, যা অধিক সমীচীন।

قَوْلُهُ شَفَا : অর্থ– কূপের কাঁচা কিনারা, নদী, পুকুর ইত্যাদির পানি মুক্ত কিনারা বা পার্শ্ব, সমুদ্র সৈকত।

قَوْلُهُ هَارٍ : এটা اِسْمُ فَاعِلٌ-এর সীগাহ। অর্থ– পড়ে যাওয়ার নিকটবর্তী। মূলবর্ণ (ه و ر) هَار শব্দটি মূলত هَاوِر অথবা هَائِرٌ ছিল। رَا:-কে অথবা هَائِرٌ-এর هَمْزَةٌ-কে قَلْبِ مَكَانِىْ তথা স্থানভিত্তিক পরিবর্তন করে هَاوِرٌ-এর وَاو-এর পরে করে দিয়েছে ফলে هَاوِرُ বা هَارُ হয়ে গেছে। এরপর وَاو বা هَمْزَة-কে يَا দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে هَارِىْ হয়ে গেছে। এরপর كَسْرَة-এরপর يَا-এর উপর পেশ কঠিন হওয়ার কারণে يَا-কে সাকিন করে দিয়েছে। এরপর يَا সাকিন ও তানবীনের মাঝে দু সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে يَا-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে هَارٌ হয়ে গেছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, هَاوِرٌ-এর وَاو-কে বা هَائِرٌ-এর يَا-কে قَلْبِ مَكَانِىْ ব্যতীত تَخْفِيْفًا ফেলে দেওয়ার ফলে هَارٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَعَ بَانِيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِهِ-এর মধ্যে بَا টি مَعَ অর্থে হয়েছে, سَبَبِيَّة হয়নি।

قَوْلُهُ تَمْثِيْلٌ لِلْبِنَاءِ بِمَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ : اِلَيْهِ-এর مَرْجِعْ হলো سُقُوْط এটা সেই بِنَاء-এর تَمْثِيْل যা তাকওয়ার বিপরীতে বিনির্মিত হয়েছে। অর্থাৎ مُشَبَّهْ بِهِ সেই অট্টালিকা যা এমন জায়গায় বানানো হয়েছে যা ধসে যাওয়া ও দেবে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে। আর مُشَبَّهْ হলো ধর্মীয় বিধান ও আমল সমূহকে কুফর ও নেফাকের উপর مُرَتَّبْ করা।

قَوْلُهُ رِيْبَةً : অর্থাৎ سَبَبُ رِيْبَةٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الخ : এর পরবর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবান বেদুইন মু'মিনদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে সাধারণ নিষ্ঠাবান মু'মিনদের আলোচনা হচ্ছে, যাতে তাদের মর্যাদা ও ফজিলতেরও বিবরণ রয়েছে।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয়কে অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ تَبْعِيْض-এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজিরীন ও আনসারদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। ১. ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং ২. অন্যান্য সাহায়ে কেরাম। এমন করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা [অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ]-এর দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাদেরকে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ গণ্য করেছেন। এমনটি হলো সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব ও হযরত কাতাদা (র.)-এর। হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আউওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (র.)-এর মতে যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার বায়'আতে রেজওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আউওয়ালীন'। বস্তুত প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবা মুহাজির হোক বা আনসার 'সাবেকীনে আউওয়ালীনের' পর দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। –[কুরতুবী, মাযহারী]

তাফসীরে মাযহারীতে আরো একটি অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি আংশিককে বুঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি; বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আউওয়ালীন। আর سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ হলো তার বিবরণ। বয়ানুল কুরআন থেকে তাফসীরের যে সারসংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তাফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দুটি শ্রেণি সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হলো সাবেকীনে আউওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি হলো কেবলা পরিবর্তন কিংবা গজওয়ায়ে বদর অথবা বাই'আতে রেজওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাদের। আর দ্বিতীয় তাফসীরের মর্ম হলো এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আউওয়ালীন। কারণ ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তাফসীর অনুযায়ী তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে সেসমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গজওয়ায়ে বদর অথবা বায়'আতে হুদাবিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের, যারা কিয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تَابِعِىْ [তাবেয়ী] বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কিয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতি ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত : মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রা.)-কে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন, যদি দুনিয়াতে তাদের কারো দ্বারা কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোত্থেকে বলেছেন [এর প্রমাণ কি?] তিনি বললেন, কুরআন কারীমের আয়াত পড়ে দেখ- اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবী সম্পর্কেই বলা হয়েছে- رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اِتِّبَاعٌ بِاِحْسَانٍ-এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোনো রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিধন্য হবেন।

তাফসীরে মাজহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো- لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى. আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের আল্লাহ তা'আলার তাদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে। -[তিরমিযী]

জ্ঞাতব্য : যেসব লোক সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং তাঁদের মাঝে সংঘটিত ঘটনাবলির ভিত্তিতে কোনো কোনো সাহাবী সম্পর্কে এমন সমালোচনা করে, যার ফলে মানুষের মন তাদের উপর কুধারণায় লিপ্ত হতে পারে, তারা নিজেদেরকে এক আশঙ্কাজনক পথে নিয়ে ফেলছে। আল্লাহ রক্ষা করুন।

قَوْلُهُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ الخ : বিগত অনেক আয়াতে সেসব মুনাফিকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের নেফাক তথা মুনাফিকী তাদের কথা ও কাজে প্রকাশ পেয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও জানতেন যে, এরা মুনাফিক। এ আয়াতে এমন সব মুনাফিকের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মুনাফিকী অত্যন্ত চরম পর্যায়ের হওয়ার দরুন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গোপনই রয়ে গেছে। এ আয়াত এহেন কঠিন মুনাফিকদের উপর আখেরাতের পূর্বেই দু-রকম আজাব দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো দুনিয়াতে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের মুনাফিকী গোপন রাখার চিন্তা এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে পতিত থাকা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আর তাদের অনুসরণে বাধ্য থাকাটাও কোনো অংশে কম আজাব নয়। দ্বিতীয়ত কবর ও বরজখ এর আজাব যা কিয়ামত ও আখেরাতের পূর্বে তারা ভোগ করবে।

قَوْلُهُ وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ الخ : গাযওয়ায়ে তাবুকের জন্য যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা প্রচার করা হলো এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। গন্তব্যও ছিল দূরদূরান্তের, আর মোকাবিলা ছিল একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের নিয়মিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সাথে, যা ছিল ইসলামি ইতিহাসের প্রথম ঘটনা। এসব কারণেই এ নির্দেশ সম্পর্কে জনগণের অবস্থায় বিভিন্নতা দেখা দেয় এবং তাদের দলগুলো কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এক শ্রেণি ছিল নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ লোকদের যারা প্রথম নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় জিহাদের জন্য তৈরি হয়ে যান। দ্বিতীয় শ্রেণির ছিলেন সেসব লোক যারা প্রথমে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও পরক্ষণেই সঙ্গী হয়ে যান আয়াতে- الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ বলে এসব লোকেরই উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় শ্রেণি সেসব লোকের যারা প্রকৃত মাজুর বা অক্ষম ছিলেন বলে যুদ্ধে যেতে পারেননি। তাদের উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ অংশে। চতুর্থ শ্রেণি সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনের যারা কোনো রকম ওজর না থাকা সত্ত্বেও আলস্যের দরুন জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। এঁদের আলোচনা উল্লিখিত وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا ও وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ অংশে এসেছে। আর পঞ্চম শ্রেণিটি ছিল মুনাফিকদের যারা কুটিলতা ও মুনাফেকীর কারণে জিহাদে শরিক হয়নি। এদের আলোচনা কুরআনের বহু আয়াতে এসেছে। সারকথা, বিগত আয়াতসমূহে বেশিরভাগই পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে চতুর্থ শেণির লোকদের কথা বলা হচ্ছে যারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও শুধু আলস্যের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের আমল ও কাজকর্ম সংমিশ্রিত– কিছু ভালো, কিছু মন্দ। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নেবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম দশ ব্যক্তি ছিল যারা কোনো রকম যথার্থ ওজর-আপত্তি ছাড়াই গাযওয়ায়ে তাবুকে যাননি। তারপর তাদের সাতজন নিজেদেরকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে নেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তওবা কবুল করে নিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে না খুলবেন, আমরা এভাবেই আবদ্ধ কয়েদি হয়ে থাকব। এঁদের মধ্যে আবূ লুবাবাহর নামের ব্যাপারে হাদীসের সমস্ত রেওয়ায়েতকারী একমত। অন্যান্য নামের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম রেওয়ায়েত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাদেরকে এভাবে বাঁধা অবস্থায় দেখলেন এবং জানতে পারলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং তাদেরকে না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই থাকবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তিনি বললেন, আমিও আল্লাহর কসম খাচ্ছি যে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এঁদেরকে খুলব না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাকে এদের বাধন খোলার নির্দেশ দান করেন। এদের অপরাধ বড়ই মারাত্মক। এরই প্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াতটি নাজিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এঁদের বাধন খুলে দেবার নির্দেশ দান করেন। অতঃপর তাঁদের খুলে দেওয়া হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ লুবাবাহকে বাঁধনমুক্ত করার যখন সংকল্প প্রকাশ করা হয়, তখন তিনি অস্বীকার করেন এবং বলেন, যতক্ষণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজি হয়ে নিজের হাতে না খুলবেন, আমি বাঁধাই থাকব। সুতরাং ভোরে যখন তিনি নামাজ পড়তে আসেন, তখন পবিত্র হস্তে তাঁকে খুলে দেন।

সদাসৎ মিশ্রিত আমল কি? আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের কিছু আমল ছিল নেক, কিছু ছিল মন্দ। তাদের নেক আমল তো ছিল তাদের ঈমান, নামাজ, রোজার অনুবর্তিতা এবং উক্ত জিহাদের পূর্ববর্তী গাযওয়াসমূহে মহানবী ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ, স্বয়ং এই তাবুকের ঘটনায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া এবং এ কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা প্রভৃতি। আর মন্দ আমল হলো গাযওয়ায়ে তাবুকে অংশগ্রহণ না করা এবং নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা মুনাফিকের সামঞ্জস্য বিধান করা।

যেসব মুসলমানদের আমল মিশ্রিত হবে কিয়ামত পর্যন্ত তারাও এ হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত : তাফসীরে কুরতুবীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতটি যদিও একটি বিশেষ জামাত তথা দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত ব্যাপক। যে সমস্ত মুসলমানদের আমল ভালো ও মন্দে মিশ্রিত হবে, তারা যদি নিজেদের পাপের জন্য তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্যও মাগফেরাত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করা যায়।

আবূ ওসমান (র.) বলেছেন, কুরআন কারীমের এ আয়াতটি উম্মতের জন্য বড়ই আশাব্যঞ্জক। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী শরীফে মি'রাজ সম্পর্কিত এক বিস্তারিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে যখন মহানবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি তার কাছে এমন কিছু লোককে দেখতে পান

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যাদের চেহারা ছিল সাদা। আর কিছু লোক যাদের চেহারা ছিল কিছু দাগ-যুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণির এ লোকগুলো একটি নহরে প্রবেশ করল এবং তাতে গোসল করে বেরিয়ে এলো। আর তাতে করে তাদের চেহারায় দাগগুলোও সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়ে সাদা হয়ে গেল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে জানালেন যে, স্বচ্ছ চেহারার এ লোকগুলো হলো যারা ঈমান এনেছে এবং পাপতাপ থেকেও মুক্ত থেকেছে– اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ আর দ্বিতীয় শ্রেণির লোকগুলো হলো যারা ভালোমন্দ সবরকম কাজই মিশিয়ে করেছে এবং পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন এবং তাদের পাপ মোচন হয়ে গেছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً : আয়াতের ঘটনা হলো এই যে, উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যারা কোনো রকম ওজর- আপত্তি ছাড়াই তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন এবং পরে অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটির সাথে আবদ্ধ করে নেন। অতঃপর উল্লিখিত আয়াত তাদের তওবা কবুল হওয়ার বিষয় নাজিল হয় এবং বন্ধনমুক্তির পর তাঁরা শুকরিয়া স্বরূপ নিজেদের সমস্ত ধনসম্পদ সদকা করে দেওয়ার জন্য পেশ করেন। তাতে রাসূলে কারীম ﷺ এই বলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যে, এসব মালামাল গ্রহণের নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয় যে, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ এদের মাল থেকে গ্রহণ করুন। ফলে তিনি সমগ্র মালামালের পরিবর্তে এক-তৃতীয়াংশ মালের সদকা গ্রহণ করতে সম্মত হন। কারণ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেন সমগ্র মাল নেওয়া না হয়; বরং তার অংশবিশেষ যেন নেওয়া হয়। مِنْ অব্যয়টিই এর প্রমাণ।

মুসলমানদের সদকা-জাকাত আদায় করে তা যথাযথ খাতে ব্যয় করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব : এ আয়াতের শানে নুযূল অনুযায়ী যদিও বিশেষ একটি শ্রেণি বা দলের সদকা বা দান গ্রহণ করার নির্দেশ হয়েছে, কিন্তু তা নিজ মর্ম অনুযায়ী ব্যাপক।

তাফসীরে কুরতুবী, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস, মাজহারী প্রভৃতি গ্রন্থে একেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কুরতুবী ও জাস্‌সাস একথাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, এ আয়াতের শানে নুযূল অনুযায়ী যদি সেই বিশেষ ঘটনাকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তবুও কুরআনি মূলনীতির ভিত্তিতে এ হুকুমটি ব্যাপক ও সাধারণই থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য বলবৎ থাকবে। কারণ কুরআনের অধিকাংশ বিশেষ বিশেষ হুকুম-আহকাম বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাজিল হয়েছে, কিন্তু তার কার্যকারিতা পরিধি কারো মতেই সেই বিশেষ ঘটনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যে পর্যন্ত নির্দিষ্টতার কোনো দলিল না থাকবে, এই হুকুম সমস্ত মুসলমানের জন্য ব্যাপক বলেই গণ্য হবে এবং সবাইকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এমনকি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াতে যদিও নির্দিষ্টভাবে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এ হুকুমটি না তাঁর জন্য নির্দিষ্ট এবং না তাঁর যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ; বরং এমন প্রতিটি লোক যিনি হুজুরে আকরাম ﷺ -এর নায়েব হিসেবে মুসলমানদের নেতা হবেন, তিনিই এ হুকুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবেন। মুসলমানদের জাকাত-সদকাসমূহ আদায় করা এবং তা যথাযথ খাত অনুযায়ী ব্যয় করার ব্যবস্থা করা তার দায়িত্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর খেলাফতের প্রাথমিক আমলে জাকাত দানে বিরত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, তাতে জাকাত দানে বিরত লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল যারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামের বিদ্রোহী ও মুরতাদ। আর কিছু লোক এমনও ছিল যারা নিজেদের মুসলমান বলত সত্য, কিন্তু জাকাত না দেওয়ার জন্য এমন ছলছুতা অবলম্বন করত যে, "এ আয়াতে মহানবী ﷺ -এর প্রতি আমাদের কাছ থেকে সদকা-জাকাত উসুল করার নির্দেশ ছিল, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই। বস্তুত আমরা তা মান্যও করেছি। তার ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এমন কি অধিকার থাকতে পারে যে, তিনি আমাদের কাছ থেকে জাকাত দাবি করতে পারেন!" তাছাড়া প্রথম দিকে এ বিষয়ে জিহাদ করার ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর মনেও এ কারণেই দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছিল যে, যতই হোক, এরা মুসলমান এবং একটি আয়াতের আশ্রয় নিয়ে জাকাত থেকে বিরত থাকতে চাইছে। কাজেই এদের সাথে এমন আচরণ করা বাঞ্ছনীয় হবে না, যা সাধারণ মুরতাদদের সাথে করা যায়। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) পূর্ণ দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বললেন, যে ব্যক্তি নামাজ ও জাকাতের ব্যাপারে ব্যতিক্রম করবে তার বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবই।

Free @ www.e-ilmweebly.com

এতে এ ইঙ্গিতই ছিল যে, যারা জাকাতের হুকুমকে শুধুমাত্র মহানবী ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট করত এবং তাঁর অবর্তমানে তা রহিত হয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিল, তারা অদূর ভবিষ্যতে এমনও বলতে পারে যে, নামাজও মহানবী ﷺ -এর সাথেই নির্দিষ্ট ছিল। কারণ কুরআনে কারীমে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ আয়াতও এসেছে, যাতে নামাজ কায়েমের জন্য নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে নামাজ সংক্রান্ত আয়াতের হুকুম যেভাবে গোটা উম্মতের জন্য ব্যাপক এবং একে মহানবী ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার মতো ভ্রান্ত ও অপব্যাখ্যাদানকারীদেরকে কুফরি থেকে বাঁচানো যায় না, তেমনিভাবে خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ আয়াতের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যাদান করাও তাদেরকে কুফরি ও ইসলামদ্রোহিতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এ কথার পর হযরত ফারূকে আযম (রা.)-এর দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ঘুচে যায় এবং সমগ্র উম্মতের ঐকমত্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়।

জাকাত সরকারি কর নয়; বরং ইবাদত : কুরআন মাজীদের আয়াত خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ -এর পর صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাকাত ও সদকা রাষ্ট্রীয় কোনো কর নয়, যা সরকার পরিচালনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গ্রহণ করে থাকে; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, গুনাহ থেকে ধনী লোকদের পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা।

এখানে উল্লেখ্য, জাকাত-সদকা উসুলে দু-ধরনের উপকার পাওয়া যায়। প্রথমত এক উপকার স্বয়ং ধনী লোকদের জন্য। কারণ এর দ্বারা ধনী লোকেরা গুনাহ ও অর্থসম্পদের মোহজাত স্বভাব রোগের বিষাক্ত জীবাণু থেকে পাকসাফ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা সমাজের সেই দুর্বল শ্রেণির লালনপালনের ব্যবস্থা হয়, যারা নিজেদের জীবিকা আহরণে অসমর্থ ও অপারগ। যেমন– এতিম, বিধবা, বিকলাঙ্গ, ছিন্নমূল, মিসকিন ও গরিব প্রভৃতি।

কিন্তু কুরআনের এ আয়াতে শুধু প্রথমোক্ত উপকারিতার উল্লেখ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেটিই হলো জাকাত ও সদকা উসুলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকারিতাগুলো হলো আনুষঙ্গিক। সুতরাং কোথাও এতিম, বিধবা ও গরিব-মিসকিন না থাকলেও ধনী লোকদের পক্ষে জাকাতের হুকুম রহিত হয়ে যাবে না।

পূর্ববর্তী উম্মতগণের দান-খয়রাতের রীতিনীতি থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। সেকালে দান-খয়রাত ভোগ করা কারো পক্ষে জায়েজ ছিল না; বরং নিয়ম ছিল যে, কোনো পৃথক স্থানে সেগুলো রেখে দেওয়া হতো এবং আকাশ থেকে আগুন নেমে এসে তা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে যেত। এ ছিল কবুল হওয়ার আলামত। কিন্তু যেখানে আগুন দ্বারা ভস্ম হতো না, সেখানে তা অগ্রাহ্য হওয়ার আলামত মনে করা হতো। অতঃপর এই অপয়া মালামল কেউ স্পর্শ পর্যন্ত করত না। এ থেকে পরিষ্কার হলো যে, জাকাত ও সদকার আয়াতের হুকুম মূলত কারো অভাব মোচনের জন্য নয়; বরং তা মালের হক ও ইবাদত। যেমন– নামাজ রোজা হলো শারীরিক ইবাদত। তবে উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, যে মালামাল আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তার ভোগ-ব্যবহার সে উম্মতের ফকির-মিসকিনদের জন্য জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক সহীহ হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে।

একটি প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন উঠে যে, উপরিউক্ত ঘটনায় তাদের তওবা যখন কবুল হয়েছে বলে আয়াতে বলা হলো, তখন বোঝা গেল যে, তওবার ফলেই গুনাহের মার্জনা ও পরিশুদ্ধি হয়ে গেল। এরপরও সদকা উসুলকে পরিশুদ্ধির মাধ্যম বলা হলো কেন? জবাব এই যে, তওবা দ্বারা যদিও গুনাহ মাফ হলো, কিন্তু তার পরও গুনাহের কিছু কালিমা, মলিনতা থাকা সম্ভব যা পরবর্তীকালে গুনাহের কারণ হতে পারে। সদকা আদায়ে সে মলিনতা দূর হয়ে পূর্ণতর বিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে।

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ বাক্যে صَلٰوةٌ অর্থ তাদের জন্য রহমতের দোয়া করা। রাসূলে কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কারো কারোর জন্য صَلٰوةٌ [সালাত] শব্দ দ্বারা দোয়া করেছিলেন। যেমন, হাদীস শরীফে আছে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى কিন্তু পরবর্তীকালে صَلٰوةٌ শব্দটি নবীগণের বিশেষ আলামতে পরিণত হয়। সে জন্য অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে অন্য কারো জন্য صَلٰوةٌ শব্দ দ্বারা দোয়া করা যাবে না; বরং শব্দটি নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, যাতে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। –[বয়ানুল কুরআন প্রভৃতি]

এ আয়াতে মহানবী ﷺ -এর প্রতি সদকা আদায়কারীদের জন্য দোয়া করার আদেশ হয়। এ কারণে কতিপয় কিফহবিদ বলেন, ইমাম ও আমীরদের পক্ষে সদকাদাতাগণের জন্য দোয়া করা ওয়াজিব। আর কেউ কেউ এ নির্দেশকে মোস্তাহাবও মনে করেন। –[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ : যে দশজন মু'মিন বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাতজন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকি তিনজনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেওয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং ইখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا الخ : মুনাফিকদের অবস্থা ও তাদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার কথা উপরের অনেক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে রয়েছে তাদের এক ষড়যন্ত্রের বর্ণনা। তা হলো, মদিনায় আবূ আমের নামের এক ব্যক্তি জাহিলি যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আবূ আমের 'পাদ্রি' নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রা.) যার মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহি ও খ্রিস্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম ﷺ হিজরত করে মদিনায় উপস্থিত হলে আবূ আমের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী ﷺ তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসল না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দুজনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে।" সে একথা বলল যে, আপনার যে কোনো প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাব। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযিনের মতো সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় গেল। কারণ তখন এটি ছিল খ্রিস্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল তা ভোগ করল। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোমান সম্রাটকে মদিনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের দেশান্তরিত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল। এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনায় পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোমান সম্রাট কর্তৃক মদিনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথাসময়ে সম্রাটের সাহায্য হয় মতো কোনো সম্মিলিত শক্তি তোমার থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদিনার মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যাতে মুসলমানদের অন্তরে কোনো সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।" তার এ পত্রের ভিত্তিতে বারোজন মুনাফিক মদিনার কোবা মহল্লায়, যেখানে রাসূলে কারীম ﷺ হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তথায় অপর একটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইসহাক (র.) প্রমুখ ঐতিহাসিক এ বারোজানের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যা হোক, অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামাজ সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মতো এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রাসূলে কারীম ﷺ তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামাজ আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পরে যখন তিনি মদিনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন উপরিউক্ত আয়াতগুলো নাজিল হলো, এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হলো।

Free @ www.e-ilmweebly.com

আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর তিনি কতিপয় সাহাবীকে যাদের মধ্যে আমের ইবনে সাকস এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হন্তা 'ওয়াহশী'ও উপস্থিত ছিলেন। এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো। আদেশমতে তাঁরা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

তাফসীরে মাযহারীতে ইউসুফ ইবনে সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মদিনায় পৌছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম ইবনে আদীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে জায়গা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগ-দখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখিকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

ঘটনার বিবরণ জানার পর এবার আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا অর্থাৎ উপরে অপরাপর মুনাফিকের আজাব ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য মুনাফিকরাও ওদের অন্তর্ভুক্ত, যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত ضِرَارًا অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضِرَارٌ ও ضَرَرٌ শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে কতিপয় অভিধান প্রণেতা এ দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। তারা বলেন, ضَرَرٌ সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক। আর ضِرَارٌ হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। সেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে একই পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضِرَارٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করা। একটি দল সে মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, اِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কুরআন মাজীদ 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী ﷺ -এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলত মসজিদই ছিল না, নামাজ আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, যা কুরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোনো মসজিদের মুকাবিলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লি হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার ছওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরিয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েজ হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলত গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামাজ আদায় করবে, তাদের নামাজকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের ছওয়াব সে পাবে না; বরং গুনাহগার হবে; কিন্তু একে আয়াতে উল্লিখিত 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিরার' নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে যিরার' -এর মতো বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত রাখা যেতে পারে। যেমন, হযরত ওমর ফারূক (রা.) এক আদেশ জারি করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। -[কাশশাফ]

উপরিউক্ত মসজিদে যিরার সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত মহানবী ﷺ -কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيهِ اَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। অর্থাৎ আপনি এ তথাকথিত মসজিদ কখনো নামাজ আদায় করবেন না।

মাসআলা : এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানকালেও যদি কেউ পূর্বতন মসজিদের নিকটে নিছক লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বা জিদের বশে কোনো মসজিদ নির্মাণ করে, তবে সেখানে নামাজ শুদ্ধ হলেও নামাজ পড়া ভালো নয়।

এ আয়াতে মহানবী ﷺ -কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনার নামাজ সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথম দিন থেকে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামাজ আদায় করে, যারা পাক-পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদ্গ্রীব। বস্তুত আল্লাহ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী ﷺ তখন নামাজ আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। كَمَا رَوَاهُ اِبْنُ مَرْدُوْيَةَ عَنْ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ اِبْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَهْلِ الْاَنْصَارِىْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِىْ صَحِيْحِهِ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ -[তাফসীরে মাযহারী]

অপর কতিপয় রেওয়ায়েত মতে এর অর্থ যে মসজিদে নববী নেওয়া হয়েছে, তা আয়াতের মর্মের পরিপন্থিও নয়। কেননা মসজিদে নববীর ভিত্তি যে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলাই বাহুল্য। কেননা তাঁর চেয়ে অধিক পবিত্র আর কে হতে পারে? অতএব এ মসজিদটিও আয়াতের উদ্দেশ্য। -[তিরমিযী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا : এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী ﷺ -এর নামাজের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লিগণ পাক-পবিত্রতা অর্জনে সবিশেষ যত্নবান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ নাপাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বুঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লিগণ সাধারণত এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

ফায়দা : উক্ত আয়াত থেকে একথাও বুঝা গেল যে, কোনো মসজিদের মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, তা ইখলাসের সাথে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে নির্মিত হওয়া এবং তাতে কোনো লোক দেখানো মনোবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্যের সামান্যতম দখলও না থাকা। আর একথাও জানা গেল যে, নেককার, পরহেজগার এবং আলেম ও আবেদ মুসল্লির গুণেও মসজিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাই যে মসজিদের মুসল্লিগণ আলেম, আবেদ ও পরহেজগার হবে, সে মসজিদে নামাজ আদায়ে অধিক ফজিলত লাভ করা যাবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সেই মকবুল মসজিদের মোকাবিলায় মুনাফিকদের নির্মিত মসজিদে যিরারের নিন্দা করে বলা হয়েছে, তার তুলনা নদীর তীরবর্তী এমন মাটির সাথেই করা যায়, যাকে পানির ঢেউ নিচের দিকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু উপর থেকে মনে হয় যেন সমতল ভূমি। এর উপর কোনো গৃহ নির্মাণ করলে যেমন অচিরেই তা' ধসে যাবে, মসজিদে যিরার-এর ভিত্তিও ছিল তেমনি নড়বড়ে। সুতরাং অচিরেই সেটি ধসে গেল এবং জাহান্নামে পতিত হলো। জাহান্নামে পতিত হওয়ার কথাটি রূপক অর্থেও নেওয়া যায় এ হিসেবে যে, এর নির্মাতারা যেন জাহান্নামে পৌছার পথ পরিষ্কার করল। তবে কতিপয় মুফাসসির এর আক্ষরিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ মসজিদটিকে ধ্বংস করার পর তা প্রকৃত প্রস্তাবেই জাহান্নামে চলে গেল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

শেষের আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের এই নির্মাণ কর্ম সর্বদা তাদের সন্দেহ ও মুনাফেকীকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলবে, যতক্ষণ না তাদের অন্তরগুলো ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের জীবন শেষ না হওয়া অবধি তাদের সন্দেহ, কপটতা, হিংসা ও বিদ্বেষ সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١١. إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ يَبْذُلُوْهَا فِىْ طَاعَتِهِ كَالْجِهَادِ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ جُمْلَةُ اسْتِيْنَافٍ بَيَانٌ لِلشِّرَاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَقْدِيْمِ الْمَبْنِىِّ لِلْمَفْعُوْلِ أَىْ فَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ وَيُقَاتِلُ الْبَاقِىْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا مَصْدَرَانِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمَحْذُوْفِ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ اَىْ لَا اَحَدَ اَوْفٰى مِنْهُ فَاسْتَبْشِرُوْا فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذٰلِكَ الْبَيْعُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ الْمُنِيْلُ غَايَةَ الْمَطْلُوْبِ.

১১১. জান্নাত প্রদানের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। অর্থাৎ মু'মিনগণ জিহাদ ও এই ধরনের ফরমাবরদারীর কাজে নিজেদের জানমাল ব্যয় করে। তারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করে; নিধন করে ও নিহত হয়। অর্থাৎ তাদের কতকজন যুদ্ধে নিহত হয়ে যায় আর বাকিরা যুদ্ধে রত থাকে। এ বাক্যটিতে ক্রয়ের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। বস্তুত; তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন তিনি এই প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ। নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠতর কে আছে? না তাঁর অপেক্ষা আর কেউ অধিক ওয়াদা পালনকারী নেই। তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য সুসংবাদ লাভ কর এবং তাই এই বিক্রয় কার্যই মহাসাফল্য কামনার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। يُقَاتِلُوْنَ তা اِسْتِيْنَافٌ বা নববাক্য। তাতে ক্রয়ের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। فَيُقْتَلُوْنَ অপর এক কেরাতে مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচকরূপে প্রদত্ত صِيْغَة বা রূপটি [يَقْتُلُوْنَ-কে] অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। وَعْدًا - حَقًّا এ দুটিই مَصْدَر বা ক্রিয়ার মূল। এ স্থানে তা একটি সামর্থবোধক ক্রিয়ার মাধ্যমে এ দুটি مَنْصُوْب [যবরযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْتَبْشِرُوْا তাতে غَيْب অর্থাৎ নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

١١٢. اَلتَّائِبُوْنَ رَفْعٌ عَلَى الْمَدْحِ بِتَقْدِيْرِ مُبْتَدَأٍ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ الْعٰبِدُوْنَ الْمُخْلِصُوْنَ الْعِبَادَةَ لِلّٰهِ الْحٰمِدُوْنَ لَهُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ السّٰئِحُوْنَ الصَّائِمُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ اَىِ الْمُصَلُّوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط لِاَحْكَامِهِ بِالْعَمَلِ بِهَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَنَّةِ.

১১২. তারা শিরক ও মুনাফেকী হতে তওবাকারী, ইবাদতকারী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে একনিষ্ঠ, সর্বাবস্থায়ই তাঁর প্রশংসাকারী, রোজা পালনকারী, রুকু-সিজদাকারী অর্থাৎ সালাত আদায়কারী সৎকাজের নির্দেশদানকারী, অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদানকারী এবং আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সীমারেখার অর্থাৎ তাঁর বিধিবিধানের সংরক্ষক। আর মু'মিনদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দাও। اَلتَّائِبُوْنَ তার পূর্বে مُبْتَدَأٌ বা তার উদ্দেশ্য থাকায় তা رَفْعٌ عَلَى الْمَدْحِ অর্থাৎ প্রশংসাব্যঞ্জকভাবে مَرْفُوْعٌ [পেশযুক্ত] ব্যবহৃত হয়েছে। اَلسَّائِحُوْنَ অর্থ- রোজা পালনকারী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.ejlmweebly.com

١١٣. وَنَزَلَ فِيْ اِسْتِغْفَارِهٖ ﷺ لِعَمِّهٖ اَبِيْ طَالِبٍ وَاسْتِغْفَارِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِاَبَوَيْهِ الْمُشْرِكِيْنَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِيْ قُرْبٰى ذَوِيْ قَرَابَةٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ النَّارِ بِاَنْ مَاتُوْا عَلَى الْكُفْرِ.

১১৩. রাসূল ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালিবের জন্য ইস্তেগফার করেছেন। তখন কতিপয় সাহাবীও তাঁদের মুশরিক পিতামাতার জন্য ইস্তেগফার করেছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন– আত্মীয় হলেও আত্মীয়তার অধিকারী হলেও মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা নবী এবং মু'মিনগণের পক্ষে সঙ্গত নয়, এরা কুফরি অবস্থায় মারা যাওয়ায় তাদের নিকট এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামি অগ্নিবাসী। اَلْجَحِيْمُ অর্থ– অগ্নি, দোজখ।

١١٤. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ج بِقَوْلِهٖ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ رَجَاءً اَنْ يُسْلِمَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِلّٰهِ بِمَوْتِهٖ عَلَى الْكُفْرِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ط وَتَرَكَ الْاِسْتِغْفَارَ لَهٗ اَنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ كَثِيْرُ التَّضَرُّعِ وَالدُّعَاءِ حَلِيْمٌ صَبُوْرٌ عَلَى الْاَذٰى.

১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তা ছিল একটি প্রতিশ্রুতি যা সে তাকে দিয়েছিল। তার ঈমানের আশায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমার জন্য আমার প্রভুর নিকট সত্বর ক্ষমা প্রার্থনা করব।' কিন্তু কুফরি অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করায় যখন তা তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ তা'আলার শত্রু তখন ইবরাহীম তা হতে আলাদা হয়ে গেল। এবং তার জন্য ইস্তেগফার করা ছেড়ে দিল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয়, আল্লাহর দরবারে খুবই ক্রন্দনকারী ও দোয়াকারী, সহনশীল দুঃখকষ্টে ধৈর্যশীল।

١١٥. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ لِلْاِسْلَامِ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ مِنَ الْعَمَلِ فَلَا يَتَّقُوْهُ فَيَسْتَحِقُّوا الْاِضْلَالَ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ مُسْتَحِقُّ الْاِضْلَالِ وَالْهِدَايَةِ.

১১৫. ইসলামের হেদায়েত করার পর কোনো সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেন না যতক্ষণ না তিনি তাদেরকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে দেন যে, কি কার্যে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। কিন্তু তা সুস্পষ্ট করার পরও কেউ কেউ তাকওয়া অবলম্বন করে না ফলে তারা পথভ্রষ্টতার যোগ্য হয়ে পড়ে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। কে হেদায়েতের আর কে গুমরাহির যোগ্য তাও তার অন্তর্ভুক্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١٦. اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ ط وَمَا لَكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ يَحْفَظُكُمْ مِنْهُ وَلَا نَصِيْرٍ يَمْنَعُ عَنْكُمْ ضَرَرَهٗ .

১১৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলারই, তিনি জীবনযাপন করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। হে মানুষ সকল! আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই যে তোমাদেরকে তাঁর আজাব হতে রক্ষা করবে. এবং কোনো সাহায্যকারী নেই যে তোমাদের হতে তাঁর ক্ষতিসাধন বাধা দিয়ে রাখতে পারবে। دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত।

١١٧. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ اَيْ اَدَامَ تَوْبَتَهٗ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اَيْ وَقْتِهَا وَهِيَ حَالُهُمْ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ كَانَ الرَّجُلَانِ يَقْتَسِمَانِ تَمْرَةً وَالْعَشَرَةُ يَعْتَقِبُوْنَ الْبَعِيْرَ الْوَاحِدَ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ حَتّٰى شَرِبُوا الْفَرْثَ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَمِيْلُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ عَنِ اتِّبَاعِهٖ اِلَى التَّخَلُّفِ لِمَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الشِّدَّةِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط بِالثَّبَاتِ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

১১৭. আল্লাহ অনুগ্রহ পরবশ হলেন সর্বদাই তিনি তাঁর অনুগ্রহদৃষ্টি রাখেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি যারা তার অনুগমন করেছিল সংকট মুহূর্তে কঠিন সময়ে। তাবুক যুদ্ধকালে তাদের এ ধরনের কঠিন অবস্থা ছিল। এমনকি দুজনে আহারের জন্য একটি খেজুর পেতেন। পরপর দশজনকে একটি উটে আরোহণ করতে হতো। এতো প্রচণ্ড গরম ছিল যে উটের নাড়িভুঁড়ি চুষে তাদেরকে পিপাসা নিবারণ করতে হয়েছিল। এমনকি তখন এই নিদারুণ কষ্টের কারণে তাদের একদলের মন বক্র হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তারা অনুসরণ করা হতে বিরত হয়ে পশ্চাতে রয়ে যাওয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দৃঢ়তা দান করত ক্ষমা করলেন। তিনি তাদের বিষয়ে দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। يَزِيْغُ তা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়রূপেই গঠিত রয়েছে।

١١٨. وَ تَابَ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا عَنِ التَّوْبَةِ عَلَيْهِمْ بِقَرِيْنَةٍ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ قُلُوْبُهُمْ لِلْغَمِّ وَالْوَحْشَةِ بِتَاخِيْرِ تَوْبَتِهِمْ فَلَا يَسَعُهَا سُرُوْرٌ وَلَا اُنْسٌ وَظَنُّوْا اَيْقَنُوْا اَنْ مُخَفَّفَةٌ لَا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَفَّقَهُمْ لِلتَّوْبَةِ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

১১৮. এবং তিনি ক্ষমা পরবশ হলেন অপর তিনজনের প্রতিও যাদের তওবা কবুলের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ তার বিস্তৃতি সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। এমন কোনো স্থান তারা পাচ্ছিল না যেখানে তারা স্বস্তি পেতে পারে। তওবা কবুল হতে বিলম্ব দেখে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় তাদের হৃদয় কুঞ্চিত হয়ে পড়েছিল। ফলে সেখানে কোনো আনন্দ ও প্রীতির অবকাশ ছিল না। তারা ধারণা করেছিল তাদের প্রতীতি জন্মিল যে আল্লাহ তা'আলার [শাস্তি] হতে [বাঁচার] তিনি ব্যতীত আর কোনো আশ্রয় নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ পরববশ হলেন। তাদেরকে তওবা করার তাওফীক দান করলেন যেন তারা তওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাপরবশ, পরম দয়ালু। اَلَّذِيْنَ خُلِّفُوْا অর্থাৎ যাদের তওবার বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। তার প্রমাণ ও আলামত হলো حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ - مَا رَحُبَتْ তার مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থ ব্যঞ্জক। অর্থ তার [পৃথিবীর] বিস্তৃতি সত্ত্বেও। اَنْفُسُهُمْ অর্থ- তাদের হৃদয়। اَنْ তা এ স্থানে مُثَقَّلَةٌ হতে পরিবর্তিত হয়ে مُخَفَّفَةٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ بِاَنْ يَبْذُلُهَا فِىْ طَاعَتِهِ : এটা একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ মুজাহিদগণকে স্বীয় জানমাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করার বিনিময়ে জান্নাত দেওয়াকে شِرَاءٌ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কাজেই বাস্তবিক ক্রয়বিক্রয় হওয়া জরুরি নয়।

قَوْلُهُ جُمْلَةُ اِسْتِئْنَافٍ : এটা مَا سَبَقَ হতে عَدَمُ وَصْلٍ -এর ইল্লত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ وَيُقَاتِلُ الْبَاقِىْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, مَجْهُوْل মুকাদ্দম হওয়ার সুরতে যখন সে নিহত হয়ে যায়, তখন সে যুদ্ধ কিভাবে করে?

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো এই যে, مُسْنَدٌ اِلَيْهِ হলো সকল মু'মিন অর্থাৎ যখন তাদের মধ্যে কতেক নিহত হতেন তখন বাকিরা হতবিহ্বল হয়ে পলায়ন করতেন না; বরং বীর বিক্রমে যুদ্ধি চালিয়ে যেতেন।

قَوْلُهُ مَصْدَرَانِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمَحْذُوْفِ : অর্থাৎ وَعْدًا এবং حَقًّا উভয়টি স্বীয় উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَعَدَهُمْ وَعْدًا وَحَقَّ الْوَعْدُ حَقًّا -এর করীনা হলো شِرَاءٌ টা وَعْد অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ رَفْعٌ عَلَى الْمَدْحِ : এটা মুবতাদা হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়নি। যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন, কেননা এ সুরতে অহেতুক খবরকে উহ্য মানার প্রয়োজন পড়ছে। مَرْفُوْعٌ بِالْمَدْحِ -এর সুরতে যদিও حَذْف আবশ্যক হচ্ছে; কিন্তু তা ফায়দামুক্ত নয়। যেমনটি সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ بِتَقْدِيْرِ الْمُبْتَدَأِ : আর তা হলো هُمْ

قَوْلُهُ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ : এ উভয়টাই اَلتَّائِبُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلصَّائِمُوْنَ : এটা اَلسَّائِحُوْنَ -এর অর্থের বিবরণ। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– سِيَاحَةُ اُمَّتِىْ الصَّوْمُ

قَوْلُهُ وَنَزَلَ فِىْ اِسْتِغْفَارِهِ ﷺ لِعَمِّهِ اَبِىْ طَالِبٍ : খাজা আবূ তালিব যখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন রাসূল ﷺ খাজা আবূ তালেবকে বললেন, চাচা কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করুন। আমি এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে প্রমাণ উপস্থাপন করব। কিন্তু খাজা আবূ তালিব অস্বীকার করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন– لَا اَزَالُ اَسْتَغْفِرُ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْهُ –[বুখারী ও মুসলিম]

অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, আমি এক ব্যক্তিকে তার পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনেছি। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছ অথচ তারা কাফের ছিল। তখন সে বলল, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, অথচ তাঁর পিতা মুশরিক ছিল। এই ঘটনা রাসূল ﷺ -এর সম্মুখে উল্লেখ করা হলো এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[তিরমিযী]

قَوْلُهُ اَوَّاهٌ : এটা فَعَّالٌ -এর ওজনে মুবালাগার সীগাহ। অর্থ বেশি বেশি আফসোসকারী / আহকারী। নরম দিল।

قَوْلُهُ اَدَامَ تَوْبَتَهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো, তওবা কবুল হওয়ার জন্য প্রথমে গোনাহে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা তওবা গ্রহণ হওয়া গুনাহে লিপ্ত হওয়ার শাখা। অথচ রাসূল ﷺ হলেন নিষ্পাপ/মাসূম। আর সাহাবায়ে কেরামও এ ঘটনায় কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হননি। এরপরও তওবা গ্রহণীয় হওয়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : دَوَامٌ এবং اِثْبَاتٌ عَلَى التَّوْبَةِ তথা তওবার উপর সুদৃঢ় থাকা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিনা ওজরে জিহাদ থেকে বিরত থাকার নিন্দা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে রয়েছে মুজাহিদগণের ফজিলতের বর্ণনা।

শানে নুযূল : অধিকাংশ মুফাসসিরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে 'বায়আতে আকাবায়' অংশগ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়'আত নেওয়া হয়েছিল মক্কায় মদিনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মাদানী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মাক্কী বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বুঝায় 'মিনা'র জমরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেওয়া হয়েছে। এখানে মদিনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফে বায়'আত নেওয়া হয়। প্রথম দফে নেওয়া হয় নবুয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদিনায় ফিরে যান। এতে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম ﷺ -এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে বারোজন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচজন ছিলেন পূর্বের এবং সাতজন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী ﷺ -এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদিনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ চল্লিশজনেরও বেশি। তারা নবী করীম ﷺ -এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কুরআনের তালিম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কুরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদিনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তরজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণত বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বুঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকিদা ও আমল, বিশেষত কাফেরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদিনা গেলে তাঁর হেফাজত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেওয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এখন অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে, আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোনো শর্তারোপ থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক। হুজুর ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো, তোমরা আমার হেফাজত করবে যেমন নিজের জানমাল ও সন্তানের হেফাজত কর। তাঁরা আরজ করলেন, এ শর্ত দুটি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাজি এমন রাজি যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনোদিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

বায়'আতে আকাবার ব্যাপারটি দৃশ্যত লেনদেনের মতো বিধায় এ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে ক্রয়বিক্রয় সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ আয়াত শুনে সর্বপ্রথম হযরত বারা ইবনে মা'রুর, আবুল হায়সম ও আসআদ (রা.) নিজেদের হাত মহানবী ﷺ -এর হস্ত মোবারকের উপর রেখে বললেন, এ অঙ্গীকার পালনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনার হেফাজত করব নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মতো। আর আপনার বিরুদ্ধে সমগ্র দুনিয়ার সাদা কালো সবাই সমবেত হলেও আমরা সবার সাথে যুদ্ধ করে যাব।

জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত : মহানবী ﷺ মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত কোনো হুকুম নাজিল হযনি। এটিই সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়– اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ [সূরা হজ : আয়াত ৩৯] মক্কার কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় আর তখনই মহানবী ﷺ মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম ﷺ নিজে আল্লাহ তা'আলার অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মতো নিবৃত্ত রাখেন। –[মাযহারী]

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাজিল হয়েছিল। ইঞ্জিলে [বাইবেলে] জিহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবত এজন্য যে, পরবর্তী খ্রিস্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায়– আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

قَوْلُهٗ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمْ : বায়'আতে আকাবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, দৃশ্যত ক্রয়বিক্রয়ের মতো। তাই আয়াতের শুরুতে 'ক্রয়' শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরিউক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা এর দ্বারা অস্থায়ী জানমালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকি থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল হলো আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে অর্থসম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেওয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর ফারূক (রা.) বলেন, "এ এক অভিনব বেচাকেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদেরকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ তা'আলা।" হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, "লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মু'মিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।"

قَوْلُهٗ اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ : এ গুণাবলি হলো সেসব মু'মিনের, যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে- "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন।" আয়াতটি নাজিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّائِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তারূপে নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলি উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত তারা এ সকল গুণেরও অধিকারী হয়। বিশেষত বায়'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে اَلسَّائِحُوْنَ -এর অর্থ- صَائِمُوْنَ অর্থাৎ রোজা পালনকারী। শব্দটি سِيَاحَتْ [দেশ ভ্রমণ] থেকে উদ্ভূত। ইসলামপূর্ব যুগে খ্রিস্ট ধর্মে দেশ ভ্রমণকে ইবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোজা পালনের ইবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ। অথচ রোজা এমন এক ইবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জিহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিস সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, سِيَاحَةُ اُمَّتِى الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত سَائِحِيْنَ শব্দের অর্থ রোজাদার। হযরত ইকরিমা (রা.) سَائِحِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো ইলমে দীনের শিক্ষার্থী, যারা ইলম হাসিলের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ, যথা- تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، حَامِدُوْنَ، سَائِحُوْنَ، رَاكِعُوْنَ، سَاجِدُوْنَ، اٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ উল্লেখ করে অষ্টম গুণ হিসেবে বলা হয়েছে الحافظون لحدود الله এতে রয়েছে উপরিউক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এঁরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরিয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাজতকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয় وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যে সকল মু'মিনের উপরিউক্ত গুণাবলি রয়েছে, তাদের এমন নিয়ামতের সুসংবাদ দান করুন, যা ধারণার অতীত, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না এবং যা এ পর্যন্ত কেউ শুনেওনি অর্থাৎ জান্নাতের নিয়ামত।

قَوْلُهٗ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : গোটা সূরা তওবাই কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম-আহকাম সংবলিত। সূরাটি শুরু হয় بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ বাক্য দিয়ে। এজন্য এটি সূরা 'বারাআত' নামেও খ্যাত। এ পর্যন্ত যতগুলো হুকুম বর্ণিত হয়েছে তা ছিল পার্থিব জীবনে কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কছেদ সম্পর্কিত। কিন্তু আলোচ্য

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে বর্ণিত সম্পর্কচ্ছেদের হুকুম হলো পরজীবন সংক্রান্ত। তা হলো এই যে, মৃত্যুর পর কাফের ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনাও জায়েজ নেই। যেমন, পূর্ববর্তী এক আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে মুনাফিকদের জানাজার নামাজ পড়তে বারণ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত অবতরণের পটভূমি হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর চাচা আবূ তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তথাপি তিনি আজীবন ভ্রাতুষ্পুত্রের হেফাজত ও সাহায্যকারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে স্বগোত্রের কারো এতটুকু তোয়াক্কা করেননি। এজন্য মহানবী ﷺ তার দ্বারা অন্তত কালেমাটি পাঠ করিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিলেন। কারণ ঈমান আনলে রোজ হাশরে সুপারিশ করার একটা সুযোগ হবে এবং দোজখের আজাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। অতঃপর চাচা যখন মৃত্যুশয্যায় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখন তাঁর চেষ্টা ছিল যদি শেষ মুহূর্তেও কোনো উপায়ে কালেমাটি পাঠ করিয়ে নেওয়া যায়, তবে একটা সদগতি হয়। তাই তিনি চাচার শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু দেখলেন, আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত। তবুও তিনি বললেন, চাচাজান, কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন! আমি আপনার মাগফিরাতের জন্য চেষ্টা করব। তখন আবূ জাহল বলে উঠল, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথাটি আরো কয়েকবার বলেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই আবূ জাহল নিজের বক্তব্য পেশ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আবূ তালেব একথা বলেই মৃত্যুবরণ করেন যে, "আমি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি।" পরে রাসূলে কারীম ﷺ শপথ করে বলেন, কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত আমি তোমার জন্য নিয়মিত মাগফিরাত কামনা করব। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ ও সকল মুসলমানকে কাফের ও মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে বারণ করা হয়েছে যদিও তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়।

এতে কোনো কোনো মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের কাফের পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তররূপে পরবর্তী আয়াতটি নাজিল হয়- مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য যে দোয়া করেছিলেন, তা ছিল এ কারণে যে, পিতা শেষ পর্যন্ত কুফরের উপর যে অটল থাকবে এবং কুফরি অবস্থায়ই যে মৃত্যুবরণ করবে, সেকথা তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, আমি আপনার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর পিতা আল্লাহর শত্রু অর্থাৎ কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনিও সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন এবং মাগফিরাতের দোয়াও ত্যাগ করেন।

কুরআনে যে সকল আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য দোয়া করার উল্লেখ রয়েছে তা সবই ছিল উপরিউক্ত কারণের প্রেক্ষিতে অর্থাৎ তাঁর দোয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে পিতা ঈমান ও ইসলামের তাওফীক লাভ করে এবং তাতে তাঁর মাগফিরাত হতে পারে।

ওহুদ যুদ্ধে যখন কাফেররা মহানবী ﷺ -এর চেহারা মুবারকে আঘাত করে তখন তিনি নিজ হাতে গণ্ডদেশের রক্ত মুছতে মুছতে দোয়া করেছিলেন- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা কর, তারা অবুঝ। কাফেরদের জন্য মহানবী ﷺ -এর উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদের যেন ঈমান ও ইসলামের তাওফীক লাভ হয় এবং তার ফলে যেন তারা মাগফিরাতের যোগ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, জীবিত কাফেরের জন্য ঈমানের তাওফীক লাভের নিয়তে দোয়া করা জায়েজ রয়েছে, যাতে সে মাগফিরাতের যোগ্য হতে পারে। اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - اَوَّاهٌ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লামা কুরতুবী (র.) এর ১৫টি অর্থ উল্লেখ করেছেন, তবে সবই সমার্থবোধক। প্রকৃতপক্ষে তাতে তেমন ব্যবধান নেই। তন্মধ্যে কয়েকটি অর্থ এই অতিশয় হা-হুতাশকারী, অত্যধিক প্রার্থনাকারী, মানুষের প্রতি দয়াশীল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে শেষোক্ত অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াত وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে, তাবুক যুদ্ধে আদেশ ঘোষিত হলে মদিনাবাসীরা পাঁচ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দু-দল ছিল মুনাফিকের যাদের বর্ণনা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে এসেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে রয়েছে নিষ্ঠাবান মু'মিনের তিনটি দলের বর্ণনা। প্রথম দল ছিল তাদের যারা যুদ্ধের আদেশ হওয়া মাত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তাদের আলোচনা রয়েছে প্রথম আয়াতের اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ বাক্যে। দ্বিতীয় দল যারা প্রথম দিকে রয়েছে অত্র আয়াতের مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ বাক্যে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তৃতীয় দল হলো তাদের, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু পরে অনুতাপ ও অনুশোচনা সাথে তওবা করে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তওবা কবুলও হয়। কিন্তু পরে তারা আবার দুদলে বিভক্ত হয়ে যায় সর্বসাকুল্যে তাদের সংখ্যা ছিল দশজন। তাদের সাতজন জিহাদ থেকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তনের প নিজেদের মনস্তাপ ও তওবাকে এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তাঁরা মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নেন এব প্রতিজ্ঞা করেন যে, তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকবেন। তখনই তাদের তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কিত আয় নাজিল হয়, যার বিবরণ ইতঃপূর্বে এসেছে। তাঁদের বাকি তিনজন নিজেদের মনস্তাপ সেভাবে প্রকাশ করেননি। রাসূ কারীম ﷺ তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও সালামের আদান-প্রদান থেকে বিরত থাকার আদেশ দান করেন। ফলে তাঁ ভীষণভাবে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়েন। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতের শুরুতে وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا বাক্যে তাঁদের বিষ উল্লেখ করা হয়েছে এবং অবশেষে তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের সমাজচ্যু করার হুকুম রহিত হয়ে যায়। বলা হয়- لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুল করেছেন নবীর এবং সেসব মুহাজির ও আনসারগণের যারা এক সংকটকালে নবীর অনুগমন করেছেন।

প্রশ্ন আসে, তওবা করতে হয় পাপাচার ও নাফরমানির কারণে। অথচ রাসূলে কারীম ﷺ হলেন নিষ্পাপ, তাঁর তও কবুলের অর্থ কি? এছাড়া মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা শুরুতেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাঁদের তো কো দোষ ছিল না। এ সত্ত্বেও তাঁদের তওবা কোন অপরাধে ছিল, যা কবুল হয়?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা গোনাহ থেকে তাঁদের রক্ষা করেছেন, যাকে তাওবা নামে অভিহিত ক হয়েছে। কিংবা এর অর্থ এও হতে পারে যে,, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তওবাকারীতে পরিণত করেছেন। এতে ইঙ্গি রয়েছে যে, কোনো মানুষ তওবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারে না, তা স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা ত বিশিষ্ট সাহাবী যেই হোক না কেন? যেমন, অপর আয়াতে আছে- تُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ "তোমরা সবাই আল্ল তা'আলার কাছে তওবা কর।" এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। যে যেখানে পৌছাক না কেন, তারপরেও অন্য স্তর থেকে যায়। তাই বর্তমান স্তরে স্থির থাকা অলসতার নামান্তর। মাওলানা রুমী (র বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

اے برادر بے نہایت در گہی ست
ہرچہ بروئے می رسی بروئے مایست

অর্থাৎ "হে আমার ভাই, আল্লাহ তা'আলার দরবার বহু উচ্চে, তাই যেখানে পৌছাবে সেখানেই স্থির হয়ে থেকো না অতএব আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত বর্তমান স্তরে থেকে যাওয়া হতে তওবার আবশ্যক আছে, যাতে পরবর্তী স্তরে পৌ যায়। سَاعَةِ الْعُسْرَةِ কুরআন মাজীদ জিহাদের এ মুহূর্তকে সংকটময় মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছে। কারণ সেস মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র.) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে স দশজনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালাবদল করে তারা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছি নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ : আয়াতের এ বাক্যে যে কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যু কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়; বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের অল্পতা হেতু সাহস হারি ফেলা এবং জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাদের অপর যেজন্য তারা তওবা করেন এবং তা কবুল হয়।

قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا : এখানে خُلِّفُوْا অর্থ যাদের পেছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হ যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো। এঁরা তিনজন হলেন হযরত কা'আব ইবনে মালেক, মুরারা ইবনে রবি এ হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.), তাঁরা তিনজনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যাঁরা ইতঃপূর্বে বায়'আতে আকাবা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মহানবী ﷺ -এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরিক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুলল। অতঃপর যখন রাসূলে কারীম ﷺ জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল। আর মহানবী ﷺ ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহ তা'আলার সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন। ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে ঐ তিন বুজুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হুজুর ﷺ -কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন, যে অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেওয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ .... عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিনজন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাজিল হয় তাদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তাঁরা অবার আনন্দিত মনে রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

সহীহ্ হাদীসের আলোকে ঘটনার বিবরণ : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-এর এ ঘটনার এক দীর্ঘ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, যা বহু ফায়দা ও মাসায়েল সংবলিত এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সে জন্য পুরা হাদীসের তরজমা এখানে পেশ করা সমীচীন মনে করছি। সে বিদগ্ধ তিন শ্রদ্ধেয়জনের একজন ছিলেন কা'আব ইবনে মালেক (রা.)। তিনি ঘটনার নিম্ন বিবরণ পেশ করেন–

"রাসূলে কারীম ﷺ যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, একমাত্র তাবুক যুদ্ধ ছাড়া বাকি সবগুলোতেই আমি তাঁর সাথে যোগদান করি। তবে বদর যুদ্ধ যেহেতু আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় এবং এতে যোগ না দেওয়ায় কেউ হযরত ﷺ -এর বিরাগভাজন হয়নি তাই এ যুদ্ধেও আমি শরিক হতে পারিনি। অবশ্য আমি বায়'আতে আকাবার রাতে সেখানেও উপস্থিত ছিলাম এবং আমরা ইসলামের সাহায্য হেফাজতের অঙ্গীকার করেছিলাম। বদর যুদ্ধের খ্যাতি যদিও সর্বত্র, তথাপি বায়'আতে আকাবার মর্যাদা আমার কাছে অধিক। তবে তাবুক যুদ্ধে শরিক না হওয়ার কারণ হলো এই যে, তখনকার মতো এত প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা পরবর্তী কোনো কালেই আমার ছিল না। আল্লাহর কসম করে বলছি, বর্তমানের মতো দুটি বাহন ইতঃপূর্বে কখনো একত্রে আমার ছিল না। "যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর অভ্যাস ছিল এই যে, মদিনা থেকে বের হবার সময় গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তিনি রণাঙ্গনে বিপরীত দিকে যাত্রা শুরু করতেন, যাতে মুনাফিক গুপ্তচরেরা সঠিক গন্তব্য সম্পর্কে শত্রু পক্ষকে হুঁশিয়ার করতে না পারে। আর প্রায়ই তিনি বলতেন, যুদ্ধে [এ ধরনের] ধোঁকা জায়েজ আছে।

"এমতাবস্থায় তাবুক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। [এ যুদ্ধটি কয়েকটি কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত] মহানবী ﷺ প্রকট গ্রীষ্ম ও দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যে এ যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করেন। সফরও ছিল বহু দূরের। শত্রু সেনার সংখ্যা ছিল বহুগুণ বেশি। তাই তিনি যুদ্ধের ব্যাপক ও সাধারণ ঘোষণা দিলেন যাতে মুসলমানরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে।"

মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত মতে এ জিহাদে যোগদানকারী মুসলমানের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি। আর হাকেম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে হযরত মু'আয (রা.) বলেন, 'নবী করীম ﷺ -এর সাথে এ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় আমাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারের বেশি।'

"এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কোনো তালিকা প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে জিহাদে যেতে যারা অনিচ্ছুক তাদের এ সুযোগ হলো যে, তাদের অনুপস্থিতির কথা কেউ জানবে না। যখন রাসূলে কারীম ﷺ জিহাদে রওয়ানা হলেন, তখন ছিল খেজুর পাকার মৌসুম। তাই খেজুর বাগানের মালিকেরা এ নিয়ে মহাব্যস্ত ছিল। ঠিক এ সময় নবী করীম ﷺ ও সাধারণ মুসলমানগণ এ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। বৃহস্পতিবার তিনি যুদ্ধে যাত্রা করেন। যে কোনো দিকের সফরে তা যুদ্ধের হোক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার দিনটিকেই মহানবী ﷺ পছন্দ করতেন।

"এদিকে আমার অবস্থা ছিল এই যে, প্রতিদিন সকালে জিহাদের প্রস্তুতির ইচ্ছা পোষণ করতাম, কিন্তু কোনোরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই ঘরে ফিরে আসতাম। মনে মনে বলতাম জিহাদের সামর্থ্য আমার আছে, বের হয়ে পড়াই আবশ্যক কিন্তু 'আজ'না কালে'র চক্করে পড়ে থাকলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ ও অপরাপর মুসলমানগণ জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তবুও মনে আসত, এক্ষুণি রওয়ানা হয়ে যাই, পরে কোনোখানে তাঁদের সাথে মিলিত হব। হায়! যদি তাই করতাম, কতইনা ভালো হতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হলো না।

"রাসূলে কারীম ﷺ -এর জিহাদে চলে যাওয়ার পর মদিনায় যে কোনো পথে চলতে গিয়ে একটি কথা আমাকে পীড়া দিত। আমি দেখতাম, মদিনায় রয়েছে মুনাফিক, সফরের অযোগ্য অসুস্থ কিংবা মাজুর লোকেরা। অপরদিকে চলার পথে মহানবী ﷺ কখনো আমাকে স্মরণ করেননি, অবশেষে তাবুক পৌঁছে তিনি বললেন, কা'আব ইবনে মালেকের কি হলো? [সে কোথায়?] "উত্তরে বনূ সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি জানালেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! উত্তম পোশাক ও তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার দরুন জিহাদ থেকে নিবৃত রয়েছে।' হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) ওকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি মন্দ কথা বললে। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তার মাঝে ভালো ব্যতীত আমি আর কিছুই পাইনি।' একথা শুনে নবী করীম ﷺ নীরব হয়ে গেলেন।"

হযরত কা'আব (রা.) বলেন, "যখন শুনতে পেলাম যে, রাসূলে কারীম ﷺ জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন বড়ই চিন্তিত হয়ে পরলাম এবং তাঁর বিরাগভবাজন না হওয়ার জন্য যুদ্ধে না যাওয়ার কোনো একটি বাহানা দাঁড় করবার ইচ্ছাও করছিলাম এবং প্রয়োজনবোধ বন্ধুদের সাহায্যও নিতাম। কিন্তু [এ জল্পনা-কল্পনায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর] যখন শুনলাম, নবী করীম ﷺ মদিনায় ফিরে এসেছেন, তখন মনের জল্পনা-কল্পনা সব তিরোহিত হয়ে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, কোনো মিথ্যা বাহানার আশ্রয় নিয়েই হযরত ﷺ -এর রোষাণল থেকে বাঁচা যাবে না। তাই সত্য বলার সংকল্প গ্রহণ করি। কারণ সত্য তখন আমাকে বাঁচাতে পারে।

"সূর্য কিছু উপরে উঠলে রাসূলে কারীম ﷺ মদিনায় প্রবেশ করেন। ঠিক এমনি সময় যে কোনো সফর থেকে ফিরে আসা ছিল তাঁর অভ্যাস। আরেকটি অভ্যাস ছিল এই যে, কোনোস্থান থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু-রাকাত নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে দেখা করতে যেতেন। তারপর স্ত্রীগণের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

"এ অভ্যাস মতে তিনি প্রথমে মসজিদে গমন করেন এবং দু-রাকাত নামাজ আদায় করেন, অতঃপর মসজিদেই বসে পড়েন। তখন যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক মুনাফিকের দল, যাদের সংখ্যা ছিল আশিজনের কিছু অধিক হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে মিথ্যা বাহানা গড়ে, মিথ্যা শপথ করতে থাকে। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এ বাহ্যিক অজুহাত ও মৌখিক শপথকে কবুল করে নিয়ে তাদের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের গোপন বিষয়কে আল্লাহ তা'আলার হাতে সমর্পণ করেন।

"ঠিক এ সময় আমিও তাঁর খিদমতে হাজির হই এবং তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়ি। আমি যখন তাঁকে সালাম দেই, তখন তিনি এমন ভঙ্গিতে একটু হাসলেন যেমন অসন্তুষ্ট লোকেরা হাসে।" কতিপয় রেওয়ায়েত মতে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি মুনাফেকী করিনি। আমার মনে দীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং দীনের মধ্যে কোনো পরিবর্তনও আনিনি। এবার তিনি বললেন, তাহলে জিহাদে গেলে না কেন? তুমি কি সওয়ারি খরিদ করনি?

"আরজ করলাম, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দুনিয়ার আর কোনো মানুষের সামনে যদি বসতাম তবে নিশ্চয়ই কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে বিরাগভাজন হওয়া থেকে বাঁচতাম। কেননা বাহানা গড়ার ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার বুঝতে বাকি নেই যে, কোনো মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হয়তো আপনার সাময়িক সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব, কিন্তু বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ আমার প্রকৃত অবস্থার কথা আপনাকে জানিয়ে দিয়ে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি, তবে আপনি সাময়িকভাবে অসন্তুষ্ট হলেও আশা করি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং সত্য কথা হলো এই যে, জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার যথার্থ কোনো ওজর আমার ছিল না এবং এমনকি সে সময় যে আর্থিক ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য আমার ছিল, তা অন্য কোনো সময় ছিল না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, এ সত্য কথা বলেছে। অতঃপর বললেন, এখন যাও, দেখি আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি চলে আসলাম। চলার পথে বনূ সালামার কিছু লোক আমাকে বলল, 'আমাদের জানামতে ইতঃপূর্বে তুমি কোনো অপরাধ করনি। এ কেমন নির্বুদ্ধিতা? অন্যান্য লোকের মতো তুমিও তো কোনো একটি বাহানা গড়ে নিলে পারতে এবং তোমার অপরাধের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগফিরাত কামনা করলে যথেষ্ট হতো। আল্লাহর কসম, তারা আমার এই সত্যবাদিতার বারংবার নিন্দা করেছে। এমনকি আমারও মনে হয়েছে, আবার গিয়ে নবী করীম ﷺ-কে বলে আসি যে, আমার পূর্ব বক্তব্য মিথ্যা, আমরা যথার্থ ওজর রয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে বলেছি, অপরাধের উপর অপরাধ কেন করব? এক অপরাধ করেছি জিহাদে না গিয়ে। দ্বিতীয় অপরাধ হবে মিথ্যা কথা বলে। কাজেই আমি তাদের বললাম, আমার মতো আর কি কেউ আছে, যারা নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ দুজন আরো আছে; একজন মুরারা ইবনে রবিয়া আল আমেরী অপরজন হলেন হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফী (রা.)।

ইবনে আবী হাতেম (রা.)-এর রেওয়ায়েত মতে হযরত মুরারা (রা.)-এর জিহাদ থেকে বিরত থাকার কারণ ছিল এই যে, তাঁর বাগানের ফল তখন পাকছিল। মনে মনে ভাবলেন, ইতিপূর্বে অনেক জিহাদেই তো শরিক হয়েছি। এ বছর বিরত থাকলে কি আর হবে? কিন্তু পরে যখন নিজের অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে বললেন, এই বাগান আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিলাম।

হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা.)-এর ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁর পরিবারবর্গ ছিল দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন। এ সময় তাঁরা পরস্পর মিলিত হন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, এ বছর জিহাদ থেকে বিরত থেকে পরিবার-পরিজনের সাথে কাটিয়ে নিই। কিন্তু পরে যখন অপরাধ বুঝতে পারলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, এখন থেকে পরিবারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকব।

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, "লোকেরা এমন দুজন সম্মানী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল, যাঁরা বদর যুদ্ধের মুজাহিদ। তাই আমি একথা বলে তাদের ত্যাগ করলাম যে, এ দুজন শ্রদ্ধেয়জনের আমলই আমার অনুসরণীয়। "এদিকে রাসূল কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে আমাদের তিনজনের সাথে সালাম-কালাম বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অথচ পূর্বের মতোই আমাদের অন্তরে মুসলমানদের ভালোবাসা ছিল। কিন্তু তারা সবাই আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"ইবনে আবি শায়বার রেওয়ায়েতে আছে, এখন আমাদের অবস্থা এমন হলো যে, আমরা লোকদের কাছে যেতাম কিন্তু কেউ আমাদের সাথে না কথা বলত, না সালাম দিত, আর না সালামের জবাব দিত।"

মুসনাদে আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত আছে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, তখন দুনিয়াই যেন আমাদের জন্য বদলে গেল। মনে হচ্ছিল যেন এক অচেনা জগতে বাস করছি। নিজের ঘরবাড়ি, উদ্যান, পরিচিত লোকজন বলতে কিছুই যেন আমাদের নেই। সর্বাধিক চিন্তার বিষয় হলো যে, এ অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করি তবে নবী করীম ﷺ আমার জানাজার নামাজ আদায় করবেন না। কিংবা আল্লাহ না করুন যদি ইতোমধ্যে হযরত ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়ে যায়, তবে সারা জীবন এ লাঞ্ছনার মধ্যেই ঘুরে ফিরতে হবে। এ চিন্তায় আমি বড় কাহিল হয়ে পড়লাম। এমনি অবস্থায় আমাদের পঞ্চাশ রাত কেটে গেল। আমার অপর দু-সঙ্গী [মুরারা ও হেলাল] এ অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে ঘরে বসে দিবারাত্র কান্নাকাটিতে মগ্ন থাকে। তবে আমি ছিলাম যুবক, বাইরে ঘুরাফেরা করতাম, নামাজের জামাতে শরিক হতাম এবং বাজারেও যেতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না, সালামের জবাব দিত না। নামাজের পর হুজুর ﷺ-এর মজলিসে বসতাম এবং সালাম দিয়ে দেখতাম জবাবে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ছে কিনা। অতঃপর তাঁর পাশেই নামাজ আদায় করতাম এবং আড় চোখে তাঁকে দেখতাম, যখন আমি নামাজে মশগুল তখন তিনি আমার প্রতি সময় সময় দৃষ্টি রাখতেন, কিন্তু আমি তাঁর দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতেন।

"মুসলমানদের এই বয়কট দীর্ঘতর হয়ে উঠলে একদিন চাচাতো ভাই কাতাদাহ (রা.)-এর কাছে যাই, তিনি ছিলেন আমার বড় আপনজন। আমি তাঁর বাগানের দেওয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি এবং তাঁকে সালাম দেই। আল্লাহর কসম! তিনি সালামের উত্তর দিলেন না। বললাম, কাতাদাহ তোমার কি জানা নেই, আমি নবী করীম ﷺ-কে কত ভালোবাসি? কাতাদাহ তখন নিশ্চুপ। কথাটি আরো কয়েকবার বললাম, অবশেষে তৃতীয় কি চতুর্থবার তিনি শুধু এতটুকু বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম আর দেয়াল টপকে বাইরে চলে এলাম। একদিন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মদিনার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ সিরিয়া থেকে আগত জনৈক ব্যবসায়ীর প্রতি আমার নজর পড়ল। সে লোকদের জিজ্ঞেস করছিল, কা'আব ইবনে মালেকের ঠিকানা কেউ দিতে পার? লোকেরা আমার দিকে ইশারা করলে সে আমার কাছে এসে গাসসানের রাজার একটি পত্র আমার হাতে দেয়। পত্রটি রেশম বস্ত্রের উপর লিখিত ছিল। বিষয়বস্তু ছিল এই- "অতঃপর জানতে পারলাম যে, আপনার নবী আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং আপনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন, অথচ আল্লাহ আপনাদের এহের লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের স্থানে রাখেননি। আমার এখানে আসা যদি ভালো মনে করেন চলে আসুন। আমরা আপনাদের সাহায্যে থাকব।"

"পত্রটি পাঠ করে বললাম, হায়! এতো আরেক পরীক্ষা। কাফেররা আমার প্রতি আশাবাদী হয়ে উঠেছে [যাতে তাদের সাথে একাত্ম হই]। পত্রটি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলি। কিছুদূর গিয়ে রুটির এক চুলায় তা নিক্ষেপ করলাম।"

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, "পঞ্চাশ রাতের মধ্যে যখন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হলো তখন হঠাৎ নবী করীম ﷺ-এর জনৈক দূত খোযাইমা ইবনে সাবিত (রা.) আমার কাছে এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ, নিজ স্ত্রী থেকেও দূরে সরে থাক। আমি বললাম, তাকে তালাক দিয়ে দেব, না অন্য কিছু? তিনি বলেন, না। তবে কার্যত তার থেকে দূরে থাকবে। নিকটে যাবে না; এ ধরনের আদেশ অপর সঙ্গীদ্বয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে। আমি স্ত্রীকে বললাম, পিতৃগৃহে চলে যাও, সেখানে থাক এবং আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা কর। ওদিকে হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী খাওলা বিনতে আসেম এ আদেশ শুনে সোজা রাসূল ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া বৃদ্ধ ও দুর্বল তার সেবা করার কেউ নেই। ইবনে আবি শায়বার রেওয়ায়েত মতে তিনি চোখেও কম দেখতেন। খাওলা বিনতে আসেম আরো বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তাঁর খিদমত করা কি আপনার পছন্দ নয়? তিনি বলেন, খিদমতে আপত্তি নেই, তবে সে যেন তোমার কাছে না যায়। আমি আরজ করি, সে তো বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, নড়চড়ার শক্তি নেই। আল্লাহর কসম! সে তো দিনরাত শুধু কেঁদে চলেছে।

কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, 'বন্ধুজনেরা আমাকেও পরামর্শ দিয়েছিল যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গিয়ে স্বপরিবারে থাকার অনুমতি চেয়ে নেই, যেমন তিনি হেলালকে অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে বললাম, আমি তা পারব না। জানি না নবী করীম ﷺ কি জবাব দেবেন। তাছাড়া আমি তো যুবক [স্ত্রী সাথে রাখা সতর্কতার পরিচায়ক নয়]। এমনিভাবে আরো দশটি রাত কাটিয়ে দিলাম। এতে মোট পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো। [মুসনাদে আব্দুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে,] সে সময়ই রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের তওবা কবুল হওয়ার আয়াতটি নাজিল হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, অনুমতি থাকলে এ সময় কা'আব ইবনে মালেক (রা.)-কে সংবাদটি দেওয়ার ব্যবস্থা করি? হুজুর ﷺ বললেন, না। লোকেরা ভিড় জমাবে, ঘুমানো দুষ্কর হবে।' কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, পঞ্চাশতম রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর ফজরের নামাজ আদায় করার পর ঘরের ছাদে বসেছিলাম আর কুরআনের ভাষায় অবস্থা ছিল এই- "পৃথিবী এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য আমার জন্য সংকুচিত হয়ে গেল।" হঠাৎ সিলা (سَلْعٌ) পর্বতের চূড়া থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম- কে যেন বলছে, 'কা'আব ইবনে মালেকের জন্য সুসংবাদ।'

মুহাম্মদ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-ই সেই পর্বতের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে বলছিলেন, আল্লাহ কা'আবের তওবা কবুল করেছেন, তার জন্য সুসংবাদ। হযরত ওকবার রেওয়ায়েত মতে কা'আবকে এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দুজন সাহাবী দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের একজন আগে চলে গেলেন। কিন্তু পেছনে যিনি ছিলেন তিনি 'সিলা' পর্বতের চূড়ায় উঠে সজোরে চিৎকার করে সংবাদটি প্রচার করে দিলেন। কথিত আছে, তাঁরা দুজন হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারূক (রা.)। হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, 'আমি এ চিৎকার শুনে সিজদায় চলে গেলাম। অনন্দাশ্রু দু-গণ্ড বেয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। বুঝতে পারলাম, সংকট কেটে গেছে। রাসূলে কারীম ﷺ ফজরের নামাজের পর আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সংবাদটি সাহাবীদেরকেও দিলেন। তখন সবাই মোবারকবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে ত্রস্তপদে আমাদের তিনজনের দিকে ছুটে আসেন। কেউ ঘোড়া নিয়ে আমার দিকে ছুটলেন। তবে পাহাড়ে চিৎকারকারী ব্যক্তির আওয়াজই সবার আগে আমার কানে পৌঁছেছিল।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য বাইরে এসে দেখি, লোকেরা দলে দলে মোবারকবাদ জানাতে আসছেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখি মহানবী ﷺ সেখানেই অবস্থান করছেন আর তাঁর চারদিকে সাহাবায়ে কেরামের ভিড়। আমাকে দেখে সবার আগে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ আমার কাছে এসে করমর্দন করলেন এবং তওবা কবুল হওয়ার জন্য মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন। আমি তালহার এই দয়া কখনো ভুলব না। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাম জানাই, তখন তার পবিত্র চেহারা আনন্দে ঝলমল করছিল। তিনি বললেন, কা'আব তোমার সুসংবাদ আজকের এই মোবারক দিনের জন্য, যা তোমার গোটা জীবনের দিনগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এ সংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? ইরশাদ হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তুমি সত্য কথা বলেছ বলে আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্যতা প্রকাশ করে দিলেন।

'আমি তাঁর সামনে বসে নিবেদন করলাম, আমার তওবা হলো, অর্থসম্পদ যা আছে সমুদয় ত্যাগ করব, সবই আল্লাহ তা'আলার রাহে করে দান দেব। তিনি বলেন, না, নিজের জন্যও কিছু রেখো, এটিই উত্তম। আরজ করলাম, অর্ধেক সম্পদ দান করে দেব? তিনি এতেও বারণ করলেন। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ সদকার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাতে সম্মত হলেন। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সত্য বলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে নাজাত দিয়েছেন, তাই আমার প্রতিজ্ঞা হলো এই যে, আমি জীবনে সত্য ছাড়া টু শব্দটি করব না। হযরত কা'আব (রা.) বলেন, 'আল্লাহর একান্ত শুকরিয়া যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি কথাও মিথ্যা বলিনি।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের পর এর চাইতে বড় নিয়ামত আর একটিও লাভ করিনি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে সত্য কথা বলেছি, মিথ্যাকে ত্যাগ করেছি। কারণ যদি মিথ্যা বলতাম, তবে সেই মিথ্যা শপথকারী লোকদের মতোই আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যাদের সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ .... فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদের বয়কট অব্যাহত থাকার মাঝে এ রহস্য রয়েছে যে, তাবুক যুদ্ধের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ بِتَرْكِ مَعَاصِيْهِ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ فِي الْاِيْمَانِ وَالْعُهُوْدِ بِاَنْ تَلْزَمُوا الصِّدْقَ ـ

১২০. مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ يَتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِذَا غَزَا وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ بِاَنْ يَصُوْنُوْهَا عَمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ ط مِنَ الشَّدَائِدِ وَهُوَ نَهْيٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ ذٰلِكَ اَيِ النَّهْيُ عَنِ التَّخَلُّفِ بِاَنَّهُمْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ عَطَشٌ وَّلَا نَصَبٌ تَعَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ جُوْعٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى وَطْأً يَّغِيْظُ يُغْضِبُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ لِلّٰهِ نَّيْلًا قَتْلًا اَوْ اَسْرًا اَوْ نَهْبًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ط لِيُجَازُوْا عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ اَيْ اَجْرَهُمْ بَلْ يُثِيْبُهُمْ ـ

অনুবাদ :

১১৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা পাপাচার বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং ঈমান ও চুক্তির বিষয়ে যারা সত্যবাদী তাদের অন্তর্ভুক্ত হও। অর্থাৎ তোমরা সর্বদা সততাকে আঁকড়ে থাক।

১২০. আল্লাহর রাসূলের যখন তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন তাঁর সহগামী না হয়ে পিছনে রয়ে যাওয়া এবং তিনি নিজে আল্লাহর পথে যে কষ্ট স্বীকার করেন তা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় জ্ঞান করা মদিনাবাসী ও তাদের পার্শ্ববর্তী মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয়। তা অর্থাৎ যুদ্ধ হতে পশ্চাদপদ থাকার এই নিষেধাজ্ঞা এ জন্য যে আল্লাহ তা'আলার পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি এবং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফেরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন স্থানে পদক্ষেপ করা এবং আল্লাহর শত্রুদের নিকট হতে কিছু লাভ করা অর্থাৎ তাদেরকে বধ করা বা বন্দী করা বা দেশান্তর করা সবকিছুর প্রতিফল দানের উদ্দেশ্যে তাদের সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল অর্থাৎ উল্লিখিত জনপদের প্রতিফল বিনষ্ট করেন না। বরং তাদেরকে তিনি পুণ্যফল দিয়ে থাকেন। مَا كَانَ এ বাক্যটি خَبَرٌ বা বিবরণমূলক ভঙ্গিতে ব্যবহৃত হলেও এ স্থানে نَهْيٌ বা নিষেধাজ্ঞামূলক অর্থে ব্যবহৃত। بِاَنَّهُمْ তার ب টি سَبَبِيَّة বা হেতু বোধক। ظَمَاٌ অর্থ তৃষ্ণা। نَصَبٌ অর্থ ক্লান্তি مَخْمَصَةٌ অর্থ ক্ষুধা। مَوْطِئًا তা مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল وَطْأً [পদক্ষেপ করা] অর্থে ব্যবহৃত يَغِيْظُ অর্থ ক্রোধ সঞ্চার করা।

Free@www.e-ilm.weebly.com

١٢١. وَلَا يُنْفِقُوْنَ فِيْهِ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَوْ تَمْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا بِالسَّيْرِ اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ذٰلِكَ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاءَهُ .

১২১. এবং তাতে তাদের ক্ষুদ্র যেমন একটি খর্জুর বা বৃহৎ ব্যয় এবং যাত্রার মাধ্যমে তাদের প্রান্তর অতিক্রম এসব কিছুই তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করা হয়– এ উদ্দেশ্যে যে আল্লাহ তা'আলা তারা যা করে তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দেবেন।

١٢٢. وَلَمَّا وُبِخُوْا عَلَى التَّخَلُّفِ وَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً نَفَرُوْا جَمِيْعًا فَنَزَلَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا اِلَى الْغَزْوِ كَافَّةً ط فَلَوْلَا فَهَلَّا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ قَبِيْلَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ جَمَاعَةٌ وَمَكَثَ الْبَاقُوْنَ لِيَتَفَقَّهُوْا اَىِ الْمَاكِثُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ بِتَعْلِيْمِ مَا تَعَلَّمُوْهُ مِنَ الْاَحْكَامِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ عِقَابَ اللّٰهِ بِامْتِثَالِ اَمْرِهِ وَنَهْيِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) فَهٰذِهِ مَخْصُوْصَةٌ بِالسَّرَايَا وَالَّتِىْ قَبْلَهَا بِالنَّهْىِ عَنْ تَخَلُّفِ اَحَدٍ فِيْمَا اِذَا اَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ .

১২২. যুদ্ধ হতে পশ্চাতে রয়ে যাওয়ার বিষয়ে তারা তিরস্কৃত হওয়ার পর রাসূল ﷺ অপর একটি দল জিহাদের জন্য প্রেরণ করার উদ্যোগ নিলে তখন একেবারে সকলেই তাতে যাত্রা করতে উদ্যত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– মু'মিনদের সকলে একসাথে যুদ্ধ অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের প্রত্যেক কবিলার এক অংশ এক জামাত কেন বের হয় না আর অবশিষ্টরা কেন বাড়িতে থেকে যায় না। যাতে তারা বাড়িতে অবস্থানরত অবশিষ্টরা দীন সম্পর্কে জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তারা যে সমস্ত আহকাম ও বিধিবিধান শিক্ষা করেছে তৎমাধ্যমে সতর্ক করতে পারে যখন তারা যুদ্ধ হতে তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহ বাস্তবায়ন করত আল্লাহ তা'আলার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতোক্ত বিধানটি সারিয়্যা অর্থাৎ রাসূল ﷺ নিজে যে যুদ্ধে শরিক হননি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যুদ্ধে শরিক না হয়ে পশ্চাতে থাকা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত বিধানটি হলো যে যুদ্ধে রাসূল ﷺ নিজে বের হয়েছেন সে ক্ষেত্রের জন্য। لَوْلَا তা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِى الْاِيْمَانِ وَالْعُهُوْدِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَعَ الصَّادِقِيْنَ -এর মধ্যে مَعِيَّتْ দ্বারা مَعِيَّتْ فِى الْاِيْمَانِ উদ্দেশ্য مَعِيَّتْ فِى الْمُعَامَلَاتِ وَالْمَكَانِ উদ্দেশ্য নয়। কেননা এই مَعِيَّتْ এ কোনো কল্যাণ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না হয়।

قَوْلُهُ تَلْزَمُوا الصِّدْقَ : এটা مَعِيَّتْ -এর পদ্ধতির বর্ণনা

قَوْلُهُ بِاَنْ يَصُوْمُوْا الخ : এটা حَاصِلِ مَعْنٰى -এর বর্ণনা بِاَنْفُسِهِمْ -এর মধ্যে بَاءٌ টা تَعْدِيَةْ -এর জন্য হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো যে কঠিন তা ও মসিবতে নিজেকে ফেলেছেন, যেই ক্লেশ আপনার সম্মুখে আসছে। তোমরা তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَهُوَ نَهْيٌ بِلَفْظِ الْخَبَرِ : এটা মুবালাগার ভিত্তিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيِ النَّهْيُ : এটা ذَالِكَ -এর مَرْجِعْ -এর বর্ণনা। আর نَهْيٌ দ্বারা সেই نَهِيٌ উদ্দেশ্য যা مَا كَانَ لِاَهْلِ مَدِيْنَةِ الخ থেকে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى وَطْئًا : অর্থাৎ مَوْطِئًا অর্থে এর مِيْم টা হলো مَصْدَر مِيْمِىْ এটা ظَرْف -এর مِيْم নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَنَالُوْنَ : অর্থাৎ لَا يُصِيْبُوْنَ সম্মুখন হওয়া পেশ আসা, অর্থাৎ সময় ও পেরেশানির সম্মুখীন হওয়া।

قَوْلُهُ نَيْلًا : অর্থাৎ اِصَابَةً তথা يُصِيْبُوْنَ اِصَابَةً এটা প্রত্যেক কষ্ট ও মসিবতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

قَوْلُهُ اَىْ اَجْرُهُمْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, اَلْمُحْسِنِيْنَ টা هُمْ যমীরের স্থানে তার সিফত বলা যথেষ্ট হতো। কিন্তু তাতে دَلَالَةٌ عَلَى الْاِحْسَانِ হতো না।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كُتِبَ -এর যমীর اِنْفَاقْ এবং قَطْع وَادِىْ উভয়ের দিকেই উল্লিখি تَاوِيْل -এর ভিত্তিতে ফিরতেছে। কাজেই عَدَمِ مُطَابَقَتْ -এর সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

قَوْلُهُ لَمَّا وُبِخُوْا عَلَى التَّخَلُّفِ : এতে আগত আয়াত (وَمَا كَانَ) -এর শানে নুযূল এর দিকে ইঙ্গিত করেছে।

قَوْلُهُ قَبِيْلَةٌ : فِرْقَةٍ -এর তাফসীর قَبِيْلَةٍ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِرْقَةٍ দ্বারা বড় জামাত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَكَثَ الْبَاقُوْنَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে لِيَتَفَقَّهُوْا -এর যমীর উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে نَفَرٌ -এর সাথে নয়। কাজেই এ সন্দেহ শেষ হয়ে গেল যে, যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দানে কিভাবে ফিকহ অর্জন করবে?

قَوْلُهُ وَالَّتِى قَبْلَهَا بِالنَّهْيِ عَنِ التَّخَلُّفِ الخ : এই বৃদ্ধি করা দ্বারা উভয় ইবারতের দ্বন্দ্ব নিরসন করা উদ্দেশ্য। مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ -এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির জন্যই জিহাদ থেকে বসে থাকা জায়েজ নয়। আর وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا الخ আয়াতে সকলকে জিহাদে গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। উভয় আয়াতের مَفْهُوْم -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা تَعَارُضْ রয়েছে।

اَلَّتِىْ قَبْلَهَا الخ দ্বারা এই সন্দেহেরই নিরসন করা হয়েছে। এই জবাবের সারকথা হলো এই যে, পূর্বে যেই نَهْى রয়েছে তা এই সুরতে রয়েছে যে, বের হওয়াটা ব্যাপকভাবে হয় এবং স্বয়ং রাসূল ﷺ ও জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়েন। আর ছোট জামাত বের হওয়া আর বড় জামাত মদিনায় অবস্থান করার বিধান হলো সারিয়ার। যখন ব্যাপক ঘোষণা না হয় এবং রাসূল ﷺ নিজে তাতে অংশগ্রহণ না করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) এবং তাঁর দুজন সঙ্গীকে আল্লাহ তা'আলা তাদের সত্যবাদীতার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন কর। এই আয়াতে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে দুটি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একটি তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বন করা আর দ্বিতীয় হলো সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করা এবং মুনাফিকদের সঙ্গ পরিহার করা।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের পরই তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বন করা একান্ত জরুরি। এরপর সত্যবাদী এবং নেককারদের সঙ্গ অবলম্বন করা পক্ষান্তরে মুনাফিকদের তথা কাফের ও সকল মন্দ লোকের সঙ্গ পরিহার করা কর্তব্য।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً : অর্থাৎ এমন নয় যে, মুসলমানগণ সকলেই একসাথে অভিযানে যাবে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে যে কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে তাতে কোনো কোনো মুসলমানের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রত্যেক জিহাদেই মুসলমান মাত্রেরই অংশগ্রহণ একান্ত কর্তব্য। এজন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিহাদে সকল মুসলমানেরই শরিক হওয়া একান্ত কর্তব্য নয়।

শানে নযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাবুকের জিহাদে গমন করেন তখন মদিনাতে শুধু মুনাফেকরাই থেকে যায়। আর দু চারজন যারা খাঁটি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও যেতে

পারেননি তাদের তওবা সম্পর্কীয় আলোচনা ইতঃপূর্বে হয়েছে ঐ অবস্থায় মু'মিনগণ বললেন, আমরা আর কোনো সময় কোনো জিহাদ থেকে বিরত থাকব না স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদে গমন করেন অথবা তিনি সাহাবায়ে কেরামের কোনো দল জিহাদে প্রেরণ করেন কোনো অবস্থাতেই আমরা জিহাদ থেকে বিরত থাকব না।

মহানবী ﷺ যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন দিকের কাফেরদের মোকাবিলায় সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করলেন তারা সকলেই ঐ জিহাদে শরিক হলেন, মদিনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একা রেখে গেলেন, তখন এই আয়াত নাজিল হয়।

সূরা তাওবায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাবুক যুদ্ধের ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। এ যুদ্ধে শরিক হওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হয়। বিনা ওজরে এ আদেশের বিরুদ্ধাচারণ জায়েজ ছিল না। যারা আদেশ লঙ্ঘন করেছে তাদের অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। এ সূরার অনেক আয়াতে তাদের আলোচনা এসেছে। আর কিছু নিষ্ঠাবান মু'মিনও ছিলেন, যারা সাময়িক অলসতার দরুন জিহাদ থেকে বিরত ছিলেন। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছেন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে বাহ্যত বুঝা যেতে পারে যে, প্রত্যেক জিহাদে গমন করাই প্রত্যেকটি মুসলমানদের জন্য ফরজ এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম অথচ শরিয়তের হুকুম তা নয়। বরং শরিয়ত মতে সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ নিলেই অবশিষ্ট মুসলমানদের পক্ষ থেকেও এ ফরজ আদায় হয়ে যায়। কিন্তু জিহাদকারী যদি যথেষ্ট সংখ্যক না হয় এবং যদি তাদের পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তবে আশপাশের মুসলমানদের জিহাদে যোগ দেওয়া এবং দলের শক্তি বৃদ্ধি করা ফরজ হয়ে দাঁড়ায়। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানগণ এমনকি প্রয়োজনবোধ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের পক্ষে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরজে আইন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। তেমনিভাবে মুসলমানদের আমির যদি প্রয়োজন বোধে সকল মুসলমানকেই জিহাদে যোগ দেওয়ার সাধারণ আদেশ জারি করেন, তবুও জিহাদ সবার উপরে ফরজ হয়ে যায়। তখনও জিহাদ থেকে বিরত থাকা হারাম। যেমন তাবুক যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আদেশ জারি হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তাবুক যুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধের ঘোষণা ছিল এক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে, অথচ সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন নয় এবং এতে সকলের সমবেতভাবে যোগ দেওয়াও ফরজ নয়। কেননা জিহাদের মতো ইসলাম ও মুসলমানদের আরো অনেক সমষ্টিগত সমস্যা রয়েছে, যার সমাধান জিহাদের মতোই ফরজে কিফায়া। আর তা হবে দায়িত্ব বণ্টনের নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থাৎ মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। তাই সকল মুসলমানদের পক্ষে একই সময়ে জিহাদে যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এ আলোচনা থেকে 'ফরজে কিফায়া'র পরিচয় জানা গেল। অর্থাৎ যে কাজ ব্যক্তিগত নয়, বরং সমষ্টিগত এবং সকল মুসলমানদের পক্ষে তা সমাধা করা কর্তব্য, শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকেই ফরজে কিফায়া বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে দায়িত্ব বণ্টনের নীতি অনুসারে যাবতীয় কার্য স্ব-স্ব গতিতে চলতে পারে এবং সমষ্টিগত দায়িত্বগুলোও আদায় হয়ে যায়। মুসলমান পুরুষের পক্ষে জানাজার নামাজ, কাফন-দাফন, মসজিদ নির্মাণ, তার হেফাজত ও সীমান্ত রক্ষা প্রভৃতি হলো ফরজে কিফায়া। সাধারণত বিশ্বের সকল মুসলমানের উপরই এ দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু যদি কিছু সংখ্যক লোক তা আদায় করে তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

ফরজে কিফায়ার মধ্যে দীনের তালিম সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তা'লিমে-দীনের গুরুত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে, জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলাকালেও যেন দীনের তা'লিম স্থগিত না হয়। সে জন্য প্রত্যেক বড় দল থেকে একেকটি ছোট দল জিহাদে বের হবে এবং অবশিষ্ট লোকেরা দীনি ইলম হাসিলে নিয়োজিত থাকবে। অতঃপর তারা ইলম হাসিল করে মুজাহিদ ও অপরাপর লোককে দীনি তালিম দেবে।

দীনের ইলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতটি দীনের ইলম হাসিলের মৌলিক দলিল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দীনি ইলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি এবং ইলম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দীনি ইলমের ফজিলত : দীনি ইলমের অগণিত ফজিলত ও ছওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোড় বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) রেওয়ায়েত

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ তা'আলা এই চলার ছওয়াব হিসেবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ দীনি জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল ইবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফজিলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেম সমাজ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ সোনা রূপার মিরাস রেখে যান না। তবে ইলমের মিরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি ইলমের মিরাস পায়, সে যেন মহাসম্পদ লাভ করল। –[কুরতুবী]

ইমাম দারেমী (র.) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, বনী ইসলাঈলের দুজন লোক ছিলেন যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামাজ ও লোকদের দীনি তালিম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দুজনের মধ্যে কার ফজিলত বেশি? রাসূল ﷺ বলেন, সেই আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফজিলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর। –[কুরতুবী]

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবিলায় একজন ফিকহবিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারি। –[তিরমিযী, মাযহারী]

তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। এক. সদকায়ে জারিয়া, যেমন– মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। দুই. ইলম, যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। যেমন– শাগরিদ রেখে গিয়ে ইলমে দীনের চর্চা জারি রাখা বা কোনো কিতাব লিখে যাওয়া। তিন. নেককার সন্তান, যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং ছওয়াব পাঠাতে থাকে। –[কুরতুবী]

দীনি ইলম ফরজে আইন অথবা ফরজে কিফায়া হওয়ার বিবরণ : ইবনে আদী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ও হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ। বলা বাহুল্য এ হাদীস ও উপরিউক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লিখিত ইলম শব্দের অর্থ দীনের ইলম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো দুনিয়াবি জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরি। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফজিলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দীনি ইলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বুঝায় না; বরং তা বহু বিষয়ের উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান ননারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লিখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানদের উপরই যে ইলম তলব ফরজ করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দীনি ইলমের শুধু সে অংশটি আয়ত্ত করাই ফরজ করা হয়েছে যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরি এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরজসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয়সমূহ থেকে বাঁচতে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়, কুরআন হাদীসের মাসআলা মাসায়েল, কুরআন হাদীস থেকে আহরিত হুকুম-আহকাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরজে আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরজে কেফায়া। তাই প্রত্যেকটি শহরেই যদি শরিয়তের উপরিউক্ত ইলম ও আইন-কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত লাভ করতে পারে। কিন্তু যে শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোনো আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরজ, যাতে করে যে কোনো প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমতে আমল করা যায়। দীনি ইলম সম্পর্কে ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়ার তাফসীর নিম্নরূপ–

ফরজে আইন : ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামাজ রোজা ও অন্যান্য ইবাদত বা শরিয়ত যেসব বিষয় ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মাকরূহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক তার জন্য জাকাতের মাসআলা মাসায়েল জানা, যে হজ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আহকাম ও মাসায়েল জেনে নেওয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনাবেচা বা শিল্প কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরজ। এক কথায় শরিয়ত মানুষের যেসব কাজ ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ।

ইলমে তাসাউফও ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত : শরিয়তের জাহিরী হুকুম তথা নামাজ রোজা প্রভৃতি যে ফরজে আইন তা সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর ইলম রাখাও ফরজে আইন। হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরজে আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর ইলম যাকে পরিভাষায় ইলমে তাসাউফ বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরজে আইন। অধুনা বিভিন্ন ইলম তত্ত্বজ্ঞান, কাশ্‌ফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরজে আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বুঝায় যা ফরজ ওয়াজিবের তাফসীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকিদা, যার সম্পর্কে বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরজ কিংবা গর্ব, অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কুরআন হাদীসের মতে হারাম। এগুলোর গতি প্রকৃতি অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। এ সকল বিষয়ের উপরই হলো ইলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরজে আইন।

ফরজে কিফায়া : পূর্ণ কুরআন মাজীদের অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বুঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, কুরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া। বস্তুত এটি এত বড় কাজ যে, গোটা জীবন এতে নিয়োজিত থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরিয়ত একে ফরজে কিফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমতো এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দীনি ইলমের সিলেবাস : কুরআন মাজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দীনি ইলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে– لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ অথচ يَتَعَلَّمُوْنَ الدِّيْنَ [যেন দীনের জ্ঞান হাসিল করে] -ও বলা যেত। কিন্তু কুরআন এখানে تَعَلُّمْ-এর স্থলে تَفَقُّهْ শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দীনের ইলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের সাথে। বরং ইলমে দীনের উদ্দেশ্য হলো দীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تَفَقُّهْ শব্দের অর্থও তাই। এটি فِقْه থেকে উদ্ভূত। فِقْه অর্থ– বুঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদ এ আয়াতে صِيْغَة مُجَرَّدْ ব্যবহার করে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ [যেন তারা দীনকে বুঝে নেয়।] বলেনি; বরং একে بَاب تَفَعُّلْ এ নিয়ে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধানও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে বাক্যের মর্ম হবে, "তারা যেন দীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলা বাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামাজ-রোজা, হজ-জাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জ্ঞানকেই দীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না; বরং দীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বুঝে, তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে, দুনিয়ার এজীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে, মূলত এ চিন্তাই হলো দীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) 'ফিকহ' -এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফিকহ সেই শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বুঝে নেয়, যা থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরি।" অধুনা মাসআলা- মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে ইলমে ফিকহ বলা হয় তা পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফিকহের তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় দীনের ইলম হাসিল করার অর্থ হলো, দীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোনো উপায়েই হোক সব একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব : দীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ [যেন তারা জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ভয় প্রদর্শন করে] বাক্যটিতে। উল্লেখ্য, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে اِنْذَارٌ বা ভয় প্রদর্শন। এটি اِنْذَارٌ-এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুত ভয় প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতি প্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত শত্রু, হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয় প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয় প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয় প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবিতে একেই বলা হয় اِنْذَارٌ এজন্য নবী-রাসূলগণ نَذِيْر উপাধিতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয় প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে তা মূলত নবীগণের আংশিক মিরাস বা হাদীস মতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য, নবীগণ بَشِيْر ও نَذِيْر উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نَذِيْر-এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بَشِيْر অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলিলের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেককার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া। তবে এখানে শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দুটি। ১. দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং ২. অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেম ও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় একে جَلْبِ مَنْفَعَتٌ [উপকার লাভ] دَفْعِ مُضَرَّتٌ [লোকসান পরিহার] নামে অভিহিত করে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসান পরিহারের ও উপকার লাভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কেননা যে কাজ মানুষের জন্য কল্যাণকর ও বাঞ্ছনীয় তা ত্যাগ করা বড়ই ক্ষতিকর। সুতরাং ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে যে বাঁচতে চায় সে করণীয় কর্মে অলসতা থেকেও দূরে থাকবে।

এ আলোচনা থেকে আরো একটি কথা জানা যায়। বর্তমান যুগে ওয়াজ ও নসিহতের কার্যকারিতা যে খুব কম পরিলক্ষিত হয়, তার প্রধান কারণ হলো, ভয় প্রদর্শনের নিয়ম পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য না রাখা। যে ওয়ায়েজের কথা ও ভাবভঙ্গি থেকে দয়া-প্রীতি ও কল্যাণ কামনা পরিস্ফুট হবে, শ্রোতার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকবে যে, এ ওয়াজের উদ্দেশ্য তাকে নিন্দা ও খাটো করাও নয় এবং মনের রোষ মেটানোও নয়; বরং তার পক্ষে যা কল্যাণকর ও আবশ্যকীয় তাই বলা হচ্ছে পরম স্নেহভরে। শরিয়তের প্রতি অমনোযোগী লোকদের সংশোধন এবং দীন প্রচারে যদি উপরিউক্ত নীতি অবলম্বিত হয় তবে কখনো শ্রোতাবৃন্দ জেদের বশবর্তী হবে না। তারা তর্কে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের আমলের বিচার-বিশ্লেষণ ও পরিণাম চিন্তায় নিয়োজিত হবে এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে একদিন ওয়াজ-নসিহত কবুল করে বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত আর কিছু না হলেও অন্তত পরস্পরের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে না যার অভিশাপে আজ গোটা জাতি ক্ষতিকর। আয়াতের শেষে لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আলেম সমাজের দায়িত্ব শুধু ভয় প্রদর্শন করাই নয়; বরং ওয়াজ-নসিহতের ক্রিয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। একবার ক্রিয়া না হলে বারংবার তাকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যেন يَحْذَرُوْنَ-এর সুফল লাভ হয়। আর তা হলো পাপ ও নাফরমানি থেকে জাতির বেঁচে থাকা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

অনুবাদ :

١٢٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ اَيِ الْاَقْرَبِ فَالْاَقْرَبِ مِنْهُمْ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً شِدَّةً اَيْ اَغْلِظُوْا عَلَيْهِمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ .

১২৩. হে মু'মিনগণ, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী ক্রমান্বয়ে যারা নিকট হতে নিকটতর তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়। অর্থাৎ তোমরা তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন কর। জেনে রাখ! আল্লাহ তাঁর সাহায্য-সহযোগিতাসহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। غِلْظَةً অর্থ কঠোরতা।

١٢٤. وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ فَمِنْهُمْ اَيِ الْمُنَافِقِيْنَ مَنْ يَّقُوْلُ لِاَصْحَابِهِ اِسْتِهْزَاءً اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖۤ اِيْمَانًا ء تَصْدِيْقًا قَالَ تَعَالٰى فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا لِتَصْدِيْقِهِمْ بِهَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ يَفْرَحُوْنَ بِهَا .

১২৪. যখনই কুরআনের কোনো সূরা নাজিল হয় তখন তাদের অর্থাৎ মুনাফিকদের কেউ কেউ সাহাবীগণকে উপহাস করে বলে তা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান প্রত্যয় বৃদ্ধি করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা মু'মিন যেহেতু তারা তার প্রত্যয় রাখে সেহেতু তা তো তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারা এতদ্বিষয়ে আনন্দিত সুখী।

١٢٥. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ضُعْفُ اِعْتِقَادٍ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ كُفْرًا اِلٰى كُفْرِهِمْ لِكُفْرِهِمْ بِهَا وَمَاتُوْا وَهُمْ كَافِرُوْنَ .

১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি অর্থাৎ প্রত্যয়ের দুর্বলতা বিদ্যমান যেহেতু তারা তা অস্বীকার করে সেহেতু তা তোমাদের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে। কুফরির উপর আরো কুফরির বৃদ্ধি ঘটায় এবং কুফরি অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করে।

١٢٦. اَوَلَا يَرَوْنَ بِالْيَاءِ اَيِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالتَّاءِ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ يُبْتَلُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ بِالْقَحْطِ وَالْاَمْرَاضِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ مِنْ نِفَاقِهِمْ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ .

১২৬. তারা কি দেখে না لَا يَرَوْنَ তা ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষরূপে গঠিত হলে মুনাফিকদেরকে বুঝাবে। আর ت সহ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে হে মু'মিনগণ! তোমরা কি দেখ না? যে তারা প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ, মহামারী দ্বারা দু একবার বিপর্যস্ত হয়? বিপদাপন্ন হয়? তারপরও তারা মুনাফেকী হতে তওবা করে না এবং তারা শিক্ষা গ্রহণও করে না। তা হতে উপদেশও নেয় না।

Free @ www.eilmweebly.com

١٢٧. وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فِيْهَا ذِكْرُهُمْ وَقَرَأَهَا النَّبِيُّ نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ط يُرِيْدُوْنَ الْهَرَبَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ يَرٰكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِذَا قُمْتُمْ فَاِنْ لَّمْ يَرَهُمْ اَحَدٌ قَامُوْا وَاِلَّا ثَبَتُوْا ثُمَّ انْصَرَفُوْا ط عَلٰى كُفْرِهِمْ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ عَنِ الْهُدٰى بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ الْحَقَّ لِعَدَمِ تَدَبُّرِهِمْ.

১২৭. এবং যখনই তাদের উল্লেখ সংবলিত কোনো সূরা নাজিল হয় আর রাসূল ﷺ তা পাঠ করেন তখন তারা ভেগে যাওয়ার ইচ্ছায় একে অপরের দিকে তাকায়। বলে, দাঁড়ালে তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করবে কি? কেউ যদি লক্ষ্য না করে তবে তারা চলিয়া যায়। আর তা না হলে বসে থাকে। অতঃপর তারা কুফরির উপরই ফিরে চলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের হৃদয় সত্যপথ হতে বিমুখ করে দিয়েছেন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা চিন্তা না করার কারণে সত্যকে বুঝে না।

١٢٨. لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَىْ مِنْكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ عَزِيْزٌ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ اَىْ عَنَتُكُمْ اَىْ مَشَقَّتُكُمْ وَلِقَاؤُكُمُ الْمَكْرُوْهَ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ اَنْ تَهْتَدُوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ شَدِيْدُ الرَّحْمَةِ رَّحِيْمٌ يُرِيْدُ لَهُمُ الْخَيْرَ.

১২৮. তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এসেছেন। তোমাদেরকে যা কষ্ট দেয় অর্থাৎ তোমাদের কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া তাঁর জন্য পীড়াদায়ক ক্লেশকর। তোমরা পথপ্রাপ্ত হও তার প্রতি তিনি অতি আগ্রহী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র, ক্ষমতাশীল। অর্থাৎ তিনি তাদের মঙ্গলকামী। مَا عَنِتُّمْ তার مَا টি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থ ব্যঞ্জক। এদিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে তাফসীরে عَنَتُكُمْ উল্লেখ করা হয়েছে। رَؤُوْفٌ অর্থ– অতিশয় মমতা যার।

١٢٨. فَاِنْ تَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِكَ فَقُلْ حَسْبِىَ كَافِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بِهٖ وَثِقْتُ لَا بِغَيْرِهٖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكُرْسِىِّ الْعَظِيْمِ خَصَّهٗ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهٗ اَعْظَمُ الْمَخْلُوْقَاتِ رَوَى الْحَاكِمُ فِى الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اٰخِرُ اٰيَةٍ لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ.

১২৯. অতঃপর তারা যদি তোমার উপর ঈমান আনয়ন করা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল, আমার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আমি অন্য কারো উপর নয় তাঁর উপরই নির্ভর করি আস্থা পোষণ করি। তিনি মহাআরশের আসনের অধিপতি। সৃষ্টির মধ্যে আকাশে আরশ সর্ববৃহৎ বলে এ স্থানে বিশেষভাবে কেবল তারই উল্লেখ করা হয়েছে। حَسْبِىَ অর্থ আমার জন্য যথেষ্ট। হাকেম তৎপ্রণীত 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে হযরত উবাই ইবনে কা'ব প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, لَقَدْ جَاۤءَكُمْ হতে শেষ পর্যন্ত এ সূরার আয়াতসমূহই সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَلُوْنَكُمْ : এটা وَلِيٌّ মাসদার থেকে جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ– তারা যারা তোমাদের নিকটবর্তী।

قَوْلُهُ اِغْلُظُوْا عَلَيْهِمْ : এ ইবারত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, وَلْيَجِدُوْا এটা কাফেরদেরকে নির্দেশ করা যে, তারা মুসলমানদের মধ্যে غِلْظَتً এবং কঠোরতা পাবে। অথচ কাফেরদের উপর غِلْظَتً পাওয়া ওয়াজিব নয়।

উত্তর. উত্তর এই যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে নির্দেশ কাফেরদের প্রতি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নির্দেশ মু'মিনদেরকেই করা হয়েছে। আয়াতে সবব বলে مُسَبَّبُ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ الخ : **প্রশ্ন.** يَقُوْلُوْنَ উহ্য মানার প্রয়োজন কি ছিল?

উত্তর. যেহেতু هَلْ يَرَاكُمْ -এর পূর্বে অর্থাৎ نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ -এর মধ্যে বাহ্যত কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা هَلْ يَرَاكُمْ হলো حَاضِرٌ আর نَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ হলো غَائِبٌ -এর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্য يَقُوْلُوْنَ উহ্য মানার প্রয়োজন হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : অর্থাৎ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

قَوْلُهُ صَرَفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ : এটা মূলত মুনাফিকদের জন্য বদদোয়া। কেননা এটা স্থানের হিসেবে যথোপযুক্ত খবর নয়।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ : এটা اِنْصَرَفُوْا -এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে صَرَفَ اللّٰهُ -এর নয়। কেননা এ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ دُعَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ مِنْكُمْ اَيْ مِنْ جِنْسِكُمْ : অর্থাৎ عَرَبِيٌّ قُرَيْشِيٌّ مِثْلُكُمْ

قَوْلُهُ اَيْ عَنَتُّكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا عَنِتُّمْ -এর মধ্যে مَا টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ মওসূলাহ নয়। এতে عَائِدٌ -এর প্রয়োজন নেই। কাজেই عَائِدٌ না থাকার সন্দেহ দূরীভূত হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদের বিধান পেশ করা হয়েছে এবং জিহাদের ফজিলতও বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে জিহাদ কিভাবে শুরু হবে এবং কার সঙ্গে সর্বপ্রথম জিহাদ করতে হবে এ বিধান বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا -এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন নিয়মে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। নিকটবর্তী দুরকমের হতে পারে। **এক.** অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। **দুই.** গোত্র আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটবর্তী অন্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। কারণ ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কুরআনে রাসূলে কারীম ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে– وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ হে রাসূল নিজের নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করুন। তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ তিনি স্থান হিসেবে প্রথমে মদিনার আশপাশের কাফের তথা বনূ কুরায়জা, বনূ নাজীর ও খায়বারবাসীদের সাথে বোঝাপড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

قَوْلُهُ وَيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً : غِلْظَةٌ অর্থ– কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোনো দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا বাক্য থেকে বোঝা যায়, কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফরমাবরদারী সহজ হয়ে উঠে। ইবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রা.) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মতো দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্রেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরির তীব্রতার সাথে সে কালো দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কালো হয়ে যায়। −[মাযহারী]

এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন, আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يَفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতি বছরই তারা কখনো একবার, কখনো দুবার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোনো বিশেষ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদের এই দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করেন না?

قَوْلُهُ لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ الخ : এ দুটি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত। তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ সকল সৃষ্টির উপর বিশেষ মুসলমানদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জিহাদের বর্ণনা, যা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থারূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তাবলীগে হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষের ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করা এবং তারই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-এর মতে এ দুটি আয়াত হলো কুরআন মাজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আরো কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)ও এ মতই পোষণ করেন। −[কুরতুবী]

হাদীস শরীফে আয়াত দুটির অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাত বার করে আয়াত দুটি পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কাজ সহজ করে দেবেন। আল্লাহ মহান, পবিত্র, সর্বজ্ঞ। −[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ : সূরা ইউনুস মক্কায় অবতীর্ণ

... فِي شَكٍّ الْآيَتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَ أَوْ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ الْآيَةَ مِائَةٌ وَتِسْعٌ أَوْ عَشْرُ آيَاتٍ.

সূরা ইউনুস فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ হতে দুই আয়াত বা তিন আয়াত বা وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ

এই আয়াত ব্যতীত তা মাক্কী। ১০৯ বা ১১০ আয়াতবিশিষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. الٓرٰ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْحَكِيْمِ اَلْمُحْكَمِ.

٢. اَكَانَ لِلنَّاسِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ حَالٌ مِنْ قَوْلِهٖ عَجَبًا بِالنَّصَبِ خَبَرُ كَانَ وَبِالرَّفْعِ اِسْمُهَا وَالْخَبَرُ وَهُوَ اِسْمُهَا عَلَى الْاُوْلٰى اَنْ اَوْحَيْنَا اَىْ اِيْحَاؤُنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنْ مُفَسِّرَةٌ اَنْذِرْ خَوِّفْ النَّاسَ الْكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ اَىْ بِاَنَّ لَهُمْ قَدَمَ سَلَفَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ اَىْ اَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ الْمُشْتَمِلُ عَلٰى ذٰلِكَ لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ لَسٰحِرٌ وَالْمُشَارُ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ.

অনুবাদ :

১. আলিফ লাম রা তার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবহিত। তা অর্থাৎ এ আয়াতসমূহ জ্ঞানগর্ভ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত একটি গ্রন্থের অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত। اٰيٰتُ الْكِتٰبِ এই اَلْكِتَابْ শব্দটির প্রতি اٰيَاتُ শব্দটির اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ مِنْ অর্থব্যঞ্জক।

২. মানুষের জন্য মক্কাবাসীদের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজন মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে তুমি মানুষকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে সতর্ক কর ভয় প্রদর্শন কর এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে সত্যিকার অগ্রদূত। অর্থাৎ পূর্বে তারা যে সমস্ত সৎকার্য করেছে তার উত্তম প্রতিদান রয়েছে। কাফেররা বলে, এটা তো অর্থাৎ উক্ত বক্তব্য সংবলিত এই কুরআন তো প্রকাশ্য সুস্পষ্ট এক জাদু। اَكَانَ এস্থানে اِنْكَارْ অর্থাৎ অস্বীকার অর্থে اِسْتِفْهَامْ বা প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। عَجَبًا তা نَصَبْ সহ [যবর সহ] পঠিত হলে উল্লিখিত كَانَ -এর خَبَرْ বা বিধেয়রূপে বিবেচ্য হবে। আর رَفْعْ সহ [পেশসহ পঠিত হলে তার [كَانَ -এর] اِسْمْ বলে বিবেচ্য হবে। এমতাবস্থায় পরবর্তী শব্দ اَنْ اَوْحَيْنَا তার خَبَرْ বলে গণ্য হবে। اَنْ اَوْحَيْنَا তার اَنْ টি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ ক্রিয়ার মূল অর্থব্যঞ্জক এদিকে করণার্থে তাফসীরে اِيْحَاؤُنَا [আমার ওহী প্রেরণ করা] উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রথম কেরাত অনুসারে [অর্থাৎ عَجَبًا যদি نَصَبْ সহ পঠিত হয় তবে] كَانَ -এর اِسْمْ বলে গণ্য হবে। اَنْ اَنْذِرْ তার اَنْ টি مُفَسِّرَةٌ বা ভাষ্যমূলক। اَنَّ لَهُمْ এ স্থানে اَنَّ টির পূর্বে একটি بِ উহ্য রয়েছে। قَدَمَ এ স্থানে তার অর্থ যা অগ্রে হয়েছে। لَسِحْرٌ এটা অপর এক কেরাতে سَاحِرٌ [অর্থ জাদুকর] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তা দ্বারা রাসূল ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে বুঝাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣. اِنَّ رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَىْ فِىْ قَدْرِهَا لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِىْ لَمْحَةٍ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ لِتَعْلِيْمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ط بَيْنَ الْخَلَائِقِ مَا مِنْ زَائِدَةٌ شَفِيْعٍ يَشْفَعُ لِاَحَدٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ط رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ اَنَّ الْاَصْنَامَ تَشْفَعُ لَهُمْ ذٰلِكُمُ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ وَحِّدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ.

৩. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, যিনি দুনিয়ার দিন হিসেবে ছয়দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ছয় দিনে অর্থ পৃথিবীর দিন হিসেবে ততটুকু পরিমাণ সময়ে। তৎসময়ে তো আর চন্দ্র বা সূর্য কিছুই ছিল না। যদ্দ্বারা সময়ের পরিমাপ করা হয়। ইচ্ছা করলে তিনি মুহূর্তের মধ্যেই তা তৈরী করে ফেলতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টি জগতকে ধীরতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি তা না করে এই বিলম্ব করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। যেমন তাঁর শানের পক্ষে উপযুক্ত তেমনি সমাসীন হন। সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল বিষয়ে তিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁর অনুমতি লাভ ব্যতীত কারো জন্য সুপারিশ করবার কেউ নেই। ইনিই অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক সৃষ্টিকর্তাই হলেন আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। তাঁকে এক বলে বিশ্বাস কর। তোমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করবে না? مِنْ شَفِيْعٍ এ স্থানে مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। تَذَكَّرُوْنَ তাতে ذ -এ تَ -এর اِدْغَامٌ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে।

٤. اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا مَصْدَرَانِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ اِنَّهُ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا وَالْفَتْحُ عَلٰى تَقْدِيْرِ اللَّامِ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ اَىْ بَدَأَهُ بِالْاِنْشَاءِ ثُمَّ يُعِيْدُهُ بِالْبَعْثِ لِيَجْزِىَ لِيُثِيْبَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيْمٍ مَاءٍ بَالِغٍ نِهَايَةَ الْحَرَارَةِ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ اَىْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ.

৪. তারই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদে সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে ন্যায়ভিত্তিক কর্মফ দেওয়ার জন্য। প্রতিফল দেওয়ার জন্য। এবং যার কাফের কুফরির দরুন তাদের জন্য রয়েছে হামীম অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি। অর্থ আমি পুনরাবর্তন ঘটাই তাদের কুফরির দরুন তাদে বদলা দিত। وَعْدًا حَقًّا এ দুটি শব্দ مَصْدَرٌ ক্রিয়ার মূল। [এ স্থানে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ সমধাতুজ কর্ম।] এস্থানে উহ্য সমধাতুজ ক্রিয়া মাধ্যমে তারা مَنْصُوْبٌ [যবরযুক্ত,] রূপে ব্যবহৃ হয়েছে। اِنَّهُ তার হামযাটি اِسْتِئْنَافٌ অর্থাৎ ন বাক্যরূপে কাসরাসহ পাঠ করা যায়। আর তার পূর্ একটি ل তা ধরা হলে তা ফাতাহসহ পঠিত হবে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً ذَاتَ ضِيَاءٍ
اَىْ نُوْرٍ وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَقَدَّرَهٗ مِنْ حَيْثُ سَيْرِهٖ
مَنَازِلَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِيْنَ مَنْزِلاً فِىْ ثَمَانٍ
وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَسْتَتِرُ
لَيْلَتَيْنِ وَاِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا اَوْ
لَيْلَةً اِنْ كَانَ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا
لِتَعْلَمُوْا بِذٰلِكَ عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط
مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ط لاَ
عَبَثًا تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ يُفَصِّلُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ
يُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

৫. তিনিই সূর্যকে দীপ্ত অর্থাৎ আলো বিশিষ্ট ও চন্দ্রকে
জ্যোতির্ময় করেছেন এবং চলার গতি হিসেবে তার
মনজিল নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে তা দ্বারা
তোমরা বৎসর গণনা ও হিসাবের জ্ঞান লাভ করতে
পার। প্রতি মাসে ২৮ রাত্র হিসেবে চন্দ্রের ২৮টি
মানজিল বা তিথি নির্ধারিত রয়েছে। মাস যদি ৩০শা
হয় তবে দুই রাত্র আর ২৯শা হলে এক রাত্র তা
লুক্কায়িত থাকে। আল্লাহ তা অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুসমূহ
তাৎপর্য ভিন্ন সৃষ্টি করেননি। এই সবকিছু নিরর্থক
নয়। নিরর্থক কাজ হতে তিনি বহু ঊর্ধ্বে। জ্ঞানী
সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল লোকদের জন্য তিনি
নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। يُفَصِّلُ তা ى
সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ একবচন পুংলিঙ্গরূপে ও ن সহ
অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচনরূপে পঠিত রয়েছে।

٦. اِنَّ فِىْ اخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِالذَّهَابِ
وَالْمَجِئِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ
فِى السَّمٰوٰتِ مِنْ مَلاَئِكَةٍ وَشَمْسٍ وَقَمَرٍ
وَنُجُوْمٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَ فِى الْاَرْضِ مِنْ حَيَوَانٍ
وَجِبَالٍ وَبِحَارٍ وَاَنْهَارٍ وَاَشْجَارٍ وَغَيْرِهَا لَاٰيٰتٍ
دَلاَلاَتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ
فَيُؤْمِنُوْنَ خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ
الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا.

৬. দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে তার আগমন নির্গমন ও
হ্রাস বৃদ্ধির মধ্যে এবং আকাশমণ্ডলীতে ফেরেশতা,
সূর্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি এবং পৃথিবীতে অর্থাৎ তার
মধ্যে জীব জন্তু, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, গাছপালা
ইত্যাদি যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তাতে
মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তাঁর
কুদরতের প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। ফলে তাতে তারা
বিশ্বাস স্থাপন করে। মুত্তাকী ও সাবধানরাই যেহেতু
তা দ্বারা উপকৃত হয় সেহেতু এ স্থানে বিশেষ করে
তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে।

٧. اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا بِالْبَعْثِ وَرَضُوْا
بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بَدَلَ الْاٰخِرَةِ لِاِنْكَارِهِمْ لَهَا
وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا سَكَنُوْا اِلَيْهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ
اٰيٰتِنَا دَلاَئِلِ وَحْدَانِيَّتِنَا غٰفِلُوْنَ تَارِكُوْنَ
النَّظَرَ فِيْهَا.

৭. যারা পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমার সাক্ষাৎ কামনা করে
না এবং পরকাল অস্বীকার করত তার পরিবর্তে যারা
পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং তাতেই যারা নিশ্চিন্ত
তাতেই যারা প্রশান্তি লয় এবং যারা আমার
নিদর্শনাবলি সম্বন্ধে আমার একত্বের প্রমাণাদি
সম্পর্কে উদাসীন তাতে লক্ষ্য প্রদান যারা পরিত্যাগ
করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨. أُولَٰئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي .

৮. তাদেরই আবাস জাহান্নাম তাদের শিরক, পাপাচার অবাধ্যতা ইত্যাদি কৃতকর্মের জন্য।

٩. إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيهِمْ يُرْشِدُهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ بِهِ بِأَنْ يَّجْعَلَ لَهُمْ نُورًا يَهْتَدُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ .

৯. যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাস হেতু তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে এমন এক নূর ও জ্যোতি প্রদান করবেন যদ্দারা তারা কিয়ামতের দিন পথ চলবে। তারা থাকবে সুখকর উদ্যানে, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত থাকবে নদীসমূহ।

١٠. دَعْوٰهُمْ فِيهَا طَلَبُهُمْ لِمَا يَشْتَهُونَهُ فِي الْجَنَّةِ أَنْ يَّقُولُوا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ أَيْ يَا اللّٰهُ فَإِذَا طَلَبُوهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ ج وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ أَنِ مُفَسِّرَةٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ .

১০. সেখানে তাদের যখন কোনো বস্তুর বাসনা হবে তখন তাদের ধ্বনি হবে এই কথা বলা সুবহানাকাল্লাহুম্মা হে আল্লাহ তুমি মহান, পবিত্র। তারা যা চাইবে তৎক্ষণাৎ তাদের সামনে উপস্থিত পাবে। এবং সেখানে পরস্পরে তাদের অভিবাদন হবে সালাম এবং তাদের শেষধ্বনি হবে প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ عَجَبًا : মূলত لِلنَّاسِ টা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে عَجَبًا -এর সিফত হয়েছে। আর সিফত যখন মওসূফের উপর مُقَدَّمٌ হয় তখন তাকে حَال বলা হয়। কেননা সিফতের মওসূফের উপর مُقَدَّمٌ হওয়া ঠিক নয় এবং لِلنَّاسِ এটা عَجَبًا -এর مُتَعَلِّقٌ নয়। কেননা মাসদারটা দুর্বল আমেল হয়ে থাকে এবং তার مَا قَبْلَ -এ আমল করে না, عَجَبًا টা كَانَ -এর খবরে মুকাদ্দাম হয়েছে। আর أَنْ أَوْحَيْنَا হলো كَانَ -এর إِسْمٌ مُؤَخَّرٌ ; উহ্য ইবারত হলো كَانَ أَنْ أَوْحَيْنَا অর্থাৎ إِيحَاؤُنَا عَجَبًا لِلنَّاسِ আর عَجَبٌ রফা' সহও পড়া হয়েছে। এ সুরতে عَجَبٌ টা كَانَ -এর إِسْم হবে। আর أَنْ أَوْحَيْنَا যা نَصَبْ -এর সুরতে إِسْم ছিল তা خَبَرْ হবে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) كَانَ -কে تَامَّةٌ মেনে عَجَبٌ -কে রফা' সহকারে পাঠ করেছেন। আর أَنْ أَوْحَيْنَا -কে عَجَبٌ থেকে بَدَلٌ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ قَدَمَ صِدْقٍ : এটা إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ -এর অন্তর্গত। যেমন– مَسْجِدُ الْجَامِعِ -এর মধ্যে হয়েছে। قَدَمٌ অর্থ হলো মর্যাদা, ইজ্জত, অতীত নেক আমলের শুভ প্রতিদান। মুফাসসির (র.) قَدَمٌ -এর তাফসীর سَلَفٌ দ্বারা করে এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) أَجْرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوا مِنَ الْأَعْمَالِ বলে এই অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ফায়দা : যেহেতু قَدَمٌ [পা] -এর মাধ্যমে অগ্রগামীতা হয়ে থাকে এজন্য سَابِقَةٌ -কে قَدَمٌ বলে দেওয়া হয়। যেমন নিয়ামতকে يَدٌ বলা হয়। قَدَمٌ -এর صِدْقٌ -এর দিকে ইজাফত করা হয়েছে زِيَادَتِي فَضْلٍ -এর জন্য। অথবা এজন্য যে صِدْقُ قَوْلٍ -এর স্থান صَادِقٌ দ্বারাই অর্জিত হয়।

قَوْلُهُ مَذْكُورٌ : ذٰلِكَ -এর তাফসীর مَذْكُورٌ দ্বারা করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো পূর্বে চন্দ্র ও সূর্যের আলোচনা রয়েছে। কাজেই اِسْمُ اِشَارَةٌ দ্বিবচন নেওয়া উচিত ছিল অথচ ذٰلِكَ কে একবচন নেওয়া হয়েছে।

উত্তর. জবাবের সারকথা হলো এই যে, مَذْكُورٌ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে ذٰلِكَ -কে একবচন নেওয়া হয়েছে

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : يَهْدِيْهِمْ হলো اَنَّ -এর প্রথম খবর। আর تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ হলো দ্বিতীয় খবর আর فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ হলো তৃতীয় খবর।

قَوْلُهُ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ : অর্থাৎ যখনই কোনো পছন্দনীয় বস্তুর আশা করবে তখন প্রার্থনার পদ্ধতি এটা হবে যে, اَللّٰهُمَّ বলবে। তাহলে তৎক্ষণাৎ কামনীয় বস্তু বিদ্যমান হয়ে যাবে। اَللّٰهُمَّ টা যেহেতু كَلِمَةُ نِدَاءٌ কাজেই دُعَاءٌ টা طَلَبْ অর্থে হবে।

قَوْلُهُ اِذَا مَا طَلَبُوْهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ : এখানে اذا টা হলো مَفَاجَاتِيَةٌ অর্থাৎ জান্নাতিগণ যখন কোনো জিনিসের কামনা করবেন, তখন তাৎক্ষণিকভাবেই সেই বস্তু উপস্থিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ ذَاتَ ضِيَاءٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلشَّمْسُ ضِيَاءٌ -এর حَمْل -কে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া। কেননা ضِيَاءٌ হলো মাসদার আর এর ذات -এর উপর حَمْل করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সূরাটি 'সূরায়ে ইউনুস' নামে খ্যাতি লাভ করে। অনেক সূরার নাম তার বিশেষ অংশের কারণে রাখা হয়েছে, এ সূরাটি তন্মধ্যে অন্যতম। এই সূরা হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। এই সূরার তিনটি আয়াত মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে।

এ সূরার মধ্যেও কুরআনে কারীম এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয় বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং কাহিনীর অবতারণা করে সে সমস্ত লোকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার এসব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসত্ত্বেও অংশীবাদের খণ্ডন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু সন্দেহের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ সূরার সার বিষয়বস্তু তাই। এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলি [তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি] হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জিহাদ করা এবং কুফর ও শিরকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জিহাদের হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলিকে মক্কী জিন্দেগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। الٓرٰ এগুলোকে হরুফে মুকাত্তাআহ বলা হয়, যা কুরআন মাজীদের অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– الٓر - عٓسٓقٓ - قٓ - حٰمٓ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরুফে মুকাত্তাআহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুজুর্গানে কেরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুজুর ﷺ -কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সম্বন্ধেই অবহিত করেছেন যা তারা সহ্য করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হরুফে মুকাত্তাআহর গূঢ় তত্ত্ব এমন কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোনো ক্ষতি হতে পারে। এজন্যই হুজুর ﷺ ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করে যাননি। অতএব আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ এটা তো সত্যকথা যে, এসব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোনো রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে আলম ﷺ অন্তত এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোনো রকম কার্পণ্য করতেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ : বাক্যে تِلْكَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ সূরার সে সমস্ত আয়াতের প্রতি, যা একটু পরেই পরিবেশিত হতে যাচ্ছে। আর কিতাব অর্থ এখানে কুরআন। এর প্রশংসা এখানে اَلْحَكِيْمِ শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, যার অর্থ হলো হিকমতপূর্ণ কিতাব।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিল এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রাসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না; বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কুরআনে কারীম বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ لَوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰۤئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا অর্থাৎ জমিনের উপর যদি ফেরেশতা বাস করত, তাহলে আমি তাদের জন্য কোনো ফেরেশতাকেই রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম। যার মূলকথা হলো এই যে, রিসালাতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল এবং যাদের মধ্যে রাসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুত ফেরেশতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রাসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোনো মানুষকেই রাসূল বানানো উচিত।

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রাসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ তা'আলার ফরমাবরদার তাদেরকে ছওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো? এই বিস্ময় প্রকাশই একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ মানুষের কাছে মানুষকে রাসূল করে পাঠানোই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ শব্দের দ্বারা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে قَدَمَ অর্থ পা। যেহেতু পা'ই মানুষের চেষ্টা তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবিতে 'কদম' [পদমর্যাদা] বলে দেওয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্যাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয় যে, কোনো কাজের বিনিময়ে প্রথমত সে সম্মান পাবার কোনো নিশ্চয়তাই থাকে না, আর যদিও বা পাওয়া যায় তবুও তা চিরকাল থাকার নিশ্চয়তা নেই। বরং সেই সম্মান বা পদমর্যাদা শেষ হয়ে গিয়ে ধুলোয় মিশে যাওয়াটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা যায়, তার জীবিত অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়, আর মৃত্যুর সময় তো পৃথিবীর সমস্ত পদমর্যাদা এবং ধনসম্পদ থেকে মানুষ খালি হাত হয়ে যায়ই। মোটকথা صِدْقٍ শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য, সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়াল এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দেন যে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না [অর্থাৎ চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে।] কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এক্ষেত্রে صِدْقٍ শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্যনিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণেই পেয়ে থাকবে, শুধু মুখের জমাখরচ এবং মুখে কালেমায়ে ঈমান পড়ে নিলেই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টি দিয়েই নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে, যার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তাওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো শরিক-অংশীদার নেই, তখন ইবাদত-বন্দেগী এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরিক হতে পারে? বরং এতে [ইবাদতে] অন্য কাউকে শরিক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালঙ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও জমিনকে [আল্লাহ তা'আলা] মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান জমিন ও তারকা নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসাব কি করে হবে? কাজেই [দিন বলতে] এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً الخ : এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হিকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ তা'আলার বিশ্বকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন জারি করবেন। আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা।

এভাবে এ তিনটি আয়াত ঐ সংক্ষেপের বিশ্লেষণ, যা পূর্ববর্তী তিনটি আয়াতে আসমান-জমিনকে ছয় দিনে তৈরি করা অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার পর يُدَبِّرُ الْاَمْرَ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয় যে, তিনি শুধু এ বিশ্বকে তৈরি করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেক জিনিসের পরিচালনা এবং শাসনব্যবস্থাও তার হাতেই রয়েছে। এ ব্যবস্থা ও পরিচালনার একটি অংশ হলো هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا এখানে ضِيَاءٌ এবং نُوْر উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য। সেজন্যই অভিধানের অনেক ইমাম এ দুটি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা যামাখশারী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نُوْرٌ শব্দটি ব্যাপক। দুর্বল-সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ণ যে কোনো জ্যোতিকেই নূর বলা যায়। কিন্তু ضَوْءٌ এবং ضِيَاءٌ যে আলোতে তীক্ষ্ণতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশি পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকত, তাহলে কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতেও সূর্যের তীক্ষ্ণ আলো থাকত, তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ তা'আলা দু-ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضَوْءٌ [যাও] এবং ضِيَاءٌ [যিয়া] -এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজকর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হালকা এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কুরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূরা নূহে বলা হয়েছে- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا সূরা ফুরকানে বলেছেন- وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا 'সিরাজ' শব্দের অর্থ চেরাগ [অথাৎ প্রদীপ]। যেহেতু প্রদীপের আলো তার নিজস্ব আলো, অন্য কারো কাছ থেকে ধার করা নয়, সেহেতু কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, কোনো বস্তুর নিজস্ব আলোকে ضِيَاءٌ বলা হয়। আর نُوْر বলা হয় সে সমস্ত আলোকে যা অন্য কারো থেকে অর্জন করে আলোকিত হয়। কিন্তু এ মতের পেছনে গ্রীক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান। অন্যথায় এর কোনো আভিধানিক ভিত্তি নেই। আর স্বয়ং কুরআন কারীমও এর কোনো শেষ সমাধান দেয়নি।

মুফাসসির যুজাজ ضِيَاءٌ শব্দকে ضَوْءٌ শব্দের বহুবচন বলেছেন। এ প্রেক্ষিতে হয়তো এখানে একথা বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যে, আলোর সাতটি প্রসিদ্ধ রং এবং অন্যান্য রং পৃথিবীতে পাওয়া যায় সূর্যই হলো সেগুলোর উৎস, যা বৃষ্টির পর রংধনুর মধ্যে প্রকাশ পায়। -[মানার]

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে- وَقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ - قَدَّرَ শব্দটি تَقْدِيْرٌ শব্দ থেকে গঠিত تَقْدِيْرٌ অর্থ হলো কোনো বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলি অনুযায়ী একথা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা। রাত এবং দিনের সময়কে একটা বিশেষ পরিমাণের উপর রাখার জন্য কুরআন কারীমে বলা হয়েছে- وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ আর সাধারণ পরিমাণ সম্পর্কে বলেছে-
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا

مَنَازِلُ শব্দটি مَنْزِلٌ -এর বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ নাজিল হওয়ার জায়গা। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটিকেই একেক مَنْزِلٌ বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতিমাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনজিল হলো ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে একদিন লুক্কায়িত থাকে সেজন্যে সাধারণ চাঁদের মনজিল আটাশটি বলা হয়। আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মনজিল হলো তিনশ ষাট অথবা পঁয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মঞ্জিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে, যেগুলো সেসব মনজিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুরআন কারীম এ সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে। বস্তুত কুরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দূরত্ব বুঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

উপরোল্লিখিত আয়াতে قَدَّرَهُ مَنَازِلَ একবচনের ضَمِيْر [সর্বনাম] ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ মনজিল কিন্তু চন্দ্র সূর্য উভয়েরই। কাজেই কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, যদিও এখানে একবচনের সর্বনাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটি একক হিসেবে উভয়টি বুঝানোই উদ্দেশ্য, যার দৃষ্টান্ত কুরআন এবং আরবি পরিভাষায় অনেক অনেক পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, যদিও আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্য উভয়ের জন্য মনজিলসমূহ কায়েম রেখেছেন, কিন্তু এখানে চাঁদের মনজিল বুঝানোই উদ্দেশ্য। অতএব قَدَّرَهُ শব্দের সর্বনাম চাঁদের সাথেই সম্পৃক্ত। একটির সঙ্গে খাস করার কারণ হলো এই যে, সূর্যের মনজিল দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং হিসাব ছাড়া জানা যায় না। সূর্যের উদয়াস্ত বছরের প্রতিদিন একই অবস্থানে হয়ে থাকে। শুধু চোখে দেখে একথা বুঝা যাবে না যে, আজ সূর্য কোনো মনজিলে অবস্থিত। কিন্তু চাঁদের অবস্থা অন্য রকম। তার অবস্থা প্রতিদিন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। মাসের শেষের দিকে তো চাঁদ মোটেই দেখা যায় না। এ ধরনের পরিবর্তন দেখে একজন বিদ্যাহীন লোকও চাঁদের তারিখগুলো বলে দিতে থাকে। উদাহরণত যদি ধরা যায়, আজ মার্চ মাসের আট তারিখ, তবে কোনো মানুষই সূর্য দেখে একথা বুঝতে পারবে না যে, আজ আট তারিখ কি একুশ তারিখ। কিন্তু চাঁদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা- চাঁদকে দেখেও তার তারিখটা বলে দেওয়া যেতে পারে।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ক্ষেত্র আসমান-জমিন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তাওহীদ ও আখেরাতের আকিদা ও বিশ্বাসকে এক 'সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নিদর্শন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকুল দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক. সে শ্রেণি যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সমস্ত জীব-জন্তু অপেক্ষা বহুগুণ বেশি চেতনাভূতি ও জ্ঞানবুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তো বা আমাদের প্রতিও কিছু দায়দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সেসবের জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন, কুরআনের পরিভাষায় যাকে কিয়ামত ও হাশর-নাশর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণির লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোনো ধারণা কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত-অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না, চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেওয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কারো কোনো সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য ছিল।"

তৃতীয়ত "এসব লোক আমার নির্দেশাবলি ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান জমিন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হতো না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফলতির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।"

এ সমস্ত লোক যাদের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে তাদের শাস্তি হলো এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি। পরিতাপের বিষয় যে, কুরআনে কারীম কাফের ও মুনাফিকদের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের জীবন ও আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যকলাপ ও চিন্তা-কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাঝেও এ দুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এদতসত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে সত্য ও পাকা মুসলমান প্রতিপন্ন করে চলেছি। পক্ষান্তরে সত্য ও পাকা মুসলমান ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ, তাদের চেহারা দেখার সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং মনে হতো, এর মনে অবশ্যই কোনো মহান সত্তার ভয় এবং কোনো হিসাব-কিতাবের চিন্তা বিদ্যমান। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর যাবতীয় পাপপঙ্কিলতা থেকে মাসুম হওয়া সত্ত্বেও এমনি অবস্থা ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় বিষণ্ন ও চিন্তান্বিত থাকতেন।

দুই. এ আয়াতে সেসব ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত তথা মহাশক্তির নিদর্শনাবলি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদনে প্রতিনিয়ত নিয়োজিত রয়েছে। কুরআনে কারীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে- أُولَٰئِكَ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ অর্থাৎ তাঁদের পরওয়ারদিগার তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের কারণে মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। এতে 'হেদায়েত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হলো পথ প্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণির লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মু'মিন শ্রেণির প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তাঁরা তাদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

চতুর্থ আয়াতে জান্নাতে পৌছার পর জান্নাতবাসীদের কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা ও আচরণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ এখানে دَعْوَىٰ শব্দটি তার নির্ধারিত দাবি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোনো বাদী তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, বরং এখানে دَعْوَىٰ অর্থ হলো দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হলো এই যে, জান্নাতে পৌছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলা জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো দোয়া বলা হয় কোনো বিষয়ের আবেদন এবং কোনো উদ্দেশ্য যাঞ্চা করাকে, কিন্তু سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [সুবহানাকাল্লাহুম্মা]-তে কোনো আবেদন কিংবা কোনো কিছুর প্রার্থনা নেই। একে দোয়া বলা যায় কেমন করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন। কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আরো হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মতো অবশ্যকরণীয় কোনো ইবাদত হিসেবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তাঁর থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব। এ হিসেবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিতে দোয়া বলা যেতে পারে।

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে যখনই কোনো কষ্ট কিংবা পেরেশানি উপস্থিত হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

আর ইমাম তাবারী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোনো বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানির সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া প্রার্থনা করতেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযিরে প্রমুখ এমন এক রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোনো জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শুনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের কাম্য বস্তু এনে উপস্থিত করে দেবেন। বস্তুত সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী] সুতরাং এ হিসেবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ প্রচলিত অর্থে تَحِيَّةٌ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে, যার মাধ্যমে কোনো আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন- সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা 'আহলান ওয়া সাহলান' প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سَلَامٌ -এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেওয়া হবে যে, তোমরা যে কোনো রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, সূরা ইয়াসীনের রয়েছে- سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দুটি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্য নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। 'সালাম' শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে। -[রূহুল মা'আনী]

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ তা'আলার মা'রিফত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে [বিপুল] উন্নতি লাভ করবে। যেমন হযরত শিহাব উদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র.) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌছে সাধারণ জান্নাতবাসীদের জ্ঞান ও মা'রিফতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবন ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ যে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী-রাসূলগণের হতো। আর নবী রাসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমূদ' যার জন্য আজানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

١١. وَنَزَلَ لَمَّا اسْتَعْجَلَ الْمُشْرِكُوْنَ الْعَذَابَ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ اَىْ كَاسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ـ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ بِاَنْ يُهْلِكَهُمْ لٰكِنْ يُمْهِلُهُمْ فَنَذَرُ نَتْرُكُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ مُتَحَيِّرِيْنَ ـ

অনুবাদ :

১১. মুশরিকদের শীঘ্র আজাবের দাবি জানাবার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন. আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের অকল্যাণ তরান্বিত করতেন যেভাবে তারা কল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চায় তবে তিনি তাদের নির্ধারিত সময় শেষ করে দিতেন। অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু আমি তাদেরকে অবকাশ দেই। অনন্তর যারা আমার সাক্ষাতের ভয় করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেই। اِسْتِعْجَالَهُمْ তার পূর্বে একটি كَافٌ উহ্য থেকে তাকে نَصْب [যবর,] দান করছে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে তার উল্লেখ করা হয়েছে। قُضِىَ তা مَعْرُوْف অর্থাৎ কর্তৃবাচ্য ও مَجْهُوْل অর্থাৎ কর্মবাচ্য উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اَجَلُهُمْ এটা مَنْصُوْب ও مَرْفُوْع [পেশ ও যবর] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। فَنَذَرُ অর্থ– অনন্তর আমরা ছেড়ে রাখি। يَعْمَهُوْنَ অর্থ– তারা উদভ্রান্ত ও অস্থির হয়ে ঘুরে.

١٢. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الْكَافِرَ الضُّرُّ الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ دَعَانَا لِجَنْبِهٖۤ اَىْ مُضْطَجِعًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۤئِمًا ـ اَىْ فِىْ كُلِّ حَالٍ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ عَلٰى كُفْرِهٖ كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ كَاَنَّهٗ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ كَذٰلِكَ كَمَا زُيِّنَ لَهُ الدُّعَاۤءُ عِنْدَ الضُّرِّ وَالْاِعْرَاضُ عِنْدَ الرَّخَاۤءِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১২. যখন মানুষকে কাফেরদের দুঃখ রোগ, স্পর্শ করে তখন সে পার্শ্বস্থিত হয়ে, অর্থাৎ শুয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে অর্থাৎ সকল অবস্থায় আমাকে ডেকে থাকে। অনন্তর যখন আমি তার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে তখন তার পূর্ব কুফরির পথই অবলম্বন করে যেন তাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করেছিল তার জন্য সে আমাকে ডাকেনি। যারা সীমালঙ্ঘন করে অর্থাৎ যারা মুশরিক এভাবে অর্থাৎ দুঃখ কষ্টে নিপতিত হলে দোয়া করা ও সুখের সময় তার হতে বিমুখ হওয়ার এ কাজটি যেভাবে তাদের নিকট শোভন করে ধরা হয়েছে সেভাবে তাদের কর্ম তাদের নিকট শোভন করে ধরা হয়েছে। كَاَنْ তা مُخَفَّفَة অর্থাৎ লঘুকৃত । তার اِسْم এস্থানে তা। উহ্য মূলত ছিল كَاَنَّهٗ ।

١٣. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا ظَلَمُوْا بِالشِّرْكِ وَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الدَّالَّاتِ عَلٰى صِدْقِهِمْ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ـ عَطْفٌ عَلٰى ظَلَمُوْا كَذٰلِكَ كَمَا اَهْلَكْنَا اُولٰۤئِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ ـ

১৩. হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা শিরক অবলম্বন করত সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শন সহ অর্থাৎ তাদের সত্যতার প্রমাণসহ তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি সেভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে অর্থাৎ কাফেরদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। جَاۤءَهُمْ তার পূর্বে قَدْ শব্দটি উহ্য রয়েছে। وَمَا كَانُوْا পূর্বোল্লিখিত ظَلَمُوْا ক্রিয়ার সাথে তার عَطْف বা অন্বয় হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٤. ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ خَلٰٓئِفَ جَمْعُ
خَلِيْفَةٍ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فِيْهَا وَهَلْ تَعْتَبِرُوْنَ
بِهِمْ فَتُصَدِّقُوْا رُسُلَنَا ـ

١٥. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ بَيِّنٰتٍ
ظَاهِرَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ
لِقَاۤءَنَا لَا يَخَافُوْنَ الْبَعْثَ ائْتِ بِقُرْاٰنٍ
غَيْرِ هٰذَا لَيْسَ فِيْهِ عَيْبُ اٰلِهَتِنَا اَوْ
بَدِّلْهُ ط مِنْ تِلْقَاۤءِ نَفْسِكَ قُلْ مَا يَكُوْنُ
يَنْبَغِىْ لِىْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاۤءِ قِبَلِ
نَفْسِىْ ط اِنْ مَا اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ ج
اِنِّىْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ بِتَبْدِيْلِهٖ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ـ

١٦. قُلْ لَّوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ
اَدْرٰىكُمْ اَعْلَمَكُمْ بِهٖ ز وَلَا نَافِيَةٌ عَطْفٌ
عَلٰى مَا قَبْلَهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِلَامٍ جَوَابُ لَوْ
اَىْ لَاَعْلَمَكُمْ بِهٖ عَلٰى لِسَانِ غَيْرِىْ فَقَدْ
لَبِثْتُ مَكَثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا سِنِيْنًا
اَرْبَعِيْنَ مِنْ قَبْلِهٖ لَا اُحَدِّثُكُمْ بِشَىْءٍ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ اَنَّهٗ لَيْسَ مِنْ قِبَلِىْ ـ

অনুবাদ :

১৪. অনন্তর আমি তাদের পর হে মক্কাবাসীগণ! দুনিয়ায় তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি। যেন আমি দেখতে পারি সেখানে তোমরা কি প্রকার আচরণ কর। তাদের অবস্থা হতে তোমরা কোনোরূপ শিক্ষা গ্রহণ কর কিনা? ফলে আমাদের রাসূলগণকে স্বীকার কর কিনা। خَلَائِفَ তা خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- প্রতিনিধি।

১৫. যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন তাদের নিকট পাঠ করা হয় তখন যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না অর্থাৎ পুনরুত্থানের ভয় করে না; তারা বলে, এটা ব্যতীত অন্য এক কুরআন নিয়ে আস। যাতে আমাদের দেবদেবীদের কোনো দোষ উল্লেখ করা হয়নি। অথবা একে তোমার তরফ হতে বদলিয়ে নিয়ে আস। বল, নিজ পক্ষ হতে এটা বদলানো আমার কাজ নয়। আমার জন্য উচিতও নয়। আমার প্রতি যে ওহী হয় আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি। তাতে পরিবর্তন করে আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা যদি করি তবে আমার মহা দিবসের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তির আশঙ্কা হয়। بَيِّنَات তা এ স্থানে حَال ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- সুস্পষ্ট। مِنْ تِلْقَاءِ অর্থ পক্ষ হতে, তরফ হতে। إِنْ أَتَّبِعُ এ স্থানে إِنْ শব্দটি না-বোধক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. বল, আল্লাহ তা'আলার সেরূপ অভিপ্রায় হলে আমি তোমাদের নিকট তা পাঠ করতাম না এবং তিনি তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। তা তোমাদেরকে জানাতেন না। আমি তো তার পূর্বে তোমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল চল্লিশ বৎসরকাল বসবাস করেছি। অবস্থান করেছি। অথচ এ বিষয়ে আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি। তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না? যে, তা আমার পক্ষ হতে রচিত নয়। وَلَا أَدْرَاكُمْ তার لَا টি না-বোধক। পূর্ববর্তী ক্রিয়া مَا تَلَوْتُهُ -এর সাথে তার عَطْف হয়েছে। অপর এক কেরাতে তা ل সহ لَأَدْرَاكُمْ রূপে পঠিত রয়েছে এমতাবস্থায় তা لَوْ -এর جَوَابٌ বলে বিবেচ্য হবে অর্থ- দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হলে অন্য কারো বাচনিক আমি তা তোমাদেরকে অবহিত করতাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٧. فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ اِلَيْهِ اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اَلْقُرْاٰنِ اِنَّهٗ اَىِ الشَّاْنُ لَا يُفْلِحُ يُسْعِدُ الْمُجْرِمُوْنَ الْمُشْرِكُوْنَ .

অনুবাদ :

১৭. যে ব্যক্তি শিরক আরোপ করত আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা আল্লাহ তা'আলার নির্দশনকে আল কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? না, আর কেউ নেই। নিশ্চয়ই প্রকৃত অবস্থা এই যে অপরাধীদের অর্থাৎ মুশরিকগণ সফলকাম সৌভাগ্যশালী হয় না। اِنَّهٗ তার শেষের ةٗ টি شَانِيَه বা অবস্থা নির্দেশক।

١٨. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مَا لَا يَضُرُّهُمْ اِنْ لَمْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اِنْ عَبَدُوْهُ وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَيَقُوْلُوْنَ عَنْهَا هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ط قُلْ لَهُمْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ تُخْبِرُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ اَىْ لَوْ كَانَ لَهٗ شَرِيْكٌ لَعَلِمَهٗ اِذْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ مَعَهٗ .

১৮. তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যার ইবাদত করে তা অর্থাৎ এ প্রতিমাসমূহ এমন যে তাদের ইবাদত না করলেও তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর ইবাদত করলেও কোনো উপকার করে না। এগুলো সম্পর্কে তাঁরা বলে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের পক্ষে সুপারিশকারী। তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছো এমন কিছু সম্পর্কে অবহিত করেছ যা তিনি জানেন না? সত্যই তাঁর যদি কোনো শরিক থাকত তবে নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। কেননা কোনো কিছুই তার নিকট গোপন নয়। তিনি মহান সকল দোষ হতে পবিত্রতা তাঁরই। তার সাথে যে সমস্ত বস্তু তারা শরিক করে সেসব কিছু হতে তিনি উর্ধ্বে। دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ– আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত। اَتُنَبِّئُوْنَ তার প্রশ্নবোধকটি اِنْكَارْ বা অস্বীকার অর্থবাচক।

١٩. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً عَلٰى دِيْنٍ وَّاحِدٍ وَهُوَ الْاِسْلَامُ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ اِلٰى نُوْحٍ وَقِيْلَ مِنْ عَهْدِ اِبْرَاهِيْمَ اِلٰى عَمْرِو بْنِ لُحَىٍّ فَاخْتَلَفُوْا ط بِاَنْ ثَبَتَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاْخِيْرِ الْجَزَاءِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ اَىِ النَّاسِ فِى الدُّنْيَا فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ . مِنَ الدِّيْنِ بِتَعْذِيْبِ الْكَافِرِيْنَ .

১৯. মানুষ ছিল একই উম্মতভুক্ত। হযরত আদম হতে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত একই ধর্ম ইসলামের অনুসারী। কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম হতে আমর ইবনে লুহাই পর্যন্ত একই ধর্মমতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। কিছু সংখ্যক তো মূল আদর্শে সুদৃঢ় রইল আর কিছু সংখ্যক কুফরি অবলম্বন করল। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কর্মফল দানের বিষয়টি বিলম্বিত করা সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে অর্থাৎ ধর্ম সম্পর্কে যে মতভেদ ঘটায় কাফেরদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে এই দুনিয়াতেই মানুষের মাঝে নিশ্চয়ই তার মীমাংসা হয়ে যেত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২০. وَيَقُولُونَ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ لَوْلاَ هَلاَّ اُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ج كَمَا كَانَ لِلْاَنْبِيَاءِ مِنَ النَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ فَقُلْ لَّهُمْ اِنَّمَا الْغَيْبُ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ اَىْ اَمْرُهُ لِلّٰهِ وَمِنْهُ الْاٰيَاتُ فَلَا يَاْتِىْ بِهَا اِلاَّ هُوَ وَاِنَّمَا عَلَىَّ التَّبْلِيْغُ فَانْتَظِرُوْا ج الْعَذَابَ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.

২০. তারা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা বলে, তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তার নিকট মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? যেমন অন্যান্য নবীদের মধ্যে উষ্ট্র, লাঠি, হাত ইত্যাদি নিদর্শন ছিল। তাদেরকে বল, অদৃশ্য যা বান্দাদের অগোচরে তা অর্থাৎ এতদসম্পর্কিত বিষয়াদি তো আল্লাহরই ক্ষমতায়। নিদর্শনাদিও এরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি ব্যতীত আর কেউ তা আনতে পারে না। আমার দায়িত্ব কেবল পৌছিয়ে দেওয়া। সুতরাং তোমরা যদি ঈমান আনয়ন না কর তবে আজাবের অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। لَوْلَا তা هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَاسْتِعْجَالِهِمْ : প্রশ্ন. اِسْتِعْجَالَهُمْ -এর তাফসীর كَاسْتِعْجَالِهِمْ তথা كَافْ বৃদ্ধি করার দ্বারা কি ফায়দা?
উত্তর. اِسْتِعْجَالُهُمْ بِالْخَيْرِ টা হুবহু اِسْتِعْجَالُ بِالشَّرِّ নয়। যদি হরফে তাশবীহ كَافْ বৃদ্ধি করা না হয়, তবে উভয়টি এক হওয়া আবশ্যক হয়। আর এ পার্থক্যটাকে সুস্পষ্ট করার জন্যই اِسْتِعْجَالَهُمْ -এর তাফসীর كَاسْتِعْجَالِهِمْ দ্বারা করেছেন। এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, اِسْتِعْجَالَهُمْ টা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ : قُضِىَ -এর নায়েবে ফায়েল হওয়ার কারণে رَفْع হয়েছে। আর قَضٰى মা'রূফ হওয়ার সুরতে মাফউল হওয়ার কারণে نَصْب হবে। এ সুরতে اَللّٰهُ ফায়েল হবে।

قَوْلُهُ يُمْهِلُهُمْ : প্রশ্ন. يُمْهِلُهُمْ -কে উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?
উত্তর. فَنَذَرُ -এর মধ্যে فَاء টি হলো আতেফা। তার জন্য مَعْطُوْف عَلَيْه -এর প্রয়োজন। অথচ পূর্বে তার مَعْطُوْف عَلَيْه -এর উল্লেখ নেই। আর قُضِىَ -এর উপর لَفْظًا ও مَعْنًى কোনোভাবেই তার আতফ সহীহ নয়। কেননা, لَقُضِىَ -এর জবাব لَوْ হওয়ার কারণে তা جَزْم যুক্ত হয়েছে। যদি فَنَذَرُ -এর আতফ لَقُضِىَ -এর উপর হতো তবে তো فَنَذَرُ জযমযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। অথচ তা مَجْزُوْم নয়। অর্থের হিসেবে অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে عَطْف বৈধ নয় যা সুস্পষ্ট। কাজেই فَنَذَرُ -এর আতফ সেই نَفِىْ -এর উপর হবে যা لَوْ شَرْطِيَّة থেকে বুঝা যায়। কেননা لَوْ يُعَجِّلُ টা نَفِىْ تَعْجِيْل -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর এই نَفِىْ تَعْجِيْل -এর مَفْهُوْم বর্ণনা করার জন্য মুফাসসির (র.) وَلٰكِنْ يُمْهِلُهُمْ বৃদ্ধি করেছেন। মোটকথা হলো فَنَذَرُ -এর আতফ উহ্য يُمْهِلُهُمْ -এর উপর হয়েছে فَقُضِىَ -এর উপর নয়।

قَوْلُهُ وَقَدْ جَائَتْهُمْ : প্রশ্ন. وَجَائَتْهُمْ টা ظَلَمُوْا থেকে حَالْ হয়েছে অথচ مَاضِىْ টা قَدْ বিহীন حَالْ হয় না।
উত্তর. এ প্রশ্নের নিরসনের জন্যই মুফাসসির (র.) قَدْ উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ بَيِّنٰتٍ টা اٰيٰتُنَا থেকে حَالْ হয়েছে; صِفَتْ হয়নি। কেননা, اٰيٰتُنَا টা ইজাফতের কারণে مَعْرِفَة হয়েছে। আর بَيِّنٰتٍ হলো نَكِرَة অথচ مَوْصُوْف এবং صِفَتْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ থাকা জরুরি হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِلَامٍ : অর্থাৎ لَا اَدْرٰكُمْ -এর স্থলে لَاَدْرٰكُمْ রয়েছে। অর্থাৎ لَامِ تَاكِيْد -এর সাথে।

قَوْلُهُ جَوَابُ لَوْ : অর্থাৎ جَوَاب لَوْ -এর উপর আতফ হয়েছে, যা مَا تَلَوْتُهُ

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ الخ : উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ সেসব লোকের সাথে, যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী। সেজন্যই যখন তাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রূপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আজাব ডেকে আন। অথবা বলে এ আজাব শীঘ্র কেন আসে না। যেমন, নজর ইবনে হারেস বলেছিল, "হে আল্লাহ একথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোনো কঠিন আজাব পাঠিয়ে দেন।" প্রথম আয়াতে এরই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আজাব এক্ষণেই নাজিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হিকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদদোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাজিল করেন না। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের বদদোয়াগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভালো দোয়াগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবুল করে দেন। অবশ্য কখনো কোনো হিকমত ও কল্যাণের কারণে কবুল না হওয়া এর পরিপন্থি নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কখনো দুঃখকষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদোয়া করে বসে অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আজাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না; বরং অবকাশ দেন যাতে অস্বীকৃতরাও বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোনো সাময়িক দুঃখকষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদোয় করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ লক্ষ্য করে, তাঁর পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

ইমাম জারীর তাবারী (র.) কাতাদাহ (র.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে এবং বুখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (র.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোনো কোনো সময় কেউ কেউ রাগত নিজের সন্তানসন্ততি কিংবা অর্থসম্পদের ধ্বংস প্রাপ্তির জন্য বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্তু সামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশত সহসাই এসব দোয়া কবুল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়াযেত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, "আমি আল্লাহ তা'আলার নিকটে প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোনো বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবুল না করেন।" আর শাহর ইবনে হাওশাব (র.) বলেছেন, আমি কোনো কোনো কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বান্দা দুঃখকষ্টের দরুন কিংবা রাগবশত কোনো কথা বলে ফেললে তা লিখবে না। -[কুরতুবী]

তারপরেও কোনো কোনো সময় এমন কবুলিয়াত বা প্রার্থনা মঞ্জুরির সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোনো কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেজন্য রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, নিজের সন্তানসন্ততি ও অর্থসম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরির সময় এবং এ দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে গজওয়ায়ে 'বাওয়াত' -এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

এ সমুদয় রেওয়ায়েতের সারমর্ম হলো এই যে, উল্লিখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য যদিও আখেরাতে অস্বীকৃতি ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের দাবি তাৎক্ষণিক আজাবের সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু সাধারণভাবে এত সেসব মুসলমানও অন্তর্ভুক্ত, যারা কোনো দুঃখকষ্ট ও রাগের দরুন নিজেদের সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদের জন্য বদদোয়া করে বসে। আল্লাহ তা'আলার রীতি স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণাবশত উভয়ের সাথে একই রকম যে, তিনি এ ধরনের বদদোয়া সাথে সাথে কার্যকর করেন না, যাতে করে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখেরাত অস্বীকৃত লোকদেরকে আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তা হলো এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়, অন্যদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরিক সাব্যস্ত করে এবং তাঁদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোনো

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হলো এই যে, যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন কোনো বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে আল্লাহ তা'আলার সাথে যারা অপর কাউকে শরিক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা উপলব্ধি করে, কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আজাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আজাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোনো সাধারণ ব্যাপক আজাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবি করতে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোনো অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আজাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আজাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

চতুর্থ আয়াতে বলেছেন– ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়ের ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খিলাফত [শুধু] তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে; বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন করো, বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের আশায় উন্মুক্ত হয়ে পড়। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়। বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়দায়িত্ব।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এ চার আয়াতে আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃত লোকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে। এসব লোক না জানত আল্লাহ তা'আলার মারিফত, না ওহী ও রিসালাত সম্পর্কিত কোনো পরিচয়। নবী-রাসূলগণকে সাধারণ মানুষের মতো মনে করত। যে কুরআন কারীম রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই কালাম, তাঁরই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী ﷺ -এর কাছে দাবি জানায়, এই যে কুরআন, এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী। যে মূর্তিবিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সতত সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধিদাতা হিসেবে মান্য করে এসেছে, কুরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কুরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাজি নই। সুতরাং হয় আপনি এ কুরআনের পরিবর্তনে অন্য কুরআন তৈরি করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্তত এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কুরআন কারীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী ﷺ -কে হিদায়াত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন, এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামতো আমি এতে কোনো পরিবর্তনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওহীর তাঁবেদার। আমি আমার ইচ্ছামতো এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গুনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আজাব নির্ধারিত রয়েছে আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

তারপর বললেন, আমি যাই কিছু করি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করি। তোমাদেরকে এ কালাম শুনানো না হোক এটাই যদি আল্লাহ তা'আলা চাইতেন, তাহলে না আমি শুনাতাম, না আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অবহিত করতেন। সুতরাং তোমাদেরকে এ কালাম শুনানো হোক এটাই যখন আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়, তখন কার এমন সাধ্য আছে যে, এতে কোনো রকম কমবেশি করতে পারে?

অতঃপর কুরআন যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত ঐশী কালাম তা এক প্রকৃষ্ট দলিলের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়টিও তো একটু চিন্তা কর যে, কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে তোমরা কখনো আমার কাছ থেকে কাব্য কবিতা বলতে কিংবা কোনো কথিকা প্রবন্ধ রচনা করতে শোননি। যদি আমি নিজের পক্ষ থেকে এমন কালাম বলতে পারতাম, তবে এ চল্লিশ বছরের মধ্যে কিছু না কিছু তো বলতাম। তাছাড়া চল্লিশ বছরের এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমরা আমার চাল-চলনের বিশ্বস্ততাও প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ। সারা জীবনেই যখন কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তখন আজ চল্লিশ বছর পর মিথ্যা বলার কি এমন হেতু থাকতে পারে। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ সত্য ও বিশ্বস্ত। কুরআনে যা কিছু রয়েছে সেসব আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আগত তাঁরই কালাম।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : কুরআন কারীমের এ দলিল-যুক্তি শুধু কুরআনের ঐশি বাণী হওয়ারই পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ নয়, বরং সাধারণ আচার অনুষ্ঠানে ভালোমন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় যাচাইয়েরও একটি নীতি বাতলে দিয়েছে। কাউকে কোনো পদ বা নিয়োগ দান করতে হলে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাচাই করার উত্তম পদ্ধতি হলো তার বিগত জীবনের পর্যালোচনা। যদি তাতে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকে, তবে ভবিষ্যতেও তা আশা করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বিগত জীবনে যদি সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে আগামীতে শুধু তার বলা-কওয়ায় তার উপর ভরসা করা কোনো বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। ইদানীং নিয়োগ ও পদ বন্টনে এবং দায়িত্ব সমর্পণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে এবং সে কারণে যেসব হাঙ্গামা-উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে, সেসবের কারণেও এই প্রকৃতিগত পদ্ধতি পরিহার করে প্রথাগত বিষয়াদির পেছনে পড়া।

অষ্টম আয়াতে এই একই বিষয়ের অতিরিক্ত তাকিদ এসেছে যাতে কোনো বাণী বা কালামকে ভ্রান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার সাথে জুড়ে দেওয়ার জন্য কঠিন আজাবের কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً الخ : **কাফের ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি-বর্ণ ও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন :** كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার কতদিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আ.)-কে এর মোকাবিলা করতে হয়। -[তাফসীরে মাজহারী]

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ কাল। এ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুরআন কারীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি; বরং উম্মতে ওয়াহেদাহ তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অতঃপর যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শিরকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাফের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে। فَاخْتَلَفُوْا কুরআন কারীমের هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্রবর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মূর্খতার একটা নয়া নিদর্শন যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখাপড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে রয়েছে। أَعَاذَ اللّٰهُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢١. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ أَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ رَحْمَةً مَطَرًا وَخِصْبًا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ بُؤْسٍ وَجَدْبٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ط بِالْاِسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ قُلِ لَهُمُ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ط مُجَازَاةً إِنَّ رُسُلَنَا الْحَفَظَةَ يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ .

২১. এবং আমি মানুষকে মক্কার কাফেরদেরকে তাদের দুঃখ অভাব ও দুর্ভিক্ষ স্পর্শ করবার পর বৃষ্টি ও প্রচুর ফলনের মাধ্যমে অনুগ্রহের আস্বাদ দিলে তারা তক্ষুণি আমার নিদর্শন সম্পর্কে বিদ্রূপ ও অস্বীকার করে চক্রান্তে লিপ্ত হয় তাদেরকে বল, আল্লাহ কৌশলে প্রতিফল দানে আরো তৎপর। তোমরা যে চক্রান্ত কর আমার রাসূলগণ অর্থাৎ সংরক্ষক ফেরেশতাগণ নিশ্চয়ই তা লিখে রাখেন। تَمْكُرُونَ এটা ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ ও ى অর্থাৎ নাম পুরুষ উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

٢٢. هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَنْشُرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ج السُّفُنِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ لَيِّنَةٍ وَفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ شَدِيْدَةُ الْهُبُوْبِ تُكَسِّرُ كُلَّ شَيْءٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ أَيْ أُهْلِكُوْا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج الدُّعَاءَ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ الْأَهْوَالِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ الْمُوَحِّدِيْنَ .

২২. তিনিই তাদেরকে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করান يُسَيِّرُكُمْ অপর এক পাঠে রয়েছে يَنْشُرُكُمْ অর্থ তোমাদেরকে ছড়িয়ে দেন। এবং তোমরা যখন নৌকায় اَلْفُلْك অর্থ নৌকাসমূহ। আরোহণ কর আর এগুলো তাদের [আরোহীদের] নিয়ে সুখকর নরম বাতাসে বয়ে যায় جَرَيْنَ তাতে দ্বিতীয় পুরুষ হতে اِلْتِفَات বা রূপান্তর হয়েছে। এবং তাতে তারা আনন্দিত হয় আর হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস এসে পড়ে عَاصِفٌ প্রচণ্ড বেগে ধাবিত বায়ু ঝাঞ্ঝা বায়ু। যা সবকিছু ভেঙ্গেচুরে ফেলে আর সকল দিক হতে তরঙ্গ আছড়ে পড়ে তাতে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে বলে তাদের ধারণা হয় তারা ধ্বংসের আশঙ্কা করতে থাকে তখন দীন অর্থাৎ দোয়াকে কেবল আল্লাহ তা'আলারই জন্য বিশুদ্ধ করত তাকে ডাকে যে এই বিভীষিকা হতে আমাদেরকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদের একত্ববাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। لَئِنْ এর ل টি قَسَمِيَّة অর্থাৎ শপথব্যঞ্জক।

٢٣. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط بِالشِّرْكِ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ ظُلْمُكُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ لِأَنَّ إِثْمَهُ عَلَيْهَا هُوَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا تَتَمَتَّعُوْنَ فِيْهَا قَلِيْلًا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَنُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصْبِ مَتَاعَ أَيْ تَتَمَتَّعُوْنَ .

২৩. অতঃপর তিনি যখনই তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই তারা শিরক অবলম্বন করত পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে। হে লোক সকল! তোমাদের সীমালঙ্ঘন এ জুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের উপরই বর্তায় কেননা এর পাপ তার নিজের উপরই বর্তায়। এটা পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগ। সামন্য কয়েকদিনই কেবল তাতে তোমরা তা ভোগ করবে। অতঃপর মৃত্যুর পর আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। অর্থাৎ তাদেরকে তার প্রতিফল দেব। مَتَاعَ এটা অপর এক কেরাতে نَصَب সহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তার পূর্বে تَتَمَتَّعُوْنَ [অর্থাৎ তারা ভোগ করবে] ক্রিয়াটি উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৪. إِنَّمَا مَثَلُ صِفَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ مَطَرٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ بِسَبَبِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ وَاشْتَبَكَ بَعْضُهٗ بِبَعْضٍ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيْرِ وَغَيْرِهِمَا وَالْاَنْعَامُ ط مِنَ الْكَلَأِ حَتّٰى إِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا بُهْجَتَهَا مِنَ النَّبَاتِ وَازَّيَّنَتْ بِالزَّهْرِ وَاَصْلُهٗ تَزَيَّنَتْ اُبْدِلَتِ التَّاءُ زَايًا وَاُدْغِمَتْ فِى الزَّايِ ثُمَّ اُجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ مُتَمَكِّنُوْنَ مِنْ تَحْصِيْلِ ثِمَارِهَا اَتٰهَآ اَمْرُنَا قَضَاؤُنَا وَعَذَابُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا اَىْ زَرْعَهَا حَصِيْدًا كَالْمَحْصُوْدِ بِالْمَنَاجِلِ كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ كَاَنَّهَا لَّمْ تَغْنَ تَكُنْ بِالْاَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ نُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ـ

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত উদাহরণ হলো পানি বৃষ্টি। আমি তা আকাশ হতে বর্ষণ করি এবং তা দ্বারা بِهٖ এ ب টি سَبَبِيَّةٌ বা হেতু বোধক। তার কারণে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন হয়। একটি অপরটির সন্নিবিষ্ট হয় মানুষ তার গম, যব ইত্যাদি এবং জন্তুগুলি ঘাস ইত্যাদি আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে উদ্ভিদ উদগমের মাধ্যমে চকচক করতে থাকে এবং ফুলে ফুলে নয়নাভিরাম হয় اِزَّيَّنَتْ তা মূলত ছিল تَزَيَّنَتْ; এর ت টিকে ز -এ পরিবর্তিত করত তাকে ز -এ اِدْغَامْ বা সন্ধি করে দেওয়া হয়। অতঃপর শুরুতে একটি هَمْزَةِ وَصْل বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। আর তার মালিকগণ মনে করে এটা তাদের আয়ত্তাধীন অর্থাৎ তারা তার ফসল নিজেরাই নিতে পারবে তখন রাত্রে বা দিনে আমার নির্দেশ আমার ফয়সালা বা আমার আজাব এসে পড়ে। অনন্তর আমি তা তার ফসল এমনভাবে নির্মূল করে দেই, حَصِيْد অর্থ কাস্তে দ্বারা কর্তিত শস্য। যেন ইঃতপূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশাবলি বিশদভাবে বিবৃত করি বর্ণনা করে দেই। كَاَنْ এটা مُخَفَّفَة বা লঘুকৃত। মূলত ছিল كَاَنَّهٗ । لَمْ تَغْنَ এ স্থানে অর্থ অস্তিত্ব ছিল না।

২৫. وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ع اَىِ السَّلَامَةِ وَهِىَ الْجَنَّةُ بِالدُّعَاءِ اِلَى الْاِيْمَانِ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ هِدَايَتَهٗ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

২৫. ঈমানের প্রতি আহ্বানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শান্তির আবাসের প্রতি ধর্মের প্রতি পরিচালিত করেন। سَلَام অর্থ এ স্থানে سَلَامَةٌ বা শান্তি। অর্থাৎ জান্নাতের প্রতি আহ্বান করেন এবং যাকে তিনি হেদায়েতের ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথে ইসলাম ধর্মের প্রতি পরিচালিত করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٦. لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْاِيْمَانِ الْحُسْنٰى اَلْجَنَّةُ وَزِيَادَةٌ ط هِيَ النَّظْرُ اِلَيْهِ تَعَالٰى كَمَا فِيْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ وَلَا يَرْهَقُ يَغْشٰى وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ سَوَادٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ط كَاٰبَةٌ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

২৬. যারা ঈমান আনয়ন করত মঙ্গলকর কার্য করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল অর্থাৎ জান্নাত এবং আরো কিছু। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার দীদার বা দর্শন লাভ। কালিমা قَتَرٌ অর্থ কালিমা। ও হীনতা কষ্ট ও দুঃখ তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে না, ঢেকে ফেলবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٢٧. وَالَّذِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا اَيْ وَلِلَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ عَمِلُوا الشِّرْكَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ عَاصِمٍ ج مَانِعٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ اُلْبِسَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا بِفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قِطْعَةٍ وَاِسْكَانِهَا اَيْ جُزْءًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ط اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

২৭. যারা وَالَّذِيْنَ পূর্বোল্লিখিত لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا-এর সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। মন্দ কাজ করে শিরক অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে মন্দের অনুরূপ প্রতিফল এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা আচ্ছন্ন করে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা হতে তাদেরকে রক্ষা করবার কেউ নেই। কেউ তাঁর আর প্রতিহতকারী নেই। তাদের মুখমণ্ডল যেন অন্ধকার রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা এমন হবে যে, রাত্রিরূপে আচ্ছাদনের একটা টুকরা এনে যেন তাদের মুখে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা অগ্নিবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে। مِنْ عَاصِمٍ এ স্থানে مِنْ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। قِطَعًا এটা ط-এ ফাতাহসহ পঠিত রয়েছে। তা قِطْعَةٌ-এর বহুবচন। অপর এক কেরাতে ط-এ সাকিনসহও পঠিত রয়েছে।

٢٨. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ اَيِ الْخَلْقَ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ نُصِبَ بِالْزَمُوْا مُقَدَّرًا اَنْتُمْ تَاكِيْدٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ لِيُعْطَفَ عَلَيْهِ وَشُرَكَاؤُكُمْ ج اَيِ الْاَصْنَامُ فَزَيَّلْنَا مَيَّزْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا فِيْ اٰيَةٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ وَقَالَ لَهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ. مَا نَافِيَةٌ وَقُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلْفَاصِلَةِ.

২৮. স্মরণ কর যেদিন আমি তাদের সকলকে অর্থাৎ সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করব অতঃপর যারা অংশীবাদী তাদেরকে বলব 'তোমরা اَنْتُمْ এটা এ স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়াস্থিত সর্বননামের تَاكِيْد রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরবর্তী শব্দ شُرَكَاؤُكُمْ-কে তার সাথে عَطْف বা অন্বয় সাধন। এবং তোমরা যাদেরকে শরিক করেছিলে তারা অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ স্বস্থানে অবস্থান কর। مَكَانَكُمْ-এর পূর্বে اِلْزَمُوْا উহ্য থাকায় তা مَنْصُوْب ব্যবহৃত হয়েছে। অনন্তর আমি তাদের মধ্যে ও মু'মিনদের মধ্যে পার্থক্য করে দেব। পরস্পরকে আলাদা করে দেব। যেমন অপর একটি আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন– وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ 'হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।, এবং তাদেরকে ঐ শরিকগণ বলবে 'তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ এ مَا এ টি এ স্থানে না বোধক। এ স্থানে فَاصِلَة বা আয়াতের অন্ত্যমিল রক্ষার উদ্দেশ্যে مَفْعُوْل অর্থাৎ কর্মপদ (اِيَّانَا) -কে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٩. فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ.

২৯. আল্লাহ তা'আলাই আমরা ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, তোমরা আমাদের ইবাদত করতে এ বিষয়ে আমরা অনবধান ছিলাম। اِنْ এটা مُخَفَّفَة বা লঘুকৃত। মূলত ছিল اِنَّا।

٣٠. هُنَالِكَ اَىْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ تَبْلُوْا مِنَ الْبَلْوٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَائَيْنِ مِنَ التِّلَاوَةِ كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ قَدَّمَتْ مِنَ الْعَمَلِ وَرُدُّوْآ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ الثَّابِتِ الدَّائِمِ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الشُّرَكَاءِ.

৩০. সেস্থানে অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেক পূর্বকৃত কর্মের বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের প্রকৃত অভিভাবক যিনি সবসময় হতে আছেন ও সর্বদা থাকবেন সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদেরকে নিশ্চিতভাবে ফিরিয়ে আনা হবে এবং আল্লাহ তা'আলার শরিক আছে বলে যে মিথ্যা রচনা তারা করিত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। গায়েব হয়ে যাবে। تَبْلُوْا এটা بَلْوٰى হতে উদ্গত ক্রিয়া। অপর এক কেরাতে تِلَاوَةٌ হতে গঠিত ক্রিয়ারূপে প্রথমে দুটি ت সহ تَتْلُوْا রূপে পঠিত রয়েছে। مَا اَسْلَفَتْ অর্থ পূর্বে যা করেছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ .... اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِىْ اٰيٰتِنَا : এখানে وَاوْ টি اِسْتِئْنَافِيَّة আর اِذَا হলো ظَرْفِيَّة যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর اِذَا هُمْ হলো شَرْط-এর جَزَاء আর اِذَا হলো مُفَاجَاتِيَّة।

قَوْلُهُ مُجَازَاةً : প্রশ্ন. مَكْر-এর তাফসীর مُجَازَاةً দ্বারা করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. যেহেতু مَكْر-এর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা অনুচিত তাই مَكْر-এর তাফসীর جَزَاءُ مَكْرٍ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ السُّفُنِ : فُلْكِ শব্দটি যেহেতু একবচন ও বহুবচনের ক্ষেত্রে মুশতারিক। তাই فُلْكِ-এর তাফসীর سُفُنِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে বহুবচন উদ্দেশ্য– একবচন নয়।

قَوْلُهُ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ : পূর্বে خِطَابٌ-এর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর جَرَيْنَ بِهِمْ-এর মধ্যে غَائِبْ-এর যমীর নেওয়া হয়েছে এরকম বৃদ্ধিকরণ تَقْبِيْح তথা মন্দত্বকে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। جَرَيْنَ হলো فِعْل مَاضِى-এর جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ-এর সীগাহ। অর্থ– তারা চলেছে। তারা প্রবাহিত হয়েছে। এটা بَاء দ্বারা مُتَعَدِّىْ হওয়ার কারণে তার অর্থ হয়েছে যে, সেই নৌযানগুলো তাদেরকে নিয়ে চলাচল করেছে।

قَوْلُهُ الرِّيْحُ : اَلْهَوَاءُ الْمُسَخَّرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ তথা শূন্যে ঝুলন্ত বায়ুকে رِيْح বলা হয়। رِيْح (الْمِصْبَاح) শব্দটি মূলত رُوْحٌ ছিল। وَاو-এর পূর্ব বর্ণে যের হওয়ার কারণে وَاوْ-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করায় رِيْح হয়েছে। বহুবচনে اَرْوَاحٌ এবং رِيَاحٌ আসে। رِيْح শব্দটি مُؤَنَّث سَمَاعِىْ

قَوْلُهُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ : এর আতফ হয়েছে جَائَتْهُمْ-এর উপর। এবং اَنَّ ও তার অধীনে যা রয়েছে তা ظَنُّوا-এর দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। আর اُحِيْطَ بِهِمْ হলো اَنَّ-এর খবর। আর دَعَوُا اللّٰهَ الخ টা ظَنُّوْا থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে এজন্য যে, তাদের দোয়া তাদের ধ্বংসের ধারণার لَوَازِمْ-এর অন্তর্গত। আর উহ্য প্রশ্নের জবাব হওয়ার সুরতে جُمْلَة مُسْتَانِفَة ও হতে পারে অর্থাৎ مَاذَا صَنَعُوْا؟ - قِيْلَ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَصْلُهُ تَزَيَّنَتْ : এটা বাবে تَفَعُّلْ হতে।

قَوْلُهُ زَرْعَهَا : প্রশ্ন. এখানে مُضَافْ উহ্য রাখার মধ্যে কি ফায়দা রয়েছে।

উত্তর. যদি زَرْع মুযাফকে উহ্য মানা না হয় তবে نَفْس اَرْض কর্তন করা আবশ্যক হবে। অথচ জমিন কর্তন করার কোনো অর্থই হতে পারে না। এ কারণেই زَرْع মুযাফকে উহ্য মেনেছেন এবং مُبَالَغَةْ-কে প্রকাশ করার জন্য মুযাফকে উহ্য করে দিয়েছে। অর্থাৎ ফসল কেটে এমন পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মনে হয় যেন জমিনকে কেটেই পরিষ্কার করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا : এটা সে সকল লোকদের উক্তি অনুযায়ী যারা فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو-এর তারকীবকে জায়েজ মনে করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً الخ : **আয়াতের শানে নুযূল :** একবার মক্কাবাসী দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হয়। অবশেষে প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে তারা আরজি পেশ করল আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের জন্য দোয়া করুন। যদি দুর্ভিক্ষের বিপদ কেটে যায় তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরগুজার থাকব। প্রিয়নবী ﷺ তাদের জন্য দোয়া করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দুর্ভিক্ত দূরীভূত করে দিলেন। বিপদ থেকে মুক্তি লাভের পরই তারা পুনরায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হলো, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا : আরবি অভিধান অনুসারে مَكْر বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালো হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু [কিংবা বাংলা] পরিভাষার দরুন ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু [কিংবা বাংলায়] مَكْر বলা হয় ধোঁকা, প্রতারণা, ফেরেববাজি প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

قَوْلُهُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয় বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। [আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে] অন্যায়-অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। [দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।] অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার ওবাল [অশুভ পরিণতি] তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হলো জুলুম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা। -[আবুশ শায়খ ইবনে মারদুবিয়াহ কর্তৃক তাঁর তাফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ الخ : বিগত আয়াতে পার্থিব জীবন এবং তার ক্ষণস্থায়িত্বের উদাহরণ এমন আবাদির দ্বারা দেওয়া হয়েছিল যা আকাশ থেকে বর্ষিত পানিতে সঞ্চিত হয়ে লক লক করতে থাকে, আর ফুলে-ফলে ভরে উঠে এবং তা থেকে কৃষাণ আনন্দিত হতে থাকে যে, এবার আমাদের যাবতীয় প্রয়োজনাদি এর দ্বারা পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কৃতঘ্নতার দরুন রাতে কিংবা দিনে আমার আজাবের কোনো দুর্ঘটনা এসে উপস্থিত হয় যা সেগুলোকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়, যেন এখানে কোনো বস্তুর অস্তিত্বই ছিল না। এ তো হলো পার্থিব জীবনের অবস্থা। এর পরবর্তী আয়াতে তার বিপরীতে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে- وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন অর্থাৎ এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোনো রকম দুঃখকষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছ রোগ তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস। 'দারুসসালাম' -এর মর্মার্থ হলো জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হলো এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয়ত

Free @ www.eilm.weebly.com

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌছতে থাকবে; বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাআয (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে নসিহত হিসেবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে আদম সন্তানগণ! তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দারুসসালামের দিকে আহ্বান করেছেন, তোমরা এ আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভালো করে জেনে রাখ, এ আহ্বান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌছে এই আহ্বানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ তা কর্মস্থল নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হলো জান্নাতের সাতটি নামের একটি। –[তাফসীরে কুরতুবী]

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোনো ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েজ নয়।

অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌছে দেন। এর মর্মার্থ হলো যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়েতের বিশেষ প্রকার সরল সোজা পথে তুলে দেওয়া এবং তাতে চলার তাওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

উল্লিখিত দুটি আয়াতে পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনের তুলনা এবং পৃথিবীবাসী এবং পরলোকবাসীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছিল। পরবর্তী চার আয়াতে এতদুভয় শ্রেণির লোকদের প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে জান্নাতবাসীদের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, অর্থাৎ সবচেয়ে বৃহত্তর সৎকর্ম ঈমানে এবং পরে সৎকর্মে সুদৃঢ় রয়েছে তাদেরকে তাদের কর্মের বিনিময়ে শুভ ও উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। আর শুধু বিনিময় দানই নয় তার চেয়েও কিছু বেশি দেওয়া হবে।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তা হলো এই যে, এক্ষেত্রে ভালো বদলা বা বিনিময় বলতে অর্থ হলো জান্নাত। আর زيادة -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ যা জান্নাতবাসীরা প্রাপ্ত হবে। [হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে কুরতুবী।]

সহীহ মুসলিমে হযরত সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে সারবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমাদের কি আরো কোনো কিছুর প্রয়োজন রয়েছে? যদি [কারো] থাকে, তবে বল, আমি তা পূরণ করে দেব। এতে জান্নাতবাসীগণ জবাব দেবে যে, আপনি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করেছেন, জাহান্নাম থেকে নাজাত বা অব্যাহতি দান করেছেন, এর চেয়ে বেশি আর এমনকি প্রার্থনা করব? তখন আল্লাহ তা'আলার ও বান্দার মধ্যবর্তী পর্দা তুলে দেওয়া হবে এবং সমস্ত জান্নাতবাসী আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। এতে বুঝা গেল যে, বেহেশতের যাবতীয় নিয়ামত অপেক্ষা বড় ও উত্তম নিয়ামত ছিল এটাই, যা আল্লাহ তা'আলা কোনো আবেদন নিবেদন ব্যতীত দান করেছেন। মাওলানা রুমীর ভাষায়–

ما نبوديم وتقاضه ما نبود

لطف تونا گفته ما مى شنود

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আমরাও থাকব না এবং আমাদের কোনো চাহিদাও থাকবে না, [বরং] তোমার অনুগ্রহই আমাদের অব্যক্ত নিবেদন শুনবে। অতঃপর জান্নাতবাসীদের এ অবস্থা বিবৃত করা হয়েছে যে, তাদের মুখমণ্ডলে কখনো মলিনতা কিংবা দুঃখ-বেদনার প্রতিক্রিয়া অথবা অপমানের ছাপ পড়বে না, যেমনটি দুনিয়ার বুকে কোনো না কোনো সময় সবারই হয়ে থাকে এবং আখেরাতে জান্নাতবাসীদের হবে।

এর বিপরীতে জান্নাতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যেসব লোক অসৎকর্ম করেছে তাদেরকে সে অসৎকর্মের বদলা সমানভাবে দেওয়া হবে তাতে কোনো রকম বৃদ্ধি হবে না। তাদের চেহারায় কলহ লাঞ্ছনা ছেয়ে থাকবে। কেউই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের চেহারার মলিনতা এমন হবে যেন রাতের আঁধার ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর পরবর্তী দুই আয়াতে একটি সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা জান্নাতবাসী এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী মূর্তি-বিগ্রহ কিংবা শয়তানের মাঝে হাশরের ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। ইরশাদ হয়েছে, "সেদিন আমি সবাইকে একত্রে সমবেত করে দেব এবং অংশীবাদীদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমাদের নির্বাচিত উপাস্যরা একটু নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াও, যাতে তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের তাৎপর্য জেনে নিতে পার। অতঃপর তাদের এবং তাদের উপাস্যদের মাঝে পৃথিবীতে যে ঐক্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তা ছিন্ন করে দেওয়া হবে, যার ফলে তাদের [উপাস্য] মূর্তি-বিগ্রহগুলো নিজেই বলে উঠবে, তোমরা আমাদের উপাসনা করতেই না। এরা আল্লাহকে সাক্ষী করে বলবে, তোমাদের শিরকী উপাসনার ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না! কারণ আমাদের মধ্যে না ছিল কোনো চেতনা-স্পন্দন, না ছিল আমাদের কোনো বিষয় বুঝবার বুদ্ধি-বিবেচনা। ষষ্ঠ আয়াতে জান্নাতি ও জাহান্নামি উভয় শ্রেণির একটা যৌথ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে অর্থাৎ হাশরের ময়দানে প্রতিটি লোক নিজ নিজ কৃতকর্ম যাচাই করে নেবে যে, তা লাভজনক ছিল, কি ক্ষতিকর। সবাইতে সত্য সঠিক মা'বুদের দরবারে হাজির করে দেওয়া হবে এবং যেসব ভরসা ও আশ্রয় পৃথিবীতে মানুষ খুঁজে বেড়াত, তা সবই শেষ করে দেওয়া হবে। মুশরিক তথা অংশীবাদীরা যেসব মূর্তি-বিগ্রহকে নিজেদের সহায় ও সুপারিশকারী বলে মনে করত সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

৩১. قُلْ لَهُمْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ وَالْاَرْضِ بِالنَّبَاتِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ اَىْ خَلْقَهَا وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ط بَيْنَ الْخَلَائِقِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اللّٰهُ ط فَقُلْ لَهُمْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ فَتُؤْمِنُوْنَ .

৩২. فَذٰلِكُمُ الْفَعَّالُ لِهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج الثَّابِتُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ج اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَىْ لَيْسَ بَعْدَهُ غَيْرُهُ فَمَنْ اَخْطَأَ الْحَقَّ وَهُوَ عِبَادَةُ اللّٰهِ وَقَعَ فِى الضَّلَالِ فَاَنّٰى كَيْفَ تُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ .

৩৩. كَذٰلِكَ كَمَا صَرَفَ هٰؤُلَاءِ عَنِ الْاِيْمَانِ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا كَفَرُوْا وَهِىَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ اَوْ هِىَ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

৩৪. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ تُصْرَفُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيْلِ .

অনুবাদ :

৩১. তাদেরকে বল, কে তোমাদেরকে আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে ও পৃথিবী হতে উদ্ভিদ জন্মিয়ে রিজিক দান করে? শ্রবণ اَلسَّمْعَ এটা এ স্থানে তার বহুবচন اَسْمَاعٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে اَلْاَسْمَاعُ -এর উল্লেখ করা হয়েছে। ও দৃষ্টিশক্তি অর্থাৎ তাদের সৃজন কার আয়ত্তাধীন? কে মৃত হতে জীবিতকে বের করে আনে? কে জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করে? এবং কে সৃষ্টি জগতের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন নিশ্চয়ই তারা বলবে, তিনি হলেন আল্লাহ, তাদের বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? ও ঈমান আনয়ন করবে না? اَلسَّمْعَ এটা এ স্থানে তার বহুবচন اَسْمَاعٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য তাফসীরে اَلْاَسْمَاعُ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৩২. তিনিই অর্থাৎ এ সমস্ত কাজের যিনি কর্তা তিনিই আল্লাহ! তোমাদের সত্য অর্থাৎ সদা অস্তিত্বশীল প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে? فَمَاذَا এ স্থানে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْر অর্থাৎ বক্তব্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, এর পর আর অন্য কিছুই থাকে না। সত্য অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত যেজন পরিত্যাগ করবে সে বিভ্রান্তিতেই নিপতিত হবে। সুতরাং প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠার পরও ঈমান হতে তোমরা কোথায় কেমন করে অন্যদিকে চালিত হচ্ছো?

৩৩. এভাবে অর্থাৎ যেমন তারা ঈমান হতে ফিরে গেল সেভাবে অসৎকর্মশীলদের সম্পর্কে সত্য-ত্যাগীদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এ বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনয়ন করবে না। কিংবা উক্ত বাণীটি হলো– لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।.

৩৪. বল, তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সৃষ্টিকে শুরুতে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটায়? বল, আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে তার পুনরাবর্তন ঘটান সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য বিচ্যুত হচ্ছো? প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কেমন করে তোমরা ঈমান হতে অন্যদিকে চালিত হচ্ছো?

٣٥. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ ط بِنَصْبِ الْحُجَجِ وَخَلْقِ الْاِهْتِدَاءِ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ط أَفَمَنْ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَهُوَ اللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّيْ يَهْتَدِيْ إِلَّا أَنْ يُهْدٰى ج أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ وَتَوْبِيْخٍ أَيِ الْأَوَّلُ أَحَقُّ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ هٰذَا الْحُكْمَ الْفَاسِدَ مِنْ اِتِّبَاعِ مَا لَا يَحِقُّ اِتِّبَاعُهُ.

৩৫. বল, তোমরা যাদেরকে শরিক কর তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠা ও হেদায়েত সৃজনের মাধ্যমে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল, আল্লাহই সত্যের পথ নির্দেশ করেন। যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের অধিক হকদার না সে আনুগত্যের হক রাখে যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না? নিশ্চয়ই প্রথমজনই তার অধিক হকদার। তোমাদের কি হলো? তোমরা কেমন করে যেজন আনুগত্য পাবার হক রাখে না তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মতো অলীক সিদ্ধান্ত কর? أَفَمَنْ এ স্থানে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْر অর্থাৎ বক্তব্যটি সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বা تَوْبِيْخ তিরস্কারমূলক অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। مَنْ لَا يَهِدِّيْ অর্থাৎ যে পথ পায় না।

٣٦. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ فِيْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ إِلَّا ظَنًّا ط حَيْثُ قَلَّدُوْا فِيْهِ آبَاءَهُمْ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ط فِيْمَا الْمَطْلُوْبُ مِنْهُ الْعِلْمُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ.

৩৬. তাদের অধিকাংশ জনই প্রতিমা উপাসনার বিষয়ে শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। তাই তাতে তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরই অনুকরণ করে। সত্যের বিষয়ে অভীপ্সিত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে অনুমান কোনো কাজে আসে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন।

٣٧. وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرٰى أَيِ افْتِرَاءً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَيْ غَيْرِهِ وَلٰكِنْ أُنْزِلَ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ تَبْيِيْنَ مَا كَتَبَ اللّٰهُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ مُتَعَلِّقٌ بِتَصْدِيْقِ أَوْ بِأُنْزِلَ الْمَحْذُوْفِ وَقُرِئَ بِرَفْعِ تَصْدِيْقُ وَتَفْصِيْلُ بِتَقْدِيْرِ هُوَ

৩৭. এ কুরআন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো তরফ হতে মিথ্যা রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটা তার পূর্বের অর্থাৎ পূর্বে যে সমস্ত গ্রন্থ ছিল সেগুলোর সমর্থক ও কিতাবের অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত হুকুম-আহকাম ইত্যাদি ফরজ করে দিয়েছেন তার বিশদ বিবরণ হিসেবে প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। تَصْدِيْق تَفْصِيْل অপর কেরাতে এ ক্রিয়া দুটি رَفْع সহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এর পূর্বে هُوَ উহ্য রয়েছে বলে গণ্য হবে। أَنْ يُفْتَرٰى তার أَنْ টি مَصْدَرِيَّة বা ক্রিয়ার মূল অর্থব্যঞ্জক। لَا رَيْبَ অর্থ সন্দেহ নেই। مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটা تَصْدِيْق-এর সাথে বা এ স্থানে উহ্য انزل-এর সাথে مُتَعَلِّق বা সংশ্লিষ্ট।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٨. أَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ط اِخْتَلَقَهُ مُحَمَّدٌ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ عَلٰى وَجْهِ الْاِفْتِرَاءِ فَاِنَّكُمْ عَرَبِيُّوْنَ فُصَحَاءُ مِثْلِيْ وَادْعُوْا لِلْاِعَانَةِ عَلَيْهِ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْ اَنَّهٗ اِفْتِرَاءٌ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৮. বরং أَمْ এটা এ স্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তারা কি বলে, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তা রচনা করেছেন; নিজে বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। বল, আমিই যদি রচনা করে থাকি তবে তোমরা ফাসাহাত-বালাগাত বা শব্দ, বাক্য ও ভাষালঙ্কার সকল ক্ষেত্রে এর অনুরূপ এক সূরা আনয়ন কর তো দেখি। তোমরাও তো আমারই মতো ভাষালঙ্কার জ্ঞান সমৃদ্ধ আরবি ভাষাভাষী মানুষ। আর এ কাজে সাহায্য করার জন্য তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর যাকে পার আহ্বান কর যদি তোমরা এক কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক যে, তিনি তা নিজে রচনা করেছেন। কিন্তু এরূপ চ্যালেঞ্জের পরও তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।

٣٩. قَالَ تَعَالٰى بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ اَيْ بِالْقُرْاٰنِ وَلَمْ يَتَدَبَّرُوْهُ وَلَمَّا لَمْ يَأْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ عَاقِبَةُ مَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ كَذٰلِكَ التَّكْذِيْبِ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ اَيْ اٰخِرُ اَمْرِهِمْ مِنَ الْهَلَاكِ فَكَذٰلِكَ يُهْلَكُ هٰؤُلَاءِ .

৩৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বস্তুত তারা যে বিষয়ের অর্থাৎ আল কুরআনের জ্ঞান আয়ত্ত করে না ও চিন্তা করে না তা অস্বীকার করে। এর মর্ম অর্থাৎ এতে যে সমস্ত হুমকি বিদ্যমান তার বাস্তবতা এখনো তাদের সামনে আসেনি। لَمَّا তা এ স্থানে না-বোধক لَمْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে অস্বীকার করার ন্যায় তাদের পূর্ববর্তীগণও তাদের রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং দেখ রাসূলগণকে অস্বীকার করে যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। ধ্বংসই তাদের শেষ পরিণাম। তেমনিভাবে তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

٤٠. وَمِنْهُمْ اَيْ اَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ لِعِلْمِ اللّٰهِ ذٰلِكَ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ط اَبَدًا وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ تَهْدِيْدٌ لَّهُمْ .

৪০. তাদের মধ্যে অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে কেউ তা বিশ্বাস করে কারণ তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানও তদ্রূপ আর কেউ কেউ তাতে কখনো বিশ্বাস করবে না। আর তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلسَّمْعَ -এর উপর اَلِفْ وَلَامْ টি اِسْتِغْرَاقْ -এর জন্য হয়েছে, যাতে করে اَلْاَبْصَارُ -এর تَقَابُلْ বৈধ হতে পারে।

প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) يَمْلِكُ -এর তাফসীর خَلَقَهَا দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর. যেহেতু কর্ণ ও চক্ষুর মধ্যে মালিকানা কান ও চোখওয়ালার হয়ে থাকে। আর এ কারণেই কানওয়ালাই اَرْش -এর মালিক হয়ে থাকে। এ সংশয়কে দূর করার জন্যই مَلَكَ -এর তাফসীর خَلَقَهَا দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ هُوَ اللّٰهُ : **প্রশ্ন.** هُوَ উহ্য মানার কারণ কি?

উত্তর. যেহেতু এখানে اَللّٰهُ শব্দটি যা مَقُوْلَه হয়েছে তা مُفْرَدٌ বা একক শব্দ। অথচ مَقُوْلَه বাক্য হয়ে থাকে। মুফাসসির (র.) هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, هُوَ উহ্য রয়েছে। যার কারণে مَقُوْلَه জুমলা হয়েছে مُفْرَدْ হয়নি।

قَوْلُهُ اَوْ هِيَ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كَلِمَتُ رَبِّكَ দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। একটি তো হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الخ আর দ্বিতীয় হলো اِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ যদি প্রথম সুরত উদ্দেশ্য হয় তবে اِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ টা ইল্লত হবে অর্থাৎ لِاَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

قَوْلُهُ بِنَصْبِ الْحُجَجِ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হেদায়েত দ্বারা শুধু اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা তো পথ প্রদর্শনের কর্মের আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তবে اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ এর বিপরীত। যা এখানে উদ্দেশ্য। আর তা আল্লাহ তা'আলার সাথে নির্দিষ্ট।

قَوْلُهُ يَهْدِيْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يَهْدِيْ -এর মূল বর্ণনা করা يَهْدِيْ মূলে يَهْتَدِيْ ছিল। বাবে اِفْتِعَالْ হতে تَاء -কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে دَالْ -কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। আর اِلْتِقَاء سَاكِنَيْن -এর কারণে هَاء -এর নিচে যের দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ : এটা اَمْ مَنْ لَا يَهْدِيْ মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণামের ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বা তাওহীদের এমন অকাট্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যা অস্বীকার করার জো নেই। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৭, পৃ. ১৮; তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত. আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.), খ. ৩, পৃ. ৪৬৬]

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম কুদরত হিকমতের এবং তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের অনেক দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার এমন গুণাবলির বিবরণ রয়েছে যাকে কোনো কাফের মুশরিকও অস্বীকার করতে পারে না। কেননা এ গুণাবলি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো মধ্যেই নেই। এরপর কাফের মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এ মহাসত্য উপলব্ধি করার পরও কেন তোমরা এক অদ্বিতীয়, লা-শরিক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে মাথানত কর? কেন তোমরা স্বহস্তে নির্মিত মূর্তির পূজা আর্চনা কর? এ আয়াতসমূহের বর্ণনা শৈলী এত হৃদয়গ্রাহী যে, মানুষ মাত্রেরই হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, মনে দাগ কাটে। ইরশাদ হয়েছে– قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি কাফের-মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আসমান জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দেয়? আসমান থেকে কে বারি বর্ষণ করে? সূর্যের তাপ কার দান? জমিন কার সৃষ্টি? জমিনের মাঝে উৎপাদন ক্ষমতা কে দান করেছে? মাটি পানি সংমিশ্রিত হওয়ার পর জমিন থেকে ফলমূল, তরি-তরকারি এককথায় যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য কে উৎপাদন করে? অন্য আয়াতে কথাটিকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com
এভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে- أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ . অর্থাৎ তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি তাকে অঙ্কুরিত কর? না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ অর্থাৎ তোমরা বলবে আমাদের তো সর্বনাশ হয়ে গেল, আমরা সম্পূর্ণ হৃতঃসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।

অতএব, একথা অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই মানব জাতিকে রিজিক দান করেন। পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

আসমান জমিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে যে, আল্লাহ তা'আলাই রিজিকদাতা। তিনি পালনকর্তা, তিনিই স্রষ্টা, তিনি এক, অদ্বিতীয়। হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! তোমার নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার নিজের দেহের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রকৃষ্ট দলিল-প্রমাণ।

মানুষের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ শক্তি কার দান? কোন মহাশক্তি প্রত্যেকটি মানুষকে দেখবার এবং শুনবার এ অপূর্ব শক্তি দান করেছেন। কে তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন? কে এই শক্তি দান করে, কে এই শক্তি থেকে বঞ্চিত করে? অথবা এর অর্থ হলো কে তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির হেফাজত করেন? পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন- وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا অর্থাৎ এবং আল্লাহ তা'আলা বের করেছেন তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের উদর থেকে, অথচ তোমরা কিছুই জানতে না এবং আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং উপলব্ধিশক্তি, হয়তো তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরগুজার হবে। যেহেতু শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি তথা যাবতীয় শক্তি আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে দান করেছেন, তাই এসব শক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে বলেও পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ এভাবে যেভাবে উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, এক আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা ও পালনকর্তা এবং রিজিকদাতা, ঠিক এমনিভাবে একথাও প্রমাণিত হলো যে, এ কাফের মুশরিকরা ঈমান আনবে না। [অতএব হে রাসূল ﷺ!] মক্কাবাসী কাফের মুশরিকদের ঈমান না আনার কারণে আপনি ব্যথিত হবেন না। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও যারা পথভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য মর্মাহত হওয়ার কিছুই নেই। এ কাফেরদের অন্যায় আচরণ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা কখনো ঈমান আনবে না আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এ কথা জানতেন। এই দুরাত্মা কাফেররা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যা জানতেন তা বাস্তব সত্যে প্রমাণ করলো।

قَوْلُهُ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَؤُا الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর আরো দলিল পেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকরা যে নিজেদের হাতে তৈরি মূর্তির পূজা অর্চনা করত, অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা তার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তাই প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ﷺ! আপনি কাফের মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার শরিক মনে করে তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে প্রথম অস্তিত্ব দিতে পারে? এবং এরপর দ্বিতীয়বারও তাকে সৃষ্টি করতে পারে? আর এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, তাদের তথা কথিত উপাস্যরা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের উপাস্যগুলো সম্পূর্ণ অসহায় অক্ষম। এমন অবস্থায় [হে রাসূল ﷺ!] قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ অর্থাৎ আপনিই জবাব দিন যে, আল্লাহ তা'আলাই পৃথিবীর সব কিছুকে সর্বপ্রথম অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর পুনরায় তিনিই তাকে সৃষ্টি করবেন। অতএব, যখন তোমাদের উপাস্যরা কোনো কিছু সৃষ্টি

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করতে পারে না, সব বিষয়েই তারা অক্ষম, সৃষ্টি করার গুণ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই, আর কারো নয়, এমন অবস্থায় তোমরা কোথায় ফিরে যাও? তোমরা স্বচক্ষে দেখ তোমাদের অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দান, তোমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা তথা তোমাদের যাবতীয় শক্তি এক আল্লাহ তা'আলাই দান করেছেন, আসমান জমিন এককথায় নিখিল বিশ্ব আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি। এ সত্য তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট আর তোমরা এসব সত্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য এমন অবস্থায় পুনরায় তোমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে তোমরা কেন সন্দিহান হও?

বিশেষত, যখন আল্লাহ তা'আলার প্রিয়নবী ﷺ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেছেন এবং অবশেষে হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে একত্রিত করা হবে এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন এমন অবস্থায় তোমরা পুনর্জীবনের কথা, হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কথা কোন যুক্তিতে অস্বীকার কর?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বও আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন। এর পাশাপাশি এ কথাও ধ্রুব সত্য যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা পুনর্জীবন দান করবেন এবং তার দরবারে হাজির করবেন, সৃষ্টির শুরুও তার হাতে এবং শেষও তার হাতে। এমন অবস্থায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ ছেড়ে তোমরা কোথায় যাও? أَيْنَ تَفِرُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা কোথায় পলায়ন করছ? قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের বা তাওহীদের উপর আরো একটি দলিল- প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল ﷺ ! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরিক মনে কর তাদের মধ্যে কে আছে যে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে, দলিল-প্রমাণ দিয়ে মানুষকে সরল সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়? কে মানুষকে হেদায়েত করে?

কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, তাদের তথাকথিত উপাস্যরা কোনো মানুষকে সঠিক পথ দেখানো তো দূরের কথা তারা নিজেরাই তো পথ চিনে না, তারা দেখতে পারে না, চলতেও পারে না। তারা কিছুই করতে পারে না। তাই অন্যকে কিভাবে তারা পথ দেখাবে?

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهُ এখানে تَأْوِيْلُ -এর মর্মার্থ হলো প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফলতি ও নির্লিপ্ততার দরুন কুরআন সম্পর্কে কোনো চিন্তাভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৪১. وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لَهُمْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ
عَمَلُكُمْ ج اَيْ لِكُلٍّ جَزَاءُ عَمَلِهِ اَنْتُمْ
بَرِيْئُوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ
وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ .

৪২. وَمِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ط اِذَا قَرَأْتَ
الْقُرْاٰنَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ شَبَّهَهُمْ بِهِمْ
فِيْ عَدَمِ الْاِنْتِفَاعِ بِمَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ وَلَوْ
كَانُوْا مَعَ الصَّمَمِ لَا يَعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ .

৪৩. وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ط اَفَاَنْتَ تَهْدِي
الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ شَبَّهَهُمْ
بِهِمْ فِيْ عَدَمِ الْاِهْتِدَاءِ بَلْ هُمْ اَعْظَمُ فَاِنَّهَا
لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ
الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ .

৪৪. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ
النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ .

৪৫. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ اَيْ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوْا
فِي الدُّنْيَا اَوِ الْقُبُوْرِ اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ
لِهَوْلِ مَا رَأَوْا وَجُمْلَةُ التَّشْبِيْهِ حَالٌ مِنَ
الضَّمِيْرِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ط يَعْرِفُ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِذَا بُعِثُوْا ثُمَّ يَنْقَطِعُ
التَّعَارُفُ لِشِدَّةِ الْاَهْوَالِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ
مُقَدَّرَةٌ اَوْ مُتَعَلَّقُ الظَّرْفِ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ .

অনুবাদ :

৪১. আর তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে তাদেরকে বলে দাও, আমার কাজ আমার আর তোমাদের কাজ তোমাদের। অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তার নিজ আমলের প্রতিফল। আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়িত্বমুক্ত আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি দায়িত্বমুক্ত। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা এ বিধানটি مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে গেছে।

৪২. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার দিকে কান পেতে রাখে। তুমি বধিরদেরকে শুনাবে? আর এ বধিরতাসহ তারা কিছু না বুঝলেও? এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা না করলেও? তাদের নিকট যা পাঠ করা হয় তা হতে যেহেতু তারা কোনোরূপ উপকার লাভ করে না সেহেতু তাদেরকে বধিরের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।

৪৩. তাদের কেউ কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তুমি অন্ধদের পথ দেখাবে তারা না দেখলেও? তারা যেহেতু সৎপথ লাভ করে না সেহেতু অন্ধের সাথে তাদের উপমা প্রদান করা হয়েছে। তারা আসলে অন্ধ হতেও অধিকতর মন্দ। কারণ তাদের দৃষ্টি লোপ পায়নি; বরং বক্ষস্থিত হৃদয় তাদের অন্ধ।

৪৪. আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি কোনো জুলুম করেন না বস্তুত মানুষ নিজদের প্রতি জুলুম করে থাকে।

৪৫. এবং যেদিন তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন সেদিনের ভয়াবহতা দর্শন করত মনে হবে যে, পৃথিবীতে বা কবরে তাদের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল। كَاَنْ এটা এ স্থানে كَاَنَّهُمْ [যেন তারা] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। جُمْلَةُ التَّشْبِيْهِ অর্থাৎ উপমাসূচক বাক্যটি يَحْشُرُهُمْ -এর সর্বনাম হতে حَالٌ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পরস্পরকে তারা চিনবে। অর্থাৎ যখন তারা পুনরুত্থিত হবে তখন তারা একে অপরকে চিনবে কিন্তু পরে সেই দিনের ভীষণ ভয়াবহতার দরুন এ পরিচিতি ছিন্ন হয়ে যাবে। يَتَعَارَفُوْنَ এটা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অথবা ظَرْف বা কালবাচক শব্দ يَوْمَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর তারা সৎপথপ্রাপ্ত নয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٦. وَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ نُونِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَا الزَّائِدَةِ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِي حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ أَيْ فَذَاكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قَبْلَ تَعْذِيبِهِمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ مُطَّلِعٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ مِنْ تَكْذِيبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ فَيُعَذِّبُهُمْ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

৪৬. আমি তাদেরকে তোমার জীবদ্দশায়ই আজাব প্রদানের যে ভীতি প্রদর্শন করেছি তার কিছু যদি إِمَّا তাতে অতিরিক্ত مَا -এর م এ শর্তবাচক শব্দ إِنْ -এর ن -এর إِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে। তোমাকে দেখিয়ে দেই তবে তা হলো অথবা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের পূর্বেই তোমার কাল যদি পূর্ণ করে দেই তবে তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট; এবং তারা মিথ্যারোপ ও সত্য প্রত্যাখ্যান যা কিছু করে আল্লাহ তার সাক্ষী। তিনি তৎবিষয়ে অবহিত। সুতরাং তিনি তাদেরকে অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। এ স্থানে جَوَابُ شَرْط উহ্য। তা হলো فَذٰلِكَ অর্থাৎ ‘তবে তো হলোই।’

٤٧. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ رَسُولٌ ط فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ إِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوهُ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ فَيُعَذَّبُوا وَيُنَجَّى الرَّسُولُ وَمَنْ صَدَّقَهُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بِتَعْذِيبِهِمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ فَكَذٰلِكَ يُفْعَلُ بِهٰؤُلَاءِ.

৪৭. জাতিসমূহের প্রত্যেক জাতির জন্য আছে রাসূল আর যখনই তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করেছে অথচ ন্যায়ের সাথে ইনসাফের সাথে তাদের মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে। অনন্তর তারা আজাবের মধ্যে নিপতিত হয়েছে আর রাসূল এবং তাঁকে যারা সত্য বলে বিশ্বাস করেছে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে আর বিনা অপরাধে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করত তাদের প্রতি জুলুম করা হয়নি। তাদের সাথেও তদ্রূপ আচরণ করা হবে।

٤٨. وَيَقُولُونَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ فِيهِ.

৪৮. আর তারা বলে আজাবের এ প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে? যদি তোমরা তাতে সত্যবাদী হয়ে থাক বল।

٤٩. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا أَدْفَعُهُ وَلَا نَفْعًا أَجْلِبُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ط أَنْ يُقْدِرَنِي عَلَيْهِ فَكَيْفَ أَمْلِكُ لَكُمْ حُلُولَ الْعَذَابِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ط مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ لِهَلَاكِهِمْ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ يَتَأَخَّرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهِ.

৪৯. বল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে বিষয়ে ক্ষমতাবান করতে ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত নিজের ক্ষতি প্রতিহত করার ও মঙ্গল অর্জন করার উপরও আমার কোনো অধিকার নেই; সুতরাং তোমাদের বিরুদ্ধে আজাব নিয়ে আসার ক্ষমতা আমার কেমনে হবে? প্রত্যেক জাতিরই একটা নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের একটা নির্ধারিত মুদ্দত রয়েছে, যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা তা হতে মুহূর্তকালও পিছনে অর্থাৎ বিলম্ব করতে এবং অগ্রে অর্থাৎ তা হতে ত্বরা করতে পারবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٠. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُهٗ اَىِ اللّٰهِ بَيَاتًا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا اَىَّ شَىْءٍ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اَىِ الْعَذَابِ الْمُجْرِمُوْنَ الْمُشْرِكُوْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ وَجُمْلَةُ الْاِسْتِفْهَامِ جَوَابُ الشَّرْطِ كَقَوْلِكَ اِنْ اَتَيْتُكَ مَاذَا تُعْطِيْنِىْ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّهْوِيْلُ اَىْ مَا اَعْظَمَ مَا اسْتَعْجَلُوْهُ.

৫০. বল, তোমরা কি দেখ, অর্থাৎ তোমরা আমাকে বল, যদি তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে বা দিনে এসে পড়ে তবে অপরাধীরা মুশরিকরা তার এ আজাবের কি বিষয় তরান্বিত করতে চায়! بَيَاتًا অর্থ রাত্রে। مَاذَا প্রশ্নবোধক এ বাক্যটি এ স্থানে جَوَابُ شَرْط রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আরবিতে ব্যবহার রয়েছে যে, اِنْ اَتَيْتُكَ مَاذَا تُعْطِيْنِىْ অর্থাৎ তোমার নিকট যদি আসি তবে তুমি আমাকে কি দেবে? এ উদাহরণটিতে مَاذَا تُعْطِيْنِىْ এ প্রশ্নবোধক বাক্যটি جَوَابُ شَرْط রূপে ব্যবহার হয়েছে। এ স্থানে تَهْوِيْل অর্থাৎ বিষয়টির ভয়াবহতা বুঝাতে এ ধরনের ভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ভয়ঙ্কর জিনিস তারা তরান্বিত করতে চাচ্ছে? وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ এস্থানে اَلْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যের ব্যবহার হয়েছে।

٥١. اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ حَلَّ بِكُمْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ط اَىِ اللّٰهِ اَوِ الْعَذَابِ عِنْدَ نُزُوْلِهٖ وَالْهَمْزَةُ لِاِنْكَارِ التَّاخِيْرِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ وَيُقَالُ لَكُمْ اٰلْئٰنَ تُؤْمِنُوْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ اِسْتِهْزَاءً.

৫১. তা ঘটবার পর অর্থাৎ তোমাদের উপর তা আপতিত হওয়ার পর তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বা আজাব সম্পর্কে বিশ্বাস করবে? কিন্তু তোমাদের হতে তখন তা গ্রহণ করা হবে না। তোমাদেরকে বলা হবে এখন তোমরা বিশ্বাস আনয়ন করছ? অথচ তোমরা তো উপহাসবশত তাই তরান্বিত করতে চেয়েছিলে? اَثُمَّ এ স্থানে اِنْكَار অর্থাৎ ঈমান আনয়নে বিলম্ব করাকে অস্বীকার করার অর্থে প্রশ্নবোধক হামযার ব্যবহার করা হয়েছে।

٥٢. ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ج اَىِ الَّذِىْ تَخْلُدُوْنَ فِيْهِ هَلْ مَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءً بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ.

৫২. অতঃপর সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে বলা হবে, স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। অর্থাৎ তাতেই তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। তোমরা যা করতে তার প্রতিফল ভিন্ন আর কিছুর প্রতিফল তোমাদের দেওয়া হচ্ছে না। هَلْ এ প্রশ্নবোধক শব্দটি এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٣. وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ يَسْتَخْبِرُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ط اَىْ مَا وَعَدْتَنَا بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ وَالْبَعْثِ قُلْ اِىْ نَعَمْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ط وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ الْعَذَابَ.

৫৩. তারা তোমাদের নিকট জানতে চায় তা কি অর্থাৎ পুনরুত্থান ও আজাব সম্পর্কে আমাদের সাথে যে প্রতিশ্রুতি দাও তা কি সত্য? বল, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের শপথ, তা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। অর্থাৎ এ আজাব অতিক্রম করতে পারবে না। يَسْتَنْبِئُوْنَكَ অর্থ তারা তোমার নিকট জানতে চায়। اِىْ অর্থ হ্যাঁ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ : আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ

قَوْلُهُ بَلْ هُمْ اَعْظَمُ : কাফেরদেরকে অন্ধদের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। অন্ধ হলো مُشَبَّهٌ بِهٖ আর কাফের হলো مُشَبَّهٌ আর عَدَمُ الْبَصَرِ -এর তুলনায় عَدَمُ الْبَصِيْرِ -এর মধ্যে অধিক কঠোরতা হয়ে থাকে। যেহেতু কাফেররা ভ্রষ্টতা ও গোমরাহিতে অন্ধদের চেয়েও অগ্রগামী।

قَوْلُهُ كَاَنَّهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَاَنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ হয়েছে এবং তার اِسْمُ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ التَّشْبِيْهِ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ : কেননা يَوْمٌ -এর সিফত স্বীকৃতি দেওয়ার সুরতে উহ্য ইবারত হবে- حَالَ كَوْنِهِمْ مُشْبِهِيْنَ بِمَنْ لَمْ يَلْبَثْ اِلَّا سَاعَةً اِلخ

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো এই যে, يَتَعَارَفُوْنَ টা يَحْشُرُهُمْ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর حَالٌ এবং ذُو الْحَالِ -এর জমানা এক হয়ে থাকে। অথচ حَشْرٌ প্রথমে হবে এবং تَعَارُفٌ তার পরে হবে। কাজেই উভয়টির জমানা এক হলো না।

উত্তর. এটা হলো حَالٌ مُقَدَّرَةٌ যে, কাফেরদেরকে একত্রিত করা হবে। অবস্থা এরূপ যে, তাদের জন্য تَعَارُفٌ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِمْ مُقَدَّرِيْنَ التَّعَارُفَ لَا اَنَّهُمْ مُتَعَارِفُوْنَ بِالْفِعْلِ

قَوْلُهُ اَوْ مُتَعَلِّقُ الظَّرْفِ : আর তা হলো উহ্য يَوْمٌ; উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, يَتَعَارَفُوْنَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

قَوْلُهُ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ اَىْ فَذٰلِكَ : এ বৃদ্ধি করার দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো اِمَّا نُرِيَنَّكَ এবং اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ শর্ত হলো দুটি আর جَزَاءٌ হলো একটি। আর তাহলো فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ অথচ اِمَّا نُرِيَنَّكَ -এর উপর فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ -এর تَرَتُّبٌ অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বৈধ নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ উভয় شَرْطٌ -এর جَزَاءٌ নয়; বরং اِمَّا نُرِيَنَّكَ -এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) فَذَاكَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন. فَذَاكَ হলো جَزَاءٌ অথচ جَزَاءٌ মুফরাদ হয় না।

উত্তর. فَذَاكَ মূলত ছিল فَذَاكَ حَقٌّ

قَوْلُهُ وَضَعُ الظَّاهِرِ مَوْضَعَ الْمُضْمَرِ : প্রশ্ন. يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ বলেছেন, يَسْتَعْجِلُوْنَ مِنْهُ বলেননি, অথচ এটা তার মোকাবিলায় اَخْصَرُ

উত্তর. اَخْصَرُ -এর মোকাবিলায় مُخْتَصَرٌ تَعْبِيْرٌ কে গ্রহণ করার কারণ হলো এই যে, مُخْتَصَرٌ -এর মধ্যে تَرْكٌ -এর কারণটা اِسْتِعْجَالٌ -এর উপর বুঝায় আর তা হলো جُرْمٌ এটা ছাড়াও তার صِفَتْ قَبِيْحٌ -এর উপরও বুঝায়।

قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ الْاِسْتِفْهَامِ : এটা جَوَابُ شَرْطٌ আর اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُهٗ হলো شَرْطٌ আর فَاءٌ مَاذَا يَسْتَعْجِلُ উহ্য -এর সাথে جَوَابُ شَرْطٌ কেননা جُمْلَةُ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ টা فَاءٌ ব্যতীত جَزَاءٌ হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِنْ اَتَيْتُكَ مَاذَا تُعْطِيْنِىْ : এ উপমা اِسْتِبْعَادٌ -কে দূর করার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ এটা বর্ণনা করার জন্য যে, আরবি ভাষায় جُمْلَةُ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ টা فَاءٌ ব্যতীতও جَزَاءٌ হতে পারে কাজেই কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّحْوِيْلُ : অর্থাৎ اِسْتِفْهَامٌ দ্বারা اِسْتِعْلَامٌ উদ্দেশ্য নয়; বরং ভয়াবহতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ لَكُمْ : এই ইবারতকে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য مُقَدَّرٌ মানা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ -এর আতফ آلْئٰنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ -এর উপর হয়েছে অথচ مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ হলো جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٌ আর جُمْلَةُ فِعْلِيَّةٌ হলো مَعْطُوْفٌ

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর পূর্বে فِعْلٌ উহ্য রয়েছে যাকে মুফাসসির (র.) وَيُقَالُ لَكُمْ বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ تُؤْمِنُوْنَ : প্রশ্ন. آلْئٰنَ টা يُقَالُ لَكُمْ -এর مَقُوْلَهٗ হয়েছে। অথচ مَقُوْلَةٌ জুমলা হয়ে থাকে। আর آلْئٰنَ হলো مُفْرَدٌ। জবাবের সারকথা হলো, ইবারত উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- آلْئٰنَ يُؤْمِنُوْنَ যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকে না।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ : এটি এ পর্যায়ের শেষকথা, যখন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, রাসূলের রেসালাত এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতার যাবতীয় দলিল প্রমাণ পেশ করা হয় তখনও দুরাত্মা কাফের মুশরিকরা [হে রাসূল!] আপনার সত্যতাকে অস্বীকার করে, কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না।

আপনার রেসালাতকে অমান্য করে এবং আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তখন আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমার আমল আমার জন্যে, তোমাদের আমল তোমাদের জন্য প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের কৃত কর্মের জন্য দায়ী থাকতে হবে। আর আমার আমলের জন্য তোমরা দায়ী হবে না, আর তোমাদের আমলের জন্য আমি দায়ী হবো না। আমার কর্মের বিনিময় আমি পাব, আর তোমাদের কর্মের বদলা দেওয়া হবে। আমি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট। তাই তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হবো না। আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলি তা তোমাদের কল্যাণের জন্যই বলি।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে জিনিস দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তার এবং আমার অবস্থার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছে, আমি ঐ পাহাড়ের অপর দিকে শত্রু বাহিনী দেখে এসেছি, যারা রাতের শেষ প্রহরে তোমাদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তোমাদেরকে হত্যা করবে। আমি তোমাদেরকে এই মহাবিপদ সম্পর্কে অবহিত করছি। তোমরা অতি সত্তর এখান থেকে বের হয়ে যাও, অনতিবিলম্বে পলায়ন কর, এই ব্যক্তির কথা কিছু লোক বিশ্বাস করল। রাতের অবকাশের সদ্ব্যবহার করে সে স্থান থেকে পলায়ন করল এবং দুশমনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো। কিন্তু কিছু লোক ঐ ব্যক্তিকে মিথ্যাজ্ঞান করে। সকাল পর্যন্ত সে স্থানেই রয়ে গেল। দুশমন অতি প্রত্যূষে তাদের উপর আক্রমণ করে সকলকে ধ্বংস করল। এ অবস্থায়ই সে সব লোকের যারা আমি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছি তা মেনে চলেছে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অথবা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে আমার প্রতি ঈমান আনেনি। এ হাদীস বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, মানুষের মধ্যে দু-দল রয়েছে, একদল আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনে আর একদল ঈমান আনে না।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যারা ঈমান আনেনি তারাও দু-ভাগে বিভক্ত। তাদের একদল হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চরম শত্রু, ইসলামের ঘোর বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি ইমান আনতে রাজি নয়। আর একদল এমন নয়। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রথম দলের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আপনার কথা কান পেতে শ্রবণ করে, যখন আপনি পবিত্র কুরআন পাঠ করেন, শরিয়তের মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য বর্ণনা করেন তখন দেখা যায় প্রকাশ্যে তারা কান পেতে শ্রবণ করে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আপনার দিকে তাকিয়ে দেখে কিন্তু তাদের এ দেখা বা শোনার সঙ্গে তাদের মনের কোনো মিল থাকে না। অতএব তাদের দেখা বা না দেখা, শুনা বা না শুনা একই সমান। এ দু অবস্থায় মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই। এজন্যে মাওলান রুমী (র.) বলেছেন,

این سخن را از گوش دل باید شنود
گوش گل اینجا ندارد ہیچ سود

এ কথা [দীন ইসলামের কথা] শ্রবণ করতে হবে মনের কর্ণে, চর্মের কর্ণ এখানে কোনো উপকারে আসে না। তারা আসলে অন্ধ এবং বধিরের ন্যায়, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধ, আর শ্রবণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা বধির।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কাফেররা আপনার প্রতি ঈমান আনে না এ জন্য আপনি মর্মাহতো হবেন না। কেননা তারা মনের দিক থেকে অন্ধ ও বধির। আর হে রাসূল ﷺ ! আপনি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবেন না। অতএব, তাদের ঈমান না আনায় দুঃখিত হবেন না, কেননা আপনি অন্ধ বধিরকে হেদায়েত করতে পারবেন না।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা : ১১, পৃ. ৬০]

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, কোনো মানুষের অন্তরে যখন অন্য মানুষের জন্য চরম শত্রুতা থাকে তখন সে তার শত্রুর দোষ অনুসন্ধানে তৎপর থাকে। ঐ ব্যক্তির গুণ সে দেখেও দেখে না। তার ভালো কথা শুনেও শুনে না। কাফেরদের শত্রুতা এমন চরম পর্যায়ে পৌছেছিল বলেই তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

–[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৭, পৃ. ১০০-১০১]

তাদের মধ্যে যারা আপনার দিকে তাকিয়ে দেখে তারা সত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ এবং নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আপনার মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু যেহেতু তাদের মন অন্ধ, তাই তাদের চর্ম চক্ষের দেখা তাদের জন্য উপকারী হয় না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ হে রাসূল! তবে কি আপনি অন্ধদেরকে পথ দেখাবেন যদিও তারা কিছুই বুঝে না? যেহেতু তাদের মন ঈমান আনয়নে প্রস্তুত নয়, সত্য সন্ধানে আগ্রহী নয়, তাই তাদেরকে অন্ধ বলা হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ -এর অসাধারণ গুণাবলি, তাঁর ফজিলত ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর বিস্ময়কর মোজেজা তথা অলৌকিক ক্ষমতা তারা স্বচক্ষে দেখে কিন্তু মন যেহেতু বিদ্রোহী তাই তারা ঈমান আনে না। তারা যেন অন্ধ বধির।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক লেখক হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর গুণাবলি প্রকাশ করে বহু গ্রন্থ রচনা করেছে। ইসলামের প্রশংসায়ও তারা ক্ষেত্রবিশেষে পঞ্চমুখ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের ক্ষতি সাধনে তারা তৎপর এবং ইসলামের মহান শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

–[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৪৪২]

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا : অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করেন না। কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করে। মানুষ মাত্রকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যার মাধ্যমে সে ভালো এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন বিবেক-বুদ্ধিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করে তখন সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে না, স্বভাব ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ করতে রাজি হয় না, ইসলামের মহান শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে।

قَوْلُهُ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ : অর্থাৎ কিয়ামতে যখন মৃতদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি সামনে চলে আসলে পর এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْئٰنَ : অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আজাব পতিত হয়ে যাবে? তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে বলা হবে– آٰلْئٰنَ কি এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে? যেমন, জলমগ্ন হবার সময়ে ফেরাউন যখন বলল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِيْلَ অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোনো উপাস্য নেই তাকে ছাড়া যার উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা। উত্তরে বলা হয়েছিল– آٰلْئٰنَ অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে? বস্তুত তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আজাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আজাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওমের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছিল, তা এ মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল, কারণ তারা দূরে থেকে আজাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে- কেটে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আজাব সরে যায়। যদি আজাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল করা হতো না।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٤. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ كَفَرَتْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنَ الْاَمْوَالِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ط مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ عَلٰى تَرْكِ الْاِيْمَانِ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ج اَىْ اَخْفَاهَا رُؤَسَاؤُهُمْ عَنِ الضُّعَفَاءِ الَّذِيْنَ اَضَلُّوْهُمْ مَخَافَةَ التَّعْيِيْرِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْخَلَائِقِ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا .

৫৪. পৃথিবীতে যা কিছু আছে যত সম্পদ আছে সবকিছু যদি প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারীর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীর হতো তবে তা কিয়ামতের দিন আজাব হতে মুক্তির বিনিময়ে দিয়ে দিত এবং যখন তারা আজাব প্রত্যক্ষ করবে তখন ঈমান আনয়ন পরিত্যাগ করার অনুতাপ গোপন রাখবে। অর্থাৎ সর্দারগণ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে সেই দুর্বল শ্রেণির ব্যক্তিরা লজ্জা দেবে এ ভয়ে তারা [সর্দাররা] তাদের [দুর্বলদের] নিকট তা গোপন করে রাখবে। তাদের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে ন্যায়ের সাথে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেওয়া হবে। আর তারা বিন্দুমাত্রও অত্যাচারি হবে না।

٥٥. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ حَقٌّ ثَابِتٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ اَىِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

৫৫. শুনে রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তা'আলারই সাবধান পুনরুত্থান ও প্রতিফল সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য সঠিক। কিন্তু তাদের মানুষের অধিকাংশ জনই তা অবহিত নয়।

٥٦. هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ .

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান পরকালে তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যাবলির প্রতিদান দেবেন।

٥٧. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ مَا لَكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَشِفَاءٌ دَوَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ مِنَ الْعَقَائِدِ الْفَاسِدَةِ وَالشُّكُوْكِ وَهُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بِهٖ .

৫৭. হে লোক সকল! মক্কাবাসীগণ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের প্রতি এসেছে উপদেশ, একটি কিতাব, অর্থাৎ আল কুরআন যাতে তোমাদের লাভ ও ক্ষতির সবকিছুর বিবরণ রয়েছে এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ মন্দ আকিদা ও সন্দেহের যে ব্যাধি আছে তার প্রতিষেধক ঔষধ মু'মিনদের জন্য গোমরাহি হতে হেদায়েত ও তারা মাধ্যমে রহমত।

٥٨. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ وَبِرَحْمَتِهٖ الْقُرْاٰنِ فَبِذٰلِكَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ .

৫৮. বল তা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অর্থাৎ ইসলাম ও দয়ায় অর্থাৎ আল কুরআনের ফলে, সুতরাং তাতে অর্থাৎ এ অনুগ্রহ ও দয়ায় তারা আনন্দিত হোক। পার্থিব যা তারা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা এটা শ্রেয়। يَجْمَعُوْنَ তা ى [তৃতীয় পুরুষ] ও ت [দ্বিতীয় পুরুষরূপে] সহ পঠিত রয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٥٩. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ مَآ اَنْزَلَ خَلَقَ اللّٰهُ
لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا
وَّحَلٰلًا ط كَالْبَحِيْرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْمَيْتَةِ
قُلْ آللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ مَا ذٰلِكَ بِالتَّحْرِيْمِ
وَالتَّحْلِيْلِ لَا اَمْ بَلْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ
تَكْذِبُوْنَ بِنِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ .

৫৯. বল, তোমরা কি দেখ অর্থাৎ তোমরা আমাকে বল আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যে রিজিক নাজিল করেছেন সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তোমরা যে তার কিছু অবৈধ ও কিছু বৈধ করে নিয়েছ যেমন– বহীরা, সায়বা, মৃত বস্তু ইত্যাদি। আল্লাহ কি তোমাদেরকে এ বৈধ ও অবৈধকরণের অনুমতি দিয়েছেন? না, তিনি এরূপ দেননি বরং তোমরা তার প্রতি তার আরোপ করত আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ। اَمْ এটা এ স্থানে بَلْ বরং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। تَفْتَرُوْنَ মিথ্যা আরোপ করছ।

٦٠. وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ اَىْ اَىَّ شَىْءٍ ظَنُّهُمْ بِهٖ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ط اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُ لَا يُعَاقِبُهُمْ لَا
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
بِاِمْهَالِهِمْ وَالْاِنْعَامِ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ .

৬০. যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে তাদের কি ধারণা? এ বিষয়ে তাদের ধারণা কিরূপ? তারা কি মনে করে যে, তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করা হবে না? না, এরূপ ধারণা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অবকাশ প্রদান করত ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করত দয়াপরায়ণ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

তারকীব ও তাহকীক

اِنْ আর شَرْطِيَّةٌ اِمْتِنَاعِيَّةٌ হলো لَوْ এখানে : قَوْلُهُ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ
হলো اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ যা مَا আর হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ এর- اِنْ মিলে সিফত মওসূফ এটা نَفْسٌ ظَلَمَتْ আর حَرْفٌ مُشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ
مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। اَنَّ তার অধীনস্থসহ উহ্য ثَبَتَ ফে'লের فَاعِلٌ হয়েছে। مَا مَوْصُوْلَةٌ তার صِلَةٌ-এর সাথে মিলে
জুমলা হয়ে اَنَّ-এর اِسْمٌ আর لَافْتَدَتْ بِهٖ হলো جَوَابُ شَرْطٍ অর্থাৎ لَوْ ثَبَتَ ذٰلِكَ لَافْتَدَتْ بِهٖ

قَوْلُهُ اَىْ اَخْفَاهَا : اَسَرُّوْا-এর তাফসীর اَخْفَاهَا দ্বারা করেছেন। অর্থ বর্ণনা করার জন্য যে اَسَرُّوْا টা اَضْدَادٌ-এর অন্তর্ভুক্ত, কেননা এর অর্থ اَظْهَرَ ও আসে এবং اَخْفَا অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় অর্থটি অধিক প্রসিদ্ধ। যদিও উভয়টিই সম্ভাবনা থাকে।

قَوْلُهُ اَىُّ شَىْءٍ ظَنُّهُمْ بِهٖ : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ-এর মধ্যে مَا টা اَىُّ شَىْءٍ অর্থে হয়েছে যা মুবতাদা হয়েছে। আর ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ তার খবর হয়েছে। আর يَوْمٌ টা ظَنُّ-এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ ظَنٌّ وَاقِعٌ بِهٖ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ الخ : অর্থাৎ পাপিষ্ঠরা যখন কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখবে তখন তাদের অবস্থা এমন হবে যে সম্ভব হলে সারা বিশ্বের সমস্ত সম্পদ/মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে তারা আজাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আজাব থেকে রক্ষা পাবে না।

বিগত আয়াতসমূহে কাফেরদের দুরবস্থা এবং আখেরাতে তাদের উপর নানরকম আজাবের বর্ণনা ছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথম দুটিতে তাদের সে দুরবস্থা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বেরিয়ে আসার পন্থা এবং আখেরাতে আজাব থেকে মুক্তি লাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব কুরআন ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর আনুগত্য।

মানব ও মানবতার জন্য এ দুটি বিষয় এমন সুদৃঢ় যে, আসমান ও জমিনের সমস্ত নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসূলের সুন্নতের আনুবর্তিতা মানুষকে সত্যিকার অর্থেই মানুষ বানিয়ে দেয় এবং যখন মানুষ সত্যিকার অর্থেই মানুষ হয়ে যায় তখন সমগ্র বিশ্ব সুন্দর হয়ে উঠে এবং এ পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হতে পারে।

প্রথম আয়াতে কুরআনে কারীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে–

১. مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ -এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন বিষয় প্রার্থনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতির পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ 'মাওয়েযায়ে হাসানাহ' -এর অত্যন্ত সালংকার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি প্রদর্শন, ছওয়াবের সাথে সাথে আজাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রণ আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কুরআনে কারীমের অন্যান্য বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের কায়া পাল্টে দিতে অদ্বিতীয়।

مَوْعِظَةٌ -এর সাথে مِنْ رَّبِّكُمْ বলে কুরআনী ওয়াজের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়াজ নিজেদেরই মতো কোনো দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোনো দুর্বলতা কিংবা আপত্তি-ওজরের আশঙ্কা নেই।

২. কুরআনে কামীদের দ্বিতীয় গুণ شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। شِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া। আর صُدُوْر হলো صَدْر -এর বহুবচন, যার অর্থ– বুক। আর এর মর্মার্থ হলো অন্তর।

সারকথা হচ্ছে যে, কুরআনি কারীম অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন যে, কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি বিশেষত অন্তরের রোগের শেফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়। –[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু অন্যান্য মনীষী বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারীতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কোরো সাধ্যের ব্যাপারে নয়, সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কুরআনে কারীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্য উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক লোক রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী ﷺ বললেন, কুরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– شِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ অর্থাৎ কুরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে]

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (র.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে জানাল যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কুরআন পড়তে থাক।

উম্মতের ওলামাগণ কিছু রেওয়ায়েত, কিছু উদ্ধৃতি এবং কিছু নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআনের আয়াতসমূহের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা পৃথক গ্রন্থে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ইমাম গাযালী (র.) রচিত গ্রন্থ 'খাওয়াসে কুরআনী' এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধ একখানি গ্রন্থ। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) গ্রন্থটি সংক্ষেপ করে 'আমালে কুরআনী' নামে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া অভিজ্ঞাতার আলোকে যা দেখা যায়, তাতে এ বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে, কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্য নিরাময় হিসেবে প্রমাণিত হয়ে থাকে। অবশ্য একথা সত্য যে, আত্মার রোগ-ব্যাধি দূর করাই কুরআন নাজিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তবে আনুষঙ্গিকভাবে এটি দৈহিক রোগ-ব্যাধিরও উত্তম চিকিৎসা।

এতে সেসব লোকের নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রষ্টতাও স্পষ্ট হয়ে গেছে, যারা কুরআন কারীমকে শুধু দৈহিক রোগের চিকিৎসা কিংবা পার্থিব প্রয়োজনের ভিত্তিতেই পড়ে বা পড়ায়। না এরা আত্মিক রোগব্যাধির প্রতি লক্ষ্য করে, না কুরআনের হেদায়েতের উপর আমল করার প্রতি মনোনিবেশ করে। এমনি লোকদের ব্যাপারে আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

ترا حاصل زیس اش جزیس نیست * که از هم خواندنش اسان بمیری

অর্থাৎ তোমরা কুরআনের সূরা ইয়াসীনের দ্বারা এতটুকুই উপকৃত হয়েছ যে, এর পাঠে মৃত্যুযন্ত্রণা সহজ হয়। অথচ এ সূরার মর্ম তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্যের প্রতি যদি লক্ষ্য করতে, তাহলে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি উপকারিতা ও বরকত হাসিল করতে পারতে।

কোনো কোনো গবেষক তাফসীরকার বলেছেন যে, কুরআনের প্রথম গুণ مَوْعِظَةٌ -এর সম্পর্ক হলো মানুষের বাহ্যিক আমলের সাথে– যাকে শরিয়ত বলা হয়। কুরআন কারীম সে সমস্ত আমর সংশোধনের সর্বোত্তম উপায়। আর شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ -এর সম্পর্ক হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে, যাকে তরিকত ও তাসাউফ নামে অভিহিত করা হয়।

৩. এ আয়াতে কুরআনের তৃতীয় গুণ هُدًى ৪. আর চতুর্থ رَحْمَةٌ বলা হয়েছে। هُدًى অর্থ– হেদায়াত। অর্থাৎ পথ-প্রদর্শন। কুরআন কারীম মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানায়। সে মানুষকে বলে যে, সমগ্র বিশ্ব এবং স্বয়ং মানবসত্তার মাঝে আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে মহান নির্দেশসমূহ দিয়ে রেখেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে, যাতে তোমরা সেসব বিষয়ের স্রষ্টা ও মালিককে চিনতে পার।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধনসম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনোটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, [সবই] অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়ত সততাই তার পতনাশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধনসম্পদ ও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দুটি বিষয়কে আনন্দ উল্লাসের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো فَضْل [ফজল], অপরটি رَحْمَةٌ [রহমত]। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার 'ফজল' এর মর্ম হলো কুরআন, আর রহমতের মর্ম হলো এই যে, তোমাদেরকে তিনি কুরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেছেন। –[রূহুল মা'আনী, ইবনে মারদুবিয়া থেকে]

এ বিষয়টি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তাফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফজল' অর্থ কুরআন, আর রহমত হলো ইসলাম। বস্তুত এর মর্মার্থও তাই, যা উপরে উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্যও দিয়েছেন। কারণ ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ফজল -এর মর্ম হলো কুরআন, আর রহমত হলো নবী করীম ﷺ। কুরআন কারীমের আয়াত– وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -এর মাঝেও তারই সমর্থন পাওয়া যায়। বস্তুত এর সারমর্মও প্রথম ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন কিছু নয়। কারণ কুরআন কিংবা ইসলামের উপর আমল করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর আনুগত্যেরই বিভিন্ন শিরোনাম।

এ আয়াতে সুপ্রসিদ্ধ কেরাত [পাঠ] অনুযায়ী فَلْيَفْرَحُوْا গায়েবের সীমা বা নাম পুরুষ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এর প্রকৃত লক্ষ্য হলো তখনকার উপস্থিত লোকেরা, যার চাহিদা মোতাবেক এখানে মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করাই সমীচীন ছিল। যেমন, কোনো কোনো কেরাত বা পাঠে তাও রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ পাঠে নামপুরুষই ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ কিংবা ইসলামের ব্যাপক রহমত শুধু তখনকার উপস্থিত লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦١. وَمَا تَكُونُ يَا مُحَمَّدُ فِي شَأْنٍ أَمْرٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ أَيْ مِنَ الشَّأْنِ أَوِ اللّٰهِ مِنْ قُرْاٰنٍ أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ وَلَا تَعْمَلُونَ خَاطَبَهُ وَأُمَّتَهُ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا رُقَبَاءَ إِذْ تُفِيضُونَ تَأْخُذُونَ فِيهِ ط أَيِ الْعَمَلِ وَمَا يَعْزُبُ يَغِيبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ وَزْنِ ذَرَّةٍ أَصْغَرِ نَمْلَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُبِينٍ بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ.

৬১. হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি যে অবস্থায়ই বিষয়েই থাক এবং তুমি তৎসম্পর্কে উক্ত বিষয়ে যা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমার উপর অবতীর্ণ কুরআন হতে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোনো কর্ম কর না কেন لَا تَعْمَلُونَ এ স্থানে রাসূল ﷺ ও তাঁর উম্মত সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আমি তোমাদের সাক্ষী পরিদর্শক যখন তোমরা তাতে ঐ কাজে প্রবৃত্ত হও। إِذْ تُفِيضُونَ যখন তোমরা প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও ছোট্ট পিপীলিকা সমান ওজনের বিষয়ও তোমার প্রতিপালক হতে দূর নয় তার অগোচরে নয়। আর তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর এমন কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে নেই।

٦٢. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فِي الْاٰخِرَةِ.

৬২. জেনে রাখ! পরকালে আল্লাহ তা'আলার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

٦٣. هُمُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللّٰهَ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

৬৩. যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং আদেশ ও নিষেধসমূহ পালন করত আল্লাহকে ভয় করে।

٦٤. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فُسِّرَتْ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِالرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرٰى لَهُ وَفِي الْاٰخِرَةِ ط بِالْجَنَّةِ وَالثَّوَابِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط لَا خُلْفَ لِمَوَاعِيدِهِ ذٰلِكَ الْمَذْكُورُ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

৬৪. তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে। একটি হাদীসে তার ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সুসংবাদ হলো মু'মিনগণ যে সৎ স্বপ্ন দেখে বা তাদের সম্পর্কে যা দেখানো হয় তা। হাকেম এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। আর পরকালের জীবনেও হলো জান্নাত ও পুণ্যলাভের সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলার কথার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ তাঁর প্রতিশ্রুতির কোনো বরখেলাফ হয় না। তাই অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়টিই মহাসাফল্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٥. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ لَكَ لَسْتَ مُرْسَلًا وَغَيْرِهِ إِنَّ اِسْتِئْنَافُ الْعِزَّةَ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ط هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ . بِالْفِعْلِ فَيُجَازِيْهِمْ وَيَنْصُرُكَ .

৬৫. তাদের তুমি প্রেরিত রাসূল নও ইত্যাদি ধরনের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সকল শক্তি ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার; اِنَّ তা এ স্থানে مُسْتَانِفَةٌ অর্থাৎ নববাক্যমূলক। তিনি সকল কথা শুনেন ও সকল কাজ সম্পর্কে খুবই অবহিতি রাখেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে পরিণামফল ভোগ করাবেন আর তোমাকে সাহায্য করবেন।

٦٦. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط عَبِيْدًا وَمِلْكًا وَخَلْقًا وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ اَصْنَامًا شُرَكَآءَ ط لَهُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ اِنْ مَا يَتَّبِعُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ اِلَّا الظَّنَّ اَىْ ظَنَّهُمْ اَنَّهَا اٰلِهَةٌ تَشْفَعُ لَهُمْ وَاِنْ مَا هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ يكذبون فى ذلك .

৬৬. জেনে রাখ! যারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রয়েছে সকলেরই মালিকানা, দাসত্ব, সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার! যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে অর্থাৎ প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ তা'আলার শরিক হিসেবে ডাকে উপাসনা করে অথচ তিনি তা হতে অনেক উর্ধ্বে, তারা কিসের অনুসরণ করে? এ বিষয়ে তারা অনুমান ভিন্ন অন্য কিছুর অনুসরণ করে না। অর্থাৎ এগুলো উপাস্য ও তারা তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে এ ধারণা ভিন্ন কিছুই তাদের নেই। আর তারা এ বিষয়ে কেবল মিথ্যাই বলে। اِنْ هُمْ . اِنْ এ স্থানে اِنْ টি না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَخْرُصُوْنَ তারা মিথ্যা ধারণা করে।

٦٧. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِسْنَادُ الْاِبْصَارِ اِلَيْهِ مَجَازٌ لِاَنَّهُ مُبْصَرٌ فِيْهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ وَاتِّعَاظٍ .

৬৭. তিনিই রাত্রি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পার এবং তিনি দেখবার জন্য দিবস বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাতে রয়েছে নিদর্শন অর্থাৎ তাঁর একত্বের প্রমাণ শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ যারা চিন্তা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করার ইচ্ছায় শুনে তাদের জন্য। مُبْصِرًا অর্থ- দৃষ্টির অধিকারী। এ স্থানে দিবসের প্রতি এ শব্দটির আরোপ مَجَازٌ বা রূপক। দিন দেখে না বরং তাতে অন্য বস্তু দেখা যায়।

٦٨. قَالُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ سُبْحَانَهُ ط تَنْزِيْهًا لَهُ عَنِ الْوَلَدِ هُوَ الْغَنِىُّ ط عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَاِنَّمَا يَطْلُبُ الْوَلَدَ مَنْ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ

৬৮. ইহুদি, খ্রিস্টান এবং যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দুহিতা বলে ধারণা করে তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, তিনি পবিত্র, সন্তান হতে তিনি পাক। তিনি সকল কিছু হতে অমুখাপেক্ষী যে মুখাপেক্ষী সে সন্তানের আশা করে।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا اِنْ مَا عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ حُجَّةٍ بِهٰذَا ط اَىِ الَّذِىْ تَقُوْلُوْنَهٗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ .

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেরই মালিকানা, সৃষ্টি, দাসত্ব আল্লাহ তা'আলার। এ বিষয়ে অর্থাৎ তোমরা যা বল সে বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সনদ প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে এমন কিছু বলতেছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। اِنْ তা এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَتَقُوْلُوْنَ এ স্থানে اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ বা হুমকি ও তিরস্কার অর্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।

৬৯. اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ اِلَيْهِ لَا يُفْلِحُوْنَ لَا يَسْعَدُوْنَ لَهُمْ .

৬৯. বল, সন্তান আরোপ করত যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করবে তারা সফলকাম হবে না। সৌভাগ্যের অধিকারী হবে না।

৭০. مَتَاعٌ قَلِيْلٌ فِى الدُّنْيَا يَتَمَتَّعُوْنَ بِهٖ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ بِالْمَوْتِ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ .

৭০. পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ, জীবনকালের এ সামান্য সময়ে তারা তা ভোগ করে। পরে মৃত্যুর মাধ্যমে আমারই নিকট হবে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর অর্থাৎ মৃত্যুর পর সত্যপ্রত্যাখ্যান হেতু তাদেরকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ : এতে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। شَاْنٌ অর্থ– অবস্থা, কর্ম, চিন্তা, গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন। বহুবচনে شُئُوْنٌ। এখানে وَاوْ হলো عَاطِفَةٌ আর مَا হলো نَافِيَةٌ আর تَكُوْنُ হলো ফে'লে মুযারে' নাকেস তার মধ্যস্থ যমীর হলো اَنْتَ তার اِسْم আর فِىْ شَاْنٍ টা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে تَكُوْنُ -এর খবর। আর وَمَا -এর وَاوْ টি হলো عَاطِفَةٌ আর مَا হলো نَافِيَةٌ আর تَتْلُوْا হলো فِعْلُ مُضَارِعٍ তার মধ্যস্থ যমীর হলো তার فَاعِلٌ আর مِنْ টা تَتْلُوْا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ আর مِنْهُ -এর যমীর قُرْاٰنٌ -এর দিকে বা شَاْنٌ -এর দিকে ফিরবে। তখন مِنْهُ টা تَعْلِيْلِيَّةٌ হবে আর مِنَ الْقُرْاٰنِ -এর মধ্যে مِنْ টি অতিরিক্ত। আর قُرْاٰنٌ হলো مَحَلًّا مَفْعُوْلٌ بِهٖ

প্রশ্ন. এ সুরতে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হবে।

উত্তর. تَفْخِيْم এবং تَعْظِيْم -এর কারণে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ জায়েজ হয়। مِنْهُ -এর যমীর ضَمِيْرُ شَاْنٍ -ও হতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার দিকেও ফিরতে পারে। যেমন মুফাসসির (র.) اِلَى مِنَ الشَّاْنِ اَوِ اللّٰهِ বলে উভয় সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আপনি কোনো অবস্থার মধ্যে না হন এবং না شَاْنٌ [অবস্থা] তেলাওয়াতের মধ্যে হয়ে থাকেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সেই অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

قَوْلُهٗ خَاطِبَهٗ وَاُمَّتَهٗ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : হলো এই যে, পূর্বে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছিল। আর এ কারণেই ضَمِيْر -কে مُفْرَدْ এনেছেন। আর এখানে تَعْمَلُوْنَ -এর মধ্যে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার হয়েছে যা পূর্বের বিপরীত।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হচ্ছে এই যে, এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে উম্মতও অন্তর্ভুক্ত।

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ اِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شُهُوْدًا : এটা হলো সম্বোধিতগণের ব্যাপক অবস্থা। এটা اِسْتِثْنَاء مُفَرَّغٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَزْنُ ذَرَّةٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন হলো এই যে, مِثْقَالُ হলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের নাম। অথচ এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, মুফাসসির (র.) مِثْقَالٌ -এর তাফসীর وَزْنٌ দ্বারা করে এ আপত্তির উত্তরের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে. এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্দেশ্য নয় বরং মতলক وَزْنٌ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ هُمْ : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا -এর মধ্যে عَلَاقَةٌ হলো ظَرْفِيَتْ -এর। যেমন- نَهَارُهٗ صَائِمٌ এবং وَلَيْلُهٗ قَائِمٌ -এর মধ্যে ظَرْفِيَتْ -এর عَلَاقَةٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ................اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط : আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কিছু গোপন নেই : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ বা তাওহীদের কথা ইরশাদ হয়েছে, আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইলম সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আসমান জমিনের কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। ক্ষুদ্রতম বালুকণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। তিনি সর্বক্ষণ পৃথিবীর সবকিছু শিক্ষা লক্ষ্য করছেন।

برو علم ایک ذره پوشیده نیست

که پید او پهنان بنزدش یکے است

আল্লাহ তা'আলার নিকট পৃথিবীর একটি বালুকণাও গোপন নয়। এখানকার প্রকাশ্য ও গোপন তাঁর নিকট সবই এক সমান।

আল্লাহ তা'আলার এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনার দুটি উদ্দেশ্য :

১. কাফের ও মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা যে, তোমরা আমার রাসূল এবং আমার দীনের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা এবং চক্রান্ত করছ তা আমার নিকট গোপন নেই। তোমাদের চক্রান্ত কখনো সফল হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের হেফাজত করবেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেতের হিসাব নেবেন।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, আপনি কাফেরদের শত্রুতা এবং ষড়যন্ত্রে চিন্তিত হবেন না, তাদের কোনো কর্মকাণ্ডই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই, তাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মকাণ্ডও আল্লাহ তা'আলার নখদর্পণে রয়েছে। আসমান জমিনে যা কিছু আছে এবং হচ্ছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত। হে রাসূল ﷺ ! আপনি যখন যে অবস্থায় থাকেন আর কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত বা সূরা পাঠ করেন সবই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষ করেন। হে মানবজাতি! তোমরা যখন যা কিছু কর এবং যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ কর আল্লাহ তা'আলা তার সাক্ষী থাকেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৩, পৃ. ৪৮২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, যেহেতু হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী এবং তার মরতবা এবং মান সর্বোচ্চ তাই আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এরপর সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হযেছে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আকাশে বা পাতালে একটি বালুকণা পরিমাণ বস্তুও আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নেই। আর ছোট বড় কোনো কিছুই এমন নেই যা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত নেই।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যদিও আসমান-জমিনের উল্লেখ রয়েছে, এর উদ্দেশ্য হলো সমগ্র সৃষ্টিজগৎ কেননা মানুষ আসমান-জমিনকেই দেখে, এর বাইরের কোনো কিছু সাধারণত মানুষের বোধগম্য হয় না।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৫, পৃ. ৫১৬]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পবিত্র কুরআনে রয়েছে নসিহত, অন্তরের দুরারোগ ব্যাধির নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত। কিন্তু যাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয় না, তারা পবিত্র কুরআনের এ নিয়ামত থেকে উপকৃত হয় না। ঠিক এমনিভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে যে মহান অনুপম আদর্শ পেশ করেছেন, তারা তাও বরণ করে না, অথচ আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষণ তাদের যাবতীয় কার্যক্রম লক্ষ্য করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে আছে– فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ অর্থাৎ যদি তুমি তাঁকে নাও দেখতে পার কিন্তু তিনি তোমাকে দেখেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুই তাঁর অগোচর নেই। এমন অবস্থায় কাফের মুশরিকরা কোন সাহসে আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা রচনা করে এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ ..... اَلْفَوْزُ الْعَظِيْمُ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাঁদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাঁদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহর ওলী তাদের না থাকবে কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহর ওলী হলেন সে সমস্ত লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহেজগারি অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও–

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়।

১. আল্লাহ তা'আলার ওলীগণের উপর ভয় ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? ২.. ওলী-আল্লাহর সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? ৩. দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহ তা'আলার ওলীদের কোনো ভয়-শঙ্কা থাকে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতের তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। না থাকবে কোনো রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ। বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোনো বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছবে তাদের সবাইকে ওলীআল্লাহ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলী-আল্লাহর তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তাফসীরকার বলেছেন, ওলী-আল্লাহদের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলী-আল্লাহদের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত। এ ছাড়া আখেরাতে তাদের মনে কোনো চিন্তা ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হলো এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থি দেখা যায়। কারণ ওলী-আল্লাহর তো কথাই নেই স্বয়ং নবী-রাসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না; বরং তাঁদের ভয়ভীতি অন্যদের তুলনায় বেশিই ছিল। যেমন কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে– إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ। অর্থাৎ ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেন। অন্যত্র ওলী-আল্লাহগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ অর্থাৎ এরা সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় করে। কারণ তাদের পালনকর্তার আজাব এমন জিনিস যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভয় করি।

Free @ www.eilm.weebly.com

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারুক (রা.) সহ অন্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলী-আল্লাহগণের কান্নাকাটির ঘটনাবলি ও আখেরাতের ভয়ভীতি সন্ত্রস্ত থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলী-আল্লাহগণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হলো এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণত যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন; পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধনসম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুষড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে– আল্লাহর ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এসবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম আয়েশের কোনো গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা ব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম কোনো লক্ষ্য করার মতো বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে; বরং তাঁদের অবস্থা হলো–

نہ شادی دا سامانے نہ غم أورد نقصانے

بہ پیش ہمت ماھرچہ امد بود مہمانے

অর্থাৎ না কোনো সম্পদ-সামগ্রী আনন্দ দিতে পারে, না তার কোনো ক্ষতিতে দুঃখ আনতে পারে, আমার সৎসাহসের সামনে যা কিছুই আসে, সবই ক্ষণিকের অতিথি মাত্র।

মহান আল্লাহ তা'আলারও প্রেম-মহত্ত্ব আর তাঁর ভয়ভীতি এসব মনীষীর উপর এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, এর মোকাবিলায় তাদের পার্থিব দুঃখ-বেদনা, আরাম-আয়েশ ও লাভ-ক্ষতির গুরুত্ব তৃণ-কণিকার মতো নয়। কবির ভাষায়–

بہ ننگ عاشقی ہیں سود بوحاصل دیکھنے والے

یہاں گمراہ کہلاتے ہیں منزل دیکھنے والے

অর্থাৎ 'প্রেমের চলার পথে যারা লাভের প্রত্যাশা করে, তারা প্রেমের কলঙ্ক। এ প্রান্তরে চলতে গিয়ে যারা মনজিলের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তারা পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত।

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহর ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আওলিয়া' শব্দটি 'ওলী' শব্দের বহুবচন। আরবি ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো জীবজন্তু এমনকি কোনো বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোনো একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্ব প্রকৃত উপকরণ হলো সেই সংযোগ যা আল্লাহ তা'আলার সাথে রয়েছে। যদিও এ সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আউলিয়াহ' শব্দে নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং নৈকট্য প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট সে নৈকট্যকে মহব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নেকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ; তথা আল্লাহ তা'আলার ওলী। যেমন হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নেকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু সে শুনে আমার মাধ্যমেই শুনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হলো এই যে, তার কোনো গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোনো কাজ আমার ইচ্ছা বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুত এ বিশেষ ওলিত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী-রাসূলগণের প্রাপ্য। কারণ প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ স্তর হলো সায়্যিদুল আম্বিয়া নবী করীম ﷺ -এর এবং এ বেলায়েতের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সর্বনিম্ন স্তর হলো সূফী-সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা' তথা আত্মবিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হলো এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ তা'আলার স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালোবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহর জন্যই করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালোবাসা ও শত্রুতা কোনোটিই নিজের ব্যক্তিগত কোনো কারণে হয় না। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো যে তার দেহ মন, বাহ্যাভ্যন্তর সবই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হলো জিকিরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম-আহকামের অনুগত থাকা। এ দুটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাঁকেই ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দুটির কোনো একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দুটিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা ও উচ্চতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এসব স্তরের দিক দিয়েই ওলী-আল্লাহগণের মর্যাদার বেশকম হয়ে যায়।

এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর ﷺ -কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়াল্লাহ' [আল্লাহর ওলীগণ] বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা পোষণ করে; কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য এর মাঝে থাকে না। [ইবনে মারদুবিয়াহ থেকে মাহারী] আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

হযরত কাজি সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এ স্তর রাসূলে কারীম ﷺ -এর সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কের সেইরূপ, যা মহানবী ﷺ পেয়েছিলেন স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত মহানবী ﷺ -এর সৎসর্গের ফজিলত সাহাবায়ে কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাঁদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী-কুতুব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফজিলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণই বাড়তে থাকে। এ মাধ্যমে শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাঁদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ তা'আলার জিকিরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। ১. কোনো ওলীর সংসর্গ, ২. তার আনুগত্য ও ৩. আল্লাহর অধিক জিকির। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, এ জিকির সুন্নত তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ অধিক জিকিরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিস বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিস হলো আল্লাহ তা'আলার জিকির। এ কথাই হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন যে, [একবার] এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে প্রশ্ন করল যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির সাথে মহব্বত রাখে, কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌঁছাতে পারে না। হুজুর ﷺ বললেন- اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ "প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালোবাসে।" এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলী-আল্লাহগণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত রাযীন (রা.) -কে বললেন যে, তোমাকে দীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে– তা হলো এই যে, যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করে তাদের তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশি সম্ভব আল্লাহ তা'আলার জিকিরে নিজের জিহ্বা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মহব্বত রাখবে– আল্লাহ তা'আলার জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে– আল্লাহ তা'আলার জন্য করবে। –[মাযহারী]

কিন্তু এ সঙ্গ-সান্নিধ্য তাদেরই লাভজনক, যারা নিজেরাও সুন্নতের অনুসারী ওলী-আল্লাহ। পক্ষান্তরে যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সুন্নতের অনুসারী নয়, তারা ওলীত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, তাদের দ্বারা কাশ্‌ফ ও কারামত যতই প্রকাশ পাক না কেন। আর সে লোক উল্লিখিত গুণাবলি অনুযায়ী ওলী হবেন, তাঁর দ্বারা কোনো কাশ্‌ফ ও কারামত প্রকাশ না হলেও তিনি ওলী-আল্লাহ। –[মাযহারী]

ওলী-আল্লাহগণের লক্ষণ ও পরিচয় প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে একখানি হাদীস হাদীসে কুদসীতে উদ্ধৃতিক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে সে সব লোকই আমার আওলিয়া, যারা আমার স্মরণের সাথে স্মরণে আসে এবং যাদের স্মরণের সাথে আমি স্মরণে আসি।" আর ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ওলী-আল্লাহদের পরিচয় বলতে গিয়ে বলেছেন– اَلَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ অর্থাৎ যাদেরকে দেখলে আল্লাহ তা'আলার কথা মনে হয় তারাই ওলী।

সারমর্ম এই যে, যাদের সান্নিধ্যে বসে মানুষ আল্লাহ তা'আলার জিকিরের তাওফীক লাভ করতে পারে এবং দুনিয়ার মায়া কম অনুভূত হয়, এই হলো তাদের ওলী-আল্লাহ হওয়ার লক্ষণ।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশ্‌ফ-কারামত ও গায়বি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোঁকা। হাজার হাজার ওলী-আল্লাহ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাঁদের দ্বারা এ ধরনের কোনো বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশ্‌ফ ও গায়বি সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

আয়াতের শেষাংশে যে বিষয়টি বলা হয়েছে, ওলী-আল্লাহদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সুসংবাদ– তাতে আখেরাতের সুসংবাদ হলো এই যে, মৃত্যুর পর তার রূহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। পরে কিয়ামতের দিন যখন কবর থেকে উঠবে তখনও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হবে। যেমন, ইমাম তাবারানী (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন "যারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর অনুসারী মৃত্যুকালেও তাদের কোনো ভয় হবে না, কবরেও নয় এবং কবর থেকে উঠার সময়েও নয়। আমার চোখ যেন তখনকার অবস্থা দর্শন করছে, যখন মানুষ কবর থেকে মাটি [ধুলাবালি] ঝাড়তে ঝাড়তে এবং একথা বলতে বলতে উঠবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া যিনি আমাদের চিন্তাভাবনা দূর করে দিয়েছেন।

আর দুনিয়ার সুসংবাদ সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেছেন, যে সমস্ত সত্য স্বপ্ন যা মানুষ নিজে দেখে কিংবা তাদের জন্য কেউ দেখতে পায়, যাতে তাদের জন্য সুসংবাদ বিদ্যমান থাকে। –[এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন।]

এ ছাড়া পৃথিবীর অপর সুসংবাদ হলো এই যে, সাধারণ মুসলমান কোনো রকম স্বার্থপরতা ব্যতিরেকে তাকে ভালোবাসে এবং ভালো মনে করে। এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানের ভালো মনে করা এবং প্রশংসা করা অপর মু'মিনের একটি নগদ সুসংবাদ। –[মুসলিম ও বগবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧١. وَاتْلُ يَا مُحَمَّدُ عَلَيْهِمْ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ نَبَأَ خَبَرَ نُوْحٍ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ شَقَّ عَلَيْكُمْ مُقَامِىْ لُبْثِىْ فِيْكُمْ وَتَذْكِيْرِىْ وَعْظِىْ اِيَّاكُمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ اَعْزِمُوْا عَلٰى اَمْرٍ تَفْعَلُوْنَهٗ بِىْ وَشُرَكَآءَكُمْ اَلْوَاوُ بِمَعْنٰى مَعَ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً مَسْتُوْرًا بَلْ اَظْهِرُوْهُ وَجَاهِرُوْنِىْ بِهٖ ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ اَمْضُوْا فِىَّ مَا اَرَدْتُّمُوْهُ وَلَا تُنْظِرُوْنِ تُمْهِلُوْنِ فَاِنِّىْ لَسْتُ مُبَالِيًا بِكُمْ.

৭১. হে মুহাম্মদ ﷺ তাদের মক্কার কাফেরদের নিকট নূহের বৃত্তান্ত তার কাহিনী শুনাও, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থান অর্থাৎ তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দ্বারা তোমাদেরকে আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় কষ্টদায়ক হয় তবে আমি তো আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করি। যাদেরকে শরিক কর তাদের সহ তোমরা তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও অর্থাৎ আমার সাথে তোমরা যা করতে চাও সে সম্পর্কে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও আর তোমাদের নিকট তোমাদের সেই সিদ্ধান্ত যেন গোপন না থাকে বরং তা প্রকাশ করে দাও এবং আমাকেও তা জানিয়ে দাও এবং আমার বিষয়ে তোমাদের কাজ নিষ্পন্ন করে ফেল, অর্থাৎ আমার বিষয়ে তোমরা যা চাও তা সমাধা করে ফেল আর আমাকে অবসর দিও না। অবকাশ দিও না। আমি তোমাদের বিন্দুমাত্রও পরোয়া করি না। اِذْ قَالَ টা نَبَأَ نُوْحٍ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। تَذْكِيْرِىْ অর্থ আমার উপদেশ প্রদান। وَشُرَكَآءَكُمْ তার وَ টি এ স্থানে مَعَ [সহ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। غُمَّةً অর্থ গোপন।

٧٢. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنْ تَذْكِيْرِىْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ط ثَوَابٍ عَلَيْهِ فَتَوَلَّوْا اِنْ مَا اَجْرِىَ ثَوَابِىْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

৭২. তোমরা আমার উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিলে তা নাও আমি তো তোমাদের নিকট বিনিময় তার প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান পুণ্যফল তো আল্লাহ তা'আলারই নিকট। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি। اِنْ اَجْرِىَ এ اِنْ টি না- বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٣. فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهُمْ اَىْ مَنْ مَعَهٗ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ج بِالطُّوْفَانِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ مِنْ اِهْلَاكِهِمْ فَكَذٰلِكَ نَفْعَلُ مَنْ كَذَّبَكَ.

৭৩. অনন্তর তারা তাকে অস্বীকার করে। আর আমি তাকে ও নৌকায় যারা তার সঙ্গে ছিল তাদেরকে উদ্ধার করি তাদেরকে অর্থাৎ তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করি এবং যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে তুফানে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের কিরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। তোমাকে যারা অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারেও আমি ঠিক তদ্রূপ করব। اَلْفُلْكِ অর্থ নৌযান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٤. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ اَىْ نُوْحٍ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ كَاِبْرَاهِيْمَ وَهُوْدٍ وَصَالِحٍ فَجَاۤءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ الْبَعْثِ الرُّسُلِ اِلَيْهِمْ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ نَخْتِمُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ فَلَا تَقْبَلُ الْاِيْمَانَ كَمَا طَبَعْنَا عَلٰى قُلُوْبِ اُولٰۤئِكَ ۔

৭৪. অনন্তর তার পরে হযরত নূহ (আ.)-এর পরে রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করি যেমন– হযরত ইবরাহীম, হযরত হূদ, হযরত সালেহ (আ.) প্রমুখ তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ মু'জিযাসহ এসেছিল। কিন্তু তারা পূর্বে অর্থাৎ তাদের নিকট রাসূলগণের আগমনের পূর্বে যা অস্বীকার করেছিল তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মতো ছিল না। এভাবে অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে যেমন মোহর করে দিয়েছিলাম তেমনি আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে মোহর করে দেই। অনন্তর তাদের ঈমান আর কবুল করা হয় না। نَطْبَعُ অর্থ আমরা মোহর করে দেই।

٧٥. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ قَوْمِهٖ بِاٰيٰتِنَا التِّسْعِ فَاسْتَكْبَرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۔

৭৫. অতঃপর আমার নয়টি নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফেরাউন ও তার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু তারা এতদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা সম্পর্কে অহংকার প্রদর্শন করে, আর তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। مَلَاءٌ অর্থ– পরিষদবর্গ, সম্প্রদায়।

٧٦. فَلَمَّا جَاۤءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ ظَاهِرٌ ۔

৭৬. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার নিকট হতে সত্য আসল, তখন তারা বলল, তা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু। مُبِيْنٌ অর্থ– সুস্পষ্ট, পরিষ্কার।

٧٧. قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَكُمْ اِنَّهٗ لَسِحْرٌ اَسِحْرٌ هٰذَا ط وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَتٰى بِهٖ وَاَبْطَلَ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ وَالْاِسْتِفْهَامُ فِى الْمَوْضِعَيْنِ لِلْاِنْكَارِ ۔

৭৭. মূসা বলল, সত্য যখন তোমাদের নিকট আসল তৎসম্পর্কে তোমরা কি বলতেছ যে, এটা জাদু এটা কি জাদু? যিনি তা নিয়ে এসেছেন তিনি তো সফলকাম হলেন আর জাদুকরদের জাদু নিষ্ফল প্রমাণিত হয়ে গেল। কারণ জাদুকররা তো সফলকাম হয় না। اَتَقُوْلُوْنَ এবং أَسِحْرٌ এ উভয় স্থানেই اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

٧٨. قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا لِتَرُدَّنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاۤءُ الْمُلْكُ فِى الْاَرْضِ ط اَرْضِ مِصْرَ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ مُصَدِّقِيْنَ ۔

৭৮. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা হতে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে ফিরাতে আমাদের নিকট এসেছ? এবং দেশে অর্থাৎ মিশর ভূমিতে যাতে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয় সেজন্য? আমরা তোমাদের দুজনের উপর বিশ্বাস রাখি না। তোমাদের বিষয়ে আমরা প্রত্যয়ী নই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৭৯. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَائِقٍ فِي عِلْمِ السِّحْرِ .

৭৯. ফেরাউন বলল, তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ জাদুকরদেরকে যারা জাদু বিদ্যায় সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাদেরকে নিয়ে আস।

৮০. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى بَعْدَ مَا قَالُوا لَهُ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ .

৮০. অতঃপর যখন জাদুকররা আসল তখন মূসা তাদেরকে বলল, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর। হযরত মূসা (আ.) -কে তারা বলেছিল, 'তুমি নিক্ষেপ করবে না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করব।' তখন হযরত মূসা (আ.) ঐ কথা বলেছিলেন।

৮১. فَلَمَّا أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ قَالَ مُوسَى مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ط بَدَلٌ وَفِي قِرَاءَةٍ بِهَمْزَةٍ إِخْبَارٌ فَمَا مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ط سَيُمْحِقُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ .

৮১. যখন তারা তাদের লাঠিসোটা ও দড়িদড়া নিক্ষেপ করল তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমরা যা নিয়ে আনলে তা জাদু। আল্লাহ তা'আলা শীঘ্র তা নিষ্ফল করে দেবেন। অসার করবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। مَا جِئْتُمْ بِهِ এ مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّة বা প্রশ্নবোধক। তা مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য। তার خَبَر বা বিধেয় হলো جِئْتُمْ بِهِ । اَلسِّحْرُ তা بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। অপর এক কেরাতে তা একটি হামযাসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তা خَبَر বা বিধেয় বলে গণ্য হবে। আর مَا جِئْتُمْ بِهِ -এর مَا টি مَوْصُوْلَه বা সংযোজক অব্যয়রূপে مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য বলে গণ্য হবে।

৮২. وَيُحِقُّ يُثَبِّتُ وَيُظْهِرُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ بِمَوَاعِيدِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ .

৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তা'আলা তার কথা অনুসারে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, সুদৃঢ় ও প্রকাশিত করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاتْلُ : এটা وَاتْلُوْ মূলে ছিল فِعْل اَمْر যা حَرْف عِلَّتْ উহ্য থাকার উপর مَبْنِيْ শেষের وَاوْ টিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। اُتْلُ এটা عَلَيْهِمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। نَبَأَ نُوْحٍ এটা مُرَكَّب اِضَافِيْ হয়ে مَفْعُوْل بِه হয়েছে। اِذْ قَالَ -এর نَبَأَ টা اِذْ قَالَ হলো ظَرْفِيَّة যা مَاضِيْ -এর জন্য। এটা نَبَأَ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ার কারণে مَحَل مَنْصُوْب হয়েছে। اِذْ -এর মুতাআল্লিক ও হতে পারে। نُوْح -এর উপর ওয়াকফ করা আবশ্যক। কেননা اِذْ قَالَ -এর সম্পর্ক اُتْلُ -এর সাথে অর্থ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে জায়েজ নেই। কেননা اُتْلُ হলো مُسْتَقْبِلْ এবং ظَرْف হচ্ছে مَاضِيْ এ সুরতে অনুবাদ হবে যে, তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত শুনাও যখন হযরত নূহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল। অথচ এটা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ لِقَوْمِهِ : এর মধ্যে لَامْ টা تَبْلِيْغ -এর জন্য হয়েছে। مَقَامْ [مِيْم বর্ণে যবর] অর্থ হলো- দাঁড়ানোর স্থান, মর্যাদা, ঘর, উদ্দেশ্য হলো নিজের অস্তিত্ব। আর مُقَامْ [مِيْم বর্ণে পেশ] অর্থ- দাঁড়ানো, অবস্থান করা, اَلْقِيَامُ عَلَى الدَّعْوَةِ خِلَالَ مُدَّةِ اللُّبْثِ যেহেতু দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সাধারণত দাঁড়িয়েই করা হয়।

قَوْلُهُ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ : এটা হলো إِنْ كَانَ كَبُرَ -এর جَزَاء আর যদি فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ -কে جُمْلَة مُعْتَرِضَة মানা হয় তবে فَاجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ টা جَوَاب شَرْط হবে।

قَوْلُهُ فَاجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ : এর তাফসীর اعْزِمُوْا عَلٰى اَمْرٍ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَجْمِعُ টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় এবং مُتَعَدِّىْ بِالْحَرْفِ ও হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ غُمَّةً : অর্থ– বায়ু বন্ধ হওয়ার কারণে এমন গরম যে দম বন্ধ হয়ে আসে, অন্ধকার, সংশয়, গোপন, কঠিন, যখন চাঁদ ডুবে যায় তখন আরবগণ বলে থাকেন– غُمَّ الْهِلَالُ

قَوْلُهُ وَاوٌ بِمَعْنٰى مَعَ : অর্থাৎ شُرَكَاء এটা مَفْعُوْل مَعَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এর দ্বারা এ সংশয়কে বিদূরিত করে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকাশ্যভাবে شُرَكَاء -এর عَطْف হয়েছে اَجْمِعُوْا -এর ফায়েলের যমীরের উপর। অর্থাৎ তোমরা শরিকগণ তোমাদের কৌশলকে মজবুত করে নাও। এ হিসেবে شُرَكَاء টা মারফূ' হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَكُمْ اِنَّهٗ لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ اَسِحْرٌ هٰذَا : এখানে قَالَ مُوْسٰى হলো ফে'ল ও ফায়েল। اَتَقُوْلُوْنَ -এর মধ্যে হামযাটা হলো اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ আর تَقُوْلُوْنَ হলো فِعْل ও ফায়েল اَنْتُمْ لِلْحَقِّ এটা تَقُوْلُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ। لَمَّا جَاۤءَكُمْ এটা تَقُوْلُوْنَ -এর ظَرْف হয়েছে। اِنَّهٗ لَسِحْرٌ এটা تَقُوْلُوْنَ -এর مَقُوْلَه যা উহ্য রয়েছে। পূর্ণবাক্য قَالَ مُوْسٰى -এর مَقُوْلَة حِكَائِىْ হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উক্তি নকল করেছেন।

قَوْلُهُ اَسِحْرٌ هٰذَا : এ উক্তি উহ্য মূসার مَقُوْلَة আর هٰذَا হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ আর وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ হলো جُمْلَة حَالِيَة

ব্যাখ্যা : মুফাসসির (র.) اِنَّهٗ لَسِحْرٌ هٰذَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী اَسِحْرٌ هٰذَا টা يَقُوْلُوْنَ -এর مَقُوْلَة নয়; বরং তার مَقُوْلَة উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اِنَّهٗ لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ এ উহ্য করার قَرِيْنَة হলো এই যে, ফেরাউনরা অকাট্যভাবে সংবাদের ভিত্তিতে اِسْتِفْهَامْ -এর ভিত্তিতে নয়, হযরত মূসা (আ.) -এর মো'জিযাকে জাদু স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিল اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ আর আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَسِحْرٌ هٰذَا এটা হযরত মূসা (আ.) -এর مَقُوْلَة । অর্থ হলো এই যে, হে ফেরাউন সম্প্রদায়! তোমরা এই সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত বাস্তবতাকে জাদু বলতেছ, তোমাদের এ সকল কথা যা বাস্তবতার বিরোধী কিছুতেই মুখ থেকে বের না করা উচিত।

উল্লিখিত তারকীব প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে হয়েছে।

প্রশ্ন. হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উক্তির বর্ণনা اِسْتِفْهَامْ -এর ভিত্তিতে অর্থাৎ اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا؟ দ্বারা কেন করলেন? অথচ ফেরাউন দৃঢ়তা ও اِخْبَارٌ -এর ভিত্তিতে অকাট্যতার স্বীয় বাক্যকে اِنَّ এবং لَامْ দ্বারা তাকিদ করে বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَلَمَّا جَاۤءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ

উত্তর. এতে ফেরাউনের مَقُوْلَة حِكَائِىْ উহ্য রয়েছে। আর উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ এর জবাবে হযরত হারূন (আ.) তাদের উক্তির অস্বীকার করে বলেন– اَسِحْرٌ هٰذَا [এটা কি জাদু?] বাস্তবতা বিরোধী এমন কথা তোমাদের মুখ দিয়ে বের না করাই উচিত।

قَوْلُهُ بَدَلٌ : অর্থাৎ اَلسِّحْرُ টা مَا جِئْتُمْ بِهٖ থেকে মুবতাদা উহ্য থাকার সাথে بَدَل হয়েছে। অর্থাৎ اَمْ اَلسِّحْرُ কাজেই এ আপত্তি শেষ হয়ে গেল যে, مُفْرَدْ টা جُمْلَة থেকে بَدَل হতে পারে না।

قَوْلُهُ فِىْ قِرَاءَةٍ : অর্থাৎ আবূ আমরের কেরাতে اَسِحْرٌ هٰذَا -এর মধ্যে একটি هَمْزَة اِسْتِفْهَامِيَّة রয়েছে। ঐ কেরাত অনুসারে اَىُّ شَىْءٍ جِئْتُمْ بِهٖ هُوَ -এর মধ্যে مَا جِئْتُمْ টা مَا اِسْتِفْهَامِيَّة হবে আর اَلسِّحْرُ টা مَا হতে بَدَل হবে অর্থাৎ اَلسِّحْرُ আর অন্য কেরাতে একটি هَمْزَة اِخْبَارٌ -এর সাথে এ সুরতে مَا টা مَا مَوْصُوْلَة মুবতাদা হবে। আর جِئْتُمْ بِهٖ টা তার صِلَة হবে। আর اَلسِّحْرُ তার খবর হবে। অর্থাৎ اَلَّذِىْ جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ لَا اَلَّذِىْ جِئْتُ بِهٖ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত এবং কিয়ামতের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং দীন ইসলামের দুশমনদের তরফ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এবং কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার লক্ষ্যে পূর্বকালের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে আরববাসী এই সমস্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, দুনিয়ার শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য এক কথায় কোনো কিছুই মানুষকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার জীবন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, এখানকার সুখ-সামগ্রী অবশেষে মানুষকে চিরতরে ছেড়ে যেতে হয়। কোনো কিছুই মানুষের চিরস্থায়ী হয় না। যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরোধিতা করে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের শাস্তি অবধারিত। শাস্তি আসতে হয়তো বিলম্ব হয় কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো পন্থা থাকে না।

হযরত নূহ (আ.) -কে 'আদমে ছানী' বলা হয়। মানব জাতির ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাঁর যুগেই মানুষ মূর্তি পূজা শুরু করে। যদিও হযরত আদম (আ.)-ই সর্বপ্রথম মানুষ, সর্বপ্রথম নবী-রাসূল, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন তবে হযরত আদম (আ.)-এর জমানায় কুফর ও নাফরমানি ছিল না। হযরত আদম (আ.)-এর দশ যুগ পর কুফরি এবং নাফরমানি শুরু হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন যেন তিনি কাফেরদেরকে তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানান। কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নে রাজি হয়নি। সুদীর্ঘ বছর ধরে হযরত নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য পথের নির্দেশনা দিতে থাকেন কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। এরপর হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জন্য এসেছে আল্লাহর আজাব। প্রলয়ঙ্করী বন্যা এসে তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُ : হযরত নূহ (আ.) শতাব্দীর পর শতাব্দী তার সম্প্রদায়কে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। কুফর ও নাফরমনি পরিত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। দীন ইসলাম গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তারা তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি এবং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উপহাস করেছে। অবশেষে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আজাবের আদেশ হয়। প্রলয়ঙ্করী বন্যা এসে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ ঐতিহাসিক বন্যার আক্রমণ থেকে হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনগণই রক্ষা পেয়েছিলেন। তাই ইরশাদ হয়েছে- فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ অর্থাৎ অতঃপর আমি নূহ এবং তাঁর সঙ্গের মু'মিনদেরকে রক্ষা করি। আর অবাধ্য কাফেররা সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا : যারা সেদিন আসমানি গজব থেকে রক্ষা পেয়েছিল সমগ্র বিশ্বমানব তাদেরই বংশধর। যারা সেদিন নিমজ্জিত হয়েছেন তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল এ মু'মিনগণ। বলাবাহুল্য, কয়েকজন মু'মিনের ঈমানের বরকতেই সেদিন মানব জাতির বংশ সংরক্ষিত থাকে। অতএব, বিশ্ববাসীর জন্যে রয়েছে এতে বিরাট শিক্ষা যারা সত্যের মোকাবিলা করেছে, আল্লাহ তা'আলার নবীকে যারা মিথ্যা জ্ঞান করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নবীর মোকাবিলায় কাফের মুশরিকদের অগাধ ধন- সম্পদ এবং ক্ষমতা প্রভাব প্রতিপত্তি কোনো কিছুই কাজে লাগেনি; বরং তাদের অহংকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান কোথায় হয়েছে : তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, এ ঐতিহাসিক প্লাবণ হয়েছে ইরাকের দজলা এবং ফোরাত নদীর মধ্য এলাকায়। ঐতিহাসিকগণ ঐ এলাকার জরিপ কার্য চালিয়েছেন এবং পরিমাপ করেছেন। প্রায় চার'শ মাইল দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে একশত মাইল এলাকায় এ প্লাবন এসেছিল। হযরত নূহ (আ.) -কে আল্লাহ তা'আলা যে তরী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা দৈর্ঘ্যে তিনশত হাত এবং প্রস্থে ছিল পঞ্চাশ হাত এবং উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত। এর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অর্থ হলো বর্তমান যুগে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে যেসব জাহাজ চলাচল করে তার সমানই ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজ। যারা আল্লাহ তা'আলার রহমতে আল্লাহ তা'আলার নবীর অনুসরণের বরকতে সেদিন প্রলয়ঙ্করী বন্যার শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তারাই পুনরায় সেই এলাকায় আবাদ হয়েছিলেন। ঐতিহাসিগণ এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, তদানীন্তনকালে হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোনো সম্প্রদায় ছিল না।

-[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৪৪৯]

যারা রক্ষা পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা :

قَوْلُهٗ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا : এ বাক্যটির তাফসীরে আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, যারা হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু যারা হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রলয়ঙ্করী বন্যা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশজন পুরুষ এবং চল্লিশজন নারী। -[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ. ১১, পৃ. ১৬০]

অতএব, লক্ষ্য কর যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় দেখানো হয়েছিল সেই অবাধ্য কাফেরদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে। ক্ষণিকের মধ্যে তাদেরকে কিভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। এটি অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয়।

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

অর্থাৎ দুনিয়া মন বসাবার স্থান নয়, এটি হলো শিক্ষা গ্রহণের স্থান, খেল-তামাশার স্থান এটি নয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনের অবশিষ্ট নিদর্শনাবলি : হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের নিদর্শনাবলি সাইন্স বিষেশজ্ঞরা আজও হযরত নূহ (আ.)-এর ভূমিতে খুঁজে পাচ্ছেন। এ প্লাবন ইরাকের দজলা নদী ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে হয়েছিল। এ এলাকার পরিসীমা বর্তমান বিশেষজ্ঞগণের অনুমানের ভিত্তিতে দৈর্ঘ্য চারশত মাইল এবং প্রস্থ একশত মাইল ছিল। -[মাজেদী]

তাওরাতের ভাষ্য মতে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ [তিনশত] হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ [পঞ্চাশ] হাত এবং ত্রিশ হাত উঁচু ছিল। -[মাজেদী]

হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ডুবে মরার পর একনিষ্ঠ মু'মিনগণ পুনরায় এ এলাকায়ই বসতি স্থাপন করেন এবং তাদের সূত্র ধরেই নতুনভাবে মানব বিস্তার ঘটে। মানুষ বসতির ইতিহাস প্রথম যুগে শুধুমাত্র এই সীমার ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ কারণেই যে সকল মুফাসসিরগণ হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবন সমগ্র বিশ্বব্যাপী হওয়ার দাবি করেছিল তারা কোনোই ভুল করেননি। সে কালে পৃথিবীর বসতি ইরাক ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল।

قَوْلُهٗ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ : এ আয়াতে সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয়ে মহর মেরে দেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সীমালঙ্ঘনকারী এ লোকেরা একবার ভুল করে যাওয়ার পর পুনরায় স্বীয় জিদ, বক্রতা ও হটধর্মীর কারণে নিজেদের ভুলের উপর অনড় থাকে এবং যে কথার একবার অস্বীকার করে তাকে পুনরায় কোনো বুঝ ও জ্ঞানগর্ভ দলিলও তাকে মানাতে সক্ষম হয় না। ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের এ মানসিকতা অদ্যাবধি চলে আসছে। যেখানে একবার না বুঝেশুনে না বলে দিয়েছে, ব্যস শেষ পর্যন্ত তাতেই সুদৃঢ় থাকে। এ জাতীয় লোকদের উপরই আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ পড়ে যে, তারা পুনরায় সঠিক পথে ফিরে আসার তৌফিক প্রাপ্ত হয় না।

قَوْلُهٗ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ : অর্থাৎ ফেরাউন স্বীয় ধন-দৌলত, রাজত্ব, শান-শওকত ও শ্রেষ্ঠত্বে মাতল হয়ে নিজেই নিজেকে উপাসনার থেকে বহু উর্ধ্বে মনে করে নিয়েছে এবং আনুগত্যের জন্য মাথা নত করার পরিবর্তে বাবুয়ানা ও বিলাসিতা দেখাতে শুরু করে দেয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨٣. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ طَائِفَةٌ مِنْ أَوْلَادِ قَوْمِهِ أَيْ فِرْعَوْنَ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ط يَصْرِفَهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ بِتَعْذِيْبِهِ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ مُتَكَبِّرٌ فِي الْأَرْضِ ج أَرْضِ مِصْرَ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ . الْمُتَجَاوِزِيْنَ الْحَدَّ بِادِّعَاءِ الرُّبُوْبِيَّةِ .

৮৩. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ বিপদে ফেলবে অর্থাৎ তাদেরকে নির্যাতন করে দিন হতে ফিরিয়ে দিবে এই আশঙ্কা নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে অর্থাৎ ফেরাউন বংশের কিছু সন্তান ব্যতীত অর্থাৎ তাদের একদল ব্যতীত আর কেউ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে অর্থাৎ মিশর ভূমিতে প্রতিপত্তিশালী অহংকারী ছিল এবং সে নিজের রব হওয়ার দাবি করায় ন্যায়লঙ্ঘনকারীদের অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٨٤. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ .

৮৪. মূসা বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক তবে তোমরা তারই উপর নির্ভর কর।

٨٥. فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ . أَيْ لَا تُظْهِرْهُمْ عَلَيْنَا فَيَظُنُّوا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ فَيَفْتِنُوا بِنَا .

৮৫. অতঃপর তারা বলল, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না। অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর জয়ী করিও না। কেননা তাতে তারা মনে করবে যে, তারা ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে আমাদেরকে নির্যাতনের শিকারে পরিণত করবে।

٨٦. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ .

৮৬. এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।

٨٧. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّآ اِتَّخِذَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً مُصَلًّى تُصَلُّوْنَ فِيْهِ لِتَأْمَنُوْا مِنَ الْخَوْفِ وَكَانَ فِرْعَوْنُ مَنَعَهُمْ مِنَ الصَّلٰوةِ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ أَتِمُّوْهَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْجَنَّةِ .

৮৭. আমি মূসা ও তার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম মিশরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য আবাসস্থল বানাও গৃহ স্থাপন কর। এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কিবলা সালাতস্থল বানাও। আশঙ্কা হতে নিরাপদ থাকার জন্য তাতেই তোমরা সালাত আদায় কর। ঐ সময় ফেরাউন তাদেরকে সালাত হতে বারণ করে দিয়েছিল। সালাত কায়েম কর। অর্থাৎ তা পূর্ণভাবে সমাধা কর এবং মু'মিনদেরকে সাহায্য বিজয় ও জান্নাতের সুসংবাদ দাও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٨. وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ
وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
رَبَّنَا اٰتَيْتَهُمْ ذٰلِكَ لِيُضِلُّوْا فِىْ عَاقِبَتِهٖ
عَنْ سَبِيْلِكَ ج دِيْنِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى
اَمْوَالِهِمْ اِمْسَخْهَا وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ
اِطْبَعْ عَلَيْهَا وَاسْتَوْثِقْ فَلَا يُؤْمِنُوْا
حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ الْمُؤْلِمَ دَعَا
عَلَيْهِمْ وَاَمَّنَ هٰرُوْنُ عَلٰى دُعَائِهٖ

৮৮. মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে তুমি তা দিয়েছ যদ্দারা পরিণামে তারা তোমার পথ হতে তোমার দীন হতে গুমরাহ করতে পারে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ তুমি বিনষ্ট করে দাও তাদের আকৃতি বিকৃতি করে দাও, তাদের হৃদয় কঠোর করে দাও, সীলমোহর করে শক্ত করে দাও, মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত যেন তারা বিশ্বাস আনয়ন না করে। হযরত মূসা তাদের বিরুদ্ধে এই দোয়া কবুল করেছিলেন আর হযরত হারুন (আ.) তার দোয়ার সাথে আমিন বলেছিলেন।

٨٩. قَالَ تَعَالٰى قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا
فَمُسِخَتْ اَمْوَالُهُمْ حِجَارَةً وَلَمْ يُؤْمِنْ
فِرْعَوْنُ حَتّٰى اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ فَاسْتَقِيْمَا
عَلَى الرِّسَالَةِ وَالدَّعْوَةِ اِلٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ وَلَا تَتَّبِعٰنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا
يَعْلَمُوْنَ ـ فِى اسْتِعْجَالِ قَضَائِىْ رُوِىَ
اَنَّهٗ مَكَثَ بَعْدَهَا اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ـ

৮৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাদেরকে দু'জনের প্রার্থনা গৃহীত হলো। ফলে তাদের সম্পদসমূহ পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল আর নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষণ পর্যন্ত ফেরাউন বিশ্বাস স্থাপন করেনি। সুতরাং তাদের উপর আজাব না আসা পর্যন্ত তোমরা উভয়েই রিসালাত ও ন্যায়ের দিকে আহ্বানের কাজে দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনো আমার ফয়সালা আসার শীঘ্রতা সম্পর্কে যারা অজ্ঞ তাদের পথ অনুসরণ করিও না। বর্ণিত আছে যে, তারপর আরো চল্লিশ বছর তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

٩٠. وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ
فَاَتْبَعَهُمْ لَحِقَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا
وَّعَدْوًا ط مَفْعُوْلٌ لَهٗ حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ
الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ اَىْ بِاَنَّهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ
بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ
اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ـ كَرَّرَهٗ لِيُقْبَلَ مِنْهُ فَلَمْ
تُقْبَلْ وَدَسَّ جِبْرِيْلُ فِىْ فِيْهِ مِنْ حَمَاةِ
الْبَحْرِ مَخَافَةَ اَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ ـ

৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন এবং তার সৈন্যবাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হয়ে ও সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। তাদের সাথে এসে মিলিত হলো। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হলো বলল, আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, যার উপর বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কবুলের আশায় সে তার ঈমান আনার কথার পুনরাবৃত্তি করেছে। কিন্তু তার ঈমান কবুল করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার রহমত পেয়ে যাবে এ আশঙ্কায় হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরাউনের মুখে সমুদ্রের কালো কাদা ঠেসি ধরেছিলেন। بَغْيًا وَّعَدْوًا এটা এস্থানে مَفْعُول বা হেতুবোধক কর্মকারকরূপে ব্যবহৃত রয়েছে। اَنَّهٗ তা এস্থানে بِاَنَّهٗ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে তা مُسْتَانِفَةً বা নববাক্যরূপে হামযার কাসরাসহ পঠিত রয়েছে।

৯১. أٰلْئٰنَ تُؤْمِنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ . بِضَلَالِكَ وَاِضْلَالِكَ عَنِ الْاِيْمَانِ .

৯১. হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এতক্ষণে ঈমান আনতেছ? ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ আর তুমি নিজের পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যকেও ঈমান হতে পথভ্রষ্ট করে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

৯২. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ نُخْرِجُكَ مِنَ الْبَحْرِ بِبَدَنِكَ جَسَدِكَ الَّذِىْ لَا رُوْحَ فِيْهِ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ بَعْدَكَ اٰيَةً عِبْرَةً فَيَعْرِفُوْا عُبُوْدِيَّتَكَ وَلَا يُقْدِمُوْا عَلٰى مِثْلِ فِعْلِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ شَكُّوْا فِىْ مَوْتِهِ فَاُخْرِجَ لَهُمْ لِيَرَوْهُ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ لَا يَعْتَبِرُوْنَ .

৯২. আজ আমি তোমার দেহ তোমার নিষ্প্রাণ শব রক্ষা করব সমুদ্র হতে বের করে নিব [যাতে তুমি তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য] পরবর্তীদের জন্য [নিদর্শন] শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত [হয়ে থাক।] অনন্তর তারা যেন চিনতে পারে তুমি একজন দাস মাত্র এবং তোমার মতো আচরণ করতে যেন তারা অগ্রণী না হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের কেউ কেউ তার মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল। সেহেতু তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তার লাশটি বের করে আনা হয়েছিল। অবশ্য মানুষের মধ্যে মক্কাবাসীদের মধ্যে অন্যকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান। এটা হতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ : فَا হলো আতেফা مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। যা سِيَاقْ দ্বারা বুঝা যায়। আর তা হলো فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ আর فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى -এর অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর কথা মানেনি। এটাকে اِيْمَانٌ بِالتَّسْلِيْمِ বলা হয়। এটা مُتَعَدِّىْ بِاللَّامِ হয়। আর এটাকে اِيْمَانٌ بِالتَّصْدِيْقِ হয়ে থাকে। আর সেটা مُتَعَدِّىْ بِالْبَاءِ হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ ذُرِّيَّةٌ : ذُرِّيَّةٌ শব্দের ذَالْ বর্ণে তিন ধরনের হরকতই হতে পারে। ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ অর্থ হলো– সন্তান সন্তুতি, বংশ। বহুবচনে ذَرَارِىُّ ; ذُرِّيَّاتٌ এখানে ذرية টা قِلَّتْ عَدَدْ -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। মুফাসসির (র.) ذُرِّيَّةٌ -এর তাফসীর طَائِفَةٌ দ্বারা করে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাফসীরে কাবীরে রয়েছে যে, هٰهُنَا مَعْنَاهَا التَّقْلِيْلُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, ذُرِّيَّةٌ শব্দটি যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর বলা হয় তখন এর দ্বারা تَصْغِيْر বা تَحْقِيْر উদ্দেশ্য হয়। قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَفْظُ الذُّرِّيَّةِ يُعَبَّرُ بِهٖ عَنِ الْقَوْمِ عَلٰى وَجْهِ التَّحْقِيْرِ وَالتَّصْغِيْرِ (كَبِيْر) যেহেতু এখানে تَحْقِيْر -এর কোনো قرينة নেই এ কারণে تصغير عدد -ই উদ্দেশ্য হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنْ قَوْمِهٖ : قَوْمِهٖ -এর যমীরটি দুটি ভিন্নমুখী অর্থ সৃষ্টি করে দিয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় ও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার ফেরাউনের সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রথম সুরতে উদ্দেশ্য এই নেওয়া হবে যে, ফেরাউন ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের ভয়ে শুরুতে ইসরাঈলীদের খুব কম লোকই হযরত মূসা (আ.) কথার সত্যায়ন করেছে। আর দ্বিতীয় সুরতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক জামাত উদ্দেশ্য হবে। যাতে সে সকল জাদুকররাও অন্তর্ভুক্ত যারা হযরত মূসা (আ.) মোকাবিলা করার জন্য এসেছিল এবং তাদের ব্যতীত ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, ফেরাউনের ট্রেজারার ও তার স্ত্রী, ফেরাউনের মেয়ের মাথা চিরুনি কারিণী এবং رَجُلٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ও এর অন্তর্ভুক্ত। মুফাসসির (র.) দ্বিতীয় شِقّ পছন্দ করে قَوْمِهٖ -এর যমীরকে ফেরাউনের দিকে ফিরিয়েছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ أَرْضِ مِصْرَ : এতে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন فِى الْاَرْضِ -এর মধ্যে اَلِف لَامْ টি عَهْدِى -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰمَنَ هَارُوْنُ عَلٰى دُعَائِهِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, বদদোয়া তো হযরত মূসা (আ.) করেছেন। এরপরও قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا -এর মধ্যে দ্বি-বচনের শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো?

উত্তরের সারকথা হলো, দোয়া করা এবং দোয়ার উপর اٰمِيْن বলা একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ حَمَاٍ : অর্থ– কালো মাটির কাঁদা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতে হযরত মূসা ও হারুন (আ.) এবং বনী ইসরাঈল ও ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তাহলো এই যে, বনী ইসরাঈল যারা হযরত মূসা (আ.)-এর দীনের উপর আমল করতো তাদের সবাই অভ্যাস অনুযায়ী নিজেদের 'সওমাআহ' তথা উপাসনালয়েই নামাজ আদায় করতো। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী ﷺ -এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনোখানে ইচ্ছা নামাজ আদায় করে নিতে পারে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মাঝে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা জমিনকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে; সব জায়গাতেই নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে এটা আলাদা কথা যে ফরজ নামাজসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামাজ ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরজ নামাজই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যাহোক বনী ইসরাঈলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামাজ আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপাসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল যাতে এরা নিজেদের ধর্মানুযায়ী নামাজ পড়তে না পারে। একই কারণে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উভয় পয়গাম্বর হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-কে এ নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসরে বনী ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহনির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী হবে যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামাজ আদায় করতে পারে।

এতে বোঝা যাচ্ছে, পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপাসনালয়েই নামাজ পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামাজ আদায় করে নেওয়ার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে যে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরেই নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছিল যা কিবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামাজ পড়ার অনুমতি তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী ﷺ -এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যে কোনো নগরে কিংবা মাঠে যে কোনো স্থানে নামাজ আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী]

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মতো যে, এ আয়াতে বনী ইসরাঈলদেরকে যে কিবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে তা কোন কিবলা ছিল? কা'বা ছিল, না বায়তুল মুকাদ্দাস? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য; বরং কা'বাই ছিল হযরত মূসা (আ.) ও তার আসহাবের কেবলা। –[কুরতুবী, রুহুল মা'আনী] কোনো কোনো ওলামা এমনও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের কিবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা নিজেদের নামাজে 'সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করতো, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আ.) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহ হওয়ার পরিপন্থি নয়।

এ আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামাজ পড়ার জন্য কিবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের শরিয়তের নামাজের জন্য পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আবাসগৃহসমূহকে কিবলামুখী করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাতেই যেন নামাজ আদায় করা হয়। সেজন্য তার পরেপরেই أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ -এর নির্দেশ দানের মাধ্যমে হেদায়েত দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফেরাউন যদি নির্ধারিত উপাসনালয়ে নামাজ আদায় করতে বাধা দান করে, তবে তাতে নামাজ রহিত হয়ে যাবে না; বরং নিজ নিজ ঘরে তা আদায় করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে; শত্রুর উপর তাদের জয় হবে এবং আখেরাতে তারা জান্নাতপ্রাপ্ত হবে। -[রূহুল মা'আনী]

আয়াতের শুরুতে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে দ্বিবচন পদের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে। তার কারণ, আবাসগৃহগুলোকে কিবলামুখী করে তাতে নামাজ পড়ার অনুমতি দান ছিল তাঁদেরই কাজ। অতঃপর বহুবচন পদের মাধ্যমে সমস্ত বনী ইসরাঈলকে অন্তর্ভুক্ত করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার কারণ, এ নির্দেশে পয়গাম্বর ও উম্মত সবাই শামিল। সবশেষে সুসংবাদ দানের নির্দেশটি দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে হযরত মূসা (আ.)-কে। তার কারণ, প্রকৃতপক্ষ তিনিই ছিলেন শরিয়তের অধিকারী নবী। জান্নাতের সুসংবাদ দান তাঁরই হক বা অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হযরত মূসা (আ.) যে বদদোয়া করেছিলেন, তা বর্ণিত হয়েছে। এর প্রারম্ভে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করেন যে, আপনি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের পার্থিব আড়ম্বরের সাজ সরঞ্জাম ও ধনদৌলত যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়েছেন। মিসর থেকে শুরু করে আবিসিনিয়া পর্যন্ত সোনা চাঁদী, হীরা জহরতের খনিসমূহ দিয়ে রেখেছেন। -[কুরতুবী] যার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে গুমরাহ করে দিচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষ তাদের বাহ্যিক সাজ সরঞ্জাম ও আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ বিলাস দেখে এমন সংশয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে যে, সত্যিই যদি এরা গোমরাহীর মধ্যেই থাকবে, তবে এরা আল্লাহ তা'আলার এসব নিয়ামত কেমন করে পেতে পারে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এই তাৎপর্যের গভীরে পৌঁছতে পারে না যে, নেক আমল ব্যতীত যদি কারো পার্থিব উন্নতি হয়, তবে তা তার ন্যায়-নিষ্ঠার লক্ষণ হতে পারে না। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়ার পর তার ধনৈশ্বর্য অন্য লোকদের গুমরাহ হয়ে পড়ার আশঙ্কা করে বদদোয়া করেন- رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদিগার, তার ধনৈশ্বর্যের রূপকে পরিবর্তিত করে বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় করে দাও।

হযরত কাতাদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, এই দোয়ার প্রতিক্রিয়ার ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সমস্ত হীরা-জহরত, নগদ মুদ্রা এবং বাগ-বাগিচা, শস্য ক্ষেতের সমস্ত ফল ফসল পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)-এর আমলে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল যাতে ফেরাউনের আমলের কিছু জিনিসপত্র রক্ষিত ছিল। তাতে ডিম এবং বাদামও দেখা যায় যা সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গিয়েছিল।

তাফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত ফলমূল, তরিতরকারি ও খাদ্যশস্যকে পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর এটি ছিল আল্লাহ তা'আলার সেই নয়টি [মেজোসূলভ] নিদর্শনের একটি যার আলোচনা কুরআন কারীমের وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ আয়াতে করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় বদদোয়া হযরত মূসা (আ.) তাদের জন্য করেছিলেন এই وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ। অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, তাদের অন্তরগুলোকে এমন কঠিন করে দাও, যে তাতে ঈমান এবং অন্য কোনো সৎকর্মের যোগ্যতা না থাকে। যাতে তারা বেদনাদায়ক আজাব আসার পূর্বে ঈমান আনতে না পারে।

কোনো নবী রাসূলের মুখে এমন বদদোয়া বাহ্যত অসম্ভব বলেই মনে হয়। কারণ মানুষকে ঈমান ও সৎকর্মের আমন্ত্রণ জানানো এবং সেজন্য চেষ্টা-সাধনা করাই হয়ে থাকে নবী রাসূলগণের জীবনের ব্রত।

কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনা হলো এই যে, হযরত মূসা (আ.) যাবতীয় চেষ্টা চরিত্রের পরে তাদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই কামনা করেছিলেন যে, এরা যেন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। এতে এমন একটা সম্ভাবনাও বিদ্যমান ছিল যে, এরা যে আবার আজাব আসতে দেখে ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে দেয় এবং তাতে করে আজাব স্থগিত হয়ে যায় তাই কুফরের প্রতি ঘৃণাবিদ্বেষই ছিল এই প্রার্থনার কারণ। যেমন, ফেরাউন ডুবে মরার সময় ঈমানের স্বীকৃতি দিতে আরম্ভ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তার মুখ বন্ধ করে দেন, যাতে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও করুণায় সে আজাব থেকে বেঁচে যেতে না পারে।

তাছাড়া এমন হতে পারে যে, এই বদদোয়াটি প্রকৃতপক্ষে বদদোয়াই নয়, বরং শয়তানের উপর যেমন লানত করা হয় তেমনি বিষয়। সে যখন কুরআনের প্রকৃষ্ট বর্ণনার মতোই লানতপ্রাপ্ত তখন তার উপর লানত করার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ তা'আলার যার উপর লানত চাপিয়ে দিয়েছেন, আমরাও তার উপর লানত করি। এক্ষেত্রে মর্ম দাঁড়াবে এই যে, তাদের অন্তরসমূহের কঠোর হয়ে পড়া এবং ঈমান ও সংশোধনের যোগ্য না থাকা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) বদদোয়ার আকারে সে বিষয়টিই প্রকাশ করেছেন মাত্র।

তৃতীয় আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর উক্ত দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু হযরত হারুন (আ.)-কেও দোয়ার অংশীদার সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে- قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا অর্থাৎ তোমাদের দুজনের দোয়া কবুল করে নেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় কোনো দোয়ায় 'আমীন' বলাও দোয়ারই অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু কুরআন কারীমে নিঃশব্দে দোয়া করাকেই দোয়ার সুন্নত নিয়ম বলে অভিহিত করা হয়েছে, কাজেই এতে 'আমীন' ও নিঃশব্দে বলাই উত্তম বলে মনে হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গাম্বরকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরিতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মতো তাড়াহুড়া করবেন না।

চতুর্থ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর বিখ্যাত মোজেজা সাগর পাড়ি দেওয়া এবং ফেরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনছি যে, যে আল্লাহর উপর বনী ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে- آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ কি এখন মুসলমান হচ্ছে। অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে?

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয় যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। -[তিরমিযী]

Free @ www.eilm.weebly.com

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মু'মিন বলা যাবে না এবং কাফন দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফেরাউনের মৃত্যু কুফরির অবস্থায় হয়েছে বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফেরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোনো ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে।-[রূহুল মা'আনী]

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা যদি এমনি মুমূর্ষু অবস্থায় কারো মুখ দিয়ে কুফরির বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফেরও বলা যাবে না। বরং তার জানাযার নামাজ পড়ে তাকে মুসলমানদের মতো দাফন করতে হবে এবং তার কুফরির বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোনো কোনো ওলীআল্লাহর অবস্থায় দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরির বাক্য মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরে যখন তার কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাতলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিন্ত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল বটে।

সারকথা এই যে, যখন রূহ, বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয় তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোনো আমল বা কার্যকলাপ শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ ঐ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রূহ্ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময় কিংবা তার পূর্ব মুহূর্ত।

قَوْلُهُ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ الخ : প্রথম আয়াতে ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পশ্চাৎবর্তীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শনও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হওয়ার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এলো এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপরে এই লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজো সে স্থানটি জাবালে ফেরাউন নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত কায়রোর জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনো ফেরাউন। কারণ ফেরাউন শব্দটি কোনো একক ব্যক্তির নাম নয়। সে যুগে মিসরে সব বাদশাহকেই ফেরাউন পদবী দেওয়া হতো।

কিন্তু এটাও কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসেবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে, বহু লোক আমার আয়াতসমূহ এবং নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে অমনোযোগী, সেগুলোর উপর চিন্তা-ভাবনা করে না এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। অন্যথায় পৃথিবীর প্রতিটি অণুকণায় এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে, যা লক্ষ্য করলে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩٣. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا اَنْزَلْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ مَنْزِلَ كَرَامَةٍ وَهُوَ الشَّامُ وَمِصْرُ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ فَمَا اخْتَلَفُوْا بِاَنْ اٰمَنَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ بِاِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَعْذِيْبِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে مُبَوَّاَ صِدْقٍ অর্থ– উৎকৃষ্ট আবাসস্থল। অর্থাৎ সিরিয়া ও মিশরে ঠিকানা দিলাম অবতরণ করালাম। এবং তাদেরকে উত্তম ও পবিত্র জীবনোপকরণ দিলাম। অতঃপর তাদের নিকট জ্ঞান না আসা পর্যন্ত তারা বিভেদ করেনি। জ্ঞান আসার পরই তারা বিভেদ করল, যেমন কেউ কেউ তার উপর ঈমান আনল আর কেউ কেউ তা প্রত্যাখ্যান করল। তারা যে বিষয়ে অর্থাৎ দীন ও ধর্মের বিষয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তোমার প্রতিপালক কিয়ামাতের দিন মু'মিনদেরকে মুক্তিদান ও কাফেরদেরকে শাস্তিদান করতো তার ফয়সালা করবেন।

٩٤. فَاِنْ كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْقَصَصِ فَرْضًا فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ مِنْ قَبْلِكَ ج فَاِنَّهُ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ يُخْبِرُوْنَكَ بِصِدْقِهٖ قَالَ ﷺ لَا اَشُكُّ وَلَا اَسْاَلُ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ اَلشَّاكِّيْنَ فِيْهِ ـ

৯৪. হে মুহাম্মদ ﷺ ! আমি তোমার প্রতি যা যে সমস্ত কাহিনী অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তুমি সন্দিহান তবে তোমার পূর্বের কিতাব তওরাত যারা পাঠ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। তাদের নিকট এগুলো সপ্রমাণিত, তারা তোমাকে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করবে। একথা নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, আমি সন্দেহ পোষণ করি না। সুতরাং আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার নিকট সত্য এসেছে। তুমি কখনো এতে সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। اَلْمُمْتَرِيْنَ : সন্দেহ পোষণকারী।

٩٥. وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

৯৫. এবং যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে তুমি কখনো তাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে।

٩٦. اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِالْعَذَابِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

৯৬. যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কথা অর্থাৎ আজাব সত্য হয়েছে অবশ্যম্ভাবী হয়েছে তারা ঈমান আনবে না।

٩٧. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ فَلَا يَنْفَعُهُمْ حِيْنَئِذٍ ـ

৯৭. যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ততক্ষণ তাদের নিকট সকল নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনবে না। কিন্তু ঐ সময়ের ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٨. فَلَوْلَا فَهَلَّا كَانَتْ قَرْيَةٌ أُرِيْدَ أَهْلُهَا آمَنَتْ قَبْلَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ بِهَا فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا لٰكِنْ قَوْمَ يُوْنُسَ ط لَمَّا آمَنُوْا عِنْدَ رُؤْيَةِ أَمَارَاتِ الْعَذَابِ الْمَوْعُوْدِ وَلَمْ يُؤَخِّرُوْا إِلٰى حُلُوْلِهِ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ إِلٰى حِيْنٍ انْقِضَاءِ آجَالِهِمْ.

৯৮. ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত এমন হয়নি যে, আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বক্ষণ কোনো জনপদ অর্থাৎ জনপদবাসী ঈমান আনয়ন করেছে আর এ ঈমান কোনো উপকার করেছে। প্রতিশ্রুত আজাবের আলামত দেখতে পেয়ে তারা যখন ঈমান আনল আজাব আপতিত হওয়া পর্যন্ত তারা ইউনুসের সম্প্রদায় বিলম্ব করল না তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবন হেয়কর শাস্তি বিদূরিত করে দিলাম এবং কিছুকালের জন্য তাদের জীবনকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবনোভোগ করতে দিলাম। لَوْلَا তা এস্থানে هَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। إِلَّا قَوْمَ : এ স্থানে إِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٩٩. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ط أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ بِمَا لَمْ يَشَأْ اللّٰهُ مِنْهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ لَا.

৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি আল্লাহ যা তাদের হতে চাননা সেই বিষয়ে মানুষের উপর জবরদস্তি করবে যাতে তারা মু'মিন হয়ে যায় সেই জন্য? না তুমি তা করবে না।

١٠٠. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ط بِإِرَادَتِهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ الْعَذَابَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ. يَتَدَبَّرُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ.

১০০. আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত তার ইচ্ছা ব্যতীত ঈমান আনয়নের কারো সাধ্য নেই। যারা অনুধাবন করে না অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহে চিন্তা ভাবনা করে না আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর 'রিজস' অর্থাৎ আজাব আপতিত করেন।

١٠١. قُلْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ انْظُرُوْا مَاذَا أَيِ الَّذِيْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا تُغْنِي الْآيٰتُ وَالنُّذُرُ جَمْعُ نَذِيْرٍ أَيِ الرُّسُلُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ أَيْ مَا تَنْفَعُهُمْ.

১০১. মক্কার কাফেরদেরকে বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রমাণ বহু নিদর্শনসমূহের যা কিছু আছে তৎপ্রতি লক্ষ্য কর। যারা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানানুসারে অবিশ্বাসী নিদর্শন ও ভীতি প্রদর্শন সেই সম্প্রদায়ের কাজে আসে না। এ সমস্ত তাদের কোনো উপকার পৌছবে না। اَلنُّذُرُ : তা نَذِيْرٌ-এর বহুবচন ভীতি প্রদর্শনকারীগণ। অর্থাৎ রাসূলগণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠٢. فَهَلْ مَا يَنْتَظِرُوْنَ بِتَكْذِيْبِكَ اِلاَّ مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْاُمَمِ اَىْ مِثْلَ وَقَائِعِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ قُلْ فَانْتَظِرُوْا ذٰلِكَ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ .

১০২. তারা তোমাকে অস্বীকার করতো তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর যে ধরনের দিন অতিবাহিত হয়েছে সেরূপ ব্যতীত অন্য কিছুর অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের উপর শাস্তির যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গিয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করতেছে না। বল, তোমরা তার প্রতীক্ষা কর, আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করতেছি। هَلْ এ প্রশ্নবোধক শব্দটি এস্থানে না বোধক শব্দ مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٣. ثُمَّ نُنَجِّىْ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْعَذَابِ كَذٰلِكَ ج الْاِنْجَاءُ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ . اَلنَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ حِيْنَ تَعْذِيْبِ الْمُشْرِكِيْنَ .

১০৩. পরিশেষে আমি আমার রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে আজাব হতে রক্ষা করি। نُنَجِّىْ অর্থাৎ আমরা উদ্ধার করতেছি। এস্থানে اَلْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ অর্থাৎ অতীতে সংঘটিত বিষয়টিকে ঘটমানরূপে চিত্রিত করতে مُضَارِعْ অর্থাৎ বর্তমানকাল বাচক ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবেই হয় রক্ষা করা; আমার দায়িত্ব হলো মু'মিনদের অর্থাৎ রাসূল ﷺ ও তার সঙ্গীদের মুশরিকদেরও উৎপীড়ন হতে রক্ষা করা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَوَّأْنَا : এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَبْوِيَةٌ মাসদার হতে جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো– ঠিকানা দেওয়া, মুনাসিব জায়গা ক্রয় করা।

قَوْلُهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ : এখানে مُبَوَّأً টি اِسْمُ مَكَانٍ অথবা মাসদার আর صِدْقٌ -এর দিকে ইজাফত আরবদের অভ্যাস অনুযায়ী হয়েছে। আরবগণ যখন কোনো কিছুর প্রশংসা করতে চায় তখন তার ইজাফত صِدْقٌ -এর দিকে করে দেয়। যেমন– هٰذَا رَجُلُ صِدْقٍ ، قَدَمَ صِدْقٍ এখানে উদ্দেশ্য হলো প্রশংসিত স্থান। مَقَامَ صِدْقٍ দ্বারা কেউ কেউ মিসর, কেউ কেউ জর্দান ও ফিলিস্তীন, কেউ কেউ শাম দেশ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ : এই ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, نُنَجِّىْ হলো مُضَارِعْ -এর সীগাহ যা حَالْ এবং اِسْتِقْبَالْ -এর উপর বুঝায়। এর অর্থ হলো বনী ইসরাঈলকে বর্তমানকালে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। অথবা ভবিষ্যতে দেওয়া হবে। অথচ মুক্তি তো অতীত কালেই দেওয়া হয়েছে।

উত্তর. এটা حِكَايَةُ حَالْ مَاضِيَةٍ -এর ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। মনে হয় যেন অতীতকালের অবস্থাকে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খলীল ইবরাহীম ও তার সন্তানবর্গের জন্য মিরাস বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কুরআন কারীমে مُبَوَّأَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْق অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তুসামগ্রী ও আরাম আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তার আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে তাওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করতো তাতে তার আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করতো, তার নিদর্শনসমূহ ও তার আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলতো, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ জামানার নবীর অসিলা দিয়ে দোয়া করতো, কিন্তু যখন শেষ জামানার নবী ﷺ তার যাবতীয় প্রমাণ এবং তওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমনকে جَاءَهُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে عِلْم বলতে নিশ্চিত বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে عِلْم অর্থ مَعْلُوْم অর্থাৎ যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হলো যা তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

আয়াতের শেষ ভাগে বাহ্যত মহানবী ﷺ কে সম্বোধন করা হলেও একথা অতি স্পষ্ট যে, ওহী সম্পর্কে তার সন্দেহ করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কাজেই এই সম্বোধনের মাধ্যমে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য। স্বয়ং তিনি উদ্দেশ্য নন। আবার এমনও হতে পারে যে, এতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, হে মানবকুল এই ওহীর ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, তাহলে তোমরা সেসব লোকের কাছে জিজ্ঞেস কর, যারা তোমাদের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করতো। তাহলে তারা তোমাদের বলে দেবে যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী (আ.) ও তাদের কিতাবসমূহ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সুসংবাদ দিয়ে এসেছে। তাতে তোমাদের মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে লোকের মনে দীনি ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ উদয় হয়, তার কর্তব্য হলো এই যে, সত্যপন্থি আলেমগণের নিকট জিজ্ঞেস করে সন্দেহ সংশয় দূর করে নেবে, সেগুলো মনের মাঝে লালন করবে না।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট আয়াতে একই বিষয়বস্তুর সমর্থন ও তাকিদ এবং এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীদের প্রতি সতর্কতা উচ্চারণ করা হয়েছে।

সপ্তম আয়াতে শৈথিল্যপরায়ণ মুনকিরদিগকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, জীবনের অবকাশকে গনিমত মনে কর, অস্বীকার এবং অবাধ্যতা থেকে এখনও বিরত হও। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে, যখন তওবা করলেও তা কবুল হবে না কিংবা ঈমান আনলেও তা কবুল হবে না। আর সে সময়টি হলো যখন মৃত্যুকালে আখেরাতের আজাব সামনে এসে উপস্থিত হয়। এ প্রসঙ্গেই হযরত ইউনুস (আ.) ও তার সম্প্রদায়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এমনটি কেন হলো না যে, অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী জাতিসমূহ এমন এক সময়ে ঈমান নিয়ে আসতো, যখন তাদের ঈমান তাদের জন্য লাভজনক হতো। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় কিংবা আজাব অনুষ্ঠিত ও আজাবে পতিত হওয়ার পর অথবা কিয়ামত সংঘটনের সময় যখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন কারো ঈমান কবুল করা হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাজেই তার পূর্বাহ্নেই নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে যেন বিরত হয়ে যায় এবং ঈমান নিয়ে আসে। অবশ্য হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন এমন সময় আসার পূর্বাহ্নে যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব আসতে দেখল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিল এবং ঈমান গ্রহণ করে ফেলল যার ফলে আমি তাদের উপর থেকে অপমানজনক আজাব সরিয়ে নিলাম।

তাফসীরের সারমর্ম এই যে, দুনিয়ার আজাব সামনে এসে উপস্থিত হলেও তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় না; বরং। তখন তওবা কবুল হতে পারে, অবশ্য আখেরাতের আজাবের উপস্থিতি হয় কিয়ামতের দিন হবে কিংবা মৃত্যুকালে। তা সে মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু হোক অথবা কোনো পার্থিব আজাবে পতিত হওয়ার মাধ্যমেই হোক, যেমনটি হয়েছিল ফেরাউনের ক্ষেত্রে।

সে কারণেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়া সাধারণ আল্লাহ তা'আলার রীতি বিরোধী হয়নি; বরং তারই আওতায় হয়েছে। কারণ তারা যদিও আজাবের আগমন প্রত্যক্ষ করেই তওবা করেছিল, কিন্তু তারা সে আজাবে পতিত হওয়ার কিংবা মৃত্যুর পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে যেহেতু ফেরাউন ও অন্য লোকদের যারা আজাবে পতিত হওয়ার পর মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস শুরু হওয়ার সময় তওবা করেছে এবং ঈমানের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেহেতু তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং সে তওবাও কবুল হয়নি।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনার একটি উদাহরণ স্বয়ং কুরআনে কারীমে বর্ণিত বনী ইসরাঈলদের সে ঘটনা যাতে তার পর্বতকে তাদের মাথার উপর টাঙ্গিয়ে দিয়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং তওবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তাতে তারাও তওবা করে নেয় এবং সে তওবা কবুল হয়ে যায়। সূরা বাকারায় এ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে– وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আমি তাদের উপর তুর পর্বতকে টাঙ্গিয়ে দিয়ে নির্দেশ করলাম যে, যেসব হুকুম আহকাম তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর।

এর কারণ ছিল এই যে, তারা আজাব সংঘটিত হওয়ার এবং মৃত্যুতে পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নে শুধু আজাবের আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করে তওবা করে নিয়েছিল। তেমনিভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় আজাবের আগমন লক্ষ্য করেই নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তওবা করে নেয় [এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে]। কাজেই ঐ তওবা কবুল হয়ে যাওয়াটা উল্লিখিত রীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় নয়। –[কুরতুবী]

এক্ষেত্রে সমকালীন কোনো কোনো লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গাম্বরের শৈথিল্যকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব সরে যাবার কারণ সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এই শৈথিল্যকেই আল্লাহ তা'আলার রোষের কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ 'কুরআনের ইঙ্গিত এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিবষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আজাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তার সঙ্গীসাথীগণ তওবা ইস্তেগফার করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন আল্লাহ তা'আলার যেসব রীতি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতি সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আজাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলার ন্যায়নীতি তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আজাব দান করতে সম্মত হয়নি। –[তাফহীমুল কুরআন : মাওলানা মওদুদী, পৃ. ৩১২, জিলদ. ২]

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের পাপ থেকে মা'সুম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা কবীরা সর্বপ্রকার গুনাহ থেকেই না শুধু কবীরা গুনাহ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কি না? কিন্তু এতে কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারো কোনো মতবিরোধ নেই.যে, নবী রাসূলগণের কেউই রিসালতের দায়িত্ব পালনে কোনো রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ নবী-রাসূলগণের জন্য এর চাইতে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বাচন করেছেন, তারা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খেয়ানত, যা সাধারণ শালীনতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ত্রুটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ!

কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিশ্বাসের পরিপন্থি বাহ্যিক কোনো কথা যদি কুরআন হাদীসের মাঝেও কোনোখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কুরআান হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লিখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কুরআন কারীম ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন তা সহীফায়ে ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোনো গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই। তবে এ ব্যাপারে কুরআনি ইঙ্গিত একটিও নেই। বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদস্তিমূলকভাবে।

প্রথমে তো ধরা নেওয়া হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওমের উপর থেকে আজাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা স্বয়ং এ আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তাফসীরশাস্ত্রের গবেষক ইমামগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও পরিপন্থি। তারপর এর সাথে এ কথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ঐশী রীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লঙ্ঘন করা হয়েছে যে, স্বয়ং নবী দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে একথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পয়গাম্বরের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দীনের প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সামান্যতম বিচার-বিবেচনাও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর কোনো ইঙ্গিত এসব মনগড়া প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুজে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কুরআনের আয়াতের বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আয়াতে বলা হয়েছে- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ-এর পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনইবা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসতো যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো। অর্থাৎ আজাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে আগে যদি ঈমান নিয়ে আসতো, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। কিন্তু হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আজাবের লক্ষণাদি দেখে আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবুল হয়ে যায়।

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোনো ঐশীরীতির লঙ্ঘন করা হয়নি। বরং একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঈমান ও তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছে।

অধিকাংশ তাফসীরকার বাহরে মুহীত, কুরতুবী, যমখশারী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ আল্লাহ তা'আলার রীতিই আওতায়ই হয়েছে। কুরতুবীর বক্তব্য নিম্নরূপ-

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ غَشِيَهُمُ الْعَذَابُ كَمَا يَغْشَى الثَّوْبُ الْقَبْرَ فَلَمَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُمْ رَفَعَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ خُصَّ قَوْمُ يُوْنُسَ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْاُمَمِ بِاَنْ تِيْبَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ وَذَكَرَ ذٰلِكَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ اِنَّهُمْ لَمْ يَقَعْ بِهِمُ الْعَذَابُ وَاِنَّمَا رَاَوُا الْعَلَامَةَ الَّتِيْ تَدُلُّ عَلَى الْعَذَابِ وَلَوْ رَاَوْا عَيْنَ الْعَذَابِ لَمَّا نَفَعَهُمْ اِيْمَانُهُمْ. قُلْتُ قَوْلُ الزَّجَّاجِ حَسَنٌ فَاِنَّ الْمُعَايَنَةَ الَّتِيْ لَا تَنْفَعُ التَّوْبَةُ مِنْهَا هِيَ التَّلَبُّسُ بِالْعَذَابِ كَقِصَّةِ فِرْعَوْنَ وَلِهٰذَا جَاءَ بِقِصَّةِ قَوْمِ يُوْنُسَ عَلٰى اَثَرِ قِصَّةِ فِرْعَوْنَ، وَيَعْضُدُ هٰذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ وَالْغَرْغَرَةُ الْحَشْرَجَةُ وَذٰلِكَ هُوَ حَالُ التَّلَبُّسِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ رُوِيَ مَعْنٰى مَا قُلْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) (اِلٰى) وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ تَوْبَتَهُمْ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْعَذَابِ (اِلٰى) وَعَلٰى هٰذَا فَلَا اِشْكَالَ وَلَا تَعَارُضَ وَلَا خُصُوْصَ.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ হযরত ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন যে, আজাব তাদেরকে এমনভাবে আবৃত করে নেয়, যেমন কবরের উপর চাদর। তারপর যেহেতু তাদের তওবা [আজাব আসার পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হওয়ার দরুন] যথার্থ হয়ে যায়, তাই তাদের আজাব তুলে নেওয়া হয়। তাবারী (র.) বলেন যে, সমগ্র বিশ্ব সম্প্রদায়ের উপর হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এই বৈশিষ্ট্য দান করা হয় যে, আজাব প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়। যুজাজ বলেন যে, তাদের উপর তখনও আজাব পতিত হয়নি; বরং আজাবের লক্ষণই শুধু দেখতে পেয়েছিল। যদি আজাব পতিত হয়ে যেত, তবে তাদের তওবাও কবুল হতো না। কুরতুবী (র.) বলেন যে, যুজাজের অভিমতটি উত্তম ও ভালো। কারণ যে আজাব দর্শনের পর তওবা কবুল হয় না, তা হলো সে আজাব যাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছে ফেরাউনের ঘটনায়। আর সে কারণেই এ সূরায় ইউনুসের সম্প্রদায়ের ঘটনাটি ফেরাউনের ঘটনার লাগালাগি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এ পার্থক্য নিরূপিত হয়ে যায় যে, ফেরাউনের ঈমান ছিল আজাবে পতিত হওয়ার পর। আর তার বিপরীতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ঈমান ছিল আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বে। এই দাবির সমর্থন মহানবী ﷺ -এর বাণীতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন যে, বান্দার তওবা সে সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কবুল করে থাকেন, যতক্ষণ না সে মৃত্যুর গরগরা বা মুমূর্ষু অবস্থার সম্মুখীন হয়। আর গরগরা বলা হয় মৃত্যুকালীন অচেতন অবস্থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতেও একথাই বুঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বাহ্নেই তওবা করে নিয়েছিল। কুরতুবী (র.) বলেন যে, এই বক্তব্য ও বিশ্লেষণে না কোনো আপত্তি আছে, না আছে স্ববিরোধিতা, আর নাই বা আছে ইউনুস সম্প্রদায়ের কোনো নির্দিষ্টতা।

আর তাবারী প্রমুখ তাফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের কেউই একথা বলেন নি যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল হযরত ইউনুস (আ.)-এর ত্রুটিসমূহ। বরং সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন।

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ আল্লাহ তা'আলার রীতির পরিপন্থি নয়, বরং একান্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে কুরআনের কোনো বক্তব্যে এ কথা প্রমাণিত নেই যে, আজাবের দুঃসংবাদ শুনানোর পর হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই তার সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান। বরং আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তাফসীর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, সমস্ত সাবেক উম্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ চলে আসছিল অর্থাৎ তাদের উম্মতের উপর আজাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলাও তার পয়গাম্বরগণকে এবং তাদের সঙ্গীদেরকে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন। যেমন হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে, তেমনিভাবে এখানে আল্লাহ তা'আলার সে নির্দেশ যখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হয় যে, তিনদিন পর আজাব আসবে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টত একথাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয়েছে।

অবশ্য পয়গাম্বরসূলভ মর্যদার দিক দিয়ে হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতের আয়াতসমূহে যে ভর্ৎসনাসূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে, তা এজন্য নয় যে, তিনি রিসালাতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন, বরং ঘটনাটি তাই, যা উপরে প্রমাণ্য তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে লেখা হয়েছে। তা হলো এই যে, হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ মোতাবেক তিনদিন পর আজাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান। পরে যখন আজাব আসেনি, তখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ার মধ্যে প্রাণেরও আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথই ছিল না। কিন্তু নবী রাসূলগণের রীতি

হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো দিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছামতো তারা হিজরত করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস (আ.)-এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপ না হলেও নবী রাসূলগণের রীতির পরিপন্থি ছিল। কুরআনের আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, হযরত ইউনুস (আ.)-এর পদস্খলন রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর কোনো কিছুই প্রমাণিত হবে না। সূরা সাফফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে- إِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে اَبَقَ শব্দ ভর্ৎসনা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোনো ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা আম্বিয়ার আয়াতে রয়েছে- وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এসবই রিসালাতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে-

اَىْ غَضْبَانَ عَلٰى قَوْمِهٖ لِشِدَّةِ شِكَايَتِهِمْ وَتَمَادِىْ اِصْرَارِهِمْ مَعَ طُوْلِ دَعْوَتِهٖ اِيَّاهُمْ وَكَانَ ذِهَابُهٗ هٰذَا سَهْمُ هِجْرَةٍ عَنْهُمْ لٰكِنَّهٗ لَمْ يُؤْمَرْ بِهٖ.

অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরির উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রিসালাতের আহ্বান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন। বস্তুত তার এ সফর ছিল হিজরত হিসেবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেন নি।

এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লিখিত সমকালীন তাফসীরকারকে কোনো কোনো ওলামা তার এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা সাফফাতের তাফসীর স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তাফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনেটির দ্বারাই তার এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা [মা'আযাল্লাহ] রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তাফসীরবিদগণ নিজেদের তাফসীরে এমন সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রমাণ কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরিয়তের কোনো হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তাফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তার দ্বারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোনো তাফসীরকার এহেন কোনো মত গ্রহণও করেন নি।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা : হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা যার কিছু কুরআনের এবং কিছু হাদীস ও ইতিহাসের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, তা এই যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় ইরাকের বিখ্যাত মুছেল এলাকার নীনেওয়া নামক জনপদে বসবাস করতো। কুরআনে তাদের সংখ্যা এক লক্ষ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে পাঠান। তারা ঈমান আনতে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে নির্দেশ দান করেন যেন এদের জানিয়ে দেন যে, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের উপর আজাব

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

নাজিল হবে। হযরত ইউনুস (আ.) সম্প্রদায়ের মাঝে এ ঘোষণা দিয়ে দেন। অতঃপর হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এ বিষয়ে একমত হয়ে যে, আমরা কখনো হযরত ইউনুস (আ.)-কে মিথ্যা বলতে শুনিনি। কাজেই তার কথা উপেক্ষা করার মতো নয়। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হলো যে, দেখা যাক, হযরত ইউনুস (আ.) রাতের বেলা আমাদের মাঝে নিজের জায়গায় অবস্থান করেন কি না। যদি তিনি তাই করেন তবে বুঝব, কিছুই হবে না। আর যদি তিনি এখান থেকে কোথাও চলে যান, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করবো যে, ভোরে আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার আজাব নেমে আসবে। হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার কথামতো রাতের বেলায় সেই বস্তি থেকে বেরিয়ে যান। ভোর হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার আজাব এক কালো ধোঁয়া ও মেঘের আকারে তাদের মাথার উপর চক্রাবর্তের মতো ঘুরপাক খেতে থাকে এবং আকাশ দিগন্তের নিচে তাদের নিকটবর্তী হয়ে আসতে থাকে। তখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এবার আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। এ অবস্থা দেখে তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর সন্ধান করতে আরম্ভ করে, যাতে তাঁর হাতে ঈমানের দীক্ষা নিতে এবং বিগত অস্বীকৃতির ব্যাপারে তওবা করে নিতে পারে। কিন্তু যখন হযরত ইউনুস (আ.)-কে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন নিজেরা নিজেরাই একান্ত নির্মলচিত্তে, বিশুদ্ধ মনে তওবা ইস্তেগফারের উদ্দেশ্যে জনপদ থেকে এক মাঠে বেরিয়ে গেল। সমস্ত নারী, শিশু এবং জীব জন্তুকেও সে মাঠে এনে সমবেত করা হলো। চটের কাপড় পরে অতি বিনয়ের সাথে সে মাঠে তওবা ইস্তেগফার এবং আজাব থেকে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনায় এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে যায় যে, গোটা মাঠ আহাজারিতে গুঞ্জরিত হতে থাকে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব সরিয়ে দেন, যেমন এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ দিনটি ছিল আশুরা তথা ১০ই মহররমের দিন।

এদিকে হযরত ইউনুস (আ.) বস্তির বাইরে এ অপেক্ষায় ছিলেন যে, এখনই এই সম্প্রদায়ের উপর আজাব নাজিল হবে। তাদের তওবা ইস্তেগফারের বিষয় তাঁর জানা ছিল না। কাজেই যখন আজাব খণ্ড চলে গেল, তখন তার মনে চিন্তা হলো যে, আমাকে [নির্ঘাৎ] মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, তিনদিনের মধ্যে আজাব এসে যাবে। এ সম্প্রদায়ে আইন প্রচলিত ছিল যে, যার মিথ্যা সম্পর্কে জানা যায় এবং সে যদি তার দাবির পক্ষে কোনো সাফ প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। অতএব হযরত ইউনুস (আ.)-এর মনেও আশঙ্কা দেখা দেয় যে, আমাকেও মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে হত্যা করে ফেলা হবে।

নবী রাসূলগণ যাবতীয় পাপ তাপ থেকে মা'সূম হয়ে থাকেন সত্য, কিন্তু মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি থেকে মুক্ত বা পৃথক থাকেন না। সুতরাং তখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মনে স্বভাবতই এই ভাবনা উপস্থিত হয় যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মতোই ঘোষণা করেছিলাম, অথচ এখন আমি সে ঘোষণার কারণে মিথ্যুক প্রতিপন্ন হয়ে যাব। নিজের অবস্থানেই বা কোন মুখে ফিরে যাই এবং সম্প্রদায়ের আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হই। এই দুঃখ-বেদনা ও পেরেশান অবস্থায় এ শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়েন। রোম সাগরের তীরে পৌছে সেখানে একটি নৌকা দেখতে পান। তাতে লোক আরোহণ করছিল। হযরত ইউনুস (আ.)-কে আরোহীরা চিনতে পারল এবং বিনা ভাড়ায় তুলে নিল। নৌকা রওয়ানা হয়ে যখন মধ্য নদীতে গিয়ে পৌছল, তখন হঠাৎ তা থেমে গেল। না সামনে যেতে পারছিল, না পিছনের দিকে ফিরে আসতে পারছিল। নৌকার আরোহীরা ঘোষণা করল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের এই নৌকার এমনই গুণ যে, এতে যখনই কোনো জালেম, পাপী কিংবা ফেরারী গোলাম আরোহণ করে, তখন এটি নিজে নিজেই থেমে যায়। কাজেই যে লোক এমন তাকে তা প্রকাশ করে ফেলাই উচিত, যাতে একজনের জন্য সবার উপর বিপদ না আসে।

হযরত ইউনুস (আ.) বলে উঠলেন, "আমি ফেরারী গোলাম, পাপীটি আমিই বটে।" কারণ নিজের শহর থেকে পালিয়ে তাঁর নৌকায় আরোহণ করাটা ছিল একটি স্বভাবজাত ভয়ের দরুন, আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে নয়। এই বিনা অনুমতিতে এদিকে চলে আসাকে হযরত ইউনুস (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ মর্যাদা একটি পাপ হিসেবেই গণ্য করল। কেননা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

গাম্বরের কোনো গতিবিধি আল্লাহ তা'আলার বিনা অনুমতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্যই বললেন, আমাকে সাগরে লে দিলে তোমরা সবাই এ বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু নৌকার লোকেরা তাতে সম্মত হলো না, বরং তারা লটারী ল যে, লটারীতে যার নাম উঠবে, তাকেই সাগরে ফেলে দেওয়া হবে। দৈবক্রমে লটারীতেও হযরত ইউনুস (আ.)-এর উঠল। সবাই এতে বিস্মিত হলো। তখন কয়েকবার লটারী করা হলো এবং সব কয়বারই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রত ইউনুস (আ.)-এর নাম উঠতে থাকল। কুরআন কারীমে এই লটারী এবং তাতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম র বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে- فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ

রত ইউনুস (আ.)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার এ আচরণ ছিল তার বিশেষ পয়গাম্বরোচিত মর্যাদারই কারণ। যদিও ন আল্লাহ তা'আলার কোনো হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করেন নি যাকে পাপ বলে গণ্য করা যায় এবং কোনো পয়গাম্বরের তার সম্ভাবনাও নেই। কারণ তারা হলেন, মা'সুম তথা নিষ্পাপ, কিন্তু তা পয়গাম্বরের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে এমনটি ভন ছিল না যে, শুধুমাত্র স্বাভাবিক ভয়ের দরুন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই কোথাও স্থানান্তরিত হবেন। এই দাবহির্ভূত কাজের জন্য ভর্ৎসনা হিসেবেই এ আচরণ করা হয়েছে।

কে লটারীতে নাম উঠার ফলে সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল আর অপরদিকে একটি বিরাটকায় মাছ আল্লাহ আলার নির্দেশক্রমে নৌকার কাছে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছিল, যাতে তিনি সাগরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে নিজের ট ঠাঁই করে দিতে পারে। তাঁকে পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর যা তোমার পেটের ভিতরে রাখা হবে, তা কিন্তু তোমার আহার্য নয়; বরং আমি তোমার পেটকে তার আবাস করছি। রাং হযরত ইউনুস (আ.) সাগরে পৌছার সাথে সাথে সে মাছ তাঁকে মুখে নিয়ে নিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ .) বলেন, হযরত ইউনুস (আ.) এ মাছের পেটে চল্লিশ দিন ছিলেন। সে তাকে মাটির তলদেশ পর্যন্ত নিয়ে যেত এবং দূর-দূরান্তে নিয়ে বেড়াত। কোনো কোনো মনীষী সাত দিন, কেউ কেউ পাঁচ দিন, আবার কেউ কেউ এক দিনের কয়েক কাল মাছের পেটে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। -[মাযহারী]

র প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এ অবস্থায় হযরত ইউনুস (আ.) দোয়া করেন-

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

ল্লাহ তা'আলা তার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় হযরত ইউনুস (আ.)-কে সাগর তীরে ফেলে দেন।

ছর পেটের উষ্ণতার দরুন তার শরীরে কোনো লোম ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছাকাছি একটি লাউ গাছ গিয়ে দেন, যার পাতার ছায়া হযরত ইউনুস (আ.)-এর জন্য এক প্রশান্তি হয়ে যায়। আর এক বন্য ছাগলকে আল্লাহ আলা ইশারা দিয়ে দেন, সে সকাল সন্ধ্যায় তার কাছে এসে দাঁড়াত আর তিনি তার দুধ পান করে নিতেন।

াবে হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি তাঁর পদস্খলনের জন্য সতর্কীকরণ হয়ে যায়। আর পরে তাঁর সম্প্রদায় ও বিস্তারিত স্থা জানতে পারে।

কাহিনীতে যে অংশগুলো কুরআনে উল্লেখ রয়েছে কিংবা প্রামাণ্য হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলো তো ন্দহাতীতভাবে সত্য, কিন্তু বাকি অংশগুলো ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে গৃহীত, যার উপর শরিয়তের কোনো মাসআলার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٠٤. قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اِنْ
كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ اَنَّهٗ حَقٌّ فَلَاۤ
اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ
غَيْرِهٖ وَهُوَ الْاَصْنَامُ لِشَكِّكُمْ فِيْهِ
وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ
يَقْبِضُ اَرْوَاحَكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَىْ بِاَنْ
اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقِيْلَ لِىْ ـ

১০৪. বল, হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ। তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি অর্থাৎ তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত হও তবে জেনে রাখ, তাতে সংশয়ের কারণে তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যার অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিমার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করি না বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহ তা'আলার যিনি তোমাদেরকে মৃত্যু ঘটান। তোমাদের রূহসমূহ সংহার করেন। আর মু'মিনদেরকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। اَنْ এস্থানে بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত।

١٠٥. اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج
مَائِلًا اِلَيْهِ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ـ

১০৫. আর আমাকে বলা হয়েছে তুমি একনিষ্ঠভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এই দিনেই তুমি অনুরক্ত হয়ে থাক এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

١٠٦. وَلَا تَدْعُ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا
يَنْفَعُكَ اِنْ عَبَدْتَّهٗ وَلَا يَضُرُّكَ اِنْ لَّمْ
تَعْبُدْهُ فَاِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَرْضًا فَاِنَّكَ
اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

১০৬. এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, অন্য কারো ইবাদত করো না। যাদের ইবাদত করলেও তোমাদের কোনো উপকার করে না আর ইবাদত না করলেও তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যদি তা কর তবে নিশ্চয় তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

١٠٧. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ يُصِبْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ
كَفَقْرٍ وَّمَرَضٍ فَلَا كَاشِفَ رَافِعَ لَهٗۤ اِلَّا
هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ دَافِعَ
لِفَضْلِهٖ ط اَلَّذِىْ اَرَادَكَ بِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ
اَىْ بِالْخَيْرِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط
وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

১০৭. আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের ক্লেশ দেন ক্ষতি পৌছান যেমন, দারিদ্র্য, অসুস্থতা ইত্যাদি দ্বারা তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী বিদূরণকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তার অনুগ্রহ যা তিনি তোমাকে করবার ইচ্ছা করেছেন তা প্রতিহত করবার রদ করবার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি তা অর্থাৎ মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৮. قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ قَدْ جَاۤءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج لِاَنَّ ثَوَابَ اِهْتِدَائِهٖ لَهٗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط لِاَنَّ وَبَالَ ضَلَالِهٖ عَلَيْهَا وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ فَاُجْبِرُكُمْ عَلَى الْهُدٰى .

১০৮. বল হে মানুষ! মক্কাবাসীগণ, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। অনন্তর যারা হেদায়েত গ্রহণ করবে তারা নিজের জন্যই হেদায়েত অবলম্বন করবে। কারণ হেদায়েত অবলম্বনের ছওয়াব ও পুণ্যফল তারই। এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে নিজেদের অকল্যাণের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে। কারণ তার এই পথভ্রষ্টতার মন্দ পরিণাম তারই উপর বর্তাবে। আমি তোমাদের কর্মবিধায়ক নই যে তোমাদেরকে আমি কোনোরূপ জবরদস্তি করব।

১০৯. وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ عَلَى الدَّعْوَةِ وَاَذَاهُمْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ج فِيْهِمْ بِاَمْرِهٖ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ . اَعْدَلُهُمْ وَقَدْ صَبَرَ حَتّٰى حَكَمَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ بِالْقِتَالِ وَاَهْلِ الْكِتَابِ بِالْجِزْيَةِ .

১০৯. তোমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর এবং তুমি দীনের আহ্বানে এবং তাদের উৎপীড়নের সামনে ধৈর্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না তাদের বিষয়টি আল্লাহ তাঁর বিধান দ্বারা ফয়সালা করে দিয়েছেন। আর তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিধানকারী। এই নির্দেশ অনুসারে তাদের বিষয়ে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের এবং কিতাবীদের বিষয়ে জিযিয়ার বিধান জারি হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنَّهٗ حَقٌّ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, شَكٌّ-এর সম্পর্ক مُفْرَدٌ হতে হয় না। এ কারণেই মুফাসসির (র.) اِنَّهٗ حَقٌّ উহ্য মেনেছেন। যাতে করে شَكٌّ-এর সম্পর্ক জুমলার সাথে হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يَتَوَفَّاكُمْ : এটা বাবে تَفَعُّلٌ-এর تَوَفِّىْ মাসদার হতে مُضَارِعٌ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ كُمْ যমীর হলো মাফউল। অর্থ হলো– তোমাদেরকে পুরোপুরি নেয়। তোমাদের রূহ কবজ করে।

قَوْلُهُ قِيْلَ لِىْ : এটা বৃদ্ধি করা হয়েছে مَا قَبْلَ-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য। কেননা مَا قَبْلَ-এর মধ্যে وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আছে। এখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে– اُمِرْتُ وَقِيْلَ لِىْ اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

قَوْلُهُ ذٰلِكَ فَرْضًا : এটা হলো এই প্রশ্নের জবাব যে, নবীর দ্বারা غَيْرُ اللّٰهِ-এর ইবাদত অসম্ভব। এরপরেও কেন এরূপভাবে সম্বোধন করা হয়েছে? মুফাসসির (র.)-এর উত্তর দিয়েছেন যে, এটা عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيْرِ হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى الدَّعْوَةِ : পূর্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই قَيْد-এর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ الخ : এই সূরার শুরু থেকে এই পর্যন্ত দীন ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ যথা তাওহীদ, রেসালাত, হাশর নাশর, কিয়ামত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে দলিল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে, হে নবী! আপনি সকলকে জানিয়ে দিন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যে, আমি যে ধর্মের দাওয়াত তোমাদেরকে দিয়েছি সে সম্পর্কে তোমরা যদি এখনও সন্দিহান থাক বা বুঝতে অপারগ হও তবে একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের মনগড়া হাতের তৈরি উপাস্যদের মানি না, কোনো দিনও মানবো না। আমি সে আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগী করি যিনি জীবন মরণের মালিক, যিনি আমাদেরকে জীবন দান করেছেন এবং যার আদেশেই হয় মৃত্যু, বন্দেগীর উপযুক্ত একমাত্র তিনিই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে জীবন ও মৃত্যু উভয়টিই যে আল্লাহ তা'আলার আদেশে হয় একথা বলাই উদ্দেশ্য। তবে শুধু মৃত্যুর উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যেন শ্রোতার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়।

আয়াতের মর্মকথা হলো এই যদি তোমরা দীন ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে তবে সে সম্পর্কে চিন্তা চর্চা করে সন্দেহ দূরীভূত কর। মনে রেখো! আমি এই পাথরের সম্মুখে মাথা নত করি না যা কোনো উপকার করতে পারে না। অপকারও করতে পারে না এমন কিছুর বন্দেগী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; বরং আমি বন্দেগী করি এক, অদ্বিতীয়, লাশারীক আল্লাহ তা'আলার, যাঁর হাতে রয়েছে আমাদের জীবন ও মরণ, আমার উপর এ আদেশ হয়েছে যেন আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হই। আর একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করি শিরক ও কুফর থেকে দূরে থাকি।

قَوْلُهُ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ الخ :

বস্তুত, মানুষের লাভ ক্ষতি, ভালো মন্দ সবই এক আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে। যদি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোনো লোককে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে মর্জি করেন তবে তিনি ভিন্ন আর কেউ এমন নেই যে ঐ কষ্ট দূর করতে পারে। আর যদি আল্লাহ তা'আলা কারো কল্যাণ সাধন করতে চান তবে তাকে বাধা দেওয়ার শক্তিও কারো নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার কল্যাণ সাধন করেন। অতএব, বন্দেগী শুধু তারই করা উচিত আর কারো নয়, জীবনের মালিক তিনিই, আর কেউ নয়।

قَوْلُهُ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ : ইতিপূর্বে দীন ইসলামের মৌলিক নীতি সমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করা হয়েছে, তোমাদের নিকৃষ্ট সত্য দীন এসেছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মাধ্যমে তোমাদেরকে জীবনের সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন তোমরা নিজেদের পথভ্রষ্টতার জন্য কোনো ওজর আপত্তি পেশ করতে পারবে না। যদি তোমরা হেদায়েত গ্রহণ কর তবে তোমাদেরই উপকার। আর যদি তোমরা হেদায়াত গ্রহণ না কর তবে তাতে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহ তা'আলার পথে চলবে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত আর যারা পথভ্রষ্ট হবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ তা'আলার রাসূলের কাজ হলো মানুষকে সৎপথ দেখানো। আর সে কাজ তিনি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে সর্বময় কর্তারূপে প্রেরণ করেন না, তিনি মানুষকে হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করবেন; বরং রাসূল আগমন করেন সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, তাই ইরশাদ হয়েছে- مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ অর্থাৎ আর আমি তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই।

এর পরবর্তী আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা যদি সৎপথে না আসে আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তবে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে যে নির্দেশ আসে তা মেনে চলুন আর কাফেরদের পক্ষ থেকে জুলুম অত্যাচার করা হলে তাতে সবর অবলম্বন করুন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বিজয় দান করেন, অথবা যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ প্রদান করেন এবং মু'মিনদের ও কাফেরদের মধ্যে যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক নিষ্পত্তি না করে দেন সে পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে আপন কর্তব্য পালন করতে থাকুন।

وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ

তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। তার নির্দেশে কোনো ভুলভ্রান্তি হয় না, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়েই সম্পূর্ণ অবগত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ هُوْدٍ مَكِّيَّةٌ : সূরা হূদ মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ الْاٰيَةَ وَاُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ الْاٰيَةَ مِائَةٌ وَّثِنْتَانِ اَوْ ثَلٰثٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

সূরা হূদ اَقِمِ الصَّلٰوةَ আয়াতটি বা فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ এবং اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ

এই আয়াত দুটি ব্যতীত সূরাটি মক্কী ১২২ অথবা ১২৩ আয়াত বিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. الٓرٰ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ هٰذَا كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ بِعَجِيْبِ النَّظْمِ وَبَدِيْعِ الْمَعَانِيْ ثُمَّ فُصِّلَتْ بُيِّنَتْ بِالْاَحْكَامِ وَالْقِصَصِ وَالْمَوَاعِظِ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ . اَيِ اللّٰهِ .

১. আলিফ লাম রা তার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবহিত। এটা একটি কিতাব, তার আয়াতসমূহ অত্যাশ্চর্য বিন্যাস ও অভিনব ভাষা অলঙ্কার দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বিবৃত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিধি-বিধান, কাহিনীও উপদেশসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞসত্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে।

٢. اَ اَيْ بِاَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ بِالْعَذَابِ اِنْ كَفَرْتُمْ وَّبَشِيْرٌ بِالثَّوَابِ اِنْ اٰمَنْتُمْ .

২. তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কুফরি করলে আজাব সম্পর্কে সতর্ককারী আর ঈমান আনয়ন করলে পুণ্যফল সম্পর্কে সুসংবাদ দানকারী। اَلَّا মূলত ছিল اَنْ لَا তার اَنْ টি এস্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣. وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اَرْجِعُوْا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ يُمَتِّعْكُمْ فِي الدُّنْيَا مَتَاعًا حَسَنًا بِطِيْبِ عَيْشٍ وَسَعَةِ رِزْقٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى هُوَ الْمَوْتُ وَّيُؤْتِ فِي الْاٰخِرَةِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فِي الْعَمَلِ فَضْلَهٗ جَزَاءَهٗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فِيْهِ حُذِفَ اِحْدَى التَّائَيْنِ اَيْ تُعْرِضُوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ .

৩. আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট শিরক হতে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তার প্রতি তওবা কর, ফিরে আস। তিনি তোমাদেরকে পার্থিব জগতে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দিবেন রিজিকের মধ্যে সচ্ছলতা ও সুখী জীবন দান করবেন। আর পরকালে কার্য সম্পাদনে মর্যাদাবান প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দান করবেন। তার প্রতিফল প্রদান করবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহা দিবসের। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের শাস্তির। تَوَلَّوْا তাতে মূলত একটি ت বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . وَمِنْهُ الثَّوَابُ وَالْعَذَابُ .

٥. وَنَزَلَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِيْمَنْ كَانَ يَسْتَحْيِيْ اَنْ يَّتَخَلّٰى اَوْ يُجَامِعَ فَيُفْضِيَ اِلَى السَّمَاءِ وَقِيْلَ فِي الْمُنَافِقِيْنَ اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اَيِ اللّٰهِ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَتَغَطَّوْنَ بِهَا يَعْلَمُ تَعَالٰى مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ج فَلَا يُغْنِيْ اِسْتِخْفَاؤُهُمْ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ . اَيْ بِمَا فِي الْقُلُوْبِ .

অনুবাদ :

৪. আল্লাহ তা'আলারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন, এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। পুণ্যফল বা শাস্তি দানও তার শক্তির অন্তর্ভুক্ত।

৫. ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, মুসলিমদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ব্যক্তিও ছিলেন, যারা পেশাব-পায়খানা ও স্ত্রী সঙ্গম করতেও লজ্জা পেতেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন। কেউ কেউ বলেন, মুনাফিক সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এই আয়াত নাজিল হয়েছিল। শোন এরা তার নিকট হতে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে গোপন রাখার জন্য তাদের বক্ষ ফিরিয়ে নেয়। শোন, তারা যখন তাদের বস্ত্র পরিধান করে তার দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদিত করে তিনি তো জানেন তখন তারা যা লুকায় এবং প্রকাশ করে। সুতরাং তাকে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। তিনি তো নিশ্চয়ই মনে যা আছে তাও জানেন।

مَافِي الصُّدُوْرِ অর্থ– মনে যা আছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُوْرَةُ هُوْدَ : এটা مُرَكَّب إِضَافِيْ হয়ে মুবতাদা আর مَكِّيَّةٌ হলো প্রথম খবর। مِائَةُ الخ এটা দ্বিতীয় খবর مَكِّيَّةٌ হলো مُسْتَثْنٰى مِنْهُ আর اِلَّا হলো حَرْف اِسْتِثْنَاء আর (اَلْاٰيَةَ) اَقِمِ الصَّلٰوةَ হলো مُسْتَثْنٰى অর্থাৎ পূর্ণ সূরাটি মক্কী একটি আয়াত ব্যতীত। আর তা হলো وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ আয়াতটি। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি।

قَوْلُهُ اَوْ اِلَّا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ (اَلْاٰيَةَ) : এটা দ্বারা দ্বিতীয় উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই উক্তি অনুযায়ী পূর্ণ সূরাটাই মক্কী, দুটি আয়াত ব্যতীত। একটি হলো فَلَعَلَّكَ আর দ্বিতীয়টি হলো وَاُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ এটা মুকাতিল (র.)-এর উক্তি।

قَوْلُهُ هٰذَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে كِتَابٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। নিজেই মুবতাদা নয়। কেননা نَكِرَة مَحْضَة টা মুবতাদা হতে পারে না। اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ এটা জুমলা হয়ে كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ : ثُمَّ-এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম হলো– এটা خَبَر مَحْض -এর জন্য। আর অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, কুরআন চূড়ান্ত পর্যায়ের ও সর্বোত্তম প্রকারের مُحْكَمٌ এবং উত্তম تَفْصِيْل -এর সাথে مُفَصَّلٌ হয়েছে। যেমন– আরবগণ বলে থাকে فُلَانٌ كَرِيْمُ الْاَصْلِ ثُمَّ كَرِيْمُ الْفِعْلِ

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো এই যে, ثُمَّ অবতীর্ণের হিসেবে تَرْتِيْب زَمَانِيْ হবে। এভাবে যে, প্রথম অবতরণ তথা আরশ হতে লৌহে মাহফূজের উপর অবতরণের সময় مُحْكَمٌ করা হয়েছে। এরপর অবস্থার হিসেবে বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ : এটা كِتَابٌ -এর দ্বিতীয় সিফত।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِأَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, أَنْ টা হলো مَصْدَرِيَّة আবার أَنْ টা تَفْسِيرِيَّه ও হতে পারে। أَنْ টা تَفْسِيرِيَّة ওয়ার জন্য شَرْط এই যে, তার পূর্বে قَوْل বা قَوْل -এর সমার্থক কোনো শব্দ হবে। এখানে যদিও قَوْل শব্দটি নেই তবে তার মার্থক فُصِّلَتْ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই أَنْ টা مُفَسِّرَه হওয়াও সঠিক। আর এখানে تَفْسِيرِيَّة হওয়াই উত্তম। (صَاوِيْ)

قَوْلُهُ قِيلَ فِى الْمُنَافِقِيْنَ : যদি মুনাফিক দ্বারা প্রসিদ্ধ মুনাফিক উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে কথা আছে। কেননা সিদ্ধ মুনাফিকের অস্তিত্ব মক্কায় ছিল না। অথচ আয়াতটি মক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এই আয়াত আখনাস ইবনে শোরাইকের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যে মক্কার মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি চাটুকার ও দর্শন ছিল। এবং রাসূল ﷺ -কে চিত্তাকর্ষক সংবাদ পরিবেশন করতো। আর অন্তরে তার বিপরীত ভাব গোপন রাখত। ার সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ يَثْنُوْ : اَلثَّنْيُ اَلطَّيُّ লুকানোর জন্য পেচিয়ে ফেলা, يَثْنُوْنَ মূলে ছিল يَثْنِيُوْنَ এখন يَاء -এর উপর পেশ কঠিন ওয়ার কারণে نُوْن কে দিয়েছে। এরপর দু'সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে يَاء কে ফেলে দিয়েছে ফলে يَثْنُوْنَ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহর গজব ও বিভিন্ন কঠিন আজাবের এবং রে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি এবং পুরস্কার ও শাস্তির বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদিন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর কিছু দাড়ি-মুবারক পাকা দেখে চলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।' তখন রাসূল ﷺ -ইরশাদ রেছিলেন, "হ্যাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা য়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা'আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। [আল-হাকেম ও তিরমিযী রীফ]। উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাজিল ওয়ার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র চেহারায় বাধ্যক্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

ত্র সূরার প্রথম আয়াত 'আলিফ লাম-রা' বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র াল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকেই এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি, বরং এ ব্যাপারে চিন্তা রতেও বারণ করা হয়েছে।

অতঃপর কুরআন মাজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। مُحْكَمٌ শব্দ إِحْكَامٌ হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোনো বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোনো ভুল বা বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে "مُحْكَمٌ" শব্দ مَنْسُوْخٌ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের আয়াতসমূহকে সাময়িকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, রূপে তৈরি করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পবিত্র কুরআন নাজিলের ফলে যেভাবে 'মনসূখ' বা রহিত হয়েছে কুরআন পাক নাজিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না। [কুরতুবী] তবে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থি নয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কুরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تَفْصِيلٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সেজন্যই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فُصِّلَ، فُصِّلَ শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের বিভিন্ন বিষয়বস্তু আকায়িদ, ইবাদত, আদান-প্রদান, আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তু গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কুরআন মাজীদ একসাথে লওহে মাহফূযে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বি কর্তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ এসব আয়াতে এমন এক মহান রহস্য ও হিকমত বিদ্যমান যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাজিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ। পরিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতেই তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যতকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইলম ও হিকমত কখনো ভুল হওয়ার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তওহীদের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করবে না" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-উপাসনা করবে না।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন اِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ "নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র আয়াতে বিশ্বনবী ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি সারা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দোজাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে অফুরন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نَذِيْرٌ শব্দের অর্থ করা হয়, 'ভীতি প্রদর্শনকারী'। কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্র জন্তু বা অন্য কোনো অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং এমন ব্যক্তিকে 'নাযীর' বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমন সব বস্তু বা কর্ম হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

তৃতীয় আয়াতে হেদায়েতসমূহের একটি অতীব গুরত্বপূর্ণ হেদায়েত এভাবে দেওয়া হয়েছে اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ অর্থাৎ মুহকাম আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে এ পথনির্দেশ দিয়েছেন যে, "তারা যেন স্বীয় পালনকর্তা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে।" ক্ষমার সম্পর্ক পূর্বকৃত গোনাহ সমূহের সাথে আর তওবার সম্পর্ক ভবিষ্যতে পুনরায় তার কাছেও না যাওয়ার অঙ্গীকারের সাথে। অতএব পূর্বকৃত গুনাহর জন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রর্থনা করা এবং আগামীতে পুনরায় তা না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাই হলো সত্যিকার তওবা। এজন্যই কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, ভবিষ্যতে গুনাহ হতে বিরত থাকার সংকল্প ছাড়া মৌখিক তওবা করা হলো تَوْبَةُ كَذَّابِيْنَ [অর্থাৎ মিথ্যাবাদীদের তওবা। [কুরতুবী]। অনুরূপভাবে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে কোনো কোনো বুযুর্গ বলেন مَعْصِيَتْ راخنده مى آيد ز استغفارما অর্থাৎ আমাদের তওবা দেখে খোদ গুনাহেরও হাসি পায়। অন্য কথায় এ ধরনের তওবা হতে তওবা করা উচিত।

অতঃপর সত্যিকার তওবাকারীদের জন্য ইহকাল ও পরকালে সাফল্য ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى বলে। অর্থাৎ যারা পূর্বকৃত গুনাহ হতে সত্যিকারভাবে তওবা করে, ভবিষ্যতে তাতে লি না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ও সতর্কতা অবলম্বন করে, তাদের শুধু ক্ষমাই করা হয় না, বরং তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবন দান ক হবে। পার্থিব নশ্বর জীবন ও আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন উভয়ই অত্র সুসংবাদের আওতাভুক্ত। যেমন অন্য এক আয়াে এরূপ তওবাকারী সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً অর্থাৎ আমি অবশ্যই তাকে সুখময় জীবন দান করব

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মত্র আয়াত সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এখানে ইহজীবন ও পরজীবন উভয়ই শামিল রয়েছে। সূরা নূহে তওবাকারীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে রহমত বর্ষণ করবেন। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা তোমাদের মদদ করবেন এবং তোমাদেরকে বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দান করবেন। এখানে রহমত বর্ষণ, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দ্বারা পার্থিব নিয়ামতসমূহ বোঝানো হয়েছে এবং বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহ দ্বারা আখেরাতের নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে مَتَاعًا حَسَنًا শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবার ফলশ্রুতি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রিজিকের সচ্ছলতা ও প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী সহজলভ্য করে দেবেন, সর্বপ্রকার আজাব ও অনিষ্ট হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। তবে পার্থিব জীবন যেহেতু একদিন শেষ হয়ে যাবে, কাজেই এর সুখ-শান্তিও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। সুতরাং إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, ইহজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বজায় থাকবে। অতঃপর মৃত্যু এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই আখেরাতের অন্তহীন জীবন শুরু হবে। তওবাকারীদের জন্য সেখানেও অফুরন্ত আরাম-আয়েশের বিপুল আয়োজন রাখা হয়েছে।

হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, এখানে مَتَاعًا حَسَنًا দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টির দিক থেকে সরে স্রষ্টার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া। কোনো কোনো বুযুর্গ বলেন مَتَاعٌ حَسَنٌ অর্থ হচ্ছে, যা আছে তার উপর তুষ্ট থাকা। আর যা খোয়া গেছে তার জন্য বিষণ্ন না হওয়া। অর্থাৎ বৈষয়িক সামগ্রী বৈধভাবে যতটুকু অর্জিত হয় তাতে সন্তুষ্ট থাকা আর যা অর্জিত নয় সেজন্য পেরেশান না হওয়া।

ইস্তেগফার ও তওবাকারীদের জন্য দ্বিতীয় খোশখবরী শোনানো হয়েছে وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ এখানে প্রথম فَضْل দ্বারা মানুষের নেক আমল এবং দ্বিতীয় فَضْل দ্বারা আল্লাহর অনুগ্রহ অর্থাৎ বেহেশত বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অত্র আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, প্রত্যেক সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে তার সৎকর্ম অনুসারে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস দান করবেন।

প্রথম বাক্যে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনে সুখ-সচ্ছলতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে আখেরাতের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ অর্থাৎ এতসব নীতিবাক্য ও হিতোপদেশ সত্ত্বেও যদি তোমরা বিমুখ হও, পূর্বকৃত গোনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনা না কর এবং ভবিষ্যতে তা হতে বিরত থাকতে বদ্ধপরিকর না হও, তাহলে আমার ভয় হয় যে, এক মহাদিনের আজাব এসে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে মহাদিন বলে কিয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা ব্যক্তির দিক দিয়ে সে দিনটি হবে হাজার বছরের সমান। আর সংকট ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে তার চেয়ে বড় কোনো দিন নেই।

পঞ্চম আয়াতেও পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুর উপর আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনে তোমরা যা কিছু কর আর যেভাবেই জীবন-যাপন কর না কেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তোমাদের সবাইকে অবশ্যই আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে হবে। আর তিনি সর্বশক্তিমান, তার জন্য কোনো কার্যই দুঃসাধ্য বা দুষ্কর্ম নয়। তোমাদের মৃত্যু এবং মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর তোমাদের সমস্ত অণুকণাসমূহ একত্র করে তিনি তোমাদেরকে পুনরায় মানুষরূপে দাঁড় করাতে সক্ষম।

ষষ্ঠ আয়াতে মুনাফিকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ও বদভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলপাক ﷺ-এর সাথে তাদের বৈরিতা ও বিদ্বেষকে গোপন রাখার ব্যর্থপ্রয়াসে লিপ্ত। তাদের অন্তরস্থ হিংসা ও কুটিলতার আগুনকে ছাইচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, বুকের উপর চাদর আচ্ছাদিত করে রাখলে এবং চুপে চুপে চক্রান্ত করলে তাদের কুটিল মনোভাব ও দুরভিসন্ধির কথা কেউ জানতে বা আঁচ করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ ত'আলা সর্বাবস্থায় তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ ও সলা পরামর্শ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছেন। কেননা إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি তো অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত গুপ্ত ভেদের কথাও পূর্ণ ওয়াকিফহাল কোনো সন্দেহ নেই।

Free@www.eilmweebly.com

اَلْجُزْءُ الثَّانِيْ عَشَرَ : বারোতম পারা

অনুবাদ :

٦. وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ هِيَ مَا دَبَّ
عَلَيْهَا اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا تُكَفِّلُ بِهِ
فَضْلًا مِنْهُ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مَسْكَنَهَا
فِي الدُّنْيَا اَوِ الصُّلْبِ وَمُسْتَوْدَعَهَا
بَعْدَ الْمَوْتِ اَوْ فِي الرَّحِمِ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ
فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ . بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ
الْمَحْفُوْظُ

৬. পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি অনুগ্রহ বশতঃ তার দায়িত্ব নিজের উপর নিয়েছেন। তিনি তাদের অবস্থান অর্থাৎ দুনিয়ার বা পিতৃ পৃষ্ঠদেশে তাদের অবস্থান এবং মৃত্যুর পর বা মাতৃগর্ভে তাদের অবস্থিতি সম্পর্কে তিনি অবহিত। উল্লিখিত সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ লাওহে মাহফূজে রয়েছে। مِنْ دَابَّةٍ এস্থানে مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। دَابَّةٍ অর্থ– যা ভূমিতে বিচরণ করে।

٧. وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي
سِتَّةِ اَيَّامٍ اَوَّلُهَا اَحَدٌ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ
وَّكَانَ عَرْشُهُ قَبْلَ خَلْقِهَا عَلَى الْمَاءِ
وَهُوَ عَلَى مَتْنِ الرِّيْحِ لِيَبْلُوَكُمْ مُتَعَلِّقٌ
بِخَلَقَ اَيْ خَلَقَهُمَا وَمَافِيْهِمَا مَنَافِعُ
لَكُمْ وَمَصَالِحُ لِيَخْتَبِرَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا اَيْ اَطْوَعُ لِلّٰهِ وَلَئِنْ قُلْتَ يَا مُحَمَّدُ
لَهُمْ اِنَّكُمْ مَبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ مَا هٰذَا الْقُرْاٰنُ
النَّاطِقُ بِالْبَعْثِ اَوِ الَّذِيْ تَقُوْلُهُ اِلَّا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ . بَيِّنٌ وَفِي قِرَاءَةٍ سَاحِرٌ وَ
الْمُشَارُ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

৭. তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, রবিবার ছিল শুরু আর শেষ দিনটি ছিল শুক্রবার, তোমাদের মধ্যে কে আচরণে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অধিক আনুগত্যশীল তা পরীক্ষা করার জন্য। অর্থাৎ এতদুভয় এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তোমাদের উপকার ও কল্যাণকর সবকিছুর সৃষ্টি তোমাদেরকে যাচাই করার জন্যই। আর এতদুভয়ের সৃষ্টির পূর্বে তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। এবং তা ছিল বায়ুর পিঠে। হে মুহাম্মদ ﷺ ! তাদেরকে যদি বল, তোমরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে তখন কাফেররা নিশ্চয়ই বলবে এটা তো অর্থাৎ পুনরুত্থানের কথা সম্বলিত এই কুরআন বা তুমি যা বল তাতো স্পষ্ট জাদু। لِيَبْلُوَكُمْ উল্লিখিত خَلَقَ ক্রিয়ার সাথে তা مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। اِنْ هٰذَا এই اِنْ টি এস্থানে নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অপর এক কেরাতে سِحْرٌ শব্দটি سَاحِرٌ [জাদুকর] রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তা দ্বারা রাসূল ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে বলে বুঝাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨. وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰى اُمَّةٍ جَمَاعَةٍ اَوْ اَوْقَاتٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ اسْتِهْزَاءً مَا يَحْبِسُهُ ط يَمْنَعُهُ مِنَ النُّزُوْلِ قَالَ تَعَالٰى اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا مَدْفُوْعًا عَنْهُمْ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ ـ

৮. নির্দিষ্ট এক সম্প্রদায়ের অর্থাৎ দলের বা সময়ের আগমন পর্যন্ত আমি যদি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে তারা বিদ্রূপ করতো নিশ্চয়ই বলবে, কি সে তাকে নিবারণ করছে? তা আপতিত হতে কি জিনিস বাধা দিয়ে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সাবধান! যেদিন তা তাদের নিকট আসবে সেদিন তাদের নিকট হতে তা ফিরবে না। তাদের তরফ হতে তাকে আর প্রতিহত করা হবে না। যা নিয়ে অর্থাৎ যে আজাব সম্পর্কে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। অর্থাৎ এটা তাদের উপর আপতিত হবে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ تَكَفَّلَ بِهِ فَضْلًا مِنْهُ : এই বৃদ্ধিকরণ একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর যে, اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার উপর রিজিক পৌছানো ওয়াজিব। অথচ وُجُوْب আল্লাহ তা'আলার জন্য অসম্ভব।

উত্তর ॥ উত্তরের সারকথা হলো সৃষ্টিজীবকে জীবিকা পৌছানো আবশ্যক হওয়া ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং শুধুমাত্র দয়া ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে।

قَوْلُهُ كُلٌّ مِمَّا ذُكِرَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كُلٌّ-এর তানভীনটি مُضَافْ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে হয়েছে।

قَوْلُهُ بَيِّنٌ : مُبِيْنٌ-এর তাফসীর بَيِّنٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَازِمْ টা مُتَعَدِّيْ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ جَمَاعَةٍ اَوْقَاتٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُمَّةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের দল নয়; বরং এর দ্বারা সময়ের مَحْدُوْد مَجْمُوْعَة উদ্দেশ্য। اُمَّةٍ মূলত মানুষের দলকে বলা হয়। অর্থাৎ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ আর এখনো طَائِفَةٌ مِنَ الْاَزْمِنَةِ উদ্দেশ্য। যেমনটি ব্যাখ্যাকার اَوْقَاتٌ শব্দ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ مَعْدُوْدَةٍ : مَعْدُوْدَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَلِيْلَةٌ কেননা حَصْرٌ بِالْعَدَدِ টা قِلَّتٌ-এর উপর বুঝায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইলমের ব্যাপকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু এবং মানুষের মনের গোপন কল্পনাও তাঁর অজানা নয় অতঃপর তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে মানুষের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শুধু মানুষেরই পানীয় ইত্যাদি রিজিকের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। শুধু মানুষেরই নয়, পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণী যেখানেই আল্লাহর নিকট হতে কিছু গোপন করার জন্য কাফেরদের অপকৌশল ও ব্যর্থপ্রয়াস বোকামি এবং মূর্খতা বৈ নয়। এখানে مِنْ শব্দ বৃদ্ধি করে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বলে আয়াতের ব্যাপকতার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, অন্য হিংস্র জন্তু, পক্ষীকুল, গুহাবাসী সরীসৃপ, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, সামুদ্রিক প্রাণী প্রভৃতি সবই অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত। সকলের রিজিকের দায়িত্বই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

دَابَّةٌ [দাব্বাতুন এমন সব প্রাণীকে বলে, যা পৃথিবীতে বিচরণ করে। পক্ষীকুলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা সাগর-মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকুলের রিজিকের দায়িত্বই

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন, এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যার দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ করেছেন عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا 'তাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।' একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই। বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে এ দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে عَلٰى ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরজ বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোনো কাজ ফরজ বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رِزْق রিজিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তুও যা কোনো প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যা দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিজিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। সকল জীব-জন্তু রিজিক ভোগ করে থাকে। কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। কারণ মালিক হওয়ার যোগ্যতাই তাদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিজিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিজিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রিজিক হালালও হতে পারে হারামও হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ্য করে, তখন উক্ত বস্তু তার রিজিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম হয়েছে। যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত রিজিক বৈধ পন্থায় তার নিকট পৌঁছে যেত।

রিজিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব যেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নিজে গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে কারো মৃত্যুবরণ করার কথা নয়। অথচ বাস্তবে দেখা যায় অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, অনাহারে ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়! এর রহস্য কি? ওলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের বিভিন্নভাবে জবাব দিয়েছেন। তন্মধ্যে এক জবাব হচ্ছে, এখানে রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কারণেই মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়া এর কারণ হতে থাকে। অনুরূপভাবে রিজিক বন্ধ করে দেওয়ার কারণে অনাহার ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আসলে তাদের রিজিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অতঃপর রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিজিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবূ মূসা (রা.) ও হযরত আবূ মালেক (রা.) প্রমুখ আশ'আরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়েমেন হতে হিজরত করে মদিনা শরিফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথেয় স্বরূপ আহার্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেল। তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হুজুর ﷺ-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রাসূলে কারীম ﷺ তাদের জন্য কোনো আহার্যের সুব্যব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রাসূলে আকরাম ﷺ -এর গৃহদ্বারে হাজির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রাসূলে পাক ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের সুমধুর ধ্বনি ভেসে এলো وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেন নি। উক্ত সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন যাবতীয় প্রাণীকুলের রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশ'আরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন "শুভ সংবাদ তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে।" তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দূরবস্থার কথা রাসূলে কারীম ﷺ কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহার্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চিত মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত রুটিপূর্ণ একটি قَصْعَةٌ অর্থাৎ বড় খাঞ্চা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশ'আরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশ'আরী গোত্রের লোকদের আহার করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত অবশিষ্ট রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তারা খাঞ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলছেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার প্রেরিত রুটি গোশত অত্যন্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।" তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো কোনো খানা প্রেরণ করিনি।"

তখন তারা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিনে। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনই খানা প্রেরণ করেছেন। এতশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলনে "আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।"

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত মূসা (আ.) আগুনের খোঁজে তূর পাহাড়ে পৌঁছে আগুনের পরিবর্তে যখন সেখানে আল্লাহর নূরের তাজাল্লী দেখতে পেলেন, নবুয়ত ও রিসালত লাভ করলেন এবং ফেরাউন ও তার কওমকে হেদায়েতের জন্য মিসর গমনের নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, তখন তাঁর মনের কোণে উদয় হলো যে, আমি স্বীয় স্ত্রীকে জনহীন-মরুপ্রান্তরে একাকিনী রেখে এসেছি, তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর সন্দেহ নিরসনের জন্য আদেশ করলেন যে, "তোমার সম্মুখে পতিত প্রস্তরখানির উপর লঠি দ্বারা আঘাত হান।" তিনি আঘাত করলেন। তখন উক্ত প্রস্তরখানি বিদীর্ণ হয়ে তার মধ্যে হতে আরেকখানি পাথর বের হলো। দ্বিতীয় প্রস্তরখানির উপর আঘাত করার জন্য পুনরায় আদেশ হলো। হযরত মূসা (আ.) আদেশ পালন করলেন। তখন তা ফেটে গিয়ে আরেকখানি প্রস্তর বের হলো। তিনি আঘাত করলেন। তা বিদীর্ণ হলো এবং এর অভ্যন্তর হতে একটি জ্যান্ত কীট বেরিয়ে এলো, যার মুখে ছিল একটি তরু-তাজা তৃণখণ্ড [সুবহানাল্লাহ]। আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের একীন হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বেও ছিল। তবে বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার প্রতিক্রিয়া স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। তাই এ দৃশ্য দেখার পর হযরত মূসা (আ.) সরাসরি মিসর পানে রওয়ানা হলেন।

সহধর্মিণীকে এটা বলা প্রয়োজন মনে করেননি যে, মিসর যাওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিজিক পৌঁছাবার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা : অত্র আয়াতে "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন" বলেই ক্ষান্ত হন নি; বরং মানুষকে আরো নিশ্চয়তা দান করার জন্য ইরশাদ করেছেন وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا আলোচ্য আয়াতে مُسْتَقَرٌ 'মুস্তাকার' ও مُسْتَوْدَعٌ 'মুস্তাওদা' শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে তাফসীরে কাশশাফের ব্যাখ্যাই অধিক অভিধানসম্মত। তা হচ্ছে 'মুস্তাকার' স্থায়ী বাসস্থান বা বাসভূমিকে বলে। আর অস্থায়ী ও সাময়িক অবস্থানস্থলকে 'মুস্তাওদা' বলা হয়।

সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারীকে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা শক্তির দায়িত্বের সাথে তুলনা করা চলে না। কারণ দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার যদি আপনার খোরাকীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে কিছুটা পরিশ্রম আপনাকে অবশ্যই করতে হবে। নির্দিষ্ট অবস্থান হতে আপনি যদি স্থানান্তরিত হতে চান, তবে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে যে, অমুক মাসের অত তারিখ হতে অত তারিখ পর্যন্ত আমি অমুক শহরে বা গ্রামে অবস্থান করব। অতএব, আমার খোরাকি সেখানে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা হোক। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা জিম্মাদারী গ্রহণ করলে এতটুকু মেহনতও করা লাগে না। কেননা তিনি তো সকল প্রাণীর প্রতিটি নড়াচড়া, উঠা-বসা, চলাফেরা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি যেমন আপনার স্থায়ী নিবাস জানেন, তেমনি সাময়িক আবাসও জ্ঞাত আছেন। কাজেই কোনো আবেদন অনুরোধ ছাড়াই আপনার রেশন যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হবেই।

আল্লাহ তা'আলার সর্বাত্মক ইলম ও সর্বময় ক্ষমতার ফলে যাবতীয় কাজ সমাধার জন্য তাঁর ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। কোনো কিতাব বা রেজিষ্টারে লেখা-লেখির আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্বল মানুষ যে ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে মনের খটকা দূর করে তাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার জন্য ইরশাদ করেছেন كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ সবকিছুই এক খোলা কিতাবে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে। 'এখানে' 'খোলা কিতাব' বলে 'লওহে মাহফূজকে বোঝানো হয়েছে। যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্ট জীবের আয়ু, রুজি ও ভালোমন্দ কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা যথাসময়ে কার্যকরী করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ইরশাদ ফরমান আসমান ও জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের তাকদীর নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করেছেন। –[সহীহ মুসলিম শরীফ]

Free @ www.eilm.weebly.com

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একখানি দীর্ঘ হাদীস বয়ান করেন যার সারমর্ম হলো মানুষ তার জন্মের পূর্বে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আসে। মাতৃগর্ভে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক একজন ফেরেশতা তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম, ভালোমন্দ তার যাবতীয় কার্যকলাপে, যা সে জীবনভর করবে। দ্বিতীয়, তার আয়ুষ্কালের বর্ষ, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট ও শ্বাস-প্রশ্বাস। তৃতীয়, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কোথায় সমাধিস্থ হবে। চতুর্থ, তার রিজিক কি পরিমাণ হবে এবং কোন পথে তার কাছে পৌঁছবে। সুতরাং লওহে মাহফূযে আসমান-জমিন সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকা অত্র রেওয়ায়েতের বিপরীত নয়। সপ্তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ইলম ও অসীম শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি মাত্র ছয় দিন পরিমাণ সময়ে সমগ্র আসমান ও জমিন সৃজন করেছেন। আর এসব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ পানির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। এতদ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্বেই পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সূরা হা-মীম-সাজদার দশম ও একাদশ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে, দুই দিনে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গাছ-পালা এবং প্রাণীকুলের আহার্য ও জীবন ধারণের উপকরণাদি সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এবং দুই দিনে সাত আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, এখানে আসমান দ্বারা সমগ্র উর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে এবং জমিন দ্বারা সমস্ত নিম্নজগত বোঝানো হয়েছে। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু সূর্যও ছিল না, তার উদয়-অস্তও ছিল না, সুতরাং দিনের অস্তিত্বও ছিল না। তবে এখানে 'দিন' বলে আসমান ও জমিন সৃষ্টির পরবর্তী 'একদিন পরিমাণ' সময়কে বোঝানো হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এক মুহূর্তে সবকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা করেন নি; বরং স্বীয় হিকমতের প্রেক্ষিতে ধীরে সৃজন করেছেন, যেন তা মানুষের প্রকৃতিসম্মত হয় এবং মানুষও কাজে ধীরতা, স্থিরতা অবলম্বন করে।

আয়াতের শেষভাগে আসমান ও জমিন সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا সবকিছু সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে– আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা করতে চাই যে, তোমাদের মধ্যে কে সৎকর্মশীল।

এতে বোঝা যায় যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; বরং আমলকারী মানুষের উপকারার্থে তা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তারা এর মাধ্যমে নিজেদের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং এর অপার রহস্য চিন্তা করে নিজেদের প্রকৃত মালিকও পালনকর্তাকে চিনতে পারে।

সারকথা আসামান ও জমিন সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে মানুষ। বরং মানুষের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং তাদের মধ্যে আবার যারা অধিক সৎকর্মশীল তাদের খাতিরেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ ই সর্বাধিক সৎকর্মশীল ব্যক্তি। অতএব, একথা নির্ঘাত সত্য যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এর পবিত্র সত্তাই হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মূল কারণ।– [তাফসীরে মাযহারী]

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে أَحْسَنُ عَمَلًا -কে সবচেয়ে ভালো কাজ বলা হয়েছে, কিন্তু কে সর্বাধিক কাজ করে বলা হয়নি। অতএব, বোঝা যায় যে, নামাজ-রোজা কুরআন তেলাওয়াত, জিকির আজকার ইত্যাদি যাবতীয় নেক কাজ সংখ্যায় খুব বেশি করার চেয়ে, সুন্দর ও নিখুঁতভাবে আমল করাই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমলের এই সৌন্দর্যকে হাদীস শরীফে ইহসান বলা হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমল করতে হবে। পার্থিব কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য জড়িত করবে না। আল্লাহর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে আমল করতে হবে, যেভাবে মহানবী ﷺ নিজে করে দেখিয়েছেন। আর তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করা উম্মতের জন্য জরুরি সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা, সুন্নত তরিকা মুতাবিক ইখলাসের সাথে অল্প আমল করাও ঐ অধিক আমলের চেয়ে উত্তম যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণ দু'টি নেই অথবা কম আছে।

সপ্তম আয়াতে কিয়ামতও আখেরাতকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের যে কথা বোধগম্য না হয় তাকেই তারা 'জাদু' বলে অভিহিত করে এড়িয়ে যেতে চায়।

অষ্টম আয়াতে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে, যারা আজাবের হুশিয়ারি সত্ত্বেও নবীদের সতর্কবাণী গ্রাহ্য করত না; বরং বলত যে, আপনার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছেন, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে সে আজাব কেন আপতিত হচ্ছে না?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ الْكَافِرَ مِنَّا رَحْ
غِنًى وَصِحَّةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ط اِ
لَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَفُ
شَدِيْدُ الْكُفْرِ بِهٖ .

৯. যদি আমি মানুষকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহের সচ্ছলতা ও সুস্থতার আস্বাদ দেই ও পরে তা তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেই তখন সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে হতাশ নিরাশ এবং এতদ্বিষয়ে খুবই অকৃতজ্ঞ হয়।

١٠. وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ فَ
وَشِدَّةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّ
الْمَصَائِبُ عَنِّيْ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَوَالَهَا
يَشْكُرُ عَلَيْهَا اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَرِحٌ بِ
فَخُوْرٌ . عَلَى النَّاسِ بِمَا اُوْتِيَ .

১০. ক্লেশ স্পর্শ করার পর দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের প? যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে বলে থাকে, আমার মন্দাবস্থা বিপদ আপদ কেটে গেছে। এটা বিনষ্ট হওয়ার আর সে আশঙ্কা করে না এবং তার জন্য সে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। সে হয় আনন্দিত আনন্দে উৎফুল্ল ও তাকে যা দান করা হয়েছে সে কারণে মানুষের উপর অহংকার প্রদর্শনকারী।

١١. اِلَّا لٰكِنِ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلَى الضُّ
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط فِى النَّعْمَاءِ اُولٰ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ . هُوَ الْجَنَّةُ .

১১. কিন্তু যারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণকারী ও অনুগ্রহের সময়েও সৎ কর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। অর্থাৎ জান্নাত। اِلَّا এস্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٢. فَلَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدُ تَارِكٌ بَعْضَ
يُوْحٰى اِلَيْكَ فَلَا تُبَلِّغْهُمْ اِيَّ
لِتَهَاوُنِهِمْ بِهٖ وَضَائِقٌ بِهٖ صَدْ
بِتِلَاوَتِهٖ عَلَيْهِمْ لِاَجْلِ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَ
هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهٗ مَلَ
يُصَدِّقُهٗ كَمَا اقْتَرَحْنَا اِنَّمَا اَنْتَ نَذِ
فَلَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ لَا الْاِتْيَانُ بِ
اقْتَرَحُوْهُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْ
حَفِيْظٌ فَيُجَازِيْهِمْ .

১২. হে মুহাম্মাদ ﷺ! তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি যে তার কিয়দাংশ পরিত্যাগ না করে বস, তাদের অবহেলার কারণে তার কিছু অংশ যেন তাদের নিকট পৌছবে না এমন যেন না হয় এবং তাদের এটা পাঠ করে শুনাতে তোমার মন যেন সংকোচিত না হয় এ কারণে যে, তারা বলে আমাদের দাবি অনুসারে তার উপর ধন ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন বা তার সাথে ফেরেশতা আসে না কেন? যা তাকে সত্য বলে সমর্থন করতো। তুমি তো কেবল সতর্ককারী। সুতরাং পৌছে দেওয়া ব্যতীত তোমার কোনো দায়িত্ব নেই। এদের দাবি অনুসারে নিদর্শন আনয়ন তোমার কাজ নয়। আর আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে কর্মবিধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী। অনন্তর তিনি তাদের প্রতিফল প্রদান করবেন। لَوْلَا এটা এস্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٣. أَمْ بَلْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ط أَيِ الْقُرْآنَ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ مُفْتَرَيَاتٍ فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلِي تَحَدَّاهُمْ بِهَا أَوَّلًا ثُمَّ بِسُورَةٍ وَّادْعُوا لِلْمُعَاوَنَةِ عَلٰى ذٰلِكَ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَيْ غَيْرِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِيْ أَنَّهُ افْتَرَاهُ.

১৩. বরং তারা বলে তিনি এটা আল কুরআন মনগড়াভাবে রচনা করে নিয়ে এসেছেন। বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও যে তিনি এটা রচনা করেছেন তবে তোমরা ফাসাহাত, বালাগাত, ভাষা অলঙ্কার ও ভাষা সৌন্দর্য তার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর। তোমরা তো আমারই মতো আরবি ভাষাভাষী, অলঙ্কার অভিজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অপর যাকে পার তাকেও উক্ত বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আহ্বান কর। প্রথমে দশটি সূরার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল পরে একটি সূরা আনয়নেরও চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। أَمْ এটা এস্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। دُوْنِ اللّٰهِ অর্থ, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত।

١٤. فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ أَيْ مَنْ دَعَوْتُمُوْهُمْ لِلْمُعَاوَنَةِ فَاعْلَمُوْا خِطَابٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنَّمَا أُنْزِلَ مُتَلَبِّسًا بِعِلْمِ اللّٰهِ وَلَيْسَ افْتِرَاءً عَلَيْهِ وَأَنْ مُخَفَّفَةٌ أَيْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ بَعْدَ هٰذِهِ الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ أَيْ أَسْلِمُوْا.

১৪. যদি তারা অর্থাৎ যাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছ তারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে হে মুশরিকগণ! জেনে রাখ! এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তার জ্ঞানসহ অবতীর্ণ এটা মিথ্যা রচনা নয়। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। এই অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পরও কি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবে না। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। بِعِلْمِ এটা এস্থানে উহ্য مُلْتَبِسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। أَنْ لَا এই أَنْ টি مُخَفَّفَةٌ বা লঘুকৃত। মূলত ছিল أَنَّهُ

١٥. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا بِأَنْ أَصَرَّ عَلَى الشِّرْكِ وَقِيْلَ هِيَ فِي الْمُرَائِيْنَ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ أَيْ جَزَاءَ مَا عَمِلُوْهُ مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فِيْهَا بِأَنْ نُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُمْ وَهُمْ فِيْهَا أَيِ الدُّنْيَا لَا يُبْخَسُوْنَ يُنْقَصُوْنَ شَيْئًا.

১৫. যদি কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে শিরক করার উপর জিদ ধরে থাকে তবে আমি তাতেই দুনিয়াতেই তাদের কর্ম অর্থাৎ দান, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ইত্যাদি ভালো কাজ যা তারা করে সেগুলোর পরিপূর্ণ প্রতিদান দিয়ে দেব। যেমন তাদের রিজিক বিস্তৃত করে দেব এবং তাতে অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা কম পাবে না। তাদের প্রতিদান হতে কিছু কম করা হবে না। কেউ কেউ বলল, রিয়াকার বা লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

١٦. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ط وَحَبِطَ بَطَلَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا أَيِ الْاٰخِرَةِ فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

১৬. তাদের জন্যই পরকালে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে তাতে অর্থাৎ পরকালে বিনষ্ট হয়ে যাবে। নিষ্ফল হয়ে যাবে, তারা কোনোরূপ পুণ্যফল পাবে না। তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٧. اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَهُوَ النَّبِىُّ ﷺ اَوِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهِىَ الْقُرْاٰنُ وَيَتْلُوْهُ يَتَّبِعُهٗ شَاهِدٌ يُّصَدِّقُهٗ مِّنْهُ اَىْ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ جِبْرَائِيْلُ وَمِنْ قَبْلِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ كِتٰبُ مُوْسٰى التَّوْرٰةُ شَاهِدٌ لَهٗ اَيْضًا اِمَامًا وَّرَحْمَةً ط حَالٌ كَمَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ لَا اُولٰٓئِكَ اَىْ مَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط اَىْ بِالْقُرْاٰنِ فَلَهُمُ الْجَنَّةُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ جَمِيْعِ الْكُفَّارِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ج فَلَاتَكُ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنْهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

১৭. যারা প্রতিষ্ঠিত প্রভুর পক্ষ হতে আগত বিবরণ অর্থাৎ আল কুরআন যার অনুসরণ করে তারা প্রেরিত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত সাক্ষী অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) তা সত্য বলে সাক্ষ্য দান করেন এবং যার পূর্বে অর্থাৎ আল কুরআনের পূর্বে আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ প্রেরিত মূসার কিতাব তাওরাতেও যার সাক্ষী সেই বিবরণের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ রাসূল ﷺ বা মু'মিনগণ তাদের মতো কি হতে পারে তারা যারা এরূপ নয়। না, এটা তাদের মতো হতে পার না। তারাই অর্থাৎ যারা উক্ত বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত তারাই তাতে অর্থাৎ আল কুরআনে বিশ্বাসী সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। অন্যান্য দলের অর্থাৎ সকল কাফের সম্প্রদায়ের যারা এটাকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি তাতে অর্থাৎ আল কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ো না। এটাতো নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের তরফ হতে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তা বিশ্বাস করে না। بَيِّنَةٍ এস্থানে এটার অর্থ بَيَانٌ বা বিবরণ। يَتْلُوْهُ অর্থ– এটার অনুসরণ করে। اِمَامًا وَّرَحْمَةً এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। مِرْيَةٍ অর্থ সন্দেহ।

١٨. وَمَنْ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ط بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْ جُمْلَةِ الْخَلْقِ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ جَمْعُ شَاهِدٍ وَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاغِ وَعَلَى الْكُفَّارِ بِالتَّكْذِيْبِ هٰٓؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ج اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

১৮. শরিক ও সন্তান আরোপ করত যারা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাদের অপেক্ষা অধিক জালেম আর কে? না কেউ নেই। কিয়ামতের দিন অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সাথে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ, তারা রাসূলগণের সম্পর্কে পৌঁছাবার এবং কাফেরদের সম্পর্কে অস্বীকার করার সাক্ষ্য দান করবেন। বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। শোন! সীমালঙ্ঘনকারীদের উপর মুশরিকদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ। اَلْاَشْهَادُ এটা شَاهِدٌ -এর বহুবচন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٩. الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِ الْإِسْلَامِ وَيَبْغُوْنَهَا يَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ عِوَجًا مُعْوَجَّةً وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ تَاكِيْدٌ كٰفِرُوْنَ.

১৯. যারা আল্লাহ তা'আলার পথে দীন ইসলামের পথে বাধা দেয় এবং তাতে এপথে দোষ ত্রুটি বক্রতা অনুসন্ধান করে। আর এরাই পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাসী। يَبْغُوْنَ তারা অনুসন্ধান করে। هُمْ كٰفِرُوْنَ এই هُمْ সর্বনামটি এস্থানে تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٠. أُولٰئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ اَنْصَارٍ يَمْنَعُوْنَهُمْ عَذَابَهٗ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ط بِاِضْلَالِهِمْ غَيْرَهُمْ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ لِلْحَقِّ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ اَىْ لِفَرْطِ كَرَاهَتِهِمْ لَهٗ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَطِيْعُوْا ذٰلِكَ.

২০. তারা পৃথিবীতে পালিয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাকে পরাভূত করতে পারেনি এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যাতীত তাদের অপর কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী নেই। যে তাদের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে প্রতিহত করবে। অন্যদের পথভ্রষ্ট করার দরুন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে। সত্য সম্পর্কে তাদেরকে শোনার সামর্থ্য ছিল না এবং তারা দেখত না। অর্থাৎ সত্যের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টির আতিশয্যের কারণে তাদের যেন শোনা বা দেখার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

٢١. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ. عَلَى اللّٰهِ مِنْ دَعْوَى الشِّرْكِ.

২১. চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রত্যাবর্তন করত তারা নিজদিগেরই ক্ষতি করল এবং শিরকের দাবি করত আল্লাহ তা'আলার উপর যে সমস্ত বস্তুর তারা মিথ্যা আরোপ করত তা হারিয়ে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল।

٢٢. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ.

২২. নিশ্চয়ই তারা হবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।

٢٣. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا سَكَنُوْا وَاطْمَاَنُّوْا وَاَنَابُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

২৩. যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে এবং তাদের প্রতিপালকের সমীপে মিনতি প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলার দিকেই প্রশান্তি লয়, তার দিকেই ফিরে আসে তারাই জান্নাতবাসী সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٤. مَثَلُ صِفَةُ الْفَرِيْقَيْنِ الْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ هٰذَا مَثَلُ الْكَافِرِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ط هٰذَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ط لَا اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ تَتَّعِظُوْنَ ـ

২৪. দল দুটির কাফের ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত বিবরণ হলো অন্ধ ও বধির এটা কাফেরদের উদাহরণ এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রোতা এটা মু'মিনের উদাহরণ। এই উভয়ের অবস্থা কি সমান? না সমান নয়। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না। تَذَكَّرُوْنَ তাতে মূলত ذ এ ت -এর اِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً (الْاٰيَة) : لَئِنْ -এর মধ্যে لَامْ টি قَسَمِيَّة হয়েছে। اِنَّهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ হলো جَوَاب قَسَمْ আর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। مِنَّا হলো حَالْ আর رَحْمَةً হলো اَذَقْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল। আর مِنَّا মূলত رَحْمَةً -এর সিফত مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে حَالْ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ : এই উভয়টিই مُبَالَغَة -এর সীগাহ। আর এ দুটিই اِنَّ -এর খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْكَافِرُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْاِنْسَانَ -এর اَلِفْ لَامْ টি عَهْدِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْكُفْرِ ب : এটা كَفُوْرٌ -এর মুবালাগাহ -এর সীগাহ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَوَقَّعْ زَوَالَهُ : এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ -এর মধ্যে শুধুমাত্র মসিবতসমূহ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং বক্তা এই মসিবতে ফিরে না আসার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অর্থাৎ অর্জিত নিয়ামত তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

قَوْلُهُ لٰكِنْ : এখানে اِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয়েছে। কেননা لَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ -এর মধ্যে اِنْسَانَ দ্বারা কাফের ইনসান উদ্দেশ্য। কাজেই اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

قَوْلُهُ بَيَانٌ : بَيِّنَةٍ -এর তাফসীর بَيَانٍ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলার বাণী يَتْلُوْهُ -এর যমীর بَيِّنَةٍ -এর দিকে ফিরেছে। অথচ যমীর এবং مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো بَيِّنَةٍ টা بَيَانٍ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ النَّبِىُّ ﷺ اَوِ الْمُؤْمِنُوْنَ : এটা مَنْ كَانَ بَيِّنَةٍ -এর মধ্যে مَنْ -এর مِصْدَاقْ -এর ব্যাখ্যা। مَنْ -এর مِصْدَاقْ -এর ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম হলো রাসূল ﷺ -আর অপরটি হলো মু'মিনগণ। আর وَحِىَ الْقُرْاٰنُ হলো بَيِّنَةٍ -এর مِصْدَاقْ -এর বিবরণ।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ هُمَا حَالَانِ مِنْ كِتَابِ مُوْسٰى

قَوْلُهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذَالِكَ : মুফাসসির (র.) এই বাক্য বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَفَمَنْ كَانَ الخ মুবতাদার খবর উহ্য রয়েছে। আর তা হলো كَمَنْ لَيْسَ كَذَالِكَ

قَوْلُهُ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ -এর মধ্যে হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ

قَوْلُهُ يَطْلُبُوْنَ السَّبِيْلَ : এটা এই প্রশ্নের উত্তর যে, يَبْغُوْنَهَا -এর যমীর سَبِيْل -এর দিকে ফিরেছে। অথচ যমীর স্ত্রী লিঙ্গ বা مُؤَنَّثْ আর سَبِيْل হলো مُذَكَّرْ বা পুংলিঙ্গ।

জবাবের সারকথা হলো এই যে, سَبِيْل শব্দটি مُذَكَّرْ এবং مُؤَنَّثْ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রকৃতির ও জলদি-প্রিয়। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোনো নিয়ামতের স্বাদ-আস্বাদন করার পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত -হারা হতাশ ও না-শোকর বনে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বাভাবত জলদি-বাজ, বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নিয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামি করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুঃখ দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহঙ্কার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমার যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এ কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে چناں نماند چنیں نیز هم نخواهد ماند তা যেমন রয়নি এও তেমনি থাকবে না, থাকাটাই বরং অসম্ভব।

অতীত ও ভবিষ্যতকে ভুলে গিয়ে বর্তমান-পূজায় আক্রান্ত হওয়ার ব্যাধি মানুষের মন-মগজকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, একজন ক্ষমতাসীনের রক্তমাখানো মাটির উপর আরেকজন স্বীয় মসনদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং কখনো ফিরে তাকাবার সুযোগ হয় না যে, তার পূর্বসূরী একজন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিও ছিল, তার পরিণতি কত মর্মান্তিক হয়েছে। বরং ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করার নেশায় বুঁদ হয়ে এর শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকে।

এহেন বর্তমান-পূজার ব্যাধি ও ভোগমত্ততার রোগ হতে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই আসমানি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে নবী রাসূল (আ.) গণ প্রেরিত হয়েছেন। তাঁরা অতীত ইতিহাসের শিক্ষামূলক ঘটনাবলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ সাফল্যের চিন্তা সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তাঁরা উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের পরিবর্তনশীল অবস্থ পর্যবেক্ষণ করে দেখ, এক পরাক্রমশালী মহাশক্তি অন্তরাল হতে একে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছেন। তোমরাও তাঁ বিধি-নিষেধ মেনে চল। হযরত শায়খুল-হিন্দের ভাষায় বলতে হয়। قلابات جہاں واعظ رب ہے دیکھو - ہو تغیر سے صدا اتی ہے فافہم فافہم 'জগতের পরিবর্তনসমূহ আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশ দিচ্ছেন, প্রতিটি পট-পরিবর্তন ডাক দি যায়-উপলব্ধির অনুধাবন কর।' পূর্ণ ঈমানদার তথা সত্যিকার মানুষ ঐ সব ব্যক্তি যারা সাময়িক সুখ-দুঃখ ও বস্তুজগতের প্রা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন না। বরং সকল সুখ-দুঃখ, প্রতিটি আবর্তন-বিবর্তন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল এ মহাশক্তিকে অনুধাবন করেন। কার্যকারণের পেছনে না ছুটে বরং উহার মূল উৎস ও স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা এবং ত সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ।

১১ নং আয়াতে এমন ঈনসানে-কামিল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য ইরশ করেছেন إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশে গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

صَبْر - সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবি ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেওয়া, বন্ধন করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যায় কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণকে করাকে 'সবর' বলে। সুতরাং শরিয়তের পরিপন্থি যাবতীয় পাপকর্ম হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত তদ্রূপ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কিয়ামতের জবাবদেহিতার ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কাজে মশগুল থাকে তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্যধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ : অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাদের সৎকাজসমূহের বিরাট প্রতিদান দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ তা'আলা أَذَقْنَا "স্বাদ আস্বাদন করাই বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বরং মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনা স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেওয়া হয়েছে, যেন আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং পার্থিব সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন বোকামি, তদ্রূপ পার্থিব দুঃখ-দুর্দশায়ও অত্যাধিক বিমর্ষ হওয়া উচিত নয়। বস্তুত দুনিয়াটাকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটি প্রদর্শনীস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেখানে আখেরাতের সুখ-দুঃখের নমুনা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২ নং আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী ﷺ সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করেছিল। প্রথমত তারা বলল 'এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি হয়তো অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন।' ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ "আপনি অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।"

–[তাফসীরে বগবী ও তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয়ত তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুয়তের প্রতি ঐ সময় বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো আপনার আয়ত্তে কোনো ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে আপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা আসমান হতে কোনো ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবে এবং আপনার কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।"

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কারণ তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তাঁর ইখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরি ও শিরকের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা তিনি রাহমাতুললি 'আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়, নবুয়তকে তারা বাদশাহীর উপর কিয়াস করে বসেছিল। আসলে ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুয়তের আদৌ কোনো সম্পর্কে নেই। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলারও এমন কোনো রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। নতুবা নিখিল সৃষ্টি জগত তাঁর অপার কুদরতের করায়ত্ত। কার সাধ্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোনো কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হিকমতের তাগিদে ইহজগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকাজ সম্পাদন অথবা অন্যায়-অসত্য হতে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে মজবুর বা বাধ্য করা হয় না।

Free @ www.eilm.weebly.com

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাজিল করে ভালো-মন্দের পার্থক্য এবং উহার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সৎকাজ করাও অসৎকার্য হতে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোনো ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হতো। ফলে এ দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হতো। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান-বিল গায়েব বা গায়েবের প্রতি ঈমান হতো না। অথচ ঈমান বিল-গায়েবই হচ্ছে ইমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার ইখতিয়ারও থাকত না। অথচ ইখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অতএব, তাদের আবদার ছিল নিরর্থক ও অবাঞ্ছিত। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে তাদের এহেন বেহুদা আবদার প্রমাণ করে তারা নবী ও রাসূলের হাকিকত সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহর ন্যায় রাসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রাসূলের কাছে তারা এমন আবদার করছে যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না। যা হোক রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দান করা ও মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো। যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহর প্রেরিত কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন? যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরিকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করছে। এখানে لَعَلَّكَ শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরিকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রাসূলে পাক ﷺ কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ তিনি তো আল্লাহর পক্ষ হতে نَذِيْر ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখনই নবীর মাধ্যমে মোজেজা প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরিকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে نَذِيْر বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نَذِيْر [ভীতি প্রদর্শক] ছিলেন, অপরদিকে সৎ কর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بَشِيْر সুসংবাদদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর'-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মোজেজা দাবি করার উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর মোজেজা পাক-কুরআন তোমাদের সম্মুখে বর্তমান রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ মোজেজার দাবি করে থাক, তাহলে কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবি পূরণ করা হয়েছে! সুতরাং নতুন কোনো মোজেজার দাবি করে থাক তাহলে তোমাদের মতো হঠকারী লোকেরা মোজেজা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশা করা যায় না। সারকথা, কুরআনে কারীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মোজেজা, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফের ও মুশরিকরা যেসব অমূলক সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম নয়;বরং রাসূলে কারীম ﷺ স্বয়ং তা রচনা করেছেন! যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে উম্মী ﷺ নিজে রচনা করেছেন তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেবদেবী সবাই মিলে তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরি করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এই কুরআন যদি কোনো মানুষের রচিত কালাম হতো তাহলে অন্য মানুষরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই কুরআন আল্লাহ পাকের ইলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে দশটি সূরা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হলো, তখন তাদের
মতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কুরআন করীমের সূরা বাকারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ
অর্থাৎ তোমরা পবিত্র কুরআনকে যদি মানুষের তৈরি কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশি নয়, অনুরূপ
টি সূরা তৈরি করে আন। কিন্তু তাদের জন্য অতদূর সহজ করে দেওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের
াবিলা করতে সক্ষম হলো না। অতএব, কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম ও স্থায়ী মোজেজা হওয়া সন্দেহাতীতভাবে
ণিত হলো। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ অর্থাৎ এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে,
সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا : ইসলাম বিরোধীদের যখন আজাবের ভয় দেখানো হতো, তখন
নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলিকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সৎকাজ
সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন? আজকাল পাণ্ডিত্যের দাবিদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা
। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সচ্চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোনো রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ
াদি কোনো জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। এ আয়াতে [১৫ নং] সে
ভাবেরই জবাব দেওয়া হয়েছে।

বের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, এটা একমাত্র
াহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলে আকরাম ﷺ-এর তরিকা
বিক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ, গুণ-গরিমা,
-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িও মূল্য নেই। তবে
ত তা যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং এর দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ জাল্লাশানুহু এহেন তথাকথিত
ার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না; বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সুনাম ও সম্মান
হবে, লোক তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয়
াফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নিয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার
া ছিল না। কাজেই আখেরাতে তার কোনো প্রতিদানও লাভ করবে না। বরং নিজেদের কুফরি, শিরকি ও গোনহের
ণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এটাই ১৫ নং আয়াতের সংক্ষিপ্তসার। এবার অত্র আয়াতের শব্দ
াস লক্ষ্য করুন।

াদ হয়েছে, যারা শুধু দুনিয়ার যিন্দেগী ও এর চাকচিক্য কামনা করে তাদের যাবতীয় সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান আমি
নেই দান করি, আর এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনোরূপ কমতি করা হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য দোজখের
ন ছাড়া আর কিছুই নেই।

নে বিশেষ লক্ষণীয় যে, অত্র আয়াতে কুরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুসারে مَنْ اَرَادَ সংক্ষিপ্ত শব্দের পরিবর্তে দীর্ঘতর
مَنْ كَانَ يُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বাকরীতিতে চলমান কাল বোঝায় এবং এর অর্থ হচ্ছে যারা পার্থিব জীবন কামনা
তে থাকে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, অত্র আয়াতে শুধু ঐ সব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা নিজেদের সৎকাজের
ময়ে শুধু পার্থিব ফায়দাই হাসিল করতে চায়। আখেরাতে মুক্তিলাভের কল্পনা তাদের মনের কোণে কখনো উদয় হয় না।
ান্তরে যারা আখেরাতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সৎকাজ করে এবং সাথে সাথে পার্থিব কিছু লাভের আশাও রাখে, তারা
আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আয়াত কি কাফেরদের সম্পর্কে, না মুসলমানদের অথবা কাফের ও মুসলমান উভয়ের সম্পর্কে, এ ব্যাপারে তাফসীরকার
মগণের মতভেদ রয়েছে।

াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতে করে বোঝা যায় যে, অত্র
াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গুনার শাস্তি ভোগ
ার পর অবশেষে দোজখ হতে মুক্তিলাভ করে বেহেশত প্রবেশ করবে এবং আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত লাভ করবে। এজন্য
্হাক প্রমুখ মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফেরদের উপর প্রযোজ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐ মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, যশ-মান, খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোজখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তাফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকাজ শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যত সেদিকে কোনো লক্ষ্য রাখে না; বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তাফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মায়মূন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (র.) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রসিদ্ধ হাদীস إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটিও তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ কতে চায়, সে আখেরাতের নিয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবি হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্বধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হাদীস শরীফে আছে কিয়ামতের দিন ঐসব লোককে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করা হবে, যারা লোকসমাজে সুনাম ও প্রশংসা লাভের জন্য লোকদেখানো মনোভাব নিয়ে ইবাদত ও সৎকাজ করেছে। তাদেরকে বলা হবে যে, "তোমরা দুনিয়াতে নামাজ পড়েছ, দান-খয়রাত করেছ, জিহাদ করেছ, কুরআন তেলাওয়াত করেছ কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল যেন লোকে তোমাদেরকে মুসল্লি, দাতা, বীর ও কারী সাহেব বলে। তোমাদের যা কাম্য ছিল, তা তোমরা পেয়েছ, দুনিয়াতেই তোমরা এসব বিশেষণে বিভূষিত হয়েছ। অতএব, আজ এখানে তোমাদের কার্যাবলির কোনো প্রতিদান নেই।" অতঃপর তকাদেরকে সর্বপ্রথম দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কুরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিম হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ করবে। আর কাফেররা যেহেতু আখেরাতের কোনো ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেওয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলির প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে তখন সেখানে পাওয়ার মতো তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না। তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, মুমিন ব্যক্তি যদিও পার্থিব সাফল্য ও প্রত্যাশা করে, কিন্তু আখেরাতের আকাঙ্ক্ষাই তার প্রবলতর থাকে। সুতরাং দুনিয়ায় সে প্রয়োজন পরিমাণ পায় এবং আখেরাতে বিপুল প্রতিদান লাভ করে।

হযরত ওমর ফারূক (রা.) একদা হুজুর ﷺ -এর গৃহে হাজির হলেন। সারা ঘরে হাতেগোনা কিছু আসবাবপত্র ছাড়া বেশি কিছু জিনিসপত্র দেখতে পেলেন না। তিনি আরজ করলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনার উম্মতকে দুনিয়ায় সচ্ছলতা দান করেন। আমরা পারসিক ও রোমকদেরকে দেখেছি, তারা দুনিয়ায় অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই করে না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এতক্ষণ তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন, হযরত ওমর (রা.) -এর কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, হে ওমর! তুমি এখন পর্যন্ত এহেন চিন্তাধারা পোষণ করছ! এরা তো ঐসব লোক যাদের কাজের প্রতিফল ইহজীবনেই দান করা হয়েছে।

জামে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে আখেরাত লাভ করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও বেনিয়াজ করে দেন এবং তার পার্থিব প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে দেন, দুনিয়া তার কাছে নত হয়ে ধর্ণা দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিল করতে চায়,

Free @ www.e-ilmweebly.com

আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহতাজ ও পরমুখাপেক্ষী করে দেন। তার অভাব ও দৈন্য কখনো দূর হয় না। কারণ দুনিয়ার মোহ তাকে কখনো নিশ্চিন্তে বসার অবসর দেয় না। একটি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আগেই আরেকটি প্রয়োজন তার সামনে উপস্থিত হয়। আর অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি তাকে পেয়ে বসে। অথচ শুধু ততটুকুই সে প্রাপ্ত হয়, যতটুকু আল্লাহ তা'আলার তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তাদেরকে দুনিয়াতেই পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হয়, কোনো কমতি করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা শুধুমাত্র পার্থিব সুখ-সম্পদ হাসিল করতে চায় এবং এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা-তদবীরও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কিছুই পায় না। এর কারণ কি?

জবাব এই যে, কুরআনুল কারীমের অত্র আয়াতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর তাফসীর সূরা বনী ইসরাঈলের এই আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুইটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মুতাবিক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমার হিকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মোকাবিলায় তুলে ধরা হয়েছে– যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুটি শ্রেণি কখনো সমকক্ষ হতে পারে না, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশ্বমানবের জন্য রাসূল হওয়টা এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামি হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে যে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যিনি কুরআনের ধারক ও বাহক এবং তার উপর স্থির অবিচল, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যার সত্যতার একটি প্রমাণ তো এর মধ্যেই মওজুদ রয়েছে এবং এর পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাবও এর সাক্ষী– যা ছিল মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য এবং রহমতস্বরূপ।

অত্র আয়াতে بَيِّنَةٍ বলে কুরআন পাককে বোঝানো হয়েছে شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল কুরআনে হযরত থানবী (র.) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহিদ' অর্থ পবিত্র কুরআনের إِعْجَازُ ইজায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কুরআনের উপর কায়েম রয়েছে। আর কুরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো খোদ কুরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ, তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা কুরআন যে আল্লাহ তা'আলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

দ্বিতীয় বাক্যে হুজুর ﷺ ও কুরআনের প্রতি ঈমান ও একীনকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব-মানবের পরিত্রাণ লাভের একমাত্র ভিত্তি ঘোষণা করা হয়েছে যে, যে কোনো ব্যক্তি আপনাকে অমান্য বা অস্বীকার করবে জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ইরশাদ করেছেন আমার প্রাণ যার কুদরতের করায়ত্ত, সেই মহান সত্তার কসম: যে-কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টান আমার দাওয়াত শোনা সত্ত্বেও আমার আনীত শিক্ষার উপর ঈমান আনবে না, সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে।

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা ঐসব লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হওয়া উচিত, যারা ইহুদি খ্রিস্টান বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের প্রশংসনীয় কার্যলাবলি দেখে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর কায়েম বলে সাফাই পেশ করে, তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় এবং কুরআনে পাক ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতিরেকে শুধু বাহ্যিক সৎকার্যাবলিকেই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করে। এহেন ধ্যান-ধারণা পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে কারীমা ও সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

অনুবাদ :

٢٥. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْكَسْرِ عَلٰى حَذْفِ الْقَوْلِ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ ـ

২৫. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ্য সতর্ককারী। আর সুস্পষ্ট এই সতর্কীকরণ। اِنِّىْ এটা এস্থানে بِاَنِّىْ অর্থে ব্যবহৃত। অপর এক কেরাতে তার اَلِفْ এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তার পূর্বে قَوْل ধাতু হতে গঠিত কোনো শব্দ قَائِل বা قَالَ এটা রয়েছে বলে ধরা হবে।

٢٦. اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنْ عَبَدْتُّمْ غَيْرَهٗ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ـ مُؤْلِمٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

২৬. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমরা যেন অন্য কারো ইবাদত না কর। যদি অন্য কারো ইবাদত কর তবে আমি তোমাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে মর্মন্তুদ যন্ত্রাণাকর দিবসের শাস্তি আশঙ্কা করি। اَنْ এটা এস্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٧. فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ وَهُمُ الْاَشْرَافُ مَا نَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَلَا فَضْلَ لَكَ عَلَيْنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا اَسَافِلُنَا كَالْحَاكَةِ وَالْاَسَاكِفَةِ بَادِىَ الرَّاْىِ ج بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهَا اَىْ اِبْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَفَكُّرٍ فِيْكَ وَنَصْبُهٗ عَلَى الظَّرْفِ اَىْ وَقْتَ حُدُوْثِ اَوَّلِ رَاْيِهِمْ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَتَسْتَحِقُّوْنَ بِهِ الْاِتِّبَاعَ مِنَّا بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ فِىْ دَعْوَى الرِّسَالَةِ اَدْرَجُوْا قَوْمَهٗ مَعَهٗ فِى الْخِطَابِ ـ

২৭. তার সম্প্রদায়ের যারা কুফরি করেছিল সেই প্রধানরা বলল, আমরা তোমাকে তো আমাদের মতোই মানুষ দেখতেছি। আমাদের উপর তোমার তো আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। আমরা তো দেখতেছি, তোমার অনুসরণ করতেছে তো তারাই যারা আমাদের মধ্যে দুর্বল। নীচ শ্রেণির যেমন তাতী, মুচি ইত্যাদি হালকা মতামত পোষণ করে। তোমার বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা ভাবনা না করেই তারা এটা করতেছে। আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্বও দেখতে পাচ্ছি না। যে তোমরা আমাদের অনুসরণের হকদার হতে পার বরং রেসালাতের দাবি করার মধ্যে আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। اَلْمَلَاُ তারা ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। بَادِىَ এটার শেষে هَمْزَة সহ ও তা ব্যতিরেকে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। ظَرْف বা কালাধিকরণরূপে তা مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, গভীরভাবে না তলিয়ে ধারণা সৃষ্টির শুরুতেই মত দিয়ে বসে। نَظُنُّكُمْ এস্থানে সম্বোধনের বেলায় তার সাথে তার সম্প্রদায়কেও শামিল করা হয়েছে।

٢٨. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً نُبُوَّةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ خُفِيَتْ عَلَيْكُمْ ط

২৮. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা লক্ষ্য করেছ কি? তোমরা আমাকে বল আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে সুস্পষ্ট বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ অর্থাৎ নবুয়ত দান করে থাকেন। অনন্তর তা তোমাদের চোখে না পড়ে গোপন হয়ে যায়

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ وَالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا أَنُجْبِرُكُمْ عَلَى قَبُوْلِهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ لَا نَقْدِرُ عَلَى ذٰلِكَ.

فَعُمِّيَتْ অপর এক কেরাতে এটার مِيْم এ তাশদীদসহ مَجْهُوْل বা কর্মবাচ্যরূপে পঠিত রয়েছে। আমরা কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি এটা গ্রহণ করতে কি তোমাদেরকে জবরদস্তি করতে পারি যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর? না আমরা এটার অধিকার রাখি না।

٢٩. وَيٰقَوْمِ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ مَالًا ط تُعْطُوْنِيْهِ إِنْ مَا أَجْرِىَ ثَوَابِىَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط كَمَا أَمَرْتُمُوْنِىْ إِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ فَيُجَازِيْهِمْ وَيَأْخُذُ لَهُمْ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَطَرَدَهُمْ وَلٰكِنِّىْٓ أَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! তার পরিবর্তে অর্থাৎ রেসালাতের পয়গাম পৌছানোর বিনিময়ে আমি তোমাদের নিকট কোনো অর্থসম্পদ যাচ্ঞা করি না যে তোমরা তা আমাকে দিবে। আমার বিনিময় পুণ্যফল কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছে। তোমাদের নির্দেশানুসারে মু'মিনদেরকে আমি তাড়িয়ে দেওয়ার নই। পুনরুত্থানের মাধ্যমে নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। অনন্তর তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। যারা তাদের উপর জুলুম করবে ও তাড়িয়ে দিবে তাদের পক্ষ হতে তিনি প্রতিশোধ নিবেন। কিন্তু আমি দেখতেছি তোমরা তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ এক সম্প্রদায়। إِنْ এটা এস্থানে নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত।

٣٠. وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ يَمْنَعُنِىْ مِنَ اللّٰهِ أَىْ عَذَابِهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ أَىْ لَا نَاصِرَ لِىْ أَفَلَا فَهَلَّا تَذَكَّرُوْنَ. بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الْأَصْلِ فِى الذَّالِ تَتَعَظُوْنَ

৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহ তা'আলা হতে অর্থাৎ তার শাস্তি হতে আমাকে কে সাহায্য করবে? কে রক্ষা করবে? আর কেউই আমার সাহায্যকারী নেই। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না। শিক্ষাগ্রহণ করবে না? تَذَكَّرُوْنَ তাতে এ প্রথম ت টির ذ এ إِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে।

٣١. وَلَآ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ أَنِّىْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُوْلُ إِنِّىْ مَلَكٌ بَلْ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَآ أَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْ تَحْتَقِرُ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ط اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ أَنْفُسِهِمْ ج قُلُوْبِهِمْ إِنِّىْٓ إِذًا إِنْ قُلْتُ ذٰلِكَ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

৩১. আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার ধন ভাণ্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত নই এবং আমি তাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। বরং আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় নীচ তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মঙ্গল দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। ঐরূপ বললে আমি অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। أَنْفُسِهِمْ অর্থ তাদের অন্তরে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩২. قَالُوا يٰنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا خَاصَمْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْهِ ـ

৩২. তারা বলল হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক বাক্‌বিতণ্ডা করেছ আর অতিমাত্রায় বিতণ্ডা করেছ। তুমি যদি এই বিষয়ে সত্যবাদী হয়ে থাক তবে আমাদেরকে যার যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছে তা নিয়ে আস।

৩৩. قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ تَعْجِيْلَهٗ لَكُمْ فَاِنَّ اَمْرَهٗ اِلَيْهِ لَا اِلَيَّ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ اللّٰهَ ـ

৩৩. সে বলল আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের ব্যাপারে শীঘ্র করতে চাহেন তবে তিনি তা তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন। কারণ এটা আমার দায়িত্ব নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাভুক্ত। আর তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে হারিয়ে যেতে পারবে না।

৩৪. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ اَيْ اِغْوَائَكُمْ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

৩৪. আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান তোমাদের বিভ্রান্তিই যদি তার ইচ্ছা হয়ে থাকে তবে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। اِنْ كَانَ اللّٰهُ আল্লাহ যদি চান। এই শর্তবাচক বাক্যটির জওয়াব এই স্থানে উহ্য। পূর্ববর্তী لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ বাক্যটি তার প্রতি ইঙ্গিতবহ।

৩৫. قَالَ تَعَالٰى اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ افْتَرٰىهُ اِخْتَلَقَ مُحَمَّدٌ الْقُرْاٰنَ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ اَيْ عُقُوْبَتُهٗ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ مِنْ اِجْرَامِكُمْ فِيْ نِسْبَةِ الْاِفْتِرَاءِ اِلَيَّ ـ

৩৫. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ বরং বলে যে, সে তা রচনা করেছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ নিজে এই কুরআন তৈরি করে নিয়ে এসেছেন বল আমি যদি এটা রচনা করে থাকি তবে আমার উপরই আমার এই অপরাধ অর্থাৎ তার শাস্তি। আর আমার প্রতি মিথ্যা রচনার দোষ আরোপ করতো তোমরা যে অপরাধ করতেছ তা হতে আমি দায়িত্ব মুক্ত। اَمْ এটা এস্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ الخ : অর্থাৎ تَذَكَّرُوْنَ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ হতে হয়েছে বাবে تَفْعِيْلٌ থেকে নয়।

قَوْلُهٗ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ : এটা مُبِيْنٌ -এর তাফসীর بَيِّنٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُبِيْنٌ এখানে اِبَانٌ লাজেম।

قَوْلُهٗ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ : يَوْمٌ -এর সিফত اَلِيْمٌ -এর সাথে اِسْنَادٌ مَجَازِيٌّ -এর ভিত্তিতে হয়েছে عَلَاقَةُ ظَرْفِيَّتْ -এর কারণে

قَوْلُهٗ كَالْحَاكَةِ : এটা حَائِكٌ -এর বহুবচন অর্থ তাঁতী।

قَوْلُهٗ اَسَاكِفَةُ : এটা سَكَّافٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মুচি, জুতা, সেণ্ডেল সেলাইকারী।

قَوْلُهٗ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهٖ : অর্থাৎ হামযাকে বাকি রেখে (اَلرَّائِيْ) এবং হামযাকে ফেলে দিয়ে (اَلرَّاىِٔ)

قَوْلُهٗ اِبْتِدَاءُ الخ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بَادِيَ টা بَدَأَ থেকে অর্থ হলো اِبْتِدَا [সূচনা] بُدُوٌّ থেকে নয়। যার অর্থ ظُهُوْرٌ বা প্রকাশ পাওয়া।

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ نَصْبُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ : অর্থাৎ اِتَّبَعَكَ টা بَادِيَ ظَرْف এর- হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقْتَ حُدُوْثِ اَوَّلِ رَأْيِهِمْ : এখানে وَقْتَ মুযাফ উহ্য মেনে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, ظَرْف টা হয়তো زَمَانٌ হবে অথবা مَكَانٌ হবে। আর بَادِيَ টা زَمَانٌ ও নয় আবার مَكَانٌ ও নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো بَادِيَ-এর পূর্বে একটি وَقْتَ শব্দ উহ্য রয়েছে, কাজেই এখন কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ اَدْرَجُوْا قَوْمَهُ مَعَهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলো। প্রশ্ন হলো এই যে, হযরত নূহ (আ.) তো একক ব্যক্তি ছিলেন। এরপরও তার জন্য نَظُنُّكُمْ বহুবচনের সীগাহ কেন ব্যবহার করলেন?

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, كِذْب -এর নিসবতে হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে তার উপর ঈমান আনয়নকারীদের কেও অংশীদার করে নিয়েছে। এ কারণেই বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ عَلَى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ : এই বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো عَلَيْهِ-এর যমীরের مَرْجِع বর্ণনা করা।

প্রশ্ন. পূর্বে تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ-এর কোথাও উল্লেখ নেই। কাজেই এতে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো যদিও পূর্বে প্রকাশ্যভাবে تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ-এর কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু বাক্যের ধরন দ্বারা তা বুঝা যায়। কাজেই اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ اِنِّيْ : মুফাসসির (র.) اِنِّيْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَا اَعْلَمُ টা عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ- এর উপর আতফ হয়েছে। اَقُوْلُ-এর উপর নয়। এজন্যই উদ্দেশ্য হলো اِنِّيْ لَا اَقُوْلُ لَكَ اِنِّيْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ

قَوْلُهُ تَزْدَرِيْ : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ-এর اِزْدِرَاءٌ মাসদার হতে। এটা مُشْتَقّ- زَرٰى يَزْرِيْ থেকে -এর অর্থ হলো কালিমা লেপন করা, দোষ লাগানো। زَرٰى عَلَيْهِ অর্থ হলো عَابَهُ; এর মূল ছিল تَزْتَرِيْ এরপর تَا কে دَالٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় تَزْدَرِيْ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَانِـے مَوْصُوْلَهْ-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اِغْوَائَكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে اَنْ يُغْوِيَكُمْ-এর মধ্যস্থ اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ

قَوْلُهُ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ فَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ : দ্বিতীয় شَرْط অর্থাৎ اِنْ كَانَ اللّٰهُ الخ -এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। যার উপর وَلَا يَنْفَعُكُمْ টা বুঝাচ্ছে। আর দ্বিতীয় شَرْط তার جَوَاب شَرْط-এর সাথে মিলে প্রথম شَرْط তথা اِنْ اَرَدْتُ الخ- এর جَوَابٌ হয়েছে। এই তারকীব হলো বসরীগণের মতানুযায়ী।

আর কূফীগণের নিকট প্রথম شَرْط-এর جَزَاءٌ- وَلَا يَنْفَعُكُمْ মুকাদ্দম হয়েছে। এই সুরতে উহ্য বাক্য হবে اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ فَاِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ فَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ আর দ্বিতীয় তারকীব এ কারণে যে, যখন দুটি شَرْط এবং একটি جَوَاب একত্রিত হয়ে যায় তখন جَوَابٌ টা দ্বিতীয় شَرْط-এর জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় شَرْط তার জবাবের সাথে মিলে প্রথম شَرْط-এর جَزَاءٌ হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) যখন তার জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহ এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাসাপেক্ষে কয়েকটি শব্দের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

مَلَأٌ 'মালাউ' শব্দের সাধারণ অর্থ জামাত বা দল। কোনো কোনো ভাষাবিদ ইমামের মতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জামাতকে مَلَأٌ বলে। بَشَرٌ 'বাশার' অর্থ– ইনসান বা মানুষ। اَرَاذِلُ বহুবচন, তার এক একবচন اَرْذَلُ অর্থ নীচাশয়, ইতর লোক। কওমের মধ্যে যাদের কোনো মান মর্যাদা নেই। بَادِيَ الرَّأْيِ অর্থ– স্থূলবুদ্ধি, ভাসাভাসা মতামত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল- مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا অর্থাৎ আমরা তো দেখি যে, আপনিও আমাদের মতোই মানুষ মাত্র। আমাদের মতো পানাহার করেন, হাটবাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান, জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে করত যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলরূপে কোনো মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে এর জবাবে ইরশাদ হয়েছে- يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ.

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থি নয়। বরং চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তার কাছে দীনি শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হতো, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হতো। কেননা ফেরেশতাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তারা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তালীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার নবী হতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার কাছে এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে, যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পয়গাম্বর বা বার্তাবহ। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মোজেজাই তার নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আ.) বলেছেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে স্পষ্ট দলিল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করতে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছ।

কিন্তু পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহ তা'আলার রহমত জোরজবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকতো তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম কিন্তু এটা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন বিধানের পরিপন্থি। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হেচ্ছ যে, জোর জবরদস্তি কাউকে মুমিন বা মুসলমান বানানো কোনো নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রচনা করে তাদেরও একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রথমে স্পষ্টত বোঝা গেল যে, কোনো ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সবদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং তাদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হতো। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার সাধ্য ছিল কার? আর কোনো পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং ঈমান বিল গায়েব অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রবল পরাক্রম প্রত্যক্ষ না করেই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল- وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ অর্থাৎ আমরা দেখছি যে, আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর, স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এই উক্তির মধ্যে দুটি দিক রয়েছে এক. আপনার দাবি যদি সত্য ও সঠিক হতো, তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্রে গ্রহণ করতো। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আন

আমরাও আহম্মকরূপে পরিচিত ও ধিকৃত হবো। **দুই.** সমাজের নিকৃষ্ট ও ইতর ও ছোট লোকগুলো আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসেবে তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হবো, নামাজের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব, এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; বরং তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

বস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণিকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল, যাদের কাছে পার্থিব ধনসম্পদ ও বিষয়-বৈভব ছিল না। মূলত তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুত পক্ষে ইজ্জত ও উন্নতি , ধন-দৌলত বা বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মতো, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোনো অন্তরায় থাকে না, কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে এর স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রাসূলে পাক ﷺ -এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই এর তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করলো। কেননা সে তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পারদর্শী ছিল, তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল তাদের একত্র করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তার অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণি ঈমান আনয়ন করছে, না বিত্তশালী বড় লোকেরা? তারা জবাব দিল, দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণি। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল,এ তো সত্য রাসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বল শ্রেণিই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মুর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই-যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তাঁর নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন, যারা বাদশাহও রাজ কর্মচারীদের খোশামোদ-তোশামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, যারা দীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমিনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের (রা.) নিন্দা সমালোচনা করে, সেই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ তারাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরিয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

যা হোক ৩৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলা হয়েছে যে, কারো ধনসম্পদের প্রতি নবী রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজের খেদমত ও তা'লীম তাবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই তাদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়তো আমাদের বিত্ত সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়ত তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসেবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা সম্ভবপর নয়। কারণ আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ তা'আলার ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকারও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায়-অসঙ্গত।

مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ -এর আরেক অর্থও হতে পারে যে, ধরে নেওয়া যাক, আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে কিয়ামতের দিন তারা যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ জানাবে, তখন আমি কি জবাব দেব?

৩০ নং আয়াতে একই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই, তাহলে আমাকে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন, তখন আমাকে আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে কে রক্ষা করবে? পরিশেষে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, মানুষের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জন্য নবুয়ত প্রাপ্তিকে অসম্ভব মনে করা, দরিদ্রদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার আবদার করা ইত্যাদি সবই তাদের জাহিলিয়াত ও মূর্খতার লক্ষণ ৩১ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা তিনি তার কওমের প্রশ্ন ও আপত্তি শ্রবণ করার পর তাদের মৌলিক হেদায়েত দানের জন্য ব্যক্ত করেছেন। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ধন-ভাণ্ডার থাকা, গায়েবের খবর জানা ফেরেশতা হওয়া প্রভৃতি যা কিছু তোমরা নবী রাসূলগণের জন্য আবশ্যক মনে করছ, আসলে তার একটিও নবুয়ত বা রিসালতের জন্য প্রয়োজনীয় নয়।

তিনি প্রথমেই বলেছেন– وَلَآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তা'আলার ধন ভাণ্ডার আছে। এখানে তাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে। তারা বলতো যে, তিনি যদি আল্লাহ তা'আলার নবীরূপে আগমন করে থাকেন, তবে তার কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ধন ভাণ্ডার থাকা উচিত ছিল, যা থেকে লোকদেরকে সাহায্য দান করবেন। হযরত নূহ (আ.) জানিয়ে দিলেন যে, পার্থিব ধন সম্পদে মানুষকে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য নবী রাসূলগণ প্রেরিত হননি। বরং ধনসম্পদের মোহমুক্ত করে আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেওয়ার জন্যই তারা প্রেরিত হয়েছেন। অতএব, ধন ভাণ্ডারের সাথে তাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্ভবত এখানে আরো একটি ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, নবী রাসূল এমনকি আল্লাহ তা'আলার ওলীগণকে পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদত্ত হয়েছে, তাদের হাতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের ভাণ্ডার তুলে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে যাকে খুশি তাকে দিতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখতে পারেন। এহেন ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে হযরত নূহ (আ.) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতের ভাণ্ডার কোনো নবী রাসূলের হাতে তুলে দেননি। ওলী আবদাল তো দূরের কথা। তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্য নিজ অনুগ্রহে তাদের দোয়া ও চাহিদা স্বীয় মর্জি মোতাবেক পূরণ করে থাকেন।

হযরত নূহ (আ.)-এর দ্বিতীয় উক্তি ছিল– وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ অর্থাৎ আর আমি গায়েবও জানি না।" কেননা উক্ত জাহিলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গাম্বর তারা নিশ্চয়ই গায়েবের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আ.)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য গায়েবের ইলম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়েবের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সিফত বা বৈশিষ্ট্য। কোনো নবী, ওলী বা ফেরেশতা তার অংশীদার হতে পারে না। তাদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শিরক। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তদীয় পয়গাম্বরগণের মধ্যে যাকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের ইলম দান করেন। তা নবী ওলীগণের ইখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তারা যখন তখন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন অবহিত করেন, তখন তাদের জন্য তা আর গায়েব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল গায়েব বলা হারাম ও শিরক।

তার তৃতীয় উক্তি হয়েছে– وَلَآ اَقُولُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ অর্থাৎ আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী রাসূল রূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে– তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লাঞ্ছিত, ক্ষুদ্রাপিক্ষুদ্র দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মতো এ কথা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কোনো কল্যাণ ও কামিয়াবি দান করবেন না। কারণ প্রকৃত কল্যাণ ও কামিয়াবি ধনসম্পদ এবং ক্ষমতার জোরে হাসিল করা যায় না; বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবি হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) বলেন, তোমাদের মতো আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমি জালিমরূপ পরিগণিত হবো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free © www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

৩৬. وَ اُوْحِىَ اِلَى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ مِنَ الشَّرِّ فَدَعَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ رَبِّ لَا تَذَرْ الخ فَاَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهُ وَقَالَ

৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল যে যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো বিশ্বাস করবে না। সুতরাং তারা যা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না। দুঃখ করিও না। অনন্তর হযরত নূহ (আ.) তাদের প্রতি বদদোয়া করেন .... رَبِّ لَا تَذَرْ অর্থাৎ প্রভু! পৃথিবীতে কোনো সত্য প্রত্যাখ্যানকারী গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। আল্লাহ তা'আলার তার দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন,

৩৭. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِيْنَةَ بِاَعْيُنِنَا بِمَرْأًى مِنَّا وَحِفْظِنَا وَوَحْيِنَا اَمْرِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج كَفَرُوْا بِتَرْكِ اِهْلَاكِهِمْ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ.

৩৭. তুমি আমার দৃষ্টির সমক্ষে আমার তত্ত্বাবধানে ও চক্ষের সামনে এবং আমার ওহী অর্থাৎ নির্দেশ অনুসারে নৌযান নৌকা নির্মাণ কর আর সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে কাফেরদের সম্পর্কে অর্থাৎ তাদের ধ্বংস করা হতে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে আমাকে কিছু বলিও না। তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

৩৮. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ جَمَاعَةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ط اِسْتَهْزَؤُوْا بِهٖ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ اِذَا نَجَوْنَا وَغَرِقْتُمْ.

৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল। যখনই তার সম্প্রদায়ের কোনো দল তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করত তাকে উপহাস করতো। এই বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। সে বলত তোমারা যদি আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরা যখন উদ্ধার পাইব আর তোমরা নিমজ্জিত হবে তখন আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করতেছ। يَصْنَعُ এস্থানে অতীতের ঘটনাটিকে বর্তমানেও ঘটমানরূপে চিত্রিত করতে যেয়ে مُضَارِعْ বা বর্তমানকাল বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। اَلْمَلَأُ অর্থ দল।

৩৯. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ . دَائِمٌ .

৩৯. অনন্তর তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। مَنْ এটা مَوْصُوْلَةٌ বা সংযোগবাচক বিশেষ্য। পূর্বোল্লিখিত تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ বা কর্মকারকরূপে এস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। مُقِيْمٌ অর্থ– দণ্ডায়মান, স্থায়ী।

৪০. حَتّٰى غَايَةٌ لِّلصُّنْعِ اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ وَفَارَ التَّنُّوْرُ لِلْخَبَّازِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةً لِّنُوْحٍ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا فِى السَّفِيْنَةِ مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اَىْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى اَىْ مِنْ كُلِّ اَنْوَاعِهِمَا اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَ اُنْثٰى وَهُوَ مَفْعُوْلٌ.

৪০. অবশেষে তাদেরকে ধ্বংস করা সম্পর্কে আমার আদেশ আসল এবং রুটি তৈরিকারীদের চুলা প্লাবিত হলো। এটা ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর জন্য আজাব আসার আলামত। আমি বললাম, তাতে এই নৌকায় উঠিয়ে লও প্রত্যেক জীবের দুটি করে এক এক জোড়া অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার প্রাণী হতে নর ও নারী এক একটি করে এক এক জোড়া লও। مِنْ كُلٍّ এটা এস্থানে مَفْعُوْلٌ অর্থাৎ কার্যকারকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَفِى الْقِصَّةِ اِنَّ اللّٰهَ حَشَرَ لِنُوْحٍ السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَغَيْرَهُمَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ فِىْ كُلِّ نَوْعٍ فَتَقَعُ يَدُهُ الْيُمْنٰى عَلَى الذَّكَرِ وَالْيُسْرٰى عَلَى الْاُنْثٰى فَيَحْمِلُهُمَا فِى السَّفِيْنَةِ وَاَهْلَكَ اَىْ زَوْجَتَهُ وَاَوْلَادَهُ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اَىْ مِنْهُمْ بِالْاِهْلَاكِ وَهُوَ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ كِنْعَانُ بِخِلَافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثٍ فَحَمَلَهُمْ وَزَوْجَاتِهِمْ ثَلٰثَةً وَمَنْ اٰمَنَ ط وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ قِيْلَ كَانُوْا سِتَّةَ رِجَالٍ وَنِسَاءَهُمْ وَقِيْلَ جَمِيْعُ مَنْ كَانَ فِى السَّفِيْنَةِ ثَمَانُوْنَ نِصْفُهُمْ رِجَالٌ وَنِصْفُهُمْ نِسَاءٌ.

উপাখ্যানে আছে, আল্লাহ তা'আলা হিংস্র পশু, পক্ষী ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাণী হযরত নূহ (আ.)-এর সামনে একত্রিত করে দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধরনের প্রাণীর দিকে হাত প্রসারিত করতে ছিলেন। তাঁর ডান হাত নর ও বাম হাত নারী জাতীয় প্রাণীর গায়ে পড়তেছিল। অনন্তর তিনি ঐগুলো নৌকায় তুলে নিতেছিলেন। আর তুলে লও তোমার পরিবার পরিজনকে অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তানদেরকে তবে তাদের মধ্যে যাদের সম্পর্কে ধ্বংসের পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা অর্থাৎ তার এক স্ত্রী ও তার পুত্র কিনআন ব্যতীত; সুতরাং তারা ব্যতীত তার অন্যান্য পুত্র সাম, হাম, ইয়াফিছ ও অপর তিন স্ত্রীকে তিনি নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন। আর তুলে নাও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন মাত্র ঈমান এনেছিল। বলা হয়, তারা ছিল ছয়জন পুরুষ এবং তাদের স্ত্রীগণ। অপর কেউ কেউ বলেন, সকলে মিলে ঐ নৌকা আরোহীদের সংখ্যা ছিল আশিজন। তাদের অর্ধেক ছিল পুরুষ আর অর্ধেক নারী। حَتّٰى এটা এস্থানে নৌকা নির্মাণের সময় সীমা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤١. وَقَالَ نُوْحٌ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا بِفَتْحِ الْمِيْمَيْنِ وَضَمِّهِمَا مَصْدَرَانِ اَىْ جَرْيُهَا وَرُسُوُّهَا اَىْ مُنْتَهٰى سَيْرِهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. حَيْثُ لَمْ يُهْلِكْنَا.

৪১. আর নূহ বলল, তাতে আরোহণ কর, আল্লাহ তা'আলার নামে এটার গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তাই তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করেন নি। مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰهَا এই উভয় শব্দই مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ামূল। অর্থ তার [নৌকার] চলা ও থামা। অর্থাৎ এটার চলার চূড়ান্ত পর্যায়ও।

٤٢. وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فِى الْاِرْتِفَاعِ وَالْعِظَمِ وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ كِنْعَانَ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ عَنِ السَّفِيْنَةِ يٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ.

৪২. উচ্চতা ও বিরাটত্বে পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে এটা তাদেরকে নিয়ে চলল। নূহ তার পুত্র কেনআনকে ডেকে বললেন, আর সে ছিল নৌকা হতে পৃথক, হে আমার পুত্র। আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের সঙ্গী হয়ো না।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٣. قَالَ سَاٰوِیْۤ اِلٰی الْجَبَلِ یَعْصِمُنِیْ یَمْنَعُنِیْ مِنَ الْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ عَذَابِهٖ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ فَهُوَ الْمَعْصُوْمُ قَالَ تَعَالٰی وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِیْنَ ـ

৪৩. সে বলল, আমি শীঘ্র পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করব। যা আমাকে জলপ্লাবন হতে বাঁচাবে : রক্ষা করবে। নূহ বললেন, আজ আল্লাহ তা'আলার বিধান হতে অর্থাৎ তার আজাব হতে রক্ষা করবার কেউ নেই। তবে আল্লাহ যাকে দয়া করেছেন সে ব্যতীত। সে হবে রক্ষাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। اِلَّا مَنْ رَّحِمَ এস্থানে اِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٤. وَقِیْلَ یٰۤاَرْضُ ابْلَعِیْ مَآءَكِ الَّذِیْ نَبَعَ مِنْكِ فَشَرِبَتْهُ دُوْنَ مَا اُنْزِلَ مِنَ السَّمَآءِ فَصَارَ اَنْهَارًا وَبِحَارًا وَیٰسَمَآءُ اَقْلِعِیْ اَمْسِكِیْ عَنِ الْمَطَرِ فَاَمْسَكَتْ وَغِیْضَ نَقَصَ الْمَآءُ وَقُضِیَ الْاَمْرُ تَمَّ اَمْرُ هَلَاكِ قَوْمِ نُوْحٍ وَاسْتَوَتْ وَقَفَتِ السَّفِیْنَةُ عَلَی الْجُوْدِیِّ جَبَلٌ بِالْجَزِیْرَةِ بِقُرْبِ الْمَوْصِلِ وَقِیْلَ بُعْدًا اِهْلَاكًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ الْكٰفِرِیْنَ ـ

৪৪. আর বলা হলো, হে পৃথিবী! তোমার পানি অর্থাৎ যে পানি তোমার হতে নির্গত হয়েছিল তা তুমি শোষণ করে নাও। অনন্তর তা আকাশ হতে যা বর্ষিত হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য পানি শুষে নেয়। ফলে তা নদনদী ও সমুদ্রের রূপ ধারণ করে। এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। অর্থ তোমার বারি বর্ষণ বন্ধ কর। ফলে তার বর্ষণ ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর বন্যা প্রশমিত হলো। পানি হ্রাস পেল এবং কার্য সমাপ্ত হলো। অর্থাৎ নূহ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বিষয়টি পূর্ণ হলো এটা অর্থাৎ নৌকাটি জুদীতে এটা মুছিলের সন্নিকট দজলা ফুরাতের মধ্যবর্তী জাযীরার একটি পাহাড়ের নাম স্থির হলো থামল আর বলা হলো ধ্বংসই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের অর্থাৎ কাফেরদের পরিণাম। بُعْدًا অর্থ এস্থানে ধ্বংস।

٤٥. وَنَادٰی نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِیْ كِنْعَانَ مِنْ اَهْلِیْ ج وَقَدْ وَعَدْتَّنِیْ بِنَجَاتِهِمْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ الَّذِیْ لَا خُلْفَ فِیْهِ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِیْنَ ـ اَعْلَمُهُمْ وَاَعْدَلُهُمْ ـ

৪৫. নূহ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র কিনআন আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনি আমার পরিবারবর্গকে রক্ষার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনার প্রতিশ্রুতি তো নিশ্চয়ই সত্য এটার বরখেলাফ তো হওয়ার নয়। এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যে অধিক বিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ।

٤٦. قَالَ تَعَالٰی یٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ ج النَّاجِیْنَ اَوْ مِنْ اَهْلِ دِیْنِكَ اِنَّهٗ سُؤَالُكَ اِیَّایَ بِنَجَاتِهٖ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ن فَاِنَّهٗ كَافِرٌ وَلَا نَجَاةَ لِلْكٰفِرِیْنَ ـ

৪৬. তিনি আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে নূহ সে তোমার রক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। বা তোমার দীন ও আদর্শভুক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই এটা অর্থাৎ এটাকে রক্ষা করার জন্য আমার নিকট তোমার প্রার্থনা করা ভালো কাজ হয়নি। কারণ সে কাফের বা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী, কাফেরদের জন্য মুক্তি নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَفِى قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ مِيْمِ عَمِلَ فِعْلٌ وَنَصَبَ غَيْرُ فَالضَّمِيْرُ لِابْنِهِ فَلَا تَسْئَلْنِ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط مِنْ اِنْجَاءِ ابْنِكَ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ بِسُؤَالِكَ مَا لَمْ تَعْلَمْ.

عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ অপর এক কেরাতে عَمَلٌ -এর مِيْم অক্ষরে কাসরাসহ ক্রিয়া হিসেবে এবং غَيْرُ শব্দটির শেষে نَصَبْ সহ পঠিত রয়েছে। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। যেমন তোমার ঐ পুত্রের মুক্তির বিষয়টি সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি যেন যে বিষয় তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও। এমতাবস্থায় এই বাক্যটির ضَمِيْر বা সর্বনাম দ্বারা اِبْنٌ বা তার পুত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে বুঝাবে। لَا تَسْئَلْنِ এটার ن অক্ষরটি تَشْدِيْد ও تَخْفِيْف বা রূঢ় এবং তাশদীদ ব্যতীত লঘুরূপেও পঠিত রয়েছে।

٤٧. قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاِلَّا تَغْفِرْلِىْ مَا فَرَطَ مِنِّىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ.

৪৭. সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করা হতে আমি আপনারই শরণ নিতেছি। আমার পক্ষ হতে ত্রুটি হয়ে গিয়েছে, সে বিষয়ে আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

٤٨. قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ اِنْزِلْ مِنَ السَّفِيْنَةِ بِسَلٰمٍ بِسَلَامَةٍ اَوْ بِتَحِيَّةٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ خَيْرَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ فِى السَّفِيْنَةِ اَىْ مِنْ اَوْلَادِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاُمَمٌ بِالرَّفْعِ مِمَّنْ مَّعَكَ سَنُمَتِّعُهُمْ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُمُ الْكُفَّارُ.

৪৮. বলা হলো হে নূহ! নৌকা হতে অবতরণ কর আমার দেওয়া শান্তিসহ নিরাপত্তা বা আমার তরফ হতে অভিবাদন ও শুভেচ্ছাসহ। আর তোমার এবং তোমার সাথে নৌকায় যে সমস্ত সম্প্রদায় আছে তাদের উপর অর্থাৎ তাদের আল আওলাদ ও সন্তান সন্তুতিদের উপর বরকতসহ কল্যাণসহ। তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে ছাড়া অপর সম্প্রদায়কে অর্থাৎ যারা কাফের হবে তাদেরকে দুনিয়ার জীবন উপভোগ করতে দিব; পরে আমার তরফ হতে পরকালে তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি স্পর্শ করবে। اِهْبِطْ অর্থ অবতরণ কর। بِسَلَامٍ অর্থ শান্তিসহ বা শুভেচ্ছা ও অভিবাদনসহ। وَاُمَمٌ এই اُمَمٌ শব্দটি رَفْع সহ পঠিত রয়েছে।

٤٩. تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الْمُتَضَمِّنَةُ قِصَّةَ نُوْحٍ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ اَخْبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ فَاصْبِرْ عَلَى التَّبْلِيْغِ وَاَذٰى قَوْمِكَ كَمَا صَبَرَ نُوْحٌ اِنَّ الْعَاقِبَةَ الْمَحْمُوْدَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ.

৪৯. এই অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী সংবলিত এই আয়াতসমূহ অদৃশ্য লোকের সংবাদ এমন বিষয়ের সংবাদ যা তোমাদের হতে অদৃশ্য। হে মুহাম্মদ ﷺ! আমি তোমাকে এতদ্বিষয়ে ওহী দ্বারা জ্ঞাত করেছি যা ইতিপূর্বে অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমিও জানতে না তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং নূহ যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তুমিও তোমার সম্প্রদায় প্রদত্ত পীড়ন ও ক্লেশ এবং দীন প্রচারের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় পরিণাম তাকওয়ার অধিকারীদের জন্যই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ : এখানে اُوْحِىَ হলো فِعْل مَاضِىْ مَجْهُوْل আর اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ হলো নায়েবে ফায়েল অর্থাৎ اُوْحِىَ اِلَيْهِ عَدَمُ اِيْمَانِ بَعْضِ قَوْمِهِ

قَوْلُهُ تَبْتَئِسْ : এ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ-এর اِبْتِئَاسٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ-এর সীগাহ। এখানে যেহেতু حَرْف نَفِىْ প্রবেশ করেছে এজন্য এটা نَهِىْ হয়েছে। অর্থ হলো তুমি রাগ করিও না।

قَوْلُهُ بِمَرْاٰى مِنَّا وَحِفْظِنَا : এই বৃদ্ধিকরণও একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন হলো بِاَعْيُنِنَا দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার اَعْضَاء তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। আর যার اَعْضَاء হয় সে مُجَسَّمْ বা শরীর বিশিষ্ট হয়। কাজেই আল্লাহর জন্য جِسْمْ হওয়া প্রমাণিত হলো যেমনটি মুজাসসামিয়াদের বিশ্বাস।

জবাবের সার হলো এই যে, بِاَعْيُنِنَا এটা حِفْظ এবং رُؤْيَا থেকে কেনায়া হয়েছে। যেমন بَسَطَ اللّٰهُ يَدَهٗ এটা বদান্যতার থেকে কেনায়া হয়েছে। بِاَعْيُنِنَا টা مَحَلًّا حَالٌ হয়েছে উহ্য ইবারত হলো مُتَلَبِّسًا بِاَعْيُنِنَا

قَوْلُهُ حِكَايَةُ حَالٍ مَاضِيَةٍ : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হলো يَصْنَعُ যারে' -এর সীগাহ। যা حَالٌ এবং اِسْتِقْبَالٌ-এর উপর বুঝায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নৌকা নির্মাণ করা খবর দেওয়ার পরে হয়েছে। অথচ নৌকা অতীত কালে নির্মাণ করা হয়েছিল।

উত্তর হলো এই যে, অতীত কালের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নৌকা নির্মাণের দৃশ্য টেনে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ مَوْصُولَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ : مَنْ يَّاْتِيْهِ-এর মধ্যে مَنْ টা مَوْصُوْلَه এবং تَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْل بِهٖ তারকীব দ্বারা এই সংশয়ের নিরসন হলো যে, مَنْ-টি اِسْتِفْهَامِيَّة তার জন্য صَدَارَتْ প্রয়োজন।

قَوْلُهُ غَايَةٌ لِلصُّنْعِ : অর্থাৎ حَتّٰى টা صُنْع-এর غَايَتْ এটা يَاْتِيْهِ বা يَحِلُّ-এর غَايَتْ নয়। যেমন নাকি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সন্দেহ হয়। حَتّٰى হলো اِبْتِدَائِيَّة যা جُمْلَه شَرْطِيَّة-এর উপর প্রবেশ করেছে এবং وَاصْنَعِ الْفُلْكَ-এর غَايَتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى السَّفِيْنَةِ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِيْهَا-এর যমীর পূর্বে উল্লিখিত اَلْفُلْكِ-এর দিকে ফিরেছে। যা مُذَكَّر বা পুংলিঙ্গ। অথচ فِيْهَا-এর যমীর হলো مُؤَنَّثْ বা স্ত্রীলিঙ্গ।

উত্তর হলো فُلْك টা سَفِيْنَة-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো সংশয় নেই।

قَوْلُهُ اِنَّهُ سُؤَالُكَ اِيَّاىَ بِنَجَاتِهٖ : মুফাসসির (র.) اِنَّهٗ-এর যমীরের নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন যে, مَرْجِعْ স্বীয় সন্তান কেনানের মুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন। অর্থাৎ তোমাদের প্রশ্ন অনুচিত। জমহুর মুফাসসিরগণ, যমীরের مَرْجِعْ বলেছেন اِبْنِ কে অর্থাৎ কেনান তোমার পরিবার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর দ্বারা مَجَازْ আবশ্যক হয়। কেননা বাস্তবিক পক্ষে পরিবার থেকে نَفِىْ করা বৈধ নয়। যার কারণে مَجَازِىْ পরিবার তথা দীনি পরিবার উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ مِيْمِ عَمِلَ فِعْلٌ وَنَصْبُ غَيْرُ فَالضَّمِيْرُ لِابْنِهٖ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عَمَلٌ-এর اِعْرَابْ বর্ণনা করা। জমহুরের কেরাত হলো عَمَلٌ মাসদার আর غَيْرُ صَالِحٍ তার সিফত। অর্থ হলো তোমার জন্য নিজ সন্তান কেনানের মুক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করা অনুচিত। কেননা সে কাফের। আর কাফেরের জন্য মুক্তি নেই। আবার এক কেরাতে عَمِلَ ফে'লে মাযী রূপে এসেছে সেই সুরতে غَيْرَ টা উহ্য মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। উহ্য ইবারত হবে اِنَّهٗ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ এই সুরতে اِنَّهٗ-এর যমীর اِبْنِ-এর দিকে ফিরবে। অর্থাৎ কেনান অসৎ কর্ম করেছে। মুফাসসির (র.) প্রথম সুরতকে পছন্দ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর স্বীয় কাফের সন্তানের জন্য মুক্তির সুপারিশ করা অনুচিত কর্ম হয়েছে। একারণেই পূর্বে বলা হয়েছে যে, اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ এর দ্বারা হযরত নূহ (আ.)-এর দিকে جَهْل বা অজ্ঞতার নিসবত করা আবশ্যক হচ্ছে।

قَوْلُهُ فَلَا تَسْئَلْنِ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ : অর্থাৎ نُوْن বর্ণে তাশদীদসহ ও পূর্বের বর্ণে যবর। আর এটা হলো নাফে (র.) -এর কেরাত। আর ইবনে কাছীর ইবনে আমের এবং বাকূন (র.) لَامْ কে সাকিন এবং نُوْن কে তা খফীফ সহকারে পড়েছেন। এবং وَصْل-এর অবস্থায় نُوْن-এর সাথে يَا. কে বাকি রেখেছেন। ওয়াকফের অবস্থায় তা করেননি। আর ওয়ারশ ও আবূ আমর (র.) ওয়াকফ ও ওয়াসল উভয় অবস্থাতেই يَا. কে অবশিষ্ট রেখেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِسَلَامَةٍ اَوْ بِتَحِيَّةٍ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَلَامٍ-এর দুটি অর্থ বর্ণনা করা। بِسَلَامَةٍ বলে নিরাপত্তা ও শান্তির অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর بِتَحِيَّةٍ বলে সালাম ও অভিবাদনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উদ্দেশ্য হলো এখানে উভয় অর্থই বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ مِمَّنْ مَّعَكَ : اُمَمٌ টা رَفْع -এর সাথে। মুবতাদা হওয়ার কারণে। আর سَنُمَتِّعُهُمْ হলো তার খবর। পূর্বের اُمَمٍ -এর উপর مَعْطُوْف হওয়ার কারণে مَجْرُوْر হয়নি। কেননা এ সকল লোকের শান্তি নিরাত্তা ও বরকতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন. اُمَمٌ টা نَكِرَة হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়?

উত্তর. اُمَمٌ হলো مَوْصُوْف আর مِمَّنْ مَّعَكَ হলো তার صِفَتْ কাজেই اُمَمٌ টা نَكِرَة مَوْصُوْفَه হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। মুফাসসির (র.) مِمَّنْ مَّعَكَ বৃদ্ধি করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الْمُتَضَمِّنَةُ الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো এই যে, تِلْكَ হলো اِسْمِ اِشَارَه যা স্ত্রী লিঙ্গের জন্য ব্যবহার হয়। তা মুবাতাদা হয়েছে। অথচ তার তিনটি খবর রয়েছে। আর তিনটিই مُذَكَّرٌ হয়েছে। ১. اَنْبَاءِ الْغَيْبِ ২. نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ ৩. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا কাজেই খবরের رِعَايَتْ-এর কারণে মুবতাদা ও مُذَكَّرٌ হওয়া উচিত ছিল?

উত্তর. হলো এই যে, هٰذِه -এর مُشَارٌ اِلَيْه উল্লিখিত খবর সমূহ নয়। বরং তা مُشَارٌ اِلَيْه হলো اَلْاٰيَاتُ যা উহ্য রয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। কাজেই কোনো আপত্তি অবশিষ্ট থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বরসুলভ উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তাওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয়া করতেন হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বুঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হয়তো তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন, اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۤءِىْۤ اِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্য পথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। -[সূরা নূহ]

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করতেন رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ হে আল্লাহ! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। [১৮ পারা, আয়াত ৩৯ সূরা আল মু'মিনুন।] দেশবাসীর জুলুম-নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন। -[বগভী ও মাযহারী]

৩৩ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আজাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরি করুন যার মধ্যে আপনার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন তাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলো নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আ.) নৌকা

Free @ www.e-ilm.weebly.com
তৈরি করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসাবে ভূমি হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল হযরত নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করানোর জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। তিনি আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল
আলোচ্য আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হলো, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুসঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ওহী নাজিল করা হয়েছিল যে, তাঁর জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭ নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায় হযরত নূহ (আ.) -এর মুখে তাঁর কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল–

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। [পারা ২৯, সূরা নূহ, আয়াত : ২৬] এই বদদোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো, যার ফলে সমস্ত কওমে নূহ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান : হযরত নূহ (আ.)-কে যখন নৌকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরি করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا "আর আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত নূহ (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

হযরত নূহ (আ.)-এর তরীর বিবরণ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের হুকুম হয়েছে যে, কাঠ কেটে শুষ্ক করে নৌকা নির্মাণের জন্য তৈরি কর। এতে ১০০ বছর অতিবাহিত হয়। সম্পূর্ণ ভাবে নৌকা তৈরিতে আরো ১০০ বছর ব্যয় হয়, মতান্তরে ৪০ বছর।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত এই নৌকাটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৮০ হাত এবং প্রস্থে ৫০ হাত ছিল বাইরে এবং ভেতরে কাষ্ঠের উপর এক প্রকার তৈল ব্যবহার করা হয়েছিল।

কাতাদা (র.) বলেছেন, দৈর্ঘ্যে তরীটি ৩০০ হাত ছিল। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত, আর প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল দু'হাজার হাত এবং প্রস্থ ছিল ১০০ হাত। এর উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। নৈকাটি ছিল ত্রিতল। এক এক তলের উচ্চতা ছিল দশ হাত। সর্বনিম্ন তলে চতুষ্পদ জন্তু রাখা হয়েছিল। মধ্যম তলে মানুষ ছিল। আর উপরের তলে পাখিদের রাখা হয়েছিল।

ইবনে জারীর (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সূত্রে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীরা তাঁর নিকট এই আরজি পেশ করেন যে, যদি আপনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ ক্রমে এমন কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন যে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকাটি দেখেছিল তবে আমরা এ সম্পর্কে কিছু অবগত হতে পারতাম। তখন হযরত ঈসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে একটি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করলেন। সেখানে হাম ইবনে নূহ এর কবর ছিল। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, আল্লাহর হুকুমে উঠে দাড়াও" তখন একজন বৃদ্ধ মানুষ মাটির অভ্যান্তর থেকে বের হয়ে আসলো। সে তার মাথার উপর থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলছিল। হযরত ঈসা (আ.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার মৃত্যু কি বৃদ্ধ বয়সে হয়েছে? সে বলল, না, যৌবনেই আমার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কেয়ামত কায়েম হয়েছে এ ধারণা করে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছি। আর সে ভয় আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। হযরত ঈসা (আ.) তখন বললেন, তুমি আমাদেরকে হযরত নূহ (আ.) -এর তরী সম্পর্কে কিছু জানাও। সে বলল তরীটির দীর্ঘ ১২০০ হাত ছিল এবং তার প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। এতে তিনটির স্তর ছিল প্রথম স্তরে বিভিন্ন প্রকার জন্তু রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় স্তরে মানুষ, আর তৃতীয় স্তরে ছিল পাখি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ঈসা (আ.) ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন হযরত নূহ (আ.) কি করে জানতে পারলেন যে, শহরগুলো নিমজ্জিত হয়েছে? তখন লোকটি বলল, হযরত নূহ (আ.) এ সম্পর্কীয় খবর সংগ্রহের জন্যে কাককে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু কাক একটি লাশের উপর বসে গিয়েছিল। সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসলোনা তাই হযরত নূহ (আ.) তার জন্য এ বদদোয়া করলেন যে সে যেন সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। এজন্যই কাকেরা কোনো সময় ঘরে থাকেনা। অবশেষে হযরত নূহ (আ.) কবুতরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। সে তার ঠোঁটে জয়তুন বৃক্ষের সামান্য নমুনা নিয়ে আসলো এবং সঙ্গে সামান্য শুকনো মাটিও আনলো। এর দ্বারা জানা গেল যে, শহর নিমজ্জিত হয়েছে। এরপর হযরত নূহ (আ.) কবুতরের জন্য নিরাপত্তার এবং মিলে মিশে থাকার তৌফিকের দোয়া করলেন, এজন্যই কুবুতরেরা মানুষের বাড়িতে বাসা বেধে থাকে। হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বললেন হে, আল্লাহর রাসূল! আপনি তাঁকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। তাঁর নিকট থেকে আরো কথা জানতে পারবো। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, সে তোমাদের সঙ্গে কি করে যাবে? তার তো দুনিয়াতে জীবিকা নেই। এরপর তিনি বললেন, "যেমন ছিলে আল্লাহর হুকুমে তেমন হয়ে যাও"। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) হযরত নূহ (আ.)-এর তরীর যে বিবরণ দিয়েছেন তা হলো এই– ইবনে আসাকের সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) -এর সূত্রে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং হযরত কাব (রা.) -এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর আল্লামা বগভী হযরত কাব (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত নূহ (আ.)-এর তরীর দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত এবং প্রস্থ ছিল ৫০ হাত। উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। এর মধ্যে তিনটি স্তর ছিল। সর্ব নিম্ন স্তরে বণ্য এবং চতুষ্পদ জন্তু ছিল। দ্বিতীয় স্তরে অশ্ব, উষ্ট্র আর গৃহ পালিত জন্তু ছিল এবং সর্বোচ্চ স্তরে হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর সাথী মোমেনগণ ছিলেন এবং খাদ্যদ্রব্যও ছিল।

ইবনে জারীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, নৌকাটিতে তিনটি স্তর ছিল। একটি স্তরে বন্য ও চতুষ্পদ জন্তু ছিল। আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সর্বনিম্ন স্তরে ছিল জীব জন্তু কীট-পতঙ্গ। আর মধ্যম স্তরে ছিল খাদ্যদ্রব্য পোশাক পরিচ্ছদ, আর সর্বোচ্চ স্তরে ছিল মানুষ। আর আল্লামা শামী লিখেছেন, নৌকাটির দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত এবং উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। আর হাতের অর্থ হলো আঙ্গুল থেকে বাজু পর্যন্ত।

–[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬]

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে : হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত 'আত-তিববুন-নববী' কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোনো নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি-অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি যেসব ওহী নাজিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ি হযরত আদম (আ.)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

আলীগড়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ির ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি হতে শুরু মোটর ও রেলগাড়ি সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত আদম (আ.)–ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এর দ্বারা আরো বোঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন। আল্লাহ ত'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা নির্মাণ পদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোনো সুপারিশ যেন না করেন।

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরিকালীন সময়ে হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ (আ.) যখন নৌকা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন তাঁর পার্শ্ব দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন যে, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত "এখানে তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চলার ফিকিরে আছেন" তদুত্তরে হযরত নূহ (আ.) বলতেন, যদিও আজ

Free @ www.eelm.weebly.com
তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখ সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুত পক্ষে নবীগণ কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থি বরং হারাম। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে- لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে [আল্লাহর কাছে] তারাই শ্রেষ্ঠতর।" [পারা ২৬, সূরা হুজুরাত, ১১ আয়াত] সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেওয়া। সেমতে "আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব।" বাক্যের অর্থ হচ্ছে তোমরা যখন আজাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, "এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।" যেমন ৩৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাকর আজাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আজাব কাদের উপর হয়। প্রথম عَذَابٌ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আজাব এবং عَذَابٌ مُّقِيْمٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আজাব উদ্দেশ্য।

৪০ নং আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ অর্থাৎ "অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হলো এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।"

اَلتَّنُّوْرُ : তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানো তন্দুরকেও তান্নুর বলে, জমিনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তাফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আ.)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عَيْنُ وَرْدَةٌ (আইনে অরদাহ) নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুর অভ্যন্তর হতেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর তন্দুরকে বোঝানো হয়েছে, যা কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী (র.) মুজাহিদ (র.) শা'বী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসির এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (র.) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কূফা শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কূফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ (আ.) তাঁর নৌকা তৈরি করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশদ্বার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাস স্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে।

-[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা প্লাবন যখন শুরু হয়েছে তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উঁচু জমিন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কূফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়েই সব একাকার হয়েছে। যেমন কুরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট ইরশাদ করা হয়েছে। فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا অর্থাৎ "অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং জমিনকে প্রস্রবণরূপে প্রবহমান করলাম। [২৭ পারা, সূরা আল কামার, আয়াত : ১১]

ইমাম শা'বী (র.) আরো বলেছেন যে, কূফার এই জা'মে মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে -আকসার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তূফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আ.)-কে হুকুম দেওয়া হলো- اِحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ "জোড়াবিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।" এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখি উঠানো হয়েছিল। জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখি কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা ঐ সন্দেহ দূরীভূত হলো যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকুলের স্থান সংকুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কুরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেসও তাদের ৩জন স্ত্রীও ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র কেন'আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছে।

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ নং আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জলযানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে আরোহণ করবে।

مَجْرٰى 'মাজরে' অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مُرْسٰى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহর নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও কুদরতের অধীন!

প্রতিটি যানবাহনের গতি স্থিতি আল্লাহর কুদরতের অধীন : সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান ও শূন্যযান অথবা কোনো জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা তৈরি করা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূল দৃষ্টিতে মানুষ হয়তো এই বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা এটা তৈরি করেছি, আমরা এটা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটার লোহা লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লৌহ বা এক ইঞ্চি কাঠও তৈরি করার ক্ষমতা তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারি যন্ত্রাংশ তৈরি করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত তাহলে দুনিয়ায় কোনো নির্বোধ লোক থাকত না, সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরি হয় অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মন মালামাল বহন করে জমিনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য, তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে হোক বা জ্বালানি তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখুন তন্মধ্যে কোনটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন? বায়ু বা পানি কে সে সৃষ্টি করেছে? তেল বা পেট্রোল কে সে সৃষ্টি করেছে? এর অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায় তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটা অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا : একমাত্র আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মাত্র দুই শব্দ বিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুত এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যা দ্বারা মানুষ বস্তু জগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মু'মিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মু'মিন যখন কোনো যানবাহনে আরোহণ করে তখন সে শুধু জমিনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে হযরত নূহ (আ.)-এর সকল পরিবার-পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু 'কেনআন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশত হযরত নূহ (আ.) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেক না, পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সঙ্গে উক্ত ছেলেটির যোগসাজশ ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ.) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরি সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহ্বানের মর্ম হবে নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরি হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ

করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেনআন' তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল আপনি চিন্তিত হবেন না আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আ.) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে, আজকে কোনো উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া আজ বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল।

৪৪ নং আয়াতে প্লাবন সমাপ্তি ও পরিবেশ শান্ত হওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জমিনকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিলেন يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ অর্থাৎ " হে জমিন, তোমার সব পানি গিলে ফেল।" অর্থাৎ যে পরিমাণ পানি জমিন উদগীরণ করেছিল, সে সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হলো যেন জমিন তা শুষে নেয়। আকাশকে অর্থাৎ মেঘমালাকে নির্দেশ দিলেন "ক্ষান্ত হও, বারি বর্ষণ বন্ধ কর।" ফলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হলো, জমিনের পানি ভূ-অভ্যন্তরে চলে গেল। আর আসমান হতে ইতিপূর্বে বর্ষিত পানি নদ-নদীর আকার ধারণ করল যা দ্বারা পরবর্তীকালে মানব সমাজ উপকৃত হতে পারে।

–[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জমিন ও আসমানকে সম্বোধন করে নির্দেশ দান করেছেন। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো কোনো অনুভূতিসম্পন্ন বস্তু নয়। তাই কেউ কেউ এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আমাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের যেসব বস্তু অনুভূতিহীন নির্জীব জড় পদার্থ মাত্র, আসলে তা সবাই অনুভূতিসম্পন্ন ও প্রাণবিশিষ্ট। অবশ্য তাদের আত্মা ও অনুভূতি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পর্যায়ের নয়। তাই তাদের প্রাণহীন ও অনুভূতিহীন সাব্যস্ত করে শরিয়তের বিধি নিষেধ হতে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে এর প্রমাণ রয়েছে যেমন وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ "এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ পাঠ করছে না।" আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর মারেফত ও পরিচয় ছাড়া হামদ ও তাসবীহ পাঠ সক্ষম হওয়া সম্ভব নয়। আর পরিচয় লাভের জন্য জ্ঞান ও অনুভূতি থাকা অপরিহার্য। অতএব উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যথাযোগ্য অনুভূতি রয়েছে, যা দ্বারা সে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে ও জানতে পারে; স্রষ্টা তাকে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন, কোন কাজে নিয়োজিত করেছেন, তাও উত্তমরূপে জানে এবং তা পূরণ করার জন্য আত্মনিয়োজিত থাকে। কুরআন পাকের আয়াতে أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ-এর মধ্যে এ কথাই বলা হয়েছে।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে আসমান ও জমিনকে সরাসরি সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বললে কোনো অসুবিধা নেই। মাওলানা রূমী (র.) বলেন خاک وباد واب واتش زنده اند- با من وتو مرده باحق زنده اند "মাটি বায়ু, আগুন ও পানিরও প্রাণ আছে। আমার ও তোমার কাছে তা প্রাণহীন, কিন্তু আল্লাহর কাছে জীবন্ত।" আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, জমিন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেওয়া হলো যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে। জুদি পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। এটা হযরত নূহ (আ.)-এর মূল আবাসভূমি ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুত এটি একটি পর্বতমালার অংশ বিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্ন স্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তাফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌছল, তখন সাতবার কা'বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ (আ.) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোজা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোজা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোজা পালন করেছিল।

–[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পূর্ববর্তী নবীগণের সব শরিয়তেই মুহাররম মাসের দশম তারিখে অর্থাৎ আশুরার দিনটিকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আশুরার রোজা ফরজ ছিল। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোজা ফরজ থাকেনি, তবে তা সুন্নত ও বিশেষ ছওয়াবের কাজ হিসাবে সর্বদা পরিগণিত।

জুদী পাহাড়টি কোথায়? : তাফসীরকার যাহ্‌হাক (র.) বর্ণনা করেছেন, জুদী পাহাড়টি মোসেল এলাকায় রয়েছে। মোসেল আধুনিক ইরাকের একটি প্রদেশ।

উল্লেখ, যে এই প্রদেশের নাইনুয়া শহরেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাজার রয়েছে। যেখানে আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে মাছ তাঁকে ফেলে দিয়েছিল। আর এই বিশেষ এলাকাতেই হযরত নূহ (আ.) -এর নৌকাটি আল্লাহ পাকের হুকুমে থেমে যায়। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তুর পাহাড়কে জুদী বলা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ নৌকাতে ৮০ জন লোক ছিলেন। একশ' পঞ্চাশ দিন তারা নৌকায় ছিলেন। আল্লাহ পাক নৌকাটির মুখ মক্কা শরীফের দিকে করে দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তা'আলা বন্যার সময় কা'বা শরীফকে পানির উপর তুলে রেখেছিলেন। নৌকাটি চল্লিশ দিন যাবত বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফে রত ছিল। এরপর আল্লাহ পাক জুদী পাহাড়ের দিকে তাকে প্রেরণ করেন।

হযরত নূহ (আ.) জুদী পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করেন। এই ৮০ জন মানুষকে নিয়ে সেখানে একটি বসতি গড়ে উঠে যাকে "ছামানিন" বলা হয়। একদিন সকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেকের ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। ৮০ জন লোক ৮০-টি ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম ভাষা ছিল আরবি। বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, কেউ একে অন্যের কথা বুঝতে সক্ষম হচ্ছিলনা। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে সকলের ভাষা বোঝাবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন তখন সকলের অনুবাদক। তিনি পরস্পরকে তাদের কথা বুঝিয়ে দিতেন।

কাবে আহবার বর্ণনা করেন হযরত নূহ (আ.) -এর নৌকাটি প্রাচ্যে এবং প্রাতিচ্যে চলাফেরা করে এরপর জুদী পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে থেমে যায়।

قَوْلُهُ وَنَادٰى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي الخ : আলোচ্য ৫টি আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান সংক্রান্ত অবশিষ্ট কাহিনী ও সংশ্লিষ্ট হেদায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র কিনআন যখন মহান পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য ও আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল তখন তার ধ্বংস অনিবার্য দেখে হযরত নূহ (আ.)-এর পিতৃস্নেহ ভিন্ন পথ অবলম্বন করল। তিনি আল্লাহ রাব্বুল-ইজ্জতের মহান দরবারে আরজ করলেন, হে প্রভু! আপনি আমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবেন বলে আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আপনার ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক। কিন্তু অবস্থা দেখছি যে, আমার পুত্র কিনআন তুফানে মারা পড়বে। এখনও তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনি তো আহকামুল হাকিমীন, আপনি সর্বশক্তিমান। অতএব, আপনি নিজ ক্ষমতাবলে তাকে রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি।

৪৬ নং আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোনো আবেদন করা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞ-সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসিহত করছি।

আল্লাহ তা'আলার অত্র ফরমানের মধ্যে দুটি বিষয়ই জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ (আ.) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; বরং তার মুনাফিকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ "অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোনো অবাধ্য কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।" এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে এটা কুফরি অবস্থায় কেনানকে রক্ষা করার আবদার ছিল না; বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর মতো একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালোমতে না জেনেশুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন নি; বরং এরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। পয়গম্বরের উচ্চ মর্যাদার জন্য এটা এমন একটি ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসাবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাফের ও জালিমের জন্য দোয়া করা জায়েজ নয়: উপরিউক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাস'আলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে তা জায়েজ, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেওয়া সন্দেহজনক কোনো বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তাফসীরে বায়জাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনেশুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম হবে।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুযর্গানের নীতি হচ্ছে– যে-কোনো ব্যক্তি যে কোনো দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে, পীর-বুজর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি জালিম ও অন্যায়কারী অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোনো চাকরি বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনেশুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দেওয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মু'মিন ও কাফেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না: এখানে জানা গেল যে, মু'মিন ও কাফেরদের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোনো মূল্য নেই! ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

هزار خویش که بیگانه از خدا باشد * فدائے یک تن بیگانه کاشنا باشد

অর্থাৎ হাজারো আপন লোক আল্লাহর খাতিরে পর হয়েছে। আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত পরও আপন হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। তারা যে-কোনো বংশের, যে-কোনো গোত্রের, যে-কোনো বর্ণের, যে-কোনো দেশের যে -কোনো ভাষাভাষী হোক না কেন, সবই মিলে এক জাতি একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়। এ তত্ত্বটি কুরআন মাজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জবানীতে অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যেসব বাতিল মা'বুদের উপাসনা করছ যেসব উপাস্যের প্রতিও বিরক্ত। –[২৮ পারা, সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াত ৪]

আলোচ্য আয়াতে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি دِينِي مُعَامَلَاتْ 'ধর্মীয় ব্যাপারে শর্ত' অতিরিক্ত আরোপ করেছি। কেননা দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে সুষ্ঠ লেনদেন, ভালো আচার-ব্যবহার, পরোপকার, দয়াশীলতা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি স্বতন্ত্র ব্যাপার। যে কোনো ব্যক্তির সাথে তা করা জায়েজ, উত্তম ও ছওয়াবের কাজ। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সদ্ব্যবহার, কাফের ও অমুসলিমদের প্রতি তাদের উদারতা ও সদয় ব্যবহারের অসংখ্য ঘটনা এর উজ্জ্বলতা বহন করেছে।

বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে আঞ্চলিক ভৌগলিক, বর্ণগত ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী, আরবি, হিন্দী, সিন্ধীরা ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তারূপে পরিগণিত হচ্ছে। এহেন জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শের পরিপন্থি তথা রাসূলে কারীম ﷺ -এর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহের শামিল।

৪৭ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.) কর্তৃক পেশকৃত ওজরখাহীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যার সারমর্ম হচ্ছে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া মাত্র আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ, তাঁর কাছে আশ্রয় গ্রহণ, অন্যায় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য কামনা, অতীত দোষত্রুটি মার্জনার জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে তাঁর অনুগ্রহের জন্য আবেদন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এতদ্বারা বোঝা যায় যে, মানুষের কোনো ভুলত্রুটি হওয়ার পর ভবিষ্যতে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শুধু নিজের সংকল্প ও দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে কাজ হবে না; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করবে এবং দোয়া করবে যে, আয় পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে নিজ কুদরত ও রহমতে ত্রুটি -বিচ্যুতি, পাপ-তাপ হতে রক্ষা করুন!

৪৮ নং আয়াতে তুফানের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্লাবনের উদ্দেশ্য যখন সাধিত হলো, তখন আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টিপাত বন্ধ হলো, জমিনের পানি জমিন গ্রাস করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, হযরত নূহ (আ.)-এর কিশতি জুদী পাহাড়ে ভিড়ল, অবশিষ্ট বৃষ্টির পানি নদ-নদীরূপে সংরক্ষিত হলো। ফলে জমিন মানুষের বসবাসের যোগ্য হলো। হযরত নূহ (আ.)-কে পাহাড় হতে সদলবলে সমতল ভূমিতে অবতরণের হুকুম দিয়ে বলা হলো, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবেন না। কেননা আপনার প্রতি আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা থাকবে, অথবা সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা দেওয়া হলো এবং আপনার ধন-সম্পদ ও আওলাদ-ফরজন্দের মধ্যে বরকত ও প্রাচুর্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হলো।

কুরআনে কারীমের এই ইরশাদ অনুযায়ী প্লাবন -পরবর্তীকালের সমস্ত মানব মণ্ডলী হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبٰقِيْنَ "আর শুধু তাঁর বংশধরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছি।" এ জন্যই ইতিহাসবেত্তাগণ হযরত নূহ (আ.)-কে দ্বিতীয় আদম উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

নিরাপত্তা ও বরকতের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা শুধু হযরত নূহ (আ.)-এ সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইরশাদ হয়েছে وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ "আর আপনার সঙ্গীয় সম্প্রদায়গুলোর উপরও সালামতি ও বরকত রয়েছে।" এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর সহযাত্রী ঈমানদারগণকে اُمَمٌ বলা হয়েছে, যা اُمَّةٌ উম্মত -এর বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, কিশতিতে আরোহণকারীরা বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক ছিল। অথচ ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, কিশতির আরোহীগণ অধিকাংশ হযরত নূহ (আ.)-এর খান্দানের লোক ছিল। আঙ্গুলে গনাকয়েকজন মাত্র অন্য বংশের ছিল। এতদসঙ্গেও তাদের প্রতি اُمَمٌ مِّمَّنْ مَّعَكَ শব্দ প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে যে, ভবিষ্যতে তাদের বংশধরদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হবে। কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত বংশধরগণকে সালামতি ও বরকতের শামিল করা হয়েছে।

অতএব, এখানে সালামতি ও বরকতের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা ভষ্যিত বংশধরদের মধ্যে যেমন মু'মিনও থাকবে, তদ্রূপ বহু জাতি কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকও হয়ে যাবে। মু'মিনদের জন্য তো দুনিয়া ও আখেরাতে সালামতি ও বরকত রয়েছে। কিন্তু তাদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের, মুশরিক, নাস্তিক তারা তো জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে। তাদের জন্য নিরাপত্তা ও বরকত কিভাবে হতে পারে? আয়াতের শেষ বাক্যে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ অন্যান্য সম্প্রদায়কেও আমি পার্থিব জীবনে নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য দান করব, সর্বপ্রকার ভোগবিলাসের সামগ্রী দ্বারা সাময়িকভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেব। কেননা পার্থিব নিরাপত্তা ও প্রাচুর্য সাধারণ দস্তরখান-স্বরূপ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই তা উপভোগ করতে পারে। অতএব, কিশতি আরোহীগণের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের হবে তারাও এর অংশীদার হবে। কিন্তু আখেরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবি শুধু ঈমানদারদের জন্য সংরক্ষিত। কাফেরদের সৎকাজের পূর্ণ প্রতিদান ইহজীবনেই বুঝিয়ে দেওয়া হবে। অতএব, আখেরাতে তাদের উপর শুধু আমার আজাবই নির্ধারিত রয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর জমানায় সংঘটিত মহাপ্লাবনের বিস্তারিত বিবরণ হুজুর ﷺ ওহীর মাধ্যমে অবহিত হয়ে স্বীয় দেশবাসীকে শুনালেন, ওহীর পূর্ব পর্যন্ত এসব ঘটনা তিনিও জানতেন না, তাঁর দেশবাসীও জানতো না। একমাত্র ওহী ছাড়া তা জানার কোনো উপায়-উপকরণও তাদের কাছে ছিল না। সমগ্র জাতি যে ঘটনা সম্পর্কে বেখবর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু বিদ্যা-শিক্ষার জন্য কখনো বিদেশ যান নি, সুতরাং এটা জানার একমাত্র পন্থা ওহী সাব্যস্ত হলো। আর ওহীপ্রাপ্ত হওয়াই নবুয়ত ও রিসালতের অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্যে রাসূলে আকরাম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে যে, আপনার নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতার পক্ষে সূর্যের চেয়ে ভাস্বর অনস্বীকার্য যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কতিপয় বদবখত যদি আপনাকে অমান্য করে, আপনার সাথে কলহ করে, আপনাকে কষ্ট-ক্লেশ দেয়, তাহলে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বর হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনাবলি চিন্তা করুন। তিনি প্রায় এক হাজার বছর যাবত অপরিসীম কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেছেন, আপনি তাঁর মতো ধৈর্য অবলম্বন করুন। কারণ পরিশেষে আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণই কল্যাণ ও কামিয়াবি লাভ করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৫০. وَاَرْسَلْنَا اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيْلَةِ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط اِنْ مَا اَنْتُمْ فِىْ عِبَادَتِكُمُ الْاَوْثَانَ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ كَاذِبُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

৫০. আদ জাতির নিকট তাদের গোত্রীয় ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর. তাঁকে এক বলে বিশ্বাস কর. তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তোমরা প্রতিমা উপাসনার ক্ষেত্রে মিথ্যা রচনাকারী বৈ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী বৈ কিছু নয়। مِنْ اِلٰهٍ : এই مِنْ টি এই স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত اِنْ اَنْتُمْ : এই اِن টি এই স্থানে না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫১. يٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلَى التَّوْحِيْدِ اَجْرًا ط اِنْ مَا اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ خَلَقَنِىْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

৫১. হে আমার সম্প্রদায়! এটার উপর অর্থাৎ এই তাওহীদের বিনিময়ে তোমাদের নিকট আমি কোনোরূপ পারিশ্রমিক যাচনা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁরই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? اِنْ اَجْرِىَ -এই اِنْ টি এই স্থানে না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلَّذِىْ فَطَرَنِىْ : অর্থ আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

৫২. وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ تُوْبُوْا ارْجِعُوْا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ الْمَطَرَ وَكَانُوْا قَدْ مُنِعُوْهُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا كَثِيْرَ الدُّرُوْرِ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى مَعَ قُوَّتِكُمْ بِالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ مُشْرِكِيْنَ ـ

৫২. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট শিরক হতে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি তওবা কর প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাবেন। তৎসময়ে এদের অঞ্চলে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করত তিনি তোমাদেরকে আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন। তোমরা অপরাধী হয়ে মুশরিকরূপে পরিগণিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। اَلسَّمَآءُ : অর্থ আকাশ, এই স্থানে مَجَازٌ বা রূপক হিসাবে বৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِدْرَارًا : অর্থ প্রবল বর্ষণ। اِلٰى قُوَّتِكُمْ : এই স্থানে اِلٰى [পর্যন্ত, প্রতি] শব্দটি مَعَ [সঙ্গে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৩. قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ بِبُرْهَانٍ عَلٰى قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اَىْ لِقَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

৫৩. তারা বলল, 'হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোনো স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমার দাবির উপর কোনো দলিলসহ আগমন করনি তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদিগকে পরিত্যাগ করার নই এবং আমরা তোমার বিষয়ে বিশ্বাসীও নই। عَنْ قَوْلِكَ : এই স্থানে عَنْ [হতে] শব্দটি لِ [জন্য] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

٥٤. اِنْ نَقُوْلُ فِىْ شَانِكَ اِلَّا اعْتَرٰىكَ اَصَابَكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ ط فَخَبَلَكَ بِسَبِّكَ اِيَّاهَا فَاَنْتَ تَهْذِىْ قَالَ اِنِّىْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَىَّ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ

৫৪. আমরা তোমার সম্পর্কে তো এটাই বলি, আমাদের ইলাহদিগের কেউ তোমাকে অশুভ কিছু করেছে। তাদের মন্দ বলায় তোমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটিয়ে দিয়েছে। তাই তুমি এরূপ প্রলাপ বকতেছ। সে বলল, আমি আমার সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী করতেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক; তোমরা তাঁর সাথে যা শরিক কর তা হতে আমি মুক্ত। اِنْ-এটা এস্থানে নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اِعْتَرَاكَ : অর্থ তোমাকে স্পর্শ করেছে, আবিষ্ট করেছে।

٥٥. مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ اِحْتَالُوْا فِىْ هَلَاكِىْ جَمِيْعًا اَنْتُمْ وَاَوْثَانُكُمْ ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنَ تُمْهِلُوْنَ ـ

৫৫. তিনি ব্যতীত। তোমরা সকলে অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের দেবতাগণ সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত কর আমাকে ধ্বংস করার বিষয়ে ষড়যন্ত্র কর অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না। সময় ও সুযোগ দিও না।

٥٦. اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ زَائِدَةٌ دَآبَّةٍ نَسَمَةٍ تَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اَىْ مَالِكُهَا وَقَاهِرُهَا فَلَا نَفْعَ وَلَا ضَرَرَ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَخَصَّ النَّاصِيَةَ بِالذِّكْرِ لِاَنَّ مَنْ اُخِذَ بِنَاصِيَتِهٖ يَكُوْنُ فِىْ غَايَةِ الذُّلِّ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَىْ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ ـ

৫৬. আমি নির্ভর করি আল্লাহর উপর আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। পৃথিবীর উপর বিচরণশীল এমন কোনো জীব-জন্তু নেই প্রাণী নেই যার মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ তাঁর মুষ্টিতে নেই অর্থাৎ তিনি যার মালিক নন এবং যা তাঁর আয়ত্তাধীন নয়। এই স্থানে মস্তকের সম্মুখভাগের কেশ গুচ্ছের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, যার ঐ কেশগুচ্ছ ধরা হয় সে চরম অনুগত ও লাঞ্ছিত বলে ইঙ্গিত হয়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে সত্য ও ন্যায়ের পথে আছেন। مِنْ دَابَّةٍ : এই স্থানে مِنْ-টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত।

٥٧. فَاِنْ تَوَلَّوْا فِيْهِ حُذِفَ اِحْدَى التَّائَيْنِ اَىْ تُعْرِضُوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ط وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ط بِاِشْرَاكِكُمْ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ رَقِيْبٌ ـ

৫৭. অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যা সহ তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি আমি তো তোমাদের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক তোমাদের হতে ভিন্ন কোনো সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তোমাদের শিরক করা দ্বারা– তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার প্রতিপালক সকল কিছুর রক্ষাকর্তা নেগাহবান। تَوَلَّوْا -এতে মূলত একটি تَا উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٨. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا عَذَابُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ هِدَايَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ شَدِيْدٍ ـ

৫৮. আর যখন আমার নির্দেশ অর্থাৎ শাস্তি আসল তখন আমি আমার রহমতে অর্থাৎ হেদায়েত দান করে হূদকে ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি হতে।

٥٩. وَتِلْكَ عَادٌ اِشَارَةٌ اِلٰى اٰثَارِهِمْ اَيْ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ وَانْظُرُوْا اِلَيْهَا ثُمَّ وَصَفَ اَحْوَالَهُمْ فَقَالَ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ جُمِعَ لِاَنَّ مَنْ عَصٰى رَسُوْلاً عَصٰى جَمِيْعَ الرُّسُلِ لِاِشْتِرَاكِهِمْ فِىْ اَصْلِ مَا جَاؤُوْا بِهٖ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ وَاتَّبَعُوْا اَيْ اَلسَّفْلَةُ اَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ مُعَانِدٍ مُعَارِضٍ لِلْحَقِّ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ ـ

৫৯. এই আদ জাতি تِلْكَ : অর্থ তা। এই স্থানে তাদের [আদ জাতির] পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ও আলামত সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা পৃথিবী পর্যটন কর এবং এইগুলো [ঐ নিদশনগুলো] পর্যবেক্ষণ কর। তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলগণকে আর তারা অর্থাৎ নীচ শ্রেণির লোকেরা প্রত্যেক উদ্ধত বিরুদ্ধাচারীর অর্থাৎ সত্য ও হকের বিরুদ্ধাচারী, তাদের নেতাদের নির্দেশ অনুসরণ করত। جَحَدُوْا : এই শব্দাবলি দ্বারা এদের অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। رُسُلَ : এটা বহুবচন। একজন রাসূলের অবাধ্যাচরণ ও অস্বীকার করা সকল রাসূলকে অস্বীকার করা বুঝায়। কারণ মূল আনীত বিষয় ও তাওহীদের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলই এক। এই হিসাবে এই স্থানে একবচন ব্যবহার না করে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

٦٠. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً مِنَ النَّاسِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط لَعْنَةً عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا جَحَدُوْا رَبَّهُمْ ط اَلَا بُعْدًا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ

৬০. এই দুনিয়া মানুষের পক্ষ হতে তাদেরকে করা হয়েছে অভিশাপগ্রস্ত এবং কিয়ামত-দিবসেও তারা সকল সৃষ্টির সম্মুখে লা'নতের অধিকারী হবে। শোন! আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে প্রত্যাখ্যান করেছিল অস্বীকার করেছিল। শোন! আল্লাহর রহমত হতে বিদূরিত হওয়াই ছিল হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَرْسَلْنَا : এর আতফ হলো نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ-এর উপর এটাকে عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ বলা হয়।

قَوْلُهٗ هُوْدًا : এটা হলো اَخَاهُمْ -এর عَطْف بَيَانْ

قَوْلُهٗ اَىْ بِقَوْلِكَ : عَنْ-এর তাফসীর لَامْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, عَنْ- টি تَعْلِيْلِيَّةْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِعْتَرَاكَ : এটা বাবে اِفْتِعَالْ-এর اِعْتِرَاءٌ মাসদার হতে فِعْل مَاضِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ হলো সামনে আসা, ইচ্ছা করা, সংযুক্ত হওয়া, মসিবতে নিপতিত হওয়া।

قَوْلُهٗ بِسُوْءٍ : এতে بَاءٌ টা تَعْدِيَةْ -এর জন্য হয়েছে।

প্রশ্ন. اِيَّاهَا-এর যমীর بَعْضٌ শব্দের দিকে ফিরেছে। অথচ بَعْض শব্দটি مُذَكَّرْ তাই যমীর ও مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. মুযাফ ইলাইহি -এর رِعَايَتْ করে اِيَّاهَا -এর মধ্যে مُؤَنَّثْ-এর যমীর নিয়েছেন।

قَوْلُهُ إِشَارَةٌ اِلٰى اٰثَارِهِمْ : এই বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের জবাব দান কল্পে হয়েছে যে, تِلْكَ عَادٌ মুবতাদা ও খবর হয়েছে; আর عَادٌ হলো مُذَكَّرٌ কাজেই تِلْكَ-এর স্থলে هٰذَا হওয়া উচিত ছিল?

জবাবের সারকথা, হলো এই যে, خَبَرٌ হলো اٰثَارُ যা উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ تِلْكَ الْاٰثَارُ اٰثَارُ عَادٍ

قَوْلُهُ عَنِيْدٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে عُنُدٌ অর্থ হলো ঔদ্ধত, অহংকারী, অবাধ্য, জেদি, গোঁয়াড়, শত্রুতা ও বৈরিতা পোষণকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হূদ (আ.)-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র: সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত সাতজন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কুরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যেকোনো অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাতজন পয়গাম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হূদ (আ.)-এর নামে। এতে বোঝা যায় যে, এখানে হযরত হূদ (আ.)-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক হযরত হূদ (আ.)-কে জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হূদ (আ.) ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন اَخَاهُمْ هُوْدًا 'তাদের ভাই হূদ' শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরি প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হূদ (আ.) তাঁর কওমের নিকট যে দীনি দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা প্রথম তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে, তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি জীবন উসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোনো ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ-নসিহত ও দীনি দাওয়াতের পারিশ্রমিক : কুরআনে কারীমে প্রায় সব নবী (আ.)-এর জবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না।" এতে বোঝা যায় যে, দীনি-দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরি, শিরকি ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, যেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে কাছেও যাবে না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও ইস্তেগফার করতে পার, [তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই,] অধিকন্তু দুনিয়াতেও এর বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে. তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধনবল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও ইস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধনসম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত হূদ (আ.)-এর আহ্বানের জবাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতালুভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোনো মোজেজা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপদাদার আমলের উপাস্য দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করব না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন।

তদুত্তরে হযরত হূদ (আ.) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না।

এত বড় কথা আমি এ জন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি, যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদিগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘদিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটা কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এও হযরত হূদ (আ.)-এর একটি মোজেজা। এর দ্বারা একে-তো তাদের এ কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোনো মোজেজা প্রদর্শন করেন নি। দ্বিতীয়ত, তারা যে বলত, "আমাদের কোনো কোনো দেবতা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে" তাও বাতিল করা হলো। কারণ দেব-দেবীর যদি কোনো ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব ও গজব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদিগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আ.)-এর কোনো কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহর আজাব নেমে এলো। সাতদিন আটরাত যাবত অনবরত ঝড়-তুফান বইতে লাগল। বাড়ি-ঘর ধসে গেল, গাছপালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে জমিনে নিক্ষিপ্ত হলো, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আজাব নাজিল হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হূদ (আ.) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আজাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আজাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য ইরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্ঠদের কথামতো কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গজব নাজিল হয়েছে এবং আখেরাতেও অভিশপ্ত আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড়-তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মুমিনূন'-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়তো উভয় প্রকার আজাবই নাজিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড়-তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আদ জাতির তিনটি বৈশিষ্ট্য ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ আদ জাতি আল্লাহ পাকের একত্ববাদের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করেছে। وَعَصَوْا رُسُلَهٗ তারা আল্লাহর রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। যদিও আদ জাতি শুধু হযরত হূদ (আ.)-কে অস্বীকার করেছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে رُسُلَ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোনো একজন রাসূলকে অস্বীকার করার অর্থ

সকল রাসূলকে অস্বীকার করা। কেননা সকল রাসূলের শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং আদর্শ একই। অতএব, যারা একজন রাসূলকে অস্বীকার করলো তারা যেন সকল রাসূলকেই অস্বীকার করলো। এই আয়াতে পবিত্র কুরআন ইসলামের এই মূলনীতি পুনরায় ঘোষণা করেছে যা সূরায়ে বাকারার একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ আমরা আল্লাহ পাকের কোনো রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করিনা।

وَاتَّبَعُوْٓا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ আর তারা এমন লোকদের কথা মেনে চলে যারা ছিল জালেম, যারা ছিল সত্যের দুশমন।
[তাফসীরে কবীর খণ্ড-১৮,পৃষ্ঠা-১৫.]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, এই বাক্যটি দ্বারা আদ জাতির পথভ্রষ্ট, অহংকারী তথাকথিত নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহর নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নের স্থলে তাঁদের বিরোধিতা করেছে। আর যে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তারা চিরশান্তি, চিরমুক্তি লাভ করতো সে শিক্ষাকে তারা বর্জন করেছে। আর এমন জালেম, সত্য বিরোধী লোকদের অনুসরণ করেছে, যারা কুফরি ও নাফরমানিকে তাদের জন্য বেছে নিয়েছে, যা তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯]

তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন, আদ জাতি আল্লাহর নিয়ামতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সমৃদ্ধির কারণে তাদের নৈতিক অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদের নিদর্শন সমূহকে তারা অস্বীকার করেছিল। আর তা করেছিল শুধু জিদ এবং শত্রুতার বশবর্তী হয়ে। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করে ইরশাদ হয়েছে– وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ আদ জাতি তখন কঠোর শাস্তি ভোগ করে ধ্বংস হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের প্রতি রয়েছে লানত। এই লানত তাদের প্রতি অব্যাহত থাকবে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত। এরপর শুরু হবে চিরশাস্তি।

আল্লাহ পাকের নাফরমানির পরিণাম ভয়াবহ : কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুনিয়ার জিন্দেগিতে তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে লানত বা অভিশাপ অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এটি হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানির পরিমাণ।

এ অর্থ হতে পারে যে, পার্থিব জীবনেও তারা নানা প্রকার বালা মসিবতে গ্রেফতার হবে, অশান্তি অকল্যাণ হবে তাদের চির সাথী। বর্তমান যুগেও পবিত্র কুরআনে ঘোষিত এ সত্যের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় যেমন পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে সুখ-সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শান্তির অভাব চরম। তার পাশাপাশি রয়েছে এইডস রোগের প্রাদুর্ভাব।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে, মানুষকে গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং খাদ্যের অভাব জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির কারণে তারা এটম বোমা তৈরি করে চলেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের দেশের মানুষের মুখে এক মুঠো খাদ্য তুলে দিতে পারছে না। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিধি নিষেধকে অমান্য করার এটিই হলো অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এ আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে না তাদের প্রতি লানত, দুনিয়াতেও হবে এবং আখেরাতেও হবে। কারণ পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হয়েছে– اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ "সাবধান! আদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাই ধ্বংসই তাদের পরিণতি।" আর জেনে রাখ হূদের জাতি আদের প্রতি আল্লাহ পাকের অভিশাপ রয়েছে। আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে তাদের এই ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের بُعْدً শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে ১. এর অর্থ হলো দূরত্ব অর্থাৎ আদ জাতি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে সরে পড়েছে। ২. এর অর্থ হলো, ধ্বংস অর্থাৎ আদ জাতি উল্লিখিত অপরাধ সমূহের কারণে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আদ জাতির পরিণতিকে পৃথিবীর অন্য জাতি সমূহের জন্যে শিক্ষণীয় হিসেবে পেশ করার লক্ষ্যে ٧। শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা সানউল্লাহ পানিপতি (র.) এ কথাও লিখেছেন, যে, قَوْمُ هُوْدٌ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ এই যে, দু'টি জাতির নামই আদ ছিল। প্রথম আদ এবং দ্বিতীয় আদ নামে তারা ছিল পরিচিত। দ্বিতীয় আদ হলো সমূদ জাতি। আর প্রথম আদ হলো হূদ (আ.) -এর জাতি "কওমে"হূদ শব্দটি ব্যবহার করে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে সামূদ জাতি উদ্দেশ্য নয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০ তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-১৮, পৃষ্ঠা-১৬]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦١. وَ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيْلَةِ صَالِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ اِبْتَدَاَ خَلْقَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا جَعَلَكُمْ عُمَّارًا تَسْكُنُوْنَ بِهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ مِنَ الشِّرْكِ ثُمَّ تُوْبُوْا ارْجِعُوْا اِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مِنْ خَلْقِهٖ بِعِلْمِهٖ مُجِيْبٌ لِمَنْ سَاَلَهٗ

৬১. ছামূদ জাতির নিকট তাদের গোত্রীয় ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে বিশ্বাস কর তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করত, শুরুতে তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন, তোমাদেরকে আবাদকারী বানিয়েছেন যাতে তাতে তোমরা বসবাস কর। সুতরাং তোমরা শিরক হতে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর প্রতিই তোমরা তওবা কর, প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক জ্ঞান হিসাবে তাঁর সৃষ্টির নিকটই যে ব্যক্তি তাঁকে আহ্বান করে তার আহ্বানে তিনি সাড়া দেন।

٦٢. قَالُوْا يٰصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا نَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ سَيِّدًا قَبْلَ هٰذَا الَّذِىْ صَدَرَ مِنْكَ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا مِنَ الْاَوْثَانِ وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ مُرِيْبٍ مُوْقِعٍ فِى الرَّيْبِ ـ

৬২. তারা বলল, হে সালেহ! এটার পূর্বে অর্থাৎ তোমার নিকট হতে যে আচরণ প্রকাশ পেল এটার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের পিতৃ-পুরুষ যাদের অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিমার উপাসনা করতে তুমি কি আমাদেরকে তাদের উপাসনা করতে নিষেধ করতেছ? যে বিষয়ের প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করতেছ অর্থাৎ তাওহীদ আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে সংশয়ে নিপতিতকারী সন্দেহে আছি। مُرِيْبٌ : অর্থ সংশয়ে নিপতিতকারী

٦٣. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ بَيَانٍ مِنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً نُبُوَّةً فَمَنْ يَنْصُرُنِىْ يَمْنَعُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَىْ عَذَابِهٖ اِنْ عَصَيْتُهٗ قف فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ بِاَمْرِكُمْ لِىْ بِذٰلِكَ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ تَضْلِيْلٍ

৬৩. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তাঁর পক্ষ হতে যদি আমার নিকট রহমত অর্থাৎ নবুয়ত [এসে থাকে তবে আল্লাহ হতে] অর্থাৎ তাঁর শাস্তি হতে কে আমাকে সাহায্য করবে কে আমাকে রক্ষা করবে আমি যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ করি? আমাকে তোমরা এই ধরনের নির্দেশ দিয়ে কেবল আমার ক্ষতিই অর্থাৎ গুমরাহকরণ কার্যেরই বৃদ্ধি করতেছ। بَيِّنَةٌ : এই স্থানে এটার অর্থ বিবরণ।

٦٤. وَيٰقَوْمِ هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً حَالٌ عَامِلُهُ الْاِشَارَةُ فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ عَقْرٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ اِنْ عَقَرْتُمُوْهَا

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর এই উষ্ট্র তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। এটাকে আল্লাহর জমিতে চরে খেতে দাও। এটাকে মন্দভাবে স্পর্শ করিও না, বধ করে ফেলিও না। যদি তোমরা এটাকে বধ করে ফেল তবে তোমাদেরকে আশু শাস্তি পাকড়াও করবে। اٰيَةً : এটা এই স্থানে حَالٌ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْمُ اِشَارَةٍ বা ইঙ্গিত নির্দেশক বিশেষ্য هٰذِهٖ এটার عَامِلٌ

٦٥. فَعَقَرُوْهَا عَقَرَهَا قُدَارٌ بِاَمْرِهِمْ فَقَالَ صَالِحٌ تَمَتَّعُوْا عِيْشُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ تَهْلِكُوْنَ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ فِيْهِ

৬৫. কিন্তু তারা তাকে বধ করল তাদের নির্দেশে কুদার নামক এক ব্যক্তি তাকে বধ করেছিল। অনন্তর সে হযরত সালেহ বলল, তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করে নাও, জীবিত থাকার স্বাদ নিয়ে নাও। অতঃপর তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এটা একটি প্রতিশ্রুতি, এই বিষয়ে মিথ্যা কিছু হওয়ার নয়।

٦٦. فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَهُمْ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَا هُمْ مِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ بِكَسْرِ الْمِيْمِ اِعْرَابًا وَفَتْحِهَا بِنَاءً لِاِضَافَتِهٖ اِلٰى مَبْنِيٍّ وَهُوَ الْاَكْثَرُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ

৬৬. অনন্তর যখন অর্থাৎ এদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্পর্কে আমার নির্দেশ আসলে তখন আমি সালেহ এবং তাঁর সঙ্গী মু'মিনদেরকে এরা সংখ্যায় ছিল চার হাজার আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, এবং ঐদিনের লাঞ্ছনা হতে তাদেরকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল يَوْمَئِذٍ : এটার يَوْمٌ শব্দটি مُعْرَبٌ রূপে গণ্য হলে তার مِيْمٌ অক্ষরটি কাসরাসহ পঠিত হবে। আর مَبْنِىٌّ-এর দিকে اِضَافَتْ বা সম্বন্ধিত বলে তার مِيْم অক্ষরটি ফাতাহ সহও পঠিত হয়। এটার এই ধরনের ব্যবহারই সর্বাধিক।

٦٧. وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ

৬৭. অতঃপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে পাকড়াও করল; ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু হয়ে মরে পড়ে রইল। جَاثِمِيْنَ অর্থ নতজানু হয়ে মরে পড়ে রইল।

٦٨. كَاَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا يُقِيْمُوْا فِيْهَا فِىْ دَارٍ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهٖ عَلٰى مَعْنَى الْحَىِّ وَالْقَبِيْلَةِ

৬৮. যেন তারা সেথায় তাদের গৃহসমূহে কখনও অবস্থান করেনি।] বসবাস করে নি। শোন! ছামূদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। শোন! ধ্বংসই ছিল ছামূদ জাতির পরিণাম। ثَمُوْدُ শব্দটি مُنْصَرِفٌ পাঠ করা যায়। আর কবীলা ও গোত্রের নাম হিসাবে এটাকে غَيْرُ مُنْصَرِفٍ রূপেও পাঠ করা যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثَمُوْدُ : ছামূদ একটি সম্প্রদায়ের নাম, যার তাদের পরদাদা ছামূদ ইবনে আবির ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)-এর দিকে مَنْسُوْبٌ হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের সাথে ই হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্পর্ক ছিল এবং এ সম্প্রদায়ের প্রতিই তাকে রাসূল রূপে প্রেরণ করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا تَسْكُنُوْنَ بِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে اِسْتَعْمَرَ-এর মধ্যে س- ت টা تَصْيِيْرٌ-এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে উহাকে আবাদকারী রূপে বানিয়েছি। আবার কেউ কেউ عَمَرَ- يَعْمُرُ থেকে নিয়েছেন, ঐ সময় তার অর্থ হবে তোমাদেরকে বাসিন্দা বানিয়েছেন। এই সুরতে من - ت টা অতিরিক্ত হবে।

قَوْلُهُ صَالِحٌ : তিনি প্রসিদ্ধ নবীগণের একজন। পবিত্র কুরআনের নয়টি স্থানে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন?

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ اٰيَةً টা نَاقَةٌ থেকে حَالٌ হয়েছে আর তাতে আমেল হলো هٰذِهٖ যা اُشِيْرُ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فَعَقَرُوْهَا : এ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর عَقْرًا মাসদার হতে এসেছে অর্থ হলো পায়ের গোড়ালী কেটে ফেলা, আরবদের নিয়ম ছিল যখন কোনো উটকে ধ্বংস করতে চাইত তখন তার গোড়ালী কেটে দিত। পায়ের গোড়ালী কেটে দিত। পায়ের গোড়ালী কর্তনের জন্য ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

قَوْلُهُ بِنَاءً لِاِضَافَةٍ : অর্থাৎ يَوْم-এর ইযাফত যখন اِذْ-এর দিকে হবে তখন يَوْمَئِذٍ টা فَتْحَة-এর উপর مَبْنِىْ হবে। কেননা ظَرْفٌ টা যখন اِسْمٌ مُبْهَمٌ-এর দিকে মুযাফ হয় তখন مُضَافٌ اِلَيْهِ থেকে بِنَاءٌ অর্জন করে নেয়। اِذْ টা يَوْمٌ-এর ظَرْفٌ مُضَافٌ হয়েছে যার কারণে مَبْنِىْ عَلَى الْفَتْحِ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত সালেহ (আ.)-এর বংশ সূত্র : হযরত সালেহ (আ.) যে সম্প্রদায়ে প্রেরিত হয়েছিলেন তাকে ছামূদ বলা হয়। পবিত্র কুরআনের ৯ স্থানে ثَمُوْدُ-এর উল্লেখ রয়েছে। তা হলো সূরা আ'রাফ, হূদ, হজর নমল, ফুসসিলাত, নাজম, কামার, হাক্কাহ ও শামস সূরা সমূহে। হযরত সালেহ (আ.) -এর বংশ পরম্পরার মধ্যে বংশ বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস ইমাম বগভী (র.) তাঁর বংশ সূত্র এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সালেহ ইবনে ওবায়দ ইবনে আসিফ ইবনে মাশেহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে হাদির ইবনে ছামূদ এই বংশ সূত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সম্প্রদায়ের পরদাদার নাম ছামূদ থাকায় এদেরকে ছামূদ সম্প্রদায় বা ছামূদ জাতি বলা হয়। প্রতিটি বংশ সূত্রই সর্বশেষ সাম ইবনে নূহ (আ.) -এর সাথে গিয়ে মিলে যায়। মোটকথা সকল বর্ণনার সমষ্টির দ্বারা বুঝা যায় যে, ছামূদ সম্প্রদায় ও সামী গোত্রের একটি শাখা ছিল। আর এটা হলো সেই গোত্র যা عَادٌ اُوْلٰى তথা হূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পরে হযরত হূদ (আ.)-এর সাথে বেচে গিয়েছিল। আর এদেরকে عَادٌ ثَانِيَةٌ-এর বংশধরও বলা হয়।

৬১ হতে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে ছামূদ' -এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল "এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড হতে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজি আছি।"

হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মুতাবিক মোজেজা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ ত'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আজাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা হতে বিরত হলো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মুতাবিক মোজেজা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলি সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্মপ্রকাশ করল। আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনোরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হয়, তবে তোমাদের প্রতি আজাব নাজিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হলো। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে বললেন قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا অর্থাৎ তাওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো, যেমন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে নবুয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত, এবং 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুয়তের দাবি ও মূর্তিপূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব লোক তার বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, মাত্র তিনদিন তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো, এ তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا "যখন আমার আজাবের আদেশ আসল তখন আমি সালেহকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করেছি সেদিনের কঠিন আজাব থেকে এবং অপমানজনক শাস্তি থেকে আর তা করেছি আমার রহমতে।" আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে–

১. আল্লাহর অবাধ্য নাফরমানদের যখন কঠোর আজাব হয় তখনও তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে রক্ষা করেন যেমন হযরত সালেহ (আ.) এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

২. আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে শুধু তাঁর রহমতে রক্ষা করেছেন, যদি তিনি রহমত নাজিল না করতেন তবে এ ভয়ংকর আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পন্থা ছিলনা।

وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ : ৩. [সেদিনের অপমান থেকে] অর্থাৎ একটি আজাব ছিল ধ্বংসের, আর দ্বিতীয় আজাব ছিল অপমানের। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে উভয় আজাব থেকেই হযরত সালেহ (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করেছেন।

قَوْلُهُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ : [হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ধ্বংসও করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষাও করতে পারেন। কেননা তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। একই সময় ধ্বংস করা ও রক্ষা করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি পরাক্রমশালী।

–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা-৯২ তাফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৩]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিনদিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রোববার প্রত্যুষে তাদের উপর আজাব নাজিল হলো।

قَوْلُهُ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ : অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোনো জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপে প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বোঝা যায় যে, কওমে ছামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা 'আরাফ'-এর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বোঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোনো বিরোধ নেই। হয়তো প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٩. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرٰى أَيْ بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَعْدَهُ قَالُوا سَلَامًا مَصْدَرٌ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ مَشْوِيٍّ

٧٠. فَلَمَّا رَاٰى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ بِمَعْنٰى أَنْكَرَهُمْ فَأَوْجَسَ أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ مِنْهُمْ خِيْفَةً ط خَوْفًا قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمِ لُوطٍ لِنُهْلِكَهُمْ

٧١. وَامْرَأَتُهُ أَيْ إِمْرَأَةُ إِبْرَاهِيمَ سَارَةُ قَائِمَةٌ تَخْدِمُهُمْ فَضَحِكَتْ إِسْتِبْشَارًا بِهَلَاكِهِمْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ بَعْدِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ وَلَدَهُ تَعِيشُ إِلٰى أَنْ تَرَاهُ

٧٢. قَالَتْ يَا وَيْلَتٰى كَلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ أَمْرٍ عَظِيمٍ وَالْأَلِفُ مُبْدَلَةٌ مِنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ لِيْ تِسْعٌ وَّتِسْعُونَ سَنَةً وَهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ط لَهُ مِائَةٌ وَّعِشْرُونَ سَنَةً وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيهِ مَا فِيْ ذَا مِنَ الْإِشَارَةِ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ أَنْ يُّوْلَدَ وَلَدٌ لِهَرِمَيْنِ

অনুবাদ :

৬৯. আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইসহাক ও তৎপর ইয়াকূবের সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের নিকট আসল তারা বলল, সালাম। সে বলল, তোমাদের উপরও সালাম। সে অনতিবিলম্ব কাবাব করা গো-বৎস নিয়ে আসল। سَلَامًا -এটা مَصْدَرٌ বা উহ্য একটি ক্রিয়ার সমধাতুজ কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। حَنِيذٍ : অর্থ কাবাবকৃত, ভুনা।

৭০. সে যখন দেখল, উহার দিকে তাদের হাত বাড়তেছে না তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত বোধ করল এবং তাদের সম্বন্ধে মনে ভীতি সঞ্চার হলো। তারা বলল, ভয় করিও না। আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। نَكِرَهُمْ -অর্থ তাদেরকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করল। أَوْجَسَ -অর্থ মনে গোপনে উদয় হলো। خِيْفَةً -অর্থ ভয়।

৭১. তার স্ত্রী অর্থাৎ ইবরাহীমের স্ত্রী সারা দাঁড়ানো ছিল। সে তাদের খেদমত করতেছিল। সে এদের ধ্বংসের সংবাদে খুশি হয়ে হেসে উঠল অনন্তর তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরবর্তীতে তৎসন্তান ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম সে তাকে ইয়াকূবকে দর্শন না করা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। وَرَاءٌ -এই স্থানে অর্থ পরবর্তী।

৭২. সে বলল, কি আশ্চর্য! وَيْلَتٰى সাজ্যাতিক কোনো বিষয়ের বেলায় এই শব্দটি বলা হয়ে থাকে। এটার শেষের اَلِفْ -টি يَاءِ اِضَافَةْ হতে পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। সন্তানের জননী হবো আমি অথচ আমি বৃদ্ধা! তখন তার বয়স ছিল নিরানব্বই। এই আমার স্বামীও বৃদ্ধ। তাঁর বয়স ছিল একশত বিশ বৎসর। এটা অর্থাৎ দুই সাতিশয় বৃদ্ধ বৃদ্ধার সন্তান হওয়া সত্যই এক অদ্ভুত ব্যবহার شَيْخًا -এটা حَالٌ বাচক পদ হিসাবে مَنْصُوبٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় اِسْمُ اِشَارَةٌ বা ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য هٰذَا স্থিত ক্রিয়া اُشِيْرُ এটার عَامِلٌ [রূপে গণ্য হবে।]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٣. قَالُوْآ اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ قُدْرَتِهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ ط بَيْتِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ مَّجِيْدٌ كَرِيْمٌ

৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহর কাজে তাঁর কুদরত সম্পর্কে তুমি বিস্ময় বোধ করতেছ? হে গৃহবাসী অর্থাৎ হে ইবরাহীমের পরিবার, তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত। তিনি নিশ্চয় প্রশংসিত ও সম্মানিত। حَمِيْدٌ -অর্থ مَحْمُوْدٌ বা প্রশংসিত। مَجِيْدٌ -অর্থ كَرِيْمٌ বা সম্মানিত।

٧٤. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ الْخَوْفُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى بِالْوَلَدِ اَخَذَ يُجَادِلُنَا يُجَادِلُ رُسُلَنَا فِيْ شَاْنِ قَوْمِ لُوْطٍ .

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীম ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার নিকট সন্তানের সুসংবাদ আসল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের বিষয়ে আমার সাথে আমার প্রেরিত রাসূলগণের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। اَلرَّوْعُ -অর্থ ভয়।

٧٥. اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ كَثِيْرُ الْاَنَاةِ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ رَجَّاعٌ فَقَالَ لَهُمْ اَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا ثَلَاثُمِائَةِ مُؤْمِنٍ قَالُوْا لَا قَالَ اَفَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا مِائَتَا مُؤْمِنٍ قَالُوْا لَا قَالَ اَفَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا اَرْبَعُوْنَ مُؤْمِنًا قَالُوْا لَا قَالَ اَفَتُهْلِكُوْنَ قَرْيَةً فِيْهَا اَرْبَعَةَ عَشَرَ مُؤْمِنًا قَالُوْا لَا قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ فِيْهَا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ قَالُوْا لَا قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا الخ فَلَمَّا اَطَالَ مُجَادَلَتَهُمْ قَالُوْا .

৭৫. ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, আল্লাহ অভিমুখী। اَلْحَلِيْمُ -অর্থ যিনি ধীরে সুস্থে কাজ করেন। مُنِيْبٌ -অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহ অভিমুখী। তিনি তাদের বলেছিলেন, আপনারা কি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে তিনশত মু'মিনের বাস? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে দুইশত মু'মিনের বাস? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে চল্লিশ জন মু'মিনের বাস? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে চৌদ্দ জন মু'মিনের বাস? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, যদি একজন মু'মিনের বাস হয় তবে আপনাদের মত কি? তাঁরা বললেন, তখনও না। তিনি বললেন, ঐ জনপদে তো লূত আছেন? তাঁরা বললেন, সেখানে কে আছেন আমরা ভালো করে জানি।

٧٦. يٰاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا الْجِدَالِ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ بِهَلَاكِهِمْ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ .

৭৬. যা হউক এই বাদানুবাদ দীর্ঘায়িত হলো তাঁরা বললেন, হে ইবরাহীম! এটা এই বাদানুবাদ হতে বিরত হও, এদের ধ্বংস সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ এসে গিয়েছে। এদের প্রতি অনিবার্যরূপে শাস্তি আসবে যা প্রত্যাহার করা হবে না।

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۔ .77

৭৭. এবং আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসল তখন সে বিষণ্ণ হলো এদের আগমনের দরুন চিন্তিত হয়ে পড়ল, এবং তার বাহু সংকুচিত বলে বোধ হলো অর্থাৎ তার মন শঙ্কিত হয়ে পড়ল। কারণ তারা সুন্দর চেহারার বালক আকৃতি ধারণ করে মেহমান হিসাবে এসেছিলেন। সেহেতু এদের সম্পর্কে তিনি তার সম্প্রদায়ের মন্দ আচরণের আশঙ্কা করতেছিলেন। এবং বলল, 'এটা নিদারুণ দিন।' কঠিন এক দিন।

حَزِنَ بِسَبَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدْرًا لِأَنَّهُمْ حِسَانُ الْوُجُوهِ فِي صُورَةِ أَضْيَافٍ فَخَافَ عَلَيْهِمْ قَوْمَهُ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ شَدِيدٌ ۔

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ لَمَّا عَلِمُوا بِهِمْ يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ قَبْلِ مَجِيئِهِمْ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ط هِيَ إِتْيَانُ الرِّجَالِ فِي الْأَدْبَارِ قَالَ لُوطٌ يٰقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي فَتَزَوَّجُوهُنَّ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ تَفْضَحُونِي فِي ضَيْفِي ط أَضْيَافِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ .78

৭৮. তাদের আগমন সম্পর্কে জানতে পেরে তার সম্প্রদায় তার নিকট দ্রুত দৌড়ে আসল। পূর্ব হতে তাদের আগমনের পূর্ব হতে তারা কুকর্মে অর্থাৎ সমকামের মতো জঘন্য কর্মে লিপ্ত ছিল। সে হযরত লূত (আ.) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এই আমার কন্যাগণ, তাদেরকে তোমরা বিধান মতো বিবাহ করে নিও তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার অতিথিদিগের বিষয়ে আমাকে হেয় করিওনা, অপমান করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? যে সৎ কর্মের আদেশ দিবে ও অসৎ কর্ম হতে বিরত করবে। يُهْرَعُونَ - إِهْرَاعٌ দ্রুত দৌড়ে আসা। ضَيْف -এটা এই স্থানে বহুবচন أَضْيَافٌ [অতিথিগণ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাফসীরে أَضْيَافٌ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ حَاجَةٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ مِنْ إِتْيَانِ الرِّجَالِ .79

৭৯. তারা বলল, তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কি চাই তা তুমি তো ভালো করে জান। আর তা হলো সমকাম কর্ম। حَقٌّ -এই স্থানে এটার অর্থ হলো প্রয়োজন।

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً طَاقَةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ عَشِيرَةٍ تَنْصُرُنِي لَبَطَشْتُ بِكُمْ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَلٰئِكَةُ ذٰلِكَ .80

৮০. সে বলল, তোমাদের উপর যদি আমার ক্ষমতা শক্তি থাকত অথবা আমি যদি কোনো শক্তিশালী দলের গোত্রের আশ্রয় পেতাম! যারা আমাকে তোমাদের দাপট হতে রক্ষা পেতে সাহায্য করত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨١. قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ بِسُوْءٍ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ طَائِفَةٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ لِئَلَّا يَرٰى عَظِيْمَ مَا يَنْزِلُ بِهِمْ اِلَّا امْرَاَتَكَ بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ اَحَدٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصَبِ اِسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْاَهْلِ اَيْ فَلَا تُسْرِبِهَا اِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ ط فَقِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهَا وَقِيْلَ خَرَجَتْ وَالْتَفَتَتْ فَقَالَتْ وَاقَوْمَاهُ فَجَاءَهَا حَجَرٌ فَقَتَلَهَا وَسَأَلَهُمْ عَنْ وَقْتِ هَلَاكِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ فَقَالَ اُرِيْدُ اَعْجَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالُوْا اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ

৮১. এই অবস্থা দর্শনে ফেরেশতাগণ বললেন, 'হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখনই মন্দ অভিপ্রায়ে তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক সময়ে কোনো একভাগে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে যেন না দেখে। যেন সে এটার উপর যে ভীষণ বিভীষিকা আপতিত হবে তা না দেখতে পায়। তোমার স্ত্রী ব্যতীত। সে অবশ্য পিছনের দিকে তাকাবে তাদের অর্থাৎ লূতের সম্প্রদায়ের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। কথিত আছে যে, সে ঐ অঞ্চল হতে বাইরেই যায় নি। কেউ কেউ বলেন, সে তাঁর সঙ্গে বের হয়েছিল বটে কিন্তু [নিষেধ থাকা সত্ত্বেও] পিছনের দিকে তাকিয়ে তার সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ে দর্শন বলে উঠে وَا قَوْمَاهُ হায় আমার সম্প্রদায়! তখন একটি পাথর ছুটে এসে তাকে আঘাত করে এবং তাকে মেরে ফেলে। হযরত লূত তাদেরকে ফেরেশতাদেরকে তাদের ধ্বংসের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল প্রভাত তাদের জন্য নির্ধারিত কাল। তিনি বললেন, আরো শীঘ্র হউক। তারা বলল, প্রভাত কি নিকট নয়? اِمْرَاَتَكَ -এটা اَحَدٌ-এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদরূপে رَفْع সহকারে পঠিত রয়েছে। অপর এক কিরাতে اَهْل হতে اِسْتِثْنَاءٌ রূপে نَصَبْ - اَهْل হতে اِسْتِثْنَاءٌ ব রূপে نَصَبْ সহও পঠিত রয়েছে, এমতাবস্থায় অর্থ হবে এটাকে [স্ত্রীকে] নিয়ে যেয়ো না।

٨٢. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ جَعَلْنَا عَالِيَهَا اَيْ قُرَاهُمْ سَافِلَهَا بِاَنْ رَفَعَهَا جِبْرَئِيْلُ اِلَى السَّمَاءِ وَاَسْقَطَهَا مَقْلُوْبَةً اِلَى الْاَرْضِ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ طِيْنٍ طُبِخَ بِالنَّارِ مَّنْضُوْدٍ مُتَتَابِعٍ

৮২. অতঃপর যখন এদের ধ্বংসের সম্পর্কে আমার আদেশ আসল। এই গুলোকে এই জনপদগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) এগুলোকে আকাশে তুলে পৃথিবীতে উল্টিয়ে ছুড়ে ফেললেন। এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম কঙ্কর, سِجِّيْل -আগুনে পোড়া মাটি, কঙ্কর। مَنْضُوْدٌ -একের পর এক ক্রমাগত।

٨٣. مُّسَوَّمَةً مُعَلَّمَةً عَلَيْهَا اِسْمُ مَنْ يُّرْمٰى بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ظَرْفٌ لَهَا وَمَاهِيَ الْحِجَارَةُ اَوْ بِلَادُهُمْ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ اَيْ اَهْلِ مَكَّةَ بِبَعِيْدٍ

৮৩. যা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। যাকে তা ছুঁড়া হবে তার নাম তাতে অঙ্কিত ছিল। [এটা] এই পাথর বা তাদের জনপদসমূহ সীমালঙ্ঘনকারীদের হতে অর্থাৎ মক্কাবাসীদের হতে দূরে নয়। عِنْدَ رَبِّكَ -এটা এইস্থানে ظَرْفٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَصْدَرٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, سَلَامًا টা سَلَّمْنَا উহ্য ফে'লের মাসদার। এতে এই আপত্তিরও নিরসন হয়ে গেল যে. قَالُوْا -এর مَقُوْلَهُ হয়েছে অথচ مَقُوْلَه টা مُفْرَدْ হয় না। এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এটাও হলো যে. سَلَامًا টা مُفْرَدْ নয়; বরং سَلَّمْنَا -এর সাথে মিলে জুমলা বা বাক্য হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَيْكُمْ : মুফাসসির (র.) عَلَيْكُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, سَلَامٌ হলো মুবতাদা আর عَلَيْكُمْ তার খবর উহ্য রয়েছে।

প্রশ্ন. سَلَامٌ হলো نَكِرَهْ আর نَكِرَهْ টা মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়?

উত্তর. হলো سَلَامٌ -এর তানভীনটা হলো تَعْظِيْم -এর জন্য অর্থাৎ سَلَامٌ عَظِيْمٌ কাজেই سَلَامٌ -এর মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। এটা شَرٌّ اَهَرَّ ذَا نَابٍ -এর অন্তর্গত। এখানে مَقُوْلَهُ মুফরাদ হওয়ার প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেলে।

قَوْلُهُ بُشْرٰى : এর অর্থ হলো সুসংবাদ। সুসংবাদের প্রতিক্রিয়া যেহেতু চেহারায় প্রকাশ পায় এ কারণেই তাকে بُشْرٰى বলা হয়। এখানে بُشْرٰى দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র ইসহাক এবং পৌত্র ইয়াকূবের সুসংবাদ উদ্দেশ্য। যাকে আগত فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এবং এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, بُشْرٰى দ্বারা ব্যাপক সুসংবাদ উদ্দেশ্য হবে। তখন তাতে হযরত লূত (আ.) ও অন্যান্যদের মুক্তি এবং তার দুশ্চরিত্র সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সুসংবাদও অন্তর্ভুক্ত হবে। মুফাসসির (র.) এই শেষোক্ত অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন।

প্রশ্ন. হযরত ইব্রাহীম (আ.) জবাবে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ ব্যবহার করেছেন আর ফেরেশতাগণ جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ -এর কারণ কি?

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো– সালামের জবাব সালামের চেয়ে উত্তম হওয়া চাই। কেননা শরিয়তের নীতিমালাও এটাই, আর সালামের জবাব তখনই উত্তম হবে যখন জবাবে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ ব্যবহার করা হয়। جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ টা جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ হতে উত্তম হয়ে থাকে। কেননা جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ টা دَوَامْ এবং ثَبَاتْ -এর উপর বুঝায়।

قَوْلُهُ اَنْكَرَهُمْ : نَكِرَهُمْ -এর তাফসীর اَنْكَرَهُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَازِمْ টা مُتَعَدِّىْ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ يَا وَيْلَتَا : এ শব্দটি মূলে ছিল يَاوَيْلَتِىْ ইযাফতের يَاءْ -কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়ার ফলে يَاوَيْلَتَا হয়েছে।

قَوْلُهُ رَحْمَةُ اللّٰهِ الخ : এটা مُسْتَانِفَهْ বাক্য; এবং اِنْكَارُ تَعَجُّبٍ -এর ইল্লত। অর্থাৎ তুমি তাতে আশ্চর্যবোধ করো না। কেননা এটা তোমাদের উপর আল্লাহর অনুকম্পা ও বরকত স্বরূপ।

قَوْلُهُ اَخَذَ يُجَادِلُنَا : এটা সেই উহ্য প্রশ্নের জবাব যে, لَمَّا-এর জবাব مَاضِىْ হয়ে থাকে مُضَارِعْ নয়। আর এখানে لَمَّا -এর জবাব يُجَادِلُنَا তথা مُضَارِعْ হয়েছে?

قَوْلُهُ شَاْنِ : যেহেতু قَوْمْ শব্দের মধ্যে ظَرْف হওয়ার যোগ্যতা নেই, এ কারণেই شَاْنْ শব্দটিকে উহ্য মেনে নিয়েছেন যাতে করে فِىْ এর ظَرْف হওয়া বৈধ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَبَطَشْتُ بِكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لَوْ-এর জবাব উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ بَدَلٌ الخ : কেননা اِسْتِثْنَاءْ كَلَامٌ غَيْرُ مُوْجَبْ -এর মধ্যে بَدَلْ ই পছন্দনীয় হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْاَهْلِ : অর্থাৎ اِلَّا امْرَاَتَكَ টা مِنَ الْاَهْلِ হতে اِسْتِثْنَاءْ হয়েছে اَحَدْ থেকে নয়। কেননা اَحَدْ থেকে اِسْتِثْنَاءْ বলার সুরতে اِمْرَاَةْ কে اِلْتِفَاتْ -এর হুকুম দেওয়া আবশ্যক হবে। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়।

ফায়েদা : اِلَّا امْرَاَتَكَ নসবের সাথে জমহুরের কেরাত আবূ আমের এবং ইবনে কাছীরের নিকট اَحَدْ থেকে بَدَلْ হওয়ার কারণে হয়েছে। প্রথম কেরাতের সুরতে اِمْرَاَتَهُ টা فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ হতে مُسْتَثْنٰى হবে অর্থাৎ اَسْرِ بِاَهْلِكَ جَمِيْعًا اِلَّا امْرَاَتَكَ مَرْفُوْعْ একদল رَفْعْ -এর কেরাত কে অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে আবূ ওবায়দও রয়েছেন। فَلَا تُسْرِكْ

Free @ www.e-ilmweb.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَاءَتْ ...... حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ : আলোচ্য পাঁচটি আয়াতে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সন্তান লাভের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যত সন্তান লাভের কোনো সম্ভাবনা ছিল না এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন তাঁর নামকরণ করা হলো ইসহাক। আরো অবহিত করা হলো যে, হযরত ইসহাক (আ.) দীর্ঘজীবি হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তাঁর সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকূব' (আ.)। উভয়েই নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তাঁরা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়তো এদের মনে কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহর ফেরেশতা, আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কওমের উপর আজাব নাজিল করা।"

হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনেছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সুখবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে! আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যার অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য-কারণের উর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনা তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার। এবার আয়াত সমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট কোনো সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনে তৃতীয় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মীকাঈল (আ.) ও ইস্রাফীল (আ.) এ তিনজন ফেরেশতা ছিলেন। -[কুরতুবী]

তাঁরা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সালাম করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাঁদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। -[কুরতুবী]

তাঁর নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে ইসরাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন 'বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি বল।' সে বলল 'আল্লাহ কাকে বলে আমি জানি না।' হযরত ইবরাহীম (আ.) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান হতে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আমি তার কুফরি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারাজীবন তাকে আহার্য-পানীয় দিয়ে আসছি আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। এ কথা শোনামাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবরাহীম (আ.) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে বলল, যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে এ কথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যিই পরম দয়ালু। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবাই করলেন এবং তা ভুনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হিকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহার্যের দিকে হাত বাড়ান নি।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর ছিল। তাঁরা এর ফলক দ্বারা ভুনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণ হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশ্যে কেউ কারো বাড়িতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। -[তাফসীরে কুরতুবী] অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহর ফেরেশতা।

আহকাম ও মাসায়েল : আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) তদীয় তাফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত : قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ 'তাঁরা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম' এর দ্বারা বোঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ -মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাকালে বিশেষ কোনো বাক্যে উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহর একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহর জিকির করা হলো, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হলো, নিজের পক্ষ হতে তার জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো।

এখানে কুরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سَلٰمًا 'সালামান' এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তরফ হতে শুধু سَلٰمٌ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যত অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মুতাবিক সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্যেই বোঝানো হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্যে শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ আসসালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ' বলবে।

মেহমানদারির কতিপয় মূলনীতি : فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ একটি ভুনা ভাছুর উপস্থাপন করতে যতটুকু সময় একান্ত অপরিহার্য, তিনি তার চেয়ে বেশি বিলম্ব করলেন না।

এতদ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা গেল। **প্রথমত**, মেহমান হাজির হওয়ার পরে আহার্য-পানীয় যা কিছু তাৎক্ষণিকভাবে গৃহে মওজুদ থাকে তা মেহমানের সামনে পেশ করা এবং সামর্থ্যবান হলে উপাদেয় আহার্যের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়

-[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয়ত, মেহমান আপ্যায়নের জন্য বাড়াবাড়ি বা সাধ্যতিরিক্ত আয়োজন করা সমীচীন নয়। সহজে যতটুকু ভালো খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা যায়, তাই মেহমানের সামনে নিঃসঙ্কোচ পেশ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে অনেকগুলো গরু ছিল। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বাছুর জবাই করে ভুনে মেহমানগণের সামনে পেশ করেছিলেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

তৃতীয়ত, বহিরাগত আগন্তুকদের আতিথেয়তা করা ইসলামের দৃষ্টিতে একটি নৈতিক ও মহৎ কার্য। এটা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও মহান বুজুর্গগণের একটি ঐতিহ্যও বটে। আতিথেয়তা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রয়েছে। তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। কোনো কোনো আলেমের মতে বাহিরাগত আগন্তুকদের মেহমানদারি করা গ্রামবাসীদের জন্য ওয়াজিব। কেননা গ্রামে তাদের জন্য সাধারণত কোনো হোটেলের ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে শহরে হোটেল-রেস্টুরেন্টের সুব্যবস্থা থাকায় বিদেশী লোকদের মেহমানদারি করা শহরবাসীদের জন্য ওয়াজিব নয়। -[তাফসীরে কুরতুবী।]

فَلَمَّا رَاٰى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ : অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন দেখলেন যে, উক্ত আহার্যের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সন্ত্রস্ত হলেন।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মেহমানের সম্মুখে মেজবান কর্তৃক যা কিছু পেশ করা হয়, তা সাদরে গ্রহণ করা মেহমানের কর্তব্য। তা তার কাছে অরুচিকর হলেও গৃহকর্তার সন্তুষ্টির জন্য যৎসামান্য স্বাদ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এখানে আরো জানা গেল যে, অতিথির সম্মুখে খাদ্যসামগ্রী রেখে দূরে সরে যাওয়া রীতি নয়, বরং মেহমান আহার করেন কি না তা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। হযরত ইবরাহীম (আ.) ফেরেশতাদের হাত গুটিয়ে রাখা লক্ষ্য করেছিলেন। তবে মেহমানের আহারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকাও রীতিবিরুদ্ধ, বরং ভাসা-ভাসাভাবে লক্ষ্য করবে। কেননা লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকা ভদ্রতার পরিপন্থি এবং মেহমানের জন্য বিব্রতকর। একদা খলীফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের খানার মজলিসে জনৈক বেদুঈনও শরিক ছিল। তার লোকমার মধ্যে একটা পশম লক্ষ্য করে খলীফা সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু তাতে বেদুঈন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আমরা এমন লোকের সাথে খানা খেতে পছন্দ করি না যারা আমাদের লোকমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

এখানে ইমাম তাবারী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতাগণ প্রথমে আহার্য গ্রহণ করার অজুহাত হিসাবে বলেছিলেন যে, আমরা মুফত [বিনামূল্য] খানা খাই না। আপনি মূল্য ধার্য করুন, তাহলে খেতে পারি। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, "ঠিক আছে, খানার মূল্য ধার্য করছি যে, শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন। একথা শুনে হযরত জিবরাঈল (আ.) তদীয় সঙ্গী ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন-'আল্লাহ তা'আলা তাঁকে স্বীয় খলীল [অন্তরঙ্গ বন্ধু] রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি সত্যিই এর যোগ্য এর দ্বারা জানা গেল যে, খানার প্রারম্ভে বিসিমল্লাহ ও সমাপ্তিতে আল-হামদুলিল্লাহ বলা সুন্নত।

قَوْلُهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ الخ : সূরা হূদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানি আজাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আ.)-এর কওম একে তো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও এটা জঘন্য অপরাধ। এজন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আজাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোনো অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নি।

হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আজাব নাজিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তাঁরা ফিলিস্তিনে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আজাবই নাজিল করে থাকেন। এক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ.)-ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কু-স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন 'আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।'

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ দুনিয়াকে আজাব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আজরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত লূত (আ.)-এর মতো একজন বিশিষ্ট পয়গাম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আ.)-এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন।

-[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

হযরত লূত (আ.)-এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হলো। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ "আর তাঁর কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এলো। আর আগে থেকেই তারা কুকর্মে অভ্যস্ত ছিল।" এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কুকর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আ.)-এর মতো একজন সম্মানিত পয়গাম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আ.) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল। হুজুরে আকরাম ﷺ -এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হুজুর ﷺ স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবূ লাহাব ও আবুল আসইবনে রবী'র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরির হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষিত হয়।

-[তাফসীরে কুরতুবী।]

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এখানে হযরত লূত (আ.) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধূ-কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তান স্বরূপ। যেমন কুরআনের ২১ পারা সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ -এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ বাক্যেও বর্ণিত আছে, যার মধ্যে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সমগ্র 'উম্মতের পিতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তাফসীর অনুসারে হযরত লূত (আ.)-এর কথার অর্থ হলো, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আ.) তাদেরকে আল্লাহর আজাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর' এবং কাকুতি-মিনতি করে বললেন وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ "আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন, اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ "তোমাদের মাঝে কি কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ভালো মানুষ নেই?" আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মানুষত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল "আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধূ-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।"

হযরত লূত (আ.) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জালিমের হাত হতে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হতো!

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না; বরং আজাব নাজিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-এর উপর রহম করুন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।" তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আ.)-এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। -[কুতুবী] স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে কুরাইশ-কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও

পৃষ্ঠপোশকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিকে দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এজন্যই সম্পূর্ণ বনী হাশিম গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শামিল ছিল যখন কুরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আ.)-এর গৃহদ্বারে সমবেত হলো, তখন তিনি গৃহদ্বারে রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবর্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙ্গতে উদ্যোগী হলো। এমন কঠিন মুহূর্তে হযরত লূত (আ.) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং পালাতে লাগল।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আ.)-কে বললেন, আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ অন্যদের উপর যে আজাব আপতিত হবে, তাকেও সে আজাব ভোগ করতে হবে।

এর এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেবেন না। [দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুঁশিয়ারি মেনে চলবে না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল। [তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আজাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আ.) বললেন- "আমি চাই, আরো জলদি আজাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ "প্রত্যুষকাল দূরে নয়; বরং সমাগত প্রায়।"

অতঃপর উক্ত আজাবের ধরন সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে যখন আজাবের হুকুম কার্যকর করার সময় হলো, তখন আমি তাদের বস্তির উপরিভাগকে নিচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসিত ছিল। ঐসব জনপদকেই কুরআন পাকের অন্য আয়াতে مُؤْتَفِكَاتٌ 'মুতাফিকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের জমিনে তলদেশে প্রবিষ্ট করত এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমন কি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐ সব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উল্টিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হলো। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল, তাই এই ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আ.)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ প্রস্তর বর্ষণের আজাব বর্তমানকালের জালিমদের থেকেও দূরে নয়; বরং কুরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থলে ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠও যেন নিজেদেরকে এহেন আজাব হতে দূরে মনে না করে। রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে যখন এরূপ হতে দেখবে তখন তাদের উপরও অনুরূপ আজাব আসার অপেক্ষা কর।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨٤. وَاَرْسَلْنَا اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ط وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ نِعْمَةٍ تُغْنِيْكُمْ عَنِ التَّطْفِيْفِ وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ بِكُمْ يُهْلِكُكُمْ وَوَصْفُ الْيَوْمِ بِهِ مَجَازٌ لِوُقُوْعِهِ فِيْهِ .

৮৪. আর মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। মাপ ও ওজনে কম করিও না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখতেছি। স্বচ্ছল দেখতেছি। যা মাপে কম দেওয়া হতে তোমাদেরকে অনপেক্ষ করে দিয়েছে। তোমরা যদি ঈমান আনয়ন না কর, তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসে শাস্তির, যা তোমাদের বিধ্বংস করে দিবে। مُحِيْطٌ -বেষ্টনকারী। অর্থাৎ যা তোমাদেরকে সকল দিক হতে বেষ্টন করে ফেলবে। এই স্থানে يَوْمٌ অর্থাৎ দিবসের বিশেষণ হিসাবে এটাকে مَجَازٌ বা রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তা ঐ দিবসের মাঝে সংঘটিত হবে।

٨٥. وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اَتِمُّوْهُمَا بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ لَا تَنْقُصُوْهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَثِىَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ وَمُفْسِدِيْنَ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَعْنٰى عَامِلِهَا تَعْثَوْا .

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ইনসাফের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পূরণ করবে এইগুলো পরিপূর্ণরূপে করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু দিবে ত্রুটি করবে না তাদের প্রাপকের কিছুমাত্র কম করবে না, এবং খুন-খারাবি ইত্যাদি করে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ে ঘুরবে না। تَعْثَوْا-এটা ث অক্ষরে তিন হরকত বিশিষ্ট ক্রিয়া عَثِىَ হতে গঠিত। অর্থ বিশৃঙ্খলা ঘটানো। مُفْسِدِيْنَ এটা حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ অর্থাৎ তার আমেল تَعْثَوْا-এর অর্থের তাকিদব্যঞ্জক حَالٌ পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٦. بَقِيَّتُ اللّٰهِ رِزْقُهُ الْبَاقِىْ لَكُمْ بَعْدَ اِيْفَاءِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْبَخْسِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ج وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ رَقِيْبٍ اُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ اِنَّمَا بُعِثْتُ نَذِيْرًا .

৮৬. যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে আল্লাহ-অনুমোদিত যা থাকবে। মাপ ও ওজন পরিপূর্ণভাবে প্রদানের পর আল্লাহ প্রদত্ত যে রিজিক তোমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তোমাদের জন্য তা মাপে কম করা হতে শ্রেয়। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই নিগাহবান নই যে, তোমাদের কার্যাবলির আমি প্রতিফল দিব, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হয়েছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٧. قَالُوْا لَهٗ اسْتِهْزَاءً يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ بِتَكْلِيْفِنَا اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا مِنَ الْاَصْنَامِ اَوْ نَتْرُكَ اَنْ نَفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط اَلْمَعْنٰى هٰذَا اَمْرٌ بَاطِلٌ لَا يَدْعُوْ اِلَيْهِ دَاعِيْ خَيْرٍ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ قَالُوْا ذٰلِكَ اِسْتِهْزَاءً .

৮৭. তারা তাকে উপহাস ভরে বলল, 'হে শুআয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় আমাদের উপর এই বিষয় চাপাতে যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদত করত অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ তা আমাদেরকে বর্জন করতে হবে এবং আমাদের ধনসম্পদে যা খুশি করার অধিকারও ছেড়ে দিতে হবে? অর্থাৎ এই ধরনের হুকুম তো অন্যায়। কল্যাণের পথে আহ্বানকারী কোনো ব্যক্তি এটা আহ্বান জানাতে পারে না। তুমি তো অবশ্যই সহনশীল, সদাচারী। এরা তাকে বিদ্রূপ করে এই কথা বলেছিল।

٨٨. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ط حَلَالًا اَفَاَشُوْبُهٗ بِالْحَرَامِ مِنَ الْبَخْسِ وَالتَّطْفِيْفِ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ وَاَذْهَبَ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط فَاَرْتَكِبَهٗ اِنْ مَا اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ لَكُمْ بِالْعَدْلِ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْ قُدْرَتِيْ عَلٰى ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ مِنَ الطَّاعَاتِ اِلَّا بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ اَرْجِعُ .

৮৮. সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ হালাল জীবনোপকরণ দান করে থাকেন তবে কি আমি মাপে কম দিয়ে এই হালালের সঙ্গে হারাম মিশ্রিত করব? আমি চাই না যে, তোমাদের বিরোধিতা করব আর যে জিনিস হতে তোমাদেরকে নিষেধ করতেছি তা নিজে করতে যাব। যতটুকু সম্ভব ন্যায়ের মাধ্যমে আমি কেবল তোমাদের সংশোধন করতে চাই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। اِنْ اُرِيْدُ-এই স্থানে اِنْ শব্দটি নাবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٩. وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ يَكْسِبَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ خِلَافِيْ فَاعِلُ يَجْرِمُ وَالضَّمِيْرُ مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ وَالثَّانِيْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ط مِنَ الْعَذَابِ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ اَيْ مَنَازِلُهُمْ اَوْ زَمَنُ هَلَاكِهِمْ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ فَاعْتَبِرُوْا .

৮৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে মতানৈক্য আমার বিরোধিতা কিছুতেই যেন তোমাদেরকে এমন আচরণ না করায় তোমাদেরকে এমন কাজে লিপ্ত না করায় যা দ্বারা নূহ সম্প্রদায় কিংবা সালেহ সম্প্রদায়ের উপর যা অর্থাৎ যে শাস্তি আপতিত হয়েছিল অনুরূপ তোমাদের উপরও আপতিত হবে। আর লূতের সম্প্রদায় তো তাদের আবাসস্থল বা তাদের ধ্বংস কাল তোমাদের হতে দূরে নয়। সুতরাং তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। لَا يَجْرِمَنَّكُمْ -এই স্থানে كُمْ [তোমাদেরকে] সর্বনামটি হলো এই ক্রিয়াটির مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ। شِقَاقِيْ-এটা لَا يَجْرِمُ ক্রিয়ার কর্তা। اَنْ يُصِيْبَكُمْ -এটা لَا يَجْرِمُ ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ ثَانِيْ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٠. وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَدُوْدٌ مُحِبٌّ لَهُمْ ۔

৯০. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু প্রেমময়। তাদের প্রতি তিনি ভালোবাসা পোষণকারী।

٩١. قَالُوْا اِيْذَانًا بِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ نَفْهَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ذَلِيْلًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ عَشِيْرَتُكَ لَرَجَمْنٰكَ بِالْحِجَارَةِ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ كَرِيْمٍ عَنِ الرَّجْمِ وَاِنَّمَا رَهْطُكَ هُمُ الْاَعِزَّةُ ۔

৯১. তার কথার প্রতি নিজেদের অবহেলা ও লক্ষ্য প্রদানের স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করে তারা বলল, হে শুআয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না। আমরা তো আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল হেয় দেখতে পাচ্ছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে তোমার গোত্র যদি না থাকত তবে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করতাম। আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও। তুমি এমন কোনো সম্মানী নও যে, প্রস্তরাঘাত করা যাবে না। তোমার গোত্র অবশ্য সম্মানী ও শক্তিশালী। مَا نَفْقَهُ অর্থ আমরা বুঝি না।

٩٢. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ط فَتَتْرُكُوْا قَتْلِىْ لِاَجْلِهِمْ وَلَا تَحْفَظُوْنِىْ لِلّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ اَىِ اللّٰهَ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ط مَنْبُوْذًا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ لَا تُرَاقِبُوْنَهُ اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ عِلْمًا فَيُجَازِيْكُمْ

৯২. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হলো? এদের কারণে তোমরা আমার হত্যা পরিহার করতেছ? আল্লাহর জন্য তোমরা আমাকে রক্ষা করতেছ না।? তোমরা তাঁকে অর্থাৎ আল্লাহকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ, তোমাদের পিঠের পিছনে নিক্ষিপ্ত করে রেখেছ। তাঁর খেয়াল তোমরা কর না। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তা তাঁর জ্ঞানে পরিবেষ্টন করে আছেন। অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতিফল প্রদান করবেন।

٩٣. وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ط عَلٰى حَالَتِىْ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ط وَارْتَقِبُوْٓا اِنْتَظِرُوْا عَاقِبَةَ اَمْرِكُمْ اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ مُنْتَظِرٌ

৯৩. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের স্থানে তোমাদের অবস্থায় কাজ কর। আমিও আমার অবস্থায় কাজ করতেছি; তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর। তোমাদের শেষ পরিণামের অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে লক্ষ্য করতেছি। প্রতীক্ষারত আছি। مَنْ -এটা مَوْصُوْلَة বা সংযোজক বিশেষ্য। উপরিউক্ত تَعْلَمُوْنَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل

٩٤. وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ج وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ صَاحَ بِهِمْ جِبْرِيْلُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ ۔

৯৪. যখন এদের ধ্বংস সম্পর্কে আমার নির্দেশ আসল তখন আমি শুআয়ব ও তার সঙ্গী মু'মিনদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে পাকড়াও করল। হযরত জিবরাঈল (আ.) এই ভীষণ চিৎকার দিয়েছিলেন, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। মরে নতজানু অবস্থায় পড়ে রইল।

৯৫. كَأَنْ مُخَفَّفَةٌ أَيْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا يُقِيمُوْا فِيهَا ط أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ

৯৫. যেন তারা সেথায় কখনও অবস্থান করেনি বসবাস করেনি শোন! ধ্বংসই ছিল মাদয়ানবাসীর পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল ছামূদ সম্প্রদায়! كَأَنْ-এটার أَنْ-টি এইস্থানে مُخَفَّفَه অর্থাৎ তাশদীদহীন লঘুরূপে পরিবর্তিত। এটা মূলত ছিল, كَأَنَّ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَدْيَنَ أَيْ أَهْلُ مَدْيَنَ : হযরত শুআয়ব (আ.)-এ সম্প্রদায়েরই একজন সদস্য ছিলেন, যাকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। মাদইয়ান হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক সন্তানের নাম। যিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতূরা-এর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। তার নামেই এই শহরের নামকরণ করা হয়েছে মাদয়ান বলে। তার মহল وُقُوع عُقْبَه হতে পূর্বে দিকে ছিল। বর্তমানে তাকে مَعَادِنْ বলে। এই ব্যক্তি ব্যবসায়ী ছিল। মিশর, ফিলিস্তীন এবং লেবাননে ব্যবসা করত।

قَوْلُهُ وُصِفَ الْيَوْمُ بِهِ مَجَازٌ لِوُقُوعِهِ فِيهِ : এই ইবারত দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, مُحِيْط হলো عَذَاب -এর সিফত يَوْم-এর নয়। অথচ مُحِيْط -এর ইযাফত يَوْم -এর দিকে হয়েছে। উত্তরের সারকথা হলো এই যে, এতে مَجَازْ হয়েছে। যেহেতু শাস্তি يَوْم -এর মধ্যে হবে। আর يَوْم টা عَذَاب -এর ظَرْف হবে। মুনাসাবাতের কারণে مَظْرُوْف -এর ইযাফত ظَرْف দিকে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ : এটা হলো সেই প্রশ্নের উত্তর যে, تَعْثَوْا -এর অর্থ হলো فَسَادْ আর مُفْسِدِيْنَ -এর অর্থও হলো فَسَادْ কাজেই তাতে تَكْرَارْ রয়েছে।

উত্তর. হলো এই যে, এটা تَكْرَارْ নয়; বরং অর্থের হিসেবে তাকিদ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَعْثَوْا : এ শব্দটি عَثْىٌ বা عِثِيٌّ হতে نَهِيْ -এর جَمع مُذَكَّر حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।

قَوْلُهُ لِمَعْنَى عَامِلِهَا : অর্থাৎ مُفْسِدِيْنَ স্বীয় আমেল لَا تَعْثَوْا-এর অর্থ থেকে حَالْ হয়েছে। এবং অর্থ হলো فَسَادْ

قَوْلُهُ بَقِيَّتُ اللّٰهِ : এটাকে تَاءِ مَجْرُوْرَة لِبَنِيْ -এর সাথে আর আবূ আমের কেসায়ী ও বাকূন (র.) تاءِ مدورة -এর সাথে পড়েছেন। بَقِيَّة অর্থ হলো উদ্বৃত্ত বস্তু। এটা فَعِيْلَة -এর ওজনে হয়েছে صِفَت مُشَبَّه -এর সীগাহ। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ওজন করার পর এবং মানুষের হক আদায় করার পর যা অতিরিক্ত হয়/ বেচে যায়। তা তোমাদের জন্য তা থেকে অনেক গুণে উত্তম যা তোমরা ওজনে কম দিয়ে ও মানুষের হক বিনষ্ট করে সঞ্চয় কর। যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই জীবিকা দান করেন এজন্য بَقِيَّت-এর ইযাফত আল্লাহর দিকে করা হয়েছে। এখানে আনুগত্য ও সৎ আমল সমূহের অর্থে হয়নি।

قَوْلُهُ بِتَكْلِيْفِنَا : অর্থাৎ بِتَكْلِيْفِكَ إِيَّانَا এখানে بِتَكْلِيْفِنَا উহ্য মেনে মুফাসসির (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো এই যে, تَرْك হলো কাফেরদের কর্ম আর أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ-এর মধ্যে مَامُوْر হলো হযরত শুআয়ব (আ.)। تَرْك -এর অনুবাদ এই হবে যে, হে শুআয়ব তোমার নামাজ কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে, আমরা মূর্তিদের উপাসনা ছেড়ে দিব, আর এটা সম্ভব নয় যে, تَرْك -এর হুকুম হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর জন্য হবে। আর তার উপর কাফের আমল করবে।

উত্তর. এখানে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো بِتَكْلِيْفِنَا এখন অনুবাদ হবে যে, হে শুআয়ব! তোমার নামাজ তোমাকে এ কথার নির্দেশ দেয় যে, তুমি আমাদেরকে মূর্তিদের উপাসনা পরিহার করতে বাধ্য করবে।

قَوْلُهُ تَتْرُكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, أَنْ تَفْعَلَ টা بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে مَا -এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ أَفَاَشُوْبُهُ : একে উহ্য করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছ যে, إِنْ شَرْطِيَه -এর জবাব উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاذْهَبُ : প্রশ্ন. أَذْهَبُ উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

উত্তর. কেননা এখানে أَخَالِفَ -এর সেলাহ إِلَى আনা হয়েছে। অথচ أَخَالِفَ -এর সেলাহ إِلَى আসে না; বরং عَنْ আসে। أَذْهَبُ উহ্য মেনে বলে দিয়েছেন যে, أَخَالِفَ -টা أَذْهَبُ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কাজেই إِلَى সেলাহ নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ ظِهْرِيًّا : এ শব্দের অর্থ হলো পিঠের পেছনে ফেলে রাখা। الظَّهْرِيُّ শব্দটি -এর দিকে নিসবত কৃত। আরবের এই অভ্যাস রয়েছে যে, যখন কোনো বস্তুর দিকে নিসবত করে তখন উচ্চারণে পরিবর্তন করে নেয়। কিন্তু তার উপর অন্য শব্দকে কিয়াস করা যায় না। কেননা এই পরিবর্তন কোনো নীতিমালা অনুপাতে হয়নি, বরং এটা غَيْر قِيَاسْ হয়েছে। যেমন بِصْرِيٌّ [. بَا বর্ণে যের সহকারে] বলে থাকেন। অথচ কিয়াস হলো যবর সহকারে হওয়া। এই পদ্ধতিতেই ظِهْرِيٌّ শব্দটিও হয়েছে। অথচ কিয়াসের চাহিদা ছিল طَا . বর্ণে যবর হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়াইব (আ.) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরি ও শিরকি ছাড়া ওজনে-পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কমেবেশি করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও নাফরমানির উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আজাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল। وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا 'আর আমি মাদয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আ.)-কে প্রেরণ করেছি।' মাদয়ান আসলে একটি শহরের নাম। মাদায়ান ইবনে ইবরাহীম (আ.)-এর পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান مُعَانٌ 'মোয়ান' নামক স্থানে তা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু 'মাদয়ান' বলা হতো। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ "তিনি বললেন হে আমার জাতি, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শোয়াইব (আ.) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা তারা ছিল মুশরিক, গাছ-পালার পূজা করত। এজন্যই মাদয়ানবাসীকে 'আসহাবুল আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এহেন কুফরি ও শিরকির সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরি ও শিরকিই সকল পাপের মূল। যে জাতি এতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমেই তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কাজ-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরির ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোনো দখল থাকে না। কুরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এর প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরির সাথে সাথে তাদের বদআমলেরও দখল ছিল। এক. হযরত লূত (আ.)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরি ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়. হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কওম। যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার জন্য কুফরি ও মাপে কম দেওয়াকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ এটা এমন দুই কাজ যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। ওজন-পরিমাপে হেরফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন- اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভালো ও সচ্ছল দেখছি। তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মতো কোনো কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ

তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোনো সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আজাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আজাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আজাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আজাব হচ্ছে, তোমাদের সচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন "যখন কোনো জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি জনিত শাস্তিতে পতিত করেন।

-ওজন-পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) উদাত্ত আহ্বান জানালেন يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ "হে আমার জাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিস-পত্রে কম দিও না, আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ মানুষের পাওনা ঠিকমতো ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখো তোমাদের উপর কোনো আজাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।

হযরত শোয়াইব (আ.) সম্বন্ধে রাসূলে কারীম ﷺ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল-আম্বিয়া' বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মিতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল, তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলল اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ অর্থাৎ আপনার নামাজ কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার পূজা করে আসছে! আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শু'আয়ব (আ.) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামাজ ও নফল ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতিবাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো আপনার নামাজ কি আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে? [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক]

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোনো দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশি ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোনো বিধি -নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোনো কোনো অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কত বড় রূঢ় মন্তব্য করল! কিন্তু হযরত শু'আয়ব (আ.)-এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস-পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বোঝাতে লাগলেন يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا অর্থাৎ হে আমার জাতি! তোমরা বল তো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিজিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিজিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি বিবেচনা তথা নবুয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মতো অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন, مَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাইনা। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল। এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসিহত ও তাবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তাঁর কথায় শ্রোতাদের কোনো ফায়দা হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর বলেন إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ "আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বারবার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা-সাধনাও নিজ বাহু বলে নয়; বরং وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহর সাহায্যে করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুজু হই।"

নসিহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে সতর্ক করে বললেন وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ অর্থাৎ হে আমার কওম, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হূদ কিংবা সালেহ (আ.)-এর কওমের মতো বিপদ ডেকে আনবে না। আর হযরত লূত (আ.)-এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ কওমে লূতের উল্টিয়ে দেওয়া জনপদগুলো মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোনো ব্যাপার নয়। অতএব, তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল"আপনার গোষ্ঠি-জ্ঞাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরে হযরত শুআয়ব (আ.) তাদেরকে নসিহত করে বললেন, "তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কোনো কথা মানল না, তখন তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা এখন আজাবের অপেক্ষা করতে থাক।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শুআয়ব (আ.)-কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমিষে ধ্বংস হয়ে গেল।

আহকাম ও মাসায়েল : মাপে কম দেওয়া : আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসীদের ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেওয়াকে, আরবিতে যাকে "তাতফীক"বলা হয়। কুরআন করীমের وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে উম্মতের 'ইজমা' বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালিক (র.) তদীয় 'মুয়াত্তা' কিতাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে -পরিমাপে কম দেওয়ার কথা বলে আসলে বোঝানো হয়েছে কারো কোনো ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেওয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোনো বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোনো' কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোনো শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোনো নামাজি ব্যক্তি যদি নামাজের সুন্নতগুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে। [নাউযুবিল্লাহ মিনহু]

মাস'আসলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শুআয়ব (আ.) তাদেরকে এ কাজ হতেও নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনের ১৯ পারা, সূরা নমল, ৪৮ নং আয়াত تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, মাদায়ানবাসীরা দিনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো, যাকে কুরআনে কারীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) -এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলীফা দোররা মারা ও মস্তক মুণ্ডন করে শহর প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ দিলেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩٦. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ بُرْهَانٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ.

৯৬. আমি মূসাকে আমার নির্দেশাবলি ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রকাশ্য ও পরিষ্কার দলিলসহ প্রেরণ করেছিলাম। سُلْطَانٍ -এই স্থানে এটার অর্থ প্রমাণ, দলিল।

٩٧. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ج وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ سَدِيْدٍ.

৯৭. ফেরাউন ও তার দল-বলের নিকট। কিন্তু তারা ফেরাউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করল, আর ফেরাউনের কার্যকলাপ সাধু অর্থাৎ সঠিক ছিল না।

٩٨. يَقْدُمُ يَتَقَدَّمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَتَّبِعُوْنَهٗ كَمَا اتَّبَعُوْهُ فِى الدُّنْيَا فَاَوْرَدَهُمُ اَدْخَلَهُمُ النَّارَ ط وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ هِىَ.

৯৮. সে কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে। এরা দুনিয়াতে যেমন তার অনুসরণ করত তেমনি তখনও তার অনুসরণ করবে। সে অনন্তর তাদেরকে জাহান্নামে অবতরণ করাবে। প্রবেশ করাবে। কতই না নিকৃষ্ট অবতরণস্থলে অবতরণ! তা يَقْدُمُ-অর্থ এই স্থানে يَتَقَدَّمُ অগ্রে থাকবে।

٩٩. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ اَىِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَعْنَةً بِئْسَ الرِّفْدُ الْعَوْنُ الْمَرْفُوْدُ رِفْدُهُمْ

৯৯. এতে এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশপ্ত এবং কিয়ামতের দিনেও হবে অভিশপ্ত। কত নিকৃষ্ট সহযোগিতা, যা তারা লাভ করেছে। তাদের জন্য এই সাহায্য-সহযোগিতা কতই না মন্দ! اَلرِّفْدُ অর্থ সাহায্য।

١٠٠. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنْهَا اَىِ الْقُرٰى قَآئِمٌ هَلَكَ اَهْلُهٗ دُوْنَهٗ وَّمِنْهَا حَصِيْدٌ هَلَكَ بِاَهْلِهٖ فَلَا اَثَرَ لَهٗ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُوْدِ بِالْمَنَاجِلِ.

১০০. তা অর্থাৎ উল্লিখিত বিবরণসমূহ জনপদসমূহের কিছু সংবাদ হে মুহাম্মদ! যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করতেছি। এগুলোর মধ্যে জনপদ সমূহের মধ্যে কতক এখনও দণ্ডায়মান, বিদ্যমান কিন্তু তার অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আর কতক নির্মূল হয়েছে। কাস্তে দ্বারা কর্তিত শস্যের মতো অধিবাসীরাসহ বিধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কোনো চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই। ذٰلِكَ -এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। مِنْ اَنْۢبَآءِ -এটা خَبَرٌ বা বিধেয়।

١٠١. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ بِاِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَّلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ فَمَآ اَغْنَتْ دَفَعَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ط عَذَابُهٗ وَمَا زَادُوْهُمْ بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا غَيْرَ تَتْبِيْبٍ تَخْسِيْرٍ.

১০১. বিনা অপরাধে ধ্বংস করে আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং শিরক করত তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ অর্থাৎ তাঁর আজাব আসল তখন তারা আল্লাহ ব্যতীত যে সমস্ত ইলাহকে ডাকত অর্থাৎ উপাসনা করত তাদের সেই ইলাহগণ তাদের কোনো কাজে আসল না, তারা তাদের হতে আজাব প্রতিহত করল না। এই সমস্ত উপাসনা ধ্বংস ব্যতীত তাদের জন্য আর কিছুই বৃদ্ধি করল না। تَتْبِيْبٍ -অর্থ ধ্বংস, ক্ষতি।

Free @ www.eilm.weebly.com

١٠٢. وَكَذٰلِكَ مِثْلَ ذٰلِكَ الْاَخْذِ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى اُرِيْدَ اَهْلُهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ بِالذُّنُوْبِ اَىْ فَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِنْ اَخْذِهٖ شَىْءٌ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهٗ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ ﷺ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ (اَلْاٰيَةَ)

১০২. এরূপই এই ধরনের পাকড়াও করার মতো তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও হয় যখন তিনি জনপদসমূহকে অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন, যখন তারা পাপে লিপ্ত হয়ে সীমালঙ্ঘনকারীরূপে পরিগণিত হয়। তাঁর পাকড়াও হতে কোনো কিছুই আর তাদের বাঁচাতে পারে না। শায়খান অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) প্রমুখ্যাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা জালিমকে প্রথম অবকাশ দেন। পরে তাকে যখন পাকড়াও করেন তখন তাকে আর ছাড়েন না। অতঃপর রাসূল ﷺ তেলাওয়াত করলেন وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ

١٠٣. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْقِصَصِ لَاٰيَةً لَعِبْرَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ط ذٰلِكَ اَىْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ فِيْهِ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ يَشْهَدُهٗ جَمِيْعُ الْخَلَائِقِ

১০৩. নিশ্চয় এতে উল্লিখিত কাহিনীসমূহে নিদর্শন অর্থাৎ শিক্ষা বিদ্যমান যারা পরকালের শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য। তা অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঐদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। তা সেই দিন যেদিন সকলকেই হাজির করা হবে। সকল সৃষ্টি সেই দিন গিয়ে হাজির হবে। مَجْمُوْعٌ لَّهُ -এই স্থানে لَهُ [যার জন্য] শব্দটি فِيْهِ [যাতে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাফসীরে فِيْهِ উল্লেখ করা হয়েছে।

١٠٤. وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ لِوَقْتٍ مَعْلُوْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ

১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য তা স্থগিত রাখব।

١٠٥. يَوْمَ يَاْتِ ذٰلِكَ الْيَوْمُ لَا تَكَلَّمُ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ تَعَالٰى فَمِنْهُمْ اَىِ الْخَلْقِ شَقِىٌّ وَّ مِنْهُمْ سَعِيْدٌ كُتِبَ كُلُّ ذٰلِكَ فِى الْاَزَلِ

১০৫. যখন আসবে ঐ দিন তখন তাঁর অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ বাক্যালাপ করতে পারবে না; তাদের মধ্যে সৃষ্টির মধ্যে অনেকে হতভাগ্য এবং তাদের মধ্যে অনেক সৌভাগ্যশালী। আদিতেই এই সব কিছু তাদের জন্য লিখে রাখা হয়েছে। تَكَلَّمُ -এতে একটি ت উহ্য রয়েছে। মূলত ছিল تَتَكَلَّمُ।

١٠٦. فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فِىْ عِلْمِهٖ تَعَالٰى فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ صَوْتٌ شَدِيْدٌ وَّشَهِيْقٌ صَوْتٌ ضَعِيْفٌ

১০৬. অনন্তর যারা আল্লাহর জ্ঞানে হতভাগ্য তারা থাকবে জাহান্নামে। সেথায় তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। زَفِيْرٌ -ভীষণ চিৎকার। شَهِيْقٌ -দুর্বল আওয়াজ।

Free @www.e-ilmweebly.com

١٠٧. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اَىْ مُدَّةَ دَوَامِهِمَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا غَيْرَ مَا شَاۤءَ رَبُّكَ ط مِنَ الزِّيَادَةِ عَلٰى مُدَّتِهِمَا مِمَّا لَا مُنْتَهٰى لَهٗ وَالْمَعْنٰى خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ .

১০৭. সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, অর্থাৎ দুনিয়ায় এই উভয়ের যতদিন স্থায়িত্ব ছিল সেই মুদ্দত তারা থাকবে যদি না তোমার প্রভু অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ সীমাহীন সময়ের জন্য তিনি এই মুদ্দত বাড়াতে ইচ্ছা করেন। তখন চিরকালের জন্য তারা তাতে স্থায়ী হবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা করেন। اِلَّا -এটা এই স্থানে حَرْف اِسْتِثْنَاء হিসাবে নয়; বরং غَيْر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٠٨. وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا غَيْرَ مَا شَاۤءَ رَبُّكَ ط كَمَا تَقَدَّمَ وَدَلَّ عَلَيْهِ فِيْهِمْ قَوْلُهٗ عَطَاۤءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ مَقْطُوْعٍ وَمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّاوِيْلِ هُوَ الَّذِىْ ظَهَرَ لِىْ وَهُوَ خَالٍ عَنِ التَّكَلُّفِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ .

১০৮. এবং যারা ভাগ্যবান তারা জান্নাতে থাকবে; সেথায় তারা স্থায়ী হবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। পূর্ববর্তী আয়াতটিতে এটার যে অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে এই স্থানেও তদ্রূপ অর্থ হবে। এই স্থানের বেলায় পরবর্তী বাক্যটি উক্ত অর্থের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ। ইরশাদ হচ্ছে– এটা এক নিরবচ্ছিন্ন দান। এই আয়াতটির উল্লিখিত মর্মই আমার নিকট অধিক স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য। এটা تَكَلُّفْ বা কষ্ট কল্পনা হতে মুক্ত। আল্লাহ এটার মর্ম সম্পর্কে অবহিত। سُعِدُوْا -এটার س অক্ষরটি ফাতাহ ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পাঠ করা যায়। اِلَّا এটা এই স্থানে حَرْف اِسْتِثْنَاء হিসাবে নয়; বরং غَيْر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। غَيْرَ مَجْذُوْذٍ- অর্থ নিরবচ্ছিন্ন।

١٠٩. فَلَا تَكُ يَا مُحَمَّدُ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰۤؤُلَاۤءِ مِنَ الْاَصْنَامِ اِنَّا نُعَذِّبُهُمْ كَمَا عَذَّبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ وَهٰذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُهُمْ اَىْ كَعِبَادَتِهِمْ مِّنْ قَبْلُ وَقَدْ عَذَّبْنَاهُمْ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ مِثْلَهُمْ نَصِيْبَهُمْ حَظَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ اَىْ تَامًّا .

১০৯. সুতরাং হে মুহাম্মদ! তারা যাদের উপাসনা করে অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ তাদের সম্পর্কে সংশয়ে সন্দেহে থেকো না তাদের পূর্ববর্তীদের যেমন আমি শাস্তি প্রদান করেছি। তাদেরকেও নিশ্চয় শাস্তি প্রদান করব। এই বক্তব্যটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ। পূর্বে এদের পিতৃপুরুষরা যেমন উপাসনা করত তারাও তদ্রূপ উপাসনা করে তাদের ন্যায়ই এদের এই উপাসনা। আর তাদেরকেও আমি শাস্তি দান করেছি। আর নিশ্চয় আমি তাদের মতো এদেরকেও এদের প্রাপ্য অর্থাৎ আজাবের হিস্যা পুরোপুরি দিব কিছুমাত্র হ্রাস করা হবে না। অর্থাৎ পরিপূর্ণ হিস্যা তারা পাবে।

তাহকীক ও তারকীব

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ : اٰيَاتٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত। আর سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোজেজা সমূহ। [ফাতহুলকাদীর]

قَوْلُهُ الْمَرْفُوْدُ : এর অর্থ হলো -দান, পুরস্কার, সাহায্য, সহযোগিতা, সাহায্যকৃত। লা'নত বা ভর্ৎসনাকে বিদ্রূপভাবে مَرْفُوْد বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْوِرْدُ : এর অর্থ হলো অবতরণ স্থল, ঘাট।

قَوْلُهُ مِنْهَا : আল্লামা সুয়ূতী (র.) مِنْهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, حَصِيْدٌ -এর আতফ হয়েছে قَائِمٌ -এর উপর حَصِيْدٌ হলো خَبَر مُقَدَّم হলো مِنْهَا আর مُبْتَدَأ مُؤَخَّر

قَوْلُهُ حَصِيْدٌ : এটা فَعِيْلٌ ওযনে صِفَت مُشَبَّه -এর সীগাহ مَفْعُوْل অর্থে, অর্থ হলো কর্তিত ক্ষেত।

قَوْلُهُ يُفْلِتَهُ : এটা বাবে اِفْعَال হতে অর্থ হলো ছেড়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ فِيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে لَهُ -এর মধ্যে لَامْ টা فِيْ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ يَشْهَدُهُ : এর অর্থ হলো- يَشْهَدُ فِيْهِ

قَوْلُهُ غَيْرَ مَا شَاءَ رَبُّكَ : এর মধ্যে اِلَّا টা غَيْرَ অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন. اِلَّا কে غَيْرَ অর্থে নেওয়ার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত? এটা একটা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো- اِلَّا -এর মাধ্যমে যদি خُلُوْدٌ থেকে اِسْتِثْنَاء হয় যেমনটি কেউ কেউ করেছেন, তাহলে এটা কাফেরদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী না হওয়াকে বুঝাবে। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। আর যদি حُكْم اَصْلِيْ থেকে اِسْتِثْنَاء করা হয় যা হলো আল্লাহর বাণী فَفِى النَّارِ তখন তা হতে এটা এটা বুঝা যায় যে, কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর কোনো কোনো সময় জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে, অথচ এটাও বাস্তবতার পরিপন্থি।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, اِلَّا টা غَيْرَ অর্থে হয়েছে। আর এটা আরবদের সেই উক্তির মতো যে, عَلَىَّ اَلْفٌ اِلَّا اَلْفَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ অর্থাৎ আমার উপর অমুক ব্যক্তির এক হাজার রয়েছে পূর্বের দুই হাজারের সাথে অর্থাৎ এক হাজার দু হাজারের সাথে মিলে তিন হাজার। সে সময় আয়াতের অর্থ হবে–

اِنَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُدَّةَ دَوَامِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فِي الدُّنْيَا مَعَ الزِّيَادَةِ الَّتِىْ لَا اٰخِرَ لَهَا عَلٰى مُدَّةِ بَقَاءِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلٰى مُدَّتِهِمَا مِمَّا لَا مُنْتَهٰى لَهُ : অর্থাৎ পূর্বে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটাই এখানে হবে।

قَوْلُهُ اِنَّا نُعَذِّبُهُمْ الخ : এটি সেই প্রশ্নের উত্তর যে, شَكّ টা حُكْم -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। আর مِرْيَة এটা হুকুম নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, اَىْ لَا تَكُ اَىْ مُحَمَّدُ فِىْ مِرْيَةٍ اِنَّا نُعَذِّبُهُمْ الخ

قَوْلُهُ كَعِبَادَتِهِمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا يَعْبُدُوْنَ -এর মধ্যে مَا টা হলো مَصْدَرِيَة অর্থাৎ এ সকল লোকেরা তাদের পূর্ব পুরুষদের ন্যায় উপাসনা করে।

قَوْلُهُ تَامًّا : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, কোনো সময় كُلّ বলে بَعْض উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে বিষয়টি এরূপ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ : আর আমি মূসাকে প্রেরণ করি আমার নিদর্শন সমূহ এবং প্রকাশ্য সনদসহ। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.) -এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। এ পর্যায়ের এটি হলো সপ্তম ঘটনা এবং এ সূরায় বর্ণিত সর্বশেষ ঘটনা। এ ঘটনার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মোকাবিলায় কোনো রাজশক্তি, ধন-শক্তি, জনশক্তি এককথায় কোনো কিছুই কাজে আসেনা। এ সত্য উপলব্ধি করার জন্য আলোচ্য ঘটনার অবতারণা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى : আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে অনেক নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দিয়ে ফেরাউন এবং তার দলবলের নিকট প্রেরণ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে নিদর্শন বলতে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর মোজেজা সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা হলো তাঁর লাঠি। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সম্ভবত হযরত মূসা (আ.) -এর লাঠির এ মোজেজাকেই سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা ফেরাউনের সম্মুখে হযরত মূসা (আ.) তাওহীদের যে দলিল উপস্থিত করেছেন, তা উদ্দেশ্য হতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ -এর ব্যাখ্যা করেছেন, এর অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর প্রাধান্য। কেননা হযরত মূসা (আ.) একা ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ছিল ফেরাউন ও তার বিরাট সৈন্য বাহিনী। হযরত মূসা (আ.)-কে তারা হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করেছেন এবং হযরত মূসা (আ.)-কে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন। ফেরাউন এবং তার দলবলকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে চিরতরে ধ্বংস করেছেন।

قَوْلُهُ فَاتَّبَعُوْا أَمْرَ فِرْعَوْنَ : হযরত মূসা (আ.) -এর মোজেজা সত্ত্বেও ফেরাউন তার দলবল তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি; বরং তারা ফেরাউনের অনুসরণই করে অথচ ফেরাউনের মত এবং তার বিধি-নিষেধ সঠিক ছিলনা। তার নাফরমানি চরম পর্যায়ে পৌছেছিল। এ আয়াতে ফেরাউনের দলবলের পথভ্রষ্টতার এবং মূর্খতার কথা বলা হয়েছে। ফেরাউন তাদের মতো একজন সাধারণ মানুষই ছিল। অন্যায় অনাচারে, কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল। এমনকি, সে খোদায়ী দাবি করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার মূর্খ সম্প্রদায় তারই অনুসরণ করতো।

পক্ষান্তরে, হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী, সত্যের আহ্বায়ক, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ছিলেন, সর্বক্ষণ সাধনারত, আল্লাহ তাঁকে অনেক বিস্ময়কর মোজেজা দান করেছেন, তাঁর মোকাবিলায় দুরাত্মা ফেরাউনের সকল চক্রান্ত, সকল শক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তবুও দুর্ভাগা ফেরাউন সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ করেনি।

قَوْلُهُ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ : সে তাদেরকে দোজখে পৌছিয়ে দেবে এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে, কাফেরদেরকে দোজখে পৌছাবার ব্যাপারে যে, ঘোষণা রয়েছে, তার বর্ণনার জন্যে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা অতীত কাল বোঝায়। [অর্থাৎ সে তাদেরকে দোজখে পৌছে দিয়েছে।]

তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু দোজখের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত এবং নিশ্চিত, তাই যে, তারা দোজখে পৌছে গেছে, এজন্যে অতীত অর্থের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ : আর দোজখ অত্যন্ত মন্দ এবং নিকৃষ্ট স্থান যেখানে তারা পৌছেছে, সেখানে ঠাণ্ডা পানির স্থলে তাঁদেরকে জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন পূর্ববর্তী একটি আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন। وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ "আর ফেরাউনের মত সঠিক ছিল একটি দাবি। আর আলোচ্য আয়াত হলো এ দাবির দলিল। এ মর্মে যে, ফেরাউনের কুফরি নাফরমানির কারণেই সে অভিশপ্ত এবং ধ্বংস হয়েছে। আর তার এ অন্যায়ের কারণেই সে তার দলবলসহ দোজখে যাবে।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তার নেতৃত্বই ছিল ধ্বংসাত্মক এবং বিপজ্জনক। এজন্যে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন সে কাজই শুভ এবং পছন্দনীয় যার পরিণাম শুভ হয়, সে সম্পর্কে رَشِيْدٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. - পৃ. -৬

ইমাম তাবারী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, اَلْوِرْدُ শব্দটি পবিত্র কুরআনের চার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. সূরায়ে হুদে بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ

২. সূরায়ে মারয়ামে وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

৩. সূরায়ে আম্বিয়ায় اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

৪. পুনরায় সূরায়ে মারয়ামে وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

اَلْوِرْدُ শব্দটির অর্থ হলো প্রবেশ করা। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. -৬, পৃ. -৮৬]

قَوْلُهُ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ : ফেরাউন ও তার দলবলের উপর দুনিয়াতেও লানত এবং আখেরাতেও লানত, দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং মুমিনগণ এই জালেম ফেরাউন এবং তার দলবলের উপর লানত দিয়েছেন, ঠিক এমনিভাবে আখেরাতেও তাদের প্রতি লানত দেওয়া হবে। তাদের অন্যায়, অনাচার, কুফরি এবং নাফরমানির কারণে আল্লাহ পাকের লানত এবং ফেরেশতাদের লানত দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে হতে থাকবে, তারা চির অভিশপ্ত, এ লানত থেকে তাদের রেহাই নেই কোনোদিনও।

قَوْلُهُ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ : "অত্যন্ত মন্দ পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।"

رِفْد শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. সাহায্য, দুই. পুরস্কার। বিখ্যাত আরবি অভিধান গ্রন্থ, কামূসে, আলোচ্য শব্দটির এ দু'টি অর্থই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অতএব, বাক্যটির অর্থ "হলো অত্যন্ত মন্দ পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে"। আর এ কথার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়। ফেরাউন তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য বাহিনী নিয়ে যেভাবে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে, তা সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটি বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা, আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে কঠিন কঠোর শাস্তি।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ : **প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা :** [হে রাসূল!] এ হলো উক্ত জনপদ গুলোর কিছু ঘটনা, যা আপনার নিকট বর্ণনা করছি।

এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর নবীদের সাথে শত্রুতা করেছে, তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায় বর্ণিত ঘটনাবলিতে। ইতিপূর্বে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে কাফেররা যে আচরণ করেছে তার ভয়ঙ্কর পরিণাম লক্ষ্য করা যায় আলোচ্য আয়াত সমূহে। এর দ্বারা একদিকে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এই মর্মে যে, [হে রাসূল!] মক্কাবাসী কাফেররা আপনার সাথে যে আচরণ করেছে তা নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গেও এমনি কষ্টদায়ক ব্যবহার করা হয়েছে।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : দ্বিতীয়ত : এর দ্বারা এই উম্মতের কাফেরদের সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সাথে তাদের অন্যায় আচরণ পরিহার না করে তবে তাদের পরিণামও হবে ভয়াবহ।

قَوْلُهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ : হাশরের ময়দানে হতভাগ্য এবং ভাগ্যবান উভয় প্রকার লোকই থাকবে। যার জন্যে বদনসিবী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে বদনসিবই হবে। আর যার জন্যে সৌভাগ্য লেখা হয়েছে, সে ভাগ্যবানই হবে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি একটি জানাযার সঙ্গে বাকীতে [মদীনা শরীফের কবরস্থান] পৌঁছি। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ [একটি ছড়ি হাতে করে] আগমন করেন। তিনি সেখানে উপবিষ্ট হলেন। কিছুক্ষণ ছড়ি দ্বারা মাটিতে দাগ দিতে থাকেন, এরপর তিনি ইরশাদ করলেন, এমন কোনো প্রাণ নেই যার নাম জান্নাত বা দোজখে লিপিবদ্ধ রয়নি, তার ভাগ্যবান বা হতভাগা হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ রয়নি। একথা শ্রবণ করে এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! তাহলে আমরা তকদীরের উপর ভরসা রাখি না কেন এবং আমল বর্জন করিনা কেন? তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা আমল করে যাও, প্রত্যেককেই তার তকদীর অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেওয়া হয়। যে হতভাগা হবে, তাকে সে অনুযায়ী আমলের তৌফিক দেওয়া হয়। যে ভাগ্যবান হবে তাকে ভাগ্যবানের আমলের তৌফিক দেওয়া হবে। এরপর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى তেলাওয়াত করেন।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. -৬, পৃ. -৮৯; বুখারী, মুসলিম]

قَوْلُهُ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ : অতএব, যারা হতভাগা হবে তারা দোজখে যাবে, সেখানে তারা চিৎকার এবং আর্তনাদ করতে থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, زَفِيْر শব্দটির অর্থ হলো অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করা। আর شَهِيْق অর্থ হলো নিম্নস্বরে চিৎকার।

তাফসীরকার যাহহাক এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, গাধার চিৎকারের প্রাথমিক অবস্থাকে زَفِيْر বলা হয়। আর এ আওয়াজের শেষ অবস্থাকে شَهِيْق বলা হয়। আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামূসেও আলোচ্য দু'টি শব্দের এ ব্যাখ্যাই লেখা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاۤءَ رَبُّكَ : দোজখীরা তাতে চিরদিন থাকবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আসমান জমিন দুনিয়াতে রয়েছে আর কিয়ামতের পূর্বে আসমান জমিন ধ্বংস হয়ে যাবে। [তবে যতদিন আসমান জমিন থাকবে] এর তাৎপর্য কি?

তাফসীরকার এর দু'টি জবাব দিয়েছেন। এক. যাহহাক (র.) বলেছেন, জান্নাত এবং দোজখেরও আসমান জমিন থাকবে। মূলত যা মাথার উপর থাকে তাইতো আসমান। আর যার উপর মানুষ পা রাখে তারই নাম জমিন। আর একথা অনস্বীকার্য যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে। তা কোনো স্থানে অবশ্যই হবে এবং পায়ের নীচেও কোনো জিনিস থাকবে। আর মাথার উপরও কিছু থাকবে।

দুই. অর্থাৎ যতদিন আসমান জমিন টিকে থাকবে। আরবের লোকেরা অনন্তকাল বুঝানোর জন্যে এ বাক্যটি ব্যবহার করে। আলোচ্য আয়াতেও বাক্যটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

আর যদি এর দ্বারা আখেরাতের আসমান জমিন উদ্দেশ্য করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা আরো জোরদার হয়। কেননা আখেরাতের আসমান জমিন পৃথিবীর আসমান জমিন থেকে হবে স্বতন্ত্র।

ভাগ্যবান ও হতভাগ্যদের কথা : আলোচ্য আয়াতসমূহ দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, পৃথিবীতে সব যুগেই এবং সকল দেশেই দু'দল লোক বাস করে। একদলকে পবিত্র কুরআন ভাগ্যবান বলেছে, অন্য দলকে হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়েছে। উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে, যার সারমর্ম হলো ভাগ্যবান হলো সে সব লোক যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং বিশ্বাস করে নবী রাসূলগণের প্রতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, অনুরক্তি রাখে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান না আনে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়ে জীবন অতিবাহিত করে তারাই হতভাগা বা বদনসীব। উভয় দলের পরিণতি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এক দল চির সুখী হবে আর একদল হবে চির দুঃখী। ইমাম বলখী (র.) উভয় দলের পাঁচটি করে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন

ভাগ্যবানদের বৈশিষ্ট্য : ভাগ্যবানদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য :

১. তাদের অন্তর বিনম্র হয়।
২. আল্লাহর ভয়ে তারা কাঁদতে থাকে।
৩. দুনিয়ার জীবনে দীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা রাখে না।
৪. দুনিয়ার প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয়না।
৫. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তারা লজ্জিত থাকে।

হতভাগ্যদের পাঁচটি আলামত :

১. তাদের অন্তর হয় কঠিন কঠোর।
২. নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়না।
৩. দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে অধিকতর।
৪. তারা সুদীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।
৫. তারা নির্লজ্জ হয়। -[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. -৩. পৃ. -৫৯৪]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١٠. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط بِالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ كَالْقُرْاٰنِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاخِيْرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَاِنَّهُمْ اَىِ الْمُكَذِّبِيْنَ بِهٖ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ مُوْقِعُ الرِّيْبَةِ.

١١١. وَاِنَّ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كُلًّا اَىْ كُلُّ الْخَلَائِقِ لَمَّا مَا زَائِدَةٌ وَاللَّامُ مُوْطِئَةٌ لِقَسَمٍ مُقَدَّرٍ اَوْ فَارِقَةٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ لَمَّا بِمَعْنٰى اِلَّا فَاِنْ نَافِيَةٌ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ط اَىْ جَزَاءَهَا اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ عَالِمٌ بِبَوَاطِنِهٖ كَظَوَاهِرِهٖ.

١١٢. فَاسْتَقِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِاَمْرِ رَبِّكَ وَالدُّعَاءِ اِلَيْهِ كَمَآ اُمِرْتَ وَلْيَسْتَقِمْ مَنْ تَابَ اٰمَنَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا تَجَاوَزُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ.

অনুবাদ:

১১০. আমি মূসাকে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত দিয়েছিলাম; অতঃপর এতে আল কুরআনের মতোই স্বীকার করা না করার বিষয়ে মতভেদ ঘটে। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সকল সৃষ্টির হিসাব-কিতাব ও প্রতিদান প্রদান বিলম্বিত করা সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতেছে দুনিয়াতেই সেই বিষয়ের মীমাংসা করে দেওয়া হতো। অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা অবশ্যই এটার সম্বন্ধে সংশয়কর সন্দেহে বিদ্যমান। مُرِيْبٍ -অর্থ সংশয়কর।

১১১. নিশ্চয় প্রত্যেককে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রত্যেককে তোমার প্রতিপালক তাদের কাজ অর্থাৎ কাজের বিনিময় পুরোপুরি দিবেন। তারা যা করে তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত। অর্থাৎ বাহ্যিক দিকের মতো তার আভ্যন্তরীণ দিক সম্পর্কেও তিনি অবহিত। اِنَّ-এটার ن অক্ষরটি এই স্থানে তাশদীদ ও তাখফীক [তাশদীদ ব্যতীত] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। لَمَّا -এটার مَا -টি এই স্থানে زَائِدَة বা অতিরিক্ত। আর ل-টি হলো قَسَم مُقَدَّرٌ বা উহ্য কসমের অর্থদানকারী শব্দ। কিংবা এটা না বোধক اِنْ ও তাকীদবাচক اِنَّ-এর মধ্যে فَارِقَة বা পার্থক্যকারীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অপর এক কেরাতে م -এ তাশদীদসহ لَمَّا রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটা اِلَّا অর্থে ব্যবহৃত বলে এবং উল্লিখিত اِنْ শব্দটি نَافِيَة বা নাবোধক বলে গণ্য হবে।

১১২. সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর নির্দেশ মতো কাজে ও তাঁর প্রতি দোয়া যেভাবে আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে স্থির থাকো। আর তোমার সাথে যারা তওবা করেছে অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তারাও যেন তাতে স্থির থাকে। এবং অবাধ্য হয়োনা, আল্লাহর সীমাসমূহ লঙ্ঘন করো না। তোমরা যা কর তিনি নিশ্চয় তা দেখেন অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় প্রদান করবেন।

١١٣. وَلَا تَرْكَنُوْآ تَمِيْلُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِمَوَادَّةٍ اَوْ مُدَاهَنَةٍ اَوْ رِضًى بِاَعْمَالِهِمْ فَتَمَسَّكُمُ تُصِيْبَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ زَائِدَةٌ اَوْلِيَآءَ يَحْفَظُوْنَكَ مِنْهُ ثُمَّ لَا تُبْصَرُوْنَ تُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِهٖ ـ

১১৩. যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করত বা শিথিলতা প্রদর্শন করত বা তাদের কার্যকলাপে সন্তুষ্টি প্রকাশ করত ঝুঁকে পড়িও না। অনুরক্ত হয়ে যেয়োনা। পড়লে, অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে তা তোমাদের শরীরে লাগবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না, যে তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবে। অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না, অর্থাৎ তোমাদের হতে তার আজাব প্রতিহত করা হবে না। مِنْ اَوْلِيَاءَ -এই স্থানে مِنْ -টি زَائِدَه বা অতিরিক্ত।

١١٤. وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اَىِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَزُلَفًا جَمْعُ زُلْفَةٍ اَىْ طَائِفَةٍ مِّنَ الَّيْلِ اَىِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط الذُّنُوْبَ الصَّغَائِرَ نَزَلَتْ فِيْمَنْ قَبَّلَ اَجْنَبِيَّةً فَاَخْبَرَهٗ ﷺ فَقَالَ اَلِىْ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِىْ كُلِّهِمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ عِظَةٌ لِلْمُتَّعِظِيْنَ ـ

১১৪. আর তোমরা সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্ত ভাগে ভোরে এবং বিকালে অর্থাৎ ফজর, জোহর ও আসর এবং রজনীর একাংশে অর্থাৎ মাগরিব ও এশা। নিশ্চয় সৎকর্ম যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অসৎকর্ম অর্থাৎ ছোট পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়। এটা স্মরণকারীদের জন্য একটি স্মরণিকা। অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। শায়খান অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো এক অপরিচিতা মহিলাকে চুম্বন করেছিল। সে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে এই ঘটনাটি বিবৃত করে। তখন এই আয়াত নাজিল হয়। ঐ ব্যক্তি তখন বলল, এটা কি কেবল আমার জন্যই? রাসূল ﷺ বললেন, এটা আমার উম্মতের সকলের জন্য। زُلَفًا-এটা زُلْفَةٌ-এর বহুবচন ; অর্থ এক অংশ।

١١٥. وَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى اَذٰى قَوْمِكَ اَوْ عَلَى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ ـ

১১৫. হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের সামনে বা সালাত পালনের ক্ষেত্রে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ বন্দেগী পালনে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে সৎকর্মশীলদের শ্রম-ফল নষ্ট করেন না।

١١٦. فَلَوْلَا فَهَلَّا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ اَصْحَابُ دِيْنٍ وَفَضْلٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ الْمُرَادُ بِهِ النَّفْىُ اَىْ مَا كَانَ فِيْهِمْ ذٰلِكَ ـ اِلَّا لٰكِنْ قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج نُهُوْا فَنَجَوْا وَمِنْ لِلْبَيَانِ

১১৬. তোমাদের পূর্বযুগে অতীত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে অল্প কতক জনই সজ্জন ছিল যাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করত। তারা এ ধরনের নিষেধ করত বলে রক্ষা পেয়েছিল। فَلَوْلَا -এটা এই স্থানে فَهَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা এই স্থানে না বোধক; অর্থ তাদের মধ্যে উক্তরূপ [সজ্জন] ছিল না কিন্তু মাত্র কতকজন। اُولُوْ بَقِيَّةٍ-অর্থ দীনদার ও মর্যাদার অধিকারীগণ, সজ্জন। اِلَّا-এটা এই স্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِمَّنْ-এটার مِنْ টি بَيَانِيَة বা বিবরণমূলক

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالْفَسَادِ اَوْ تَرْكِ النَّهْيِ مَآ اُتْرِفُوْا نُعِمُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ	বিপর্যয় ঘটিয়ে ও নিষেধ করা বর্জন করে যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল তারা যাতে স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান ভোগ-বিলাস বিদ্যমান তারই অনুসরণ করত। আর তারা ছিল অপরাধী
١١٧. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ مِنْهُ لَهَا وَاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ مُؤْمِنُوْنَ	১১৭. আল্লাহর নিজের তরফ হতে অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস তোমার প্রতিপালকের কাজ নয় যখন হয় তার অধিবাসীরা শুদ্ধাচারী অর্থাৎ বিশ্বাসী।
١١٨. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَهْلَ دِيْنٍ وَاحِدٍ وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ فِي الدِّيْنِ	১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করতেন। অর্থাৎ একই ধর্মের অনুসারী করতেন। কিন্তু ধর্মের বিষয়ে তারা মতভেদ করতে থাকবেই।
١١٩. اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط اَرَادَ لَهُمُ الْخَيْرَ فَلَا يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط اَىْ اَهْلَ الْاِخْتِلَافِ لَهُ وَاَهْلَ الرَّحْمَةِ لَهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَهِيَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الْجِنِّ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ	১১৯. তবে যাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করবেন অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে তিনি শুভতার ইচ্ছা করেছেন তারা এই সম্পর্কে মতভেদ করবেন না। আর তিনি তাদেরকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ মতভেদকারীদেরকে মতভেদ করার জন্য আর দয়া পাওয়ার অধিকারীদের দয়া লাভের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রতিপালকের কথা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আর তা হলো আমি জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।
١٢٠. وَكُلًّا نَصْبٌ بِنَقُصُّ وَتَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ اَىْ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا بَدَلٌ مِنْ كُلًّا نُثَبِّتُ نُطَمْئِنُ بِهِ فُؤَادَكَ قَلْبَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْاَنْبَاءِ اَوِ الْاٰيَاتِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاِنْتِفَاعِهِمْ بِهَا فِي الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ	১২০. যতটুকু প্রয়োজন সেই অনুসারে রাসূলদের সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করতেছি যা দ্বারা আমি তোমার চিত্ত দৃঢ় করি, প্রশান্ত ও সুস্থির করি। এতে অর্থাৎ এই বৃত্তান্ত ও নিদর্শনের মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য আর মুমিনদের জন্য রয়েছে উপদেশ ও শিক্ষা। যেহেতু এটা দ্বারা মু'মিনরাই বিশেষ করে উপকৃত হয়; পক্ষান্তরে কাফেরগণ তদ্রূপ নয়; সেহেতু এই স্থানে বিশেষ করে তাদেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। نَقُصُّ-كُلًّا-এটা ক্রিয়ার মাধ্যমে এই স্থানে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এটার تَنْوِيْن [তানবীন]-টি مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল كُلَّ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ যতটুকু প্রয়োজন তার সকল কিছু। مَا نُثَبِّتُ-এই স্থানে مَا-টি উপরোল্লিখিত كُلًّا-এর بَدَل রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। فُؤَادَكَ : তোমার হৃদয়, চিত্ত।
١٢١. وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنَّا عٰمِلُوْنَ عَلٰى حَالَتِنَا تَهْدِيْدٌ لَهُمْ	১২১. যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বল, তোমরা তোমাদের স্থানে অর্থাৎ তোমাদের অবস্থায় কাজ কর। আমরাও আমাদের অবস্থায় কাজ করতেছি। এই আয়াতটি তাদের প্রতি হুমকিমূলক।

١٢٢. وَانْتَظِرُوْا ج عَاقِبَةَ اَمْرِكُمْ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ذٰلِكَ

১২২. এবং তোমরা তোমাদের পরিণামের অপেক্ষা কর আমরাও তার অপেক্ষা করতেছি।

١٢٣. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَىْ عِلْمِ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ يَعُوْدُ وَلِلْمَفْعُوْلِ يُرَدُّ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَيَنْتَقِمُ مِمَّنْ عَصٰى فَاعْبُدْهُ وَحِّدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط ثِقْ بِهٖ فَاِنَّهٗ كَافِيْكَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ وَاِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِوَقْتِهِمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ

১২৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ অর্থাৎ এই গুলিতে যা অদৃশ্য সেইসব কিছুর জ্ঞান আল্লাহরই তাঁরই নিকট সকল বিষয় প্রত্যানীত হবে। অনন্তর যারা অবাধ্যতা করত তাদের নিকট হতে তিনি বদলা নিবেন। সুতারং তাঁর ইবাদত কর, তাঁকে এক বলে বিশ্বাস কর এবং তাঁর উপরই নির্ভর কর. ভরসা রাখ কারণ তিনিই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন। নির্ধারিত সময়ের জন্য তিনি তাদের [শাস্তি] স্থগিত করে রেখেছেন মাত্র। يُرْجَعُ-এটা بِنَاءً لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যরূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, ফিরে আসবে। আর بِنَاءً لِلْمَفْعُوْلِ অর্থাৎ কর্মবাচ্যরূপেও পঠিত রয়েছে। তখন অর্থ হবে প্রত্যানীত হবে। يَعْمَلُوْنَ-এই ক্রিয়াটি ت সহ অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন রূপেও পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَاِنَّ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كُلًّا اَىْ كُلَّ الْخَلَائِقِ لَمَّا : এখানে اِنَّ-এবং لَمَّا -এর মধ্যে সর্বমোট চারটি কেরাত রয়েছে।

১. اِنْ এবং لَمَا উভয়টি مُخَفَّفٌ হবে।
২. اِنَّ এবং لَمَّا উভয়টি مُشَدَّدٌ হবে।
৩. اِنَّ টা مُخَفَّفَة আর لَمَّا টা مُشَدَّدَه হবে।
৪. اِنَّ টা مُشَدَّدَه আর لَمَا টা مُخَفَّفَة হবে।

আর এই চারটি কেরাতই মুতাওয়াতির। এই চারটি কেরাতেই كُلًّا টা اِنَّ-এর اِسْم হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর لَيُوَفِّيَنَّهُمْ الخ জুমলা হয়ে اِنَّ-এর হবে خَبَرٌ-এর جُمْلَه قَسَمِيَّه তথা لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ আর لَمَّا টা مُشَدَّدْ হওয়ার সুরতে জুমলা হয়ে اِنَّ-এর খবর হবে।

قَوْلُهُ الْخَلَائِق : এখানে خَلَائِق শব্দটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন كُلّ -এর তানভীনটা مُضَاف اِلَيْه-এর পরিবর্তে হয়েছে।

قَوْلُهٗ مَا زَائِدَة : لَمَا টা مُخَفَّفَه হওয়ার সুরতে مَا টা অতিরিক্ত। যদি مَازَائِدَه -কে উহ্য করে দেওয়া হয় তবে এ শব্দের উপর দুই لَام অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক হবে। যা কঠিন্যতার কারণ হবে। আর উহ্য ইবারত হবে لَلَيُوَفِّيَنَّهُمْ

قَوْلُهٗ وَاِلَّا لَامُ مُوَطِّئَةٌ لِقَسَمٍ مُقَدَّرٍ : অর্থাৎ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ-এর মধ্যে لَامْটা قَسَم উহ্য হওয়ার উপর বুঝাবে। অর্থাৎ এ কথাকে বুঝাবে যে, قَسَم উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ اَوْ فَارِقَة : অর্থাৎ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ-এর لَامْ টা হলো فَارِقَه-এর মাধ্যমে لَيُوَفِّيَنَّهُمْ-এর-لَامْ-এর ব্যাপারে দ্বিতীয় মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। لَام فَارِقَة-এর অর্থ হলো اِنْ مُخَفَّفَة এবং اِنْ نَافِيَه -এর মাঝে পার্থক্যকারী। অর্থাৎ যদি خَبَر-এর উপর لَامْ প্রবেশ করে তবে এর দ্বারা জানা যাবে যে, এটা اِنْ مُخَفَّفَة عَنِ الْمُثَقَّلَة হয়েছে।

সতর্কীকরণ : এটা স্মরণযোগ্য যে, لَام فَارِقَه টা اِنْ مُخَفَّفَة-এর خَبَرْ-এর উপর সেই সময় প্রবেশ করে যখন اِنْ مُخَفَّفَه কে আমল করা হতে বিরত রাখা- হয়। অর্থাৎ [اِهْمَال-এর সুরতে] যেমন اِنْ زَيْدٌ لَقَائِمٌ আর যদি اِنْ زَيْدًا لَقَائِمٌ পড়ে তবে

اَلْتِبَاسُ [মিলে যাওয়ার ভয়] না হওয়ার কারণে لَامِ فَارِقَه -এর প্রয়োজন হবে না। আয়াতে اِنَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ -এর মধ্যে যেহেতু اِنْ টা عَامِلَه হয়েছে। কাজেই এখানে لَامِ فَارِقَه বলা ঠিক হবে না। কেননা اِنْ نَافِيَه এবং مُخَفَّفَة -এর মধ্যে সে সময়ই اَلْتِبَاسُ হয় যখন তাকে আমল করা থেকে বিরত রাখা হয়। আবার কেউ কেউ উল্লিখিত ইবারতের এই অর্থও করেছেন যে, لَامِ موطىه -এর সম্পর্ক اِنَّ مُشَدَّدَه -এর সুরতে, আর فَارِقَة -এর সম্পর্ক مُخَفَّفَة-এর সাথে হয়েছে।

قَوْلُهُ كُلًّا نُصِبَ بِنَقْصٍ : অর্থাৎ كُلًّا-এর পূর্বে نَقُصُّ উহ্য রয়েছে। যা كُلًّا কে نَصَب দানকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদে হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এক বিশেষ বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হিকমত, আহকাম ও হেদায়েতও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলি হতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّحَصِيْدٌ অর্থাৎ এটা পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোনো কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোনো কোনো জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোনো চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের প্রতি কোনো জুলুম করিনি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া হাতে তৈরি মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে, যার ফলে আল্লাহর আজাব যখন নেমে এলো, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বুদেরা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জনপদবাসীকে আজাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকড়াও করেন তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোনো গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য ইরশাদ করেন যে, এসব ঘটনার মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলি রয়েছে, যারা পরকালের আজাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানব জাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না।

অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে পুনরায় ইরশাদ করেছেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ আপনি দীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরি হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবেন না। কেননা তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন।

ইস্তিকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল : 'ইস্তিকামতে'র আসল অর্থ হচ্ছে, কোনো দিকে একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুত এটা কোনো সহজ কাজ নয়। কোনো লৌহদণ্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়ত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোনো প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোনো সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্ববাস্থায় ইস্তিকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ইস্তিকামত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানেবামে ঝুঁকে পড়া ইস্তিকামতের পরিপন্থি।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তিকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকাইদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তিকামত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফরি ও শিরকি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তা'আলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভালো হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রাসূলগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা। তেমনি কোনো রাসূলকে আল্লাহর গুণাবলি ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেওয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য কুরআনে আযীম ও রাসূলে কারীম ﷺ যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনোরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তিকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে। অনুরূপভাবে এর মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোনো বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করছি। অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য-নতুন সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোনো কার্য সে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কিনা? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনে করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলোকে রাসূলে কারীম ﷺ বাস্তবে শরিয়ত করে একটি সুষ্ঠু-সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্র মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। এটা হতে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তিকামতের তাফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন, যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।" তিনি বললেন قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তিকামত অবলম্বন কর। −[মুসলিম শরীফ ও তাফসীরে কুরতুবী]

উসমান ইবনে হাযের আযদী বলেন একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সমীপে উপস্থি হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ اِتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ অর্থাৎ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ও ইস্তিকামত অবলম্বন কর, হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেয়ো না। −[তাফসীরে দারেমী ও কুরতুবী]

এ দুনিয়ায় ইস্তিকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কাজ। এজন্যই বুযুর্গানে দীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তিকামতের মর্যাদা উর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তিকামত অবলম্বন করে রয়েছে, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "পূর্ণ কুরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়েও কষ্টকর কোনো হুকুম রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর নাজিল হয়নি।" তিনি আরো বলেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাড়ি মোবারকের কয়েক গাছি পাক ধরেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আজাবের ঘটনাবলিও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'ইস্তিকামতের' নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের কারণ।

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ আলী সিররী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জিয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বললেন 'হ্যা'। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আ.)-গণের কাহিনী ও তাঁদের কওমসমূহের উপর আজাবের ঘটনাবলি কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন না'। বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ "ইস্তিকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে" এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

একথা স্পষ্ট যে, রাসূলে কারীম ﷺ পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তবে নমুনারূপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তিকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ ত'আলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং كَمَا أُمِرْتَ "যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রাসূলগণের অন্তরে অপরিসীম আল্লাহভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজনা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তিকামতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ইস্তিকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কিনা?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ইস্তিকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা আল্লাহর ফজলে তা পুরো মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াত সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তিকামতের আদেশ দানের পর বলেন, وَلَا تَطْغَوْا "সীমালঙ্ঘন করো না। এটা طُغْيَانٌ শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয়নি; বরং এর নিতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফ্যাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ "ঐ সব পাপিষ্ঠের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। "لَا تَرْكَنُوا" শব্দের মূল হচ্ছে رُكُونٌ যার অর্থ "কোনো দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা। "সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ কি এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোনো বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটির উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রেও সঠিক।

'পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না' এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (র.) বলেন, "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামতো চলবে না। "হযরত ইবনে জুরাইয বলেন, "পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না" [কুরতুবী] 'সুদ্দী' (র.) বলেন, "তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।" 'ইকরামা (র.) বলেন– "তাদের সংসর্গে থাকবে না।" কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, "বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাক চাল চলন তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।"

কাযী বায়যাবী (র.) আরো বলেন, পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্কই শুধু নিষেধ করা হয়নি; বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (র) বলেন– সমগ্র জগতে ঐ আলেমই আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়, যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।– [তাফসীরে মাযহারী] বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফের, মুশরিক, বিদ'আতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে মানুষের ভালো-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশত অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েজ আছে।

হযরত হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ দীনকে দু'টি ل হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক لَا تَطْغَوْا সীমালঙ্ঘন করবে না, দ্বিতীয় لَا تَرْكَنُوا পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দীনদারির সার সংক্ষেপ।

Free @ www.eilm.weebly.com

রাসূলে পাক ﷺ -এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত : সূরা হূদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলি বর্ণনা করার পর নবী করীম ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কুরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ "আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।" [১১২ নং আয়াত] ১১৪ নং আয়াত وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ 'আপনি নামাজ কায়েম রাখুন।' ১১৫ তম আয়াত وَاصْبِرْ "আপনি ধৈর্য ধারণ করুন" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২ তম আয়াতে وَلَا تَطْغَوْا 'আর তোমরা সীমলঙ্ঘন করবে না", ১১৩ নং আয়াতে وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا " এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না" বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কুরআন মজীদে সাধারণত একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। এর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা প্রকশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কার্য আছে, রাসূলে পাক ﷺ নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে এমন স্বভাব প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোনো নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েজ ও হালাল ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল; রাসূলে পাক ﷺ জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যাননি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে নামাজ কায়েম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উলামায়ে তাফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরজ নামাজ, [বাহরে মুহীত ও তাফসীরে কুরতুবী] এবং ইকামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করা। কোনো কোনো আলেমের মতে নামাজ কায়েম করার অর্থ সুমুদয় সুন্নত ও মোস্তাহাবসহ নামাজ আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়া أَقِمِ الصَّلٰوةَ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে উপরিউক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলত এটা কোনে মতানৈক্য নয়। বস্তুত আলোচ্য সবগুলোই ইকামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দানের পর ইজমালীভাবে নামাজের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামাজ কায়েম করবে।" দিনের দু'প্রান্তের নামাজের মধ্যে প্রথম ভাগের নামাজ সম্পর্কে সবাই একমত যে, এটা ফজরের নামাজ। কিন্তু শেষ প্রান্তরে নামাজ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন– তা মাগরিবের নামাজ। কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামাজ পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাজকেই দিনের শেষ নামাজ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা তাই দিনের সর্বশেষ নামাজ। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়। বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামাজ পড়া হয়। زُلَفًا শব্দ বহুবচন, তার একবচন زُلْفَةٌ যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের নামাজ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কাতাদা, যাহ্হাক প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, এটা মাগরিব ও ইশার নামাজ। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে যে, زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ মাগরিব ও ইশার নামাজ। তাফসীরে ইবনে কাসীর অনুসারে طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ ফজর ও আসরের নামাজ এবং যে, زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশার নামাজ। অতএব অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামাজ। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ "নামাজ কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।"

আলোচ্য আয়াতে নামাজ কায়েম করার নির্দেশদানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ "পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।" শ্রদ্ধেয় তাফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সদকা, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বোঝানো হয়েছে

Free @ www.eilm.weebly.com

তবে তন্মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গুনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদের অন্য এক আয়াত এবং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গুনাহ্ বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ বিশেষ করে নামাজ সগীরা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় [কবীরা] গুনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট [সগীরা] গুনাহগুলো মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামাজ এবং এক জুমা হতে পরবর্তী জুমা এবং এক রমজান হতে পরবর্তী রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় [সগীরা] গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গুনাহ, তো তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গুনাহ নামাজ, রোজা, দান খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকার্য করার ফলে আপনা-আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে 'বাইরে মুহীত' নামক তাফসীরে উসূল শাস্ত্রের মুহাক্কিক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গুনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গুনাহে বারবার লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায়। সগীরা গুনাহ মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে , সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হওয়ার শর্ত রয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলোকে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে ১. আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলির মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। ২. শরিয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া। ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ৪. ব্যভিচার করা। ৫. চুরি করা ৬. মদ্য পান করা। ৭. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। ৮. মিথ্যা কসম করা। ৯. মিথ্যা সাক্ষী দান করা। ১০. জাদু করা। ১১. সুদ খাওয়া। ১২. অবৈধভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করা। ১৩. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। ১৪. সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। ১৫. অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। ১৬. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ১৭. আমানতের মাল খেয়ানত করা ১৮. অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া। ১৯. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গুনাহও সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে ওলামায়ে কেরাম সহস্র কিতাব প্রণয়ন করেছেন। মুফতি শফী (র.)-এর লেখা 'গুনাহে বে-লজ্জত' বা বেহুদা গুনাহ কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, " তোমাদের থেকে কোনো মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসিখুশি ব্যবহার কর। –[মুসনাদে আহমদ ও তাফসীরে ইবনে কাসীর]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে আরজ করলাম যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি আমাকে একটি উপদেশে দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমার থেকে কোনো গুনাহর কাজ হয়ে যায় তবে পরক্ষণেই কোনো নেক কাজ কর, তাহলে গুনাহ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গুনাহ হতে তওবা করার সুন্নত তরিকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি কোনো মুসলমান কোনো পাপকার্য করে বসে তবে অজু করে তার দু'রাকাত নামাজ পড়া উচিত । তাহলে উক্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" অত্র নামাজকে তওবার নামাজ বলে [উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহ তাফসীরে ইবনে কাসীর হতে গৃহীত]।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ : এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ 'এটা' শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে এই কুরআন পাক অথবা তাতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হেদায়েত ও নসিহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদি হঠকারী লোক যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোনো কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

قَوْلُهُ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ : অর্থাৎ "আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্য ধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাঁধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে অবিচল রাখা এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রাসূলে আকরাম ﷺ -কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশদানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তিকামাত ও নামাজ কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম-নির্যাতন ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।' এখানে স্পষ্টত 'মুহসিনীন'বা সৎকর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তিকামাতের উপর কায়েম, শরিয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাজকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরিয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকাজ করতে হবে যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা অন্তত এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলি সম্পর্কে যখন কোনো ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ প্রচলিত ছিল, যা তাঁরা প্রায়শই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলো অনায়াসলব্ধ এবং সু-সম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তা'আলার স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভালো করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। সেই তিনটি বাক্যের মূল হলো وَكَانَ أَهْلُ الْخَيْرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيْرَتَهُ أَصْلَحَ اللّٰهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ أَصْلَحَ اللّٰهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

–[তাফসীরে রূহুল বয়ান, ২য় জিল ১৩১. পৃ.]

১১৬ ও ১১৭ তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপর আজাব নাজিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে মানুষকে তা হতে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, "আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না? যারা জাতিকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত, তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হতো না। তবে মুষ্টিময় কিছু লোক ছিল, যারা নবী গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারা আজাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল।"

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে أُولُوا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٌ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও তা ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে بَقِيَّةٌ বলা হয়। কেননা তা সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১৭তম আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নি এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্মা সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোনো আশঙ্কা নেই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য অপরাধী।

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظُلْمٌ (জুলুম) অর্থ শিরকি এবং مُصْلِحُوْنَ অর্থে ঐ সব লোক যারা কাফের-মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেনদেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভালো। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোঁকাবাজি করে না, কারো কোনো ক্ষতি করে না। সে-মতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরিক হওয়া দুনিয়ায়

Free @ www.e-ilmweebly.com

কোনো জাতির উপর আল্লাহর আজাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের কার্যকলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করো। পূর্ববর্তী যতগুলো জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আ.)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হেরফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আ.) -এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছিল। তাদের এসব কার্যকলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরি বা শিরকির কারণে দুনিয়ায় আজাব আপতিত হয় না; কেননা তার শাস্তি তো দোজখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবে। এজন্য কোনো কোনো আলেমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরি ও শিরকিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বাজায় থাকতে পারে না।

মতবিরোধ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় দিক : ১১৮তম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেতো, কোনো মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোনো কাজের জন্য বাধ্য করবেন না; বরং তিনি মানুষকে অনেকটা ইখতিয়ার দান করেছেন, যার ফলে মানুষ ভালোমন্দ পাপ-পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারণ তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্ব যুগেই কিছু লোক সত্য-ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা খাস রহমত করেছেন অর্থাৎ যারা সত্যিকারভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছেন তাঁরা কখনো সত্য-বিচ্যুত হননি।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে উলামায়ে-দীন ও মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহর রহমতের পরিপন্থি নয়; বরং তা একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহর রহমতস্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থি।

سُوْرَةُ يُوْسُفَ مَكِّيَّةٌ : সূরা ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ

مِائَةٌ وَاحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً : ١١١ আয়াত বিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. الٓرٰ قف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ
هٰذِهِ الْاٰيٰتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ
وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْمُبِيْنِ الْمُظْهِرِ
لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ ـ

٢. اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا بِلُغَةِ الْعَرَبِ لَعَلَّكُمْ
يَا اَهْلَ مَكَّةَ تَعْقِلُوْنَ تَفْهَمُوْنَ مَعَانِيَهٗ ـ

٣. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ بِاِيْحَائِنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ج
وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ وَاِنَّهٗ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ
الْغٰفِلِيْنَ ـ

٤. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يَعْقُوْبَ يٰۤاَبَتِ
بِالْكَسْرِ دَلَالَةً عَلٰى يَاءِ الْاِضَافَةِ
الْمَحْذُوْفَةِ وَالْفَتْحِ دَلَالَةً عَلٰى اَلِفٍ
مَحْذُوْفَةٍ قُلِبَتْ عَنِ الْيَاءِ اِنِّيْ رَاَيْتُ فِي
الْمَنَامِ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ تَاكِيْدٌ لِيْ سٰجِدِيْنَ جُمِعَ
بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ لِلْوَصْفِ بِالسُّجُوْدِ الَّذِيْ
هُوَ مِنْ صِفَاتِ الْعُقَلَاءِ ـ

অনুবাদ :

১. আলিফ লাম-রা এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অধিক অবহিত। এগুলো এই আয়াতসমূহ সুস্পষ্টকারী অর্থাৎ সত্যকে অসত্য হতে সুস্পষ্টকারী একটি কিতাবের অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত। اٰيٰتُ الْكِتٰبِ শব্দটির -এই স্থানে مِنْ [হতে] অর্থে الْكِتٰبِ -এর প্রতি اٰيٰتُ -এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ পদের ব্যবহার হয়েছে।

২. কুরআন, এটা আমি আরবিতে আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছি হে মক্কাবাসীগণ! যাতে তোমরা বুঝতে পার। তার মর্ম অনুধাবন করতে পার।

৩. তোমার নিকট এই কুরআন ওহী হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে আমি তোমার নিকট সর্বোত্তম এক কাহিনী বর্ণনা করতেছি। আর এটার পূর্বে তুমি তো ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত। بِمَاۤ اَوْحَيْنَا-এই স্থানে مَا-টি مَصْدَرِيَّه এই দিকে ইঙ্গিত করতে এটার তাফসীরে بِاِيْحَائِنَا [আমার ওহী করার মাধ্যমে] উল্লেখ করা হয়েছে। اِنْ-এটা এই স্থানে مُخَفَّفَه বা লঘুকৃত [তাশদীদহীন] রূপে পঠিত। মূলত ছিল اِنَّهٗ।

৪. স্মরণ কর যখন হযরত ইউসুফ (আ.) তার পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.) -কে বলেছিলেন হে আমার পিতা! আমি স্বপ্নে একাদশ নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র দেখেছি- দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়। اَبَتِ-এটার শেষের اِضَافَة বাচক উহ্য ي-এর প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে এটা ت-এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। আর ت-এ ফাতাহসহও পাঠ করা যায়। এমতাবস্থায় এটা সম্বন্ধবাচক ي-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত এই স্থানে উহ্য اَلِفْ -এর প্রতি ইঙ্গিতবহ বলে বিবেচ্য হবে। رَاَيْتُهُمْ-এই স্থানে تَاكِيْد সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই ক্রিয়াটির পুনরুক্তি করা হয়েছে। سٰجِدِيْنَ-এই স্থানে যেহেতু ঐ বস্তুসমূহকে সেজদারত হওয়ার বিশেষণে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে; আর সেজদা হলো মূলত ذَوِي الْعُقُوْل বা বিবেকবান প্রাণীর গুণ, সেহেতু এই স্থানেও শব্দটিকে ذَوِي الْعُقُوْل প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ي ও ن-এর সাহায্যে جَمْع বা বহুবচন গঠনের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ط يَحْتَالُوْا فِىْ هَلَاكِكَ حَسَدًا لِعِلْمِهِمْ بِتَاوِيْلِهَا مِنْ اَنَّهُمُ الْكَوَاكِبُ وَالشَّمْسُ اُمُّكَ وَالْقَمَرُ اَبُوْكَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ظَاهِرُ الْعَدَاوَةِ ـ

৫. সে বলল, হে আমার প্রিয় বৎস, তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা করিও না করলে, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। তারা যেহেতু এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে যে, নক্ষত্র বলতে তাদেরকে, আর চন্দ্র বলতে তোমার মাতা ও সূর্য বলতে তোমার পিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেহেতু তোমার প্রতি ঈর্ষায় তারা তোমাকে বিনাশ করার চক্রান্ত করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু তার শত্রুতা তো সুস্পষ্ট।

٦. وَكَذٰلِكَ كَمَا رَاَيْتَ يَجْتَبِيْكَ يَخْتَارُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ بِالنُّبُوَّةِ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ اَوْلَادِهٖ كَمَا اَتَمَّهَا بِالنُّبُوَّةِ عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهٖ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ بِهِمْ ـ

৬. এইভাবে অর্থাৎ যেভাবে তুমি এই স্বপ্ন দেখলে সেভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করে নিবেন يَجْتَبِيْكَ অর্থ তোমাকে মনোনীত করে নিবেন। এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন, تَاْوِيْل الْاَحَادِيْث -এই স্থানে অর্থ স্বপ্নের ব্যাখ্যা। তোমার প্রতি ও হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারে প্রতি তাঁর বংশধরদের প্রতি নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি পূর্বে নবুয়ত প্রদানের মাধ্যমে এটা পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর প্রতি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে খুবই জানেন, এবং তাদের সাথে আচরণে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ : এতে تِلْكَ ইসমে ইশারা مُؤَنَّثْ নেওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

قَوْلُهٗ اَلْمُظْهِرُ لِلْحَقِّ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُبِيْن টা اَبَانَ হতে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ بِاِيْحَائِنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَا টা হলো مَصْدَرِيَّة মওসূলাহ নয়। যে, এর সেলা হতে عَائِدْ-এর প্রয়োজন হবে।

قَوْلُهٗ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اِنَّهٗ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ আর اِنْ ইসিম হলো উহ্য ضَمِيْر شَانْ অর্থাৎ اِنَّهٗ আর لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ -এর মধ্যে لَامْ টা হলো فَارِقَه

قَوْلُهٗ دَلَالَةً عَلٰى اَلِفٍ مَحْذُوْفٍ : কেননা এর আসল يَا اَبَتَا ছিল। اَلِفْ ফেলে দিয়ে যবর অবশিষ্ট রাখা হয়েছে উহ্য اَلِفْ কে বুঝানোর জন্য।

قَوْلُهٗ فِى الْمَنَامِ : এই বৃদ্ধিকরণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رَاَيْتُ টা رُؤْيَا থেকে بَدَل হয়েছে رُؤْيَتْ থেকে নয়।

قَوْلُهٗ تَاكِيْد : رَاَيْتُهُمْ টা رَاَيْتُ -এর تَاكِيْد কাজেই অহেতুক تَكْرَار-এর আপত্তি শেষ হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ يَحْتَالُوْا : এ বৃদ্ধিকরণের দ্বারা এই কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, كَيْدًا টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হয়ে থাকে, অথচ এখানে مُتَعَدِّىْ بِاللَّامِ নেওয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা হলো كَيْدًا-এর اِحْتِمَالْ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে مُتَعَدِّىْ بِاللَّامِ নেওয়া বৈধ রয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে ইউসুফ প্রসঙ্গে : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এজন্যেই তাঁর নামেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। বিগত সূরায় বকয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় শুধু একজন নবীর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক অনেক ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত ইউসূফ (আ.)-এর ঘটনাকে বার বার বর্ণনা করেননি। কেননা এ ঘটনা মানুষের ফরমায়েশের কারণে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে তা একই স্থানে একবারে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আসহাবে কাহাফ এবং জুলকারনাইনের ঘটনাও একবারই বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরায়ে হূদে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্যে অতীতকালের ঘটনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এভাবেই সূরায়ে ইউসুফেও হযরত ইউসূফ (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনা প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অবস্থার অনুরূপ। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের প্রারম্ভিক অবস্থায় সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে– أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট ওহী শুরু হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে, [আল হাদীস] যেমন হযরত ইউসূফ (আ.)-এর নবুয়ত আরম্ভ হয় একটি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনেই রয়েছে তার বিবরণ। إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (الْآيَة) এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাঁকে হিংসা করেছে এবং চরম কষ্ট দিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরম ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মান মর্যাদা এবং প্রাধান্য দান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.)- তাঁর ভাইদের থেকে কোনো প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" এমনকি হযরত ইউসুফ (আ.) কখনও তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগও করেননি; বরং তাদেরকে অনেক দান দক্ষিণায় ধন্য করেছেন। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে কুরায়েশ গোত্রের লোকেরা তথা তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাই প্রিয়নবী ﷺ -কে চরম কষ্ট দিয়েছে। সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি তাদের দ্বারা নির্যাতীত উৎপীড়িত হয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক অসাধারণ সবর এবং ইস্তেকামাতের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। এমনকি, অবশেষে প্রিয়নবী ﷺ তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণে মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফ চলে গিয়েছেন। তারপরও তারা বারে বারে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন তিনি বললেন– لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি পরম দয়ালু। আরও বললেন; اِذْهَبُوْا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ তোমরা আজ মুক্ত

এমনিভাবে হযরত ইউসূফ (আ.)-এর ন্যায় তিনিও মক্কার কুরায়েশদেরকে যখন তারা ইসলাম কবুল করেছে, তখন হুনায়নের যুদ্ধের গনিমত থেকে প্রত্যেককে একশত করে উষ্ট্র দান করেছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর জালেম ভাইদের সাথে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ মক্কার কুরায়শদের সাথে অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্র মাধুর্যের প্রমাণ রয়েছে এ ঘটনায় শয়তান কোনোভাবেই তাঁকে কবু করতে পারেনি, ঠিক এভাবে এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে তাঁরা থাকেন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং নিরাপদ।

যেভাবে হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.)–এর ঘটনাবলির বর্ণনা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিল ছিল, ঠিক এমনিভাবে হযরত ইউসূফ (আ.)-এর ঘটনাও পবিত্র কুরআনের আল্লাহর কিতাব হওয়া এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এতদ্ব্যতীত, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে রয়েছে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-তাঁর ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও সবর অবলম্বন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনিও মক্কাবাসীর জুলুম অত্যাচারে সবর অবলম্বন করুন, সত্যের উপর অটল অবিচল থাকুন এবং পরিণামের অপেক্ষা করুন।

–[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত-আল্লামা ইদিরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪. পৃ. ১-২]

শানে নুজুল : এই সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে

১. হযত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআন অনেক দিন থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি নাজিল হয়ে আসছিল। প্রিয়নবী ﷺ পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরামকে শ্রবণ করাতেন। ঐ সময় তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি কোনো ঘটনা বর্ণনা করতেন, তবে ভালো হতো। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

২. তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে। কেননা মক্কায় কুরায়শ বংশের লোকেরা তথা প্রিয়নবী ﷺ -এর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁর প্রতি যে দুর্ব্যবহার করছিল, তাতে তাঁর মনক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলে প্রিয়নবী ﷺ -এর মনে সান্ত্বনা আশাও স্বাভাবিক।

৩. এ পর্যায়ে একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

৪. আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা মক্কার কাফেরদেরকে বলেছিল, যেন তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করে যে, বনী ইসরাঈলরা কেন সিরিয়া ত্যাগ করে মিশরে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা জানতে চেয়েছিল, তখন এ সূরা নাজিল হয়। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ. -১২, পৃ. -১৭০ ; খোলাসাতুতাফাসীর, খ. ২ পৃ. ৩৯২]

এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি হিজরতের সময় মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মধ্যখানে নাজিল হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরার ৪টি আয়াত ব্যতীত আর সবই মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। অবশ্যই নোহাস, আবুশ শেখ ইবনে মরদবীয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে ফতহুল কাদীর., খ. ৩, পৃ. ৯]

قَوْلُهُ الٓرٰ : এ অক্ষর গুলোকে "মোকাত্তা'আত" বলা হয়। আল্লাহ পাক ব্যতীত এর প্রকৃত অর্থ কারোই জানা নেই, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীদের এটিই অভিমত। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, এ অক্ষরগুলো আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলের মধ্যে একটি রহস্য। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ রহস্য সম্পর্কে অবগত। পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে ২৯টি সূরা মোকাত্তাআত, অক্ষর দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তন্মধ্যে আলিফ, লাম, রা, অক্ষর দ্বারা পাঁচটি সূরা আরম্ভ করা হয়েছে।

এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কিত কহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ.)-এর কাহনী ও ঘটনাবলি সমগ্র কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশ নামা হিসাবে প্রেরিত কুরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কুরআন পাক বিশ্ব-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কেও স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কোনো ইতিহাস গ্রন্থ; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও

উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করা হয়েছে, সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোনো ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলি পাঠ করা এবং স্মরণ রাখা স্বয়ং কোনো লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোনো না কোনো শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং জনৈক অনুসন্ধানবিদ বলেছেন মানুষের বাক্যাবলির দুটি প্রকারের মধ্যে خَبْرٌ [ঘটনা বর্ণনা] ও إِنْشَاء [রচনা]-এর মধ্যে শেষোক্ত প্রকারই আসল উদ্দেশ্য। خَبْرٌ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে কখনও উদ্দেশ্য হয়না; বরং প্রত্যেক খবর ও ঘটনা শোনা ও দেখার মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একমাত্র স্বীয় অবস্থা ও কর্মের সংশোধন হওয়া উচিত।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয় যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত আলোচ্য কাহিনীর কুরআনী বর্ণনা থেকে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান করা হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদিরা পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা ও তাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ। কেননা তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি এবং কোনো গ্রন্থও পাঠ করেন নি। এতদসত্ত্বেও তাওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন। বরং কিছু এমন বিষয়ও তিনি বর্ণনা করেন, যেগুলো তাওরাতে উল্লিখিত ছিল না। এ কাহিনীতে প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিধি বিধানেরও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো পরে যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবন ব্যবস্থা দান করে। এগুলা অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তাওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদিরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ আমি একে আরবি কুরআন হিসাবে নাজিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাজিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলিকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করে। এজন্য এখানে لَعَلَّ শব্দটি 'সম্ভবত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এসব সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থা জানা ছিল যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সামনে এসে যাবার পরেও তাদের কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা ছিল সুদূর পরাহত।

قَوْلُهُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ .... قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ : অর্থাৎ আমি এ কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদিদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহর শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ .... رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতাকে বললেন, পিত: আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে। এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এগারটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ.)-এর ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে– হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তাঁর পিতার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভার্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَوْلُهُ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ .... لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ : অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ কড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

স্বপ্নের তাৎপর্য, স্তর ও প্রকারভেদ : সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তাফসীরে মাযহারীতে কাজী সানাউল্লাহ (র.) বলেন, স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু-প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটি প্রকার মৌলকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোনো কোনো সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সেগুলোই স্বপ্নে আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোনো কোনো সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলি মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এগুলোর কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حَدِيثُ النَّفْسِ তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تَسْوِيلُ الشَّيْطَانِ। অর্থাৎ শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম [আল্লাহর ইশারা] যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোনো কোনো বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তাবারানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

সূফী বুযুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে মিছাল' অর্থাৎ উপমা জগতে বিদ্যমান থাকে। তেমনি 'মাআনী' তথা অবস্তুবাচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমন সব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে উপরিউক্ত আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও কোনো কোনো স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ । কারণ তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায় যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোনো উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে।

পয়গাম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোনো কোনো সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোনো সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয়। মাঝে মাঝে এবং বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাও উপনীত হওয়া যায় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানি। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অভ্রান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬তম অংশ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন নবুয়তের অংশ এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। কোনো হাদীসে নবুয়তের ৪০ তম অংশ, কোনো হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোনো হাদীসে ৪৯ তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তাফসীরে কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আব্দুল বার (র.)-এর বিশ্লেষণ এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই; বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা ভূষিত, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ আরো কম তার স্বপ্ন নবুয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তা সাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ এর অর্থ কি? তাফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত, কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোনো বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানি দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন : এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিতে হয়েছে। তারা বলে নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কুরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থি এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোনো বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরি হয়ে পড়ে না। যদি কোনো ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কলকজার মধ্য থেকে কোনো একটি কলকজা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারও কাছে থাকে এবং সে দাবি করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ কিন্তু নবুয়ত নয়। নবুয়ত তো আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ অর্থাৎ ভবিষ্যতে 'মুবাশ্‌শিরাত' ব্যতীত নবুয়তের কোনো অংশ বাকি থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'মুবাশ্‌শিরাত' বলতে কি বোঝায়? উত্তর হলো সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোনো প্রকার অথবা কোনো আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশ্‌শিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কোনো সময় কাফের ও ফাসেক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে : মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাফের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কুরআনও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দুজন কারা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমুসলিম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত

হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফুফু আতেকা কাফের থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফের বাদশাহ বখতে নসরের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়েল (আ.) দিয়েছেন এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণত সত্য হবে এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। ফাসিক ও পাপাচারীদের সাধারণত মনে সংলাপ ও শয়তানি প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোটকথা সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুঁশিয়ারির চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোনো ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোনো কোনো অজ্ঞ লোক এ ধরনের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরিয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানি অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) কে কতিপয় নিয়ামত দানে ওয়াদা করেছেন। **প্রথম.** كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধনসম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। **দ্বিতীয়.** وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এখানে اَحَادِيْث বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

মাস'আলা : তাফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরি নয়।

তৃতীয়. ওয়াদা وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ আপনার প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নবুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নবুয়তের নিয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম ও ইসহাক (আ.)-কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোনো শাস্ত্র শেখানো তাঁর কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককে তা শেখান না; বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোনো কোনো ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. لَقَدْ كَانَ فِىْ خَبَرِ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ وَهُمْ اَحَدَ عَشَرَ اٰيٰتٌ عِبَرٌ لِّلسَّائِلِيْنَ عَنْ خَبَرِهِمْ .

৭. হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার ভ্রাতাগণের কাহিনীতে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন শিক্ষা। হযরত ইউসুফের ভ্রাতার সংখ্যা ছিল এগারো।

٨. اُذْكُرْ اِذْ قَالُوْا اَىْ بَعْضُ اِخْوَةِ يُوْسُفَ لِبَعْضِهِمْ لَيُوْسُفُ مُبْتَدَأٌ وَاَخُوْهُ شَقِيْقُهٗ بِنْيَامِيْنَ اَحَبُّ خَبَرٌ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جَمَاعَةٌ اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلٰلٍ خَطَأٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ بِاِيْثَارِهِمَا عَلَيْنَا .

৮. স্মরণ কর তারা অর্থাৎ হযরত ইউসুফের ভ্রাতারা কতকজনকে অপর কতজন বলেছিল, আমাদের পিতার নিকট হযরত ইউসুফ ও তার সহোদর ভ্রাতা বিনয়ামিন আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একদল। এক জামাত। নিশ্চয় আমাদের পিতা এদের দুজনকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে অর্থাৎ ভুলে আছেন لَيُوْسُفُ-এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَحَبُّ-এটা خَبَرٌ বা বিধেয়।

٩. اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا اَىْ بِاَرْضٍ بَعِيْدَةٍ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ بِاَنْ يُّقْبِلَ عَلَيْكُمْ وَلَا يَلْتَفِتَ لِغَيْرِكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ قَتْلِ يُوْسُفَ اَوْ طَرْحِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ بِاَنْ تَتُوْبُوْا .

৯. হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হত্যা কর অথবা তাকে কোনো স্থানে দূরবর্তী কোনো জায়গায় নির্বাসন দাও। এতে তোমাদের পিতার লক্ষ্য তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে। তিনি তখন কেবল তোমাদের দিকেই লক্ষ্য দিবেন অন্য কারও দিকে ফিরে তাকাবেন না। এটার পর অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হত্যা কিংবা দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপের পর ভালো লোক হয়ে যাবে। তওবা করে নিবে।

١٠. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ هُوَ يَهُوْدَا لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ اطْرَحُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ مُظْلِمِ الْبِيْرِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْجَمْعِ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ الْمُسَافِرِيْنَ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ مَا اَرَدْتُّمْ مِنَ التَّفْرِيْقِ فَاكْتَفُوْا بِذٰلِكَ .

১০. তাদের মধ্যে একজন বলল, তার নাম ছিল ইয়াহুদা ইউসুফকে হত্যা করো না। তাকে কোনো গভীরকূপে কূপের অন্ধকারময় তলায় নিক্ষেপ কর। ফেলে দাও। যাত্রীদের কেউ অর্থাৎ কোনো মুসাফির তাকে তুলে নিয়ে যাবে। তার পিতার সাথে বিচ্ছেদ সৃষ্টির যে ইচ্ছা তোমরা করেছো তা যদি তোমরা একান্তই করতে চাও এতটুকুতেই যথেষ্ট করিও। غَيٰبَةٌ-এটা অপর এক কেরাতে বহুবচন غَيٰبٰتٌ রূপে পঠিত রয়েছে।

١١. قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ لَقَائِمُوْنَ بِمَصَالِحِهٖ .

১১. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! কি হলো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করো না? নিশ্চয় আমরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী।' আমরা তার কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত।

١٢. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا إِلَى الصَّحْرَاءِ يَرْتَعْ
وَيَلْعَبْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ فِيْهِمَا نَنْشَطْ
وَنَتَّسِعْ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সঙ্গে মাঠে প্রেরণ করিও সে ফলমূল খাবে ও খেলাধূলা করবে। নিশ্চয় আমরা তার রক্ষাণাবেক্ষণকারী। يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ -এই উভয় ক্রিয়াই ى [অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ] এবং ن [অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচনরূপে] সহ পঠিত রয়েছে। শেষোক্ত অবস্থায় অর্থ, আমরা আনন্দ-আহলাদ করব।

١٣. قَالَ إِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْ أَنْ تَذْهَبُوْا أَيْ ذَهَابُكُمْ
بِهٖ لِفِرَاقِهٖ وَأَخَافُ أَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ
وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَكَانَتْ أَرْضُهُمْ
كَثِيْرَةَ الذِّئَابِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ
مَشْغُوْلُوْنَ

১৩. সে বলল, এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে। তোমরা তাকে নিয়ে গেলে তার বিচ্ছেদে আমার কষ্ট হবে। আর আশঙ্কা হয় যে, তোমাদের অমনোযোগ অবস্থায় অন্য কাজে লিপ্ত থাকাকালে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। أَنْ تَذْهَبُوْا-এটার ان-টি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার মূল অর্থব্যঞ্জক। اَلذِّئْبُ -এই স্থানে নির্দিষ্ট কোনো বাঘ নয় বরং জাতি অর্থে তাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলে বহু বাঘ ছিল বলে শব্দটিকে مَعْرِفَةٌ বা নির্দিষ্ট পদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

١٤. قَالُوْا لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ
عُصْبَةٌ جَمَاعَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ عَاجِزُوْنَ
فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ

১৪. তারা বলল, আমরা এক জামাত অর্থাৎ একদল হওয়া সত্ত্বেও যদি বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরা সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত অক্ষম ও অযোগ্য বলে পরিগণিত হবো। অনন্তর তিনি তাকে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। لَئِنْ-এটা لَا-টি قَسَمِيَّة বা শপথব্যঞ্জক

١٥. فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَأَجْمَعُوْا عَزَمُوْا أَنْ يَّجْعَلُوْهُ
فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَجَوَابُ لَمَّا مَحْذُوْفٌ
أَيْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ بِأَنْ نَزَعُوْا قَمِيْصَهٗ بَعْدَ
ضَرْبِهٖ وَإِهَانَتِهٖ وَإِرَادَةِ قَتْلِهٖ وَأَدْلَوْهُ فَلَمَّا
وَصَلَ إِلَى نِصْفِ الْبِئْرِ أَلْقَوْهُ لِيَمُوْتَ
فَسَقَطَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَوٰى إِلَى صَخْرَةٍ
فَنَادَوْهُ فَأَجَابَهُمْ لِظَنِّ رَحْمَتِهِمْ فَأَرَادُوْا
رَضْخَهٗ بِصَخْرَةٍ فَمَنَعَهُمْ يَهُوْذَا وَأَوْحَيْنَا
إِلَيْهِ فِي الْجُبِّ وَحْيَ حَقِيْقَةٍ وَلَهٗ سَبْعَ
عَشَرَةَ سَنَةً أَوْ دُوْنَهَا تَطْمِيْنًا لِقَلْبِهٖ
لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ بِأَمْرِهِمْ بِصُنْعِهِمْ
هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِكَ حَالَ الْإِنْبَاءِ

১৫. অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল সংকল্প করল, তখন তারা তা সম্পাদন করল। তারা তাকে মারধর এবং অপমান ও হত্যার ইচ্ছা প্রদর্শনের পর জামা খুলে রেখে কূপের ভিতর লটকিয়ে নামাতে থাকে এবং অর্ধ পরিমাণ পৌঁছলে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য ধপাস করে ফেলে দেয়। হযরত ইউসুফ (আ.) কূপের পানিতে পড়েন এবং একটি পাথরে আশ্রয় নেন। তাঁর ভ্রাতাগণ বেঁচে আছেন কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য। তাঁর নাম ধরে ডাক দেয়। হয়তো এদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছে এই ভেবে তিনি তাদের ডাকের জওয়াব দেন। তখন তারা পাথর ছুঁড়ে তাঁকে চূর্ণ করে দিতে চাইল। তখন ভাই ইয়াহুদা এতে তাদেরকে নিষেধ করে। আর আমি কূপের ভিতরেই তার মনকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে ওহী পাঠালাম। রূপকার্থে নয় মূলত সত্য সত্যই ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বৎসর বা কিছু কম। পরে তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা আচরণের কথা অবশ্যই বলবে কিন্তু ঐ কথা বলার অবস্থায় তারা তোমাকে চিনবে না। فَلَمَّا -এই শর্তবাচক শব্দটির জওয়াব এই স্থানে উহ্য। তা হলো فَعَلُوْا ذٰلِكَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٦ ১৬. وَجَاءُوْا اَبَاهُمْ عِشَاءً وَقْتَ الْمَسَاءِ يَبْكُوْنَ

১৬. তারা রাত্রিতে অর্থাৎ সন্ধ্যায় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসল।

١٧ ১৭. قَالُوْا يَابَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ نَرْمِيْ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا ثِيَابِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ مُصَدِّقٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ عِنْدَكَ لَاتَّهَمْتَنَا فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ لِمَحَبَّةِ يُوْسُفَ فَكَيْفَ وَاَنْتَ تُسِيْءُ الظَّنَّ بِنَا

১৭. তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা প্রতিযোগিতা করতে ছিলাম তীরান্দাজী করতেছিলাম আর হযরত ইউসুফকে আমাদের মাল পত্রের নিকট কাপড় চোপড়ের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে তাকে একটি বাঘ এসে খেয়ে ফেলে। কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না সত্যবাদী বলে মনে করবে না। যদিও আমরা তোমার নিকট সত্য বলব। হযরত ইউসুফের প্রতি ভালোবাসার আতিশয্যে তুমি আমাদেরকে এই ব্যাপারে অভিযুক্ত মনে করবে। আমাদের সম্পর্কে যখন তোমার এই খারাপ ধারণা তখন আমাদের কথায় আর কেমন করে বিশ্বাস করতে পারবে?

١٨ ১৮. وَجَاءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهِ مَحَلُّهُ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ اَيْ فَوْقَهُ بِدَمٍ كَذِبٍ اَيْ ذِيْ كِذْبٍ بِاَنْ ذَبَحُوْا سَخْلَةً وَلَطَّخُوْهُ بِدَمِهَا وَذَهَلُوْا عَنْ شَقِّهِ وَقَالُوْا اِنَّهُ دَمُهُ قَالَ يَعْقُوْبُ لَمَّا رَاٰهُ صَحِيْحًا وَعَلِمَ كِذْبَهُمْ بَلْ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَفَعَلْتُمُوْهُ بِهِ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط لَا جَزَعَ فِيْهِ وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مَحْذُوْفٍ اَيْ اَمْرِيْ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ الْمَطْلُوْبُ مِنْهُ الْعَوْنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ تَذْكُرُوْنَ مِنْ اَمْرِ يُوْسُفَ

১৮. তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। একটি ভেড়ার বাচ্চা জবাই করে তার রক্ত লেপন করে এসে বলল, এটা হযরত ইউসুফের রক্ত; কিন্তু জামাটি ছিঁড়ে আনতে ভুলে গিয়েছিল। জামাটি অক্ষত দেখতে পেয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) এদের মিথ্যা বুঝে ফেললেন। সে বলল, তোমাদের মন একটি বিষয় তোমাদের নিকট বানিয়ে পেশ করেছে, শোভন করে তুলে ধরেছে, আর তোমরা তাই করে বসেছো সুতরাং আমি পূর্ণ ধৈর্যধারণ করলাম। কোনো অভিযোগ ও হা-হুতাশ আমার নেই। তোমরা যা বলতেছ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে তোমরা যা কিছু বর্ণনা করতেছ সে বিষয়ে আল্লাহ আমার সাহায্যস্থল। তাঁরই নিকট আমার সাহায্য প্রার্থনা। عَلٰى قَمِيْصِهِ-এটা এই স্থানে ظَرْف বা স্থানাধিকরণরূপে مَحَلّ বা স্থান হিসাবে মূলত مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত। অর্থ, তার জামার উপরে। كَذِبٍ-এটা ذِيْ كِذْبٍ [মিথ্যা দ্বারা সজ্জিত করে] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ-এটা خَبَرْ বা বিধেয়। এটার مُبْتَدَا উহ্য তা হলো اَمْرِيْ অর্থাৎ আমার কাজ হলো পূর্ণ ধৈর্যধারণ।

١٩ ১৯. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ مُسَافِرُوْنَ مِنْ مَدْيَنَ اِلٰى مِصْرَ فَنَزَلُوْا قَرِيْبًا مِنْ جُبِّ يُوْسُفَ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ الَّذِيْ يَرِدُ الْمَاءَ لِيَسْتَقِيَ مِنْهُ فَاَدْلٰى اَرْسَلَ دَلْوَهُ فِي الْبِئْرِ فَتَعَلَّقَ بِهَا يُوْسُفُ فَاَخْرَجَهُ.

১৯. এক যাত্রীদল আসল। মাদয়ান হতে মিসরের দিকে যাত্রী একদল মুসাফির আসল। হযরত ইউসুফ যে কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তারা তার নিকটেই বিশ্রামের জন্য অবতরণ করল। অনন্তর তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল সে ঐ কূপে তার পানির ডোল লটকিয়ে দিল, নামিয়ে দিল। হযরত ইউসুফ তা জড়িয়ে ধরলেন। ফলে সে তাঁকেও বাইরে উঠিয়ে আনল।

Free @ www.eilm.weebly.com

فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ يٰبُشْرٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بُشْرٰى وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ اَىْ اُحْضُرِىْ فَهٰذَا وَقْتُكِ هٰذَا غُلٰمٌ فَعَلِمَ بِهِ اِخْوَتُهٗ فَاَتَوْهُمْ وَاَسَرُّوْهُ اَىْ اَخْفُوْا اَمْرَهٗ جَاعِلِيْهِ بِضَاعَةً بِاَنْ قَالُوْا هُوَ عَبْدُنَا اَبَقَ وَسَكَتَ يُوْسُفُ خَوْفًا اَنْ يَّقْتُلُوْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

তাকে দেখে সে বলে উঠল, ও হে সুসংবাদ! এই যে এক বালক! হযরত ইউসুফের ভ্রাতাগণ এটা জানতে পেরে ঐ যাত্রীদের নিকট আসল এবং তাকে পণ্যরূপে আখ্যা দিয়ে তার বিষয়টি লুকিয়ে রাখল। গোপন করে রাখল। বলল, এ আমাদের ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছিল। এরা হত্যা করে ফেলবে এই ভয়ে হযরত ইউসুফ নিজে চুপ করে রইলেন। এরা যা করতেছে আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। وَارِدٌ অর্থ পানীয় জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি পানির স্থলে যায়। بُشْرٰى এই- يٰبُشْرٰى শব্দটি অপর এক কেরাতে নিজের দিকে اِضَافَتْ করত بُشْرَىَّ [আমার সুসংবাদ] রূপে পঠিত রয়েছে। এই স্থানে مَجَازٌ হিসাবে তাকে ওহে বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটার অর্থ হলো, সুসংবাদ, এখনি এসে হাজির হও, এটাই তো তোমার উপস্থিতির মোক্ষম সময়।

٢٠. وَشَرَوْهُ اَىْ بَاعُوْهُ مِنْهُمْ بِثَمَنٍ بَخْسٍ نَاقِصٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ عِشْرِيْنَ اَوْ اِثْنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ وَكَانُوْا اَىْ اِخْوَتُهٗ فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ فَجَاءَتْ بِهِ السَّيَّارَةُ اِلٰى مِصْرَ فَبَاعَهُ الَّذِىْ اِشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَزَوْجَىْ نَعْلٍ وَثَوْبَيْنِ ـ

২০. এবং তারা তাকে এদের নিকট বিক্রয় করল স্বল্প মূল্যে شَرَوْهُ-এই স্থানে অর্থ, তারা তাকে বিক্রি করল। মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে। بَخْسٍ-অর্থ কম। অর্থাৎ বিশ দিরহাম বা বাইশ দিরহাম তারা অর্থাৎ তার ভ্রাতাগণ হতে নিরুৎসাহী ছিল। অতঃপর তারা তাঁকে মিসরে নিয়ে আসলে তার ক্রেতা তাকে বাইশ দীনার এবং দুই জোড়া জুতা ও দুই জোড়া কাপড়ের বিনিময়ে ক্রয় করল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ خَبَرٌ : মুফাসসির (র.) خَبَرٌ মুযাফ উহ্য মেনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো এই যে, আয়াতে يُوْسُفُ টা فِىْ-এর ظَرْفٌ হয়েছে। অথচ يُوْسُفُ যেহেতু ذَاتٌ কাজেই তাতে ظَرْفٌ হওয়ার যোগ্যতা নেই।

জবাবের সারকথা হলো এই যে, يُوْسُفُ টা ظَرْفٌ হয়নি; বরং يُوْسُفَ-এর পূর্বে خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই আর কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهٗ مُبْتَدَأٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِيُوْسُفُ- এর উপর لَامٌ টা হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ এটা قَسَمِيَّةٌ নয়।

قَوْلُهٗ شَقِيْقُهٗ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিনয়ামিন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাকীকী ভাই ছিলেন। আর বাকিরা ছিলেন আল্লাতী [বাবা শরিক] ভাই তথা বাবা এক মা দুই।

قَوْلُهٗ بِاَرْضٍ بَعِيْدَةٍ : এখানে بَعِيْدَةٌ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَرْضٌ -এর তানভীনটি تَعْظِيْم-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهٗ غَيَابَةِ الْجُبِّ : অন্ধকার কূপ, কূপের গভীরতার অন্ধকার।

قوله فاكتفوا بذالك : এটা اِنْ كُنْتُمْ -এর জবাব যা উহ্য রয়েছে

قَوْلُهٗ يَرْتَعْ : এটা বাবে فَتَحَ হতে মুযারে وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগাহ। অর্থ ফল খাবে। স্বাদ উপভোগ করবে। رَاتِعٌ বলা হয় দ্বিখণ্ডিতকারীকে।

قَوْلُهٗ فَعَلُوْا ذَالِكَ : এটা হলো لَمَّا-এর জবাব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِاَنْ نَزَعُوْا قَمِيْصَهُ : এখানে بَاءٌ টা تَصْوِيْرِيَّةٌ যা صُوْرَتْ فِعْل কে বর্ণনা করার জন্য। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) কে কিভাবে কূপে নিক্ষেপ করা হলো?

قَوْلُهُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ فِيْهِمَا نَنْشَطْ وَنَتَّسِعْ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يَرْتَعْ এবং يَلْعَبْ-এর দুই কেরাতকে বর্ণনা করা অর্থাৎ يَرْتَعْ এবং يَلْعَبْ যেভাবে وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ হতে পারে অনুরূপভাবে جَمْعْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহও হতে পারে। আর نَنْشَطْ হলো نَلْعَبْ-এর তাফসীর। অর্থাৎ যাতে আমরা তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করতে পারি। আর نَتَّسِعْ হলো نَرْتَعْ-এর তাফসীর অর্থাৎ যাতে আমরা খাবো উপভোগ করব। এই তাফসীরে لَفّ نَشْرِ غَيْرِ مُرَتَّبْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلذِّئْبُ-এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ টা عَهْدِىْ-এর জন্য নয়। কেননা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মনে কোনো নির্দিষ্ট বাঘ ছিলনা। বরং اَلِفْ وَلَامْ টা جِنْس-এর জন্য হবে অর্থাৎ বাঘের মধ্য হতে কোনো একটা বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে।

قَوْلُهُ اِنَّا اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ : এটা জবাবে কসম হয়েছে।

قَوْلُهُ جَوَابُ لَمَّا مَحْذُوْفٌ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, বাক্য পরিপূর্ণ নয়। কেননা فَلَمَّا ذَهَبُوْا-এর জবাব উল্লেখ নেই।

উত্তরের সারকথা হলো لَمَّا-এর জবাব উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فَعَلُوْا ذٰلِكَ

قَوْلُهُ مَحَلُّهُ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ : অর্থাৎ عَلٰى قَمِيْصِهٖ টা ظَرْف হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَجَاءُوْا فَوْقَ قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ

قَوْلُهُ اَىْ ذِىْ كَذِبٍ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই আপত্তির খণ্ডন করা যে, بِدَمٍ كَذِبٍ-এর মধ্যে মাসদারের حَمْل জাতের উপর হয়েছে। যা বৈধ নয়। এখানে ذِىْ বৃদ্ধি করে বলে দিয়েছেন যে, মাসদার টা اِسْمُ فَاعِلْ-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো আপত্তি অবশিষ্ট থাকেনা। আর যদি ذِىْ উহ্য মানা না হয় তবে মুবালাগার ভিত্তিতে حَمْل বৈধ হবে। যেমনটি زَيْدٌ عَدْلٌ-এর মধ্যে হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِىْ يَرِدُ الْمَاءَ : এটা হলো وَارِدٌ-এর তাফসীর অর্থাৎ যে ব্যক্তি পানির ব্যবস্থা করেন যাকে سَقَّاءٌ বলে। ঐ سَقِّى -এর নাম মালেক ইবনে যা'র খোযায়ী ছিল।

قَوْلُهُ لِيَسْتَسْقِىَ مِنْهُ : যাতে করে কূপ হতে পানি আনয়ন করতে পারে। আবার কোনো কোনো নুসখায় لِيَسْتَقِىَ রয়েছে। উভয়টির সেলাহ مِنْ আসে। اِسْتَقٰى مِنَ النَّهْرِ অর্থ হলো নদী থেকে পানি সংগ্রহ করেছে।

قَوْلُهُ فِىْ قِرَاءَةٍ بُشْرٰى : আমার শুভ সংবাদ بَشَارَتْ কে আহ্বান করা مَجَازًا হয়েছে। কেননা بَشَارَتْ-এর মধ্যে مُخَاطَبْ হওয়ার যোগ্যতা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলি রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদি পরীক্ষার উদ্দেশ্য নবী কারীম ﷺ -কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌঁছেছিল, তখন মদীনায় ইহুদিরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল। যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার বিরহ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায়?

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছনে কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোনো অংশবিশেষ জানা যেত। বলা বাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ.)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি প্রকাশ্য মোজেজা।

আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইহুদিদের প্রশ্ন বাদ দিলেও স্বয়ং এ কাহিনীতে এমন এমন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ তা'আলার অপার মহিমার নিদর্শন এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য বড় বড় নির্দেশ, বিধান ও মাস'আলা বিদ্যমান রয়েছে। যে বালককে ভ্রাতারা ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহর অপরিসীম শক্তি তাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে, কিভাবে তার হেফাজত হয়েছে! এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে স্বীয় নির্দেশাবলি পালনের কেমন গভীর আগ্রহ দান করে থাকেন! যৌবনাবস্থায় অবাধ ভোগের চমৎকার সুযোগ হাতে আসা সত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর ভয়ে প্রবৃত্তিকে কিভাবে পরাভূত করে অক্ষত অবস্থায় এ বিপদের কবল থেকে বের হয়ে আসেন! আরও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহভীতির পথ থেকে বের হয়ে আসেন! আরও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুতা ও আল্লাহ ভীতির পথে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শত্রুদের বিপরীতে কিরূপ ইজ্জত দান করেন এবং শত্রুদেরকে কিভাবে তার পদতলে লুটিয়ে দেন। এগুলোই হচ্ছে এ কাহিনীর শিক্ষা এবং আল্লাহর শক্তির মহান নিদর্শন। চিন্তা করলেই এগুলো বোঝা যায়। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) সহ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়।

বার পুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী নিয়ে বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকূব (আ.) লাইয়্যানের ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামিন। এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই ইউসুফ জননী রাহীলও বিনয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় আয়াত থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে দেখল যে, তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনোরূপে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার অনুজ বিনয়ামিনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হলো এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় হযরত ইউসুফ (আ.)- কে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

এ আয়াতে ভ্রাতারা নিজেদের সম্পর্কে عُصْبَةٌ শব্দ ব্যবহার করেছে। আরবি ভাষায় পাঁচ থেকে দশজনের একটি দলের অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিতা সম্পর্কে তারা বলেছে إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ এতে ضَلَالٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ পথভ্রষ্টতা। কিন্তু এখানে ধর্মীয় পথ ভ্রষ্টতা বোঝানো হয়নি। নতুবা এরূপ ধারণা করার কারণে তারা সবাই কাফের হয়ে যেত। কেননা হযরত ইয়াকূব (আ.) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গম্বর। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা নিশ্চিত কুফর।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাকে উল্লিখিত রয়েছে যে, পরবর্তীকালে তারা দোষ স্বীকার করে পিতার কাছে মাগফেরাতের দোয়া প্রার্থনা করেছিল। পিতা তাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। এগুলো তখনই সম্ভবপর, যখন তাদের মুসলমান ধরা হয়। নতুবা কাফেরদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা বৈধ নয়। এ কারণেই ভ্রাতাদের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে তো আলেমরা মতভেদ করেছেন কিন্তু মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এখানে ضَلَالٌ শব্দটি শুধু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তিনি সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না।

তৃতীয় আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল তাকে কোনো অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গুনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

এ ছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতামাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরিউক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবীরা গুনাহ করেছে। একজন নিরাপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলেমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গাম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গুনাহ হতে পারে না।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর. যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোনো দূর দেশে যেতে হবে না। কোনো কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর দূরান্তে পৌছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ছোট ভাই বিনয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

আয়াতে غَيَابَةِ الْجُبِّ বলা হয়েছে যা কোনো বস্তুকে ঢেকে ফেলে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, তাকেই غَيَابَةٌ বলা হয়। এ কারণেই কবরকেও غَيَابَةٌ বলা হয়। যে কূপের পাড় তৈরি করা হয় না, তাকে جُبٌّ বলা হয়।

يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ এখানে الْتِقَاطْ শব্দটি لُقْطَةٌ থেকে উদ্ভূত। যে পড়ে থাকা বস্তু অন্বেষণ ব্যতিরেকেই কেউ পেয়ে ফেলে, তাকে لُقْطَةٌ বলা হয়। অ-প্রাণী বাচক বস্তু হলে لُقْطَةٌ এবং প্রাণীবাচক হলে ফিকহবিদদের পরিভাষায় لَقِيْط বলা হয়। অপ্রাপ্ত বয়বস্ক ও অপরিপক্ক বালক হলেও কুড়িয়ে পাওয়া মানুষকে لَقِيْط বলা হবে। কুরতুবী এ শব্দ দ্বারাই প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)কে যখন কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন। এছাড়া ইয়াকূব (আ.)-এর এরূপ বলাও তাঁর বালক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আমার আশঙ্কা হয় ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলবে। কেননা ব্যাঘ্রে খেয়ে ফেলা বালকদের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তখন ইউসুফ (আ.)-এর বয়স ছিল সাত বছর। [তাফসীরে মাযহারী]

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে لُقْطَة ও لَقِيْط -এর বিস্তারিত বিধানাবলি বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইসলামি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জান ও মালের হেফাজত পথঘাট ও সড়ক পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারি বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয় প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথেঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোনো আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জিহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোনো বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরা, পাথর ইত্যাদি, তাহলে এগুলোকে সরানো শুধু ভার প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে তাদের জন্য অশেষ প্রতিদান ও ছওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাৎ না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়; বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই তবে তাকে প্রত্যার্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজা-খুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকির-মিসকিনদের দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দান রূপে গণ্য করা হবে। দানের ছওয়াব সেই পাবে যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com
এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়!

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল আব্বাজান! ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সেও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোনো সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে প্রমোদ ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু হযরত ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্তত করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয় বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরিয়তের সীমালঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরিয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোনো কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, তাকে প্রেরণ করা আমি দু' কারণে পছন্দ করি না। প্রথমত, এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়ত, আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘে খাওয়ার আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নিচে পাহাড়ের পাদদেশে হযরত ইউসুফ (আ.)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয় কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ.) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এ ভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন নি। -[তাফসীরে কুরতুবী]

ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কথা শুনে বলল, আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্য বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হযরত ইয়াকূব (আ.) পয়গম্বর সুলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ এতে প্রথমত তাদের মনোকষ্ট হতো, দ্বিতীয়ত পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোনো সময় কোনো ছলছুঁতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে হযরত ইউসুফের কোনোরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোর্পাদ করে বললেন, তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখাশোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে হযরত ইউসুফকে (আ.) কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন হযরত ইউসুফ (আ.)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোনোরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুমি যে, এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছ তাদেরকে ডাক। তারাই তোমাকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতে বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোনো না কোনো উপায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ.) ইয়াহুদাকে বললেন, আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনে কষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হলো এবং তাকে বলল, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল, নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবে না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা উত্তর দিল আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল, তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোনো সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোনো কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোনো দেশে পৌছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হলো। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াত এভাবে বর্ণিত হয়েছে। فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَةِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌছল, তখন আল্লাহ ত'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

এখানে وَاَوْحَيْنَا শব্দটি فَلَمَّا ذَهَبُوْا -এর جَزَاءْ বা جَوَابْ এখানে وَاوْ অক্ষরটি অতিরিক্ত ।-[তাফসীরে কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, ভাইয়েরা যখন মিলিতভাবে তাকে কূপে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেই ফেলল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সান্ত্বনার জন্য ওহী প্রেরণ করলেন। এতে ভবিষ্যতে কোনো সময় ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং সাথে সাথে এ বিষয়েও সুসংবাদ দেওয়া হলো যে, তখন সে ভাইদের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং তাদের ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে থাকবে। ফলে সে তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিচার করবে অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন, এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। এক. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করেছিল। দুই. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভবিষ্যত ঘটনাবলি বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পৌঁছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন, যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী দান করা হয়েছিল। –[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মিসর পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী] এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো একজন পয়গাম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোনো ব্যবস্থা করেন নি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কার? সম্ভবত আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোনো কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা রাখা যে, আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত যাচনাকারীর বেশে ভাইদেরকেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ এস্থলে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যখন ওরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তা দ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারোটি নক্ষত্র তোমাকে সেজদা করে, তাদেরকে ডাক দাও। তারাই তোমার সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হযরত ইউসুফের হেফাজত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনোরূপ আঘাত পান নি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

হযরত ইউসুফ (আ.) তিনদিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্য কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিত।

قَوْلُهُ وَجَاءُوْا اَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ : অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে করতে পিতার নিকট পৌঁছল। হযরত ইয়াকূব (আ.) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল يَا اَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ অর্থাৎ পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। ইবনে আরাবী 'আহকামুল কুরআনে' বলেন পারস্পরিক [দৌড়] প্রতিযোগিতা শরিয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব-প্রতিযোগিতা করানো [অর্থাৎ ঘোড়দৌড়]ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েজ। কিন্তু পরস্পর হারজিতে কোনো টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত যা কুরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনেটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও না জায়েজ।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে– وَجَآءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি জরুরি বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। হযরত ইয়াকূব (আ.) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে কিন্তু জামার কোনো অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি!

এভাবে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাস'আলা : হযরত ইয়াকূব (আ.) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবি ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারস্পরিক অবস্থা ও আলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা। মাওয়ারদি বলেন, হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হলো, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তার জামাটিই মোজেজার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা : কোনো কোনো আলেম বলেন, কাহিনীর এ পর্যায়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) পুত্রদেরকে বলেছেন بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا অর্থাৎ তোমাদের মন একটি বিষয় খাড়া করে নিয়েছে। তিনি হুবহু এই উক্তি তখনও করেছিলেন, যখন মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাই বিনয়ামিন কথিত একটি চুরির অভিযোগে ধৃত হয় এবং তার ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে এর সংবাদ দেয়। এ সংবাদ শুনেও তিনি بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا বলেছিলেন। এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) উভয় ক্ষেত্রে নিজ অভিমত অনুসারে একথা বলেছিলেন, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তা নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। কেননা এক্ষেত্রে ভাইদের কোনো দোষ ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, পয়গম্বরগণের অভিমতও প্রথম পর্যায়ে ভ্রান্ত হতে পারে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর কায়েম থাকতে দেওয়া হয় না।

কুরতুবী বলেন, এতে বুঝা যায় যে, অভিমতের ভ্রান্তি বড়দের তরফ থেকেও হতে পারে। কাজেই প্রত্যেক অভিমত প্রদানকারীর উচিত, নিজ অভিমতকে ভ্রান্তির সম্ভাবনাযুক্ত মনে করা এবং নিজ মতামতের উপর কারও অটল অনড় হয়ে থাকা উচিত নয় যে, অপরের মতামত শুনতে এবং তা মেনে নিতে সম্মত নয়।

قَوْلُهُ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهُ : এখানে سَيَّارَةٌ শব্দের অর্থ কাফেলা وَارِدٌ বলে কাফেলার অগ্রবর্তী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কাফেলার পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব। اِدْلَاء শব্দের অর্থ কূপে বালতি নিক্ষেপ করা। উদ্দেশ্য এই যে, ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহকারীদেরকে কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফেলা পথ ভুলে এখানে পৌছা এবং এই অন্ধ কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। হযরত ইউসুফের স্রষ্টা ও রক্ষকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থা তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোনো কিছু হয়না। আল্লাহ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ [তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন]। তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলির সাথে তার কোনো সম্পর্ক বুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব মনে করে বসে।

মোটকথা, কাফেলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলি তার মহত্ত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল : يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ আরে, আনন্দের কথা! এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে সহীহ মুসলিমের মি'রাজ রজনীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً : অর্থাৎ তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দোবর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আদায় করা যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানো জন্য যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল। অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বের করল। তখন তারা বলল, এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ : অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফেলা কি করবে সব আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোনো রহস্যের কারণেই আল্লাহ তা'আলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেন নি; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর বলেন, এ বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, আপনার কওম আপনার সাথে যা কিছু করছে অথবা করবে, তা সবই আমার জ্ঞান ও শক্তির আওতাধীন রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব বানচাল করে দিতে পারি কিন্তু আপাতত তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়াই হিকমতের চাহিদা। পরিণামে আপনাকে বিজয়ী করে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা হবে যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ : আরবি ভাষায় شِرَاءٌ শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে হযরত ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফিরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফেলার লোকেরা হযরত ইউসুফ (আ.) কে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেন, আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেনদেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেনদেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই دَرَاهِمَ শব্দের সাথে مَعْدُودَةٍ [গুণাগুনতি] শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেন, বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিল। দিরহামের সংখ্যা কত ছিল এ ব্যাপারে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে বাইশ এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে চল্লিশ।– [তাফসীরে ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ : এখানে زَاهِدِينَ শব্দটি زَاهِدٌ-এর বহুবচন زُهْدٌ থেকে এর উৎপত্তি। زُهْدٌ-এর শাব্দিক অর্থ বৈরাগ্য ও নির্লিপ্ততা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় সাংসারিক ধনসম্পদের প্রতি অনাসক্তি ও বিমুখতা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা এ ব্যাপারে আসলে ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষী ছিল না। তাদের আসল লক্ষ্য ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তাই অল্প সংখ্যক দিরহামের বিনিময়েই ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যায়।

Free@www.eilmweebly.com

অনুবাদ :

٢١. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ وَهُوَ قِطْفِيرُ الْعَزِيزُ لِامْرَاَتِهٖ زُلَيْخَا اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ مَقَامَهٗ عِنْدَنَا عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ط وَكَانَ حَصُورًا وَكَذٰلِكَ كَمَا نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْجُبِّ وَعَطَفْنَا قَلْبَ الْعَزِيْزِ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ حَتّٰى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ط تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا عَطْفٌ عَلٰى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِمَكَّنَّا اَيْ لِنُمَكِّنَهٗ اَوِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ تَعَالٰى لَا يُعْجِزُهٗ شَيْءٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

২১. মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল সে অর্থাৎ মিসর সম্রাটের সভাসদ কিতফীর তার স্ত্রী যুলায়খাকে বলল, আমাদের নিকট তার অবস্থান সম্মানজনক কর। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। সে রতিক্রিয়ায় অক্ষম এক পুরুষ ছিল। এবং এভাবে অর্থৎ যেভাবে তাকে নিহত হওয়া হতে এবং কূপ হতে রক্ষা করলাম ও আযীয বা মিসর সম্রাটের সভাসদের মনে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক করে দিলাম সেভাবে আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সেই দেশে অর্থাৎ মিসর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলাম। শেষে যা হওয়ার তা হলো, এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করলাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর আল্লাহ তাঁর কার্যে অপ্রতিরোধ্য। তাঁকে কোনো কিছু অক্ষম ও প্রতিহত করতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেরগণ তা অবগত নয়। مَثْوٰى অর্থ অবস্থান। وَلِنُعَلِّمَ উপরিউক্ত مَكَّنَّا ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট এ স্থানে উহ্য একটি ক্রিয়া। لِنُمَكِّنَهٗ -এর সাথে এটার عَطْفٌ বা অন্বয় সাধিত হয়েছে। অথবা , টি এ স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এ স্থানে এটার অর্থ স্বপ্নের ব্যাখ্যা।

٢٢. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَهُوَ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً اَوْ ثَلٰثٌ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا حِكْمَةً وَعِلْمًا ط فِقْهًا فِي الدِّيْنِ قَبْلَ اَنْ يُبْعَثَ نَبِيًّا وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ .

২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো অর্থাৎ তার বয়স যখন ত্রিশ বা তেত্রিশ তখন তাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করার পূর্বেই হুকুম অর্থাৎ হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দীনের বিশেষ উপলব্ধি দান করলাম। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে আমি তাকে পুরস্কৃত করেছি সেভাবে নিজেদের প্রতি যারা দয়াশীল তাদেরকে পুরস্কৃত করি।

٢٣. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا هِيَ زُلَيْخَا عَنْ نَّفْسِهٖ اَيْ طَلَبَتْ مِنْهُ اَنْ يُّوَاقِعَهَا وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ لِلْبَيْتِ وَقَالَتْ لَهٗ هَيْتَ لَكَ ط اَيْ هَلُمَّ وَاللَّامُ لِلتَّبْيِيْنِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَاُخْرٰى بِضَمِّ التَّاءِ .

২৩. সে যে মহিলার গৃহে ছিল সে অর্থাৎ জুলায়খা তাকে নিজের দিকে ফুসলাইল, অর্থাৎ অসৎভাবে তার সাথে সঙ্গত হতে আহ্বান করল এবং ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও তাকে বলল আস। هَيْتَ অপর এক কেরাতে এ কাসরাসহ এবং অপর আরেক কেরাতে ت-এ পেশ সহ পঠিত রয়েছে। لَكَ-এটার لـ টি تَبْيِيْن বা [এ স্থানের مَفْعُوْل বা কর্মপদটির] সুস্পষ্টকরণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّهُ اَىِ الَّذِىْ اشْتَرَانِىْ رَبِّىْ سَيِّدِىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ط مَقَامِىْ فَلَا اَخُوْنُهُ فِىْ اَهْلِهِ اِنَّهُ اَىِ الشَّانُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ الزُّنَاةُ ـ

সে বলল, আল্লাহ পানাহ অর্থাৎ তা হতে আমি আল্লাহর আশ্রয় নিতেছি, নিশ্চয় তিনি অর্থাৎ যিনি আমাকে ক্রয় করে এনেছেন তিনি আমার প্রভু অর্থাৎ মালিক তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন তাঁর পরিবারের বিষয়ে আমি কোনোরূপ খেয়ানত করতে পারি না। مَثْوَاىَ অর্থ আমার অবস্থান। اِنَّهُ এটার শেষের ضَمِيْرٌ বা সর্বনামটি شَانٌ বা অবস্থাবাচক নিশ্চয় সীমালজ্ঘনকারীগণ ব্যভিচারীগণ সফলকাম হয় না

২৪. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ قَصَدَتْ مِنْهُ الْجِمَاعَ وَهَمَّ بِهَا قَصَدَ ذٰلِكَ لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ط قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) مُثِّلَ لَهُ يَعْقُوْبُ فَضَرَبَ صَدْرَهُ فَخَرَجَتْ شَهْوَتُهُ مِنْ اَنَامِلِهِ وَجَوَابُ لَوْلَا لَجَامَعَهَا كَذٰلِكَ اَرَيْنَاهُ الْبُرْهَانَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ الْخِيَانَةَ وَالْفَحْشَآءَ ط الزِّنَا اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ فِى الطَّاعَةِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ اَىِ الْمُخْتَارِيْنَ ـ

২৪. সেই মহিলা তার কথা ভাবে, তার সাথে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করে আরও সেও তার প্রতি অনুরক্ত হয়, তার ইচ্ছা করে, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তবে সে নিশ্চয় তাতে রত হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঐ সময় তার সামনে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রতিকৃতি ভেসে উঠে। তিনি তাঁর বুক চাপড়িয়ে দেন। ফলে তাঁর আঙ্গুলের মাথা দিয়ে সম্ভোগ-লিপ্সা বের হয়ে চলে যায়। لَوْلَا [যদি না] এটার জওয়াব এ স্থানে উহ্য। উহা হলো لَجَامَعَهَا [তবে নিশ্চয় সে সঙ্গত হতো]। এভাবে আমি তাকে নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়েছিলাম তার থেকে মন্দকর্ম বিশ্বাসভঙ্গ করা ও অশ্লীলতা ব্যভিচার বিদূরিত করে রাখার উদ্দেশ্য। সে ছিল আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। اَلْمُخْلَصِيْنَ-অপর এক কেরাতে তার ل অক্ষরটিতে ফাতহাসহ اَلْمُخْلَصِيْنَ রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থ, আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

২৫. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ بَادِرًا اِلَيْهِ يُوْسُفُ لِلْفِرَارِ وَهِىَ لِلتَّشَبُّثِ بِهِ فَاَمْسَكَتْ ثَوْبَهُ وَجَذَبَتْهُ اِلَيْهَا وَقَدَّتْ شَقَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا وَجَدَا سَيِّدَهَا زَوْجَهَا لَدَا الْبَابِ ط فَنَزَهَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا زِنًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَىْ يُحْبَسَ فِى السِّجْنِ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِاَنْ يُّضْرَبَ ـ

২৫. তারা উভয়েই দরজার দিকে দৌড়ে গেল। হযরত ইউসুফ (আ.) পালাতে ছুটলেন আর ঐ মেয়েটি তাঁকে জড়িয়ে ধরতে গেল। সে পিছন দিক হতে তাঁর কাপড় ধরে নিজের দিকে টান দিল। এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল আর তারা তার সর্দারকে অর্থাৎ যুলায়খার স্বামীকে দরজার নিকট পেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করে বলল, যে ব্যক্তি তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে ব্যভিচার করতে চায় তাকে কারাগারে প্রেরণ জেলে বন্দী করে রাখা বা প্রহার করত মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি দান ব্যতীত তার জন্য আর কি দণ্ড হতে পারে? اِسْتَبَقَا। অর্থ– তারা উভয়ে দৌড়াল। قَدَّتْ অর্থ– ছিঁড়ে ফেলল। اَلْفَيَا অর্থ– তারা উভয়েই পেল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٦. قَالَ يُوْسُفُ مُتَبَرِّئًا هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ اَهْلِهَا ج اِبْنُ عَمِّهَا رُوِيَ اَنَّهُ كَانَ فِي الْمَهْدِ فَقَالَ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ قُدَّامٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ.

২৬. হযরত ইউসুফ নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে বলল, সেই আমাকে ফুসলিয়েছিল। ঐ স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী তার চাচাতো ভাই বর্ণিত আছে যে, সে তখন দোলনার শিশু ছিল, সাক্ষ্য দিল। বলল, যদি তার জামার সম্মুখে ভাগ ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য বলেছে আর সে [হযরত ইউসুফ (আ.)] মিথ্যাবাদীর অন্তর্ভুক্ত। قُبُلٌ অর্থ– সম্মুখে ভাগ

٢٧. وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ خَلْفٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

২৭. আর তার জামা যদি পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলেছে আর সে [হযরত ইউসুফ (আ.)] সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। دُبُرٌ অর্থ– পিছনের দিক।

٢٨. فَلَمَّا رَاٰ زَوْجُهَا قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ اَيْ قَوْلُكِ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ الخ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط اِنَّ كَيْدَكُنَّ اَيَّتُهَا النِّسَاءُ عَظِيْمٌ

২৮. স্ত্রীলোকটির স্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে তখন সে বলল, এটা অর্থাৎ কি দণ্ড হবে? তোমার এ কথা বলা তোমরা নারীদের ছলনা। হে নারী জাতি! তোমাদের ছলনা ভীষণ!

٢٩. ثُمَّ قَالَ يَا يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ وَلَا تَذْكُرْهُ لِئَلَّا يَشِيْعَ وَاسْتَغْفِرِيْ يَا زُلَيْخَا لِذَنْبِكِ ج اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ الْاٰثِمِيْنَ

২৯. অতঃপর সে বলল, হে ইউসুফ! এটা অর্থাৎ এই ব্যাপারটিকে উপেক্ষা কর। কাউকেও এটা বলো না, এটা যেন প্রচার না হয়। আর হে যুলায়খা! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমিই অপরাধীদের পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقَالَ : وَاو হলো عَاطِفَة আর عَلَيْهِ مَعْطُوْف হলো فَاشْتَرَاهُ عَزِيْزُ مِصْرَ অর্থাৎ وَقَالَ لِامْرَاَتِهِ আর الَّذِيْ اشْتَرَاهُ হলো قَالَ -এর ফায়েল। আর مِنْ مِصْرَ এটা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে فَاعِلْ থেকে حَالْ হয়েছে। আবার কেউ কেউ مِصْرَ শব্দের পূর্বে اَهْل -কে উহ্য মেনেছেন। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, الَّذِيْ اشْتَرَاهُ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ আবার কেউ কেউ مِنْ –কে فِيْ অর্থে নিয়েছেন অর্থাৎ اِشْتَرَاهُ فِيْ مِصْرَ এ সুরতে কোনো اِلْتِبَاسْ থাকে না। –[মাজেদী] لِامْرَاَتِهِ হলো قَالَ -এর مُتَعَلِّقْ আর اَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ হলো مَقُوْلَهْ -

قَوْلُهُ قِطْفِيْر : এটা قِنْدِيْل -এর ওযনে মিশরের ধনাগারের মন্ত্রীর নাম। তার উপাধি হলো 'আজীজ''।

قَوْلُهُ اَكْرِمِيْ مَقَامَهُ عِنْدَنَا : অর্থাৎ তাকে নিজেদের নিকট ইজ্জত ও সম্মানের সাথে রাখ।

قَوْلُهُ حَصُوْرًا : এটা মুবলাগার সীগাহ, অর্থ হলো– সহবাসে অক্ষম ব্যক্তি।

قَوْلُهُ لِنُعَلِّمَهُ :এটা মুযারে'-এর সীগাহ, যা لَامْ-এর পরে اَنْ উহ্য থাকার কারণে মানসূব হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) لِنُعَلِّمَهُ-এর মধ্যে দুটি তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম হলো وَاوْ টা আতেফা হবে, এ সুরতে উহ্য ইবারত হবে–

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ مَكَّنَّاهُ فِي الْأَرْضِ لِنُمَلِّكَهُ مَا فِيهَا এ সুরতে لِنُعَلِّمَهُ-এর আতফ উহ্য لِنُمَلِّكَهُ-এর উপর হবে। মুফাসসির (র.) -এর উক্তি عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ-এর উদ্দেশ্য এটাই। দ্বিতীয় সুরত হলো واو টি অতিরিক্ত হবে। এ সুরতে উহ্য ইবারত হবে- مَكَّنَّاهُ فِي الْأَرْضِ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ যদি نُمَلِّكَهُ টি مِلْكٌ [মীমের নিচে যের] হতে নির্গত হয় তবে অর্থ হবে যাতে আমি তাকে মালিক বানাই। আর যদি مُلْكٌ [بِضَمِّ الْمِيْمِ] নির্গত হয় তবে অর্থ হবে- যাতে করে তাকে বাদশাহ বানাই। (جُمَلٌ)

قَوْلُهُ أَشُدَّهُ : এটা একবচন তবে বহুবচনের ওযনে হয়েছে।

সতর্কীকরণ : জালালাইনের নোসখায় لِنُمَكِّنَهُ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ ইবারত হবে- لِنُمَلِّكَهُ

قَوْلُهُ رَاوَدَتْهُ : সেই নারী তাকে প্রবঞ্চিত করল। এটা مَاضِيْ-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ। আর ه যমীর হলো وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর।

قَوْلُهُ طَلَبَتْ مِنْهُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে مُفَاعَلَةْ থেকে হলেও একদিকের জন্য হবে।

قَوْلُهُ هَيْتَ لَكَ : এ বাক্যটি দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত। একটি হলো هَيْتَ আর অপরটি হলো لَكَ আর هَيْتَ টা اِسْمُ فِعْلٍ যা اُقْبُلْ-এর অর্থে হয়েছে। অর্থ আস। আর لَكَ-এর لَامْ টি হলো حَرْفُ جَارْ আর كَافْ হলো مَجْرُوْر ; جَارْ مَجْرُوْرْ মিলে উহ্য اَمْر-এর ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। এর অর্থ হলো আমি তোমাকেই বলতেছি যে, দ্রুত আস। (رُوْح)

سِرَاجْ-এর মধ্যে খতীব লিখেছেন যে, هَيْتَ لَكَ পুরোটাই اِسْمُ فِعْلٍ এটা هَلُمَّ-এর অর্থে হয়েছে। যার অর্থ হলো- আস। আর هَيْتَ-এর تَاءْ বর্ণে তিন প্রকার اِعْرَابْ-ই রয়েছে। لَكَ-এর মধ্যে لَامْ-টি مُخَاطَبْ-এর ব্যাখ্যার জন্য। অর্থাৎ هَيْتَ-এর মধ্যে যে مُخَاطَبْ রয়েছে তাকে لَكَ দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে كَافْ مُخَاطَبْ-এর প্রয়োজন না হওয়ার কারণে শুধুমাত্র সুস্পষ্ট করার জন্যই নেওয়া হয়েছে। কেননা هَيْتَ-এর অর্থ যা, তাই هَيْتَ لَكَ-এর অর্থও; যেমন سُقْيًا لَكَ বলে থাকে। অথচ سَقْيًا-এর كَافْ خِطَابْ-এর প্রয়োজন নেই। কেননা سَقْيًا-এর অর্থ এবং سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا-এর অর্থ হুবহু একই অর্থ لَكَ-কে শুধুমাত্র تَاكِيْدْ বৃদ্ধি করার জন্যই নেওয়া হয়েছে। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِيْ)

قَوْلُهُ مَعَاذَ اللّٰهِ : এটা عَاذَ يَعُوْذُ-এর একটি মাসদার।

قَوْلُهُ وَجَوَابُ لَوْلَا لَجَامَعَهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَوْلَا-এর জবাব উহ্য রয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত هَمَّ بِهَا নয়। কেননা لَوْلَا-এর জবাব لَوْلَا-এর উপর مُقَدَّمْ হয় না।

قَوْلُهُ اَرَيْنَاهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِذٰلِكَ উহ্যের মাফউল হওয়ার কারণে نَصَبْ-এর স্থানে হয়েছে। অর্থাৎ اَرَيْنَاهُ كَذٰلِكَ আর لِنَصْرِفَ-এর لَامْ টা উহ্য اَرَيْنَا-এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রাথমিক জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কাফেলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন তার ভাইয়েরা তাঁকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমত তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকাপয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোনো রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তাফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছু দূর পর্যন্ত কাফেলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল, দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না; বরং বেঁধে রাখ। এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা অজ্ঞ কাফেলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কুরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বুঝা যায়, তার বেশি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণত কাফেলার বিভিন্ন মঞ্জিল

Free@www.e-ilm.weebly.com

অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌছা, সেখানে পৌছে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে– وَقَالَ الَّذِىْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَأَتِهٖ اَكْرِمِىْ مَثْوَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল ইউসুফ-এর বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগনাভি এবং সমপরিমাণ রেশমি বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা এ রত্ন আজীজে মিসরের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কুরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোনো দৈবাৎ ঘটনা নয়; বরং বিশ্বপালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে কাছীর বলেন, যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম 'কিতফীর' কিংবার 'ইতফীর' বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি 'রাইয়ান ইবনে ওসায়দ'। তিনি পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। –[মাযহারী] ক্রেতা আজীজে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল 'রাইল' কিংবা 'জুলায়খা' আজীজে মিসর 'কিতফীর' হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন: তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও; ক্রীতদাসের মতো রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। **প্রথম.** আজীজে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলি অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরিউক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। **দ্বিতীয়.** হযরত শো'আয়ব (আ.)-এর ঐ কন্যা, যে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল يَا اَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ পিতা! 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।' তৃতীয়. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক যিনি ফারুকে আজম (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেছিলেন। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ : অর্থাৎ এমনভাবে আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এখন ক্রীতদাসের বেশে আজীজে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্ব প্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

قَوْلُهٗ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ : এখানে শুরুতে وَاوْ কে عَطْف -এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ্য মেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরিউক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরি জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সব কিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

قَوْلُهٗ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا : অর্থাৎ যখন হযরত ইউসুফ (আ.) পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন' কোন বয়সে অর্জিত হলো, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রা.) বলেন, তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহহাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুয়ত দান করা। এতে আরও জানা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

গেল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)- মিসর পৌছারও অনেক পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুয়তের ওহী ছিল না; বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গম্বর নয় এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায় যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ : আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌছানো ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সদাচরণ, আল্লাহ ভীতি ও সৎ কর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে। وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে হযরত ইউসুফ (আ.) থাকতেন, সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল, শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আজীজে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কুরআন 'আজীজ পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গুনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেন নি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গাম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং জুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আজীজে মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণ প্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং জুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েক দিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশি স্বীকার করা দরকার।

এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) আজীজে মিসরকে স্বীয় 'রব' পালনকর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ এধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোনো দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোনো প্রভু স্বীয়দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে চিত্রনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর اِنَّهٗ رَبِّىْٓ 'তিনি আমার পালনকর্তা বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে اِنَّهٗ শব্দের সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)–আল্লাহকেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল, তোমার মাথার চুল কত সুন্দর! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর জুলায়খা বলল, তোমার নেত্রদ্বয় কতই না

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মনোহর! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। জুলায়খা আরও বলল, তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশি প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগবিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আজীজে মিসরের স্ত্রী জুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হলো এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল; কিন্তু ইজ্জতের মালিক আল্লাহ এ সৎ যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, জুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঠিক সেই মূহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

এ আয়াতে هَمَّ শব্দটি [কল্পনা অর্থে] যুলায়খা ও হযরত ইউসুফ (আ.) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا একথা সুনিশ্চিত যে, জুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থি। কেননা সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গাম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গুনাহ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশত কোনোরূপেই হতে পারে না। তবে সগীরা গুনাহ অনিচ্ছা ও ভুলবশত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেওয়া হয় না; বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গাম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া পরিণত ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরি। কেননা যদি পয়গাম্বরগণের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাঁদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোনো উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোনো উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই গুনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

তাই, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া গেছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনে যে কল্পনা ছিল তা পাপ পর্যায়ের ছিল না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, আরবি ভাষায় هَمَّ শব্দটি দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়। **এক.** কোনো কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করে ফেলা। **দুই.** শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া। প্রথমোক্ত প্রকারটি পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা ও সংকল্পের পর একমাত্র আল্লাহর ভয়ে কেউ এ গুনাহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এ গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দেন। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া এবং তা কার্যে করার ইচ্ছা মোটেই না থাকা। যেমন, গ্রীষ্মকালীন রোজায় পানির দিকে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক প্রায় সবারই জাগ্রত হয় অথচ রোজা অবস্থা হওয়ার ফলে তা পান করার ইচ্ছা মোটেই জাগ্রত হয় না। এই প্রকার কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এ জন্য কোনো শাস্তি বা গুনাহ নেই।

সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না। -[তাফসীরে কুরতুবী]

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা যখন কোনো সৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎ কাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোনো পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে তখন, পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপ কাজটি করেই ফেলে, তবে একটি গুনাহ লিপিবদ্ধ কর। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

তাফসীরে কুরতুবীতে উপরিউক্ত দু' অর্থে هَمَّ শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে আরবদের প্রচলিত বাকপদ্ধতি ও কবিতার সাক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এতে বুঝা গেল যে, আয়াতে যদিও هَمّ শব্দটিকে জুলায়খা ও হযরত ইউসুফ (আ.) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তবুও উভয়ের هَمّ অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। প্রথমটি গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি অনিচ্ছাকৃত ধারণা, যা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গিও এ দাবির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা উভয়ের কল্পনা যদি একই প্রকার হতো, তবে এ ক্ষেত্রে تَثْنِيَةٌ তথা দ্বিবাচক পদ ব্যবহার করে وَلَقَدْ هَمَّا বলা হতো, যা সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা ছেড়ে উভয়ের কল্পনা পৃথক পৃথক বর্ণনা করে هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا বলা হয়েছে। জুলায়খার কল্পনার সাথে তাকিদের শব্দ لَقَدْ যোগ করা হয়েছে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর هَمّ ও কল্পনার সাথে তা যোগ করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, জুলায়খার কল্পনা এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কল্পনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সমীপে আরজ করল, আপনার এ খাঁটি বান্দা পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, অপেক্ষা কর। যদি সে এ গুনাহ করে ফেলে, তবে যেরূপ কাজ করে, তদ্রূপই তার আমলনামায় লিখে দাও; আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা সে একমাত্র আমার ভয়ে স্বীয় খাহেশ পরিত্যাগ করেছে। এটা খুব বড় নেকী। -[তাফসীরে কুরতুবী]

মোটকথা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ স্থলে একথাও বলেছেন যে, আয়াতের বাক্যাংশে অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ : অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হতো যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তাফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তী বাক্য হচ্ছে لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ এখানে এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণাও অন্তরে থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল? কুরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মোজেজা হিসাবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুঁশিয়ার করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আজীজে মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কুরআন পাকের এ আয়াতে লিখিত দেখলেন।

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা এটা খুবই নির্লজ্জতা, [আল্লাহর শাস্তির কারণ] এবং [সমাজের জন্য] অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন জুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিকে জুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গুনাহ করার মতো সাহস আমার নেই। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমার উপাস্য আরও বেশি লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারও কারও মতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নবুয়ত ও বিভুজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তার প্রমাণ।

তাফসীরবিদ ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন, কুরআন পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কিছু বস্তু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালঙ্ঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরীত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল। তাফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর যে কোনো একটাই হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

Free@www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ : অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ.)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গুনাহ এবং 'নির্লজ্জলতা' বলে কবীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। −[তাফসীরে মাযহারী]

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানো কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নবুয়তের কারণে এ গুনাহ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে আবেষ্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কুরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) কোনো সামান্যতম গুনাহেও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হতো যে, আমি হযরত ইউসুফকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম এভাবে বলা হতো না যে, গুনাহকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। এখানে مُخْلَصِيْنَ শব্দটির লামের যবর-যোগে مُخْلَص -এর বহুবচন; এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার ঐ সব বান্দার অন্যতম, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ রিসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এমন লোকদের চারপাশে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ মনোনীত বান্দাদের উপর তার কলাকৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ আপনার ইজ্জত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করবই, তবে যে সব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি مُخْلِصِيْنَ লামের যের-যোগেও পঠিত হয়েছে। مُخْلِص ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে, এতে কোনো পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দ سُوْء ও فَحْشَاء ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। فَحْشَاء শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা। এর দ্বারা কবীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। এতদ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)−কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গুনাহ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি যে هَمّ অর্থাৎ কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোনো প্রকারের গুনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মাফ।

قَوْلُهُ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আজীজে-মিসরের পত্নী যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গাম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোনো এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোনো আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এ নির্জন কক্ষে আল্লাহর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজীজ পত্নী তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। ইত্যবসরে হযরত ইউসুফ (আ.) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে জুলায়খাও তথায় উপস্থিত হলো। ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) দৌড়ে দরজায় পৌছতেই আপনা-আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আজীজে-মিসরকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)−এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্য বলল, যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোনো কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন, هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي অর্থাৎ সেই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আজীজে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে স্বাভাবত কথা বলতে অক্ষম এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের একটি অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে হযরত মূসা (আ)-কে শৈশবে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনি ভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কারও ধারণা ছিল যে, সে এসব কার্যকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বে প্রত্যেকটি অণু-পরামাণু তাঁর গুপ্ত পুলিশ [গোয়েন্দা বাহিনী]। এরা অপরাধীকে ভালোভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব কিতাবের সময় মানুষ দুনিয়ার পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী যখন স্বীয় অরপাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনোটিই তার আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন পুলিশ বাহিনী।

মোটকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশু বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মোজেজা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আজীজে-মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে দোদুল্যমান

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নির্দোষ এবং দোষ জুলায়খার, তবে তাও একটি মোজেজারূপে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটি দেখ যদি তা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে জুলায়খার কথা সত্য এবং হযরত ইউসুফ (আ.) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোনো আশঙ্কাই নেই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পলায়নরত ছিলেন এবং জুলায়খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়া এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাকে আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা চারটি শিশুকে দোলনায় বাকশক্তি দান করেছেন। এ শিশু চতুষ্টয় তারাই, যাদের কথা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে 'সাক্ষ্যদাতা'র অন্যান্য ব্যাখ্যাও বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে জারীর ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মোটকথা, এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, জুলায়খা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ থেকে এ বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা প্রকাশ করলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটি দেখা হোক। যদি তা পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে তা এ বিষয়ের পরিষ্কার আলামত যে, তিনি পলায়ন করেছিলেন এবং জুলায়খা তাঁকে ধরার চেষ্টা করছিল। কাজেই হযরত ইউসূফ (আ.) নির্দোষ।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আজীজে -মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক তথা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ জুলায়খার এবং হযরত ইউসুফ (আ.) পবিত্র। তদনুসারে সে জুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল, নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বুঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাব বশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে। −[তাফসীরে মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর। কেননা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ অর্থাৎ তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখানে সব নারী বুঝানো হয়নি; বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছলচাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আজীজে-মিসর জুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলল يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا অর্থাৎ ইউসুফ এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না। যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর জুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ অর্থাৎ ভুল তোমারই। তুমি নিজ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত বুঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছ।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তার উত্তেজিত না হওয়া এবং পূর্ণ ধীরতা ও স্থিরতা সহকারে কথাবার্তা বলা মানবস্বভাবের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর কারণ হয়তো এই যে, আজীজে-মিসরের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলতে কোনো কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভবপর যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে গুনাহ থেকে অতঃপর বদনামী থেকে বাঁচাবার জন্য যে অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই অংশ হিসেবে আজীজে মিসরকে ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেননি। নতুবা সহজাত অভ্যাস অনুযায়ী এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করেই ধৈর্য হারা হয়ে পড়ে এবং মারপিট শুরু করে দেয়। মৌখিক গালিগালাজ তো মামুলী বিষয়। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী যদি আজীজে-মিসর উত্তেজিত হয়ে যেত, তবে তার মুখ কিংবা হাত দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে মর্যাদাহানিকর কোনো কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এটা আল্লাহর কুদরতেরই লীলা। তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের পদে পদে হেফাজত করেন। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

পরবর্তী আয়াতসমূহে অন্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যা পরবর্তী কাহিনীর সাথেই সংশ্লিষ্ট। তা এই যে, এ ঘটনা গোপন করা সত্ত্বেও শাহী দরবারের পদস্থ ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তারা আজীজে-মিসরের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এরূপ মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবাই ছিল আজীজে-মিসরের নিকটতম কর্মকর্তাদের স্ত্রী। −[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল দেখ, কেমন বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়। আজীজে-মিসরের বেগম এত বড় পদমর্যাদা সত্ত্বেও নিজের তরুণ ক্রীতদাসের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তাঁর দ্বারা কুমতলব চরিতার্থ করতে চায়! আমরা তাকে নিদারুণ পথভ্রষ্ট মনে করি। আয়াতে فَتًى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তরুণ। সাধারণের পরিভাষায় অল্পবয়স্ক ক্রীতদাসকে গোলাম, যুবক ক্রীতদাসকে فَتًى এবং যুবতী ক্রীতদাসীকে فَتَاةٌ বলা যায়। এখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জুলায়খার ক্রীতদাস বলার কারণ হয়তো এই যে, স্বামীর জিনিসকেও স্ত্রীর জিনিস বলার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে অথবা জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বামীর কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল। −[তাফসীরে কুরতুবী]

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

৩০. وَاشْتَهَرَ الْخَبَرُ وَشَاعَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ مِصْرَ اِمْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَبْدَهَا عَنْ نَفْسِهِ ج قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا تَمْيِيْزٌ اَيْ دَخَلَ حُبُّهُ شِغَافَ قَلْبِهَا اَيْ غِلَافَهُ اِنَّا لَنَرٰهَا فِيْ ضَلٰلٍ خَطَاٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ بِحُبِّهَا اِيَّاهُ.

৩০. এই ঘটনাটি প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভ করে : তখন নগরের মিসর নগরের কিছু নারী বলল, আযীযের অর্থাৎ মিসর সম্রাটের সভাসদের স্ত্রী তার যুবকটির উপর অর্থাৎ দাসটিকে নিজের প্রতি ফুসলায়। প্রেম তার অন্তস্থলে স্থান করে নিয়েছে। আমরা তো তাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে অর্থাৎ একে ভালোবাসার মধ্যে সে স্পষ্ট ভুলে নিপতিত দেখতেছি। حُبًّا এটা এই স্থানে تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। شَغَفَهَا حُبًّا-অর্থ, ভালোবাসা তার অন্তরের আবরণের ভিতর গিয়ে ঢুকে গেছে شِغَاف -অর্থ আবরণ

৩১. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ غِيْبَتِهِنَّ لَهَا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ اَعَدَّتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً طَعَامًا يُقْطَعُ بِالسِّكِّيْنِ لِلْاِتِّكَاءِ عِنْدَهُ وَهُوَ الْاُتْرُجُّ وَاٰتَتْ اَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتِ لِيُوْسُفَ اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَاَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ اَعْظَمْنَهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ز بِالسَّكَاكِيْنِ وَلَمْ يَشْعُرْنَ بِالْاَلَمِ لِشُغْلِ قَلْبِهِنَّ بِيُوْسُفَ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهُ مَا هٰذَا اَيْ يُوْسُفُ بَشَرًا ط اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ لِمَا حَوَاهُ مِنَ الْحُسْنِ الَّذِيْ لَا يَكُوْنُ عَادَةً فِي النَّسَمَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَفِي الصَّحِيْحِ اَنَّهُ اُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ .

৩১. ঐ নারী যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তার নিন্দা শুনল তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য এমন আহার প্রস্তুত করল اَعْتَدَتْ অর্থ প্রস্তুত করল مُتَّكَاً -এমন আহার যা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়। কেননা সেই সময় হেলান দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এটার শাব্দিক অর্থ হলো, যাতে হেলান দেওয়া হয়। যা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়। এটা ছিল লেবু জাতীয় ফল বিশেষ। আর তাদের প্রত্যেকের নিকট একটি করে ছুরি আনল অর্থাৎ প্রত্যেককে ছুরি দিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলল, 'তাদের সম্মুখে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন একে বিরাট বলে মনে করল দারুণ বলে মনে করল এবং ছুরি দিয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলল হযরত ইউসুফ (আ.) কে দেখে তাদের মন এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তাতে ব্যথাও টের পেল না। বলল, আল্লাহর অপূর্ব লীলা! সকল মাহাত্ম ও পবিত্রতা তাঁরই, এ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) তো মানুষ নয়। এতো মহিমান্বিত এক ফেরেশতা। কারণ তার মধ্যে সুন্দরের এত সমাবেশ যে, সাধারণত মানুষ জাতির মধ্যে তা হয় না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে সমস্ত সৌন্দর্যের অর্ধাংশ প্রদান করা হয়েছিল।

৩২. قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيْزِ لَمَّا رَأَتْ مَا حَلَّ بِهِنَّ فَذٰلِكُنَّ فَهٰذَا هُوَ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ط فِيْ حُبِّهِ بَيَانٌ لِعُذْرِهَا وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ اِمْتَنَعَ

৩২. আযীয বা মিসর সম্রাটের ঐ সভাসদের স্ত্রী তাদের অবস্থা দেখে বলল, এই সে যার বিষয়ে যার ভালোবাসার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে নিন্দা করেছ। এই বাক্যটি ঐ স্ত্রীলোকটির কৈফিয়তের বিবরণস্বরূপ। আমি তো আমার সম্পর্কে তাকে খুবই ফুসলিয়েছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, তা হতে নিজকে বিরত রেখেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ بِهٖ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ الذَّلِيْلِيْنَ فَقُلْنَ لَهٗ اَطِعْ مَوْلَاتَكَ .

আমি তাকে যার আদেশ করতেছি সে যদি তা না করে তবে অবশ্যই তাকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে নীচদিগের হেয়দিগের অন্তর্ভুক্ত হবে। তখন ঐ আমন্ত্রিত মহিলারাও তাঁকে তাঁর মালিক স্ত্রীলোকটির কথা মেনে নিতে বলে।... ذَالِكُنَّ الَّذِىْ - এই সে যার সম্পর্কে....

٣٣. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ ج وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اَمِلْ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ اَصِرْ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ وَالْقَصْدُ بِذٰلِكَ الدُّعَاءُ فَلِذَا قَالَ تَعَالٰى .

৩৩. সে হযরত ইউসুফ (আ.) বলল, হে আমার 'রব, এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করতেছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব ঝুঁকে পড়ব এবং অজ্ঞদের পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। এই বক্তব্য দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দরবারে নিজের অবস্থা সম্পর্কে দোয়া করা। তাই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতটিতে ইরশাদ করেন-

٣٤. فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ دُعَاءَهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ .

৩৪. অতঃপর তার প্রতিপালক তার প্রার্থনা কবুল করে নিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি নিশ্চয় কথা শুনেন, আর সকল কাজ সম্পর্কে জানেন।

٣٥. ثُمَّ بَدَا ظَهَرَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ الدَّالَّاتِ عَلٰى بَرَاءَةِ يُوْسُفَ اَنْ يَّسْجُنُوْهُ دَلَّ عَلٰى هٰذَا لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى اِلٰى حِيْنٍ يَنْقَطِعُ فِيْهِ كَلَامُ النَّاسِ فَسُجِنَ .

৩৫. অনন্তর নিদর্শনাদি দেখার পরও অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নির্দোষিতার প্রমাণ দেখার পরও তাদের নিকট স্পষ্ট হলো, এই কথা তাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল যে, তাকে কারারুদ্ধ করতে হবে। এ কথার প্রমাণ হলো পরবর্তী বাক্য لَيَسْجُنُنَّهٗ নিশ্চয়ই তাকে তারা কিছুকালের জন্য কারাগারে দিবে। যাতে এই বিষয়ে মানুষের আলোচনা-সমালোচনা বন্ধ হয়ে যায়। অনন্তর তাকে কারা রুদ্ধ করা হলো حِيْنٍ -এটার পূর্বে একটি اِلٰى [পর্যন্ত] উহ্য রয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য এটার তাফসীরে اِلٰى -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ نِسْوَةٌ : অর্থ মহিলাদের দল, এটা اِسْمِ جَمْعٍ এই শব্দের একবচন নেই। আর অর্থের হিসেবে اِمْرَأَةٌ এর একবচন। نِسْوَةٌ হলো مُؤَنَّثْ غَيْر حَقِيْقِىْ এর ফে'ল مُذَكَّرْ এবং مُؤَنَّثْ উভয়টি নেওয়াই বৈধ। এ কারণেই قَالَتْ -এর পরিবর্তে قَالَ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهٗ مَدِيْنَةِ مِصْرَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْمَدِيْنَةُ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ -টি عَهْدِىْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِمْرَأَةُ الْعَزِيْزِ : এটা হলো মুবতাদা আর تُرَاوِدُ হলো তার খবর, تُرَاوِدُ টা বাবে مُفَاعَلَةٌ হতে মুযারে' -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ হলো সে প্রবঞ্চিত করে, ফুসলায়।

قَوْلُهٗ تَمْيِيْزٌ : এটা একটি আপত্তির জবাব, যে, شَغَفَ টা مُتَعَدِّىْ بَيَكْ مَفْعُوْلْ হয়ে থাকে। অথচ এখানে তার দুটি মাফঊল হয়েছে একটি হলো هَا অপরটি হলো حُبًّا

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উত্তর. হলো حُبًّا টা হলো تَمْيِيْز এটা মাফউল নয়। এটা ফায়েল হতে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে। মূল ইবারত এরূপ ছিল যে, دَخَلَ حُبُّهُ فِيْ شِغَافِ قَلْبِهَا

قَوْلُهُ شِغَافُ : شِغَافُ الْقَلْبِ বলা হয় ঐ ঝিল্লি বা চামড়ার পাতলা আবরণ কে যা অন্তকরণকে বেষ্টন করে রাখে।

قَوْلُهُ اَعْتَدَتْ : এ শব্দটি اِعْتَادٌ থেকে مَاضِيْ-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ, অর্থ তৈরি করা।

قَوْلُهُ مُتَّكَأ : এটা اِسْمُ مَكَانْ অর্থ হেলান দেওয়ার স্থান, মসনদের উপর রক্ষিত বালিশ, মসনদ। আরবগণ مُتَّكَأً বলতে সেই বস্তুকে বুঝিয়ে থাকেন, যাতে খাওয়া দাওয়া ও কথাবার্তা বলার সময় হেলান দেওয়া হয়। ইমাম রাযী (র.) বলেন, ঐ খাবার কে বলা হয় যা খেতে ছুরির প্রয়োজন হয়ে থাকে। [তাফসীরে কাবীর]

বর্তমান কালে যেরূপভাবে খাওয়ার জন্য চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়। অনুরূপ ভাবে পূর্ববর্তী সভ্যতায় দস্তর খানের আশে পাশে বালিশের ব্যবস্থা করা হতো। এবং বর্তমানে যেভাবে টেবিল লাগানো ও দস্তরখানা বিছানোর দ্বারা খানা নির্বাচন/তৈরি করা উদ্দেশ্য হয় আর টেবিল বা দস্তরখানে বসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খাওয়ার জন্য বসা। অনুরূপভাবে তৎকালে মসনদে বালিশ স্থাপন করা দ্বারা খানা খাওয়ার জন্য বসা উদ্দেশ্য হতো। جَمِيْل-এর কবিতাটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

فَظَلَلْنَا بِنِعْمَةٍ وَاتَّكَأْنَا * وَشَرِبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلَلِهِ

অর্থ আমরা আনন্দে আহলাদে দিনাতিপাত করেছি এবং খাদ্য গ্রহণ করেছি এবং মটকা থেকে বের করে শারাব পান করেছি।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) مُتَّكَأً-এর তাফসীর করেছেন طَعَامًا يُقْطَعُ بِالسِّكِّيْنِ দ্বারা। এটা ইমাম রাযী (র.)-এরও অভিমত। কিন্তু এরপর وَهُوَ الْاُتْرُجُّ বাক্যটি লিখে দেওয়া হয়েছে। আল্লাম সুয়ূতী (র.) وَهَبْ-এর অনুসরণে এরূপ করেছেন। আবূ ওবায়দা ও অন্যান্য ভাষা পণ্ডিতগণ এটাকে অস্বীকার করেছেন। কেননা কমলা লেবুকে مُتَّكَةٌ বা مُتْكٌ বলা হয়। ضَرَارْ بِنْ نَهْشَلْ ও مُتَّكَةٌ অর্থ কমলা লেবু করেছেন فَاَهْدَتْ مُتَّكَةً لِبَنِيْ اَبِيْهَا [সে তার চাচাতো ভাইদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ কমলা লেবু প্রেরণ করেছেন। [লোগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ لِلْاِتِّكَاءِ : এর মাধ্যমে খাবার কে مُتَّكَأً বলার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু আরবগণ খাওয়ার সময় হেলান দিত এই মুনাসাবাতের কারণেই اِسْتِعَارَةٌ-এর ভিত্তিতে খাবার কে مُتَّكَأً বলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ حَاشَ لِلّٰهِ : এখানে হলো حَاشَا حَرْفُ تَنْزِيْهٍ এই সময় এটা اِسْمٌ হবে। আর এর ব্যবহার اِسْتِثْنَاءٌ-এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। ঐ সময় حَرْف হবে।

قَوْلُهُ بَيَانٌ لِعُذْرِهَا : এটা হলো তার জবাব যে, মিশরীয় নারীদের তো এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েই গিয়েছিল যে, আজীজের স্ত্রী তার ভৃত্যের উপর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছেন। তদুপরি فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ এটাই তো সেই বস্তু যার ব্যাপারে তোমরা আমার তিরস্কার করছ।

উত্তর. জবাবের সারকথা হলো এই যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য খবর দেওয়া নয়; বরং স্বীয় অপারগতা ও অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করা যে, যাকে তোমরা এক পলক দেখেই হতবাক হয়ে গেলে এবং হস্ত কর্তন করে ফেলেছ, তাহলে এখন তোমরা বল যে, সে যখন সর্বদা আমার সাথে আমার ঘরেই অবস্থান করে তবে আমার অবস্থা কিরূপ হবে? কাজেই এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে অক্ষম মনে কর।

قَوْلُهُ بِهِ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. প্রশ্ন হলো এই যে, اٰمُرُهُ-এর যমীর প্রকাশ্যত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। যদি ব্যাপারটি এরূপই হয় তবে مَا نِےْ مَوْصُوْلَة টা عَائِدْ বিহীন থেকে যাবে।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো اٰمُرُهُ-এর যমীর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দিকে ফিরেনি; বরং مَا نِےْ مَوْصُوْلَة -এর দিকে ফিরেছে। আর মূলে ছিল اٰمُرُ بِهِ এখানে بَاءٌ কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমন اَمَرْتُكَ الْخَيْرَ মূলে ছল اَمَرْتُكَ بِالْخَيْرِ

قَوْلُهُ لَهُمْ : অর্থাৎ لِلْعَزِيْزِ وَاَهْلِهِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَنْ يَّسْجُنُوْهُ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন হলো এই যে, بَدَا হলো ফে'ল এর فَاعِل হলো لَيَسْجُنُنَّهُ অথচ ফে'ল ফায়েল হতে পারে না? কাজেই ফে'লটা فَاعِل বিহীন থেকে গেল, যা জায়েজ নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, بَدَا-এর ফায়েল لَيَسْجُنُنَّهُ নয়; বরং فَاعِل উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَنْ يَسْجُنُوْهُ আর اَنْ يَسْجُنُوْهُ টা اَنْ مَصْدَرِيَّة-এর সাথে بِتَاوِيْلِ مَصْدَر হয়ে بَدَا-এর فَاعِل হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো بَدَا تَسْجِيْنُهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ : অর্থাৎ যখন জুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল। এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে জুলায়খা مَكْر অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যত তারা কোনো চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً : অর্থাৎ তাদের জন্য তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا : অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হলো, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হলো। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হলো। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ : অর্থাৎ এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জুলায়খা বলল, একটু বের হয়ে এসো। হযরত ইউসুফ (আ.) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

قَوْلُهُ فَلَمَّا رَاَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ .... اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ : অর্থাৎ সমাগত মহিলারা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হলো, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্যমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল হায় আল্লাহ, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়! সে তো মহানুভব ফেরেশতা! উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ জুলায়খা বলল, দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

জুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে , তখন সে তাদের সামনেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলতে লাগল, তুমি জুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোনো শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরিউক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায় যেমন يَدْعُوْنَنِيْ এবং كَيْدَهُنَّ এগুলোতে বহুবচনে কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও জুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোনো উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরজ করলেন– رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানা আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুঁকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। "আমি জেলখানা পছন্দ করি" হযরত ইউসুফ (আ.) -এর এ উক্তি বন্দি জীবন প্রার্থনা বা কামনা নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যখন হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ আপনি বলেছিলেন اَلسِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ অর্থাৎ এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোনো বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়া 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভালো মনে করি, বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহর কাছে সবরের দোয়া করার পবির্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত। –[তাফসীরে তিরমিযী]

একবার হযরত ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) আরজ করলেন, আমাকে কোনো একটি দোয়া শিক্ষা দেন। তিনি বললেন, পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া করুন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর কাছে দোয়া শিক্ষা দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

"যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবত আমি ওদের দিকে "ঝুঁকে পড়ব" হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিত্রতা জরুরি, তার পরিপন্থি নয়। কারণ এ পবিত্রতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গুনাহের কাজ মূর্খতাবশত হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ : অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখে আজীজে-মিসর ও তাঁর বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে কানাঘুষা হতে থাকে। এ কানাঘুষার অবসান করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হলো যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰى حِيْنٍ : অর্থাৎ এর পর আজীজ ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সে মতে হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٦. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ط غُلَامَانِ لِلْمَلِكِ اَحَدُهُمَا سَاقِيْهِ وَالْاٰخَرُ صَاحِبُ طَعَامِهِ فَرَاٰيَاهُ يُعَبِّرُ الرُّؤْيَا فَقَالَ لَنَخْتَبِرَنَّهُ قَالَ اَحَدُهُمَا السَّاقِيْ اِنِّيْ اَرَانِيْ اَعْصِرُ خَمْرًا ج اَيْ عِنَبًا وَقَالَ الْاٰخَرُ صَاحِبُ الطَّعَامِ اِنِّيْ اَرَانِيْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ط نَبِّئْنَا خَبِّرْنَا بِتَاْوِيْلِهِ ج بِتَعْبِيْرِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

৩৬. তার সাথে দুইজন যুবক সম্রাটের সেবক কারারুদ্ধ হলো। এদের একজন সম্রাটের পানীয় সরবরাহে অপরজন আহার সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। তারা দেখল, হযরত ইউসুফ (আ.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। তাই তারা একদিন তাকে পরীক্ষা করার জন্য একজন অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন বলল, স্বপ্নে দেখলাম, 'আমি আঙ্গুর নিংড়িয়ে মদ বের করতেছি, অপরজন অর্থাৎ আহার সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন বলল, স্বপ্নে দেখলাম, মাথায় রুটি বহন করতেছি আর তা হতে পাখি খাচ্ছে। আমাদেরকে এটার তাৎপর্য ব্যাখ্যা জানিয়ে দাও। আমরা তোমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের মধ্যে দেখতেছি। خَمْرًا -দ্বারা এই স্থানে আঙ্গুর বুঝানো হয়েছে। نَبِّئْنَا আমাদেরকে সংবাদ দাও।

٣٧. قَالَ لَهُمَا مُخْبِرًا اَنَّهُ عَالِمٌ بِتَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ فِيْ مَنَامِكُمَا اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهِ فِي الْيَقْظَةِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا تَاْوِيْلُهُ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ط فِيْهِ حَثٌّ عَلٰى اِيْمَانِهِمَا ثُمَّ قَوَّاهُ بِقَوْلِهِ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ دِيْنِ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ تَاْكِيْدٌ كٰفِرُوْنَ.

৩৭. স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানেন এই কথা জানাতে গিয়ে সে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) বলল, স্বপ্নে তোমাদেরকে খাদ্য দেওয়া হলে তার বাস্তব রূপায়ন প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্বেই আমি জাগরণে তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারি এই বিষয়ে আমার প্রভু আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এটা তা হতেই। অতঃপর তিনি তাদেরকে ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং বক্তব্যটিকে এই কথা বলে আরও শক্তিশালী করলেন যে, আমি বর্জন করে এসেছি এমন এক সম্প্রদায়ের মতবাদ ধর্ম যারা আল্লাহে ঈমান রাখে না আর পরকাল সম্পর্কেও তারা অবিশ্বাসী। بِالْاٰخِرَةِ هُمْ -এই স্থানে هُمْ শব্দটি تَاْكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٨. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ ط مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ لِعِصْمَتِنَا ذٰلِكَ التَّوْحِيْدُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ فَيُشْرِكُوْنَ ثُمَّ صَرَّحَ بِدُعَائِهِمَا اِلَى الْاِيْمَانِ.

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং হযরত ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি। আমরা যেহেতু মা'সূম ও নিষ্পাপ সেহেতু আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরিক করা আমাদের কাজ নয় উচিত নয়। এটা অর্থাৎ তাওহীদের বিশ্বাস আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অর্থৎ কাফেরগণ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না তাই তারা তাঁর সাথে শরিক করে। مِنْ شَيْءٍ এই স্থানে مِنْ-টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٣٩. فَقَالَ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ سَاكِنَيِ السِّجْنِ
ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ خَيْرٌ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ ـ

৩৯. হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে স্পষ্টভাবে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন, হে কারাসঙ্গীদ্বয়! কারা বসবাসকারীদ্বয়! বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক শ্রেয় না এক পরাক্রমশালী আল্লাহ শ্রেয়? أاَرْبَابٌ এই স্থানে تقرير অর্থাৎ বক্তব্যটি আরো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে।

٤٠. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ اِلَّآ
اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَا سَمَّيْتُمْ بِهَا
اَصْنَامًا اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
بِهَا بِعِبَادَتِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ط حُجَّةٍ
وَبُرْهَانٍ اِنْ مَا الْحُكْمُ الْقَضَاءُ اِلَّا لِلّٰهِ ط
وَحْدَهٗ اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ
التَّوْحِيْدُ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُوْنَ مَا
يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُوْنَ ـ

৪০. তাঁকে ছেড়ে তোমরা কতগুলো নামের উপাসনা করতেছ যেগুলোর তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রতিমারূপে নামকরণ করে নিয়েছে এইগুলোর উপাসনার কোনো প্রমাণ কোনো সনদ ও দলিল আল্লাহ পাঠান নি। হুকুম ফয়সালা ও বিধান একমাত্র আল্লাহরই, যিনি এক। তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত না করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন। এটাই অর্থাৎ তাওহীদই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেরগণ জানে না যে, তারা কি শাস্তির দিকে এগিয়ে চলছে। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে। اِنِ الْحُكْمُ এই স্থানে اِنْ -টি নাবোধক مَا-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤١. يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا اَىْ
السَّاقِىْ فَيُخْرَجُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَيَسْقِىْ
رَبَّهٗ سَيِّدَهٗ خَمْرًا ج عَلٰى عَادَتِهٖ هٰذَا
تَاْوِيْلُ رُؤْيَاهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُخْرَجُ بَعْدَ
ثَلَاثٍ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ
رَّاْسِهٖ ط هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَاهُ فَقَالَا مَا
رَاَيْنَا شَيْئًا فَقَالَ قُضِىَ تَمَّ الْاَمْرُ الَّذِىْ
فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ سَاَلْتُمَا عَنْهُ
صَدَقْتُمَا اَمْ كَذَبْتُمَا ـ

৪১. হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন তিন দিন পর খালাস পাবে। আর [সে] পূর্ব দায়িত্ব অনুসারে তার প্রভুকে তার মালিককে মদ্যপান করাবে। এটা হলো এই জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আর অপরজন-কেও তিন দিন পর এই স্থান হতে বের করা হবে অনন্তর তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে। এবং পাখি তার মস্তক হতে আহার করবে। এটা হলো এই জনের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এই সময় তারা দুইজন বলল, আমরা আসলে কিছুই দেখিনি। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন যে বিষয় সম্পর্কে তোমরা জানতে চেয়েছিলে প্রশ্ন করেছিলে সত্য বলে থাক বা মিথ্যা বলে থাক সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। তা শেষ হয়ে গিয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilmweebly.com

٤٢. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَيْقَنَ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا وَهُوَ السَّاقِي اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ج سَيِّدِكَ فَقُلْ لَهُ إِنَّ فِي السِّجْنِ غُلَامًا مَحْبُوسًا ظُلْمًا فَخَرَجَ فَأَنْسَاهُ أَيِ السَّاقِيَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ يُوسُفَ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَبِثَ مَكَثَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ قِيلَ سَبْعًا وَقِيلَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ

৪২. এদের মধ্যে যে জন মুক্তি পাবে বলে তাঁর ধারণা ছিল বিশ্বাস হয়েছিল, অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে যে ছিল তাকে বলল, তোমার প্রভু অর্থাৎ তোমার মালিকের নিকট আমার কথা বলিও যে, কারাগারে অন্যায়ভাবে এক গোলাম আটকা পড়ে রয়েছে। যা হোক, সে খালাস পেল কিন্তু শয়তান তাকে অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত সেই লোকটিকে তার প্রভুর নিকট তার কথা অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে কয়েক বৎসর বলা হয়, সাত বৎসর, অপর কেউ কেউ বলেন, বার বৎসর পড়ে রইলেন। لَبِثَ-অর্থ- পড়ে রইল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَسُجِنَ : এই উহ্য করণের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَاوْ-টি হলো عَاطِفَه আর উহ্যের উপর دَخَلَ-এর عَطْف হয়েছে। আর سُجِنَ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ الْمَلِكُ : এই বাদশাহর নাম ছিল রাইয়ান ইবনে ওয়ালীদ।

قَوْلُهُ أَيْ عِنَبًا : এটা مَايَؤُلُ إِلَيْهِ-এর হিসেবে مَجَازْ হয়েছে। কাজেই এই সংশয় শেষ হয়ে গেল যে, মদ নিংড়ানোর বস্তু নয়।

قَوْلُهُ مُخْبِرًا أَنَّهُ عَالِمٌ بِتَعْبِيْرِ الرُّؤْيَاءِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর জবাব প্রশ্ন অনুপাতে হয়নি।

قَوْلُهُ فِيْ مَنَامِكُمَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই তাফসীরকে রদ করা। যা কতিপয়, মুফাসসির طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ-এর তাফসীর, এমন খাবার দ্বারা করেছেন যা বন্দীদেরকে প্রদান করা হয়। কেননা এই তাফসীর অনুপাতে উভয় বন্দীদের প্রশ্ন এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উত্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা অবশিষ্ট থাকে না। কেননা প্রশ্ন স্বপ্নে খানার বস্তুর ব্যাপারে ছিল। আর উত্তর জাগ্রত অবস্থায় খাওয়ার ব্যাপারে হয়েছে।

قَوْلُهُ ذَالِكُمَا : এটা ইসমে ইশারা দূরবর্তীর জন্য হয়েছে এবং উদ্দেশ্য হলো স্বপ্নের তা'বীরের জ্ঞান।

قَوْلُهُ ذَالِكَ التَّوْحِيْدُ : اِسْم إِشَارَه بَعِيْد-এর স্থানে اِسْم إِشَارَه قَرِيْب নেওয়া উচ্চ মর্যাদা ও তাওহীদের বড়ত্বকে প্রকাশ করার জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ صَرَّحَ بِدُعَائِهِمَا إِلَى الْإِيْمَانِ : অর্থাৎ কেনায়া ইঙ্গিত রূপে তাওহীদের দাওয়াত ছিল, আর এখানে সুস্পষ্ট রূপে। কাজেই تَكْرَارْ হওয়ার প্রশ্ন রহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ صَاحِبَيْ : এটা صَاحِبٌ-এর দ্বিবচন। মূলে ছিল صَاحِبَيْنِ এটা مُنَادٰى مُضَافٌ হওয়ার কারণে শেষের نُوْن-টি পড়ে গেছে।

قَوْلُهُ بِعِصْمَتِنَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এটা বলা যে, আমাদের জন্য কাউকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা কিছুতেই উচিত নয়। এই অনুচিত ব্যাপার টি শুধু হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার পিতৃপুরুষের জন্য অনুচিত ও কদর্য নয়; বরং এটাতো সমস্ত মানুষের জন্যই অনুচিত তদুপরি ব্যাপারটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে নির্দিষ্টকরণ কিভাবে সহীহ হতে পারে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উত্তর. لِنَصْرِفَ -এর বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া হয়েছে জবাবের সারকথা হলো এই যে, কুফর ও শিরকের অনুচিত হওয়া আমাদের জন্য এ জন্য নয় যে, তা হারাম, বরং এজন্য অনুচিত যে, আমাদেরকে তাহতে পবিত্র ও সংরক্ষিত রাখা হয়েছে নবী না যারা তাদের বিপরীত। কেননা তাদেরকে কুফর থেকে পবিত্র ও সংরক্ষিত রাখা হয়নি। যদিও কুফর ও শিরককে তাদের উপরও হারাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ سَمَّيْتُمْ بِهَا : سَمَّيْتُمُوهَا-এর তাফসীর سَمَّيْتُمْ بِهَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যমীরের هَا. مَرْجِعْ হলো اَسْمَاء. কাজেই তখন অনুবাদ হবে সেই কতিপয় নাম যার তোমরা নাম রেখে দিয়েছ এমনিভাবে اَسْمَاء -এর জন্য اَسْمَاء. হওয়া আবশ্যক হয়। যা বৈধ নয়।

জবাবের সারকথা হলো এই যে, ضَمِيْر مَنْصُوْب -এর পূর্বে حَرْف جَار উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো سَمَّيْتُمْ بِهَا এটা এরূপ যেমন বলা হয়েছে যে, سَمَّيْتُهُ زَيْدًا অর্থাৎ سَمَّيْتُ زَيْدًا

قَوْلُهُ مَا يَصِيْرُوْنَ : এটা يَعْلَمُوْنَ-এর মাফউল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, কুরআন পাক ঐতিহাসিক ও কিস্‌সা কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কুরআন এবং অসংখ্য পয়গাম্বরের ঘটনাবলির মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটিই কুরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মতো ফুটে উঠা সত্ত্বেও আজীজে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা আজীজে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে কাসীর তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মকদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গাম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমতো তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হলো এবং বলল আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনোরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : কারাধ্যক্ষ কিংবা কয়েদীর মধ্যে কেউ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ করে বলল, আমরা আপনাকে খুব মহব্বত করি। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আল্লাহর কসম আমাকে মহব্বত করো না।

কারণ যখনই কেউ আমাকে মহব্বত করেছে, তখনই আমি কোনো না কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়েছি। শৈশবে ফুফু আমাকে মহব্বত করতেন। ফলে আমার উপর চুরির অভিযোগ আনা হয়। এরপর আমার পিতা আমাকে মহব্বত করেন। ফলে ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত অতঃপর গোলামি ও নির্বাসনে পতিত হয়েছি। সর্বশেষ বেগম আজীজের মহব্বতের পরিণামে এ কারাগারে পৌছেছি। −[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী।]

হযরত ইউসুফ (আ.) -এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল, আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন, তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল, আমি স্বপ্ন দেখি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল, আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কিন্তু তিনি পয়গাম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশে একটি মোজেজা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই।

বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ অর্থাৎ এটা কোনো ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মোজেজাটি নবুয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবত মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহর গুণাবলিতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়! এ সত্য ধর্মের তাওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন; কিন্তু অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহর দাস হওয়া ভালো, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ পুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছে। এরা শুধু নামসর্বস্বই অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। ওদের মধ্যে এমন কোনো সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপাস্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাজিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও ওদের আল্লাহ স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোনো নির্দেশও নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোনো প্রমাণ কিংবা সনদও নাজিল করেননি। বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর হযরত ইউসুফ (আ.) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। অপরজনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শুলে চড়ানো হবে। পাখিরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত : ইবনে কাছীর বলেন, উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাতো, সে মুক্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শুলে চড়ানো হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত হয়ে না পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে।

সর্বশেষে বলেছেন, আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমান ভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহর অটল ফয়সালা। যেসব তাফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বনোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল আমরা কোনো স্বপ্নই দেখিনি; বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এমন বাস্তবে তাই হবে যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরি করার যে গুনাহ করেছ, এখন তার শাস্তি তাই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়ও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারের কাটাতে হলো। আয়াতে بِضْعَ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায় কোনো কোনা তাফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

বিধি-বিধান ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে অনেক বিধিবিধান, মাস'আলা ও নির্দেশ জানা যায়। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।

মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার গুণ্ডা, বদমায়েশ ও অপরাধীদের আড্ডা। কিন্তু তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন যে, তারা সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাপাচারীদের সাথে দয়া ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করে তাদেরকে বশে ও আয়ত্তাধীন রাখা প্রত্যেক সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য। তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়।

মাসআলা : আয়াতের اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ বাক্য থেকে জানা গেল যে, যাদেরকে পুণ্যবান, সৎকর্মী ও সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করা হয়, স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত।

মাসআলা : যারা সত্যের দাওয়াত দেন এবং সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁদের কর্মপন্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, প্রথমে স্বীয় চরিত্রমাধুর্য এবং জ্ঞানগত ও কর্মগত পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে; যদিও এতে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতে হয় যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) এক্ষেত্রে স্বীয় মোজেজাও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে নবী পরিবারের একজন তাও প্রকাশ কছেন। এ গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ যদি জনসংস্কারের উদ্দেশ্যে হয় এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য না হয়, তবে তা কুরআনের নিষিদ্ধ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআনে বলা হয়েছে فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজের শুচিতা নিজে প্রকাশ করো না।

মাসআলা : প্রচারক ও সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় প্রচারবৃত্তিকে সব কাজের অগ্রে রাখা। প্রচারকর্মের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। কেউ তাঁর কাছে কোনো কার্যোপলক্ষে আগমন করলে তাঁর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

আসল কর্তব্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে কয়েদীরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি উত্তরদানের পূর্বে দাওয়াত এবং প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত উপহার দিলেন। এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, দাওয়াত ও প্রচার জনসভা, মিম্বর অথবা মঞ্চেই হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও একান্ত আলোচনার মাধ্যমেই বরং এ কাজ আরও বেশি কার্যকর হয়ে থাকে।

মাসআলা : পথপ্রদর্শন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এমন কথা বলা উচিত, যা সম্বোধিত ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করতে পারে যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) কয়েদীদেরকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তা কুফরি ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করারই ফলশ্রুতি। এরপর তিনি কুফর ও শিরকের অনিষ্টকারিতা চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

মাসআলা : এ থেকে প্রমাণিত হলো যে ব্যাপারে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে কষ্টকর ও অপ্রিয় এবং তা প্রকাশ করা জরুরি, তা তার সামনে যতদূর সম্ভব এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে যে, তার কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়; যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির মৃত্যু নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তা অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরূপ নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাকে শূলীতে চড়ানো হবে। −[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মাযহারী]

মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েদীকে বললেন, যখন বাদশার কাছে যাবে তখন আমার কথা আলোচনা করবে যে, সে নিরপরাধ কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, বিপদ থেকে নিষ্কৃত লাভের জন্য কোনো ব্যক্তিকে চেষ্টা তদ্‌বীরের মাধ্যমে স্থির করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়।

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলা মনোনীত পয়গাম্বরগণের জন্য সকল বৈধ প্রচেষ্টাও পছন্দ করেন না। যেমন, তাঁরা মুক্তির জন্য কোনো মানুষকে মধ্যস্থতাকারী স্থির করবেন। তাঁদের ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে কোনো মধ্যস্থতা না থাকাই পয়গাম্বরগণের আসল স্থান। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদী হযরত ইউসুফ (আ.) -এর কথা ভুলে যায় এবং তাঁকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। এক হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٣. وَقَالَ الْمَلِكُ مَلِكُ مِصْرَ الرَّيَّانُ بْنُ الْوَلِيْدِ اِنِّىْ اَرٰى اَىْ رَاَيْتُ سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ يَبْتَلِعُهُنَّ سَبْعٌ مِنَ الْبَقَرِ عِجَافٌ جَمْعُ عَجْفَاءَ وَّسَبْعَ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ اَىْ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ يٰبِسٰتٍ ط قَدِ الْتَوَتْ عَلَى الْخُضْرِ وَعَلَتْ عَلَيْهَا يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُءْيَاىَ بَيِّنُوْا لِىْ تَعْبِيْرَهَا اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ فَاعْبُرُوْهَا .

৪৩. সম্রাট অর্থাৎ মিসরের তৎকালীন সম্রাট আর-রায়্যান ইবনে আল ওলীদ বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করতেছে। গিলে ফেলতেছে, আর সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ। শুষ্ক শীষগুলো সবুজ শীষগুলোকে লেপটিয়ে রয়েছে এবং তাদের উপর প্রবল হয়ে রয়েছে। হে প্রধানগণ! আমার এই স্বপ্ন সম্পর্কে সমাধান দাও, আমাকে উহার ব্যাখ্যা বলে দাও। যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার। তবে তার ব্যাখ্যা দাও। اَرٰى-এটা এই স্থানে مُضَارِعٌ হলেও مَاضِىْ অর্থে ব্যবহৃত। তাই এটার তাফসীর رَاَيْتُ উল্লেখ করা হয়েছে। عِجَافٌ-এটা عَجْفَاءُ-এর বহুবচন, অর্থ শীর্ণকায়।

٤٤. قَالُوْۤا هٰذِهٖ اَضْغَاثُ اَخْلَاطُ اَحْلَامٍ ج وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ

৪৪. তারা বলল, এটা অর্থহীন স্বপ্ন। আর আমরা অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। اَضْغَاثُ -অর্থ আবোল তাবোল।

٤٥. وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا اَىْ مِنَ الْفَتَيَيْنِ وَهُوَ السَّاقِىْ وَادَّكَرَ فِيْهِ اِبْدَالُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ دَالًا وَادْغَامُهَا فِى الدَّالِ اَىْ تَذَكَّرَ بَعْدَ اُمَّةٍ حِيْنَ حَالَ يُوْسُفَ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ فَاَرْسَلُوْهُ اِلَيْهِ فَاَتٰى يُوْسُفَ .

৪৫. এরা দুইজনের মধ্যে অর্থাৎ ঐ দুইজন সেবকের মধ্যে যে জন মুক্তি পেয়েছিল অর্থাৎ পানীয় সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত জন এবং দীর্ঘকাল পরে যার হযরত ইউসুফের কথা স্মরণ হলো সে বলল, আমি এটার তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে প্রেরণ কর। اِدَّكَرَ -এতে মূলত ت টিকে د-এ পরিবর্তন করে পরবর্তী د-টিতে اِدْغَامْ করা হয়েছে। অর্থ স্মরণ করল। اُمَّةٍ -এই স্থানে অর্থ বহুকাল।

٤٦. فَقَالَ يَا يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ الْكَثِيْرُ الصِّدْقِ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ اَىِ الْمَلِكِ وَاَصْحَابِهٖ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ تَعْبِيْرَهَا .

৪৬. অনন্তর তারা তাকে প্রেরণ করল। সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আসল। বলল, হে ইউসুফ হে অতি সত্যবাদী, সাতটি স্থূলকায় গাভী। তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে সমাধান দাও যাতে আমি লোকদের নিকট রাজা ও সভাসদদের নিকট ফিরে যেতে পারি আর যাতে তারা এর তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। اَلصِّدِّيْقُ -অর্থ অতি সত্যবাদী।.

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٧. قَالَ تَزْرَعُوْنَ اَىْ اَزْرَعُوْا سَبْعَ سِنِيْنَ دَاْبًا ج بِسُكُوْنِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا مُتَتَابِعَةً وَهِىَ تَاْوِيْلُ السَّبْعِ السِّمَانِ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ اُتْرُكُوْهُ فِىْ سُنْبُلِهٖ لِئَلَّا يَفْسُدَ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ فَدُوْسُوْهُ ـ

৪৭. সে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) বলল, তোমরা সাত বৎসর একাদিক্রমে চাষ করবে। এটা হলো স্থূলকায় সাতটির তাৎপর্য। তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে এতে আর তা নষ্ট হবে না। আর যে পরিমাণ ভক্ষণ করবে সেই পরিমাণ শস্য কেবল মাড়িয়ে নিবে। تَزْرَعُوْنَ-এটা خَبَرِيَّه হলেও এই স্থানে اَمْر বা নির্দেশাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ চাষ কর। তাফসীরে اَمْر বা নির্দেশাত্মক শব্দ اِزْرَعُوْا উল্লেখ করে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। دَاْبًا-এটার মাঝের হামযা অক্ষরটি সাকিন ও ফাতাহ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ একাদিক্রমে। ذَرُوْهُ-এই স্থানে অর্থ রেখে দাও।

٤٨. ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ اَىِ السَّبْعُ الْمُخْصِبَاتُ سَبْعٌ شِدَادٌ مُجْدِبَاتٌ صِعَابٌ وَهِىَ تَاْوِيْلُ السَّبْعِ الْعِجَافِ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ مِنَ الْحَبِّ الْمَزْرُوْعِ فِى السِّنِيْنَ الْمُخْصِبَاتِ اَىْ تَاْكُلُوْنَهٗ فِيْهِنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ تَدَّخِرُوْنَ ـ

৪৮. এটার পর প্রাচুর্যের সাত বৎসরের পর আসবে কঠিন সাত বৎসর খরা ও বিপদের সাত বৎসর। এটা হলো সাতটি শীর্ণকায় গাভীর তাৎপর্য। প্রাচুর্যের সাত বৎসর উৎপাদিত শস্য হতে যা সঞ্চয় করে রেখেছিলে তা এই সময় খাবে তবে সামান্য কিছু যা তোমরা হেফাজত করবে সঞ্চয় করে রাখবে তা ব্যতীত।

٤٩. ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ اَىِ السَّبْعِ الْمُجْدِبَاتِ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ بِالْمَطَرِ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ الْاَعْنَابَ وَغَيْرَهَا لِخِصْبِهٖ ـ

৪৯. এটার পর অর্থাৎ খরার সাত বৎসরের পর আসবে এমন বৎসর যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তারা স্বচ্ছলতার ফলে আঙ্গুর ইত্যাদির রস নিংড়িয়ে বের করবে।

٥٠. وَقَالَ الْمَلِكُ لَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ وَاَخْبَرَهٗ بِتَاْوِيْلِهَا ائْتُوْنِىْ بِهٖ اَىْ بِالَّذِىْ عَبَّرَهَا فَلَمَّا جَاءَهُ اَىْ يُوْسُفَ الرَّسُوْلُ وَطَلَبَهٗ لِلْخُرُوْجِ قَالَ قَاصِدًا اِظْهَارَ بَرَاءَتِهٖ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ اَنْ يَّسْاَلَ مَا بَالُ حَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ط اِنَّ رَبِّىْ سَيِّدِىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ـ

৫০. ঐ প্রেরিত ব্যক্তিটি যখন ফিরে আসল এবং স্বপ্নের তাৎপর্য সম্পর্কে খবর দিল তখন সম্রাট বলল, তোমরা তাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছে তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। যখন দূত তার নিকট হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট আসল এবং বের হতে বলল, তখন সে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় নির্দোষিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বল, যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের কী ব্যাপার হয়েছিল তা জিজ্ঞাসা করতে। নিশ্চয় আমার প্রভু আমার মালিক আজীজ-মিসর তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত। بَالُ-অর্থ অবস্থা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥١. فَرَجَعَ فَاَخْبَرَ الْمَلِكَ فَجَمَعَهُنَّ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ شَأْنُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ط هَلْ وَجَدْتُّنَّ مِنْهُ مَيْلًا اِلَيْكُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ط قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ وَضَحَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْ قَوْلِهٖ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ فَاَخْبَرَ يُوْسُفُ بِذٰلِكَ.

৫১. অনন্তর ঐ দূত ফিরে আসল এবং সম্রাটকে ঐ কথা জানাল। তখন সম্রাট ঐ নারীদেরকে একত্রিত করে বলল, তোমরা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কুকর্মে প্ররোচিত করেছিলে তখন তোমাদের কী বিষয় হয়েছিল। তার মধ্যে কি তোমাদের প্রতি কোনো আসক্তি দর্শন করেছিলে? তারা বলল, আল্লাহর অদ্ভুত মাহাত্ম্য! আমরা তার কোনো দোষ আছে বলে জানিনা। আজীজ অর্থাৎ সভাসদের স্ত্রী বলল, সত্য প্রকাশ পেল। উদঘাটিত হলো। আমিই তাকে কুকর্মে প্ররোচিত করেছিলাম। 'নারীটি আমাকে প্ররোচিত করেছিল' তার এই কথায় সে তো সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

٥٢. فَقَالَ ذٰلِكَ اَىْ طَلَبُ الْبَرَاءَةِ لِيَعْلَمَ الْعَزِيْزُ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ فِي اَهْلِهٖ بِالْغَيْبِ حَالٌ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ ثُمَّ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ.

৫২. হযরত ইউসুফকে এই বিষয়ে সংবাদ জানানো হলো বললেন, এটা অর্থাৎ আমার তরফ হতে এই যে, নির্দোষিতা প্রমাণের দাবি এই জন্য যে, যাতে আজীজ জানতে পারে যে, আমি অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের বিষয় কোনো খেয়ানত করিনি। আর নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসহন্তাদিগের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। بِالْغَيْبِ এটা মূলত حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদরূপে এই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رَاَيْتَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُضَارِعٌ টা مَاضِىْ-এর অর্থে হয়েছে। অতীত কালের দৃশ্য টেনে আনার ভিত্তিতে مُضَارِعٌ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ عِجَافٌ جَمْعُ عَجْفَاءِ : عِجَافٌ শব্দটি عَجْفَاءُ এর বহুবচন عَجِيْفٌ-এর বহুবচন; নয়। কেননা এটা بَقَرَةٌ-এর صِفَتْ হয়েছে।

প্রশ্ন. اَفْعَلُ এবং فَعْلَاءُ-এর বহুবচন فِعَالٌ ওযনে আসেনা, কিয়াস অনুযায়ী عُجْفٌ হওয়া উচিত ছিল। যেমন حَمْرَاءُ-এর বহুবচন حُمْرٌ আসে।

উত্তর. এটা حَمْلُ النَّقِيْضِ عَلَى النَّقِيْضِ-এর অন্তর্গত। عِجَافٌ যেহেতু سِمَانٌ-এর বিপরীত, এ কারণেই عِجَافٌ-কে سِمَانٌ-এর উপর কিয়াস করে عِجَافٌ বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ : একে سَبْعَ بَقَرَاتٍ-এর উপর কেয়াস করে سُنْبُلَاتٌ-এর মধ্যে سَبْعٌ-এক হযফ করে দিয়েছে। মুফাসসির (র.) যা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন. গাভীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, সাতটি দুর্বল গাভী সাতটি মোটাতাজা সবল গাভীকে খেয়ে ফেলেছে, কিন্তু سُنْبُلَاتٌ-এর অবস্থা বর্ণনা করেননি। যাকে মুফাসসির (র.) اِلْتَوَتْ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

উত্তর. بَقَرَاتٌ-এর অবস্থার উপর কেয়াস করে سُنْبُلَاتٌ-এর অবস্থা বর্ণনা করাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَاعْبُرُوْهَا : এতে جَزَاء উহ্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذِهٖ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَضْغَاثُ উহ্য মুবতাদার খবর। কাজেই বাক্যটি غَيْرُ مُفِيْدٍ হওয়ার সংশয় কেটে গেল। اَضْغَاثٌ এটা ضِغْثٌ-এর বহুবচন; অর্থ হলো ঘাসের আঁটি যাতে তাজা ও শুষ্ক সবধরনের ঘাসই থাকে। এখানে পেরেশানিমূলক স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাতে ওয়াসওয়াসা এবং حَدِيْثُ النَّفْسِ -এর দখল থাকে।

قَوْلُهُ اَحْلَامٌ : এটা حُلْمٌ -এর বহুবচন; স্বপ্নকে বলা হয়।

قَوْلُهُ اُمَّةٌ : اُمَّةٌ দ্বারা এখানে মানুষের জামাত উদ্দেশ্য নয়; বরং সুদীর্ঘকাল উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) اُمَّةٌ-এর তাফসীর حِيْنٌ দ্বারা করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ حَالَ يُوْسُفَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَادَّكَرَ -এর মধ্যে وَاوْ -টি حَالِيَهْ কাজেই قَالَ আমেল ও اَنَا اُنَبِّئُكُمْ মা'মূলের মধ্যে فَصْل -এর প্রশ্ন রহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ يُوْسُفُ : এটা اِدَّكَرَ-এর মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْمَطَرِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, يُغَاثُ শব্দটি غَيْثٌ থেকে এসেছে; غَوْثٌ থেকে নয়।

قَوْلُهُ سَيِّدِيْ : رَبِّيْ-এর তাফসীর سَيِّدِيْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, رَبِّيْ দ্বারা সর্দার আজীজ উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ উদ্দেশ্য নন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একত্র করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হলো না। তাই সবাই উত্তর দিল اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ এখানে اَضْغَاثٌ শব্দটি ضِغْثٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলি, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল, আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলি, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। বাদশাহ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলো। কুরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ فَاَرْسِلُوْنِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নামোল্লেখ, সরকারি মঞ্জুরি অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি; বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর صِدِّيْقٌ অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

قَوْلُهُ لَعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরাৎ আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত তারা আপনার জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে মিছাল' তথা প্রত্যাকৃতি জগতে ঘটনাবলি যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরোপুরিই এ সব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলন সম্পন্ন সাত বছর। কেননা মৃত্তিকা

Free @ www.e-ilmweebly.com

চষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটাতাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভালো ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি হযরত ইউসুফ (আ.) এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীর্ষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীর্ষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ : অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে, যদিও বছর এমন কোনো বস্তু নয়, যা কোনো কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহকে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কুরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে- وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ অর্থাৎ বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসো। অতঃপর বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

হযরত ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। তিনি দূতকে উত্তর দিলেন قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) দূতকে বললেন, তুমি বাদশার কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কিনা এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এখানে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আজীজ-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা বাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা হযরত ইউসুফ (আ.) আজীজের গৃহে লালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদের তেমন কোনো অপমান ছিল না তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আজীজ-পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাঁকে ঘিরেই তদন্ত কার্য অনুষ্ঠিত হতো। ফলে তার অপমান বেশি হতো। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে সাথে আরও বললেন, اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আমার পালনকর্তাতো তাদের মিথ্যা ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বুখারী ও তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, যদি আমি এত দীর্ঘকাল কারাগারে থাকতাম, অতঃপর আমাকে মুক্তিদানের জন্য ডাকা হতো, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যেতাম।

ইমাম তাবারীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে হযরত ইউসূফ (আ.)–এর ধৈর্য, সহনশীলাতা ও সচ্চরিত্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কারাগারে যখন তাঁকে বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে বলতাম যে, আগে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত কর, এরপর ব্যাখ্যা দেব। দ্বিতীয়বার যখন মুক্তির বার্তা নিয়ে দূত আগমন করে, তখন তাঁর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ কারাগারের দরজার দিকে পা বাড়াতাম। –[তাফসীরে কুরতুবী]

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্তু এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজের কর্মপন্থা বর্ণিত হয়েছে, যা আমি থাকলে দেরি করতাম না এর অর্থ কি? যদি এর অর্থ এই হয় যে, তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কর্মপন্থাকে উত্তম এবং নিজের কর্মপন্থাকে অনুত্তম বলেছেন; তবে এটা শ্রেষ্ঠতম পয়গাম্বরের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রেষ্ঠতম পয়গাম্বর। কিন্তু কোনো আংশিক কাজে অন্য পয়গাম্বরও শ্রেষ্ঠতম হতে পারেন।

এ ছাড়া তাফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে– এরূপ অর্থ হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কর্মপন্থার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহান চরিত্রের অনন্যাসাধারণ প্রমাণ রয়েছে, তা যথাস্থানে প্রশংসনীয় কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের যে কর্মপন্থা বর্ণনা করেছেন, উম্মতের শিক্ষা ও জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে তাই উপযুক্ত ও উত্তম। কেননা বাদশাহদের মেজাজের কোনো স্থিরতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা অথবা দেরি করা সাধারণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। কারণ বাদশাহর মত পাল্টে যেতে পারে। ফলে কারাবাসের বিপদ যথারীতি অব্যাহত থাকতে পারে। হযরত ইউসুফ (আ.) তো পয়গাম্বর হওয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কথা জেনেও থাকতে পারেন যে, এ বিলম্বের কারণে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু সাধারণ লোক তো এ স্তরে উন্নীত নয়! রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ -এর মেজাজ ও অভিরুচিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ চিন্তার গুরুত্ব ছিল অধিক। তাই তিনি বলেছেন, আমি এরূপ সুযোগ পেলে দেরি করতাম না।

قَوْلُهُ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهِ الخ : হযরত ইউসুফ (আ.)-কে যখন রাজকীয় দূত মুক্তির পয়গাম দিয়ে ডেকে নিতে আসে, তখন তিনি দূতকে উত্তর দেন যে, প্রথমে ঐ মহিলাদের অবস্থা তদন্ত করা হোক যারা হাত কেটে ফেলেছিল। এতে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরদেরকে যেমন পূর্ণ ধার্মিকতা দান করেছিলেন, তেমনি তাঁদেরকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন ব্যাপারাদি সম্পর্কে পূর্ণ দূরদৃষ্টিও দান করেছিলেন। রাজকীয় পয়গাম পেয়ে হযরত ইউসূফ (আ.) অনুমান করে নেন যে, কারামুক্তির পর মিসরের বাদশাহ তাঁকে কোনো সম্মানে ভূষিত করবেন। তখন এটাই ছিল বুদ্ধিমত্তা যে, যে অপকর্মের অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ ও অন্য সবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক এবং তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনোরূপ সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এই যে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জনসাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই যে মালিকের স্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোনো সময় এ জাতীয় ধারণা দ্বারা স্বয়ং বাদশাহরও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পূর্বে এ ব্যাপারে সাফাই ও তদন্তকে তিনি জরুরি মনে করলেন। উল্লিখিত দু আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতে স্বয়ং হযরত ইউসূফ (আ.) এর কর্ম ও মুক্তি বিলম্বিত করার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন।

প্রথম কারণ : ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ -এ বিলম্বের কারণ হচ্ছে, যাতে আজীজে-মিসর নিশ্চিত হন যে, আমি তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

তাঁকে নিশ্চয়তা দানের জন্য উদগ্রীব হওয়ার কারণ এই যে, আজীজে-মিসরের মনে আমার প্রতি সন্দেহ থাকলে এবং রাজকীয় সম্মানের কারণে আমাকে কিছু বলতে না পারলে তাতে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আমার রাজকীয় সম্মানও তার কাছে অপ্রিয় থাকবে এবং চুপ থাকা তার জন্য আরও কষ্টকর হবে। যে ব্যক্তি কিছুকাল পর্যন্ত প্রভু ছিল, তার মনে কষ্ট দেওয়া হযরত ইউসূফ (আ.) পছন্দ করেননি। এ ছাড়া আজীজে-মিসর তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্যদের মুখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তৃতীয় কারণ : وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ অর্থাৎ এসব তদন্তের কারণ হচ্ছে, যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণা এগুতে দেন না।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। **এক.** তদন্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা ফুটে উঠবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, বিশ্বাসঘাতককে পরিণামে লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে সবাই এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকার সমস্ত চেষ্টা করবে। **দুই.** যদি এ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে হযরত ইউসুফ (আ.) -এর রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন, তবে অন্যরা ধারণা করতে পারত যে, বিশ্বাসঘাতকরাও বড় বড় পদমার্যাদা লাভ করতে পারে। ফলে তাদের বিশ্বাসে ক্রটি দেখা দিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার কুফল মন থেকে মুছে যেত। মোটকথা, উল্লিখিত কারণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইউসুফ (আ.) মুক্তির পয়গাম পাওয়া মাত্রই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়া পছন্দ করেন নি; বরং রাজকীয় পর্যায়ে তদন্ত দাবি করেছেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে এ তদন্তের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ অর্থাৎ বাদশাহ হস্ত কর্তনকারিণী মহিলাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্ন করলেন : কি ব্যাপারে ঘটেছে যখন তোমরা হযরত ইউসুফের কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে? বাদশাহর এ প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে, স্বস্থানে তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দোষ হযরত ইউসূফের নয় মহিলাদেরই। তাই তিনি বলেছেন: তোমরা তার কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে। এরপর মহিলাদের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ۚ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْاٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ সবাই বলল, আল্লাহ মহান! আমরা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মন্দ কোনো কিছু জানি না। আজীজ-পত্নী বলল, এখন তো সত্য কথা ফুটেই উঠেছে! আমিই তাঁর কাছে কুমতলবের কামনা করেছিলাম। সে নিশ্চিতই সত্যবাদী।

হযরত ইউসুফ (আ.) তদন্তের দাবিতে আজীজ-পত্নীর নাম চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ যখন কাউকে ইজ্জত দান করেন, তখন তার সততা ও সাফাই প্রকাশ মানুষের মুখ আপনা থেকেই খুলে যায়। এ ক্ষেত্রে আজীজ-পত্নী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলিতে অনেক উপকারিতা, মাস'আলা ও মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে ইতিপূর্বে আটটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও কিছু মাস'আলা ও পথনির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হলো।

মাসআলা : আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিজেই অদৃশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা কোনো নষ্ট জীবের কাছে ঋণী হোন এটা তিনি পছন্দ করেন না। এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়দিকে বললেন, বাদশাহর কাছে আমার কথা বলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক দিন পর্যন্ত বিস্মৃত করে রাখেন এবং অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে হযরত ইউসুফ (আ.) কারও কাছে ঋণী না হন এবং পূর্ণ মান-সম্ভ্রমের সাথে কারাগার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যও পূর্ণ হয়।

এ ব্যবস্থা ছিল এই যে, মিসরের বাদশাহ্‌কে একটি উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখানো হলো, যার ব্যাখ্যা দিতে দরবারের সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করল। ফলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে যেতে হলো।

মাসআলা : এতে সচ্চরিত্রতার শিক্ষা রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বাদশাহর কাছে বলে দেওয়ার মতো কাজটাও না করার দরুন হযরত ইউসূফ (আ.)-কে অতিরিক্ত সাত বছর পর্যন্ত বন্দী জীবনের দুঃসহ যাতনা ভোগ করতে হয়। সাত বছর পর যখন সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেওয়ার জন্য আগমন করল, তখন তিনি স্বভাবতই তাকে ভর্ৎসনা করতে পারতেন এবং বলতে পারতেন যে, তোমার দ্বারা আমার এতটুকু কাজও হলো না! কিন্তু হযরত ইউসূফ (আ.) তা করেন নি। তিনি পয়গাম্বরসুলভ চরিত্রের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি -[তাফসীরে ইবনে কাসীর, কুরতুবী]

মাসআলা : সাধারণ লোকদের পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে পরকালে ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গাম্বর ও আলেমদের কর্তব্য, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দায়িত্ব। হযরত ইউসুফ (আ.) এ ক্ষেত্রে শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি; বরং বিজ্ঞজনোচিত ও হিতাকাঙ্ক্ষার পরামর্শও দেন যে, উৎপন্ন গম শীষের মধ্যেই থাকতে দেবে এবং খোরাকীর পরিমাণে বের করবে যাতে সেসব শস্য নষ্ট না হয়ে যায়।

Free @ www.eilm.weebly.com

মাসআলা : অনুসরণযোগ্য আলেম সমাজের এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যেন কোনো মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না হয়। কেননা কু-ধারণা মূর্খতাপ্রসূত হলেও তা দাওয়াত ও প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জনগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কথার ওজন থাকে না। -[তাফসীরে কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ এমন অবস্থা ও ক্ষেত্র থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ, যেখানে কেউ তোমার প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ পায়। এ নির্দেশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তবে আলেম শ্রেণিকে এ ব্যাপারে দ্বিগুণ সাবধান হতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ রকম যত্নবান ছিলেন। একবার তাঁর একজন স্ত্রী তাঁর সাথে মদীনার এক গলিতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। জনৈক সাহাবীকে সম্মুখ থেকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন, আমার সাথে আমার অমুক স্ত্রী রয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি অনাত্মীয়া কোনো মহিলার সাথে পথ অতিক্রম করেছেন বলে কেউ সন্দেহ না করে। এ ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ (আ.) ও কারাগার থেকে মুক্তি এবং রাজকীয় আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও মুক্তির পূর্বে জনগণের মন থেকে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

মাসআলা : অধিকারের ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতেও হয়, তবে এতেও সাধ্যানুযায়ী অধিকার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা ভদ্রতার দাবি। হযরত ইউসুফ (আ.) স্বীয় পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আজীজ ও তাঁর পত্নীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে ঐ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত কেটে ফেলেছিলেন। [কুরতুবী] কেননা উদ্দেশ্য এতেও সিদ্ধ হতে পারত।

মাসআলা : এতে উত্তম চরিত্রের একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের হাতে সাত অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতা পেয়েও হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের উপর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দেওয়াও পছন্দ করেন নি, যেমন لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আয়াতে এ বিষয়ের উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ عَشَرَ : তেরোতম পারা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٣. فَقَالَ وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ج مِنَ الزَّلَلِ اِنَّ
النَّفْسَ الْجِنْسَ لَاَمَّارَةٌ كَثِيْرَةُ الْاَمْرِ
بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا بِمَعْنٰى مَنْ رَحِمَ رَبِّىْ ط
فَعَصَمَهٗ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

٥٤. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ
لِنَفْسِىْ ج اَجْعَلْهُ خَالِصًا لِىْ دُوْنَ شَرِيْكٍ
فَجَاءَهُ الرَّسُوْلُ وَقَالَ اَجِبِ الْمَلِكَ فَقَامَ
وَدَّعَ اَهْلَ السِّجْنِ وَدَعَا لَهُمْ ثُمَّ اغْتَسَلَ
وَلَبِسَ ثِيَابًا حِسَانًا وَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا
كَلَّمَهٗ قَالَ لَهٗ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ
اَمِيْنٌ ذُوْمَكَانَةٍ وَاَمَانَةٍ عَلٰى اَمْرِنَا فَمَاذَا
تَرٰى اَنْ نَفْعَلَ قَالَ اِجْمَعِ الطَّعَامَ وَازْرَعْ
زَرْعًا كَثِيْرًا فِىْ هٰذِهِ السِّنِيْنَ الْمُخْصَبَةِ
وَادَّخِرِ الطَّعَامَ فِىْ سُنْبُلِهٖ فَيَاْتِىْ اِلَيْكَ
الْخَلْقُ لِيَمْتَارُوْا مِنْكَ فَقَالَ مَنْ لِىْ بِهٰذَا.

٥٥. قَالَ يُوْسُفُ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ج
اَرْضَ مِصْرَ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ذُوْ حِفْظٍ
وَعِلْمٍ بِاَمْرِهَا وَقِيْلَ كَاتِبٌ وَحَاسِبٌ.

অনুবাদ :

৫৩. হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিনয় প্রকাশ করত বললেন, পদস্খলন হতে আমি নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দের নির্দেশ দেয়, তবে যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেছেন, সে ব্যতীত। অর্থাৎ তাকে তিনি রক্ষা করেন। আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। اَلنَّفْسَ এ স্থানে جِنْس বা জাতি অর্থ বুঝানো হয়েছে। اَمَّارَةٌ খুব নির্দেশ দানকারী। مَا رَحِمَ এই স্থানে مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৪. সম্রাট বলল, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে আমার একান্ত সভাসদ করে নিব। তাকে এককভাবে আমারই করে নিব। অন্য কেউ আর তাতে শরিক থাকবে না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট সম্রাটের দূত আসল। বলল, সম্রাট আপনাকে ডেকেছেন। তখন তিনি উঠলেন, কারাবাসীদেরকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানালেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর গোসল করলেন, সুন্দর ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করলেন। পরে রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন। সম্রাট তার সাথে কথা বলাকালে তাকে বলল, 'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে। অর্থাৎ আমাদের বিষয়াদিতে আস্থাভাজন ও আমাদের নিকট মর্যাদার অধিকারী হলে, এখন আমাদের কি করা কর্তব্য বলে মনে কর? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, খাদ্য মওজুদ করতে থাকুন, প্রাচুর্যের বৎসরগুলোতে অধিক হারে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নিন এবং শীষ সমেত খাদ্য মওজুদ করুন। অচিরেই বহু লোক খাদ্যের তালাশে আপনার নিকট ধন্না দিবে। সম্রাট বললেন, এই বিরাট দায়িত্ব আঞ্জম দেওয়ার জন্য কাকে পাবো।

৫৫. হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমাকে এই দেশের মিসর ভূমির কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দিন। আমি সংরক্ষণকারী ও অভিজ্ঞ। এই বিষয়ে আমার জ্ঞানও আছে এবং আমি সংরক্ষণে পারদর্শী। কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ হলো আমি লিখক ও হিসাব রক্ষক

Free @ www.eilm.weebly.com

٥٦. وَكَذٰلِكَ كَانْعَامِنَا عَلَيْهِ بِالْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ج اَرْضِ مِصْرَ يَتَبَوَّءُ يَنْزِلُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ط بَعْدَ الضِّيْقِ وَالْحَبْسِ وَفِي الْقِصَّةِ اَنَّ الْمَلِكَ تَوَّجَهُ وَخَتَمَهُ وَ وَلَّاهُ مَكَانَ الْعَزِيْزِ وَعَزَلَهُ وَمَاتَ بَعْدُ فَزَوَّجَهُ اِمْرَاَتَهُ زُلَيْخَا فَوَجَدَهَا عَذْرَاءَ وَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ وَاَقَامَ الْعَدْلَ بِمِصْرَ وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ .

৫৬. এভাবে অর্থাৎ যেভাবে কারাগার হতে মুক্ত করে আমি তাকে পুরস্কৃত করেছি সেভাবে ইউসুফকে আমি সে দেশে অর্থাৎ মিশরে প্রতিষ্ঠিত করলাম। বন্দিত্ব ও কঠিন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হওয়ার পর এখন সে এই দেশের যে স্থানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারত। যাকে ইচ্ছা আমি দয়া করি এবং সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করি না। يَتَبَوَّأُ বসবাস করা, অবতরণ করা। বিবরণে পাওয়া যায় যে, মিসর সম্রাট তাকে স্বীয় তাজ ও নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে দেন। উক্ত আজীজে মিসরকে পদচ্যুত করত তদস্থলে তাকে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর আজীজে মিসর মারা যায়। তখন তার স্ত্রী জুলায়খার সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি তাকে কুমারী ও সতীচ্ছেদ ছিন্নহীন অবস্থায় পেলেন। পরে তার দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি মিসরের সর্বস্তরে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। সকল লোক তার প্রতি অনুগত ছিল।

٥٧. وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ اَجْرِ الدُّنْيَا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ .

৫৭. যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য দুনিয়া হতে পরকালের পুরস্কারই উত্তম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ : এই বাক্যটি ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ ذٰلِكَ -এর উহ্য আমেল তথা طَلَبُ الْبَرَاءَةِ لِيَعْلَمَ থেকে حَالٌ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, طَلَبُ الْبَرَاءَةِ থেকে যেই নফসের পবিত্রতা বুঝা যায় তার দ্বারা আজীজে মিসর -এর স্ত্রীর ব্যাপারে পবিত্রতা ও নিষ্পাপতা উদ্দেশ্য হয়েছে। মুতলাক পদস্খলন ও বিচ্যুতিসমূহ থেকে নয়। মোটকথা হলো এই যে, পূর্বে আমি طَلَبُ بَرَاءَةٍ করেছি এর দ্বারা নফসের পবিত্রতা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اَلْجِنْسُ : অর্থাৎ اَلَّذِيْ فِيْ ضِمْنِ جَمِيْعِ الْاَفْرَادِ যদি মুফাসসির (র.) جِنْس -এর পরিবর্তে اِسْتَغْرَقَ দ্বারা ব্যক্ত করতেন তবে উত্তম হতো।

قَوْلُهُ مَا بِمَعْنٰى مَنْ : কেননা نَفْس দ্বারা ذَوِى الْعُقُوْلِ উদ্দেশ্য হয়েছে। আবার এটাও বৈধ যে, مَا رَحِمَ টা অর্থের ক্ষেত্রে زَمَانٌ হয় তবে সেই সুরতে مَا কে مَنْ -এর অর্থে নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না অর্থাৎ اِلَّا وَقْتَ رَحْمَةِ رَبِّيْ উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- اِنَّهَا اِمَارَةٌ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ اِلَّا وَقْتَ الْعِصْمَةِ

قَوْلُهُ اَجْعَلُهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَسْتَخْلِصْهُ এটা تَصْيِيْر -এর অর্থে হয়েছে। কেননা طَلَبْ -এর অর্থ বৈধ নয়।

قَوْلُهُ فَقَالَ مَنْ لِيْ بِهٰذَا : অর্থাৎ مَنْ يَضْمَنُ هٰذَا لِاَجْلِيْ

قَوْلُهُ وَمَاتَ بَعْدَهُ : অর্থাৎ بَعْدَ الْعَزْلِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা দুরস্ত নয়, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরোপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না। যাতে আজীজ ও বাদশাহর মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যত নিজের শুচিতা নিজে বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সংবলিত একটি আয়াত রয়েছে- فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ অর্থাৎ তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবি করো না। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসূফ (আ.) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের আল্লাহভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয়; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা- অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এমন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গাম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কুরআন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতমায়িন্নাহ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোটকথা এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গুনাহ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোনো সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না, বরং আল্লাহ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মতো কু-প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোনো কোনো হাদীসে আছে, হযরত ইউসূফ (আ.)-এর এ কথা বলার কারণ এই যে, তার মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার : আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষে যে, এতে প্রত্যেক মানবমনকেই أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ [মন্দ কাজের আদেশদাতা] বলা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন, এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যাকে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এর চেয়ে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোনো কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে এই ধরনের সাথী। -[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদেও জড়িত করে দেয়।

মোটকথা উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব মনকেই 'লাউওয়ামা' উপাধি দিয়ে এটাকে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন- لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এবং সূরা আল ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে- يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ এভাবে মানব মনকে এক জায়গায় أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ দ্বিতীয় জায়গায় لَوَّامَةٌ এবং তৃতীয় জায়গায় مُطْمَئِنَّةٌ বলা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব মন আপন সত্তার দিক দিয়ে أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لَوَّامَةٌ হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কাকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী। যেমন সাধারণ সাধু -সজ্জনদের মন এবং যখন কোনো মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোনো স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে, কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গাম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা আপনা আপনি পূর্বসাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তারা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غَفُوْرٌ শব্দের ইঙ্গিত আছে যে, নফসে আম্মারা যখন স্বীয় গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَحِيْمٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ الخ অর্থাৎ বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দাবি অনুযায়ী মহিলার কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং জুলায়খাও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে আমি তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হলো। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ফলে তার যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বাদশাহ বললেন, আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে পৌছল এবং বাদশাহর পয়গাম পৌছাল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) সব কারাবাসীদের জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহর দরবারে পৌছে এ দোয়া করলেন–

حَسْبِيْ رَبِّيْ مِنْ دُنْيَا وَحَسْبِيْ رَبِّيْ مِنْ خَلْقِهٖ عَزَّ جَارُهٗ وَجَلَّ ثَنَائُهٗ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ

অর্থাৎ আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্ট জীবের মোকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তার আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

দরবারে পৌছে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবি ভাষায় সালাম করেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এবং বাদশাহর জন্য হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবি ও হিব্রু ভাষা তার জানা ছিল না। হযরত ইউসুফ (আ.) বলে দেন যে, সালাম আরবি ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবি ও হিব্রু এদুটি অতিরিক্ত ভাষায় শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহর মনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ বললেন, আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ নিজেও কারো কাছে বর্ণনা করেননি। এরপর ব্যাখ্যা বললেন।

বাদশাহ বললন, আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন, অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, প্রথমে সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এসময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্তি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিনদেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষের সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারি ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন, এ বিষয়টি পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন– اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাপ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। –[কুরতুবী]

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরিউক্ত দুটি শব্দের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেননা অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি ধনসম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া; বরং পূর্ণ হেফাজত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরি, সেখানে সেই পরিমাণে ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোনো কমবেশি না করা। حَفِيْظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عَلِيْم শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের গ্যারান্টি।

বাদশাহ যদিও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলিতে মুগ্ধ ও তার ধর্মপরায়ণা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়; বরং যাবতীয় সরকারি দায়িত্ব ও তাকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না। যেমন শেখ সাদী (র.) বলেন–

چو یوسف کسے در صلاح وتمیز
بیک سال باید کہ گردد عزیز

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সমতুল্য যোগ্যতা ও শিষ্টাচার থাকে, তার পক্ষে এক বছর কালের মধ্যেই মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা লাভ সম্ভব।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ লিখেছেন, এ সময়েই জুলায়খার স্বামী কিতফীর মৃত্যুবরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে জুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) জুলায়খাকে বললেন, তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চেয়ে উত্তম নয়? জুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা সসম্মানে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ আহলাদে তাদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে লাগল। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাদের দুজন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে জুলায়খার প্রতি এ গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা জুলায়খার অন্তরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ছিল না। এমন কি একবার হযরত ইউসুফ (আ.) জুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন, এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালোবাস না? জুলায়খা আরজ করল, আপনার অসিলায় আমি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জন করেছি। এ ভালোবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তাভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরো কিছু বর্ণনাসহ তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ কাফের। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থবাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরিবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কি গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এ পদ দান করেন।

আজও যদি কেউ সরকারি এমন কোনো পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার মতো অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েজ তো বটেই বরং ওয়াজিব। কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্ঞাত। −[কুরতুবী]

খোলাফায়ে রাশেদীন স্বেচ্ছায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও তাই ছিল যে, তারা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আলী (রা.), হযরত মু'আবিয়া (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খেলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারো মূল লক্ষ্য ছিল না।

وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থাৎ আমি ইউসুফকে বাদশাহর দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদ মর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এ ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তা এতে আমন্ত্রিত হন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়− যাবতীয় রাজকার্যই কার্যত হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। −[কুরতুবী, মাযহারী]

হযরত ইউসুফ (আ.) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারো কোনো অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তার প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কোনোরূপ বাধাপিবত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান জারি করা এবং তার দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোনো সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তার অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহও মুসলমান হয়ে যান।

قَوْلُهُ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ : অর্থাৎ পরকালের প্রতিদান ও ছওয়াব দুনিয়ার নিয়ামতের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাদের জন্য যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। হযরত ইউসুফ (আ.) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সবাই বলল, মিসর সম্রাজ্যের যাবতীয় ধনভাণ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা? তিনি বললেন, সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন, দিনে মাত্র একবার দ্বিপ্রহরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজ পরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٨. وَدَخَلَتْ سِنُو الْقَحْطِ وَاَصَابَ اَرْضَ كِنْعَانَ وَالشَّامِ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ اِلَّا بِنْيَامِيْنَ لِيَمْتَارُوْا لِمَا بَلَغَهُمْ اَنَّ عَزِيْزَ مِصْرَ يُعْطِى الطَّعَامَ بِثَمَنِهٖ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ اَنَّهُمْ اِخْوَتُهٗ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ لَا يَعْرِفُوْنَهٗ لِبُعْدِ عَهْدِهِمْ بِهٖ وَظَنِّهِمْ هَلَاكَهٗ فَكَلَّمُوْهُ بِالْعِبْرَانِيَّةِ فَقَالَ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِمْ مَا اَقْدَمَكُمْ بِلَادِىْ فَقَالُوْا لِلْمِيْرَةِ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ عُيُوْنٌ قَالُوْا مَعَاذَ اللّٰهِ قَالَ فَمِنْ اَيْنَ اَنْتُمْ قَالُوْا مِنْ بِلَادِ كِنْعَانَ وَاَبُوْنَا يَعْقُوْبُ نَبِىُّ اللّٰهِ قَالَ وَلَهٗ اَوْلَادٌ غَيْرُكُمْ قَالُوْا نَعَمْ كُنَّا اِثْنَىْ عَشَرَ فَذَهَبَ اَصْغَرُنَا هَلَكَ فِى الْبَرِّيَّةِ وَكَانَ اَحَبَّنَا اِلَيْهِ وَبَقِىَ شَقِيْقُهٗ فَاحْتَبَسَهٗ لِيَتَسَلّٰى بِهٖ عَنْهُ فَاَمَرَ بِاِنْزَالِهِمْ وَاِكْرَامِهِمْ.

৫৮. যা হোক, পরে সেই ভীষণ খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শাম ও কিনআন অঞ্চলও তার কবল থেকে রক্ষা পেল না। বিনয়ামীন ব্যতীত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্যান্য ভ্রাতাগণ যখন জানতে পারল আজীজ মিসর মূল্যের বিনিময়ে খাদ্য দেন তখন তারা খাদ্যলাভের আশায় আসল ও তার নিকট উপস্থিত হলো। সে তাদেরকে চিনল যে, তারা তার ভাই কিন্তু তাদের নিকট সে অপরিচিত রয়ে গেল। তাদের ধারণা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.) মারা গেছে। অনেক কাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা তাকে চিনতে পারেনি। তারা তার সাথে হিব্রু ভাষায় কথাবার্তা বলল। তিনি অপরিচিত ভাব রেখেই বললেন, কি উদ্দেশ্যে আমার দেশে তোমাদের আগমন? তারা বলল, খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন, তোমাদেরকে গুপ্তচর বলে অনুমিত হয়। তারা বলল, আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই ধরনের কাজ হতে রক্ষা করুন। তিনি বললেন, কোন দেশ হতে তোমরা এসেছ? তারা বলল. কেনআন হতে, আমাদের পিতা হলেন আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত ইয়াকূব (আ.)। তিনি বললেন, তোমরা ব্যতীত তার আরো সন্তান আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ! আমরা বারজন ছিলাম। কনিষ্ঠ জন বনে হারিয়ে যায়। সে পিতার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তার সহোদর ভাইটিকে পিতা সান্ত্বনা লাভের জন্য কাছে রেখে দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে উত্তমভাবে মেহমানদারি করতে ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে অধীনস্তদেরকে হুকুম দিলেন।

٥٩. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ وَفّٰى لَهُمْ كَيْلَهُمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ج اَىْ بِنْيَامِيْنَ لِاَعْلَمَ صِدْقَكُمْ فِيْمَا قُلْتُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْ اُوْفِى الْكَيْلَ اُتِمُّهٗ مِنْ غَيْرِ بَخْسٍ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

৫৯. এবং সে যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তাদেরকে মাপে পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিল তখন সে বলল, তোমরা আমার নিকট তোমাদেরকে বৈমাত্রীয় ভ্রাতা বিনয়ামীনকে নিয়ে এসো যাতে আমি তোমাদের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে জানিতে পারি। তোমরা কি দেখ না যে, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই। অর্থাৎ কোনো রূপ ক্ষতি বা হ্রাস না করে তা পরিপূর্ণভাবে দেই। আর আমি উত্তম অতিথি সেবক।

٦٠. فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ اَىْ مِيْرَةَ وَلَا تَقْرَبُوْنِ نَهْىٌ اَوْ عَطْفٌ عَلٰى مَحَلِّ فَلَا كَيْلَ اَىْ تُحْرَمُوْا وَلَا تَقْرَبُوْا .

৬০. কিন্তু তোমরা যদি আমার নিকট তাকে নিতে না আস তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোনো ওজন করা হবে না। অর্থাৎ কোনো খাদ্য তোমরা পাবে না। এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীও হবে না। وَلَا تَقْرَبُوْنِ তা نَهْىٌ বাচক শব্দ। পূর্বোল্লিখিত فَلَا كَيْلَ -এর مَحَلِّ সাথে তার عَطْف হয়েছে। অর্থাৎ تُحْرَمُوْا وَلَا تَقْرَبُوْا তোমরা খাদ্য হতে বঞ্চিত হবে এবং আমার নিকটবর্তীও হতে পারবে না।

٦١. قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ سَنَجْتَهِدُ فِىْ طَلَبِهٖ مِنْهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ذٰلِكَ .

৬১. তারা বলল, তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে প্ররোচিত করব। তার নিকট হতে তাকে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই তা করব।

٦٢. وَقَالَ لِفِتْيٰتِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ لِفِتْيَانِهٖ غِلْمَانِهٖ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ الَّتِىْ اَتَوْا بِهَا ثَمَنَ الْمِيْرَةِ وَكَانَتْ دَرَاهِمَ فِىْ رِحَالِهِمْ اَوْعِيَتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمْ وَفَرَغُوْا اَوْعِيَتَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْنَا لِاَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّوْنَ اِمْسَاكَهَا .

৬২. ভৃত্যগণকে বলল, তাদের পুঁজি অর্থাৎ তারা খাদ্যের বিনিময়ে যে মূল্য নিয়ে এসেছে তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও। আর তা ছিল কতিপয় দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা। যাতে তারা স্বজনগণের নিকট যখন প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাদের পাত্রসমূহ খালি করবে তখন তা বুঝতে পারে। ফলে তারা পুনরায় আমাদের নিকট আসতে পারে। কেননা তারা তা নিজেদের নিকট রেখে দেওয়া হালাল বলে মনে করবে না। لِفِتْيٰتِهٖ অপর এক কেরাতে لِفِتْيَانِهٖ রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থ– ভৃত্যগণ। فِىْ رِحَالِهِمْ এস্থানে তার অর্থ তাদের পাত্রসমূহ।

٦٣. فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ اِنْ لَّمْ تُرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا اِلَيْهِ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ .

৬৩. অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার নিকট ফিরে আসল তখন বলল, হে পিতা যদি আমাদের সাথে আমাদের ভাই [বিনয়ামীন]-কে না পাঠান তবে আমাদের জন্য রসদ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের ভ্রাতাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। যাতে আমরা রসদ পুরা মেপে নিতে পারি। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। نَكْتَلْ তা ن [উত্তম পুরুষ বহুবচন] ও ى [নাম পুরুষ একবচন পুংলিঙ্গ] উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

٦٤. قَالَ هَلْ مَا اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ يُوْسُفَ مِنْ قَبْلُ ط وَقَدْ فَعَلْتُمْ بِهٖ مَا فَعَلْتُمْ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حِفْظًا ص وَفِىْ قِرَاءَةٍ حٰفِظًا تَمْيِيْزٌ كَقَوْلِهِمْ لِلّٰهِ دَرُّهٗ فَارِسًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ فَاَرْجُوْا اَنْ يَمُنَّ بِحِفْظِهٖ .

৬৪. বলল, আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ আস্থাভাজন মনে করব, যেরূপ আস্থা পূর্বে তার ভ্রাতা ইউসুফ সম্বন্ধে তোমাদের উপর করেছিলাম। আর তার সাথে তোমরা যা করার করেছিলে। আল্লাহ তা'আলাই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ আর তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। সুতরাং তার নিকটই আশা করবে। তার রক্ষণাবেক্ষণ করে তিনিই অনুগ্রহ করবেন। هَلْ اٰمَنُكُمْ - এস্থানে প্রশ্নবোধক শব্দ هَلْ না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। حِفْظًا এটা অপর এক কেরাতে حٰفِظًا রূপে পঠিত রয়েছে। আরবদের প্রবচন لِلّٰهِ دَرُّهٗ فَارِسًا -এর মধ্যে فَارِسًا শব্দটি اِسْم مُشْتَقّ হওয়া সত্ত্বেও تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি এই স্থানেও তা اِسْم مُشْتَقّ হওয়া সত্ত্বেও تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٥. وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ط قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ط مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ اَيْ اَيَّ شَيْءٍ نَطْلُبُ مِنْ إِكْرَامِ الْمَلِكِ اَعْظَمَ مِنْ هٰذَا وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ خِطَابًا لِيَعْقُوْبَ وَكَانُوْا ذَكَرُوْا لَهُ اِكْرَامَهُ لَهُمْ هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا نَأْتِيْ بِالْمِيْرَةِ لَهُمْ وَهِيَ الطَّعَامُ وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ط لِاَخِيْنَا ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ سَهْلٌ عَلَى الْمَلِكِ لِسَخَائِهِ ـ

৬৫. যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল তাদের পুঁজি তাদেরকে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে। তারা বলল, হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এই আমাদের পুঁজি, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গের খাদ্য আনব। আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং এই ভ্রাতার মাধ্যমে আরো এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য অতিরিক্ত নিয়ে আসব। এটা তো সামান্য পরিমাণই। অর্থাৎ সম্রাটের দানশীলতার পক্ষে তা তার জন্য অতি সহজ। مَا نَبْغِيْ এ স্থানে مَا শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ বা প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ সম্রাটের নিকট হতে তা হতে অধিক বড় আর কি অনুগ্রহ ও সম্মান আমরা আশা করতে পারি? অপর এক কেরাতে তা ت সহ [দ্বিতীয় পুরুষ تَبْغِيْ অর্থ, তুমি আর কি আশা করতে পার?] পঠিত রয়েছে, এমতাবস্থায় এস্থানে তাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে বলে বিবেচ্য হবে। তারা ইতিপূর্বে তার নিকট তাদের প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ ও মর্যাদাদানের কথা উল্লেখ করেছিল। نَمِيْرُ اَهْلَنَا অর্থ– আমরা আমাদের পরিবারের জন্য مِيْرَة অর্থাৎ খাদ্য নিয়ে আসব।

٦٦. قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا عَهْدًا مِّنَ اللّٰهِ بِاَنْ تَحْلِفُوْا لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ج بِاَنْ تَمُوْتُوْا اَوْ تُغْلَبُوْا فَلَا تُطِيْقُوا الْاِتْيَانَ بِهٖ فَاَجَابُوْهُ اِلٰى ذٰلِكَ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ نَحْنُ وَاَنْتُمْ وَكِيْلٌ شَهِيْدٌ وَاَرْسَلَهُ مَعَهُمْ ـ

৬৬. বলল, আমি তাকে কখনোই তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দাও যে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে, তবে তোমরা যদি অসহায় হয়ে পড় অর্থাৎ তোমরা মারা যাও বা পরাজিত হয়ে যাও, ফলে তাকে নিয়ে আসার যদি সমর্থ্য না থাকে তবে অন্য কথা। তারা এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করল। অতঃপর যখন তারা তার নিকট উক্ত প্রতিশ্রুতি দিল তখন সে বলল, আমরা অর্থাৎ আমি এবং তোমরা যে বিষয়ে কথা বলতেছি সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই তত্ত্বাবধায়ক সাক্ষী। مَوْثِقًا অর্থ– প্রতিশ্রুতি।

٦٧. وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِصْرَ مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط لِئَلَّا تُصِيْبَكُمُ الْعَيْنُ ـ

৬৭. অনন্তর তিনি তাকে তাদের সাথে পাঠালেন। বলল, হে আমার পুত্রগণ, তোমরা মিসরে এক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করিও না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে। কারণ তোমাদের উপর যেন কারো নজর না লাগে।

وَمَا أُغْنِىْ عَنْكُمْ بِقَوْلِىْ ذٰلِكَ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ ط قَدَّرَهٗ عَلَيْكُمْ وَاِنَّمَا ذٰلِكَ شَفَقَةٌ اِنِ مَا الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ط وَحْدَهٗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ بِهٖ وَثِقْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

আমার এই কথার মাধ্যমে আল্লাহর তরফ হতে কিছু হলে আমি তোমদের জন্য কিছু করতে পারি না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে নির্ধারিত তাকদীর আমি প্রতিহত করতে পারব না। তবে এই কথা তোমাদের প্রতি আপত্য স্নেহ বশত বললাম। কোনো বিধান হতে পারে না এক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত। আমি তার উপরই নির্ভর করি আস্থা রাখি। আর নির্ভরকারীরা তার উপরই নির্ভর করুক। مِنْ شَىْءٍ এই স্থানে مِنْ টি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। اِنِ الْحُكْمُ এই স্থানে اِنْ শব্দটি না বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٨ ৬৮. قَالَ تَعَالٰى وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ط اَىْ مُتَفَرِّقِيْنَ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ اَىْ قَضَائِهٖ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا لٰكِنْ حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضَاهَا وَهِىَ اِرَادَةُ دَفْعِ الْعَيْنِ شَفَقَةً وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ لِتَعْلِيْمِنَا اِيَّاهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَا يَعْلَمُوْنَ اِلْهَامَ اللّٰهِ لِاَوْلِيَائِهٖ.

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাদের পিতা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারা যখন প্রবেশ করল তখন আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বাইরে ফয়সালার বাইরে তা তাদের কোনো কাজে আসল না তবে তা ইয়াকুবের মনের একটা কামনা ছিল যা সে পূরণ করেছে। আর তা হলো আপত্য স্নেহবশত কু নজর হতে তাদেরকে রক্ষা করার অভিপ্রায়। অবশ্যই সে জ্ঞানী ছিল। কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেরগণ আল্লাহ তা'আলার ওলীগণের প্রতি তার ইলহাম প্রদানের কথা জানে না। اِلَّا حَاجَةً এস্থানে اِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত। لِمَا عَلَّمْنَاهُ এস্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَة বা ক্রিয়ার উৎস ব্যঞ্জক এই দিকে ইঙ্গিত করণার্থে তাফসীরে لِتَعْلِيْمِنَا اِيَّاهُ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ : وَاوْ টি হলো عَاطِفَة -এর عَطْف উহ্য রয়েছে। যাকে مُفَسِّر (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রফুল্লতা ও সুখকর বছর শেষ হয়ে যখন দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটনের বছর শুরু হলো এবং এর প্রভাব কেনান, শাম প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুভূত হলো। হযরত ইয়াকূব (আ.) এবং তার পরিবারেও এর প্রভাব পড়ল। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বীয় সন্তানদেরকে বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, মিশরের ন্যায়নীতিবান বাদশাহ ন্যায্যমূল্যে শষ্য বিক্রি করেছেন। তোমরাও সেখানে যাও এবং তোমাদের প্রয়োজন অনুপাতে শষ্য নিয়ে আস। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাই আসলেন, অর্থাৎ (وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ)

قَوْلُهُ يَمْتَارُوْا : অর্থাৎ لِيَشْتَرُوا الْمِيْرَةَ ; مِيْرَه বলা হয় সেই শষ্যদানাকে যাকে এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لَا تَقْرَبُوْنِ : হয়তো نَهْى হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হবে। আর এর নূন হলো نُوْن وِقَايَة অথবা فَلَا كَيْلَ -এর উপর আতফ হয়েছে। এই সুরতে مَحَلّ -এর جَزَاء -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হবে।

قَوْلُهُ تُحْرَمُوْا : প্রশ্ন. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ -এর তাফসীর تُحْرَمُوْا দ্বারা কেন করেছেন?

উত্তর. এজন্য যে, لَا تَقْرَبُوْا -এর আতফ لَا كَيْلَ لَكُمْ -এর উপর হয়েছে। আর এটা عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْاِسْمِ -এর অন্তর্গত। যা জায়েজ নয়। কাজেই لَا كَيْلَ لَكُمْ কে تُحْرَمُوْا -এর তাবীলের মধ্যে করে দিয়েছেন। যাতে করে فِعْل -এর আতফ فِعْل -এর উপর হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لِتَعْلِيْمِنَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِمَا -এর مَا টা مَصْدَرِيَة হয়েছে। مَانے مَوْصُوْلَه হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কুরআন বর্ণনা করে নি। কারণ তা আপনা আপনি বুঝা যায়।

ইবনে কাছীর সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুটা গ্রহণযোগ্য। কারণ কুরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁরা বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। হযরত ইউসুফ (আ.) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অবিরাম অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওজুদ শস্যভাণ্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বুভুক্ষু জন-সাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। হযরত ইউসুফ (আ.) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক অর্থাৎ ষাট বা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ সের অর্থাৎ পাঁচ মণের কিছু বেশি হয়।

তিনি এ কাজকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে তা একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ.)-এর সমাধি অবস্থিত। এ বাসভূমিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন, তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

একথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চেয়ে বেশি খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামিন ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর। হযরত ইউসুফ (আ.) নিখোজ হওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর স্নেহ ও ভালোবাসা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশভাই কেনান থেকে মিসর পৌছল। হযরত ইউসুফ (আ.) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল কিন্তু এখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। –[কুরতুবী ও মাযহারী]

বলাবাহুল্য এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের অঙ্গাবয়ব পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌছে যায়। তাদের ধারণাও এ কথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রয় করেছিল, সে কোনো দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে চিনল না, কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে চিনে ফেললেন, فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবি ভাষায় إِنْكَارٌ শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنكِرُونَ -এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরো বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌছলে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমনিভাবে সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়, যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে দেয়। প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল, আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন, তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা কোনো শত্রুর চর নও একথা কিরূপে বিশ্বাস করব? তারা বলল, আল্লাহর পানাহ। আমাদের দ্বারা এরূপ কখনো হতে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ও তার পরিবারের বর্তমান হাল অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক। তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতার আরো কোনো সন্তান আছে কি? তারা বলল, আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। এ সান্ত্বনার জন্য তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠান নি।

এসব কথা শুনে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বণ্টনের ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোনো এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চেয়ে বেশি খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তার মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তারা পুনর্বার আসুক। এর জন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন–

ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.

অর্থাৎ তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সেই ভাইকেও নিয়ে আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন– فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ অর্থাৎ তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। [কেননা আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।] এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলঙ্কার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়িতে পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলঙ্কার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য মনস্থ করে।

ইবনে কাসীর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কাজের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করেছেন, এক. হযরত ইউসুফ (আ.) মনে করলেন যে, তাদের কাছে এ নগদ অর্থ ও অলঙ্কার ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই নেই। ফলে পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তারা আসতে পারবে না। দুই. তিনি পিতা ও ভাইদের কাছ থেকে খাদ্যশস্যের মূল্য গ্রহণ করা পছন্দ করেননি। তাই শাহী ভাণ্ডারে নিজের কাছ থেকে পণ্যমূল্য জমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। তিন. তিনি জানতেন যে, তাদের অর্থ যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে এবং পিতা তা জানতে পারবেন, তখন তিনি আল্লাহর নবী বিধায় এ অর্থকে মিসরীয় রাজভাণ্ডারের আমানত মনে করে অবশ্যই ফেরত পাঠাবেন। ফলে ভাইদের পুনর্বার আসা আরো নিশ্চিত হয়ে যাবে। মোটকথা, হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তার সাক্ষাৎ ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রবসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্য সামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করা আল্লাহ তা'আলার আদেশের কারণে ছিল : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে পিতা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.) তার বিরহ-ব্যাথায় অশ্রু বির্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বয়ং নবী ও রাসূল, পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালোবাসা ব্যতীত তার অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোনো উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনো অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আজীজে মিসরের গৃহে তার সব রকম স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারো মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া তার পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছাতে পারে তা কে না জানে। বিশেষত আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তার হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়ার তার সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোনো কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তার জন্য নেহায়েত মামুলি ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা তো দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, তখনো আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। এ অবস্থা কোনো সামান্যতম মানুষের কাছ থেকে কল্পনা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গাম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন।

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহস্যের অধীনে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তাফসীরে কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে নিজের সম্পর্কে কোনো সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বুঝা কিরূপে সম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় কারো বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাঘে খায়নি; বরং এটা তার ভাইদের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেজমিনে তদন্ত করা তার কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তার মনকে এ দিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল, আজীজে মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাজত করব। তার কোনোরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন, আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হেফাজতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গাম্বরসুলভ তাওয়াক্কুলে ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনোটাই বান্দার ক্ষমতাধীন নয় যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্ট জীবনের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন। তাই বললেন, فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا অর্থাৎ তোমাদের হেফাজতের ফল তো ইতিপূর্বে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের উপরই ভরসা করি।

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য, বর্তমান দুঃখ ও দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা হযরত ইয়াকূব (আ.) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহ তা'আলার ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

لَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوْا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيْ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيْرٌ. অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হলো এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত পণ্যমূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারলো যে, এ কাজ ভুলবশত হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ إِلَيْنَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল مَا نَبْغِيْ অর্থাৎ আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্য ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ এ অবস্থা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আজীজে মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজত রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَا نَبْغِىْ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হলো। এ বাক্যের مَا শব্দটি 'না' বোধক অর্থ নিলে বাক্যের আয়াতটির অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না, শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন– لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖ অর্থাৎ আমি বিনয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর কসম এবং সাথে এরূপ ওয়াদা অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোনো সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহর শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) এ অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন– إِلَّا أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা কোনো বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ এই যে, তেমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদার মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ অর্থাৎ ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, বিনয়ামিনের হেফাজতের জন্য হরফ নেওয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারো হেফাজত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোনো কিছু নয়।

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানুষের জন্য অনেক নির্দেশও মাসআলা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখা দরকার।

সন্তান ভুলত্রুটি করলে সম্পর্কচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধনের চিন্তা করাই একান্ত বিধেয় :

মাসআলা : ১. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা ও জঘন্য গুনাহ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত এক. মিথ্যা কথা বলে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। দুই. পিতার সাথে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা। তিন. কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। চার. বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। পাঁচ. একটি নিরাপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। ছয়. একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোর-জবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেওয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। হযরত ইয়াকুব (আ.) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কোথাও রেখে এসেছে। তখন বাহ্যত এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি; বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি, মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোনো গুনাহ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে এবং গুনাহের জন্য তওবা করেছে। হ্যাঁ, যদি সংশোধনের আশা না থাকে এবং তাদের সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই অধিকতর সমীচীন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

মাসআলা : ২. এখানে হযরত ইয়াকুব (আ.) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছেন।

মাসআলা : ৩. এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) প্রথমে বলে দিয়েছিলেন যে, বিনয়ামীনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাসআলা : ৪. কোনো মানুষের ওয়াদা ও হেফাজতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ তা'আলার উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়া শক্তিদান করার ক্ষমতা তারই। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন– فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا

কা'বে আহবার বলেন, এবার হযরত ইয়াকূব (আ.) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেন নি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাসআলা : ৫. যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোনো বস্তু আসবাব পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা পূর্বক আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েজ। হযরত ইউসুফ (আ.) ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছা বশত তা হয়নি; বরং ইচ্ছাপূর্বক তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই হযরত ইয়াকুব (আ.) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন নি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাসআলা : ৬. কোনো ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, হযরত ইয়াকূব (আ.) বিনয়ামীনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করব।

মাসআলা : ৭. হযরত ইউসুফ (আ.) ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা অঙ্গীকার নেওয়া যে, তারা বিনয়ামীনকে ফিরিয়ে আনবে এ থেকে বুঝা যায় যে, [ব্যক্তির জামানত] বৈধ। অর্থাৎ কোনো মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাজির করার জামানত নেওয়া জায়েজ।

এ মাস'আলায় ইমাম মালেক (র.) দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু আর্থিক জামানতকে বৈধ মনে করেন এবং ব্যক্তির জামানতকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন।

قَوْلُهُ قَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) তার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীনের ব্যাপারে তার বৈমাত্রেয় ভাইদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমাদের একথার উপর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী। এমন অবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাদের সঙ্গে বিনয়ামীনকে প্রেরণ করা হবে। যখন তারা সকলে মিশরের দিকে রওয়ানা হলো তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর পুত্রদেরকে মিশর প্রবেশের সময় একটা পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। আলোচ্য আয়াতে সেই নির্দেশের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ.

অর্থাৎ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সকলে একই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ইতিপূর্বেও তার নিকট হাজির হয়েছিল। কিন্তু এবারের উপস্থিতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এবার তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উদারতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার নিকট গমন করেছিল।

দ্বিতীয়ত এবার তাদের সঙ্গে রয়েছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ামীন। এভাবে একই পিতার এগারোজন সুশ্রী, সুদর্শন, বলিষ্ঠ যুবকদের এই দল অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, একথা চিন্তা করা অস্বাভাবিক নয়। এতদ্ব্যতীত মিসরের বাদশাহের দরবারে তাদের বিশেষ মর্যাদা ও মরতবা রয়েছে, এমনি অবস্থায় তাদের প্রতি কোনো প্রকার বদনজর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ জন্যে হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে বদনজর থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি তদবীর হিসেবে বলেছেন, তোমরা একই দ্বার দিয়ে সকলে প্রবেশ করো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে প্রবেশ কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর প্রতিটি পুত্রই ছিল সুন্দর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং প্রত্যেকেই ছিল আকর্ষণীয়। এতদ্ব্যতীত মিশরের বাদশাহর দরবারে তাদের যে উচ্চ মর্যাদা ছিল এরই মধ্যে তার প্রচারও হয়েছিল অনেক বেশি। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) মনে করলেন, এভাবে তারা যদি একত্রিত হয়ে প্রবেশ করে তবে কারো বদনজর তাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেমন হাদীস শরীফে বদনজরের সত্যতার কথা ঘোষিত হয়েছে– اَلْعَيْنُ حَقٌّ অর্থাৎ নজর ধ্রুব সত্য। আর এজন্যই বদনজর থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তার সন্তানদেরকে নির্দেশ দেন। তোমরা এক সঙ্গে একই দ্বারে প্রবেশ করো না, বরং বিভিন্ন দ্বার দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ কর। যাতে করে বদনজর থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

তদবীর ও তকদীর :

একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এটি একটি তদবীর মাত্র তথা আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা। কিন্তু যদি অদৃষ্টের লিখন কিছু থাকে তবে তার ব্যতিক্রম হয় না। আল্লাহ তা'আলা যা স্থির করে রাখেন তাই হয়। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে; বরং চেষ্টা তাদের অবশ্যই করতে হবে। চেষ্টা তদবীরে কসুর করা সঠিক পন্থা নয়। এর পাশাপাশি নিজের চেষ্টা তদবীরের উপর ভরসা রাখাও সঠিক পন্থা নয়; বরং ভরসা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রতি। কেননা তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছা এবং মর্জিই কার্যকর হয় সর্বত্র। মোটকথা একদিকে উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা তদবীর করতে হবে। অন্যদিকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রাখতে হবে। চেষ্টা তদবীর না করা যেমন ভুল, তেমনিভাবে আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে শুধু চেষ্টা তদবীরের উপর নির্ভর করে থাকাও ভুল। এজন্যই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলার কোনো কিছু থেকেই আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না।

এতে মানব জাতির জন্য রয়েছে এক পরম শিক্ষা। নিজেদের হেফাজত বা নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা যেমন কর্তব্য ঠিক তেমনিভাবে এ উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রখাও একান্ত কর্তব্য।

–[ফাওয়ায়েদে উসমানী, পৃ. ৩১৫]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, মানুষের নজর যে সত্য এর প্রতিক্রিয়া যে হয়ে থাকে আলোচ্য আয়াতে রয়েছে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এজন্যই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইমাম হাসান হুসাইন (রা.)-এর হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন– اُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পুত্রদ্বয় ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.)-এর জন্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হাদীস শরীফে এই পর্যায়ে আরো কিছু বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। ইমাম রাযী (র.) এসব বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

–[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৮, পৃ. ১৭২]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, যা আল্লাহ তা'আলার হুকুম তা কার্যকর হবেই, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তকদীরের লিখনকে খণ্ডাতে পারে না।

–[হাকেম, আহমদ]

এ হাদীস হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ : অর্থাৎ হুকুম তো শুধু আল্লাহ তা'আলারই। অর্থাৎ যা আল্লাহ তা'আলার হুকুম হয়েছে তা অবশ্যই তোমার নিকট পৌছবে। আর এজন্যই হযরত ইয়াকূব (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করার কথা ঘোষণা করেছেন যা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতিই আমি ভরসা করেছি আর ভরসাকারীদের এক আল্লাহ তা'আলার প্রতিই ভরসা করা উচিত।

قَوْلُهُ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ : অর্থাৎ আর তাদের পিতা যেখান থেকে তাদেরকে প্রবেশ করার জন্য বলেছিলেন, তারা সেখান থেকে প্রবেশ করে, পিতার নির্দেশ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কোনো কিছু থেকেই বাঁচাতে পারতো না, শুধু হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মনের বাসনা ছিল তা পূর্ণ করেছেন মাত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন বর্ণিত আছে যে, শহরের চারটি ফটক ছিল। প্রত্যেকটি ফটক দিয়েই তারা প্রবেশ করে এবং এ তদবীরের মাধ্যমে তারা বদনজর থেকে রক্ষা পায় সত্য; কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে করবে খণ্ডন তাই দেখা যায় বিনয়ামীন চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হলো, আর সকল ভাই এজন্য অপমানিত অপদস্ত হলো।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ : আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম, তাই তিনি ছিলেন অবগত, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে এসব বিষয় অবগত করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে যে ইলম দান করেছেন তার উপর তিনি আমল করেছেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলম দান করেছেন তাই তিনি এসব বিষয়ে ছিলেন অভিজ্ঞ। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, যে আলেম তার ইলমের উপর আমল করে না সে প্রকৃত আলেম নয়।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) জানতেন। অথবা এর অর্থ হলো হযরত ইয়াকূব (আ.) এসব বিষয় যে অবগত ছিলেন অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশ লোক বলতে মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা জানতো না আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কিভাবে এমন ইলম দান করেন যা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের জন্য হয় উপকারী।

–[তাফসীরে কাবীর– খ. ১৬, পৃ. ১৭৭]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٩. وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى ضَمَّ اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ الْحَسَدِ لَنَا وَاَمَرَهُ اَنْ لَا يُخْبِرَهُمْ وَتَوَاطَا مَعَهُ عَلٰى اَنَّهُ سَيَحْتَالُ عَلٰى اَنْ يُبْقِيَهُ عِنْدَهُ.

٧٠. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ هِىَ صَاعٌ مِنْ ذَهَبٍ مُرَصَّعٍ بِالْجَوَاهِرِ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ بِنْيَامِيْنَ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ نَادٰى مُنَادٍ بَعْدَ اِنْفِصَالِهِمْ عَنْ مَجْلِسِ يُوْسُفَ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ الْقَافِلَةُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ.

٧١. قَالُوْا وَ قَدْ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا مَا الَّذِىْ تَفْقِدُوْنَ.

٧٢. قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ صَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ مِنَ الطَّعَامِ وَّاَنَا بِهِ بِالْحِمْلِ زَعِيْمٌ كَفِيْلٌ.

٧٣. قَالُوْا تَاللّٰهِ قَسَمٌ فِيْهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ مَا سَرَقْنَا قَطُّ.

٧٤. قَالُوْا اَىِ الْمُؤَذِّنُ وَاَصْحَابُهُ فَمَا جَزَاؤُهُ اَىِ السَّارِقِ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ فِىْ قَوْلِكُمْ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ وَوُجِدَ فِيْكُمْ.

অনুবাদ :

৬৯. অতঃপর যখন তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সম্মুখে উপস্থিত হলো তখন হযরত ইউসুফ (আ.) তার সহোদরকে নিজের কাছে রেখে দিলেন নিজের নিকট নিয়ে আসলেন, বললেন, আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং তারা যা করত অর্থাৎ আমাদের প্রতি ঈর্ষা করে যা করত তজ্জন্য তুমি দুঃখ করিও না। তিনি তাকে আরো নির্দেশ দিলেন যে, এই কথা তাদেরকে অপর ভ্রাতাদিগকে জানাইও না। আর তাকে তিনি নিজের নিকট রেখে দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করবেন বলে জানালে তাও সে সমর্থন করল। لَا تَبْتَئِسْ অর্থ– দুঃখিত হয়ো না।

৭০. অতঃপর সে যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিল তখন সে তার সহোদর বিনয়ামীনের মাল-পত্রে রাজার পানপাত্র রেখে দিল। এটা ছিল মূল্যবান পাথর অলঙ্কৃত একটি স্বর্ণের পিয়ালা অতঃপর অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দরবার হতে তাদের নির্গমনের পর এক আহবায়ক চিৎকার করে বলল এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলল, হে যাত্রীদল হে কাফেলাযাত্রী। নিশ্চয়ই তোমরা চোর।

৭১. তারা তাদের দিকে এগিয়ে বলল, তোমরা কি হারিয়েছ? ذَا এটা সংযোজক শব্দ - اَلَّذِىْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই তার তাফসীরে اَلَّذِىْ -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

৭২. তারা বলল, আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা এনে দিবে সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল খাদ্য পাবে। আর আমি তার অর্থাৎ উষ্ট্র বোঝাই খাদ্য দানের ব্যাপারে জামিন জামানতদার। صُوَاعٌ অর্থ– صَاعٌ বা পেয়ালা।

৭৩. তারা বলল, আল্লাহর কসম, তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই। কখনো আমরা চুরিতে লিপ্ত হয়নি। تَاللّٰهِ এটা কসম বাচক শব্দ। তবে এখানে তাতে বিস্ময়ের অর্থ বিদ্যমান।

৭৪. তারা অর্থাৎ উক্ত ঘোষক ও তার সঙ্গীগণ বলল, তোমরা যদি 'আমরা চুরি করিনি' তোমাদের এই কথায় মিথ্যাবাদী হও তোমাদের কাছে তা পাওয়া যায় তবে তার অর্থাৎ চোরের শাস্তি কি?

٧٥. قَالُوْا جَزَاؤُهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهِ يَسْتَرِقُ ثُمَّ اَكَّدَ بِقَوْلِهِ فَهُوَ اَيِ السَّارِقُ جَزَاؤُهُ ط اَيِ الْمَسْرُوْقِ لَا غَيْرُ وَكَانَتْ سُنَّةُ اٰلِ يَعْقُوْبَ كَذٰلِكَ الْجَزَاءُ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ بِالسَّرِقَةِ فَصَرَفُوْا اِلٰى يُوْسُفَ لِتَفْتِيْشِ اَوْعِيَتِهِمْ .

৭৫. তারা বলল, যার মাল পত্রে পাওয়া যাবে অর্থাৎ যে চুরি করেছে সেই চোরই তার অর্থাৎ চুরিকৃত দ্রব্যের প্রতিদান হবে। আর অন্য কিছু নয়। এরূপই অর্থাৎ এরূপ শাস্তিই আমরা চুরি করত সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে দিয়ে থাকি। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারের মধ্যে চোরের শাস্তির বিধান ছিল এরূপই। جَزَاؤُهُ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। مَنْ وُّجِدَ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। فَهُوَ এটা تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

٧٦. فَبَدَأَ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَفَتَّشَهَا قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ لِئَلَّا يُتَّهَمَ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا اَيِ السِّقَايَةَ مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ ط قَالَ تَعَالٰى كَذٰلِكَ الْكَيْدِ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ط عَلَّمْنَاهُ الْاِحْتِيَالَ فِيْ اَخْذِ اَخِيْهِ مَا كَانَ يوسف لِيَأْخُذَ اَخَاهُ رَقِيْقًا عَنِ السَّرِقَةِ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ حُكْمِ مَلِكِ مِصْرَ لِاَنَّ جَزَاءَهُ عِنْدَهُ الضَّرْبُ وَتَغْرِيْمُ مِثْلَيِ الْمَسْرُوْقِ لَا الْاِسْتِرْقَاقُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط اَخْذَهُ بِحُكْمِ اَبِيْهِ اَيْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اَخْذِهِ اِلَّا بِمَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِاِلْهَامِهِ سُؤَالَ اِخْوَتِهِ وَجَوَابُهُمْ بِسُنَّتِهِمْ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ط بِالْاِضَافَةِ وَالتَّنْوِيْنِ فِى الْعِلْمِ كَيُوْسُفَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ عَلِيْمٌ اَعْلَمُ مِنْهُ حَتّٰى يَنْتَهِيَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى .

৭৬. অনন্তর তাদের মাল পত্রের তল্লাশি নেওয়ার জন্য তাদেরকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। অতঃপর তারা সহোদরের মাল পত্রের তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে শুরু করল। যাতে কোনোরূপ সন্দেহ না করতে পারে, পরে তার সহোদরের মালপত্র হতে তা অর্থাৎ পানপাত্রটি বের করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, এভাবে অর্থাৎ এই কৌশলের মতো আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম। অর্থাৎ তার সহোদরকে রাখতে তাকে কৌশল গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। সম্রাটের ধর্ম অর্থাৎ মিসর সম্রাটের বিধানানুসারে হযরত ইউসুফ (আ.) তার সহোদরকে চুরির কারণে দাস বানিয়ে রাখতে পারত না। কেননা তার আইনে চুরির শাস্তি ছিল প্রহার করা এবং চুরিকৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ জরিমানা করা। দাসরূপে পরিগণিত করা তার আইন ছিল না। যদি না আল্লাহ তার পিতার বিধানানুযায়ী তাকে রাখার ইচ্ছা করতেন অর্থাৎ তাকে তার ভ্রাতাগণকে এতদৃশ প্রশ্ন করার ইলহাম করত ও তার ভ্রাতাগণ কর্তৃক নিজেদের আইন অনুসারে জবাব দান যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ইচ্ছা না হতো তবে তাকে রাখতে তার সামর্থ্য হতো না। আমি যাকে ইচ্ছা জ্ঞানের ক্ষেত্রে মর্যাদার উন্নত করি। যেমন ইউসুফকে করেছি। সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে আরো জ্ঞানীজন। আরো অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী অবশেষে তা আল্লাহ পর্যন্ত যেয়ে শেষ হয়। دَرَجَاتٍ তা اِضَافَة অর্থাৎ পরবর্তী শব্দটির প্রতি সম্বন্ধ বাচক রূপে ব তার শেষে তানভীনসহ পঠিত রয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٧. قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ
قَبْلُ ط اَىْ يُوْسُفُ وَكَانَ سَرَقَ لِاَبِىْ اُمِّهٖ
صَنَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَسَّرَهٗ لِئَلَّا يَعْبُدَهٗ
فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا
يُظْهِرْهَا لَهُمْ ج وَالضَّمِيْرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِىْ
فِىْ قَوْلِهٖ قَالَ فِىْ نَفْسِهٖ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ج
مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ لِسَرِقَتِكُمْ اَخَاكُمْ مِنْ
اَبِيْكُمْ وَظُلْمِكُمْ لَهٗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَالِمٌ
بِمَا تَصِفُوْنَ تَذْكُرُوْنَ فِىْ اَمْرِهٖ ـ

৭৭. তারা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে তার সহোদর হযরত ইউসুফ (আ.) তো পূর্বে চুরি করেছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতামহের একটি মূর্তি ছিল। যাতে তার আর উপাসনা হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি তা লুকিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তা তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না। মনে মনে বলল পিতার নিকট হতে ভাইকে অভিসন্ধিমূলকভাবে এনে ও উক্ত ভ্রাতার উপর নিপীড়ন করার কারণে হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার সহোদর হতে তোমাদের অবস্থা হীনতর এবং তোমরা যে বিবরণ দিতেছ অর্থাৎ তার বিষয়ের যা উল্লেখ করেছ সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবহিত। لَمْ يُبْدِهَا অর্থ তা প্রকাশ করল। এর مَفْعُوْل বা কর্মবাচক ضَمِيْر বা সর্বনাম هَا দ্বারা পরবর্তী বাক্য قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا তে যে كَلِمَةٌ বা বক্তব্য রয়েছে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। اَعْلَمُ শব্দটি যদিও اِسْم تَفْضِيْل অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ম বোধক তারতম্য সূচক বিশেষ্য হলেও এই স্থানে সাধারণ اِسْم فَاعِل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই হেতুই তার তাফসীরে عَالِمٌ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

٧٨. قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا
كَبِيْرًا يُحِبُّهٗ اَكْثَرَ مِنَّا وَيَتَسَلّٰى بِهٖ عَنْ
وَلَدِهِ الْهَالِكِ وَيَحْزُنُهٗ فِرَاقُهٗ فَخُذْ اَحَدَنَا
اسْتَعْبِدْهُ مَكَانَهٗ ج بَدَلًا مِنْهُ اِنَّا نَرٰىكَ
مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ فِىْ اَفْعَالِكَ ـ

৭৮. তারা বলল, হে আজীজ, অতিশয় বৃদ্ধ তার পিতা। তাকে তিনি আমদের অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন। হারানো পুত্রের শোকে তাকে নিয়ে সান্ত্বনা লাভ করেন। তার বিচ্ছেদ তাকে দুঃখ দেয়। সুতরাং তার স্থলে তার পরিবর্তে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। একজনকে দাস করে রাখুন। আপনাকে আমরা আপনার কাজে কর্মে সত্যপরায়ণদের একজন দেখতেছি।

٧٩. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ
حُذِفَ فِعْلُهٗ وَاُضِيْفَ اِلَى الْمَفْعُوْلِ اَىْ
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا
مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ لَمْ يَقُلْ مَنْ سَرَقَ تَحَرُّزًا
مِنَ الْكِذْبِ اِنَّآ اِذًا اِنْ اَخَذْنَا غَيْرَهٗ
لَظٰلِمُوْنَ ـ

৭৯. সে বলল, যার নিকট আমরা মাল পেয়েছি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও পাকড়াও করার কাজ হতে আমরা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ নিতেছি। এরূপ করলে অর্থাৎ অন্য কাউকেও ধরলে আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হবো। مَعَاذَ اللّٰهِ এস্থানে مَعَاذَ শব্দটি مَصْدَرْ বা সমধাতুজ কর্ম পদরূপে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং مَفْعُوْل বা কর্ম পদের প্রতি তার اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ হয়েছে। মূলত বাক্যটি হলো نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَنْ نَّاْخُذَ আমরা অন্যকে ধরা হতে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ নিতেছি। مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ সে চুরি করেছে বললে মিথ্যায় লিপ্ত হওয়া হতো। তা হতে বাঁচতে যেয়ে 'যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি' এই ধরনের বাক্যভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَوَاطَأَ مَعَهُ : تَوَاطَأَ অর্থাৎ تَوَافَقَ তথা উভয়ে একমত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ السِّقَايَةَ : পনি পান করানোর পাত্র, পানি পান করানোর স্থান, পানি পান করানো। এখানে পানির পাত্র উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে ঐ পাত্রকে كَيْل বা পরিমাপক পাত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করে দেয়। صَاعٌ এতে এক লোগাতে صُوَاعٌ ও রয়েছে।

قَوْلُهُ لِئَلَّا يُتَّهَمَ : যাতে করে ষড়যন্ত্রের অপবাদ আরোপিত না হয়।

قَوْلُهُ عَلَّمْنَاهُ الْإِحْتِيَالَ : এটা كِدْنَا لِيُوسُفَ -এর তাফসীর। এই তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ তা'আলার দিকে كَيْد -এর নিসবতের نَفِي করা। كِدْنَا টা عَلَّمْنَا الْكَيْدَ তথা আমি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাহানা শিখিয়েছি।

قَوْلُهُ بِحُكْمِ أَبِيْهِ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়ত অনুযায়ী। তার শরিয়তে চুরির শাস্তি ছিল গোলাম বানিয়ে ফেলা।

قَوْلُهُ بِإِلْهَامِهِ سُوَالَ إِخْوَتِهِ وَجَوَابَهُمْ بِسُنَنِهِمْ : মিসরীয় নীতিমালার ভিত্তিতে বিনয়ামিনকে গোলাম বানিয়ে আটক রাখতে পারতেন না। কেননা মিসরী আইনে চুরির শাস্তি ছিল শাস্তি দেওয়া ও চোরাই মালের দ্বিগুণ আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা ইলহামের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হৃদয়ে একথা ঢেলে দিলেন যে, স্বয়ং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা কর যে, চুরির শাস্তি কি হতে পারে? যাতে করে তারা স্বীয় নীতিমালার আলোকে জবাব দেয়। কেনানী আইনে চুরির শাস্তি হলো গোলাম বানিয়ে রাখা। এভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতৃবৃন্দ নিজেরাই বিনয়ামিনের শাস্তি গোলাম বানিয়ে নেওয়া নির্ধারণ করল।

قَوْلُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِيْنَ : কেউ কেউ যাদের মধ্যে فَلَاسِفَة এবং মো'তাযিলাও রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ দ্বারা اِسْتِدْلَال করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা عَالِمٌ بِالذَّاتِ : عَالِمٌ بِالصِّفَاتِ নন। কেননা যদি আল্লাহ তা'আলা عَالِمٌ بِالصِّفَاتِ হন তবে প্রত্যেক ذِيْ عِلْمٍ -এর উপর ও اعلم রয়েছে। এর দ্বারা আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলার চেয়েও বড় কোনো أَعْلَمُ হবে, অথচ এটা বাতিল।

উত্তর. মুফাসসির (র.) مِنَ الْمَخْلُوقِيْنَ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, যার সারমর্ম হলো প্রত্যেক ذِيْ عِلْمٍ -এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব مَخْلُوق -এর হিসেবে خَالِق -এর হিসেবে নয়। مِنَ الْمَخْلُوقِيْنَ -এর قَيْد -এর পরে حَتّٰى يَنْتَهِي -এ قَيْد -এর প্রয়োজন থাকে না।

قَوْلُهُ وَالضَّمِيْرُ لِلْكَلِمَةِ الَّتِيْ فِيْ قَوْلِهِ الخ : এতে مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাফসীরে খাযেনে রয়েছে যে, فَاَسَرَّهَا -এর মাফঊলের যমীরে তিনটি উক্তি রয়েছে–

১. যমীরটা পরবর্তী বাক্য অর্থাৎ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا -এর দিকে ফিরেছে।

২. فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهُ -এর দিকে ফিরেছে।

৩. যমীরটি حُجَّةٌ -এর দিকে ফিরেছে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ঐ اِحْتِجَاجٌ -কে পরিত্যাগ করেছেন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ اٰوٰى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ মিসরে পৌছার পর যখন সব ভাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তার সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) ছোট ভাই বিনয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তাফসীরবিদ কাতাদাহ (র.) বলেন, সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে হযরত ইউসুফ (আ.) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বিনয়ামিন একা থেকে যায়। হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন, যখন উভয়ে একান্তে গেলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন, আমি তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ! এখন তোমার কোনো চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যে সব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্য মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাসআলা : আলোচ্য আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়–

১. চোখ লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরিয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।

২. প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

৩. ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াক্কুল ও পয়গাম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থি নয়।

৪. যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখে কষ্টে পতিত হবে তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বাতলে দেওয়া উত্তম, যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) করেছিলেন।

৫. যদি অন্য কারো কোনো গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং চোখ লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে তা দেখে بَارَكَ اللّٰهُ অথবা مَا شَاءَ اللّٰهُ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোনো ক্ষতি না হয়।

৬. চোখ লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোনো সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েজ। তন্মধ্যে দোয়া তাবীর ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৭. বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহ তা'আলার উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা রুমী বলেন– بر توكل زانوئے اشتر به بند এটাই পয়গাম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল ও রাসূল ﷺ -এর সুন্নত।

৮. এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ছোট ভাইকে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং যখন সে এসেছে, তখন তার কাছে নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু পিতাকে আনার জন্য কোনো চিন্তাও করেননি এবং তাঁকে স্বীয় কুশল সংবাদ অবগত করানোর কোনো পদক্ষেপও গ্রহণ করেননি। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এমন অনেক সুযোগ ছিল, যখন তিনি পিতাকে স্বীয় অবস্থা ও কুশল সংবাদ দিতে পারতেন, কিন্তু যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাকদীর ও ওহীর ইঙ্গিতেই হয়েছে। হয়তো তখন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পিতাকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি ছিল না। কারণ তখনও প্রিয় পুত্র বিনয়ামিনের বিচ্ছেদের মাধ্যমে পিতার আরো একটি পরীক্ষা বাকি ছিল। এ পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্যই সব ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهٗ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বিনয়ামিনকে রেখে দেওয়ার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হলো, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হলো।

বিনয়ামিনের যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে চাপানো হলো, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হলো। কুরআন পাক ও পাত্রটিকে এক জায়গায় سِقَايَة শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। سِقَايَة শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعٌ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে مَلِكٌ তথা বাদশাহর দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরো জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোটকথা, বিনয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ নিজে তা ব্যবহার করতেন অথবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হতো।

قَوْلُهٗ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ : অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকজন তোমরা চোর। এখানে ثُمَّ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর হয়েছে, যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَوْلُهٗ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা আমাদের চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদেরকে বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ অর্থাৎ ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে, সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।

এখানে প্রথমে প্রশ্ন এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বিনয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তার বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরো একটি আঘাত দেওয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরাপরাধ ভাইয়ের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা গোপনে তাদের আসবাব পত্রের মধ্যে কোনো বস্তু রেখে দেওয়ার মতো জালিয়াতি করা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন?

কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন, বিনয়ামিন যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে রাখা হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়ত তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে আটক রাখা। বিনয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বিনয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন তেমনি ঘটনার সাথে বেখাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন, ভ্রাতাগণ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে

Free @ www.eilm.weebly.com

এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তাই যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন : তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে তা বিনয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহর নির্দেশে তারই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কুরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ অর্থাৎ আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি : এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোনো মানে নেই। এগুলো হযরত মূসা ও খিজির (আ.)-এর ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতোই। এগুলো বাহ্যত গুনাহের কাজ ছিল বলেই হযরত মূসা (আ.) তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু হযরত খিজির (আ.) সব কাজ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গুনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ .

অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল, সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ রাজকর্মচারীরা বলল, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ . অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল, যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে নিজেই তার শাস্তি। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই। উদ্দেশ্য হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকূবী শরিয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

قَوْلُهٗ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ : অর্থাৎ সরকারি তল্লাশিকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমে অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করলো। প্রথমেই বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ অর্থাৎ সব শেষে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলো তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হয়ে এলো। তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বিনয়ামিনকে গালমন্দ দিয়ে বলল, তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহর আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করা এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূবী শরিয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বিনয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আমি যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মর্যাদা তার ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্ট জীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মোকাবিলায় আরো অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

قَوْلُهُ قَالُوْا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهُ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ভাই বিনয়ামিনের রসদপত্রের মধ্যে একটি শাহী পাত্র লুকিয়ে রেখে অতঃপর কৌশলে তা বের করে তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ভাইদের সামনে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলো এবং লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেল, তখন বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলো– اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয় বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সেও চুরি করেছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা এখন স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বিনয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে তখন হুবহু তেমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বিনয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশত সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যে বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তান প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) ও বিনয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যে-ই দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হতো। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অবস্থাও এর চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোনো মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরি বিধায় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি আটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আ.)-এর কাছ থেকে একটি হাসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হতো। ফুফু এই হাঁসুলিটিই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশি নেওয়ার পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে তা বের হলো। ইয়াকুবী শরিয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। হযরত ইয়াকূব (আ.) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিরুক্তি না করে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, হযরত ইউসুফ (আ.) তার কাছেই রইলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এই ছিল ঘটনা, যাতে হযরত ইউসুফ (আ.) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মতো ফুটে উঠেছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কোনো চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তার ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

قَوْلُهُ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে এ কথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্দারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَوْلُهُ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) মনে মনে বললেন, তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনে শুনে ভাইয়ের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরো বললেন, তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবত জোরেই বলেছেন।

قَالُوا يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোনো চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বিনয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ.

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন, যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই; বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালেম হয়ে যাব। কারণ তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٠. فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا يَئِسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا اِعْتَزَلُوْا نَجِيًّا ط مَصْدَرٌ يَصْلُحُ لِلْوَاحِدِ وَغَيْرِهٖ اَىْ يُنَاجِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ كَبِيْرُهُمْ سِنًّا رُوْبِيْلُ اَوْ رَاْيًا يَهُوْذَا اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا عَهْدًا مِّنَ اللّٰهِ فِىْ اَخِيْكُمْ وَمِنْ قَبْلُ مَا زَائِدَةٌ فَرَّطْتُّمْ فِىْ يُوْسُفَ ج وَقِيْلَ مَا مَصْدَرِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ مِنْ قَبْلُ فَلَنْ اَبْرَحَ اُفَارِقَ الْاَرْضَ اَرْضَ مِصْرَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْٓ اَبِىْٓ بِالْعَوْدِ اِلَيْهِ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ ج بِخَلَاصِ اَخِىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ. اَعْدَلُهُمْ.

অনুবাদ :

৮০. যখন তারা তার নিকট হতে নিরাশ হয়ে পড়ল তখন তারা পরামর্শ করতে একান্তে গেল। একজন অপরজনের সাথে পরামর্শ করতে আলাদা হয়ে গেল। তাদের জ্যেষ্ঠ জন বয়োজ্যেষ্ঠ জন অর্থাৎ রুবায়ল অথবা এর অর্থ বুদ্ধি বিবেচনায় যে বড় অর্থাৎ ইয়াহুদা বলল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে তোমাদের ভ্রাতা সম্পর্কে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন আর পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ অর্থাৎ মিশর ভূমি ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে তার নিকট ফিরে যেতে অনুমতি প্রদান করেন অথবা আমার ভ্রাতাকে মুক্তিদান করতো আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করে দেন। আর তিনিই ফয়সালাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ইনসাফ বিধানকারী। اِسْتَيْـَٔسُوْا অর্থ– তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। نَجِيًّا এটা مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস বাচক শব্দ। তা একবচন বা অন্যান্য বচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। مَا فَرَّطْتُّمْ এস্থানে مَا শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। কেউ কেউ বলেন, এটা এই স্থানে مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস অর্থব্যঞ্জকরূপে مُبْتَدَأٌ উদ্দেশ্য। আর তার خَبَرٌ বা বিধেয় হলো مِنْ قَبْلُ। لَنْ اَبْرَحَ অর্থ কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হবো না।

٨١. اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ج وَمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا تَيَقَّنَّا مِنْ مُشَاهَدَةِ الصَّاعِ فِىْ رَحْلِهٖ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ لِمَا غَابَ عَنَّا حِيْنَ اِعْطَاءِ الْمَوْثِقِ حٰفِظِيْنَ وَلَوْ عَلِمْنَا اَنَّهٗ يَسْرِقُ لَمْ نَاْخُذْهُ.

৮১. তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বলিও হে পিতা! তোমার পুত্র চুরি করে ফেলেছে। তার মাল পত্রে পানপাত্র চাক্ষুষ দেখে আমরা যা জানি যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রত্যয় হয়েছে তারই চাক্ষুষ বিবরণ দিলাম, অদৃশ্য বিষয়ে অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময় যা আমাদের হতে গায়েব ছিল সে বিষয়ে আমরা রক্ষাকর্তা নই সে চুরি করবে বলে যদি পূর্বেই জানতাম তবে আর তাকে নিয়ে যেতাম না।

٨٢. وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا هِىَ مِصْرُ اَىْ اَرْسِلْ اِلٰى اَهْلِهَا فَاسْاَلْهُمْ وَالْعِيْرَ اَىْ اَصْحَابَ الْعِيْرِ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ط وَهُمْ قَوْمٌ مِّنْ كِنْعَانَ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ فِىْ قَوْلِنَا فَرَجَعُوْا اِلَيْهِ وَقَالُوْا لَهٗ ذٰلِكَ.

৮২. যে জনপদে আমরা ছিলাম তাকে অর্থাৎ মিসরকে জিজ্ঞাসা করুন অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীদের নিকট লোক প্রেরণ করত জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও অর্থাৎ সেই কাফেলা সঙ্গীদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন। তারা ছিল কিনআন অঞ্চলের একটি সম্প্রদায়। আমরা অবশ্যই আমাদের কথায় সত্যবাদী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٣. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَفَعَلْتُمُوْهُ اِتَّهَمَهُمْ لِمَا سَبَقَ مِنْهُمْ فِيْ اَمْرِ يُوْسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط صَبْرِيْ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِيَنِيْ بِهِمْ بِيُوْسُفَ وَاَخَوَيْهِ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ بِحَالِيْ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهٖ.

৮৩. তারা ফিরে এসে তাদের পিতাকে এ কথা বলল সে বলল, না; বরং তোমাদের মন একটি বিষয় তোমাদের চোখে শোভন করে ধরেছে আর তাই তোমরা করে এসেছ। পূর্বে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে যেহেতু তারা বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছিল সেহেতু এই বারেও তিনি তাদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করছিলেন। সুতরাং আমার ধৈর্যধারণই হলো উত্তম ধৈর্যধারণ হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদের অর্থাৎ ইউসুফ ও তার ভ্রাতাগণ সকলকেই আমার নিকট এনে দিবেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত, তার কাজে কর্মে প্রজ্ঞাময়। سَوَّلَتْ অর্থ শোভন করে ধরেছ।

٨٤. وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ تَارِكًا خِطَابَهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى اَلْاَلِفُ بَدَلٌ مِنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ اَيْ يَا حُزْنِيْ عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ اِنْمَحَقَ سَوَادُهُمَا وَبُدِّلَ بَيَاضًا مِنْ بُكَائِهٖ مِنَ الْحُزْنِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَظِيْمٌ. مَغْمُوْمٌ مَكْرُوْبٌ لَا يُظْهِرُ كَرْبَهٗ.

৮৪. সে তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিল। অর্থাৎ তাদের সম্বোধন করা পরিত্যাগ করল, বলল হায়! ইউসুফ। তার উভয় চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ অত্যাধিক ক্রন্দনের কারণে তার চোখের পুতলির কালো রং বিনষ্ট হয়ে সাদায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর সে ছিল মনস্তাপে ক্লিষ্ট, অতি শোকাহত, চিন্তিত। তার কষ্ট কারো নিকট প্রকাশ হতে দিতেন না। اَسَفٰى তার শেষের আলিফ অক্ষরটি اِضَافَة বাচক শব্দ ی হতে পরিবর্তিত হয়ে এস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল يَا اَسَفِىْ 'হায় আমার দুঃখ ও আফসোস।'

٨٥. قَالُوْا تَاللّٰهِ لَا تَفْتَؤُا تَزَالُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا مُشْرِفًا عَلَى الْهَلَاكِ لِطُوْلِ مَرَضِكَ وَهُوَ مَصْدَرٌ يَسْتَوِيْ فِيْهِ الْوَاحِدُ وَغَيْرُهٗ اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ الْمَوْتٰى.

৮৫. তারা বলল, আল্লাহর কসম! তুমি সব সময়ই ইউসুফের কথা স্মরণ কর। শেষে সুদীর্ঘ অসুস্থতার দরুন মুমূর্ষ হয়ে পড়বে মৃত্যুর সমীপবর্তী হয়ে যাবে বা ধ্বংস প্রাপ্তদের মধ্যে অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হবে। لَا تَفْتَؤُا অর্থ সব সময়। حَرَضًا এটা مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎস ব্যঞ্জক শব্দ। একবচন ও অন্যান্য বচন সকল কিছুই তাতে সমভাবে প্রযোজ্য।

٨٦. قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّيْ هُوَ عَظِيْمُ الْحُزْنِ الَّذِيْ لَا يُصْبَرُ عَلَيْهِ حَتّٰى يُبَثُّ اِلَى النَّاسِ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ لَا اِلٰى غَيْرِهٖ فَهُوَ الَّذِيْ تَنْفَعُ الشَّكْوٰى اِلَيْهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مِنْ اَنَّ رُؤْيَا يُوْسُفَ صِدْقٌ وَهُوَ حَيٌّ.

৮৬. সে বলল, আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ কেবল আল্লাহ তা'আলার নিকট নিবেদন করতেছি। আর কারো নিকট নয়। তার নিকট নিবেদন করা দ্বারাই উপকার লাভ হবে। এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে তা জানি যা তোমরা জান না যে, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য। সে এখনো জীবিত। بَثٌّ এমন ভীষণ শোক যাতে ধৈর্যধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে ফলে মানুষের সামনে তা প্রকাশ হয়ে যায়।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٨٧. ثُمَّ قَالَ يٰبَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اُطْلُبُوْا خَبَرَهُمَا وَلاَ تَايْـئَسُوْا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ رَحْمَتِهِ اِنَّهُ لاَ يَايْـئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ فَانْطَلَقُوْا نَحْوَ مِصْرَ لِيُوْسُفَ ـ

৮৭. অতঃপর বলল হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে কেউ নিরাশ হয় না। تَحَسَّسُوْا অর্থ তোমরা খবর অনুসন্ধান কর। رَوْح অর্থ– রহমত।

٨٨. فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ الْجُوْعُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ مَدْفُوْعَةٍ يَدْفَعُهَا كُلُّ مَنْ رَاٰهَا لِرَدَاءَتِهَا وَكَانَتْ دَرَاهِمَ زُيُوْفًا اَوْ غَيْرَهَا فَاَوْفِ اَتِمَّ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ط بِالْمُسَامَحَةِ عَنْ رَدَاءَةِ بِضَاعَتِنَا اِنَّ اللّٰهَ نَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ يُثِيْبُهُمْ ـ

৮৮. অনন্তর তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য মিশরের দিকে যাত্রা করল। যখন তারা তার নিকট গেল তখন বলল, হে আজীজ! আমরা ও আমাদের পরিবারে কষ্ট অর্থাৎ অনাহার দেখা দিয়েছে এবং আমরা বহু পণ্য নিয়ে এসেছি। مُّزْجٰةٍ অর্থাৎ এমন জিনিস যা এত নিকৃষ্ট যে, যে কেউ তা দেখে সেই তা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয়। তাদের সাথে কিছু অচল দিরহাম ইত্যাদি ছিল। আপনি আমাদের রসদের মাপ পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের পণ্যের নিকৃষ্টতার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে আমাদেরকে দান স্বরূপ দিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। অর্থাৎ তাদেরকে পুণ্যফল দান করেন।

٨٩. فَرَقَّ عَلَيْهِمْ وَاَدْرَكَتْهُ الرَّحْمَةُ وَرَفَعَ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ تَوْبِيْخًا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ مِنَ الضَّرْبِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَاَخِيْهِ مِنْ هَضْمِكُمْ لَهُ بَعْدَ فِرَاقِ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ـ مَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ اَمْرُ يُوْسُفَ ـ

৮৯. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মন আর্দ্র হয়ে গেল। করুণা তাকে গ্রাস করে ফেলল। তিনি নিজের ও তাদের মধ্যে অপরিচয়ের আবরণ উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিরস্কার করে তাদেরকে বললেন, ইউসুফ ও তার সহোদরের সাথে তোমরা কি আচরণ করেছিলে তা অর্থাৎ ইউসুফকে তো ভীষণ প্রহার ও বিক্রয় ইত্যাদি করা ও তার বিচ্ছেদের পর তার সহোদরের উপর ভীষণ জুলুম করার কথা কি তোমরা জান? যখন তোমরা ছিলে অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতে ইউসুফ কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সে সম্পর্কে তোমরা ছিলে অজ্ঞ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٠. قَالُوْا بَعْدَ اَنْ عَرَفُوْهُ لَمَّا ظَهَرَ مِنْ شَمَائِلِهِ مُسْتَثْبِتِيْنَ ءَاِنَّكَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَاَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِيْ قَدْ مَنَّ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط بِالْاِجْتِمَاعِ اِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ يَخَفِ اللّٰهَ وَيَصْبِرْ عَلٰى مَا يَنَالُهُ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ .

৯০. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করে তারা তাকে চিনতে পেরে বিষয়টিকে সত্যায়িত করার উদ্দেশ্যে বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদেরকে মিলিত করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি সাবধানী অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে, বিপদে কষ্টে ধৈর্যধারণ করে তবে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। ءَاِنَّكَ এই হামযাদ্বয়কে আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে। দ্বিতীয়টিকে তাসহীল করত বা উভয় অবস্থায় এতদুভয়ের মাঝে একটি اَلِفٌ [আলিফ] বৃদ্ধি করত পাঠ করা যায়। مَنَّ অর্থ তিনি অনুগ্রহ করেছেন। اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ এস্থানে وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ অর্থাৎ সর্বনামের (هُمْ) স্থলে প্রকাশ্য বিশেষ্যের (الْمُحْسِنِيْنَ) ব্যবহার হয়েছে।

٩١. قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ فَضَّلَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا بِالْمُلْكِ وَغَيْرِهِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اِنَّا كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ اٰثِمِيْنَ فِيْ اَمْرِكَ فَاَذَلَّنَا لَكَ .

৯১. তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমাকে সাম্রাজ্য ইত্যাদি দান করত আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মর্যাদা দিয়েছেন। আর তোমার বিষয়ে নিশ্চয় আমরা ভ্রষ্ট ছিলাম। অপরাধী ছিলাম। সুতরাং তোমার সামনে তিনি আমাদেরকে অবনত করে দিয়েছেন। اِنْ এটা এই স্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ লঘুকৃত [তাশদীদহীন] রূপে পঠিত। মূলত ছিল اِنَّا নিশ্চয়ই আমরা।

٩٢. قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَتْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط خَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّثْرِيْبِ فَغَيْرُهُ اَوْلٰى يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .

৯২. আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ভর্ৎসনা নেই বিশেষ করে আজকের দিন উল্লেখ করার কারণ এই যে, মূলত আজকের দিনই ছিল তিরস্কার ও ভর্ৎসনার বেশি সম্ভাবনা, সুতরাং আজকের দিন যখন তিরস্কার নয় তখন অন্যান্য দিনগুলো তো কিছুতেই তিরস্কারের হবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٩٣. وَسَاَلَهُمْ عَنْ اَبِيْهِ فَقَالُوْا ذَهَبَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا اَوْ هُوَ قَمِيْصُ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ لَبِسَهُ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ كَانَ فِيْ عُنُقِهِ فِي الْجُبِّ وَهُوَ مِنَ الْجَنَّةِ اَمَرَهُ جِبْرَئِيْلُ بِاِرْسَالِهِ لَهُ وَقَالَ اِنَّ فِيْهِ رِيْحَهَا وَلَا يُلْقٰى عَلٰى مُبْتَلًى اِلَّا عُوْفِيَ فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ يَصِرْ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ .

৯৩. পিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, তার চক্ষু নষ্ট হয়ে গেছে, তিনি বললেন, তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও। এই জামাটি ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় এটা তার পরিধানে ছিল। কূপের ভিতর এটা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গলায় ছিল। আসলে এটা জান্নাতের ছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তার পিতার জন্য এটা প্রেরণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটাতে জান্নাতের গন্ধ বিদ্যমান। যে কোনো অসুস্থকে ছোয়ালে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো। يَاْتِ এই স্থানে এটার অর্থ يَصِرْ হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِسْتَيْاَسُوْا : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর اِسْتِيْاَسٌ মাসদার হতে مَاضِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ অর্থ– তারা নিরাশ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ يَئِسُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِسْتِفْعَالٌ টা فِعْلٌ -এর অর্থে হয়েছে। আর سِيْن এবং تَاءْ মুবালাগার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ يَئِسُوْا يَاْسًا كَامِلًا

قَوْلُهُ مَصْدَرُ صَالِحٌ الخ : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, خَلَصُوْا হলো বহুবচন, আর نَجِيًّا হলো একবচন। আর একবচনের حَمْلٌ বহুবচনের উপর বৈধ নয়।

উত্তরের সার হলো– نَجِيًّا হলো মাসদার। আর একবচন বহুবচন সকলের উপরই মাসাদরের প্রয়োগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَىْ يُنَاجِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نَجِيًّا টা حَالٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে। خَلَصُوْا مُتَنَاجِيْنَ

قَوْلُهُ صَبْرِىْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ টা صَبْرِىْ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। কেউ কেউ صَبْرِىْ -এর পরিবর্তে اَمْرِىْ উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ اِنْمَحَقَ : এটা اِنْفِعَالٌ হতে مَحْقٌ হতে নির্গত। অর্থ– মিটিয়ে দেওয়া, বাতিল করা।

قَوْلُهُ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تَفْتَؤُ -এর পূর্বে لَا حَرْفِ نَفِىْ উহ্য রয়েছে। অন্যথায় অনুবাদ হবে যে, তোমরা ভুলে যাও এবং স্মরণ করতে থাক। অথচ এর কোনো অর্থই হয় না। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, تَفْتَؤُ জবাবে কসম। আর جَوَابٌ قَسَمٌ যখন مَاضِىْ مُثْبَتْ হয়। তখন তাতে لَامْ এবং نُوْنْ নেওয়া আবশ্যক হয়। এখানে এই উভয়টিই নেই।

قَوْلُهُ مُزْجَاةٌ : এটা اَزْجَيْتُهُ থেকে নির্গত اَزْجَيْتُهُ অর্থ دَفَعْتُهُ

قَوْلُهُ مُسْتَثْبِتِيْنَ : কোনো কোনো নুসখায় مُتَثَبِّتِيْنَ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে. هَلْ عَلِمْتُمْ এবং مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ -এর মধ্যে مَا টা اِسْتِفْهَامْ تَقْرِيْرِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَذَلَّنَاكَ : অর্থাৎ جَعَلْنَا ذَلِيْلًا (تَرْوِيْعُ الْاَرْوَاحِ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। –[তাফসীরে মারেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৪২, পৃ. ৫৭]

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যখন বিনয়ামিনের মালপত্রে শাহী পান পাত্র পাওয়া গেল এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শরিয়ত মোতাবেক বিনয়ামিনকে মিসরে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো, তখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা একটি প্রস্তাব দিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ অর্থাৎ বিনয়ামিনের স্থলে আমাদের একজনকে ধরে রাখুন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যার কাছে আমাদের মাল পাওয়া গেছে শুধু তাকেই আটক রাখা হবে, অন্য কাউকে নয়। যদি অন্য কাউকে তার স্থলে আটক রাখা হয় তবে তা হবে জুলুম, আর আমরা জুলুম করতে পারি না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ জবাব শ্রবণ করে বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হলো এ অবস্থার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা যখন বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হলো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ قَالَ كَبِيْرُهُمْ الخ : তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল, তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিশর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারো মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

قَوْلُهُ اِرْجِعُوْٓا اِلٰى اَبِيْكُمْ : অর্থাৎ বড় ভাই বললেন, আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ : অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাজত করেছি যাতে সে কোনো অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে আমাদের জানা ছিল না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোঁকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বলল, আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম [অর্থাৎ মিশরে] তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিশর থেকে কেনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এক্ষেত্রে তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বারবার মিসরে এসেছে, কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– اِنَّهٗ عَمِلَ ذٰلِكَ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى لِيَزِيْدَ فِىْ بَلَاءِ يَعْقُوْبَ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই করেছিলেন, হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

বিধান ও মাসআলা : وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারো সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পিতার সাথে বিনয়ামিনের হেফাজত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিনয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরো একটি মাসআলা বের করে বলা হয়েছে– এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনো ভাবে হোক, তদানুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোনো ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না। বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহাবের ফিকহবিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে? কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গুনাহে লিপ্ত না হয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বিনয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ মিশরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাধ্যমে দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন, আমার সাথে 'সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই' রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ শয়তান মানুষের শিরা উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয়। -[বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী]

قَوْلُهُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ الخ : হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ছোট ছেলে বিনয়ামিন মিশরে গ্রেফতার হওয়ার পর তার ভ্রাতারা দেশে ফিরে এলো এবং হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিশরবাসীদের কাছে কিংবা মিশর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বিনয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও হযরত ইয়াকূব (আ.) বিশ্বাস করতে পারলেন না। যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অর্থাৎ তোমরা যা বলছ সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সরবই আমার জন্য উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী (র.) বলেন, মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি পয়গাম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন এ ব্যাপারে হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গাম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে যে, 'মনগড়া কথা' বলে হযরত ইয়াকূব (আ.) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিশরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বিনয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ দিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে- عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ আশা করা যায় যে, সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দিবেন।

মোটকথা হযরত ইয়াকূব (আ.) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না মানার তাৎপর্য এই ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো চুরিও হয়নি এবং বিনয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল তাও ভ্রান্ত ছিল না। وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا اَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন, ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে তার চোখ দুটি শ্বেত বর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ অতঃপর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كَظِيْمٌ শব্দটি كَظْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তার মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারো কাছে তিনি দুঃখেই কথা বর্ণনা করতেন না

একারণেই كَظْمٌ শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোনো কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে- وَمَنْ يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللّٰهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে বড় প্রতিদান দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন, জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জারীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদ মুহূর্তে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তাঁর দুঃখ ও আঘাতের সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) এ বাক্যটির পরিবর্তে يَا اَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ বলেছেন। বায়হাকী 'শু'আবুল ঈমানে'ও এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর গভীর মহব্বতের কারণ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তার দৃষ্টি শক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যত পয়গাম্বরসুলভ পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কুরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে ফিতনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে- اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কুরআন পাকের ভাষায় পয়গাম্বরগণের শান হচ্ছে এই اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ। অর্থাৎ আমি পয়গাম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনানের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখেরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোনো বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরো কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.)-এর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণ গরিমা শুধু দৈহিক রূপ সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং পয়গাম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তার মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না; বরং প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যই এটা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এতো গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌছে খোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হলো। ফলে মিশরের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চেয়ে বেশি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার মতো ঘটনাবলি তখন ঘটেছে,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা বার বার মিশর গমন করতে থাকে। তিনি তখনো ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টাও করেননি; বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো একজন মনোনীত পয়গাম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে আল্লাহ তা'আলার ওহীর ফলশ্রুতিতে সাব্যস্ত করেছেন। কুরআনের كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ : অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল। আল্লাহ তা'আলার কসম! আপনি তো সদা-সর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। [প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতোই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।]

হযরত ইয়াকূব (আ.) ছেলেদের কথা শুনে বললেন- اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারো কাছে করি না; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে একথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

قَوْلُهُ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ : অর্থাৎ বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফের ছাড়া কেউ তার রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

হযরত ইয়াকূব (আ.) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোনো কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হলো। এটা বিনয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যত কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার হযরত ইয়াকূব (আ.) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদের আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন, আজীজে মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে হযরত ইয়াকূব (আ.) প্রথমবার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আজীজে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সেই তার হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাসআলা : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোনো বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং হযরত ইয়াকূব (আ.) ও অন্যান্য পয়গাম্বরের অনুসরণ করা।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দুটি ঢোকই আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয়। এক বিপদে সবর ও দুই. ক্রোধ সংবরণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, مَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে সবরের কারণে শহীদের ছওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী (র.) হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদিন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। আর তার সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)। হঠাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তার মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমনি হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন, দেখ আমার দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম! আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দেব, যদ্দ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেব। কোনো কোনো রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (আ.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, নামাজে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন, এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামাজ ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ الخ : আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) ও তার ভাইদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে আদেশ করেন যে, যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। এ আদেশ পেয়ে তারা তৃতীয়বার মিসর সফরে রওয়ানা হয়। কেননা বিনয়ামিন যে সেখানে আছে তা জানাই ছিল। তাই তার মুক্তি জন্য প্রথমে চেষ্টা করা দরকার ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) মিসরে রয়েছেন বলে যদিও জানা ছিল না কিন্তু যখন কোনো কাজের সময় এসে যায়, তখন মানুষের চেষ্টা-চরিত্র অজান্তেও সঠিক পথেই এগুতে থাকে। এক হাদীসে রয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি আপনা-আপনি উপস্থিত করে দেন। তাই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তালাশ করার জন্যও অজান্তে মিসর সফরই উপযুক্ত ছিল। এছাড়া খাদ্যশস্যেরও প্রয়োজন ছিল। এটাও এক কারণ ছিল যে, খাদ্যশস্য চাওয়ার বাহানায় আজীজে মিসরের সাথে সাক্ষাৎ হবে এবং তার কাছে বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে আবেদন করা যাবে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا (الاية) : অর্থাৎ ইউসুফ ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আজীজে মিশরের সাথে সাক্ষাৎ করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল। হে আজীজ! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসে অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য আমাদের কোনো অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন, কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُزْجَاةٍ শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের এহেন মিসকিনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দূরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে বিধি নিষেধ ছিল এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) আজীজে মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ–

ইয়াকূব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যবীহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আজীজে মিসর সমীপে

বিনীত আরজ!

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পরিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা হযরত ইসহাক (আ.)-এরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গাম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনো চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস্‌সালাম।

পত্র পাঠ করে হযরত ইউসুফ (আ.) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের স্মরণ আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে? যখন তোমাদের মুর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভালো মন্দের বিচার করতে পারতে না?

এ প্রশ্ন শুনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আজীজে মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে হযরত ইউসুফ (আ.) একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোনো উচ্চ মর্তবায় পৌঁছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আজীযে মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো। এরপর আরো চিন্তা ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরো তথ্য জানার জন্য বলল– إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইদের প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। আরো কারণ এই যে, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দুজনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন– قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দুটি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয়ই যারা পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ তা'আলা এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ ভ্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল– تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা মাফ করুন। উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন– لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ অর্থাৎ তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তার পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন– يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান।

Free @ www.e-ilmweebly.com

অতঃপর বললেন– اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও, এতে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো যাতে সবাই দেখা সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হতে পারি। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়।

تَصَدَّقْ عَلَيْنَا বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গাম্বগণের আওলাদ। তাদের জন্য সদকা খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গাম্বর না হলেও হযরত ইউসুফ (আ.) তো পয়গাম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুঁশিয়ার করলেন না কেন?

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে সদকা শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ সুবিধা দেওয়াকেই 'সদকা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের ছওয়াল করেনি; বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, গয়গাম্বরগণের আওলাদের জন্য সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদের উক্তি তাই। –[বয়ানুল কুরআন]

اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সদকা-খয়রাতদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আজীজে মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ ভ্রাতারা তখনো পর্যন্ত জানতো না যে, তিনি ঈমানদার না কাফের। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালই বোঝা যায়।

–[বয়ানুল কুরআন]

এছাড়া এখানে বাহ্যত আজীজে মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আজীজে মিসর ঈমানদার। তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ প্রতিদান দিয়ে থাকেন এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বলা হয়নি। –[কুরতুবী]

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোনো পিবদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করে হা-হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কুরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে বলা হয়েছে اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ). (لَكَنُوْدٌ - كَنُوْد ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে অনুগ্রহ স্মরণ না করে শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার : اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কুরআন পাক অনেক জায়গায় এদুটি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে– اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে বাহ্যত বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) দাবি করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী তার তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কুরআন পাকে এরূপ দাবি করা নিষিদ্ধ হয়েছে- فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى অর্থাৎ নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না। আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন কে মুত্তাকী। কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবি করা হয়নি, বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ : অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না।

قَوْلُهُ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি; বরং অতীত ঘটনাবলির জন্য তিরস্কার করাও পছন্দ করেননি। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদকালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন- اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ أَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দাও। এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারো জামা মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না; বরং এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি মোজেজা, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, যখন তার জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টিশক্তি বহাল করে দেবেন।

যাহ্হাক ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ এ জামাটি সাধারণ কাপরের মতো ছিল না; বরং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য এটি জান্নাত থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূপদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ.)-এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকূব (আ.) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গলায় তাবিজ হিসেবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকেন। ভাইয়েরা পিতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন তার জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত ইউসুফ (আ.)-কে পরামর্শ দেন যে, এটি জান্নাতের পোশাক। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটাই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যদ্দ্বারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপসৌন্দর্য এবং তার সত্তাই ছিল জান্নাতী বস্তু। তাই তা দেহের স্পর্শপ্রাপ্ত প্রত্যেক জামার মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। −[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَأْتُوْنِيْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ : অর্থাৎ তোমরা সব ভাই আপন পরিবারবর্গকে আমার কাছে মিশরে নিয়ে এসো। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে যে, পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে, যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোনো বাধা থাকবে না। তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল, এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩٤. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ خَرَجَتْ مِنْ عَرِيْشِ مِصْرَ قَالَ اَبُوْهُمْ لِمَنْ حَضَرَ مِنْ بَنِيْهِ وَاَوْلَادِهِمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ اَوْصَلَتْهُ اِلَيْهِ الصَّبَا بِاِذْنِهِ تَعَالٰى مِنْ مَسِيْرَةِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَوْ ثَمَانِيَةٍ اَوْ اَكْثَرَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ تُسَفِّهُوْنِىْ لَصَدَّقْتُمُوْنِىْ .

৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন অতিক্রম করল অর্থাৎ মিসরের সীমান্তবর্তী শহর আরীশ হতে বের হলো তখন তাদের পিতা পুত্র-সন্তানদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তাদেরকে বলল, আমি অবশ্যই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি, যদি না তোমরা আমাকে অপ্রকৃতস্থ মনে কর। বেওকুফ বলে না ঠাওরাও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করবে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পূর্বদিকে প্রবাহিত বাতাশ তিন দিন বা আটদিন বা ততোধিক দিনের দূরত্ব হতে এই গন্ধ তার নিকট নিয়ে এসেছিল।

٩٥. قَالُوْا لَهُ تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ خَطَائِكَ الْقَدِيْمِ مِنْ اِفْرَاطِكَ فِىْ مَحَبَّتِهِ وَرَجَاءِ لِقَائِهِ عَلٰى بُعْدِ الْعَهْدِ .

৯৫. তারা তাকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি তোমার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই অর্থাৎ তার প্রতি সীমাতিরিক্ত ভালোবাসা এবং এতদীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার মিলনের আশা করার মতো ভুলেই রয়েছ।

٩٦. فَلَمَّآ اَنْ زَائِدَةٌ جَآءَ الْبَشِيْرُ يَهُوْدَا بِالْقَمِيْصِ وَكَانَ قَدْ حَمَلَ قَمِيْصَ الدَّمِ فَاَحَبَّ اَنْ يُّفْرِحَهُ كَمَا اَحْزَنَهُ اَلْقٰهُ طَرَحَ الْقَمِيْصَ عَلٰى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ رَجَعَ بَصِيْرًا ج قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো পুত্র ইয়াহুদা উক্ত জামাসহ আসল। পূর্বে সে-ই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মিথ্যা রক্ত মাখা জামাটি নিয়ে এসেছিল। তাই সে চাইতেছিল পূর্বে যেমন পিতাকে দুঃখ দিয়েছিল এখন সুসংবাদসহ এই জামাটি দেখিয়ে তাকে আনন্দিত করবে। এবং তার মুখমণ্ডলে তা রাখল অর্থাৎ জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল। বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তা জানি তোমরা যা জান না। اَنْ جَآءَ এই স্থানে اَنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। فَارْتَدَّ অর্থ ফিরল।

٩٧. قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ .

৯৭. তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের কারণে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী।

٩٨. قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَخَّرَ ذٰلِكَ اِلَى السَّحَرِ لِيَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَى الْاِجَابَةِ وَقِيْلَ اِلٰى لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ .

৯৮. বলল, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। রাত্রের শেষ প্রহর পর্যন্ত তিনি তা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ ঐ সময়টি দোয়া কবুল হওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। কেউ কেউ বলেন, তিনি জুমার রাত পর্যন্ত তা পিছিয়ে দিলেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٩٩. ثُمَّ تَوَجَّهُوْٓا اِلٰى مِصْرَ وَخَرَجَ يُوْسُفُ وَالْاَكَابِرُ لِتَلَقِّيْهِمْ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ فِيْ مَضْرِبِهٖ اٰوٰى ضَمَّ اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ اَبَاهُ وَاُمَّهٗ اَوْ خَالَتَهٗ وَ قَالَ لَهُمْ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ قَدْ خَلُوْا وَجَلَسَ يُوْسُفُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ ـ

৯৯. অতঃপর তারা সকলে মিশরের দিকে যাত্রা করেন। হযরত ইউসুফ (আ.) ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যর্থনার জন্য আসেন। অনন্তর তারা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিকট রাজ তাঁবুতে প্রবেশ করল, তখন সে তার পিতা মাতাকে পিতা ও মাতা বা তার খালাকে স্থান দিল ও জড়িয়ে ধরল। এবং তাদেরকে বলল, আপনারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। অনন্তর তারা সেই দেশে প্রবেশ করল। হযরত ইউসুফ (আ.) সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

١٠٠. وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ اَجْلَسَهُمَا مَعَهٗ عَلَى الْعَرْشِ السَّرِيْرِ وَخَرُّوْا اَيْ اَبَوَاهُ وَاِخْوَتُهٗ لَهٗ سُجَّدًا سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ لَا وَضْعِ جَبْهَةٍ وَكَانَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِلَيَّ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ لَمْ يَقُلْ مِنَ الْجُبِّ تَكَرُّمًا لِئَلَّا يَخْجَلَ اِخْوَتُهٗ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ الْبَادِيَةِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ اَفْسَدَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ط اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ بِخَلْقِهٖ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهٖ ـ

১০০. এবং তিনি স্বীয় পিতা মাতাকে আরশের উপর উঠালেন। অর্থাৎ তার সাথে সিংহাসনে বসালেন এবং তার পিতামাতা ও ভ্রাতাগণ সকলে সেজদায় লুটে পড়ল। অর্থাৎ আনত হয়ে অভিবাদন করল। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে নয়। তৎকালে এটাই ছিল অভিবাদনের রীতি। আর সে বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক এটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করলেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের মধ্যে আঘাত সৃষ্টি করার পরও ভাঙ্গন সৃষ্টির করার পর আমাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এনে দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আ.) এই স্থানে কারাগার হতে মুক্তির কথা উল্লেখ করলেন, কূপ হতে মুক্তির কথা তার ভ্রাতাগণের সম্মানার্থে উল্লেখ করলেন না। কারণ তাতে তাদের লজ্জা হতো। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি নিশ্চয়ই তার সৃষ্টি সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তার কর্মে তিনি প্রজ্ঞাময়। اَحْسَنَ بِيْٓ এ স্থানে بِيْ -এর ب টি اِلٰى [প্রতি] -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْبَدْوِ অর্থ মরু জনপদ।

١٠١. وَاَقَامَ عِنْدَهٗ اَبَوَاهُ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً اَوْ سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً وَكَانَتْ مُدَّةُ فِرَاقِهٖ ثَمَانِيْ عَشَرَةَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اَوْ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَصّٰى يُوْسُفَ اَنْ يَّحْمِلَهٗ وَيَدْفِنَهٗ عِنْدَ اَبِيْهِ ـ

১০১. এটার পর তার পিতা তার নিকট চব্বিশ ভিন্ন মতে সতের বৎসরকাল ছিলেন। তাদের বিচ্ছেদকাল ছিল আঠার বা চল্লিশ মতান্তরে আশি বৎসর। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার পিতার পার্শ্বে দাফন করার অসিয়ত করে যান।

Free @ www.eilm.weebly.com

فَمَضٰى بِنَفْسِهٖ وَدَفَنَهٗ ثَمَّهٗ ثُمَّ عَادَ اِلٰى مِصْرَ وَاَقَامَ بَعْدَهٗ ثَلَاثًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً وَلَمَّا تَمَّ اَمْرُهٗ وَعَلِمَ اَنَّهٗ لَا يَدُوْمُ تَاقَتْ نَفْسُهٗ اِلَى الْمُلْكِ الدَّائِمِ فَقَالَ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ج تَعْبِيْرِ الرُّؤْيَا فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قف اَنْتَ وَلِيّٖ مُتَوَلِّيْ مَصَالِحِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ مِنْ اٰبَائِيْ فَعَاشَ بَعْدَهٗ لَكَ اُسْبُوْعًا اَوْ اَكْثَرَ وَمَاتَ وَلَهٗ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ سَنَةً وَتَشَاحَّ الْمِصْرِيُّوْنَ فِيْ قَبْرِهٖ فَجَعَلُوْهُ فِيْ صُنْدُوْقِ مَرْمَرٍ وَدَفَنُوْهُ فِيْ اَعْلَى النِّيْلِ لِتَعُمَّ الْبَرَكَةُ جَانِبَيْهِ فَسُبْحَانَ مَنْ لَا انْقِضَاءَ لِمُلْكِهٖ .

সে মতে হযরত ইউসুফ (আ.) নিজে তাকে নিয়ে যান এবং দাফন করার পর মিশরে ফিরে আসেন। এটার পরও তিনি তেইশ বৎসর অবস্থান করেন। জীবন যখন তার ঘনিয়ে আসল এবং বুঝতে পারলেন যে বেশি দিন আর নেই তখন চিরস্থায়ী ভুবনের প্রতি তার মন উদগ্রীব হয়ে উঠে। সুতরাং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান শিক্ষা দিয়েছে। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। আমার সকল কল্যাণ বিধানের তত্ত্বাবধায়ক। তুমি আমাকে মুসলিম আত্মসমর্পণকারী রূপে মৃত্যু দাও এবং আমাকে আমার পিতৃ পুরুষগণের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত কর। এটার পর তিনি মাত্র এক সপ্তাহ বা কিছু বেশি কাল জীবিত ছিলেন। একশত বিশ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। তার কবরের স্থান নিয়ে মিসরবাসীদের বিবাদ হয়। সকলেই কামনা করছিল যে আমার নিজের মহল্লায় যেন তার দাফন হয়। শেষে তারা একটি মর্মর পাথরের সিন্দুকে তার শব রেখে নীলনদের উভয়কুলে বরকত বিস্তারের উদ্দেশ্যে তার উজানে তারা দাফন করে। আল্লাহ পবিত্র তাঁর রাজত্বের কোনো অন্ত নেই। تَاْوِيْلَ الْاَحَادِيْثِ অর্থ এই স্থানে স্বপ্ন ব্যাখ্যা। فَاطِرَ অর্থ সৃষ্টিকর্তা।

١٠٢. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اَمْرِ يُوْسُفَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ اَخْبَارِ مَا غَابَ عَنْكَ يَا مُحَمَّدُ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ لَدٰى اِخْوَةِ يُوْسُفَ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ فِيْ كَيْدِهٖ اَيْ عَزَمُوْا عَلَيْهِ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ بِهٖ اَيْ لَمْ تَحْضُرْهُمْ فَتَعْرِفَ قِصَّتَهُمْ فَتُخْبِرَ بِهَا وَاِنَّمَا حَصَلَ لَكَ عِلْمُهَا مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ .

১০২. এটা অর্থাৎ ইউসুফ সম্পর্কিত উল্লিখিত বিষয়সমূহ হে মুহাম্মদ ﷺ ! অদৃশ্যলোকের সংবাদ অর্থাৎ যা তোমার সমক্ষে নেই সে কালের সংবাদ তোমার নিকট আমি এটা ওহীরূপে প্রেরণ করেছি। তুমি তাদের নিকট ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের নিকট ছিলে না, যখন তারা ষড়যন্ত্রের বিষয়ে মতৈক্যে পৌছেছিল। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। আর তারা তার সম্পর্কে চক্রান্ত চালাচ্ছিল অর্থাৎ তুমি তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলে না যে এটা জেনেশুনে সংবাদ দিতেছ। একমাত্র ওহীর মারফতেই তুমি এটার জ্ঞান লাভ করেছ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠٣. وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ وَلَوْ حَرَصْتَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

১০৩. তুমি যতই তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে উদগ্রীব হও না কেন, অধিকাংশ লোক মক্কাবাসীগণ ঈমান আনার নয়।

١٠٤. وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ اَىْ اَلْقُرْاٰنِ مِنْ اَجْرٍ ط تَأْخُذُهُ اِنْ مَا هُوَ اَىْ اَلْقُرْاٰنُ اِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

১০৪. তুমি তো তাদের নিকট এটার আল কুরআনের কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছ না যে এটা গ্রহণ করবে। এটা আল কুরআনের বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ব্যতীত কিছু নয়। اِنْ هُوَ এস্থানে اِنْ টি না অর্থবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ذِكْرٌ অর্থ উপদেশ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَرَجَتْ مِنْ عَرِيْشِ مِصْرَ : একমত অনুযায়ী عَرِيْش হলো মিসর ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। অন্য মতানুসারে আবাদীকে عَرِيْش বলে। উদ্দেশ্য হলো মিসরের আবাদী তথা চাষাবাদ ও জনবসতি পূর্ণ এলাকা।

قَوْلُهُ مِنْ بَنِيْهِ وَاَوْلَادِهِمْ : এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্য হতে কয়েকজন স্বীয় পিতার নিকট রয়ে গিয়েছিলেন। অথচ পূর্বে জানা গেছে যে, সকল ভ্রাতাগণই মিশর চলে গিয়েছিলেন। তাফসীরে খাযেনে রয়েছে- مِنْ اَوْلَادِ بَنِيْهِ আর শায়খ যাদাহ -এর ইবারত হলো- مِنْ وُلْدِ وَلَدِهٖ

قَوْلُهُ اَوْصَلَتْهُ اِلَيْهِ الصَّبَا : অর্থাৎ رِيْحُ الصَّبَا মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بَادْصَبَا এখানে একটি সুদৃঢ় সন্দেহ এই যে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিচরণশীল বায়ুকে صَبَا বলা হয়। আর পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে চলাচলকারী বায়ুকে بَرُوْد বলে। আর শাম মিসর হতে পূর্ব দিকে অবস্থিত। কাজেই সিরিয়া থেকে আগত বায়ুকে صَبَا বলা হবে। কাজেই صَبَا সিরিয়া [কেনান] থেকে মিসরের দিকে সুঘ্রাণ আনতে পারে; কিন্তু নিয়ে যেতে পারে না। তবে دَبُوْر মিসর থেকে সিরিয়ার দিকে সুঘ্রাণ নিয়ে যেতে পারে। উচিত ছিল/উত্তম হতো যদি মুফাসসির (র.) صَبَا -এর পরিবর্তে دَبُوْر বলতেন।

قَوْلُهُ تُفَنِّدُوْنِ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর تَفْنِيْدٌ মাসদার হতে جَمْعُ مُذَكَّرٍ حَاضِرٌ -এর সীগাহ এর অর্থ হলো- সুদীর্ঘ হায়াতের কারণে জ্ঞানের দুর্বল হয়ে যাওয়া, স্মৃতি শক্তিতে ক্রটি এসে যাওয়া, বার্ধক্য জনিত কারণে জ্ঞান লোপ পাওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لَصَدَّقْتُمُوْنِىْ : এটা لَوْلَا -এর জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ مَضْرِبَةٍ : এর অর্থ হলো বড় ছাউনী, ক্যাম্প, তাবু।

প্রশ্ন. مَضْرِبَةٍ উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. কেননা دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ বলার পর اُدْخُلُوْا مِصْرَ বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু دُخُوْل -এর পরে دُخُوْل -এর কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ কারণেই فِىْ مَضْرِبَةٍ উহ্য মেনেছেন। যাতে করে প্রথম دُخُوْل দ্বারা তাবুতে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হয়, যা স্বাগত জানানোর জন্য শহরের বাইরে নির্মাণ করা হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় دُخُوْل দ্বারা মিসর শহরে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য হয়েছে।

قَوْلُهُ اُمُّهُ اَوْ خَالَتُهُ : এতে সেই মতবিরোধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা রাহীল সে সময় জীবিত ছিলেন কি না? কেউ কেউ বলেন যে, জীবিত ছিলেন। কিন্তু জমহুর মুফাসসিরগণের অভিমত হলো যে, বিনয়ামিনের জন্মের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন রাহীলের ইন্তেকালের পর হযরত ইয়াকূব (আ.) তার বোন লাইয়া কে বিবাহ করেন। আর রূপকভাবে খালাকে মা বলে দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে চাচাকে আব্বা বলা হয়ে থাকে। ইবরানী ভাষায় بِنْيَا বলা হয় প্রসব বেদনাকে, এই মুনাসাবাতের কারণেই তার নাম বিনয়ামিন রাখা হয়েছিল। এটাও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মায়ের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

قَوْلُهُ اٰمِنِيْنَ : অর্থাৎ اٰمِنِيْنَ مِنَ الْقَحْطِ وَسَائِرِ الْمَكَارِهِ

قَوْلُهُ اِلَى : এতে ইঙ্গিত ও রয়েছে যে, بَاءٌ টা اِلٰى অর্থে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ الخ : অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে হযরত ইয়াকূব (আ.) নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন, তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তা'আলা এতদূর থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিনদিন পড়ে রইলেন, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই জানা যায় যে, মোজেজা পয়গাম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মোজেজা পয়গাম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়। সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মোজেজা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে নিকটতম বস্তু ও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَوْلُهُ تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ : অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি তো সেই পুরোনো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং ইউসুফের জামা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَوْلُهُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি যা তোমরা জান না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

قَوْلُهُ قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ : বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

قَوْلُهُ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ : হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, আমি সত্বরই তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। হযরত ইয়াকূব (আ.) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তাফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন। কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি ক্ষমা করব?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ : কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র বস্তু ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিশরে আসার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তার আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিশর পৌছার সময় নিকটবর্তী হলে হযরত ইউসুফ (আ.) ও শহরের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হলো। সবাই যখন মিশরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতামাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে اَبَوَيْهِ [পিতামাতা] উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা তার শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর হযরত ইয়াকূব (আ.) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতোই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

কারণটি ঐ রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে, যাতে বিনয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তেকালের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য এখানে লেখকের বক্তব্য সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। সেখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিমাতার নাম রাহীল বলা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত নেই। যা আছে সবই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এগুলোও পরস্পর বিরোধী। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার লেখেন, বিনয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তেকাল ইহুদিরা স্বীকার করে না। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোনো প্রশ্ন উঠে না। এমতাবস্থায় আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আপন মাতাই বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীরের মতে এ রেওয়ায়েতই অগ্রগণ্য। ইবনে জারীর বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতার ইন্তেকালের কোনো প্রমাণ নেই। কুরআনের ভাষা থেকেও বাহ্যত তাই বুঝা যায়।

−[মোঃ তকী ওসমানী]

قَوْلُهُ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ : হযরত ইউসুফ (আ.) পরিবারের সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে অবাধে মিশরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবত যে সব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

قَوْلُهُ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ : অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) পিতামাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

قَوْلُهُ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا : অর্থাৎ পিতামাতা ও ভ্রাতারা সবাই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে সেজদা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদাটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জন্য নয় আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, উপাসনামূলক সেজদা প্রত্যেক পয়গাম্বরের শরিয়তে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো জন্য বৈধ ছিল না। কিন্তু সম্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরিয়তের বৈধ ছিল। শিরকের সিড়ি হওয়ার কারণে ইসলামি শরিয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে− আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَقَالَ يَا اَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে যখন পিতামাতা ও এগারো ভাই একযোগে সেজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ল। তিনি বললেন, পিতা! এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা; যাতে দেখেছিলেন যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারোটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহ তা'আলার শুকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ الخ: পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতামাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এলো, তখন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন– رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন। পরিপূর্ণ সৎ বান্দা পয়গাম্বরগণই হতে পারেন। তারা যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্র। –[মাযহারী]

এ দোয়ায় 'খাতেমা বিলখায়র' অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মরতবাই লাভ করুন এবং যতো প্রভাব প্রতিপত্তি ও পদ মর্যাদাই তাদের পদচুম্বন করুক। তারা কখনো গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই তারা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ প্রদত্ত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; বরং সেগুলো আরো যেন বৃদ্ধি পায়।

এ পর্যন্ত কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিস্ময়কর কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নির্দেশের বর্ণনা সমাপ্ত হলো। এর পরবর্তী কাহিনী কুরআন পাক অথবা কোনো মারফূ' হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ ঐতিহাসিক কিংবা ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন।

তাফসীর ইবনে কাছীরে হযরত হাসানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কূপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তার বয়স ছিল [১৭] সতের বছর। এরপর পিতার কাছ থেকে আশি বছর নিরুদ্দেশ থাকেন এবং পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। একশ বিশ বছর বয়সে ওফাত পান।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, কিতাবী সম্প্রদায়ের রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) ও হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বিচ্ছেদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর। এরপর হযরত ইয়াকূব (আ.) মিশরে আগমন করার পর ছেলের সাথে সতের বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয়ে যায়।

তাফসীরে কুরতুবীতে ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিশরে চব্বিশ বছর অবস্থান করার পর হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ওফাত হয়ে যায়। ওফাতের পূর্বে তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে অসিয়ত করেন যেন তার মৃতদেহ দেশে পাঠিয়ে পিতা ইসহাক (আ.)-এর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে শাল কাঠের শবাধারে রেখে বায়তুল মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণেই সাধারণ ইহুদিদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে যায় যে, তারা মৃত্যদেহ দূর দূরান্ত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে এনে দাফন করে। ওফাতের সময় হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বয়স ছিল একশত সাতচল্লিশ বছর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) পরিবারবর্গসহ যখন মিশরে প্রবেশ করেন, তখন তাদের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই জন। পরবর্তীকালে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আওলাদ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে মিশর থেকে বের হয়, তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ সত্তর হাজার। –[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাবেক আজীজে মিসরের মৃত্যুর পর বাদশাহর উদ্যোগে হযরত ইউসুফ (আ.) জুলায়খাকে বিয়ে করেছিলেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

তওরাত ও কিতাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আছে, তার গর্ভে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দুই ছেলে ইফরায়ীয ও মানশা এবং এক কন্যা 'রহমত বিনতে ইউসুফ' জন্মগ্রহণ করেন। রহমতের বিয়ে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। ইফরাযীমের বংশধরের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর ইবনে নূন জন্মগ্রহণ করেন। -[মাযহারী]

হযরত ইউসুফ (আ.) একশ বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তাকে নীলনদের কিনারায় সমাহিত করা হয়।

ইবনে ইসহাক হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আ.)-কে যখন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে মিশর ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন ওহীর মাধ্যমে একথাও বলা হয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মৃতদেহ মিশরে রেখে যাবেন না; বরং সাথে নিয়ে সিরিয়া চলে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের পাশে দাফন করুন। এ নির্দেশ পেয়ে হযরত মূসা (আ.) খোঁজাখুঁজি করে তার কবর আবিষ্কার করেন, যা মর্মর পাথরের একটি শবাধারে রক্ষিত ছিল। তিনি তাঁকে কেনান ভূমি অর্থাৎ ফিলিস্তীনে নিয়ে যান এবং হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পাশে দাফন করেন। -[মাযহারী]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পর মিশর দেশ 'আমালিক' গোত্রের ফেরাউনের করতলগত হয়। বনী ইসরাঈল তাদের রাজত্বে বাস করে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ধর্ম পালন করতে থাকে, কিন্তু বিদেশী হওয়ার অজুহাতে তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন।

-[মাযহারী]

নির্দেশ ও বিধান : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত জানা যায় যে, পিতামাতার প্রতি সম্মানসূচক সেজদা তখন জায়েজ ছিল বলেই তার পিতামাতা ও ভ্রাতারা সেজদা করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদী শরিয়তের সেজদা হচ্ছে ইবাদতের বিশেষ আলামাত। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সেজদা করা হারাম। কুরআনে বলা হয়েছে- لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করো না। হাদীসে আছে হযরত মুআজ (রা.) সিরিয়া গমন করে যখন দেখলেন যে, খ্রিস্টানরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সেজদা করে, তখন ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সেজদা করতে উদ্যত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিষেধ করে বলেন, যদি আমি কাউকে সেজদা করা জায়েজ মনে করতাম, তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সেজদা করে। এমনিভাবে হযরত সালমান ফারিসী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সেজদা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিষেধ করে বলেছিলেন- لَا تَسْجُدْ لِيْ يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ অর্থাৎ সালমান আমাকে সেজদা করো না, বরং ঐ চিরজীবীকে সেজদা কর, যার ক্ষয় নেই। -[ইবনে কাসীর]

এতে বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন সম্মানসূচক সেজদা করা জায়েজ নয়, তখন আর কোনো বুজুর্গ অথবা পীরের জন্য কেমন করে তা জায়েজ হতে পারে?

هٰذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নের অর্থ দীর্ঘদিন পরেও প্রকাশ পায়। যেমন এ ঘটনায় চল্লিশ কিংবা আশি বছর পর প্রকাশ পেয়েছে। -[ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর]

قَدْ أَحْسَنَ بِيْ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোগ-শোক ও বিপদাপদ পতিত হওয়ার পর যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পয়গাম্বরগণের সুন্নত এবং রোগ ও বিপদাপদের কথা উল্লেখ না করাও সুন্নত।

إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজের ইচ্ছা করেন, তার জন্য ধারণাতীত সূক্ষ্ম ও গোপন তদবীরের ব্যবস্থা করে থাকেন। যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا বাক্যে হযরত ইউসুফ (আ.) ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুর জন্য দোয়া করেছেন। এতে বুঝা গেল, বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া নিষিদ্ধ নয়। সহীহ হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সংসারে দুঃখ কষ্টে পেরেশান ও অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করা দুরস্ত নয়। বিপদের কারণে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। যদি দোয়া করতেই হয় তবে এভাবে করেন ইয়া আল্লাহ, যে পর্যন্ত জীবিত রাখ ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও এবং যখন মৃত্যু শ্রেয় হয়, তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ ذَالِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ الخ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (রা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ অর্থাৎ এই কাহিনী ঐ সব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলাকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারো কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেন নি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারো কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলার ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

কুরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, [আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না।] অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। কারণ সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারো কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরো জানা ছিল যে, তার সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবূ তালিবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। তবে কুরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে– مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا। অর্থাৎ কুরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানতো না।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, ইহুদি ও কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করল, আপনি যদি সত্য নবী হন তবে বলুন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরি ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয় আপনি যতো চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হলো প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়। এরপর বলা হয়েছে– وَمَا تَسْئَلُهُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছেন সেজন্য আপনার পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শুনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব লাভ নয়; বরং পরকালের ছওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

অনুবাদ :

١٠٥. وَكَاَيِّنْ وَكَمْ مِنْ اٰيَةٍ دَالَّةٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا يُشَاهِدُوْنَهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا .

১০৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রমাণবহ কত নিদর্শন রয়েছে তারা এই সব অতিক্রম করে যায়। এইসব প্রত্যক্ষ করে কিন্তু এগুলো সম্পর্কে তারা উদাসীন। এই গুলোতে তারা কোনো রূপ চিন্তা করে না। كَاَيِّنْ অর্থ– كَمْ বা কত।

١٠٦. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ حَيْثُ يُقِرُّوْنَ بِاَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّزَّاقُ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ بِهِ بِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَلِذَا كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ فِى تَلْبِيَتِهِمْ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَعْنُوْنَهَا .

১০৬. তাদের অধিকাংশ জন আল্লাহ বিশ্বাস করে বটে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা এবং রিজিকদাতা তা স্বীকার করে বটে কিন্তু তারা প্রতিমার উপাসনা করতো তার সাথে শরিক করে। তাই তারা তাদের হজের তালবিয়া পাঠকালে তাতে বলত لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا لَكَ تَمْلِكُهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি হাজির, তোমার কোনো শরিক নেই কেবল ঐ শরিক ব্যতীত যার মালিক তুমিই। এই বলে তারা প্রতিমাসমূহের দিকেই ইঙ্গিত করতো।

١٠٧. اَفَاَمِنُوْا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ نِقْمَةٌ تَغْشَاهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً فُجَاءَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ اِتْيَانِهَا قَبْلَهُ .

১০৭. তবে কি তারা এটা হতে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলার সর্বগ্রাসী শাস্তি তাদের উপর এসে পড়বে অথবা কিয়ামত এসে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হবে অথচ তারা পূর্বে তার আগমনের সময় টের পাবে না। غَاشِيَةٌ অর্থাৎ এমন শাস্তি যা তাদেরকে গ্রাস করে নিবে। بَغْتَةً অর্থ আকস্মিকভাবে।

١٠٨. قُلْ لَهُمْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهٖ اَدْعُوْا اِلَى دِيْنِ اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ حُجَّةٍ وَاضِحَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ط اٰمَنَ بِىْ عَطْفٌ عَلٰى اَنَا الْمُبْتَدَاُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهُ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جُمْلَةِ سَبِيْلِهِ اَيْضًا .

১০৮. তাদেরকে বল, এটাই আমার পথ। পরবর্তী বাক্যটিতে এটার ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি অর্থাৎ তাঁর দীন ও ধর্ম পথের আহ্বান করি সজ্ঞানে অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর আমি ও আমার অনুসারীগণ অর্থাৎ আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ। আল্লাহ মহিমান্বিত অংশী হওয়া হতে পবিত্রতা তাঁরই। আমি মুশরিকদেরকে অন্তর্ভুক্ত নই। এটাও তার পথেরই শামিল। وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ পূর্বোল্লিখিত اَنَا -এর সাথে এটার عَطْف হয়েছে। আর اَنَا হলো مُبْتَدَاٌ বা উদ্দেশ্য। এটা خَبَر বা বিধেয় হলো তৎপূর্ববর্তী শব্দ عَلٰى بَصِيْرَةٍ

١٠٩. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالاً نُّوْحِىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْحَاءِ اِلَيْهِمْ لَا مَلَائِكَةً مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى ط الْاَمْصَارِ لِاَنَّهُمْ اَعْلَمُ وَاَحْلَمُ بِخِلَافِ اَهْلِ الْبَوَادِ لِجَفَائِهِمْ وَجَهْلِهِمْ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط اَىْ اٰخِرُ اَمْرِهِمْ مِنْ اِهْلَاكِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ اَىِ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اللّٰهَ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَا اَهْلَ مَكَّةَ هٰذَا فَتُؤْمِنُوْنَ.

১০৯. তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের হতে শহরবাসীদের হতে, কারণ শহরবাসীরা অধিক জ্ঞানী ও সহিষ্ণু হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মরুবাসীরা সাধারণত অজ্ঞ ও গোয়ার। বহু পুরুষের প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করেছি ফেরেশতাগণকে নয়। তারা কি অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? অনন্তর তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল অর্থাৎ রাসূলগণকে অস্বীকার করার ফলে শেষে তাদের কেমন ধ্বংস কর পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখে না? যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তাদের জন্য পরকালই অর্থাৎ জান্নাতই শ্রেয়। হে মক্কাবাসীগণ, তোমরা কি তা বুঝ না? এবং ঈমান আনয়ন কর না? يُوْحِىْ এটা অপর এক কেরাতে প্রথমে نُوْنْ [উত্তমপুরুষ বহুবচনরূপে] ও ح-এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ এটা تَعْقِلُوْنَ ক্রিয়াটি ت দ্বিতীয় পুরুষ] ও ى [নাম পুরুষ] উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

١١٠. حَتّٰى غَايَةٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا اَىْ فَتَرَاخٰى نَصْرُهُمْ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ يَئِسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَيْقَنَ الرُّسُلُ اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا بِالتَّشْدِيْدِ تَكْذِيْبًا لَا اِيْمَانَ بَعْدَهُ وَالتَّخْفِيْفِ اَىْ ظَنَّ الْاُمَمُ اَنَّ الرُّسُلَ اَخْلَفُوْا مَا وُعِدُوْا بِهٖ مِنَ النَّصْرِ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ بِنُوْنَيْنِ مُشَدَّدًا وَ مُخَفَّفًا وَبِنُوْنٍ مُشَدَّدٍ مَاضٍ مَنْ نَّشَآءُ ط وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَذَابُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

১১০. অনন্তর তাদের প্রতি রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসতে বিলম্ব হলো। অবশেষে রাসূলগণ যখন নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং তারা ভাবলেন রাসূলগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে তাদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে যে এটার পর আর কাফেরদের ঈমান আনয়ন হতে পারে না তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল। حَتّٰى এটা এস্থানে وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالاً-এর মধ্যে নিহিত বক্তব্যটির غَايَة বা সীমা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। اسْتَيْئَسَ অর্থ নিরাশ হলো। كُذِّبُوْا এটার ذ-এ তাশদীদসহ (بَابُ تَفْعِيْل) পঠিত হলে অর্থ হবে এমনভাবে তাদেরকে অস্বীকার করা হয়েছে যে এটার পর আর কাফেরদের তরফ হতে ঈমান আনয়নের আশা নেই। এটার ذ টি تَخْفِيْف অর্থাৎ তাশদীদ ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে যে, উম্মতদের ধারণা হলো যে, নবীগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সাহায্য আসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটার বিপরীত হয়েছে। অনন্তর আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে উদ্ধার করি। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে অর্থাৎ মুশরিক সম্প্রদায় হতে আমার প্রচণ্ডতা অর্থাৎ আমার শাস্তি রদ করা হয় না। نُنَجِّىْ এটাতে দুটি ن সহ এবং ج এ তাশদীদ ব্যতিরেকেও পাঠ করা যায়। অপর এক কেরাতে مَاضِىْ অর্থাৎ অতীতকাল রূপে একটি ن ও ج এ তাশদীদসহও পঠিত রয়েছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

١١١. لَقَدْ كَانَ فِىْ قِصَصِهِمْ اَىِ الرُّسُلِ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ط اَصْحَابِ الْعُقُوْلِ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى يُخْتَلَقُ وَلٰكِنْ كَانَ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ وَتَفْصِيْلَ تَبْيِيْنَ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فِى الدِّيْنِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاِنْتِفَاعِهِمْ بِهٖ دُوْنَ غَيْرِهِمْ.

১১১. তাদের অর্থাৎ রাসূলগণের কাহিনীতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এই কুরআন মিথ্যা রচিত বাণী নয়। তবে এটা তার সমক্ষে যা রয়েছে তার অর্থাৎ তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক এবং দীনের বিষয়ে যা কিছুর প্রয়োজন সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, গুমরাহী হতে বাঁচার পথ নির্দেশ ও রহমত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য। বিশ্বাসীরাই যেহেতু এটার মাধ্যমে উপকৃত হয় অন্যরা নয়; সেহেতু এস্থানে বিশেষ করে কেবল তাদেরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اُولِى الْاَلْبَابِ অর্থ বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ। يُفْتَرٰى অর্থ যা মিথ্যা রচিত। تَصْدِيْقَ الَّذِىْ এটার পূর্বে একটি ক্রিয়া كَانَ উহ্য রয়েছে। تَفْصِيْلَ অর্থ বিশদ বিবরণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَاَيِّنْ : এটা মূলত كَاَيٍّ ছিল। তানভীনকে نُوْن দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে كَاَيِّنْ হয়ে গেছে। এটা كَافْ تَشْبِيْه এবং اَىٌّ দ্বারা مُرَكَّبْ হয়েছে। এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই كَمْ خَبَرِيَّةٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যা تَكْثِيْر তথা আধিক্যতার অর্থ দেয়। যেমন كَاَيٍّ مِنْ رَجُلٍ رَاَيْتُ [আমি অনেক লোক দেখেছি।] আবার কখনো اِسْتِفْهَام -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, كَاَيٍّ تَقْرَأُ سُوْرَةَ الْاَحْزَابِ [আপনি কতবার সূরায়ে আহযাব পড়েছেন?] كَاَيِّنْ হলো মুবতাদা আর مِنْ اٰيَةٍ হলো تَمْيِيْز যা مِنْ -এর কারণে مَجْرُوْر হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এটা اٰيَةٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا : এটা জুমলা হয়ে كَاَيِّنْ -এর খবর হয়েছে। আর وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ বাক্য হয়ে يَمُرُّوْنَ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمُخْبَرُ عَنْهُ بِمَا قَبْلَهُ : اَنَا এবং مَنْ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর عَلٰى بَصِيْرَةٍ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ যেমনটি মুফাসসির (র.) সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ اَهْلِ الْبَوَادِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَهْلُ الْقُرٰى দ্বারা শহরের মোকাবিল উদ্দেশ্য। কাজেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, নবীগণ বেশির ভাগ শহরেই প্রেরিত হয়েছেন।

قَوْلُهُ يَئِسَ : اِسْتَيْئَسَ -এর মধ্যে [س এবং ت] طَلَبْ -এর জন্য হয়নি।

قَوْلُهُ تَكْذِيْبًا لَا اِيْمَانَ بَعْدَهُ : এতে এই সংশয়ের উত্তর রয়েছে যে, تَكْذِيْب তো প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ এখন এমন تكذيب করেছে যে, এরপরে ঈমানের আশাও শেষ হয়ে গেছে। আর ظَنُّوْا -এর অর্থ اَيْقَنَ الرُّسُلُ হবে তাশদীদের সুরতে। আর تَخْفِيْف -এর সুরতে ظَنُّوْا টা স্বীয় অর্থের উপরই বলবৎ থাকবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَنُنَجِّىْ : جِيْم -এর তাশদীদসহ تَنْجِيَة মাসদার বাবে تَفْعِيْل হতে অর্থ– আমরা উদ্ধার করি। نُنْجِىْ তথা তাখফীফের সাথে বাবে اِفْعَال হতে مُضَارِعْ-এর جَمْعُ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। نُجِّىْ মাজী মাজহূলের وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। বাবে تَفْعِيْل-এর تَنْجِيَةٌ মাসদার থেকে অর্থ হলো– তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। مُشَدَّدًا-এর সম্পর্ক প্রত্যেক কেরাতেই جِيْم-এর সাথে রয়েছে। আর مَاضِىْ مَجْهُوْل-এর সুরতে مَنْ نَشَاءُ টা নায়েবে ফায়েল হবে। আর প্রথম দুই সুরতে مَفْعُوْلٌ بِه হবে। কেউ কেউ مُشَدَّدًا কে نُوْنْ-এর صِفَتْ বলেছেন যা ভুল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ : অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশত কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হলো এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুজে চলে যায়। এটুকুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপর শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আজাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরিউক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'আলায় বিশ্বাসী, কিন্তু তার সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে– وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন, যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমাদের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ছোট শিরক কি? সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, রিয়া [লোক দেখানো ইবাদত] হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেওয়াও ফিকহবিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর কোনো আজাব এসে যাবে কিনা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা মান অথবা না মান আমার তরিকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকব। আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোনো চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহ তা'আলার সিপাহী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাদের মধ্যে লৌকিকতার নাম গন্ধও নেই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা তারা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐসব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কালবী ও ইবনে যায়েদ বলেন, এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণের দাবি করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তার দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। –[মাযহারী]

قَوْلُهٗ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহ তা'আলার 'বান্দা' এবং মানুষকেও তার দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ।

মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতো যে, আল্লাহ তা'আলার রাসূল ও দূত মানুষ নয়। বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহ তা'আলার রাসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার রাসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্য এই যে, তার প্রতি সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারো প্রচেষ্টাও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দাতার ও রাসূলের নির্দেশাবলি অমান্য করে আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে– اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. অর্থাৎ তারা কি দেশ ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহেজগারদের জন্য পরকাল ইহকালের চেয়ে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভালো, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত ভালো?

বিধান ও নির্দেশ : অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য : ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩ আয়াতে মরিয়মের কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হুদের ৪৮ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে– تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গাম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গাম্বর মুহাম্মদ ﷺ কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের তুলনায় বেশি। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সংবলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস গ্রন্থসমূহে বিস্তর মওজুদ রয়েছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনোরূপ অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বুঝে। এগুণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাদের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলিমুল গায়েব' [অদৃশ্যে জ্ঞানী] ছিলেন। কিন্তু কুরআনে পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ এতে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ আলিমুল গায়েব হতে পারে না। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো রাসূল অথবা ফেরেশতাকে শরিক মনে করা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খ্রিস্টানদের অপকর্ম। তারা রাসূলকে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর সত্তায় অংশীদার সাব্যস্ত করে। কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং 'আলিমুল গায়েব' একমাত্র তিনিই। তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গাম্বরগণকে অবহিত করেন। কুরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ এই সুক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে। এরপর কুরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ এর বেশি নয় যে–

اختلاف خلق از نام اوفتاد
هوں بمعنى رفت ارام اوفتاد

অর্থাৎ জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তাৎপর্যে পৌছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেকে গেছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

এ আয়াত পয়গাম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, পয়গাম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রাসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাছীর (র.) ব্যাপক সংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো নারীকে নবী কিংবা রাসূল নিযুক্ত করেননি। কোনো কোনো আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিবি হযরত সারা, হযরত মূসা (আ.)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিনজন মহিলা সম্পর্কে কুরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে যদ্দারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ফেরেশতারা তাদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোনো বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত তিনজন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বুঝা যায়। এই ভাষা নবুয়ত ও রিসালাত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই اَهْلَ الْقُرٰى শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সাধারণত শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন। অজ্ঞ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হয়নি। কারণ সাধারণত গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকে। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী প্রমুখ]

قَوْلُهُ حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ পয়গাম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গাম্বরদের সম্পর্কে কোনো কোনো সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গাম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করতো এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করতো, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারতো যে, পয়গাম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে আদ ও কওমে ছামূদকে নানাবিধ আজাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আজাব আরো কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থাই চিরস্থায়ী এবং সুখ দুঃখও চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরিয়তের যাবতীয় বিধি বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘদিন থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোনো আজাব আসতে দেখেনি। এতে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আজাব যদি আসবারই হতো, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশত অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এতো দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায় এবং পয়গাম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে- حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا مِنَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ । অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আজাব না আসার কারণে পয়গাম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আজাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আজাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গাম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো কোনো নির্দিষ্ট সময় বলেন নি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের উপর আজাব এসে যায়। অতঃপর এ আজাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের অনুসারী মু'মিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং অপসৃত করা হয় না; বরং আজাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আজাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফেরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوْا শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তাফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ كُذِبُوْا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গাম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গাম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গাম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না; বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্য মুজতাহিদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার ভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে খানায়ে কাবার তওয়াফ করেছেন। পয়গাম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এ ঘটনাটি যে ঘটবে তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোনো বিশেষ সময় বর্ণিত না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হলো না। বরং দু'বছর পর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوْا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের উপর আজাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গাম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আজাব আসেনি। ফলে তারা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তাফসীরটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ সহীহ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি যাল এর তাশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوْا ও পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوْا ক্রিয়াপদটি تَكْذِيْبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গাম্বরদের অনুমতি সময়ে আজাব না আসার কারণে তারা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুলসলমান তারাও বুঝি তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তার যা কিছু বলেছিলেন, তা পূর্ণ হলো না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আজাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলো। ফলে পয়গাম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো।

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। এর অর্থ সব পয়গাম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুনামের উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌছে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

قَوْلُهُ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ : অর্থাৎ এ কাহিনী কোনো মনগড়া কথা নয়; বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা তাওরাত ও ইঞ্জীলেও এ কহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, যতগুলো আসমানি গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী থেকে কোনোটিই খালি নয়। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ এ কুরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ কুরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ে বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরি। ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি ইত্যাদি মানবজীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরো বলা হয়েছে এ কুরআন ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফেরদের জন্যও কুরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবূ মনসূর (র.) বলেন, সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করেছেন, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আর-রা'দ মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْاٰيَةُ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا الْاٰيَةُ اَوْ مَدَنِيَّةٌ اِلَّا وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا
الْاٰيَتَيْنِ ثَلَاثٌ اَوْ اَرْبَعٌ اَوْ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ وَاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً

তবে وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই আয়াতগুলো ব্যতীত সূরাটি মক্কী।
মতান্তরে وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا হতে দুটি আয়াত ব্যতীত সূরাটি মাদানী। আয়াত ৪৩/৪৪/৪৫ বা ৪৬।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. الٓمّٓرٰ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ
الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِضَافَةُ
بِمَعْنٰى مِنْ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اَيِ
الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ الْحَقُّ لَا شَكَّ فِيْهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَيْ اَهْلَ مَكَّةَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِاَنَّهٗ مِنْ عِنْدِهٖ تَعَالٰى.

٢. اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا اَيِ الْعَمَدُ جَمْعُ عِمَادٍ وَهُوَ
الْاُسْطُوَانَةُ وَهُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَا عَمَدَ اَصْلًا ثُمَّ
اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ
وَسَخَّرَ ذَلَّلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا
يَّجْرِيْ فِيْ فَلَكِهٖ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يَقْضِيْ اَمْرَ مُلْكِهٖ
يُفَصِّلُ يُبَيِّنُ الْاٰيٰتِ دَلَالَاتِ قُدْرَتِهٖ لَعَلَّكُمْ
يَا اَهْلَ مَكَّةَ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ بِالْبَعْثِ تُوْقِنُوْنَ.

অনুবাদ :

১. আলীম, লাম, মীম, রা এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত, এগুলো এ আয়াতগুলো কিতাবের অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াত। اٰيٰتُ এ স্থানে الْكِتٰبِ শব্দটির প্রতি اٰيٰتُ الْكِتٰبِ শব্দটির اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধ مِنْ [হতে] অর্থব্যঞ্জক। আর যা তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা অর্থাৎ আল কুরআন وَالَّذِيْٓ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَلْحَقُّ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। সত্য তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে এটা প্রেরিত হয়েছে।

২. আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ উঁচিয়ে ধরেছেন স্তম্ভ ব্যতীত যা তোমরা দেখতেছ عَمَدٌ এটা عِمَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ স্তম্ভ। এ কথাটি একটি বাস্তব সত্য। কেননা আসলেই কোনো স্তম্ভ নেই। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন যেভাবে সমাসীন হওয়া তার শানযোগ্য সেভাবে। সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করে দিলেন আজ্ঞাবহ করলেন। তাদের প্রত্যেকটিই স্ব-স্ব কক্ষে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পর্যন্তের জন্য আবর্তন করছে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন স্বীয় সাম্রাজ্যের সকল কিছুর ফয়সালা করেন। এবং নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ তাঁর কুদরত ও অপার ক্ষমতার প্রমাণসমূহ স্ববিস্তারে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন। যাতে হে মক্কাবাসীগণ তোমরা পুনরুত্থানের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

৩. وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ بَسَطَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ خَلَقَ فِيْهَا رَوَاسِىَ جِبَالًا ثَوَابِتَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ خَلَقَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ يُغْشِى يُغَطِّى الَّيْلَ بِظُلْمَتِهِ النَّهَارَ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِىْ صُنْعِ اللّٰهِ .

৩. তিনিই ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেক ফল অর্থাৎ ফলের প্রত্যেক রকম সৃষ্টি করেছেন দু প্রকারের। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা অর্থাৎ এটার তমসা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয়ই তাতে অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ে নিহিত নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ও তাঁর কুদরতের প্রমাণ রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। مَدَّ অর্থ বিছিয়েছেন। جَعَلَ অর্থ সৃষ্টি করেছেন। رَوَاسِىَ অর্থ সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ। يُغْشِىْ অর্থ আচ্ছাদিত করেন।

৪. وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ بِقَاعٌ مُّخْتَلِفَةٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ مُتَلَاصِقَاتٌ فَمِنْهَا طَيِّبٌ وَسَبْخٌ وَقَلِيْلُ الرَّيْعِ وَكَثِيْرُهٗ وَهُوَ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالٰى وَّجَنّٰتٌ بَسَاتِيْنُ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى جَنَّاتٍ وَالْجَرِّ عَلٰى اَعْنَابٍ وَكَذَا قَوْلُهٗ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ جَمْعُ صِنْوٍ وَهِىَ النَّخَلَاتُ يَجْمَعُهَا اَصْلٌ وَاحِدٌ وَتَتَشَعَّبُ فُرُوْعُهَا وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ مُنْفَرِدَةٍ يُّسْقٰى بِالتَّاءِ اَىِ الْجَنَّاتُ وَمَا فِيْهَا وَالْيَاءِ اَىِ الْمَذْكُوْرُ بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُوْنِهَا فَمِنْ حُلْوٍ وَّحَامِضٍ وَهُوَ مِنْ دَلَائِلِ قُدْرَتِهِ تَعَالٰى اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ .

৪. পৃথিবীতে বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ এটার বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পর সংলগ্ন। এটার কতক অংশ উর্বর, কতক অংশ লবণাক্ত। কতক অংশ কম উপকারী আর কতক অংশ বেশ উপকারী। এটাও তাঁর কুদরতের নির্দশন। আছে বহু দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র। একাধিক শিরবিশিষ্ট ও এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ, তাদেরকে দেওয়া হয় একই পানি। আর স্বাদে তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেই। কিছু তো রয়েছে সুমিষ্ট, আর কিছু রয়েছে তিক্ত। এগুলোও হলো আল্লাহ তা'আলা কুদরতের প্রমাণ। অবশ্যই বোধ শক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতো অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়সমূহে রয়েছে নিদর্শন। مُتَجَاوِرَاتٌ অর্থ– পরস্পর সংলগ্ন। جَنَّاتٌ অর্থ উদ্যানসমূহ। زَرْعٌ এটাকে جَنَّاتٌ-এর সাথে عطف বা অন্বয়রূপে رَفع আর اَعْنَابٍ-এর সাথে عطف বা অন্বয়রূপে جَرّ সহ পাঠ করা যায়। পরবর্তী শব্দ نَخِيْلٌ ও তেমনি উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। صِنْوَانٌ এটা صِنْوٌ -এর বহুবচন। এমন খর্জুর বৃক্ষ যার কাণ্ড একটি কিন্তু মাথা একাধিক। غَيْرُ صِنْوَانٍ এক মাথাবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ। يُسْقٰى এটা ت সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গরূপে পঠিত হলে অর্থ হবে ঐ جنات [উদ্যানে] এবং ঐগুলোতে যা আছে তাতে পানি দেওয়া হয়। আর ى সহ অর্থাৎ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গরূপে গঠিত হলে অর্থ হবে উল্লিখিত বস্তুসমূহে পানি দেওয়া হয়। يُفَضِّلُ এটা ن অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বহুবচন ও ى নাম পুরুষ একবচন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। اَلْاُكُلِ এটার ك অক্ষরটিতে পেশ ও সাকিন উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

٥. وَاِنْ تَعْجَبْ يَا مُحَمَّدُ مِنْ تَكْذِيْبِ
الْكُفَّارِ لَكَ فَعَجَبٌ حَقِيْقٌ بِالْعَجَبِ
قَوْلُهُمْ مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا
ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ لِاَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى
اِنْشَاءِ الْخَلْقِ وَمَا تَقَدَّمَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ
سَبَقَ قَادِرٌ عَلٰى اِعَادَتِهِمْ وَفِي الْهَمْزَتَيْنِ
فِي الْمَوْضِعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَحْقِيْقُ
الْاُوْلٰى وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ
بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكُهَا وَفِيْ
قِرَاءَةٍ بِالْاِسْتِفْهَامِ فِي الْاَوَّلِ وَالْخَبَرِ فِي
الثَّانِيْ وَاُخْرٰى عَكْسُهُ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ ج
وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

৫. হে মুহাম্মদ [ﷺ] ! কাফেরগণ কর্তৃক অস্বীকার করার দরুন যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিস্ময়ের কারণ হলো মূলত অধিক বিস্ময়যোগ্য হলো তাদের অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের কথা: মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? কারণ যিনি কোনোরূপ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে সকল সৃষ্টি ও উল্লিখিত বিষয়সমূহ সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি এগুলো পুনর্বার সৃষ্টি করতে নিশ্চয়ই আরো অধিক সক্ষম। أَإِذَا এবং أَإِنَّا এ উভয় স্থানেই হামযাদ্বয়কে আলাদা আলাদা স্পষ্টভাবে বা প্রথমটি স্পষ্ট ও দ্বিতীয়টিকে তাসহীল করত উভয় অবস্থায়ই এতদুভয়ের মধ্যে একটি আলিফ বৃদ্ধি করত বা তা পরিত্যাগ করত পাঠ করা যায়। এক কেরাতে প্রথমাংশের [অর্থাৎ أَإِذَا] হামযাটি اِسْتِفْهَامِيَّة বা প্রশ্নবাচক ও দ্বিতীয় অংশটিতে [অর্থাৎ أَإِنَّا] হামযাটি خَبَرِيَّة [অর্থাৎ বিবরণমূলকরূপে]] গণ্য করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে এটার বিপরীত পাঠ [অর্থাৎ প্রথমটিতে خَبَرِيَّة বা বিবরণমূলক ও দ্বিতীয়টিতে اِسْتِفْهَامِيَّة বা প্রশ্নবোধকরূপে] রয়েছে। তারাই তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং তাদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ শৃঙ্খল। তারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

٦. وَنَزَلَ فِي اسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ اِسْتِهْزَاءً
وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ الْعَذَابِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ الرَّحْمَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
الْمَثُلٰتُ ط جَمْعُ الْمَثُلَةِ بِوَزْنِ السَّمُرَةِ اَيْ
عُقُوْبَاتُ اَمْثَالِهِمْ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ اَفَلَا
يَعْتَبِرُوْنَ بِهَا وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ
عَلٰى مَعَ ظُلْمِهِمْ ج وَاِلَّا لَمْ يَتْرُكْ عَلٰى
ظَهْرِهَا دَابَّةً وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ
لِمَنْ عَصَاهُ ـ

৬. তারা বিদ্রূপ করত শীঘ্র আজাব আসার দাবি করত। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। মঙ্গলের পরিবর্তে অর্থাৎ রহমত ও করুণার পরিবর্তে তারা তোমাকে মন্দ অর্থাৎ শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে তার বহু দৃষ্টান্ত অর্থাৎ তাদের মতো অস্বীকারকারীদের উপর শাস্তি নিপতিত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে; কিন্তু তারা তা হতে কোনোরূপ শিক্ষাগ্রহণ করতেছে না। اَلْمَثُلَاتُ এটা سَمُرَةٌ ঢঙ্গে উচ্চারিত শব্দ مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। নতুবা তিনি পৃথিবীতে বিচরণশীল কোনো প্রাণী আস্ত ছাড়তেন না। আর তোমার প্রতিপালক যারা তার প্রতি অবাধ্যাচরণ করে তাদেরকে শাস্তিদানেও কঠোর। عَلٰى ظُلْمِهِمْ এ স্থানে عَلٰى [অর্থাৎ উপর] শব্দটি مَعَ [অর্থাৎ সাথে, সত্ত্বেও] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

٧. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا هَلَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مُخَوِّفُ الْكَافِرِينَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ إِتْيَانُ الْآيَاتِ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ نَبِيٌّ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ بِمَا يُعْطِيهِ مِنَ الْآيَاتِ بِمَا يَقْتَرِحُونَ.

৭. আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, তার নিকট অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন যেমন- লাঠি, হাত হতে জ্যোতি বিকিরণ, পাথর হতে উষ্ট্র নির্গমন ইত্যাদি অবতীর্ণ হয় না কেন? لَوْلَا এটা এস্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি তো একজন সতর্ককারী কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী বই কিছুই নও। নিদর্শন আনয়ন তোমার কর্তব্য নয়। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক। অর্থাৎ নবী। যিনি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিদর্শনের সাহায্যে তাদের প্রতিপালকের প্রতি তাদেরকে আহ্বান জানান। তাদের দাবি অনুসারে তিনি নিদর্শন প্রদর্শন করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ : এখানে سُوْرَةُ الرَّعْدِ হলো মুবতাদা আর مَكِّيَّةٌ হলো خَبَر اَوَّل আর تِلْكَ الخ হলো خَبَر ثَانِى এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে পাঁচটি উক্তি রয়েছে- ১. وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (اَلْاٰيَة) ব্যতীত পূর্ণ সূরাটাই মাক্কী। ২. هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ হতে لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ পর্যন্ত ব্যতীত পূর্ণ সূরাটাই মাক্কী। ৩. وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا الخ দুটি আয়াত ব্যতীত পূর্ণ সূরাটাই মাদানী। ৪. বলা হয়েছে যে, পূর্ণ সূরাটাই মাদানী। ৫. বলা হয়েছে যে, পূর্ণ সূরাটাই মাক্কী।

قَوْلُهُ الْاِضَافَةُ بِمَعْنَى مِنْ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, اٰيَاتُ الْكِتَابِ -এর মধ্যে اِضَافَةُ الشَّىْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ আবশ্যক হচ্ছে। কেননা আয়াত এবং কিতাব একই বস্তু?

উত্তরের সারকথা হলো- اِضَافَةُ الشَّىْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ সে সময় আবশ্যক হয় যখন اِضَافَةٌ بِمَعْنَى اللَّامِ হয়। আর এখানে اِضَافَةٌ بِمَعْنٰى مِنْ হয়েছে, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ بِاَنَّهُ مِنْ عِنْدِهٖ : এ বাক্যটি يُؤْمِنُوْنَ -এর مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে।

প্রশ্ন. يُؤْمِنُ টা مُتَعَدِّىْ بِالْبَاءِ ব্যবহার হয় مُتَعَدِّىْ بِاِلٰى ব্যবহার হয় না।

উত্তর. এখানে يُؤْمِنُوْنَ টি يُقِرُّوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে تَعْدِيَةٌ بِالْبَاءِ বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ الخ : এখানে اَللّٰهُ হলো মুবতাদা আর اَلَّذِىْ الخ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ وَهُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَا عَمَدَ اَصْلًا : এটা একটা সংশয়ের নিরসন যে, বহুবচনের نَفِىْ করা দ্বারা مَفْهُوْم হিসেবে نُبُوْت وَاحِدْ -এর উপর বুঝায়। অর্থাৎ একটা স্তম্ভ রয়েছে। উত্তর হলো এই যে, مُقَيَّدْ -এর نَفِىْ করা مُطْلَقْ -এর نَفِىْ -কে বুঝায়। এখানে نَفِىْ টা مَوْصُوْف এবং صِفَتْ উভয়ের দিকেই ফিরেছে।

قَوْلُهُ جَعَلَ : এটা একটি সংশয়ের জবাব যে, جَعَلَ টা مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হয়ে থাকে। অথচ এখানে দুই মাফউল হয়নি।

উত্তর. جَعَلَ এখানে خَلَقَ অর্থে হয়েছে, صَيَّرَ অর্থে হয়নি।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ : এর মধ্যে مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ -এর তাফসীর করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ : এটা হলো جُمْلَة مُسْتَانِفَة আর পূর্বে উল্লিখিত اِفْعَالٌ-এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ ও হতে পারে يُغْشِى-এর فَاعِلٌ উহ্য যমীর هُمْ যা আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরেছে। اَللَّيْلُ হলো প্রথম মাফউল আর اَلنَّهَارُ হলো দ্বিতীয় মাফউল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাতের মাধ্যমে দিনকে ঢেকে দেন।

قَوْلُهُ صِنْوَانٌ : এ শব্দটি صَادْ বর্ণে তিন ধরনের হরকতই হতে পারে। অর্থ হলো- نَخْلَةٌ لَهَا رَاسَانِ وَاَصْلُهَا وَاحِدٌ তথা এমন খর্জুর বৃক্ষ যার মূল একটি কিন্তু মাথা দুটি।

قَوْلُهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تُسْقٰى : مُؤَنَّثٌ-এর সুরতে তার নায়েবে ফায়েল اَلْجَنَّاتُ হবে এবং يُسْقٰى টা مُذَكَّرٌ-এর সুরতে তার ফায়েল উল্লেখ হবে।

قَوْلُهُ بِالْيَاءِ : অর্থাৎ نُفَضِّلُ-এর মধ্যে يَاء এবং نُوْن উভয়টি বৈধ হবে। مُذَكَّر غَائِبٌ-এর সুরতে يُدَبِّرُ-এর সাথে مُطَابِقَتْ হবে।

قَوْلُهُ حَقِيْقٌ بِالْعَجَبِ : প্রশ্ন. কোনো উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে تَعْجَبُ-এর তাফসীর حَقِيْقٌ দ্বারা করেছেন? উত্তর. এর উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। প্রশ্নটি হলো عَجَبٌ হচ্ছে خَبَر مُقَدَّمٌ আর قَوْلُهُمْ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ আর عَجَبًا হলো মাসদার। আর قَوْلُهُمْ-এর উপর মাসদারের حَمْل বৈধ নয়। তাই حَقِيْق-কে উহ্য মেনেছেন যাতে করে حَمْل বৈধ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে রা'দ প্রসঙ্গে : এ সূরাটি সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.), হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত ইকরিমা (র.), হযরত আতা (র.) এবং হযরত জাবের ইবনে জায়েদ (র.) এ মতই পোষণ করেছেন। এদিকে আবুশ শেখ এবং ইবনে মারদুবিয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। ইবনে জোবায়ের (র.), কালবী (র.) এবং মোকাতেল (র.) এ মতই পোষণ করেছেন।

তৃতীয় আর একটি মত হলো, দুটি আয়াত ব্যতীত আর সবই মদীনা তৈয়্যবায় নাজিল হয়েছে, শুধুমাত্র দুটি আয়াতই মক্কায়ে মুয়ায্যমায় নাজিল হয়েছে। আয়াত দুটি হলো এই-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ (الْاٰيَةَ) .

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا (الْاٰيَةَ) .

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত কাতাদা (র.) এ মত পোষণ করতেন।

ইবনে আবি শায়বা থেকে জাবের ইবনে জায়েদের কথা বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির নিকট তারা সূরায়ে রা'দ পাঠ করতেন। কেননা এর বরকতে মৃত ব্যক্তির রূহ কবজ করা সহজ হয়। -[তাফসীরে ফতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৬৩]

এ সূরায় ৪৩টি আয়াত, ৮৬৫৫ টি বাক্য এবং ৩৫০৬টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরায় দীন ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাত, ওহী, কর্মফল এবং হক ও বাতিলের তাৎপর্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাই সূরার শুরু থেকেই হকের বিবরণ রয়েছে এবং এত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন যে মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম একথা ধ্রুব সত্য। হক বা সত্যের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা বিজয়ী এবং স্থায়ী হয়। আর যা বাতিল তা বিদায় নিতে বাধ্য হয়। পবিত্র কুরআনের সত্যতা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরার শুরুতে কুরআনে হাকীমের সত্যতার বিবরণ ছিল এবং সূরার শেষেও এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এরপর বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ এবং তার বিস্ময়কর কুদরত হিকমতের আলোচনা রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যারা নবুয়তকে অস্বীকার করে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ, প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং আখেরাতের সত্যতার কথা সুস্পষ্টভাবে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

এটা কারো বানানো কথা নয়, বরং এ হলো তার পূর্ববর্তী কথারই অনুকূল, প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং হেদায়েত ও রহমত। ঠিক এমনিভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

الٓمّٓرٰ . تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

এগুলো কিতাবেরই আয়াতসমূহ। হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা ধ্রুব সত্য, সন্দেহাতীত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি ঈমান আনে না। এমন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহকে তারা অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ الٓمّٓرٰ : এগুলোকে حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ বা খণ্ড বর্ণ বলা হয়। এসবের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কুরআনের মতো আল্লাহ তা'আলার ওহী : প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং সত্য। কিতাব অর্থ কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কুরআন বুঝানো যেতে পারে। কিন্তু عَطْف এবং وَاوْ অক্ষরটি বাহ্যত বুঝায় যে, কিতাব এবং اَلَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ দুটি পৃথক পৃথক বস্তু। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কুরআন এবং اَلَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ -এর অর্থ ঐ ওহী হবে, যা কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসেছে। কেননা এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কুরআনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কোনো কিছু বলেন না, বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধিবিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে, কুরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কুরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কুরআন ছাড়া হাদীসে যেসব বিধিবিধান রয়েছে, সেগুলোরও অর্থ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এজন্যই নামাজে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, এ কুরআন এবং যেসব বিধিবিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তাভাবনা করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর মুঠোর মধ্যে।

বলা হয়েছে– اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থাই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নিচে তারকারাজির আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়। যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কুরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীর বক্তব্য প্রথমত এর পরিপন্থি নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোনো রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হবে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কুরআন পাকে যেখানে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অ-প্রাকৃত দেখাও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ আকাশের অস্তিত্ব নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তা যেন চাক্ষুষ দেখার মতোই। –[রূহুল মা'আনী]

এরপর বলা হয়েছে– ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারো বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তার পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছে।

قَوْلُهُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা সর্বদা তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো সময় তাদের গতি চুল পরিমাণ কমবেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোনো সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌছার পর তাদের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সবসময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে।

এসব গ্রহের এক একটির আয়তন পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির দূরের কথা, হাজারো ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এ ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু ঊর্ধ্বে।

প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা; মানবীয় পরিচালনা নামে মাত্র : يُدَبِّرُ الْاَمْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণত মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। জাগতিক বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলার শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা-আপনি এসে জুড়ে হয় আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের শারীরিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে পড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহাব্যবস্থাপক আল্লাহ তা'আলারই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

قَوْلُهُ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ : অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কুরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এগুলো নাজিল করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শনাবলিও হতে পারে। অর্থাৎ আসমান, জমিন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ : অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করে পরকাল ও কিয়ামতের বিশ্বাসী হও। কেননা এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহ তা'আলার শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভবপর হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বুঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন একজন ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোনো দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا : অর্থাৎ তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারি পাহাড় পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থি নয়। কেননা গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতোই দৃষ্টিগোচর হয়। কুরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারি পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের পৃষ্ঠে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোনো চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এক একটি ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক ফল্গুধারার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারায় সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

قَوْلُهُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ : অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল উৎপন্ন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু দু প্রকার সৃষ্টি করেছেন। লাল-সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ -এর অর্থ দু না হয়ে একাধিক প্রকারও হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টা زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ -এর অর্থ নর ও মাদি হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদি হয়। উদাহরণত খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে। যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন। যেমন কোনো উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ.

অর্থাৎ অনেক ভূমি খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন রূপ। কোনোটি উর্বর জমি ও কোনোটি অনুর্বর, কোনোটি নরম ও কোনোটি শক্ত এবং কোনোটি শস্যের উপযোগী এবং কোনোটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ। তন্মধ্যে কোনো বৃক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু কাণ্ড হয়ে যায়; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনোটিতে এক কাণ্ডই থাকে; যেমন খেজুর বৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয় একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ ও বিভিন্ন প্রকার বাতাসও সবাই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়।

সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোনো একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে– শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়; যেমন এ শ্রেণির অজ্ঞলোক তাই মনে করে। কেননা নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হতো। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ : নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি, মাহাত্ম্য ও এককত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয় যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ الخ : আলোচ্য প্রথম তিন আয়াতে কাফেরদের নবুয়ত সম্পর্কিত সন্দেহের জবাব রয়েছে এবং এর সাথে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। **এক.** তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরকালের সংবাদদাতা পয়গাম্বরগণকে অবিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁদের নবুয়ত অস্বীকার করত। কুরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে– هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গাম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলত, এসো আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, যে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে– وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মোজেজা এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে?

Free @ www.e-ilmweebly.com

কিন্তু এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এ উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে? এটা কি সম্ভবপর? কুরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলা বাহুল্য যে সত্তা প্রথমবার কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোনো নতুন বস্তু তৈরি করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, কিন্তু পুনর্বার তৈরি করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হিকমতসহ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবত অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে, একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের কণা একত্রিত নয় কি? বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরেছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপারশক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তার পক্ষে কেন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি, পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু তার ভিতরকার, পানি তার ভিতরকার এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি কাফেররা আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন।

خاک وباد واب وآتش زنده اند

بامن وتو مرده باحق زنده اند

মোটকথা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতে পুনর্জীবন ও হাশরের দিন অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোজখে বাস করবে।

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই- যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? দ্বিতীয় আয়াতে এর জবাব দেওয়া হয়েছে-

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ.

অর্থাৎ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আপনার কাছে বিপদ নাজিল হওয়ার তাগাদা করে [যে আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আজাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আজাব আসাকে খুবই অবান্তর অথবা অসম্ভব মনে করে]।

অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আজাব এসেছে। সকলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আজাব আসা অবান্তর হলো কিরূপে? এখানে مَثُلَاتُ শব্দটি مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে, নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গুনাহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। কাজেই কোনোরূপ ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু তখন আমাদের উপর কোনো আজাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই, আমরা রাসূল ﷺ -এর অনেক মোজেজা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মোজেজা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেওয়া হয়েছে- يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ط إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ কাফেররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মোজেজা দেখতে চাই তা তাঁর উপর নাজিল করা হলো না কেন? এর উত্তর এই যে, মোজেজা জাহের করা পয়গাম্বরদের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মোজেজা প্রকাশ করতে চান, করেন। তিনি কারো দাবি ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এজন্যেই বলা হয়েছে- إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা-মোজেজা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গাম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মোজেজা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন যে ধরনের মোজেজা প্রকাশ করতে চান করেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দেশে পয়গাম্বর আসা কি জরুরি? আয়াতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না। যে কোনো পয়গাম্বর হোক কিংবা পয়গাম্বরের প্রতিনিধিরূপে তার দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণত সূরা ইয়াসীনে পয়গাম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দুব্যক্তিকে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে এটা জরুরি হয় না যে, হিন্দুস্তানে কোনো নবী ও রাসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রাসূলের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এ দেশে প্রচুর সংখ্যক আলেমের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৮. اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّ وَاحِدٍ وَّمُتَعَدِّدٍ وَّغَيْرِ ذٰلِكَ وَمَا تَغِيْضُ تَنْقُصُ الْاَرْحَامُ مِنْ مُّدَّةِ الْحَمْلِ وَمَا تَزْدَادُ ط مِنْهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ بِقَدْرٍ وَّحَدٍّ لَا يَتَجَاوَزُهُ ـ

৮. আল্লাহ তা জানেন যা প্রত্যেক স্ত্রীজাতি গর্ভে বহন করে অর্থাৎ এটা পুত্র কি কন্যা, এক বা একাধিক ইত্যাদি আর গর্ভধারণের মেয়াদ হতে জরায়ুতে যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় مَا تَغِيْضُ যা হ্রাস পায়। এবং তা হতে যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর তার নিকট প্রতিটি বস্তুই নির্দিষ্ট পরিমাপে নির্দিষ্ট এক সীমা ও পরিমাণানুসারে রয়েছে। কেউই এটা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

৯. عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ الْكَبِيْرُ الْعَظِيْمُ الْمُتَعَالِ عَلٰى خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ بِيَاءٍ وَّدُوْنِهَا ـ

৯. দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে তিনি অবহিত। তিনি বড় সুমহান, তার সৃষ্টির উপর তিনি ক্ষমতাধিকারে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। اَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থ যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান। اَلْمُتَعَالِ শেষে ى সহ বা এটা ব্যতিরেকেও এটা পঠিত রয়েছে।

১০. سَوَاءٌ مِّنْكُمْ فِيْ عِلْمِهِ تَعَالٰى مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ مُسْتَتِرٍ بِاللَّيْلِ بِظَلَامِهِ وَسَارِبٌ ظَاهِرٌ بِذَهَابِهِ فِيْ سَرْبِهِ اَيْ طَرِيْقِهِ بِالنَّهَارِ ـ

১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন করে বা যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাত্রিতে অর্থাৎ তার অন্ধকারে আত্মগোপন করে ও দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তা সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে এক সমান। مُسْتَخْفٍ অর্থ আত্মগোপনকারী। سَارِبٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পথে প্রকাশ্যে বিচরণ করে। سَرْبٌ অর্থ পথ।

১১. لَهُ لِلْاِنْسَانِ مُعَقِّبٰتٌ مَلٰٓئِكَةٌ تَعْتَقِبُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قُدَّامِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَائِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ط اَيْ بِاَمْرِهِ مِنَ الْجِنِّ وَغَيْرِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ لَا يَسْلُبُهُمْ نِعْمَتَهُ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ مِنَ الْحَالَةِ الْجَمِيْلَةِ بِالْمَعْصِيَةِ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا عَذَابًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ج مِنَ الْمُعَقِّبٰتِ وَلَا غَيْرِهَا ـ

১১. তার জন্য অর্থাৎ মানুষের জন্য সম্মুখে ও পশ্চাতে بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থ তার সম্মুখে। خَلْفِهِ অর্থাৎ তার পিছনে। একের পর এক প্রহরী বিদ্যমান। অর্থাৎ হেফাজতকারী ফেরেশতা বিদ্যমান যারা একের পর এক তার প্রতি নেগাহবানী করে। তারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে তাকে জিন ইত্যাদি হতে রক্ষা করে। আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না অর্থাৎ তাদের প্রদত্ত তাঁর নিয়ামত তিনি ছিনিয়ে নেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা অর্থাৎ নিজেদের উত্তম অবস্থা অবাধ্যাচারের মাধ্যমে পরিবর্তন করে। কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ তা'আলা মন্দ করার অর্থাৎ শাস্তিদানের ইচ্ছা করেন তবে তা এই রক্ষণাবেক্ষণকারী বা অন্য কেউই রদ করবার নেই। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এ স্থানে مِنْ শব্দটি بِ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেহেতু এটার তাফসীরে بِاَمْرِهِ উল্লেখ করা হয়েছে। مِنْ وَّالٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمَا لَهُمْ لِمَنْ أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِمْ سُوْءً مِنْ دُوْنِهٖ أَىْ غَيْرِ اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ وَّالٍ يَمْنَعُهُ عَنْهُمْ ـ

তিনি ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তাদের অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মন্দ করার ইচ্ছা করেন তাদের কোনো অভিভাবক নেই। যে আল্লাহ তা'আলার শাস্তিকে তাদের তরফ হতে প্রতিহত করবে।

١٢. هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا لِلْمُسَافِرِ مِنَ الصَّوَاعِقِ وَّطَمَعًا لِلْمُقِيْمِ فِى الْمَطَرِ وَيُنْشِئُ يَخْلُقُ السَّحَابَ الثِّقَالَ بِالْمَطَرِ ـ

১২. তিনিই তোমাদেরকে বিজলী দেখান যা পথিকদের জন্য বজ্র পতনের ভয় প্রদানকারী এবং স্বগৃহে অবস্থানকারীদের জন্য বৃষ্টির ভরসা প্রদানকারী। আর তিনি সৃষ্টি করেন বৃষ্টির বোঝায় ভারি মেঘ। يُنْشِئُ অর্থ তিনি সৃষ্টি করেন।

١٣. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ هُوَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِالسَّحَابِ يَسُوْقُهُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهٖ أَىْ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَ تُسَبِّحُ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ج أَىِ اللّٰهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَهِىَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ السَّحَابِ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ فَتُحْرِقُهُ نَزَلَ فِىْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ يَدْعُوْهُ فَقَالَ مَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ مِنْ ذَهَبٍ هُوَ أَمْ مِنْ فِضَّةٍ أَمْ مِنْ نُحَاسٍ فَنَزَلَتْ بِهٖ صَاعِقَةٌ فَذَهَبَتْ بِقِحْفِ رَأْسِهٖ وَهُمْ أَىِ الْكُفَّارُ يُجَادِلُوْنَ يُخَاصِمُوْنَ النَّبِىَّ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ الْقُوَّةِ وَالْأَخْذِ ـ

১৩. রা'দ অর্থাৎ মেঘের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। তিনি এটা একস্থান হতে অন্যস্থানে হাঁকিয়ে নেন। তাঁর সপ্রশংসা মহিমা কীর্তন করে বলে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে মহিমা কীর্তন করে। আর তিনি বজ্রপাত করেন اَلصَّوَاعِقُ মেঘ হতে যে অগ্নি বিচ্ছুরিত হয়। اَلْمِحَالُ অর্থ শক্তি বা পাকড়াও। এবং যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা আঘাত করেন এবং তা তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। ইসলামের আহ্বান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তির নিকট দূত প্রেরণ করেন। তখন সে বলল, আল্লাহ তা'আলাই বা কে, আর তার রাসূলই বা কে? আল্লাহ কি রূপার? না সোনার? না পিতলের? এ সময় তার উপর এক বজ্র আপতিত হয় এবং তার মাথার খুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়। এ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়। তারা অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে মহানবী ﷺ -এর সাথে বিবাদ করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। بِحَمْدِهٖ এটা উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

١٤. لَهٗ تَعَالٰى دَعْوَةُ الْحَقِّ ط أَىْ كَلِمَتُهٗ وَهِىَ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ أَىْ غَيْرِهٖ وَهُمُ الْأَصْنَامُ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ مِمَّا يَطْلُبُوْنَهٗ ـ

১৪. তাঁর আহ্বানই আল্লাহ তা'আলার কালিমাই সত্য। তা হলো কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। তারা তাকে ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান করে يَدْعُوْنَ এটা ى অর্থাৎ নাম পুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ রূপেই পঠিত রয়েছে। যাদের উপাসনা করে। অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ তারা তাদের কিছুরই অর্থাৎ তাদের কাম্য কিছু সম্পর্কেই সাড়া দেয় না,

Free @ www.eilm.weebly.com

إِلَّا اسْتِجَابَةً كَبَاسِطِ أَيْ كَاسْتِجَابَةِ
بَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ عَلَى شَفِيْرِ الْبِئْرِ
يَدْعُوْهُ لِيَبْلُغَ فَاهُ بِارْتِفَاعِهِ مِنَ الْبِئْرِ
إِلَيْهِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ط أَيْ فَاهُ أَبَدًا فَكَذٰلِكَ
مَا هُمْ بِمُسْتَجِيْبِيْنَ لَهُمْ وَمَا دُعَاءُ
الْكٰفِرِيْنَ عِبَادَتُهُمُ الْأَصْنَامَ أَوْ حَقِيْقَةُ
الدُّعَاءِ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ضَيَاعٍ.

তবে তাদের সাড়া প্রদান তেমনই যেমন কূপের কিনারে বসে পানির দিকে হাত প্রসারিতকারী কোনো ব্যক্তি কূপ হতে পানি তার দিকে উথলিয়ে উঠে তার মুখে তা পৌছতে দোয়া করে অথচ তা কখনো তার মুখে পৌছবে না। তদ্রূপ এরাও তাদের ডাকে কোনো দিন সাড়া দেবে না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আহ্বান অর্থাৎ তাদের প্রতিমা উপাসনা বা তার অর্থ হলো তাদের প্রার্থনা নিষ্ফল। ضَلٰلٍ এ স্থানে অর্থ নিষ্ফল।

١٥. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعًا كَالْمُؤْمِنِيْنَ وَكَرْهًا كَالْمُنَافِقِيْنَ
وَمَنْ أُكْرِهَ بِالسَّيْفِ وَيَسْجُدُ ظِلٰلُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَالْبُكَرِ وَالْاٰصَالِ الْعَشَايَا.

১৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু ইচ্ছায় যেমন মু'মিনগণ বা অনিচ্ছায় যেমন মুনাফিকগণ ও যাদেরকে অস্ত্রের মাধ্যমে বাধ্য করা হয়েছে তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি সেজদাবনত থাকে। আর তাদের ছায়াসমূহও সকাল ও সন্ধ্যায়। সেজদাবনত থাকে। اَلْغُدُوُّ অর্থ সকাল। اَلْاٰصَالُ অর্থ সন্ধ্যা।

١٦. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط إِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا جَوَابَ
غَيْرُهُ قُلْ لَهُمْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ أَيْ
غَيْرِهِ أَوْلِيَاءَ أَصْنَامًا تَعْبُدُوْنَهَا لَا
يَمْلِكُوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا وَتَرَكْتُمْ
مَالِكَهُمَا اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ لا الْكَافِرُ
وَالْمُؤْمِنُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ الْكُفْرُ
وَالنُّوْرُ ج الْإِيْمَانُ لَا.

১৬. হে মুহাম্মদ ﷺ ! তোমার সম্প্রদায়কে বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? তারা যদি উত্তর না দেয় তবে তুমিই বল, তিনি আল্লাহ কারণ এটা ব্যতীত তার কোনো উত্তর নেই। তাদেরকে বল, তিনি ব্যতীত তোমরা কি এমন কিছুকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ? অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? আর তাদের যিনি অধীশ্বর তাকে তোমরা পরিত্যাগ করেছ? اَفَاتَّخَذْتُمْ এ স্থানে প্রশ্নবোধকটি تَوْبِيْخ বা তিরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বল অন্ধ ও চক্ষুষ্মান অর্থাৎ কাফের ও মু'মিন কি সমান? বা অন্ধকার কুফরি ও আলো অর্থাৎ ঈমান সমান? না, সমান নয়।

أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ اَيْ خَلْقُ الشُّرَكَاءِ بِخَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ ط فَاعْتَقَدُوْا اِسْتِحْقَاقَ عِبَادَتِهِمْ بِخَلْقِهِمْ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ اَيْ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ اِلَّا الْخَالِقُ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا شَرِيْكَ لَهُ فِيْهِ فَلَا شَرِيْكَ لَهُ فِي الْعِبَادَةِ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لِعِبَادِهِ ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا لِلْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَقَالَ .

١٧. اَنْزَلَ تَعَالٰى مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَطَرًا فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا بِمِقْدَارِ مِلْئِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ط عَالِيًا عَلَيْهِ هُوَ مَا عَلٰى وَجْهِهِ مِنْ قَذَرٍ وَنَحْوِهِ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ عَلَيْهِ فِي النَّارِ مِنْ جَوَاهِرِ الْاَرْضِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ اِبْتِغَاءَ طَلَبَ حِلْيَةٍ زِيْنَةٍ اَوْ مَتَاعٍ يُنْتَفَعُ بِهِ كَالْاَوَانِيْ اِذَا اُذِيْبَتْ زَبَدٌ مِثْلُهُ اَيْ مِثْلُ زَبَدِ السَّيْلِ وَهُوَ خَبَثُهُ الَّذِيْ يَنْفِيْهِ الْكِيْرُ كَذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط اَيْ مِثْلَهُمَا فَاَمَّا الزَّبَدُ مِنَ السَّيْلِ وَمَا اُوْقِدَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج بَاطِلًا مَرْمِيًّا بِهِ .

তবে কি তারা আল্লাহ তা'আলার এমন ধরনের শরিক করেছে যারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে। ফলে তাদের নিকট এ সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে শরিকদের সৃষ্টির জট লেগে গেছে। যদ্দরুন তারা এ সৃষ্টি-কার্যের জন্য এ শরিকদেরকেও উপাসনাযোগ্য বলে বিশ্বাস করে। أَمْ جَعَلُوْا এ স্থানে প্রশ্নবোধকটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। না মূলত ব্যাপার এরূপ নয়। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত আর কেউই উপাসনার অধিকার রাখে না। বল আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর স্রষ্টা এ বিষয়ে তাঁর কোনো শরিক নেই। সুতরাং ইবাদতের বেলায়ও তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি এক তাঁর বান্দাদের উপর তিনি মহাপরাক্রমশালী।

১৭. হক ও বাতিলের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে পানি অর্থাৎ বৃষ্টি পাত করেন। ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী তার ভরাটের আন্দাজ অনুসারে প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে। زَبَدٌ অর্থ প্লাবনের পানির উপরস্থিত আবর্জনা ইত্যাদি। رَابِيًا অর্থ যা উপরিভাগে রয়েছে। অলঙ্কার বা তৈজসপত্র যদ্দ্বারা সে উপকার লাভ করে যেমন থালা-বাসন ইত্যাদি নির্মাণ উদ্দেশ্যে ভূমির খনিজ ধাতু যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল ইত্যাদি যা তারা আগুনে প্রজ্বলিত করে يُوْقِدُوْنَ এটা ى অর্থাৎ নামপুরুষ ও ت অর্থাৎ দ্বিতীয় পুরুষ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। حِلْيَةٌ অর্থ অলংকার। যখন তা গলে যায় তখন তা হতে তদ্রূপ অর্থাৎ প্লাবনের আবর্জনার মতো আবর্জনা হয়। এটা হলো ভাটায় উত্তপ্ত করা হলে যে ময়লা ফেনা বের হয় তা। এভাবে উল্লিখিতভাবে আল্লাহ তা'আলা সত্য ও অসত্যের এতুদভয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। অনন্তর যা আবর্জনা প্লাবনের আবর্জনা ও অগ্নিতে প্রজ্বলিত করার পর খনিজ ধাতু-নির্গলিত আবর্জনা তা ফেলে দেওয়া হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ مِنَ الْمَاءِ وَالْجَوَاهِرِ فَيَمْكُثُ يَبْقٰى فِى الْاَرْضِ ط زَمَانًا كَذٰلِكَ الْبَاطِلُ يَضْمَحِلُّ وَيَنْمَحِقُ وَاِنْ عَلَا عَلَى الْحَقِّ فِىْ بَعْضِ الْاَوْقَاتِ وَالْحَقُّ ثَابِتٌ بَاقٍ كَذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ يَضْرِبُ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ .

এবং যা মানুষের উপকার আসে পানি ও ধাতু তা দীর্ঘকাল জমিতে থেকে যায়। جُفَاءً অর্থ যা ছুড়ে ফেলা হয়। فَيَمْكُثُ অর্থ যা বাকি থাকে। স্থির থাকে। তেমনি বাতিল ও অসত্য কোনো কোনো সময় হক ও সত্যের উপর জয়ী হয়ে পড়লেও পরিণামে তা বিলীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে হক ও সত্য সবসময় কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। এভাবে অর্থাৎ উল্লিখিতভাবে আল্লাহ তা'আলা উপমা দিয়ে থাকেন। উদাহরণ বর্ণনা করে থাকেন।

١٨. لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ اَجَابُوْهُ بِالطَّاعَةِ الْحُسْنٰى الْجَنَّةُ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ وَهُمُ الْكُفَّارُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ط مِنَ الْعَذَابِ اُولٰئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ لا وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ بِكُلِّ مَا عَمِلُوْهُ وَلَا يُغْفَرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِىَ .

১৮. যারা আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তাদের প্রভুর ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল জান্নাত আর যারা সাড়া দেয় না অর্থাৎ কাফেরগণ তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্ত থাকত ও তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকত তবে তারা আযাব ও শাস্তি হতে বাঁচতে মুক্তিপণস্বরূপ তা সবকিছু দিত। তাদের জন্যই হবে মন্দ হিসাব। অর্থাৎ তাদের কৃত সকল দুষ্কর্মের শাস্তি দেওয়া হবে। সামান্য কিছুও তাদের ক্ষমা করা হবে না। আর জাহান্নাম হবে তাদের আবাস। কত নিকৃষ্ট শয্যা তা। اَلْمِهَادُ অর্থ শয্যা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمُتَعَالِ : এটা বাবে تَفَاعُلٌ-এর تَعَالِىْ মাসদার হতে اِسْم فَاعِل-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। মূলে ছিল اَلْمُتَعَالِىُ শেষের يَاء টি পড়ে গেছে। মূলবর্ণ হলো عُلُوٌّ এখানে ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ-কে مَزِيْد فِيْه-এর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো অর্থের ক্ষেত্রে অতিরিক্ততাকে বর্ণনা করা। এর অর্থ হলো– উচ্চতর, উৎকৃষ্ট, মহান, সম্মানিত। اَلْمُتَعَالِ-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে– ১. يَاء-এর সাথে অর্থাৎ اَلْمُتَعَالِىْ ২. يَاء বিহীন রূপে اَلْمُتَعَالِ

قَوْلُهُ سَوَاءٌ مِنْكُمْ الخ : এতে দুটি কেরাত রয়েছে– ১. سَوَاءٌ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর اَسَرَّ الْقَوْلَ الخ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

প্রশ্ন. মুবতাদা হলো দুটি, কাজেই خَبَرْ ও দ্বিবচন নেওয়া উচিত ছিল? অর্থাৎ سَوَاءَانِ বলা উচিত ছিল।

উত্তর. سَوَاءٌ যেহেতু মাসদার যা مُسْتَوِىْ অর্থে হয়েছে কাজেই তাতে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সবই সমান।

২. سَوَاءٌ হলো মুবতাদা আর اَسَرَّ الْقَوْلَ الخ হলো তার খবর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রশ্ন. سَوَاءٌ হলো نَكِرَه কাজেই এটা মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. যেহেতু سَوَاء -এর সিফত مِنْكُمْ বিদ্যমান রয়েছে কাজেই তাতে تَخْصِيْص সৃষ্টি হয়ে গেছে। যার কারণে سَوَاءٌ -এর মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ سَارِبٌ : এটা سَرْبٌ হতে إِسْم فَاعِلْ অর্থ হলো রাস্তায় চলাচলকারী পথিক, অলিতে-গলিতে ঘুরাফেরাকারী। سَارِبٌ -এর বহুবচন سَرْبٌ যেমন رَاكِبٌ -এর বহুবচন رَكْبٌ আসে। سَارِبٌ -এর আতফ হয়েছে مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ -এর উপর; শুধু مُسْتَخْفٍ -এর উপর নয়।

قَوْلُهُ مُعَقِّبَاتٌ : এটা إِسْم فَاعِلْ -এর সীগাহ এবং مُعَقِّبَةٌ -এর বহুবচন, বাবে تَفْعِيْل হতে, মাসদার تَعْقِيْبٌ অর্থ বারি বারি করে দিন রাতে ক্রমান্বয়ে আগমনকারী ফেরেশতাগণ। –[বায়যাবী, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعْتَقِبُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُعَقِّبَاتٌ টা إِعْتَقَبَ হতে এসেছে। মূলে ছিল مُتَعَقِّبَاتٌ এরপর تَاء -কে قَاف -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে। অর্থ– ঐ ফেরেশতাগণ যারা আসা-যাওয়ার মধ্যে একজন অপরজনের অনুসরণ করে। উদ্দেশ্য হলো সেই ফেরেশতাগণ যারা দিবা-নিশিতে ডিউটির পরিবর্তন করে।

قَوْلُهُ مَرَدَّ : এটা إِسْم فِعْل অর্থ হলো– মুলতবি রাখা, দূর করা, পরিহার করা, দেরি করা, ফিরিয়ে আনা।

قَوْلُهُ مِنْ وَّالٍ : এখানে مِنْ টা অতিরিক্ত وَالٍ হলো إِسْم فَاعِلْ -এর সীগাহ। মূলে ছিল وَالِيٌ [বাবে ضَرَبَ হতে] يَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থ– সাহায্যকারী, সহযোগী।

قَوْلُهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا : কেউ কেউ বলেছেন যে, উভয়টি মাসদার হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, لِتَخَافُوْا خَوْفًا وَلِتَطْمَعُوْا طَمَعًا এবং বলা হয়েছে যে, এ উভয়টি يُرِيْكُمْ -এর كُمْ হতে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِكُمْ خَائِفِيْنَ وَطَامِعِيْنَ আবুল বাকা (র.) বলেছেন, এই উভয়টি নিজ নিজ ফে'লের مَفْعُوْل ও হতে পারে। [তবে আল্লামা যমখশারী (র.) এটাকে অস্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ اَلْبَرْقَ থেকে ও حَالْ বলেছেন।

(اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِيْ)

قَوْلُهُ تُسَبِّحُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْمَلَائِكَةُ -এর আতফ اَلرَّعْدُ -এর উপর হয়েছে قَرِيْبٌ -এর উপর হয়নি।

قَوْلُهُ بِقِحْفٍ : قِحْفٌ অর্থ মাথার খুলি। বহুবচনে اَقْحَافٌ . قُحُوْفٌ

قَوْلُهُ اَىْ كَلِمَةُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, دَعْوَتُ টা دُعَاءٌ -এর অর্থে নয় এবং اَلدَّعْوَةُ الْمُسْتَجَابَةُ অর্থেও নয়।

قَوْلُهُ اِسْتِجَابَةً : প্রশ্ন. اِسْتِجَابَةً উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. দুটি কারণে, ১. প্রথম হলো এই যে, مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْه -এর জিনস হয়ে যাবে। কেননা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ -ই হলো মূল। আর مُسْتَثْنٰى مِنْه হলো اِسْتِجَابَةً যা يَسْتَجِيْبُوْنَ হতে বুঝা যায়। কেননা ফে'লটা মাসদারকে বুঝিয়ে থাকে।

দ্বিতীয় হলো এই যে. যদি اِسْتِجَابَةً -কে উহ্য মনে করা না হয় তাহলে تَشْبِيْهُ الْغَرَضِ بِالذَّاتِ আবশ্যক হবে, যা অবৈধ। কেননা اِسْتِجَابَةٌ হলো عَرَضْ আর بَاسِطِ الْكَفَّيْهِ হলো ذَاتٌ আর মূর্তিগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রার্থনাকারীকে এমন ব্যক্তির সাথে তাশবীহ দেওয়া যে ব্যক্তি পানিকে বলতেছে যে, হে পানি! তুমি আমার মুখে এসে পড়। এটা সুস্পষ্ট যে, এটা অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা পানি হলো جَمَادٌ তথা নির্জীব তার পক্ষে কারো আবেদন শ্রবণ করার যোগ্যতা নেই। এমনিভাবে সেই ব্যক্তি যে মূর্তিদের থেকে উদ্দেশ্য কামনা করে থাকে, সেও মূর্খ ও বেকুফ কেননা মূর্তিও তো جَمَادٌ তথা নির্জীব. অনুভূতিহীন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ غُدُوٌّ : এটা غَدَاةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- সকাল বেলা।

قَوْلُهُ الْأَصَالُ : এটা أَصِيْلٌ -এর বহুবচন। অর্থ- সন্ধ্যা বেলা।

قَوْلُهُ جُفَاءً : এটা غُرَابٌ -এর ওজনে। অর্থ- বাতিল, অহেতুক। বলা হয়- جُفَاءُ الْوَادِىْ وَالْقِدْرِ অর্থাৎ নদী এবং ডেগচি ফেনা বাইরে ফেলে দিয়েছে।

قَوْلُهُ أَجَابُوْهُ بِالطَّاعَةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِسْتَجَابُوْا এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর হলেও اِفْعَالٌ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করার কোনোই অবকাশ থাকল না যে, এখানে طَلَبٌ -এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ الْجَنَّةُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلْحُسْنٰى হলো উহ্য اَلْجَنَّةُ -এর সিফত অর্থাৎ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হলো لِلَّذِيْنَ الخ আর مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ হলো اَلْجَنَّةُ الْحُسْنٰى।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ الخ : আলোচ্য আয়াতে আবার তাওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ.

অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎ না অসৎ তা সবই আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয় যে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোনো সময় এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোনো সময় দ্রুত কোনো সময় দেরিতে- তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলিমুল গায়েব।' সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু পরমাণু ও সে সবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই: না কিছুই না, শুধু পানি অথবা শুধু বায়ু রয়েছে- এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোনো হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চেয়ে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদ্‌ঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই জানেন যা কিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবি ভাষায় تَغِيْضُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া, শুষ্ক হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزْدَادُ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ বলে এই হ্রাস বুঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের দ্বারা সবগুলোতেই পরিব্যাপ্ত। কাজেই কোনো বিরোধ নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ নির্দিষ্ট রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিজিক পাবে- এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুপম জ্ঞান তাঁর তাওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছিল। সেগুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের প্রমাণ। এ আয়াতে বলা হয়েছে- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ এখানে غَيْب শব্দ দ্বারা ঐ বস্তু বুঝানো হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত। অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বুঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شَهَادَةٌ হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

اَلْكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং مُتَعَالِ -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলির ঊর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহ তা'আলাকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলি সাব্যস্ত করত, যেগুলো তার মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণত ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ তা'আলার জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তার জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলি থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বারবার বলেছে- سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -এর তৎপূর্ববর্তী اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى বাক্যে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার ঊর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে-

سَوَاۗءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ .

اَسَرَّ শব্দটি اَسْرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলা এবং جَهْر শব্দের অর্থ- জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্য যে কথা বলা হয় তাকে جَهْر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে سِرّ বলে مُسْتَخْفٍ শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سَارِبٌ -এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত নয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে আরো ব্যক্ত করে বলা হয়েছে-

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

مُعَقِّبَاتٌ শব্দটি مُعَقِّبَةٌ -এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে مُعَقِّبَةٌ অথবা مُتَعَقِّبَةٌ বলা হয়। مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ -এর শাব্দিক অর্থ উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهٖ -এর অর্থ পশ্চাৎদিক। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بِاَمْرِ اللّٰهِ কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি بِاَمْرِ اللّٰهِ বর্ণিতও আছে। -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.eilm.weebly.com

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখ ও পশ্চাৎদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মানুষের হেফাজত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে– ফেরেশতাদের দুটি দল হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাজের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাজের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাজের পর তারা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক হেফাজতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোনো প্রাচীর ধসে না পড়ে কিংবা সে কোনো গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোনো জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাজত করেন। তবে কোনো মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হেফাজতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত উসমান গনী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে জারীরের এক হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, হেফাজতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখকষ্ট থেকে হেফাজত করাই নয়; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহভীতির প্রেরণা করেন যাতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনোরূপেই হুঁশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গুনাহ লিখে দেয়।

মোটকথা, হেফাজতকারী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাজত করে। হযরত কা'ব আহবার (র.) বলেন, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের এ পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তাকদীরে ইলাহী মানুষের হেফাজতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ তা'আলাই কোনো বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারা নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। [তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলা বাহুল্য] যখন আল্লাহ তা'আলাই কাউকে আজাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাজতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ তা'আলার গজব ও আজাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আজাব থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোনো সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাজতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোনো জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়। এ অর্থেই নিম্নোক্ত কবিতাটি সুবিদিত—

خدا نے اج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کوخیا ل آپ آپنی حالت کے بدلنے کا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেননি যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার খেয়াল করেছে।

এ বিষয়বস্তুটি যদিও কিছুটা নির্ভুল; কিন্তু আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরূপ নয়। কবিতার বিষয়বস্তুটি একটি সাধারণ আইন হিসেবে নির্ভুল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজের অবস্থা সংশোধন করার ইচ্ছা করে না, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাকে সাহায্য করার ওয়াদা নেই। সাহায্য করার ওয়াদা তখনই কার্যকর হয় যখন কেউ স্বয়ং সংশোধনের চেষ্টা করে। যেমন এক আয়াতে وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও হেদায়েতের পথ তখনই উন্মুক্ত হয়, যখন কারো মধ্যে হেদায়েতের অন্বেষণ থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত দান এ আইনের অধীনে নয়। অনেক সময় অন্বেষণ ছাড়াই নিয়ামত দান করা হয়।

داد حق را قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد اوست

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দানের জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়, যোগ্যতা ব্যতীতও তাঁর দান এসে পতিত হয়।

স্বয়ং আমাদের অস্তিত্ব ও তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য নিয়ামত আমাদের চেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। আমরা কোনো সময় এরূপ দোয়াও করিনি যে, আমাদেরকে এমন সত্তা দান করা হোক যার চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ ও যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত হয়। এসব নিয়ামত চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে।

ما نبوديم وتقاضا ما نبود

لطف توانا گفته ما می شنود

অর্থাৎ আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোনো প্রার্থনাও ছিল না, তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা প্রার্থনা শ্রবণ করেছে।

তবে নিয়ামত দানের যোগ্যতা ও ওয়াদা স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং কোনো জাতির পক্ষে চেষ্টা ও কর্ম ব্যতীত নিয়ামত দানের অপেক্ষায় থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই ভস্ম করে দেয়। আবার এটাও আশা সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনের অবলম্বন এবং আল্লাহ তা'আলাই বড় বড় ভারি মেঘমালাকে মৌসুমি বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তাকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

قَوْلُهُ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ : অর্থাৎ রা'দ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তাসবীহ পাঠ করার অর্থ ঐ তাসবীহ, যে সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোনো বস্তু নেই, যে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ তাসবীহ শুনতে সক্ষম হয় না।

কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তাসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ : এখানে صَوَاعِقُ শব্দটি صَاعِقَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

قَوْلُهُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ : এখানে مِحَالٌ শব্দটি মীমের যেরযোগ কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

قَوْلُهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্ধ এবং মুসলমানদেরকে চক্ষুষ্মান বলা হয়েছে। কুফর এবং নাফরমানিতে অন্ধকার আর ইসলামকে নূর বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে হক ও বাতিলের দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। একটি পানির আর একটি অগ্নির। আসমান থেকে আল্লাহ তা'আলা পানি বর্ষণ করেন, বৃষ্টিপাত হয় তার নির্দেশক্রমে। নদী-নালা ভরে যায় এ পানিতে। পানি একই পরিমাণে নাজিল হয় তবে প্রত্যেক নদীনালা তার প্রশস্ততা, গভীরতা এবং পরিমাণ মোতাবেক ঐ পানি গ্রহণ করে। ঠিক এমনিভাব আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। আর মানুষের অন্তরভূমি তার যোগ্যতা অনুসারে এই আসমানি রহমতকে গ্রহণ করে এবং ফয়েজ লাভ করে। যেমন– নদী-নালা বা উপত্যকা তার প্রশস্ততা এবং যোগ্যতা মোতাবেক আসমান থেকে অবতীর্ণ বৃষ্টির পানি ধারণ করে। আর ঐ পানির উপরে ফেনা এমনভাবে ফুলে উঠে মনে হয় সবই সেখানে ফেনা, পানির অস্তিত্ব সেখানে নেই। কিন্তু পানি থাকে তার নিচে। ঠিক এভাবে বাতিল বা অসত্য ফেনার ন্যায় সত্যের উপর থাকে, আর সত্য পানির ন্যায় নিচে থাকে। যখন ক্ষণিকের মধ্যে বাতিল দূরীভূত হয় ফেনার মতো, তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় তখন সত্য উদ্ভাসিত হয় আর বাতিলের নাম-নিশানাও থাকে না।

মক্কা মুয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী ﷺ সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দিলেন, পবিত্র কুরআন নাজিল হলো বাতিল বা অসত্য তখন চরম শক্তিশালী ছিল। বাতিলপন্থিরা ইসলামের মহাসত্যকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা করল। প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হলো সুদীর্ঘ তেরোটি বছর। বাতিলের ঢেউ সবকিছু যেন গ্রাস করে ফেলবে। ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হলো মদীনায়ে মুনাওয়ারায়। এরপর সুদীর্ঘ আটটি বছর যাবৎ হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অব্যাহত রইল। বদর, ওহুদ, খন্দক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক রণাঙ্গনগুলো হক ও বাতিলের তথা সত্য-অসত্যের সশস্ত্র সংগ্রামের জীবন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে আল্লাহ তা'আলা মহা বিজয় দান করলেন। বাতিল বা অসত্য শুধু ভূলুণ্ঠিত হলো না; বরং নিশ্চিহ্ন হলো এবং হক বা সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তিনশত ষাটটি মূর্তি স্বহস্তে ভেঙ্গে ফেলার সময় প্রিয়নবী ﷺ এ আয়াত পাঠ করেছিলেন– وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি ঘোষণা করুন,

নিশ্চয়ই সত্য এসেছে মিথ্যা বিদায় নিয়েছে আর মিথ্যা তো বিদায় নেওয়ারই যোগ্য। যেভাবে পানির উপরের ফেনা কিছুক্ষণ পরেই তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ঠিক এমনিভাবে বাতিল সত্যের অব্যাহত আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে হক ও বাতিলের আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অলংকার বা কোনো তৈজষপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে স্বর্ণ-রৌপ্যকে যখন অগ্নিতে পোড়ানো হয় তখন তাতে আবর্জনা বা ফেনা ভেসে উঠে। ঐ আবর্জনা বা ফেনাই দৃষ্টিগোচর হয়, মূল্যবান ধাতু পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা যায় ফেনা আপনা-আপনি উধাও হয়ে গেছে, তার চিহ্নও শুষ্ক হয়ে যায়। আর এভাবে নিশ্চিহ্ন হয় যা আসল যা মানুষের প্রয়োজনের শুধু তাই থেকে যায়। ঠিক এভাবে কখনো অন্যায়-অনাচারের, অসত্যের প্রভাব এত বেড়ে যায়, মিথ্যা এবং বাতিল এত শক্তিশালী হয়ে উঠে যে তাদেরই জয় জয়কার মনে হয়। এমনি অবস্থায় দুর্বল চিত্ত মানুষ বাতিলের অনুসারী হয়ে পড়ে। কিছু কিছু দিনের মধ্যেই সত্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অসত্য বা বাতিল, মিথ্যা অধর্ম ফেনার ন্যায় উধাও হয়ে যায়।

সত্য ও অসত্যের তথা হক ও বাতিলের সংঘর্ষ পৃথিবীতে আবহমান কাল ধরেই আছে তবে সত্যের জয় এবং বাতিল বা অসত্যের পরাজয় অনিবার্য, অবধারিত। যদি কোনো সময় বাতিল শক্তিশালী হয়ে যায় সত্যকে আপাত দৃষ্টিতে দুর্বলও মনে হয় তবুও প্রকৃত মুমিন ভীত হয় না। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ আর তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না-চিন্তিতও হয়ো না, তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও।

এ আয়াত নাজিল হয়েছিল তৃতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল সেই বিপদজনক মুহূর্তে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বাতিলের সাময়িক প্রভাবে ভীত না হওয়ার আদেশ দিয়েছেন অবশেষে বিজয় সত্য ও ন্যায়ের তথা ইসলামের। আলোচ্য আয়াতের দুটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এভাবে হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এবং তার পূর্বে অন্যান্য আসমানি কিতাবও তিনি নাজিল করেছেন। মানুষ তার যোগ্যতা অনুসারে এ আসমানি গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয় এবং এর মহান শিক্ষার আলোকে নিজেকে আলোকিত করে। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ এ পবিত্র কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে। যতদিন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখা পছন্দ করবেন ততদিন পর্যন্ত মানুষের অন্তর আলোকিত করার জন্য তাকেও পৃথিবীতে রাখবেন। এর দৃষ্টান্ত হলো বৃষ্টির পানি যা আসমান থেকে নাজিল হয়। নদী-নালা উপত্যকা সবই ঐ পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। প্রত্যেকটি নদী-নালার প্রশস্ততা এবং গভীরতা অনুযায়ী সে ঐ পানি ধারণ করে। আর মানুষও তার অন্তরের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কুরআন থেকে ফয়েজ হাসিল করে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ইরশাদ হয়েছে, যে কোনো ধাতু যথা স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা অলংকার বা তৈজষপত্র তৈরি করতে হলে তাকে আগুনে পোড়ানো হয় যে কারণে তার ভিতরের আবর্জনা উপরে ভেসে উঠে কিছুক্ষণ পর তা শুকিয়ে যায়, যা মানুষের প্রয়োজনীয় তা থেকে যায়। আর ফেনা বা আবর্জনা উধাও হয়ে যায়। এভাবে সত্য-অসত্যের তথা হক ও বাতিলের মোকাবিলায় প্রথমে বাতিলের আবর্জনা দেখতে পাওয়া যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

১৯. وَنَزَلَ فِى حَمْزَةَ وَاَبِىْ جَهْلٍ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ فَاٰمَنَ بِهٖ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط لَا يَعْلَمُهٗ وَلَا يُؤْمِنُ بِهٖ لَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ .

১৯. হযরত হামযা ও আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয় যে, তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে অনন্তর তারা বিশ্বাস করে সে কি তার মতো যে ব্যক্তি অন্ধ অর্থাৎ তৎসম্পর্কে জ্ঞানও রাখে না এবং বিশ্বাসও রাখে না। শুধু বোধশক্তি সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। تَذَكَّرَ অর্থ উপদেশ গ্রহণ করে। اُولُو الْاَلْبَابِ অর্থ বোধশক্তির অধিকারী।

২০. اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ الْمَاخُوْذِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِىْ عَالَمِ الذَّرِّ اَوْ كُلِّ عَهْدٍ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ بِتَرْكِ الْاِيْمَانِ اَوِ الْفَرَائِضِ .

২০. যারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার অর্থাৎ আলমে যার -এ তাদের নিকট হতে যে সমস্ত অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে বা অন্যান্য সকল অঙ্গীকার পূরণ করে এবং ঈমান আনয়ন পরিত্যাগ করত বা ফরজ কাজসমূহ পরিত্যাগ করত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না।

২১. وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالرَّحِمِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اَىْ وَعِيْدَهٗ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ تَقَدَّمَ مِثْلُهٗ .

২১. এবং আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন ঈমান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি তারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাদের প্রতিপালককে অর্থাৎ তার হুমকিসমূহকে ভয় করে। আর আশঙ্কা রাখে মন্দ হিসেবের– এ ধরনের বাক্য পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে।

২২. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ ابْتِغَآءَ طَلَبَ وَجْهِ رَبِّهِمْ لَا غَيْرِهٖ مِنْ اَغْرَاضِ الدُّنْيَا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا فِى الطَّاعَةِ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَّيَدْرَؤُوْنَ يَدْفَعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ كَالْجَهْلِ بِالْحِلْمِ وَالْاَذٰى بِالصَّبْرِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ اَىِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ .

২২. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যই অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে নয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, বিপদ-আপদে এবং অবাধ্যতার কাজ হতে বিরত থাকার বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো দ্বারা মন্দের যেমন– সহিষ্ণুতা দ্বারা মূর্খ আচরণকে, ধৈর্যধারণের মাধ্যমে উৎপীড়নের মোকাবিলা করে তা প্রতিহত করে। তাদের জন্যই রয়েছে শেষ পরিণাম অর্থাৎ পরকালের শুভ পরিণাম। اِبْتِغَآءَ অর্থ তালাশ করা।

Free @ www.eilm.weebly.com

٢٣. هِىَ جَنّٰتُ عَدْنٍ اِقَامَةٍ يَدْخُلُوْنَهَا هُمْ
وَمَنْ صَلَحَ اٰمَنَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ ج وَاِنْ لَمْ يَعْمَلُوْا بِعَمَلِهِمْ يَكُوْنُوْنَ
فِىْ دَرَجَاتِهِمْ تَكْرِمَةً لَهُمْ وَالْمَلٰئِكَةُ
يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ
الْجَنَّةِ اَوِ الْقُصُوْرِ اَوَّلَ دُخُوْلِهِمْ لِلتَّهْنِئَةِ.

২৩. সেই পরিণাম হলো জান্নাত 'আদন স্থায়ীভাবে বসবাসের জান্নাত তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নি ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও। তারা তাদের পর্যায়ের সৎকাজ করতে না পারলেও তাদের সম্মানার্থে এদেরও তাদেরই মর্যাদা ও স্থান প্রদান করা হবে। আর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া তারা যখন সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন জান্নাতের বা তাদের জন্য নির্ধারিত প্রাসাদের দ্বার দিয়ে খোশ আমদেদ জানাবার জন্য ফেরেশতা হাজির হবে।

٢٤. يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ هٰذَا الثَّوَابُ بِمَا
صَبَرْتُمْ بِصَبْرِكُمْ فِى الدُّنْيَا فَنِعْمَ عُقْبَى
الدَّارِ عُقْبَاكُمْ.

২৪. তারা বলবে 'সালামু আলাইকুম' তোমাদের উপর শান্তি দুনিয়ায় তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে বলে এই প্রতিদান। কত ভালো পরকালের পরিণাম। অর্থাৎ তোমাদের এ পরিণাম। مَا صَبَرْتُمْ এ স্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎসবোধক অর্থব্যঞ্জক।

٢٥. وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ
مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ
يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ج بِالْكُفْرِ
وَالْمَعَاصِىْ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ الْبُعْدُ مِنْ
رَحْمَةِ اللّٰهِ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ اَىِ الْعَاقِبَةُ
السَّيِّئَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ وَهِىَ جَهَنَّمُ.

২৫. যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে। যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং কুফরি ও অবাধ্যতা করত পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদেরই জন্য আছে অভিশাপ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে বিদূরিত হওয়া এবং তাদেরই আছে মন্দ আবাস। পরকালে মন্দ পরিণাম। তা হলো জাহান্নাম।

٢٦. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَفَرِحُوْا اَىْ
اَهْلُ مَكَّةَ فَرَحَ بَطَرٍ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط اَىْ
بِمَا نَالُوْهُ فِيْهَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِىْ
جَنْبِ حَيٰوةِ الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ شَىْءٌ قَلِيْلٌ
يَتَمَتَّعُ بِهٖ وَيَذْهَبُ.

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবনোপকরণ স্ফীত করেন বৃদ্ধি করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন সংকীর্ণ করেন। [কিন্তু তারা] মক্কাবাসীরা পার্থিব জীবনে অর্থাৎ তাতে যা পেয়েছে তা নিয়েই উল্লসিত গর্বে উৎফুল্ল; অথচ পরকালের জীবনের পার্শ্বে পার্থিব জীবন তো সামান্য ভোগ্যবস্তু বৈ কিছুই নয়। অর্থাৎ এটা এত ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তু যা ভোগ করা হয়, লয়প্রাপ্ত হয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ : হামযাটা উহ্যের উপর প্রবেশ করেছে। আর فَا হলো عَاطِفَةٌ উহ্য ইবারত এরূপ হবে- اَيَسْتَوِى الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ فَمَنْ يَّعْلَمُ

قَوْلُهُ لَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نَفِىْ টা اِسْتِفْهَامْ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ : এ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ هِىَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جَنّٰتُ عَدْنٍ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে عُقْبَى الدَّارِ থেকে بَدَلْ হয়নি, যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন।

قَوْلُهُ يَدْخُلُوْنَهَا هُمْ : প্রশ্ন : هُمْ উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. যাতে করে مَنْ صَلَحَ -এর আতফ يَدْخُلُوْنَهَا -এর যমীরের উপর বৈধ হতে পারে। কেননা ضَمِيْر مَرْفُوْعْ مُتَّصِلْ -এর উপর আতফ করতে হলে ضَمِيْر مُنْفَصِلْ দ্বারা تَاكِيْد নেওয়া জরুরি হয়।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : يَقُوْلُوْنَ -কে উহ্য মেনেছেন যাতে করে বাক্যটি مَرْبُوْطْ এবং مُنْظَّمْ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بِمَا نَالُوْا فِيْهَا : পার্থিব জীবন তো প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্জন করেছে نَفْسِ زندگى -এর উপর গর্ব-অহংকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং পার্থিব জীবনে যা কিছু অর্জন হয়েছে এর উপর গর্ব-অহংকার করা এবং বে জায়গায় দম্ভ করা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اِنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ : এ আয়াতে উভয় প্রকার লোকদের উদাহরণ 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান' দ্বারা দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে- اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট; কিন্তু এটি তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গুনাহ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা এত বড় তফাৎটুকুও বোঝে না।

দ্বিতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পালনকারীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা-অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল- بَلٰى অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধিবিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরজ কর্ম পালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে- وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ অর্থাৎ তারা কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দাদের মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গাম্বরদের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আবূ দাউদ আওফ ইবনে মালেক (রা.)-এর রেওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে এ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়'আত নিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাঞ্জেগানা নামাজ পাবন্দি সহকারে আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণির আনুগত্য করবেন এবং কোনো মানুষের কাছে কোনো কিছু যাচনা করবেন না।

যারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা হয় না। অশ্বারোহণের সময় তাদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তারা কোনো মানুষকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বলতেন না; বরং স্বয়ং নিচে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।

এটা ছিল সাহাবায়ে কেরামের মনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভালোবাসা, মাহাত্ম্য ও আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাচনা নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একবার মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে 'বসে যাও' কথাটি বের হয়ে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি সেখানেই বসে গেলেন।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তাফসীর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই– وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خَوْف শব্দের পরিবর্তে خَشْيَة শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মতো নয়; বরং তা পিতামাতার প্রতি সন্তানের এবং উস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মতো। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়; বরং মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার কারণে বান্দা এরূপ আশঙ্কা করে যে, আমাদের কোনো কর্ম অথবা কথা যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ কারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই خَشْيَة শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মাহাত্ম্য ও ভালোবাসার কারণ থেকে উদ্ভূত ভয়কে خَشْيَة বলা হয়। এ কারণেই পরবর্তী বাক্যে হিসাব-কিতাবের কঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে خَشْيَة -এর পরিবর্তে خَوْف শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে– وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি কৃপাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা এমন ব্যক্তি কে আছে যে জীবনে কখনো কোনো গুনাহ বা ত্রুটি করেননি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠগুণ এই– وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে।

প্রচলিত কথায় কোনো বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় কিন্তু আরবি ভাষায় এর অর্থ আরো ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া। বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এ দুটি প্রকার বর্ণনা করা হয়। ১. صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং ২. صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা কোনো না কোনো সময় বেসবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ তা'আলা দেন না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى অর্থাৎ আসল ও ধর্তব্য সবর তাই যা বিপদের প্রাথমিক পর্যায়ে অবলম্বন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোনো কোনো সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর; তা হোক কোনো ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা কিংবা হারাম ও মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি চুরির নিয়তে কোনো গৃহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, তবে এ অনিচ্ছাধীন সবর কোনো প্রশংসনীয় ও ছওয়াবের কাজ নয়। ছওয়াব তখনই হবে, যখন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির কারণে হয়।

সপ্তম গুণ হচ্ছে- اَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ নামাজ কায়েম করা। অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামাজ আদায় করা শুধু নামাজ পড়া নয়। এ জন্যই কুরআনে নামাজের নির্দেশ সাধারণত اِقَامَةُ الصَّلٰوةِ শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে- وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু আল্লাহ তা'আলার নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেওয়া রিজিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মতো সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবত তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়।

অর্থসম্পদ আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দুটি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এজন্যেই আলেমগণ বলেন যে, জাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়, যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে- يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ তারা মন্দকে ভালো দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জবাবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাক্যটির এরূপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, পাপকে পুর্ণ দ্বারা ব্যবহৃত করে। অর্থাৎ কোনো সময় কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গুনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে বলেন- পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দেবে। অর্থ এই যে, যখন পাপের পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করবে এবং এর পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুণ্য কাজ বিগত গুনাহকে মিটিয়ে দেবে। অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত পাপের পর কোনো পুণ্য কাজ করে নেওয়া পাপমুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - دار শব্দের অর্থ এখানে دَارِ اٰخِرَتْ অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পরকালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেন, এখানে دَارْ বলে دَارِ دُنْيَا অর্থাৎ ইহকাল বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কষ্টেরও সম্মুখীন হয়। কিন্তু পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরই প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে।

অতঃপর عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عَدْن শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনো তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন, জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরো একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তাদের ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরো একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখকষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ الخ : রুকুর শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে দু-শ্রেণিতে বিভক্ত করে বলা হয়েছিল যে, তাদের একদল আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও একদল অবাধ্য। অতঃপর অনুগত বান্দাদের কতিপয় গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যে সর্বোত্তম প্রতিদানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের আলামত ও গুণাবলি এবং তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে। এতে অবাধ্য বান্দাদের একটি স্বভাব বর্ণনা করা হয়েছে- اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে। আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ তা'আলার পালনকর্তা ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফের ও মুশরিকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরি করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত বিধিবিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোনো মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলা অথবা রাসূলের কোনো আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্বভাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে- وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ অর্থাৎ তারা এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে, যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বুঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিধিবিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার নাফরমান বান্দারা এসব হক ও সম্পর্কও ছিন্ন করে। উদাহরণত পিতামাতা, ভাইবোন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আত্মীয়দের যেসব অধিকার আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল মানুষের উপর আরোপ করেছেন, তারা এগুলো আদায় করে না।

তৃতীয় স্বভাব এই- وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত দু-স্বভাবেরই ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের অঙ্গীকারের পরোয়া করে না এবং কারো অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কার্যকাণ্ড যে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীরে সর্ববৃহৎ ফ্যাসাদ।

অবাধ্য বান্দাদের এ তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে- اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ। অর্থাৎ তাদের জন্য লানত ও মন্দ আবাস রয়েছে। লানতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। বলা বাহুল্য আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আজাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ পাওয়া যায়- কিছু স্পষ্টত এবং কিছু ইঙ্গিতে। উদাহরণত উল্লেখ্য-

১. اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো সাথে কোনো চুক্তি করা হলে তা পালন করা ফরজ এবং লঙ্ঘন করা হারাম। চুক্তিটি আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের সাথে হোক, যেমন ঈমানের চুক্তি। কিংবা সৃষ্টজগতের মধ্যে কোনো মুসলমান অথবা কাফেরের সাথে হোক- চুক্তি লঙ্ঘন করা সর্বাবস্থায় হারাম।

২. وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ থেকে জানা যায় যে, ইসলাম বৈরাগ্য গ্রহণ করত জাগতিক চাহিদা ও বিষয়াদি ত্যাগ করা শিক্ষা দেয় না; বরং সম্পর্কিতদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাকে ইসলামে অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকার, সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও ভাইবোনদের অধিকার এবং অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ করা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন। এগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নফল ইবাদত অথবা কোনো ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করাও জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় অন্য কাজে গেলে এগুলো ভুলে যাওয়া কিরূপে জায়েজ হবে?

কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়দেরকে দেখাশোনা করা এবং তাদের অধিকার প্রদান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কাছে রিজিকের প্রশস্ততা ও কাজে-কর্মে বরকত কামনা করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ আত্মীয়দের দেখাশুনা করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা।

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) বলেন, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল, আমাকে বলুন ঐ আমল কোনটি যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে ঠেলে দেবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর; তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। -[বগভী]

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আত্মীয়স্বজনের অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করাকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলে না; বরং কোনো আত্মীয় যদি তোমার অধিকার প্রদানে ত্রুটি করে, তোমার সাথে সম্পর্ক না রাখে; এরপরও শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করাই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিজেদের বংশ-তালিকা সংরক্ষিত রাখ। এর মাধ্যমেই আত্মীয়তা সংরক্ষিত থাকতে পারবে এবং তোমরা তাদের অধিকার প্রদান করতে পারবে। তিনি আরো বলেছেন, সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা এই যে, এতে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং আয়ুতে বরকত হয়। -[তিরমিযী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রধান যে, পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে তেমনি সম্পর্ক বজায় রাখবে, যেমন তার জীবদ্দশায় রাখা হতো।

৩. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কুরআন ও হাদীসে সবরের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত সবরকারী আল্লাহ তা'আলার সঙ্গ ও সাহায্য লাভ করে এবং অগণিত ছওয়াব ও পুরস্কার পায়। উপরিউক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, এসব ফজিলত তখনই লাভ হয় যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবর এখতিয়ার করা হয়।

সবরের আসল অর্থ মনকে বশে রাখা এবং দৃঢ় থাকা। এর আবার শ্রেণিভেদ আছে। ১. কষ্ট ও বিপদে সবর অর্থাৎ অস্থির ও নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টি রেখে আশাবাদী হওয়া। ২. ইবাদতে সবর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পালন করা কঠিন মনে হলেও তাতে অটল থাকা। ৩. গুনাহ ও মন্দকাজ থেকে সবর অর্থাৎ মন মন্দকাজের দিকে ধাবিত হতে চাইলেও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেদিকে ধাবিত না হওয়া।

৪. وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পথে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে ব্যয় করা দুরস্ত। তবে ওয়াজিব সদকা যেমন– জাকাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম যাতে অন্য মুসলমানগণ তা দিতে উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে নফল দান-খয়রাত গোপনে প্রদান করা উচিত, যাতে রিয়া ও নামযশের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫. يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ প্রত্যেক মন্দকে প্রতিহত করা একটি যুক্তিগত ও স্বভাবগত দাবি। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা ইসলামের নীতি নয়; বরং ইসলামের শিক্ষা এই যে, মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। কেউ তোমার সাথে জুলুম করলে তুমি তার সাথে ন্যায়ানুগ আচরণ কর। যে তোমার সম্পর্কের হক প্রদান করেনি, তুমি তার হক প্রদান কর। কেউ রাগ করলেও তুমি তার জবাব সহনশীলতার মাধ্যমে দাও। এর অনির্বায পরিণতি হবে এই যে, শত্রুও মিত্রে পরিণত হবে এবং দুষ্টও তোমার সামনে শিষ্ট হয়ে যাবে।

এ বাক্যের আরো একটি অর্থ এই যে, ইবাদত দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। যদি কোনো সময় কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তওবা কর এবং এরপর আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ কর। এতে তোমার বিগত গুনাহ ও মাফ হয়ে যাবে।

হযরত আবূযর গিফারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, তোমার দ্বারা যখন কোনো মন্দ কাজ অথবা গুনাহ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে কোনো সৎকাজ করে নাও। এতে গুনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শর্ত এই যে, বিগত গুনাহ থেকে তওবা করে সৎকাজ করতে হবে। –[আহমদ, মাযহারী]

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণ নিজেরা তো জান্নাতে স্থান পাবেই, তাদের খাতিরে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরাও স্থান পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে যোগ্য অর্থাৎ মুমিন মুসলমান হতে হবে কাফের হলে চলবে না। তাদের সৎকর্ম আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দার সমান না হলেও আল্লাহ তা'আলা তার বরকতে তাদেরকেও জান্নাতে তার স্থানে পৌঁছিয়ে দেবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি সৎ বান্দাদের বংশধর ও সন্তানসন্ততিকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব। এতে জানা যায় যে, বুজুর্গদের সাথে বংশ আত্মীয়তার অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা পরকালে ঈমানের শর্তসহ উপকারী হবে।

৬. سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ থেকে জানা যায় যে, পরকালীন মুক্তি, উচ্চ মর্যাদা ইত্যাদি সব দুনিয়াতে সবর করার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনকে বাধ্য করতে হবে।

اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নিয়ামত তোমাদের সবর ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি; তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লানত অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٧. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط كَالْعَصَا وَالْيَدِ وَالنَّاقَةِ قُلْ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاۤءُ اِضْلَالَهٗ فَلَا تُغْنِى الْاٰيَاتُ عَنْهُ شَيْئًا وَيَهْدِىْ يُرْشِدُ اِلَيْهِ اِلٰى دِيْنِهٖ مَنْ اَنَابَ ج رَجَعَ اِلَيْهِ وَيُبْدَلُ مِنْ مَنْ .

২৭. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বলে, তার নিকট অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? لَوْلَا এটা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– লাঠি, হস্ত, উষ্ট্রী ইত্যাদি; তাদেরকে বল, আল্লাহ তা'আলা যাকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা করেন তাকে বিভ্রান্ত করেন সুতরাং নিদর্শনসমূহ তাঁর কোনো কাজে আসে না। এবং যারা তাঁর অভিমুখী তাঁর প্রতি মুখ ফিরায় তাদেরকে তিনি তাঁর দিকে অর্থাৎ তাঁর দীনের দিকে হেদায়েত করেন পথ প্রদর্শন করেন।

٢٨. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ تَسْكُنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط اَىْ وَعْدِهٖ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ اَىْ قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

২৮. যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে অর্থাৎ তৎপ্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহ স্মরণ করে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। শুনে রাখ! আল্লাহ তা'আলার স্মরণেই হৃদয় অর্থাৎ মুমিনদের হৃদয় প্রশান্তি পায়। اَلَّذِيْنَ এটা পূর্বোক্ত আয়াতটির مَنْ শব্দটির بَدْل বা স্থলাভিষিক্ত বাক্য। تَطْمَئِنُّ অর্থ প্রশান্ত হয়।

٢٩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ طُوْبٰى مَصْدَرٌ مِنَ الطِّيْبِ اَوْ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ مَرْجِعٍ .

২৯. যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্যই হলো কল্যাণ ও শুভ প্রত্যাবর্তন স্থল। اَلَّذِيْنَ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। طُوْبٰى এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। এ শব্দটি طَيِّبٌ-এর مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎসবোধক শব্দ, অর্থ– ভালো, উত্তম। কিংবা এটা হলো, জান্নাতের এক বৃক্ষ। এত বিরাট যে, কোনো আরোহী যদি শত বৎসর এটার ছায়ায় চলে তবুও তা শেষ করতে পারবে না। مَاٰبٌ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

٣٠. كَذٰلِكَ كَمَا اَرْسَلْنَا الْاَنْبِيَاۤءَ قَبْلَكَ اَرْسَلْنٰكَ فِىْ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِتَتْلُوَ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَىِ الْقُرْاٰنَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط حَيْثُ قَالُوْا لَمَّا اُمِرُوْا بِالسُّجُوْدِ لَهٗ وَمَا الرَّحْمٰنُ قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ هُوَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ .

৩০. এভাবে আমি অর্থাৎ তোমার পূর্বে যেভাবে নবীগণকে প্রেরণ করেছিলোম সেভাবে আমি এমন এক জাতির প্রতি যাদের পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে তোমাকে পাঠিয়েছি তাদের নিকট তেলাওয়াত করার জন্য পাঠ করার জন্য তা যা আমি তোমার প্রতি ওহী নাজিল করেছি। অর্থাৎ আল কুরআন। কিন্তু তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। তাদেরকে যখন দয়াময়কে সেজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? হে মুহাম্মদ ﷺ! তাদেরকে বল, তিনিই আমার প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣١. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا لَهُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَسَيِّرْ
عَنَّا جِبَالَ مَكَّةَ وَاجْعَلْ لَنَا فِيْهَا أَنْهَارًا
وَ عُيُوْنًا لِنَغْرِسَ وَنَزْرَعَ وَابْعَثْ لَنَا آبَاءَنَا
الْمَوْتٰى يُكَلِّمُوْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا
سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ نُقِلَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا أَوْ
قُطِّعَتْ شُقِّقَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ
الْمَوْتٰى ط بِأَنْ يُحْيَوْا لَمَّا اٰمَنُوْا بَلْ لِلّٰهِ
الْأَمْرُ جَمِيْعًا ط لَا لِغَيْرِهٖ فَلَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ
يَّشَاءُ اللّٰهُ إِيْمَانَهُ دُوْنَ غَيْرِهٖ وَإِنْ أُوْتُوْا مَا
اقْتَرَحُوْا وَنَزَلَ لَمَّا أَرَادَ الصَّحَابَةُ إِظْهَارَ
مَا اقْتَرَحُوْا طَمَعًا فِيْ إِيْمَانِهِمْ أَفَلَمْ
يَيْئَسِ يَعْلَمِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ أَنْ مُخَفَّفَةٌ أَيْ
أَنَّهُ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا
إِلَى الْإِيْمَانِ مِنْ غَيْرِ اٰيَةٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تُصِيْبُهُمْ بِمَا
صَنَعُوْا يَصْنَعُهُمْ أَيْ بِكُفْرِهِمْ قَارِعَةٌ
دَاهِيَةٌ تَقْرَعُهُمْ بِصُنُوْفِ الْبَلَاءِ مِنَ الْقَتْلِ
وَالْأَسْرِ وَالْحَرْبِ وَالْجَدْبِ أَوْ تَحُلُّ يَا
مُحَمَّدُ بِجَيْشِكَ قَرِيْبًا مِنْ دَارِهِمْ مَكَّةَ
حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ط بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ إِنَّ
اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَقَدْ حَلَّ
بِالْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى أَتٰى فَتْحُ مَكَّةَ.

৩১. কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেছিল– আপনি যদি সত্যই নবী হয়ে থাকেন তবে মক্কার এ পাহাড়সমূহ সরিয়ে দিন এবং আমরা যাতে বৃক্ষ রোপণ করতে পারি ও শস্য উৎপাদন করতে পারি তজ্জন্য তাতে নদীনালা বানিয়ে দিন। আর আমাদের মৃত পিতৃপুরুষগণকে পুনর্জীবিত করে দিন যাতে তারা আমাদেরকে বলে দেয় যে, 'আপনি নবী।' এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, যদি কুরআন দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা হতো স্বস্থান হতে সরিয়ে নেওয়া হতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা হতো, قُطِّعَتْ অর্থ বিদীর্ণ হলো অথবা মৃতের সাথে তাদেরকে জীবিত করে কথা বলা যেতো তবুও তারা বিশ্বাস করত না। বরং সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারভুক্ত অন্য কারো এখতিয়ারে নয়। তারা যা দাবি করে তা প্রদর্শন করলেও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সে ব্যতীত অন্য কেউ বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তাদের ঈমান আনয়নের প্রতি আগ্রহাতিশয্যের দরুন সাহাবীগণও তাদের দাবি অনুসারে মোজেজা প্রদর্শনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তখন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তবে কি যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, مَا صَنَعُوْا এ স্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎসবোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকেই নিদর্শন ব্যতিরেকেই ঈমানের দিকে হেদায়েত করতে পারতেন। তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত সাহায্য না আসা পর্যন্ত মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের কর্মফলের জন্য أَفَلَمْ يَيْئَسْ এ স্থানে অর্থ তারা কি জানে না? أَنْ এটা এস্থানে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ তাশদীদহীন রূপে লঘুকৃত। মূলত ছিল أَنَّهُ অর্থাৎ কুফরির জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে। অর্থাৎ হত্যা, বন্দিত্ব, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রলয়ঙ্করী বিপদ তাদের উপর আপতিত হতে থাকবেই অথবা হে মুহাম্মদ ﷺ ! তুমি তোমার সেনাদলসহ তাদের আবাস ভূমির অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী স্থানে এসে অবতীর্ণ হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত ওয়াদার বিপরীত করেন না। রাসূল ﷺ মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবতরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয়ও হয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ هَلَّا : لَوْلَا-এর তাফসীর هَلَّا দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لَوْلَا টা تَحْضِيْضِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْ مَنْ : অর্থাৎ مَنْ اَنَابَ হতে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ জুমলা হয়ে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এখানে তারকীবের হিসেবে পাঁচটি সুরত হতে পারে–

১. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হলো মুবতাদা, পরবর্তীতে আগত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا জুমলা হয়ে তার খবর। আর মধ্যবর্তী বাক্য وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

২. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا টা مَنْ اَنَابَ হতে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে।

৩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا টা مَنْ-এর عَطْفُ بَيَانٍ হয়েছে।

৪. উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُمُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

৫. উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হবে অর্থাৎ اَمْدَحُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

قَوْلُهُ اَىْ وَعْدَهُ : ذِكْرُ اللّٰهِ-এর তাফসীর وَعْدَهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَامٌ বলে خَاصٌ উদ্দেশ্য হয়েছে। অন্যথায় ذِكْرُ اللّٰهِ টা وَعْدٌ এবং وَعِيْدٌ উভয়কেই শামিল করত। আর وَعِيْدٌ দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হওয়ার পরিবর্তে আরো পেরেশানিতে পড়ে যেত। মুফাসসির (র.) وَعْدَهُ দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তরের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ طُوْبٰى : এর অর্থ হলো– সৌন্দর্য, সুখকর অবস্থা, জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম। আল্লামা আলূসী (র.) طُوْبٰى-কে طَابَ يَطِيْبُ তথা বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার বলেছেন। যেমন– زُلْفٰى . بُشْرٰى ; আর طُوْبٰى মূলে طِيْبٰى এরপর يَاءٌ সাকিন এবং তার পূর্বাক্ষরে ضَمَّةٌ হওয়ার কারণে يَاءٌ-কে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করায় طُوْبٰى হয়েছে।

قَوْلُهُ شُقِّقَتْ : অর্থাৎ আপনার কেরাতের কারণে জমিন বিদীর্ণ হয়ে তাতে ঝরনা ধারা ও নদী প্রবাহিত হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, قُطِّعَتْ-এর অর্থ হলো কুরআনের মাধ্যমে طَيُّ الْاَرْضِ তথা দ্রুততার সাথে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূরত্ব নির্ধারিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ لَمَّا اٰمَنُوْا : এটা لَوْ-এর জবাব যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا بِغَيْرِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا-এর মূল ছিল اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا لِلّٰهِ জার ও মাজরূরকে اِخْتِصَاصٌ-এর জন্য مُقَدَّمٌ করে দিয়েছেন, যাকে মুফাসসির (র.) لَا بِغَيْرِهِ বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَعْلَمْ : يَيْئَسْ-এর তাফসীর يَعْلَمْ দ্বারা করেছেন। অর্থাৎ لَمْ يَيْئَسُوْا-এর তাফসীর لَمْ يَعْلَمُوْا দ্বারা بَنِىْ نَخْعٍ বা هَوَازِنْ-এর ভাষা মতে হয়েছে। আর يَاسٌ টা عِلْمٌ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে করেছেন। কেননা যে ব্যক্তি নিরাশ হয়ে যায় সে জানে যে, এ কাজটি হওয়ার নয়।

قَوْلُهُ بِصُنْعِهِمْ : مَا صَنَعُوْا-এর তাফসীর بِصُنْعِهِمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَا টা হলো مَصْدَرٌ মওসূলের مَا নয়। কাজেই عَدَمُ عَائِدٍ-এর আপত্তি উঠবে না।

قَوْلُهُ الدَّاهِيَةُ : তথা اَلْاَمْرُ الْعَظِيْمُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ الخ : মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্য রাসূল হওয়ার নিদর্শনাবলি তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের এবং বিস্ময়কর মোজেজার মাধ্যমে দিবালোকের মতো ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবূ জাহল বলে দিয়েছিল যে, বনূ হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আমরা তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে স্বীকার করতে পারি যে, আল্লাহর রাসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করেছেন? তাই তিনি যাই বলুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোনো অবস্থাতেই তাকে বিশ্বাস করব না। এজন্যই সে বাজে ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ও অবান্তর ফরমায়েশের মাধ্যমে সর্বত্র এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতসমূহও আবূ জাহল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়েছে।

তাফসীরে বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হলো। তাদের মধ্যে আবূ জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল, আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রাসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবি আছে এগুলো কুরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবি ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মোজেজার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন, যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, হযরত দাঊদ (আ.)-এর জন্য পাহাড়ও সাথে সাথে তাসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাঊদ (আ.)-এর চেয়ে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবি ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্য তদ্রূপ করে দিন, যাতে সিরিয়া ইয়েমেনের সফর আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবি ছিল এই যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চেয়ে কোনো অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন, যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি আপনার ধর্ম সত্য কিনা। -[মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ]

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবির উত্তরে বলা হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا .

এখানে سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বুঝানো হয়েছে। لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ -এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে; অর্থাৎ لَمَّا اٰمَنُوْا যেমন কুরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জবাবই উল্লেখ করা হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا .

অর্থ এই যে, যদি কুরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা তারা এসব দাবির পূর্বে এমন এমন মোজেজা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মোজেজার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইশারায় চন্দ্রের দিখণ্ডিত হওয়া পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চেয়ে অনেক বেশি বিস্ময়কর। এমনিভাবে তার হাতে নিষ্প্রাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তাসবীহ পাঠ করা কোনো মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চেয়ে অধিকতর বিরাট মোজেজা। শবে মি'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের আলৌকিকতার চেয়ে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবির পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা– কিন্তু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এসব দাবির লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবি পূরণ না করা হলে তারা বলবে– [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ তা'আলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রাসূলের কথা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে– بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا অর্থাৎ ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবিগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবি পূর্ণ করা উপযুক্ত মনে করেননি। কারণ দাবি উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তার জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবি পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا : ইমাম বগভী (র.) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের এসব দাবি শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মোজেজা হিসেবে দাবিগুলো পূরণ করে দিলে ভালোই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হননি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা আল্লাহর রহস্যের অনুকূলে নয়। আল্লাহ তা'আলার রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

قَوْلُهُ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, قَارِعَةٌ শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবিদাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য। যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনো দুর্ভিক্ষের কখনো ইসলামি জিহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাজিল হয়েছে। কারো উপরও বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোনো বালামসিবতে আক্রান্ত হয়েছে। اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ অর্থাৎ আপদ-বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা কোনো সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমনকি পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোনো সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আজাব অথবা বিপদ নাজিল হলে তাতে আল্লাহ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আজাব তাদের জন্য রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আজাবে পতিত হবে।

নিত্যদিনকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমাদের আশেপাশে প্রায়ই কোনো না কোনো সম্প্রদায় ও জনপদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ আসছে। কোথাও বন্যার ধ্বংসলীলা, কোথাও ঝড় ঝঞ্ঝা, কোথাও ভূমিকম্প এবং কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনো বিপদ অহরহ আপতিত হচ্ছে। কুরআন পাকের উপরিউক্ত বক্তব্য অনুযায়ী এগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও জনপদের জন্যই শাস্তি নয়; বরং পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের জন্যও হুঁশিয়ারি সংকেত হয়ে থাকে। অতীতে যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটুকু উন্নত ছিল না, কিন্তু মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আল্যর ভয় ছিল। কোথাও এ ধরনের দুর্ঘটনা দেখা দিলে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সবাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যেত, আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করত তওবা করত এবং ইস্তেগফার ও দান-খয়রাতকে মুক্তির উপায় মনে করত। ফলে চাক্ষুষ দেখা যেত যে, তাদের বিপদ সহজেই দূর হয়ে গেছে। আজ আমরা এতই গাফিল হয়ে গেছি যে, বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহ স্মরণে আসে না– বাকি সব কিছুই আমরা স্মরণ করি। দুনিয়ার তাবত অমুসলিমদের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি কেবল বস্তুগত কারণাদির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। কারণাদির উদ্ভাবক আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগের তাওফীক তখনো কম লোকেরই হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব আজ একের পর এক উপর্যুপরি দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকে।

قَوْلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ : অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আজাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পৌছে না যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা কখনো ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গাম্বরদের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফের ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٢. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ كَمَا اسْتُهْزِئَ بِكَ وَهٰذَا تَسْلِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمْلَيْتُ أَمْهَلْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَيْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ فَكَذٰلِكَ أَفْعَلُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ.

৩২. তোমার সাথে যেরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে তেমনি তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অনন্তর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে কিছু অবকাশ বিরতি দিয়েছিলাম। অতঃপর তাদেরকে শাস্তিতে পাকড়াও করেছিলাম। অনন্তর কেমন ছিল এই শাস্তি! অর্থাৎ যথাস্থানেই তা আপতিত হয়েছিল। তোমার সাথে যারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের বেলায়ও আমি তদ্রূপ আচরণ করব। এ আয়াতটি হলো রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনাস্বরূপ।

٣٣. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ رَقِيْبٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ج عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَهُوَ اللّٰهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ مِنَ الْأَصْنَامِ لَا دَلَّ عَلٰى هٰذَا وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ ط قُلْ سَمُّوْهُمْ ط لَهُ مَنْ هُمْ أَمْ بَلْ أَتُنَبِّئُوْنَهٗ تُخْبِرُوْنَ اللّٰهَ بِمَا أَيْ بِشَرِيْكٍ لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ أَيْ لَا شَرِيْكَ لَهٗ إِذْ لَوْ كَانَ لَعَلِمَهٗ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ أَمْ بَلْ أَتُسَمُّوْنَهُمْ شُرَكَاءَ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ط بِظَنٍّ بَاطِلٍ لَا حَقِيْقَةَ لَهٗ فِي الْبَاطِنِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ كُفْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ط طَرِيْقِ الْهُدٰى وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ.

৩৩. প্রত্যেক মানুষ যা করে ভালো ও মন্দ যা কিছু করে তা যিনি লক্ষ্য করেন তার যিনি তত্ত্বাবধায়ক তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কি ঐ সমস্ত প্রতিমার সমান যারা এরূপ নয়। না কখনো সমান নন। পরবর্তী বাক্য এ বক্তব্যটির প্রতি ইঙ্গিতবহ। তা হলো অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার বহু শরিক করেছে। বল, তাঁকে তাদের নাম বল তারা কে? বরং أَمْ এটা এ স্থানে بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা কি তাঁকে আল্লাহ তা'আলাকে এমন কিছুর এমন শরিকের সংবাদ দিচ্ছ পৃথিবীতে যা আল্লাহ তা'আলা জানেন না। أَتُنَبِّئُوْنَ অর্থ তোমরা কি সংবাদ দিচ্ছ? এ স্থানে প্রশ্নবোধকটি إِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মূলত তাঁর কোনো শরিক নেই। কারণ শরিক থাকলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তা জানতেন। তা হতে আল্লাহ তা'আলা বহু ঊর্ধ্বে। না তার উক্তি হিসেবে তা করছ? ভিতরে যার কোনো তাৎপর্য বা ভিত্তি নেই সেই ধরনের বাতিল ও অবান্তর ধারণারূপে তোমরা এগুলোকে শরিক নামকরণ করে নিয়েছ? না সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ছলনা অর্থাৎ তাদের কুফরিই তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান করা হয়েছে এবং তাদেরকে পথ হতে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। أَمْ بِظَاهِرٍ এ স্থানে أَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٤. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ج أَشَدُّ مِنْهُ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ أَيْ عَذَابِهٖ مِنْ وَّاقٍ مَانِعٍ.

৩৪. তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে হত্যা ও বন্দিত্বের শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরো কঠোর। তা হতে আরো কঠিন। আল্লাহ তা'আলা হতে অর্থাৎ তাঁর শাস্তি হতে তাদের জন্য কোনো রক্ষাকারী নেই। কেউ তার প্রতিহতকারী নেই।

Free @ www.eelm.weebly.com

٣٥. مَثَلُ صِفَةُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط
مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوْفٌ اَىْ فِيْمَا نَقُصُّ
عَلَيْكُمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط
اُكُلُهَا مَا يُؤْكَلُ فِيْهَا دَآئِمٌ لَا يَفْنٰى وَظِلُّهَا ط
دَائِمٌ لَا تَنْسَخُهُ شَمْسٌ لِعَدَمِهَا فِيْهَا تِلْكَ
اَىِ الْجَنَّةُ عُقْبٰى عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ
وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ.

৩৫. সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার উপমা مَثَلُ الْجَنَّةِ এটা এ স্থানে مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। এটার خَبَرٌ বা বিধেয় এ স্থানে উহ্য। তা হলো فِيْمَا نَقُصُّ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ঐ জান্নাতের বিবরণ হলো যা আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ বিবরণ এরূপ– তার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তার খাদ্য চিরস্থায়ী তা কখনো বিলুপ্ত হবে না। তার ছায়াও চিরস্থায়ী। সূর্যালোক তা নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। কারণ, সেখানে সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না। এটা অর্থাৎ এই জান্নাত যারা শিরক হতে বেঁচে রয়েছে তাদের পরিণাম ফল। আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম হলো জাহান্নাম। اُكُلٌ অর্থ– যা আহার করা হয়। عُقْبٰى অর্থ– শেষ পরিণাম।

٣٦. وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ
سَلَامٍ وَغَيْرِهِ مِنْ مُؤْمِنِى الْيَهُوْدِ يَفْرَحُوْنَ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ لِمُوَافَقَتِهِ مَا عِنْدَهُمْ وَمِنَ
الْاَحْزَابِ الَّذِيْنَ تَحَزَّبُوْا عَلَيْكَ بِالْمُعَادَاةِ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهُ ط
كَذِكْرِ الرَّحْمٰنِ وَمَا عَدَا الْقَصَصِ قُلْ اِنَّمَآ
اُمِرْتُ فِيْمَا اُنْزِلَ اِلَىَّ اَنْ اَىْ بِاَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ
وَلَآ اُشْرِكَ بِهِ ط اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ مَرْجِعِىْ.

৩৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং আরো যারা ইহুদিদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছিলেন তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দিত। কারণ তাদের নিকট যা আছে তা তার অনুরূপ। তবে কোনো কোনো দল অর্থাৎ মুশরিক ও ইহুদিদের যারা তোমার শত্রুতায় জোট বেঁধেছে তারা তার কতক অংশ 'আর-রাহমান' -এর উল্লেখ ও কুরআনের কাহিনীগুলো ব্যতীত তাতে যে সমস্ত বিধিবিধান রয়েছে তা অস্বীকার করে। বল, আমার নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমি তো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে ও তাঁর কোনো শরিক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন। اَنْ এটা এ স্থানে بِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَاٰبِ অর্থ আমার প্রত্যাবার্তনস্থল। শব্দটির শেষে اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধবাচক ى উহ্য রয়েছে।

٣٧. وَكَذٰلِكَ الْاِنْزَالُ اَنْزَلْنٰهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ حُكْمًا
عَرَبِيًّا ط بِلُغَةِ الْعَرَبِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ
النَّاسِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ
فِيْمَا يَدْعُوْنَكَ اِلَيْهِ مِنْ مِلَّتِهِمْ فَرْضًا بَعْدَ
مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِالتَّوْحِيْدِ مَا لَكَ مِنَ
اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ وَّلِيٍّ نَاصِرٍ وَّلَا وَاقٍ مَانِعٍ مِنْ
عَذَابِهِ.

৩৭. আর এভাবে অর্থাৎ যেভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে সেভাবে আমি তা অর্থাৎ আল কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবিতে এক ফয়সালাকারীরূপে অর্থাৎ এটা আরবি ভাষায় নাজিল করেছে যার মাধ্যমে তুমি মানুষের সাথে ফয়সালা বিধান করবে। তাওহীদ সম্পর্কে জ্ঞান প্রাপ্তির পর ধরে নাও তুমি যদি তাদের কাফেরদের খেয়াল-খুশির অর্থাৎ তারা তোমাকে তাদের ধর্মের প্রতি যে আহ্বান করে তার অনুসরণ কর তবে আল্লাহ তা'আলার মোকাবিলায় তোমার কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী। অর্থাৎ তাঁর শাস্তি প্রতিহতকারী থাকবে না। مِنْ وَّلِيٍّ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَيْفَ كَانَ عِقَابِ : অর্থাৎ عَلٰى اَيِّ حَالَةٍ كَانَ عِقَابِىْ اَهَلْ كَانَ ظُلْمًا اَوْ كَانَ عَدْلًا অর্থাৎ আমার শাস্তি কি অত্যাচারীসুলভ না ইনসাফ ভিত্তিক? এর উত্তর ব্যাখ্যার স্বীয় উক্তি هُوَ قَائِمٌ مَوْقِعَهُ দ্বারা দিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ كَمَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ : এটা فَمَنْ هُوَ قَائِمٌ মুবতাদার খবর হয়েছে। قَرِيْنَةٌ مُقَابَلَةٌ দ্বারা যেহেতু খবরের উহ্য হওয়া বুঝা যায়। এ কারণেই বাক্য উপকারবিহীন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

قَوْلُهُ دَلَّ عَلٰى هٰذَا : অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ের উপর وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ দালালত করতেছে। আর উল্লিখিত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হওয়া এবং উহ্যের উপরে বুঝানো। অর্থাৎ اِجْعَلُوْا الخ এ উভয় বিষয়টিকে বুঝাচ্ছে।

قَوْلُهُ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ : এ বাক্যটি জুমলা হয়ে মুবতাদা আর তার খবর উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فِيْ كَانَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ আর تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ টা উহ্য যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত এরূপ যে, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَهَا الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

قَوْلُهُ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا دَائِمٌ : এ উভয় বাক্যই মুবতাদা ও খবর হয়ে حَالٌ হয়েছে। আর ظِلُّهَا মুবতাদার খবর হলো دَائِمٌ যা قَرِيْنَة -এর কারণে উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مَا يُؤْكَلُ فِيْهَا : প্রশ্ন : কি কারণে اُكُلُهَا -এর তাফসীর مَا يُؤْكَلُ দ্বারা করা হয়েছে?

উত্তর. এর দ্বারা দুটি প্রশ্নের উত্তর খণ্ডন করা উদ্দেশ্য–

১. যদি اُكُلُهَا -কে মাসদার মানা হয় তবে তার উপর دَائِمٌ -এর حَمْل বৈধ নয়। আর যদি اُكُلٌ টা مَأْكُوْل অর্থে হয়; তবে مَأْكُوْل তো খাওয়ার পরে مَعْدُوْم হয়ে যায়। কাজেই دَوَام -এর কোনো অর্থ হলো না।

উত্তর হলো, اُكُلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে مَا مِنْ شَانِهٖ اَنْ يُؤْكَلَ এ তাফসীর দ্বারা উভয় প্রশ্নেরই নিরসন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فِيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُكُلُهَا -এর ইযাফত হলো اِضَافَت فِىْ বা فِىْ অর্থে। এটা اِسْنَاد مَجَازِىْ - عَلَاقَة ظَرْفِيَّة

قَوْلُهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا : এ উভয়টি اَنْزَلْنَاهُ -এর যমীর তথা قُرْاٰن থেকে حَالٌ হয়েছে। অথচ حُكْمًا এবং عَرَبِيًّا -এর কুরআনের উপর حَمْل করা বৈধ নয়।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, حُكْمًا হলো মাসদার যা مَفْعُوْل অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ مَا يُحْكَمُ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ الخ : শানে নুযূল : যেহেতু মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেজা দাবি করেছিল এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি বিদ্রূপ করছিল তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এ আয়াত নাজিল করেছেন। কেননা কাফেরদের আচরণ ছিল প্রিয়নবী ﷺ-এর জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক তাই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন– وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা আপনার প্রতি বিদ্রূপ করে আপনাকে যে কষ্ট দিচ্ছে এটি নতুন কিছু নয়; বরং ইতঃপূর্বেও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের সঙ্গে এমন অন্যায় আচরণই করা হয়েছে। তাদেরও বিদ্রূপ করা হয়েছে, তাদেরকেও চরম কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাই তারা যেভাবে সবর করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আপনিও সবর করুন। আল্লাহ তা'আলার বিধান হলো কাফেরদেরকে তিনি অবকাশ দান করে থাকেন। তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তাদের অন্যায়-অনাচারের ঘট পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন। আর সে পাকড়াও হয় অত্যন্ত শোচনীয় এবং ভয়াবহ। তাই ইরশাদ হয়েছে– ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ অর্থাৎ এরপরও যদি তাদেরকে পাকড়াও করি বল কেমন ছিল শাস্তি? –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৯, পৃ. ৫৫]

Free © www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ﷺ ! আপনার পূর্বের নবী-রাসূলগণকেও এভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাই আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি এ কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছি। অবশেষে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন জালেম হতবাক হয়ে যায়। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন– وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ অর্থাৎ এভাবেই আপনার পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে পাকড়াও করা হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর, পারা ১৩, পৃ. ৪৭]

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে তাদের কঠিন কঠোর শাস্তির ইতিহাস সর্বজনবিদিত। আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন নমরূদ সহ সকল জালেম সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ এবং তাদের ধ্বংসের কথা ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো জালেম সম্প্রদায়কে তাদের অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির বিধান করেন না; বরং তাদেরকে যথেষ্ট সময় অবকাশ দেওয়া হয়। একদিকে তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হতে থাকে অন্যদিকে তাদের সত্য গ্রহণের তথা হেদায়েতের পথ অবলম্বনের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু যখন তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে আরো ঔদ্ধত্য দেখায় তখন তাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়ে। পূর্বকালের বিভিন্ন পথভ্রষ্ট জাতির শিক্ষামূলক ঘটনা থেকে মক্কার কাফেরদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি। তাই অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। –[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৫২০]

ইমাম তাবারী (র.) এ আয়াতের ব্যাখায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ﷺ ! এ মুশরিকরা যদিও আপনাকে বিদ্রূপ করে আপনার নিকট বারে বারে নতুন নতুন নিদর্শন প্রদর্শনের দাবি জানিয়েছে, এর দ্বারা আপনার প্রতি তাদের বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, অবশেষে তাদের এ অবকাশ শেষ হবে এবং তাদের কঠোর কঠিন শাস্তি হবে। –[তাফসীরে তাবারী, খ. ১৩, পৃ. ১০৬]

قَوْلُهُ اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ : "বলতো যে সকলের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকের কীর্তিকলাপ নিয়ে তাঁর [আল্লাহ তা'আলার] কবল থেকে কে রক্ষা পেতে পারে?"

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের অবস্থা এবং শাস্তির কথা স্থান পেয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকের মাথার উপর দাঁড়িয়ে সকলের যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং শাস্তির কথা স্থান পেয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ১০৫]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের মাথার উপর দাঁড়িয়ে সকলের যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন। সবই তার সম্মুখে। কোনো কিছুই তার নিকট গোপন নেই। সবকিছু যদি সচক্ষে দেখেন। অতএব, কারো শাস্তি বিধানের সর্বময় ক্ষমতা তার রয়েছে, যারা দুরাত্মা তারা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে পারে না। তাই ইরশাদ হয়েছে– اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই। কোনো বৃক্ষের পাতা ঝড়ে গেলে তাও তিনি জানেন। প্রাণী মাত্রই রিজিকের দায়িত্ব তাঁর উপরই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা তাঁর সাথে শরিক করে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ قُلْ سَمُّوهُمْ : অর্থাৎ "[হে নবী!] আপনি বলুন, তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের নাম বল।" যারা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, যাদের কোনো ক্ষমতাই নেই, তাদের সম্মুখে মাথা নত করার ন্যায় বোকামি আর কিছুই হতে পারে না। তারা কি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সমান হতে পারে? যাদেরকে তোমরা আল্লাহ তা'আলার সমান বলে মনে কর তাদের নাম বলতো? এ সমস্ত অক্ষমদের অবস্থা বর্ণনা কর। সমস্ত সৃষ্টি জগতে আল্লাহ তা'আলার কোনো শরিক আছে বলে আল্লাহ তা'আলা জানেন না। যদি থাকত তবে তিনি অবশ্যই জানতেন। তাই ইরশাদ হয়েছে- أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ তবে কি তোমরা এমন কথা তাকে জানতে চাও যা তিনি জানেন না? বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী আবূ হাইয়ান এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হে কাফেররা! তোমরা কি সেসব দেব দেবতাকে মহান আল্লাহ তা'আলার সমান করতে চাও যারা পৃথিবীর কোনো খবরই রাখে না? অথবা তোমরা এ সম্পর্কে ভাসা ভাসা কথা বলছ। তোমাদের উক্তি অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলিমাত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু যার কোনো অস্তিত্ব নেই তার সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো প্রশ্ন উত্থিত হয় না। তোমরা কি তোমাদের হাতের বানানো মূর্তিগুলোর এমন কোনো গুণ বর্ণনা করতে পার যার কারণে তারা ইবাদতেরও যোগ্য হতে পারে? অথবা তোমরা ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন এমন কথাবার্তা বল বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই।

বস্তুত যদি পৌত্তলিকরা তাদের অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করে, প্রত্যেকেই তার বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করে তবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তঃসারশূন্যতা তাদের নিকটই প্রমাণিত হবে। তারাই উপলব্ধি করবে যে, তাদের বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই, তাদের কথায় কোনো যুক্তি নেই।

قَوْلُهُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ : অর্থাৎ "আর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি।" এ বাক্য দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা হলো সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অথবা ইহুদি এবং ঈসায়ীদের মধ্যে সেসব লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (র.) এবং তাঁর সাথি এমনিভাবে আবিসিনিয়ার কিছু খ্রিস্টানও ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তথা মুসলমানগণ আর ইতঃপূর্বে যারা কিতাব পেয়েছিল যেমন ইহুদি এবং খ্রিস্টান তারা সকলেই হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতি আনন্দিত। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ায় তারা অত্যন্ত খুশি। কেননা পবিত্র কুরআনকেই তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্যের একমাত্র উপকরণ মনে করে।

এতদ্ব্যতীত তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে প্রিয়নবী ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ ছিল। তারা তার আগমনের মধ্যে তাদের কিতাবের ঘোষণায় সত্যতা লক্ষ্য করে খুশি হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! যা আপনার নিকট নাজিল করা হয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত খুশি। وَمِنَ الْأَحْزَابِ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা এর সত্যতা স্বীকার করে না। قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন কে খুশি হলো বা কে দুঃখী হলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করি, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করি না। আর মানুষকে তাঁর দিকে আহ্বান করি কেননা, আমি আল্লাহরই রাসূল আর তাঁর দিকে আহ্বান করার জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। আর তাঁরই নিকট আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। কেননা এ ক্ষণস্থায়ী জগতে মানুষের অবস্থান একটি সীমিত সময়ের জন্যেই হয়ে থাকে। এ সময় শেষ হলে প্রত্যেকটি মানুষকে পাড়ি জমাতে হয় পরপারে। এটিই স্রষ্টার অমোঘ বিধান। আর কিয়ামত সত্য, অবশেষে সকলকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে কিতাব দেওয়ার কথা ইরশাদ হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তারা হলেন মুমিনগণ, যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তাদের মধ্যে আহলে কিতাব যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব (রা.) এবং তাঁর সাথিগণ। আর নাসারাদের মধ্য হতে ৮০জন ইসলাম কবুল করেছিলেন। ৪০ জন নাজরানবাসী ৮ জন ইয়ামানবাসী এবং ১৩ জন আবিসিনিয়াবাসী। যেহেতু তারা পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাই পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ায় তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهُ : অর্থাৎ আর কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্র কুরআনের কিছু অংশকে অস্বীকার করে।

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, এ বাক্য দ্বারা যেসব আহলে কিতাব ঈমান আনেনি তারা সহ সমস্ত কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا : ইতঃপূর্বে যেসব তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর বিভিন্ন যুগে নাজিল করেছি ঠিক এমনিভাবে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে হে রাসূল ﷺ ! আপনার নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করেছি। ইতঃপূর্বে আসমানি গ্রন্থসমূহ আম্বিয়ায়ে কেরামের জাতীয় ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে হে রাসূল ﷺ ! আপনার জাতীয় ভাষায় তথা আরবি ভাষায় পবিত্র কুরআন নাজিল করেছি। এতে রয়েছে জ্ঞানভাণ্ডার। আরবি ভাষাকে 'উম্মুল আলসেনা' বলা হয় তথা ভাষার জননী আর পবিত্র কুরআন হলো 'উম্মুল কিতাব' তথা কিতাব জননী। অতএব আরবি ভাষাই এ মহান গ্রন্থের জন্যে সমীচীন বিবেচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ : পবিত্র কুরআন সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। অতএব, আহলে কিতাবসহ সকলের এ কিতাবই মেনে চলা কর্তব্য। পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর পূর্বের যাবতীয় বিধি-নিষেধ বাতিল। এখন সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র হেদায়েত পবিত্র কুরআনের হেদায়েত এবং একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহান আদর্শ।

অতএব পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার পর কে খুশি হলো আর কে খুশি হলো না সেদিকে লক্ষ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তার অনুসরণেই চলতে থাকুন। পবিত্র কুরআন আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও যদি এ কাফেরদের আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক আপনি চলতে চান তবে আল্লাহ তা'আলার কবল থেকে কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে, কিন্তু মূলত এ দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে মুশরিক এবং কাফেরদেরকে এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ ! আপনি আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন এবং কোনো অবস্থাতেই কাফেরদের কথা মেনে চলবেন না। কেননা এর পরিণতি হলো চরম বিপদ আর উম্মতের কর্তব্য হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -এর আদর্শকে পরিহার করা মুসলিম জাতির চরম ক্ষতির কারণ হয়। তাঁর অনুসরণেই রয়েছে মুসলিম জাতি তথা সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ১০৯]

Free @ www.eilmweebly.com

অনুবাদ :

٣٨. وَنَزَلَ لَمَّا عَيَّرُوْهُ بِكَثْرَةِ النِّسَاءِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط أَوْلَادًا وَأَنْتَ مِثْلُهُمْ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ مِنْهُمْ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ط لِأَنَّهُمْ عَبِيْدٌ مَرْبُوْبُوْنَ لِكُلِّ أَجَلٍ مُّدَّةٍ كِتَابٌ مَكْتُوْبٌ فِيْهِ تَحْدِيْدُهُ.

৩৮. রাসূলে কারীম ﷺ -এর অধিক বিবাহ সম্পর্কে কাফেরগণ নিন্দা করলে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তোমার পূর্বেও বহু রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিও দিয়েছিলাম ذُرِّيَّةً অর্থ- সন্তানসন্ততি। তুমিও তাদের মতোই। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কোনো নিদর্শন উপস্থিত করা তাদের মধ্য হতে কোনো রাসূলেরই কাজ নয়। কারণ, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিপালিত দাস। প্রত্যেক নির্ধারিত বস্তুরই মুদ্দতেরই রয়েছে এক কিতাব লিপিবদ্ধ নামচা। তাতেই তার সকল কিছুর সীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে।

٣٩. يَمْحُوا اللّٰهُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ج بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فِيْهِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ أَصْلُهُ الَّذِيْ لَا يُغَيَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ مَا كَتَبَهُ فِي الْأَزَلِ.

৩৯. তা হতে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা বাতিল করেন এবং যা ইচ্ছা যে সমস্ত বিধিবিধান ইত্যাদি ইচ্ছা বহাল রাখেন। يُثْبِتُ এটা ب অক্ষরে তাশদীদ ও তাশদীদহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। আর তাঁর নিকট আছে উম্মুল কিতাব মূল কিতাব যার মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না। তা হলো যা আদিকাল হতে তিনি লিবিবদ্ধ করে রেখেছেন।

٤٠. وَإِمَّا فِيْهِ إِدْغَامُ نُوْنِ إِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِيْ مَا الْمَزِيْدَةِ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِيْ حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ أَيْ فَذَاكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ لَا عَلَيْكَ إِلَّا التَّبْلِيْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ إِذَا صَارُوْا إِلَيْنَا فَنُجَازِيْهِمْ.

৪০. তাদেরকে যার তোমার জীবদ্দশায়ই যে শাস্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তার কিছু যদি إِمَّا এতে বা مَا مَزِيْدَه শর্তবাচক শব্দ إِنْ-এর ن এর অক্ষরটি এ স্থানে অতিরিক্ত مَا- এর مِيْم ইদগাম হয়েছে। তোমাকে দেখিয়ে দেই তবে তো ভালোই এ স্থানে উক্ত শর্তবাচক বাক্যটির জবাব উহ্য। তা হলো فَذَاكَ বা তাদেরকে শাস্তিদানের পূর্বেই তোমার মৃত্যু ঘটাই- তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা প্রচার ভিন্ন তোমার কোনো দায়িত্ব নেই আর যখন আমার নিকট ফিরে আসবে তখন হিসাব নেওয়া আমার কাজ। অনন্তর তাদেরকে আমি প্রতিফল দেব।

٤١. أَوَلَمْ يَرَوْا أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصِدُ أَرْضَهُمْ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا بِالْفَتْحِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ فِيْ خَلْقِهِ بِمَا يَشَاءُ لَا مُعَقِّبَ رَادَّ لِحُكْمِهِ ط وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

৪১. তারা অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কি দেখে না যে, আমি তাদেরকে ভূমিতে এসে অর্থাৎ তাদের দেশের ধ্বংসাভিপ্রায় নিয়ে চতুর্দিক হতে রাসূল ﷺ -কে বিজয় দানের মাধ্যমে তা সংকুচিত করে এনেছি? আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা নির্দেশ করেন। তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। আর তিনি হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। مُعَقِّبَ অর্থ এ স্থানে রদকারী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٢. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ بِأَنْبِيَائِهِمْ كَمَا مَكَرُوْا بِكَ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ط وَلَيْسَ مَكْرُهُمْ كَمَكْرِهِ لِأَنَّهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط فَيُعِدُّلَهَا جَزَاءَهَا وَهٰذَا هُوَ الْمَكْرُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يَأْتِيْهِمْ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّرُ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ أَيِ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ أَلَهُمْ أَمْ لِلنَّبِىِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ.

৪২. তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে যে সমস্ত জাতি অতীত হয়েছে তারাও তাদের নবীগণের সাথে চক্রান্ত করেছিল যেমন তারা তোমার সাথে চক্রান্তে লিপ্ত কিন্তু সমস্ত কৌশল আল্লাহ তা'আলার এখতিয়ারে তাদের চক্রান্ত তাঁর কৌশলের মতো নয়। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তিনি তা জানেন। সুতরাং তার পরিপূর্ণ বদলা তিনি দেবেন। এটাই তাঁর কৌশল। কারণ, তিনি তাদের নিকট এমন স্থান হতে আজাব নিয়ে আসেন যে স্থান হতে তারা ধারণাও করতে পারে না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ শীঘ্রই জানবে اَلْكَافِرُ এ স্থানে জাতিবাচক অর্থে তার ব্যবহার হয়েছে। অপর এক কেরাতে اَلْكُفَّارُ [বহুবচন] রূপেও তা পঠিত রয়েছে। পরকালের পরিণাম কার? অর্থাৎ পরকালে কার জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম? তাদের জন্য, না রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য?

٤٣. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ لَهُمْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ عَلٰى صِدْقِىْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ مِنْ مُؤْمِنِىْ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى.

৪৩. যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তারা তোমাকে বলে, তুমি প্রেরিত পুরুষ নয়। তাদেরকে বল, আমার সত্যতার জন্য আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান রয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্য হতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَذَاكَ : এটা হলো মুবতাদা আর شَافِيْكَ হলো তার উহ্য খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলা হয়ে اَمَّا-এর جَوَابْ شَرْط হয়েছে।

قَوْلُهُ نَتَوَفَّيَنَّكَ : এটাও পূর্বের শর্তের উপর مَعْطُوْف হওয়ার কারণে شَرْط হয়েছে। এর জবাবও উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فَلَا تَقْصُرْ مِنْكَ আর فَاِنَّمَا عَلَيْكَ হলো সেই উহ্যের ইল্লত। সম্ভবত মুফাসসির (র.) شَرْط ثَانِىْ -এর جَوَابْ উহ্য হওয়ার প্রতি প্রথমটির উপর নির্ভর করে অথবা ইল্লতের উপর নির্ভর করে ইঙ্গিত করেননি। প্রথম شَرْط -এর جَوَابْ -এর বিপরীত যে, তার ইল্লত বর্ণনা করা হয়নি।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ : প্রশ্ন. এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, اَلْكَافِرُ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ টা عَهْدِىْ মানার তো কোনো করীনা বিদ্যমান নেই। কেননা কোনো সুনির্দিষ্ট বিশেষ কাফের উদ্দেশ্য নয়। আর না সাধারণভাবে একজন কাফের উদ্দেশ্য হয়। এরপরও اَلْكَافِرُ -কে মুফরাদ নেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. اَلْكَافِرُ -এর اَلِفْ لَامْ টি জিনসের জন্য হয়েছে যা বহুবচনের অর্থকে বুঝায়। কাজেই কোনো আপত্তি আর থাকে না।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الخ : নবী-রাসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিজীবন যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকবে। কুরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব একাধিক আয়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুয়ত-রেসালাতের স্বরূপ ও রহস্যই বোঝনি, ফলে এ ধরনের কল্পনায় মেতে উঠেছ। রাসূলকে আল্লাহ তা'আলা একটি আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেন, যাতে উম্মতের সবাই তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর মতোই কাজকর্ম ও চরিত্র শিক্ষা করে। বলা বাহুল্য, মানুষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ করতে পারে। স্বজাতীয় নয় এরূপ কোনো অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানসিক প্রবৃত্তির সাথেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গৃহেরও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে যেতো। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ আপত্তিই উত্থাপিত হলো। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহ বেড়ে গেল। এর জবাব প্রথম আয়াতের বাক্যগুলোতে দেওয়া হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবিশিষ্ট হওয়াকে তোমরা কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থি মনে করে নিয়েছ? সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি পয়গাম্বরদেরকে পরিবার-পরিজনবিশিষ্ট করেছেন। অনেক পয়গাম্বর অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকের নবুয়তের প্রবক্তা তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক পত্নীর অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল। অতএব একে নবুয়ত, রিসালাত অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মূর্খতা বৈ নয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তো রোজাও রাখি এবং রোজা ছাড়াও থাকি। [অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোজা রাখব।] তিনি আরো বলেন, আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাজের জন্য দণ্ডায়মানও হই। [অর্থাৎ এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাজই পড়ব।] এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ : অর্থাৎ "কোনো রাসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারে।" কাফের ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবি পয়গাম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব দাবি করেছে, তন্মধ্যে দুটি দাবি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক–

১. আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধিবিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে, اِئْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ অর্থাৎ আপনি বর্তমান কুরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধিবিধান পরিবর্তন করে দিন– আজাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

২. পয়গাম্বরদের সুস্পষ্ট মোজেজা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করে বলা যে, অমুক ধরনের মোজেজা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কুরআন পাকের উপরিউক্ত বাক্যে اٰيَةٌ শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কুরআনের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মোজেজাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরবিদ কুরআনি আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো পয়গাম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোনো আয়াত তৈরি করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মোজেজা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনো রাসূল ও নবীকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মোজেজা প্রকাশ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে– عُمُوْمِ مَجَازٍ -এর কায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তাফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এদিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার-বিষয়বস্তু এই যে, আমার রাসূলের কাছে কুরআনি আয়াত পরিবর্তন করার দাবি অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোনো রাসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোনো বিশেষ ধরনের মোজেজা দাবি করাও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচালক। কেননা কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মোজেজা প্রদর্শন করবেন।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ : এখানে اَجَلٌ শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كِتَابٌ শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গাম্বরের প্রতি কি ওহি এবং কি কি বিধিবিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধিবিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরো লিখিত আছে যে, অমুক পয়গাম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এ মোজেজা প্রকাশ পাবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এরূপ দাবি করা যে, অমুক ধরনের বিধিবিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মোজেজা দেখান। এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবি, যা রিসালাত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ এখানে اُمُّ الْكِتَابِ -এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহফূজ বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারো কোনো ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

তাফসীরবিদদের মধ্যে সাঈদ ইবনে জারীর, কাতাদাহ প্রমুখ এ আয়াতটিকেও আহকাম ও বিধিবিধানের নসখ তথা রহিতকরণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন পয়গাম্বরের মাধ্যমে স্বীয় গ্রন্থ নাজিল করেন। এসব গ্রন্থে যেসব বিধিবিধান ও ফরায়েজ বর্ণিত হয়, সেগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বকালে প্রযোজ্য থাকা জরুরি নয়; বরং জাতিসমূহের অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে রহস্যজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যেসব বিধান মিটিয়ে দিতে চান, সেগুলো মিটিয়ে দেন এবং যেগুলো বাকি রাখতে চান সেগুলো বাকি রাখেন এবং মূল গ্রন্থ সর্বাবস্থায় তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। তাতে পূর্বেই লিখিত আছে যে, অমুক জাতির জন্য নাজিলকৃত অমুক বিধানটি একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধার্যকৃত হয়েছে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিংবা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মূলগ্রন্থে এর মেয়াদ নির্ধারণের সাথে সাথে একমাত্র লিপিবদ্ধ আছে যে, এ বিধানটি পরিবর্তন করে তার স্থলে কোনো বিধান আনয়ন করা হবে।

এ থেকে এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলার বিধান কোনো সময়ই রহিত না হওয়া উচিত। কারণ কোনো বিধান জারি করার পর তা রহিত করে দিলে বোঝা যায় যে, বিধানদাতা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না, তাই পরিস্থিতি দেখার পর বিধানটি পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার শান এর অনেক ঊর্ধ্বে। কোনো বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, যে নির্দেশটি রহিত করা হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ বিধান মাত্র এতদিনের জন্য জারি করা হয়েছে। এরপর পরিবর্তন করা হবে। উদাহরণত রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার অথবা হাকীম তখনকার অবস্থার উপযোগী কোনো ওষুধ মনোনীত করেন এবং তিনি জানেন যে, এ ওষুধের এই ক্রিয়া হবে। এরপর এ ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। মোটকথা এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতে 'মিটানো' ও 'বাকি রাখার' অর্থ বিধানাবলিকে রহিত করা ও অব্যাহত রাখা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সুফিয়ান ছাওরী, ওয়াকী' প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিজিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিজিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না।

বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অনেক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোনো কোনো কর্মের দরুন মানুষের বয়স ও রিজিক বৃদ্ধি পায় এবং কোনো কোনো কর্মের দরুন হ্রাস পায়। সহীহ বুখারীতে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, মানুষ মাঝে মাঝে এমন গুনাহ করে, যার কারণে তাকে রিজিক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্যের কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। দোয়া ব্যতীত কোনো বস্তু তাকদীর খণ্ডন করতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কারো ভাগ্যলিপিতে যে বয়স রিজিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন যে, তা কোনো কোনো কর্মের দরুন কম অথবা বেশি হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিজিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোনো কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তিত হয় তা ঐ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোনো সময় কোনো নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকি থাকে না। এ শর্তটি কোনো সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোনো সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' [ঝুলন্ত] বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও 'বাকি রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতে শেষ বাক্য وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' [চূড়ান্ত] ভাগ্য আছে, যা মূল গ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জানার জন্যই। এতে এসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্ম ও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

قَوْلُهٗ وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ : এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবত আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি এসব অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূখণ্ড চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে দিচ্ছি, অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহ তা'আলার হাতেই। তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ : সূরা ইবরাহীম মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ الْاٰيَتَيْنِ اِحْدٰى اَوْ ثِنْتَانِ اَوْ اَرْبَعٌ اَوْ خَمْسٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً

তবে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ এ দু-আয়াত ব্যতীত। আর তা একান্ন বা বায়ান্ন বা চুয়ান্ন বা পঞ্চান্ন আয়াত বিশিষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. الٓرٰ تف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ الْاِيْمَانِ بِاِذْنِ بِاَمْرِ رَبِّهِمْ وَيُبْدَلُ مِنْ اِلَى النُّوْرِ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْغَالِبِ الْحَمِيْدِ الْمَحْمُوْدِ.

১. আলীফ, লাম, রা এটার প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত। এ কুরআন একটি কিতাব হে মুহাম্মদ ﷺ! এটা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে নির্দেশে অন্ধকার হতে অর্থাৎ কুফরি হতে বের করে আলোর দিকে অর্থাৎ ঈমানের দিকে পরাক্রমশালী, প্রশংসাই সত্তার পথের দিকে আনতে পারে। اِلٰى صِرَاطِ এটা اِلَى النُّوْرِ -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত বাক্যাংশ। اَلْعَزِيْزِ অর্থ পরাক্রমশালী। اَلْحَمِيْدِ অর্থ مَحْمُوْد বা প্রশংসিত।

٢. اَللّٰهِ بِالْجَرِّ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ وَمَا بَعْدَهٗ صِفَةٌ وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ.

২. আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সবকিছু তাঁরই। আর কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যই। اَللّٰهُ এটা جَرّ সহ পঠিত হলে [পূর্ববর্তী আয়াতের اَلْعَزِيْزِ -এর] بَدَل অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত পদ বা তার عَطْفُ بَيَانٍ অর্থাৎ বিবরণমূলক অন্বয়। আর পরবর্তী বাক্যটি হবে এটার صِفَتْ বা বিশ্লেষণ। رَفْع সহ পঠিত হলে এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য ও পরবর্তী শব্দ اَلَّذِىْ এটার خَبَرْ বা বিধেয় বলে গণ্য হবে।

٣. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ يَسْتَحِبُّوْنَ يَخْتَارُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَيَبْغُوْنَهَا اَيِ السَّبِيْلَ عِوَجًا مُعْوَجَّةً اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ عَنِ الْحَقِّ.

৩. যারা ইহজীবনকে পরজীবনের পরিবর্তে ভালোবাসে ইহজন্মকেই গ্রহণ করে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ তা'আলার পথ অর্থাৎ দীন ইসলাম হতে এবং তা ঐ পথ বক্র করতে চায় তারাই সত্য হতে বহু দূর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। اَلَّذِيْنَ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কাফেরদের বিবরণ। عِوَجًا অর্থ مُعْوَجَّةً বা বক্রকৃত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ بِلُغَةِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ط لِيُفْهِمَهُمْ مَا اَتٰى بِهٖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِيْ مِلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهٖ .

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি যাতে তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে বিবৃত করতে পারে। অর্থাৎ তাদের নিকট যে ওহি নিয়ে এসেছে তা পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে। অনন্তর তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী তাঁর কাজে প্রজ্ঞাময়। لِسَانٍ অর্থ এ স্থানে ভাষা।

٥. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ التِّسْعِ وَقُلْنَا لَهٗ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ الْاِيْمَانِ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ بِنِعْمَتِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ التَّذْكِيْرِ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ عَلَى الطَّاعَةِ شَكُوْرٍ لِلنِّعَمِ .

৫. মূসাকে আমি আমার নয়টি নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম। এবং তাকে বলেছিলাম তোমার সম্প্রদায়কে অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে অন্ধকার হতে কুফরি হতে আলোর দিকে ঈমানের দিকে বের করে আন এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিনগুলোর অর্থাৎ তাঁর নিয়ামতসমূহের স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই তাতে অর্থাৎ স্মরণ করাবার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে আনুগত্য প্রদর্শনে পরম ধৈর্যশীল ও অনুগ্রহের প্রতি পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

٦. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ الْمَوْلُوْدِيْنَ وَيَسْتَحْيُوْنَ يَسْتَبْقُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ اَنَّ مَوْلُوْدًا يُّوْلَدُ فِيْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ يَكُوْنُ سَبَبَ ذَهَابِ مُلْكِ فِرْعَوْنَ وَفِيْ ذٰلِكُمْ الْاِنْجَاءِ وَالْعَذَابِ بَلَآءٌ اِنْعَامٌ اَوْ اِبْتِلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ .

৬. আর স্মরণ কর মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কর যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল হতে, যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিত। কোনো এক গণক বলেছিল, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক সন্তানের জন্ম হবে। সে ফেরাউনের সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ হবে। সেই কারণে তারা তোমাদের ভূমিষ্ঠ জীবিত পুত্রগণকে জবাই করত ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত ছেড়ে দিত। বাকি রেখে দিত। আর এতে অর্থাৎ ঐ মুক্তিদান বা শাস্তিদান ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা।' এক মহাপুরস্কার বা এক মহাবিপদ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ : এটাকে উহ্য মানার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। كِتَابٌ মুবতাদা আর اَنْزَلْنٰهُ তার খবর নয়। কেননা كِتَابٌ হলো نَكِرَةٌ مُخَصَّصَه যা মুবতাদা হওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَيُبْدَلُ مِنْ اِلَى النُّوْرِ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ : اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ এটা اِلَى النُّوْرِ থেকে اِعَادَه عَامِلٌ -এর সাথে بَدَل হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْجَرِّ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ : অর্থাৎ اَللّٰهِ শব্দটি اَلْعَزِيْزِ থেকে بَدَل অথবা عَطْف بَيَانٌ হয়েছে।

প্রশ্ন. اَللّٰهِ হলো عَلَمٌ আর اَلْعَزِيْزِ হলো সিফত। আর عَلَمٌ টা সিফত হতে بَدَل হওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. اَلْعَزِيْزِ টা صِفَت مُخْتَصَّه হওয়ার কারণে عَلَمٌ -এর স্থানে হয়ে গেছে। কাজেই اَللّٰهِ শব্দটি তার থেকে بَدَل হওয়া বৈধ হয়েছে।

সুপ্রসিদ্ধ নীতিমালা :

صِفَت مَعْرِفَة যদি مَوْصُوْف -এর উপর مُقَدَّمٌ হয়। তবে সিফতের اِعْرَابٌ আমেল অনুপাতে হয়ে থাকে এবং مَوْصُوْف টা بَدَل অথবা عَطْف بَيَانٌ হয়ে থাকে। মূল ইবারত এভাবে- اِلٰى صِرَاطِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الخ اَللّٰهِ শব্দটির তিনটি সিফত রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি مُقَدَّمٌ আর একটি مُؤَخَّرٌ আর اَلْعَزِيْزِ এবং اَلْحَمِيْدِ হলো مُقَدَّمٌ আর اَلَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ الخ হলো مُؤَخَّرٌ - এ নীতিমালার আলোকেই اَللّٰهِ শব্দটি اَلْعَزِيْزِ থেকে بَدَل অথবা عَطْف بَيَانٌ হয়েছে। اَللّٰهِ শব্দের মধ্যে দ্বিতীয় সুরত হলো رَفْع -এর। তাতে اَللّٰهِ শব্দটি মুবতাদা এবং اَلَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ الخ তার খবর হবে।

قَوْلُهُ نَعْتٌ : অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الخ জুমলা لِلْكٰفِرِيْنَ -এর সিফত হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ بِنِعْمَةِ : এখানে بِاَيَّامِ اللّٰهِ বলে এভাবে نِعْمَتْ উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, ظَرْف বলে مَظْرُوْف উদ্দেশ্য নেওয়ার অন্তর্গত। নিয়ামত ও অনুগ্রহ যেহেতু اَيَّام -এর মধ্যে অর্জিত হয় তাই اَيَّام বলে اِنْعَامَات এবং اِحْسَانَات উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ يَسْتَبِقُوْنَ : يَسْتَحْيُوْنَ -এর তাফসীর يَسْتَبِقُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَسْتَحْيُوْنَ -এর مَعْنٰى مَوْضُوْع لَهٗ উদ্দেশ্য নয়; বরং مَعْنٰى لَازِم উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ও তার বিষয়বস্তু : এটা কুরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা 'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদিনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম সূরা ইবরাহীম রাখা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় তৌহিদ, রেসালাত এবং কিয়ামতের আলোচনা ছিল। আর আলোচ্য সূরায়ও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ বিষয়সমূহের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার ঘোষণা ছিল, আর এ সূরার শুরুতে কুরআনে কারীম নাজিল করার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো মানুষের গোমরাহির অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এমনিভাবে বিগত সূরার ন্যায় এ সূরায়ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের চক্রান্তের উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ الٓرٰ : এগুলো খণ্ড অক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত পন্থাই হচ্ছে সবচেয়ে নির্মল ও স্বচ্ছ অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, এ সবের যা অর্থ, তা সত্য। এগুলোর অর্থ কি, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ : ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে هٰذَا -এর خَبَرٌ সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে করার মধ্যে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়– ১. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে نَاسٌ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বুঝানো হয়েছে। ظُلُمٰتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظُلُمٰتٌ বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نُوْر বলে ঈমানের আলো বুঝানো হয়েছে। এজন্যই ظُلُمٰتٌ শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। এমনিভাবে মন্দকর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نُوْر শব্দটি একবচন আনা হয়েছে। কেননা ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رَبّ শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গাম্বরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া– আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবাণি, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন। নতুবা আল্লাহ তা'আলার জিম্মায় না কারো কোনো পাওনা আছে এবং না কারো জোর তাঁর উপর চলে।

হেদায়েত শুধু আল্লাহ তা'আলার কাজ : আলোচ্য আয়াতে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর দিকে আনয়ন করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ হেদায়েত দান করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই কাজ। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ আপনি নিজ ক্ষমতাবলে কোনো প্রিয়জনকে হেদায়েত দিতে পারেন না; বরং আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে بِاِذْنِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত করে এ সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে আয়াতের অর্থ এই হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও সৎকর্মের আলোর মধ্যে আনয়ন করার ক্ষমতা যদিও মূলত আপনার হাতে নেই, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও অনুমতিক্রমে আপনি তা করতে পারেন।

বিধান ও নির্দেশ : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মানবজাতিকে মন্দকর্মের অন্ধকার থেকে বের করা এবং আলোর দিকে আনয়ন করার একমাত্র উপায় এবং মানব ও মানবতাকে ইহকাল ও পরকালে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে কুরআন পাক। মানুষ যতই এর নিকটবর্তী হবে, ততই তারা ইহকালেও সুখ-শান্তি নিরাপত্তা ও মনতুষ্টি লাভ করবে এবং পরকালেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জন করবে। পক্ষান্তরে তারা যতই এ থেকে দূরে সরে পড়বে, ততই উভয় জাহানের দুঃখ-ক্ষতি, আপদ-বিপদ ও অস্থিরতার গহ্বরে পতিত হবে।

আয়াতের ভাষায় একথা ব্যক্ত করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের সাহায্য কিভাবে মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে

আলোর মধ্যে আনয়ন করবেন। কিন্তু এতটুকু অজানা নয় যে, কোনো গ্রন্থের সাহায্যে কোনো জাতিকে সংশোধন করার উপায় হচ্ছে গ্রন্থের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহকে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এর অনুসারী করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কুরআন পাকের তেলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য : কিন্তু কুরআন পাকের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তেলাওয়াত অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে শুধু শব্দাবলি পাঠ করাও মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে মন্দকাজ থেকে বিবৃত থাকতে সাহায্য করে। কমপক্ষে কুফর ও শিরকের মতো মনোমুগ্ধকর জালই হোক, কুরআন তেলাওয়াতকারী অর্থ না বুঝলেও এ জালে আবদ্ধ হতে পারে না। হিন্দুদের শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের সময় এটা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তাদের জালে এমন কিছু সংখ্যক মুসলমানই মাত্র আবদ্ধ হয়েছিল, যারা কুরআন তেলাওয়াত অজ্ঞ ছিল। আজকাল খ্রিস্টান মিশনারীরা প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নানা ধরনের প্রলোভন ও সেবা প্রদানের জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের প্রভাব শুধুমাত্র এমন পরিবারের উপরই পড়ে যারা মূর্খতার কারণে অথবা নবশিক্ষার সুপ্রভাবে কুরআন তেলাওয়াত থেকে গাফেল।

সম্ভবত এ তাত্ত্বিক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কুরআন পাকে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থ শিক্ষাদানের পূর্বে তেলাওয়াতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ১. কুরআন পাকের তেলাওয়াত। বলা বাহুল্য তেলাওয়াত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ বুঝা হয়– তেলাওয়াত করা হয় না। ২. মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে পবিত্র করা। ৩. কুরআন পাকও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহর শিক্ষা দান করা।

মোটকথা কুরআন এমন একটি হেদায়েতনামা, যার অর্থ বুঝে তদনুযায়ী কাজ করার মূল লক্ষ্য ছাড়াও মানব জীবনের সংশোধনে এর ক্রিয়াশীল হওয়াও সুস্পষ্ট। এতদসঙ্গে এর শব্দাবলি তেলাওয়াত করাতেও অজ্ঞাতভাবে মানব মনের সংশোধনে প্রভাব বিস্তার করে।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনার কাজকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও হেদায়েত সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাজ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে এটা অর্জন করা যায় না। কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাও তাই গ্রহণযোগ্য, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهٗ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ اَللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পথ। এ পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহ তা'আলার পথ বলে ঐ পথ বুঝানো হয়েছে, যে পথে চলে মানুষ আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দুটি গুণবাচক নাম عَزِيْز ও حَمِيْد উল্লেখ করা হয়েছে। عَزِيْز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حَمِيْد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দুটি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্যও। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তার গন্তব্যস্থলে পৌছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এ পথ ছাড়তে পারবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলার এ দুটি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে- اَللّٰهُ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোনো অংশীদার নেই।

قَوْلُهٗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ : ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কুরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আজাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা : আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ তা'আলার পথের আলোতে আনার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কুরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আজাবে নিক্ষেপ করে। কুরআন যে আল্লাহ তা'আলা কালাম যারা এ বিষয়টি স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরিউক্ত সাবধান বাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কুরআনকে ত্যাগ করে বসেছে- তেলাওয়াতের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধান বাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ .

এ আয়াতে কুরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। **প্রথম অবস্থা** হলো, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কুরআনের সুস্পষ্ট মোজেজা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালোবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসতে কোনো আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই, তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পথে চলতে বাধা দান করে।

কুরআন বোঝার ব্যাপারে কোনো কোনো ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ : তৃতীয় অবস্থা يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। ১. তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার উজ্জ্বল ও সরল পথে কোনো বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তারা আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাছীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

২. তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার পথে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের কোনো বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কিনা, পাওয়া গেলে সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে, তাফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনো ভ্রান্তিবশত এবং কখনো বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কুরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোনো শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কুরআনি প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা মুমিনের কাজ হলো নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কুরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ : উপরে যেসব কাফেরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এত দূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

বিধান ও মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে যদিও কাফেরদের এ তিনটি অবস্থা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদেরই এ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে যে মুসলমানের মধ্যে এ তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেও এ সাবধান বাণীর যোগ্য। অবস্থানত্রয়ের সারমর্ম এই–

১. দুনিয়ার মহব্বতকে পরকালের উপর প্রবল রাখা এমনকি ধর্মপথে না আসা।

২. অন্যদেরকেও নিজের সাথে শরিক রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলার পথে চলতে না দেওয়া।

৩. কুরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا الخ : এ আয়াতে বলা হয়েছে– আমি হযরত মূসা (আ.)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গুনাহের অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

اٰيٰتٌ আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাজিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মোজেজাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা নয়টি মোজেজা বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার কথা কুরআনের একাধিক জায়গায় উল্লিখিত আছে। এ অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.)-কে সুস্পষ্ট মোজেজা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো দেখার পর কোনো ভদ্র ও সমঝদার ব্যক্তি অস্বীকার ও অবাধ্যতায় কায়েম থাকতে পারে না।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব : এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে نَاسٌ [মানবমণ্ডলী] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে– لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে– وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করান।

আইয়ামুল্লাহ : اَيَّامٌ শব্দটি يَوْمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। اَيَّامُ اللّٰهِ শব্দটি দু-অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন– বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলি অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাবলি। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলটপালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুঁশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহর অপর অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভালো মানুষকে যখন কোনো অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

কুরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোনো কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াত শুনিয়ে অথবা মোজেজা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের দিকে অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু-উপায়ে সৎপথে আনা যায়। ১. শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং ২. নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা। ذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ বাক্যে এ দুটি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি, তাদের আজাব, জিহাদে তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করানো যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহ তা'আলার যেসব নিয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণত তীহ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : এখানে اٰيٰتٌ-এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। صَبَّارٌ শব্দটি صَبْرٌ থেকে مُبَالَغَةٌ-এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবরকারী। شَكُوْرٌ শব্দটি شُكْرٌ থেকে مُبَالَغَةٌ-এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আজাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতেই অতীত ঘটনাবলিতে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান আছে ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারি এবং অধিক শোকরকারী।

উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদি যদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হেদায়েতের জন্য কিন্তু হতভাগ্য কাফেররা চিন্তাই করে না, তারা এগুলো থেকে কোনো উপকারই লাভ করে না। উপকার তারাই লাভ করে, যারা সবর ও শোকর উভয় গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ মু'মিন। কেননা বায়হাকী হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ঈমান দু-ভাবে বিভক্ত। এর অর্ধাংশ সবর এবং অর্ধাংশ শোকর। -[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সবর ঈমানের অর্ধেক। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত সোহায়ব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মুমিনের প্রত্যেক অবস্থাই সর্বোত্তম ও মহত্তম। এ বিষয়টি মুমিন ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। কারণ মু'মিন কোনো সুখ, নিয়ামত অথবা সম্মান পেলে তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। [ইহকালে তো আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী নিয়ামত আরো বেড়ে যায় এবং অব্যাহত থাকে, পরকালে সে এ কৃতজ্ঞতার বিরাট প্রতিদান পায়।] পক্ষান্তরে মু'মিনের কষ্ট অথবা বিপদ হলে সে তজ্জন্য সবর করে। সবরের কারণে তার বিপদও তার জন্য নিয়ামত ও সুখ হয়ে যায়। [ইহকালে এভাবে যে, সবরকারীরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গলাভে সমর্থ হয়। কুরআন বলে- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ। আল্লাহ তা'আলা যার সঙ্গে থাকেন পরিণামে তার মসিবত আরামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরকালে এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবরের বিরাট প্রতিদান অগণিত রয়েছে। কুরআন বলে-

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

মোটকথা, মু'মিনের কোনো অবস্থা মন্দ হয় না, সর্বোত্তম হয়ে থাকে। সে পতিত হয়েও উত্থিত হয় এবং নষ্ট হয়েও গঠিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نہ شوخی چل سکی باد صبا کی

بگڑنے میں بھی زلف اسکی بناکی

ঈমান এমন একটি অনন্য সম্পদ যা বিপদ ও কষ্টকেও নিয়ামত ও সুখে রূপান্তরিত করে দেয়। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে বললেন, আমি আপনার পর এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করব, যদি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের ইচ্ছা মর্জির বিরুদ্ধে কোনো অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তবে তারা একে ছওয়াবের উপায় মনে করে সবর করবে। এ বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধি ও সহ্যগুণের ফলশ্রুতি নয় বরং আমি তাদেরকে স্বীয় জ্ঞান ও সহনশীলতার একটি অংশ দান করব। -[তাফসীরে মাযহারী]

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকে তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহ তা'আলার রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয় আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দেওয়া হয়।

হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হতো না। তাদের ছেলে-সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হতো এবং শুধু কন্যা সন্তানদেরকে খেদমতের জন্য লালন পালন করা হতো। হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিদান করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. وَاِذْ تَاَذَّنَ اَعْلَمَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ نِعْمَتِىْ بِالتَّوْحِيْدِ وَالطَّاعَةِ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ جَحَدْتُّمُ النِّعْمَةَ بِالْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ لَاُعَذِّبَنَّكُمْ دَلَّ عَلَيْهِ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ .

৭. আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা দিলেন, তোমরা তাওহীদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অর্থাৎ কুফরি ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করত তোমরা যদি নিয়ামতের অস্বীকার কর তবে অবশ্যই আমি তোমাদের শাস্তি দান করব। পরবর্তী এ বাক্যটি উক্ত বক্তব্যটির প্রতি ইঙ্গিতবহ। অবশ্যই আমার শাস্তি অতি কঠোর। تَاَذَّنَ অর্থ ঘোষণা করল।

٨. وَقَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ خَلْقِهِ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ فِىْ صُنْعِهِ بِهِمْ .

৮. এবং মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তবুও আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি হতে অনপেক্ষ, প্রশংসিত। তাদের সাথে তাঁর আচরণে তিনি প্রশংসিত।

٩. اَلَمْ يَاْتِكُمْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ وَثَمُوْدَ ط قَوْمِ صَالِحٍ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ط لِكَثْرَتِهِمْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ عَلٰى صِدْقِهِمْ فَرَدُّوْا اَىِ الْاُمَمُ اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ اَىْ اِلَيْهَا لِيَعَضُّوْا عَلَيْهَا مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ وَقَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِ عَلٰى زَعْمِكُمْ وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ مُوْقِعٍ لِلرِّيْبَةِ .

৯. তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি اَلَمْ এ স্থানে تَقْرِيْرٌ অর্থাৎ বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহৃত হয়েছে। তোমাদের পূর্ববর্তী নূহ সম্প্রদায়, আদ হুদ সম্প্রদায় সামূদ সালেহ সম্প্রদায়ের এবং তাদের পরবর্তীদের? সংখ্যাধিক্যের দরুন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাদের বিষয় আর কেউ জানে না। তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ অর্থাৎ তাদের সভ্যতার পরিষ্কার নিদর্শনসহ রাসূলগণ এসেছিল। তারা ঐ সম্প্রদায়সমূহের লোকের ভীষণ ক্রোধে নিজেদের হাত কামড়াবার জন্য মুখে তুলে নিত এবং বলত তোমাদের ধারণা মতো যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং যার প্রতি তোমরা আহ্বান করছ সেই বিষয়ে অবশ্যই আমরা বিভ্রান্তিকর সংশয়ের মধ্যে রয়েছি। مُرِيْبٌ অর্থ সংশয়কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ اِسْتِفْهَامُ
اِنْكَارٍ اَىْ لَاشَكَّ فِيْ تَوْحِيْدِهٖ لِلدَّلَائِلِ
الظَّاهِرَةِ عَلَيْهِ فَاطِرِ خَالِقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط يَدْعُوْكُمْ اِلٰى طَاعَتِهٖ لِيَغْفِرَ
لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ فَاِنَّ الْاِسْلَامَ
يُغْفِرُ بِهٖ مَا قَبْلَهٗ اَوْ تَبْعِيْضِيَّةٌ لِاِخْرَاجِ
حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَيُؤَخِّرَكُمْ بِلَا عَذَابٍ اِلٰى اَجَلٍ
مُسَمًّى ط اَجَلِ الْمَوْتِ قَالُوْۤا اِنْ مَا اَنْتُمْ اِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ
يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا مِنَ الْاَصْنَامِ فَأْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ عَلٰى صِدْقِكُمْ.

১০. তাদের রাসূলগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বিষয়ে সন্দেহ? أَفِي اللّٰهِ এ স্থানে اِنْكَارٌ বা অস্বীকার অর্থে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও একত্বের বিষয়ে কোনো সন্দেহ হতে পারে না। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। فَاطِر অর্থ- সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদেরকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করবার জন্য مِنْ ذُنُوْبِكُمْ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। ইসলাম গ্রহণ পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমার কারণ হয়। কিংবা مِنْ শব্দটি بَعْضِيَّة বা ঐকদেশিক। কেননা 'হককুল ইবাদ' বা বান্দার হক এই ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আজাব না দেওয়া তোমাদের অবকাশ দেওয়ার জন্য। তারা বলত, তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের উপাসনা করত তাদের অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের উপাসনা হতে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের নিকট তোমাদের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ পরিষ্কার ও স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস।

١١. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ مَا نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ كَمَا قُلْتُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى
مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ بِالنُّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مَا
يَنْبَغِىْ لَنَاۤ اَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ط بِاَمْرِهٖ لِاَنَّا عَبِيْدٌ مَرْبُوْبُوْنَ وَعَلَى
اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ يَثِقُوْا بِهٖ.

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত সত্য বটে আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ اِنْ نَحْنُ এ স্থানেও اِنْ শব্দটি না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন তোমরা বল তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবুয়ত দানের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি তাঁর নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয় উচিত নয়। কারণ আমরা তাঁর পালিত দাস। মু'মিনগণের আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করা কর্তব্য। তাঁর উপরই আস্থা করা উচিত।

١٢. وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ اَىْ لَا
مَانِعَ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا عَلٰى اَذَاكُمْ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

১২. আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করব না কেন? এ বিষয়ে তো আমাদের কোনো বাধা নেই। তিনিই তো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তোমরা আমাদরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ তাতে তোমাদের নিপীড়নের মুখে অবশ্যই আমরা ধৈর্যধারণ করব। আর যারা নির্ভর করতে চায় আল্লাহ তা'আলারই উপর তারা নির্ভর করুক।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَعْلَمَ : تَأَذَّنَ -এর তাফসীর اَعْلَمَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, تَأَذَّنَ টা বাবে تَفَعُّلْ থেকে স্ত্রী خَاصِيَتْ -এর হিসেবে تَكَلُّفْ -এর উপর বুঝায়, যা আল্লাহ তা'আলার শানে অনুচিত। কাজেই اِذْنَ টা تَأَذَّنَ অর্থে হবে।

قَوْلُهُ لَاُعَذِّبَنَّهُ : এটা شَرْط -এর جَزَاءْ হয়েছে যা উহ্য রয়েছে اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ নয়। কাজেই اِنَّ عَذَابِىْ -এর شَرْط -এর উপর عَدَمْ تَرَتُّبْ -এর আপত্তির নিরসন হয়ে গেল। আর اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ টা জবাব উহ্য হওয়ার উপর বুঝাচ্ছে।

قَوْلُهُ اَىْ اِلَيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِىْ টা اِلٰى অর্থে হয়েছে। اَيْدِيْهِمْ এবং اَفْوَاهِهِمْ উভয়ের যমীরই كُفَّارْ -এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ কাফেররা স্বীয় হাত গোসসার কঠোরতার কারণে মুখে পুড়ে দেয়। এ তাফসীর عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ -এর অনুযায়ী হয়েছে। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় هُمْ যমীরকে رُسُلْ -এর দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, উম্মতের লোকেরা স্বীয় হাত রাসূলগণের মুখের উপর রেখে দিয়েছে, যেন তারা সত্য কথা বলতে না পারেন। এটা خِلَافْ ظَاهِرْ -

قَوْلُهُ بِزَعْمِكُمْ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর যে, بِمَا اَرْسِلْتُمْ দ্বারা জানা গেল যে, কাফেররা مَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ -এর প্রবক্তা ছিল। অথচ বাস্তবতা এরূপ নয়। জবাবের সারকথা হলো আমরা তোমার রাসূল হওয়া আমাদের নিকট স্বীকৃত নয়। কিন্তু তোমাদের কথা মতে আমরা মেনে নিতেও প্রস্তুত নই।

قَوْلُهُ لَا شَكَّ فِىْ تَوْحِيْدِهٖ : এটা একটি সংশয়ের অপনোদন। সংশয় হলো এই যে, هَمْزَةْ اِنْكَارِىْ -এর দাবি হলো شَكْ - (مَظْرُوفْ) -এর প্রবিষ্ট হবে ظَرْفْ -এর উপর নয়। আর এখানে اَللّٰهُ শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে যা ظَرْفْ হয়েছে। জবাবের সার হলো কথা হচ্ছে شَكْ -এর মধ্যে নয় বরং مَشْكُوكْ -এর মধ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম :

قَوْلُهُ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ : تَاَذَّنَ শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই– এ কথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর অর্থাৎ সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর তবে আমি এসব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীক প্রাপ্ত হয়, যে কোনো সময় নিয়ামতকে বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। –[তাফসীরে মাযহারী]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতার এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরজ ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে পরকালেও আজাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদের জন্য প্রতিদান, ছওয়াব ও নিয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন– لَاَزِيْدَنَّكُمْ কিন্তু এর বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্য তাকিদ সহকারে لَاُعَذِّبَنَّكُمْ [আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেব।] বলেননি, বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আজাবে পতিত হবে এটা জরুরি নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) স্বজাতিকে বললেন, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রাখ! এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তার প্রশংসনীয় তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশত তোমাদেরই উপকার করার জন্য।

قَوْلُهُ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِىْٓ اَفْوَاهِهِمْ : তারা তাদের হাতকে নিজেদের মুখে স্থাপন করে। এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন যে, নবী-রাসূলগণের আহ্বানে তারা রাগান্বিত হয়ে নিজেদের হাত নিজেদের দাঁত দ্বারা কর্তন করতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে এ মর্মটি লক্ষ্য করা যায়– عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার কিতাব শ্রবণ করল তখন আশ্চর্যান্বিত হলো। তাই আশ্চর্য অথবা বিদ্রূপ করে নিজেদের হাত মুখে রেখে দিল। যেমন– কোনো কোনো লোক অট্টহাসি চালিয়ে রাখার জন্যে মুখে হাত রেখে দেয়।

আল্লামা কালবী (র.) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো তারা মুখের উপর নিজের হাত রেখে নবী-রাসূলগণকে ইঙ্গিত করেছে যে, আপনারা রসনা বন্ধ রাখুন, এসব কথা বলবেন না।

মোকাতেল (র.) বলেছেন, তারা নবী-রাসূলগণকে নীরব করার জন্যে নিজেদের হাত তাদের মুখের উপর স্থাপন করে এবং তাদেরকে নীরব করে রাখে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে اَيْدِىْ শব্দটির অর্থ হলো নিয়ামতসমূহ অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের নসিহতসমূহ, শরিয়তের বিধানসমূহ এবং ওহি অর্থাৎ তারা নবী-রাসূলগণের বিধি-নিষেধ এবং তাদের শরিয়তকে তাদের মুখের উপর ফিরিয়ে দিয়েছে তথা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। মুজাহিদ এবং কাতাদা (র.) এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রবাদ বাক্য আছে যে, "আমি তার কথা তার মুখের উপর ফেরত দিয়েছি" অর্থাৎ তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছি। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা নিজেদের ভাষায় আম্বিয়ায়ে কেরামের বিধি-নিষেধকে অস্বীকার করেছে এবং নবী-রাসূলগণের নসিহত সমূহকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ২৮৭-৮৮]

আলোচ্য বাক্য দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলগণের বক্তব্য শ্রবণ করে কাফেররা অত্যন্ত উত্তেজনায় নিজেদের মুখেই নিজের হাত কাটতে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নবীর কথায় উত্তেজিত হয়ে নবী-রাসূলগণের মুখ বন্ধ করার জন্যে মুখের কাছে হাত নিয়ে তারা নীরব থাকতে সংকেত দেয়।

قَوْلُهُ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ : অর্থাৎ আর তারা বলে তোমরা যে বিধান নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।

যাহোক ভাগ্যাহত লোকেরা পয়গাম্বরগণের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তারা সে আহ্বানকে উপেক্ষা করে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে তারা বলে– وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে আহ্বান কর সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ রয়েছে তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলার রাসূলগণ বলেছেন– قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ তা'আলা ব্যাপারে সন্দেহ করছ? অথচ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে কোনো প্রকার সন্দেহ হতেই পারে না। কোনো সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তথা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু তারা স্রষ্টার অস্তিত্বের ও একত্ববাদের জীবন্ত সাক্ষী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আসমান জমিনের তিনিই স্রষ্টা। আকাশ-পাতালের সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং যাবতীয় সুব্যবস্থার তিনিই প্রবর্তক। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদনদী এক কথায় সমগ্র বিশ্ব জগতের তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর অদৃশ্য মহাশক্তিই সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বত্র কার্যকর, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্ব গুণাকর। অতএব তাঁর প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

قَوْلُهُ يَدْعُوْكُمْ : তিনিই আমাদেরকে প্রেরণ করে তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যেন তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তিনি পরম করুণাময়, তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়। তোমরা তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস কর, তার প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তিনি এজন্যে তোমাদেরকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন। ইতঃপূর্বে যা কিছু হয়েছে, যা কিছু তোমরা করেছ, এখনো যদি সেসব অন্যায়-অনাচার পরিত্যাগ করে তার দরবারে হাজির হও।

قَوْلُهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ : তিনি তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেবেন তথা তিনি তোমাদেরকে মাগফেরাতের দিকে ডাকেন। অথবা এর অর্থ হলো, তিনি তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করার জন্যে ডাকেন।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– ইসলাম সে সমস্ত গুনাহকে দূরীভূত করে যা মুসলমান হওয়ার পূর্বে কারো দ্বারা হয়ে থাকে। –[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهُ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের গুনাহসমূহ থেকে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো ইসলাম গ্রহণের কারণে সে গুনাহ মাফ হয়ে যায় যা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্কীয় তথা হক্কুল্লাহ। কিন্তু হক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক মাফ হয় না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন, কাফেরদেরকে মাগফেরাতের যে কথা বলা হয়েছে তা হলো ঈমানের শর্ত সাপেক্ষ তথা যদি ঈমান আনয়ন কর তবে পূর্বকৃত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى : আর তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিয়ে থাকেন। ঐ সময় আসা পর্যন্ত তোমাদের প্রতি আজাবকে ত্বরান্বিত করেন না।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, অতীত যুগে যেসব জাতিকে তাদের কুফরি ও নাফরমানির কারণে ধ্বংস করা হয়েছে তা তাদের কুফরি ও নাফরমানির কারণেই করা হয়েছে। যদি তারা ঈমান আনত তবে তাদের বয়স সুদীর্ঘ হতো এবং বয়স শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করা হতো না।

قَوْلُهُ قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا : অর্থাৎ কাফেররা নবী-রাসূলগণকে বলেছিল তোমরা আমাদের ন্যায় মানুষই, তোমরা আসমানের ফেরেশতা নও, মানব জাতির ঊর্ধ্বে কিছু নও, বরং তোমরা আমাদের ন্যায় রক্তমাংসের মানুষই, সৃষ্টিগত দিক থেকে, আকৃতিতে তোমরা আমাদেরই ন্যায়। এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করি? তোমাদের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো নবী-রাসূল প্রেরণ করার সিদ্ধান্তই করে থাকেন তবে এমন কাউকে প্রেরণ করতেন যে মানুষের চেয়ে উত্তম হতো।

قَوْلُهُ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا : মূলত তোমাদের উদ্দেশ্য হলো তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতামহের সনাতন ধর্ম থেকে বিরত রাখতে চাও। আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের পূজা করেছে তোমরা আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে চাও। তোমরা তোমাদের দল বড় করতে চাও। যদি তবুও তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী বলে দাবি কর তবে– فَأْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ এমন কোনো প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণ ও প্রামাণ্য সনদ পেশ কর, যার দ্বারা তোমাদের নবুয়তের দাবি সত্য প্রমাণিত হয়। যাতে আমরা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রাসূল বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হই। কাফেররা নবীগণের সুস্পষ্ট মোজেজাকে অস্বীকার করে শুধু কলহ-দ্বন্দ্ব এবং জেদের বশবর্তী হয়ে ফরমায়েশী মোজেজা দাবি করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ لَتَصِيْرُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط دِيْنِنَا فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

১৩. সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করব। অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শী হতে হবে। অতঃপর তাদেরকে [রাসূলগণকে] তাদের প্রতিপালক ওহি নাজিল করলেন। সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করব।

١٤. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ اَرْضَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ط بَعْدَ هَلَاكِهِمْ ذٰلِكَ النَّصْرُ وَاِيْرَاثُ الْاَرْضِ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ اَيْ مَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيَّ وَخَافَ وَعِيْدِ بِالْعَذَابِ.

১৪. তাদের পর তাদের ধ্বংসের পর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই; তা অর্থাৎ সাহায্য ও পৃথিবীর উত্তরাধিকাররূপে নির্বাচিত করা তোমাদের জন্য যারা আমার অবস্থানকে অর্থাৎ আমার সম্মুখে তার অবস্থানকে ভয় করে এবং শাস্তি সম্পর্কিত আমার হুমকিরও ভয় রাখে।

١٥. وَاسْتَفْتَحُوْا اِسْتَنْصَرَ الرُّسُلُ بِاللّٰهِ عَلٰى قَوْمِهِمْ وَخَابَ خَسِرَ كُلُّ جَبَّارٍ مُتَكَبِّرٍ عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَنِيْدٍ مُعَانِدٍ لِلْحَقِّ.

১৫. তারা বিজয় কামনা করল অর্থাৎ রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করলেন। প্রত্যেক উদ্ধত আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ব্যাপার অহংকারী বিরুদ্ধচারী সত্যের মোকাবিলাকারী ব্যর্থ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

١٦. مِنْ وَّرَائِهِ اَيْ اَمَامِهِ جَهَنَّمُ يَدْخُلُهَا وَيُسْقٰى فِيْهَا مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ هُوَ مَاءٌ يَسِيْلُ مِنْ جَوْفِ اَهْلِ النَّارِ مُخْتَلِطًا بِالْقَيْحِ وَالدَّمِ.

১৬. প্রত্যেকের সামনে রয়েছে وَّرَائِهِ এ স্থানে অর্থ তার সামনে। জাহান্নাম তাতে সে প্রবেশ করবে। এবং তাতে তাকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে। مَاءٌ صَدِيْدٌ জাহান্নামির উপর হতে নির্গত পুঁজ ও রক্ত মিশ্রিত পানি।

١٧. يَتَجَرَّعُهُ يَبْتَلِعُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لِمَرَارَتِهِ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ يَزْدَرِدُهُ لِقُبْحِهِ وَكَرَاهَتِهِ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ اَيْ اَسْبَابُهُ الْمُقْتَضِيَةُ لَهُ مِنْ اَنْوَاعِ الْعَذَابِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَائِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ الْعَذَابِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ قَوِيٌّ مُتَّصِلٌ.

১৭. এত তিক্ত হবে যে, এটা সে এক ঢোক এক ঢোক করে গিলবে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট হওয়ায় তা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্বদিক হতে তার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হবে অর্থাৎ নানা ধরনের শাস্তির দরুন মৃত্যুর সকল উপকরণ তার সমক্ষে হবে অথচ তারা মৃত্যু ঘটবে না। তার পিছনেও এ শাস্তির পরও রয়েছে কঠোর শাস্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠিন শাস্তি। يَتَجَرَّعُ অর্থ ঢোকে ঢোকে গলাধঃকরণ করবে। يُسِيْغُ অর্থ গিলবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٨. مَثَلُ صِفَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ مُبْتَدَأٌ وَيُبْدَلُ مِنْهُ أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ كَصِلَةٍ وَصَدَقَةٍ فِيْ عَدَمِ الْاِنْتِفَاعِ بِهَا كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ط شَدِيْدِ هُبُوْبِ الرِّيْحِ فَجَعَلَتْهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُوْرُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ لَا يَقْدِرُوْنَ أَيِ الْكُفَّارُ مِمَّا كَسَبُوْا عَمِلُوْا فِي الدُّنْيَا عَلٰى شَيْءٍ ط أَيْ لَا يَجِدُوْنَ لَهُ ثَوَابًا لِعَدَمِ شَرْطِهِ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْهَلَاكُ الْبَعِيْدُ.

১৮. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদেরকে উপমা বিবরণ হলো যে, তাদের সৎ কর্মসমূহ যেমন- আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার, দান-সদকা ইত্যাদি কর্মসমূহ কোনো উপকারে না আসার ক্ষেত্রে ভস্মের মতো, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ডবেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড়ে প্রক্ষিপ্ত বালুকণার ন্যায় হয়ে যায়। তা আর ধরতে পারে না কেউ। যা তারা অর্থাৎ কাফেররা অর্জন করে অর্থাৎ দুনিয়ায় যে আমল করে তারা কিছুই তাদের অধিকারে আসে না। অর্থাৎ আমল কবুল হওয়ার শর্ত ঈমান না থাকায় কোনো পুণ্যের ফল তারা পায় না। এটাই ভীষণ বিভ্রান্তি। বিরাট ধ্বংস। مَثَلُ এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। أَعْمَالُهُمْ এটা خَبَرُ -এর বা بَدَلُ বা স্থলাভিষিক্ত পদ। كَرَمَادٍ এটা مَثَلُ বা বিধেয়। يَوْمٍ عَاصِفٍ প্রচণ্ড গতির বাতাসের দিন।

١٩. أَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ يَا مُخَاطَبُ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ بَدَلَكُمْ.

১৯. হে উপস্থিত সম্বোধিতজন! তুমি কি দেখ না লক্ষ্য করা না এ স্থানে أَلَمْ تَرَ تَقْرِيْرٌ অর্থাৎ বক্তব্যটিকে সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক ব্যবহার করা হয়েছে। যে, আল্লাহ যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? بِالْحَقِّ এটা خَلَقَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন।

٢٠. وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ شَدِيْدٍ.

২০. আর এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য কঠিন নয়। عَزِيْزٌ এ স্থানে অর্থ কঠিন।

٢١. وَبَرَزُوْا أَيِ الْخَلَائِقُ وَالتَّعْبِيْرُ فِيْهِ وَفِيْمَا بَعْدَهُ بِالْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهِ لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰؤُا الْأَتْبَاعُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا الْمَتْبُوْعِيْنَ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا جَمْعُ تَابِعٍ.

২১. তারা সকলে অর্থাৎ সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার নিকট উপস্থিত হবেই। بَرَزُوْا এ স্থানে ও পরবর্তী কতিপয় স্থানে বিষয়টির অবশ্যম্ভাব্যতা বুঝাতে مَاضِيْ বা অতীত কালবাচক ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করা হয়েছে। তখন যারা অহংকার করত তাদেরকে অর্থাৎ অনুসৃত নেতাদেরকে দুর্বলরা অনুসারীরা বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। تَبَعًا এটা تَابِعٌ -এর বহুবচন। অর্থ- অনুসারীবৃন্দ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ دَافِعُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ط مِنَّ الْاُوْلٰى لِلتَّبْيِيْنِ وَالثَّانِيَةُ لِلتَّبْعِيْضِ قَالُوْا اَىِ الْمَتْبُوْعُوْنَ لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ط لَدَعَوْنَاكُمْ اِلَى الْهُدٰى سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ زَائِدَةٌ مَّحِيْصٍ مَلْجَأٍ.

তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে কিছুমাত্র উপকার করতে পারবে? আমাদের হতে তা প্রতিহত করতে পারবে? مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ এ مِنْ টি এ স্থানে بَيَانِيَةٌ বা বিবরণমূলক। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ مِنْ شَيْءٍ এ مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। তারা অর্থাৎ অনুসৃত নেতারা বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম হেদায়েতের দিকে আহ্বান করতাম। এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া বা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোনো নিষ্পত্তি নেই। আশ্রয়স্থল নেই। مِنْ مَّحِيْصٍ এ স্থানে مِنْ টি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَتَصِيْرُنَّ : মুফাসসির (র.) لَتَعُوْدُنَّ -এর তাফসীর لَتَصِيْرُنَّ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো এই যে, عَوْدٌ তথা প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রথমে সেই অবস্থার উপর হওয়া জরুরি যার থেকে সে প্রত্যাবর্তন করবে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নবীগণ প্রথমে স্বীয় উম্মতের দীনের উপর হয়ে থাকেন পরবর্তীতে তা থেকে ফিরে এসে সত্য দীনের উপর অবিচল থাকেন। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। নবীগণ প্রথম থেকেই সত্য দীনের উপর থাকেন।

উত্তর. উত্তরের সারমর্ম হলো এই যে, تَعُوْدُنَّ টা تَصِيْرُنَّ অর্থে হবে অর্থাৎ তোমরা আমাদের দীনের উপর হয়ে যাও।

قَوْلُهُ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ : এতে মুযাফ উহ্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَدْخُلُهَا : يَدْخُلُهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, উহ্যের উপর يُسْقٰى -এর আতফ হয়েছে। যাতে করে عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْاِسْمِ তথা اِسْم -এর উপর فِعْل -এর আতফ করা আবশ্যক না হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فِيْهَا : প্রশ্ন. فِيْهَا উহ্য মানার ফায়দা কি?

উত্তর. مَعْطُوْف যখন জুমলা হয়ে তখন তাতে একটি عَائِدٌ হওয়া আবশ্যক হয় যা مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর দিকে ফিরে।

قَوْلُهُ يَتَجَرَّعُهُ : অর্থাৎ يَتَكَلَّفُ

قَوْلُهُ يَزْدَرِدُهُ : اَلْاِزْدِرَادُ অর্থ হলো স্বাচ্ছন্দ্য ও সহজতার সাথে কোনো বস্তু কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাওয়া।

قَوْلُهُ اَسْبَابُهُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْمَوْتِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাহান্নামের মৃত্যু হবে না। কেননা মৃত্যুর জন্য তো একটি কারণই যথেষ্ট হয়। এত গুলো কারণ বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন কি? এরপরও মৃত্যু আসবে না। এটা মৃত্যু না আসার দলিল।

قَوْلُهُ يُبْدَلُ مِنْهُ : এটা হলো সেই প্রশ্নের উত্তর যে, মুবতাদা ও খবরের মধ্যে (اَعْمَالُهُمْ) দ্বারা فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ আবশ্যক হচ্ছে, যা বৈধ নয়।

উত্তর. এটা فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ নয়; বরং সেটা مُبْتَدَأٌ হতে بَدَلٌ হয়েছে। আর بَدَلٌ টা مُبْدَلٌ مِنْهُ থেকে اَجْنَبِيٌّ হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ : عَاصِفٌ -এর يَوْمٌ -এর দিকে إِسْنَادٌ হওয়াটা مَجَازٌ রূপে হয়েছে। আর نَهَارُهُ টা يَوْمٌ عَاصِفٌ এবং لَيْلُهُ قَائِمٌ صَائِمٌ -এর অন্তর্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْأَوْلَى لِلتَّبْيِيْنِ : অর্থাৎ مِنْ টা তার পরবর্তীতে আগত شَيْءٌ শব্দের বর্ণনার জন্য হয়েছে। বয়ান যা আল্লাহ তা'আলা শাস্তি مُبِيْن অর্থাৎ شَيْءٌ -এর উপর مُقَدَّمٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ–

هَلْ أَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا بَعْضَ الشَّيْءِ هُوَ بَعْضُ عَذَابِ اللّٰهِ .

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا অর্থাৎ কাফেররা তাদের রাসূলগণকে বলে, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেব। অথবা তোমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের ধর্মে অবিচল থাক তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমরা তোমাদের সকলকে দেশান্তরিত করে ছাড়ব।

যখন কোনো সম্প্রদায় কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় এবং বিরোধীদের কাছে শক্তি-সামর্থ্য থাকে, এমন অবস্থায় দুশমনের হুমকি ধমকিতে প্রভাবান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে পরবর্তী বাক্যে নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা যে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণের নিকট ওহী প্রেরণ করে জানিয়ে দিলেন।

قَوْلُهُ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ : অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি জালেমদেরকে ধ্বংস করে দেব, এটি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নবী-রাসূলগণকে সান্ত্বনা যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক তারা কোনো দিনও তোমাদেরকেও বহিষ্কার করতে পারবে না, বরং তারাই দুনিয়া থেকে বহিষ্কৃত হবে।

قَوْلُهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ : অর্থাৎ আর কাফেরদেরকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ তা'আলার দুনিয়া শূন্য থাকবে না; বরং তোমাদেরকে তথা মু'মিনদেরকে আবাদ করা হবে। মূলত যারা শুধু আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে হবে একথা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফেরদের ধ্বংস করা পর তোমাদেরকে সেখানে আবাদ করবেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ : অর্থাৎ আর আমার এ রহমত ও দান সে ব্যক্তির জন্যে যে আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজিরীকে ভয় করে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারকে যারা ভয় করে অথবা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে উচ্চারিত সতর্কবাণীকে ভয় করে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যখন কাফেরদের কোনো দলিল অবশিষ্ট রইল না তখন তারা নবীগণকে দেশ হতে বহিষ্কার করার ধমক দিতে লাগল। যেমন হযরত শুআইব (আ.)-এর জাতি বলেছিল যে, শহর থেকে তোমাদেরকে বের করে দেব। আর মক্কার পৌত্তলিকরাও প্রিয়নবী ﷺ -এর ব্যাপারে এ কুপরিকল্পনাই গ্রহণ করেছিল। তারা বলেছিল, তাকে বন্দী কর অথবা হত্যা কর অথবা দেশত্যাগে বাধ্য কর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নিরাপদে রেখেছেন আর দুশমনদের সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, নবী-রাসূলগণের সম্মুখেই আল্লাহ তা'আলা তাদের দুশমনদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং মহা সাফল্য মু'মিনদেরকেই দান করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ : অর্থাৎ যারা তাদের প্রতিপালকের নাফরমান হয় তাদের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যেমন ভস্ম। ঝড়ের দিনে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবে আখেরাতের বাতাসেও তাদের আমলের ছাই-ভস্ম উড়ে যাবে। তাই আদের কোনো সৎকাজ আর থাকবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, তারা যেমন গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করেছে, গোলামের মুক্তিপণ আদায় করেছে কিন্তু এসব সৎকাজের উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছিল না, তাই এর যে শুভ পরিণতি বা ছওয়াব তা তারা পাবে না। অথবা যেহেতু তারা তাদের দেবদেবীর নামে সৎকাজ করত আর তাদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিগুলো নিজেই অসহায় নিরুপায়, তারা পূজারীদেরকে কিছুই দিতে পারে না, তাই তাদের সৎকাজগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ছাই-ভস্মের সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতএব, কাফেরদের সৎকাজের কোনো মূল্যই পরকালে তারা পাবে না। কেননা ঈমান ব্যতীত নেক আমল প্রাণহীন। তাই কোনো অবস্থাতেই তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কিয়ামতের দিন হবে নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব, এমনকি সর্বস্বান্ত। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে ইরশাদ হয়েছে– لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা যা কিছুই করেছে কিয়ামতের দিন তার বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না তথা কোনো আমলেরই শুভ পরিণতি তারা পাবে না, কোনো নেক আমলের চিহ্নও তারা সেদিন দেখতে পাবে না।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : কোনো কাজকে সৎকাজ মনে করে করা এবং পরে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মূলত তা হলো– هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ অর্থাৎ সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়া।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ : অর্থাৎ হে রাসূল ! আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন ইচ্ছা আসমান-জমিন তৈরি করেছেন।

মূলত কাফেরদের ধারণা ছিল আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব। আবার জীবন কোথায়? আজাব ছওয়াব সবই কথার কথা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তার জবাব দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজের ইচ্ছায়, নিজের শক্তিতে, নিজের পছন্দমতো আসমান-জমিনের ন্যায় বিশাল বিস্তৃত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা মানুষকেও তিনিই হাজির করা এবং তার ভালোমন্দ দিয়ে বিচার করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে আদৌ কঠিন নয়, এমনকি এর পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে নতুন জাতি সৃষ্টি করতে পারেন যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন তোমাদেরকে বিদায় করে নতুন মাখলুক আনতে পারেন তেমনি তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের ময়দানে হাজির করতে পারেন।

قَوْلُهُ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ : আর এ কাজ আল্লাহ তা'আলার জন্যে আদৌ কঠিন নয়। তিনি সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

অতএব, শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করা উচিত এবং তার প্রতিই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তার নিকটই ছওয়াবের আশা করা এবং তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করা উচিত।

قَوْلُهُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গাম্বরগণকে অস্বীকার করার শাস্তির উল্লেখ ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার ভয়াবহ আজাব দেখার পর কাফেরদের পরস্পরের মাঝে যে কথাবার্তা হবে তার উল্লেখ রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কিয়ামতের দিন কাফেরদের আস্ফালন : কিয়ামতের দিন কাফেররা তাদের প্রধান নেতাদেরকে বলবে, পৃথিবীতে তোমরাই নেতৃত্ব দিয়েছ। আমরা তোমাদের নিকট হাজির হয়েছি, তোমরা যেভাবে বলেছ আমরা সেভাবেই কাজ করেছি, তাই আজকের এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে তোমরা আমাদেরকে কি কোনো সাহায্য করতে পারবে না? তখন কাফেরদের নেতারা বলবে, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত করতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আজাবের যোগ্য বিবেচিত হয়েছি। এখন ধৈর্যহারা হলে কোনো লাভ হবে না। সবর অবলম্বন করলেও আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অতএব, আজ ধৈর্যহারা হওয়া বা ধৈর্যধারণ করা একই কথা।

এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ বর্ণনা করেন, দোজখিরা সেদিন বলবে, দেখ মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দুনিয়াতে কান্নাকাটি করত। এজন্যে তারা জান্নাতবাসী হয়েছে। চল আমরাও আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করি। তখন তারা চিৎকার করে আহাজারী করবে। কিন্তু তাদের আহাজারী কোনো কাজে আসবে না। তখন তারা বলবে জান্নাতবাসীদের জান্নাতে গমনের একটি কারণ হলো সবর অবলম্বন। তাই আমরাও সবর অবলম্বন করি এবং নীরবতা পালন করি। তখন তারা এমন সবর অবলম্বন করবে যা কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু এ সবরও তাদের জন্যে উপকারী হবে না। তখন আক্ষেপ করে তারা বলবে, হায়! সবরও কোনো কাজে আসল না। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) একথাও বলেছেন, নেতা এবং অনুসারীদের এসব কথা জাহান্নামে প্রবেশের পরে হবে।

যেমন অন্য আয়াতেও ইরশাদ হয়েছে- وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ অর্থাৎ যখন জাহান্নামে তারা পরস্পর কলহ করবে। তখন দুর্বল লোকেরা অহংকারী নেতাদেরকে বলবে, আমরা তো ছিলাম তোমাদের তাঁবেদার। যা কিছু করেছি সবই তোমাদের নির্দেশেই করেছি। এখনকি তোমরা দোজখের অগ্নি থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? তখন অহংকারী লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই এখন দোজখে আছি, বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এরপর তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে একথা বলে ফরিয়াদ করবে, হে পরওয়ারদেগার! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব তাদেরকে দিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

তখন জবাব দেওয়া হবে, প্রত্যেককেই দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তোমরা তা জান না।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা, ১৩, পৃ. ৬৬]

قَوْلُهُ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ : অর্থাৎ অহংকারী লোকেরা তাদের অনুসারীদেরকে একথা বলে জবাব দেবে, যদি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আমাদের ঈমান নসিব হতো তবে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়েতের পথে আহ্বান করতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম, তাই তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছি। নিজের জন্যে যা আমাদের পছন্দনীয় ছিল, তোমাদের জন্যেও আমরা তাই পছন্দ করেছি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে আমরা তোমাদেরকে দোজখের পাড়ে নিয়ে এসেছি, এখন যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আত্মরক্ষার কোনো পথ বাতলিয়ে দিতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সে পথের সন্ধান দিতাম, কিন্তু নাজাতের পথ আমাদের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ২৯৫]

قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ : যখন আমাদের ব্যাপারে আজাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় আমরা অস্থির, ব্যাকুল এবং ধৈর্যহারা হই, অথবা সবর অবলম্বন করি উভয় অবস্থাই সমান, কোনো পন্থাই এখন আর উপকারী হবে না। পলায়নের বা আত্মরক্ষার কোনো পথই নেই।

এ বাক্যটি কাফের সর্দারদের, অথবা উভয়ের।

মোকাতেল (র.) বলেছেন, কাফেররা দোজখে ৫০০ বছর ধরে নাজাতের জন্যে ফরিয়াদ করবে, কিন্তু কোনো কিছুই উপকারী হবে না। এরপর তারা ৫০০ বছর সবর করবে, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হবে না। তখন তারা আলোচ্য বাক্যটি উচ্চারণ করবে- سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا অর্থাৎ আমরা অস্থির হই অথবা সবর করি, আমাদের নাজাতের কোনো পথ নেই।

ইবনে আবি হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে মারদওয়াইহ হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দোজখিরা বলবে- আস, আমরা সবর করি। [হয়তো আল্লাহ তা'আলা রহম করবেন] তাই তারা ৫০০ বছর ধরে সবর করবে। যখন এ পন্থায় কোনো ফল দেখবে না তখন তারা আলোচ্য বাক্যটি উচ্চারণ করবে।

মুহাম্মদ ইবনে কাব কারজী বর্ণনা করেন, আমার নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, দোজখিরা দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের বলবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ আপন প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য ফরিয়াদ কর যেন অন্তত একটি দিন আমাদের শাস্তি লাঘব করেন। ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে আগমন করেননি? তখন দোজখিরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন।

তখন ফেরেশতাগণ বলবেন- اُدْعُوْا وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ কর। আর কাফেরদের ফরিয়াদ ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না।

যখন তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে- يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

অর্থাৎ হে মালেক! [দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতার নাম] তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে দেন, যেন আমরা এ আজাব থেকে পরিত্রাণ পাই। মালেক আশি বছর পর্যন্ত তাদের কোনো জবাব দেবে না। আশি বছরের প্রত্যেক বছরেই ৩৬০ দিনের হবে। আর প্রত্যেক দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান হবে। এমনি আশি বছর পর তাদেরকে জবাব দেওয়া হবে, "তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে।"

তখন তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে, তারা একে অন্যকে বলবে, তোমাদের উপর যে বিপদ আসন্ন ছিল তা এসে গেছে, এখন হাহাকার আর্তনাদ করা নিরর্থক আমাদের ধৈর্যধারণ করা উচিত। হয়তো এর দ্বারা কোনো উপকার হতেও পারে। যেভাবে দুনিয়াকে আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে যারা সবর করেছিল এবং সকল দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিল, আজ তারা তার শুভ পরিণতি লাভ করছে।

যাহোক এভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সবরের পথ অবলম্বন করবে, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হবে না। এরপর হাহাকার আর্তনাদ করতে থাকবে, কিন্তু তাতেও কোনো উপকার হবে না। তখন তারা আলোচ্য বাক্য উচ্চারণ করবে- سَوَآءٌ عَلَيْنَا অর্থাৎ আমরা অধৈর্য হই অথবা সবর অবলম্বন করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্যে সমান। আমাদের আত্মরক্ষার কোনো পথ নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

২২. وَقَالَ الشَّيْطٰنُ اِبْلِيْسُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ وَاُدْخِلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ اَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَاجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ فَصَدَقَكُمْ وَوَعَدْتُّكُمْ اَنَّهٗ غَيْرُ كَائِنٍ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ زَائِدَةٌ سُلْطٰنٍ قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ اَقْهَرُكُمْ عَلٰى مُتَابَعَتِيْ اِلَّا لٰكِنْ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط عَلٰى اِجَابَتِيْ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ بِمُغِيْثِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ بِاِشْرَاكِكُمْ اِيَّايَ مَعَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ ط فِي الدُّنْيَا قَالَ تَعَالٰى اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ.

২২. যখন সবকিছু মীমাংসা হয়ে যাবে জান্নাতির জান্নাতে ও জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামিরা শয়তানের নিকট একত্র হবে তখন শয়তান অর্থাৎ ইবলীস বলবে, আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদেরকে পুনরুত্থান ও প্রতিফল দান সম্পর্কে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সত্য রূপায়িত করেছেন আর আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা হবে না কিন্তু তা রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না। مِنْ سُلْطٰنٍ এ مِنْ টি এ স্থানে زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত। তোমাদেরকে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য করার মতো শক্তি ও ক্ষমতা ছিল না। আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম। اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ এ স্থানে اِلَّا শব্দটি لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা আমার প্রতি দোষারূপ করো না। আমার ডাকে সাড়া প্রদানের জন্য তোমরা নিজেদেরকেই দোষারূপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই مُصْرِخٌ অর্থ- উদ্ধারকারী। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। مُصْرِخِيَّ -এর শেষে ى অক্ষরটি ফাতহা ও কাসরা উভয়রূপেই পাঠ করা যায়। তোমরা পূর্বে অর্থাৎ দুনিয়ায় আমাকে যে শরিক করেছিলে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে যে তোমরা আমাকেও অংশী বানিয়েছিলে তা আমি অস্বীকার করি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য অর্থাৎ কাফেরগণের জন্য অবশ্যই মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি রয়েছে।

২৩. وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ط تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَفِيْمَا بَيْنَهُمْ سَلٰمٌ.

২৩. যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও পরস্পরের মধ্যে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। خَالِدِيْنَ এটা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ তাদের এ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٤. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً اَىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ هِىَ النَّخْلَةُ اَصْلُهَا ثَابِتٌ فِى الْاَرْضِ وَفَرْعُهَا غُصْنُهَا فِى السَّمَاءِ ـ

২৪. তুমি কি দেখ না লক্ষ্য কর না আল্লাহ তা'আলা কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের كَلِمَةً এটা مَثَلًا-এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। অর্থাৎ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ অর্থাৎ তা খর্জুর বৃক্ষের মতো তার মূল ভূমিতে সুদৃঢ় ও তার শাখা-প্রশাখা ডালপালা আকাশে বিস্তৃত।

٢٥. تُؤْتِىْ تُعْطِىْ اُكُلَهَا ثَمَرَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط بِاِرَادَتِهٖ كَذٰلِكَ كَلِمَةُ الْاِيْمَانِ ثَابِتَةٌ فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ وَعَمَلِهٖ يَصْعَدُ اِلَى السَّمَاءِ وَيَنَالُهٗ بَرَكَتَهٗ وَثَوَابَهٗ كُلَّ وَقْتٍ وَيَضْرِبُ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

২৫. প্রতি মৌসুমে তা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে তাঁর অভিপ্রায়ে ফল দান করে। تُؤْتِىْ অর্থ প্রদান করে। اُكُلَ ফল। কালিমায়ে তাওহীদও তদ্রূপ। মু'মিনদের হৃদয়ে এটার মূল সুপ্রোথিত আর তাদের সৎকর্মসমূহ আকাশে উত্থিত হয়। প্রতি মুহূর্তে এটার বরকত ও ছওয়াব মুমিন পায়। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে উপদেশ লাভ করে। অনন্তর ঈমান আনয়ন করে। يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ আল্লাহ তা'আলা উপমা দেন।

٢٦. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ هِىَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ ن هِىَ الْحَنْظَلُ اجْتُثَّتْ اُسْتُوْصِلَتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ مُسْتَقَرٍّ وَثَبَاتٍ كَذٰلِكَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ لَا ثُبَاتَ لَهَا وَلَا فَرْعَ وَلَا بَرَكَةَ ـ

২৬. মন্দ বাক্যের অর্থাৎ কুফরি কথার তুলনা এক নিকৃষ্ট বৃক্ষ অর্থাৎ হানযালা বা মাকাল গাছের মতো ভূমির উপরে যার মূল। এটার কোনো স্থায়িত্ব নেই এটা সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কুফরি কালিমাও তদ্রূপ। এটার কোনো দৃঢ়তা নেই, কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। কোনো বরকত বা কল্যাণও নেই। اُجْتُثَّتْ মূল ধারণ করে।

٢٧. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ هُوَ كَلِمَةُ التَّوْحِيْدِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج اَىْ فِى الْقَبْرِ لَمَّا يَسْاَلُهُمُ الْمَلَكَانِ عَنْ رَبِّهِمْ وَدِيْنِهِمْ وَنَبِيِّهِمْ فَيُجِيْبُوْنَ بِالصَّوَابِ ـ

২৭. যারা মুমিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত কথায় অর্থাৎ কালিমা তাওহীদে অবিচলিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালের জীবনেও। অর্থাৎ কবরেও। যখন দুই ফেরেশতা এসে প্রতিপালক, ধর্ম ও নবী সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে তখন তারা সঠিক জবাব প্রদান করতে পারবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كَمَا فِي حَدِيْثِ الشَّيْخَيْنِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ الْكُفَّارَ فَلَا يَهْتَدُوْنَ لِلْجَوَابِ بِالصَّوَابِ بَلْ يَقُوْلُوْنَ لَا نَدْرِيْ كَمَا فِي الْحَدِيْثِ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.

শায়খান অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। আর যারা সীমালজ্ঘনকারী তাদেরকে অর্থাৎ কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভ্রান্তিতে রাখবেন। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, তারা সঠিক জবাবে প্রদান করতে পারবে না বরং বলবে আমরা কিছুই জানি না। আর আল্লাহ তা'আলা তা করেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَعْدَ الْحَقِّ : অর্থাৎ وَعْدًا مَنْ حَقُّهُ اَنْ يُنْجَزَ অর্থাৎ এরূপ অঙ্গীকার যে, যার হক এই যে, তাকে পুরা করা হবে। এবং اِضَافَةُ مَوْصُوْفٍ اِلَى الصِّفَةِ ও বলা যেতে পারে– اِلَى الْوَعْدِ الْحَقِّ

قَوْلُهُ لٰكِنْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ হলো مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ কেননা دُعَاء টা سُلْطَانٍ -এর جِنْس -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ بِالْفَتْحِ : অর্থাৎ مُصْرِخِيَّ -এর মধ্যে يَاء তে যবর ও যের উভয় কেরাতই রয়েছে। যবর হলো تَخْفِيْف -এর জন্য, আর যের হলো আসলের অনুপাতে। مُصْرِخٌ হলো বাবে اِفْعَالٌ -এর اِصْرَاخٌ মাসদার হতে اِسْم فَاعِل -এর وَاحِدْ مُذَكَّر -এর সীগাহ অর্থ হলো– সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী, ফরিয়াদে সারা দানকারী। اِصْرَاخٌ -এর অর্থের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। তথা সাহায্যকারী ও সাহায্যপ্রার্থী উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ : অর্থাৎ مُقَدَّرِيْنَ خُلُوْدُهُمْ এখানে خَالِدِيْنَ টা جَنّٰت থেকে حَالٌ হয়েছে। জান্নাতের অস্তিত্ব হলো مُقَدَّمْ আর জান্নাতে প্রবেশ করা পরে হবে। বুঝা গেল যে, حَالٌ এবং ذُو الْحَالِ -এর যুগ এক নয়। অথচ حَالٌ এবং ذُو الْحَالِ -এর যুগ এক হওয়া জরুরি। উত্তর এই যে, এটা حَال مُقَدَّرَة হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدَّرِيْنَ خُلُوْدُهُمْ

قَوْلُهُ تُعْطِيْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, تُؤْتِيْ টা اِيْتَاءٌ হতে এসেছে اِتْيَانٌ থেকে নয়।

قَوْلُهُ اُجْتُثَّتْ : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اِجْتِثَاثٌ মাসদার হতে مَاضِيْ مَجْهُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ হলো– তাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ :

অর্থাৎ যখন সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গীকার করেছেন তা ছিল সত্য, আর আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা ছিল মিথ্যা। এতদ্ব্যতীত তোমাদের উপর আমার তো কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে [মন্দকাজের দিকে] আহ্বান করেছি, তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ। অতএব, আমাকে তিরস্কার করো না, তোমরা নিজেদেরকেই তিরস্কার কর।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন সব বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে তথা বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোজখিরা দোজখে প্রবেশ করবে, তখন দোজখিরা ইবলিস শয়তানকে বলবে, তোর কারণেই আজকে আমাদের এই বিপদ, তোর অনুসরণ করেই আজ আমাদের এ সর্বনাশ হয়েছে। অতএব যদি সম্ভব হয় তবে কোনো ব্যবস্থা কর, যাতে করে আমরা এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। তখন শয়তান বলবে, তোমরা আমাকে অযথাই দোষারূপ করছ, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তোমাদের নিকট বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, তাদের মাধ্যমে ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতি তথা চিরশান্তি লাভের কথা ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে কুফরি ও নাফরমানির শাস্তির ব্যাপারেও নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ঘোষণা করেছিলেন সবই সত্য, আর এ সত্যতার প্রমাণ আজ তোমরা স্বচক্ষে দেখছ।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমিও আমার ভূমিকা পালন করতে কসুর করিনি, মন্দকাজের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেছি, আমার আহ্বানের সত্যতার কোনো প্রমাণও আমার কাছে ছিল না। তোমরা একটু চিন্তা করলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারতে। কিন্তু তোমরা তা করনি, বরং আমার কথায় তোমরা যাবতীয় অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়েছ, আমি তোমাদেরকে কোনো দিনও কুফরি ও নাফরমানিতে বাধ্য করিনি এবং তেমন ক্ষমতাও আমার ছিল না। তাই তোমরা যা কিছু করেছ, তা স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, স্বশক্তিতেই করেছ। আমি একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করব না যে, অন্যায়ের পথে তথা সর্বনাশের পথে তোমাদেরকে আমি আহ্বান করেছি, তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছ, তোমরা আমার আহ্বানের পক্ষে কোনো দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করনি, নিতান্ত ভক্ত অনুরক্তের ন্যায় তোমরা আমার অনুসরণ করেছ। তোমরা যদি ভেবে দেখতে তবে আমার তাবেদার হতে না। তোমাদের কুফরি ও নাফরমানির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

–[তাফসীরে তাবারী, খ. ১৩, পৃ. ১৩৩]

ইবলিসের এসব কথা দোজখিদের মনে নিজেদের উপরই ঘৃণা সৃষ্টি হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, আজ তোমাদের প্রতি তোমাদের যে ঘৃণা রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ছিল, তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের আহ্বান করা হচ্ছিল তখন তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দাওনি; বরং ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে।

এ ঘোষণা শুনে দোজখিরা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কথার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করেছি, এখন যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে পুনরায় ফেরত পাঠাও আমরা সৎকাজ করব। আমাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তির প্রতিবাদে ইরশাদ করবেন– وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের প্রত্যেককে হেদায়েত করতাম।

দোজখিরা পুনরায় ফরিয়াদ করবে, আমরা বিধি-নিষেধ মেনে চলব, নবী-রাসূলগণকে মেনে চলব, আমাদেরকে সামান্য অবকাশ দান করুন।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়– رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়াদেগার! আমাদেরকে অল্প সময়ের জন্যে অবকাশ দিন।

আল্লাহ তা'আলা জবাবে ইরশাদ করবেন– اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ অর্থাৎ তোমরা কি ইতঃপূর্বে শপথ করে বলনি যে, আমাদের বিনাশ নেই।

অতঃপর পুনরায় তারা ফরিয়াদ করবে– رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা ইতঃপূর্বে যে কাজ করেছি, তেমন কাজ না, বরং অন্য প্রকার কাজ করব।

আল্লাহ তা'আলা প্রতি উত্তরে ইরশাদ করবেন– أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ অর্থাৎ তোমাদের কি আমি এমন জীবন দান করিনি যাতে কোনো উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারত। আর তোমাদের নিকট কি কোনো ভয় প্রদর্শক পৌঁছেনি?

কিছুক্ষণ পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ অর্থাৎ আমার বিধানসমূহ কি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয়নি? যা তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করতে। একথা শ্রবণ করে দোজখিরা বলবে, আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের প্রতি আর কখনো দয়া করবেন না? এরপর চিৎকার করে বলবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল, আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! এবার আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন, যদি আমরা দ্বিতীয়বারও মন্দ কাজ করি তবে নিশ্চয়ই আমরা জালেম বলে বিবেচিত হবো।

قَوْلُهُ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ : অর্থাৎ তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক, আমার সাথে কথা বলো না। তখন দোজখিরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়বে এবং ফরিয়াদ করার এ ব্যবস্থাও শেষ হয়ে যাবে। পরস্পর তারা কাঁদতে থাকবে এবং দোজখের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হবে। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ২৯৬-৯৭]

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদওয়াইহ, বগভী, তাবারানী, ইবনুল মোবারক (র.) হযরত আকাবা ইবনে আমের (রা.) -এর সূত্রে লিখেছেন, হুজুর আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আগের পরের সকলকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করবেন, তখন ঈমানদারগণ বলবেন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছেন, এখন এমন কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের সুপারিশ করতেন, তখন লোকেরা বলবে, এ কাজ হযরত আদম (আ.) করতে পারবেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে তাঁকে তৈরি করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন। লোকেরা তখন হযরত আদম (আ.)-এর কাছে হাজির হয়ে সুপারিশের জন্যে তাঁকে অনুরোধ করবে। হযরত আদম (আ.) বলবেন, তোমরা হযরত নূহ (আ.)-এর নিকট যাও। লোকেরা তাঁর নিকট যাবে, কিন্তু হযরত নূহ (আ.) বলবেন, তোমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট যাও। লোকেরা যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট যাবে, তখন তিনি বলবেন, তোমরা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট যাও, আর হযরত মূসা (আ.) বলবেন, তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট যাও, আর হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট যখন লোকেরা হাজির হবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে ঠিকানা দিচ্ছি, তোমরা উম্মী আরবি নবী তথা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুর ﷺ -এর নিকট যাও, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অবশেষে লোকেরা আমার নিকট হাজির হবে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে দণ্ডায়মান হয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। এরপর আমার মজলিশ অসাধারণ সুগন্ধি দ্বারা মোহিত করা হবে যা ইতঃপূর্বে কোনোদিন কেউ পায়নি। এরপর আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হয়ে সুপারিশ করব। আল্লাহ তা'আলা আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং আমার মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন।

এ অবস্থা দেখে কাফেররা বলবে, মুসলমানগণ সুপারিশকারী পেয়ে গেছেন, আমাদের জন্য কে সুপারিশ করবে। তখন নিজেরাই বলবে, এখনো তা ইবলিসই রয়েছে যে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তখন তারা ইবলিসের নিকট গিয়ে বলবে, মু'মিনদের জন্যে তো সুপারিশকারী রয়েছে, এখন তুমি আমাদের জন্যে সুপারিশ কর, কেননা তুমিই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে। যখন ইবলিস দাঁড়াবে, তখন এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যা ইতঃপূর্বে কেউ কোনোদিন পায়নি। তখন ইবলিস তাদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

মূলত সে সময়ের কথাটিই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ইবলিস তখন কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ছিল সত্য, আর আমি তোমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা ছিল মিথ্যা। আর তোমদের উপর আমার তেমন কোনো ক্ষমতাও ছিল না। আমি শুধু তোমাদেরকে মন্দকাজের দিকে আহ্বান করেছিলাম, তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে, অতএব, তোমরা আমাকে তিরস্কার করো না, বরং নিজেদেরকেই তিরস্কার কর।"

مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط

"এখন আমি তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করে তোমাদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারব না, আর তোমরাও আমার পক্ষে সুপারিশ করে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।"

اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ

"এতদ্ব্যতীত ইতঃপূর্বে তোমরা যে আমকে আল্লাহ তা'আলার শরিক করতে, আমি তাতে আমার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। তোমাদের এ অপকর্মে আমি সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট।"

اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

যে কথা কিয়ামতের দিন হবে তার উল্লেখ করার মাধ্যমে পবিত্র কুরআন সমগ্র বিশ্বাবাসীকে পরিণামদর্শী হওয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্যে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির জন্যে সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করছে। যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সবকিছু মনে করছে, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির সকল সংগ্রহ করছে না, তাদের জন্যে এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।

قَوْلُهُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাই-ভস্মের মতো, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্র করে কোনো কাজ নিতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত সৎ হলেও তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়, তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

এরপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফের ও মু'মিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে. যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতারে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশপানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায় এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়- সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীরে অভ্যন্তরে পৌছাও সুবিধিত। এর ফলও সবসময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। বৃক্ষে ফল দেখা দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাটনি আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাণ্ডারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম মোটকথা সব সময় ও সব ঋতুতে এটি কাজে আসে। এ বৃক্ষের শাঁসও খাওয়া হয়। এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী বস্তুসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এর আঁটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। অন্যান্য বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য বৃক্ষ বিশেষ ঋতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে যায়- সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হানযল [মাকাল] বৃক্ষ।

-[তাফসীরে মাযহারী]

মুসনাদে আহমদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন, বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে মু'মিনের দৃষ্টান্ত। [বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এ স্থলে তিনি আরো বললেন যে, কোনো ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।] বল, এ কোন বৃক্ষ? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমার মনে চাইল যে, বলে দেই খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে হযরত আবূ বকর, ওমর (রা.) অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়েবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড়বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মু'মিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবিলায় জানমাল ও কোনো কিছুর পরোয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূপৃষ্ঠের ময়লা ও আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দুটি গুণ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ -এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চ ধাবমান, মু'মিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কুরআন বলে- إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ অর্থাৎ পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহ তা'আলার দিকে উঠানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন আল্লাহ তা'আলার যেসব জিকির, তাসবীহ, তাহলীল, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি করে সেগুলো সকাল-বিকাল আল্লাহ তা'আলার দরবারে পৌঁছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সবসময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সবসময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি বস্তু যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, উঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ বাক্যে أُكُلٌ শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حِينٍ শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারো কারো অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফেরদের দৃষ্টান্ত : এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালিমায়ে তাইয়েবার অর্থ যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালিমায়ে খবীসার অর্থ কুফরি বাক্য ও কুফরি কাজকর্ম। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে شَجَرَةٌ خَبِيثَةٌ অর্থাৎ খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন।

কুরআনে এ খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশি যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা এর আসল অর্থ কোনো বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফেরদের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি- ১. কাফেরের ধর্মবিশ্বাসের কোনো শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড় হয়ে যায়। ২. দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ৩. বৃক্ষের ফলমূল অর্থাৎ কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফলদায়ক নয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া : এরপর মু'মিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়েবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ মু'মিনের কালেমায়ে তাইয়েবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায়ে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ কবর জগৎ বুঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শান্তি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কবরে মু'মিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে আল্লাহ তা'আলা সমর্থনের বলে এই কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ' সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -এর উদ্দেশ্য তা-ই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরো প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে একই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুঞ্জিকা اَلتَّثْبِيْتُ عِنْدَ التَّبْيِيْتِ এবং شَرْحُ الصُّدُوْرِ -এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আজাব ও ছওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে ছওয়াব অথবা আজাব হওয়ার বিষয়টি কুরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এ ছওয়াব ও আজাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোনো বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সেই বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জীন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতঃপূর্বে তা কারো দৃষ্টিগোচর হতো না, কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোনো বিপদে পতিত হয়ে বিষম কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

নীতির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রাসূলের মাধ্যমে পর জগতে পৌঁছার পর এ আজাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালেম অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা একপ্রকার আজাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন। তার ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায় এরূপ কোনো শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) প্রমুখ সাহাবী বলেন, মু'মিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তারা আরো বলেন, যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٨. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اَىْ شُكْرَهَا كُفْرًا هُمْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ وَّاَحَلُّوْا اَنْزَلُوْا قَوْمَهُمْ بِاِضْلَالِهِمْ اِيَّاهُمْ دَارَ الْبَوَارِ الْهَلَاكِ ۔

২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখ না লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে অর্থাৎ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অকৃতজ্ঞতা দ্বারা পরিবর্তিত করে নিয়েছে এবং তারা তাদের সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করত ধ্বংসের ক্ষেত্রে নামিয়ে এনেছে? তারা কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফেরগণ। اَحَلُّوْا নামিয়ে এনেছে اَلْبَوَارِ ধ্বংস।

٢٩. جَهَنَّمَ عَطْفُ بَيَانٍ يَصْلَوْنَهَا ط يَدْخُلُوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ الْمَقَرُّ هِىَ ۔

২৯. জাহান্নামে যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। جَهَنَّمَ এটা عَطْفُ بَيَانٍ বা বিবরণমূলক অন্বয়। يَصْلَوْنَهَا অর্থ তাতে প্রবেশ করবে। اَلْقَرَارُ এ স্থানে অর্থ مَقَرٌّ বা অবস্থানস্থল।

٣٠. وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا شُرَكَاءَ لِيُضِلُّوْا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيْلِهِ ط دِيْنِ الْاِسْلَامِ قُلْ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا بِدُنْيَاكُمْ قَلِيْلًا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ مَرْجِعَكُمْ اِلَى النَّارِ ۔

৩০. তারা আল্লাহ তা'আলার শরিক اَنْدَادً অর্থ– শরিক। উদ্ভাবন করে তাঁর পথ অর্থাৎ দীন ইসলাম হতে বিভ্রান্ত করবার জন্য لِيُضِلُّوْا এটার ى-এ ফতাহ ও পেশ উভয় হরকতসহ পাঠ করা যায়। তাদেরকে বল, তোমরা দুনিয়ার সামান্য কিছু ভোগ করে নাও। কেননা অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। مَصِيْرٌ অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল।

٣١. قُلْ لِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِدَاءٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ مُخَالَّةٌ اَىْ صَدَاقَةٌ تَنْفَعُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۔

৩১. আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে বল, সালাত কায়েম করবে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সেই দিনের পূর্বে যেদিন ক্রয়বিক্রয় মুক্তিপণ ও বন্ধুত্ব অর্থাৎ এমন বন্ধুত্ব যা উপকারে আসবে তা থাকবে না। এটা হলো কিয়ামতের দিন। خِلَالٌ অর্থ বন্ধুত্ব।

٣٢. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ السُّفُنَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِالرُّكُوْبِ وَالْحَمْلِ بِاَمْرِهٖ بِاِذْنِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۔

৩২. আল্লাহ তা'আলা যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর তা দ্বারা তোমাদেরকে জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, আর নৌকাসমূহকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। اَلْفُلْكَ অর্থ– নৌযানসমূহ। সেগুলো তাঁর নির্দেশে তার অনুমতিক্রমে আরোহী ও মালপত্রসহ সমুদ্রে বিচরণ করে। আর তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন নদীসমূহ।

Free@www.e-ilm.weebly.com

٣٣. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ج جَارِيَيْنِ فِي فَلَكِهِمَا لَا يَفْتَرَانِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ لِتَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ.

৩৩. তিনি তোমাদের অধীন করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যা একই অবস্থায় চলেছে। অর্থাৎ স্ব-স্ব কক্ষপথে অবিরাম ক্লান্তিহীন একই রূপে ছুটে চলেছে। আর তোমাদের অধীন করেছেন রাত্রিকে তাতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এবং দিবসকে তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অন্বেষণের জন্য।

٣٤. وَاٰتٰكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط عَلٰى حَسْبِ مَصَالِحِكُمْ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ بِمَعْنٰى اِنْعَامِهٖ لَا تُحْصُوْهَا ط لَا تُطِيْقُوْا عَدَّهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ الْكَافِرَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ كَثِيْرُ الظُّلْمِ لِنَفْسِهٖ بِالْمَعْصِيَةِ وَالْكُفْرِ لِنِعْمَةِ رَبِّهٖ.

৩৪. এবং তোমাদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু তোমরা কামনা করেছ তিনি তোমাদেরকে তা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যদি গণনা কর তবে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। তা গণনা করতে সক্ষম হবে না। মানুষ অর্থাৎ কাফেরগণ অবশ্যই অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘনকারী, অর্থাৎ অবাধ্যাচার করত নিজের উপরই সে অন্যায় করে [অকৃতজ্ঞ] অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। نِعْمَتَ এটা এ স্থানে اِنْعَام [অনুগ্রহ প্রদর্শন] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ شُكْرَهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই যে, بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ এটা كُفْرًا -এর অর্থে হয়েছে যে, সে সকল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে كُفْر দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। অথচ নিয়ামত হলো عَيْن আর কুফর হলো وَصْف আর عَيْن -কে وَصْف দ্বারা পরিবর্তনের কোনো অর্থ হয় না?

উত্তর. এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, নিয়ামতের শোকরকে নাশোকরি দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

قَوْلُهُ لِيُضِلُّوْا : প্রশ্ন. جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا -এর উদ্দেশ্য اِضْلَال এবং ضَلَال -কে বলেছেন। অথচ শরিক স্বীকৃতি দেওয়ার দ্বারা কাফেরদের উদ্দেশ্য اِضْلَال এবং ضَلَال ছিল না।

উত্তর. উত্তরের সার হলো এই যে, اِضْلَال এবং ضَلَال যদিও اَنْدَادٌ -এর উদ্দেশ্য নয় তবে নতিজা সুনিশ্চিত। এ কারণেই নতিজাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ لِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ : প্রশ্ন. يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ الخ -এর مَقُوْلَة হওয়া বৈধ নয়। কেননা اِقَامَتْ صَلٰوة বা নামাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্বোধিতগণের কর্ম বক্তার বক্তব্য নয়। অথচ مَقُوْلَه -এর জন্য বক্তার বক্তব্য হওয়াই জরুরি।

উত্তর. قُلْ -এর مَقُوْلَة উহ্য রয়েছে। আর جَوَاب اَمْر যা হলো وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ উহ্যের উপর বুঝাচ্ছে। উহ্য ইবারত এরূপ যে, قُلْ لِعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفِقُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا কেউ কেউ বলেন যে, مَقُوْلَه اَمْر হলো উহ্য ইবারত হলো এই যে, قُلْ لَهُمْ لِيُقِيْمُوْا الخ আর قُلْ -এর দালালতের কারণে لَامْ -কে উহ্য করে দেওয়া হয়েছে, ফলে يُقِيْمُوْا হয়েছে। আর যদি শুরুতেই উহ্যের সাথে يُقِيْمُوْا -কে مَقُوْلَه বলা হয় তবে তা বৈধ হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً : উভয়টি اَنْفِقُوْا আমরের যমীর হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ يُنْفِقُوْنَ مُسِرِّيْنَ وَمُعْلِنِيْنَ

قَوْلُهُ السُّفُنَ : এ শব্দটি اُسُدٌ ওজনে বহুবচন এ কারণেই تَجْرِيْ ফে'লকে مُؤَنَّثْ নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ دَائِبَيْنِ : এক রীতির বিচরণকারী। এটা دَائِبٌ -এর দ্বিবচন। অর্থ- অবস্থা, অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ, রীতি ইত্যাদি। বাবে فَتَحَ হতে মাসদার دَأْبًا অর্থ হলো লাগাতারভাবে কোনো কাজে লেগে থাকা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ : শানে নুযূল : এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার কাফের প্রধানদের সম্পর্কে। বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর শপথ! এ আয়াত নাজিল হয়েছে কুরাইশদের দলপতিদের সম্পর্কে। আরবদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব তখন তাদের হাতেই ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েতের জন্য, তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য, তাদের এ জীবন ও পরজীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্য অনেক ব্যবস্থা করেছেন, যেমন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন, তাঁর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। তাদেরকে পবিত্র কাবা শরীফের প্রতিবেশী হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন, সারা আরবের নেতৃত্ব আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেছেন। তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামতসমূহের জন্যে শোকরগুজার হওয়া তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করা।

কিন্তু হতভাগা কাফের প্রধানরা আল্লাহ তা'আলার এ সমস্ত নিয়ামতের জন্যে শোকরগুজারির স্থলে তাঁর অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হয় এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূলের বিরোধিতা করে, আল্লাহ তা'আলার কুরআনকে অবিশ্বাস করে, তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি কি দেখেননি? যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে পরিবর্তন করেছে নাশোকরী ও নাফরমানি দ্বারা।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতার স্থলে তারা অকৃতজ্ঞ হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাঁর নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারা যেন নিয়ামতের স্থলে নাশোকরী ও অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেছে। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে অকৃতজ্ঞ লোকদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল মক্কার কুরাইশ। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত যাঁকে বলা হয়েছে তিনি হলেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

ইবনে জারীর আতা ইবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে মক্কার যেসব কুরাইশ সর্দার নিহত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র মক্কা মুয়াযযমায় অবস্থানের তৌফিক দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তাদেরকে দান করেন, তারা নিশ্চিন্ত মনে মক্কায় জীবনযাপন করেছিল। যখন আবরাহা বাদশাহ তার হস্তীবাহিনী

নিয়ে মক্কা আক্রমণে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিশ্চহ্ন করে দিয়েছিলেন। মক্কাবাসীর রিজিকের দুয়ার তিনি খুলে দিয়েছিলেন। সিরিয়া এবং ইয়েমেনে শীত এবং গ্রীষ্মে সফর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে করে তারা তাদের যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। কিন্তু তারা এ সমস্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার স্থলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহ তা'আলার রাসূলের পরম দুশমন হয়ে গেছে। মূলত তারা হেদায়েত ছেড়ে দিয়ে গোমরাহির পথ বেছে নিয়েছে। অবশেষে তারা সাত বছরের দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং বদরের দিন বন্দী হয়, নিহত হয়, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। আমৃত্যু আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

ইমাম রাজী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন,

প্রথমত কাফেররা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শোকরকে নাশোকরীতে পরিবর্তন করেছে, কেননা আল্লাহ তা'আলার অসীম নিয়ামতের কারণে তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল আল্লাহ তা'আলার শোকরগুজার হওয়া, কিন্তু তারা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, নাফরমান হয়েছে, তাই তারা শোকরকে নাফরমানিতে পরিবর্তন করেছে।

দ্বিতীয়ত তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে কুফরি ও নাফরমানিতে পরিবর্তন করেছে। কেননা তারা যখন কুফরি করেছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাদের নিকট নিয়ামতের পরে কুফরই রয়ে গেছে।

তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি নিয়ামত স্বরূপ রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তার নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। কিন্তু এই হতভাগার দল ঈমানের বদলে কুফরিকে গ্রহণ করেছে। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ১৯, পৃ. ১২৩]

قَوْلُهٗ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا الخ : সূরা ইবরাহীমের শুরুতে রেসালাত, নবুয়ত ও পরকাল সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছিল। এরপর তাওহীদের ফজিলত, কালেমায়ে কুফর ও শিরকের নিন্দা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ধিত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা ও কুফরির পথ বেছে নিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা : اَنْدَادٌ শব্দটি نِدٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ– সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে اَنْدَادٌ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تَمَتُّعٌ শব্দের অর্থ কোনো বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক। তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে, মক্কার কাফেররা তো আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে কুফরি দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে। আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামাজ কায়েম করুক এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মানদানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামাজ কায়েম করুক। নামাজের সময়ে অলসতা এবং নামাজের সুষ্ঠু নিয়মাবলিতে ত্রুটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতি বৈধ রাখা হয়েছে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেন, ফরজ যাকাত ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দান করা উচিত, যাতে রিয়া বা নাম-যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়ামতের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম-যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফজিলত খতম হয়ে যায়। ফরজ হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরজ ও নফল উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ وَّلَا خِلَالٌ : এখানে خِلَالٌ শব্দটি خُلَّةٌ -এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে بَاب مُفَاعَلَة -এর ধাতুও বলা যায়। যেমন– قِتَالٌ ও دِفَاعٌ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু-ব্যক্তি পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামাজ ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ তা'আলা নামাজ পড়ার এবং গাফলতিবশত বিগত জমানার না পড়া নামাজের কাজা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকাপয়সা ও অর্থসম্পদ তোমার করায়ত্তে রয়েছে। একে আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, যখন এ দুটি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামাজ পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায়ও কোনো টাকা পয়সা থাকবে না, যা দ্বারা কারো পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোনো কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোনো কাজে আসবে না। কোনো প্রিয়জন কারো পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আজাব কোনোরূপে হটাতে পারবে না।

ঐদিন বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারো দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারো মালিকানায় টাকাপয়সাও থাকে না।

বিধান ও নির্দেশ : এ আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামতের দিন কারো বন্ধুত্ব কারো কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না। কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দীনের কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনো উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে– اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা পরস্পরে বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পরে শত্রু হয়ে যাবে। তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলার সত্তাই হলো যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের উপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলো তোমাদের রিজিক হতে পারে। ثَمَرَاتٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ -এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثَمَرَةٌ বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ সবই ثَمَرَاتٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত رِزْقٌ শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এক আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سَخَّرَ শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা, লক্কড়, নৌকা তৈরির হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কর্তার গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনোটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এ আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরি নয়।

এরপর বলা হয়েছে– আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই গতিতে চলাচল করে। دَائِبَيْنِ শব্দটি دَأْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দুটি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু-ঘণ্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ দিনের কাজ বেশি। তাই আল্লাহ তা'আলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, ওগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জির অধীন। এমনিভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ তা'আলার দান ও পুরস্কার কারো চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপার চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন–

ما نبوديم وتقاضا ما نبود

لطف تو نا گفته ما مى شنود

অর্থাৎ আমি ছিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোনো তাকিদও ছিল না। তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা আকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করেছে।

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাজি বায়যাভী (র.) এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ মানুষ সাধারণত যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোনো না কোনো উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শতশত সূক্ষ্ম, নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদাই কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কুল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ প্রত্যেক কষ্ট, প্রত্যেক বিপদ ও প্রত্যেক শোক ও দুঃখ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নিয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা কারো দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরি হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন– اَلْاٰنَ قَدْ شَكَرْتَ يَا دَاوُدُ অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ অর্থাৎ মানুষ খুবই জালেম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা। একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ। কিন্তু সাধারণত মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায়। এ কারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মু'মিনের গুণ صَبَّارٌ ও شَكُوْرٌ [অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী] ব্যক্ত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٥. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ مَكَّةَ اٰمِنًا ذَا اَمْنٍ وَقَدْ اَجَابَ اللّٰهُ تَعَالٰى دُعَاءَهُ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يُسْفَكُ فِيْهِ دَمُ اِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيْهِ اَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهُ وَّاجْنُبْنِىْ بَعِّدْنِىْ وَبَنِىَّ عَنْ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

৩৫. আর স্মরণ কর ইবরাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে অর্থাৎ মক্কা নগরীকে নিরাপদ কর। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দোয়া কবুল করেছিলেন। এ নগরীকে তিনি 'হারাম' বলে নির্ধারণ করেছেন। কোনো মানুষের রক্ত সে স্থানে প্রবাহিত করা যায় না, কারো উপর জুলুম করাও বৈধ নয়। তাতে কোনো প্রাণী শিকার করা বা তার ঘাস উৎপাটন করারও অনুমোদন নেই। আরো বলেছিলেন, আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রেখ। اُجْنُبْنِىْ অর্থ আমাকে দূরে রেখ। اَنْ نَّعْبُدَ এটার পূর্বে একটি عَنْ [হতে] শব্দ উহ্য রয়েছে।

٣٦. رَبِّ اِنَّهُنَّ اَىِ الْاَصْنَامُ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ج بِعِبَادَتِهِمْ لَهَا فَمَنْ تَبِعَنِىْ عَلَى التَّوْحِيْدِ فَاِنَّهُ مِنِّىْ مِنْ اَهْلِ دِيْنِىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ هٰذَا قَبْلَ عِلْمِهِ اَنَّهُ تَعَالٰى لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ.

৩৬. হে আমার প্রতিপালক! তারা অর্থাৎ প্রতিমাসমূহ বহু মানুষকে তাদের উপাসনা করার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করেছে। তাওহীদ অবলম্বনের ক্ষেত্রে যে তার অনুসরণ করবে সে আমার অর্থাৎ আমার আদর্শভুক্ত আর কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে ক্ষমা করবেন না, একথা জানবার পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দোয়া করেছিলেন।

٣٧. رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ اَىْ بَعْضَهَا وَهُوَ اِسْمٰعِيْلُ مَعَ اُمِّهٖ هَاجَرَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ هُوَ مَكَّةُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَ الطُّوْفَانِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً قُلُوْبًا مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ تَمِيْلُ وَتَحِنُّ اِلَيْهِمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ قَالَ اَفْئِدَةُ النَّاسِ لَحَنَّتْ اِلَيْهِ فَارِسُ وَالرُّوْمُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ وَقَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ اِلَيْهِ.

৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে مِنْ ذُرِّيَّتِىْ এ مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে বসবাস করালাম এক অনুর্বর উপত্যকায় মক্কায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট যে গৃহ হযরত নূহের প্লাবনের পূর্বে ছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। তুমি কতক মানুষের হৃদয় اَفْئِدَةً হৃদয়সমূহ। তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও مِنَ النَّاسِ এ স্থানে مِنْ শব্দটি تَبْعِيْضِيَّةٌ বা ঐকদেশিক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, مِنَ النَّاسِ না বলে যদি اَفْئِدَةُ النَّاسِ [সকল মানুষের হৃদয়] বলা হতো তবে পারস্য, রোম সকল দেশের মানুষই তার প্রতি অনুরাগী ও আগ্রহী হয়ে পড়ত। تَهْوِىْ অনুরক্ত ও আগ্রহী হওয়া। এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা কর, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তায়েফ অঞ্চলটিকে এস্থানে স্থানান্তর করত এই কাজও তিনি করে দিয়েছিলেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

٣٨. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالٰى أَوْ كَلَامِ إِبْرَاهِيْمَ .

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি অবশ্যই জানেন যা আমরা গোপন করি আর যা আমরা প্রকাশ করি। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন থাকে না। مَا نُخْفِيْ যা আমরা গোপন করি। وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ এ বক্তব্যটি আল্লাহরও হতে পারে বা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এরও হতে পারে। مِنْ شَيْءٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

٣٩. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ أَعْطَانِيْ عَلٰى مَعَ الْكِبَرِ إِسْمٰعِيْلَ وُلِدَ وَلَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ سَنَةً وَإِسْحٰقَ وُلِدَ وَلَهُ مِائَةٌ وَثِنْتَا عَشَرَةَ سَنَةً إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ .

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল তাঁর জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল নিরানব্বই ও ইসহাককে তাঁর জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল একশত বারো বৎসর দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। وَهَبَ لِيْ আমাকে দান করেছেন। عَلَى الْكِبَرِ এ স্থানে عَلٰى শব্দটি مَعَ [সত্ত্বেও] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٠. رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَاجْعَلْ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ مَنْ يُقِيْمُهَا وَأَتٰى بِمَا لِإِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَهُ أَنَّ مِنْهُمْ كُفَّارًا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ الْمَذْكُوْرَ .

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের কতককেও তা কায়েমকারী বানাও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার উক্ত প্রার্থনা কবুল কর। مِنْ ذُرِّيَّتِيْ আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কত কাফেরও হবে সেহেতু এ স্থানে তিনি দোয়ায় مِنْ تَبْعِيْضِيَّة বা ঐকদেশিক مِنْ-এর ব্যবহার করেছেন।

٤١. رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ هٰذَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ عَدَاوَتُهُمَا اللّٰهِ وَقِيْلَ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَقُرِئَ وَالِدِيْ مُفْرَدًا وَوَلَدِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ يَثْبُتُ الْحِسَابُ .

৪১. হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব সংঘটিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা কর। তাঁর পিতামাতা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার দুশমন ছিলেন এ কথা জানার পূর্বে তিনি তাদের জন্য দোয়া করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তার মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য এক কেরাতে وَالِدِيْ শব্দটি একবচন وَالِدِيْ রূপে পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. সূরায়ে বাকারাতে بَلَدًا নাকেরাহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে اَلْبَلَدُ মারেফা। এতে কি হিকমত রয়েছে?

উত্তর. সূরা বাকারাতে নির্মাণের পূর্বে দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ আপনি এখানে একটি শহর নির্মাণ করে দিন। আর এখানে যে দোয়া রয়েছে তা নির্মাণের পরে তা নিরাপদ শহরে পরিণত হওয়ার জন্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ ذَا اَمْنٍ : প্রশ্ন. اٰمِنًا -এর তাফসীর ذَا اَمْنٍ দ্বারা করার মধ্যে কি উপকারিতা রয়েছে?

উত্তর. উত্তর এই যে, اٰمِنٌ হলো নিসবতের সীগাহ اِسْم فَاعِل -এর সীগাহ নয়। যেমন– تَامِرٌ অর্থ হলো খেজুর বিক্রেতা اٰمِنٌ অর্থ– নিরাপত্তাপ্রাপ্ত নিরাপত্তাদাতা নয়। কেননা اٰمِنٌ যা ইসমে ফায়েল নিরাপত্তাদাতা অর্থে বৈধ নয়। কেননা بَلَدٌ হলো প্রাণহীন নির্জিব এবং غَيْرُ ذَوِي الْعُقُوْلِ কাজেই এতে নিরাপত্তা দেওয়ার যোগ্যতা নেই এবং اٰمِنٌ -এর নিসবত بَلَدٌ -এর দিকে মুনাসিবও নয়। কেননা নিরাপত্তা দেওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাজ।

قَوْلُهُ يُخْتَلٰى : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اَلْاِخْتِلَاءُ মাসদার হতে। অর্থ হলো– সবুজ ঘাস ইত্যাদি উপড়ানো।

قَوْلُهُ اُجْنُبْنِيْ : এটা বাবে نَصَرَ হতে اَمْر -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرٌ -এর সীগাহ। মূলে ছিল اُجْنُبْ এর সাথে نُوْن وِقَايَة এবং يَائے مُتَكَلِّم সংযুক্ত হয়েছে। অর্থ– তুমি আমাকে বাঁচাও; তুমি আমাকে দূরে রাখ।

قَوْلُهُ عَنْ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامَ : এখানে عَنْ শব্দটি বৃদ্ধি করে বলে দিয়েছেন যে, اَنْ نَعْبُدَ -এর মধ্যে اَنْ টা হলো مَصْدَرِيَة তাফসীরিয়্যাহ নয়। কেননা اَنْ تَفْسِيْرِيَه -এর জন্য পূর্বে قَوْل বা তার সমার্থক শব্দ থাকা জরুরি, যা এখানে নেই।

قَوْلُهُ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا : اِضْلَالٌ -এর اِسْنَادٌ মূর্তিগুলোর দিকে مَجَازًا হয়েছে। এটা اِسْنَادُ الشَّيْءِ اِلٰى سَبَبِه -এর অন্তর্গত। যেহেতু এ মূর্তিগুলো মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণ, এজন্য ضَلَال -এর নিসবত তারই দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْ كَانَ قَبْلَ الطُّوْفَانِ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ বলা কিভাবে বৈধ হলো। যখন وَادِي غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ -এর মধ্যে কোনো ঘরই ছিল না।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো بَيْت বলা হয়তো مَا كَانَ -এর হিসেবে হয়েছে অথবা مَا يَكُوْنُ -এর হিসেবে অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর প্লাবনের পূর্বে তথায় ঘর ছিল ভবিষ্যতেও তা বিদ্যমান থাকবে।

قَوْلُهُ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ : ইসমাঈল এ কারণে নামকরণ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার সমীপে দোয়া করতেন, তখন বলতেন اِسْمَعْ يَا اِيْلُ এখানে اِسْمَعْ হলো اَمْر অর্থ শ্রবণ কর আর اِيْلُ ইবরানী ভাষায় আল্লাহ তা'আলাকে বলা হয়। এখন اِسْمٰعِيْل অর্থ হলো– হে আল্লাহ শুন। আর যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া শুনে সন্তান দান করলেন তখন তিনি তার নাম اِسْمٰعِيْل রেখে দিলেন। আর اِسْحٰق ইবরানী ভাষায় اِضْحَاك -কে বলা হয়।

قَوْلُهُ اِجْعَلْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ -এর আতফ اِجْعَلْنِيْ -এর ضَمِيْر مَنْصُوْب -এর উপর হয়েছে।

قوله من يقيمها : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِجْعَلْنِيْ -এর দ্বিতীয় মাফঊল উহ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত মূর্খতা ও নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদের ব্যাপারে পয়গাম্বরগণের মধ্যে সবচাইতে অধিক সফল জিহাদ হযরত ইবরাহীম (আ.) করেছিলেন। এজন্যই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনকে বিশেষভাবে 'দীনে হানীফ' বলা হয়।

এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আরো একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ আয়াতে মক্কার ঐসব কাফেরদের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ঈমানকে কুফরে এবং তাওহীদকে শিরকে রূপান্তরিক করেছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে তাদের ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আকিদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে পিতৃ অনুসরণে অভ্যস্ত কাফেররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত হয়। -[বাহরে মুহীত]

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষেই কুরআন পাকে পয়গাম্বরগণের কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি; বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে যেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোকে ভাস্বর রাখার জন্য এসব ঘটনা বারবার কুরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুটি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া- رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এ [মক্কা] নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাকারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بَلَدْ শব্দটি لَامْ ও اَلِفْ ব্যতীত بَلَدًا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তানসন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গাম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোনো গুনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তানসন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দোস্তের দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে মুহীত গ্রন্থে হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র.)-এর বরাত দিয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেননি; বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তানদেরকে হেরেম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হেরেমের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হেরেম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ [তওয়াফ] করত। এতে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনোরূপ ধারণা ছিল না; বরং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা যেমন আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এ পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তওয়াফ করাকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পরিপন্থি মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে এ দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরি ও অস্বীকৃতি নেওয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেননি। একথা বলেননি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গাম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গাম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোনো কাফেরও যেন আজাবে পতিত না হয়। "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু" -একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ.)ও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন- وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ আপনি যদি ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ তা'আলার এ দুজন মনোনীত পয়গাম্বর কাফেরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেননি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থি। কিন্তু একথা বলেননি যে, কাফেরদের উপর আজাব নাজিল করুন; বরং আদবের সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

قَوْلُهٗ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ط وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতিমিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে رَبَّنَا শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তাভাবনা বুঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং হযরত হাজেরা (আ.)-এর ঐসব বাক্য বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলার আদেশ শুনার পর তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরো বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোনো বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

قَوْلُهٗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ط اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ : এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন। নিয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ.)-কে দান করেছেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান আপনিই তার হেফাজত করুন। অবশেষে إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ বলে প্রশংসা বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান- رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য নামাজ কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতিমিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা! আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এতে তিনি মাতাপিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কুরআন পাকেই উল্লিখিত আছে। সম্ভবত এ দোয়াটি তখন করেছেন যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কাফেরদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে- وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে দোয়ার যথাবিহিত পদ্ধতি জানা গেল যে, বারবার কাকুতিমিনতি ও ক্রন্দন সহকারে দোয়া করা চাই এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা যায় যে, দোয়া কবুল হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٢. قَالَ تَعَالٰى وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ط اَلْكَافِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ بِلَا عَذَابٍ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ لِهَوْلِ مَا تَرٰى يُقَالُ شَخَصَ بَصَرُ فُلَانٍ اَىْ فَتَحَهٗ فَلَمْ يَغْمِضْهُ ـ

٤٣. مُهْطِعِيْنَ مُسْرِعِيْنَ حَالٌ مُقْنِعِىْ رَافِعِىْ رُؤُسِهِمْ اِلَى السَّمَآءِ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ بَصَرُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ قُلُوْبُهُمْ هَوَآءٌ خَالِيَةٌ مِنَ الْعَقْلِ لِفَزَعِهِمْ ـ

٤٤. وَاَنْذِرْ خَوِّفْ يَا مُحَمَّدُ النَّاسَ الْكُفَّارَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَا بِاَنْ تَرُدَّنَا اِلَى الدُّنْيَا اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ط فَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ حَلَفْتُمْ مِنْ قَبْلُ فِى الدُّنْيَا مَا لَكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ زَوَالٍ عَنْهَا اِلَى الْاٰخِرَةِ ـ

٤٥. وَسَكَنْتُمْ فِيْهَا فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ مِنَ الْاُمَمِ السَّابِقَةِ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ مِنَ الْعُقُوْبَةِ فَلَمْ تَنْزَجِرُوْا وَضَرَبْنَا بَيَّنَّا لَكُمُ الْاَمْثَالَ فِى الْقُرْاٰنِ فَلَمْ تَعْتَبِرُوْا ـ

অনুবাদ :

৪২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি কখনো মনে করো না যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা মক্কাবাসী কাফেররা যা করে আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে অনবধান। তবে তিনি তাদেরকে আজাব না দিয়ে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রাখবেন যেদিন এর বিভীষিকা দর্শনে চক্ষু হয়ে যাবে স্থির। تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ নির্নিমেষে চক্ষু খুলে রাখার ক্ষেত্রে বলা হয়– شَخَصَ بَصَرُ فُلَانٍ অর্থাৎ অমুক জনের চক্ষু বন্ধ না করে খুলে রেখেছে।

৪৩. আকাশের দিকে মাথা তুলে তারা ছুটাছুটি করবে তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরবে না আর তাদের অন্তর হবে বিকল। ভয়-বিহ্বলতার কারণে জ্ঞানশূন্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। مُهْطِعِيْنَ এটা حَالٌ বা অবস্থা ও ভাববাচক পদ। অর্থ– দ্রুত ছুটাছুটি করা। مُقْنِعِىْ তুলে। طَرْفٌ চক্ষু। اَفْئِدَةٌ হৃদয়সমূহ।

৪৪. হে মুহাম্মদ ﷺ ! যেদিন শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সম্পর্কে মানুষকে কাফেরগণকে সতর্ক কর। তখন সীমালঙ্ঘনকারীরা অর্থাৎ কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও। অর্থাৎ দুনিয়ায় ফিরিয়ে দাও আমরা তাওহীদ সম্পর্কিত তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব। ধিক্কার ও ভর্ৎসনা করে তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি পূর্বে অর্থাৎ দুনিয়াতে শপথ করে বলতে না যে তোমাদের কোনো ধ্বংস নেই? দুনিয়া হতে আখেরাতের দিকে তোমাদের অপসৃতি নেই। اَقْسَمْتُمْ তোমরা কসম খেতে। مِنْ زَوَالٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَةٌ বা অতিরিক্ত।

৪৫. তোমরা বাস করেছ তাদের আবাসভূমিতে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে কুফরি করত যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল এবং তাদের সাথে আমি কি করেছিলাম যে শাস্তি প্রদান করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল। কিন্তু তোমরা তাতেও ভীত ও সতর্ক হওনি এবং কুরআন কারীমে তোমাদের জন্য দৃষ্টান্তও দিয়েছিলাম বিবৃত করেছিলাম কিন্তু তোমরা তাতেও শিক্ষা গ্রহণ করনি।

٤٦. وَقَدْ مَكَرُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ مَكْرَهُمْ حَيْثُ اَرَادُوْا قَتْلَهُ اَوْ تَقْيِيْدَهُ اَوْ اِخْرَاجَهُ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ط اَيْ عِلْمُهُ اَوْ جَزَاؤُهُ وَاِنْ مَا كَانَ مَكْرُهُمْ وَاِنْ عَظُمَ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ اَلْمَعْنٰى لَا يُعْبَأُ بِهٖ وَلَا يَضُرُّ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَالْمُرَادُ بِالْجِبَالِ هُنَا قِيْلَ حَقِيْقَتُهَا وَقِيْلَ شَرَائِعُ الْاِسْلَامِ الْمُشَبَّهَةُ بِهَا فِي الْقَرَارِ وَالثُّبَاتِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ لَامِ لَتَزُوْلُ وَرَفْعِ الْفِعْلِ فَاِنْ مُخَفَّفَةٌ وَالْمُرَادُ تَعْظِيْمُ مَكْرِهِمْ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْمَكْرِ كُفْرُهُمْ وَيُنَاسِبُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا وَعَلَى الْاُوْلٰى مَا قُرِئَ وَمَا كَانَ.

৪৬. তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ভীষণ চক্রান্ত করেছিল তাঁকে হত্যা বা বন্দী বা বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র করেছিল; তাদের চক্রান্ত অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জ্ঞান বা তার প্রতিফল আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে। তাদের চক্রান্ত ভীষণ হলেও এমন ছিল না যাতে পর্বত টলে যেত। অর্থাৎ তা তেমন কোনো ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। আর তা দ্বারা তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কারো ক্ষতি করতেছিল না। اِنْ كَانَ এ স্থানে اِنْ শব্দটি না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لِتَزُوْلَ عَنْهُ الْجِبَالُ পর্বত টলে যেতো। কেউ কেউ বলেন, এ স্থানে اَلْجِبَالُ বা পর্বত বলতে আক্ষরিক অর্থেই পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তা দ্বারা ইসলামি শরিয়ত ও বিধিবিধান বুঝানো হয়েছে। দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব হিসেবে এ স্থানে তাকে পর্বতের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অপর এক কেরাতে لَتَزُوْلُ -এর প্রথম لَامْ অক্ষরটিতে ফাতাহ ও তার শেষে رَفْعٌ সহ পঠিত হয়েছে। এমতাবস্থায় اِنْ كَانَ -এর اِنْ শব্দটি مُخَفَّفَةٌ বা তাশদীদবিহীনরূপে লঘুকৃত বলে গণ্য হবে। এ বাক্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের চক্রান্তের ভীষণতা বুঝানো। অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত এত মারাত্মক ও ভীষণ যে তাতে অবশ্য পর্বত পর্যন্ত টলে যেতো। কেউ কেউ বলেন, اَلْمَكْر বলতে এ স্থানে তাদের কুফরিকেই বুঝানো হয়েছে– تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا এ আয়াতটি উপরিউক্ত দ্বিতীয় কেরাতটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর اِنْ كَانَ -এর স্থলে مَا كَانَ -এর কেরাত প্রথম কেরাত অর্থাৎ اِنْ শব্দটি مَا অর্থ বাচক হওয়ার কেরাতটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

٤٧. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهُ ط بِالنَّصْرِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَالِبٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ ذُو انْتِقَامٍ مِمَّنْ عَصَاهُ.

৪৭. তুমি কখনো মনে করো না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলগণকে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরাক্রমশালী কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। যারা তাঁর অবাধ্যাচরণ করে তাদের হতে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

٤٨. اُذْكُرْ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ كَمَا فِيْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَرَوٰى مُسْلِمٌ حَدِيْثَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ وَبَرَزُوْا خَرَجُوْا مِنَ الْقُبُوْرِ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

৪৮. স্মরণ কর যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, পরিষ্কার খালি এক ময়দানে মানুষকে ঐ দিন একত্র করা হবে। মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানুষ ঐ দিন কোথায় অবস্থান করবে। তিনি বলেছিলেন, পুলের উপরে। আর সকলেই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে জাহির হবে কবর হতে বের হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٩. وَتَرَى يَا مُحَمَّدُ تُبْصِرُ الْمُجْرِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِيْنَ مَشْدُوْدِيْنَ مَعَ شَيَاطِيْنِهِمْ فِى الْاَصْفَادِ الْقُيُوْدِ اَوِ الْاَغْلَالِ.

৪৯. হে মুহাম্মদ ﷺ ! সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে কাফেরদেরকে তাদের শয়তানের সাথে শৃঙ্খলে বাঁধা দেখবে। تَرَى তুমি দেখবে। مُقَرَّنِيْنَ শয়তানের সাথে বাঁধা। اَلْاَصْفَادُ পায়ের বা গলার বেড়ি।

٥٠. سَرَابِيْلُهُمْ قُمُصُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ لِاَنَّهُ اَبْلَغُ لِاِشْتِعَالِ النَّارِ وَتَغْشَى تَعْلُوْا وُجُوْهَهُمُ النَّارُ.

৫০. তাদের জামা হবে আলকাতরার আগুনে তা অতিশীঘ্র ও অধিক উত্তপ্ত হয়। আর অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। سَرَابِيْلُهُمْ তাদের জামাসমূহ। تَغْشٰى আচ্ছন্ন করে নেবে।

٥١. لِيَجْزِىَ مُتَعَلِّقٌ بِبَرَزُوْا اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ط مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ جَمِيْعَ الْخَلْقِ فِىْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ.

৫১. সকলেই উপস্থিত হবে এজন্য যে, ভালো বা মন্দ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন। لِيَجْزِىَ তা ৪৮ নং আয়াতে উল্লিখিত بَرَزُوْا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই শীঘ্র হিসাব গ্রহণকারী। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এ দুনিয়ার দিন অনুযায়ী অর্ধ দিনের ভিতর তিনি সকল সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করে নেবেন।

٥٢. هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ اَىْ اُنْزِلَ لِتَبْلِيْغِهِمْ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا بِمَا فِيْهِ مِنَ الْحُجَجِ اِنَّمَا هُوَ اَىِ اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ يَتَّعِظَ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

৫২. তা এই আল কুরআন মানুষের জন্য এক বার্তা অর্থাৎ তা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার তাবলীগ ও বার্তা পৌছানোর জন্য আর তা দ্বারা যেন তারা সতর্ক হয় এবং তাতে যে সমস্ত দলিল-প্রমাণ রয়েছে তা দ্বারা জানতে পারে যে, তিনিই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে। لِيَذَّكَّرَ তাতে মূলত ذ অক্ষরটিতে ت -এর اِدْغَامْ বা সন্ধি সাধিত হয়েছে। অর্থ যেন সে উপদেশ গ্রহণ করে। اُولُوا الْاَلْبَابِ যারা বোধশক্তির অধিকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَشْخَصُ : এ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর شُخُوْصٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো– দণ্ডের সাথে বেঁধে অপরাধীকে শাস্তি দিতে দেখা, চোখ খোলা থাকা, চোখ উঠা।

قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ : এটা হলো مُهْطِعٌ ইসমে ফায়েল -এর বহুবচন, বাবে اِفْعَالٌ হতে মাসদার اِهْطَاعٌ অর্থ– মাথানত করা, দ্রুত দৌড়ানো। এটা اَصْحَابٌ উহ্য মুযাফ থেকে حَالٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– اَصْحَابُ الْاَبْصَارِ مُهْطِعِيْنَ

قَوْلُهُ مُقْنِعِىْ : এটা বাবে اِفْعَالٌ -এর اِقْنَاعٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلٍ মূলবর্ণ (ق ـ ن ـ ع) মূলে ছিল مُقْنِعِيْنَ ইযাফতের কারণে نُوْنٌ টি পড়ে গেছে। অর্থ– উথিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَفْئِدَتُهُمْ : اَفْئِدَةٌ হলো فُؤَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ- হৃদয়, অন্তর, দিল।

قَوْلُهُ هَوَاءٌ : এটা اِسْمٌ অর্থ শূন্য, খালি, ভয়ভীতির কারণে হৃদয় শূন্য হওয়া। প্রত্যেক কল্যাণকর বস্তু থেকে খালি। هَوَاءٌ সেই শূন্য প্রান্তরকে বলা হয় যা আকাশ ও পাতালের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। পরিভাষায় ভিতু হৃদয়ের صِفَتْ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ نُجِبْ : এটা اَخِّرْنَا আমরের জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُمْ : পূর্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এটা উহ্য মানার প্রয়োজন হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبَيَّنَ : تَبَيَّنَ -এর ফায়েল دَلَالَتْ كَلَامْ -এর কারণে مُضْمَرْ রয়েছে আর তা হলো حَالٌ উহ্য ইবারত হবে এই যে, تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ

قَوْلُهُ اِنْ مَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِنْ টা হলো نَافِيَةٌ আর لِتَزُوْلَ -এর মধ্যে لَامْ টি نَفِى تَاكِيْد -এর জন্য হয়েছে। وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ لَامِ الْاُوْلٰى وَرَفْعِ الْاٰخِيْرَةِ اَىْ لِتَزُوْلَ এ সুরতে اِنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ হবে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, এদের প্রতারণা এতই কঠোর ছিল যে, পাহাড়ও স্বীয় স্থানচ্যুত হতো। لِتَزُوْلَ -এর لَامْ টা مُخَفَّفَةٌ এবং نَافِيَةٌ -এর মাঝে فَارِقَةٌ হয়েছে।

সারকথা : দ্বিতীয় কেরাত অর্থাৎ اِنْ مُخَفَّفَةٌ -এর সুরতে (لِتَزُوْلَ) কাফেরদের প্রতারণাকে মহা এবং কঠিন হওয়াকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। আর প্রথম কেরাত অর্থাৎ اِنْ نَافِيَةٌ এবং لَامْ -এর যেরসহ (لِتَزُوْلَ) তাদের প্রতারণার দুর্বলতাকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের প্রতারণা আল্লাহ তা'আলার তদবীরের মোকাবিলায় এতই দুর্বল যে, তা মনোযোগ দেওয়ারও যোগ্য নয়। না তোমাদের কোনো কিছু বিনষ্ট করতে সক্ষম। দ্বিতীয় কেরাত আল্লাহ তা'আলার বাণী- تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ الخ -এর মুনাসিব। আর প্রথম কেরাত আল্লাহ তা'আলার বাণী- مَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ -এর মুনাসিব।

قَوْلُهُ قَطِرَانٍ : قَطِرَانٌ হলো বহমান তরল বস্তু যা কালো ও ঘন হয় যাতে তীব্রতা হয়ে থাকে। যদি একে পাঁচড়াযুক্ত উটকে মালিশ করে দেওয়া হয় তবে পাঁচড়া ভালো হয়ে যায়। আগুন খুব দ্রুত এটাকে গ্রহণ করে এবং এটা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। কেউ কেউ একে গন্ধক বলেছেন। আবার কেউ কেউ একে আলকাতরা বলেছেন।

قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِبَرَزُوْا : অর্থাৎ لِيَجْزِىَ টা بَرَزُوْا -এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। তার মাঝখানের অংশটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اُنْزِلَ لِتَبْلِيْغِهِمْ : هٰذَا بَلٰغٌ -এর মধ্যে যেহেতু وَصْفٌ -এর حَمْلٌ টা ذَاتٌ -এর উপর আবশ্যক হচ্ছে। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত ইবারত উহ্য মেনেছে যাতে করে حَمْلٌ বৈধ হয়ে যায়। অর্থাৎ هٰذَا -এর খবর নয়; বর খবর উহ্য রয়েছে। খবরের ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا الخ : সূরা ইবরাহীমে পয়গাম্বর ও তাদের সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরুদ্ধাচারণকারীদের অশুভ পরিণাম এবং সবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণ করেন, তার সন্তানদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তারই সন্তানসন্ততি বনী ইসরাঈল পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বপ্রথম সম্বোধিত সম্প্রদায়।

সূরা ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুকূতে সারসংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসীদেরকেই পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এখনো চৈতন্যোদয় না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং জালেমকে কঠোর আজাবের সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিয়েছেন দেখে জালেম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাদের অপরাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত নন; বরং তারা যা কিছু করছে, সব আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও রহস্যের তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন।

لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যত ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয় তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফিলদেরকে শুনানো এবং হুঁশিয়ার করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালেমদের উপর তাৎক্ষণিক আজাব না আসা তাদের জন্য তেমন শুভ নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের আজাবে ধৃত হয়ে যাবে। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত পরকালের বিবরণ এবং ভয়াবহ দৃশ্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ অর্থাৎ অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে। وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ অর্থাৎ তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালেম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আরো কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গাম্বরদের অনুসরণ করে এ আজাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জবাবে বলা হবে, এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতঃপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধনসম্পদ ও শানশওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস বাসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগৎ অস্বীকার করেছিলে।

قَوْلُهُ وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسَاكِنِ ...... كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ : এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে وَاَنْذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীতে জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা। আশ্চর্যের বিষয় তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হলো না।

قَوْلُهُ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ الْجِبَالُ : অর্থাৎ তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কূটকৌশল করেছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কূটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণত নমরূদ, ফেরাউন, কওমে আদ, কওমে সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোকাবিলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের اِنْ শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে; কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল। 'পাহাড়' বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোনো চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে- فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ অর্থাৎ কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গাম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেওয়া হবে, যেমন- কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোনো গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে- لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا অর্থাৎ গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না; বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণ এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথা জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রং হবে রৌপ্যের মতো সাদা। এর উপর কোনো গুনাহ বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মুসনাদে আহমদে ও তাফসীরে ইবনে জারীরে উল্লিখিত হাদীসে এ বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মতো পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোনো বস্তুর চিহ্ন [গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি] থাকবে না। বায়হাকী এ আয়াতের তাফসীরে এ তথ্যটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এ পৃথিবীতে জমায়েত হবে। ভিড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সেজদায় নত হবো। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব-কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোনো পৃথিবী হবে। আয়াতে এ সত্তার পরিবর্তনই বুঝানো হয়েছে।

বয়ানুল কুরআন গ্রন্থে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পরবিরোধিতা নেই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুৎকারের পর পৃথিবীতে শুধুমাত্র গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়েদ থেকে হযরত ইকরিমা (র.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যা দ্বারা উপরিউক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই– এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত ছাওবান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ইহুদি এসে প্রশ্ন করল, যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নমের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এছাড়া বান্দার উপায় নেই যে,

زباں تازہ کردن باقرار تو
نینگیختن علت از کار تو

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে একসাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার। এটি একটি দ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে– কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনো বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক থেকে বিরত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল হিজর মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً : এতে নিরানব্বইটি আয়াত রয়েছে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

১. الٓرٰ تف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَالْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ مُظْهِرٍ لِلْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ ـ

১. আলিফ, লাম, রা এগুলোর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত। এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের অর্থাৎ আল কুরআনের বিশদভাবে বর্ণনাকারী অর্থাৎ বাতিল হতে হকের স্পষ্টতা বিধানকারী [আল-কুরআনের] اٰيٰتُ الْكِتٰبِ : এ স্থানে اَلْكِتَابُ -এর প্রতি اٰيَاتٌ শব্দটির اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধ مِنْ [হতে] অর্থব্যঞ্জক। وَقُرْاٰنٌ -এ স্থানে قُرْاٰنٌ -এর একটি صِفَتٌ বা গুণ مُبِيْنٌ [স্পষ্টতা বিধানকারী] বৃদ্ধিসহ এটাকে পূর্ববর্তী শব্দটির সাথে عَطْف বা অন্বয় করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ : প্রশ্ন. تِلْكَ-এর তাফসীর هٰذِهٖ দ্বারা করাতে কি লাভ হয়েছে?

উত্তর. قُرْبٌ حِسِّىٌّ -কে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. তবে هٰذِهٖ কেন ব্যবহার করলেন না?

উত্তর. تِلْكَ দ্বারা عُلُوْ رُتْبِىٌّ -কে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। تِلْكَ -কে هٰذِهٖ -এর অর্থে নেওয়ার কারণে উভয় ফায়দাই অর্জিত হয়েছে قُرْبٌ حِسِّىٌّ এবং عُلُوْ رُتْبِىٌّ; যদি تِلْكَ -এর স্থানে هٰذِهٖ ব্যবহার হতো, তবে শুধুমাত্র قُرْبٌ حِسِّىٌّ -এরই ফায়দা অর্জিত হতো।

قَوْلُهُ اِضَافَتْ : অর্থাৎ مِنْ اَىِّ اٰيَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ

قَوْلُهُ مُظْهِرٌ لِلْحَقِّ : প্রশ্ন. মুফাসসির (র.) সাধারণত مُبِيْنٌ -এর তাফসীর بَيِّنٌ দ্বারা করেছেন আর قَرِيْنِ قِيَاسْ ও এটাই, কিন্তু এখানে مُظْهِرٌ দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর. যেহেতু لَازِمٌ بِمَعْنٰى مُتَعَدِّىْ নেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে مُبِيْن দ্বারা مُتَعَدِّىْ অর্থই উদ্দেশ্য لَازِمٌ উদ্দেশ্য নয়। এ কারণেই মুফাসসির (র.) مُبِيْن-এর তাফসীর مُظْهِرٌ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ الصِّفَتِ : প্রশ্ন. এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ফায়দা কি?

উত্তর. এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, قُرْاٰنٌ -এর আতফ كِتَابٌ-এর উপর হচ্ছে আর উভয়টির مِصْدَاقٌ একই। কাজেই এটা عَطْفُ الشَّئِ عَلٰى نَفْسِهٖ-এর অন্তর্গত হলো, অথচ আতফটা مُغَايَرَتْ -কে কামনা করে থাকে।

উত্তর এই যে, كِتَابٌ যা মা'তূফ আলাইহি হয়েছে তা مُطْلَقٌ হয়েছে। আর قُرْاٰنٌ হলো صِفَتْ مُبِيْن -এর সাথে مُقَيَّدٌ কাজেই এটা عَطْفُ مُقَيَّدٌ عَلَى الْمُطْلَقِ -এর অন্তর্গত হলো। আর উভয়ের মধ্যে مُغَايَرَتْ সুস্পষ্ট। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। মুফাসসির (র.) عَطْفٌ بِزِيَادَةِ الصِّفَتِ বলে এ প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হিজর প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৯৯, রুকূ' ৬। হিজর নামক স্থানটি সিরিয়া এবং মদীনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যখানে অবস্থিত। এ স্থানের অধিবাসীরা তাদের নাফরমানির কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে আর এজন্য এ নামেই আলোচ্য সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালতকে অস্বীকার করে তাদের মন্দ আচরণ এবং তার পরিণাম সম্পর্কে এ সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তৌহিদ এবং কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ : আলিফ-লাম-রা। [এটি হরফে মুকাত্তাআত], এ আয়াতসমূহ মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআনেরই, যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পবিত্র কুরআন কামেল, পরিপূর্ণ কিতাব, মহান গ্রন্থ, যার মোকাবিলায় অন্য কোনো কিতাবকে কিতাবই বলা যায় না। এ কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোনো আড়ম্বরতা বা অস্পষ্টতা এতে নেই। এ মহান গ্রন্থের বর্ণনা শৈলী অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল, এই পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণসমূহ অতি উজ্জ্বল, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত, তাই পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করা এবং তা অনুধাবনে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা এতেই নিহিত রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। আলোচ্য আয়াত পবিত্র কুরআনের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

১. এটি কামেলা বা পরিপূর্ণ।

২. এটি সুস্পষ্ট, হালাল ও হারাম, হক ও বাতিল এবং হেদায়েত ও গোমরাহীকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ মহান গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ : চৌদ্দতম পারা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢. رُبَمَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ يَوَدُّ يَتَمَنَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِذَا عَايَنُوْا حَالَهُمْ وَحَالَ الْمُسْلِمِيْنَ لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ وَرُبَّ لِلتَّكْثِيْرِ فَاِنَّهُ يُكْثِرُ مِنْهُمْ تَمَنِّى ذٰلِكَ وَقِيْلَ لِلتَّقْلِيْلِ فَاِنَّ الْاَهْوَالَ تُدْهِشُهُمْ فَلَا يُفِيْقُوْنَ حَتّٰى يَتَمَنَّوْا ذٰلِكَ اِلَّا فِىْ اَحْيَانٍ قَلِيْلَةٍ ـ

২. কখনও কখনও কাফেররা চাইবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা যখন নিজেদের ও মুসলমানদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা কখনও আশা করবে যে, আহা, যদি তারা মুসলিম হতো! رُبَمَا-এটার ب অক্ষরটিতে তাশদীদসহ বা তাশদীদ ব্যতিরেকে লঘু আকারেও পাঠ করা যায়। এ স্থানে رُبَّ শব্দটি تَكْثِيْر অর্থাৎ অধিক অর্থব্যঞ্জক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এদের হতে এ ধরনের আশা অতি অধিকবার প্রকাশ পাবে। কেউ কেউ বলেন, এটা এ স্থানে تَقْلِيْل বা অল্প অর্থব্যঞ্জক। কেননা কিয়ামতের বিভিষীকা তাদেরকে ভীত বিহ্বল করে রাখবে। ফলে খুব অল্পবারই তাদের এ ধরনের আশা করতে হুঁশ হবে।

٣. ذَرْهُمْ اُتْرُكِ الْكُفَّارَ يَا مُحَمَّدُ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا بِدُنْيَاهُمْ وَيُلْهِهِمُ يُشْغِلُهُمُ الْاَمَلُ بِطُوْلِ الْعُمْرِ وَغَيْرِهِ عَنِ الْاِيْمَانِ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ اَمْرِهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ ـ

৩. এদেরকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, এ কাফেরদেরকে নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিন এরা খেতে থাকুক আর তাদের দুনিয়া উপভোগ করুক। দীর্ঘায়ু হওয়ার এবং এই ধরনের আরও আশা এদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করা হতে এদেরকে অমনোযোগী করে রাখুক শীঘ্রই এরা এদের শেষ পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারবে। এ আয়াতোক্ত বক্তব্য ছিল যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিল হওয়ার পূর্বের।

٤. وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ زَائِدَةٌ قَرْيَةٍ اُرِيْدَ اَهْلُهَا اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ اَجَلٌ مَّعْلُوْمٌ مَحْدُوْدٌ لِهَلَاكِهَا ـ

৪. আমি কোনো জনপদকে অর্থাৎ জনপদবাসীকে ধ্বংস করিনি কিন্তু তাদের জন্য ছিল অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের ছিল নির্ধারিত কাল। مِنْ قَرْيَةٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। كِتَابٌ এটা এ স্থানে اَجَلٌ বা কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَعْلُوْمٌ এস্থানে অর্থ নির্ধারিত।

٥. مَا تَسْبِقُ مِنْ زَائِدَةٌ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ يَتَاَخَّرُوْنَ عَنْهُ ـ

৫. কোনো জাতি তার নির্দিষ্ট কাল আগেও নিয়ে আসতে পারে না বা বিলম্বিত করতে পারে না। مِنْ اُمَّةٍ এ স্থানে مِنْ শব্দটি زَائِدَة অতিরিক্ত। مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ অর্থ নির্দিষ্টকাল হতে পরেও নিয়ে যেতে পারে না।

٦. وَقَالُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ يٰاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ الْقُرْاٰنُ فِىْ زَعْمِهِ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ـ

৬. তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ রাসূল ﷺ -কে বলে, ওহে যার প্রতি তার ধারণা অনুসারে উপদেশ অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই একজন উন্মাদ।

٧. لَوْمَا هَلَّا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِكَ اِنَّكَ نَبِىٌّ وَاَنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৭. তুমি নিশ্চয় একজন নবী আর এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ তোমার এ কথায় তুমি সত্যবাদী হলে, তুমি আমাদের নিকট ফেরেশতা নিয়ে আসতেছ না কেন? لَوْمَا এটা এ স্থানে هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨. قَالَ تَعَالٰى مَا نُنَزِّلُ فِيْهِ حَذْفُ اِحْدَى التَّائَيْنِ الْمَلٰئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ بِالْعَذَابِ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا اَىْ حِيْنَ نُزُوْلِ الْمَلٰئِكَةِ بِالْعَذَابِ مُّنْظَرِيْنَ مُؤَخَّرِيْنَ .

৮. সত্যসহ অর্থাৎ আজাবসহ ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হয়। তখন অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আজাবসহ অবতীর্ণ হলে তারা অবকাশ প্রাপ্ত হবে না। তাদের বিষয়ে আর বিলম্ব করা হবে না। تُنَزِّلُ এটা হতে মূলত একটি ت বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

٩. اِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدٌ لِاِسْمِ اِنَّ اَوْ فَصْلٌ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ مِنَ التَّبْدِيْلِ وَالتَّحْرِيْفِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ .

৯. আমিই উপদেশ অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং পরিবর্তন, বিকৃতি, বৃদ্ধি ও হ্রাস সাধন ইত্যাদি হতে আমিই এটার সংরক্ষক। اِنَّا نَحْنُ এ স্থানে نَحْنُ শব্দটি اِنَّ-এর اِسْم -এর تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টিবাচক শব্দ অথবা فَصْل অর্থাৎ পার্থক্যসূচক শব্দ।

١٠. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فِىْ شِيَعِ فِرَقِ الْاَوَّلِيْنَ .

১০. পূর্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট আমি তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলাম। شِيَعٌ - দলসমূহ।

١١. وَمَا كَانَ يَاْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اِسْتِهْزَاءُ قَوْمِكَ بِكَ وَهٰذَا تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ .

১১. তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আসেনি যাদের সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত না। যেমন তোমার সম্প্রদায় তোমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে থাকে। এ আয়াতটি রাসূল ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা স্বরূপ। وَيَاْتِيْهِمْ এটার পূর্বে এ স্থানে كَانَ শব্দটি উহ্য রয়েছে।

١٢. كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ اَىْ مِثْلَ اِدْخَالِنَا التَّكْذِيْبَ فِىْ قُلُوْبِ اُولٰئِكَ نُدْخِلُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ .

১২. এভাবে অর্থাৎ যেভাবে এদের হৃদয়ে আমি অস্বীকার করার প্রবণতা প্রবেশ করে দিয়েছি সেভাবে অপরাধীদের মক্কার কাফেরদের অন্তরে তার সঞ্চার করি। তা প্রবেশ করিয়ে দেই।

١٣. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَىْ سُنَّةُ اللّٰهِ فِيْهِمْ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ اَنْبِيَاءَهُمْ وَهٰؤُلَاءِ مِثْلُهُمْ .

১৩. এরা তাঁতে অর্থাৎ রাসূল ﷺ সম্পর্কে বিশ্বাস আনয়ন করবে না। আর পূর্ববর্তীগণ সম্পর্কে রীতি অর্থাৎ নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ কর্তৃক এদেরকে শাস্তি দান সম্পর্কিত রীতি অতিবাহিত হয়েছে। এরাও তাদের মতোই।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٤. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ فِى الْبَابِ يَعْرُجُوْنَ يَصْعَدُوْنَ.

১৪. যদি তাদের জন্য আকাশের কোনো এক দুয়ার খুলে দিই আর তাতে দুয়ার দিয়ে তারা দিনে আরোহণ করে। يَعْرُجُوْنَ - তারা আরোহণ করে।

١٥. لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ سُدَّتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ يُخَيَّلُ اِلَيْنَا ذٰلِكَ.

১৫. তবুও এরা বলবে, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। না, বরং আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। আমাদের নিকট এতদৃশ খেয়াল সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। سُكِّرَتْ-আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. يَسْتَأْخِرُوْنَ এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ হতে যা طَلَبٌ -এর উপর দালালত করে অথচ এখানে طَلَبٌ-এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়?।
উত্তর. এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ হলেও تَفَعُّلٌ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ : এটা হলো মুশরিকদের রদ ও ইনকারের জবাব যা মুশরিকরা "اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ" বলে কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে তাকিদের সাথে অস্বীকার করেছিল। কাজেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সত্যতাও তাকিদের সাথে اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الخ বলে ইরশাদ করেছেন।

قَوْلُهُ تَاكِيْدٌ اَوْ فَصْلٌ : অর্থাৎ نَحْنُ টা نَا اِسْمُ -এর তাকিদ অথবা এই যে, نَحْنُ-কে فَصْل আর فَصْل বলার সুরতে এই প্রশ্ন হবে যে, فَصْل দুটি اِسْم-এর মাঝে হয়ে থাকে; اِسْم এবং فِعْل -এর মধ্যে নয়। যেমনটি এখানে হয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই হবে যে, ফসল ضَمِيْرِ غَائِبٌ থেকে হয় তা ব্যতীত অন্য কিছু থেকে নয়। কাজেই আল্লামা জুরজানী (র.) اِسْم এবং فِعْل-এর মাঝেও فَصْل -কে জায়েজ বলেছেন। সম্ভবত মুসান্নেফ (র.) আল্লামা জুরজানী (র.) -এর মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ كَانَ : كَانَ বৃদ্ধি করে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, مَا حَالِيَه সেই মুযারে' -এর উপর প্রবেশ করে যা حَالٌ অর্থে হয়ে থাকে। অথবা ঐ مَاضِىْ-এর উপর প্রবেশ করে حَالٌ -এর নিকটবর্তী হয়। মুফাসসির (র.) كَانَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مَا حَالِيَه টা مَاضِىْ قَرِيْبٌ اِلَى الْحَالِ -এর উপর প্রবেশ করেছে।

قَوْلُهُ نُدْخِلُهُ : অর্থাৎ اَلْاِسْتِهْزَاءُ এখানে ، যমীরের مَرْجِعٌ হলো اِسْتِهْزَاءُ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا : থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মু'মিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরি করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া [অর্থাৎ গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা], কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া। -[তাফসীরে কুরতুবী]

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া।- [কুরতুবী] ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, দামেশকবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধনসম্পদ একত্র করেছিল। সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদি জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হয়?

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরি করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الخ :

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্কবিতর্ক ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদি পণ্ডিত আগমন করল। সে আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির প্রাঞ্জল, অলঙ্কারপূর্ণ এবং বিজ্ঞসুলভ। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইহুদি? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন, আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করব।

সে উত্তরে বলল, আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামি ফিকহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তিই, যে বিগত বছর এসেছিলেন,? সে বলল, হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদিদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিনটি কপি কমবেশ করে লিখে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রিস্টানরা খুব খাতির-যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কুরআনের বেলায় আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কমবেশ করে দিলাম! এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কিনা,. যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশকম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাজি ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম বলেন, ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলিম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়! কারণ কুরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন, কুরআনে পাক যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে- بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ - ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হেফাজতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআন পাক

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাজত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নোক্তা এবং যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রিসালাতের আমলের পর আজ চৌদ্দশ বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামি ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআন পাক মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের পূর্বে ও পশ্চিমে পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক-বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোনো বড় থেকে বড় আলেমেরও সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

হাদীস সংরক্ষণও কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত : বিদ্বান মাত্রেই এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন শুধু কুরআনি শব্দাবলির নাম নয় এবং শুধু অর্থসম্ভারও কুরআন নয়; বরং শব্দাবলি ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। কারণ এই যে, কুরআনের অর্থসম্ভার এবং বিষয়বস্তু তো অন্যান্য গ্রন্থেও বিদ্যমান আছে। বলতে কি, ইসলামি গ্রন্থাবলিতে সাধারণত কুরআনি বিষয়বস্তুই থাকে। তাই বলে এগুলোকে কুরআন বলা হয় না। কেননা এগুলোতে কুরআনের শব্দাবলি থাকে না। এমনিভাবে যদি কেউ কুরআনের বিচ্ছিন্ন শব্দ ও বাক্যাবলি নিয়ে একটি রচনা অথবা পুস্তিকা লিখে দেয়, তবে একেও কুরআন বলা হবে না; যদিও এতে একটি শব্দও কুরআনের বাইরের না থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন শুধুমাত্র ঐ আল্লাহর মাসহাফ তথা গ্রন্থকেই বলা হয়, যার শব্দাবলি ও অর্থসম্ভার একসাথে সংরক্ষিত রয়েছে।

এ থেকে এ মাসআলাটি জানা গেল যে, উর্দু, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় কুরআনের শুধু অনুবাদ প্রকাশ করে তাকে উর্দু অথবা ইংরেজি কুরআন নাম দেওয়ার যে প্রবণতা প্রচলিত রয়েছে, এটা কিছুতেই জায়েজ নয়। কেননা এটা কুরআন নয়। যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, কুরআন শুধু শব্দাবলির নাম নয়; বরং অর্থসম্ভারও এর একটি অংশ, তখন আলোচ্য আয়াতে কুরআন সংরক্ষণের অনুরূপ অর্থসম্ভার সংরক্ষণ তথা কুরআনকে যাবতীয় অর্থগত পরিবর্তন থেকে সংরক্ষিত রাখার দায়িত্বও আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, কুরআনের অর্থসম্ভার তাই, যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রেরিত হয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে- لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ আপনাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে আপনি লোকদেরকে ঐ কালামের মর্ম বলে দেন, যা তাদের জন্য নাজিল করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই- يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে বলেছেন- إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যখন কুরআনের অর্থ বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, তখন তিনি উম্মতকে যেসব উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, সেসব উক্তি ও কর্মের নামই হাদীস।

যে ব্যক্তি রাসূলের হাদীসকে ঢালাওভাবে অরক্ষিত বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কুরআনকেই অরক্ষিত বলে। আজকাল কিছু সংখ্যক লোক সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট যে, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়কালের অনেক পর সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে।

প্রথমত তাদের এরূপ বলাও শুদ্ধ নয়। কেননা হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলদারিতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ করেছে মাত্র। এছাড়া হাদীস প্রকৃতপক্ষে কুরআনের তাফসীর ও যথার্থ মর্ম। এর সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভব যে, কুরআনের শুধু শব্দাবলি সংরক্ষিত থাকবে আর অর্থসম্ভার [অর্থাৎ হাদীস] বিনষ্ট হয়ে যাবে?

قَوْلُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الخ : شِيَعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কারো অনুসারী ও সাহায্যকারী। বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদে ঐকমত্য পোষণকারী সম্প্রদায়কেও شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি। এখানে إِلَى অব্যয়ের পরিবর্তে فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রাসূল তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তাঁর উপর আস্থা রাখা লোকদের পক্ষে সহজ হয় এবং রাসূল ও তাদের স্বাভাব ও মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে তাদের সংশোধনের যথোপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারেন।

Free @ www.eelm.weebly.com

১৬. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا اثْنَى عَشَرَ الْحَمَلُ وَالثَّوْرُ وَالْجَوْزَاءُ وَالسَّرَطَانُ وَالْاَسَدُ وَالسُّنْبُلَةُ وَالْمِيْزَانُ وَالْعَقْرَبُ وَالْقَوْسُ وَالْجُدْىُ وَالدَّلْوُ وَالْحُوْتُ وَهِىَ مَنَازِلُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ اَلْمَرِيْخُ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهَرَةِ وَلَهَا الثَّوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعَطَارِدٍ وَلَهُ الْجَوْزَاءُ وَالسُّنْبُلَةُ وَالْقَمَرِ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسِ وَلَهَا الْاَسَدُ وَالْمُشْتَرِىْ وَلَهُ الْقَوْسُ وَالْحُوْتُ وَزَحَلٍ وَلَهُ الْجُدْىُ وَالدَّلْوُ وَزَيَّنَّاهَا بِالْكَوَاكِبِ لِلنَّاظِرِيْنَ .

১৭. وَحَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيْمٍ مَرْجُوْمٍ .

১৮. اِلَّا لَكِنْ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ خَطْفَةً فَاَتْبَعَهُ لَحِقَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ كَوْكَبٌ مُضِيْئٌ يُحْرِقُهُ اَوْ يَثْقُبُهُ اَوْ يَخْبِلُهُ .

১৯. وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا بَسَطْنَاهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ جِبَالًا ثَوَابِتَ لِئَلَّا تَتَحَرَّكَ بِاَهْلِهَا وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ مَعْلُوْمٍ مُقَدَّرٍ .

২০. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ بِالْيَاءِ مِنَ الثِّمَارِ وَالْحُبُوْبِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ فَاِنَّمَا يَرْزُقُهُمُ اللّٰهُ .

অনুবাদ :

১৬. আমি আকাশে বারোটি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এগুলো হলো মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। এগুলো হলো সাতটি নক্ষত্রের অবস্থান স্থল। মঙ্গলের জন্য হলো মেষ ও বৃশ্চিক, শুক্রের জন্য হলো বৃষ ও তুলা, বুধের জন্য হলো মিথুন ও কন্যা, চন্দ্রের জন্য হলো কর্কট, সূর্যের জন্য হলো সিংহ, বৃহস্পতির জন্য হলো ধনু ও মীন, শনির জন্য হলো মকর ও কুম্ভ। এবং উহাকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা করেছি সুশোভিত দর্শকদের জন্য।

১৭. এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি অগ্নিশিখা দ্বারা তা রক্ষা করি। رَجِيْمٍ অর্থ مَرْجُوْمٍ বা বিতাড়িত।

১৮. তবে কেউ ছোঁ মারার মতো হঠাৎ চুরি করে আকাশের সংবাদ শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে গিয়ে আঘাত করে প্রদীপ্ত শিক্ষা। জ্বলন্ত নক্ষত্র তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয় বা এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলে বা স্মৃতিভ্রষ্ট পাগল বানিয়ে দেয়। اِلَّا এটা এস্থানে لَكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯. পৃথিবীকে আমি বিলম্বিত করেছি। বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা সৃষ্টি যাতে তা না দোলে আর তাতে প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছি সুপরিমিতভাবে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে। رَوَاسِىَ অর্থ– সুদৃঢ় পর্বতসমূহ।

২০. এবং তাতে ফল-ফলাদি ও শস্য দানের মাধ্যমে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমাদের জন্য এমন বস্তুও সৃষ্টি করেছি তোমরা যাদের রিজিকদাতা নও যেমন, দাস-দাসী, জন্তু ও গৃহপালিত পশুসমূহ! এই সকল কিছুকে আল্লাহ তা'আলাই রিজিক দিয়ে থাকেন। مَعَايِشَ এ শব্দটি ش-এর পূর্বে ى সহ পঠিত।

٢١. وَاِنْ مَا مِنْ زَائِدَةٌ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهِ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ عَلٰى حَسْبِ الْمَصَالِحِ .

২১. এমন কোনো জিনিস নেই যার ভাণ্ডার অর্থাৎ ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আমার নিকট নেই; কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণেই আমি তা অবতীর্ণ করে থাকি। وَاِنْ এ اِنْ শব্দটি এ স্থানে না-বোধক শব্দ مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنْ شَىْءٍ এ مِنْ শব্দটি এস্থানে زَائِدَة বা অতিরিক্ত।

٢٢. وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ تُلَقِّحُ السَّحَابَ فَيَمْتَلِئُ مَاءً فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ السَّحَابِ مَاءً مَطَرًا فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِيْنَ اَىْ لَيْسَتْ خَزَائِنُهُ بِاَيْدِيْكُمْ .

২২. আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু অর্থাৎ যে বায়ু মেঘ বহন করে এবং পানিতে ভরে যায় সেই বায়ু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হতে অর্থাৎ মেঘ হতে পানি অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই অথচ তোমরা তার ভাণ্ডারী নও অর্থাৎ তার ভাণ্ডার তোমাদের হাতে নেই।

٢٣. وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ الْبَاقُوْنَ نَرِثُ جَمِيْعَ الْخَلْقِ .

২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই তো উত্তরাধিকারী অর্থাৎ অবিনশ্বর এবং সকল সৃষ্টির আমিই উত্তরাধিকারী হবো। কারণ একমাত্র আমিই বাকি থাকব।

٢٤. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ اَىْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْخَلْقِ مِنْ لَّدُنْ اٰدَمَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

২৪. আদম হতে যে সমস্ত সৃষ্টি তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা পরে আসবে তাদেরকেও জানি।

٢٥. وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ط اِنَّهُ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهِ عَلِيْمٌ بِخَلْقِهِ .

২৫. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাদেরকে একত্র সমাবেশ করবেন। তিনি তাঁর কর্মে প্রজ্ঞাময়, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بُرُوْجًا : بُرُوْجٌ শব্দটি بُرْجٌ-এর বহুবচন। যার অর্থ হলো প্রকাশ হওয়া। تَبَرُّجٌ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে তথা নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ করাকে تَبَرُّجٌ বলা হয়। এখানে আকাশের তারকাগুলোকে بُرْج বলা হয়েছে। কেননা সেগুলোও উঁচু এবং প্রকাশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় মুফাসসিরীনের মতে سَبْع سَيَّارَه -এর ১২টি মঞ্জিলের নাম হলো بُرْج ইলমে হাইয়াতে এটাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَلْمِرِّيْخ : এটা سَبْع سَيَّارَه-এর বর্ণনা।

قَوْلُهُ اَلْمِرِّيْخ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ : حَمَل এবং عَقْرَبْ-এর مِرِّيْخ মঞ্জিলে হওয়ার অর্থ হলো এই যে, مِرِّيْخ এ উভয় মঞ্জিলেই প্রবেশ করে। তাফসীর এবং হিকমতের কিতাবে এটা লেখা রয়েছে যে, সূর্যের ১২টি برج রয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, সূর্য এগুলোর সামনা-সামানি পতিত হয়। অর্থ এটা নয় যে, সূর্য তাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য তারকারাজিরও এ অবস্থা; কাজেই উভয় মতাদর্শের মধ্যে কোনোই বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهُ مَرْجُوْم : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَعِيْل টা مَفْعُوْل অর্থে হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لٰكِنْ : এখানে اِلَّا-এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ হয়েছে। কেননা اِسْتِرَاق টা حفظ-এর جِنْس-এর থেকে নয়।

قَوْلُهُ خَطْفَةً : এখানে اِسْتِرَاق-এর তাফসীর خَطْفَةً দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হলো এই যে, سَمْعٌ একটি সিফাত যা سَامِعٌ-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এর স্থানান্তর সম্ভব নয়। সুতরাং اِسْتَرَقَ السَّمْعَ-এর কি অর্থ?

উত্তর. اِسْتِرَاقٌ অর্থ হলো اَلْاِخْتِلَاسُ سِرًّا তথা চুপিসারে ছো-মেরে নিয়ে নেওয়া। এটা তাশবীহের ভিত্তিতে হয়েছে। কাজেই কোনো প্রশ্ন বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ لَحِقَهُ : اَتْبَعَهُ-এর তাফসীর لَحِقَهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اِفْعَالْ টা مُجَرَّد لَازِمْ অর্থে হয়েছে। কাজেই অর্থ বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَخْبِلُهُ : এটা خَبْلٌ থেকে হয়েছে। এর অর্থ হলো স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত করা, পাগল বানানো। শয়তান অগ্নিশিখা নিক্ষেপের ফলে স্তম্ভিত হয়ে জঙ্গলের ভূতে পরিণত হয়ে যায় যা মানুষদেরকে জঙ্গলে ভীতি প্রদর্শন করে থাকে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا لَكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَنْ لَسْتُمْ-এর আতফ مَعَايِشَ-এর উপর হয়েছে। কাজেই এই সন্দেহ শেষ হয়ে গেল যে, مَنْ لَسْتُمْ-এর আতফ لَكُمْ-এর ضَمِيْر مَجْرُوْر-এর উপর হয়েছে আর ضَمِيْر مَجْرُوْر-এর উপর حَرْف جَار-এর পুনরাবৃত্তি ছাড়া আতফ বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ الخ : بُرُوْجٌ শব্দটি بُرْجٌ-এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ সালেহ প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে بروج-এর তাফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বুঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিক কালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগোত্র এবং আকাশের অনেক নিচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল– এই উভয় অর্থে سَمَاء শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত; কুরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে سَمَاء শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত এর চূড়ান্ত আলোচনা কুরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ সূরা ফোরকানের আয়াত تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا الخ-এর তাফসীরে করা হবে।

قوله وحفظنها من كل الخ : **উল্কাপিণ্ড** : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত হয় প্রমাণিত যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলিসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলিসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এত দ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ বাক্য থেকেও বুঝা যায় যে, এরা চোরের মতো শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বেও জিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌছে তারা কিছু সংবাদ শুনে নিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের অসম্ভব প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও নয় যে, ফেরেশতাগণ কোনো সময় আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলতেন এবং তারা তা শুনে ফেলত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নিচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূরা জিনের اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

Free @ www.eelm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতসমূহের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে উল্কাপিণ্ড। কুরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে শয়তানদেরকে মারার জন্য উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হতো এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উল্কার সৃষ্টি? এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তাঁরা বলেন, সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। উপরে পৌঁছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোনো কারণে, অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোনো তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয় উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে 'তারকা খসে যাওয়া' বলেই ব্যক্ত করা হয়। আরবি ভাষায়ও এর জন্য اِنْقِضَاضُ كَوْكَبٍ [তারকা খসে যাওয়া] শব্দ ব্যবহার করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্বলিত হওয়া এবং কোনো তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভবপর। এমনটা সম্ভপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায় ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা যায়।

আল্লামা আলূসী (র.) তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন, উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হলো, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে আকাশে তারকা খরেস পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলিয়াহ যুগে অর্থাৎ ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তাঁরা বললেন, আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোনো ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোনো মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন, এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কুরআনের পরিপন্থি নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোনো তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কুরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا الخ :

আল্লাহর রহস্য, জীবিকার প্রয়োজনাদিতে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ -এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম হলে জীবনধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশি হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশি উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে তা পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফলমূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাজিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ -এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে; কিন্তু এগুলোর

বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

সব সৃষ্টজীবনে পানি সরবরাহ করার অভিনব ব্যবস্থা : وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ থেকে مَا اَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِيْنَ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীবজন্তু, পশুপক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজনমাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল, ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারো কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং কারো কাছে তা দাবিও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প থেকে বৃষ্টির উপকরণ [মৌসুমি বায়ু] সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীবজন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত– এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌঁছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে যেসব উড়োজাহাজ তৈরি হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাণ্ডারই নয়; বরং মৌসুমি পানির বায়ুও উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠাপানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এদিকে ইঙ্গিত আছে– وَاَسْقَيْنٰكُمْ مَّاءً فُرَاتًا এখানে فُرَاتٌ শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি, যা দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি।

সূরা ওয়াকেআয় বলা হয়েছে– اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۔ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ - لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ পানিকে দেখ, যা তোমরা পান কর। একে তোমরা মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে একে লোনা করে দিতে পারি। তথাপি তোমারা অনুগ্রহ স্বীকার কর না কেন?

এ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর কুদরতের লীলা দেখলাম যে, সমুদ্রের পানিকে মিঠা পানিতে পরিণত করে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে মেঘমালার সাহায্যে কি চমৎকারভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন! ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শুধু মানুষই নয়, অগণিত জীবজন্তু ঘরে বসে পানি পেয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমনকি অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক কারণে অবধারিতভাবেই তাদের কাছে পানি পৌঁছে গেছে।

কিন্তু মানুষ ও জীবজন্তুর সমস্যার সমাধান এতটুকুতেই হয়ে যায় না। কারণ পানি তাদের এমন একটি প্রয়োজন, যার চাহিদা প্রত্যহ ও প্রতিনিয়ত। তাই তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল এই যে, সর্বত্র প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক দিনে বৃষ্টিপাত হতো। এমতাবস্থায় তাদের পানির প্রয়োজন তো মিটে যেত কিন্তু জীবিকা নির্বাহের অপরাপর প্রয়োজনাদিতে যে কি পরিমাণ ত্রুটি দেখা দিত, তা অনুমান করা অভিজ্ঞজনের পক্ষে কঠিন নয়। বছরের প্রত্যেক দিন বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাস্থ্যের অপরিসীম ক্ষতি হতো এবং কাজ-কারবার ও চলা-ফেরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হতো।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এই যে, বছরের বিশেষ বিশেষ মাসে এ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হতো যে, পানি তার অবশিষ্ট মাসগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন হতো প্রত্যেকের জন্য একটি কোটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং তার অংশের পানির হেফাজত তার দায়িত্বে সমর্পণ করা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

চিন্তা করুন, এরূপ করা হলে প্রত্যেকেই এতগুলো চৌবাচ্চা অথবা পাত্র কোথা থেকে যোগাড় করত, যেগুলোর মধ্যে তিন অথবা ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি জমা করে রাখা যায় যদি কোনোরূপ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেও নেওয়া হতো, তবুও দেখা যেত যে, কয়েকদিন অতিবাহিত হলেই এ পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পান করার উপযুক্ত থাকত না। তাই আল্লাহর কুদরত পানিকে ধরে রাখার এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সর্বত্র সুলভ করার অপর একটি অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তা এই যে, আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করা হয়, তার কিছু অংশ তো তাৎক্ষণিকভাবেই গাছপালা, ক্ষেত-খামার মানুষ ও জীব-জন্তুকে সিক্ত করার কাজে লেগে যায়, কিছু পানি উন্মুক্ত পুকুর, বিল-ঝিল ও নিম্নভূমিতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অতঃপর একটি বৃহৎ অংশকে বরফের স্তূপে পরিণত করে পাহাড়-পর্বতের শৃঙ্গে সঞ্চিত রাখা হয়। সেখানে ধুলাবালি আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই পৌঁছতে পারে না। যদি তা পানির মতো তরল অবস্থায় থাকত তবে বাতাসের সাহায্যে কিছু ধুলাবালি অথবা অন্য কোনো দূষিত বস্তু সেখানে বস্তু সেখানে পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। তাতে পশু-পক্ষীদের পতিত হওয়া ও মরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। ফলে পানি দূষিত হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতি এ পানিকে জমাট বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গে উঠিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে অল্প পরিমাণে চুয়ে-চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে এবং ঝরনার আকারে সর্বত্র পৌঁছে যায়। যেখানে ঝরনা নেই সেখানে মৃত্তিকার স্তরে মানুষের ধমনির ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে হাজারো নিয়ামত লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথমত পানি সৃষ্টি করাই একটি বড় নিয়ামত। অতঃপর মেঘমালার সাহায্যে একে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানো দ্বিতীয় নিয়ামত। এরপর একে মানুষের পানের উপযোগী করা তৃতীয় নিয়ামত। এরপর মানুষকে তা পান করার সুযোগ দেওয়া চতুর্থ নিয়ামত। এরপর তা থেকে মানুষকে পান ও সিক্ত হওয়ার সুযোগ দান করা ষষ্ঠ নিয়ামত। কেননা পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমন আপদবিপদ দেখা দিতে পারে যদ্দরুন মানুষ পানি পান করতে সক্ষম না হয়। কুরআন পাকের فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ আয়াতে এসব নিয়ামতের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

সৎকাজে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য : وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مُسْتَقْدِمِينَ [অগ্রগামী দল] ও مُسْتَأْخِرِينَ [পশ্চাদ্‌গামী দল] -এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত কাতাদাহ ও ইকরিমা (র) বলেন, যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি তারা পশ্চাদ্‌গামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহহাক বলেন, যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদ্‌গামী। মুজাহিদ বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদ্‌গামী। হাসান ও কাতাদাহ বলেন, ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী, গুনাহগাররা পশ্চাদ্‌গামী। হাসান বসরী, সাইদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে যারা নামাজের কাতারে অথবা জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরি করে, তারা পশ্চাদ্‌গামী। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এ আয়াত থেকে নামাজের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি লোকেরা জানত যে, আজান দেওয়া ও নামাজের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফজিলত কতটুকু তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হতো এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারি যোগে স্থান নির্ধারিত করতে হতো।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সিজদায় গেলে পেছনের সবার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এজন্যই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহর কোনো এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে।

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফজিলত নিহিত, যেমন কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক দিয়ে একপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোনো নেক বান্দার বরকতে তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাজের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اٰدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِيْنٍ يَابِسٍ تُسْمَعُ لَهٗ صَلْصَلَةٌ اَىْ صَوْتٌ اِذَا نُقِرَ مِّنْ حَمَاٍ طِيْنٍ اَسْوَدٍ مَّسْنُوْنٍ مُتَغَيِّرٍ .

২৬. আমি তো মানুষ অর্থাৎ আদমকে সৃষ্টি করেছি বিবর্তিত শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে। صَلْصَالٍ -শুষ্ক মৃত্তিকা। যাতে আঘাত করলে ঠনঠন করার আওয়াজ শোনা যায়। حَمَاٍ-অর্থ কালো মাটি। مَسْنُوْنٍ-অর্থ পরিবর্তিত, বিবর্তিত।

٢٧. وَالْجَانَّ اَبَا الْجِنِّ وَهُوَ اِبْلِيْسُ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلِ خَلْقِ اٰدَمَ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ هِىَ نَارٌ لَا دُخَانَ لَهَا تَنْفُذُ فِى الْمَسَامِ .

২৭. এবং এটার পূর্বে অর্থাৎ আদম সৃষ্টির পূর্বে জিন অর্থাৎ জিনদের আদি পিতা ইবলীসকে সৃষ্টি করেছি অত্যুষ্ণ অগ্নি হতে। اَلسَّمُوْمُ-অর্থ এমন উষ্ণ অগ্নি যাতে ধোঁয়া নেই এবং লোমকূপের ভিতর যা ভেদ করে যায়।

٢٨. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ .

২৮. আর স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি বিবর্তিত শুষ্ক ঠনঠনে কাল মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করতেছি।

٢٩. فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ اَتْمَمْتُهٗ وَنَفَخْتُ اَجْرَيْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَصَارَ حَيًّا وَاِضَافَةُ الرُّوْحِ اِلَيْهِ تَشْرِيْفٌ لِاٰدَمَ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ .

২৯. যখন আমি তাকে সুঠাম করব পূর্ণাঙ্গ করব এবং তাতে অমার রূহ ফুৎকার করব সঞ্চার করব, অনন্তর তা জীবন্ত হয়ে উঠবে তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হও। অর্থাৎ ঝুঁকিয়ে অভিবাদনমূলক সেজদা করিও। رُوْحِىْ -আমার রূহ, এস্থানে رُوْح [রূহ] শব্দটিকে আদমের মর্যাদাবিধানার্থে আল্লাহর প্রতি اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ করা হয়েছে।

٣٠. فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ فِيْهِ تَاكِيْدَانِ .

৩০. তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সেজদা করল, এস্থানে كُلُّهُمْ ও اَجْمَعُوْنَ-এ দুটি تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টিবোধক শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে।

٣١. اِلَّا اِبْلِيْسَ ط هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ اَبٰى اِمْتَنَعَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ .

৩১. কিন্তু ইবলিস অর্থাৎ জিনদের আদি পিতা তা করল না। সে ফেরেশতাদের মধ্যেই বসবাস করত। সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। তা হতে বিরত রইল।

٣٢. قَالَ تَعَالٰى يٰاِبْلِيْسُ مَالَكَ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا زَائِدَةٌ تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ .

৩২. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইবলিস! তোমার কি হলো কি জিনিস তোমাকে বাধা দিল যে, সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? اَلَّا-মূলত ছিল اَنْ لَا এ স্থানে لَا শব্দটি زَائِدَة অতিরিক্ত।

٣٣. قَالَ لَمْ اَكُنْ لِاَسْجُدَ لَا يَنْبَغِى لِىْ اَنْ اَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ.

৩৩. সে বলল, আপনি বিবর্তিত শুষ্ক কাল মৃত্তিকা হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি তাকে সেজদা করার নই। তাকে সেজদা করা আমার জন্য উচিত নয়।

٣٤. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا اَىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ مَطْرُوْدٌ.

৩৪. তিনি আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান হতে অর্থাৎ জান্নাত হতে কেউ কেউ অর্থ করেন আকাশ হতে বের হয়ে যাও। কারণ তুমি অভিশপ্ত। বিতাড়িত।

٣٥. وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ.

৩৫. কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রইল অভিশাপ। اَلدِّيْنِ এস্থানে অর্থ কর্মফল।

٣٦. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ اَىِ النَّاسُ.

৩৬. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যেদিন মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

٣٧. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ.

৩৭. তিনি বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের মধ্যে হলে,

٣٨. اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَقْتِ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى.

৩৮. নির্ধারিত উপস্থিত হওয়ার দিন অর্থাৎ প্রথম শিঙ্গা ফুৎকারের দিন পর্যন্ত।

٣٩. قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ اَىْ بِاِغْوَائِكَ لِىْ وَالْبَاءُ لِلْقَسَمِ وَجَوَابُهُ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ الْمَعَاصِىَ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

৩৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন তার শপথ, আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্ম শোভন করে তুলব এবং তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ এ স্থানে ب টি قَسَمِيَه বা শপথ অর্থব্যঞ্জক। আর مَا টি مَصْدَرِيَه অর্থাৎ ক্রিয়ার উৎস শব্দব্যঞ্জক। لَاُزَيِّنَنَّ -এটা উপরিউক্ত কসমের জওয়াব।

٤٠. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৪০. তবে তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাদের নয়। অর্থাৎ মু'মিনদেরকে নয়।

٤١. قَالَ تَعَالٰى هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ وَهُوَ

৪১. আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ।

٤٢. اِنَّ عِبَادِىْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ قُوَّةٌ اِلَّا لٰكِنْ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৪২. বিভ্রান্তদের মধ্যে অর্থাৎ কাফেরদের মধ্যে যারা তোমার অনুকরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর অর্থাৎ মু'মিদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। سُلْطَانٌ অর্থ ক্ষমতা। اِلَّا এটা এস্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٣. وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ اَىْ مَنِ اتَّبَعَكَ مَعَكَ.

৪৩. অবশ্যই এদের সকলের অর্থাৎ তোমার সাথে যারা তোমার অনুসরণ করেছে তারা সকলের নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٤. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ط أَطْبَاقٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهَا مِنْهُمْ جُزْءٌ نَصِيبٌ مَقْسُومٌ .

৪৪. তার সাতটি দরজা স্তর আছে, এর প্রতিটি দরজার জন্য তাদের মধ্য হতে বণ্টিত অংশ রয়েছে।

جُزْءٌ অর্থ– অংশ, হিস্যা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ادم : এখানে اَلْاِنْسَانَ-এর তাফসীর اٰدَمَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْاِنْسَانَ-এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টি عَهْد হয়েছে।

قَوْلُهُ حَمَإٍ : এর অর্থ– কাদা, কালো মাটি।

قَوْلُهُ تَنْفُذُ فِي الْمَسَامِ : এতে مَسْنُوْن-এর وَجه تَسْمِيَة-এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَعُوْا : এটা وَقَعَ يَقَعُ হতে اَمْر-এর جَمع مُذَكَّر حَاضِر-এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা সকলে পতিত হও। جَوَاب شَرْط হওয়ার কারণে শুরুতে فَاء যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَاكِيْدَانِ : প্রথম تَاكِيْد টা اِطْلَاقُ الْجَمْعِ عَلَى الْبَعْضِ-এর সম্ভাবনাকে শেষ করে দিয়েছে। যেমন اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ-এর মধ্যে বহুবচনের اِطْلَاق কতেকের উপর হয়েছে। কিন্তু اِنْفِرَاد-এর সম্ভাবনা অবশিষ্ট রয়েছে। এটাকে اَجْمَعُوْنَ বলে নিরসন করে দিয়েছে। আয়াতের مَفْهُوْم এটা হবে যে, সকল ফেরেশতা সেজদা করেছেন। মনে হয় যেন হুকুমটা বিদ্যমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, যাতে ইবলিসও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

قَوْلُهُ بِاِغْوَائِكَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে بِمَا اَغْوَيْتَنِيْ -এর মধ্যে مَا টা হলো مَصْدَرِيَه মওসূলাহ নয় যে, عَائِد-এর প্রয়োজন পড়বে। আর بَاء হলো قَسَمِيَّه অর্থাৎ শপথ তোমার আমাকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে।

قَوْلُهُ اُزَيِّنَنَّ : এটা বাবে تَفْعِيْل-এর تَزْيِيْن মাসদার হতে مُضَارِع بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه-এর وَاحِد مُتَكَلِّم-এর সীগাহ অর্থ– আমি অবশ্যই সৌন্দর্য দান করব, সজ্জিত করব।

قَوْلُهُ الْمَعَاصِيَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اُزَيِّنَنَّ টা مُتَعَدِّىْ হয়েছে। আর তার মাফউল مَعَاصِيْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مُخْلَصِيْنَ : অর্থাৎ اَخْلَصْتَهُ لِعِبَادَتِكَ

قَوْلُهُ هٰذَا : অর্থাৎ تَخَلُّصُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اِغْوَائِكَ

قَوْلُهُ صِرَاطٌ عَلَيَّ : অর্থাৎ حَقٌّ عَلَيَّ

قَوْلُهُ وَهُوَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, هُوَ-এর مَرْجِع হলো اِنَّ عِبَادِيْ الخ আর اِنَّ عِبَادِيْ হলো صِرَاط مُسْتَقِيْم-এর بَيَان-

قَوْلُهُ اَطْبَاقٍ : এটা طَبَق-এর বহুবচন অর্থাৎ মর্যাদা যাতে শয়তানের মর্যাদার অনুসরণের হিসেবে জাহান্নামিদেরকে প্রবেশ করানো হবে। আর তারতীবের হিসেবে জাহান্নামের মর্যাদা সাতটি– ১. জাহান্নাম ২. লাযা ৩. হুতামা ৪. আস সা'ঈর ৫. আস সাকার ৬. আল জাহীম ৭. আল হাবিয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ الخ : মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা : রূহ [আত্মা] কোনো যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ– এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আব্দুর রউফ মানাভী বলেন, এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকের উক্তি এই যে, রূহ কোনো যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রাযী এ মতের পক্ষে বারোটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলেমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نَفَخَ শব্দের অর্থ ফুঁক মারা অথবা সঞ্চার করা। উপরিউক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুঁকে দেওয়া অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে রূহ ফুঁকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

রূহ ও নফস সম্পর্কে কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি (র)-এর তথ্যানুসন্ধান : এখানে দীর্ঘ আলোচনা ছেড়ে একটি বিশেষ তথ্যের উপর আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। এটি কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি তাফসীরে মাযহারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) বলেন, রূহ দু প্রকার– স্বর্গজাত ও মর্তজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর-নিচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই– কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা– এগুলো আদেশ জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কুরআনে قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্তজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়। এ মর্তজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা মর্তজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরিউক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্য কিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে; তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্তজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক উর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্তজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্তজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্তজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিণ্ডের জীবন ও ঐসব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্তজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্তজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াকেই نَفْخِ رُوْحٍ তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোনো বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِنْ رُوْحِىْ বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মার উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশেই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এজন্যই কুরআন পাকে মানব সৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্তজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রিফতের নূর, ইশক-মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্যপাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গে লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

আল্লাহর দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহর সঙ্গ লাভের কারণেই আল্লাহর রহস্য দাবি করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। আল্লাহ বলেন– فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ [তারা সবাই তার প্রতি সেজদায় অবনত হলো।]

Free@www.e-ilm.weebly.com

ফেরেশতাগণ সেজদা করতে আদিষ্ট হয়েছিল, ইবলীসকে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে সূরা আ'রাফে ইবলিসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের সাথে ইবলিসকেও সেজদার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, সেজদার আদেশ মূলত ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইবলিসও যেহেতু ফেরেশতাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই প্রসঙ্গত সেও আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা আদমের সম্মানার্থে যখন আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য সৃষ্টি যে প্রসঙ্গত এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই ইবলীস উত্তরে একথা বলেনি যে, আমাকে যখন সেজদা করার আদেশ দেওয়াই হয়নি, তখন পালন না করার অপরাধও আমার প্রতি আরোপিত হয় না। কুরআন পাকে اَبٰى اَنْ يَسْجُدَ [সে সেজদা করতে অস্বীকৃত হলো] বলার পরিবর্তে اَبٰى اَنْ يَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ [সে সেজদাকারীদের সাথে শামিল হতে অস্বীকৃত হলো] বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল সেজদাকারী তো ফেরেশতারাই ছিল, কিন্তু ইবলীস যেহেতু তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই যুক্তিগতভাবে তারও সেজদাকারী ফেরেশতাদের সাথে শামিল হওয়া অপরিহার্য ছিল। শামিল না হওয়ার কারণে তার প্রতি ক্রোধ বর্ষিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাগণ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ : اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানি কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদম কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন বলে- اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا [আলে ইমরান]। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোনো সময় বুঝতেই পারে না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোনো ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ করে ফেলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলি এ তথ্যের পরিপন্থি নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্ত যে গুনাহ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাত দরজা : لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর, তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলী (রা.) -এর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর্রি নিচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মতো সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٥. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَّعُيُوْنٍ تَجْرِيْ فِيْهَا وَيُقَالُ لَهُمْ

৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকিরা অবস্থান করবে জান্নাতে উদ্যানে ও প্রস্রবণসমূহে। জান্নাতে এগুলো প্রবাহিত থাকবে।

٤٦. اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ اَيْ سَالِمِيْنَ مِنْ كُلِّ مَخُوْفٍ اَوْ مَعَ سَلَامٍ اَيْ سَلِّمُوْا وَادْخُلُوْا اٰمِنِيْنَ مِنْ كُلِّ فَزَعٍ

৪৬. তাদেরকে বলা হবে তোমরা শান্তির সাথে ও সকল বিপদ হতে নিরাপত্তার সাথে এতে প্রবেশ কর। بِسَلَامٍ - অর্থাৎ সকল প্রকার ভীতিকর বসন্ত হতে নিরাপদ হয়ে কিংবা এর অর্থ সালামসহ অর্থাৎ সালাম প্রদান কর এবং তাতে প্রবেশ কর।

٤٧. وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ حِقْدٍ اِخْوَانًا حَالٌ مِنْ هُمْ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ حَالٌ اَيْضًا اَيْ لَا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى قَفَا بَعْضٍ لِدَوَرَانِ الْاَسِرَّةِ بِهِمْ

৪৭. আর তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা বের করে দিব, তারা ভাই ভাই রূপে পরস্পর মুখামুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। তাদেরকে নিয়ে আসনসমূহ আবর্তন করবে। ফলে, তারা একজন অপর জনের পৃষ্ঠ দর্শন করবে না। غِلّ-অর্থ ঈর্ষা। اِخْوَانًا-এটা حَالٌ-এর حَالٌ বাচক পদ। مُتَقَابِلِيْنَ-এটাও هُمْ-বাচক পদ।

٤٨. لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ تَعَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ اَبَدًا

৪৮. সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে কখনও বহিস্কৃত হবে না। نَصَبٌ - অর্থ অবসাদ।

٤٩. نَبِّئْ خَبِّرْ يَا مُحَمَّدُ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الرَّحِيْمُ بِهِمْ

৪৯. হে মুহাম্মদ! আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও আমি মুমিনদের প্রতি ক্ষমাশীল, তাদের সাথে আচরণে পরম দয়ালু। نَبِّئْ-অর্থ সংবাদ দাও।

٥٠. وَاَنَّ عَذَابِيْ لِلْعُصَاةِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ الْمُؤْلِمُ

৫০. এবং অবাধ্যাচারীদের জন্য আমার শাস্তি খুবই মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

٥١. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ وَهُمْ مَلٰئِكَةٌ اِثْنَا عَشَرَ اَوْ عَشَرَةٌ اَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ جِبْرَئِيْلُ

৫১. আর তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কেও সংবাদ দাও। এরা ছিলেন বার জন বা দশজন বা তিন জন ফেরেশতা। হযরত জিবরাইল (আ.) এদের মধ্যে ছিলেন।

٥٢. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط اَيْ هٰذَا اللَّفْظَ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لَمَّا عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْاَكْلَ فَلَمْ يَاْكُلُوْا اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ خَائِفُوْنَ

৫২. যখন তারা তার নিকট আসল, বলল 'সালাম'। এই শব্দটি অভিবাদন রূপে বলল। হযরত ইবরাহীম তাদের সামনে খানা পেশ করলেন, কিন্তু তারা আহার গ্রহণ করতেছেন না দেখে তিনি বললেন, আমরা তোমাদেরকে ভয় করতেছি। اِنَّا وَجِلُوْنَ অর্থ আমরা ভীত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٣. قَالُوْا لَا تَوْجَلْ لَا تَخَفْ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ذِىْ عِلْمٍ كَثِيْرٍ هُوَ اِسْحَاقُ كَمَا ذُكِرَ فِىْ هُوْدٍ

৫৩. তারা বলল, 'ভয় করো না। আমরা তোমার প্রভুর তরফ হতে প্রেরিত তোমাকে এক বিদ্বান পুত্রের শুভসংবাদ দিতেছি। সূরা হুদে উল্লেখ রয়েছে যে, এই পুত্র হলেন হযরত ইসহাক। لَا تَوْجَلْ-অর্থ ভয় করো না। عَلِيْمٌ অর্থ যিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী।

٥٤. قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ بِالْوَلَدِ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ حَالٌ اَىْ مَعَ مَسِّهِ اِيَّاىَ فَبِمَ فَبِاَىِّ شَىْءٍ تُبَشِّرُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ

৫৪. সে বলল, আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছ? তোমরা কিসের কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ? عَلٰى اَنْ -এটা حَالٌ অর্থাৎ এই বার্ধক্যাবস্থা আমাকে স্পর্শ করা সত্ত্বেও? اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ -এই স্থানে تَعَجُّبٌ বা বিস্ময় প্রকাশার্থে প্রশ্নবোধক ব্যবহৃত হয়েছে।

٥٥. قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ الْاٰئِسِيْنَ

৫৫. তারা বলল, আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি, সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। بِالْحَقِّ -এই স্থানে অর্থ সত্য সহ। اَلْقَانِطِيْنَ-অর্থ হতাশাগ্রস্তগণ।

٥٦. قَالَ وَمَنْ اَىْ لَا يَقْنَطُ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ الْكَافِرُوْنَ

৫৬. সে বলল, যারা পথভ্রষ্ট কাফের তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? আর কেউ হয় না। مَنْ-অর্থ কে? এই স্থানে এটা لَا [না] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَقْنَطُ -এটার ن অক্ষরটিতে কাসরা ও ফাতাহ উভয় হরকতসহ পাঠ করা যায়।

٥٧. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ شَأْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ

৫৭. সে বলল, হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! তোমাদের আর কি বিষয়? আর কি অবস্থা ও কাজ রয়েছে?

٥٨. قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ كَافِرِيْنَ اَىْ قَوْمِ لُوْطٍ لِاِهْلَاكِهِمْ

৫৮. তারা বলল, আমাদেরকে এক অপরাধী অর্থাৎ কাফেরদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

٥٩. اِلَّا اٰلَ لُوْطٍ ط اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ لِاِيْمَانِهِمْ

৫৯. লূত-পরিবারের বিরুদ্ধে নয়। আমরা অবশ্যই তাঁদের সকলকে তাঁদের ঈমানের কারণে রক্ষা করব।

٦٠. اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ لِكُفْرِهَا

৬০. তবে লূতের স্ত্রীকে নয়। আমরা নির্ধারণ করেছি যে, সে তার কুফরির কারণে অবশ্যই যারা পশ্চাতে রয়েছে তাদের অর্থাৎ শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ سَالِمِيْنَ : سَلَام-এর তাফসীর سَالِمِيْنَ দ্বারা করার কারণ হলো একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। প্রশ্ন হলো এই যে, سَلَام হলো মাসদার هَا যমীরের উপর এর حَمْل বৈধ নয়। কেননা যমীর দ্বারা জান্নাত উদ্দেশ্য যা ذَاتٌ আর মাসদারের حَمْل টা ذَاتٌ -এর উপর বৈধ হয় না।

উত্তর এই যে, মাসদারটা بِتَاوِيْلِ مُشْتَقٍ سَالِمِيْنَ হয়ে حَالٌ হয়েছে কাজেই حَمْل বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَعَ سَلَامٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِسَلَامٍ -এর মধ্যে بَاء টা مَعَ অর্থে হয়েছে سَبَبِيَّة -এর জন্য হয়নি।

قَوْلُهُ سَلِّمُوْا : অর্থাৎ سَلِّمْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

قَوْلُهُ اُدْخُلُوْا : প্রশ্ন. اُدْخُلُوْا উহ্য মানার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর. হতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اٰمِنِيْنَ টা اُدْخُلُوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ ثَانِيَه হয়েছে بِسَلَامٍ থেকে নয়। কেননা আমলের ক্ষেত্রে আসল হলো فِعْل; মাসদার নয়।

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ هُمْ : অর্থাৎ اِخْوَانًا টা هُمْ থেকে حَالٌ হয়েছে صِفَتْ হয় নি।

প্রশ্ন. মুযাফ থেকে حَال হয়ে থাকে مُضَافْ اِلَيْه থেকে নয় আর এখানে اِخْوَانًا টা هُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে যা مُضَافْ اِلَيْه

উত্তর. مُضَافْ اِلَيْه যখন مُضَافْ -এর جُزْء হয় তখন حَالٌ হওয়া বৈধ হয়। এখানে যেহেতু مُضَافْ اِلَيْه টা مُضَافْ -এর جُزْء কাজেই حَالٌ হওয়া বৈধ হয়েছে। আবার اُدْخُلُوْا -এর যমীর থেকেও حَالٌ হওয়া বৈধ। আবার مُتَقَابِلِيْنَ اِخْوَانًا থেকেও حَالٌ হওয়া বৈধ যখন اِخْوَانًا টা مُتَصَافِيْنَ বা مُتَحَابِيْنَ -এর অর্থে হবে। আবার اِخْوَانًا -এর সিফতও হতে পারে।

قَوْلُهُ كَمَا ذُكِرَ فِيْ هُوْدٍ : অর্থাৎ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

قَوْلُهُ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا : অর্থাৎ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَمِنْ بَابِ فَتَحَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ : শানে নুযূল : সা'লাবীর বর্ণনা হলো এই যে, পূর্ববর্তী আয়াত وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ [তাদের সকলের জন্যে দোজখের ওয়াদা রইল] এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র হযরত সালমান ফারসী (রা.) ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিহবল হয়ে পলায়ন করেন। তিনদিন পর্যন্ত তিনি পালায়নপর ছিলেন। অবশেষে তাঁকে প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির করানো হলো। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত সালমান ফারসী (রা.) আরজ করেন- وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ যখন নাজিল হয় তখন আমার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্যের বাহক করে প্রেরণ করেছেন- এ আয়াত দ্বারা আমার অন্তর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়; তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬ পৃ. ৩৫০]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পাপিষ্ঠদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। আর এ আয়াতে নেককার ঈমানদার পরহেজগার লোকদেরকে আল্লাহ পাক যে নিয়ামত দান করবেন তার উল্লেখ রয়েছে। আর মুত্তাকী পরহেজগার হলো সেসব লোক যারা আল্লাহ পাকের তৌফিকে শয়তানের প্রতারণা এবং প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকে। ইবলিস শয়তানের চরম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা দুনিয়ার পাগল হয় না; বরং আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকে। ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ -[তাফসীরে কবীর, খ. ১৯, পৃ. ১৯১ তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ১৭১]

বেহেশতের বিবরণ : নিশ্চয় যারা পরহেজগার হবে, যারা সৎ ও সত্য পথের অনুসারী হবে, যারা শয়তানের ধোঁকা থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করে চলবে, আল্লাহ পাকের শাস্তির ভয়ে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আশায় পাপাচার পরিহার করবে, তারা জান্নাতের চিরসুখ লাভ করবে। বেহেশতের মনোরম বাগানে তারা জীবন যাপন করবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা নিশ্চিন্ত মনে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর এবং নিশ্চিন্তে জান্নাতে বাস কর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম তাদের পানির দুটি নির্ঝরিণী পেশ করা হবে। প্রথম নির্ঝরিণী থেকে পানি পান করতেই তাদের অন্তর থেকে ঐসব পারস্পরিক শত্রুতা বিধৌত হয়ে যাবে যা কোনো সময় দুনিয়াতে জন্মেছিল এবং স্বভাবগতভাবে তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর সবার অন্তরে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা পারস্পরিক শত্রুতাও একপ্রকার কষ্ট এবং জান্নাত প্রত্যেক কষ্ট থেকেই পবিত্র।

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিন্দু পরিমাণও ঈর্ষা ও শত্রুতা থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ ঐ হিংসা ও শত্রুতা, যা জাগতিক স্বার্থের অধীনে এবং নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে হয় এবং এর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। মানব সুলভ স্বাভাবিক মন কষাকষি অনেকটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার; এটা এ সাবধান বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনিভাবে ঐ শত্রুতাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোনো শরিয়ত সম্মত কারণের উপর ভিত্তিশীল। আয়াতে এ ধরনের হিংসা ও শত্রুতার কথাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতিদের মন থেকে সর্বপ্রকার হিংসা ও শত্রুতা দূর করে দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কেই হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি আশা করি, আমি তালহা ও যুবায়ের ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো, যাদের মনোমালিন্য জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর করে দেওয়া হবে। এতে ঐ মতবিরোধ ও বিবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা হযরত আলী এবং তালহা ও যুবায়েরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ : এ আয়াত থেকে জান্নাতের দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। এক. সেখানে কেউ কোনো ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্ষতি হয়ই, বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোনো না কোনো সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোনো সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা সাদ-এ বলা হয়েছে- إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ অর্থাৎ এ হচ্ছে আমাদের রিজিক, যা কোনো সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ অর্থাৎ তাদেরকে কোনো সময় এসব নিয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোনো বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোনো সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতিকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়! কুরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে- لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا অর্থাৎ তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোনো সময়ই পোষণ করবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦١. فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطٍ اَىْ لُوْطًا الْمُرْسَلُوْنَ

٦٢. قَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ لَا اَعْرِفُكُمْ

٦٣. قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا اَىْ قَوْمُكَ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ يَشُكُّوْنَ وَهُوَ الْعَذَابُ

٦٤. وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ فِىْ قَوْلِنَا

٦٥. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ اِمْشِ خَلْفَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ لِئَلَّا يَرٰى عَظِيْمَ مَا يَنْزِلُ لَهُمْ وَامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ وَهُوَ الشَّامُ

٦٦. وَقَضَيْنَآ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ وَهُوَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاۤءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ حَالٌ اَىْ يَتِمُّ اِسْتِئْصَالُهُمْ فِى الصَّبَاحِ

٦٧. وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةُ سَدُوْمَ وَهُمْ قَوْمُ لُوْطٍ لَمَّا اُخْبِرُوْا اَنَّ فِىْ بَيْتِ لُوْطٍ مُرْدًا حِسَانًا وَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَسْتَبْشِرُوْنَ حَالٌ طَمَعًا فِىْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِمْ

٦٨. قَالَ لُوْطٌ اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ

٦٩. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ بِقَصْدِكُمْ اِيَّاهُمْ بِفِعْلِ الْفَاحِشَةِ بِهِمْ

٧٠. قَالُوْا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ عَنْ اِضَافَتِهِمْ

অনুবাদ :

৬১. প্রেরিত ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের অর্থাৎ লূতের নিকট আসল।

৬২. তাদেরকে বলল, তোমরা তো অপরিচিত লোক। তোমাদেরকে তো আমি চিনতেছি না।

৬৩. তারা বলল, বরং যে বিষয়ে এরা অর্থাৎ যে শাস্তি সম্পর্কে তোমার সম্প্রদায় সন্দেহ পোষণ করে আমরা তোমার নিকট তা নিয়ে এসেছি। يَمْتَرُوْنَ -অর্থ তারা সন্দেহ করে।

৬৪. আমরা তো তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা আমাদের কথায় সত্যবাদী।

৬৫. সুতরাং তুমি রাত্রির কোনো এক অংশে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় আর তুমি তাদের পশ্চাদানুসরণ কর অর্থাৎ তাদের পশ্চাতে চলবে, আর এদের সম্প্রদায়ের উপর যে ভীষণ অবস্থা আপতিত হতে যাচ্ছে তা যেন দেখতে না পায় সেই কারণে তোমাদের কেউ যেন পিছন-দিকে না তাকায়। যে স্থানে তোমরা নির্দেশিত হয়েছ সেস্থানে অর্থাৎ শামদেশে তোমরা চলে যাও।

৬৬. এই বিষয়ে তাকে [লূতকে] সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম ওহী পাঠিয়ে দিলাম যে, প্রত্যূষে তাদের সমূলে বিনাশ করা হবে। مُصْبِحِيْنَ -এটা حَالٌ বাচক পদ। অর্থাৎ প্রত্যুষে এদেরকে ধ্বংসসাধন করার কাজ সম্পন্ন হবে।

৬৭. নগরবাসীগণ অর্থাৎ লূত সম্প্রদায় সাদূম নগরবাসীগণ যখন শুনল হযরত লূতের নিকট একদল অতীব সুন্দর বালক এসেছে তখন এদের সাথে অশ্লীল আচরণের আশায় উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হলো। অথচ ঐ বালকগণ মূলত ছিলেন আগন্তুক ফেরেশতা। يَسْتَبْشِرُوْنَ -এটা এইস্থানে حَالٌ বাচক পদ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৮. লূত বলল, তারা আমার অতিথি। সুতরাং তোমরা আমাকে বে ইজ্জত করোনা।

৬৯. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং এদের সাথে অশ্লীল কর্মের কুবাসনা করে আমাকে হেয় করিও না।

৭০. তারা বলল, আমরা কি বিশ্ব-জগত হতে অর্থাৎ এদেরকে অতিথি বানাতে নিষেধ করিনি?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧١. قَالَ هٰۤؤُلَاۤءِ بَنَاتِیۤ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ فَتَزَوَّجُوْهُنَّ

৭১. সে বলল, একান্তই তোমরা যদি কিছু করতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা চরিতার্থ করার বাসনা করতেছ তার জন্য এদেরকে বিবাহ করে নাও।

٧٢. قَالَ تَعَالٰى لَعَمْرُكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَیْ وَحَيَاتِكَ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ يَتَرَدَّدُوْنَ

৭২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার এই স্থানে রাসূল ﷺ -এর প্রতি সম্বোধন করা হচ্ছে জীবনের শপথ। তারা তাদের মত্ততায় বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতেছে। يَعْمَهُوْنَ-অর্থ তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতেছে।

٧٣. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ جِبْرَئِيْلَ مُشْرِقِيْنَ وَقْتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মহানাদ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.)-এর নাদ তাদেরকে আঘাত করল مُشْرِقِيْنَ -অর্থ সূর্য আলোকিত হওয়ার সময়।

٧٤. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا اَیْ قُرَاهُمْ سَافِلَهَا بِاَنْ رَفَعَهَا جِبْرِيْلُ اِلَى السَّمَاءِ وَاَسْقَطَهَا مَقْلُوْبَةً اِلَى الْاَرْضِ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ طِيْنٍ طُبِخَ بِالنَّارِ

৭৪. এবং আমি এইগুলোকে অর্থাৎ তাদের নগরগুলোকে উল্টিয়ে দিলাম হযরত জিবরাঈল (আ.) এইগুলোকে আকাশের দিকে উল্টিয়ে ছুড়ে মারলেন। আর তাদের উপর কঙ্কর বারি বর্ষণ করলাম। سِجِّيْلٍ-অর্থ আগুনে পোড়া মাটি।

٧٥. اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ تَعَالٰى لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ الْمُعْتَبِرِيْنَ

৭৫. অবশ্যই এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহর একত্বের নিদর্শন অর্থাৎ প্রমাণ রয়েছে। اَلْمُتَوَسِّمِيْنَ-অর্থ যারা দেখে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে।

٧٦. وَاِنَّهَا اَیْ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ طَرِيْقِ قُرَيْشٍ اِلَى الشَّامِ لَمْ يَنْدَرِسْ اَفَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِهِمْ

৭৬. অবশ্যই এগুলো অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের গ্রামসমূহ পথে অবস্থিত। শামের দিকে কুরায়শদের যাত্রা-পথে বিদ্যমান। এখনও এগুলোর ধ্বংসস্তূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। তবুও কি তারা এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না?

٧٧. اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَعِبْرَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

৭৭. অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শন অর্থাৎ শিক্ষা বিদ্যমান।

٧٨. وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ اَیْ اِنَّهٗ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ هِیَ غَيْضَةُ شَجَرٍ بِقُرْبِ مَدْيَنَ وَهُمْ قَوْمُ شُعَيْبٍ لَظٰلِمِيْنَ بِتَكْذِيْبِهِمْ شُعَيْبًا

৭৮. নিশ্চয় ঘন বনের অধিকারীরাও তো অর্থাৎ শুআইব সম্প্রদায় ও ছিল শুআইবকে অস্বীকার করার দরুন সীমালঙ্ঘনকারী। اِنْ كَانَ-এই اِنْ-টি مُخَفَّفَة অর্থাৎ লঘুকৃত। মূলত ছিল اِنَّ। اَلْاَيْكَةِ-অর্থ হলো ঘন-বন মাদায়েনের নিকটবর্তী একটি অঞ্চল।

٧٩. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بِاَنْ اَهْلَكْنَاهُمْ بِشِدَّةِ الْحَرِّ وَاِنَّهُمَا اَیْ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ وَالْاَيْكَةِ لَبِاِمَامٍ طَرِيْقٍ مُّبِيْنٍ وَاضِحٍ اَفَلَا يَعْتَبِرُ بِهِمْ اَهْلُ مَكَّةَ

৭৯. আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম প্রচণ্ড গরমের শাস্তি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। তারা অর্থাৎ লূত ও শুআইব সম্প্রদায় উভয়েই তো প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং মক্কাবাসীরা কি এদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না? اِمَام-এই স্থানে অর্থ পথ। مُبِيْنٍ-অর্থ প্রকাশ্য

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ لُوْطًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اٰلُ لُوْطٍ দ্বারা শুধুমাত্র হযরত লূত (আ.) উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا থেকেও এটাই বুঝা যায়।

قَوْلُهُ لَا اَعْرِفُكُمْ : তোমরা অপরিচিত। না তোমরা স্থানীয় না আমি তোমাদের চিনি। এবং তোমাদেরকে মুসাফিরও মনে হচ্ছে না। কেননা তোমাদের উপর সফরের কোনো নিদর্শনও নেই।

قَوْلُهُ اَوْحَيْنَا : এটা সেই প্রশ্নের উত্তর যে, قَضَيْنَا-এর সেলাহ اِلٰى আসে না অথচ এখানে اِلٰى এসেছে?
উত্তর. قَضَيْنَا টা اَوْحَيْنَا -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে আর اَوْحَيْنَا-এর সেলাহ اِلٰى আসে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الْاَمْرَ : এটা مُبْهَمْ বা অস্পষ্ট; اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ দ্বারা এর تَفْصِيْل করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ هٰؤُلَاءِ থেকে حَالٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ مَقْطُوْعٌ-এর যমীর থেকে حَالٌ বলেছেন। আর مَقْطُوْعٌ টা مَقْطُوْعِيْنَ-এর অর্থে হবে।

قَوْلُهُ مُرْدًا : এটা اَمْرَدُ -এর বহুবচন; শুশ্রুহীন যুবককে বলে।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ يَسْتَبْشِرُوْنَ হলো اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ থেকে حَالٌ হয়েছে, সিফত হয়নি। কেননা জুমলা نَكِرَهْ হওয়ার কারণে مَعْرِفَه থেকে حَالٌ হতে পারে না।

قَوْلُهُ عَنْ اِضَافَتِهِمْ : অর্থাৎ ضِيَافَتُهُمْ মেজবানি করা।

قَوْلُهُ تَتَرَدَّدُوْنَ : অর্থাৎ يَتَحَيَّرُوْنَ فَكَيْفَ يَسْمَعُوْنَ نَصِيْحَتَكَ

قَوْلُهُ وَقْتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ : আজাবের সূচনা ফজর উদয়কাল থেকেই শুরু হয়েছে। আর পরিপূর্ণতা পেয়েছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর চিৎকারের মাধ্যমে সূর্যোদয় কালে। কাজেই কোনোই বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهُ تَنْدَرِسُ : এটা বাবে اِنْفِعَال থেকে অর্থ- বিনষ্ট হওয়া, মিটে যাওয়া।

قوله طَرِيْق : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে اِمَامٌ দ্বারা প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ مَا يُؤْتَمُّ بِهٖ; বরং এখানে রাস্তা উদ্দেশ্য। কেননা মুসাফির রাস্তারও অনুসরণ করে থাকে। রাস্তা যেদিক যায় মুসাফিরও সেদিকে যায়।

قَوْلُهُ الْمُتَوَسِّمِيْنَ : এটা مُتَوَسِّمٌ ইসমে ফায়েলের বহুবচন বাবে تَفَعُّلٌ হতে মাসদার تَوَسُّمٌ মূলবর্ণ وَسَمَ অর্থ- তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণকারী, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ সম্মান : لَعَمْرُكَ –রূহুল মা'আনীতে অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لَعَمْرُكَ-এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম খেয়েছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবূ নয়ীম ও ইবনে মরদওয়াইহ প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে কাউকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -এর চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কোনো পয়গম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। এবং আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাপহ ﷺ -এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া : আল্লাহর নাম ও গুণাবলি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কসম খাওয়া কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা কসম এমন জনের খাওয়া হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহর কসমও তখনই খেতে পার যখন তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে পিতার কসম খেতে দেখে বললেন, খবরদার! আল্লাহ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। কারো কসম করতে হলে আল্লাহর নামে কসম করবে। নতুবা চুপ থাকবে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলার কালামে এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোনো সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যেসব বস্তির উপর আজাব এসেছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত : إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ এতে আল্লাহ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহর আজাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ ত'আলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়িকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারির উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই খুবই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ তা'আলার আজাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা পাষাণ হৃদয়ের কাজ; বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌছে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আজাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কুরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত লূত (আ.)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ একপ্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোনো মাছ, বেঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে 'মৃত সাগার' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তৈল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, তাই এতে কোনো সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালানকোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কুরআন পাক অবশেষে বলেছে- إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মু'মিনেদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ الخ : اَيْكَة শব্দের অর্থ বন ও ঘন জঙ্গল। কেউ কেউ বলেন, মাদইয়ানের সন্নিকটে একটি বন ছিল। এজন্য মাদয়ানবাসীদেরই উপাধি হচ্ছে اَيْكَة। কেউ কেউ বলেন, আসহাবে-আইকা ও আসহাবে-মাদয়ান দুটি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর হযরত শোয়াইব (আ.) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন।

তাফসীর রুহুল মা'আনীতে ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত মরফূ' হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। إِنَّ مَدْيَنَ وَاَصْحَابَ الْاَيْكَةِ اُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

'হিজর' হিজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকাকে বলা হয় এখানে সামুদ গোত্রের বসতি ছিল।

সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মক্কার কাফেরদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতা বর্ণিত হয়েছিল। এর সাথে সংক্ষেপে তাঁর সান্তনার বিষয়বস্তুও উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন সূরার উপসংহারে উপরিউক্ত শত্রুতা ও বিরোধিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্তনার বিস্তারিত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হচ্ছে।

قَوْلُهٗ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ : "তারা উভয়তো প্রকাশ্য পথে অবস্থিত" অর্থাৎ হযরত লূত (আ.)-এর জনপদ সাদূম এবং হযরত শেয়ায়েব (আ.)-এর জনপদ আইকা উভয়ই মক্কা এবং সিরিয়ার মধ্যপথে, রাস্তার পার্শ্বেই রয়েছে। অথবা হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর বস্তি আইকা এবং মাদয়ান উভয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এটি প্রকাশ্য পথের ধারেই রয়েছে। মক্কার কাফেররা যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরোধিতা করছিল এবং পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করছিল, তাদের সিরিয়া গমনের পথে অবস্থিত ধ্বংসপ্রাপ্ত এ জনপদগুলো দেখে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে বিরত থাকা উচিত। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৩৫৮]

এসব ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য : আলোচ্য ঘটনাবলির উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, রিসালাতের প্রমাণ উপস্থাপন করা। হযরত লূত সম্প্রদায় হযরত লূত (আ.)-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এমনিভাবে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে অবিশ্বাস করেছে, ওজনে কম দিয়েছে, পৌত্তলিকতায় মত্ত রয়েছে, এরপর আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর নবীকে অমান্য করবে, তাঁর আদর্শকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদের শাস্তি অবধারিত।
-[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. -৪, পৃ. -১৭৭]

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨٠. وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ وَادٍ بَيْنَ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّامِ وَهُمْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ بِتَكْذِيْبِهِمْ صَالِحًا لِاَنَّهٗ تَكْذِيْبٌ لِبَاقِى الرُّسُلِ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِى الْمَجِىْءِ بِالتَّوْحِيْدِ

৮০. হিজরবাসীগণও অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায়ও রাসূলদেরকে হযরত সালেহকে অস্বীকার করত সকল রাসূলকে অস্বীকার করেছিল। রাসূলগণ যেহেতু তাওহীদের বার্তা নিয়ে আসার বিষয়ে সকলই এক সেহেতু তাঁদের একজনকে অস্বীকার করা বাকি সকলকে অস্বীকার করার নামান্তর। حِجْر-হিজর হলো মদিনা ও শামের মধ্যে অবস্থিত একটি উপত্যকা।

٨١. وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فِى النَّاقَةِ فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا

৮১. আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন উষ্ট্র দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল। এতে তারা চিন্তা-গবেষণা করতো না।

٨٢. وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ

৮২. তারা নিশ্চিন্ত হয়ে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করতো।

٨٣. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ وَقْتَ الصَّبَاحِ

৮৩. অতঃপর প্রভাতে তাদেরকে আঘাত করল মহানাদ। مُصْبِحِيْنَ -প্রভাতকালে।

٨٤. فَمَآ اَغْنٰى دَفَعَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنْ بِنَاءِ الْحُصُوْنِ وَجَمْعِ الْاَمْوَالِ

৮৪. অনন্তর তারা দুর্গ নির্মাণ ও অর্থ সম্পদ জমা করতো যা করেছিল তা তাদের কোনো কাজ আসেনি। তাদের হতে শাস্তি প্রতিহত করতে পারে নি।

٨٥. وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَا مُحَالَةَ فَيُجَازٰى كُلُّ اَحَدٍ بِعَمَلِهٖ فَاصْفَحِ يَا مُحَمَّدُ عَنْ قَوْمِكَ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ اَعْرِضْ عَنْهُمْ اِعْرَاضًا لَا جَزَعَ فِيْهِ وَهٰذَا مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ السَّيْفِ

৮৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত সুনিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে। অনন্তর প্রত্যেককেই তার নিজের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে সুতরাং হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়কে চরমভাবে উপেক্ষা কর অর্থাৎ কোনোরূপ মনস্তাপ ব্যতিরেকে এদেরকে উপেক্ষা কর। কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা এটা مَنْسُوْخٌ বা রহিত হয়ে গিয়েছে।

٨٦. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ لِكُلِّ شَىْءٍ الْعَلِيْمُ بِكُلِّ شَىْءٍ

৮৬. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে অতীব জ্ঞানী।

٨٧. وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ قَالَ ﷺ هِىَ الْفَاتِحَةُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ لِاَنَّهَا تُثَنّٰى فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

৮৭. আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ আবৃত সাতটি আয়াত। শায়খাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন এই সাতটি আয়াত হলো সূরা ফাতিহার। কেননা এইগুলো প্রত্যেক রাকাতেই পুনঃ পুনঃ আবৃত হয়। আর দিয়েছি মহা কুরআন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

৮৮. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلِنْ جَانِبَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

৮৮. আমি এদের কতককে কতক শ্রেণিকে ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তোমার চক্ষু কখনও প্রসারিত করিও না। এবং এরা যদি ঈমান গ্রহণ না করে তবে তুমি বিষণ্ন-চিন্তিত হয়োনা, আর মু'মিনদের প্রতি তোমার ডানা অবনত কর। অর্থাৎ তুমি নরম হও।

৮৯. وَقُلْ إِنِّيْ أَنَا النَّذِيْرُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَنْ يَّنْزِلَ عَلَيْكُمْ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ الْإِنْذَارِ

৮৯. এবং বল, আমি অবশ্যই তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হওয়া সম্পর্কে একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। অর্থাৎ যার সতর্কীকরণ অতি স্পষ্ট।

৯০. كَمَا أَنْزَلْنَا الْعَذَابَ عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى

৯০. যেমন আমি শাস্তি আপতিত করেছিলাম তাদের প্রতি যারা এখন বিভক্ত। অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি।

৯১. الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ أَيْ كُتُبَهُمُ الْمُنَزَّلَةَ عَلَيْهِمْ عِضِيْنَ أَجْزَاءً حَيْثُ اٰمَنُوْا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوْا بِبَعْضٍ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهِمُ الَّذِيْنَ اقْتَسَمُوْا طُرُقَ مَكَّةَ يَصُدُّوْنَ النَّاسَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْقُرْاٰنِ سِحْرٌ وَبَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ وَبَعْضُهُمْ شِعْرٌ

৯১. যারা কুরআন অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহ বিভক্ত করে রেখেছে। কতক অংশের উপর তো ঈমান রাখে আর কতক অংশ তারা প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটি হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে যারা ইসলাম হতে লোকদের বাধা দেওয়ার জন্য মক্কার পথসমূহ ভাগ করে নিয়েছিল। কুরআন সম্পর্কে এদের কেউ বলত, এটা জাদু, কেউ বলত, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মন্ত্র, কেউ বলত এটা কবিতা। عِضِيْنَ-অর্থ ভাগ, খণ্ড খণ্ড অংশসমূহ।

৯২. فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ سُؤَالَ تَوْبِيْخٍ

৯২. সুতরাং কসম তোমার প্রতিপালকের আমি তাদের সকলকে অবশ্য প্রশ্ন করব এই প্রশ্ন হবে ভর্ৎসনামূলক।

৯৩. عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯৩. সেই বিষয়ে যা তারা করে।

৯৪. فَاصْدَعْ يَا مُحَمَّدُ بِمَا تُؤْمَرُ أَيْ اِجْهَرْ بِهِ وَامْضِهِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ هٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ

৯৪. হে মুহাম্মদ! তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর তা চালু কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। এটা জিহাদ সম্পর্কিত নির্দেশ নাজিলের পূর্বের বিধান ছিল। اِصْدَعْ-এই স্থানে অর্থ প্রকাশ্যে কর।

৯৫. إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ بِكَ بِأَنْ أَهْلَكْنَا كُلًّا مِنْهُمْ بِاٰفَةٍ وَهُمُ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ وَعَدِيُّ بْنُ قَيْسٍ وَالْاَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَالْاَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوْثَ

৯৫. তোমার সাথে বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই যথেষ্ট। এদের প্রত্যেককে কোনো না কোনো বিপদে ফেলে দিব। এই বিদ্রূপকারীরা ছিল, ওয়ালীদ-ইবনে মুগিরা, আল আস ইবনে ওয়াইল, আদী-ইবনে- কায়স, আল আসওয়াদ-ইবনে আল-মুত্তালিব এবং আল আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٦. اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ صِفَةٌ وَقِيْلَ مُبْتَدَأٌ وَلِتَضَمُّنِهٖ مَعْنَى الشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِيْ خَبَرِهٖ وَهُوَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ اَمْرِهِمْ

৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদ জড়িয়ে নিয়েছে। শীঘ্রই তারা তাদের কাজের পরিণাম জানতে পারবে। صِفَتْ-এর اَلْمُسْتَهْزِئِيْنَ-اَلَّذِيْنَ-এটা পূর্বে উল্লিখিত বা বিশেষণ। কেউ কেউ বলেন, এটা مُبْتَدَا বা উদ্দেশ্য। এটার অর্থে যেহেতু শর্তের অর্থও অন্তর্ভুক্ত সেহেতু তার خَبَرْ বা বিধেয় فَسَوْفَ-তেও ف ব্যবহার করা হয়েছে।

٩٧. وَلَقَدْ لِلتَّحْقِيْقِ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ مِنَ الْاِسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيْبِ

৯৭. আমি অবশ্যই জানি তারা বিদ্রূপ করে বা অস্বীকার করে যা বলে তাতে তোমার অন্তর সংকোচিত হয়। قَدْ-এটা এই স্থানে تَحْقِيْق বা বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٩٨. فَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ رَبِّكَ اَيْ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَكُنْ مِنَ السّٰجِدِيْنَ الْمُصَلِّيْنَ

৯৮. সুতরাং তুমি প্রশংসাসহ তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর অর্থাৎ বল, সুবহাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। এবং তুমি সেজদাকারীদের অর্থাৎ মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত হও। رَبِّكَ بِحَمْدِ- এই স্থানে এটা مُلْتَبِسًا-এর সাথে مُتَعَلِّقْ বা সংশ্লিষ্ট।

٩٩. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ الْمَوْتُ

৯৯. নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِي النَّاقَةِ : মুফাসসির (র.) فِى النَّاقَةِ বলে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, اٰيٰتِنَا হলো বহুবচন আর তার তাফসীর اَلنَّاقَةُ হলো একবচন যা বৈধ নয়।

উত্তরের সার হলো এই যে, نَاقَةٌ কয়েকটি আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, পাহাড় থেকে উষ্ট্রী বের হওয়া, বের হয়ে সাথে সাথে বাচ্চা দেওয়া, তার বারিতে সমস্ত পানি পান করে ফেলা এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দান করা। কাজেই اٰيٰتِنَا -এর তাফসীর نَاقَة দ্বারা করা বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَصْنَافًا : اَزْوَاجًا-এর তাফসীর اَصْنَافًا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَزْوَاجًا-এর প্রসিদ্ধ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রকারভেদ উদ্দেশ্য। যেমন– কাফের, ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক, মূর্তি পূজারী ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ كُتُبُهُمْ : قُرْاٰن-এর তাফসীর كُتُبُهُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, قُرْاٰن দ্বারা এখানে প্রসিদ্ধ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اَجْزَاءً : এটা عِضِيْنَ-এর শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করার জন্য বৃদ্ধি করেছেন। এটা عِضَةٌ-এর বহুবচন। মূলে ছিল عِضَوَةٌ যা فِعْلَةٌ ওযনে হয়েছে। এটা عَضَى الشَّاةَ হতে নির্গত। অর্থ– টুকেরা টুকেরা করা।

قَوْلُهُ صِفَةٌ : অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ এটা يَسْتَهْزِئِيْنَ -এর সিফত হয়েছে। কাজেই فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِيِّ হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ : আর হে রাসূল! আমি আপনাকে দিয়েছি সাতটি আয়াত যা বারে বারে [নামাজে] পাঠ করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছে, হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, سَبْع مَثَانِيْ দ্বারা সূরা ফাতেহাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এর আয়াত সাতটি।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাফসীরকার কাতাদা (র.), হাসান বসরী (র.), আতা (র.), সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) এ মতই পোষণ করেন। বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, اُمُّ الْقُرْاٰنِ [সূরা ফাতেহা] সাত আয়াত। اَلْمَثَانِىْ অর্থাৎ যা নামাজে বারে বারে পাঠ করা হয়।

মাছানী নামকরণের তাৎপর্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান (রা.), কাতাদা (রা.) বলেছেন, যেহেতু সূরা ফাতেহা নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা হয় এজন্য এ সূরাকে "মাছানী" مَثَانِىْ বলা হয়েছে।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, সূরা ফাতেহার দু'টি অংশ রয়েছে। এক অংশ আল্লাহ পাকের জন্য, যাতে আল্লাহ পাকের প্রশংসা রয়েছে। আর অন্য অংশ হলো দোয়া যা বান্দার জন্যে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন সূরা ফাতেহাকে আমি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করেছি।

হুসাইন ইবনে ফজল مَثَانِىْ (মাছানী) নামকরণের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, সূরা ফাতেহা দুবার নাজিল হয়েছে। একবার মক্কা শরীফে আর একবার মদিনা শরীফে এবং প্রত্যেক বার সূরা ফাতেহার সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেশতা ছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, مَثَانِىْ শব্দটির অর্থ হলো নির্বাচিত, বাছাই করা। কেননা সূরা ফাতেহাকে আল্লাহ পাক এ উম্মতের জন্য বাছাই করেছেন অন্য কোনো উম্মতকে তা দান করেন নি। আবূ যায়েদ বলখী (র.) বলেছেন, ثَنَيْتُ الْعِنَانَ এর অর্থ হলো, আমি লাগামকে ফিরিয়ে দিয়েছি। যেহেতু সূরা ফাতেহা মন্দ লোকদেরকে মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে দেয় এজন্য তাকে مَثَانِىْ বলা হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, مَثَانِىْ শব্দটি ثَنَىٌ থেকে নিষ্পন্ন। কেননা এ সূরায় আল্লাহর প্রশংসা স্থান পেয়েছে এবং আল্লাহ পাকের মহান গুণাবলির বিবরণ রয়েছে।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলোচ্য আয়াতে سَبْعًا শব্দ দ্বারা সাতটি বড় বড় সূরা উদ্দশ্য করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম সূরা বাকারাহ, সূরা আনফাল এবং সূরা তওবা । এ দুটি সূরা একই সূরার হুকুমে এ জন্যে দুটি সূরার মধ্যখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ হয় না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সাতটি বড় বড় সূরার শেষ সূরা তওবা। আর কারো মতে সাতটি বড় সূরার মধ্যে সর্বশেষ সূরা হলো সূরা ইউনুস। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) "মাছানী" مَثَانِىْ নামকরণের এ কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এ সাতটি সূরার মধ্যে ফরজসমূহ, অপরাধের শাস্তি, ভালোমন্দের দৃষ্টান্তসমূহ এবং শিক্ষণীয় ঘটনাবলি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

আর এ সম্পর্কে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, مَثَانِىْ শব্দটি ثَنَىٌ শব্দ হতে নিষ্পন্ন। পবিত্র কুরআনের ভাষার অলঙ্কার শুধু যে সর্বত্র প্রশংসনীয় হয়েছে তাই নয়, বরং এটি অত্যন্ত বড় মোজেজা। কেননা এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে কেউ সক্ষম হয়নি। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির বিবরণ রয়েছে। এজন্য এটি প্রশংসাকারীও। এ প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনকে مَثَانِىْ বলা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে নাসির হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর ﷺ -ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তাওরাতের স্থলে আমাকে সাতটি বড় বড় সূরা দান করেছেন। আর ইঞ্জিলের স্থলে সেই সূরাসমূহ দান করেছেন, যেগুলোর শুরুতে الٓر এবং طٰسٓ রয়েছে। আর যাবূরের স্থলে طٰسٓ থেকে حٰمٓ বিশিষ্ট সূরাসমূহ দান করেছেন। আর حٰمٓ বিশিষ্ট সূরাসমূহ বাড়তি দান রয়েছে আমার প্রতি। বড় বড় সূরা ইতঃপূর্বে আর কোনো নবীকে দান করা হয়নি শুধু আমাকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -কে সাতটি বড় বড় সূরা দান করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-কে ছয়টি দেওয়া হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন ফলক হাত থেকে ফেলে দেন, তখন দুটি সূরা উঠিয়ে নেওয়া হয় আর চারটি তাঁর কাছে রাখা হয়।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত ছাওবান (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হুজুর ﷺ -ইরশাদ করেছে, আল্লাহ পাক তাওরাতের স্থলে আমাকে সাতটি বড় বড় সূরা দান করেছেন, আর ইঞ্জিলের স্থলে مِئِيْن আর যাবূরের স্থলে مَثَانِىْ এবং আমার প্রতিপালক আমাকে আরও অনেক কিছু দিয়েছেন। তাউসের মত হলো, "মাছানী" শব্দ দ্বারা সমগ্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন, কুরআনে কারীমেও এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআনকে مَثَانِىْ বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনকে مَثَانِىْ বলার কারণ হলো এই যে, এতে বিভিন্ন ঘটনা বারে বারে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সাহাবী হযরত আবূ সায়ীদ ইবনে মুআল্লা (রা.) বর্ণনা করেন– আমি নামাজেরত ছিলাম, এমন সময় হুজুরে আকরাম ﷺ আমাকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ডাকলেন, নামাজে রত থাকার কারণে আমি সাড়া দিতে পারলাম না। নামাজ শেষ করে আমি তাঁর দরবার হাজির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কেন আসলে না? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি নামাজে ছিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি কি আল্লাহ পাকের এ বাণী শ্রবণ করেনি– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখনই তিনি তোমাদেরকে ডাকেন। শোন! আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই তোমাকে পবিত্র কুরআনের বড় সূরার কথা বলব। কিছুক্ষণ পর যখন প্রিয়নবী ﷺ বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেন, তা হলো সূরা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। আর এটিই "সাবউল মাছানী"। অন্য হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা ফাতেহাই হলো সাবয়ে মাছানী। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু], পারা-১৪. পৃ. ১৬]

সূরা ফাতেহা সমগ্র কুরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কুরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতেহা একদিক দিয়ে সমগ্র কুরআন। কেননা ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে।

হাশরের ময়দানে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে? : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজ পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করলেন যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর উক্তি সম্পর্কে। তাফসীরে কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, ঈমান কোনো বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না; বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তস্তলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে, যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন, যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহর হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ এ আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম গোপনে গোপনে ইবাদত ও তেলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সঙ্গোপনে একজন দুজনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফেরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশঙ্কা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তেলাওয়াত, ইবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

قَوْلُهُ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ : এ বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি– আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এ পাঁচজনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্য কথা বললে কোনো উপকার আশা করা যায় না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার : ولقد نعلم আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আন-নাহল মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ إِلٰى اٰخِرِهَا مِائَةٌ وَّثَمَانٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

তবে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ শেষ পর্যন্ত আয়াতটি ব্যতীত ১২৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. لَمَّا اسْتَبْطَأَ الْمُشْرِكُوْنَ الْعَذَابَ نَزَلَ أَتٰى أَمْرُ اللّٰهِ أَيِ السَّاعَةُ وَأَتٰى بِصِيْغَةِ الْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهٖ أَيْ قَرُبَ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ تَطْلُبُوْهُ قَبْلَ حِيْنِهٖ فَإِنَّهٗ وَاقِعٌ لَا مُحَالَةَ سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهٖ غَيْرَهٗ

٢. يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ أَيْ جِبْرَئِيْلَ بِالرُّوْحِ بِالْوَحْيِ مِنْ أَمْرِهٖ بِإِرَادَتِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ أَنْ مُفَسِّرَةٌ أَنْذِرُوْا خَوِّفُوا الْكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ وَأَعْلِمُوْهُمْ أَنَّهٗ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُوْنِ خَافُوْنِ

٣. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ أَيْ مُحِقًّا تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهٖ مِنَ الْأَصْنَامِ

٤. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِيٍّ إِلٰى أَنْ صَيَّرَهٗ قَوِيًّا شَدِيْدًا فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ مُّبِيْنٌ بَيِّنُهَا فِيْ نَفْيِ الْبَعْثِ قَائِلًا مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ

অনুবাদ :

১. মুশরিকরা আল্লাহর শাস্তি অনেক দূর বলে ভাবলে নাজিল হয়। আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ কিয়ামত এসেই গেল। তা সন্নিকটে। সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তা ঘটতে দাবি করো না। সুনিশ্চিত ভাবেই এটা সংঘটিত হবে। তিনি মহান সকল পবিত্রতা তাঁরই এবং তারা তাঁর সাথে অন্য যার শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। أَتٰى-এটা مَاضِيْ বা অতীতকাল বাচক ক্রিয়াপদ। বিষয়টির আমোঘতা বুঝাবার উদ্দেশ্যে এই স্থানে এটার ব্যবহার করা হয়েছে।

২. তিনি তাঁর নির্দেশ তাঁর ইচ্ছায় রূহসহ অর্থাৎ ওহীসহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার নিকট ইচ্ছা অর্থাৎ নবীগণের নিকট ফেরেশতা জিবরাঈলকে প্রেরণ করে বলেন যে, কাফেরদের আজাব সম্পর্কে সতর্ক কর ভীতি প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমাকে ভয় কর। أَنْ أَنْذِرُوْا -এই স্থানে أَنْ শব্দটি مُفَسِّرَة বা বিবরণমূলক। اِتَّقُوْنِ অর্থ আমাকে ভয় কর।

৩. তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা তাঁর সাথে যা যে সমস্ত প্রতিমা শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে। بِالْحَقِّ -অর্থ যথাযথভাবে। এটা মূলত এই স্থানে حَال বাচক পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে এটার তাফসীরে مُحِقًّا শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. তিনি ফোটা হতে অর্থাৎ শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। শেষে তাকে সুঠাম-শক্তিশালী করেছেন অথচ সে পুনরুত্থান অস্বীকার করার বিষয়ে একজন প্রকাশ্যে বিতণ্ডাকারী। বলে, ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়ার পর হাড্ডিগুলোতে জীবন দান করবে? خَصِيْمٌ -অতিশয় বিতণ্ডাকারী। مُبِيْنٌ-স্পষ্ট।

Free @ www.eilm.weebly.com

٥. وَالْاَنْعَامَ الْاِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَنَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ يُفَسِّرُهُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْ جُمْلَةِ النَّاسِ فِيْهَا دِفْءٌ مَا تَسْتَدْفِئُوْنَ بِهِ مِنَ الْاَكْسِيَةِ وَالْاَرْدِيَةِ مِنْ اَشْعَارِهَا وَاَصْوَافِهَا وَمَنَافِعُ مِنَ النَّسْلِ وَالدَّرِّ وَالْكُوْبِ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ قُدِّمَ الظَّرْفُ لِلْفَاصِلَةِ

৫. তিনি আন'আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুও সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জন্য অর্থাৎ মানুষজাতির জন্য তাতে রয়েছে উষ্ণতা লাভের উপকরণ অর্থাৎ তাদের লোম ও পশম হতে নির্মিত যে সমস্ত চাদর ও পোশাক দ্বারা মানুষ উষ্ণতা লাভ করে তা এবং বহু উপকার যেমন দুগ্ধ, পরিবহন ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে উপকার লাভ। আর তা হতে তোমরা আহারও করে থাক। اَلْاَنْعَامَ-এটা এমন একটি ক্রিয়ার মাধ্যমে এখানে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে যে পরবর্তী خَلَقَ ক্রিয়াটি হচ্ছে তার ভাষ্য স্বরূপ। مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ-এই স্থানে فَاصِلَه বা আয়াতসমূহের অন্তমিল রক্ষার জন্য ظَرْف অর্থাৎ مِنْهَا শব্দটি -কে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ زِيْنَةٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ تَرُدُّوْنَهَا اِلٰى مَرَاحِهَا بِالْعَشِيِّ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ تُخْرِجُوْنَهَا اِلَى الْمَرْعٰى بِالْغَدَاةِ

৬. যখন তোমরা বিকালে চারণভূমি হতে এদের গোয়ালে ফিরিয়ে আন এবং যখন প্রভাতে চারণ ভূমিতে বের করে নিয়ে যাও তখন তাতে দৃশ্য হয় তোমাদের সৌন্দর্য। جَمَالٌ অর্থ– সৌন্দর্য।

٧. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اَحْمَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ وَاصِلِيْنَ اِلَيْهِ عَلٰى غَيْرِ الْاِبِلِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط بِجُهْدِهَا اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ بِكُمْ حَيْثُ خَلَقَهَا لَكُمْ

৭. এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেথায় উট ছাড়া অন্যভাবে প্রাণান্তকর ক্লেশ ব্যতীত পৌছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তাই তিনি এই গুলো তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। اَثْقَالَكُمْ-তোমাদের বোঝাসমূহ। لَمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ-সে স্থানে তোমরা পৌছতে পারতে না। اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ-প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও ক্লেশ ব্যতীত।

٨. وَ خَلَقَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط مَفْعُوْلٌ لَهُ وَالتَّعْلِيْلُ بِهِمَا لِتَعْرِيْفِ النِّعَمِ لَا يُنَافِيْ خَلْقَهَا لِغَيْرِ ذٰلِكَ كَالْاَكْلِ فِي الْخَيْلِ الثَّابِتِ بِحَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ مِنَ الْاَشْيَاءِ الْعَجِيْبَةِ الْغَرِيْبَةِ

৮. আর তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং বিস্ময়কর এমন অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা অবগত নও। لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً - এটা مَفْعُوْل لَهُ বা হেতু বোধক কর্মকারক। উক্ত গৃহপালিত পশুসমূহের পরিচয়কে এই দুইটি বিষয়ের সাথে হেতুযুক্ত করা অন্য উপায়ে এগুলোর ব্যবহারকে অস্বীকার করে না। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, খাদ্য রূপেও অশ্ব ব্যবহার করা যায়।

Free @ www.eilm.weebly.com

৯. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ اَىْ بَيَانُ الطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ وَمِنْهَا اَىِ السُّبُلِ جَائِرٌ حَائِدٌ عَنِ الْاِسْتِقَامَةِ وَلَوْ شَاءَ هِدَايَتَكُمْ لَهَدٰكُمْ اِلٰى قَصْدِ السَّبِيْلِ اَجْمَعِيْنَ فَتَهْتَدُوْنَ اِلَيْهِ بِاخْتِيَارٍ مِّنْكُمْ

৯. সরল পথ অর্থাৎ সরল পথের বর্ণনা দান আল্লাহর উপর ন্যস্ত। এটার মধ্যে অর্থাৎ পথের মধ্যে বক্রপথও আছে। আল্লাহ যদি তোমাদের হেদায়েত চাইতেন তবে অবশ্যই তোমাদের সকলকে সরল পথের হেদায়েত করতেন। ফলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা ক্রমেই এই দিকে পরিচালিত হতে। جَائِرٌ-এই স্থানে অর্থ বক্র।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ قُرْبُ : অর্থাৎ قُرْبُ وُقُوْعِهٖ এবং تَطْلُبُوْهُ অর্থাৎ تَطْلُبُوْا وُقُوْعَهٗ

قَوْلُهُ سُبْحَانَهٗ : এটা উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে। অর্থাৎ سَبِّحْ سُبْحَانَهٗ

قَوْلُهُ بِهٖ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَمَّا-এর মধ্যে مَا টি হলো مَوْصُوْلَه যার সেলাহ তে عَائِدٌ -এর প্রয়োজন পড়বে না।

قَوْلُهُ عَمَّا : এতে سُبْحَانَهٗ এবং تَعَالٰى উভয় ফে'লই تَنَازُعْ করতেছে। প্রত্যেকটাই عَمَّا -কে স্বীয় مَفْعُوْل বানাতে চায়। এ ব্যাপারটি تَنَازُعْ فِعْلَانِ-এর অন্তর্গত। বসরী নাহবীদের মতে দ্বিতীয় ফে'লকে আর কূফী নাহবীদের মতে প্রথম ফে'লকে আমল করতে দেবে।

قَوْلُهُ اَىْ جِبْرِيْلَ : প্রশ্ন. مَلٰٓئِكَةُ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে একবচন উদ্দেশ্য করার কারণ কি?

উত্তর. রূপকভাবে এরূপ করেছেন, যেমন اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يَا مَرْيَمُ-এর মধ্যে مَلٰٓئِكَةُ দ্বারা শুধুমাত্র হযরত জিবরীল (আ.) -ই উদ্দেশ্য। আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেছেন, যখন একক ব্যক্তি জামাতের নেতা / সর্দার হন তখন তার উপর বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা বৈধ। হযরত জিবরীল (আ.) যেহেতু ফেরেশতাগণের নেতা সেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে বহুবচনের শব্দের প্রয়োগ করা বৈধ।

قَوْلُهُ بِاِرَادَتِهٖ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنْ اَمْرِهٖ-এর মধ্যকার مِنْ টি بَاءْ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এ আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, مِنْ اَمْرِهٖ-এর মধ্যে مِنْ টা بَيَانِيَه ও হতে পারে না, تَبْعِيْضِيَّة ও হতে পারে না, আবার اِبْتِدَائِيَّة হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَنْ مُفَسِّرَةٌ : اَنْ مُفَسِّرَةٌ টা قَالَ অথবা قَالَ -এর مُشْتَقَّاتْ অথবা قَالَ -এর সমার্থবোধক শব্দের পরে পতিত হয়; আর এখানে এরূপ হয়নি?

উত্তর. এখানে رُوْح যেহেতু ওহীর অর্থে। আর ওহী قَالَ -এর অর্থে। কাজেই اَنْ مُفَسِّرَه হওয়া বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَعْلِمُوْهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. اِنْذَارْ হলো مُتَعَدِّىْ بَيْك مَفْعُوْل আর তা উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اَنْذِرُوا الْمُشْرِكِيْنَ কাজেই اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ -এর মধ্যে اَنَّ টা যবরযুক্ত হওয়ার কারণ কি? কিয়াসের চাহিদা হলো اِنَّ যের যুক্ত হওয়া।

উত্তর. এই যে, এখানে اِعْلَمُوْا উহ্য রয়েছে। আর اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا হলো দ্বিতীয় মাফউল। এ কারণে اَنَّهٗ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مُحِقًّا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِالْحَقِّ টা حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, خَصِيْمٌ টা فَعِيْلٌ-এর ওযনে মুবালাগাহ-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ نَصْبُهٗ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُ خَلَقَهَا : অর্থাৎ এটা مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ-এর অন্তর্গত। উহ্য ইবারত হলো- خَلَقَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ

قَوْلُهُ دِفْءٌ : শীতের পোশাক, গরম কাপড়, উষ্ণতা অর্জন করার বস্তু, বাবে سَمِعَ ও كَرُمَ হতে মাসদার دُفُوْءًا-دِفْأً-دَفَاءَةً; অর্থ- গরম হওয়া। উষ্ণতা অনুভব করা। اِسْتِدْفَاءْ গরম কাপড় পরিধান করা।

قَوْلُهُ مِنْ اَشْعَارِهَا وَاَصْوَافِهَا : এটা مَا تَسْتَدْفِئُوْنَ-এর মধ্যস্থ مَا-এর بَيَانْ হয়েছে। دِفْءٌ -এর তাফসীর مَا تَسْتَدْفِئُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, دِفْءٌ মাসদার اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হয়েছে। এমনিভাবে دِفْءٌ -এর حَمْل ও বৈধ হয়ে গেল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ قَدَّمَ الظَّرْفَ لِلْفَاصِلَةِ : অর্থাৎ تَاكُلُونَ মূলে ছিল وَمِنْهَا تَاكُلُونَ-এর রেয়ায়েতের কারণে فَوَاصِلَ-কে مُقَدَّمْ করে দিয়েছে। ظَرْف

قَوْلُهُ مُرَاحٌ بِضَمِّ الْمِيْمِ : আরামের জায়গা, ঠিকানা, জানোয়ারের পরিবেষ্টন।

قَوْلُهُ وَخَلَقَ : خَلَقَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে اَلْخَيْلَ-এর عَطْف টা اَلْاَنْعَامَ-এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ خَلَقَ الْاَنْعَامَ وَخَلَقَ الْخَيْلَ الخ

قَوْلُهُ مَفْعُوْلٌ لَهُ : এখানে زِيْنَةً হলো مَفْعُوْل لَهُ এবং لِتَرْكَبُوْهَا-এর مَحَلّ-এর উপর আতফ হয়েছে অর্থাৎ تَرْكَبُوْهَا এবং زِيْنَةً উভয়টিই خَلَقَ-এর مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে।

প্রশ্ন. উভয়টিই مَفْعُوْل لَهُ কিন্তু উভয়টিকে একই রীতিতে আনা হয়নি?

উত্তর. উভয়টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে যে, رُكُوْب-কে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের ফে'ল আর زِيْنَةً হলো خَالِقْ-এর ফে'ল।

قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيْلُ بِهِمَا لِتَعْرِيْفِ النِّعَمِ الخ : এটা হলো আহনাফের اِسْتِدْلَالْ-এর জবাব। এ আয়াত দ্বারা আহনাফ এভাবে প্রমাণ পেশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোড়া, গাধা এবং খচ্চরের সৃষ্টির কারণ زِيْنَتْ তথা সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। আর এ তিনটিকে খাওয়ার ইল্লত বলেননি। যেমনিভাবে اِنْعَامْ-এর মধ্যে تَخْلِيْق-এর ইল্লত اَكْل [খাওয়া] বর্ণনা করেছেন। অথচ مَنْفَعَتْ اَكْل তথা খাওয়ার উপকারিতা অন্যান্য উপকারিতা হতে উর্ধ্বে। আর আয়াত নিয়ামতের বর্ণনার জন্যই নেওয়া হয়েছে। আর একথা কিছুতেই মুনাসিব নয় যে, খোঁটা দেওয়ার স্থানে اَدْنٰى নিয়ামতের উল্লেখ করা হয় আর উচ্চ নিয়ামতকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ قَصْدُ السَّبِيْلِ : এটা اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ-এর অন্তর্গত অর্থাৎ اَلسَّبِيْلُ الْقَصْدُ আর قَصْد হলো قَاصِدٌ অর্থে, যাতে করে حَمْل বৈধ হয়ে যায়। قَصْد বলা হয় সোজা রাস্তাকে। বলা হয় سَبِيْل قَصْد এবং سَبِيْل قَاصِد সোজা রাস্তা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নাহল প্রসঙ্গে : [সূরা নাহল মক্কায় অবতীর্ণ] এতে ১২৮ আয়াত এবং ১৬ টি রুকূ রয়েছে।

সূরা নাহল -এর নামকরণ : নাহল বলা হয় মধু মক্ষীকাকে। যেহেতু এতে মধু মক্ষীকার কথা রয়েছে তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুন নাহল। এ সূরার আরেকটি নাম হলো সূরাতুন নিয়াম। যেহেতু এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনেক নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে তাই তাকে সূরাতুন নিয়াম বলা হয়। আর এ নিয়ামতসমূহের আলোচনা মূলত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত দলিল প্রমাণ। এর দ্বারা শিরক ও পৌত্তলিকতার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তাওহীদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত তাদের সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর নবুয়ত, রিসালতের বাস্তবতা এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ সূরার শেষ রুকূতে প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের সত্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রিসালতের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু মক্কা মুয়াযযমার কাফের মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতে খড়গহস্ত ছিল তাই সূরার শেষে সবর অবলম্বনের তথা ধৈর্যধারণের এবং তাকওয়া-পরহেজগারির নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ সূরা মক্কা মুয়াযযমায় নাজিল হয়েছে। তবে ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর আতা ইবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াত মদীনা মুনাওয়ারায় ওহুদের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ الخ : এ সূরাকে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরোনামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে কিয়ামত ও আজাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহর তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

'আল্লাহর নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর দেখে নেবে। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী বিষয় নয়। −[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহর ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরি ও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র। −[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলিল দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রাসূলই আগমন করেছেন। তিনি জনসমক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্যজনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতই মানুষ এ কথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

আয়াতে رُوْحٌ শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে ওহী এবং অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে হেদায়েত বুঝানো হয়েছে। -[বাহর] এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে।

خَصِيْمٌ শব্দটি خُصُوْمَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ− ঝগড়াটে। اَنْعَامٌ শব্দটি نَعَمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ− উট, ছাগল, গরু ইত্যাদি চতুষ্পদ জন্তু −[মুফরাদাত-রাগিব]

دِفْءٌ-এর অর্থ− উত্তাপ লাভ করার বস্তু। অর্থাৎ পশম যা দ্বারা গরম বস্তু তৈরি করা হয়। تُرِيْحُوْنَ শব্দটি رَوَاحٌ থেকে تَسْرَحُوْنَ শব্দটি سَرَاحٌ থেকে উদ্ভূত। চতুষ্পদ জন্তুর সকাল বেলায় চারণ ক্ষেত্রে গমনকে سَرَاحٌ এবং বিকাল বেলায় গৃহে প্রত্যাবর্তনকে رَوَاحٌ বলা হয়। شِقِّ الْاَنْفُسِ -এর অর্থ পরিশ্রম।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সৃষ্ট জগতের মহান নিদর্শনাবলি দ্বারা তাওহীদ সপ্রামণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টবস্তু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যার সেবায় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জগতকে নিয়োজিত করেছেন। মানবের সূচনা যে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট বীর্য থেকে হয়েছে, একথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে− فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হলো, তখন সে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কুরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে− وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেস উপকার হয়, তন্মধ্যে দুটি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানু বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপি তৈরি করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

২. وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু জবাই করে খোরাক তৈরি করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। দুধ, দই, মাখন, ঘি এবং দুগ্ধজাত যাবতীয় খাদ্রদ্রব্য এর অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য সাধারণ উপকার বুঝার জন্য বলা হয়েছে− وَمَنَافِعُ অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আর অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐ সব নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলে জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথব ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর আরও একটি উপকার আরববাসীদের রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের জন্য শোভা ও সৌন্দর্যের সামগ্রী, বিশেষত চতুষ্পদ জন্তু যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে গোশালায় প্রত্যাবর্তন করে অথবা সকালে গোশালা থেকে চারণক্ষেত্রে গমন করে। কারণ তখন চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মালিকদের বিশেষ শান-শওকত ও জাঁকজমক ফুটে উঠে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারি জিনিসপত্র দূর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ি, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিষ্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

أَنْعَامٌ অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐ সব জন্তুর কথা প্রসঙ্গত উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারি ও বোঝা বহনের উদ্দেশ্যে। এদের দুধ ও গোশ্‌তের সাথে মানুষের কোনো উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরিয়তের আইন নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে–

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً অর্থাৎ আমি ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও– বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শানশওকত বুঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।

কুরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ : সওয়ারির তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে– وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে জোড়াতালি দিয়ে বিভিন্ন কলকব্জা তৈরি করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতিপ্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খানি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোনো লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোনো হালকা ধাতু তৈরি করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ/ জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্বোল্লিখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خَلَقَ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে يَخْلُقُ বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে আল্লাহ তা'আলা আয়াতে সেগুলোর নামও উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তখনকার দিনে যদি রেল, মোটর, বিমান ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করতেন, তবে তাতে সম্বোধিতদের মস্তিষ্কের পক্ষে হতবুদ্ধিতা ছাড়া কোনো লাভ হতো না। কেননা তখন এমন জিনিসের কল্পনা করাও মানুষের জন্য সহজ ছিল না। উপরিউক্ত যানবাহন বুঝানোর জন্য এসব শব্দ তখন কোথাও ব্যবহৃত হতো না। ফলে এগুলোর কোনো অর্থই বুঝা যেত না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুবী (র.) বলতেন, কুরআন পাকে রেলের উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে আলোচ্য আয়াতটি পেশ করতেন। তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিমান আবিষ্কৃতই হয়নি। তাই তিনি শুধু রেলের কথাই বলতেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাসআলা : কুরআন পাক প্রথমে أَنْعَامٌ অর্থাৎ উট, গরু-ছাগল ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে– وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু গোশ্‌ত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশ্‌ত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকহবিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্ত ঘোড়ার ব্যাপারে দুটি পরস্পরবিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম। হওয়া বুঝা যায়; এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। কারো মতে হালাল এবং কারো মতে হারাম ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এ পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার মাংসকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেননি; কিন্তু মাকরূহ বলেছেন। –[আহকামুল কুরআন-জাসসাস]

মাসআলা : এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহংকার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশি অথবা আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তাঁর দৃষ্টিতে একথাই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা– এটা হারাম –[তাফসীরে বায়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার মহান অবদানসমূহ উল্লেখ করে তাওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এসব নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে এ আয়াতটি 'মধ্যবর্তী বাক্য' হিসেবে এনে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ওয়াদার কারণে মানুষের জন্য সরল পথ প্রতিভাত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এ পথে সোজা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছবে। এ কারণেই আল্লাহর অবদানসমূহ পেশ করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। কিন্তু এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক অন্যান্য বক্র পথও অবলম্বন করে রেখেছে। তারা এসব সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রমাণ দ্বারা উপকার লাভ করে না, বরং পথভ্রষ্টতার আবর্তে ঘোরাফেরা করে।

এরপর বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে সবাইকে সরল পথে চলতে বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু রহস্য ও যৌক্তিকতার তাগিদ ছিল এই যে, জোরজবরদস্তি না করে উভয় প্রকার পথই সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অতঃপর যে যে পথে চলতে চায় চলুক। সরল পথ আল্লাহ ও জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং বক্র পথ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখন মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা, সে তা বেছে নিতে পারে।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

১০. هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ تَشْرَبُوْنَهُ وَمِنْهُ شَجَرٌ يَنْبُتُ بِسَبَبِهِ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ تَرْعَوْنَ دَوَابَّكُمْ.

১০. তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় যা তোমরা পান কর আর উদ্ভিদ অর্থাৎ এটার মাধ্যমে উদ্ভিদ জন্মায় যাতে তোমরা পশুচারণ কর। تُسِيْمُوْنَ অর্থ তোমরা পশু চারণ কর।

১১. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً دَالَّةً عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِيْ صُنْعِهِ فَيُؤْمِنُوْنَ.

১১. তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য জন্মান শস্য, জয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল, অবশ্যই তাতে উল্লিখিত বস্তুসমূহে রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রমাণ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। অনন্তর তারা ঈমান আনয়ন করে।

১২. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى مَا قَبْلَهُ وَالرَّفْعِ مُبْتَدَأً وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ بِالْوَجْهَيْنِ مُسَخَّرٰتٌ بِالنَّصْبِ حَالٌ وَالرَّفْعُ خَبَرٌ بِأَمْرِهِ ط بِإِرَادَتِهِ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

১২. তিনিই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন রজনী, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে। আর নক্ষত্ররাজিও অধীনস্ত তাঁর নির্দেশে তাঁর ইচ্ছায়। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য পরিণামদর্শীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। وَالشَّمْسَ পূর্ববর্তী শব্দের عَطْف বা অন্বয় রূপে এটা مَنْصُوْبٌ [ফাতহাযুক্ত] আর مُبْتَدَأ বা উদ্দেশ্য রূপে رَفْع [পেশযুক্ত] সহ পাঠ করা যায়। وَالنُّجُوْ এটাও উপরিউক্ত দুই রূপে পাঠ করা যায়। مُسَخَّرَاتٌ এটা হালরূপে مَنْصُوْبٌ [ফাতহাযুক্ত] আর خَبَرٌ বা বিধেয়রূপে مَرْفُوْعٌ [পেশযুক্ত] রূপে পাঠ করা হয়

১৩. وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا ذَرَأَ خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ط كَأَحْمَرَ وَأَخْضَرَ وَأَصْفَرَ وَغَيْرِهَا إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ.

১৩. এবং তিনি তোমদের অধীন করেছেন বিবিধ রঙের যেমন– লাল, সবুজ ও হলুদ ইত্যাদি বস্তু পশু, উদ্ভিদ ইত্যাদি যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। যারা উপদেশ গ্রহণ করে সেই সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। يَذَّكَّرُوْنَ যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪. وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ ذَلَّلَهُ لِرُكُوْبِهِ وَالْغَوْصِ فِيْهِ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا هُوَ السَّمَكُ وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج هِيَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

১৪. তিনিই সমুদ্রকে পরিভ্রমণ ও ডুব দেওয়ার জন্য অধীন অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তা হতে আর্দ্র গোশত অর্থাৎ মৎস আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলি বড় ও ছোট মুক্তা যা তোমরা পরিধান কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَتَرَى تُبْصِرُ الْفُلْكَ السُّفُنَ مَوَاخِرَ فِيْهِ تَمْخَرُ الْمَاءَ اَيْ تَشُقُّهُ بِجَرْيِهَا فِيْهِ مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً بِرِيْحٍ وَاحِدَةٍ وَلِتَبْتَغُوْا عَطْفٌ عَلٰى لِتَاْكُلُوْا تَطْلُبُوْا مِنْ فَضْلِهٖ تَعَالٰى بِالتِّجَارَةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

আর তোমরা দেখতে পাও একই বাতাসে সামনে বা পশ্চাতে তার বুক চিরিয়ে নৌযান চলাচল করে যেন তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাঁর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার আর তোমরা যেন এতদ্বিষয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। تَرَى অর্থ দেখ। اَلْفُلْكَ অর্থ নৌযানসমূহ। مَوَاخِرَ বলা تَمْخَرُ الْمَاءَ অর্থাৎ পানি চিরিয়ে চলে। وَلِتَبْتَغُوْا পূর্বোল্লিখিত لِتَاْكُلُوْا ক্রিয়ার সাথে এটার عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। অর্থ, এবং যাতে তোমরা তালাশ কর।

১৫. وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ جِبَالًا ثَوَابِتَ لِ اَنْ لَا تَمِيْدَ تَتَحَرَّكَ بِكُمْ وَ جَعَلَ فِيْهَا اَنْهَارًا كَالنِّيْلِ وَسُبُلًا طُرُقًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ اِلٰى مَقَاصِدِكُمْ ـ

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে না দোলে এবং তিনি এতে সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী যেমন নীলনদ ও বহু পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার। رَوَاسِىَ সুদৃঢ় পর্বতসমূহ। اَنْ تَمِيْدَ এটা হেতুবোধক। তাই তাফসীরে এটার পূর্বে ل-এর উল্লেখ করা হয়েছে। تَمِيْدَ -এর পূর্বে এক না-বোধক لا উহ্য রয়েছে। অর্থ যেন না দোলে। سُبُلًا পথসমূহ।

১৬. وَعَلٰمٰتٍ تَسْتَدِلُّوْنَ بِهَا عَلَى الطُّرُقِ كَالْجِبَالِ بِالنَّهَارِ وَبِالنَّجْمِ بِمَعْنَى النُّجُوْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ اِلَى الطُّرُقِ وَالْقِبْلَةِ بِاللَّيْلِ ـ

১৬. এবং চিহ্নসমূহও। যা দ্বারা তোমরা দিবসে পথ নির্ণয় কর যেমন পাহাড়সমূহ। আর নক্ষত্ররাজির সাহায্যেও তারা রাত্রিতে কিবলা ও পথ নির্দেশ পায়। اَلنَّجْم এটা এ স্থানে বহুবচন اَلنُّجُوْم অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৭. اَفَمَنْ يَّخْلُقُ وَهُوَ اللّٰهُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ط وَهُوَ الْاَصْنَامُ حَيْثُ تُشْرِكُوْنَهَا مَعَهٗ فِى الْعِبَادَةِ لَا اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ هٰذَا اَفَتُؤْمِنُوْنَ ـ

১৭. যিনি সৃষ্টি করেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তিনি কি তাঁর মতো যে সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের মতো যে, তোমরা এগুলিকে তাঁর শরিক কর। না, তিনি এগুলির মতো নন। তবুও কি তোমার এ উপদেশ গ্রহণ করবে না? এবং ঈমান আনয়ন করবে না?

১৮. وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط تَضْبِطُوْهَا فَضْلًا اَنْ تُطِيْقُوْا شُكْرَهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ حَيْثُ يُنْعِمُ عَلَيْكُمْ مَعَ تَقْصِيْرِكُمْ وَعِصْيَانِكُمْ ـ

১৮. তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার শুকরিয়া আদায় করা তো দূরের কথা তার সংখ্যা নির্ণয়ও করতে পারবে না। গণনাবদ্ধ করতে পারবে না আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাই তিনি তোমদের ত্রুটি ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেন।

Free © www.e-ilmweebly.com

١٩. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ.

১৯. তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন।

٢٠. وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ بِالتَّا وَالْيَاءِ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهُوَ الْاَصْنَامُ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ يُصَوَّرُوْنَ مِنَ الْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا

২০. তারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিমাকে আহ্বান করে উপাসনা করে তারা তো কিছুই সৃষ্টি করে না অথচ তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। পাথর ইত্যাদি দ্বারা এগুলোর আকৃতি গঠন করা হয়। يَدْعُوْنَ এটা ى বা নাম পুরুষ ও ت বা দ্বিতীয় পুরুষ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٢١. اَمْوَاتٌ لَا رُوْحَ فِيْهِمْ خَبَرٌ ثَانٍ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ط تَاكِيْدٌ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَىِ الْاَصْنَامُ اَيَّانَ وَقْتَ يُبْعَثُوْنَ اَىِ الْخَلْقُ فَكَيْفَ يَعْبُدُوْنَ اِذْ لَا يَكُوْنُ اِلٰهًا اِلَّا الْخَالِقُ الْحَىُّ الْعَالِمُ بِالْغَيْبِ.

২১. এরা মৃত এদের আসলেই কোনো প্রাণ নাই। নির্জীব এবং কখন সকল সৃষ্টির পুনরুত্থান-এর সময় সে বিষয়ে তাদের এ প্রতিমাসমূহের কোনো চেতনা নেই। সুতরাং কেমন করে এদের উপাসনা করা যায়? কেননা, চিরঞ্জীব, অদৃশ্য সম্পর্কে পরম জ্ঞানী, সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন কেউ ইলাহ বা উপাস্য হতে পারে না। اَمْوَاتٌ এটা পূর্ববর্তী আয়াতোক্ত اَلَّذِيْنَ-এর خَبَرٌ ثَانِىْ বা দ্বিতীয় বিধেয়। غَيْرُ اَحْيَاءٍ এটা تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِالنَّصَبِ حَالٌ : اَلشَّمْسَ (مُسَخَّرَاتٍ)-এর উপর نَصَبْ-এর সুরতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর পূর্বে উল্লিখিত سَبَبٌ থেকে حَالٌ হবে আর আমেল হবে سَخَّرَ-এর যমীর। আর اَلشَّمْسُ-এর উপর رَفْع-এর সুরতে مُسَخَّرَاتٌ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ مَا ذَرَاَ : এর আতফ হয়েছে اَللَّيْل-এর উপর। মুফাসসির (র.) سَخَّرَ উহ্য বের করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَوَاخِرَ : এটা مَاخِرٌ-এর বহুবচন। বাবে فَتَحَ হতে মাসদার مَخْرًا ، مَخُوْرًا অর্থ– পানি ভেদ করা।

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى لِتَاكُلُوْا : অর্থাৎ تَبْتَغُوْا-এর আতফ لِتَاكُلُوْا-এর উপর হয়েছে। আর মাঝের বাক্যটি হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا : এর আতফ হলো رَوَاسِىَ-এর উপর। কেননা اَلْقٰى-এর মধ্যে جَعَلَ-এর অর্থ রয়েছে।

قَوْلُهُ خَبَرٌ ثَانٍ : অর্থাৎ اَمْوَاتٌ টা اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ-এর দ্বিতীয় খবর। আর প্রথম খবর হলো

قَوْلُهُ تَاكِيْدٌ : অর্থাৎ غَيْرُ اَحْيَاءٍ টা اَمْوَاتٌ-এর تَاكِيْد হয়েছে কাজেই عَدَمُ حَاجَتْ-এর প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ : شَجَرٌ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোনো কোনো সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شَجَرٌ বলা হয় যা ভূপৃষ্ঠে হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। কেননা এরপরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশির ভাগ সম্পর্ক। تُسِيْمُوْنَ শব্দটি اِسَامَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বারবার এ বিষয়ের প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তাভাবনার দাবি রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্যকণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোনো কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই; বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবরাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে–

إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বুঝতে তেমন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যও কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই। এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে–

إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ এতে তাদের জন্য প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাজ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোনো নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

قَوْلُهُ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ : রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত আছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ মাছের টাটকা গোশ্ত লাভ করে।

قَوْلُهُ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا : এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশ্ত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে জবাই করা শর্ত নয় এ যেন আপনা-আপনি তৈরি গোশ্ত।

قَوْلُهُ وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا : এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরিরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةً-এর শাব্দিক অর্থ– শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐ রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বুঝানো হয়েছে, যা সমুদ্র গর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরি করে গলায় অথবা অন্যান্য পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কুরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُوْنَهَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজসজ্জা করাটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজসজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

قَوْلُهُ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ : এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْكٌ শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِرَ শব্দটি مَاخِرَةٌ-এর বহুবচন। مَخْر-এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূরদূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূরদূরান্তে সমুদ্রপথেই সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَأَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ : رَوَاسِىَ শব্দটি رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ- ভারী পাহাড়। تَمِيْدَ শব্দটি مَيْد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূমণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোনো দিক দিয়ে ভারী এবং কোনো দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূপৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছু সংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মতো একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক- উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরি ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন, যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মতো চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কিনা, এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরও অধিক সহায়ক হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَامَاتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করাও এখানে সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মঞ্জিলে মকসূদে পৌছার জন্য ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে- وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলা বাহুল্য, ভূপৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হতো তবে মানুষ কোনো গন্তব্যস্থানে পৌছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

قَوْلُهُ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : অর্থাৎ পথিক যেমন ভূপৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٢. اِلٰهُكُمُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ مِنْكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَا نَظِيْرَ لَهُ فِيْ ذَاتِهِ وَلَا فِيْ صِفَاتِهِ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ جَاحِدَةٌ لِلْوَحْدَانِيَّةِ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ مُتَكَبِّرُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا.

٢٣. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ط فَيُجَازِيْهِمْ بِذٰلِكَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ بِمَعْنٰى اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ وَنَزَلَ فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ

٢٤. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ ذَا مَوْصُوْلَةٌ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ قَالُوْا هُوَ اَسَاطِيْرُ اَكَاذِيْبُ الْاَوَّلِيْنَ اِضْلَالًا لِلنَّاسِ.

٢٥. لِيَحْمِلُوْا فِيْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ اَوْزَارَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ كَامِلَةً لَمْ يُكَفَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَمِنْ بَعْضِ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ط لِاَنَّهُمْ دَعَوْهُمْ اِلَى الضَّلَالِ فَاتَّبَعُوْهُمْ فَاشْتَرَكُوْا فِي الْاِثْمِ اَلَا سَاءَ بِئْسَ مَا يَزِرُوْنَ يَحْمِلُوْنَهُ حِمْلُهُمْ هٰذَا.

অনুবাদ :

২২. তোমাদের ইবাদতের যোগ্য অধিকারী তোমাদের ইলাহ তিনিই এক ইলাহ। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে কেউই তাঁর নজির নাই। তিনি হচ্ছেন সুমহান আল্লাহ পাক। সুতরাং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর আল্লাহর একত্বের অস্বীকারকারী এবং তারা ঈমান আনয়নের বিষয়ে অহংকারী। مُنْكِرَةٌ অর্থ– অস্বীকারকারিণী। يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তারা অহংকার প্রদর্শন করে।

২৩. এটা নিঃসন্দেহ যে, যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন। অনন্তর তিনি তাদেরকে এগুলোর প্রতিফল প্রদান করবেন। নিশ্চয় তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবেন। لَا جَرَمَ অর্থ– নিঃসন্দেহে।

২৪. আল্লাহ তা'আলা নযর ইবনে হারিছ সম্পর্কে নাজিল করেন– তাদেরকে যখন বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর কি অবতীর্ণ করেছেন? তখন তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে এটা সেকালের উপকথা, মিথ্যা কাহিনী। مَا এটা এ স্থানে اِسْتِفْهَامِيَّةٌ বা প্রশ্নবোধক। ذَا এটা مَوْصُوْلَةٌ বা সংযোজক অব্যয়।

২৫. পরিণামে কিয়ামত দিবসে তারা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে নিজেদের পাপের বোঝা তার বিন্দুমাত্র কাফ্ফারা হবে না এবং তাদের পাপের কতক যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। কেননা, এরা তাদেরকে গোমরাহির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। তারা এদের অনুসরণ করেছে। সুতরাং পাপের মধ্যে এরাও তাদের অংশী হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مُتَكَبِّرُوْنَ : مُسْتَكْبِرُوْنَ-এর তাফসীর مُتَكَبِّرُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتِفْعَالٌ টা تَفَعُّلٌ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এ আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, এখানে طَلَبٌ -এর অর্থ বৈধ নয়।

قَوْلُهُ بِمَعْنَى اَنَّهُ يُعَاقِبُهُمْ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, حُبٌّ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহার বৈধ নয়। কেননা حُبٌّ-এর تَعَلُّقٌ অন্তঃকরণের সাথে হয়ে থাকে। আর অন্তঃকরণ مُجَسَّمٌ হয়ে থাকে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র :

উত্তর. عَدَمُ حُبٍّ -এর লাযেমী অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ শাস্তি। কাজেই এখন আর কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ هُوَ : প্রশ্ন. هُوَ উহ্য মানার কারণ কি?

উত্তর. اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ যেহেতু قَالَ -এর مَقُوْلَهٌ আর مَقُوْلَهٌ-এর জন্য জুমলা হওয়া জরুরি অথচ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ হলো مُفْرَدٌ অর্থাৎ পরিপূর্ণ বাক্য নয়। মুফাসসির (র.) هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়ে পরিপূর্ণ বাক্য হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِيَحْمِلُوْا -এর মধ্যে لَامٌ টা عَاقِبَتْ-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ حِمْلُهُمْ هٰذَا : এটা مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত নিদর্শনগুলো এত সুস্পষ্ট যে, যে কোনো বুদ্ধিমান, বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের তৌহিদ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মাবুদ তিনি একক, অদ্বিতীয় মাবুদ, তাঁর কোনো শরিক নেই।

কিন্তু যারা নির্বোধ, যারা ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে না, যাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় নেই তথা এ জীবনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই নেই, পৃথিবীতে কেন তারা এসেছে? কার নির্দেশের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তারা নিজেদের অস্তিত্ব লাভ করেছে? এ জীবনের অবসানের পর তাদের কি অবস্থা হবে? এসব কথা যারা চিন্তা করেন না তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির প্রতি বিশ্বাস করে না এবং এজন্য কোনো প্রস্তুতিও গ্রহণ করে না। তাই ইরশাদ হয়েছে–

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ বস্তুত যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যকে গ্রহণ করে না, যদি কেউ দিবালোকে চক্ষু বন্ধ করে রাখে এবং সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তবে তার যে অবস্থা হয়, কাফের মুশরিকদেরও অনুরূপ অবস্থা। তাদের অন্তরে সত্যকে গ্রহণ করার এবং অসত্যকে বর্জন করার শক্তি নেই, তাদের দৃষ্টিতে আলো-আঁধারের পার্থক্য নেই। দুনিয়ার ক্ষণাস্থায়ী জীবনকে তারা চিরস্থায়ী মনে করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে তারা অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ : আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আখেরাতকে মানে না তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার অনন্ত-অসীম নিয়ামতকে অস্বীকার করে, অথচ এ নিয়ামতসমূহকে তারা অহরহ ভোগ করে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। এর কারণ এই, আল্লাহ পাক তাদের নাফরমানি, নিমকহারামী এবং অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে মারেফাতের নূর থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাই চক্ষু থাকা সত্ত্বেও তারা অন্ধ।

قَوْلُهُ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তৌহিদের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে এবং বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেছে এ আয়াত থেকে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেরদের এ সন্দেহ নতুন কিছু নয়, বরং পূর্বকালের নবীগণের সময়ও এমন সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ কারণে তারা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের ধ্বংস হওয়াই ছিল সন্দেহের প্রতি উত্তর। ইরশাদ হয়েছে– وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ তাদেরকে যখন বলা হয় তোমাদের প্রতিপালক কি নাজিল করেছেন? তারা বলে প্রাচীনকালের লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র।

শানে নুযূল : প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম ﷺ যখন তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের দলিল হিসেবে ঘোষণা করেন, এই কুরআনে কারীম আল্লাহ পাকের কালাম, আল্লাহ পাক আমাকে নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আর পবিত্র কুরআন আমার প্রতি নাজিল করেছেন, তখন কাফের মুশরিকরা বলত এটি আল্লাহর কালাম নয়; বরং এটি প্রাচীন কিচ্ছা-কাহিনী [নাউযুবিল্লাহ] তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে লিখেছেন– আরববাসী যখন এ কথা জানতে পারল যে, মক্কা মুয়াযযমায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তারা হজের মৌসুমে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে, এদিকে মক্কার মুশরিকরা বিভিন্ন রাস্তায় মোড়ে দুর্বৃত্তদেরকে মোতায়েন করে রাখে যেন তারা মানুষকে প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ লোকেরা যখন মক্কাবাসীকে জিজ্ঞাসা করত, তোমাদের পরওয়ারদেগার কি নাজিল করেছেন? অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দাবি করেছেন তাঁর প্রতি আল্লাহ পাক কুরআন নাজিল করেছেন, সে সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ তখন তারা বলত, না তেমন কিছু নয়; বরং এটি প্রাচীন লোকদের কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এটি আল্লাহর প্রেরিত কালাম নয়। [নাউযুবিল্লাহ]

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬ পৃ. ৩৮৫]

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যখন প্রিয়নবী ﷺ তাঁর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআনকে মোজেজা হিসেবে পেশ করেছেন, তখন কাফেররা বলেছে, এটি মোজেজা বলে কিছু নয়; বরং এতে প্রাচীন কালের লোকদের কিছু-কিচ্ছা কাহিনীই রয়েছে।

প্রশ্ন হলো পবিত্র কুরআন সম্পর্কে এ আপত্তিকর মন্তব্য কে করেছে? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কাফেররা একে অন্যকে একথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, হজের উদ্দেশ্যে আগমনকারী লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে কাফের সর্দাররা যে দুর্বৃত্তদের মোতায়েন করে রাখত, তারা এসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে। ঐ দুর্বৃত্তরা সর্বদা মানুষকে প্রিয়নবী ﷺ এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত।

قَوْلُهُ لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ : অর্থাৎ তারা যে পবিত্র কুরআনের অমর্যাদা করেছে এবং এ সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, তার পরিণামে কেয়ামতের দিন তারা নিজেদের গুনার বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুনার বোঝাও বহন করবে যারা তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র.) এবং মুসলিম (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডাকবে, তাকে নেক আমলকারীর সমান ছওয়াব দেওয়া হবে। [তার আহ্বানে যে নেক আমল করল] তার সওয়াব কম করা হবে না। আর যে পাপাচারের দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, তার এতটুকু গুনাহ হবে, যতখানি পাপাচারীর হবে। আর এজন্যে যে পাপকার্যে লিপ্ত হবে, তার গুণাহ কম হবে না।

قَوْلُهُ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ : যারা পথভ্রষ্টকারী, তারা তাদের অনুসারীদের কিছু গুনার বোঝা বহন করবে। مِنْ অব্যায়টির কারণে এ মর্ম প্রকাশ পায়। কেননা পাপাচারীদের নিজস্ব কিছু গুনাহ থাকবে। আর কিছু গুনাহ পথভ্রষ্টকারীদের কারণে হবে, আর এ গুনাহগুলোর বোঝা কেয়ামতের দিন তাদেরকেই বহন করতে হবে। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৩৮৬]

قَوْلُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : অর্থাৎ যারা মানুষকে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে পথভ্রষ্ট করে, তাদের নিকট এর কোনো জ্ঞান বা দলিল নেই। অথবা এর অর্থ হলো যারা পথভ্রষ্ট হয়, তারা অজানা অবস্থায় পথভ্রষ্ট হয়, তারা একথা জানেনা যে পথভ্রষ্ট লোকরাই তাদেরকে পথহারা করেছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে সতর্কবাণী রয়েছে যে, না জানার কারণে যারা পথভ্রষ্ট হয়, তাদের না জানা ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না, কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেককে বিবেক– বুদ্ধি দিয়েছেন যা দ্বারা হক্ব ও বাতিল বা ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

قَوْلُهُ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ : সতর্ক হও! তারা যে গুনার বোঝা নিজেদের উপর তুলে নিচ্ছে তা অত্যন্ত মন্দ বোঝা। কেননা যে গুনার কাজের দিকে ডাকে সে তার অনুসারীর ন্যায় গুনার অংশীদার হয়। কিন্তু এজন্য অনুসারীর গুনার বোঝা এতটুকুও কম হয় না।

আলোচ্য আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা করত। কেয়ামতের দিন তাদের নিজেদের পাপাচারের শাস্তির পাশাপাশি অন্যদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার শাস্তিও তারা ভোগ করবে। –[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৫৫২]

Free @ www.eilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٦. قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهُوَ نَمْرُوْدُ بَنٰى صَرْحًا طَوِيْلًا لِيَصْعَدَ مِنْهُ اِلَى السَّمَاءِ لِيُقَاتِلَ اَهْلَهَا فَاَتَى اللّٰهُ قَصَدَ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْاَسَاسِ فَاَرْسَلَ عَلَيْهِ الرِّيْحَ وَالزَّلْزَلَةَ فَهَدَمَتْهَا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ اَىْ وَهُمْ تَحْتَهُ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ مِنْ جِهَةٍ لَا تَخْطُرُ بِبَالِهِمْ وَقِيْلَ هٰذَا تَمْثِيْلٌ لِاِفْسَادِ مَا اَبْرَمُوْهُ مِنَ الْمَكْرِ بِالرُّسُلِ .

২৬. তাদের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করেছিল; আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন ফলে ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধসে পড়ল আর তারা এর নিচে চাপা পড়ল এবং এমন দিক হতে তাদের উপর শাস্তি আসল যা ছিল তাদের ধারণার অতীত। তাদের কল্পনায়ও এই দিকের চিন্তা আসে নাই। সে ছিল নমরূদ। আকাশে চড়ে তথাকার অধিবাসীদের হত্যা করার জন্য সে বিরাট এক বালাখানা নির্মাণ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে তা ধ্বংস করেছিলেন। فَاَتَى اللّٰهُ 'আল্লাহ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন' এ বাক্যটি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, তাদের সুকঠিন চক্রান্তকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন তা বুঝাতে উদাহরণ স্বরূপ এ বাক্যটির ব্যবহার হয়েছে। اَتَى اللّٰهُ এ স্থানে এটা قَصَدَ 'তিনি ইচ্ছা করেন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْقَوَاعِدُ অর্থ ভিত্তিমূহ

٢٧. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ يُذِلُّهُمْ وَيَقُوْلُ لَهُمُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ الْمَلٰئِكَةِ تَوْبِيْخًا اَيْنَ شُرَكَائِىَ بِزَعْمِكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ تُخَالِفُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهِمْ ط فِىْ شَاْنِهِمْ قَالَ اَىْ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يَقُوْلُوْنَهُ شَمَاتَةً بِهِمْ .

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের বাচনিক ভর্ৎসনা করে তাদেরকে বলবেন, কোথায় তোমাদের কল্পনা প্রসূত আমার সেই সমস্ত শরিক যাদের সম্বন্ধে যাদের বিষয় নিয়ে তোমরা বিতণ্ডা করতে মু'মিনদের বিরোধিতা করতে! যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা অর্থাৎ নবী ও মু'মনগণ বলবে, আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যই। এ কথা তাঁরা এদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আনন্দ প্রকাশার্থে বলবেন। يُخْزِيْهِمْ অর্থ তিনি এদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। قَالَ الَّذِيْنَ এ স্থানে قَالَ ক্রিয়াটি مَاضِىْ বা অতীতকাল বাচক হলেও مُسْتَقْبَلْ বা ভবিষ্যৎকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেহেতু এটার তাফসীরে يَقُوْلُ ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٨. اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ص بِالْكُفْرِ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ اِنْقَادُوْا وَاسْتَسْلَمُوْا عِنْدَ الْمَوْتِ قَائِلِيْنَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْءٍ ط شِرْكٍ فَتَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ بَلٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهِ .

২৮. কুফরি করত নিজেদের উপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটাবে, অনন্তর তারা আত্মসমর্পণ করত অর্থাৎ মৃত্যুর সময় বাধ্যগত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলবে আমরা কোনো মন্দকর্ম অর্থাৎ শিরক করতাম না। ফেরেশতাগণ বলবেন, হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে এটার প্রতিফল দেবেন। يَتَوَفّٰهُمْ এটা ى বা নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت বা নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয় রূপেই পাঠ করা যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৯. وَيُقَالُ لَهُمْ فَادْخُلُوٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط فَلَبِئْسَ مَثْوٰى مَاْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ .

২৯. তাদেরকে বলা হবে সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর তাতে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে; অহংকারীদের আবাসস্থল অবশ্যই কত নিকৃষ্ট। مَاْوٰى অর্থ আবাসস্থল।

৩০. وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْاِيْمَانِ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ اَىِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ ط مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا قَالَ تَعَالٰى فِيْهَا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ هِىَ .

৩০. এবং যারা শিরক হতে আত্মরক্ষা করেছিল তাদেরকে বলা হবে 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, মহাকল্যাণ।' যারা ঈমান আনয়নের মাধ্যমে সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে এ দুনিয়ার মঙ্গল অর্থাৎ পবিত্র ও সুখময় জীবন এবং পরকালের আবাস অর্থাৎ জান্নাত; এ দুনিয়া ও এর সকল কিছু হতে তা আরো উৎকৃষ্ট এবং তাতে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মুত্তাকীদের কত উত্তম আবাসস্থল এটা।

৩১. جَنّٰتُ عَدْنٍ اِقَامَةٍ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يَدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاءُوْنَ ط كَذٰلِكَ الْجَزَاءِ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ .

৩১. স্থায়ী ভাবে বসবাসের জান্নাত। এতে তারা প্রবেশ করবে। جَنّٰتُ عَدْنٍ মুবতাদা আর يَدْخُلُوْنَهَا খবর এর পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে এতে তাদের জন্য তাই থাকবে। এভাবে পুরস্কার প্রদানের মতো আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পুরস্কৃত করেন।

৩২. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ طَيِّبِيْنَ طَاهِرِيْنَ مِنَ الْكُفْرِ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ وَيُقَالُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

৩২. কুফর হতে পবিত্রাবস্থায় ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে ফেরেশতাগণ মৃত্যুকালে বলবে, তোমাদের উপর সালাম– শান্তি। পরকালে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে তার ফলস্বরূপ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। اَلَّذِيْنَ এটা نَعْتٌ বা বিশেষণমূলক সংযোজক অব্যয়। طَيِّبِيْنَ অর্থ যারা পবিত্র।

৩৩. هَلْ مَا يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُ الْكُفَّارُ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلٰۤئِكَةُ لِقَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ اَوْ يَأْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ ط الْعَذَابُ اَوِ الْقِيٰمَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ

৩৩. তারা অর্থাৎ কাফেররা কি هَلْ এটা এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতীক্ষা করে তাদের রূহ কবজ করার জন্য তাদের নিকট ফেরেশতা আসার বা তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ অর্থাৎ শাস্তি বা শাস্তি সংবলিত কিয়ামতের দিন আসার?

كَذٰلِكَ كَمَا فَعَلَ هٰٓؤُلَآءِ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْاُمَمِ كَذَّبُوْا رُسُلَهُمْ فَاُهْلِكُوْا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ بِاِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِالْكُفْرِ.

এরা যেমন করে এদের পূর্ববর্তীগণও জাতিগণও এরূপ করত। তাঁরাও তাদের রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অপরাধ ছাড়া ধ্বংস করত আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি; বরং তরাই কুফরি করত নিজেদের প্রতি জুলুম করত। يَنْتَظِرُوْنَ এ স্থানে অর্থ يَنْظُرُوْنَ [এরা প্রতীক্ষা করছে।] يَاْتِيَهُمْ এটা ى বা নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ ও ت বা নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٣٤. فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا ج اَىْ جَزَاؤُهَا وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَىِ الْعَذَابُ.

৩৪. সুতরাং তারা যা করেছিল তার মন্দতা অর্থাৎ মন্দকর্মের প্রতিফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা অর্থাৎ আল্লাহর আজাব তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। আর তা তাদের উপর নেমে এসেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَصَدَ : যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য اِتْيَانْ-এর اِطْلَاقْ অসম্ভব, তাই مَجَازْ হিসেবে اِتْيَانْ -এর তাফসীর قَصَدَ দ্বারা করেছেন।

قَوْلُهُ بُنْيَانَهُمْ : এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ قَصَدَ اِسْتِيْصَالَ بُنْيَانِهِمْ

قَوْلُهُ لِاِفْسَادِ مَا اَبْرَمُوْهُ : অর্থাৎ تَمْثِيْل উদ্দেশ্য নেওয়ার সুরতে তাদের ষড়যন্ত্রকে যাকে তারা মহাশক্তিমান মনে করেছিল তাকে ব্যর্থ করে দেওয়া উদ্দেশ্য হবে। নমরূদের নির্মিত ইমারত ধ্বংস করা উদ্দেশ্য হবে না।

قَوْلُهُ اَىْ يَقُوْلُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَاضِىْ টা مُضَارِعْ -এর অর্থে হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হওয়ার কারণে مُضَارِعْ -কে مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قَائِلِيْنَ : قَائِلِيْنَ -এর বৃদ্ধিকরণ বাক্যকে সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক বানানোর জন্য করা হয়েছে। তা ব্যতীত পূর্বাপরের সংযুক্তি থাকে না।

قَوْلُهُ نَعْتٌ : অর্থাৎ اَلْمُتَّقِيْنَ হলো مَوْصُوْفٌ আর تَتَوَفّٰهُمْ হলো তার সিফত আর طَيِّبِيْنَ টা تَتَوَفّٰهُمْ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الخ : যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছিল এবং পবিত্র কুরআনকে অমান্য করেছিল, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের অবস্থা এবং শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে পূর্ববর্তীকালে যারা এমন অন্যায় করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা। এতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের জন্যে একপ্রকার সান্ত্বনা। মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার জন্যে এবং সত্যের আহ্বানকে চাপা দেওয়ার অপচেষ্টায় আজ যারা লিপ্ত রয়েছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, নবুয়ত ও রেসালতের ইতিহাসে এটি নতুন কোনো ঘটনা নয়; বরং ইতঃপূর্বেও যুগে যুগে যখনই কোনো নবীর আবির্ভাব হয়েছে তখনই সে যুগের দুর্বৃত্তরা সত্যের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিশ্চিন্ত মনে চক্রান্তের সৌধ নির্মাণ করেছে, কিন্তু অবশেষে ষড়যন্ত্রের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়েছে। আর এভাবেই ষড়যন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদের চিরসমাধি ঘটেছে, তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ষড়যন্ত্র করে গেছে, অবশেষে আল্লাহর হুকুম আসে এবং তাদের প্রাসাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, পরিণামে তাদের উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নমরুদের ঘটনা : আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হলো নমরুদের ঘটনা। সে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল এবং পৃথিবীতে সেই সর্বপ্রথম অবাধ্য হয়েছিল। আল্লাহ পাক নমরুদকে ধ্বংস করার জন্য একটি মশা প্রেরণ করেছিলেন যা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছিল, সুদীর্ঘ চারশত বছর যাবৎ ঐ মশাটি তার মগজ চুষে খেয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে সে শুধু ঐ সময়েই একটু স্বস্তি লাভ করত যখন তার মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করা হতো। সে চারশ' বছর রাজত্ব করেছিল এবং চরম অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ ব্যক্তি হলো বখতে নসর। এ লোকটিও ছিল অত্যন্ত বড় ষড়যন্ত্রকারী এবং জঘন্য জালেম। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু], পারা ১৪, পৃ. ২৯ তাফসীরে কাবীর, খ. ২০, পৃ. ২০]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীর লিখেছেন, যারা ইতঃপূর্বে নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, ষড়যন্ত্রের ইমারত নির্মাণ করেছে, যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশ এসেছে তথা যখন তাদের প্রতি আজাবের হুকুম হয়েছে তখন তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তারা সত্যের বিরুদ্ধে ন্যায়ের বিরুদ্ধে তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেই ব্যবস্থাগুলোই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যেমন কোনো সম্প্রদায় যদি তাদের দুশমন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রাসাদ নির্মাণ করে আর ভূমিকম্প এসে সেই প্রাসাদকেই ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের উপর প্রাসাদের ছাদ নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ধ্বংসের উপকরণে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের পরিণামের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে কেউ কোনো প্রাসাদ তৈরি করেছিল যা ভেঙ্গে পড়ার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

অবশ্য ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা নমরুদ ইবনে কেনানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সে ইরাকের বাবুল শহরে আসমানের দিকে আরোহণের উদ্দেশ্যে একটি অতি উচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল সাড়ে সাত হাজার গজ। কাব এবং মোকাতেল (রা.) বলেছেন, এ প্রাসাদটির উচ্চতা ছিল ছয় মাইল। কিন্তু প্রবল ঝড়ের কারণে ঐ প্রাসাদটি ভেঙ্গে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তার কিছু অংশ কাফেরদের মাথার উপর পড়ার কারণে তারা ধ্বংসের হয়ে যায়। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৩৮৭ খোলাসাতুততাফাসীর, খ. ২, পৃ. ৫২৫]

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন যে, নমরুদ নির্মিত এ প্রাসাদটি পাঁচ হাজার গজ উঁচু ছিল। আর কারো কারো মতে এটি ছয় মাইল উঁচু ছিল। যখন আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসের হুকুম জারি করলেন, তখন ভূমিকম্পের কারণে এ প্রাসাদটির ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যায় আর কাফের মুশরিকরা তার নিচে পড়ে চিরতরে শেষ হয়ে গেল । তাই ইরশাদ হয়েছে– فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ। এরপর তাদের উপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে এবং তাদের উপর এমন স্থান থেকে আজাব আসে যা তারা ভাবতেও পারেনি। ফলে, তারা তাদেরই প্রাসাদের তলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় –[তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১০, পৃ. ৯৭]

আল্লামা আলূসী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তাফসীরকার যাহহাক (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তিনি একথাও লিখেছেন, নমরুদ নির্মিত এ উঁচু ইমারতটিকে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর ডানার আঘাতে ধ্বংস করে দেন কিন্তু নমরুদ তখন ধ্বংস হয়নি। সে ধ্বংসে হয়েছে মশার দংশনে যা তার নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছিল

–[তাফসীরে রুহুল মাআনী, খ. ১৪, পৃ. ১২৫-২৬]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ : অর্থাৎ অপমান এবং লাঞ্ছনা সেই কাফেরদের জন্যে, ফেরেশতারা যাদের প্রাণ সংহার করে থাকেন এবং যারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে থাকে। তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা তো কোনো অসৎকাজ করতাম না। যারা কুফর ও নাফরমানির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, কেননা তারা নিজেদেরকে চিরকাল আজাবে রাখার ব্যবস্থা করে, আর এটি তাদের প্রতি তাদের নিজেদেরই জুলুম। মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা, মরণ মুহূর্তের ভয়াবহ দৃশ্য, ফেরেশতাদের ধমক– সব মিলিয়ে যখন তারা চরম অসহায় হয়ে পড়বে, তখন তাদের সকল অহংকার চির বিদায় গ্রহণ করবে, তাদের দৌরাত্ম্য এবং ধৃষ্টতা কর্পূরের ন্যায় উড়ে যাবে. তখন তারা বিনীত হয়ে বলবে– فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ আমরা তো কখনও মন্দ কাজ করেনি অথবা এর অর্থ হলো কাফেররা তখন আত্মসমর্পণ করে বলবে, আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি, আমরা সব সময়ই ভালো কাজ করে এসেছি

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بَلْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, না, তোমরা সব সময়ই মন্দ কাজ করতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কাফেররা তখনও মিথ্যা কথা বলে ফাঁকি দেওয়ার অপচেষ্টা করবে, অথচ তাদের জন্য উচিত যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের কোনো অবস্থাই গোপন নেই। তাই এ মিথ্যাবাদিতার কারণে তাদের কোনো উপকার হবে না।

তাফসীরকার ইকরিমা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কাফেরদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলো সেই কাফের যারা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।

فَادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا : অতএব, তোমরা দোজখে প্রবেশ কর, সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে তোমাদের কোনো ফন্দি ফিকির কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র, কলাকৌশল আল্লাহ পাকের আজাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

قَوْلُهُ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ : অতএব, অহংকারীদের ঠিকানা কত মন্দ, কাফের মুশরিকরা তাদের অহংকারের কারণেই নবীর দাওয়াতকে অস্বীকার করত। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় ঈমানের মোকাবিলায় কুফরি এবং সত্যের মোকাবিলায় অহংকারের পরিণতি অপমান এবং লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, মক্কার কাফেরদেরকে যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত, মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি কি নাজিল হয়েছে? তখন তারা অহংকার করে বলত, এসব তো প্রাচীনকালের কিচ্ছা-কাহিনী মাত্র। তাদের এ আপত্তিকর মন্তব্যে ছিল অহংকার। ঈমানের মোকাবিলায় নাফরমানি শোকরের মোকাবিলায় না- শোকরী এবং বিনয়ের মোকাবিলায় অহংকার। এই অহংকারের শাস্তিই তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ভোগ করবে। -[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ২০২]

قَوْلُهُ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ الخ : সুতরাং তাদের উপর আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কাজের শাস্তি। আর তাদের পরিবেষ্টন করেছিল তাই, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত। আল্লাহর নবী-রাসূলগণের শত্রুতায় ইতঃপূর্বে যারা তৎপর হয়েছিল, দীন ইসলামের মহান শিক্ষাকে যারা উপহাস করেছিল অবশেষে তাদের উপর আপতিত হয় আল্লাহ পাকের আজাব। তাদের অন্যায়-অনাচারের জুলুম-অত্যাচারের বিভৎস পরিণাম তারা স্বচক্ষে দেখতে পায়। খোদাদ্রোহিতা তথা সত্যদ্রোহিতা যাদের বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে, যারা সত্যকে শুধু বর্জনই করে না, বরং সত্যের প্রতি বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে, তাদের আজাব হয়ে অত্যন্ত কঠিন, তাদের আত্মরক্ষার কোনো পথ থাকে না, তাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয় অবধারিত, তাদের দুর্ভোগের জন্য তারা নিজেরাই হয় দায়ী।

সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে সত্যদ্রোহীদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। যদিও মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। পবিত্র কুরআন বিশ্বগ্রন্থ। এতে সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে রয়েছে হেদায়েত। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সুসংবাদ যেমন সর্বকালের সকল মানুষের উদ্দেশ্যে, ঠিক তেমনিভাবে এর প্রতিটি সতর্কবাণীও সকল দেশের সর্বকালীন মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। এ যুগে যারা দীন ইসলামের বিরোধিতা করে এমনকি দীন ইসলামের বিশেষ নিদর্শন টুপি-দাড়িকে উপহাস করে, আলোচ্য আয়াতের কঠোর সতর্কবাণী তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, তাদের শাস্তি অবধারিত। এ শাস্তির ভয়াবহতা তারা তখনই উপলব্ধি করবে, যখন তারা আল্লাহর আজাবের সম্মুখীন হবে। বিশেষত যখন তারা এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায় নেবে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিগত ১৯১৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত দীন ইসলামকে উপহাস করা হয়েছিল। বোখারা, সমরকন্দ, আজাবরাইজান, বাকু, উজবেকিস্তান, তাজকিস্তান সহ বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মসজিদ মাদরাসাগুলোকে যারা বন্ধ করে দিয়েছিল, আজ তাদের শক্তি কেন্দ্রগুলো বন্ধ, তারা অপমানিত, লাঞ্ছিত। কিন্তু শাস্তি শুধু এখানেই শেষ নয়; বরং আখেরাতে হবে কঠিনতর শাস্তি।

قَوْلُهُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ : "আর আখেরাতের আজাব অত্যন্ত কঠিন" সে আজাব অবধারিত, চিরনির্ধারিত। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকবে তাদের শুভ পরিণতি তথা জান্নাত সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, তাঁর বিধানকে অমান্য করবে, এমনকি দীন-ইসলামের কোনো বিধানকে উপহাস করবে তাদের শাস্তি অবধারিত। আর এ শাস্তি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই হয়ে থাকে এটি আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান, এর ব্যতিক্রম নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٥. وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لَوْ
شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ
نَحْنُ وَلَاۤ اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ
شَيْءٍ ط مِنَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ فَاِشْرَاكُنَا
وَتَحْرِيْمُنَا بِمَشِيْئَتِهٖ فَهُوَ رَاضٍ بِهٖ قَالَ
تَعَالٰى كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج
اَيْ كَذَّبُوْا رُسُلَهُمْ فِيْمَا جَاؤُوْا بِهٖ فَهَلْ
فَمَا عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ
الْاِبْلَاغُ الْمُبِيْنُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ هِدَايَةٌ.

٣٦. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا كَمَا
بَعَثْنَاكَ فِيْ هٰؤُلَاۤءِ اَنِ اَيْ بِاَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
وَحِّدُوْهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج الْاَوْثَانَ اَنْ
تَعْبُدُوْهَا فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ فَاٰمَنَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ
فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ فَلَمْ يُؤْمِنْ فَسِيْرُوْا يَا
كُفَّارَ مَكَّةَ فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ رُسُلَهُمْ مِنَ الْهَلَاكِ.

٣٧. اِنْ تَحْرِصْ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى هُدٰهُمْ وَقَدْ
اَضَلَّهُمُ اللّٰهُ لَا تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ
وَالْفَاعِلِ مَنْ يُّضِلُّ مَنْ يُّرِيْدُ اِضْلَالَهٗ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْ
عَذَابِ اللّٰهِ.

অনুবাদ :

৩৫. মক্কাবাসী অংশীবাদীরা বলে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তাঁকে ব্যতীত অপর কোনো কিছুর উপাসনা করতাম না এবং তাঁর হুকুম ব্যতীত কোনো কিছু যেমন বাহীরা সায়িবা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করতাম না। আমাদের এ শিরক করা ও নিষিদ্ধ করা আল্লাহর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে। সুতরাং তিনি এ কাজে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের পূর্ববর্তীগণও এরূপ করত অর্থাৎ তারাও রাসূলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন তা অস্বীকার করেছিল। সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া ভিন্ন রাসূলগণের উপর অন্য কিছু কর্তব্য আছে কি? না, নাই। সৎপথ কবুল করানো তাঁদের দায়িত্ব নয়। هَلْ এটা এ স্থানে না-বোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানো।

৩৬. এদের নিকট যেমন প্রেরণ করেছি তেমন প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আমি এ নির্দেশসহ রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর এবং তাগূত অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের উপাসনা বর্জন কর। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করে এবং তাদের কতকের উপর আল্লাহর জ্ঞানানুসারে পথ-ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করেনি। সুতরাং হে মক্কার কাফেরগণ! তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য কর যারা রাসূলগণকে মিথ্যা জেনেছে তাদের কি ধ্বংসকর পরিণাম হয়েছে! حَقَّتْ এ স্থানে অর্থ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল।

৩৭. হে মুহাম্মদ! আল্লাহ যখন এদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন তখন তুমি যদি এদের হেদায়েত করতে আগ্রহী হও তবু তা পারবে না। কেননা আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন যার বিভ্রান্তির তিনি ইচ্ছা করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করেন না এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী অর্থাৎ আল্লাহর আজাব হতে রক্ষাকারী নাই। لَا يَهْدِيْ এটা بِنَاءٌ لِلْفَاعِلِ বা কর্তৃবাচ্য ও بِنَاءٌ لِلْمَفْعُوْلِ বা কর্মবাচ্য উভয়রূপেই পাঠ করা যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٨. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَيْ غَايَةَ اجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ط قَالَ تَعَالٰى بَلٰى يَبْعَثُهُمْ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا مَصْدَرَانِ مُؤَكِّدَانِ مَنْصُوْبَانِ بِفِعْلِهِمَا الْمُقَدَّرِ اَيْ وَعَدَ ذٰلِكَ وَعْدًا وَحَقَّهُ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَيْ اَهْلَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ.

৩৮. তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে, যে মারা যায় আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন এতদ্বিষয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তা অবগত নয়। جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ অর্থ চূড়ান্ত দৃঢ়তার সাথে।

حَقًّا ... وَعْدًا এরা উভয়েই مَصْدَرْ [ক্রিয়ার উৎস] : تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সমধাতুজ উহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে مَنْصُوْبْ [ফাতহাযুক্ত] রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল وَعَدَ ذٰلِكَ وَعْدًا وَحَقَّهُ حَقًّا

٣٩. لِيُبَيِّنَ مُتَعَلِّقٌ بِيَبْعَثُهُمُ الْمُقَدَّرِ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْهِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ بِتَعْذِيْبِهِمْ وَاِثَابَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ فِيْ اِنْكَارِ الْبَعْثِ.

৩৯. যে বিষয়ে অর্থাৎ তাদের শাস্তি ও মু'মিনদের জন্য পুণ্যফল সম্পর্কিত দীনের বিধান সম্পর্কে তারা মু'মিনদের সাথে মতানৈক্য করত তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা যেন জানতে পারে যে, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করায় তারাই ছিল মিথ্যাবাদী। সেজন্য তিনি তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। لِيُبَيِّنَ এটা এ স্থানে উহ্য يَبْعَثُهُمْ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

٤٠. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنٰهُ اَيْ اَرَدْنَا اِيْجَادَهُ وَقَوْلُنَا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اَيْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصَبِ عَطْفًا عَلٰى نَقُوْلَ وَالْاٰيَةُ لِتَقْرِيْرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ.

৪০. আমি কোনো কিছু চাইলে অর্থাৎ তার অস্তিত্ব দিতে চাইলে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। পুনরুত্থানের উপর আল্লাহর কুদরত সুপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি আনা হয়েছে। قَوْلُنَا এটা مُبْتَدَأٌ বা উদ্দেশ্য। اَنْ نَقُوْلَ এটা خَبَرٌ বা বিধেয়। فَيَكُوْنُ এটা অপর এক কেরাতে نَقُوْلَ-এর সাথে عطف বা অন্বয়রূপে نَصَبْ [ফাতহা] সহও পঠিত রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَهُوَ رَاضٍ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কাফের মুশরিকদের এ কথা বলা যে, আমাদের শরিক করা এবং কোনো জিনিসকে হারাম করা আল্লাহর ইচ্ছা ও চাহিদার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, একথা তো একেবারেই ঠিক। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তো কোনো কিছুই হতে পারে না। এরপরও এটা অস্বীকার করা ও প্রতিহত করার কি উদ্দেশ্য?

উত্তর. فَهُوَ رَاضٍ بِهٖ দ্বারা এই সংশয়েরই জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারসংক্ষেপ হলো এই যে, আল্লাহর مَشِيَّتْ এবং ইরাদা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মনঃপূত হওয়া। অথচ مَشِيَّتْ এবং اِرَادَه-এর জন্য রেজামন্দি জরুরি নয়।

قَوْلُهُ الْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ : এখানে اَلْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ-এর তাফসীর اَلْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, উভয়টি অর্থের ক্ষেত্রে مُتَعَدِّىْ-এর জন্য হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَنْ تَعْبُدُوْهَا : এতে মুযাফ উহ্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা نَفْسِ اَوْثَانٍ থেকে বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য হয় না।
قَوْلُهُ فَامَنْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, هِدَايَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ কাজেই এই সংশয়ের নিরসন হয়ে গেল যে, হেদায়েত ও রাহনুমায়ী তো عَامٌ এরপরও تَخْصِيْص -এর কি উদ্দেশ্য?
قَوْلُهُ لَا تَقْدِرُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ تَحْرِصْ -এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে আর তা হলো- لَا تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ
قَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ : এর কারণ হচ্ছে এই যে, مَنْ يُضِلُّ হলো মুবতাদা আর لَا يَهْتَدِىْ হলো তার খবর। অর্থ হলো এই যে, اِنَّ مَنْ يُضِلُّ اللّٰهُ لَا يَهْدِىْ اِلَيْهِ لِعَدَمِ تَغْيِيْرِ فِعْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
قَوْلُهُ مَنْ يُرِيْدُ اِضْلَالَهُ الخ : অর্থাৎ যদি مَنْ يُضِلُّ দ্বারা বাস্তবিক ভ্রষ্টতা উদ্দেশ্যে হয় তবে তো হেদায়েতের نَفِىْ করার কোনো প্রয়োজন নেই।
قَوْلُهُ لِيُبَيِّنَ مُتَعَلِّقٌ بِيَبْعَثُهُمُ الْمُقَدَّرُ : এ ইবারতের উদ্দেশ্যে হলো এই যে, لِيُبَيِّنَ এর সম্পর্ক يَبْعَثُهُمْ-এর সাথে لَا يَعْلَمُوْنَ-এর সাথে নয়। কাজেই এই সংশয়ের নিরসন হয়ে গেল যে, لِيُبَيِّنَ -এর لَا يَعْلَمُوْنَ-এর ইল্লত হওয়া সহীহ নয়। এখন উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, اِنَّهُمْ يَبْعَثُوْنَ لِيُبَيِّنَ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ
قَوْلُهُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে আর জুমলা হয়ে نَصَبٌ -এর مَحَلٌّ-এ হয়েছে। আর যারা يَكُوْنُ-কে اَمْر-এর জবাব বলে مَنْصُوْبٌ বলেছেন এটা ঠিক নয়। কেননা উভয় মাসদারই এক। অথচ جَوَابُ اَمْرٍ-এর মধ্যে এই شَرْط রয়েছে যে, প্রথমটা দ্বিতীয়টার জন্য سَبَبٌ হবে আর এটা تَغَايُرٌ -কে চায়। نَصَبٌ-এর সুরতে বৈধ। যদি نَقُوْلُ-এর উপর আতফ হয় جَوَابُ اَمْرٍ হওয়ার কারণে নয়। অন্যথায় তো একটি مَوْجُوْدٌ (مُكَوَّنٌ)-এর জন্য দুটি وُجُوْدٌ অর্থাৎ দুটি كَوْنٌ হওয়া আবশ্যক হবে যে, তাদের একটি অপরটির سَبَبٌ হবে।
قَوْلُهُ وَالْاٰيَةُ لِتَقْرِيْرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ : এ ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো এই প্রশ্নকে প্রতিহত করা যে, আল্লাহর বাণী كُنْ হয়তো مَوْجُوْدٌ থেকে হবে। এ সুরতে تَحْصِيْلُ حَاصِلٍ আবশ্যক হবে। অথবা مَعْدُوْمٌ থেকে خِطَابٌ হবে তাহলে مَعْدُوْمٌ -কে خِطَابٌ করা আবশ্যক হবে যা অসম্ভব। উত্তরের সার হলো, (كُنْ) -এর উদ্দেশ্য قُدْرَتْ عَلَى الْبَعْثِ -এর প্রমাণ করা ও سُرْعَةٌ فِى الْاِيْجَادِ তথা দ্রুত অস্তিত্বে আসা। কাজেই এখন আর কোনো প্রশ্ন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا الخ : কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন? এ সন্দেহ যে আসার তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে আসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে একপ্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আজাবের অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধা করেন না কেন। একটি বোকামি ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

উপমহাদেশেও আল্লাহর কোনো রাসূল আগমন করেছেন কি? لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا এবং আরও একটি আয়াত وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোনো দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপর পক্ষে لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ আয়াত থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোনো রাসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যত আরব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর কোনো পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যই কুরআন পাকে তাদেরকে اُمِّيِّيْن নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে কোনো পয়গম্বর আসেননি।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ : আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি [এই নির্দেশ দিয়ে] যে তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগি কর, মিথ্যা উপাস্যদের থেকে দূরে থাক।

যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে নবী-রাসূলগণ এভাবে মানুষকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং কুফর, শিরক ও নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে শিরক ও কুফরের পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কেননা হযরত নূহ (আ.)-এর যুগেই জমিনে সর্বপ্রথম শিরক ও কুফর শুরু হয়। এ পর্যায়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন আমাদের নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ, যাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কুরআনের হেফাজত করা হবে। আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান এবং তাঁর অনুসরণই হলো আখেরাতে নাজাত লাভের একমাত্র পন্থা। কুরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ "হে রাসূল! আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি সকলের নিকট এ মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, অতএব, তোমরা শুধু আমার বন্দেগি কর।" যেমন সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হয়েছে, وَاَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ "আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগি কর এটি সরল সঠিক পথ" অতএব, মুশরিকদের একথা আদৌ সঠিক নয় যে "আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আমরা শিরক করতাম না।" তাদেরকে বারে বারে যুগে যুগে সতর্ক করা হয়েছে কিন্তু তারা সতর্ক হয়নি।

قَوْلُهُ اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ : যেহেতু প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্তরে মানুষের জন্য অসাধারণ দয়ামায়া ছিল, মানুষের পথভ্রষ্টতায় তিনি হতেন অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যথিত, বিশেষত মক্কার কাফের মুশরিকদেরকে হেদায়েত করার জন্যে তিনি থাকতেন অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ অর্থাৎ হে রাসূল! যদিও আপনি কাফের মুশরিকদের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে আছেন এবং আপনার মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই যে, কাফেররা ভ্রান্ত মত ও পথ বর্জন করে সরল সঠিক পথে চলে আসুক এবং দোজখ থেকে আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করুক। কিন্তু হে রাসূল! যারা চরম নাফরমানীর কারণে হেদায়েত লাভের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে তাদের হেদায়েতের ব্যাপারে আপনার আকাঙ্ক্ষা পুরা হবার নয়। তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে তারা হেদায়েত গ্রহণ করবে না। তাই আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, আর তাদের হেদায়েতের জন্য আপনার ইচ্ছা এবং সংকল্প যত প্রবল হোকনা কেন, তা তাদের পক্ষে ফলদায়ক হবে না।

পুনরুত্থান আদৌ কঠিন নয় : আর মানবজাতির পুনরুত্থান আল্লাহ পাকের জন্যে কোনো কঠিন কাজই নয় কেননা আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা হলো এই- اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ "আমি যখন কোনো কিছু করতে চাই তখন শুধু বলি হও, তখনই তা হয়ে যায়।" অর্থাৎ আল্লাহ পাক কোনো কিছুর ইচ্ছা করা মাত্রই তা বাস্তবায়িত হয়। এতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। অতএব, তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তখনই কিয়ামত কায়েম হবে এবং সমগ্র মানব জাতির পুনরুত্থান হবে। কেননা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। اِذَا اَرَدْنٰهُ [আমি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করি।]

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কুদরত হেকমত এবং শক্তিতে কোনো কিছুর সৃষ্টি অন্য কিছুর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং প্রত্যেকটি সৃষ্টিই আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এজন্যই যখন কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না এবং কোনো কিছুর দৃষ্টান্ত ও ছিলনা তখন তিনি সমগ্র বিশ্বজগৎ এবং তার মাঝে যা কিছু আছে, সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তাই দ্বিতীয়বার এসব কিছু সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়। কেননা কোনো কিছুর সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হওয়াই যথেষ্ট।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, আমার বান্দা আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, অথচ তার জন্য তা শোভনীয় ছিল না। আর আমার বান্দা আমাকে গালি দিয়েছে, আর এ কাজটিও তার জন্য উচিত হয়নি। আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই যে বান্দা বলেছে, যেভাবে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এভাবে দ্বিতীয়বার আর সৃষ্টি করবেন না। অথচ প্রথম বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের চেয়ে সহজ ছিল না। আর বান্দার গালি দেওয়ার কথা হলো এই যে, সে বলেছে আল্লাহ পাক সন্তানসন্ততি গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক, অদ্বিতীয় কারো মুখপেক্ষী নই, আমি কারো পিতাও নই, পুত্রও নই, আমার কোনো দৃষ্টান্তও নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, বান্দার গালি দেওয়া হলো এই যে, সে বলেছে আমার সন্তানসন্ততি রয়েছে অথচ আমি স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। -[বুখারী শরীফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

অনুবাদ :

٤١. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ لِاِقَامَةِ دِيْنِهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا بِالْاَذٰى مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ نُنْزِلَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا دَارًا حَسَنَةً ط هِىَ الْمَدِيْنَةُ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَىِ الْجَنَّةِ اَكْبَرُ ج اَعْظَمُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ اَىِ الْكُفَّارُ اَوِ الْمُتَخَلِّفُوْنَ عَنِ الْهِجْرَةِ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ مِنَ الْكَرَامَةِ لَوَافَقُوْهُمْ .

৪১. মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে কষ্ট পেয়ে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা আল্লাহর পথে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার মানসে হিজরত করে এরা হলেন রাসূল ﷺ ও সাহাবীবৃন্দ আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ার ঠিকানা দেব তাদেরকে অবতারণ করাব উত্তম আবাসে অর্থাৎ মদিনায়। حَسَنَةً এটা এ স্থানে উহ্য মওসূফ دَارٌ-এর সিফত। আর পরকালের পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত অবশ্যই অধিকতর বড় মহান হায় যদি তারা অর্থাৎ কাফেররা বা হিজরত হতে যারা পশ্চাতে রয়েছে তারা জানত যে, মুহাজিরদের জন্য কি মর্যাদা বিদ্যমান তবে নিশ্চয় তারা এদের অনুসরণ করত।

٤٢. هُمُ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلٰى اَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْهِجْرَةِ لِاِظْهَارِ الدِّيْنِ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُوْنَ .

৪২. এরা তারা যারা মুশরিকদের পীড়নের সম্মুখে ও দীন প্রকাশের তাগিদে হিজরতের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তিনি তাদেরকে তাদের ধারণার অতীত স্থান হতে জীবিকার ব্যবস্থা করবেন।

٤٣. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ لَا مَلٰٓئِكَةً فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ الْعُلَمَاءَ بِالتَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُوْنَهُ وَاَنْتُمْ اِلٰى تَصْدِيْقِهِمْ اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ .

৪৩. তোমার পূর্বেও আমার প্রত্যাদেশসহ মানুষ ভিন্ন আর কাউকেও পাঠাইনি ফেরেশতা পাঠাননি তোমার যদি তা না জান তবে উপদেশ অধিকারীদেরকে অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তারা তা জানে। মু'মিনরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে যতটুকু বিশ্বাস করে তোমার তো এদেরকে তা হতেও অধিক বিশ্বাস করে থাক।

٤٤. بِالْبَيِّنٰتِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ اَرْسَلْنٰهُمْ بِالْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ وَالزُّبُرِ الْكُتُبِ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ فِيْهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ فَيَعْتَبِرُوْنَ .

৪৪. আমি তাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন প্রমাণাদি ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতিও উপদেশ অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি এতে মানুষের জন্য হালাল-হারাম ইত্যাদি যে বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য যাতে তারা এতে চিন্তা করে। অনন্তর শিক্ষা গ্রহণ করে। بِالْبَيِّنَاتِ এটা এ স্থানে উহ্য اَرْسَلْنَا ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট। اَلزُّبُرُ অর্থ কিতাবসমূহ।

٤٥. اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا الْمَكَرَاتِ السَّيِّاٰتِ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِىْ دَارِ النَّدْوَةِ مِنْ تَقْيِيْدِهٖ اَوْ قَتْلِهٖ اَوْ اِخْرَاجِهٖ كَمَا ذُكِرَ فِى الْاَنْفَالِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ كَقَارُوْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ اَىْ مِنْ جِهَةٍ لَا تَخْطُرُ بِبَالِهِمْ وَقَدْ اُهْلِكُوْا بِبَدْرٍ وَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْدِرُوْا ذٰلِكَ .

৪৫. নাদওয়া বা পরামর্শ কক্ষে বসে যারা রসূল ﷺ -কে বন্দী বা হত্যা কিংবা বহিষ্কার করার মতো কুচক্রান্ত করে যেমন সূরা আনফালে উল্লিখিত হয়েছে তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, কারূনের মতো আল্লাহ তাদেরকেসহ জমিন ধসিয়ে দেবেন না অথবা এমন দিক হতে তাদের উপর শাস্তি আসবে না যা তাদের ধারণাতীত। যে স্থান হতে শাস্তি আসার কল্পনাও তাদের মনে আসবে না। বদর যুদ্ধে এরা ধ্বংস হয়েছিল অথচ তাদের এটার অনুমানও হয়নি اَلسَّيِّاٰتُ এটা এ স্থানে উহ্য مَوْصُوْف বা বিশেষিতব্য শব্দ اَلْمَكْرُ-এর صِفَتْ বা বিশেষণ।

٤٦. اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِىْ تَقَلُّبِهِمْ فِىْ اَسْفَارِهِمْ لِلتِّجَارَةِ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ الْعَذَابَ

৪৬. বা ব্যবসাব্যপদেশে এদের চলা-ফিরা কালে যাত্রাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেন না? এরা তো অপরাগকারী নয়। শাস্তি এড়িয়ে যাবার নয়।

٤٧. اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ط تَنَقُّصٍ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتّٰى يَهْلِكَ الْجَمِيْعُ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ .

৪৭. অথবা এদেরকে তিনি ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার শাস্তিতে বিধৃত করবেন না? শেষে একদিন তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। তাই তিনি এদের বিরুদ্ধে শাস্তি ত্বরান্বিত করেননি। تَخَوُّفٍ অর্থ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া। عَلٰى تَخَوُّفٍ এটা يَاْخُذَهُمْ ক্রিয়ার فَاعِلْ অর্থাৎ কর্তা বা مَفْعُوْلٌ অর্থাৎ কর্ম হতে حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ।

٤٨. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ لَهٗ ظِلٌّ كَشَجَرٍ وَجَبَلٍ يَتَفَيَّؤُا يَمِيْلُ ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ جَمْعُ شِمَالٍ اَىْ عَنْ جَانِبَيْهِمَا اَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهٗ سُجَّدًا لِّلّٰهِ حَالٌ اَىْ خَاضِعِيْنَ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَهُمْ اَىِ الظِّلٰلُ دٰخِرُوْنَ صَاغِرُوْنَ نَزَلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ .

৪৮. তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর ঐ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যেগুলোর ছায়া বিদ্যমান যেমন বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি সেইগুলোর ছায়া বাধ্যগতভাবে সেজদাবনত থেকে যে বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয় তার অনুগত থেকে দিনের শুরুতে ও শেষে ডানে ও বামে উভয় দিকে ঢলে পড়ে? يَتَفَيَّؤُا -ঢলে পড়ে। اَلشَّمَائِلُ এটা شِمَالٌ-এর বহুবচন। سُجَّدًا এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। এ স্থানে অর্থ, নির্দেশের সামনে অনুগত। دٰخِرُوْنَ অর্থ একান্ত বাধ্যগত। এ স্থানে বিবেকবান প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٩. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ اَىْ نَسَمَةٍ تَدِبُّ عَلَيْهَا اَىْ يَخْضَعُ لَهُ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَغَلَبَ فِى الْاِتْيَانِ بِمَا مَالَا يَعْقِلُ لِكَثْرَتِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ خَصَّهُمْ بِالذِّكْرِ تَفْضِيْلًا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ.

৪৯. আল্লাহকেই সেজদা করে অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ পালনে বাধ্যগত যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, আর পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রাণী আছে সেই সমস্তও এবং ফেরেশতাগণও মর্যাদা বিধান হেতু এদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কেউ তাঁর ইবাদত করা হতে অহংকার করে না। ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না। مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -বিবেক-বোধহীন বস্তুর সংখ্যা যেহেতু বেশি সেহেতু এ স্থানে مَا-এর ব্যবহাররের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। دَابَّةٌ অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল।

٥٠. يَخَافُوْنَ اَىْ الْمَلَائِكَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يَسْتَكْبِرُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ حَالٌ مِنْ هُمْ اَىْ عَالِيًا عَلَيْهِمْ بِالْقَهْرِ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ بِهِ.

৫০. এরা ফেরেশতারা ভয় করে এদের উপর পরাক্রমশালী এদের প্রতিপালককে এবং যা আদেশ করা হয় এরা তা করে। يَخَافُوْنَ এটা يَسْتَكْبِرُوْنَ-এর ضَمِيْر অর্থাৎ সর্বনাম هُمْ-এর حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য। مِنْ فَوْقِهِمْ এটা رَبَّهُمْ -এর هُمْ-এর حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ যিনি এদের উপর পরাক্রমশালী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِاِقَامَةِ دِيْنِهِ : এ বৃদ্ধিকরণে সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, فِى اللّٰهِ -এর মধ্যে اَللّٰهُ শব্দটি مُهَاجِرْتُ-এর ظَرْف হয়েছে অথচ اَللّٰهُ-এর ظَرْف হওয়ার কোনোই অর্থ নেই।

উত্তর. উত্তরের সার কথা হলো, فِىْ টা لَامْ অর্থে হয়েছে এবং مُضَافٌ উহ্য রয়েছে فِى اللّٰهِ অর্থাৎ لِدِيْنِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে تَاكِيْد بَانُوْن ثَقِيْلَة لَامْ تَاكِيْد -مُضَارِعْ-এর جَمْعُ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ। অর্থ আমরা তাদেরকে অবশ্যই অবতরণ করাবো। অবশ্যই ঠিকানা দেব। মূলবর্ণ হলো (ب - و - ء) আর هُمْ যমীর হলো جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ

قَوْلُهُ دارًا : এ বৃদ্ধি করণের মধ্যে حَسَنَةً-এর تَانِيْث-এর عِلَّتْ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ الْكُفَّارِ وَالْمُتَخَلِّفُوْنَ عَنِ الْهِجْرَةِ : এতে يَعْمَلُوْنَ-এর যমীরের মধ্যে দুটি সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ : এটা يَعْمَلُوْنَ-এর مَفْعُوْلْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوَافَقُوْهُمْ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে لَوْ-এর জবাব উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَهُ : এটা হলো اِنْ شَرْطِيَّةٌ -এর জবাব, যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ لِمَحْذُوْفٍ : অর্থাৎ بِالْبَيِّنٰتِ টা উহ্য اَرْسَلْنَا-এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে; উল্লিখিত مَا اَرْسَلْنَا এবং نُوْحِىْ এবং تَعْلَمُوْنَ-এর مُتَعَلِّقٌ নয়। কেননা প্রথম দু সুরতে مُتَعَلِّقٌ এবং مُتَعَلِّقٌ-এর মাঝে فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِىْ আবশ্যক হয় আর তা হলো فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ আর তৃতীয় সুরতে شَرْطٌ টা تَبْكِيْتٌ ও اِلْزَامٌ-এর জন্য হয়েছে। কেননা তাদের عَالِمْ হওয়ার نَفِىْ সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمَكَرَاتِ : এটা দ্বারা اَلسَّيِّئَاتُ-এর تَانِيْث হওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَتَفَيَّؤُ : এটা বাবে تَفَعُّلٌ-এর تَفَىْءٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। মূলবর্ণ ف - ى - ء অর্থ ঝুঁকে যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَنَقُّص : تَخَوُّفٍ-এর তাফসীর تَنَقُّصٍ দ্বারা করা হয়েছে অর্থ বর্ণনা করার জন্য। কেননা تَخَوُّفٌ-এর অর্থ ভয়ভীতিও আসে এবং ধীরে ধীরে কম করার অর্থেও এসে থাকে। চাই এ স্বল্পতা نَفْس-এর মধ্যেই হোক বা সম্পদেই হোক মুফাসসির (র.) এ অর্থই উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। বলা হয়- تَخَوَّفُ الشَّيْئَ অর্থাৎ تَنَقَّصَهُ

قَوْلُهُ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ عَلٰى تَخَوُّفٍ টা হয়তো يَاْخُذَ-এর فَاعِلْ-এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে অথবা هُمْ যমীর থেকে।

قَوْلُهُ جَمْعُ شِمَال : এটা মানুষের يَمِيْن [ডান] شِمَالٌ [বাম] হতে কেনায়া হয়েছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَمِيْن-কে مُفْرَدْ নেওয়ার মধ্যে مَا-এর শব্দের প্রতি আর شَمَائِلْ-কে বহুবচন নেওয়ার ক্ষেত্রে 'مَا' -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেমন ظِلَالُهُ-এর মধ্যে مَا-এর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে আর سُجَّدًا-এর মধ্যে مَا-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ نَزَلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ : এতে এই সংশয়ের জবাব রয়েছে যে, ون দ্বারা ذَوِى الْعُقُوْلِ-এর বহুবচন নেওয়া হয়। আর ظِلَالٌ এটা ذَوِى الْعُقُوْلِ নয় অথচ এর বহুবচন دَاخِرُوْنَ-কে ون দ্বারা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর. যেহেতু ظِلَالٌ-এর দিকে دُخُوْرٌ [অক্ষম করা] -এর নিসবত করা হয়েছে যা ذَوِى الْعُقُوْلِ-এর সিফত। তাই ون দ্বারা তার বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ دَابَّةٍ : এটা مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ-এর بَيَانٌ এবং এতে সেই প্রশ্নের জবাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, دَابَّة তাকে বলা হয় যা পৃথিবীতে / জমিনে বিচরণ করে থাকে। কাজেই তাতে সেই مَخْلُوْقٌ [সৃষ্টজীব] অন্তর্ভুক্ত নয় যা আকাশে বা শূন্যে নড়াচড়া করে এবং চলাফেরা করে। এর জবাব দিয়েছেন যে, اِنَّ الدَّبِيْبَ هِىَ حَرَكَةٌ جِسْمَانِيَّةٌ سَوَاءٌ كَانَ فِى الْاَرْضِ اَوْ فِى السَّمَاءِ কাজেই এটা বলা যে, دَابَّةٌ বলা হয় مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ-কে যাতে ফেরেশতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয় বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ الخ -এর ব্যাখ্যা : اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا-এটি هِجْرَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ- দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে এটি বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গুনাহ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়। হিজরতের কোনো কোনো অবস্থায় ফরজ, ওয়াজিব এবং কোনো কোনো অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত- اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا-এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি? আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথম দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় পরকালে বেহিসেবে ছওয়াবের। 'দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা' এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসে জন্য গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিজিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইজ্জত ও গৌরব পাওয়া- সবই এর অন্তর্ভুক্ত। -[তাফসীরে কুরতুবী]

আয়াতের শানে নুযূল মূলত ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তীকালে মদিনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কেরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদিনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহর এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ তা'আলা মদিনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন! উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকির, মিসকিন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশীল, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ তা'আলা অসামান্য ইজ্জত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান বলেন– وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا عَامٌ فِى الْمُهَاجِرِيْنَ كَائِنًا مَا كَانُوْا فَيَشْمَلُ اَوَّلَهُمْ وَاٰخِرَهُمْ অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোনো অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ তাফসীর বিধির তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণির লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমনি ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে– وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলি এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলিও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِى اللّٰهِ অর্থাৎ হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকরি এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে– مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা যেমন বলা হয়েছে– اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহর উপর রাখা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে; যেমন বলা হয়েছে– وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোনো মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কুরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষে যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধিবিধান : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধিবিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকরার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো–

কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন, দেশত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ করা কোনো সময় কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোনো সময় কোনো বস্তু অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার।

প্রথম. দরুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেও ফরজ ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তি সামর্থ্যের শর্তসহ ফরজ, যদি দরুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দরুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গুনাগার হবে।

দ্বিতীয়. বিদ'আতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেন আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোনো মুসলমানদের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এ উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আরাবী লিখেন, এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা যদি তুমি কোনো গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরি; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয়. যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

চতুর্থ. দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েজ; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। যে স্থানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সে স্থান ত্যাগ করা উচিত, যাতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) এ প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইরাক থেকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বলেন- إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي তারপর হযরত মূসা (আ.) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন কুরআন বলে- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

পঞ্চম. দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে হিজরত করা। ইসলামি শরিয়ত এরও অনুমতি দেয়: যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন রাখালকে মদিনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.) আবূ ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোনো মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

কিন্তু এটা তখন, যখন কোনো স্থানে প্লেগ অথবা মহামারী ছড়িয়ে না থাকে। যেখানে কোনো মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে নির্দেশ এই যে, পূর্ব থেকে যারা সেখানে বিদ্যমান রয়েছে, তারা সেখান থেকে পলায়ন করবে না এবং যারা সেই এলাকার বাইরে রয়েছে তারা এলাকার ভিতরে যাবে না। সিরিয়ার সফরে হযরত ওমর (রা.) এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছার পর জানতে পারেন যে, সিরিয়ায় প্লেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিরিয়ায় প্রবেশ করবেন কিনা এ ব্যাপারে ইতস্ত করতে থাকেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে আবিরাম পরামর্শের পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে একটি হাদীস শোনান। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ যখন কোনো ভূখণ্ডে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাক, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না এবং যেখানে তোমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাক, প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ শুনে সেখানে প্রবেশ করো না। -[তিরমিযী]

খলিফা হযরত ওমর (রা.) তখন হাদীসের নির্দেশ পালন করে সমগ্র কাফেলাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন। কোনো কোনো আলেম বলেন, হাদীসের নির্দেশের একটি বিশেষ রহস্য এই যে, যারা মহামারীর এলাকায় পূর্ব থেকে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে মহামারীর জীবাণু থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তারা যদি সেখান থেকে পলায়ন করে, তবে যে ব্যক্তির মধ্যে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে, সে তো মরবেই এবং যেখানে সে যাবে, সেখানকার লোকও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই এটা হাদীসের বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা।

ষষ্ঠ. ধনসম্পদ হেফাজতের জন্য হিজরত করা। কোনো স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সেস্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা মুসলমানের ধনসম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোনো বস্তুর অন্বেষণে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

১. শিক্ষার সফর অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টজগৎ, অপার শক্তি ও বিগত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। কুরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে- أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ হযরত জুলকারনাইনের সফরও কোনো কোনো আলেমের মতে এ ধরনের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

২. হজের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামি ফরজ, তা সুবিদিত।

৩. জিহাদের সফর। এটাও যে ফরজ, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

৪. জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপরিহার্য।

৫. বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য সফর করা। শরিয়তে এটাও জায়েজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ আয়াতে اِبْتِغَاءَ فَضْلٍ [কৃপা অন্বেষণ] বলে বাণিজ্য বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হজের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরও উত্তম রূপে বৈধ হবে।

৬. জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য যতটুকু জরুরি, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা ফরজে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরজে কেফায়া।

৭. কোনো স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয়- মসজিদে হারাম [মক্কা], মসজিদে নববী [মদিনা] এবং মসজিদে আকসা [বায়তুল মোকাদ্দাস]। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েজ। -[মোঃ শফি]

৮. ইসলামি সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

Free@www.eilm.weebly.com

৯. স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোনো বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

قَوْلُهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا الخ : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর মক্কার মুশরিকরা মদিনার ইহুদিদের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করল। তারা জানতে চাইলে যে, বাস্তবিকই পূর্বেই সব পয়গাম্বর মানব জাতির মধ্যে থেকে প্রেরিত হয়েছেন কিনা?

أَهْلَ الذِّكْرِ : শব্দটি গ্রন্থধারী সম্প্রদায় ও মুসলমান সবাইকে বুঝায়। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, মুশরিকরা অমুসলমানদের বর্ণনা দ্বারাই তুষ্ট হতে পারত। কারণ তারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনায় সন্তুষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের বর্ণনা তারা কিরূপে মানতে পারত। أَهْلُ الذِّكْرِ - ذِكْر শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ জ্ঞান। অর্থের সাথে সম্পর্ক রেখে কুরআন পাকে তাওরাতকে ذِكْر বলা হয়েছে- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এবং কুরানকেও ذِكْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন এর পরের আয়াতে أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে। অতএব أَهْلُ الذِّكْرِ -এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়াল বিদ্বান, জ্ঞানবান। এখানে স্পষ্টতই বিদ্বান বলে গ্রন্থধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদ্দী প্রমুখ তাই বলেছেন। কেউ কেউ এখানেও ذِكْر -এর অর্থ কুরআনকে ধরে أَهْلُ الذِّكْرِ -এর তাফসীরে 'কুরআনধারী' বলেছেন। এ ব্যাপারে বাযযার ও মাহারীর বক্তব্য অধিক স্পষ্ট। তাঁরা বলেন- اَلْمُرَادُ بِأَهْلِ الذِّكْرِ عُلَمَاءُ أَخْبَارِ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَالذِّكْرُ بِمَعْنَى الْحِفْظِ كَأَنَّهُ قِيْلَ إِسْأَلُوا الْمُطَّلِعِيْنَ عَلَى أَخْبَارِ الْأُمَمِ يُعَلِّمُوْكُمْ بِذٰلِكَ এ ভাষা অনুযায়ী গ্রন্থধারী ও কুরআনধারী সবাই أَهْلُ الذِّكْرِ -এর অন্তর্ভুক্ত।

بَيِّنَاتٌ-এর অর্থ সুবিদিত। এখানে মোজেজা বুঝানো হয়েছে। زُبُرٌ শব্দটি আসলে زُبْرَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ লোহার বড় খণ্ড; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ খণ্ডসমূহকে সংযোজন করার সাথে সম্পর্কে রেখে লেখাকে زُبُرٌ বলা হয় এবং লিখিত গ্রন্থকে زُبُرٌ ও زَبُوْرٌ বলা হয়। এখানে زُبُرٌ বলে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর ও কুরআনসহ ঐশীগ্রন্থসমূহ বুঝানো হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অন্যদের উপর ওয়াজিব : আলোচ্য আয়াতের فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কুরআনি বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধিবিধানে জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামতো কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরজ হবে। একেই তকলীদ [অনুসরণ] বলা হয়। এটা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোনো উপায় নেই। সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তাকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তাকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছের থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোনো নির্দেশকে শরিয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তাকলীদ। এ তাকলীদ যে বৈধ বরং জরুরি, তাতে কোনোরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলেম কুরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বুঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও তাকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কুরআনি আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, যেসব বিধিবিধান ইজতিহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফীহ মাস'আলা, বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও এ জাতীয় মাস'আলায় কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা জরুরি। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এমনিভাবে কুরআন ও সুন্নতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরিয়ত সম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহভীতি ও পরহেজগারিতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আব্দুল্লাইস প্রমুখ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সংসর্গের বরকত শরিয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বুঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরিয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোনো না কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোনো নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ, ইমাম গাযালী, রাজী, তিরমিযী, ত্বাহাভী, মুযানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণির আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবি ভাষা ও শরিয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ করে গেছেন। তাঁরা ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোনো ফতোয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেননি।

তবে উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কুরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কুরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোনো মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তাকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সংকুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো মাসআলায় যে-কোনো ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মানুষ শরিয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরিয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশি। অথচ দীন ও শরিয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তাকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফিকহবিদগণ এটা জরুরি মনে করেছেন যে, আমলকারীদের উপর কোনো একজন ইমামেরই তাকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তাকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত উসমান গনী (রা.)-এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের সাতটি কেরাতের মধ্যে থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কুরআন সাত কেরাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরাতে কুরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরাতে কুরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত উসমান (রা.) সেই এক কেরাতে কুরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্ত ও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরাত সঠিক ছিল না; বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কুরআন হেফাজতের কারণে একটি মাত্র কেরাত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোনো একজনকে তাকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তাকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তাকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

উদাহরণত রোগী হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্যে থেকে কোনো একজনকেই চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরি মনে করে; কারণ সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশি কিছু ছিল না। একে দালাদলির রঙ দেওয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে উঠা দীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ কোনো সময় একে সুনজরে দেখেননি। কোনো কোনো আলেমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাব প্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমাদের অভিযোগ। وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তাকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বুঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকহের কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খ. ইজতিহাদ অধ্যায়, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খ. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইকতিসাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থের দ্রষ্টব্য।

কুরআন বুঝার জন্য হাদীস জরুরি, হাদীস অস্বীকার কুরআন অস্বীকারের নামান্তর : وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذِكْرٌ -এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কুরআন পাক। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাকের তত্ত্ব তথ্য ও বিধানবলি নির্ভুলভাবে বুঝা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করেই কুরআনের বিধানাবলি আল্লাহর অভিপ্রেত পন্থায় বুঝাতে সক্ষম হতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোনো অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস আগাগোড়া কুরআনর ব্যাখ্যা। কেননা কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেছে اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এ মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ -এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে কোনো উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কুরআনেরই বক্তব্য। কোনো কোনোটি বাহ্যত কোনো আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোনো কোনোটি বাহ্যত কুরআনে নেই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে তা ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কুরআনই। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ কোনো কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى এতে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ তা'আলার ওহী ও কুরআনি নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি।

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমু'আ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাজত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরিয়তের বিধানাবলির ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোনো ছুলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনি নির্দেশ অমান্য করে কুরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেননি কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কুরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন– وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অতএব উপরিউক্ত দাবি কুরআনের এ আয়াতের পরিপন্থি হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনই অস্বীকার করে نَعُوذُ بِاللّٰهِ

قَوْلُهُ اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমাদের যে মাটির উপর বসে আছি, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেওয়া যেতে পারে। কিংবা কোনো ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমারা আজাবে পতিত হতে পার। যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোনো আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোনো দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আজাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আয়াতে ব্যবহৃত تَخَوُّفٌ শব্দটি خَوْف ভয় করা থেকে উদ্ভূত। এ অর্থের দিক দিয়ে কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে, একদলকে আজাবে ফেলে অপর দলকে ভয় প্রদর্শন করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় দলকে আজাবে গ্রেফতার করে তৃতীয় দলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হবে। এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ প্রমুখ এখানে تَخَوُّفٌ এর অর্থ নিয়েছেন تَنَقُّصٌ অর্থাৎ হ্রাস পাওয়া। এদিক দিয়েই ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি তরজমা করা হয়েছে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, হযরত ওমর ফরূক (রা.)ও تَخَوُّفٌ শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম হননি। ফলে তিনি প্রকাশ্য মিম্বরে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন– আপনারা تَخَوُّفٌ শব্দের অর্থ কি বুঝেছেন? সবাই নিশ্চুপ, কিন্তু হুযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মু'মিনীন, এটি আমাদের গোত্রের বিশেষ ভাষা। আমাদের ভাষায় এর অর্থ تَنَقُّصٌ অর্থাৎ আস্তে আস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, আরবি কাব্যে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি? জবাবে বলা হলো, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি স্বগোত্রের কবি আবূ কবীর হুযায়লীর একটি কবিতা পেশ করলেন। তাতে تَخَوُّفٌ শব্দটি আস্তে আস্তে হ্রাস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন খলিফা বললেন, তোমরা অন্ধকার যুগের কাব্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন কর। কারণ তা দ্বারা কুরআনের তাফসীর তোমাদের কথাবার্তার অর্থের ফয়সালা হয়।

কুরআন বুঝার জন্য যেনতেন আরবি জানা যথেষ্ট নয় : এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, আরবি ভাষা বলা ও লেখার মামুলি যোগ্যতা কুরআন বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এতে এতটুকু দক্ষতা অর্জন করা জরুরি, যা দ্বারা প্রাচীন যুগের আরবদের কবিতাও পুরোপুরি বুঝা যায়। কেননা কুরআন তাদেরই ভাষায় এবং তাদেরই বাকপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই ঐ স্তরের আরবি সাহিত্য শিক্ষা করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য।

আরবি সাহিত্য শিক্ষার জন্য অন্ধকার যুগের কবিদের কাব্য পাঠ করা জায়েজ; যদিও তাতে অশ্লীল কথাবার্তা আছে : এ থেকে আরও জানা গেল যে, কুরআন বুঝার জন্য আন্ধকার যুগের আরবি সাহিত্য পাঠ করা জায়েজ এবং সেই যুগের শব্দার্থও পড়ানো জায়েজ যদিও একথা সুপরিজ্ঞাত যে, তাদের কবিতায় জাহিলিয়াসুলভ আচারণবিধি এবং ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হবে। কিন্তু কুরআন বুঝার প্রয়োজনে এগুলো পড়া ও পড়ানো বৈধ করা হয়েছে।

দুনিয়ার আজাবও একপ্রকার রহমত : আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আজাব বর্ণনা করার পর সবশেষে বলা হয়েছে– اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ এতে প্রথমে رَبّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আজাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لَامْ সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুঁশিয়ারি প্রকৃতপক্ষ স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুঁশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

Free @www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ الخ : অর্থাৎ আসমান জমিনে যতকিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদা রত হয় তথা অনুগত থাকে। যা কিছু আসমানে আছে যেমন– চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, তারা, আর যা কিছু জমিনে আছে যেমন জীবজন্তু, একথায় আসমান-জমিনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের অনুগত এবং তাঁর মহান দরবারে অবনত থাকে।

وَالْمَلٰئِكَةُ : অর্থাৎ ফেরেশতাগণ! সকলেই বিনীত হয়ে আল্লাহ পাককে সেজদা করে থাকে, ক্ষণিকের জন্য বিন্দুমাত্রও তারা অহংকার করে না। বিশ্ব সৃষ্টির কি ছোট, কি বড় সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মাথা নত করে রাখে। বিনীত হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হয়। অতএব, আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানো অথবা গাফলত করা অমার্জনীয় অপরাধ। যারা আল্লাহ পাকের দরবারে মাথানত করতে অস্বীকৃতি জানায় বা অহংকার করে তাদের শাস্তি হবে কঠোর এবং কঠিন।

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করে ইরশাদ করেছেন, আসমান-জমিনের সব কিছুই আল্লাহকে সেজদা করে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হয়েও আল্লাহ পাকের দরবারে আনুগত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকে এবং অন্য সৃষ্টির সম্মুখে মাথানত করে, এমনকি তারা আল্লাহর আজাবকে ভয় করে না, অথচ নিখিল বিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ফেরেশতাগণও মহিমাময় আল্লাহ পাকের তাবেদারিতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকে।

قَوْلُهُ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ : আর তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে যিনি পরাক্রমশালী। অথবা এর অর্থ হলো, ফেরেশতাগণ এজন্য ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে যে তাদের উপর কোনো প্রকার আজাব না আসে।

قَوْلُهُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ : আর তাদেরকে যা আদেশ দেওয়া হয় তা তারা পালন করে থাকে। অতএব, আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা, তাঁর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা, আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালন করা ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। হযরত আবূ যর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না। আর আমি যা শ্রবণ করি তোমরা তা শ্রবণ কর না। শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আসমানে আঙ্গুল পরিমাণ স্থান নেই, যেখানে তাঁর ফেরেশতা সেজদায় মশগুল নেই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি যদি তোমরা জানতে তবে হাসতে কম, কাঁদতে বেশি। আর আনন্দ-উল্লাসে মশগুল হতে না। এবং বাড়ি-ঘর ছেড়ে ময়দানে এসে আল্লাহ পাকের দরবারে চিৎকার দিতে এবং ফরিয়াদ করতে। একথা শ্রবণ করে হযরত আবূ যর (রা.) বললেন, হায় আক্ষেপ! যদি আমি বৃক্ষ হতাম তবে আমাকে কেটে ফেলা হতো –[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥١. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ تَاكِيْدٌ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج اَتٰى بِهٖ لِاِثْبَاتِ الْاِلٰهِيَّةِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ خَافُوْنِ دُوْنَ غَيْرِيْ وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ

৫১. আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনিই একমাত্র ইলাহ। আল্লাহর উপাস্য হওয়ার বিষয়টি এবং তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এটার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অন্য কাউকেও নয় আমাকেই ভয় কর। اِثْنَيْنِ এটা تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। فَاِيَّايَ এস্থানে غَيْب বা নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর করা হয়েছে। فَارْهَبُوْنِ অর্থ আমাকে ভয় কর।

٥٢. وَلَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَلَهُ الدِّيْنُ الطَّاعَةُ وَاصِبًا ط دَائِمًا حَالٌ مِنَ الدِّيْنِ وَالْعَامِلُ فِيْهِ مَعْنَى الظَّرْفِ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ وَهُوَ الْاِلٰهُ الْحَقُّ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلْاِنْكَارِ اَوِ التَّوْبِيْخِ

৫২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসেবে সকল কিছু তাঁরই। আর ধর্ম অর্থাৎ আনুগত্য তাঁরই সকল সময়ের জন্য। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ভয় করছ? অথচ তিনিই সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত আর কেউ ইলাহ নেই। وَاصِبًا অর্থ সকল সময়ের জন্য। এটা اَلدِّيْنُ-এর حَالٌ হয়েছে। এস্থানে ظَرْف অর্থাৎ অধিকরণবাচক। পদ لَهٗ-এর ইঙ্গিতবাচক ক্রিয়া এটার عَامِلٌ রূপে গণ্য। اَفَغَيْرَ এস্থানে اِنْكَار অর্থাৎ অস্বীকার কিংবা تَوْبِيْخ অর্থাৎ ভর্ৎসনার উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধকের ব্যবহার হয়েছে।

٥٣. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ اَيْ لَا يَاْتِيْ بِهَا غَيْرُهٗ وَمَا شَرْطِيَّةٌ اَوْ مَوْصُوْلَةٌ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمْ اَصَابَكُمْ الضُّرُّ الْفَقْرُ وَالْمَرَضُ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ تَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَكُمْ بِالْاِسْتِغَاثَةِ وَالدُّعَاءِ وَلَا تَدْعُوْنَ غَيْرَهٗ

৫৩. তোমাদের সাথে যে সমস্ত অনুগ্রহ বিদ্যমান তা আল্লাহর নিকট হতে অন্য কেউ এগুলো তোমাদেরকে দেয়নি আবার যখন তোমাদেরকে দুঃখ রোগ-শোক ও দরিদ্রতা স্পর্শ করে এটা তোমাদেরকে আঘাত করে তখন তোমরা সাহায্য চেয়ে ও দোয়া করে তাঁকেই উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান কর, অন্য কাউকেও আহ্বান কর না। مَابِكُمْ এ مَا শব্দটি শর্তবাচক বা مَوْصُوْلَةٌ আর تَجْئَرُوْنَ অর্থ তোমরা তোমাদের আওয়াজ উচ্চ করে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে ডাক।

٥٤. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ

৫৪. অতঃপর যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ দূরীভূত করেন তখন তেমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরিক করে।

٥٥. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ط مِنَ النِّعْمَةِ فَتَمَتَّعُوْا بِاجْتِمَاعِكُمْ عَلٰى عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ اَمْرُ تَهْدِيْدٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ ذٰلِكَ

৫৫. আমি তাদেরকে যা অর্থাৎ যে সমস্ত অনুগ্রহ দান করেছি তার অকৃতজ্ঞতা করতে। সুতরাং প্রতিমা উপাসনার ব্যাপারে তোমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বাদ ভোগ করে লও। শীঘ্রই তোমরা তার পরিণাম জানতে পারবে। فَتَمَتَّعُوْا এস্থানে হুমকি প্রদর্শনার্থে اَمْرٌ অর্থাৎ অনুজ্ঞাসূচক শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

٥٦. وَيَجْعَلُوْنَ اَيِ الْمُشْرِكُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَهِيَ الْاَصْنَامُ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ط مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ بِقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلّٰهِ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ سُؤَالَ تَوْبِيْخٍ وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اَنَّهُ اَمَرَكُمْ بِذٰلِكَ

৫৬. আমি তাদেরকে কাফেরদেরকে শস্য ও গবাদি ইত্যাদি যে সমস্ত জীবনোপকরণ দান করি তারা এই অংশ আল্লাহর আর এই অংশ প্রতিমাসমূহের এই কথা বলে তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা জানে না যে, এগুলো লাভ-লোকসান কিছুই করতে পারে না। কসম আল্লাহর ভর্ৎসনামূলকভাবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তিনি তোমাদেরকে এ সমস্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে তোমরা আল্লাহর প্রতি যে মিথ্যারোপ কর সেই সম্পর্কে। لَتُسْئَلُنَّ এস্থানে غَيْبٌ বা নাম পুরুষ হতে اِلْتِفَاتٌ বা রূপান্তর সংঘটিত হয়েছে।

٥٧. وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ بِقَوْلِهِمُ الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ سُبْحٰنَهُ تَنْزِيْهًا لَهُ عَمَّا زَعَمُوْا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ اَيِ الْبَنُوْنَ وَالْجُمْلَةُ فِيْ مَحَلِّ رَفْعٍ اَوْ نَصْبٍ بِيَجْعَلُ الْمَعْنٰى يَجْعَلُوْنَ لَهُ الْبَنَاتِ الَّتِيْ يَكْرَهُوْنَهَا وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْوَلَدِ وَيَجْعَلُوْنَ لَهُمُ الْاَبْنَاءَ الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَهَا فَيَخْتَصُّوْنَ بِالْاَبْنَاءِ كَقَوْلِهِ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ

৫৭. ফেরেশতাগণ আল্লাহর দুহিতা এই কথা বলে তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে। এদের এই স্বকপোলকল্পনা হতে আল্লাহ পবিত্র তাঁরই তরে সকল পবিত্রতা, আর তাদের নিজেদের জন্য হলো যা তারা কামনা করে অর্থাৎ পুত্র। সন্তান হতে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা আল্লাহর প্রতি কন্যা সন্তান আরোপ করে। যা নিজেদের ব্যাপারেও তারা পছন্দ করে না; নিজেদের জন্য তারা পুত্র সন্তান হওয়া কামনা করে এবং তাই নিজেদের জন্য বিশেষ করে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ 'এদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্য হলো কন্যা আর তাদের জন্য হলো পুত্র? مَا يَشْتَهُوْنَ এ ই বাক্যটি رَفْعٌ [পেশযুক্ত]-এর مَحَلٌ বা স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা يَجْعَلُ ক্রিয়ার মাধ্যমে نَصْبٌ সহকারেও পাঠ করা যায়।

٥٨. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى بِتُوْلَدَ لَهُ ظَلَّ صَارَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا مُتَغَيِّرًا تَغَيُّرَ مُغْتَمٍّ وَهُوَ كَظِيْمٌ مُمْتَلِئٌ غَمًّا فَكَيْفَ تُنْسَبُ الْبَنَاتُ اِلَيْهِ تَعَالٰى

৫৮. তাদেরর কাউকেও যদি কন্যা সন্তানের অর্থাৎ তার কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে বলে সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল দুঃখ ভারাক্রান্তরূপে কালো হয়ে যায় বিষণ্ণ ব্যক্তির ন্যায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং কেমন করে আল্লাহর প্রতি এটা আরোপ করা হয়ে থাকে? ظَلَّ এ স্থানে অর্থ صَارَ হয়ে যায়। كَظِيْمٌ অর্থ দুঃখভারাক্রান্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٩. يَتَوَارٰى يَخْتَفِىْ مِنَ الْقَوْمِ اَىْ قَوْمِهٖ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط خَوْفًا مِنَ التَّعْيِيْرِ مُتَرَدِّدًا فِيْمَا يَفْعَلُ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ يَتْرُكُهٗ بِلَا قَتْلٍ عَلٰى هُوْنٍ هَوَانٍ وَذُلٍّ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط بِاَنْ يَئِدَهٗ اَلَا سَآءَ بِئْسَ مَا يَحْكُمُوْنَ حُكْمُهُمْ هٰذَا حَيْثُ نَسَبُوْا لِخَالِقِهِمُ الْبَنَاتِ اللَّاتِىْ هُنَّ عِنْدَهُمْ بِهٰذَا الْمَحَلِّ

৫৯. তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয় তার গ্লানি হেতু লজ্জা পাওয়ার ভয়ে সম্প্রদায় হতে স্ব সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। এটাকে নিয়ে কি করবে সেই বিষয়ে সে দ্বিধান্বিত থাকে, হীনতা সত্ত্বেও অর্থাৎ লজ্জা ও অপমান সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে হত্যা না করে ছেড়ে রাখবে না মাটিতে পুতে ফেলবে জীবন্ত প্রোথিত করবে! শুনে রাখ, তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা অর্থাৎ তাদের এই সিদ্ধান্ত কত নিকৃষ্ট। তাই তারা তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কন্যা সন্তান আরোপ করে যাদের স্থান তাদের নিকটও এই ধরনের।

٦٠. لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَىِ الْكُفَّارِ مَثَلُ السَّوْءِ ج اَىِ الصِّفَةُ السُّوْءٰى بِمَعْنَى الْقَبِيْحَةِ وَهِىَ وَأْدُهُمُ الْبَنَاتِ مَعَ احْتِيَاجِهِمْ اِلَيْهِنَّ لِلنِّكَاحِ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ط اَلصِّفَةُ الْعُلْيَاءُ وَهُوَ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ خَلْقِهٖ

৬০. যারা পরলোক বিশ্বাস করে না তাদের অর্থাৎ কাফেরদের কত নিকৃষ্ট উদাহরণ কত নিকৃষ্ট গুণ ও আচরণ। তা হলো, বিবাহ দিতে নারীর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কন্যাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা। আর আল্লাহর হলো উৎকৃষ্ট উদাহরণ মহান গুণাবলি। তা হলো, লা ইলাহ ইল্লা হুওয়া অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে পরাক্রমশালী, তাঁর সৃষ্টিতে তিনি প্রজ্ঞাময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَاكِيْدُ : অর্থাৎ اِثْنَيْنِ টা اِلٰهَيْنِ-এর تَاكِيْد হয়েছে।

لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ-এর তারকীবে দুটি উক্তি রয়েছে– এবং اِثْنَيْنِ শব্দের ব্যাপারেও দুটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. اِثْنَيْنِ টা اِلٰهَيْنِ-এর تَاكِيْد হয়েছে। এ সুরতে لَا تَتَّخِذُوْا টা مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل হবে। আর لَا تَتَّخِذُوْا টা لَا تَعْبُدُوْا-এর অর্থে হবে।

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই যে, لَا تَتَّخِذُوْا টা مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হবে, আর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য হবে। অর্থাৎ لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ مَعْبُوْدًا এখানে اِلٰهَيْنِ হলো প্রথম মাফউল। আর اِثْنَيْنِ তার تَاكِيْد এবং مَعْبُوْدًا হলো দ্বিতীয় মাফউল যা উহ্য রয়েছে।

দ্বিতীয় উক্তি হলো এই যে, اِثْنَيْنِ টা لَا تَتَّخِذُوْا-এর প্রথম মাফউল কিন্তু তাকে مُؤَخَّرْ করে দিয়েছে। আর اِلٰهَيْنِ হলো দ্বিতীয়। মাফউল যা শাব্দিকভাবে مُقَدَّمْ হয়েছে। মূল ইবারত হলো– لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ

Free @ www.eilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আশ্চর্য মিল : প্রায় সকল মুফাসসিরই اِثْنَيْنِ -কে اِلٰهَيْنِ -এর تَاكِيْد বলেছেন। অথচ اِثْنَيْنِ টা تَاكِيْد لَفْظِىْ ও নয় আবার تَاكِيْد مَعْنَوِىْ ও নয়। এটা এক আশ্চর্য ধরনের মিল। সহীহ হলো এই যে, اِثْنَيْنِ হলো اِلٰهَيْنِ -এর সিফত। হতে পারে যে, যারা اِثْنَيْنِ -কে تَاكِيْد বলেছেন তারা مَعْنٰى وَصْفِىْ -এর কারণে تَاكِيْد বলেছেন। কেননা সিফতের মধ্যেও تَاكِيْد -এর অর্থ হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, বাক্যের মধ্যে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر হয়েছে, মূল ইবারত এভাবে যে, لَا تَتَّخِذُوْا اِثْنَيْنِ اِلٰهَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ কেউ কেউ বলেছেন যে, اِثْنَيْنِ -কে সেই تَثْنِيَةٌ -এর تَاكِيْد বলেছেন যা اِلٰهَيْنِ থেকে বুঝা যায় [জুমাল]। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, تَكْرَارٌ টা مُبَالَغَة فِى التَّنْفِيْرِ -এর জন্য হয়েছে- কেননা অক্ষরের আধিক্যতা অর্থের ব্যাপকতাকে বুঝায়।

قَوْلُهُ اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ : প্রশ্ন. اِلٰهَيْنِ দ্বিবচন হওয়ার কারণে নিজেই দুয়ের উপর বুঝায়। তাতে مَعْدُوْد -এর প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -এর মধ্যেও مَعْدُوْد -কে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না, কেননা اِلٰهَيْنِ এবং اِلٰهٌ টা عَدَدْ ও مَعْدُوْد উভয়ের উপরই দালালত করে। কাজেই দু থেকে বেশি এর জন্য مَعْدُوْد নেওয়া জরুরি হয়ে থাকে। যেমন رَجُلٌ একজন পুরুষ رَجُلٌ وَاحِدٌ বলার প্রয়োজন হয় না। এমনিভাবে رَجُلَيْنِ দুজন পুরুষ। এতে رَجُلَيْنِ اِثْنَيْنِ বলার প্রয়োজন নেই। এর ব্যতিক্রম হলো رِجَالٌ ثَلٰثَةٌ এবং نِسَاءٌ ثَلٰثٌ এতে مَعْدُوْد -এর উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা رِجَالٌ এবং نِسَاءٌ হলো مُبْهَمٌ বা অস্পষ্ট। এর অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য مَعْدُوْد -এর প্রয়োজন হয়।

উত্তর. কয়েকভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়।

১. ইবারতে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر হয়েছে উহ্য ইবারত হলো- لَا تَتَّخِذُوْا اِثْنَيْنِ اِلٰهَيْنِ

২. কোনো বস্তু যখন অপছন্দনীয় ও কবীহ হয় এবং তার قَبَاحَتْ -এর মধ্যে মুবালাগা উদ্দেশ্যে হয় তখন তাকে অধিক সংখ্যক ইবারত দ্বারা ব্যক্ত করে যাতে করে অক্ষরের অধিক্যতা অর্থের ব্যাপকতাকে বুঝায়।

قَوْلُهُ اَتٰى بِهِ لِاِثْبَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ : এটা সেই প্রশ্নের উত্তর যে, اِلٰهٌ টা নিজেই এককের উপর বুঝায়। তদুপরি وَاحِدٌ নেওয়ার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. শুধুমাত্র اِلٰه উল্লেখ করলে এই সংশয় হতে পারত যে, সম্ভবত শুধুমাত্র اُلُوْهِيَّتْ -কে সাব্যস্ত করাই উদ্দেশ্য হয়েছে। এ কারণে وَاحِدٌ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যাতে করে اُلُوْهِيَّتْ এবং وَاحِدَنِيَّتْ উভয়ের উপরই বুঝায়। কাজেই এই আপত্তির নিরসন হয়ে গেল যে, اِلٰهٌ শব্দটি جِنْسِيَّةٌ এবং وَحْدَتْ উভয়টিকে বুঝায়। কাজে وَاحِدٌ -এর সাথে تَاكِيْد -এর প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ الطَّاعَةُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, دِيْن অর্থ হলো طَاعَتْ বা আনুগত্য, جَزَاءٌ বা প্রতিদান নয়। কেননা جَزَاءٌ সর্বদা থাকে না। যেহেতু প্রতিদান পরকালে হবে।

قَوْلُهُ وَاصِبٌ : এটা وُصُوْبٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلٍ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো সুদৃঢ়, স্থায়ী।

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ وَاصِبًا টি دِيْن থেকে حَالْ হয়েছে صِفَتْ নয়। কেননা نَكِرَةٌ টা مَعْرِفَةٌ হতে صِفَتْ হতে পারে না। এবং عَامِلٌ তাতে সেই ফে'ল যা جَارٌ ও مَجْرُوْرٌ হতে বুঝা যায়। অর্থাৎ اِسْتَقَرَّ বা ثَبَتَ আর কেউ কেউ ثَبَتَ বা اِسْتَقَرَّ -এর উহ্য যমীর থেকে حَالْ বলেছেন। উভয় সুরতে অর্থ একই হবে। উহ্য ইবারত হলো- اِسْتَقَرَّ الدِّيْنُ وَثَبَتَ لَهُ حَالَ كَوْنِهِ دَائِمًا

قَوْلُهُ تَجْاَرُوْنَ : তোমরা ফরিয়াদ করো। আওয়াজ উচ্চ কর। اَلْجُوَارُ হলো رَفْعُ الصَّوْتِ فِى الدُّعَاءِ এটা مُضَارِعْ -এর جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهُ وَلَا تَدْعُوْنَ غَيْرَهُ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো اِلَيْهِ تَجْاَرُوْنَ -এর মধ্যে ظَرْف -এর تَقْدِيْم -এর ফায়েদার দিকে ইঙ্গিত করা।

قَوْلُهُ اَمْرُ تَهْدِيْد : অর্থাৎ فَتَمَتَّعُوْا -এর মধ্যে اَمْر টা تَهْدِيْد -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا : يَعْلَمُوْنَ -এর যমীর মুশরিকদের দিকে ফিরেছে। আর مَا -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর উহ্য রয়েছে যাকে আল্লামা সুয়ূতী (র.) اَنَّهَا বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন। কাজেই عَدَمِ عَائِدْ -এর আপত্তির নিসরন হয়ে গেল। উহ্য ইবারত হলো- لَا يَعْلَمُوْنَهَا اَنَّهُمْ اٰلِهَةٌ وَيَعْتَقِدُوْنَ فِيْهَا اَنَّهَا تَضُرُّ وَتَنْفَعُ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ لِاَنَّهَا جَمَادٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ فِىْ مَحَلِّ رَفْعٍ اَوْ نَصْبٍ بِيَجْعَلُ : অর্থাৎ لَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ -এর মধ্যে দুটি اِعْرَاب হবে বৈধ। প্রথম হলো مَا يَشْتَهُوْنَ বাক্য হয়ে رَفْع -এর مَحَلّ -এ হয়েছে। আর لَهُمْ উহ্য ثَابِتٌ ইত্যাদির সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর اَلْبَنَاتِ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে يَجْعَلُ -এর মাফউল হওয়ার কারণে نَصْب হয়েছে।

قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : এটা مَعْطُوف এবং مَعْطُوف عَلَيْهِ-এর মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَة হয়েছে। فَصْل بِالْأَجْنَبِي হয়নি।

قَوْلُهُ يَخْتَارُوْنَهَا : نُسْخُ مُتَدَاوِلَهْ-এর মধ্যে এটাই রয়েছে আর স্পষ্ট এটা যে, يَخْتَارُوْنَهُمْ হওয়া উচিত ছিল। কেননা যমীর اَبْنَاء-এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ : এ বৃদ্ধিকরণ একটি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে। প্রশ্ন হলো এই যে, يَجْعَلُوْنَ-এর ফায়েলের যমীর যা কাফেরদের দিকে ফিরেছে এবং মাফউলের যমীর যা لَهُمْ উভয়টির মেসদাক একই। আর তা হলো كُفَّارَ অথচ নাহুর রীতি রয়েছে যে, فَاعِلْ এবং মাফউলের যমীর مُتَّحِدْ হওয়া نَفْس-এর মাধ্যম ব্যতীত জায়েজ নেই। বাবে ظَنَّ ব্যতীত এবং তার اَخَوَاتْ-এরও একই কারণ যে, زَيْدٌ ضَرَبَهُ জায়েজ নেই। অবশ্য زَيْدٌ ظَنَّهُ قَائِمٌ অর্থাৎ نَفْسَهُ বলা বৈধ রয়েছে।

উত্তর. اَلَّذِيْنَ يَخْتَارُوْنَ দ্বারা এই প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন যে, يَجْعَلُوْنَ অর্থ يَخْتَارُوْنَ কেননা اِخْتِيَارْ টা দুই মাফউলকে কামনা করে না। আর এক মাফউল হলো مَا يَشْتَهُوْنَ কাজেই اَلَام টা اَجَلْ অর্থে হবে।

قَوْلُهُ يَئِدُ : وَادَ يَئِدُ বাবে ضَرَبَ হতে অর্থ হলো জীবজন্তু প্রোথিত করা।

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْقَبِيْحَةِ : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, مَثَلُ بِمَعْنَى صِفَتْ مُؤَنَّثْ আর اَلسَّوْءُ হলো مُذَكَّرْ অথচ مَوْصُوْف এবং صِفَتْ-এর মধ্যে مُطَابَقَتْ জরুরি?

উত্তর. জবাবের সার হলো এই যে, اَلسَّوْءُ টা اَلسُّوى যা قَبِيْحَةْ-এর অর্থে হয়েছে কাজেই مُوَافَقَتْ বিদ্যমান।

قَوْلُهُ الصِّفَةُ الْعُلْيَاءُ : এ বৃদ্ধি করণ সেই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা দুই মাবুদে বিশ্বাস করো না, তিনি একক মাবুদই, অতএব তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, করতলগত। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক খাঁটি তৌহিদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ দিয়েছেন এবং শিরক থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

মূলত সমগ্র বিশ্বের সব কিছু যখন আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত এবং অবনত ও সেজদারত তখন খবরদার তোমরা কখনো আল্লাহ পাকের সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, তিনি এক, অদ্বিতীয় فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ অতএব, তোমরা শুধু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাককে ভয় কর তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর।

قَوْلُهُ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আর আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি সব কিছুর মালিক এবং তিনি কারো প্রতি জুলুম করেন না।

قَوْلُهُ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا : ইবাদত তাঁরই, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে ভয় কর? অর্থাৎ আনুগত্য আল্লাহ পাকের প্রতিই থাকতে হবে এবং ভয় শুধু তাঁকেই করতে হবে। ফেরেশতাদের ন্যায় মানুষেরও কর্তব্য হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার অনুগত থাকা। প্রিয়নবী ﷺ -ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নাফরমানির কাজে কারো কোনো কথা মেনে চলার অনুমতি নেই। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, নাসাঈ শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফে হযরত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নাফরমানির কাজে কারো কাছে আনুগত্য প্রকাশ করা বৈধ নয়। আনুগত্য, শুধু নেক কাজে, মন্দ কাজে নয়। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কোনো মালিক নেই, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা। অতএব, শুধু তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই মানুষের কর্তব্য। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَلدِّيْنُ শব্দটির অর্থ হলো সৎ কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি। মানুষের আমলের বদলা আল্লাহ পাকই দান করবেন। মুমিনদেরকে তাদের নেক আমলের ছওয়াব তিনিই দান করবেন। আর তিনিই কাফেরদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَلدِّيْنُ শব্দটির অর্থ আজাব অর্থাৎ তিনিই কাফেরদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ : এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যদেরকে ভয় কর? অর্থাৎ শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই ভয় করা উচিত, আর কাউকে নয়। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। অতএব, শুধু আল্লাহ পাককেই ভয় করতে হবে, অন্য কাউকে নয়।

তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ামত রয়েছে সবইতো আল্লাহ পাকের দান। বস্তুত মানুষের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব তথা সম্পদ, শক্তি, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য, সম্মান ও পদমর্যাদা, সন্তানসন্ততি, জনপ্রিয়তা, প্রভাব– প্রতিপত্তি এককথায় সব কিছুই তো আল্লাহ পাকের দান, তাঁরই দয়া এবং তাঁরই করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ : এরপর যখন তোমাদের প্রতি বিপদ আসন্ন হয় তখন তোমরা তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতে থাক। কেননা তোমরা জান কঠিন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত সম্ভব নয়, তাই বিপন্ন বিপদগ্রস্ত অবস্থায়, মুশরিক এবং নাস্তিকদেরকেও দেখা যায় বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহ পাককে ডাকতে, তারা যাঁকে অবিশ্বাস করে, যাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে অথচ বিপদ মুহূর্তে তাঁকেই ডাকতে তারা বাধ্য হয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ : এরপর যখন আল্লাহ পাক তোমাদের বিপদ দূর করে দেন তখন তোমাদেরই একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শিরক করে। কিন্তু কি আশ্চর্য আর কি লজ্জাস্কর ব্যাপার যে, যার হাতে রয়েছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ, বিপদ মুক্তির জন্য যার নিকট মানুষ আকুল আবেদন জানায় সেই করুণাময় আল্লাহ পাক যখন দয়া করে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখন অকৃতজ্ঞ মানুষ মহান আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, যদি আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে মনে করা হয় অর্থাৎ মুমিন ও কাফের উভয়কে সম্বোধন করা হয় তবে مِنْكُمْ -এর তাৎপর্য হবে কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে আর যদি মনে করা হয় যে আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তবে আয়াতের তাৎপর্য হবে এই, কাফেরদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে, আর কিছু লোক বিপদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। −[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৪০১]

قَوْلُهُ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দুটি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমে তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বেইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে! উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ তা'আলার কন্যা।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– اَلَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তাফসীরে বাহরে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরিউক্ত দুটি বদ অভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান শাস্তি ও বেইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বেইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

তৃতীয় আয়াতের শেষে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেলা আল্লাহর রহস্যের মোকাবিলা করার নামান্তর। কেননা নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহর একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি। −[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা বৈধ নয়। এটা কাফেরদের কাজ। তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লিখিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার যুগের কুপ্রথার খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে, ঐ মহিলা পুণ্যময়ী, যার প্রথম গর্ভের সন্তান কন্যা হয়। কুরআন পাকের يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ আয়াতে কন্যার কথা অগ্রে উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম গর্ভ থেকে কন্যা জন্মগ্রহণ করা উত্তম। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তানদের সাথে যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার ও জাহান্নামের মধ্যে সেই সন্তানেরা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। −[তাফসীরে রূহুল বয়ান]

মোটকথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা। এ থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত এবং এর বিপরীতে আল্লাহর ওয়াদায় মুসলমানদের আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦١. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ بِالْمَعَاصِيْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا اَىْ الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ نَسَمَةٍ تَدِبُّ عَلَيْهَا وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ عَلَيْهِ ـ

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য পাপকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তবে এতে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তার উপর বিচরণশীল কোনো জীবকে রেহাই দিতেন না ; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের জন্য নির্ধারিত সময় আসে তখন তারা তা হতে মুহূর্তকাল বিলম্ব বা হতে ত্বরা করতে পারে না ;

٦٢. وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ مِنَ الْبَنَاتِ وَالشَّرِيْكِ فِى الرِّيَاسَةِ وَاِهَانَةِ الرُّسُلِ وَتَصِفُ تَقُوْلُ اَلْسِنَتُهُمْ مَعَ ذٰلِكَ الْكَذِبَ وَهُوَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ط عِنْدَ اللّٰهِ اَىْ الْجَنَّةُ كَقَوْلِهِ وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى قَالَ تَعَالٰى لَاجَرَمَ حَقًّا اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ مَتْرُوْكُوْنَ فِيْهَا اَوْ مُقَدَّمُوْنَ اِلَيْهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ مُتَجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ ـ

৬২. যা তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে অর্থাৎ কন্যা সন্তান, ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরিকানা, দূতকে অপমান করা ইত্যাদি তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এতদসহ তাদের জিহ্বা মিথ্যা বিবরণ দেয় যে এটা হলো এই যে, আল্লাহর নিকটস্থ মঙ্গল অর্থাৎ জান্নাত তাদের জন্যই। যেমন একটি আয়াতে আছে যে এরা বলত- وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى "যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাই তবে তাঁর নিকট নিশ্চয় আমার জন্য মঙ্গলময় বস্তু থাকবে।" [সূরা হা-মীম আস্‌সাজদা ৫০] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে অগ্নি এবং তাদেরকে তাতে অগ্রে নিক্ষেপ করা হবে। لَا جَرَمَ অর্থ অবশ্যই। مُفْرَطُوْنَ অর্থ তাতে ছেড়ে রাখা হবে, বা এদেরকে তার দিকে অগ্রবর্তী করা হবে। অপর এক কেরাতে এটার ر -এ কাসরাসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ সীমা অতিক্রমকারী।

٦٣. تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ رُسُلًا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمُ السَّيِّئَةَ فَرَاَوْهَا حَسَنَةً فَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ مُتَوَلِّىْ اُمُوْرِهِمُ الْيَوْمَ اَىْ فِى الدُّنْيَا

৬৩. কসম আল্লাহর! আমি তোমাদের পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি অনন্তর শয়তান এদের মন্দ কার্যকলাপ এদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিয়েছিল ফলে তাই তাদের ভালো বলে মনে হয়। অনন্তর তারা রাসূলগণকে অস্বীকার করে বসে সেই আজ অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের অভিভাবক এদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْيَوْمِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى حِكَايَةِ الْحَالِ الْاٰتِيَةِ اَىْ لَا وَلِىَّ لَهُمْ غَيْرُهُ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَصْرِ نَفْسِهٖ فَكَيْفَ يَنْصُرُهُمْ ـ

এবং এদের জন্য পরকালে রয়েছে মর্ম যন্ত্রণাকর শাস্তি কেউ কেউ বলেন, اَلْيَوْم বলতে حِكَايَةُ الْحَالِ الْاٰتِيَةِ [অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা বর্তমানে ঘটতেছে] রূপে কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শয়তান ব্যতীত ঐ দিন তাদের আর কেউ অভিভাবক নেই। সেই দিন তো সে নিজেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় সুতরাং সে অন্যকে কেমন করে সাহায্য করবে?

٦٤. وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ لِلنَّاسِ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَهُدًى عَطْفٌ عَلٰى لِتُبَيِّنَ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بِهٖ ـ

৬৪. হে মুহাম্মদ! আমি তো তোমার প্রতি কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ করেছি। এদেরকে অর্থাৎ মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে বিষয়ে অর্থাৎ দীন সম্পর্কিত যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে তা আর এতে বিশ্বাসস্থাপনকারী সম্প্রদায়ের জন্য এটা পথ-নির্দেশ ও রহমত স্বরূপ। وَهُدًى -পূর্বে উল্লিখিত لِتُبَيِّنَهٗ -এর সাথে এটার عَطْف হয়েছে।

٦٥. وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا يُبْسِهَا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً دَالَّةً عَلَى الْبَعْثِ لِقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ سِمَاعَ تَدَبُّرٍ ـ

৬৫. আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তিনি ভূমিকে এটার মৃত্যুর পর বিশুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর বৃক্ষলতাদি দ্বারা পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ যারা চিন্তা ও ধ্যানের কানে শ্রবণ করে তাদের জন্য নিদর্শন পুনরুত্থানের উপর প্রমাণ রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ الْاَرْض : প্রশ্ন. عَلَيْهَا-এর যমীরের مَرْجِعْ-কে اَلْاَرْض নির্ধারণ করেছেন। অথচ পূর্বে اَلْاَرْض উল্লেখ নেই। এতে اِضْمَارْ قَبْلَ الذِّكْر আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর. যেহেতু نَاسْ এবং دَابَّةٌ টা اَلْاَرْض-এর উপর বুঝায় কাজেই যদিও اَلْاَرْض প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ নেই কিন্তু دَلَالَةً উল্লেখ রয়েছে। কাজেই اِضْمَارْ قَبْلَ الذِّكْر -এর প্রশ্ন আসবে না।

قَوْلُهٗ نَسَمَةٌ : অর্থ ব্যক্তি, রূহ, বহুবচনে نَسَمَاتٌ-نَسَمْ

قَوْلُهٗ تَقُوْلُ : نَصِفُ-এর তাফসীর تَقُوْلُ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, تَصِفُ শব্দটি مَوْصُوْف এবং সিফতকে কামনা করে। অথচ এখানে مَوْصُوْفও নেই এবং صِفَتْও নেই।

উত্তর. এখানে تَصِفُ টা تَقُوْلُ অর্থে হয়েছে। কাজেই صِفَتْ ও مَوْصُوْف -এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهٗ هُوَ : এটা উহ্য মানার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ টা তার مَدْخُوْل সহকারে جُمْلَةٌ হয়ে উহ্য هُوَ মুবতাদা -এর খবর হয়েছে। تَصِفُ-এর মাফউল নয়। কেননা تَصِفُ -এর মাফউল اَلْكَذِبَ বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهٗ مُقَدَّمُوْنَ : অর্থ– আগে করা হয়েছে। এটা اَفْرَطْتُهٗ فِىْ طَلَبِ الْمَاءِ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ قَدَّمْتُ لَهٗ তথা আমি তাকে পানির জন্য অগ্রে প্রেরণ করেছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের অন্যায়-অনাচারের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে তাদের নাফরমানি ও অন্যায়-অনাচারের জন্যে তাৎক্ষণিক ভাবে শাস্তি প্রদান করেন না; বরং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তাঁর দয়ামায়া এবং করুণার কারণেই তিনি অপবাদের সঙ্গে অপরাধীদেরকে পাকড়াও করেন না।

পাকড়া করার অর্থ শাস্তি দেওয়া আর আলোচ্য আয়াতের اَلنَّاسْ শব্দটির দ্বারা কাফের মুশরিক এবং পাপিষ্ঠদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ظُلْم শব্দটি এ ব্যাখ্যারই ইঙ্গিতবহ। ظُلْم শব্দ দ্বারা কুফর, শিরক, নাস্তিকতা, মোনাফেকী এক কথায় যাবতীয় পাপাচারকে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ আয়াতের মর্মকথা : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত-অসীম দয়ামায়া এবং করুণার উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের কুফর শিরক ও যাবতীয় নাফরমানি দেখেন, কিন্তু তবুও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন যেন তারা আত্মসংশোধনের সুযোগ পায়। এটি বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিতান্ত করুণা ব্যতীত আর কিছু নয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ الخ "যদি আল্লাহ পাক মানুষের অপরাধের সঙ্গে তার শাস্তি বিধান করেন তবে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীও থাকবে না।" পৃথিবী অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিরান হয়ে যাবে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা, মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ব্যবহৃত হচ্ছে, যদি মানুষের পাপাচারের কারণে তাদের শাস্তি বিধান করেন তবে মানুষ তো ধ্বংস হবেই, তার পাশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টিও শেষ হয়ে যাবে, জীবজন্তুই হোক বা বৃক্ষ তরুলতাই হোক। তাছাড়া যদি মানুষই না থাকে অন্য কিছুরই প্রয়োজন থাকবে না। কেননা মানুষ ব্যতীত অন্যসব কিছুকে আল্লাহ পাক মানুষের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। যদি মানুষের পাপাচারের পরিণামে প্রলয়ঙ্করী ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি আজাব আপতিত হয়, তখন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জীবজন্তুও ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) শুনেছিলেন যে, এক ব্যক্তি বলেছিল, যদি কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি জুলুম করে, তবে সে জালেম তার নিজেরই ক্ষতি করে, তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন না, তা নয়; বরং ঐ ব্যক্তির জুলুমের কারণে পাখিরা ও তাদের নীড়ে ধ্বংস হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর, [উর্দু] পারা ১৪, পৃ. ৪০]

মানুষের অন্যায়-অনাচারের কারণে যখন আল্লাহ পাকের আজাব স্বরূপ বন্যা বা অনাবৃষ্টি আসে, তখন জীবজন্তুরাও সে আজাবের কবল থেকে রক্ষা পায় না। যখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজ অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ পাকের শান, উচ্চতম মর্যাদা এবং সর্বময় ক্ষমতা এ কথার দাবিদার হয় যে, অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করা হোক। কিন্তু আল্লাহ পাকের দয়া, তাঁর করুণা ও তাঁর উদারতার কারণে অপরাধীদেরকে তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন, অপরাধীকে তৎক্ষণাৎ দণ্ড প্রদান করেন না; বরং তাকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন। যখন সে নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে তখন আর তার শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয় না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক যখন কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি আজাব নাজিল করার ইচ্ছা করেন, তখন সকলেই ঐ আজাবের কবলে পড়ে, কিন্তু কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ এবং নিষ্পাপকে তাদের নিয়ত অনুসারে উঠানো হবে।

قَوْلُهُ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ .... وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : "হে রাসূল! আমি আপনার প্রতি এই কিতাব [কুরআনে করীম] এজন্যে নাজিল করেছি যেন আপনি তাদের জন্যে সে বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তারা মতবিরোধ করেছে" অর্থাৎ তওহীদ, রেসালত, আখেরাত, হালাল-হারাম প্রভৃতি এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যেন আপনি মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিরসন করেন। এ উদ্দেশ্যেই আপনার নিকট কুরআন নাজিল করা হয়েছে। "আর বিশেষত মুমিনদের জন্য রয়েছে এতে হেদায়েত এবং রহমত।"

Free @ www.e-ilmweekly.com

বস্তুত নবী রাসূলগণের কাজ হলো মানুষকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করা এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। আর এ আহ্বানে সাড়া দেওয়া হলো মানুষের দায়িত্ব। যারা এ দায়িত্ব যত্নসহকারে পালন করে তথা সত্যকে গ্রহণ করে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, দুনিয়া আখেরাত দোজাহানে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে যারা এ দায়িত্ব পালন না করে, তাদের পরিণাম হয় শোচনীয়। অতএব, হে রাসূল! আপনি তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না।

قَوْلَهُ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا : কাফের মুশরিকরা তাওহীদের বিশ্বাস করতে রাজি হতো না, তাই এ আয়াত থেকে তাওহীদের কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : যে বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধু তাওহীদের প্রমাণই নয়; বরং একদিকে আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের বিবরণও রয়েছে, অন্যদিকে এতে রয়েছে হেদায়েতের দলিল এবং আল্লাহর রহমতের কথা। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে আল্লাহ পাকই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ধরার মৃত্যুর পর তাকে পানি দ্বারা জীবন দান করেছেন। নিশ্চয়ই এতে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে।

যখন খরায় ধরা পৃষ্ঠ শুষ্ক হয়ে যায়, মানুষ পানির জন্যে হাহাকার আর্তনাদ করতে থাকে তখন পৃথিবীতে কোন শক্তি আছে যে মানব জাতিকে পানির এ নিয়ামত দান করতে পারে? আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই তোমাদের জন্যে আসমান থেকে পানি নাজিল করেন এবং মৃত শুষ্ক জমিনকে জীবন দান করেন আর ঐ পানির মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠকে শস্য-শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ করে দেন। মৃত শুষ্ক মাটি নবজীবন লাভ করে। যাঁর অনন্ত অসীম কুদরতে বিশ্ব সৃষ্টির চেহারা বদলে যায়, তিনি মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে পারেন।

অতএব, তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে একথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।

قَوْلَهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ : নিশ্চয়ই এতে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করে। মৃত শুষ্ক জমিন যখন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে, আল্লাহ পাকের হুকুমে, মৃত মানুষও পুনর্জীবন লাভ করবে। অতএব, আসমান থেকে বারি বর্ষণে রয়েছে কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٦. وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط اِعْتِبَارًا نُسْقِيْكُمْ بَيَانٌ لِلْعِبْرَةِ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ اَيِ الْاَنْعَامِ مِنْ لِلْاِبْتِدَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِنُسْقِيْكُمْ بَيْنِ فَرْثٍ ثُفْلِ الْكَرْشِ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَا يَشُوْبُهٗ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ مِنْ طَعْمٍ اَوْ لَوْنٍ اَوْ رِيْحٍ وَهُوَ بَيْنَهُمَا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ سَهْلَ الْمُرُوْرِ فِىْ حَلْقِهِمْ لَا يَغُصُّ بِهٖ .

৬৬. আর অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা তার অর্থাৎ গবাদি পশুর গোবর ও রক্তের মাঝে উদরস্থিত যা আছে তা হতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ তোমাদেরকে পান করাই গোবর ও রক্তের সাথে অবস্থান সত্ত্বেও এটার স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে এতদুভয়ের কোনোরূপ সংমিশ্রণ নেই যা পানকারীদের জন্যে সুপেয়। গলায় আটকায় না অতি সহজে গলাধঃকরণ হয়ে যায়। عِبْرَةً অর্থ শিক্ষা। نُسْقِيْكُمْ এটা উক্ত শিক্ষার বিবরণ। مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ এস্থানে مِنْ শব্দটি اِبْتِدَائِيَّه বা সূচনাবাচক; نُسْقِيْكُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট فَرْثٌ উদরের ময়লা, গোবর।

٦٧. وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ ثُمَّ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا خَمْرًا تُسْكِرُ سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ وَهٰذَا قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا وَّرِزْقًا حَسَنًا ط كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْخَلِّ وَالدِّبْسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيَةً دَالَّةً عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ .

৬৭. এবং খেজুর বৃক্ষ ও আঙ্গুর হতে নেশাকর বস্তু মদ্য. سَكَرًا অর্থ নেশাকর মদ্য। مَصْدَرٌ বা ক্রিয়ার উৎসমূলরূপে এস্থানে তার নামকরণ করা হয়েছে। এই আয়াতটি হলো এটা হারাম হওয়ার পূর্বের এবং উত্তম খাদ্য যেমন শুকনা খেজুর, কিশমিশ, রস ইত্যাদি লাভ করে থাক। এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন।

٦٨. وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ وَحْىَ اِلْهَامٍ اَنْ مُفَسِّرَةٌ اَوْ مَصْدَرِيَّةٌ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا تَاْوِىْ اِلَيْهَا وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوْتًا وَّمِمَّا يَعْرِشُوْنَ اَيِ النَّاسُ يَبْنُوْنَ لَكَ مِنَ الْاَمَاكِنِ وَاِلَّا لَمْ تَاْوِ اِلَيْهَا .

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে ওহী করেছেন অন্তরে ইলহাম করেছেন যে, পাহাড়ে তোমরা গৃহ নির্মাণ কর আবাস গ্রহণ কর; اَنِ اتَّخِذِىْ এস্থানে اَنْ টি مُفَسِّرَة অর্থাৎ বিবরণমূলক বা مَصْدَرِيَّه বা ক্রিয়ার উৎসমূল ব্যঞ্জক। বৃক্ষে গৃহ নির্মাণ কর এবং তারা অর্থাৎ মানুষ যে কুটির তৈরি করে তাতে অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে কুটির নির্মাণ করে তাতেও আবাস গ্রহণ কর। আল্লাহ যদি ইলহাম না করতেন তবে সে ঐ সমস্ত স্থানে আবাস গ্রহণ করত না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٩. ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِي
اُدْخُلِي سُبُلَ رَبِّكِ طُرُقَهُ فِي طَلَبِ الْمَرْعٰى
ذُلُلًا جَمْعُ ذَلُولٍ حَالٌ مِنَ السُّبُلِ اَيْ
مُسَخَّرَةً لَكِ فَلَا تَعْسُرُ عَلَيْكِ وَاِنْ تَوَعَّرَتْ
وَلَا تَضِلِّي عَنِ الْعَوْدِ مِنْهَا وَاِنْ بَعُدَتْ
وَقِيْلَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِي اُسْلُكِي اَيْ
مُنْقَادَةً لِمَا يُرَادُ مِنْكِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا
شَرَابٌ هُوَ الْعَسَلُ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ
شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ط مِنَ الْاَوْجَاعِ قِيْلَ لِبَعْضِهَا
كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَنْكِيْرُ شِفَاءٍ اَوْ لِكُلِّهَا
بِضَمِيْمَةٍ اِلٰى غَيْرِهِ اَقُوْلُ وَبِدُوْنِهِ بِنِيَّتِهِ
وَقَدْ اَمَرَ بِهِ ﷺ مَنِ اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ رَوَاهُ
الشَّيْخَانِ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
فِي صُنْعِهِ تَعَالٰى .

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু আহার কর। এবং আহরণ-ক্ষেত্র অন্বেষণে তোমার প্রভুর পথসমূহে চল যা তোমার বাধ্যগত করে দেওয়া হয়েছে। فَاسْلُكِي তুমি প্রবেশ কর। سُبُلَ পথসমূহে। ذُلُلًا -এটা ذَلُولٌ -এর বহুবচন। سُبُلَ -এর حَالٌ অর্থাৎ সেই পথসমূহ যেগুলো বাধ্যগত করে দেওয়া হয়েছে। বহু দূরের পথ হলেও তোমার জন্য তা কষ্টকর হবে না যতদূরই যাও না কেন ফেরার পথ ভুল হবে না। কেউ কেউ বলেন, এটা اُسْلُكِي -এর ضَمِيْر [সর্বনাম اَنْتِ]-এর حَالٌ অর্থাৎ ভাব ও অবস্থাবাচক পদ। অর্থাৎ তুমি আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হয়ে চলো। তার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় মধু এতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির ব্যথা-বেদনার প্রতিকার। অবশ্যই এতে অর্থাৎ আল্লাহর ক্রিয়াকর্মে যারা চিন্তা করে সেই সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ মানুষের জন্য প্রতিষেধক। কেউ কেউ বলেন, কতক অবস্থার জন্য এটা প্রতিষেধক। شِفَاءٌ শব্দটির نكره ব্যবহার এটার প্রমাণ। অথবা এটার অর্থ অন্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত করলে সকল রোগের জন্যই এটা প্রতিষেধক। আমি বলি, নিয়ত ঠিক থাকলে অন্য উপাদানের সাথে এটার মিশ্রণ না ঘটালেও এটা সকল রোগের প্রতিষেধক হতে পারে। শায়খাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, জনৈক সাহাবীর পেটের পীড়ায় রাসূল ﷺ তাকে মধু পান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٧٠. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَلَمْ تَكُوْنُوْا شَيْئًا ثُمَّ
يَتَوَفّٰكُمْ عِنْدَ اِنْقِضَاءِ اٰجَالِكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ اَيْ اَخَسِّهِ مِنَ الْهَرَمِ
وَالْخَرَفِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ط
قَالَ عِكْرِمَةُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَصِرْ بِهٰذِهِ
الْحَالَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهِ قَدِيْرٌ
عَلٰى مَا يُرِيْدُهُ .

৭০. আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না। অতঃপর তোমাদের মেয়াদ অন্ত হলে তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও কাউকেও করা হবে জরাগ্রস্ত। বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে উপনীত করা হবে, বুদ্ধি-বিভ্রম অবস্থায় পৌঁছানো হবে। ফলে, যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকবে না। ইকরিমা বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে এই অবস্থায় উপনীত হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি পরিচালনা সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ এবং তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়নে সর্ব-শক্তিমান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مِمَّا فِي بُطُوْنِهِ : এখানে مِنْ টা تَبْعِيْضِيَّه اِبْتِدَائِيَّه হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ : এটা لَبَنًا থেকে حَال مُقَدَّمْ হয়েছে। অথবা مَا থেকে حَالْ হয়েছে যা তার থেকে مُقَدَّمْ হয়েছে।

প্রশ্ন. بُطُوْنِه-এর যমীর اَنْعَامْ-এর দিকে ফিরেছে। আর اَنْعَامْ বহুবচন হওয়ার কারণে مُؤَنَّثْ আর তার দিকে প্রত্যাবর্তিত যমীর হলো مُذَكَّر উভয়ের মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. اَنْعَامْ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে যমীর مُذَكَّر নিয়েছেন আর সূরা আল মু'মিনূনে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে مؤنث নিয়েছেন। ইমাম সীবাওয়াইহি বলেন যে, اَنْعَامْ টা اَفْعَالْ-এর ওজনে مُفْرَدْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ بَيْنَهُمَا : এটা لَبَنًا থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ : এটা উহ্য نُسْقِيْكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ الخ-এর উপর এর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ : অর্থাৎ سَكَرًا যদিও মাসদার কিন্তু অর্থের দিক থেকে মদের অর্থ দেবে অর্থাৎ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ خَمْرًا এখন حَمْل-এর ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। আর مُبَالَغَة এবং مَجَازْ স্বরূপ خَمْر-এর নাম سَكَرْ রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا এটা খোঁটা দেওয়ার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। অথচ শরাব হারাম। আর হারাম জিনিসের সাথে খোঁটা দেওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. জবাবের সারমর্ম হলো এই যে, এই اِمْتِنَانْ বা অনুগ্রহ করা হুরমত সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বের, আয়াতটি মাক্কী, আর মদের হুরমত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ : অর্থাৎ لِلنَّحْلِ الَّتِى تَتَعَسَّلُ فِيْهَا مَا بَيْنَ النَّاسِ بُيُوْتًا অর্থাৎ يَعْرِشُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই বেড়া বা বাঁশের কাঠামো যা মানুষ মধুমক্ষিকা লালনপালনের জন্য বানিয়ে থাকে।

قَوْلُهُ جَمْعُ ذَلُوْلٍ : এই হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, سُبُلَ হলো বহুবচন যা ذُو الْحَالِ হয়েছে, আর ذُلُلًا হলো একবচন, আর সেটা حَالْ হয়েছে। কাজেই حَالْ এবং ذُو الْحَالِ-এর মাঝে مُطَابَقَتْ পাওয়া যায়নি।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, ذُلُلًا টা একবচন নয়; বরং ذَلُوْل-এর বহুবচন। কাজেই عَدَم مُطَابَقَتْ-এর প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَوَعَّرَتْ : এ শব্দটি اَلْوَعْرُ থেকে এসেছে। অর্থ হলো– সহজতার বিপরীত, কঠিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً الخ : بُطُوْنِه শব্দের সর্বনামটি اَنْعَامْ-কে বুঝায়। اَنْعَامْ বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে بُطُوْنِهَا বলা ব্যাকরণসম্মত ছিল। যেমন, সূরা মু'মিনে এভাবেই نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِى بُطُوْنِهَا বলা হয়েছে। কুরতুবী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, সূরা মু'মিনূনে বহুবচনের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নাহলে বহুবচনের রেওয়ায়েত করে সর্বনাম পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবদের বাচন পদ্ধতিতে এর ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা বহুবচন শব্দের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করে।

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চলায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দীনদারির পরিপন্থি নয় তবে। শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) তাই বলেছেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। তিনি আরও বলেছেন, দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোনো খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আল্লাহর নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহর কুদরত যা চতুষ্পদ জীবজন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করেছি।

এরপর ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরি করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু-ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো, উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ উত্তম রিজিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তা দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি প্রস্তুত করবে- মাদকদ্রব্য তৈরি করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরি করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ হালাল হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিয়ামত। যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন ব্যবহারটি হালাল ও কোনটি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سَكَرٌ -এর বিপরীত رِزْقٌ حَسَنٌ আনার কারণে জানা গেছে যে, سَكَرٌ ভালো রিজিক নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে سَكَرٌ-এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাসসাস]

[কোনো কোনো আলেমের মতে এর অর্থ সিকরা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।]

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাজিল হওয়ার সময় মদ হালাল ছিল এবং মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভালো নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টত শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কুরআনে বিধিবিধান অবতীর্ণ হয়।

-[জাস্‌সাস, কুরতুবী-সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ الخ : اَوْحٰى এখানে وَحْيٌ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে কোনো বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

اَلنَّحْلُ-জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসেবে اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলেছেন, কিন্তু এ ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে اَوْحٰى رَبُّكَ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বারো হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে দিয়ে [illegible] সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাজত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুঁড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোনো কোনো মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোনো মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। -[আল জাওয়াহের]

قَوْلُهُ اَوْحٰى رَبُّكَ ...... بُيُوْتًا : বলে যেসব নির্দেশ বোঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ। এতে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, বসবাসের জন্য প্রত্যেক জন্তু অবশ্যই গৃহ নির্মাণ করে কিন্তু মৌমাছিদেরকে এমন গুরুত্ব সহকারে নির্মাণের আদেশ দানের বৈশিষ্ট্য কি? এছাড়া এখানে শব্দও بُيُوْتٌ ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণত মানুষের বাসগৃহের অর্থে আসে। এতে প্রথমত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৌমাছিদেরকে মধু তৈরি করতে হবে। এর জন্য প্রথম থেকেই তারা একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করে নিক। দ্বিতীয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা যে গৃহ নির্মাণ করবে, তা সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহের মতো হবে না, বরং তার গঠন ও নির্মাণ হবে অনন্যা সাধারণ। সেমতে তাদের গৃহ সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। তাদের গৃহ ছয় কোণাকৃতির হয়ে থাকে। স্কেল ও রুলার দিয়ে পরিমাপ করলেও তাতে চুল বরাবরও পার্থক্য ধরা পড়ে না। কোণাকৃতি ছাড়া অন্য কোনো আকৃতি যেমন চতুর্ভুজ ও পঞ্চভূজ ইত্যাদি আকৃতি অবলম্বন না করার কারণ এই যে, এগুলোর কোনো কোনো বাহু অকেজো থেকে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিদেরকে শুধু গৃহ নির্মাণেরই নির্দেশ দেননি, বরং গৃহের অবস্থানস্থলও নির্দেশ করেছেন যে, তা কোনো উঁচুস্থানে হওয়া উচিত। কারণ উঁচুস্থানে মধু টাটকা ও স্বচ্ছ বাতাস পায় এবং দূষিত বায়ু থেকে মুক্ত থাকে। এছাড়া ভাঙনের আশঙ্কা থেকেও নিরাপদ থাকে। বলা হয়েছে। مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ অর্থাৎ এসব গৃহ পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং সুউচ্চ দালানকোঠায় নির্মিত হওয়া উচিত, যাতে সুরক্ষিত পদ্ধতিতে মধু তৈরি হতে পারে।

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ এটা দ্বিতীয় নির্দেশ। এতে বলা হয়েছে যে, নিজেদের পছন্দমতো ফল ও ফুল থেকে রস চুষে নাও। مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ দ্বারা বাহ্যত সারা বিশ্বের ফল-ফুল বুঝানো হয়নি; বরং যেসব ফল ও ফুল পর্যন্ত তারা অনায়াসে পৌছাতে পারে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। সাবার রাণীর ঘটনায়ও كُلّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলা বাহুল্য, সেখানেও সারা বিশ্বের বস্তুসামগ্রী বোঝানো হয়নি, যদ্দরুন রাণীর কাছে উড়োজাহাজ, রেল, মোটর ইত্যাদি থাকাও জরুরি হয়ে পড়ে; বরং তখনকার সব জিনিসপত্র বুঝানো হয়েছে। এখানেও مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ বলে তাই বুঝানো হয়েছে। মৌমাছিরা এমন সব সূক্ষ্ম ও মূল্যবান নির্যাস আহরণ করে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মেশিনের সাহায্যেও এরূপ নির্যাস বের করা সম্ভবপর নয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً : এটা মৌমাছিকে প্রদত্ত তৃতীয় নির্দেশ। অর্থাৎ স্বীয় পালনকর্তার প্রস্তুতকৃত পথে চলমান হও। মৌমাছিরা যখন রস চুষে নেওয়ার জন্য গৃহ থেকে দূরদূরান্তের কোথাও চলে যায়, তখন বাহ্যত তার গৃহে ফিরে আসা সুকঠিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। সেমতে কয়েক মাইল দূরে গিয়েও কোনোরূপ ভুল না করে নিজ গৃহে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা শূন্যে তার জন্য পথ করে দিয়েছেন। কেননা ভূপৃষ্ঠের আঁকাবাকা পথে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আল্লাহ তা'আলা শূন্যকে এই নগণ্য মাছির জন্য অনুবর্তী করে দিয়েছেন, যাতে সে বিনা বাধায়, অনায়াসে গৃহে আসা-যাওয়া করতে পারে।

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে– يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ অর্থাৎ তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে, তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহর একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়! অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ : মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্যলাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা মাজুন তৈরি করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন! এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল [Alcohol]-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কোনো এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন, অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এলো যে, অসুখে কোনো পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন, صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيكَ অর্থাৎ আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شِفَاءٌ শব্দটি نَكِرَه تَحْتَ الْاِثْبَاتِ এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু شِفَاءٌ শব্দের تَنْوِين যা تَعْظِيم -এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বুঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের কিছুসংখ্যক আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ –[তাফসীরে কুরতুবী]

বান্দার সাথে আল্লাহ তদ্রূপ ব্যবহারই করেন, যেরূপ বান্দা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার কাছেই থাকি [অর্থাৎ ধারণার অনুরূপ করে দেই।]

قَوْلُهُ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তির উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করার পর মানুষকে পুর্নরায় চিন্তাভাবনার আহ্বান জানিয়েছেন যে, তোমরা শক্তির এসব দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখ, আল্লাহ মৃত জমিনকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে জীবিত করে দেন। তিনি ময়লা ও অপবিত্র বস্তুর মাঝখান দিয়ে তোমাদের জন্য পরিষ্কার-

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পরিচ্ছন্ন ও সুপেয় দুধের নালি প্রবাহিত করেন। তিনি আঙ্গুর ও খেজুর বৃক্ষে মিষ্ট ফল সৃষ্টি করেন, যা দ্বারা তোমরা সুস্বাদু শরবত ও মোরব্বা তৈরি কর। তিনি একটি ছোট বিষাক্ত প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের জন্য মুখরোচক খাদ্য ও নিরাময়ের চমৎকার উপাদান সরবরাহ করেন। এরপরও কি তোমরা দেব-দেবীরই আরাধনা করবে? এরপরও কি তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্য স্রষ্টা ও মালিকের পরিবর্তে পাথর ও কাঠের নিষ্প্রাণ মূর্তিদের জন্য নিবেদিত হবে? ভালোভাবে বুঝে নাও, এ বিষয়টিও কি তোমাদের বোধগম্য হতে পারে যে, এগুলো সব কোনো অন্ধ, বধির, চেতনাহীন বস্তুর লীলাখেলা হবে? শিল্প-কারিগরির এই অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন, জ্ঞান ও কৌশলের এই বিস্ময়কর কীর্তি এবং বুদ্ধি-বিবেকের এই চমৎকার ফয়সালা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছে, আমাদের একজন স্রষ্টা অদ্বিতীয় ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা। তিনিই ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য। তিনিই বিপদ বিদূরণকারী এবং শোকর ও হামদ তাঁর জন্যই শোভনীয়।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ الخ : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা পানি, উদ্ভিদ, জন্তু ও মৌমাছির বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে স্বীয় অপার শক্তি এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজির কথা মানুষকে অবহিত করেছেন। এখন আলোচ্য আয়াতে মানুষকে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাকে অস্তিত্বের সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যু প্রেরণ করে এ নিয়ামত খতম করে দেন। কোনো কোনো লোককে মৃত্যুর পূর্বেই বার্ধক্যের এমন স্তরে পৌঁছে দেন যে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাত-পা হীনবল ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং তারা কোনো বিষয় বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও স্মরণ রাখতে পারে না। বিশ্বজোড়া এই পরিবর্তন থেকে বুঝা যায় যে, যিনি স্রষ্টা ও প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারেই যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি সংরক্ষিত।

قَوْلُهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ : এখানে مَنْ يُرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে একপ্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনোরূপ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠাবসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে বয়স বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمُرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ اَنْ ارد الى...... অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ -এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কুরআনও এর প্রতি لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ যে বয়সে হুঁশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ -এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে أَرْذَلَ الْعُمُرِ বলেছেন। হযরত আলী (রা.) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো হয়ে যায়, আর কোনো কিছুর খবর থাকে না। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ : নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্তি-সামর্থ্য যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

٧١. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ج فَمِنْكُمْ غَنِيٌّ وَفَقِيْرٌ وَمَالِكٌ وَمَمْلُوْكٌ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا اَىِ الْمَوَالِىْ بِرَادِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اَىْ بِجَاعِلِىْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْاَمْوَالِ وَغَيْرِهَا شِرْكَةً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَمَالِيْكِهِمْ فَهُمْ اَىِ الْمَمَالِيْكُ وَالْمَوَالِىْ فِيْهِ سَوَاءٌ شُرَكَاءُ الْمَعْنٰى لَيْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ مِنْ مَمَالِيْكِهِمْ فِىْ اَمْوَالِهِمْ فَكَيْفَ يَجْعَلُوْنَ بَعْضَ مَمَالِيْكِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ لَهُ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ يَكْفُرُوْنَ حَيْثُ يَجْعَلُوْنَ لَهُ شُرَكَاءَ.

অনুবাদ :

৭১. আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন সুতরাং তোমাদের মধ্যে রয়েছে ধনী ও নির্ধন, মালিক ও দাস। অনন্তর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। অর্থাৎ মালিক সম্প্রদায় তাদের মালিকানাস্থ ব্যক্তিদের নিজেদের জীবনোপকরণ হতে কিছু দেয় না অর্থাৎ ধনসম্পদ ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিস আমি এদেরকে প্রদান করেছি তাতে এরা নিজেরা ও এদের দাস-দাসীরা সমঅংশী হবে তেমন ভাবে কিছু দেয় না যাতে তারা অর্থাৎ দাস-দাসীও এক সমান শরিক হবো। অর্থাৎ এদের মালিকানাস্থ দাস-দাসীরা এদের শরিক হয় না, সুতরাং এরা আল্লাহর মালিকানাভুক্ত কতক দাস-দাসীকে কেমন করে তাঁর শরিক রূপে নির্ধারণ করে? তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? তাই তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে। يَجْحَدُوْنَ অস্বীকার করে, কুফরি করে।

٧٢. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا فَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ اٰدَمَ وَسَائِرَ النَّاسِ مِنْ نُطَفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً اَوْلَادَ الْاَوْلَادِ وَّرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ ط مِنْ اَنْوَاعِ الثِّمَارِ وَالْحُبُوْبِ وَالْحَيَوَانِ اَفَبِالْبَاطِلِ الصَّنَمِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ بِاِشْرَاكِهِمْ.

৭২. আর আল্লাহ তোমাদের হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। হযরত হাওয়া (আ.)-কে তিনি হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজরাস্থি হতে আর সকল মানুষকে পুরুষ ও নারীর শক্রকীট হতে সৃষ্টি করেন। তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে নানা প্রকার ফল-ফলাদি, শস্য ও জীব-জন্তু দ্বারা সুপবিত্র জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যাতে প্রতিমাতে বিশ্বাস করবে এবং শিরক করত তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? حَفَدَةً অর্থ পৌত্র-পৌত্রী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٣. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهٖ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ بِالْمَطَرِ وَالْاَرْضِ بِالنَّبَاتِ شَيْئًا بَدَلٌ مِنْ رِزْقًا وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ وَهُوَ الْاَصْنَامُ

৭৩. এবং তারা উপাসনা করে আল্লাহ ব্যতীত অপরদের অর্থাৎ প্রতিমাসমূহের যারা আকাশমণ্ডলী হতে বৃষ্টির মাধ্যমে এবং পৃথিবী হতে গাছপালা জন্মাবার মাধ্যমে তাদেরকে জীবনোপকরণ সরবরাহের মালিক নয় এবং তারা সক্ষমও নয়। কোনো কিছুরই তারা শক্তি রাখে না। شَيْئًا -এটা رِزْقًا -এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

٧٤. فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ط لَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَشْبَاهًا تُشْرِكُوْنَهُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنْ لَا مِثْلَ لَهٗ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ

৭৪. সুতরাং আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করোনা। অর্থাৎ আল্লাহর কোনো সদৃশ নির্ধারণ করে তাকে তাঁর সাথে শরিক করো না। আল্লাহ অবশ্য জানেন যে তাঁর কোনো সদৃশ নেই এবং তোমার তা জান না।

٧٥. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ عَبْدًا مَّمْلُوْكًا صِفَةٌ تُمَيِّزُهٗ مِنَ الْحُرِّ فَاِنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ لِعَدَمِ مِلْكِهٖ وَمَنْ نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ اَيْ حُرًّا رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ط اَيْ يَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَالْاَوَّلُ مَثَلُ الْاَصْنَامِ وَالثَّانِيْ مَثَلُهٗ تَعَالٰى هَلْ يَسْتَوٗنَ اَيِ الْعَبِيْدُ الْعَجَزَةُ وَالْحُرُّ الْمُتَصَرِّفُ لَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وحده بل اَكْثَرُهُمْ اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُوْنَ.

৭৫. আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন মালিকানাভুক্ত এক দাসের মালিকানা অধিকার না থাকায় যে কোনো কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক স্বাধীন ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন এবং সে তা হতে গোপন ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে অর্থাৎ যথেচ্ছা তার ব্যবহার করতে পারে। তারা কি অর্থাৎ ক্ষমতাহীন দাস ও স্বাধীকার সম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তি কি একে অপরের সমান? না, সমান নয়। সকল প্রশংসা এক আল্লাহরই প্রাপ্য। তবে তাদের মক্কাবাসীদের অধিকাংশজনই জানে না কি শাস্তির দিকে তারা চলেছে, তাই তারা শিরক করে। এ আয়াতটিতে প্রথমটি [মালিকানাহীন দাস] হলো প্রতিমাসমূহের উদাহরণ, আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ তা'আলার উদাহরণ। عَبْدًا এটা مَثَلًا-এর بَدَل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। مَمْلُوْكًا এটা عَبْدًا-এর বিশেষণ। এটার মাধ্যমে স্বাধীন ব্যক্তি হতে তার পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কেননা عَبْد বা দাস বলতে সকলেই তো আল্লাহর। مَنْ এটা এস্থানে نَكِرَة مَوْصُوْفَة বা বিশেষণযুক্ত অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ।

٧٦. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ وُلِدَ أَخْرَسَ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ وَلَا يُفْهِمُ وَّهُوَ كَلٌّ ثَقِيلٌ عَلٰى مَوْلٰىهُ وَلِيِّ أَمْرِهِ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ يَصْرِفْهُ لَا يَأْتِ مِنْهُ بِخَيْرٍ ط بِنُجْحٍ وَهٰذَا مَثَلُ الْكَافِرِ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ أَيِ الْأَبْكَمُ الْمَذْكُورُ وَمَنْ يَّأْمُرُ بِالْعَدْلِ أَيْ وَمَنْ هُوَ نَاطِقٌ نَافِعٌ لِلنَّاسِ حَيْثُ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَهُوَ الثَّانِي الْمُؤْمِنُ لَا وَقِيْلَ هٰذَا مَثَلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْأَبْكَمُ لِلْأَصْنَامِ وَالَّذِيْ قَبْلَهُ فِي الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ.

৭৬. আল্লাহ আরও উদাহরণ দিচ্ছেন দুই ব্যক্তির তাদের একজন মূক, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না কেননা সে নিজেও বুঝে না এবং তাকে বুঝাতেও পারা যায় না। সে তার অভিভাবকের উপর তার বিষয়াদির তত্ত্বধায়কের উপর ভারস্বরূপ। তাকে যে দিকেই ঘুরানো হোক না কেন তার তরফ হতে ভালো কিছু আসে না সে উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়ে আসে না। এটা হলো কাফেরের উদাহারণ। সে কি অর্থাৎ উল্লিখিত মূক ব্যক্তি কি সমান হবে ঐ কাফের ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ যে সবাক ও মানুষের উপকারকারী। কারণ সে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় ও মানুষকে এটার জন্য উৎসাহিত করে এবং সে আছে সরল পথে? না তার সমান নয়। এই দ্বিতীয়টি হলো মু'মিনের উদারহণ। কেউ কেউ বলেন, এটা হলো আল্লাহর উদাহরণ আর মূক ব্যক্তিটি হলো প্রতিমাসমূহের উদাহরণ। পূর্ববর্তী আয়াত [৭৫ নং] -এ যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে কাফের ও মু'মিনের উদারহণ।

তাহকীক ও তারকীব

قوله بِرَادِّيْ : এখানে بَاء হলো حَرْف جَارّ আর رَادِّيْ আসলে ছিল رَادِّيْنَ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) অর্থ ফিরিয়ে দেয় যে প্রত্যর্পণকারী, দাতা, ইযাফতের কারণে نُوْن টা পড়ে গেছে।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى لَيْسَ لَهُمْ شُرَكَاءُ : এ বাক্যটি جَوَاب نَفْي -এর স্থানে পতিত হয়েছে এবং এটা মুশরিকদের উপর رَدّ হয়েছে। তার স্বীয় দাসদেরকে নিজেদের মালিকানায় সম অধিকারের ভিত্তিতে শরিক করার জন্য তৈরি নয় আর আল্লাহর কতিপয় দাসকে তাঁর উলূহিয়্যাতের মধ্যে শরিক করে।

قَوْلُهُ يَكْفُرُوْنَ : يَجْحَدُوْنَ-এর তাফসীর يَكْفُرُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَجْحَدُوْنَ টা يَكْفُرُوْنَ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে কাজেই তার مُتَعَدِّيْ بِالْبَاء হওয়া বৈধ রয়েছে। অন্যথায় يَجْحَدُوْنَ টা مُتَعَدِّيْ بِنَفْسِهٖ হয়েছে।

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ رِزْقًا : মুফাসসির (র.) যদি شَيْئًا -কে رِزْقًا থেকে بَدَل না বলে مَفْعُوْل بِهٖ বললে বেশি ভালো হতো। চাই মাসদার হোক বা اِسْم مَصْدَر হোক। কেননা بَدَل টা দুটি অর্থ হতে একটি অর্থের জন্য আসে, হয়তো بَيَان -এর জন্য অথবা تَاكِيْد-এর জন্য। এখানে এ উভয়টিই বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ : প্রশ্ন. এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর مَا لَا يَمْلِكُ -এর মধ্যে একবচনের। অথচ উভয় যমীরের مَرْجِع একই। আর তা হলো شُرَكَاءُ

উত্তর. يَمْلِكُ-এর মধ্যে مَا-এর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, আর يَسْتَطِيْعُوْنَ-এর মধ্যে مَا-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য কর হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ الخ : ইতঃপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রতীক এবং মানুষকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে তাওহীদের প্রকৃতিগত প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন এসব প্রমাণ দেখে সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও কোনো সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ইত্যাদি গুণাবলিতে অংশীদার মেনে নিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে তাওহীদের এ বিষয়বস্তুই একটি পারস্পরিক আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্যবশতই মানুষের উপকারার্থে জীবিকার ক্ষেত্রে সব মানুষকে সমান করেননি; বরং একজনকে অপরজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। কাউকে এমন ধনাঢ্য করেছেন যে, সে বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম, চাকর-নওকর ও দাসদাসীর অধিকারী। নিজেও ইচ্ছামতো ব্যয় করে এবং গোলাম ও চাকর-নকররাও তার হাত থেকে রিজিক পায়। অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কাউকে গোলাম ও খাদেম করেছেন। সে অন্যের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, নিজের ব্যয়ও অন্যের হাত থেকে পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কাউকে মধ্যবিত্ত করেছেন। সে অপরের জন্য ব্যয় করার মতো ধনীও নয় এবং নিজ প্রয়োজনের ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মতো নিঃস্বও নয়।

এই প্রাকৃতিক বণ্টনের ফলশ্রুতি সবার চোখের সামনে। যাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে ধনাঢ্য করা হয়েছে, সে কখনো এটা পছন্দ করে না যে, নিজের ধন-সম্পত্তি গোলাম ও খাদেমের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দেবে, যার ফলে তারাও ধনসম্পত্তিতে তার সমান হয়ে যাবে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা দরকার যে, মুশরিকদের স্বীকারোক্তি মতেই যখন প্রতিমা ও অন্যান্য উপাস্য সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার সৃজিত ও মালিকানাধীন, তখন তারা এটা কিরূপে পছন্দ করে যে, এসব সৃষ্ট ও মালিকানাধীন বস্তু স্রষ্টা ও মালিকের সমান হয়ে যাবে? তারা কি এসব নিদর্শন দেখে এবং বিষয়বস্তু শুনেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক ও সমতুল্য সাব্যস্ত করে? এরূপ করার অনিবার্য পরিণতি এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি অস্বীকার করে। কেননা তারা যদি স্বীকার করত যে, এসব নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দান, স্বকল্পিত প্রতিমা অথবা কোনো মানুষ ও জিনের কোনো হাত নেই, তবে এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কিরূপে সাব্যস্ত করত?

এসব বিষয়বস্তুই সূরা রূমের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে- ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْمَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকেই একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, যারা তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম, তারা কি আমার দেওয়া রিজিকে তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা তাতে তাদের সমান হয়ে যাও? এ আয়াতের সারকথাও তাই যে, তোমরা স্বীয় মালিকানাধীন গোলাম ও খাদেমদেরকে নিজেদের সমতুল্য করা পছন্দ কর না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার জন্য কিরূপে পছন্দ কর যে, তাঁর সৃজিত ও মালিকানাধীন বস্তুসমূহ তাঁর সমান হয়ে যাবে।

জীবিকায় শ্রেণি-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ : আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দরিদ্র হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহর অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধনদৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোনো যুগে ও কোনো সময়ে সব মানুষ ধনসম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোরজবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্যমান রয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে ধনসম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণি থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কুরআনের বিধান : তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিজিক ও ধনসম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণির

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কুরআন পাক সূরা হাশরে বলেন- كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ আমি সম্পদ বণ্টনের আইন এজন্য তৈরি করেছি, যাতে ধনসম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

আজকাল বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে হাহাকারপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, তা এই আল্লাহর আইন উপেক্ষা করারই ফলশ্রুতি। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে সুদ ও জুয়ার সাথে ধনসম্পদের কেন্দ্রসমূহের উপর কতিপয় ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অবশিষ্ট জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করে। তাদের জন্য নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য দাসত্ব ও মজুরি ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকে না। তারা যোগ্যতা সত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পা রাখতে পারে না।

পুঁজিপতিদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসেবে একটি পরস্পর বিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শ্লোগান হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মেটানো এবং সর্বস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। পুঁজিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এ শ্লোগানের পেছনে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, এ শ্লোগানটি নিছক একটি প্রতারণা। অর্থনৈতিক সাম্যের স্বপ্ন কোনোদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। দরিদ্র নিজ দারিদ্র্য অনাহার ও উপবাস সত্ত্বেও একটি মানবিক সম্মানের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার মালিক ছিল। কম্যুনিজমে এ মানবিক সম্মানও হাতছাড়া হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় মেশিনের কলকজার চাইতে অধিক মানুষের কোনো মূল্য নেই। এতে কোনো সম্পত্তির মালিকানা কল্পনাও করা যায় না। একজন শ্রমিকের অবস্থা এই যে, সে কোনো কিছুর মালিক নয়। তার সন্তান ও স্ত্রীও তার নিজের নয়; বরং সবই রাষ্ট্ররূপী মেশিনের কলকজার। মেশিন চালু হওয়ার সাথে সাথে এদের কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কল্পিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার না আছে কোনো বিবেক আর না আছে কোনো বাকস্বাধীনতা। রাষ্ট্রযন্ত্রের জোর-জুলুম ও অসহনীয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে উহঃ আহঃ করাও প্রাণদণ্ডযোগ্য বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ও ধর্মের বিরোধিতা এবং খাঁটি জড়বাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিস্তম্ভ।

কোনো সমাজতন্ত্রী এসব সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের কর্ণধারদের গ্রন্থাবলি এবং আমলনামা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাদের এসব বরাত একত্রিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে।

কুরআন পাক উৎপীড়নমূলক পুঁজিবাদ এবং নির্বোধসুলভ সমাজতন্ত্রের মাঝা-মাঝি, স্বল্পতা ও বহুল্য বিবর্জিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এতে রিজিক ও অর্থসম্পদের প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে গোলামে পরিণত করতে পারে না এবং কৃত্রিম দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করতে পারে না। সুদ ও জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করে অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তি ভূমিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানের ধনসম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্য নির্ধারিত করে তাদেরকে তাতে অংশীদার করা হয়েছে। এটা দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং কর্তব্য সম্পাদন মাত্র। وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ আয়াতটি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি পরিবারের লোকজনের মাঝে বণ্টন করে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও বন-জঙ্গলের নিজে নিজে গজিয়ে উঠা সম্পদকে সমগ্র জাতির যৌথ সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোতে কোনো ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর মালিকসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বৈধ নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসব বস্তুর উপর পুঁজিপতিদের মালিকানা স্বীকার করা হয়।

জ্ঞানগত ও কর্মগত যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং জীবিকা উপার্জন এসব যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। তাই ধনসম্পদের মালিকানার বিভিন্নতাও যথার্থ তাৎপর্যের তাগাদা। সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা অস্বীকার করতে পারে না। সাম্যের ধ্বজাধারীরাও কয়েক পা এগুতে না এগুতেই সাম্যের দাবি পরিত্যাগ করতে এবং জীবিকায় তারতম্য ও পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৬০ সনের ৫ই মে তারিখে সুপ্রীম সোভিয়েটের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

"আমরা মজুরির পার্থক্য বিলুপ্ত করার আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। আমরা মজুরির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সবার মজুরি এক পর্যায়ে আনার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। এটা লেনিনের শিক্ষা। তার শিক্ষা ছিল এই যে, সমাজে সমাজবাদী বৈষয়িক কারণাদির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে।" –[সোভিয়েট ওয়ার্ল্ড, ৩৪৬ পৃ.]

অর্থনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন যে অসাম্যের মাধ্যমে হয়েছিল, তা প্রথম থেকেই সবার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এ অসাম্য এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াতে সাধারণ পুঁজিবাদী দেশের চাইতেও অধিক প্রকট হয়ে পড়ে। লিউন শিডো লিখেন–

"এমন কোনো উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশ থাকলে থাকতেও পারে, যেখানে রাশিয়ার ন্যায় মজুরিতে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।" উল্লিখিত কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ অবিশ্বাসীদের মুখে وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ আয়াতের সত্যায়ন তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়ে দিয়েছে। وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধনসম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। অতঃপর সম্পদ বণ্টনে ইসলামি মূলনীতি এবং পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে তার পার্থক্য ইনশাআল্লাহ সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا : আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালোবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً : অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য এই যে, সন্তানসন্ততি পিতামাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। পিতা থেকে শুধু নিষ্প্রাণ একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এজন্যই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতামাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ : বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর সদৃশরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহদের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোনো রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে পারে না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর কাজে তাঁকে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল কেটে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

শেষের দু আয়াতে মানুষের দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রভু ও গোলাম অর্থাৎ মালিক ও মালিকানাধীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই যখন একই জাতি ও একই শ্রেণিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান হতে পারে না, তখন কোনো সৃষ্টজীবকে আল্লাহর সমান কিরূপে সাব্যস্ত কর?

দ্বিতীয় উদাহরণে একদিকে এমন লোক রয়েছে, যে লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও ভালো কথা শিক্ষা দেয়। এটা তার জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে চলে। এটা তার কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন কর্মগত ও জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার অধিকারী ব্যক্তির বিপরীতে এমন একজন লোক রয়েছে, যে নিজের কাজ করতে সক্ষম নয় এবং অন্যের কাজও ঠিকমতো করতে পারে না। এই উভয় প্রকার মানুষ একই জাতি, একই শ্রেণি এবং একই সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সমান হতে পারে না। অতএব সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা ও প্রভু যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তাঁর সাথে কোনো সৃষ্টবস্তু কিরূপে সমান হতে পারে।

Free @ www.eelm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧٧. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَىْ عِلْمِ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ مِنْهُ لِاَنَّهُ بِلَفْظِ كُنْ فَيَكُوْنُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৭৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়সমূহ অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে যা অদৃশ্য সেই সব কিছুর জ্ঞান আল্লাহরই। কিয়ামতের বিষয়টি তো চক্ষুর পলকের মতো বা তা অপেক্ষাও নিকটতর কেননা তা 'কুন' শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথেই সংঘটিত হবে। আল্লাহ অবশ্যই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧٨. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا اَلْجُمْلَةُ حَالٌ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ الْقُلُوْبَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণেন্দ্রীয় ও হৃদয়, যাতে তোমরা এগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আনয়ন কর। .... لَا تَعْلَمُوْنَ এটা حَالٌ - اَلسَّمْعَ এটা এই স্থানে বহুবচন اَسْمَاء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلْاَفْئِدَةَ অর্থ– হৃদয়সমূহ।

٧٩. اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ مُذَلَّلَاتٍ لِلطَّيَرَانِ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ اَىِ الْهَوَاءِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ مَا يُمْسِكُهُنَّ عِنْدَ قَبْضِ اَجْنِحَتِهِنَّ وَبَسْطِهَا اَنْ يَّقَعْنَ اِلَّا اللّٰهُ بِقُدْرَتِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ هِىَ خَلْقُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُهَا الطَّيَرَانَ وَخَلَقَ الْجَوَّ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الطَّيَرَانُ فِيْهِ وَاِمْسَاكُهَا ـ

৭৯. আকাশের শূন্য গর্ভে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বায়ুমণ্ডলে নির্দেশাবদ্ধ উড্ডয়নের জন্য বাধ্যগত পক্ষীকূলকে কি তারা লক্ষ্য করে না? আল্লাহই অর্থাৎ তাঁর কুদরতেই তিনি তাদেরকে ডানা সংকোচন ও বিস্তারের সময় পতন হতে স্থির রাখেন। অবশ্যই এতে অর্থাৎ উড্ডয়নের সামর্থ্য দিয়ে এদেরকে সৃষ্টি করা এবং উড্ডয়ন ও স্থির থাকার উপযোগী করে বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

٨٠. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا مَوْضِعًا تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا كَالْخِيَامِ وَالْقِبَابِ تَسْتَخِفُّوْنَهَا لِلْحَمْلِ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ سَفَرِكُمْ ـ

৮০. এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদেরকে পশু-চর্মের ঘরেরও যেমন বড় ছোট তাঁবু ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করেছেন। তোমরা তোমাদের ভ্রমণকালে বহনের জন্য এবং অবস্থানকালেও তা খুবই হালকাবোধ কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا اَيِ الْغَنَمِ وَاَوْبَارِهَا اَيِ الْاِبِلِ وَاَشْعَارِهَآ اَيِ الْمَعْزِ اَثَاثًا مَتَاعًا لِبُيُوْتِكُمْ كَبُسْطٍ وَاَكْسِيَةٍ وَّمَتَاعًا تَتَمَتَّعُوْنَ بِهِ اِلٰى حِيْنٍ تُبْلٰى فِيْهِ.

তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদেরকে যেমন মেষের পশম উষ্ট্রের লোম ও ছাগলের কেশ হতে গৃহ-সামগ্রী। যেমন বিছানা, বস্ত্র ইত্যাদি ও নির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ্য সামগ্রীর। যা তোমরা পুরাতন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ভোগ কর। سَكَنًا অর্থ– আবাসস্থল। ظَعْنِكُمْ অর্থ– তোমাদের যাত্রাকালে। اَثَاثًا অর্থ– গৃহ-সামগ্রী।

٨١. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ مِنَ الْبُيُوْتِ وَالشَّجَرِ وَالْغَمَامِ ظِلٰلًا جَمْعُ ظِلٍّ تَقِيْكُمْ حَرَّ الشَّمْسِ وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا جَمْعُ كِنٍّ وَهُوَ مَا يَسْتَكِنُّ فِيْهِ كَالْغَارِ وَالسِّرْدَابِ وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ قُمُصًا تَقِيْكُمُ الْحَرَّ اَيْ وَالْبَرْدَ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ط حَرْبَكُمْ اَيِ الطَّعْنَ وَالضَّرْبَ فِيْهَا كَالدُّرُوْعِ وَالْجَوَاشِنِ كَذٰلِكَ كَمَا خَلَقَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ فِى الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ بِخَلْقِ مَا تَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ تُسْلِمُوْنَ تُوَحِّدُوْنَهُ.

৮১. এবং আল্লাহ গৃহাদি, বৃক্ষ ও মেঘ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন। যাতে তোমরা সূর্য-তাপ হতে আত্মরক্ষা করতে পার এবং পাহাড়ে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করেছেন। আরও ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের জামা ইত্যাদি তা তোমাদেরকে তাপ ও শীত হতে রক্ষা করে এবং এমন বস্ত্রের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে খোঁচার আঘাত হতে রক্ষা করে যেমন লৌহবর্ম ইত্যাদি। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তিনি তোমাদের জন্য এ সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সৃষ্টি করত দুনিয়ায় তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা হে মক্কাবাসীরা আত্মসমর্পণ কর, তাওহীদ অবলম্বন কর। ظِلٰلًا এটা ظِلٌّ -এর বহুবচন; ছায়া। اَكْنَانًا এটা كِنٌّ -এর বহুবচন। অর্থাৎ যাতে একজন আত্মগোপন করে। بَاْسَكُمْ অর্থ– তোমাদের যুদ্ধে।

٨٢. فَاِنْ تَوَلَّوْا اَعْرَضُوْا عَنِ الْاِسْلَامِ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ الْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ.

৮২. অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ইসলাম উপেক্ষা করে তবে হে মুহাম্মদ, তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ সংবলিত আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল। اَلْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ স্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

٨٣. يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ اَيْ يُقِرُّوْنَ بِاَنَّهَا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا بِاِشْرَاكِهِمْ وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

৮৩. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে। অর্থাৎ তারা জ্ঞানত স্বীকার করে যে তা আল্লাহর পক্ষ হতে কিন্তু শিরক করত মূলত আবার এগুলো অস্বীকার করে এবং তারা অধিকাংশই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عِلْمِ مَا غَابَ : مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ

قَوْلُهُ كَلَمْحِ الْبَصَرِ : অর্থাৎ كَرَجْعِ الطَّرْفِ مِنْ اَعْلَى الْحَدِيْقَةِ اِلٰى اَسْفَلِهَا

قَوْلُهُ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ : اَوْ لِلتَّخْيِيْرِ اَوْ بِمَعْنٰى هَلْ

قَوْلُهُ اَلْجُمْلَةُ حَالٌ : এখানে لَا تَعْلَمُوْنَ টা বাক্য হয়ে كُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর شَيْئًا হলো مَفْعُوْل بِهٖ

قَوْلُهُ جَعَلَ لَكُمْ : এর আতফ হলো اَخْرَجَكُمْ -এর উপর। তার ফায়েল তাতে উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بَسْطٌ : অর্থ– বিছানা, ফরাশ। একবচনে بِسَاطٌ

قَوْلُهُ اَكْسِيَةٌ : বহুবচন; একবচনে كِسَاءٌ অর্থ– চাদর।

قَوْلُهُ ظَعْنِكُمْ : ظَعْنٌ অর্থ– সফর, যাত্রা, স্থানান্তর। বাবে فَتَحَ থেকে মাসদার ظَعْنًا অর্থ– স্থানান্তর করা, সফর করা।

قَوْلُهُ قِبَابٌ : এটা قُبَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– গম্বুজ, মিনার।

قَوْلُهُ سَرَابِيْلَ : জামা, কোর্তা। এটা سِرْبَالٌ -এর বহুবচন। مَجَازٌ হিসেবে মুতলাক পোশাক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ جَوَاشَنَ : এটা جَوْشَنٌ -এর বহুবচন। অর্থ– লৌহবর্ম, যুদ্ধের পোশাক বিশেষ, বর্ম, সাঁজোয়া, যুদ্ধের পোশাক লৌহ নির্মিত হোক বা অন্য কিছুর। অথবা এখানে শিরস্ত্রাণ উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোনো জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও ওস্তাদের কোনো ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পেলে সে কান্না জুড়ে দেয়, শীত-উত্তাপ লাগলে কান্না জুড়ে দেয়। অনুরূপ অন্য যে কোনো কষ্ট অনুভব করলেই কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তাঁরা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতেই সচেষ্ট হয়ে যায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হতো, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোনো অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা স্বভাবত ও সরাসরি না হলে কোন ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া! এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই আপনা-আপনি শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোনো কোনো বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয়ে নিয়ে চিন্তা করার ও বুঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا -এর পরে বলা হয়েছে وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ অর্থা ৎ জন্মের শুরুতে যদিও কোনো কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سَمْعٌ অর্থাৎ শ্রবণ-শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনাভাগে চক্ষু বন্ধ থাকে, কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞান সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা আসে, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্জন করে। কুরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজ মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায়ে اَفْئِدَةً বলা হয়েছে। এটা فُؤَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কুরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোনো কিছু বুঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তিও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন। বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবত তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোনো শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا : এখানে بُيُوْتٌ শব্দটি بَيْتٌ-এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بَيْت বলা হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরে বলেন- كُلُّ مَا عَلَاكَ فَاَظَلَّكَ فَهُوَ سَقْفٌ وَسَمَاءٌ، وَكُلُّ مَا اَقَلَّكَ فَهُوَ اَرْضٌ وَكُلُّ مَا سَتَرَكَ مِنْ جِهَاتِكَ الْاَرْبَعِ فَهُوَ جِدَارٌ فَاِذَا انْتَظَمَتْ وَاتَّصَلَتْ فَهُوَ بَيْتٌ অর্থাৎ "যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করেছে তা জমিন এবং যে বস্তু চতুর্দিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بَيْت তথা গৃহে পরিণত হয়।"

গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তি : আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানবগৃহকে শান্তির জায়গা বলে অভিহিত করে গৃহ নির্মাণের দর্শন ও রহস্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ও অন্তরের শান্তি। মানুষ অভ্যাসগতভাবে গৃহের বাইরে পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন ও কাজকর্ম করে। তখন পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে পৌছে বিশ্রাম ও শান্তি অর্জন করাই গৃহের আসল উদ্দেশ্য। যদিও মাঝে মাঝে মানুষ গৃহেও কাজকর্মে মশগুল থাকে, কিন্তু এটা সাধারণত খুব কমই হয়।

এ ছাড়া আসল শান্তি হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের শান্তি। এটা মানুষ গৃহের মধ্যেই পায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, গৃহের প্রধান গুণ হচ্ছে তাতে শান্তি পাওয়া। বর্তমান বিশ্বের গৃহনির্মাণ কাজ চরম উন্নতির পথে রয়েছে। এতে বাহ্যিক সাজসজ্জার জন্য বেহিসাব খরচও করা হয়, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি পাওয়া যায়, এরূপ গৃহের সংখ্যা খুবই কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং কৃত্রিম লৌকিকতাই আরাম ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত হানে। এটা না হলে গৃহে যাদের সাথে উঠাবসা করতে হয়, তারা শান্তি বরবাদ করে দেয়। এহেন সুরম্য অট্টালিকার চাইতে এমন কুড়ে ঘরও উত্তম, যার বাসিন্দারা দেহ ও মনের শান্তি পায়। কুরআন পাক প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ ও মূল বর্ণনা করে। শান্তিকে মানব গৃহের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্যে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে কুরআন দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যও শান্তি সাব্যস্ত করে বলেছে, لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا অর্থাৎ "তোমরা যেন তার নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার।" যে দাম্পত্য জীবন থেকে এ লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তা প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। সাম্প্রতিক বিশ্বে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা ও অনানুষ্ঠানিক লৌকিকতা এবং বাহ্যিক সাজসজ্জার অন্ত নেই এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এসব বিষয়ে বাহ্যিক সাজসজ্জার যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিয়েছে, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নিয়েছে।

مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ এবং مِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا থেকে প্রমাণিত হলো যে, জীবজন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি জবাইকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোনো শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশ্‌ত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোনো শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোনো প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েজ হয়ে যায়। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

قَوْلُهُ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ : এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের জামার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে; অথচ জামা মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী (র.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কুরআন পাক আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, কুরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨٤. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا
هُوَ نَبِيُّهَا يَشْهَدُ لَهَا وَعَلَيْهَا وَهُوَ يَوْمُ
الْقِيٰمَةِ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي
الْاِعْتِذَارِ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ لَا تُطْلَبُ مِنْهُمُ
الْعُتْبٰى اَيِ الرُّجُوْعُ اِلٰى مَا يَرْضَى اللّٰهُ ـ

৮৪. এবং স্মরণ কর যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নবী তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। আর এ ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের দিন। সেদিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীকে অজুহাত পেশ করারও অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে ফিরার সুযোগও দেওয়া হবে না অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসারও ব্যবস্থা হবে না।

٨٥. وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا كَفَرُوا الْعَذَابَ
النَّارَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ
يُمْهَلُوْنَ عَنْهُ اِذَا رَاَوْهُ ـ

৮৫. যখন সীমালঙ্ঘনকারীগণ কাফেরগণ শাস্তি জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে তাদের হতে তা লঘুও করা হবে না এবং তাদেরকে কোনো বিরামও দেওয়া হবে না। তা প্রত্যক্ষ করার পর তাদেরকে কোনোরূপ অবকাশও প্রদান করা হবে না।

٨٦. وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَاۤءَهُمْ مِنَ
الشَّيٰطِيْنِ وَغَيْرِهَا قَالُوْا رَبَّنَا هٰۤؤُلَاۤءِ
شُرَكَاۤؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا نَعْبُدُهُمْ مِنْ
دُوْنِكَ ج فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اَيْ قَالُوْا لَهُمْ
اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِيْ قَوْلِكُمْ اِنَّكُمْ
عَبَدْتُمُوْنَا كَمَا فِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى مَا كَانُوْا
اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ ـ

৮৬. অংশীবাদীগণ শয়তান ইত্যাদি যাদেরকে তারা আল্লাহর শরিক করেছিল তাদেরকে যখন দেখবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই তারা যাদেরকে আমরা তোমার শরিক করেছিলাম এবং তোমার পরিবর্তে আহবান করতাম অর্থাৎ উপাসনা করতাম। এ বক্তব্য তাদের প্রতিই তারা ছুড়ে দেবে অর্থাৎ প্রত্যুত্তরে তাদেরকে তারা যাদেরকে শরিক করা হয়েছিল তারা বলবে অবশ্যই তোমরা আমাদেরকে উপাসনা করতে বলে যে বক্তব্য প্রকাশ করেছে তাতে মিথ্যাবাদী। অপর একটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তারা বলবে– مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ 'তারা আমাদের উপাসনা করত না।' [সূরা কাসাস : ৬৩] অর্থাৎ তারা তাদেরকে উপাসনা করার কথা অস্বীকার করবে।

٨٧. وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ اَيْ
اسْتَسْلَمُوا الْحِكْمَةَ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ مِنْ اَنَّ اٰلِهَتَهُمْ تَشْفَعُ لَهُمْ ـ

৮৭. সেদিন তারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে অর্থাৎ তাঁর হুকুমের তাবেদার হবে এবং তারা যে মিথ্যা-উদ্ভাবন করত যে, তাদের দেবতারা তাদের জন্য সুপারিশ করবে তা তাদের হতে হারিয়ে যাবে। গায়েব হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৮৮. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا النَّاسَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دِيْنِهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ الَّذِىْ اسْتَحَقُّوْهُ بِكُفْرِهِمْ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَقَارِبُ اَنْيَابُهَا كَالنَّخْلِ الطِّوَالِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ بِصَدِّهِمِ النَّاسَ عَنِ الْاِيْمَانِ ـ

৮৮. যারা সত্য-প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে তাঁর দীন হতে বাধা প্রদান করে কুফরির দরুন তারা যে শাস্তির অধিকারী হয়েছিল সেই শাস্তির উপর তাদেরকে আমি আরও শাস্তি বৃদ্ধি করব। কারণ তারা ঈমান হতে মানুষকে বাঁধা প্রদান করে অশান্তি সৃষ্টি করত। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেছেন যে, এদের শাস্তির জন্য এমন এমন বৃশ্চিক হবে যেগুলোর দাঁত হবে সুদীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষের ন্যায়।

৮৯. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ هُوَ نَبِيُّهُمْ وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدُ شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَاءِ اَىْ قَوْمِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الْقُرْاٰنَ تِبْيَانًا بَيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ اِلَيْهِ مِنْ اَمْرِ الشَّرِيْعَةِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى بِالْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ الْمُوَحِّدِيْنَ ـ

৮৯. আর স্মরণ কর সেই দিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদের মধ্য হতে এক একজন সাক্ষী। তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-ই হবেন এই সাক্ষী [এবং] হে মুহাম্মদ! তোমাকে আমি এদের বিষয় অর্থাৎ তোমার সম্প্রদায়ের বিষয়ে আনব সাক্ষীরূপে। আমি তোমার নিকট কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য শরিয়ত সম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন সেই সমস্ত প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়ে বিভ্রান্তি হতে পথ-নির্দেশ, রহমত ও জান্নাতের সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারী সম্প্রদায়ের জন্য। তাওহীদ অবলম্বী সম্প্রদায়ের জন্য। تِبْيَانًا অর্থাৎ সুস্পষ্ট বিবরণস্বরূপ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُسْتَعْتَبُوْنَ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর اِسْتِعْتَابٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর جَمع مُذَكَّرغَائِبٌ -এর সীগাহ, অর্থ– আনন্দ অর্জন করার জন্য বলা, সন্তুষ্টি অর্জন করার ইচ্ছা করা। কতিপয় মুফাসসির لَا يُسْتَعْتَبُوْنَ -এর অনুবাদ করেছেন, তাদের ওজর কবুল করা হবে না, আল্লামা মহল্লী (র.) এই শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ اَنْ يُرْضُوْنَ رَبَّهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالطَّاعَةِ لِاَنَّهَا لَا تَنْفَعُ يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ তাদের থেকে এ কথা প্রার্থনা হবে না যে, তওবা ও আনুগত্যের মাধ্যমে স্বীয় প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন করে নাও। কেননা সেদিন এ সকল বস্তু কোনোই কাজে আসবে না।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : এটা হলো মুবতাদা আর زِدْنَاهُمْ হলো তার খবর। আবার এটাও হতে পারে যে, اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ হলো يَفْتَرُوْنَ -এর ফায়েল এবং زِدْنَاهُمْ হলো جُمْلَه مُسْتَانِفَه -

قَوْلُهُ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ : এখানে بَا. টি হলো سَبَبِيَّه আর مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থা– بِسَبَبِ كَوْنِهِمْ مُفْسِدِيْنَ

قَوْلُهُ اَىْ قَوْمِكَ : এটা একটা তাফসীর অর্থাৎ প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মত সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন এবং রাসূল ﷺ ও স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। বায়যাবী এরূপই বলেছেন আবার কতিপয় মুফাসসির বলেন যে, هٰؤُلَاءِ দ্বারা নবীগণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নবীগণের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। কেননা প্রত্যেক নবীর স্বীয় উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া

যাতে রাসূল ﷺ ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন يَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ থেকে বুঝা যায়, এটাকে রাসূল ﷺ -এর ব্যাপারে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করাটা অহেতুক تَكْرَارْ হয়েছে। কাজেই شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَاءِ দ্বারা شَهَادَةً عَلٰى الْأَنْبِيَاءِ -ই উদ্দেশ্য হবে। আর আবূ সঊদের ইবারত হলো এই- عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْأُمَمِ وَشُهَدَائِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এরপর একথাও ইরশাদ হয়েছে যে, অনেক লোক আল্লাহ পাকের নিয়ামত দেখেও তা অস্বীকার করে। আর এ আয়াতে কিয়ামতের কঠিন দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, সেই কাফেরদের সম্পর্কে যারা বুঝেশুনেও আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করেছে, তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা আলোচ্য আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে। -[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ২৪০]

ইমাম রাজী (র.) এ সম্পর্কে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর নিয়ামতের পরিচয় পাওয়ার পরও তা অস্বীকার করেছে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তাদের অধিকাংশই হলো কাফের। আর আলোচ্য আয়াতে ঐ দুরাত্মা কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। -[তাফসীরে কবীর, খ. ২০, পৃ. ৯৫]

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের যে দুর্গতি হবে, আলোচ্য আয়াতে তারই উল্লেখ রয়েছে।

এ আয়াতে شَهِيْد শব্দ দ্বারা পয়গম্বরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি তাঁর উম্মতের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন যে তিনি তাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর কাফেরদেরকে তাদের পক্ষে কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না অথবা এর অর্থ হলো তাদেরকে সেদিন কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ভয়াবহ আজাব প্রত্যক্ষ করার পর তারা দুনিয়াতে ফিরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। কিন্তু তাদেরকে সে অনুমতিও দেওয়া হবে না।

বস্তুত কিয়ামতের দিন সমাগত, স্থির-নিশ্চিত। যেদিন প্রত্যেককে তার সারা জীবনের হিসাবপত্র পেশ করার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে। প্রত্যেক উম্মতের পয়গম্বর সেই উম্মতের সাক্ষী হিসেবে পেশ হবেন এবং নিজের উম্মতের নেককার, বদকার, অসৎ এবং পাপী লোকদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। -[তাফসীরে মাযহারী. খ. -৬, পৃ,. -৪২২-২৩]

আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের সঙ্গে তাঁদের উম্মত বা জাতি কি ব্যবহার করেছে তার বিবরণ পেশ করবেন, সে মুহূর্তে এত ভয়াবহ হবে যে মুশরিক তথা পৌত্তলিক এবং নাস্তিকরা তাদের প্রকৃত রূপ এবং ভয়াবহ পরিণাম দেখে এমন অসহায় হয়ে পড়বে যে কোনো কথা বলার অবস্থায় তারা থাকবে না, তারা এত অপমাণিত এবং লাঞ্ছিত হবে যে, কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করার কোনো সুযোগই তারা পাবে না। এমনকি ঈমান আনার এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করারও কোনো সুযোগ থাকবে না। তারা সেদিন এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবী ছিল কর্মস্থল আর আখেরাত হলো কর্মফল লাভের স্থান। অতএব, কথা বলার চেষ্টা হবে বৃথা। আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের উম্মত সম্পর্কে যে স্বাক্ষ্য প্রদান করবেন, সে অনুযায়ীই ফয়সালা হবে। যারা শিরক কুফর এবং নাফরমানীর মাধ্যমে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, সাক্ষীগণের সাক্ষ্য প্রদানের পর তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا : ইমাম রাজী (র.) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে- ১. কাফেরদেরকে কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। ২. তাদেরকে অধিক কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে না। ৩. তাদেরকে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। ৪. সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের সময় কাউকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে না, সকলে তখন থাকবে নীরব।

قَوْلُهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ : অর্থাৎ তাদেরকে একথাও বলা হবে না যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে রাজী করে নাও তথা তওবার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ কর। এক কথায় কাফেররা সেদিন কোনোভাবেই আল্লাহ পাককে রাজী করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَإِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ : জালেমরা যখন আল্লাহর আজাব দেখতে পাবে তখন তাদের প্রতি আজাব লঘু হবে না এবং তারা অবকাশও পাবে না। তারা আজাব থেকে কোনো অবস্থাতেই রেহাই পাবে না, এমনকি তাদের প্রতি আজাব কিছুমাত্র লঘুও করা হবে না এবং মুহূর্তের জন্যেও তাদের প্রতি আজাবে বিরতি হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদেরকে জালেম বলা হয়েছে। কেননা, কাফেররা কুফরি এবং নাফরমানির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে। আর যখন তারা আজাবের সম্মুখীন হবে, তখন যত কান্নাকাটিই তারা করুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই আজাব থেকে তারা রেহাই পাবে না এবং তাদের প্রতি আজাবকে লঘু করা হবে না এবং আজাব প্রদানে বিরতি করে ক্ষণিকের জন্যেও তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ প্রসঙ্গে আজাবের কিছু বিবরণ পেশ করেছেন। কাফেরদেরকে সেদিন হঠাৎ পাকড়াও করা হবে। দোজখ তাদের সম্মুখে বর্তমান থাকবে, যার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। তখন দোজখ থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যার বিভৎস আকৃতি দেখে কেয়ামতের ময়দানের লোকেরা নতজানু হয়ে পড়বে। তখন দোজখ তাদের নিজের ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, আমি সেই জেদী, বিদ্রোহী ব্যক্তির জন্য নিযুক্ত আছি যে আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করেছে এবং এ অন্যায় কাজ করেছে।

এরপর কয়েক প্রকার পাপিষ্ঠ লোকদের নাম উল্লেখ করবে। যেভাবে পাখি একটি খাদ্য-দানাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, ঠিক এমনিভাবে কাফের মুশরেক এবং পাপিষ্ঠ লোকদেরকে দোজখ ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। তারা মহা বিপদ ও চরম শাস্তির কারণে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, কিন্তু মৃত্যু আর হবে না। মৃত্যুর মাধ্যমে আত্মরক্ষার কোনো পথ হবে না। তখন তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না এবং আজাব থেকে রেহাই পাবার কোনো ব্যবস্থাও হবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, পারা ১৪ পৃ. ৫০]

قَوْلُهُ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ شُرَكَاءَهُمْ : আর মুশরিকরা যখন তাদের শরিকদেরকে [উপাস্য] দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদের সেসব শরিক, আমরা তোমার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকতাম, আজীবন আমরা তাদেরই পূজা অর্চনা করেছি, তাদের নামেই নজর-নিয়াজ মেনেছি। কাফেররা তাদের উপাস্যদেরকে দেখিয়ে বলবে যে, এরা হলো আমাদের ধ্বংসের মূল কারণ। অতএব, এদের দ্বিগুণ শাস্তি হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ : উপাস্যরা তখন তাদের পূজারীদের উপর কথা ফেলে বলবে, নিশ্চয়ই তোমরাই মিথ্যাবাদী। আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক তখন মূর্তিগুলোকে বাকশক্তি দান করবেন, তখন মূর্তিগুলো তাদের পূজারীদের সম্বোধন করে বলবে, তোমরা তোমাদের দাবিতে মিথ্যাবাদী। তোমরা মূলত আমাদের পূজা করতে না; বরং নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়ানার পূজা করতে। আমরা কখন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা আমাদের পূজা কর, আল্লাহর সাথে শরিক কর, তখন তোমাদের যা ইচ্ছা করেছ আর এখন তোমাদের পাপের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাও। অথবা এর অর্থ হলো, তোমরা তোমাদের এ দাবিতে মিথ্যাবাদী যে আমরা তোমাদেরকে মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করেছি এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে শিরক করতে বাধ্য করেছি। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেররা হয়তো এ আশায় তাদের দেব-দেবীর উল্লেখ করবে যে, এ সুযোগে তাদের আজাব কিছু লঘু হবে, অথবা আজাব পূজারী এবং পূজনীয়ের মাঝে ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু এ পন্থা তাদের জন্য কার্যকর হবে না। তাদের কথার প্রতিবাদ করা হবে সঙ্গে সঙ্গে। তখন কাফেররা আরও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। এরপর আর কোনো উপায় না দেখে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আত্মসমর্পণ করবে। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ن السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ সেদিন তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত হয়ে হাজির হবে এবং নিজেদের যাবতীয় মিথ্যা রচনা ভুলে যাবে। দুরাত্মা কাফের মুশরিকরা সেদিন সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে। যারা দুনিয়াতে অহংকার করত, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে অমান্য করত তারা মনে করত তাদের দেব-দেবীরা আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করবে। কিন্তু যখন দেখবে এ ·াবই ছিল মিথ্যা ধোঁকা, প্রতারণা তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তারা পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তা তা তাদের কোনো কাজে আসবে না। তাদের অপরাধ জঘন্য, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত।

قوله ونزلنا عليك القران تبيانا لكل شئ : এতে কুরআনকে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী বলা হয়েছে। 'প্রত্যেক বস্তু' বলে প্রধানত দীনের যাবতীয় বিষয় বুঝনো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য বিজ্ঞান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরি সমাধান কুরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যেসব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কুরআন পাকে অনেক দীনি খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কুরআনকে تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ বলা যথার্থ হবে কিরূপে?

উত্তর এই যে, কুরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। যেসব মূলনীতির আলোকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কুরআনেরই বর্ণিত মাসআলা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৯০. اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ التَّوْحِيْدِ اَوِ الْاِنْصَافِ وَالْاِحْسَانِ اَدَاءِ الْفَرَائِضِ اَوْ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ كَمَا فِى الْحَدِيْثِ وَاِيْتَآئِ اِعْطَاءِ ذِى الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ اِهْتِمَامًا بِهٖ وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ الزِّنَا وَالْمُنْكَرِ شَرْعًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ وَالْبَغْيِ ج الظُّلْمِ لِلنَّاسِ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ اِهْتِمَامًا كَمَا بَدَأَ بِالْفَحْشَاءِ كَذٰلِكَ يَعِظُكُمْ بِالْاَمْرِ وَالنَّهْيِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ تَتَّعِظُوْنَ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ وَفِى الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) هٰذِهٖ اَجْمَعُ اٰيَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ ـ

৯১. وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ مِنَ الْبَيْعَةِ وَالْاِيْمَانِ وَغَيْرِهِمَا اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا ج تَوْثِيْقِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ط بِالْوَفَاءِ حَيْثُ حَلَفْتُمْ بِهٖ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ ـ

অনুবাদ :

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ আদল অর্থাৎ তাওহীদ ও ন্যায়পরায়ণতা সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন গুরুত্ব প্রদানের জন্য এ স্থানে নিকট আত্মীয়দের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা ব্যভিচার, শরিয়তের দৃষ্টিতে যা অসৎকর্ম যেমন কুফরি ও অবাধ্যাচরণ ও সীমালঙ্ঘন। মানুষের উপর জুলুম করা। فَحْشَاءِ বা ব্যভিচারে কথা যেমন গুরুত্বের জন্য শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিভাবে সে জন্য এ স্থানে জুলুমের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তোমাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করার মাধ্যমে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর উপদেশ গ্রহণ কর। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখাৎ মুস্তাদরাক -এ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ভালো ও মন্দ সকল কিছু সম্পর্কে এ আয়াতটি আল কুরআনের সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ একটি আয়াত। এতে সকল কিছুই সন্নিবিষ্ট রয়েছে। اَلْاِحْسَانِ অর্থাৎ ফরজ কাজসমূহ পালন করা। একটি হাদীসে এটার ভাষ্যে উল্লেখ হয়েছে যে, 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করছ।' اِيْتَاءِ অর্থ এ স্থানে اِعْطَاءِ ব দান করা। ذِى الْقُرْبٰى অর্থাৎ ذِى الْقَرَابَةِ নৈকট্যের অধিকারী স্বজন। تَذَكَّرُوْنَ এতে মূলত ذ -এ একটি ت-এর اِدْغَامُ বা সন্ধি হয়েছে।

৯১. তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার অর্থাৎ শপথ, বায়'আত ইত্যাদি বিষয়ের অঙ্গীকার পূরণ কর যখন তোমরা অঙ্গীকার কর এবং প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না অথচ তোমরা তা পূরণ করবে বলে আল্লাহকে তার উপর জামিন করেছ। তাই তো তোমরা তাঁর নামে হলফ করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন। এ বাক্যটি তাদের প্রতি হুমকিস্বরূপ। بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا তা সুদৃঢ় করার পর। وَقَدْ এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٢. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ اَفْسَدَتْ غَزْلَهَا مَا غَزَلَتْهُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اِحْكَامٍ لَهُ وَبَرْمٍ اَنْكَاثًا ط حَالٌ جَمْعُ نِكْثٍ وَهُوَ مَا يَنْكُثُ اَيْ يَحِلُّ اِحْكَامُهُ وَهِيَ اِمْرَأَةٌ حَمْقَاءُ مِنْ مَكَّةَ كَانَتْ تَغْزِلُ طُوْلَ يَوْمِهَا ثُمَّ تَنْقُضُهُ تَتَّخِذُوْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَكُوْنُوْا اَيْ لَا تَكُوْنُوْا مِثْلَهَا فِي اتِّخَاذِكُمْ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا هُوَ مَا يَدْخُلُ فِي الشَّيْءِ وَلَيْسَ مِنْهُ اَيْ فَسَادًا اَوْ خَدِيْعَةً بَيْنَكُمْ بِاَنْ تَنْقُضُوْهَا اَنْ اَيْ لِاَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ جَمَاعَةٌ هِيَ اَرْبٰى اَكْثَرُ مِنْ اُمَّةٍ ط وَكَانُوْا يُحَالِفُوْنَ الْحُلَفَاءَ فَاِذَا وَجَدُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَعَزَّ نَقَضُوْا حَلْفَ اُولٰئِكَ وَحَالَفُوْهُمْ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ يَخْتَبِرُكُمُ اللّٰهُ بِهِ اَيْ بِمَا اَمَرَ بِهِ مِنَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ لِيَنْظُرَ الْمُطِيْعَ مِنْكُمْ وَالْعَاصِيَ اَوْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ اَرْبٰى لِيَنْظُرَ اَتَفُوْنَ اَمْ لَا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ فِي الدُّنْيَا مِنْ اَمْرِ الْعَهْدِ وَغَيْرِهِ بِاَنْ يُعَذِّبَ النَّاكِثَ وَيُثِيْبَ الْوَافِيَ.

৯২. অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের পরস্পরে প্রবঞ্চনারূপে শপথকে ব্যবহার করে অর্থাৎ পূর্ব শপথ বিনষ্ট করে সেই নারীর মতো হয়ো না যে শক্তিশালী অর্থাৎ মজবুত ও সুদৃঢ় করার পর সুতা খুলে ফেলে তার সুতাকাটা নষ্ট করে দেয়। মক্কায় এক নির্বোধ রমণী ছিল সারাদিন সুতাকাটার পর আবার তা নষ্ট করে ফেলত। কাফেররা কোনো গোত্রের সাথে বন্ধুত্বচুক্তি করার পর যদি অপর কোনো গোত্রকে অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী পেত তবে পূর্বের চুক্তি ভঙ্গ করে এদের সাথে চুক্তি আবদ্ধ হতো। এ স্থানে তা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে। আল্লাহ তো তোমাদেরকে এটা দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে কে বাধ্যগত আর কে অবাধ্য তা পরীক্ষা করেন। অথবা এটার অর্থ অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন তোমরা অঙ্গীকার পূরণ কর কিনা তা লক্ষ্য করার জন্য। এবং দুনিয়ায় অঙ্গীকার ইত্যাদির বিষয়ে তোমরা যে মতভেদ কর কিয়ামতের দিন তিনি অবশ্য তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেবেন। অঙ্গীকারভঙ্গকারীকে শাস্তি দেবেন আর তা পালনকারীকে পুণ্যফল দান করবেন। نَقَضَتْ নষ্ট করে দেওয়া। غَزْلَهَا অর্থাৎ সে যে সূতা কাটে তা। اَنْكَاثًا এটা نِكْثٌ-এর বহুবচন। যার মজবুত বাঁধন খুলে যায়। এটা حَالٌ বা ভাব ও অবস্থাবাচক বাক্য। অর্থাৎ শপথকে প্রতারণারূপে ব্যবহার করার মধ্যে ঐ রমণীর মতো হয়ো না। دَخَلًا অর্থ কোনো বস্তুতে বিজাতীয় কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটানো। এ স্থানে অর্থ প্রতারণামূলকভাবে বিনষ্ট করতে। اَنْ এটার পূর্বে একটি হেতুবোধক ل উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল لِاَنْ। اُمَّةٌ অর্থ দল। يَبْلُوْكُمْ অর্থ– তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে।

٩٣. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَهْلَ دِيْنٍ وَّاحِدٍ وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَلَتُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سُؤَالَ تَبْكِيْتٍ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ لِتُجَازُوْا عَلَيْهِ۔

৯৩. ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন একই ধর্মের অনুসারী করতে পারতেন কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তোমাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করা হবে। تَبْكِيْتٍ অর্থাৎ নিশ্চুপ বা লা জওয়াব করার জন্য এ প্রশ্ন করা হবে।

٩٤. وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ كَرَّرَهٗ تَاكِيْدًا فَتَزِلَّ قَدَمٌ اَيْ اَقْدَامُكُمْ عَنْ مَحَجَّةِ الْاِسْلَامِ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا اِسْتِقَامَتِهَا عَلَيْهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْءَ الْعَذَابَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ بِصَدِّكُمْ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ اَوْ بِصَدِّكُمْ غَيْرَكُمْ عَنْهُ لِاَنَّهٗ يَسْتَنُّ بِكُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِي الْاٰخِرَةِ۔

৯৪. পরস্পর প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের শপথ ব্যবহার করো না; করলে তোমাদের পা ইসলামে স্থির হওয়ার পর সুদৃঢ় হওয়ার পর ইসলামের সুস্পষ্ট পথ হতে পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে অর্থাৎ অঙ্গীকার পূরণ করা হতে বা অন্যকে তা হতে বাধা দানের কারণে; কেননা অন্যরা এ বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করবে তোমরা মন্দের আস্বাদ শাস্তির আস্বাদ নিবে। পরকালে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। وَلَا تَتَّخِذُوْا এটার تَاكِيْد অর্থাৎ জোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। قَدَمٌ এটা এস্থানে বহুবচন اَقْدَامٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٩٥. وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا بِاَنْ تَنْقُضُوْهُ لِاَجْلِهٖ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا فِي الدُّنْيَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَلَا تَنْقُضُوْا۔

৯৫. তোমরা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। অর্থাৎ এই তুচ্ছ জিনিসের লোভে তা ভঙ্গ করো না। আল্লাহর নিকট যা আছে অর্থাৎ কাজের পুণ্যফল অবশ্যই তা তোমাদের জন্য এ দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা হতে উত্তম যদি তোমরা তা জানতে তবে আর তা ভঙ্গ করতে না।

٩٦. مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا يَنْفَدُ يَفْنٰى وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ط دَائِمٌ وَلَنَجْزِيَنَّ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلَى الْوَفَاءِ بِالْعُهُوْدِ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَحْسَنِ بِمَعْنٰى حَسَنٍ۔

৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ এ দুনিয়া তা অস্থায়ী। যারা অঙ্গীকার পূরণে ধৈর্যশীল আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবেন। يَنْفَدُ ধ্বংস হয়ে যাবে। بَاقٍ অর্থাৎ স্থায়ী। لَنَجْزِيَنَّ এটা ى [নাম পুরুষ] ও ن [উত্তম পুরুষ বহুবচন] সহ পঠিত রয়েছে। اَحْسَنَ এটা تَفْضِيْل বা দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষবোধক শব্দ হলেও এ স্থানে সাধারণভাবে حَسَنٍ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilmweebly.com

٩٧. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ج قِيْلَ هِىَ حَيَاةُ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ فِى الدُّنْيَا بِالْقَنَاعَةِ وَالرِّزْقِ الْحَلَالِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

৯৭. ঈমান গ্রহণ করে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি অবশ্যই পবিত্রময় জীবন দান করবে এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেব। حَيٰوةً طَيِّبَةً পবিত্র জীবন। অর্থাৎ জান্নাতের জীবন। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হলো হালাল উপজীবিকা ও অল্পতুষ্টির মাধ্যমে দুনিয়াতেই তা দান করব।

٩٨. فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ اَىْ اَرَدْتَ قِرَاءَتَهٗ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اَىْ قُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করবে অর্থাৎ তা তেলাওয়াতের ইচ্ছা করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নেবে বলবে- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ নিচ্ছি।

٩٩. اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ تَسَلُّطٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

৯৯. তার কোনো আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা বিশ্বাস করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। سُلْطَانٌ আধিপত্য।

١٠٠. اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ بِطَاعَتِهٖ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ اَىِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُشْرِكُوْنَ .

১০০. তার অধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যারা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করত তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা তাঁর সাথে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْقُرْبٰى : এটা اِسْم مَصْدَرٌ অর্থ আত্মীয়তার বন্ধন।

قَوْلُهُ تَخْصِيْصُ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ : আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা اِحْسَانٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে ।

قَوْلُهُ كَمَا بَدَاَ بِالْفَحْشَاءِ لِذَالِكَ : অর্থ গুরুত্বের কারণে সর্বপ্রথম فَحْشَاء তথা ব্যভিচারের বিবরণ দিয়েছেন। কেননা ব্যভিচারের কারণে বংশধারা সংরক্ষিত থাকে না। আর তা আল্লাহর ক্রোধকে আবশ্যক করে।

قَوْلُهُ مِنَ الْبَيْعَةِ : অর্থাৎ بَيْعَةُ الرَّسُوْلِ عَلَى الْاِسْلَامِ এর দ্বারা بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ উদ্দেশ্যে নয়। কেননা এ সূরা মাক্কী। আর বায়া'আতে রেযওয়ান হিজরতের পরে হয়েছিল।

قَوْلُهُ كَفِيْلًا : অর্থাৎ شَهِيْدًا

قَوْلُهُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ : অর্থাৎ وَقَدْ جَعَلْتُمْ টা জুমলা হয়ে تَنْقُضُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে مَعْطُوْف নয়। অন্যথায় عَطْفُ الْخَبَرِ عَلَى الْاِنْشَاء আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ সেই প্রশ্নের জবাব যে, اِنَّ اللّٰهَ مَا تَفْعَلُوْنَ দ্বারা مَعْطُوْف عَلَيْهِ لَا تَنْقُضُوا এবং لَا تَكُوْنُوْا মা'তৃফ -এর মধ্যে فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِىْ হয়েছে।

উত্তর. উত্তরের সার হলো এই যে, اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ হলো جُمْلَهْ تَهْدِيْد যা اَجْنَبِىْ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مَا غَزَلَتْهُ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, غَزْلَ হলো মাসদার এর দিকে نَقْض তথা ভাঙ্গার নিসবত করা বৈধ নয়। মুফাসসির (র.) غَزْل -এর তাফসীর مَا غَزَلَتْهُ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, মাসদার টা মাফউল অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সে যে সুতা কেটেছে তা ভেঙ্গে দিয়েছে।

قَوْلُهُ بَعْدِ قُوَّةٍ : কেউ কেউ بَعْدَ قُوَّةٍ -এর অর্থ নিয়েছেন মজবুত করার পর। মুফাসসির (র.)ও এ অর্থই উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। আবার অন্যান্য কতিপয় মুফাসসির এর অর্থ নিয়েছেন– "কষ্ট করে কাটার পরে"।

قَوْلُهُ غَزْلَهَا : এটা মাসদার যা هَا যমীরের প্রতি মুযাফ হয়েছে। এর অর্থ হলো– সুতা কাটা। এখানে اِسْم مَفْعُول অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ কর্তিত সুতা। মক্কায় একজন নির্বোধ নারী ছিল। যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বীয় বাঁদিদের সাথে সুতা কাটত, আর সন্ধ্যায় সকল কর্তিত সুতা বিনষ্ট করে দিত। সেই মহিলার নাম ছিল রাবতা বিনতে ওমর। এই মহিলা আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা -এর মাতা এবং সা'দের মেয়ে ছিল। কেউ কেউ বলেন যে, তার নাম ছিল রাবতা বিনদে সা'দ ইবনে তাইম আল কুরাশিয়্যাহ। অর্থ হলো এই যে, তোমরা আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করে রেখেছে তা বিনষ্ট করো না, অন্যথায় তোমাদের কৃত কষ্ট অহেতুক হয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ يُبْرَمُ : এর অর্থ হলো সবল ও মজবুত করা, সুতা কর্তন করার পর পুনরায় কাটা।

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ تَكُونُوا : অর্থাৎ تَتَّخِذُونَ টা تَكُونُوا-এর যমীর হতে حَالٌ হয়েছে; দ্বিতীয় মাফউল নয়। কেননা تَكُونُوا টা مُتَعَدِّى بَدُوْ مَفْعُول হয় না। তবে এটা যদি تَصْيِيْر ইত্যাদি অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

قَوْلُهُ اِنْكَاثًا : এটা نَكْثٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পুরাতন তুলাকে নতুন করে কাটার জন্য ভেঙ্গে ফেলা।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يَنْكُثُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نَكْثٌ টা مَكُوْثٌ অর্থে হয়েছে। আর مَنْكُوْثٌ অর্থ হলো مَنْقُوْضٌ-

قَوْلُهُ دَخَلًا : টা لَا تَكُوْنُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে অর্থাৎ لَا تَكُوْنُوْا مُشَابِهِيْنَ اِمْرَأَةً شَانُهَا هٰذَا

قَوْلُهُ خَدِيْعَةً : এর অর্থ– বাহানা, ধোঁকা, দাগাবাজি, বিশৃঙ্খলা, অপরিচিত।

قَوْلُهُ اَرْبٰى : অর্থ বর্ধিত, উর্ধ্বস্থত হওয়া। এটা رِبًا থেকে اِسْم تَفْضِيْل-এর সীগাহ।

قَوْلُهُ اَتَفُوْنَ : এখানে هَمْزَة টি হলো اِسْتِفْهَامٌ-এর জন্য। تَفُوْنَ এটা وَفٰى থেকে مُضَارِعٌ-এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ -এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা পূরণ কর।

قَوْلُهُ اَىْ اَقْدَامٌ : قَدَمٌ -এর তাফসীর اَقْدَامٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন এক পায়ের পদচ্যুতিই লজ্জা শরম ও শাস্তিকে আবশ্যককারী তখন উভয় পা পিছলে গেলে অবস্থা কিরূপ হবে?

قَوْلُهُ مُحَجَّه : অর্থ– মধ্যবর্তী রাস্তা, রাজপথ, ভি.আইপি. রোড।

قَوْلُهُ بِصَدِّكُمْ عَنِ الْوَفَاءِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, حَمَد হলো লাযেম।

قَوْلُه بِصَدِّكُمْ غَيْرَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, صَدَّ টা নিষেধের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে مُتَعَدِّى ও ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ فَلَا تَنْقُضُوْا : এটা اِنْ شَرْطِيَّة-এর জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ الخ : আলোচ্য আয়াতটি কুরআন পাকের একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। এর কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ইসলামি শিক্ষার যাবতীয় বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুজুর্গগণের আমল থেকে আজ পর্যন্ত জুমা ও দুই ঈদের খুতবার শেষ দিকে এ আয়াতটি পাঠ করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সূরা নাহলের اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াতটি হচ্ছে কুরআন পাকের ব্যাপকতার অর্থবোধক আয়াত। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা.) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাছীর হাফেযে হাদীস আবূ ইয়া'লার গ্রন্থ মারেফাতুস্ সাহাবা থেকে সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত দাবি ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল, আপনি সবার প্রধান। আপনার স্বয়ং যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন, তবে গোত্র থেকে দু ব্যক্তিকে মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমারা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দুটি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দুটি এই– مَنْ اَنْتَ وَمَا اَنْتَ আপনি কে এবং কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এরপর তিনি সূরা নাহলের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ উভয় দূত অনুরোধ করল, এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল, এতে বুঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এমনিভাবে হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.) বলেন, শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম হঠাৎ তাঁর উপর ওহি অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন, আল্লাহর দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাজিল হয়েছে। হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা.) বলেন, এ ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাছীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত করলে সেও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরাইশদের সামনে ভাষণ দেয় যে, وَاللّٰهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُوْرِقٌ وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ "আল্লাহর কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনও কোনো মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন- সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন- নির্লজ্জ কাজ, প্রত্যেক মন্দকাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

عَدْلٌ শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عَدْلٌ বলা হয়। اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিকে দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عَدْلٌ বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عَدْلٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। অর্থাৎ عَدْلٌ এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عَدْلٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরিউক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরাবী বলেন, 'আদল' শব্দের আসল অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার হককে নিজের ভোগ-বিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহর বিধানাবলি পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পে তুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশি বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবি করা এবং কোনো মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোনোরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়া একপ্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজ স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও একপ্রকার আদল। আবূ আব্দুল্লাহ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কর্মের সমতা, চরিত্রের সমতা সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দকর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

اَلْاِحْسَانُ -এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু প্রকার। ১. কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভালো করা। ২. কোনো ব্যক্তির সাথে ভালো ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবি ভাষায় اِحْسَانٌ শব্দের সাথে اِلٰى অব্যয় ব্যবহৃত হয়; যেমন এক আয়াতে اَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরিউক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার ইহসান অর্থাৎ কোনো কাজকে সুন্দর করা– এটাও ব্যাপক অর্থাৎ ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরাঈলে' স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহসানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদতের ইহসান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহর ইবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছে। যদি আল্লাহর উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। কেননা আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোনো কিছু থাকতে পারে না– এটা ইসলামি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহসান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহসান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের ইহসান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফের মানুষ ও জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, যে ব্যক্তির গৃহে তার বিড়াল খোরাক ও অন্যান্য দরকারি বস্তু না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখির পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত ইবাদতই করুক, ইহসানকারী গণ্য হবে না। আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে ইহসানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে– কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেওয়া– কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকু কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহসান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও কবুল করে নেওয়া এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও; বরং সৎকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হলো ফরজ ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহসানের আদেশ হলো কর্মের স্তরে।

قَوْلُهُ اِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى : এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ اِيْتَاءٌ শব্দের অর্থ কোনো কিছু দেওয়া এবং قُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা ذِى الْقُرْبٰى শব্দের অর্থ আত্মীয়স্বজন। অতএব اِيْتَاءِ ذِىالْقُرْبٰى -এর অর্থ হলো আত্মীয়স্বজনকে কিছু দেওয়া। কি বস্তু দেওয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে– وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান করা। বাহ্যত আলোচ্য আয়াতেও তাই বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মীয়কে তার পাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে, আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরিউক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বুঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ; অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজ যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত। তাই ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে কোনো পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গুনাহ মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بَغْىٌ শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বুঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فَحْشَاءٌ ও بَغْى ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فَحْشَاءٌ -কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। بَغْىٌ -কে পৃথক উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এ সীমালঙ্ঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুলুম ব্যতীত এমন কোনো গুনাহ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বুঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই এর আগে দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা জালেমকে শাস্তি দেন যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা মজলুমের সাহায্য করার অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের আমোঘ প্রতিকার। رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِتِّبَاعَهٗ

قَوْلُهٗ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ الخ : অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম : যেসব লেনদেন ও চুক্তি মুখে জরুরি করে নেওয়া হয় অর্থাৎ দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عَهْد শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতসমূহ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। عَدْل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত। -[তাফসীরে কুরতুবী]

কারো সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা খুব বড় গুনাহ। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোনো নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা খাড়া করা হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গুনাহ। পরকালে বিরাট শাস্তি হবে এবং দুনিয়াতেও কোনো কোনো অবস্থায় কাফফরা জরুরি হয়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهٗ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ : এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে জাগতিক স্বার্থ ও উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাদের বিপরীতে অপর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে, প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েজ নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরিয়তবিরোধী কাজকর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরিউক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা মানসিক স্বার্থ ও বাসনার বশবর্তী হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, না আল্লাহর আদেশ পালনার্থে মানসিক প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে : لَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতে অধিক বিপজ্জনক গুনাহ। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। اَنْ تَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

ঘুষ নেওয়া কঠোর হারাম এবং আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা : وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ আল্লাহর অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধনসম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোনো বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়া বলেন, যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারো কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সবরকম ঘুষই হারাম। উদাহরণত সরকারি কর্মচারী কোনো কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন যদি সে একাজ করার জন্য কারো কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে টালবাহানা করে, তবে সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, ঘুষ নিয়ে তা করাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

ঘুষের সংজ্ঞা : ইবনে আতিয়ার এ আলোচনায় ঘুষের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তাফসীরে বাহরে মুহীতের ভাষায় তা এই– أَخْذُ الْأَمْوَالِ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَى الْآخِذِ فِعْلُهُ أَوْ فِعْلِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ অর্থাৎ যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। –[তাফসীরে বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃ. ৫ম খ.]

সমগ্র বিশ্বের সমগ্র নিয়ামত যে অল্প, তা পরবর্তী আয়াতেত এভাবে বর্ণিত হয়েছে– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে [এতে পার্থিব মুনাফা বুঝানো হয়েছে] তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে [এতে পরকালের ছওয়াব ও আজাব বুঝানো হয়েছে] তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ বন্ধুত্ব-শত্রুতা সবই ধ্বংসশীল এবং এগুলোর ফলাফল ও পরিণতি, যা আল্লাহর কাছে রয়েছে, যা চিরকাল বাকি থাকবে : مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণত ধনসম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুদ বলেন, مَا শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কোনো শরিয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধনসম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে ছওয়াব ও আজাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আজাব ও ছওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

قَوْلُهُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ الخ : 'হায়াতে তাইয়েবা' কি? সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়েবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে পারলৌকিক জীবন বুঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মু'মিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দুটি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। ১. অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। ২.. তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনেরও অধিকারী হয়, তবে লোভের আধিক্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেল অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

ইবনে আতিয়া বলেন, ঈমানদার সৎকর্মশীলদের আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও প্রফুল্লতা ও আনন্দঘন জীবন দান করেন, যা কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না। সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে জীবন আনন্দময় হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষত এ কারণে যে, অনাবশ্যক সম্পদ বাড়ানোর লোভ তাদের মধ্যে থাকে না। এটাই সর্বাবস্থায় উদ্বেগেরে কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তারা যদি অভাব-অনটন অথবা অসুস্থতারও সম্মুখীন হয়, তবে আল্লাহর ওয়াদার উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং কষ্টের পরেই সুখ পাওয়ার দৃঢ় আশা তাদের জীবনকে নিরানন্দ হতে দেয় না। যেমন কৃষক ক্ষেতে শস্য বপনের পর তার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নিড়ানি-বাছানি ও জল সেচনের সময় যত কষ্টই করুক, সব তার কাছে সুখ বলে অনুভূত হয়। কেননা, কিছু দিন অতিবাহিত হলেই সে এর বিরাট প্রতিদান পাবে। ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়ে, চাকরিজীবী তার দায়িত্ব পালনে কতই না পরিশ্রম করে, এমনকি মাঝে মাঝে অপমানও সহ্য করে, কিন্তু এ কারণে আনন্দিত থাকে যে, কয়েক দিন পর সে ব্যবসায়ে বিরাট মুনাফা অথবা চাকরির বেতন পাবে বলে বিশ্বাস রাখে। মু'মিনও বিশ্বাস রাখে যে, প্রত্যেক কষ্টের জন্য সে প্রতিদান পাচ্ছে এবং পরকালে এর প্রতিদান চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে পাওয়া যাবে। পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের কোনো মূল্য নেই। তাই এখানে সে সুখ-দুঃখ এবং ঠাণ্ডা-গরম সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করে যায়। এমতাবস্থায়ও তার জীবন উদ্বেগজনক ও নিরানন্দ হয় না। এটাই হচ্ছে 'হায়াতে তাইয়েবা', যা মু'মিন দুনিয়াতে নগদ পায়।

قَوْلُهُ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ الخ : পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধিবিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কুরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যা দ্বারা শয়তান পলায়ন করে. دیو بگریزد ازاں قوم کہ قران خوانند "যারা কুরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়।" এছাড়া কোনো কোনো বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানি প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। −[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

এ সত্ত্বেও যখন কুরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরি হয়ে যায়। এছাড়া স্বয়ং কুরআন তেলওয়াতের মধ্যে শয়তানি কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়-নম্রতা থাকে না। এজন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। −[তাফসীরে ইবনে কাছীর, মাযহারী]

ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, মানুষের শত্রু দু রকম। ১. স্বয়ং মানবজাতির মধ্যে থেকে; যেমন সাধারণ কাফের। ২. জিনদের মধ্যে থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনাসামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আজাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক− জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে ছওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা : কুরআন তেলাওয়াতের সময় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিক সংখ্যক আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়− সুন্নত বলেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত যত হাদীস রয়েছে, তেলাওয়াতের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং কোনো অবস্থায় না পড়ার− সব বিবরণ ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

নামাজে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ শুধু প্রথম রাকাতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শুধু প্রথম রাকাতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তাফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কুরআন তেলাওয়াত নামাজে হোক কিংবা নামাজের বাইরে– উভয় অবস্থাতেই তেলাওয়াতের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যত বারই তেলাওয়াত হবে প্রথম اَعُوْذُ بِاللّٰهِ যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোনো সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তেলাওয়তের সময় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ও بِسْمِ اللّٰهِ পড়ে নেওয়া উচিত।

কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু بِسْمِ اللّٰهِ পড়া উচিত। –[দুররে মুখতার]

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ -এর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ পাঠ করা মোস্তাহাব। –[শামী]

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ : এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোনো মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশত কিংবা কোনো স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা হয়েছে– যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, কেননা তিনিই সৎকাজের তাওফীকদাতা এবং প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী, এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। হ্যাঁ, যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোনো সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

সূরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুও তাই। তাতে শয়তানের দাবির বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিয়েছেন– اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর কোনো জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজই বিপথগামী হয় এবং তোমার অনুসরণ করতে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٠١. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ بِنَسْخِهَا وَإِنْزَالِ غَيْرِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا أَيِ الْكُفَّارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ كَذَّابٌ تَقُولُهُ مِنْ عِنْدِكَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حَقِيْقَةَ الْقُرْاٰنِ وَفَائِدَةَ النَّسْخِ .

১০১. আমি যখন বান্দাদের কল্যাণার্থে এক আয়াতের স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি। অর্থাৎ এক আয়াত মানসূখ বা রহিত করত অন্য আয়াত অবতীর্ণ করি তখন তারা কাফেররা রাসূল ﷺ -কে বলে, তুমি তো একজন মিথ্যা রচনাকারী। তুমি অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী, নিজের তরফ হতে তুমি এটা বল। অথচ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই ভালো জানেন; কিন্তু এটা তাদের অধিকাংশই কুরআনের হাকীকত ও মূলতত্ত্ব এবং নাসখ বা রহিতকরণের উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ।

١٠٢. قُلْ لَهُمْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ جِبْرَئِيْلُ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَّلَ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِإِيْمَانِهِمْ بِهٖ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ .

১০২. তাদেরকে বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল যথাযথভাবে তা অবতীর্ণ করেছে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে এ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য এবং পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য। بِالْحَقِّ এটা نَزَّلَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

١٠٣. وَلَقَدْ لِلتَّحْقِيْقِ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْاٰنَ بَشَرٌ ط وَهُوَ قَيْنٌ نَصْرَانِيٌّ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى لِسَانُ لُغَةُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ يَمِيْلُوْنَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ أَعْجَمِيٌّ وَهٰذَا الْقُرْاٰنُ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ذُوْ بَيَانٍ وَفَصَاحَةٍ فَكَيْفَ يُعَلِّمُهُ أَعْجَمِيٌّ .

১০৩. আমি তো জানিই তারা বলে, তাঁকে অবশ্যই একজন মানুষ অর্থাৎ জনৈক খ্রিস্টান কর্মকার তা অর্থাৎ আল-কুরআন শিখিয়ে দেয়। বলা হয়, রাসূল ﷺ উক্ত কর্মকারের নিকট যেতেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা যার প্রতি তা আরোপ করে অর্থাৎ তাঁকে শিখিয়ে দেয় বলে তার ভাষা তো আরবি নয় অথচ এটা কুরআন তো সুস্পষ্ট অলঙ্কার সমৃদ্ধ ও পরিষ্কার আরবি ভাষায় সুতরাং একজন অনারব কেমন করে তাঁকে এটা শিক্ষা দিতে পারে? لَقَدْ এটার لَامْ অক্ষরটি تَحْقِيْق অর্থাৎ বক্তব্য প্রতিষ্ঠাকরণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। لِسَانٌ অর্থ এ স্থানে ভাষা।

١٠٤. إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ .

১০৪. যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে না তাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠٥. اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ج الْقُرْاٰنِ بِقَوْلِهِمْ هٰذَا مِنْ قَوْلِ الْبَشَرِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ وَالتَّاكِيْدُ بِالتَّكْرَارِ وَاِنَّ وَغَيْرِهِمَا رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ .

১০৫. যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে এটা মানব রচিত কথা– এই বলে যারা আল-কুরআনে বিশ্বাস করে না তারাই মিথ্যা উদ্ভাবন করে আর এরাই মিথ্যাবাদী। এ আয়াতটিতে "তুমি অবশ্যই মিথ্যা উদ্ভাবনকারী" তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে اِنَّ ও বক্তব্যের পুনরুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে تَاكِيْد বা জোর সৃষ্টি করা হয়েছে।

١٠٦. مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ عَلَى التَّلَفُّظِ بِالْكُفْرِ فَتَلَفَّظَ بِهٖ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَمَنْ مُبْتَدَأٌ اَوْ شَرْطِيَّةٌ وَالْخَبَرُ اَوِ الْجَوَابُ لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ دَلَّ عَلَيْهِ هٰذَا وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا لَهٗ اَىْ فَتَحَهٗ وَوَسَّعَهٗ بِمَعْنٰى طَابَتْ بِهٖ نَفْسُهٗ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

১০৬. যাকে কোনো কুফরি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয় আর সে তা উচ্চারণ করে বসে তবে তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত থাকে সেই ধরনের ব্যক্তি ব্যতীত যারা ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহকে অস্বীকার করে আর কুফরির জন্য তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয় অর্থাৎ আনন্দিত চিত্তে সে তা গ্রহণ করে নেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। مَنْ كَفَرَ এ مَنْ শব্দটি مُبْتَدَأٌ অর্থাৎ উদ্দেশ্যবাচক বা شَرْطِيَّةٌ অর্থাৎ শর্তবাচক। এটার خَبَرٌ অর্থাৎ বিধেয় বা জওয়াব এ স্থানে উহ্য। তা হলো لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ অর্থাৎ এদের জন্য রয়েছে ভীষণ হুমকি। পরবর্তী বাক্য وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ এটার প্রতি ইঙ্গিতবহ। شَرَحَ অর্থ উন্মুক্ত করে দেয়, প্রশস্ত করে দেয়।

١٠٧. ذٰلِكَ الْوَعِيْدُ لَهُمْ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِخْتَارُوْهَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ .

১০৭. এটা অর্থাৎ উক্ত হুমকি এজন্য যে তারা ইহজীবনকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

١٠٨. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ عَمَّا يُرَادُ بِهِمْ .

১০৮. ওরাই তারা যাদের অন্তর, কর্ণ, চক্ষু আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই তাদের নিকট হতে যা চাওয়া হয় সেই সম্পর্কে উদাসীন।

١٠٩. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ .

১০৯. নিঃসন্দেহে তারা পরকালে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। لَا جَرَمَ অর্থ- নিঃসন্দেহে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١٠. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا إِلَى الْمَدِيْنَةِ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا عُذِّبُوْا وَتَلَفَّظُوْا بِالْكُفْرِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ كَفَرُوْا أَوْ فَتَنُوا النَّاسَ عَنِ الْإِيْمَانِ ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا عَلَى الطَّاعَةِ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا أَيِ الْفِتْنَةِ لَغَفُوْرٌ لَهُمْ رَحِيْمٌ بِهِمْ وَخَبَرُ إِنَّ الْأُوْلَى دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الثَّانِيَةِ .

১১০. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর এবং কুফরি কথা উচ্চারণ করার পর মদিনায় হিজরত করে অতঃপর জিহাদ করে এবং আনুগত্য প্রদর্শনে ধৈর্যধারণ করে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক এই সবের পর এ নির্যাতনের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাদের বিষয়ে অতি দয়ালু। فُتِنُوْا অর্থ– নির্যাতিত হয়ে। অপর এক কেরাতে এটা مَعْرُوْف بِنَاءٌ لِلْفَاعِلِ অর্থাৎ বা কর্তৃবাচ্য রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এটার অর্থ হবে কুফরি করে বা অপরাপর মানুষকে ঈমান হতে বাধা প্রদান করত ফিতনায় নিপতিত করে। এ আয়াতটির প্রথমোক্ত إِنَّ-এর خَبَرْ বা বিধেয় । উহ্য। দ্বিতীয় إِنَّ-এর خَبَرْ বা বিধেয়টি (لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ) তার প্রতি ইঙ্গিতবহ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِذَا : এটা شَرْطِيَّة আর قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ হলো جَوَابُ شَرْط -

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ : এখানে شَرْط ও جَزَاءٌ মধ্যখানে এটা جُمْلَه مُعْتَرِضَه تَوْبِيْخِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ رُوْحُ الْقُدُسِ : এটা হলো إِضَافَةُ الْمَوْصُوْفِ إِلَى الصِّفَةِ অর্থাৎ اَلرُّوْحُ الْمُقَدَّسُ এখানে اَلْقُدُسْ শব্দের دَالْ-এর উপর পেশ এবং সাকিন উভয়টিই বৈধ।

قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِنَزَّلَ : অর্থাৎ مُتَلَبِّسًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে نَزَّلَهُ-এর যমীরে মাফউল থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ نَزَّلَهُ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

قَوْلُهُ هُدًى وَبُشْرٰى : প্রশ্ন. এর আতফ হয়েছে لِيُثَبِّتَ-এর উপর। অথচ এ আতফ বৈধ নয়, কেননা এ উভয়টি مَعْطُوْف عَلَيْهِ-এর সাথে না إِعْرَابْ-এর ক্ষেত্রে মিল রয়েছে না عِلَّتْ-এর মধ্যে মিল রয়েছে। অথচ এ উভয় বিষয়টিই জরুরি।

উত্তর. هُدًى এবং بُشْرٰى-এর আতফ لِيُثَبِّتَ-এর مَحَلْ-এর উপর হয়েছে। لِيُثَبِّتَ-এর لَامْ টি تَعْلِيْلِيَّةْ যার পরে أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ উহ্য রয়েছে। যার কারণে مُضَارِعْ টা মাসদারের অর্থে হয়েছে। يُثَبِّتَ-এর মধ্যে هُوَ যমীর ফায়েল যার مَرْجِعْ হলো কুরআন– এবং لِيُثَبِّتَ টা مَفْعُوْلٌ لِأَجْلِهٖ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর بُشْرٰى ও هُدًى উভয়টি মাসদার যার আতফ لِيُثَبِّتَ-এর مَحَلْ-এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ تَثْبِيْتًا وَهِدَايَةً وَبِشَارَةً কাজেই এখন عَدَمْ مُطَابَقَتْ প্রশ্ন আসবে না।

قَوْلُهُ لِلتَّحْقِيْقِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, قَدْ টা যখন مُضَارِعْ-এর উপর আসে তখন সাধারণত تَقْلِيْل-এর জন্য হয়ে থাকে, অথচ এখানে تَقْلِيْل-এর অর্থ لِنَعْلَمَ-এর সাথে মিলে না এবং আল্লাহ তা'আলার শানেরও মুনাসিব নয়। জবাবের সার কথা হলো এই যে, এখানে قَدْ টা تَحْقِيْق-এর জন্য হয়েছে। لَقَدْ-এর মধ্যে لَامْ টি হলো قَسَمِيَّةٌ

قَوْلُهُ قَيْنٌ : এটা একবচন, বহুবচনে قُيُوْنٌ – أَقْيَانٌ অর্থ– লৌহকার, কর্মকার, কামার।

قَوْلُهُ يُمِيْلُوْنَ إِلَيْهِ : অর্থাৎ يُشِيْرُوْنَ إِلَيْهِ

قَوْلُهُ أَعْجَمِيٌّ : যে বিশুদ্ধ ভাষী হয় না যদিও সে আরব ভাষী হয়। আর عَجَمِيٌّ হলো مَنْسُوْبٌ إِلَى الْعَجَمِ তথা অনারবি ভাষী হওয়ার প্রতি নিসবতকৃত। যে ব্যক্তি আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ যদিও সে বিশুদ্ধভাষী হয়।

قَوْلُهُ وَالتَّاكِيْدُ بِالتَّكْرَارِ وَإِنَّ وَغَيْرِهِمَا : যেহেতু মক্কার কাফেররা বিভিন্ন ধরনের তাকিদ সহকারে إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ বলে কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করেছিল, তাদের প্রতি উত্তরও বিভিন্ন تَاكِيْد-এর সাথে দেওয়া হয়েছে। প্রথম تَكْرَار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ-এর تَكْرَارْ এবং إِنَّ-এর تَكْرَار আর غَيْرُهُمَا দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো ضَمِيْرِ فَصْلْ এবং تَعْرِيْفُ مُسْنَدْ এবং جُمْلَهُ اِسْمِيَّهُ হওয়া। কাজেই প্রকাশ্য দৃষ্টিতে تَكْذِيْبْ-এর حَصْرْ যা কুরাইশদের মধ্যে বুঝা যাচ্ছিল তা শেষ হয়ে গেল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مَنْ مُبْتَدَأٌ اَوْ شَرْطِيَّةٌ : এখানে مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ -এর مَنْ -এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. مَنْ টা مَوْصُوْلَهْ হয়ে মুবতাদা হবে, اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ থেকে بَدَل হবে না। কেননা بَدَل এবং مُبْدَلْ مِنْهُ -এর মাঝে فَصْل بِالْاَجْنَبِىْ বৈধ নয়। আর এখানে اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ -এর فَصْل বিদ্যমান রয়েছে। مَنْ -কে মাওসূলাহ মুবতাদা মানার সুরতে كَفَرَ তার সেলাহ হবে। আর مَوْصُوْل এবং সেলাহ মিলে মুবতাদা হবে। আর তার খবর উহ্য হবে। আর তা হলো لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ

২. مَنْ টা شَرْطِيَّةٌ হবে। আর جَزَاءٌ উহ্য হবে। আর তা হলো لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ যেমনটি আল্লামা সুয়ূতী (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর আগত বাক্যটি উহ্য হওয়ার প্রতি দিকনির্দেশনা দিচ্ছে। তা হলো فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ অথবা وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ

قَوْلُهُ صَدْرًا لَهُ : لَهُ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, شَرْح -এর সেলাহ بَاءٌ আসে না। অথচ এখানে بِالْكُفْرِ -এর মধ্যে بَاءٌ সেলাহ হয়েছে।

উত্তর. হলো এই যে, بَاءٌ টা لَامْ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى طَابَتْ : এটা সেই সংশয়ের নিরসন যে, এখানে فَتْحَةٌ -এর কোনো অর্থ নেই।

উত্তর. হলো এই যে, فَتْحَةٌ টা طَابَ অর্থে হয়েছে এবং এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَدْرًا টা মাফউল হতে স্থানান্তরিত হয়ে تَمْيِيْز হয়েছে।

قَوْلُهُ اخْتَارُوْهَا : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, اِسْتَحَبُّوْا -এর সেলাহ عَلٰى আসে না। অথচ এখানে عَلٰى সেলাহ এসেছে? জবাবের সারকথা হলো এই যে, اِسْتَحَبُّوْا টা اِخْتَارُوْا-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই আর কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ : অর্থাৎ فُتِنُوْا-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। একটি مَجْهُوْل আর অপরটি مَعْرُوْف মাজহুল হওয়ার সুরতে مُهَاجِرِيْنَ টা নায়েবে ফায়েল হবে এবং كَفَرُوْا-এর ফায়েলও। আর مَعْرُوْف -এর সুরতে উভয় ফে'লের ফায়েল كُفَّارٌ হবে অর্থাৎ মুশরিকরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মানুষদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধা প্রদান করেছে।

قَوْلُهُ خَبَرُ اِنَّ الْاُوْلٰى الخ : অর্থাৎ প্রথমে اِنَّ-এর খবরকে ফেলে দিয়েছে। কেননা দ্বিতীয় اِنَّ-এর খবর উহ্য খবরের উপর বুঝাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَكَانَ اٰيَةٍ الخ : পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতের সময় اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পড়ার নির্দেশ ছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তান কুরআন তেলাওয়াতের সময় মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে শয়তানের এমনি ধরনের কুমন্ত্রণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

নবুয়ত সম্পর্কে কাফেরদের সন্দেহের তিরস্কারপূর্ণ জওয়াব : যখন আমি কোনো আয়াত অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, [অর্থাৎ এক আয়াতকে শব্দগত অথবা অর্থগতভাবে রহিত করে তৎস্থলে অন্য আদেশ দেই] অথচ আল্লাহ তা'আলা যে আদেশ [প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার] প্রেরণ করেন [তার উপযোগিতা ও তাৎপর্য] তিনিই ভালো জানেন [যে, যাদেরকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা অনুযায়ী এক সময়ে এক উপযোগিতা ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনে উপযোগিতা ও তাৎপর্য অন্যরূপ হয়ে গেছে] তখন তারা বলে, [নাউযুবিল্লাহ!] আপনি [আল্লাহর বিরুদ্ধে] মনগড়া উক্তি করেন [নিজের কথাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। তা না হলে আল্লাহর আদেশ হলে তা পরিবর্তন করা কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ কি পূর্বে জানতেন না? তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে না যে, মাঝে মাঝে সব অবস্থা জান থাকা সত্ত্বেও প্রথম অবস্থায় প্রথম আদেশ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেওয়ার কথা যদিও তখন জানা থাকে, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে তখন দ্বিতীয় অবস্থার আদেশ বর্ণনা করা হয় না; বরং অবস্থাটি যখন দেখা দেয়, তখনই তা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণত ডাক্তার এক ওষুধ মনোনীত করে এবং সে জানে যে, এটা ব্যবহার করলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে এবং অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। কিন্তু রোগীকে প্রথমেই সব বিবরণ বলে না। কুরআন ও হাদীসেও বিধিবিধান রহিত করার স্বরূপ তাই। যে ব্যক্তি এ স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, সে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শয়তানের প্ররোচনায় নসখ অর্থাৎ রহিতকরণকে অস্বীকার করে। এজন্যই এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মনগড়া কথা বলেন না] বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক মূর্খ [ফলে বিধিবিধানের রহিতকরণকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর কালাম হওয়ার পরিপন্থি মনে করে।], আপনি [তাদের জবাবে] বলে দিন- [এ কালাম আমার রচিত নয়; বরং] একে পবিত্র আত্মা [অর্থাৎ জিবরাঈল] পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে আনয়ন করেছেন, [তাই এটা আল্লাহর কালাম। বস্তুত বিধানের পরিবর্তন তাৎপর্য ও উপযোগিতার তাগিদে হয়। এই কালাম এজন্য প্রেরিত হয়েছে] যাতে ঈমানদারদেরকে [ঈমানের উপর] দৃঢ়পদ রাখেন এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়ত ও সুসংবাদ [-এর উপায়] হয়ে যায়। [এরপর কাফেরদের আরও একটি অনর্থক সন্দেহের জবাব দেওয়া হচ্ছে যে] আমি জানি, তারা [অন্য একটি ভ্রান্ত কথা] আরও বলে যে, তাকে তো জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দান করে [এতে একজন অনারব, রোমের অধিবাসী কর্মকারকে বুঝানো হয়েছে। তার নাম বাল'আম অথবা মকীস। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই সে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে বসত। সে ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থও কিছু কিছু জানত। এ থেকেই কাফেররা রটিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তিই মুহাম্মদকে কুরআনের কালাম শিক্ষা দেয়। -[দুররে মনসূর] আল্লাহ তা'আলা এর জবাব দিয়েছেন যে, কুরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিকে বলা হয়। তোমরা যদি কুরআনের অর্থ ও তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হও, তবে কমপক্ষে আরবি ভাষার উচ্চমান অলঙ্কার সম্পর্কে তো অনবগত নও। অতএব তোমাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, যদি ধরে নেওয়া যায়, কুরআনের অর্থ- ভাণ্ডার এই ব্যক্তি শিখিয়ে দিয়েছে, তবে কুরআনের ভাষা ও তার অনুপম অলঙ্কাকার, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব অক্ষম- কোত্থেকে এসে গেল? কেননা] যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা অনারব এবং এ কুরআনের ভাষা সুস্পষ্ট আরবি। [কোনো অনারব ব্যক্তি এমন বাক্যাবলি কিরূপে রচনা করতে পারে? যদি বলা হয় যে, বাক্যাবলি রাসূলুল্লাহ ﷺ রচনা করে থাকবেন, তবে ঐ চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর পুরোপুরি জবাব হয়ে গেছে, যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আদেশে স্বীয় নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতার মাপকাঠি এ বিষয়কেই স্থির করেছিলেন যে, তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মানবরচিত কালাম হলে তোমরাও তো মানুষ এবং অনুপম ভাবালঙ্কারের দাবিদার। অতএব তোমরা তদনুরূপ কালাম বেশি না হোক এক আয়াত পরিমাণেই লিখে আন। কিন্তু সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এরপর নবুয়ত অস্বীকারকারী এবং কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,] যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে আল্লাহ কখনো সুপথে আনবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [এরা যে আপনাকে, নাউযুবিল্লাহ- মিথ্যা কালাম রচয়িতা বলছে] মিথ্যা রচনাকারী তো তারাই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং এরা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرًا : "আর আমি ভালো করেই জানি যে তারা বলে, তাকে এক ব্যক্তি শিক্ষা দিয়ে থাকে।" বলাবাহুল্য, কাফেররা অন্ধ বিদ্বেষে মেতে উঠেছিল, তাই এমন ভিত্তিহীন, আজগুবি কথা তারা বলেছে। যার সম্পর্কে তারা একথা বলে ইঙ্গিত করত, সে ব্যক্তিটি কে? আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চিহ্নিত করতে পারেনি।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে তারা এ মিথ্যা কথা বলত, তাকে নির্দিষ্ট করে কেউ এ পর্যন্ত তার নাম ঠিকানা বলেনি তবে ইবনে জারীর মসনদে অতি দুর্বল সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কা মুয়াযযামায় সে যুগে একজন অনারব খ্রিস্টান গোলাম ছিল, তার নাম ছিল বালআম। পেশার দিক থেকে সে ছিল একজন কামার। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বালআমের কোনো কোনো সময় কথাবার্তা হতো। তাই কাফেররা বলত লাগল, এই বালআমই তাঁকে কুরআন শিক্ষা দেয়।

হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, বনী মুগীরার ইয়াইশা নামক একজন গোলাম ছিল। হুজুর ﷺ তাকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। কাফেররা বলতে লাগল, এ ইয়াইশাই তাঁকে কুরআন শিক্ষা দেয়।

ইমাম ফররা বলেছেন, হুয়াইতব ইবনে আব্দুল ওযযার আয়েশ নামক এক গোলাম ছিল। সে অনারবি ভাষায় কথা বলত। কোনো কোনো কাফের বলত যে তিনি আয়েশ থেকেই কুরআন শিখে নেন। অবশেষে আয়েশ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী হয়েছিলেন।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ একজন রুমী ঈসায়ী গোলামের সঙ্গে কথা বলতেন, তার নাম ছিল জবর। সে বনীল হজরম গোত্রের এক ব্যক্তির গোলাম ছিল সে কিতাব পত্র পাঠ করতে পারত। আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম হাজরামী বর্ণনা করেন, আমাদের দুটি ইয়ামনী গোলাম ছিল। একজনের নাম ছিল ইয়াছার, আরেকজন ছিল জবর। তারা উভয়ে মক্কায় তরবারি তৈরি করত এবং তাওরাত ইঞ্জিল পাঠ করত। কখনো কখনো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিক দিয়ে অতিক্রম করতেন, তাদেরকে তাওরাত ইঞ্জিল পাঠ করতে দেখে তিনি তা তা শ্রবণ করতেন। ইবনে আবি হাতেম হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে একথাই বর্ণনা করেছেন।

যাহহাক (র.) বর্ণনা করেছেন, দুর্বৃত্তরা যখন হুজুর ﷺ -কে কষ্ট দিত, তখন তিনি এ দু ব্যক্তির সঙ্গে বসতেন এবং তাদের কথায় তিনি সান্ত্বনা লাভ করতেন। মুশরিকরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ এ দু ব্যক্তি থেকেই এসব কথা শিক্ষা করেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ পাক মুশরিকদের মিথ্যা কথার প্রতি উত্তরে ইরশাদ করেছেন।

-[তাফসীরে ইবনে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৮]

لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ তারা যার প্রতি ইঙ্গিত করে তার ভাষা অনারবি, অথচ এ কিতাব স্পষ্ট আরবি ভাষায় রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, 'আয়েশ' ছিলেন রুমী নওমুসলিম। পূর্বে ঈসায়ী ছিল। ইঞ্জিলের শিক্ষা সম্পর্কেও তার ভালো ধারণা ছিল। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথাবার্তা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। এজন্য তিনি কখনো কখনো তাঁর আবাসস্থলে গমন করতেন। শুধু এ কারণেই কাফেররা বলত যে, এ ব্যক্তির নিকটই তিনি কুরআন করীম শিক্ষা করতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরা দুজন গোলাম ছিল। কাফেররা তাদের সম্পর্কে একথা বলত। একবার কাফেররা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল তোমরাই কি মুহাম্মদ ﷺ কুরআন শেখাও? তারা বলল, আমরা তাঁকে কি করে শেখাব? বরং আমরাই তাঁর নিকট শিখি। এতদসত্ত্বেও তারা বলত- اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ 'তাকে একজন মানুষ এসে শিক্ষা দিয়ে যায়।'

মূলত পবিত্র কুরআনের ভাষার অলঙ্কার এবং মাধুর্য, নতুন নতুন তথ্য এবং তাৎপর্যমণ্ডিত শিক্ষা দেখে তারা বিস্মিত হতো এবং কে প্রিয়নবী ﷺ -কে এসব শিক্ষা দিত তার অনুসন্ধান করতে থাকত। ঐ অবস্থায় কখনো একজনের নাম বলত, কখনো আরেক জনের নাম বলত। -[তাফসীরে মাজেদী; খ. ১, পৃ. ৫৭১]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসলিম বলেছেন, রূমের অধিবাসী দু ব্যক্তি তাদের নিজেদের ভাষায় ইঞ্জিল পাঠ করত। কখনো হুজুর ﷺ ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করতেন। তারা যদি ইঞ্জিল পাঠ করত তবে তিনি তা শ্রবণ করতেন। এতেই মুশরিকরা এ গুজব রটিয়ে দেয় যে, প্রিয়নবী ﷺ এদের থেকে কুরআন শিক্ষা করেন।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র.) বর্ণনা করেন, কাফেরদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর ওহী লিপিবদ্ধ করত। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়। সে এসব আপত্তিকর কথা রটায়। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর; পারা ১৪, পৃ. ৫৮]

قَوْلُهٗ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ الخ : মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরি কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোনো গুনাহ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরি কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাঁদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরি অবলম্বন করতে বলেছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা, সুহায়েব, বেলাল এবং খাব্বাব (রা.)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়্যা কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়্যাকে দু উটের মাঝখানে বেঁধে উট দুটিকে দুদিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দুজন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খাব্বাবও কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফরির মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যখন কুফরি কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরজ করলেন, আমার অন্তরে ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্য কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোরজবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা : إِكْرَاهٌ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোরজবরদস্তির দুটি পর্যায় রয়েছে−

১. মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষমও অবশ্যও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে إِكْرَاهٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফরি বাক্য অথবা কোনো হারাম করা জায়েজ নয়। তবে কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহশাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

২. জোরজবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারগ করে দেওয়া যে, সে যদি জোরজবরদস্তিকারীদের কথামতো কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোনো অঙ্গহানি করা হবে। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে إِكْرَاهٌ مُلْجِئٌ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোরজবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফরি কালিমা উচ্চারণ করা জায়েজ। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোনো গুনাহ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোরজবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয়, তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে। −[তাফসীরে মাযহারী]

লেনদেন দু প্রকার। ১. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য যেমন কেনাবেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কুরআন বলে− إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ অর্থাৎ অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্মতিতে ব্যবস্থা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে− لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ অর্থাৎ কোনো মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মানের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়।

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে− জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনাবেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, না হয় বাতিলও করে দিতে পারে।

২. কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয় যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে−

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) অর্থাৎ দু ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোনো স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তালাক হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারও শুদ্ধ হবে। −[তাফসীরে মাযহারী]

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, শা'বী, যুহরী, নখয়ী ও ক্বাতাদাহ (র.) প্রমুখ বলেন, জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে− মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয় যেমন পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে, رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে।

Free@www.eilm.weebly.com

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোনো কথা অথবা কাজ শরিয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্য কোনো গুনাহ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্ষুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন অন্যজনকে ভুলবশত হত্যা করলে। এখানে হত্যার গুনাহ এবং পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুস পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরিয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধনসম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিবাহের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরিয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে। –[তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا : যারা অত্যাচারিত উৎপীড়িত হওয়ার পর হিজরত করেছে, এরপর আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে ও সবর অবলম্বন করেছে। এসব কিছুর পর [হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, কাফের, মুশরিক এবং মুরতাদ তাদের অবস্থা এবং পরিণাম বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। আর যারা কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়েছে এবং এরপর নিজের ভিটামাটি এমনকি প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করেছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছে, শত নির্যাতন সত্ত্বেও সবর অবলম্বন করেছে, এ আয়াতে তাদের জন্য মাগফেরাত এবং রহমতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

মক্কা মুয়াযযমায় যখন সর্বপ্রথম প্রিয়নবী ﷺ মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার স্থলে মক্কাবাসী শুধু যে তাঁর বিরোধিতা করল তাই নয়; বরং প্রিয়নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করল। কোনো কোনো সাহাবী ঐ অমানুষিক নির্যাতনের কারণে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কখনো অমানুষিক নির্যাতনের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রাণ রক্ষার তাগিদে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হতেন। যখন এমন বিপদ সাময়িকভাবে লাঘব হতো তখন ঐ ত্রুটির জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও ব্যথিত হতেন। তাঁরা অবশেষে হিজরত করেন মদিনা মুনাওয়ারায়, আলোচ্য আয়াতে তাঁদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ রয়েছে। কেননা তাঁরা ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেরদের দ্বারা চরম নির্যাতন ভোগ করেছেন। এরপর তাঁরা হিজরত করেছেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন, অত্যন্ত ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তাদের জন্য এ সুসংবাদ যে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি ক্ষমা করবেন এবং তিনি অত্যন্ত দয়াবান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١١. اُذْكُرْ يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ تُحَاجُّ عَنْ نَفْسِهَا لَا يُهِمُّهَا غَيْرُهَا وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ جَزَاءَ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا .

১১১. স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সমর্থনে বিতর্ককারী যুক্তি প্রদর্শন করে উপস্থিত হবে। সেদিন তার অন্য কারো চিন্তা হবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করা হবে না।

١١٢. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَيُبْدَلُ مِنْهُ قَرْيَةً هِىَ مَكَّةُ وَالْمُرَادُ اَهْلُهَا كَانَتْ اٰمِنَةً مِّنَ الْغَارَاتِ لَا تُهَاجُ مُّطْمَئِنَّةً لَا يَحْتَاجُ اِلَى الْاِنْتِقَالِ عَنْهَا لِضَيْقٍ اَوْ خَوْفٍ يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا وَاسِعًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ بِتَكْذِيْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ فَقَحَطُوْا سَبْعَ سِنِيْنَ وَالْخَوْفِ بِسَرَايَا النَّبِىِّ ﷺ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ .

১১২. এবং আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের মক্কানগরীর অর্থাৎ সেখানের অধিবাসীদের যা ছিল সকল লুণ্ঠন ও উসকানি-উত্তেজনা হতে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ভয়-ভীতি বা স্থান সংকীর্ণতার দরুন তথা হতে অন্যত্র গমনের প্রয়োজন ছিল না সর্বাদিক হতে সেখানে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর তারা রাসূল ﷺ -কে অস্বীকার করত আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে, তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা এবং রাসূল ﷺ প্রেরিত যোদ্ধা বাহিনীর ভীতির অস্বাদ ভোগ করালেন। একাধারে সাত বছর তারা দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। قَرْيَةً -এটা مَثَلًا-এর بَدْل বা স্থলাভিষিক্ত পদ। رَغَدًا এ স্থানে অর্থ প্রচুর।

١١٣. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ الْجُوْعُ وَالْخَوْفُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ .

১১৩. তাদের নিকট তো এক রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ এসেছে তাদের হতে কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল। ফলে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির শাস্তি পাকড়াও করল, আর তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

١١٤. فَكُلُوْا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ .

১১৪. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তন্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, সত্যিই যদি তোমরা ইবাদত কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١٥. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১১৫. আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতবস্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা, তবে কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ তো অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

١١٦. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمْ اَىْ لِوَصْفِ اَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِمَا لَمْ يُحِلَّهُ اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط بِنِسْبَةِ ذٰلِكَ اِلَيْهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ـ

১১৬. তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বিবরণানুসারে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করার জন্য যা তিনি হালাল করেননি তা তাঁর প্রতি সম্পর্কিত করে তা হালাল এবং যা তিনি হারাম করেননি তা তাঁর প্রতি আরোপ করে তা হারাম বলো না। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করবে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে না। لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ এটার مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ বা ক্রিয়ার উৎসবাচক শব্দ। অর্থ তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বিবরণের কারণে।

١١٧. لَهُمْ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ ـ

১১৭. তাদের সুখ-সম্ভোগ দুনিয়ায় সামান্য দিনের এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি।

١١٨. وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ج فِىْ اٰيَةِ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ اِلٰى اٰخِرِهَا وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ بِتَحْرِيْمِ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِى الْمُوْجِبَةِ لِذٰلِكَ ـ

১১৮. وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ الخ এ আয়াতটিতে তোমার নিকট পূর্বে যা বিবৃত করেছি ইহুদিদের জন্য আমি তো কেবল তাই নিষিদ্ধ করেছিলাম। আর ঐগুলো নিষিদ্ধ করত আমি তাদের উপর কোনো জুলুম করি নাই বরং এ জুলুমের কার্য-কারণ পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে তারাই তাদের নিজেদের প্রতি জুলুম করত।
اَلَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ ইহুদিগণ।

١١٩. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ الشِّرْكَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا رَجَعُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا عَمَلَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا اَىِ الْجَهَالَةِ اَوِ التَّوْبَةِ لَغَفُوْرٌ لَّهُمْ رَّحِيْمٌ بِهِمْ ـ

১১৯. অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকর্ম করে শিরক করে তারপর তারা তওবা করলে ফিরে আসলে এবং নিজেদের ক্রিয়া-কলাপ সংশোধন করলে তার পর অর্থাৎ অজ্ঞাতা বা তওবার পর তাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল তাদের প্রতি অতি দয়ালু।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تُحَاجُّ : যেহেতু تُجَادِلُ -এর সেলাহ عَنْ আসে না, এ কারণে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, تُجَادِلُ টা تُحَاجُّ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يُهِمُّهَا غَيْرَهَا : অর্থাৎ কারোর জন্য কারোর কোনো রকম চিন্তা পেরেশানি হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেকেই نَفْسِیْ نَفْسِیْ বলতে থাকবে।

قَوْلُهُ جَزَاءُ : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা تَوَفّٰی عَمَلْ -এর কোনো অর্থ হয় না যেহেতু اَعْرَاض -এর স্থানান্তর হয় না।

قَوْلُهُ لَا تُهَاجُ : এটা اَهَاجَ الْغُبَارَ থেকে নির্গত অর্থাৎ ধুলাবালি উড়িয়েছে।

قَوْلُهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ : ক্ষুধা এবং ভয়কে পোশাকের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। উভয়ের মধ্যে وَجْهُ شِبْه হলো এই যে, যেমনিভাবে ক্ষুধা ও ভীতি মানুষের শরীরকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলে। কেননা এ উভয়টির প্রতিক্রিয়া শরীরের উপর হয়ে থাকে। এমনিভাবে পোশাকও শরীরকে বেষ্টন করে ফেলে। এ কারণেই ক্ষুধা ও ভয়ের প্রতিক্রিয়াকে পোশাকের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর اِدْرَاكْ -কে আস্বাদনের দ্বারা এজন্য ব্যক্ত করেছেন যে, আস্বাদনের দ্বারাও কোনো বস্তুর اِدْرَاكْ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لِوَصْفِ اَلْسِنَتِكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِمَا تَصِفُ -এর মধ্যে مَا টা হলো مَصْدَرِيَّةْ

قَوْلُهُ اَلْكَذِبَ : এটা لَا تَقُوْلُوْا -এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ : এটা اَلْكَذِبَ হতে بَدْل হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ مَتَاعٌ : এখানে مَتَاعٌ قَلِيْلٌ হলো مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ আর لَهُمْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ -

প্রশ্ন. يَوْمَ تَاْتِیْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا এখানে একটি এই প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, عَنْ نَفْسِهَا -এর মধ্যে نَفْس -এর ইযাফত نَفْس -এর দিকে হচ্ছে। অথচ مُضَافْ এবং مُضَافْ اِلَيْهِ-এর মাঝে পরিবর্তন হওয়া জরুরি। অন্যথায় اِضَافَةُ الشَّيْئِ اِلٰی نَفْسِهٖ আবশ্যক হবে।

উত্তর. প্রথম نَفْس দ্বারা جِسْمِ اِنْسَانِیْ উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় نَفْس দ্বারা ذَاتْ উদ্দেশ্য। ইবারত হলো এরূপ যে, كُلُّ اِنْسَانٍ يُجَادِلُ عَنْ ذَاتِهٖ وَلَا يُهِمُّ غَيْرَهَا আর مُجَادَلَةْ অর্থ হলো ওজরখাহী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ تَاْتِیْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا : **কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা :** আলোচ্য আয়াতেও কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ করার তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে- يَوْمَ تَاْتِیْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন প্রত্যেকেই নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করতে করতে হাজির হবে। ঐ সংকটময় মুহূর্তে প্রত্যেকেই নিজের নিজের চিন্তায় এত বিভোর এবং ব্যস্ত থাকবে যে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ভাইবেরাদর, পিতামাতা কারো উপকার করা তো দূরের কথা; অন্যের সম্পর্কে চিন্তা করারও সুযোগ পাবে না। সেদিন সকলেই নিজের চিন্তায় অস্থির থাকবে, নিজের কৃতকর্মের কি কৈফিয়ত দেবে, বা কি সাফাই পেশ করবে, প্রত্যেকে এ চিন্তায় মগ্ন থাকবে। প্রত্যেকে আপন মনে প্রশ্নোত্তর তৈরি করতে করতে হাজির হবে। আল্লাহ পাকের দরবারে অবিচার নেই, সকলেই তার জীবনের যাবতীয় কুকর্মের যথার্থ ফল পুরোপুরি পাবে। সেদিন প্রত্যেকেই আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে। কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতাদের কথা মেনে পথভ্রষ্ট হয়েছি। আমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রেরণ করুন, আমরা নেক আমল করব। মুমিন বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে রক্ষা করুন, আজাব থেকে পানাহ চাই। হে প্রতিপালক! আমাকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।

দোজখকে কোথা থেকে আনা হবে : হযরত ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে হযরত মু'আয (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয় কিয়ামতের দিন দোজখকে কোথা থেকে আনা হবে? তিনি ইরশাদ করেন, জমিনের সপ্তম স্তর থেকে। তার এক হাজার লাগাম হবে, প্রত্যেক লাগামকে সত্তর হাজার ফেরেশতা ধরে টানবে। দোজখ যখন মানুষ থেকে এক হাজার বছরের দূরত্বে থাকবে, তখন সে একটি নিঃশ্বাস ফেলবে, যার কারণে প্রত্যেক নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত মাটিতে বসে পড়বেন এবং আরজ করবেন, হে আমার মালিক! আমাকে রক্ষা করুন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আখেরাতের আলোচনা : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত ওমর (রা.) একবার কা'ব আহবারকে বলেছিলেন, আখেরাতের আলোচনা করুন, যাতে করে আমাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হয়।

কা'ব আহবার আরজ করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি সত্তরজন পয়গাম্বরের সমান নেক আমল করে আপনি কিয়ামতের দিন হাজির হন, তবুও সেদিন এমন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবেন যে নিজের প্রাণরক্ষা ছাড়া আর কারো কথা আপনার মনেও হবে না। দোজখ এমন এক ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস ফেলবে, যার কারণে প্রত্যেক নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং প্রত্যেক নবী-রাসূল বসে পড়বেন এমনকি হযরত হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) পর্যন্ত বলে উঠবেন, হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমার নিকট আমার প্রাণের নিরাপত্তা চাই। আলোচ্য আয়াতেই রয়েছে সেই অবস্থার বিবরণ। এরপর কা'ব আহবার আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন– يَوْمَ تَأْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

হযরত ইকরিমা (র.) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে একাধারে ঝগড়া হতে থাকবে এমনকি একটি মানুষের রূহ এবং দেহের মধ্যেও ঝগড়া হবে। রূহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাত ছিল না যে আমি কোনো কিছু ধরব, আমার পা ছিল না যে আমি কোথাও যাব, আমার চক্ষু ছিল না যে আমি কিছু দেখব, যা কিছু অন্যায়-অনাচার হয়েছে, তা শুধু দেহেরই কাজ আমার নয়। আর দেহ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় প্রাণহীন সৃষ্টি করেছ, আমার হাত ছিল না যে আমি ধরব, আমার পা ছিল না যে আমি চলব, আমার চক্ষু ছিল না যে আমি দেখব, কিন্তু এই রূহ যখন আমার মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় প্রবেশ করল, তখন আমার রসনা কথা বলতে লাগল, আমার নয়ন যুগল দেখতে লাগল, আমার পা চলতে লাগল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ পাক রূহ এবং দেহকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যেমন একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু ব্যক্তি কোনো বাগানে পৌঁছল, বাগানের বৃক্ষগুলোতে অনেক ফল ধরে রয়েছে, অন্ধ ব্যক্তি তো ফল দেখতেই পারেনি, আর পঙ্গু ব্যক্তি ফল দেখছিল কিন্তু ফলের কাছে পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তখন অন্ধ ব্যক্তি পঙ্গু লোকটিকে তার কাঁধে তুলে নিল এবং উভয়ে ফল তুলে নিল। [আর চুরির অপরাধে উভয়ে ধৃত হলো] এভাবেই কেয়ামতের দিন রূহ এবং দেহ পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত হবে এবং আজাবের জন্যে তাদের পাকড়াও করা হবে।

تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا : প্রত্যেকেই সেদিন নিজের তরফ থেকে সওয়াল জবাব করবে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই সেদিন নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট থাকবে।

وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে সেদিন কোনো প্রকার অবিচার করা হবে না। তথা সেদিন সকলের ছওয়াব পুরোপুরি দেওয়া হবে, কারো ছওয়াব এতটুকু কম করা হবে না, কারো হক বিনষ্ট করা হবে না, কাউকে অযথা বা অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে না। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ৪৫০-৫১]

قَوْلُهُ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ الخ : **উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় :** এ আয়াতে ব্যবহৃত اِنَّمَا শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ حَرَامًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো বস্তু হারাম নয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও অনেক বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তসমূহের তালিকা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল অথচ আল্লাহ তদ্রূপ কোনো নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তাফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল কুরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাকারার ১৭৩ আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।

যে গুনাহ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গুনাহ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে : আয়াতে ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ -এর جَهْل শব্দ নয়; বরং جَهَالَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جَهْل শব্দটি عِلْم-এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে আসে। পক্ষান্তরে جَهَالَةٌ -এর অর্থ হয় মূর্খতাসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বুঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গুনাহই মাফ হয় না; বরং যে গুনাহ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٢٠. اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً اِمَامًا قُدْوَةً جَامِعًا لِخِصَالِ الْخَيْرِ قَانِتًا مُطِيْعًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا ط مَائِلًا اِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

১২০. ইবরাহীম তো ছিলেন এক উম্মত অর্থাৎ নেতা, পরিচালক ও সকল মঙ্গলময় চরিত্রের সমাবেশকারী আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ সত্য ও সরল ধর্মের প্রতি ছিল অনুরক্ত এবং সে অংশীবাদদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। قَانِتًا অনুগত।

١٢١. شَاكِرًا لِاَنْعُمِهِ ط اِجْتَبٰهُ اِصْطَفَاهُ وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

১২১. সে ছিল তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনিই তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। اِجْتَبٰهُ তাকে মনোনীত করেছিলেন।

١٢٢. وَاٰتَيْنٰهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ط هِىَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِىْ كُلِّ اَهْلِ الْاَدْيَانِ وَاِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى

১২২. এবং তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল সকল ধর্মাবলম্বীর নিকট তাঁর সুনাম ও প্রশংসা রয়েছে এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের যাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা তাদের অন্যতম। اٰتَيْنٰهُ এ স্থানে غَيْبَةٌ অর্থাৎ নামরুপুরুষবাচক রূপ হতে اِلْتِفَاتٌ অর্থাৎ রূপান্তর হয়েছে।

١٢٣. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ دِيْنِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَرَّرَ رَدًّا عَلٰى زَعْمِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اِنَّهُمْ عَلٰى دِيْنِهِ .

১২৩. হে মুহাম্মদ অতঃপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের ধর্মাদর্শের অনুসরণ কর, আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ যারা তাঁকে স্ব-স্ব ধর্মের অনুসারী বলে ধারণা করে তার প্রতিবাদ স্বরূপ এ স্থানে এই বক্তব্যটির পুনরুক্তি করা হয়েছে।

١٢٤. اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ فُرِضَ تَعْظِيْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط عَلٰى نَبِيِّهِمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ اُمِرُوْا اَنْ يَّتَفَرَّغُوْا لِلْعِبَادَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالُوْا لَا نُرِيْدُهُ وَاخْتَارُوْا السَّبْتَ فَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ فِيْهِ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِهِ بِاَنْ يُّثِيْبَ الطَّائِعَ وَيُعَذِّبَ الْعَاصِىَ بِانْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ .

১২৪. শনিবার পালন তো নির্ধারিত করা হয়েছিল অর্থাৎ ঐ দিবসটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ফরজ করা হয়েছিল তাদের জন্যই যারা এ বিষয়ে তাদের নবীর সাথে মতবিরোধ করেছিল অর্থাৎ ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর। জুমার দিন শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য খালি রাখতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা বলেছিল, আমরা ঐ দিনটিকে চাই না, শেষে তারা নিজেরাই শনিবার দিনটিকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, সেহেতু এ দিনটিতে তাদের উপর অতি কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। কিয়ামতের দিন তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তাঁর বিধানের যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল সে বিষয়ে তাদের ফয়সালা করে দেবেন। অর্থাৎ অনুগতদেরকে পুণ্যফল দান করবেন এবং তৎকৃত হারামের সীমা ভেঙ্গে যারা পাপী হলো তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٢٥. أُدْعُ النَّاسَ يَا مُحَمَّدُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ دِيْنِهٖ بِالْحِكْمَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ مَوَاعِظِهٖ اَوِ الْقَوْلِ الرَّفِيْقِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ اَيْ بِالْمُجَادَلَةِ الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ كَالدُّعَاءِ اِلَى اللّٰهِ بِاٰيَاتِهٖ وَالدُّعَاءِ اِلٰى حُجَجِهٖ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ اَيْ عَالِمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ فَيُجَازِيْهِمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ .

১২৫. হে মুহাম্মদ! তুমি মানুষকে তোমার প্রভুর পথের দিকে ধর্মের দিকে আহ্বান কর হিকমত আল কুরআন এবং সদুপদেশ দ্বারা ওয়াজ-নসিহত বা বিনম্র কথায় এবং তাদের সাথে আলোচনা কর এমন বিতর্কের মাধ্যমে যা সুন্দর যেমন আল্লাহর প্রতি আহ্বান কর তাঁর নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে এবং তাঁর যুক্তি-প্রমাণাদির মাধ্যমে। কে তাঁর পথ হতে বিপথগামী সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই অধিক সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে সেই বিষয়ও তিনি অধিক অবহিত সুতরাং তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন। এটা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংক্রান্ত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের বিধান ছিল। اَعْلَمُ এটা تَفْضِيْل বা তুলনামূলক শব্দ হলেও এ স্থানে عَالِمٌ [অবহিত] সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

١٢٦. وَنَزَلَ لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ وَمُثِّلَ بِهٖ فَقَالَ ﷺ وَقَدْ رَاٰهُ لَاُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِيْنَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ عَنِ الْاِنْتِقَامِ لَهُوَ اَيِ الصَّبْرُ خَيْرٌ لِلصّٰبِرِيْنَ فَكَفَّ ﷺ وَكَفَّرَ عَنْ يَمِيْنِهٖ رَوَاهُ الْبَزَّارُ .

১২৬. উহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা নিহত হন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করে তার চেহারা বিকৃত করা হয়। এতদদর্শনে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'আপনার স্থলে সত্তরজন কাফেরের আমি অবশ্যই এই দশা করব।' এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন– আর যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে তবে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে যদি ধৈর্যধারণ কর তবে তা অর্থাৎ ধৈর্যধারণ ধৈর্যশীলদের জন্য অবশ্যই উত্তম। বাযযার বর্ণনা করেন, অনন্তর রাসূল ﷺ উক্ত সংকল্প হতে বিরত হয়ে গেলেন এবং কসমের কাফফারা আদায় করে দেন।

١٢٧. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ بِتَوْفِيْقِهٖ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اَيِ الْكُفَّارِ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا لِحِرْصِكَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ اَيْ لَا تَهْتَمَّ بِمَكْرِهِمْ فَاَنَا نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ .

১২৭. এবং ধৈর্যধারণ কর, আর আল্লাহর সাহায্যে তাঁরই প্রদত্ত তাওফীকে হবে তোমার এই ধৈর্যধারণ। যদি ঈমান গ্রহণ নাও করে তবুও তুমি তোমার আগ্রহের কারণে তাদের উপর কাফেরদের সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না তোমারও তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমিই তোমাকে এদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٢٨. إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيَ وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ بِالطَّاعَةِ وَالصَّبْرِ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ.

১২৮. আল্লাহ তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা সহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে আছেন যারা কুফর ও পাপকর্ম হতে বেঁচে থাকে এবং যারা আনুগত্য প্রদর্শন ও ধৈর্যধারণ করত সৎকর্ম অবলম্বন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أُمَّةً : أُمَّةٌ শব্দের ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর أُمَّةٌ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এটা হয়তো এ কারণে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একাকী صِفَاتْ كَمَالِيَهْ -এ- جَامِعْ হওয়ার হিসেবে এক উম্মতের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। যেমন কোনো কবি বলেন–

لَيْسَ مِنَ اللّٰهِ بِمُسْتَنْكِرٍ * أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِدٍ

দ্বিতীয় কারণ হলো তিনি স্বীয় যুগে একাই মুমিন ছিলেন, বাকি সকলেই কাফের ছিল। এ কারণেই তাঁকে উম্মত বলা হয়েছে। তৃতীয়. কারণ হলো أُمَّةٌ অর্থ مَأْمُوْمٌ তথা ইমাম ও অনুসরণযোগ্য; যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا উল্লিখিত তিনটি ব্যাখ্যার আলোকে এই প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর أُمَّةٌ-এর প্রয়োগ বৈধ নয়। কেনেনা হযরত ইবরাহীম (আ.) একা ছিলেন। আর أُمَّةٌ -এর إِطْلَاقٌ বহুবচনের উপর হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اجْتَبَاهُ : অর্থাৎ لِلنُّبُوَّةِ তথা নবীরূপে তাঁকে নির্বাচন করেছেন।

قَوْلُهُ فَرْض : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جَعْلٌ টা فَرْض অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعْظِيْمَهُ : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে– কেননা فَرْض -এর- تَعَلُّقْ ফে'লের সাথে হয় اَشْيَا -এর সাথে নয়।

قَوْلُهُ الْقَوْلُ الرَّفِيْقُ : رَفِيْق শব্দটি رِفْقٌ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো– নম্রতা ও সহজতা। উদ্দেশ্য এই যে, দীনের দাওয়াত নরম ও মিষ্ট ভাষায় দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا الخ : **পূর্বাপর সম্পর্ক :** পূর্ববতী আয়াতসমূহ শিরক ও কুফরের মূল অর্থা তাওহীদ ও রেসালতের অস্বীকৃতি খণ্ডন এবং কুফর ও শিরকের কতিপয় শাখা অর্থাৎ হারামকে হালাল করা ও হালালকে হারাম করার বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বাতিল করা হয়েছিল। কুরআন পাকের সম্বোধনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়। মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এরা দাবি করত যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড হযরত ইবরাহীম (আ.)-এরই শিক্ষা। তাই আলোচ্য চারটি আয়াতে তাদের এ দাবি খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরই স্বীকৃত নীতি দ্বারা তাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বাতিল প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাতিল এভাবে করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচটি আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশ্বের জাতিসমূহের সর্বজন স্বীকৃত অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এটা নবুয়ত ও রিসালতের সর্বোচ্চ স্তর। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন মহান পয়গাম্বর ছিলেন। এর সাথেই مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন নিষ্কলুষ একত্ববাদী ছিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে তিনি যে কৃতজ্ঞ এবং সরল পথের অনুসারী ছিলেন, একথা বর্ণনা করে মুশরিকদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েও নিজেদেরকে কোন মুখে হযরত ইবরাহীমে (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করছ? তৃতীয় আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইহকাল ও পরকালে সফলকাম ছিলেন। চতুর্থ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত প্রমাণ করার সাথে সাথে তিনি যে যথার্থ মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী, একথা বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি নিজেদের দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্য ব্যতীত এ দাবি সত্য হতে পারে না।

قَوْلُهُ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ : এই পঞ্চম আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মিল্লাতে ইবরাহীমীতে পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম ছিল না। তোমরা এগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছ।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গুণাবলি : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করেছেন।

১. أُمَّةً তিনি ছিলেন সকলের মুরব্বি, সকলের জন্যে চির অনুসরণীয়।

২. قَانِتًا আল্লাহ পাকের হুকুমের তাবেদার।

৩. حَنِيْفًا সবদিক থেকে বিমুখ হয়ে শুধু এক আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশকারী।

৪. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ তিনি মুশরিক ছিলেন না, শিরক থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তৌহিদের উপর কায়েম ছিলেন।

৫. شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهِ আল্লাহ পাকের শোকরগুজার বান্দা।

৬. اِجْتَبٰهُ আল্লাহ পাক তাঁকে মনোনীত করেছেন।

৭. وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ তিনি ছিলেন সঠিক পথের অনুসারী, আল্লাহ পাক তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

৮. وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ দান করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর বংশেও বরকত দান করেছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

৯. وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ এবং আখেরাতেও নিঃসন্দেহে তিনি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।

১০. সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি আদেশ হয়েছে যেন তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করেন।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যেসব গুণাবলি বর্ণনা করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সর্বপ্রথম ইরশাদ হয়েছে, তিনি ছিলেন উম্মত। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং একটা জাতির সমতুল্য। আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, অদ্বিতীয়তা প্রকাশে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সোচ্চার। যে কারণে জালেম নমরূদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, উম্মত অর্থ ইমাম। যার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়, যার অনুসরণ করা হয়। আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামূসে উম্মত শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– উম্মত সেই ব্যক্তি, যার মাঝে বিপুল গুণের সমাবেশ হয়, সেই ব্যক্তি, যিনি সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকেন, যিনি সকল বাতিল ধর্মের বিরোধী হন।

বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে এত গুণ একত্রিত হয়েছিল যা বহু লোকের মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর। তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং চিরস্মরণীয় ও চির অনুকরণীয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সত্যের ধারক, বাহক, প্রবর্তক, সত্য পথ প্রদর্শক, তৌহিদ বা একত্ববাদের মূর্ত প্রতীক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন সত্যের মহান শিক্ষক, সারা বিশ্বের মানুষ তাঁর অনুসরণের দাবিদার।

হযরত মুজাহেদ (র.) বলেছেন, উম্মত শব্দটির তাৎপর্য হলো এই যে, সারা বিশ্ববাসী যখন কাফের ছিল তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই ছিলেন মুমিন। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২০, পৃ. ১৩৪]

قَانِتًا لِّلّٰهِ এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مُطِيْعًا لِّلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত। আর حَنِيْفًا হলো শিরক বর্জনকারী এবং তৌহিদ অবলম্বনকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -কে যখন أُمَّةً قَانِتًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন, মানুষকে কল্যাণকর কাজের শিক্ষা দানকারী এবং আল্লাহ পাকের অনুগত রাসূল ﷺ -এর অনুসারী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে أُمَّةً শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, দীনের মহান শিক্ষক।

হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.) হেদায়েতের ইমাম ছিলেন, আল্লাহ পাকের গোলাম ছিলেন, আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহের জন্যে শোকরগুজার ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধানের উপর আমলকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবী এবং রাসূল হিসাবে মনোনীত করেছেন। তিনি ছিলেন সত্য সাধক, তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহ্বায়ক।

মক্কার কাফেররা বলত যে, আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দীনের উপর রয়েছি। আল্লাহ পাক তাদের এ মিথ্যা দাবি প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করলেন– وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "তিনি মুশরিক ছিলেন না," অথচ তোমরা মুশরেক। ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি শৈশব কাল থেকেই তৌহিদপন্থি ছিলেন এবং তৌহিদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweeply.com

قَوْلُهُ اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ الخ : **দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম :** আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়স্বজনরা অনুরোধ করল– আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, মানুষ সাধারণত অর্থসম্পদের ব্যাপারে অসিয়ত করে। অর্থসম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে অসিয়ত করছি : এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دَعْوَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– ডাকা, আহ্বান করা। পয়গাম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রাসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ পদবি হচ্ছে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়া। সূরা আহযাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে– وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا এবং সূরা আহকাফের ৩১নং আয়াতে বলা হয়েছে– يَا قَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের উপরও ফরজ করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে আছে– وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। অন্য আয়াতে আছে– وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ কথাবার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى اللّٰهِ কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى الْخَيْرِ এবং কোনো কোনো সময় دَعْوَتُ اِلٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ শিরোনাম দেওয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ : এতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ رَبٌّ [পালনকর্তা] উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তার উপর বোঝা না চাপে এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা পয়গাম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধিবিধান পৌঁছিয়ে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ 'হিকমত' শব্দটি কুরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ স্থলে কোনো কোনো তাফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কুরআন, কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল মা'আনী বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তাফসীর নিম্নরূপ করেছেন– اِنَّهَا الْكَلَامُ الصَّوَابُ الْوَاقِعُ مِنَ النَّفْسِ اَجْمَلَ مَوْقِعٍ অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তাফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এ অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন– "হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুয়েমিভাবেও সৃষ্টি হয় না।"

اَلْمَوْعِظَةُ - مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত তার কাছে কবুল করার ছওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা। [কামূস, মুফরাদাতে রাগিব]

اَلْحَسَنَةُ-এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই– শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَوْعِظَةً শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حَسَنَةً শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ - جَادِلْ শব্দটি مُجَادَلَةٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এখানে مُجَادَلَةٌ বলে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক বুঝানো হয়েছে। بِالَّتِيْ هُوَ اَحْسَنُ -এর অর্থে এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্কবিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্কবিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন মুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ অবলম্বন না করে। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে, وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ অন্য আয়াতে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে قَوْلًا لَهٗ قَوْلًا لَيِّنًا নির্দেশ নিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে– ১. হিকমত, ২. সদুপদেশ এবং ৩. উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠু পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশত বলছে– আমাকে লজ্জিত করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এ স্থলে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায় আসলে দুটি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি– হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোনো কোনো সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে উপরিউক্ত গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে, যদি তিনটি বিষয়ই মূলনীতি হতো, তবে স্থানের তাগিদ অনুসারে তিনটি বিষয়কেই عَطْف যোগে এভাবে বর্ণনা করা হতো– بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْجِدَالِ الْاَحْسَنِ কিন্তু কুরআন পাক হিকমত ও উপদেশকে عَطْف যোগে একই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে কিন্তু বিতর্কের জন্য আলাদা বাক্য جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ অবলম্বন করেছে। এতে জানা যায় যে, শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক আসলে দাওয়াতের স্তম্ভ অথবা শর্ত নয়; বরং দাওয়াতের পথে সংঘটিত ব্যাপারাদি সম্পর্কে একটি নির্দেশ মাত্র। যেমন, এর পরবর্তী আয়াতে সবর করার কথা বলা হয়েছে। কেননা দাওয়াতের পথে মানুষ যে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তজ্জন্য সবর করা অপরিহার্য।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দুটি– হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোনো দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলেম ও বিশেষ শ্রেণির লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্কবিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় তর্কবিতর্ক করার শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -এর শর্ত জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যে তর্কবিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরিয়তে তার কোনো মর্যাদা নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ : এ বাক্যটি দীনের প্রতি দাওয়াতদাতাদের সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে। কেননা পূর্বোল্লিখিত নীতি ও আদবের অনুসরণ সত্ত্বেও যখন প্রতিপক্ষ সত্য গ্রহণ না করে, তখন স্বভাবত মানুষ দারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং মাঝে মাঝে এর এমন প্রতিক্রিয়াও হতে পারে যে, দাওয়াতের কোনো উপকার না দেখে দাওয়াতদাতা নিরাশ হয়ে তা বর্জন করে বসতে পারে। তাই এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু নির্ভুল নীতি অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করে যাওয়া। দাওয়াত কবুল করা বা না করা, এতে আপনার কোনো দখল নেই এবং এটা আপনার দায়িত্ব নয়। এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাজ। তিনিই জানেন কে পথভ্রষ্ট থাকবে এবং কে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আপনি এ চিন্তায় পড়বেন না। নিজের কাজ করে যান। সাহস হারাবেন না এবং নিরাশ হবেন না। এতে বুঝা গেল যে, এ বাক্যটিও দাওয়াতের আদবেরই পরিশিষ্ট।

দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েজ, কিন্তু সবর করা উত্তম : বিগত আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে দাওয়াতদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর-প্রাণ মূর্খদের সাথেও পালা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নম্রতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বুঝানো হোক না কেন তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কটুকথা বলে কষ্ট দেয় এবং কোনো কোনো সময় আরও বাড়াবাড়ি করে দাওয়াতদাতাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়, এমনকি তাদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতাদের কি করা উচিত?

এ সম্পর্কে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ الخ বাক্যে প্রথমত তাদেরকে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায় তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযূল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন : সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দারাকুতনী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধ-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তরজন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা.)-এর মৃতদেহও ছিল। তাঁর প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তাই তাঁকে হত্যা করার পর মনের ঝাল মিটাতে গিয়ে তাঁর নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তরজনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَاِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীর মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।

–[তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাব্বান]

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তরজন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহর কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণেই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তরজনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ন্যায়ানুগ আচরণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেবে না। এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার এটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয়

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বারবার নাজিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করল আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোনো মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে। -[জাস্সাস]

মাসআলা : আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে সেই পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত হলো, অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকাপয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকাপয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে পারবে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্যশস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু একপ্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। উদাহরণত টাকাপয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোনো ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোনো কোনো ফিকহবিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন- একপ্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকহগ্রন্থের দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ : আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে- وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না- সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহর সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য অর্জিত হওয়ার একটি সাধারণ কায়দা বলে দেওয়া হয়েছে যে- اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দুটি গুণে গুণান্বিত। ১. তাকওয়া, ২. ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহসানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ যারা শরিয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গ [সাহায্য] অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

الْجُزْءُ الْخَامِسُ عَشَرَ : পনেরোতম পারা

سُوْرَةُ الْإِسْرَاءِ مَكِّيَّةٌ : اِلَّا وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ الْاٰيَةَ الثَّمَانَ مِائَةٌ وَّعَشْرُ اٰيَاتٍ اَوْ اِحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً

সূরা আল-ইসরা, মক্কায় অবতীর্ণ। কিন্তু وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ হতে আটটি আয়াত ব্যতীত একশত দশ বা একশত এগারো আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

Free @ www.eilm.weebly.com

١. سُبْحٰنَ تَنْزِيْهُ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ مُحَمَّدٍ لَيْلًا نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِ وَالْإِسْرَاءُ سَيْرُ اللَّيْلِ وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ الْإِشَارَةُ بِتَنْكِيْرِهٖ إِلٰى تَقْلِيْلِ مُدَّتِهٖ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ مَكَّةَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِبُعْدِهٖ مِنْهُ الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ بِالثِّمَارِ وَالْاَنْهَارِ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط عَجَائِبَ قُدْرَتِنَا إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ اَيِ الْعَالِمُ بِاَقْوَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَفْعَالِهٖ فَاَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالْإِسْرَاءِ الْمُشْتَمِلِ عَلٰى اِجْتِمَاعِهٖ بِالْاَنْبِيَاءِ وَعُرُوْجِهٖ إِلَى السَّمَاءِ وَرُؤْيَتِهٖ عَجَائِبَ الْمَلَكُوْتِ وَمُنَاجَاتِهٖ لَهٗ تَعَالٰى. فَإِنَّهٗ ﷺ قَالَ اُتِيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ اَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهٗ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهٖ.

অনুবাদ :

১. পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর নিদর্শনসমূহ কুদরতের অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি দেখানোর জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন سُبْحَانَ পবিত্রতা তাঁরই। لَيْلًا এটা ظَرْف [স্থান বা কালবাচক] শব্দরূপে এ স্থানে مَنْصُوْب ব্যবহৃত হয়েছে। اِسْرَاءُ শব্দের অর্থ যদিও রাত্রিতে পরিভ্রমণ করা তবুও এ স্থানে نَكِرَة অর্থাৎ অনির্দিষ্টবাচক রূপে لَيْلًا শব্দটি উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে সময়ের স্বল্পতার প্রতি ইঙ্গিত করা। মাসজিদুল হারাম থেকে অর্থাৎ মক্কা থেকে মাসজিদুল আকসায় বায়তুল মুকাদ্দাসে যার চতুষ্পার্শ্ব আমি ফল-ফলাদি ও নদীনালা দ্বারা করেছি বরকতময়। তিনি অবশ্যই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর কথাবার্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি অবহিত। সেই রাতে নবীগণের একত্রিত সমাবেশ, আকাশে আরোহণ, সৃষ্ট-সাম্রাজ্যের অত্যাশ্চর্য বিষয়াদি দর্শন আল্লাহ তা'আলার সাথে আলাপন ইত্যাদি বহু বিষয় সংবলিত 'ইসরা'-এর নিয়ামত দ্বারা তাঁকে বিভূষিত করেছিলেন তিনি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমার জন্য বোরাক আনয়ন করা হলো। তা গর্দভ অপেক্ষা কিছু বড় ও খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি প্রাণী। এত দ্রুতগতি সম্পন্ন যে দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে এর এক এক কদম পড়ে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَرَكِبْتُهُ فَسَارَ بِىْ حَتّٰى اُتِيْتُ بَيْتَ
الْمُقَدَّسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِىْ
يَرْبِطُ فِيْهَا الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ
فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِىْ
جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ
وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ قَالَ
جِبْرَئِيْلُ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِىْ
اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ
قِيْلَ لَهُ مَنْ اَنْتَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ
مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ
قَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاٰدَمَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِىْ وَ دَعَا لِىْ بِخَيْرٍ
ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ
فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ فَقَالَ
جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ
قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ
فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِابْنَىِ الْخَالَةِ يَحْيٰى
وَعِيْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَرَحَّبَا بِىْ
وَدَعَوَا لِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ
الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ
قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ
ﷺ فَقِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ـ

অনন্তর আমি তাতে আরোহণ করলাম। আমাকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসা হলো। অন্যান্য নবীগণ যে আংটাটিতে নিজেদের বাহন বাঁধতেন আমিও সে স্থানে তাকে বাঁধলাম। অতঃপর আমি তাতে প্রবেশ করলাম এবং দু-রাকাত নামাজ পড়লাম। পারে বের হলাম। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এক পেয়ালা মদ ও এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন। আমি দুধেরটি গ্রহণ করলাম। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি সঠিক স্বভাবের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমাকে নিয়ে পৃথিবীর আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্ঘাটন করতে বললেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অতঃপর দ্বার খুলে দেওয়া হলো। সে স্থানে হযরত আদম (আ.) -কে পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্ঘাটন করা হলো। সে স্থানে দুই খালাতো ভাই হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর তৃতীয় আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল?

قَالَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيْسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَ دَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُوْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَ دَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيْلُ فَقِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সেখানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁকে যেন [illegible] সৌন্দর্যের অর্ধেকই দান করা হয়েছে। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর চতুর্থ আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত ইদরীস (আ.)-এর সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর পঞ্চম আসমানে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত হারূন (আ.)-এর সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর ষষ্ঠ আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে মারহাবা জানালেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর সপ্তম আকাশে আরোহণ করা হলো। হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। বলা হলো, তাঁকে আনতে কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রেরণ করা হয়েছিল। অনন্তর দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হলো। সে স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ مَا غَشِيَهَا تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا قَالَ فَأَوْحَى إِلَيَّ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ وَإِنِّيْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّيْ فَقُلْتُ أَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِيْ فَحَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى قَالَ مَا فَعَلْتَ قُلْتُ قَدْ حَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ وَبَيْنَ مُوْسَى وَيَحُطُّ عَنِّيْ خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ ﷺ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِكُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرٌ فَتِلْكَ خَمْسُوْنَ صَلَاةً.

তিনি 'বায়তুল মামূর'-এ হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাতে [বায়তুল মামূরে] প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। পুনর্বার আর তারা তাতে প্রবেশের সুযোগ পান না। অতঃপর আমাকে 'সিদরাতুল মুন্তাহা'য় নিয়ে আসা হলো। এর পাতাগুলো ছিল হাতির কানের মতো বিরাট আর ফলগুলো ছিল মটকার মতো বড়। আল্লাহর হুকুমে যখন তাকে যা আচ্ছাদিত করার আচ্ছাদিত করে তখন তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে সক্ষম সৃষ্টির মধ্যে কেউ নেই। রাসূল ﷺ বলেন, অনন্তর আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা ওহি করার তা ওহি করলেন এবং প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করলেন। অতঃপর আমি নেমে আসলাম। হযরত মূসার নিকট গিয়ে পৌঁছলে তিনি বললেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলা কি ফরজ করলেন? বললাম, প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, পুনরায় প্রভুর দরবারে ফিরে যান; আরো সহজ করে দিতে প্রার্থনা করুন। আপনার উম্মত এটা পারবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা করেছি। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন, আমি প্রভুর দরবারে পুনরায় ফিরে গেলাম। আরজ করলাম, হে প্রভু! আমার উম্মতের জন্য আরো সহজ করে দিন। আমার উম্মতের দায়িত্ব থেকে তখন পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করে দেওয়া হলো। পুনরায় হযরত মূসার নিকট আসলে তিনি বললেন, কি করলেন? বললাম, পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এখনও তা পারবে না। প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করে দিতে আবেদন করুন। রাসূল ﷺ বলেন, এভাবে আল্লাহর দরবার ও মূসার মাঝে আসা-যাওয়া করলাম। প্রতিবারই পাঁচ ওয়াক্ত করে হ্রাস করা হলো। শেষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে মুহাম্মদ! রাত্র-দিনে এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হলো। প্রতি ওয়াক্তের বিনিময়ে হলো দশ ওয়াক্তের সমান প্রতিদান। সুতরাং এতদনুসারে এটা মোট পঞ্চাশ বলেই বিবেচ্য হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَ سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ ـ

কেউ যদি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করে তবে তা আদায় না করতে পারলেও তার জন্য আমি একটি নেকি লিখি; আর তা আদায় করলে দশটি নেকি লিখা হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোনো মন্দ কার্যের ইচ্ছা করে আর তা না করে তবে কোনো পাপ লিখা হয় না। আর যদি তা করে তবে কেবল একটি পাপই লিখা হয়। অতঃপর আমি হযরত মূসার নিকট নেমে আসলাম এবং তাঁকে এটা অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আপনার প্রভুর নিকট পুনরায় ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করে দিতে আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এটা পালন করতে সক্ষম হবে না। আমি বললাম, প্রভুর নিকট বিষয়টি নিয়ে এতবার ফিরে গিয়েছি যে এখন পুনর্বার যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে। উপরিউক্ত বিষয়টি শায়খাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বিবৃত করেছেন। তবে এর শব্দগুলো হচ্ছে মুসলিমের। হাকিম তৎপ্রণীত মুস্তাদরাকে ইবনে আব্বাস প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আমি আমার মহান ও পরাক্রমশালী প্রভুকে দর্শন করেছি। اَلْاَقْصٰى দূরবর্তী। বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদটি যেহেতু মাসজিদুল হারাম থেকে দূর সেহেতু তাকে 'মাসজিদুল আকসা' বলা হয়।

২. قَالَ تَعَالٰى وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لِ اَنْ لَّا يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا يُفَوِّضُوْنَ اِلَيْهِ اَمْرَهُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ تَتَّخِذُوْا بِالْفَوْقَانِيَّةِ اِلْتِفَاتًا فَاَنْ زَائِدَةٌ وَالْقَوْلُ مُضْمَرًا ـ

২. আর আমি মূসাকে কিতাব অর্থাৎ তওরাত দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বনী ইসরাঈলের পথ-নির্দেশক। এজন্য যে তারা যেন আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ না করে তাদের বিষয়াদি অপর কারো নিকট যেন সোপর্দ না করে। اَلَّا يَتَّخِذُوْا এটা অপর এক কেরাতে فَوْقَانِيَّه অর্থাৎ تَ সহ দ্বিতীয় পুরুষ নিষেধবাচক শব্দরূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় এতে اِلْتِفَاتْ অর্থাৎ রূপান্তর হয়েছে বলে এবং اَنْ শব্দটি زَائِدَه বা অতিরিক্ত বলে বিবেচ্য হবে। এর পূর্বে قَوْل ধাতু থেকে উদ্গত কোনো শব্দ উহ্য আছে বলে ধরা হবে যেমন وَاَقُوْلُ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদেরকে বলেছিলাম......।

৩. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ط فِي السَّفِيْنَةِ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا كَثِيْرَ الشُّكْرِ لَنَا حَامِدًا فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِهٖ ـ

৩. যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধর, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ সর্বাবস্থায় আমার প্রশংসাকারী এক বান্দা। اَلشَّكُوْرُ পরম কৃতজ্ঞ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤. وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ التَّوْرٰةِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ الشَّامِ بِالْمَعَاصِىْ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا تَبْغُوْنَ بَغْيًا عَظِيْمًا .

৪. এবং আমি কিতাবে তাওরাতে বনী ইসরাঈলকে প্রত্যাদেশ মারফত জানিয়েছিলাম নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে অর্থাৎ সিরিয়া ভূমিতে পাপাচারের মাধ্যমে দুবার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের খুবই বাড় বাড়বে অতিশয় জুলুম ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটাবে। قَضَيْنَا এ স্থানে অর্থ– প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলাম।

٥. فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا اُوْلٰى مَرَّتَىِ الْفَسَادِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ اَصْحَابِ قُوَّةٍ فِى الْحَرْبِ وَالْبَطْشِ فَجَاسُوْا تَرَدَّدُوْا لِطَلَبِكُمْ خِلٰلَ الدِّيَارِ ط وَسَطَ دِيَارِكُمْ لِيَقْتُلُوْكُمْ وَيَسْبُوْكُمْ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا وَقَدْ اَفْسَدُوْا الْاُوْلٰى بِقَتْلِ زَكَرِيَّا فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ جَالُوْتَ وَجُنُوْدَهُ فَقَتَلُوْهُمْ وَسَبُوْا اَوْلَادَهُمْ وَخَرَبُوْا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ .

৫. অতঃপর এ দুয়ের প্রথমটির অর্থাৎ এ দুই বিপর্যয় ঘটাবার প্রথমবারেরটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হলো তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে বিক্রমশালী বান্দাদেরকে যুদ্ধবিগ্রহে যারা অতীব শক্তিশালী সেই বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তারা তোমাদের সন্ধানে তোমাদেরকে হত্যা ও বন্দী করার জন্য তোমাদের গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে প্রবেশ করেছিল। এটা কার্যকরীকৃত এক অঙ্গীকার ছিল প্রথমবার তারা হযরত যাকারিয়াকে হত্যা করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে জালূত ও তার সেনাদলকে প্রেরণ করেন। তারা এসে তাদেরকে হত্যা করে। তাদের সন্তানদের বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে ক্ষতি সধান করে। جَاسُوْا অর্থ তারা অনুসন্ধানের জন্য ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। خِلَالَ الدِّيَارِ গৃহের অভ্যন্তরে।

٦. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ الدَّوْلَةَ وَالْغَلَبَةَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ بِقَتْلِ جَالُوْتَ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا عَشِيْرَةً .

৬. অতঃপর একশত বৎসর পর জালূতকে হত্যা করার মাধ্যমে অমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম বিজয় ও সাম্রাজ্য দান করলাম। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সাহায্য করলাম এবং পরিবার-পরিজনে সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।

٧. وَقُلْنَا اِنْ اَحْسَنْتُمْ بِالطَّاعَةِ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ لِاَنَّ ثَوَابَهُ لَهَا وَاِنْ اَسَاْتُمْ بِالْفَسَادِ فَلَهَا اِسَاءَتُكُمْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْمَرَّةِ الْاٰخِرَةِ بَعَثْنَا هُمْ .

৭. বললাম তোমরা যদি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে সৎকর্ম কর তবে তা নিজদের জন্যই কেননা এর পুণ্যফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর ফাসাদ ঘটিয়ে মন্দ কার্য যদি কর তবে এই মন্দতাও তারই। অতঃপর শেষ বারের প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হলে। অমি বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম

لِيَسُوْءُوا وُجُوْهَكُمْ يَحْزُنُوْكُمْ بِالْقَتْلِ
وَالسَّبْيِ حُزْنًا يَظْهَرُ فِيْ وُجُوْهِكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَيُخَرِّبُوْهُ
كَمَا دَخَلُوْهُ وَخَرَّبُوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا
يُهْلِكُوْا مَا عَلَوْا غَلَبُوْا عَلَيْهِ تَتْبِيْرًا
إِهْلَاكًا وَقَدْ أَفْسَدُوْا ثَانِيًا بِقَتْلِ يَحْيٰى
فَبَعَثَ عَلَيْهِمْ بُخْتَ نَصَّرَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ
أُلُوْفًا وَسَبٰى ذُرِّيَّتَهُمْ وَخَرَّبَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ .

তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য অর্থাৎ হত্যা ও বন্দী করত তোমাদেরকে এমন দুঃখ দিতে যে তার প্রভাব যেন তোমাদের মুখমণ্ডলে ভেসে উঠে। এবং প্রথমবার যেভাবে মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল এবং তার ধ্বংস সাধন করেছিল পুনরায় সেভাবে তাতে প্রবেশ করার জন্য অনন্তর তা ধ্বংস করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল যাতে তারা বিজয় লাভ করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। হযরত ইয়াহয়া (আ.)-কে হত্যা করে তারা দ্বিতীয়বারের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে সম্রাট বুখতে নাসসারকে প্রেরণ করেন। সে তাদের হাজার হাজার লোককে হত্যা করে, সন্তানসন্ততিকে বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের ধ্বংস সাধন করে। لِيُتَبِّرُوْا تَتْبِيْرًا সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য।

٨. وَقُلْنَا فِي الْكِتٰبِ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَّرْحَمَكُمْ
ج بَعْدَ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِنْ تُبْتُمْ وَإِنْ عُدْتُّمْ إِلَى
الْفَسَادِ عُدْنَا م إِلَى الْعُقُوْبَةِ وَقَدْ عَادُوْا
بِتَكْذِيْبِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ بِقَتْلِ
قُرَيْظَةَ وَنَفْيِ النَّضِيْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ
عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا
مَحْبَسًا وَسِجْنًا .

৮. এবং কিতাবে আরো বলেছিলাম দ্বিতীয়বারের পর যদি তোমরা তওবা কর তাহলে সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি বিপর্যয় সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও আমার শাস্তির পুনরাবৃত্তি করব। আর জাহান্নামকে আমি করেছি কাফেরদের জন্য কারাগার। তারা রাসূল ﷺ -এর অস্বীকার করে নিজদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি করে। ফলে তাদের বনূ কুরাইযাকে হত্যা ও বনূ নাযীরকে দেশান্তর করে ও জিজিয়া আরোপ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে তাদের উপর ক্ষমতাধিকারী করেন। حَصِيْرًا অর্থ– বন্দী করে রাখার স্থান, কারাগার।

٩. إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ أَيْ لِلطَّرِيْقَةِ
الَّتِيْ هِيَ أَقْوَمُ أَعْدَلُ وَأَصْوَبُ وَيُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ أَنَّ
لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا .

৯. এ কুরআন অবশ্যই হেদায়েত করে এমন বিষয়ের এমন পথের যা সুদৃঢ় ন্যায়ানুগ ও সঠিক। এবং যে সকল মুমিন সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

١٠. وَيُخْبِرُ أَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا مُؤْلِمًا هُوَ
النَّارُ .

১০. এবং সংবাদ দেয় যে আখেরাতের যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকর শাস্তি তা হলো জাহান্নাম। أَعْتَدْنَا প্রস্তুত রেখেছি।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُبْحَانَ : এটা উহ্য ফে'লের মাসদার অর্থাৎ سَبَّحْتُ اللّٰهَ سُبْحَانًا

قَوْلُهُ لَيْلًا نَصْبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ : অর্থাৎ لَيْلًا টা اَسْرٰى-এর ظَرْف زَمَانٌ হয়েছে মাফউল নয়, কেননা اَسْرًا এবং سَرًا উভয়টিই لَازِمٌ -

প্রশ্ন. اَسْرٰى বলা হয় سَيْرٌ فِى اللَّيْلِ তথা রাতের ভ্রমণকে, এরপরও لَيْلًا উল্লেখ করার কারণ কি?

উত্তর. سَيْرٌ فِى اللَّيْلِ যদিও اَسْرٰى -এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু لَيْلًا -কে نَكِرَه উল্লেখ করে স্বল্প সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর لَيْلًا - এর তানবীন এখানে قِلَّتْ -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ لِبُعْدِهِ مِنْهُ : এটা দ্বারা মসজিদে আকসা-এর নামকরণের কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার মাঝে এক মাসের ব্যবধান রয়েছে। অথবা এজন্য যে, সে সময় মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসার মাঝে কোনো মসজিদ ছিল না। এ কারণেই তার নাম মসজিদে আকসা রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَالْقِلَالِ : قِلَالٌ টা قُلَّةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মটকা, কলস।

قَوْلُهُ اَلَّا تَتَّخِذُوْا : এখানে اَنْ টা হলো মাসদারিয়া। আর لَامِ تَعْلِيْل উহ্য রয়েছে, যাকে ব্যাখ্যাকার প্রকাশ করে দিয়েছেন। لَا تَتَّخِذُوْا টা উহ্য نُوْنْ -এর সাথে مَنْصُوْب হয়েছে। আর لَا টা হলো نَافِيَه আর এই তারকীব يَاء -এর সুরতে হবে। আর تَاء -এর সুরতে উহ্য نُوْنْ -এর সাথে مَجْزُوْم হবে। আর لَا টা نَافِيَة হবে, আর اَنْ টা অতিরিক্ত হবে।

قَوْلُهُ الْقَوْلُ مُضْمَرٌ : অর্থাৎ مَقُوْلًا لَهُمْ لَا تَتَّخِذُوْا এবং কেউ কেউ বলেছেন যে, اَنْ টা مُفَسِّرَه হওয়াটা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কেননা اٰتَيْنَا টা قُلْنَا -এর অর্থে হয়েছে, যা اَنْ مُفَسِّرَه -এর জন্য শর্ত।

قَوْلُهُ نَفِيْرٌ : এটা نَفَرٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– জামাত, বংশ।

قَوْلُهُ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا : প্রশ্ন. نُقْصَانٌ -এর জন্য সেলাহ এর মধ্যে عَلٰى ব্যবহার হয়। অথচ এখানে لَامْ ব্যবহার হয়েছে, যা نَفْع -এর জন্য ব্যবহার হয়।

উত্তর. এটা اِزْدِوَاجْ তথা মোকাবিলার ভিত্তিতে عَلٰى -এর স্থানে لَامْ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ الخ : আলোচ্য আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের রাসূল ﷺ -এর একটি বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যমূলক মোজেজা। اَسْرٰى শব্দটি اِسْرَاءٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ– রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টত এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نَكِرَه ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আর মি'রাজ সূরা নাজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بعبده শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না। হযরত হাসান দেহলভী চমৎকার বলেছেন–

بنده حسن بصد زبان گفت که بنده توام

تو بزبان خود بگو بنده نواز کیستی

অর্থাৎ তোমার বান্দা হাসান তো শত মুখে বলে থাকে যে, আমি তোমার বান্দা; তুমি তোমার নিজের মুখে একবার বলনা যে. আমি তোমারই দাস!

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি এরূপ সম্বোধন একটা অতুলনীয় মর্যাদা। যেমন অন্য এক আয়াতে عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ বলে স্বীয় মকবুল বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধি করা লক্ষ্য রয়েছে। এতে আরও জানা গেল যে, আল্লাহর পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে যাওয়াই মানুষের সর্ববৃহৎ গুণ। কেননা বিশেষ সম্মানের স্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক গুণের মধ্য থেকে দাসত্ব গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা আরও একটি বড় উপকার সাধন লক্ষ্য। তা এই যে, আগাগোড়া অলৌকিক ঘটনাবলিতে পূর্ণ এই সফর থেকে কারো মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়ে যায় যে, এ অলৌকিক উর্ধ্বাকাশ ভ্রমণের ব্যাপারটি একটি আল্লাহর গুণের অংশবিশেষ। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে খ্রিস্টান জাতি ধোঁকায় পড়েছে। তাই عَبْد [বান্দা] শব্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এসব গুণ চরম পরাকাষ্ঠা ও মোজেজা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর বান্দাই– স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লাহর কোনো অংশীদার নন।

কুরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা : ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মতো দৈহিক ছিল, একথা কুরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হতো তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عَبْد শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হতো, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল। এমনকি কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোনো আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থি নয়। وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মতে رُؤْيَا [স্বপ্ন] বলে رُؤْيَتْ [দেখা] বুঝানো হয়েছে, কিন্তু একে رؤيا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ মি'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে এ কারণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যে স্বপ্নযোগে মি'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মি'রাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশজন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাযী আয়ায শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। নামগুলো এই– হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবূ যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুর রহমান ইবনে কুর্য, আবূ হাইয়্যা, আবূ লায়লা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবূ আইয়ুব আনসারী, আবূ উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)।

এরপর ইবনে কাছীর (র.) বলেন– فَحَدِيْثُ الْاِسْرَاءِ اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُوْنَ মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে কাছীরের রেওয়ায়েত থেকে : ইমাম ইবনে কাছীর (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন, সত্য কথা এই যে, নবী করীম ﷺ ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। ইদানিং কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই আলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গাম্বরগণের সাথে সাক্ষাৎ হয়, যাঁদের অবস্থান কোনো নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণত ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ.) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গাম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল মুন্‌তাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয়শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পালকিকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মূরও দেখেন। বায়তুল মা'মূরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মূরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচক্ষে জান্নাত ও দোজখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং আকাশে যেসব পয়গাম্বরের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা [যেন] তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাজের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গাম্বরগণের সাথে নামাজ আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাজও হতে পারে। ইবনে কাছীর বলেন, নামাজে পয়গাম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারো কারো মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা আকাশে পয়গাম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) সব পয়গাম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গাম্বর বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবার ইমাম বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতে থাকতেই মক্কা মুকাররমা পৌঁছে যান। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য : তাফসীর ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, হাফেয আবূ নায়ীম ইস্পাহানী দালায়েলুন নবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর [ওয়াকেদীকে হাদীস বর্ণনায় হাদীসবিদগণ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে কাছীরের মতো সাবধানী মুহাদ্দিস তাঁর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কারণ ব্যাপারটি আকিদা কিংবা হালাল-হারামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ ধরনের ঐতিহাসিক ব্যাপারে তাঁর রেওয়ায়েত ধর্তব্য।] সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুর্যীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন–

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছুসংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবূ সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটিমাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোনো সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হবো এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন। আমি বললাম, আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবূ সুফিয়ান বলল, নবুয়তের এই দাবিদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মুকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌছেছে এবং সে রাত্রেই প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার [বায়তুল মুকাদ্দাসের] সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল, আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হলো না। [দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।] মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রিদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল, কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোনো জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবত এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, কোনো নবী এখানে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাতে তিনি আমাদের মসজিদে নামাজ পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।"

—[তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃ.]

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ : ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাত নবুয়তপ্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হরবী বলেন, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন, নবুয়াতপ্রাপ্তির আঠারো মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পরে কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম রাত্রি মি'রাজের রাত্রি। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَعْلَمُ

মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা : হযরত আবূ যর গিফারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাজের সময় হয়, সেখানেই নামাজ পড়ে নাও। –[মুসলিম]

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু-হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ.) নির্মাণ করেছেন।

–[নাসায়ী, তাফসীরে কুরতুবী, ১২৭ পৃ. ৪র্থ খণ্ড]

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দুটি রেওয়ায়েতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মসজিদে আকসা ও সিরিয়ার বরকত : আয়াতে بَارَكْنَا حَوْلَهٗ বলা হয়েছে। এখানে حَوْلَ বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আবশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী]

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ– ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় বরতক এই যে, এ ভূ-ভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরনা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! শহরসমূহের মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। – [তাফসীরে কুরতুবী] মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না– ১. মদিনার মসজিদ ২. মক্কার মসজিদ ৩. মসজিদে আকসা এবং ৪. মসজিদে তূর।

قَوْلُهٗ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الخ : পূর্বাপর সম্পর্ক : ইতঃপূর্বেকার جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ আয়াতে শরিয়তের বিধিবিধান এবং আল্লাহর নির্দেশাবলি অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান বাণী উচ্চারণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আয়াতগুলোতে শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বনী ইসরাঈলের দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা শত্রুদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। ওরা তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এরপর তারা কিছুটা হুঁশিয়ার হলে এবং অনাচারের অভ্যাস কিছুটা কমে আসলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু কিছু দিন পর আবার তাদের মধ্যে অনাচার ও কুকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ফলে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত করেন। কুরআন পাকে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের ছয়টি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রথম ঘটনা : বর্তমান মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ওফাতের কিছু দিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা : এর প্রায় চারশত বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল মুকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদি মূর্তি পূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা : এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতানসর বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরিউক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বুখতানসরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতানসর পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। এ দুর্ঘটনাটি হযরত সোলায়মান (আ.) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদিরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেল স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে। এ সময় ইহুদিরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা : ইহুদিরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদিদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারী শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছু দিন পর বায়তুল মুকাদ্দাস রোম সম্রাটদের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদিরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদিও ছিল না এবং খ্রিস্টানও ছিল না। কেননা তার অনেক দিন পর কনস্টানটাইন প্রথম খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়েছিল। হযরত ওমর (রা.) এটি পুনঃনির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কুরআনে উল্লিখিত দুটি ঘটনা কোন গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যত এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদিদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বুঝা দরকার। বলা বাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হুযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো, হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলাম, বায়তুল মুকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ.)-এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা, ইয়াকূত ও যমররদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আ.) যখন এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিনদের তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, এরপর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানি করে গুনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলো এবং পয়গাম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতানসরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতানসর ছিল অগ্নি উপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল মুকাদ্দাস শাসন করে। কুরআন পাকের فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। বুখতানসররের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে পুরুষদের হত্যা করে, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানারকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতানসরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতানসর যেসব ধনসম্পদ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল মুকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানি কর এবং গুনাহের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আজাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا বলে একথাই বুঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে এলো এবং সমস্ত ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধনসম্পদ রোমের স্বর্ণ মন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ জমানায় হযরত মাহদী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্র করবেন। [এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন।]

বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে, কুরআনে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুটি শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। ১. হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং ২. হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলি প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলির বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উল্লিখিত ঘটনাবলির সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সলা ছিল এই– তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কুরআন পাক তাদের দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল সমকালীন শরিয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয়ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং জনবল ও সন্তানসন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

এ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন– وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا অর্থাৎ তোমরা পুনরায় নাফরমানির দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আজাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আজাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরিয়তে মুহাম্মদীয় যুগ যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরিয়তে মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবৎ বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং পয়গাম্বরগণের এ কিবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলি মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ-বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা, এ ঘটনা পরম্পরার একটি অংশ : বনী ইসরাঈলদের এসব ঘটনা কুরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, মুসলমানগণ এ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শানশওকত, অর্থসম্পদ ও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

সাম্প্রতিককালে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর ইহুদিদের অধিকার এবং তাতে অগ্নি সংযোগের হৃদয়বিদারক ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে উদ্বেগাকুল করে রেখেছে। সত্য বলতে কি, এতে করে কুরআনের উপরিউক্ত বক্তব্যেরই সত্যায়ন হচ্ছে। মুসলমানগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিস্মৃত হয়েছে, পরকাল থেকে গাফিল হয়ে পার্থিব শানশওকত মনোনিবেশ করেছে এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধিবিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। ফলে আল্লাহর কুদরতেরই সেই বিধানই আত্মপ্রকাশ করেছে যে, কোটি কোটি আরবের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ ইহুদি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা আরবদের ধনসম্পদের বিস্তর ক্ষতি সাধান করেছে এবং ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠতম মসজিদের একটি মসজিদ যা সব সময়ই পয়গাম্বরগণের কিবলা ছিল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে জাতি বিশ্বে সর্বাধিক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বলে গণ্য হতো, আজ সে ইহুদি জাতিই আরবদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি দেখা যায়, এ জাতি সংখ্যায় মুসলমানদের মোকবিলায় কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং মুসলমানদের সমষ্টিগত সমরাস্ত্রের মোকাবিলায়ও ওদের কোনো গুরুত্ব নেই। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনাটি ইহুদিদেরকে কোনো সম্মানের আসন দান করে না। তবে এটা মুসলমানদের অবাধ্যতার শাস্তি অবশ্যই। এ থেকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, যা কিছু ঘটেছে, তা আমাদের কুকর্মের শাস্তি হিসাবেই ঘটেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে যদি আমরা স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি মনে তওবা করি, আল্লাহর নির্দেশাবলির আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করি, সাচ্চা মুসলমান হয়ে যাই, বিজাতির অনুকরণ ও বিজাতির উপর ভরসা করা থেকে বিরত হই, তবে ওয়াদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন আবার আমাদের অধিকারভুক্ত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজকালকার আরব শাসকবর্গ এবং সেখানকার মুসলমান জনগণ এখনও এ সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা এখন বিজাতির সাহায্যের উপর ভরসা করে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করছে। অথচ বাহ্যত এর কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। فَاللّٰهُ الْمُشْتَكٰى

যে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন পুনরায় মসুলমানদের অধিকারে আসতে পারে, তা হচ্ছে শুধু আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন, পরকালে বিশ্বাস, শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ, নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে বিজাতির উপর ভরসা ও তাদের অনুকরণ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুনরায় আল্লাহর উপর ভরসা করে খাঁটি ইসলামি জিহাদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আরব শাসকবর্গকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে এর তাওফীক দান করুন।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার : আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের ইবাদতের জন্য দুটি স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল মুকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তীবাহিনীর সে ঘটনা, যা কুরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়েমেনের খ্রিস্টান বাদশাহ বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে আল্লাহ তা'আলা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখিদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কিবলা ও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফের আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় : উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কুরআন পাক বলেছে, আল্লাহর দীনের অনুসারীরা যখন ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কুরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে عِبَادَنَا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দিকে কোনো বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ-এর অধীনে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কুরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম অথবা কোনো বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু عَبْدِهٖ [বান্দা] বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক তাকে বান্দা বলে আখ্যায়িত করা। বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে عِبَادَنَا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে إِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহর বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের إِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হতে পারে।

قَوْلُهُ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত সম্পর্কে আলোচনা ছিল, আর তাওরাতের উপর আমল না করার কারণে বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি যেসব আজাব এবং বিপদাপদ এসেছিল তার উল্লেখ ছিল।

আর এ আয়াতে বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের আলোচনা করা হয়েছে যা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের দলিল।

পবিত্র কুরআন বিশ্বগ্রন্থ : এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, তাওরাত নিঃসন্দেহে আসমানি গ্রন্থ যা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি নাজিল হয়েছে। তাওরাতও সরল সঠিক পথের দিশারী ছিল। তবে তাওরাত শুধু বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে তাওরাতের আহ্বান শুধু বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে। সমগ্র বিশ্ব মানবের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণের সর্বাপেক্ষা সহজ সরল এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে পবিত্র কুরআন। সমগ্র বিশ্ব মানবের নামে বিশ্বনবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ এই গ্রন্থ হলো মানব জাতির উদ্দেশ্যে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সর্বশেষ বাণী, সর্বশেষ পয়গাম। যেভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল; ঠিক তেমনিভাবে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের মূর্ত প্রতীক এ মহান গ্রন্থ। যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত রূপে আগমন করেছেন, তিনিই পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক। পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষার অনুশীলন এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ ব্যতীত নাজাতের কিবল্প কোনো পন্থা নেই, তাই যারা পবিত্র কুরআনের বিধান মেনে চলে তাদের জন্য রয়েছে এতে সুসংবাদ।

قَوْلُهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا : পবিত্র কুরআন মুমিনদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মহান পুরস্কারের তথা জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, যারা ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলও করে। আর নেক আমলের মানদণ্ড হলো পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাগ্রহণ ও প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ।

قَوْلُهُ وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا : কিন্তু যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করে না, প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনে না, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে মুগ্ধ মত্ত হয়ে আখেরাত সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে তারা তার পরিণাম স্বরূপ ভোগ করবে আখেরাতের মর্মান্তিক শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দুটি কথার ঘোষণা রয়েছে–

১. পবিত্র কুরআন সর্বাপেক্ষা সহজ সরল এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।

২. পবিত্র কুরআন নেককার মুমিনদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মহান পুরস্কার লাভের সুসংবাদ দেয় এবং যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে কাফেরদের উদ্দেশ্যে যেমন আজাবের ঘোষণা রয়েছে, তেমনি রয়েছে মুমিনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ, যারা মুমিনদের সঙ্গে শত্রুতা করে, মুমিনদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করে, তাদের উদ্দেশ্যে আজাবের ঘোষণা মু'মিনদের জন্যে সুসংবাদ। বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেছে দুনিয়াতেই যেমন তাদের শাস্তি হয়েছে, এমনিভাবে মক্কার যে কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে, তাদের শাস্তিও দুনিয়াতেই হয়েছে। তবে কথা এখানেই শেষ নয়; বরং আখেরাতেও হবে তাদের কঠিন শাস্তি। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে– اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ আমি তৈরি রেখেছি তাদের জন্য অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ عَلٰى نَفْسِهٖ وَاَهْلِهٖ اِذَا ضَجِرَ دُعَاءَهٗ اَيْ كَدُعَائِهٖ لَهٗ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ الْجِنْسُ عَجُوْلًا بِالدُّعَاءِ عَلٰى نَفْسِهٖ وَعَدَمِ النَّظْرِ فِيْ عَاقِبَتِهٖ .

১১. মানুষ যখন মারাত্মক পেরেশানিতে নিপতিত হয় তখন নিজের ও পরিবারের জন্য অকল্যাণ প্রার্থনা করে যেভাবে সে নিজের কল্যাণ প্রার্থনা করে। মানুষ জাতি তো নিজের উপর বদদোয়া করার এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য না দেওয়ার মধ্যে বড় তাড়াহুড়া প্রিয়। دُعَاءً - এর পূর্বে ك উহ্য রয়েছে। অর্থ যেমন সে প্রার্থনা করে।

١٢. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ دَالَّتَيْنِ عَلٰى قُدْرَتِنَا فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ طَمَسْنَا نُوْرَهَا بِالظَّلَامِ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً اَيْ مُبْصَرًا فِيْهَا بِالضَّوْءِ لِتَبْتَغُوْا فِيْهِ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ بِالْكَسْبِ وَلِتَعْلَمُوْا بِهِمَا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ط لِلْاَوْقَاتِ وَكُلَّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا اَيْ بَيَّنَّاهُ تَبْيِيْنًا .

১২. আমি রাত্রি ও দিবসকে দুটি নিদর্শন অর্থাৎ আমার কুদরতের উপর দুটি প্রমাণ রূপে বানিয়েছি, রাত্রির নিদর্শনকে মুছে ফেলি অর্থাৎ তার আলো বিলুপ্ত করে দেই যাতে তোমরা এতে আরাম নিতে পার আর দিবসকে করেছি আলোকময় অর্থাৎ এর জ্যোতিতে সবকিছু পরিদৃষ্ট হয় এমনভাবে বানিয়েছি যাতে উপার্জনের জন্য তাতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা এতদুভয়ের মাধ্যমে বর্ষ-সংখ্যা ও সময়ের হিসাব স্থির করতে পার। আর আমি প্রয়োজনীয় সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। اٰيَةَ الَّيْلِ এ স্থানে اَلَّيْلِ -এর প্রতি اٰيَةَ -এর اِضَافَةٌ বা সম্বন্ধ بَيَانِيَةٌ বা বিবরণমূলক। فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

١٣. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ عَمَلَهٗ يَحْمِلُهٗ فِيْ عُنُقِهٖ خُصَّ بِالذِّكْرِ لِاَنَّ اللُّزُوْمَ فِيْهِ اَشَدُّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا وَفِيْ عُنُقِهٖ وَرَقَةٌ مَكْتُوْبٌ فِيْهَا شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا مَكْتُوْبًا فِيْهِ عَمَلُهٗ يَلْقٰهُ مَنْشُوْرًا صِفَتَانِ لِكِتَابًا .

১৩. আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম তার গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি তা সে বহন করে। গ্রীবায় কোনো বস্তুর বাঁধন সুদৃঢ় হয় বেশি। সেহেতু এ স্থানে বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেন, প্রতিটি ভূমিষ্ঠ সন্তানের গ্রীবায় একটি কাগজ আঁটা থাকে। তাতে লিখা থাকে সে দুর্ভাগ্যের অধিকারী না সৌভাগ্যের অধিকারী। এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব যা সে পাবে উন্মুক্ত। এতে তার কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ থাকবে। طَائِرَهٗ এ স্থানে এর অর্থ তার কৃতকর্ম। يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا এটি كِتَابٌ - এর صِفَتٌ বা বিশেষণ।

١٤. وَيُقَالُ لَهٗ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا مُحَاسِبًا .

১৪. এবং তাকে বলা হবে তুমি পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ট। حَسِيْبًا অর্থাৎ হিসাব-নিকাশকারী রূপে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٥. مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ لِاَنَّ ثَوَابَ اِهْتِدَائِهٖ لَهٗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط لِاَنَّ اِثْمَهٗ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَازِرَةٌ اٰثِمَةٌ اَىْ لَا تَحْمِلُ وِزْرَ نَفْسٍ اُخْرٰى ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ اَحَدًا حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا يُبَيِّنُ لَهٗ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ

১৫. যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করবে সে নিজের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে কেননা সৎপথ অবলম্বনের পুণ্যফল তো তারই। আর যে কেউ পথভ্রষ্ট হবে সে তো নিজের ধ্বংসের জন্যই পথভ্রষ্ট হবে কারণ এর পাপ তার উপরই বর্তাবে। এবং কোনো বহনকারী অর্থাৎ পাপী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। আর আমি রাসূল যিনি তাদেরকে তাদের কর্তব্য করণীয় সম্পর্কে বিবরণ দেন তাকে প্রেরণ না করে কাউকেও শাস্তি দেই না। لَا تَزِرُ অর্থাৎ কোনো প্রাণী বহন করে না।

١٦. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا مُنَعَّمِيْهَا بِمَعْنٰى رُؤَسَائِهَا بِالطَّاعَةِ عَلٰى لِسَانِ رُسُلِنَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا خَرَجُوْا عَنْ اَمْرِنَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا اَهْلَكْنَاهَا بِاِهْلَاكِ اَهْلِهَا وَتَخْرِيْبِهَا

১৬. আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন তার সম্পদশালী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর নিয়ামত উপভোগকারীদেরকে অর্থাৎ তথাকার নেতৃবর্গকে আমার রাসূলগণের যবানী আনুগত্য প্রদর্শনের কাজে রত হতে আদেশ করি কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কর্ম করে আমার নির্দেশের সীমালঙ্ঘন করে ফলে তথায় আমার আজাবের নির্দেশ বাস্তবায়িত হয় আর আমি অঞ্চলটিকে তার অধিবাসীদেরসহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। دَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا অর্থাৎ তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

١٧. وَكَمْ اَىْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ط وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا عَالِمًا بِبَوَاطِنِهَا وَظَوَاهِرِهَا وَبِهٖ يَتَعَلَّقُ بِذُنُوْبِ.

১৭. নূহের পর আমি কত অর্থাৎ বহু মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তোমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য যথেষ্ট। এর সাথেই তো ذُنُوْبِ বা পাপাচারসমূহ সংশ্লিষ্ট। اَلْقُرُوْنَ যুগসমূহ, অর্থাৎ মানবগোষ্ঠীসমূহ।

١٨. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ الْعَاجِلَةَ اَىِ الدُّنْيَا عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاۤءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ التَّعْجِيْلَ لَهٗ بَدَلٌ مِنْ لَهٗ بِاِعَادَةِ الْجَارِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا يَدْخُلُهَا مَذْمُوْمًا مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا مَطْرُوْدًا عَنِ الرَّحْمَةِ.

১৮. কেউ স্বীয় কার্যের বিনিময়ে নগদ বস্তু অর্থাৎ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে সত্বর দিতে চাই তাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে দেই, অনন্তর পরকালে তার জন্য নির্ধারিত করি জাহান্নাম যেথায় সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ভর্ৎসিত অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায়। لِمَنْ نُّرِيْدُ এটা جَرّ বাচক শব্দটির পুনরাবৃত্তিসহ لَهٗ-এর بَدَل হয়েছে। مَدْحُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৯. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا عَمِلَ عَمَلَهَا اللَّائِقَ بِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ حَالٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا عِنْدَ اللّٰهِ اَىْ مَقْبُوْلًا مُثَابًا عَلَيْهِ

১৯. যারা ঈমান গ্রহণ করত পরলোক কামনা করে এবং এর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে অর্থাৎ তার জন্য যথোপযুক্ত ও যথাযোগ্যভাবে কাজও করে তাদেরই চেষ্টা আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতার অধিকারী হয় অর্থাৎ তা গ্রহণীয় হয় এবং তার জন্য ফল প্রদত্ত হয়। وَهُوَ مُؤْمِنٌ এটা حَالٌ হয়েছে।

২০. كُلًّا مِّنَ الْفَرِيْقَيْنِ نُمِدُّ نُعْطِىْ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ بَدَلٌ مِنْ مُتَعَلِّقٌ بِنُمِدُّ عَطَاءِ رَبِّكَ ط فِى الدُّنْيَا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ فِيْهَا مَحْظُوْرًا مَمْنُوْعًا عَنْ اَحَدٍ

২০. এরা তারা অর্থাৎ এ উভয় দলের প্রত্যেককেই আমি দুনিয়াতে দান করি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে এবং এতে তোমার প্রতিপালকের দান কারো থেকে নিষিদ্ধ রাখা হয় না। অর্থাৎ ফিরিয়ে রাখা হয় না। لِمَنْ আমি দান করি। هٰؤُلَاءِ এটা بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ। مِنْ عَطَاءِ এটা لِمَنْ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা সংশ্লিষ্ট।

২১. اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ وَالْجَاهِ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ اَعْظَمُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا مِنَ الدُّنْيَا فَيَنْبَغِىْ الْاِعْتِنَاءُ بِهَا دُوْنَهَا

২১. লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের একজনকে অপর দলের উপর উপজিবীকা এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি দানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছি। আর পরকাল তো অবশ্যই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ মহান এবং দুনিয়া থেকে প্রাধান্য লাভে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং অন্য কিছুর প্রতি নয় এর প্রতিই সকলের একনিষ্ঠ হওয়া কর্তব্য।

২২. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَخْذُوْلًا لَا نَاصِرَ لَكَ

২২. আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ স্থির করো না, করলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়বে তোমার কেউ সাহায্যকারী হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْجِنْس : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْاِنْسَانُ-এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টি جِنْس-এর জন্য হয়েছে اِسْتِغْرَاقْ-এর জন্য নয়। কাজেই এখন এ আপত্তি উত্থাপিত হবে না যে, সকল মানুষ বদদোয়ার ক্ষেত্রে عَجُوْل হয় না।

قَوْلُهُ الْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ : অর্থাৎ اٰيَةَ اللَّيْلِ-এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّهْ হয়েছে। এটা সেই সংশয়ের নিরসন যে, مُضَاف টা مُضَافْ اِلَيْهِ-এর ভিন্ন হয়ে থাকে। অথচ اٰيَةَ اللَّيْلِ-এর মধ্যে مُضَاف এবং مُضَافْ اِلَيْهِ একই হয়েছে। উত্তরের সারকথা হলো এই যে, এটা হলো اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ আর এটা اِضَافَتْ عَدَدْ اِلَى الْمَعْدُوْد-এর অন্তর্গত যেমন عَشَرَ سِنِيْنَ-এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ হয়েছে- اٰيَةَ النَّهْرِ -এর মধ্যেও এ সুরতই রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ مُبْصَرًا فِيْهِ : এতে مَجَازْ عَقْلِىْ হয়েছে। কেননা দিন দেখে না; বরং দিনে দেখা যায়, عَلَاقَةْ ظَرْفِيَّتْ-এর কারণে দেখার ইযাফত দিনের দিকে করে দিয়েছে, অর্থাৎ اِسْمُ فَاعِلْ বলে ظَرْفْ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ بِالضَّوْءِ : অর্থাৎ بِسَبَبِ الضَّوْءِ

قَوْلُهُ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ : شِدَّتْ لُزُوْم -কে বর্ণনা করার জন্য এটা একটি আরবীয় تَعْبِيْر বা ব্যক্তকরণ। আরবদের এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হতো তখন তারা পাখির মাধ্যমে শুভাশুভের নিদর্শন নিত। এর সুরত এরূপ হতো যে, পাখি নিজে উড়ে বা কারো উড়ানোর মাধ্যমে যদি ডানদিকে যেত তবে তারা এটাকে নেকফালি মনে করত এবং সেই কাজটি করে ফেলত। যখন আরবে এই প্রথা ব্যাপক হয়ে গেল তখন মূল কল্যাণ ও অকল্যাণকেই طَائِرٌ দ্বারা ব্যক্ত করতে লাগল। আর এটা تَسْمِيَةُ الشَّىْءِ بِاسْمِ لَازِمِهٖ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ خُصَّ بِالذِّكْرِ : এটা হলো সেই প্রশ্নের জবাব যে, আমল পূর্ণ মানুষের জন্যই আবশ্যক হতো শুধুমাত্র গর্দানের জন্য নয়। অথচ এখানে اَعْمَالُ -কে গর্দানের জন্য আবশ্যক বলা হয়েছে।

উত্তরের সারকথা হলো এই যে, যেমনিভাবে قِلَادَةٌ [গলার হার] গলার জন্য সাধারণভাবে لَازِمٌ غَيْرُ مُنْفَكٍّ হয়ে এমনিভাবে মানুষের আমল মানুষের জন্য لَازِمٌ হয়। এ ব্যক্তকরণের মধ্যে شِدَّتُ لُزُوْمٍ এবং لُزُوْمٌ دَوَامٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الخ : মুজাহিদ (র)-এর উক্তি মতে এতে مَجَازٌ عَقْلِيٌّ হবে না।

قَوْلُهُ صِفَتَانِ لِكِتَابًا : يَلْقَهُ টা জুমলা হয়ে كِتَابًا - এর প্রথম সিফত, আর مَنْشُوْرًا হলো দ্বিতীয় সিফত। আবার مَنْشُوْرًا টা يَلْقَهُ -এর ضَمِيْرِ مَفْعُوْلِي হতে حَالٌ হওয়াও বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ لَهُ : পূর্বের সাথে رَبْطٌ এবং نَظْرٌ প্রতিষ্ঠা করার জন্য يُقَالُ -কে উহ্য মানা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَحْمِلُ : এটা لَا تَزِرُ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ وَبِهِ : এর যমীর خَبِيْرًا عَلٰى سَبِيْلِ الْاِنْفِرَادِ এবং بَصِيْرًا - এর দিকে ফিরেছে। ইবারত এভাবে হলে উত্তম হতো যে, وَبِذُنُوْبِ يَتَعَلَّقُ بِخَبِيْرًا وَبَصِيْرًا

قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ لَهُ : অর্থাৎ لِمَنْ نُرِيْدُ টা لَهُ থেকে اِعَادَهُ جَارٌ -এর সাথে بَدَلُ الْبَعْضِ مِنَ الْكُلِّ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। যে কাজে মানুষ আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পুরস্কার লাভ করবে সে কাজের প্রতি পবিত্র কুরআন মানুষকে আকৃষ্ট করে। আর যে কাজের পরিণাম মানুষের জন্যে ভয়াবহ হবে সে কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, পবিত্র কুরআনের এ আহ্বান সত্ত্বেও মানুষ তার ভালোমন্দ বুঝতে চায় না, তার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না। সে যেমন তার মঙ্গল কামনা করে ঠিক তেমনিভাবে তার অমঙ্গল এবং অকল্যাণের দিকেও ছুটে যায়। তার আচার আচরণের মাধমে সে নিজের অকল্যাণ ডেকে আনে এমনকি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে। মক্কার কাফের নযর ইবনে হারেস প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস করতো না, পবিত্র কোরআনকে সত্য মনে করত না। তাই সে বিদ্রূপ করে এভাবে দোয়া করত, "হে আল্লাহ যদি ইসলাম এবং কুরআন সত্য হয় তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর।" [নাউযুবিল্লাহ!] বদরের যুদ্ধের দিন নযর এবনে হারেস নিহত হয়। এভাবে মানুষ নিজের অকল্যাণ কামনা করে। তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ৪১; তাফসীরে কাবীর, পারা ২০, পৃ. ১৬২]

এ পর্যায়ে আরও বিবরণ রয়েছে। ওয়াকেদী হযরত আয়েশা (রা.)-এর কোনো আজাদ করা গোলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর ﷺ একজন বন্দীকে এনে হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, "এর প্রতি লক্ষ্য রেখ [যেন পালিয়ে না যায়]।" হযরত আয়েশা (রা.) অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথায় মশগুল হওয়ার কারণে বন্দীর প্রতি নজর রাখতে পারেননি। এই সুযোগে সে পলায়ন করে। পরে হুজুর ﷺ আগমন করলেন এবং বন্দী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, "আমি জানি না, আমি তার ব্যাপারে সামান্য গাফেল হয়েছিলাম, এই ফাঁকে সে পালিয়ে গেছে তখন হুজুর ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন। [রাগান্বিত হয়ে] বললেন, "আল্লাহ তোমার হাত কেটে দিন।" একথা বলে তিনি বাহিরে তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং অপরাধীকে ধরবার জন্যে চারিদিকে লোক প্রেরণ করলেন। লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে আসল। হুজুর ﷺ ঘরে তশরিফ আনলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তখন বিছানায় বসে তাঁর হাতকে ওলটপালট করে দেখছিলেন। হুজুর ﷺ বললেন, "কি হয়েছে?" হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন, "আপনার বদদোয়ার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করছি।" তখন হুজুর ﷺ আল্লাহ পাকের দরবারে হাত তুলে এভাবে মুনাজাত করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ, অন্য মানুষের ন্যায় আমারও কষ্ট হয় এবং রাগ আসে। আমি যদি কোনো মোমেন পুরুষ বা মোমেন নারীর জন্যে বদদোয়া করি তবে আমার বদদোয়াকে তাঁর জন্যে গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানিয়ে দাও।" –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. ২৪; তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ৪০ - ৪১]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহকে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগৎ একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। ১. দিনের আলোতে মানুষ রুজি অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরি, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্য আলো অত্যাবশ্যক। ২. দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণত ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরি, চাকরের চাকরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আজাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইস্পাহানী হযরত আবূ উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কোনো কোনো লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরজ করবে, পরওয়ারদিগার! এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে। আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ তোমরা অন্যদের গিবত করতে। -[তাফসীরে মাযহারী]

পয়গাম্বর প্রেরণ ব্যতীত আজাব না হওয়ার ব্যাখ্যা : এ আয়াতদৃষ্টে কোনো কোনো ফিকহ্‌বিদের মতে যাদের কাছে কোনো নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো আজাব হবে না। কোনো কোনো ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকিদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায়। যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ প্রভৃতি- সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আজাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রাসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গাম্বরগণের দাওয়াত ও তাবলীগ ব্যতীত সাধারণ গুনাহের কারণে আজাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রাসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন: রসূল ও নবী অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহর রাসূল বটে।

মুশরিকদের সন্তানসন্ততির আজাব হবে না : لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আজাব হবে না। কেননা পিতামাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ প্রশ্নে ফিকহবিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

قَوْلُهُ وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً الخ : একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : اِذَا اَرَدْنَا এবং অতঃপর اَمَرْنَا বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আজাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন এবং আজাব ও ছওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আজাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আজাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আজাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরি ও গুনাহের সংকল্প- আল্লাহর ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

আয়াতের জন্য একটি তাফসীর : اَمَرْنَا শব্দের প্রচলিত অর্থ তাই, যা উপরে বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি আদেশ দেই। কিন্তু এ আয়াতে এ শব্দের বিভিন্ন কেরাত হয়েছে। আবূ উছমান নাহদী, আবূ রাজা, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ অবলম্বিত এক কেরাত এ শব্দটি মীমের তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ আমি অবস্থাপন্ন বিত্তশালী লোকদেরকে প্রভাবশালী ও শাসক করে দেই। তারা পাপাচারে মেতে উঠে এবং গোটা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক কেরাতে শব্দটিকে اٰمَرْنَا পাঠ করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে এর তাফসীর اَكْثَرْنَا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতির উপর আজাব প্রেরণ করেন, তখন তার প্রাথমিক লক্ষণ এই প্রকাশ পায় যে, সে জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী লোকদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়। তারা পাপাচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আজাবে পতিত করার কারণ হয়ে যায়।

প্রথম কেরাতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, জাতির মধ্যে অবস্থাপন্ন ভোগবিলাসী লোকদের শাসনকার্য অথবা এ ধরনের লোকের প্রাচুর্য মোটেই আনন্দের বিষয় নয়; বরং আল্লাহর আজাবের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে আজাবে পতিত করতে চান, তখন এর প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে জাতির শাসনকর্তা ও নেতৃপদে এমন লোকদেরকে অধিষ্ঠিত করে দেন, যারা বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সেবী। অথবা শাসনকর্তা না হলেও জাতির মধ্যে এ ধরনের লোকের আধিক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। উভয় অবস্থায় পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তারা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে আল্লাহর নাফরমানি নিজেরাও করে এবং অন্যদের জন্যও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অবশেষে তাদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসে।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার : আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণির চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ الخ : যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, আলোচ্য আয়াতে তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা اِسْتِمْرَار وَدَوَام ক্রমাগত বলতে থাকা ও স্থায়ী হওয়া বুঝায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই আচ্ছন্ন করে রাখে– পরকালের প্রতি কোনো লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় اَرَادَ الْاٰخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মু'মিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোনো কোনো কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোনো কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হলো মু'মিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিদ'আত ও মনগড়া আমল যতই ভালো দেখা যাক-গ্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعْيَهَا শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা [পরকালের] লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎ কর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়– সাধারণ বিদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন– পরকালের জন্য উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তাফসীরে রূহুল মা'আনী سَعْيَهَا শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে এ কথা ও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কোনো সময় করল কোনো সময় করল না– এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

Free @ www.eelm.weebly.com

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَخْذُوْلًا : "আল্লাহ পকের সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ স্থির করো না নতুবা তোমাকে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসে থাকতে হবে।"

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একদল দুনিয়া প্রিয়, যাদের পরিণাম হলো আখেরাতের আজাব। আরেক দল যারা আখেরাতের কল্যাণকামী, আল্লাহ পাকের অনুগত, তাদের শুভপরিণতি হলো আখেরাতের ছওয়াব, তবে এর জন্য তিনটি পূর্ব শর্ত রয়েছে। ১. আখেরাতের সাফল্যের জন্যে প্রয়াসী হতে হবে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। ২. এই আকাঙ্খা পূরণের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা এবং সাধনা অব্যাহত থাকতে হবে। ৩. ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন হতে হবে।

আর আলোচ্য আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। ঈমান হলো তৌহীদ তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো প্রকার শিরক না করা। তাই ইরশাদ হয়েছে– لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ "আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদ স্থির করো না।"

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে অথচ এই আয়াতে শিরক না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, যদিও প্রকাশ্যে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে, কিন্তু উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাঁর সমগ্র উম্মতকে। এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় অন্য আয়াতে–

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ এ আয়াতেও সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে আর উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমগ্র উম্মতকে। অথবা কথাটি এভাবে ইরশাদ হয়েছে– اَيُّهَا الْاِنْسَانُ অর্থাৎ হে মানব জাতি! আল্লাহ পাকের সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না।

যদি তা কর তবে তোমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অসহায় ও নিরুপায় হয়ে বসে থাকবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খে আকবর মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো কাছে দানের আশা করে আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কিছুকে মাবুদ স্থির করো না। আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিস যখন তোমার তাকদীরে না রাখেন এমন অবস্থায় সেই জিনিস অন্যের কাছে যদি আশা করা হয় তবে তাও হবে শিরক। এমন অবস্থায় তাকে অসহায় এবং অপমানিত হয়ে দোজখে প্রবেশ করতে হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهٖ "আর যদি তিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেন তবে তাঁর পরে কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?" আর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয় তোমার উপকার করার জন্যে, আল্লাহ পাক যা তোমার জন্যে লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো উপকার তারা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয় তোমার ক্ষতি সাধনের জন্যে, আল্লাহ পাক যা তোমার ব্যাপারে লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষতি সাধন করতে তারা সক্ষম হবে না। তকদীর লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, কলম তুলে ফেলা হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে।

–[তাফসীরে শায়খে আকবর ইবনে আরাবী (র.) খ. ১, পৃ. ৭১৬]

Free @ www.eelm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٣. وَقَضٰى اَمَرَ رَبُّكَ اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّاتَعْبُدُوْٓا اِلَّا اِيَّاهُ وَ اَنْ تُحْسِنُوْا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط بِاَنْ تَبَرُّوْهُمَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا فَاعِلٌ اَوْ كِلٰهُمَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ يَبْلُغَانِ فَاَحَدُهُمَا بَدَلٌ مِنْ اَلِفِهٖ فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا مُنَوَّنًا وَغَيْرَ مُنَوَّنٍ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى تَبًّا وَقُبْحًا وَّلَا تَنْهَرْهُمَا تَزْجُرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا جَمِيْلًا لَيِّنًا .

২৩. তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত তোমরা অপর কারো ইবাদত করবে না, আর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে তাদের বাধ্য থাকবে তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ধমকও দিও না। তাদের সাথে সম্মানজনক অর্থাৎ ভালো ও নম্র কথা বলো। وَقَضٰى এ স্থানে অর্থ স্থির নির্দেশ দিয়েছেন। اَنْ এটা এ স্থানে بِاَنْ রূপে ব্যবহৃত। اِحْسَانًا এটা এ স্থানে উহ্য اَنْ تُحْسِنُوْا ক্রিয়ার مَصْدَرْ বা সমধাতুজ কর্ম। اَحَدُهُمَا এটা يَبْلُغَنَّ ক্রিয়ার فَاعِلْ বা কর্তা. يَبْلُغَنَّ ক্রিয়াটি অপর এক কেরাতে تَثْنِيَةٌ বা দ্বিবচন হিসেবে يَبْلُغَانِ রূপে পঠিত রয়েছে। এমতাবস্থায় اَحَدُهُمَا উক্ত ক্রিয়ার اَلِفْ বা দ্বিবচন থেকে بَدَلْ বা স্থলাভিষিক্ত পদ বলে গণ্য হবে। اُفٍّ-এর ف অক্ষরটি ফাতাহ ও কাসরা, তানবীন ও তানবীন ব্যতিরেকেও পঠিত রয়েছে, এটা مَصْدَرْ বা ক্রিয়ার উৎস। অর্থাৎ মন্দ বা ধ্বংসের কথা বলো না। وَلَا تَنْهَرْهُمَا তাদের উভয়কে ধমক দিও না

٢٤. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اَلِنْ لَهُمَا جَانِبَكَ الذَّلِيْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ اَىْ لِرِقَّتِكَ عَلَيْهِمَا وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَحِمَانِىْ حِيْنَ رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا .

২৪. অনুকম্পা অর্থাৎ তাদের প্রতি তোমরা দয়ার্দ্রতায় তাদের প্রতি বিনয়ের পাখনা অবনত রেখ অর্থাৎ তুমি তোমাকে বিনম্র রেখ এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে তারা আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিল যখন তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালক করেছিল।

٢٥. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط مِنْ اِضْمَارِ الْبِرِّ وَالْعُقُوْقِ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ طَائِعِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ الرَّجَّاعِيْنَ اِلٰى طَاعَتِهٖ غَفُوْرًا لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ فِىْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ بَادِرَةٍ وَهُمْ لَا يُضْمِرُوْنَ عُقُوْقًا

২৫. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে অর্থাৎ তাদের প্রতি বাধ্যতা বা অবাধ্যতা যা গোপন আছে তা ভালো জানেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হলে আল্লাহর প্রতি বাধ্যগত হলে যারা আল্লাহ অভিমুখী অর্থাৎ যারা সতত তাঁর আনুগত্য অভিমুখী আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে নয়; বরং হঠাৎ করে যদি তাদের হকের বিষয়ে কোনো কিছুর প্রকাশ হয়ে যায় তবে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন।

٢٦. وَاٰتِ اَعْطِ ذَا الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ حَقَّهٗ مِنَ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا بِالْاِنْفَاقِ فِىْ غَيْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

২৬. এবং দিয়ে দাও আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অর্থাৎ সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষার যা কিছু আছে তা এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদেরকেও, আর আল্লাহর অনুগত্যের বাইরে ব্যয় করে কিছুতেই অপব্যয় করো না। اٰتِ দিয়ে দাও। ذَا الْقُرْبٰى আত্মীয়তার সম্পর্কের অধিকারীগণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٧. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْآ اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ اَىْ عَلٰى طَرِيْقَتِهِمْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا شَدِيْدَ الْكُفْرِ لِنِعَمِهٖ فَكَذٰلِكَ اَخُوْهُ الْمُبَذِّرُ .

২৭. নিঃসন্দেহে অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই অর্থাৎ তারা শয়তানের পথে অধিষ্ঠিত। এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ তাঁর অনুগ্রহের প্রতি সে খুবই কৃতঘ্ন। সুতরাং এর ভ্রাতাও তদ্রূপ হবে'।

٢٨. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اَىْ الْمَذْكُوْرِيْنَ مِنْ ذِى الْقُرْبٰى وَمَا بَعْدَهُمْ فَلَمْ تُعْطِهِمْ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا اَىْ لِطَلَبِ رِزْقٍ تَنْتَظِرُهٗ يَاْتِيْكَ فَتُعْطِيْهِمْ مِنْهُ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا لَيِّنًا سَهْلًا بِاَنْ تَعِدَهُمْ بِالْاِعْطَاءِ عِنْدَ مَجِىْءِ الرِّزْقِ

২৮. আর যদি তাদের অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও তৎপর যাদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বিমুখ করতে হয় এবং কিছু দিতে না পার আর তুমি তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে অনুগ্রহ প্রত্যাশায় তার সন্ধানে রত অবস্থায় থাক অর্থাৎ তোমার নিকট কিছু না থাকায় তুমি জীবনোপকরণ তালাশে রত ও তা পাওয়ার অপেক্ষায় আছ। তা তোমার হস্তগত হলে তাদেরে দেবে বলে আশা কর তবে এই অবস্থায় তাদেরকে নম্র কথা বল যেমন, সম্পদ হস্তগত হলে দেবে বলে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাও। مَّيْسُوْرًا নম্র, সহজ।

٢٩. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ اَىْ لَا تُمْسِكْهَا عَنِ الْاِنْفَاقِ كُلَّ الْمَسْكِ وَلَا تَبْسُطْهَا فِى الْاِنْفَاقِ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا رَاجِعٌ لِلْاَوَّلِ مَحْسُوْرًا مُنْقَطِعًا لَا شَىْءَ عِنْدَكَ رَاجِعٌ لِلثَّانِىْ

২৯. তোমার হস্ত গলায় বেড়িযুক্ত করে রেখ না অর্থাৎ ব্যয় করা বন্ধ করে রেখো না আর ব্যয়ের বেলায় হস্ত একেবারে সম্প্রসারিত করে দিও না, তাহলে প্রথমোক্ত অবস্থায় তুমি নিন্দিত এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তুমি নিঃস্ব হয়ে যাবে ফলে কিছুই তোমার থাকবে না। مَحْسُوْرًا - নিঃস্ব।

٣٠. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهٗ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهٗ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا عَالِمًا بِبَوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ فَيَرْزُقُهُمْ عَلٰى حَسْبِ مَصَالِحِهِمْ .

৩০. তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ সম্প্রসারিত করেন তাকে স্বচ্ছল করে দেন, এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করে দেন। সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে অবহিত ও চক্ষুষ্মান। তাদের ভিতর ও বাহির সকল কিছু জানেন। সুতরাং তাদের কল্যাণানুসারে তাদেরকে জীবনোপকরণ দান করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِأَنْ : এটা উহ্য মানার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, أَنْ হলো مَصْدَرِيَّة এ সুরতে لَا টা نَافِيَة হবে। আর تَعْبُدُوْنَ টা عِبَادَة-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বলেছেন যে, তিনি ব্যতীত কারো জন্যই উপাসনা নয়। আবার এটাও বৈধ যে, أَنْ টা مُفَسِّرَة হবে। কেননা قَضٰى টা قَالَ অর্থে হয়েছে। এ সুরতে لَا টা نَافِيَة হবে।

قَوْلُهُ يَبْلُغَنَّ এটা : وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ - مُضَارِعْ بَانُوْن ثَقِيْلَة এর - এর সীগাহ।

قَوْلُهُ وَاَنْ تُحْسِنُوْا : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. أَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর. بِالْوَالِدَيْنِ টা جَارْ مَجْرُوْر মিলে اِحْسَانًا مُؤَخَّرْ-এর مُتَعَلِّقْ হতে পারে না, তাই বাধ্য হয়েই أَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানতে হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, যদি أَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানা না হয় তবে بِالْوَالِدَيْنِ-এর আতফ হবে لَا تَعْبُدُوْا-এর উপর এবং এটা جُمْلَة اِسْمِيَّة-এর আতফ جُمْلَة فِعْلِيَّة-এর উপর হবে, যা বৈধ নয়। আর যখন أَنْ تُحْسِنُوْا উহ্য মানা হয় তখন فِعْلِيَّة-এর আতফ جُمْلَة فِعْلِيَّة ই হবে।

قَوْلُهُ عِنْدَكَ : অর্থাৎ فِىْ كَفَالَتِكَ وَحِرْزِكَ

قَوْلُهُ فَاعِلْ : অর্থাৎ يَبْلُغَنَّ-এর মধ্যে فَاعِلْ-এর যমীর উহ্য নয় যে, تَكْرَارْ فَاعِلْ - এর আপত্তি উত্থাপিত হবে, বরং أَحَدُهُمَا হলো ফায়েল। أَحَدُهُمَا হলো فَاعِلْ এটা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো এটা যে,

قَوْلُهُ فَاَحَدُهُمَا بَدَلْ مِنْ اَلِفِهٖ : এটা দ্বিতীয় কেরাতের তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর সারমর্ম হলো এই যে, এক কেরাতে يَبْلُغَنَّ-এর স্থলে يَبْلُغَانِ রয়েছে। সেই সুরতে অবশ্যই تَكْرَارْ فَاعِلْ - এর আপত্তি উত্থাপিত হবে। এর উত্তর হলো এই যে, يَبْلُغَانِ - এর فَاعِلْ নয়। اَلِفْ-এর يَبْلُغَانِ হলো ফায়েলের আর أَحَدُهُمَا হলো তার থেকে بَدَلْ এটা কাজেই এ কেরাতের সুরতেও تَكْرَارْ فَاعِلْ-এর আপত্তি উত্থাপিত হবে না।

قَوْلُهُ اَلِنْ لَهُمَا جَانِبَكَ الخ : অর্থাৎ جَنَاحْ দ্বারা রূপকভাবে جَانِبْ - এর ইচ্ছা করেছেন। আর এটা خَاصْ উল্লেখ করে عَامْ উদ্দেশ্য নেওয়ার অন্তর্গত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ الذَّلِيْلُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلَّذِىْ-এর দিকে جَنَاحْ-এর ইযাফতটা হলো بَيَانِيَة

قَوْلُهُ اَىْ لِرِقَّتِكَ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مِنَ الرَّحْمَة-এর مِنْ টি اَجَلْ - এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ رِحْمَانِىْ : এ বৃদ্ধি করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাশবীহকে বৈধ করা।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَا يُضْمِرُوْنَ الخ : এটা হলো جُمْلَة حَالِيَة

قَوْلُهُ فِىْ غَيْرِ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভালো কাজে যদি অতিরঞ্জনের সাথেও ব্যয় করা হয় তবুও তা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ الخ : পিতামাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে ফরজ করেছেন। যেমন সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতামাতার শোকরকে একত্র করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছে- اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার শোকর কর এবং পিতামাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করল। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন, [মোস্তাহাব] সময় হলে নামাজ পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল, এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হাদীসের আলোকে পিতামাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফজিলত : মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাকে হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -[মাযহারী]

১. তিরমিযী ও মুস্তাদারাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -[মাযহারী]

২. তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

৩. হযরত আবূ উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন, তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে বেআদবি ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

৪. বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতামাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতামাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, জাহান্নামের এ শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিনবার বলেন- وَاِنْ ظَلَمَا وَاِنْ ظَلَمَا وَاِنْ ظَلَمَا অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি জুলুম করে তবুও পিতামাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

৫. বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজের ছওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করল, সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই ছওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ্! তাঁর ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই।

পিতামাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

৬. বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত আবূ বকরা (রা.)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সমস্ত গুনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতামাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া হয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

কোনো কোনো বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোনো কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকহবিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গুনাহের কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েজও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ স্রষ্টিকর্তার নাফরমানির কাজে কোনো সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েজ নয়।

পিতামাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরি নয় : ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েজ হবে কি? তিনি বললেন- صِلِيْ أُمَّكِ অর্থাৎ "তোমার জননীকে আদার-আপ্যায়ন কর।" কাফের পিতমাতা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাক বলে- وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ যার পিতামাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েজ নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে মা'রূফ বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

পিতামাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্ধক্যে : পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতামাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোনো সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও ফরজ কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবত সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ্যে কুরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালনপালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কুরআন পাকের সাধারণ নীতি!

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা এবং দাবিদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কুরআন পাক এসব অবস্থায় পিতামাতার মনো-তুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্বরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশি তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতামাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক. তাঁদেরকে 'উফ'-ও বলবে না। এখানে 'উফ' শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উফ' বলার চাইতেও কম কোনো স্তর থাকলেও তাও অবশ্য উল্লেখ করা হতো। [মোটকথা, যে কথায় পিতামাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।]

দ্বিতীয়. وَلَا تَنْهَرْهُمَا - نَهْر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ. وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا প্রথমোক্ত দুটি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, যেমন কোনো গোলাম তার রূঢ়স্বভাব সম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ - এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جَنَاحَ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতামাতার জন্য নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়; বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়ত. এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার ইজ্জতের পটভূমি। কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়; বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ. وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا - এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার ষোল আনা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশত তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতামাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা : পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা যাবেই; কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েজ হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তাওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েজ নয়।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : কুরতুবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন, তোমার পিতাকে ডেকে আন। এমন সময়ই হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, তার পিতা এসে গেলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো সে মনে মনে বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনতে পায়নি। যখন লোকটি তার পিতাকে নিয়ে হাজির হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাপার কি, আপনার পুত্র আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিতে চান? পিতা বলল, আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার ফুফু, খালা এবং নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত কোথায় ব্যয় করি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, اِيْهٍ [অর্থাৎ ব্যস! আসল ব্যাপার জানা হয়ে গেছে। এখন আর কোনো বলার শোনার দরকার নেই।] এরপর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ বাক্যগুলো কি, যেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার কানও শোনেনি? লোকটি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান বৃদ্ধি করে দেন। [যে কথা কেউ শোনেনি; তা আপনার জানা হয়ে গেছে। এটা একটা মোজেজা] অতঃপর সে বলল, এটা ঠিক যে, আমি মনে মনে কয়েক লাইন কবিতা বলেছিলাম, যেগুলো আমার কানও শোনেনি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কবিতাগুলো আমাকে শোনান। তখন সে নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করল–

غَذَوْتُكَ مَوْلُوْدًا وَمَنَنْتُكَ يَافِعًا * تُعَلُّ بِمَا اَجْنِى عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ

আমি তোমাকে শৈশবে খাদ্য দিয়েছি এবং যৌবনেও তোমার দায়িত্ব বহন করেছি। তোমার যাবতীয় খাওয়া-পড়া আমারই উপার্জন থেকে ছিল।

اِذَا لَيْلَةٌ ضَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ اَبْتُ * لِسُقْمِكَ اِلَّا سَاهِرًا اَتَمَلْمَلُ

কোনো রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ. তখন আমি সারা রাত তোমার অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি।

كَاَنِّىْ اَنَا الْمَطْرُوْقُ دُوْنَكَ بِالَّذِىْ * طَرَقْتَ بِهٖ دُوْنِىْ فَعَيْنِىْ تَهْمَلُ

যেন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে– তোমাকে নয়। ফলে আমি সারা রাত ক্রন্দন করেছি।

تَخَافُ الرَّدَىَّ نَفْسِىْ عَلَيْكَ وَاِنَّهَا * لَتَعْلَمُ اَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ

আমার অন্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হতো; অথচ আমি জানতাম যে. মৃত্যুর জন্য দিন নির্দিষ্ট রয়েছে– আগে পিছে হতে পারবে না।

فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِىْ * اِلَيْهَا مَدٰى مَا كُنْتُ فِيْكَ اُؤَمِّلُ

অতঃপর যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বয়সের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছ।

جَعَلْتَ جَزَائِىْ غِلْظَةً وَفِظَاظَةً * كَاَنَّكَ اَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ

তখন তুমি কঠোরতা ও রূঢ় ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিয়েছ; যেন তুমিই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা না করতে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَلَيْتَكَ اِذْ لَمْ تَرْعَ حَقَّ اُبُوَّتِيْ * فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُلَاصِقُ يَفْعَلُ

আফসোস যদি তোমার দ্বারা আমার পিতৃত্বের হক আদায় না হয়, তবে কমপক্ষে ততটুকুই করতে হবে যতটুকু একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে থাকে।

فَاَوْلَيْتَنِيْ حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ * عَلَيَّ بِمَالٍ دُوْنَ مَالِكَ تَبْخَلُ

তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তো দিতে এবং স্বয়ং আমারই অর্থসম্পদে আমার বেলায় কৃপণতা না করতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কবিতাগুলো শোনার পর পুত্রের জামার কলার চেপে ধরলেন এবং বললেন, اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ অর্থাৎ যাও, তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ সবই তোমার পিতার। -[তাফসীরে কুরতুবী খ, ষষ্ঠ, পৃ. ২৪]

কবিতাগুলো আরবি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'হামাসা'তেও উদ্ধৃত রয়েছে; কিন্তু কবির নাম লেখা হয়েছে উমায়া ইবনে আবুস্সলত। কেউ কেউ বলেন, এগুলো আব্দুল আ'লার কবিতা এবং কারো কারো মতে কবিতাগুলো আলী আব্বাস অন্ধের।

-[হামিয়া-কুরতুবী]

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতামাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সব সময় সমান যায় না। কোনো সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরিউক্ত আদবের পরিপন্থি। এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবির ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো সময় কোনো পেরেশানি অথবা অসাবধানতার কারণে কোনো কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবি অথবা কষ্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اَوَّابِيْنَ শব্দের অর্থ تَوَّابِيْنَ অর্থাৎ তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিবের ছয় রাকাত এবং ইশরাকের নফল নামাজকে صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ নামাজগুলো পড়ার তাওফীক তাদেরই হয়, যারা اَوَّابِيْنَ অর্থাৎ تَوَّابِيْنَ [তওবাকারী]।

قَوْلُهُ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ الخ : সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতামাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়ের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবনযাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ- এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতে সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবন ধারণের মতো ধনসম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণপোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরজ। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণপোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াত وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়। - [তাফসীরে মাযহারী]

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। কেননা তাদের হক তার জিম্মায় ফরজ। দাতা সে ফরজই পালন করছে মাত্র; কারো প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تَبْذِيْر অর্থাৎ অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা : কুরআন পাক অপব্যয়কে দুটি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تَبْذِيْر এবং অপরটি اِسْرَاف - আলোচ্য আয়াতে تَبْذِيْر নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوْا আয়াতে اِسْرَاف নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গুনাহের কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে اِسْرَاف ও تَبْذِيْر বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, গুনাহের কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে اِسْرَاف বলা হয়। তাই اِسْرَاف-এর চাইতে গুরুতর। تَبْذِيْر - কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত মুজাহিদ বলেন, কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক মুদও [অর্ধসের] ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হক নয় এমন অবস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয় [মাযহারী]। ইমাম মালিক (র.) বলেন, হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تَبْذِيْر বলা হয়। একে إِسْرَاف-ও বলে। এটা হারাম। -[তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম কুরতুবী বলেন, হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تَبْذِيْر এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়- এটাও تَبْذِيْر -এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে তবে তা تَبْذِيْر -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ الخ : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোনো সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মতো কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মানসূর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লিখিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً الخ : খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযূলে ইবনে মারদওয়াইহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমার আম্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অন্য কোনো কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন, অন্য সময় যখন তোমার আম্মার সওয়াল পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, আম্মা বলেছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাজের সময় হলো। হযরত বেলাল (রা.) আজান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মতো বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভেতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহর পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর : এ আয়াত থেকে বাহ্যত এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানি ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআন পাকের مَحْسُوْرًا শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হতো এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে স্বীয় ধনসম্পদ নিঃশেষে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোনো কিছুই করেননি। এ থেকে বুঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভালো হতো' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ : আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃঙ্খলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃঙ্খলা। –[কুরতুবী] কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়াও বিশৃঙ্খলা। –[মাযহারী] مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, مَلُوْمٌ শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَحْسُوْرًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশি ব্যয় করে নিজে ফকির হয়ে গেলে সে مَحْسُوْر অর্থাৎ শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

فَائِدَه جَلِيْلَه

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا হতে وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا

২৫টি আহকাম বর্ণ না করা হয়েছে যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে লিকে দেওয়া হলো–

১. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

২. ৩. وَقَضٰى رَبُّكَ الخ আয়াতে দু'টি হুকুম বর্ণিত হয়েছে

ক. عِبَادَةُ اللّٰهِ খ. نَهْىٌ عَنْ عِبَادَةِ الْغَيْرِ

৪. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

৫. فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ

৬. وَلَا تَنْهَرْهُمَا

৭. وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

৮. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

৯. وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا

১০. وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

১১. وَالْمِسْكِيْنَ

১২. وَابْنَ السَّبِيْلِ

১৩. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

১৪. فَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

১৫. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً

১৬. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

১৭. وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ

১৮. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى

১৯. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

২০. فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ

২১. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ

২২. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ

২৩. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ

২৪. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

২৫. وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣١. وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ بِالْوَادِ خَشْيَةَ مَخَافَةَ اِمْلَاقٍ ط فَقْرٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً اِثْمًا كَبِيْرًا عَظِيْمًا .

৩১. তোমাদের সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা অবশ্যই মহাপাপ। خَشْيَةَ আশঙ্কা। اِمْلَاقٍ দারিদ্র্য। خِطْاً পাপ। كَبِيْرًا মহা।

٣٢. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اَبْلَغُ مِنْ لَا تَأْتُوْهُ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط قَبِيْحًا وَسَآءَ بِئْسَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا هُوَ .

৩২. ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়োনা, এটা অশ্লীল মন্দ ও নিকৃষ্ট আচরণ কত নিকৃষ্ট পথ তা। لَا تَقْرَبُوْا - নিকটবর্তী হয়ো না। এটা لَا تَأْتُوْهُ [তা করো না] থেকে অধিক তাকীদ সম্পন্ন।

٣٣. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ لِوَارِثِهِ سُلْطٰنًا تَسَلُّطًا عَلَى الْقَاتِلِ فَلَا يُسْرِفْ بِتَجَاوُزِ الْحَدِّ فِي الْقَتْلِ ط بِاَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ اَوْ بِغَيْرِ مَا قَتَلَ بِهِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا .

৩৩. আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন ন্যায়ভাবে ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার অভিভাবককে উত্তরাধিকারীকে তো হত্যাকারীর উপর ক্ষমতা দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে সীমালঙ্ঘন না করে। যেমন, হত্যাকারীকে ছেড়ে অন্যকে হত্যা করা বা যে ধরনের বস্তু দ্বারা হত্যা করেছিল তা ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারা হত্যা করা সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই। سُلْطٰنًا ক্ষমতা।

٣٤. وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ص وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ج اِذَا عَاهَدْتُمُ اللّٰهَ اَوِ النَّاسَ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا عَنْهُ .

৩৪. সদুদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। এবং আল্লাহ কিংবা মানুষের সাথে অঙ্গীকার করলে সে অঙ্গীকার তোমরা পালন করো। অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই তার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।

٣٥. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اَتِمُّوْهُ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ الْمِيْزَانِ السَّوِيِّ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا مَالًا .

৩৫. মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণমাপে দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। اَوْفُوْا পূর্ণভাবে দাও। اَلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। تَاْوِيْلًا এ স্থানে অর্থ পরিণাম।

٣٦. وَلَا تَقْفُ تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ الْقَلْبَ كل اولئك كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا صَاحِبُهُ مَاذَا فَعَلَ بِهِ .

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ের অনুসরণ করো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়– তাদের প্রত্যেকের নিকট তাদের অধিকারী প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। যে সে এগুলোকে কি কাজে ব্যবহার করেছে। لَا تَقْفُ অনুসরণ করো না। اَلْفُؤَادَ হৃদয়।

٣٧. وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا اَىْ ذَا مَرَحٍ بِالْكِبْرِ وَالْخُيَلَاءِ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ تَشُقَّهَا حَتّٰى تَبْلُغَ اٰخِرَهَا بِكِبْرِكَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا الْمَعْنٰى اِنَّكَ لَا تَبْلُغُ هٰذَا الْمَبْلَغَ فَكَيْفَ تَخْتَالُ

৩৭. ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে অহংকার ও গর্বে স্ফীত হয়ে ঔদ্ধত্য সহকারে বিচরণ করো না। তুমি কখনই ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না। অর্থাৎ তোমার অহংকারে তুমি ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করত তার পাতালে পৌঁছতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ থেকে পারবে না; অর্থাৎ তুমি তো কখনও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। এর পরও তুমি কেমন করে অহংকার প্রদর্শন কর।

٣٨. كُلُّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا .

৩৮. উল্লিখিত এ সবগুলোর যা মন্দ তা তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

٣٩. ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰى اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ط الْمَوْعِظَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا مَطْرُوْدًا عَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

৩৯. হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক যে হিকমত উপদেশ তোমাকে ওহীর মাধ্যমে দিয়েছেন তা তার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ স্থির করো না। করলে, তুমি নিন্দিত ও দূরীকৃত অর্থাৎ আল্লাহর রহমত থেকে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

٤٠. اَفَاَصْفٰكُمْ اَخْلَصَكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ط بَنَاتٍ لِنَفْسِهٖ بِزَعْمِكُمْ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ بِذٰلِكَ قَوْلًا عَظِيْمًا .

৪০. হে মক্কাবাসীগণ! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য বিশেষ করে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন আর তোমাদের স্বকপোলকল্পিত ধারণানুসারে নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে মহিলা অর্থাৎ কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমার এ বিষয়ে অবশ্যই এক সাংঘাতিক কথা বলে থাক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِمْلَاقٍ : এটা বাবে اِفْعَالٌ হতে অর্থ-দারিদ্র্য, বিরক্ততা, নিঃস্বতা।

قَوْلُهٗ اَلْوَادِ : এটা বাবে ضَرَبَ - এর মাসদার অর্থ– জীবিত দাফন করা, প্রোথিত করা।

قَوْلُهٗ خِطْأً : এটা বাবে سَمِعَ -এর মাসদার অর্থ– ভুলত্রুটি, গুনাহ, অপরাধ।

قَوْلُهٗ اَبْلَغُ مِنْ لَا تَاْتُوْهُ : অর্থাৎ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى টা لَا تَاْتُوْهُ থেকে اَبْلَغُ এর মধ্যে مَعْنَوِيَّتْ এবং تَعْبِيْر -এর মধ্যে কেননা لَاتَقْرَبُوْا -এর মধ্যে ব্যভিচারের নিকটে যাওয়া থেকেও বারণ করা হয়েছে, যাতে دَوَاعِى زِنَا এবং مُقَدِّمَات زِنَا থেকে বিরত থাকাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। لَا تَاْتُوْهُ -এর বিপরীত।

قَوْلُهٗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا : এখানে যমীরটি নিহতের অভিভাবকের দিকে ফিরেছে। নিহতের অভিভাবক এজন্য مَنْصُوْر যে, শরিয়ত তাকে قِصَاص নেওয়ার অধিকার দিয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مَسْئُوْلًا عَنْهُ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

قَوْلُهُ لَا تَقْفُ : তুমি পিছনে চলো না, তুমি অনুসরণ করো না। এটা বাবে نَصَرَ -এর قَفْوًا মাসদার হতে نَهْى حَاضِرْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ- পিছে চলা, অনুসরণ করা।

قَوْلُهُ ذَامَرَحٍ : মুযাফ উহ্য মেনে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, مَرَحًا টা لَا تَمْشِ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে অথচ مَرَحًا -এর حَمْل মাসদার হওয়ার কারণে বৈধ নয়। জবাবের সার কথা হলো মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ذَا مَرَحٍ অর্থাৎ مَارِحًا -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ "নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন, যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন।"

আর এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন- وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ "আর তোমরা সন্তানসন্ততিকে অভাবের ভয়ে হত্যা করো না, আমি তাদেরকে রিজিক দান করি এবং তোমাদেরকেও।"

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী আয়াতে পিতামাতার সঙ্গে এহসান করার পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আর এ আয়াতে সন্তানের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর, খ. ২০, পৃ. ১৯৬]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিজিক দানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিজিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিজিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল শ্রেণির জন্যই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের অসিলাতেই পায়।

মাসআলা : কুরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিজিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়াত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গুনাহ না হলেও এটা যে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করতো, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিজিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিজিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকে দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপরাধী হচ্ছ? বরং এক্ষেত্রে রিজিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে দুর্বল শ্রেণির জন্যই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়। তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের অসিলাতেই পায়।

মাসআলা : কুরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিজিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই ভ্রান্ত ও জাহেলিয়াত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গুনাহ না হলেও এটা যে গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ الخ : অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এতৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোনো মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

–[ইবনে মাজাহ, বায়হাকী : মাযহারী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে- أَيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ এই লোকটিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, ইবনে মাজাহ থেকে]

বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্বক কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। ১. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি জেনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরিয়তসম্মত শাস্তি। ২. সে যদি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারে। ৩. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কিসাস নেওয়ার অধিকার কার : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ সরকারও এক দিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী। তাই তাফসীরের সারসংক্ষেপে 'সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ওলী' লেখা হয়েছে।

অন্যায়ের জওয়াব অন্যায় নয়- ইনসাফ। অপরাধীর শাস্তির বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে : فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ এটা ইসলামি আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েজ নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরিয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কিসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মজলুমের পরিবর্তে জালিমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম মজলুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূর্খতা যুগের আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কিসাস হিসাবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হতো না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হতো। কেউ কেউ প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হতো না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হতো। ইসলামি কিসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প : একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধিক জালিম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বুজুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তি প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোনো জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে কোনো অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ الخ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আর্থিক হক সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশ যথা- নবম, দশম ও একাদশতম নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বর্ণিত হয়েছে।

এতিমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতিমদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতিমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ এতে যেন শরিয়তবিরোধী অথবা এতিমদের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতিমদের মালের হেফাজত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতিমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। নিজেদের খেয়াল-খুশিতে অথবা কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে ব্যয় করবে না। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতিম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাজত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনেরো বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠারো বছর।

অবৈধ পন্থায় যে কোনো ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েজ নয়। এখানে বিশেষ করে এতিমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোনো হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবি করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবি কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ত্রুটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গুনাহ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকর করার নির্দেশ : অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দু প্রকার। ১. যা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলি মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে- দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মু'মিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -এর সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেনদেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরিয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরিয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোনো এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোনো কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোনো লোক একতরফাভাবে কারো সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গুনাহগার হবে। হাদীসে একে কার্যত নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا - অর্থাৎ কিয়ামতে অন্যান্য ফরজ, ওয়াজিব কর্ম এবং আল্লাহর বিধানাবলি পালন করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেনদেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফফিফীনে উল্লিখিত আছে।

মাসআলা : ফিকহবিদগণ বলেছেন, আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা : মাসআলা– أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ তাফসীর বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষ মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে– ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - এতে মাপ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে। ১. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরিয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভালো মনে করতে পারে না। ২. এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা ছওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোনো ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরিউক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বাদশতম ও ত্রয়োদশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দ্বাদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোনো বিষয়কে কার্যে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরি যে, জানার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। একপ্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের কোনো সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পৌঁছা। এতে বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে। এমনিভাবে বিধানাবলিও দু'প্রকার। ১. অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানাবলি; যেমন আকায়েদ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ। এগুলোতে প্রথম স্তরের জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। এছাড়া আমল করা জায়েজ নয়। ২. ظَنِّيَاتٌ অর্থাৎ ধারণা প্রসূত বিধানাবলি; যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এ বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাট্য বিধানাবলিতে প্রথম স্তরের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আকায়েদ ও ইসলামি মূলনীতিসমূহে এরূপ জ্ঞান না হলে তার কোনো মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসূত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। –[বয়ানুল কুরআন]

কান, চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا - এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে। কানকে প্রশ্ন করা হবে– তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে– তুমি সারা জীবনে কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে– সারা জীবনে মনে কি কি কামনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরিয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারো গিবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরিয়ত বিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন ভিন্ন স্ত্রী সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আজাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোনো কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে– اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ অর্থাৎ আজ [কিয়ামতের দিন] আমি এদের [অপরাধীদের] মুখ মোহর করে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবত এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে– কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যাদ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দুটি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দুটি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবত এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

দ্বিতীয় আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই– ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যাদ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহর সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গুনাহ। মানুষের ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে উঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। –[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। –[মুসলিম]

Free @ www.eelm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবূ হুরায়রার এক রেওয়ায়েতে হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বড়ত্ব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব [চাদর ও লুঙ্গি বলে পোশাক বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব বিশিষ্টও নন যে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহর মহত্ত্বগুণ বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণে আল্লাহর শরিক হতে চায় সে জাহান্নামি।]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা অহংকার করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিপীলিকার সমান মানবাকৃতিতে উত্থিত করা হবে। তাদের উপর চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা প্রকোষ্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, যার নাম বুলস। তাদের উপর প্রখরতর অগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামিদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি দেওয়া হবে। -[তিরমিযী]

খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) একবার এক ভাষণে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট, কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়। -[তাফসীরে মাযহারী]

উল্লিখিত নির্দেশাবলি বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দকাজ আল্লাহ তা'আলার কাছে মাকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলির মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি; যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

হুঁশিয়ারি : পূর্বোল্লিখিত পনেরোটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলি একদিক দিয়ে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল- وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়; বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এ পনেরোটি আয়াত সমগ্র তাওরাতের সার-সংক্ষেপ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলি সূরা বনী ইসরাঈলের পনেরো আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤١. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيَّنَّا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنَ الْاَمْثَالِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ لِيَذَّكَّرُوْا ط يَتَّعِظُوْا وَمَا يَزِيْدُهُمْ ذٰلِكَ اِلَّا نُفُوْرًا عَنِ الْحَقِّ ـ

৪১. আমি অবশ্যই এ কুরআনে বহু উদাহরণ, প্রতিশ্রুতি ও হুমকির কথা বারবার বিবৃত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু তা সত্য থেকে এদের বিমুখতা ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। صَرَّفْنَا বারবার বিবৃত করেছি। لِيَذَّكَّرُوْا যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

٤٢. قُلْ لَهُمْ لَوْ كَانَ مَعَهٗٓ اَيِ اللّٰهِ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا طَلَبُوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ اَيِ اللّٰهِ سَبِيْلًا طَرِيْقًا لِيُقَاتِلُوْهُ ـ

৪২. তাদেরকে বল, তাদের মতো যদি তাঁর সাথে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আরও ইলাহ থাকত তবে তারা অবশ্যই আরশ অধিপতির অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার পথ উপায় অন্বেষণ করত।

٤٣. سُبْحٰنَهٗ تَنْزِيْهًا لَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ مِنَ الشُّرَكَاءِ عُلُوًّا كَبِيْرًا ـ

৪৩. তিনি পবিত্র দোষমুক্ততা কেবল তাঁরই এবং তারা যা বলে অর্থাৎ যে সমস্ত অংশী আরোপ করে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।

٤٤. تُسَبِّحُ لَهٗ تُنَزِّهُهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ اِلَّا يُسَبِّحُ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهٖ اَيْ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَفْهَمُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط لِاَنَّهٗ لَيْسَ بِلُغَتِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوْبَةِ ـ

৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা দোষ-ত্রুটি মুক্ততার কথা ঘোষণা করে এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করে না অর্থাৎ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী বলে না। কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝতে পার না। কেননা তা তোমাদের ভাষায় নয় নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। তাই তিনি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না। لَا تَفْقَهُوْنَ তোমরা বুঝ না।

٤٥. وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا اَيْ سَاتِرًا لَكَ عَنْهُمْ فَلَا يَرَوْنَكَ وَنَزَلَ فِيْمَنْ اَرَادَ الْفَتْكَ بِهٖ ﷺ ـ

৪৫. যখন তুমি কুরআন পাঠ কর তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না তারা ও তোমার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দেই। যা তোমাকে তাদের থেকে লুকিয়ে রাখে। ফলে তারা আর তোমাকে দেখতে পায় না। কিছু সংখ্যক লোক অতর্কিতে গুপ্ত হামলা করে রাসূল ﷺ -কে হত্যা করে ফেলতে চেয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٦. وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَغْطِيَةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ مِنْ اَنْ يَّفْهَمُوا الْقُرْاٰنَ اَىْ فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط ثِقْلًا فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا عَنْهُ.

৪৬. আমি তাদের অন্তরের উপর তা উপলব্ধি করার বিষয়ে অর্থাৎ আল কুরআনকে বুঝার ক্ষেত্রে আবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছি ফলে তারা তা বুঝতে পারে না এবং তাদের কর্ণে গিট সৃষ্টি করে দিয়েছি ফলে তারা তা শুনে না যখন কুরআনে তুমি এক আল্লাহর কথা উল্লেখ কর তখন তারা তা থেকে বিমুখ হয়ে সরে পড়ে। اَكِنَّةً আবরণ। وَقْرًا ছিপি।

٤٧. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖ بِسَبَبِهٖ مِنَ الْهَزْءِ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ قِرَاءَتَكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى يَتَنَاجَوْنَ بَيْنَهُمْ اَىْ يَتَحَدَّثُوْنَ اِذْ بَدَلٌ مِنْ اِذْ قَبْلَهُ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ تَنَاجِيْهِمْ اِنْ مَا تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا مَخْدُوْعًا مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِهٖ.

৪৭. যখন তারা তোমার প্রতি অর্থাৎ তোমার আবৃত্তির প্রতি কান পাতে তখন তারা কি কারণে অর্থাৎ বিদ্রূপ করার জন্য যে কান পাতে তা আমি ভালো জানি। এবং জানি যখন তারা গোপন সলাপরামর্শ করে পরস্পরে গোপন কানাকানি করে অর্থাৎ আলোচনা করে এবং সীমালঙ্ঘনকারীরা তাদের কানাকানিতে বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির ধোঁকায় নিপতিত ও বুদ্ধি বিভ্রান্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। اِذْ يَقُوْلُ এটা পূর্ববর্তী اِذْ هُمْ نَجْوٰى-এর بَدَلٌ বা স্থলবর্তী বাক্যাংশ। اِنْ এটা এ স্থানে না অর্থবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٨. قَالَ تَعَالٰى اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ بِالْمَسْحُوْرِ وَالْكَاهِنِ وَالشَّاعِرِ فَضَلُّوْا بِذٰلِكَ عَنِ الْهُدٰى فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا اِلَيْهِ.

৪৮. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয় জাদুগ্রস্ত, গণক, কবি ইত্যাদি কত কিছু বলে। ফলে তারা সৎপথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তারা তাঁর পথ পেতে সক্ষম হবে না। سَبِيْلًا পথ।

٤٩. وَقَالُوْا مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا.

৪৯. তারা অর্থাৎ যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হবো?

٥٠. قُلْ لَّهُمْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا.

৫০. তাদেরকে বল, তোমরা হয়ে যাও পাথর বা লৌহ-

٥١. اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ج يَعْظُمُ عَنْ قُبُوْلِ الْحَيٰوةِ فَضْلًا عَنِ الْعِظَامِ وَالرُّفَاتِ فَلَابُدَّ مِنْ اِيْجَادِ الرُّوْحِ فِيْكُمْ.

৫১. অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; অস্থিতে পরিণত বা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার কথা তো সহজ বরং এমন বস্তুও যদি হও যাতে জীবনের অস্তিত্ব অসম্ভব তবুও তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার অবশ্যই করা হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ط اِلَى الْحَيٰوةِ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ج وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا لِاَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْبَدْءِ قَادِرٌ عَلَى الْاِعَادَةِ بَلْ هِىَ اَهْوَنُ فَسَيُنْغِضُونَ يُحَرِّكُونَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ تَعَجُّبًا وَيَقُولُونَ اِسْتِهْزَاءً مَتٰى هُوَ ط اَىِ الْبَعْثُ قُلْ عَسٰى اَنْ يَكُونَ قَرِيْبًا ـ

তারা অচিরেই বলবে কে আমাদেরকে জীবন ফিরিয়ে দেবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন অথচ তোমরা কিছুই ছিলে না। যিনি শুরুতে অস্তিত্ব প্রদানের ক্ষমতা রাখেন তিনি তা পুনর্বার করতেও সক্ষম; বরং তা তো আরও সহজ। অতঃপর তারা বিস্মিত হয়ে তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে এবং বিদ্রূপ করে বলবে, তা পুনরুত্থান কবে? বল, সম্ভবত খুব শীঘ্রই হবে। اَلَّذِىْ فَطَرَكُمْ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। يُنْغِضُوْنَ নাড়বে।

৫২. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ يُنَادِيْكُمْ مِنَ الْقُبُوْرِ عَلٰى لِسَانِ اِسْرَافِيْلَ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ فَتُجِيْبُوْنَ مِنَ الْقُبُوْرِ بِحَمْدِهٖ بِاَمْرِهٖ وَقِيْلَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَتَظُنُّونَ اِنْ مَا لَّبِثْتُمْ فِى الدُّنْيَا اِلَّا قَلِيْلًا لِهَوْلِ مَا تَرَوْنَ ـ

৫২. যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন অর্থাৎ ইসরাফীলের জবানি কবর থেকে তোমাদেরকে ডাক দেবেন এবং তোমরা তাঁর হামদসহ অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে; কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, "তাঁরই সকল প্রশংসা"– এ কথা বলে তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা এ দিনের বিভীষিকা দর্শনে মনে করবে যে দুনিয়ায় খুব অল্প কালই অবস্থান করেছিলে। اِنْ لَّبِثْتُمْ এটা এ স্থানে না অর্থবোধক مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ : এখানে وَاوْ টি عَاطِفَه আর لَامْ হলো قَسَمِيَّه আর صَرَّفَ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে بَيَّنَّا এবং اَوْضَحْنَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ– وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اَمْثَالًا

قَوْلُهُ سَاتِرًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَفْعُوْل টা فَاعِلْ অর্থে হয়েছে। কেননা পর্দা سَاتِرْ হয়ে থাকে مَسْتُوْر নয়।

قَوْلُهُ الْفَتْكَ : بِتَثْلِيْثِ الْفَاءِ اَلْقَتْلُ عَلَى الْغَفْلَةِ আচমকা বেখেয়ালীর অবস্থায় হত্যা করে দেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ اَنْ يَفْقَهُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَنْ টা হলো মাসদারিয়া ; تَفْسِيْرِيَّه নয়। مِنْ اَنْ يَفْقَهُوْا -এর মধ্যে مِنْ বৃদ্ধি করেছেন যে, اَنْ يَفْقَهُوْهُ টা উহ্য مِنْ -এর সাথে اَكِنَّةً -এর সেলাহ হয়েছে। আর اَكِنَّةً টা مَنْع -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটা নয় যে, اَنْ يَفْقَهُوْهُ টা مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে যে, উহ্য মুযাফের প্রয়োজন হবে এবং উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, كَرَاهَةَ اَنْ يَفْقَهُوْهُ

এটা বর্ণনার জন্য

قَوْلُهُ وَحْدَهٗ : এটা মাসদার حَالْ -এর স্থানে পতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ نُفُوْرًا : এটা মাসদার وَلَّوْا -এর مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ الخ : إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ এবং إِذْ هُمْ نَجْوٰى এ إِذْ উভয়টি أَعْلَمُ -এর ظَرْف হয়েছে

قَوْلُهُ قِرَاءَتَكَ : এখানে মুযাফ উহ্য মেনে বলে দিয়েছেন যে, اِسْتِمَاعٌ -এর মাফউল কেরাত উহ্য রয়েছে কেননা ذَاتٌ -এর শ্রবণ করা অসম্ভব এবং ذَاتٌ শ্রবণের বস্তুও নয়।

قَوْلُهُ مَخْدُوْعًا : অর্থাৎ مَسْحُوْرًا অর্থাৎ এমন জাদুগ্রস্ত যে, জাদুর কারণে তার জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে

قَوْلُهُ رُفَاتًا : رُفَاتٌ সেই বস্তুকে বলা হয় যা শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يُنْغِضُوْنَ : এটা বাবে اِنْعَالٌ -এর اِنْغَاضٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ- তারা মাথা নাড়ায়, আন্দোলিত করে। আর বাবে نَصَرَ ও ضَرَبَ হতে نَغْضٌ মাসদার অর্থ- উপর থেকে নিচের দিকে মথা নড়ানো

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক** : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাওহীদের প্রতি ঈমান। আর আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতি তাগিদ এবং শিরকের বাতুলতার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا অর্থাৎ কাফের মুশরিকরা যেন তাওহীদের সত্যতা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তারা বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী হয় এবং তারা উপদেশ গ্রহণ করে এজন্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বারবার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, কিছুতেই তাদের কিছু হয় না, তারা সঠিক পথে আসে না, তাদের বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, দৌরাত্ম্য এবং ধৃষ্টতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, এই কুরআনে আমি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ নসিহত এবং সারগর্ভ উপদেশ, বিধি-নিষেধ, দৃষ্টান্ত, যুক্তি-প্রমাণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে করে লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং সরল সঠিক পথ অবলম্বন করে। অথবা এর অর্থ হলো, এ আয়াতসমূহে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমি পবিত্র কুরআনে বারবার বিভিন্নভাবে এজন্যে বর্ণনা করেছি যেন লোকেরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং জীবন-সাধনায় সঠিক পথ অবলম্বন করে। অথবা এর অর্থ হলো, ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের কন্যা না হওয়ার কথা আমি পবিত্র কুরআনে বারবার ঘোষণা করেছি, যেন তারা আল্লাহ পাকের শানে এমন আপত্তিকর বেআদবিপূর্ণ কথা না বলে এবং পবিত্র কুআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে। কিন্তু তারা সঠিক পথে আসে না, তাদের গোমরাহি এবং ধৃষ্টতা বেড়েই চলেছে।

قَوْلُهُ إِذًا لَّا بْتَغَوْا : আয়াতে তাওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমস্ত সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ না হন; বরং তাঁর আল্লাহতে অন্যরাও শরিক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কালামশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়াও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিক্ষিত পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তাসবীহ পাঠ করার অর্থ : ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জিনদের তাসবীহ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্বল্যমান- সবারই জানা। কাফের মানব ও জিন বাহ্যত তাসবীহ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্য বস্তু যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তাসবীহ পাঠ করার অর্থ কি? কোনো কোনো আলিম বলেন, তাদের তাসবীহ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তাসবীহ। অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করেছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোনো বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তাসবীহ।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তাসবীহ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তা'আলা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তাসবীহ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফেররাও সাধারণভাবে আল্লাহকে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহ্যত আল্লাহর অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে; যেমন- বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তাসবীহ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কুরআন পাকের وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তাসবীহ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তাসবীহ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তাসবীহ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়- সত্যিকারের; কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে। -[কুরতুবী]

হাদীসে একটি মোজেজা উল্লিখিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের তালুতে কঙ্করের তাসবীহ পাঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে মোজেজা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে-কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, কঙ্করসমূহের তাসবীহ পাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা নয়। তারা তো যেখানে থাকে, সেখানেই তাসবীহ পাঠ করে; বরং মোজেজা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তাসবীহ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণত সূরা সাদে হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ অর্থাৎ আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল-বিকাল তাসবীহ পাঠ করে। সূরা বাকারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহর ভয়ে নিচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে- وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا অর্থাৎ এরা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এ কুফরি বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তাসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এক পাহাড় অন্য পাহাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহকে স্মরণ করে- এমন কোনো বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে, তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতটি পাঠ করেন- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا অতঃপর বলেন, এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় কুফরি বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর জিকির শোনে না এবং তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? -[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো জিন, মানব, পাথর ও ঢিলা এমন নেই যে মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়। -[মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইবনে মাজাহ]

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা খাওয়ার সময় খাদ্যের তাসবীহের শব্দ শুনতাম। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে খানা খেলে খাদ্যের তাসবীহের শব্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি মক্কার ঐ পাথরটিকে চিনি, যে নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি। কেউ কেউ বলেন, এই পাথরটি হচ্ছে "হাজরে-আসওয়াদ।"

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ বিষয়াবলি সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। হান্নানা স্তম্ভের কাহিনী তো সকল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিম্বর তৈরি হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একে ছেড়ে মিম্বরে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কান্নার শব্দ সাহাবায়ে কেরামও শুনেছিলেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

এসব রেওয়ায়েত দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তু সত্যিকারভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক সব বস্তুর মধ্যেই এই তাসবীহ বিদ্যমান আছে। এমনকি দরজার কপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তাসবীহ আছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, তাসবীহের অর্থ অবস্থাগত তাসবীহ হলে উপরিউক্ত আয়াতে হযরত দাউদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাগত তাসবীহ প্রত্যেক চেতনাশীল মানুষ প্রত্যেক বস্তু থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উক্তিগত তাসবীহ। খাসায়েসে কুবরা গ্রন্থের বরাত দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কঙ্করদের তাসবীহ পাঠে মোজেজা ছিল না। ওরা তো সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তাসবীহ পাঠ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা ছিল এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তাসবীহ এমন শব্দময় হয়ে উঠে, যা সাধারণ মানুষেরও শ্রুতিগোচর হয়। এমনিভাবে পাহাড়সমূহের তাসবীহ পাঠও হযরত দাউদ (আ.)-এর মোজেজা এ হিসাবেই ছিল যে, তাঁর মোজেজায় ঐ তাসবীহ কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

قَوْلُهُ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا الخ : পয়গাম্বরের উপর জাদুর ক্রিয়া হতে পারে : পয়গাম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ও ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর জাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা জাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরও জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে জাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কুরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে– জাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কুরআন তা'ই খণ্ড করেছে। অতএব জাদুর হাদীসটি এ আয়াতের পরিপন্থি নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুযূল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে যখন সূরা লাহাব নাজিল হয়, যাতে আবূ লাহাবের স্ত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভালো হয়। কারণ সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন, না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলতে লাগল– আপনার সঙ্গী আমার 'হিজু' [কবিতার মাধ্যমে নিন্দা] করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, সে কি আপনাকে দেখেনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

قَوْلُهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ : يَدْعُوْ শব্দটি دُعَاء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ ছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর। –[কুরতুবী]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভালো নাম রাখবে। [অর্থহীন নাম রাখবে না।]

হাশরে কাফেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে : فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ . إِسْتِجَابَتْ শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে।

بِحَمْدِهِ অর্থাৎ ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মু'মিন ও কাফের সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহলে কাফেরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তাফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র (র.) বলেন, কাফেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। –[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কেননা তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোনো কোনো তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মু'মিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে- يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا হায় আফসোস, কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে! অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে- يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ হায় আফসোস, আমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তাফসীরের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে মু'মিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াত রয়েছে- وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলি উচ্চারিত হবে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হাম্দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্দ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্দের মাধ্যমে হবে। যেমন বলা হয়েছে- وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

قَوْلُهُ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং নবুয়তের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত সম্পর্কে কাফেরদের যে সন্দেহ ছিল তা খণ্ডন করা হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২০, পৃ. ২২৪]

কাফেরদের কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ ছিল যে আমরা যখন মৃত্যুর পরে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব তখন কিভাবে আমাদের পুনরুত্থান হবে? আল্লাহ পাক তাদের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর যখন তোমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে তখন পুনরায় তোমাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করবেন যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর এ কাজ তাঁর জন্যে অত্যন্ত সহজ। আল্লামা ওসমানী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার করত তন্মধ্যে একটি কথা হলো এই যে, মানুষের মৃত্যুর পর সে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং ধীরে ধীরে সবই শেষ হয়ে যায়। এমনকি অস্থি পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। অথচ ইনি দাবি করেন যে, তোমরা নতুন জীবন লাভ করবে এবং তোমাদের পুনরুত্থান হবে। এমন আজগুবি কথা যে বলে তাকে পয়গাম্বর কি করে মেনে নেওয়া যায়? কাফেরদের এসব কথার উত্তরই দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

-[ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ৩১৭]

ইরশাদ হয়েছে- قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি বলুন, 'তোমরা পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও অথবা তোমরা যা তার চেয়েও কঠিন মনে কর তা হয়ে যাও অর্থাৎ তোমরা যদি জীবনী শক্তি বঞ্চিত লৌহ বা পাথরে পরিণত হও তবুও আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাঁর মহান দরবারে হাজির করবেন। সূরা জুমু'আয় কিভাবে এ সত্যকে ঘোষণা করা হয়েছে তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে-.... قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ অর্থাৎ [হে রসূল!] আপনি বলুন নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ সে মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করবে। এরপর তোমাদেরকে হাজির করা হবে সেই মহান সত্তার দরবারে যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٣. وَقُلْ لِعِبَادِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ يَقُوْلُوا لِلْكُفَّارِ الْكَلِمَةَ الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ يُفْسِدُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا بَيِّنَ الْعَدَاوَةِ .

৫৩. আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন কাফেরদেরকে এমন কথা বলে যা উত্তম; শয়তান অবশ্য তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উসকানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তার শত্রুতা সুস্পষ্ট। يَنْزَغُ বিশৃঙ্খলার উসকানি দেয়।

٥٤. وَالْكَلِمَةُ الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ هِيَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَّشَأْ يَرْحَمْكُمْ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيْمَانِ أَوْ إِنْ يَّشَأْ تَعْذِيْبَكُمْ يُعَذِّبْكُمْ ط بِالْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا فَتَجْبُرُهُمْ عَلَى الْإِيْمَانِ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ .

৫৪. সেই উত্তম কথাটি হলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন। ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদেরকে তওবা ও ঈমান গ্রহণের তাওফীক প্রদান করে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। আর তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করলে কুফরি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে শাস্তি প্রদান করবেন। আর আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি যে, ঈমান গ্রহণের জন্য তুমি তাদেরকে বাধ্য করবে। এটা জেহাদ সংক্রান্ত বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বের ছিল।

٥٥. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط فَيَخُصُّهُمْ بِمَا شَاءَ عَلٰى قَدْرِ أَحْوَالِهِمْ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ بِتَخْصِيْصِ كُلٍّ مِنْهُمْ بِفَضِيْلَةٍ كَمُوْسٰى بِالْكَلَامِ وَإِبْرَاهِيْمَ بِالْخُلَّةِ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِالْإِسْرَاءِ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا .

৫৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কারা আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন। সুতরাং তাদের অবস্থানুসারে তিনি যা দ্বারা ইচ্ছা তাদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। আমি তো নবীগণের কতককে বিশেষ কোনো মর্যাদায় বিভূষিত করে যেমন হযরত মূসাকে কালাম বা আল্লাহর সাথে কথোপকথন দ্বারা; হযরত ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করত, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ইসরা ও মি'রাজের মর্যাদা দিয়ে অপর কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি। আর দাউদকে দিয়েছি যাবূর।

٥٦. قُلْ لَهُمْ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ اٰلِهَةٌ مِّنْ دُوْنِهٖ كَالْمَلَائِكَةِ وَعِيْسٰى وَعُزَيْرٍ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا لَهٗ إِلٰى غَيْرِكُمْ .

৫৬. এদেরকে বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ইলাহ বলে ধারণা কর তাদেরকে যেমন ফেরেশতা, ঈসা, উযায়র প্রভৃতিকে আহ্বান কর। অনন্তর তোমাদের দুঃখ দূর করার বা অন্য কারো দিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাদের নেই।

Free @ www.e-ilmweebly.com

৫৭ ৫৭. أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ هُمْ اٰلِهَةً يَبْتَغُوْنَ يَطْلُبُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ الْقُرْبَةَ بِالطَّاعَةِ اَيُّهُمْ بَدَلٌ مِنْ وَاوِ يَبْتَغُوْنَ اَىْ يَبْتَغِيْهَا الَّذِىْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهٖ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ط كَغَيْرِهِمْ فَكَيْفَ يَدْعُوْنَهُمْ اٰلِهَةً اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا .

তারা যাদেরকে ইলাহ বলে আহ্বান করে তাদের মধ্যে যারা তাঁর নিকটতর তারাই তো আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে। সুতরাং অন্যদের অবস্থা আর কি হতে পারে? আর তারা অন্যান্যদের মতোই তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে সুতরাং এদেরকে তারা কেমন করে ইলাহ হিসেবে আহ্বান করে? নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। اَيُّهُمْ এটা يَبْتَغُوْنَ -এর وَاوْ [বহুবচন বাচক সর্বনাম]-এর بَدَل বা স্থলবর্তী বাক্য। অর্থাৎ তারাই তা অন্বেষণ করে যারা নিকটতর।

৫৮ ৫৮. وَاِنْ مَا مِنْ قَرْيَةٍ اُرِيْدَ اَهْلُهَا اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ بِالْمَوْتِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ط بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهٖ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مَسْطُوْرًا مَكْتُوْبًا .

এমন কোনো জনপদ নেই অর্থাৎ জনপদবাসী নেই যা আমি কিয়ামত দিনের পূর্বে মৃত্যু দিয়ে ধ্বংস করব না বা যাকে হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা অবশ্যই কিতাবে লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। اِنْ مَا এই اِنْ টি এ স্থানে না-অর্থবোধক مَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَسْطُوْرٌ -লিপিবদ্ধ।

৫৯ ৫৯. وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ الَّتِىْ اِقْتَرَحَهَا اَهْلُ مَكَّةَ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ط لِمَا اَرْسَلْنَاهَا فَاَهْلَكْنَاهُمْ وَلَوْ اَرْسَلْنَاهَا اِلٰى هٰؤُلَاۤءِ لَكَذَّبُوْا بِهَا وَاسْتَحَقُّوا الْاِهْلَاكَ وَقَدْ حَكَمْنَا بِاِمْهَالِهِمْ لِاِتْمَامِ اَمْرِ مُحَمَّدٍ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ اٰيَةً مُبْصِرَةً بَيِّنَةً وَاضِحَةً فَظَلَمُوْا كَفَرُوْا بِهَا فَاُهْلِكُوْا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ الْمُعْجِزَاتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا لِلْعِبَادِ لِيُؤْمِنُوْا .

মক্কাবাসীরা যে নিদর্শনের তলব করে তা প্রেরণ করতে আমাকে এটা ব্যতীত অন্য কিছুই ফিরায় না যে পূর্ববর্তীগণ যখন আমি তা তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তখন তারা তা অস্বীকার করেছিল। অনন্তর তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এদের নিকটও যদি আমি তা প্রেরণ করি তবে তারাও তা অস্বীকার করে বসবে এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। তবে মুহাম্মদ ﷺ -এর বিষয় পূর্ণ করার জন্য এদেরকে অবকাশ প্রদানের ফয়সালা দিয়েছি। স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ আমি ছামূদের নিকট উষ্ট্রী প্রেরণ করেছিলাম; অনন্তর তারা তার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাকে অস্বীকার করেছিল; অনন্তর তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন মোজেজা প্রেরণ করি। যাতে তারা ঈমান আনয়ন করে। مُبْصِرَةً - সুস্পষ্ট, পরিষ্কার।

٦٠. وَاذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ط عِلْمًا وَقُدْرَةً فَهُمْ فِي قَبْضَتِهِ فَبَلِّغْهُمْ وَلَا تَخَفْ أَحَدًا فَهُوَ يَعْصِمُكَ مِنْهُمْ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنٰكَ عِيَانًا لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ أَهْلِ مَكَّةَ إِذْ كَذَّبُوْا بِهَا وَارْتَدَّ بَعْضُهُمْ لَمَّا أَخْبَرَهُمْ بِهَا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ط وَهِيَ الزَّقُّوْمُ الَّتِي تَنْبُتُ فِي أَصْلِ الْجَحِيْمِ جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لَّهُمْ إِذْ قَالُوْا النَّارُ تُحْرِقُ الشَّجَرَ فَكَيْفَ تُنْبِتُهُ وَنُخَوِّفُهُمْ بِهَا فَمَا يَزِيْدُهُمْ تَخْوِيْفُنَا إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا.

৬০. এবং স্মরণ কর আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার প্রতিপালক তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতায় মানুষকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন সকল কিছুই তাঁর মুষ্টির ভিতর, এদেরকে আমার কথা পৌঁছাতে থাকুন। কাউকেও আপনি ভয় করবেন না। তিনি আপনাকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করবেন। ইসরা ও মি'রাজ রজনীতে প্রত্যক্ষভাবে তোমাকে যে দৃশ্য আমি দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের অর্থাৎ মক্কাবাসীদের পরীক্ষার জন্য। রাসূল ﷺ যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন তখন অনেকেই তা অস্বীকার করেছিল এবং ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। আর কুরআনে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের উল্লেখ রয়েছে তাও তা হলো যাক্কুম নামক একপ্রকার বৃক্ষ। এটা জাহান্নামের তলদেশে উদ্গমিত হয়। এটাও তাদের পরীক্ষার জন্য ছিল। তারা বলেছিল, আগুন তো বৃক্ষ জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং তাতে বৃক্ষ উদ্গম হবে কেমন করে? আমি এটা দ্বারা তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু তা অর্থাৎ আমার ভীতি প্রদর্শন কেবল তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْكَلِمَةُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : الَّتِىْ হলো اِسْمٌ مَوْصُوْل আর هِىَ হলো মুবতাদা, আর اَحْسَنُ হলো তার খবর। مُبْتَدَأ এবং خَبَرٌ মিলে জুমলা হয়ে সেলাহ হয়েছে। صِلَةٌ এবং مَوْصُوْل মিলে صِفَتٌ হয়েছে উহ্য اَلْكَلِمَةُ মাওসূফের। مَوْصُوْف এবং صِفَتٌ মিলে مَقُوْلَةٌ হয়েছে يَقُوْلُ-এর। মুফাসসির (র.) اَلْكَلِمَةُ উহ্য মেনে اَلَّتِىْ-কে تَانِيْث নেওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ هِيَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ الخ : اَلْكَلِمَةُ হলো اَلَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ-এর তাফসীর। আর মধ্যবর্তী বাক্য হলো جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ কাজেই مُفَسِّرْ এবং مُفَسَّرْ-এর মাঝে পার্থক্যের আপত্তির নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ بِمَا شَاءَ : অর্থাৎ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا : এতে এ কথার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ফজিলত এ কারণে যে, তাঁর উপর ওহির মাধ্যমে যাবূর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাঁর রাজত্ব ও সম্পদের কারণে নয়।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الخ : এখানে اُولٰئِكَ হলো اِسْمُ اِشَارَةٍ مَوْصُوْف আর اَلَّذِيْنَ হলো اِسْمٌ مَوْصُوْل আর يَدْعُوْنَ হলো ফে'ল ও ফায়েল هُمْ যমীর হলো সেলাহ উহ্য মাফঊল। আর اٰلِهَةٌ টা هُمْ থেকে تَمْيِيْز এখন يَدْعُوْنَ ফে'ল তার ফায়েল এবং মাফঊলের সাথে মিলে সেলাহ। مَوْصُوْل এবং صِلَةٌ মিলে জুমলা হয়ে اُولٰئِكَ মাওসূফের সিফত। مَوْصُوْف এবং صِفَتٌ মিলে مُبْتَدَأ আর يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ জুমলা হয়ে مُبْتَدَأ-এর خَبَرٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় তারকীব : أُولَٰئِكَ হলো مُبْدَلْ مِنْهُ আর الَّذِينَ يَدْعُونَ হলো بَدَلْ এখন مُبْدَلْ مِنْهُ ও بَدَلْ মিলে মুবতাদা আর يَبْتَغُونَ জুমলা হয়ে তার খবর।

قَوْلُهُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ : এটা মুবতাদা ও খবর। আবার এটাও বৈধ রয়েছে যে, أَيُّهُمْ টা يَبْتَغُونَ -এর যমীর থেকে بَدَلْ হবে অর্থাৎ يَبْتَغِى مَنْ هُوَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ تَعَالَى الْوَسِيْلَةَ فَكَيْفَ مَنْ دُوْنَهُ আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ তারকীবই পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهُ مُبْصِرَةً : مُبْصِرَةً টা উহ্য اٰيَةً মাওসূফের সিফত اَلنَّاقَةَ -এর নয়। কাজেই মওসূফ ও সিফতের মধ্যে عَدَمْ مُطَابَقَتْ -এর আপত্তির নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ عِيَانًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رُؤْيَا অর্থ رُؤْيَتْ بَصَرِى

قَوْلُهُ الشَّجَرَةُ : এর আতফ হয়েছে اَلرُّؤْيَا -এর উপর– আমি উভয়কে পরীক্ষার কারণ বানিয়েছি।

قَوْلُهُ اَلشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ : এতে مَجَازْ হয়েছে। অর্থাৎ ভর্ৎসনা গাছের উপর হয়নি; বরং গাছ থেকে ভক্ষণকারীর উপর হয়েছে। কেননা গাছের উপর ভর্ৎসনার কোনো অর্থই হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقُلْ لِعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ এবং কিয়ামতের সত্যতার দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যদি কাফের মুশরিকদের সাথে বিতর্কের প্রয়োজন হয় তবে বিনম্র ভাষায় যেন তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়।

–[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩২৫]

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عِبَادْ শব্দ দ্বারা মুমিনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনে শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে মুমিনদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَبَشِّرْ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ.... [অতএব, সুসংবাদ দিন আমার সেই বান্দাদেরকে যারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণ করতে চায়।]

আরও ইরশাদ হয়েছে– فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ [অতএব, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও।] যেহেতু ইতঃপূর্বে শিরকের বাতুলতা এবং তাওহীদের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কিয়ামতের দিনের বাস্তবতার কথাও দলিল-প্রমাণ সহ ইরশাদ হয়েছে, তাই আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সঙ্গে যেন বিনম্র ভাষায় কথা বলা হয়, তাদেরকে যেন গালি না দেওয়া হয় এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে যেন তাদের সাথে কথা বলা হয়। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২০, পৃ. ২২৮]

শানে নুযূল : কালবী (র.) বর্ণনা করেছেন, মুশরিকরা যখন মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করে তখন মুসলমানগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাজিল হয় হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে। জনৈক কাফের তাকে গালি দিয়েছিল তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন এ আয়াতের মাধ্যমে। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৮৪ - ৮৫]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, আল্লাহ পাক হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি আমার মুমিন বান্দাদেরকে বলে দিন যেন তারা পরস্পর কথা বলার সময় বিনম্র ভাষা ব্যবহার করে, তা না হলে শয়তান পরস্পরের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে দেবে এবং কলহ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে, শয়তান সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এজন্যে হাদীস শরীফে কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উঠিয়ে ইশারা করাকেও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শয়তান তাতে আঘাত করিয়ে দিতে পারে। পরিণামে সে জাহান্নামি হয়ে যেতে পারে। –[মুসনাদে আহমদ]

হুজুর পাক ﷺ একটি সমাবেশে ইরশাদ করেন, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে এবং একে অন্যকে বিরক্ত না করে। আর কেউ যেন কাউকে অপমান না করে। এরপর তিনি তাঁর বক্ষ মোবারকের প্রতি ইশারা করেন, "তাকওয়া এখানে।" যে দু ব্যক্তির মধ্যে দীনি মহব্বত গড়ে উঠে এবং পরে তা ছিন্ন হয়ে যায়, সেই বিচ্ছিন্নতার কথা যে ব্যক্তি আলোচনা করে সে অত্যন্ত মন্দ এবং নেহায়েত বদ ও দুষ্ট। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] : পারা ১৫, পৃ. ৫১]

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয় : প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

که به حکم شرع آب خوردن خطاست

وگر خون بفتوی بریزی رواست

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শানশওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে গালিগালাজ ও কটুকথা দ্বারা কোনো দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা ছিল এই- জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন। ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এ আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا : এখানে বিশেষভাবে যাবূরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, যাবূর গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কুরআনে বলা হয়েছে- وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ বর্তমান প্রচলিত যাবূরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। -[তাফসীরে হক্কানী]

ইমাম বগভী (র.) স্বীয় তাফসীরে এ স্থানে লিখেন, যাবূর আল্লাহর গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশো পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হামদ ও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরজ কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

قَوْلُهُ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ : وَسِيْلَة শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারও কাছে পৌঁছার উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর জন্য অসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরিয়তের বিধিবিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

قَوْلُهُ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ : হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা- মানুষের এ দুটি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোনো একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ : অর্থাৎ শবে মি'রাজে যে দৃশ্যাবলি আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফিতনা ছিল। আরবি ভাষায় 'ফিতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ তাফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ গোমরাহি। এর এক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়শা, সুফিয়া হাসান, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফিতনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শবে মি'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোনো কোনো অপক্ব নওমুসলিম এ কথাকে মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল। -[তাফসীরে কুরতুবী]

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رُؤْيَا শব্দটি আরবি ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্সা বুঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বুঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। এ কারণেই অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনাকেই আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦١. وَ اذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا نَصَبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اَىْ مِنْ طِيْنٍ .

৬১. এবং স্মরণ কর যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমের প্রতি সিজদা কর অর্থাৎ নত হয়ে অভিবাদনমূলক সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে বলল, যাকে আপনি কর্দম হতে সৃষ্টি করেছেন আমি কি তাকে সিজদা করব? طِيْنًا এটা بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ এর কাসরা দানকারী অক্ষর [এ স্থানে مِنْ] প্রত্যাহারের ফলে مَنْصُوْب রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত ছিল مِنْ طِيْنٍ

٦٢. قَالَ اَرَءَيْتَكَ اَىْ اَخْبِرْنِىْ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ فَضَّلْتَ عَلَىَّ بِالْاَمْرِ بِالسُّجُوْدِ لَهُ وَاَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَارٍ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ لَاَسْتَاْصِلَنَّ ذُرِّيَّتَهُ بِالْاِغْوَاءِ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ مِمَّنْ عَصَمْتَهُ .

৬২. সে বলেছিল, লক্ষ্য করুন আমাকে অবহিত করুন এটা সেই জন যাকে আপনি সেজদা করার নির্দেশ দান করত আমার উপর সম্মানিত করলেন মর্যাদা দিলেন। অথচ আমি এটা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা আমাকে আপনি অগ্নি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে যদি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তবে আমি তাদের অল্প কতক জন ব্যতীত যাদেরকে আপনি রক্ষা করবেন তারা ব্যতীত তার বংশধরকে অসৎ কার্যে প্ররোচিত করে সমূলে শেষ করে দেব। لَئِنْ -এর لَامْ টি قَسْمِيَّة বা শপথব্যঞ্জক। لَاَحْتَنِكَنَّ নিশ্চয় সমূলে উৎপাটিত করে দেব।

٦٣. قَالَ تَعَالٰى لَهُ اذْهَبْ مُنْظَرًا اِلٰى وَقْتِ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ اَنْتَ وَهُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا وَافِرًا كَامِلًا .

৬৩. তাকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, যাও প্রথম শিঙ্গা ফুৎকার পর্যন্ত অবকাশ প্রদত্ত হলো যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে নিঃসন্দেহে জাহান্নামই হবে তোমাদের অর্থাৎ তোমার ও তাদের পরিপূর্ণ শাস্তি। مَوْفُوْرًا পরিপূর্ণ, যথাযথ।

٦٤. وَاسْتَفْزِزْ اسْتَخِفَّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ بِدُعَائِكَ بِالْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيْرِ وَكُلِّ دَاعٍ اِلَى الْمَعْصِيَةِ وَاَجْلِبْ صِحْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَهُمُ الرُّكَّابُ وَالْمُشَاةُ فِى الْمَعَاصِىْ .

৬৪. তোমার আওয়াজে অর্থাৎ গানবাদ্য ও পাপকার্যের দিকে আহ্বানকারী বিষয়সমূহের মাধ্যমে আহ্বান করার দ্বারা তাদের মধ্য যাকে পার প্রতারণা কর, তোমার পাপকার্যের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে তাদের বিরুদ্ধে ডাক দাও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ كَالرِّبٰوا وَالْغَصْبِ وَالْاَوْلَادِ مِنَ الزِّنَا وَعِدْهُمْ بِاَنْ لَا بَعْثَ وَلَا جَزَاءَ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ بِذٰلِكَ اِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا .

এবং তাদের ধনে অর্থাৎ হারাম সম্পর্কে যেমন- সুদ, অপহরণ ইত্যাদিতে এবং ব্যভিচারজাত সন্তানসন্ততিতে শরিক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও যে পুনরুত্থানও হবে না, কোনোরূপ প্রতিফলেরও সম্মুখীন হতে হবে না। শয়তান তাদেরকে এভাবে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা তো মাত্র ছলনা। নিস্ফল। اِسْتَفْزِزْ এ স্থানে অর্থ প্রতারণা কর। اَجْلِبْ এ স্থানে মর্ম চিৎকার করে ডাক। خَيْل অশ্বারোহী। رَجْل পদাতিক।

٦٥. اِنَّ عِبَادِي الْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط تَسَلُّطٌ وَقُوَّةٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا حَافِظًا لَهُمْ مِنْكَ .

৬৫. আমার মু'মিন বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা শক্তি ও দাপট চলবে না। কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোমার চক্রান্ত থেকে রক্ষাকারী হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

٦٦. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي يُجْرِي لَكُمُ الْفُلْكَ السُّفُنَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ط تَعَالٰى بِالتِّجَارَةِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا فِي تَسْخِيْرِهَا لَكُمْ وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ الشِّدَّةُ فِي الْبَحْرِ خَوْفَ الْغَرَقِ ضَلَّ غَابَ عَنْكُمْ مَنْ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنَ الْاٰلِهَةِ فَلَا تَدْعُوْنَهٗ اِلَّا اِيَّاهُ ج تَعَالٰى فَاِنَّكُمْ تَدْعُوْنَهٗ وَحْدَهٗ لِاَنَّكُمْ فِي شِدَّةٍ لَا يَكْشِفُهَا اِلَّا هُوَ .

৬৬. তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান নৌকাসমূহ পরিচালিত করেন। যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তাঁর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার তা তোমাদের বাধ্যগত করে দেওয়ায় নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। يُزْجِي - প্রবাহিত করেন, পরিচালিত করেন। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ অর্থাৎ নিমজ্জনের ভয় স্পর্শ করে তখন হারিয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের [মন] থেকে সরিয়ে যায় তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর অর্থাৎ ইলাহ হিসেবে উপাসনা কর তারা। এ সময় আর এদের তোমরা আহ্বান কর না। এ বিপদে নিপতিত হয়ে কেবল আল্লাহকেই তখন তোমরা ডাক। তিনি ব্যতীত আর কেউ তা বিদূরিত করার নেই।

٦٧. فَلَمَّا نَجّٰكُمْ مِنَ الْغَرَقِ وَاَوْصَلَكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ عَنِ التَّوْحِيْدِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا جُحُوْدًا لِلنِّعَمِ .

৬৭. অনন্তর তিনি যখন তোমাদেরকে নিমজ্জন থেকে উদ্ধার করেন এবং পৌঁছিয়ে দেন স্থলে তখন তোমরা তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। اَلضُّرُّ কষ্ট, বিপদ। كَفُوْرًا - অতিশয় নিয়ামত অস্বীকারকারী।

٦٨. اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَيِ الْاَرْضِ كَقَارُوْنَ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اَيْ يَرْمِيْكُمْ بِالْحَصْبَاءِ كَقَوْمِ لُوْطٍ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا حَافِظًا مِنْهُ .

৬৮. তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেলে যে, কারূনের মতো তোমাদেরকেও তিনি মাটিতে ভূগর্ভে দাবিয়ে দেবেন না বা লূত সম্প্রদায়ের মতো তোমাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন না? তোমাদেরকে কঙ্কর ছুঁড়ে মারবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোনো কর্মবিধায়ক অর্থাৎ তা থেকে রক্ষাকারী পাবে না।

Free @ www.eilm.weebly.com

٦٩. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ أَيِ الْبَحْرِ تَارَةً مَرَّةً أُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ أَيْ رِيْحًا شَدِيْدَةً لَا تَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا قَصَفَتْهُ فَتَكْسِرُ فُلْكَكُمْ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ بِكُفْرِكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا نَصِيْرًا أَوْ تَابِعًا يُطَالِبُنَا بِمَا فَعَلْنَا بِكُمْ.

৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে তিনি তোমাদেরকে তাতে অর্থাৎ সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না অনন্তর তা তোমাদের নৌযানসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে। অনন্তর তোমাদের কুফরি করার দরুন তোমাদেরকে তিনি নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না। বা এর অর্থ হলো তোমাদের পরবর্তী এমন কেউ থাকবে না যে তোমাদের সাথে আমার আচরণ সম্পর্কে আমাকে কৈফিয়ত চাইতে পারে। تَارَةً أُخْرٰى আরেকবার। قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ কুজঝটিকা যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাই ভেঙ্গেচুরে একাকার করে ফেলে। بِمَا كَفَرْتُمْ-এ স্থানে مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّة বা ক্রিয়ার উৎস অর্থব্যঞ্জক। تَبِيْعًا অর্থ সাহায্যকারী, অনুসরণকারী।

٧٠. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا فَضَّلْنَا بَنِيْ آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالنُّطْقِ وَاعْتِدَالِ الْخَلْقِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَمِنْهُ طَهَارَتُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْبَحْرِ عَلَى السُّفُنِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا كَالْبَهَائِمِ وَالْوُحُوْشِ تَفْضِيْلًا فَمَنْ بِمَعْنٰى مَا أَوْ عَلٰى بَابِهَا وَتَشْمُلُ الْمَلٰئِكَةَ وَالْمُرَادُ تَفْضِيْلُ الْجِنْسِ وَلَا يَلْزَمُ تَفْضِيْلُ أَفْرَادِهٖ إِذْهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْبَشَرِ غَيْرَ الْأَنْبِيَاءِ.

৭০. নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি অর্থাৎ জ্ঞান, ভাষা, সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি। মৃত্যুর পর তাদের [মু'মিনদের লাশ] পবিত্র হওয়ার বিধানও এর অন্যতম, স্থলে বহনকারীপ্রাণীর মাধ্যমে ও সমুদ্রে জলযানসমূহের মাধ্যমে আমি তাদের চলাচলের বাহনের ব্যবস্থা করেছি; তাদেরকে পবিত্র জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছি সে সমস্তের অনেক কিছুর উপর যেমন– পশু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির উপর নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। ফেরেশতাগণের উপরও এ শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। এ স্থানে শ্রেষ্ঠত্ব বলতে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এতে প্রত্যেক সদস্যের শ্রেষ্ঠ হওয়া বুঝায় না। ফেরেশতাগণ নবীগণ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। مِمَّنْ خَلَقْنَا - এ স্থানে مَنْ শব্দটি مَا অর্থে বা এর নিজস্ব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ أَخْبِرْنِيْ : أَرَأَيْتَكَ-এর كَافْ টি خِطَابْ-এর জন্য হয়েছে, এটা اِسْمْ নয়। বরং فَاعِلْ مُخَاطَبْ-এর اِسْنَادْ-এর تَاكِيْد হয়েছে। কাজেই এর কোনো مَحَلِّ اِعْرَابْ নেই। আর هٰذَا টা أَرَأَيْتَكَ-এর প্রথম মাফউল আর اَلَّذِيْ كَرَّمْتَ হলো هٰذَا - এর সিফত, আর أَرَأَيْتَكَ-এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে। আর তা হলো لِمَ كَرَّمْتَ عَلَيَّ এই উহ্যের উপর সিফত দালালত করতেছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ فَضَّلْتَ : প্রশ্ন. كَرَّمْتَ -এর তাফসীর فَضَّلْتَ দ্বারা কেন করা হলো?

উত্তর. কেননা تَكْرِيْم -এর সেলাহ عَلٰى হয় না।

قَوْلُهُ مُنْظَرًا : অর্থাৎ مُهْمَلًا এখানে اَذْهَبْ টা ذِهَابٌ থেকে নয় যা اَلْمَجِيْ -এর বিপরীত; বরং এর অর্থ হলো- اِمْضِ لِشَانِكَ الَّذِىْ اِخْتَرْتَهٗ অর্থাৎ তুমি যা করার ইচ্ছা করেছ তা করে ফেল।

قَوْلُهُ اَنْتَ وَهُمْ : এ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, مِنْهُمْ -এর মধ্যে هُمْ হলো غَائِبٌ -এর বহুবচনের যমীর আর جَزَائُكُمْ -এর মধ্যে كُمْ হলো حَاضِرٌ -এর বহুবচনের যমীর। কাজেই উভয়টির মধ্যে مُطَابَقَتْ নেই।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো, মূলে ছিল- اِنَّ جَهَنَّمَ جَزَائُكَ وَجَزَاءُهُمْ এরপর مُخَاطَبْ কে- غَائِبْ -এর উপর প্রাধান্য দিয়ে দিয়েছে। কাজেই উভয় যমীরের مُخَالَفَتْ -এর আপত্তির নিরসন হয়ে গেল।

قَوْلُهُ اِسْتَفْزِزْ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ হতে اَمْر -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ- তুমি ঘাবড়ে যাও, হতবুদ্ধি হয়ে যাও।

قَوْلُهُ لَاَحْتَنِكَنَّ : এ শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اِحْتِنَاكٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَةٌ -এর وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। অর্থ- অবশ্যই আমি তোমাকে আমার আয়ত্তে নিয়ে নেব। অবশ্যই আমি তোমাকে লাগাম লাগিয়ে দেব।

قَوْلُهُ لَاَسْتَاْصِلَنَّ : অর্থ- আমি পরিপূর্ণভাবে মূলোৎপাটন করব, মূল থেকে উপড়ে ফেলব।

قَوْلُهُ اَوْصَلَكُمْ : প্রশ্ন. نَجَّاكُمْ -এর তাফসীর اَوْصَلَكُمْ দ্বারা কেন করা হলো?

উত্তর. যেহেতু تُنْجِيْكُمْ -এর সেলাহ اِلٰى আসে না আর এখানে সেলাহ اِلٰى হয়েছে যা বৈধ নয়, যার কারণ বলে দিয়েছেন যে, تُنْجِيْكُمْ টা اَوْصَلَكُمْ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার সেলাহ اِلٰى আসে।

قَوْلُهُ بِكُفْرِكُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, بِمَا كَفَرْتُمْ -এর মধ্যে مَا টা مَصْدَرِيَّةْ হয়েছে, কাজেই عَدَمْ عَائِدْ -এর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

قَوْلُهُ اِعْتِدَالُ الْخَلْقِ : এবং اِعْتِدَالٌ -এরই কথা সেটা যেটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি মাথা নিচু করে আহার গ্রহণ করে কিন্তু মানুষ মাথা নিচু করার পরিবর্তে আহারকে মুখের দিকে উত্তোলন করে থাকে।

قَوْلُهُ اَلْمَرَاُ وَتَفْضِيْلُ الْجِنْسِ : এই বৃদ্ধিকরণ একটি প্রশ্নের জবাবে হয়েছে।

প্রশ্ন. আমরা এটা মানি না যে, সকল আদম সন্তান সকল ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম?

উত্তর. এখানে جِنْس بَنِىْ اٰدَمَ - এর جِنْس مَلَائِكَةٌ -এর উপর শ্রেষ্ঠ বুঝানো উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বিশেষ ফেরেশতাগণ সাধারণ মানুষ থেকে উত্তম। বিশেষ মানুষ যেমন নবীগণ তাদের থেকে উত্তম নয়।

বি. দ্র. যদি عَلٰى كَثِيْرٍ শব্দটির প্রতি বিশেষভাবে গবেষণা করা হয় তবে উল্লিখিত প্রশ্নটিই উত্থাপিত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের দৌরাত্ম্য, নাফরমানি, প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরোধিতা ও শত্রুতার উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে হযরত আদম (আ.) এবং ইবলিস শয়তানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পুরাতন দুশমন তাই তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না এবং তোমাদের নিকট আমার প্রেরিত নবীর বিরোধিতা করো না। শয়তানের কাজই হলো মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক করা, মানুষকে পথভ্রষ্ট করা।

-[মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্ধলবী (র.) খ. ৪, পৃ. ৩৩৬]

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য ঘটনা দ্বারা এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া হলো ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করা হলো শয়তানের কাজ। এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করার লক্ষ্যেই হযরত আদম (আ.) ও ইবলিস শয়তানের ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

আর সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সেজদা কর তখন সঙ্গে সঙ্গে ইবলিস ব্যতীত সকলে সেজদা করেছে। ইবলিস বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। ইবলিস সেজদা করতে অস্বীকার করেছে এবং অহংকার করেছে।

মানব সৃষ্টির ইতিকথা : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, সাইদ ইবনে যুবায়ের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, জমিন থেকে এক মুঠো মাটি নিয়েছেন মিষ্টি এবং লবণাক্ত উভয় প্রকার, তা দ্বারা আদমের দেহ তৈরি করেছেন। যাকে মিষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সে ভাগ্যবান হয়েছে, এমনকি তার পিতামাতা কাফের হলেও। পক্ষান্তরে যাকে লবণাক্ত মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে সে হয়েছে ভাগ্যহত, এমনকি নবীর সন্তান হলেও।

আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, বায়হাকী এবং হাকেম হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহ পাক সমগ্র পৃথিবী থেকে এক মুঠো মাটি নিয়েছেন, তা থেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আদমের সন্তানগণ ঐ মাটি মোতাবেকই হয়েছে। বর্ণের দিক থেকে লাল, সাদা, কাল অথবা মাঝারী ধরনের। এমনিভাবে মেজাজের দিক থেকে বিনম্র, কঠোর, মন্দ এবং উত্তম। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ৯৪ ; তাফসীরে তাবারী, খ. ১৫, পৃ. ৮০]

قَوْلُهُ قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ : "সে বলেছে, এই তো সেই, যাকে আপনি আমার চেয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন।" অভিশপ্ত শয়তান দরবারে এলাহীতে মানুষের সাথে তার শত্রুতার কথা প্রকাশ করেছে। আদম সন্তানের প্রতি তার যে বিদ্বেষ রয়েছে তা প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। শুধু তাই নয়, বরং মানব জাতির সর্বনাশ সাধনের সংকল্পের কথাও সে বলেছে। আর এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কেয়ামত পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদানের আবেদন পেশ করেছে।

اِحْتِنَاكٌ . لَاَحْتَنِكَنَّ শব্দের অর্থ– কোনো বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা।

اِسْتَفْزِزْ : قَوْلُهُ وَاسْتَفْزِزْ শব্দের আসল অর্থ– বিচ্ছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বুঝানো হয়েছে।

صَوْتٌ : قَوْلُهُ بِصَوْتِكَ শব্দের অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং-তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গানবাজনা হারাম। –[কুরতুবী]

ইবলীস হযরত আদমকে সিজদা না করার সময় দুটি কথা বলেছিল। **প্রথম কথা**, আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহর আদেশের বিপরীতে, নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোনো আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোনো কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন– আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের আজাবে তাদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরি বিবেচিত হয় না; বরং এই বাক্যপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবত সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবিই ছিল, তাও অবাস্তব নয়।

قَوْلُهُ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ : মানুষের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এই যে, ধনসম্পদকে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধনসম্পদে শয়তানের শরিকানা। সন্তানসন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানা কয়েকভাবে হতে পারে। সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে তাদের লালনপালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? সর্বশেষ আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। **এক.** এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলি ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? **দুই.** অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বুঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণত সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে– যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এ ছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র ঊর্ধ্বজগৎ ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো– এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোনো কোনো আলিম বলেন, হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ কাঁচা মাংস, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীবজন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যেই বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীবজন্তুর চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী; যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণত ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ শ্রেণির ফেরেশতা; যেমন জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সৎকর্মী মু'মিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণির মু'মিন, যেমন পয়গাম্বর শ্রেণি, তাঁরা বিশেষ শ্রেণির ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলা বাহুল্য এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য সাফল্য ও যুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা এই- أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত। -[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ : এ আয়াতে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সেরা মানব জাতির সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। মানুষকে আল্লাহ পাক অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। যেমন মানুষের আকার-আকৃতি, মানুষের বাক-শক্তি, বিচার-বুদ্ধি, বোধ-শক্তি, লেখার শক্তি, ইঙ্গিতে বুঝাবার শক্তি, সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর কর্তৃত্ব, বিভিন্ন রকম শিল্প এবং পেশা কৌশল প্রদান করেছেন। তিনি মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর সঙ্গে মহাকাশের কিছুর যোগসূত্র স্থাপনের তৌফিক দান করেছেন যেন মানুষ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হতে পারে এবং রিজিকের উপকরণ সমূহ অর্জিত হতে পারে। তিনি মানুষকে জীবজন্তুদের থেকে পৃথক এক বিশেষ ব্যবস্থা দিয়েছেন যে মানুষ হাত দ্বারা ধরে স্বচ্ছন্দে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে এবং মানুষকে তিনি মহব্বত, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করেছেন যেন সে আল্লাহ পাকের মারেফাত লাভ করে, তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। হাকেম এবং দায়লামী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- আঙ্গুল দ্বারা খাবার গ্রহণ করার ব্যবস্থার মাধ্যমেও আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানিত করেছেন।

মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা : এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ পাক মানব জাতিকে যে সম্মান এবং মর্যাদা দান করেছেন তা দু'প্রকার একটি দৈহিক আরেকটি আধ্যাত্মিক বা রূহানী। দৈহিক সম্মান এবং বৈশিষ্ট্য সকল মানুষই পেয়ে থাকে মুমিন হোক বা কাফের। দৈহিক মর্যাদা এই যে-

১. আল্লাহ পাক স্বয়ং তার মালমসলা তৈরি করেছেন এবং স্বীয় কুদরতি হাতে তাকে বানিয়েছেন।

২. আল্লাহ পাক মানুষকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

৩. মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সঠিক ওজন মোতাবেক বানিয়েছেন।

৪. ধরা এবং খাওয়ার জন্য আঙ্গুল দিয়েছেন।

৫. চলার জন্য পা দান করেছেন।

৬. পুরুষদেরকে দাড়ি এবং মেয়েদেরকে চুল দিয়ে তাদের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন।

৭. বুদ্ধি-বিবেচনা দান করেছেন।

৮. বাকশক্তি দান করেছেন।

৯. কলম দ্বারা লিখতে শিখিয়েছেন।

১০. জীবিকা উপার্জনের পথ নির্দেশ করেছেন।

১১. নব-নব আবিষ্কারের পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আধ্যাত্মিক বা রূহানী মর্যাদা : মানুষের দ্বিতীয় প্রকার মর্যাদা হলো রূহানী। আর এ মর্যাদাও দু-ভাগে বিভক্ত। একটি হলো সাধারণ। আরেকটি হলো বিশেষ। সাধারণ মর্যাদা মুমিন এবং কাফের উভয়েই লাভ করে।

১. রূহানী মর্যাদা হলো এই যে, আল্লাহ পাক মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি মানবদেহে একটি রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, ফলে সে জীবন্ত হয়েছে।

২. এরপর আদম সন্তানদেরকে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেছেন এবং সমগ্র মানব জাতিকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?] বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ পাকের সম্বোধন লাভ করা নিঃসন্দেহের বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ পাকের এই কথার জবাবে মুমিন ও কাফের সকলে بَلٰى [হ্যাঁ] বলে জবাব দেয় অর্থাৎ আল্লাহ পাক সকলের নিকট থেকে তাঁকে পালনকর্তা হিসাবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

৩. সমগ্র মানব জাতিকে স্বভাব ধর্মের উপর সৃষ্টি করা হয়।

৪. এরপর কৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণ করেন যুগে যুগে এবং আসমানি গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেন। এর দ্বারা একথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, যদি তোমরা স্বভাব ধর্ম ইসলামের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা কর, তবে কেয়ামতের পর তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে জান্নাতে চিরদিন বাস করবে। পক্ষান্তরে যদি কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ কর এবং তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শত্রু ইবলিসের অনুসারী হও, তবে ইবলিসের সঙ্গে তোমাদেরকে দোজখে থাকতে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧١. اُذْكُرْ يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ج بِنَبِيِّهِمْ فَيُقَالُ يَا اُمَّةَ فُلَانٍ اَوْ بِكِتَابِ اَعْمَالِهِمْ فَيُقَالُ يَاصَاحِبَ الْخَيْرِ وَيَا صَاحِبَ الشَّرِّ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَمَنْ اُوْتِيَ مِنْهُمْ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ وَهُمُ السُّعَدَاءُ اُولُوا الْبَصَائِرِ فِى الدُّنْيَا فَاُولٰئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ يُنْقَصُوْنَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ فَتِيْلًا قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ

৭১. স্মরণ কর সেই দিনকে যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব নবীগণের নাম উল্লেখ করে আহ্বান করব, যেমন বলা হবে, হে অমুক নবীর উম্মত; বা এর অর্থ হলো, তাদের আমলনামা উল্লেখ করে ডাকব, যেমন, বলা হবে, হে সৎ আমলের অধিকারী বা হে অসৎ আমলের অধিকারী! আর এই ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের দিন। এদের মধ্যে যাদের দক্ষিণ হস্তে তাদের আমল নামা দেওয়া হবে অর্থাৎ যারা সৌভাগ্যবান এবং দুনিয়াতে ছিল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না অর্থাৎ তাদের আমলনামা থেকে কিছু হ্রাস করা হবে না। فَتِيْلًا অর্থাৎ খর্জুর বীচির উপরস্থ হালকা বাকল পরিমাণও।

٧٢. وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَىِ الدُّنْيَا اَعْمٰى عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى عَنْ طَرِيْقِ النَّجَاةِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَاَضَلُّ سَبِيْلًا اَبْعَدُ طَرِيْقًا عَنْهُ ـ

৭২. যে এই স্থানে অর্থাৎ ইহলোকে সত্য থেকে অন্ধ পরলোকেও সে মুক্তির পথ ও আমলনামা পাঠ হতে হবে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট তা হতে অধিকতর দূরবর্তী পথে সে বিদ্যমান।

٧٣. وَنَزَلَ فِىْ ثَقِيْفٍ وَقَدْ سَاَلُوْهُ اَنْ يُحَرِّمَ وَادِيْهِمْ وَاَلَحُّوْا عَلَيْهِ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ كَادُوْا قَارَبُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ يَسْتَنْزِلُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ق وَاِذًا لَّوْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ـ

৭৩. সাকীফ গোত্রের লোকগণ রাসূল ﷺ -এর নিকট তাদের এলাকাটি হেরেমরূপে নির্ধারণ করতে আবেদন করেছিল এবং এই বিষয়ে তারা খুবই পীড়াপীড়ি করেছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা থেকে তারা প্রায় তোমার পদস্খলন ঘটিয়ে ফেলেছিল যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর। তখন অর্থাৎ তুমি তা করলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। اِنْ এটা مُخَفَّفَه বা লঘুকৃত। كَادُوْا - নিকট ছিল। يَفْتِنُوْنَكَ - যে তারা তোমার পদস্খলন ঘটিয়ে ফেলবে।

٧٤. وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ عَلَى الْحَقِّ بِالْعِصْمَةِ لَقَدْ كِدْتَّ قَارَبْتَ تَرْكَنُ تَمِيْلُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا رُكُوْنًا قَلِيْلًا لِشِدَّةِ احْتِيَالِهِمْ وَاِلْحَاحِهِمْ وَهُوَ صَرِيْحٌ فِىْ اَنَّهٗ لَمْ يَرْكَنْ وَلَاقَارَبَ ـ

৭৪. আমি তোমাকে ইচ্ছামতো বা নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করার মাধ্যমে সত্যের উপর অবিচলিত না রাখলে তাদের পীড়াপীড়ি এবং প্রতারণায় তুমি তাদের প্রতি প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তে। বক্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে এই কথা ব্যক্ত করছে যে, রাসূল ﷺ তাদের প্রতি ঝুঁকেও যান নি বা তার নিকটবর্তীও হননি। كِدْتَ - তুমি সন্নিকটে ছিলে, تَرْكَنُ - ঝুকতে।

٧٥. إِذًا لَّوْ رَكَنْتَ لَأَذَقْنٰكَ ضِعْفَ عَذَابِ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ عَذَابِ الْمَمَاتِ أَيْ مِثْلَيْ مَا يُعَذَّبُ غَيْرُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا مَانِعًا مِنْهُ.

৭৫. তখন অর্থাৎ তুমি যদি ঝুঁকে পড়তে তবে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে অন্যরা যে শাস্তি পেত বা পাবে তার দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম অতঃপর আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোনো সাহায্যকারী তা হতে তোমাকে রক্ষাকারী পেতে না।

٧٦. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ لَهُ الْيَهُوْدُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا فَالْحَقْ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا أَرْضُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ أَرْضِ الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّوْ أَخْرَجُوْكَ لَا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا ثُمَّ يُهْلَكُوْنَ.

৭৬. ইহুদিরা রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, আপনি সত্যই নবী হয়ে থাকলে শামে চলে যান। কেননা তাই মূলত নবীগণের ভূমি। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, তারা তোমাকে ভূমি হতে অর্থাৎ মদীনা ভূমি হতে উৎখাত করতে চেয়েছিল, তোমাকে সেথা হতে বের করার জন্য। তা হলে অর্থাৎ যদি তোমাকে বের করে দিত তবে তোমার পর তারাও সেথায় অল্প কালই টিকে থাকত পরে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। إِنْ - এটা مُخَفَّفَه বা লঘুকৃত।

٧٧. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَيْ كَسُنَّتِنَا فِيْهِمْ مِنْ إِهْلَاكِ مَنْ أَخْرَجَهُمْ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا تَبْدِيْلًا.

৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদের ক্ষেত্রের বিধানের মতো; অর্থাৎ যারা নবীগণকে বহিষ্কার করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া ছিল যেমন আমার বিধান তদ্রূপ তাদের ক্ষেত্রেও আমার তদ্রূপ বিধান। আর তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না। تَحْوِيْلًا - পরিবর্তন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أُنَاسٍ : লোকজন, এটা نَوْسٌ হতে নির্গত, যার অর্থ নড়াচড়া করা, এটা اِنْسَانٌ - এর جَمْعٌ بِغَيْرِ لَفْظِهِ হয়েছে। مِصْبَاحٌ তে রয়েছে যে, اِنْسَانٌ টা نَاسٌ হতে নির্গত এবং এটা اِسْمُ جِنْسٍ, এটা مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ, একবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ يَاصَاحِبَ الشَّرِّ : এতে মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ يَا صَاحِبَ كِتَابِ الشَّرِّ.

قَوْلُهُ يَقْرَرُوْنَ : অর্থাৎ يَقْرَءُوْنَ سُوَرًا অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পড়বে।

قَوْلُهُ قَدْرَ قِشْرَةِ النَّوَاةِ : মুফাসসির (র) فَتِيْلًا - এর তাফসীর قِشْرَةُ النَّوَاةِ দ্বারা করেছেন। যদি اَلْخَيْطُ الَّذِيْ فِيْ نُقْرَةِ النَّوَاةِ طُوْلًا দ্বারা فَتِيْلًا -এর তাফসীর করতেন তবে উত্তম হতো। কেননা খেজুর দানার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকে ১. فَتِيْل ২. قِطْمِيْر ৩. نَقِيْر

فَتِيْل ঐ রগ-বেশাকে বলা হয় যা দানার পিঠে লম্বা আকারে হয়ে থাকে, এবং বিচির উপর ঝিল্লির ন্যায় আবরণকে قِطْمِيْر বলা হয়। এবং বিচির পিঠে একটি ছিদ্র থাকে তাকে نَقِيْر বলা হয়। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِيْ)

قَوْلُهُ اَبْعَدُ طَرِيْقًا عَنْهُ : অর্থাৎ اَبْعَدُ طَرِيْقًا عَنِ الْاَعْمٰى فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ অন্ধ যেভাবে রাস্তা অবলোকন করা থেকে দূরে থাকে, কাফেররা মুক্তির পথ অবলোকন করা থেকে তার চেয়ে দূরে অবস্থান করবে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ رُكُوْنًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَفْعُوْل مُطْلَق হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে, مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে নয়। কেননা تَرْكَنُ হলো لَازِمْ ; مُتَعَدِّىْ নয়। شَيْئًا - এর মওসূফ رُكُوْنًا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَسْتَفِزُّوْنَكَ : অর্থাৎ لَيُزْعِجُوْنَكَ এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ - এর اِسْتِفْزَازٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ -এর جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ্ ك হলো মাফঊলের যমীর, অর্থ- তোমাদের পা উপড়ে ফেলবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ : এখানে اِمَامٌ শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ এখানে اِمَامٍ مُّبِيْنٍ অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থেরই আশ্রয় নেওয়া হয়; যেমন কোনো অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ قَالَ يُدْعٰى اَحَدُهُمْ فَيُعْطٰى كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ : অর্থাৎ يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ আয়াতের তফসীরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অর্থ আমলনামা করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েব মাশায়েখ ও ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বানকারী নেতা হোক।

-[তাফসীরে কুরতুবী]

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী দল, হযরত মূসা (আ)-এর অনুসারী দল, হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেওয়াও সম্ভবপর।

আমলনামা : কুরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাফেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ অন্য এক আয়াতে রয়েছে, اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ - প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডান হাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে; পরহেজগার হোক কিংবা গোনাহগার। তারা আনন্দচিত্তে আমলনামা পাঠ করবে এবং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে মুক্তির হবে; যদিও কোনো কোনো কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কুরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে تَطَايُرُ الْكُتُبِ শব্দটি উল্লিখিত আছে; অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোনো কোনো হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে- কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। -(বয়ানুল কোরআন)

قَوْلُهُ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম তিন আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তফসীরে মাযহারীতে ঘটনাটি নির্ণয় করার ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে যুবায়ের ইবনে নুফায়র (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঘটনাটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা সমর্থিত। ঘটনাটি এই যে, কতিপয় কুরায়শ সরদার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল ঃ আপনি যদি বাস্তবিকই আমাদের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার মজলিস থেকে সে সব দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্নমূল লোককে বের করে দিন, যাদের সাথে একত্রে বসা আমাদের জন্য অপমানকর। এরূপ করলে আমরাও আপনার সাহাবী ও বন্ধু হয়ে যাবো। তাদের এই আবদার শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনেও কিছুটা কল্পনা জাগে যে, এদের দাবি পূরণ করা হলে সম্ভবত এরা মুসলমান হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের আবদার একটি ফিতনা এবং তাদের বন্ধুত্বও ফিতনা। আপনি তাদের কথা মেনে নেবেন না। এরপর বলা হয়েছে : যদি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশিক্ষণ এবং আপনাকে দৃঢ়পদ রাখার ব্যবস্থা না হতো, তবে তাদের আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হয়ে যাওয়া আপনার কাছে অসম্ভব ছিল না।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কাফেরদের অনর্থক আবদারের দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঝুঁকে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার তাঁকে নিষ্পাপ করে এ থেকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। চিন্তা করলে এ আয়াতটি পয়গাম্বরদের সুউচ্চ ও পবিত্রতম চরিত্র ও স্বভাবের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। পয়গাম্বরসুলভ পাপমুক্ততা না থাকলেও কাফেরদের অনর্থক আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়া পয়গাম্বরের স্বভাবের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। পয়গাম্বরসুলভ নিষ্পাপ চরিত্রের কারণে তাও দূর করে দেওয়া হয়েছে।

إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ : অর্থাৎ যদি অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হতো এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বিগুণ হতো। কেননা নৈকট্যশীলদের মামুলি ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্নীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ : অর্থাৎ হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ : اِسْتِفْزَازٌ -এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দুরকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আবুল কাসেম ﷺ ! যদি আপনি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গাম্বরদের বাসভূমি। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ আয়াতটি নাজিল করে, এতে তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়েশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশি দিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাছীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসাবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কুরআন পাকের এই হুঁশিয়ারিও মক্কার কাফেররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরি অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ ﷺ সমগ্র মক্কা মোকাররমা জয় করে নেন।

قَوْلُهُ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا : এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপ চালু রয়েছে যে, যখন কোনো জাতি তাদের পয়গাম্বরকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٨. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اَىْ مِنْ وَقْتِ زَوَالِهَا اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ اِقْبَالِ ظُلْمَتِهٖ اَىِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا تَشْهَدُهٗ مَلٰۤئِكَةُ الَّيْلِ وَمَلٰۤئِكَةُ النَّهَارِ ۔

٧٩. وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ فَصَلِّ بِهٖ بِالْقُرْاٰنِ نَافِلَةً لَّكَ فَرِيْضَةً زَائِدَةً لَكَ دُوْنَ اُمَّتِكَ اَوْ فَضِيْلَةً عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَةِ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ يُقِيْمَكَ رَبُّكَ فِى الْاٰخِرَةِ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَحْمَدُكَ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ وَهُوَ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ فِىْ فَصْلِ الْقَضَاءِ ۔

٨٠. وَنَزَلَ لَمَّا اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ الْمَدِيْنَةَ مُدْخَلَ صِدْقٍ اَىْ اِدْخَالًا مَّرْضِيًّا لَا اَرٰى فِيْهِ مَا اَكْرَهُ وَّاَخْرِجْنِىْ مِنْ مَكَّةَ مُخْرَجَ صِدْقٍ اِخْرَاجًا لَا اَلْتَفِتُ بِقَلْبِىْ اِلَيْهَا وَاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا قُوَّةً تَنْصُرُنِىْ بِهَا عَلٰى اَعْدَائِكَ ۔

অনুবাদ :

৭৮. সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত অর্থাৎ যুহর, আসর, মাগরিব, ঈশা-এর সালাত কায়েম করবে আর ফজরের কুরআনও ভোরের সালাতও। ফজরের সালাত অবশ্যই তখন সমুপস্থিত হয় অর্থাৎ রাত্রি ও দিনের ফেরেশ্‌তাগণ সেই সময় সমুপস্থিত হয়। دُلُوْكِ الشَّمْسِ সূর্য হেলে পড়ার সময়। غَسَقِ الَّيْلِ অর্থাৎ নিশার ঘন অন্ধকার সমাগম।

৭৯. এবং রাত্রির কিছু অংশ তা সহ অর্থাৎ কুরআন সহ তাহাজ্জুদ সালাত কায়েম করবে; এটা তোমার জন্য অতিরিক্ত অর্থাৎ কেবল তোমার জন্য একটি অতিরিক্ত ফরজ হিসাবে নির্ধারিত। তোমার উম্মতের জন্য নয়; বা এর অর্থ, ফরজ সালাতসমূহের বাইরে এটা একটি বিশেষ মর্যাদা লাভের সালাত। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরকালে পৌঁছাবেন প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমূদে- প্রশংসিত স্থানে। পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সকলেই যে স্থানে তোমার প্রশংসা করবে। এটা হলো কিয়ামতের দিন বিচার কার্যের ফয়সালা দানের জন্য শাফায়াত স্থান।

৮০. হিজরত করার জন্য নির্দেশিত হওয়ার সময় নাজিল হয়। বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি মদীনায় আমার প্রবেশ শুভ রূপে কর সন্তোষ জনক কর। সেখানে যেন অপ্রীতিকর কিছু প্রত্যক্ষ না করি এবং মক্কা থেকে নির্গমন শুভ রূপে কর অর্থাৎ এমনভাবে নির্গমন কর যে এর প্রতি আমার মন যেন না ফিরে এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি। অর্থাৎ এমন শক্তি যা তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

٨١. وَقُلْ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ جَاءَ الْحَقُّ الْاِسْلَامُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ؕ بَطَلَ الْكُفْرُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا مُضْمَحِلًّا زَائِلًا وَقَدْ دَخَلَهَا وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ صَنَمًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهٖ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ الخ حَتّٰى سَقَطَتْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

৮১. এবং পুনরায় মক্কায় প্রবেশের সময় বলো, সত্য অর্থাৎ ইসলাম এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে অর্থাৎ কুফরির বিনাশ হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার তাতে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ সময় বায়তুল্লাহ কা'বা শরীফের চতুষ্পার্শে তিন শত ষাটটি মূর্তি অধিষ্ঠিত ছিল, তিনি তখন তাঁর হস্তের একটি লাঠি দ্বারা তাদেরকে গুঁতো দিতেছিলেন আর তেলাওয়াত করছিলেন : جَاءَ الْحَقُّ - .... সত্য এসেছে ... ...। শেষ পর্যন্ত প্রতিমাগুলো ভূলুণ্ঠিত হলো। শায়খান অর্থাৎ বুখারী-মুসলিম এর বিবরণ দিয়েছেন। زَهُوْقًا - অর্থাৎ বিবর্ণ ও বিনাশ প্রাপ্ত হলো

٨٢. وَنُنَزِّلُ مِنَ لِلْبَيَانِ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مِنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بِهٖ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا خَسَارًا لِكُفْرِهِمْ بِهٖ.

৮২. আমি অবতীর্ণ করি কুরআন যা মুমিনদের জন্য বিভ্রান্তি থেকে উপশমদাতা ও রহমত স্বরূপ আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য কাফেরদের জন্য এতদ্বিষয়ে তাদের কুফরির কারণে ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। مِنَ الْقُرْاٰنِ এ স্থানে مِنْ শব্দটি بَيَانِيَّة বা বিবরণমূলক।

٨٣. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ الْكَافِرِ اَعْرَضَ عَنِ الشُّكْرِ وَنَا بِجَانِبِهٖ ج ثَنٰى عَطْفَهٗ مُتَبَخْتِرًا وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ الْفَقْرُ وَالشِّدَّةُ كَانَ يَئُوْسًا قَنُوْطًا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ.

৮৩. আর মানুষের প্রতি কাফেরের প্রতি অনুগ্রহ করলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও এক পার্শ্বে সরে যায় অহংকার দেখিয়ে এক পার্শ্বে ঘুরে যায়। আর তাকে অনিষ্ট অর্থাৎ অভাব ও বিপদ স্পর্শ করলে সে হতাশ হয়ে পড়ে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে।

٨٤. قُلْ كُلٌّ مِنَّا وَمِنْكُمْ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ طريقته فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا طَرِيْقًا فَيُثِيْبُهٗ.

৮৪. বল, আমরা ও তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা সঠিক ও নির্ভুল। অনন্তর তাকে তিনি পুণ্য ফল প্রদান করবেন। سَبِيْلًا - পথ, পদ্ধতি

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مِنْ وَقْتِ زَوَالِهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ -এর মধ্যে لَامْ টা مِنْ অর্থে হয়েছে। কেননা ওয়াক্তের জন্য নামাজ পড়ার কোনো অর্থ হয় না। সালাতুল ফজর কে কুরআন বলা হয়েছে। কেননা কুরআন পাঠ করা সালাতের রোকন। যেমনি ভাবে সেজদা বলে সালাত উদ্দেশ্য হয়, রুকূ বলে নামাজ উদ্দেশ্য হয়। এমনিভাবে কুরআন বলেও সালাত উদ্দেশ্য হয়। এবং قُرْاٰنَ - এর আতফ اَلصَّلٰوةَ - এর উপর হয়েছে অর্থাৎ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاَقِمِ الْقُرْاٰنَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مِنَ اللَّيْلِ : অর্থাৎ بَعْضِ اللَّيْلِ

قَوْلُهُ دُلُوْكِ : সূর্য ঢলে পড়া, অস্ত যাওয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, دُلُوْكِ অর্থ হলো- অস্ত যাওয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর এবং জাবের (রা.)-এর মতে সূর্য ঢলে পড়া। আর زَوَال شَمْس - এর অর্থই অধিকাংশের থেকে বর্ণিত রয়েছে। আর এই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া অধিক উত্তম। তদুপরি دُلُوْك - এর অর্থ زَوَال নেওয়া হলে আয়াত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে অন্তর্ভুক্ত করবে। دُلُوْكِ الشَّمْسِ দ্বারা জোহর আসর এবং إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ দ্বারা মাগরিব ও এ'শা এবং قُرْاٰنَ الْفَجْرِ দ্বারা ফজরের নামাজকে বুঝাবে।

قَوْلُهُ غَسَقِ اللَّيْلِ : غَسَقٌ হলো অন্ধকার, আধার এবং বলা হয়েছে রাতের প্রথম অংশ প্রবেশ করা।

قَوْلُهُ فَتَهَجَّدْ : এটা اَلْهُجُوْدُ থেকে নির্গত অর্থ تَرْكُ النَّوْمِ لِلصَّلٰوةِ তথা নামাজের জন্য নিদ্রা পরিত্যাগ করা।

قَوْلُهُ نَافِلَةً : এর অর্থ অতিরিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শত্রুদের দূরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাজ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দূরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ অর্থাৎ আমি জানি যে, কাফেরদের কথা-বার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। -[তাফসীরে কুরতুবী]

এ আয়াতে আল্লাহর জিকির, প্রশংসা, তাসবীহ ও নামাজে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর জিকির ও নামাজ বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামাজ, যেমন কুরআন পাকে বলে وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ সবর ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ : সাধারণ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা دُلُوْك শব্দের অর্থ, আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دُلُوْك বলা যায়। কিন্তু সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই নিয়েছেন।

-[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ : غَسَقٌ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে دُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ -এর মধ্যে চারটি নামাজ এসে গেছে, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের দু'নামাজের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غَسَقِ لَيْل অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। এ কারণেই ইমাম আজম আবূ হানীফা সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তমিত হয়ে যায়।

Free @ www.eilm.weebly.com

বলা বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একই غَسَقِ اللَّيْلِ -এর তাফসীর স্থির করেছেন।

قَوْلُهُ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ : এখানে قُرْاٰنَ শব্দ বলে নামাজ বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাছীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, دُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ বাক্যে চার নামাজের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُوْدًا : شهادة ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, অর্থ– উপস্থিত হওয়া। সহীহ হাদীসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাজে উপস্থিত হয়। তাই একে مَشْهُوْد বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায় করতে পারে না। জানিনা, যারা কুরআনকে হাদীস ও রাসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবি করে তারা নামাজ কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাজে কুরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, অর্থাৎ ফজরের নামাজে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত এবং ফজরের সংক্ষিপ্ত কেরাতের কথা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তা কার্যত পরিত্যক্ত। সহীহ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাজে সূরা আ'রাফ, মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাজে শুধু 'قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ' ও 'قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী (র.) সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন– অর্থাৎ মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

তাহাজ্জুদ নামাজের সময় ও বিধানাবলি : وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ - تَهَجُّدْ শব্দটি هُجُوْدٌ থেকে উদ্ভূত। নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা بِهٖ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। [মাযহারী] কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামাজ পড়া। এ কারণেই শরিয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাজকে 'নামাজে তাহাজ্জুদ' বলা হয়। সাধারণত এর অর্থ এরূপ নেওয়া হয় যে, কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামাজ। কিন্তু তাফসীরে মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশ নামাজ পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাজের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কুরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোনো কোনো হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাছীর হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাছীর লেখেন قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ هُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيُحْمَلُ عَلٰى مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ অর্থাৎ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাজকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কুরআনের ভাষারও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই কিন্তু সাধারণত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম শেষরাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন, তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহাজ্জুদ ফরজ না নফল? نَافِلَةً نَفْل- نَافِلَةً لَّكَ শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব নামাজ ও সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরি নয় করলে ছওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গুনাহ, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাজে তাহাজ্জুদের সাথে نَافِلَةً لَكَ শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যও নফল। এজন্যই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে نَافِلَةً শব্দটিকে فَرِيْضَةً -এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ উম্মতের উপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাজই ফরজ কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরজ। অতএব এখানে نَافِلَةً শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত ফরজ; নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযযাম্মিল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামাজ সবার উপর ফরজ ছিল। সূরা মুয্যাম্মিলে এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে মি'রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরজ নামাজ সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষেও রহিত হয় কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের نَافِلَةً لَّكَ বাক্যের অর্থ এই যে, তাহাজ্জুদের নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরজ। কিন্তু তাফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। **এক.** ফরজকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোনো কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। **দুই.** সহীহ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে কিন্তু ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ অর্থাৎ আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম তখন ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই ছওয়াব দেওয়া হবে, যদিও কাজ হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর পাঞ্জেগানা নামাজ ছাড়া কোনো নামাজ ফরজ ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, نَافِلَةً শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরজের অর্থে হতো, তবে এর পরে لَكَ শব্দের পরিবর্তে عَلَيْكَ হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। لَكَ তো শুধু জায়েজ হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তাফসীর মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফরজ নামাজ যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে نَافِلَةً لَّكَ বলার কি অর্থ হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই নফল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের গুনাহের কাফফারা এবং ফরজ নামাজ সমূহের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ গুনাহ থেকে এবং ফরজ নামাজের ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোনো ত্রুটি পূরণের জন্য নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়। -[তাফসীরে কুরতুবী, মাযহারী]

তাহাজ্জুদ নফল, না সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ : ফিকহবিদদের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদার সাধারণ সংজ্ঞা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজ স্থায়ীভাবে করেছেন এবং বিনা ওজরে ত্যাগ করেননি, তাই সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। তবে যদি কোনো শরিয়ত সম্মত প্রমাণ দ্বারা বোঝা যায় যে, কাজটি একান্তভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই বৈশিষ্ট্য। সাধারণ উম্মতের জন্য নয়; তবে তা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ নয়। এই সংজ্ঞার বাহ্যিক তাগিদ এই যে, তাহাজ্জুদও সবার জন্য সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ হওয়া চাই, শুধু নফল নয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

কেননা তাহাজ্জুদের নামাজ স্থায়ীভাবে পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হওয়ারও কোনো প্রমাণ নেই। তাফসীরে মাযহারীতে একেই পছন্দনীয় ও অগ্রগণ্য উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে পূর্বে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ত এবং পরে ত্যাগ করে। তিনি উত্তরে বললেন, তার কর্ণকুহরে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। এ ধরনের বিরূপ মন্তব্য ও হুঁশিয়ারি শুধু নফলের জন্য হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

যারা তাহাজ্জুদকে শুধু নফল মনে করেন, তারা স্থায়ীভাবে তাহাজ্জুদ পড়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। উপরিউক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ তরক করার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এটা প্রকৃতপক্ষে নিছক তরক করার কারণে নয়, বরং প্রথমে অভ্যাস গড়ে তোলার পর তরক করার কারণে। কেননা একবার কোনো নফলের অভ্যাস করার পর তা নিয়মিতভাবে পালন করে যাওয়া সবার মতেই বাঞ্ছনীয়। অভ্যাস গড়ে তোলার অপর ত্যাগ করা নিন্দনীয়। কেননা অভ্যাসের পর বিনা ওজরে ত্যাগ করা এক প্রকার বিমুখতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই অভ্যাস করে না, সে নিন্দার পাত্র নয়।

তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা : সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ রমজানে অথবা রমজানের বাইরে কোনো সময় এগারো রাকাতের বেশি পড়তেন না। তন্মধ্যে হানাফীদের মতে তিন রাকাত ছিল বিতিরের নামাজ এবং অবশিষ্ট আট রাকাত তাহাজ্জুদের।

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে তেরো রাকাত পড়তেন। বিতিরের তিন রাকাত এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নতও এর অন্তর্ভুক্ত [মাযহারী] রমজানের কারণে ফজরের সুন্নতকে রাত্রিকালীন নামাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামাজ আট রাকাত পড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল।

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)-এরই অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে উপরিউক্ত সংখ্যা থেকে কম চার অথবা ছয় রাকাত ও পড়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে মাসরূক (র.) হযরত আয়েশা (রা.) কে তাহাজ্জুদের নামাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সাত, নয় ও এগারো রাকাত হতো ফজরের সুন্নত ছাড়া। [মাযহারী] হানাফী নিয়ম অনুযায়ী বিতিরের তিন রাকাত বাদ দিলে সাতের মধ্যে চার, নয়ের মধ্যে ছয় এবং এগারোর মধ্যে আট তাহাজ্জুদের রাকাত থেকে যায়।

তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার নিয়ম : বিভিন্ন হাদীস থেকে যা প্রমাণিত আছে, তা এই যে, প্রথমে দুরাকাত হালকা ও সংক্ষিপ্ত কেরাতে অতঃপর অবশিষ্ট রাকাতগুলোতে কেরাতেও দীর্ঘ এবং রুকূ-সিজদাও দীর্ঘ করা হতো। মাঝে মাঝে খুব বেশি দীর্ঘ করা হতো এবং মাঝে মাঝে কম [এ হচ্ছে ঐসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার, যেগুলো তাফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

'মাকামে মাহমূদ' আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মকামে মাহমূদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে এই মকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অন্য কোনো পয়গাম্বরের জন্য নয়। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ হাদীসসমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গাম্বরের সমীপে শাফায়াতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গাম্বরই ওজর পেশ করবেন। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফায়াত করবেন।

পয়গাম্বর ও সৎলোকদের শাফায়াত গ্রহণীয় হবে : ইসলামি উপদল সমূহের মধ্যে খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় পয়গাম্বরদের শাফায়াত স্বীকার করে না। তারা বলে কবিরা গুনাহ কারও শাফায়াত দ্বারা মাফ হবে না। কিন্তু মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, পয়গাম্বরগণের এমন কি, সৎলোকদের শাফায়াত গুনাহগারদের পক্ষে কবুল করা হবে। অনেক মানুষের গুনাহ শাফায়াতের ফলে মাফ হয়ে যাবে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকীতে হযরত উসমান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পয়গাম্বরগণের গুনাহগারদের জন্য শাফায়াত করবেন, এরপর আলেমগণ, এরপর শহীদগণ শাফায়াত করবেন। দায়লমী হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আলেমকে বলা হবে, আপনি স্বীয় শিষ্যদের জন্য শাফায়াত করতে পারেন, যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের তারকাসমূহের সমান।"

আবূ দাউদ ও ইবনে হাইয়ান হযরত আবুদ্দারদার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, শহীদের শাফায়াত তার পরিবারের সত্তর জনের জন্য কবুল করা হবে।

হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফায়াতের ফলে রবিয়া ও মুযার গোত্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীর চাইতে বেশি লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী]।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ শাফায়াত করবেন এবং তাঁর শাফায়াতের ফলে কোনো ঈমানদার দোজখে থাকবে না, তখন আলেম ও সৎলোকদের শাফায়াত কেন এবং কিভাবে হবে? তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সম্ভবত আলেম ও সৎলোকদের মধ্যে যারা শাফায়াত করতে চাইবেন, তারা নিজ নিজ শাফায়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পেশ করবেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে শাফায়াত করবেন।

ফায়দা : এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ আমার শাফায়াত তাদের জন্য হবে, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যারা কবীরা গুনাহ করেছিল। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে করীরা গুনাহগারদের জন্য শাফায়াত করবেন। কোনো ফেরেশতা অথবা উম্মতের কোনো ব্যক্তি তাদের জন্য শাফায়াত করতে পারবে না। বরং উম্মতের সৎকর্মশীলদের শাফায়াত সগীরা গুনাগারদের জন্য হবে।

শাফায়াতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাজের বিশেষ প্রভাব আছে : হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) বলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর মকামে মাহমূদ অর্থাৎ শাফায়াতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফায়াতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাজের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

قَوْلُهٗ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে এ কথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শধু পাঞ্জেগানা নামাজ কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গাম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ 'মকামে মাহমূদ' দান করার ওয়াদা করা হয়েছে, এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাফেরদের দূরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁবে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهٗ وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ : এখানে مُدْخَلَ ও مُخْرَجَ -এর অর্থ, প্রকাশ করার স্থানে ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صِدْقٍ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সং আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা আরবি ভাষায় صِدْقٍ এমন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যত ও অন্তর্গত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কুরআন পাকে قَدَمَ صِدْقٍ ـ لِسَانَ صِدْقٍ ও مَقْعَدِ صِدْقٍ শব্দগুলো এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

'প্রবেশ করার স্থান' বলে মদিনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, হে আল্লাহ মদিনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ি-ঘরের মহব্বত অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই তাফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তাফসীর আখ্যা দিয়েছন। ইবনে জারীরও এই তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেওয়ার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোনো লক্ষ্য ছিল না; বরং বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদিনায় প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল। তাই লক্ষ্যবস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া : হিজরতের সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদিনায় পৌছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেরদের কবল থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদিনাকে বাহ্যত ও অন্তর্গত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্য ও মুসলমানদের জন্য উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোনো আলেম বলেন, এ দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا এ দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালাতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

قَوْلُهُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ : এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম বলেন, বছরের প্রত্যেক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানে পৌছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। -[বুখারী, মুসলিম]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নিচ দিকে রাঙ্গতা অথবা লোহার রজত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মূর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযির বলেন– কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রঙবেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ.) যখন শেষ জমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ হাদীস অনুযায়ী খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

Free © www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ : কুরআন পাক যে অন্তরের ঔষধ এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কোনো কোনো আলেমের মতে কুরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের আমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কুরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর শরীরে ফুঁ দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোনো এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিচ্ছু দংশন করল লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর পায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'قُلْ اَعُوْذُ' শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কুরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا : এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কুরআন পাঠ করলে যেমন কুরআন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে তেমনি অবিশ্বাস এবং কুরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি ও বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ : এখানে شَاكِلَة শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সমবগুলোর সারমর্ম, পরিবেশ, অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। [কুরতুবী] এতে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরবার এবং সৎ লোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। [জাসসাস] কেননা পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এস্থলে شَاكِلَة-এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন! এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নজির।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্টা পুরুষদের জন্য এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

অনুবাদ :

٨٥. وَيَسْئَلُوْنَكَ اَىِ الْيَهُوْدُ عَنِ الرُّوْحِ ط الَّذِىْ يَحْيٰى بِهِ الْبَدَنُ قُلْ لَهُمْ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ اَىْ عِلْمِهٖ لَا تَعْلَمُوْنَهٗ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا بِالنِّسْبَةِ اِلٰى عِلْمِهٖ تَعَالٰى

৮৫. তারা অর্থাৎ ইহুদিগণ তোমাকে প্রশ্ন করে রূহ অর্থাৎ যার মধ্যে শরীর জীবন স্পন্দন পায় সেই বস্তুটি সম্পর্কে। তাদেরকে বল,- রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ থেকে আসে। অর্থাৎ এটা তিনিই অবগত আছেন। এ সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

٨٦. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَىِ الْقُرْاٰنِ بِاَنْ نَمْحُوْهُ مِنَ الصُّدُوْرِ وَالْمَصَاحِفِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ـ

৮৬. ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি অর্থাৎ আল-কুরআন অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম যেমন তা হৃদয় ও পুস্তকের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারতাম অতঃপর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো কর্ম-বিধায়ক পেতে না। لَئِنْ - এর لَامْ টি قَسْمِيَّةٌ অর্থাৎ শপথ ব্যঞ্জক।

٨٧. اِلَّا لٰكِنْ اَبْقَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا عَظِيْمًا حَيْثُ اَنْزَلَهٗ عَلَيْكَ وَاَعْطَاكَ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ ـ

৮৭. কিন্তু এটা প্রত্যাহার না করে বিদ্যমান রাখা তোমার প্রতিপালকের দয়া মাত্র। তোমার উপর তাঁর মহা অনুগ্রহ বিদ্যমান। সেহেতুই তিনি এটা তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছেন। তোমাকে 'মাকামে মাহমূদ' এবং আরো বহু বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছেন। اِلَّا - এটা এ স্থানে لٰكِنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٨. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ فِى الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا مُعِيْنًا نَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا ـ

৮৮. বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ অর্থাৎ এর ভাষালঙ্কার ও ভাব ঐশ্বর্যের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সকলেই সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। কাফেরদের কেউ কেউ বলত, ইচ্ছা করলে আমরাও এ ধরনের কথা বলতে পারি। এর জওয়াবে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। ظَهِيْرًا সাহায্যকারী।

٨٩. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيَّنَّا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز صِفَةٌ لِمَحْذُوْفٍ اَىْ مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ لِيَتَّعِظُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ اِلَّا كُفُوْرًا جُحُوْدًا لِلْحَقِّ ـ

৮৯. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য বিভিন্ন উপমা বার বার বর্ণনা করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কুফরি ব্যতীত সত্য-প্রত্যাখ্যান ব্যতীত আর সকল কিছুই অস্বীকার করে। صَرَّفْنَا বর্ণনা করে দিয়েছি। مِنْ كُلِّ مَثَلٍ এটা এ স্থানে উহ্য একটি শব্দের صِفَتْ বা বিশেষণ। মূলতঃ ছিল مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ - অর্থাৎ প্রত্যেক জাতীয় উদাহরণ।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৯০. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا

৯০. এবং তারা বলে, কখনই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। وَقَالُوا - পূর্বোল্লেখিত اِلّٰى -এর সাথে এর عَطْف বা অন্বয় হয়েছে। يَنْبُوْعًا এমন প্রস্রবণ যা থেকে পানি বেগে বের হয়।

৯১. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا

৯১. অথবা তোমার খর্জুর ও দ্রাক্ষার বাগান হবে। অনন্তর তার মাঝে মাঝে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদ-নালা। جَنَّةٌ বাগান। خِلَالَهَا তার মাঝে মাঝে।

৯২. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا

৯২. অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশ খণ্ড বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলে দিবে অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে নিয়ে আসবে আমরা তাদেরকে দেখব। كِسَفًا খণ্ড-খণ্ড করে। قَبِيْلًا সামনা সামনি, প্রত্যক্ষভাবে।

৯৩. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ হবে বা কোনো সিঁড়ি দিয়ে আকাশে আরোহণ করবে; কিন্তু তুমি যদি তাতে আরোহণ কর তবুও আমরা তোমার আকাশারোহণ কখনো বিশ্বাস করব না যতক্ষণ তুমি সেথা থেকে এমন এক কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবে যাতে তোমার সত্যতার সমর্থন থাকবে। আমরা তা পাঠ করব। এদেরকে বল, পবিত্র ও মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো অপরাপর রাসূলগণের মতো একজন মানুষ, একজন রাসূল বই তো নই। আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের কেউই তো কোনো নিদর্শন আনতে পারেননি। زُخْرُفٍ এ স্থানে অর্থ স্বর্ণ। تَرْقٰى আরোহণ করবে। سُبْحَانَ رَبِّيْ এ স্থানে বিস্ময় প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। هَلْ كُنْتُ এ স্থানে প্রশ্নবোধক هَلْ শব্দটি مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَنِ الرُّوْحِ : অর্থাৎ عَنْ حَقِيْقَةِ الرُّوْحِ

قَوْلُهُ عِلْمَهُ : অর্থাৎ اَلرُّوْحُ مِنَ الْاُمُوْرِ الَّتِىْ خَصَّ اللّٰهُ نَفْسَهُ بِعِلْمِهِ فَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الشَّانِ اَىِ الرُّوْحُ مِنْ شَانِ رَبِّىْ

قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ اِلٰى عِلْمِهِ تَعَالٰى : এটা সেই সন্দেহের জবাব যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا আর এখানে বলেছেন مَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই যে, সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলমের মোকাবিলায় স্বল্প।

قَوْلُهُ لَامُ قَسَمٍ : এটা উহ্য قَسَم -এর উপর বুঝাচ্ছে, لَنَذْهَبَنَّ হলো جَوَابُ قَسَمٍ যা جَوَابُ شَرْطٍ - এর স্থলাভিষিক্তও বটে। আবার কেউ কেউ ذَهَبْنَا بِهِ জবাবে শর্তকে উহ্য মেনেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لٰكِنْ اَبْقَيْنَاهُ : اِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয়েছে مُتَّصِلْ নয়। কেননা اِلَّا - এর পূর্বেরটি رَحْمَتْ - এর جِنْس থেকে নয়।

قَوْلُهُ اَبْقَيْنَاهُ : اَبْقَيْنَاهُ কে উহ্য মেনেছেন যাতে করে বাক্যটি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কেননা এটা ব্যতীত বাক্যটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

قَوْلُهُ صِفَةٌ لِمَحْذُوْفٍ : এটা সেই প্রশ্নের জবাব যে, بَيَّنَّا টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِه একে مِنْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ করার প্রয়োজন নেই।

উত্তর হলো এই যে, তার মাফঊল উহ্য রয়েছে আর তা হলো مَثَلًا আর مِنْ كُلِّ مَثَلٍ টা كَائِنًا - এর مُتَعَلِّقْ হয়ে উহ্য মাফঊলের সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا كُفُوْرًا : প্রশ্ন. যখন ضَرَبْتُ اِلَّا زَيْدًا জায়েজ নেই, তবে اِلٰى اَكْثَرَ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا কেন বৈধ হয়? এটাতো مُثْبَتْ - এর مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغْ হয়েছে। আর এটা জায়েজ নেই।

উত্তর. اِلٰى টা نَفْىْ - এর ফায়দা দিতেছে, মনে হয় যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, فَلَمْ يَرْضَوْا اِلَّا كُفُوْرًا ফার্সীতে এর অনুবাদ হলো - پس قبول نه کرد بیشتر مردمان مگر ناسپاسی را ـ

قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلٰى قَالُوْا : অর্থাৎ مُسْتَثْنٰى -এর উপর عَطْف হয়নি যার কারণে অর্থের ক্ষেত্রে فَسَادْ আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে রূহ্ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লিখিত হয়েছে। রূহ্ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কুরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়; অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কুরআন পাকে এ শব্দটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্যও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি, স্বয়ং কুরআন ও ওহীকেও রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا

রূহ বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন অর্থের দিক দিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোনো কোনো তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কুরআন অথবা ওহী বাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এর পূর্বেও نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ কুরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কুরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ্ বলে ওহী, কুরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কুরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ্ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ্ কি? মানবদেহে রূহ্ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদিনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদির কাছ দিয়ে গমন করছিলেন তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল : মুহাম্মদ ﷺ আগমন করছেন। তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজনে নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদি প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাজিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাজিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন : وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ বলা বাহুল্য কুরআন অথবা ওহীকে রূহ্ বলা কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই অবাস্তব। তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এ প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। এজন্যই ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর, কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কুরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ, কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযূল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর রিসালাত পরীক্ষা করা।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন : কুরাইশরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করতো। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদিরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তদনুসারে কুরাইশরা কয়েকজন লোক ইহুদিদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। -[ইবনে কাছীর] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই এক আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে রূহকে কিভাবে আজাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো আয়াত নাজিল হয়নি বিধায় রসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন।
-[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদীনায় : শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোনো কোনো তফসীরবিদ আয়াতটিকে 'মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই ইবনে কাছীর এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবত এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বার নাজিল হয়েছে; যেমন কুরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তাফসীরে মাযহারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্ন মদীনার এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাযহারী এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছে। এক. এ রেওয়ায়েতটি বুখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। দুই. এতে বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াব : প্রশ্নের উত্তরে কুরআন বলেছে, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ পানিপতির উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরি ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয়নি। কারণ তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোনো প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রূহ সাধারণ সৃষ্টজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জবাব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোনো ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেওয়া হয়নি; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি নয়, প্রশ্নকারীর ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য : ইমাম জাসসাস এই জওয়াব থেকে এ মাস'আলা বের করেছেন যে, প্রশ্নকারীর প্রত্যেক প্রশ্ন এবং তার দিকের জওয়াব দেওয়া মুফতি ও আলেমের দায়িত্বে জরুরি নয় বরং তার ধর্মীয় উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জওয়াব দেওয়া উচিত। যে জওয়াব প্রতিপক্ষের বোধশক্তির অতীত অথবা যে জওয়াবে প্রতিপক্ষের ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেই জওয়াব না দেওয়া উচিত। এমনিভাবে অনাবশ্যক ও বাজে প্রশ্নাদিরও জওয়াব দেওয়া উচিত নয়। তবে উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির যদি কোনো আমল করা জরুরি হয়ে পড়ে এবং সে নিজে আলিম না হয়, তবে মুফতি ও আলিমের পক্ষে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী এর জওয়াব দেওয়া জরুরি। [জাসসাস] ইমাম বুখারী 'ইলম' অধ্যায়ে এই মাস'আলার একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম যুক্ত করে বলেছেন যে, যে প্রশ্নের জওয়াব দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেই প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া অনুচিত।

রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কেউ জ্ঞান লাভ করতে পারে কি না? কুরআন পাক এ প্রশ্নের জওয়াব শ্রোতাদের প্রয়োজন ও বোধশক্তির অনুরূপ দান করেছে – রূহের স্বরূপ বর্ণনা করেনি। কিন্তু এতে জরুরি হয় না যে, রূহের স্বরূপ কোনো মানুষ বুঝতেই পারে না স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ ও এরূপ জানতেন না। সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতটি এর পক্ষেও নয় এবং বিপক্ষেও নয়। যদি কোনো রাসূল ওহীর মাধ্যমে এবং কোনো ওলী কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে এর রূপ জেনে নেয়, তবে তা আয়াতের পরিপন্থি নয়। বরং যুক্তি দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তাকে অনর্থক ও বাজে বলা গেলেও অবৈধ বলা যায় না। এ জন্যই অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম রূহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। শেষ যুগে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) একখানি পুস্তিকায় এ প্রশ্নের উপর চমৎকার আলোকপাত করেছেন এবং রূহের স্বরূপ সাধারণ মানুষের পক্ষে যতটুকু বোঝা সম্ভব, ততটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। একজন শিক্ষিত লোক এতে সন্তুষ্ট হতে পারে এবং সন্দেহ ও জটিলতা থেকে বাঁচতে পারে।

ফায়দা : ইমাম বগভী এস্থলে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতটি এই। এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়। একবার মক্কায় কোরায়েশ সরদাররা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততায় কেউ কোনোদিন সন্দেহ করেনি। তিনি কোনোদিন মিথ্যা বলেছেন বলেও কেউ অপবাদ আরোপ করেনি। এতদসত্ত্বেও তাঁর নবুয়তের দাবি আমাদের বোধগম্য নয়। তাই একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় ইহুদি আলিমদের কাছে প্রেরণ করে তার ব্যাপারে অনুসন্ধান করা দরকার। তদনুসারে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনার ইহুদি আলিমদের কাছে পৌঁছল। ইহুদি আলিমরা তাদেরকে পরামর্শ দিল যে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় বলে দিচ্ছি। তোমরা এগুলো সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করবে। যদি তিনি তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর না দেন, তবে তিনি নবী নন। এমনিভাবে যদি একটি প্রশ্নেরও উত্তর না দেন, তবুও নবী নন। পক্ষান্তরে যদি দুটি প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর না দেন, তবে বুঝে নেবে যে, তিনি নবী। প্রশ্ন তিনটি ছিল এই ঃ **এক.** তাঁকে ঐ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শিরক থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোনো গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। তাদের ঘটনা খুবই বিস্ময়কর। **দুই.** ঐ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সফর করেছিলেন। তার ঘটনা কি? তিন. রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।

প্রতনিধি দলটি ফিরে এসে তিনটি প্রশ্নই রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে পেশ করে দিল। রাসূল ﷺ বললেন–
আগামীকাল এর উত্তর দেব। কিন্তু তিনি 'ইনশাল্লাহ্' না বলায় এর ফলশ্রুতিতে কয়েকদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ রইল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এই বিরতিকাল বার থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। কোরাইশরা বিদ্রূপ ও দোষারোপের সুযোগ পেয়ে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ ও উদ্বিগ্ন হলেন। এরপর হযরত জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন–
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনো কাজের ওয়াদা করা হলে 'ইনশাল্লাহ' বলে করতে হবে। এরপর রূহ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। গর্তে আত্মগোপনকারীদের সম্পর্কে আসহাবে কাহাফের ঘটনা এবং পূর্ব পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কেও আয়াত নাজিল হয়। পরবর্তী সূরা কাহাফে তা বর্ণিত হবে। ঐ সূরায় আসহাবে কাহফ ও যুলকারনাইনের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জওয়াব দেওয়া হয়নি। [ফলে নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে ইহুদিদের বর্ণিত আলামত সত্যে পরিণত হয়।] তিনমিযীও এ রেওয়ায়েতটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছে। –[মাযহারী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

রূহ এবং প্রবৃত্তি : তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, রূহ এবং প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র বস্তু রয়েছে। রূহ মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে তথা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য উপকারী হবে এমন কাজের দিকে আহ্বান জানায়। আর প্রবৃত্তি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্পদের দিকে ডাকে। প্রবৃত্তি পানাহারের দিকে আকৃষ্ট, ভোগ বিলাসে মত্ত, আরাম আয়াশে নিরত। ক্রোধের সময় পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত। প্রতারণায় শয়তানের সঙ্গে রয়েছে তার ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু রূহ মানুষকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর নাজাতের পথে আহ্বান জানায়। রূহ এবং প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য হলো যেমন ফেরেশতা এবং শয়তানের মধ্যে। ফেরেশতা নূর দ্বারা তৈরি আর ইবলীস শয়তান অগ্নি দ্বারা। ফেরেশতা বাধ্য, ইবলীস শয়তান অবাধ্য।

হাফেজ ইবনুল বার (র.) শরহে মোয়াত্তার ভূমিকায় একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন–

إِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ جَعَلَ فِيْهِ نَفْسًا وَرُوْحًا فَمِنَ الرُّوْحِ عِفَافُهٗ وَفَهْمُهٗ .... وَسَفْهُهٗ وَغَضَبُهٗ وَنَحْوُ هٰذَا .

অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নফস বা প্রবৃত্তি এবং রূহ আমানত রেখেছেন। তাই রূহ থেকেই চরিত্র মাধুর্য, বিবেক বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে, নফস বা প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হলো অনাচার, ব্যভিচার, অহংকার, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি চারিত্রিক দুর্বলতা।

–[তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৬৫-৬৬]

রূহের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য : রূহ কি? রূহের তাৎপর্য্য এবং মাহাত্ম কি? এ সম্পর্কে মানব মনে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মানুষের নাজাতের জন্যে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরিও নয় এবং এটি নবী রসূলগণের তাবলীগের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তও নয়। তাহলে মক্কার কাফেররা বা মদীনার ইহুদিরা এ সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করেছে? এর একই জবাব, শুধু পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, সত্যকে উপলব্ধি করে তা গ্রহণের জন্যে নয়।

রূহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত : রূহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেননা মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান যখন মানুষের মধ্যে কার্যকর হয় তখন প্রকাশ্যে রক্ত ব্যতীত মানব দেহ থেকে আর কিছুই বের হয় না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি হলো নিঃশ্বাস'। কেননা নিঃশ্বাস বন্ধ হলে মানুষের মৃত্যু হয়। পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা বলেন, 'রূহ হলো একটি সূক্ষ্ম বাষ্প, যার দ্বারা সমস্ত দেহের কল-কব্জা চলমান থাকে। যখন এ বাষ্প বন্ধ হয়ে যায় তখন মানুষের মৃত্যু হয়।

আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আরেফীনের মতে রূহ হলো এমনি একটি সূক্ষ্ম নূরানী বস্তু যা' সমগ্র দেহে প্রবাহিত থাকে। যেমন গোলাপের পাপড়িতে সুগন্ধ এবং বৃক্ষে পানি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম বস্তুটির সম্পর্ক মানব দেহের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ মানুষটি জীবিত থাকে। পক্ষান্তরে, যখন মানব দেহের সঙ্গে এ সূক্ষ্ম নূরানী বস্তুটির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন মানুষটির মৃত্যু হয়। ইমামুল হারামাইন এবং ইমাম রাজী (র.) এ মতই প্রকাশ করেছেন।

–[তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কন্ধলভী (র.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ৫৬-৫৭]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে রূহের তাৎপর্য বা মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এজন্যে পবিত্র কুরআনে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ : [হে রসূল!] আপনি বলুন, 'রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে।" এ থেকে একথা প্রমাণিত হলো, আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে মানব দেহে কোনো কিছু প্রবেশ করে। ফলে মানুষ জীবনী শক্তির অধিকারী হয়। কিন্তু যখন ঐ বস্তুটি বের হয়ে যায় তখন মানুষের মৃত্যু ঘটে। এটিই আল্লাহ পাকের বিধান। একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মর্জি এবং নির্দেশক্রমেই সৃষ্টি এবং লয় হয়ে থাকে।

মানবজাতির সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে এ কথাও ঘোষণা করেছেন, خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ : আল্লাহ পাক তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে বলেছেন, হও। তাই সে হয়ে গেছে। আরও ইরশাদ হয়েছে, اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ আমি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করি তখন শুধু বলি হও আর তা হয়ে যায়। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রূহের চেতনা, গুণাবলি পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করতে থাকে। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহ এবং অন্য মানুষের রূহের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে রূহ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছে তা হলো রূহে মোহাম্মদী, কেননা প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর রূহ মোবারক উন্নতির এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অন্যদের জন্যে কল্পনাতীত। এই চরম ও পরম উন্নতির কিছু ইঙ্গিত আলোচ্য আয়াতের ভাষায়ও রয়েছে ঃ

Free @ www.eilm.weebly.com

قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ : এখানে রূহ শব্দের সঙ্গে اَمْرٌ শব্দের সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তদুপরি রব শব্দটির সঙ্গে (ইয়া) অক্ষরটির সম্পর্ক [যার অর্থ হলো 'আমার'] আরও তাৎপর্যবহ।

এতদ্ব্যতীত, রূহের যে উন্নতির কথা বলা হলো তা তার নিজস্ব নয়, অর্থাৎ তার নিজের এখতিয়ার নয়, বরং আল্লাহ পাকের মহান দানে ধন্য হয়েই রূহ উন্নতি করে, আল্লাহ পাক যাকে যতখানি উন্নতি প্রদানের মর্জি করেন সে ততখানি উন্নতি করতে পারে।

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে মানুষের রূহ বা মানবাত্মা যত উন্নতি করুক না কেন এবং তার পরিধি যত বিস্তৃতই হোক না কেন তা একটি সীমার মধ্যে থাকবে, অসীম হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ পাকের গুণাবলি অনন্ত অসীম, মানবাত্মার উন্নতি তেমন নয়। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে এটিই পার্থক্য।

মানুষ যত কামেল বা পরিপূর্ণই হোক না কেন তার রূহ যত উন্নতিই করুক না কেন, রূহানী বা আধ্যাত্মিক সাধনায় সে যে উন্নত মাকামেই পৌঁছুক না কেন, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকল গুণাবলি মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিতে পারেন। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, قربان رابیش بود حیرانی যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য হন তাদের পেরেশানি হয় অধিকতর। এজন্যেই বলা হয়েছে, اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ "ঈমান হলো আশা এবং ভয়ের মাঝখানে"। আল্লাহর রহমতের আশা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর গজবের ভয়ও অপরিহার্য। যেমন কুরআনে কারীমের একখানি আয়াতে আশা ও ভয়কে একত্রিত করে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ [হে রাসূল!] আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, আর একথাও জানিয়ে দিন যে নিশ্চয় আমার আজাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

মোটকথা : রূহের উন্নতি পুরোপুরি আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। দান করা বা দান ছিনিয়ে নেওয়া সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন। এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিখ্যাত সুফী সাধক হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) প্রায় সারারাত ক্রন্দন করতেন। কোনো কোনো সময় এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে তাঁর প্রতিবেশীরা মনে করতো হয়তো তাঁর বাড়িতে কারো মৃত্যু হয়েছে। একবার তাঁর খাদেম জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনার এ ক্রন্দন কি জান্নাত লাভের জন্য? তিনি বললেন, জান্নাতের জন্য ক্রন্দনের কি প্রয়োজন? কেননা আল্লাহ পাক যদি জান্নাত আমাদেরকে না দেন তবে কি কাফেরদেরকে দেবেন? লোকটি পুনরায় পশ্ন করলো ঃ তা হলে আপনার এই ক্রন্দন কি দোজখের ভয়ে? তিনি বললেন ঃ যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করেন তবে কাফেরদেরকে কোথায় রাখবেন? লোকটি বলল, তাহলে আপনার ক্রন্দন কিসের জন্যে? হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (র.) বললেন, আমার ক্রন্দনের কারণ হলো এই রাতের শেষ প্রহরে যখন সমগ্র বিশ্ববাসী নিদ্রায় বিভোর, তখন আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার এবং সেজদায় রত হয়ে নৈকট্য-ধন্য হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আমার ভয় হয় আমার কোনো আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে নৈকট্যের এই মাকাম থেকে বঞ্চিত না করেন। এ জন্যে আমি ক্রন্দন করি। মূলতঃ কুরআনে কারীমে এ কথাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে– وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ "আর আমি ইচ্ছা করলে যা কিছু নাজিল করেছি এর সব কিছু কেড়ে নিতে পারি কিন্তু আপনার প্রতিপালকের রহমত যে, তিনি তা করেননি।"

হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে দশজন সাহাবায়ে কেরামকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হলো, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নামই ছিল হযরত আবূ বকর (রা.) এর। তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারাবাদ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় দেখা গেল হযরত আবূ বকর (রা.) ক্রন্দনরত রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ এত বড় সুসংবাদ পাওয়ার পর ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি বলেছিলেন ঃ আল্লাহ পাক জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু যদি আমার কোনো আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করেন তখন আমার গতি কি হবে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বস্তুত : এটিই হলো রুহানী উন্নতির উচ্চ মাকাম। এ পর্যায়ে স্বয়ং প্রিয়নবী ﷺ -এর অবস্থাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একখানি হাদীসে রয়েছে– হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে এক ব্যক্তি আরজ করলেন, হুজুর ﷺ -এর কোনো আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ হুজুর ﷺ -এর কোন কাজটি আশ্চর্যজনক নয়? একদিন তিনি আমার নিকট আগমন করলেন, আমার বিছানায় আমার লেপের নীচেই শায়িত হলেন। একটু পরেই তিনি উঠলেন এবং উঠে বললেন ঃ আমি তো আমার প্রতিপালকের ইবাদত করবো। একথা বলে তিনি অজু করে নামাজের নিয়ত করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাঁর অশ্রুতে বক্ষ মোবারক ভেসে গেল। এভাবে রুকূ' ও সেজদার হালতেও তিনি ক্রন্দন করতে থাকলেন। আর ক্রন্দন করে রাত অতিবাহিত করলেন। অবশেষে ফজরের নামাজের জন্য হযরত বেলাল (রা.) ডাকতে আসলেন। আমি আরজ করলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক তো আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন। তবু এত ক্রন্দন করেন কেন? তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি কেন ক্রন্দন করবো না? অথচ আর এ রাতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে। এরপর ইরশাদ করলেন, ঐ ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস অনিবার্য যে এ আয়াতসমূহ পড়ে এবং চিন্তা করে না।

রূহের মাহাত্ম অনুভব করতে হলে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সমগ্র বিশ্ব একটা বিরাট কারখানা। তাতে অনেক প্রকার যন্ত্র রয়েছে। যথা ঃ শ্রবণযন্ত্র, দর্শন-যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র, চিন্তা করার যন্ত্র, পানাহার গ্রহণের যন্ত্র, খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের যন্ত্র, পানি নিষ্কাশনের যন্ত্র, চলাচল করার যন্ত্র প্রভৃতি। আর এজন্যেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক মানুষকে তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেছেন– وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

বস্তুতঃ মানব দেহ একটি বিরাট কারখানা, এতে অনেক যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। কারখানার সত্ত্বাধিকারী যখন তাতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করলেন, তখনই তাতে জীবনের স্পন্দন দেখা দিল। ঠিক এমনিভাবে মানবদেহের যন্ত্র রূহ বিহীন অসার, জীবনীশক্তি বিহীন হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয় তখন তা জীবন্ত, বলন্ত, চলন্ত হয়ে উঠে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক কথাটি এভাবে ইরশাদ করেছেন– وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ "আর আমি তাতে আমার রূহকে ফুঁকে দিলাম"। ঠিক যেমন অচল কারখানা বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলে তা চলমান হয় এবং যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে মানবদেহে যখন রূহ সঞ্চারিত হয় তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জীবনীশক্তি অনুভূত হয়। বিদ্যুতের কোনো স্বতন্ত্র আকৃতি যেমন লক্ষ্য করা যায় না, ঠিক তেমনি রূহও অদৃশ্য, তাকে কেউ দেখে না, এমনকি রূহের বিস্ময়কর রহস্য আজও মানুষের কাছে উদঘাটিত নয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শুধু এতটুকুই ইরশাদ করেছেন, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ : "হে রাসূল! আপনি জানিয়ে দিন যে রূহ হলো আমার প্রতিপালকের নির্দেশ"। প্রশ্ন হলো, এই নির্দেশটি কী? কুরআনে করীমে এই প্রশ্নের জবাবে রয়েছে, اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ : আল্লাহ পাক যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হও, তখন তা' হয়ে যায়। এই كن শব্দটি اَمْرٌ বা আদেশ। যখনই আল্লাহ পাক কোনো কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে আদেশ প্রদান করেন তখন তো সৃষ্টি হয়ে যায়। এটিই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনে خَلْقٌ اَمْرٌ সৃষ্টি আর আদেশ উভয় শব্দকে একত্র করে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

সতর্ক হও, আল্লাহর জন্যই সৃষ্টি এবং আদেশ অর্থাৎ সৃষ্টি করার শক্তি শুধু তারই। আর আদেশ প্রদানের একচ্ছত্র অধিকারও শুধু তাঁরই, এতে আর কেউ শরিক নয়।

অতএব, মানুষের দেহকে একটি কারখানা মনে করা যেতে পারে। আর রূহকে কারখানায় প্রবাহিত বিদ্যুৎ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যেভাবে বিদ্যুতের সুইচ টিপে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ পাকের আদেশ হলে মানবদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রূহের গন্তব্যস্থল : হযরত আবূ বকর (রা.)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানবদেহ থেকে যখন রূহ বের হয়, তখন কোথায় যায়? তিনি বলেন, মানবদেহের রূহ সাতটি স্থানে যায়।

১. নবী রসূলগণের রূহ, এর অবস্থান জান্নাতে আদন।

২. ওলামায়ে কেরামের রূহ, এর স্থান হলো জান্নাতুল ফেরদাউস।

৩. নেককার মুমিনদের রূহ ইল্লীয়্যিনে স্থান পাবে।

৪. আল্লাহর রাহে শহীদগণের রূহ বেহেশতে উড়তে থাকে এবং যে কোনো স্থানে যেতে পারে।

৫. গুনাহগার মুমিনগণের রূহ আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, জমিনেও নয়; আসমানেও নয়। এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

৬. মুমিনদের শিশু সন্তানদের রূহ কস্তুরীর পাহাড়ে থাকে।

৭. কাফেরদের রূহ সিজ্জীনে থাকে, তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের দেহ সহ আজাব দেওয়া হয়ে থাকে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

كَلَّآ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা আলোচ্য আয়াতের مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ বাক্যটির অর্থ হলো مِنْ وَحْيِ اللّٰهِ অর্থাৎ রূহ হলো আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ মাত্র।

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا : আর তোমাদেরকে সামান্য পরিমাণই জ্ঞান দান করা হয়েছে। এই সামান্য বলতে কতখানি তার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, মহাসমুদ্রে কোনো মানুষ তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দিলে মহাসমুদ্রের অথৈ পানির অনুপাতে ঐ আঙ্গুলের শীর্ষ যতখানি পানি ধারণ করে, ততখানি ইলমই মানুষকে দান করা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান অর্জনের পন্থা সীমিত। মানুষ শ্রবণ এবং দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। কুরআনে কারীমেই রয়েছে এর ঘোষণা।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا : আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃ-উদর থেকে বের করে এনেছেন, যখন তোমরা কিছুই জানতেনা তথা তোমাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না।

পরবর্তী আয়াতে জ্ঞান অর্জনের পন্থা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ : আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন শ্রবণ–শক্তি, দর্শন-শক্তি ও অন্তঃকরণ। অতএব, মানুষকে সীমিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের ইলমের অনুপাতে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে অতি সামান্য ইলমই দান করা হয়েছে। তাফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন– পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, রূহ সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা বা রূহের মাহাত্ম উপলব্ধি করা তোমাদের শক্তির উর্ধ্বে। আর তা তোমাদের দীনি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্তও নয় তাই এ সম্পর্কে তোমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়নি। –[তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা– ৫৯৫]

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا : যদি আমি ইচ্ছা করি তবে [হে রাসূল!] আপনাকে যে ওহী দান করেছি তা কেড়ে নিয়ে যেতে পারি। এরপর আপনি আমার বিরুদ্ধে তা এনে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে কাউকে পাবেন না।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, সামান্য জ্ঞানটুকু দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তা-ও ছিনিয়ে নিতে পারেন। মানুষের অন্তর থেকে তা ভুলিয়ে দিতে পারেন। অথবা গ্রন্থে লিখিত অংশ মুছে দিতে পারেন। কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ পাক যদি তাঁর মহান বাণী তুলে নেন তবে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যা' ফিরিয়ে দিতে পারে।

–[তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৩]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সেই ভ্রান্ত ধারণাকারীদের প্রতিবাদ রয়েছে যারা এই অন্যায় কথা বলেছে যে পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ রচনা করেন। কেননা এতে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ওহী তাঁর নবীর প্রতি প্রেরণ করা হয় তা আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে ছিনিয়ে নিতে পারেন। সেই শক্তি এবং অধিকার তাঁর আছে।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ: "কিন্তু আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে রহমতের কারণে"। অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন আপনার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেননা। কেননা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত আপনার প্রতি রয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো যদি আল্লাহ পবিত্র কুরআন ছিনিয়ে নেন তবে কেউ তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ পাক আপনার প্রতি রহম করেন তবে তিনিই ফিরিয়ে দিতে পারেন।

ইমাম রাযী (র.) আরো লিখেছেন, পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন তা মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট এহসান। বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ পাকের দু'টি বিশেষ দান রয়েছে। এক. কুরআনের ইলম হাছেল করা আল্লাহ পাক তাদের জন্য সহজ করেছেন। দুই. পবিত্র কুরআনকে হেফজ করে রাখার তৌফিক দান করেছেন।

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ : পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِن شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গির নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত; বিশেষত যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়, বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ : এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবি করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কুরআনকে আল্লাহ্‌র কালাম স্বীকার না কর; বরং কোনো মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কুরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবত একারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে নবুয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্য রূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কুরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়ত ও রিসালাত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহ্‌র কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কুরআনের আল্লাহ্‌র কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا - আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কুরআনের মোজেজা এতটুকু জাজ্বল্যমান যে, এরপর কোনো প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর করে না এবং কুরআনরূপী নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতার উল্লেখ ছিল। মুশরিকরা যখন পবিত্র কুরআনের মোকাবিলা করতে অক্ষম হয় তখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে অনেক আজগুবি ফরমায়েশ করতে লাগলো আর বলল, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আমাদেরকে এ সব নিদর্শন দেখিয়ে দিন [যার আলোচনা পরে আসছে]। কাফেরদের সন্দেহ নিরসনকল্পে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে রয়েছে তাদের ভীত্তিহীন কথাবার্তার জবাব। –[তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত- আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭০]

শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) ইকরামার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, উতবা, শায়বা, আবূ সুফিয়ান, আবূ জেহেল, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, উমাইয়া ইবনে খালফ সহ মক্কার দূরাত্মা কাফেরদের একটি দল প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে দেখা করে বলল, আমরা আপনার রেসালাতে বিশ্বাস করতে পারি না যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের ফরমায়েশ পুরা করেন। আমাদের এই মক্কা শহর চারিপার্শ্বের পাহাড়ের কারণে সংকীর্ণ এবং সংকুচিত হয়ে আছে। এর সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। ইয়েমেন এবং সিরিয়াবাসীর ন্যায় আমাদের সম্পদও নেই। তাই আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করে এই পাহাড়গুলো এখান থেকে সরিয়ে দিন। যাতে করে মক্কা শহরকে সম্প্রসারণ করা যায়। এমনিভাবে সিরিয়া এবং ইরাকের ন্যায় আমাদের পূর্ব পুরুষকে জীবিত করতে হবে, তাদের মধ্যে কুসাই ইবনে কেলাব কুরাইশ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে ছিল অত্যন্ত সত্যবাদী। আমরা তাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো যে আপনি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। যদি সে আপনাকে সত্যায়িত করে তবে আমরাও আপনাকে সত্যবাদী মনে করব। রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করলেনঃ আমাকে এজন্যে প্রেরণ করা হয়নি, যে মহান বাণী নিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি তা তোমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। যদি তোমরা মেনে নাও তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের জন্যে তা' সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি অমান্য কর তবে আমি আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় সবর করবো। কাফেররা বলল, আচ্ছা যদি এসব না করেন তবে আপনি এতটুকু করিয়ে দিন যেন আপনাকে সত্যায়িত করার জন্যে আসমান থেকে ফেরেশতা প্রেরিত হয়। আর আপনাকে যেন কিছু বাগান এবং সোনা-রূপার ভাণ্ডার প্রদান করা হয় তাতে আমরা আপনাকে যেরূপ দরিদ্র এবং দুঃখ কষ্টে পতিত দেখতে পাচ্ছি তা লাঘব হয় এবং আমাদের ন্যায় বাজারে গিয়ে আপনাকে রুজির অন্বেষণের চিন্তা না করতে হয়। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেননি। আমাকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে। তখন কাফেররা বলল, তাহলে আমাদের উপর আসমানকে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হোক। কেননা আপনার দাবি হলো, আপনার প্রতিপালক এমনটি করতে পারেন। এর জবাবে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের উপর আসমান ফেলে দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে তা করবেন। তখন জনৈক কাফের বলল, আমরা আপনার কথা ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না যতক্ষণ না আপনি আল্লাহকে এবং ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে এনে আপনার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। (নাউযুবিল্লাহ) কাফেরদের এ সব কথা শ্রবণ করে হুজুর ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর ফুফু আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালেবের পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াও দাঁড়িয়ে গেল। পথে সে বলল, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে কয়েকটি কথা বলল, আপনি তার কোনোটিই গ্রহণ করেননি। এরপর তারা আরও কিছু বিষয় আপনার কাছে চেয়েছে, এর দ্বারা মনে হয় যে আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার বিশেষ মরতবা রয়েছে। কিন্তু আপনি সেগুলোও মানেননি। এরপর তারা আপনার নিকট আজাব নিয়ে আসার কথা বলেছে যে সম্পর্কে আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। এখন আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি শুধু তখনই বিশ্বাস করবো যখন আপনি আমার সম্মুখে সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণ করবেন আর সেখান থেকে আমরা সম্মুখে উন্মুক্ত গ্রন্থ নিয়ে আসবেন এবং আপনার সঙ্গে চারজন ফেরেশতাও আসবে যারা আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে এবং আমার ধারণা এ কাজটি করলেও আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবো না। কাফেরদের এসব কষ্টদায়ক কথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইবনে জারীর ইবনে ইসহাকের সূত্রে ইকরামার বর্ণনার অবলম্বনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর সাঈদ ইবনে মনসূর সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতসমূহ আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১৪৯-৫০]

قَوْلُهُ وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا : আর তারা বলে আমরা আপনার কথা মানবো না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্যে জমিন থেকে একটা ঝর্ণা প্রবাহিত করেন।

বস্তুত: পবিত্র কুরআনের মোজেজা বা অলৌকিক প্রভাবে কাফেররা পরাজিত হয়ে অত্যন্ত উদ্ভট এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। কখনও বলে মক্কার বুক চিরে আমাদের জন্যে ঝর্ণা বের করে দিন। কখনও বলে মক্কার পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। আর কখনও বলে, যে পর্যন্ত খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান না হয় আর তার ফাঁকে ফাঁকে নহর সমূহ প্রবাহিত না হয় সে পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না।

এ আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যেহেতু কাফেরদের এ সমস্ত কথা শুধু হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার কারণেই ছিল তাই তাদেরকে এ জবাব দেওয়া হয়েছে। যদি ঈমান আনয়নের উদ্দেশ্যে তারা এ সব কথা বলতো তবে হয়তো আল্লাহ পাক এ সব মোজেজাও দেখিয়ে দিতেন। এজন্যে প্রিয়নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে তাদের চাহিদা মোতাবেক এসব মোজেজা আমি দেখিয়ে দেব। তবে একথা স্মরণ রাখুন, যদি তারা এসব মোজেজা দেখার পরও ঈমান না আনে তবে তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব যা' ইতিপূর্বে কোনো জাতিকে দেওয়া হয়নি। আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি তাদের জন্যে তওবা কবুল হওয়ার এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত রাখবো। হযরত রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় কথাটি পছন্দ করেছেন, কেননা তিনি হলেন রহমতের নবী। তাঁর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম।

-[তফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৭৩]

قَوْلُهُ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاۤءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ قَبِيْلًا : অথবা আপনি যেমন বলেন আমাদের উপর খণ্ড খণ্ড ভাবে আসমান পতিত করবেন অথবা আল্লাহ তা'আলা এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قَبِيْل শব্দটির অর্থ كَفِيْل অর্থাৎ আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণকে নিজের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্যে সাক্ষী হিসাবে পেশ করুন। তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে আপনার কথা সত্য। আর একথা বিশ্বাস করার কারণে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তার দায়িত্ব নিবেন আল্লাহ পাক, তার রসূল এবং ফেরেশতাগণ।

ইমাম কাতাদা (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে قَبِيْلًا শব্দটির অর্থ হলো সামনা সামনি। অর্থাৎ আমাদের চোখের সম্মুখে আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে নিয়ে আসুন।

ফররা বলেছেন, আরবরা বলে لَقِيْتُ فُلَانًا قَبِيْلًا وَقَبَلًا আমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে সামনা সামনি সাক্ষাৎ করেছি।

قَوْلُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا : কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ এর নিকট যে সব অযথা আবদার করেছে তার জবাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, [হে নবী] আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী রাসূলগণের আগমন হয়েছে তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। আমিও তাঁদের ন্যায় একজন মানুষ। তবে আমি আল্লাহ পাকের মনোনীত রসূল! মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অযথা কোনো ফরমায়েশ বা আবদার করা আমার পক্ষে শুধু যে অশোভনীয় তাই নয়, বরং অসম্ভবও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে বিধি-নিষেধ আসে তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়াই নবী রাসূলগণের কাজ। তাই তোমাদের এসব অনর্থক কথা-বার্তা আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক যুগে যুগে যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তাঁদেরকে সেই যুগ, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি মোতাবেক অনেক মোজেজাও দিয়েছেন। যেমন প্রিয়নবী ﷺ -কে অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার, তাঁর অঙ্গুলি মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার, সামান্য খাদ্যে তিন হাজার লোকের তৃপ্তি লাভ করার মোজেজা প্রদান করা হয়েছে। এমনি ভাবে শবে মেরাজে মহাশূন্য পরিভ্রমণ করার তথা আসমানে আরোহণ করার, জান্নাত দোজখ দেখার এবং আল্লাহ পাকের আরো অনেক বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের দীদার লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন যা তাঁর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। এরপরও কাফেররা অনর্থক মোজেজা প্রদর্শনের যে ফরমায়েশ করছে তা শুধু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং কালিমালিপ্ত, ঘৃণ্য ও মন্দ স্বভাবের কারণেই করছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন যে আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে আরও বিস্তারিতভাবে দূরাত্মা কাফেরদের অযথা আবদারের জবাবে ইরশাদ হয়েছে- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ : যদি আপনার প্রতি [হে রসূল!] কাগজে লিখিত কিতাবও অবতরণ করতাম তবুও তারা বলতো এটা স্পষ্ট জাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

আরও এরশাদ হয়েছে- وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ : যদি তাদের জন্যে আসমানের দরজা খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং, আমরা এক জাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।'

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ : যদি কোনো কুরআন এমন হতো যার দ্বারা পাহাড়কে গতিশীল করা যেতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেতো অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যেতো তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৯৪. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَىْ قَوْلُهُمْ مُنْكِرِيْنَ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا وَلَمْ يَبْعَثْ مَلَكًا ـ

৯৪. আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন ফেরেশতা পাঠান নি? তাদের অর্থাৎ অস্বীকারকারীদের এ উক্তিই লোকদেরকে বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিরত রাখে। যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ।

৯৫. قُلْ لَهُمْ لَوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ بَدَلَ الْبَشَرِ مَلٰۤئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا اِذْ لَا يُرْسَلُ اِلٰى قَوْمٍ رَسُوْلٌ اِلَّا مِنْ جِنْسِهِمْ لِيُمْكِنَهُمْ مُخَاطَبَتُهُ وَالْفَهْمُ عَنْهُ ـ

৯৫. তাদেরকে বল, পৃথিবীতে মানব জাতির পরিবর্তে ফেরেশতাগণ যদি বিচরণ করত নিশ্চিন্তে তবে আমি আকাশ থেকে তাদের নিকট ফেরেশতাকেই রাসূল করে পাঠাতাম। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট তাদের জাতীয়ই কাউকেও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয়। এতেই আলোচনা, সম্বোধন ও বক্তব্য বুঝা সম্ভবপর হয়।

৯৬. قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ عَلٰى صِدْقِىْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا عَالِمًا بِبَوَاطِنِهِمْ وَظَوَاهِرِهِمْ ـ

৯৬. বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে আমার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সবিশেষ জানেন ও দেখেন। তাদের ভিতর ও বাইর সকল কিছু সম্পর্কে তিনি অবহিত।

৯৭. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاۤءَ يَهْدُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ ط وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَاشِيْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ط مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط كُلَّمَا خَبَتْ سَكَنَ لَهَبُهَا زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا تَلَهُّبًا وَاشْتِعَالًا ـ

৯৭. আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন সে পথ-প্রাপ্ত এবং আল্লাহ যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনও তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও তাদের অভিভাবক পাবে না যে তাদেরকে হেদায়েত করবে। কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলাবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধীর রূপে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, যখনই তা স্তিমিত হবে অর্থাৎ তার লেলিহান শিখা প্রশমিত হবে তখনই আমি তাদের জন্য তার অগ্নি অর্থাৎ প্রজ্বলন ও দহন বৃদ্ধি করে দেব।

৯৮. ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْا مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ـ

৯৮. এটাই তাদের প্রতিফল, কারণ তারা আমার নির্দেশসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং পুনরুত্থান অস্বীকার করে বলেছিল, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?

Free @ www.eilm.weebly.com

৯৯. أَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مَعَ عِظَمِهَا قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَىِ الْأَنَاسِىَّ فِى الصِّغَرِ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لِلْمَوْتِ وَالْبَعْثِ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ط فَأَبَى الظّٰلِمُوْنَ إِلَّا كُفُوْرًا جُحُوْدًا لَهُ .

৯৯. তারা কি লক্ষ্য করে না জানেনা আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এত বিশাল অবয়বের হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষও সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন মৃত্যুর ও পুনরুত্থানের এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি সীমালঙ্ঘনকারীগণ কুফরি ব্যতীত তা প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সমস্তই অস্বীকার করে।

১০০. قُلْ لَّهُمْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ مِنَ الرِّزْقِ وَالْمَطَرِ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ لَبَخِلْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ خَوْفَ نَفَادِهَا بِالْإِنْفَاقِ فَتَفْتَقِرُوْا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًا بَخِيْلًا .

১০০. তাদেরকে বল, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার যেমন জীবনোপকরণ, বৃষ্টি ইত্যাদির ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও ব্যয় হয়ে যাবে ব্যয় করলে ফুরিয়ে যাবে ও দরিদ্র হয়ে পড়বে এ আশঙ্কায় নিশ্চয় তা ধরে রাখতে এ বিষয়ে নিশ্চয় কৃপণতা প্রদর্শন করতে। মানুষ তো অতিশয় কৃপণ। قَتُوْرٌ - কৃপণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ قَوْلُهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, أَنْ টা হলো مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ ও কোনোরূপ প্রতিবন্ধক অবশিষ্ট থাকল না রাসূল প্রেরণের অস্বীকারকারীরা মুমিনগণকে এটা বলত যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণের জন্য মানুষকেই নির্বাচন করলেন?

قَوْلُهُ مُطْمَئِنِّيْنَ : এটা اِسْم فَاعِلْ-এর جَمْع مُذَكَّرْ - এর সীগাহ্ حَالَت نَصْبِىْ তে পতিত হয়েছে অর্থ– বাসস্থান বিনির্মাণকারী, অবস্থানকারী।

قَوْلُهُ لَوْ اَنْتُمْ : প্রশ্ন. لَوْ شَرْطِيَّةٌ টা সর্বদা ফে'লের উপর আসে, কিন্তু এখানে اِسْم - এর উপর এসেছে। এর কারণ কি? উত্তর. اَنْتُمْ - এর পূর্বে فِعْل উহ্য রয়েছে। পরের ফে'লটি তার তাফসীর করতেছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, لَوْ تَمْلِكُوْنَ اَنْتُمْ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ এখানে اَنْتُمْ - تَمْلِكُوْنَ -এর মধ্যকার ফায়েল -এর যমীরের تَاكِيْد হয়েছে এটা مَااُضْمِرَ عَامِلُهُ -এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেররা রেসালাত ও নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বিদ্বেষমূলক যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলোর জবাব স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আরও একটি সন্দেহের জবাব রয়েছে। কাফেররা একথাও বলে যে যদি আল্লাহ পাকের রাসূল প্রেরণ করার ইচ্ছা হয়েই থাকে, তবে আসমান থেকে কোনো ফেরেশতাই পাঠাতেন। মানুষ আবার রাসূল হবে কি করে? মূলতঃ কাফেরদের এমনি ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন কথারই জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। ইরশাদ হয়েছে– وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا . অর্থাৎ মানুষের নিকট যখন হেদায়েত উপস্থিত হয় তখন এই একটি কথাই তাদেরকে ঈমান আনতে বারণ করে তবে কি আল্লাহ পাক মানুষকেই পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেছেন?'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, অনেক লোক ঈমানের নিয়ামত থেকে এই জন্য বঞ্চিত হয়েছে যে, তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি, যে কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হতে পারেন। তারা প্রথমে আশ্চার্যান্বিত হয়েছে এবং পরে অস্বীকার করেছে, এমনকি তারা সুস্পষ্টভাবে বলে ফেলেছে যে, একজন মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ও একথাই বলেছিল, আমরা আমাদের ন্যায় দু'জন মানুষের প্রতি কিভাবে ঈমান আনবো? বিশেষত: যখন তাদের সমগ্র সম্প্রদায়ই আমাদের অধীনস্থ রয়েছে। এ ধরনের কথা অন্য নবীগণের পথভ্রষ্ট উম্মতরাও বলেছে। আর কোনো কোনো লোকেরা নবী রাসূলগণকে একথাও বলেছে, "তুমি তো আমাদেরই ন্যায় মানুষ, এমন অবস্থায় তুমি আল্লাহর রাসূল কি করে হবে? তুমি তো আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বল। অতএব বড় এবং বিস্ময়কর কোনো নিদর্শন পেশ কর"।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا : হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্ত মনে বাস করতো আর তাদের আসমানে গমনের অধিকার না থাকতো তাহলে আমি আসমান থেকে তাদের জন্য ফেরেশতাকে রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করতাম। কিন্তু পৃথিবীতে তো মানুষ বাস করে যারা আসমান থেকে বিধি নিষেধ নিয়ে আসতে পারে না, তাই মানব জাতির হেদায়েতের জন্য মানুষকে রাসূল মনোনীত করে প্রেরণ করা জরুরি ছিল। মানুষের হেদায়েতের জন্যে ফেরেশতা প্রেরণ করা যায় না। আর ফেরেশতাকে রাসূল করে প্রেরণ করার মাধ্যমে উদ্দেশ্যও সফল হবে না। কেননা ফেরেশতারা যদি তাদের প্রকৃতরূপে আসে তাহলে মানুষ তাদেরকে দেখতে সক্ষম হবে না; বরং হেদায়েত লাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর যদি ফেরেশতারা মানব রূপ ধারণ করে আসে, তবে ফেরেশতা রাসূল ও মানব রাসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। এখন মানুষ রাসূলের ব্যাপারে তোমরা যে অলীক সন্দেহ পোষণ করছ তখনও তাই করবে। অতএব, ফেরেশতাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণের দাবি সম্পূর্ণ অর্থহীন।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ : "হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমাদের ও আমার মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট"। কাফেররা বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাগণ যদি সামনা সামনি এসে আমাদেরকে আপনার সত্যতার কথা না বলেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব না। কাফেরদের এই অন্যায় আবদারের জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে এর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা কার্যত: আমার সত্যতার কথা ঘোষণা করছেন।

আর আল্লাহ পাকের সাহায্যই যথেষ্ট তিনি আমার নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অনেক মোজেজা প্রকাশ করার তৌফিক দান করেন। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট যে, আমি রেসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি, আল্লাহ পাকের মহান বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হওয়ার পরও তোমরা নিতান্ত বিদ্বেষের কারণে এর বিরোধিতা করেছো। আর আল্লাহ পাকই আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন। যে সত্যকে গ্রহণ করবে, তাকে তিনি ছওয়াব দান করবেন, আর যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন।

اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا : "নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন" অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। ভয় প্রদর্শক নবী অথবা তাঁর উম্মত সকলের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। তোমাদের নিকট আমার নবুয়তের দাবি সম্পর্কেও তিনি অবগত এবং আমার মাধ্যমে তিনি বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন : এতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্য এক প্রকার সান্ত্বনা এবং কাফেরদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর সতর্কবাণী এ মর্মে যে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরোধিতা করছে, যাদের দ্বারা মুসলমানগণ নির্যাতিত উৎপীড়িত হয়েছে তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ : আর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে-ই পথ পায়, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ পাক ব্যতীত আপনি তার কোনো সহায় পাবেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে যারা অস্বীকার করেছে পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের সকল সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এরপর তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ কাফেরদের হেদায়েতের ব্যাপারে অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে তাঁকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তৌফিক হলেই হেদায়েত লাভ সম্ভব হয়, যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের তৌফিক দান করেন, তারাই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। পক্ষান্তরে, যারা নিজেদের জেদ এবং হঠকারিতার কারণে আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়। এমনি অবস্থায় তাদেরকে সাহায্য করার মতো সাধ্য কারো থাকে না। কেননা হেদায়েত লাভের ব্যাপারে সাহায্য শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই আসতে পারে। কিন্তু তাদের অন্যায় অনাচার এবং জেদ ও হঠকারিতা আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। পরিণামে তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্নই থেকে যায়। –[তফসীরে কাবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬০]

قَوْلُهُ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا : আর কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ বোবা ও বধির করে উঠাবো। তারা তাদের মুখের উপর চলবে। অথবা তাদেরকে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টেনে টেনে নেবে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা মুখের উপর কেমন করে চলবে? তখন তিনি ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক যাদেরকে তাদের পায়ের উপর চালাতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাদেরকে মুখেরও উপরে চালাতে পারবেন।

কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পন্থা :

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস আবূ দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনটি পন্থায় পুনরুত্থান করানো হবে। কিছু লোক আরোহী অবস্থায় থাকবে। আর কিছু লোক পদব্রজে চলবে। আর কিছু লোককে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টেনে নেবে। তখন এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! মুখের উপর কি করে চলবে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, যে আল্লাহ পাক পায়ের উপর চালাতে পারেন, নিঃসন্দেহে তিনি মুখের উপরও চালাতে পারেন। নাসায়ী, হাকেম এবং বায়হাক্বী হযরত আবূ যার (রা:) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। এতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তিনটি দলে বিভক্ত করে উঠানো হবে।

একদল পোশাক পরিহিত অবস্থায় পানাহার করে যানবাহনে আরোহী অবস্থায় থাকবে। আর এক দল পদব্রজে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আর এক দলকে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টানতে থাকবেন।

وَعُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا : অর্থাৎ "তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির করে উঠানো হবে।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অন্ধ, বোবা ও বধির করে পুনরুত্থানের এ অর্থ নয় যে, তারা কিছুই দেখতে পারবে না, কিছুই বলতে পারবে না বা কিছুই শ্রবণ করতে পারবে না; বরং এর অর্থ হলো– যেভাবে তারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহ দেখতে রাজি হতো না, আর সত্য বাণী গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করতো না এবং তাদের রসনা দ্বারা আল্লাহ পাকের বাণী উচ্চারণ করতো না, ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিন তারা এমন কোনো দৃশ্য দেখবে না যা তাদের শান্তি ও আনন্দের কারণ হতে পারে এবং তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে এমন কোনো কৈফিয়তও পেশ করতে পারবে না যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আর এমন কোনো কথাও তারা শ্রবণ করবে না, যা তাদের আনন্দের কারণ হতে পারে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে সে সব আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যাতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন : وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ : সেদিন পাপীষ্ঠরা দোজখকে দেখবে।

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا : অর্থাৎ সেখানেই তারা তাদের ধ্বংসকে ডাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سَمِعُوا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا : অর্থাৎ "পাপীষ্ঠরা সেখানে ক্রোধ এবং বিরক্তির কথা শ্রবণ করবে।" এ আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কাফেররা কেয়ামতের দিন দেখবে শুনবে, এমনকি চিৎকারও করবে।

قَوْلُهُ قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ الخ : এ আয়াতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মতো সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে দিন। এর জওয়াবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবি করছ। আমি তো একজন রাসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রিসালাত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কুরআনের অলৌকিকতার মোজেজাটি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর পরিণামও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনকে এখানে রহমতের অর্থ নবুয়ত ও রিসালাত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুয়ত দেবে না– কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (র) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম দান। তাফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ নবুয়ত। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٠١. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ وَهِيَ الْيَدُ وَالْعَصَا وَالطُّوْفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ وَالطَّمْسُ وَالسِّنِيْنُ وَنَقْصٌ مِنَ الثَّمَرَاتِ فَسْئَلْ يَا مُحَمَّدُ بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ عَنْهُ سُؤَالَ تَقْرِيْرٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى صِدْقِكَ اَوْ فَقُلْنَا لَهُ اِسْأَلْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِلَفْظِ الْمَاضِيْ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا مَخْدُوْعًا مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِكَ.

১০১. হে মুহাম্মদ! বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ অর্থাৎ মুশরিকদের নিকট তোমার সত্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য এই জিজ্ঞাসা কর যে, আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম এগুলো ছিল, হস্ত, লাঠি, জলোচ্ছ্বাস, পঙ্গপাল, কীট, ভেক, রক্ত, সম্পদ পাথরে পরিণত হওয়া, দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফলাদির ঘাটতি যখন সে তাদের নিকট এসেছিল তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! আমি তো তোমাকে জাদুগ্রস্ত ধোঁকায় নিপতিত ও বুদ্ধিবিনষ্ট বলেই মনে করি। بَيِّنَاتٍ সুস্পষ্ট। فَاسْئَلْ কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন যে, আমি মূসাকে বললাম, 'তুমি জিজ্ঞাসা কর। অপর এক কেরাতে এটা مَاضِيْ অর্থাৎ অতীত কাল বাচক রূপে পঠিত রয়েছে।

١٠٢. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَاۤءِ الْاٰيَاتِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ ج عِبَرًا وَلٰكِنَّكَ تُعَانِدُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ التَّاءِ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا هَالِكًا اَوْ مَصْرُوْفًا عَنِ الْخَيْرِ.

১০২. মূসা বলেছিল, তুমি নিশ্চয় অবগত আছ যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক ব্যতীত এই সমস্ত নিদর্শন শিক্ষাপ্রদরূপে আর কেউ অবতীর্ণ করেনি। কিন্তু তুমি তোমার জেদ ও অবাধ্যতার উপরই বিদ্যমান। হে ফেরাউন! আমি তোমাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলে মনে করি। عَلِمْتَ এটা অপর এক কেরাতে ت -এ পেশ সহ অর্থাৎ পুরুষ একবচনরূপে পঠিত রয়েছে। بَصَائِرَ শিক্ষাপ্রদ। مَثْبُوْرًا ধ্বংসপ্রাপ্ত বা কল্যাণ হতে বিমুখ।

١٠٣. فَاَرَادَ فِرْعَوْنُ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ يُخْرِجُ مُوْسٰى وَقَوْمَهُ مِنَ الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيْعًا.

১০৩. অতঃপর সে অর্থাৎ ফেরাউন তাদেরকে অর্থাৎ মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেশ থেকে অর্থাৎ মিসর ভূমি থেকে উচ্ছেদের বহিষ্কারের সংকল্প করল। তখন আমি ফেরাউন ও তার সঙ্গী সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

١٠٤. وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ اَيِ السَّاعَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا جَمِيْعًا اَنْتُمْ وَهُمْ.

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন পরকালের প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে অর্থাৎ তোমরা ও তারা সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠٥. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ اَيِ الْقُرْاٰنَ وَبِالْحَقِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ نَزَلَ كَمَا اُنْزِلَ لَمْ يَعْتَرِهِ تَبْدِيْلٌ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ اِلَّا مُبَشِّرًا مَنْ اٰمَنَ بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا مَنْ كَفَرَ بِالنَّارِ.

১০৫. আমি তা অর্থাৎ আল-কুরআন সত্য-সহই অবতীর্ণ করেছি এবং এর অন্তর্ভুক্ত সকল কিছু সত্য-সহই অবতীর্ণ হয়েছে ঠিক তেমনি আছে যেমন তা অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোনোরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি এটাকে স্পর্শ করেনি। হে মুহাম্মদ! আমি তো তোমাকে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দাতা এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।

١٠٦. وَقُرْاٰنًا مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ فَرَقْنٰهُ نَزَّلْنَاهُ مُفَرَّقًا فِيْ عِشْرِيْنَ سَنَةً اَوْ وَثَلَاثٍ لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ مَهْلٍ وَتُؤَدَةٍ لِيَفْهَمُوْهُ وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ عَلٰى حَسْبِ الْمَصَالِحِ.

১০৬. কুরআন বিশ বর্ণনান্তরে তেইশ বৎসরে খণ্ড খণ্ডভাবে অবতীর্ণ করেছি। যাতে তুমি তা মানুষের নিকট থেমে থেমে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে পাঠ করতে পার ফলে, তারা যেন তা বুঝে। আর পরিস্থিতির পক্ষে কল্যাণকর চাহিদা অনুসারে কিছু কিছু করে আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। قُرْاٰنَ এটা এ স্থানে এমন একটি ক্রিয়াপদের মাধ্যমে مَنْصُوْب হয়েছে পরবর্তী ক্রিয়া فَرَقْنَا হলো যার বিবরণবহ। فَرَقْنٰهُ অর্থাৎ এটা খণ্ড খণ্ড করে অবতীর্ণ করেছি।

١٠٧. قُلْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ط تَهْدِيْدٌ لَهُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ قَبْلَ نُزُوْلِهَا وَهُمْ مُؤْمِنُوْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا.

১০৭. মক্কার কাফেরদেরকে বল, তোমরা এতে ঈমান আন অথবা ঈমান স্থাপন না কর, যাদেরকে এর পূর্বে অর্থাৎ এটা নাজিল করার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয় তখনই তারা সেজদার লুটিয়ে পড়ে। ...اٰمِنُوْا তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর....কথাটি তাদের প্রতি হুমকী স্বরূপ।

١٠٨. وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا تَنْزِيْهًا لَهُ عَنْ خُلْفِ الْوَعْدِ اِنْ مُخَفَّفَةٌ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا بِنُزُوْلِهٖ وَبَعْثِ النَّبِيِّ لَمَفْعُوْلًا.

১০৮. এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র মহান। ওয়াদা ভঙ্গ করা হতে তিনি পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের এতদ্‌বিষয়ের নাজিল হওয়ার এবং রাসূল -এর প্রেরণের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়ে থাকে। اِنْ এটা এ স্থানে مُخَفَّفَة বা লঘুকৃত।

١٠٩. وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ وَيَزِيْدُهُمُ الْقُرْاٰنُ خُشُوْعًا تَوَاضُعًا لِلّٰهِ.

১০৯. এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে আর তা আল-কুরআন তাদের বিনয় আল্লাহর প্রতি বিনয়ই বৃদ্ধি করে। ...وَيَخِرُّوْنَ আয়াতটিতে অতিরিক্ত একটি গুণ উল্লেখসহ এটাকে পূর্বোল্লিখিত আয়াতটির সাথে عَطْف বা অন্বয় করা হয়েছে। [এটা সেজদা-ই-তেলাওয়াতের আয়াত]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١٠. وَكَانَ ﷺ يَقُوْلُ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ فَقَالُوْا
اِنَّهُ يَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ اِلٰهَيْنِ وَهُوَ يَدْعُوْا
اِلٰهًا اٰخَرَ مَعَهُ فَنَزَلَ قُلْ لَهُمْ ادْعُوا اللّٰهَ
اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَىْ سَمُّوْهُ بِاَيِّهِمَا اَوْ
نَادُوْهُ بِاَنْ تَقُوْلُوْا يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ اَيًّا
شَرْطِيَّةٌ مَّا زَائِدَةٌ اَىْ اَىَّ شَيْءٍ مِّنْ هٰذَيْنِ
تَدْعُوْا فَهُوَ حَسَنٌ دَلَّ عَلٰى هٰذَا فَلَهُ اَىْ
لِمُسَمَّاهُمَا الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط وَهٰذَانِ
مِنْهَا فَاِنَّهَا كَمَا فِى الْحَدِيْثِ اَللّٰهُ الَّذِىْ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ
الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ
الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ
الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ
الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِىُّ
الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ
الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ
الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ
الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ ـ

১১০. রাসূলে কারীম ﷺ বলতেন, "হে আল্লাহ! হে রাহমান!" এটা শুনে মুশরিকগণ বলত, "আমাদেরকে ইনি দুই মাবূদের ইবাদত করতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই আল্লাহর সাথে অপর এক মাবূদ রাহমান -কে ডাকেন।" এ সম্পর্কে নাজিল হয় : তাদের বল, তোমরা "আল্লাহ" নামে আহ্বান কর বা "রাহমান" নামে আহ্বান কর অর্থাৎ এ দুই-এর যে নামেই তোমরা তাঁর নামকরণ কর, বা এর অর্থ হলো, এ দুই-নামের যে কোনো নামে তোমরা তাঁকে ডাক, যেমন বল, "হে আল্লাহ" বা "হে রাহমান", মোটকথা তোমরা যে নামেই আহ্বান কর তাই সুন্দর। এর প্রমাণ হলো তাঁর অর্থাৎ ঐ নামাঙ্কিত মহান সত্তার জন্য রয়েছে সুন্দরতম বহু নাম। আর উল্লিখিত দুটিও আল্লাহ ও রাহমান এগুলোরই অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তিনিই আল্লাহ-যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি আর রাহমান-অতি মেহেরবান, আর রাহীম-পরম দয়ালু, আল মালিক-রাজাধিরাজ, আল-কুদ্দূস-নিষ্কলুষ, আস-সালাম-শান্তি বিধায়ক, আল-মু'মিন-নিরাপত্তা বিধায়ক, আল-মুহায়মিন-নিগাহবান, আল'আযীয-প্রবল, আল-জাব্বার- পরাক্রমশালী, আল-মুতাকাব্বির অহংকারের অধিকারী, আল খালিক-সৃষ্টিকর্তা, আল বারী-উন্মেষকারী, আল মুসাওবীর-রূপদানকারী, আল গাফ্ফার- মহাক্ষমাশীল, আল কাহ্হার-মহাপরাক্রান্ত, আল ওয়াহ্হাব-মহাবদান্য, আর রায্যাক-রিজিকদাতা, আল ফাত্তাহ-মহা বিজয়ী, মহা উদঘাটক, আল আলীম-মহাজ্ঞানী, আল কাবিয-সংকোচনকারী, আল বাসিত-সম্প্রসারণকারী, আল খাফিয-আবনমনকারী, আর রাফী- উন্নয়নকারী, আল মুইয্য-সম্মানদাতা, আল মুযিল্ল-হতমানকারী, আস সামী-সর্বশ্রোতা, আল বাসীর-সর্বদ্রষ্টা, আল হাকাম- মীমাংসাকারী, আল 'আদল-ন্যায়নিষ্ঠ, আল লাতীফ-সূক্ষ্ম দক্ষতাসম্পন্ন, আল খাবীর-সর্বজ্ঞ, আল হালীম-অতিসহিষ্ণু, আল আজীম- মহিমাময়, আল গাফূর-ক্ষমাশীল, আশ্ শাকূর- গুণগ্রাহী, আল 'আলী-অত্যুচ্চ, আল কাবীর-বিরাট, মহান, আল হাফীজ-মহারক্ষক, আল মুকীত-আহার্যদাতা, আল হাসীব-মহা পরীক্ষক, আল জালীল-প্রতাপশালী, আল কারীম-মহামান্য, দয়ার্দ্র, আর রাকীব-নিরীক্ষণকারী, আল মুজীব-দোয়া কবুলকারী, আহ্বানের প্রতি উত্তরদানকারী, আল ওয়াসি- সর্বব্যাপী, আল হাকীম-হিকমত ওয়ালা, বিচক্ষণ, আল ওয়াদূদ-প্রেমময়, আল মাজীদ- গৌরবময়, আল বা'ইছ-পুনরুত্থানকারী, আশ্ শাহীদ- প্রত্যক্ষকারী, আল হাকক-মহাসত্য, আল ওয়াকীল- তত্ত্বাবধায়ক, আল কাবিয়্যু-শক্তিশালী, আল মাতীন- দৃঢ়তাসম্পন্ন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُّ الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) قَالَ تَعَالٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ بِقِرَاءَتِيْ فِيْهَا فَيَسْمَعُكَ الْمُشْرِكُوْنَ فَيَسُبُّوْكَ وَيَسُبُّوا الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَنْزَلَهُ وَلَا تُخَافِتْ تُسِرَّ بِهَا ۚ لِيَنْتَفِعَ اَصْحَابُكَ وَابْتَغِ اِقْصِدْ بَيْنَ ذٰلِكَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ سَبِيْلًا طَرِيْقًا وَسَطًا ـ

আল ওয়ালী– অভিভাবক, বন্ধু, আল হামীদ প্রশংসিত, আল মুহসী– সংখ্যা নিরুপণকারী, আল মুবদি'–আদি স্রষ্টা, আল মুঈদ– পুনঃসৃষ্টিকারী, আল মুহ্‌ই– জীবন দাতা, আল মুমীত–মরণদাতা, আল হায়্যু–চিরঞ্জীব, আল কায়্যুম–স্বয়ং স্থিতিশীল, আল ওয়াজিদ–অবধায়ক, প্রাপক, আল মাজিদ–মহান, আল ওয়াহিদ–একক, আস্ সামাদ–অনপেক্ষ, মুখাপেক্ষিতাহীন, আল কাদির–সামর্থ্যশালী, আল মুকতাদির–ক্ষমতাশালী, আল মুকাদ্দিম–অগ্রবর্তীকারী, আল-মুআখ্‌খির– পশ্চাৎবর্তীকারী, আল আওওয়াল–সকল কিছুর প্রথম, অনাদি, আল আখির–সকল কিছুর শেষ, অনন্ত, আয্‌যাহির– প্রকাশ্য, আল বাতিন-অভ্যন্তর, গুপ্ত, আল ওয়ালী–কার্য নির্বাহক, আল মুতা'আল-সমুন্নত, আল–বারর–ন্যায়বান, আত্ তাওওয়াব–মহা তওবাকবুলকারী, আল মুন্‌তাকিম-প্রতিশোধ গ্রহণকারী, আল 'আফুবু-ক্ষমা প্রদর্শনকারী, আর রাউফ-কোমল, আল মালিকুল মুলক–রাজ্যের অধিকারী, যুল জালালী ওয়াল ইকরাম–মহিমান্বিত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ, আল মুকসিত–ন্যায়পরায়ণ, আল জামি'–একত্রকারী, আলগানী-অভাবমুক্ত, আল মুগনী-অভাবমোচনকারী, আল মানি'–প্রতিরোধকারী, আয্ যারর-অকল্যাণকর্তা, আল নাফি'–উপকারকারী, আন্ নূর-জ্যোতি, আল হাদী–পথ প্রদর্শক, আল বাদী'–অভিনব সৃষ্টিকারী, আল বাকী-চিরস্থায়ী, আল ওয়ারিছ– উত্তরাধিকারী, আর রশিদ–কল্যাণ পথে পরিচালনাকারী, আস সাবূর–ধৈর্যশীল [তিরমিযী শরীফ]। তোমার সালাতে অর্থাৎ সালাতে কেরাত পাঠে স্বর উচ্চ করো না কেননা মুশরিকগণ তোমার নিকট থেকে এটা শুনবে ও তোমাকে গালি দিবে এবং কুরআন ও যিনি এই কুরআন নাজিল করেছেন তাঁকে গালি-গালাজ করবে, আবার তোমার সাহাবীরাও যেন উপকৃত হতে পারে তাই অতিশয় ক্ষীণও করো না। এই দুয়ের মধ্যে অর্থাৎ স্বর উচ্চ করা ও ক্ষীণ করার মধ্যে পথ তা'লাশ কর অর্থাৎ এতদুভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। أَيًّا مَّا এ স্থানে أَيًّا শব্দটি شَرْطِيَه বা শর্তবাচক, আর مَا শব্দটি زَائِدَة বা অতিরিক্ত। অর্থ এতদুভয়ের যে কোনোটিই ডাক না কেন। لَا تُخَافِتْ ক্ষীণ করো না, স্বর একেবারে নীচু করো না। اِبْتَغِ তালাশ কর, গ্রহণ কর।

١١١. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ۚ الْاُلُوْهِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ يَنْصُرُهٗ مِّنَ اَجْلِ الذُّلِّ اَيْ لَمْ يَذِلَّ فَيَحْتَاجَ اِلٰى نَاصِرٍ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ

১১১. আর বল, সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, সার্বভৌমত্বে মাবুদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর কোনো অভিভাবক নেই যে তাঁকে সাহায্য করবে অবমাননার বিষয়ে। অর্থাৎ তিনি কখনও লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন না যে, এটা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁর কোনো সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী হতে হবে। সুতরাং তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

Free@www.eilmweebly.com

عَظِّمْهُ عَظَمَةً تَامَّةً عَنْ اِتِّخَاذِ الْوَلَدِ
وَالشَّرِيْكِ وَالذُّلِّ وَكُلِّ مَالاَ يَلِيْقُ بِهِ
وَتَرْتِيْبُ الْحَمْدِ عَلٰى ذٰلِكَ لِلدَّلاَلَةِ عَلٰى
اَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ لِكَمَالِ
ذَاتِهِ وَتَفَرُّدِهِ فِيْ صِفَاتِهِ رَوَى الْاِمَامُ اَحْمَدُ
فِيْ مُسْنَدِهِ عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْهُ ﷺ
اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اٰيَةُ الْعِزِّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَدًا اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
قَالَ مُؤَلِّفُهُ هٰذَا اٰخِرُ مَا كَمَّلْتُ بِهِ تَفْسِيْرَ
اَلْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ اَلَّفَهُ الْاِمَامُ الْعَلاَّمَةُ
اَلْمُحَقِّقُ جَلاَلُ الدِّيْنِ الْمَحَلِّيُّ الشَّافِعِيُّ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ اَفْرَغْتُ فِيْهِ جُهْدِيْ
وَبَذَلْتُ فِيْهِ فِكْرِيْ فِيْ نَفَائِسَ اَرَاهَا اِنْ شَاءَ
اللّٰهُ تُجْدِيْ * وَاَلَّفْتُهُ فِيْ مُدَّةِ قَدْرِ مِيْعَادِ
الْكَلِيْمِ وَجَعَلْتُهُ وَسِيْلَةً لِلْفَوْزِ بِجَنَّاتِ
النَّعِيْمِ وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ مُسْتَفَادٌ مِنَ
الْكِتَابِ الْمُكَمَّلِ * وَعَلَيْهِ فِي الْاٰيِ
الْمُتَشَابِهَةِ الْاِعْتِمَادُ وَالْمُعَوَّلُ * فَرَحِمَ
اللّٰهُ امْرَأً نَظَرَ بِعَيْنِ الْاِنْصَافِ اِلَيْهِ *
وَوَقَفَ فِيْهِ عَلٰى خَطَإٍ فَاَطْلَعَنِيْ عَلَيْهِ.
* وَقَدْ قُلْتُ شِعْرًا
* حَمِدْتُ اللّٰهَ رَبِّيْ اِذْ هَدَانِيْ

সন্তান গ্রহণ, শরিক গ্রহণ করা, অবমাননা ইত্যাদি যত ধরনের বিষয় তাঁর সত্তার যোগ্য নয় সেই সকল বিষয় থেকে তার সমুচ্চ পবিত্রতা ও মর্যাদার পরিপূর্ণ ঘোষণা দাও। এই আয়াতটিতে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করার বিষয়টিকে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও বিন্যস্ত করায় প্রমাণ হয় যে, তাঁর সত্তার পরিপূর্ণতা ও সকল গুণে তাঁর এককত্বের দরুনই তিনি সকল প্রশংসার অধিকারী। ইমাম আহমাদ তৎসংকলিত মুসনাদে মুআয আল-জুহানী প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলতেন, আয়াতুল ইয্য বা মর্যাদার আয়াত হলো : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا... হতে শেষ পর্যন্ত। اَللّٰهُ اَعْلَمُ "আল্লাহই সর্বাধিক ভালো জানেন। এ তাফসীর খানার সংকলয়িতা [জালালুদ্দীন সুয়ূতী] বলছি, বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ আল্লামা আল ইমাম জালালুদ্দীন মাহাল্লী আশ শাফিঈ (র.) আল কুরআনুল কারীমের যে অসমাপ্ত তাফসীর খানা সংকলন করেছিলেন এটা সম্পূর্ণ ও সমাপ্তকরণ কর্মের এই হলো শেষ। এই কাজে আমি আমার শক্তি নিঃশেষে ব্যয় করেছি। আমার চিন্তা ভাবনা এমন কিছু সুন্দর ও ভালো বিষয়ের মধ্যে লাগিয়েছি ইনশা আল্লাহ এগুলো সকলের উপকারে আসবে বলে আমি ধারণা করি। কলীমুল্লাহ হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে তাওরাত লাভ করতে যে সময়টুকু ব্যয় করেছিলেন সে সময়ের মধ্যে অর্থাৎ চল্লিশ দিনে আমি তাফসীরের এ অংশটুকু সংকলন করতে সক্ষম হয়েছি। নিয়ামত ও সুখ-স্বচ্ছন্দময় জান্নাত লাভে কামিয়াব হওয়ার পথে বইটিকে আমি অন্যতম অসিলা বানালাম। এ তাফসীরখানা মূলত: সমাপ্তকৃত তাফসীরটির অর্থাৎ ইমাম মাহাল্লীর তাফসীরকৃত অংশে অনুসৃত পদ্ধতি থেকে জ্ঞান আহরণ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মুতাশাবিহ ও যে সমস্ত আয়াত দ্ব্যর্থ বোধক সেই সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কেও তারই উপর নির্ভর করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহম করুন যারা এই তাফসীরটির প্রতি ইনসাফের দৃষ্টিতে তাকাবেন এবং কোনো ভুল পরিদৃষ্ট হলে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবেন। এ বিষয়ে আমি কয়েকটি চরণ রচনা করেছি–

আল্লাহ আমার প্রভু– প্রশংসা যত সকলই তাঁহার।
তিনিই আমাকে দেখিয়েছেন পথ উহার,

Free © www.eilmweebly.com

* لَمَّا اَبْدَيْتُ مَعَ عِجْزِيْ وَضُعْفِيْ
* فَمَنْ لِيْ بِالْخَطَا فَارُدُّ عَنْهُ
* وَمَنْ لِيْ بِالْقَبُوْلِ وَلَوْ بِحَرْفِ هٰذَا وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ فِيْ خَلَدِيْ اَنْ اَتَعَرَّضَ لِذٰلِكَ لِعِلْمِيْ بِالْعِجْزِ عَنِ الْخَوْضِ فِيْ هٰذِهِ الْمَسَالِكِ وَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّنْفَعَ بِهٖ نَفْعًا جَمًّا وَيَفْتَحَ بِهٖ قُلُوْبًا غُلْفًا وَاَعْيَانًا عُمْيًا وَاٰذَانًا صُمًّا وَكَاَنِّيْ بِمَنِ اعْتَادَ بِالْمُطَوَّلَاتِ وَقَدْ اَضْرَبَ عَنْ هٰذِهِ التَّكْمِلَةِ وَاَصْلِهَا حَسْمًا وَعَدَلَ اِلٰى صَرِيْحِ الْعِنَادِ وَلَمْ يُوَجِّهْ اِلٰى دَقَائِقِهِمَا فَهْمًا وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى رَزَقَنَا اللّٰهُ بِهٖ هِدَايَةً اِلٰى سَبِيْلِ الْحَقِّ وَتَوْفِيْقًا وَاطِّلَاعًا عَلٰى دَقَائِقِ كَلِمَاتِهٖ وَتَحْقِيْقًا وَجَعَلَنَا بِهٖ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَ مُؤَلِّفُهٗ عَامَلَهُ اللّٰهُ بِلُطْفِهٖ فَرَغْتُ مِنْ تَالِيْفِهٖ يَوْمَ الْاَحَدِ عَاشِرَ شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِيْنَ وَثَمَانِ مِائَةٍ وَكَانَ الْاِبْتِدَاءُ فِيْهِ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ مُسْتَهَلَّ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَفَرَغَ مِنْ تَبْيِيْضِهٖ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ سَادِسَ صَفَرَ سَنَةَ اِحْدٰى وَسَبْعِيْنَ وَثَمَانِ مِائَةٍ

যাহা আমি করিয়াছি শুরু।
সকল অক্ষমতা লইয়া আমার
কে আছেন এমন সুজন।
যিনি দেখাইয়া দিবেন আমার ভুল
আর আমি আসিব ফিরে।
সেই সব হতে, এমনও বা কে আছেন।
যিনি একটি হরফ হলেও আমার, করিবেন কবুল।

আমার অক্ষমতা সম্পর্কে আমার জ্ঞানের কারণে কোনো দিন এই দুরূহ পথে চলার ধারণাও আমার মনে উদিত হয়নি। যা হোক, হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপুল ভাবে উপকৃত করবেন, বহু অবরুদ্ধ মনের দুয়ার খুলে দিবেন, বহু অন্ধ চক্ষু ও আবদ্ধ কর্ণকে উন্মিলীত করে দিবেন। আর যারা বিরাট ও বিপুল পরিসরের গ্রন্থতে অভ্যস্ত তাদের কথা ভিন্ন কিন্তু যারা এ গ্রন্থখানায় ও এর মূল তাফসীর গ্রন্থ খানা হতে নিজদেরকে সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়ে রাখে ও একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এবং সুস্পষ্ট বিদ্বেষে যারা আবিষ্ট ও এতদুভয়ের তাৎপর্যপূর্ণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহের প্রতি যাদের দৃষ্টি নেই তাদের সম্পর্কে বক্তব্য হলো যে, এ পৃথিবীতে যারা সত্য সম্পর্কে অন্ধ তারা আখেরাতেও অন্ধরূপেই প্রতিভাত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এর মাধ্যমে সত্য-পথের হেদায়েত দান করুন। এর তাওফীক দিন এবং তাঁর কালামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অবহিত লাভ ও এর তাহকীক ও গবেষণার শক্তি দিন। আর নাবিয়্যীন, সিদ্দিকীন, শহীদগণ ও সালেহীন যাদেরকে তিনি তাঁর নিয়ামতে অভিসিক্ত করেছেন তাদের সাথে আমাদের হাশর করুন। সঙ্গী হিসাবে তাঁরা কতই না উত্তম! সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, তিনি এক অদ্বিতীয়, নাজিল করুন নবীজি এবং তাঁর পরিজন ও সাহাবীদের উপর অগণন ও অসংখ্য সালাত ও সালাম। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। এই সংকলক, আল্লাহ তাঁর সাথে লুতফ ও মেহেরবানির ব্যবহার করুন, বলছি যে, আটশত সত্তর হিজরি সনের দশই শাওয়াল রবিবার আমার এ খসড়া লেখা সমাপ্ত হয়। উক্ত সনের পহেলা রমজান বুধবার এই কাজ শুরু করেছিলাম আর আটশত একাত্তর সনের ছয়ই সফর বুধবার এর পাণ্ডুলিপি সাফ করার কাজ শেষ হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُوَالُ تَقْرِيْرٍ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর তো জানা ছিল, এরপরও প্রশ্ন করার মধ্যে ফায়দা কি?

উত্তর. এটা سُوَالُ اِسْتِفْهَامٍ নয়; বরং এটা হলো سُوَالُ تَقْرِيْرٍ

قَوْلُهُ قَبْلَ نُزُوْلِهِ : এখানে نُزُوْلُ মুযাফ উহ্য মেনে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, قَبْلَ الْقُرْاٰنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَبْلَ نُزُوْلِ الْقُرْاٰنِ আর এটা সম্ভব নয়। কেননা قُرْاٰنٌ হলো قَدِيْمٌ কাজেই এর পূর্বে হুকুম দেওয়ার কোনো অর্থই হতে পারে না।

قَوْلُهُ عَطْفٌ بِزِيَادَةٍ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর যে, يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ - এর আতফ পূর্বের يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ -এর উপর হয়েছে। যার কারণে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْفٌ একই হয়ে গেছে, অথচ مَعْطُوْفٌ টা مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর বিপরীত হওয়া জরুরি।

উত্তর. مَعْطُوْفٌ -এর মধ্যে يَبْكُوْنَ সিফতের বৃদ্ধি রয়েছে যার কারণে اِتِّحَادٌ অবশিষ্ট থাকেনি।

قَوْلُهُ اَيَّ شَيْئٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَيًّا - এর মধ্যে تَنْوِيْنٌ টা مُضَافٌ اِلَيْهِ - এর পরিবর্তে হয়েছে। نِدَاءٌ - এর অর্থে নয়।

قَوْلُهُ فَهُوَ حَسَنٌ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَيًّا مَّا শর্তের جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। এবং فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى টা উহ্য جَزَاءٌ -এর উপর দালালত করতেছে। جَزَاءٌ কে উহ্য করে جَزَاءٌ - এর উপর দালালতকারীকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ لِمُسَمَّاهُمَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فَلَهُ - এর যমীর উহ্য مُسَمّٰى - এর দিকে ফিরেছে, اِسْمٌ - এর দিকে নয়। অন্যথায় اِسْمٌ -এর জন্য اِسْمٌ হওয়া আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ تَرْتِيْبُ الْحَمْدِ عَلٰى ذٰلِكَ لِلدَّلَالَةِ عَلٰى اَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো এই যে, حَمْدٌ বলা হয় কোনো ভালো اِخْتِيَارِىْ কর্মের প্রশংসা করাকে (اَلْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ) উল্লিখিত আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ এই আয়াতে তিনটি গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনোটিই سَلْبِىْ হয়েছে اِيْجَابِىْ নয়। অথচ حَمْدٌ হয় اِيْجَابِىْ -এর উপর; سَلْبِىْ এর উপর নয়। কেননা سَلْبِىْ - এর উপর تَنْزِيْهَةٌ হয়ে থাকে।

উত্তর. لِكَمَالِ ذَاتِهِ দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত তিনটি سَلْبِىْ সিফাত এই সম্ভাবনার نَفِىْ করতেছে যা اِحْتِيَاجٌ - এর مُقْتَضٰى হয় এবং وَاجِبُ الْوُجُوْدِ لِذَاتِهِ - এর উপর দালালত করে অর্থাৎ সবাই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কাজেই প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র তিনিই, (جُمَلٌ) উত্তরের সারকথা হলো এই যে, যেমনিভাবে صِفَاتٌ - এর কারণে প্রশংসার উপযুক্ত হয়, এমনিভাবে ذَاتٌ - এর কারণেও প্রশংসার উপযুক্ত হয়। আর تَمْثِيْلٌ - এর পদ্ধতিতে উত্তর এই যে, উল্লিখিত তিনটি سَلْبِىْ صِفَاتٌ - এর মধ্যে নিয়ামত এই যে, রাজার যখন স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকে, তখন ভৃত্যদের উপর পরিবার পরিজনের ব্যয় মিটানোর পর উদ্বৃত্ত থেকে ব্যয় করে। আর যখন তার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি থাকে না তখন রাজা সকল দান অনুদানকে ভৃত্যগণের জন্যই ব্যয় করে থাকেন। এমনিভাবে সন্তান না হওয়া ভৃত্যগণের উপর অধিক অনুদানের مُقْتَضٰى হয়ে থাকে। আর نَفِىْ شَرِيْكٌ - এর মধ্যে নিয়ামত এই যে, শরিক হওয়ার চেয়ে শরিক না হওয়ার সুরতে রাজা অনুদান দানের ক্ষেত্রে ভীড় না থাকার কারণে অধিক সক্ষম হন। আর نَفِىْ نَصِيْرٌ - এর সুরতে নিয়ামত এটা হয় যে, نَصِيْرٌ - এর نَفِىْ টা শক্তি ও অমুখাপেক্ষীতা বুঝায়। আর এই উভয়টি অধিক অনুদান দানের সক্ষমতাকে বুঝায়। এই পদ্ধতিতে উল্লিখিত তিনটি سَلْبِىْ صِفَاتٌ গুলো اِيْجَابِىْ হয়ে যায়। কাজেই তার উপর প্রশংসা বর্ণনা করা বৈধ হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اٰيَتُ الْعِزِّ : অর্থাৎ وَلَدًا ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ ٱلَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ (আয়াত) অর্থাৎ রাসূল ﷺ এই আয়াতকে اٰيَتُ عِزَّتْ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিয়মানুবর্তিতার সাথে প্রত্যহ এই আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন। পাঠরীতি হচ্ছে এই যে, প্রথমে تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ পাঠ করবে। এরপর প্রত্যহ ৩৫১ বার قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا নিয়মানুবর্তিতার সাথে পাঠ করবে। −[হাশিয়ায়ে জালালাইন, সাবী]

قَوْلُهُ وَقَدْ اَفْرَغْتُ فِيْهِ جُهْدِىْ اَىْ فِىْ مَا كَمَّلْتُ بِهِ : অর্থাৎ فِيْهِ - এর যমীরটা مَا كَمَّلْتُ - এর দিকে ফিরেছে। এমনিভাবে رَزَقَنَا اللّٰهُ بِهِ পর্যন্ত সকল যমীর مَا كَمَّلْتُ - এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ فِىْ نَفَائِسَ : এটা فِيْهِ থেকে بَدَلْ হয়েছে। অথবা فِىْ نَفَائِسَ - এর মধ্যে فِىْ টা مَعَ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مَعَ نَفَائِسَ আর نَفَائِسَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো دَقَائِقُ حَقَائِقُ এবং পছন্দনীয় نِكَاتٌ نَفِيْسَةٌ বা বালাগাত পূর্ণ বাক্য যা সকলের বুঝে আসে না।

قَوْلُهُ اُرَاهَا : এখানে اُرَاهَا শব্দটি هَمْزَةٌ তে যবর ও পেশ উভয় হরকতই বৈধ রয়েছে। অর্থ হলো اَعْلَمُ وَاَظُنُّ আর تَجْرِىْ টা اُرٰى -এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর هَا হলো প্রথম মাফঊল। অর্থাৎ اُرَاهَا تَجْرِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ جَدْوَاهَا অর্থাৎ হে সম্বোধিত ব্যক্তি! আমি মনে করতেছি যে, এই সূক্ষ্ম ব্যাপার তোমাকে উপকৃত করবে যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন যে, এটা তোমাকে উপকৃত করবে। تَجْرِىْ অর্থ হলো تَنْفَعُ

قَوْلُهُ وَالْفَتْهُ فِىْ مُدَّةِ قَدْرِ مِيْعَادِ الْكَلِيْمِ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) যতদিন তূর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন। আর তা হলো চল্লিশ দিন। রচনার সূচনা করা হয়েছে ১লা রমজান থেকে এবং ১০ই শাওয়াল এটা পূর্ণতা লাভ করেছে। মুফাসসির আল্লামা সুয়ূতী (র:) تَحْدِيْثُ نِعْمَتْ - এর ভিত্তিতে এই সময়ের প্রকাশ করেছেন। কেননা সাধারণত এত অল্প সময়ে এত বড় কাজ সম্পাদন করা অভ্যাস বিরুদ্ধই হয়ে থাকে। সে সময় আল্লামা সুয়ূতী (র:)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র ২২ (বাইশ) বছরের চেয়ে কম। যেমনটি আল্লামা কারখী উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ যে অংশ আল্লামা সুয়ূতী (র.) রচনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَهُمْ مُسْتَفَادٌ مِنَ الْكِتَابِ الْمُكَمَّلِ : আল্লামা সুয়ূতী (র) এটা كَسْرِنَفْس তথা নিজেকে ছোট মনে করার ভিত্তিতে বলেছেন।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লামা মহল্লী (র)-এর রচনা কৃত।

قَوْلُهُ اِذْ هَدَانِىْ : এখানে اِذْ টা হলো تَعْلِيْلِيَّةٌ অর্থাৎ لِاَجْلِ هِدَايَتِهِ لِلَّذِىْ اَبْدَيْتُهُ وَ اَظْهَرْتُهُ আর তা হলো উল্লিখিত تَكْمِلَةُ

قَوْلُهُ فَمَنْ لِىْ بِالْخَطَا : অর্থাৎ مَنْ اَظْهَرَ لِىَ الْخَطَأَ অর্থাৎ যে মহান ব্যক্তি আমার ভুল শুধরে দিবেন আমি সেই ভ্রান্তি ফিরে আসব তথা তার সংশোধন করব।

قَوْلُهُ اَضْرِبُ حَسْمًا : অর্থাৎ اَعْرِضْ اِعْرَاضًا

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ : এখানে فِىْ টা عَنْ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ مَنْ كَانَ عَنْ هٰذِهٖ اَعْمٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি জালালাইনে পূর্বের এবং সংযুক্ত উভয় অংশ থেকে বঞ্চিত ও অজ্ঞাত থাকবে সে অন্যান্য কিতাব থেকেও বঞ্চিত ও অজ্ঞাত থাকবে।

فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى এখানেও فِىْ টা عَنْ অর্থে হয়েছে এবং اٰخِرَةٌ দ্বারা مُطَوَّلَاتٌ উদ্দেশ্য। অর্থ হলো এই যে, যে ব্যক্তি এই সংক্ষিপ্ত তাফসীর হতে অজ্ঞাত ও বঞ্চিত থাকবে সে مُطَوَّلَاتٌ তথা তাফসীরের বড় বড় কিতাব থেকেও বঞ্চিত থাকবে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ رَزَقَنَا اللّٰهُ بِهِ : بِهِ -এর যমীর কুরআনের দিকে ফিরেছে। এর পরের যমীরগুলোও قُرْاٰنٌ - এর দিকে ফিরেছে। কিন্তু বাক্যের ধারা অনুপাতে অধিক মুনাসিব হলো এই যমীর ও পরবর্তী যমীরগুলো لَمَّا كَمُلَ অর্থাৎ সংযুক্ত অংশের দিকে ফিরবে।

قَوْلُهُ فَرَغْتُ مِنْ تَالِيْفِهِ الخ : আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেন যে, আমি প্রথম অর্ধেকের খসড়া কপি ৮৭০ হিজরির ১০ই শাওয়াল রবিবার দিন সমাপ্ত করেছি। আর এর রচনা শুরু করেছিলাম ৮৭০ হিজরির ১লা রমজান। এবং এটাকে পরিচ্ছন্ন করে লেখা শেষ করেছি ৮৭১ হিজরির ৬ই সফর বুধবার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের অনেক প্রশ্নের জবাব ছিল। এ আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউন এবং তার দলবলের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছেন। এতদসত্ত্বেও ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় ঈমান আনেনি। অবশেষে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এভাবে হে মক্কার কাফেররা তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ -এর নিকটও মোজেজার দাবি কর। যদি তোমাদের আবদার অনুযায়ী সে সব মোজেজা প্রকাশ করা হয় তবুও তোমরা সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আনবে না। যেভাবে দুরাত্মা ফেরাউন তার সকল শক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা করতে পারেনি, ঠিক এমনিভাবে তোমরা আমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ -এর মোকাবিলা করতে পারবে না। হযরত মূসা (আ.) কে আল্লাহ পাক লাঠির মোজেজা দিয়েছেন এবং সর্বশেষ নবীকে কুরআনের মোজেজা দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরেশতা ছিলেন না মানুষই ছিলেন, প্রকাশ্যে অসহায়, নিরুপায় ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। অতএব, হযরত মোহাম্মদ ﷺ এর প্রকাশ্য অসহায় অবস্থা দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। তাঁর নিকট রয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শক্তি। যেভাবে ফেরাউন ও হামান হযরত মূসা (আ.) এর মোকাবিলা করতে পারেনি; বরং ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ পাক মিসরেই আবাদ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীর কোনো শক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলাল্লাহ ﷺ -এর মোকাবিলা করতে পারবে না। অদূর ভবিষ্যতে মক্কা বিজয় হবে। সারা আরবের নেতৃত্ব আসবে হযরত রাসূলাল্লাহ ﷺ -এর হাতে, বনী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষদের জন্মস্থান সিরিয়াও হবে তাঁর করতলগত। এই সমস্ত কথা দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

–[তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (রা.), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৪-৭৫]

তাই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ আর নিশ্চয়ই আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্কের ব্যাপারে ইমাম রাযী (রা.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী একটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ : আর কাফেররা বলে, যে পর্যন্ত আমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক এই নিদর্শন সমূহ না দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো না। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ অর্থাৎ তোমরা যে সব মোজেজার দাবি করছো এর চেয়ে শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠ মোজেজা আমি ইতিপূর্বে মূসাকে দান করেছি কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল ঐ মোজেজা সমূহ দেখা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, পরিণামে তারা হয়েছে ধ্বংস।

–[তাফসীরে কাবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ : এতে হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ايۃ শব্দটি মোজেজা এবং কুরআনি আয়াতের অর্থাৎ আহকামে ইলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। একদল তাফসীরবিদ এখানে ايۃ -এর অর্থ মোজেজা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করায় নয়ের বেশি হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নয়টি মোজেজা এভাবে গণনা করেছেন, ১. হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেতো। ২. শুভ্র হাত, যা জামার নিচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকতো। ৩. মুখের তোৎলামি যা দূর করে দেওয়া হয়েছিল। ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া। ৫. অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আজাব প্রেরণ করা। ৬. তুফান প্রেরণ করা। ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা যা থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। ৮. ব্যাঙের আজাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং ৯. রক্তের আজাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুকে রক্ত দেখা যেতো।

অপর একটি সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এখানে ايات বলে আল্লাহর বিধি বিধান বোঝানো হয়েছে। এই হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বিশুদ্ধ সনদ সহকারে সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী বলো না। সে যদি জানতে পারে যে, আমরাও তাকে নবী বলি, তবে তার চার চক্ষু গজাবে। অর্থাৎ সে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, হযরত মূসা (আ.) যে নয়টি প্রকাশ্য আয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেগুলো কি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. জেনা করো না, ৪. যে প্রাণকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, ৫. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করে হত্যা ও শাস্তির জন্য পেশ করো না, ৬. জাদু করো না, ৭. সুদ খেয়ো না, ৮. সতীসাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করো না, ৯. জিহাদের ময়দান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করো না। যে ইহুদি সম্প্রদায়, বিশেষ করে তোমাদের জন্য এ বিধানও আছে যে, শনিবার সম্পর্কে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভঙ্গ করো না।

এসব কথা শুনে উভয় ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হস্তপদ চুম্বন করে বলল, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কি? তারা হযরত দাউদ (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তার বংশধরের মধ্যে যেন সব সময় নবী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের আশঙ্কা, যদি আমরা আপনাকে অনুসরণ করি তাহলে ইহুদিরা আমাদেরকে বধ করবে।

এই তাফসীরটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই অনেক তাফসীরবিদ একেই অগ্রগণ্যতা দান করেছেন।

قَوْلُهٗ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– কুরআন তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মোস্তাহাব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করে সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। অর্থাৎ দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে– আল্লাহ তা'আলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। এক. যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। দুই. যে ইসলামি সীমান্তের হেফাজতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে। –[বায়হাকী, হাকিম]

হযরত নজর ইবনে সা'দ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সম্প্রদায়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.eilm.weebly.com

আজ মুসলমান জাতি যে মহাবিপদে পতিত আছে, এর কারণ এটাই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর সংখ্যা খুবই কম। রূহুল মা'আনী গ্রন্থকার এ স্থলে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফজিলত সম্পর্কিত অনেক হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন– وَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّكُوْنَ ذَالِكَ حَالُ الْعُلَمَاءِ . অর্থাৎ আলেমদের এরূপ অবস্থাই হওয়া উচিত। কেননা ইবনে জারীর ইবনে মুযির প্রমুখ তাফসীরবিদ আব্দুল আলা তায়মী (র.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু এমন ইলম প্রাপ্ত হয়েছে, যা তাকে ক্রন্দন করায় না; বুঝে নাও যে সে উপকারী ইলম প্রাপ্ত হয়নি।

قَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ الخ : এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও তাওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিধৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এক. রসূলুল্লাহ ﷺ -একদিন দোয়ায় 'ইয়া আল্লাহ্' ইয়া রহমান বলে আহ্বান করলে মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু' আল্লাহ্কে আহ্বান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু'উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার দু'টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং কোরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্পদ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র শরিক বলত। সাবেয়ী ও অগ্নিপূজারিরা বলত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাজিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যা দ্বারা শক্তিলাভ করে সে কোনো সময় নিজের চাইতে ছোট হয়– যেমন সন্তান; কোনো সময় নিজের সমতুল্য হয়; যেমন অংশীদার এবং কোনো সময় নিজের চাইতে বড় হয়; যেমন সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাস'আলা : উল্লিখিত আয়াতে নামাজে কুরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুবই উচ্চৈঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলা বাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাজসমূহের জন্য। জোহর ও আসরের নামাজে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামাজ বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামাজ বুঝায়। তাহাজ্জুদের নামাজও এর অন্তর্ভুক্ত; যেমন এক হাদীসে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে নিঃশব্দে এবং হযরত ওমর (রা.)-কে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন, যাকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা গোপনতম আওয়াজও শ্রবণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন। অতঃপর হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন : আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেও আদেশ দিলেন যে, অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। –[তিরমিযী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নামাজে প্রিয়নবী ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের অবস্থা : হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর ﷺ যখন তাঁর স্বগৃহে থাকতেন তখন উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন যেন গৃহের লোকেরা তেলাওয়াত শ্রবণ করতে পারে। –[আবূ দাঊদ শরীফ]

প্রিয়নবী ﷺ কিভাবে পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন হযরত উম্মে সালমা (রা.) তা আমাদেরকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং এক এক শব্দ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাঠ করেন। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী]

হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার বাড়িতে থেকে হুজুর ﷺ এর কেরাতের শব্দ শ্রবণ করতাম।

–[তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

আর হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর ঘর হুজুর ﷺ -এর বাড়ির সাথেই ছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে হুজুর ﷺ -এর পবিত্র কুরআন পাঠের পন্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন, তিনি কখনও উচ্চৈঃস্বরে, কখনও নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতেন।

–[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৬]

নামাজের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত মাস'আলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি ইজাজতের আয়াত। [আহমদ, তাবারানী] এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য। –[তাফসীরে মাযহারী]

হযরত আনাস (রা.) বলেন : আব্দুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোনো শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন :

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছে দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আরজ করল! রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দিই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই– تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (الاية) -এর কিছু দিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরজ করল, যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি। –[তাফসীরে মাযহারী]

সমাপ্ত

سُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ : সূরা কাহাফ মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ (اَلْاٰيَةُ) مِائَةٌ وَّعَشْرُ اٰيَاتٍ اَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ اٰيَةً

কিন্তু وَاصْبِرْ نَفْسَكَ আয়াতটি ব্যতীত। এতে ১১০ বা ১১৫ আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. اَلْحَمْدُ هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ ثَابِتٌ لِلّٰهِ وَهَلِ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ بِذٰلِكَ لِلْاِيْمَانِ بِهِ اَوِالثَّنَاءُ بِهِ اَوْ هُمَا اِحْتِمَالَاتٌ اَفْيَدُهَا الثَّالِثُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ مُحَمَّدٍ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ اَىْ فِيْهِ عِوَجًا ـ اِخْتِلَافًا وَتَنَاقُضًا وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْكِتَابِ ـ

٢. قَيِّمًا مُسْتَقِيْمًا حَالٌ ثَانِيَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِيُنْذِرَ يُخَوِّفَ بِالْكِتَابِ الْكَافِرِيْنَ بَأْسًا عَذَابًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ـ

٣. مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ـ هُوَ الْجَنَّةُ ـ

٤. وَيُنْذِرَ مِنْ جُمْلَةِ الْكَافِرِيْنَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ـ

অনুবাদ :

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। হামদ বলা হয় সিফাতে কামালিয়া বর্ণনা করাকে। জুমলায়ে খবরিয়া বা সংবাদমূলক বাক্য ব্যবহার করার দ্বারা উদ্দেশ্য কি হামদ সাব্যস্তের উপর ঈমান বা বিশ্বাসের সংবাদ দেওয়া, নাকি প্রশংসা করা উদ্দেশ্য, নাকি উভয়টিই উদ্দেশ্য? মোট তিন ধরনের সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় সম্ভাবনাটি অধিকতর উপকারী। যিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর বান্দা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর কিতাব আল-কুরআন এবং তাতে রাখেননি কোনো প্রকার বক্রতা অর্থাৎ শাব্দিক বিরোধ ও অভিব্যক্তির দিক দিয়ে ত্রুটি। আর لَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ বাক্যটি اَلْكِتٰبَ থেকে حَالٌ হয়েছে।

২. একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন সরল قَيِّمًا শব্দটি كِتَابٌ থেকে حَالٌ ثَانِيَةٌ এবং جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ -এর তাকীদ। সতর্ক করার জন্য যাতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে কিতাবের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করেন। তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। এবং মু'মিনগণ যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

৩. যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী আর উত্তম পুরস্কারটি হলো জান্নাত।

৪. এবং সতর্ক করার জন্য কাফের দলের মধ্যে ঐ কাফেরদেরকে, যারা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন।

৫. مَا لَهُمْ بِهٖ بِهٰذَا الْقَوْلِ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَائِهِمْ ط مِنْ قَبْلِهِمُ الْقَائِلِيْنَ لَهٗ كَبُرَتْ عَظُمَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ط كَلِمَةً تَمْيِيْزٌ مُفَسِّرَةٌ لِلضَّمِيْرِ الْمُبْهَمِ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوْفٌ اَىْ مَقَالَتُهُمُ الْمَذْكُوْرَةُ اِنْ مَا يَقُوْلُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ اِلَّا مَقُوْلًا كَذِبًا .

অনুবাদ :

৫. তাদের কোনো জ্ঞান নেই এ বিষয়ে এই কথার এবং তাদের পিতৃ পুরুষদেরও ছিল না যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তারাও সে কথার প্রবক্তা ছিল। কি সাংঘাতিক মন্দ তাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য كَلِمَةً শব্দটি تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যা كَبُرَتْ -এর মধ্যস্থিত উহ্য যমীর বা সর্বনামের ব্যাখ্যা করছে। আর এখানে مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো তাদের উক্তি- اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا তারা তো কেবলই মিথ্যা বলে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ عِوَجًا : عِوَجًا শব্দটির عَيْن বর্ণে যের হলে অর্থ হবে فَسَادٌ فِى الْمَعَانِىْ তথা অর্থের দুর্বোধ্যতা, অর্থ বিকৃত হওয়া, অর্থ নষ্ট হওয়া। আর عَيْن বর্ণে যবর হলে অর্থ হবে فَسَادٌ فِى الْاَجْسَامِ তথা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হওয়া, বিকৃত হওয়া, অকেজো হওয়া। অর্থাৎ عَوَجٌ হলো এমন বক্রতা যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। আর عِوَجٌ [عَيْن বর্ণে যের] এমন বক্রতা যা জ্ঞানের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। কিন্তু এটা পূর্ণাঙ্গ নীতি নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ : وَهَلِ الْمُرَادُ الْاِعْلَامُ بِذٰلِكَ : এই বাক্য দ্বারা শারেহ (র.)-এর এ কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য যে, জুমলায়ে খবরিয়ার মাধ্যমে ثُبُوْتُ حَمْدٍ -এর যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। এর দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে-

১. হয়তো এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ গুণাবলি اَزَلِىْ وَاَبَدِىْ তথা অনাদি ও অনন্ত বুঝানো উদ্দেশ্য। এ সুরতে বাক্যটি শাব্দিক ও অর্থগত উভয়ভাবেই خَبَرِيَّةٌ হবে। আর খবর দেওয়ার জন্য ثَابِتٌ উহ্য বের করে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গ্রহণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইঙ্গিত করা যে, আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি অনাদিকাল থেকে আছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। বান্দার জন্য এই বিশ্বাস রাখা অত্যাবশ্যক।

২. অথবা اِنْشَاءُ حَمْدٍ উদ্দেশ্য হবে। আর গ্রন্থকার এটাকেই وَالثَّنَاءُ بِهٖ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই সূরতে বাক্যটি শব্দগতভাবে খবরিয়া এবং অর্থগতভাবে اِنْشَائِيَّةٌ হবে। যেন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اَحْمَدُ وَاُنْشِئُ حَمْدًا لِنَفْسِىْ لِعِجْزِ خَلْقِىْ مِنْ كُنْهِ حَمْدِىْ

৩. অথবা উভয়টি উদ্দেশ্য হবে। এর দিকেই গ্রন্থকার اَوْ هُمَا দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ اِخْبَارُ حَمْدٍ এবং اِنْشَاءُ حَمْدٍ উভয়টি উদ্দেশ্য হবে। এই সুরতে বাক্যের ব্যবহার خَبَرٌ এবং اِنْشَاءٌ উভয়ের মধ্যে হবে। আর এটা حَقِيْقَتْ এবং مَجَازٌ একত্র হওয়ার ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু خَبَرٌ -এর মধ্যে হাকীকত এবং اِنْشَاءٌ -এর মধ্যে مَجَازٌ হবে। আর উদ্দেশ্য হবে ثُبُوْتُ حَمْدٍ -এর উপর ঈমানের খবর দেওয়া এবং اِنْشَاءُ حَمْدٍ করা।

قَوْلُهٗ اَفْيَدُهَا الثَّالِثُ : ব্যাখ্যাকার বলেন, উল্লিখিত তিনটি সুরতের মধ্যে তৃতীয় সুরতটিই উপকারী ও উত্তম। কেননা এই সুরতে اِخْبَارٌ এবং اِنْشَاءٌ উভয়টি مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ হয়ে থাকে, প্রথম দুই সুরতের বিপরীত। তাতে একটি مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ এবং অপরটি مَقْصُوْدٌ بِالتَّبْعِ হয়ে থাকে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, اِنْشَاءٌ ثَنَاءٌ এটা اِخْبَارٌ بِالثَّنَاءِ -কে আবশ্যক করে। আর তা এভাবে যে- اِنْشَاءُ حَمْدٍ -কারীও প্রশংসাকারী হয়ে থাকে।

এর উত্তরে বলা হয় যে, مَقْصُوْدٌ بِالتَّبْعِ এবং مَقْصُوْدٌ بِالذَّاتِ-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন– যদি বাক্যকে শুধুমাত্র খবরিয়া বলা হয় তখন এই সুরতে إِخْبَارٌ بِالْحَمْدِ উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু إِنْشَاءُ ثَنَاءٍ এটা تَبْعًا হবে। আর যদি বাক্যকে শুধুমাত্র إِنْشَائِيَّةٌ বলা হয়, তখন এই সুরতে إِنْشَاءُ حَمْدٍ তো ইচ্ছাকৃত হবে; কিন্তু إِخْبَارٌ بِالْحَمْدِ টি ضِمْنًا ও تَبْعًا হবে। আর যদি উভয়টি তথা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ এবং إِنْشَائِيَّةٌ বলা হয়, তখন إِخْبَارٌ এবং إِنْشَاءٌ উভয়টিই উদ্দেশ্য হবে।

قَوْلُهُ الَّذِيْ أَنْزَلَ : এটা ثُبُوْتُ حَمْدٍ-এর জন্য ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত। কেননা صِلَةٌ ও مَوْصُوْلٌ মিলে যখন সিফত হয় আর صِلَةٌ টা مُشْتَقٌّ হয়, তখন এ জাতীয় সিফত মওসূফের জন্য ثُبُوْتُ حُكْمٍ-এর عِلَّتٌ হয়ে থাকে। এই নীতির ভিত্তিতেই اَلَّذِيْ أَنْزَلَ টা اَلْحَمْدُ ثَابِتٌ لِلّٰهِ-এর জন্য ইল্লত হবে অর্থাৎ আল্লাহর জন্য প্রশংসা এ কারণে যে, তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

اَلْحَمْدُ-এর পরে هُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে حَمْدٌ-এর অর্থ বর্ণনা করা। আর ثَابِتٌ উহ্য মেনে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, اَلْحَمْدُ হলো মুবতাদা আর لِلّٰهِ শব্দটি ثَابِتٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে খবর।

প্রশ্ন : ثَبَتَ-এর পরিবর্তে ثَابِتٌ [যা ইসমে ফায়েল] কে উহ্য নেওয়ার দ্বারা ফায়দা কি?

উত্তর : ثَابِتٌ ইসমে ফায়েল। এটা دَوَامٌ ও إِسْتِمْرَارٌ কে বুঝায়, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য ثُبُوْتُ حَمْدٍ টা دَائِمِيْ এবং أَزَلِيْ তথা সর্বদা আছে এবং সর্বদাই থাকবে। এটা ثَبَتَ-এর বিপরীত। কেননা এটা تَجَدُّدٌ এবং حُدُوْثٌ-কে বুঝায়।

لَهُ-এর ব্যাখ্যা فِيْهِ দ্বারা করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এখানে لَامٌ টা فِيْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ قَيِّمًا : এটা সিফাতের সীগাহ। এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা–

১. সরল সঠিক। যেমন– ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ এটাই সরল সঠিক পদ্ধতি।

২. সংশোধনকারী। অর্থাৎ এমন কিতাব যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় বিষয়কে সংশোধন করে থাকে। এ সুরতে قَيِّمًا শব্দটি مُقَوِّمٌ অর্থে হবে।

قَيِّمًا শব্দটি اَلْكِتَابُ হতে দ্বিতীয় حَالٌ হয়েছে। আর এ সুরতে এটা حَالٌ مُتَرَادِفَةٌ হবে। প্রথম حَالٌ হলো وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا বাক্যটি। অথবা قَيِّمًا শব্দটি لَهٗ-এর যমীর থেকে حَالٌ হবে। তখন এটা حَالٌ مُتَدَاخِلَةٌ হবে এবং এটাকে مُؤَكِّدَةٌ-ও বলা হবে; যেহেতু দ্বিতীয় حَالٌ টা প্রথম حَالٌ-এর مَفْهُوْمٌ-এর তাকিদ করে থাকে। আর এটা উহ্য ফেলের مَفْعُوْلٌ ثَانِيْ-ও হতে পারে। উহ্য ইবারত হবে– جَعَلَهٗ قَيِّمًا

قَوْلُهُ لِيُنْذِرَ : এখানে لَامٌ টি تَعْلِيْلٌ বা عَاقِبَتٌ-এর জন্য। আর এটা أَنْزَلَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ। আর لِيُنْذِرَ-এর مَفْعُوْلٌ أَوَّلٌ হলো اَلْكَافِرِيْنَ যা উহ্য রয়েছে। আর بَأْسًا شَدِيْدًا হলো দ্বিতীয় মাফঊল। আর مِنْ لَّدُنْهُ টা উহ্য كَائِنًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে জুমলা হয়ে بَأْسًا-এর দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। অর্থাৎ بَأْسًا شَدِيْدًا كَائِنًا مِنْهُ

قَوْلُهُ يُبَشِّرُ : يُبَشِّرُ-এর আতফ لِيُنْذِرَ-এর উপরে হয়েছে। আর اَلْمُؤْمِنِيْنَ শব্দটি يُبَشِّرَ-এর মাফঊল। আর اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الخ বাক্যটি اَلْمُؤْمِنِيْنَ-এর সিফত হয়েছে। আর أَنَّ لَهُمْ-এর পূর্বে একটি ب হরফে জার উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مَاكِثِيْنَ : এটা لَهُمْ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর فِيْهِ-এর যমীরেরর مَرْجِعٌ হলো أَجْرٌ আর দ্বিতীয় يُنْذِرَ-এর আতফ হয়েছে لِيُنْذِرَ আর এই আতফকে বলা হয় عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ আর এর দ্বিতীয় মাফঊল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بَأْسًا شَدِيْدًا

قَوْلُهُ مَا لَهُمْ : مَا لَهُمْ এটা হলো جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ আর لَهُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর مِنْ عِلْمٍ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর مِنْ টি হলো অতিরিক্ত। আর بِهٖ-এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো قَوْلٌ

قَوْلُهُ : كَبُرَتْ শব্দটি فِعْل مَاضِىْ যা اِنْشَاءُ ذَمْ -এর জন্য। আর তার মধ্যস্থিত هِىَ যমীর হলো فَاعِلْ যা مَقَالَتُهُمْ -এর দিকে ফিরেছে। كَلِمَةً হলো تَمْيِيْز আর تَخْرُجُ বাক্য হয়ে كَلِمَةً -এর সিফত হয়েছে। আর مَقَالَتُهُمْ الْمَذْكُوْرَة হলো مَخْصُوْصْ بِالذَّمِّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাহফের ফজিলত : হাদীস শরীফে এ সূরার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, এক সাহাবী এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, তার গৃহে একটি চতুষ্পদ জন্তু ছিল। সে ছুটাছুটি করতে লাগলো। সাহাবী লক্ষ্য করলেন, আকাশে তাঁর ঘরের উপরে একটি মেঘখণ্ড চাঁদোয়ার মতো ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। উক্ত সাহাবী প্রিয়নবী ﷺ-এর খেদমতে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এটি হলো সাকিনা, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কুরআন কারীম তেলাওয়াতের কারণে নাজিল হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এই সাহাবীর নাম ছিল হযরত উবাইদ ইবনে হুজায়ের (রা.)।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অবশ্য তিরমিযীতে তিন আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ করবে, তার জন্যে তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে সম্পূর্ণ সূরাটি পাঠ করবে সে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করবে।

তাফসীরে ইবনে মারদূইয়াহ রয়েছে, জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পায়ের তলা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রদান করা হবে। যা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে এবং পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমার দিন পাঠ করে তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাকেম (র.) আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্যে দু'জুমার মধ্যে নূরের আলো হবে।

বায়হাকীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ সেভাবে তেলাওয়াত করে, যেভাবে তা নাজিল হয়েছে তবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে।

বর্ণিত আছে, যে হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রত্যেক রাতে এই সূরা পাঠ করতেন।

ইবনে মারদূইয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে গৃহে এই সূরা কোনো রাতে পাঠ করা হয় তাতে সেই রাতে ইবলীস শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে রাখবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এই কথাটি সূরা কাহাফের শেষ দশটি আয়াত সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই সূরা সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি সেই সূরা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো না, যা নাজিল হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছিলেন? তা হলো সূরা কাহাফ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে তাসবীহ দ্বারা, আর শেষ হয়েছে হামদ দ্বারা। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে হামদ দ্বারা।

দ্বিতীয়ত: সূরা বনী ইসরাঈলে একটি আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করেছে। একটি রূহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে, তৃতীয়টি জুলকারনাইন সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্নটির জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে প্রদান করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট প্রশ্ন দু'টির জবাব এ সূরায় স্থান পেয়েছে।

যেহেতু কাফেরদের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা, তাই এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রেসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : আসহাবে কাহফের ঘটনা দ্বারা হাশর-নাশর তথা মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্যে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর দুনিয়ার স্থায়িত্বহীনতা এবং কিয়ামত ও আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রূহ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ হয়েছে- وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا অর্থাৎ, তোমাদেরকে খুবই অল্প জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর এ সূরায় হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যাতে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে ইলম দান করেছেন, তা অতি সামান্য। কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ে ইলম দিয়েছেন, অন্য লোককে সেই ইলম না দিয়ে অন্য ইলম দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর এই ঘটনা এ কথারই প্রমাণ যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অতি সামান্য ইলমই দান করেছেন। এ সূরার শেষাংশে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর কিয়ামত এবং আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনার মাধ্যমে সূরা শেষ করা হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে নবুয়তের শান, উচ্চ মর্তবা এবং সম্মান বর্ণিত হয়েছে এবং নবীর মুজেজার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহর ওলীগণের বেলায়েত, তাদের কারামত এবং ফকিরী ও দরবেশীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ সূরায় আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরা ক'জন সাহসী যুবক ছিলেন। যারা কুফরি, নাফরমানি এবং শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার নিমিত্তে পলায়ন করেছিলেন এবং একটি গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এ সম্পর্কে কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যার অর্থ হলো- 'তাদের কথা যারা কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে কোনো পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন।' এটিও ঈমানের একটি বড় শাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَفِرُّوٓا إِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের দিকে পলায়ন কর, দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এ কর্মসূচিরই একটি অংশ। যেভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় আসহাবে কাহাফের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা ঈমানের হেফাজতের জন্য এবং কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার **সন্তুষ্টি** লাভের উদ্দেশ্যে পাপাচারের স্থান পরিত্যাগ করে, পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা একটি বিরাট ইবাদত। স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নবুয়ত লাভের পূর্বক্ষণে লোক সমাজ থেকে দূরে হেরা নামক গুহায় সাধনায় রত হতেন। এর তাৎপর্য হলো, আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃষ্টি থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার নৈকট্যধন্য হওয়ার চেষ্টা সর্বজন স্বীকৃত একটি পন্থা।

যেভাবে হযরত রাসূল কারীম ﷺ -এর মহাশূন্য পরিভ্রমণ তথা মেরাজের কথা সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এমনিভাবে সূরা কাহফে আসহাবে কাহফের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও সাধনায় রত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনার পর এই সূরা শেষ করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

শানে নুজুল : ইবনে জরীর ইকরিমার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের লোকেরা নজর ইবনে হারেস এবং উকবা ইবনে আবী মুআইত নামক দু'ব্যক্তিকে মদীনায় প্রেরণ করে এবং এই নির্দেশ দেয় যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অবস্থা মদীনার ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট বর্ণনা কর এবং ইহুদি ধর্মযাজকদের নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তাদের নিকট জ্ঞানের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা আমাদের নেই। আর তারা তার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দেয় তা আমাদেরকে অবগত কর। উভয় দূত যথাসময়ে মদীনায় পৌছে ইহুদি ধর্মযাজকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর অবস্থা তাদের নিকট বর্ণনা করে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন

ইহুদি ধর্মযাজকরা বলে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। যদি তিনি সঠিক উত্তর দিয়ে দেন, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আর যদি এই প্রশ্নগুলোর জবাব তিনি না দেন, তবে জেনে রাখ যে, তিনি সত্যবাদী নন। তিনটি প্রশ্ন হলো এই–

১. সেই যুবকগণ কারা ছিল, যারা অতীতকালে বিদায় নিয়েছেন এবং যাদের ঘটনা সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিস্ময়কর, আর সেই ঘটনাগুলো কি?

২. সে ব্যক্তি কে? যিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন তার ঘটনাবলি কি?

৩. রূহের তাৎপর্য কি?

কুরাইশদের প্রেরিত ঐ দুই ব্যক্তি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং কুরাইশদেরকে তাদের ভ্রমণের ফলাফল জানিয়ে দিল। এরপর তারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করলো। তিনি বললেন, আমি আগামীকাল বলবো।

হুজুর ﷺ তাদেরকে কথা দিলেন যে, আগামীকাল তিনি তাদের কথার জবাব দিবেন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। ফলে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে পনের দিন বিলম্ব হলো। এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-ও আসেননি এবং আল্লাহ পাক কোনো ওহীও প্রেরণ করেননি। তখন প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত অস্থির হলেন। এদিকে দুর্বৃত্ত কাফেররা বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলো।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা কাহাফ নিয়ে আগমন করলেন। এই সূরায় দুটি প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আর রূহ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৬৮, ৬৯]

পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত : পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, সর্বাধিক প্রিয় নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগর্ভ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। মূলত সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাই তাঁর মহান দরবারে পেশ করি সকল প্রশংসা! পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত, যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীকে এই মহান নিয়ামত দানে বাধিত করেছেন। পবিত্র কুরআন অদ্বিতীয়, মহান আসমানি গ্রন্থ, যার ভাষা প্রাঞ্জল, সরল, যার বর্ণনাধারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং সাবলীল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় কোনো বক্রতা নেই, এতে নেই কোনো জটিলতা। এর জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই মনে দাগ কাটে, তাকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই– যখনই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার কথা আসে তখনই তার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার হামদ বা প্রশংসার কথা উল্লিখিত হয়। যেমন– বলা হয় সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতেই سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ বলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এই সূরার শুরুতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ বলে আল্লাহ তা'আলার হামদের কথা ইরশাদ হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণার কথা হবে প্রথমে, এরপর ঘোষণা করা হবে তার হামদ বা প্রশংসার কথা। এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মেরাজ হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর সর্বপ্রথম উচ্চ মর্তবার কথা। আর তাঁর নিকট পবিত্র কুরআন নাজিল করা হলো তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করা। এই পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে মেরাজের মাধ্যমে প্রিয়নবী ﷺ উপরের দিকে গমন করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী উপর থেকে নিচের দিকে এসেছে। এই কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো যারা পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত, তাদেরকে সতর্ক করা এবং যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ৭৩-৭৪]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলাই দয়া করে স্বীয় বান্দাদেরকে পবিত্র কুরআনের নিয়ামত দান করেছেন। আর এজন্য কুরআনের নিয়ামতের উল্লেখ করে তার প্রশংসার শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানবজাতি আল্লাহ পাকের এই মহান নিয়ামতের জন্য তাঁর দরবারে শুকরগুজার হয়। এই শিক্ষার প্রতি আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৬৯]

قَوْلُهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا قَيِّمًا : عِوَجٌ শব্দের অর্থ হলো– কোনো প্রকার বক্রতা এবং এক দিকে ঝুঁকে পড়া। কুরআন পাক শাব্দিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র। অলংকার শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর কোনো জায়গায় এতটুকু ক্রটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে না এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয়। وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا বাক্যে যে অর্থটি ঋণাত্মক আকারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদের জন্য এ অর্থকেই قَيِّمًا শব্দের মধ্যে ধনাত্মক আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেননা قَيِّمًا -এর অর্থ হচ্ছে مُسْتَقِيْمًا [সঠিক]।

مُسْتَقِيْم তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক না থাকে। এখানে قَيِّمٌ শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ রক্ষক ও হিফাজতকারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার বক্রতা, ক্রটি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরকেও সঠিক পথে রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হেফাজত করে। এখন উভয় শব্দের সারসংক্ষেপ এই যে, কুরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণকারী। –[তাফসীরে মাযহারী]

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত বিষয় চতুষ্টয় : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোতে চারটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যথা–
১. আল্লাহর প্রশংসা এবং পবিত্র কুরআনের বড়ত্ব ও মহত্ব।
২. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তিনটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
৩. কুরআনের ধারক বাহকের জিম্মাদারী কতটুকু?
৪. আল্লাহ তা'আলা এ সমগ্র সৃষ্টিজীবকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং এর শেষ পরিণতি কি ঘটবে?

উপরিউক্ত বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ : সকল প্রশংসা সেই পবিত্র সত্তার জন্য যিনি স্বীয় বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ যেই সত্তা মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ করছেন, তিনি সকল সৌন্দর্যের অধিকারী, সর্বপ্রকার স্তুতি গানের উপযুক্ত, সর্বোত্তম শুকর ও কৃতজ্ঞতার আধার। আর সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা হতে চিরমুক্ত। তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর এই কিতাবে সামান্যতম বক্রতারও স্থান দেননি। শাব্দিকভাবেও নয় যে, তা ফাসাহাত ও বালাগাতের পরিপন্থি হবে এবং অর্থগতভাবেও নয় যে, তার কোনো বিধান ও নির্দেশ প্রজ্ঞার খেলাফ হবে। আর কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো– কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা ও সৎকর্মশীল পুণ্যবান মু'মিনগণকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আগাম সুসংবাদ পরিবেশন করা। বিশেষ করে সে সকল কাফের সম্প্রদায়কে ভয় দেখানো, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করতে সদা তৎপর। আল্লাহ তা'আলার সন্তান রয়েছে, এ আকীদায় বিশ্বাসী কাফেরদেরকে সাধারণ কাফের থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আরবের সাধারণ জনগণ, ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলেই লিপ্ত ছিল। অথচ এর সপক্ষে না তাদের কাছে কোনো ন্যূনতম প্রমাণ ছিল, না তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট। আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মুখ থেকে খুবই ভয়ানক মন্দ কথা নির্গত হয়, যা কোনো সামান্যতম বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও বলতে পারে না। –[জামালাইন, খ. ৪, পৃ. ২৪-২৫]

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত : আয়াতে বর্ণিত عَبْدِهٖ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, عَبْدِيَّتْ তথা দাসত্বের সমপর্যায়ের কোনো উচ্চ স্থান নেই। আর এর দ্বারা এটাও জানা গেল যে, রাসূল ﷺ এর সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আয়াতে বর্ণিত لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيْدًا দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর মারেফত থেকে বঞ্চিত থাকাও এক ধরনের কঠিন শাস্তি। কাজেই সাধককে মারেফত বঞ্চিত হওয়া থেকে ভয় করা উচিত।

আয়াতে বর্ণিত وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ দ্বারা সে সকল আমল উদ্দেশ্য যার দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কারো কারো নিকট আল্লাহর প্রেমে ডুবে থাকার ফলে স্বীয় প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতা থেকে নারাজি উদ্দেশ্য।

আয়াতে বর্ণিত اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا -এর মধ্যস্থ اَجْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি বাস্তব চোখে অবলোকন করা।

অনুবাদ :

٦. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُهْلِكٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ بَعْدَهُمْ اَىْ بَعْدَ تَوَلِّيْهِمْ عَنْكَ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْقُرْاٰنِ اَسَفًا ـ غَيْظًا وَحُزْنًا مِنْكَ لِحِرْصِكَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ وَنَصْبُهٗ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لَهٗ ـ

৬. সম্ভবত আপনি আত্মবিনাশী হালাক ও ধ্বংস হয়ে পড়বেন, তাদের পিছনে ঘুরে অর্থাৎ তারা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর [তারা এই বাণী] আল কুরআন বিশ্বাস না করলে দুঃখে মনস্তাপে রাগে ও চিন্তায় তাদের ঈমান আনয়নের প্রতি আপনার লোভ থাকার কারণে। اَسَفًا শব্দটি مَفْعُوْل لَهٗ হিসেবে মানসূব হয়েছে।

٧. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَالْاَنْهَارِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ لِنَخْتَبِرَ النَّاسَ نَاظِرِيْنَ اِلٰى ذٰلِكَ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ فِيْهِ اَىْ اَزْهَدُ لَهٗ ـ

৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু রয়েছে অর্থাৎ জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা ইত্যাদি আমি সেগুলোকে করেছি শোভা জমিনের জন্য, মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে, অর্থাৎ মানুষকে এ ব্যাপারে এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাদের মধ্যে কে দুনিয়াবিমুখতা প্রদর্শন করে।

٨. وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ـ يَابِسًا لَا يَنْبُتُ ـ

৮. জমিনের উপর যা কিছু রয়েছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব। এমন শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করব যাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهٗ بَاخِعٌ : অভিধানে بَخَعَ نَفْسَهٗ -এর অর্থ করা হয়েছে مَنَعَ । এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, আপনি তাদের ঈমান গ্রহণ না করার ফলে এত চিন্তিত ও পেরেশান হবেন না, যা আপনাকে বিনাশ সাধন করবে। তবে কাফেরদের ঈমান গ্রহণ না করার কারণে নফসকে চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা যাবে না। কেননা সেটাতো ঈমানের শর্তের অন্তর্ভুক্ত। এটা থেকে কিভাবে বারণ করা যাবে? কেননা কুফরের উপর সন্তুষ্টি থাকাও তো কুফরেরই নামান্তর।

قَوْلُهٗ بَعْدَهُمْ : এটা اٰثَارْ -এর তাফসীর হয়েছে। আর بَعْدَ تَوَلِّيْهِمْ এটা তাফসীরের তাফসীর হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো– আপনি কাফেরদের ঈমান না আনার কারণে এত চিন্তিত হবেন না যে, নিজেই নিজেকে বিনাশ করে দিবেন।

لَعَلَّ : এটা تَرَجِّىْ এবং اِشْفَاقْ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে نَهِىْ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আপনাকে এ পরিমাণ চিন্তিত হওয়া থেকে বারণ করার জন্য।

اٰثَار শব্দটি اَثَرٌ -এর বহুবচন, অর্থাৎ তাদের পিছনে তথা তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করবেন না।

قَوْلُهٗ لَمْ يُؤْمِنُوْا : এর দুটি তারকীব হতে পারে– ১. اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا হলো শর্ত আর পূর্বের উপর নির্ভর করে جَزَاءْ টা উহ্য থাকবে অর্থাৎ فَلَا تُهْلِكْ نَفْسَكَ

২. لَمْ يُؤْمِنُوْا হলো شَرْطٌ مُؤَخَّرٌ আর فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ হলো جَزَاءٌ مُقَدَّمٌ

اَسَفًا শব্দটি بَاخِعٌ -এর مَفْعُوْل لَهٗ অথবা بَاخِعٌ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِحِرْصِكَ : এটা ইল্লতের ইল্লত। অর্থাৎ আপনার এত বেশি পেরেশানি কেন? যেহেতু তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে আপনি অতিশয় আগ্রহী, তাই আপনি এত পেরেশান।

قَوْلُهُ اِنَّا جَعَلْنَا : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ যদি جَعَلَ ফে'লটি صَيَّرَ-এর অর্থে হয় তাহলে زِيْنَةً টি তার مَفْعُوْل ثَانِيْ হবে। আর لَهَا-এর لَامٌ টা زِيْنَةً-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হবে। আর এটাও হতে পারে যে, তা كَائِنَةً-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে زِيْنَةً-এর صِفَةٌ হবে। مَا عَلَى الْاَرْضِ হলো مَفْعُوْل اَوَّل আর جَعَلَ যদি خَلَقَ অর্থে হয় তাহলে হবে শব্দটি হয়তো حَال হবে অথবা পরবর্তীতে مَفْعُوْل لَهٗ হবে।

قَوْلُهُ جُرُزًا : এটা صَعِيْدًا শব্দের صِفَتٌ হয়েছে। এতে اِسْنَادْ مَجَازِيْ হয়েছে। কেননা جُرُزٌ-এর মূল অর্থ হলো- এমন ভূমি যার ঘাস কেটে ফেলা হয়েছে। এটাকে مَا عَلَى الْاَرْضِ-এর সিফত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এটা اَرْض-এর সিফত। কাজেই عَلَاقَةْ مُجَاوِرَتْ-এর কারণে اِسْنَادْ مَجَازِيْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ : এটা মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা হয়েছে। আর তার خَبَرْ হলো اَحْسَنُ আর عَمَلًا হলো تَمْيِيْز এটা জুমলা হয়ে نَبْلُوَ-এর দ্বিতীয় মাফঊলের স্থলাভিষিক্ত।

فِيْهِ-এর যমীরের مَرْجِعْ হলো مَا عَلَى الْاَرْضِ আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু রয়েছে।

قَوْلُهُ اَزْهَدُ لَهٗ : এটা اَحْسَنُ عَمَلًا-এর তাফসীর।

قَوْلُهُ اَسَفًا : اَسَفًا শব্দের ব্যাখ্যায় غَيْضًا وَ حُزْنًا এনে এ শব্দটির অর্থ নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য। কেননা اَسَفًا শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ : এ বাক্যটি مَا عَلَى الْاَرْضِ-এর بَيَانْ হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاظِرِيْنَ اِلٰى ذٰلِكَ : দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, هُمْ হলো ذُو الْحَالِ আর نَاظِرِيْنَ তার থেকে حَال হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ : এ আয়াত দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে এবং দুনিয়াদার ও পরকালবিমুখদেরকে/গাফেলদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, এ পৃথিবী ও তাঁর নিয়ামতসমূহ গুটি কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কাজেই এতে অধিক আসক্তির সাথে নিপতিত হয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি উদাসীন থাকা মোটেও সমীচীন নয়। আর اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ হতে এটাই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও তার আরাম আয়েশ শুধুমাত্র গুটি কয়েকদিন তথা সামান্য সময়ের জন্য। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৫৬৩]

قَوْلُهُ : فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا-এর শানে নুযূল :

ইবনে মারদূইয়াহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ কুরাইশের একটি দলের সঙ্গে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে কথা বলেন। তাদেরকে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। এই দলে ছিল রবীয়ার দুই পুত্র ওতবা এবং শায়বা, আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, নজর ইবনে হারেস, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ও আবুল বুখতারী প্রমুখ।

কিন্তু তারা কোনো যুক্তি প্রমাণ মানতে রাজি হলো না। তখন প্রিয়নবী ﷺ ঐ মজলিস থেকে মনক্ষুণ্ন হয়ে উঠে গেলেন। কুরাইশ সর্দারদের বিরোধিতা, তাদের আপত্তিকর মন্তব্য ও তার উপদেশ গ্রহণ না করা প্রিয়নবী ﷺ-এর জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তার পক্ষে এ কষ্ট যেন অসহনীয় ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল ﷺ ! যদি কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, সরল সঠিক পথ অবলম্বন না করে, পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং আপনার রেসালাতকে অস্বীকার করে তবে এই হতভাগাদের জন্য আপনি কি আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলবেন? হে নবী! এর কোনো প্রয়োজনই নেই। আপনার দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছে দেওয়া, এ ব্যাপারে আপনি সফলকাম হয়েছেন। সত্যের প্রচার প্রসারে আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন। হতভাগারা যদি ঈমান না আনে তবে তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা ঈমান না আনলে আপনার কোনো ক্ষতি নেই, তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়নি, একথা চিন্তা করেও দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা হে রাসূল ﷺ! আপনাকে প্রেরণ করেছি ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা রূপে। আর এ কাজটি আপনি সঠিকভাবেই করেছেন। তাদের ঈমান না আনার জন্যে আপনি দায়ী নন। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا : অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি, এগুলো সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক বস্তুও তো রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও খারাপ সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোনো কিছুই খারাপ নয়। কেননা প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি চমৎকার বলেছেন–

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً : অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু পরীক্ষাস্বরূপ এ মর্মে যে, কে কাজ ভালো করে, কে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করে? আর কে মন্দ কাজ করে?

মুজাহিদ (র.) বলেন, مَا عَلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ পৃথিবীতে যা আছে, এতে মানব দানব, বৃক্ষ তরুলতা, ফল-ফুল এক কথায় সৃষ্টি মাত্রই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা শুধু মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকারদের মতে এ শব্দটি দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এবং নেককারদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারাই পৃথিবীর সৌন্দর্য।

ইবনে আবি হাতেম হাসান বসরী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটি দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, যদি এই শব্দটি দ্বারা পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে তা অযৌক্তিক হবে না। কেননা পৃথিবীর সৌন্দর্যে প্রতিটি বস্তুরই অংশ রয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা সেসব বস্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার দ্বারা কেনো কিছুকে সুসজ্জিত করা হয়। যেমন, সুন্দর মনোরম পরিবেশ, সুন্দর বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচা। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসুর, খ. ৪, পৃ. ২৩৩]

اَحْسَنُ عَمَلاً হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট এই বাক্যটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবীজী ﷺ তখন ইরশাদ করেছিলেন– اَحْسَنُكُمْ عَقْلاً وَ اَوْرَعُكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ وَاَسْرَعُكُمْ فِىْ طَاعَتِهٖ سُبْحَانَهٗ

অর্থাৎ বুদ্ধি যার ভালো, যে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে হারাম বস্তুকে বর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনে যে ছুটে চলে, তাকেই উত্তম আদর্শের অনুসারী বলা হয়েছে।

ইবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো যারা দুনিয়াত্যাগী হয়, তাদের আমলই উত্তম।

قَوْلُهُ وَإِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا : অর্থাৎ দুনিয়ার ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য যতই মনোরম এবং মনোহর হোক না কেন, এর কোনো স্থায়িত্ব নেই। মানুষ যত সম্পদ, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা অর্জন করুক না কেন, কোনো কিছুই টিকে থাকবে না; বরং প্রত্যেককেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে এ পৃথিবী থেকে। যদি আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করা হয়, তথা পারলৌকিক সম্পদ অর্জন করা হয় তবে এতে দুনিয়ার সম্পদের সার্থকতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক অবশেষে একদিন পৃথিবীর শোভা সৌন্দর্য, বৃক্ষ তরুলতা এক কথায় সব কিছু ভেঙ্গে একাকার করে দেবেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে সমতল প্রান্তরে পরিণত করবেন। তখন পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য দূরীভূত হবে। এজন্যই পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

হে রাসূল ﷺ! আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য; আর আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। মূলত এ কারণেই যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা দুনিয়ার সম্পদের লোভে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করে না। এমনিভাবে কারো ভয়-ভীতি তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করতে পারে না। আসহাবে কাহাফের ঘটনাই এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

قَوْلُهُ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ الخ : আয়াতের মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর সীমাহীন দয়া, অনুগ্রহ ও বিরোধীদেরকে স্বীয় মতালম্বী বানানোর গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ الخ : আয়াতে উল্লিখিত حُسْنَ عَمَلْ বা সৎকর্ম ব্যাপক, যাতে পৃথিবীর সকল বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও মহত্ত্বের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করার দর্পণ বানানোও অন্তর্ভুক্ত হয়। আর ইবনে আতা (র.) বলেন, সকল বিপদ আপদকে ভ্রুক্ষেপ না করাও حُسْنَ عَمَلْ বা সৎ কর্মের অন্তর্ভুক্ত। আবার কারো কারো মতে পৃথিবীর সৌন্দর্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَهْلُ مُحَبَّتْ وَمَعْرِفَتْ আর তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবেদনও حُسْنَ عَمَلْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

-[কামালাইন, পারা ১৫, পৃ. ৮৬০-৮৭]

অনুবাদ :

٩. اَمْ حَسِبْتَ اَىْ ظَنَنْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ الْغَارِ فِى الْجَبَلِ وَالرَّقِيْمِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوْبِ فِيْهِ اَسْمَاءُ هُمْ وَاَنْسَابُهُمْ وَقَدْ سُئِلَ ﷺ عَنْ قِصَّتِهِمْ كَانُوْا فِىْ قِصَّتِهِمْ مِنْ جُمْلَةِ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ـ خَبَرُ كَانَ وَمَا قَبْلَهُ حَالٌ اَىْ كَانُوْا عَجَبًا دُوْنَ بَاقِى الْاٰيَاتِ اَوْ اَعْجَبُهَا لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ ـ

৯. আপনি কি মনে করেন অর্থাৎ, ধারণা করেন যে, গুহা ও রকীমের অধিবাসীরা স্বীয় ঘটনার দিক দিয়ে আমার সকল নিদর্শনাবলির মধ্যে বিস্ময়কর কিছু। কাহাফ হলো পাহাড়ের গুহা। আর রকীম হলো ঐ ফলক যাতে আসহাবে কাহাফের নাম এবং তাদের বংশধারা লেখা ছিল। রাসূল ﷺ -এর কাছে তাদের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। عَجَبًا শব্দটি كَانَ -এর খবর। এবং তাদের পূর্বের বাক্যটি অর্থাৎ مِنْ اٰيَاتِنَا হলো كَانُوْا -এর মধ্যস্থ যমীর থেকে حَالٌ অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শনাবলি ছাড়া কেবল সেই নিদর্শনটাই আমার কুদরতের মধ্যে আশ্চর্যের ছিল অথবা বিস্ময়কর বিষয়সমূহের মধ্যে সেটিই অধিকতর বিস্ময়কর ছিল। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন নয়।

١٠. اُذْكُرْ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ جَمْعُ فَتًى وَهُوَ الشَّابُّ الْكَامِلُ خَائِفِيْنَ عَلٰى اِيْمَانِهِمْ مِنْ قَوْمِهِمِ الْكُفَّارِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ قِبَلِكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ اَصْلِحْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ هِدَايَةً ـ

১০. ঐ সময়কে স্মরণ করুন, যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল। فِتْيَةٌ শব্দটি فَتًى -এর বহুবচন। অর্থ– পূর্ণাঙ্গ যুবক। তারা তাদের কাফের সম্প্রদায়ের কৃত অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে নিজেদের ঈমানের জন্য আশঙ্কাবোধ করে তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার নিকট হতে অর্থাৎ তোমার পক্ষ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। হেদায়েতপূর্ণ বানিয়ে দাও।

١١. فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ اَىْ اَنَمْنَاهُمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ـ مَعْدُوْدَةً ـ

১১. অতঃপর আমি গুহার মাঝে তাদের কর্ণ কুহরে কয়েক বছরের জন্য পর্দা আচ্ছাদন করে দিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রাখলাম।

١٢. ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ اَىْ اَيْقَظْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ الْفَرِيْقَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِىْ مُدَّةِ لُبْثِهِمْ اَحْصٰى فِعْلٌ بِمَعْنٰى ضَبَطَ لِمَا لَبِثُوْا لِلُبْثِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ اَمَدًا ـ غَايَةً ـ

১২. পরে আমি তাদেরকে উঠালাম অর্থাৎ, জাগ্রত করলাম জানবার জন্য ইলমে মুশাহাদার ভিত্তিতে দুই দলের মাঝে কোন দল তাদের অবস্থানকাল নির্ণয় সম্পর্কে মতবিরোধকারী দু'দলের মধ্যে তাদের অবস্থানকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে اَحْصٰى শব্দটি ফে'লে মাযী ضَبَطَ তথা আয়ত্ত রাখা অর্থে لِمَا لَبِثُوْا তার পরবর্তী শব্দের সাথে مُتَعَلِّقٌ আর اَمَدًا অর্থ غَايَتْ বা সীমা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَمْ حَسِبْتَ : اَمْ حَسِبْتَ-এর মধ্যে اَمْ مُنْقَطِعَةٌ টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার এই ধারণা পোষণ করা শোভন নয়।

قَوْلُهُ اِنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ : এটি জুমলা হয়ে حَسِبْتَ ফে'লের مَفْعُوْل بِهٖ আর كَانُوْا مِنْ اٰيَاتِنَا عَجَبًا জুমলা হয়ে اِنَّ-এর খবর হয়েছে। আর عَجَبًا শব্দটি উহ্য اٰيَةً-এর সিফত হয়ে اِنَّ-এর খবর হয়েছে। আর اَصْحَابُ الْكَهْفِ হলো اِنَّ-এর ইসিম।

كَهْفٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো كُهُوْفٌ ـ اَكْهُفٌ অর্থ– গুহা, গর্ত। كَهْفٌ এবং غَارٌ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো غَارٌ [গর্ত] সংকীর্ণ ও ছোট হয়ে থাকে। আর كَهْفٌ [গুহা] বড় ও প্রশস্ত হয়ে থাকে।

رَقِيْم অর্থ مَرْقُوْمٌ তথা লিখিত, লিপিবদ্ধকৃত, সিলকৃত।

رَقِيْم সম্পর্কে মুফাসসিরগণের ছয় ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা–

১. এটা সেই গ্রামের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিলেন।

২. এটা সেই পাহাড়ের নাম যাতে সেই গুহা বিদ্যমান।

৩. আসহাবে কাহাফের কুকুরের নাম হলো رَقِيْم

৪. সেই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত খোলা ময়দানের নাম হলো رَقِيْم

৫. এটা ঐ ফলক যাতে আসহাবে কাহাফের সদস্যদের নাম লিখে গর্তের মুখে স্থাপন করা হয়েছিল।

৬. এটা সীসা নির্মিত সেই ফলক যাতে আসহাবে কাহফের নাম খোদাই করে শাহী ট্রেজারিতে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

ইমাম বুখারী (র.) শেষোক্ত উক্তিটিকে তাঁর সহীহ বুখারীতে تَعْلِيْقًا উল্লেখ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এর সনদকে বুখারীর শর্তের উপর রয়েছে বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ هَيِّئْ : শব্দটি بَابُ تَفْعِيْل হতে اَمْر-এর সীগাহ। মাসদার تَهْيِئَةٌ অর্থ– পরিশুদ্ধ করা। ঠিক করা। তৈরি করা। প্রস্তুত করা।

قَوْلُهُ اَحْصٰى : শব্দটি بَابُ اِفْعَالْ-এর ফে'লে মাযীর সীগাহ, اِسْمُ تَفْضِيْل-এর নয়। কেননা ثُلَاثِىْ مَزِيْد থেকে اِسْمُ تَفْضِيْل-এর সীগাহ اَفْعَلُ-এর ওজনে আসে না।

قَوْلُهُ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ : মুবাক্কাবে ইযাফী হয়ে مُبْتَدَأٌ আর اَحْصٰى জুমলা হয়ে খবর। আর اَحْصٰى-এর যমীরের مَرْجِعْ হলো كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْحِزْبَيْنِ অর্থাৎ উভয় দলের প্রত্যেক ব্যক্তি।

قَوْلُهُ لِمَا لَبِثُوْا : এটা حَرْفُ جَارْ-এর মাধ্যমে اَحْصٰى ফে'লের مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। আর اَمَدًا হলো تَمْيِيْز

قَوْلُهُ ضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ : এখানে ضَرَبْنَا-এর মাফঊল حِجَابًا বাক্যের মধ্যে مَجَازْ হিসেবে উহ্য রয়েছে। কেননা اِلْقَاءُ نَوْم-কে ضَرْبِ حِجَابْ দ্বারা তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। আর ضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ অর্থ হলো اَنَمْنَا তথা নিদ্রামগ্ন রাখা।

قَوْلُهُ عَدَدًا : এটা مَعْدُوْدًا অর্থে। আর এটা سِنِيْنَ-এর সিফত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا : বস্তুত আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম কুদরত-হেকমতের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন আকাশে পাতালে ছড়িয়ে আছে তার তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনা আদৌ এমন বিস্ময়কর কিছু নয়। যিনি কোনো স্তম্ভ ব্যতীত নীলাভ আকাশকে চাঁদোয়ার মতো করে রেখেছেন, যিনি সমগ্র

বিশ্বের সৃষ্টিকে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছেন, যার নির্দেশে এবং মর্জিতে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা সদা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার নিকট আসহাবে কাহাফের ঘটনা এমন আর কি আশ্চর্যজনক হতে পারে! যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে হিজরতের রাতে অগণিত কাফেরদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়ে গেলেন, আর তারা কিছুই দেখলো না, যিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর নামক গুহায় প্রিয়নবী ﷺ ও তার একমাত্র সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)-কে দুশমনের কবল থেকে নিরাপদে রাখলেন, তার অনুসন্ধানকারী শত্রুদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করলেন, যিনি নিরস্ত্র প্রায় তিনশত তের জন মুসলমানকে বদরের রণাঙ্গনে বিজয়ী করলেন এবং সহস্র অশ্বারোহী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করে দিলেন, ইতিপূর্বে যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় ফেরাউনকে এবং হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর মোকাবিলায় নমরুদকে ধ্বংস করলেন, তাঁর অনন্ত অসীম কুদরতের তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনাকে খুব একটা বিস্ময়কর বলা যায় না। কিন্তু যেহেতু ইহুদিরা এ সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করেছেন তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রমাণ এবং কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার সুস্পষ্ট দলিল। আসহাবে কাহাফের ঘটনা কিয়ামতের দলিল এই মর্মে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন শত শত বছর ধরে মৃত রাখার পর তাদেরকে জাগ্রত করতে পারেন তখন হাজার হাজার বছর ধরে মৃত অবস্থায় থাকার পর জীবিতও করতে পারেন। কেননা প্রবাদ বাক্য হলো– "নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই।"

আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম : اَلْكَهْفُ সেই প্রশস্ত গর্তকে বলা হয় যা পাহাড়ের ভিতরে থাকে। আর رَقِيْم শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ বস্তু। যেহেতু লোকেরা আসহাবে কাহাফের নাম ও তাদের ঘটনা একটি ফলকের উপর লিপিবদ্ধ করে তা এই গর্তের মুখে রেখে দিয়েছিল, তাই তাদেরকে'আসহাবে কাহাফ' ও 'আসহাবে রকীম' বলা হয়। আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দলের দুটি খেতাব। গর্তের অধিবাসী হওয়ার কারণে আসহাবে কাহাফ বলা হয়। আর যেহেতু একটি ফলকে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল এজন্যে তাদেরকে আসহাবে রকীম বলা হয়।

–[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৮]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, رَقِيْم সেই উপত্যকার নাম, যেখানে আসহাবে কাহাফ ছিল। আর কা'বে আহবার বলেছেন, رَقِيْم সেই শহরের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহাফ বের হয়েছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন رَقِيْم ঐ পাহাড়ের নাম যাতে আসহাবে কাহাফ এর গর্ত ছিল। এসব অভিমত যাদের, তারা এ মতও পোষণ করেন যে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম একই দল ছিল, ভিন্ন ভিন্ন কিছু ছিল না। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রকীম ভিন্ন ভিন্ন দুটি দল।

আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, ইবনে আবি হাতেম এবং ইবনে মারদূইয়াহ হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসহাবে রকীম সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, এরা তিন ব্যক্তি ছিল, যারা একটি গর্তে প্রবেশ করেছিল।

ইমাম আহমদ ও ইবনুল মুনযির হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্বকালের তিন ব্যক্তি উপজীবিকার সন্ধানে বের হয়েছিল। পথে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় তারা একটি গর্তে আশ্রয় নেয়। গর্তের ভিতর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট পাথরখণ্ড গর্তের মুখে এসে পড়লো। ফলে গর্তের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। এক ব্যক্তি বলল, আমাদের যে কেউ জীবনে কোনো নেক কাজ করে থাকে সেই নেক কাজটির কথা মনে করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা উচিত। হয়তো আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে আমাদের উপর রহমত নাজিল করবেন। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি একদিন কিছু লোককে কাজের জন্য রেখেছিলাম। তন্মধ্যে একটি লোক দ্বিপ্রহরে আমার কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য আসলো। কেননা সে অর্ধেক দিনে এত কাজ করেছে যে অন্যরা তা সারাদিনে করেছে। আমি তাকে অন্যদের সমান পারিশ্রমিক দান করি। অন্য শ্রমিকদের একজন এ কারণে রাগান্বিত হলো এবং তার পারিশ্রমিক সে আমার নিকট রেখে চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিক ঘরে সংরক্ষণ করলাম। কিছুদিন পর তার ঐ পারিশ্রমিক দ্বারা একটি বকরির বাচ্চা ক্রয় করলাম। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে ঐ বকরির বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুদীর্ঘ সময় পর সেই শ্রমিক আমার নিকট ফিরে আসলো। সে বর্তমানে বৃদ্ধ হয়ে গেছে

এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমি তাকে চিনতেও পারিনি। সে বলল, আপনার নিকট আমার কিছু হক রয়েছে। এরপর সে তার হকের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন আমি তাকে চিনতে পারলাম। পরে আমি তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ বকরির পাল তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তা শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে আমাদের জন্যে এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন সঙ্গে সঙ্গে একটু ফাঁক হলো, বাইরের আলো আসতে লাগলো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, আমার কাছে সম্পদ ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেতে লাগলো। একজন অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোক আমার কাছে আসলো এবং সাহায্যপ্রার্থী হলো। আমি বললাম, আমি তোমার বিনিময় দিতে পারি, শুধু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই। সে তাতে অস্বীকৃতি জানাল এবং প্রত্যাবর্তন করলো। তিনবারই এমন হলো। অবশেষে এ সম্পর্কে সে তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করলো। সে বললো, তোমার দুর্দশা এবং অভুক্ত সন্তান সন্ততির প্রয়োজনের আয়োজনে তুমি রাজী হতে পার। তাই স্ত্রী লোকটি আমার কাছে আসলো। কিন্তু সে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিল এবং তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ কম্পমান ছিল। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে আমি ভীত সন্ত্রস্ত। আমি বললাম, এত কষ্টে থেকেও তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভর কর আর আমি এমন স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি না। তখন আমি অসৎ কাজ থেকে তওবা করলাম এবং ঐ অবস্থায় তার চাহিদা মোতাবেক সম্পদ দ্বারা সাহায্য করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ঐ নিঃস্ব স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করে থাকি, তবে আজ তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও এবং এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন পাথরটি এতখানি সরে গেল যে তারা এক অন্যকে চিনতে পারলো।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমার পিতামাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমার কাছে কয়েকটি বকরি ছিল। আমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে আহার করিয়ে বকরি নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতাম। একদিন বকরিগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোকে একত্র করতে বিলম্ব হয়ে গেল। অনেক রাতে আমি বাড়ি ফিরলাম এবং দুধের পাত্র হাতে নিয়ে পিতামাতাকে পান করাবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় দণ্ডায়মান রইলাম। ভোরে যখন তাঁরা জাগ্রত হলেন, তখন আমি তাদেরকে দুধ পান করালাম।

হে আল্লাহ! যদি আমি এই কাজটি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকি তবে তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও ও বন্ধ দুয়ার খুলে দাও! তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং আমরা সকলে বেরিয়ে আসলাম।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আসহাবে রকীম বাক্যটি এদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৭৩-৭৪, দুররে মানসূর, খ. ৪, পৃ. ২৩৪, মা'আরিফুল কুরআনম আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৮৯]

আসহাবে কাহাফের ঘটনা : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, দাকয়ানূস নামক এক ব্যক্তি রোমের সম্রাট ছিল। লোকটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং বড় জালেম। সে শুধু গোঁড়া পৌত্তলিক ও মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়, বরং সে জনসাধারণকে বল প্রয়োগ করে মূর্তি পূজার জন্যে বাধ্যও করতো। তাই অনেকেই তার ভয়ে অথবা অর্থ-সম্পদের লোভে মূর্তিপূজা করতো। যার সম্পর্কে সে জানতে পারতো যে, সে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে হাজির করে বলা হতো, হয় মূর্তিদের সম্মুখে মাথা নত কর, অথবা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও। এভাবে যারা মূর্তিপূজা করতে অস্বীকার করতো তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হতো। সমগ্র সাম্রাজ্যে তখন সে তাওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে জুলুম অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছিল। ঐ দেশেরই কয়েকজন যুবক যারা রাজ পরিবারের লোক ছিল, তারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, তাওহীদের উপর কায়েম ছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সঠিক অনুসারী ছিল। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এরা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের লোক ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে তুলে নেওয়ার পর তারা জাগ্রত হয়েছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ৫, পৃ. ২২১]

ইমাম তাবারী (র.) বর্ণনা করেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তারা হযরত ঈসা (আ.) -এর পরে এসেছেন। আর তাদের ঘটনা ঘটেছে হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.)-ও লিখেছেন এ ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বের। যাহোক, কয়েকজন সত্যপন্থি যুবক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে, আমরা রাজা দাকয়ানুসের জন্যে আল্লাহ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করতে পারি না এবং তাওহীদকে বাদ দিয়ে মূর্তিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি না। রাজা দাকয়ানূস তাদেরকে তার দরবারে হাজির করল এবং বলল, তোমরা যদি মূর্তি পূজা করতে প্রস্তুত না হও এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী থাক তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। কিন্তু তারা তাওহীদের বিশ্বাসে সুদৃঢ় ছিল। তাই রাজা দাকয়ানূসের মুখের

উপর বলে দিল, তোমার যা ইচ্ছা কর, আমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেছি। যিনি আসমান জমিনের মালিক, তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই, যুবকদের একথা শ্রবণ করে সকলেই বিস্মিত হলো। সে তাদের পরিধেয় মূল্যবান বস্ত্র এবং স্বর্ণরৌপ্যের যে অলংকার তাদের সাথে ছিল তা খুলে নিল এবং বললো, তোমাদের জন্যে যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু তোমরা বিষয়টি আরো ভেবে চিন্তে দেখ, তাই তোমাদেরকে আরো কিছু দিনের জন্যে অবকাশ দেওয়া হলো। নওজোয়ানরা তখন পরস্পর পরামর্শ করল যে, কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে রয়েছে, রাজার নিষ্ঠুর অত্যাচারের সম্মুখে আমরা টিকতে পারবো কিনা, তা জানি না। তাই আপাতত কোনো পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করা সমীচীন মনে করি। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে আমাদেরকে রক্ষা কর এবং আমাদের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার তাওফীক দান কর। তখন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে অনেক সম্পদ নিয়ে নিল। তন্মধ্যে কিছুটা আল্লাহর রাহে খয়রাত করলো এবং অবশিষ্ট সম্পদ সঙ্গে নিয়ে গর্তের দিকে রওয়ানা হলো। পথে একজন কৃষক এবং তার কুকুরটিও সাথে সাথে চলতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করার পরও তাদেরকে বিদায় করা সম্ভব হলো না। আল্লাহ তা'আলা সেই কুকুরটিকেও বাকশক্তি দান করলেন। সে বলল, তোমরা আমাকে ভয় করো না, আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে আপন জানি, আমি তোমাদের নিরাপত্তা এবং প্রহরার দায়িত্ব পালন করবো। যখন তারা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলো, তখন কৃষক লোকটি বলল, আমি এ পাহাড়ের একটি গর্ত সম্পর্কে অবগত, সেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। তখন তারা একমত হয়ে পাহাড়ের গর্তের দিক রওয়ানা হলো। গর্তে পৌঁছে তারা নামাজ, তাসবীহ, তাহলীলে মশগুল হলো এবং তাদের মধ্যে তালমীখা নামক ব্যক্তির নিকট সকলে নিজ নিজ টাকা-পয়সা জমা দিল। সে রাত্রিকালে গোপনে নিজের বেশ পরিবর্তন করে শহরে গমন করতো এবং তাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসতো। শহরের খবরও সে তাদেরকে সরবরাহ করতো।

দাকয়ানুস সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ সাতজন যুবকের অনুসন্ধানের আদেশ দিল। তালমীখা যখন জানতে পারলো যে সরকারের তরফ থেকে তাদের খোঁজ করা হচ্ছে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের ঠিকানা বলার জন্যে তখন সে সামান্য খাবার সংগ্রহ করে ক্রন্দনরত অবস্থায় সাথীদের নিকট আসলো এবং অবস্থা বর্ণনা করলো যে সেই নিষ্ঠুর জালেম পুনরায় শহরে এসেছে এবং আমাদের খোঁজ করছে। এ খবর শ্রবণ করে সকলে সেজদারত হলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্রন্দনরত হয়ে দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জালেম থেকে রক্ষা কর! তাদের সকলের চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরেছিল। তারা দোয়া শেষ করে পরস্পর আলাপ করছিল এবং একে অন্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ তাদেরকে নিদ্রিত করে দিলেন এবং কুকুরটি গর্তের মুখে পড়ে রইলো।

এদিকে দাকয়ানুস তাদের খোঁজ করে কোথাও পেল না। শহরের গণ্যমান্য লোকদের সে বলল, এই যুবকদেরকে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তারা যদি মত পরিবর্তন করতো এবং আমার উপাস্যদের পূজা করতো, তবে আমি তাদের মাফ করে দিতাম। শহরের সর্দাররা বলল, আপনি তো তাদের প্রতি অনেক দয়া করেছেন, তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন; কিন্তু তারা তো নিজেদের মত পরিবর্তন করল না, তারা অবাধ্যই রয়ে গেল। তখন রাজা দাকয়ানুস অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং ঐ যুবকদের পিতাদের হাজির করার আদেশ জারি করলো। তারা বলল, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে এই যুবকরা আপনার অবাধ্য হয়েছে এবং কোথাও আত্মগোপন করেছে, যে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমরাতো আপনার অবাধ্য নই, দয়া করে আমাদেরকে হত্যা করবেন না। তখন দাকয়ানুস তাদের পিতাদের ছেড়ে দিল এবং যুবকদের অনুসন্ধানে বের হলো। দাকয়ানুস এই তথ্য সম্পর্কে অবগত হলো যে তারা পাহাড়ের কোনো গর্তে আত্মগোপন করেছে। তাই পরদিন নিজের সৈন্যদল নিয়ে তাদের সন্ধানে বের হলো এবং সেই গর্তের কাছে পৌঁছে গেল, যেখানে তারা আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু সেখানে দাকয়ানুস এবং তার সঙ্গীদের মনে এমন ভয়ের সঞ্চার হলো যে, কেউ এ গর্তে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার নেক বান্দাদেরকে নিষ্ঠুর জালেম দাকয়ানুসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হিজরতের রাতে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবূ বকর (রা.)-কে আবূ জেহল ও অন্যান্য মুশরিকদের জুলুম থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেননা দুশমনরা গারে সওরের কাছে এসেছিল। এতদসত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.)-কে দেখতে পায়নি।

যা হোক দাকয়ানুস যখন তাদের সন্ধান পেল না তখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তার অন্তরে এই ইচ্ছা হলো যে, গর্তের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে করে তারা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গর্তের ভিতরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর এ গর্তই তাদের কবরে পরিণত হয়।

দাকয়ানুসের ধারণা ছিল তারা গর্তের ভিতর জাগ্রত আছে আর তাদের গর্তের দ্বার বন্ধ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা অবগত আছে। কিন্তু সে জানতো না যে তারা নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের কুকুরটিও দুয়ারে পড়ে ছিল। দাকয়ানুসের সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি ছিল যারা তাদের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুসলমান। তাদের একজনের নাম ছিল বেদরস। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল রোনাস। তারা দুটি ফলকের মধ্যে এই নওজোয়ানদের নাম এবং বংশ পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখে তামার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে ঐ গর্তে রেখে দেয়। হয়তো আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে কখনও এই নওজোয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো মু'মিন সম্প্রদায়কে অবগত করবেন।

হাফেজ আসকালানী (র.) লিখেছেন, যখন অনেক অনুসন্ধানের পরও আসহাবে কাহফের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন রাজা দাকয়ানুস নিজেই এই আদেশ দিয়েছে যে এদের নাম লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হোক। -[ফতহুল বারী, খ. ৬, পৃ. ৩৬৬]

যাহোক সাতজন যুবক যে গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন, সেখানে একাধারে তিনশত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রইলেন। এই সময়ের মাঝে দাকয়ানুসের মৃত্যু হলো। তার জুলুমের রাজত্ব শেষ হলো। আর একের পর এক রাজা হলো। কিন্তু আসহাবে কাহফ তিনশত নয় বছর যাবত গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করলেন। যখন তাদের জাগ্রত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সে দেশে এমন একজন বাদশাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, যিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, যিনি ইবাদতগুজার, পরহেজগার এবং সুবিচারক ছিলেন। যিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই আসহাবে কাহাফ জাগ্রত হলেন। এই রাজা অত্যন্ত নেককার ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বেদরোস। ৫৮ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। সে যুগে কিয়ামত সম্পর্কে অনেক মতভেদ দেখা দেয়। অনেকে কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে এবং তারা বলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন হবে না। আর কোনো কোনো লোক বলে, কিয়ামত অবশ্যই হবে, তবে আধ্যাত্মিকভাবে হবে, শারীরিকভাবে নয়। রূহগুলো একত্র হবে, দেহগুলো নয়। কেননা মৃত্যুর পর দেহগুলোকে মাটি খেয়ে ফেলে, শুধু রূহ বাকি থাকে। আর কেউ কেউ বলতো, আত্মা এবং দেহ উভয়েরই হাশর হবে।

যেহেতু তখনকার বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত নেককার ঈমানদার, তাই কিয়ামত সম্পর্কে মানুষের এই মতভেদ তাঁর জন্য বড় কষ্টদায়ক হয়। তিনি মানুষকে এ সম্পর্কে উপদেশ দেন। কিন্তু লোকেরা তা মানতে চায় না।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে বেদরুস নিজের ঘরে প্রবেশ করে দুয়ার বন্ধ করে দিলেন এবং রাত দিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্রন্দন করে এই দোয়া করতে লাগলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি মানুষের মতভেদ সম্পর্কে অবগত রয়েছো, তুমি গায়েব থেকে এমন কিছু নিদর্শন প্রেরণ কর, যার দ্বারা সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং বাতিলের বাতুলতা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছেন। ঐ শহরের আলিয়াস নামক এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি ইলহাম করলেন যে, বেদযুস নামক গর্তের উপর যে ইমারত নির্মিত হয়েছে তা ভেঙ্গে তাকে তার বকরি রাখার স্থান করবে। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রমিকরা ঐ ইমারতটি ভাঙ্গতে শুরু করলো। যখন গর্তের মুখের পাথরটি ভেঙ্গে দিল তখন আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফকে জাগ্রত করলেন। তাদের ধারণা হলো তাঁরা কিছুক্ষণ নিদ্রিত হওয়ার পর জাগ্রত হয়েছেন। একদিন বা অর্ধেক দিন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। অথচ তিনশত নয় বৎসরের এই সুদীর্ঘ সময় এরই মধ্যে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। এ সময়ে জালেম নিষ্ঠুর দাকয়ানুস পূর্বেই বিদায় নিয়েছে। তারা জাগ্রত হয়ে নামাজ আরম্ভ করলেন। নামাজের পর তারা ক্ষুধা অনুভব করে তামলীখাকে বললেন, শহরে যাও, আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আন। জালেম দাকয়ানুস এবং শহরবাসীদের অবস্থাও জানার চেষ্টা কর। তামলীখা বললেন, গতকাল শহরে তোমাদের খোঁজ করা হয়েছে। জালেম রাজার ইচ্ছা হলো, তোমাদেরকে পাকড়াও করে মূর্তির সম্মুখে সেজদা করতে বাধ্য করবে, যদি তোমরা তাতে প্রস্তুত না হও তবে তোমাদেরকে হত্যা করবে। তাদের মধ্যে মেকলেমিসা নামক ব্যক্তি বললেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা জান, একদিন অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হাজির হতে হবে, অতএব আল্লাহর এ দুশমনের কথায় তোমরা কুফর ও শিরক করো না। এরপর তামলীখাকে বললেন, তুমি শহরে যাও এবং জানার চেষ্টা কর দাকয়ানুস আমাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খুব সতর্ক হয়ে যাবে আর অতি সত্বর আমাদের নিকট ফিরে আসবে। কেননা, আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত।

তামলীখা তার পোশাক পরিবর্তন করলেন। শ্রমিকদের ন্যায় ময়লা কাপড় পরিধান করলেন। দাকয়ানুসের যুগের কিছু মুদ্রা সংগ্রহ করে শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। যেহেতু মনে দাকয়ানুসের ভয় অত্যন্ত বেশি ছিল সেজন্য অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং ধীর গতিতে অগ্রসর হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, শহরের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ঈমানদার লোকও দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং চিন্তা করলেন যে, হয়তো এটি তারসুস শহর নয়। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন এই শহরটির কি নাম? সে বলল, তারসুস। যাহোক তিনি রুটিওয়ালার দোকানে পৌঁছে

দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা দোকানদারকে দিলেন এবং বললেন, এর বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দাও। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে বিস্মিত হলো এবং অন্য দোকানদারকে দেখিয়ে বলল, এটি তো দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা! পরে দোকানদার বললো, মনে হয় এ লোক মাটির নিচে রক্ষিত মুদ্রা পেয়েছে এবং নিজের রহস্য সে প্রকাশ করতে চায় না। তখন লোকেরা তাকে বলল, তুমি সত্য সত্য বল এই মুদ্রা কোথায় পেয়েছো? হয়তো তুমি মাটির নিচের সম্পদ পেয়ে গেছ। তামলীখা এসব কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হলেন। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হলো। তিনি ধারণা করলেন, হয়তো এরা আমার পরিচয় পেয়ে গেছে এবং সকলে মিলে আমাকে পাকড়াও করে দাকয়ানুসের নিকট নিয়ে যাবে। এরপর শহরে একথা প্রচার হতে লাগল। সকলের মুখে একই কথা যে, এ লোকটি মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদ পেয়েছে। এ কারণে শহরের অনেক লোক তার চারিপার্শ্বে একত্র হলো এবং বলতে লাগল, এই ব্যক্তি অবশ্যই এ শহরের অধিবাসী নয়। কিন্তু তামলীখার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার পিতা ও তার ভাই এই শহরের অধিবাসী। তারা সংবাদ পেলে অবশ্যই আমাকে মুক্ত করবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হলো তারা আসলো না। তখন শহরবাসী তামলীখাকে শহরের দুজন কর্মকর্তার নিকট হাজির করলো। তারা দুজন অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল আরইউস, আর একজনের নাম ছিল তানতিউস। তারা অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই সিদ্ধান্ত করলো যে, এই ব্যক্তিকে বাদশাহর নিকট হাজির করতে হবে। তামলীখা তখন ধারণা করলেন যে, হয়তো তাকে জালেম দাকয়ানুসের নিকট হাজির করা হবে, তাই তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, জালেম দাকয়ানুসের মৃত্যু হয়েছে বহুপূর্বে, তখন তার ভয়-ভীতি দূর হলো এবং ক্রন্দন বন্ধ হলো। এ সময় তিনি তার পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা কয়েকজন যুবক দাকয়ানুসের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলাম এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজ আমি সকলের জন্য খাবার নিতে এসেছি, আমি জমিনের গুপ্তধন পাইনি। এই মুদ্রা আমাকে আমার পিতা দিয়েছিলেন। এই মুদ্রাতে এই শহর অঙ্কিত রয়েছে; এই শহরেই এগুলো তৈরি হয়েছে। অতঃপর তিনি নিজের সাথীদের নাম প্রকাশ করলেন এবং বললেন, যদি আমার কথায় আপনাদের কোনো সন্দেহ থাকে তবে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, ঐ গর্ত খুব দূরেও নয়। তখন তারা সকলেই আসহাবে কাহাফকে স্বচক্ষে দেখার জন্য রওয়ানা হলো।

এদিকে তামলীখার সাথীগণ গর্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। কেননা, খাবার আনয়নে তামলীখার অনেক বিলম্ব হয়েছে। খোদা না করুন, যদি সে ধরা পড়ে যায়, তখন কি হবে? তাই তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি শুরু করলেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন। নামাজের পর একে অন্যকে অসিয়ত করলেন। ঠিক সেই সময় আরইউস ও তার সাথীরা গর্তের সম্মুখে হাজির হলেন। তামলীখা তাদের পূর্বে গর্তে প্রবেশ করলেন এবং সকল অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন তারা জানতে পারলেন যে, তারা তিনশত নয় বৎসর নিদ্রিত ছিলেন। আর তাদেরকে শুধু এজন্য জাগ্রত করা হয়েছে যেন তারা মানুষের জন্য কিয়ামতের একটি নিদর্শন হিসেবে হাজির হয় এবং হাশরের ময়দানে যে প্রত্যেকটি মানুষকে সশরীরে হাজির হতে হবে– এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে তারা লোকালয়ে উপস্থিত হয়। এ সুদীর্ঘ সময় নিদ্রিত থাকার পর জাগ্রত হয়ে লোকালয়ে উপস্থিত হলে লোকেরা কিয়ামত এবং হাশর সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ঈমান আনবে।

যাহোক তামলীখা প্রথমে গর্তে প্রবেশ করে এবং তারপর আরইউস গর্তে প্রবেশ করে। সে সেখানে একটি তামার সিন্দুক দেখতে পেল, যার উপর রূপালী সীলমোহর লাগানো রয়েছে। গর্তের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে আরউইস সে দেশের তদানীন্তন গণ্যমান্য লোকদের ডাকলো এবং সকলের সম্মুখে ঐ সিন্দুকটি খোলার আদেশ দিল। তা থেকে দুটি ফলক বের করা হলো। সীসার ফলকে ঐ যুবকদের নাম, পরিচয় এবং তাদের অন্তর্ধানের কথা লিপিবদ্ধ ছিল। আসহাবে কাহাফের নাম, মেকসালমীনা, মেখ শালমীনা, তামলীখা, মরতুনাস, কাশতুনাস, বেরুনাস তাইমুনাস, লাত বুয়াস, কাবুস, আর কুকুরটির নাম কেতমীর। এই যুবকগণ জালিম রাজা দাকয়ানুসের ভয়ে নিজেদের ঈমান রক্ষার লক্ষ্যে পলায়ন করে এই গর্তে আত্মগোপন করেছে।

যখন জালেম দাকয়ানুস তাদের আত্মগোপনের খবর পায় তখন সেই এই গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। আমরা তাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে দিলাম, যাতে করে পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের সত্যিকারের পরিচয় পায়। এই সীসার ফলকটি পাঠ করার পর তামলীখা বললেন, আমিই তামলীখা এবং এরা আমার সাথী। আরইউস ফলকের লেখা পাঠ করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলেন যে, সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর কাল নিদ্রিত থাকার পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। এজন্য আল্লাহ পাকের দরবারে হামদ ও ছানা পেশ করলেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন সকলকে জীবিত করার নমুনা উপস্থাপিত

করেছেন। নেককার বাদশাহর নিকট এই ঘটনার বিবরণ পেশ করা হলো এবং বেদারুস নামক বাদশাহকে আহ্বান করলো যে, আপনি স্বয়ং এসে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখুন। আপনার শাসনামলেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মুখে হাশরের নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ ঈমানের নূর অর্জন করতে পারে এবং শারীরিকভাবে হাশর হবে একথা বিশ্বাস করে। আর সেই নিদর্শন হলো আল্লাহ পাক কয়েকজন যুবককে সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর যাবত নিদ্রিত রেখেছেন। এরপর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় জাগ্রত করেছেন। ঠিক এভাবে কিয়ামতের দিন রূহ এবং দেহকে একত্র করে উঠানো হবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের এক বিস্ময়কর নমুনা এবং মহিমা প্রকাশ করেছেন, যেন মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে যে কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে সশরীরে হাজির করা হবে।

বাদশাহ বেদরুস এই সংবাদ পাওয়া মাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গর্তে প্রবেশ করে ঐ যুবকদেরকে দেখলেন। আনন্দের অতিশয্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তিনি সেজদারত হলেন। তারপর আসহাবে কাহাফের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। আসহাবে কাহাফ জমিনে বসে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করেছিলেন। বাদশাহ বেদরুসের মোলাকাতের পর তারা বাদশাহকে বললেন, আমরা তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সোপর্দ করি। আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং তোমার রাজত্বের হেফাজত করুন! জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করুন! আর আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। একথা বলে বাদশাহকে তারা বিদায় দিলেন এবং নিজেরা শয়নস্থলে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ তা'আলা সেখানেই তাদেরকে ওফাত দান করলেন। বাদশাহ তাদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং আদেশ দিলেন তাদের প্রত্যেককে স্বর্ণনির্মিত সিন্দুকে রাখা হোক। রাতে বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন– তারা বলছেন, আমরা স্বর্ণ দিয়ে নয়, মাটি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছি; আর মাটির সাথেই মিশে যাব, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে ছিলাম, সেভাবেই আমাদেরকে গর্তের ভিতর মাটিতে রেখে দাও যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পুনরুত্থান করান। বাদশাহ এবং তার সঙ্গীরা যখন গর্ত থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তারা এত ভীত হলেন যে, দ্বিতীয়বার তাতে প্রবেশ করার সাহস আর তাদের হলো না। বাদশাহ গর্তের মুখে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুররআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৩৯০-৩৯৬, মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৩৬-২৩৭, ইবনে কাসীর পারা-১৫ পৃ. ৮৪-৮৬, রূহুল মা'আনী পারা– ১৫, পৃ. ২১৬ - ২১৭, কুরতুবী খ. ১০, পৃ. ৩৫৭]

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রিস্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহাফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবূ কালাম আজাদ আয়লার [আকাবা] নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্টাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লিখেন– 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭ এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে সেটা জর্দান নদী ও লুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর।

–[এনসাইক্লো পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬ সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৬৫৮]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরস্কের ইজমীর [স্মার্ণা] শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র.)-ও 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরোনো নাম রকীম ছিল। মাওলানা হিফজুর রহমান (র.) 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থে একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাওরাতও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন। –[দায়েরাতুল মাআরিফ, আরব থেকে গৃহীত]

জর্দানে আম্মানের নিটকবর্তী এক মাশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দুটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীর ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহাফের গুহাটি অবস্থিত।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহাফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লিখেন, যে অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রিস্টাব্দ। এরপর তিনশ বছর পর্যন্ত তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহাফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তাফসীরে হক্কানীতেও তাদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তুরতুস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য প্রাচীন তাফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হলো। আমি পূর্বেই আরজ করেছিলাম যে, কুরআনের কোনো আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কুরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোনো জরুরি অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরও কোনোরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়; কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হলো। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তুরতুস শহরের নিকট ঘটেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ সত্য এই যে, এসব গবেষণার পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান নির্ধারণের না কোনো প্রয়োজন আছে এবং না কোনো নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব। তাফসীরবিদ আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ কথাই বলেছেন–

قَدْ اَخْبَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِذٰلِكَ وَاَرَادَ مِنَّا فَهْمَهٗ وَتَدَبُّرَهٗ وَلَمْ يُخْبِرْنَا بِمَكَانِ هٰذَا الْكَهْفِ فِىْ اَىِّ الْبِلَادِ مِنَ الْاَرْضِ اِذْ لَا فَائِدَةَ لَنَا فِيْهِ وَلَا قَصْدَ شَرْعِىٍّ .

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহাফের কুরআনে বর্ণিত অবস্থাসমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, গুহাটি কোন জায়গায় এবং কোন শহরে অবস্থিত। কারণ, এর মধ্যে আমাদের কোনো উপকার নিহিত নেই এবং শরিয়তের কোনো উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

–[ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৭৫]

আসহাবে কাহাফ এখনো জীবিত আছেন কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাকে কাহাফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহাফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশহার জন্য দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন–

قَالَ قَتَادَةُ غَزَا اِبْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَمَرُّوْا بِكَهْفٍ فِىْ بِلَادِ الرُّوْمِ فَرَأَوْا فِيْهِ عِظَامًا فَقَالَ قَائِلٌ هٰذِهٖ عِظَامُ اَهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ بَلِيَتْ عِظَامُهُمْ مِنْ اَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِ مِاَةِ سَنَةٍ

অর্থাৎ, হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল, এগুলো আসহাবে কাহাফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তাদের হাড় তো তিনশত বছর পূর্বে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কুরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কুরআনের কোনো আয়াত বুঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোনো অকাট্য ফায়সালা করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কুরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হবে।

ফায়দা : আসহাবে কাহাফের ঘটনা অসংখ্য হওয়ার কারণে أَصْحَابُ كَهْفٍ-এর পরে اَلرَّقِيْمِ-কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. যাহহাক (র.) বলেন, রোমের এক শহরে একটি গুহা আছে যাতে ২১ জন মানুষ শায়িত। মনে হয় যেন তারা শুয়ে রয়েছেন।

২. ইবনে আতিয়া (র.) শাম দেশের একটি গুহার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে কিছু মরা লাশ রয়েছে এবং সেই গুহার নিকট একটি মসজিদও রয়েছে।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে আকাবা উপকূলের নিকট ফিলিস্তীনের নিম্নাঞ্চল ঈলা এর নিকটবর্তী একটি গুহা রয়েছে।

৪. আফসূস শহরের একটি ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। যার ইসলামি নাম হলো তুরতুস। এই শহর এশিয়া মাইনরের -এর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

মোটকথা দীন ও ঈমানের সংরক্ষণে গুহায় আশ্রয় নেওয়ার অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে সকল ঘটনাবলি হতে পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যাদের নাম ও অবস্থা সীসার ফলকে খোদাই করে শাহী ধনাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। যেহেতু এই যুবকবৃন্দ উচ্চ বংশের মধ্যমণি ছিলেন তাই তাদের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া তাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, বংশধর এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রের জন্যও দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার কারণ ছিল। এই কতিপয় যুবক কালের প্রথা ডিঙ্গিয়ে ক্ষমতাধর কাফেরের জুলুম নিপীড়ন থেকে পলায়ন করে দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য শহর তথা লোকালয় হতে বেরিয়ে গহীন অরণ্যের একটি অন্ধকার গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তথায় বসে তারা ভঙ্গুর হৃদয় নিয়ে কায়মনো বাক্যে দরবারে ইলাহীতে ফরিয়াদ জানালেন−

প্রভু হে! আমাদেরকে অনুগ্রহ কর, দয়া কর, রহম কর, আমাদের ঈমান সংরক্ষণের ব্যবস্থা কর! আমাদেরকে সাহায্য কর! তোমার সহায়তা বিনে দীনে ইলাহীতে দৃঢ়পদ থাকা সম্ভব নয়। ওগো দয়াময়! চতুর্দিকে বিরোধিতার জাল ছেয়ে গেছে। আমাদের ঈমান হরণের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা, অন্যথায় হত্যার হুমকি ধমকি দিচ্ছে, আমাদেরকে হত্যার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। অন্যায় তো শুধু একটিই, আমরা তোমাকে এক বলে বিশ্বাস করি, তোমার বিধান মতে জীবন গড়ি। ওগো আল্লাহ! আমরা আমাদের জীবন প্রদীপের জন্য চিন্তা করি না, শুধু ভাবি দীন থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

আল্লাহ তা'আলা এই মজলুম যুবকবৃন্দের দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের ও তাদের প্রাণপ্রিয় দীনের হেফাজতের উত্তম ব্যবস্থা করে দিলেন। −[জামালাইন, খ. ৪ পৃ. ২৮-২৯]

অনুবাদ :

١٣. نَحْنُ نَقُصُّ نَقْرَأُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ط بِالصِّدْقِ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى .

১৩. আমি আপনার কাছে তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে সত্য সহকারে বর্ণনা করছি, তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।

١٤. وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ قَوَّيْنَاهَا عَلٰى قَوْلِ الْحَقِّ اِذْ قَامُوْا بَيْنَ يَدَىْ مَلِكِهِمْ وَقَدْ اَمَرَهُمْ بِالسُّجُوْدِ لِلْاَصْنَامِ . فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ اِلٰهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا . اَىْ قَوْلًا ذَا شَطَطٍ اَىْ اِفْرَاطٍ فِى الْكُفْرَانِ دَعَوْنَا اِلٰهًا غَيْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَرْضًا .

১৪. আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিলাম অর্থাৎ সত্য কথা বলার জন্য তাদের অন্তর শক্তিশালী করেছিলাম। তারা যখন উঠে দাঁড়াল তাদের রাজার সামনে অথচ রাজা তাদেরকে মূর্তির সামনে সিজদা করতে বলেছিল। তখন তারা বললেন, আমাদের প্রতিপালক হলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। আমরা কখনোই তার পরিবর্তে অন্য কোনো ইলাহকে আহ্বান করব না। যদি করে বসি, তবে তা অতিশয় গর্হিত হবে। অর্থাৎ ধরে নিলাম যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ ডেকেই বসি তাহলে আমরা কুফরিতে সীমালঙ্ঘনকারী রূপে সাব্যস্ত হবো।

١٥. هٰؤُلَاۤءِ مُبْتَدَأٌ قَوْمُنَا عَطْفُ بَيَانٍ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ط لَوْلَا هَلَّا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ عَلٰى عِبَادَتِهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ بِحُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ فَمَنْ اَظْلَمُ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا . بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ اِلَيْهِ تَعَالٰى .

১৫. এরাই আমাদের স্বজাতি। هٰؤُلَاۤءِ শব্দটি مُبْتَدَأٌ আর قَوْمُنَا হলো عَطْفُ بَيَانٍ এরা আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। কেন তারা উপস্থিত করে না তাদের সম্বন্ধে তাদের উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ প্রকাশ্য দলিল। কে তার অপেক্ষা অধিক জালিম অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম আর কেউ নয়, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাঁর প্রতি অংশীদার সাব্যস্ত করে।

١٦. قَالَ بَعْضُ الْفِتْيَةِ لِبَعْضٍ . وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَأْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا . بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَبِالْعَكْسِ مَا تَرْتَفِقُوْنَ بِهٖ مِنْ غَدَاءٍ وَعَشَاءٍ .

১৬. যুবকরা পরস্পর একজন অন্যজনকে বলল, তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ কর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। مِرْفَقًا শব্দটি مِيْم হরফে যের এবং فَاء হরফে যবর দিয়ে এবং তার উল্টোভাবেও পঠিত। مَرْفِقْ অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যার ঐ খাবার যা দ্বারা তোমরা উপকৃত হবে।

অনুবাদ :

১৭. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّاوَرُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ تَمِيْلُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ نَاحِيَتَهُ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تَتْرُكُهُمْ وَتَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ فَلَا تُصِيْبُهُمْ اَلْبَتَّةَ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِنْهُ . مُتَّسِعٌ مِنَ الْكَهْفِ يَنَالُهُمْ بَرْدُ الرِّيْحِ وَنَسِيْمُهَا ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ دَلَائِلِ قُدْرَتِهٖ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا .

১৭. আর তুমি দেখতে পাবে সূর্য উদয়কালে তাদের গুহায় ডান পার্শ্বে হেলে যায় تَزَّاوَرُ শব্দটির زَاءْ বর্ণটি তাশদীদ যুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত। এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়ে। অর্থাৎ তাদেরকে রেখে ঝুঁকে অতিক্রম করে চলে যায়। যার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের উপর রৌদ্র পড়ে না। তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত প্রশস্ত জায়গায়। যেখানে তাদের শীতল বাতাস এবং পূবালী সমীরণ পৌঁছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। অর্থাৎ, তাঁর কুদরতের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার কোনো পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِتْيَةٌ : فِتْيَةٌ শব্দটি فَتًى-এর বহুবচন। যেমন صِبْيَةٌ শব্দটি صَبِيٌّ-এর বহুবচন। অর্থ– যুবক, নওজোয়ান।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : এটা مُتَلَبِّسًا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে হয়তো نَقُصُّ-এর فَاعِلٌ থেকে حَالٌ হবে অথবা نَبَأَ-এর মাফঊল থেকে حَالٌ হবে।

قَوْلُهُ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ : এ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ : বাক্যটি জুমলা হয়ে فِتْيَةٌ-এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبَطْنَا : শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে মাযীর সীগাহ। মাসদার اَلرَّبْطُ অর্থ হলো– বাঁধা, শক্তিশালী করা।

قَوْلُهُ لَنْ نَّدْعُوَا : এটি نَفْىْ تَاكِيْد بِلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبَلْ-এর جَمْعُ مُتَكَلِّمٌ-এর সীগাহ, এর শেষের واو টি হলো لَامْ كَلِمَةْ ; এটা বহুবচনের وَاوْ নয়। তবে বহুবচনের وَاوْ-এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে এর শেষে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে লেখা হয়েছে। অর্থ– কখনো আহ্বান করবে না।

قَوْلُهُ شَطَطًا : এটা بَابُ نَصَرَ وَضَرَبَ-এর মাসদার। অর্থ হলো– সীমাতিক্রম করা। সত্য হতে দূরে অবস্থান করা।

رَبَطْنَا إِذْ قَامُوْا হলো رَبَطْنَا-এর ظَرْف আর فَاْ-এর فَاءْ টি جَزَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ قَوْلًا ذَا شَطَطٍ : এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَطَطًا শব্দটি মুজাফ উহ্য থেকে মাসদার হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর তার মওসূফ قَوْلًا উহ্য রয়েছে। আর যদি ذَا-কে উহ্য না মানা হয় তবে মাসদারের حَمْل মুবালাগার ভিত্তিতে হবে। যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ-এর মধ্যে হয়েছে।

قَوْلُهُ فَرْضًا : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা তো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। না জ্ঞানের দিক থেকে, না শরিয়তের দিক থেকে, না চারিত্রিকভাবে। এরপরেও যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ এরূপ করল তবে সে নিশ্চিতভাবেই মারাত্মক গর্হিত কাজ করল।

قَوْلُهُ هٰؤُلَاءِ : এখানে هٰؤُلَاءِ শব্দটি مُبْتَدَأْ আর اِتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হলো তার خَبَر

قَوْلُهُ قَوْمُنَا : قَوْمُنَا শব্দটি هٰؤُلَاءِ হতে আতফে বয়ান হয়েছে। আবার এটা بَدْل -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ تَزَاوَرُ : এ শব্দটি মূলত تَتَزَاوَرُ ছিল। একটি تَاءْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে تَزَاوَرُ হয়েছে। আর শব্দটিকে যদি تَزَاوَرُ তথা زَاءْ তাশদীদযুক্ত ধরা হয়, তবে এক تَاءْ -কে زَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করে زَاءْ -কে زَاءْ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। ফলে تَزَّاوَرُ হয়েছে। অর্থ- মানুষের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করা। আর যদি এর صِلَةْ টা عَنْ আসে তখন অর্থ হবে মুখ ফিরানো। একে অপরকে পরিত্যাগ করা।

قَوْلُهُ تَقْرِضُهُمْ : এটা مُضَارِعْ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ- কর্তন করা। কাটা। টুকরা করা।

قَوْلُهُ ذَاتَ : এটা ذُوْ -এর স্ত্রী লিঙ্গ। আয়াতে ذَاتَ শব্দটি অতিরিক্ত হয়েছে। যাকে বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আনা হয়েছে। আর ذَاتَ الْيَمِيْنِ এবং ذَاتَ الشِّمَالِ শব্দদ্বয় تَزَاوَرُ -এর যরফে মাকান হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاحِيَتَهُ : তাফসীরে نَاحِيَةْ বৃদ্ধি করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, ذَاتَ الْيَمِيْنِ এবং ذَاتَ الشِّمَالِ শব্দদ্বয় ظَرْفُ مَكَانْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ فِىْ فَجْوَةٍ : এটা হলো جُمْلَةْ حَالِيَةْ

قَوْلُهُ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ : এ বাক্যটি ঘটনা বর্ণনার মাঝে একটি جُمْلَةْ مُعْتَرِضَةْ হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, যাতে করে যারা সত্য সাধনায় রত, যারা ধৈর্য, সহনশীলতা এবং সৎকাজের দৃঢ়তা অর্জন করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাহায্য কামনা করে তাদের জন্য এই ঘটনাটি হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়।

قَوْلُهُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ : তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ বাক্যটি এ জন্য ইরশাদ করেছেন যে, আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়। এর মধ্যে অনেক অসত্য কথাও অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ঘটনা বর্ণনার পূর্বাহ্নেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, হে রাসূল! আমি আপনার নিকট এই ঘটনার সঠিক বিবরণ পেশ করছি। আসহাবে কাহাফ হলেন কয়েকজন নওজোয়ান। তারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল, অথচ তাদের সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ মূর্তিপূজক। তারা শিরক, কুফর, মূর্তি পূজা বা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল এবং তারা অন্যদেরকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করতো।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ : فَتًى -এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ- যুবক। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুবক।

-[ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়ান]

قَوْلُهُ وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ : ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা যখন হয়েছে, তখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে আপন মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবিলায় হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করে না, ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য কোনো কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَأْوُوْا اِلَى الْكَهْفِ : ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গাম্বরের সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যায়।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

فَأْوُوْا اِلَى الْكَهْفِ : আয়াতাংশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের প্রেমাস্পদের সাথে একাকিত্ব গ্রহণ কর, তবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতের ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিবেন। কতিপয় বুজুর্গ বলেন, গায়রুল্লাহ হতে দূরে সরে নির্জনতা ও একাকিত্ব গ্রহণই হলো রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ وَتَرَى الشَّمْسَ الخ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলোর সাথে আঁধারের সংমিশ্রণের উপকারিতা হলো এই যে অতিরিক্ত আলোর কারণে একাগ্রতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কেননা, অন্ধকার থেকে সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে সাহায্য পাওয়া যায়। এ কারণেই তো ধ্যান করার জন্য ক্ষীণ আলোকময় স্থানকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। তদুপরি চোখ বন্ধ করেই ধ্যানমগ্ন হতে হয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ الخ : এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে যোগ্যতাই নেই তার সংশোধন করা খুবই কঠিন। এমনকি এটা অসম্ভবও বটে।

অনুবাদ :

١٨. وَتَحْسَبُهُمْ لَوْ رَأَيْتَهُمْ أَيْقَاظًا أَيْ مُنْتَبِهِيْنَ لِأَنَّ أَعْيُنَهُمْ مُفَتَّحَةٌ جَمْعُ يَقِظٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَّهُمْ رُقُوْدٌ نِيَامٌ جَمْعُ رَاقِدٍ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ق لِئَلَّا تَأْكُلَ الْأَرْضُ لُحُوْمَهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ يَدَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ط بِفِنَاءِ الْكَهْفِ وَكَانُوْا إِذَا انْقَلَبُوْا انْقَلَبَ وَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْهُمْ رُعْبًا - بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا مَنَعَهُمُ اللّٰهُ بِالرُّعْبِ مِنْ دُخُوْلِ أَحَدٍ عَلَيْهِمْ -

১৮. যদি আপনি তাদেরকে দেখতেন তাহলে আপনি মনে করতেন তারা জাগ্রত অর্থাৎ জাগ্রত মনে করতেন এজন্য যে, তাদের চোখ উন্মুক্ত। أَيْقَاظًا শব্দটি يَقِظٌ-এর বহুবচন। অথচ তারা নিদ্রিত رُقُوْدٌ শব্দটি رَاقِدٌ-এর বহুবচন। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করতাম ডান দিকে ও বাম দিকে যাতে জমিন তাদের শরীরের গোশত খেয়ে না ফেলে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে গুহার আঙ্গিনায়। আর গুহার অধিবাসীরা যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করে তথা শয়ন ও জাগরণের ক্ষেত্রে কুকুরটির অবস্থানও তাদের মতোই। আপনি উকি দিয়ে তাদেরকে দেখলে পিছন ফিরে পলায়ন করতেন ও তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তেন لَمُلِئْتَ শব্দটির لَامْ বর্ণটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। رُعْبًا শব্দের ع বর্ণটিতে সুকূন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ভীতির সৃষ্টি করে লোকজনকে তাদের কাছে যেতে বারণ করেছেন।

١٩. وَكَذٰلِكَ كَمَا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا ذَكَرْنَا بَعَثْنٰهُمْ - أَيْقَظْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ط عَنْ حَالِهِمْ وَمُدَّةِ لُبْثِهِمْ - قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا الْكَهْفَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَبُعِثُوْا عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَظَنُّوْا أَنَّهُ غُرُوْبُ يَوْمِ الدُّخُوْلِ ثُمَّ قَالُوْا مُتَوَقِّفِيْنَ فِيْ ذٰلِكَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ز فَابْعَثُوْا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ بِسُكُوْنِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا بِفِضَّتِكُمْ هٰذِهٖ إِلَى الْمَدِيْنَةِ -

১৯. এভাবেই যেমনিভাবে আমি আসহাবে কাহাফের উপরে বর্ণিত আচরণ করেছি। আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম। যাতে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান কাল সম্পর্কে। তাদের একজন বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল, আমরা একদিন বা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা গুহায় সূর্য উদিত হওয়ার সময় প্রবেশ করেছিল এবং সূর্যাস্তের সময় জাগ্রত হয়েছিল তাই তারা মনে করল এটা গুহায় প্রবেশের দিনেরই সূর্যাস্ত। কেউ কেউ ক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা করে বলল, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই ভালো জানেন। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর। بِوَرِقِكُمْ শব্দের رَاءٌ বর্ণে সুকূন ও কাসরা উভয়রূপে পঠিত রয়েছে।

يُقَالُ اِنَّهَا الْمُسَمَّاةُ الْاٰنَ طَرَطُوْسُ بِفَتْحِ الرَّاءِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا اَيْ اَطْعِمَةِ الْمَدِيْنَةِ اَحَلُّ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ـ

অনুবাদ :
কথিত আছে যে, বর্তমানে সে শহরটিকে তারাতুস বলা হয়। طَرَطُوْس -এর رَاء বর্ণে যবর হবে। সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম অর্থাৎ সে শহরের কোন খাদ্যটি হালাল এবং তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে। আর সে যেন বিচক্ষণতার সাথে এ কাজ সম্পাদন করে। এবং কিছুতেই যেন তোমাদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু জানতে না দেয়।

২০. اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا يَطَّلِعُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ يَقْتُلُوْكُمْ بِالرَّجْمِ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْآ اِذًا اَيْ اِنْ عُدْتُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ اَبَدًا ـ

২০. তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জানতে পারে অবগত হতে পারে তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনো সাফল্য লাভ করবে না। অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের ধর্মে ফিরে যাও তবে তোমরা কিছুতেই সফল হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْوَصِيْدِ : اَلْوَصِيْدُ -এর অর্থ ফটকদ্বার। চৌকাঠ। দেউড়ি। প্রবেশদ্বার। গ্রন্থকার এখানে অর্থ নিয়েছেন প্রশস্ত জায়গা, আঙ্গিনা।

قَوْلُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ : এটা حِكَايَت حَال مَاضِيَة কেননা ইসমে ফায়েল যদি মাযীর অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমল করা থেকে বিরত থাকে।

قَوْلُهُ بِالْوَصِيْدِ : এটা بَاسِطٌ-এর সাথে مُتَعَلِّق এবং ذِرَاعَيْه হলো بَاسِطٌ-এর মাফউলে বিহী।

قَوْلُهُ فِرَارًا : এটা وَلَّيْتَ ফেলের مَفْعُوْل بِغَيْرِ لَفْظِه আবার এটা وَلَّيْتَ থেকে حَال -ও হতে পারে আবার مَفْعُوْل -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ رُعْبًا : অর্থ হলো خَوْفًا এটা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এরপর এটা وَلَّيْتَ-এর مَفْعُوْل ثَانِيْ হয়েছে। আর كَمَا فَعَلْنَا -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَذَالِكَ-এর مَرْجِع -কে প্রকাশ করে দেওয়া।

قَوْلُهُ بَعَثْنَا : بَعَثْنَا-এর তাফসীর اَيْقَظْنَا দ্বারা করা হয়েছে অর্থকে নির্দিষ্ট করার জন্য। কেননা بَعَثْنَا ফেয়েলটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ্রত হওয়া।

قَوْلُهُ لِيَتَسَاءَلُوْا : এর মধ্যে لَامْ টি عَاقِبَة বা سَبَبِيَّة -এর জন্য হয়েছে। كَمْ টি ظَرْفِيَّتْ -এর কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। এর مُمَيَّزْ টা উহ্য রয়েছে। মূলত তা এরূপ ছিল যে- كَمْ مُدَّةً لَبِثْتُمْ

قَوْلُهُ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ : এটা لِيَتَسَاءَلُوْا-এর بَيَانْ হয়েছে। আর اَزْكٰى হলো তার খবর।

قَوْلُهُ طَعَامًا : طَعَامًا হলো تَمْيِيْز মুযাফ ইলাইহি হতে مَنْقُوْل অর্থাৎ اَزْكَى الطَّعَامِ এরপর এটা জুমলা হয়ে يَنْظُرْ-এর مَفْعُوْل بِه হয়েছে। اَيُّهَا-এর যমীরের مَرْجِع হলো اَلْاَطْعِمَةُ যা পরস্পর কথোপকথনের সময় مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ হয়ে থাকে।

অন্যভাবে তারকীব এভাবে যে, اَيُّهَا-এর هَاء যমীরের مَرْجِعْ হবে مَدِيْنَة তখন মূল ইবারত এরূপ হবে যে- اَىُّ اَهْلِهَا اَطْيَبُ طَعَامًا অর্থাৎ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি খাবার দাবারের ব্যাপারে পবিত্র ও নিষ্কলুষ।

قَوْلُهٗ اِذًا : اِذًا -এর পরে اِنْ عُدْتُمْ এনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِذًا হলো مُتَضَمِّنٌ بِمَعْنٰى شَرْطٍ আর لَنْ تُفْلِحُوْا হলো তার জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আসহাবে কাহাফের কুকুর : আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফের হেফাজতের প্রকাশ্য ব্যবস্থা হিসেবে ঐ গর্তের বাইরে একটি কুকুরও মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এই পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, কুকুরটিকে চৌকাঠে রাখার কারণ হলো এই, যে গৃহে কুকুর বা ছবি বা নাপাক ব্যক্তি বা কাফের থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি : বস্তুত সংসর্গ এক বিস্ময়কর বিষয়, যদি ভালো লোকেরা সংসর্গ কেউ অর্জন করে তবে সে আরো ভালো হয় আর মন্দ লোকেরা সংসর্গে ভালো মানুষও মন্দ হয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো এই আসহাবে কাহাফের ন্যায় নেককার লোকদের সংসর্গে থাকার কারণে তাদের কুকুরটি এত গুরুত্ব পেয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ হয়েছে। এই কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর।

বর্ণিত আছে যে, আসহাবে কাহফের একজনেরই ছিল এই কুকুরটি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে এটি ছিল দাকয়ানুস রাজার বাবুর্চির কুকুর। সে আসহাবে কাহাফের সাথী হয়ে হিজরত করেছিল। কিতমীর নামক এই কুকুরটি বেহেশতে যাবে বলে বর্ণিত আছে। এজন্য শায়খ সাদী (র.) বলেছেন-

پسر نوح بابدان نشست * خاندان نبوتش گم شد .

سگ اصحاب کهف روزے چند * پئے نیکان گرفت مردم شد .

হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সঙ্গদোষে নবুয়ত হারালো, আর আসহাবে কাহাফের কুকুর কয়েকদিন নেককার লোকদের সঙ্গে থাকার কারণে মানুষ হয়ে গেল।

মুজাহিদ (র.) ও যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতের اَلْوَصِيْدِ শব্দটির অনুবাদ করেছেন গর্তের আঙ্গিনা। আর তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো চৌকাঠ। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, এই শব্দটির অর্থ হলো দুয়ার। ইকরামার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিলো; কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, এটি কুকুর ছিল না; বরং এটি ছিল বাঘ। কেননা সকল চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেই আরবি ভাষায় "কালব শব্দটি ব্যবহৃত হয়।" লাহাবের পুত্র উৎবার জন্যে বদদোয়া করে ইরশাদ করেছেন, হে আল্লাহ নিজের কোনো কালবকে [কুকুরকে] তার উপর চড়াও করে দাও [এই বদদোয়া কবুল হয়েছে] এবং উতবাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলেছিল। এ মতপোষণ করেছেন ইবনে জুরাইজ (র.)। তবে প্রথম অভিমত তথা আসহাবে কাহাফের কুকুর কুকুরই ছিল এ মতই সর্বজনবিদিত।

-[তাফসীরে রূহুল মাআনী, খ. ১৫, পৃ. ২২৫]

মুকাতেল (র.) বলেছেন, কুকুরটির বর্ণ ছিল হলুদ, আর কুরতুবী (র.) বলেছেন, তার বর্ণ ছিল লাল মিশ্রিত হলুদ। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তার বর্ণ ছিল পাথরের।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে কুকুরটির নাম ছিল কিতমীর। আর হযরত আলী (রা.)-এর মতে তার নাম ছিল রিয়ান। আর আওযায়ী (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল তাকুর। কাব (র.) বলেছেন, তার নাম ছিল 'সাহবা'।

খালেদ ইবনে মিদান বলেছেন, আসহাবে কাহাফের কুকুর এবং বালম ইবনে বাউরের গাধা ব্যতীত কোনো চতুষ্পদ জন্তু জান্নাতে যাবে না। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হিফাজতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু' কিরাত হ্রাস পায়। [কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এর রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের বিধান ব্যতিক্রম বলে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের হিফাজতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার ভক্ত আসহাবে কাহাফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরিয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবত খ্রিস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাজতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন ককুরও তাদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎসঙ্গের বরকত কুকরের সম্মানও বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়া বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরিতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফজল জওহারীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন– যে ব্যক্তি সৎলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের নেকীর অংশ সেও পাবে। দেখ, আসহাবে কাহাফের কুকুর তাদেরকে ভালোবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে আতিয়ার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সৎসঙ্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তাওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালোবাসে তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মনেপ্রাণে ভালোবাসে।

সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজদি থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ [যে তা আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ]? এ কথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলো। অতঃপর সে বলল, আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামাজ, রোজা ও দান খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তাই হয় তবে [শুনে নাও] তুমি [কিয়ামতে] তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাস। হযরত আনাস (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে একথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চেয়ে বেশি আনন্দিত কোনো সময় হইনি। এরপর হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন, [আলহামদুলিল্লাহ] আমি আল্লাহকে, তার রাসূল ﷺ -কে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে ভালোবাসি। এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব। –[কুরতুবী]

আসহাবে কাহাফের ভীতিপ্রদ অবস্থা : আসহাবে কাহাফকে আল্লাহ তা'আলা এত ভীতিপ্রদ অবস্থা দান করেছিলেন যে, যে দেখত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না। لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ আয়াতে বাহ্যত সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই এটা জরুরি নয় যে, আসহাবে কাহাফের ভয়ভীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আয়াতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উকি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে।

এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কুরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এই যে, তাদের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রোদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপ দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কারামত হিসেবে আলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভব। কুরআন ও হাদীস যখন এর কোনো বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নিরর্থক।

তাফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমরা রোমকদের মোকাবিলায় হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে এক জিহাদে শরিক হয়েছিলাম, যা 'গজওয়াতুল মুযীফ' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া (রা.) আসহাবে কাহাফকে জানা ও দেখার জন্য গুহায় যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস নিষেধ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার চেয়েও বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি لَوِ اطَّلَعْتَ আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত কবুল করলেন না। [সম্ভবত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কুরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কাহাফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহুদিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ভীষণ উত্তপ্ত হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। -[তাফসীরে মাযহারী]

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ الخ : তারা এতো গভীর ঘুমে ছিলেন যে, তারা কতকাল ঘুমিয়েছিলেন তাও অনুভব করতে পারছিলেন না। জাগ্রত হওয়া পর একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, কতকাল ঘুমিয়েছ? সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনুমান করে নিদ্রিত সময়ের কথা বলতে লাগলেন। তখন তাদের একজন বললেন যে, এ ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত করে এসো কাজের কথা বলি।

قَوْلُهُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ : হতে পারে এটা সামান্য সময়ের প্রতি ইঙ্গিত। ফুকাহায়ে কেরাম তাদের ধারণাপ্রসূত কথা যাতে পবিত্র কুরআনে তাদেরকে কোনোরূপ দোষারোপ করা হয়নি" থেকে এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কেউ যদি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলে ফেলেন যা বাস্তবের অনুকূলে হয় না তবে এ কারণে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না।

قَوْلُهُ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ : এখানে টাকা দ্বারা সে মুদ্রাই উদ্দেশ্য যা দাকয়ানুসের যুগে সে দেশে প্রচলিত ছিল। তার সেই মুদ্রায় রোম সম্রাটের ছবি খোদাইকৃত ছিল। সে কালের কিছু মুদ্রা তাদের পকেটে ছিল।

قَالَ الْمُفَسِّرُوْنَ كَانَتْ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ عَلَيْهَا صُوْرَةُ الْمَلِكِ كَانَ فِىْ زَمَانِهِمْ ـ (كَبِيْر)

মুহাক্কিকগণ/সূক্ষ্মদর্শীগণ এখান থেকে এই মাসআলা বের করেছেন যে, সফরকালে সফরের পাথেয় সাথে নিয়ে ভ্রমণ করাটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়।

وَحَمْلُهُمُ الْوَرَقَ عِنْدَ فِرَارِهِمْ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ حَمْلَ النَّفَقَةِ وَمَا يَصْلُحُ لِلْمُسَافِرِ هُوَ رَاْىُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَى اللّٰهِ دُوْنَ الْمُتَّكِلِيْنَ عَلَى الْاِنْفَاقَاتِ ـ (مَدَارِكٌ)

তাফসীরে বায়যাবীতে আছে- وَحَمْلُهُمْ لَهٗ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّ التَّزَوُّدَ رَاْىُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

ফুকাহায়ে কেরাম এখান থেকে আরেকটি মাসআলা বের করেছেন যে, কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত পূজি থেকে খাবার ক্রয় করে সকলেই একত্রে আহার করলে যদিও তাতে কম বেশি হয়ে থাকে তা জায়েজ।

يَدُلُّ عَلٰى جَوَازِ خَلْطِ دَرَاهِمِ الْجَمَاعَةِ وَالشِّرٰى بِهَا وَالْاَكْلُ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِىْ بَيْنَهُمْ بِالشَّرِكَةِ وَاِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ قَدْ يَاْكُلُ اَكْثَرَ مِمَّا يَاْكُلُ غَيْرُهٗ وَهٰذَا الَّذِىْ يُسَمِّيْهِ النَّاسُ الْمُنَاهَدَةَ وَيَفْعَلُوْنَهٗ فِى الْاَسْفَارِ ـ (جَصَّاص)

-[তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৬৩১]

অনুবাদ :

২১. وَكَذَٰلِكَ كَمَا بَعَثْنَاهُمْ أَعْثَرْنَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِمْ قَوْمَهُمْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ لِيَعْلَمُوْآ أَيْ قَوْمُهُمْ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ بِطَرِيْقِ أَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى إِنَامَتِهِمُ الْمُدَّةَ الطَّوِيْلَةَ وَإِبْقَائِهِمْ عَلٰى حَالِهِمْ بِلَا غِذَاءٍ قَادِرٌ عَلٰى إِحْيَاءِ الْمَوْتٰى وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا ج إِذْ مَعْمُوْلٌ لِأَعْثَرْنَا يَتَنَازَعُوْنَ أَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكُفَّارُ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ أَمْرَ الْفِتْيَةِ فِي الْبِنَاءِ حَوْلَهُمْ فَقَالُوْا أَيِ الْكُفَّارُ ابْنُوْا عَلَيْهِمْ أَيْ حَوْلَهُمْ بُنْيَانًا يَسْتُرُهُمْ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى أَمْرِهِمْ أَمْرِ الْفِتْيَةِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ حَوْلَهُمْ مَّسْجِدًا ـ يُصَلّٰى فِيْهِ وَفُعِلَ ذٰلِكَ عَلٰى بَابِ الْكَهْفِ ـ

২১. এভাবে যেমনিভাবে তাদেরকে জাগিয়েছি আমি জানিয়ে দিলাম অবগত করলাম তাদের বিষয় তাদের সম্প্রদায় ও ঈমানদারগণের অবস্থা যাতে তারা সম্প্রদায়ের লোকেরা জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য। কেননা যে সত্তা এত দীর্ঘ সময় ঘুমন্ত রাখতে সক্ষম এবং পানাহার ব্যতিরেকে স্বীয় অবস্থায় স্থির রাখতে পারেন অবশ্যই তিনি মৃতদেরকেও জীবন দান করতে সক্ষম। নিশ্চয় কিয়ামতের ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন إِذْ এটা أَعْثَرْنَا -এর مَعْمُوْلٌ তারা মু'মিন ও কাফেররা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতেছিল তাদের কর্তব্য বিষয়ে ঐ যুবকদের স্মরণে এখানে ইমারত নির্মাণের ব্যাপারে তখন তারা কাফেররা বলল, তাদের উপর গর্তের উপর নির্মাণ কর সৌধ যা তাদেরকে ছায়া দিবে। তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বন্ধে ভালো জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো তারা বলল যুবকদের ব্যাপারে। তারা হলো মু'মিনগণ। আমরা তো নিশ্চয় তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করব যেখানে নামাজ পড়া হবে। সে মতে গুহার প্রবেশ পথে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

২২. سَيَقُوْلُوْنَ أَيِ الْمُتَنَازِعُوْنَ فِيْ عَدَدِ الْفِتْيَةِ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ هُمْ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ج وَيَقُوْلُوْنَ أَيْ بَعْضُهُمْ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وَالْقَوْلَانِ لِنَصَارٰى نَجْرَانَ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ج أَيْ ظَنًّا فِي الْغَيْبَةِ عَنْهُمْ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَنَصَبُهُ عَلَى الْمَفْعُوْلِ لَهُ أَيْ لِظَنِّهِمْ ذٰلِكَ وَيَقُوْلُوْنَ أَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ـ

২২. কেউ কেউ বলবে মহানবী ﷺ -এর যুগে আসহাবে কাহাফের সংখ্যার ব্যাপারে বিতর্ককারীরা পরস্পরে বলবে তারা ছিল তিনজন তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর। কেউ কেউ বলবে, অর্থাৎ পরস্পরে তাঁরা ছিল পাঁচজন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। এ দুটি অভিমত নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ শুধুই ধারণা করে رَجْمًا بِالْغَيْبِ বাক্যটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত উভয় মতের সাথেই। আর رَجْمًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ لَهُ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ لِظَنِّهِمْ ذٰلِكَ অর্থে আবার কেউ কেউ মু'মিনগণ বলবে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।

اَلْجُمْلَةُ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ صِفَةُ سَبْعَةٍ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ وَقِيْلَ تَاكِيْدٌ اَوْ دَلَالَةٌ عَلٰى لُصُوْقِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوْفِ وَ وَصْفُ الْاَوَّلَيْنَ بِالرَّجْمِ دُوْنَ الثَّالِثِ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ مَرْضِيٌّ صَحِيْحٌ ـ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ـ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا مِنَ الْقَلِيْلِ وَذَكَرَهُمْ سَبْعَةً فَلَا تُمَارِ تُجَادِلْ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْكَ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ تَطْلُبُ الْفُتْيَا مِنْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ الْيَهُوْدِ اَحَدًا ـ وَسَاَلَهٗ اَهْلُ مَكَّةَ عَنْ خَبَرِ اَهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ اُخْبِرُكُمْ بِهٖ غَدًا وَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَنَزَلَ ـ

অনুবাদ :

এ বাক্যটি মুবদাতা-খবর এবং وَاوْ বৃদ্ধিসহ سَبْعَةٌ -এর সিফত। কারো মতে সিফত এবং মওসূফের মধ্যে জোর সৃষ্টি এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে وَاوْ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর শুধু প্রথম দুটি অভিমতকে رَجْمًا بِالْغَيْبِ বিশেষণে বিশিষ্ট করা এবং তৃতীয়টিকে না করা এবং তৃতীয় অভিমতটি পছন্দনীয় ও বিশুদ্ধ হওয়াকে বুঝায়। আপনি বলুন আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভালো জানেন; তাদের সংখ্যার খবর অল্প কয়েকজনই জানে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারা ছিল সাতজন। আপনি তর্ক করবেন না বহছ করবেন না। তাদের বিষয়ে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তাদের বিষয়ে ওদের আহলে কিতাব ইহুদিদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। মক্কাবাসী রাসূল ﷺ -কে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে আগামীকাল বলে দিব। এক্ষেত্রে তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে–

٢٣. وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْئٍ اَىْ لِاَجْلِ شَىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ـ اَىْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الزَّمَانِ ـ

২৩. কখনোই আপনি কোনো বিষয়ে বলবেন না যে, আমি তা আগামীকাল করব। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনো দিন।

٢٤. اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ اَىْ اِلَّا مُتَلَبِّسًا بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ بِاَنْ تَقُوْلَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اَىْ مَشِيَّتَهٗ مُعَلَّقًا بِهَا اِذَا نَسِيْتَ التَّعْلِيْقَ بِهَا وَيَكُوْنُ ذِكْرُهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ كَذِكْرِهَا مَعَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَسَنُ وَغَيْرُهٗ مَا دَامَ فِى الْمَجْلِسِ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا مِنْ خَبَرِ اَهْلِ الْكَهْفِ فِى الدَّلَالَةِ عَلٰى نُبُوَّتِىْ رَشَدًا ـ هِدَايَةً وَقَدْ فَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ ـ

২৪. আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ কথা না বলে/ইনশাআল্লাহ না বলে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে জুড়ে দিয়ে বলবেন, ইনশাআল্লাহ। আর স্মরণ করুন আপনার প্রতিপালককে অর্থাৎ কাজটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করুন যখন ভুলে যান তার সাথে সম্পৃক্ত করাটা অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ বলা। সুতরাং ভুলে যাওয়ার পর তা বলা কথার সাথে উল্লেখ করার মতোই। হযরত হাসান (র.) বলেন, ভুলে যাওয়ার পর এক মজলিস অব্যাহত থাকা পর্যন্ত উক্ত বাক্যটি বললে শুরুতে বলার হুকুমে হবে। আর বলুন! সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে এটা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। আসহাবে কাহাফের ঘটনার চেয়েও অধিক। আমার নবুয়তের বিষয়টি বুঝানোর ক্ষেত্রে আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

অনুবাদ :

٢٥. وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ بِالتَّنْوِيْنِ سِنِيْنَ عَطْفُ بَيَانٍ لِثَلَاثَمِائَةٍ وَهٰذِهِ السِّنُوْنَ الثَّلَاثُمِائَةِ عِنْدَ اَهْلِ الْكِتَابِ شَمْسِيَّةٌ وَتَزِيْدُ الْقَمَرِيَّةُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَرَبِ تِسْعَ سِنِيْنَ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِىْ قَوْلِهٖ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ـ اَىْ تِسْعَ سِنِيْنَ فَالثَّلَاثُمِائَةِ الشَّمْسِيَّةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعٌ قَمَرِيَّةٌ ـ

২৫. তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশত বৎসর مِاْئَةٍ শব্দটি তানভীনসহ পঠিত। আর سِنِيْنَ হলো ثَلَاثَ مِاْئَةٍ -এর আতফে বয়ান। আর এই তিনশত বছর সময় আহলে কিতাবদের নিকট সৌর বছর গণনায়। আরবরা চান্দ্র মাসের হিসেবে আরো নয় বছর বৃদ্ধি করেছে। যা সামনে বর্ণিত হয়েছে। আর মানুষেরা আরো নয় বৃদ্ধি করে দিয়েছে। অর্থাৎ নয় বৎসর, সুতরাং তিনশত বছর হলো সৌর মাস গণনার ভিত্তিতে আর তিনশত নয় বছর হলো চন্দ্রমাস গণনার ভিত্তিতে।

٢٦. قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ج مِمَّنِ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهٗ ـ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَىْ عِلْمُهٗ اَبْصِرْ بِهٖ اَىْ بِاللّٰهِ هِىَ صِيْغَةُ تَعَجُّبٍ وَاَسْمِعْ ط بِهٖ كَذٰلِكَ بِمَعْنٰى مَا اَبْصَرَهٗ وَمَا اَسْمَعَهٗ وَهُمَا عَلٰى جِهَةِ الْمَجَازِ وَالْمُرَادُ اَنَّهٗ تَعَالٰى لَا يَغِيْبُ عَنْ بَصَرِهٖ وَسَمْعِهٖ شَيْءٌ مَا لَهُمْ لِاَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ نَاصِرٍ وَّلَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ـ لِاَنَّهٗ غَنِىٌّ عَنِ الشَّرِيْكِ ـ

২৬. আপনি বলুন! তারা কতকাল ছিল তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তাদের চেয়ে বেশি যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করছে। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ! اَبْصَرَ শব্দটি বিস্ময়সূচক শব্দ। এবং কি সুন্দর শ্রোতা তিনি। এ اَسْمَعَ শব্দটিও বিস্ময়সূচক শব্দ। এ উভয় শব্দ مَا اَبْصَرَهٗ وَمَا اَسْمَعَهٗ -এর অর্থে। আর এভাবে বলাটা রূপক হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর আয়াতের মর্মার্থ হলো কোনো বস্তুই তার দৃষ্টি এবং শ্রবণের বাইরে নয়। তাদের নেই আসমান ও জমিনবাসীদের তিনি ব্যতীত অন্য কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরিক করেন না। কেননা তিনি শরিক থেকে অমুখাপেক্ষী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَعْثَرْنَا : এ শব্দটি بَابِ اِفْعَالٌ থেকে مَاضِىْ -এর সীগাহ, মাসদার হলো اِعْثَارٌ অর্থ- অবগত করানো, জানিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهٗ قَوْمَهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ : এটা হলো اَعْثَرْنَا -এর উহ্য مَفْعُوْلٌ بِهٖ

قَوْلُهٗ لِيَعْلَمُوْا : এটা اَعْثَرْنَا -এর مُتَعَلِّقٌ আর وَاَنَّ السَّاعَةَ -এর আতফ হয়েছে اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ -এর উপর।

قَوْلُهٗ يَسْتُرُهُمْ : এটা জুমলা হয়ে بُنْيَانًا -এর সিফত হয়েছে। আর ثَلٰثَةٌ শব্দটি هُمْ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যে দিকে ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ : এই বাক্যটি مُبْتَدَأ ও خَبَرْ মিলে ثَلٰثَةٌ -এর সিফত হয়েছে। পরবর্তীতে আগত দুটি বাক্যের তারকীবও এরূপই হবে।

قَوْلُهُ رَجْمًا بِالْغَيْبِ : এটা يَرْمُوْنَ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে। অর্থাৎ يَرْمُوْنَ رَمْيًا হালও হতে পারে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِ كَلْبُهُمْ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ رَاجِمِيْنَ بِالْغَيْبِ ; جَاعِلُهُمْ اَرْبَعَةً بِانْضِمَامِهِ اِلَيْهِمْ

قَوْلُهُ وَثَامِنُهُمْ : এখানে وَاوْ টি অতিরিক্ত। تَاكِيْدِيْ مَعْنٰى ভ্রুক্ষেপ না করে অথবা تَاكِيْد مَعْنٰى হিসেব করে অর্থাৎ সিফতের সাথে মওসুফের গুণান্বিত হওয়ার তাকিদের জন্য তথা বুঝানোর জন্য। কেননা মওসূফ যখন সিফতের সাথে গুণান্বিত হয় তখন মওসূফের অস্তিত্ব অত্যাবশ্যক হবে। কেন সিফত মওসূফ বিনে অস্তিত্বে আসতে পারে না। উদ্দেশ্য এই হলো যে, আসহাবে কাহাফ কুকুরের সাথে মিলে আট সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ তারা হলেন সাতজন আর অষ্টম হলো তাদের কুকুর।

قَوْلُهُ اَوْ دَلَالَةً : এটা اَقْرَبُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর رَشَدًا শব্দটি لِيَهْدِيَنِ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে مِنْ غَيْرِ لَفْظِهٖ আর এটা اَقْرَبُ থেকে تَمْيِيْز -ও হতে পারে। অর্থাৎ لِاَقْرَبَ هِدَايَةً مِنْ هٰذَا

আর مِأَةٍ শব্দটি ثَلَاثَ -এর تَمْيِيْز এবং سِنِيْنَ শব্দটি مِأَةٍ এর عَطْف بَيَانْ বা بَدَل হয়েছে। কেননা সাধারণ مِأَةٍ -এর تَمْيِيْز যর বিশিষ্ট একক শব্দ বা مُفْرَدْ مَجْرُوْر হয়ে থাকে। এ কেরাতে مِأَةِ سِنِيْنَ ইযাফতের সাথে রয়েছে। সেই সুরতে سِنِيْن শব্দটি مِأَةِ -এর تَمْيِيْز হবে এবং বহুবচন বা جَمْع টা مُفْرَدْ -এর মহলে হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনার ইতি টানা হয়েছে। এখানে সর্বমোট পাঁচটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে–

১. দীর্ঘদিন পর আসহাবে কাহাফকে জাগ্রতকরণ ও জনসম্মুখে তাদের অবস্থা প্রকাশের মধ্যে কি হিকমত ছিল?

২. মানুষের মধ্যে আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। একদল গুহার নিকট সৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অপর দল তথায় মসজিদ নির্মাণ করতে চেয়েছিল। অতঃপর মসজিদ নির্মাণকারী দল বিজয়ী হয়ে তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন।

৩. আসহাবে কাহাফের সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। সেই বিরোধপূর্ণ উক্তিগুলো উল্লেখ করে সঠিক সংখ্যাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. অবশেষে এই হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, আসহাবে কাহাফের যতটুকু বিবরণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, তাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। অহেতুক অতিরিক্ত আলোচনা করা যাবে না। এ ব্যাপারে অন্য কারো থেকে কোনো কিছু অকাট্যরূপে জানা যাবে না। আর যদি তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব আগামীতে দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তবে ইনশাআল্লাহ বলে নিতে হবে।

৫. আসহাবে কাহাফ কতকাল নিদ্রিত ছিলেন?

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ الخ : অর্থাৎ যেভাবে আমি আসহাবে কাহাফকে পর্বতগুহায় আশ্রয় দান করেছি, কয়েক শতাব্দী যাবত তাদেরকে নিদ্রিত রেখেছি এবং তাদের দেহকে হেফাজত করেছি, জালেমের জুলুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছি, ঠিক এমনিভাবে জনসাধারণের নিকট তাদের কথা প্রকাশ করে দিয়েছি। যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং কিয়ামতের দিন সকল মানুষের পুনরুত্থান হবে, তাঁর ওয়াদার সত্যতা যে মানুষ উপলব্ধি করে এজন্যই আসহাবে কাহাফের এই ঘটনা। কেননা যে আল্লাহ তা'আলা তিনশত বৎসর ধরে এই আসহাবে কাহাফের রূহকে নিজের কাছে রেখেছেন আর তাদেরকে নিদ্রিত অবস্থায়

ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনশত নয় বৎসর পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করেছেন, তার পক্ষে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৯৫]

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎ এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর এই মাটি থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে বের করবো।

এমনিভাবে আরো ইরশাদ হয়েছে- قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

তিনি বললেন, তোমরা তাতেই জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং এরপর সেখান থেকে তোমাদেরকে উঠানো হবে। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আসহাবে কাহাফের ঘটনার মাধ্যমে।

قَوْلُهُ وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا : আর এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ বৈধ, যেন তাঁদের মাজার থেকে বরকত লাভ করা যায়। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাঁরা বর্ণনা করেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ বৃদ্ধি পায় [যখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন] তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাদর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। কিন্তু এতে তার কষ্ট হয়, তখন চাদর চেহারা মোবারক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ঐ অবস্থায় তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার লা'নত হোক ইহুদি ও নাসারাদের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা হুজুর ﷺ এই উম্মতকে আহলে কিতাবদের ন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর ﷺ কবরকে পাকা করা, তার উপর উপবিষ্ট হওয়া এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে আবুল হেয়াজ -এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। আবুল হেয়াজ বলেছেন, আমাকে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করবো না? যে কাজে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদি কোনো মূর্তি পাও তবে তাকে ধ্বংস কর, আর যদি কোনো উঁচু কবর পাও তবে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এই হাদীসসমূহের উদ্ধৃতি দেওয়ার পর লিখেছেন, এই হাদীসসমূহ দ্বারা কবরকে পাকা করা, উঁচু করা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে হুজুর ﷺ আহলে কিতাবের একটি পর্যালোচনা করেছেন। কেননা তারা নবী রাসূলগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। এর অর্থ হলো, তারা কবরকে সেজদা করা শুরু করেছিল।

হযরত আবূ মারসাদ গনবী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা কবরের উপর উপবিষ্ট হয়ো না এবং কবরের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করো না। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ১৯৭, মুসলিম শরীফ]

মাসআলা : কোনো মসজিদের পাশে অথবা কোনো ঘরে কাউকে দাফন করা জায়েজ নেই। মৃতব্যক্তিকে কবরস্থানেই দাফন করা চাই। হাদীসে এসেছে- صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا অর্থাৎ তোমরা স্বীয় ঘরে নামাজ পড়। ঘরকে কবর বানিয়ো না। উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁকে স্বীয় হুজরায় দাফন করা হয়েছে।

-[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪০]

আসহাবে কাহফের সংখ্যা : বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থা : سَيَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ তাঁরা বলবে। 'তাঁরা' কারা- এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। ১. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহাফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তিটি কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তিটি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তিটি করেছিল। -[বাহর]

২. سَيَقُولُونَ বাক্যে নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'ইয়াকুবিয়্যা'। তাঁরা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তুরীয়া'। তাঁরা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসে এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। -[বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ وَثَامِنُهُمْ : এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে وَاو عَاطِفَه [সংযোগকারী ওয়াও] ব্যবহার না করে বলা হয়েছে- ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে سَبْعَةٌ -এর وَاو عَاطِفَه এনে وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলা হয়েছে।

তাফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পর যে সংখ্যা আসত তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হতো। যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি, নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় وَاو عَاطِفَه ব্যবহার করতো না। সাতের পর কোনো সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে وَاو عَاطِفَه এনে পৃথক করে বর্ণনা করতো। এজন্যই وَاوْ -কে وَاو ثَمَان নাম দেওয়া হয়। -[মাযহারী]

আসহাবে কাহাফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তাফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থ বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাঁদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে- মুফসালামিনা, তামলীখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিতুনুস, যুনওয়াস, কায়াস্তাতিয়ুনুস।

তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় বলা হয়েছে-

هُمْ سَبْعَةٌ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ سَبْعَةُ نَفَرٍ أَسْمَائُهُمْ يَمْلِيْخَا . وَمَكْسَلْمِيْنَا وَمَشْلِيْنَا وَ بَرْنُوْش وَشَاذْنُوْش وَالسَّابِعُ كَفْشَطِيْطُوْش أَوْ كَفَشْطَطِيُوْش وَهُوَ الرَّاعِيْ وَافَقَهُمْ وَقَالَ الْكَاشِفِيُّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَرْطُوْشٌ .

-[জালালাইন পৃ. ২৩৪, হাশিয়া নং. ১৪]

কেউ কেউ আসহাবে কাহাফের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, ১. মাকসালমীনা ২. তামলীখা ৩. মারতূনাস ৪. নায়নূনাস ৫. সারবূলাস ৬. যূনাওয়াস ৭. কালইয়াসতুয়ূনাস। এই শেষোক্ত ব্যক্তি রাখাল ছিল যে রাস্তা থেকে তাদের সঙ্গী হয়েছে। তার সাথে একটি কুকুরও ছিল। যার নাম ছিল 'কিতমীর'। -[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪২]

فَائِدَةٌ : قَالَ النَّيْشَابُوْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْكَهْف تَصْلُحُ لِلطَّلَبِ وَالْهَرَبِ وَإِطْفَاءِ الْحَرِيْقِ تُكْتَبُ فِيْ خِرْقَةٍ وَيُرْمٰى فِيْ وَسَطِ النَّارِ وَلِبُكَاءِ الطِّفْلِ تُكْتَبُ وَتُوْضَعُ تَحْتَ رَأْسِهٖ فِي الْمَهْدِ وَلِلْحَرْثِ تُكْتَبُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَتُرْفَعُ عَلٰى خَشَبٍ مَنْصُوْبٍ فِيْ وَسَطِ الزَّرْعِ وَلِلضَّرْبَانِ وَالْحُمَّى الْمُثَلَّثَةِ وَالصُّدَاعِ وَالْغِنٰى وَالْجَاهِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى السَّلَاطِيْنِ تُشَدُّ عَلَى الْفَخِذِ الْيُمْنٰى وَلِعُسْرِ الْوِلَادَةِ تُشَدُّ عَلٰى فَخِذِهَا الْيُسْرٰى وَلِحِفْظِ الْمَالِ وَالرُّكُوْبِ فِي الْبَحْرِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الْقَتْلِ .

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) বলেন, আসহাবে কাহাফ ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগে জাগ্রত হয়ে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন, পৃ. ২৪৩, হাশিয়া নং ১৪]

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا الخ : আসহাবে কাহাফ গুহায় অর্ন্তধানের তিনশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর খ্রিস্ট মতালম্বীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কঠিন বিরোধের সৃষ্টি হলো যে, হাশর-নাশর রূহের উপর হবে, না শরীরের উপর হবে। তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান পাদ্রী 'থিয়োডর' সরাসরি শরীরের উপর হাশর নাশর হওয়াকে অস্বীকার করে বসেছিল। এ আলোচনা যখন তুঙ্গে উঠেছিল ঠিক সে সময় আসহাবে কাহাফ সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়ার ফলে সকলের মধ্যে এ মহা বিভ্রাটের পরিসমাপ্তি ঘটে।

قَوْلُهُ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ : অর্থাৎ যাতে তাদের সমসাময়িকদেরও নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যায় যে, হাশর-নাশরের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। হাশর-নাশরের ব্যাপারটি গ্রহণে যখন এক বিশাল প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছিল। ঠিক সে সময়ে আসহাবে কাহাফের সুদীর্ঘ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়া হকপন্থিদের জন্য এক বিরাট নজির স্থাপন করেছিল। যা শারীরিক হাশর-নাশরের পক্ষে মজবুত দলিল ছিল। ঐ ব্যক্তি যখন টাকা নিয়ে খাবার ক্রয়ের জন্য বাজারে পৌছলেন যেহেতু সুদীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাই শহরের চাল-চলন, পোশাক-আশাক, ভাষা, ভূমিচিত্র সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি রাজ্য ক্ষমতারও ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টান বিরোধীদের জায়গায় স্বয়ং খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের হাতেই রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল। এই ব্যক্তি তার শতাধিক বর্ষের পুরাতন পোশাকের কারণে এমনিতেই মানুষের নিকট হাসি তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তদুপরি যখন সে তার পকেট থেকে বহু পুরাতন টাকা বের করলেন তখন মানুষের পেরেশানি ও ভুল ধারণার আর সীমা রইল না। সবাই তাকে ঘিরে ফেলল। অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে স্বীয় আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিলেন। তখন কিছু লোক তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর সাথে গুহার দ্বারে আসল। –[তাফসীরে মাজেদী : পৃ. ৬৩১]

قَوْلُهُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا : আসহাবে কাহাফের গুহার মুখে মসজিদ নির্মাণ করব যাতে করে এটা বুঝা যায় যে, এ লোকগুলো একত্ববাদে বিশ্বাসী আবেদ ছিল। কেউ যেন তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে না নেয়। আসহাবে কাহাফের সেই গুহার মুখে এখনো একটি খ্রিস্টীয় খানকাহ/উপাসনালয় বিদ্যমান রয়েছে।

আয়াতে اَلَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে যুগের শাসক। قَالَ قَتَادَةُ هُمُ الْوُلَاةُ (بَحْر) কেউ কেউ বলেন যে, মুসলিম বাদশাহ। আবার কেউ কেউ বলেন, শহরের কোতোয়াল। –[তাফসীরে কাবীর]

عَلَيْهِمْ অর্থ হলো সে গুহার উপর। সে গুহার মুখে اَىْ عَلٰى بَابِ الْكَهْفِ অর্থাৎ গুহার দ্বারে। –[মাদারিক]

আয়াতে مَسْجِدًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– তৎকালীন যুগের ইবাদতগাহ বা উপাসনালয়। ইসলামি পরিভাষার মসজিদ উদ্দেশ্য নয়।

আল্লামা থানবী (র.) ও অন্যান্য ফকীহ মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কোনো যুগে মসজিদ নির্মাণের ফলে সহিংসতার আশঙ্কা থাকে তাহলে মসজিদ নির্মাণ জায়েজ হবে না। থানবী (র.) আরো বলেন যে, এই মসজিদ দ্বারা সেই মসজিদ উদ্দেশ্য ছিল না যা জাহেলী যুগে কবরের কাছে নির্মাণ করা হতো। কাজেই এ ঘটনা দ্বারা কবর পুজারীদের পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় না। –[তাফসীরে মাজেদী : পৃ. ৬৩২]

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান : এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহাফের নিদ্রাকাল বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে তিনশত বৎসর এরপর তিনশত নয় বছর বলা হয়েছে। সাধারণ রীতি মতে প্রথমেই তিনশত বছর বলা হয়নি কেন?

এর উত্তরে মুফাসসিরগণ লিখেন, যেহেতু ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে সৌর বছরের প্রচলন ছিল তাই সে হিসেবে তিনশত বছরই হয়। চান্দ্র বছরে প্রতি বছরে দশদিন তিন বছরে একমাস এবং ৩৬ বছরে এক বছর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ হিসেবে প্রতি একশত বছরে প্রায় তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশত সৌর বছরে চান্দ্র বছরের প্রায় তিনশত নয় বছর হয়। এই হিসাবটা অনুমানিক তথা ভগ্নাংশকে বাদ দিয়ে। অন্যথায় ৩০৯ -এর আরো কিছুমাস বেড়ে যাবে। আর বড়বড় গণনার ক্ষেত্রে সাধারণত ভগ্নাংশকে বাদ দিয়েই হিসাব ধরা হয়। আর সৌর বছর ও চান্দ্র বছরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যই বাকরীতির উপরিউক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে তাফসীরে হক্কানীর উদ্ধৃতিতে আসহাবে কাহাফের অবস্থান ও তার ইতিহাস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই অত্যাচারী শাসকের ভয়ে ভীত হয়ে আসহাবে কাহাফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ২৫০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর তারা তিনশত বছর পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন। সব মিলে তারা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছিলেন ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে। আর রাসূল ﷺ -এর পবিত্র জন্ম ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হয়েছে। তাই রাসূল ﷺ -এর জন্মের বিশ বছর পূর্বে আসহাবে কাহাফের জাগ্রত হওয়া ঘটনা ঘটেছিল। আর তাফসীরে হক্কানীতে তাদের অবস্থানস্থলের নাম 'আফসূস' বা 'তুরতুস' বলা হয়েছে। যা এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। এখনো তাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

–[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ৪৪]

٢٧. وَاتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ـ مَلْجَأً ـ

٢٨. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اِحْبِسْهَا مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَجْهَهٗ تَعَالٰى لَا شَيْئًا مِنْ اَغْرَاضِ الدُّنْيَا وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَلَا تَعْدُ تَنْصَرِفُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ج عَبَّرَ بِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِمَا تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا اَىِ الْقُرْاٰنِ وَهُوَ عُيَيْنَةُ ابْنُ حِصْنٍ وَاَصْحَابُهٗ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فِى الشِّرْكِ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ـ اِسْرَافًا ـ

٢٩. وَقُلْ لَهٗ وَلِاَصْحَابِهٖ هٰذَا الْقُرْاٰنُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ تف فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ تف وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ج تَهْدِيْدٌ لَهُمْ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ اَىِ الْكَافِرِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ط مَا اَحَاطَ بِهَا وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ كَعَكَرِ الزَّيْتِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط مِنْ حَرِّهٖ اِذَا قُرِّبَ اِلَيْهَا بِئْسَ الشَّرَابُ ط هُوَ وَسَآءَتْ اَىِ النَّارُ مُرْتَفَقًا ـ تَمْيِيْزٌ مَنْقُوْلٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَىْ قَبُحَ مُرْتَفَقُهَا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ الْاٰتِىْ فِى الْجَنَّةِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاِلَّا فَاَىُّ اِرْتِفَاقٍ فِى النَّارِ ـ

অনুবাদ :

২৭. আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট আপনার প্রতিপালকের কিতাব হতে পাঠ করে শুনান, তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আপনি কখনোই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয় পাবেন না। مُلْتَحَدً শব্দটির অর্থ হলো مَلْجَأً আশ্রয়স্থল, মাথা গোঁজার জায়গা।

২৮. আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন আপনার নফসকে আটকিয়ে রাখবেন তাদের সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। তাদের ইবাদত দ্বারা দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নয়। আর তাঁরা হলো দরিদ্রগণ। আর আপনি ফিরাবেন না সরিয়ে নিবেন না তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি দৃষ্টি বলে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উদ্দেশ্য পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে। আর আপনি তাঁর অনুসরণ করবেন না, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। অর্থাৎ কুরআন থেকে। আর সে ব্যক্তি হলো উমাইয়া ইবনে হিসন ও তার সঙ্গীরা। আর যে তার খেয়াল খুশির অনুসরণ করে শিরকের মাঝে আর যার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে সামনে বেড়ে গেছে।

২৯. আর বলুন তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে, এই কুরআন সত্য আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে। সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক এটা তাদের জন্য ধমকী স্বরূপ আমি প্রস্তুত রেখেছি জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। ঐ বেষ্টনী যার দ্বারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হবে। তারা পানীয় প্রার্থনা করলে তাদেরকে দেওয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়। যা তেলের গাদ সদৃশ হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে তার উত্তাপে যখন তা তার নিকটবর্তী করা হবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এটি আর কত নিকৃষ্ট আশ্রয় জাহান্নাম। مُرْتَفَقًا তমীয মূল বাক্য বিন্যাসে এটি فَاعِلْ ছিল। ইবারতটি এরূপ ছিল যে- قَبُحَ مُرْتَفَقُهَا এরপরে আগত জান্নাতের বর্ণনায় وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে, সে হিসেবে এখানে তার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে। অন্যথায় জাহান্নামে আরাম আয়েশের কি আছে?

৩০. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ـ اَلْجُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ الَّذِيْنَ وَفِيْهَا إِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالْمَعْنٰى أَجْرُهُمْ أَىْ نُثِيْبُهُمْ بِمَا تَضَمَّنَهُ ـ

৩১. أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ إِقَامَةٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ قِيْلَ مِنْ زَائِدَةٌ وَقِيْلَ لِلتَّبْعِيْضِ وَهِىَ جَمْعُ أَسْوِرَةٍ كَأَحْمِرَةٍ جَمْعُ سَوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ مَا رَقَّ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَّاِسْتَبْرَقٍ مَا غَلُظَ مِنْهُ وَفِىْ اٰيَةِ الرَّحْمٰنِ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ جَمْعُ أَرِيْكَةٍ وَهِىَ السَّرِيْرُ فِى الْحَجَلَةِ وَهِىَ بَيْتٌ يُزَيَّنُ بِالثِّيَابِ وَالسُّتُوْرِ لِلْعُرُوْسِ نِعْمَ الثَّوَابُ الْجَزَاءُ الْجَنَّةُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ـ

অনুবাদ :

৩০. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না, যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে। إِنَّا لَا نُضِيْعُ এ বাক্যটি إِنَّ الَّذِيْنَ الخ -এর খবর হয়েছে এবং এখানে যমীরের স্থলে ইসমে জাহের ব্যবহার করা হয়েছে। এর মর্ম হলো তাদের প্রতিফল হবে ঐ ছওয়াব যা সামনের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১. তাদের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত। যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলঙ্কৃত করা হবে। কারো মতে مِنْ أَسَاوِرَ -এর مِنْ টি অতিরিক্ত। আর কারো মতে مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّة আর أَسَاوِرَ শব্দটি أَسْوِرَةٌ -এর বহুবচন, أَحْمِرَةٌ -এর ওজনে। আর أَسْوِرَةٌ হলো سَوَارٍ -এর বহুবচন। তাঁরা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র। সূরা আর রাহমানের আয়াতে রয়েছে بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ তথায় সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। أَرَائِكُ শব্দটি أَرِيْكَةٌ -এর বহুবচন। এটি এক বিশেষ ধরনের কক্ষ, যা নব দম্পতির জন্য কাপড় ও পর্দার দ্বারা সজ্জিত করা হয় কত সুন্দর পুরস্কার প্রতিদান। সেটি হবে জান্নাত ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أُتْلُ : তুমি পাঠ কর। এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। অর্থ– পাঠ করা। তেলাওয়াত করা। এ শব্দটি تَلْوٌ থেকে নির্গত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার অর্থ হলো– অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

قَوْلُهُ مِنَ الْكِتَابِ : এর مِنْ টি بَيَانِيَّة এটা مَا مَوْصُوْلَة -এর বয়ান।

قَوْلُهُ مُلْتَحَدًا : ইসমে যরফ, মাসদারে মীমী, বাবে اِفْتِعَالٌ থেকে অর্থ– আশ্রয়স্থল, আশ্রয় নেওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ : এ বাক্যটি مَآ أُوْحِىَ إِلَيْكَ বাক্যের বয়ান হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَعْدُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ হরফে নাহীর কারণে শেষের وَاوْ টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাবে نَصَرَ -এর মাসদার عَدْوًا অর্থ– কোনো জিনিসকে অতিক্রম করা, দৌড়ানো।

قَوْلُهُ عَيْنَاكَ : এটা لَا تَعْدُ -এর ফায়েল। আর تُرِيْدُ الخ বাক্যটি عَيْنَاكَ -এর كَافْ [যা মুযাফ ইলাইহি, তা] থেকে حَالْ হয়েছে। যদি مُضَافْ اِلَيْهِ টা مُضَافْ -এর جُزْء হয় তবে مُضَافْ اِلَيْهِ থেকে حَالْ হতে পারে। কেননা عَيْنْ [চক্ষু, দৃষ্টি] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো] صَاحِب عَيْنْ কাজেই ফে'লের اِسْنَادْ বাহ্যিক দৃষ্টিতে مُضَافْ اِلَيْهِ -এর দিকে হলেও বাস্তবে তা مُضَافْ -এর দিকেই হয়েছে।

قَوْلُهُ فُرُطًا : এটা বাবে نَصَرَ হতে মাসদার। অর্থ- সীমালঙ্ঘন করা। فَرَطَ فِى الْاَمْرِ অর্থ হলো- ত্রুটি বিচ্যুতি করা, অসম্পূর্ণ কাজ করা।

قَوْلُهُ الْحَقُّ : এটা هٰذَا الْقُرْاٰنُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর اَلْحَقُّ শব্দটি উহ্য ফে'লের فَاعِلْ -ও হতে পারে অর্থাৎ جَاءَ الْحَقُّ

قَوْلُهُ مِنْ رَبِّكُمْ : হয়তো এটা اَلْحَقُّ থেকে حَالْ হবে অর্থাৎ كَائِنًا مِنْ رَبِّكُمْ অথবা هٰذَا الْقُرْاٰنُ উহ্য মুবতাদার দ্বিতীয় খবর হবে। অর্থাৎ كَائِنٌ مِنْ رَبِّكُمْ

قَوْلُهُ اِنَّا اَعْتَدْنَا : এটা لَفّ نَشْر غَيْر مُرَتَّبْ অর্থাৎ اِنَّا اَعْتَدْنَا -এর সম্পর্ক وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ -এর সাথে। আর اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর সম্পর্ক فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ -এর সাথে। আর اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا এটা نَارًا -এর সিফত হয়েছে। سُرَادِقٌ -এর বহুবচন হলো سُرَادِقَاتٌ আর سُرَادِقٌ বলা হয় এমন বস্তুকে যার দ্বারা কোনো কিছুকে পরিবেষ্টন করা হয়, ঘিরে ফেলা হয়। চাই তা দেয়ালের মাধ্যমে হোক বা সামিয়ানার দ্বারা হোক বা পার্টিশনের দ্বারা হোক। সবগুলোই سُرَادِقٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ يَسْتَغِيْثُوْا : এটা বাবে اِسْتِفْعَالْ -এর মাসদার। অর্থ- সাহায্য প্রার্থনা করা। يَسْتَغِيْثُوْا মূলে ছিল يَسْتَغْوِثُوْا - وَاوْ -এর যেরকে তার পূর্বের বর্ণে দিয়ে وَاوْ -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে يَسْتَغِيْثُوْا হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ الْمُهْلِ : এটি اِسْم অর্থ- তেলের গাদ, পূঁজ, পূঁজ মিশ্রিত রক্ত। يَشْوِى الْوُجُوْهَ পূরো বাক্যটি مَاءٍ -এর সিফত হতে পারে। আবার اَلْمُهْلِ থেকে حَالْ -ও হতে পারে।

عَكَرٌ : অর্থ- গাদ, তেলের তলানি, কাইট।

قَوْلُهُ الشَّرَابُ : এটা بِئْسَ -এর ফায়েল। আর مَخْصُوْصْ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। তা হলো هُوَ যার مَرْجِعْ হলো مُسْتَغَاثٌ بِهٖ

قَوْلُهُ مُرْتَفَقًا : এটা نِسْبَتْ থেকে تَمْيِيْز যা فَاعِلْ হতে مَنْقُوْل অর্থাৎ قَبُحَ مُرْتَفَقُهَا আর مُرْتَفَقٌ হলো ظَرْف مَكَانْ অর্থ- আরামের জায়গা, দোজখীদের জন্য এ শব্দটি اِسْتِهْزَاء বলা হয়েছে। অথবা مُشَاكَلَتْ -এর ভিত্তিতেও হতে পারে। যেহেতু জান্নাতীদের জন্য حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا : اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। এর যমীর نَا হলো اِسْم اِنَّ আর لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا জুমলা হয়ে اِنَّ -এর খবর। اِنَّ তার اِسْم ও خَبَرْ -কে নিয়ে প্রথম اِنَّ -এর খবর হয়েছে। এরপর اِنَّ তার اِسْم ও خَبَرْ মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ : এখানে لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّم আর جَنّٰتُ عَدْنٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ এরপর এটা جُمْلَة خَبَرْ হয়ে হয়েছে اُولٰئِكَ মুবতাদার।

قَوْلُهُ مِنْ اَسَاوِرَ : এখানে مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّة হয়েছে। অথবা مِنْ টি مَفْعُوْل بِهٖ -এর উপর অতিরিক্ত। আর مِنْ ذَهَبٍ -এর মধ্যে مِنْ টি بَيَانِيَّة এবং তা كَائِنَةً বা مَصْنُوْعَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে اَسَاوِرَ -এর সিফত হয়েছে। আর اَسَاوِرَ এটা سِوَار -এর বহুবচন। অর্থ- চুরি, অলঙ্কার।

قَوْلُهُ مُتَّكِئِيْنَ : এটা উহ্য ফে'ল يَجْلِسُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى الْحَجَلَةِ : এটা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে اَلسَّرِيْرُ থেকে حَالٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এই সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের অবতরণকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এরপর এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যারা এই ক্ষণভঙ্গুর জগত ও জীবনের যাবতীয় আনন্দ উল্লাসকে তুচ্ছ মনে করে সুদৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তারা অবশেষে সফলকাম হয়, আর অহংকারী জালেম দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

আসহাবে কাহাফের ঘটনার পর এখন আলোচ্য আয়াতে পুনরায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কাফেরদের অনেক প্রশ্নের জবাবও রয়েছে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহাফের ন্যায় যে সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার আনন্দ উল্লাস বর্জন করে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল রয়েছেন, তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাগিদ রয়েছে, যেমন হযরত আম্মার (রা.), হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে দীন ইসলামের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের প্রতি সুনজর রাখার তাগিদ হয়েছে। আর যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার নির্দেশ রয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (র.) তাঁর 'এজালাতুল খেফা' গ্রন্থে লিখেছেন, এ আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর সেসব লোকের সঙ্গ লাভের আদেশ দেওয়া হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকে; এমন লোকদের থেকে বিমুখ না হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, পথভ্রষ্ট তাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ হয়েছে। এ আয়াতে যে দলের সঙ্গে উঠাবসা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রাহে বিলীন করে দিয়েছিলেন, তাই তারা হয়েছিলেন রিক্তহস্ত, এটি ছিল তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

কাফেররা রাসূল ﷺ -কে একথা বলতো, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার কথা শ্রবণ করি এবং আপনার উপর ঈমান আনয়ন করি তবে যখন আমরা আপনার নিকট আসি তখন আপনি এ দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন, তাদের সঙ্গে একত্রে বসা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। তাছাড়া তাদের পোষাক থেকে দুর্গন্ধ আসে। এরা আমাদের সঙ্গে বসবার লোক নয়। তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়। এতে কাফেরদের দরখাস্ত মঞ্জুর না করার নির্দেশ রয়েছে এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি এই অহংকারী লোকদের দিকে মনোনিবেশ করবেন না; বরং ইসলামের সত্য-সাধনায় যারা শত কষ্ট সহ্য করেও অগ্রসর হয়েছে তাদেরকে সঙ্গে রেখে চলুন। তারা সকাল সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল রয়েছে, তারাই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়বান্দা এবং আসহাবে কাহাফের নমুনা। অহংকারী কাফেররা এই নিঃস্ব মুসলমানদের সঙ্গে বসা পছন্দ করেনি আল্লাহ তা'আলা তাদের এই আবদার রক্ষা না করার আদেশ দিয়েছেন। −[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১১৪, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪১১ - ১২]

قَوْلُهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ الخ - শানে নুযূল :

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, উয়াইনা ইবনে হুসাইন ফাজারী সম্পর্কে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উয়াইনা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়। তখন তার দরবারে কয়েকজন নিঃস্ব মুসলমান উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী (রা.) অন্যতম। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর গায়ে একটি ছোট চাদর ছিল।

তিনি ছিলেন ঘর্মাক্ত, তখন উয়াইনা বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ ! এই লোকদের দুর্গন্ধ আপনার কষ্টের কারণ হয় না? আমরা মোজের গোত্রের নেতা, সমাজের উচুস্তরের লোক। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে সব লোক মুসলমান হয়ে যাবে; কিন্তু এসব লোকদের উপস্থিতি আমাকে আপনার অনুসরণে বাধা দিচ্ছে, আপনি যদি এদেরকে আপনার এখান থেকে দূরে সরিয়ে দেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করবো অথবা আমাদের জন্যে বসবার কোনো ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করুন এবং তাদেরকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২০৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কুরাইশদের তথাকথিত কোনো নেতারা এসে প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করল, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনি তবে এই দারিদ্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার মজলিস থেকে সরিয়ে দিন অথবা এ ব্যবস্থা করুন, যখন আমরা হাজির হই, তারা যেন না থাকে। আর তাদের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিন। তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১১৪-১৫]

বিশিষ্ট তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন- اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ বাক্য দ্বারা আসহাবে সোফফাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাঁদের সংখ্যা ছিল সাতশত। তাঁরা ছিলেন নিঃস্ব ও হৃতসর্বস্ব। ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে তথা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তারা তাঁদের সকল ধন-সম্পদ মক্কা শরীফে রেখে হিজরত করে এসেছেন মদীনা মুনাওয়ারায়। তাঁদের বাড়ি ঘরও ছিল না, বাগবাগিচাও ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল না। তারা সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতেন। তাঁরা এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে দ্বিতীয় নামাজের জন্যে মসজিদে অপেক্ষা করতেন। যখন এ আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্যে, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হতো। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বণ্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হতো। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেতো। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

জান্নাতীদের অলঙ্কার : يُحَلَّوْنَ فِيْهَا এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কঙ্কন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে।

হযতর আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, একজন সাধারণ জান্নাতবাসীকে যে সাধারণ অলঙ্কার পরানো হবে, যদি তা দুনিয়ার অলঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে তা দুনিয়ার সমস্ত অলঙ্কারের চেয়ে উন্নততর এবং উচ্চতর হবে। আবুশ শেখ কাবে আহবারের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার একজন ফেরেশতা তার সৃষ্টিলগ্ন থেকে জান্নাতবাসীর জন্য অলঙ্কার তৈরী করে যাচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তৈরী করতে থাকবে। যদি জান্নাতবাসীর একটি অলঙ্কার সামনে আনা হয় তবে তার মোকাবিলায় সূর্যের জ্যোতি নিস্প্রভ হয়ে যাবে। জান্নাতবাসীগণ সবুজ বর্ণের মিহি এবং মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করবেন। তন্মধ্যে পালংকে হেলান দিয়ে তারা বসবে। অর্থাৎ কখনো তাদের পোশাকের আস্তর মোটা হবে আর কখনো মিহি হবে। উভয় প্রকার পোষাকই তারা ব্যবহার করবেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, স্বর্ণ এবং রেশম জান্নাতী পুরুষদের জান্নাতী পোষাক। যারা পৃথিবীতে এই দুটি জিনিষ ব্যবহার করবে সে জান্নাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জান্নাতীদের পোষাক মোটা অস্তরের হওয়ার অর্থ হলো তা তৈরী করা হবে অত্যন্ত মজবুতভাবে। ইমাম নাসায়ী, আবূ দাউদ এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! জান্নাতবাসীদের পোষাক কি রকম হবে, তা কি তৈরী পোষাক হবে, নাকি তৈরী করা হবে? একথা শ্রবণ করে মজলিসের এক ব্যক্তির হাসি পেল। তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি জানে না সে ব্যক্তি যখন কোনো জ্ঞানী লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে, তখন তোমরা হাস কেন?

তাবারানী (র.) হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে হযরত আবুল খায়ের মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে তাতে মিহি রেশম তৈরী হয়, তার দ্বারাই জান্নাতবাসীর পোষাক তৈরী হবে।

এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলঙ্কার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভণীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কঙ্কন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথাও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে ঘৃণার বস্তু বলে মনে করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোনো বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষণীয় মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও অলঙ্কার এবং রেশমী বস্তু শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারো কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোনো অলঙ্কার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কিন্তু জান্নাতে পৃথক এক জগৎ। সেখানে এ আইন থাকবে না।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الخ : এ আয়াতে এমন সকল দরিদ্র লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যারা সবকিছু কে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগীতে সদা ব্যাপৃত। هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

قَوْلُهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ الخ : আয়াতে মাশায়েখে কেরামের জন্য এই নির্দেশ রয়েছে যে, তাঁরা যেন স্বীয় মুরিদ, ভক্তবৃন্দ ও ছাত্রদের প্রতি সদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন; তাদের ব্যাপারে যেন বিরূপ না হন।

قَوْلُهُ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا : আয়াতে সে সকল লোকদের কুৎসা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা সম্পদশালীদের নিকট ধন্না দেয় ও তাদের সম্পদের কারণে তাদেরকে তোশামোদ করে।

قَوْلُهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا الخ : আয়াতে বদকার, আল্লাহবিমুখ, ফাসেক ও জ্ঞানপাপীদের আনুগত্য না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কেননা তার সাথে নম্র ব্যবহার করলে মুখে যদিও তাকে অস্বীকার করা হচ্ছে; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মনে হবে যে, তারই আনুগত্য করা হচ্ছে।

–[কামালাইন ১৫পারা, পৃ. ১০৭]

অনুবাদ :

٣٢. وَاضْرِبْ اِجْعَلْ لَهُمْ لِلْكُفَّارِ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ بَدَلٌ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ تَفْسِيْرٌ لِلْمَثَلِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا الْكَافِرِ جَنَّتَيْنِ بُسْتَانَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا اَحْدَقْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ـ يُقْتَاتُ بِهِ ـ

৩২. আপনি বর্ণনা করুন পেশ করুন তাদের কাছে কাফের এবং মুসলমানদের কাছে দুই ব্যক্তির উপমা مَثَلًا হলো بَدَلٌ আর رَجُلَيْنِ শব্দটি তার পরবর্তী ইবারতসহ مَثَلًا -এর তাফসীর। আমি তাদের একজনকে কাফেরকে দিয়েছিলাম দুটি দ্রাক্ষা উদ্যান আঙ্গুরের বাগান এবং পরিবেষ্টিত করেছিলাম সে দুটোকে كِلْتَا শব্দটি একবচন কিন্তু দ্বিবচনের অর্থ দেয়। আর তারকীবে মুবতাদা হয়েছে। খেজুর বৃক্ষ দ্বারা এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র যা খানাপিনার কাজে আসে।

٣٣. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ كِلْتَا مُفْرَدٌ يَدُلُّ عَلَى التَّثْنِيَةِ مُبْتَدَأٌ اٰتَتْ خَبَرُهُ اُكُلَهَا ثَمَرَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ـ يَجْرِىْ بَيْنَهُمَا ـ

৩৩. উভয় বাগানই ফলদান করত كِلْتَا টি শব্দ হিসেবে مُفْرَدٌ ; কিন্তু অর্থগত দিক থেকে تَثْنِيَة বা দ্বিবচন বুঝায়। كِلْتَا হলো মুবতাদা। আর اٰتَتْ তার খবর। এতে কোনো ত্রুটি করত না। আর উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর যা উভয়ের মাঝে প্রবাহিত হয়।

٣٤. وَّكَانَ لَهُ مَعَ الْجَنَّتَيْنِ ثَمَرٌ ج بِفَتْحِ الثَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبِضَمِّهِمَا وَبِضَمِّ الْاَوَّلِ وَسُكُوْنِ الثَّانِىْ وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ كَشَجَرَةٍ وَشَجَرٍ وَخَشَبَةٍ وَخَشَبٍ وَبَدَنَةٍ وَبَدَنٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ الْمُؤْمِنِ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ يُفَاخِرُهٗ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا ـ عَشِيْرَةً ـ

৩৪. আর তার ছিল দুটি বাগানসহ প্রচুর সম্পদ ثَمَرٌ শব্দে তিনটি পাঠ রয়েছে– ১. ثَاء এবং مِيْم উভয়টিতে ফাতাহ। ২. উভয়টিতে পেশ বা জুম্মা ৩. প্রথমটিতে ফাতাহ দ্বিতীয়টিতে সুকূন। ثَمَرٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ -এর বহুবচন। যেমন شَجَرَةٌ -এর বহুবচন شَجَرٌ , خَشَبَةٌ -এর বহুবচন خَشَبٌ এবং بَدَنَةٌ -এর বহুবচন بَدَنٌ আসে। অতঃপর সে তার বন্ধুকে মু'মিনকে বলল তার সাথে আলোচনাকালে গর্বভরে ধন সম্পদে আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী জনবলে আত্মীয়স্বজনে।

٣٥. وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ بِصَاحِبِهِ يَطُوْفُ بِهِ فِيْهَا وَيُرِيْهِ اَثْمَارَهَا وَلَمْ يَقُلْ جَنَّتَيْهِ اِرَادَةً لِلرَّوْضَةِ وَقِيْلَ اِكْتَفٰى بِالْوَاحِدِ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ بِالْكُفْرِ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ تَنْعَدِمَ هٰذِهٖ اَبَدًا ـ

৩৫. সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে এবং তাতে প্রদক্ষিণ করে তাকে তার ফলফলাদি দেখাতে ছিল। جَنَّتَيْهِ দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করেননি। সাধারণ বাগান বুঝানোর জন্য। কেউ কেউ বলেন, শুধু একটি বাগান দেখানোর উপরে ক্ষান্ত করা হয়েছে। দুটি দেখায়নি। নিজের প্রতি জুলুম করে কুফরি করে। সে বলল যে, আমি মনে করি না যে, এটা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অনুবাদ :

٣٦. وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ فِى الْاٰخِرَةِ عَلٰى زَعْمِكَ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ج مَرْجِعًا ـ

৩৬. আমি এও মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবৃত্ত হই। আখিরাতে তোমার ধারণা অনুযায়ী তবে আমি তো নিশ্চয় এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান প্রত্যাবর্তনস্থল পাব।

٣٧. قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ يُجَاوِبُهٗ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ لِاَنَّ اٰدَمَ خُلِقَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِىٍّ ثُمَّ سَوّٰىكَ عَدَلَكَ وَصَيَّرَكَ رَجُلًا ـ

৩৭. তদুত্তরে তার বন্ধু তার সঙ্গে আলোচনা কালে কথার জবাব দিয়ে তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। কেননা হযরত আদম (আ.) কে তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ও পরে শুক্র বীর্য থেকে। তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানুষ আকৃতিতে বানিয়েছেন।

٣٨. لٰكِنَّا اَصْلُهٗ لٰكِنْ اَنَا نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ اِلَى النُّوْنِ وَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ ثُمَّ اُدْغِمَتِ النُّوْنُ فِىْ مِثْلِهَا هُوَ ضَمِيْرُ الشَّاْنِ يُفَسِّرُهُ الْجُمْلَةُ بَعْدَهٗ وَالْمَعْنٰى اَنَا اَقُوْلُ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْ اَحَدًا ـ

৩৮. কিন্তু لٰكِنَّا শব্দটি মূলত لٰكِنْ اَنَا ছিল। হামযার হরকত টি نُوْن -এ দিয়ে হামযাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এরপর نُوْن-কে نُوْن -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। তিনিই هُوَ হলো যমীরে শান, যার ব্যাখ্যা করছে পরবর্তী বাক্য। মর্ম হলো– আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরিক করি না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِضْرِبْ : যদি ضَرْب -এর ব্যবহার مَثَل -এর সাথে হয় তাহলে তার দুটি মাফউল হয়ে থাকে। এখানে একটি মাফউল হলো مَثَلًا আর দ্বিতীয় মাফউল হলো رَجُلَيْنِ । বাস্তবিক পক্ষে উভয় মাফউল একই এবং رَجُلَيْنِ উহ্য মুযাফের সাথে مَثَلًا থেকে بَدَل -ও হতে পারে।

قَوْلُهٗ مِنْ اَعْنَابٍ : এখানে مِنْ টি হলো بَيَانِيَّة আর مَا فِى الْجَنَّتَيْنِ হলো مُبَيَّنْ এবং مِنْ اَعْنَابٍ হলো بَيَانْ ।

قَوْلُهٗ حَفَفْنَا : এটা বাবে نَصَرَ -এর حَفٌّ মাসদার হতে মাযীর সীগাহ। অর্থ– হলো– বেষ্টন করে নেওয়া, ঘিরে ফেলা।

قَوْلُهٗ كِلْتَا : যেহেতু শব্দ হিসেবে كِلْتَا টি مُفْرَدٌ এ কারণেই اٰتَتْ -কে একবচন আনা হয়েছে। আর خِلَالَهُمَا হলো অর্থের দিকে বিবেচনা করে এটাকে দ্বিবচন আনা হয়েছে। كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ এটা মুরাক্কাব হয়ে مُبْتَدَأ আর اٰتَتْ হলো خَبَرْ খবর

قَوْلُهٗ ثَمَرٌ : এ শব্দটি দ্বারা বাগ-বাগিচা ব্যতীত অন্যান্য সম্পদ বুঝানো হয়েছে। চাই তা নগদ টাকা হোক কিংবা অন্য কিছু।

قَوْلُهٗ يُحَاوِرُ : এ শব্দটি বাবে تَفَاعُلْ -এর مُحَاوَرَةٌ ও حِوَارًا মাসদার থেকে। অর্থ– কথাবার্তা বলা, উত্তর দেওয়া। قَرِيْنَة مَقَامْ -এর কারণে يُحَاوِرُ -এর তাফসীর يُفَاخِرُ দ্বারা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مَالًا وَنَفَرًا : এটা নিসবত হতে تَمْيِيْز হয়েছে।

قَوْلُهُ اَثْمَارُهَا : কোনো কোনো নোসখায় اَثْمَارُهَا -এর জায়গায় اَثَارُهَا রয়েছে অর্থ হলো- সৌন্দর্য, চমক, টাটকা, সজীবতা।

قَوْلُهُ سَوَّاكَ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো- বরাবর করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামঞ্জস্যশীল বানানো। এ سَوَّاءَ টা جَعَلَ এবং صَيَّرَ -এর অর্থে হয়েছে। "كَ" হলো প্রথম মাফঊল আর رَجُلًا হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل

قَوْلُهُ لٰكِنَّا : মূলে ছিল لٰكِنْ اَنَا হামযাকে খেলাফে কিয়াস ফেলে দিয়ে نُوْن -কে نُوْن -এর মধ্যে اِدْغَامْ করেছে। ফলে لٰكِنَّا হয়েছে। لٰكِنَّا -এর মধ্যে لكن হলো আমলহীন তার ضَمِيْر হলো প্রথম মুবতাদা। هُوَ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা, اَللّٰهُ তৃতীয় মুবতাদা এবং رَبِّىْ হলো খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা অর্থ-সম্পদের নেশায় মগ্ন ছিল এবং দরিদ্র মুসলমানদেরকে হীন মনে করত এবং তাদের সাথে বসা অপমানজনক মনে করতো। নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্য গর্ব করতো। তাঁরা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে এই আরজি পেশ করতো যে, আপনি এই নিঃস্ব মুসলমানদেরকে সরিয়ে দিন!

আলোচ্য আয়াতে ঐ অহংকারী লোকদেরকে শ্রবণ করাবার জন্য এবং পৃথিবীর অস্তিত্বহীনতা প্রকাশ করার জন্যে বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সম্পদশালী কাফের ছিল, আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল। আর নিজের অর্থ-সম্পদের কারণে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল মুমিন এবং দরবেশ। সম্পদশালী কাফের অর্থ-সম্পদের নেশায় মত্ত ছিল এবং আখিরাতকে অস্বীকার করতো। আর তার মুসলিম ভাই আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ছিল। সে এই সত্য উপলব্ধি করতো যে, এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, যিনি তোমাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর বন্দেগীতেই রয়েছে সত্যিকার সম্মান এবং মর্যাদা। আর এই প্রকৃত মর্যাদা মু'মিনই অর্জন করে। মু'মিন ব্যক্তি তার সম্পদশালী ভাইকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার শিক্ষা দিত, তাঁর নাফরমানি না করার তাগিদ করতো এবং বলতো, আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ হয়ো না, যে কোনো সময় যে কোনো বিপদ তোমার প্রতি আপতিত হতে পারে এবং তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অবশেষে তাই হয়েছে। হঠাৎ এক আসমানি বালা অবতরণ করে। পরিণামে তার বাগানটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে। তখন সে উপলব্ধি করে আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই হয়।

-[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪১৫]

ইমাম রাজী (র.) লিখেছেন এ আয়াতসমূহের মর্মকথা হলো- ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে কাফেররা তাদের ধন শক্তি এবং জনশক্তির ব্যাপারে গর্ব করতো এবং দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো।

আলোচ্য ঘটনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব মানবকে জানিয়ে দিতে চান যে ধনী হওয়া কোনো গৌরবের বিষয় নয়, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমেই মানুষ গৌরবান্বিত হয়, আল্লাহ তা'আলার দরবারে বান্দা হিসেবে তার গুরুত্ব হয়। ধন-সম্পদ নিতান্তই অস্থায়ী জিনিস, আজ যে ধনী, কাল সে হয় ফকির; আর আজ যে ফকির কাল সে ধনী হয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে ধনী দরিদ্র হয়ে যায়; তাঁর মর্জি হলে দরিদ্রও ধনী হয়ে যায়।

-[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা- ১৫, পৃ. ৯৭ তাফসীরে কাবীর- খ. ২১, পৃ. ১২৩-১২৪]

قَوْلُهُ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ - শানে নুযূল : অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি তাদের নিকট দুই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন। এই দুই ব্যক্তি কে? তাদের পরিচয় কি? এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আল্লামা বগভী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মক্কায় বনূ মখজুম গোত্রের দুই ভাই বাস করতো। একজন ছিলেন মু'মিন আর অপরজন ছিল কাফের। যিনি মু'মিন ছিলেন তার নাম আবূ সালমা আব্দুল্লাহ [তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.)-এর সাবেক স্বামী] ইবনে আব্দুল আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়ালাইল। আর যে কাফের ছিল তার নাম ছিল আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়ালাইল। এই দুজনের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উয়াইয়া ইবনে হুসাইন এবং হযরত সালমান (রা.)-এর অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বনী ইসরাঈলের দুই ভাইয়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা। আর মুজাহেদ (র.) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল তামলীখা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতরুস। ওয়াহ্যাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতফারু। প্রথম ব্যক্তি মুসলমান ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের ছিল। সূরা ওয়াসসাফফাতেও ঐ দুই ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) মা'মারের সূত্রে এই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে খোরাসানীর প্রদত্ত বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন। এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। পিতার ওয়ারিশসূত্রে উভয়ে আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা করে পায় এবং প্রত্যেকে তা ভাগ করে নেয়। এক ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করে। আর দ্বিতীয়জন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করে এবং বলে, হে আল্লাহ! আমার ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করেছে, আমি তোমার নিকট থেকে এই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্নাতের জমি ক্রয় করলাম। প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি বাড়ি নির্মাণ করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দারিদ্রপীড়িত মানুষকে দান করে এবং এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! সে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বাড়ি নির্মাণ করেছে, আর আমি তোমার নিকট থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্নাতের একটি বাড়ি ক্রয় করলাম। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহ তা'আলার রাহে দান করে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি আরজি পেশ করছি যে, জান্নাতে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় করে গোলাম বাঁদি এবং ঘরের আসবাব পত্র ক্রয় করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করে এবং জান্নাতে খাদেম, খেদমতগার এবং আসবাব পত্রের জন্য আরজি পেশ করে।

যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সমস্ত সম্পদ এভাবে দান করে ফেলে এবং অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে চিন্তা করলো যে ভাইয়ের নিকট আমি সাহায্যপ্রার্থী হতে পারি। আর একথা চিন্তা করে সে তার ভাই যে রাস্তা অতিক্রম করবে তার পার্শ্বে বসে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তার সম্পদশালী ভাই চাকর বাকর নিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করলো। ভাইকে দেখে সে চিনতে পারলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, বর্তমানে আমি অত্যন্ত দরিদ্র এবং আপনার সাহায্যপ্রার্থী। সম্পদশালী ভাই বললো, তোমার অর্থ-সম্পদ কি হয়েছে? তুমি তো তোমার অংশ নিয়েছিলে। দরিদ্র ভাই তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন সে বলল, আচ্ছা তুমি দান খায়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো, তুমি যেতে পার আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না। এভাবে সে তার দরিদ্র ভাইকে বিদায় করে। যাহোক অবশেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়। -[তাফসীরে মাযহারী, খ.৭, পৃ. ২১৩]

قَوْلُهُ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ : ثَمَرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধনসম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা.) থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। -[ইবনে কাছীর]

কামুস গ্রন্থে আছে, ثَمَرٌ শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রেই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-বাসনের যাবতীয় সাজসরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং তার উক্তি যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا -ও এ অর্থই বুঝায়।

قَوْلُهُ : مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ শুআবুল ঈমানে হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন- কোনো পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোনো বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। [অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কালেমা পাঠ করলে তা 'চোখ লাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

ইমামু দারিল হিজরত হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) স্বীয় দরজার উপর مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ লিখে রেখেছিলেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, হুজুর ঘরের দরজায় এটা লিখেছেন কেন? তিনি জবাবে বললেন, তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন- وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এ কারণেই তো আমি ঘরের দরজায় এটা লিখেছি। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০৩]

ফায়েদা : আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নীতি হচ্ছে যে, তিনি তার প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মোহ থেকে নিবৃত রাখেন। আর কাফেরদেরকে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত রাখেন এবং ঈমানদারগণকে পরীক্ষায় নিপতিত করেন। -[প্রাগুক্ত : ৬০৪]

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত : وَاضْرِبْ الخ আয়াতে দুনিয়ার মোহে নিপতিত সম্পদশালীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং গরিব, অসহায়, নিঃস্ব আল্লাহনির্ভর ব্যক্তিবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে

অনুবাদ :

٣٩. وَلَوْلَا هَلَّا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ عِنْدَ إِعْجَابِكَ بِهَا هٰذَا مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فِي الْحَدِيْثِ مَنْ أُعْطِيَ خَيْرًا مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ فَيَقُوْلُ عِنْدَ ذٰلِكَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَمْ يَرَ فِيْهِ مَكْرُوْهًا إِنْ تَرَنِ أَنَا ضَمِيْرُ فَصْلٍ بَيْنَ الْمَفْعُوْلَيْنِ أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا .

৩৯. আর কেন তুমি বললে না যখন প্রবেশ করলে তোমার বাগানে তার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে এটি ঐ জিনিস যা চেয়েছেন আল্লাহ, নেই কোনো শক্তি আল্লাহ ছাড়া। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ধনসম্পদ ও সন্তানাদি প্রাপ্ত হলে مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করে সে তাতে কোনো অপছন্দনীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করবে না। যদি তুমি মনে কর আমাকে أَنَا হলো দুটি মাফঊলের মাঝে পার্থক্যকারী যমীর ধনে ও সম্পদে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।

٤٠. فَعَسٰى رَبِّيْٓ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ جَوَابُ الشَّرْطِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا جَمْعُ حُسْبَانَةٍ أَيْ صَوَاعِقَ مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا . أَرْضًا مَلْسَاءَ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهَا قَدَمٌ .

৪০. তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এটি جَوَاب شَرْط এবং পাঠাবেন তোমার বাগানে গজব حُسْبَانًا শব্দটি حُسْبَانَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– বিদ্যুৎ চমক। আকাশ থেকে, যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। মসৃণ ভূমি যাতে পা স্থির থাকে না।

٤١. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا بِمَعْنٰى غَائِرًا عَطْفٌ عَلٰى يُرْسِلَ دُوْنَ تُصْبِحَ لِأَنَّ غَوْرَ الْمَاءِ لَا يَتَسَبَّبُ عَنِ الصَّوَاعِقِ فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا . حِيْلَةً تُدْرِكُهٗ بِهَا .

৪১. অথবা তার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হবে غَوْرًا শব্দটি غَائِرًا -এর অর্থে। এর عَطْف হবে يُرْسِلَ -এর সাথে يُصْبِحَ -এর সাথে নয়। কেননা পানি বর্ষিত হয় বিজলীর কারণে; গর্জনের কারণে নয়। এবং তুমি কখনো তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। এমন কৌশল যার মাধ্যমে তা লাভ করবে।

٤٢. وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ بِأَوْجُهِ الضَّبْطِ السَّابِقَةِ مَعَ جَنَّتِهٖ بِالْهَلَاكِ فَهَلَكَتْ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا عَلٰى مَا أَنْفَقَ فِيْهَا فِيْ عِمَارَةِ جَنَّتِهٖ وَهِيَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا دَعَائِمِهَا لِلْكَرْمِ بِأَنْ سَقَطَتْ ثُمَّ سَقَطَ الْكَرْمُ وَيَقُوْلُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا .

৪২. তার ফল সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল। ثَمَرٌ শব্দে পূর্বে বর্ণিত তিনটি পঠনই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ বাগান সমুদয় ফল-ফলাদিসহ বিনষ্ট হয়ে যায়। এবং সে হাত কচলাতে লাগল আক্ষেপ ও লজ্জায় তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য বাগান আবাদ করার জন্য। যখন তা মাচানসহ ভূমিসাৎ হয়ে পড়ল আঙ্গুরের মাচান। এভাবে যে প্রথমে মাচান ভূপাতিত হলো। অতঃপর আঙ্গুর পতিত হয়েছে। সে বলতে লাগল, হায়! يَا সতর্ক করার জন্য আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের সাথে শরিক না করতাম।

অনুবাদ :

٤٣. وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِئَةٌ جَمَاعَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِنْدَ هَلَاكِهَا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ـ عِنْدَ هَلَاكِهَا بِنَفْسِهِ ـ

৪৩. আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোনো লোকজন ছিল না। تَكُنْ শব্দটি يَاء ও تَاء উভয়ভাবে পঠিত। তা ধ্বংসের সময় এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলো না তা ধ্বংসের সময় নিজের পক্ষ থেকেও কোনো সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি।

٤٤. هُنَالِكَ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الْوَلَايَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ النُّصْرَةُ وَبِكَسْرِهَا الْمُلْكُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ط بِالرَّفْعِ صِفَةُ الْوَلَايَةِ وَبِالْجَرِّ صِفَةُ الْجَلَالَةِ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا مِنْ ثَوَابِ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ يُثِيْبُ وَّخَيْرٌ عُقْبًا ـ بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُوْنِهَا عَاقِبَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَنَصْبِهِمَا عَلَى التَّمْيِيْزِ ـ

৪৪. সেখানে কিয়ামতের দিন কর্তৃত্ব وَلَايَةٌ শব্দে وَاوْ টি যবর যোগে পঠিত, অর্থ– সাহায্য করা। আর وَاوْ টি যের যোগে পঠিত হলে অর্থ হবে– মালিক হওয়া। আল্লাহরই, যিনি সত্য اَلْحَقّ শব্দটি رَفْع বা পেশ যোগে পঠিত হলে এটি اَلْوَلَايَةُ -এর সিফত হবে। আর جَرّ বা যের যোগে পঠিত হলে اَللّٰهِ শব্দের সিফত হবে। পুরস্কার দানে তিনি শ্রেষ্ঠ অন্য কেউ যদি প্রতিদান দিত তাহলে তিনি শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ প্রতিদান দিতে পারে না। এবং পরিণাম নির্ধারণে শ্রেষ্ঠ عُقْبًا শব্দের قَافْ টি পেশ ও সুকূন উভয়ভাবেই পড়া যায়। আর تَمْيِيْز হিসেবে তাতে নসব হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَوْلَا : শব্দটি تَخْصِيْصِيَّة তথা প্রস্তুত করা, সন্তুষ্ট করা, সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

اِذْ دَخَلْتَ-এর ظَرْف টা مُقَدَّمْ হয়েছে। مَا شَاءَ اللّٰهُ বাক্যটি مَوْصُوْل ও صِلَة মিলে উহ্য মুবতাদা মাহযূফের খবর হয়েছে। উহ্য ইবারত اَلْاَمْرُ مَا شَاءَ اللّٰهُ হলো মুবতাদা। আর তার خَبْر হলো كَائِنٌ যা উহ্য রয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, مَا হলো شَرْطِيَّة আর شَرْط جَوَاب উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَىُّ شَىْءٍ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ بِاللّٰهِ এটা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে لَائِ نَفِي جِنْس -এর খবর।

قَوْلُهُ اِنْ تَرَنِ : اِنْ হলো حَرْف شَرْط আর تَرَن হলো فِعْل مَجْزُوْم বা জযমযুক্ত ফে'ল। সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর মধ্যে نُوْن -এর পূর্বে يَاء যা লাম কালিমা উহ্য রয়েছে। نُوْن وِقَايَة আর يَاء যমীর مُتَكَلِّمْ -এর জন্য। উহ্য প্রথম মাফঊল। نُوْن -এর নিচে যের হলো তার নিদর্শন। আর رُؤْيَت قَلْبِىْ দ্বারা رُؤْيَت উদ্দেশ্য। আর اَنَا দুই মাফঊলের মাঝে ضَمِيْر فَصْل তাকিদের জন্য। اَقَلَّ হলো مَفْعُوْل ثَانِىْ আর مَالًا এবং وَلَدًا হলো تَمْيِيْز আর فَعَسٰى হলো جَوَاب شَرْط। আর যদি تَرَن দ্বারা رُؤْيَت بَصَرِىْ উদ্দেশ্য হয় হবে اَقَلَّ টা حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে।

قَوْلُهُ يُؤْتِيَنِ : এ শব্দের শেষে مُتَكَلِّمْ -এর যমীর يَاء উহ্য রয়েছে يُؤْتِيَنِ সীগাহটি মুযারে' -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বাবে اِفْعَالْ হতে অর্থ– দেওয়া।

قَوْلُهُ حُسْبَانًا : এর অর্থ হলো– গরম বাতাসের ঝড়, শাস্তি।

حُسْبَانٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে غُفْرَانٌ ওজনে মাসদার অর্থ– হিসাব তথা مِقْدَارٌ قَدَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهَا -এর একবচন হলো حُسْبَانَةٌ

قَوْلُهُ تُصْبِحُ : এটা فِعْل نَاقِص তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هِيَ হলো তার اِسْم আর صَعِيْدًا زَلَقًا মওসূফ সিফত মিলে হলো তার খবর।

قَوْلُهُ وَيُصْبِحُ : এর عَطْف পূর্ববর্তী জুমলা يُرْسِلُ -এর উপর হয়েছে। تُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا -এর উপর নয়। যদি حُسْبَانٌ -এর তাফসীর عَذَابٌ مُطْلَق দ্বারা করা হয় তখন يُصْبِحَ -এর আতফ فَتُصْبِحَ -এর উপর করা বৈধ হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার আজাব ফলবাগানকে উদ্ভিদশূন্য মরুদ্যানে পরিণত করার ও পানি নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার কারণ। غَوْرًا টা غَائِرٌ -এর অর্থে, যাতে করে حَمل করা বৈধ হতে পারে। অন্যথায় مُبَالَغَة হিসেবে زَيْدٌ عَدلٌ -এর অনুরূপ প্রয়োগ করা হবে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا : এটা يقلب -এর متعلق হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَوْجُهِ الضَّبْطِ السَّابِقَةِ : এর উদ্দেশ্য হলো ثَمَرٌ -এর মধ্যে পূর্বে যে তিনটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। এখানেও সেই কেরাতগুলো প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا : এ শব্দ দুটি বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يُقَلِّبُ -এর صِلَة হলো عَلٰى এজন্য বৈধ হবে যে, يُقَلِّبُ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا -এর অর্থে হয়েছে। অন্যথায় يُقَلِّبُ -এর صِلَه টা عَلٰى হতে পারে না। تَحَسُّرًا এটা يُقَلِّبُ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ خَاوِيَةٌ : এটা اِسْم فَاعِلٌ হলেও অর্থগত ভাবে اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হবে অর্থ হলো– পতিত জিনিস।

قَوْلُهُ عُرُوْشٌ : শব্দটি عَرْشٌ -এর বহুবচন, অর্থ– বেড়া, কাঠামো, ডালপালা দ্বারা নির্মিত ছাদ।

قَوْلُهُ دَعَائِمُ : এটা دَعَامَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– মাচান, ছাদ।

قَوْلُهُ يَنْصُرُوْنَهٗ : এটি جُمْلَة হয়ে فِئَةٌ -এর صِفَت اَوَّلْ আর مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এটা كَائِنَةٌ -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে صِفَت ثَانِيْ

قَوْلُهُ هُنَالِكَ : এটা خَبَر مُقَدَّمْ আর اَلْوِلَايَةُ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ - لِلّٰهِ হলো خَبَر ثَانِيْ আর اَلْحَقُّ টি اَلْوِلَايَةُ -এর সিফত হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। আর যদি اَلْحَقِّ -এর নিচে যের দেওয়া হয় তবে তা اَللّٰهِ -এর সিফত হবে। আর عُقْبًا এটা تَمْيِيْز - আর عُقْبَ অর্থ হলো– প্রতিদান, ছওয়াব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ : অর্থাৎ মু'মিন ভাই তার সম্পদশালী অহংকারী কাফের ভাইকে বলল, তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন অহংকার করে একথা কেন বললে যে, আমার এই বাগান স্থায়ী সম্পদ? কেন এ কথা বললে না যে, আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগান আবাদ রাখবেন, ইচ্ছা হলে বরবাদ করে দিবেন?

অহংকার পতনের মূল : বস্তুত ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত, কিন্তু যদি ধন-সম্পদের কারণে মানব অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়, মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয়, তবে সেই ধন-সম্পদ তার জন্যে বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অহংকার মানুষের পতনের কারণ হয়। তাই তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জনশক্তির জন্য গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা– مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ যা আল্লাহ তা'আলার মর্জি, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। এভাবে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রাপ্ত সম্পদের জন্য দরবারে এলাহীতে শুকরগুজার থাকা। কেননা মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব এক আল্লাহ তা'আলারই দান। যদি তিনি দান করেন তবে মানুষ পায়, আর যদি তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন তবে কেউ তাকে দিতে পারে না। এজন্য হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মানুষ যখন সুখ শান্তিতে থাকে বা কোনো সুখসামগ্রী লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো– مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। যদি সে এ কথাটি বলে, তবে তার ধন-সম্পদ সর্বপ্রকার বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ নিজের ধন-সম্পদ বা বাড়ী ঘর দেখে এই দোয়া পাঠ করে তা মানুষের বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকে।

এ আয়াতের উপর বুজুর্গানে দ্বীনের আমল : আল্লামা বগভী (র.) হিশাম ইবনে ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া যখন তার কোনো পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দেখতেন, অথবা তার কোনো বাগানে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন–
مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন ইবনে শিহাব যখন নিজের ধন-সম্পদ দেখতেন, তখন বলতেন–
مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এমনিভাবে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বাড়ির ফটকেও লেখা ছিল– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
আর তার কারণ হলো আলোচ্য আয়াত।

বর্ণিত আছে যে হযরত মূসা (আ.) তাঁর কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজি পেশ করেছেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের আয়োজন পূরণে হয়। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন– مَا شَآءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি অনেক আগে এই প্রয়োজনের আরজি পেশ করেছিলাম, আর ঠিক এ মুহূর্তে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে মূসা! তুমি যে مَا شَآءَ اللّٰهُ বলেছ তা তোমার কাম্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী হয়েছে।

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করছেন, আমি কি জান্নাতের একটি দ্বারের কথা বলবো না? তখন তিনি বললেন, কোন দ্বার? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তখন বললেন– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত আবূ ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর ﷺ হযরত আবূযর (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটি বাক্য শিখাবো না? তখন তিনি বললেন, জী-হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেছেন, আমাকে প্রিয়নবী ﷺ আদেশ দিয়েছেন, যেন আমি অধিক পরিমাণে পাঠ করি
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

মুসনাদে আহমদে আছে, হুজুরে পাক ﷺ ইরশাদ করেন, আমি কি জান্নাতের একটি ভাণ্ডারের কথা তোমাদেরকে বলে দিব? সেই ভাণ্ডার হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আমার এই বান্দা মেনে নিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, শুধু مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -ই নয়; বরং তা-ও যা সূরা কাহফে আছে। অর্থাৎ– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

–[তাফসীরে নূরুল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. ৪২১-৪২৪]

قَوْلُهُ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا الخ - আয়াতের মর্মকথা : এই আয়াত দ্বারা কয়েকটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো–

১. সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।
২. বিপদের মুহূর্তে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।
৩. অতএব এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য।
৪. যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের কর্মফল বা ছওয়াব কখনো বাতিল হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বদলা দিয়ে থাকেন।
৫. এই ক্ষণস্থায়ী জগতের কোনো সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা এখানকার সবকিছুই নিতান্ত সাময়িক এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর; যে কোনো সময় সম্পদ বা শক্তি বিদায় নিতে পারে। যদি সম্পদ ও শক্তি থাকেও, তবু যে ব্যক্তিকে এই সম্পদ ও শক্তি প্রদান করা হয় তাকে সবকিছু ফেলে নির্ধারিত সময়ে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়।
৬. অতএব মনো-ভুবনে স্থান থাকবে এক আল্লাহ তা'আলার আর কারো নয়, আর কোনো কিছুরও নয়। যদি দুনিয়ার সম্পদ থাকে তবে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না থাকে তবুও আলহামদুলিল্লাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককারদের জন্যে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে অনন্ত অসীম নিয়ামত রেখে দিয়েছেন।
৭. কোনো লোককে দুনিয়ার সম্পদ বা ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করা হলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করেছে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাকেও দান করেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আখিরাতের নিয়ামত শুধু তাকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

অনুবাদ :

٤٥. وَاضْرِبْ صَيِّرْ لَهُمْ لِقَوْمِكَ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ كَمَاءٍ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ تَكَاثُفَ بِسَبَبِ نُزُوْلِ الْمَاءِ نَبَاتُ الْاَرْضِ وَامْتَزَجَ الْمَاءُ بِالنَّبَاتِ فَرَوٰى وَحَسَنَ فَاَصْبَحَ فَصَارَ النَّبَاتُ هَشِيْمًا يَابِسًا مُتَفَرِّقَةً اَجْزَاؤُهٗ تَذْرُوْهُ تُثِيْرُهٗ وَتُفَرِّقُهُ الرِّيٰحُ ط فَتَذْهَبُ بِهِ الْمَعْنٰى شَبَّهَ الدُّنْيَا بِنَبَاتٍ حَسَنٍ فَيَبِسُ وَتَكَسَّرُ فَفَرَّقَتْهُ الرِّيَاحُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الرِّيْحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا قَادِرًا .

৪৫. বর্ণনা করুন পেশ করুন তাদের নিকট আপনার সম্প্রদায়ের সামনে পার্থিব জীবনের উপমা এটি প্রথম মাফঊল এটা পানির ন্যায় দ্বিতীয় মাফঊল যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি, যা দ্বারা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয় পানি বর্ষণের ফলে ঘন হয় ভূমিজ উদ্ভিদ এবং পানি উদ্ভিদের সঙ্গে মিশে খুব হৃষ্ট-পুষ্ট ও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ছড়িয়ে দেয় ও বিচ্ছিন্ন করে দেয় বাতাস। সারকথা দুনিয়াকে এমন উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা পূর্বে তরতাজা ছিল। অতঃপর তা শুকিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বাতাসের সাথে মিশে গেছে। অপর এক কেরাতে اَلرِّيْحُ পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে শক্তিমান ক্ষমতাবান।

٤٦. اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج يُتَجَمَّلُ بِهِمَا فِيْهَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ هِىَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ . خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا . اَىْ مَا يَأْمُلُهُ الْاِنْسَانُ وَيَرْجُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা যা দ্বারা এ পৃথিবীর সাজসজ্জা লাভ হয়। আর স্থায়ী সৎকর্ম অর্থাৎ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ আর কেউ কেউ এতে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বৃদ্ধি করেছেন। আপনার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কারপ্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আশা আকাঙ্ক্ষা করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِضْرِبْ : اِضْرِبْ-এর তাফসীর صَيِّرْ দ্বারা করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন اِضْرِبْ-এর ব্যবহার مَثَلٌ-এর সাথে হয় তখন এটা দুই মাফঊলের দিকে مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে। আর এ উপমাতে পার্থিব জীবনের শুরু ও শেষকে বৃষ্টির মাধ্যমে উৎপন্ন ঘাসের শুরু এবং শেষের/শেষ পরিণতির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَاءٍ : এর মধ্যে كَافْ অর্থ مَثَلٌ [ন্যায়/মতো] এবং اِضْرِبْ-এর দ্বিতীয় মাফঊল হলো مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا প্রথম মাফঊল। আর اِضْرِبْ এটা صَيِّرْ -এর অর্থে হয়েছে।

كَمَاءٍ এটা هِيَ উহ্য মুবতাদার খবর। আর اَنْزَلْنَاهُ এটা জুমলা হয়ে مَاءٍ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْهَشِيْمَ : এটা বাবে ضَرَبَ -এর هَشْيًا মাসদার থেকে ব্যবহৃত। অর্থ– টুকরো টুকরো করা, ছিন্ন ভিন্ন হওয়া। هَشِيْمٌ শব্দটি مَهْشُوْمٌ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ رَوٰى : এটা বাবে سَمِعَ থেকে মাসদার رَوًا অর্থ– সজীব সতেজ হওয়া, তরতাজা হওয়া, চাকচিক্যময় হওয়া, মনোমুগ্ধকর হওয়া।

قَوْلُهُ شَبَّهَ : এটা فِعْل اَمْر -এর فَاعِلٌ রাসূল ﷺ زِيْنَةٌ শব্দটি মাসদার اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হয়েছে। যাতে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন সবই সমান। এ কারণেই زِيْنَةٌ শব্দটি اَلْمَالُ এবং اَلْبَنُوْنَ উভয়েরই খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ : এটা এমন একটি কিয়াস যার كُبْرٰى এবং نَتِيْجَة উহ্য রয়েছে। কিয়াসের তারতীব হচ্ছে كُلُّ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَكُلُّ مَا هُوَ زِيْنَتُهَا فَهُوَ هَالِكٌ ـ فَالْمَالُ وَالْبَنُوْنَ هَالِكٌ এরপর বলা হবে مَا هُوَ هَالِكٌ لَا يُفْتَخَرُ بِهِ فَالْمَالُ وَالْبَنُوْنَ لَا يُفْتَخَرُ بِهِمَا

قَوْلُهُ اَلْبَاقِيَاتُ : এটা হলো صِفَتٌ ; -এর مَوْصُوْف উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَلْكَلِمَاتُ বা اَلْاَعْمَالُ

قَوْلُهُ خَيْرًا : এটা اِسْم تَفْضِيْل কিন্তু এটা তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ব্যাখ্যাকার بِسَبَبِ النُّزُوْلِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِهِ -এর মধ্যে بَاء টি سَبَبِيَّه

قَوْلُهُ اِمْتَزَجَ الْمَاءُ : এখান থেকে اِخْتَلَطَ -এর দ্বিতীয় তাফসীরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে اِمْتِزَاجٌ যেহেতু উভয়ের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। এ কারণেই اِمْتِزَاجٌ-এর নিসবত পানি ব্যতীত উদ্ভিদের দিকে করা বৈধ। যদিও উরফ এবং ব্যবহার এর বিপরীত। উরফ ও লুগাতে بَاء টি كَثِيْر غَيْر طَارِىْ -এর উপর দাখিল হয়। যেমন اِمْتَزَجَ الْمَاءُ بِاللَّبَنِ [পানি দুধে মিশ্রিত হয়ে গেছে, দুধ পানিতে মিশেনি।] এখানে بَاء টি كَثِيْر طَارِىْ -এর উপর দাখেল হয়েছে পানি আধিক্যের ক্ষেত্রে مُبَالَغَة করার জন্য। আর যদি দুধ কম হয় এবং পানি বেশি হয়, তখন বলা হবে اِمْتَزَجَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ [দুধ পানিতে মিশে গেছে] এমনিভাবে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে এটা বলা উদ্দেশ্য যে, পানি এত বেশি যে, মনে হয় পানিই মূল।

قَوْلُهُ اَمَلًا : اَمَلًا -এর তাফসীর مَا يَاْمِلُهُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَمَلًا মাসদার, এটা اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল একথা জানিয়ে দেওয়া যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। আর আলোচ্য আয়াতেও এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরো একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– দুনিয়ার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কোনো স্থায়িত্ব নেই, এ জগত ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, এ জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই অস্থায়ী। তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ যেসব লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে গর্ব করে অহংকারী হয় তাদের উদ্দেশ্যে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। দুনিয়ার জীবন সেই পানির ন্যায় যা আমি আসমান থেকে অবতরণ করি, শুষ্ক জমিনে বৃষ্টিপাত হয় তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই তাতে সজীবতা আসে, তরুলতা জন্মায়, কয়েক দিনের মধ্যেই মাঠের রং পরিবর্তন হয়ে যায়, সবুজের মেলা বসে, সবুজ তরুলতায় মাঠ ভরে উঠে, আর ঐ মনোরম দৃশ্য মনকে মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তা কয়দিন, কতক্ষণ? সামান্য কয়েকদিন অতিবাহিত

হওয়ার পরই ফসল কেটে আনা হয় এবং যা মাটিতে অবশিষ্ট থাকে তা ধূলির ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকে। সবুজের মেলা কোথাও খুঁজেও পাওয়া যায় না। এজন্য কবি বলেছেন–

چند روزان زندگی مثل حباب آب هے

ای نظام دور عالم بس تجهے آداب هے

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে মানুষের কয়েক দিনের জীবন যেন পানির বুদবুদ, হে বিশ্ব! তোমাকে সালাম জানিয়ে বিদায় হই।

দুনিয়ার অবস্থা ঠিক এরূপই, এমন একদিন আসবে যখন এই পাহাড় পর্বত এই বৃক্ষ তরুলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আকাশ ও ইমারতগুলোর কোনো চিহ্ন থাকবে না। এখানকার সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য সবই বিদায় নেবে, সারা পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। অতএব, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই অস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ শান্তি ভুলে থাকা নিতান্ত বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীকে যিনি আবাদ করেছেন, যিনি তাকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনিই তার সবকিছু শেষ করে দিবেন।

قَوْلُهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا : আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করার সময় নিয়ামতদাতাকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। বর্তমান ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

অর্থাৎ ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেক আমলের উত্তম প্রতিদান এবং উত্তম আশা রয়েছে।

বস্তুতঃ ধন-সম্পদ হোক অথবা সন্তান সন্তুতি ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের শোভা মাত্র। এসবই দুদিনের সাথী, যখন মানুষের জীবনের অবদান ঘটে মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে তখন সবই বিদায় নেয়, মানুষ পৃথিবীতে একা আসে এবং একাই চলে যায়, অর্থ–সম্পদ সঙ্গে যায় না, যায় না সন্তান-সন্ততি বা কোনো আপনজন।

نہ قسمت ساتھ جائیگی نہ دولت ساتھ جائیگی * نہ عظمت ساتھ جائیگی نہ صولت جائیگی

جو کچھ پوچھے جائیگے محشر میں وہ نیک اعمال ہیں تیرے * جو کچھ کام ائینگے وہ نیک افعال ہیں تیرے

অর্থাৎ তোমার সৌভাগ্য বা সম্পদ তোমার সঙ্গে যাবে না। উচ্চ মর্যাদা, সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো কিছুই সঙ্গে যাবে না। পরকালীন জিন্দেগীতে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে নেক আমল কি নিয়ে এসেছো। বস্তুত শুধু নেক আমলই সেদিন কাজে আসবে। ইরশাদ হয়েছে– وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাইয়্যান ও হাকিম হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (র.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– যত বেশি সম্ভব بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ অর্জন কর। নিবেদন করা হলো– بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ কি? তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করা। হাকিম (র.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ওকায়লী নো'মান ইবনে বশীরের উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ এগুলোই হচ্ছে بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার বরাতে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি বর্ণনা করেছে যে– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ কালেমাটি আমার কাছে সেসব বস্তুর চেয়ে অধিক প্রিয় যেগুলোর উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারাবিশ্বের চেয়ে অধিক প্রিয়।

হযরত জাবের (রা.) বলেন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কালেমাটি অধিক পরিমাণে পাঠ কর। কেননা এটি রোগ ও কষ্টের নিরানব্বইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতের بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ শব্দটির তাফসীর তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরিউক্ত কালেমাসমূহ পাঠ করা বুঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, মাসরূক ও ইবরাহীম (র.) বলেন যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ -এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামাজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ বলে উপরিউক্ত কালেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বুঝানো হয়েছে। তা পাঞ্জেগানা নামাজই হোক অথবা অন্যান্য সৎকর্ম হোক, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাদাতা (রা.) থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। -[মাযহারী]

এ তাফসীর কুরআনের শব্দাবলিরও অনুকূল বটে। কেননা بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎকর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জারীর, তাবারী ও কুরতুবী (র.) এ তাফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, শস্যক্ষেত্র দু'রকম। দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর পরকালের শস্যক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ হচ্ছে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎকর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবাইদ ইবনে ওমর (র.) বলেন- بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ হচ্ছে নেক কন্যা সন্তান। তারা পিতামাতার জন্য সর্ববৃহৎ ছওয়াবের ভাণ্ডার। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এর সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করল, হে আল্লাহ তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালনপালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। -[কুরতুবী]

তবে بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হলো- بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ দ্বারা সে সকল ভালো কর্মসমূহ উদ্দেশ্য যার ফলাফল সর্বদা অব্যাহত থাকে। যেমন- কাউকে ইলম শিক্ষা দিল, যা সর্বদাই চলতে থাকে বা কোনো ভালো নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন করল বা মসজিদ, বা কূপ বা সরাইখানা বা বাগান বা ক্ষেত আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াকফ করে দিল অথবা স্বীয় সন্তানকে সৎকর্মপরায়ণ আলেমরূপে গঠন করে গেল। এগুলো সবই সদকায়ে জারিয়া। যার বিনিময় ব্যক্তির মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

এ অভিমতটি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এই যে, এটা পূর্বোক্ত সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে নামাজ রোজা, হজ, হাদীসে বর্ণিত দোয়া সমূহ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল পবিত্র উক্তি ও কর্ম যার ফলাফল পরকালের জন্য অবশিষ্ট থাকে এই সবগুলোই بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। এই অভিমতকে ইমাম তাবারী ও হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) পছন্দ করেছেন।

-[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০৮]

٤٧. وَاذْكُرْ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ يَذْهَبُ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْاَرْضِ فَتَصِيْرُ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْيَاءِ وَنَصْبِ الْجِبَالِ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ظَاهِرَةً لَيْسَ عَلَيْهَا شَىْءٌ مِنْ جَبَلٍ وَلَا غَيْرِهِ وَحَشَرْنٰهُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فَلَمْ نُغَادِرْ نَتْرُكْ مِنْهُمْ اَحَدًا ـ

অনুবাদ :

৪৭. এবং স্মরণ কর সেদিন আমি পর্বতমালাকে সঞ্চালিত করব। অর্থাৎ পাহাড়কে পৃথিবী হতে উপড়ে ফেলব এবং পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় রূপান্তরিত হবে। অন্য এক কেরাতে نُوْن দ্বারা ى -তে কাসরা দ্বারা। আর اَلْجِبَالُ নসবের সাথে। [এখানে উক্ত কেরাত অনুযায়ই অনুবাদ করা হয়েছে। অন্যথায় মুসান্নিফ (র.)-এর মতে শব্দটি হচ্ছে يَسِيْرُ] আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর প্রকাশ্যভাবে। তাতে পাহাড় ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আমি একত্র করব তাদের সকলকে মু'মিন ও কাফেরদেরকে এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না।

٤٨. وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ـ حَالٌ اَىْ مُصْطَفِّيْنَ كُلُّ اُمَّةٍ صَفٌّ وَيُقَالُ لَهُمْ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ز اَىْ فُرَادٰى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَيُقَالُ لِمُنْكِرِى الْبَعْثِ بَلْ زَعَمْتُمْ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَىْ اَنَّهُ لَنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ـ لِلْبَعْثِ ـ

৪৮. এবং তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এটি حَالٌ বা অবস্থাবাচক অর্থাৎ مُصْطَفِّيْنَ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একেকটি কাতার হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ অর্থাৎ একাকী উলঙ্গ বদনে, খালি পা, খতনাবিহীন অবস্থায়। আর পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদেরকে বলা হবে অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনো উপস্থিত করবো না। اَنْ টি مُثَقَّلَةٌ হতে مُخَفَّفَةٌ করা হয়েছে অর্থাৎ اَنَّهُ

٤٩. وَوُضِعَ الْكِتٰبُ اَىْ كِتَابُ كُلِّ امْرِئٍ فِىْ يَمِيْنِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِىْ شِمَالِهِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ مُشْفِقِيْنَ خَائِفِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيْهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَتَنَا هَلَكَتَنَا وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا فِعْلَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً مِنْ ذُنُوْبِنَا اِلَّا اَحْصٰهَا عَدَّهَا وَ اَثْبَتَهَا تَعَجَّبُوْا مِنْهُ فِىْ ذٰلِكَ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا مُثْبَتًا فِىْ كِتَابِهِمْ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ لَا يُعَاقِبُهُ بِغَيْرِ جُرْمٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابِ مُؤْمِنٍ ـ

৪৯. এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা। যদি মু'মিন হয় তবে ডান হাতে আর যদি কাফের হয় তবে বাম হাতে প্রদান করা হবে। ফলে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন কাফেরদেরকে তাতে যা রয়েছে তার কারণে আতঙ্কগ্রস্ত, আর তারা বলবে অর্থাৎ আমলনামায় লিখিত বদ আমলগুলো দেখে হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! يَاءْ হরফটি সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত। وَيْلَتَنَا শব্দটি هَلَكَتَنَا অর্থে وَيْلُ টি এমন মাসদার যার মূলবর্ণ থেকে কোনো ফে'লের ব্যবহার নেই। এটা কেমন গ্রন্থ তা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না আমাদের পাপরাশি থেকে বরং তা সবই হিসাব করে রেখেছে। তারা তা দৃষ্টে অবাক হয়ে পড়বে তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে তাদের আমলনামায় বিদ্যমান। আর আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না। তিনি কাউকে অপরাধ ছাড়া শাস্তি দিবেন না এবং কোনো মু'মিনের প্রতিদান হ্রাস ও করবেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حَشَرْنَا وَعُرِضُوا وَوُضِعَ : উল্লিখিত তিনটি ফে'ল مَاضِى-এর সীগাহ হওয়া সত্ত্বেও এখানে مُضَارِعْ-এর অর্থ- প্রদান করবে। নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হওয়া বুঝানোর প্রতি ইঙ্গিত করে মাজীর সীগাহ আনা হয়েছে। لَمْ نُغَادِرْ-এর আতফ হয়েছে حَشَرْنَا-এর উপর। কেননা لَمْ نُغَادِرْ টা لَمْ-এর কারণে مَاضِى مَنْفِى-এর অর্থে হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ صَفًّا : এটা عُرِضُوا ফে'ল এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে বহুবচন রয়েছে।

يَسِيْرُ-এর তাফসীর يَذْهَبُ بِهَا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, يَسِيْرُ ফে'ল টা بَاءْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে। আর اَلْجِبَالُ হলো তার প্রথম মাফউল।

হযরত হাসান, ইবনে কাছীর ও আবূ আমের (র.) تَسْيِيْرُ الْجِبَالُ-কে مَجْهُوْل পড়েছেন এবং اَلْجِبَالُ-কে نَائِبْ فَاعِلْ বলেছেন এবং جِبَالُ-কে مَفْعُوْل বলেছেন। আর ইবনে মাহিস (র.) تَسِيْرُ الْجِبال পড়েছেন এবং اَلْجِبَالُ-কে فَاعِلْ আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বাকূন (র.) نُسَيِّرُ الْجِبَالَ পড়েছেন এবং اَلْجِبَالُ -কে مَفْعُوْل আখ্যা দিয়েছেন আর আল্লাহ তা'আলাকে فَاعِلْ বলেছেন। উল্লেখ্য যে, نُسَيِّرُ শব্দটি উহ্য فِعْل - اُذْكُرْ-এর যরফ হয়েছে।

قَوْلُهُ نُغَادِرْ : এর তাফসীর نترك দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে نُغَادِرْ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে যদিও উভয়প্রান্ত থেকে ফে'লকে কামনা করে। কিন্তু এখানে طَرَفَيْن থেকে ফে'ল উদ্দেশ্য নয়; غَادَرَ অর্থ হলো غَدَّرَ অর্থাৎ تَرَكَ আর এটা عَاقَبْتُ اللِّصَّ-এর সম্প্রদায়ভুক্ত।

قَوْلُهُ مُصْطَفِّيْنَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَفًّا যদিও مُفْرَدْ কিন্তু মাসদার হওয়ার কারণে অর্থের মধ্যে বহুবচনের অর্থ রয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَاءٍ : এটা হয়তো মাফউলে মুতলাক। অথবা ضَمِيْر مَرْفُوْع হতে حَالٌ হয়েছে। প্রথম সূরতে كَمَاءٍ মাসদার মাহযুফের সিফত হয়েছে। অর্থাৎ فَجِئْنَا كَائِنًا كَمَاءٍ

قَوْلُهُ اَنْ لَنْ : এখানে দুটি বর্ণ রয়েছে। প্রথমটি হলো مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ তার اِسْم হলো উহ্য ضَمِيْر شَانْ অর্থাৎ اَنَّهُ আর لَنْ نَجْعَلَ الخ বাক্যটি তার খবর।

দ্বিতীয় শব্দ لَنْ এটা নসবদাতা বর্ণ اَنْ كَانُوْا-কে لَنْ-এর لَا-এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। আর কুরআনের رَسْم اَلْخَطُّ-এর মধ্যে نُوْن-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আর لَكُمْ হলো نَجْعَلَ ফে'লের দ্বিতীয় মাফউল। আর مَوْعِدًا হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهُ كِتَابُ كُلِّ امْرِئٍ : শারেহ (র.) اَلْكِتَابُ-এর তাফসীর كِتَابُ كُلِّ امْرِئٍ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلْكِتَابُ-এর اَلِفْ لَامْ টি مُضَافْ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে এসেছে।

قَوْلُهُ مُشْفِقِيْنَ : এর তাফসীর خَائِفِيْنَ করার অর্থ অর্থকে নির্ধারণ করা। কেননা مُشْفِقِيْنَ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে ভীতি, ভয় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَا لِهٰذَا الْكِتَابُ : এর মধ্যে مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ যা مُبْتَدَأٌ আর এই ইস্তেফহাম হলো تَوْبِيْخِىْ আর ل টি حَرْفُ جَارْ - هٰذَا ইসমে ইশারা اَلْكِتَابُ হলো مُشَارٌ اِلَيْهِ

لِهٰذَا-এর لَامْ কুরআনের رَسْمُ الْخَطْ-এর মুতাবেক هٰذَا থেকে পৃথক লেখা হয়। যথা– ل هٰذَا মাসহাফে উসমানীতে এভাবে লেখা হয়েছে।

قَوْلُهُ صَغِيْرَةً وَكَبِيْرَةً : এর মওসূফ হচ্ছে هَنَّةً বা উহ্য فِعْلَةً আবার مَعْصِيَةٌ-কেও উহ্য ধরা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ .... وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا : এ আয়াতে কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কিয়ামত যখন কায়েম হবে তার পূর্বে পাহাড় পর্বত কোনো কিছুই থাকবে না। সবকিছু নিজ নিজ স্থান ছেড়ে চলে যাবে, বড় বড় পাথরগুলো তুলার ন্যায় শূন্যে উড়তে থাকবে, বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। সমগ্র মানবজাতিকে সেদিন আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে, কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

اے عاقل نہو غافل تجھے دنیا سے جانا ہے * تجھے اخر خدا کو منہ اپنا ایك دن دیکھانا ہے

হে বুদ্ধিমান! গাফেল হয়ো না তোমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। অবশেষে তোমাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে।

বস্তুত এ জগত ও জীবন যেমন সত্য, তেমনি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীও সত্য। ইতিপূর্বে আমরা এই পৃথিবীতে ছিলাম না, এখন আছি একথা সত্য, এমন একদিন আসবে যখন আমরা থাকবো না, একথা সত্য। প্রশ্ন হলো, কোথায় যাব? আখিরাতে দুটি স্থান রয়েছে। যারা ঈমানদার এবং নেককার হবে তাদের জন্য জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা বেঈমান ও বদকার হবে তাদের জন্য দোজখ।

قَوْلُهُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً الخ : অর্থাৎ আর হে রাসূল ﷺ! আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবীকে একটি উন্মুক্ত ময়দান, তাতে থাকবে না কোনে ইমারত এবং থাকবে না কোনো পাহাড় পর্বত।

ইমাম কাতাদা (র.) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু তাফসীরকার আতা (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জমিনের অভ্যন্তরীণ অংশ উপরে উঠে আসবে এবং মৃত ব্যক্তিরা বের হয়ে আসবে।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২১, তাফসীরে কাবীর খ. ২১. পৃ. ১৩৩]

কিয়ামতের পূর্বের অবস্থা : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কিয়ামতের দিনের পূর্বের কিছু ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন আসমান ফেটে যাবে, পাহাড় তুলার ন্যায় উড়ে যাবে, সারা পৃথিবী একটি উন্মুক্ত ময়দানে রূপান্তরিত হবে। উঁচু নিচু স্থান একাকার হয়ে যাবে। কোনো বাড়ি ঘর থাকবে না, কোনো তরুলতা পাথরের অস্তিত্ব থাকবে না। সেদিন সমগ্র মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত করা হবে। ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অনুমতি দেবেন তারা ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। যারা পৃথিবীতে কিয়ামতের এই দিনকে অস্বীকার করতো তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে–

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ তোমরা যে মহা সত্যকে অস্বীকার করতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করতে না, অবশেষে সেই কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন তোমরা হয়েছো। যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা হাজির হয়েছো। অর্থাৎ নগ্ন দেহে তোমরা আমার দরবারে হাজির হয়েছো। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু, পারা– ১৫, পৃ. ১০২]

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফে এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমাদেরকে কবর থেকে বের করে নগ্ন দেহে নগ্ন পায়ে আল্লাহর তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে। তখন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পোষাক পরিধান করানো হবে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্ন পায়ে নগ্ন দেহে বিবস্ত্র অবস্থায় হাজির করা হবে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তখন পুরুষ ও নারী সকলেই কি এক সাথে থাকবে এবং একে অন্যকে তারা দেখবে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আয়েশা! তখন অত্যন্ত কঠিন সময় হবে [অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবস্থা থাকবে না।]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত উম্মে সালামা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের নাকি অন্যকে নগ্ন অবস্থায় উঠতে হবে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, লোকেরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজে ব্যস্ত থাকবে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, প্রত্যেকের সম্মুখে তার জীবনের আমলনামা রাখা হবে, যাতে তার ছোট বড় সকল কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২২২]

যারা পাপিষ্ঠ তারা তাদের অন্যায় কাজের বিবরণ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হবে। আর আক্ষেপ করে বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা আমাদের জীবনকে গাফলতের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। হায় আক্ষেপ! আমরা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলাম, আর কি বিস্ময়কর এই গ্রন্থ, এতে কোনো কিছুই বাদ পড়েনি।

তাবারানীতে একটি বর্ণনা রয়েছে, বর্ণনাকারী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বলেন, যে আমরা হুনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রিয়নবী ﷺ এক জায়গায় অবস্থান করলেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা যাও, জ্বালানী বা কাষ্ঠখণ্ড বা ঘাস যা কিছু পাও নিয়ে এসো! আমরা এদিক সেদিক চলে গেলাম। এ সম্পর্কীয় যা পাওয়া গেল আমরা সবকিছু সংগ্রহ করে স্তুপাকারে একত্র করলাম। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা দেখছো, এভাবে গুনাহগুলো একত্র হয়ে স্তুপ আকার ধারণ করে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, ছোট বড় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা সবকিছু লিপিবদ্ধ হচ্ছে, ভালোমন্দ যে যা করে সে সবই দেখতে পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ـ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ـ

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন প্রত্যেকে তার ভালো এবং মন্দ সর্বপ্রকার আমল দেখতে পাবে।"

আরো ইরশাদ হয়েছে– يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

অর্থাৎ "সেদিনকে ভয় কর, যেদিন সকল রহস্য উদঘাটিত হবে, যেদিন সকল গোপন তথ্য প্রকাশ পাবে, সেদিন মানুষের কোনো শক্তি থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও সে পাবে না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকার মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই পতাকা তার রানের কাছে হবে, আর ঘোষণা করা হবে এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার চিহ্ন। হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি কোনো সৃষ্টির প্রতি জুলুম করবেন। হ্যাঁ ক্ষমা করা তাঁর গুণ, তাঁর ন্যায় বিচার কায়েম করার লক্ষ্যে তিনি পাপিষ্ঠদেরকে শাস্তিও দিয়ে থাকেন। দোজখ পাপিষ্ঠ এবং অবাধ্য লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। পরে গুনাহগার মু'মিনদেরকে রেহাই দেওয়া হবে, আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম অবিচারও করেন না। তিনি নেক আমলকে বৃদ্ধি করেন, আর গুনাহকে সমানই রাখেন। সেদিন ন্যায় বিচারের পাল্লা সম্মুখে থাকবে, কারো প্রতি অবিচার হবে না। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এ খবর পেলাম যে, এক ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর একখানা হাদীস শ্রবণ করেছিলেন যা তিনি বর্ণনা করেন। আমি ঐ হাদীস বিশেষভাবে শ্রবণ করার জন্যে একটি উষ্ট্র ক্রয় করলাম এবং সফরের অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরি করলাম। একমাস সফরের পর সিরিয়ায় পৌঁছে জানতে পারলাম, তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উয়াইস (রা.)। আমি দ্বার রক্ষীকে বললাম, যাও খবর দাও যে, হযরত জাবের (রা.) দরজায় অপেক্ষমাণ। এ কথা শ্রবণমাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে বললাম, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিয়াস সম্পর্কে কোনো একটি হাদীস শুনেছেন। আমার ইচ্ছা হলো আমি আপনার নিকট থেকে সেই হাদীসটি শ্রবণ করি, এজন্য এখানে এসেছি। আর এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে, এই হাদীস শ্রবণের পূর্বে যেন আমার মৃত্যু না হয়ে যায় বা আপনার মৃত্যু না হয়। এখন আপনি ঐ হাদীস বর্ণনা করুন! তখন তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে একত্র করবেন নগ্ন দেহ, খতনা ব্যতীত, অসহায় অবস্থায়। এরপর একটি ঘোষণা করা হবে যা নিকট দূরের সকলেই শ্রবণ করবে। ঘোষণাটি হচ্ছে– আমি মালিক, আমি প্রতিদান প্রদানকারী, কোনো দোজখী সে পর্যন্ত দোজখে যাবে না। যে পর্যন্ত কোনো জান্নাতীর উপর তার যে হক রয়েছে তা তাকে না দিয়ে দেই। আর কোনো জান্নাতীও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেবে না, যে পর্যন্ত না তার কোনো হক

তাকে না দিয়ে দেই যা কোনো দোজখীর উপর রয়েছে, তা একটি চপেটাঘাতই হোক না কেন। আমরা আরজ করলাম, এই হক কিভাবে দেওয়া হবে, অথচ আমরা সেখানে সকলেই নগ্ন দেহ এবং নগ্ন পা অবস্থায় থাকবো, কোনো অর্থ-সম্পদ বা কোনো আসবাব পত্র আমাদের থাকবে না। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, সেদিন হক নেক আমল এবং বদ আমল দ্বারা আদায় হবে। যে দেনাদার তার নেকী পাওনাদারকে দেওয়া হবে, যদি তবু দেনা শোধ না হয় তবে পাওনাদারের গুনাহের বুঝা দেনাদারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ১৫, পৃ. ১০২ - ৩]

قَوْلُهُ وَ وُضِعَ الْكِتَابُ الخ : বস্তুত কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং পাপিষ্ঠ লোকেরা তাদের পাপের কথা মনে করে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। কেননা, ছোট বড় সবকমের বিবরণ স্থান পাবে আমলনামায়। তাই ইরশাদ হয়েছে- فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

অর্থাৎ [হে রাসূল ﷺ !] আপনি দেখতে পাবেন পাপিষ্ঠরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

وَيَقُوْلُوْنَ يَوَيْلَتَنَا .

আর তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! এ কিতাবের কি হলো ছোট বড় কোনো কিছুই তো বাদ দেয়নি সবই তো এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে اَلْمُجْرِمِيْنَ তাদেরকে বলা হয়েছে যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু আমলনামায় তারও এক একটি হিসাব লিপিবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ ছোট হোক বড় হোক কোনো গুনাহই না লিখে ছাড়েনি। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, সেই সকল গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা কর যে গুলোকে তুচ্ছ মনে করা হয়। তুচ্ছ গুনাহসমূহের উদাহরণ হলো এরূপ যেমন কিছু সংখ্যক লোক একটি উপত্যকায় সমবেত হয়ে কেউ একটি লাকড়ি খুঁজে আনলো অন্যজন আরেকটি লাকড়ি খুঁজে আনলো; [এভাবে এক একটি তুচ্ছ লাকড়ি জমা হয়ে এত হলো] যা রান্না করার জন্য যথেষ্ট হলো। [অর্থাৎ ছোট ছোট তুচ্ছ গুনাহগুলো জমা হয়ে বড় হয়ে যায়। ঐ ছোট গুনাহগুলোও বড় গুনাহের মতো ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। -[বগভী]

নাসায়ী ইবনে মাজাহ এবং ইবনে হিব্বান হযরত আয়েশা (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যেসব গুনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকেও তোমরা বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা, কিয়ামতের দিন] সেগুলো সম্পর্কেও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, তোমরা এমন আমল কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সুক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র। আমরা হুজুর ﷺ -এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

قَوْلُهُ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا - কর্মানুযায়ী প্রতিদান : অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তাফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেননি যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলতেন, এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দকর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে যারা জাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে اَنَا مَالُكَ অর্থাৎ আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্য আগমন করবে। কুরবানির জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গুনাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

কুরআনে এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হবে। উপরিউক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এগুলোতে রূপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আসল অর্থেই থাকে।

কুরআনে এতিমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আগুন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনো আগুনই বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইয়ের বাষ্পকে আগুন বললে তা নির্ভুল হবে কিন্তু এর দাহিকাশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্রোলকে আগুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে। তবে এর জন্য আগুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে, সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শাস্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত এ দুনিয়া থেকে ভিন্নরূপ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا - কিয়ামতের দিন যেভাবে হিসাব হবে : ইমাম রাযী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো বান্দা যে কাজ করেনি তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয় না, আর কোনো ব্যক্তির অন্যায়ের যে শাস্তি হওয়া উচিত তার চেয়ে অধিক পরিমাণে শাস্তি দেওয়া হয় না, এমনিভাবে একজনের অন্যায়ের জন্য অন্যকে শাস্তি দেওয়া হয় না। ইমাম রাজী (র.) এই পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে সম্মুখে রেখে মানুষের হিসাব করা হবে। হযরত ইউসূফ (আ.) হযরত আইয়ূব (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)। যারা গোলাম [বা চাকরিরত] তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি ইবাদত কেন করোনি? সে বলবে, আমিতো অন্য একজনের গোলাম ছিলাম এজন্য ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত ইউসূফ (আ.)-কে ডাকা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, ইউসুফ তোমার ন্যায়ই গোলাম ছিল; কিন্তু আমার ইবাদত থেকে কেউ তাকে বাধা দিতে পারেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ হবে। এরপর এমন একজনকে হাজির করা হবে, যে অসুস্থ বিপদগ্রস্ত। সে বলবে আমিতো বালা মসিবতে আক্রান্ত ছিলাম, আমি কি করে ইবাদত করবো। তখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এই ব্যক্তিকে তোমার চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত করেছি; কিন্তু তার বিপদ তাকে আমার ইবাদত থেকে মাহরুম করেনি। এরপর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। এরপর একজন বাদশাহকে [বা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে] আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি আমল নিয়ে এসেছো? সে বলবে, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি ইবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, এ হলো আমার বান্দা সুলায়মান (আ.)। আমি তাকে তোমার চেয়ে বেশি ক্ষমতা এবং তোমার চেয়ে বেশি সম্পদ দান করেছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ তাকে আমার বন্দেগী থেকে বাধা দেয়নি। এরপর ঐ ব্যক্তিকে দোজখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হবে। -[তাফসীরে কাবীর : খ. ২১, পৃ. ১৩৪-৩৫]

٥٠. وَاِذْ مَنْصُوْبٌ بِاُذْكُرْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ سُجُوْدَ اِنْحِنَاءٍ لَا وَضْعِ جَبْهَةٍ تَحِيَّةً لَهٗ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط كَانَ مِنَ الْجِنِّ قِيْلَ هُمْ نَوْعٌ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَقِيْلَ هُوَ مُنْقَطِعٌ وَاِبْلِيْسُ اَبُو الْجِنِّ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ وَذُكِرَتْ مَعَهٗ بَعْدُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ لَا ذُرِّيَّةَ لَهُمْ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ اَىْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهٖ بِتَرْكِ السُّجُوْدِ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَلْخِطَابُ لِاٰدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَالْهَاءُ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لِاِبْلِيْسَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ تُطِيْعُوْنَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط اَىْ اَعْدَاءٌ حَالٌ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ـ اِبْلِيْسُ وَذُرِّيَّتُهٗ فِىْ اِطَاعَتِهِمْ بَدَلَ اِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

٥١. مَا اَشْهَدْتُّهُمْ اَىْ اِبْلِيْسَ وَذُرِّيَّتَهٗ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ اَىْ لَمْ اُحْضِرْ بَعْضَهُمْ خَلْقَ بَعْضٍ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ الشَّيَاطِيْنَ عَضُدًا ـ اَعْوَانًا فِى الْخَلْقِ فَكَيْفَ تُطِيْعُوْنَهُمْ ـ

অনুবাদ :

৫০. এবং স্মরণ কর এখানে اِذْ টি اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলাম "আদমের প্রতি সেজদা কর" শুধু মাথা ঝুকানোর মতো সেজদা মাটিকে কপাল রাখার সেজদা নয়। তার সম্মানার্থে। তখন তারা সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে জিনদের একজন। কেউ বলেন, তারা ছিল ফেরেশতাদেরই একটি প্রকার। তখন ইস্তেছনাটি মুত্তাসিল হবে। আর কেউ বলেন, ইস্তেছনাটি মুনকাতি, আর ইবলিস হলো জিনদের আদি পিতা এবং তার সন্তান রয়েছে। যার কথা পরে বর্ণিত হয়েছে। আর ফেরেশতাদের কোনো সন্তান নেই। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল অর্থাৎ সেজদার নির্দেশ বর্জন করে আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে গ্রহণ করছ এখানে হযরত আদম (আ.) এবং তার বংশধরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর উভয়স্থানে هَاءْ -এর মারজি হলো ইবলীস। আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করবে। বস্তুত তারা তো তোমাদের শত্রু। এখানে عَدُوٌّ টা اَعْدَاءٌ -এর অর্থে এবং এটি حَالْ হয়েছে। জালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট। অর্থাৎ ইবলীস এবং তার বংশধররা। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের পরিবর্তে তাদের আনুগত্য।

৫১. আমি তাদেরকে ডাকিনি অর্থাৎ ইবলীস ও তার বংশধরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও নয়। অর্থাৎ স্বয়ং তাদের কতেককে সৃষ্টির সময় তাদের কাউকে উপস্থিত রাখিনি। আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে শয়তানদেরকে সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করার নই। অর্থাৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বীয় সাহায্যকারী গ্রহণ করি না। এরপরও তোমরা তাদের আনুগত্য কেন কর?

অনুবাদ :

৫২. وَيَوْمَ مَنْصُوبٌ بِاذْكُرْ يَقُولُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ نَادُوا شُرَكَائِيَ الْاَوْثَانَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ لِيَشْفَعُوا لَكُمْ بِزَعْمِكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لَمْ يُجِيبُوهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْاَوْثَانِ وَعَابِدِيْهَا مَوْبِقًا ـ وَادِيًا مِنْ اَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ يَهْلِكُوْنَ فِيْهِ جَمِيْعًا وَهُوَ مِنْ وَبَقَ بِالْفَتْحِ هَلَكَ ـ

৫২. এবং সে দিনের কথা স্মরণ কর এটা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে যেদিন তিনি বলবেন يَقُوْلُ শব্দটি يَاءٌ এবং نُوْن উভয়রূপেই পঠিত। তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে মূর্তিকে তাদেরকে আহ্বান কর যাতে করে তোমাদের ধারণা মতে সে তোমাদের জন্য সুপারিশ করে। তারা তাদেরকে আহ্বান করবে; কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে না। উত্তর দিবে না। এবং তাদের উভয়ের অর্থাৎ মূর্তি ও তার উপাসকদের মধ্যস্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহ্বর অর্থাৎ জাহান্নামের উপত্যকাসমূহ হতে কোনো একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করে দিব। তারা সকলে তাতে ধ্বংস হয়ে যাবে। مَوْبِقًا শব্দটি وَبَقَ [بَاءٌ বর্ণে যবর সহকারে] হতে মুশতাক বা নির্গত। এর অর্থ হলো- هَلَكَ

৫৩. وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَىْ اَيْقَنُوْا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا اَىْ وَاقِعُوْنَ فِيْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا مَعْدِلًا ـ

৫৩. অপরাধীরা সেদিন আগুন দেখে বুঝবে যে, অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করবে তাঁরা তথায় পতিত হচ্ছে অর্থাৎ তাতে প্রবেশ করছে এবং তারা তা হতে কোনো পরিত্রাণস্থল পাবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَحِيَّةً لَهُ : এটা اُسْجُدُوْا-এর مَعْمُوْل কেউ কেউ বলেছেন كَانَ অর্থ صَارَ অর্থাৎ صَارَ مِنَ الْجِنِّ আর كَانَ مِنَ الْجِنِّ এটা جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ এবং لَمْ يَسْجُدْ-এর ইল্লত।

قَوْلُهُ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ : এখানে فَاءٌ টি تَعْلِيْلِيَّةٌ এবং سَبَبِيَّةٌ উভয়ই হতে পারে। فَسَقَ অর্থ হলো خَرَجَ ; যখন খেজুর স্বীয় চামড়া থেকে বেরিয়ে পড়ে আরবগণ বলে থাকেন- فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا। এমনিভাবে তারা আরো বলেন- فَسَقَتِ الْفَارَةُ مِنْ جُحْرِهَا [ইঁদুর তার গর্ত থেকে বেরিয়ে গেছে]। এটা বাবে نَصَرَ ـ ضَرَبَ ও كَرُمَ হতে ব্যবহৃত হয়। فِسْق-এর পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে- সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাওয়া। অবাধ্য হয়ে যাওয়া, শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম করা।

قَوْلُهُ هُمْ نَوْعٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : এটা হলো مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হওয়ার ব্যাখ্যা। আর اِبْلِيْسُ وَاَبُو الْجِنِّ এটা হলো مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হওয়ার ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ : এখানে হামযাটি অস্বীকার জ্ঞাপক ও পেরেশানি প্রকাশ করার জন্য। আর فَاءٌ হলো تَعْقِيْب-এর জন্য। ذُرِّيَّتَهٗ-এর আতফ تَتَّخِذُوْنَهٗ-এর যমীরের উপর হয়েছে। মুজাহিদ (র.) বলেন যে, ইবলিসের সন্তানাদির মধ্যে لَاقِسْ এবং وَلْهَانْ রয়েছে। এদের কাজ হলো তাহারাতের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেওয়া।

قَوْلُهُ ذُرِّيَّةٌ : এটা اَبُو الْجِنِّ-এর উপর تَفْرِيْع হয়েছে فِسْق-এর তাফসীরে خَرَجَ এনে এর শাব্দিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর عَنْ طَاعَتِهٖ بِتَرْكِ السُّجُوْدِ বৃদ্ধি করে فِسْق-এর পারিভাষিক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ : এখানে হামযাটা উহ্য বস্তুর উপর প্রবেশ করেছে। পরবর্তী فَاءٌ হলো عَاطِفَةٌ মাতূফ আলাইহি উহ্য রয়েছে। এটা اِسْتِفْهَامْ تَوْبِيْخِىْ মূল ইবারত হলো-

اَبَعْدَ مَا حَصَلَ مِنْهُ مَا حَصَلَ مِنَ الْاِبَاءِ وَالْفِسْقِ يَلِيْقُ مِنْكُمْ اِتِّخَاذُهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ ـ

قَوْلُهُ مِنْ دُوْنِيْ : এটা উহ্য বস্তুর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে أَوْلِيَاءْ-এর সিফত হয়েছে। আবার مِنْ دُوْنِيْ-এর مُتَعَلِّقْ টা تَتَّخِذُ-এর সাথেও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ : এটা مَفْعُوْلْ কিংবা فَاعِلْ থেকে حَالْ হয়েছে। عَدُوٌّ মাসদার হওয়ার কারণে أَعْدَاءْ-এর অর্থে হয়েছে। لِلظَّالِمِيْنَ এটা بَدَلْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর بَدَلًا টা بِئْسَ-এর উহ্য ضَمِيْر فَاعِلْ থেকে تَمْيِيْز হয়েছে। আর إِبْلِيْسُ وَذُرِّيَّتُهُ হলো مَخْصُوْصْ بِالذَّمِّ-এর بَيَانْ; মূল ইবারত হলো- بِئْسَ الْبَدَلُ بَدَلًا هُوَ إِبْلِيْسُ وَذُرِّيَّتُهُ

قَوْلُهُ زَعَمْتُمُوْهُمْ شُرَكَائِيْ : এর উভয় মাফঊলই উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ زَعَمْتُمُوْهُمْ شُرَكَائِيْ

قَوْلُهُ رَاٰى : কূফীগণের মতে رَاٰى-এর শেষে يَاءْ লিখা হয়। বসরীগণের মতে লিখতে হয় না। [رَاٰى মূলত رَأَيَ ছিল। হরকতযুক্ত يَاءْ-এর পূর্বাক্ষর مَفْتُوْحْ হওয়ার কারণে يَاءْ-কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করায় رَاٰى হয়ে গেছে। আরবি ভাষায় কূফীগণের رَسْمُ الْخَطْ বা লেখারীতি প্রচলিত। কাজেই رَاٰى-এর শেষে يَاءْ লিখা হবে।

قَوْلُهُ مُوَاقِعُوْا : এটা جَمْعُ مُذَكَّرْ-এর اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ। এটি মূলত ছিল مُوَاقِعُوْنَ; ইযাফতের কারণে نُوْنْ পড়ে গেছে। অর্থ- একে অন্যের নিকটবর্তী হওয়া। মাসদার হলো- مُوَاقَعَةً

قَوْلُهُ مَصْرِفًا : এটা ظَرْفُ مَكَانْ অর্থ হলো- ফিরে আসার স্থান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কতিপয় সম্পদশালী কাফেরের অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরিকরা দাবি করেছিল যে, তারা উচ্চ বংশের লোক এবং তারা ধন সম্পদশালী। অতএব, দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদের সাথে তারা বসবে না। ঠিক এভাবেই ইবলীসও অহংকার করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছিল, হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দেওয়ার আদেশ অমান্য করে বলেছিল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি দিয়ে, তাই আমি আদমকে সিজদা করতে পারি না।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে ইবলীসের ঘটনা বর্ণনা করার কারণ হলো এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তোমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছো তা হলো ইবলীস শয়তানের পন্থা, আর ইবলীস শয়তানের পন্থা হলো ধ্বংসের পন্থা।

সকল অন্যায়ের উৎস হলো অহংকার : অহংকার শুধু একটি মাত্র অন্যায় নয়; বরং সকল অন্যায়ের উৎসই হলো অহংকার, যা শুরু হয়েছিল অভিশপ্ত ইবলীস শয়তান দ্বারা। পক্ষান্তরে বিনয়, আনুগত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করা এসবই যাবতীয় কল্যাণকর কাজের উৎস, যা শুরু করেছিলেন হযরত আদম (আ.)। অতএব, মানবজাতির একান্ত কর্তব্য হলো আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর অনুসরণ করা। কাফেররা অহংকার করেছে আর দারিদ্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় মনে করেছে, ঠিক এমনিভাবে ইবলীস শয়তান অহংকার করেছে এবং হযরত আদম (আ.)-কে হেয় মনে করেছে। অতএব, ইবলীসের শোচনীয় পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে অহংকারীকে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪ পৃ. ৪২৫]

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হলো, মানুষের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার দুটি পন্থা রয়েছে। যথা- ১. অর্থ-সম্পদের লোভ। ২. ইবলীস শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হওয়া। ইতিপূর্বে অর্থ-সম্পদের লোভ এবং অর্থ-সম্পদ লাভের কারণে অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ইবলীস শয়তানের ধোঁকাবাজির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে-

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ .

অর্থাৎ আর সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম যে তোমরা আদমের প্রতি সম্মানসূচক সিজদা দাও। ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা দিল। ইবলীস ছিল জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইবলিস তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।

ইবলীসের ইতিকথা : আয়াতের বর্ণনাশৈলী দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, ইবলীসের অবাধ্য হওয়ার কারণ হলো, জিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কেননা ফেরেশতাগণ কোনো সময়ই আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেন না।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদেরকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদেরকে জিন বলা হতো। আর হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ইবলীস ফেরেশতা ছিল না; বরং সে ছিল জিন। যেভাবে হযরত আদম (আ.) সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা, ঠিক এমনিভাবে জিনদের আদি হলো ইবলীস।

কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-এর এই অভিমতকে অযৌক্তিক বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি। এই আয়াত এবং সূরা আর রাহমান ও সূরা জিনের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মানুষের ন্যায় জিনদের মধ্যেও কিছু নেককার এবং কিছু জালেম কাফের রয়েছে। জালেম ও কাফেররা নিঃসন্দেহে দোজখী হবে। আর ইবলীস এবং তার বংশধররা সকলেই আল্লাহ তা'আলার শত্রু, ওলী আল্লাহগণের শত্রু। অতএব, ইবলীস কোনো অবস্থাতেই জিনদের আদি ব্যক্তি হতে পারে না। كَانَ مِنَ الْجِنِّ -এর অর্থ হচ্ছে– ইবলীস ছিল্ল জিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন। জিন হওয়া সত্ত্বেও তার অত্যধিক ইবাদতের কারণে সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়। আর এ কারণেই যখন ফেরেশতাদেরকে সিজদা দেওয়ার হুকুম হয়, সেই হুকুম ইবলীসের ব্যাপারেও হয়। কিন্তু এই হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ইবলীসের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। সে অহংকারী হয়, আর অহংকারের কারণেই সে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখায়। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে, আদম সন্তানেরা তাদের পৈত্রিক শত্রু ইবলীস শয়তানকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে এবং তাকে নিজেদের সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মানবজাতিকে ইবলীস শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এই মর্মে, ইবলীস তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর শত্রু। অতএব, তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার বিধানকে অমান্য করো না এবং ইবলীসের অনুগমন করো না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইবলীসকে অগ্নি দ্বারা। যদিও ইবলীস দিবারাত্রি ফেরেশতাদের ন্যায় ইবাদত করেছিল, কিন্তু হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। তার ভিতর যে অহংকার নিহিত ছিল, তার কারণে সে হযরত আদম (আ.) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা– ১৫, পৃ. ১০৩]

قَوْلُهُ أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ : এ আয়াতে মানুষকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা কি তবে, আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং শয়তান সন্তান সন্ততিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু।

অর্থাৎ ইবলীসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়, ইবলীস শয়তানই মানুষকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের সম্মোহনীয় ফাঁদে ফেলে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে ধ্বংস করে।

قَوْلُهُ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا - পাপীদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ : কাফেররা যে আল্লাহ তা'আলার স্থলে ইবলীস ও তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের এ কাজটি অত্যন্ত মন্দ।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মুজাহিদ (র.) ইমাম শা'বী (র.)-এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বসেছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইবলীসের স্ত্রী আছে কি? আমি জবাব দিলাম আমি জানি না। এরপর আমার স্মরণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন– أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ অর্থাৎ তোমরা কি ইবলীস এবং তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছো? আর বংশধর স্ত্রী ব্যতীত হতে পারে না। এ কথা স্মরণ হওয়ার পর আমি বললাম, হ্যাঁ ইবলীসের স্ত্রী আছে।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেন, মানুষের ন্যায় শয়তানের সন্তান সন্ততি হয়। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে, লাকীন, ওয়ালহান, হাফাফ, মোররা, জালনাবুর, আওয়ার, মাতূস, ইয়াসূর, ওয়াসেম।

ওয়ালহান অজু গোসল ও নামাজের সময় মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়। আর ইবলীসকে বলা হয় আবূ মোররা অর্থাৎ ইবলীস এই উপনামেই বিখ্যাত। জালনাবূর বাজারে মিথ্যা শপথ করায় এবং বিক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। আওয়ার নামক শয়তান মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। মাতূস মানুষের মধ্যে গুজব রটায়। আর ইয়াসূর নামক শয়তান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে শরিয়ত বিরোধী পন্থায় বিলাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ওয়াসেম নামক শয়তানের কাজ হলো মানুষ যখন বাড়িতে যায়, সে কাউকে সালাম দেয় না, আল্লাহ তা'আলার জিকিরও করে না তখন ওয়াসেম নামক শয়তান যে ব্যক্তির বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিসিকে এদিক সেদিক করে বিনষ্ট করে রাখে যা দেখে মানুষ রাগান্বিত হয়। আর সে বাড়ির লোকদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে। আর বিসমিল্লাহ পাঠ না করে আহার করা আরম্ভ করে, তখন ওয়াসেম নামক শয়তান তার সাথে খাবারে অংশীদার হয়। আ'মাশ (রা.) বলেছেন, কোনো কেনো সময় বিসমিল্লাহ না বলে কেউ গৃহে প্রবেশ করে এবং কাউকে সালামও করে না, এরপর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অজুতে প্রতারণাকারী শয়তানকে বলা হয় ওয়ালহাম, তোমরা তার ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, যে হযরত ওসমান ইবনে আবীল আস প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! শয়তান আমার নামাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং আমার নামাজের ব্যাপারে সন্দিহান করেছে। [আমার মনে থাকে না কয় রাকাত পড়েছি] তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন এ হলো শয়তান তাকে খিনজিব বলা হয়। যখন এ অবস্থা উপলব্ধি কর, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর! অর্থাৎ আউজুবিল্লাহ পাঠ কর এবং বা দিকে তিনবার থুথু ফেল। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি তাই করেছি এবং আল্লাহ তা'আলার শয়তানকে দূর করে দিয়েছেন। –[মুসলিম শরীফ]

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইবলীস তাঁর আসন পানির উপর স্থাপন করে। এরপর তার দলবলকে সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ইবলীসের কাছে সবচেয়ে নৈকট্যধন্য সেই হয় যে, সবচেয়ে বেশি অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কেউ এসে বলে, আমি এই কাজ করেছি। ইবলীস বলে, তুমি কিছুই করনি। আরেক শয়তান বলে, আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। ইবলীস বলে তুমি ভালো কাজ করেছো। এরপর ঐ শয়তানকে নিজের কাছে টেনে আনে। আ'মাশের বর্ণনা হলো এই যে, বর্ণনাকারী বলেছেন, এরপর ইবলীস তাকে জড়িয়ে ধরে। –[মুসলিম শরীফ]

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি কাফেরদের এবং তাদের উপাস্যদের মধ্যে একটি আড়াল রেখে দিব।" مَوْبِقًا অর্থ– ধ্বংসের স্থান। তাফসীরকার আতা এবং যাহ্যাক (র.) শব্দটির এ অনুবাদই করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مَوْبِقٌ হলো দোজখের একটি ময়দানের নাম। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, গরম পানির একটি হ্রদ। আর ইকরামা (র.) বলেছেন مَوْبِقٌ হলো অগ্নির একটি সাগর। যার তীরে কালো বর্ণের খচ্চরের সমান সর্প রয়েছে। আর ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, দু'টি জিনিসের মধ্যে যা আড়াল করে রাখে তাকে مَوْبِقٌ বলা হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩০]

قَوْلُهُ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ .... عَنْهَا مَصْرِفًا : তাফসীরকারগণ লিখেছেন প্রথম প্রথম পাপিষ্ঠদের মনে ক্ষীণ আশা থাকবে যে, হয়তো নাজাত হতেও পারে। কিন্তু যখন দোজখ দেখতে পাবে তখন আর এ সত্য বুঝতে বাকি থাকবে না যে, দোজখই তাদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ আছে; নাজাতের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা দোজখের অগ্নি তাদেরকে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আর সবদিক থেকেই ফেরেশতারা প্রহরায় রত থাকবে। আর যাদেরকে তারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার শরিক মনে করতো তারা এত অসহায় হবে যে পূজারীদেরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা তাদের কাছেও আসতে পারবে না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসনাদে আহমদে সংকলিত হয়েছে। এতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কাফেররা দোজখকে ৪০ মাইল দূরত্ব থেকে দেখবে। এরপর তাদের মনে নাজাতের আর কোনো আশা থাকবে না, ঐ দোজখেই তারা নিক্ষিপ্ত হবে– এই সত্য তারা উপলব্ধি করবে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪২৬]

٥٤. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيَّنَّا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ـ صِفَةٌ لِمَحْذُوْفٍ اَيْ مَثَلًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَلٍ لِيَتَّعِظُوْا وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَيْ الْكَافِرُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ـ خُصُوْمَةً فِى الْبَاطِلِ وَهُوَ تَمْيِيْزٌ مَنْقُوْلٌ مِنْ اِسْمِ كَانَ الْمَعْنٰى وَكَانَ جَدَلُ الْاِنْسَانِ اَكْثَرَ شَيْءٍ فِيْهِ ـ

٥٥. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى اَيْ اَلْقُرْاٰنُ وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ فَاعِلٌ اَيْ سُنَّتُنَا فِيْهِمْ وَهِيَ الْاِهْلَاكُ الْمُقَدَّرُ عَلَيْهِمْ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ـ مُقَابَلَةً وَعِيَانًا وَهُوَ الْقَتْلُ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضُمَّتَيْنِ جَمْعُ قَبِيْلٍ اَيْ اَنْوَاعًا ـ

٥٦. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ج مُخَوِّفِيْنَ لِلْكَافِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ بِقَوْلِهِمْ اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا وَنَحْوِهِ لِيُدْحِضُوْا بِهٖ لِيُبْطِلُوْا بِجِدَالِهِمُ الْحَقَّ الْقُرْاٰنَ وَاتَّخَذُوْا اٰيَاتِيْ اَلْقُرْاٰنَ وَمَآ اُنْذِرُوْا بِهٖ مِنَ النَّارِ هُزُوًا ـ سُخْرِيَّةً ـ

অনুবাদ :

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। আয়াতে বর্ণিত مِنْ كُلِّ مَثَلٍ বাক্যটি উহ্য مَثَلًا মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের উপমা যাতে করে উপদেশ গ্রহণ করে। এবং মানুষ অর্থাৎ কাফেররা অধিকাংশ ব্যাপারেই কলহপ্রিয় অর্থাৎ বাতিল বিষয়ে বিতর্ক করে থাকে। আর جَدَلًا শব্দটি كَانَ -এর ইসিম হতে مَنْقُوْل হয়ে تَمْيِيْز হয়েছে। মূল ইবারত হলো- وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ فِيْهِ

৫৫. কেবল এ অপেক্ষা মানুষকে বিরত রাখে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদেরকে ঈমান আনয়ন হতে এটা مَفْعُوْل ثَانِيْ হয়েছে। যখন তাদের নিকট পথনির্দেশ আসে অর্থাৎ কুরআন এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হতে যে, তাদের নিকট পূর্ববর্তীদের বেলায় অনুসৃত নীতি আসুক। سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ এটা تَاْتِيَهُمْ -এর ফায়েল। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে আমার রীতি। আর তা হলো তাদের জন্য অবধারিত ধ্বংস অথবা আসুক তাদের নিকট সরাসরি আজাব মুখোমুখি এবং প্রকাশ্যে। আর তা ছিল বদর যুদ্ধে নিহত হওয়া। অপর এক কেরাতে قُبُلًا শব্দের ق ও ب পেশ সহকারে পঠিত রয়েছে। তখন এটি قَبِيْل -এর বহুবচন হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের।

৫৬. আমি রাসূলগণকে পাঠিয়ে থাকি কেবল সুসংবাদদাতা মু'মিনদের জন্য ও সতর্ককারী রূপেই ভীতি প্রদর্শনকারী কাফেরদের জন্য। কিন্তু কাফেররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে। তাদের এ জাতীয় উক্তি দ্বারা যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন ইত্যাদি। তা দ্বারা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য। বিতণ্ডার মাধ্যমে বাতিল করে দেওয়ার জন্য। সত্যকে কুরআনকে আর তারা গ্রহণ করে থাকে আমার নিদর্শনাবলিকে কুরআনকে ও যা দ্বারা তাদেরকে নরকাগ্নি থেকে সতর্ক করা হয়েছে সেই সমস্তকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে উপহাসের বস্তু হিসেবে।

অনুবাদ :

٥٧. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ط مَا عَمِلَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ فَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِىْ عَاقِبَتِهَا اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَغْطِيَةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ مِنْ اَنْ يَّفْقَهُوا الْقُرْاٰنَ اَىْ فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ وَفِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط ثِقْلًا فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَىْ بِالْجَعْلِ الْمَذْكُوْرِ اَبَدًا ـ

৫৭. তার চেয়ে অধিক জালেম কে? যাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি, তারপরও সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়। অর্থাৎ তা হলো কুফর ও গুনাহের কাজ যা সে করেছে। আর সে তার শেষ পরিণতির ব্যাপারে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি। যেন তারা তা বুঝতে না পারে তাদের কুরআন বুঝা থেকে অর্থাৎ ফলে তারা কুরআন বুঝে না। আর তাদের কানে বধিরতা এঁটে দিয়েছি। ভারত্ব। ফলে তারা কুরআন শুনতে পারে না। আপনি তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করলেও তারা কখনো সৎপথে আসবে না উপরিউক্ত কর্মের কারণে। অর্থাৎ হৃদয়ে আবরণ ফেলে দেওয়া ও কর্ণে বধিরতা ফেলে দেওয়ার কারণে।

٥٨. وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ط لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ فِى الدُّنْيَا بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ فِيْهَا بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ـ مَلْجَأً مِنَ الْعَذَابِ ـ

৫৮. এবং আপনার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান। তাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন পৃথিবীতে, তবে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন পৃথিবীতেই কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত। আর তা হলো কিয়ামতের দিন যা হতে তারা কখনোই কোনো আশ্রয়স্থল পাবে না। অর্থাৎ শাস্তি হতে পরিত্রাণের জায়গা।

٥٩. وَتِلْكَ الْقُرٰى اَىْ اَهْلُهَا كَعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَغَيْرِهِمَا اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا كَفَرُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ لِاِهْلَاكِهِمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْمِيْمِ اَىْ لِهَلَاكِهِمْ مَوْعِدًا ـ

৫৯. ঐসব জনপদ অর্থাৎ তার অধিবাসীগণকে যেমন- আদ, ছামুদ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে তাদের অধিবাসীবৃন্দ। কে, আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। অর্থাৎ কুফরি করেছিল। এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য। অন্য এক কেরাতে مِيْم বর্ণটি যবরসহ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَقَدْ صَرَّفْنَا : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل হতে صَرَّفَ تَصْرِيْفًا অর্থ- বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা, বিভিন্নভাবে বুঝানো।

قَوْلُهُ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ : এর মধ্যে مِنْ টি অতিরিক্ত। এটা مَثَلًا উহ্য মওসূফের সিফত হয়ে صَرَّفْنَا -এর মাফঊলে বিহী। মূল ইবারত হলো- صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مَثَلًا كَائِنًا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

قَوْلُهُ قَوْلًا جَدَلًا : এটা اَكْثَرَ شَيْءٍ -এর নিসবত থেকে تَمْيِيْز হয়েছে। كَانَ -এর اِسْم থেকে স্থানান্তরিত। অর্থাৎ كَانَ جِدَالُ الْاِنْسَانِ اَكْثَرَ شَيْءٍ فِيْهِ اَىْ جِدَالُهُ اَكْثَرَ مِنْ كُلِّ مُجَادِلٍ ـ

قَوْلُهُ مَنَعَ : এটা বাবে فَتَحَ থেকে ফে'লে মাযীর সীগাহ। আর اَلنَّاس হলো এর প্রথম মাফঊল। اَنْ يُّؤْمِنُوْا এটা جُمْلَةٌ بِتَاوِيْلِ مَصْدَرٍ হয়ে দ্বিতীয় মাফঊল اَنْ يُّؤْمِنُوْا-এর পূর্বে একটি مِنْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ جَاءَهُمْ : এটা يُؤْمِنُوْا-এর ظَرْف হয়েছে। আর يَسْتَغْفِرُوْا-এর আতফ হয়েছে يُؤْمِنُوْا-এর উপর।

قَوْلُهُ اَنْ تَاْتِيَهُمْ : এটা مَصْدَرٌ بِتَاوِيْلِ হয়ে مَنَعَ-এর فَاعِلٌ আর اِنْتِظَارٌ মুযাফ উহ্য রয়েছে। اَنْ تَاْتِيَهُمْ হলো মুযাফ ইলাইহি যা মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। আর يَاْتِيَهُمْ-এর আতফ হয়েছে تَاْتِيَهُمْ-এর উপর।

قَوْلُهُ قُبُلًا : এটা اَلْعَذَابُ হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থ- সামনে, মুখোমুখি। এক কেরাতে এসেছে قُبُلًا যা قَبِيْل-এর বহুবচন, যার অর্থ হলো প্রকার। যেমন- سُبُلٌ এটা سَبِيْلٌ-এর বহুবচন।

قَوْلُهُ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ : এটা مُرْسَلِيْنَ থেকে حَالٌ হয়েছে। يُجَادِلُ-এর মাফঊল اَلْمُرْسَلِيْنَ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لِيُدْحِضُوْا : এটা يُجَادِلُ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ ; اِدْحَاضٌ বাবে اِفْعَالٌ থেকে অর্থ- পিছনে যাওয়া, টলে যাওয়া।

قَوْلُهُ مَا اُنْذِرُوْا : এর মধ্যে مَا টি হলো مَوْصُوْلَةٌ আর انذروا এটা جُمْلَةٌ হয়ে صِلَةٌ হয়েছে। عَائِدٌ بِهٖ উহ্য অথবা مَا টা مَصْدَرِيَّةٌ যা اِنْذَارَهُمْ-এর অর্থে হয়েছে। اُنْذِرُوْا-এর আতফ اٰيَاتِيْ-এর উপর হয়েছে। আর هُزُوًا এটা اِتَّخَذُوْا-এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর اٰيَاتِيْ এবং وَمَا اُنْذِرُوْا জুমলায়ে আতেফা হয়ে اِتَّخَذُوْا-এর প্রথম মাফঊল।

قَوْلُهُ مَنْ : এটা শাব্দিকভাবে مُفْرَدٌ বা একবচন, আর অর্থগতভাবে বহুবচন, কাজেই এর দিকে একবচন ও বহুবচন উভয়ের যমীরই ফিরতে পারে। যেমন সামনে পাঁচটি যমীর مُفْرَدٌ-এর এবং পাঁচটি جَمْع-এর যমীর مَنْ-এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ اَكِنَّةً : এটা كِنَانٌ-এর বহুবচন। অর্থ- পর্দা। এ বাক্যটি اِعْرَاضٌ ও نِسْيَانٌ-এর ইল্লত।

قَوْلُهُ بِالْجَعْلِ الْمَذْكُوْرِ : اِذًا-এর মফহুম নির্দিষ্ট করণার্থে এই جُمْلَةٌ-টির প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبُّكَ : এটা مُبْتَدَأٌ আর اَلْغَفُوْرُ হলো প্রথম খবর আর ذُو الرَّحْمَةِ হলো দ্বিতীয় খবর।

قَوْلُهُ مَوْئِلًا : এটা যরফ, অর্থ- আশ্রয়স্থল, বাবে ضَرَبَ হতে মাসদার وَاَلَ، يَئِلُ، وَاْلًا অর্থ- আশ্রয় গ্রহণ করা।

قَوْلُهُ تِلْكَ الْقُرٰى : এটা মুবতাদা, আর اَهْلَكْنَاهُمْ হলো খবর। تِلْكَ الْقُرٰى উহ্য ফেলের কারণে مَنْصُوْبٌ-ও হতে পারে। তখন মূল ইবারত হবে- اَهْلَكْنَا تِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنَاهُمْ

قَوْلُهُ مَهْلِكُ : এটা مَصْدَرٌ مِيْمِيٌّ অর্থ- ধ্বংস করা। অথবা ظَرْفُ زَمَانٍ অর্থ- ধ্বংস হওয়ার সময়, বহুবচনে مَهَالِكُ। مَهْلِكٌ-এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে-

১. مِيْم-এর মধ্যে পেশ এবং لَام-এর মধ্যে যবর হবে- مُهْلَكٌ

২. مِيْم এবং لَام উভয়টিতে যবর হবে- مَهْلَكٌ

৩. مِيْم -এর মধ্যে যবর এবং لَام-এর মধ্যে যের হবে- مَهْلِكٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, কাফেররা তাদের ধন সম্পদের কারণে অহংকার করেছে এবং দারিদ্র পীড়িত মুসলমানকে হেয় মনে করেছে, তাদের এই আচরণ শুধু নিন্দনীয়ই নয়; বরং তাদের জন্য বিপদজনকও। এই পর্যায়ে ইতিপূর্বে দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে আমি মানবজাতির হেদায়েতের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, বারে বারে সত্যকে বুঝাবার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু যারা কলহপ্রিয়, যারা তর্কপ্রিয়, তাদের তর্কের শেষ হয় না। ঈমান না আনার জন্য, পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস না করার জন্যে তাদের কাছে কোনো দলিল প্রমাণ বা যুক্তিও থাকে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের জিদ এবং হঠকারিতা ও অযথা তর্ক শেষ হয় না। তাদের এই ঘৃণ্য আচরণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তারা নিজেদের জন্যে চরম ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ আমি তাদের জন্যে প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্টভাবে বার বার বর্ণনা করেছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সঠিক পথ থেকে দূরে থাকে।

এই আয়াতের তাফসীরে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আলী (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীস প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাত্রে প্রিয়নবী ﷺ আমার এবং তাঁর কন্যার নিকট আগমন করলেন এবং ইরশাদ করলেন, তোমরা উভয়ে রাত্রে নামাজ আদায় কর না? [অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ, বা নফল নামাজ] আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে, তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন উঠিয়ে নেন। আমার এই আরজীর পর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, আমাকে কোনো জবাব দিলেন না। আমি শুনলাম, তিনি তাঁর রানের উপর হাত মেরে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন- وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا অর্থাৎ মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বড় কলহপ্রিয়।

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে হযরত আলী (রা.) মুস্তাহাব বা নফল ইবাদতের ব্যাপারে এই জবাব প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই, তিনি তাওফীক দিলেই ইবাদত করতে পারে, আর তিনি তাওফীক না দিলে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা সম্ভব হয় না। প্রিয়নবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-এর এই জবাব শ্রবণ করে কোনো কথা বললেন না; বরং তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, হয়তো হযরত আলী (রা.)-এর এই জবাব তিনি পছন্দ কনেনি, তাই আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩১; মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪২৭, ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ১৫. পৃ. ১০৫, রূহুল মা'আনী, খ. ১৫, পৃ. ৩০০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আলোচ্য আয়াতের اَلْإِنْسَانُ শব্দ দ্বারা নজর ইবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কালবী (র.)-এর মতে উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের اَلْإِنْسَانُ শব্দ দ্বারা সকল কাফেরকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ কাফেররা সকলেই কলহপ্রিয়। সত্য গ্রহণে তাদের চরম অনীহা রয়েছে। তারা অত্যন্ত কলহপ্রিয়। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, اِنْسَانُ শব্দ দ্বারা সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। [মুমিন হোক কিংবা কাফের।] -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, খ. ২৩১]

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁর আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছুই নেই। লোকটি বলবে, আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তাঁরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। লোকটি বলবে, আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সামনে লওহে মাযফুজ রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপেই লিখিত রয়েছে। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কিনা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত পা তার কুফর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৫৯৯-৬০০]

قَوْلُهُ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا .... سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ - কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী : যখন মানুষের কাছে পবিত্র কুরআনে হেদায়েত এসে পৌঁছে তখন ঐ হেদায়েত গ্রহণ করায় এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোনো প্রকার বাধা বিপত্তি ছিল না। কিন্তু শুধু এতটুকুই বাধা ছিল যে তারা এই অপেক্ষায় রয়েছে যে অতীত কালে যেসব উম্মত আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তা'আলার কোপগ্রস্থ হয়েছে তাদের দশা এদেরও হোক, অথবা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে তাদের প্রতি আজাব আসুক। কেননা ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জিদ ও হঠকারিতার কারণে সত্যের বিরোধিতা করেছে তাদের শাস্তি হয়েছে যুগে যুগে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তার নিকট নাজিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করে। অতএব তাদের এই আচরণ এ তথ্যেরই প্রমাণ যে তারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের অপেক্ষায় রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের هُدًى শব্দটি দ্বারা পবিত্র কুরআন এবং ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন এর দ্বারা স্বয়ং হুজুর ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ হলো আল্লাহ তা'আলার আজাবের সেই পন্থা যা পূর্বকালের কাফেরদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে পন্থায় তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ - প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : রাসূলগণকে প্রেরণের দুটিই উদ্দেশ্য। যথা- ১. মুমিনদের জন্য সওয়াব এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা। ২. কাফেরদেরকে দোজখের আজাবের ভয় প্রদর্শন করা। এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে আমি কোনো পয়গাম্বরকে এ বিষয়ের অধিকার দেই না যে কাফেররা কোনো প্রকার মুজিজা তলব করলেই তা পেশ করবেন। অথবা এর অর্থ হলো, আমি কোনো পয়গাম্বরকে এই দায়িত্ব দেই না যে সারা পৃথিবীর মানুষকে হেদায়েত করবেন; বরং তাদের কাজ হলো দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া। যে তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে সে ভাগ্যবান হবে, আর যে তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না সে ভাগ্যহত হবে। কোনো লোককে হেদায়েত গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা পয়গাম্বরের কাজ নয়। এতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা। এই মর্মে যে, হে রাসূল! যদি মক্কাবাসী আপনার প্রতি ঈমান না আনে তবে আপনি তার জন্যে দায়ী নন। কেননা মক্কার কাফেররা বলেছিল, হে আল্লাহ যদি এই নবী সত্য হয় তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা কোনো যন্ত্রনাদায়ক আজাব প্রেরণ কর! এমনকি তারা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিল, হে নবী! আমরা তো আপনাকে পাগল মনে করি; তাই ফেরেশতা কেন আনেন না? তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কববাণী উচ্চারণ করার পর প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করেছেন এই মর্মে যে, হে রাসূল! আপনার কাজ হলো মুসলমানদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা এবং কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। আর এই দায়িত্ব আপনি সঠিকভাবে পালন করেছেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দু], পারা- ১৫, পৃ. ১০৬, মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৩২, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ. ৪, পৃ. ৪২৭]

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্যায় আচরণের বিবরণ দেওয়ার পর তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, দুর্বৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে কেন রয়েছে, তাদের শাস্তি কেন হয় না? তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অনন্ত অসীম তাঁর রহমত। আর এই রহমতের কারণেই তিনি দুর্বৃত্ত কাফেরদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না; বরং তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর তাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকে না।

কাফেরদের অবকাশ প্রদানের কারণ : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব দয়াবান। তার একটি প্রমাণ হলো এই যে মক্কার দুর্বৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে চরম কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। তাদের উপর আজাব আপতিত হয় না। তবে তাদের এ অবকাশ চিরদিনের জন্য নয়; বরং কয়েক দিনের জন্য। বস্তুত মানুষের কৃতকর্ম এত মন্দ যে, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত অনতিবিলম্বে, কিন্তু করুণাময় আল্লাহ তা'আলার অন্তহীন করুণা ও রহমতই তাদের শাস্তি বিধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। যেন এই সুযোগে তারা আত্ম সংশোধনে মনোনিবেশ করতে পারে। এটি আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই ইরশাদ হয়েছে- بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلًا "বরং তাদের জন্য রয়েছে একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময়, তা থেকে সরে যাওয়ার কোনো স্থান তারা পাবে না।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। আর [দুনিয়াতে] বদরের যুদ্ধের দিন। কেননা বদরের যুদ্ধের দিন মক্কার কাফেরদের তথাকথিত নেতা উপনেতাদের অনেকেই নিহত হয়।

قَوْلُهُ وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمْ .... لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا : আদ জাতি, সামূদ জাতি, ফেরাউনের দলবল তথা যাদেরকে ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। তারা তাদের কীর্তি কলাপের শাস্তি পেয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদের জানা উচিত যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব আপতিত হয়, তখন তাদের জন্য কোথাও আশ্রয়স্থল থাকে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যেভাবে ইতিপূর্বে অবাধ্য কাফেরদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক এমনিভাবে যখন এদের জন্য নির্দিষ্ট সময় আসবে তখন তাদেরও আত্মরক্ষার কোনো স্থান থাকবে না।

٦٠. وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى هُوَ ابْنُ عِمْرَانَ لِفَتٰهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ وَكَانَ يَتَّبِعُهُ وَيَخْدِمُهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ لَآ اَبْرَحُ لَا اَزَالُ اَسِيْرُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مُلْتَقٰى بَحْرِ الرُّوْمِ وَبَحْرِ فَارِسَ مِمَّا يَلِى الْمَشْرِقَ اَىْ الْمَكَانَ الْجَامِعَ لِذٰلِكَ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ـ دَهْرًا طَوِيْلًا فِىْ بُلُوْغِهِ اِنْ بَعُدَ ـ

অনুবাদ :

৬০. ঐ সময়কে স্মরণ করুন যখন হযরত মূসা (আ.) তিনি ইমরানের ছেলে বলেছিলেন, তার সঙ্গীকে অর্থাৎ ইউশা' ইবনে নূনকে, সে তাঁর অনুসরণ করত। তাঁর খেদমত করত এবং হযরত মূসা (আ.) থেকে ইলম অর্জন করত। আমি থামব না সফরে চলতেই থাকব দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব দিক হতে রোম সমুদ্র ও পারস্য সমুদ্রের সঙ্গমস্থল অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। যদি লক্ষ্যস্থল খুঁজে না পাই তবে এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতেই থাকব।

٦١. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ نَسِيَا حُوْتَهُمَا نَسِىَ يُوْشَعُ حَمْلَهُ عِنْدَ الرَّحِيْلِ وَنَسِىَ مُوْسٰى تَذْكِيْرَهُ فَاتَّخَذَ الْحُوْتُ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ اَىْ جَعَلَهُ بِجَعْلِ اللّٰهِ سَرَبًا ـ اَىْ مِثْلَ السَّرَبِ وَهُوَ الشِّقُّ الطَّوِيْلُ لَا نَفَاذَ لَهُ وَذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمْسَكَ عَنِ الْحُوْتِ جَرْىَ الْمَاءِ فَانْجَابَ عَنْهُ فَبَقِىَ كَالْكُوَّةِ لَمْ يَلْتَئِمْ وَجَمَدَ مَا تَحْتَهُ مِنْهُ ـ

৬১. তারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছলেন তারা নিজেদের মৎসের কথা ভুলে গেলেন হযরত ইউশা' রওয়ানার প্রাক্কালে মৎস উঠিয়ে নিতে ভুলে গেলেন। আর হযরত মূসা (আ.) তাকে মৎস্য উঠিয়ে নেওয়ার কথা বলে দিতে ভুলে গেলেন। তা মৎস্যটি সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। অর্থাৎ মৎস্যটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এরূপ করেছে। এবং সুড়ঙ্গের মতো রাস্তা এতো লম্বা ছিল যে, তার এপার ওপার ছিল না। এটা এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মৎস্য চলে যাওয়ার পর পানিকে আটকে দিয়েছিলেন। যার কারণে পানি মৎসের রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই ঐ সুড়ঙ্গটি সিড়ির মতো হয়ে গিয়েছিল। আর এটা হযরত মূসা (আ.) ফেরত আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। আর মৎস্যটি যেখান দিয়েই অতিক্রম করত সেখানেই পানি জমে যেত। যার ফলে সেই রাস্তা সুড়ঙ্গের রূপ ধারণ করেছিল।

٦٢. فَلَمَّا جَاوَزَا ذٰلِكَ الْمَكَانَ بِالسَّيْرِ اِلٰى وَقْتِ الْغَدَاءِ مِنْ ثَانِىْ يَوْمٍ ـ قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز هُوَ مَا يُؤْكَلُ اَوَّلَ النَّهَارِ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ـ تَعَبًا وَحُصُوْلُهُ بَعْدَ الْمُجَاوَزَةِ ـ

৬২. যখন তারা আরো অগ্রসর হলেন ঐ ফিরে আসার জায়গা থেকে সামনে চলে গেলেন এবং দ্বিতীয় দিন প্রাতঃরাশের সময়কাল পর্যন্ত অতিক্রান্ত হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের প্রাতঃরাশ আন অর্থাৎ যা দিনের প্রথমভাগে ভক্ষণ করা হয়। আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। نَصَبٌ শব্দের অর্থ হলো تَعَبٌ এবং এই ক্লান্তি প্রতিশ্রুত স্থান থেকে সম্মুখে চলে যাওয়ার পর অনুভূত হলো।

অনুবাদ :

٦٣. قَالَ اَرَاَيْتَ اَىْ تَنَبَّهْ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ بِذٰلِكَ الْمَكَانِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ يُبْدَلُ مِنَ الْهَاءِ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج بَدَلُ اشْتِمَالٍ اَىْ اَنْسَانِىْ ذِكْرَهٗ وَاتَّخَذَ الْحُوْتُ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا ـ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَىْ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ مُوْسٰى وَفَتَاهُ لِمَّا تَقَدَّمَ فِىْ بَيَانِهٖ ـ

৬৩. সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম সেইস্থানে তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। اَنْ اَذْكُرَهٗ এটা اَنْسَانِيْهُ-এর যমীর থেকে بَدْلُ اشْتِمَالٍ অর্থাৎ আমাকে তার স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মৎস্য আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। عَجَبًا শব্দটি اِتَّخَذَ-এর দ্বিতীয় মাফঊল। এ ঘটনার কারণে হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর খাদেম আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লেন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

٦٤. قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ اَىْ فَقْدُنَا الْحُوْتَ مَا الَّذِىْ كُنَّا نَبْغِ ق نَطْلُبُهٗ فَاِنَّهٗ عَلَامَةٌ لَنَا عَلٰى وُجُوْدِ مَنْ نَطْلُبُهٗ فَارْتَدَّا رَجَعَا عَلٰى اٰثَارِهِمَا يَقُصَّانِهَا قَصَصًا فَاَتَيَا الصَّخْرَةَ ـ

৬৪. বললেন, হযরত মূসা (আ.) সে স্থানটিই তো মৎস্য হারিয়ে যাওয়ার স্থানটি আমরা অনুসন্ধান করছিলাম খোঁজ করছিলাম। কেননা সেটিই তো আমাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের অস্তিত্বের নিদর্শন। অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। এবং সেই শিলাখণ্ডের নিকট পৌঁছলেন।

٦٥. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا هُوَ الْخَضِرُ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا نُبُوَّةً فِىْ قَوْلٍ وَ وِلَايَةً فِىْ اٰخَرَ وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ قِبَلِنَا عِلْمًا ـ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَىْ مَعْلُوْمًا مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ رَوَى الْبُخَارِىُّ حَدِيْثَ اَنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ اَعْلَمُ ـ

৬৫. অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের তিনি হলেন হযরত খিজির (আ.) যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম। এক অভিমতে নবুয়ত এবং অন্য অভিমতে وِلَايَتْ এটাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। আর আমার নিকট হতে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। عِلْمًا এটা عَلَّمْنَاهُ থেকে দ্বিতীয় মাফঊল অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াবলি জানার জ্ঞান দিয়েছিলাম। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, সবচেয়ে জ্ঞানী কে?

فَقَالَ اَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنَّ لِىْ عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِىْ بِهٖ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهٗ فِىْ مِكْتَلٍ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَّ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ فَاَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهٗ فِىْ مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهٗ فَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ حَتّٰى اَتَيَا الصَّخْرَةَ فَوَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِى الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا وَاَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِىَ صَاحِبُهٗ اَنْ يُّخْبِرَهٗ بِالْحُوْتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا حَتّٰى اِذَا كَانَا مِنَ الْغَدَاةِ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا اِلٰى قَوْلِهٖ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ وَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا .

অনুবাদ :

তিনি জবাবে বললেন, আমি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই জবাব দেওয়ার কারণে তিরস্কার করলেন। যেহেতু তিনি এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সোপর্দ করেননি। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার অমুক বান্দা তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি করে তার সাক্ষাৎ পেতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার সাথে একটি মৎস্য নাও এবং সেটাকে থলেতে রাখ। যেখানেই মৎস্যটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তুমি তাঁকে পাবে। অতঃপর তিনি থলেতে একটি ভাজা মাছ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এবং তাঁর সফরসঙ্গী হলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। তাঁরা উভয়ে শিলাখণ্ডের নিকট এসে তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। মৎস্যটি থলের ভেতর লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করে দিল এবং থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ল। আর তা সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। আল্লাহ তা'আলা মৎস্যের পথ থেকে পানির সঞ্চালন বন্ধ করে দিলেন। ফলে তা একটি সিড়ির মতো হয়ে গেল। যখন হযরত মূসা (আ.) জাগ্রত হলেন তার সাথী তাকে মৎস্যের বিষয়টি বলতে ভুলে গেলেন। দিনের অবশিষ্টাংশ ও সারারাত চলার পর যখন প্রাতঃরাশের সময় হলো তখন হযরত মূসা (আ.) স্বীয় সঙ্গীকে বললেন, আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো! وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا পর্যন্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন- كَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسٰى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا অর্থাৎ মৎস্যের পানিতে এভাবে চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যের জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। আর হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সাথীর জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَتًى : একবচন; বহুবচনে فِتْيَةٌ অর্থ- নওজোয়ান, সেবক, খাদেম, গোলাম, দাস, যুবক। মুফাসসিরগণ এখানে فَتًى দ্বারা সাধারণত খাদেম উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন।

قَوْلُهٗ لَا اَبْرَحُ : এটা فِعْل نَاقِص যা لَا اَزَالُ অর্থে হয়েছে। এর اِسْم হলো اَنَا যা তার মধ্যে আবশ্যকরূপে উহ্য রয়েছে। আর তার খবর حَتّٰى ابلغ -এর قَرِيْنَةٌ -এর কারণে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَسِيْرُ যদি এই فِعْل টি تَامّ মেনে নেওয়া হয় তবে তার খবরের প্রয়োজন নেই।

মুসান্নিফ (র.) হযরত মূসা (আ.)-এর নামের তাফসীরে ইবনে ইমরান উল্লেখ করে সে সকল লোকদের বক্তব্যকে রহিত করেছেন যারা এখানে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ.)-কে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ এ আয়াতে মূসা দ্বারা মূসা ইবনে ইমরান (আ.) উদ্দেশ্য, যিনি একজন জলীলুল কদর পয়গাম্বর ছিলেন।

قَوْلُهُ لَا اَبْرَحُ : এর তাফসীর لَا اَزَالُ اَسِيْرُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَبْرَحُ হলো فِعْل نَاقِص আর তার খবর হলো উহ্য اَسِيْرُ আর উহ্য থাকার উপর قَرِيْنَةٌ হলো حَتّٰى اَبْلُغَ অর্থাৎ لَا اَبْرَحُ سَائِرًا

قَوْلُهُ حُقُبًا : একটি সুদীর্ঘ কালকে حُقُبٌ বলা হয়। আবার একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদকালকেও حُقُبٌ বলে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ৭০ বছর কেউ ৮০ বছর। কেউ ত্রিশ হাজার বছরও বলেছেন। তবে এখানে রূপকভাবে সুদীর্ঘকাল উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ سَرَبٌ : এর অর্থ সুড়ঙ্গ, নালা, গর্ত। سَرَبًا এটা اِتَّخَذَ-এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর سَبِيْلَهُ হলো প্রথম মাফঊল।

قَوْلُهُ نَصَبًا : এটা اِسْم অর্থ হলো ক্লান্তি, অবসাদ, কষ্ট, ব্যথা, যন্ত্রণা, চোট, দুঃখ ইত্যাদি। نَصَبًا শব্দটি لَقِيْنَا-এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ

قَوْلُهُ اَرَاَيْتَ : এর হামযাটি হলো اِسْتِفْهَامِيَّةٌ تَعَجُّبِيَّةٌ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে এটা বলা উদ্দেশ্য যে, এমন ঘটনা আশ্চর্যজনক হওয়ার কারণে বিস্মৃত হওয়ার অযোগ্য ছিল; কিন্তু তাকে ভুলে গেছে। اَرَاَيْتَ-এর মাফঊল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَرَاَيْتَ مَا نَابَنِيْ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ বাকরীতিতে اَخْبِرْنِيْ-এর অর্থে ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ اَوَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ اِثْبَات فِعْل مَاضِيْ مُطْلَق مَعْرُوْف বাবে ضَرَبَ মাসদার اَوِيًّا ـ اِوَاءً অর্থ- ঠিকানা নেওয়া, অবতরণ করা।

قَوْلُهُ اَنْسَانِيْهُ : এটা বাবে اِفْعَالٌ থেকে اِنْسَاءٌ মাসদার। অর্থ- ভুলিয়ে দেওয়া। نُوْن হলো نُوْن وِقَايَةٌ আর ى হলো وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ-এর যমীর যা প্রথম মাফঊল। ه হলো وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর যমীর এবং দ্বিতীয় মাফঊল। ه-এর মূল হলো সর্বদা পেশযুক্ত হওয়া। কিন্তু যদি এর পূর্বে يَاءْ سَاكِنْ অথবা যের হয় তখন ه-কে যের দেওয়া হয়। যেমন- بِهٖ ـ فِيْهِ ـ কিন্তু দুই স্থানে ইমাম হাফস (র.) মূলের মতোই তথা পূর্বে يَائے سَاكِنْ থাকা সত্ত্বেও ه-কে পেশ দিয়ে পড়েছেন। একটি اَنْسَانِيْهُ-এর মধ্যে। আর দ্বিতীয়টি হলো সূরা ফাতাহ -এর ১০নং আয়াতে عَلَيْهُ اللّٰهَ যাকে মোল্লা আলী কারী (র.) شَاطِبِيَّه-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৩২০ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ اَذْكُرَهُ : এখানে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ আর اَذْكُرَ শব্দটি بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হয়ে اَنْسَانِيْهُ-এর দ্বিতীয় মাফঊল হতে بَدْل اِشْتِمَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ مَا اَنْسَانِيْ ذِكْرَهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ ; ذِكْر অর্থ অন্তরে স্মরণ করা। আর কারো সম্মুখে স্মরণ করার জন্য ذُكِرَ لَهُ ব্যবহার হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ عَجَبًا : এটা اِتَّخَذَ-এর ভিত্তিতে مَنْصُوْب হবে। অর্থাৎ كَائِنًا فِى الْبَحْرِ এবং اِتَّخَذَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ ও পারে মূলত نَبْغِىْ نَبْغِ ছিল। পবিত্র কুরআনের রুসমে খতে এখানে يَاءْ-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর সূরা ইউসুফের ৬৫নং আয়াতে বহাল রাখা হয়েছে।

اِسْم-এর মধ্যে يَاءْ কে ফেলে দেওয়া তো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন- قَاضِىْ-এর মধ্যে। তবে ফে'লের মধ্যে এটা شَاذٌ ও খেলাপে কিয়াস।

قَوْلُهُ قَصَصًا : এটা বাবে نَصَرَ-এর মাসদার অর্থ- অনুসরণ করা, আনুগত্য করা, অথবা এটা حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ قَاصِّيْنَ قَصَصًا

قَوْلُهُ مِنْ عِنْدِنَا : এটা উহ্য শব্দের مُتَعَلِّقٌ হয়ে رَحْمَةً-এর حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ لَّدُنَّا : এটাও উহ্য শব্দের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে عِلْمًا হতে حَالٌ হয়েছে। فَاصِلَهْ-এর প্রতি লক্ষ্য করে مُقَدَّمْ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : যেহেতু মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে পরীক্ষা করার জন্য তিনটি প্রশ্ন করেছিল। সেগুলো হলো– ১. রূহ ২. আসহাবে কাহাফ এবং ৩. জুলকারনাইন সম্পর্কে। আর ইহুদিরা তাদের বলে দিয়েছিল যে, যদি তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন, তবে তোমরা জানবে যে, তিনি সত্য নবী। পক্ষান্তরে যদি তিনি এর সঠিক জবাব না দেন তবে তিনি নবী নন। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যেন ইহুদিরা জানতে পারে যে, নবীর জন্য সবকিছু জানা জরুরি নয়; বরং নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলার ওহী এবং হেদায়েতের ইলম থাকা একান্ত জরুরি। আর এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সেই ইলম তার নিকট ছিল না, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। আর এ জন্যই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন, যাতে করে তিনি সেই ইলম অর্জন করেন যা বিশেষভাবে হযরত খিজির (আ.)-কে দান করা হয়েছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী হওয়ার জন্যে সব বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের, তাঁর নৈকট্যে ধন্য হওয়ার এবং হেদায়েতের পথ ও পন্থা তথা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। হযরত খিজির (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ ইলম দান করেছিলেন তা এই প্রকার ছিল না। আর এ বিষয়ে হযরত মূসা (আ.) থেকে হযরত খিজির (আ.)-এর ইলম অধিকতর ছিল; কিন্তু হেদায়েতের ইলম এবং শরিয়তের বিধান সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-এর ইলম তখন সর্বাধিক ছিল।

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ : এ ঘটনায় 'মূসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গাম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। নওফল বাক্কালী অন্য এক মূসার সাথে এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

فَتٰى -এর শাব্দিক অর্থ– যুবক। শব্দটিকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয় , যেসব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামি শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভালো খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فَتٰى শব্দটিকে মূসা (আ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই এখানে অর্থ হবে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদেম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউসা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসূফ (আ.)। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগ্নে ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ রেওয়ায়েতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই। –[কুরতুবী]

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ -এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলা বাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিদৃষ্টে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বুঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে এটি হচ্ছে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান। কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। [অনেকের মতে বাহরে আন্দালুস ও বাহরে মুহীদের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর কাহিনী : সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদিন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলের এক সভার ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ.)-এর জানা মতে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই তিনি বলেন, আমি সবার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল প্রকৃত আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে তিরস্কার করে ওহী নাজিল হলো যে, দুই

সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। [একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত।] তাই বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, থলিয়ার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। হযরত মূসা (আ.) নির্দেশমতো থলিয়ায় একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলি থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। [মাছের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরো একটি মুজিজা এই প্রকাশ পেল যে] মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউসা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করেছিল। তখন হযরত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন হযরত ইউশা ইবনে নূন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার কাছে বলতে ভুলে গেলেন। অতঃপর সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলা হযরত মূসা (আ.) খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গন্তব্যস্থল অতিক্রম করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) মোটেই ক্লান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। বলল, মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্যস্থল ছিল। [অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।]

সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং সেই স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। হযরত মূসা (আ.) তদবস্থাই সালাম করলে হযরত খিজির (আ.) বললেন, এই [জনমানবহীন] প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি মূসা! হযরত খিজির (আ.) প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি বনী ইসলাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিজির (আ.) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তারা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিজির (আ.)-কে চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই হযরত খিজির (আ.) কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আ.) স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন, তাঁরা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এটাতো আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন হযরত মূসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন, আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল [ইতিমধ্যে] একটি পাখি এসে নৌকায় এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিজির (আ.) কে বললেন, আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না যেমনটি এ পাখির চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানির।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিজির (আ.) এক বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিজির (আ.) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গুনাহের কাজ করলেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন

না। হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন, এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওজর আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিজির (আ.) এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটিকে সোজা করে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। হযরত খিজির (আ.) বললেন- هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর হযরত খিজির (আ.) উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন- ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا অর্থাৎ এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ. যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করে বললেন, হযরত মূসা (আ.) যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের আরো কিছু জানা যেত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) বলতে বনী ইসরাঈলের পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। আর দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত খিজির (আ.)। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬০৪-৬০৬]

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গাম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা : لَا أَبْرَحُ حَتّٰى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
এ বাক্যটি হযরত মূসা (আ.) তার সফরসঙ্গী ইউশা ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিকও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। কারণ সফরের জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচারকদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে না।

حُقُبًا শব্দটি حِقْبَةٌ-এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। কারো কারো মতে আরো বেশি সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হযরত মূসা (আ.) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক গন্তব্যস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গাম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

فَلَمَّا بَلَغَا .... فِي الْبَحْرِ سَرَبًا - হযরত খিজির (আ.)-এর তুলনায় হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মুজেযা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) নবীকুলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিজির (আ.)-এর নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেওয়া যায়, কিন্তু তিনি তো রাসূল ছিলেন না। তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই এবং কোনো বিশেষ উম্মতও নেই, তাই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর চেয়ে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্যও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাদের দ্বারা ত্রুটি শুধরিয়ে নেওয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' হযরত মূসা (আ.)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ছিল না। যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছেই খিজিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা হযরত মূসা (আ.)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হতো না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই হযরত খিজির (আ.)-কে পাওয়া যাবে।

বুখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই থলিয়ায় মাছ রেখে দেওয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়্যা ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিযা হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়্যা নিজেও তা দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুবী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার থলে ছাড়া পৃথক একটি থলেতে মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তাফসীর থেকেও বুঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিযাই ছিল।

হযরত খিজির (আ.)-এর অস্পষ্ট ঠিকানা দেওয়ার বিষয়টিও হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরো পরীক্ষা ছিল এই যে, ঠিক গন্তব্যস্থলে পৌছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে نَسِيَا حُوتَهُمَا বলে তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বুখারীর হাদীসে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় হযরত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। শুধু ইউশা ইবনে নূন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং জাগ্রত হওয়ার পর হযরত মূসা (আ.)-কে জানাবার ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভুলে ফেলে রাখেন। সুতরাং আয়াতে "উভয়ে ভুলে গেলেন" কথাটা এমন হবে, যেমন অন্য এক আয়াতে يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ বলে মিঠা সমুদ্র ও লবণাক্ত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মোতি শুধু লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয়। কিন্তু تَغْلِيبْ -এর কায়দা অনুযায়ী এরূপ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে সেখান থেকে সামনের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সঙ্গে নেওয়ার কথা বিস্মৃত ছিলেন। তাই আয়াতে ভুলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপারটি সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) আরো একটু কষ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করে তখন তা وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর নবুয়ত প্রসঙ্গ : কুরআন পাকে ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি, বরং عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا [আমার বান্দাদের একজন] বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিজির উল্লেখ করা হয়েছে। খিজির অর্থ– সমুজ-শ্যামল। সাধারণ তাফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত। মাটি যেরূপই হোক না কেন। কুরআন পাক একথাও বর্ণনা করেনি যে, হযরত খিজির (আ.) পয়গাম্বর ছিলেন নাকি একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরিয়তবিরোধী। আল্লাহ তা'আলার ওহী ব্যতীত শরিয়তের নির্দেশ কোনোরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গাম্বর ছাঁড়া আল্লাহ তা'আলা ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরিয়তের কোনো নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হলো যে, হযরত

খিজির (আ.) আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরিয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে- وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশে করছি।

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিজির (আ.)-ও একজন নবী। তবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাফসীর কুরতুবী, বাহরে মুহীত ও আবূ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয় : অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সূফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরিয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরিকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরিয়তে হারাম কিন্তু তরিকতে হালাল। কাজেই কোনো ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গুনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিজির (আ.)-কে দুনিয়ার কোনো ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং শরিয়তের বিরুদ্ধে তার কোনো কাজকে বৈধ বলা যায় না।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর প্রিয় বান্দা কে? : ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির ও ইবনে আবি হাতেম (র.) তাদের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি আমার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, যে আমাকে স্মরণ রাখে এবং কখনো ভুলে না।

হযরত মূসা (আ.) পুনরায় আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম শাসনকর্তা কে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয় না এবং যে হক বা সত্য সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বললেন, যে নিজের ইলমের সঙ্গে অন্যের ইলম একত্র করে বা অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা করে নিজের ইলম বৃদ্ধি করে। [এই উদ্দেশ্যে হয়তো তার নিকট থেকে হেদায়েতের কোনো পথ জানা যায় এবং ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসা যায়।] হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে বড় আলেম যদি থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা ও পথ বাতলিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ কররেন, তোমার চেয়ে বেশি ইলম রয়েছে হযরত খিজির (আ.)-এর। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি খিজিরকে কোথায় পাব? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, সমুদ্রের তীরে পাথরের নিকট। হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি তার চিহ্ন কি করে জানবো। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, একটি ভাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই হযরত খিজির (আ.)-কে পাবে। হযরত মূসা (আ.) তার খাদেমকে বললেন, যেস্থানে মাছটি হারিয়ে যায় সেখানে আমাকে বলবে। এরপর হযরত মূসা (আ.) এবং তার খাদেম ইউশা তাঁরা উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৩৩-৪৩৫]

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : এই ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়। হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, সফরে সাথী বা খাদেম রাখা নবীগণের সুন্নত। হযরত মূসা (আ.) বলেছেন, যে পর্যন্ত আমি দুই সমুদ্রের সংযোগ স্থলে না পৌছব সে পর্যন্ত চলতে থাকবো। এর তাৎপর্য হলো, জ্ঞানের অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রমের ফজিলত এবং গুরুত্ব রয়েছে। হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (র.) লিখেছেন, এর দ্বারা একথাও জানা যায় যে, শায়খে কামেলের অন্বেষণে চরম সাধনা করা উচিত, যতক্ষণ এর দ্বারা কোনো ওয়াজিব বিনষ্ট না হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো লোকের ধারণা এই ঘটনায় যে পাথরের উল্লেখ রয়েছে, সেই পাথরটির নিচে আবে হায়াতের ঝরণা ছিল, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যদি কোনো মৃত প্রাণীর উপর ঐ পানি পড়তো তবে তা জীবিত হয়ে যেত।

কালবী (র.) বলেছেন, ইউশা ইবনে নূন আবে হায়াত দ্বারা অজু করে ভাজা মাছটির উপর পানির ছিটা দিয়েছিলেন। ফলে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। মাছটি তার লেজ দিয়ে আঘাত করলে পানির ভিতর পথ তৈরি হয়।

হযরত খিজির (আ.) প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত : হযরত খিজির (আ.) সর্বকালের সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি রহস্যের অনেক অসাধারণ জ্ঞান দান করেছিলেন। তার প্রকৃত নাম হলো, বিলিয়া বিন মালকান। অথবা আল ইয়াসা, অথবা ইলিয়াস। খিজির হলো তাঁর উপাধি। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। আল্লামা বগভী হোমাম ইবনে মোনাব্বার সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, খিজিরকে খিজির এজন্যে বলা হয়, তিনি যখন কোনো স্থানে বসতেন, তখন সেই স্থানটি সবুজ হয়ে যেত। চারিপার্শ্বে সবুজের মেলা বসতো। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যে স্থানে হযরত খিজির (আ.) নামাজ আদায় করতেন তার চারিপার্শ্বে সবকিছু সবুজ হয়ে যেত। আল্লামা বগভী (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) ইসরাঈলী বংশধর ছিলেন। কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন রাজপুত্র, যিনি দুনিয়াত্যাগী হয়েছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন যে আমার মতে হযরত খিজির (আ.) ইসরাঈলী ছিলেন না। কেননা তাহলে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ করা তার কর্তব্য হতো। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪০]

হযরত খিজির (আ.) নবী ছিলেন নাকি শুধু শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণের মতভেদ রয়েছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী না হলেও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ জ্ঞান প্রদানে ধন্য করেছেন।

-[ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃ. ৩৯০]

সুদ্দী (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) কোনো স্থানে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের তলদেশে উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো যা দু'পাকে ঢেকে দিত। ইবনে আসাকের যাহহাক (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত খিজির (আ.) ছিলেন হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। তার মায়ের নাম ছিল রূমিয়া।

সুদ্দী (র.) বলেছেন, তিনি ছিলেন শাহজাদা, পূর্বকালের কোনো বাদশহার পুত্র। সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ওহাব ইবনে মোনাব্বাহ (র.) বলেছেন, তিনি হলেন মালকান ইবনে ফালেগ ইবনে আবের ইবনে সারেখ ইবনে আরফাখসাজ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)।

আল্লামা আলুসী (র.) ইমাম নববী (র.)-এর অভিমতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে হযরত খিজির (আ.)-এর নাম ছিল বিলিয়া ইবনে মালকান। অধিকাংশ আলেম এ মতই পোষণ করতেন। আল্লামা আলূসী (র.) আরো বলেছেন, যেভাবে তার নবুয়তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, তেমনিভাবে বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন কিনা? এ সম্পর্কেও তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের এক দলের অভিমত হলো তিনি এখন জীবিত নেই। ইমাম বুখারী (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত খিজির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) এখনো কি জীবিত আছেন? তখন তিনি বলেন, কিভাবে? কেননা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা বর্তমানে পৃথিবীতে আছে, একশত বৎসর পর তাদের কেউ থাকবে না।' এমনিভাবে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। রাসূলে আকরাম ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ইরশাদ করেছেন, বর্তমানে পৃথিবীতে যারা আছে, একশত বছরের মাথায় তারা কেউ থাকবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, যদি হযরত খিজির (আ.) জীবিত থাকতেন তবে তাঁর কর্তব্য হতো হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হওয়া, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর সম্মুখে আল্লাহ তা'আলার রাহে জিহাদ করা, অথচ বদরের যুদ্ধের দিন হুজুর ﷺ দোয়া করেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكِ الْعِصَابَةَ لَا تُعْبَدْ فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ!" যদি এই ছোট দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তোমার বন্দেগী আর হবে না। আর বদরের রণাঙ্গণে সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিনশত তেরজন এবং তাঁরা ছিলেন সুপরিচিত, সুবিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে হযরত খিজির (আ.)-তো ছিলেন না।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী- খ. ১৫, পৃ. ৩১৯-২০]

কুরআন পাকে যে ব্যক্তিকে عَبْدٌ [বান্দা] বলা হয়েছে বুখারী শরীফ এবং অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে তাঁকে خَضِرٌ [খিজির] বলা হয়েছে। তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য-ধন্য একজন মকবুল বান্দা।

قَوْلُهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا : আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা হযরত খিজির (আ.)-এর মকবুল বান্দা হওয়া সম্পর্কে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। অবশ্য এই বিশেষ রহমতটি নবুয়ত রূপে হওয়া জরুরি নয়। সুতরাং হযরত খিজির (আ.)-এর নবী হওয়ার

ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। আল্লামা আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি একজন নবী, তবে রাসূল নন। আবার কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি একজন রাসূল। অনেকে বলেছেন, তিনি একজন ওলী। কুশাইরী এবং অপর একটি সম্প্রদায় এই অভিমত পোষণ করেন। তাফসীরে মোয়ালেমুত তানজীল গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অনেক আলেমের মতে তিনি নবী নন।

قَوْلُهُ وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا : অর্থাৎ "আমি তাকে নিজের তরফ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছিলাম।" এই ইলম তাকে চেষ্টার মাধ্যমে উপার্জন করতে হয়নি বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা করতে হয়নি, বরং কোনো বস্তুর মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে এই ইলম সরাসরি দেওয়া হয়েছিল। এই ইলম ছিল বিশ্বসৃষ্টির গোপন রহস্য। মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য বিশ্বজগতের গোপন রহস্য জানা জরুরি নয়; বরং ইলমে শরয়ী ও ইলমে ইলাহী [শরিয়ত ও মারিফত] আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য জরুরি। এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় যে, হযরত মূসা (আ.) এক বিশাল মর্যাদার অধিকারী নবী হওয়ার কারণে একথা নিশ্চিত যে তিনি তাঁর যুগের সকল মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং তাকে কিভাবে তখন অন্য এক ব্যক্তির নিকট জ্ঞান লাভের জন্য পাঠানো সম্ভব হলো। কিন্তু ইমাম রাযী (র.) বলেন যে, এটা অতি সহজেই সম্ভব হয়। কোনো ব্যক্তি যদি অনেক ধরনের ইলমে সমৃদ্ধ হয়েও থাকেন, তবুও তার কাছে কোনো কোনো বিষয় অজানা থাকতে পারে এবং তা শিক্ষা করতে তাঁকে কারো কাছে পাঠানো যেতে পারে।

قَوْلُهُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا : "আমার বান্দাগণের মধ্যে একজন বান্দা।" অর্থাৎ তিনি কামেল বুজুর্গ এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমার একজন বান্দা-ই ছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দার চেয়ে কণা পরিমাণ অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। আর আল্লাহ তা'আলার অনেক বান্দার মধ্য থেকে তিনি ছিলেন একজন মাত্র বান্দা।

قَوْلُهُ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا : অর্থাৎ আর আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি, যা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে عِلْمًا শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলির ইলম।

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى الخ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কামিল শায়খ বা পীরের খুঁজে চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা করার অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হলো তাতে যেন কোনো ওয়াজিব ছুটে না যায়।

نَسِيَا حُوْتَهُمَا الخ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফরকালে সফরের সম্বল ও পাথেয় ইত্যাদি সাথে রাখা তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়।

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا الخ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, অসুস্থতার অবস্থা প্রকাশ করাও তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়।

وَمَا اَنْسٰنِيْهُ الخ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, শয়তানি প্রভাব ও ওয়াসওয়াসার কারণে ভুলক্রটি হয়ে যাওয়াটা وِلَايَتْ -এর পরিপন্থি নয়। তবে শয়তানের যে প্রভাব মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে ফেলে তা অবশ্যই নবুয়তের শানের বিপরীত।

وَاٰتَيْنٰا مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا এ আয়াত থেকে যে ইলমে লাদুন্নী প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব বলে প্রতীয়মান হলো। সেটা হলো ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। আর এই ইলমে লাদুন্নীকে 'ইলমে হাকীকত' এবং 'ইলমে বাতেন'ও বলা হয়। যে ঘটনার বিবরণ এই কাহিনীতে প্রদান করা হয়েছে তাদের ইলমও ইলমে লাদুন্নীর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত খিজির (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। মোটকথা এই আয়াতটি হলো ইলমে লাদুন্নীর উৎস-মূল।

অনুবাদ :

٦٦. قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا - اَىْ صَوَابًا اَرْشُدُ بِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِ الشِّيْنِ وَسَأَلَهُ ذٰلِكَ لِاَنَّ الزِّيَادَةَ فِى الْعِلْمِ مَطْلُوْبَةٌ -

৬৬. হযরত মূসা (আ.) তাঁকে বললেন, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন– এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? رُشْدًا অর্থ হলো صَوَابًا অর্থাৎ যার মাধ্যমে সঠিক পথ অর্জন করব। অপর এক কেরাতে رُشْدًا শব্দটি رَاء বর্ণে পেশ এবং شِيْن বর্ণে সাকিনসহ পঠিত হয়েছে। ইলমের ক্ষেত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করার উদ্দেশ্যেই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-কে প্রশ্ন করেছেন।

٦٧. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا -

৬৭. তিনি বললেন, আপনি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

٦٨. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا - فِى الْحَدِيْثِ السَّابِقِ عَقِبَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ يَا مُوْسٰى اِنِّىْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهُ وَقَوْلُهُ خُبْرًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى لَمْ تُحِطْ اَىْ لَمْ تُخْبَرْ حَقِيْقَتَهُ -

৬৮. যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে এ আয়াতের পরে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যে বিষয়ে আপনি অনবহিত। আর আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এমন জ্ঞান দান করেছেন যে বিষয়ে আমি অনবগত। আল্লাহর বাণীতে خُبْرًا শব্দটি মাসদার আর لَمْ تُحِطْ ফে'লটি لَمْ تُخْبَرْ حَقِيْقَتَهُ অর্থে হয়েছে।

٦٩. قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ اَىْ وَغَيْرَ عَاصٍ لَكَ اَمْرًا - تَأْمُرُنِىْ بِهٖ وَقَيَّدَ بِالْمَشِيَّةِ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلٰى ثِقَةٍ مِنْ نَفْسِهٖ فِيْمَا الْتَزَمَ وَهٰذِهٖ عَادَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَ الْاَوْلِيَاءِ اَنْ لَا يَثِقُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ -

৬৯. হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না। অর্থাৎ যে বিষয়ে আপনি আমাকে নির্দেশ দিবেন আমি তাতে নাফরমানি করব না। হযরত মূসা (আ.) স্বীয় অঙ্গীকারকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে শর্তায়িত করেছেন। কেননা হযরত মূসা (আ.) নিজের উপর আবশ্যককৃত পাবন্দির ব্যাপারে ভরসা ছিল না। আর এটাই নবী ও ওলীগণের চিরাচরিত রীতি যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও নিজের উপর নির্ভরশীল থাকেন না।

অনুবাদ :

٧٠. قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيْدِ النُّوْنِ عَنْ شَىْءٍ تُنْكِرُهُ مِنِّىْ فِىْ عِلْمِكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا . اَىْ اَذْكُرُهُ لَكَ بِعِلَّتِهِ فَقَبِلَ مُوْسٰى شَرْطَهُ رِعَايَةً لِاَدَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ .

৭০. হযরত খিজির (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করেনই, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না। যাকে আপনার জ্ঞানে গর্হিত মনে হয়, এবং ধৈর্যধারণ করবেন। আর تَسْئَلْنِىْ শব্দটি এক কেরাতে লাম বর্ণটি যবরযুক্ত এবং نُوْن বর্ণটি তাশদীদ বিশিষ্ট যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। অর্থাৎ আমি আপনাকে এর কারণ বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমাকে কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না। হযরত মূসা (আ.) ছাত্র-শিক্ষকের শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার শর্ত মেনে নিলেন।

٧١. فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ الَّتِىْ مَرَّتْ بِهِمَا خَرَقَهَا ط الْخَضِرُ بِاَنْ اِقْتَلَعَ لَوْحًا اَوْ لَوْحَيْنِ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ الْبَحْرِ بِفَاسٍ لَمَّا بَلَغَتِ اللُّجَّ قَالَ لَهُ مُوْسٰى اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالرَّاءِ رَفْعِ اَهْلِهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا . اَىْ عَظِيْمًا مُنْكَرًا - رُوِىَ اَنَّ الْمَاءَ لَمْ يَدْخُلْهَا .

৭১. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন সমুদ্রের পাড় ঘেষে চলতে লাগলেন পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলেন যে নৌকা তাদেরকে নিয়ে চলছিল তিনি তখন তা বিদীর্ণ করে দিলেন অর্থাৎ নৌকাটি নদীর মধ্যস্থলে পৌঁছার পর হযরত খিজির (আ.) কুঠারের সাহায্যে একটি বা দুটি কাঠ উপড়ে ফেললেন। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁকে বললেন, আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেওয়ার জন্য তা বিদীর্ণ করলেন? এক কেরাতে لِتُغْرِقَ-এর تَاء-এর স্থলে যবরবিশিষ্ট يَاء এবং رَاء বর্ণে যবর ও اَهْلُهَا রফা অবস্থায় পঠিত রয়েছে। আপনি কত গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করে ফেললেন। বর্ণিত আছে যে, নৌকায় কাঠ খুলে ফেলার পরও তাতে পানি প্রবেশ করেনি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ : এটা اَتَّبِعُكَ-এর كَاف থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِكَ مُعَلِّمًا لِىْ

قَوْلُهُ رُشْدًا : এটা تُعَلِّمَنِ-এর দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে। অর্থাৎ تُعَلِّمَنِ عِلْمًا ذَا رُشْدٍ

قَوْلُهُ اَنْ تُعَلِّمَنِ : এর মধ্যে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّةٌ এবং শেষের نُوْن টি হলো نُوْنِ وِقَايَةٌ আর يَائے مُتَكَلِّمْ এখানে উহ্য রয়েছে। আর نُوْن-এর যের উহ্য يَاء-কে বুঝাচ্ছে।

رُشْدًا শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে, অর্থ হলো– হেদায়েত পাওয়া।

قَوْلُهُ لَمْ تُحِطْ : اَحَاطَ بِهٖ অর্থ– বেষ্টন করে ফেলা, ঘিরে ফেলা।

أَحَاطَ بِهِ عِلْمًا অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ রূপে অবগত হওয়া, পরিপূর্ণভাবে জানা।

قَوْلُهُ خُبْرًا : এটি হয়তো فَاعِل থেকে স্থানান্তরিত হয়ে نِسْبَتْ থেকে تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। অথবা এটা مَفْعُوْل مُطْلَقْ তাকিদের জন্য । কেননা لَمْ تُحِطْ অর্থ হলো لَمْ تُخْبِرْ আর خَبَرْ অর্থ عِلْم অর্থাৎ বাক্যের অর্থ হবে لَمْ تَعْلَمْ بِهِ عِلْمًا

قَوْلُهُ لَا اَعْصِىْ لَكَ : এর আতফ হয়েছে صَابِرًا -এর উপর আর لَا অর্থ হলো غَيْرَ

قَوْلُهُ وَغَيْرَ عَاصٍ : এই বাক্য দ্বারা মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَا টা غَيْرَ -এর অর্থে হয়েছে। আর এটা صَابِرًا -এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَأْمُرُنِىْ : تَأْمُرُنِىْ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَمْرًا টি تَأْمُرُ উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاسٌ : অর্থ হলো, কুঠার, কুড়াল, বহুবচনে فُؤُوْسٌ

قَوْلُهُ اِصْبِرْ : اِصْبِرْ উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ এটা উহ্য مُغَيًّا -এর অংশ। আর اِصْبِرْ হলো مُغَيًّا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا : হযরত মুসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-কে বললেন, আপনার থেকে কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্য আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে এবং ইবনে আসাকের (র.) হযরত আলী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা মু'মিনের হারানো সম্পদ।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো হাদীসে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-কে তাঁর সঙ্গে থাকার কথা বললেন, তখন হযরত খিজির (আ.) বললেন, ইলমের জন্য তাওরাত যথেষ্ট, আর আমলের জন্য বনী ইসরাঈলের হেদায়েতের প্রচেষ্টা যথেষ্ট। আর বাড়তি ইলম ও আমলের কোনো প্রয়োজন নেই। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন আপনার সঙ্গে থেকে আমার ইলম বৃদ্ধি করি। হযরত মূসা (আ.) তাঁর এই কথায় অত্যন্ত আদব ও বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট দরখাস্ত করেছেন যে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে ইলম দান করেছেন তার কিছু অংশ আমাকে দান করুন!

ইলম হাসিল করার আদব : আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এই আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) যখন হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করেন তখন তিনি অত্যন্ত আদব এবং ভদ্রতার পরিচয় দেন। যেমন–

১. তিনি হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট বিনয় প্রকাশ করে এভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেন– هَلْ اَتَّبِعُكَ অর্থাৎ আমি আপনার অনুসরণ করবো কি?

২. তিনি তাঁকে অনুসরণ করার জন্য এমন এক ভঙ্গিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন যার ভাষাটি হলো "আমার নিজেকে আপনার অনুগত করে দিতে আমাকে অনুমতি দিন", এটা ছিল চরম বিনয়ের দৃষ্টান্ত।

৩. তিনি আরজ করেছিলেন, আমাকে আপনি শিক্ষা দান করবেন। একথা দ্বারা তিনি নিজেকে অজ্ঞ এবং হযরত খিজির (আ.)-কে বিজ্ঞ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

৪. তিনি তার কাছে এভাবে আরজ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্যে থেকে কিছু আমাকে দান করুন। مِنْ শব্দটি ব্যবহার করে কিছু জ্ঞান প্রার্থনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত খিজির (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু বা কিঞ্চিৎ জ্ঞান তিনি প্রার্থনা করেছেন। কথা বলার এই ভঙ্গিটিও

বিনয়ের এক অনন্য উদাহরণ, যেন তিনি বলছেন, আমি আপনার কাছে সেই পরিমাণ চাই না যে জ্ঞানের দ্বারা আমাকে আপনার সমান বানিয়ে দিবেন; বরং আপনার অগাধ ইলমের কিছু অংশ দান করবেন, যেরূপ একজন বিত্তবানের কাছে তার বিশাল সম্পদ থেকে একজন ভিক্ষুক সামান্য কিছু প্রার্থনা করে থাকে।

৫. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন- مِمَّا عُلِّمْتَ অর্থাৎ আপনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ কথার দ্বারা তিনি স্বীকার করেছেন যে হযরত খিজির (আ.) যত ইলমের অধিকারী হয়েছেন, তা আল্লাহ তা'আলাই শিক্ষা দিয়েছেন।

৬. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন- رُشْدًا অর্থাৎ হেদায়েত। তিনি হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে হযরত খিজির (আ.)-এর কাছ থেকে ইলম হাসিল করতে চেয়েছেন। আর হেদায়েত এমন এক বস্তু যদি তা হাসিল না হয় তবে তার স্থলে হাসিল হয় গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।

৭. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন- تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এ কথার মধ্যেও হযরত মূসা (আ.)-এর বিনয় প্রকাশ পেয়েছে এই মর্মে যে, আপনি আমাকে যা কিছু শিক্ষা দিবেন তা হবে আপনার তরফ থেকে আমার প্রতি সেইরূপ একটি দান যেরূপ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিয়ামত স্বরূপ দান করেছেন। এখানে যেন এ কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে, আমি তার অনুগত যার কাছ থেকে আমি একটি মাত্র হরফ শিখেছি। –[তাফসীরে কবীর, খ. ২১, পৃ. ১০১]

قَوْلُهُ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا : হযরত খিজির (আ.) হলেন, নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্যজ্ঞানী। আর হযরত মূসা (আ.) হলেন শরিয়তের আইন কানুনের ধারক বাহক এবং প্রচারক। একজনের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হলো অভ্যন্তরীণ রহস্য বা হিকমত। আর আরেকজনের যাবতীয় পদক্ষেপ হলো শরিয়তের বিধান মোতাবেক। তাই হযরত মূসা (আ.) প্রকাশ্য শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজকে সহ্য করবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

অর্থাৎ আর যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ ইলম নেই, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে সবর করবেন?

আলোচ্য আয়াতের خُبْرًا শব্দটির অর্থ ইলম, খবর। হযরত খিজির (আ.) জানতেন এমন এমন ঘটনা ঘটবে যা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ হবে। আর নবীগণ নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেন না, যে পর্যন্ত না সেই নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনো বৈধতা তাদের নিকট প্রকাশিত হয়। হযরত মুসা (আ.) মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর হযরত খিজির (আ.)-এর কাজ হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত মোতাবেক ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক ছিল। তাই উভয়ের সহযাত্রা বা সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে হযরত খিজির (আ.) মন্তব্য করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এজন্য সুফী সাধকগণ বলেন, যদি মুরীদ একথা পূর্ণ বিশ্বাস করে যে পীর কামেল এবং তিনি আরেফ, কামেল, তবে তাঁর কোনো কাজে প্রশ্ন করা উচিত নয়। যদি পীরে কামেলের সাথে মুরীদের মত-বিরোধ হয়ে যায় এবং মুরীদ পীরের কর্মের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন না করে থাকতে না পারে, তবে পীরের সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত, কাছে থেকে প্রশ্ন করার চেয়ে দূরে থাকা অনেক ভালো। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪২-২৪৩]

হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান ও হযরত খিজির (আ.)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্যে সমাধান : এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হযরত খিজির (আ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহপ্রদত্ত তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তার বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিনম্নে উদ্ধৃত করা হলো-

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরিয়ত নাজিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। কুরআন পাকে যত নবী রাসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবার উপরই শরিয়তের আইন প্রয়োগ ও

সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোনো কেনো পয়গাম্বরকেও আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিজির (আ.) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরিয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরিয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গাম্বরের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়, যার জিম্মায় সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরিয়তের আওতাবহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরিয়তের আইন বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬১১]

قَوْلُهُ فَانْطَلَقَا حَتّٰى الخ : হযরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে কোনো প্রকার প্রশ্ন না করার অঙ্গীকারের পর তাঁদের উভয়ের যাত্রা শুরু হলো। তাদের নৌকায় আরোহণের প্রয়োজন হলো এবং একটি নৌকা পেয়েও গেলেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, একটি নৌকা তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নৌকার মালিক হযরত খিজির (আ.)-কে চিনতে পেরেছিলো, তাই সে তাদেরকে বিনা পয়সায় আরোহণ করালো।

قَوْلُهُ حَتّٰى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا الخ : নৌকাটি তীরের কাছাকাছি হওয়ার পূর্বেই হযরত খিজির (আ.) নৌকার একখানি তক্তা খুলে তাতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এ কাজ পছন্দ করলেন না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আরোহীদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্যই কি আপনি তাদের ফাটল ধরিয়ে দিলেন। তারাতো আমাদেরকে বিনা পয়সায় আরোহণ করিয়েছে, এখন পানি প্রবেশ করবে এবং সকলেই নিমজ্জিত হবে। নিশ্চয় আপনি একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত মূসা (আ.) হয়তো লক্ষ্য করেননি, কিন্তু নৌকার আরোহীরা যেন নিমজ্জিত না হয় এবং আপাতত নৌকাটি ত্রুটিপূর্ণ হলেও তক্তাটি পরে যেন জুড়ে দেওয়া যায় সেদিকে হযরত খিজির (আ.) লক্ষ্য রেখেছেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত খিজির (আ.) যে তক্তায় ছিদ্র করেছেন ঐ ছিদ্রের উপর তিনি একটি পাত্র স্থাপন করেছেন। ফলে নৌকায় পানি প্রবেশ করতে পারেনি। বিখ্যাত তাফসীরকার জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, নৌকাটিতে পানি প্রবেশ না করা ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেযা। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৪৬]

আয়াতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত :

قَوْلُهُ هَلْ أَتَّبِعُكَ : এখানে হযরত মূসা (আ.) -এর পক্ষ হতে যে বিনয় নম্রতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করা হয়েছে, তা سُلُوْك এবং تَعْلِيْم -এর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

قَوْلُهُ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ الخ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শায়খের জন্য মুরিদের প্রতি কিছু যথাযথ শর্তারোপ করার অধিকার রয়েছে।

قَوْلُهُ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا الخ : এ আয়াত থেকে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথমত আকাবিরগণ থেকে অনেক সময় এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যার দৃশ্যত শরিয়তের খেলাফ হলেও বাস্তবে তা শরিয়তের খেলাফ নয়।

দ্বিতীয়ত কতিপয় আল্লাহওয়ালা যাদেরকে قُطُبُ التَّكْوِيْنِ এবং صَاحِبِ خِدْمَتْ বলা হয়, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তারা কিছু تَكْوِيْنِيْ تَصَرُّفَاتْ -ও করে থাকেন।

٧٢. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ

٧٣. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيْتُ اَىْ غَفَلْتُ عَنِ التَّسْلِيْمِ لَكَ وَتَرْكِ الْاِنْكَارِ عَلَيْكَ وَلَا تُرْهِقْنِى تُكَلِّفْنِى مِنْ اَمْرِى عُسْرًا ـ مَشَقَّةً فِى صُحْبَتِى اِيَّاكَ اَىْ عَامِلْنِى فِيْهَا بِالْعَفْوِ وَالْيُسْرِ ـ

٧٤. فَانْطَلَقَا بَعْدَ خُرُوْجِهِمَا مِنَ السَّفِيْنَةِ يَمْشِيَانِ حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ اَحْسَنُهُمْ وَجْهًا فَقَتَلَهُ الْخَضِرُ بِاَنْ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّيْنِ مُضْطَجِعًا اَوِ اقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهٖ اَوْ ضَرَبَ رَأْسَهُ بِالْجِدَارِ اَقْوَالٌ وَاَتٰى هُنَا بِالْفَاءِ الْعَاطِفَةِ لِاَنَّ الْقَتْلَ عَقِبَ اللِّقَاءِ وَجَوَابُ اِذَا قَالَ لَهُ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً اَىْ طَاهِرَةً لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ التَّكْلِيْفِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ زَكِيَّةً بِتَشْدِيْدِ الْيَاءِ بِلَا اَلِفٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَىْ لَمْ تَقْتُلْ نَفْسًا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا بِسُكُوْنِ الْكَافِ وَضَمِّهَا اَىْ مُنْكَرًا ـ

অনুবাদ :

৭২. তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না।

৭৩. হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না। অর্থাৎ আমার থেকে আপনার আনুগত্যে ও আপনার কর্মে প্রশ্ন করা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে। এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। আপনার সান্নিধ্য গ্রহণে কঠোরতার আশ্রয় নিবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে বিনয় ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন!

৭৪. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন নৌকা থেকে নেমে তারা উভয়ে হাঁটতে লাগলেন। চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলো সে বালকটি এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি, সে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলায় মত্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে সর্বাধিক সুদর্শন ছিল। আর হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করলেন এভাবে যে, তাকে শুইয়ে ছুরি দ্বারা জবাই করে ফেললেন, অথবা হাতে ধরে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন, অথবা তার মস্তককে দেওয়ালের সাথে সজোরে আঘাত করে মেরে ফেললেন, এই তিনটি উক্তিই বর্ণিত রয়েছে। فَقَتَلَهُ -এর মধ্যে فَا تَعْقِيْبِيَّه عَاطِفَه -কে এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, যাতে এটা বুঝা যায় যে, সাক্ষাতের পরেই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে। এবং এটি اذا -এর জবাব। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন অর্থাৎ এমন এক নিষ্পাপ শিশু যে এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। এক কেরাতে زَاكِيَةً শব্দের ى বর্ণে তাশদীদ ও আলিফবিহীন তথা زَكِيَّةً পঠিত হয়েছে। হত্যার অপরাধ ছাড়াই অর্থাৎ সে কাউকে হত্যাও করেনি। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। نُكْرًا শব্দটি ك বর্ণটি সুকুন ও পেশ উভয়ভাবেই পড়া যায়। অর্থাৎ গর্হিত কাজ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَنْ تَسْتَطِيْعَ : لَنْ تَسْتَطِيْعَ শব্দটি اِسْتِطَاعَةٌ মাসদার থেকে مُسْتَقْبِل فِعْل دَرْ بَلَنْ نَفِىْ تَاكِيْد মা'রূফ مَعْرُوْف-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ-এর সীগাহ, অর্থ হলো– তুমি কখনো করতে পারবে না, সক্ষম হবে না।

قَوْلُهُ بِمَا نَسِيْتُ : এখানে مَا হলো مَوْصُوْلَه । জার ও মাজরূর মিলে لَا تُوَاخِذْنِىْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। عَائِدْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَا تَأْخُذْنِىْ بِاَمْرِ الَّذِىْ نَسِيْتُهُ কেউ কেউ বলেছেন– نَسِيْتُ হলো تَرَكْتُ-এর অর্থে যা نَسِيْتُ-এর لَازِمِىْ অর্থ। আবার এটাও হতে পারে যে, مَا হলো مَصْدَرِيَّةْ অর্থাৎ لَا تَأْخُذْنِىْ بِنِسْيَانِىْ আর نَسِيْتُ-এর তাফসীর غفلت দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে نَسِيْتُ-এর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং لَازِمِىْ অর্থ উদ্দেশ্য। আর তা হলো غَفْلَتْ-এবং تَرْك ; কেননা نِسْيَانْ-এর জন্য تَرْك আবশ্যক।

قَوْلُهُ لَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا : عُسْرًا টি لَا تُرْهِقْنِىْ-এর দ্বিতীয় মাফউল। আর تُرْهِقْنِىْ-এর মধ্যে ى হলো প্রথম মাফউল। বলা হয়– اَرْهَقَهُ عُسْرًا অর্থাৎ সে তাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে বা তার সাথে সংকীর্ণতার আচরণ করেছে।

قَوْلُهُ زَاكِيَةً : زَاكِيَةً বলা হয় এমন আত্মাকে যা এখনো গুনাহে লিপ্ত হয়নি। আর زَكِيَّةً বলা হয় এমন আত্মাকে যা গুনাহের পরে তওবা করে নিয়েছে। আল্লামা কিসায়ী (র.) বলেন– زَاكِيَةً ও زَكِيَّةً উভয়টিরই একই অর্থ।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ نَفْسٍ : এখানে তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে–

১. بِغَيْرِ نَفْسٍ এটা قَتَلْتَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে।

২. উহ্য শব্দের সাথে مُتَعَلِّقْ হবে এবং فَاعِلْ অথবা مَفْعُوْل থেকে حَالْ হবে অর্থাৎ قَتَلْتَهُ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

৩. উহ্য মাসদারের সিফত হবে। অর্থাৎ قَتَلْتَ قَتْلًا مُتَلَبِّسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ

قَوْلُهُ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ : এ ইবারতে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَقْتَ الْحِنْثِ আর غُلَامْ-এর তাফসীর لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থ নির্দিষ্ট করা। কেননা غُلَامْ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا : হযরত মূসা (আ.)-এর মন্তব্যের জবাবে হযরত খিজির (আ.) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। এভাবে হযরত খিজির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর শর্তের কথা মনে করিয়ে দিলেন। এদিকে হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করা হলেও আরোহীদের কোনো ক্ষতি হয়নি, পানি ভেতরে প্রবেশ করেনি।

قَوْلُهُ قَالَ لَا تُوَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ভুলক্রমে কথাটি বলে ফেলেছি। অতএব, দয়া করে আমার ভুল ধরবেন না।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল ভুলক্রমে, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল দোষ স্বীকারে, আর তৃতীয় জিজ্ঞাসা ছিল ইচ্ছা করে বিদায় গ্রহণে।

قَوْلُهُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا : হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-কে বললেন, আমার কাজকে কঠিন করবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না। ভুলবশত আমি প্রশ্ন করেছি, এর জন্য এমন কঠোর ব্যবহার করবেন না যে আপনার সঙ্গে অবস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهُ : নৌকা থেকে অবতরণ করে তারা পুনরায় চলতে থাকেন। অবশেষে তারা একটি বালককে দেখতে পান, হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, একটি বালক অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তাদের মধ্যে সবেচেয় সুদর্শন বালকটিকে হযরত খিজির (আ.) হত্যা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বালকটি নাবালক ছিল। পবিত্র কুরআনের غُلٰمًا শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। কেননা সাবালক হওয়ার পর غُلٰمًا শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাও বলেছেন, যে হযরত মূসা (আ.) বলেছেন- اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً

অর্থাৎ আপনি কি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন। নিহত ছেলেটি নাবালক ছিল বলেই হযরত মূসা (আ.) তাকে নিষ্পাপ বলেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, ছেলেটি সাবালক ছিল। আর কালবী (র.) বলেছেন , সে নওজোয়ান ছিল। সে পথিক মুসাফিরের সম্পদ লুণ্ঠন করতো এবং তার পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতো। যাহহাক (র.) বলেছেন, নাবালক ছিল, কিন্তু খারাপ কাজ করতো, এজন্য তার পিতা মাতা ব্যথিত হতো।

ইমাম মুসলিম হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে বালকটিকে হযরত খিজির (আ.) হত্যা করেছেন সে জন্মগত কাফের ছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তার পিতাকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে লিপ্ত করতো। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে দেখেই হত্যা করেছেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এ হত্যাকাণ্ডের হিকমত বুঝতে না পেরে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন-

اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا .

অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) বললেন আপনি কি একটি নিষ্পাপ শিশুকে কোনো অপরাধ ব্যতীত হত্যা করলেন! নিশ্চয় আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। আপনি অকারণে তথা কোনো অপরাধ ব্যতীত তাকে যে হত্যা করলেন, তা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায়। বিশেষত যখন সে এমন কোনো অন্যায় করেনি যার শাস্তি হতে পারে মৃত্যু। সে হত্যাকারীও নয় এবং মুরতাদও নয়। অতএব, এমন একটি বালককে হত্যা করার চেয়ে আর অন্যায় কি হতে পারে?

اَلْجُزْءُ السَّادِسُ عَشَرَ : ষষ্ঠদশ পারা

অনুবাদ :

٧٥. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ـ زَادَ لَكَ عَلٰى مَا قَبْلَهٗ لِعَدَمِ الْعُذْرِ هُنَا ـ

৭৫. তিনি বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। এখানে لَكَ বৃদ্ধি করেছেন পূর্বের বিপরীতে। কেননা তথায় হযরত মূসা (আ.) ভুল ত্রুটির উজর পেশ করেননি।

٧٦. وَلِهٰذَا قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا اَىْ بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ فَلَا تُصَاحِبْنِىْ ج لَا تَتْرُكْنِىْ اَتَّبِعُكَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ مِنْ قِبَلِىْ عُذْرًا ـ فِىْ مُفَارَقَتِكَ لِىْ ـ

৭৬. এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) বললেন এরপর যদি আমি আপনাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি এই বারের পর তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না অর্থাৎ আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিবেন না। আমার ওজর আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে لَدُنِّىْ -এর نُوْن টি তাশদীদসহ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। مِنْ لَّدُنِّىْ অর্থ مِنْ قِبَلِىْ অর্থাৎ আপনি আমাকে আপনার থেকে পৃথক করার ব্যাপারটি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

٧٧. فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةٍ هِىَ اِنْطَاكِيَّةُ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا طَلَبَا مِنْهُمُ الطَّعَامَ ضِيَافَةً فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا اِرْتِفَاعُهٗ مِائَةُ ذِرَاعٍ يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ اَىْ يَقْرُبُ اَنْ يَّسْقُطَ لِمَيَلَانِهٖ فَاَقَامَهٗ ط اَلْخَضِرُ بِيَدِهٖ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ـ جُعْلًا حَيْثُ لَمْ يُضَيِّفُوْنَا مَعَ حَاجَتِنَا اِلَى الطَّعَامِ ـ

৭৭. অতঃপর তারা উভয়ে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তারা এক জনপদের এন্তাকিয়া অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে খাদ্য প্রার্থনা করলেন অর্থাৎ মেহমানদারীর ভিত্তিতে খাবার চাইলেন; কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তথায় তারা তাদের পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন অর্থাৎ ঝুঁকে পড়ার কারণে ভেঙ্গে পড়ার নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যার উচ্চতা ছিল একশত হাত। তখন হযরত খিজির (আ.) স্বীয় হাত দ্বারা ঐ দেয়ালটিকে সুদৃঢ় করে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) তাঁকে বললেন, আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। অন্য এক কেরাতে لَتَخِذْتَ রয়েছে। কেননা আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা আমাদের মেহমানদারী করেনি।

٧٨. قَالَ لَهُ الْخَضِرُ هٰذَا فِرَاقُ اَىْ وَقْتُ فِرَاقِ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ فِيْهِ اِضَافَةُ بَيْنَ اِلٰى غَيْرِ مُتَعَدِّدٍ سَوَّغَهَا تَكْرِيْرُهٗ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ سَاُنَبِّئُكَ قَبْلَ فِرَاقِىْ لَكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ـ

৭৮. বললেন হযরত খিজির (আ.) এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হলো অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদের সময় বা কারণ। এখানে بَيْنَ -এর ইজাফত غَيْرِ مُتَعَدِّدْ -এর প্রতি হয়েছে। যার ফলে وَاو عَاطِفَة -এর মাধ্যমে بَيْنَ -কে تَكْرَارْ আনা হয়েছে। আমি আপনাকে ব্যাখ্যা করতেছি। আপনার থেকে বিচ্ছেদের পূর্বেই তার তাৎপর্য যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হননি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا فِرَاقُ : বিনিময় ছেড়ে দেওয়ার উপর প্রশ্ন করাই ছিল বিচ্ছেদের কারণ তথা বিচ্ছেদের সময়। অর্থাৎ সে সময়ই হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ : এখানে بَيْنَ -এর ইজাফত مُتَعَدِّدْ -এর দিকে হয়েছে। অথচ بَيْنَ -এর ইজাফত مُتَعَدِّدْ -এর প্রতি হওয়া আবশ্যক। যেমন- بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -এর মধ্যে مُتَعَدِّدْ -এর দিকে ইজাফত হয়েছে।

قَوْلُهُ يُرِيْدُ : মুফাসসির (র.) يُرِيْدُ -এর তাফসীরে يَقْرُبُ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, جِدَارْ -এর দিকে يُرِيْدُ -এর নিসবত اسناد مجازى হিসেবে হয়েছে। কেননা جِدَارْ শব্দটি اِرَادَةْ বিশিষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

قَوْلُهُ تَسْتَطِعْ : تَسْتَطِعْ মূলত تَسْتَطِيْعُ ছিল শুরুতে لَمْ আসার কারণে শেষের ع টি সাকিন হয়ে গেছে। এখন يَاء এবং عَيْن -এর মধ্যে দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে يَاء পড়ে গেছে ফলে تَسْتَطِعْ হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا : হযরত মূসা (আ.) যখন দেখলেন হযরত খিজির (আ.) একটি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করেছেন, তখন তার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। তাই তিনি অত্যন্ত ব্যকুল হয়ে পড়লেন। অবস্থাদৃষ্টে তিনি হযরত খিজির (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন- لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا
অর্থাৎ আপনি অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় কাজ করেছেন। তখন হযরত খিজির (আ.) হযরত মুসা (আ.)-এর বক্তব্যের জবাবে বলেন- قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

অর্থাৎ আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি ধৈর্যধারণ করে আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না। অবশেষে তাই হলো যা ইতিপূর্বে আমি বলেছি। যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে দু'বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে তাই হযরত খিজির (আ.) এবার বিশেষভাবে তাগিদ করে বলেছেন, আপনাকে ইতিপূর্বে আমি যা বলেছিলাম আপনি মনে হয় তা ভুলে গেছেন।
হযরত মূসা (আ.) ধারণা করলেন যে, এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাবলির উপর সবর করা অত্যন্ত কঠিন। তাই হযরত মূসা (আ.) শেষ কথা বলে দিয়েছেন যে যদি এরপর আপনার নিকট আর কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তবে আমাকে আপনি সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনি ওজর আপত্তি গ্রহণের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন আর আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কেননা তিনবার আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। যাহোক যেহেতু হযরত মূসা (আ.) বার বার হযরত খিজির (আ.)-এর বিরোধিতা করছিলেন, তাই তিনি লজ্জিত হলেন এবং বললেন, যদি এরপরও আমি আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আর আপনার সঙ্গে থাকার কোনো অধিকার আমার থাকবে না। আর আপনি যদি আমাকে সরিয়ে দেন তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ থাকবে না।
তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) এই সত্য উপলব্ধি করলেন যে, ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। শুধু জটিলই নয়, বরং দুর্বোধ্য রহস্যময়, এমন অন্যায় কাজ যা দেখে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়, আর কথা বললে কৃত অঙ্গীকারের বিরোধিতা হয়। তাই হযরত মূসা (আ.) সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, এরপরও যদি আমি এমন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। একে একে তিনবার আমাকে সতর্ক করেছেন। এমন অবস্থায় যদি আপনি আমাকে সঙ্গে না রাখেন তবে আপনার প্রতি কোনো প্রকার দোষারোপ করা যাবে না।
মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) আমাদের প্রতি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত হোক, তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তবে আরো বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতেন, কিন্তু তিনি তার সাথীর ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেছেন।
ইবনে মরদবীয়া এই হাদীসকে এভাবে সংকলন করেছেন, "আমার ভাই মূসার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত নাজিল করুন! তিনি লজ্জিত হয়েছেন বলে একথাটি বলেছেন। যদি তিনি তার সাথীর সাথে অবস্থান করতেন তবে আরো বিস্ময়কর বিষয় দেখতেন।" -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ২৪৯]

قَوْلُهُ فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ : তারা উভয়ে চলতে চলতে এক গ্রামের অধিবাসীর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল আনতাকীয়া। ইবনে সীরীন (র.) বলেছেন, স্থানটি

ছিল আইকা। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ঐ বস্তির নাম ছিল বারকা। আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে লিখেছেন, এটি ছিল স্পেনের একটি শহর। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ১৬, পৃ. ১]

قَوْلُهُ اِسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا : তাঁরা ঐ গ্রামবাসীর নিকট খাবার চান, কিন্তু গ্রামবাসীরা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) গ্রামবাসীকে বলেছিলেন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিদের মেহমানদারীর সৌভাগ্য ঐ ভাগ্যহত লোকদের অদৃষ্টে ছিল না, এজন্যে তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানায়।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ঐ বস্তির অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত কৃপণ। হযরত খিজির (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) যখন তাদের এলাকায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তারা তাদের মেহমানদারী করেনি, এমনকি যখন তারা নিজেদের তরফ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন, তখনও তারা অস্বীকার করলো।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, অত্যন্ত মন্দ সে বস্তি যার অধিবাসীরা মেহমানদারী করেনি।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনার সূত্রে লিখেছেন, যখন সেই বস্তির পুরুষরা মেহমানদারীতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাঁরা স্ত্রীলোকদেরকে বললেন, একজন স্ত্রী লোক তাদের মেহমানদারী করলেন।

حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَيَا 'অবশেষে যখন তারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হন', এই বাক্যটির বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে একথা অনুধাবন করা যায় যে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.) শুধু পথ অতিক্রম করার জন্যেই সে গ্রামে উপস্থিত হননি, বরং ইচ্ছা করেই সে গ্রামে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীর এই ব্যবহারে হযরত খিজির (আ.) অসন্তুষ্ট হননি, বরং বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিয়েছিলেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৫০]

তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন- فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ

অর্থাৎ তারা সেখানে একটি পতনোম্মুখ প্রাচীর দেখতে পান। প্রাচীরটি প্রায় পড় পড় অবস্থায় ছিল। হযরত খিজির (আ.) সেই প্রাচীরটি ঠিক করে দিলেন। কেননা যে কোনো সময় তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছিল।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, হযরত খিজির (আ.) হাতের ইঙ্গিতে প্রাচীরটি ঠিক করে দিয়েছেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.) বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) প্রাচীরটি স্পর্শ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরটি সোজা এবং সুদৃঢ় হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত খিজির (আ.) পুরোনো প্রাচীরটিকে ফেলে দিয়ে নতুন প্রাচীর তৈরি করে দিয়েছেন। যাহোক, এটি ছিল হযরত খিজির (আ.)-এর মু'জেযা।

قَوْلُهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا : অর্থাৎ এ সময় হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি এমন কঠোর অন্তর বিশিষ্ট, অনুদার এবং কৃপণ লোকদের প্রতি ইহসান করলেন! অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিলেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন, যা দ্বারা আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো।

قَوْلُهُ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ : এবার হযরত খিজির (আ.) বললেন, ইতিপূর্বে আপনার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এটি আমাদের বিচ্ছেদের সময়। আপনি এখন আমার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারেন।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তাঁদের উভয়ের সহ অবস্থান যে সম্ভব নয়, তা হযরত মূসা (আ.)-ও উপলব্ধি করেন। কেননা তাঁদের উভয়কে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.)-কে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা জনসাধারণের অনুসরণযোগ্য। কেননা তিনি জাহেরী শরিয়তের বিধান প্রচার করতেন এবং তা কায়েম করতেন। কিন্তু হযরত খিজির (আ.)-এর নিকট যে জ্ঞান ছিল, তার অনুসরণ করা এমন কি তার রহস্য উপলব্ধি করাও সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হিকমত : হযরত মূসা ও হযরত খিজির (আ.)-এর মধ্যে উল্লিখিত তিনটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার হিকমত হযরত মূসা (আ.)-কে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল।

যখন হযরত মূসা (আ.) নৌকা ভেঙ্গে ফেলার কারণে আপত্তি উত্থাপন করলেন এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন এবং বাহ্যিক উপকরণকে গুরুত্ব দিলেন। তখন হযরত মূসা (আ.)-কে বলা হলো, হে মূসা যখন তোমাকে সিন্দুকে ভরে নীলনদে নিক্ষেপ করা হলো তখন তোমার রক্ষার বাহ্যিক উপকরণ কোথায় ছিল? যখন হযরত মূসা (আ.) শিশু হত্যার প্রতি আপত্তি পেশ করলেন তখন আওয়াজ আসল সে সময় তোমার আপত্তি কোথায় ছিল যখন তুমি একজন কিবতীকে হত্যা করেছিলে? যখন হযরত মূসা (আ.) বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল ঠিক করে দেওয়ার উপর আপত্তি উত্থাপন করলেন তখন তাকে বলা হলো যখন তুমি পাথর সরিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর কন্যাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়েছ তখন তোমার আপত্তি কোথায় ছিল?

٧٩. اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ عَشَرَةٍ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ بِالسَّفِيْنَةِ مُوَاجِرَةً لَهَا طَلَبًا لِلْكَسْبِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ اِذَا ارَجَعُوْا اَوْ اَمَامَهُمُ الْاٰنَ مَّلِكٌ كَافِرٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ـ نَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُبَيِّنِ لِنَوْعِ الْاَخْذِ ـ

অনুবাদ :

৭৯. নৌকার ব্যাপারটি হলো– এটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তি দশজন তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করতো নৌকার মাধ্যমে তা ভাড়ায় চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করত। আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ক্রটিযুক্ত করতে। আর তাদের পেছনে ছিল যখন তারা ফিরে যাবে অথবা এখন থেকে তাদের সম্মুখে এক রাজা কাফের যে বলপ্রয়োগে সকল ভালো নৌকা ছিনিয়ে নিতো غَصْبًا -এর নসব اَنْ مَصْدَرِيَّة -এর ভিত্তিতে হয়েছে যা প্রকার বর্ণনার জন্য হয়েছে।

٨٠. وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ـ فَاِنَّهُ كَمَا فِىْ حَدِيْثِ مُسْلِمٍ طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لَاَرْهَقَهُمَا ذٰلِكَ اَىْ لِمَحَبَّتِهِمَا لَهُ يَتَّبِعَانِهِ فِىْ ذٰلِكَ ـ

৮০. আর কিশোরটি, তার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরিরর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রয়েছে যে, সেই বাচ্চা জন্মগতভাবে কুফরির উপর সৃষ্টি হয়েছিল। যদি সে জীবিত থাকতো তবে নিশ্চিতভাবে সে তার পিতামাতার উপর প্রাধান্য লাভ করতো। আর তারা অধিক ভালোবাসার কারণে কুফরিতে তার অনুসরণ করতো।

٨١. فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً اَىْ صَلَاحًا وَتُقًى وَاَقْرَبَ مِنْهُ رُحْمًا ـ بِسُكُوْنِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا رَحْمَةً وَهِىَ الْبِرُّ بِوَالِدَيْهِ فَاَبْدَلَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى جَارِيَةً تَزَوَّجَتْ نَبِيًّا فَوَلَدَتْ نَبِيًّا فَهَدَى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ اُمَّةً ـ

৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদেরকে তার পরিবর্তে اَنْ يُّبْدِلَهُمَا শব্দটির دَالْ বর্ণে তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। তাদের পালনকর্তা যেন এক সন্তান পবিত্র এবং খোদাভীরু দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর। رُحْمًا শব্দটির ح বর্ণে সাকিন ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত রয়েছে। এর অর্থ হলো দয়া। পিতামাতার আনুগত্য ও অনুসরণ করা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছেলে সন্তানের পরিবর্তে একটি কন্যা সন্তান দান করলেন। যার সাথে এক নবীর বিবাহ হয়েছে এবং তার গর্ভে একজন নবী জন্ম নিয়েছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গোটা একটি জাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন।

٨٢. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ مَالٌ مَدْفُوْنٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا فَحَفِظَا بِصَلَاحِهِ فِيْ أَنْفُسِهِمَا وَمَالِهِمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَا أَشُدَّهُمَا أَيْ إِيْنَاسُ رُشْدِهِمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ مَفْعُوْلٌ لَهُ عَامِلُهُ أَرَادَ وَمَا فَعَلْتُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ خَرْقِ السَّفِيْنَةِ وَقَتْلِ الْغُلَامِ وَإِقَامَةِ الْجِدَارِ عَنْ أَمْرِيْ أَيْ اِخْتِيَارِيْ بَلْ بِأَمْرِ إِلْهَامٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ـ يُقَالُ إِسْطَاعَ وَاسْتَطَاعَ بِمَعْنٰى أَطَاقَ فَفِيْ هٰذَا وَمَا قَبْلَهُ جَمْعٌ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ وَنُوِّعَتِ الْعِبَارَةُ فِيْ فَأَرَدْتُّ فَأَرَدْنَا فَأَرَادَ رَبُّكَ ـ

অনুবাদ :

৮২. আর ঐ প্রাচীরটি। এটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে রয়েছে তাদের গুপ্তধন। স্বর্ণ ও রৌপ্য জাতীয় সম্পদ প্রোথিত ছিল। তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তাঁর সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কারণেই তার জান ও মাল নিরাপদ থাকল। সুতরাং আপনার প্রভু ইচ্ছা করলেন যে, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হোক। অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যাক দয়াপরবশ হয়ে। এবং তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। رَحْمَةً হলো مَفْعُوْل لَهُ তার আমেল হলো أَرَادَ আর আমি করিনি অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হয়েছে তথা নৌকা ছিদ্র করা, কিশোর হত্যা করা এবং দেয়াল ঠিক করার ব্যাপারে। আমার নিজের পক্ষ হতে অর্থাৎ আমার নিজের ইচ্ছায়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ইলহামের মাধ্যমেই করেছি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারগ হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা। إِسْطَاعَ এবং إِسْتَطَاعَ উভয়টিই أَطَاقَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে এবং তার পূর্বে উল্লিখিত শব্দে দুই লোগাতে একত্রিকরণ হয়েছে। আর فَأَرَادَ رَبُّكَ فَأَرَدْنَا এবং فَأَرَدْتُّ -এর মধ্যে ইবারতে تَنَوُّعْ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلسَّفِيْنَةُ : سَفِيْنَةٌ এটা একবচন, বহুবচনে سَفِيْنٌ ـ سَفَائِنُ অর্থ– নৌকা, জাহাজ, জলযান।

قَوْلُهُ وَرَائَهُمْ : وَرَاءَ শব্দটি اَضْدَادْ তথা বিপরীতধর্মী শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ– আগে পিছে। এটা মূলত মাসদার। এর অর্থ হলো– আড়াল, বিচ্ছিন্নতার সীমানা। এটা اِضْمَار قَدْ -এর সাথে جُمْلَة حَالِيَة হয়েছে।

قَوْلُهُ غَصْبًا : এটা يَأْخُذُ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ যা نَوْع বর্ণনা করার জন্য। যেহেতু يَأْخُذُ -এর মধ্যে غَصْب -এর অর্থ রয়েছে। কাজেই উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, غَصَبَ غَصْبًا আর وَرَائَهُمْ -এর তাফসীর رَجَعُوْا -এবং اَمَامَهُمْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَرَاءَ এটা اَضْدَادْ -এর অন্তর্গত; এটা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ سَفِيْنَةٍ : এর সিফত صَالِحَةٍ শব্দটি উহ্য রয়েছে। হযরত উবাই এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কেরাতে صَالِحَةٍ শব্দটি বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ فَخَشِيْنَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا : অর্থাৎ কিশোরটি তার পিতামাতাকে বাধ্য করবে। বলা হয় رَهِقَهُ অর্থাৎ غَشِيَهُ

قَوْلُهُ طُغْيَانًا : এটা يُرْهِقَهُمَا -এর মাফউল। আর كُفْرًا -এর আতফ طُغْيَانًا -এর উপর হয়েছে।

قَوْلُهُ رُحْمًا : এটা মাসদার। অর্থ হলো– দয়া, অনুগ্রহ, মেহেরবানি। বাবে سَمِعَ হতে মাসদার رَحْمَةٌ . رُحْمًا অর্থ– মেহেরবান হওয়া। আর زَكٰوة এবং رُحْمًا এ দুটি خَيْرًا থেকে تَمْيِيْز হয়েছে। এখানে اِسْم تَفْضِيْل -এর অর্থে নয়।

قَوْلُهُ رَحْمَةً : হয়তো رَحْمَةً শব্দটি يَبْلُغَا এবং يَسْتَخْرِجَا -এর مَفْعُوْل لَهُ অথবা فَعَلْتُهُ উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل بِهِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ : কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তাঁরা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচজন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকিনের সংজ্ঞা : কারো কারো মতে মিসকিন এমন ব্যক্তি যার কাছে কিছুই নেই। আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকিনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সেও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে যাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চেয়ে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকিন বলা হয়েছে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا : আল্লামা বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিজির (আ.) এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, যাতে জালিম বাদশাহ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

বর্ণিত আছে যে, অত্যাচারী বাদশাহর এলাকা অতিক্রম করার পর হযরত খিজির (আ.) স্বহস্তে নৌকাটি ঠিক করে দেন। আল্লামা রূমী (র.) চমৎকার বলেছেন–

گرخضر در بحر کشتی را شکست

صد درستی در شکست خضر هست

অর্থাৎ হযরত খিজির (আ.) যদিও নদীতে নৌকা ভেঙ্গে ফেলেছেন; কিন্তু তার নৌকা ভাঙ্গার মধ্যে হাজারো কল্যাণ নিহিত ছিল।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْغُلَامُ : হযরত খিজির (আ.) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বভাবে কুফর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতামাতার ছিল সৎকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিজির (আ.) বলেন, আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি সৎকর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতামাতাকে ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً : অর্থাৎ ফলে আমি চাই যে তাদের প্রতিপালক যেন এর পরিবর্তে পবিত্রতা এবং স্নেহ মায়ার নিরিখে তার চেয়ে উত্তম সন্তান তাদেরকে দান করেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, বালকটির মৃত্যু হলো, তবে তার পিতামাতা বিপদমুক্ত হলো, তারা তাদের পুত্র হারালো, কিন্তু তাদের ঈমান রক্ষা পেল, শুধু তাই নয়; বরং এই পুত্রের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করলেন জনৈকা পুণ্যবতী কন্যা।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা অনুধাবন করা যায়, ঐ পুত্রের বদলে যে কন্যা সন্তান তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তা হবে দয়ামায়ার প্রতীক এবং পিতামাতার অত্যন্ত অনুগত এবং তাদের স্নেহধন্য ও খেদমতগুজার।

আল্লামা বগভী (র.) কালবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ পুত্রের বদলে তাকে একটি পুণ্যবতী কন্যা দান করেছেন, যার সঙ্গে একজন নবীর বিয়ে হয়।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন যার বংশে সত্তরজন নবী হয়েছেন।

ইবনে জোরাইজ বলেছেন, এই বালকটির পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তাকে একান্ত অনুগত একটি কন্যা দান করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। ইবনুল মুনযির অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কন্যা সন্তান দান করেছেন, যার থেকে বহু পয়গাম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র.) এবং তিরমিযী (র.) হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে এক কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুতরিফ (র.) লিখেছেন, যখন ঐ বালকটি পয়দা হয়েছিল তখন তার পিতামাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল। এরপরে যখন তাকে হত্যা করা হয় তখন তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়। যদি সে জীবিত থাকতো তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য ছিল।

আয়াতে خَشِيْنَا ও اَرَدْنَا ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, হযরত খিজির (আ.) এ দুটি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় اردنا -এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে হযরত খিজির (আ.) অথবা অন্য কেউ শরিক হতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাফের হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে– এ বিষয়টি যদি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি ছিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফের হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিপক্ষে নয়। –[মাযহারী]

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দুজন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী [নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেছেন।

قَوْلُهُ وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا : হযরত আবুদ্দারদা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নিচে রক্ষিত এতিম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ রৌপ্যের ভাণ্ডার। –[তিরমিযী, হাকিম]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল–

১. বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহীম।

২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিন্তামুক্ত হয়।

৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, সে আল্লাহ তা'আলাকে রিজিকদাতারূপে বিশ্বাস করে। এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎকাজে গাফিল হয়।

৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)ও এই রেওয়ায়েতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]

তাফসীরে জালালাইনের ২৫১নং পৃষ্ঠার ৭নং হাশিয়ায় বর্ণিত রয়েছে–

قَوْلُهُ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا . اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكَنْزِ فَقَالَ عِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ كَانَ مَالًا جَسِيْمًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ عِلْمًا فِيْ صُحُفٍ مَدْفُوْنَةٍ وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ كَانَ لَوْحًا مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوْبٍ فِيْ اَحَدِ جَانِبَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَجِبْتُ لِمَنْ يُّؤْمِنُ بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَحْزَنُ عَجِبْتُ لِمَنْ يُّؤْمِنُ بِالرِّزْقِ كَيْفَ يَتْعَبُ عَجِبْتُ لِمَنْ يُّؤْمِنُ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ عَجِبْتُ لِمَنْ يُّؤْمِنُ بِالْحِسَابِ كَيْفَ يَغْفَلُ عَجِبْتُ لِمَنْ يَّعْرِفُ الدُّنْيَا وَتَقَلُّبَهَا بِاَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ اِلَيْهَا . لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ . وَفِي الْجَانِبِ الْاٰخَرِ مَكْتُوْبٌ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا وَحْدِيْ لَا شَرِيْكَ لِيْ خَلَقْتُ الْخَيْرَ فَطُوْبٰى لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِلْخَيْرِ وَاَجْرَيْتُهُ عَلٰى يَدَيْهِ وَالْوَيْلُ لِمَنْ خَلَقْتُهُ لِلشَّرِّ وَاَجْرَيْتُهُ عَلٰى يَدَيْهِ .

قَوْلُهُ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ : বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে হযরত খিজির (আ.) বললেন, আর আমি যা কিছু করেছি এর কোনোটিই আমার নিজের ইচ্ছায় করিনি; বরং আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমেই করেছি। কেননা, কারো কোনো সম্পদ নষ্ট করা, অথবা কোনো লোককে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার ওহী বা প্রত্যাদেশ ব্যতীত বৈধ হতে পারে না। এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেকই আমি কাজ করেছি। আর এ হলো সেসব বিষয়, যে সম্পর্কে আপনি সবর করতে পারেননি। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৬২]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.) থেকে বিদায় হওয়ার সময় বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন। হযরত খিজির (আ.) বললেন, জ্ঞানের অন্বেষণ এবং ইলম হাসিল করুন তার উপর আমল করার জন্যে, মানুষের নিকট বর্ণনা করার জন্যে নয়।

শিক্ষণীয় বিষয় : আল্লামা বায়যাবি (র.) লিখেছেন, এই ঘটনা দ্বারা আমাদের জন্য যা শিক্ষণীয় তা হলো এই, কোনো ব্যক্তিরই তার ইলমের জন্যে গর্ব করা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত কোনো কথা অপছন্দনীয় হলে, তথা সঠিক বলে মনে না হলে সঙ্গে সঙ্গে তা অস্বীকার করা উচিত নয়। কেননা হয়তো এর পেছনে এমন কোনো রহস্য থাকতে পারে, যা তার অজানা রয়েছে।

আল্লামা সানউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, কোনো ব্যক্তির কথা যদি সঠিক মনে না হয়, আর সে ব্যক্তি দীনদার পরহেজগার আলেম হয়, তবে তার কথা সঙ্গে অস্বীকার করা অনুচিত; বরং তার নিকট থেকে আরো ইলম হাসিল করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা কর্তব্য এবং যিনি শিক্ষা দেন, তার প্রতি আদব রক্ষা করা উচিত, তার সম্মুখে বিনয় প্রকাশ করা কর্তব্য। আর যদি দেখা যায় তিনি বার বারই ভুল করে যাচ্ছেন তবে তার নিকট থেকে দূরে থাকা উত্তম। হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা থেকে এমনি অনেক মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া যায়।

পয়গাম্বরসুলভ অলঙ্কার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত : এ দৃষ্টান্তটি বুঝার আগে একটি জরুরি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালোমন্দ সবই আল্লাহ তা'আলার সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যেসব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্ব প্রকৃতির জন্য সবই জরুরি এবং আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি হিসেবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন–

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যক ভালো ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোনো মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্ট না বলা আদব। কুরআনে উল্লিখিত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন– اَلَّذِىْ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ এতে তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহ তা'আলার প্রতিই সম্পৃক্ত করেছেন কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পৃক্ত করে اِذَا مَرِضْتُ বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিজির (আ.)-এর উক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দূষণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে اَرَدْتُّ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দকাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভালো কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে اَرَدْنَا অর্থাৎ "আমরা ইচ্ছা করলাম" বলেছেন। যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভালো কাজটি আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করে এতিমদের গুপ্তধনের হেফাজত করা একটি সম্পূর্ণ ভালো কাজ। তাই একে পুরোপুরি আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পৃক্ত করে فَاَرَادَ رَبُّكَ অর্থাৎ "আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন" বলেছেন।

অনুবাদ :

٨٣. وَيَسْئَلُوْنَكَ اَيِ الْيَهُوْدُ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط اِسْمُهُ اِسْكَنْدَرُ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قُلْ سَأَتْلُوْا سَاَقُصُّ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ مِنْ حَالِهِ ذِكْرًا ـ خَبَرًا ـ

৮৩. ইহুদিরা আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তার নাম হলো ইস্কান্দার। আর তিনি নবী ছিলেন না। আপনি বলুন! আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করব।

٨٤. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْاَرْضِ بِتَسْهِيْلِ السَّيْرِ فِيْهَا وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ سَبَبًا ـ طَرِيْقًا يُوْصِلُ اِلٰى مُرَادِهِ ـ

৮৪. আমি তো তাকে পৃথিবীর কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। পৃথিবীতে ভ্রমণ করাকে সহজ করে দিয়ে। এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম। যার দিকে সে মুখাপেক্ষী ছিল। এমন পথ যার মাধ্যমে সে তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হতো।

٨٥. فَاَتْبَعَ سَبَبًا ـ سَلَكَ طَرِيْقًا نَحْوَ الْمَغْرِبِ ـ

৮৫. অতঃপর তিনি একপথ অবলম্বন করলেন পশ্চিম দিকে চলার পথ অবলম্বন করলেন।

٨٦. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ مَوْضِعَ غُرُوْبِهَا وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ ذَاتَ حِمَاةٍ وَهِىَ الطِّيْنُ الْاَسْوَدُ وَغُرُوْبُهَا فِى الْعَيْنِ فِىْ رَأْىِ الْعَيْنِ وَاِلَّا فَهِىَ اَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا وَوَجَدَ عِنْدَهَا اَىِ الْعَيْنِ قَوْمًا كَافِرِيْنَ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ بِالْهَامٍ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ الْقَوْمَ بِالْقَتْلِ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ـ بِالْاَسْرِ ـ

৮৬. চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছলেন সূর্য ডোবার স্থানে। তখন সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্তাগমন করতে দেখলেন কালো মাটি বিশিষ্ট জলাশয়ে সূর্যের অস্ত যাওয়া দর্শকের দৃষ্টির অনুভূতি অনুসারে অন্যথায় সূর্য তো পৃথিবী থেকেও অনেক বড়। এবং তিনি তথায় জলাশয়ের নিকটে এক কাফের সম্প্রদায় দেখতে পেলেন। আমি বললাম, হে জুলকারনাইন! ইলহামের মাধ্যমে তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার সম্প্রদায়কে হত্যা করার মাধ্যমে অথবা এদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। বন্দী করে।

٨٧. قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ بِالشِّرْكِ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ نَقْتُلُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا ـ بِسُكُوْنِ الْكَافِ وَضَمِّهَا شَدِيْدًا فِى النَّارِ ـ

৮৭. তিনি বললেন, যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে আমি তাকে শাস্তি দিব তাকে হত্যা করব। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। نُكْرٌ শব্দটি ك বর্ণে সাকিন ও পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থ– আগুনের কঠিন শাস্তি।

অনুবাদ :

٨٨. وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاۤءَ الْحُسْنٰى ج اَيِ الْجَنَّةُ وَالْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِنَصَبِ جَزَاءً وَتَنْوِيْنِهٖ قَالَ الْفَرَّاءُ وَنَصَبُهٗ عَلَى التَّفْسِيْرِ اَىْ لِجِهَةِ النِّسْبَةِ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ـ اَىْ نَاْمُرُهٗ بِمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ ـ

৮৮. তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত। আর ইজাফত হলো اِضَافَت بَيَانِيَّة অপর এক কেরাতে جَزَاءً শব্দটি نَصَبْ এবং تَنْوِيْن সহ পঠিত হয়েছে। ইমাম ফাররা বলেন যে, এর নসব হয়েছে جِهَةِ نِسْبَت -এর তাফসীরের কারণে। এবং তার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলব অর্থাৎ আমি তার জন্য এমন বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করব যা তার জন্য সহজ হবে।

٨٩. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ـ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ـ

৮৯. আবার তিনি এক পথ ধরলেন পূর্ব দিকে।

٩٠. حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ مَوْضِعَ طُلُوْعِهَا وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ هُمُ الزَّنْجُ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا اَيِ الشَّمْسِ سِتْرًا ـ مِنْ لِبَاسٍ وَلَا سَقْفٍ لِاَنَّ اَرْضَهُمْ لَا تَحْمِلُ بِنَاءً وَلَهُمْ سُرُوْبٌ يَغِيْبُوْنَ فِيْهَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَيَظْهَرُوْنَ عِنْدَ ارْتِفَاعِهَا ـ

৯০. চলতে চলতে তিনি যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছলেন সূর্য উদিত হওয়ার জায়গা তখন তিনি দেখলেন তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হচ্ছে তারা হলো নিগ্রো সম্প্রদায় যাদের জন্য সূর্যতাপ হতে কোনো অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। যেমন– পোশাক, ছাদ/আচ্ছাদন ইত্যাদি। কেননা তাদের ভূমিতে ইমারত নির্মাণ সম্ভব ছিল না। তাদের জন্য গর্ত ছিল। তারা তাতে সূর্যোদয়কালে আত্মগোপন করত এবং সূর্যাস্তকালে গুহা হতে বের হতো।

٩١. كَذٰلِكَ ط اَيِ الْاَمْرُ كَمَا قُلْنَا وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ اَىْ عِنْدَ ذِى الْقَرْنَيْنِ مِنَ الْاٰلَاتِ وَالْجُنْدِ وَغَيْرِهَا خُبْرًا ـ عِلْمًا ـ

৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই বিষয়টি এমনই যা আমি বর্ণনা করেছি। তার নিকট যা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি। অর্থাৎ জুলকারনাইনের যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সৈন্য ইত্যাদি সম্পর্কে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ سَاَتْلُوْا : এখানে سِيْن টি শুধুমাত্র তাকিদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। مُسْتَقْبِلْ -এর জন্য নয়। কেননা পূর্ণ কুরআন ধারাবাহিকভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِنْهُ : এখানে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّة আর যমীর জুলকারনাইনের দিকে ফিরেছে। আর مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مِنْ اَخْبَارِهٖ জার মাজরূর বাস্তবিক পক্ষে ذِكْرًا -এর সিফত। কিন্তু مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে حَالْ হয়েছে।

২. مِنْهُ-এর যমীর اَللّٰهُ-এর দিকে ফিরেছে। আর مِنْ হলো اِبْتِدَائِيَّة অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ অবস্থা পড়ে শুনাচ্ছি। তবে এই সম্ভাবনাটি খুবই দুর্বল।

ذِكْرًا এটা سَاَتْلُوْا-এর مَفْعُوْل بِهٖ আর যদি اَتْلُوْا এটা اَذْكُرُ-এর অর্থে হয়ে থাকে তবে ذِكْرًا এটা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ হবে। ذِكْرًا টি প্রথম সুরতে نَبَأ-এর অর্থে হবে। আর দ্বিতীয় সূরতে কুরআনের অর্থে হবে। আর مِنْهُ-এর তাফসীর مِنْ حَالُهٗ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো উহ্য মুজাফের প্রতি ইঙ্গিত করা। কেননা প্রশ্ন অবস্থা সম্পর্কে হয়ে থাকে ذَاتٌ সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهٗ مَكَّنَّا : এটা বাবে تَفْعِيْل-এর تَمْكِيْن মাসদার হতে মাযীর সীগাহ। অর্থ- শক্তি বা ক্ষমতা দেওয়া, পা সুদৃঢ় করা।

قَوْلُهٗ سَبَبَ : এটা একবচন, বহুবচনে اَسْبَابٌ অর্থ হলো রশি, মাধ্যম, উপকরণ ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ وَجَدَ : وَجَدَ অর্থ হলো رَاٰى বা দেখা, অনুভব করা।

قَوْلُهٗ حَمِئَةٍ : এটা বাবে سَمِعَ হতে صِفَت مُشَبَّه মাসদার حَمَئًا আর حَمَأ الْمَاءُ অর্থ- পানি ঘোলাটে হলো। কর্দমযুক্ত হলো। اَلْحَمْئَةُ অর্থ- কালো মাটি।

قَوْلُهٗ اَمَّا : এটা اَنْ এবং مَا-এর সমন্বয়ে ঘটিত। এটা حَرْف تَفْصِيْل বা ব্যাখ্যামূলক অব্যয়। আর اَنْ تُعَذِّبَ-এর মধ্যে اَنْ টি হলো مَصْدَرِيَّة আর পূর্ণ বাক্য হলো بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে হয়তো মুবতাদা হবে এবং خَبَرْ উহ্য হবে। অর্থাৎ اَمَّا تَعْذِيْبُكَ وَاقِعٌ অথবা خَبَرْ হবে এবং তার مُبْتَدَا উহ্য থাকবে অর্থাৎ اَمَّا اَمْرُكَ تَعْذِيْبُكَ অথবা উহ্য ফেলের مَفْعُوْل হবে। অর্থাৎ اَمَّا تُوْقِعُ تَعْذِيْبَكَ আর اَمَّا تَتَّخِذُ-এর মধ্যেও উপরিউক্ত সম্ভাবনাগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهٗ فِىْ رَاْىِ الْعَيْنِ : فِىْ رَاْىِ الْعَيْنِ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, وَجَدَ এখানে তার حَقِيْقِىْ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে না; বরং দৃষ্টিতে আসা বা অনুভব করা অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেননা সূর্য পৃথিবীর কোনো জলাশয়ে অস্ত যাওয়া অসম্ভব। যেহেতু সূর্য তের লক্ষ পৃথিবীর সমান এবং তার ব্যাস ৮৬,৬৫.০০০ মাইল। সূর্যের জলাশয়ে অস্ত যাওয়ার বিষয়টি এরূপ যেমন কোনো দর্শক দেখেন যে, আকাশ চতুর্দিক দিয়ে দিগন্তের সাথে মিলিত রয়েছে। অথচ বাস্তবে এরূপ নয়। অনুরূপভাবে যদি আপনি রেল লাইনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে রেল লাইন দেখেন তবে মনে হবে যে, একটি লাইন অপর লাইনের খুবই নিকটবর্তী। এমনকি এক পর্যায়ে মনে হবে যে, উভয় লাইন একেবারেই মিলে গেছে। অথচ বাস্তবিক অবস্থা এরূপ নয়। সূর্য জলাশয়ে অস্ত যাওয়ার বিষয়টিও তদ্রূপ।

قَوْلُهٗ حُسْنًا : এর مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذَا حُسْنٍ অথবা মুবালাগা হিসেবে মাসদারের حَمْل করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ : এখানে اَمَّا হলো حَرْف تَفْصِيْل বা ব্যাখ্যামূলক অব্যয়। কিন্তু তাতে শর্তের অর্থও বিদ্যমান আছে এজন্যই তার জবাবে فَاء আনা জরুরি।

قَوْلُهٗ فَلَهٗ جَزَاءً : لَهٗ হলো خَبَر مُقَدَّم আর اَلْحُسْنٰى হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ আর جَزَاءً শব্দটি حَال বা تَمْيِيْز হবে। অর্থাৎ لَهُ الْحُسْنٰى جَزَاءً كَمَا يُقَالُ لَكَ هٰذَا الثَّوْبُ هِبَةً

قَوْلُهٗ يُسْرًا : এর مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذَا يُسْرٍ অথবা মাসদারের حَمْل মুবালাগা রূপে হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَمْ نَجْعَلْ : এটা قَوْم-এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهٗ كَذٰلِكَ : এটা উহ্য مُبْتَدَأ-এর সিফত হয়েছে। অর্থাৎ اَلْاَمْرُ كَذٰلِكَ

قَوْلُهٗ اَحَطْنَا : এটা جُمْلَة مُسْتَاْنِفَة হয়েছে।

قَوْلُهٗ خُبْرًا : এটা خَبَرْ-এর মাসদার বাবে فَتَحَ ও كَرُمَ ; خَبُرَ الشَّيْئَ وَبِهٖ অর্থ- বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

قَوْلُهُ بِإلْهَام : এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত জুলকারনাইন নবী ছিলেন না; বরং একজন নেককার বাদশাহ ছিলেন।

قَوْلُهُ سَنَقُوْلُ : سنقول -এর তাফসীর نَأمُرُ -এর দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থকে নির্দিষ্টকরণ। কেননা قَوْل শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে তিনটি প্রশ্ন করেছিল। ১. রূহের তাৎপর্য ২. আসহাবে কাহাফ ৩. জুলকারনাইন। এই সূরার শুরুতে আসহাবে কাহাফের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর সূরার শেষের দিকে জুল কারণাইন সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

জুলকারনাইন-এর পরিচিতি : জুলকারনাইন একজন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের রাজত্ব দান করেছিলাম। সমগ্র বিশ্বের রাজা বাদশাহ তথা শাসনকর্তাগণ তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। প্রকাশ্যে তিনি ক্ষমতাধর বাদশাহ ছিলেন আর অন্যদিকে দরবেশ ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং আল্লাহ তা'আলার ওলী ছিলেন তিনি।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তাঁকে জুলকারনাইন এজন্য বলা হতো যে, তিনি পৃথিবীর প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান তিনি দেখেছিলেন। আর পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম উভয় দিকে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আর সূফী সাধকগণ বলেছেন, তাকে জুলকারনাইন এজন্য বলা হয়– আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাহেরী এবং বাতেনী ইলম দান করেছিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আসহাবে কাহাফ পৌত্তলিক জালেম রাজার অকথ্য নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে পাহাড়ের গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। পক্ষান্তরে জুলকারনাইন ইয়াজুজ মাজুজের ন্যায় অশান্তি সৃষ্টিকারী জালেমদেরকে পাহাড়ের পিছনে ঠেলে দিয়ে সীসাঢালা প্রাচীর তৈরি করেছিলেন। যাতে করে জালেমর এসে অরাজকতা সৃষ্টি করতে না পারে। আসহাবে কাহফ জালেমের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আর জুলকারনাইন জালেমদেরকে পৃথিবীর এক প্রান্তে সরিয়ে দিয়েছেন। জুলকারনাইনের ঘটনায় দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়ের সমন্বয়ে ঘটেছে। একদিকে তার রাজকীয় শান-শওকত, অসাধারণ ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, শক্তি সামর্থ্য, আর অন্য দিকে তার কারামতসমূহ এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তির যে বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তা মানবজাতির ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা।

বর্ণিত আছে যে, জুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর যুগে বর্তমান ছিলেন। তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কাবা শরীফ প্রাঙ্গণে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং তার সাথে মোছাফাহার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার বরকতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সফর তার জন্য সহজ হয়ে যায়। অনেক বিস্ময়কর ক্ষমতা তিনি লাভ করেন। হযরত খিজির (আ.) তার উজির বা সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পাশাপাশি ইলম এবং হেকমতও দান করেছিলেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। পৃথিবীর সকল রাজা বাদশাহ তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, তারা তাকে ভয় করতো।

ইহুদিদের পরামর্শক্রমে মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করেছিল যে, কোন বাদশাহ প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য ভ্রমণ করেছিল। তাঁর ঘটনা কি?

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের ঐ প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে জুলকারণাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

قَوْلُهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ : বস্তুত জুলকারনাইনে অত্যন্ত নেককার বাদশাহ ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বাতাসের উপর নিয়ন্ত্রণ দান করেছিলেন, ঠিক তেমিনভাবে জুলকারনাইনকে জমিনের উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন। সারা পৃথিবীর পথঘাট সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান দান করেছিলেন।

বর্ণিত আছে চার ব্যক্তি সারা পৃথিবীর বাদশাহ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে দু'জন মু'মিন আর দুজন কাফের। মু'মিন হলেন, জুলকারনাইন ও হযরত সুলায়মান (আ.)। আর কাফের দুজন হলো বখতে নসর ও নমরূদ এবং পঞ্চম ক্ষমতাবান ব্যক্তি হবেন ইমাম মাহদী (আ.)। তিনি শেষ জমানায় আত্মপ্রকাশ করবেন এবং সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবেন। পূর্বোল্লিখিত চারজন সাবেক উম্মতসমূহের হয়েছিলেন। আর ইমাম মাহদী (আ.) হবেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া থেকে। কোনো কোনো লোকের ধারণা রোমের ইস্কান্দরন বাদশাহের নাম ছিল জুলকারনাইন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, জুলকারনাইন অন্য একজন বাদশাহ, যিনি রোমের ইস্কান্দর থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে ছিলেন। কেননা পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতে যে জুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে তিনি অত্যন্ত দীনদার, প্রকৃত অর্থে মর্দে মু'মিন, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আর রোমের ইস্কান্দর ছিল কাফের মুশরিক, তার উজির ছিল আরাসতাতালীস। সে শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ তার হয়নি। সে ইয়াজুজ মাজুজকে গতিরোধ করার জন্যে কোনো প্রাচীর নির্মাণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ করেননি। পবিত্র কুরআনে জুলকারনাইনের কথা স্থান পেয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পাড়া ১৬, পৃ. ১০৬]

قَوْلُهُ يَسْـئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ : এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আল্লামা বগভী (র.) বলেছেন যে, কোনো কোনো আলেমের মতে জুলকারনাইনের নাম ছিল মারজুবান বিন মারজিয়াহ। তিনি স্পেনের লোক ছিলেন এবং ইয়াফিছ বিন নূহের বংশোদ্ভূত ছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন, তিনি সিরীয় ছিলেন এবং নাম ছিল সিকান্দার বিন কিবলীস বিন ফিলকূস।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর মতে দ্বিতীয় বক্তব্যটি অধিক যুক্তিসঙ্গত।

শিরাজী (র.) 'আল-আলক্বাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক ও ইবনে মুনজের এবং ইবনে আবি হাতেম ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ ইয়ামানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ ঐতিহাসিক ঘটনার বড় আলেম ছিলেন। তাঁদের মতে জুলকারনাইন রুমী ছিলেন, এক বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান ছিলেন, তার প্রকৃত নাম ছিল সেকান্দার। ইবনুল মুনজের (র.) লিখেছেন যে, তাফসীরকার কাতাদা (র.) এ মতই পোষণ করতেন।

জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী হওয়ার ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। আবুল ফোজাইলের বর্ণনা হলো, হযরত আলী (রা.)-কে জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, তিনি কি নবী ছিলেন? না বাদশাহ? হযরত আলী (রা.) বললেন, তিনি নবীও ছিলেন না বাদশাহও ছিলেন না; বরং এমন এক বান্দা ছিলেন, যিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতেন আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ভালোবাসতেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করতেন, আর আল্লাহ তা'আলা তাকে কল্যাণ দান করেন।

ইবনে মরদবীয়া সালেম ইবনে আবীল জোদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইন কি নবী ছিলেন? তিনি বললেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, জুলকারনাইন আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত অনুগত বান্দা ছিলেন, আর আল্লাহ তা'আলাও তাঁর আন্তরিকতার কদর করতেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে জুলকারনাইন বলে ডেকেছিল। তখন হযরত ওমর (রা.) **বললেন**, তোমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের নামে নামকরণ করা যথেষ্ট মনে করনি এখন ফেরেশতাদের নামও ব্যবহার করতে শুরু করেছ।

নামকরণের কারণ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন যে জুলকারনাইন নামকরণ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

১. সূর্যের দু'টি প্রান্ত রয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম। জুলকারনাইন উভয় প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

২. তিনি রোম এবং পারস্য উভয় সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

৩. দুনিয়ার আলোকিত এবং অন্ধকার উভয় অঞ্চলেই তিনি প্রবেশ করেছেন। আলোকিত অঞ্চল অর্থাৎ শেতাঙ্গ লোকদের দেশ যেমন– ইউরোপ, আর অন্ধকার কৃষ্ণাঙ্গদের দেশ যেমন– আফ্রিকা।

৪. জুলকারনাইন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি সূর্যের উভয় প্রান্তকে স্পর্শ করেছেন।

৫. তাঁর দুটি অতি সুন্দর জুলফ ছিল।

৬. তার মাথায় শিং এর মতো দুটি স্থান ছিল, যা তিনি আমামা বা পাগড়ি দ্বারা ঢেকে রাখতেন।

৭. আবূ তোফাইল বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী (রা.) জুলকারনাইন নামকরণের এই কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার উপদেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁর মাথার ডান দিকে আঘাত দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন, তিনি পুনরায় তার জাতিকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ দেন, তখন তারা তাঁর মাথার বা দিকে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে জীবিত করেন। কারণ শব্দটির অর্থ হলো মাথার ডান বা বা দিকের উচু স্থান।

ইমাম আহমদ (র.) 'আযজুহুদ' নামক গ্রন্থে এবং ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম ও আবুশ শায়খ 'আল আজমত' গ্রন্থে আবূল ওয়াকার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়, জুলকারনাইনের শিং দুটি কেমন ছিল, তোমরা হয়তো মনে করতে পারো যে সোনালী বা রূপালি দুটি শিং ছিল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় এমন ছিল না, বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার ওলী ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর উম্মতের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তার উম্মতকে সত্যের দাওয়াত দেন, লোকেরা তার মাথার বা দিকে এমন আঘাত দেয় যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন এবং মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার আদেশ দেন। লোকেরা তার মাথার ডান দিকে এমন আঘাত দেয় যে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জুলকারনাইন নামকরণ করেন।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৬১-২৬৩]

قَوْلُهُ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا - শানে নুযূল : আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইহুদিরা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, আপনি হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করেন। তাদের নাম হয়তো আমাদের নিকট থেকেই শ্রবণ করেছেন। এখন এমন একজন নবীর সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বলুন, যার আলোচনা তাওরাতে মাত্র এক জায়গায় রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার কথা বলছো? তারা বলল, আমরা জুলকারনাইনের কথা বলছি। প্রিয়নবী ﷺ তখন ইরশাদ করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার নিকট কোনো কথা এখনো পৌছেনি।

এই জবাব শ্রবণ করে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো, তারা মনে করলো যে প্রিয়নবী ﷺ তাদের জবাব দিতে অপারগ হয়েছেন। [নাউজুবিল্লাহ] [তাদের এই উপলব্ধির জন্যই তারা আনন্দিত হয়] এরপর তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবার থেকে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু তারা তাঁর গৃহের দুয়ার পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন, তখন আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হলো– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا

ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে আহলে কিতাবদের কয়েকজন হাজির হলো। তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো ইলম নেই। আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই গৃহের ছাদের উপর এক রকম শব্দ শ্রুত হলো। প্রিয়নবী ﷺ -এর মধ্যে ওহী নাজিল হওয়ার সময়ের অবস্থা পরিলক্ষিত হলো। একটু পরেই যিনি এই আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে লাগলেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ الخ

এরপর তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার নিকট জুলকারনাইন সম্পর্কে খবর এসে গেছে, আপনার জন্য তা যথেষ্ট।

ইমাম সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যিনি পাগড়ি ব্যবহার করেছেন তিনি হলেন জুলকারনাইন। যেহেতু তাঁর মাথার ডানে ও বাঁয়ে কাফেরদের আঘাতের কারণে শিং এর ন্যায় উঁচু হয়েছিল। তিনি পাগড়ি পরিধান করে ঐ উঁচু স্থানটি গোপন করে রাখতেন।

قَوْلُهُ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْاَرْضِ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মেঘমালাকে আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনের অনুগত করে দিয়েছিলেন। মেঘমালার উপর তিনি আরোহণ করতেন। তার উপায়-উপকরণ বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্য আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, রাতদিন তার জন্য ছিল সমান। আর পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেওয়ার তাৎপর্য হলো, পৃথিবীতে চলাফেরা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। আর সহজ করার তাৎপর্য হলো, তার জন্য সর্বত্র সর্বপ্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। রাত দিনের পরিবর্তনের বা মৌসুমের পরিবর্তনের কারণে তার গতি রোধ হতো না, তার ভ্রমণ বন্ধ হতো না।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا : আরবি অভিধানে سَبَبٌ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যদ্দ্বারা লক্ষ্য অর্জনের সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। -[বাহরে মুহীত]

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয়, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগের যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ فَاَتْبَعَ سَبَبًا : অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছার উপকারণাদি তাকে দান করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছার উপকরণাদি কাজে লাগান।

قَوْلُهُ حَمِئَةٍ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ : حَمِئَةٍ-এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বুঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোনো বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোনো ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো পাহাড়, বৃক্ষ, দালান কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

قَوْلُهُ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا : অর্থাৎ ঐ কালো জলাশয়ের কাছে জুলকারণাইন এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর। অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে জুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন, আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে পথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

قَوْلُهُ لَنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ : এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, জুলকারনাইনকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন। জুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোনো পয়গাম্বরের মধ্যস্ততায়ই তাকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন- রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিজির (আ.) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এটা নবুয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর জন্য কুরআন وَاَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রাসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ হাইয়্যান (র.) বাহরে মুহীতে বলেন, এখানে জুলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না। কাশ্‌ফ ইলহাম অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় জুলকারনাইকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যাঁর মাধ্যমে তাঁকে এসব সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই বিশুদ্ধ নয়।

اَمَّا শব্দটির তাৎপর্য হলো এই যে, জুলকারনাইনকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করতে পার। কেননা তারা কাফের। আর তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে বন্দী করে রাখতে পার অথবা তোমার মধুর ব্যবহার দ্বারা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পার। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-.... قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ অর্থাৎ জুলকারনাইন বললেন, যে কেউ অন্যায় করবে আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দিব। এরপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।"

জুলকারনাইন বললেন, যে জুলুম অত্যাচার করবে আমি তাকে অবশ্যই সমুচিত শাস্তি দিব। তবে দুনিয়ার এ শাস্তিই শেষ নয়; বরং তারা যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট হাজির হবে, তখন তিনি তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দিবেন। যেহেতু তারা কাফের ছিল তাই তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ধারার একটি বৈশিষ্ট্য হলো-

কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়, তখনই তার পাশাপাশি মু'মিন বান্দাদের পুরস্কারের কথাও ঘোষিত হয়। তাই পরবর্তী আয়াতে মু'মিনদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ আর যে ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলার বিধান মোতাবেক জীবনযাপন করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার।

قَوْلُهٗ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا : অর্থাৎ "আর আমি তাকে আমার কাজে সহজ নির্দেশ দিব" অর্থাৎ কঠিন নির্দেশ দিব না। আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, উত্তম নির্দেশ দিব।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি জুলকারনাইনকে সম্বোধন করেছেন এবং ওহী প্রেরণ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জুলকারনাইন নবী ছিলেন। কিন্তু আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, জুলকারনাইন নবী ছিলেন না, আর তাঁর সঙ্গে যে কথা হয়েছে তা ওহী নয়; বরং ইলহাম যা আল্লাহর ওলীগণের প্রতি হয়ে থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হয়তো কোনো নবীর মাধ্যমে জুলকারনাইনকে এই বাণী পৌছানো হয়েছে, হতে পারে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো নবীকে তাঁর সঙ্গে মোতায়েন করেছিলেন।

قَوْلُهٗ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا : জুলকারনাইনের সফর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশেষে যখন সে সূর্যের উদয়স্থলে পৌছে গেল তখন সে সূর্যকে এমন লোকদের উপর উদয় হতে দেখল, যাদের এবং সূর্যের মধ্যে আমি কোনো আড়াল রাখিনি। অর্থাৎ তাদের কোনো পোষাক ছিল না, তাদের কোনো বাড়িঘরও ছিল না। যা দ্দ্বারা দারা তারা সূর্য থেকে নিজেদেরকে আড়ালে রাখতে পারতো। আর সেখানের জমিন বাড়িঘর নির্মাণের যোগ্যও ছিল না।

জুলকারনাইনের ঘটনা এমনই ছিল। অর্থাৎ জুলকারনাইনের ক্ষমতা অসাধারণ শক্তি সামর্থ্য এমনই ছিল যেমন আমি বর্ণনা করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, জুলকারনাইন যেভাবে সূর্যকে চোরাবালিতে অস্ত যেতে দেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে চোরাবালি থেকে উদয় হতেও দেখেছে। অথবা এর অর্থ হলো, যেভাবে প্রতীচ্যবাসীর জন্য আমি সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি, ঠিক তেমনিভাবে প্রাচ্যবাসীর জন্যও সূর্য থেকে কোনো আড়াল রাখিনি।

قَوْلُهٗ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا : জুলকারনাইনের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন, "আর জুলকারনাইনের কাছে যা কিছু ছিল তার যাবতীয় সংবাদ আমি আয়ত্ব করে রেখেছি।"

অর্থাৎ জুলকারনাইনের নিকট কত সৈন্য ছিল, কি আসবাবপত্র ছিল, আর কত যুদ্ধাস্ত্র ছিল এক কথায় জুলকারনাইনের যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য, আসবাবপত্র সবকিছু সম্পর্কে আমি ওয়াকেফহাল ছিলাম। اَحَطْنَا শব্দটি দ্বারা সৈন্যবাহিনীর আধিক্য এবং তার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা জুলকারনাইন সম্পর্কে প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন।

অনুবাদ :

٩٢. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ـ

৯২. আবার তিনি এক পথ ধরলেন।

٩٣. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا هُنَا وَبَعْدَهُمَا جَبَلَانِ بِمُنْقَطَعِ بِلَادِ التُّرْكِ سَدَّ الْاِسْكَنْدَرُ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا سَيَأْتِيْ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا اَيْ اَمَامَهُمَا قَوْمًا ۙ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ـ اَيْ لَا يَفْهَمُوْنَهُ اِلَّا بَعْدَ بُطْوْءٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ ـ

৯৩. চলতে চলতে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছলেন اَلسَّدَّيْنِ শব্দটির سِيْن বর্ণে যবর ও পেশ উভয়টিই বৈধ রয়েছে, এখানেও এবং পরবর্তীতেও। তুর্কী সীমান্তের শেষ প্রান্তের দুটি পাহাড় বাদশাহ সিকান্দার ঐ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সামনে তার আলোচনা আসছে। তখন তথায় তিনি এক সম্প্রদায়কে পেলেন অর্থাৎ তাদের সম্মুখে যারা কোনো কথা বুঝাবার মতো ছিল না। অর্থাৎ তারা দীর্ঘ বিলম্ব তথা ইশারা ইঙ্গিত ব্যতীত কোনো কিছু বুঝতা না। অপর কেরাতে يَفْقَهُوْنَ শব্দের يَاء পেশ যুক্ত ও قَاف যের যুক্ত রয়েছে।

٩٤. قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهَا اِسْمَانِ اَعْجَمِيَّانِ لِقَبِيْلَتَيْنِ فَلَمْ يَنْصَرِفَا مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِالنَّهْبِ وَالْبَغْيِ عِنْدَ خُرُوْجِهِمْ اِلَيْنَا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ـ جُعْلًا مِنَ الْمَالِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ خَرَاجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ـ حَاجِزًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْنَا ـ

৯৪. তাঁরা বলল, হে জুলকারনাইন! নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ مَاْجُوْج ও يَاْجُوْج শব্দ দুটি হামযাসহ ও হামযা ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত হয়েছে। এটা অনারব দুটি গোত্রের নাম। عُجْمَة ও عَلَم -এর কারণে শব্দ দুটি غَيْر مُنْصَرِف হয়েছে। পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমাদের নিকট আগমন করে হত্যা, সন্ত্রাস ও ডাকাতি করার মাধ্যমে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, অর্থাৎ চাঁদার মাধ্যমে সম্পদ একত্র করে দিব। আর خَرْجًا শব্দটি অন্য কেরাতে خَرَاجًا পঠিত রয়েছে আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবেন। অর্থাৎ আড়াল, যার ফলে তারা আমাদের নিকট আসতে সক্ষম হবে না।

٩٥. قَالَ مَا مَكَّنِّيْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ اِدْغَامٍ فِيْهِ رَبِّيْ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ خَيْرٌ مِنْ خَرْجِكُمُ الَّذِيْ تَجْعَلُوْنَهُ لِيْ فَلَا حَاجَةَ لِيْ اِلَيْهِ وَاَجْعَلُ لَكُمُ السَّدَّ تَبَرُّعًا فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ لِمَا اَطْلُبُهُ مِنْكُمْ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ـ حَاجِزًا حَصِيْنًا ـ

৯৫. তিনি বললেন, যে ক্ষমতা দিয়েছেন অন্য কেরাতে مَكَّنِّيْ শব্দটির نُوْن দুটি ইদগামবিহীন অবস্থায় (مَكَّنَنِيْ) রয়েছে। আমার প্রতিপালক আমাকে যেই সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়াদি দান করেছেন। তাই উৎকৃষ্ট আমার ঐ সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমি কোনো বিনিময় ছাড়াই তোমাদের জন্য প্রাচীর নির্মাণ করে দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর যখন আমি তোমাদের থেকে তা কামনা করি। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব অর্থাৎ সুদৃঢ় আড়াল বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দেব।

অনুবাদ :

٩٦. اٰتُوْنِیْ زُبَرَ الْحَدِیْدِ ط قِطْعَةً عَلٰى قَدْرِ الْحِجَارَةِ الَّتِیْ یَبْنِیْ بِهَا فَبَنٰى بِهَا وَجُعِلَ بَیْنَهَا الْحَطَبُ وَالْفَحْمُ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ بِضَمِّ الْحَرْفَیْنِ وَفَتْحِهِمَا وَضَمِّ الْاَوَّلِ وَسُكُوْنِ الثَّانِیْ اَیْ جَانِبَیِ الْجَبَلَیْنِ بِالْبِنَاءِ وَوَضَعَ الْمَنَافِخَ وَالنَّارَ حَوْلَ ذٰلِكَ قَالَ انْفُخُوْا ط فَنَفَخُوْا حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ اَیِ الْحَدِیْدَ نَارًا لا اَیْ كَالنَّارِ ـ قَالَ اٰتُوْنِیْٓ اُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا ـ هُوَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ تَنَازَعَ فِیْهِ الْفِعْلَانِ وَحُذِفَ مِنَ الْاَوَّلِ لِاِعْمَالِ الثَّانِیْ فَاُفْرِغَ النُّحَاسُ الْمُذَابُ عَلَى الْحَدِیْدِ الْمُحْمٰى فَدَخَلَ بَیْنَ زُبَرِهٖ فَصَارَا شَیْئًا وَاحِدًا ـ

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর। অর্থাৎ পাথরের মতো বড় বড় টুকরা যার দ্বারা দেয়াল নির্মাণ করা যায়। এবং তার মাঝে মাঝে লাকড়িও কয়লা রেখে দেওয়া হলো। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হলো اَلصَّدَفَیْنِ শব্দটির صَادْ এবং دَالْ বর্ণে পেশ হতে পারে। আবার উভয় বর্ণে যবরও হতে পারে। আর صَادْ বর্ণে পেশ এবং دَالْ বর্ণে সাকিনও হতে পারে। অর্থাৎ যখন পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান নির্মাণ সামগ্রীর মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হলো এবং চতুর্পাশ্বে ফুকযন্ত্র ও আগুনের ব্যবস্থা করা হলো। তখন তিনি বললেন তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক কাজেই লোকেরা ফুঁক দিল। যখন তা লৌহ টুকরা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো অর্থাৎ আগুনের মতো তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর আমি তা এর উপর ঢেলে দেই। قِطْرٌ হলো গলিত তাম্র। قِطْرًا -এর মধ্যে দু'ফেল تَنَازُعْ করেছে। দ্বিতীয় ফেয়েল আমল করার কারণে প্রথম ফেয়েলের মাফউল قِطْرًا -কে উহ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং গলিত তাম্র গরম লৌহখণ্ডের উপর ঢেলে দেওয়া হলো। আর গলিত তাম্র লৌহখণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে তা একই বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।

٩٧. فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَیْ یَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ اَنْ یَّظْهَرُوْهُ یَعْلُوْا ظَهْرَهٗ لِاِرْتِفَاعِهٖ وَمَلَاسَتِهٖ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ـ خَرْقًا لِصَلَابَتِهٖ وَسَمْكِهٖ ـ

৯৭. এরপর তারা সক্ষম হলো না অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায় তা অতিক্রম করতে তার উচ্চতা ও মসৃণতার কারণে এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হলো না ছিদ্র করতে, তা শক্ত ও অধিক সুদৃঢ় হওয়ার কারণে।

٩٨. قَالَ ذُو الْقَرْنَیْنِ هٰذَا اَیِ السَّدُّ اَیِ الْاِقْدَارُ عَلَیْهِ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّیْ ج نِعْمَةٌ لِاَنَّهٗ مَانِعٌ مِنْ خُرُوْجِهِمْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّیْ بِخُرُوْجِهِمِ الْقَرِیْبِ مِنَ الْبَعْثِ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ج مَدْكُوْكًا مَبْسُوْطًا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّیْ بِخُرُوْجِهِمْ وَغَیْرِهِمْ حَقًّا ـ كَائِنًا ـ

৯৮. হযরত জুলকারনাইন তখন বললেন, এটা এই দেয়াল নির্মাণে সক্ষম হওয়া আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ অর্থাৎ নিয়ামত। কেননা এটা তাদের বের হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তাদের বের হওয়ার সময় হবে। তখন তিনি তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন। ভেঙ্গে চুড়ে সমতল করে দিবেন আর আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি তাদের বের হওয়া ও অন্যান্য ব্যাপারে সত্য, যা সংঘটিত হবেই হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سَدًّا : এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার অর্থ– বন্ধ করা।

قَوْلُهُ بَيْنَ السَّدَّيْنِ : এটা بَلَغَ -এর মাফঊল।

قَوْلُهُ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ : এই শব্দটি অনারবীয় শব্দ। এটা দুটি সম্প্রদায়ের পিতৃপুরুষদের নাম। এ উভয় সম্প্রদায়ই হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান ইয়াফিসের বংশধর। عُجْمَة এবং عَلَمْ হওয়ার কারণে শব্দ দুটি غَيْر مُنْصَرِفْ হয়েছে।

قَوْلُهُ خَرْجًا : خَرْجًا অর্থ– কর, ট্যাক্স, শুল্ক। কেউ কেউ خَرْج এবং خَرَاجٌ -এর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করেছেন যে, خَرْج বলা হয় ফিদিয়ার অর্থকে। আর خَرَاجٌ হলো ব্যাপক যাতে ফিদিয়ার অর্থ, ট্যাক্স, কর, শুল্ক ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ مَكَّنِّىْ : এটা মূলত ছিল مَكَّنَنِىْ মাযীর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। বাবে تَفْعِيْل মাসদার تَمْكِيْنٌ অর্থ– কর্তৃত্বের অধিকারী বানানো। আর نِىْ -এর মধ্যে نُوْن হলো نُوْن وِقَايَة আর يَاء হলো مُتَكَلِّمْ -এর যমীর। যা مَفْعُوْل بِه এরপর لَام كَلِمَة -এর نُوْن -কে সাকিন করে نُوْن وِقَايَة -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ رَدْمًا : رَدْمًا বলা হয় মোটা ও সুদৃঢ় দেয়ালকে। আর এটা বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। অর্থ– গর্ত বন্ধ করা। তবে এখানে মাসদারটি اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ صَدَفٌ : صَدَفٌ অর্থ পাহাড়ের চূড়া।

قَوْلُهُ اِسْتَطَاعُوْا : اِسْطَاعُوْا মূলত ছিল اِسْتَطَاعُوْا - طَاء এবং تَاء নিকটবর্তী মাখরাজ হওয়ার কারণে সহজিকরণের লক্ষ্যে تَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْوَعْدُ : اَلْوَعْدُ অর্থ– সময়, অথবা এটা মাসদার বা مَوْعُوْدٌ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত।

قَوْلُهُ اٰتُوْنِىْ : অর্থ হলো– তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো!

قَوْلُهُ زُبَرَ : زُبَرٌ শব্দটি زُبْرَةٌ -এর বহুবচন, যেমন غُرَفٌ এটা غُرْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– লোহার পাত, লৌহখণ্ড, লোহার প্লেট।

قَوْلُهُ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ : এই বাক্যটি تَنَازُع فِعْلَانْ -এর অন্তর্গত। আর قِطْرًا এটা اُفْرِغْ -এর প্রথম মাফঊল এবং اٰتُوْنِىْ এর উহ্য মাফঊল।

قَوْلُهُ يَظْهَرُوْهُ : এটা بِتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে مَا اسْطَاعُوْا -এর উহ্য মাফঊল।

قَوْلُهُ اَلسَّدُّ اَىِ الْاِقْدَارُ عَلَيْهِ : এর দ্বারা প্রথমে هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْه নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর বলেছেন যে, দেয়াল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতা যা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার রহমত মাত্র। উদ্দেশ্য হলো– এই প্রাচীর তো সেই সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমত স্বরূপ। আর এই প্রাচীর নির্মাণের ক্ষমতাও জুলকারনাইনের জন্য এক বিশেষ রহমত ছিল।

قَوْلُهُ بِخُرُوْجِهِمْ : মুসান্নিফ (র.) بِخُرُوْجِهِمْ শব্দ বৃদ্ধি করে ওয়াদার مِصْدَاقٌ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, ওয়াদা হলো কিয়ামতের পূর্বে ইয়াজুজ মাজুজের বের হওয়া। আবার কেউ কেউ ওয়াদা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এই প্রাচীর ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময়কে।

قَوْلُهُ بَيْنَ السَّدَّيْنِ : যে বস্তু কোনো কিছুর জন্য বাধ্য হয়ে যায়, তাকে سَدٌّ বলা হয়। তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سَدَّيْن বলে দুই পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। জুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

قَوْلُهُ زُبَرَ الْحَدِيْدِ : زُبَرٌ শব্দটি زُبْرَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে লৌহখণ্ড বুঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নির্মিতব্য প্রাচীরে ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ الصَّدَفَيْنِ : দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক।

قَوْلُهُ قِطْرًا : অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারো কারো মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ دَكَّاءَ : অর্থাৎ যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? জুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাদের কাছের এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই যতটুকু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোনো প্রভাব কুরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মতো তারাও হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান-সন্ততি। কুরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে- وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তান সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত ও এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁরা ইয়াফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ-

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ভোরবেলা দাজ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য। [উদাহরণত সে কানা হবে।] পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যা দ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। [উদাহরণত জান্নাত ও জাহান্নাম তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরো অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণনার ফলে [আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম] যেন দাজ্জাল খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। [অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।] বিকালে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আরজ করলাম, আপনি দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন যাতে বুঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরো কিছু কথা বলেছেন যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যেন সে আমাদের নিকটেই খর্জুর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার তুলনায় অন্যান্য ফিতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। [অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।] যদি

আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। [কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।] পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানদের সাহায্যকারী। [তার লক্ষণ এই যে] সে যুবক, ঘন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে। [এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।] যদি আমি [কুৎসিত চেহারার] কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে কুত্না। [জাহেলিয়াতের আমলে কুৎসিত চেহারায় বনু খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।] যদি কোনো মুসলমান দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। [এতে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।] দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা তার মোকাবিলায় সুদৃঢ় থেকো।

আমরা আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন, সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতোই হবে। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের [পাঁচ ওয়াক্ত] নামাজই পড়ব? তিনি বললেন, না। বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাজ পড়তে হবে। আমরা আবার আরজ করলাম! ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন, সে মেঘখণ্ডের মতো দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। সে মাটিকে আদেশ দেবে। ফলে সে শস্যশ্যামল হয়ে যাবে। [তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চড়বে।] সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দিবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হবে। তাদের কাছে কোনো অর্থকড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে, তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে। যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন পরিপূর্ণ যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে। যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে [জীবিত হয়ে] দাজ্জালের কাছে প্রফুল্লচিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দুটি রঙ্গিন চাদর পরে দামেস্কে মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। [মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।] তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মতো স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তার দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ঈসা (আ.) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুল্লুদ্দে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। [এই জনপদটি এখনও বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।] তিনি সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শুনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারো নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তূর পর্বতে চলে যান। [সেমতে তিনি তাই করবেন।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের রাস্তা খুলে দেবেন। তাঁদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোনোদিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীরা তূর পবর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ দীনারের চেয়ে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ.) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবেন। [আল্লাহ

তা'আলা দোয়া কবুল করবেন।] তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যধি পাঠাবেন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তূর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই। এবং [মৃতদেহ পঁচে] অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। [এ অবস্থা দেখে পুনরায়] হযরত ঈসা (আ.) ও তার সঙ্গীরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করবেন। [যেন এ বিপদও দূর করে দেওয়া হয়] আল্লাহ তা'আলা এ দোয়া কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখি প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মতো। [মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবেন।] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোনো নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন, তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। [ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,] একটি ডালিম একদল লোকের আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। [চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন] আল্লাহ তা'আলা একটি মনোরমম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। শুধু কাফের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে। তারা ভূ-পৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মতো প্রকাশ্যে অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের রেওয়ায়েতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরো অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে, আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলার আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে [যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।]

দাজ্জালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, দাজ্জাল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন, আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সে দাজ্জাল যার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দিয়েছিলেন। [একথা শুনে] দাজ্জাল বলবে, লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা, এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে, না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাজ্জালকে বলবেন, এবার আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাজ্জাল। দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ হবে না। -[মুসলিম]

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে বলবেন, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরজ করবেন, হে পরওয়ারদিগার! তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন, চিন্তা করো না। এই নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয়ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট একভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। -[রূহুল মা'আনী]

ইবনে কাছীর 'আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়াহ' গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন, এতে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ- মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবে।

মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত ঈসা (আ.) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না। –[মুসলিম ও আহমদ]

বুখারী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে। –[মাযহারী]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তার মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাভ এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ تِسْعِيْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি মিলিয়ে বৃত্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যয়নব (রা.) বলেন, একথা শুনে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ ধ্বংস হতে পারে। যদি অনাচারের আধিক্য হয়। –[আল বিদায়া ওয়ান্নিহায়া]

ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। –[ইবনে কাছীর, আবূ হাইয়্যান]

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ জুলকারনাইনের দেয়ালটি খুড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এ লৌহ প্রাচীরের প্রান্তসীমায় এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপর পার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা একথা বলে ফিরে যায় যে, বাকি অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ তা'আলা থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশকে খুঁড়ে উপারে চলে যাব। [আল্লাহ তা'আলার নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তৌফিক হয়ে যাবে।] অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিযী এই রেওয়ায়েতটি اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ -এর সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে রওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, اِسْنَادُهٗ جَيِّدٌ قَوِيٌّ وَلٰكِنْ سَنَدُهٗ فِىْ رَفْعِهٖ نَكَارَةٌ এই সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কিনা, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে কাছীর 'আল-বিদায়া ওয়ান্নিহায়া' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নয়, বরং কা'ব আহবারের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয় তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা যখন জুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কুরআনে ছিদ্র বলে এপার ওপার ছিদ্র বুঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার ওপার হবে। –[বিদায়া খ. ২, পৃ. ১১২]

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে হাব্বানের বরাত দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন, তারা সবাই হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোনো কোনো হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বুখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু'জিজা রয়েছে–

১. আল্লাহ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচি আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।

২. আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাব্বিহের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা কৃষিশিল্পে পারদর্শী ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না।

৩. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে 'ইনশাআল্লাহ' বলার কথা জাগ্রত হলো না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে। –[আসারাতুস সারা : সৈয়দ মুহাম্মদ পৃ. ১৫৪]

কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গাম্বরদের দাওয়াত পৌঁছেছে। নতুবা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কুরআন বলে– وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا এতে বুঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। মোটকথা 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে। –[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬৩৬-৬৪৩]

জুলকারনাইনের প্রাচীর ও পৃথিবীর পাঁচটি বিশাল প্রাচীরের বিবরণ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনে জুলকারনাইনের প্রাচীরের উল্লেখ থাকলেও তার স্থান ও অবস্থানের কোনো বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্ববিদগণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলির নিরিখে কয়েকটি বৃহদাকার প্রাচীরের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নিজস্ব ধারণাপ্রসূত ও আনুমানিকভাবে সেগুলোকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। মাওলানা আব্দুল হক দেহলভী (র.) স্বীয় তাফসীরে হক্কানীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং এইসূত্রে পাঁচটি প্রাচীরের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

১. **চীনের প্রাচীর :** এই প্রাচীরকে চীনের রাজা 'ফাগফূর' হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ২৩৫ বছর পূর্বে নির্মাণ করেছিল। যার দৈর্ঘ্য ছিল বারশত হতে পনেরশত মাইল পর্যন্ত। সেই প্রাচীরের পৃষ্ঠদেশে কতিপয় জঙ্গী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল, যারা চীনে এসে লুটতরাজ করত। তাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলা হয়। এই বক্তব্য শুদ্ধ নয়। কেননা এই প্রাচীর ইট ও পাথরের দ্বারা নির্মিত ছিল আর তা নির্মাণ করেছিল একজন কাফের বাদশাহ। অথচ জুলকারনাইনের প্রাচীর ছিল লৌহ ও তাম্র দ্বারা নির্মিত এবং তিনি ছিলেন মুসলমান। আর এই ঘটনা হযরত ঈসা (আ.) মাত্র দুশত পয়ত্রিশ বছর পূর্বের। অথচ জুলকারনাইনের ঘটনা তাঁর দুই হাজার বছর পূর্বের।

২. **সমরকন্দের প্রাচীর :** সমরকন্দের নিকট অবস্থিত প্রাচীর। এটি একটি সুদৃঢ় প্রাচীর যা লোহার পাত এবং ইটের সমন্বয়ে তৈরিকৃত। অনেক উঁচু এবং সুদৃঢ় প্রাচীর এটি। এ প্রাচীরের মধ্যে তালাবদ্ধ একটি ফটকও রয়েছে। খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ স্বপ্নে এ প্রাচীরটিকে ভাঙ্গা দেখতে পেয়ে তা অনুসন্ধানের জন্য পঞ্চাশজন লোকের একটি কাফেলা প্রেরণ করেন। তারা সে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করে এসে তার বিবরণ প্রদান করেছেন। 'তাঈ' পাহাড়ের গিরিপথ বন্ধ করার জন্য এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ এই প্রাচীরকেই জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে মত পেশ করেছেন। ইয়েমেনের কোনো এক হিময়ারী বাদশাহ এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। কতিপয় ওলামা বলেছেন যে, এই হিময়ারী বাদশাহই জুলকারনাইন ছিলেন এবং تُبَّعْ يَمَانِيْ তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যার উপর তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। এ কারণেই কতিপয় আলেম সমরকন্দের প্রাচীরকে জুলকারনাইনের প্রাচীর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

৩. **আজারবাইজান প্রাচীর :** এ প্রাচীর আজারবাইজানের উপকণ্ঠে بُحَيْرَةِ طَرَسْتَانَ এর পাদদেশে কুবুক পাহাড়ের জেটি ও অন্য জাতির আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিলো। এই প্রাচীর আজারবাইজান ও আরমেনিয়ার দুই পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। পাথর ও সীসা ঢালাই করে এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। যার উচ্চতা তিনশত গজ বা হাত। বাদশাহ নওশেরওয়া এই প্রাচীর নির্মাণ করেছেন। আজও এই প্রাচীর বিদ্যমান। কেউ কেউ এটাকে হযরত জুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর বলে ধারণা করে থাকেন।

৪. **তিব্বত প্রাচীর :** তিব্বতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ের মাঝে এই প্রাচীর অবস্থিত। এটা হলো খোরাসানের শেষ কিনারা। এই পাদদেশ দিয়ে তুর্কিরা লুণ্ঠন চালাতো। এ কারণে ফজল ইবনে ইয়াহইয়া বরমকী একটি তোরণ নির্মাণ করে এটাকে বন্ধ করে দিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এটি কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইনের প্রচীর নয়। কেননা এটা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরে নির্মিত হয়েছে।

৫. **এশিয়ার প্রাচীর :** পৃথিবীর ইতিহাসের পঞ্চম বৃহত্তর প্রাচীর হলো রোম উপসাগরের পূর্বপ্রান্তরে এশিয়া মাইনরের কোনো এক ভূখণ্ডে অবস্থিত। তবে এটা জানা যায়নি যে, এ প্রাচীর কে কখন নির্মাণ করেছে এবং তা আজও বিদ্যমান রয়েছে কিনা? সর্বসম্মতিক্রমে এটাও কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইনের প্রাচীর নয়।

মোটকথা এ সবগুলোই হলো ঐতিহাসিক কিসসা কাহিনী যা কখনোই নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য হতে পারে না। এগুলোই পৃথিবীর প্রসিদ্ধ পাঁচটি প্রাচীর। যা ইতিহাস ও ভূগোলের বই পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে। লেখকগণ এর মধ্য হতেই কোনো কোনোটিকে স্বীয় ধারণা ও অনুমান নির্ভর করে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইনের প্রাচীর সাব্যস্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তবে এই সবগুলো স্বীয় কল্পনাপ্রসূত দাবি। কারো নিকটেই কোনো ধরনের দলিল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তাই কুরআনে বর্ণিত প্রাচীর নির্ধারণের জন্য কুরআন ও হাদীসে এই প্রাচীরের কি কি বৈশিষ্ট বর্ণিত রয়েছে তার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে যাতে করে এই প্রাচীর নির্ধারণ করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য : জুলকারনাইনের নির্মিত এ ঐতিহাসিক প্রাচীরের যে সকল বৈশিষ্ট্য কুরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে তা হলো এই–

১. এই প্রাচীরের নির্মাতা আল্লাহ তা'আলার কোনো মকবুল নেককার বান্দা এবং মর্দে মু'মিন হবেন। তিনি নেক আমলকারী ঈমানদারদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্তির সুসংবাদ শুনাবেন এবং কাফের ও জালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় দেখাবেন।

২. এর নির্মাতা হবেন এমন এক মর্যাদাবান বাদশাহ, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবাই যার অনুগত থাকবে এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বপ্রকার জাহেরী ও বাতেনী উপকরণ আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাকে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِى الْأَرْضِ وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا
অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সবাই তার অনুগত হবে যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং সমর্থনও তাঁর পক্ষে থাকবে, বিজয় ও সফলতার পতাকা তার হাতে থাকবে। তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারো থাকবে না। পৃথিবীর সকল বাদশাহ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়ে নীরব থাকবে।

৩. ধাতুর তৈরি সেই প্রাচীরটি তামা গলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ইট অথবা পাথর দ্বারা সেই প্রাচীরের দুই প্রান্ত দুই দিকে দু'টি পাহাড়ের সাথে মিলিত আছে। প্রাচীরটি অনেক উঁচু এবং শক্ত ও সুগঠিত। অস্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ কারামত রূপে এটি নির্মিত হয়েছে। কারণ এত উঁচু প্রাচীর যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লৌহ ফলক দিয়ে বানানো হয়েছে এবং যার নির্মাণের সময় এমনভাবে আগুন জ্বালানো হয়েছে যে, প্রত্যেকটি লৌহ ফলক প্রজ্বলিত আগুন হয়ে উঠেছে। আবার তার মধ্যে হাজার হাজার টন গলানো সীসা ঢালা হয়েছে এই সকল কর্ম-কাণ্ড স্পষ্টভভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এটা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ নয়, এরূপ বিপুল আয়োজনে প্রজ্বলিত অগ্নির কাছে কোনো প্রাণীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এই আগুনের কাছে গিয়ে ফুঁক দিয়ে প্রজ্বলিত করা এবং গলানো তামা তার উপর ঢেলে দেওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মে সম্ভব নয়। সুতরাং এই আশ্চর্যজনক প্রাচীর সম্পর্কে একথা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না যে, এটা সেই নেককার বাদশাহর একটি কারামত ছিল অথবা তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তবে এটা ছিল তার একটি মু'জিজা। কারণ যখন এত দীর্ঘ এবং প্রশস্ত

লোহার প্রাচীর আগুনে পরিণত হয়ে যায় তখন কারো ক্ষমতা থাকে না যে তার নিকটে গিয়ে তার উপরে গলানো সীসা ঢালতে পারে। এটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার খাছ রহমত যে তিনি এই কাজে নিয়োজিত লোকদের দেহ আগুনের প্রচণ্ড তাপ থেকে হেফাজত করেছেন এবং তারা এই বিরাট কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. এই ধাতু নির্মিত প্রাচীরের ওপারে ইয়াজুজ মাজুজ আবদ্ধ আছে। তারা এর উপর আরোহণও করতে পারে না এবং কোনো সিঁড়ি লাগিয়ে সেখান থেকে এপারে নেমেও আসতে পারে না। এই প্রাচীরে তারা কোনো ছিদ্রও করতে পারে না। তবে কিয়ামতের কাছাকাছি এক সময়ে তারা এই প্রাচীর ছিদ্র করে বের হয়ে আসতে সক্ষম হবে। হাদীস শরীফে এ কথার উল্লেখ রয়েছে।

৬. হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, হুজুর পাক ﷺ -এর জমানায় এই প্রাচীরে ইয়াজুজ-মাজুজ সামান্য ছিদ্র করতে সক্ষম হয়েছে।

৭. সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইয়াজুজ মাজুজ প্রতিদিন বের হয়ে আসার জন্যে এই প্রাচীরটি খুঁড়তে থাকে। কিন্তু প্রাচীরটি আবার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় পূর্বের ন্যায় পুরু এবং মোটা হয়ে যায়। তবে কিয়ামতের পূর্বে তারা একদিন 'ইনশাআল্লাহ' বলে সেই প্রাচীরটি খুঁড়তে শুরু করবে। তখন ইনশাআল্লাহ -এর বরকতে সেই প্রাচীরে প্রশস্ত এক ছিদ্র হয়ে যাবে এবং পরের দিন তারা প্রাচীর ভেঙ্গে বাইরে চলে আসতে সক্ষম হবে।

৮. ইয়াজুজ-মাজুজ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চেয়েও তারা শক্তিতে অনেক বেশি হবে এবং সংখ্যার দিক থেকে তারা এত অধিক হবে যে তাদের মধ্যে এবং সাধারণ আদম সন্তানের মধ্যে সেইরূপ আনুপাতিক হার হবে যেরূপ এক হাজার এবং এক এর অনুপাত। এরা সবাই কাফের সুতরাং সবাই জাহান্নামী।

৯. ইয়াজুজ-মাজুজের বহির্গমন হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের জামানায়। সেই সময় হযরত ঈসা (আ.) তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগণকে তূর পাহাড়ে নিয়ে যাবেন এবং অবশিষ্ট লোকেরা কোনো দুর্গ অথবা বাড়িতে হেফাজতে থাকবে।

১০. হযরত ঈসা (আ.)-এর বদদোয়ায় ইয়াজুজ-মাজুজ অস্বাভাবিকভাবে একসঙ্গে সবাই মারা যাবে। তাদের ঘাড়ে আল্লাহ তা'আলা মহামারী স্বরূপ এক ধরনের পোকা সৃষ্টি করে দিবেন যার কারণে তাদের মৃত্যু হবে।

এই দশটি বৈশিষ্ট্য হলো সেই প্রাচীরের। প্রথম পাঁচটি বৈশিষ্ট কুরআন পাকে উল্লেখ হয়েছে এবং পরের পাঁচটি বিখ্যাত হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। -[তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪ পৃ. ৪৫৮-৪৫৯]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ এবং ভূগোল বিশারদগণ একটি সন্দেহ উত্থাপন করে থাকেন যে, আমরা সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু কোথাও তো জুলকারনাইনের প্রাচীর দেখতে পাইনি এবং কোথাও ইয়াজুজ-মাজুজের সন্ধানও পাইনি।

এই সন্দেহের জবাবে আমাদের কিছু কিছু গ্রন্থকার যারা পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং গবেষণায় আগ্রহী, তারা সেই প্রাচীরটির সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এর প্রকৃত জবাব তাই হবে যা, আল্লামা আলূসী (র.) তার তফসীরগ্রন্থে লিখেছেন এবং আল-হুছুনুল হামিদিয়া গ্রন্থে আল্লামা হুসাইন জসর তরাবলুসী উল্লেখ করেছেন। জবাবে বলা হয়েছে যে, যে প্রাচীর এবং যে জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সঠিক। এ বিষয়ে ঈমান রাখা অবশ্য কর্তব্য এবং তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ। তবে প্রাচীরটির অবস্থানস্থল আমাদের জানা নেই। এটা সম্ভব যে আমাদের এবং সেই কওম ও প্রাচীরের মাঝখানে বড় বড় পাহাড় এবং বড় বড় সমুদ্রের আড়াল হয়ে রয়েছে। কথাটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর ভূগোল বিশারদগণ যে বলেছেন, আমরা সারা দুনিয়ায় তা তন্ন করে খুঁজেছি এবং আমরা দুনিয়ার স্থল-ভাগ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল কোথাও বাকি রাখিনি। কথাটি নিছক অযৌক্তিক, তাই এ কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ পৃথিবীর সকল ভূ-পৃষ্ঠের খোঁজ করা তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বসবাসযোগ্য ভূ-পৃষ্ঠ দেখাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল এখনও এমন আছে যেখানে আজও মানুষ পদচারণা করতে পারেনি। এখনও ভূ-পৃষ্ঠে এমন সব পাহাড় এবং উপত্যকা রয়ে গেছে যেখানে এই সকল ভূ-তত্ত্ববিদ পৌঁছতে পারেননি। বিশেষ করে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল। সেখানে বরফে ঢাকা এমন সব পাহাড় বিদ্যমান আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। একথা ভূ-তত্ত্ববিদগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন। সুতরাং ঐ সকল অঞ্চলেও এই জাতি থাকতে পারে এটা অসম্ভব কিছুই নয়।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে আছে বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানচিত্র যারা দেখেছেন তারা জানেন যে, সাইবেরিয়ার পরে উত্তর দিকে যে সকল বরফের পাহাড় রয়েছে সেগুলো বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে এবং কোনো মানুষ সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। এই সকল পাহাড়ের ওপারে মাটি বিদ্যমান রয়েছে। সেই জমিন প্রশস্ত রেখার শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং এই সকল বরফের পাহাড়ের নীচে কোনো নীচু ভূমি থাকা অসম্ভব কিছু নয়। নীচু এবং সমতল হওয়ার কারণে এই ভূমিতে বরফ এতটা কম থাকতে পারে যা মানুষের বসবাসের উপযুক্ত হয়। আর সেখানেই হয়তো ইয়াজুজ-মাজুজ জাতি বসবাস করছে। আমাদের এবং তাদের মাঝখানে এভাবেই সমুদ্র অথবা বরফের পাহাড় আড়াল হয়ে রয়েছে। তবে জুলকারনাইনের যুগে হয়তো কোনো উপত্যকা পথে রাস্তা ছিল। আর ইয়াজুজ-মাজুজ সেই পথে পাহাড়ের দিক থেকে এসে আশেপাশের লোকদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাতো। আর জুলকারনাইন এই অবস্থা দেখে উপত্যকার রাস্তা প্রাচীরের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়ে পাহাড়ের বিপরীত দিকে তাদেরকে ধাওয়া করে দেন। এরপর সেই প্রাচীরের কারণে তাদের এদিকে আসা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর যখন কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হবে তখন হয়তো বায়ুমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলীয় কোনো ঘটনার কারণে বরফ গলে যাবে এবং তখন ইয়াজুজ-মাজুজ জুলকারনাইনের প্রাচীর ভাঙ্গার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর তখন পৃথিবীর লোকদের দিকে চলে আসবে এবং এখানে এসে উৎপাত চালাবে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করবে। কুরআন ও হাদীসে একথার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

মোটকথা কুরআন এবং হাদীসে যে বিষয়ের খবর দেওয়া হয়েছে তা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং তা যুক্তিসঙ্গতও বটে। আর এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং যা সম্ভব ও স্বাভাবিক এবং যা সন্দেহাতীতভাবে শরিয়ত সম্মত তা সত্য বলে স্বীকার করা ফরজ এবং অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যেই আমরা বিশ্বাস করি যে, কিয়ামতের কাছাকাছি কোনো এক সময়ে জুলকারনাইনের প্রাচীরকে ভেঙ্গে ইয়াজুজ-মাজুজ বের হয়ে আসবে। আর এই যে, ভূ-গোল বিশারদ এবং গবেষকদের দাবি যে তারা দুনিয়ার সমগ্র ভূ-খণ্ডের ব্যাপারে অবগত হয়ে পড়েছেন– এই দাবির সমর্থনে কোনো যুক্তি নেই। সুতরাং তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। –[তাফসীরে নূরুল কুরআন : পারা– ১৬, পৃ. ৩৫ - ৩৭]

জুলকারনাইনের প্রাচীর কি এখনো বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, নাকি তা ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরিউক্ত প্রাচীরসমূহের কোনোটিই স্বীকার করে না। তারা একথাও স্বীকার করে না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোনো কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে ও লিখতে শুরু করেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উত্থিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কুরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়াজ ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যার পরে। দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কেনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে জুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোনো কোনো গোত্র এপারে চলে এসেছে, একথা বলাও কুরআন ও হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থি নয়, যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনো হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই, ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোনো গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজুজ মাজুজের কিছু গোত্র এপারে এসে যাবে। কুরআন ও হাদীসের কোনো অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থি নয়। জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে। এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কুরআন পাকের আয়াত فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ অর্থাৎ জুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে [অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে] তখন আল্লাহ তা'আলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভুমিসাৎ করে দেবেন। এই আয়াতে وَعْدُ رَبِّي [আমার পালনকর্তার ওয়াদা] এর অর্থ কিয়ামত নেওয়া হয়েছে। অথচ কুরআনের ভাষ্য এই অর্থে অকাট্য নয়; বরং এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, জুলকারনাইন ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরি নয়। যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরি নয়। সেমতে সব তাফসীরবিদই وَعْدُ رَبِّي -এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তাফসীর বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে- وَالْوَعْدُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يُرَادَ بِهِ وَقْتُ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরির তাতারী ফিতনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফিতনাকে কুরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ ও রক্তপাতের মাধ্যমে হবে যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে; বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজুজ মাজুজেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামি দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাফসীর অনুযায়ী তারা এখন পর্যন্ত এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যেহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে مَنْقُوْل দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনই কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোনো প্রমাণ নেই যে, ইয়াজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাত্যে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরিউক্ত হাদীস এর পরিপন্থি নয়।

মোটকথা! কুরআন ও হাদীসে এরূপ কোনো প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, জুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামূলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফায়সালা করা যায় না, তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরি। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন খ. ৫, পৃ. ৬৪৯ – ৬৫০]

অনুবাদ :

٩٩. قَالَ تَعَالٰى وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ خُرُوْجِهِمْ يَمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ يَخْتَلِطُ بِهٖ لِكَثْرَتِهِمْ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ اَىِ الْقَرْنِ لِلْبَعْثِ فَجَمَعْنٰهُمْ اَىِ الْخَلَائِقَ فِىْ مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَمْعًا ـ

৯৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেদিন তাদের বের হওয়ার দিন আমি তাদেরকেও এ অবস্থায় ছেড়ে দিব যে, তাদের একদল অপর দলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে। তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে। এবং সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে পুনরুত্থানের জন্য। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টজীবকে কিয়ামতের দিন একইস্থানে।

١٠٠. وَعَرَضْنَا قَرَّبْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ـ

১০০. এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। নিকটবর্তী করব কাফেরদের নিকট।

١٠١. اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِىْ غِطَاۤءٍ عَنْ ذِكْرِىْ اَىِ الْقُرْاٰنِ فَهُمْ عُمْىٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهٖ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ـ اَىْ لَا يَقْدِرُوْنَ اَنْ يَسْمَعُوْا مِنَ النَّبِىِّ مَا يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ بُغْضًا لَهٗ فَلَا يُؤْمِنُوْا بِهٖ ـ

১০১. যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ এটা اَلْكَافِرِيْنَ হতে بَدَلٌ হয়েছে আমার নিদর্শনের প্রতি অর্থাৎ কুরআন থেকে গাফিল বা অমনোযোগী ছিল। তারা অন্ধ, কুরআন থেকে হেদায়েত অর্জন করেনি। এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম। অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে এই কুরআনের বাণীকে শুনতেও তারা প্রস্তুত ছিল না ছিল না। ফলে তারা ঈমানের মহান দৌলত লাভেও ব্যর্থ হয়েছে।

١٠٢. اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ اَىْ مَلٰۤئِكَتِىْ وَعِيْسٰى وَعُزَيْرًا مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَاۤءَ اَرْبَابًا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ لِيَتَّخِذُوْا وَالْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ لِحَسِبَ مَحْذُوْفٌ الْمَعْنٰى اَظَنُّوْا اَنَّ الْاِتِّخَاذَ الْمَذْكُوْرَ لَا يُغْضِبُنِىْ وَلَا اُعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ كَلَّا اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ هٰؤُلَاۤءِ وَغَيْرِهِمْ نُزُلًا ـ اَىْ هِىَ مُعَدَّةٌ لَهُمْ كَالنُّزُلِ الْمُعَدِّ لِلضَّيْفِ ـ

১০২. যারা কুফরি করেছে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার বান্দাদেরকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত উযাইর (আ.)-কে আমার পরিবর্তে অভিভাবকরূপে اَوْلِيَاۤءَ শব্দটি يَتَّخِذُوْا -এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর حَسِبَ -এর মাফঊলে ছানী উহ্য রয়েছে। আর আয়াতের অর্থ হচ্ছে– কাফেররা কি আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে এটা মনে করছে যে, এই বিষয়টি আমাকে ক্রোধান্বিত করবে না? এবং আমি তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করব না? কক্ষনো নয়। নিশ্চয় আমি কাফেরদের এ সকল কাফের ও অন্যান্য কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি যেমনভাবে পৃথিবীতে মেহমানদের জন্য মেহমানখানা তৈরি করে প্রস্তুত রাখা হয়।

অনুবাদ :

١٠٣. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ط تَمْيِيْزٌ طَابَقَ الْمُمَيَّزَ وَبَيَّنَهُمْ بِقَوْلِهِ -

১০৩. বলুন, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? اَعْمَالًا এটা تَمْيِيْز যা مُمَيَّزْ -এর অনুরূপ হয়েছে। আর ক্ষতিগ্রস্তদেরকে পরবর্তী আয়াত اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

١٠٤. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا بَطَلَ عَمَلُهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا عَمَلًا يُجَاوِزُوْنَ عَلَيْهِ -

১০৪. এরাই তারা পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়। তাদের আমল বাতিল ও রহিত হয়ে যায়। যদিও তারা মনে করে ধারণা করে যে, তারা সৎকর্মই করছে। এমন কাজ করছে, যার বিনিময়ে তাকে প্রতিদান প্রদান করা হবে।

١٠٥. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ بِدَلَائِلِ تَوْحِيْدِهٖ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِهٖ وَلِقَائِهٖ اَىْ وَبِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ - فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ بَطَلَتْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا - اَىْ لَا نَجْعَلُ لَهُمْ قَدْرًا -

১০৫. এরাই তারা যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি কুরআন ও অন্যান্যভাবে প্রদত্ত তার একত্ববাদের প্রমাণাদি। ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয় অর্থাৎ পুনরুত্থান, হিসাব, প্রতিদান দান ও শাস্তি প্রদানকে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোনো ব্যবস্থা রাখব না। অর্থাৎ আমি তাদের আমলের সামান্যতম পরিমাণও মূল্যায়ন করব না। অর্থাৎ

١٠٦. ذٰلِكَ اَىِ الْاَمْرُ الَّذِىْ ذُكِرَتْ مِنْ حُبُوْطِ اَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِهٖ وَابْتِدَاءٌ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا - اَىْ مَهْزُوًّا بِهِمَا -

১০৬. এটাই অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আমল রহিত হওয়া ইত্যাদি। আর جَزَاؤُهُمْ হলো جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ তাদের প্রতিফল জাহান্নাম, যেহেতু তারা কুফরি করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ। অর্থাৎ উপহাসের পাত্র বানিয়েছে।

١٠٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ هُوَ وَسْطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَاهَا وَالْاِضَافَةُ اِلَيْهِ لِلْبَيَانِ نُزُلًا - مَنْزِلًا -

১০৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফেরদাউসের উদ্যান। জান্নাতুল ফিরদাউস হলো সকল জান্নাতের মধ্যমণি ও সর্বোচ্চ মর্যাদার জান্নাত। আর جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ -এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّةْ হয়েছে।

١٠٨. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ يَطْلُبُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا . تَحَوُّلًا اِلٰى غَيْرِهَا .

١٠٩. قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ اَىْ مَاؤُهٗ مِدَادًا هُوَ مَا يُكْتَبُ بِهٖ لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ الدَّالَّةِ عَلٰى حِكَمِهٖ وَعَجَائِبِهٖ بِاَنْ تُكْتَبَ بِهٖ لَنَفِدَ الْبَحْرُ فِىْ كِتَابَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَفْرُغَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ اَىِ الْبَحْرِ مَدَدًا . زِيَادَةً فِيْهِ لَنَفِدَ وَلَمْ تَفْرُغْ هِىَ وَ نَصْبُهٗ عَلَى التَّمْيِيْزِ .

١١٠. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اٰدَمِىٌّ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج اِنَّ الْمَكْفُوْفَةَ بِمَا بَاقِيَةٌ عَلٰى مَصْدَرِيَّتِهَا وَالْمَعْنٰى يُوْحٰى اِلَىَّ وَاحْدَانِيَّةُ الْاِلٰهِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا يَأْمُلُ لِقَاءَ رَبِّهٖ بِالْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَىْ فِيْهَا بِاَنْ يُّرَائِىْ اَحَدًا .

অনুবাদ :

১০৮. তারা সেথায় স্থায়ী হবে। তা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না। অর্থাৎ অন্য কোনো জায়গা খোঁজ করবে না।

১০৯. বলুন, সমুদ্র যদি হয় অর্থাৎ সমুদ্রের পানি কালি যার দ্বারা লিখা হয় আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য যা তাঁর প্রজ্ঞা ও عَجَائِبْ -কে বুঝায় যে তা দ্বারা তা লিখা হবে তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি এর সাহায্যে অনুরূপ আরো সমুদ্র আনলেও। تَنْفَدَ শব্দটি يَاء ও تَاء উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ এই সমুদ্রের সাথে যদি আরো সমুদ্রও যুক্ত করা হয় তবুও আমার প্রতিপালকের কালেমা শেষ হওয়ার পূর্বেই ঐ সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। আর আমার প্রতিপালকের কালেমা শেষ হবে না। مِدَاد শব্দটি تَمْيِيْز -এর ভিত্তিতে نَصَبْ যুক্ত হয়েছে।

১১০. আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। اَنَّ যার উপর مَائے كَافَّة এসেছে সেটা তার مَصْدَرِيَّتْ -এর উপর অবশিষ্ট রয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রত্যাদেশ করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে পুনরুত্থান ও প্রতিদানের মাধ্যমে। সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করে অর্থাৎ লৌকিকতা ও রিয়া যেন ইবাদতের মধ্যে না করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قَالَ تَعَالٰى : এ বাক্যের দ্বারা মুফাসসির (র.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জুলকারনাইনের আলোচনা এ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। এখন وَتَرَكْنَا হতে আল্লাহ তা'আলার কালাম শুরু হচ্ছে।

قَوْلُهٗ يَوْمَئِذٍ : এর তাফসীর يَوْمَ خُرُوْجِهِمْ দ্বারা করে উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা কতিপয় মুফাসসির يومئذ দ্বারা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার দিন উদ্দেশ্য করেছেন। যার কারণে পরস্পর ঝগড়া ঝাটিতে লেগে যায়। কোনো কোনো মুফাসসির (র.) বলেন, يَوْمَئِذٍ দ্বারা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জালকে হত্যার পর বের হওয়া উদ্দেশ্য।

মুসান্নিফ (র.)-এর নিকট যেহেতু দ্বিতীয় অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে এজন্য তিনি يَوْمَئِذٍ -এর তাফসীর يَوْمَ خُرُوْجِهِمْ দ্বারা করে স্বীয় মনোপুত মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত করে দেন। যদিও প্রথম অভিমতটি মুহাক্কিকগণের নিকট অধিক অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ يَمُوْجُ : এটা বাবে نَصَرَ হতে অর্থ– ঢেউ খেলা, তরঙ্গায়িত হওয়া, ঢেউ উঠা।

এটা تَرَكْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল আর بَعْضَهُمْ হলো প্রথম মাফউল। আর تَرَكْنَا হচ্ছে جَعَلْنَا অর্থে। আর يَوْمَئِذٍ এটা يَمُوْجُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ : এর তাফসীর اَلْقَرْنِ لِلْبَعْثِ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে ফুৎকার দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। কেননা প্রথম ফুৎকারতো হবে সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। আর فَجَمَعْنَا -এর فَائِى تَعْقِيبِيَّه -ও এটাই বুঝাচ্ছে।

قَوْلُهُ غِطَاءٍ : এর অর্থ যদিও ঘোমটা; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো গাফলত, বেখেয়ালী ও অলসতা।

قَوْلُهُ عَرَضْنَا : এর তাফসীর قَرَّبْنَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো عَرَضْنَا -এর صِلَةْ -তে যে لَامْ এসেছে, এটাকে বৈধতার স্বীকৃতি প্রদান করা। মূলত عَرَضْنَا -এর صِلَه আসে عَلٰى

قَوْلُهُ كَانُوْا : كَانُوْا -এর আতফ كَانَتْ -এর উপর হয়েছে। এরপর পূর্ণ জুমলা اَلْكَافِرُوْنَ সিফত হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর উপর حَسِبَ -এর ফায়েল হয়েছে। আর فَاء হলো عَاطِفَةْ মূল ইবারত হবে اَكَفَرُوْا فَحَسِبُوْا আর এটা اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَتَّخِذُوْا : এটা حَسِبَ -এর مَفْعُوْل بِه যা দুটি মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। আর عِبَادِىْ এটা يَتَّخِذُ -এর প্রথম মাফউল। আর اَوْلِيَاءَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর مِنْ دُوْنِىْ এটা عِبَادِىْ থেকে حَالْ হয়েছে। আবার حَسِبَ -এর দ্বিতীয় মাফউল উহ্যও হতে পারে যেমনটি ব্যাখ্যাকারের অভিমত।

قَوْلُهُ اَعْمَالًا : اَعْمَالًا এটা تَمْيِيْز হয়েছে। বহুবচন। হয়তো مُشَاكَلَتْ -এর ভিত্তিতে হয়েছে। অথবা আমলের প্রকারভেদের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন নেওয়া হয়েছে। অথচ تَمْيِيْز -এর ক্ষেত্রে মূল হলো مُفْرَدْ বা একবচন হওয়া।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ : এটা তার সেলাহসহ উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُمُ الَّذِيْنَ এটা جُمْلَةَ مُسْتَاْنِفَةْ হয়েছে এবং مَنْ هُمْ -এর জবাবে হয়েছে। আবার اَلَّذِيْنَ এটা اَلْاَخْسَرِيْنَ -এর সিফত, বদল এবং عَطْف بَيَانْ -ও হতে পারে।

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ বাক্যটি ضَلَّ -এর ফায়েল থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : ذٰلِكَ -এর পরে اَلْاَمْرُ الَّذِىْ ذُكِرَتْ الـخ বৃদ্ধি করার একটি উদ্দেশ্য তো এটাও হতে পারে যে, ذٰلِكَ এটা اَلْاَمْرُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْه নির্ধারণ করা।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ : এখানে তারকীবের দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা–

১. ذٰلِكَ এটা اَلْاَمْرُ উহ্য মুবতাদার খবর, অর্থাৎ اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ আর جَزَاؤُهُمْ হলো একটি পৃথক বাক্য।

২. ذٰلِكَ হলো প্রথম মুবতাদা। আর جَزَاؤُهُمْ দ্বিতীয় মুবতাদা। جَهَنَّمُ তার খবর। مُبْتَدَأْ ثَانِىْ স্বীয় খবরকে নিয়ে جُمْلَةْ হয়ে خَبَرْ হলো প্রথম মুবতাদার। আর عَائِدْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَزَاؤُهُمْ بِه

৩. ذٰلِكَ এটা মুবতাদা مُبْدَلْ مِنْه আর جَزَاؤُهُمْ হলো তার بَدْل অথবা عَطْف بَيَانْ এখন مُبْدَلْ مِنْه ও بَدْل অথবা مُبَيَّنْ ও بَيَانْ মিলে مُبْتَدَأْ আর جَهَنَّمُ হলো তার খবর।

৪. ذٰلِكَ হলো মুবতাদা আর جَزَاؤُهُمْ হলো مُبْدَلْ مِنْه এবং جَهَنَّمُ তার বদল। مُبْدَلْ مِنْه এবং بَدْل মিলে جُمْلَةْ হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ نُزُلًا : এটা كَانَتْ-এর খবর হয়েছে। আর যদি لَهُمْ খবরে মুকাদ্দাম হয় তাহলে نُزُلًا এটা حَالٌ হবে خَالِدِيْنَ হলো حَالٌ مُقَدَّرَة আর لَا يَبْغُوْنَ হলো দ্বিতীয় حَالٌ

قَوْلُهُ حِوَلًا : এটা حَوْلٌ থেকে اِسْم مَصْدَرٌ অর্থ হলো– এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া।

قَوْلُهُ لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ : এতে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لِكِتَابَةِ كَلِمَاتٍ

قَوْلُهُ اَنْ تَنْفَدَ : এটা بِتَاوِيْل مَصْدَرٌ হয়ে قَبْلَ-এর মুযাফ ইলাইহি হয়েছে।

قَوْلُهُ مَدَدًا : এটা تَمْيِيْز হয়েছে। অর্থ– বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত, সংযুক্ত করা।

قَوْلُهُ اِنَّمَا : اِنَّمَا-এর মধ্যে مَا টা হলো مَائِى كَافَّة যা শব্দের মধ্যে اِنَّ-এর আমল করাকে আটকে দিয়েছে। উভয়টি মিলে كَلِمَة حَصْر হয়ে গেছে। উভয়টির مَعْنَوِىٌّ আমল অবশিষ্ট রয়েছে। اِنَّ-এর আমল হলো বাক্যে তাকিদ সৃষ্টি করা। আর اِنَّ টা বাক্যের তাকিদের সাথে সাথে তার পরবর্তী অংশকে مُفْرَدٌ-এর হুকুম বানিয়ে দেয়। নাহুবিদ ইবনে হিশাম [মৃত. ৭৬১ হি.] مَغْنَى اللَّبِيْبِ গ্রন্থে লিখেছেন মূলত اَنَّ টা اِنَّ-এর শাখা। এ কারণেই আল্লামা যমখশরী (র.)-এর দাবি اَنَّمَا টা اِنَّمَا-এর মতো حَصْر-এর ফায়দা দেয়। এটা বিশুদ্ধ। আর উল্লিখিত উভয় حَصْر-এর শব্দ উল্লিখিত আয়াতে একত্র হয়েছে। প্রথম শব্দ সিফতকে মওসূফের উপর সীমাবদ্ধ করার জন্য আর দ্বিতীয়টা এর বিপরীত।

قَوْلُهُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ : এর মধ্যে সম্বোধিতগণ যেমন بَشَرِيَّتْ সিফতটি হলো مَقْصُوْد আর اَنَا মওসূফ হলো مَقْصُوْد عَلَيْه আর اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ-এর মধ্যে সত্য মা'বুদ আল্লাহ তা'আলা [মওসূফ] হলো مَقْصُوْد আর وَحْدَانِيَّةٌ তথা একত্ববাদ [সিফত] হলো مَقْصُوْد عَلَيْه এখন বাক্যের অর্থ হলো– আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ তা'আলার সকল বিষয় আমার জানা নেই। যেমন তোমরা জান না। আমি তো শুধুমাত্র ততটুকুই জানি যা আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো সত্য মা'বুদ তথা আল্লাহ তা'আলার শুধুমাত্র وَحْدَانِيَّةٌ তথা একত্ববাদের গুণই রয়েছে, تَعَدُّدٌ-এর সিফত নেই। যেমনটি অংশীবাদীরা ধারণা করে।

قَوْلُهُ مِثْلُكُمْ : এটা بَشَرٌ-এর সিফত আর اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ এটা بِتَاوِيْل مُفْرَدٌ হয়ে يُوْحٰى-এর نَائِب فَاعِلٌ আর لِيَعْمَلْ এটা اَمْر غَائِبٌ-এর সীগাহ।

قَوْلُهُ وَلِقَائَهُ اَىْ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالثَّوَابِ : মুসান্নিফ (র.) لِقَاء-এর তাফসীরে উল্লিখিত শব্দগুলো এনে এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, لِقَاء-এর অর্থ হলো وُصُوْلٌ এবং اِتِّصَالٌ আর এ অর্থ আল্লাহ তা'আলার জন্য অসম্ভব। কেননা وُصُوْلٌ এবং اِتِّصَالٌ হলো جِسْمَانِيَّتْ-এর সিফত। আর আল্লাহ তা'আলা جِسْم হতে পবিত্র। এ কারণেই বিজ্ঞ মুফাসসির لِقَاء-এর তাফসীরে اَلْبَعْثُ ـ اَلْحِسَابُ ـ اَلثَّوَابُ শব্দগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছেন।

قوله لَا نَجْعَلُ لَهُمْ قَدْرًا : দ্বারা فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ وَزْنًا-এর তাফসীর করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, দ্বিতীয় আয়াতে সকলের আমল ওজন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের আমল পরিমাপ করা হবে না।

জবাবের সারকথা হলো– এখানে পরিমাপ না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের আমলের মূল্যায়ন করা হবে না। আর এই প্রশ্নকে প্রতিহত করার জন্যই কেউ কেউ وَزْنًا এর পরে نَافِعًا সিফত উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ পরিমাপ তো করা হবে কিন্তু তা উপকারী ও কল্যাণকর হবে না।

قَوْلُهُ وَابْتِدَاءُ : মুফাসসির (র.) وَابْتِدَاءُ শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ বাক্যটি جُمْلَة مُسْتَانِفَة অর্থাৎ جَزَاؤُهُمْ হলো মুবতাদা এবং جَهَنَّمُ হলো তার খবর। এর বিপরীতও বৈধ।

قَوْلُهُ مَهْزُوًّا : মুফাসসির (র.) هُزُوًا -এর তাফসীর مَهْزُوًّا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাসদারটি এখানে اِسْمِ مَفْعُوْل-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতে প্রবেশ তো হবে ভবিষ্যৎ কালে। কিন্তু এখানে مَاضِى كَانَتْ-এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, বেহেশতে প্রবেশ করে ফেলেছে। এর জবাবের সারকথা হলো– বাস্তবিক পক্ষে তো ভবিষ্যতকালেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে عِلْمِ اَزَلِىْ হিসেবে তাদের জান্নাতে প্রবেশ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مَاءَهُ : مَاءُهُ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুযাফ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لَنَفِدَ : لنفد উহ্য মেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَوْ হলো شَرْطِيَّة আর তার জবাব হলো لَنَفِدَ

قَوْلُهُ لَمْ تَفْرَغْ : لَمْ تَفْرَغْ বৃদ্ধি করা দ্বারাও একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান দেওয়া উদ্দেশ্য। আর তা হলো উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার كَلِمَات-ও এক সময় শেষ হয়ে যাবে। যদিও তা সমুদ্রের পরিসমাপ্তির পরেই হোক না কেন। জবাবের সারমর্ম হলো قَبْلَ শব্দটি غَيْرَ -এর অর্থে হয়েছে। আর তখন كَلِمَاتِ رَبِّ শেষ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ : তাফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। যখন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়, তখন যেহেতু তারা বের হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই ভিড়ের কারণে একজন আরেকজনের উপর পতিত হয়। অথবা এর অর্থ হলো, যখন আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি মোতাবেক কিয়ামতের পূর্বে তারা জুলকারনাইন নির্মিত ঐতিহাসিক প্রাচীর ভেঙ্গে বের হবে তখন তরঙ্গের ন্যায় তারা বের হবে এবং একের উপর অন্যে পতিত হবে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে প্রবেশ করবে, সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করে ফেলবে, জীবজন্তু কীট-পতঙ্গ এমনকি মানুষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলবে। শুধু মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে তারা প্রবেশ করতে পারবে না। তখন তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে একে অন্যের আগে যেতে চাইবে এবং পরস্পর পরস্পরের উপর পতিত হবে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই ঘটনা তখন ঘটবে যখন কিয়ামত কায়েম হওয়ার সময় আসবে, সমগ্র মানবজাতি কবর থেকে বের হয়ে আসবে। আর জিনরাও এসে মানুষের সাথে ভীড় জমাবে, আর সকলেই সেদিন ভীত সন্ত্রস্ত এবং হতবাক হবে। এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় পরবর্তী বাক্যে। ইরশাদ হচ্ছে– وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا

অর্থাৎ আর কবর থেকে মৃতদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। আর হিসাব, পুরস্কার ও শাস্তির জন্য আমি সকলকে একত্র করবো। হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতিকে একত্র করা হবে।

–[তাফসীরে কবীর খ. ২১, পৃ. ১৭২, তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৭৬, তাফসীরে আদদুররুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ২৭৭]

বর্ণিত আছে যে হযরত ইসরাফীল (আ.) সমগ্র মানবজাতিকে হাশরের ময়দানে একত্র করার জন্যে শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কিভাবে শান্তিতে বসবো? শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফেরেশতা মাথা নত করে শিঙ্গা মুখে ধারণ করে অপেক্ষা করছে, কখন হুকুম হবে এবং শিঙ্গায় ফুঁক দিবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এ অবস্থায় আমরা কি বলবো? তখন তিনি ইরশাদ করলেন– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ . عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

আর এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে ঘোষণা হয়েছে– وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

অর্থাৎ আর আমি তাদের সকলকে একত্র করবো, একজনও বাদ থাকবে না। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর, [উর্দু] পারা– ১৬, পৃ. ১৩]

قَوْلُهُ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا الخ : যেহেতু আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্যেই দোজখ তৈরি করা হয়েছে। তাই বিশেষভাবে এ ক্ষেত্রে দোজখের উল্লেখ করা হয়েছে। এ জীবনে যাদের চক্ষু ও কর্ণে পর্দা পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ দেখেও তারা দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী শ্রবণ করার

সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেনি, কিয়ামতের দিন তাদের চোখ খুলবে এবং প্রত্যেকে তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দোজখ অবশ্যই তাদের সম্মুখে দেখতে পাবে।

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী শ্রবণ করতো না, প্রিয়নবী ﷺ -এর অনিন্দ সুন্দর আদর্শের অনুসরণ করতো না, তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : সূরা কাহাফের প্রারম্ভে তাওহীদ, রিসালত এবং আখিরাতের কথা উল্লিখিত হয়েছিল। আর এই তিনটি বিষয় দ্বারাই সূরা সমাপ্ত করা হচ্ছে। যারা জিদ, হঠকারিতা এবং অহংকারের কারণে আল্লাহ তা'আলার বিধান গ্রহণে বিমুখ হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৪]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন এভাবে যে পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জিকির থেকে বিমুখ হয়েছে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর মহান বাণী গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৭৩]

قَوْلُهُ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ يَتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَاۤءَ : কাফের মুশরিক নাস্তিকরা কি এই ধারণা করে যে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে তার বান্দাদের ইবাদত করে আল্লাহ পাকের কঠিন আজাব থেকে তারা রক্ষা পাবে? কখনো তা হবে না- তথা তারা কখনো তাদের জন্য নির্ধারিত আজাব থেকে কোনো অবস্থাতেই রক্ষা পাবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عِبَادِىْ শব্দ দ্বারা ফেরেশতা, হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কোনো কাফের হযরত ঈসা (আ.)-এর আর কোনো কোনো কাফের হযরত উজাইর (আ.)-এর এবং কেউ ফেরেশতাদের উপাসনা করে মনে করতো যে, তারা এভাবে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে নাজাত পেয়ে যাবে, অথচ এটি ছিল তাদের নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– عِبَادِىْ -এর দ্বারা সেই শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কাফেররা যাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, কাফেররা যে মূর্তির পূজা অর্চনা করে, এই শব্দ দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে যাদের বন্দেগী করে, তারা কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে রেহাই দিতে পারবে না। যদি তারা এই ভুয়া উপাস্যদের আশায় বসে থাকে, তবে তাদের জানা উচিত যে, اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কাফেরদের আপ্যায়নের জন্য দোজখকে প্রস্তুত করে রেখেছি। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, কাফেরদের প্রতি বিদ্রূপ করেই نُزُلًا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের আদর আপ্যায়নের জন্য দোজখের অগ্নিশিখা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাদের কুফর শিরক, নাস্তিকতা এবং নাফরমানির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তারা ভোগ করবে দোজখের কঠিন কঠোর শাস্তি। এই শাস্তি হবে চিরস্থায়ী, কখনো তারা এই শাস্তি থেকে নাজাত পাবে না। কখনো তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। কেননা শিরক ও কুফরকে ক্ষমা করা হবে না বলে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না।

قَوْلُهُ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا .... يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا – সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, এই আয়াতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক বলতে খ্রিস্টান এবং ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে, এরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে থাকে। অথচ এদের প্রত্যেকের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত বলতে সেই

সকল পাদ্রীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা তাদের নিজের ধারণায় মনে করে যে তারা ভালো কাজ করছে। কেননা তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস থেকে বিরত রয়েছে, অথচ ইসলামি শরিয়তকে তারা অস্বীকার করছে, এমনি অবস্থায় তাদের সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এই কথাটির তাৎপর্য হলো খারেজী ফেরকা। কেননা খারেজীরাই প্রথম দল যারা সাহাবায়ে কেরামের বিরোধিতা করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো এই যে, আলোচ্য আয়াতে বেদআতী এবং প্রবৃত্তির অনুসারীদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর মো'তাযিলা, রাফেজী, খারেজী এবং আহলে সুন্নতের বিরোধী সকল সম্প্রদায় এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, এই আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করে না, যারা পুনরুত্থানের বিষয়টি অস্বীকার করে, আর যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো দু'দিনের এ জীবনের সাফল্য লাভ করা, আর যাদের উদ্দেশ্য একমাত্র দুনিয়ার এই জীবনে উপকৃত হওয়া। পরবর্তী আয়াতে তাদের সম্পর্কেই ইরশাদ হয়েছে- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ

অর্থাৎ তারাই সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে তারা অস্বীকার করেছে। আলোচ্য আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে সেসব লোকদের প্রতিও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যারা আখিরাতের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও দুনিয়ার কাজকে প্রাধান্য দেয়, আখিরাতের কাজকে ভুলে যায়। কেননা আখিরাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য যে সম্বল সংগ্রহ করবে না সে আখিরাতের নিয়ামত থেকে মাহরুম হবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সর্বাধিক বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত রেখেছে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি যে নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা করেছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ব্যাপারে গাফেল রয়েছে এবং যা ইচ্ছা জীবনে তা করেছে এবং একথা মনে করেছে যে আল্লাহ তা'আলা তো মাফ করেই দিবেন। কারণ তিনি তো রহীম, তিনিতো করীম। -[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

যদি এই আয়াত দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে- كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ বাক্যটির অর্থ হবে যদিও তারা কিয়ামতের সার্বিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করে, অথবা তাদের জন্য যে আজাব আখিরাতে অপেক্ষা করছে তা অস্বীকার করে।

قَوْلُهُ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا - কিয়ামতের দিন কাফেরদের আমল ওজন করা হবে না : এমন অবস্থায় তাদের আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজনই হবে না। কেননা নেক আমল এবং বদ আমল যদি এক সঙ্গে থাকে তবে তার ওজনের প্রয়োজন। নেক ও বদ কোন আমল অধিক তা প্রমান করার জন্যে ওজন করার প্রয়োজন। যখন তারা কোনো আমলই থাকবে না তখন তার আমল ওজনও করা হবে না। কেননা যদি তারা কোনো ভালো কাজ করেও থাকে, কিন্তু ভালো কাজ কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। অথচ তারা ছিল কাফের। আর ওজন না করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের কোনো গুরুত্বই নেই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো কোনো মোটা লোক এমন অবস্থায় হাজির হবে যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মাছির একটি ডানার সমানও তাদের ওজন হবে না। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আবূ নু'আঈম (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আরো একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোনো কোনো শক্তিশালী মানুষকে কিয়ামতের দিন পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু তাদের ওজন একটি শস্যদানার সমানও হবে না। ফেরেশতাগণ এমনি সত্তর হাজার মানুষকে এক ধাক্কায় দোজখে ফেলে দিবেন।

অথবা এই আয়াতের অর্থ হলো তাদের আমল পরিমাপের জন্য পাল্লাই রাখা হবে না এবং তাদের আমল ওজন না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অথবা এর অর্থ হলো, যেসব আমলকে তারা নেকী মনে করে, নেক আমলের পাল্লায় সেগুলোর কোনো ওজনই হবে না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন লোকেরা এমন আমল নিয়ে হাজির হবে যা তাদের ধারণায় তেহামা পাহাড়ের সমান বড় হবে। কিন্তু পাল্লায় তোলার পর তার কোনো ওজনই হবে না। আলোচ্য আয়াত– فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ -এর অর্থ এটিই।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন শুধু মুমিনদের আমল পরিমাপ হবে এবং কাফেরদের আমলের পরিমাপ হবে না। এই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। যারা বলেন যে, কাফেরদের আমলের ওজন হবে না। তারা দলিল হিসেবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। আর যারা বলেন, কাফেরদেরও আমলের ওজন হবে, তারা আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতের এই অর্থ নয় যে, কাফেরদের আমলের পরিমাপ করা হবে না; বরং এর অর্থ হলো তাদের আমলের কোনো গুরুত্ব হবে না। কেননা অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ .

অর্থাৎ আর যাদের আমলের ওজন হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতো। –[সূরা আরাফ : ৯]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইমাম কুরতবী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকের আমলের ওজন হওয়া জরুরি নয়। প্রত্যেক মু'মিনেরও নয় এবং কাফেরেরও নয়। কেননা যেসব মু'মিন বে-হিসাব জান্নাতে যাবেন তাদের আমলের ওজন হবে না। [যখন হিসাবই হবে না তখন আমলের ওজনের কোনো প্রশ্ন উঠে না।] এমনিভাবে কিছু কাফেরও বিনা হিসাবে দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে তাদেরও আমলের ওজন হবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ .

অর্থাৎ পাপীষ্ঠদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পাও মাথার ঝুটি ধরে।

–[সূরা আর রাহমান : ৪১]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন যে, ইমাম কুরতুবী (র.)-এর এই কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যাদেরকে অবিলম্বে দোজখে প্রেরণ করা হবে তাদের আমলের ওজন করা হবে না। অবশিষ্ট কাফেরদের আমলের ওজন করা হবে।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭ পৃ. ২৭৯-৮০, তাফসীরে আদদুররুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৭৮]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত– فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا এর অর্থ হলো কিয়ামতের দিন তাদের আমলের কোনো গুরুত্ব হবে না। তাদের কুফরি এবং নাফরমানির কারণে তাদের ভালো কাজগুলো প্রাণহীন হবে। তাদের পুণ্যকর্মে কোনো ওজন থাকবে না। যেসব কাজকে তারা অত্যন্ত দামী এবং অতি মূল্যবান মনে করতো, কিয়ামতের দিন তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে এবং তাদের কর্মের কোনো মূল্য বা গুরুত্বই হবে না, ঈমান এবং ইখলাসের অভাবে তাদের পুণ্যকর্মও প্রাণহীন হবে। এরপর তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

বস্তুত কাফেরদের পুণ্যকর্মগুলো ঈমানের অভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এরপর তাদের আমলনামায় পাপ আর পাপই থাকবে। তাদের অবস্থা তাদেরকে বুঝাবার জন্যে পুণ্যকর্মগুলো নেক আমলের পাল্লায় রাখা হবে, যার কোনো ওজন হবে না। আর মন্দ কাজগুলো মন্দ কাজের পাল্লায় রাখা হবে এভাবে তাদের কুফর ও নাফরমানির পাল্লা ভারি হবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, কাফেরদের ওজন কায়েম না করার তাৎপর্য হলো, তাদের আমল পরিমাপ না করেই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। কেননা পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে। কিন্তু তাদের আমলের মধ্যে মন্দ ব্যতীত কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো এবং তাঁর রাসূলগণকে বিদ্রূপ করতো এবং আসমানি গ্রন্থসমূহকে অস্বীকার করতো, তাই তাদের আমল ওজন করার কোনো প্রয়োজনই নেই; ওজন ব্যতীতই তারা দোজখের শাস্তির জন্য বিবেচিত হবে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৬৫]

আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) একথাও লিখেছেন যে, এই বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো কিয়ামতের দিন মু'মিন কাফের সকলেরই আমলের ওজন হবে, যার উদ্দেশ্য হলো ন্যায় বিচার কায়েম করা; যেন কারো কোনো ওজর আপত্তি না থাকে। কাফেরদের আমলও পাল্লায় রেখে পরিমাপ করা হবে, কিন্তু সেগুলোর কোনো ওজন হবে না। কেননা তারা কুফর ও নাফরমানির মাধ্যমে তাদের পরিণামকে ভয়াবহ করে তুলেছে। আর এজন্যই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে– ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اٰيٰتِي وَرُسُلِي هُزُوًا অর্থাৎ তাই তাদের শাস্তি হবে দোজখ, কেননা তারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে, কুফরি ও নাফরমানি করেছে, আমার নিদর্শনসমূহের এবং আমার রাসূলগণের প্রতি বিদ্রূপ করেছে, তাই তাদের শাস্তি হলো দোজখ। তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর সত্যতার যথেষ্ঠ প্রমাণ তাদের নিকট ছিল; কিন্তু তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস করেনি, তারা চক্ষুষ্মান থাকা সত্ত্বেও যেন অন্ধ ছিল।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এই আয়াতের তাফসীরে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মক্কার জনৈক কাফের দম্ভ প্রকাশ করে প্রিয়নবী ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে চলে যায়। তখন তিনি হযরত বুরায়দা (রা.)-কে বললেন, এই লোকটি তাদের অন্তর্ভুক্ত, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট যাদের গুরুত্ব হবে না। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দূ] পারা- ১৬, পৃ. ১৫]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا এতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এখন মু'মিনদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। বস্তুত ঈমানদার ও নেককারগণ তাদের ঈমান ও নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ বেহেশত লাভ করবে। বেহেশতের সুশীতল মনোরম ছায়ায় তারা চিরদিন বাস করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককার মু'মিনদের জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউসের কথা ঘোষণা করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া কর, কেননা ফেরদাউস জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত। আর তা অন্য জান্নাতসমূহ থেকে উচ্চতর অবস্থায় রয়েছে, আর তার উপরই করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আরশ অবস্থিত এবং ফেরদাউস থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।

তিরমিযী ও হাকেম (র.) হযরত ওবায়দা ইবনে সামের (রা.)-এর সূত্রে এবং বায়হাকী হযরত মা'আজ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একশটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মধ্যে তফাত এতখানি যতখানি আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে। ফেরদাউস হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। আর এ ফেরদাউস থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তার উপর রয়েছে আরশ। যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট বেহেশতের জন্য দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে।

বাযযার হযরত ইরবাজ ইবনে সাবিয়া (রা.)-এর সূত্রে এবং তাবারানী হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া কর তখন ফেরদাউসের জন্য দোয়া করবে; তা অন্য জান্নাতসমূহের উপর রয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত কাব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জান্নাতসমূহের মধ্যে ফেরদাউসের চেয়ে উঁচু কোনো জান্নাত নেই। কল্যাণকর কাজের আদেশদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতকারী ব্যক্তি জান্নাতুল ফেরদাউসে প্রবেশ করবেন।

মোকাতেল (র.) বলেছেন, ফেরদাউস জান্নাতের একটি উপত্যকা। অর্থাৎ তা সর্বোচ্চে অবস্থিত, সর্বোত্তম এবং সর্বপ্রকার নিয়ামতে পরিপূর্ণ।

ইমাম আহমদ, তায়ালুসী ও বায়হাকী (র.) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ফেরদাউসে ৪টি জান্নাত রয়েছে তন্মধ্যে দু'টি স্বর্ণনির্মিত। ঐ জান্নাতের সবকিছুই স্বর্ণের, আর দু'টি রূপার।

ইবনে আবিদ দুনিয়া 'সিফাতুল জান্নাত' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নওফেলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিস নিজের দস্ত মোবারক দ্বারা তৈরি করেছেন। হযরত আদম (আ.)-কে স্বহস্তে তৈরি করেছেন। তাওরাতকে নিজ হাত দিয়ে লিখেছেন। আর ফেরদাউসকে নিজের হাত দ্বারা তৈরি

করেছেন। এরপর ইরশাদ করেছেন, শপথ নিজের সম্মান ও উচ্চ মরতবার! এতে [ফেরদাউসে] নিত্য মদ্যপায়ী কখনো প্রবেশ করবে না এবং দাইয়ূসও প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দাইয়ূস অর্থ কি? তিনি ইরশাদ করেন, সে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর মধ্যে মন্দ কাজ দেখে অর্থাৎ নিজের স্ত্রীর দ্বারা মন্দ কাজ করায়।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ২৮৩]

قَوْلُهُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا : উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের এ স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জান্নাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনো বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জান্নাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জান্নাতও একটি কয়েদখানার মতো মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতাই বটে। যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, জান্নাতের নিয়ামত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জান্নাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোনো সময় কারো মনে জাগবে না।

হাদীসে বর্ণিত শানে নুযূল থেকে সূরা কাহাফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য– وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ রিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বুঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করতো যে, জনসমাজে শৌর্যবীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। [এ থেকে জানা গেল যে, জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায় না।]

ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'কিতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বললেন, আমি মাঝে মাঝে যখন কোনো সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত আবূ নু'আঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন, জুনদুব ইবনে সুহাইব যখন নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন অথবা দান খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরো বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনোরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ হয়ে যায়; বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাজে [নামাজরত] থাকি। হঠাৎ কোনো ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভালো লাগে যে, সে আমাকে নামাজরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ হুরায়রা! আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি রহম করুন! এমতাবস্থায় তুমি দু'টি ছওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করেছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। [এটা রিয়া নয়]।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবূ জর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোনো সৎকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শুনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ। অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ [যে, তার আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন]।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টির অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরিক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরো বাড়িয়ে দেওয়া– এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হলো সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য [আমল কবুল হওয়ার] অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণিত এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশঙ্কা করি তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, রিয়া। –[আহমদ]

বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃতি করে তাতে অতিরিক্ত আরো বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেওয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোনো প্রতিদান আছে কিনা?

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরিকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোনো সৎকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল, শরিকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত। সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরিক করেছিল। –[মুসলিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন। যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যায়। –[আহমদ, বায়হাকী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রা.)-কে ইখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, ইখলাসের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ ও ভালো কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল, হে আল্লাহ! এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিরমিযী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, هُوَ فِيْكُمْ اَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতোই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক [অর্থাৎ রিয়া] থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُهُ.

ফায়দা– ১ : قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ الخ আয়াতে একথা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ আমাদের মতোই রক্ত মাংসে গড়া মানুষ অর্থাৎ হাত ও সত্তা হিসেবে তিনি মানুষ। তবে গুণাবলি ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এ কারণেই তো তাঁর মানুষ হওয়াও তাঁর জন্য গর্বের কারণ। যেরূপভাবে عَبْدِيَّتْ হলো তাঁর সর্বোত্তম গুণ, বরং তিনি মানুষ হওয়ার কারণে স্বয়ং মনুষত্ব ফেরেশতাগণের ঈর্ষার কারণ হয়েছেন। কাজেই যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে মানুষ মনে না করে কোনো ব্যাখ্যা ব্যতীত সরাসরি মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সে কুরআনের স্পষ্ট صَرِيْح আয়াতকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যাবে।

ফায়দা- ২ : সীরাতের কতিপয় কিতাবে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর ছায়া পড়ত না। একথাও সঠিক নয়। রাসূল ﷺ -এর ছায়া ছিল এবং তার উপর রৌদ্রতাপও পতিত হতো। মুসনাদে আহমদের বর্ণনা দ্বারা রাসূল ﷺ -এর ছায়া প্রমাণিত হয়। আর এই রেওয়ায়েতকে মুসনাদে আহমদের তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যার মূল বক্তব্য হলো বিদায় হজের সফরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)-এর বাহন বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ হযরত যায়নব (রা.)-কে বললেন, যেহেতু তোমার নিকট একটি অতিরিক্ত বাহন আছে তাই তা সাফিয়াকে দিয়ে দাও। তিনি তাকে বাহন দিতে অস্বীকার করে সতীনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করে দিলেন। এতে রাসূল ﷺ হযরত যয়নব (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনমাস তার থেকে দূরে থাকলেন। এক পর্যায়ে হযরত যয়নব (রা.) নিরাশ হয়ে গেলেন। রবিউল আওয়াল মাস শুরু হলে রাসূল ﷺ হযরত যয়নব (রা.)-এর নিকট আগমন করলেন। তখন হযরত যয়নব (রা.) ছায়া দেখে ভাবতে লাগলেন, এতো কোনো মানুষের ছায়া হয়ে থাকবে। নবী করীম ﷺ তো আমার নিকট আসেন না। তাহলে এই ছায়া কার হবে? এটা ভাবছিলেন ইত্যবসরেই রাসূল ﷺ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল ﷺ -এর ছায়া ছিল এবং তা মাটিতেও নিপতিত হতো।

ফায়দা- ৩ : শেষ আয়াতে যে শিরকের নিষেধাজ্ঞার কথা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যাপক। তাতে শিরকে জলী ও শিরকে খফী সবই অন্তর্ভুক্ত। শিরকে জলী হলো যা মুশরিকরা করে থাকে। আর শিরকে খফী হলো লৌকিকতা সম্বলিত ইবাদত। যেরূপভাবে শিরকে জলী দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে লৌকিকতাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়, যা দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং যা দ্বারা প্রসিদ্ধি ও মর্যাদা লাভ উদ্দেশ্য হয়। আর যেটা মানুষদেরকে দেখানো ও শুনানোর জন্য করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ জাতীয় আমল পরকালে তার জন্য অনিষ্টই বয়ে আনবে। বহু হাদীসে এ জাতীয় বক্তব্য পাওয়া যায়।

ফায়দা- ৪ : ইখলাস এবং লৌকিকতার দিক থেকে আমল চার পর্যায়ের বা চার ধরনের। যথা-

১. শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমল পরিপূর্ণ রূপেই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য হবে এবং কাজ শেষ হওয়ার পরেও কেউ সে ব্যাপারে জানতে পারবে না। এটা খুবই উঁচু পর্যায়ের আমল। কিয়ামতের দিন যখন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সে সময় এ ধরনের একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া প্রদান করবেন।

২. শুরু হতে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র লৌকিকতা দেখানোর জন্যই হবে। এ জাতীয় আমল পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হবে; বরং এ আমল আরো বিপদের কারণ হবে। হাদীস শরীফে এমন তিন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাদেরকে ফয়সালা শুনানো হবে। তারা হলেন- ১. শহীদ ২. কারী ৩. সম্পদশালী। বিস্তারিত মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে দ্রষ্টব্য।

৩. এমন আমল যা ইখলাসের সাথেই আরম্ভ করা হয়েছিল তা পূর্ণতার পূর্বেই তাতে লৌকিকতা স্থান করে নিয়েছে। এটাও আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।

৪. এমন আমল যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইখলাসের সাথেই হয়েছে। আর শেষ হওয়ার পরও সে নিজে তা প্রকাশ করেনি এবং প্রকাশ করার কামনাও সে করেনি; কিন্তু কোনো কারণবশত নিজে নিজেই তার আমল প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে লোকজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। আর তার নিকট এই প্রশংসা ভালো মনে হতে লাগলো। এটা আমলের জন্য ক্ষতিকর নয়। -[জামালাইন খ. ৪, পৃ. ১১১ - ১১২]

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ : সূরা মারইয়াম মক্কায় অবতীর্ণ

اَوْ اِلَّا سَجْدَتُهَا فَمَدَنِيَّةٌ اَوْ اِلَّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ الْاٰيَتَيْنِ فَمَدَنِيَّتَانِ وَهِيَ ثَمَانٌ اَوْ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ اٰيَةً ـ

তবে সিজদার আয়াতটি মাদানী অথবা সিজদার আয়াতটি এবং فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ এ দু আয়াত মদনী, এতে সর্বমোট ৯৮ বা ৯৯ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. كٓهٰيٰعٓصٓ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

٢. هٰذَا ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ مَفْعُوْلُ رَحْمَةٍ زَكَرِيَّا ج بَيَانٌ لَهٗ ـ

٣. اِذْ مُتَعَلِّقٌ بِرَحْمَةٍ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً مُشْتَمِلًا عَلٰى دُعَاءٍ خَفِيًّا ـ سِرًّا جَوْفَ اللَّيْلِ لِاَنَّهٗ اَسْرَعُ لِلْاِجَابَةِ ـ

٤. قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ ضَعُفَ الْعَظْمُ جَمِيْعُهٗ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ مِنِّيْ شَيْبًا تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ اَيْ اِنْتَشَرَ الشَّيْبُ فِيْ شَعْرِهٖ كَمَا يَنْتَشِرُ شُعَاعُ النَّارِ فِي الْحَطَبِ وَاِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَدْعُوْكَ وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ اَيْ بِدُعَائِيْ اِيَّاكَ رَبِّ شَقِيًّا ـ اَيْ خَائِبًا فِيْمَا مَضٰى فَلَا تُخَيِّبْنِيْ فِيْمَا يَأْتِيْ ـ

অনুবাদ :

১. কাফ-হা-ইয়া 'আইন-সাদ। এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

২. এটা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ, তার বান্দা জাকারিয়ার প্রতি। عَبْدَهٗ শব্দটি رَحْمَةِ -এর মাফউল। আর زَكَرِيَّا হলো عَبْدَهٗ -এর بَيَانٌ।

৩. যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল নিভৃতে اِذْ টা رَحْمَةِ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ দোয়া সম্বলিত আহ্বান, চুপে চুপে রাতের দ্বি-প্রহরে। কেননা এ পদ্ধতি দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত পন্থা।

৪. তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! আমার সকল অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে। شَيْبًا শব্দটি فَاعِلْ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে تَمْيِيْز হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে লাকড়ির মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তেমনিভাবে শুভ্রতা আমার মাথার চুলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এতদ সত্ত্বেও আমি আপনার নিকট একটি আবেদন করছি যে, আর আপনাকে আহ্বান করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। অর্থাৎ আমি আপনার থেকে অতীতে কোনো দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হয়নি। কাজেই ভবিষ্যতেও আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

অনুবাদ :

৫. وَإِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ - اَيِ الَّذِيْنَ يَلُوْنِىْ فِى النَّسَبِ كَبَنِى الْعَمِّ مِنْ وَّرَائِىْ اَىْ بَعْدَ مَوْتِىْ عَلَى الدِّيْنِ اَنْ يُضَيِّعُوْهُ كَمَا شَاهَدْتُهٗ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ تَبْدِيْلِ الدِّيْنِ وَكَانَتِ امْرَأَتِىْ عَاقِرًا لَا تَلِدُ فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيًّا اِبْنًا -

৫. আমি আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে আশঙ্কা করি অর্থাৎ আমার বংশীয় আত্মীয় স্বজন যেমন- চাচাতো ভাই প্রমুখ থেকে আমার পর আমার তিরোধানে পর ধর্মীয় ব্যাপারে যে, তারা তা নষ্ট করে ফেলবে, যেমনটি আমি বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে চাক্ষুষ অবলোকন করেছি দীনের পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে। আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা সন্তান জন্ম দেয় না, সুতরাং আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে উত্তরাধিকারী দান করুন অর্থাৎ আপনার বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা একটি পুত্র সন্তান দান করুন!

৬. يَرِثُنِىْ بِالْجَزْمِ جَوَابُ الْاَمْرِ وَبِالرَّفْعِ صِفَةُ وَلِيًّا وَيَرِثُ بِالْوَجْهَيْنِ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ق جَدِّى الْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا - اَىْ مَرْضِيًّا عِنْدَكَ قَالَ تَعَالٰى فِىْ اِجَابَةِ طَلَبِهِ الْاِبْنَ الْحَاصِلَ بِهَا رَحْمَتَهٗ -

৬. যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে يَرِثُنِىْ শব্দটি ثَاء -এর جَزْم -এর সাথে হতে পারে اَمْر -এর জবাব হিসেবে। আবার رَفْع যুক্তও হতে পারে وَلِيًّا -এর সিফত হিসেবে। এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে يَرِثُ -এর মধ্যেও يَرِثُنِىْ -এর মতো দু'ধরনের ইরাব হতে পারে। আমার দাদা ইয়াকূবের বংশের ইলম ও নবুয়তের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে করুন সন্তোষভাজন। অর্থাৎ আপনার নিকট গ্রহণযোগ্য। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.) اِجَابَتْ دُعَاء -এর কারণে রহমত স্বরূপ অর্জিত হওয়া সন্তানের দরখাস্তের জবাবে বলে দিলেন يَا زَكَرِيَّا الخ

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كٓهٰيٰعٓصٓ : এটা مُتَشَابِهَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত। যার বাস্তবজ্ঞান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর রয়েছে। উম্মতের জন্য এর অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেগুলো অনুমান নির্ভর ও ধারণাভিত্তিক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্তর্গত একটি নাম। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, এটা কুরআনের একটি নাম। কেউ কেউ এটাকে ইসমে আযমও বলেছেন।

قَوْلُهٗ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ الخ : عَبْدَهٗ এটা رَحْمَةِ -এর مَفْعُول بِهٖ আবার কেউ কেউ ذِكْر -এর مَفْعُول بِهٖ বলেছেন। زَكَرِيَّا এটা عَبْدَهٗ থেকে بَدْل বা عَطْف بَيَانْ হয়েছে। ذِكْرُ رَحْمَتِ -এর মধ্যে ذِكْر মাসদার স্বীয় مَفْعُول -এর দিকে مُضَاف হয়েছে। আর মাসদারের فَاعِلْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذِكْرُ اللّٰهِ رَحْمَتَهٗ আর رَحْمَة মাসদারের ইজাফত رَبِّ -এর দিকে মাসদারের ইজাফত ফায়েলের দিকে হয়েছে। আর এটা جُمْلَه হয়ে هٰذَا উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) هٰذَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ هٰذَا الْمَتْلُوُّ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ আরেকটি তারকীব এরূপও হতে পারে যে, ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الخ হলো মুবতাদা আর তার খবর পূর্বে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكَ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

আর ذِكْرُ رَحْمَتِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রহমত বর্ষণ করা। অনুগ্রহের লেনদেন করা। যেই ذِكْر টা نِسْيَانْ -এর মোকাবিলায় আসে, এখানে সেটা উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اِذْ نَادٰى : এটা رَحْمَة -এর ظَرْف হয়েছে। আবার কেউ কেউ এটাকে ذِكْر -এর ظَرْف বলেছেন। মুফাসসির (.র) اِذْ-এর পরে مُتَعَلِّقٌ بِرَحْمَةٍ উল্লেখ করে এটা বলে দিয়েছেন যে, اِذْ نَادٰى যদিও ذِكْر -এর ظَرْف হতে পারে। কিন্তু মুফাসসির (র.)-এর নিকট এটাকে رَحْمَة -এর ظَرْف বানানো উত্তম। অর্থাৎ- رَحْمَةِ اللّٰهِ اِيَّاهُ وَقْتَ اَنْ نَادَاهُ

قَوْلُهُ وَهَنَ : এটা বাবে ضَرَبَ ও سَمِعَ -এর মাসদার। অর্থ হলো- শক্তিহীন হওয়া, দুর্বল হওয়া। হযরত জাকারিয়া (আ.) وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ বলেছেন। অথচ وَهَنَ عُظْمِىْ অধিক সংক্ষিপ্ত ছিল। এর কারণ কি?

এর জবাবে বলা হয় যে, وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ -এর মধ্যে اِجْمَالْ -এর পরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা اَلْعَظْمُ এটা جِنْسِيَّة مَقْصُوْدَه -এর উপর সুস্পষ্টভাবে বুঝায়। এভাবে যে, وَهَنَ الْعَظْمُ হলো مُطْلَقٌ যাতে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্যদের হাড় অন্তর্ভুক্ত ছিল। مِنِّىْ বলে নিজেকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনিভাবে مِنِّىْ টা اَلْعَظْمُ -এর তাকিদ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ رَبِّىْ : এই বাক্যটি نَادٰى بِهٖ -এর তাফসীর اَلْعَظْمُ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ টা اِسْتِغْرَاقْ جِنْسِىْ -এর জন্য হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো সকল হাড়। اَلْعَظْمُ -কে বহুবচন না এনে একবচন আনা হয়েছে। কেননা বহুবচনের প্রয়োগ সেই সুরতেও ঠিক রয়েছে যখন কিছু হাড় দুর্বল হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِشْتِعَالُ : মূলত اِشْتِعَالُ বলা হয় اِنْتِشَاعُ الشُّعَاعِ النَّارِ فِى الْحَطَبِ তথা লাকড়ির মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়াকে। شَيْبًا এটা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে এবং فَاعِلْ হতে স্থানান্তরিত হয়েছে। মূল ইবারত হলো اِنْتَشَرَ الشَّيْبُ فِىْ شَعْرِه বাবে ضَرَبَ হতে মাসদার شَيْبًا অর্থ হলো- বুড়ো হওয়া, চুল শুভ্র হওয়া। কেউ কেউ شَيْبًا -কে মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب বলেছেন। এভাবে যে, اِشْتِعَالُ الرَّأْسِ এটা شَابَ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এখন ইবারত হবে شَابَ شَيْبً আবার কেউ কেউ حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب বলেছেন এবং شَيْبًا অর্থ شَائِبًا বলেছেন। তবে শেষোক্ত দুটি উক্তি অসমর্থিত। رَأْسُ-এর পরে مِنِّىْ -কে পূর্বের উপর নির্ভর করে ছেড়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ الْمَوَالِىَ : এটা مَوْلٰى -এর বহুবচন, অর্থ হলো- নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন, চাচাতো ভাই প্রমুখ।

عَاقِرًا -এর অর্থ হলো বন্ধ্যা, যার সন্তান হয় না। عَاقِرًا -এর শেষে ة ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি حَائِضٌ -এর মধ্যে হয়েছে। হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ঈশা বিনতে ফাকূর ছিল এবং ঈশার বোনের নাম ছিল হান্না। ঈশার সন্তান হযরত ইয়াহইয়া (আ.) আর হান্নার সন্তান হযরত মারইয়াম (আ.)। আর হযরত মারইয়াম (আ.)-এর সন্তান হলেন হযরত ঈসা (আ.)। এভাবেই হযরত ঈসা (আ.) হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর খালাতো ভাগ্নে হয়েছেন।

قَوْلُهُ رَضِيًّا : এটা মাসদার اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে হয়েছে। অর্থ- পছন্দনীয়।

قَوْلُهُ بِدُعَائِكَ : এর তাফসীর بِدُعَائِىْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, دُعَاء হলো মাসদার যা স্বীয় مَفْعُوْل -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর তার فَاعِلْ হলো مُتَكَلِّمْ -এর যমীর ى যা উহ্য আছে।

قَوْلُهُ اَلْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবীগণের মীরাস হলো ইলম বা জ্ঞান; সম্পদ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : যেহেতু এ সুরায় হযরত মাইয়াম (আ.)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এজন্যে মারইয়াম নামে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করেন, তখন তারা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব (রা.)-কে বললেন,

তোমাদের রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তন্মধ্যে আমাদেরকে কিছু শুনাও! তখন হযরত জা'ফর (রা.) সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনে নাজ্জাশী এত ক্রন্দন করলেন যে, তার দাড়ীগুলো ভিজে গেল, তার সঙ্গে ক্রন্দন করলেন খ্রিস্টান ধর্মের আলেমগণ, তাদের নয়নের অশ্রুর কারণে সম্মুখস্থ কিতাবগুলো পর্যন্ত ভিজে গলে। নাজ্জাশী বললেন, এই মহান বাণী অবিকল তাই যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ.)। এটাতো একই কেন্দ্রের আলো। –[আহমদ, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতেম]

এরপর নাজ্জাশী হুজুর আকরাম ﷺ -এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেন। কিছুদিন পর যখন তার ইন্তেকাল হয় তখন হুজুর ﷺ তার গায়েবানা নামাজ আদায় করলেন।

হুজুর ﷺ -এর মুজেযা : বর্ণিত আছে যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ ইন্তেকাল করেন, তখন হুজুর ﷺ -এর মুজেযা স্বরূপ বাদশাহ নাজ্জাশীর জানাযা তার সম্মুখে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ–

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخَاكُمُ النَّجَاشِىْ تُوُفِّىَ فَقُوْمُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ اِلَّا اَنَّ جَنَازَةً بَيْنَ يَدَيْهِ ـ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশীর ইন্তেকাল হয়েছে। অতএব তোমরা দাঁড়াও এবং তার উপর জানাযার নামাজ পড়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হলেন। চার তাকবীরের মাধ্যমে জানাযার নামাজ আদায় করা হলো। হুজুর ﷺ -এর মুজেযা স্বরূপ জানাযা তাঁর সম্মুখেই রাখা হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমরা তাঁর পেছনে নামাজ আদায় করেছি, যদিও আমরা জানাযা দেখতে পাইনি, যা আমাদের সম্মুখে রাখা ছিল। –[ফাতহুল বারী খ. ৩, পৃ. ১৫১]

গায়েবানা জানাযা প্রসঙ্গে : এই ঘটনা দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ গায়েবানা জানাযার নামাজ আদায় করেছেন। তবে আর কারো গায়েবানা জানাযা আদায়ের কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এটি নাজ্জাশীর বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.) গায়েবানা জানাযার পক্ষে মত প্রকাশ করেননি। তবে অন্যান্য ইমামগণ গায়েবানা জানাযার পন্থাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আসহাবে কাহফ, জুলকারনাইন, ইয়াজুজ মাজুক প্রভৃতি। এই সূরায়ও কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের ঘটনা এই সূরায় স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলিও এই সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত, দুনিয়ার এই জীবন ও পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের অনেক জরুরি কথা ইরশাদ হয়েছে। এসব ঘটনা দ্বারা পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবকে এই সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছে যে, দেখ যারা আল্লাহ তা'আলার বিধান মেনে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কত বরকত নাজিল করেন, আর কত নিয়ামত তিনি তাদেরকে দান করেন। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার নেককার বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। কেননা, এ জীবন ও পরজীবনের সাফল্য এতেই রয়েছে নিহিত।

সূরা কাহাফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা কাহাফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

হযরত জাকারিয়া (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্যতম নবী। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাকারিয়া (আ.) সুতারের কাজ করতেন। তিনি নিজের হাতের কামাই ভোগ করতেন, তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তাঁর অন্তরে এই আশঙ্কা ছিল যে, আমার পরবর্তীকালে যাদের উপর সত্য দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হবে, হয়তো তারা সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে না। হয়তো এর মধ্যে তারা পরিবর্তন পরিবর্ধন করবে। যেমন বনী ইসরাঈলে তা ইতিপূর্বেও হয়েছে। এজন্য তিনি রাতের শেষ প্রহরে অত্যন্ত বিনীতভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করেন।

সূরা মারইয়ামের শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রতি তার বিশেষ রহমত নাজিল করার কথা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ كٓهٰيٰعٓصٓ : এ অক্ষরগুলোকে মুকাত্তাআত' বলা হয়।

পবিত্র কুরআনের বহু সূরার প্রারম্ভে এমনি অক্ষর স্থান পেয়েছে। এর সঠিক অর্থ মানুষের বোধগম্য নয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর রহস্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। এ জাতীয় অক্ষরগুলো সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছেন প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু গোপন বিষয় রয়েছে, পবিত্র কুরআনের গোপন বিষয় হলো 'হুরূফে মুকাত্তা'আত' যা সূরার প্রারম্ভে স্থান পেয়েছে। আর হযরত আলী (রা.) বলেন, প্রত্যেক গ্রন্থেই কিছু বিশেষ কথা থাকে পবিত্র কুরআনের বিশেষ কথা হলো এ অক্ষরসমূহ। –[তাফসীরে নূরুল করআন : খ. ১, পৃ. ১৮৩-১৮৪]

ইবনে মারদাবয়া কালবী (র.)-এর সূত্রে হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তাতে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এই হরফে মুকাত্তাআতের অর্থ হলো– كَافٍ هَادٍ عَالِمٌ صَادِقٌ

এ বাক্যটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ হলো كٓهٰيٰعٓصٓ। অন্য একটি বর্ণনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রয়েছে যে, ك দ্বারা كَرِيْمٌ - ه দ্বারা هَادٍ - ى দ্বারা حَكِيْمٌ - ع দ্বারা عَلِيْمٌ এবং ص দ্বারা صَادِقٌ বুঝানো হয়েছে।

কালবী (র.) বলেছেন–

كَافٍ لِخَلْقِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট।

هَادٍ لِعِبَادِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী।

يَدُهٗ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাঁর হাত তাদের [মু'মিনদের] হাতের উপর।

عَالِمٌ بِبَرِيَّتِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞাত।

صَادِقٌ فِىْ وَعْدِهٖ অর্থাৎ তিনি তাঁর ওয়াদায় সত্য।

দারিমী, ইবনে মাজাহ এবং ইবনে জারীরে ফাতেমা বিনতে আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আলী (রা.) তার দোয়ায় বলতেন– يَا كٓهٰيٰعٓصٓ اِغْفِرْلِىْ অর্থাৎ হে কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ। আমাকে মাফ করুন! –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৬, পৃ. ৫৭]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে এই অক্ষরসমূহ আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নাম। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরও একটি বর্ণনা রয়েছে সেখানে বলা হয়েছে– هُوَ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ নাম। –[তাফসীরে মাজেদী, খ. ১, পৃ. ৬২৩]

قَوْلُهُ نِدَاءً خَفِيًّا : এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اِنَّ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِىُّ وَخَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِىْ অর্থাৎ অনুচ্চ জিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন জীবিকাই শ্রেষ্ঠ। [অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না]। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنِّىْ وَهَنَ عَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا : অর্থাৎ অস্থির দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اِشْتِعَالٌ -এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তককে ছড়িয়ে পড়াকে বুঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মোস্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত জাকারিয়া (আ.) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ হলো– এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, দোয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।

قَوْلُهُ مَوَالِىَ : এটা مَوْلٰى -এর বহুবচন। আরবি ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাতো ভাই ও স্বজন। এখানে তা-ই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ - পয়গাম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না : অধিক সংখ্যক আলেমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা প্রথমত হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর কাছে এমন কোনো অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গাম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবাস্তব। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সংবলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

অর্থাৎ নিশ্চিতই আলেমগণ পয়গাম্বরগণের ওয়ারিস। পয়গাম্বরগণ কোনো দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান রেখে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে। -[আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী]

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ আমাদের [অর্থাৎ পয়গাম্বরগণের] আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ রেখে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে يَرِثُنِىْ -এরপর وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়নি। কেননা যে পুত্রের জন্মলাভের জন্য দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকূব (আ.)-এর বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مَوَالِىَ তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহইয়া (আ.) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থি।

রূহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে-

رَوَى الْكُلَيْنِىْ فِى الْكَافِىْ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِىْ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ وَرِثَ دَاوٗدَ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَرِثَ سُلَيْمَانَ .

অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর ওয়ারিস হয়েছেন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওয়ারিস হয়েছেন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوٗدَ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বুঝানো হয়নি।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া يَرِثُنِىْ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রার্থিত সন্তান হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও জীবিত থাকবেন। কেননা উত্তরাধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণত এটাই হয়ে থাকে। অথচ ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে হত্যা করা হয়েছে।

জবাব :

১. بَقَاء তথা অবশিষ্ট থাকাটা ব্যাপক। এটা بَقَاء ذَاتْ এবং بَقَاء اٰثَارْ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর সত্তা বিদ্যমান না থাকলেও তাঁর اٰثَارْ তো হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর পরও বিদ্যমান ছিল। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না।

২. অথবা فَاسْتَجَبْنَا বলা হয়েছে দোয়ার কতিপয় অংশ হিসেবে।

৩. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর হত্যার ঘটনা হযরত জাকারিয়া (আ.) জীবদ্দশায় হওয়া প্রমাণিত নেই।

বালাগাত :

١. اَلْكِنَايَةُ (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ) كِنَايَةٌ عَنْ ذَهَابِ الْقُوَّةِ وَضُعْفِ الْجِسْمِ .

٢. اَلْاِسْتِعَارَةُ (اِشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) شُبِّهَ اِنْتِشَارُ الشَّيْبِ بِاشْتِعَالِ النَّارِ فِى الْحَطَبِ وَاسْتُعِيْرَ الْاِشْتِعَالُ لِلْاِنْتِشَارِ وَاشْتُقَّ مِنْهُ وَاشْتَعَلَ بِمَعْنٰى اِنْتَشَرَ فَفِيْهِ اِسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ .

অনুবাদ :

٧. يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ يَرِثُ كَمَا
سَاَلْتَ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ
قَبْلُ سَمِيًّا ـ اَىْ مُسَمًّى بِيَحْيٰى ـ

৭. হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি যে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হবে। তার নাম হবে ইয়াহইয়া, এ নামে আমি পূর্বে কারো নামকরণ করিনি। অর্থাৎ ইয়াহইয়ার মতো হুবহু নাম।

٨. قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ
امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عِتِيًّا ـ مِنْ عَتَا يَبِسَ اَىْ نِهَايَةَ السِّنِّ
مِائَةً وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً وَبَلَغَتْ اِمْرَاَتُهٗ
ثَمَانِىْ وَتِسْعِيْنَ سَنَةً وَاَصْلُ عِتِيٍّ
عُتُوْوٌ كُسِرَتِ التَّاءُ تَخْفِيْفًا وَقُلِّبَتِ
الْوَاوُ الْاُوْلٰى يَاءً لِمُنَاسَبَةِ الْكَسْرَةِ
وَالثَّانِيَةُ يَاءً لِتُدْغَمَ فِيْهَا الْيَاءُ ـ

৮. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত عِتِيًّا শব্দটি عَتَا হতে নির্গত, অর্থ– يَبِسَ তথা জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ ১২০ বছর এবং আমার স্ত্রী বয়স ৯৮ বছর হয়ে গেছে। عِتِيٌّ মূলত ছিল عُتُوْوٌ যা فُعُوْلٌ ওজনে সহজিকরণের জন্য تَاءْ-এর পেশের পরিবর্তে যের দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম وَاوْ টিকে কাসরার মুনাসাবাতে يَاءْ দ্বারা রূপান্তর করা হয়েছে। এরপর وَاوْ এবং يَاءْ একত্রে আসায় দ্বিতীয় وَاوْ-কে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করত يَاءْ-কে- يَاءْ-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এরপর عَيْن-এর পেশকে تَاءْ-এর মুনাসাবাতে كَسْرَةْ দ্বারা বদলে দেওয়া হয়েছে, ফলে عِتِيًّا হয়েছে।

٩. قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ ۚ مِنْ خَلْقِ غُلَامٍ مِنْكُمَا
قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ اَىْ بِاَنْ اَرُدَّ
عَلَيْكَ قُوَّةَ الْجِمَاعِ وَاُفَتِّقَ رَحِمَ امْرَاَتِكَ
لِلْعُلُوْقِ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ
شَيْئًا ـ قَبْلَ خَلْقِكَ وَلِاِظْهَارِ اللّٰهِ تَعَالٰى
هٰذِهِ الْقُدْرَةَ الْعَظِيْمَةَ اَلْهَمَهُ السُّؤَالَ
لِيُجَابَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَلَمَّا تَاقَتْ
نَفْسُهٗ اِلٰى سُرْعَةِ الْمُبَشَّرِ بِهٖ ـ

৯. তিনি বললেন, এরূপই হবে অর্থাৎ তোমাদের উভয় থেকে সন্তানের সৃষ্টি এই অবস্থায়ই অবশ্যই হবে। তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। অর্থাৎ আমি তোমার মধ্যে সহবাসের শক্তি সৃষ্টি করে দেব এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভাশয়কে গর্ভধারণের উপযুক্ত করে দিব। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। অর্থাৎ তোমার সৃষ্টির পূর্বে। আল্লাহ তা'আলা তার এই মহান কুদরত প্রকাশ করার জন্য হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয়ে এমন একটি প্রশ্নের সঞ্চার করে দিলেন। যাতে তার জবাবে এমন আচরণ করবে যা এই মহান কুদরতের জন্য দিক নির্দেশক হবে। আর যখন হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর হৃদয় দ্রুত এই সুসংবাদের প্রত্যাশী হলো।

١٠. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ اَىْ عَلَامَةً عَلٰى
حَمْلِ امْرَاَتِىْ قَالَ اٰيَتُكَ عَلَيْهِ اَنْ لَّا تُكَلِّمَ
النَّاسَ اَىْ تَمْتَنِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ بِخِلَافِ
ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ لَيَالٍ اَىْ بِاَيَّامِهَا
كَمَا فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ سَوِيًّا ـ حَالٌ
مِنْ فَاعِلِ تُكَلِّمُ اَىْ بِلَا عِلَّةٍ ـ

১০. তখন হযরত জাকারিয়া (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও অর্থাৎ আমার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার নিদর্শন প্রদান করুন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি কারো সাথে বাক্যালাপ করবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জিকির ব্যতীত শুধুমাত্র তাদের সাথে কথা বলতে অক্ষম থাকবে। তিন রাত অর্থাৎ দিনসহ তিনরাত। যেমনটা সূরা আলে ইমরানে এসেছে ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ তথা তিনদিন। তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও। سَوِيًّا টা تُكَلِّمُ-এর ফায়েল থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ কোনো রোগ ব্যতীতই।

অনুবাদ :

١١. فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ اَىِ الْمَسْجِدِ وَكَانُوْا يَنْتَظِرُوْنَ فَتْحَهُ لِيُصَلُّوْا فِيْهِ بِاَمْرِهٖ عَلَى الْعَادَةِ فَاَوْحٰى اَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا صَلُّوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ـ اَوَائِلَ النَّهَارِ وَاَوَاخِرَهُ عَلَى الْعَادَةِ فَعَلِمَ بِمَنْعِهٖ مِنْ كَلَامِهِمْ حَمْلَهَا بِيَحْيٰى ـ

১১. অতঃপর তিনি কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন অর্থাৎ মসজিদ থেকে আর লোকজন মসজিদ খোলার প্রতীক্ষায় ছিলেন। যাতে করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার নির্দেশ অনুপাতে ইবাদত করতে সক্ষম হয়। এবং তিনি ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন। অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী দিনের শুরু ও শেষ ভাগে তার উপাসনায় লিপ্ত থাকো। সুতরাং লোকদের সাথে কথা বলতে না পারার কারণে হযরত জাকারিয়া (আ.) স্বীয় স্ত্রীর ইয়াহইয়াকে গর্ভধারণের বিষয়টি বুঝতে পারলেন।

١٢. وَبَعْدَ وِلَادَتِهٖ بِسَنَتَيْنِ قَالَ تَعَالٰى لَهٗ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ اَىِ التَّوْرٰةَ بِقُوَّةٍ ط بِجِدٍّ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ النُّبُوَّةَ صَبِيًّا ـ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ ـ

১২. আর হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের দু'বছর পর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহইয়াকে বললেন, হে ইয়াহইয়া! এই কিতাবকে গ্রহণ কর। তাওরাতকে সুদৃঢ়ভাবে। আর আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান। নবুয়ত, তিন বছর বয়সে।

١٣. وَحَنَانًا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ مِّنْ لَّدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا وَزَكٰوةً ط صَدَقَةً عَلَيْهِمْ وَكَانَ تَقِيًّا ـ رُوِىَ اَنَّهٗ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيْئَةً قَطُّ وَلَمْ يَهُمَّ بِهَا ـ

১৩. এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা। এবং তাকে মানুষের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। সে ছিল মুত্তাকী বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনো কোনো অন্যায়ে জড়িত হননি এমনকি এর কল্পনাও করেননি।

١٤. وَبَرًّا ۢبِوَالِدَيْهِ اَىْ مُحْسِنًا اِلَيْهِمَا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا مُّتَكَبِّرًا عَصِيًّا ـ عَاصِيًا لِرَبِّهٖ ـ

১৪. পিতামাতার অনুগত তাদের সাথে ভদ্রোচিত ব্যবহারকারী এবং তিনি ছিলেন না উদ্ধত ও অবাধ্য অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্য ছিলেন না।

١٥. وَسَلٰمٌ مِّنَّا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ـ اَىْ فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْمُخَوِّفَةِ الَّتِىْ يَرٰى فِيْهَا مَا لَمْ يَرَهٗ قَبْلَهَا فَهُوَ اٰمِنٌ فِيْهَا ـ

১৫. তাঁর প্রতি শান্তি আমার পক্ষ থেকে যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন তিনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হবেন। অর্থাৎ সেই ভয়ানক তিনদিন যাতে মানুষ এমন বিষয় দেখে থাকে যা ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি, তখন যেন তিনি নিরাপদ থাকেন।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ يَحْيٰى : এটা বাবে سَمِعَ -এর حَيَاةٌ মাসদার হতে মুজারের সীগাহ। অর্থ- জীবিত থাকুক। ইয়াহইয়া হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর সন্তান। যেহেতু হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্মের মাধ্যমে তার মায়ের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়েছিল এজন্য তার নাম ইয়াহইয়া রাখা হয়েছে। এটি عَلَمِيَّتْ ও عُجْمَةْ -এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِسْمُهُ يَحْيٰى : এটা غُلَامٌ -এর সিফত হয়েছে।

لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ الخ : এটা হয়তো غُلَامٌ -এর দ্বিতীয় সিফত হবে অথবা غُلَامٌ থেকে حَالْ হবে।

قَوْلُهُ عِتِيًّا : এটা عَتَا يَعْتُوْ -এর মাসদার। অর্থ- শক্ত হওয়া, অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়া, জোড়া হাড়সমূহে শুষ্কতার সৃষ্টি হওয়া। ১. عِتِيًّا এটা بَلَغْتُ-এর مَفْعُوْل بِهٖ ২. بَلَغْتُ -এর অর্থের মাসদারটা তাকিদ হবে। কেননা بُلُوْغُ الْكِبَرِ عِتِيًّا -এর অর্থে হয়ে থাকে। ৩. عِتِيًّا মাসদার بَلَغْتُ -এর فَاعِلْ থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ بَلَغْتُ عِتِيًّا .৪ عِتِيًّا টা تَمْيِيْز হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ هَيِّنٌ : এটা هَوْن থেকে صِفَتْ مُشَبَّهَةٌ অর্থ- সহজ, আসান।

قَوْلُهُ اَنّٰى : এটা كَيْفَ অর্থে হয়েছে। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে সন্তান হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে। অসম্ভব মনে করে নয়, এবং এটা اِسْتِفْهَامْ تَعَجُّبِىْ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ ثَلٰثُ لَيَالٍ : এরপরে بِاَيَّامِهَا বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই আয়াত ও সূরা আলে ইমরানের আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। কেননা সেখানে اَيَّامْ -এর উল্লেখ রয়েছে। আর এখানে لَيَالْ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَاقَتْ : বাবে نَصَرَ হতে মাসদার تَوْقًا ـ تَوَقَانًا অর্থ- আগ্রহী হওয়া, আকাঙ্ক্ষী হওয়া।

قَوْلُهُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ : এটা عَلَىَّ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। আর وَلَمْ تَكُ এটা خَلَقْتُكَ -এর ك থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ سَوِيًّا : এটা لَا تُكَلِّمُ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمِحْرَابْ : অর্থ- মসজিদ, শয়তানের সাথে লড়াই করার স্থান।

قَوْلُهُ حَنَانًا : এর عَطْف হয়েছে اَلْحُكْم -এর উপর। حَنَانْ অর্থ হলো- দয়া, অনুকম্পা, অনুগ্রহ, হৃদয়ের বিগলতা।

قَوْلُهُ بَعْدَ وِلَادَتِهٖ الخ : এটা উহ্য মানা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَحْيٰى শব্দটি উহ্যের উপর مُرَتَّبْ কেননা ইয়াহইয়ার বীর্য রেহেমে প্রবেশ করার সাথে সাথেই ইয়াহইয়াকে শক্তভাবে ধরার নির্দেশ দেওয়া হলো। অথচ এখনো ইয়াহইয়া ভূমিষ্ঠ হয়নি। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে বাক্য উহ্য রয়েছে যাকে মুফাস্সির (র.) بَعْدَ وِلَادَتِهٖ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাকে সম্বোধন করে সুসংবাদ দিলেন, হে জাকারিয়া! আমি সুসংবাদ দেই যে তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করবো। তার নাম হবে ইয়াহইয়া। অর্থাৎ ঐ সন্তানের জন্মের পূর্বেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার নামকরণ করেছেন।

قَوْلُهُ لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا : তাফসীরকারগণ এই বাক্যটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। ১. ইতিপূর্বে এই নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। ২. ইতিপূর্বে তাঁর কোনো নজীর বা দৃষ্টান্তও দেখা যায়নি। অর্থাৎ হে জাকারিয়া! তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। তোমাকে উত্তরাধিকারী প্রদান করা হবে। তাঁর উচ্চ মরতবা এবং সম্মান স্বরূপ আমি নিজেই তার নামকরণ করলাম- ইয়াহইয়া। তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) এবং কালবী (র.) বলেছেন, ইতিপূর্বে এই নামে আর কারো নামকরণ করা হয়নি। অর্থাৎ আর কাউকে ইয়াহইয়া নাম দেওয়া হয়নি।

তাফসীরকার হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের এবং আতা (র.) আলোচ্য আয়াতের سَمِيًّا শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, নজির বা দৃষ্টান্ত। এমন অবস্থায় আল্লামা বগভীর মতে অর্থ হবে যে ইতিপূর্বে ইয়াহইয়ার ন্যায় কেউ হয়নি। কেননা হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কখনো কোনো গুনাহের কাজের দিকে আকৃষ্ট হননি। আর হযরত আলী ইবনে আবি তালহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পূর্বে কোনো বন্ধ্যা মাতার ঘরে এমন সন্তান কখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

ইয়াহইয়া বলে নামকরণের কারণ :

১. ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর কারণে তার মাতাকে জীবন প্রবাহ দান করেছেন। তাই তার নাম করা হয়েছে ইয়াহইয়া।

২. হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কলবকে ঈমান ও আনুগত্য দ্বারা জীবিত করেছেন। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত বান্দাকে জীবিত এবং পাপীদেরকে মৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে এমন পবিত্র জীবন তাঁকে দান করেছেন যে কোনো দিন শুধু যে তিনি গুনাহ করেননি তাই নয়; বরং তার অন্তরে কোনো দিন গুনাহের কথাও আসেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা গুনাহ হয়, অথবা সে অন্তত গুনাহের কথা চিন্তা করে; কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া দ্বারা এর কোনোটিই হয়নি।

৪. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) শাহাদাত বরণ করেছেন, আর যারা শহীদ হন, তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে জীবিত থাকেন।

৫. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তাই তাঁর কলবকে আল্লাহ তা'আলা ঐ ঈমানের বরকতে জীবিত করে দিয়েছেন। -[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ১৮৬-১৮৭]

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ الخ : হযরত জাকারিয়া (আ.) যখন এই অসাধারণ সুসংবাদ শ্রবণ করলেন তখন অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হয়ে আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমি কি যৌবন লাভ করবো? অথবা এই বৃদ্ধকালেই শিশুর জন্ম হবে? তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর এই প্রশ্ন أَنَّى [কিভাবে হবে?] অস্বীকৃতির অর্থ বুঝায় না; বরং এই প্রশ্নের অর্থ কৌতুহলবশত জানার চেষ্টা করা যে, কিভাবে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, আমাদের উভয়কে যৌবন প্রদান করা হবে অথবা আমরা উভয়ে বৃদ্ধই থাকবো, আর এভাবেই শিশু জন্মগ্রহণ করবে।

হযরত জাকারিয়া (আ.) পুত্রের সুসংবাদে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে এই প্রশ্ন করেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

قَالَ كَذَالِكَ অর্থাৎ এভাবেই হবে।

অর্থাৎ যেভাবে সাধারণত শিশু জন্মগ্রহণ করে ঠিক সেভাবেই। আর আল্লাহ তা'আলার জন্যে এটি কঠিন কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার দয়ায় সবকিছুই সম্ভব, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

قَوْلُهُ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করলেন পুত্র ইয়াহইয়া। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে ইয়াহইয়া! শক্তভাবে আসমানি কিতাব তাওরাত এবং অন্যান্য সহীফা ধারণ কর এবং বিধিনিষেধ যথাযথভাবে পালন কর এবং মানুষকে তাওরাতের উপর আমল করার জন্যে অনুপ্রাণিত কর। তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, পিতার বার্ধক্যের সময় যুবক পুত্রের প্রতি কিতাবের ইলম প্রচার প্রসার এবং রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পাতিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে কিতাব শব্দ দ্বারা তাওরাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا - একটি বিশেষ ঘটনা : শৈশবকালে একবার ছেলেরা তাকে খেলা করার জন্যে ডাকলো। তখন তিনি বললেন আমাদেরকে খেলা করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আবার কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, اَلْحُكْمَ শব্দ দ্বারা সহনশীল, সম্ভ্রান্ত এবং শান্ত বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য : মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবকালেই ইলম এবং হিকমত দান করেছেন যেন তিনি শরিয়তের আহকাম ভালোভাবে বুঝতে পারেন। এটি হলো তাঁর প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি কোমল অন্তরের লোক ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার নিজের তরফ থেকেই তাকে দান করি কোমলতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রতি স্নেহপ্রবণ ছিলেন এবং যখন নামাজ পড়তেন তখন অবিরাম ক্রন্দন করতে থাকতেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁকে পবিত্রতা এবং পবিত্র অন্তর দেওয়া হয়েছিল।

زَكٰوةً শব্দ দ্বারা এখানে অন্তরের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে যেন গুনাহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে অন্তর পবিত্র থাকে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে, زَكٰوةً শব্দ দ্বারা নেক আমল বুঝানো হয়েছে।

তাঁর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সৃষ্টিগত এবং স্বভাবগতভাবে পরহেজগার ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ভয় কখনো তাঁর অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি তার পিতামাতার খেদমতগুজার ছিলেন। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার খেদমতের চেয়ে অধিক আর কোনো গুণ নেই।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'হুকুম' অর্থ হলো নবুয়ত। কেননা তাঁর শৈশবকালেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর আমি তাকে আমার তরফ থেকে রহমত এবং গুনাহ থেকে পবিত্র থাকার তাওফীক দিয়েছি। রহমত প্রদানের দুটি অর্থ হতে পারে–

১. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত নাজিল করেছেন।

২. তাঁর অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার প্রতি রহম করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী حَنَانٌ শব্দটির অর্থ লিখেছেন, ভয় ভীতি, সম্মান অথবা রিজিক বা বরকত।

আরবি ভাষার বিখ্যাত অভিধানগ্রন্থ কামূসে حَنَانٌ শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে– রহমত, রিজিক, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং নম্রতা।

আর زَكٰوةٌ শব্দটির অর্থ হলো, পাপাচার থেকে পবিত্র থাকা। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং ইখলাস ও আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া।

বিখ্যাত তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) ও যাহহাক (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো নেক আমল। আর তাফসীরকার হযরত কালবী (র.)-এর মতে এই শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান, যা তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর পিতা হযরত জাকারিয়া (আ.)-কে পুত্র সন্তান প্রদানের মাধ্যমে বখশিশ করেছেন।

قَوْلُهُ وَكَانَ تَقِيًّا : আর তিনি ছিলেন পরহেজগার, পূর্ণ অনুগত। যিনি কোনোদিন গুনাহ করেননি, আর কখনো গুনাহের ইচ্ছাও করেননি। তিনি সৃষ্টিগতভাবেই পরহেজগার ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতিতেই পরহেজগারী ছিল।

অতি শৈশবেই তার মধ্যে ছিল নেক আমলের প্রেরণা, সৎকাজের উৎসাহ উদ্দীপনা। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। দয়া-মায়া তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। দেহ মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্য। পিতা-মাতার আদরের কারণে কখনো কখনো সন্তান অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়, কিন্তু তিনি এমন ছিলেন না।

قَوْلُهُ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ : তিনি ছিলেন পিতা মাতার সাথে সদয় ব্যবহারকারী, তাদের পরিপূর্ণ অনুগত, তাদের সেবা-যত্নে তিনি ছিলেন রত। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থাৎ "আর আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো ইবাদত করো না, আর পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর।" আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর আদেশের পাশাপাশি পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর পরই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো পিতামাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। এজন্যই প্রিয়নবী ﷺ তাগিদ করে ইরশাদ করেছেন- رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে। আর এই গুণের পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا : আর তিনি অবাধ্য নিষ্ঠুর ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি অহংকারী নাফরমান ছিলেন না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'জাব্বার' সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে রাগান্বিত অবস্থায় মানুষকে প্রহার করে এমনকি হত্যাকাণ্ডও করে।

قَوْلُهُ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا : তাঁর জন্মদিনে তাকে নিরাপদ রাখা হয়েছে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ থেকে, এমনিভাবে যেদিন তার মৃত্যু হবে সেদিন তাকে কবরের আজাব থেকে নিরাপদ রাখা হবে। আর কিয়ামতের দিন যখন তার পুনরুত্থান হবে তখন তাকে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) বলেছেন, মানব জীবনের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা-

১. মানুষ মায়ের উদর থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসে।

২. পৃথিবী থেকে বের হয়ে মধ্যলোকে চলে যায় সেখানে সে এমন কিছু দেখে যা পৃথিবীতে কখনো দেখেনি।

৩. পুনর্জীবিত হয়ে মানুষ হাশরের ময়দানে পৌছবে, আর এমনি ময়দান ও এমনি গণ-জমায়েত সে আর কখনো দেখেনি। আর এই তিনটি অবস্থায় এবং স্থানেই নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকার বেশিষ্ট্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-কে দান করেছেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ১৯৩]

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সালাম তথা শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা নিশ্চয় হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদার বিশেষ নিদর্শন। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যদিও আলোচ্য আয়াতে জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের দিনের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু এতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জন্ম থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তথা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা।

ফায়দা : হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর প্রাপ্ত সুসংবাদের বহিঃপ্রকাশ-সুসংবাদ পাওয়ার ১৩ বছর পরে ঘটেছিল। কেননা যখন হযরত জাকারিয়া (আ.) তাঁর নিকট প্রতিপালিত শিশু মরিয়মের নিকট অসময়ের ফল দেখতে পেলেন তখন তার দৃঢ় আশা জাগল যে, যদিও আমাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার মৌসুম ও কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। তবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে অসময়ে সন্তান দান করা কোনো ব্যাপারই নয়। তাই তিনি দরবারে ইলাহীতে কায়মনো বাক্যে দোয়া করলেন। যার ফলেই তিনি হযরত ইয়াহইয়া (আ.) জন্মের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন। উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর ছয় মাসের ছোট ছিলেন।

অনুবাদ :

١٦. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْقُرْاٰنِ مَرْيَمَ ـ اَىْ خَبَرَهَا اِذِ حِيْنَ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ـ اَىْ اِعْتَزَلَتْ فِىْ مَكَانٍ نَحْوَ الشَّرْقِ مِنَ الدَّارِ ـ

১৬. বর্ণনা করুন এই কিতাবে কুরআনে মারইয়ামের কথা অর্থাৎ তাঁর বৃত্তান্ত যখন যে সময় তিনি তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিলেন। অর্থাৎ বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে এক নিরবচ্ছিন্ন স্থানে আশ্রয় নিলেন।

١٧. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ـ اَرْسَلَتْ سِتْرًا تَسْتَتِرُ بِهِ لِتَفْلِيْ رَأْسَهَا اَوْ ثِيَابَهَا اَوْ تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضِهَا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا جِبْرَئِيْلَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَعْدَ لُبْسِهَا ثِيَابَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ـ تَامَّ الْخَلْقِ ـ

১৭. অতঃপর তাদের হতে তিনি পর্দা করলেন অর্থাৎ পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন মাথা বা কাপড়ের উকুন বাছাইয়ের জন্য অথবা তার ঋতুস্রাবান্তে পবিত্রতা লাভের গোসলের জন্য আমি তার নিকট পাঠালাম আমার রূহকে হযরত জিবরীল (আ.)-কে তিনি তার নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন তার কাপড় পরিধানের পর পূর্ণ মানবাকৃতিতে।

١٨. قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ـ فَتَنْتَهِيْ عَنِّيْ بِتَعَوُّذِيْ ـ

১৮. হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর যদি তুমি মুত্তাকী হও। আমি তোমা হতে দয়াময়ের আশ্রয় নিতেছি। সুতরাং তুমি আমার থেকে সরে যাও, আমার আশ্রয় গ্রহণের দরুন।

١٩. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ق لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ـ بِالنُّبُوَّةِ ـ

১৯. তিনি বললেন, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত। তোমাকে এক পবিত্র পুত্র সন্তান দান করার জন্য। নবুয়তের কারণে পবিত্র।

٢٠. قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ يَتَزَوَّجُ وَلَمْ اَكُ بَغِيًّا ـ زَانِيَةً ـ

২০. হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন, কেমন করে আমার সন্তান হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

٢١. قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ ج مِنْ خَلْقِ غُلَامٍ مِّنْكَ مِنْ غَيْرِ اَبٍ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ج اَىْ بِاَنْ يَّنْفُخَ بِاَمْرِيْ جِبْرَئِيْلُ فِيْكِ فَتَحْمِلِيْ بِهِ وَلِكَوْنِ مَا ذُكِرَ فِيْ مَعْنَى الْعِلَّةِ عُطِفَ عَلَيْهِ وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِلنَّاسِ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَرَحْمَةً مِّنَّا ج لِمَنْ اٰمَنَ بِهِ وَكَانَ خَلْقُهُ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ـ بِهِ فِيْ عِلْمِيْ فَنَفَخَ جِبْرَئِيْلُ فِيْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَاَحَسَّتْ بِالْحَمْلِ فِيْ بَطْنِهَا مُصَوَّرًا ـ

২১. তিনি বললেন বিষয়টি এরূপই হবে অর্থাৎ আপনার থেকে পিতাবিহীন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে। আপনার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। এভাবে যে, আমার নির্দেশে জিবরীল (আ.) তোমার মধ্যে ফুৎকার দিবে। অতঃপর সে ফুৎকারের মাধ্যমেই তুমি গর্ভবতী হবে। উল্লিখিত هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ বাক্যটি যেহেতু ইল্লতের অর্থে হয়েছে। এ কারণেই তার উপর لِنَجْعَلَهُ -এর আতফ করা হয়েছে। আর আমি তাকে এজন্য সৃষ্টি করব যাতে সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। আমার অপরিসীম ক্ষমতার ব্যাপারে। এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ যে ব্যক্তি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এটা তো এক স্থিরিকৃত ব্যাপার অর্থাৎ তার সৃষ্টির ব্যাপারে আমার জ্ঞানে। এরপর হযরত জিবরীল (আ.) তার জামার বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশে ফুৎকার দিলেন। তখনই তিনি স্বীয় উদরে মানবাকৃতির গর্ভ অনুভব করলেন।

প্রশ্ন ও জবাব : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শয়তান তো হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা না করার পরিণতিতে পূর্ব থেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছিল। এরপর হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে প্ররোচিত করার জন্য কিভাবে জান্নাতে পৌছল?

উত্তর : যদিও এ মর্মে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, শয়তান জান্নাতে প্রবেশ করে তাদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে, নাকি ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে প্ররোচিত করেছে, তবুও প্ররোচিত করার কয়েকটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

১. সাক্ষাৎ করা ছাড়াই তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা প্রদান করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

২. শয়তান তার নিজস্ব আকৃতি পরিবর্তন করে জান্নাতের কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে [কারো মতে ময়ূর ও সাপের সাথে যোগসাজস করে] প্রবেশ করেছে এবং তাঁদেরকে সামনাসামনি প্ররোচিত করেছে। আর قَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ দ্বারাও বাহ্যত এটি বুঝে আসে যে, শয়তান শুধু ওয়াসওয়াসা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি এবং মৌখিক কথাবার্তা বলে এবং কসম খেয়ে তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। –[জামালাইন খ. ১, পৃ. ১০০]

৩. হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে পায়চারি করছিলেন। এক পর্যায়ে তারা জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী হন। আর শয়তান বাহির থেকে জান্নাতের দরজার কাছে দণ্ডায়মান ছিল। তখন সে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে প্ররোচিত করে। –[হাশিয়ায়ে জামাল– খ. ১, পৃ. ৬২]

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন উঠে, হযরত আদম (আ.) তো মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলেন?

উত্তর :

১. তিনি মনে করেছিলেন, نَهِى টা ছিল نَهِى تَنْزِيْهِى তাহরীমী নয়।

২. তিনি নিষেধাজ্ঞার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

৩. ইবলীস কর্তৃক আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে তিনি মনে করেছিলেন নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গিয়েছে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তা'আলার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না। –[হাশিয়ায়ে জামাল খ.১, পৃ. ৬৩]

قَوْلُهُ اَلشَّيْطَانُ : শয়তানের পরিচয় : শয়তান হলো সেই দুষ্ট সত্তা, যে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে দূরে সরে গেছে।

شَيْطَنٌ اَىْ تُبَاعِدٌ (رَاغِب) اَلشَّيْطَانُ فَيْعَالٌ مِنْ شَطَنٍ اَىْ بَعُدَ سُمِّىَ بِه لِبُعْدِه عَنِ الْخَيْرِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ (مَعَالِم)

পূর্বোক্ত ইবলীসকেই এখানে গুণবাচক নামে উল্লেখ করা হয়েছে। নাফরমানির কারণে জান্নাত থেকে সে বহিষ্কৃত হয়েছে। মানবের প্রতি রয়েছে তার সুতীব্র বিদ্বেষ। এখন তার নাম হয়েছে শয়তান। পৃথক কোনো ক্ষমতা নেই তার। মানুষকে সে বিন্দুমাত্র মজবুর বা বাধ্য করতে সক্ষম নয়। তবে প্রচারণা ও প্ররোচনা শিল্পের সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী। পাপকর্মে মানুষকে প্রলুব্ধ করা এবং অসুন্দরকে সুন্দরের মোড়কে তুলে ধরার কাজে সে অত্যন্ত সুনিপুণ। ওয়াসওয়াসা ও চিত্তবিক্ষেপ ঘটানোর ক্ষমতা তার তীব্র। দূর ও নিকট যে কোনো স্থান থেকেই উদ্দেশ্য সাধনে সে পারঙ্গম। দূরত্ব ও ব্যবধান তার জন্য কোনো সমস্যাই নয় এবং স্থূল প্রতিবন্ধকতা যে কোনো ধরনেরই হোক, তার উদ্দেশ্যের পথে তা অন্তরায় হতে পারে না। –[তাফসীরে মাজেদী]

قَوْلُهُ عَنْهَا : এর মাঝে عَنْ হরফটি سَبَب বা হেতু জ্ঞাপক, অর্থ হলো– তার কারণে। আর هَا সর্বনামটি شَجَرَة-এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ সেই গাছের কারণে এবং মাধ্যমে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে পদস্খলনে নিমজ্জিত করেছে। কেউ কেউ هَا সর্বনামের উদ্দেশ্য জান্নাতও ধরেছেন। তখন অর্থ দাঁড়াবে, শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে বিচ্যুত করল।

–[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ وَقَاسَمَهُمَا : اَىْ قَسَمَ لَهُمَا فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلٰى بَابِهَا لِلْمُبَالَغَةِ

قَوْلُهُ مِمَّا كَانَا فِيْهِ : এর দু'ধরনের অনুবাদ হতে পারে, যে নিয়ামতের মাঝে তাঁরা ছিলেন, তা থেকে কিংবা যে মর্যাদায় তারা ছিলেন, তা থেকে। উভয় ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে এবং তাৎপর্য উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন। اَىْ مِنَ النَّعِيْمِ وَالْكَرَامَةِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ. (كَشَّاف) –[তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. ৭৯]

قَوْلُهُ إِذِ انْتَبَذَتْ : এটা উহ্য مُضَافٌ -এর ظَرْف ব্যাখ্যাকার (র.) خَبَرَهَا বলে তা প্রকাশ করেছেন। আবার مَرْيَمْ থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ অথবা بَدَلُ الْكُلِّ -ও হতে পারে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَكَانًا شَرْقِيًّا : এটা مَوْصُوْفٌ ও صِفَتْ মিলে اِنْتَبَذَتْ -এর ظَرْف কিংবা مَفْعُوْل بِهٖ কেননা اِنْتَبَذَتْ শব্দটি اَتَتْ -এর অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ اِنْتَبَذَتْ . اَتَتْ مَكَانًا অর্থ– اِبْتَعَدَتْ . وَتَنَحَّتْ অর্থাৎ দূরবর্তী হওয়া, একদিক হওয়া।

قَوْلُهُ بَعْدَ لُبْسِهَا ثِيَابًا : এটি একটি প্রশ্নের উত্তর, হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে ঘরে মহিলারা নগ্ন মাথায় থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতারা আসে না। আর মারইয়াম সেখানে নগ্ন ছিলেন। কাজেই ফেরেশতা আসলেন কিভাবে?

উত্তর : دَخَلَ بَعْدَ لُبْسِهَا অর্থাৎ কাপড় পরিধানের পরে ফেরেশতা এসেছেন।

قَوْلُهُ لِتَفْلِيَ : এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ . مُضَارِعْ উকুন বাছাই করার জন্য।

قَوْلُهُ رُوْحَنَا : অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)।

قَوْلُهُ لَمْ اَكُ بَغِيًّا : এখানে بَغِيَّةً বলেননি, অথচ ক্ষেত্রটির চাহিদা এটাই ছিল। এর কারণ এই যে, মহিলাদের মধ্যে ব্যভিচারের দোষটি বেশির ভাগ ঘটে থাকে। এ কারণে حَائِضْ ও عَاقِرْ -এর ন্যায় খাস এর পর্যায়ে গণ্য হওয়ার কারণে স্ত্রীলিঙ্গের ঃ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ : এটা قَالَ كَذٰلِكِ -এর عِلَّتْ বা কারণ -এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ এমনভাবেই হবে। কারণ এটা আমার জন্য সহজসাধ্য। এটা মূলত একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : এখানে جُمْلَةْ تَعْلِيْلِيَّةْ -এর عَطْف হয়েছে غَيْر تَعْلِيْلِيَّةْ -এর উপর। আর এটা সঙ্গত নয়।

উত্তর : এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও جُمْلَةْ تَعْلِيْلِيَّةْ অতএব لِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ -এর উপর তার عَطْف সঙ্গত হবে।

قَوْلُهُ الْمَخَاضُ : অর্থ– প্রসব বেদনা।

قَوْلُهُ فَتَنْتَهِيْ : এটা বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا -এর জওয়াবের শর্ত فَتَنْتَهِيْ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَتَزَوَّجْ : ব্যাখ্যাকার (র.) এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : لَمْ يَمْسَسْنِ -এর দ্বারা মিলন না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বুঝায়। অতএব, এটা হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে শামিল করে। কাজেই لَمْ اَكُ بَغِيًّا বলার প্রয়োজন ছিল না।

উত্তর. ওরফে বৈধ মিলনকে مَسّ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আর অবৈধ মিলনকে ওরফে مَسّ বলা হয় না; সুতরাং হালাল ও হারাম উভয় মিলনকে নফী করার জন্য لَمْ اَكُ بَغِيًّا বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ اَجَابَهَا : এর ব্যাখ্যা جَاءَ بِهَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ এক مَفْعُوْلْ -এর প্রতি مُتَعَدِّيْ বাহ্যিকভাবে প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, جَاءَ শব্দের শুরুতে হামযা বৃদ্ধি করার দ্বারা সম্ভবত দুই مَفْعُوْلْ -এর প্রতি مُتَعَدِّيْ হয়েছে। ব্যাখাকার (র.) جَاءَ بِهَا বলে তা দূর করে দিয়েছেন। এমনও বলা যেতে পারে যে, اَجَاءَ শব্দটি الْجَاء অর্থে। আর ব্যবহার পরিবর্তন হওয়ার কারণে এক মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّيْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী রুকুতে হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে বৃদ্ধকালে আল্লাহ তা'আলা একটি সুসন্তান দান করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কেননা হযরত জাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ ছিলেন এবং তার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরত ও রহমত স্বরূপ

তিনি লাভ করেন পুত্র ইয়াহইয়া (আ.)। আর তার চেয়ে বিস্ময়কর হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনা। কেননা তাঁকে আল্লাহ তা'আলা পিতা ব্যতীত শুধু মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের একটি জীবন্ত নিদর্শন।

আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আর কোনো সৃষ্টিই মাবূদ বা উপাস্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন ইহুদি ও নাসারা উভয় পথহারা জাতির সংশোধনের জন্যে। কেননা ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করতো আর খ্রিস্টানরা তাকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে দাবি করতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যাতে করে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং তার বিশেষ রহমত। হযরত ঈসা (আ.) জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেছেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর বন্দেগীর কথা ঘোষণা করেছেন– قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ। অর্থাৎ তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা।

এরপর তিনি তাঁর নিজের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের নবুয়তের কথা, বরকতের কথা এবং ইবাদতের কথা তথা নামাজ, জাকাত, প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। এর পাশাপাশি নিজের বিনম্র স্বভাবের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্যের কথা এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। যাতে করে শ্রবণকারী মাত্রই একথা শ্রবণ করে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। যারা বাপ ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে আল্লাহ তা'আলার পুত্র আখ্যায়িত করে তারা অসত্য বলে থাকে। জন্মগ্রহণ করা এবং উপাস্য হওয়া একত্র হতে পারে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা উপাস্য হওয়ার দলিল নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এটি হলো সম্মান এবং মর্যাদার প্রমাণ। হযরত ঈসা (আ.) স্তন্যপানের সময় বলেছিলেন– وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।" আর এটি একথার প্রমাণ যে হযরত ঈসা (আ.) খোদাও নন, তাঁর পুত্রও নন। কেননা যিনি খোদা হবেন তার কোনো প্রকার নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় না।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ১৭৯-৮০]

তাই এ সত্য উপলব্ধির জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আর এ কিতাবে মরিয়মের কথা বর্ণনা করুন! এই কিতাব হলো পবিত্র কুরআন।

قَوْلُهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا : হযরত মারইয়াম (আ.) গোসল করার জন্যে সকলের নিকট থেকে দূরে তথা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ইবাদতের জন্যে একান্তে চলে যান। যেহেতু ঐ স্থানটি বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকে ছিল তাই খ্রিস্টানরা পূর্ব দিককে তাদের কেবলা নির্ধারণ করেছে।

قَوْلُهُ حِجَابًا : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর তরজমা করেছেন, "লোক চক্ষুর অন্তরালে" কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তিনি দেয়ালের অন্তরালে বসেছিলেন। তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, তিনি পাহাড়ের ওপারে চলে গিয়েছিলেন। তাফসীরকার ইকরামা (র.) বলেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.) মসজিদে অবস্থান করতেন। কিন্তু তিনি তার ঋতুকালে খালার গৃহে চলে যেতেন। ঐ সময় শেষ হলে পুনরায় মসজিদে আগমন করতেন। একদিন যখন তিনি গোসলের উদ্দেশ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) একজন পুরুষের বেশে তার সম্মুখে উপস্থিত হন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَاَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অর্থাৎ এরপর আমি তার নিকট আমার ফেরেশতা [জিবরাঈল (আ.)]-কে প্রেরণ করি, সে তাঁর সম্মুখে মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়।

قَوْلُهُ رُوْحَنَا : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বাক্যতে রূহের সম্পর্ক নিজের সাথে করেছেন। এতে তাঁর উচ্চ মর্যাদার ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ سَوِيًّا : একজন সুদর্শন যুবকরূপে অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবকরূপে হাজির হন। হযরত মরিয়ম (আ.) যখন দেখলেন যে, একজন অজানা পুরুষ হঠাৎ তার দিকে আসছে তখন তিনি বললেন–

اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

অর্থাৎ যদি তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় থাকে, যদি তুমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর তবে আমি তোমার নিকট থেকে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করি।

অর্থাৎ যদি তুমি মোত্তাকী পরহেজগার হও, তবে তোমার পরহেজগারী প্রমাণ স্বরূপ তুমি এখান থেকে সরে যাও। আর যদি তুমি পরহেজগার না হও তবুও আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে মানুষ মনে করেই আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে এজন্য হাজির হয়েছেন যেন তাকে দেখে হযরত মারইয়াম (আ.) ভীত সন্ত্রস্ত না হন। কেননা যদি হযরত জিবরাঈল (আ.) আপন আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করতেন তবে হয়তো হযরত মারইয়াম (আ.) বেহুশ হয়ে পড়তেন। অথবা এর দ্বারা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৪৮০]

হযরত জিবরাঈল (আ.) লক্ষ্য করলেন, যে হযরত মারইয়াম (আ.) ভীত হয়েই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিয়েছেন, তখন তিনি বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। ইরশাদ হচ্ছে– قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۔ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا

অর্থাৎ ফেরেশতা বললেন, আমি তো শুধু তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার উদ্দেশ্যেই আমি এসেছি। তখন হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন– قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِیْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِیْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا

অর্থাৎ কিভাবে আমার পুত্র হবে যখন কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি, আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নূরানী চেহারা দেখে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, আগন্তুক একজন ফেরেশতা। কিন্তু তিনি বিস্মিত ছিলেন এ বিষয়ে যে বর্তমান অবস্থায় তার সন্তান কিভাবে হবে? আর আমি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হইনি, যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নাফরমান হয় তাদের কথা ভিন্ন; কিন্তু আমি তো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য নই। বর্তমান অবস্থায় কিভাবে আমার সন্তান হবে?

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর প্রদত্ত সুসংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এর কারণ এই, সাধারণত যে পন্থায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন হযরত মারইয়াম (আ.) সেই পন্থা বা পর্যায়ে পৌঁছেননি। কেননা তিনি আল্লাহ তা'আলা ইবাদতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন। এছাড়া তার কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হয়। তিনি প্রচলিত পন্থায়ও মানুষকে সৃষ্টি করেন। আর অজানা, অপ্রচলিত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত পন্থায়ও তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর বিস্ময়ের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, কিভাবে আমার সন্তান হবে, আমাকে যে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি" তথা আমার যে বিয়ে-শাদী হয়নি। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– قَالَ كَذٰلِكِ অর্থাৎ এভাবেই হবে।

অর্থাৎ বিয়ে হয়নি, কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এতদসত্ত্বেও এভাবেই হবে। আল্লাহ তা'আলার মর্জি হলে সবই সম্ভব।

মানব সৃষ্টির চারটি অবস্থা :

১. সাধারণত পিতামাতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সন্তান দান করেন। এটাই সাধারণ পন্থা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তার ব্যতিক্রমও করতে পারেন। যেমন–

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পিতামাতা কেউ ছিল না। অর্থাৎ নরনারী ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন।

৩. এমনিভাবে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন মাতা ব্যতীত।

৪. আর হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ। এসবই আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। −[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা− ১৬, পৃ. ২৪]

মৃত্যুকামনার বিধান : হযরত মারইয়াম (আ.)-এর মৃতু কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওজর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি হযরত মারইয়াম (আ.) ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মোকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বলা হয়েছে তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে হযরত মারইয়াম (আ.) কোনো মানত করেননি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোজা ইসলামি শরিয়তে রহিত হয়ে গেছে : ইসলাম পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারো সাথে কথা না বলার রোজাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা গালি গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরি করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোনো ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েজ নয়। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন− لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোনো ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থেও বোঝা যায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয় : পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মুজেযা। মুজেযার যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং এতে আলৌকিকতা গুণটি আরো বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরো বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। −[বয়ানুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনোরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বুঝা যায় যে, রিজিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। −[রূহুল মা'আনী]

মহিলা নবী হতে পারে কি? আলেম ও মুফাসসিরগণের এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, হযরত মারইয়াম (আ.) নবী ছিলেন কিনা? আর মহিলারা নবী হতে পারে কিনা? কোনো কোনো আলেম এ আয়াত দ্বারা মহিলা নবী হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে মহিলাদের নিকট ওহী আসতে পারে। তবে তা وَحْيِ رِسَالَةٌ নয়। কারণ এটা পুরুষের সাথে খাস। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল তা ছিল وَحْيِ بَشَارَتٌ [সুসংবাদমূলক ওহী] ; وَحْيِ رِسَالَةٌ নয়।

বালাগাত : وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ كِنَايَةٌ عَنِ الْمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْجِمَاعِ .

অনুবাদ :

٢٦. فَكُلِى مِنَ الرُّطَبِ وَاشْرَبِى مِنَ السَّرِيِّ وَقَرِّى عَيْنًا ج بِالْوَلَدِ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَىْ لِتَقَرَّ عَيْنُكِ بِهِ اَىْ تَسْكُنَ فَلَا تَطْمَحُ اِلٰى غَيْرِهِ فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنْ شَرْطِيَّةِ فِى مَا الْمَزِيْدَةِ تَرَيِنَّ حُذِفَتْ مِنْهُ لَامُ الْفِعْلِ وَعَيْنُهُ وَاُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ وَكُسِرَتْ يَاءُ الضَّمِيْرِ لِاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا فَيَسْأَلُكِ عَنْ وَلَدِكِ فَقُوْلِى اِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا اَىْ اِمْسَاكًا عَنِ الْكَلَامِ فِىْ شَانِهِ وَغَيْرِهِ مَعَ الْاَنَاسِىِّ بِدَلِيْلِ فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ج اَىْ بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

২৬. সুতরাং আপনি আহার করুন পাকা ও তাজা খেজুর থেকে এবং পান করুন প্রবাহিত নহরের পানি থেকে এবং চক্ষু ঠাণ্ডা করুন পুত্র সন্তান দ্বারা عَيْنًا শব্দটি لِتَقَرَّ عَيْنُكِ فَاعِل হতে স্থানান্তরিত تَمْيِيْز অর্থাৎ بِهٖ তথা আপনি তার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করুন। অন্য বাচ্চার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। মানুষের মধ্যে কাউকে যদি আপনি দেখেন কোনো মানুষকে আপনার সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে। এখানে اِمَّا -এর মধ্যে نُوْن شَرْطِيَّة -কে অতিরিক্ত مَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। تَرَيِنَّ -এর মধ্যে عَيْن كَلِمَة এবং لَام কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর عَيْن كَلِمَة -এর হরকতকে رَاء -এর উপর দেওয়া হয়েছে এবং يَائے ضَمِيْر -কে দু সাকিন একত্র হওয়ায় যের দেওয়া হয়েছে। তখন আপনি বলুন! আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। অর্থাৎ তার ব্যাপারে এবং অন্য কোনো ব্যাপারে মানুষের সাথে কথা না বলার মানত করেছি। এ ব্যাপারে দলিল হলো فَلَنْ اُكَلِّمَ .... সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না। অর্থাৎ এরপর।

٢٧. فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط حَالٌ فَرَاَوْهُ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ـ عَظِيْمًا حَيْثُ اَتَيْتِ بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِ اَبٍ ـ

২৭. অতঃপর তিনি সন্তান কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। تَحْمِلُهٗ বাক্যটি حَالٌ হয়েছে। তারা তাকে দেখল তারা বলল, হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ মহা বিস্ময়কর! তুমি পিতৃহীন সন্তান নিয়ে আগমন করেছ।

٢٨. يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَىْ يَا شَبِيْهَتَهٗ فِى الْعِفَّةِ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ اَىْ زَانِيًا وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ج زَانِيَةً فَمِنْ اَيْنَ لَكِ هٰذَا الْوَلَدُ ـ

২৮. হে হারুন ভগ্নি! তিনি একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ হে সতিত্বে হারুন তুল্য নারী। তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না ব্যভিচারী। তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী তাহলে এই সন্তান তুমি কোথায় পেলে।

٢٩. فَاَشَارَتْ لَهُمْ اِلَيْهِ ط اَنْ كَلِّمُوْهُ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ اَىْ وُجِدَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ـ

২৯. অতঃপর হযরত মারইয়াম (আ.) ইঙ্গিত করলেন তাদের কথার জবাবে সন্তানের প্রতি তারা যেন তার সাথে কথা বলে তারা বলল যে, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলব?

অনুবাদ :

٣٠. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ ط اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ أَيِ الْإِنْجِيْلَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ـ

৩০. তিনি বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা! তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন। ইঞ্জিল কিতাব আর আমাকে নবী করেছেন।

٣١. وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ص أَيْ نَفَّاعًا لِلنَّاسِ إِخْبَارٌ بِمَا كُتِبَ لَهُ وَأَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ أَمَرَنِيْ بِهِمَا مَا دُمْتُ حَيًّا ص

৩১. আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। অর্থাৎ মানুষের জন্য অতি উপকারী। এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য যা লিখা হয়েছে তার সংবাদমূলক বাক্য। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে।

٣٢. وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ مَنْصُوْبٌ بِجَعَلَنِيْ مُقَدَّرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا مُتَعَاظِمًا شَقِيًّا ـ عَاصِيًا لِرَبِّهِ ـ

৩২. আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করেছেন। بَرًّا শব্দটি جَعَلَنِيْ উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগ্য অহংকারী ও প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণকারী।

٣٣. وَالسَّلٰمُ مِنَ اللّٰهِ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوْتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ـ يُقَالُ فِيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّيِّدِ يَحْيٰى قَالَ تَعَالٰى ـ

৩৩. আর শান্তি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমার প্রতি যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় আমি উত্থিত হবো। এ তিন অবস্থায় পূর্বে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা হবে।

٣٤. قَالَ تَعَالٰى ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلُ الْحَقِّ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ أَيْ قَوْلُ ابْنِ مَرْيَمَ وَبِالنَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ قُلْتُ وَالْمَعْنٰى الْقَوْلُ الْحَقُّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ـ مِنَ الْمِرْيَةِ أَيْ يَشُكُّوْنَ وَهُمُ النَّصَارٰى قَالُوْا إِنَّ عِيْسٰى ابْنُ اللّٰهِ كَذَبُوْا ـ

৩৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই-ই মারইয়াম তনয় ঈসা! আমি বললাম সত্যকথা قَوْلُ الْحَقِّ এটা رَفْع-এর সাথে হলে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অর্থাৎ قَوْلُ ابْنِ مَرْيَمَ। আর যদি نَصْب-এর সাথে হয় তবে উহ্য قُلْتُ ক্রিয়ার মাফ'উল হবে। অর্থ– এটি সঠিক কথা। যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে يَمْتَرُوْنَ ফে'লটি مِرْيَةٌ হতে গঠিত। অর্থাৎ তারা সন্দেহ পোষণ করে। আর তারা হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তারা বলে নিশ্চয় হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার ছেলে। মূলত তারা মিথ্যা বলে।

٣٥. مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ لا سُبْحٰنَهُ ط تَنْزِيْهًا لَهُ عَنْ ذٰلِكَ إِذَا قَضٰى أَمْرًا أَيْ أَرَادَ أَنْ يُّحْدِثَهُ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ط بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيْرِ هُوَ وَبِالنَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ أَنْ وَمِنْ ذٰلِكَ خَلْقُ عِيْسٰى مِنْ غَيْرِ أَبٍ ـ

৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার কাজ নয়। তিনি পবিত্র মহিমাময়। এর থেকে তিনি মুক্ত যখন তিনি কিছু স্থির করেন অর্থাৎ সংঘটিত করতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, হও এবং তা হয়ে যায়। فَيَكُوْنُ টি رَفْع যুক্ত হলে তা هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর হবে। আর نَصْب যুক্ত হলে أَنْ উহ্য থেকে نَصْب হবে। আর এ كُنْ فَيَكُوْنُ-এর মধ্যে একটি হলো পিতাবিহীন হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি।

৩৬. وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط بِفَتْحِ اَنَّ بِتَقْدِيْرِ اُذْكُرْ وَبِكَسْرِهَا بِتَقْدِيْرِ قُلْ بِدَلِيْلِ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهِ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ هٰذَا الْمَذْكُوْرُ صِرَاطٌ طَرِيْقٌ مُّسْتَقِيْمٌ ـ مُؤَدٍّ اِلَى الْجَنَّةِ ـ

অনুবাদ :

৩৬. আল্লাহ তা'আলাই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। اَنَّ এটা যবর যুক্ত হলে তার পূর্বে একটি اُذْكُرْ উহ্য মানতে হবে। আর اِنَّ টি যেরযুক্ত হলে পূর্বে قُلْ উহ্য মানতে হবে। শেষোক্তটির দলিল হলো সামনে مَا قُلْتُ لَهُمْ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি– আপনি আমাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাদেরকে তা ছাড়া আর কিছুই বলিনি। আর তা হলো তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপাসনা কর। তিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আর এটাই যা উল্লেখ করা হলো সরল পথ যা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।

৩৭. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ج اَىِ النَّصَارٰى فِىْ عِيْسٰى اَهُوَ ابْنُ اللّٰهِ اَوْ اِلٰهٌ مَعَهٗ اَوْ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا ذُكِرَ وَغَيْرِهٖ مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ اَىْ حُضُوْرِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاَهْوَالِهٖ ـ

৩৭. অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল অর্থাৎ খ্রিস্টানদের একদল হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলল যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার পুত্র। দ্বিতীয় দল বলল, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট আরেক খোদা। আর তৃতীয় দল বলল, তিনি তিন খোদার তৃতীয় জন। [নাউযুবিল্লাহ] সুতরাং দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি কাফেরদের জন্য মহাদিবস আগমনকালে। অর্থাৎ কিয়ামত ও তার ভয়াবহ পরিস্থিতিসমূহের আগমন।

৩৮. اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ لا بِهِمْ صِيْغَتَا تَعَجُّبٍ بِمَعْنٰى مَا اَسْمَعَهُمْ وَمَا اَبْصَرَهُمْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا فِى الْاٰخِرَةِ لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ مِنْ اِقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ ـ الْيَوْمَ اَىْ فِى الدُّنْيَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ اَىْ بَيِّنٍ بِهٖ صَمُّوْا عَنْ سِمَاعِ الْحَقِّ وَعَمُوْا عَنْ اَبْصَارِهٖ اَىْ اَعْجَبْ مِنْهُمْ يَا مُخَاطَبًا فِىْ سَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَعْدَ اَنْ كَانُوْا فِى الدُّنْيَا صُمًّا عُمْيًا ـ

৩৮. তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে শব্দ দুটি تَعَجُّبْ তথা বিস্ময়সূচক অর্থ– তারা কতই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হবে তারা যেদিন আমার কাছে আসবে পরকালে। কিন্তু জালিমরা এখানে সর্বনামের স্থলে প্রকাশ্য اِسْم ব্যবহার করা হয়েছে। আজ পৃথিবীতে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। প্রকাশ্য। বস্তুত সত্য শ্রবণ থেকে ও সত্য প্রত্যক্ষকরণ থেকে তারা অন্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। পৃথিবীতে তাদের বধির ও অন্ধ থাকা সত্ত্বেও পরকালে তাদের প্রতি শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ে বিস্ময় বোধ কর।

৩৯. وَاَنْذِرْهُمْ خَوِّفْ يَا مُحَمَّدُ كُفَّارَ مَكَّةَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَتَحَسَّرُ فِيْهِ الْمُسِئُ عَلٰى تَرْكِ الْاِحْسَانِ فِى الدُّنْيَا اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ ط لَهُمْ فِيْهِ بِالْعَذَابِ وَهُمْ فِىْ الدُّنْيَا فِىْ غَفْلَةٍ عَنْهُ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ بِهٖ ـ

৩৯. আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন হে মুহাম্মদ ﷺ! মক্কার কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে আর তা হলো কিয়ামতের দিন। পাপীরা সেদিন পৃথিবীতে সৎকাজ না করার কারণে আফসোস করবে। যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। তাদের আজাবের বিষয়ে এখন তারা পৃথিবীতে গাফিল এবং তারা বিশ্বাস করে না।

অনুবাদ :

٤٠. اِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدٌ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا مِنَ الْعُقَلَاءِ وَغَيْرِهِمْ بِاِهْلَاكِهِمْ وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ . فِيْهِ لِلْجَزَاءِ .

৪০. নিশ্চয় পৃথিবী ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই থাকবে। বিবেকবান ও বিবেকহীন সকল কিছু ধ্বংসের। এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হবে। পরকালে প্রতিদানের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَرِّىْ : শব্দটি نَرِّىْ-এর ওজনে। তুমি শীতল কর। এটা قَرٌّ থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ হলো– শীতল করা। عَيْنًا শব্দটি تَمْيِيْز হয়েছে فَاعِل-এর অর্থে থেকে। অর্থাৎ لِتَقَرَّ عَيْنُكِ بِهِ

قَوْلُهُ فَرِيًّا : শব্দটি فَرِىٌّ . فَعِيْل অর্থে مَفْعُوْل-এর অন্তর্গত। তৈরি করা, বানানো, দ্রুত করা। কেউ কেউ বলেন, এটা বড় ও আশ্চর্যকর অর্থে। مَنْ كَانَ-এর মধ্যে كَانَ শব্দটি تَامَّةٌ . صَبِيًّا হলো كَانَ-এর যমীর থেকে حَالٌ আর যদি نَاقِصَةٌ হয় তাহলে صَبِيًّا তার খবর হবে।

قَوْلُهُ ذَالِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ : এখানে ذَالِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো উপরিউক্ত عَبْدِيَّتْ-এর স্বীকারোক্তি প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত সত্ত্বা হযরত ঈসা (আ.), ذٰلِكَ হলো مُبْتَدَأٌ আর عِيْسٰى মাওসূফ اِبْنُ مَرْيَمَ সিফাত উভয়টি মিলে খবর। قَوْلُ الْحَقِّ উহ্য مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ অর্থাৎ قَوْلُهُ قَوْلُ الْحَقِّ আর قَوْلُ الْحَقِّ-এর মধ্যে সিফাতের প্রতি মওসূফের ইজাফত হয়েছে। অর্থাৎ এটা اَلْقَوْلُ الْحَقُّ-এর অর্থে। এটাকে যদি যবর দিয়ে বলা হয় তাহলে اَقُوْلُ উহ্য ফে'লের মাফঊল হবে।

قَوْلُهُ فِى الْمَهْدِ : এখানে مَهْد অর্থ দোলনাও হতে পারে এবং মায়ের কোলও উদ্দেশ্য হতে পারে। يَمْتَرُوْنَ শব্দটি اِمْتِرَاءٌ থেকে مِرْيَةٌ অর্থ– সন্দেহ। اَلَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ اَىْ يَتَرَدَّدُوْنَ وَيَتَحَيَّرُوْنَ .

قَوْلُهُ يَتَّخِذُ : মাসদারের তাবীরে হয়ে كَانَ-এর اِسْم অর্থাৎ مَكَانَ اِتِّخَاذِ الْوَلَدِ مِنْ صِفَتِهِ بَلْ هُوَ مَحَالٌ عَنْ ذٰلِكَ অর্থাৎ اِتِّخَاذُ الْوَلَدِ مِنْ وَلَدٍ-এর মধ্যে مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত, তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ذٰلِكَ خَلْقَ عِيْسٰى : এবং كُنْ فَيَكُوْنُ-এর অন্তর্গত হলো হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতাবিহীন সৃষ্টি করা। سُبْحَانَهٗ শব্দটি মাসদার। ফে'লকে বিলোপ করে مَصْدَرٌ তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ اُسَبِّحُهٗ سُبْحَانًا এটা مُعْتَرِضَةٌ বাক্য। قُلْ উহ্য মানার ক্ষেত্রে اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি হবে। এর দলিল এই যে, হযরত ঈসা (আ.) বললেন, هٰذَا مِنْ كَلَامِ عِيْسٰى بِدَلِيْلِ مَا قُلْتُ لَهُمْ ; বাক্যটি এরূপ হবে– مَا قُلْتُهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهِ الخ মোটকথা উভয় কেরাতের সুরতে اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ الخ হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি হবে।

قَوْلُهُ تَرَيِنَّ : মূলত تَرْاَيِيْنَ ছিল। এর মধ্যে رَاء হলো فَاءْ كَلِمَةٌ আর হামযা عَيْن كَلِمَةٌ এবং যেরযুক্ত يَاءٌ হলো لَامْ كَلِمَةٌ পরবর্তী يَاءٌ টি যমীর। শেষে نُوْن اِعْرَابِىْ যুক্ত হয়েছে। প্রথম হরকতবিশিষ্ট ى টি তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হামযা হওয়ার কারণে আলিফ হয়ে গেছে। এখন আলিফ ও যমীরের ى-এর মাঝে দু'সাকিন একত্র হয়েছে। ফলে হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। আর نُوْن اِعْرَابِىْ আমিলে জাযিম এর দরুন বিলোপ এবং নূনে তাকীদ ছকীলাহ প্রবিষ্ট হওয়ার পরে দু'সাকিন একত্র হয়েছে। এ কারণে যমীরের يَاءٌ-কে কাসরা দেওয়া হয়েছে।

সারকথা : تَرَايْن -এর মধ্যে মোট ছয়টি আমল হয়েছে। ১. ى -কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ২. আলিফকে বিলোপ করা হয়েছে। ৩. হামযা এর হরকত, رَا -কে দেওয়া হয়েছে। ৪. হামযা বিলুপ্ত হয়েছে। ৫. إنْ شَرْطِيَّةٌ -এর কারণে نُوْن اِعْرَابِىّ পতিত হয়েছে। ৬. যমীরের يَاءٌ -কে যের দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ انَاسِىّ : এটা হয়তো اِنْسِىٌّ -এর বহুবচন। অথবা اِنْسَانٌ -এর বহুবচন। শব্দটি মূলত اَنَاسِيْنَ ছিল نُوْن -কে ى দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ى -কে অপর ى -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ : এটা فَوَيْلٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ مِنْ شُهُوْدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -এ সময় مَشْهَدٌ মাসদারের অর্থে হবে। অথবা হাজির হওয়ার স্থান বা সময় হবে।

قَوْلُهُ لٰكِنِ الظَّالِمُوْنَ : মুশরিকদের কুকীর্তি ও কদার্যতা বর্ণনার উদ্দেশ্যে لٰكِنَّهُمْ -اِسْمٌ ضَمِيْرٌ -এর স্থলে ظَالِمُوْنَ প্রকাশ্য اِسْمٌ উল্লেখ করেছেন।

ফায়েদা : قَوْلُهُ اَىْ بَعْدَ ذٰلِكَ এ ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন. আয়াতের মধ্যে تَنَاقُضٌ তথা পরস্পর বিরোধ ঘটেছে। কেননা উপরে বলা হয়েছে اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا এ বাক্যে কথা না বলার মানত হয়ে গেছে। এর পরে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর উক্তি- فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا এটাও তো একটা কথা?

উত্তর : এখানে এর পরে কারো সাথে কথা বলব না উদ্দেশ্য। كَانَ -এর ব্যাখ্যা وُجِدَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে كَانَ হলো تَامَّةٌ আবার অতিরিক্তও হতে পারে। صَبِيًّا শব্দটি حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ فِى الْمَهْدِ حَالَ صَبَاءٍ

قَوْلُهُ اِخْبَارًا بِمَا كُتِبَ لَهُ : এর দ্বারা جَعَلَنِىْ -এর তাফসীর করে একথা বুঝিয়েছেন যে, অতীতকালীন সীগাহ দ্বারা এখানে ভবিষ্যৎকাল উদ্দেশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا : হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, এখন আর তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরত ও রহমতে টাটকা খেজুরের ব্যবস্থা করেছেন। খেজুরের ডালটি তোমার দিকে টেনে আনলেই তাজা টাটকা পাকা খেজুর তোমার উপর ঝরে পড়বে। তুমি ঐ খেজুর খাও, আর তোমার উপত্যকার তলদেশে যে ঝরণা আল্লাহ তা'আলার রহমতে প্রবাহিত হচ্ছে তার পানি পান কর। আর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান স্বরূপ যে পুত্র লাভ করছো তাকে দেখে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত কর। ভবিষ্যতে কি হবে বা কে কি বলবে? এই বিষয়ে চিন্তা করো না। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যিনি শুষ্ক মাটিতে তোমার জন্যে ঝরনা প্রবাহিত করেছেন, মৃত শুষ্ক খেজুর বৃক্ষের ডালে যিনি তোমার জন্যে তাজা পাকা খেজুর দিয়েছেন, তিনি তোমাকে পিতা ব্যতীত পুত্রও দিতে পারেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- كُلِىْ وَاشْرَبِىْ ; এর কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে। বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا : হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মারইয়াম (আ.)-কে বললেন, যদি কোনো মানুষ নবজাত শিশু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করে, তখন তুমি কোনো কথার জবাব দিয়ো না; বরং ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবে যে, আমি আজ আল্লাহ তা'আলার নামে রোজা মানত করেছি, কোনো ব্যাপারেই আজকে আমি কথা বলবো না।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আমাদের রোজায় যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়, তেমনি বনী ইসরাঈলের জন্যে পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা থেকেও বিরত থাকার বিধান ছিল। আমাদের শরিয়তে কিন্তু এমন রোজা নিষিদ্ধ আর এমন রোজার মানত করাও বৈধ নয়। বনী ইসরাঈলরা যেমন পানাহার থেকে বিরত থাকতো, তেমনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো কথাও বলতো না।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.)-কে এ আদেশ দিয়েছেন যে, কারো সঙ্গে কোনো কথা বলবে না। আর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সঠিক সময়ে তিনি নিজেই কথা বলবেন। বর্ণিত আছে যে,হযরত মারইয়াম (আ.) ঐ সময় ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলতেন, মানুষের সঙ্গে নয়।

قَوْلُهُ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ : এরপর হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-কে কোলে নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিকট উপস্থিত হলেন। পথে নবজাত শিশু হযরত ঈসা (আ.) বলেন, আম্মা আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং মসীহ। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সকলেই ছিলেন অত্যন্ত নেককার। আর এ কারণেই কুমারী মারইয়াম (আ.)-এর কোলে নবজাত শিশু দেখে তারা এত ব্যথিত এবং মর্মাহত হলেন যে, সকলেই ক্রন্দন করতে লাগলেন।

এ বাক্য থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে হযরত মারইয়াম (আ.) যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন এ সম্পর্কে ইবনে আসাকের (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মারইয়াম (আ.) সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ شَيْـئًا فَرِيًّا : আরবি ভাষায় فَرِىٌّ শব্দের আসল অর্থ- কর্তন করা ও চিলে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فَرِىٌّ বলা হয়। আবূ হাইয়্যান বলেন, প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فَرِىٌّ বলা হয়। ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

قَوْلُهُ يَـآ اُخْتَ هَارُوْنَ : হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ.) মারইয়াম (আ.)-এরে যুগের শত শত বছর পূর্বে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখানে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)-কে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কুরআনে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে হারূন-ভাগিনী বলা হয়েছে। অথচ হযরত হারূন (আ.) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা (রা.) এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্য পয়গাম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারের সাধারণ অভ্যাস। -[মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী।]

এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে- ১. হযরত মারইয়াম (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে। যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اَخَا تَمِيْم এবং আরবের লোককে اَخَا عَرَبْ বলে অভিহিত করে। ২. এখানে হারূন বলে হযরত মূসা (আ.)-এর সহচর হারূন নবীকে বুঝানো হয়নি; বরং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ভ্রাতার নাম ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারূন ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

قَوْلُهُ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ : কুরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী আল্লাহ ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের, সন্তান-সন্তুতি, মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশি গুনাহ হয়। কারণ এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুজুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎকাজ ও আল্লাহভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

قَوْلُهُ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ : এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন হযরত মারইয়াম (আ.)-কে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ.) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং

বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে একথা বলেন- انى عبد الله অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ.) এই ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি আলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি আল্লাহ নই, আল্লাহ তা'আলার বান্দা। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ اٰتَانِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا : এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর দুগ্ধপানের জমানায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোনো পয়গাম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন, আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন হযরত আদম (আ.)-এর জন্মই হয়নি। তার খামির তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, তখনি নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী ﷺ -এর জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী বানিয়েছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী বানানোর কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালাত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোনো গুনাহের দখল থাকতে পারে না।

قَوْلُهُ اَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ : তাকিদ সহকারে কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে وَصِيَّتٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। হযরত ঈসা (আ.) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ ও জাকাতের অসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাকিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামাজ ও রোজা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসূলের শরিয়তে ফরজ রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরিয়তে এগুলোর আকার আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তেও নামাজ ও জাকাত ফরজ ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.) তো কোনো সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে জাকাতের আদেশ দেওয়ার কি অর্থ? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর জাকাত ফরজ এটা ছিল তাঁর শরিয়তের আইন। হযরত ঈসা (আ.)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন। আর তা এভাবে যে, কোনো সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্র হলে তাঁকেও জাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থি নয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ مَا دُمْتُ حَيًّا : অর্থাৎ নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বুঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর থেকে অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতিকাল।

قَوْلُهُ بَرًّا بِوَالِدَتِىْ : এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন আলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ : হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিস্টানরা তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদিরা তার অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাকে ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করে। [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ قَوْلَ الْحَقِّ : লামের যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপে হলো এরূপ اَقُوْلُ قَوْلَ الْحَقِّ কোনো কোনো কেরাতে লামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং قَوْلُ الْحَقِّ [সত্য উক্তি] যেমন তাকে كَلِمَةٌ

اَللّٰه [আল্লাহ তা'আলার উক্তি] উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তার জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'আলার উক্তির মাধ্যমে হয়েছে। -[কুরতুবী]

يَوْمُ الْحَسْرَةِ কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎ কর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত। কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদের হবে। হযরত মু'আজ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবূ ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, যেসব মুহূর্ত আল্লাহ তা'আলার জিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোনো পরিতাপ হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন, সৎ কর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরো বেশি সৎকর্ম কেন করলো না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তরে স্থান অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হলো না।

হযরত ঈসা (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ : বর্ণিত আছে যে, শিশু হযরত ঈসা (আ.) মায়ের ইঙ্গিত পেয়ে দুগ্ধ পান ছেড়ে দিলেন এবং লোকদের দিকে ফিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, আমার মাতার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা [আমি আল্লাহর পুত্র নই।] এখানে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-ই করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। ফলে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ভিত্তিহীন ও বাতিল মতবাদের বাতুলতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

প্রথম বৈশিষ্ট্য : اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দা, আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন স্বরূপ আমি পিতা ব্যতীত অলৌকিকভাবে সৃষ্টি হয়েছি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো তার সম্মানিত মাতার উপর যখন অপবাদের কথা চিন্তা করা হচ্ছিল তা দূরীভূত করা। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার বান্দা, অতএব কেউ যেন আমাকে অন্য কিছু মনে না করে। এভাবে হযরত ঈসা (আ.)-কে খ্রিস্টানরা যে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলে আপবাদ দেয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব সম্পর্ক থেকে অনেক উর্ধ্বে, তিনি সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র। খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদের পর তিনি ইহুদিদের বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ করেছেন- وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী মনোনীত করেছেন, ইহুদিরা যে দাবি করে হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নবী নন, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথারও প্রতিবাদ করেছেন হযরত ঈসা (আ.)। মনে রাখতে হবে যখন তিনি এসব কথা বলছিলেন তখন তিনি কোলের কচি শিশু, যার পক্ষে কোনো কথা বলাতো সম্ভবই নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

এরপর তিনি তার সম্মানিত মাতা সম্পর্কে লোকেরা যে অপবাদ দিয়েছিল তার প্রতিবাদ করে বলেছেন- وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বরকতময় করেছেন। আমার মাতা তোমাদের আরোপিত অপবাধ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি সতী, সাধ্বী, তিনি পুণ্যের প্রতীক।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলা আমাকে কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল দান করেছেন, যা আমার নবুয়তের প্রমাণ।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী বানিয়েছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিনেই আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, তিনি আমাকে নবী বানাবেন এবং আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করবেন। আর যেহেতু এই সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত, তাই এর নির্দিষ্ট সময়ে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : وَ جَعَلَنِىْ مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ অর্থাৎ আমি যেখানেই থাকি বা যেখানেই গমন করি, বরকত আমার সঙ্গে থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন। আর তা এ কথার প্রমাণ যে, আমি আল্লাহ তা'আলার একজন মুবারক বান্দা।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : وَاَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ আর যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যেমন মু'মিনদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ যারা সর্বদা নামাজ আদায় করে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ সর্বক্ষণ নামাজই আদায় করবে; বরং যথা সময়ে নামাজ কায়েম করবে। এ নির্দেশই রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

مَا دُمْتُ حَيًّا অর্থাৎ যতক্ষণ আমি পৃথিবীতে জীবিত থাকি। এর কারণ এই যে, পৃথিবী থেকে আসমানে উত্তোলনের পর শরিয়তের বিধান পালন করা জরুরি থাকে না। কিয়ামতের পূর্বে যখন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন তিনি যথানিয়মে শরিয়তের বিধান পালন করবেন। এর তাৎপর্য হলো এই, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামাজ এবং জাকাতের আদেশ দিয়েছেন। আর নামাজ এবং জাকাত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত। ইবাদত এবং বন্দেগী প্রমাণ হলো বান্দা হওয়ার। আর বান্দা হওয়ার এবং মা'বুদ বা উপাস্য হওয়া কখনো একত্র হতে পারে না। অতএব খ্রিস্টানরা যে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বা অন্য কিছু বলে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অলীক কল্পনা মাত্র।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার মাতার খেদমতগুজার বানিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর সেবাযত্ন করা এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব আমার প্রতি অর্জিত হয়েছে। একথাটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে যে আমি পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার মাতা সতী সাধ্বী এবং পূর্ণ পবিত্র, তার সম্মান এবং তাজীম করা আমার কর্তব্য।

যদি হযরত ঈসা (আ.)-এর কোনো পিতা থাকতেন। তবে খেদমত এবং তাজীমের ব্যাপারে শুধু মাতার উল্লেখ থাকতো না; বরং পিতার কথাও উল্লেখ করা হতো। যেমন হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনায় ইরশাদ হয়েছে- وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ অর্থাৎ হযরত ইয়াহইয়া (আ.) তাঁর পিতামাতা উভয়ের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য : وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষ্ঠুর হতভাগা করেননি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করবো; বরং আল্লাহ তা'আলা আমাকে নেককার এবং বিনয়ী করেছেন। কেননা যার মধ্যে বিনয় থাকে না, যে অহংকারী হয় তার ধ্বংস অনিবার্য। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যারা নামাজ কায়েম করে না এবং জাকাত আদায় করে না এবং মাতার অবাধ্য হয় তারা নিঃসন্দেহে অহংকারী এবং বদনসীব হয়। আর বিনয়ী এবং নেককার হওয়া এ কথার প্রমাণ যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ছিলেন। কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমি যদি আমার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার বা কোনো সৃষ্টির হক যথাযথভাবে পালনে বিরত থাকি তবে তা হবে আমার দুর্ভাগ্য এবং বদনসিবী।

অষ্টম বৈশিষ্ট্য : বস্তুত এটি হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর অষ্টম বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি স্তরের জন্যে রহমত, শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর এ কথাটিও তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার অতি পছন্দনীয় বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ তা'আলার রহমতেই তিনি লাভ করেছেন এসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি। অতএব, তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং রাসূলও। খ্রিস্টানরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা সত্য নয়, আর ইহুদিরা তার সম্পর্কে যা বলে তাও অসত্য।

অনুবাদ :

٤١. وَاذْكُرْ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ ط اَيْ خَبَرَهُ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا مُبَالِغًا فِي الصِّدْقِ نَبِيًّا ـ وَيُبْدَلُ مِنْ خَبَرِهِ ـ

৪১. উল্লেখ করুন মক্কার কাফেরদের নিকট এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা অর্থাৎ তাঁর কাহিনী বর্ণনা করুন! তিনি ছিলেন সত্য নিষ্ঠ নবী। অতিশয় সত্যাশ্রয়ী। আর اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ এটা خَبَرَهُ থেকে بَدْل হয়েছে। অর্থাৎ সে সময়ের কাহিনী বর্ণনা করুন।

٤٢. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ يٰاَبَتِ التَّاءُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَعْبُدُ الْاَصْنَامَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ لَا يَكْفِيْكَ شَيْئًا ـ مِنْ نَفْعٍ اَوْ ضَرٍّ ـ

৪২. যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! اَبَتِ -এর تَاءْ টি ইজাফতের يَاءْ -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়টি একত্র হয় না। তার পিতার নাম ছিল আযর। সে মূর্তিপূজক ছিল। তুমি তার ইবাদত কর কেন? যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনোই কাজে আসে না। অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিষয়ে তোমার কোনো কাজে আসে না।

٤٣. يٰاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا طَرِيْقًا سَوِيًّا ـ مُسْتَقِيْمًا ـ

৪৩. হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা আপনার নিকট আসেনি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন! আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। সোজা রাস্তা।

٤٤. يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ط بِطَاعَتِكَ اِيَّاهُ فِيْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ـ كَثِيْرَ الْعِصْيَانِ ـ

৪৪. হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করবেন না। মূর্তি পূজার মাধ্যমে তার অনুসরণ করে। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। অতিশয় বিরুদ্ধাচরণকারী নাফরমান।

٤٥. يٰاَبَتِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ اِنْ لَمْ تَتُبْ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ـ نَاصِرًا وَقَرِيْنًا فِي النَّارِ ـ

৪৫. হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করি যে, দয়াময়ের শাস্তি আপনাকে স্পর্শ করবে। যদি আপনি তওবা না করেন, তখন আপনি হয়ে পড়বেন শয়তানের বন্ধু। সাহায্যকারী ও দোজখের সঙ্গী।

٤٦. قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰاِبْرٰهِيْمُ ج فَتَعِيْبُهَا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهَا لَاَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ اَوْ بِالْكَلَامِ الْقَبِيْحِ فَاحْذَرْنِيْ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ـ دَهْرًا طَوِيْلًا ـ

৪৬. পিতা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেবদেবী হতে বিমুখ? যার ফলে তুমি তাদের দুর্নাম করছ। যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তার সমালোচনা হতে। তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব? পাথর মেরে অথবা কটুবাক্য ব্যবহার করে। কাজেই তুমি আমার থেকে সতর্ক হও। তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। অর্থাৎ সুদীর্ঘ কাল।

অনুবাদ :

٤٧. قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ج مِنِّىْ اَىْ لَا اُصِيْبُكَ بِمَكْرُوْهٍ وَسَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ مِنْ حَفِيٍّ اَىْ بَارًّا فَيُجِبُ دُعَائِىْ وَ قَدْ وَفٰى بِوَعْدِهٖ بِقَوْلِهِ الْمَذْكُوْرِ فِى الشُّعَرَاءِ وَاغْفِرْ لِاَبِىْ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ بَرَاءَةٍ ـ

৪৭. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আপনার প্রতি সালাম। আমার পক্ষ হতে অর্থাৎ আপনার নিকট কোনো অনিষ্ট পৌঁছবে না। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। حَفِيًّا শব্দটি حَفِىٌّ থেকে নির্গত অর্থ– দয়াময়, স্নেহপরায়ণ। ফলে তিনি আমার প্রার্থনা কবুল করবেন। সূরা শু'আরায় উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তা হলো– وَاغْفِرْ لِاَبِىْ [আপনি আমার পিতাকে ক্ষমা করুন! এ আবেদন ছিল সে আল্লাহ তা'আলার শত্রু এটা প্রতীয়মান হওয়ার পূর্বে। যেমনটি সূরা বারাআতে উল্লিখিত হয়েছে।

٤٨. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا اَعْبُدُ رَبِّىْ ز عَسٰى اَنْ لَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّىْ بِعِبَادَتِهٖ شَقِيًّا ـ كَمَا شَقِيْتُمْ بِعِبَادَةِ الْاَصْنَامِ ـ

৪৮. আমি তোমাদেরকে হতে ও তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের আহ্বান কর। উপাসনা কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি। আমি আহ্বান করি। ইবাদত করি আমার প্রতিপালককে। আশা করি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে তাঁর ইবাদত করে ব্যর্থ হবো না। যেমনিভাবে তোমরা মূর্তি পূজা করে ব্যর্থ হয়েছো।

٤٩. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لا بِاَنْ ذَهَبَ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَهَبْنَا لَهٗ اِبْنَيْنِ يَاْنَسُ بِهِمَا اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط وَكُلًّا مِّنْهُمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا ـ

৪৯. অতঃপর তিনি যখন তাদের হতে এবং তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের ইবাদত করত সে সকল হতে পৃথক হয়ে গেলেন। এভাবে যে, তিনি পবিত্র ভূমিতে চলে গেলেন। তখন আমি তাকে দান করলাম। দুজন পুত্র সন্তান। যাদের মাধ্যমে তিনি শক্তি সামর্থ্য ও সৌহার্দ্য অনুভব করবেন। ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নবী বানালাম।

٥٠. وَوَهَبْنَا لَهُمْ الثَّلَاثَةَ مِنْ رَّحْمَتِنَا الْمَالَ وَالْوَلَدَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ـ رَفِيْعًا وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِىْ جَمِيْعِ اَهْلِ الْاَدْيَانِ ـ

৫০. আর দান করলাম তাদেরকে তাদের তিনজনকে আমার অনুগ্রহ দ্বারা সম্পদ ও সন্তান এবং তাদের নাম যশ সমুচ্চ করলাম। উঁচু করলাম আর তা হলো উত্তম প্রশংসা ও গুণকীর্তন সকল ধর্মাবলম্বীগণের মাঝে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ : এর আতফ হলো وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ-এর উপর। আর এর আতফ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ-এর উপর হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهٗ خَبَرَهٗ : এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِبْرٰهِيْمَ-এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে। কেননা খবর দেওয়া হয় অবস্থা সম্পর্কে, ব্যক্তি সম্পর্কে নয়।

قَوْلُهُ صِدِّيْقًا : শব্দটি ইসমে মুবালাগার সীগাহ। অর্থ অতিশয় সত্যবাদী নবী। আর সিদ্দীকের মাঝে عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَقْ-এর সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ সকল নবীই সিদ্দীক ছিলেন। কিন্তু সকল সিদ্দীক নবী হওয়া জরুরি নয়। এভাবে ওলী এবং সিদ্দীক এর মাঝেও عُمُوْم خُصُوْص مُطْلَقْ -এর সম্বন্ধ রয়েছে। সকল সিদ্দীক ওলী হয়ে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক ওলী সিদ্দীক হওয়া জরুরি নয়। صِدِّيْقِيَّتْ-এর স্তর নবুয়তের স্তরের তুলনায় নিম্নমানের।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ : এটা خَبَرَهٗ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ

قَوْلُهُ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا : এটা পূর্বের কথার عِلَّتْ বা কারণ। আর بَدْل ও مُبْدَلْ مِنْهُ-এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ। صِدِّيْقًا হলো كَانَ-এর প্রথম خَبَرْ আর نَبِيًّا হলো দ্বিতীয় খবর। কোনো কোনো আলেম বলেন, যে আযর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃত পিতা ছিলেন। কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা এটাই বুঝা যায়। আর কেউ কেউ বলেন, আযর ছিলেন তাঁর চাচা। রূপকার্থে ওরফ হিসেবে চাচাকে পিতা বলা হয়েছে। আর তার নাম ছিল তারেক।

قَوْلُهُ اَرَاغِبٌ : এটা মুবতাদা, আর اَنْتَ শব্দটি فَاعِلْ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে خَبَرْ হয়েছে। জিজ্ঞাসাটি আশ্চর্যসূচক। যেহেতু رَاغِبٌ শব্দটি هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامْ-এর পরে উল্লিখিত হয়েছে। এ কারণে নাকেরা হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। আবার اَرَاغِبٌ-কে خَبَرْ مُقَدَّمْ এবং اَنْتَ-কে مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ-ও বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ لَئِنْ : এর লামটি قَسَمِيَّةٌ তথা শপথ বুঝানোর জন্য। মূলত وَاللّٰهِ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِى-এর অর্থে।

قَوْلُهُ اَلْعَصِىُّ وَالْعَاصِىْ : উভয়টি একই অর্থের। عَصِىٌّ মূলত عَصُوِىٌّ ছিল। وَاوٌ-কে ى দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ى-কে অপর ى-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর ى-এর চাহিদা অনুযায়ী পূর্বে যের দেওয়া হয়েছে। ফলে عَصِىٌّ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا : এর আতফ হলো উহ্য وَاحْذَرْنِىْ-এর উপর। لَاَرْجُمَنَّكَ শব্দটি এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে। আর এর দ্বারা উভয় বাক্য اِنْشَائِيَّةٌ হয়ে যায়। مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও مَعْطُوْف-এর মধ্যে মিল থাকা ইমাম সীবওয়াইহে এর মতে জরুরি নয়। مَلِيًّا অর্থ– দীর্ঘ সময়। এর অপর অর্থ হলো সুস্থ ও নিরাপদ। এর উদ্দেশ্য এই যে, দীর্ঘকালের জন্য তুমি আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাও। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে তুমি আমাকে আমার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। আমাকে বিরক্ত করো না। অন্যথায় কোনো এক সময় আমার দ্বারা তোমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলতে আমাকে বাধ্য করো না। مَلِيًّا শব্দটি ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। যেমন ব্যাখ্যাকার (র.) دَهْرًا طَوِيْلًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন। অথবা وَاهْجُرْنِىْ-এর فَاعِلْ-এর যমীর থেকে حَالْ-ও হতে পারে।

قَوْلُهُ نَاصِرًا وَقَرِيْنًا : এখানে قَرِيْنًا বলে ক্ষ্যান্ত করা উচিত ছিল। দোজখে প্রবেশ করার পরে কেউ কারো সহায়তাকারী হবে না।

قَوْلُهُ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا : এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই মনে হচ্ছে যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব আজাব বা শাস্তি লাভের কারণ হবে। অর্থাৎ আজাব স্পর্শের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব হবে। অথচ বাস্তবতা এই যে, শয়তানের সাথে বন্ধুত্বের কারণে আজাবের সম্মুখীন হবে। মুফাসসির (র.) قَرِيْنًا فِى النَّارِ বলে এর উত্তর দিয়েছেন।

قَوْلُهُ حَفِيًّا : এটা صِفَتْ مُشَبَّهَةٌ-এর সীগাহ। অর্থ– বড় দয়ালু, অতি করুণাময়।

قَوْلُهُ كُلًّا : এটা جَعَلْنَا-এর প্রথম মাফউল। খাস করার উদ্দেশ্যে ফেলের পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রতি কত সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন আর কিভাবে তিনি তার পিতাকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছেন, আর কিভাবে শিরক ও মূর্তিপূজার বাতুলতা প্রকাশ করেছেন। তাওহীদের দাওয়াতের সময় কিভাবে পিতার প্রতি সম্মান বজায় রেখেছেন এবং

কিভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের পিতাকে ছেড়ে চলে গেছেন, এমনকি স্বদেশ থেকে হিজরত করেছেন আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মরতবা বুলন্দ করেছেন, তাঁকে নেককার সন্তান-সন্ততি দান করেছেন, এসব কিছুর বিবরণই শুরু হয়েছে আলোচ্য আয়াত থেকে।

আল্লামা সুযূতী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ১৭৫ বছর জীবিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আ.)-এর দুহাজার বছর পর এবং হযরত নূহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আগমন করেন।

এতদ্ব্যতীত এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত মারইয়াম (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনায় সেসব বিভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে যারা কোনো জীবিত, জ্ঞানবান ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মনে করতো, আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘটনায় সেই মুশরিকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করা হয়েছে যারা প্রাণহীন মূর্তির পূজা করতো এবং সেই মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করতো। কিয়ামতের দিন তারা সর্বাধিক আক্ষেপ করবে।
–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০০]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এই সূরায় মূলত তিনটি বিষয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। ১. তাওহীদ ২. নবুয়ত এবং ৩. হাশর। যারা তাওহীদকে অস্বীকার করে তারা দু'ভাবে বিভক্ত। একদল যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো জীবিত বুদ্ধিমান মানুষকে মাবুদ বা উপাস্য মনে করে যেমন খ্রিস্টানরা। আর দ্বিতীয় দল হলো যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রাণহীন কোনো কিছুকে উপাস্য মনে করে। যেমন– যারা মূর্তিপূজা করে।

হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের প্রথম দলের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় মুশরিকদের দ্বিতীয় দলের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

এখানে উল্লিখিত ঘটনাটি আলোচ্য সূরার তৃতীয় ঘটনা। ইতিপূর্বে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত শুরু করা হয়েছে এভাবে– وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ

অর্থাৎ হে রাসূল! যেভাবে হযরত জাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২১, পৃ. ২২২]

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম : আলেমগণ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম কি ছিল–

১. তাওরাত এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তার পিতার নাম ছিল তারেক। ২. তবে পবিত্র কুরআনে তাঁর পিতার নাম আযর বলা হয়েছে। যেমন– ইরশাদ হয়েছে– وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً

কোনো কোনো মুফাসসির এ মতানৈক্য নিরসন করার চেষ্টা করেছেন এবং তারা মন্তব্য করেছেন যে, **ক.** উভয়টি একই ব্যক্তির নাম। তার মূল নাম হলো তারেক, আর গুণগত নাম হলো আযর। কেউ এভাবে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছেন যে, ইবরানী ভাষায় আযর অর্থ হলো দেবতাপ্রেমিক।

আর তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরি ও মূর্তিপূজা উভয়ই করতো, এ কারণে আযর নামে তার উপাধি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। **খ.** কারো মতে আযর অর্থ اَعْوَجُ তথা নির্বোধ বা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন। আর তারেকের মধ্যে যেহেতু এ বিষয়টি বিদ্যমান ছিল, এ কারণেই সে এ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আর পবিত্র কুরআনে এই নামই বর্ণিত হয়েছে।

২. অন্য একদল আলেমের বিশ্লেষণ এই যে, তারেক যে দেবতার পূজা-অর্চনা করতো তার নাম ছিল আযর। হযরত মুজাহিদ (র.) বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, اَتَتَّخِذُ اٰزَرَ اِلٰهًا اَىْ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً অর্থাৎ তুমি কি আযরকে দেবতা মান? অর্থাৎ মূর্তিদেরকে আল্লাহ জ্ঞান কর। মোটকথা তাদের মতে اٰزَرَ শব্দটি اَبِيْهِ-এর بَدَلْ নয়; বরং এটি একটি দেবতার নাম। এ হিসেবে কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম উল্লেখ নেই।

৩. এক প্রসিদ্ধ উক্তি মতে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক। আর চাচার নাম ছিল আযর। আর আযরই যেহেতু তাঁকে সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করেছিল, এ কারণে কুরআনে আযরকে পিতা বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَلْعَمُّ صِنْوُ اَبِيْهِ অর্থাৎ চাচা বাপের মতোই।

আব্দুল ওহহাব নাজ্জার এর বর্ণনা মতে উপরিউক্ত উক্তিসমূহের মধ্যে মুজাহিদ (র.)-এর উক্তি অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ মিসরের প্রাচীন দেবতাসমূহের মধ্যে একটির নাম ছিল اَزُوْرِيْس [আযরীস] এর অর্থ হলো ক্ষমতার ঈশ্বর ও সাহায্যকারী। আর মূর্তিপূজক জাতির মধ্যে শুরু থেকে এ প্রচলন চলে আসছিল যে, প্রাচীন দেবতাদের নামে নতুন দেবতাদের নাম রাখতো। এ কারণে মিশরের প্রাচীন দেবতাদের নামানুসারে এ দেবতার নাম রাখা হয়েছিল আযর। অন্যথতায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম ছিল তারেক।

আমাদের মতে এ সকল উক্তি ও মন্তব্য অহেতুক ও অসার। কেননা কুরআন যেহেতু স্পষ্টভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার নাম আযর বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং আলেমগণের জন্য বাইবেল ও প্রাচীন পুস্তকাদির বর্ণনা ও যুক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাকে রূপক আখ্যা দেওয়া কিংবা আরো সামনে অগ্রসর হয়ে কুরআনের আয়াতে ব্যাকরণগত দৃষ্টিকোণে শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব রাখে না।

মোদ্দাকথা এই যে, কালদী ভাষায় আদার (اَدَار) বিশেষ উপাসককে বলা হয়। আর আরবি ভাষায় এটা আযর নামে পরিবর্তিত হয়েছে। তারেক যেহেতু মূর্তি তৈরিকারী এবং বিশিষ্ট মূর্তিপূজক ছিল, এ কারণে সে আযর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অর্থাৎ এটা তার নাম নয়; বরং উপাধি। আর নামের স্থলে উপাধি প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কুরআন মাজীদে সেটাই উল্লিখিত হয়েছে। –[কাসাসুল কুরআন খ. ১, পৃ. ১৫১]

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি মক্কাবাসীকে ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী শুনান। কারণ তারা দাবি করে থাকে যে, তারা তার বংশীয় সন্তান। যাতে তারা তাদের পূর্বপুরুষের মূর্তি ভাঙ্গার কাহিনী এবং মূর্তিপূজার প্রতি অসন্তুষ্টির কথা শ্রবণ করে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদায় বিশ্বাসী হয়। তিনি নিজ কথা ও কর্মে বড়ই সত্যবাদী ও বিশিষ্ট নবী ছিলেন। তার যে কাহিনী আমি বর্ণনা করতে চাচ্ছি তা ঐ সময়ের ঘটনা, যখন তিনি তাঁর পিতার নিকট বলেছিল আব্বাজান! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা করেন কেন? যারা কিছুই শুনে না, কিছুই দেখে না এবং আপনার কোনো কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে না। আব্বাজান! আমার নিকট এমন ইলম ও জ্ঞান পৌঁছেছে যা আপনার নিকট নেই। আপনি আমার কথা মেনে চলুন। আমি আপনাকে সোজা রাস্তা বলে দিব। আপনি শয়তানের আনুগত্য করবেন না। অর্থাৎ তাকে এবং তার উপাসনাকে আপনি নিজেও অপছন্দ করেন। অথচ মূর্তিপূজার মধ্যে নিশ্চিতভাবে শয়তান পূজা অনিবার্য হয়। কেননা শয়তানই এসব কাজ করিয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে শয়তান আল্লাহ তা'আলার বড় নাফরমান। সে কিভাবে আনুগত্যের যোগ্য হতে পারে? আব্বাজান! আমার খুবই আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনার উপর না জানি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার আজাব এসে পড়ে। তখন আপনি নিজেও শয়তানের সাথে আজাবে লিপ্ত হবেন।

পিতা আযর পুত্র ইবরাহীম (আ.)-এর এসব কথা শুনে বলল, ব্যাপার কি? তুমি কি আমার দেবতাদের থেকে দূরে সরে গেছ? তুমি যদি তাদের সমালোচনা করা এবং অপমান করা, আর আমাকে তাদের উপাসনা করতে বারণ করা থেকে বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিব।

হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার আদব ও সম্মান পূর্ণভাবে লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত বিনয় ও মহব্বতের সাথে পিতাকে তাওহীদের উপদেশ শোনালেন। কিন্তু যতোই নম্র ও কোমলভাবে বর্ণনা করা হোক না কেন? মুশরিকদের জন্য তা গ্রহণ করা কঠিন বিষয়। সুতরাং মুশরিক পিতা পুত্রের এ বিনম্র আকৃতির প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত কঠিনভাবে বলল, তুমি যদি আমার উপাস্যদের সমালোচনা থেকে বিরত না হও তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমার হাত পা ভেঙ্গে ফেলব। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আচ্ছা আপনাকে সালাম। আপনাকে আর কোনো কিছু বলতে চাই না। কারণ তা অনর্থ হবে। অতএব আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার মাগফেরাতে জন্য দোয়া করব। তিনি যেন আপনাকে হেদায়েত দান করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়। আর আপনি যেহেতু আমার কথা মানতে প্রস্তুত নন, কাজেই আপনার নিকট আমার অবস্থান করা উচিত নয়। অতএব আমি আপনার এবং আপনার দেবতাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি শান্তভাবে আমার প্রভুর উপাসনা করব। মোটকথা এ কথার পরে তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাম দেশে হিজরত করলেন। আমি তাকে পুত্র ইসহাক ও পৌত্র ইয়াকুব দান করলাম। ইসমাঈল (আ.) যেহেতু আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যে এখানে তার নাম উল্লেখ নেই। আর একটি কারণ এই যে, সামান্য পরে ভিন্নভাবে বিশেষ বৈশিষ্টসহ তাঁর আলোচনা আসছে। এ কারণে এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا - সিদ্দীক কাকে বলে? صِدِّيْق শব্দটি কুরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস করে মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠাবসা এই বিশ্বাসের প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীত যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরি নয়। বরং নবী নয় এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিদকের স্তর অর্জন করতে পারেন তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়াম (আ.)-কে স্বয়ং কুরআনে পাক 'সিদ্দীকা' (اُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোনো নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দের নসিহত করার পন্থা ও আদব : يَا اَبَتِ আরবি অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালোবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাযের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয় এর উদ্যোক্তারূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্বও ভালোবাসা। এ দুটি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَا اَبَتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালোবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোনো বাক্যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত। অর্থাৎ পিতাকে 'কাফের' গোমরাহ' ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গাম্বরসুলভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহপ্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে সতর্ক করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) يَا اَبَتِ বলে মিষ্টভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَا بُنَيَّ [হে বৎস] শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তার নাম ধরে يَا اِبْرَاهِيْمُ বলে সম্বোধন করল। অতঃপর তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ ﷺ -এর কি জবাব দেন, তা শুনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন–

سَلَامٌ عَلَيْكَ এখানে سَلَامٌ শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। যথা–

১. বয়কটের সালাম। অর্থাৎ কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কুরআন পাক আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে– وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মোকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচারণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না।

২. এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়েছে। এতে আইনগত জটিলতা এই যে, কোনো কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا تَبْدَءُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى بِالسَّلَامِ অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রথমে সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোনো কোনো হাদীসে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফেরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারো কারো কথা ও কার্য দ্বারা এর অবৈধতা বুঝা যায়। ইমাম কুরতুবী (র.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নাখায়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোনো কাফের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ : এখানেও উপরিউক্ত জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোনো কাফেরের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর চাচা আবূ তালেবকে বলেছিলেন- وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اُنْهَ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হয়- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচার জন্য ইস্তেগফার পরিত্যাগ করেন।

উপরিউক্ত জটিলতা নিরসনকারী জবাব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার সাথে এ ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তেগফার করব, এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছেন- اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ সূরা তাওবার مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে-

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ

এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তেগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহ তা'আলার শত্রু প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

قَوْلُهُ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ : একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে সত্য প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেননি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, "আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।"

قَوْلُهُ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ : পূর্ববর্তী বাক্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হবো না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বুঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকূব' [পৌত্র] শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বুঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ.) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চেয়ে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

বালাগাত :

اَلْكِنَايَةُ اللَّطِيْفَةُ "لِسَانُ صِدْقٍ" كِنَايَةٌ عَنِ الذِّكْرِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ الْجَمِيْلِ بِاللِّسَانِ لِاَنَّ الثَّنَاءَ يَكُوْنُ بِاللِّسَانِ كَمَا يُكَنّٰى عَنِ الْعَطَاءِ بِالْيَدِ -

অনুবাদ :

৫১. وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى ز اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا مَنْ اَخْلَصَ فِىْ عِبَادَتِهٖ اَخْلَصَهُ اللّٰهُ مِنَ الدَّنَسِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ـ

৫১. স্মরণ করুন, এই কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা। তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত। مُخْلَصًا শব্দটি لَامْ বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। مُخْلِصْ [যেরসহ] বলা হয় مَنْ اَخْلَصَ فِىْ عِبَادَتِهٖ তথা যে ব্যক্তি ইবাদত বন্দেগীতে একনিষ্ঠ হয়েছে। আর مُخْلَصْ [যবরসহ] বলা হয় مَنْ اَخْلَصَهُ اللّٰهُ مِنَ الدَّنَسِ তথা যাকে আল্লাহ তা'আলা পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। এবং তিনি ছিলেন রাসূল নবী।

৫২. وَنَادَيْنَاهُ بِقَوْلِ يَا مُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ اِسْمُ جَبَلٍ الْاَيْمَنِ اَىِ الَّذِىْ يَلِىْ يَمِيْنَ مُوْسٰى حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ مَدْيَنَ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ـ مُنَاجِيًا بِاَنْ اَسْمَعَهٗ تَعَالٰى كَلَامَهٗ ـ

৫২. আমি তাকে আহ্বান করেছিলাম "হে মূসা নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ" এ উক্তি দ্বারা। তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে طُوْر একটি পাহাড়ের নাম। অর্থাৎ যে পাহাড়টি হযরত মূসা (আ.)-এর মাদায়েন থেকে আগমনকালে তার ডান দিকে অবস্থিত ছিল। আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাঁকে স্বীয় বাণী শুনিয়েছিলেন।

৫৩. وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا نِعْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ نَبِيًّا ـ حَالٌ هِىَ الْمَقْصُوْدَةُ بِالْهِبَةِ اِجَابَةً لِسُؤَالِهٖ اَنْ يُّرْسِلَ اَخَاهُ مَعَهٗ وَكَانَ اَسَنَّ مِنْهُ ـ

৫৩. আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দিলাম তাঁর ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে এখানে هَارُوْنْ শব্দটি اَخَاهُ থেকে بَدَلْ অথবা عَطْفُ بَيَانٍ হয়েছে। আর نَبِيًّا শব্দটি هَارُوْنْ থেকে حَالٌ হয়েছে। আর وَهَبْنَا দ্বারা নবুয়ত দান করে তাঁর সাথে তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ.)-কেও নবী বানিয়ে দিয়েছেন। আর হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।

৫৪. وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ لَمْ يَعِدْ شَيْئًا اِلَّا وَفٰى بِهٖ وَانْتَظَرَ مَنْ وَعَدَهٗ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ حَوْلًا حَتّٰى رَجَعَ اِلَيْهِ فِىْ مَكَانِهٖ وَكَانَ رَسُوْلًا اِلٰى جُرْهُمَ نَبِيًّا ـ

৫৪. স্মরণ কর! এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা। তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী। তিনি যে অঙ্গীকারই করতেন তা পূর্ণ করে ছাড়তেন। একদা তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলে তিন দিন কিংবা একবছর যাবত তার অপেক্ষায় থাকেন। যতক্ষণ না সে লোকটি অপেক্ষাস্থলে এসেছে। এবং তিনি ছিলেন রাসূল জুরহুম গোত্রের প্রতি প্রেরিত নবী।

৫৫. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ اَىْ قَوْمَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ـ اَصْلُهٗ مَرْضُوْوٌ قُلِبَتِ الْوَاوَ اِنِ يَائَيْنِ وَالضَّمَّةُ كَسْرَةً ـ

৫৫. তিনি নির্দেশ দিতেন তাঁর পরিবারবর্গকে স্বীয় সম্প্রদায়কে সালাত ও জাকাতের এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের সন্তোষভাজন ছিলেন। مَرْضِيًّا এটা মূলে ছিল مَرْضُوْوًا দুটি وَاو -কে দুটি يَاءْ -তে রূপান্তরিত করে পূর্বে ضَادْ -এর ضَمَّةٌ -কে كَسْرَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় مَرْضِيًّا হয়েছে।

অনুবাদ :

٥٦. وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز هُوَ جَدُّ اَبِيْ نُوْحٍ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا لا .

৫৬. স্মরণ করুন এই কিতাবে ইদরীসের কথা তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ নবী।

٥٧. وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا . هُوَ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ اَوِ السَّادِسَةِ اَوِ السَّابِعَةِ اَوْ فِي الْجَنَّةِ اُدْخِلَهَا بَعْدَ اَنْ اُذِيْقَ الْمَوْتَ وَاُحْيِيَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا .

৫৭. এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যদায়। তিনি চতুর্থ, বা ষষ্ঠ বা সপ্তম আকাশে জীবিত রয়েছেন। অথবা তাঁকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর জীবিত করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। আর তিনি তা থেকে বের হননি।

٥٨. اُولٰٓئِكَ مُبْتَدَأٌ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ صِفَةٌ لَّهٗ مِنَ النَّبِيّٖنَ بَيَانٌ لَّهُمْ وَهُوَ فِيْ مَعْنَى الصِّفَةِ وَمَا بَعْدَهٗ اِلَى جُمْلَةِ الشَّرْطِ صِفَةٌ لِّلنَّبِيّٖنَ فَقَوْلُهٗ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق اَيْ اِدْرِيْسَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز فِي السَّفِيْنَةِ اَيْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ ابْنِهٖ سَامٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ اَيْ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اِسْرَآءِيْلَ ز وَهُوَ يَعْقُوْبُ اَيْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اَيْ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَخَبَرُ اُولٰٓئِكَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا . جَمْعُ سَاجِدٍ وَبَاكٍ اَيْ فَكُوْنُوْا مِثْلَهُمْ وَاَصْلُ بُكِيٍّ بُكُوْيٌ قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَالضَّمَّةُ كَسْرَةً .

৫৮. এঁরাই তাঁরা, নবীগণের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। اُولٰٓئِكَ হলো মুবতাদা الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ হলো اُولٰٓئِكَ-এর সিফত। আর مِنَ النَّبِيّٖنَ এটা الَّذِيْنَ-এর بَيَانٌ যা সিফতের অর্থে হয়েছে। আর তার পরবর্তী অংশ তথা مِنَ النَّبِيّٖنَ থেকে اِذَا تُتْلٰى এ শর্তিয়া বাক্য পর্যন্ত نَبِيّٖنَ-এর সিফত হয়েছে। আদমের বংশ হতে অর্থাৎ হযরত ইদরীস (আ.) আর যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়ে ছিলাম নৌকায়। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি তাঁর পুত্র 'সাম'-এর পুত্র ছিলেন। এবং ইবরাহীমের বংশধর থেকে অর্থাৎ ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব ও ইসরাঈলের বংশধর হতে আর ইসরাঈল হলেন হযরত ইয়াকূব (আ.) তথা হযরত মূসা, হারূন, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং ঈসা (আ.) ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম এবং মনোনীত করেছিলাম তাদের সকলের মধ্য থেকে। আর اُولٰٓئِكَ-এর খবর হলো। তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন। سُجَّدًا শব্দটি سَاجِدٌ এর এবং بُكِيًّا শব্দটি بَاكٍ-এর বহুবচন। অর্থাৎ তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাও। بُكِيٌّ মূলত بُكُوْيٌ ছিল। وَاوْ টি يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করে كَافْ-এর পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করায় بُكِيٌّ হয়েছে।

٥٩. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ بِتَرْكِهَا كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ مِنَ الْمَعَاصِيْ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . هُوَ وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ اَيْ يَقَعُوْنَ فِيْهِ .

৫৯. তাদের পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত নষ্ট করল ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো সালাত পরিত্যাগ করে ও লালসাপরবশ হলো নানা পাপকার্যের শিকার হলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। আর তা হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা অর্থাৎ তারা তথায় নিপতিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى : এর আতফ হলো وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ -এর উপর। অতএব এটা عَطْف الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ তথা ঘটনার উপর অপর ঘটনার عَطْف -এর অন্তর্গত। সূরা মারইয়ামে দশজন নবীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রত্যেক নবীর কিছু না কিছু বিশেষ গুণাবলি ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের ইজ্জত ও সম্মান জ্ঞাপন করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত নবীগণ হলেন– ১. হযরত জাকারিয়া (আ.) ২. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) ৪. হযরত ঈসা (আ.) ৫. হযরত ইসহাক (আ.) ৬. হযরত ইয়াকূব (আ.) ৭. হযরত ইসমাঈল (আ.) ৮. হযরত মূসা (আ.) ৯. হযরত হারূন (আ.) ও ১০. হযরত ইদ্রীস (আ.)।

قَوْلُهُ مُخْلِصًا اَىْ مُوَحِّدًا : অর্থাৎ একত্ববাদী অর্থে, যিনি স্বীয় ইবাদতকে শিরক থেকে মুক্ত রেখেছেন। শব্দটি ইসমে ফায়েল বা ইসমে মাফউল যে কোনোটি হতে পারে। মাফউলের ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে বাছাই করে নিয়েছেন বা মনোনীত করেছেন।

قَوْلُهُ اَلدَّنَسَ : শব্দটি একবচন বহুবচনে হলো اَدْنَاس অর্থ– ময়লা।

قَوْلُهُ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا : রাসূল নবী ছিলেন। رَسُوْل শব্দটি كَانَ-এর প্রথম خَبَرْ আর نَبِيًّا হলো দ্বিতীয় خَبَرْ; এখানে রাসূলের শাব্দিক অর্থ এবং নবী এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। رَسُوْلًا، نَبِيًّا -এর মধ্যে উচিত ছিল عَامْ শব্দকে আগেও خَاصْ শব্দকে পরে উল্লেখ করা। কিন্তু আয়াতের শেষের মিলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিপরীত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– সূরা ত্বা-হা এর মধ্যে رَبِّ هَارُوْنَ وَمُوْسٰى উল্লিখিত হয়েছে। আর কেউ কেউ রাসূলের পারিভাষিক অর্থ এবং নবী-এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ উন্নত মর্যাদাবান রাসূল। এ সময় নবী শব্দটি نُبُوَّةٌ থেকে নিষ্পন্ন হবে। এর অর্থ হলো– উচ্চতা, শ্রেষ্ঠত্ব।

قَوْلُهُ اَلطُّوْر : মাদইয়ান ও মিশরের মধ্যবর্তী এক প্রসিদ্ধ পাহাড়। এর অপর নাম জাবালে যুবায়ের।

قَوْلُهُ اَيْمَنْ : এটা نَادَيْنَا -এর মাফউল অথবা ফায়েলের যমীর থেকে حَالْ আর اَلْاَيْمَانْ হলো جَانِبْ -এর সিফত। এ কারণে ইরাবের ক্ষেত্রে তার অনুগামী হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, اَلْاَيْمَانْ শব্দটি يَمِيْنْ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এ সময় এটা طُوْرْ -এর সিফত হতে পারে। অর্থাৎ বরকতময় পাহাড়ের দিক থেকে মূসাকে আহ্বান করলেন।

قَوْلُهُ مِنْ رَحْمَتِنَا : এখানে مِنْ হলো تَعْلِيْلِيَّةٌ اَىْ مِنْ اَجَلِ رَحْمَتِنَا "আমার রহমতের কারণে।" اَخَاهُ এ সময় وَهَبْنَاهُ -এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ হবে। আর هَارُوْنَ শব্দটি اخاه থেকে বদল কিংবা আতফে বয়ান অথবা اَعْنِىْ উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْبٌ হবে نَبِيًّا এটা هَارُوْنَ থেকে حَالْ হয়েছে। جُرْهُمْ ইয়েমেনের একটি গোত্র, যারা পানি প্রাপ্তির সহজলভ্যতা দেখে মক্কা উপত্যকায় হযরত হাজেরা (আ.)-এর পাশে আবাসন গ্রহণ করছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) যুবক হয়ে এ গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর প্রকৃত নাম اَخْنُوْخْ; তিনি হযরত নূহ (আ.)-এর উর্ধ্বতন পুরুষ।

قَوْلُهُ وَرَفَعْنَا : কোনো কোনো মুফাসসির (র.) বলেন, এখানে উঁচু মর্যাদাবান হওয়া উদ্দেশ্য। কারো মতে আকাশে উত্থিত হওয়া উদ্দেশ্য। আমাদের মুফাসসির (র.)-এর অভিমত এটিই।

قَوْلُهُ خَلْفٌ : এখানে لَامْ বর্ণটি সাকিনযোগে, অর্থ হলো অযোগ্য। আর যবরযোগে হলে তার অর্থ হবে যোগ্য উত্তরসূরি।

قَوْلُهُ يَلْقَوْنَ : শব্দটি (س) جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ . مُضَارِعْ তারা পতিত হবে, সাক্ষাৎ করবে।

قَوْلُهُ غَيًّا : এটা ইসমে ফায়েল। অর্থ– পথভ্রষ্টতা, শাস্তি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)-এর আলোচনা ছিল। এ আয়াত থেকে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ.)-এর কথা শুরু হয়েছে। এটি এই সূরার চতুর্থ ঘটনা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান আদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর উম্মত হওয়ার দাবিদার ইহুদিদেরকে সাবধান করা হয়েছে। যদি ইহুদিরা নিজেদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বলে দাবি করে তবে তাদের কর্তব্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। ইরশাদ হয়েছে- وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا অর্থাৎ হে রাসূল! এই কিতাবে হযরত মূসা (আ.)-এর উল্লেখ করুন! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত, পছন্দনীয়, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

قَوْلُهُ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا : যার কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী আসে তিনি আল্লাহ তা'আলার নবী, নবীদের মধ্যে যাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে, যার নিকট কিতাব আসে, যিনি শরিয়ত রাখেন, তিনি হন নবী এবং রাসূল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নবী ও রাসূল ছিলেন এবং পাঁচজন বিশিষ্ট নবীও রাসূলের মধ্যে ছিলেন তিনি অন্যতম। তারা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ১৬, পৃ. ৩৬]

এ আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. مُخْلَصًا অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও পছন্দনীয় ছিলেন।

২. তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন।

৩. তাঁর সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৈকট্যধন্য করেছেন।

৫. হযরত মূসা (আ.)-এর আরজি কবুল করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাই হারূন (আ.)-কে নবী মনোনীত করেছেন।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৫০৩]

قَوْلُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ : এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিশর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

قَوْلُهُ الْاَيْمَنِ : তূর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ.)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

قَوْلُهُ نَجِيًّا : কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مُنَاجَاتٌ এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نَجِيٌّ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَ وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ : هِبَةٌ শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হযরত হারূন (আ.)-কেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وَهَبْنَا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হারূন' দান করেছি। এ কারণেই হযরত হারূন (আ.)-কে هِبَةُ اللّٰهِ [আল্লাহর দান]-ও বলা হয়। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ : বাহ্যত এখানে হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ.)-কেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ভ্রাতা হযরত ইসহাক (আ.)-এর সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তার কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের

ক্রম অনুসারে পয়গাম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ.)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিন সবার অগ্রে ছিলেন।

قَوْلُهُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ : ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরি মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গাম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে উক্ত গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তার মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ, এ গুণটিও সব নবীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ স্বতন্ত্রের অধিকারী ছিলেন, তাই তার আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে কিংবা কোনো বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাইয়ের জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদা পালনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু লোকটি সময়মতো আগমন না করায় তিনি সেখানে তিনদিন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। –[মাযহারী]

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী ﷺ প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মরতবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلْعِدَةُ دَيْنٌ অর্থাৎ ওয়াদা একটি ঋণ। তাই ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরি। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, মু'মিনের ওয়াদা পালন করা ওয়াজিব।

ফিকহবিদগণ বলেছেন, ওয়াদা ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গুনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা গায়ের জোরে আদায় করা যায়। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মমতে ওয়াজিব, বিচারে ওয়াজিব নয়। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ - পরিবার পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য : হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আরো একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের দায়িত্ব তথা ওয়াজিব। কুরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে– قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জবাব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সার্বিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যেমন মহানবী ﷺ -এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে– وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে একটি বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গাম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছান এবং খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ

কি? জবাব এই যে, পয়গাম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়াত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশুনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোনো বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভালো অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চেয়ে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ : হযরত ইদরীস (আ.) হযরত নূহ (আ.)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তার পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। −[মুস্তাদরাকে হাকিম] হযরত আদম (আ.)-এরপর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাজিল করেন। −[যামাখশারী] হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জিজা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। −[বাহরে মুহীত] তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণ পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও তার আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। −[বাহরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا : অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ.)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মরতবা দান করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ইদরীস (আ.)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর (র.) বলেন− هٰذَا مِنْ اَخْبَارِ كَعْبِ الْاَحْبَارِ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ وَفِىْ بَعْضِهِ نِكَارَةٌ অর্থাৎ এটা কাবে আহবারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোনো কোনোটি অপরিচিত। কুরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় না যে, এখানে মরতবা উচ্চ করা বুঝানো হয়েছে, নাকি জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বুঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কুরআনের তাফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। −[বয়ানুল কুরআন]

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক : এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরিয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল এখন শরিয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন− তাওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন− ইসমাঈল (আ.)-এর শরিয়ত। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাচীন শরিয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরিয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তারা এ শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরি নয়। যেমন ফেরেশতাগণ রাসূল; কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে اِذْ جَاۤءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ বলা হয়েছে। অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে তিনি নবী। তিনি নতুন শরিয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরিয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চেয়ে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চেয়ে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُوْلًا نَّبِيًّا বলা হয়েছে, সেখানো কোনো খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন− وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থে হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরিয়ত প্রচার করেন। −[বয়ানুল কুরআন]

বনী-ইসরাঈল যেহেতু উগ্রপন্থি গোত্র ছিল এবং লাথির ভূত কথায় মান্য করত না। তাই কঠোর শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তওবার পদ্ধতি "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন আমাদের শরিয়তের কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি তওবা সত্ত্বেও "কতল" নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন قَتْلِ عَمْدٍ-এর শাস্তি قِصَاص আর কোনো কোনো অবস্থায় জিনার শাস্তি হচ্ছে পাথর মেরে হত্যা করা।

এ শাস্তির রহস্য এটা ছিল যে, শিরকে লিপ্ত হয়ে তোমরা চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তাই এর শাস্তি স্বরূপ নিজ দুনিয়াবী জীবনকে বিলীন করে দাও।

লাত্বায়েফ-এর মধ্যে ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ উম্মতের ওলীগণ বর্তমানেও 'মন' কে বিসর্জন এবং নফসে আম্মারাকে বিলীন করতেছেন।

ষষ্ঠ নিয়ামত : ষষ্ঠ নিয়ামত সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে ম'তভেদ রয়েছে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক যিনি সীরাত ও মাগাযী বিষয়ের ইমাম, তার অভিমত হচ্ছে যে, 'কতলে তওবা'র এ হুকুম প্রয়োগের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) তার উম্মত থেকে ৭০ জন ওলী নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সুদ্দী (র.) বলেন যে, 'কতলে তওবা'র হুকুম প্রয়োগের পর হযরত মূসা (আ.) ওলীগণের সে জামাতকে নিয়ে তূর পর্বতে উপস্থিত হয়েছেন এবং সকলে মিলে আল্লাহর কালাম শুনেছেন- إِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا اَخْرَجْتُكُمْ مِنْ اَرْضِ مِصْرَ بِيَدٍ شَدِيْدَةٍ فَاعْبُدُوْنِيْ وَلَا تَعْبُدُوْا غَيْرِيْ এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সকলে একমত হয়ে প্রার্থনা করেছে لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً :

ওজরখাহী করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবি : এটা বাছুর পূজার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কিছু লোককে নিয়ে তার কাছে বাছুর পূজার ব্যাপারে ওজরখাহী করার জন্য। হযরত মূসা (আ.) সত্তরজন লোক মনোনীত করে তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজরখাহী করার জন্য তূর পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনে তারা সত্তরজনেই বলল, হে মূসা! আড়াল থেকে শুনা আমরা যথেষ্ট মনে করি না। তুমি আমাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলাকে চাক্ষুস দেখাও। এর ফলে তাদের উপর বজ্রপাত হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা এখানে قَائِل হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নির্বাচিত সত্তরজন ব্যক্তি। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে- وَاخْتَارَ مُوْسٰى سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِمِيْقَاتِنَا

قَوْلُهُ «فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ» : اَلصَّيْحَةُ অর্থ ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ। সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে, তারা اَلصَّيْحَةُ فَمِتُّمْ তথা ভূ-কম্পনে মারা গিয়েছে। উভয়টির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, হয়তো বিকট শব্দ ও ভূ-কম্পন اَلرَّجْفَةُ উভয়টিই হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ : অর্থাৎ বজ্র পতিত হওয়ার প্রাথমিক অবস্থাসমূহ দেখছিলো। কিংবা তোমরা একজন অপরজনের দিকে দেখছিলে যে, কিভাবে তার মৃত্যু হচ্ছে। এরপর তোমাদের সকলেই মারা যায়।

কেউ কেউ اَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা বেহুঁশ হওয়া মুরাদ নিয়েছেন। তারা فَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এবং وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ-কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। কেননা اِفَاقَة তো غَشِى থেকেই হয়ে থাকে, মৃত্যু থেকে নয়। মুফাসসির (র.) اَخْذُ صَاعِقَةٍ দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এবং পরে উল্লিখিত ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ-কে তার قَرِيْنَة সাব্যস্ত করেছেন। এটিই রাজেহ বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত।

قَوْلُهُ «ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ» اَحْيَيْنَاكُمْ «مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ» :

বজ্রাহতদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, বনী ইসরাঈল এমনিতেই আমার প্রতি কুধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এই লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোনো উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানিপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন! তাই আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামাজ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরো বেশি নষ্ট করবে। -[মুয়াত্তা মালেক]

হযরত হুযায়ফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজের আদব ও রোকন ঠিকমতো পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কবে থেকে এভাবে নামাজ পড়ছ? লোকটি বলল, চল্লিশ বছর ধরে। হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, তুমি একটি নামাজও পড়নি। যদি এ ধরনের নামাজ পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো মুহাম্মদ ﷺ -এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.)-এর বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তির নামাজ হয় না, যে নামাজে 'ইকামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকুও সিজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামাজ হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি অজুতে ত্রুটি করে অথবা নামাজের রুকু সিজদায় তড়িঘড়ি করে ফলে রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাজকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা.) নামাজ নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন, লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন, আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাজের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু উঠাবসা করে। এটা ছিল হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাজীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে-

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ.

قَوْلُهُ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ : شَهَوَاتْ [কুপ্রবৃত্তি] বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও নামাজ থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا : আরবি ভাষায় غَيٌّ শব্দটি رَشَادْ -এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رَشَادْ -এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غَيْ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'গাই জাহান্নামের একটি গর্তের নাম।' এতে সমগ্র জাহান্নামের চেয়ে অধিক নানা রকম আজাবের সমাবেশ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নামে। জাহান্নামও -এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে- যে জিনাকার জিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে পদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়। -[কুরতুবী]

٦٠. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ يَنْقُصُوْنَ شَيْئًا ـ مِنْ ثَوَابِهِمْ ـ

٦١. جَنّٰتِ عَدْنِ اِقَامَةٍ بَدَلٌ مِنَ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ط حَالٌ اَىْ غَائِبِيْنَ عَنْهَا اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ اَىْ مَوْعُوْدُهٗ مَاْتِيًّا ـ بِمَعْنٰى اٰتِيًا وَاَصْلُهٗ مَاْتُوْىٌ اَوْ مَوْعُوْدُهٗ هُنَا الْجَنَّةُ يَاْتِيْهِ اَهْلُهٗ ـ

٦٢. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا مِنَ الْكَلَامِ اِلَّا لٰكِنْ يَسْمَعُوْنَ سَلٰمًا ط مِنَ الْمَلٰئِكَةِ عَلَيْهِمْ اَوْ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ـ اَىْ عَلٰى قَدْرِهِمَا فِى الدُّنْيَا وَلَيْسَ فِى الْجَنَّةِ نَهَارٌ وَلَا لَيْلٌ بَلْ ضَوْءٌ وَنُوْرٌ اَبَدًا ـ

٦٣. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ نُعْطِىْ وَنُنْزِلُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ـ بِطَاعَتِهٖ ـ

٦٤. وَنَزَلَ لَمَّا تَاَخَّرَ الْوَحْىُ اَيَّامًا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِجِبْرِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ج لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا

অনুবাদ :

৬০. কিন্তু তারা নয়, যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। অর্থাৎ তাদের পুণ্যের ঘাটতি হবে না।

৬১. এটা স্থায়ী জান্নাত جَنّٰتِ عَدْنٍ এটা اَلْجَنَّةَ থেকে بَدَل হয়েছে। যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় প্রভু তাঁর বান্দাদেরকে দিয়েছেন। اَلْغَيْبُ এটা عِبَاده থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ তারা উক্ত জান্নাতকে দেখেনি তাঁর প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। مَاْتِيًّا শব্দটি اِسْمِ مَفْعُوْل হলেও এখানে اِسْمِ فَاعِلْ অর্থে ব্যবহৃত। মূলে ছিল مَاْتُوْىٌ অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রতিশ্রুত বিষয় জান্নাত অর্থাৎ জান্নাতের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৬২. সেখানে তারা শান্তি ব্যতীত কোনো অসার বাক্য শুনবে না। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর অথবা তাদের একজন অন্যজনের উপর। এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ অর্থাৎ পৃথিবীর অনুপাতে জান্নাতে দিনরাত বলতে কিছুই থাকবে না। সেখানে সর্বদা শুধুমাত্র নূর ও আলো বিরাজ করবে।

৬৩. এই সেই জান্নাত যার অধিকারী করব আমি দান করব ও আতিথেয়তা প্রদান করব আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মুত্তাকীগণকে। যারা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে ভয় করত।

৬৪. যখন ওহী আগমনে কিছুকাল বিলম্বিত হলো এবং নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে যতটুকু সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশি সাক্ষাৎ করতে আপনাকে কিসে বারণ করে? তখন অবতীর্ণ হয়। আমি আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমার সম্মুখে আছে।

অনুবাদ :

اَىْ اَمَامَنَا مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَمَا خَلْفَنَا مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ج اَىْ مَا يَكُوْنُ مِنْ هٰذَا الْوَقْتِ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اَىْ لَهٗ عِلْمُ ذٰلِكَ جَمِيْعِهٖ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ج بِمَعْنٰى نَاسِيًا اَىْ تَارِكًا لَكَ بِتَاخِيْرِ الْوَحْيِ عَنْكَ هُوَ.

অর্থাৎ পরজীবনের যেসব জিনিস আমার সামনে আছে আর যা পশ্চাতে আছে পার্থিব বিষয়াবলি থেকে এবং যা এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী তা তাঁরই অর্থাৎ এখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবকিছুর জ্ঞানই তাঁর রয়েছে। আর আপনার প্রতিপালক ভুলবার নন। نَسِيًّا শব্দটি نَاسِيًا অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ ওহী বিলম্বিত করার কারণে আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।

٦٥. رَبُّ مَالِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ط اَىْ اِصْبِرْ عَلَيْهَا هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا. اَىْ مُسَمًّى بِذٰلِكَ.

৬৫. তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু রয়েছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকুন! অর্থাৎ এর উপর ধৈর্যধারণ কর। আপনি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকেও জানেন? অর্থাৎ তাঁর গুণসম্পন্ন আর কেউ নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لٰكِنْ : لٰكِنْ দ্বারা اِلَّا -এর ব্যাখ্যা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ ; কেননা এখানে مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর সমজাতীয় নয়। কারণ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো কাফের সম্প্রদায়। আর مُسْتَثْنٰى হলো মু'মিনগণ।

قَوْلُهٗ كَانَ وَعْدُهٗ : এখানে وَعْدٌ শব্দটি مَوْعُوْدٌ তথা প্রতিশ্রুত অর্থে। আর তা হলো বেহেশত اَىْ يَأْتِيْهِ وَيَدْخُلُهٗ مَنْ وُعِدَ لَهٗ بِهَا لَا مَحَالَةَ এ সময় مَأْتِيًّا শব্দটি اِتْيَانٌ থেকে اِسْمُ مَفْعُوْلٌ হবে। অথবা اِسْمُ مَفْعُوْلٌ টি اِسْمُ فَاعِلٌ তথা اٰتِيًا অর্থে হবে। অবশ্য وَعْدٌ শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرٌ -ও হতে পারে। অর্থ হলো প্রতিশ্রুত বিষয় এবং مَصْدَرٌ অর্থেও হতে পারে। অর্থাৎ ওয়াদা করা। ব্যাখ্যাকার (র.) اَوْ مَوْعُوْدُهٗ উল্লেখ করে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর এর দ্বারা বেহেশত উদ্দেশ্য হবে এবং مَأْتِيًّا নিজ অবস্থায় থাকবে।

قَوْلُهٗ وَعْدًا : শব্দটি مَصْدَرٌ অর্থে হলে, مَأْتِيًّا শব্দটি اٰتِيًا অর্থে হবে। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থ হবে- বেহেশতের অধিকারীগণ যাদের সাথে দয়াময় আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। অবশ্যই তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাগণের সাথে যে ওয়াদা করেছেন অবশ্যই তা বাস্তবায়িত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِلَّا مَنْ تَابَ الخ - পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্বে সে সকল লোকের আলোচনা ছিল কুফরির উপর যাদের মৃত্যু হয়েছে। আর এখন اِلَّا مَنْ تَابَ থেকে সে সকল ভাগ্যবানদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেক আমল করেছে। এ ধরনের ব্যক্তিগণ আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'আদন' বেহেশতে প্রবেশ করবে, যা উৎকৃষ্টতম বেহেশত।

قَوْلُهٗ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا : لَغْو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বুঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবেন। কোনোরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

قَوْلُهُ إِلَّا سَلَامًا : এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শুনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا : জান্নাতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাপ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবেন। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে। যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে- وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُوْنَ এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয় সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বুঝানো হয়েছে, যেমন- দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ - শানে নুযূল : বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, আপনি একটু বেশি বেশি আগমন করবেন। এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আমি আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করতে পারি না। আমার অগ্রে পশ্চাতে এবং তার মাঝের সকল বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন। আর আপনার প্রতিপালক ওহী প্রেরণে বিলম্ব ঘটিয়ে আপনাকে বর্জনকারী নন। সকলের প্রতিপালক তিনি। কাজেই তাঁর উপাসনা করুন এবং তাঁর উপর অটল থাকুন। ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে যদি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হন তাহলে তাকে সবর ও ধৈর্য্যের সাথে বরদাশত করুন। আপনার জানা মতে কি তাঁর কোনো সমকক্ষ আছে? যদি না থাকে আর অবশ্যই নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কে আছে?

قَوْلُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ : اِصْطِبَارٌ শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষে। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

قَوْلُهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا : سَمِيٌّ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে ইলাহ তথা উপাস্য বলত। কিন্তু কেউ কোনোদিন কোনো মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোনো মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ তা'আলার নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার কোনো সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে যুবায়ের, কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে এস্থলে سَمِيًّا শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলিতে আল্লাহ তা'আলার কোনো সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

বালাগাত :

১. اَلطِّبَاقُ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَبَيْنَ بُكْرَةً .... عَشِيًّا) .

২. اَلسَّجْعُ الْحَسَنُ الرَّصِيْصُ (عَلِيًّا حَفِيًّا وَنَبِيًّا)

অনুবাদ :

٦٦. وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ الْمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ اُبَىُّ بْنُ خَلْفٍ اَوِ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ النَّازِلِ فِيْهِ الْاٰيَةُ ءَاِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَ تَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهَا بِوَجْهَيْهَا وَبَيْنَ الْاُخْرٰى مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا . مِنَ الْقَبْرِ كَمَا يَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَىْ لَا اُحْيٰى بَعْدَ الْمَوْتِ وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّاكِيْدِ وَكَذَا اللَّامُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى .

৬৬. মানুষ বলে পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী যেমন উবাই ইবনে খালফ অথবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। যার সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমার মৃত্যু হলো এখানে اِذَا -এর দ্বিতীয় হামযাটি স্পষ্ট করে কিংবা লঘু আকারে এবং উভয় হামজার মাঝে اَلِفٌ বৃদ্ধি করে প্রথমোক্ত উভয় সুরতে অর্থাৎ تَسْهِيْل এবং تَحْقِيْق -এর সূরতে পাঠ করা যায়। আমি কি জীবিতাবস্থায় উত্থিত হবো? কবর হতে। যেমনটি মুহাম্মদ ﷺ বলছেন। এখানে اِسْتِفْهَامْ টা نَفِىْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আর জীবিত হবো না। مَا مِتُّ -এর مَا টি তাকিদের জন্য বর্ধিত। অনুরূপভাবে لَسَوْفَ -এর ل টিও। সামনের উক্তি– اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ দ্বারা তার এ উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

٦٧. اَوَلَا يَذَّكَّرُ الْاِنْسَانُ اَصْلُهُ يَتَذَكَّرُ اُبْدِلَتِ التَّاءُ ذَالًا وَاُدْغِمَتْ فِى الذَّالِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَرْكِهَا وَسُكُوْنِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا . فَيَسْتَدِلُّ بِالْاِبْتِدَاءِ عَلَى الْاِعَادَةِ .

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, يَذَّكَّرُ মূলত ছিল يَتَذَكَّرُ - تَاءٌ -কে ذَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে ذَالْ -কে ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। অন্য কেরাতে تَاءٌ -বিহীন ذَالْ -কে সাকিন করে كَافْ -এ পেশ দিয়ে পঠিত রয়েছে। আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না এখানে প্রথম সৃষ্টি দ্বারা পুনরুত্থানের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে।

٦٨. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ اَىِ الْمُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ وَالشَّيٰطِيْنَ اَىْ نَجْمَعُ كُلًّا مِنْهُمْ وَشَيْطَانَهُ فِىْ سِلْسِلَةٍ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مِنْ خَارِجِهَا جِثِيًّا . عَلَى الرُّكَبِ جَمْعُ جَاثٍ اَصْلُهُ جُثُوْوٌ اَوْ جُثُوْىٌ مِنْ جَثٰى يَجْثُوْ اَوْ يَجْثِىْ لُغَتَانِ .

৬৮. সুতরাং শপথ আপনার প্রতিপালকের! আমি তাদেরকে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীগণকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্র করবই। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের শয়তানকে একই জিঞ্জিরে। এবং পরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। অর্থাৎ বহিঃপার্শ্বে নতজানু অবস্থায় جِثِيًّا শব্দটি جَاثٍ -এর বহুবচন। মূলত ছিল جُثُوْوٌ বা جُثُوْىٌ আর এ শব্দটি جَثٰى يَجْثُوْ বাবে نَصَرَ এবং جَثٰى يَجْثِىْ বাবে ضَرَبَ উভয় থেকেই ব্যবহৃত।

অনুবাদ :

٦٩. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا . جُرْءَةً .

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময় প্রভুর প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই। عِتِيًّا শব্দের অর্থ– দুঃসাহস।

٧٠. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا اَحَقُّ بِجَهَنَّمَ الْاَشَدُّ وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ صِلِيًّا دُخُوْلاً وَاحْتِرَاقًا فَنَبْدَأُ بِهِمْ وَاَصْلُهُ صُلُوْىٌ مِنْ صَلِىَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا .

৭০. এবং আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয়ে ভালো জানি। অর্থাৎ অবাধ্যতায় তাদের মধ্যে কে বেশি কঠোর আর কে কঠোর নয়। صِلِيًّا অর্থ প্রবেশ করা ও দগ্ধিভূত হওয়ার বিবেচনায়। অতএব তাদের মাধ্যমে আমি শুরু করব। صِلِيًّا মূলত ছিল صُلُوْىٌ যা صَلِىَ [لام বর্ণে যবর ও যেরসহ] থেকে পঠিত।

٧١. وَاِنْ اَىْ مَا مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا وَارِدُهَا ج اَىْ دَاخِلُ جَهَنَّمَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ج حَتَمَهُ وَقَضٰى بِهٖ لَا يَتْرُكُهُ .

৭১. আর তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে। অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। حَتَمَهُ وَقَضٰى بِهٖ -এর অর্থ হলো ছাড়বে না।

٧٢. ثُمَّ نُنَجِّى مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ مِنْهَا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ بِالشِّرْكِ وَالْكُفْرِ فِيْهَا جِثِيًّا . عَلَى الرُّكَبِ .

৭২. পরে আমি উদ্ধার করব نُنَجِّى শব্দের ج বর্ণ তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। মুত্তাকিদেরকে শিরক ও কুফর থেকে এবং জালিমদেরকে রেখে দিব শিরক ও কুফরের দরুন সেথায় নতজানু অবস্থায়।

٧٣. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ نَحْنُ اَوْ اَنْتُمْ خَيْرٌ مَّقَامًا مَنْزِلاً وَمَسْكَنًا بِالْفَتْحِ مِنْ قَامَ وَبِالضَّمِّ مِنْ اَقَامَ وَاَحْسَنُ نَدِيًّا . بِمَعْنَى النَّادِىْ وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُوْنَ فِيْهِ يَعْنُوْنَ نَحْنُ فَنَكُوْنُ خَيْرًا مِنْكُمْ .

৭৩. তাদের নিকট আবৃত্ত হলো অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত কুরআন থেকে। بَيِّنَاتٌ এটা اٰيَاتٌ থেকে حَالٌ হয়েছে। কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে দুই দলের মধ্যে কোনটি আমরা নাকি তোমরা মর্যাদায় উত্তম অর্থাৎ অবস্থানগত ভাবে। مَقَامٌ শব্দের مِيْم বর্ণটি যবরযুক্ত হলে قَامَ থেকে হবে আর পেশ যুক্ত হলে اَقَامَ বা বাবে اِفْعَالٌ থেকে হবে। এবং মজলিস হিসেবে উত্তম ও শ্রেয়তর نَدِيًّا অর্থ اَلنَّادِىْ সমাবেশস্থল, মজলিস, যেখানে লোকজন বসে আলাপ আলোচনা করে। তারা উদ্দেশ্য করে যে, আমরা! কাজেই তোমাদের চেয়ে আমরাই উত্তম।

অনুবাদ :

٧٤. قَالَ تَعَالٰى وَكَمْ اَىْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اَىْ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا مَالًا وَمَتَاعًا وَرِئْيًا - مَنْظَرًا مِنَ الرُّؤْيَةِ فَلَمَّا اَهْلَكْنَاهُمْ لِكُفْرِهِمْ نُهْلِكُ هٰؤُلَاءِ -

৭৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন- আমি তাদের পূর্বে কত অনেক মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ সাধন করেছি। অর্থাৎ অতীতকালের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে। যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। اَثَاثٌ শব্দের অর্থ- ধন সম্পদ, উপকরণ, আসবাবপত্র। আর رِئْيًا শব্দটি اَلرُّؤْيَةُ থেকে এসেছে। সুতরাং যখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরির কারণে ধ্বংস করেছি, তখন এদেরকেও বিনাশ করব।

٧٥. قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ شَرْطٌ جَوَابُهُ فَلْيَمْدُدْ بِمَعْنَى الْخَبَرِ اَىْ يَمُدُّ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ج فِى الدُّنْيَا يَسْتَدْرِجُهُ حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ كَالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَاِمَّا السَّاعَةَ ط اَلْمُشْتَمِلَةَ عَلٰى جَهَنَّمَ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا - اَعْوَانًا اَهُمْ اَمِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَجُنْدُهُمُ الشَّيَاطِيْنُ وَجُنْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ -

৭৫. বলুন, যারা বিভ্রান্তিতে আছে এ বাক্যটি শর্ত। আর এর জবাব হচ্ছে দয়াময় প্রভু তাদেরকে প্রচুর ঢিল দিবেন। পৃথিবীতে তাদেরকে অবকাশ দিবেন। যতক্ষণ তারা প্রত্যক্ষ না করবে যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তা শাস্তি হোক। যেমন- হত্যা ও বন্দীত্ব অথবা কিয়ামতই হোক যা দোজখ সম্বলিত। ফলে তারা তাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল তারা নাকি মু'মিনগণ। এখানে তাদের দলবল দ্বারা উদ্দেশ্য শয়তানরা আর তাদের বিপক্ষে মু'মিনগণের দলবল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতাগণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ : এর তাফসীর اَلْمُنْكِرُ لِلْبَعْثِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِنْسَانٌ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য। আর সে ব্যক্তি হলো উবাই ইবনে খালফ অথবা ওলীদ ইবনে মুগীরা।

قَوْلُهُ اِذَا مَامِتُّ : এখানে مَا অতিরিক্ত। আর مِتُّ শব্দটি مَاضِى مَعْرُوْف - وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ এটা مَوْتٌ মাসদার থেকে গঠিত। হরফে শর্ত এর কারণে ভবিষ্যতকালের অর্থ দিচ্ছে।

قَوْلُهُ لَسَوْفَ : এর মধ্যকার لَامْ বর্ণটি অতিরিক্ত। اَلْاِنْسَانُ-এর اَلْ টি عَهْدِىْ

প্রশ্ন : لَامْ تَاكِيْدْ -এর পরের অংশটি তার পূর্বের অংশের মধ্যে আমল করে না। সুতরাং এখানে اُخْرَجُ শব্দটি কিভাবে আমল করবে?

উত্তর : এই নীতিটি لَامْ اِبْتِدَاءْ -এর জন্য। আর لَامْ টি অতিরিক্ত।

প্রশ্ন : মুযারের উপর যে لَامٌ প্রবিষ্ট হয় তা মুযারে'কে حَالٌ -এর অর্থে পরিণত করে দেয়। আর سَوْفَ মুযারে'কে ভবিষ্যৎকালের অর্থের সাথে খাস করে দেয়। সুতরাং উভয়ের চাহিদার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে।

উত্তর : এ لَامٌ টি শুধু তাকিদের জন্য। মুজারেকে حَالٌ তথা বর্তমানকালের অর্থের সাথে খাস করে দেওয়া থেকে বের করে আনা হয়েছে। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন আরোপিত হবে না।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, اِذَا -এর মধ্যে اُبْعَثُ উহ্য ফে'লটি আমল করেছে। এ ব্যাপারে اُخْرَجُ শব্দটি প্রমাণ বহন করে। কাজেই اُخْرَجُ -এর ظَرْفٌ বানানো ঠিক হবে না।

قَوْلُهُ لَمْ يَكُ : শব্দটি মূলত لَمْ يَكُنْ ছিল। অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে نُونٌ -কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ شِيْعَةٌ : অর্থ- দল, জামাত, সাহায্যকারী প্রভৃতি। এর বহুবচন হলো شِيَعٌ শব্দটির মধ্যে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন সব একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ جِثِيًّا : এটা جَاثٌ -এর বহুবচন। ভয়ে মুখ থুবড়ে পতিত ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, جِثِيًّا শব্দটি جُثْوَةٌ -এর বহুবচন। ব্যাখ্যাকার (র.) وَارِدُهَا -এর ব্যাখ্যা দোজখে প্রবেশ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَارِدٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ এর অর্থ উপস্থিত হওয়া, কেউ অতিক্রম করা, কেউ প্রবেশ করা এবং কেউ হেঁটে চলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ব্যাখ্যাকার (র.) دُخُولٌ অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অতএব এ ব্যাখ্যাটি মর্ম নির্ধারণের জন্য বুঝতে হবে।

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ : এটা ইসমে মাওসূল। এর صَدْر صِلَةٌ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ هُوَ اَشَدُّ এখানে اِسْمَ مَوْصُوْلُ الَّذِىْ টি অর্থে এটা ইজাফতের কারণে পেশের উপর মবনী হয়েছে। এর صَدْر صِلَةٌ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ هُوَ اَشَدُّ ছিল। هُوَ মুবতাদা। আর اَشَدُّ হলো তার খবর مُبْتَدَاْ ও خَبَرْ মিলে صِلَةٌ আর صِلَةٌ এবং مَوْصُوْلٌ মিলে نَنْزِعَنَّ -এর مَفْعُوْلٌ - عُتُوْا হলো تَمْيِيْز উহ্য মুবতাদা থেকে পরিবর্তিত হয়ে অর্থাৎ عَتَوْهُ اَشَدُّ غَيًّا

قَوْلُهُ وَارِدٌ : অর্থ- অবতরণকারী, এখানে পুলসিরাত অতিক্রম করা উদ্দেশ্য। আল্লামা নববী (র.) এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল ইনসান' শব্দটি দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর কারো কারো মতে আবূ জেহেল। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা সকল কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। বর্ণিত আছে যে, আবূ জেহেল কিংবা উবাই ইবনে খালফ একটি হাড়খণ্ড হাতে নিয়েছিল এবং তাকে ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলেছিল। এরপর সে বলেছিল, মুহাম্মদ ﷺ -এর ধারণা হলো আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদেরকে জীবিত করা হবে, অথবা এর অর্থ হলো মৃত্যুর অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে আমাদের পুনরুত্থান হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে তারা অসম্ভব মনে করতো। তারা বলতো, আমরা যখন মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যাব, তখন পুনর্জীবন লাভ করা কি করে সম্ভব হবে? তাদের এ প্রশ্নের জবাবেই আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

অর্থাৎ মানুষ যখন কিয়ামতকে অস্বীকার করে, মানুষ যখন তার পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে, তখন কি সে তার অতীতকে ভুলে যায়। সে কি জানে না যে, একদিন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়- هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

অর্থাৎ কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

قَوْلُهُ اِنَّا خَلَقْنٰهُ : বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে তাঁর বিশেষ কুদরতে নাস্তিকের শূন্যলোক থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন। যার কোনো অস্তিত্ব জানা ছিল না। তাকে অস্তিত্ব দান করা যদি কঠিন না হয়, তবে কোনো মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান কেন কঠিন হবে? যিনি প্রথমবার তাকে অস্তিত্বদান করেছেন, মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবন দান করা তার পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে পুনর্জীবন দান করা স্বাভাবিকভাবেই সহজ হবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে অথচ তার জন্যে এ কাজ সম্পূর্ণ অনুচিত। আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ এ কাজ তার জন্যে আদৌ উচিত নয়। মিথ্যাজ্ঞান করা হলো এই, আদম সন্তানেরা বলে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, পরে পুনরুত্থান করবেন না। অথচ পুনরুত্থানের তুলনায় প্রথম সৃষ্টি করা অধিকতর কঠিন হয়। আর আমাকে বনী আদমের কষ্ট দেওয়া হলো এই যে, সে বলে আমার সন্তান সন্ততি অছে অথচ আমি এক ও অদ্বিতীয়; আমার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, আমার পিতামাতা নেই, আমার কোনো সন্তান-সন্ততিও নেই। আমি আমার নিজের শপথ করে বলছি, আমি তাদের সকলকে একত্র করবো। আর যে শয়তানের তারা পূজা অর্চনা করতো, আমি তাদেরকে একত্র করবো। এরপর তাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে হাজির করবো, যেখানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

−[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা− ১৬, পৃ. ৪৪]

قَوْلُهُ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ : এখানে وَالشَّيَاطِيْنَ-এর وَاوْ - مَعَ [সহ] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফেরদের সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার অর্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই, আর মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবেন। ফলে সবার সাথে শয়তানের সহঅবস্থান হয়ে যাবে। −[কুরতুবী]

قَوْلُهُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا : হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করা হবে। সবাই ভীত বিহ্বল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ : شِيْعَةٌ শব্দের আসল অর্থ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোনো বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোনো কেনো তাফসীরবিদ বলেন, অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। −[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا : অর্থাৎ জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোনো মু'মিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয় অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে مُرُوْرٌ [অতিক্রম করা] শব্দ বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেওয়া হয়, তবে মু'মিন ও পরহেজগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনোরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়্যা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের

পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا বাক্যের অর্থ তা-ই। এই বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আয়াতে যে وُرُودٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেওয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে। তাই কোনো বৈপরীত্য নেই।

قَوْلُهُ خَيْرٌ مَقَامًا وَاحْسَنُ نَدِيًّا : এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফেররা মুসলমানদের সামনে দুটি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। যথা– ১. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং ২. চাকর-নওকর, দলবল ও পরিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশি ছিল। এদু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভালো ভালো জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না। সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোনো সময় গাফেল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গাম্বর, যেমন হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত দাউদ (আ.) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কুরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোনো ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের চেয়েও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণে তো বটেই, বরং এর চেয়েও বেশি ধন-দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পরিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে। অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কোনো কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : মক্কায় কাফেররা শুধু যে সত্যের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করছিলো তাই নয়; বরং প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণকে চরম নির্যাতনও করছিলো, এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, [হে রাসূল ﷺ! যারা হেদায়েত গ্রহণ করতে রাজি নয়, যারা পথভ্রষ্ট থাকতে চায়, তাদেরকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিন! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিবেন এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে আজাব আসবে, অথবা মৃত্যুর পর তারা কিয়ামতের কঠিন দিনের আজাব ভোগ করবে আর তখন তারা প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাবে।

قَوْلُهُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا - কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : যেহেতু কাফেররা মুসলমানদেরকে বলেছিল, তোমরা দেখো কার বাড়ি ঘর উত্তম? আর কাফেরদের এ কথারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে কার বাড়ি ঘর মন্দ এবং কার দলবল দুর্বল? কেননা কাফেররা সেদিন দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। দুনিয়াতে ইবলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই ছিলো কাফেরদের সাহায্যকারী। কিয়ামতের দিন তারাও হবে কোপগ্রস্ত, অতএব, তাদের কেউ সাহায্যকারী থাকবে না, কাফেররা সেদিন থাকবে চরম বিপদে।

অনুবাদ :

٧٦. وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا بِالْاِيْمَانِ هُدًى ط بِمَا يُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْاٰيَاتِ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ هِيَ الطَّاعَاتُ تَبْقٰى لِصَاحِبِهَا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ـ اَيْ مَا يُرَدُّ اِلَيْهِ وَيَرْجِعُ بِخِلَافِ اَعْمَالِ الْكُفَّارِ وَالْخَيْرِيَّةُ هُنَا فِيْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِمْ اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا ـ

৭৬. যারা ঈমানের মাধ্যমে সৎপথে চলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অধিক হেদায়েত দান করেন। তাদের প্রতি বিভিন্ন নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে। এবং স্থায়ী সৎকর্ম আনুগত্য তথা ইবাদত বন্দেগী তার আমলকারীর জন্য স্থায়ী থাকবে। আপনার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। কাফেরদের আমল এর বিপরীত। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব তাদের এ উক্তির বিবেচনায় যে, কোন দল মান মর্যাদায় উত্তম?

٧٧. اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ وَقَالَ لِخَبَّابِ ابْنِ الْاَرَتِّ الْقَائِلِ لَهٗ تُبْعَثُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمُطَالِبِ لَهٗ بِمَالٍ لَاُوْتَيَنَّ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْبَعْثِ مَالًا وَّ وَلَدًا ـ فَاَقْضِيْكَ ـ

৭৭. আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন যে, আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে অর্থাৎ আস ইবনে ওয়ায়েল আর বলেছে হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.)-কে, যিনি তাকে বলেছিলেন যে, মৃত্যুর পর তোমার পুনরুত্থান করা হবে। লোকটির নিকট তিনি স্বীয় পাওনা মাল উসূলের জন্য তাগাদা করছিলেন। আমাকে দেওয়া হবেই। পুনরুত্থান মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্তুতি তখন আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব।

٧٨. قَالَ تَعَالٰى اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَيْ اَعَلِمَهٗ وَاَنْ يُّؤْتٰى مَا قَالَهٗ وَاسْتُغْنِيَ بِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ فَحُذِفَتْ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ـ بِاَنْ يُّؤْتٰى مَا قَالَهٗ ـ

৭৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন— সে কি অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত হয়েছে? অর্থাৎ সে কি জেনেছে যে, তাকে তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে? اَطَّلَعَ -এর মধ্যে هَمْزَةُ وَصْل -এর هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامٌ -এর কারণে প্রয়োজন না থাকায় সেটা পড়ে গেছে। অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে। যে, তাকে তা দেওয়া হবে যা সে বলেছে।

٧٩. كَلَّا ط اَيْ لَا يُؤْتٰى ذٰلِكَ سَنَكْتُبُ نَاْمُرُ بِكَتْبِ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ـ نَزِيْدُهٗ بِذٰلِكَ عَذَابًا فَوْقَ عَذَابِ كُفْرِهٖ

৭৯. কখনোই নয় অর্থাৎ তাকে তা দেওয়া হবে না। তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখব। অর্থাৎ লিখে রাখতে নির্দেশ দিব। এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। এ কথার কারণে আমি তার কুফরের শাস্তির উপর আরো শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব।

অনুবাদ :

٨٠. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَيَأْتِينَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ـ لَا مَالَ لَهُ وَلَا وَلَدَ ـ

৮০. সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে। অর্থাৎ সম্পদ ও সন্তানাদি। এবং সে আমার নিকট আসবে। কিয়ামতের দিন একা তার সাথে তার সম্পদও থাকবে না এবং সন্তানাদিও থাকবে না।

٨١. وَاتَّخَذُوا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الْاَوْثَانَ اٰلِهَةً يَعْبُدُوْنَهُمْ لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ـ شُفَعَاءَ عِنْدَ اللّٰهِ بِاَنْ لَّا يُعَذَّبُوْا ـ

৮১. তারা গ্রহণ করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিসমূহকে অন্য ইলাহ অর্থাৎ তারা তাদের উপাসনা করবে। যাতে তারা তাদের সহায় হয় অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য যেন তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশকারী হয়।

٨٢. كَلَّا ط اَىْ لَا مَانِعَ مِنْ عَذَابِهِمْ سَيَكْفُرُوْنَ اَىْ الْاٰلِهَةُ بِعِبَادَتِهِمْ اَىْ يَنْفُوْنَهَا كَمَا فِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ـ اَعْوَانًا وَاَعْدَاءً ـ

৮২. কখনোই নয় অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেওয়া থেকে কোনো কিছুই প্রতিবন্ধক হবে না। তারা তো অস্বীকার করবে অর্থাৎ বাতিল ইলাহরা তাদের ইবাদতকে অর্থাৎ তাদের পূজা করাকে অস্বীকার করবে। অন্য আয়াতে এসেছে যে, مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ তারা তো আমাদের ইবাদতই করত না। এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। তাদের শত্রুতে পরিণত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَزِيْدُ : অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এর আতফ হলো فَلْيَمْدُدْ-এর উপর। وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الخ বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ-ও হতে পারে। اَفَرَاَيْتَ-এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ تَعَجُّبِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ : মিসর বিজেতা হযরত ওমর (রা.)-এর পিতা ছিলেন। আর ওমর হলেন আব্দুল্লাহ এর পিতা তিনি عَبَادِلَةُ اَرْبَعَةٌ তথা প্রসিদ্ধ চার আব্দুল্লাহ এর অন্যতম। তার বংশধারা এরূপ– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে খাব্বাব ইবনে আরত বদরী। তিনি দরিদ্র সাহাবীগণের অন্তর্গত ছিলেন। اُوْتَيَنَّ শব্দটি اِيْتَاءٌ থেকে মুযারে' মাজহুলের وَاحِدُ مُتَكَلِّمٍ-এর সীগাহ। অবশ্যই আমাকে দেওয়া হবে। এখানে لَامْ টি শপথের জন্য। اَطَّلَعَ الْغَيْبَ মূলত أَاِطَّلَعَ ছিল। প্রথম হামযাটি اِسْتِفْهَامْ-এর জন্য। আর দ্বিতীয়টি هَمْزَةُ وَصْلٍ সহজিকরণের লক্ষ্যে هَمْزَةُ وَصْلٍ-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَلَّا : নাহুবিদগণের এ ব্যাপারে ছয়টি উক্তি রয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে এ শব্দটি হুমকি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের ৩৩ স্থানে এটি উল্লিখিত হয়েছে। আর সবগুলোই শেষার্ধের মধ্যে।

قَوْلُهُ وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ : অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে অহঙ্কার করে আমি তা ছিনিয়ে নেবো। দুনিয়া থেকে শূন্যহাতে গমন করবে। وَاتَّخَذُوا الْاَوْثَانَ এখানে اَلْاَوْثَانَ হলো প্রথম মাফউল, আর اٰلِهَةً দ্বিতীয় মাফউল। ضِدًّا অর্থ اَضْدَادٌ অথবা মাসদারটি বহুবচন অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى - হেদায়েত বৃদ্ধি করার তাৎপর্য : যেভাবে আল্লাহ তা'আলা গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সুদীর্ঘ অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনিভাবে যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা সজ্ঞানে নিজের বিচার বুদ্ধিতে সরল সঠিক পথ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের বিচার বুদ্ধি আরো বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তারা অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীতে মশগুল হয় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা আল্লাহ তা'আলা ও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেন। তাদেরকে নৈকট্যধন্য করেন। দুনিয়াতে কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলা কখনো অনেক নিয়ামত দান করেন, আর মু'মিনগণ কখনো থাকে দারিদ্রপীড়িত। কিন্তু এর এই অর্থ নয় যে, কাফেররা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় আর মু'মিনগণ অপ্রিয়, বরং মু'মিনদেরকে এই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ কম দিয়ে তাকে হেদায়েত অধিক পরিমাণে দান করে থাকেন এবং তাকে নৈকট্যধন্য হওয়ার একটি বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর কাফেরদেরকে যে ধন সম্পদ দেওয়া হয় তা এই কারণে যে, তাদেরকে ঢিল দেওয়া হয় এবং তাদের গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অর্থে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "যারা স্বেচ্ছায় হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত আরো বৃদ্ধি করে দেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর : [উর্দু] পারা- ১৬, পৃ. ৪৮]

ইমাম রাযী (র.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, যারা নেককার আল্লাহ তা'আলা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন এর তাৎপর্য হলো ঈমানের পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইখলাস দান করেন অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের ছওয়াব বৃদ্ধি করে দিবেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৪৪-৪৫]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন- মু'মিনগণের প্রকৃত সম্পদ হলো হেদায়েত। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের এই হেদায়েতের পুঁজি বৃদ্ধি করে দেন। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২১, পৃ. ২৪৮]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এর জন্য ঈমান বৃদ্ধির কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ. ৬১৪]

قَوْلُهُ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا : بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ -এর তাফসীর সম্পর্কে নানা জনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহাফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ বলে যেসব ইবাদত ও সৎকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বুঝানো হয়েছে। مَرَدًّا শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বুঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মই আসল সম্পদ। সৎকর্মের ছওয়াব বিরাট এবং এর পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

قَوْلُهُ اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا - শানে নুযূল : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) বর্ণনা করেছেন, যে আমি কামারের কাজ করতাম, আস ইবনে ওয়ায়েল নামক এক ব্যক্তির কিছু কাজ আমি করেছিলাম। আমার পারিশ্রমিক তার কাছে বাকি ছিল। একদিন আমি তাকে আমার প্রাপ্য আদায়ের তাগাদা করলাম। আস জবাব দিল, আল্লাহর শপথ! যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবো না। তখন আমি বললাম, খুব ভালো করে শ্রবণ কর, যখন তুমি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করবে তখনো আমি কুফরি করবো না। আস বলল, মৃত্যুর পর কি পুনরায় আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ উঠানো হবে। তখন আস বলল, তবে সেখানেও আমি ধন সম্পদ লাভ করবো আর সেখানেই তোমার পাওনা আদায় করবো। তখনই এই আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত খাব্বাব (রা.) বলেছেন, আমি মক্কায় আস ইবনে ওয়ায়েলের জন্য একটি তরবারি তৈরি করেছিলাম, এর পারিশ্রমিক তার নিকট আমার পাওনা ছিল। তার নিকট পারিশ্রমিক দাবি করলে সে এসব কথা বলে।

قَوْلُهُ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার প্রারম্ভে হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ব্যতীত জন্ম হওয়ার এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিষ্পাপ-নিষ্কলংক হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু ইহুদিরা হযরত ঈসা (আ.) এবং তার সম্মানিত মাতা সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও আপত্তিকর মন্তব্য করতো, তাই এ ঘোষণা দ্বারা তাদের অন্যায় অযৌক্তিক কথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াত থেকে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো। [নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক]

এতদ্ব্যতীত পূর্বের কয়েকটি আয়াতে কিয়ামতের অবস্থা এবং নেককারদের নেক আমল ও তার পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে মুশরিক বা পৌত্তলিকদের পথভ্রষ্টতা ও ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলার যে ধৃষ্টতা দেখায়, তা একান্ত অমার্জনীয় অপরাধ। যদি আল্লাহ তা'আলা দয়া করে সহ্য না করতেন, তবে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের মূর্খতা এবং আখিরাতে তাদের যে কঠিন শাস্তি হবে, তার বিবরণ রয়েছে। এ সূরার শেষ দিকে নেককার মু'মিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমান এবং নেক আমলের বরকতে মানুষের অন্তরে মু'মিনদের জন্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহওয়ালাগণ মানুষের মধ্যে প্রিয় এবং পছন্দনীয় ও সম্মানিত বলে বিবেচিত হন।

সূরার শেষের দিকে এ নসিহত করা হয়েছে যে, এই পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর। অবশেষে প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির হতে হবে, এ পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে, অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা।

قَوْلُهُ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّ وَلَدًا : বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল, তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। হযরত খাব্বাব (রা.) জবাব দিলেন এরূপ করা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। চাই তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল, ভালো তো আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন দৌলত ও সন্তান সন্ততি থাকবে। -[কুরতুবী]

কুরআন পাক এই আহম্মক কাফেরের জবাবে বলেছে, সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্তুতি থাকবে? اَطَّلَعَ الْغَيْبَ অর্থাৎ সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে?

اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا অর্থাৎ অথবা সে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ধন দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলা বাহুল্য এরূপ কোনো কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? وَنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ অর্থাৎ সে যে ধন দৌলত ও সন্তান সন্তুতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান সন্তুতি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আমার কাছেই ফিরে যাবে।

وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান সন্তুতি এবং না থাকবে ধন দৌলত।

وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের ইবাদত করতো, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে, হে আল্লাহ! এদেরকে শাস্তি দিন! কেননা এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য বানিয়েছিল।

অনুবাদ :

٨٣. اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ سَلَّطْنَاهُمْ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ تُهَيِّجُهُمْ اِلَى الْمَعَاصِيْ اَزًّا ـ

৮৩. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। চাপিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য সে তাদেরকে গুনাহ ও নাফরমানির প্রতি উৎসাহিত করে।

٨٤. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ط بِطَلَبِ الْعَذَابِ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ الْاَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ اَوِ الْاَنْفَاسَ عَدًّا ـ اِلٰى وَقْتِ عَذَابِهِمْ ـ

৮৪. সুতরাং তাদের বিষয়ে আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না শাস্তি কামনা করে। আমি তো তাদের জন্য গণণা করছি দিন রাত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ধারিত কাল তাদের শাস্তিকাল পর্যন্ত।

٨٥. اُذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ بِاِيْمَانِهِمْ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ـ جَمْعُ وَافِدٍ بِمَعْنٰى رَاكِبٍ ـ

৮৫. স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যেদিন মুত্তাকীদেরকে সমবেত করব তাদের ঈমানের কারণে দয়াময়ের সামনে মেহমানরূপে وَفْدًا শব্দটি وَافِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– আরোহী।

٨٦. وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ بِكُفْرِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ـ جَمْعُ وَارِدٍ بِمَعْنٰى مَاشٍ عَطْشَانَ ـ

৮৬. এবং অপরাধীদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাব তাদের কুফরির কারণে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নাম পানে وِرْدًا শব্দটি وَارِدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পদব্রজে চলন্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি।

٨٧. لَا يَمْلِكُوْنَ اَىِ النَّاسُ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ـ اَىْ شَهَادَةَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

৮৭. অন্য কারো ক্ষমতা থাকবে না অর্থাৎ কোনো মানুষের সুপারিশ করার, তবে যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ তা'আলার মাধ্যম ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই।

٨٨. وَقَالُوْا اَىِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ـ

৮৮. তারা বলে অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা এবং যারা ধারণা করে যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা। যে, দয়াময় প্রভু সন্তান গ্রহণ করেছেন।

٨٩. قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ـ اَىْ مُنْكَرًا عَظِيْمًا ـ

৮৯. আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন– তোমরা তো এমন এক বিভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছ অর্থাৎ চরম জঘন্য।

অনুবাদ :

٩٠. يَكَادُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ بِالنُّوْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ وَ تَشْدِيْدِ الطَّاءِ بِالْاِنْشِقَاقِ مِنْهُ مِنْ عِظَمِ هٰذَا الْقَوْلِ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ـ اَىْ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ اَجْلِ ـ

৯০. যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে। يَكَادُ শব্দটি يَاءٌ এবং تَاءٌ উভয়ভাবে পঠিত রয়েছে। يَنْفَطِرْنَ শব্দটি نُوْن -এর সাথে। অপর কেরাতে يَتَفَطَّرْنَ অর্থাৎ تَاءٌ দিয়ে এবং طَاءٌ বর্ণটি তাশদীদসহ। অর্থ– বিদীর্ণ হওয়া, ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ কথার জঘন্যতার কারণে পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। অর্থাৎ এ কারণে তাদের উপর আপতিত হবে।

٩١. اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ج

৯১. যেহেতু তারা দয়াময় প্রভুর প্রতি সন্তান আরোপ করে।

٩٢. قَالَ تَعَالٰى وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ط اَىْ مَا يَلِيْقُ بِهٖ ذٰلِكَ ـ

৯২. আল্লাহ তা'আলা বলেন– অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় প্রভুর জন্য শোভনীয় নয়। অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে এটা সমীচীন নয়।

٩٣. اِنْ اَىْ مَا كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ـ ذَلِيْلًا خَاضِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْهُمْ عُزَيْرٌ وَعِيْسٰى ـ

৯৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময় প্রভুর নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও বিনীত হয়ে কিয়ামতের দিন। তাদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত উজাইর (আ.)-ও থাকবেন।

٩٤. لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ـ فَلَا يَخْفٰى عَلَيْهِ مَبْلَغُ جَمِيْعِهِمْ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ـ

৯৪. তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কাজেই তাঁর নিকট তাদের সকলের পরিধি গোপন নয় এবং তাদের কোনো একজনেরও নয়।

٩٥. وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ـ بِلَا مَالٍ وَلَا نَصِيْرٍ يَمْنَعُهُ ـ

৯৫. এবং কিয়ামত দিবসে তাদের প্রত্যেকেই তাঁর নিকট একাকী অবস্থায় আসবে। সম্পদশূন্য ও শাস্তি প্রতিহতকারী সাহায্যকারী ব্যতিরেকে।

٩٦. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ـ فِيْمَا بَيْنَهُمْ يَتَوَادُّوْنَ وَيَتَحَابُّوْنَ وَيُحِبُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

৯৬. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় প্রভু অবশ্যই তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা তারা পরস্পর একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসবেন এবং আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ভালোবাসবেন।

٩٧. فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ بِلِسَانِكَ الْعَرَبِىِّ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ النَّارَ بِالْاِيْمَانِ وَتُنْذِرَ تُخَوِّفَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ـ جَمْعُ اَلَدَّ اَىْ ذُوْ جَدَلٍ بِالْبَاطِلِ وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ ـ

৯৭. আমি তো একে সহজ করে দিয়েছি অর্থাৎ কুরআনকে আপনার ভাষায় আরবি ভাষায় যাতে আপনি খোদাভীরুদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের ঈমান আনার মাধ্যমে এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারেন। لُدٌّ শব্দটি اَلَدّ -এর বহুবচন অর্থ– ভ্রান্ত বিষয়ে বিতণ্ডাকারী আর তারা হলো মক্কার কাফেররা।

৯৮. وَكَمْ اَىْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ط اَىْ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيْبِهِمُ الرُّسُلَ هَلْ تُحِسُّ تَجِدُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ـ صَوْتًا خَفِيًّا ؟ لَا ـ فَكَمَا اَهْلَكْنَا اُولٰئِكَ نُهْلِكُ هٰؤُلَاءِ ـ

অনুবাদ :

৯৮. তাদের পূর্বে আমি কত অনেক মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি অর্থাৎ অতীত কালের অনেক জাতিকে তাদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে। আপনি কি অনুভব করেন দেখতে পান তাদের কাউকে, অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পান কি? না। رِكْزًا অর্থ– মৃদু আওয়াজ। কাজেই তাদেরকে আমি যেভাবে ধ্বংস করেছি এদেরকেও সেভাবেই ধ্বংস করব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَوُزُّ : শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ ـ مُضَارِعْ-এর সীগাহ আর اَزًّا হলো -এর মাফউলে মুতলাক। অর্থ– সশব্দে নড়াচড়া করা। এটা اَزِيْزُ الْقِدْرِ তথা হাঁড়িতে কোনো বস্তু টগবগ করা থেকে গৃহীত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের বিভিন্নরূপ উক্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিস্ময় প্রকাশ।

قَوْلُهُ اَوِ الْاَنْفَاسِ : এটা نَعُدُّ لَهُمْ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। আর اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ হলো فَلَا تَعْجَلْ-এর عِلَّتْ বা কারণ। عَدًّا হলো نَعُدُّ-এর মাফউলে মুতলাক। يَوْمَ نَحْشُرُ হলো اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের ظَرْف, এর আমেল হলো لَا يَمْلِكُوْنَ অথবা نَعُدُّ

قَوْلُهُ وِرْدًا : এটা وَارِدٌ-এর اِسْمُ جَمْعٍ অর্থ– তৃষ্ণার্ত, ঘাটে আগমনকারী। لَا يَمْلِكُوْنَ বাক্য হয়ে اَلْمُجْرِمُوْنَ থেকে حَالْ আর اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ এটা لَا يَمْلِكُوْنَ-এর যমীর থেকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ

قَوْلُهُ يَتَفَطَّرْنَ : এটা تَفَطُّرٌ থেকে مُضَارِعْ ـ جَمْعُ مُؤَنَّثْ غَائِبْ; অর্থ– তা ফেটে যাবে। هَدًّا শব্দটি تَخِرُّ-এর ভিন্ন শব্দ দ্বারা مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ অর্থাৎ تَهُدُّ هَدًّا অর্থে। আর هَدًّا শব্দটি اَلْجِبَالُ থেকে حَالْ -ও হতে পারে। ব্যাখ্যাকার (র.) مِنْ اَجَلِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا হলো تَنْشَقُّ ও تَخِرُّ-এর مَفْعُوْلْ لَهُ স্থানগতভাবে اَنْ ـ مَنْصُوْبْ -এর পূর্বে اِسْمْ উহ্য হলে বাক্যটি স্থানগতভাবে মাজরূরও হতে পারে। আবার মা'রফূও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে اَنْ مَصْدَرِيَّةْ হবে। বাক্যটি হবে এরূপ– اَلْمُوْجِبُ لِذٰلِكَ دُعَائُهُمْ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

قَوْلُهُ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এর মধ্যে مَنْ হলো نَكِرَةْ مَوْصُوْفَةْ আর فِى السَّمٰوٰتِ হলো তার সিফত। উভয়টি মিলে مُبْتَدَأْ আর اِلَّا اٰتِى হলো তার খবর। كُلُّ শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে اٰتِى -কে একবচন নেওয়া হয়েছে। (س) وُدًّا অর্থ– ভালোবাসা, বন্ধুত্ব।

قَوْلُهُ لُدًّا : لُدًّا শব্দটি اَلَدُّ-এর বহুবচন। ঝগড়াকারী, বিতর্ককারী। এর দ্বারা কাফের ও মুশরিকরা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ الْعَرَبِيْ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে لِسَانٌ দ্বারা আরবি শব্দ উদ্দেশ্য, ভাষা উদ্দেশ্য নয়। رِكْزًا শব্দটি اِسْمْ অর্থ– শব্দ, স্বর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ الخ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের পথভ্রষ্টতা এবং আখিরাতে তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে কাফেরদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, শয়তানের উস্কানী এবং প্ররোচনাতেই তারা কুফর ও নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাই শয়তানের ইঙ্গিতেই তারা নাচতে থাকে।

قَوْلُهُ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا : আরবি অভিধানে حَضَّ ـ فَزَّ ـ اَزَّ ـ هَزَّ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোনো কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। اَزٌّ শব্দের অর্থ– পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোনো কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং এর অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

قَوْلُهُ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا : উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোনো কিছুই বল্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপরে আজাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফিকহবিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন! ইবনে সামমাক আরজ করলেন, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুণতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন– حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تَعُدُّ فَكُلَّمَا * مَضٰى نَفَسٌ مِنْكَ اِنْتَقَصَ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়। কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। –[কুরতুবী]

জনৈক বুজুর্গ বলেছেন– وَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالدُّنْيَا وَلَذَّتِهَا * فَتًى يُعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالنَّفَسُ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا : যারা বাদশাহ অথবা কোনো শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে– তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন, তাদের সৎকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। –[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا : وِرْد -এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وِرْدًا -এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হলো।

قَوْلُهُ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, عَهْد [অঙ্গীকার] বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর সাক্ষ্য বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেন, عَهْد বলে কুরআনের হিফজ বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا : এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলি প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তা'আলার নামের তাসবীহ পাঠ করে। যেমন কুরআন বলে– وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করে না, এমন কোনো বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনার কথাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করলে বিশেষত আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্তু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ তা'আলার কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশি হতে পারে না।

قَوْلُهُ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا : অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর এই ভালোবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তিনি আরো বলেন, কুরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়- إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا -[রূহুল মা'আনী]

হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন। -[কুরতুবী]

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন- فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ "হে আল্লাহ! আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি লোকজনের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌছে এবং বিশ্বের কোণে কাণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا : বোধ্যগম্য নয় এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয়, যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে সব রাজ্যাধিপতি জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোনো ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শুনা যায় না।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, আর এ আয়াতসমূহে রয়েছে মু'মিনদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ। ইরশাদ হয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সৃষ্টি করবেন সকলের অন্তরে ভালোবাসা।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا - শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আমি যখন মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলাম তখন মক্কাবাসী কিছু বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হলো। তাদের প্রীতি-ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠতে লাগলো। ঐ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ছিল শয়বা ইবনে রবীয়া, উৎবা ইবনে রবীয়া, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৫]

তাবারানী (র.) 'আল আউসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতখানি হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

ইবনে মরদবিয়া এবং দায়লামী (র.) হযরত বারা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, হে আলী! তুমি বল- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ عَهْدًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো প্রতিশ্রুতি এবং তোমার নিকট আমার জন্যে রেখো ভালোবাসা এবং আমার জন্যে মু'মিনদের অন্তরেও রেখে দিও ভালোবাসা। তখন আয়াত নাজিল হয়। তাবারানী ও ইবনে মারদবিয়া (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ : সূরা ত্বা-হা মক্কায় অবতীর্ণ

مِأَةٌ وَّخَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعُوْنَ وَثِنْتَانِ

১৩৫/১৪২ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. طٰهٰ ـ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ ـ

১. ত্বা-হা আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত।

٢. مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ يَا مُحَمَّدُ لِتَشْقٰى ـ لِتَتْعَبَ بِمَا فَعَلْتَ بَعْدَ نُزُوْلِهٖ مِنْ طُوْلِ قِيَامِكَ بِصَلٰوةِ اللَّيْلِ اَىْ خَفِّفْ عَنْ نَفْسِكَ ـ

২. হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি ক্লেশ পাবেন এজন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। অর্থাৎ আপনি কষ্টে নিপতিত হবেন। যা আপনি করেছেন কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর। সালাতুত তাহাজ্জুদ দীর্ঘ কিয়াম করে। অর্থাৎ নিজের উপর থেকে বোঝা লাঘব থেকে করুন!

٣. اِلَّا لٰكِنْ اَنْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةً بِهٖ لِمَنْ يَخْشٰى ـ يَخَافُ اللّٰهَ ـ

৩. বরং আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যে ভয় করে কেবল তার উপদেশার্থে অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে।

٤. تَنْزِيْلًا بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ النَّاصِبِ لَهٗ مِمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ـ جَمْعُ عَلِيًّا كَكُبْرٰى وَكُبَرٍ ـ

৪. এটা তার নিকট হতে অবতীর্ণ تَنْزِيْلًا শব্দটি উহ্য عَامِل نَاصِبٌ তথা اَنْزَلْنَاهُ-এর পরিবর্তে এসেছে। যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। اَلْعُلٰى শব্দটি عَلِيًّا-এর বহুবচন। যেমন كُبَرٌ শব্দটি كُبْرٰى-এর বহুবচন।

٥. هُوَ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ وَهُوَ فِى اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمُلْكِ اسْتَوٰى ـ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ ـ

৫. দয়াময় প্রভু আরশে সমাসীন অভিধানে 'আরশ' বলা হয় রাজ সিংহাসনকে, সমাসীন হওয়া আল্লাহ তা'আলার শান অনুপাতে যেমনটি উচিত তেমনটি উদ্দেশ্য।

٦. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ـ هُوَ التُّرَابُ النَّدِىُّ وَالْمُرَادُ الْاَرْضُوْنَ السَّبْعُ لِاَنَّهَا تَحْتَهٗ ـ

৬. তা তাঁরই যা আছে আকাশমণ্ডলীতে পৃথিবীতে, এই দুয়ের অন্তবর্তী স্থানে যত সৃষ্টি রয়েছে এবং ভূগর্ভে আর তা হলো লোনা মাটি, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সপ্ত জমিন। কেননা তা সব এর নিচে রয়েছে।

৭. وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فِىْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ فَاللّٰهُ غَنِيٌّ عَنِ الْجَهْرِ بِهٖ فَإِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى ـ مِنْهُ أَىْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ النَّفْسُ وَمَا خَطَرَ وَلَمْ تُحَدِّثْ بِهِ فَلَا تَجْهَدْ نَفْسَكَ بِالْجَهْرِ ـ

৮. اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ اَلتِّسْعَةُ وَالتِّسْعُوْنَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالْحُسْنٰى مُؤَنَّثُ الْأَحْسَنِ ـ

৯. وَهَلْ قَدْ أَتٰيكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ـ

১০. إِذْ رَأٰى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهٖ لِامْرَأَتِهٖ امْكُثُوْآ هُنَا وَذٰلِكَ فِىْ مَسِيْرِهٖ مِنْ مَدْيَنَ طَالِبًا مِصْرَ إِنِّىْٓ اٰنَسْتُ أَبْصَرْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ شُعْلَةٍ فِىْ رَأْسِ فَتِيْلَةٍ أَوْ عُوْدٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ـ أَىْ هَادِيًا يَدُلُّنِىْ عَلَى الطَّرِيْقِ وَكَانَ أَخْطَأَهَا لِظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَقَالَ لَعَلَّ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِوَفَاءِ الْوَعْدِ ـ

১১. فَلَمَّآ أَتٰيهَا وَهِىَ شَجَرَةُ عَوْسَجٍ نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ـ

অনুবাদ :

৭. যদি আপনি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলেন জিকিরে কিংবা দোয়ায়, তবে আল্লাহ তা'আলা উচ্চৈঃস্বরে বলা থেকে অমুখাপেক্ষী তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। তার থেকে অর্থাৎ যা মনে মনে বলে এবং হৃদয়ের গহীনে কল্পনা করে অথচ এখনও তা ব্যক্ত করেনি। কাজেই উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করার জন্য নিজেকে কষ্টে নিপতিত করবেন না।

৮. আল্লাহ তা'আলা তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই হাদীসে নিরানব্বই নামের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর اَلْحُسْنٰى শব্দটি اَلْأَحْسَنُ -এর مُؤَنَّثٌ।

৯. আপনার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

১০. তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন তার স্ত্রীকে তোমরা এখানে থাক এটা ছিল মাদায়েন থেকে মিশরের যাত্রাপথে। আমি অনুভব করছি দেখছি আগুন। সম্ভবত আমি তা হতে তোমাদের জন্য জ্বলন্ত আঙ্গার আনতে পারব। কোনো প্রদীপের সলতের মাথায় করে কিংবা কোনো ডালের সাহায্যে। অথবা আমি আগুনের নিকটে কোনো পথনির্দেশ পাব অর্থাৎ কোনো পথপ্রদর্শককে যিনি আমাকে রাস্তা বাতলে দিবেন। তিনি রাত্রির অন্ধকারের কারণে রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন। আর তিনি لَعَلَّ তথা সম্ভবত বলেছেন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় না থাকার কারণে।

১১. অতঃপর যখন তিনি আগুনের নিকট আসলেন তা ছিল আউসজ বৃক্ষ তখন আহ্বান করে বলা হলো, হে মূসা!

অনুবাদ :

١٢. اِنِّیْٓ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بِتَاوِيْلِ نُوْدِیَ بِقِيْلَ وَبِفَتْحِهَا بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ اَنَا تَوْكِيْدٌ لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ج اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ الْمُطَهَّرِ اَوِ الْمُبَارَكِ طُوًى - بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ بِالتَّنْوِيْنِ وَتَرْكِهٖ مَصْرُوْفٌ بِاِعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَغَيْرَ مَصْرُوْفٍ لِلتَّانِيْثِ بِاِعْتِبَارِ الْبُقْعَةِ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ -

১২. আমিই আপনার প্রতিপালক! অতএব আপনার পাদুকা খুলে ফেলুন এখানে اِنِّیْ-এর হামযা যের যুক্ত তখন نُوْدِیَ-কে قِيْلَ অর্থে ধরা হবে। আর اِنِّیْ-এর হামযা যদি যবরযুক্ত ধরা হয় তবে পূর্বে একটি بَاء উহ্য মানতে হবে অর্থাৎ بِاَنِّیْ আর اَنَا টা يَائے مُتَكَلِّمْ-এর তাকিদ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন। مُقَدَّسِ শব্দের অর্থ পবিত্র অথবা বরকতময়। طُوًى শব্দটি اَلْمُقَدَّسِ হতে بَدَل অথবা عَطْف بَيَانْ হয়েছে। আর طُوًى শব্দটি تَنْوِيْن সহও হতে পারে তখন এটা مُنْصَرِفْ হবে مَكَانْ তথা সাধারণ স্থান হিসেবে। আবার তানভীনবিহীনও হতে পারে। তখন এটা غَيْر مُنْصَرِفْ হবে بُقْعَة-এর অর্থের হিসেবে আর তাতে تَانِيْث এবং عَلَمِيَّتْ পাওয়া গেছে।

١٣. وَاَنَا اخْتَرْتُكَ مِنْ قَوْمِكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى - اِلَيْكَ مِنِّیْ -

১৩. আমি আপনাকে মনোনীত করেছি আপনার সম্প্রদায় থেকে। অতএব যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে আপনি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করুন। আমার পক্ষ হতে আপনার প্রতি।

١٤. اِنَّنِیْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ لا وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ - فِيْهَا -

১৪. আমিই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত প্রতিষ্ঠা করুন!

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لِتَشْقٰى اَیْ لِتَتْعَبَ : অর্থ হচ্ছে- আমি কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি নিজেকে অতিরিক্ত চিন্তার কারণে কষ্টে নিপতিত করবেন।

قَوْلُهٗ قَبَسٍ : অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, জ্বলন্ত কয়লা।

قَوْلُهٗ طُوًى : এটা সিরিয়ার অন্তর্গত একটি উপত্যকার নাম।

قَوْلُهٗ طٰهٰ : ব্যাখ্যাকার (র.) اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা حُرُوْف مُقَطَّعَة-এর অন্তর্গত। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এর সঠিক জ্ঞান রাখেন।

قَوْلُهٗ اِلَّا لٰكِنْ : ব্যাখ্যাকার (র.) اِلَّا-এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ অর্থাৎ لٰكِنْ اَنْزَلْنَاهُ تَذْكِرَةً অর্থে। কেননা تَذْكِرَة শব্দটি تَشْقٰى - مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর সমজাতীয় নয়।

قَوْلُهٗ تَنْزِيْلًا : এটা উহ্য نَزَّلْنَا ফে'লের মাসদার। ফে'লকে বিলুপ্ত করে তার স্থলে মাসদার উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ ধরনের বিলোপ সাধন করা ওয়াজিব। কারণ মাসদার অর্থ ও আমলের ক্ষেত্রে ফে'লের স্থলাভিষিক্ত হয়। এখানে বদল দ্বারা পারিভাষিক বদল উদ্দেশ্য নয়; বরং শাব্দিক বদল তথা পরিবর্তে আসা উদ্দেশ্য। بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ-এর অর্থ হলো, تَنْزِيْلًا

শব্দটি উচ্চারণ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তার নসব দানকারী ফে'ল, তথা উহ্য نَزَّلْنَا -এর স্থলাভিষিক্ত। مِمَّنْ خَلَقَ হলো تَنْزِيْلًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى : এর মধ্যে জিনসের আতফ জিনসের উপর ঘটেছে। মুফরাদের উপর বহুবচনের আতফ নয়। সুতরাং এখন অনুচিত হওয়ার প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল। هُوَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি উহ্য هُوَ মুবতাদা-এর خَبَرٌ হওয়ার কারণেও مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ وَهَلْ اَتَاكَ : এটা জুমলায়ে মুস্তানিফা। এখানে আল্লাহ তা'আলার নবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো মূলত উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। هَلْ অব্যয়টি قَدْ অর্থে। اِذْ رَاٰى হলো حَدِيْثُ مُوْسٰى -এর যরফ। اُمْكُثُوْا বহুবচন ও পুরুষলিঙ্গ। অথচ এর দ্বারা কেবল হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রীর প্রতি এর সম্বোধন করা হয়েছে। এর উত্তর এই যে, اَهْل শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচনের সীগাহ উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা সম্মান অর্থে অথবা খাদেম ও সঙ্গে থাকা সন্তানাদির প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচনের সীগাহ উল্লিখিত হয়েছে। اٰنَسْتُ -এর ব্যাখ্যা اَبْصَرْتُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِيْنَاس -এর অর্থ হলো কোনো পন্থায় অনুভব করা। আর এখানে بَصَرٌ দ্বারা অনুভব করার অর্থ উদ্দেশ্য। فَتِيْلَة অর্থ- বাতি, সলতা প্রভৃতি। هُدًى শব্দটি هَادٍ অর্থে। عوسج এক ধরনের কাটা বিশিষ্ট গাছ, বনকুল। কেউ কেউ আঙ্গুর ও কেউ কেউ বনকুল উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এটাকে হিন্দী ভাষায় আকাশবেল ও বাংলায় আলোকলতা বলা হয়। মাটিতে কোনো গোড়া থাকে না। বরং গাছ থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে এবং যে গাছের উপর বিস্তার লাভ করে তাকে শুকিয়ে ফেলে। طُوًى শব্দটি وَادٍ থেকে বদল কিংবা আতফে বয়ান। এটাকে مُنْصَرِفٌ ও غَيْر مُنْصَرِفٌ উভয়রূপে পড়া যায়। স্থান অর্থ হলে তখন مُنْصَرِفٌ হবে। আর بُقْعَة -এর অর্থ হলে নামবাচক ও স্ত্রীলিঙ্গের কারণ غَيْر مُنْصَرِفٌ হবে।

قَوْلُهُ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ : এটা مِمَّا يُوْحٰى থেকে বদল হয়েছে। فِيْهَا অর্থাৎ নামাজে اَللّٰهُ শব্দ বিলুপ্ত মুবতাদার খবর। অর্থাৎ بِمَا ذُكِرَ مِنَ النُّعُوْتِ الْجَلِيْلَةِ اللّٰهُ - اَلْمَنْعُوْتُ সে সত্তা যিনি উল্লিখিত উত্তম গুণাবলি সম্বলিত। তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ শব্দটি مُبْتَدَأ আর لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তার খবরও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ط . ه এ দু'টি অক্ষরকে মুকাত্তায়াত বলা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, طٰهٰ আল্লাহ তা'আলার নাম। এক্ষেত্রে এ শব্দটি শপথের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- হা মীম। প্রিয়নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন- حٰمٓ - لَا يُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ "হা মীমের শপথ! এ কাফেরদেরকে সাহায্য করা হবে না এবং তারা সফল হবে না।"

মুকাতেল ইবনে হাব্বান বলেছেন, 'তোয়াহা'র অর্থ হলো উভয় পা জমিনে রাখো, তাহাজ্জুদের নামাজে উভয় পা জমিনে স্থাপন কর। ইবনে মারদবিয়া (র.) তাঁর তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, যখন সূরা মুযযাম্মিল-এর আয়াত- يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ হে কম্বলওয়ালা, রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হোন অল্প সময় ব্যতীত।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী ﷺ সারারাত আল্লাহ তা'আলার দরবারে দণ্ডায়মান থাকতেন ফলে তার কদম মোবারকে রস জমে যায়, কদম মোবারক ফুলে যায়। তখন তিনি একটি পা মাটিতে রাখতেন আরেকটি পা তুলে রাখতেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন এবং বললেন, তোয়াহা। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ উভয় পা মাটিতে রাখুন।

তাফসীরকার হযরত মুজাহিদ (র.) আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, তোয়াহা অর্থ হলো, হে ব্যক্তি। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, হিব্রু ভাষায় তোয়া হা অর্থ হলো- হে ব্যক্তি। কালবী (র.) ও আলোচ্য শব্দটির এ অনুবাদই করেছেন। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আলোচ্য শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে বলে বুঝা যায়।

-[তাফসীরে মাযহারী খ. ৭, পৃ. ৩৫৮-৫৯]

ইমাম রাযী (র.) এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন। যথা–

১. ط অক্ষরটি দ্বারা হাবিয়া বুঝানো হয়েছে। [দোজখের একটি নাম] এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা জান্নাত এবং দোজখের শপথ করেছেন।

২. বর্ণিত আছে যে ইমাম জাফর সাদেক (রা.) বলতেন– 'তোয়া' দ্বারা আহলে বাইতের তাহারাত বা পবিত্রতা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর 'হা' অক্ষর দ্বারা আহলে বাইতের হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন 'তোয়া' দ্বারা পবিত্রতা আর 'হা' দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে সেই মহান ব্যক্তি যিনি গায়েবী বিষয়ে মানুষকে হেদায়েত করেন। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ يَا رَجُلُ [হে ব্যক্তি] এবং ইবনে ওমর (রা.) থেকে يَا حَبِيْبِى [হে আমার বন্ধু] বর্ণিত আছে। কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, طٰهٰ ও يٰسٓ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন, কুরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الٓمٓ -এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো مُتَشَابِهَاتٌ অর্থাৎ গোপন ভেদ, যার মর্ম আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ জানে না। طٰهٰ শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى : لِتَشْقٰى শব্দটি شَقَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাজে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোনো রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কুরআনের দাওয়াত কবুল করুক তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে– আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। এ কাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না? তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। –[কুরতুবী সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى : ইবনে কাছীর (র.) বলেন, কুরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবান বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কুরআন তো নয় সাক্ষাৎ বিপদ নাজিল হয়েছে। রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর।, হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কুরআন ও কুরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান মঙ্গলই মঙ্গল এবং সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও নির্বোধ। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাছীর (র.) অপর একটি সহীহ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা (রা.) কর্তৃক ইবনে হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا قَعَدَ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ لِقَضَاءِ عِبَادِهٖ اِنِّىْ لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِىْ وَحِكْمَتِىْ فِيْكُمْ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَغْفِرَلَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلَا اُبَالِىْ .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তার সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন, আমি আমার ইলম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গুনাহ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোনো পরওয়া করি না।

কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কুরআন বর্ণিত ইলমের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِمَنْ يَخْشٰى শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى : اِسْتِوَاءٌ عَلَى الْعَرْشِ [আরশের উপর সমাসীন হওয়া।] সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারো জানা নেই। এটা مُتَشَابِهَاتٌ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ তা'আলার মান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

قَوْلُهُ وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى : আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثَرٰى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثَرٰى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপারে থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

قَوْلُهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى : মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারো কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سِرٌّ পক্ষান্তরে اَخْفٰى বলে সে কথা বুঝানো হয়েছে যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোনো সময় আসবে। আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কোনো মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

قَوْلُهُ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -এর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী ﷺ -এর জানা থাকা দরকার, যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ আমি পয়গাম্বরগণের এমন সব কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করবেন। তাফসীরে বাহরে মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আরজ করলেন, এখন আমি আমার জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোঁজ করছিল। এ আশংকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা বাকি ছিল না। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তার প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোনো সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে

গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই এর স্থলে চকমকি পাথর ব্যবহার করা হতো। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত। হযরত মূসা (আ.) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা? সম্ভবত আগুনের কাছে কোনো পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি। যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোনো খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর-সঙ্গীও ছিল। কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। –[বাহরে মুহীত।]

قَوْلُهُ فَلَمَّا اَتَاهَا : অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন। মুসনাদে আহমদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ.) আগুনের কাছে পৌঁছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোনো ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বেড়ে গেছে। হযরত মূসা (আ.) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোনো স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হলো না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্র করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলা বাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়েবী আওয়াজ হলো। –[রূহুল মা'আনী] হযরত মূসা (আ.) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তার ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তোয়া'।

قَوْلُهُ نُوْدِيَ يَا مُوْسٰى اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ : বাহরে মুহীত রূহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আ.) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোনো দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে। শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মুজেযার মতোই। আওয়াজের সারমর্ম এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ তা আগুন নয়, আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, "আমিই তোমার পালনকর্তা।" হযরত মূসা (আ.) কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া হযরত মূসা (আ.) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবের্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরিক আছে। এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ তা'আলারই।

হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন : রূহুল মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেওয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বাইক' [আমি হাজির আছি] বলে জবাব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হলো, আমি আপনার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, নাকি আপনার প্রেরিত কোনো ফেরেশতার কথা শুনছি? জবাব হলো, আমি নিজেই আপনার সাথে কথা বলছি। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম

নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয় তার জবাব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শুনা যায়। হযরত মূসা (আ.) কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকেও কালাম শুনেননি এবং শুধু কানেই শুনেননি, বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। -

قَوْلُهُ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত মূসা (আ.)-এর পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী (রা.), হাসান বসরী ও ইবনে জুরাইজ (র.) থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে হযরত মূসা (আ.)-এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন, বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, **রাসূলুল্লাহ ﷺ** বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন, إِذَا كُنْتَ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।
জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া সব ফিকহবিদের মতে জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে **পাকজুতা পরিধান করে নামাজ** পড়া প্রমাণিতও রয়েছে। কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামাজ পড়া **হতো। কারণ** এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন। যেমন বায়তুল্লাহ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى - কুরআন শ্রবণের আদব : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কুরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোনে অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বুঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদবসহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা বুঝারও তৌফিক দান করেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ : এই কালামে হযরত মূসা (আ.)-কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى বলে রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِىْ -এর অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর, আমা ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। এটা তাওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ বলে পরকালের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। فَاعْبُدْنِىْ এই নির্দেশে নামাজের কথাও রয়েছে।

কিন্তু নামাজকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাজ সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামাজ ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামাজ বর্জন কাফেরদের আলামত।

قَوْلُهُ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ : উদ্দেশ্য এই যে, নামাজের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ। নামাজ আদ্যোপান্ত জিকিরই জিকির; মুখে, অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে জিকির। তাই নামাজে জিকির তথা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত নয়। কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِىْ শব্দের এক অর্থ এরূপও যে, কারো নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোনো কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাজের কথা ভুলে গেলে এবং নামাজের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাজের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামাজ পড়ে নিতে হবে।

অনুবাদ :

١٥. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا عَنِ النَّاسِ وَيَظْهَرُ لَهُمْ قُرْبُهَا بِعَلَامَاتِهَا لِتُجْزَىٰ فِيهَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ـ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ ـ

১৫. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই। মানুষ থেকে। তবে বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দ্বারা এর নিকটবর্তী হওয়া বুঝা যাবে। যাতে ফল লাভ করতে পারে সেদিন প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী এর দ্বারা ভালো ও মন্দের।

١٦. فَلَا يَصُدَّنَّكَ يَصْرِفَنَّكَ عَنْهَا أَيْ عَنِ الْإِيمَانِ بِهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فِي إِنْكَارِهَا فَتَرْدَىٰ ـ فَتَهْلِكَ إِنْ صُدِدْتَ عَنْهَا ـ

১৬. সুতরাং সে যেন আপনাকে নিবৃত্ত না রাখে ফিরিয়ে না রাখে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপনে যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তা অস্বীকারের ব্যাপারে। নিবৃত্ত হলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন যদি তা বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকতেন।

١٧. وَمَا تِلْكَ كَائِنَةٌ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ـ الْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيرِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ الْمُعْجِزَةَ فِيهَا ـ

১৭. হে মূসা! আপনার ডান হস্তে এটা কি? এখানে إِسْتِفْهَامْ টা تَقْرِيْر-এর জন্য এসেছে। যাতে তার মধ্যে মুজেযা প্রতিফলিত হতে পারে।

١٨. قَالَ هِيَ عَصَايَ ج أَتَوَكَّؤُا أَعْتَمِدُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْوُثُوبِ وَالْمَشْيِ وَأَهُشُّ أَخْبِطُ وَرَقَ الشَّجَرِ بِهَا لِيَسْقُطَ عَلَىٰ غَنَمِي فَتَأْكُلُهُ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ جَمْعُ مَأْرَبَةٍ مُثَلَّثُ الرَّاءِ أَيْ حَوَائِجُ أُخْرَىٰ ـ كَحَمْلِ الزَّادِ وَالسِّقَاءِ وَطَرْدِ الْهَوَامِّ زَادَ فِي الْجَوَابِ بَيَانَ حَاجَاتِهِ بِهَا ـ

১৮. তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি। আমি এতে ভর দেই ঠেস লাগাই। ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এবং চলার সময়। এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি। গাছের পাতা ঝরাই। ফলে তারা তা ভক্ষণ করে। এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে مَآرِبُ এটা مَأْرَبَةٌ-এর বহুবচন। এর رَاء বর্ণে তিন প্রকারের হরকতই প্রযোজ্য। অর্থ– প্রয়োজনসমূহ। যেমন– খানা ও পানি বহন করা। কষ্টদায়ক প্রাণীকে প্রতিহত করা ইত্যাদি। জবাবের পরিমাণে তিনি প্রয়োজনের বর্ণনাকে দীর্ঘায়িত করেছেন।

١٩. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ـ

১৯. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা আপনি এটা নিক্ষেপ করুন!

٢٠. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ثُعْبَانٌ عَظِيمٌ تَسْعَىٰ ـ تَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهَا سَرِيعًا كَسُرْعَةِ الثُّعْبَانِ الصَّغِيرِ الْمُسَمَّىٰ بِالْجَانِّ الْمُعَبَّرِ بِهِ عَنْهَا فِي آيَةٍ أُخْرَىٰ ـ

২০. অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। উপুড় হয়ে দ্রুত বেগে جَانٌ নামক ছোট সর্পের ন্যায় চলতে আরম্ভ করল। যাকে অন্য আয়াতে এ নামে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদ :

٢١. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ مِنْهَا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ اَيْ اِلٰى حَالَتِهَا الْاُوْلٰى . فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ فَمِهَا فَعَادَتْ عَصًا وَتَبَيَّنَ اَنَّ مَوْضِعَ الْاِدْخَالِ مَوْضِعُ مَسْكِهَا بَيْنَ شُعْبَتَيْهَا وَاُرِىَ ذٰلِكَ السَّيِّدُ مُوْسٰى لِئَلَّا يَجْزَعَ اِذَا انْقَلَبَتْ حَيَّةً لَدٰى فِرْعَوْنَ .

২১. তিনি বললেন, আপনি একে ধরুন, ভয় করবেন না। এটা থেকে আমি একে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দেব। سِيرَتَهَا শব্দটি مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা হরফে জার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে। তিনি তার মুখে হাত প্রবেশ করালেন। ফলে তা লাঠিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রবেশ করানোর জায়গা উভয় শাখার মাঝে ধরার জায়গা ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-কে এ কারণে এটা দেখানো হয়েছে যে, যখন ফেরাউনের এই লাঠি সর্পে রূপান্তরিত হবে তখন যেন তিনি ভয় পেয়ে না যান।

٢٢. وَاضْمُمْ يَدَكَ الْيُمْنٰى بِمَعْنَى الْكَفِّ اِلٰى جَنَاحِكَ اَيْ جَنْبِكَ الْاَيْسَرِ تَحْتَ الْعَضُدِ اِلَى الْاِبِطِ وَاَخْرِجْهَا تَخْرُجْ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اَيْ بَرَصٍ تَضِيئُ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ تَغْشَى الْبَصَرَ اٰيَةً اُخْرٰى . وَهِىَ وَبَيْضَاءُ حَالَانِ مِنْ ضَمِيرِ تَخْرُجْ .

২২. আপনার হাত রাখুন ডান হাত অর্থাৎ হাতের তালু, আপনার বগল তলে অর্থাৎ বাম পার্শ্বের বাহু থেকে বগল পর্যন্ত এবং তা বের করুন। এটা বের হয়ে আসবে পূর্বের বাদামী রংয়ের বিপরীত নির্মল উজ্জ্বল হয়ে কোনো রোগ ছাড়াই। যেমন শ্বেত রোগ যা সূর্যের ন্যায় আলোকময় হয়ে চোখ ঝলসে দেয়। অপর একটি নিদর্শন স্বরূপ اٰيَةً اُخْرٰى এবং بَيْضَاءُ উভয়টি تَخْرُجْ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

٢٣. لِنُرِيَكَ بِهَا اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ لِاِظْهَارِهَا مِنْ اٰيٰتِنَا الْاٰيَةِ الْكُبْرٰى . اَيِ الْعُظْمٰى عَلٰى رِسَالَتِكَ وَاِذَا اَرَادَ عَوْدَهَا اِلٰى حَالَتِهَا الْاُوْلٰى ضَمَّهَا اِلٰى جَنَاحِهٖ كَمَا تَقَدَّمَ اَخْرَجَهَا .

২৩. এটা এজন্য যে, আমি আপনাকে দেখাব এর দ্বারা যখন এমনটি করবেন আমার মহা নিদর্শনগুলোর কিছু আপনার রিসালতের ব্যাপারে। আর যখন তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চান তখন প্রথমবারের মতো পার্শ্বদেশে হাত মিলাবেন এবং বের করে আনবেন।

٢٤. اِذْهَبْ رَسُوْلًا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَّعَهٗ اِنَّهٗ طَغٰى . جَاوَزَ الْحَدَّ فِيْ كُفْرِهٖ اِلٰى اِدِّعَاءِ الْاِلٰهِيَّةِ .

২৪. আপনি যান রাসূল হয়ে ফেরআউনের নিকট এবং যারা তার সাথে রয়েছে অর্থাৎ তার মন্ত্রী পরিষদের নিকট সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে অর্থাৎ সে খোদায়ী দাবি করে কুফরিতে সীমালঙ্ঘন করেছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَكَادُ اُخْفِيْهَا : অর্থাৎ আমি তার সময় গোপন রাখার ইচ্ছা করেছি। এটা আরবদের পরিভাষা অনুযায়ী। আরবরা যখন কোনো বিষয়কে খুবই গোপন রাখতে ইচ্ছা করত, তখন বলতো (كَتَمْتُهُ حَتّٰى مِنْ نَفْسِهِ) অর্থাৎ আমি কাউকেই জানাইনি। لِتُجْزٰى শব্দটি اُخْفِيْهَا -এর সাথে কিংবা اٰتِيَةٌ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম ক্ষেত্রে مُتَعَلِّقْ ও مُتَعَلَّقْ -এর মাঝে اَكَادُ اُخْفِيْهَا বাক্যটি مُعْتَرِضَةْ

قَوْلُهُ بِهِ: এটা উহ্য মানার কারণ হলো صِلَه যদি বাক্য হয় তখন তার মধ্যে عَائِدْ তথা যমীর থাকা জরুরি হয়।

قَوْلُهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ : এর মধ্যে مِنْ হলো مَا -এর বর্ণনা।

قَوْلُهُ يَصُدَّنَّكَ : শব্দটি وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ - نَهْىٌ بَا نُوْنِ ثَقِيْلَة মূল অক্ষর হলো ص - د - د -এর ك যমীরটি مَفْعُوْل অর্থ– তোমাকে যেন আদৌ বিরত রাখতে না পারে।

قَوْلُهُ فَتَرْدٰى : এটা মূলত فَاَنْ تَرْدٰى ছিল। এটা হলো جَوَاب نَهْى

قَوْلُهُ وَمَا تِلْكَ : এর মধ্যকার مَا হলো اِسْمِ اِسْتِفْهَامْ مُبْتَدَأْ আর تِلْكَ اِسْمِ اِشَارَة خَبَر - بِيَمِيْنِكَ এটা উহ্য كَائِنَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে حَالْ হয়েছে। مَا تِلْكَ -এর اِسْمِ اِشَارَة তথা اُشِيْرَ এর যমীর থেকে। مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ নয়। কেননা, এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য অসম্ভব; বরং এটা কোনো বিষয়কে দৃঢ় করার জন্য আসে। অর্থাৎ ভালোভাবে দেখে নাও যে, এটা কি? যাতে ভুল ধারণা না হয়। কেননা অচিরেই তা সাপের আকৃতিতে মুজেযাস্বরূপ প্রকাশ লাভ করবে। حَيَّةٌ শব্দটি ছোট বড় সব ধরনের সাপকে বলা হয়। আর جَانٌّ বলা হয় ছোট সাপকে। ثُعْبَانٌ বলা হয় বড় সাপ বা অজগরকে। পবিত্র কুরআনে কোথাও جَانٌّ বলা হয়েছে। আবার কোথাও ثُعْبَانٌ বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, শরীরের গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে তা ثُعْبَانٌ ছিল এবং নড়াচড়া ও দ্রুতগতিতে جَانٌّ ছিল। অথবা প্রথমে جَانٌّ ছিল এবং পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পেয়ে ثُعْبَانٌ হয়েছে। فَاِذَا هِىَ تَسْعٰى এখানে اِذَا হলো مُفَاجَاتِيَّة তথা আকস্মিকতাজ্ঞাপক। هِىَ مُبْتَدَأْ আর حَيَّةٌ প্রথম খবর। আর تَسْعٰى দ্বিতীয় খবর। এটা বাক্য হয়ে حَيَّةٌ -এর حَالْ কিংবা صِفَتْ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ سِيْرَتَهَا : মূলত اِلٰى سِيْرَتِهَا الْاُوْلٰى ছিল। اِلٰى বিলুপ্ত করার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى এটা سَنُعِيْدُهَا -এর মাফঊলের যমীর থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ -ও হতে পারে। مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ এটা تَخْرُجْ -এর مُتَعَلِّقْ ।

قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْكَفِّ : এটা বৃদ্ধি করে এ প্রশ্ন নিরসন করেছেন যে, আরবিতে يَدٌ শব্দটি আঙ্গুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংশকে বলা হয়। আর তাকে বগলে প্রবেশ করানো সম্ভব নয়। এর উত্তর এই যে, এখানে كُلّ বলে جُزْء উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاٰيَةِ : এটা বিলুপ্ত মেনে ইশারা করেছেন যে, اَلْكُبْرٰى হলো উহ্য مَوْصُوْف -এর صِفَتْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَكَادُ اُخْفِيْهَا : অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই। এমন কি পয়গাম্বর ও ফেরেশতাদের কাছ থেকেও। اَكَادُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে– একথাও প্রকাশ করতাম না।

قَوْلُهُ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى : [যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যায়।] এই বাক্যটি اٰتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়। এখানে কেউ সৎ ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়, একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিনক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরোপুরি দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি اَكَادُ اُخْفِيْهَا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ হবে যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময় তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا : এতে হযরত মূসা (আ.)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, আপনি কাফের ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিবেন না। তাহলে তা আপনার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, নবী ও পয়গাম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার আশঙ্কা নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শুনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বরদেরকেও যখন এমনভাবে তাগিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

قَوْلُهُ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى : অর্থাৎ হে মূসা! আপনার হাতে ওটা কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানির সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলি দেখা ও আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনার কারণে তার মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরো একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মুজেযা প্রদর্শন করা হলো। নতুবা হযরত মূসা (আ.)-এর মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَوْلُهُ قَالَ هِيَ عَصَايَ : হযরত মূসা (আ.)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জবাবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) এখানে আসল জবাবের অতিরিক্ত আরো তিনটি বিষয় আরজ করেছেন। ১. এই লাঠি আমার। ২. আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই, দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগলপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং ৩. এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জবাবে ইশক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশক ও মহব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত। যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন- وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى অর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরো অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। -[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জবাবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েজ।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিকক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى : হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এ সাপ সম্পর্কে কুরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে- كَاَنَّهَا جَاۤنٌّ ; আরবি অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَاۤنٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে- فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ; অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। এসব আয়াতের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন এভাবে সম্ভবপর যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল। কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে এটাকে جَاۤنٌّ অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে كَاَنَّهَا শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ, এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে جَاۤنٌّ -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ : جناح আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের করবে তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاۤءَ -এর এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ : স্বীয় রাসূলকে দু'টি বিরাট মুজেযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চলে যান।

অনুবাদ :

٢٥. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ . وَسِّعْهُ لِتَحْمِلَ الرِّسَالَةَ .

২৫. হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দিন! প্রশস্ত করে দিন রিসালাতের দায়িত্ব বহন করার জন্য।

٢٦. وَيَسِّرْ سَهِّلْ لِىْٓ اَمْرِىْ . لِأُبَلِّغَهَا .

২৬. এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন! যাতে আমি তা প্রচার করতে পারি।

٢٧. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ . حُدِّثَتْ مِنْ اِحْتِرَاقِهٖ بِجَمْرَةٍ وَضَعَهَا بِفِيْهِ وَهُوَ صَغِيْرٌ .

২৭. আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন! যে জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল, শিশুকালে মুখে আঙ্গার দিয়ে জিহ্বা পুড়ে ফেলার কারণে।

٢٨. يَفْقَهُوْا يَفْهَمُوْا قَوْلِىْ . عِنْدَ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ .

২৮. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে যাতে রিসালাতের প্রচারকালে তারা আমার কথা অনুধাবন করতে পারে।

٢٩. وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مُعِيْنًا عَلَيْهَا مِّنْ اَهْلِىْ .

২৯. আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে!

٣٠. هٰرُوْنَ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ اَخِى . عَطْفُ بَيَانٍ .

৩০. আমার ভ্রাতা হারূনকে هَارُوْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউল اِجْعَلْ-এর আর اَخِىْ হলো عَطْفُ بَيَانٌ

٣١. اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِىْ . ظَهْرِىْ .

৩১. তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন! অর্থাৎ আমার পিঠকে।

٣٢. وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ . اَىِ الرِّسَالَةِ وَالْفِعْلَانِ بِصِغَتَىِ الْاَمْرِ وَالْمُضَارِعِ الْمَجْزُوْمِ وَهُوَ جَوَابٌ لِلطَّلَبِ .

৩২. এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করুন! অর্থাৎ রিসালাতে اُشْدُدْ এবং اَشْرِكْ শব্দ দুটি اَمْر-এর সীগাহ কিংবা مُضَارِع مَجْزُوْم-এর সীগাহ। এটা হলো তার প্রার্থনার জবাব।

٣٣. كَىْ نُسَبِّحَكَ تَسْبِيْحًا كَثِيْرًا .

৩৩. যাতে আমরা বেশি বেশি পরিমাণে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি।

٣٤. وَّنَذْكُرَكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا .

৩৪. এবং আপনাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে পারি।

٣٥. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا . عَالِمًا فَاَنْعَمْتَ بِالرِّسَالَةِ .

৩৫. আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা অবহিত। সুতরাং আপনি আমাদের উপর রিসালাতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন।

٣٦. قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى . مَنًّا عَلَيْكَ .

৩৬. তিনি বললেন, আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে দেওয়া হলো। আপনার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ।

٣٧. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى .

৩৭. আমি তো আপনার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম।

٣٨. اِذْ لِلتَّعْلِيْلِ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَنَامًا اَوْ اِلْهَامًا لِمَا وَلَدْتُكَ وَخَافَتْ اَنْ يَّقْتُلَكَ فِرْعَوْنُ فِىْ جُمْلَةِ مَنْ يُّوْلَدُ مَا يُوْحٰى ـ فِىْ اَمْرِكَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ ـ

٣٩. اَنِ اقْذِفِيْهِ اَلْقِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ بِالتَّابُوْتِ فِى الْيَمِّ بَحْرِ النِّيْلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ اَىْ شَاطِئِهٖ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ط وَهُوَ فِرْعَوْنُ وَاَلْقَيْتُ بَعْدَ اَنْ اَخَذَكَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ج لِتُحَبَّ مِنَ النَّاسِ فَاَحَبَّكَ فِرْعَوْنُ وَكُلُّ مَنْ رَاٰكَ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ م تُرَبّٰى عَلٰى رِعَايَتِىْ وَحِفْظِىْ لَكَ ـ

٤٠. اِذْ لِلتَّعْلِيْلِ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ مَرْيَمُ لِتَعْرِفَ خَبَرَكَ وَقَدْ اَحْضَرُوْا مَرَاضِعَ وَاَنْتَ لَا تَقْبَلُ ثَدْىَ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ط فَاُجِيْبَتْ فَجَاءَتْ بِاُمِّهٖ فَقَبِلَ ثَدْيَهَا فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِكَ وَلَا تَحْزَنَ ط حِيْنَئِذٍ وَقَتَلْتَ نَفْسًا هُوَ الْقِبْطِىُّ بِمِصْرَ فَاغْتَمَمْتَ لِقَتْلِهٖ مِنْ جِهَةِ فِرْعَوْنَ ـ

অনুবাদ :

৩৮. যখন اِذْ টা تَعْلِيْل -এর জন্য এসেছে। আমি আপনার মাতাকে জানিয়ে ছিলাম স্বপ্নযোগে বা ইলহামের মাধ্যমে। সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানদের সাথে আপনাকেও ফেরাউন হত্যা করবে এ আশঙ্কা করছিলেন। যা জানবার আপনার ব্যাপারে। সামনে আগত اَنِ اقْذِفِيْهِ বাক্যটি مَا يُوْحٰى থেকে بَدْل হয়েছে।

৩৯. যে আপনি তাকে রাখুন সিন্দুকে। এরপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দিন নীলনদে যাতে নদী তাকে তীরে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ নদীর পাড়ে। আর এখানে اَمر টি خبر -এর অর্থে হয়েছে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে। সে হলো ফেরাউন আর আমি ঢেলে দিলাম আপনাকে গ্রহণ করার পর আমার নিকট হতে আপনার প্রতি ভালোবাসা যাতে আপনি মানুষের নিকট প্রিয়পাত্র হন। ফলে ফেরাউন ও যে কেউ দেখত যে আপনাকে ভালোবাসত। যাতে আপনি আমার তত্ত্বাবধানে ও হেফাজতে আপনি লালিত পালিত হন।

৪০. যখন আপনার বোন হাঁটছিল। মারইয়াম, আপনার সংবাদ জানার জন্য। আর লোকজন অনেক ধাত্রী উপস্থিত করেছিল। আর আপনি এদের কোনো একজনেরও স্তন্য গ্রহণ করেননি। তখন সে বলল, আমি তোমাদেরকে বলে দিব, কে এই শিশুর ভার নিবে? তাকে সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো, তখন তিনি তার মাকে নিয়ে এলেন। আর তিনি তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। আমি আপনাকে আপনার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় আপনার সাক্ষাৎ দ্বারা এবং তিনি যেন দুঃখ না পান তখন এবং আপনি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন লোকটি মিশরের কিবতী বংশের অন্তর্গত ছিল। তাকে হত্যা করার কারণে আপনি ফেরাউনের দিক থেকে চিন্তিত হলেন।

فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ـ اِخْتَبَرْنَاكَ بِالْاِيْقَاعِ فِيْ غَيْرِ ذٰلِكَ وَخَلَّصْنَاكَ مِنْهُ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ عَشْرًا فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ لا بَعْدَ مَجِيْئِكَ اِلَيْهَا مِنْ مِصْرَ عِنْدَ شُعَيْبِ النَّبِيِّ وَتَزَوَّجِكَ بِابْنَتِهِ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ فِيْ عِلْمِيْ بِالرِّسَالَةِ وَهُوَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً مِنْ عُمْرِكَ يٰمُوْسٰى ـ

অনুবাদ :

অতঃপর আমি আপনাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই, আমি আপনাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অন্যান্য বিষয়ে লিপ্ত করে আমি আপনাকে পরীক্ষা করেছি এবং তা থেকে আপনাকে মুক্ত করেছি। এরপর আপনি অবস্থান করলেন কিছু বছর দশ বছর মাদায়েন বাসীগণের নিকট মিশর হতে মাদায়েনে গমনের পর হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট এবং তাঁর কন্যার সাথে আপনার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর। এরপর আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন আমার জ্ঞানে রেসালাতের ব্যাপারে। আর তা হলো আপনার বয়স চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়া। হে মূসা

٤١. وَاصْطَنَعْتُكَ اخْتَرْتُكَ لِنَفْسِيْ ج بِالرِّسَالَةِ ـ

৪১. এবং আমি আপনাকে প্রস্তুত করে নিয়েছি নির্বাচন করেছি আমার নিজের জন্য রেসালাতের জন্য।

٤٢. اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ اِلَى النَّاسِ بِاٰيٰتِيْ التِّسْعِ وَلَا تَنِيَا تَفْتُرَا فِيْ ذِكْرِيْ ج بِتَسْبِيْحٍ وَغَيْرِهِ ـ

৪২. আপনি ও আপনার ভ্রাতা যাত্রা করুন মানুষের নিকট আমার নিদর্শনসহ নয়টি আর আপনারা আমার স্মরণে শৈথল্য প্রদর্শন করবেন না। তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَفْقَهُوْا : দোয়ার জবাবে আসার কারণে এটা مَجْزُوْم হয়েছে। وَزِيْرًا শব্দটি وَزْرٌ-এর صِيْغَةُ صِفَتْ অর্থ– সাহায্যকারী, সহায়ক, সহযোগিতাকারী। মুফাসসির (র.)-এর উক্তি মতে وَزِيْرًا শব্দটি اِجْعَلْ-এর প্রথম مَفْعُوْل আর هَارُوْنَ হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل তবে এর বিপরীতটি উত্তম। কেননা নিয়ম আছে যে যদি দুটি مَفْعُوْل একত্র হয়, এবং তার একটি مَعْرِفَة ও অপরটি نَكِرَة হয়, তাহলে مَعْرِفَة-কে প্রথম مَفْعُوْل বানানো হয়। কেননা প্রথম مَفْعُوْل টি مُبْتَدَأ হয়ে থাকে। অতএব তা مَعْرِفَة হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل টি خَبَرٌ হয়। আর এর জন্য نَكِرَة হওয়া উপযোগী। এখানে هَارُوْنَ হলো مَعْرِفَة আর وَزِيْرًا হলো نَكِرَة তবে وَزِيْرًا শব্দটি এখানে মূল লক্ষ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় তারকীব : وَزِيْرًا প্রথম مَفْعُوْل আর لِيْ হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل এবং هَارُوْنَ বদল কিংবা আতফে বয়ান হবে। اُشْدُدْ ও اَشْرِكْ উভয়টি مُضَارِعٌ ـ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ হলে হামযাটি যবর বিশিষ্ট হবে। আর اَشْرِكْهُ-এর হামযাটি পেশ বিশিষ্ট হবে। দোয়ার জবাবে আসার কারণে দ্বিতীয় دَالْ এবং كَافْ সাকিন হবে। এ ক্ষেত্রে উভয় ফে'লের সম্বন্ধ হবে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি। উদ্দেশ্য এই হবে যে, যাতে আমি তার মাধ্যমে আমার পিঠ সুদৃঢ় করতে পারি এবং তাকে আমার কাজের শরিক বানাতে পারি। আর উভয়টি যদি আমরের সীগাহ হয়, তাহলে اُشْدُدْ-এর হামযাটি পেশ বিশিষ্ট হবে। আর اَشْرِكْ

-এর হামযাটি হবে যবর বিশিষ্ট। এ সময় উভয় ফে'লের সম্বন্ধ হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার ভাইয়ের মাধ্যমে আমার পিঠকে সুদৃঢ় কর এবং তাকে আমার কাজের শরিক বানাও। এখানে أَشْدُدْ ক্রিয়াটিকে أَخِيْ -এর সাথে মিলিয়ে পড়লে হামযাটি বিলুপ্ত হবে।

قَوْلُهُ أَزْرِيْ : اَلْأَزْرُ অর্থ শক্তি, পিঠ। سُؤْلٌ ـ سُؤْلَكَ শব্দটি فِعْل -এর ছন্দে। যেমন- خُبْزٌ শব্দটি مَخْبُوْزٌ -এর অর্থে তদ্রূপ এটিও مَفْعُوْل অর্থে। كَافٌ -এর প্রতি مُضَافٌ হয়েছে। অর্থ- আবেদন, আকাঙ্ক্ষা ও কামনা। إِذْ أَوْحَيْنَا হলো مَنَنَّا -এর যরফ। আর إِذْ أَوْحَيْنَا এটা مَرَّةً থেকে বদলও হতে পারে। এবং تَعْلِيْلِيَّةٌ -إِذْ -ও হতে পারে। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) বর্ণনা করেছেন। তিনি مَنَامًا ও إِلْهَامًا বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা وَحْى رِسَالَةٌ নয়; বরং শাব্দিক অর্থে وَحْى উদ্দেশ্য। اِقْذِفِيْ শব্দটি (ض) قَذَفَ -এর وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ -এর সীগাহ। এর শেষের ه হলো -এর যমীর مَفْعُوْل অর্থ- তুমি তাকে নিক্ষেপ কর, ফেলে দাও। اَلْيَمُّ অর্থ- সমুদ্র। এর দ্বারা নীল নদ উদ্দেশ্য। يَأْخُذْهُ হলো জওয়াবে আমর। مِنِّيْ এটা اَلْقَيْتُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ এবং كَائِنَةً উহ্য এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে مَحَبَّةً -এর সিফতও হতে পারে।

قَوْلُهُ لِتُحَبَّ : এটা اَلْقَيْتُ -এর علت এটাকে বিলুপ্ত মানার কারণ হলো যাতে لِتُصْنَعَ -এর আতফ শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ لِتُحَبَّ وَتُصْنَعَ

إِذْ تَمْشِيْ -এর সম্পর্ক উল্লিখিত দুটি ফেলের যে কোনো একটির সাথে হতে পারে। আবার প্রথম إِذْ -এর বদলও হতে পারে। কেননা ভগ্নি সাথে সাথে চলাও একটি ইহসান বা দয়া। এখানে اُذْكُرْ উহ্য মানলে বাক্যটি এমনও হতে পারে اُذْكُرْ إِذْ تَمْشِيْ

قَوْلُهُ مَرَاضِعَ : এ শব্দটি مُرْضِعَةٌ -এর বহুবচন, দুগ্ধদানকারিণী। فُتُوْنًا এটা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ অর্থাৎ اِبْتَلَيْنَاكَ فَتَنَّاكَ بِفُتُوْنٍ كَثِيْرَةٍ আবার اِبْتِلَاءً ,فِتْنَةٌ -এর বহুবচনও হতে পারে। যেমন- بَدْرَةٌ -এর বহুবচন بُدُوْرٌ আসে। অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার (র.) فَأَجَبْتَ বিলুপ্ত মেনেছেন যাতে فَرَجَعْنَاكَ -এর আতফ বৈধ হয়। اِصْطَنَعْتُكَ এটা اِصْطِنَاعٌ (اِفْتِعَالٌ) নির্বাচন করা, মনোনীত করা থেকে গৃহীত। সঠিকতার ক্ষেত্রে জোর দান করা। تَنِيَا শব্দটি وَنٰى يَنِيْ وَنْيًا থেকে, অর্থ- অলসতা করা। لَا تَنِيَا অর্থ- তোমরা উভয়ে অলসতা করো না। إِلَى النَّاسِ এখানে সামনের উপর অনুমান করে ফেরাউনকে বিলোপ করা হয়েছে। যেভাবে সেখানে اٰيَاتِيْ -কে তার উপর অনুমান করে বিলোপ করা হয়েছে। এটাকে صَنْعَتْ اِحْتِبَاكٌ বলা হয়। অর্থাৎ এক নজিরকে অপর নজিরের উপর কিয়াস করে বিলোপ করা।

قَوْلُهُ التِّسْعِ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর স্থলে اَلْعَصٰى وَالْيَدُ বললে তা মুনাসিব হতো। কারণ প্রথমত এ দুটি মুজেযা দান করা হয়েছিল। অবশিষ্টগুলো বিভিন্ন সময় সাপেক্ষে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো দুটি মুজেযার ব্যাপারে বহুবচন শব্দ উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : এ দু'টি মু'জেযা যেহেতু অনেকগুলো মুজেযা সম্বলিত ছিল। এ কারণে বহুবচন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ الخ : হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই দ্বারস্থ হলেন। কারণ তারই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলা দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِيْ অর্থাৎ আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যে, নবুয়তের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটুকথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন। এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোনো কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারো জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَا فِيْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ! প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেওয়া আপনার পক্ষে সহজ।

তৃতীয় দোয়া وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ অর্থাৎ আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ.) দুগ্ধ পান করার জমানায় তার জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মূসা (আ.) ফেরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করেছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফেরাউনের মাথায় আঘাত করেন। ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেন, রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনো ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্য আছিয়া একটি পাত্রে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অপর একটি পাত্রে মণিমুক্তা এনে হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো হয় না। এতে ফেরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে কোনো সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ তা'আলার ভাবী রাসূল ছিলেন। যার স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেহেই অনন্য অসাধারণ হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন। কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) তার হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাত্রে রেখে দিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তার জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরাউন বিশ্বাস করল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কর্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই হযরত মূসা (আ.)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআনে একেই عُقْدَةً বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই হযরত মূসা (আ.) দোয়া করেন। -[মাযহারী, কুরতুবী]

প্রথমোক্ত দোয়া দুটি সকল কাজে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। কারণ রিসালাত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরি বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে রিসালাতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا অর্থাৎ হারূন আমার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামি প্রভাব কিছুটা বাকি ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। কোনো কোনো আলেম এর উত্তরে বলেন, হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং তার দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু দূর হলে লোকেরা তার কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকি থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থি নয়।

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উজির নির্ধারণ করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালাতের করণীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসা (আ.) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বুঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজিরও তার বাদশাহর বুঝা দায়িত্ব

সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোনো সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পছন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজকালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা দুষ্কর্ম ও অযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কেনো ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভালো কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোনো জরুরি কাজ ভুল গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাকে সাহায্য করেন। -[নাসায়ী]

এই দোয়ায় হযরত মূসা (আ.) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে مِنْ اَهْلِىْ কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মিল মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়, তবে তার মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চেয়ে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোনো শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোনো সৎকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোনো উচ্চপদ দান করা দোষের কিছু নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর খুলাফায়ে রাশেদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছিলেন, যারা নবী পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

হযরত মূসা (আ.) তার দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, সে আমার ভাই হারূন, যাতে রেসালাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। হযরত মূসা (আ.) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গাম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদপ্রাপ্ত হন। হযরত মূসা (আ.)-কে যখন মিশরে ফেরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হযরত হারূন (আ.)-কে মিশরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। -[কুরতুবী]

পঞ্চম দোয়া : وَاَشْرِكْهُ فِىْٓ اَمْرِىْ হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে নিজের উজির করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুয়ত ও রিসালাতে শরিক করতে চাইলেন। কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালাতে অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেন- كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا

অর্থাৎ হযরত হারূন (আ.) কে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার জিকির ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাসবীহ ও জিকির মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তাসবীহ ও জিকিরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জিকিরে মশগুল থাকতে চায় তার উপযুক্ত পরিবেশ তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হলো। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে– قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى অর্থাৎ হে মূসা! তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হলো।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى : হযরত মূসা (আ.)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতি যুগে তার জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তার জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে أُخْرَى শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তী কালের; বরং أُخْرَى শব্দটি কোনো সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বুঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোনো অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى : অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তার মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাজতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাজতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী রাসূল নয় এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وَحْى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে, অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারো বিশেষ গুণ নয়। নবী, রাসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ আয়াতের আভিধানিক অর্থে ওহী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে হযরত মূসা (আ.) জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া জরুরি নয়। যেমন মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রাসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কারো অন্তরে কোনো বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই। ওলীআল্লাহগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন; বরং আবূ হাইয়্যান ও আরো কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তাবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই হলো জনসংস্কারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা। যারা না মানে, তাদেরকে কাফের আখ্যা দেওয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুয়তের ওহী শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোনো কোনো বুজুর্গের উক্তিতে একেই 'ওহী তাশরীয়ী' ও 'গায়র তাশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোনো কোনো বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানী তার দাবির বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরোপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা মুফতি শফী (র.) রচিত পুস্তক 'খতমে নবুয়ত'-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.)-এর জননীর নাম : রূহুল মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম "লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তার নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, আমরা এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

قَوْلُهُ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ : এখানে يَمٌّ শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত এর দ্বারা নীলনদ বুঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে দেওয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেওয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বুঝানো হয়নি। বরং খবর দেওয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলেমদের মতে এখানে আদেশই বুঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোনো সৃষ্টবস্তু [বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত] চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়; বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোনো সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধিবিধান আরোপিত হতে পারে। সাধক রূমী চমৎকার বলেছেন–

خاك وباد واب واتش بنده اند * با من وتو مرده باحق زنده اند

অর্থাৎ মৃত্তিকা, বাতাস, পানি ও অগ্নি আল্লাহ তা'আলার বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে তারা জীবিত।

قَوْلُهُ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّهُ : অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে যে, আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু। অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহ তা'আলার দুশমন তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ তখন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দুশমন ছিল না; বরং তার লালন পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু বলা শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও হযরত মূসা (আ.)-এর শত্রু ছিল। সে স্ত্রী আছিয়ার মন রক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আছিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায়। –[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

قَوْلُهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ : এখানে مَحَبَّتٌ ধাতু শব্দটি আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত সেই আদর করতে বাধ্য হতো। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা (রা.) থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ : صَنْعَتٌ শব্দ বলে এখানে উত্তম লালন-পালন বুঝানো হয়েছে। আরবে صَنَعْتُ فَرَسِيْ বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন পালন করেছি। عَلٰى عَيْنِيْ বলে عَلٰى حِفْظِيْ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাথে তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিশরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্যে এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করেছে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ إِذْ تَمْشِيْ أُخْتُكَ : হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– وَفَتَنَّاكَ فُتُوْنًا অর্থাৎ বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি। –[ইবনে আব্বাস]। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি। –[যাহ্হাক]। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মা'রিফুল কুরআন [ই. ফা. বা.] ৬ষ্ঠ খণ্ডের পৃষ্ঠা নং– ৭৮ - ১১০ দ্রষ্টব্য।]

অনুবাদ :

٤٣. اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ج بِادِّعَاءِ الرُّبُوْبِيَّةِ ـ

৪৩. আপনারা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যান সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। রবূবিয়্যত দাবি করার মাধ্যমে।

٤٤. فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا فِىْ رُجُوْعِهٖ عَنْ ذٰلِكَ لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ اَوْ يَخْشٰى ـ اللّٰهَ فَيَرْجِعُ وَالتَّرَجِّىْ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِمَا لِعِلْمِهٖ تَعَالٰى بِاَنَّهٗ لَا يَرْجِعُ ـ

৪৪. আপনারা তার সাথে নম্র কথা বলবেন। তার উক্ত দাবি থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। আল্লাহ তা'আলাকে, ফলে সে ফিরে আসবে। এখানে تَرَجِّىْ -এর শব্দ হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাইয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার তো জানা আছে যে, ফিরে আসবে না।

٤٥. قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَىْ يُعَجِّلَ بِالْعُقُوْبَةِ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ـ عَلَيْنَا اَىْ يَتَكَبَّرُ ـ

৪৫. তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে। অর্থাৎ শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করবে। অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। আমাদের উপর। অর্থাৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে।

٤٦. قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَا بِعَوْنِىْ اَسْمَعُ مَا يَقُوْلُ وَاَرٰى ـ مَا يَفْعَلُ ـ

৪৬. তিনি বললেন, আপনারা ভয় করবেন না। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমার সাহায্য আমি শুনি সে যা বলে ও আমি দেখি সে যা করে।

٤٧. فَأْتِيَاهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ لا اِلَى الشَّامِ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ط اَىْ خَلِّ عَنْهُمْ مِنْ اِسْتِعْمَالِكَ اِيَّاهُمْ فِىْ اَشْغَالِكَ الشَّاقَّةِ كَالْحَفْرِ وَالْبِنَاءِ وَحَمْلِ الثَّقِيْلِ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ بِحُجَّةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ط عَلٰى صِدْقِنَا بِالرِّسَالَةِ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ اَىِ السَّلَامَةُ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ ـ

৪৭. সুতরাং আপনারা তার নিকট যান এবং বলুন, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও। সিরিয়ায় আর তাদেরকে কষ্ট দিও না। অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টদায়ক কাজে নিয়োগ করা বন্ধ করে দাও। যেমন– খনন, নির্মাণ, বোঝাবহন ইত্যাদি কার্যে। আমরা তো তোমার নিকট এনেছি নিদর্শন দলিল প্রমাণ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমাদের রাসূল হওয়ার সত্যতার ব্যাপারে। আর শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ অর্থাৎ শাস্তি হতে তার জন্য নিরাপত্তা থাকবে।

٤٨. اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ بِمَا جِئْنَا بِهٖ وَتَوَلّٰى ـ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاَتَيَاهُ وَقَالَا لَهٗ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ ـ

৪৮. আমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে। যা আমরা নিয়ে এসেছি সে ব্যাপারে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তা থেকে। তাঁরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে এসে তাকে এসব বললেন।

٤٩. قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى - اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ الْاَصْلُ وَلِاِدْلَالِهٖ عَلَيْهِ بِالتَّرْبِيَةِ -

٥٠. قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ - مِنَ الْخَلْقِ خَلْقَهٗ الَّذِىْ هُوَ عَلَيْهِ مُتَمَيِّزٌ بِهٖ عَنْ غَيْرِهٖ ثُمَّ هَدٰى - الْحَيَوَانَ مِنْهُ اِلٰى مَطْعَمِهٖ وَمَشْرَبِهٖ وَمَنْكَحِهٖ وَغَيْرِ ذٰلِكَ -

٥١. قَالَ فِرْعَوْنُ فَمَا بَالُ حَالُ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ الْاُوْلٰى - كَقَوْمِ نُوْحٍ وَهُوْدٍ وَلُوْطٍ وَصَالِحٍ فِىْ عِبَادَتِهِمُ الْاَوْثَانَ -

٥٢. قَالَ مُوْسٰى عِلْمُهَا اَىْ عِلْمُ حَالِهِمْ مَحْفُوْظٌ عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ج هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ يُجَازِيْهِمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يَضِلُّ يَغِيْبُ رَبِّىْ عَنْ شَىْءٍ وَّلَا يَنْسٰى - رَبِّىْ شَيْئًا -

٥٣. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ فِىْ جُمْلَةِ الْخَلْقِ الْاَرْضَ مَهْدًا - فِرَاشًا وَّسَلَكَ سَهَّلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا طُرُقًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ط مَطَرًا قَالَ تَعَالٰى تَتْمِيْمًا لِمَا وَصَفَهٗ بِهٖ مُوْسٰى وَخِطَابًا لِاَهْلِ مَكَّةَ - فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا اَصْنَافًا مَا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ط صِفَةُ اَزْوَاجًا اَىْ مُخْتَلِفَةُ الْاَلْوَانِ وَالطُّعُوْمِ وَغَيْرِهِمَا وَشَتّٰى جَمْعُ شَتِيْتٍ كَمَرِيْضٍ وَمَرْضٰى مِنْ شَتَّ الْاَمْرُ تَفَرَّقَ -

অনুবাদ :

৪৯. ফেরাউন বলল, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক শুধুমাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর সম্বোধনে ক্ষান্ত করা হয়েছে। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে মূলত রেসালাত ছিল। আর ফেরাউন তার উপর তার করুণা প্রদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল।

৫০. হযরত মূসা (আ.) জবাব দিলেন- হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। যার দ্বারা তা অন্যের থেকে পৃথক করা হয়। অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ প্রাণীকে তার পানাহার, বিয়ে শাদী ইত্যাদির প্রতি।

৫১. ফেরাউন বলল, তাহলে অতীত লোকদের উম্মতদের কি অবস্থা? যেমন- হযরত নূহ, হূদ, সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা, যারা মূর্তি পূজা করত।

৫২. হযরত মূসা (আ.) বললেন, এর জ্ঞান তাদের অবস্থার জ্ঞান সংরক্ষিত। আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে। আর তা হলো লাওহে মাহফুজ। কিয়ামতে তিনি তাদেরকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না। অর্থাৎ কোনো বস্তু তাঁর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং বিস্মৃতও হন না। আমার প্রতিপালক কোনো কিছুকে।

৫৩. তিনি তোমাদের জন্য করেছেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য। পৃথিবীকে বিছানা এবং তোমাদের জন্য তাতে চলার পথ করে দিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন। আর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন বৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর কথার পরিসমাপ্তিকল্পে মক্কাবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। এখানে شَتّٰى হলো اَزْوَاجًا-এর সিফত। অর্থাৎ রং, স্বাদ ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের। আর شَتّٰى হলো شَتِيْتٌ -এর বহুবচন। যেমন- مَرِيْضٌ -এর বহুবচন হলো مَرْضٰى আর এটা شَتَّ الْاَمْرُ হতে নির্গত। অর্থ- প্রভেদ হওয়া।

٥٤. كُلُوْا مِنْهَا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ط فِيْهَا جَمْعُ نِعَمٍ هِىَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ يُقَالُ رَعَتِ الْاَنْعَامُ وَرَعَيْتُهَا وَالْاَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ وَتَذْكِيْرِ النِّعْمَةِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ اَخْرَجْنَا اَىْ مُبِيْحِيْنَ لَكُمُ الْاَكْلَ وَرَعَى الْاَنْعَامَ . اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنَّا لَاٰيٰتٍ لَعِبَرًا لِّاُولِى النُّهٰى . لِاَصْحَابِ الْعُقُوْلِ جَمْعُ نُهْيَةٍ كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ سُمِّىَ بِهِ الْعَقْلُ لِاَنَّهُ يَنْهٰى صَاحِبَهُ عَنِ الْاِرْتِكَابِ الْقَبَائِحِ .

অনুবাদ :

৫৪. তোমরা আহার কর তা হতে এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও এতে; اَنْعَامٌ শব্দটি نِعَمٌ -এর বহুবচন, তা হলো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। বলা হয়- رَعَتِ الْاَنْعَامُ এবং رَعَيْتُهَا অর্থাৎ গবাদি পশু চরেছে ও চরিয়েছি। আর وَارْعَوْا -এর اَمْر বা নির্দেশ اِبَاحَتْ তথা বৈধতামূলক। অনুগ্রহ স্মরণ করানোর জন্য। আর পূর্ণ বাক্যটি اَخْرَجْنَا -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য আহার করা ও পশু চরানোকে বৈধকারী। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকবান সম্প্রদায়ের জন্য। النُّهٰى শব্দটি نُهْيَةٌ -এর বহুবচন। যেমন غُرْفَةٌ -এর বহুবচন غُرَفٌ ; বিবেককে نُهٰى বলার কারণ হলো এটা বিবেকের অধিকারীকে ঘৃণিত বিষয়ে জড়িত হতে নিষেধ করে।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ উভয়কে একই শব্দে একত্র করার মধ্যে বিশেষ কী উপকারিতা রয়েছে? অথচ এর দ্বারা কেবল হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা এসময় হযরত হারূন (আ.) ছিলেন মিশরে।

উত্তর : ১. حَاضِرٌ তথা মধ্যম পুরুষকে غَائِبٌ তথা নাম পুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে এমন করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা মধ্যবর্তী আবরণ অপসারিত করেছিলেন। যার ফলে হযরত হারূন (আ.) আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণী শ্রবণ করেছিলেন যা হযরত মূসা (আ.) শ্রবণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) কোনো মাধ্যমবিহীন সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ শুনছিলেন। আর হযরত হারূন (আ.) শুনেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে।

قَوْلُهُ فِىْ رُجُوْعِهِ عَنْ ذٰلِكَ : অর্থাৎ রবূবিয়্যাতের দাবি থেকে ফেরাউনের রুজু করা।

قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ : এটা تَرَجِّىْ -এর জবাবে আসার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। وَالتَّرَجِّىْ بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِمَا একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. আল্লাহ তা'আলা تَرَجِّىْ তথা সন্দেহসূচক শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমের মধ্যে ফেরাউনের ঈমান না আনার বিষয়টি নির্ধারিত ছিল?

উত্তর. تَرَجِّىْ -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর প্রতি লক্ষ্য করে, নিজ সত্তার প্রতি লক্ষ্য করে নয়। يَفْرُطُ (ن) فَرْطًا فَرَطًا অর্থ- তাড়াহুড়া করা, আগে যাওয়া, পূর্ণ কথা না শুনে কারো সাজায় দ্রুততা অবলম্বন করা। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَاْتِيَاهُ وَقَالَ لَهُ جَمِيْعَ مَا ذُكِرَ : এ অংশটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ফেরাউনের এ উক্তি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

قَوْلُهُ اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. فَمَنْ رَّبُّكُمَا -এর মধ্যে হারূন এবং মূসা (আ.) উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর يَا مُوْسٰى -এর শব্দের উপর প্রযোজ্য হয়েছে।

উত্তর.

১. উভয়ের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) যেহেতু প্রধান ছিলেন আর হযরত হারূন (আ.) ছিলেন তার অনুগামী ও সহায়তাকারী। এ কারণে আহ্বান করার ক্ষেত্রে প্রধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২. ব্যাখ্যাকার (র.) لِإِدْلَالِهٖ থেকে দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন। এর সারমর্ম এই যে, হে মূসা! শৈশব থেকে আমি তোমাকে লালন পালন করেছি। সুতরাং তোমার প্রতিপালক তো আমি। তুমি অন্য কাকে আমার প্রতিপালক বলছ? যেন তার অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে ডেকে বলছে, তোমার জন্য এটা সমীচীন নয়, যে তুমি অন্য কাউকে আমার প্রতিপালক স্থির করবে। কারণ তোমার প্রতিপালক হলাম আমি। পক্ষান্তরে হযরত হারূন (আ.) এর উপর ফেরাউনের কোনো অনুগ্রহ ছিল না।

قَوْلُهُ اِدْلَالٌ : অর্থ অনুগ্রহ প্রকাশ করা, খোটা দেওয়া, গর্ব করা। رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى الخ -এর মধ্যে رَبُّنَا হলো مُبْتَدَأٌ আর اَلَّذِيْ الخ হলো خَبَرٌ অথবা এখানে هُوَ مُبْتَدَأٌ উহ্য রয়েছে। আর رَبُّنَا হলো তার خَبَرٌ উভয়টি মিলে مَوْصُوْف আর اَعْطٰى الخ হলো তার صِفَتٌ - সিফত ও মওসূফ মিলে مَقُوْلَهٗ - اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ -এর মধ্যে شَيْءٍ হলো اَعْطٰى -এর প্রথম মাফঊল। আর خَلْقَهٗ দ্বিতীয় مَفْعُوْل অথবা এর বিপরীতও হতে পারে। গুরুত্বের জন্য দ্বিতীয় مَفْعُوْل -কে আগে আনা হয়েছে। অর্থাৎ اَعْطٰى خَلْقَهٗ كُلَّ شَيْءٍ ছিল।

قَوْلُهُ قَالَ فِرْعَوْنُ فَمَا بَالُ الخ : যখন ফেরাউনের নিকট হযরত মূসা (আ.) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিজে বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন এমন কথাবার্তা বলল, যার সাথে রিসালতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে কথার গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করল। যাতে তার রাজত্বে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। হযরত মূসা (আ.) তার চালবাজি বুঝে ফেললেন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিয়ে মূল বিষয়বস্তুর উপর অটল রইলেন। তিনি ফেরাউনকে আলোচ্য বিষয় থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিলেন না। কারণ এটাই হলো বিতর্কের একটা বিশেষ নীতি। সাধারণত বিরুদ্ধবাদীর নিকট যখন কোনো দলিল প্রমাণ থাকে না। তখন সে আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়ার চেষ্টা করে এবং এদিক সেদিকের কথা বলে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করে।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ : এটা ফেরাউনের প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

قَوْلُهُ لَا يَضِلُّ اَيْ لَا يُخْطِئُ اِبْتِدَاءً : অর্থাৎ কোনো বস্তু তার থেকে ছুটতে পারে না।

قَوْلُهُ لَا يَنْسٰى : অর্থাৎ কোনো বিষয়ের জ্ঞান লাভের পরে বিস্মৃতি ঘটে না। اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا ثُمَّ এবং هدى -এর মধ্যকার مَا بَالُ قُرُوْنِ الْاُوْلٰى الخ বাক্যটি معترضة

قَوْلُهُ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِي الْكِتَابِ اَيْ عِلْمُ حَالِهِمْ مَحْفُوْظٌ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, هَا ضَمِيْر হলো মুযাফ ইলাইহি এর পূর্বে حَال مُضَاف উহ্য রয়েছে। কেননা কারো জ্ঞান দ্বারা উক্ত বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তার সত্তা উদ্দেশ্য হয় না। مَحْفُوْظٌ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, عِلْمُهَا হলো مُبْتَدَأٌ আর خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। عِلْمُهَا مُرَكَّبٌ اِضَافِيٌّ হয়ে مُبْتَدَأٌ আর عِنْدَ رَبِّيْ হলো প্রথম خَبَرٌ - فِي الْكِتَابِ দ্বিতীয় خَبَرٌ অথবা এটাও বৈধ আছে যে, هٰذَا حُلْوٌ حَامِضٌ -এর মতো উভয়টি একই خَبَرٌ অথবা عِنْدَ رَبِّيْ হলো خَبَرٌ আর فِي الْكِتَابِ যরফের যমীর থেকে حَالٌ হবে।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى - تَتْمِيْمًا لِمَا وَصَفَهُ الخ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, فَاَخْرَجْنَا بِهٖ الخ এটা ঘটনা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তি নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার বাণী যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً-কে পূর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিকদেরকে আহ্বান করেছেন এবং তাদের উপর নিজ করুণা প্রকাশ করেছেন। এ বাক্যটি تَارَةً اُخْرٰى পর্যন্ত শেষ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَتّٰى : شَتّٰى হলো شَتِيْتٌ-এর বহুবচন। যেমন- مَرِيْضٌ-এর বহুবচন আসে مَرْضٰى এবং اَزْوَاجًا উহ্য مُبِيْحِيْنَ-এর সিফত। আবার نَبَاتٍ-এর সিফতও হতে পারে। كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ এটা اَخْرَجْنَ-এর যমীর থেকে حَال অর্থাৎ مُبِيْحِيْنَ. اَخْرَجْنَا اَصْنَافَ النَّبَاتِ مُبِيْحِيْنَ لَكُمُ الْاَكْلَ وَرَعْىَ الْاَنْعَامِ এর স্থলে قَائِلِيْنَ-ও উহ্য মানা যেতে পারে।

قَوْلُهُ رَعَتِ الْاَنْعَامُ وَرَعَيْتُهَا : বৃদ্ধি করে বুঝিয়েছেন যে, رَعْىٌ শব্দটি لَازِمْ ও مُتَعَدِّىْ উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ : তোমরা উভয়ে ফিরাউনের নিকট যাও। সে রবুবিয়্যাতের দাবী করে সীমালঙ্ঘন করেছে। তার সঙ্গে বিনম্র কথা বলবে, যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তার কৃতকর্ম থেকে আনন্দ চিত্তে বিরত থাকে। অথবা আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করে রবুবিয়্যাতের দাবী থেকে ফিরে আসে। এ আয়াতে দ্বীনের আহ্বানকারীগণের জন্যে এক বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ জরুরি উসূল বর্ণিত হয়েছে। ফিরাউন যেহেতু খোদা দাবীদার জালেম, অত্যাচারী এবং নিজেকে রক্ষা করার জন্যে শত সহস্র নিষ্পাপ বনি ইসরাঈলী শিশুদেরকে হত্যার দায়ে দায়ী ছিল। তার নিকট যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট নবীকে প্রেরণ করলেন সে সময় তাঁকে হেদায়াত তথা নির্দেশনা দান করেছিলেন যে, তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। যাতে করে সে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পায়, অথবা আল্লাহ তা'আলার ইলম ছিল যে, ফিরাউন তার অহংকার ও গোমরাহী থেকে ফিরে আসার নয়। তথাপি তিনি তাঁর নবীগণকে এ উসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণ চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত হয়। ফেরাউন হেদায়েত লাভ করুক কিংবা না করুক উসূল বা মূলনীতি এমন হওয়া উচিত যা হেদায়েত ও পরিশুদ্ধির মাধ্যম হতে পারে। বর্তমান অনেক আলেম তাদের মতবিরোধের মধ্যে একজন অপরজনের বিপরীতে অতিশয়োক্তি করা এবং বিভিন্নরূপে দোষত্রুটি তালাশ করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে বসে আছেন। তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

হযরত মূসা (আ.) কেন ভয় পেলেন? اِنَّنَا نَخَافُ হযরত মূসা ও হারুন (আ.) এখানে আল্লাহ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْ يَّفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে।

দ্বিতীয় ভয় اَنْ يَّطْغٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরো বেশি অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে হযরত মূসা (আ.)-কে নবুয়ত ও রিসালাত দান করা হলে তিনি হযরত হারুন (আ.)-কে তার সাথে শরিক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলে দেন- سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَوْلُهُ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى : এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হলে অন্তরে কোনোরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে

পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শুনা ও মুজেযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শুনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরি নয়।

দ্বিতীয়ত ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গাম্বরের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন– لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا . فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ এবং فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। সত্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু মানুষের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত ভয় পয়গাম্বরদের মধ্যে দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى : আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানুষের উপলব্ধির বাইরে।

হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানান। এ থেকে জানা গেল যে, গয়গাম্বরগণ যেমন মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কুরআন পাকে হযরত মূসা (আ.) -এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে নিয়োজিত হয়েছে : এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গাম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্টজগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি,পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের উপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশগুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ড পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি ও মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হ্যাঁ, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনো অগ্নিও পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনো পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا অর্থাৎ তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল? ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত-গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল? এটাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্টজীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকে কারো শিক্ষা ব্যতীতই প্রাপ্ত হয়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্টজীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টজীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন ছওয়াব অথবা আজাবের অধিকারী হয়।

قَوْلُهُ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى : আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্টজগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোনো মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোনো জবাব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জবাব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রার্থনা, পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রশ্ন উত্তরে হযরত মূসা (আ.) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গুমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেকুফ, গুমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى : ফেরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে হযরত মূসা (আ.) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গুমরাহ ও জাহান্নামী, তবে ফেবাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গুমরাহ ও জাহান্নামী মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে যেত। হযরত মূসা (আ.) এমন বিজ্ঞজনোচিত জবাব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে 'সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি।' তিনি বললেন, তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করা অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। আর ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

قَوْلُهُ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى : ازواج শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتّٰى শব্দটি شَتِيْتٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতাগুল্ম, ফলফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى অর্থাৎ এতে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্য।

نُهٰى শব্দটি نُهْيَةٌ -এর বহুবচন। বিবেককে نُهْيَةٌ [নিষেধকারক] বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

অনুবাদ :

٥٥. مِنْهَا اَيِ الْاَرْضِ خَلَقْنٰكُمْ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهَا وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ مَقْبُوْرِيْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ عِنْدَ الْبَعْثِ تَارَةً مَرَّةً اُخْرٰى ـ كَمَا اَخْرَجْنَاكُمْ عِنْدَ اِبْتِدَاءِ خَلْقِكُمْ ـ

৫৫. আমি এখান থেকে পৃথিবী থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার মাধ্যমে এবং তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব মৃত্যুর পর কবরস্থ করার মাধ্যমে। আর তা হতেই তোমাদেরকে বের করব পুনরুত্থানকালে পুনর্বার যেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টির সময় বের করেছি।

٥٦. وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اَيْ اَبْصَرْنَا فِرْعَوْنَ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا التِّسْعَ فَكَذَّبَ بِهَا وَزَعَمَ اَنَّهَا سِحْرٌ وَاَبٰى ـ اَنْ يُوَحِّدَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

৫৬. আমি তো তাকে দেখিয়েছিলাম অর্থাৎ ফেরাউনকে দেখিয়েছি আমার সমস্ত নিদর্শন নয়টি নিদর্শন কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এগুলোকে। আর মনে করেছে যে এগুলো জাদু। ও অমান্য করেছে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ঘোষণাকে।

٥٧. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا مِصْرَ وَيَكُوْنَ لَكَ الْمُلْكُ فِيْهَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ـ

৫৭. সে বলল, তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ আমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য মিশর থেকে। আর এখানে তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার জাদু দ্বারা হে মূসা!

٥٨. فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ يُعَارِضُهُ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لِذٰلِكَ لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ فِيْ سُوًى ـ بِكَسْرِ اَوَّلِهِ وَضَمِّهِ اَيْ وَسَطًا يَسْتَوِيْ اِلَيْهِ مَسَافَةَ الْجَائِيْ مِنَ الطَّرْفَيْنِ ـ

৫৮. আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ জাদু যা তার মোকাবিলা করবে। সুতরাং আমাদের ও তোমাদের মাঝে নির্ধারণ কর নির্দিষ্ট সময় এই কারণে যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তোমরাও করবে না এক মধ্যবর্তী স্থানে مَكَانًا এটা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা হরফে জার ফেলে দেওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। سُوًى শব্দটির سِيْن বর্ণে যের ও পেশ উভয়ই হতে পারে। অর্থ- মধ্যবর্তী স্থান যা উভয় দিক থেকে আগমনকারীর জন্য সমান দূরত্বের হবে।

٥٩. قَالَ مُوْسٰى مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ يَوْمُ عِيْدٍ لَهُمْ يَتَزَيَّنُوْنَ فِيْهِ وَيَجْتَمِعُوْنَ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ يَجْمَعُ اَهْلُ مِصْرَ ضُحًى ـ وَقْتَهُ لِلنَّظَرِ فِيْمَا يَقَعُ ـ

৫৯. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন অর্থাৎ ঈদের দিন। যেদিন তারা সাজসজ্জা গ্রহণ করে ও ময়দানে একত্র হয়। এবং যেদিন জনগণকে সমবেত করা হবে মিশরবাসীকে জমায়েত করা হবে। পূর্বাহ্নে সেদিন যা সংঘটিত হবে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য।

অনুবাদ :

٦٠. فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ اَدْبَرَ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ اَىْ ذَوِىْ كَيْدِهٖ مِنَ السَّحَرَةِ ثُمَّ اَتٰى . بِهِمُ الْمَوْعِدَ .

৬০. অতঃপর ফেরাউন উঠে গেল, অতঃপর তার কৌশলসমূহ একত্র করল অর্থাৎ জাদু বিদ্যায় পারদর্শীদেরকে একত্র করল অতঃপর আসল তাদেরকে নিয়ে নির্ধারিত দিনে।

٦١. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَهُمْ اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ اَلْفًا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ حَبْلٌ وَعَصَا وَيْلَكُمْ اَىْ اَلْزَمَكُمُ اللّٰهُ تَعَالَى الْوَيْلَ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِاِشْرَاكِ اَحَدٍ مَعَهٗ فَيُسْحِتَكُمْ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا اَىْ يُهْلِكَكُمْ بِعَذَابٍ ج مِنْ عِنْدِهٖ وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنِ افْتَرٰى . كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ .

৬১. হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তারা ছিল বাহাত্তর হাজার আর তাদের প্রত্যেকের সাথেই ছিল রশি এবং লাঠি। দুর্ভোগ তোমাদের অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর দুর্ভোগ চাপিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে করলে তিনি তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন। فَيُسْحِتَكُمْ -এর يَاء বর্ণটি পেশযুক্ত আর حَاء বর্ণটি যের যুক্ত। অর্থাৎ বিনাশ করবেন। শাস্তি দ্বারা তাঁর পক্ষ হতে। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মিথ্যা উদ্ভাবন করে।

٦٢. فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ فِىْ مُوْسٰى وَاَخِيْهِ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى . اَىِ الْكَلَامَ بَيْنَهُمْ فِيْهِمَا .

৬২. তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্পর্কে বিতর্ক করল। হযরত মূসা (আ.) ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে এবং তাঁরা গোপনে পরামর্শ করল অর্থাৎ তাদের দু'জনের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল।

٦٣. قَالُوْٓا لِاَنْفُسِهِمْ اِنْ هٰذٰنِ لِاَبِىْ عَمْرٍو وَلِغَيْرِهٖ هٰذَانِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلُغَةِ مَنْ يَاْتِىْ فِى الْمُثَنّٰى بِالْاَلِفِ فِىْ اَحْوَالِهِ الثَّلَاثِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى . مُؤَنَّثُ اَمْثَلَ بِمَعْنٰى اَشْرَفَ اَىْ بِاَشْرَافِكُمْ بِمَيْلِهِمْ اِلَيْهِمَا لِغَلَبَتِهِمَا .

৬৩. তারা বলল নিজেদেরকে লক্ষ্য করে এই দুজন অবশ্যই আবূ আমর ও অন্যান্যের মতে هٰذَانِ এটা তাদের ভাষ্য মতে, যাদের নিকট দ্বিবচনের শব্দ তিন অবস্থাতেই اَلِفْ সহ ব্যবহৃত হয়। যাদুকর! তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা ধ্বংস করতে اَلْمُثْلٰى শব্দটি اَمْثَلُ -এর مُؤَنَّثْ; অর্থ– উৎকৃষ্ট, উত্তম, উন্নত। অর্থাৎ তোমাদের উৎকৃষ্টদেরকে স্বীয় আয়ত্তে নিয়ে নিবে। তাদের এই উভয় ভ্রাতার প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার কারণে তাদের উভয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে।

অনুবাদ :

٦٤. فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ مِنَ السِّحْرِ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَفَتْحِ الْمِيْمِ مِنْ جَمَعَ اَىْ لَمَّ وَبِهَمْزَةِ قَطْعٍ وَكَسْرِ الْمِيْمِ مِنْ اَجْمَعَ اَحْكَمَ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ج حَالٌ اَىْ مُصْطَفِّيْنَ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى . غَلَبَ .

৬৪. অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল সুসংহত কর অর্থাৎ জাদু ক্রিয়া। اَجْمِعُوْا শব্দটি هَمْزَةُ الْوَصْلِ এবং مِيْم বর্ণে যবরযোগে جَمَعَ একত্র করা হতে। আর هَمْزَة قَطْعِىْ সহ مِيْم বর্ণে যেরযোগে হলে اَجْمَعَ হতে, অর্থ- সুদৃঢ় করা, সুসংহত করা। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও صَفًّا শব্দটি اِئْتُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। এবং যে আজ বিজয়ী হবে সেই সফল হবে اِسْتَعْلٰى শব্দটি غَلَبَ [বিজয়লাভ করা] অর্থে হয়েছে।

٦٥. قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِخْتَرْ اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ عَصَاكَ اَىْ اَوَّلًا وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى . عَصَاهُ .

৬৫. তারা বলল, হে মূসা! আপনি পছন্দ করুন হয় আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি অর্থাৎ প্রথমে অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।

٦٦. قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ج فَاَلْقَوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ اَصْلُهُ عَصُوُوْ قُلِبَتِ الْوَاوَانِ يَائَيْنِ وَكُسِرَتِ الْعَيْنُ وَالصَّادُ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسْعٰى . عَلٰى بُطُوْنِهَا .

৬৬. হযরত মূসা (আ.) বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তখন তারা নিক্ষেপ করল। আকস্মাৎ তাদের লাঠি ও রশিগুলো عِصِيٌّ মূলত ছিল عَصُوُوْ দুটি وَاوْ-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে عَيْن ও صَادْ-এর নিচে যের দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর মনে হলো জাদুর প্রভাবে ছুটাছুটি করছে সাপ হয়ে তাদের পেটে ভর করে।

٦٧. فَاَوْجَسَ اَحَسَّ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى . اَىْ خَافَ مِنْ جِهَةِ اَنَّ سِحْرَهُمْ مِنْ جِنْسِ مُعْجِزَتِهٖ اَنْ يَلْتَبِسَ اَمْرُهُ عَلَى النَّاسِ فَلَا يُؤْمِنُوْا بِهٖ .

৬৭. হযরত মূসা (আ.) তাঁর অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলেন অর্থাৎ তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তাদের জাদুসমূহ মুজেযা জাতীয় হওয়ায় মানুষের নিকট বিষয়টি ধাঁ-ধার সৃষ্টি করবে। ফলে তারা ঈমান গ্রহণ করবে না।

٦٨. قُلْنَا لَهُ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى . عَلَيْهِمْ بِالْغَلَبَةِ .

৬৮. আমি বললাম, ভয় করবেন না। আপনিই প্রবল বিজয়ের দ্বারা তাদের উপরে থাকবেন।

٦٩. وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ وَهِىَ عَصَاهُ تَلْقَفْ تَبْتَلِعْ مَا صَنَعُوْا ط اِنَّ مَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط اَىْ جِنْسِهٖ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى . بِسِحْرِهٖ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَتَلَقَّفَتْ كُلَّ مَا صَنَعُوْا .

৬৯. আপনার দক্ষিণ হস্তে যা রয়েছে তা নিক্ষেপ করুন আর তা হলো তাঁর লাঠি এরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে গিলে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। অর্থাৎ সে জাতীয় জাদুকর যেথায়ই আসুক সফল হবে না তার জাদু দ্বারা। হযরত মূসা (আ.) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন তারা যা বানিয়েছিল তা গিলে ফেলল।

٧٠. فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا خَرُّوْا سَاجِدِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى . قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى .

৭০. অতঃপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হলো অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জন্য সিজদায় লুটে পড়ল। তারা বলল, আমরা হযরত হারূন ও মূসা (আ.)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ الخ : এর দ্বারা সে প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে প্রথমত দুটি মুজেযা লাঠি ও শুভ্রহস্ত দান করা হয়েছিল। কাজেই ফেরাউনের নিকট গমনের সাথে সাথে নয়টি মুজেযা তাকে কিভাবে দেখালেন। উল্লিখিত বাক্য দ্বারা এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, দাওয়াতের দীর্ঘ সময়ে তিনি মোট নয়টি মুজেযা দেখিয়েছেন। কেননা لَقَدْ اَرَيْنَاهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا এটা خَبَرِيَّةٌ বাক্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, দাওয়াতের পূর্ণ সময় আমি ফেরাউনকে সকল মুজেযা দেখিয়েছি। অতএব প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ اَرَيْنَا : اَرَيْنَا-এর ব্যাখ্যা اَبْصَرْنَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে رُؤْيَةٌ তথা দর্শন দ্বারা رُؤْيَة بَصَرِىْ তথা চর্মচোখে দেখা উদ্দেশ্য। فَلَنَأْتِيَنَّكَ-এর মধ্যে لَامْ বর্ণটি جَوَاب قَسَم-এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। এখানে কসম উহ্য রয়েছে। মূল বাক্যটি এমন ছিল وَعِزَّتِىْ وَكِبْرِيَائِىْ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِىْ এখানে بِسِحْرِىْ শব্দটি فَلَنَأْتِيَنَّكَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে, আর فَا বর্ণটি ক্রমধারাজ্ঞাপক।

قَوْلُهُ مَوْعِدًا : এটা যরফে জামান, اِجْعَلْ-এর প্রথম مَفْعُوْل পরে এসেছে। بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ দ্বিতীয় মাফঊলটি আগে এসেছে। سُوًى-এর মধ্যে سِيْن বর্ণে পেশ বা যের যে কোনোটি হতে পারে। مَوْعِدُكُمْ হলো مُبْتَدَأ আর يَوْمُ الزِّيْنَةِ হলো خَبَرْ।

قَوْلُهُ اَىْ ذَوِىْ كَيْدِه : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এ বাক্যে مُضَافٌ বিলুপ্ত রয়েছে। এর দ্বারা জাদুকর উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَيْلَكُمْ : এর ব্যাখ্যা اَلْزَمَكُمُ اللّٰهُ الْوَيْلَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَيْلَكُمْ শব্দটি বিলুপ্ত আমেলের কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَشْرَافِكُمْ : এটা طَرِيْقَتِكُمْ-এর ব্যাখ্যা। طَرِيْقَةٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে আসে। তার একটি অর্থ হলো সম্ভ্রান্ত জাতি।

قَوْلُهُ اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ : জাদুকরদের এ উক্তি اَسَرُّوا النَّجْوٰى-এর ফলশ্রুতি অর্থাৎ দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিশ্চিতভাবে তাঁরা উভয়েই জাদুকর।

هٰذَيْنِ হলো اِنَّ-এর ইসম, আর لَسٰحِرٰنِ হলো এর খবর। অন্য একটি قِرَاءَة-এ هٰذَانِ রয়েছে। আবুল হারেস ইবনে কা'আবের ভাষায় هٰذَانِ হলো اِنَّ-এর ইসম। এ সকল লোক تَثْنِيَة বা দ্বিবচনকে তিনো অবস্থায় আলিফ সহকারে পড়ে থাকে এবং اِعْرَابْ-কে تَقْدِيْرِىْ মেনে থাকে। কেউ বলেন اِنَّ-এর ইসম হলো ضَمِيْر شَانْ অর্থাৎ اِنَّهٗ আর هٰذَانِ لَسٰحِرٰنِ হলো اِنَّ-এর خَبَرْ - فَاَجْمِعُوْا শব্দটি هَمْزَة وَصْل ও مِيْم যবর সহকারে, অর্থ হলো– তুমি তোমার সকল কৌশল ও চেষ্টা ব্যয় কর বা একত্র কর। আর যদি فَاَجْمِعُوْا এর হামযাটি قَطْعِىْ এবং مِيْم বর্ণে যের সহকারে হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে তুমি তোমার সকল কৌশল ও চেষ্টাকে সুদৃঢ় ও মজবুত কর।

قَوْلُهُ صَفًّا : এটা اِيْتُوْا-এর যমীর থেকে حَالْ আর صَفًّا শব্দটি যেহেতু مَصْدَرْ এ কারণে বহুবচনের যমীর থেকে حَالْ হওয়া বৈধ। অর্থ হলো– مُصْطَفِّيْنَ

قَوْلُهُ اِخْتَرْ : এটা উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ তার পরবর্তী অংশসহ مُفْرَدْ-এর তাবীলে হয়ে উহ্য اِخْتَرْ ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ : এখানে বাক্যে শব্দ উহ্য রয়েছে। মূলত فَاَلْقَوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ ছিল। عِصِىٌّ শব্দটি মূলত عَصُوْوٌ ছিল। প্রথমত দ্বিতীয় وَاوْ-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন وَاوْ এবং يَاء একত্র হওয়ায় প্রথম

وَاوْ টিকে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর এক يَاء -কে অপর يَاء -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এবং صَادْ ও عَيْن বর্ণের পেশকে যের দেওয়া হয়েছে। فَإِذَا - خَبَرْ হলো يُخَيَّلُ إِلَيْهِ হলো مُبْتَدَأ আর حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ এটা تَسْعٰى হবে। এর সম্বন্ধ হবে مُفَاجَاتِيَّة خَبَر مُقَدَّم আর حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ এ সময় يُخَيَّلُ إِلَيْهِ হবে। فِعْل টি -এর প্রতি এবং حِبَالٌ -এর যমীরের প্রতি সম্বন্ধ হওয়াও বৈধ হবে। حِبَالٌ যেহেতু مُؤَنَّث غَيْر حَقِيْقِيْ এ কারণে مُذَكَّرْ ব্যবহার করা বৈধ। أَنَّهَا تَسْعٰى এটা يُخَيَّلُ -এর بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ

قَوْلُهُ اَىْ خَافَ مِنْ جِهَةِ الخ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : কথোপকথনকালে আল্লাহ তা'আলা লাঠি এবং শুভ্রহস্তের ন্যায় স্পষ্ট মুজেযা দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা ও সাহায্য করার ওয়াদা করেছিলেন। তথাপি হযরত মূসা (আ.) ভয় পেলেন কেন?

উত্তর : এ ভয় মূলত সাপ থেকে নয়, বরং জাদুকরদের জাদু যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার অনুরূপ ছিল, কারণ তারাও তাদের রশি এবং লাঠি দ্বারা সাপ বানিয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, উপস্থিত জনতা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাকে জাদু না ভেবে বসে। ফলে তারা ঈমান থেকে বিরত থাকবে।

قَوْلُهُ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ : সাধারণত কেরাতে كَيْدُ শব্দটি رَفْع -এর সাথে রয়েছে। এ সময় اِنَّ -এর خَبَرْ হবে। আর اِنَّ الَّذِىْ এবং مَا مَوْصُوْلَه হলো صَنَعُوْا হলো صِلَه এ সময় عَائِدْ বিলুপ্ত থাকবে। বাক্যটি এমন হবে। صَنَعُوْهُ كَيْدُ سَاحِرٍ আর যদি اِنَّ مَصْدَرِيَّة হয়, তাহলে বাক্য যেভাবে আছে উক্ত অবস্থায় বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা لَا يُفْلِحُ السَّحَرَةُ বললেন না কেন? কারণ জাদুকর তো অনেকজন ছিল। মুফাসসির (র.) سَاحِرٍ শব্দের ব্যাখ্যা جِنْسِه দ্বারা করে এর উত্তর দিয়েছেন যে, এর দ্বারা একজন জাদুকর উদ্দেশ্য নয়, বরং জাদুকর শ্রেণি উদ্দেশ্য। বহুবচন ব্যবহার করলে সন্দেহ থাকত যে, এখানে সংখ্যা উদ্দেশ্য। অথচ তা ঠিক নয়। فَأُلْقِىَ এটা اِلْقَاءٌ থেকে مَاضِىْ مَجْهُوْل -এর সীগাহ। অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকে লাঠি ও রশি ইত্যাদি নিক্ষেপের কাজ শুরু হলো এবং যা কিছু ঘটল তা উপস্থিত জনতা প্রত্যক্ষ করল। এরপর জাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। سُجَّدًا শব্দটি سَاجِدِيْنَ অর্থে। اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى এখানে বাক্যের শেষাংশের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য হারূনকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ - প্রত্যেক মানুষের খমিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : مِنْهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ এক হযরত আদম (আ.) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ.), তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন, সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারো কারো মতে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজন প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, কুরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বুঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীস এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবূ নু'আঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাজকিরা গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ عَوْنٍ لَمْ نَكْتُبْهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ نَبِيْلٍ وَهُوَ اَحَدُ الثِّقَاتِ الْاَعْلَامِ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ ـ

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী (র.) বলেন, যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা (র.) এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ -[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খমিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, আমি হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হবো। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি গরীব। হযরত ইবনে জাওযী (র.) একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (র.) বলেন, এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান [লিগায়রিহি]-এর চেয়ে কম নয়। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَكَانًا سُوًى : অর্থাৎ ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) ও জাদুকরদের মোকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত, যাতে কোনো পক্ষকেই বেশি দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন- مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজসজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য হলো ঈদ অথবা কোনো মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন দিন ছিল? এতে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হতো। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন, এটা শনিবার ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারো মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য : হযরত মূসা (আ.) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণির লোকের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়ই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনী জাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

যাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান : এই বিষয়বস্তুটি বিস্তারিত বর্ণনাসহ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাকারায় হারূত ও মারূতের কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

জাদুকরদের সংখ্যা : ইমাম রাযী (র.) এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কাসেম ইবনে সালাম (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার এবং প্রত্যেকের

হাতে একটি লাঠি ও একটি দড়ি ছিল। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, জাদুকরদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার, আর প্রত্যেকের হাতেই ছিল একটি লাঠি ও একটি রশি। আর ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র.) বলেছেন, জাদুকরের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার। আর ইবনে জুরায়েজ ও ইকরামা (রা.) বলেছেন, তারা ছিল নয়শ। তিনশ জাদুকর আনা হয়েছিল পারস্য থেকে, তিনশত রোম থেকে, আর তিনশত ইস্কান্দরিয়া [মিশর] থেকে।

قَوْلُهُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলার কৌশল হিসেবে জাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে জাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশত থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামঊন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমতো কাজ করতো। কথিত আছে যে, তাদের সরদার একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিল। -[কুরতুবী]

জাদুকরদের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ ভাষণ : মুজেযা দ্বারা জাদুর মোকাবিলা করার পূর্বে হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ তা'আলার আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই- وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না। অর্থাৎ তার সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরিক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আজাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলা বাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানি শক্তি ও লোক লস্করের সহায়তায় যারা মোকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্য সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গাম্বর ও তাদের অনুসারীগণের সাথে সত্যের একটি গোপন শক্তি ও জাঁকজমক থাকে। তাদের সাদাসিধে ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। হযরত মূসা (আ.)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে জাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোনো জাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন, এদের মোকাবিলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ -এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্য তারা গোপন পরামর্শ করতে লাগল

قَوْلُهُ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى : কিন্তু অবশেষে মোকাবিলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। তারা বলল-

اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى

অর্থাৎ তারা উভয়ে জাদুকর। তারা তাদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে দিতে চায়। উদ্দেশ্য এই যে, জাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ দখল করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। مُثْلٰى শব্দটি اَمْثَلُ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ হলো উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে ফেরাউনকে আল্লাহ ও ক্ষমতাশালী মান্য কর- এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম। এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোনো কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও কওমের 'তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) থেকে তরিকার এই তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব জাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হও।

قَوْلُهُ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا : সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই জাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করল।

জাদুকররা তাদের ভ্রূক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, নাকি আমরা করব? হযরত মূসা (আ.) জবাবে বললেন, بَلْ اَلْقُوا অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং জাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই জবাবে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জবাব দিয়েছেন। জাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জবাব ছিল এই যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে আরো অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত জাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে হযরত মূসা (আ.)-এর সামনে তাদের জাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই তিনি তাঁর মুজেযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মতো ফুটে উঠতে পারত। জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল।

قَوْلُهُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى : এ থেকে জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের জাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ জাদু এরূপই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَأَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهِ خِيْفَةً مُّوْسٰى : অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো। কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন, প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি জাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জবাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে– لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى এতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, জাদুকররা জিততে পারবে না। আপনিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবেন। এভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর উপরিউক্ত আশঙ্কা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হলো যে, আপনার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ করুন! এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের জাদুর কোনো মূল্য নেই। এজন্য পরোয়া করবেন না এবং আপনার হাতে যা-ই আছে, তা-ই নিক্ষেপ করুন! এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হলো। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে জাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

জাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল : হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন জাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ জাদুকরদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এ কাজ জাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মুজেযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল, আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোনো হাদীসে রয়েছে, জাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তুলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোজখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়। –[রূহুল মা'আনী]

٧١. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا لَهُ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ط اِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمْ مُعَلِّمُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ حَالٌ بِمَعْنٰى مُخْتَلِفَةٍ ط اَيِ الْاَيْدِيَ الْيُمْنٰى وَالْاَرْجُلَ الْيُسْرٰى وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ط اَيْ عَلَيْهَا وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا يَعْنِيْ نَفْسَهُ وَرَبُّ مُوْسٰى اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ـ اَدْوَمُ عَلٰى مُخَالِفَتِهِ ـ

অনুবাদ :

৭১. ফেরাউন বলল, কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করলে أَأَمَنْتُمْ -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করে তাঁর প্রতি, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই, সে তো দেখছি তোমাদের প্রধান তোমাদের শিক্ষক সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে, সুতরাং আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করব مِنْ خِلَافٍ হলো اَيْدِيَكُمْ যা مَفْعُوْل -এর حَالٌ অর্থ مُخْتَلِفَةً তথা ডান হাত এবং বাম পা এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলিবিদ্ধ করবই অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষের উপর আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর রবের শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী তার বিরুদ্ধাচরণে।

٧٢. قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ نَخْتَارَكَ عَلٰى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ الدَّالَّةِ عَلٰى صِدْقِ مُوْسٰى وَالَّذِيْ فَطَرَنَا خَلَقَنَا قَسَمٌ اَوْ عَطْفٌ عَلٰى مَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ط اَيْ اِصْنَعْ مَا قُلْتَهُ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ط اَلنَّصَبُ عَلَى الْاِتِّسَاعِ اَيْ فِيْهَا وَتُجْزٰى عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৭২. তারা বলল, তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না তোমাকে নির্বাচন করব না আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর যা হযরত মূসা (আ.)-এর সত্যতার উপর প্রমাণ বহন করে আর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর وَالَّذِيْ অংশটি কসম/শপথ অথবা তার আতফ হলো فَاقْضِ -এর উপর তুমি যা চাও তা কর অর্থাৎ তুমি যা বলেছ তা কর। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার اَلْحَيٰوةَ -এর نَصَبْ টি ظَرْف তথা مَفْعُوْل فِيْه হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনের মধ্যে। আর পরকালে এর প্রতিদান দেওয়া হবে।

٧٣. اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا مِنَ الْاِشْرَاكِ وَغَيْرِهِ وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط تَعَلُّمًا وَعَمَلًا لِمُعَارَضَةِ مُوْسٰى وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِنْكَ ثَوَابًا اِذَا اُطِيْعَ وَّاَبْقٰى ـ مِنْكَ عَذَابًا اِذَا عُصِيَ ـ

৭৩. আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ শিরক ইত্যাদি হতে এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ শিক্ষা করতে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ তোমার থেকে প্রতিদান দানে যখন তার অনুগত করা হয় ও স্থায়ী তোমার থেকে শাস্তি দানে যখন তার নাফরমানি করা হয়।

অনুবাদ :

٧٤. قَالَ تَعَالٰى اِنَّهٗ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا كَافِرًا كَفِرْعَوْنَ فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ط لَا يَمُوْتُ فِيْهَا فَيَسْتَرِيْحُ وَلَا يَحْيٰى ـ حَيَاةً تَنْفَعُهٗ ـ

৭৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে তার প্রতিপালকের প্রতি অপরাধী হয়ে ফেরাউনের ন্যায় কাফের হয়ে তার জন্য আছে জাহান্নাম। সে সেথায় মরবেও না যে স্বস্তি পাবে বাঁচবেও না এমন জীবন যা তাকে উপকৃত করবে।

٧٥. وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ـ جَمْعُ عُلْيَا مُؤَنَّثُ اَعْلٰى ـ

৭৫. যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে ফরজ ও নফল কর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা اَلْعُلٰى শব্দটি عُلْيَا -এর বহুবচন যা اَعْلٰى -এর مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গ।

٧٦. جَنّٰتُ عَدْنٍ اَىْ اِقَامَةٍ بَيَانٌ لَهٗ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ـ تَطَهَّرَ مِنَ الذُّنُوْبِ ـ

৭৬. স্থায়ী জান্নাত عَدْنٌ শব্দের অর্থ হলো অবস্থানযোগ্য তার বিবরণ হলো যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র। গুনাহ থেকে পবিত্র থাকবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اٰمَنْتُمْ لَهٗ : এর هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامٌ টি অস্বীকার ও হুমকিমূলক, হযরত হাফস (র.)-এর মতে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ ـ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ءَاٰمَنْتُمْ -এর সিলাহ لَامٌ আনা হয়েছে। কারণ ءَاٰمَنْتُمْ শব্দটি اِتَّبَعْتُمْ -এর অর্থ বিশিষ্ট। ءَاٰمَنْتُمْ উভয় হামযা স্বঅবস্থায় বহাল রয়েছে। প্রথমটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ দ্বিতীয়টি فَا كَلِمَةٌ , শব্দটি جَمْعُ مُذَكَّرٍ حَاضِرٌ - اَكْرَمْتُمْ -এর ছন্দে। দ্বিতীয় হামযাটিকে নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامٌ প্রবিষ্ট হয়েছে। এখন শব্দটিতে দুই হামযা অপরিবর্তিত অবস্থায় একত্র হয়েছে। উভয় হামযাকে স্বঅবস্থায় বহাল রেখে অথবা হামযা اِسْتِفْهَامٌ-কে বিলোপ করে পড়া যায়। মুফাসসির (র.)-এর وَاِبْدَالُ الثَّانِيَةِ اَلِفًا বলাটা অস্পষ্ট। কারণ দ্বিতীয়টি তো কেরাতের মধ্যে পরিবর্তনবিহীন বহাল রয়েছে। অবশ্য اِبْدَالُ الثَّالِثَةِ বললে তা সঙ্গত হতো।

قَوْلُهٗ مِنْ خِلَافٍ : এর مِنْ হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ আর خِلَافٍ শব্দটি مُخْتَلِفَةٍ অর্থে হয়ে حَالٌ অর্থাৎ اُقَطِّعُهَا مُخْتَلِفَاتٍ

قَوْلُهٗ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ اَىْ عَلَيْهَا : অর্থাৎ فِىْ অব্যয়টি عَلٰى অর্থে– اَيُّنَا হলো مُبْتَدَأٌ আর اَشَدُّ وَاَبْقٰى হলো خَبَرٌ ك مُبْتَدَأٌ - خَبَرٌ মিলে لَتَعْلَمُنَّ -এর مَفْعُوْلٌ যা দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। عَلٰى مُخَالَفَتِهٖ -এর সম্পর্ক হলো اَشَدُّ وَاَبْقٰى -এর সাথে। وَالَّذِىْ فَطَرَنَا -এর وَاوْ টি যদি কসমিয়্যাহ হয় তাহলে مَوْصُوْلٌ صِلَةٌ মিলে قَسَمٌ এবং لَا تُؤْثِرُكَ عَلَى الْحَقِّ - جَوَابُ قَسَمٍ উহ্য ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ وَحَقُّ الَّذِىْ فَطَرَنَا لَا تُؤْثِرُكَ عَلَى الْحَقِّ হবে। আর وَاوْ টি عَاطِفَةٌ হলে হবে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ مَا جَاءَنَا অর্থাৎ لَا تُؤْثِرُكَ عَلَى الَّذِىْ جَاءَنَا وَلَا الَّذِىْ فَطَرَنَا হবে।

قَوْلُهٗ فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ : এটা হুমকির জবাব। هٰذِهِ حَيَاةَ الدُّنْيَا -এর মধ্যে هٰذِهٖ হলো مُبْدَلٌ مِنْهُ আর اَلْحَيٰوةَ হলো بَدَلٌ এটা হরফে জর বিলুপ্তির কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। বাক্যটি এমন ছিল اِنَّمَا تَقْضِىْ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ; এর মধ্যকার فِىْ অব্যয়টি বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে তা مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّمَا : এর مَا -এর মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা– ১. مَا অব্যয়টি فِعْل -এর উপর اِنَّ -এর প্রবেশকে বৈধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর اَلْحَيٰوةَ الدُّنْيَا হলো تَقْضِىْ -এর ظَرْف আর تَقْضِىْ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ تَقْضِىْ غَرْضَكَ ২. مَا শব্দটি اَلَّذِىْ অর্থে اِنَّ -এর اِسْم আর تَقْضِيْهِ -এর صِلَة বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ اَلَّذِىْ تَقْضِيْهِ كَائِنٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا . (جَمَل)

وَمَآ اَكْرَهْتَنَا -এর আতফ হলো خَطَايَانَا -এর উপর অর্থাৎ যাতে আমাদের অন্যায় এবং জাদুকর্মকে ক্ষমা করে দেন। যার ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলেন। مِنَ السِّحْرِ হলো عَلَيْهِ -এর যমীর থেকে অথবা مَا مَوْصُوْلَة থেকেও حَالٌ হতে পারে। আর مِنْ হলো جِنْس বা শ্রেণি বুঝানোর জন্য।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ জুমলায়ে মুস্তানিফা। এর পূর্বে জাদুকরদের উক্তি ছিল। আর এটা হলো আল্লাহ তা'আলার উক্তি। خَالِدِيْنَ শব্দটিকে مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে জাদুকরদেরকে বলতে লাগল, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে, সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই জাদুকরদের কোনো কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মুজেযা দেখার পর কারো অনুমতির আবশ্যকতা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল, এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই জাদুকরই তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ।

قَوْلُهُ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ : এখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল। অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ পন্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শুলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَوْلُهُ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূববর্তী আয়াতে জাদুকরদের প্রতি ফেরাউনের ধমকের উল্লেখ ছিল। জাদুকররা যখন ইসলাম কবুল করলেন, তখন ফেরাউন উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, তোমরা আমার পক্ষ থেকে অনুমতি লাভের পূর্বেই মূসার প্রতি ঈমান আনলে? আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিব। তার প্রতিউত্তরে মু'মিনগণ যা বলেছেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

–[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ৮৯]

জাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হলো না। তারা বলল, আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোনো কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মুজেযার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, জাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল, এসব নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না। –[কুরতুবী]

এবং জগৎ স্রষ্টা আসমান জমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা বলে স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ এখন তোমার যা খুশি, আমাদের সম্পর্কে ফায়সালা কর এবং যে সাজা দেবার ইচ্ছা দাও।

قَوْلُهُ إِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا : অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোনো অধিকার থাকবে না। আল্লাহ তা'আলার অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তার অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তার শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ : জাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে জাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এই পাপকাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবিলার জন্য দর কষাকষিও ফেরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে জাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, জাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মুজেযার মোকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে জাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই জাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। -[রূহুল মা'আনী]

ফেরাউন পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া প্রতিযোগিতার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উপগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর বিজয়ের সংবাদ শুনানো হলো, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন, আমিও মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিল, একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তার প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তার মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হলো।

ফেরাউনী জাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন : إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا থেকে ذٰلِكَ جَزَاۤؤُا مَنْ تَزَكّٰى এসব বাক্যও প্রকৃত সত্য, যা খাঁটি ইসলামি বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ জাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামি বিশ্বাস ও কর্মের কোনো শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আ.)-এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বিলায়েতের [ওলীত্বের] ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফের জাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ তা'আলার ওলী হিসেবে শহীদ হয়ে গেলেন। -[ইবনে কাছীর]

٧٧. وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مِنْ اَسْرٰى اَوْ بِهَمْزَةِ وَصْلٍ وَكَسْرِ النُّوْنِ مِنْ سَرٰى لُغَتَانِ اَيْ سِرْ بِهِمْ لَيْلًا مِنْ اَرْضِ مِصْرَ فَاضْرِبْ اجعل لَهُمْ بِالضَّرْبِ بِعَصَاكَ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لا اَيْ يَابِسًا فَامْتَثَلَ مَا اُمِرَ بِهٖ وَاَيْبَسَ اللّٰهُ الْاَرْضَ فَمَرُّوْا فِيْهَا لَا تَخٰفُ دَرَكًا اَيْ اَنْ يُدْرِكَكَ فِرْعَوْنُ وَلَا تَخْشٰى ـ غَرَقًا ـ

অনুবাদ :

৭৭. আমি অবশ্যই মূসার নিকট প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে যে, আমার বান্দাগণকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও ফে'লটি اَسْرِ هَمْزَةِ قَطْعِىْ যোগে اَسْرٰى হতে অথবা سَرٰى হতে هَمْزَةِ وَصْل যোগে এবং তখন ن বর্ণটি যেরযুক্ত হবে হতে। উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলায় মিশর হতে বেরিয়ে পড়ুন। এবং তাদের জন্য বানিয়ে দিন লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ يَبَسًا অর্থ يَابِسًا হযরত মূসা (আ.)-কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা তিনি পালন করলেন। আর আল্লাহ তা'আলা মাটি শুষ্ক করলেন। ফলে তারা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে গেল। পশ্চাৎ দিক হতে এসে আপনাকে ধরে ফেলবে এই আশঙ্কা করবেন না। অর্থাৎ ফেরাউন আপনার নাগাল পেয়ে যাবে। এবং ভয়ও করবেন না ডুবে যাওয়ার।

٧٨. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ وَهُوَ مَعَهُمْ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ اَيِ الْبَحْرِ مَا غَشِيَهُمْ ـ مَا غَرَقَهُمْ ـ

৭৮. অতঃপর তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। আর সে ফেরাউন তাদের সাথেই ছিল অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলল। নিমজ্জিত করল।

٧٩. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ بِدُعَائِهِمْ اِلٰى عِبَادَتِهٖ وَمَا هَدٰى ـ بَلْ اَوْقَعَهُمْ فِى الْهَلَاكِ خِلَافَ قَوْلِهٖ وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ـ

৭৯. আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল। তাদেরকে তার উপসনার প্রতি আহ্বান করে। এবং সে সৎপথ দেখায়নি; বরং তাদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করেছে তার উক্তি– "আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করছি" -এর বিপরীতে।

٨٠. يٰبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ فِرْعَوْنَ بِاِغْرَاقِهٖ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ فَنُؤْتِيْ مُوْسَى التَّوْرٰىةَ لِلْعَمَلِ بِهَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ـ هُمَا التُّرَنْجَبِيْنُ وَالطَّيْرُ السُّمَانٰى بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ وَالْقَصْرِ وَالْمُنَادٰى مَنْ وُجِدَ مِنَ الْيَهُوْدِ زَمَنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَخُوْطِبُوْا بِمَا اُنْعِمَ بِهٖ عَلٰى اَجْدَادِهِمْ زَمَنَ النَّبِيِّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى لَهُمْ ـ

৮০. হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে। আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে সেখানে আমি মূসাকে [হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে] তাওরাত দিয়েছিলাম সে অনুযায়ী আমল করার জন্য। এবং তোমাদের নিকট মান্না সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। মান্না ও সালওয়া হলো সুমিষ্ট খাদ্য ও তিতির জাতীয় পাখি। اَلسُّمَانٰى শব্দটি مِيْم বর্ণটি তাশদীদবিহীন এবং শেষে اَلِف مَقْصُوْرَة যোগে। এখানে রাসূল ﷺ -এর যুগে বিদ্যমান ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে তাদের পূর্বসূরী বংশধরকে যে অনুগ্রহ করা হয়েছিল, তা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। [আর এটা হচ্ছে] আল্লাহ তা'আলার সামনের বাণীর ভূমিকা স্বরূপ–

অনুবাদ :

٨١. كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ اَيِ الْمُنْعَمِ بِهٖ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ بِاَنْ تَكْفُرُوا الْمُنْعِمَ بِهٖ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ج بِكَسْرِ الْحَاءِ اَيْ يَجِبُ وَبِضَمِّهَا يَنْزِلُ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ بِكَسْرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا فَقَدْ هَوٰى ـ سَقَطَ فِي النَّارِ ـ

৮১. তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভালো ভালো বস্তু আহার কর তোমাদের উপর কৃত অনুগ্রহ থেকে এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না। এভাবে যে, আমার অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করবে করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত فَيَحِلَّ -এর ح বর্ণে যের দিয়ে অর্থাৎ অবধারিত হবে। আর ح বর্ণে পেশ হলে অর্থ হবে অবতীর্ণ হবে। এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। জাহান্নামে পতিত হয়।

٨٢. وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ وَاٰمَنَ وَحَّدَ اللّٰهَ وَعَمِلَ صَالِحًا يُصَدِّقُ بِالْفَرْضِ وَالنَّفْلِ ثُمَّ اهْتَدٰى ـ بِاِسْتِمْرَارِهٖ عَلٰى مَا ذُكِرَ اِلٰى مَوْتِهٖ ـ

৮২. এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে শিরক হতে ঈমান আনে আল্লাহ তা'আলাকে এক বলে স্বীকার করে সৎকর্ম করে ফরজ ও নফল সবই এর অন্তর্ভুক্ত। ও সৎপথে অবিচলিত থাকে উল্লিখিত বিষয়াদিতে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার মাধ্যমে।

٨٣. وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمَجِيْءِ مِيْعَادِ اَخْذِ التَّوْرٰىةِ يٰمُوْسٰى ـ

৮৩. কিসে আপনাকে আপনার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে ত্বরা করতে বাধ্য করল নির্ধারিত সময়ে তাওরাত গ্রহণ করার জন্য আগমন করতে। হে মূসা!

٨٤. قَالَ هُمْ اُولَآءِ اَيْ بِالْقُرْبِ مِنِّيْ يَاْتُوْنَ عَلٰى اَثَرِيْ ج وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ـ عَنِّيْ اَيْ زِيَادَةً عَلٰى رِضَاكَ وَقَبْلَ الْجَوَابِ اَتٰى بِالْاِعْتِذَارِ بِحَسْبِ ظَنِّهٖ وَتَخَلَّفِ الْمَظْنُوْنِ لَمَّا ـ

৮৪. তিনি বললেন, এই তো তারা আমার নিকটেই আছে। আমার পশ্চাতে আসছে এবং হে আমার প্রতিপালক আমি ত্বরায় আপনার নিকট আসলাম আপনি সন্তুষ্ট হবেন এজন্য। অর্থাৎ আপনার সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য। জবাবের পূর্বেই তিনি নিজ ধারণা মতে ওজর পেশ করলেন এবং ধারণাটি বাস্তবতার বিপরীত প্রমাণিত হলো।

٨٥. قَالَ تَعَالٰى فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ اَيْ بَعْدَ فِرَاقِكَ لَهُمْ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ـ فَعَبَدُوا الْعِجْلَ ـ

৮৫. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তো আপনার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, আপনি চলে আসার পর অর্থাৎ তাদের থেকে আপনি পৃথক হওয়ার পর। এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে ফলে তারা গো-বৎস পূজা করেছে।

٨٦. فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ مِنْ جِهَتِهِمْ اَسِفًا ج شَدِيْدِ الْحُزْنِ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ط اَىْ صِدْقًا اَنَّهٗ يُعْطِيْكُمُ التَّوْرٰىةَ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ مُدَّةُ مُفَارَقَتِىْ اِيَّاكُمْ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ يَجِبَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ بِعِبَادَتِكُمُ الْعِجْلَ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ . وَتَرَكْتُمُ الْمَجِيْئَ بَعْدِىْ .

অনুবাদ :

৮৬. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের প্রতি ভীষণ মর্মাহত ও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? সত্য প্রতিশ্রুতি যে, তিনি তোমাদেরকে তাওরাত দান করবেন তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে তোমাদের নিকট হতে আমার পৃথক হওয়ার সময়? নাকি তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের গো-বৎস উপাসনার কারণে যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে এবং আমার পশ্চাতে আগমন থেকে বিরত থাকলে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا الخ : এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ তথা ঘটনার উপর ঘটনার عَطْف -এর অন্তর্গত। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রথমত হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট রাসূল বানিয়ে প্রেরণের কাহিনী এবং তার বিশেষ মুজেযা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ফেরাউন এবং তার বাহিনীর শিক্ষণীয় পরিণতির কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কাজেই এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্গত হলো।

قَوْلُهٗ طَرِيْقًا : এটা اِضْرِبْ -এর মাফউলেবিহী। কেননা اِضْرِبْ শব্দটি اِجْعَلْ -এর অর্থ বিশিষ্ট। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন। আবার اِضْرِبْ -এর মাফউলেবিহী যদি লুপ্ত হয়, তাহলে বাক্যটি এমন হবে– اِضْرِبْ مَوْضِعَ طَرِيْقٍ এ ক্ষেত্রে طَرِيْق -এর দিকে اِضْرِبْ -এর সম্বন্ধ রূপকার্থে হবে। مَوْضِع শব্দকে বিলোপ করে طَرِيْق -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। ফলে اِضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا হয়েছে। এখানে طَرِيْق দ্বারা جِنْس طَرِيْق উদ্দেশ্য। কেননা বনী ইসরাঈলের গোত্রের সংখ্যানুপাতে বারোটি রাস্তা বানিয়েছিলেন। يَبَسًا শব্দটি মাসদার, طَرِيْق -এর উপর এটা মুবালাগা স্বরূপ প্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা মাসদারের পূর্বে ذَاتَ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذَاتَ يَابِسٍ ছিল। আর যদি بَا বর্ণকে সাকিন দিয়ে পড়া হয় তাহলে এটা يَابِسًا অর্থে সিফাতের সীগাহ হবে। لَا تَخَافُ শব্দটি হামযা (র.) ছাড়া বাকি সকল ক্বারীগণের মতে রফা যোগে পঠিত। এ সময় এটা জুমলায়ে মুস্তানিফা হবে। আর এর কোনো مَحَلِّ اِعْرَابْ হবে না। অথবা اِضْرِبْ -এর فَاعِلْ -এর যমীর থেকে حَالْ হবে। অর্থাৎ اِضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا حَالَ كَوْنِكَ غَيْرَ خَائِفٍ আর হামযা (র.) জযমযোগে পড়েছেন। কারণ তার মতে لَا হলো نَاهِيَة এ কারণে تَخَفْ জযমযোগে হবে।

قَوْلُهٗ وَلَا تَخْشٰى : এটা সকল কারীগণের মতে اَلِفْ সহ পঠিত হয়েছে। رَفْع -এর ক্ষেত্রে لَا تَخَافُ -এর উপর এর আতফ হওয়াটি স্পষ্ট। আর জযমের ক্ষেত্রে এর عَطْف . لَا تَخَفْ -এর উপর হবে। আর لَا تَخْشٰى -এর মধ্যে জযমের

আলামত হবে اَلِفْ বিলুপ্ত হওয়া। আর বর্তমান যে আলিফ রয়েছে সেটি اِشْبَاعْ-এর আলিফ হবে। فَاصِلَةٌ তথা বাক্যের শেষাংশের ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে এটা আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِجُنُوْدِهِ : এটা হালের স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَهُمْ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, جَارْ টি اَتْبَعَهُمْ-এর صِلَةٌ নয়; বরং حَالْ-এর স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। আর اَتْبَعَهُمْ-এর দ্বিতীয় মাফউল লুপ্ত রয়েছে। অর্থ হলো- اَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ نَفْسَهُ مَعَ جُنُوْدِهِ আর বায়যাবিতে উল্লেখ আছে যে, وَالْمَعْنٰى فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ نَفْسَهُ وَمَعَهُ جُنُوْدُهُ . فَحُذِفَ مَفْعُوْلٌ ثَانِیْ কেউ বলেন, بِجُنُوْدِهِ-এর بَا অতিরিক্ত। فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ সমুদ্রের তরঙ্গমালার ধ্বংসাত্মক অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত তরঙ্গমালার ধ্বংসাত্মক অবস্থা এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া তার প্রকৃত অবস্থা কেউ জানে না।

قَوْلُهُ فَنُؤْتِيْ مُوْسَى التَّوْرٰةَ لِلْعَمَلِ بِهَا : এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে- প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-কে তার কওমকে নয়। সুতরাং وَوٰعَدْنٰكُمْ-এর মধ্যে কওমের প্রতি প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ করা হলো কেন?

উত্তর : যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করার উদ্দেশ্যই ছিল যে, তাঁর কওম তার উপর আমল করবে। এর মধ্যেই ছিল তাদের সফলতা। এ কারণেই তাদের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উত্তর : এই হতে পারে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি সত্তর জন সর্দারকে তূর পর্বতে নিয়ে আসবেন। এদিক দিয়েও কওমের প্রতি প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধ করা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَنَّ : এটা শিশির বিন্দুর ন্যায় বস্তু। হালুয়া বা মিষ্টান্নের আকৃতির ছিল। তীহ প্রান্তরে পথহারা ইসরাইলীদের আহারের জন্য প্রতিদিন গাছের পাতার উপর আল্লাহ তা'আলা তা অবতীর্ণ করতেন। سَلْوٰى এটা এক প্রকারের পাখি বিশেষ। উর্দু ভাষায় এটাকে বটের বলা হয়। কামূস অভিধানে এর একবচন سَلْوَةٌ লিখিত আছে। আখফাশ (র.) বলেন, এর কোনো একবচন শব্দ শোনা যায় না। هَوٰى শব্দটি مَاضِىْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বাবে ضَرَبَ এটা هَوِىٌّ মাসদার থেকে গঠিত। অর্থ- পড়ে যাওয়া।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَّحْلِلْ : এর لام বর্ণে যের বা পেশ উভয়টি শুদ্ধ। ثُمَّ اهْتَدٰى-এর ব্যাখ্যা بِاسْتِمْرَارِ عَلٰى مَا ذُكِرَهُ اِلٰى مَوْتِهِ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন. اِهْتَدٰى উল্লেখ করার রহস্য কি? কেননা اٰمَنَ-এর ব্যাপকতায় তো اِهْتَدٰى অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উত্তর : এখানে ঈমানের উপর সদা অটল থাকা উদ্দেশ্য। কেননা এর উপরই পূর্ণ নাজাত মওকুফ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ : এর مَا অব্যয়টি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ মুবতাদা, আর اَعْجَلَكَ হলো خَبَرْ ; বস্তুত এখানে জিজ্ঞাসাটি বুঝার জন্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার এর কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এটা বলা উদ্দেশ্য যে, তুমি তাড়াহুড়া করে নিজ গোত্রকে ছেড়ে এখানে চলে এলে। আমি তো তোমার গোত্রকে এক ফেৎনায় লিপ্ত করে দিয়েছি।

قَوْلُهُ هُمْ اُولَاءِ : এখানে هُمْ হলো مُبْتَدَأْ আর اُولَاءِ শব্দটি اَلَّذِىْ অর্থে عَلٰى اَثَرِىْ হলো তার صِلَةٌ

قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلٰى رِضَاكَ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-এর আগে চলে যাওয়াটা অধিক সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিল, মূল সন্তুষ্টির জন্য নয়। কেননা নবীগণের উপর আল্লাহ তা'আলা তো সন্তুষ্ট আছেনই। অবশ্য আধিক্য কাম্য হতে পারে।

عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ قَوْلُهُ وَقَبْلَ جَوَابِ اَتٰى بِاعْتِذَارِ الخ : এর সারমর্ম এই যে, مَا اَعْجَلَكَ -এর উত্তর হলো لِتَرْضٰى হযরত মূসা (আ.) আসল উত্তরের পূর্বে هُمْ اُولَاۤءِ عَلٰۤى اَثَرِىْ দ্বারা এর ওজর বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাদেরকে ছেড়ে আসেনি; বরং তারা নিকটেই আমার সঙ্গে রয়েছে। এটা বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো হযরত মূসা (আ.) বুঝেছিলেন যে, বাস্তবিকই তারা তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। কিন্তু তারা পথে থেমে গিয়েছিল। ফলে হযরত মূসা (আ.)-এর ধারণা বাস্তবের পরিপন্থি হলো। আর এটা তখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যখন আল্লাহ তা'আলা فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ বললেন। لِمَا-এর লামটি تَعْلِيْلِيَّةٌ ; যেন এটা ধারণার বিপরীত হওয়ার عِلَّتٌ

قَوْلُهُ اَلسَّامِرِىُّ : লোকটি বনী ইসরাঈলের সামেরা গোত্রের ছিল। কেউ বলেন, সামেরা হলো ইহুদিদের একটি দল। যারা কোনো কোনো বিষয়ে অন্যান্য ইহুদিদের থেকে ভিন্ন মতবালম্বী ছিল। কেউ বলেন, কিরমানের এক গ্রাম্য কাফের ছিল। তার নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। লোকটি ছিল মুনাফিক। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা গাভীর পূজা করত। মূসা সামেরী এর লালন পালন করেছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। ফেরাউন কর্তৃক তাকে হত্যা করার আশঙ্কায় তার মা তাকে গুহায় লুকিয়ে রেখেছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তাঁর আঙ্গুল চোষণ করাতেন। এক আঙ্গুল থেকে দুধ, আর এক আঙ্গুল থেকে মধু এবং তৃতীয় আরেকটি আঙ্গুল থেকে ঘি বের হতো। জনৈক কবির ভাষায়–

مُوْسَى الَّذِىْ رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ

অর্থাৎ ফেরাউন যে মূসাকে প্রতিপালন করল তিনি হলেন নবী, আর হযরত জিবরাঈল (রা.) যে মূসাকে প্রতিপালক করলেন সে হলো কাফের।

তাফসীরে কুরতুবী -এর প্রান্তটীকায় লিখিত আছে যে, সামেরী ছিল হিন্দুস্তানের অধিবাসী। সে গাভীর পূজা করতো। [বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন– লুগাতুল কুরআন তৃতীয় খণ্ড, রচনায় : মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী।]

مُوْسٰى শব্দটি مَعْرِفَةٌ ও নামবাচক শব্দ। বনী ইসরাঈলের বিখ্যাত নবী ছিলেন। তার মায়ের নাম ছিল يُوْحَانِتْ পিতার নাম ছিল عِمْرَان ; বলা হয় যে, ইবরানি ভাষায় مُوْ অর্থ পানি। شٰى অর্থ হলো গাছ। আরবি ভাষায় شِيْن কে سِيْن দ্বারা কখনো কখনো পরিবর্তন করা হয়। হযরত মূসা (আ.) কে জন্মগ্রহণের পরে এটি কাঠের বাক্সে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এজন্য তার নাম হয়েছে মূসা।

قَوْلُهُ اَنَّهُ يُعْطِيْكُمُ التَّوْرَاةَ : এ বাক্যটি يَعِدُكُمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল, আর كُمْ হলো প্রথম মাফউল। وَعْدًا حَسَنًا হলো মাফউলে মুতলাক। اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ অর্থাৎ গো-বৎস পূজা এবং আমার বিরুদ্ধাচারণে তোমাদেরকে কে উৎসাহিত করল? নাকি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমার বিচ্ছিন্নতায় তোমরা এরূপ করলে? অথচ এমনটি হয়নি। নাকি তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ তা'আলা গজব ও রোষানলকে দাওয়াত দেওয়া। আর এটাও অনুচিত। কেননা কোনো বিবেকবানের জন্য আল্লাহ তা'আলার গজবকে ডেকে আনা মুনাসিব হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَاَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِىْ : হযরত মূসা (আ.) নিজ কওমের নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা আমার পিছনে পিছনে তুর পর্বতে আসবে। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى : যখন সত্য ও মিথ্যা, মুজেযা ও জাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর নেতৃত্বে নবী ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হলো। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার

আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.)-কে এই দুটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হলো যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল ফুতূনে' উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারোটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হলো। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে- فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলতো। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল। -[কুরতুবী]

মিশর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাঈলের কিছু অবস্থা, তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনের সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে ভূমধ্য সাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাঈল ইতিপূর্বে মিশরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারোটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ তা'আলার কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিশরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিশর থেকে বের হলো যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য সাগর দেখে বনী ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল, এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে তার পশ্চাতে আসার নির্দেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ -বাক্যের সারমর্ম তাই। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَ وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ : অর্থাৎ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাঈল স্বয়ং তার বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

قَوْلُهُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى : এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন

সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদেরকে আহারের জন্য দেওয়া হতো।

যখন হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হলো, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাঈল বলতে লাগল– তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোনো আল্লাহ বানিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জবাবে বললেন–

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল।

তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এসো। আমি তোমাকে তাওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তাওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশদিন ও ত্রিশরাত অবিরাম রোজা রাখতে হবে। এরপর দশদিন আরো বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে হযরত মূসা (আ.)-এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোজা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হযরত হারূন (আ.)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাঈল হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং হযরত মূসা (আ.) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারা অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তাদের হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ তা'আলা বললেন, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسٰى অর্থাৎ হে মূসা! তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে?

ত্বরা করা সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য : হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরিউক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য। –[ইবনে কাসীর]

রূহুল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, এই প্রশ্নের কারণ ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য হুঁশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গাম্বরগণের মধ্যে এই ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। 'ইনতিসাফ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, এতে হযরত মূসা (আ.)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত। যেমন হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাকো।

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে হযরত মূসা (আ.) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরজ করলেন, আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি। কারণ নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক

সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাঈলেল মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন, সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতিবেশী এবং তার প্রতি বিশ্বাসী ছিল। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিশর ত্যাগ করেন, তখন সেও পথে রওয়ানা হয়। কারো কারো মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (র.) বলেন, এই পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনোরূপে মিশরে পৌঁছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মের দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। –[কুরতুবী]

কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে, সে ছিল ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু। সে গো-পূজা করত। সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা সে প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করেছিল।

জনশ্রুতি এই, সামেরীর নাম ছিল হযরত মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফেরাউন সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্র হত্যার ভয়ে ভীত জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তার এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর এক অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হলো ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই নিম্নোক্ত কাব্য-পংক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন–

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيْدًا تَحَيَّرَتْ * عُقُوْلُ مُرَبِّيَةٍ وَخَابَ الْمُؤَمِّلُ ـ
فَمُوْسَى الَّذِيْ رَبَّاهُ جِبْرِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِيْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنٌ ـ

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মূসাকে হযরত জিবরাঈল (আ.) লালন পালন করেছেন, সে তো কাফের হয়ে গেল এবং যে মূসাকে অভিশপ্ত ফেরাউন লালন পালন করেছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল হয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا : হযরত মূসা (আ.) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহুল্য, তাওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

قَوْلُهُ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোনো দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

قَوْلُهُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ : অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গজব ডেকে আনছ।

অনুবাদ :

٨٧. قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا مُثَلَّثُ الْمِيْمِ اَىْ بِقُدْرَتِنَا اَوْ بِاَمْرِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ بِفَتْحِ الْحَاءِ مُخَفَّفًا بِضَمِّهَا وَكَسْرِ الْمِيْمِ مُشَدَّدًا اَوْزَارًا اَثْقَالاً مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ اَىْ حُلِىِّ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِسْتَعَارَهَا مِنْهُمْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ بِعِلَّةِ عُرْسٍ فَبَقِيَتْ عِنْدَهُمْ فَقَذَفْنٰهَا طَرَحْنَاهَا فِى النَّارِ بِاَمْرِ السَّامِرِىِّ فَكَذٰلِكَ كَمَا اَلْقَيْنَا اَلْقَى السَّامِرِىُّ. مَا مَعَهُ مِنْ حُلِيِّهِمْ وَمِنَ التُّرَابِ الَّذِىْ اَخَذَهُ مِنْ اَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ جِبْرَئِيْلَ عَلَى الْوَجْهِ الْاٰتِىْ.

৮৭. তারা বলল, আমরা আপনার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি। بِمَلْكِنَا-এর مِيْم বর্ণে যবর, যের ও পেশ তিনো হরকত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের ক্ষমতা বলে বা আমাদের নির্দেশে তথা স্বেচ্ছায় তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল حُمِّلْنَا-এর দুটি কেরাত রয়েছে। ১. ح বর্ণে যবর ও مِيْم বর্ণে তাশদীদবিহীন যবর। ২. ح বর্ণে পেশ ও مِيْم বর্ণে তাশদীদসহ যের। লোকদের অলঙ্কারের বোঝা অর্থাৎ ফেরাউন সম্প্রদায়ের অলঙ্কার সমূহ যা তাদের থেকে বনী ইসরাঈলীরা ধার নিয়েছিল উৎসবের কারণে ফলে তাদের নিকট তা থেকে যায়। আমরা তা নিক্ষেপ করি অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেই সামেরীর নির্দেশে। অনুরূপভাবে আমরা যেভাবে নিক্ষেপ করেছি সামেরীও নিক্ষেপ করে তার সাথে যেই অলঙ্কার ছিল তা এবং সেই মাটি যা সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার খুরের চিহ্ন থেকে সংগ্রহ করেছে। যেমনটি সামনে বিবরণ আসছে।

٨٨. فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً صَاغَهُ لَهُمْ مِنَ الْحُلِىِّ جَسَدًا لَحْمًا وَدَمًا لَّهُ خُوَارٌ اَىْ صَوْتٌ يُسْمَعُ اَىْ اِنْقَلَبَ كَذٰلِكَ بِسَبَبِ التُّرَابِ الَّذِىْ اَثَرُهُ الْحَيَاةُ فِيْمَا يُوْضَعُ فِيْهِ وَوَضَعَهُ بَعْدَ صَوْغِهِ فِىْ فَمِهِ فَقَالُوْا اَىِ السَّامِرِىُّ وَاَتْبَاعُهُ هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ. مُوْسٰى رَبَّهُ هُنَا وَذَهَبَ يَطْلُبُهُ.

৮৮. অতঃপর সে তাদের জন্য গড়ল এক গো-বৎস অর্থাৎ অলঙ্কারাদি দ্বারা তৈরি করল এক অবয়ব রক্ত মাংসের যা হাম্বা রব করত অর্থাৎ এমন শব্দ করত যা শোনা যেত। অর্থাৎ এরূপে সে মাটির কারণে রূপান্তরিত হলো যে মাটিতে জীবনের প্রভাব ছিল। সে তা গো-বৎসের মুখাভ্যন্তরে স্থাপন করেছিল। তারা বলল অর্থাৎ সামেরী ও তার অনুসারীরা। এটা তোমাদের ইলাহ এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ইলাহ। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন হযরত মূসা (আ.), তাঁর প্রভুকে এখানে এবং তিনি তাকে খোঁজতে গেছেন।

٨٩. قَالَ تَعَالٰى اَفَلَا يَرَوْنَ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهُ لَا يَرْجِعُ الْعِجْلُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً لا اَىْ لَا يَرُدُّ لَهُمْ جَوَابًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا اَىْ دَفْعَهُ وَّلَا نَفْعًا. اَىْ فَكَيْفَ يُتَّخَذُ اِلٰهًا.

৮৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন- তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে এখানে اَنْ অব্যয়টি ثَقِيْلَة থেকে خَفِيْفَة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং তার اِسْم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَنَّهُ সাড়া দেয় না গো-বৎস তাদের কথায় অর্থাৎ তাদের কথায় কোনো প্রতিউত্তর করে না। এবং ক্ষমতা রাখে না তাদের কোনো ক্ষতি করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং উপকার করার অর্থাৎ অতএব তাকে কিভাবে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى وَجْهِ الْاٰتِىْ : এ বাক্যের সম্পর্ক وَمِنَ التُّرَابِ -এর সাথে। অর্থাৎ اَلْقَى التُّرَابَ عَلٰى وَجْهِ الْاٰتِىْ আর وَاَلْقَى فِيْهَا اَنْ اَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ وَجْهِ الْاٰتِىْ হলো এই

فَاَخْرَجَ -এর আতফ হলো وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ -এর উপর। এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী।

قَوْلُهُ جَسَدًا : এটা اَلْعِجْلَ -এর حَالٌ অর্থাৎ اَخْرَجَ لَهُمْ صُوْرَةَ عِجْلٍ حَالَ كَوْنِهَا جَسَدًا

قَوْلُهُ لَحْمًا وَدَمًا : এটা বৃদ্ধি করে বলতে চেয়েছেন যে, রক্ত মাংসে গঠিত দেহকে جَسَدٌ বলা হয়। خُوَارٌ গরুর হাম্বা রবকে বলা হয়। অর্থাৎ সত্তা বা প্রকৃতির এ পরিবর্তন উক্ত মাটি ভিতরে প্রবিষ্ট করার কারণে ঘটেছিল।

قَوْلُهُ بِسَبَبِ التُّرَابِ اَىْ بِسَبَبِ وَضْعِ التُّرَابِ : এখানে مُضَافٌ লুপ্ত রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) وَضَعَهُ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছে যে, سَبَبٌ -এর পূর্বে وَضْعِ مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ فَنَسِىَ : এর ফায়েল হযরত মূসা (আ.)-ও হতে পারে। যেমন- ব্যাখ্যাকার (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব এটা সামেরীর উক্তি হবে। এ সময় উদ্দেশ্য এই হবে যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর প্রতিপালককে এখানে ভুলে গিয়েছিলেন। তাকে খোঁজ করার জন্য তূর পর্বতে গিয়েছিলেন। আবার نَسِىَ -এর ফায়েল সামিরীও হতে পারে। এ সময় এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী হবে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, সামেরী তার প্রতিপালককে ভুলে গেল। যার দরুন সে এ ধরনের কীর্তি করল। আবার এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, সামেরী এ বিষয়ের উপর দলিল পেশ করতে ভুলে গেল যে, গো-বৎস কোনোদিন উপাস্য হতে পারে না। এর দলিল হলো সামনের উক্তি।

قَوْلُهُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا : এখানে اَلَّا মূলত اَنَّهُ لَا يَرْجِعُ ছিল اَنَّ -কে تَخْفِيْف করে اَنْ করা হয়েছে এবং ه যমীরকে বিলোপ করা হয়েছে। অতঃপর নূনকে লামের মধ্যে ইদগাম করায় اَلَّا হয়েছে। কেউ কেউ يَرْجِعَ -কে نَصْب দিয়ে পড়েছেন। তবে এটি দুর্বল। কেননা اَفْعَال يَقِيْن -এর পরে اَنْ نَاصِبَة হতে পারে না। আর رُؤْيَته দ্বারা প্রথম ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চোখ দ্বারা দৃষ্টি উদ্দেশ্য। دَفْعَهُ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ جَلْبَهُ : এর দ্বারাও مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا : এর আতফ হলো لَا يَرْجِعُ -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا : مُلْكٌ শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি; বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ : اَوْزَارٌ শব্দটি وِزْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বোঝা। মানুষের পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وِزْر এবং পাপরাশিকে اَوْزَارٌ বলা হয়। زِيْنَتٌ শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফিরাউনের কওমকে বুঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে اَوْزَارٌ তথা পাপের বোঝা বলার কারণে এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেওয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা

হয়েছে। 'হাদীসুল ফুতুন' নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে এগুলো যে পাপ সে সম্পর্কে হুশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিল, এসব অলংকার, অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফেরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফেরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোনো চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্য হালাল নয়। কিন্তু যেসব কাফের ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোনো চুক্তিও হয়নি, ফিকহবিদদের পরিভাষায় যাদেরকে কাফেরে হরবী বলা হয়। তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হযরত হারূন (আ.) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জবাব বিশিষ্ট তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল। কিন্তু তা গনিমতের মালের [যুদ্ধলব্ধ মালের] মতোই বিধান রাখে। ইসলাম পূর্বকালে গনিমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েজ ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহৃত করা ও ভোগ করা জায়েজ নয়; বরং গনিমতের মাল একত্র করে কোনো টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেওয়া হতো এবং আসমানী আগুন [বজ্র ইত্যাদি] এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনিমতের মালকে আসমানি আগুন গ্রাস করতো না, সেই মাল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হতো। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রাসূলে কারীম ﷺ -এর শরিয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনিমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলো গনিমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে اوزار [পাপরাশি] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আ.)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুরি জ্ঞাতব্য : কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুঙ্খানিপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফের হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনিমতের মাল হয় না; বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। এ কারণেই সুরখসী গ্রন্থে مُغَالَبَةٌ بِالْمُحَارَبَةِ অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফের হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনিমতের মাল নয়; বরং একে مَال فَيْئ অর্থাৎ অনায়াসালব্ধ মাল বলা হয়। এরূপ মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফেরদের সম্মতি ও অনুমতি শর্ত। যেমন কোনো ইসলামি রাষ্ট্র কাফেরদের উপর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও কোনো জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই মালও অনায়াসলব্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালালরূপে গণ্য।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে কোনো জিহাদ ও যুদ্ধ হয়নি। আর এগুলো অনায়াসলব্ধ মালও নয়। কারণ এগুলো তাদের কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামি শরিয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফেরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করতো এবং তাঁকে 'আল-আমীন' [বিশ্বস্ত] বলে সম্বোধন করতো। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সমগ্র তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা.)-এর হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মালকে গনিমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেননি। এরূপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশ্নই উঠত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَقَذَفْنَاهَا : অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতূনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ.)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

قَوْلُهُ فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ : হাদীসে ফুতূনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ.) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পৌঁছল এবং হযরত হারূন (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল, আমিও নিক্ষেপ করব? হযরত হারূন (আ.) মনে করলেন যে, তার হাতেও হয়তো কোনো অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলল, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব, নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হযরত হারূন (আ.)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরি করতে উদ্যত হলো। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে হোক, অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের পর এবং হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী ইসরাঈলকে অলংকারাদির গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরিউক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। [এসব রেওয়ায়েত তাফসীরে কুরতুবী প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোনো প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ : অর্থাৎ সামেরী অলংকার দ্বারা একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جَسَدً [অবয়ব] শব্দ দৃষ্টে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল। তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

قَوْلُهُ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِيَ : অর্থাৎ আওয়াজরত গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল, এটাই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের অসার উজর বর্ণিত হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর ক্রোধ দেখে তারা এই ওজর পেশ করেছিল। এরপর اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মতো আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে আল্লাহ তা'আলার কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোনো জবাব দিতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ মেনে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি?

অনুবাদ :

٩٠. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ اَنْ يَّرْجِعَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ج وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ فِىْ عِبَادَتِهٖ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ ـ فِيْهَا ـ

৯০. হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর ফিরে আসার আগেই হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর তাঁর ইবাদতে এবং আমার আদেশ মেনে চলো এক্ষেত্রে।

٩١. قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ نَزَالُ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ عَلٰى عِبَادَتِهٖ مُقِيْمِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ـ

৯১. তারা বলেছিল, আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হবো না। এর উপাসনায় সর্বদা অনড় থাকব। আমাদের নিকট হযরত মূসা (আ.) ফিরে না আসা পর্যন্ত

٩٢. قَالَ مُوْسٰى بَعْدَ رُجُوْعِهٖ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ـ بِعِبَادَتِهٖ ـ

৯২. হযরত মূসা (আ.) বললেন, ফিরে আসার পর হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এর উপাসনার কারণে তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল?

٩٣. اَلَّا تَتَّبِعَنِ ط لَا زَائِدَةٌ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ـ بِاِقَامَتِكَ بَيْنَ مَنْ يَّعْبُدُ غَيْرَ اللّٰهِ ـ

৯৩. আমার পদাংক অনুসরণ করা হতে এখানে ৺ টি অতিরিক্ত তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? যারা আল্লাহ তা'আলাকে ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে তাদের মাঝে তোমার অবস্থান দ্বারা।

٩٤. قَالَ هٰرُوْنُ يَابْنَؤُمَّ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَرَادَ اُمِّىْ وَذِكْرُهَا اَعْطَفُ لِقَلْبِهٖ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَكَانَ اَخَذَهَا بِشِمَالِهٖ وَلَا بِرَاْسِىْ ج وَكَانَ اَخَذَ شَعْرَهٗ بِيَمِيْنِهٖ غَضَبًا اِنِّىْ خَشِيْتُ لَوْ اِتَّبَعْتُكَ وَلَا بُدَّ اَنْ يَّتْبَعَنِىْ جَمْعٌ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدِ الْعِجْلَ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَتَغْضَبُ عَلَىَّ وَلَمْ تَرْقُبْ تَنْتَظِرْ قَوْلِىْ ـ فِيْمَا رَاَيْتَهٗ فِىْ ذٰلِكَ ـ

৯৪. তিনি বললেন হযরত হারূন (আ.) হে আমার সহোদর! اُمَّ শব্দের مِيْم বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো اُمِّىْ বা আমার মা। হযরত মূসা (আ.)-এর মনে অধিক দয়া সঞ্চারিত করার জন্য এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরো না হযরত মূসা (আ.) ক্রোধবশত বাম হাতে তার দাড়ি এবং ডান হাতে তার চুল ধরেছিলেন আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, যদি আমি তোমার পানে চলে আসতাম তবে অবশ্যই আমার সাথে সে দলটিও চলে আসত যারা গো-বৎস পূজা করেনি। তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ফলে তুমি আমার প্রতি রাগান্বিত হতে। আর তুমি যত্নবান হওনি অপেক্ষা করনি আমার বাক্য পালনে তাদের বিষয়ে যা দেখেছ সে ব্যাপারে।

٩٥. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ شَاْنُكَ الدَّاعِىْ اِلٰى مَا صَنَعْتَ يٰسَامِرِىُّ ـ

৯৫. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তোমার ব্যাপার কি? তুমি যা করেছ সে ব্যাপারে কি কারণ কাজ করেছে। হে সামেরী!

٩٦. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ عَلِمْتُ مَا لَمْ يَعْلَمُوْهُ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ اَثَرِ حَافِرِ فَرَسِ الرَّسُوْلِ جِبْرَئِيْلَ فَنَبَذْتُهَا اَلْقَيْتُهَا فِىْ صُوْرَةِ الْعِجْلِ الْمُصَاغِ وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ لِىْ نَفْسِىْ ـ وَاُلْقِىَ فِيْهَا اَنْ اٰخُذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ مَا ذُكِرَ وَاُلْقِيَهَا عَلٰى مَا لَا رُوْحَ لَهٗ يَصِيْرُ لَهٗ رُوْحٌ وَرَأَيْتُ قَوْمَكَ طَلَبُوْا مِنْكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ اِلٰهًا فَحَدَّثَتْنِىْ نَفْسِىْ اَنْ يَّكُوْنَ ذٰلِكَ الْعِجْلُ اِلٰهَهُمْ ـ

٩٧. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى فَاذْهَبْ مِنْ بَيْنِنَا فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَىْ مُدَّةِ حَيَاتِكَ اَنْ تَقُوْلَ لِمَنْ رَأَيْتَهٗ لَا مِسَاسَ ص اَىْ لَا تَقْرَبْنِىْ فَكَانَ يَهِيْمُ فِى الْبَرِّيَّةِ وَاِذَا مَسَّ اَحَدًا اَوْ مَسَّهٗ اَحَدٌ حُمَّا جَمِيْعًا وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لِعَذَابِكَ لَّنْ تُخْلَفَهٗ ج بِكَسْرِ اللَّامِ اَىْ لَنْ تَغِيْبَ عَنْهُ وَبِفَتْحِهَا اَىْ بَلْ تُبْعَثُ اِلَيْهِ وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ اَصْلُهٗ ظَلِلْتَ بِلَامَيْنِ اُوْلٰهُمَا مَكْسُوْرَةٌ وَحُذِفَتْ تَخْفِيْفًا اَىْ دُمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ط اَىْ مُقِيْمًا تَعْبُدُهٗ لَنُحَرِّقَنَّهٗ بِالنَّارِ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا لَنُذْرِيَنَّهٗ فِىْ هَوَاءِ الْبَحْرِ وَفَعَلَ مُوْسٰى بَعْدَ ذَبْحِهٖ مَا ذَكَرَهٗ ـ

অনুবাদ :

৯৬. সে বলল আমি দেখেছিলাম, যা তারা দেখেনি এখানে يَبْصُرُوْا টি ى এবং تَاءْ উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আমি যা জেনেছি তারা তা জানতে পারেনি। আমি নিয়েছিলাম একমুষ্ঠি মাটি পদচিহ্ন হতে ঘোড়ার খুরের সেই দূতের হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর। আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম আমি তা নির্মিত গো-বৎসের আকৃতির মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম। আমার মন আমার জন্য এরূপ করা শোভন করেছিল আর হৃদয়ে একথা জাগ্রত হয়েছে যে, আমি তীর পদচিহ্ন হতে একমুষ্ঠি মাটি উঠিয়ে নেই যেমনটি উল্লেখ করা হলো এবং তা নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে দিব। ফলে তাতে প্রাণের সঞ্চার হবে। আর আমি দেখেছি যে, আপনার সম্প্রদায় আপনার নিকট একজন ইলাহ বানিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছে। তাই আমি মনে মনে ভাবলাম যে, উক্ত উপাস্যটি তাদের ইলাহ হোক।

৯৭. হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, দূর হও আমাদের থেকে তোমার জন্য রইল তোমার জীবদ্দশায় অর্থাৎ তোমার সারা জীবন যে, তুমি বলবে যাকে তুমি দেখবে তাকেই আমি অস্পৃশ্য অর্থাৎ তুমি আমার নিকটবর্তী হয়ো না। সে মাঠে ময়দানে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াত। যখন সে কাউকে স্পর্শ করতো অথবা কেউ তাকে স্পর্শ করতো তখন তারা উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত। এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল তোমার শাস্তির জন্য তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না। تُخْلَفَهُ শব্দের لَامْ বর্ণটি যেরযুক্ত হবে। অর্থাৎ তুমি তার থেকে অদৃশ্য থাকবে না। আর لَامْ বর্ণটি যবরযুক্ত হলে অর্থ হবে তোমাকে সেই শাস্তি পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছানো হবে। তুমি তোমার সেই ইলাহ এর প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে ظَلْتَ মূলত ظَلِلْتَ ছিল। প্রথম لَامْ টি যেরযুক্ত হওয়ায় সহজ করার জন্য তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সর্বদা তার পূজায় তুমি রত ছিলে। আমরা তাকে জ্বালিয়ে দিবই আগুন দ্বারা এরপর তাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে সাগরের বাতাসে ছড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) তাকে জবাই করার পর এরূপই করেছিলেন।

অনুবাদ :

٩٨. اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ـ تَمْيِيْزٌ مُحَوَّلٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَىْ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَىْءٍ ـ

৯৮. তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ তা'আলাই যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত। عِلْمًا শব্দটি فَاعِلٌ হতে পরিবর্তিত حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ وَسِعَ عِلْمُهٗ كُلَّ شَىْءٍ তথা তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

٩٩. كَذٰلِكَ اَىْ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ اَخْبَارِ مَا قَدْ سَبَقَ مِنَ الْاُمَمِ ج وَقَدْ اٰتَيْنَاكَ اَعْطَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا مِنْ عِنْدِنَا ذِكْرًا ـ قُرْاٰنًا ـ

৯৯. এভাবেই যেমনিভাবে আমি আপনার নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করলাম। পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি আপনার নিকট বিবৃত করি পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাসমূহ। আর আমি আমার নিকট হতে আপনাকে প্রদান করেছি উপদেশ কুরআন।

١٠٠. مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهٖ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ـ حِمْلًا ثَقِيْلًا مِنَ الْاِثْمِ ـ

১০০. এটা থেকে যে বিমুখ হবে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না। সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে পাপের ভারি বোঝা।

١٠١. خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ط اَىْ فِىْ عَذَابِ الْوِزْرِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا لا تَمْيِيْزٌ مُفَسِّرٌ لِلضَّمِيْرِ فِىْ سَاءَ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوْفٌ تَقْدِيْرُهٗ وِزْرُهُمْ وَاللَّامُ لِلْبَيَانِ وَيُبْدَلُ مِنْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

১০১. তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ পাপের শাস্তিতে কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য হবে কত মন্দ حِمْلًا শব্দটি تَمْيِيْز যা سَاءَ-এর যমীরের ব্যাখ্যা করছে। আর مَخْصُوص بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে। এর মূল ইবারত হলো وِزْرُهُمْ আর لَامْ টা হলো بَيَانْ-এর জন্য। আর يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এটা يَوْمَ الْقِيٰمَةِ হতে বদল হয়েছে।

١٠٢. يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ الْكٰفِرِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا لا عُيُوْنُهُمْ مَعَ سَوَادِ وُجُوْهِهِمْ ـ

১০২. যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে صُوْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সিঙ্গা। আর ফুৎকার বলতে দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব কাফেরদেরকে সেদিন দৃষ্টিহীন অবস্থায় অর্থাৎ তাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করার সাথে সাথে তাদের চোখগুলোও নীল বর্ণের হয়ে যাবে।

١٠٣. يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ يَتَسَارُّوْنَ اِنْ مَا لَبِثْتُمْ فِى الدُّنْيَا اِلَّا عَشْرًا ـ مِنَ اللَّيَالِىْ بِاَيَّامِهَا ـ

১০৩. সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে। পৃথিবীতে, দশ দিবারাত্রি।

١٠٤. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ لَيْسَ كَمَا قَالُوْا اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ اَعْدَلُهُمْ طَرِيْقَةً فِيْهِ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا ـ يَسْتَقِلُّوْنَ لُبْثَهُمْ فِى الدُّنْيَا جِدًّا لِمَا يُعَايِنُوْنَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا ـ

অনুবাদ :

১০৪. আমি ভালো জানি তারা কি বলবে? তাতে ঐ ব্যাপারে! অর্থাৎ এমনটি নয় যেমনটি তারা বলেছে। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করে ছিলে। অর্থাৎ তারা আখিরাতের ভয়ানক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পার্থিব জীবনের অবস্থাকে একেবারেই নগণ্য মনে করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْنُ : এখানে وَلَقَدْ-এর لَامْ অব্যয়টি قَسَمِيَّةٌ অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَصَحَ هٰرُوْنُ وَنَبَّهَ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْاَمْرِ مِنْ قَبْلِ رُجُوْعِ مُوْسٰى اِلَيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শপথ! অবশ্যই হযরত হারূন (আ.) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং হযরত মূসা (আ.) তাদের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে উক্তি বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে তাদেরকে সজাগ করেছিলেন।

قَوْلُهُ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ : অর্থাৎ তোমাদেরকে গো-বৎসের কারণে ফেতনায় লিপ্ত করা হয়েছে। اِنَّمَا হলো حَصَرْ তথা সীমিতকরণ অব্যয়। উদ্দেশ্য এই যে, গো-বৎসটি তোমাদের ফেতনার কারণ হয়েছে, হেদায়েতের কারণ নয়। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা গো-বৎসের কারণেই ফেতনায় লিপ্ত হয়েছ, অন্য কোনো কারণে নয়। رَبُّكُمُ الرَّحْمٰنُ এখানে বিশেষভাবে رَحْمٰنْ শব্দ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য আনা হয়েছে যাতে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, যদি খাঁটিভাবে তওবা করে নেওয়া হয়, তাহলে তিনি তাওবা কবুল করেন। কারণ তিনি অতি দয়াময়।

قَوْلُهُ اَلَّا تَتَّبِعَنِىْ : এখানে لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত। যেমন– اَلَّا تَسْجُدَ-এর মধ্যে لَا টি অতিরিক্ত, কেবল তাকিদ বা গুরুত্বের জন্য এসেছে। اَلَّا تَتَّبِعَنِىْ টি مَنَعَ-এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَنْصُوْبْ-এর স্থলে পতিত হয়েছে। আর مَنَعَكَ-এর كَافْ টি প্রথম মাফউল। اِذَا رَاَيْتَهُمْ হলো مَنَعَ-এর ظَرْفْ অর্থাৎ اَىُّ شَيْئٍ مَنَعَكَ حِيْنَ رُؤْيَتِكَ لِضَلَالِهِمْ مِنْ اِتِّبَاعِىْ অর্থাৎ তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে যখন তুমি অবগত হলে, তখন কিসে তোমাদেরকে বিরত রাখল আমার অনুসরণ থেকে?

قَوْلُهُ اَفَ عَصَيْتَ : এর মধ্যকার হামযাটি অস্বীকার ও হুমকিস্বরূপ জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর فَاءْ বর্ণটি উহ্য শব্দের উপর আতফ করার জন্য যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَانَ اَخَذَ شَعْرَهُ : এখানে ، দ্বারা رَأْس তথা মাথার চুল উদ্দেশ্য। وَلَمْ تَرْقُبْ-এর আতফ হলো تَقُوْلُ-এর উপর। অর্থাৎ এ ভয়ে যে, তুমি বলবে আমি গোত্রের মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছি এবং এ ভয়ে যে, তুমি বলবে তুমি আমার কথার আদৌ লক্ষ্য রাখনি।

قَوْلُهُ بِالْيَاءِ : অর্থাৎ لَمْ يَبْصُرُوْا-এর দ্বারা বনী ইসরাঈল উদ্দেশ্য। وَبِالتَّاءِ অর্থাৎ তুমি ও তোমার সম্প্রদায়।

قَوْلُهُ اَلْمَصَاغُ : বিশুদ্ধ হলো اَلْمَصُوْغُ যেমনটা কোনো কোনো কপিতে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَبَضْتُ قَبْضًا : এর অর্থ হলো মুষ্টি পূর্ণ করা এবং কোনো কোনো কপিতে فَقَبَصْتُ قَبْصًا অর্থাৎ صَاد বর্ণযোগে এসেছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ اَىْ مِنْ مَحَلِّ اَثَرِ حَافِرِ الرَّسُوْلِ : অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পদচিহ্নের স্থান থেকে।

قَوْلُهُ وَالْقَى فِيْهَا : এর আতফ হলো سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ আমাকে একথা বুঝিয়েছে এবং আমার অন্তরে এ বিষয়টি উদ্ভব করা হয়েছে যে, এ মাটি থেকে এক মুষ্ঠি তার মধ্যে নিক্ষেপ করি। এতে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

قَوْلُهُ لَا مِسَاسَ : এটা বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার, মানসূব। অর্থাৎ কেউ তোমাকে স্পর্শ করবে না এবং তুমিও কাউকে স্পর্শ করবে না।

قَوْلُهُ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا : এখানে مَوْعِدًا মাসদার وَعْدًا অর্থে।

قَوْلُهُ نَنْسِفَنَّهُ : এটা جَمْعُ مُتَكَلِّمْ مُضَارِعْ بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَةٌ -এর সীগাহ। অর্থ– আমি তাকে অবশ্যই বাতাসে উড়িয়ে দেব।

قَوْلُهُ اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الخ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর সমাপ্তি।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الخ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা এবং মু'জিজা এর আধিক্যের জন্য বলা হয়েছে।

كَذٰلِكَ نَقُصُّ : এটা লুপ্ত মাসদারের সিফাত। অর্থাৎ نَقُصُّ قَصَصًا كَذٰلِكَ

قَوْلُهُ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ : এর ব্যাখ্যা فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهٖ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِعْرَاضْ তথা বিমুখ হওয়ার দ্বারা অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ فِيْهِ اَىْ فِىْ عَذَابِ الْوِزْرِ : এখানে مُضَافٌ বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ خَالِدِيْنَ : এটা يَحْمِلُ -এর যমীর থেকে حَالْ যা مَنْ -এর দিকে ফিরেছে। يَحْمِلُ -এর মধ্যে শব্দ এবং خَالِدِيْنَ -এর মধ্যে مِنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ زُرْقًا : এটা اَلْمُجْرِمِيْنَ থেকে حَالْ ـ اَزْرَقْ -এর বহুবচন, صِفَتْ مُشَبَّهْ -এর সীগাহ। অর্থ– বিড়াল চোখা। অর্থাৎ নীল চক্ষুবিশিষ্ট। يَتَخَافَتُوْنَ এটা زُرْقًا -এর যমীর থেকে حَالْ

قَوْلُهُ اَعْدَلُهُمْ : اَعْدَلُ অর্থ– সর্বাধিক সঠিক মন্তব্যের অধিকারী। এটা অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে বলা হয়নি; বরং اَقْرَبُ اِلَى الْهَوْلِ তথা ভয়াবহতার প্রতি অধিক নিকটবর্তী। এদিক দিয়ে اَعْدَلْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার উক্তির মধ্যে সে দিনের ভয়াবহতার অধিক প্রকাশ ঘটেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন। কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হযরত হারূন (আ.)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার হাজার ছিল বলে বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

অবশিষ্ট দুই দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদল স্বীকার করল, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে **নিষেধ করলে** আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মূসা (আ.)-ও ফিরে এসে **গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে** গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে

হযরত হারূন (আ.) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

হযরত মূসা (আ.) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হযরত হারূন (আ.)-কে সম্বোধন করে তার প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শ্মশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গুমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন?

قَوْلُهُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوْا أَلَّا تَتَّبِعَنِ : এখানে অনুসরণের এক অর্থ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে তুর পর্বতে চলে যাওয়া। কোনো কোনো তাফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থও করেছেন যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হযরত হারূন (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তো তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান হযরত মূসা (আ.)-এর মতে ভ্রান্তি ও অন্যায় ছিল। হযরত হারূন (আ.) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে হযরত মূসা (আ.)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওজর শুনে নাও। অতঃপর হযরত হারূন (আ.) এরূপে ওজর বর্ণনা করলেন, আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اُخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। [কারণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে।] কুরআন পাকের অন্যত্র হযরত হারূন (আ.)-এর ওজরের মধ্যে একথাও রয়েছে- إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মোকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওজরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথী ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার বনী ইসরাঈলই আমার সাথে থাকত। অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতো এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওজর শুনে হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্গাতা সামেরীর খবর নিলেন। কুরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত হারূন (আ.)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়গাম্বরদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিক : এ ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হযরত হারূন (আ.) ও তার সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে ছেড়ে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হযরত হারূন (আ.)-এর মতো ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, হযরত মূসা (আ.) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তাওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা

পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তাওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতাকে এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকেও উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী মনে করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তা-ভাবনার পাত্র। কোনো এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গুনাহগার অথবা নাফরমান বলা যায় না। হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক হযরত হারূন (আ.)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে প্রকাশ্যে ভুলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওজর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

قَوْلُهُ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ : অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি। এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযায় ভূমধ্য সাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত মূসা (আ.)-কে তূর পর্বতে গমনের আদেশ শুনানোর জন্য হযরত জিবরাঈল (আ.) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না। –[বয়ানুল কুরআন]

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ : রাসূল বলে এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে– اُلْقِيَ فِيْ رُوْعِهٖ اَنَّهٗ لَا يُلْقِيْهَا عَلٰى شَيْءٍ فَيَقُوْلُ كُنْ كَذَا اِلَّا كَانَ অর্থাৎ সামেরীর মনে আপনা আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নে এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে। –[কামালাইন]

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ তাফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত বলা হয়েছে। অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজকালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। فَجَزَاهُ اللّٰهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ –[বয়ানুল কুরআন]

এরপর বনী ইসরাঈলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরি করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভিতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি 'হাম্বা' রব করতে লাগল। হাদীসে ফুতূনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হযরত হারূন (আ.)-কে বলেছিল, আমি মুঠির ভিতরের বস্তু নিক্ষেপ করব। কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হযরত হারূন (আ.) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হযরত হারূন (আ.)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিশরে পৌঁছে সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَإِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ : হযরত মূসা (আ.) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বয়কট করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারো গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাঈলীর জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির ঊর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তার মাঝে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না। যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়ের জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত। -[মা'আলিম]

এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদভ্রান্তের মতো ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত, لَا مِسَاسَ অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক : রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মূসা (আ.) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ : [অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।] এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা স্বর্ণ রৌপ্য গলিত ধাতু দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণরৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘষে কণা কণা করে দেওয়া। -[দুররে মানসূর] অলৌকিককভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ قَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا : বিশিষ্ট তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذِكْر বলে কুরআন বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا : অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপবোঝা বহন করবে। কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা কুরআন তেলাওয়াত না করা, কুরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কুরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কুরআনের বিধানাবলির বুঝার চেষ্টা না করাও কুরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বুঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলির বিরুদ্ধাচারণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কুরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গুনাহ। কিয়ামতের দিন এই গুনাহ ভারি বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও গুনাহকে কিয়ামতের দিন ভারি বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

قَوْلُهُ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করল, صُوْر [ছুর] কি? তিনি বললেন, শিং। এতে ফুৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, صُوْر শিং এর মতোই কোনো বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

অনুবাদ :

١٠٥. وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ كَيْفَ تَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقُلْ لَهُمْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا - بِاَنْ يُّفَتِّتَهَا كَالرَّمْلِ السَّائِلِ ثُمَّ يُطِيْرُهَا بِالرِّيَاحِ -

১০৫. তারা আপনাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। কিয়ামতের দিন সেগুলোর অবস্থা কি হবে? আপনি বলে দিন তাদেরকে আমার প্রতিপালক এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। ধূলিকণার ন্যায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র করে তাকে বাতাসে উড়িয়ে দিবেন।

١٠٦. فَيَذَرُهَا قَاعًا مُنْبَسِطًا صَفْصَفًا - مُسْتَوِيًا -

১০৬. অতঃপর তিনি একে পরিণত করবেবন মসৃণ সমতল ময়দান।

١٠٧. لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا اِنْخِفَاضًا وَّلَاۤ اَمْتًا - اِرْتِفَاعًا -

১০৭. যাতে আপনি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবেন না। নিচুতা ও উচ্চতা।

١٠٨. يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ اِذَا نُسِفَتِ الْجِبَالُ يَّتَّبِعُوْنَ اَىِ النَّاسُ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُبُوْرِ الدَّاعِىَ اِلَى الْمَحْشَرِ بِصَوْتِهٖ وَهُوَ اِسْرَافِيْلُ يَقُوْلُ هَلُمُّوْۤا اِلٰى عَرْضِ الرَّحْمٰنِ لَا عِوَجَ لَهٗ ج اَىْ لِاتِّبَاعِهِمْ اَىْ لَا يَقْدِرُوْنَ اَنْ لَّا يَتَّبِعُوْا وَخَشَعَتِ سَكَنَتْ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا - صَوْتَ وَطْءِ الْاَقْدَامِ فِىْ نَقْلِهَا اِلَى الْمَحْشَرِ كَصَوْتِ اَخْفَافِ الْاِبِلِ فِىْ مَشْيِتِهَا -

১০৮. সেদিন অর্থাৎ যেদিন পর্বতসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে উড়বে তারা অনুসরণ করবে অর্থাৎ মানুষেরা কবর থেকে বের হওয়ার পর আহ্বানকারীর তার আহ্বানের শব্দের কারণে হাশরের ময়দানের প্রতি। আর তিনি হলেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। তিনি বলবেন, হে লোক সকল! তোমরা দয়াময়ের সম্মুখে উপস্থিত হও! এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না অর্থাৎ তাদের অনুসরণের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তারা অনুসরণ না করার কোনোই ক্ষমতা রাখবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত আপনি কিছুই শুনবেন না। অর্থাৎ পায়ের চলার শব্দ, হাশরের ময়দানে যাওয়ার সময়। হাঁটার সময় উটের ক্ষুরের শব্দের মতো।

١٠٩. يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اَحَدًا اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ اَنْ يَّشْفَعَ لَهٗ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا - بِاَنْ يَّقُوْلَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

১০৯. সেদিন কারো সুপারিশ কাজে আসবে না। তবে যাকে দয়াময় অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত তার জন্য সুপারিশ করার ও যার কথা তিনি পছন্দ করতেন। তা এভাবে যে, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে।

অনুবাদ :

١١٠. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ـ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ـ

১১০. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। পরকালীন বিষয়াদি সম্পর্কে এবং পার্থিব কার্যাবলি সম্পর্কে। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। তা তারা জানে না।

١١١. وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ خَضَعَتْ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ط اَىِ اللّٰهِ وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ـ شِرْكًا ـ

১১১. এবং মুখমণ্ডলসমূহ অবনমিত হবে অধোবদন চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারকের নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সমীপে এবং ব্যর্থ সেই হবে ক্ষতিগ্রস্ত যে জুলুমের ভারবহন করবে শিরকের।

١١٢. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ الطَّاعَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا بِزِيَادَةٍ فِىْ سَيِّاٰتِهٖ وَلَا هَضْمًا ـ بِنَقْصٍ مِنْ حَسَنَاتِهٖ ـ

১১২. এবং যে সৎকর্ম করে আনুগত্য করবে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। মু'মিন হয়ে তার কোনো আশঙ্কা নেই অবিচারের তার পাপ বৃদ্ধির দ্বারা এবং অন্য কোনো ক্ষতির পুণ্য স্বল্প লাভের।

١١٣. وَكَذٰلِكَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى كَذٰلِكَ نَقُصُّ اَىْ مِثْلَ اِنْزَالِ مَا ذُكِرَ اَنْزَلْنٰهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا كَرَّرْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الشِّرْكَ اَوْ يُحْدِثُ الْقُرْاٰنُ لَهُمْ ذِكْرًا ـ بِهَلَاكِ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنَ الْاُمَمِ فَيَعْتَبِرُوْنَ ـ

১১৩. এরূপেই এ বাক্যের আতফ পূর্বের كَذٰلِكَ نَقُصُّ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়াদি অবতীর্ণ করার ন্যায় আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিবৃত করেছি বারবার উল্লেখ করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে শিরক থেকে বিরত থাকে। অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ পূর্বের বিভিন্ন জাতির বিনাশের বিবরণ। যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

١١٤. فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج عَمَّا يَقُوْلُ الْمُشْرِكُوْنَ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ اَىْ بِقِرَاءَتِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ز اَىْ يَفْرُغَ جِبْرِيْلُ مِنْ اِبْلَاغِهٖ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ـ اَىْ بِالْقُرْاٰنِ فَكُلَّمَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ شَىْءٌ مِنْهُ زَادَ بِهٖ عِلْمًا ـ

১১৪. আল্লাহ তা'আলা অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি মুশরিকরা যা বলে তা থেকে পবিত্র। আপনি কুরআন পাঠে ত্বরা করবেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী পৌঁছানো থেকে অবসর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এবং বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান সমৃদ্ধ কর। অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে সুতরাং যখনই তার উপর কুরআন থেকে কোনো কিছু অবতীর্ণ হতো এর দ্বারা তার জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটত।

١١٥. وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ وَصَّيْنَاهُ اَنْ لَّا يَاْكُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ اَكْلِهِ مِنْهَا فَنَسِىَ تَرَكَ عَهْدَنَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا . جَزْمًا وَصَبْرًا عَمَّا نَهَيْنَاهُ عَنْهُ .

অনুবাদ :

১১৫. আমি তো আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম এবং তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম সে যেন বৃক্ষ হতে না খায়। ইতিপূর্বে অর্থাৎ তা থেকে খাওয়ার পূর্বে। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল। আমার নির্দেশকে ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তাকে সংকল্পে সুদৃঢ় পাইনি। অনড় ও আমার নিষিদ্ধ বিষয়ে সংবরণকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَفَسًا : এটা মাসদার (ض) অর্থ– ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে দেওয়া। صَفْصَفًا ধূ ধূ প্রান্তর, সমতল ভূমি। اَمْتًا টিলা, উঁচুনিচু জায়গা।

قَوْلُهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ : অর্থাৎ পাহাড় পর্বতের অবস্থা। এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) كَيْفَ تَكُوْنُ দ্বারা مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন নয়; বরং তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো ব্যক্তি ঠাট্টাবিদ্রূপ স্বরূপ নবী করীম ﷺ -এর নিকট কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যেমন ইবনে মুনযির ও ইবনে জুরাইজ (র.) বলেছেন যে, কোনো কোনো কুরাইশী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, কিয়ামতের দিবসে এ সকল পাহাড় পর্বতের কি অবস্থা হবে? তখন তার উত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। فَقُلْ -এর মধ্যে ف উহ্য শর্তের জবাবে এসেছে। اَىْ اِنْ سَأَلُوْكَ فَقُلْ এ ক্ষেত্রে এটা কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর হবে না।

فَيَذَرُهَا -এর যমীরের মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. এটা جِبَالٌ -এর প্রতি ফিরেছে, এ সময় مُضَافٌ বিলুপ্ত হবে অর্থাৎ وَيَذَرُ مَرَاكِزَ الْجِبَالِ ২. এটা اَرْض -এর প্রতি ফিরেছে, যা স্পষ্টাকারে পূর্বে উল্লেখ নেই। তবে বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা তাকে উহ্য বুঝা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ بِقَاعًا এটা يَذَرُهَا -এর দ্বিতীয় মাফঊল হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর يَذَرُ تَصْيِيْرُ -এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে দুই মাফঊলের প্রতি মুতাআদ্দী হবে। هَا যমীরটি প্রথম মাফঊল। আর قَاعًا শব্দটি হাল হওয়ার কারণেও মানসূব হতে পারে। এ সময় صَفْصَفًا শব্দটি قَاعًا -এর প্রথম সিফত হবে। এবং لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا দ্বিতীয় সিফত হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে মানসূব হবে।

قَوْلُهُ اَلدَّاعِىْ : কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এর দ্বারা হযরত ইসরাফীল (আ.) উদ্দেশ্য। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ আহ্বানকারী হবেন হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং এটাই প্রাধান্যযোগ্য। তবে সিঙ্গায় ফুৎকারকারী হবেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। لَا عِوَجَا لَهُ এখানে لَهُ -এর যমীরের মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে– ১. এখানে اِتِّبَاعٌ মাসদার উহ্য রয়েছে। يَتَّبِعُوْنَ -এর দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ২. এটা دَاعِىَ -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থাৎ আহ্বানকারীর আহ্বানে কোনো ত্রুটি থাকবে না; বরং সকল মাখলুক অতি সহজে তা শ্রবণ করবে। ৩. বাক্যে قَلْبٌ তথা স্থানান্তর ঘটেছে। আসলে বাক্যটি ছিল এরূপ– لَا عِوَجَ لَهُمْ عَنْهُ

قَوْلُهُ هَمْسًا : এর অর্থ হলো ক্ষীণস্বর, মৃদু আওয়াজ।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ : এ বাক্যাংশে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. مَنْ হলো مَنْصُوْبٌ ; কারণ এটা تَنْفَعُ -এর مَفْعُوْل لَهٗ

২. এটা رَفْع -এর স্থানে পতিত হয়েছে। এটা شَفَاعَةٌ থেকে বদল হয়েছে। এ সময় অবশ্যকীয়ভাবে مُضَافٌ বিলুপ্ত গণ্য হবে। বাক্যটি এরূপ হবে لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا شَفَاعَةَ مَنْ اَذِنَ لَهٗ

৩. এটা شَفَاعَةٌ থেকে ইসতেসনা হওয়ার কারণে মানসূব হবে। আর তখন মুসতাসনা মুত্তাসিল ও মুনকাতি যে কোনোটি হতে পারে।

قَوْلُهُ لَا يَعْلَمُوْنَ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, عِلْمًا শব্দটি মাফউলে মুতলাক এবং يُحِيْطُوْنَ শব্দটি يَعْلَمُوْنَ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ لَا يَعْلَمُوْنَ عِلْمًا আর যদি يُحِيْطُوْنَ ক্রিয়াটি নিজ অর্থে হয় তাহলে عِلْمًا বাক্যের সম্বন্ধ থেকে تَمْيِيْز -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَعَنَتْ (ن) عُنُوًّا : অর্থ– অপমানিত হওয়া, হেয় হওয়া।

قَوْلُهُ وَقَدْ خَابَ : এটা حَالٌ -ও হতে পারে অথবা মুসতানিফা বাক্যও হতে পারে।

قَوْلُهُ هَضْمًا (ض) : ভেঙ্গে ফেলা, হ্রাস করা।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهَا : এখানে كَافٌ শব্দের মাসদার এর সিফত অর্থাৎ اَنْزَلْنٰهَا اِنْزَالًا مِثْلَ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ عَزْمًا : অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প। عَزْمًا শব্দটি نَجِدْ তথা نَعْلَمْ অর্থের মাফউল।

قَوْلُهُ لَهٗ : এটা হয়তো عَزْمًا থেকে حَالٌ হয়েছে অথবা نَجِدْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো কোনো আলেম বলেছেন– لَمْ نَجِدْ لَهٗ قَصْدًا -এর অর্থবিশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছাপূর্বক খাননি; বরং ভুলবশত খেয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামতের দিন এই পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন তার জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৭, পৃ. ৪২২]

ইবনে মুনজির ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশ গোত্রের কিছু লোক কিয়ামত সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলল, যে কিয়ামতের কথা বলে আমাকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে, সে কিয়ামতের দিন এ পাহাড়গুলোর কি হবে? তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৬, পৃ. ২৬১]

তাফসীরকার জাহহাক (র.)-ও এ কথাই বলেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী একটি আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তারা এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, যদি কিয়ামতের পরে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় আর একথা সত্য হয় তবে এ বিশাল বিস্তৃত সুদৃঢ় পাহাড়গুলোর কি দশা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই কিয়ামতের উল্লেখের পরই কাফেরদের পাহাড় সম্পর্কীয় একথাটি স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ الخ

অর্থাৎ হে রাসূল! কাফেররা কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতাকে উপহাস করে বলে, আচ্ছা কিয়ামতের পূর্বে তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে বলছেন এমন অবস্থায় এই পাহাড়গুলোর কি অবস্থা হবে? এগুলো কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

হে রাসূল! আপনি বলুন, কিয়ামতের দিন আমার প্রতিপালক এই সব পাহাড় পর্বতকে বাতাসে উড়িয়ে ছড়িয়ে দেবেন। আর তখন পৃথিবীর কোথাও আঁকাবাঁকা বা উঁচুনিচু কোনো কিছুই থাকবে না। সেদিন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ফেরেশতা মানুষকে যেদিকে ডাকবে সেদিকেই তারা পতঙ্গের মতো ছুটবে, যেদিক থেকে ফেরেশতার ডাক শুনবে সেদিকেই ছুটবে, এদিক সেদিক যাবে না, আকাবাকা পথে চলবে না।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যদি কাফেররা দুনিয়াতে নবী রাসূলগণের ডাকে সাড়া দিতো আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনে নেক আমল করতো তবে এমনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতো না।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াাতে دَاعِىْ বা আহ্বায়ক যাকে বলা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র মানবজাতিকে আহ্বান করবেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একত্র হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন, অতএব সকলে হাজির হও।

হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর ডাকের পর কেউ আর এদিক সেদিক যাবে না। যেদিক থেকে ডাক শ্রবণ করবে সেদিকেই ছুটবে।

قَوْلُهُ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا : অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সকলের শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে, কারো মুখে কথা থাকবে না, সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তুমি তখন কারো কোনো কথা শুনতে পাবে না, পদধ্বনি ব্যতীত। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের দিকে মানুষের ছুটে চলার শব্দ ব্যতীত কেউ আর কোনো কথা শুনবে না।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, هَمْسًا শব্দটির অর্থ হলো উষ্ট্রের চলার শব্দ। আল্লামা বগভী (র.) হযরত মুজাহিদ (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, هَمْسًا শব্দটির অর্থ হলো চুপিচুপি কথা বলা। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এই শব্দটির অর্থ হলো– কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে রসনা নাড়ানো।

خَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ অর্থ হলো, সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এটি হলো কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার একটি লক্ষণ। আর هَمْس অর্থ হলো পদধ্বনি। অর্থাৎ ঐ কঠিন সংকটময় দিনে মানুষের চলার সময় যে শব্দ হয়, তাছাড়া কোনো শব্দ শ্রুত হবে না। আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সেদিন সকলেই থাকবে মুহ্যমান।

قَوْلُهُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ يُقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ : সহীহ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) কোনো আয়াত নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুনাতেন, তখন তিনি তার সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হতো। আয়াতকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কাছ থেকে শুনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামার لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয় এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে আপনি তা পাঠ করার এবং জিহ্বা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ দোয়া করে যাবেন رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কুরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কুরআন বুঝার তৌফিকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল ﷺ -এর বিশেষ দোয়াসমূহের মধ্যে এটাও একটি–

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ بِمَايَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ . (ابن ماجة)

قَوْلُهُ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ الخ – পূর্বাপর সম্পর্ক : এখান থেকে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এই কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা বাকারা ও আ'রাফে এবং কিছু সূরা হিজর ও কাহাফে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে সূরা সাদ-এ বর্ণিত হবে। সব ক্ষেত্রেই কাহিনীর অংশসমূহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলিসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই কাহিনীর সম্পর্ক তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল ও অমলিন উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে– كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ مَا قَدْ سَبَقَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে, আপনার নবুয়তের প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে হুশিয়ার করার জন্য আমি পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের অবস্থা ও ঘটনাবলি আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোনো কোনো দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আ.)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ মর্মে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে,

শয়তান মানবজাতির প্রাচীন শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের পিতামাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারি হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেলে তিনি রিসালাত ও নবুয়তের উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। তাই শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রই নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য আয়াতে عَهِدْنَا শব্দটি أَمَرْنَا অথবা وَصَّيْنَا শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -[বাহরে মুহীত]

উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে তাগিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল ফুল অথবা কোনো অংশ আহার করো না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও নিয়ামত তোমাদের জন্য অবারিত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরো বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু হযরত আদম (আ.) এসব কথা ভুলে গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে نِسْيَانٌ ও عَزْم লক্ষণীয় نِسْيَانٌ শব্দের অর্থ- ভুলে যাওয়া, অনুবধান হওয়া এবং عَزْم-এর শাব্দিক অর্থ কোনো কাজের জন্য সংকল্পকে দৃঢ় করা। এই শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে এ কথা জেনে নেওয়া জরুরি যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার প্রভাবশালী পয়গাম্বরদের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গাম্বর গুনাহ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ অর্থাৎ আমার উম্মতের ভুলত্রুটি মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেন না। কিন্তু এটাও জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলা এ জগতে এমন সব উপকরণও রেখেছেন, যেগুলো পূর্ণ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে মানুষ ভুল থেকে বাঁচতে পারে। পয়গাম্বরগণ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যশীল। তাদেরকে এ জন্যও ধরপাকড় করা যেতে পারে যে, তাঁরা এসব উপকরণকে কেন কাজে লাগালেন না? অনেক সময় একজন মন্ত্রীর জন্য এমন কাজকেও ধরপাকড়ের যোগ্য মনে করা হয়, যা সাধারণ কর্মচারীদের জন্য পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) এ কথাটিই এভাবে বলেছেন, حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের আনেক সৎকর্মকে নৈকট্যশীলদের জন্য গুনাহরূপে গণ্য করা হয়।

হযরত আদম (আ.)-এর এই ঘটনা প্রথমত নবুয়ত ও রিসালাতের পূর্বেকার। এই অবস্থায় পয়গাম্বরদের কাছ থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের কতক আলেমের মতে নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল যা গুনাহ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আ.)-এর উচ্চ মর্তবা ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তার জন্য গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্য এই ভুলকে عِصْيَانٌ [অবাধ্যতা] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়ত عَزْم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে عَزْم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোনো কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করার পুরোপুরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয় এবং ভুল তাকে বিচ্যুত করে দেয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ফায়েদা : হযরত আলী (রা.) বলেন, ১০টি বস্তু ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যথা- ১. অধিক চিন্তা-ভাবনা। ২. ঘাড়ে সিঙ্গা লাগানো। ৩. দাঁড়িয়ে পানিতে প্রশ্রাব করা। ৪. টক আপেল ভক্ষণ করা। ৫. বেশি পরিমাণ ধনিয়া ব্যবহার করা। ৬. ইঁদুরের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা। ৭. কবরে লিখিত নাম ফলক ইত্যাদি পড়া। ৮. ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত ব্যক্তিকে দেখা। ৯. আলকাতরা লাগানো দুটি উটের মধ্যখান দিয়ে চলা। ১০. উঁকুনকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া। -[রূহুল বয়ান]

অনুবাদ :

١١٦. وَاذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط وَهُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ يَصْحَبُ الْمَلٰئِكَةَ وَيَعْبُدُ اللّٰهَ مَعَهُمْ اَبٰى ـ عَنِ السُّجُوْدِ لِاٰدَمَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ـ

১১৬. স্মরণ করুন, যখন ফেরেশতাগণকে বললাম আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল সে ছিল জিনদের আদি পিতা। সে ফেরেশতাগণের সাথে অবস্থান করত এবং তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত। সে অস্বীকার করল আদমকে সিজদা করতে এবং বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম।

١١٧. فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ حَوَّاءَ بِالْمَدِّ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى لا تَتْعَبُ بِالْحَرْثِ وَالزَّرْعِ وَالْحَصَدِ وَالطَّحْنِ وَالْخَبْزِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلٰى شَقَاهُ لِاَنَّ الرَّجُلَ يَسْعٰى عَلٰى زَوْجَتِهٖ ـ

১১৭. অতঃপর আমি বললাম, হে আদম! নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.) -এর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, ফলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে। চাষাবাদ করা, তা কর্তন করা, তা পেষণ করা, রুটি বানানো ইত্যাদির দরুন কষ্ট ভোগ করবে। আর কষ্টের ক্ষেত্রে কেবল হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করেছেন। কেননা পুরুষরা তার স্ত্রীর জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

١١٨. اِنَّ لَكَ اَنْ لَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ـ

১১৮. তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগ্নও হবে না।

١١٩. وَاَنَّكَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا عَطْفًا عَلٰى اِسْمِ اِنَّ وَجُمْلَتِهَا لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا تَعْطَشُ وَلَا تَضْحٰى ـ لَا يَحْصُلُ لَكَ حَرُّ شَمْسِ الضُّحٰى لِاِنْتِفَاءِ الشَّمْسِ فِى الْجَنَّةِ ـ

১১৯. নিশ্চয় তুমি اَنَّكَ -এর هَمْزَةٌ টি যবরযুক্তও হতে পারে আবার যেরযুক্তও হতে পারে। যেরযুক্ত হলে এটি পূর্বের اِنَّ ও তার বাক্যের উপর আতফ হবে। তথায় পিপাসার্তও হবে না। তৃষ্ণার্ত ও রৌদ্র ক্লিষ্টও হবে না। অর্থাৎ জান্নাতে সূর্য না থাকার কারণে তথায় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের উত্তাপ অনুভব করবে না।

١٢٠. فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ اَىِ الَّتِىْ يَخْلُدُ مَنْ يَّأْكُلُ مِنْهَا وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ـ لَا يَفْنٰى وَهُوَ لَازِمُ الْخُلُوْدِ ـ

১২০. অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা অর্থাৎ যে ব্যক্তি তা হতে ভক্ষণ করবে সে জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে। এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা যা ধ্বংস হবে না। আর তা চিরস্থায়ী হওয়া অনিবার্য।

অনুবাদ :

١٢١. فَأَكَلَا اٰدَمُ وَحَوَّاءُ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا اَىْ ظَهَرَ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا قُبُلُهٗ وَقُبُلُ الْاٰخَرِ وَدُبُرُهٗ وَسَمّٰى كُلٌّ مِّنْهُمَا سَوْءَةً لِاَنَّ اِنْكِشَافَهٗ يَسُوْءُ صَاحِبَهٗ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ اَخَذَا يَلْزِقَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ز لِيَسْتَتِرَا بِهٖ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ص بِالْاَكْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ.

১২১. অতঃপর তারা উভয়ে ভক্ষণ করলেন হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) তা হতে, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল অর্থাৎ তাদের উভয়ের প্রত্যেকের সম্মুখে তার নিজের সম্মুখস্থ লজ্জাস্থান ও অপরের সম্মুখস্থ ও পশ্চাতের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাদের প্রত্যেকের লজ্জাস্থানকে سَوْءَةً বলার কারণ হলো লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া লজ্জাস্থান বিশিষ্টের পাপের কারণ ঘটে। এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত্ত করতে লাগলেন। তারা তা শরীরে জড়িয়ে রাখতে লাগলেন এর দ্বারা ঢেকে রাখার উদ্দেশ্য। হযরত আদম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলেন, ফলে তিনি ভ্রমে পতিত হলেন। বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করার কারণে।

١٢٢. ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ قَرَّبَهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ قَبِلَ تَوْبَتَهٗ وَهَدٰى . اَىْ هَدٰهُ اِلَى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى التَّوْبَةِ.

১২২. এরপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে মনোনীত করলেন নৈকট্য দান করলেন। এবং তাঁকে পথনির্দেশ করলেন অর্থাৎ তওবার উপর অবিচল থাকার প্রতি হেদায়েত দিলেন।

١٢٣. قَالَ اهْبِطَا اَىْ اٰدَمُ وَحَوَّاءُ بِمَا اشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمَا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ بَعْضُ الذُّرِّيَّةِ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج مِنْ ظُلْمِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى ط فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ اَىِ الْقُرْاٰنَ فَلَا يَضِلُّ فِى الدُّنْيَا وَلَا يَشْقٰى . فِى الْاٰخِرَةِ.

১২৩. তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নেমে যাও অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)। তোমাদের যেসব সন্তানাদি সন্নিবেশিত রয়েছে তা সহ। এখান থেকে জান্নাত থেকে একই সঙ্গে, তোমরা পরস্পর কতিপয় সন্তান পরস্পরের শত্রু একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করার কারণে। পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসলে فَاِمَّا -এর মধ্যে শর্তিয়ার نُوْنْ টা অতিরিক্ত مَا -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। যে আমার পথ অর্থাৎ কুরআন অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না পৃথিবীতে এবং দুঃখ কষ্টও পাবে না পরকালে।

অনুবাদ :

١٢٤. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى اَىِ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهٖ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا بِالتَّنْوِيْنِ مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى ضَيِّقَةٍ وَفُسِّرَتْ فِىْ حَدِيْثٍ بِعَذَابِ الْكَافِرِ فِىْ قَبْرِهٖ وَنَحْشُرُهٗ اَىِ الْمُعْرِضَ عَنِ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ـ اَىْ اَعْمَى الْبَصَرِ اَوِ الْقَلْبِ ـ	১২৪. যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে। অর্থাৎ কুরআন থেকে ফলে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তার জীবন হবে সংকুচিত ضَنْكًا শব্দটি তানভীন সহকারে মাসদার ضَيِّقَةً অর্থে। হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে কাফেরের কবরের শাস্তি দ্বারা তাকে আমি উত্থিত করব অর্থাৎ কুরআনবিমুখ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় অর্থাৎ চোখের অন্ধত্ব বা অন্তরের অন্ধত্ব যে কোনোটি উদ্দেশ্য হতে পারে।
١٢٥. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ـ فِى الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْبَعْثِ ـ	১২৫. সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। দুনিয়ায় এবং পুনরুত্থানকালে।
١٢٦. قَالَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج تَرَكْتَهَا وَلَمْ تُؤْمِنْ بِهَا وَكَذٰلِكَ مِثْلَ نِسْيَانِكَ اٰيٰتِنَا الْيَوْمَ تُنْسٰى ـ تُتْرَكُ فِى النَّارِ ـ	১২৬. তিনি বলবেন বিষয়টি এরূপই আমার নিদর্শনাবলি তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে। তুমি সেগুলো পরিত্যাগ করেছিলে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করনি এবং সেইভাবে তোমার পক্ষে আমার নিদর্শনাবলি ভুলে যাওয়ার ন্যায়। তুমিও বিস্মৃত হলে তোমাকে জাহান্নামে ছেড়ে দেওয়া হবে।
١٢٧. وَكَذٰلِكَ وَمِثْلَ جَزَائِنَا مَنْ اَعْرَضَ عَنِ الْقُرْاٰنِ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ اَشْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَاَبْقٰى ـ اَدْوَمُ ـ	১২৭. এবং এভাবেই আমার প্রতিফল দানের ন্যায়, যে কুরআন থেকে বিমুখ থাকে আমি প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে শিরক করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো কঠিনতর। পৃথিবীর শাস্তি থেকে ও কবরের আজাব থেকে। ও অধিক স্থায়ী চিরন্তন।

অনুবাদ :

١٢٨. اَفَلَمْ يَهْدِ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ كَمْ خَبَرِيَّةٌ مَفْعُوْلُ اَهْلَكْنَا اَىْ كَثِيْرًا اِهْلَاكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَىِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ يَمْشُوْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ لَهُمْ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ط فِىْ سَفَرِهِمْ اِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَعْتَبِرُوْا وَمَا ذُكِرَ مِنْ اَخْذِ اِهْلَاكٍ مِنْ فِعْلِهِ الْخَالِىْ عَنْ حَرْفٍ مَصْدَرِيٍّ لِرِعَايَةِ الْمَعْنٰى لَا مَانِعَ مِنْهُ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لَعِبَرًا لِّاُولِى النُّهٰى ـ لِذَوِى الْعُقُوْلِ ـ

১২৮. এটাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না মক্কার কাফেরদের নিকট স্পষ্ট হলো না। কত كَمْ টি হলো خَبَرِيَّةٌ যা পূর্ববর্তী اَهْلَكْنَا -এর মাফউল ধ্বংস করেছি অনেককে বিনাশ সাধন করেছি। তাদের পূর্বে মানবগোষ্ঠী হতে অর্থাৎ অতীতের বহু জনগোষ্ঠীকে রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে এরা বিচরণ করে থাকে। এটা পূর্ববর্তী لَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। যাদের বাসভূমিতে সিরিয়া ইত্যাদি দেশে তাদের ভ্রমণকালে। সুতরাং তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। اَهْلَكْنَا ক্রিয়া দ্বারা কোনো حَرْفٌ مَصْدَرِىْ -বিহীন مَصْدَرْ তথা اِهْلَاكٌ উদ্দেশ্য নেওয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোনো দূষণীয় নয়। অবশ্যই এতে আছে নিদর্শন শিক্ষণীয় বিষয় বিবেকসম্পন্নদের জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا : এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনের ৭টি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে। পূর্বের কথার উপর এ কাহিনীর عَطْف হলো عَطْفُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ -এর অন্তর্গত। কেননা এ ঘটনাটি ইবলীসের শত্রুতার কারণ হয়েছিল।

قَوْلُهُ اِلَّا اِبْلِيْسَ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভ্যাস যে, যেখানে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয় সেখানে اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِن দ্বারা করেন। কিন্তু এখানে যেহেতু উভয়টি সম্ভাবনা রয়েছে এ কারণে এ ব্যাখ্যা করেননি। বরং كَانَ يَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ ও হতে পারে। কেননা এসময় অর্থ হবে উপস্থিতগণ সাজদা করল, তবে তাদের মধ্য থেকে ইবলীস সেজদা করেনি। আর وَهُوَ اَبُو الْجِنِّ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ কেননা, জিন ফেরেশতাদের অন্তর্গত নয়।

قَوْلُهُ اَبٰى عَنِ السُّجُوْدِ : এর পূর্বের কথার তাকিদ স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ইবলীসের অস্বীকার করাটা اِسْتِثْنَاءْ দ্বারাই বুঝা গেছে। আবার এটা اِسْتِثْنَاءْ -এর ইল্লতও হতে পারে। অর্থাৎ ইবলীসের সিজদা না করার কারণ ছিল তার অহংকার। এ সময় اَبٰى -এর মাফউল বিলুপ্ত মানা বৈধ হবে না। কেননা এক্ষেত্রে تَعْلِيْلُ الشَّئِ بِنَفْسِهٖ অনিবার্য হয়; বরং এক্ষেত্রে اَبٰى ক্রিয়াটি لَازِمٌ হবে এবং অর্থ হবে- اَظْهَرَ الْاِبَاءَ عَنِ الْمُطَاوَعَةِ অর্থাৎ আনুগত্য করা থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল।

قَوْلُهُ فَقُلْنَا : এর عَطْف হলো উহ্য একটি বাক্যের উপর, আর তা হলো- اَدْخَلْنَا اٰدَمَ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا لَهٗ يَآ اٰدَمُ

قَوْلُهُ حَوَّاءْ : এটা اَحْوٰى সিফত এর সীগাহ -এর স্ত্রী লিঙ্গ অর্থ- সবুজতা কিংবা লালিমার প্রতি ধাবিত।

قَوْلُهُ فَتَشْقٰى : এটা نَهْى -এর জবাব। (س) شَقَاوَةٌ হলো এর মাসদার। অর্থ- হতভাগা হওয়া। এটা سَعَادَتٌ তথা সৌভাগ্যের বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট। সৌভাগ্য যেরূপ দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিকক। তদ্রূপ হতভাগ্যতা ও দুই প্রকার। ১. ইহলৌকিক ও ২. পারলৌকিক। ইহলৌকিক হতভাগ্যতা আবার কয়েক প্রকার। তন্মধ্য থেকে এখানে দুঃখ-কষ্টে পড়ার অর্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ عَلٰى شَقَاهُ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন.** গাছের নিকটবর্তী গমন থেকে উভয়কে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে فَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ তোমরা উভয়ে এ গাছের নিকটবর্তী হবে না। সুতরাং হতভাগ্যতার সম্বন্ধ উভয়ের প্রতি হওয়া উচিত। অথচ فَيَشْقٰى -এর মধ্যে কেবল হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি হতভাগ্যতার সম্বন্ধ করা হয়েছে।

উত্তর. ১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত। কষ্ট-পরিশ্রম করে উপার্জন করা স্বামীর দায়িত্ব; স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। এ কারণেই হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি হতভাগ্যতার সম্বন্ধ করা হয়েছে। ২. বাক্যের শেষাংশের ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ করা হয়েছে। সুতরাং উভয়ে উদ্দেশ্য। প্রাধান্য স্বরূপ স্ত্রীকে পুরুষের অনুগামী করা হয়েছে। -[রূহুল বয়ান]

قَوْلُهُ لَهُ ضَنْكًا : (ك) ضَنْكًا অর্থ– সংকীর্ণ হওয়া। এ শব্দটি مَعِيْشَةً -এর সিফত। আধিক্য প্রকাশার্থে মাসদারকে সিফতরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন. এখানে তো মওসূফ ও সিফতের মধ্যে مُطَابَقَتْ তথা সামঞ্জস্য ঘটেনি।

উত্তর. ضَنْكًا শব্দটি যেহেতু মাসদার, আর মাসদারের মধ্যে পুরুষলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ সমপর্যায়ের হয়ে থাকে। সুতরাং ضَنْكَةً বলার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ : ব্যাখ্যাকার (র.) عَنِ الْقُرْاٰنِ -এর স্থলে عَنِ الْهِدَايَةِ উল্লেখ করতেন তাহলে তা বেশি উপযুক্ত হতো।

قَوْلُهُ وَنَحْشُرُهُ : এটা জুমলায়ে মুসতানিফা, আর যদি رَاءْ বর্ণ সাকিন হয়ে থাকে তাহলে শর্তের জবাবের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে তা مَجْزُوْمْ হবে। আবার একাধারে কয়েকটি হরকত আসার কারণেও مَجْزُوْمْ হতে পারে। عَمٰى এটা نَحْشُرُهْ -এর যমীর থেকে حَالْ।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ : এখানে হামযাটি বিলুপ্ত শব্দের পূর্বে এসেছে। ف হলো আতেফা, এর দ্বারা বিলুপ্ত বাক্যের উপর **عَطْف** করা হয়েছে। আসল বাক্যটি এরূপ ছিল اَعَمُوْا فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ আল্লামা মহল্লী (র.) يَهْدِ -এর তাফসীর يَتَبَيَّنُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَهْدِ হলো فِعْل لَازِمْ অর্থ এই যে, তারা কি অন্ধ হয়ে গেছে? ফলে আমার ধ্বংসলীলা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়নি। اَهْلَكْنَا -এর মাফউলেবিহী হলো পূর্বোল্লিখিত كَمْ আর كَمْ -এর تَمْيِيْز উহ্য রয়েছে। مِنَ الْقُرُوْنِ এটা تَمْيِيْز -এর সিফত হওয়ার কারণে নসবের স্থলে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ كَمْ اَهْلَكْنَا كَائِنًا مِنَ الْقُرُوْنِ

قَوْلُهُ يَمْشُوْنَ : আল্লামা মহল্লী (র.) يَمْشُوْنَ -কে قَبْلَهُمْ -এর যমীর-এর حَالْ সাব্যস্ত করেছেন। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার اَهْلَكْنَا -এর هُمْ যমীর থেকে حَالْ বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এমতাবস্থায় যে, তারা নিজ নিজ ঘরে চলাফেরা করছিল।

قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ : এটা হলো মুবতাদা, আর مِنَ الْاَخْذِ হলো তার বিবরণ। আর لِرِعَايَةِ الْمَعْنٰى উল্লিখিত اَخْذ তথা পাকড়াও করার ইল্লত বা কারণ। لَا مَانِعَ مِنْهُ হলো খবর। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত اَهْلَكْنَا ক্রিয়া থেকে মাসদারের অর্থের বর্ণ ছাড়াই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে اَخْذ মাসদার গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। একথাটিকে প্রশ্নোত্তরাকারে এভাবে বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন. اَهْلَكْنَا দ্বারা اِهْلَاكْ মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া কিভাবে বৈধ হতে পারে? কারণ فِعْل -এর পূর্বে এমন কোনো হরফ উল্লেখ নেই যা তাকে মাসদারের অর্থে পরিণত করবে।

উত্তর. অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ রাখার জন্য فِعْل -কে মাসদার অর্থে পরিণতকারী حَرْف ছাড়াই তার দ্বারা মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া দূষণীয় নয়।

قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ : এখানে ذٰلِكَ দ্বারা اَلْاِهْلَاكُ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ نُهٰى : এটা نُهْيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– বিবেক বুদ্ধি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে হযরত আদম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা তখন পর্যন্ত ইবলীস জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে

একত্রে বাস করতো। ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল, আমি অগ্নি নির্মিত আর সে মৃত্তিকা নির্মিত। আর অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সিজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলো। পক্ষান্তরে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর জন্য জান্নাতের সব বাগবাগিচা ও অফুরন্ত নিয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। সেখানকার সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হলো যে, একে [অর্থাৎ এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে] আহার করো না এবং এর কাছেও যেয়ো না। সূরা বাকারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হযরত আদম (আ.)-কে বললেন, দেখ, সিজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের [অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর] শত্রু। সে যেন অপকৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে তোমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تَشْقٰى শব্দটি شَقَاوَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিবিধ; একটি হচ্ছে পারলৌকিক কষ্ট আর অপরটি হলো ইহলৌকিক কষ্ট অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা প্রথম অর্থে কোনো পয়গাম্বর দূরের কথা, কোনো সৎকর্মপরায়ণ মুসলমানদের জন্য এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (র.) এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন- هُوَ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ كَدِّ يَدَيْهِ অর্থাৎ এখানে شَقَاوَتْ-এর অর্থ- হাতে খেটে আহার্য উপার্জন করা। -[কুরতুবী]

এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভ বিশেষ এবং জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ অন্ন, পানীয় ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত জান্নাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, এখান থেকে বহিষ্কৃত হলে এসব নিয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবত এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের উল্লেখ না করে শুধু এমন সব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানব জীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত না হও এবং এসব নিয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তাফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে فَتَشْقٰى শব্দের মর্ম। ইমাম কুরতুবী (র.) এখানে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) জান্নাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্য দিলেন এবং বললেন, যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরি করুন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসব কাজের পদ্ধতিও হযরত আদম (আ.)-কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে হযরত আদম (আ.) রুটি তৈরি করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। হযরত আদম (আ.) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, হে আদম আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিজিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরি ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব : আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর সাথে হযরত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে فَتَشْقٰى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরিক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী فَتَشْقِيَا বলা হতো। কুরতুবী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। এ কারণেই فَتَشْقٰى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে তা হযরত আদম (আ.)-কেই করতে হবে। কেননা হযরত হাওয়া (আ.)-এর ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা তার দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে : কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে আরো শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর জিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ– আহার্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশি কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ; অপরিহার্য নয়। এ থেকেই আরো জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারো ভরণ-পোষণ শরিয়ত কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরিউক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে। যেমন পিতামাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারগ হলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকহগ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত রয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى : জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জান্নাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। "জান্নাতে ক্ষুধা লাগে না"– এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদই পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে, এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ থেকে **وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى** এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং হুশিয়ারও করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দুশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যাতে সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গাম্বর শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অবাধ্যতা ও গুনাহ। আল্লাহর নবী ও রাসূল হয়ে তিনি এই গুনাহ কিরূপে করলেন? অথচ সাধারণ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গাম্বরগণ প্রত্যেক ছোট বড় গুনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জবাব সূরা বাকারার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে প্রথমে عَصٰى ও পরে غَوٰى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাকারায় উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরিয়তের আইনে হযরত আদম (আ.)-এর এই কর্ম গুনাহ ছিল না। কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তার সামান্য ভ্রান্তিকেও গুরুতর ভাষায় অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করে সতর্ক করা হয়েছে। غَوٰى শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং ২. পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী ও কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করেছিলেন, তা বাকি রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গাম্বরগণ সম্পর্কে একটি জরুরি নির্দেশ, তাদের সম্মানের হেফাজত : কাজী আবূ বকর ইবনে আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে عَصٰى ইত্যাদি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিটি তার ভাষায় এই–

لَا يَجُوْزُ لِاَحَدِنَا الْيَوْمَ اَنْ يُخْبِرَ بِذٰلِكَ عَنْ اٰدَمَ اِلَّا اِذَا ذَكَرْنَاهُ فِيْ اَثْنَاءِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَنْهُ اَوْ قَوْلِ نَبِيِّهٖ فَاَمَّا اَنْ يَبْتَدِئَ ذٰلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهٖ فَلَيْسَ بِجَائِزٍ لَنَا فِيْ اٰبَائِنَا الادينن اِلَيْنَا الْمُمَاثِلِيْنَ لَنَا فَكَيْفَ فِيْ اَبِيْنَا الْاَقْوَمِ الْاَعْظَمِ الْاَكْرَمِ النَّبِيِّ الْمُقَدَّمِ الَّذِيْ عَذَرَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى وَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَلَهٗ.

অর্থাৎ আজ আমাদের কারো জন্য হযরত আদম (আ.)-কে অবাধ্য বলা জায়েজ নয়। তবে কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েজ। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সর্বদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চেয়ে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত পয়গাম্বর, আল্লাহ তা'আলা যার তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তার জন্য কোনো অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েজ নয়।

এ কারণেই কুশায়রী আবূ নছর বলেন, কুরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে হযরত আদম (আ.)-কে গুনাহগার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েজ নয়। কুরআন পাকের যেখানেই কোনো নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে, না হয় নবুয়ত পূর্ববর্তী বিষয়াদি বুঝানো হয়েছে। তাই কুরআনের আয়াত ও হাদীসের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েজ; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا : অর্থাৎ জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়ই। এই সম্বোধন হযরত আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌঁছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরিক করা অবান্তর। তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে তাদের সন্তান সন্তুতির পারস্পরিক শত্রুতা। বলা বাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতামাতার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ : এখানে জিকির এর অর্থ কুরআনও হতে পারে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে ذِكْرًا رَسُوْلاً বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কুরআন অথবা রাসূলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ কুরআনের তেলাওয়াত ও বিধিবিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পরিণাম এই فَاِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى অর্থাৎ তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আজাব কিয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গাম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য সব হাদীসগ্রন্থে সা'দ (রা.) প্রমুখের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পয়গাম্বরদের প্রতি দুনিয়ার বালা মসিবত সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়। তাদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও ওলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণত কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কুরআনের এ উক্তি পরকালের জন্য হতে পারে– দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জবাব এই যে, এখানে দুনিয়ার আজাব বলে কবরের আজাব বুঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং مَعِيْشَةً ضَنْكًا -এর তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বুঝানো হয়েছে। –[মাযহারী]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ লালসা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। –[মাযহারী]

এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সঞ্চিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জুটে না। কারণ এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ : يَهْدِ ক্রিয়াপদের فَاعِل -এর ضَمِيْر . هُدٰى শব্দের দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং هُدٰى দ্বারা কুরআন অথবা রাসূল ﷺ বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাফরমানির কারণে আল্লাহ তা'আলার আজাবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে فَاعِل -এর ضَمِيْر আল্লাহ তা'আলার দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কি তাদেরকে হেদায়েত দেননি?

অনুবাদ :

١٢٩. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاْخِيْرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ اِلَى الْاٰخِرَةِ لَكَانَ الْاِهْلَاكُ لِزَامًا لَازِمًا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَاَجَلٌ مُّسَمًّى . مَضْرُوْبٌ لَهُمْ مَعْطُوْفٌ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ فِىْ كَانَ وَقَامَ الْفَصْلُ بِخَبَرِهَا مَقَامَ التَّاكِيْدِ .

১২৯. আপনার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের শাস্তি পরকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করার ব্যাপারে অবশ্যম্ভাবী হতো পৃথিবীতে তাদের ধ্বংস এবং একটা কাল নির্ধারিত না থাকলে اَجَلٌ مُّسَمًّى -এর আতফ হয়েছে كَانَ -এর মধ্যস্থ উহ্য যমীরের উপর। আর كَانَ -এর ইসিম ও খবরের মধ্যে فَصْل টা তাকিদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

١٣٠. فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ مَنْسُوْخٌ بِاٰيَةِ الْقِتَالِ . وَسَبِّحْ صَلِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَالٌ اَىْ مُتَلَبِّسًا بِهٖ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ صَلٰوةَ الصُّبْحِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ط صَلٰوةَ الْعَصْرِ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ سَاعَاتِهٖ فَسَبِّحْ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ عَطْفٌ عَلٰى مَحَلِّ مِنْ اٰنَاءِ الْمَنْصُوْبِ اَىْ صَلِّ الظُّهْرَ لِاَنَّ وَقْتَهَا يَدْخُلُ بِزَوَالِ الشَّمْسِ فَهُوَ طَرَفُ النِّصْفِ الْاَوَّلِ وَطَرَفُ النِّصْفِ الثَّانِىْ لَعَلَّكَ تَرْضٰى . بِمَا تُعْطٰى مِنَ الثَّوَابِ .

১৩০. সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করুন! এটা জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। এবং সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন بِحَمْدِ رَبِّكَ এটা سَبِّحْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত তাসবীহ আদায় করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ ফজরের নামাজ ও সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ আসরের নামাজ এবং রাত্রিকালে সময়ে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করুন। এবং দিবসের প্রান্তসমূহে এর আতফ হলো مِنْ اٰنَاءِ -এর উপর যা মূলত سَبِّحْ ফে'লের মাফউল বা মানসূব। অর্থাৎ জোহরের নামাজ আদায় করুন। কেননা তার সময় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আরম্ভ হয়। কাজেই এটা হলো প্রথমার্ধের প্রান্ত এবং দ্বিতীয়ার্ধেরও প্রান্ত। যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন। আপনাকে প্রদত্ত ছওয়াব দ্বারা।

١٣١. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا اَصْنَافًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا زِيْنَتَهَا وَبَهْجَتَهَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ بِاَنْ يَطْغَوْا وَرِزْقُ رَبِّكَ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا اُوْتُوْهُ فِى الدُّنْيَا وَاَبْقٰى اَدْوَمُ .

১৩১. আপনি আপনার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত করবেন না তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। তার সৌন্দর্য চাকচিক্য ও ঐশ্বর্য। তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তা এভাবে যে, তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। আপনার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনোপকরণ জান্নাতে উত্তম পৃথিবীতে প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে এবং অধিক স্থায়ী সর্বদা বিদ্যমান।

অনুবাদ :

١٣٢. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ اِصْبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْأَلُكَ نُكَلِّفُكَ رِزْقًا ط لِنَفْسِكَ وَلَا لِغَيْرِكَ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ الْجَنَّةُ لِلتَّقْوٰى لِاَهْلِهَا ـ

১৩২. আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন এবং তাতে অবিচলিত থাকুন। আমি আপনার নিকট চাই না। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না জীবনোপকরণ আপনার নিজের ও অন্যের ব্যাপারে। আমিই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম জান্নাত মুত্তাকীজের জন্য অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য।

١٣٣. وَقَالُوْا اَيِ الْمُشْرِكُوْنَ لَوْلَا هَلَّا يَأْتِيْنَا مُحَمَّدٌ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط مِمَّا يَقْتَرِحُوْنَهٗ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَيِّنَةُ بَيَانُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ـ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ مِنْ اَنْبَاءِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَاِهْلَاكِهِمْ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ ـ

১৩৩. তারা বলে অর্থাৎ মুশরিকরা [তিনি কেন] হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের নিকট হতে নিদর্শন আনয়ন করেন না। যা তারা কামনা করে। তাদের নিকট কি আসেনি। تَأْتِهِمْ শব্দটি تَاءْ এবং يَاءْ উভয়ভাবে পঠিত। সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে কুরআন সেসব পূর্ববর্তী উম্মতের সংবাদসমূহে এবং রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দরুন তাদেরকে ধ্বংস করার কাহিনী সম্বলিত।

١٣٤. وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ قَبْلَ مُحَمَّدٍ الرَّسُوْلِ لَقَالُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَبَّنَا لَوْلَا هَلَّا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ الْمُرْسَلَ بِهَا مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ فِى الْقِيٰمَةِ وَنَخْزٰى ـ فِىْ جَهَنَّمَ ـ

১৩৪. যদি আমি তাদেরকে ইতিপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বে। তবে তারা বলত কিয়ামতের দিন হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম যা সহ তিনি প্রেরিত হতেন। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত ও দোজখে অপমানিত হওয়ার পূর্বে।

١٣٥. قُلْ لَهُمْ كُلٌّ مِّنَّا وَمِنْكُمْ مُتَرَبِّصٌ مُنْتَظِرٌ مَا يَؤُوْلُ اِلَيْهِ الْاَمْرُ فَتَرَبَّصُوْا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ فِى الْقِيٰمَةِ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ الطَّرِيْقِ السَّوِيِّ الْمُسْتَقِيْمِ وَمَنِ اهْتَدٰى ـ مِنَ الضَّلَالَةِ اَنَحْنُ اَمْ اَنْتُمْ ـ

১৩৫. আপনি বলুন তাদেরকে প্রত্যেকে আমাদেরও তোমাদের মধ্যে অপেক্ষমাণ ব্যাপারটি যেদিকে গড়াচ্ছে তার প্রতি অপেক্ষাকৃত সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কিয়ামতের দিন কারা রয়েছে সরল সোজা পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে ভ্রষ্টতা থেকে, আমরা নাকি তোমরা?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ الخ : আল্লাহ তা'আলার যদি তাঁর চিরন্তন জ্ঞান অনুযায়ী মহানবী ﷺ-এর সম্মানের ক্ষেত্রে তার উম্মত থেকে সর্বগ্রাসী আজাবকে বিলম্বিত করার বিষয়টি সুনিশ্চিত না হতো তাহলে পূর্বের উম্মতসমূহের ন্যায় এ উম্মতের উপরও সর্বগ্রাসী আজাব নাজিল হতো। কাজেই এ বিলম্ব কেবল অবকাশ প্রদান মাত্র। যাতে কাফেররা তাদের পূর্বের স্বভাব পরিবর্তন করার সুযোগ লাভ করে।

قَوْلُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمُسْتَتِرِ فِيْ كَانَ : এর উদ্দেশ্য এই যে, وَاَجَلٌ مُسَمًّى -এর আতফ হলো كَانَ -এর গুপ্ত যমীরের উপর। বাক্যটি এমন হবে كَانَ الْاِهْلَاكُ وَالْاَجَلُ الْمُعَيَّنُ لَهُ لِزَامًا আর এখানে لِزَامًا মাসদারটি لَازِمًا অর্থে।

প্রশ্ন. اِهْلَاكٌ এবং اَجَلٌ مُسَمًّى উভয়টি كَانَ -এর اِسْم সুতরাং এর খবরও দ্বিবচন হওয়া উচিত। সুতরাং لِزَامًا -এর স্থলে لَازِمَيْنِ হওয়া উচিত।

উত্তর. لِزَامًا যদিও এখানে لَازِمًا -এর অর্থে, কিন্তু মূলত এটা মাসদার। সুতরাং তাকে দ্বিবচনের অর্থে ব্যবহার করা বৈধ।

قَوْلُهُ قَالَ قَامَ الْفَصْلُ : এটাও একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন. ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِل -এর উপর যখন আতফ হয় তখন ضَمِيْر مَرْفُوْع -এর তাকিদ স্বরূপ ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِل উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। এখানে كَانَ -এর ضَمِيْر উহ্য হয়েছে। اِهْلَاكٌ -এর উপর اَجَلٌ مُسَمًّى -এর عَطْف হচ্ছে। অথচ এখানে তার কোনো তাকীদস্বরূপ যমীরে মুনফাসিল আনা হয়নি।

উত্তর : عَطْف বৈধ হওয়ার জন্য আরো একটি উপায় আছে। তা এই যে, ضَمِيْر مُنْفَصِل ছাড়া যদি অন্য কোনো বস্তু দ্বারাও মাঝে ব্যবধান ঘটে তাহলেও عَطْف বৈধ হয়ে যায়। এখানে كَانَ -এর খবর لِزَامًا -এর ব্যবধান আসার কারণে عَطْف বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَجَلٌ مُسَمًّى : اَجَل শব্দটি مَرْفُوْع হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। ১. -এর عَطْف হলো كَانَ -এর ضَمِيْر مُسْتَتَر -এর উপর। এটাই ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এর عَطْف হলো كَلِمَةٌ -এর উপর। আর এটা لَوْلَا -এর অধীনে উল্লিখিত হয়েছে। আসল বাক্যটি এরূপ لَوْلَا كَلِمَةٌ وَاَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ الْعَذَابُ لَازِمًا لَهُمْ

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ : فَاصْبِرْ -এর মধ্যকার فَاءٌ হলো جَزَاءٌ নির্দেশক। এখানে শর্ত উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ مِنْ كَلِمَاتِ الْكُفْرِ হবে।

فِىْ اٰنَاءِ الَّيْلِ এখানে اٰنَاءٌ শব্দটি اَنًا -এর বহুবচন। অর্থ- সময়, আর مِنْ অব্যয়টি فِىْ অর্থে। অর্থাৎ مِنْ اٰنَاءِ الَّيْلِ

قَوْلُهُ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ : অর্থাৎ صَلِّ اَطْرَافَ النَّهَارِ এটা مِنْ اٰنَاءِ الَّيْلِ -এর مَحَلّ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ اَزْوَاجًا : এটা مَتَّعْنَا -এর মাফ'উলেবিহী হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর بِهٖ -এর ضَمِيْر مَجْرُوْر যা مَا -এর প্রতি ফিরেছে, তা حَالٌ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا : زَهْرَةَ শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে।

১. مَتَّعْنَا -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হওয়ার কারণে। আর প্রথম مَفْعُوْل হলো اَزْوَاجًا আর مَتَّعْنَا যেহেতু اَعْطَيْنَا -এর অর্থ বিশিষ্ট, এ কারণে দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হবে।

২. اَزْوَاجًا থেকে بَدَلٌ হওয়ার কারণে। অথবা مُضَافٌ বিলুপ্ত থাকার কারণে অর্থাৎ ذَوِىْ زَهْرَةَ অথবা مُبَالَغَةٌ স্বরূপ।

৩. উহ্য فِعْلٌ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এ ব্যাপারে مَتَّعْنَا প্রমাণ বহন করছে। অর্থাৎ جَعَلْنَا زَهْرَةَ

৪. ذَمٌّ -এর উপর ভিত্তি করে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ اَذُمُّ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এছাড়া مَنْصُوْب হওয়ার আরো ৫টি কারণ থাকতে পারে। সংক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য করে তা বর্জন করা হলো।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَّطْغَوْا : بَاءْ হলো سَبَبِيَّةٌ অর্থাৎ আমি তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে ফেতনায় লিপ্ত করেছি বা পরীক্ষায় ফেলেছি। بَهْجَةٌ অর্থ সৌন্দর্য, চাকচিক্য। يَقْتَرِحُوْنَهُ এটা اِقْتِرَاحٌ মাসদার থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ– কামনা করা, সিদ্ধান্ত পেশ করা, দাবি করা।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَأْتِيْهِمْ : হামযাটি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর وَاوْ টি আতেফা। অর্থাৎ اَعَمُوْا وَلَمْ تَأْتِيْهِمْ

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ : এটা জুমলায়ে মুসতানিফা। পূর্বের কথার তাকিদস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَنَتَّبِعَ : এটা لَوْلَا-এর জবাব। উহ্য اَنْ-এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে অর্থাৎ فَاَنْ نَتَّبِعَ

قَوْلُهُ مَنْ اَصْحَابُ الصِّرَاطِ : এটা মুবতাদা ও খবর। আল্লামা মহল্লী (র.) مَنِ اهْتَدٰى-এর ব্যাখ্যা مِنَ الضَّلَالَةِ দ্বারা করে اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ এবং مَنِ اهْتَدٰى-এর মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। اَصْحَابُ الصِّرَاطِ দ্বারা সে সকল লোক উদ্দেশ্য যারা শুরু থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন– রাসূল ﷺ এবং সে সকল সাহাবী যারা ইসলাম অবস্থায় বালেগ হয়েছেন। যেমন– হযরত আলী (রা.) প্রমুখ। আর وَمَنِ اهْتَدٰى দ্বারা ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য, যারা পূর্বে কাফের ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে مَنْ হলো জিজ্ঞাসামূলক। আবার খবরের স্থলেও হতে পারে। এ সময় الصِّرَاطُ-এর উপর عَطْفٌ হবে। অর্থাৎ اَصْحَابُ مَنِ اهْتَدٰى

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ : মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্য নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। তাঁকে কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলতো। কুরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দুটি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। ১. আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। ২. আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ বাক্যে একথাই বলা হয়েছে।

শত্রুদের নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ধৈর্যধারণ এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট-বড়, ভালোমন্দ কোনো মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোনো না কোনো শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোনো না কোনো ক্ষতি করেই ছাড়ে। যদিও তা মৌখিক গালিগালাজই হয়। সম্মুখে গালিগালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কুরআন পাক দুটি বিষয়ের সমষ্টিকে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। ১. সবর। অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। ২. আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্য একটি আলাদা আজাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো কোনো রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহ তা'আলার সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোনো না কোনো রহস্য আছে। তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপনা-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– لَعَلَّكَ تَرْضٰى অর্থাৎ উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন যাপন করতে পারবেন। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়ার অথবা ইবাদত করার তাওফীক হয়, এ কাজের জন্য গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদত তাঁরই তাওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই سَبِّحْ بِحَمْدِ শব্দটি সাধারণ জিকির ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাজের অর্থেও হতে পারে। তাফসীরবিদগণ সাধারণত শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তারা নামাজের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণত 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বলে ফজরের নামাজ, 'সূর্যাস্তের পূর্বে' বলে জোহর ও আসরের নামাজ

এবং مِنْ اٰنَاۤءِ الَّيْلِ বলে রাত্রিকালীন সব নামাজ তথা মাগরিব, ইশা, তাহাজ্জুদ প্রভৃতিতে বুঝানো হয়েছে। অতঃপর اَطْرَافَ النَّهَارِ বলে এর আরো তাকিদ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهِ الخ : শানে নুযূল : ইবনে আবি শায়বা, ইবনে মারদবিয়া, বাজ্জার এবং আবূ ইয়ালা হযরত আবূ রাফে (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার প্রিয়নবী ﷺ -এর একজন মেহমান আসলেন। তিনি আমাকে জনৈক ইহুদির নিকট থেকে আটা বাকিতে আনার জন্য প্রেরণ করলেন এবং ইরশাদ করলেন, রজব মাসের প্রথম তারিখ পর্যন্ত [এর মূল্য বাকি থাকবে] ইহুদি বলল, কোনো বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি দেব না। আমি হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে ইহুদির কথা আরজ করলাম। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, যদি সে আমার নিকট এভাবে আটা বিক্রয় করতো তবে আমি তার পাওনা অবশ্যই পরিশোধ করতাম, নিঃসন্দেহে আমি আসমানেও আমানতদার, জমিনেও আমানতদার। যাও আমার লৌহ বর্মটি তার নিকট নিয়ে যাও। আমি হুজুর ﷺ -এর দরবার থেকে বের হওয়ার পূর্বেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মু'মিনের জন্য আশঙ্কার বস্তু : وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ – আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে উম্মতকে পথপ্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্থিব চাকচিক্য ও বিবিধ নিয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। কেননা এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মু'মিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

দুনিয়াতে কাফের ও পাপাচারীদের বিলাস বৈভব, ধনাঢ্যতা ও জাঁকজমকতা সর্বকালেই প্রত্যেকের সামনে এই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে যে, এরা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় ও লাঞ্ছিত তখন এদের হাতে এসব নিয়ামত কেন? পক্ষান্তরে নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কেন? হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর মতো মহানুভব মনীষীর মনকেও এ প্রশ্ন দোলা দিয়েছিল। একবার রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর বিশেষ কক্ষে একান্তবাসে ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি একটি মোটা খেজুর পাতার তৈরি মাদুরে শায়িত আছেন এবং খেজুর পাতায় দাগ তাঁর পবিত্র দেহে ফুটে উঠেছে। এই অসহায় দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রা.) কান্না রোধ করতে পারলেন না। তিনি অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! পারস্য ও রোম সম্রাটগণ এবং তাদের অমাত্যরা কেমন কেমন নিয়ামত ও সুখ ভোগ করছে। আর আপনি সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ও প্রিয় রাসূল হয়েও আপনার এই দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, এ কেমন কথা!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে খাত্তাব তনয়! তুমি এখন পর্যন্তও সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পতিত রয়েছ? এসব ভোগ-বিলাস ও কাম্য বস্তু আল্লাহ তা'আলা এ জগতেই তাদেরকে দান করেছেন। পরজগতে তাদের কোনো অংশ নেই। সেখানে শুধুমাত্র আজাবই আজাব। মুমিনের ব্যাপার এর বিপরীত। বলা বাহুল্য, এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পার্থিব সৌন্দর্য ও আরাম আয়েশের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন এবং সংসারের সাথে সম্পর্কহীন জীবন পছন্দ করতেন। অথচ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আরাম আয়েশের সামগ্রী যোগাড় করার পূর্ণ ক্ষমতাই তার ছিল। কোনো সময় পরিশ্রম ও চেষ্টা ছাড়া ধন-সম্পদ তাঁর হাতে এসে গেলেও তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফকির মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং নিজের আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখতেন না। ইবনে আবী হাতেম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَنْ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ের সর্বাধিক ভয় ও আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য, যার দরজা তোমাদের সামনে খুলে দেওয়া হবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এ সংবাদও দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তোমাদের বিজয় অভিযান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে এবং ধনদৌলত ও বিলাস-বাসনের প্রাচুর্য হবে। এই পরিস্থিতি তেমন আনন্দের কথা নয়; বরং ভয় ও আশঙ্কার বিষয়। এতে লিপ্ত হয়ে তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তার বিধানাবলি থেকে গাফেল হয়ে যেতে পার।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদের নামাজের আদেশ ও তার রহস্য : وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

অর্থাৎ আপনি পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ দেন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যত এখানে আলাদা আলাদা দুটি নির্দেশ রয়েছে। ১. পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ এবং ২. নিজেও নামাজ অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে,

নিজের নামাজ পুরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্যও নিজের পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাজী হওয়া আবশ্যক। কেননা পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবত নিজেও অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তানসন্তুতি ও সম্পর্কশীল সবাই أَهْلٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ ফজরের নামাজের সময় হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে গমন করে اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ [নামাজ পড়, নামাজ পড়] বলতেন। -[কুরতুবী]

ধনকুবের ও রাজরাজাদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত ওরওয়া ইবনে জুবায়েরের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামাজ পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শুনাতেন। -[কুরতুবী]

যে ব্যক্তি নামাজ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিজিকের ব্যাপার সহজ করে দেন : لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا অর্থাৎ আমি আপনার কাছে এই দাবি করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিজিক নিজস্ব জ্ঞানগরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন; বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা রিজিক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে সর্বোচ্চ মাটিকে নরম ও চাষোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু বীজের ভেতর থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা এবং তাকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে তার কোনো হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হিফাজত ও আল্লাহ সৃজিত ফলফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা এই পরিশ্রমের বুঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِىْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدُّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, তুমি একাগ্রচিত্তে আমার ইবাদত কর, আমি ধনৈশ্বর্য দ্বারা তোমার বক্ষ পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব। যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তোমার বক্ষ চিন্তা ও কার্যব্যস্ততা দ্বারা পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মোচন করব না। [অর্থাৎ ধন-দৌলত যতই বৃদ্ধি পাবে, লোভ-লালসাও ততই বেড়ে যাবে। ফলে সর্বদা অভাবগ্রস্তই থাকবে।]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি-

مَنْ جَعَلَ هُمُوْمَهُ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِىْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِىْ اَىِّ اَوْدِيَةٍ هَلَكَ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে এক চিন্তা অর্থাৎ পরকালের চিন্তায় পরিণত করে আল্লাহ তা'আলা তার সংসারের চিন্তাসমূহের জন্য নিজেই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংসার চিন্তার বহুমুখী কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে নেয় সে এসব চিন্তার যে কোনো জটিলতায় ধ্বংস হয়ে যাক, সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা একটুকুও পরওয়া করেন না। -[ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى : অর্থাৎ তাওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহিফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ নয় কি?

قَوْلُهُ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى : অর্থাৎ আজ তো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরিকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু এই দাবি কোনো কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরিকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনটি বিশুদ্ধ তার সন্ধান কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল?

اَلْجُزْءُ السَّابِعُ عَشَرَ সপ্তদশ পারা

سُوْرَةُ الاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ وَّاِحْدٰى اَوْ اِثْنَتَا عَشَرَةَ اٰيَةً

সূরা আম্বিয়া মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ঃ ১১১/১১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. اِقْتَرَبَ قَرُبَ لِلنَّاسِ اَهْلِ مَكَّةَ مُنْكِرِى الْبَعْثِ حِسَابُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ـ عَنِ التَّاَهُّبِ لَهٗ بِالْاِيْمَانِ ـ

১. আসন্ন নিকটবর্তী হয়েছে মানুষের মক্কাবাসীর যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো। হিসাব-নিকাশের সময় কিয়ামতের দিন। কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে ঈমানের মাধ্যমে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে।

২. مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ شَيْئًا فَشَيْئًا اَىْ لَفْظِ قُرْاٰنٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لا يَسْتَهْزِئُوْنَ ـ

২. যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের কোনো নতুন উপদেশ আসে। ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে অর্থাৎ কুরআনের শব্দ তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। বিদ্রূপ করে খেলাচ্ছলে।

৩. لَاهِيَةً غَافِلَةً قُلُوْبُهُمْ ط عَنْ مَعْنَاهُ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ق اَىْ الْكَلَامَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بَدَلٌ مِنْ وَاوِ وَاَسَرُّوْا النَّجْوٰى هَلْ هٰذَا اَىْ مُحَمَّدٌ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ج فَمَا يَأْتِىْ بِهٖ سِحْرٌ اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ تَتَّبِعُوْنَهُ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ـ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ سِحْرٌ ـ

৩. তাদের অন্তর অমনোযোগী উদাসীন তার মর্মের ব্যাপারে। তারা গোপন পরামর্শ করে আলাপ করে যারা জালেম তারা اَلَّذِيْنَ হলো اَسَرُّوْا-এর وَاوْ যমীর হতে بَدْل হয়েছে। এতো হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মতো একজন মানুষই। সুতরাং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন এগুলো সবই জাদু। তবুও কি তোমরা জাদুর কবলে পড়বে অর্থাৎ তাঁর অনুসরণ করবে দেখে শুনে তোমরা জান যে, এটা জাদু।

৪. قٰلَ لَهُمْ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ كَائِنًا فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا اَسَرُّوْهُ الْعَلِيْمُ ـ بِهٖ ـ

৪. সে বলল তাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন। তিনিই সর্বশ্রোতা। তারা যা গোপন করে ও সর্বজ্ঞ সে বিষয়ে।

অনুবাদ :

٥. بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ غَرْضٍ اِلٰى اُخَرَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ قَالُوْا فِيْمَا اُتِىَ بِهٖ مِنَ الْقُرْاٰنِ هُوَ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ اَخْلَاطٌ رَاٰهَا فِى النَّوْمِ بَلِ افْتَرٰىهُ اِخْتَلَقَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ـ فَمَا اَتٰى بِهٖ شِعْرٌ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ـ كَالنَّاقَةِ وَالْعَصَا وَالْيَدِ ـ

৫. বরং بَلْ হরফটি এ আয়াতে তিনো স্থানে উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা বলে কুরআন সম্পর্কে যা কিছু আনীত হয়েছে তা সব অলীক কল্পনা স্বপ্নে দেখা অলীক বিষয়াবলি হয় তিনি তা উদ্ভাবন করেছেন রচনা করেছেন না হয় তিনি একজন কবি। সুতরাং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এগুলো সব কবিতা সুতরাং তিনি আনয়ন করুন আমাদের নিকট এমন এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন পূর্ববর্তীগণ। যেমন, উট, লাঠি, হাত শুভ্র হওয়া।

٦. قَالَ تَعَالٰى مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَىْ اَهْلِهَا اَهْلَكْنٰهَا ج بِتَكْذِيْبِهَا مَا اَتَاهَا مِنَ الْاٰيَاتِ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ لا ـ

৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন– এদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি তাদের নিকট আনীত নিদর্শনাবলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তবে কি এরা ঈমান আনবে? না, তারা ঈমান আনবে না।

٧. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا يُّوْحٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْحَاءِ اِلَيْهِمْ لَا مَلٰٓئِكَةً فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ الْعُلَمَاءَ بِالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ ذٰلِكَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُوْنَهٗ وَاَنْتُمْ اِلٰى تَصْدِيْقِهِمْ اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ـ

৭. আপনার পূর্বেও আমি ওহীসহ মানুষ পাঠিয়েছিলাম। ফেরেশতা নয়। يُوْحٰى শব্দটি অন্য কেরাতে يَاءْ -এর পরিবর্তে نُوْن এবং حَاءْ বর্ণে যেরসহ। তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলেমগণকে। যদি তোমরা না জান উক্ত বিষয়টি। কেননা তারা এ বিষয়ে জানে। আর তোমরা তাদের সত্যায়নে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সত্যায়নের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।

٨. وَمَا جَعَلْنٰهُمْ اَىِ الرُّسُلَ جَسَدًا بِمَعْنٰى اَجْسَادٍ لَا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ بَلْ يَأْكُلُوْنَهٗ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ ـ فِى الدُّنْيَا ـ

৮. আমি তাদেরকে করিনি। রাসূলগণকে এমন দেহ বিশিষ্ট, যে তারা আহার্য গ্রহণ করতেন না; বরং তারা খাবার গ্রহণ করতেন। আর তারা চিরস্থায়ীও ছিলেন না। পৃথিবীতে।

অনুবাদ :

٩. ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ بِاِنْجَائِهِمْ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ اَىِ الْمُصَدِّقِيْنَ لَهُمْ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ . الْمُكَذِّبِيْنَ لَهُمْ .

৯. অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। তাদেরকে মুক্তি দান করার মাধ্যমে। যথা আমি তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম অর্থাৎ নবীগণের সত্যায়নকারীদেরকে। এবং জালেমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস। অর্থাৎ নবীগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে।

١٠. لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ط لِاَنَّهٗ بِلُغَتِكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ . فَتُؤْمِنُوْنَ بِهٖ .

১০. আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি হে কুরাইশ সম্প্রদায়! কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ কেননা এটাতো তোমাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা বুঝবে না। ফলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِقْتَرَبَ قَرُبَ : اِقْتَرَبَ-এর তাফসীরে قَرُبَ শব্দ এনে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اِقْتَرَبَ এবং قَرُبَ উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত।

قَوْلُهٗ لِلنَّاسِ : لِلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যায় اَهْلُ مَكَّةَ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি اِطْلَاقُ الْجِنْسِ عَلَى الْبَعْضِ -এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রমাণ হলো এই যে, সামনে যে বিবরণ ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে তা মুশরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। অন্যথায় হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিকটবর্তী।

قَوْلُهٗ حِسَابُهُمْ : اَىْ وَقْتُ حِسَابِهِمْ অর্থাৎ مُضَافٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ : এটি جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ তার মর্ম হলো- قَرُبَ وَقْتُ حِسَابِهِمْ وَالْحَالُ اَنَّهُمْ غَافِلُوْنَ مُعْرِضُوْنَ

قَوْلُهٗ هُمْ : এটি মুবতাদা আর مُعْرِضُوْنَ হলো তার খবর।

قَوْلُهٗ فِىْ غَفْلَةٍ : এটি مُعْرِضُوْنَ-এর ضَمِيْر থেকে حَال-ও হতে পারে اَىْ اَعْرَضُوْا غَافِلِيْنَ এবং মুবতাদার خَبَرْ ثَانِىْ-ও হতে পারে।

قَوْلُهٗ تَاَهَّبَ : اَهَبَّ وَ تَاَهَّبَ-এর অর্থ হলো তৈরি হওয়া, উদ্বুদ্ধ হওয়া।

قَوْلُهٗ مَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ : এটি পূর্বের বক্তব্যের عِلَّتْ বা কারণ।

قَوْلُهٗ ذِكْرٍ : এখানে مِنْ হরফটি فَاعِلْ-এর উপর অতিরিক্ত এসেছে।

قَوْلُهٗ لَفْظُ الْقُرْاٰنِ : বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) لَفْظُ الْقُرْاٰنِ বৃদ্ধি করে এ সংশয় বিদূরিত করেছেন যে, এখানে ذِكْرْ দ্বারা কুরআন মাজীদ উদ্দেশ্য। আর কুরআন মাজীদ হলো আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং তার বিশেষ সিফত। আর আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তার মতো তাঁর কালামও কাদীম বা অবিনশ্বর। তথাপিও তাঁর কালামকে مُحْدَثْ কেন বলা হলো?

উত্তর. পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ শব্দাবলির দিক দিয়ে حَادِثْ এবং স্বীয় মর্ম ও অর্থের দিক দিয়ে قَدِيْم বা অবিনশ্বর।

قَوْلُهٗ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا : এখানে اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا বাক্যটি اَسَرُّوْا ফে'লের ضَمِيْر থেকে بَدْل হয়েছে এবং মহল হিসেবে رفع আর اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অংশটি هُمْ উহ্য মুবতাদার খবরও হতে পারে। اَىْ هُمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর যদি عَنٰى উহ্য ধরে নেওয়া হয় তাহলে اَلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا মহল হিসেবে مَنْصُوْبٌ হবে। اَىْ اَعْنِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

قَوْلُهُ هَلْ هٰذَا الخ : এটি اَلنَّجْوٰى থেকে بَدَل অর্থাৎ ঐসব জালেমদের গোপন কথাবার্তা এই ছিল যে, এ নবী তো আমাদের মতো মানুষ।

قَوْلُهُ يَعْلَمُ الْقَوْلَ كَائِنًا فِى السَّمَاءِ : আল্লামা মহল্লী (র.) اَلْقَوْلَ-এর পরে كَائِنًا বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ হলো اَلْقَوْلَ থেকে حَالٌ

قَوْلُهُ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ : এটি هٰذَا অথবা هُوَ উহ্য মুবতাদার খবর। যেমন– আল্লামা মহল্লী (র.) هُوَ উহ্য ধরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে এটি قَالُوْا-এর مَفْعُوْل بِهٖ হওয়ার কারণে মহল হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে।

اَضْغَاثٌ শব্দটি ضِغْثٌ-এর বহুবচন। অর্থ– ঐ বিচ্ছিন্ন এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা যা মানুষ স্বপ্নে দেখতে পায়।

قَوْلُهُ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ : এটি উহ্য شَرْط-এর جَزَاءٌ যা পূর্বাপর থেকে বুঝা যাচ্ছে। اَىْ كَاَنَّهُ قِيْلَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا قُلْنَا بَلْ كَانَ رَسُوْلًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ.

قَوْلُهُ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ : এটি اٰيَةٌ-এর সিফত। اَىْ اِئْتِنَا بِاٰيَةٍ كَائِنَةٍ مِثْلَ الْاٰيَةِ الَّتِىْ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

قَوْلُهُ اَهْلَكْنٰهَا : এটি قَرْيَةٌ-এর সিফত।

قَوْلُهُ لَا : اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ এরপর لا উহ্য ধরে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَفَهُمْ-এর হামযাটি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ বা অস্বীকারমূলক হামযা।

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : এটি جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ তার جَزَاءٌ হলো فَاسْئَلُوْهُمْ যা উহ্য রয়েছে। তার পূর্বের বাক্য উক্ত جَزَاءٌ টি উহ্য থাকার প্রতি দালালত করে। অর্থাৎ তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের কথার চেয়ে আহলে কিতাবদের কথাকে অধিক সত্য মেনে কর। কেননা আহলে কিতাব ইসলামের দুশমনির ক্ষেত্রে তোমাদের সমপর্যায়ের।

قَوْلُهُ اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِ الْمُؤْمِنِيْنَ : মূলত বাক্যটি হবে এমন- اَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيْقِكُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ

قَوْلُهُ جَسَدًا بِمَعْنٰى اَجْسَادًا : جَسَدًا এরপরে بِمَعْنٰى اَجْسَادًا উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جَسَدًا একবচন হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অর্থগতভাবে এটি বহুবচনের। অথবা তার পূর্বে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। اَىْ ذَوِىْ جَسَدٍ جَسَدًا কিংবা এ কারণে মানসূব হয়েছে যে, এটি جَعَلْنَا-এর দ্বিতীয় মাফঊল। যদি جَعَلَ শব্দটি صَيَّرَ-এর অর্থে হয় তখন উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি خَلَقَ-এর অর্থে হয়, তাহলে جَعَلْنَاهُمْ-এর যমীরে هُمْ থেকে حَال হওয়ার কারণে মানসূব হবে।

قَوْلُهُ لَا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ : বাহ্যিকভাবে এটি جَسَدًا-এর সিফত। মূলত এতে মুশরিকদের একটি কথার খণ্ডন করা হয়েছে। তা হলো তারা বলত– مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ অর্থাৎ এ কেমন রাসূল যিনি খাবার গ্রহণ করেন!

قَوْلُهُ لَقَدْ اَنْزَلْنَا : لَقَدْ-এর لَامٌ টি হলো কসমের অর্থে। اَىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আম্বিয়া প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ, এর আয়াত সংখ্যা ১১২, রুকু-৭। এ সূরায় সতের জন আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ রয়েছে। এতে বিবরণ রয়েছে তাদের তাবলীগের, কিভাবে তারা মানুষকে তাওহীদের জন্যে আহ্বান করেছেন। আর কিভাবে কাফেররা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম কিভাবে তাদের নির্যাতন-উৎপীড়ন সবর করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অবশেষে তাদেরকে সফলকাম করেছেন, তাদের শত্রুদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। এ সূরায় তাওহীদ ও রিসালতের অনেক অকাট্য দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি কিয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বস্তুত এসবই হলো দীন ইসলামের মৌলিক উপাদান, যার উপর বিশ্বাস করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। এ সূরার সমস্ত আয়াত মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরাতুল আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

ইমাম বুখারী (র.) এবং ইবনে মারদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা আম্বিয়া মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে আদদুরুল মানসুর খ. ৪, পৃ. ৩৪৪, মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৪, পৃ. ৬০৭]

এ সূরার ফজিলত : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই সূরা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার হিসাব সহজ করে দেবেন।

এ সূরার আমল : যার নিদ্রা হয় না, যে বিনিদ্র রজনী কাটায়, কোনো রোগ চিন্তা বা ভয়ের কারণে এ অবস্থা হয়, হরিণের চামড়ার উপর সূরাতুল আম্বিয়া লিপিবদ্ধ করে যদি তার কোমরে বেঁধে দেওয়া হয়, তবে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হবে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে সূরা আম্বিয়া পাঠ করছে তবে সে অনেক অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক আমলের তাওফীক দান করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখিরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা ঐশ্বর্য আখিরাতের স্মরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়। এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখিরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

قَوْلُهُ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ : অর্থাৎ মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা এই উম্মতই হচ্ছে সর্বশেষ উম্মত। যদি ব্যাপক হিসেবে ধরা হয়, তবে কবরের হিসাবও এতে শামিল রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসাব দিতে হয়। এজন্যই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কিয়ামত বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ : যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিয়ে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ মানুষ যতো দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দেশ্য মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসাবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গুনাহের ভিত্তি।

قَوْلُهُ مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ : অর্থাৎ যারা পরকাল ও কবরের আজাব থেকে গাফেল এবং তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কুরআনের কোনো নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কুরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধূলায় লিপ্ত থাকে, কুরআনের প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কুরআনের আয়াতের সাথেই তারা রং তামাশা করতে থাকে।

قَوْلُهُ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ : অর্থাৎ তারা পরস্পর আস্তে আস্তে কানাকানি করে বলে, এই লোকটি যে নিজেকে নবী ও রাসূল বলে দাবি করে, সে তো আমাদের মতোই মানুষ, কোনো ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তাঁর কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহ তা'আলার যে কালাম পাঠ করা হতো, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোনো কাফের অস্বীকার করতে পারতো না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য তারা একে জাদু আখ্যায়িত করে লোকদের বলতো যে, তোমরা জান যে, এটা জাদু, এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোঁকাবাজি জনসমক্ষে ফাঁস করে দেবে।

قَوْلُهُ بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ : যেসব স্বপ্নে মানসিক অথবা শয়তানী কল্পনা শামিল থাকে, সেগুলোকে احلام বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ 'অলীক কল্পনা' করা হয়েছে। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা প্রথমে কুরআনকে জাদু বলেছে, এরপর আরো অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু করেছে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন ও অপবাদ যে, এটা তাঁর কালাম। অবশেষে বলতে শুরু করেছে যে, আসল কথা হচ্ছে লোকটি একজন কবি। তার কালামে কবিসুলভ কল্পনা আছে।

قَوْلُهُ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ : অর্থাৎ সে বাস্তবিকই নবী ও রাসূল হলে আমাদের ফরমায়েশী বিশেষ মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করুক। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে দেখা গেছে যে, তাদেরকে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করার পরও তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। প্রার্থিত মুজেযা দেখার পরও যে জাতি ঈমানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়াই আল্লাহ তা'আলার আইন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে আজাবের কবল থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। তাই কাফেরদেরকে প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা সমুচিত নয়। অতঃপর اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ বাক্যে এ দিকেই ইশারা রয়েছে যে, তারা কি প্রার্থিক মুজেযা দেখলে বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে এরূপ আশা করা বৃথা। তাই প্রার্থিত মুজেযা প্রদর্শন করা হয় না।

مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا - শানে নুযূল : ইবনে জারীর (র.) কাতাদার কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট বলেছিল, যদি আপনি নবুয়তের দাবিতে সত্য হন, তবে সাফা নামক পাহাড়টিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। কাফেরদের এ উক্তির পর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পৌঁছিয়ে দেন, "হে রাসূল! যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনার জাতি যা চায়, তা করে দেওয়া হবে।" অর্থাৎ অনতিবিলম্বে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা হবে, কিন্তু এরপরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে তাদের সকলকে ধ্বংস করা হবে, কোনো প্রকার অবকাশ দেওয়া হবে না। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে, আপনার জাতিকে অবকাশ দেওয়া হোক এবং তাদেরকে আরো চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হোক, তবে তাও দেওয়া যেতে পারে। এর জবাবে প্রিয়নবী ﷺ বলেন, আমি আমার জাতির জন্যে আরো অবকাশ প্রদানের আরজি পেশ করি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ [যাদের স্মরণ আছে] বলে তাওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব আলেম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল; তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী সকল পয়গাম্বর মানুষই ছিলেন। তাই এখানে اَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা সাধারণ কিতাবধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান অর্থ নিলেও কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তারা সবাই ঐ বিষয়টির সাক্ষ্যদাতা।

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরিয়তের বিধি-বিধান জানে না এরূপ মূর্খ ব্যক্তিদের ওয়াজিব হচ্ছে আলেমদের অনুসরণ করা। তারা আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তদনুযায়ী আমল করবে।

قَوْلُهُ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ - কুরআন আরবদের জন্য সম্মান ও গৌরবের বস্তু : কিতাব অর্থ কুরআন এবং জিকির অর্থ এখানে সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও খ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ভাষা আরবিতে অবতীর্ণ কুরআন তোমাদের জন্য একটি বড় সম্মান ও চিরস্থায়ী সুখ্যাতির বস্তু। একে যথার্থ মূল্য দেওয়া তোমাদের উচিত। বিশ্ববাসী একথা প্রত্যক্ষ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরবদেরকে কুরআনের বরকতে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও বিজয়ী করেছেন। জগদ্ব্যাপী তাদের সম্মান ও সুখ্যাতির ডঙ্কা বেজেছে। একথাও সবার জানা যে, এটা আরবদের স্থানগত, গোত্রগত অথবা ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং শুধু কুরআনের বরকতে সম্ভব হয়েছে। কুরআন না হলে আজ সম্ভবত আরব জাতির নাম উচ্চারণকারীও কেউ থাকত না।

অনুবাদ :

١١. وَكَمْ قَصَمْنَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اَىْ اَهْلِهَا كَانَتْ ظَالِمَةً كَافِرَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ

১১. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে যার অধিবাসীরা ছিল জালেম কাফের এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অপর জাতি।

١٢. فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَأْسَنَا اَىْ شَعَرَ اَهْلُ الْقَرْيَةِ بِالْاِهْلَاكِ اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ ط يَهْرُبُوْنَ مُسْرِعِيْنَ فَقَالَتْ لَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِسْتِهْزَاءً ـ

১২. যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল অর্থাৎ জনপদবাসীরা যখন ধ্বংসের বিষয়টি বুঝতে পারল। তখনই তারা জনপদ হতে সরে যেতে লাগল দ্রুত পলায়ন করতে লাগল। ফেরেশতাগণ তাদেরকে উপহাসের স্বরে বললেন–

١٣. لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ نُعِمْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ ـ شَيْئًا مِنْ دُنْيَاكُمْ عَلَى الْعَادَةِ ـ

১৩. তোমরা পলায়ন করো না। ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট তোমাদেরকে যে নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে তার নিকট। এবং তোমাদের আবাসস্থলে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। স্বভাবত তোমাদের পার্থিব কোনো বিষয়ে।

١٤. قَالُوْا يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَآ هَلَاكَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ـ بِالْكُفْرِ ـ

১৪. তারা বলল, হায় يَا টা تَنْبِيْه -এর জন্য দুর্ভোগ আমাদের আমাদের ধ্বংস আমরা তো ছিলাম জালিম কুফরির কারণে।

١٥. فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ الْكَلِمَاتُ دَعْوٰىهُمْ يَدْعُوْنَ بِهَا وَيُرَدِّدُوْنَهَا حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا اَىْ كَالزَّرْعِ الْمَحْصُوْدِ بِالْمَنَاجِلِ بِاَنْ قُتِلُوْا بِالسَّيْفِ خٰمِدِيْنَ ـ مَيِّتِيْنَ كَخُمُوْدِ النَّارِ اِذَا طُفِئَتْ ـ

১৫. তাদের আর্তনাদ চলতে থাকে তারা বারবার এমন আর্তনাদ করতে থাকবে। আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য অর্থাৎ কাঁচি দ্বারা কর্তিত শস্যের ন্যায়। তাদেরকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হবে। ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করা পর্যন্ত মৃত। নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় যখন তাকে নিভিয়ে ফেলা হয়।

١٦. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ـ عَابِثِيْنَ بَلْ دَالِّيْنَ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَنَافِعِيْنَ عِبَادَنَا ـ

১৬. আকাশ ও পৃথিবী এবং যা তাদের অন্তবর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। অহেতুক বা উদ্দেশ্যহীনভাবে; বরং তা আমার কুদরতের পরিচায়ক এবং আমার বান্দাদের জন্য উপকারী।

অনুবাদ :

١٧. لَوْ اَرَدْنَاۤ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا مَا يُلْهٰى بِهٖ مِنْ زَوْجَةٍ اَوْ وَلَدٍ لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّاۤ مِنْ عِنْدِنَا مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ ذٰلِكَ لٰكِنَّا لَمْ نَفْعَلْهُ فَلَمْ نُرِدْهُ ـ

১৭. যদি আমি ক্রীড়া গ্রহণের ইচ্ছা করতাম ক্রীড়া-উপকরণ যথা– স্ত্রী ও সন্তানাদি হতে তবে আমি আমার নিকট যা আছে, তা নিয়ে তা করতাম। ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুর ও ফেরেশতা যদি আমার করার প্রয়োজন হতো এসব বিষয়ের। কিন্তু আমি তার প্রয়োজন অনুভব করিনি। তাই তার ইচ্ছাও করিনি।

١٨. بَلْ نَقْذِفُ نَرْمِىْ بِالْحَقِّ الْاِيْمَانِ عَلَى الْبَاطِلِ الْكُفْرِ فَيَدْمَغُهٗ يَذْهَبُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ ط ذَاهِبٌ وَدَمَغَهٗ فِى الْاَصْلِ اَصَابَ دِمَاغَهٗ بِالضَّرْبِ وَهُوَ مَقْتَلٌ وَلَكُمُ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ الْوَيْلُ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ـ اللّٰهَ بِهٖ مِنَ الزَّوْجَةِ اَوِ الْوَلَدِ ـ

১৮. বরং আমি আঘাত হানি নিক্ষেপ করি সত্য দ্বারা ঈমান দ্বারা মিথ্যার উপর কুফরের উপর। ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় নিঃশেষ করে দেয়। এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিলীন হয়ে যায়। دَمَغَهٗ -এর মূল অর্থ হলো– মস্তিষ্কে আঘাত পৌঁছা যা মৃত্যুর কারণ হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে হে মক্কার কাফেররা! দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি। তোমরা যা বলছ তার জন্য আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে যে তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে।

١٩. وَلَهٗ تَعَالٰى مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مِلْكًا وَمَنْ عِنْدَهٗ اَىِ الْمَلَائِكَةُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ـ لَا يَعْيَوْنَ ـ

১৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা রয়েছে সব তাঁরই মালিকানা সূত্রে। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। এটা মুবতাদা, তার খবর হলো তারা অহংকারবশত তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তি ও বোধ করে না। থমকে যায় না।

٢٠. يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ـ عَنْهُ فَهُوَ مِنْهُمْ كَالنَّفْسِ مِنَّا لَا يُشْغِلُنَا عَنْهُ شَاغِلٌ ـ

২০. তারা দিবারাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা শৈথিল্য করে না তা থেকে। ফেরেশতাদের তাসবীহ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় যা কোনো কাজ কর্মে বাধাগ্রস্ত হয় না।

٢١. اَمْ بِمَعْنٰى بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ وَهَمْزَةُ الْاِنْكَارِ اِتَّخَذُوْا اٰلِهَةً كَائِنَةً مِنَ الْاَرْضِ كَحَجَرٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ اَهُمْ اَىِ الْاٰلِهَةُ يُنْشِرُوْنَ ـ اَىْ يُحْيُوْنَ الْمَوْتٰى لَا وَلَا يَكُوْنُ اِلٰهًا اِلَّا مَنْ يُّحْيِى الْمَوْتٰى ـ

২১. এখানে اَمْ টি بَلْ অর্থে। কথার ধরন পরিবর্তনের জন্য। হামযাটি অস্বীকারব্যাঞ্জক। তারা মৃত্তিকা থেকে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে যেমন– পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? অর্থাৎ মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে পারে কি? না পারে না। আর যে মৃতকে জীবিত করতে পারে না সে ইলাহ হতে পারে না।

অনুবাদ :

٢٢. لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اَىْ اَلسَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ اَىْ غَيْرُهٗ لَفَسَدَتَا ج خَرَجَتَا عَنْ نِظَامِهِمَا الْمُشَاهِدِ لِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ بَيْنَهُمْ عَلٰى وُفْقِ الْعَادَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ مِنَ التَّمَانُعِ فِى الشَّيْءِ وَعَدَمِ الْاِتِّفَاقِ عَلَيْهِ فَسُبْحٰنَ تَنْزِيْهَ اللّٰهِ رَبِّ خَالِقِ الْعَرْشِ الْكُرْسِيِّ عَمَّا يَصِفُوْنَ . اَىْ الْكُفَّارُ اللّٰهَ بِهٖ مِنَ الشَّرِيْكِ لَهٗ وَغَيْرِهٖ .

২২. যদি থাকত এতদুভয়ের মধ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু ইলাহ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তিনি বিনে অন্য কেউ তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থাৎ উভয়টি বর্তমানে যে, সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তা অক্ষুণ্ণ থাকত না। তাদের মাঝে স্বভাবগত কলহ দ্বন্দ্ব থাকার কারণে। যেমননি একাধিক শাসন ক্ষমতাধরগণের মধ্যে কোনো বিষয়ে অনৈক্য ও সংঘর্ষ দেখা যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অতএব আল্লাহ মহান পবিত্র, মুক্ত প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা আরশের কুরসীর তারা যা বলে তা হতে অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাঁর অংশীদার থাকার ও অন্যান্য ব্যাপারে।

٢٣. لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ . عَنْ اَفْعَالِهِمْ .

২৩. তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। তাদের কর্মের ব্যাপারে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهٗ كَمْ قَصَمْنَا : كَمْ হলো خَبَرِيَّةٌ আর قَصَمْنَا -এর অগ্রগামী مَفْعُوْل আর مِنْ قَرْيَةٍ হলো كَمْ خَبَرِيَّةٌ -এর تَمْيِيْز . قَصَمْنَا (ض) হলো اَلْقَصْمُ থেকে مَاضِىْ -এর সীগাহ। অর্থ– ভেঙ্গে ফেলা, খণ্ড বিখণ্ড করা। قَرْيَةٌ দ্বারা ইয়ামানের একটি গ্রাম বা জনপদ উদ্দেশ্য। তার নাম ছিল হাজুরা, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ইবনে মীশা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব (আ.)-কে নবী বানিয়ে উক্ত জনপদে প্রেরণ করেছিলেন। কেউ কেউ পূর্বের উম্মত তথা– নূহ, লুত ও সালেহ (আ.) প্রমুখ নবীগণের উম্মত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে প্রথম অভিমতটি প্রাধান্যযোগ্য।

قَوْلُهٗ كَانَتْ ظَالِمَةً : كَانَتْ ظَالِمَةً এটা قَرْيَةٌ -এর সিফত।

قَوْلُهٗ اَحَسُّوْا : اَىْ اَدْرَكُوْا بِالْحَوَاسِّ অর্থাৎ তারা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করল।

قَوْلُهٗ اِذَا هُمْ يَرْكُضُوْنَ : এর اِذَا টি مُفَاجَاتِيَّةٌ আর هُمْ হলো مُبْتَدَأ এবং يَرْكُضُوْنَ হলো خَبَر - يَرْكُضُوْنَ অর্থ– পায়ের দ্বারা সওয়ারীকে আঘাত করা। এখানে দ্রুত পলায়ন করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ اِسْتِهْزَاءً : এর দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন. ফেরেশতাগণ মিথ্যা ইত্যাদি থেকে মুক্ত। সুতরাং তারা বাস্তবতার পরিপন্থি কথা বললেন কেন? যে, তোমরা তোমাদের বিলাসসামগ্রী ও ঘরবাড়ির দিকে ফিরে যাও। অথচ ফেরেশতারা জানতেন তাদের কেউ রেহাই পাবে না।

উত্তর. এটা মূলত বিদ্রূপমূলক বলেছিলেন। যেমন অপর জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ তুমি আস্বাদন কর। অবশ্যই তুমি সম্মানিত ও মর্যাদান্বিত হবে।

قَوْلُهُ مَسَاكِنِكُمْ : এর আতফ হলো مَا-এর উপর تِلْكَ الْكَلِمَاتُ দ্বারা তাদের উক্তি يَاوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لَاعِبِيْنَ : এটা خَلَقْنَا-এর ফায়েলের যমীর থেকে حَالٌ

قَوْلُهُ دَعْوَاهُمْ : অর্থাৎ তাদের আহ্বান ও ডাক। مَنَاحِلُ শব্দটি مَنْحَلٌ-এর বহুবচন। অর্থ- কাঁচি, ফসল কাটার যন্ত্রবিশেষ। حَصِيْدًا শব্দটি মাসদার, مَحْصُوْدٌ অর্থে, কর্তিত ফসল। মাসদার যেহেতু একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এ কারণে حَصِيْدًا একবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ خَامِدِيْنَ : جَعَلْنَاهُمْ-এর هُمْ এর যমীর থেকে حَالٌ. حَصِيْدًا وَخَامِدِيْنَ উভয়টি মিলিতভাবে এক মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। অতএব এ প্রশ্ন আরোপিত হবে না যে, جَعَلَ শব্দ তিন মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয় না। অথচ এখানে তা হয়েছে। خَامِدِيْنَ এটা خَمَدَتِ النَّارُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ- অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে যাওয়া। এ থেকে خَمَدَتُ الْحُمّٰى নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ জ্বরের তীব্রতা কমে যাওয়া। আর خَمَدَتِ النَّارُ ঐ সময় বলা হয়, তখন আগুন একেবারে নিভে ছাই হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَاعِبِيْنَ : مَا خَلَقْنَا-এর মধ্যে নফী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لَاعِبِيْنَ শব্দটি। কেননা نَفِىْ যখন مُقَيَّدٌ-এর উপর প্রবিষ্ট হয় তখন قَيْدٌ-এর نَفِىْ উদ্দেশ্য হয়। কাজেই مَا خَلَقْنَا দ্বারা সৃষ্টির نَفِىْ উদ্দেশ্য নয়; বরং لَاعِبِيْنَ তথা অহেতুক সৃষ্টি -এর نَفِىْ করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا : এখানে لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا-এর জবাব। কায়দা আছে যে, تَالِىْ-এর نَقِيْض-এর مُقَدَّمٌ টি اِسْتِثْنَاءٌ-এর نَقِيْضٌ-এর نَتِيْجَةٌ বা ফলাফল দান করে। অতএব বাক্যটি এমন হবে-

لَوْ تَعَلَّقَتْ اِرَادَتُنَا بِاتِّخَاذِ اللَّهْوِ لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا لٰكِنَّا لَمْ نَتَّخِذْهُ فَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهٖ اِرَادَتُنَا.

قَوْلُهُ اِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ : اِنْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর جَوَابُ شَرْط লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ اَرَدْنَاهُ فَاعِلِيْنَ ব্যাখ্যাকার (র.) اِنْ দ্বারা نَقِيْضُ تَالِىْ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর فَلَمْ يُرِدْ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لٰكِنَّا لَمْ نَفْعَلْهُ শব্দ قَوْلُهُ اِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ-এর মধ্যে اِنْ نَافِيَةٌ-ও হতে পারে। অর্থাৎ مَا كُنَّا فَاعِلِيْنَ আবার شَرْطِيَّةٌ

قَوْلُهُ مِمَّا تَصِفُوْنَ : ব্যাখ্যাকার (র.) بِهٖ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِمَّا-এর مَا مَوْصُوْلَةٌ আর يَصِفُوْنَ বাক্য হয়ে তার صِلَةٌ এখানে عَائِدٌ লুপ্ত রয়েছে। আবার مَا مَصْدَرِيَّةٌ-ও হতে পারে। অর্থাৎ وَلَكُمْ وَيْلٌ مِنْ اَجَلِ

قَوْلُهُ وَصْفُكُمْ اِيَّاهُ بِمَا لَا يَلِيْقُ : مِمَّا تَصِفُوْنَ এটা اِسْتِقْرَاءٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ اِسْتَقَرَّ لَكُمْ الْوَيْلُ مِنْ اَجَلِ مَا يَتَّصِفُوْنَ اللّٰهَ بِهٖ مِمَّا لَا يَلِيْقُ بِعِزَّتِهٖ

قَوْلُهُ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ : এটা جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ. مُنْفِىْ তারা ক্লান্ত হয় না।

قَوْلُهُ لَا يَفْتُرُوْنَ (ن) : অর্থ- তারা অলসতা করে না। اِتَّخَذُوْا اٰلِهَةً كَائِنَةً مِنَ الْاَرْضِ ব্যাখ্যাকার (র.) كَائِنَةً مِنْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنَ الْاَرْضِ এটা كَائِنَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে اٰلِهَةٌ-এর صِفَتٌ হয়েছে। অথবা الْاَرْض-এর দ্বিতীয় মাফউলও হতে পারে। আবার مِنَ الْاَرْضِ টা اِتَّخَذُوْا-এর مُتَعَلِّقٌ-ও হতে পারে। اِتَّخَذُوْا

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا : لَوْ হলো হরফে শর্ত। আর كَانَ হলো تَامَّةٌ এটা শর্ত اٰلِهَةٌ হলো এর ফায়েল এবং فِيْهِمَا مُتَعَلِّقٌ হয়েছে كَانَ-এর সাথে। اِلَّا এখানে غَيْر অর্থে اٰلِهَةٌ-এর সিফত। এর اِعْرَابٌ পরবর্তীতে শব্দে প্রকাশ পেয়েছে। لَفَسَدَتَا হলো جَوَابُ شَرْط শর্তের ফে'লকে مُقَدَّمٌ এবং جَوَابُ شَرْط-কে تَالِىْ বলা হয়। تَالِىْ-এর نَقِيْض-এর مُقَدَّمٌ টা اِسْتِثْنَاءٌ-এর نَقِيْض-এর نَتِيْجَةٌ বা ফল দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, وَلٰكِنْ هُمَا لَمْ يُفْسِدَا فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ غَيْرُ اللّٰهِ.

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ : কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে ইয়ামনের হাযুরা ও কালাবা জনপদসমূহকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। তার নাম এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী মূসা ইবনে মীশা এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুয়াইব বলা হয়েছে। শুয়াইব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শুয়াইব (আ.) নন, অন্য কেউ। তাঁরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জনৈক কাফের বাদশাহ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন- ফিলিস্তীনে বনী ইসরাঈল বিপদগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কুরআন কোনো বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামেনের উপরিউক্ত জনপদও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে বহু জালেম সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি এবং এরপর তাদের স্থলে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি।
আলোচ্য আয়াতে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ অর্থাৎ যখন ঐ দুরাত্মা কাফেররা আল্লাহ তা'আলার আজাবের আভাস পায়, এমনকি আজাবকে স্বচক্ষে দেখতে পায় তখন আত্মরক্ষার নিমিত্তে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ : অর্থাৎ আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী আকাশ ও সমগ্র সৃষ্ট বস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফুরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না এবং বুঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেছি?

لَاعِبِيْنَ শব্দটি لَعْبٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। বিশুদ্ধ লক্ষ্যহীন কাজকে لَعْبٌ বলা হয়। -[রাগিব]
যে কাজের পেছনে কোনো শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لَهْوٌ বলা হয়। ইসলাম বিরোধীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তাওহীদকে অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তাওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জবাবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা ও অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যাবে সৃষ্টজগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্টকর্মে হাজারো রহস্য লুক্কায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাওহীদের নীরব সাক্ষী।

قَوْلُهُ لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا اِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ : অর্থাৎ আমি যদি ক্রীড়াচ্ছলে কোনো কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং এ কাজ আমাকে করতেই হতো, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দ্বারাই হতে পারত।

আরবি ভাষায় لَوْ শব্দটি অবান্তর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لَوْ শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা ঊর্ধ্বজগত ও অধঃজগতের সমস্ত আশ্চর্যজনক সৃষ্ট বস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্য এত বিরাট কাজ করা হয় না। এ কাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোনো কাজ কোনো ভালো বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য তো অনেক ঊর্ধ্বে।

لَهْوٌ শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কর্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই উপরিউক্ত তাফসীর করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, لَهْوٌ শব্দটি কোনো সময় স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দাবি খণ্ডন করা। তারা হযরত ঈসা ও উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হতো, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ : قَذْف শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يَدْمَغُ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زَاهِقٌ-এর অর্থ যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্টজগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ : অর্থাৎ আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে [অর্থাৎ ফেরেশতা] তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার ইবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার ইবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবত অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী ইবাদতের পথে দুটি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। এক. কারো ইবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থি মনে করা। তাই ইবাদতের কাছেই না যাওয়া। দুই. ইবাদত করার ইচ্ছা থাকা। কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীভানে ইবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণের ইবাদতে এ দুটি অন্তরায় নেই। তারা ইবাদতে অহংকারও করে না যে, ইবাদতকে পদমর্যাদার খেলাফ মনে করবে এবং ইবাদতে কোনো সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাতদিন তাসবীহ পাঠ করে এবং কোনো সময় অলসতা করে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস বলেন, আমি কা'বে আহবারকে প্রশ্ন করলাম, তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোনো কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তাসবীহ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার কোনো কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দুটি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোনো কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। -[কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ اَمِ اتَّخَذُوْآ اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ : এতে মুশরিকদের অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যথা- ১. তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য নির্ধারণ করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য নির্ধারণ করেছে। এটা তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও নগণ্য। ২. যাদেরকে উপাস্য নির্ধারণ করেছে, তারা কি তাদেরকে কোনো সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণ দান করতে দেখেছে। অথচ সৃষ্টজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরি।

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ : এটা তাওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লিখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই আল্লাহ থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সে নির্দেশ দেবে এবং একজন যা পছন্দ করবে অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন দুই আল্লাহর নির্দেশাবলি পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপে হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক আল্লাহ চাইবেন যে, এখন দিন হোক, অপর আল্লাহ চাইবেন এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবেন বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবেন বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও আল্লাহ থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় আল্লাহ পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেওয়া যায় যে, যদি উভয়ে পরামর্শের অধীনে হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরি হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়ে আল্লাহ হওয়া যায় না। সম্ভবত পরবর্তী لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোনো আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে আল্লাহ হতে পারে না। আল্লাহ তিনিই হবেন, যিনি কারো অধীন নন, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই। পরামর্শের অধীন দুই আল্লাহ থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করার ও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থি।

٢٤. اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ تَعَالٰى اَىْ سِوَاهُ اٰلِهَةً ط فِيْهِ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ج عَلٰى ذٰلِكَ وَلَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ اَىْ اُمَّتِىْ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ط مِنَ الْاُمَمِ وَهُوَ التَّوْرٰيةُ وَالْاِنْجِيْلُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ لَيْسَ فِىْ وَاحِدٍ مِنْهَا اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا مِمَّا قَالُوْا تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ اَىْ تَوْحِيْدَ اللّٰهِ فَهُمْ مُعْرِضُوْنَ ـ عَنِ النَّظَرِ الْمُوْصِلِ اِلَيْهِ ـ

٢٥. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا يُوْحٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ وَكَسْرِ الْحَاءِ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ـ اَىْ وَحِّدُوْنِىْ ـ

٢٦. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ سُبْحٰنَهٗ ط بَلْ هُمْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ لا عِنْدَهٗ وَالْعُبُوْدِيَّةُ تُنَافِى الْوِلَادَةَ ـ

٢٧. لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ لَا يَأْتُوْنَ بِقَوْلِهِمْ اِلَّا بَعْدَ قَوْلِهٖ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ـ اَىْ بَعْدَهٗ ـ

٢٨. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اَىْ مَا عَمِلُوْا وَمَا هُمْ عَامِلُوْنَ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى تَعَالٰى اَنْ يَّشْفَعَ لَهٗ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ تَعَالٰى مُشْفِقُوْنَ ـ اَىْ خَائِفُوْنَ ـ

অনুবাদ :

২৪. তাঁরা কি তাকে ব্যতীত বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? এখানে اِسْتِفْهَامُ তথা প্রশ্নটা ধমকিস্বরূপ। আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এ বিষয়ে। অথচ এ ব্যাপারে তারা অপারগ। এটাই আমার সঙ্গে যারা আছেন তাদের জন্য উপদেশ। অর্থাৎ আমার উম্মতের জন্য। আর উক্ত উপদেশ হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। বিভিন্ন উম্মত। তা হলো তাওরাত, ইঞ্জীল ও আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য কিতাব। এগুলোর কোনোটিতেই এ কথা নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে। যেমনটি তারা বলে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এর থেকে ঊর্ধ্বে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ একত্ববাদ সম্পর্কে জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার প্রতি সত্যে উপনীতকারী প্রমাণ থেকে।

২৫. আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি এবং তার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, অন্য কেরাতে يُوْحٰى শব্দটি প্রথমে نُوْن ও حَاءْ -এর নিচে যেরসহ نُوْحِىْ পঠিত রয়েছে। আমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর। অর্থাৎ আমার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।

২৬. তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। ফেরেশতাদের থেকে। তিনি পবিত্র মহান; বরং তারা তো সম্মানিত বান্দা। তাঁর নিকট। আর দাসত্ব জন্মদানের পরিপন্থি।

২৭. তারা আগে বেড়ে কথা বলে না। আল্লাহ তা'আলা কথা বলার পরেই তারা কথা বলে। তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। অর্থাৎ তাঁর নির্দেশের পরে।

২৮. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত অর্থাৎ তারা যা আমল করেছে এবং ভবিষ্যতে যা করবে। তারা তো কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করবে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। মহান আল্লাহ। যে, তাদের জন্য সুপারিশ করা হোক। আর তারা তাঁর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। অর্থাৎ শঙ্কিত।

অনুবাদ :

২৯. وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ اَىِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ وَهُوَ اِبْلِيْسُ دَعَا اِلٰى عِبَادَةِ نَفْسِهٖ وَاَمَرَ بِطَاعَتِهَا فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ كَمَا نَجْزِيْهِ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ - اَىِ الْمُشْرِكِيْنَ -

২৯. তাদের মধ্যে যে বলবে, আমি ইলাহ তিনি ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া। আর সে হলো ইবলিস। সে তার উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম। এভাবেই যেভাবে আমি তাকে প্রতিফল দিব জালেমদেরকেও প্রতিফল দিব। অর্থাৎ মুশরিকদেরকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ : اَمْ অব্যয়টি اِسْتِفْهَامْ تَوْبِيْخِىْ তথা হুমকিস্বরূপ জিজ্ঞাসার জন্য। এটা بَلْ অর্থে এবং এক বিষয়বস্তু থেকে অপর বিষয়বস্তুর প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য। অর্থাৎ একাধিক উপাস্যের অস্তিত্ব না থাকাকে প্রতিষ্ঠিত করার পরে একাধিক উপাস্য অবলম্বন করা ভ্রান্ত হওয়ার বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন।

قَوْلُهٗ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ : এখানে هٰذَا হলো মুবতাদা। এর দ্বারা আসমানি কিতাবসমূহ উদ্দেশ্য। এর দুটি খবর উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানি গ্রন্থ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ : এটা পূর্বের বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ قَالُوْا : এর ضَمِيْر فَاعِلِىْ আরবের কতিপয় দলের প্রতি ফিরেছে। যারা ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কন্যা হওয়ার প্রবক্তা ছিল। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো, খুজাআ, জোহাইনা, বনু সালামা ও বনু মালীহ গোত্র।

قَوْلُهٗ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ : ফেরেশতাদের এ উক্তি মূলত অনুমানমূলক বা মেনে নেওয়া স্বরূপ। অন্যথায় ফেরেশতাদের মধ্যে নাফরমানির কোনো যোগ্যতাই নেই। আর যদি يَقُلْ-এর فَاعِلْ ইবলীসকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে অসুবিধা সৃষ্টি হয় যে, প্রকৃতপক্ষে সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, ইবলীস কখনো উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি; বরং সে তো ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক উপাসনাকারী ছিল। তবে সে আল্লাহ তা'আলার করুণা থেকে নিরাশ হয়েছিল। وَاَمَرَ بِطَاعَتِهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা যেন তাঁর কথা না মানে এবং তাওহীদের বিশ্বাসী না হয়ে মূর্তিপূজা অবলম্বন করে। এটাই ছিল তার নিজের উপাসনা ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করা।

قَوْلُهٗ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ : এখানে ذٰلِكَ মুবতাদা হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর نَجْزِيْهِ হলো তার খবর। পূর্ণ বাক্যটি শর্তের জবাব হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَجْزُوْمٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ : এর এক অর্থ হলো– ذِكْرُ مَنْ مَعِىَ বলে কুরআন এবং ذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ বলে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কুরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিতাবে কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে? তাওরাত ও ইঞ্জীল পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কুরআন আমার সঙ্গীদের জন্যও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্য তা দাওয়াত ও বিধানাবলি ব্যাখ্যার দিক দিয়ে এই কুরআন উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্য এদিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজ কারবার ও কিসসা কাহিনী সংরক্ষিত আছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াতেও তাওহীদেরই বিবরণ রয়েছে এভাবে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদের যে আহ্বান জানিয়েছেন তা নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন তারা সকলেই তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। সকল নবী রাসূলের একই কথা, তা হলো নিরঙ্কুশ তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে– হে রাসূল! ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী প্রেরিত হয়েছে সকলের নিকট আমি এ প্রত্যাদেশ দিয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, অতএব তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর। যেমন অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ আর আমি প্রত্যেক উম্মতেই আমার রাসূল প্রেরণ করেছি, যারা মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা করেছে, তোমরা সকলে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী কর। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা. ১৭, পৃ. ৮]

قَوْلُهُ وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ الخ : শানে নুযূল : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে খাজাআ' গোত্রের লোকদের সম্পর্কে। তারা বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, শুধু খাজাআ গোত্রই নয়, বরং এতে রয়েছে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ। কেননা খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র মনে করতো। [নাউযুবিল্লাহ]। আর ইহুদিরা হযরত উজায়ের (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার পুত্র বলতো [নাউজুবিল্লাহ]। আর মুশরিকদের আকীদা ছিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা। [নাউজুবিল্লাহ]

আলোচ্য আয়াতে এসব বাতিল এবং ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

অর্থাৎ পাপীষ্ঠরা বলে "দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন"। তিনি পবিত্র, মহান তাঁর শান সন্তান-সন্ততি গ্রহণের দুর্বলতা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর সম্পর্কে এমন কথা ভাবাও মহা পাপ। বরং তারা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, তার অনুগত বান্দা, তাঁর গোলাম। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে مُكْرَمُوْنَ অর্থ مُقَرَّبُوْنَ عِنْدَهٗ تَعَالٰى অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যধন্য বান্দা।

قَوْلُهُ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহ তা'আলার সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোনো কথাও বলে না এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনো কোনো কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরো জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্য অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থি।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ : এখানে مَنْ দ্বারা যদি ফেরেশতাদের একক উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ তথা মেনে নেওয়ার প্রতি লক্ষ্য করে হবে তার বাস্তবায়ন জরুরি নয়। অর্থাৎ মেনে নেওয়া স্বরূপ যদি ফেরেশতারা এরূপ কথা বলে তাহলে আমি তাদেরকেও দোজখের সাজা দিব। তবে এখানে ইবলিস উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত ছিল। তবে এ সময় প্রশ্ন জাগে যে, ইবলিস তো কখনো মা'বূদ বা উপাস্য হওয়ার দাবি করেনি এবং তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানায়নি। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি যে, ইবলিস লোকদেরকে তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল, তা কিভাবে যথার্থ হয়?

এর উত্তর এই যে, এখানে তার নিজের ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার অনুসরণ ও কথা মানার প্রতি আহ্বান জানানো। এটাই শয়তানের ইবাদত বলে অবহিত হয়েছে। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতাকে বলেছিলেন يَاۤ اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ অর্থাৎ আব্বাজান! তুমি শয়তানের ইবাদত করো না। অথচ আজর শয়তানের ইবাদত করতো না; বরং শয়তানের কথা ও প্ররোচনায় মূর্তিপূজা করত। চিন্তাভাবনাহীন শয়তানের কথা মেনে নেওয়াকে তার ইবাদত বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٣٠. اَوَلَمْ بِوَاوٍ وَتَرْكِهَا يَرَ يَعْلَمِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا اَىْ سَدًّا بِمَعْنٰى مَسْدُوْدَةً فَفَتَقْنٰهُمَا ط اَىْ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَبْعًا وَالْاَرْضَ سَبْعًا اَوْ فَتْقُ السَّمَاءِ اَنْ كَانَتْ لَا تُمْطِرُ فَامْطَرَتْ وَفَتْقُ الْاَرْضِ اَنْ كَانَتْ لَا تُنْبِتُ فَاَنْبَتَتْ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ النَّابِعِ مِنَ الْاَرْضِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط نَبَاتٍ وَغَيْرِهٖ فَالْمَاءُ سَبَبٌ لِحَيٰوتِهٖ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ بِتَوْحِيْدِىْ ـ

৩০. اَوَلَمْ শব্দটি وَاوْ ছাড়া এবং وَاوْ-সহ উভয় কেরাত জায়েজ আছে। তারা কি ভেবে দেখে না? জানে না যারা কুফরি করে, যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল। ওতপ্রোতভাবে মিলিত ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীকে সাতটি এবং পৃথিবীকে সাতটি স্তর বানালাম। অথবা আকাশকে পৃথক করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা বৃষ্টিপাতহীন ছিল এখন তা বৃষ্টি বর্ষণকারী হয়েছে। আর পৃথিবীকে পৃথক করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আগে তা উৎপাদনহীন ছিল এখন তা উৎপাদনযোগ্য হয়েছে। আর পানি হতে সৃষ্টি করলাম আকাশ থেকে বর্ষিত হয় কিংবা মাটি থেকে উৎসারিত হয়। প্রাণবান সমস্ত কিছু তরুলতা উদ্ভিদ ইত্যাদি। অর্থাৎ পানিই হলো সকল বস্তুর জীবন ধারণের উৎস। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না। আমার একত্ববাদের উপর।

٣١. وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ جِبَالًا ثَوَابِتَ لِ اَنْ لَّا تَمِيْدَ تَتَحَرَّكَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا اَىِ الرَّوَاسِىَ فِجَاجًا مَسَالِكَ سُبُلًا بَدَلٌ اَىْ طُرُقًا نَافِذَةً وَاسِعَةً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ اِلٰى مَقَاصِدِهِمْ فِى الْاَسْفَارِ ـ

৩১. এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়। নড়াচড়া না করে। এখানে اَنْ لَّا تَمِيْدَ-এর পূর্বে একটি لِ উহ্য রয়েছে। এ ফে'লটি اَنْ-এর কারণে মাসদারের অর্থে হয়েছে। আমি করে দিয়েছি তাতে পাহাড়ে প্রশস্ত পথ গিরিপথ। سُبُلًا শব্দটি فِجَاجًا-এর بدل হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রশস্ত ও বিস্তৃত বিভিন্ন পথ। যাতে তারা পথ পায়। অর্থাৎ সফরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

٣٢. وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا لِلْاَرْضِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ مَحْفُوْظًا ج عَنِ الْوُقُوْعِ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ مُعْرِضُوْنَ ـ لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ خَالِقَهَا لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ

৩২. এবং আকাশকে করেছি ছাদ পৃথিবীর জন্য যেমন ঘরের জন্য ছাদ যা সুরক্ষিত পতিত হওয়া থেকে। কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলি হতে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এতে তারা চিন্তা গবেষণা করে না। ফলে তারা জানত যে, এর সৃষ্টিকর্তা তিনিই, যাঁর কোনো অংশীদার নেই।

অনুবাদ :

٣٣. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَتَابِعِهِ وَهُوَ النُّجُوْمُ فِىْ فَلَكٍ اَىْ مُسْتَدِيْرٍ كَالطَّاحُوْنَةِ فِى السَّمَاءِ يَّسْبَحُوْنَ - يَسِيْرُوْنَ بِسُرْعَةٍ كَالسَّابِحِ فِى الْمَاءِ وَلِلتَّشْبِيْهِ بِهِ اَتٰى بِضَمِيْرِ جَمْعِ مَنْ يَعْقِلُ -

৩৩. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই كُلٌّ -এর تَنْوِيْن টি হলো تَنْوِيْن عِوَضْ যা মুজাফ ইলাইহি -এর পরিবর্তে এসেছে। আর তা হলো পূর্বোক্ত اَلْقَمَرُ ـ اَلشَّمْسُ এবং তৎপরবর্তী তথা اَلنُّجُوْمُ নিজ নিজ কক্ষপথে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বৃত্তে বা চক্রে যাঁতার ন্যায় আকাশে বিচরণ করে দ্রুত বেগে পরিভ্রমণ করে। পানিতে সন্তরণের ন্যায়। সাতারুর সাথে তুলনা করার কারণেই يَسْبَحُوْنَ -কে وَاو যোগে বহুবচন আনা হয়েছে।

٣٤. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ اَنَّ مُحَمَّدًا سَيَمُوْتُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ط اَىْ اَلْبَقَاءَ فِى الدُّنْيَا اَفَاِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ - فِيْهَا ؟ لَا - فَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ -

৩৪. কাফেররা যখন বলল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ অচিরেই মৃত্যুবরণ করবেন। তখন অবতীর্ণ হলো– আমি আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। অর্থাৎ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী করিনি। আপনি মৃত্যুবরণ করলে তারা কি চিরজীবি হয়ে থাকবে পৃথিবীতে। না তারা চিরজীবি হয়ে থাকবে না। শেষ বাক্যটি তথা فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ বাক্যটি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ তথা অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসার পর্যায়ে।

٣٥. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط فِى الدُّنْيَا وَنَبْلُوْكُمْ نَخْتَبِرُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ كَفَقْرٍ وَغِنًى وَسَقَمٍ وَصِحَّةٍ فِتْنَةً ط مَفْعُوْلٌ لَهُ اَىْ لِنَنْظُرَ اَتَصْبِرُوْنَ وَتَشْكُرُوْنَ اَوْ لَا وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ -

৩৫. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে পৃথিবীত আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। যাচাই বাছাই করে থাকি। ভালো ও মন্দ দ্বারা যেমন দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা, অসুস্থতা, সুস্থতা। পরীক্ষা স্বরূপ فِتْنَةً শব্দটি نَبْلُوْ -এর مَفْعُوْل لَهُ অর্থাৎ এটা প্রত্যক্ষ করার জন্য যে, তোমরা কি ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, নাকি কর না। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে প্রতিফল দিবেন।

٣٦. وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ مَا يَتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا اَىْ مَهْزُوًّا بِهِ يَقُوْلُوْنَ اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ج اَىْ يَعِيْبُهَا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ لَهُمْ هُمْ تَاكِيْدٌ كٰفِرُوْنَ - بِهِ اِذْ قَالُوْا مَا نَعْرِفُهُ -

৩৬. কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে অর্থাৎ আপনাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানায় এবং তারা পরস্পর বলে এই কি সেই? যে তোমাদের দেব -দেবীগুলোর সমালোচনা করে। অর্থাৎ কটুক্তি করে। অথচ এরাই তো রহমানের আলোচনার বিরোধিতা করে। তারা বলে আমরা রহমানকে চিনি না।

অনুবাদ :

٣٧. وَنَزَلَ فِيْ اِسْتِعْجَالِهِمُ الْعَذَابَ - خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ط اَيْ اَنَّهُ لِكَثْرَةِ عَجَلِهِ فِيْ اَحْوَالِهِ كَاَنَّهُ خُلِقَ مِنْهُ سَاُرِيْكُمْ اٰيٰتِيْ مَوَاعِيْدِيْ بِالْعَذَابِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ - فِيْهِ فَاَرَاهُمُ الْقَتْلَ بِبَدْرٍ -

৩৭. তাদের দ্রুত শাস্তি বাস্তবায়ন কামনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়– মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ। অর্থাৎ মানুষ নিজেদের ব্যাপারে দ্রুততা পছন্দের কারণে যেন দ্রুততা দ্বারাই সৃজিত হয়েছে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব। আজাব প্রসঙ্গে আমার কৃত অঙ্গীকারাবলি। সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না। সে ব্যাপারে বস্তুত বদর ময়দানে তাদেরকে হত্যার শাস্তি দেখানো হয়েছে।

٣٨. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْقِيَامَةِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - فِيْهِ -

৩৮. তারা বলে, বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? কিয়ামত প্রসঙ্গে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এ ব্যাপারে।

٣٩. قَالَ تَعَالٰى لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ يَدْفَعُوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ - يُمْنَعُوْنَ مِنْهَا فِى الْقِيٰمَةِ وَجَوَابُ لَوْ مَا قَالُوْا ذٰلِكَ -

৩৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন– হায় যদি কাফেররা সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা প্রতিরোধ করতে বাধা দিতে পারবে না তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। কিয়ামতে তাদের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে না। এখানে لَوْ-এর জবাব হলো مَا قَالُوْا ذٰلِكَ

٤٠. بَلْ تَاْتِيْهِمُ الْقِيٰمَةُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ تُحَيِّرُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ - يُمْهَلُوْنَ لِتَوْبَةٍ اَوْ مَعْذِرَةٍ -

৪০. বস্তুত তা তাদের উপর আসবে। কিয়ামত অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে হতবিহ্বল করে ফেলবে। ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না। তাদেরক তওবা করার অথবা ওজর পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

٤١. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فِيْهِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَحَاقَ نَزَلَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ - وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيْقُ بِمَنْ اِسْتَهْزَأَ بِكَ -

৪১. আপনার পূর্বে ও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল। এতে রাসূল ﷺ -এর সান্ত্বনা রয়েছে। পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। অবতীর্ণ হয়েছিল। আর তা হলো শাস্তি। সুতরাং তাদেরকেও আজাব স্বরূপ বেষ্টন করে নিবে। যারা আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَ : এখানে হামযাটি বিলুপ্ত فِعْل -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে এবং وَاوْ -এর মাধ্যমে يَرَ -এর আতফ হয়েছে বিলুপ্ত ক্রিয়ার উপর। বাক্যটি এরূপ হবে- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا وَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

كَانَتَا হলো تَثْنِيَةٌ -এর সীগাহ। অথচ এর যমীরটি سَمٰوٰتٌ وَالْاَرْضُ -এর প্রতি ফিরেছে, আর এটা বহুবচন। সুতরাং مَرْجِعْ এবং ضَمِيْر -এর মধ্যে সামঞ্জস্য হলো না।

উত্তর. এখানে দুই শ্রেণি বা দুই জাতি উদ্দেশ্য। কেননা আসমান এক শ্রেণির বস্তু এবং পৃথিবী ভিন্ন শ্রেণির বস্তু। رُؤْيَتَهُ দ্বারা আত্মিক দর্শন উদ্দেশ্য। শব্দটি وَاوْ যোগে এবং وَاوْ বিহীন উভয়রূপে পঠিত আছে।

قَوْلُهُ رَتْقًا : এটা كَانَتَا -এর খবর। মাসদার হওয়ার কারণে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা মুবালাগা স্বরূপ এর প্রয়োগ বৈধ হতে পারে আবার মুযাফ উহ্য মেনেও প্রয়োগ বৈধ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ذَا رَتْقٍ اَىْ كَانَتَا شَيْئًا وَاحِدَةً ব্যাখ্যাকার (র.) بِمَعْنٰى مَسْدُوْدَةً উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাসদারটি এখানে مَفْعُوْل অর্থে। আর رَتْقًا (ن) এটা মাসদার। অর্থ- মুখ বন্ধ হওয়া, মিলিত হওয়া। এখানে মাসদারটি اِسْمُ مَفْعُوْل অথবা اِسْمُ فَاعِل অর্থে। فَتْقًا (ن - ض) অর্থ- বিদীর্ণ করা, বিচ্ছিন্ন করা, পৃথক করা।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : جَعَلَ ক্রিয়াটি যদি صَيَّرَ অর্থে হয় তাহলে এটা দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হবে এবং جَارْ مَجْرُوْرْ তার مُتَعَلِّقْ উহ্য نَاشِيًا অথবা مُتَسَبِّبًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে অগ্রগামী দ্বিতীয় مَفْعُوْل হবে। আর كُلَّ شَيْءٍ প্রথম مَفْعُوْل হবে। বাক্যটি এরূপ হবে- وَجَعَلْنَا نَاشِيًا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ আর যদি خَلَقَ অর্থে হয়, তাহলে مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل হবে। আর তা হলো- كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ আর مِنَ الْمَاءِ এটা جَارْ ও مَجْرُوْرْ মিলে مُتَعَلِّقْ হবে جَعَلْنَا -এর সাথে।

قَوْلُهُ رَوَاسِىَ : এটা رَاسِيَةً অথবা رَاسِىْ -এর বহুবচন। অর্থ দৃঢ় মজবুত। مُخْتَارْ গ্রন্থে আছে যে, কোনো অবস্থিত পাহাড়কে رَاسِيَةً বলা হয়। এটা رَسَا الشَّيْءُ থেকে গৃহীত। যখন বস্তুটি দৃঢ় ও মজবুত হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকার (র.) لَا উহ্য মেনেছেন এ কারণে, যাতে اَنْ تَمِيْدَ بِهَا -এর ইল্লত বা কারণ হওয়া শুদ্ধ হয়। কেননা পাহাড়ের সৃষ্টিই হলো নড়াচড়া না করার জন্য; নড়াচড়ার জন্য নয়। فِجَاجًا অর্থ- দুই পাহাড়ের মধ্যকার প্রশস্ত রাস্তা। فِجَاجٌ -এর একবচন হলো فَجٌّ যেমন سِهَامٌ -এর একবচন আসে سَهْمٌ

قَوْلُهُ وَلِلتَّشْبِيْهِ بِهِ اَتٰى بِضَمِيْرِ جَمْعِ مَنْ يَعْقِلُ : এ পূর্ণ বাক্যটি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন. يَسْبَحُوْنَ -এর فَاعِل হলো সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি। আর এসবগুলো নির্জীব বস্তু। কাজেই جَمْعُ مُؤَنَّثْ غَائِبْ -এর সীগাহ ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর নয়। কেননা ون বোধশক্তি সম্পন্ন শ্রেণির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর. যেহেতু شَمْس وَقَمَرْ তথা সূর্য-চন্দ্রের প্রতি يَسْبَحُوْنَ -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে, আর سَبَحَ অর্থ- সন্তরণ করা বা সাঁতার কাটা। অতএব, এটা বোধসম্পন্ন বস্তুর ক্রিয়া। এ সম্বন্ধের দরুন ون দ্বারা বহুবচন উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন. عَدَمُ الْخُلْدِ তথা চিরস্থায়ী না হওয়া অর্থ মানুষের সাথে সীমিত করা হয়েছে। অথচ অন্যান্য প্রাণী বিশ্বের কোনো বস্তুর জন্য দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হওয়ার কথা উল্লেখ নেই; বরং সবই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং মানুষের জন্য বিশেষিত করা হলো কেন?

উত্তর. তাদের প্রশ্ন ছিল মহানবী ﷺ -এর জন্য মানুষ হিসেবে মৃত্যুর সম্ভাবনার উপরে ভিত্তি করে।

قَوْلُهُ فَالْجُمْلَةُ الْاَخِيْرَةُ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ : এ বাক্য দ্বারাও একটি প্রশ্নের নিরসন করা হয়েছে।

প্রশ্ন. প্রশ্নবোধক হামযাটি فَاِنْ مِّتَّ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, যা মহানবী ﷺ-এর মৃত্যু এবং তার চিরস্থায়ী হওয়ারও অস্বীকার বুঝায়। অথচ এখানে কেবল চিরস্থায়ী হওয়াকেই অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

উত্তর. প্রশ্নবোধক হামযাটি মূলত শেষ বাক্যের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে, তবে এটা যেহেতু বাক্যের সূচনা কামনা করে, এ কারণেই তাকে বাক্যের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় বাক্যটি এমন ছিল- اَفَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ اِنْ مِتَّ

قَوْلُهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ : এখানে نَفْس দ্বারা نَفْس نَاطِقَةٌ তথা বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণী এবং مَوْت দ্বারা জীবনশক্তি তিরোহিত হওয়া এবং দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়া উদ্দেশ্য এবং ذَائِقَةٌ দ্বারা এখানে اِدْرَاكٌ بِالْقُوَّةِ الذَّائِقَةِ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণযোগ্য বস্তুর অন্তর্গত নয়; বরং এখানে স্বাভাবিক উপলব্ধি উদ্দেশ্য। আর উপলব্ধি করার দ্বারাও মৃত্যুর প্রাথমিক পরিস্থিতিসমূহ যেমন- কষ্ট-যাতনা ইত্যাদি অনুভব করা উদ্দেশ্য। কেননা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ শরীরে মৃত্যুর প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে সম্ভব নয়, আর তখন মানুষ মরে যায়। কাজেই তখন উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না।

قَوْلُهُ فِتْنَةً : এটা مَنْصُوْب হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে- ১. نَبْلُوكُمْ -এর مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে। ২. حَالْ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ نَبْلُوكُمْ فَاتِنِيْنَ ৩. ভিন্ন শব্দ দ্বারা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে। কেননা نَبْلُوْ -এর সাথে مَصْدَرٌ এবং فِتْنَةٌ উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এ বাক্যের আতফ হলো পূর্বের وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى -এর উপর এবং এটি শর্ত আর اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ হলো এর جَزَاءٌ ; جَزَا -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য রয়েছে। اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا হলো شَرْط ও جَزَاءٌ -এর মধ্যে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ আর هُزُوًا মাসদারটি مَفْعُوْل অর্থে।

قَوْلُهُ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُوْنَ : এর প্রথম هُمْ মুবতাদা। আর দ্বিতীয়টি তার তাকীদস্বরূপ। كَافِرُوْنَ হলো খবর। بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ এটা সংশ্লিষ্ট হয়েছে كَافِرُوْنَ -এর সাথে। বাক্যটি এরূপ ছিল- هُمْ كَافِرُوْنَ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ الخ এটা حَالِيَةٌ বাক্য হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَنْصُوْب ; ব্যাখ্যাকার (র.) لَهُمْ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, ذِكْرٌ ইজাফত رَحْمَتٌ -এর প্রতি। এটা اِضَافَتُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفَاعِلِ -এর অন্তর্গত। কেউ কেউ مَفْعُوْل -এর প্রতি ইজাফত বলেছেন। তখন বাক্য হবে وَذِكْرُهُمُ الرَّحْمٰنَ بِالتَّوْحِيْدِ

قَوْلُهُ خُلِقَ مِنْ عَجَلٍ : এটা خَلَقَ مِنْ طِيْنٍ বাক্যের ন্যায়। প্রত্যেক মানুষ যেহেতু সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক কাজে তাড়াহুড়া করে, তাই বলা হয়েছে তাড়াহুড়ার উপাদান থেকেই যেন মানুষ সৃজিত।

قَوْلُهُ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ : এখানে لَوْ হলো শর্তজ্ঞাপক। এর জবাব লুপ্ত রয়েছে। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ لَوْ يَعْلَمُ مَا قَالُوْا ذٰلِكَ (اَيْ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ)

قَوْلُهُ حِيْنَ يَعْلَمُ : এটা মাফউলেবিহী। অর্থ- এ কাফেররা যদি ঐ সময়কে জেনে নেয় যে, যখন তারা এ শাস্তিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না।

قَوْلُهُ مَا كَانُوْا بِهٖ : এটা خَاقَ -এর فَاعِلْ আর هُوَ الْعَذَابُ -এর মধ্যকার هُوَ -এর مَرْجِعْ হলো مَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের একত্ববাদের এবং তার সর্বময় ক্ষমতার কয়েকটি দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ الخ - শানে নুযূল : ইবনুল মুনজির ইবনে জুরায়েজের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত করানো হয়, তখন প্রিয়নবী ﷺ আরজ করেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার পরে আমার উম্মতের দিকে কে লক্ষ্য রাখবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ

অর্থাৎ "হে রাসূল! আপনার পূর্বে কোনো মানুষকেই আমি অনন্ত জীবন দান করিনি।" সৃষ্টি মাত্রেরই লয় আছে। ইতিপূর্বে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন সকলকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا - শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম সুদ্দী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ জেহেল এবং আবূ সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে কোথাও গমন করছিলেন। আবূ জেহেল তাঁকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসলো এবং আবূ সুফিয়ানকে বলল, ইনি হলেন বনী আবদে মানাফের নবী। আবূ জেহেলের এ বিদ্রূপাত্মক কথা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ান রাগান্বিত হলো এবং বলল, বনী আবদে মানাফে নবী হওয়া তোমার এত অপছন্দ কেন? হুজুর ﷺ এ কথাগুলো শ্রবণ করলেন এবং আবূ জেহেলকে সাবধান করে দিয়ে ইরশাদ করলেন, "মনে হয় তুমি সে পর্যন্ত বিরত হবে না, যে পর্যন্ত তোমার উপর দিয়ে সেই বিপদ আপতিত না হয় যা তোমার পিতৃব্যের উপর আপতিত হয়েছিল। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا : এখানে رُؤْيَتٌ [দেখা] অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্ক কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

قَوْلُهُ اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا : رَتْق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং فَتْق -এর অর্থ খুলে দেওয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি رَتْق ও فَتْق কোনো কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার পূর্ণ ক্ষমতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আয়াতের তরজমা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী বন্ধ ছিল। আমি এদেরকে খুলে দিয়েছি। এখানে 'বন্ধ হওয়া ও খুলে দেওয়ার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম ও সাধারণ তাফসীরবিদগণ যে উক্তি গ্রহণ করেছেন তা হলো– বন্ধ হওয়ার অর্থ আকাশের বৃষ্টি ও মাটির ফসল বন্ধ হওয়া এবং খুলে দেওয়ার অর্থ হলো এতদুভয়কে খুলে দেওয়া।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বললেন, এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে দেবে। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পৌছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَتْقًا বলে কি বুঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করতো না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হতো না। আল্লাহ তা'আলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তাফসীর নিয়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাফসীর শুনে বললেন, এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কুরআনের বুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কুরআনের বিশেষ রুচিজ্ঞান দান করেছেন। তিনি رَتْق ও فَتْق -এর নির্ভুল তাফসীর করেছেন।

রূহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই রেওয়ায়েতটি ইবনে মুনজির, আবূ নু'আঈম ও একদল হাদীসবিদের বরাত দিয়ে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে মুস্তাদরাক প্রণেতা হাকিমও আছেন। হাকিম এই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলেছেন।

ইবনে আতিয়া আউফী এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন, এই তাফসীরটি চমৎকার, সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সঙ্গতিশীল। এতে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষা ও প্রমাণ রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত এবং পূর্ণ শক্তির প্রকাশও রয়েছে, যা তত্ত্বজ্ঞান ও তাওহীদের ভিত্তি। পরবর্তী আয়াতে যে وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ বলা হয়েছে এর সাথে উপরিউক্ত তাফসীরের দিক দিয়েই মিল আছে। বাহরে মুহীতেও এই তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। কুরতুবী একে ইকরিমার উক্তিও সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, অপর একটি আয়াত থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ; ইমাম তাবারী (র.)-ও এই তাফসীর গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী সৃজনে পানির অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়ালা নয়; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও জীবন প্রমাণিত আছে। বলা বাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিসীম।

ইবনে কাছীর (র.) ইমাম আহমদ (র.)-এর সনদ দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলাম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তুর সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন! জবাবে তিনি বললেন, "প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে" এরপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, "আমাকে এমন কাজ বলে দিন যা করে আমি জান্নাতে পৌঁছে যাই। তিনি বললেন– اَفْشِ السَّلَامَ وَاَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصِلِ الْاَرْحَامَ وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ অর্থাৎ ব্যাপক হারে সালাম কর। [যদিও প্রতিপক্ষ অপরিচিত হয়] আহার করাও [হাদীসে একেও ব্যাপক রাখা হয়েছে। কাফের ফাসেক প্রত্যেককে আহার করালেও ছওয়াব পাওয়া যাবে।] আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ। রাত্রে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে, তখন তুমি তাহাজ্জুদের নামাজ পড়। এরূপ করলে তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ : আরবি ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে مَيْد বলা হয়। আয়াতের এই অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হতো। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি? এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তাফসীরে কাবীর প্রভৃতি গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে সূরা নামলের তাফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) ও এ সম্পর্কে জরুরি আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ : প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে فَلَكٌ বলা হয়। এ কারণেই সুতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে فَلْكَةُ الْمِغْزَلِ বলা হয়। –[রূহুল মা'আনী]

এবং এ কারণেই আকাশকে فَلَكٌ বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বুঝানো হয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নিচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরো জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছে। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে কাফের ও মুশরিকদের বিভিন্ন দাবি খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আ.) অথবা হযরত উজায়ের (আ.) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোনো জবাব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণত দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্রুত মৃত্যু কামনা করত। যেমন কোনো কোনো আয়াতে আছে نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ [আমরা তার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি।] আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অনর্থক কামনার দুটি জবাব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রাসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তার ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রাসূল নয়, রাসূল হলে মৃত্যু হতো না। তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুয়ত স্বীকার কর, তারা কি মৃত্যুবরণ করেননি? তাদের মৃত্যুর কারণে যখন তাদের নবুয়তের ও রিসালাতের কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধ অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তার শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারো মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে– اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست * کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست

অর্থাৎ শত্রু মারা গেলে খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা আমাদের জীবনও অমর নয়।

মৃত্যু কি? এরপর বলা হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نَفْس বলে পৃথিবীর জীব বুঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের মৃত্যু হবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন, ফেরেশতা এবং জান্নাতের হুর ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত। -[রূহুল মা'আনী]

আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল প্রাণবিশিষ্ট সুক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যিম (র.) আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা স্বাদ আস্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি এবং আনন্দ প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা মৃত্যুর যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। কারণ কোনো বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্য ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়। এই অর্থের দিক দিয়েই কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা সংসারের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদকেও প্রিয় প্রতিপন্ন করেছেন। বলা হয়েছে- از محبت تلخها شیرین شوند অর্থাৎ ভালোবাসার কারণে তিক্তও মিষ্ট হয়ে যায়।

সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ হচ্ছে পরীক্ষাস্বরূপ : وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থাৎ আমি মন্দ ও ভালো উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় যেমন অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভালো বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা-নিরাপত্তা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্য সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবর করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শুকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুজুর্গগণ বলেন, বিপদাপদে সবর করার তুলনায় বিলাসব্যাসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকা অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন- بُلِيْنَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا وَبُلِيْنَا بِالسَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ অর্থাৎ আমরা যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবর করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম তখন সবর করতে পারলাম না। অর্থাৎ এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয় : خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ : عَجَلٍ শব্দের অর্থ ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا অর্থাৎ মানুষ অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ। হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈল থেকে অগ্রবর্তী হয়ে তূর পর্বতে পৌঁছে যান, তখন সেখানেও এই ত্বরাপ্রবণতার কারণে তার প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের সম্পর্কে ভালো কাজে অগ্রগামী থাকাকে প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটা ত্বরাপ্রবণতা নয়। কারণ এটা সময়ের পূর্বে কোনো কাজ করা নয়, বরং এ হচ্ছে যথাসময়ে অধিক পুণ্যকাজ করার চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জার যেসব দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে ত্বরাপ্রবণতা। স্বভাবগত ও মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণত কারো স্বভাব ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে লোকটি ক্রোধ দ্বারা সৃজিত হয়েছে।

قَوْلُهُ سَاُورِيْكُمْ اٰيَاتِيْ : এখানে اٰيَاتٌ [নিদর্শনাবলি] বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মুজেযা ও অবস্থা বুঝানো হয়েছে। -[কুরতুবী]

যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নিদর্শনাবলি স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা হতো।

অনুবাদ :

٤٢. قُلْ لَهُمْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ يَحْفَظُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ط مِنْ عَذَابِهٖ اَنْ نَزَلَ بِكُمْ اَىْ لَا اَحَدَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ وَالْمُخَاطَبُوْنَ لَا يَخَافُوْنَ عَذَابَ اللّٰهِ لِاِنْكَارِهِمْ لَهٗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ اَيِ الْقُرْاٰنِ مُّعْرِضُوْنَ . لَا يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْهِ .

৪২. আপনি বলুন তাদেরকে তোমাদেরকে কে রক্ষা করবে হেফাজত করবে রহমত হতে রাত্রিতে ও দিবসে তাঁর শাস্তি হতে, যদি তোমাদের উপর তা আপতিত হয়। অর্থাৎ, এরূপ করার মতো [রক্ষা করার মতো] কেউ নেই। আর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করত না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার তারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাই করত না।

٤٣. اَمْ فِيْهَا مَعْنَى الْهَمْزَةِ الْاِنْكَارِىْ اَىْ اَلَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِمَّا يَسُؤُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ط اَىْ اَلَهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ غَيْرُنَا لَا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَيِ الْاٰلِهَةُ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ فَلَا يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَا هُمْ اَيِ الْكُفَّارُ مِنَّا مِنْ عَذَابِنَا يُصْحَبُوْنَ . يُجَارُوْنَ يُقَالُ صَحِبَكَ اللّٰهُ اَىْ حَفِظَكَ وَاَجَارَكَ .

৪৩. اَمْ শব্দটিতে অস্বীকারসূচক হামযার অর্থ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ, তবে কি তাদের এমন কোনো দেব-দেবীও রয়েছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে যা তাদের ক্ষতি করে তা থেকে আমাকে ব্যতীত অর্থাৎ তাদের কি এমন কেউ রয়েছে যে, তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে আমি ছাড়া? না কেউ নেই। এরা তো পারবে না দেবতাগণ নিজেরদেরকেই সাহায্য করতে কাজেই তারা তাদেরকে কোনো সাহায্য করবে না আর না তাদেরকে কাফেরদেরকে আমার থেকে আমার শাস্তি থেকে আশ্রয় দেওয়া হবে রক্ষা করা হবে। বলা হয় صَحِبَكَ اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন এবং তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

٤٤. بَلْ مَتَّعْنَا هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ بِمَا اَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ط فَاغْتَرُّوْا بِذٰلِكَ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَقْصِدُ اَرْضَهُمْ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ط بِالْفَتْحِ عَلَى النَّبِىِّ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ . لَا بَلِ النَّبِىُّ وَاَصْحَابُهٗ .

৪৪. বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম তার মাধ্যমে তাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছিলাম। অধিকন্তু তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ। ফলে তারা প্রবঞ্চনার স্বীকার হয়। তারা কি দেখছে না যে, আমি আনছি পৃথিবীকে তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সঙ্কুচিত করে রাসূল ﷺ -এর বিজয়ের মাধ্যমে তবুও কি তারা বিজয়ী হবে না, বরং নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণই বিজয়ী হবেন।

অনুবাদ :

٤٥. قُلْ لَهُمْ إِنَّمَآ أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ز مِنَ اللّٰهِ لَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِيْ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ إِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ مَا يُنْذَرُوْنَ . اَيْ هُمْ لِتَرْكِهِمُ الْعَمَلَ بِمَا سَمِعُوْهُ مِنَ الْإِنْذَارِ كَالصُّمِّ .

৪৫. আপনি বলুন তাদেরকে আমি তো কেবল তোমাদেরকে ওহী দ্বারাই সতর্ক করি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নিজের থেকে নয়। কিন্তু যারা বধির তারা তখন সতর্ক বাণী শোনে না যখন এখানে উভয় হামযা ঠিক রেখে অথবা হামযাটি تَخْفِيْف আকারে হামযা ও يَاء এর মাঝামাঝি ভাবে পাঠ করা যায়। তাদেরকে সতর্ক করা হয় অর্থাৎ, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয় তার উপর আমল বর্জনের কারণে তারা বধীরের ন্যায়।

٤٦. وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ وَقْعَةٌ خَفِيْفَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَآ هَلَاكُنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ . بِالْإِشْرَاكِ وَتَكْذِيْبِ مُحَمَّدٍ .

৪৬. যদি তাদেরকে স্পর্শ করে সামান্য বাতাস হালকা লেশ আপনার প্রতিপালকের শাস্তির তবে তারা নিশ্চয় বলে উঠবে- হায়! يَا সতর্কীকরণের জন্য। আমাদের দুর্ভোগ আমাদের ধ্বংস আমারা তো ছিলাম জালিম। আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে।

٤٧. وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ ذَوَاتَ الْعَدْلِ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَيْ فِيْهِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط مِنْ نَقْصِ حَسَنَةٍ أَوْ زِيَادَةِ سَيِّئَةٍ وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ زِنَةَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ط اَيْ بِمَوْزُوْنِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ . مُحْصِيْنَ كُلَّ شَيْءٍ .

৪৭. এবং আমি স্থাপন করব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সঠিক তুলাদণ্ড। কিয়ামত দিবসের জন্য অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে। সুতরাং কারো প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না পুণ্য হ্রাস কিংবা পাপ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা যদিও তা হয় আমল সরিষা দানা পরিমাণ ওজনের তবুও আমি তা উপস্থিত করব অর্থাৎ পরিমাপযোগ্য বস্তুকে। আর হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। প্রতিটি বস্তু পরিবেষ্টন করার ক্ষেত্রে।

٤٨. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ اَيِ التَّوْرٰيةَ الْفَارِقَةَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَضِيَآءً بِهَا وَّذِكْرًا اَيْ عِظَةً بِهَا لِّلْمُتَّقِيْنَ لا .

৪৮. আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম ফুরকান অর্থাৎ, তাওরাত যা সত্য মিথ্যা এবং হালাল হারামের মাঝে পার্থক্যকারী ছিল। এবং জ্যোতি এর দ্বারা এবং উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

অনুবাদ :

৪৯. اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ عَنِ النَّاسِ اَىْ فِى الْخَلَاءِ عَنْهُمْ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ اَىْ اَهْوَالِهَا مُشْفِقُوْنَ اَىْ خَائِفُوْنَ -

৪৯. যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে লোকদের থেকে অর্থাৎ, অপরাপর মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। আর তারা কিয়ামত সম্পর্কে অর্থাৎ তার ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত অর্থাৎ, শঙ্কিত।

৫০. وَهٰذَا اَىِ الْقُرْاٰنُ ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ط اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ - اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّوْبِيْخِ -

৫০. এটা অর্থাৎ, কুরআন কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে? এখানে জিজ্ঞাসাটি অস্বীকারমূলক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَكْلَؤُكُمْ : এটা বাবে (س ـ ف) হতে মুযারে' -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। মাসদার كَلَأً كَلَاً وَكَلَاءَةً, অর্থ- হেফাজত করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা। اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا এখানে مِنْ دُوْنِنَا হলো اٰلِهَةٌ -এর সিফত, বাক্যে অগ্রপশ্চাৎ ঘটেছে। মূলত বাক্যটি ছিল- اٰلِهَةٌ مِنْ دُوْنِنَا تَمْنَعُهُمْ

قَوْلُهٗ مِمَّا يَسُوْءُهُمْ : তাদের কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ থেকে। (س) لَا يُصْحَبُوْنَ তাদের সঙ্গ দেওয়া হবে না, তাদেরকে রক্ষা করা হবে না।

قَوْلُهٗ اَلْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ : مَوَازِيْنُ শব্দটি বহুবচন, বড়ত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যথায় তুলাদণ্ড বা মিজান একটি হবে অথবা مَا يُوْزَنُ তথা ওজনযোগ্য বস্তুসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। অর্থাৎ, আমল যেহেতু বহু এবং তার বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণি রয়েছে। এর কারণ হলো এটা মাসদার। আর মাসদার একবচন ও বহুবচনের উপর সমভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাখ্যাকার (র.) لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ -এর ব্যাখ্যা فِيْهِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে ل অব্যয়টি فِىْ অর্থে।

قَوْلُهٗ شَيْئًا : এটা হয়ত দ্বিতীয় مَفْعُوْل অথবা تُظْلَمُ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ -এর সিফত। অর্থাৎ لَا تُظْلَمُ ظُلْمًا شَيْئًا

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ : এর পরে اَلْعَمَلُ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, كَانَ قِصَّةً -এর যমীর হলো كَانَ -এর اِسْم আর তা হলো عَمَلْ আর مِثْقَالْ হলো খবর, নাফে (র.) مِثْقَالْ -কে مَرْفُوْع পড়েছেন। এ সময় كَانَ تَامَّةْ হবে।

قَوْلُهٗ بِالْغَيْبِ : এটা يَخْشَوْنَ -এর ضَمِيْر থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ, يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ غَائِبِيْنَ عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ, যখন তারা নির্জনে থাকে তখনও আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। مِنَ السَّاعَةِ এর পরে اَهْوَالِهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُضَافْ লুপ্ত রয়েছে। আর কিয়ামত থেকে ভয় করার উদ্দেশ্য হলো তার ভয়াবহতা সম্পর্কে ভীত হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ الخ - পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আখিরাতে যখন তাদের চতুর্দিকে দোজখের অগ্নি থাকবে তখন তারা সেই কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- শুধু আখেরাতে নয়, যদি দুনিয়াতেও আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, দিনে বা রাতে যদি তাদের উপর আজাব আপতিত হয় তবে কে তাদেরকে রক্ষা করবে? তাই ইরশাদ হয়েছে- قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ

অর্থাৎ, হে রাসূল! যারা আপনাকে বিদ্রূপ করে বা পবিত্র কুরআনকে বিদ্রূপ করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, যদি দয়াময় আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন তবে কে সেই শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি রহমান তোমাদেরকে আজাব দেওয়ার ইচ্ছা করেন তবে তাঁর আক্রোশ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তোমাদের দেব-দবীরা কি এ পর্যায়ে কোনো প্রকার উপকার করতে পারবে? কখনও নয়; বরং রহমান রহীম আল্লাহ পাকই তাঁর অনন্ত অসীম রহমতের কারণে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। অথচ কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করে না। তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের নিয়ামত নিয়ে মত্ত রয়েছেন, আর যখন তাদের প্রতি তাঁর আজাব আসবে তখন তিনি ব্যতীত কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ عَذَابِهَا الخ – পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল ! আপনি জানিয়ে দিন যে আমার নিকট আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যে ওহী আসে তার আলোকেই তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু মক্কার কাফেররা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন। যে, হে রাসূল! এরা প্রকৃতপক্ষে বধির, তাই তারা আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন যে, হে রাসূল! যদি আপনার প্রতিপালকের আজাবের বিন্দুমাত্র তাপ তাদেরকে সম্পর্শ করে তবে তাদের বধিরতা, অবচেতনতা, গাফলত ও অবহেলা সবই দূরীভূত হয়ে যাবে তখন তারা কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হবে। তাদের বন্ধ চোখ-কান খুলে যাবে। তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা হতভাগ্য, নিশ্চয় আমরা জালেম, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আল্লাহ পাকের সাথে অন্যকে শরিক করে আমরা সীমালঙ্ঘন করেছি। আমরা আল্লাহকে ভয় করিনি তাই আমাদের পরিণাম এত ভয়াবহ হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের نَفْحَةٌ শব্দটির তরজমা করেছেন 'একপার্শ্ব'। আর কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো– 'সামান্য'। ইবনে জুবায়েজ বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো– একাংশ।

আয়াতের মর্মকথা : ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাফেররা বলতো, আমাদেরকে আজাবের ব্যাপারে যে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে তা এখনই আসে না কেন? তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! পূর্ণ আজাব তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; যদি তারা সামান্যতম আজাব স্পর্শ করে তবে তাদের বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হবে, তাদের হুঁশ বহাল হয়ে যাবে এবং তাদের সকাল গাফলত, অবচেতনা এবং অহংকার সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে বলবে 'আমরা ছিলাম অপরাধী।'

قَوْلُهُ وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ - কিয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা : مَوَازِيْنُ শব্দটি مِيْزَانٌ-এর বহুবচন। অর্থ– ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে। কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, আদম (আ.) থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যেসব সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قِسْطٌ শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়বিচার। অর্থাৎ এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ওজন করবে, সাম্যন্যও বেশ কম হবে না। মুস্তাদরাকে হযরত সালমান (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্য এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

হাফেয আবুল কাসেম লালকায়ীর হাদীসগ্রন্থে হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দাঁড়িপাল্লায় একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন এবং প্রত্যেক মানুষকে সেখানে উপস্থিত করা হবে। যদি সৎ কাজের পাল্লা ভারি হয়, তবে ফেরেশতা ঘোষণা করবেন, অমুক ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে! সে আর কোনো দিন ব্যর্থ হবে না। হাশরের মাঠে উপস্থিত সবাই এই ঘোষণা শুনবে। পক্ষান্তরে অসৎ কাজের পাল্লা ভারি হলে ফেরেশতা ঘোষণা করবে, অমুক ব্যক্তি ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়েছে। সে আর কেনোদিন কামিয়াব হবে না। উপরিউক্ত হাফেজ হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, দাঁড়িপাল্লায় নিয়োজিত এই ফেরেশতা আর কেউ নন, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)।

হাকিম, বায়হাকী ও আজেরী (র.) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিয়ামতের দিনও কি আপনি আপনার পরিবারবর্গকে স্মরণ রাখবেন? তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন তিন জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। যথা- ১. যখন আমল ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লার সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন শুভ অশুভ ফলাফল না জানা পর্যন্ত কারো কথা কারো স্মরণে আসবে না। ২. যখন আমলনামাসমূহ উড্ডীন করা হবে, তখন আমলনামা ডান হাতে আসে না বাম হাত আসে এ কথা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারো কথাই কারো মনে থাকবে না। ডান হাতে আমলনামা এলে মুক্তির লক্ষণ এবং বাম হাতে এলে আজাবের লক্ষণ হবে। ৩. ফুলসিরাতে উঠার পর তা সম্পূর্ণ অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا : অর্থাৎ, হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভালো-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাবও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমল কিরূপে ওজন করা হবে? হাদীসে বেতাকাহ -এর ইঙ্গিত অনুযায়ী ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা ওজন করা হতে পারে। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভবপর যে, আমলগুলোকেই স্বতন্ত্র পদার্থের আকৃতি দান করে সেগুলোকে ওজন করা হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত সাধারণত এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় এবং আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমতও তাই। কুরআনের وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا প্রভৃতি আয়াত এবং অনেক হাদীস এটাই সমর্থন করে।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ : তিরমিযী হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে বসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালিগালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁদের নাফরমানি, কারচুপি এবং ঔদ্ধত্য ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালিগালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তোমার শাস্তি ও তাদের অপরাধ সমান সমান হলে ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমার শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে তা তোমার অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি অপরের তুলনায় তা বেশি হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ ও প্রতিদান গ্রহণ করা হবে। লোকটি এ কথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করনি- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ লোকটি আরজ করল, এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত প্রথমে তাওহীদ ও রিসালতের বর্ণনা ছিল। এরপর যারা নবুয়ত ও আখিরাতকে অস্বীকার করে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে তাদের শাস্তির কথা ছিল। আলোচ্য আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়ের সমর্থনে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনাবলির বিবরণ স্থান পেয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ

মানুষকে তার পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করার লক্ষ্যে এবং এ জীবনকে সরল সঠিকভাবে যাপনের পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যেভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাব হয়েছে, ঠিক এভাবে আল্লাহ পাক ইতিপূর্বেও যুগে যুগে মানুষের কল্যাণের জন্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে আল্লাহ পাক তাওরাতের ন্যায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ দান করেছেন, যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে ছিল পার্থক্যকারী; জীবন সমস্যার সমাধানে, গোমরাহীর অন্ধকারে আলো পরিবেশনে এবং উপদেশ ও নসিহত বিতরণে তাওরাতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে তাওরাতের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. اَلْفُرْقَانُ হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।

২. ضِيَاءً গোমরাহীর অন্ধকারে যাদের মন আচ্ছন্ন, তাদের জন্যে ছিল তাওরাত আলো পরিবেশনকারী।

৩. ذِكْرٌ উপদেশ, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা মোত্তাকী পরহেজগার, যারা পরিণামদর্শী, তাদের জন্যে তাওরাত হলো উপদেশ। হযরত মূসা (আ.) তাওরাতের আলোকে মানুষকে উপদেশ দিতেন। অবশ্য এ নসিহত তারাই লাভ করতে পারতো যারা আল্লাহ পাককে ভয় করতো। তাই ইরশাদ হয়েছে– اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ অর্থাৎ "যারা না দেখে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং যারা কিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত সন্ত্রস্ত"।

যাদের অন্তরে আখিরাতের ভয়, পরকালের চিন্তা, পরিণামের আশঙ্কা থাকে, তাদের জন্যে এ নসিহত উপকারী হয়। যারা পরহেজগার নয়, তারা আল্লাহকে ভয় করে না, আখিরাতের চিন্তাও করে না, তাই তারা নসিহত গ্রহণ করে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ : পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য : এ কুরআন হলো অত্যন্ত বরকতময়, বিস্ময়কর, অদ্বিতীয়, মহান, জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ, তাওরাত ও অন্যান্য সমস্ত আসমানি গ্রন্থের সারগর্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি আমিই নাজিল করেছি, আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি।" মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের পথনির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এ মহান গ্রন্থে। এর বরকত সীমাহীন, এর ভাষা প্রাঞ্জল, এর বক্তব্য সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। এ কিতাব হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে রচনা করেননি; বরং আমিই তা তাঁর নিকট নাজিল করেছি।

قَوْلُهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ : اَنْتُمْ শব্দ দ্বারা মক্কাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এতবড় উপকারী আলোকময়, বরকতময় মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাওয়ার পরও তোমরা তা অস্বীকার কর? তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না? অবশ্য এর দ্বারা তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে, যারা কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী।

٥١. وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ اَىْ هُدَاهُ قَبْلَ بُلُوْغِهٖ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ . اَىْ بِاَنَّهٗ اَهْلٌ لِذٰلِكَ .

٥٢. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذَا التَّمَاثِيْلُ الْاَصْنَامُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ . اَىْ عَلٰى عِبَادَتِهَا مُقِيْمُوْنَ .

٥٣. قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ فَاقْتَدَيْنَا بِهِمْ .

٥٤. قَالَ لَهُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ لِعِبَادَتِهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ . بَيِّنٍ .

٥٥. قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ فِىْ قَوْلِكَ هٰذَا اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ . فِيْهِ .

٥٦. قَالَ بَلْ رَّبُّكُمُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ رَبُّ مَالِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ خَلَقَهُنَّ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمُ الَّذِىْ قُلْتُهٗ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ بِهٖ .

٥٧. وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ .

٥٨. فَجَعَلَهُمْ بَعْدَ ذَهَابِهِمْ اِلٰى مُجْتَمَعِهِمْ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ لَهُمْ جُذٰذًا بِضَمِّ الْجِيْمِ وَكَسْرِهَا فُتَاتًا بِفَاسٍ اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ عَلَّقَ الْفَاسَ فِىْ عُنُقِهٖ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ اَىِ الْكَبِيْرِ يَرْجِعُوْنَ . فَيَرَوْنَ مَا فَعَلَ بِغَيْرِهٖ .

অনুবাদ :

৫১. আমি তো এরপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তিনি তাকে হেদায়েত দিয়েছিলেন। এবং আমি তাঁর সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ, তিনি এর উপযুক্ত।

৫২. যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলো কি? প্রতিমাগুলো যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছে। অর্থাৎ, যাদের উপাসনার উপর তোমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

৫৩. তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এদের পূঁজা করতে দেখেছি। ফলে আমরা তাদের অনুকরণ করেছি।

৫৪. তিনি বললেন, তাদেরকে তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ রয়েছে প্রতিমা ভক্তির/ উপাসনার কারণে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে প্রকাশ্য।

৫৫. তারা বলল, আপনি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছেন আপনার এই কথায় না আপনি কৌতুক করছেন এ বিষয়ে।

৫৬. তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিপালক তো যিনি ইবাদতের যোগ্যও উপযুক্ত প্রতিপালক অধিপতি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এদের সৃষ্টিপূর্ব কোনো নমুনা ছাড়াই। এবং এই বিষয়ে আমি যা আমি বলছি অন্যতম সাক্ষী।

৫৭. শপথ আল্লাহর ! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।

৫৮. অতঃপর তিনি মূর্তিগুলো করেছিলেন তাদের ঈদের দিন তাদের মেলায়, যাওয়ার পর চূর্ণ-বিচূর্ণ جُذٰذًا শব্দটির جِيْم বর্ণের পেশ ও যের উভয়টিই হতে পারে, অর্থাৎ, কুড়াল দ্বারা টুকরো টুকরো করে ফেললেন, তাদের প্রধানটি ব্যতীত কুড়ালকে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন। যাতে তারা তার দিকে বড়টির দিকে ফিরে আসে অতঃপর তারা দেখবে যে, সে অন্য মূর্তিগুলোর সাথে কি আচরণ করেছে?

٥٩. قَالُوْا بَعْدَ رُجُوْعِهِمْ وَرُؤْيَتِهِمْ مَا فَعَلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ فِيْهِ ـ

٦٠. قَالُوْا اَىْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ اَىْ يَعِيْبُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ط

٦١. قَالُوْا فَأْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ اَىْ ظَاهِرًا لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ـ عَلَيْهِ اَنَّهُ الْفَاعِلُ ـ

٦٢. قَالُوْا لَهٗ بَعْدَ اِتْيَانِهٖ ءَاَنْتَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرَاهِيْمُ ط ـ

٦٣. قَالَ سَاكِتًا عَنْ فِعْلِهٖ بَلْ فَعَلَهٗ ق كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ عَنْ فَاعِلِهٖ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ـ فِيْهِ تَقْدِيْمُ جَوَابِ الشَّرْطِ وَفِيْمَا قَبْلَهٗ تَعْرِيْضٌ لَهُمْ بِاَنَّ الصَّنَمَ الْمَعْلُوْمَ عِجْزُهٗ عَنِ الْفِعْلِ لَا يَكُوْنُ اِلٰهًا ـ

٦٤. فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالتَّفَكُّرِ فَقَالُوْٓا لِاَنْفُسِهِمْ اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ـ اَىْ بِعِبَادَتِكُمْ مَنْ لَا يَنْطِقُ ـ

অনুবাদ :

৫৯. তারা বলল তাদের ফিরে আসার পর এবং সে যা করেছে তা দেখার পর আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি কে এরূপ করল? সে নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী এ ব্যাপারে।

৬০. তারা বলল অর্থাৎ, তারা একে অপরকে বলল এক যুবককে তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি অর্থাৎ তিনি তাদের দোষ বলেন। তাকে বলা হয় ইবরাহীম।

৬১. তাকে উপস্থিত কর জনসম্মুখে অর্থাৎ প্রকাশ্যে যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে তার বিপক্ষে যে. তিনিই এটা করেছেন।

৬২. তারা বলল তাঁকে উপস্থিত করার পর তুমিই কি এখানে ءَاَنْتَ এর দুটি হামযাকে নিজ অবস্থায় রেখে অথবা দ্বিতীয় হামযাকে আলিফদ্বারা পরিবর্তন করে এবং تَسْهِيْل তথা লঘুস্বরে এবং تَسْهِيْل কৃত বা লঘুকৃত ও দ্বিতীয়টির মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে এবং আলিফ বৃদ্ধি ছাড়াই পাঠ করা যায়। আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করেছ? হে ইবরাহীম!

৬৩. তিনি বললেন, নিজ কর্মের ব্যাপারে চুপ থেকে বরং এদের প্রধান, সেই তো এটা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞাসা কর তার কর্তার ব্যাপারে যদি এরা কথা বলতে পারে। এ বাক্যে شرط -এর জবাবকে অগ্রগামী করা হয়েছে। পূর্বে মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মূর্তি, যার কর্মের অক্ষমতা সকলেরই জানা, সে কখনো উপাস্য হতে পারে না।

৬৪. তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরল চিন্তার মাধ্যমে অর্থাৎ তারা মনে মনে চিন্তা করল। এরপর বলল, নিজেদেরকে তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী অর্থাৎ তাদের উপাসনার মাধ্যমে যারা কথা বলতে পারে না।

অনুবাদ :

٦٥. ثُمَّ نُكِسُوْا مِنَ اللّٰهِ عَلٰى رُؤُسِهِمْ ج اَىْ رُدُّوْا اِلٰى كُفْرِهِمْ وَقَالُوْا وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاۤءِ يَنْطِقُوْنَ ـ اَىْ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا بِسُؤَالِهِمْ ـ

৬৫. অতঃপর অবনত হয়ে গেল আল্লাহ থেকে তাদের মস্তক অর্থাৎ তারা নিজেদের কুফরির প্রতি ফিরে গেল এবং বলল, আল্লাহর কসম! তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না। অর্থাৎ, তবে কিভাবে তুমি আমাদেরকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বল।

٦٦. قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ بَدْلَهٗ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا مِنْ رِزْقٍ وَغَيْرِهٖ وَّلَا يَضُرُّكُمْ ـ شَيْئًا اِنْ لَمْ تَعْبُدُوْهُ ـ

৬৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না জীবনোপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে এবং ক্ষতিও করতে পারে না কোনোরূপ, যদি তোমরা তার উপাসনা না কর।

٦٧. اُفٍّ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا بِمَعْنٰى مَصْدَرٍ اَىْ تَبًّا وَقُبْحًا لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ـ اَىْ هٰذِهِ الْاَصْنَامُ لَا تَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَلَا تَصْلُحُ لَهَا وَاِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

৬৭. ধিক اُفٍّ শব্দটি فَا বর্ণে যের ও যবর উভয়টিই বৈধ। মাসদার অর্থে। অর্থ– ধ্বংস ও আক্ষেপ, নিকৃষ্টতা তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ, তিনি ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না? অর্থাৎ, এই মূর্তিগুলো উপাসনার অধিকারী নয় এবং তার যোগ্যও নয়। ইবাদতের একমাত্র অধিকারী ও যোগ্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ : এখানে وَاوْ টি قَسَمِيَّة অর্থাৎ وَعِزَّتِنَا وَجَلَالِنَا اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ অর্থে। رُشْد অর্থ শুভবোধ, সচেতনতা, হেদায়েত, সুকৌশল। مِنْ قَبْلُ এখানে مُضَاف اِلَيْه লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ– قَبْلَ بُلُوْغِهٖ ছিল। قَبْلَهٗ -এর ضَمِيْر দ্বারা হযরত মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ ﷺ ও উদ্দেশ্যে হতে পারে। اَلتَّمَاثِيْلُ এটা تِمْثَالٌ -এর বহুবচন। পাথর বা অন্য কোনো ধাতব মূর্তি। عَاكِفُوْنَ শব্দটি عَاكِفٌ -এর বহুবচন, অর্থ– কর্মচারী, ই'তেকাফকারী, প্রতিবেশী।

قَوْلُهٗ لَهَا عَاكِفُوْنَ : এর صِلَه আসে عَلٰى ; কিন্তু এখানে لِ এসেছে। ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, لِ টি عَلٰى অর্থে। আর যদি এটা عَابِدٌ এর অর্থ বিশিষ্ট হয় তখন لِ আসা বৈধ হবে। এভাবে যদি تَعْدِيَة -এর পরিবর্তে اِخْتِصَاص এর জন্য গণ্য করা হয়, তখনও لِ আসা বৈধ হবে। যেমন قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَائَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ -এর মধ্যে عَابِدِيْنَ -এর صِلَة স্বরূপ لِ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَجَعَلَهُمْ : এর মধ্যে هُمْ যমীরটি اَلْعُقُوْلُ ذُوْ مُذَكَّرٌ -এর জন্য মুশরিকদের ধারণা অনুপাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ جُذَاذًا : এটা মাসদার হওয়ার কারণে বহুবচন ব্যবহৃত হয়নি। কেউ কেউ এটাকে جُذَاذَةٌ -এর বহুবচন বলেছেন। যেমন– زُجَاجٌ শব্দটি زُجَاجَةٌ -এর বহুবচন। কেউ কেউ جُذَاذٌ মাসদারকে مَجْذُوْذٌ তথা مَفْعُوْلٌ অর্থে বলেছেন।

قَوْلُهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا : এর مَنْ হলো مُبْتَدَأ আর فَعَلَ هٰذَا হলো এর খবর এবং إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ হলো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ; আবার এটাও হতে পারে যে, مَنْ مَوْصُوْلَة তার صِلَة এর সাথে মিলে مُبْتَدَأ আর إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُ : سَمِعْنَا যেহেতু এমন বিষয়ের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে যা শোনা যায় না। আর তা হলো فَتًى তথা যুবক। কেননা মানুষ দর্শনীয় বস্তু, শ্রবণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে سَمِعَ দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হবে। অতএব, فَتًى হলো প্রথম مَفْعُوْل আর يَذْكُرُ হলো বাক্য হয়ে দ্বিতীয় مَفْعُوْل আর سَمِعَ যদি শ্রবণযোগ্য বস্তুর উপর প্রবিষ্ট হয় তখন সেটি এক مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়। যেমন سَمِعْتُ كَلَامَ زَيْدٍ

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ : এটা فَتًى -এর দ্বিতীয় সিফত। إِبْرَاهِيْمُ শব্দটি مَرْفُوْع হওয়ার কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন- ১. يُقَالُ -এর نَائِب فَاعِلْ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ أَىْ يُسَمّٰى لَهُ إِبْرَاهِيْمُ এ সময় إِبْرَاهِيْمُ দ্বারা উক্ত শব্দ উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তি নয়। ২. إِبْرَاهِيْمُ শব্দটি উহ্য মুবতাদা এর খবর। অর্থাৎ يُقَالُ لَهُ هٰذَا إِبْرَاهِيْمُ অথবা إِبْرَاهِيْمُ শব্দটি মুবতাদা হবে। আর তার খবরটি লুপ্ত হবে। অর্থাৎ, يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ فَاعِلُ ذٰلِكَ

قَوْلُهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا : এখানে هٰذَا হলো كَبِيْرُهُمْ থেকে بَدَلْ কিংবা صِفَتْ

قَوْلُهُ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ : জুমহুরের কেরাত মতে نُكِسُوْا শব্দটি مَجْهُوْل -এর সীগাহ। অর্থাৎ, তাদের মাথার খুলি উল্টে দেয়া হলো। আর এটা করেছিলেন আল্লাহ তা'আলা। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাষণ দ্বারা মূর্তিদের অক্ষমতা এবং অসহায়ত্ব পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। ফলে তারা সত্য ধর্মের প্রতি রুজু করার উপক্রম ছিল। কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। ফলে তারা কুফরির দিকে ধাবিত হলো। ব্যাখ্যাকার (র.) مِنَ اللّٰهِ বৃদ্ধি করে এ কেরাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অপর বিরল এক কেরাতে نَكَّسُوْا -এর ن বর্ণ যবর এবং ك তাশদীদ সহ مَعْرُوْف রূপে পঠিত হয়েছে। এ সময় এর فَاعِلْ হবে মুশরিকরা। উদ্দেশ্য এই হবে যে, মুশরিকরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দলিল প্রমাণ ও যুক্তপূর্ণ ভাষণ শুনে লজ্জা ও অনুতাপে মাথা নিচু করে ফেলল। কিন্তু সামান্য কিছু পরে তারা কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

قَوْلُهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَقَدْ عَلِمْتَ হলো উহ্য শপথের জবাব।

قَوْلُهُ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : এর মধ্যকার ف হলো عَاطِفَة -এর مَعْطُوْف عَلَيْهِ উহ্য রয়েছে। হামযাটি তার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। বাক্যটি এমন হবে। أَجَهِلْتُمْ فَلَا تَعْقِلُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ إِبْرَاهِيْمَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারূন (আ.)-এর বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সমগ্র আরব জাহানে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর শৈশব থেকেই তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। শিরক ও মূর্তি পূজাকে তিনি ঘৃণা করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন, 'খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধু' এবং বিশেষ মর্যদাসম্পন্ন নবী রাসূলগণের অন্যতম। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ إِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ

'আর নিশ্চয় আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সুপথের জ্ঞান দান করেছিলাম'।

অর্থাৎ, হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর পূর্বে অথবা মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বে ইবরাহীম (আ.)-কে যথাযোগ্য মর্যাদা, সুপথ, হেদায়েত এবং জ্ঞান দান করেছিলাম।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের رُشْد শব্দটির অর্থ হলো তাওহীদে বিশ্বাস অর্জন এবং শিরক ও মূর্তিপূজা বর্জন। আয়াতের অর্থ হলো, আমি যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ওহী অবতরণ করেছি এবং তাকে মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছি, এটি কোনো নতুন ঘটনা বা নতুন কথা নয়; কেননা ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লামা সয়ূতী (র.) ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হোমাইদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেমের সূত্র উল্লেখ করে তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) এর কথার উদ্ধিতি দিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো– فِيْ صِغَرِهٖ অর্থাৎ, আমি ইব্রাহীমকে তাঁর বাল্যকালেই হেদায়েত দান করেছি। অথবা এর অর্থ হলো, নবী মনোনীত করার পূর্বেই আমি ইবরাহীমকে হেদায়েত দান করেছি।

قَوْلُهٗ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভাষায় তাঁর সম্প্রদায়ের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তারা ঐ মূর্তিগুলোর সম্মান করতো এবং রাত দিন সেগুলোর পূজা করতো। যে মূর্তিগুলো তাদের কোনো উপকার করতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, এতদসত্ত্বেও তোমরা কোন যুক্তিতে এ প্রাণহীন জড় পদার্থের সম্মুখে মাথা নত কর? তারা জবাব দিল– وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এগুলোর পূজা করতে দেখেছি'।

অর্থাৎ, এদের পূজা করার কোনো যৌক্তিকতা বা এর পক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ না থাকলেও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা এ কাজ করতে দেখেছি। তাই আমরা তাদের অনুসরণেই আমাদের নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে সম্মান দিচ্ছি। এটি কোনো যুক্তি বুদ্ধির কাজ নয়; বরং যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যা করেছে আমরাও তাই করছি।

قَوْلُهٗ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ : আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের কাছে اِنِّيْ سَقِيْمٌ [আমি অসুস্থ] এর ওজর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধান রত হলো যে, কাজটি কে করল? যদি হযরত ইবরাহীম (আা.)-এর উপরিউক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিতে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই এ কাজ করেছেন। এর জবাব হিসেবে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোনো শক্তি ছিল না, একথা ভেবেই সম্ভবত তার কথার দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং ভুলেও যায়। –[বয়ানুল কোরআন]

এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তাফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরিউক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু' এজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবারাহ করে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কথিত উপাস্য তথা মূর্তিগুলো সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি কথার উল্লেখ রয়েছে। তিনি আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিলেন, আমি এগুলোর একটি ব্যবস্থা করবো তথা এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলবো। আলোচ্য আয়াত মুশরিকদের দেব-দেবী মূর্তিগুলোর ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কার্যক্রমের বিবরণ রয়েছে।

جُذٰذًا শব্দটি جُذٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ– খণ্ড। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ অর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চেয়ে বড় ছিল, না হয় আকার আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

قَوْلُهٗ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ : اِلَيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে।

১. এই সর্বনাম দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ,)-কে বোঝানো হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে? এরপর হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজায় যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কলবী (র.) বলেন, সর্বনাম দ্বারা كَبِيْرُ [প্রধান মূর্তি]-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হলো? সে যখন কোনো উত্তর দেবে না, তখন তার অক্ষমতা ও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

قَوْلُهُ قَالَ ال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি মিথ্যা নয়, রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করল, তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাব দিলেন, না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজে করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য তাফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল। অর্থাৎ, তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়া পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না : যেমন কুরআনে আছে- اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ অর্থাৎ রহমান তথা আল্লাহর কোনো সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন উত্তর বাহরে মুহীত , কুরতুবী, রূহুল আ'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اِسْنَاد مَجَازِيْ তথা রূপক ভঙ্গিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। কেননা এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ.)-কে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোনো বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ। হযরত ইবরাহীম (আ.) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই এ কাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবি ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি- اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ [অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।] এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরিক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরিকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরিকানা নিজেদের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হতো, তাহলে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় উপকারিতা এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে একথা বুঝা যাবে যে, যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ

মোটকথা , কোনরূপ দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনোরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ : প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ হাদীসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْذِبْ غَيْرَ ثَلَاثٍ : অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) তিন জায়গা ব্যতীত কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। –[বুখারী, মুসলিম]

অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহর জন্য বলা হয়েছে। একটি بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওজর পেশ করে إِنِّىْ سَقِيْمٌ [আমি অসুস্থ] বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাজতের জন্য বলা হয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হযরত সারাহ্সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোনো ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোনো কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগ্নি স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহ্কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞেস করল : এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন, সে আমার ভগ্নি। [এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা] কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহকে গ্রেফতার করা হলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সারাহকেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ ইসলামি সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নি। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। হযরত ইবরাহীম (আ.) জালিমের মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহকে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহর দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। [এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ]। এই হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাওরিয়া'। এর অর্থ হলো দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বুঝা ও বক্তার নিয়ত অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগ্নি বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগ্নি বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামি সম্পর্কে দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগ্নি। বলা বাহুল্য, এটাই তাওরিয়া। এই তাওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের 'তাকায়্যুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তাওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে। যেমন– ইসলামি সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগ্নি হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তাওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। إِنِّىْ سَقِيْمٌ বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা سَقِيْمٌ [অসুস্থ] শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ, চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই 'আমি অসুস্থ' বলেছিলেন; কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহর জন্য ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোনো গুনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গুনাহের কাজ আল্লাহর জন্য করার কোনো অর্থই হতে পারে না। গুনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আ.)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা : মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বে ও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চেয়ে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কুরআন পরিপন্থি। এরপর তারা এ থেকে এটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কুরআনের পরিপন্থি হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা যায়! বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কুরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কুরআন বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তাওরিয়া বুঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তাওরিয়া বুঝাতে গিয়ে كَذَبَاتٌ [মিথ্যা] শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো? এ কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আ.)-এর ভুলকে عَصٰى ও غَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা যায় না। কুরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গাম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ প্রার্থনা করবে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্র হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গাম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গাম্বর তাঁর কোনো ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) হাদীসে বর্ণিত ঐ তাওরিয়া ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওজর পেশ করবেন। এই ত্রুটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে كَذَبَاتٌ তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এরূপ করার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েজ হবে না। সূরা তোয়া-হায় হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহরে মুহীতের বরাত দিয়েই পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন অথবা হাদীসে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কুরআন তেলাওয়াতে, কুরআন শিক্ষা অথবা হাদীসে রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোনো পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা : হাদীসে ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্য ছিল। কিন্তু হযরত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তাফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) থেকে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সৎ কর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল; কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরমের হেফাজত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فِى اللّٰهِ [আল্লাহর মধ্যে] এবং لِلّٰهِ [আল্লাহর জন্য] এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ [খাঁটি ইবাদত আল্লাহর জন্যই] স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারো হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরিউক্ত তালিকায় গণ্য করা হতো। কিন্তু পয়গাম্বরদের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থি মনে করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ : যারা মুজেযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলি অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোনো বস্তুর সত্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোনো সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না– দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোনো বস্তুর সত্তার জন্য কোনো গুণ অপরিহার্য নয়; বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরি। পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরি; কিন্তু এই জরুরি অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ– এটা যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত তখন আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো বিশেষ রহস্যের কারণে কোনো অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোনো যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন, অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে। তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহ তা'আলা যেসব মুজেযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بَرْدًا [শীতল] শব্দের আগে وَسَلَامًا [নিরাপদ] শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। হযরত নূহ (আ.)-এর সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে– أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

قَوْلُهُ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ করে কাফের-মুশরিকরা লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। তাদের উপাস্য বা দেবতারা তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না দেখে তারাও লা-জবাব হয়ে গেল। এই সুযোগে হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবানের লক্ষ্যে যা বলেছিলেন তা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ

"হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করছো যারা তোমাদের ভালো-মন্দ কিছুই করতে পারে না"।

অর্থাৎ, একথা জানার পর যে তোমাদের উপাস্যরা কোনো কথা বলতে পারে না, তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, এমনকি আত্মরক্ষা করতে পারে না, যে তাদেরকে ধ্বংস করলো তার বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে না এবং সে অপরাধীর সন্ধানও দিতে পারে না; এরপরও তোমরা কোন যুক্তিতে তাদের উপসনা কর? ধিক! তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের বাতিল উপাস্যদের প্রতি। তোমরা এসব অসহায় জড় পদার্থের উপাসনা করে নিজেদেরকে অপমানিত করছ এবং আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হচ্ছো।

তবুও কি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি কর না যে এসব জড় পদার্থ আদৌ মানুষের ইবাদতের যোগ্য নয়, মানবজাতির ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই, আর কেউ নয়।

আলোচ্য আয়াতের أُفٍّ শব্দটি কোনো বিষয়ের উপর ঘৃণা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো বস্তুকে ছোট করার নিমিত্তে অথবা কোনো দুর্গন্ধ উপলব্ধি করলেও এই শব্দটি বিরক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন একবার হযরত রাসূলে কারীম ﷺ দুর্গন্ধ উপলব্ধি করে أُفٍّ বলেছেন এবং তাঁর নাক মোবারকে কাপড় ব্যবহার করেছেন। সত্য উদ্ভাসিত হওয়ার পর তথা প্রতীমা-পূজার বাতুলতা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও যেহেতু তারা এই অন্যায় ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল, তাই এই পর্যায়ে নিন্দা প্রকাশার্থে أُفٍّ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যখন তারা তাদের অন্যায় আচরণের পক্ষে কোনো যুক্তি বা দলিল প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হলো এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যুক্তি প্রমাণে হেরে গেল, তখন তারা শক্তি প্রয়োগের পথ বেছে নিল; যা সাধারণত মূর্খ লোকেরা করে থাকে। তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিদগ্ধ করে শেষ করার ইচ্ছা করলো।

অনুবাদ :

٦٨. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ اَىْ اِبْرَاهِيْمَ وَانْصُرُوْآ اٰلِهَتَكُمْ اَىْ بِتَحْرِيْقِهٖ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ـ نُصْرَتَهَا فَجَمَعُوْا لَهُ الْحَطَبَ الْكَثِيْرَ وَاَضْرَمُوا النَّارَ فِىْ جَمِيْعِهٖ وَاَوْثَقُوْا اِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلُوْهُ فِىْ مِنْجَنِيْقٍ وَرَمُوْهُ فِى النَّارِ ـ

৬৮. তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে দাও অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এবং তোমাদের দেবতাগুলোকে সাহায্য কর অর্থাৎ তাকে পুড়িয়ে হত্যা করার মাধ্যমে। যদি তোমরা কিছু করতে চাও। দেবতাদের সাহায্য করতে চাও। তাকে পোড়ানোর জন্য তারা প্রচুর জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করল এবং সবগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে রশি দিয়ে বেঁধে মিনজানীক তথা নিক্ষেপযন্ত্রে রেখে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল।

٦٩. قَالَ تَعَالٰى قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ لا فَلَمْ تَحْرِقْ مِنْهُ غَيْرَ وِثَاقِهٖ وَذَهَبَتْ حَرَارَتُهَا وَبَقِيَتْ اِضَاءَتُهَا وَبِقَوْلِهٖ سَلٰمًا سَلِمَ مِنَ الْمَوْتِ بِبَرْدِهَا ـ

৬৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। সে আগুন তার রশি ছাড়া আর কিছুই পোড়ায়নি। তার দাহনশক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর তার ঔজ্জ্বল্যতা অবশিষ্ট থেকে গেল। আর তার উক্তি سَلٰمًا শান্তিদায়ক এর কারণে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কারণে মৃত্যুর হাত থেকে তিনি নিরাপদ থাকলেন।

٧٠. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا وَهُوَ التَّحْرِيْقُ فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ـ فِىْ مُرَادِهِمْ ـ

৭০. তারা তাঁর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল আর তা হলো জ্বালিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরিবর্তে।

٧١. وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا ابْنَ اَخِيْهِ هَارَانَ مِنَ الْعِرَاقِ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ـ بِكَثْرَةِ الْاَنْهَارِ وَالْاَشْجَارِ وَهِىَ الشَّامُ نَزَلَ اِبْرَاهِيْمُ بِفِلِسْطِيْنَ وَلُوْطٌ بِالْمُؤْتَفِكَةِ وَبَيْنَهُمَا يَوْمٌ ـ

৭১. আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম। হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাতিজা ছিলেন, হারানের পুত্র। ইরাক থেকে সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য। নদ-নদী ও বৃক্ষরাজির প্রাচুর্যতার মাধ্যমে। সে দেশ হলো শাম বা সিরিয়া। হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্তীনে অবতরণ করেন, আর হযরত লূত (আ.) মু'তাফিকাতে অবতরণ করেন। তাদের উভয়ের মাঝে একদিনের পথের দূরত্ব ছিল।

٧٢. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ لِاِبْرَاهِيْمَ وَكَانَ سَاَلَ وَلَدًا كَمَا ذُكِرَ فِى الصّٰفّٰتِ اِسْحٰقَ ط وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ط اَىْ زِيَادَةً عَلَى الْمَسْئُوْلِ اَوْ هُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَكُلًّا اَىْ هُوَ وَوَلَدَاهُ جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ـ اَنْبِيَاءَ ـ

৭২. আমি তাকে দান করে ছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। যেমনটা সূরা আস সাফফাতে উল্লেখ রয়েছে। ইসহাক এবং আরো অতিরিক্ত ইয়াকুব অর্থাৎ, প্রার্থনার চেয়ে অধিক অথবা ইয়াকুব ও তার প্রপৌত্র। এবং প্রত্যেককেই অর্থাৎ তিনি ও তাঁর পুত্রদ্বয়কে করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ, নবী বানিয়েছিলাম।

অনুবাদ :

٧٣. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِىْ بِهِمْ فِى الْخَيْرِ يَهْدُوْنَ النَّاسَ بِاَمْرِنَا اِلٰى دِيْنِنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج اَىْ اَنْ تَفْعَلَ وَتُقَامَ وَتُؤْتٰى مِنْهُمْ وَمِنْ اَتْبَاعِهِمْ وَحُذِفَ هَاءُ اِقَامَةٍ تَخْفِيْفًا وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ .

৭৩. এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা اَئِمَّةً-এর উভয় হামযা ঠিক রেখে অথবা দ্বিতীয় হামযাকে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করা যায়। তা এভাবে যে, সৎকর্মে তারা অনুকরণীয় হবে। তাঁরা পথ প্রদর্শন করতেন মানুষকে আমার নির্দেশ অনুসারে আমার ধর্মের প্রতি। আমি তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, নামাজ কায়েম করতে এবং জাকাত প্রদান করতে অর্থাৎ তারা ও তাদের অনুসারীরা যেন সৎকর্ম করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে ও জাকাত প্রদান করে। এখানে اِقَامَ-এর ة কে সহজীকরণার্থে বিলুপ্ত করা হয়েছে। তারা আমারই ইবাদত করতো।

٧٤. وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا فَصْلًا بَيْنَ الْخُصُوْمِ وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ اَىْ اَهْلُهَا الْاَعْمَالَ الْخَبٰۤئِثَ ط مِنَ اللِّوَاطَةِ وَالرَّمْىِ بِالْبُنْدُقَةِ وَاللَّعْبِ بِالطُّيُوْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ مَصْدَرُ سَاءَهُ نَقِيْضُ سَرَّهُ فٰسِقِيْنَ .

৭৪. এবং আমি হযরত লূত (আ.)-কে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা বাদী বিবাদীর মামলা নিরসন প্রজ্ঞা। জ্ঞান, এবং আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যে, অর্থাৎ যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে। পুংমৈথুন, পথচারীদেরকে পাথর বর্ষণ, পাখপাখালী নিয়ে খেল-তামাশা ইত্যাদি। তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায় سَوْءٍ শব্দটি سَاءَ-এর মাসদার এটা سَرَّهُ-এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। সত্যত্যাগী।

٧٥. وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا بِاَنْ اَنْجَيْنَا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

৭৫. এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম এভাবে যে, তাকে তার সম্প্রদায় হতে নিষ্কৃতি দিয়েছি। তিনি ছিলেন সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ نُصْرَتَهَا : এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَاعِلِيْنَ-এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। اِنْ كُنْتُمْ এটা হলো شَرْط এটা جَزَاء-এর মুখাপেক্ষী নয়। কারণ পূর্বে তার উল্লেখ রয়েছে। كُوْنِىْ بَرْدًا اَىْ ذَاتَ بَرْدٍ অর্থাৎ, শীতলতা বিশিষ্ট। سَلَامًا হলো উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْل مُطْلَقٌ অর্থাৎ, سَلِّمْنَا سَلَامًا আর سَلَامًا-এর পূর্বেও مُضَاف উহ্য থাকতে পারে। অর্থাৎ– بَرْدًا وَّسَلَامًا - ذَاتَ سَلَامٍ-এর মধ্যে مُضَافٌ-কে বিলোপ করে مُضَاف اِلَيْهِ-কে তার স্থলে রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْعِرَاقِ : এটা লুপ্ত فِعْل-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। نَافِلَةً শব্দটি عَافِيَةً-এর ছন্দে مَصْدَر ; এটা يَعْقُوْب থেকে حَال আর وَهَبْنَا فِعْل-এর ভিন্ন শব্দে مَفْعُوْل مُطْلَقٌ-ও হতে পারে। اَئِمَّةً এ দ্বিতীয় হামযার মধ্যে জমহুরের মতে

تَسْهِيْل বৈধ। যদিও إِبْدَالْ তথা পরিবর্তন করে পড়াও বৈধ। ব্যাখ্যাকার (র.) أَنْ تَفْعَلَ ইত্যাদি দ্বারা فِعْلَ الْخَيْرَاتِ-এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল তারকীব হলো– أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَاتِ وَأَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ وَأَنْ تُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ ; কেননা مُوْحٰى তথা আদিষ্ট বিষয় আমরের সীগাহ দ্বারা হয়ে থাকে, মাসদার নয়। إِقَامَ الصَّلٰوةِ এখানে إِقَامَةَ الصَّلٰوةِ-এর স্থলে সহজার্থে إِقَامَ الصَّلٰوةِ বলেছেন।

قَوْلُهُ لُوْطًا : এটা লুপ্ত فِعْل-এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। এটা مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى التَّفْسِيْرِ-এর অন্তর্গত। বাক্যটি এরূপ ছিল– أٰتَيْنَا لُوْطًا أٰتَيْنَاهُ ; مِنَ الْقَرْيَةِ এ জনপদের নাম হলো সাদুম। এটা মুতাফিকা এলাকার একটা বিশেষ জনপদ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَرِّقُوْهُ : অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক! ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আ.)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যেগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারো ছিল না। শয়তান হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে 'মিনজানিকে' [এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র] রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্টজীব চিৎকার করে উঠল, হে প্রভু! আপনার দোস্তের এ কি বিপদ ! আল্লাহ তাদের সবাইকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হলো, প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল না: বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেয়ায়েতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আ.) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন। এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ : অর্থাৎ, ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ [অর্থাৎ, ইরাক] থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বাবাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের স্থান। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গাম্বরদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গাম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর প্রাচুর্য, ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً : অর্থাৎ, আমি তাঁকে [দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী] পুত্র ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نَافِلَة বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসহাক (আ.) এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকূব (আ.)-এর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক সৌভাগ্যবান বানিয়েছেন। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি তাদেরকে জাতির অগ্রনায়ক এবং নেতা মনোনীত করি এবং তারা মানুষকে আমার নির্দেশ মোতাবেক হেদায়েত করতেন। সরল সঠিক, পুণ্য পন্থার পথনির্দেশ করতেন। সত্যের দিকে মানুষকে আহবান করতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। তাই ইরশাদ হয়েছে–

قَوْلُهُ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا : তাঁরা ছিলেন জাতির নেতা : কোনো কোনো তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাঁরা শুধু যে নিজেরা আধ্যাত্মিক সাধনার সকল মঞ্জিল অতিক্রম করেছেন, তাই নয়; বরং তাঁরা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক অন্য মানুষকেও হেদায়েত করতেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অতিক্রম করতে সাহায্য করতেন অর্থাৎ,. তাঁরা শুধু হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন পথপ্রদর্শক। –[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৬৬৮]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ইমামতের কথা রয়েছে, তার তাৎপর্য হলো নবুয়ত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবুয়ত দান করেছেন। ইমাম রাজী (র.) একথাও লিখেছেন, এ আয়াতের আরো একটি কথা হলো, এই সত্যের প্রতি আহবান এবং বাতিল থেকে বিরত থাকার কাজ আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত বৈধ নয়। এজন্যে بِاَمْرِنَا শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২২, পৃ. ১৯১]

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ : এ আয়াতেও তাঁদেরকে যে নবুয়ত দান করা হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। এরপর নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাজ হলো শারীরিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ্ পাকের জিকিরের লক্ষ্যেই এর বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে জাকাত হলো আর্থিক ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই জাকাত আদায়েরও নির্দেশ রয়েছে। নামাজ ও জাকাত উভয় ইবাদতের লক্ষ্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং আল্লাহ পাকের বান্দাদের প্রতি ইহসান করা। এর দ্বারা হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদ আদায়ের তাগিদ রয়েছে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হলো– তাঁরা নেককার। বস্তুত এটি হলো আল্লাহ পাকের পথের সাধকদের প্রথম গুণ। এরপর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে তাঁদেরকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর নবুয়ত ও রিসালত প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ : "আর তারা আমারই ইবাদত করতো" অর্থাৎ তারা শুধু আমরই বন্দেগী করতো; অন্য কারো নয়। আমার বন্দেগীর যে অঙ্গীকার তারা করেছিল তা তারা পূর্ণ করেছে। অথবা এর অর্থ হলো তাঁরা ছিল খাঁটি তাওহীদবাদী। আর আল্লাহ পাকের ইবাদতে তারা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে. হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্র, পৌত্র ইতিপূর্বে যাদের উল্লেখ হয়েছে, তাঁরা আল্লাহ পাকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতেন। তাঁরা যাবতীয় গুণাবলি অর্জন করেছিলেন। তাঁরা যেমন ছিলেন ইলমের ব্যাপারে পরিপূর্ণ তেমনি আমলের ব্যাপারেও ছিলেন পরিপূর্ণ আন্তরিক। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন : পৃ. ৬৪৫]

قَوْلُهُ تَعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ : خَبَائِثُ শব্দটি خَبِيْثَةٌ-এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خَبَائِثُ বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটি মাত্র অভ্যাসকেই خَبَائِثُ বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خَبَائِثُ বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

অনুবাদ :

٧٦. وَ اذْكُرْ نُوْحًا وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ مِنْهُ اِذْ نَادٰى اَىْ دَعَا عَلٰى قَوْمِهٖ بِقَوْلِهٖ رَبِّ لَا تَذَرْ الخ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ اِبْرَاهِيْمَ وَلُوْطٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهُ الَّذِيْنَ فِىْ سَفِيْنَتِهٖ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ـ اَىْ الْغَرَقِ وَتَكْذِيْبِ قَوْمِهٖ لَهٗ ـ

৭৬. স্মরণ করুন নূহকে এর পরবর্তী অংশ হলো তার থেকে بدل যখন তিনি আহবান করেছিলেন অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন– হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের বসতিকে ছাড়বেন না– এ উক্তি দ্বারা। এর পূর্বে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর পূর্বে। তখন আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম যারা তার নৌকায় ছিল মহা সংকট হতে অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়া ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা থেকে।

٧٧. وَنَصَرْنٰهُ مَنَعْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط الدَّالَّةِ عَلٰى رِسَالَتِهٖ اَنْ لَّا يَصِلُوْا اِلَيْهِ بِسُوْءٍ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

৭৭. এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম তাকে রক্ষা করেছি সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলি অস্বীকার করেছিল যা তাঁর রিসালতের প্রমাণবহ যাতে তারা কুমতলবে তাঁর নিকট পৌঁছতে না পারে। নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এজন্য তাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

٧٨. وَاذْكُرْ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اَىْ قِصَّتَهُمَا وَيُبْدَلُ مِنْهُمَا اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ هُوَ زَرْعٌ اَوْ كَرْمٌ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج اَىْ رَعَتْهُ لَيْلًا بِلَا رَاعٍ بِاَنْ اِنْفَلَتَتْ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ـ فِيْهِ اِسْتِعْمَالُ ضَمِيْرِ الْجَمْعِ لِاِثْنَيْنِ قَالَ دَاوٗدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابَ الْغَنَمِ وَقَالَ سُلَيْمٰنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْتَفِعُ بِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوْفِهَا اِلٰى اَنْ يَّعُوْدَ الْحَرْثُ كَمَا كَانَ بِاِصْلَاحِ صَاحِبِهَا فَيَرُدُّهَا اِلَيْهِ ـ

৭৮. এবং আপনি স্মরণ করুন হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-এর কথা অর্থাৎ তাদের কাহিনীকে। সামনের অংশ এর থেকে بدل হয়েছে। যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। আর তা ছিল ফসলের ক্ষেত বা আঙ্গুরের বাগান যখন তাতে প্রবেশ করেছিল রাত্রিকালে কোনো সম্প্রদায়ের মেষ। অর্থাৎ, রাখালবিহীন তাতে মেষ চরেছিল, ফলে তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর আমি তাদের বিচার কার্য প্রত্যক্ষ করছিলাম এতে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের যমীর ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) শস্যের মালিকের জন্য মেষের মালিকানার সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন আর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, শস্যের মালিক মেষের দুধ, বাচ্চা ও পশম দ্বারা উপকৃত হবেন যতদিন না মেষ-মালিকের পরিচর্যা দ্বারা ফসল তার পূর্বৎ অবস্থায় ফিরে না আসে। এরপর সে মেষের মলিকের নিকট মেষ পাল ফিরিয়ে দিবে।

অনুবাদ :

٧٩. فَفَهَّمْنٰهَا اَىِ الْحُكُوْمَةَ سُلَيْمٰنَ وَحُكْمُهُمَا بِاجْتِهَادٍ وَرَجَعَ دَاوُدُ اِلٰى سُلَيْمَانَ وَقِيْلَ بِوَحْيٍ وَالثَّانِىْ نَاسِخٌ لِلْاَوَّلِ وَكُلًّا مِنْهُمَا اٰتَيْنَا حُكْمًا نُبُوَّةً وَّعِلْمًا بِاُمُوْرِ الدِّيْنِ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ط كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لِلتَّسْبِيْحِ مَعَهُ لِاَمْرِهٖ بِهٖ اِذَا وَجَدَ فَتْرَةً لِيَنْشَطَ لَهُ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ تَسْخِيْرَ تَسْبِيْحِهِمَا مَعَهُ وَاِنْ كَانَ عَجَبًا عِنْدَكُمْ اَىْ مُجَاوَبَتَهُ لِلسَّيِّدِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

৭৯. আমি এ বিষয়ে মীমাংসায় হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। উভয়ের বিচার ছিল গবেষণা ভিত্তিক। হযরত দাউদ (আ.) হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়ের প্রতি নিজে ফিরে আসেন। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল ওহীর মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটির জন্য নাসিখ বা রহিতকারী। এবং তাদের প্রত্যেককেই আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা নবুয়ত ও জ্ঞান দীন বিষয়ক। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত অনুরূপভাবে অধীন করে দিয়েছিলাম তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠের জন্য তার এ আদেশের কারণে যে, যখন তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন তখন তারা যেন সাথে সাথেই তাসবীহ পাঠ করে যাতে তাঁর প্রফুল্লতা লাভ হয়। আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা তার সাথে তাদের তাসবীহ পাঠের জন্য অধীনস্ত করার বিষয়ে। যদিও তা তোমাদের নিকট অতি আশ্চর্যজনক মনে হয়। অর্থাৎ, হযরত দাউদ (আ.)-এর আহনবানে তাদের সাড়া দেওয়া।

٨٠. وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ وَهِىَ الدِّرْعُ لِاَنَّهَا تُلْبَسُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ صَنَعَهَا وَكَانَتْ قَبْلَهَا صَفَائِحُ لَّكُمْ فِىْ جُمْلَةِ النَّاسِ لِتُحْصِنَكُمْ بِالنُّوْنِ لِلّٰهِ وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ لِدَاوُدَ وَبِالْفَوْقَانِيَّةِ لِلَّبُوْسِ مِنْ بَاْسِكُمْ ج حَرْبِكُمْ مَعَ اَعْدَاءِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ شٰكِرُوْنَ ـ نِعَمِىْ بِتَصْدِيْقِ الرُّسُلِ اَىِ اشْكُرُوْنِىْ بِذٰلِكَ ـ

৮০. আমি তাকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছি। আর তা হলো লৌহবর্ম, কারণ তা শরীরে পবিধান করা হয়। আর তিনি এর সর্বপ্রথম প্রস্তুতকারক ও নির্মাতা। এর পূর্বে ছিল লৌহ নির্মিত ঢাল। তোমাদের জন্য সকল মানুষের যাতে তা তোমাদেরকে রক্ষা করে لِتُحْصِنَكُمْ শব্দটি যদি نُوْن যোগে হয় তবে এর যমীর আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরবে। আর যদি يَاء দ্বারা হয় তবে যমীর ফিরবে হযরত দাউদ (আ.)-এর দিকে। আর যদি تَاء যোগে হয় তবে যমীর ফিরবে لَبُوْس তথা লৌহবর্মের দিকে। তোমাদের যুদ্ধে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে সুতরাং তোমরা কি হে মক্কাবাসীরা কৃতজ্ঞ হবে না আমার নিয়ামতসমূহের। রাসূলগণকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ এর মাধ্যমে তোমরা আমার কৃতজ্ঞা প্রকাশ করো।

অনুবাদ :

٨١. وَ سَخَّرْنَا لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى رُخَاءً اَىْ شَدِيْدَةَ الْهُبُوْبِ وَخَفِيْفَتَهُ بِحَسْبِ اِرَادَتِهٖ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَهِىَ الشَّامُ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ . مِنْ ذٰلِكَ عِلْمُهٗ تَعَالٰى بِاَنَّ مَا يُعْطِيْهِ سُلَيْمَانَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْخُضُوْعِ لِرَبِّهٖ فَفَعَلَهٗ تَعَالٰى عَلٰى مُقْتَضٰى عِلْمِهٖ .

৮১. এবং আমি বশীভূত করে দিয়েছি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য উদ্দাম বায়ুকে। অপর কেরাতে رخاء এসেছে, অর্থাৎ গতির প্রচণ্ডতা ও ধীরস্থিরতাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করে দিয়েছি। তা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হতো সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি। আর তা হলো শামদেশ বা সিরিয়া। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। এর মধ্যে আল্লাহর এ জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের প্রতি বিনয়ী হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

٨٢. وَ سَخَّرْنَا مِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ يَدْخُلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَيُخْرِجُوْنَ مِنْهُ الْجَوَاهِرَ لِسُلَيْمَانَ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ج اَىْ سِوَى الْغَوْصِ مِنَ الْبِنَاءِ وَغَيْرِهٖ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ . مِنْ اَنْ يُّفْسِدُوْا مَا عَمِلُوْا لِاَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا فَرَغُوْا مِنْ عَمَلٍ قَبْلَ اللَّيْلِ اَفْسَدُوْهُ اِنْ لَمْ يُشْتَغَلُوْا بِغَيْرِهٖ .

৮২. এবং আমি বশীভূত করে দিয়েছি শয়তানদের মধ্য থেকে কতককে যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত তারা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য মণিমুক্তা আহরণ করত। এটা ব্যতীত তারা অন্যান্য কাজও করত অর্থাৎ ডুবুরির কাজ ব্যতীতও যেমন– প্রাসাদ নির্মাণ ইত্যাদি। আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম। তারা যা নির্মাণ করত তা বিনষ্ট করা হতে। কেননা যখন তারা কোনো কাজ সমাপ্তি ঘটাতো, যদি তাদেরকে অন্য কাজে ব্যাপৃত না করা হতো তবে রাতের আগমনের পূর্বেই তারা তা বিনষ্ট করে ফেলত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ نُوْحًا : এ শব্দটি مَنْصُوْبٌ হওয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে। ১. তাঁর আতফ হলো لُوْطٌ-এর উপর। এর নসবের আমিল হবে لُوْطٌ-এর আমিলটিই। তা হলো উহ্য اٰتَيْنَا ; আর উল্লিখিত اٰتَيْنَاهُ বাক্যটি এর প্রমাণ বহন করছে। এভাবে دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ শব্দেও। বাক্যটি এরূপ হবে– وَنُوْحًا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اٰتَيْنَاهُمَا حُكْمًا এ সময় اِذْ نَادٰى শব্দটি نُوْحًا থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَال হবে। ২. اُذْكُرْ উহ্য ফে'লটি এর নাসিব হবে। যেমন গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন। نُوْحًا-এর পূর্বে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اُذْكُرْ قِصَّتَهٗ এ সময় উহ্য মুযাফের কারণে اِذْ نَادٰى মানসূব হবে। অর্থাৎ– خَبَرُهُمُ الْوَاقِعُ فِىْ وَقْتِ كَانَ كَيْتَ كَيْتَ

قَوْلُهٗ مِنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَ هٰؤُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ : হযরত নূহ (আ.) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেছেন আর ৯৫০ বছর পর্যন্ত তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তাবলীগ করেছেন এবং তুফানের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর পূর্ণ বয়স হলো ১০৫০ [এক হাজার পঞ্চাশ] বছর।

قَوْلُهٗ اِذْ نَادٰى : শব্দটি نُوْحًا থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ - دَعَا عَلٰى قَوْمِهٖ দ্বারা এর তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, نَادٰى শব্দটি دَعٰى عَلَيْهِ তথা বদ দোয়া অর্থে।

قَوْلُهُ وَنَصَرْنَاهُ : এর ব্যাখ্যা مَنَعْنَاهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مَنَعَ -এর অর্থ বিশিষ্ট। আর এ কারণেই এর স্বরূপ مِنْ صِلَةٌ এসেছে। নতুবা نَصَرَ -এর صِلَةٌ আসে عَلٰى

قَوْلُهُ اَنْ لَا يَصِلَ اِلَيْهِ اَىْ لَئِلَّا يَصِلُ اِلَيْهِ بِسُوْءٍ : এটা হলো مَنَعْنَاهُ -এর ইল্লত وَاذْكُرْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ হযরত দাউদ (আ.) ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত দাউদ ও মূসা (আ.)-এর মাঝে ৫৬৯ বছরের ব্যবধান ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) ৫৬৮ বছর বেঁচেছিলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মাঝে ১৭০০ [এক হাজার সাতশত বছরের ব্যবধান ছিল। -[হাশিয়াতুল জুমাল]

قَوْلُهُ زَرْعٌ : زَرْعٌ অর্থ- ফসলের চাষাবাদ, كَرْمٌ অর্থ- আঙ্গুর।

قَوْلُهُ نَفَشَتْ النَّفْشُ الرَّعْىُ بِاللَّيْلِ بِلَا رَاعٍ : রাখালবিহীন রাতে ছাগলের পাল চরে ফসল বিনষ্ট করা। এটা (ن، ض، س،) نَفْشًا থেকে গৃহীত। আর هَمْلٌ বলা হয় দিনের বেলা রাখালবিহীন ফসলকে মাড়িয়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেওয়াকে। لِحُكْمِهِمْ -এর মধ্যে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচনের যমীরটি হয়তো রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বহুবচনের নিম্নতম সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে। رِقَابُ الْغَنَمِ অর্থাৎ, ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ।

قَوْلُهُ يُسَبِّحْنَ : এটা اَلْجِبَالُ থেকে حَالٌ অর্থাৎ, مُسَبِّحَةٌ অর্থে। কেউ কেউ এটাকে جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ বলেছেন। যেন কোনো প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছে যে, كَيْفَ سَخَّرَهُنَّ ؟ فَقَالَ يُسَبِّحْنَ

قَوْلُهُ وَالطَّيْرَ : اَلْجِبَالُ এর উপর عَطْفٌ -এর কারণে এটা مَنْصُوْبٌ হতে পারে এবং مَفْعُوْلٌ مَعَهُ -এর কারণেও হতে পারে। কোনো কোনো কেরাতে وَالطَّيْرُ মারফূ'-ও রয়েছে। এ সময় হয়তো এটা مُبْتَدَأٌ হবে এবং তার خَبَرٌ বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ, وَالطَّيْرُ مُسَخَّرَاتٌ اَيْضًا অথবা يُسَبِّحْنَ -এর যমীরের উপর عَطْفٌ হবে। কিন্তু এ সময় একটি ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ -এর মাধ্যমে تَاكِيْدٌ কিংবা فَصْلٌ জরুরি হবে। এটা বসরার নাহবীগণের মতে। আর কূফীগণের মতে এটা জরুরি নয়।

قَوْلُهُ لِاَمْرِهِ بِهِ : এটা مَصْدَرٌ যা তার فَاعِلٌ -এর প্রতি মুযাফ হয়েছে। তার مَفْعُوْلٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, لِاَمْرِ دَاوُدَ لَهُمَا بِهِ اَىْ بِالتَّسْبِيْحِ اِذَا وَجَدَ دَاوُدُ فَتْرَةً অর্থাৎ, দাউদ (আ.) যখন জিকির ও তাসবীহে ক্লান্তি অনুভব করতেন তখন পাহাড় ও পাখিদেরকে তাসবীহ আদায়ের নির্দেশ দিতেন। যাতে জিকির ও তাসবীহের পরিবেশ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এর দরুন তার ভিতরে আনন্দ জাগরিত থাকে। সাথে সাথে এর দ্বারা তাঁর ক্লান্তিরও অবসান ঘটে। صَفَائِحٌ শব্দটি صَفِيْحَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- প্রত্যেক চওড়া বস্তু : চাই তা পাথরের হোক কিংবা লোহার। لَكُمْ এটা عَلَّمْنَا -এর সাথে মুতাআল্লিক। আর لَامٌ টি تَعْلِيْلٌ -এর জন্য হবে। অর্থাৎ, عَلَّمْنَا لِاَجْلِكُمْ আর لِيُحْصِنَكُمْ এটা حَرْفُ جَارٍّ -এর পুনরুক্তিসহ بَدَلٌ হবে অর্থাৎ لِاِحْصَانِكُمْ لَكُمْ আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে عَلَّمْنَا -এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে।

قَوْلُهُ فِىْ جُمْلَةِ النَّاسِ اَىْ مَعَ جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ جُمْلَةِ النَّاسِ : এর দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, لَكُمْ -এর দ্বারা মক্কাবাসী উদ্দেশ্য। অথচ তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে উপস্থিত ছিল না। এর উত্তর এই যে, এটা এমনই এক নিয়ামত যা পরবর্তীতে অন্যান্য লোকদের মধ্য হতে মক্কাবাসীদের নিকট পৌঁছেছে।

قَوْلُهُ بِحَسَبِ اِرَادَتِهِ : এটা বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : এখানে رِيْحٌ -এর صِفَتٌ আনা হয়েছে عَاصِفَةٌ -কে। এর অর্থ হলো প্রবল বায়ু ঝড়। অপর আয়াতে رُخَاءٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর অর্থ হলো মৃদু হাওয়া। কাজেই উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা দেখা যায়।

উত্তর : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইচ্ছা অনুপাতে বাতাসের বেগের মধ্যে তারতম্য হতো। তিনি যেমন বলতেন, তেমন বেগেই তা প্রবাহিত হতো। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই।

قَوْلُهُ مِنْ ذٰلِكَ عَلَّمَهُ تَعَالٰى : এটা হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর عَلَّمَهُ بِاَنَّ مَا يُعْطِيْهِ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

قَوْلُهُ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ : مَنْ টি মাওসূলাহ ও مَوْصُوْفَةٌ উভয় হতে পারে। আর اَلرِّيْحُ -এর উপর عَطْفٌ হওয়ার কারণে বাক্য হয়ে স্থানগতভাবে مَنْصُوْبٌ হবে। অর্থাৎ- سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ عَاصِفَةً وَمَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ আর مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে يَغُوْصُوْنَ -কে বহুবচনে আনা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ : مِنْ قَبْلُ-এর অর্থ হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর যে আহবানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন- رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগার! পৃথিবীর বুকে কোনো কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন কোনোরূপেই তার উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন- اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ, আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছে থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

قَوْلُهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ : كَرْبٍ عَظِيْمٍ [মহা সংকট] বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

قَوْلُهُ وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই পর্যায়ের পঞ্চম ঘটনার বিবরণ রয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর পুত্র ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। নবুয়ত এবং রাজত্ব উভয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক তাঁদেরকে দান করেছিলেন। আমিরী এবং ফকিরী একত্র হয়েছিল তাঁদের মাঝে। হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের একটি নমুনা ছিল। হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.) নবী ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের খলীফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আর হযরত ওমর (রা.) নবী ছিলেন না তবে শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মোহাম্মদ ﷺ -এর খলীফা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁদের উভয়কে অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি এবং প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিলেন। বিশেষত হযরত সুলায়মান (আ.)-কে অতি শৈশবেই যে সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা দান করেছেন তা তখনই মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ

"আর স্মরণ কর দাউদ এবং সুলায়মানের কথা যখন তাঁরা বিচার করছিলেন একটি শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ তাফসীরকারের মত হলো ঐ ক্ষেত্রটি ছিল আঙ্গুরের। আর কাতাদা (রা.) বলেছেন, তা ছিল শস্যক্ষেত্র।

قَوْلُهُ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ : فَفَهَّمْنَاهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বুঝিয়ে দিলেন। মকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালাও শরিয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের সুবিধানজনক ছাড় ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যে, দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। [সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই] হযরত দাউদ (আ.) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। [কেননা, ফিকহের পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ, যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যর সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।] বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালত থেকে বের হয়ে আসলে [দরজায় তাঁর পুত্র] হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি রায় দিলে তা

ভিন্নরূপ হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ কথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ.) বললেন, এই রায় থেকে যা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য উপকারী সেই রায়টা কি? হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন! সে এগুলোর দুধ পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন শস্যক্ষেত্রে শস্যক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন! হযরত দাউদ (আ.) এই রায় পছন্দ করে বললেন, বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোনো বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্ত করা যায় কি? এখানে প্রশ্ন হয়, হযরত দাউদ (আ.) যখন একটি রায় দিয়েছিলেন, তখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? আর যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোনো বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কিনা? অর্থাৎ, রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করার অধিকার আছে কিনা?

কুরতুবী (র.) এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোনো বিচারক শরিয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোনো রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোনো বিচারকের রায় শরিয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েজ নয়। কেননা এই রীতি প্রবর্তিত হলে প্রত্যেহ হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েজ বরং উত্তম। হযরত ওমর ফারুক (রা.) হযরত আবূ মূসা আশাআরী (রা.)-এর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেওয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী (র.) সনদসহ বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুবী সংক্ষেপিত] শামসুল আয়িম্মা সুরখসী (র.) মবসুতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) উভয়ের রায় স্ব স্ব স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং হযরত সুলায়মান (আ.) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মকদ্দমার রায় ছিল না: বরং এটা ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কুরআনে وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [অর্থাৎ, আপস করা উত্তম] বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। -[মাযহারী]

হযরত ওমর ফারূক (রা.) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয় তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে শরিয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। -[মাঈনুল হুক্কাম]

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস রফার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, নাকি কোনো একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে : এ স্থলে কুরতুবী (র.) বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তাফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলেমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পর বিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে وَكُلًّا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا এতে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কোনোরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর রায় সত্য ছিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর

রায়ও। তবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয়, তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য, অর্থাৎ, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক ছওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার দ্বিতীয় ছওয়াব সে পাবে না [অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে]। এই হাদীস থেকে আলেমগণের উপরিউক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতোই। কেননা উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সত্তার দিকে দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম ছওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্ৎসনা করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গোনাহগার হবে এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তাফসীর কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারো জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত : হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর শরিয়তের ফয়সালা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারো জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদ (র.)-এর ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেতের হেফাজত করা মালিকদের দায়িত্ব। হেফাজত সত্ত্বেও যদি রাত্রি বেলায় কারো জন্তু ক্ষতিসাধন করে তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও কূফার ফিকহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হেফাজতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হেফাজতকারী না থাকে, জন্তু স্বপ্রণোদিত হয়ে কারো ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ অর্থাৎ, জন্তু কারো ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না [অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্যে মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত]। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারো ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়; বরং জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর ঘটনা যে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবিলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ : পর্বত ও পক্ষীকুলের তাসবীহ : হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলির মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যাবূর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তাসবীহের আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তাসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মুজেযা। মুজেযার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা

থাকা জরুরি নয়; বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মুজেযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কুরআন তেলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে দাউদ (আ.)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। হযরত আবূ মূসা (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর তেলাওয়াত শুনেছেন তখন আরজ করলেন, আপনি শুনছেন একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। -[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালের কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা তো শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য গায়েব হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ : বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল : অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لِبَاسٌ বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ অর্থাৎ, আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। **এক.** তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটাসরু করতে পারতেন। **দুই.** লোহা আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গাম্বরগণের কাজ : আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প হযরত দাউদ (আ.)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاْسِكُمْ অর্থাৎ, যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ম তরবারির বিপদ থেকে হেফাজত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ছওয়াবের কাজ তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গাম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে। যেমন- হযরত দাউদ (আ.) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার ছওয়াব তো পাবেই; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসরের নামাজ ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চেয়ে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তাফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ-এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যেমন দাউদ (আ.)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তাসবীহ পাঠ করত, তেমনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর বশীকরণের মধ্যে مَعَ [সাথে] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে لِ [জন্য] অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। হযরত দাউদ (আ.) যখন তেলাওয়াত করতেন তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তাসবীহ পাঠ শুরু

করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করতো না। পক্ষান্তরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিত; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। -[রূহুল মা'আনী, বায়যাভী]

তাফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পরিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করতো। অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। এগুলোতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এ সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌঁছিয়ে দিত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে হযরত সুলায়মান (আ) মাথা নত করে আল্লাহর জিকির ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। -[ইবনে কাসীর]

عَاصِفَةً-এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رُخَاءً বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ- মৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধূলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোনো পাখীরও কোনোরূপ ক্ষতি হতো না।

সুলায়মান (আ.)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূতকরণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ। অর্থাৎ, আমি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত। যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে- يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ অর্থাৎ, তারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। হযরত সুলায়মান (আ.) তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَيَاطِيْنُ তথা শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝানোর জন্য আসলে جِنٌّ অথবা جِنَّاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয় কাফের, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বশীভূত ছিল। কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিদর্শনাবলি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيَاطِيْنُ তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব : হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন। যথা- পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য দেখাও যায় না, এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন। যেমন- বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। -[তাফসীরে কবীর]

অনুবাদ :

٨٣. وَ اذْكُرْ اَيُّوْبَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ لَمَّا ابْتُلِيَ بِفَقْدِ جَمِيْعِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَتَمْزِيْقِ جَسَدِهِ وَهَجْرِ جَمِيْعِ النَّاسِ لَهُ اِلَّا زَوْجَتَهُ سِنِيْنَ ثَلَاثًا اَوْ سَبْعًا اَوْ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ وَضِيْقِ عَيْشِهِ اَنِّيْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ مَسَّنِيَ الضُّرُّ اَيِ الشِّدَّةُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .

৮৩. এবং স্মরণ করুন আইয়ুবের কথা এ থেকে بَدْل হচ্ছে যখন তিনি তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলছিলেন যখন তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন সকল ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিলীন হয়ে যাওয়ায়। রোগের কারণে শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, স্ত্রী ব্যতীত সকল মানুষ তাকে পরিত্যাগ করার পর সুদীর্ঘ তিন, সাত বা আঠারো বছর দুর্বিষহ জীবন যাপন করার মাধ্যমে নিশ্চয় আমি اَنِّىْ এর হামযাটি بَاءْ উহ্য থাকার কারণে যবরযুক্ত হয়েছে দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

٨٤. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ نِدَاءَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهُ اَوْلَادَهُ الذُّكُوْرَ وَالْاِنَاثَ بِاَنْ اُحْيُوْا لَهُ وَكُلٌّ مِنَ الصِّنْفَيْنِ ثَلَاثٌ اَوْ سَبْعٌ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ مِنْ زَوْجَتِهِ وَزِيْدَ فِيْ شَبَابِهَا وَكَانَ لَهُ اَنْدَرُ لِلْقَمْحِ وَاَنْدَرُ لِلشَّعِيْرِ فَبَعَثَ اللّٰهُ سَحَابَتَيْنِ اَفْرَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلٰى اَنْدَرِ الْقَمْحِ الذَّهَبَ وَالْاُخْرٰى عَلٰى اَنْدَرِ الشَّعِيْرِ الْوَرِقَ حَتّٰى فَاضَ رَحْمَةً مَفْعُوْلٌ لَهُ مِّنْ عِنْدِنَا صِفَةٌ وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ . لِيَصْبِرُوْا فَيُثَابُوْا .

৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি তার দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিলাম। এভাবে যে, তার পুত্র-কন্যাগণকে জীবিত করা হলো। উভয় প্রকারের সন্তান তিনজন বা সাতজন করে ছিল। এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরো দিলাম তার স্ত্রী হতে, তাঁর যৌবন বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো, তার এক উঠান পূর্ণ ছিল গম দ্বারা। অপর উঠান পূর্ণ ছিল যব দ্বারা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু'টি মেঘ প্রেরণ করলেন, এক মেঘ গমের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং অপরটি যবের পরিবর্তে রৌপ্য বর্ষণ করল এমন কি তা গড়িয়ে পড়ল। বিশেষ রহমত রূপে رَحْمَةً টি مَفْعُوْلٌ لَهُ হয়েছে আমার পক্ষ থেকে عِنْدَنَا টা كَائِنَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে رَحْمَةً -এর সিফত হয়েছে। এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। যাতে তারা ধৈর্য ধারণ করে, ফলে পুণ্যপ্রাপ্ত হবে।

٨٥. وَ اذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ . عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ وَعَنْ مَعَاصِيْهِ .

৮৫. এবং স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুল কিফল (আ.)-এর কথা। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল আল্লাহর আনুগত্য ও পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে।

অনুবাদ :

৮৬. وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ط مِنَ النُّبُوَّةِ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ لَهَا وَسُمِّىَ ذَا الْكِفْلِ لِاَنَّهُ تَكَفَّلَ بِصِيَامِ جَمِيْعِ نَهَارِهٖ وَبِقِيَامِ جَمِيْعِ لَيْلِهٖ وَاَنْ يَّقْضِىَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَا يَغْضَبَ فَوَفٰى بِذٰلِكَ وَقِيْلَ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا ـ

৮৬. আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম নবুয়ত দান করে তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ নবুয়তের জন্য। আর যুল কিফলকে এ নামে নামকরণের কারণ হচ্ছে যে, তিনি সারা দিন সিয়াম সাধনা করা, সারা রাত ইবাদত করা, মানুষের মাঝে বিচার মীমাংসা করা ও কারো প্রতি ক্রোধান্বিত না হওয়াকে তিনি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে,. তিনি নবী ছিলেন না।

৮৭. وَ اذْكُرْ ذَا النُّوْنِ صَاحِبَ الْحُوْتِ وَهُوَ يُوْنُسُ بْنُ مَتّٰى وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهٖ اَىْ غَضْبَانَ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَاسٰى مِنْهُمْ وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِىْ ذٰلِكَ فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَىْ نَقْضِىَ عَلَيْهِ مَا قَضَيْنَا مِنْ حَبْسِهٖ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ اَوْ نُضَيِّقَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَظُلْمَةِ الْبَحْرِ وَظُلْمَةِ بَطْنِ الْحُوْتِ اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ فِىْ ذَهَابِىْ مِنْ بَيْنِ قَوْمِىْ بِلَا اِذْنٍ ـ

৮৭. এবং স্মরণ করুন যুননূন এর কথা মৎস্যজীবি। শিকারী, আর তিনি হলেন হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)। আগত অংশ এর থেকে بَدَلْ হয়েছে। যখন তিনি ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি। তাঁর প্রতি তাদের মন্দ আচরণের কারণে। অথচ তাকে চলে যেতে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এবং তিনি মনে করেছিলেন আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না অর্থাৎ মাছের পেটে তাকে বন্দী রাখার যে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম তা করব না, অথবা এ কারণে আমি তার উপর সংকীর্ণতা আরোপ করব না। অতঃপর তিনি অন্ধকার হতে আহবান করেছিলেন রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার ও মৎস-উদরের অন্ধকার। এভাবে যে, আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি পবিত্র মহান, আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী বিনা অনুমতিতে আমার সম্প্রদায় হতে চলে আসার কারণে।

৮৮. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ط بِتِلْكَ الْكَلِمٰتِ وَكَذٰلِكَ كَمَا اَنْجَيْنَاهُ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ مِنْ كَرْبِهِمْ اِذَا اسْتَغَاثُوْا بِنَا دَاعِيْنَ ـ

৮৮. তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে। এবং এভাবেই যেমনিভাবে আমি তাঁকে উদ্ধার করেছি আমি মুমিনগণকে উদ্ধার করে থাকি। তাদের বিপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে যখন তারা আমাকে ডেকে ডেকে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে।

অনুবাদ :

٨٩. وَ اذْكُرْ زَكَرِيَّا وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ بِقَوْلِهٖ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا اَىْ بِلَا وَلَدٍ يَرِثُنِىْ وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ـ اَلْبَاقِىْ بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِكَ ـ

৮৯. এবং স্মরণ করুন হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর কথা পরবর্তী অংশ এর থেকে بَدَلْ হয়েছে। তিনি যখন তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন তাঁর এ উক্তি দ্বারা হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখবেন না অর্থাৎ সন্তানহীন, যে আমার ওয়ারিশ হবে। আপনি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী স্থায়ী আপন সৃষ্টি বিনাশ সাধনের পর।

٩٠. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ زِ نِدَاءَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَلَدًا وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط فَاَتَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ عُقْمِهَا اِنَّهُمْ اَىْ مَنْ ذُكِرَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ يُبَادِرُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ الطَّاعَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا فِىْ رَحْمَتِنَا وَرَهَبًا ط مِنْ عَذَابِنَا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ـ مُتَوَاضِعِيْنَ فِىْ عِبَادَتِهِمْ ـ

৯০. অতঃপর আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম। তার ডাকে এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া সন্তান এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। সুতরাং সে বন্ধ্যাত্বের পর সন্তান প্রসব করল। নিশ্চয় তাঁরা অর্থাৎ যে সকল নবীগণের আলোচনা করা হলো। তাঁরা প্রতিযোগিতা করতেন সৎকর্মে আনুগত্যে ও ইবাদতে তাঁরা আমাকে ডাকতেন আশা নিয়ে আমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার ও ভয়ের সাথে আমার শাস্তির এবং তাঁরা ছিলেন আমার নিকট বিনীত। তাদের ইবাদতের ক্ষেত্রে বিনয়ী।

٩١. وَ اذْكُرْ مَرْيَمَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا حَفِظَتْهُ مِنْ اَنْ يَّنَالَ فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا اَىْ جِبْرِيْلَ حَيْثُ نَفَخَ فِىْ جَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيْسٰى وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ اَلْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ حَيْثُ وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ ـ

৯১. এবং মরিয়মকে স্মরণ করুন সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল তার পর্যন্ত পৌঁছানো থেকে তাকে রক্ষা করছিল। অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ জিবরীলকে, সে তার গ্রীবা দেশে ফুৎকার দিল। ফলে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-কে গর্ভধারণ করলেন। এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। মানব, দানব ও ফেরেশতাগণের জন্য। কেননা তিনি পুরুষ বিনে সন্তান প্রসব করেছেন।

٩٢. اِنَّ هٰذِهٖٓ اَىْ مِلَّةَ الْاِسْلَامِ اُمَّتُكُمْ دِيْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُخَاطَبُوْنَ اَىْ يَجِبُ اَنْ تَكُوْنُوْا عَلَيْهَا اُمَّةً وَّاحِدَةً ز حَالٌ لَازِمَةٌ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ . وَحِّدُوْنِ .

٩٣. وَتَقَطَّعُوْٓا اَىْ بَعْضُ الْمُخَاطَبِيْنَ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط اَىْ تَفَرَّقُوْا اَمْرَ دِيْنِهِمْ مُتَخَالِفِيْنَ فِيْهِ وَهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى قَالَ تَعَالٰى كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ . اَىْ فَنُجَازِيْهِ بِعَمَلِهٖ .

অনুবাদ :

৯২. নিশ্চয় এটা ইসলাম ধর্ম তোমাদের জাতি তোমাদের ধর্ম। হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ! তোমাদের জন্য এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা একান্তই আবশ্যক একই জাতি এটা حال لازمه হয়েছে امة -এর এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমার ইবাদত কর। আমার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর।

৯৩. তারা ভেদ সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ সম্বোধিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে অর্থাৎ তারা দীনের ব্যাপারে মতবিরোধ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কয়েকটি গ্রুপ বা দল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যানীত হবে। অর্থাৎ, তখন আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ اَيُّوْبَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ : এখানে اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ বাক্যাংশটি اَيُّوْبَ অর্থাৎ, বিলুপ্ত মুজাফ থেকে بَدَلٌ হয়েছে। অর্থাৎ, خَبَرَ اَيُّوْبَ থেকে।

قَوْلُهُ لَمَّا ابْتُلِىَ : এটা نَادٰى -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَضِيْقُ عَيْشِهٖ : ضِيْق শব্দটি মাজহুলরূপে পড়লে এর عَطْف হবে اُبْتُلِىَ -এর উপর। আর ضِيْقِ মাসদার পড়লে তখন فَقْدٌ -এর উপর عَطْف হবে এবং بَا -এর অধীনে হবে। অর্থাৎ, اُبْتُلِىَ بِضِيْقِ عَيْشِهٖ হবে।

قَوْلُهُ سِنِيْنَ ثَلَاثًا : এটা হলো اُبْتُلِىَ -এর ظَرْف

قَوْلُهُ اَنْدَرُ : এটা بُنْدَرٌ এর ছন্দে। অর্থ– উঠান, আর এর বহুবচন হলো اَنَادِرُ ; সেই স্থানকে শামবাসীদের ভাষায় بَيْدَرٌ সেই স্থানকে বলা হয় যেখানে খাদ্যশস্য মাড়াই করা হয়।

قَوْلُهُ رَحْمَةً : এটা اٰتَيْنَاهُ -এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ আর উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ– رَحِمْنَاهُ رَحْمَةً তবে প্রথমটিই অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهُ مِنْ عِنْدِنَا : এটা رَحْمَةً -এর صِفَتْ অর্থাৎ رَحْمَةً كَائِنَةً مِنْ عِنْدِنَا আর ذِكْرٰى لِلْعَابِدِيْنَ -এর মধ্যে عَابِدِيْنَ -কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ ধরনের ঘটনাবলি দ্বারা আবেদগণই বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে থাকেন।

قَوْلُهُ لِيَصْبِرُوْا : অর্থাৎ, যেভাবে আইয়ূব (আ.) ধৈর্যধারণ করেছিলেন তদ্রূপ।

قَوْلُهُ وَاَدْخَلْنٰهُمْ : এর عَطْف হলো উহ্য فِعْل -এর উপর অর্থাৎ–

فَاَعْطَيْنَاهُمْ ثَوَابَ الصَّابِرِيْنَ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا -

قَوْلُهُ وَذَا الْكِفْلِ : এর নাম ছিল বিশর ইবনে আইয়ূব, আর যুল কিফল তার উপাধি। ذُو النُّوْنِ এটাও উপাধি। আসল নাম হলো ইউনুস ইবনে মাত্তা। মাত্তা শব্দটি شَتّٰى -এর ছন্দে। যেহেতু হযরত ইউনুস (আ.) কয়েকদিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন, এ কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছিল জুননূন তথা মাছওয়ালা।

قَوْلُهُ مُغَاضِبًا : এটা ذَهَبَ -এর যমীর থেকে حَالٌ -بَابُ مُفَاعَلَةٌ থেকে। অধিকাংশ সময় এটা দুপক্ষের অংশীদারিত্ব কামনা করে। তবে এখানে অংশীদারিত্ব নেই; বরং عَاقَبْتُ اللِّصَّ -এর অন্তর্গত তথা একপক্ষ থেকে হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তিনি তার সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। ব্যাখ্যাকার (র.) اَىْ غَضْبَانَ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। অথবা অংশীদারিত্ব উদ্দেশ্যে হতে পারে। অর্থাৎ, তিনি তার কওমের উপর নারাজ হলেন এবং তার কওমও তার উপর নারাজ ছিল। এ কারণে শুরুতে কওমের লোকেরা তার উপর ঈমান আনেনি।

قَوْلُهُ نَقْضِىْ عَلَيْهِ الخ : এটা বৃদ্ধি করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ এটা قَدَرٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, قُدْرَةٌ থেকে নয়। قَدَرٌ এর অর্থ হলো সিদ্ধান্ত দেওয়া বা কঠোরতা করা। অতএব لَنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ -এর অর্থ হয়তো لَنْ نَقْضِىَ عَلَيْهِ হবে। অর্থাৎ আমি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছি তা বাস্তবায়ন করব না। এ ব্যাপারে ক্ষমতা রাখি না– এটা কুফরি আকিদা হবে। একজন সাধারণ মুসলমানও এ ধরনের আকিদা রাখতে পারে না, নবী তো দূরের কথা।

قَوْلُهُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ : এর দুটি তারকীব হতে পারে। যথা– ১. اِنْ টি مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ হবে। আর এর اِسْمٌ বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ اِنَّهٗ আর পরের অংশটি এর خَبَرٌ হবে। ২. এটি تَفْسِيْرِيَّةٌ হবে। কেননা এটা قَوْلٌ কিংবা তার সমর্থক কোনো শব্দের পরে উল্লিখিত হয়। আর এখানে এর পূর্বে نَادٰى এসেছে। এটা قَوْلٌ -এর অর্থে। অর্থাৎ, এ তারকীবও যথার্থ হবে।

قَوْلُهُ يَرِثُنِىْ : এখানে নবুয়ত, ইলম ও হিকমত -এ উত্তরাধিকারী হওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ : এটা উহ্য শব্দের উপর مَعْطُوْفٌ হয়েছে। অর্থাৎ, فَارْزُقْنِىْ وَارِثًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

قَوْلُهُ عَقِمٌ اَىْ اِنْسِدَادُ الرَّحِمِ عَنِ الْوِلَادَةِ : অর্থাৎ, বন্ধ্যা, শব্দটি পেশ বা যবরযোগে। অথাৎ যে নারী সন্তান গ্রহণের যোগ্যতা রাখে না।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ : এটা উহ্য বাক্যের ইল্লত অর্থাৎ نَالُوْا مَا نَالُوْا لِاَنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ এ সকল মনীষীগণকে যেসব ফজিলত ও মর্যাদা দান করা হয়েছিল তার কারণ ছিল কল্যাণকর সকল বিষয়ের প্রতি তাঁদের অগ্রগামী হওয়া। يُسَارِعُوْنَ -এর صِلَةٌ টি اِلٰى -এর স্থলে فِىْ আনার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ رَغَبًا وَرَهَبًا : এটা يَدْعُوْنَ -এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হতে পারে। আবার حَالٌ -এর স্থলে উল্লিখিত হওয়ার কারণেও مَنْصُوْبٌ হতে পারে। অর্থাৎ– يَدْعُوْنَ رَاغِبِيْنَ وَرَاهِبِيْنَ

قَوْلُهُ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا : এটা বিলুপ্ত مَوْصُوْفٌ -এর صِفَتٌ যা উহ্য اُذْكُرْ ফে'লের مَعْمُوْلٌ অর্থাৎ– اُذْكُرْ مَرْيَمَ الَّتِىْ الخ

قَوْلُهُ اٰيَةً : বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, اٰيَتَيْنِ বলা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু মা ও সন্তান উভয়ে সম্মিলিতভাবে একটি নিদর্শন ছিল। এজন্য اٰيَةً -কে একবচন আনা হয়েছে। আবার একটার উপর অনুমান করে অন্যটিকে বিলুপ্ত করারও সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً وَابْنَهَا اٰيَةً ছিল।

قَوْلُهُ اُمَّتُكُمْ : এটা مَرْفُوْعٌ হলে اِنَّ -এর خَبَرٌ হবে। আর مَنْصُوْبٌ হলে بَدَلٌ কিংবা عَطْفُ بَيَانٍ হবে।

قَوْلُهُ اُمَّةً وَاحِدَةً : এটা اُمَّتُكُمْ থেকে حَالٌ لَازِمَةٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কেননা اُمَّتٌ শব্দের মধ্যে একবচন ও বহুবচনের অর্থ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ طَوَائِفُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى : এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা মুসলমানদের মধ্যেও ৭৩টি ফেরকা হবে।

قَوْلُهُ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ : এখানে تَقَطَّعُوْا ক্রিয়াটি قَطَعُوْا অর্থে। আর اَمْرَهُمْ হলো এর مَفْعُوْلٌ بِهٖ ; اَمْرَهُمْ -এর অর্থ হলো فِىْ اَمْرِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী : আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়েতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কুরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায়, যে, তিনি কোনো দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোনো কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন বরং তাদের তুলনায় আরো অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশিরভাগ ঐতিহাসিক রেওয়াতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন–

আল্লাহ,তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গাম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে এসব বস্তু তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে, জিহবা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোনো অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহবা ও অন্তরকে আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ.)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মিশা ইবনে ইউসুফ (আ.)। –[ইবনে কাসীর]

সহায় সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবাযত্ন করতেন। হযরত আইয়ূব (আ.)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, পয়গাম্বরগণ সবচেয়ে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত, তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় [যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়]। আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ূব (আ.)-কে পয়গাম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ.)-কে শোকরের এমনি স্বতন্ত্র দান করা হয়েছিল।] বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে হযরত আইয়ূব (আ.) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন, আল্লাহ যখন হযরত আইয়ূব (আ.)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরজ করেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোনো অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই কাহিনী সম্পর্কে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থি নয় : হযরত আইয়ূব (আ.) সাংসারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। এতে কোনো সময় হাহুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোনো বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরজও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপতি করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গাম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না, যেন কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় [অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট

পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়]। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল, বেসবরী ছিল না, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তার সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন- انا وجدناه صابرا [আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি]। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়ূব (আ.) তদ্রূপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্য রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইয়ূব (আ.)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকেতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে হযরত আইয়ূব (আ.) বললেন, আমিই আইয়ূব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন, আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? হযরত আইয়ূব (আ.) আবার বললেন, লক্ষ্য করে দেখ আমিই আইয়ূব। আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমাকে নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। -[ইবনে কাসীর]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ.)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তান এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কুরআনে ومثله معهم বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী (র.) বলেন, এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। -[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন, পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মতো সন্তান বলে সন্তানের সন্তানকে বোঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

যুল কিফল নবী ছিলেন নাকি ওলী? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস (আ.) যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কুরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কুরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুল কিফল। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, তাঁর নাম দু'জন পয়গাম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গাম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং তিনি একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তাফসীরবিদ ইবনে জারীর (র.) মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা [যিনি পয়গাম্বর ছিলেন বলে কুরআনে উল্লেখ আছে] বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গাম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার সকল সাহাবীকে একত্র করে বললেন, আমি আমার খলিফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই- সদাসর্বদা রোজা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোনো সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্যে থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল, আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সদাসর্বদা রোজা রাখো, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্‌সা কর না? লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মতো তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুল কিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল, যাও, কোনোরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল, সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল, তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুল কিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপরে এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুল কিফল বললেন, আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুল কিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মকদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলো, আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল, হুযুর আমার শত্রু পক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তার কোনো হাদীস পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনেও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুল কিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ভিতরে ঢুকলে কিভাবে? তখন যুল কিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন, তা হলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল, আপনি আমার সবচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনোরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুল কিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুল কিফল' শব্দের অর্থ– অঙ্গীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুল কিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। –[ইবনে কাসীর]

মসনদে আহমদে আরো একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুল কিফলের পরিবর্তে 'আল-কিফল' নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে আয়াতে বর্ণিত যুল কিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন– বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোনো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর কোনো জোর জবরদস্তি করছি? মহিলাটি বলল, না, জবরদস্তি করনি; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনোদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল, যাও এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনোদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল– غَفَرَ اللّٰهُ لِلْكِفْلِ অর্থাৎ, আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্ সিত্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেওয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে; যুল কিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোনো ব্যক্তি। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুল কিফল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা ও সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ কোনো পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গাম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ وَذَا النُّوْنِ : হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ.)-এর কাহিনী কুরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহিবুল হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হুত' উভয় শব্দের অর্থ– মাছ। কাজেই যুন-নূন ও সাহিবুল হুতের অর্থ– মাছওয়ালা। হযরত ইউনুস (আ.)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং সাহিবুল হুত শব্দের মাধ্যমে ও তা ব্যক্ত করা হয়।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনী : তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে মূসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। হযরত ইউনুস (আ.) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উক্ত জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আজাব এসেই যাবে [কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আজাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল।] অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সকল আবাল, বৃদ্ধ-বণিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আজাব হটিয়ে দেন। এ দিকে হযরত ইউনুস (আ.) ভাবছিলেন যে, আজাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আজাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন তো আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। –[মাযহারী]

এর ফলে হযরত ইউনুস (আ)–এর প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলো। ঘটনাক্রমে এখানে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম বের হল। [আরোহীরা] বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই] তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হলো। এবারও হযরত ইউনুস (আ.)-এ নামই বের হলো। আরোহীরা তখনো দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লাটারি করা হলো; কিন্তু নাম হযরত ইউনুস (আ.)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ অর্থাৎ, লটারির ব্যবস্থা করা হলে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা সবুজ সাগরের এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগপতিতে সেখানে পৌঁছে যায় [ইবনে মাসউদের উক্তি] এবং সে হযরত ইউনুস (আ.)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ.)-এর অস্থি মাংসের যেন কোনো ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়; বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। –[ইবনে কাসীর]

কুরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্র মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আজাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গাম্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোনো ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু

আল্লাহ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আজাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং প্রাণনাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ ছিল না। কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গাম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলেও তজ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই হযরত ইউনূস (আ.) আল্লাহর রোষে পতিত হন।

তাফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব হটে যাওয়ার পরই হযরত ইউনূস (আ.)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আজাব দানের উদ্দেশ্যে নয়; বরং শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল। যেমন– পিতা তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদানরূপে গণ্য হয়ে থাকে। যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ ذَهَبَ مُغَاضِبًا : অর্থাৎ, ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। رَبِّ শব্দটিকে যারা مُغَاضِبًا -এর مَفْعُوْلٌ বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও مُغَاضِبًا لِرَبِّهِ অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। আর কাফের ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত। –[কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ : অভিধানের দিকে দিয়ে نَقْدِرْ শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ১. যদি قُدْرَتٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণা কোনো পয়গাম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না। কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফরি। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। ২. এটা قَدْر ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা যেমন এক আয়াতে রয়েছে– اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী প্রমুখ তাফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউনূস (আ.) মনে করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনোরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। ৩. এটা তাফসীরের অর্থে قَدْر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, হযরত ইউনূস (আ.) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোনো ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদা, মুজাহিদ ও ফাররা (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ : ইউনূস (আ.)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল : অর্থাৎ, আমি যেভাবে হযরত ইউনূস (আ.)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি, যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোবিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ মাছের পেটে কৃত হযরত ইউনূস (আ.)-এর এই দোয়াটি যদি কোনো মুসলমান কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউনূস (আ.) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইয়াহিয়া (আ.) -এর আলোচনা করা হয়েছে। এটি এ পর্যায়ের নবম ঘটনা। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি যাকারিয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন; তিনি যখন তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একলা ছেড়ে দিও না। অর্থাৎ, আমাদেরকে লা-ওয়ারিশ এবং নিঃসন্তান রেখো না, আমাকে সন্তান দান কর; যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ : 'তুমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী'। অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা দিতে পার। অথবা এর অর্থ হলো– প্রকাশ্য উত্তরাধিকারীগণ সকলেই শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু হে আল্লাহ! তুমি সর্বকালে থাকবে। তুমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং চির বিরাজমান।

قَوْلُهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ : আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে পুত্র সন্তান ইয়াহইয়াকে দান করেছিলেন। অথচ তাঁর স্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধা। আর এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আল্লাহ পাক তাঁকে সন্তানবতী হওয়ার যোগ্য করে দিলেন। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন বন্ধ্যা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত করে দিলেন।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ : 'এই নবীগণ সৎ কাজ সম্পাদনে প্রতিযোগিতা করতো'। অর্থাৎ কে কত বেশি নেক আমল করতে পারে, তার জন্যে সর্বদা তৎপর থাকতো । আর আমাকে ডাকতো আশা এবং ভয় নিয়ে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের নৈকট্যধন্য হওয়ার আশা, ছওয়াব লাভের আশা এবং দোয়া কবুল হওয়ার আশা নিয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতো। আর ভয় হলো আল্লাহ পাক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ভয়; তথা তাকে ভুলে থাকার ভয় অথবা গুনাহের ভয় অথবা আজাবের ভয়। অর্থাৎ, আশা এবং ভয়ের মধ্যে থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁরা দোয়া করতেন

قَوْلُهُ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ : তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম্যের কারণে মানব মনে যে ভয়ের সৃষ্টি হয় তাকেই 'খুশু' বলা হয়। যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফ হতেন, তাই তাঁরা তাঁদের অন্তরের গভীরে আল্লাহ পাকের ভয় পোষণ করতেন। আর ঐ ভয় থেকে সৃষ্টি হয় বিনয়ের। তাই তাঁরা হতেন অত্যন্ত বিনয়ী।

কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতেন এভাবে যে, তাঁরা আমার হুকুমের তাবেদার হতো অত্যন্ত বেশি।
–[তাফসীরে মাযহারী খ.৭, পৃ. ৫২২]

বর্ণিত আছে যে একবার হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর একটি ভাষণে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকো, তাঁর 'হামদ' পেশ করতে থাকো এবং আশা ও ভয় নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকো; আর বিনীতভাবে তাঁর দরবারে দোয়া করো। মনে রেখে, আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর এই সব গুণের উল্লেখ করেছেন পবিত্র কুরআনে।
–[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা– ১৭, পৃ. ৩২]

قَوْلُهُ وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত যাকারিয়া (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে সাধারণত হযরত যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর আলোচনার পরই হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়। কেননা, উভয় ঘটনার মধ্যে এক বিস্ময়কর মিল দেখতে পাওয়া যায়। হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ মানুষ এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা। এই অবস্থায় তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে দোয়া করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁকে ঐ অবস্থায় একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, যার নামকরণ করা হয়েছে ইয়াহইয়া। এ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা মারইয়ামের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এটি বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু এর চেয়েও অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম এবং হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনা। কেননা মারইয়াম (আ.) ছিলেন কুমারী। অথচ আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা হিসেবে তাঁর ঘরেই আল্লাহ পাক পয়দা করেছেন হযরত ঈসা (আ.)-কে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তিনি পিতা ব্যতীতও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন– হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামে স্থান পেয়েছে।

মূলত এসবই পাকের বিস্ময়কর কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। বিশ্ববাসীর জন্যে এসব হলো চিরস্মরণীয় নমুনা; যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যবস্থা রয়েছে সর্বকালের মানুষের জন্যে।

অনুবাদ :

٩٤. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ اَىْ جُحُوْدَ لِسَعْيِهٖ ج وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ـ بِاَنْ نَاْمُرَ الْحَفَظَةَ بِكُتُبِهٖ فَنُجَازِيْهِ عَلَيْهِ ـ

৯৪. সুতরাং যদি কেউ মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না অস্বীকার করা হবে না। এবং আমি তা লিখে রাখি এভাবে যে, রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দেই, তারই ভিত্তিতে আমি তাকে প্রতিফল দিব।

٩٥. وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اُرِيْدَ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ لَا زَائِدَةٌ يَرْجِعُوْنَ ـ اَىْ مُمْتَنِعٌ رُجُوْعُهُمْ اِلَى الدُّنْيَا ـ

৯৫. যে, জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষিদ্ধ হয়েছে যে, তার অধিবাসীরা উদ্দেশ্য। তার অধিবাসীবৃন্দ ফিরে আসবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব। এখানে لَا টা অতিরিক্ত।

٩٦. حَتّٰى غَايَةٌ لِاِمْتِنَاعِ رُجُوْعِهِمْ اِذَا فُتِحَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهٖ اِسْمَانِ اَعْجَمِيَانِ لِقَبِيْلَتَيْنِ وَيُقَدَّرُ قَبْلَهٗ مُضَافٌ اَىْ سَدُّهُمَا وَذٰلِكَ قُرْبَ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْاَرْضِ يَّنْسِلُوْنَ ـ يُسْرِعُوْنَ ـ

৯৬. এমনকি এখানে حَتّٰى টি তাদের প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হওয়ার সীমাকে বুঝিয়েছে। যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হবে فُتِحَتْ শব্দের تَاء বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। আর يَاْجُوْز، مَاْجُوْز শব্দ দুটি হামযাবিহীন ও হামযাসহ উভয়ভাবেই পড়া যায়। এটা অনারবি দুটি গোত্রের নাম। এর পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে আর তা হলো سَدُّهُمَا [তাদের প্রাচীর] এটা কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হবে তারা প্রত্যেক টিলা হতে উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে দ্রুতবেগে ধেয়ে আসবে।

٩٧. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاِذَا هِىَ اَىِ الْقِصَّةُ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِشِدَّتِهٖ يَقُوْلُوْنَ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكُنَا قَدْ كُنَّا فِى الدُّنْيَا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا الْيَوْمِ بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ـ اَنْفُسَنَا بِتَكْذِيْبِنَا الرُّسُلَ ـ

৯৭. অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। তখন অকস্মাৎ কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। সেদিনের কঠোরতার কারণে তারা বলবে হায় দুর্ভোগ আমাদের ধ্বংস আমাদের! এখানে يَاء টি সতর্কীকরণের জন্য আমরা তো ছিলাম পৃথিবীতে এ বিষয়ে উদাসীন এ দিন সম্পর্কে; বরং আমরা সীমালঙ্ঘনকারীই ছিলাম আমাদের নিজেদের প্রতি রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

٩٨. اِنَّكُمْ يَاَهْلَ مَكَّةَ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنَ الْاَوْثَانِ حَصَبُ جَهَنَّمَ وُقُوْدُهَا اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ـ دَاخِلُوْنَ فِيْهَا ـ

৯৮. তোমরা হে মক্কাবাসীরা! এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর অর্থাৎ তাঁকে ব্যতীত অন্যান্য মূর্তির সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন হবে। জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সকলেই তাতে প্রবেশ করবে।

অনুবাদ :

٩٩. لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَاۤءِ الْاَوْثَانُ اٰلِهَةً كَمَا زَعَمْتُمْ مَّا وَرَدُوْهَا ط دَخَلُوْهَا وَكُلٌّ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَالْمَعْبُوْدِيْنَ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

৯৯. যদি হতো এরা মূর্তিগুলো ইলাহ যেমনটি তোমরা ধারণা করেছ তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না, এবং তাদের সকলেই উপাসনাকারী ও উপাস্যদের তাতে স্থায়ী হতো।

١٠٠. لَهُمْ لِلْعَابِدِيْنَ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ . شَيْئًا لِشِدَّةِ غَلَيَانِهَا .

১০০. তাদের জন্য রয়েছে উপাসকদের জন্য সেথায় আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে না। কোনো কিছুই আগুনের তীব্রতার কারণে।

١٠١. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرٰى عُبِدَ عُزَيْرٌ وَالْمَسِيْحُ وَالْمَلَائِكَةُ فَهُمْ فِي النَّارِ عَلٰى مُقْتَضٰى مَا تَقَدَّمَ . اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْمَنْزِلَةُ الْحُسْنٰى وَمِنْهُمْ مَنْ ذُكِرَ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ .

১০১. যখন ইবনে যিবা'রা বলল যে, হযরত উযাইর ও ঈসা (আ.) এবং ফেরেশতাগণেরও উপাসনা করা হয়েছে কাজেই তোমাদের কথার চাহিদানুপাতে তারাও দোজখে যাবে, তখন অবতীর্ণ হলো– যাদের জন্য আমার নিকট হতে পূর্ব থেকেই কল্যাণ মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে এবং তন্মধ্য হতে যাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে।

١٠٢. لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا ج صَوْتَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ مِنَ النَّعِيْمِ خٰلِدُوْنَ ج .

১০২. তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবেন না তার আওয়াজ তারা সেথায় তাদের মন যা চাইবে ভোগ বিলাস হতে চিরকাল তা ভোগ করবেন।

١٠٣. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَهُوَ اَنْ يُّؤْمَرَ بِالْعَبْدِ اِلَى النَّارِ وَتَتَلَقّٰهُمُ تَسْتَقْبِلُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ط عِنْدَ خُرُوْجِهِمْ مِنَ الْقُبُوْرِ يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ . فِي الدُّنْيَا .

১০৩. মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবে না আর এটা সে সময় হবে যখন মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে। এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন কবর থেকে বের হওয়ার সময়। তারা তাদেরকে বলবেন, এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীতে।

অনুবাদ :

١٠٤. يَوْمَ مَنْصُوْبٌ بِاذْكُرْ مُقَدَّرًا قَبْلَهُ ـ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ اِسْمُ مَلَكٍ لِلْكُتُبِ صَحِيْفَةُ ابْنِ اٰدَمَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ اَوِ السِّجِلُّ الصَّحِيْفَةُ وَالْكِتَابُ بِمَعْنَى الْمَكْتُوْبِ بِهِ وَاللَّامُ بِمَعْنَى عَلٰى وَفِيْ قِرَاءَةٍ لِلْكُتُبِ جَمْعًا كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ عَنْ عَدَمٍ نُّعِيْدُهُ ط بَعْدَ اِعْدَامِهِ فَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِنُعِيْدُ وَضَمِيْرُهُ عَائِدٌ اِلٰى اَوَّلَ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَعْدًا عَلَيْنَا ط مَنْصُوْبٌ بِوَعَدْنَا مُقَدَّرًا قَبْلَهُ وَهُوَ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ مَا قَبْلَهُ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ مَا وَعَدْنَا ـ

১০৪. সেদিন يَوْمَ শব্দটি তার পূর্বে اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব যেমনিভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর سِجِلّ হলো একজন ফেরেশতার নাম। অর্থাৎ মৃত্যুকালে মানুষের আমলনামা। আর ل টি অতিরিক্ত। অথবা اَلسِّجِلُّ অর্থ আমলনামা। আর اَلْكِتَابُ এটা مَكْتُوْبٌ [লিখিত] অর্থে। আর ل টি عَلٰى অর্থে হয়েছে। অপর এক কেরাতে لِلْكُتُبِ বহুবচন রূপে এসেছে। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম অনস্তিত্ব থেকে সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব তার অস্তিত্ব বিনাশ করার পর। كَمَا -এর كَاف টি نُعِيْدُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর نُعِيْدُهُ -এর যমীর اَوَّلَ -এর দিকে ফিরেছে। আর مَا হলো মাসদারিয়া। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য ।وَعْدًا শব্দের পূর্বে بِوَعَدْنَا উহ্য থেকে এটা نَصْب দিয়েছে। এটা তার পূর্বের বাক্যের বিষয়বস্তুর জন্য তাকিদ স্বরূপ আমি এটা পালন করবই। যা আমি অঙ্গীকার করেছি।

١٠٥. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ بِمَعْنَى الْكِتَابِ اَيْ كُتُبِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ بِمَعْنَى اُمِّ الْكِتٰبِ الَّذِيْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنَّ الْاَرْضَ اَرْضَ الْجَنَّةِ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ـ عَامٌّ فِيْ كُلِّ صَالِحٍ ـ

১০৫. আমি যাবূরে লিখে দিয়েছি যাবূর অর্থ হলো কিতাব অর্থাৎ আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব। উপদেশের পর ذِكْر এটা উম্মুল কিতাব অর্থে। অর্থাৎ লৌহে মাহফুজে লেখার পর যা আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রয়েছে। নিশ্চয় ভূমির জান্নাতের ভূমির অধিকারী হবে আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ। এখানে اَلصّٰلِحُوْنَ শব্দটি عَامٌّ বা ব্যাপক যা প্রত্যেক সৎকর্মশীলকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

١٠٦. اِنَّ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَبَلٰغًا كِفَايَةً فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ عَامِلِيْنَ بِهِ ـ

১০৬. নিশ্চয় এতে রয়েছে কুরআনে উপদেশবাণী যা জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা ইবাদত করে। সে অনুপাতে আমলকারীদের জন্য।

١٠٧. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَحْمَةً اَيْ لِلرَّحْمَةِ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ بِكَ ـ

১০৭. আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি। হে মুহাম্মদ ﷺ কেবল রহমত স্বরূপ অর্থাৎ করুণার জন্য বিশ্ব জগতের প্রতি মানুষ এবং জিনের জন্য আপনার মাধ্যমে।

অনুবাদ :

١٠٨. قُلْ إِنَّمَا يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج أَيْ مَا يُوْحَى إِلَيَّ فِي أَمْرِ الْإِلٰهِ إِلَّا وَحْدَانِيَّتُهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ مُنْقَادُوْنَ لِمَا يُوْحَى إِلَيَّ مِنْ وَحْدَانِيَّتِهِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ـ

১০৮. বলুন, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ অর্থাৎ, আমার নিকট ইলাহ এর ব্যাপারে এটা ছাড়া আর কোনো প্রত্যাদেশ করা হয়নি যে, তিনি একসত্তা। সুতরাং তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে যাও আমার নিকট প্রত্যাদেশকৃত তার একত্ববাদের প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে যাও। এখানে إِسْتِفْهَامٌ মূলত নির্দেশসূচক।

١٠٩. فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ أَعْلَمْتُكُمْ بِالْحَرْبِ عَلٰى سَوَاءٍ ط حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ أَيْ مُسْتَوِيْنَ فِي عِلْمِهِ لَا أَسْتَبِدُّ بِهِ دُوْنَكُمْ لِتَتَأَهَّبُوْا وَإِنْ مَا أَدْرِيْ أَقَرِيْبٌ أَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ـ مِنَ الْعَذَابِ أَوِ الْقِيٰمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ اللّٰهُ ـ

১০৯. তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে এটা হতে আপনি বলুন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি যুদ্ধের ব্যাপারে অবহিত করেছি। যথাযথভাবে এটা فَاعِلٌ ও مَفْعُوْلٌ উভয় থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ তার সঠিক জ্ঞানের ব্যাপারে উভয় পক্ষই সমপর্যায়ের। শুধুমাত্র আমিই সে বিষয়ে অবহিত এমন নয়। যাতে তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমি জানি না তা আসন্ন না দূরস্থিত। শাস্তি অথবা কিয়ামত যা শাস্তি সংশ্লিষ্ট। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

١١٠. إِنَّهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ـ أَنْتُمْ وَغَيْرُكُمْ مِنَ السِّرِّ ـ

১১০. তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত ও কর্মের ব্যাপারে তোমাদের থেকে ও অন্যদের থেকে। এবং যা তোমরা গোপন কর। তোমরা ও অন্যরা গোপন বিষয় থেকে।

١١١. وَإِنْ مَا أَدْرِيْ لَعَلَّهُ أَيْ مَا أَعْلَمْتُكُمْ بِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ وَقْتُهُ فِتْنَةٌ إِخْتِبَارٌ لَّكُمْ لِيَرٰى كَيْفَ صُنْعُكُمْ وَمَتَاعٌ تَمَتُّعٌ إِلٰى حِيْنٍ أَيْ إِنْقِضَاءِ اٰجَالِكُمْ وَهٰذَا مُقَابِلٌ لِلْأَوَّلِ الْمُتَرَجّٰى بِلَعَلَّ وَلَيْسَ الثَّانِيْ مَحَلًّا لِلتَّرَجِّيْ ـ

১১১. আমি জানি না হয়তো এটা অর্থাৎ যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করলাম অথচ তার সময় জানা যায়নি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা স্বরূপ যাতে তোমরা কিরূপ আমল কর তা জানা যায়। এবং কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত। এটা অর্থাৎ مَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ প্রথমটি তথা لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ -এর বিপরীত; لَعَلَّ দ্বারা যে আশা পোষণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি নিশ্চিত বিষয় হওয়া এটা لَعَلَّ -এর ক্ষেত্র নয়।

অনুবাদ :

١١٢. قُلْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مُكَذِّبِيْ بِالْحَقِّ ط بِالْعَذَابِ لَهُمْ اَوِ النَّصْرِ عَلَيْهِمْ فَعُذِّبُوْا بِبَدْرٍ وَاُحُدٍ وَالْاَحْزَابِ وَحُنَيْنٍ وَالْخَنْدَقِ وَنُصِرَ عَلَيْهِمْ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ - مِنْ كِذْبِكُمْ عَلَى اللّٰهِ فِيْ قَوْلِكُمْ اِتَّخَذَ وَلَدًا وَعَلَيَّ فِيْ قَوْلِكُمْ سَاحِرٌ وَعَلَى الْقُرْاٰنِ فِيْ قَوْلِكُمْ شِعْرٌ -

১১২. আপনি বলুন! অন্য কেরাতে রয়েছে قَالَ তথা তিনি বললেন। হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফয়সালা করে দিন। আমার ও আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মাঝে ন্যায়ের সাথে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করে অথবা তাদের বিপক্ষে সাহায্য করে। সুতরাং তাদেরকে বদর ও ওহুদ আহযাব, হুনায়ন এবং খন্দকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের বিপক্ষে সাহায্য করা হয়েছে। আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের এ মিথ্যারোপের ব্যাপারে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং আমার ব্যাপারে তোমাদের এ উক্তিতে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন যাদুকর এবং কুরআনের ব্যাপারে তোমাদের এ কথায় যে, তা স্বরচিত কবিতা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ : এখানে مِنْ অতিরিক্ত বা تَبْعِيْضِيَّة তথা অংশজ্ঞাপক। كُفْرَانَ শব্দটি مَصْدَرْ এটা কুফর অর্থে।

قَوْلُهُ لَهُ اَيْ لِلسَّعْيِ : এখানে ةُ যমীর দ্বারা سَعْي উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এটা مَنْ -এর প্রতি ফিরেছে।

قَوْلُهُ حَرَامٌ : এটা خَبَر مُقَدَّمْ আর اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ উদ্দেশ্য এই যে, যে গ্রামবাসীকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, তাদের দ্বিতীয়বার দুনিয়ার ফিরে আসা অসম্ভব। কেউ কেউ এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, তাদের ঈমানের প্রতি ফিরে আসা অসম্ভব। কারণ তাদের ব্যাপারে হতভাগ্যতার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এখানে لا অতিরিক্ত, যদি حَرَامٌ শব্দটি وَاجِبٌ অর্থে হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে তাদের দুনিয়ায় ফিরে না আসা অবশ্যম্ভাবী। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো প্রতিদানের জন্য ফিরে আসা অসম্ভব।

قَوْلُهُ حَتّٰى : এটা لَا يَرْجِعُوْنَ -এর غَايَتْ অর্থাৎ, প্রান্তসীমা, উদ্দেশ্য হলো কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ফিরে আসা অসম্ভব। আর حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّه -ও হতে পারে। এ সময় বাক্যটি مُسْتَأْنِفَة হবে। فَاِذَا هِيَ এটা اِذَا فُتِحَتْ -এর جَزَاء এখানে اِسْنَادْ مَجَازِيْ হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে বিজিত বস্তু হলো ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর; ইয়াজুজ মাজুজ নয়।

قَوْلُهُ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ : এ দুটো ভিন্ন দল। উভয়টি অনারবি শব্দ। যাহহাক -এর উক্তি মতে এরা হলো তুর্কীদের বংশধর। সকল ঐতিহাসিক তাদেরকে ইয়াফিস ইবনে নূহ -এর বংশধর বলেছেন। কারো কারো মতে, এরা হলো তুরস্কের তাতারি সম্প্রদায়। তাওরাতের জন্মধ্যায় ২ : ১০ পরিচ্ছেদে ইয়াফিস এর এক পুত্রের নাম মাগুগ (مَا غُوْغ) উল্লিখিত হয়েছে। ইবরানী ভাষায় غ এর উচ্চারণ گ দ্বারা করা হয়। এর কারণে مَاغُوْغ শব্দটি مَاگُوگ হয়ে গেছে। আর আরবিতে گ কে ج দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। ফলে আরবি উচ্চারণে এটি মাজুজ হয়েছে। –[লুগাতুল কুরআন]

ইয়াজুজ মাজুজ খুলে যাওয়ার দ্বারা এখানে বাদশাহ সিকান্দর নির্মিত প্রাচীর খুলে যাওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ حَدَبٍ : এর অর্থ হলো টিলা, উঁচু ভূমি, বহুবচনে اَحْدَابٌ

قَوْلُهُ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ : এর عَطْف হলো فُتِحَتْ -এর উপর। يَاوَيْلَنَا -এর পূর্বে يَقُوْلُوْنَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, حَصَبُ مَا يُحْصَبُ بِهٖ - اَيْ يُرْمٰى بِهٖ অর্থ– জ্বালানী, ইন্ধন।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة -ও হতে পারে এবং بَدَل -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ فِى الزَّبُوْرِ : এখানে ال টি جِنْس-এর জন্য। অর্থাৎ, كُتُبُ اللّٰهِ লিখে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যাবুর দ্বারা এখানে স্বাভাবিক আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য। হযরত দাউদ (আ.)-এর উপরে অবতারিত যাবূর কিতাব উদ্দেশ্যে নয়। زَبُوْرٌ -এর বহুবচন হলো زُبُرٌ আর لِلْكُتُبِ এটা হয়ত اَلسِّجِلِّ থেকে حَال অর্থাৎ- اَلسِّجِلِّ كَائِنًا لِلْكُتُبِ অথবা صِفَت তথা اَلسِّجِلِّ الْكَائِنِ لِلْكُتُبِ

قَوْلُهُ كَمَا بَدَاْنَا كُلَّ : আসল বাক্যটি এমন ছিল كَمَا بَدَاْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِىْ اَوَّلِ خَلْقِهِ كَذٰلِكَ نُعِيْدُ كُلَّ شَيْءٍ এখানে شَيْءٍ -এর উহ্য مَفْعُوْل আর اَوَّل خلق হলো ظَرْف আর نُعِيْدُ -এর ضَمِيْر টি كُلَّ شَيْءٍ -এর প্রতি ফিরেছে।

قَوْلُهُ لِلرَّحْمَةِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা হলো مَفْعُوْل لَهُ আবার مُبَالَغَة স্বরূপ حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْخَنْدَقِ : এখানে خَنْدَق শব্দটি ভুলবশত লিখিত হয়েছে। কেননা আহযাব এবং খন্দক উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ : এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরিয়তগত অসম্ভব'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'

قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُوْنَ : এ বাক্যে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে لَا টি অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোনো কোনো তাফসীরবিদ حَرَامٌ শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরি অর্থে ধরে لَا -কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আজাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরি। -[কুরতুবী] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ : এখানে حَتّٰى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন, যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেওয়া হবে। কুরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

قَوْلُهُ حَدَبٍ : শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি, বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহাফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তর দিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তর দিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়া পড়তে দেখা যাবে।

قَوْلُهُ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ : অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে। এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আ.), হযরত উযাইর (আ.) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তাফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জবাব তাদের জানা থাকার কারণে তারা জিজ্ঞাসা করে না, নাকি তারা সন্দেহ ও জবাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না! লোকেরা আরজ করল, আপনি কোন আয়াতের কথা বলেছেন? তিনি বললেন, আয়াতটি হলো এই- إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফেরদের বিতৃষ্ণার সীমা থাকেনি। তারা বলতে থাকে, এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা [কিতাবী আলেম] ইবনে যিবা'রার কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জবাব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কি জবাব দিতেন? তিনি বললেন, আমি বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর এবং ইহুদিরা হযরত উযায়র (আ.)-এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে [হে মুহাম্মদ] আপনি কি বলেন? [নাউযুবিল্লাহ] তাঁরা কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ ﷺ এ কথার কোনো জবাব দিতে পারবে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেন- إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

অর্থাৎ, যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যিবা'রা সম্পর্কেই কুরআন পাকের এই আয়াত নাজিল হয়েছিল- وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ অর্থাৎ, যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

قَوْلُهُ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা দোজখের ক্ষীণ শব্দও শুনতে পাবেন না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- কিয়ামতের সেই মহা বিপদেও নেককার মুমিনগণ চিন্তিত হবেন না এবং ভীত সন্ত্রস্তও হবেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- فَزَعٌ أَكْبَرُ [মহাত্রাস] বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফূঁৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী (র.) বলেন, শিঙ্গায় তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فَزَعٌ أَكْبَرُ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফূঁৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুঁৎকার। এতে সবকিছু জীবিত হয়ে যাবে। এ বক্তব্যের সমর্থনে বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবূ হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। -[মাযহারী] وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) سِجِلّ শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) প্রমুখও এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর ও ইবনে জারীর (র.) প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كُتُبٌ শব্দের অর্থ এখানে مَكْتُوْبٌ অর্থাৎ, লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। -[ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী]

سِجِلّ সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোনো ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েত গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্র করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ : زَبُوْرٌ শব্দটি زُبُرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زَبُوْر বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذِكْر বলে তাওরাত এবং زَبُوْر বলে তাওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহর গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে। যথা- ইঞ্জীল, যবুর ও কুরআন। -[ইবনে জরীর] যাহ্হাক থেকে এরূপ তাফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়েদ বলেন, ذِكْر বলে লওহে মাহফূজ এবং زَبُوْر বলে পয়গাম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর সকল গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ (র.) এ অর্থই পছন্দ করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

اَلْاَرْضُ সাধারণ তাফসীরবিদদের মতে এখানে اَرْض [পৃথিবী] বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবাইর, ইকরিমা , সুদ্দী আবুল আলিয়া (র.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন কুরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ, সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, اَرْض -এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী অর্থাৎ, দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। [জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ হবেন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে- اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে- وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা করবেন। অপর এক আয়াতে আছে- اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ। অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আমার পয়গাম্বরগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামানার আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। -[রূহুল মা'আনী, ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ : عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ -এর বহুবচন। মানব, জিন জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর জিকির ও ইবাদত সব বস্তুর রূহ, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যে, সব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল! কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। -[ইবনে আসাকির]

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন- اَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ بِرَفْعِ قَوْمٍ وَخَفْضِ اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ, আমি আল্লাহ প্রেরিত রহমত, যাতে [আল্লাহর আদেশ পালনকারী] এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং [আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী] অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই। -[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ : সূরা হাজ্জ মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ الْاٰيَتَيْنِ اَوْ اِلَّا هٰذَانِ خَصْمَانِ اَلسِّتَّ اٰيَاتٍ فَمَدَنِيَّاتٌ وَهِىَ اَرْبَعٌ اَوْ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ اَوْ سَبْعٌ اَوْ ثَمَانٌ وَسَبْعُوْنَ اٰيَةً ـ

তবে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ দু'আয়াত [১১ ও ১২নং আয়াত] কিংবা هٰذَانِ خَصْمَانِ [১৯ – ২৪নং আয়াত] এ ছয় আয়াত মাদানী। এতে ৭৪/৭৫/ ৭৬/ ৭৭ বা ৭৮ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ وَغَيْرُهُمْ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اَىْ عِقَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ اَىِ الْحَرَكَةَ الشَّدِيْدَةَ لِلْاَرْضِ الَّتِىْ يَكُوْنُ بَعْدَهَا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا الَّذِىْ هُوَ قُرْبُ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ ـ فِىْ اِزْعَاجِ النَّاسِ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعِقَابِ ـ

১. হে মানুষ অর্থাৎ মক্কাবাসীও অন্যান্যরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে। এভাবে যে, তোমরা তার অনুসরণ করবে নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচণ্ড ভূমিকম্প যা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার পর সংঘটিত হবে। এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার মানুষকে হতবিহবল করার ক্ষেত্রে এটাও এক ধরনের শাস্তি।

২. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ بِسَبَبِهَا كُلُّ مُرْضِعَةٍ بِالْفِعْلِ عَمَّا اَرْضَعَتْ اَىْ تَنْسَاهُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ اَىْ حُبْلٰى حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى مِنَ الشَّرَابِ وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ـ فَهُمْ يَخَافُوْنَهُ ـ

২. যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন বিস্মৃত হবে তার কারণে প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী কর্মের মাধ্যমে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে অর্থাৎ, ভুলে যাবে তাকে। এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে অর্থাৎ গর্ভধারিণী নারী তার গর্ভকে, আর মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ অতিশয় ভয়ের কারণে যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয় মদপানের কারণে বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন। সে শাস্তিতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

অনুবাদ :

٣. وَنَزَلَ فِى النَّضْرِبْنِ الْحَارِثِ وَجَمَاعَةٍ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ قَالُوْا اَلْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ وَ الْقُرْاٰنُ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَاَنْكَرُوا الْبَعْثَ وَاِحْيَاءَ مَنْ صَارَ تُرَابًا وَّيَتَّبِعُ فِى جِدَالِهٖ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ اَىْ مُتَمَرِّدٍ .

৩. নযর ইবনে হারেছ ও একদলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে– মানুষের মধ্যে কতেক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে তারা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। আর পবিত্র কুরআন হলো পূর্বকালের কিসসা কাহিনী। আর তারা পুনরুত্থান ও মাটিতে পরিণত হওয়া ব্যক্তিবর্গকে জীবিতকরণকে অস্বীকার করে। এবং সে অনুসরণ করে বাকবিতণ্ডায় প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।

٤. كُتِبَ عَلَيْهِ قُضِىَ عَلَى الشَّيْطَانِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ اَىْ اِتَّبَعَهٗ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ يَدْعُوْهُ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ . اَىِ النَّارِ .

৪. তার সমন্ধে এই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, শয়তানের ব্যাপারে এই ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে তার অনুসরণ করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে আহবান করবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে। অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে।

٥. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ شَكٍّ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ اَىْ اَصْلَكُمْ اٰدَمَ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَهٗ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِىٍّ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ وَهِىَ الدَّمُ الْجَامِدُ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ وَهِىَ لَحْمَةٌ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ مُّخَلَّقَةٍ مُصَوَّرَةٍ تَامَّةِ الْخَلْقِ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ اَىْ غَيْرِ تَامَّةِ الْخَلْقِ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط كَمَالَ قُدْرَتِنَا لِتَسْتَدِلُّوْا بِهَا فِىْ اِبْتِدَاءِ الْخَلْقِ عَلٰى اِعَادَتِهٖ وَنُقِرُّ مُسْتَانِفٌ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۤءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَقْتَ خُرُوْجِهٖ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ طِفْلًا بِمَعْنٰى اَطْفَالًا .

৫. হে মানুষ অর্থাৎ হে মক্কাবাসীগণ! যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও সংশয় পোষণ কর পুনরুত্থান সম্পর্কে তবে জেনে রেখো! আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তোমাদের মূল তথা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মৃত্তিকা হতে অতঃপর আমি তাঁর সন্তানাদিকে সৃষ্টি করেছি তার শুক্র হতে অতঃপর আলাক হতে আর আলাক হলো জমাট রক্ত। অতঃপর মাংসপিণ্ড হতে আর তা হলো চিবানো পরিমাণ গোশতের টুকরা পূর্ণাকৃতি সৃষ্টির পূর্ণ অবয়ব এবং অপূর্ণাকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির অপূর্ণাঙ্গ অবয়ব তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য আমার পরিপূর্ণ ক্ষমতা, যাতে তোমরা সৃষ্টির সূচনা দ্বারা তাকে পুনরুত্থানের ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করতে পার। আমি স্থিত রাখি এটা জুমলায়ে মুস্তানিফা মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্য গর্ভাশয় হতে বহির্গমনকাল পর্যন্ত তারপর আমি তোমাদেরকে বের করি মায়ের উদর হতে শিশু রূপে طِفْلًا শব্দটি اَطْفَالًا অর্থে হয়েছে।

ثُمَّ نُعَمِّرُكُمْ لِتَبْلُغُوْآ اَشُدَّكُمْ ج اَيِ الْكَمَالَ وَالْقُوَّةَ وَهُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِيْنَ اِلَى الْاَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى يَمُوْتُ قَبْلَ بُلُوْغِ الْاَشُدِّ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ اَخَسِّهٖ مِنَ الْهَرَمِ وَالْخَرَفِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا قَالَ عِكْرِمَةُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَصِرْ بِهٰذِهِ الْحَالَةِ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً يَابِسَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ تَحَرَّكَتْ وَرَبَتْ اِرْتَفَعَتْ وَزَادَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ زَائِدَةٌ كُلِّ زَوْجٍ صِنْفٍ بَهِيْجٍ حَسَنٍ .

অনুবাদ :

অতঃপর তোমাদেরকে জীবনকাল দান করি যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। অর্থাৎ বয়সের পূর্ণতায় ও শক্তিতে। আর তা হলো ত্রিশ হতে চল্লিশ বছরের মাঝামাঝি সময়। এবং তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটানো হয় পরিণত বয়সে পৌঁছার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে বার্ধক্যের বয়সের হীনতম পর্যায়ে এবং বিবেকশূন্যতার স্তরে উপনীত হয়। যার ফলে যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকে না। ইকরিমা (র.) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে সে এ অবস্থায় উপনীত হবে না। আপনি ভূমিকে দেখেন শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি পানি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত হয় নড়চড়া করে ও স্ফীত হয় উঁচু হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ সুন্দর এখানে مِنْ টি অতিরিক্ত।

٦. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ مِنْ بَدْأِ خَلْقِ الْاِنْسَانِ اِلٰى اٰخِرِ اِحْيَاءِ الْاَرْضِ . بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ الدَّائِمُ وَاَنَّهٗ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

৬. এটা উল্লিখিত মানবসৃষ্টির সূচনা হতে নিয়ে ভূমি উজ্জীবিতকরণ পর্যন্ত সবকিছু এ জন্য এ কারণে যে আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٧. وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا ط وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ .

৭. কিয়ামত আসবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই সংশয় নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে নিশ্চয় আল্লাহ উত্থিত করবেন।

٨. وَنَزَلَ فِيْ اَبِيْ جَهْلٍ . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى مَّعَهٗ وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ . لَهٗ نُوْرٌ مَّعَهٗ .

৮. আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে– মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ তার সাথে। না আছে কোনো দীপ্তিমান কিতাব।

অনুবাদ :

٩. ثَانِىَ عِطْفِهٖ حَالٌ اَىْ لَاوِى عُنُقِهٖ تَكَبُّرًا عَنِ الْاِيْمَانِ وَالْعِطْفُ الْجَانِبُ عَنْ يَمِيْنٍ اَوْ شِمَالٍ لِيُضِلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا ـ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط دِيْنِهٖ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ عَذَابٌ فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـ اَىِ الْاِحْرَاقِ بِالنَّارِ ـ

৯. ঘাড় বাকিয়ে এ বাক্যটি حَالٌ হয়েছে অর্থাৎ ঈমানের বিষয়ে অহংকারবশত ঘাড় বাঁকা করে বিতণ্ডা করে, আর عِطْف হলো ডান বা বাম দিক, ভ্রষ্ট করার জন্য لِيُضِلَّ-এর يَاء বর্ণে যবর ও পেশ উভয় হরকতই হতে পারে আল্লাহর পথ হতে তাঁর দীন হতে। তার জন্য আছে ইহলোকে লাঞ্ছনা শাস্তি। সুতরাং তাকে বদর যুদ্ধের দিনে হত্যা করা হয়। এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদ করাব দহন যন্ত্রণা। অর্থাৎ আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেওয়া।

١٠. وَيُقَالُ لَهٗ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ اَىْ قَدَّمْتَهٗ عُبِّرَ عَنْهُ بِهِمَا دُوْنَ غَيْرِهِمَا لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهِمَا وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ اَىْ بِذِىْ ظُلْمٍ لِّلْعَبِيْدِ ـ فَيُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ ـ

১০. তাকে বলা হবে এটা তোমার কৃতকর্মের ফল অর্থাৎ তুমি পূর্বে যা প্রেরণ করেছ তার। এখানে ব্যক্তিকে হাত দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নয়। কেননা হাত দ্বারাই মানুষের অধিকাংশ কাজের সমাপ্তি ঘটে থাকে। কারণ আল্লাহ জুলুম করেন না অর্থাৎ অত্যাচারী নন, বান্দাদের প্রতি যে, তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ বিনেই শাস্তি দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ : কিয়ামতের দিনের ভূকম্পন, এখানে اِضَافَتْ اِلَى الظَّرْفِ-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন. يَا سَارِقَ اللَّيْلِ-এর মধ্যে হয়েছে। আর যরফের ক্ষেত্রে এটা বৈধ।

قَوْلُهٗ اَلَّتِىْ يَكُوْنُ بَعْدَهَا طُلُوْعُ الشَّمْسِ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দ্বারা উদ্দেশ্যে নিয়ছেন যে, এ কম্পন দুনিয়াতেই হবে এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পরে হবে। এই উক্তির সমর্থন হয় আল্লাহ তা'আলার বাণী- تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ দ্বারা।

قَوْلُهٗ بِالْفِعْلِ : এর উদ্দেশ্য হলো, দুধ পান করানোর অবস্থা। যখন মা সন্তানের প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হয় এমন অবস্থায় সে তীব্র ভূকম্পন দেখে তার সন্তান থেকে বেখবর হয়ে যাবে। عَمَّآ اَرْضَعَتْ-এর مَا হলো مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ, عَنْ اِرْضَاعِهَا আবার مَوْصُوْلَةٌ-ও হতে পারে। অর্থাৎ- عَنِ الَّذِىْ اَرْضَعَتْهُ

قَوْلُهٗ يَوْمَ تَرَوْنَهَا : এখানে يَوْمَ-এর নসবের কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যথা- ১. تَذْهَلُ-এর কারণে। ২. উহ্য اُذْكُرْ فِعْل-এর কারণে। ৩. اَلسَّاعَةَ থেকে বদল হওয়ার কারণে। ৪. عَظِيْمٌ-এর কারণে।

قَوْلُهٗ تَذْهَلُ : এটা تَرَوْنَهَا-এর ضَمِيْر থেকে حَالٌ, এর দ্বারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ : এখানে لٰكِنَّ-এর পরবর্তী অংশ তার নীতি অনুযায়ী পূর্ববর্তী অংশের বিপরীত উদ্দেশ্য।

কিবলামুখী থাকার প্রয়াস মোস্তাহাব ও পছন্দনীয়। ৫. পঞ্চমবারে আত্মিক মনোযোগ অর্থাৎ যেদিকে প্রতিপালকের বিশেষ সুদৃষ্টি রয়েছে, দিল যেন সেদিকেই নিমগ্ন থাকে এবং ৬. ষষ্ঠবারের উদ্দেশ্য তাকিদ ও দৃঢ়তা প্রদান অর্থাৎ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করা। –[তাফসীরে মাজেদী]

৩. মুফাসসিরগণ নিজ নিজ রুচি ও কুরআনবোধের আলোকে পুনরুল্লেখ বিধানের আরো নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। যেমন–

* কেউ বলেন, প্রথমবার নবীজির মন খুশি করার জন্যে, দ্বিতীয়বার সকল উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে, তৃতীয়বার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি নিরসনের জন্যে।

* কেউ বলেন, প্রথমবার হরমের অধিবাসীদের ব্যাপারে, দ্বিতীয়বার জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীদের জন্যে এবং তৃতীয়বার সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে।–[মা'আরিফুল করআন : আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) খ. ১, পৃ. ২৪৫]

قَوْلُهُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ : কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তাওরাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কিবলা ছিল কা'বা এবং শেষ নবীকেও এদিকেই মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। কাজেই আপনাকে কা'বার দিকে ফেরার নির্দেশ না দেওয়া হলে ইহুদিরা অবশ্যই অভিযোগ তুলত। অপর দিকে মক্কা শরীফের মুশরিকরা বলত, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কিবলা ছিল কা'বা আর এই নবী ইবরাহীমী ধর্মাদর্শের দাবি করেন অথচ কিবলার ক্ষেত্রে করেন তাঁর বিরোধিতা। এখন তাদের কারোরই কথা বলার সুযোগ থাকল না।

তবে বেয়াড়া স্বভাব উল্টোরথীদের কথা আলাদা। ওরা এ প্রাঞ্জলতার পরেও প্রশ্নের ঝড় তুলে গোঁয়ার্তুমি করবে। যেমন কুরাইশরা বলবে– তিনি এখন জানতে পেরেছেন আমাদের কিবলা সত্য, তাই এটা অবলম্বন করেছেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমাদের অন্যান্য রীতিনীতিও স্বীকার করে নেবেন। ইহুদিরা বলবে– আমাদের কিবলার সত্যতা জানার ও স্বীকার করে নেওয়ার পর এখন আবার আমাদের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার কারণেই কেবল নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী তা ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই এরূপ অবিবেচকদের মন্তব্যের কোনো পরোয়া করবেন না। আমার আদেশ পালন করুন।
–[তাফসীরে উসমানী ও মাজেদী]

قَوْلُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ : ইসলামি শরিয়ত পৃথিবীর বুকে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবসম্মত জীবন বিধান। এর কিবলা স্থিরীকরণ ও কা'বামুখী হওয়ার বিধানও এ পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। لَعَلَّكُمْ -এর لَعَلَّ অব্যয় كَيْ [যাতে করে] অব্যয়ের সমার্থক, সন্দেহ বা দ্বিধাবোধক নয়। এর অর্থ হবে– 'যাতে' বা 'যেন'। হযরত থানভী (র.) বলেছেন, যারা আগে হতে হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের সম্পর্কে আবার হেদায়েতপ্রাপ্তিতে ধন্য হওয়ার কথা বলা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তরসমূহ অসীম ও অপরিসীম।

অনুবাদ :

١٥١. كَمَآ اَرْسَلْنَا مُتَعَلِّقٌ بِاُتِمَّ اَىْ اِتْمَامًا كَاِتْمَامِهَا بِاِرْسَالِنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ مُحَمَّدًا ﷺ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنَ وَيُزَكِّيْكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ـ

১৫১. যেমন আমি প্রেরণ করেছি كَمَآ اَرْسَلْنَا পূর্বের لِاُتِمَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ বা যুক্ত। তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট একজন রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে, যাতে আমার অন্যান্য অনুগ্রহের পূর্ণতা বিধানের মতো তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আমি আমার এই অনুগ্রহেরও পূর্ণতা বিধান করতে পারি। যে আমার আয়াতসমূহ অর্থাৎ আল কুরআন তোমাদের নিকট আবৃত্তি করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে অর্থাৎ শিরক হতে তোমাদেরকে পাক করে এবং কিতাব আল-কুরআন ও হিকমত তাঁর আহকাম ও বিধিবিধানসমূহ শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা জনতে না তা শিক্ষা দেয়।

١٥٢. فَاذْكُرُوْنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالتَّسْبِيْحِ وَنَحْوِهٖ اَذْكُرْكُمْ قِيْلَ مَعْنَاهُ اُجَازِيْكُمْ وَفِى الْحَدِيْثِ عَنِ اللّٰهِ مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَمَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِّنْ مَلَئِهٖ وَاشْكُرُوْا لِىْ نِعْمَتِىْ بِالطَّاعَةِ وَلَا تَكْفُرُوْنِ بِالْمَعْصِيَةِ ـ

১৫২. সালাত, তাসবীহ ইত্যাদির মাধ্যমে তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। বলা হয়, এর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করব। আল্লাহর পক্ষ হতে বর্ণিত হাদীসে [হাদীসে কুদসীতে] আছে, যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করবে। যে ব্যক্তি আমাকে কোনো সমাবেশে স্মরণ করবে আমিও তাকে তা হতে উৎকৃষ্টতর সমাবেশে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

তাহকীক ও তারকীব

اِتْمَامٌ : পূরিপূর্ণ করা। يُزَكِّيْكُمْ : تَزْكِيَةٌ (تفعيل) زَكّٰى অর্থ– শুদ্ধ করা, পবিত্র করা।
اُجَازِيْكُمْ : তোমাদেরকে প্রতিদান দেব। مَلَاٌ : সমাবেশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : এ পর্যন্ত কিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কিবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে : কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, নাকি এর আগেই হবে? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিমতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে। যথা ১. إِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ২. وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ৩. إِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ইত্যাদি। কেউ কেউ হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই, যে উভয় উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যধাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোনো খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে। −[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ الخ : শানে নুযূল : এই আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। এ লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়। সে ছিল ইসলামের দুশমন, সত্যের দুশমন, মানবতার দুশমন। সে বলতো, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা, পবিত্র কুরআন পূর্বকালের লোকদের রচনা। [নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক] সে পরকালীন জিন্দেগীকে অস্বীকার করতো এবং বলতো, মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে এরপর তার পুনর্জীবন সম্ভব নয়।
−[ইবনে আবি হাতেম, তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ১৮]

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, এই আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো কারো মতে, এই আয়াত নাজিল হয়েছে উবাই ইবনে খালফ সম্পর্কে। −[রূহুল মা'আনী− খ. ১৭, পৃ. ১১৪]

আর আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এই আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেস সম্পর্কে। এই দুরাত্মা বলেছিল, "তোমরা যে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বল তিনি কি স্বর্ণের নাকি রৌপ্যের, নাকি তামার"? তার এই প্রশ্নে আসমান প্রকম্পিত হয়ে উঠলো এবং তার মাথার খুলি উড়ে গেল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে এক ইহুদি এমন প্রশ্ন করেছিল, ফলে আসমান থেকে বজ্রপাত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিল। −[তাফসীরে তাবারী খ. ১৭, পৃ. ৮৯]

আল্লামা শওকানী (র.) লিখেছেন, নজর ইবনে হারেস লোকটি ছিল অত্যন্ত কলহপ্রিয়, মূর্খ ও অহংকারী। সে আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করতো। তার ধারণা তিনি মৃতদেরকে পুনর্জীবন দান করতে পারবেন না। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) আর কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়েছে ওলীদ ইবনে মুগীরা ও উতবা ইবনে রাবিয়া সম্পর্কে।
−[তাফসীরে ফতহুল কাদীর খ. ৩, পৃ. ৪৩৭]

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের শানে নুযূলের বর্ণনায় রয়েছে যে, এই আয়াত নজর ইবনে হারেছ অথবা আবূ জাহল বা উবাই ইবনে খালাফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে; কিন্তু আধুনিক যুগে ঐ দুরাত্মা কাফেরদের অনুরূপ ভ্রান্ত মত পোষণকারী দেখা যায় অনেককে, বিশেষত যারা ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদেরকে দেখা যায় এমন অযৌক্তিক,অবান্তর এবং অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য করতে। −[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৬৭৬]

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী দুরাত্মা কাফের নজর ইবনে হারেসের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে তাদের শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে যারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সন্দিহান হয় তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ে মানুষের সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে এবং মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির কথা স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে প্রথমবার যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করবেন বরং দ্বিতীয়বারের সৃষ্টি হবে প্রথম বারের তুলনায় সহজ। তাই ইরশাদ হয়েছে–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

"হে মানবজাতি! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর তবে একথা জেনে রেখ যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে।"

قَوْلُهُ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ : মাতৃগর্ভে মানবসৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা : এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেওয়া হয়। ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিজিক পাবে. ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, নাকি হতভাগা। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় তখন মানবসৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করে : يَا رَبِّ مُخَلَّقَةٌ أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ অর্থাৎ, এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কিনা? যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জবাবে مُخَلَّقَةٌ বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, ছেলে নাকি কন্যা? হতভাগা নাকি ভাগ্যবান? তখনই ফেরেশতাকে সবকিছু বলে দেওয়া হয়। –[ইবনে কাসীর]

غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَةٌ শব্দদ্বয়ের এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ : উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তাফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مُخَلَّقَةٌ এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ; কোনো কোনো তাফসীরকারক غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ও مُخَلَّقَةٌ -এর এরূপ তাফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয় সে مُخَلَّقَةٌ অর্থাৎ, পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا : অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ -এর অর্থ তাই। اَشُدَّ শব্দটি شِدَّةٌ -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

قَوْلُهُ اَرْذَلِ الْعُمُرِ : اَرْذَلِ الْعُمُرِ সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রাসূলে কারীম ﷺ এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে নাসায়ীতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে করতেন এবং হযরত সা'দ (রা.)–ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

মানবসৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা : মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবূ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেক (র.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোনো সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুই জন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌঁছলে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তাওফীকপ্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তার অগ্রপশ্চাতের সব গুনাহ মাফ করে দেন; তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন এবং তার শাফায়াত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায়, 'আমিনুল্লাহ ও আমিরুল্লাহ ফিল আরয' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী। [কেননা এই বয়সে সাধারণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোনো কিছুতে ঔৎসুক্য বাকি থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে] অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পৌঁছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গোনাহ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতটি মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন- هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ جِدًّا وَفِيْهِ وَمَعَ هٰذَا رَوَاهُ نَكَارَةٌ شَدِيْدَةٌ অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন- وَمَعَ هٰذَا رَوَاهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ فِىْ سَنَدِهٖ مَوْقُوْفًا وَمَرْفُوْعًا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হাদীসটিকে 'মওকুফ ও মারফূ' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর (র.) মুসনাদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মুসনাদে আবূ ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ثَانِىَ عِطْفِهٖ শব্দের অর্থ- পার্শ্ব। অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তনকারী! এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামতের দলিল প্রমাণ ও মানবজাতির পুনরুত্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا অর্থাৎ "আর কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই"।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে মানুষের পুনরুত্থানের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হওয়ার পর পূববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে শক্তিশালী। অতএব, যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের পুরুত্থানেও সক্ষম। আর আলোচ্য আয়াতে তারই ঘোষণা রয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়। ইরশাদ হচ্ছে- وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا

অনুবাদ :

١١. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج اَیْ شَكٍّ فِیْ عِبَادَتِهٖ شَبَّهَ بِالْحَالِ عَلٰى حَرْفِ جَبَلٍ فِیْ عَدَمِ ثُبَاتِهٖ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ صِحَّةٌ وَّسَلَامَةٌ فِیْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ مِحْنَةٌ وَّسُقْمٌ فِیْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ وقف اَیْ رَجَعَ اِلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّنْيَا بِفَوَاتِ مَا اَمَلَهٗ مِنْهَا وَالْاٰخِرَةَ ط بِالْكُفْرِ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ.

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে অর্থাৎ সংশয়ের সাথে ইবাদত করে। এখানে সংশয়ের সাথে ইবাদত করার অবস্থানকে পাহাড়ের কিনারায় দণ্ডায়মান ব্যক্তির সাথে উপমা দিয়েছেন। তার মঙ্গল হলে অর্থাৎ তার জীবনের সুস্থতা ও মালের নিরাপত্তা লাভ হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। আর কোনো বিপর্যয় ঘটলে তার জীবন ও সম্পদে কোনো কষ্ট বা অসুস্থতা পরিলক্ষিত হলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ কুফরিতে ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে তার আশা বঞ্চিত হওয়ার কারণে ও পরকালে কুফরির কারণে এটাই তো স্পষ্ট ক্ষতি প্রকাশ্য।

١٢. يَدْعُوْا يَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنَ الصَّنَمِ مَا لَا يَضُرُّهٗ اِنْ لَّمْ يَعْبُدْهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ اِنْ عَبَدَهٗ ذٰلِكَ الدُّعَاءُ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ. عَنِ الْحَقِّ.

১২. সে ডাকে উপাসনা করে আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুকে মূর্তিগুলো থেকে যা তার কোনো অপকার করতে পারে না যদি সে তার উপাসনা না করে আর উপকারও করতে পারে না যদি তার উপাসনা করে। এটাই এ আহবান করা চরম বিভ্রান্তি সত্য হতে।

١٣. يَدْعُوْا لَمَنْ اللَّامُ زَائِدَةٌ ضَرُّهٗ لِعِبَادَتِهٖ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ط اِنْ نَّفَعَ بِتَخَيُّلِهٖ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى هُوَ اَیِ النَّاصِرُ وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ اَیِ الصَّاحِبُ هُوَ.

১৩. সে ডাকে এমন কিছুকে যার لَمَنْ -এর ل বর্ণটি অতিরিক্ত ক্ষতিই তার উপাসনার কারণে উপকার অপেক্ষা অধিক নিকটতর তার ধারণা অনুপাতে সে উপকার করলেও কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক সে অর্থাৎ সাহায্যকারী, কত নিকৃষ্ট এই সহচর অর্থাৎ উক্ত সাথী।

١٤. وَعُقِّبَ ذِكْرُ الشَّاكِّ بِالْخُسْرَانِ بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالثَّوَابِ فِیْ. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّوَافِلِ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ مِنْ اِكْرَامِ مَنْ يُّطِيْعُهٗ وَاِهَانَةِ مَنْ يَّعْصِيْهِ.

১৪. اِنَّ اللّٰهَ الخ আয়াতে সংশয়কারীর ক্ষতি উল্লেখের পর মুমিনগণের প্রতিদানের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ফরজ ও নফল পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে নদী প্রাবাহিত, আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করবেন যে তার আনুগত্য করে তাকে সম্মানিত করবেন আর যে তার নাফরমানি করে তাকে লাঞ্ছিত করবেন।

অনুবাদ :

١٥. مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ أَيْ مُحَمَّدًا نَبِيَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ بِحَبْلٍ إِلَى السَّمَآءِ أَيْ سَقْفِ بَيْتِهِ يَشُدُّ فِيْهِ وَفِيْ عُنُقِهِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ أَيْ لِيَخْتَنِقَ بِهِ بِأَنْ يَقْطَعَ نَفَسَهُ مِنَ الْأَرْضِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ فِيْ عَدَمِ نُصْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يَغِيْظُ ـ مِنْهَا الْمَعْنٰى فَلْيَخْتَنِقْ غَيْظًا فَلَا بُدَّ مِنْهَا ـ

১৫. যে কেউ ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনোই তাঁকে সাহায্য করবেন না অর্থাৎ তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে দুনিয়া ও আখিরাতে, সে উঁচু আকাশ পানে একটি রজ্জু প্রলম্বিত করুক অর্থাৎ ঘরের ছাদের দিকে। তাতে এবং তার কাঁধের সাথে তা বাধুক। পরে তা বিচ্ছিন্ন করুক অর্থাৎ তার সাথে গলায় ফাঁস লাগানোর জন্য। অর্থাৎ দুনিয়া থেকেই সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলুক। যেমন সহীহ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশের হেতু দূর করে কিনা? নবী করীম ﷺ -কে সাহায্য না করার বিষয়ে। আয়াতের মর্ম হচ্ছে তার সাহায্যের কারণে তাকে আত্মহত্যা করা উচিত। আর রাসূল ﷺ এর সাহায্য সহায়তা করা অবশ্যই কর্তব্য।

١٦. وَكَذٰلِكَ أَيْ مِثْلَ إِنْزَالِنَا الْاٰيٰتِ السَّابِقَةَ أَنْزَلْنٰهُ أَيِ الْقُرْاٰنَ الْبَاقِيَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ وَّأَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ـ هُدَاهُ مَعْطُوْفٌ عَلٰى هَاءِ أَنْزَلْنَاهُ ـ

১৬. এভাবেই অর্থাৎ, পূর্বের নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করার ন্যায় আমি তা অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ অবশিষ্ট কুরআনকে সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে প্রকাশ্যে। এটা أَنْزَلْنٰهُ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ তার হেদায়েত। إِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ الخ-এর আতফ হয়েছে। أَنْزَلْنَاهُ -এর ه যমীরের উপর। মূল ইবারত হবে أَنْزَلْنَا الْقُرْاٰنَ وَأَنْزَلْنَا أَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ

١٧. إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالصّٰبِئِيْنَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ق إِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِإِدْخَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ وَغَيْرَهُمُ النَّارَ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِمْ شَهِيْدٌ ـ عَالِمٌ بِهِ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ ـ

১৭. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদি হয়েছে তারা হলো ইহুদি এবং যারা সাবেয়ী ইহুদিদের একটি সম্প্রদায়। খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে এবং অন্যান্যদেরকে জাহান্নামে দিয়ে। আল্লাহ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী। অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে চাক্ষুষ দর্শক।

অনুবাদ :

١٨. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ اَىْ يَخْضَعُ لَهٗ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ط وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْخُضُوْعِ فِىْ سُجُوْدِ الصَّلَاةِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَهُمُ الْكَافِرُوْنَ لِاَنَّهُمْ اَبَوا السُّجُوْدَ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ يَشْقِهٖ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ط مُسْعِدٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ـ مِنَ الْاِهَانَةِ وَالْاِكْرَامِ ـ

১৮. তুমি কি দেখ না জান না যে, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু আল্লাহকে সিজদা করে। অর্থাৎ তাদের থেকে যে উদ্দেশ্য কামনা করা হয় সে বিষয়ে তারা তার সমীপে নত হয়। এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে আর তারা হলেন মুমিন সম্প্রদায়, নামাজের সিজদায় অতিরিক্ত অবনত হওয়া দ্বারা। আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি তারা হলো কাফের সম্প্রদায়। কেননা তারা সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অথচ ঈমান সিজদার উপর মওকূফ। আল্লাহ যাকে হেয় করেন দুর্ভাগা করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। অর্থাৎ তার জন্য সৌভাগ্য আনয়নকারী কেউ নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। অপদস্থ করার ক্ষেত্রে ও সম্মান দানের ক্ষেত্রে।

١٩. هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ خَصْمٌ وَالْكُفَّارُ الْخَمْسَةُ خَصْمٌ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ اَىْ فِىْ دِيْنِهٖ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يَلْبَسُوْنَهَا يَعْنِىْ اُحِيْطَتْ بِهِمُ النَّارُ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ـ اَلْمَاءُ الْبَالِغُ نِهَايَةَ الْحَرَارَةِ ـ

১৯. এরা দুটি বিবদমান পক্ষ, অর্থাৎ মুমিনগণ হলেন এক পক্ষ, আর পাঁচ প্রকারের কাফেররা হলো অপর পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করে অর্থাৎ তার দীন সম্পর্কে। যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক তারা তো পরিধান করবে অর্থাৎ অগ্নি তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। অতিশয় উত্তপ্ত পানি।

٢٠. يُصْهَرُ بِهٖ يُذَابُ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ مِنْ شُحُوْمٍ وَغَيْرِهَا وَ تَشْوِىْ بِهِ الْجُلُوْدُ ـ

২০. যা দ্বারা বিগলিত করা হবে তাদের উদরে যা আছে তা যেমন চর্বি ইত্যাদি। এবং এ দ্বারা ভুনা হবে চর্ম।

অনুবাদ :

২১. وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ـ لِضَرْبِ رُؤُسِهِمْ ـ

২১. আর তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর। তাদের মাথায় আঘাত করার জন্য।

২২. كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اَيِ النَّارِ مِنْ غَمٍّ يَلْحَقُهُمْ بِهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا رُدُّوْا اِلَيْهَا بِالْمَقَامِعِ وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ـ اَيِ الْبَالِغِ نِهَايَةَ الْاِحْرَاقِ ـ

২২. যখনই তারা তথা হতে বের হতে চাইবে অর্থাৎ দোযখ হতে চিন্তাকাতর হয়ে দোযখে যা তাদের উদ্রেক হবে তখনই তাতে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ মুগুর দ্বারা পিটিয়ে তাদেরকে তাতে ফেরত পাঠানো হবে। তাদেরকে বলা হবে আস্বাদন কর দহন যন্ত্রণা অর্থাৎ যা আগুনে পোড়ানোর চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَلٰى حَرْفٍ : এটা يَعْبُدُ -এর فَاعِلْ -এর ضَمِيْر থেকে حَالْ অর্থাৎ يَعْبُدُ مُتَزَلْزِلًا

قَوْلُهُ شَبَّهَ بِالْحَالِ عَلٰى حَرْفِ جَبَلٍ فِيْ عَدَمِ ثُبَاتٍ : এর মধ্যে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আয়াতে اِسْتِعَارَةْ تَمْثِيْلِيَّةْ হয়েছে। তা এভাবে যে, আয়াতে তার অবস্থাকে যে ব্যক্তি একীন ও বিশ্বাসবিহীন ইসলামে প্রবিষ্ট হয়েছে সে নড়বড়তা ও দৃঢ়পদ না হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকে, এমন ব্যক্তি সব সময় আশঙ্কিত ও চিন্তিত অবস্থায় থাকে।

قَوْلُهُ مَا اَمَلَهُ : এটা مَاضِىْ -এর সীগাহও হতে পারে। আবার اَمَلٌ অর্থ আশাও হতে পারে।

قَوْلُهُ اَللَّامُ زَائِدَةٌ : অর্থাৎ لَمَنْ -এর ل বর্ণটি অতিরিক্ত এবং مَنْ হলো يَدْعُوْا -এর مَفْعُوْل ; ضَرُّهٗ হলো مُبْتَدَأ আর اَقْرَبُ তার خَبَرٌ অতঃপর বাক্য হয়ে مَنْ -এর صِلَةْ ; صِلَةْ ও مَوْصُوْلَهْ মিলে يَدْعُوْا -এর مَفْعُوْل بِهٖ -এর সাথে মিলিত হয়ে مُتَعَلِّقْ

قَوْلُهُ بِعِبَادَتِهٖ : এর ب অব্যয়টি سَبَبِيَّةٌ অর্থাৎ بِسَبَبِ عِبَادَتِهٖ

قَوْلُهُ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى هُوَ : এখানে هُوَ হলো مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ আর اَلنَّاصِرُ হলো مَوْلٰى -এর তাফসীর। এভাবে اَلصَّاحِبُ হলো اَلْعَشِيْرُ -এর তাফসীর। ব্যাখ্যাকারের উক্তি- بِالْخُسْرَانِ উহ্য مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে شَاكٌ থেকে حَالْ -এর পরেও এরূপ তারকীব হবে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি- بِذِكْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ এটা عَقِبَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ ; আর আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ الخ এটা দ্বিতীয় ذِكْر -এর সিফত। অর্থাৎ اَلذِّكْرُ الْكَائِنُ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ মুফাসসির (র.)-এর উক্তি- مِنْ اِكْرَامِ مَنْ يُطِيْعُهٗ الخ -এর মধ্যে لَفَّ نَشْرِ غَيْرِ مُرَتَّبْ তথা ক্রমধারার ব্যতিক্রম ঘটেছে। يَنْصُرُهٗ -এর মধ্যে ضَمِيْر টি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ফিরেছে। কারণ তিনিই হলেন مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ আর اَلسَّمَاءُ মাথার উপরের বস্তুকে বলা হয়। যেমন প্রসিদ্ধ আছে- كُلُّ مَا هُوَ عَلٰى رَأْسِهٖ فَهُوَ سَمَاءٌ

قَوْلُهُ فَلْيَمْدُدْ مَنْ كَانَ : এখানে مَنْ যদি شَرْطِيَّةْ হয় তাহলে فَلْيَمْدُدْ তার جَزَاء হবে। আর যদি مَوْصُوْلَةْ হয় তাহলে فَلْيَمْدُدْ -এর ف অব্যয়টি جَزَاء -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়ার কারণে হবে।

قَوْلُهُ بِاَنْ يَقْطَعَ نَفْسَهٗ : نَفْسَهٗ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لِيَقْطَعْ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত রয়েছে। مِنَ الْاَرْضِ -এর দ্বারা পার্থিব জীবন উদ্দেশ্য। এটা ঐ সময় হবে যখন ف বর্ণটি যবরযোগে হবে। আর যদি জযমযোগে হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্য হবে এবং اَرْض দ্বারা পৃথিবী উদ্দেশ্য হবে। উদ্দেশ্য এই হবে যে, ছাদ ইত্যাদিতে একটি রশি বেঁধে তার অপর প্রান্ত সে তার গলায় বেঁধে নিক এবং কোনো বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে পৃথিবী থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে নিক, যাতে শ্বাসরুদ্ধ

হয়ে তখনই মৃত্যুবরণ করে। مَا يَغِيظُ مِنْهَا এখানে مِنْهَا হলো مَا -এর বর্ণনা। এর দ্বারা সাহায্য উদ্দেশ্য। আর مَا হলো مَوْصُوْلَة আর يَغِيظُ হলো তার صِلَة -এর মধ্যে عَائِدٌ বা যমীর বিলুপ্ত রয়েছে। صِلَة , مَوْصُوْل মিলে يُذْهِبَنَّ -এর مَفْعُوْل বাক্যটি এরূপ ছিল هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ الشَّئَ الَّذِى يَغِيظُهُ وَهُوَ نُصْرَةُ النَّبِىِّ ﷺ

قَوْلُهُ غَيْظًا مِنْهَا : এর অর্থ হলো مِنْ اَجْلِهَا

قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا : অর্থাৎ. مِنَ النُّصْرَةِ বাক্যটি এরূপ ছিল فَلْيَخْتَنِقْ لِاَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ النُّصْرَةِ

قَوْلُهُ حَالٌ : অর্থাৎ, اٰيَاتٍ শব্দটি اَنْزَلْنَاهُ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে, আর بَيِّنَاتٍ হলো اٰيَاتٍ -এর صِفَتٌ

قَوْلُهُ هَدَاهُ : দ্বারা يُرِيْدُ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ : এর عَطْف হলো اَنْزَلْنَاهُ এর যমীর উপর।

قَوْلُهُ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : এর عَطْف হলো يَسْجُدُ -এর فَاعِلٌ অর্থাৎ, مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ -এর উপর অর্থাৎ আল্লাহগপ্রদত্ত এবং বাধ্যগত বিনয় ছাড়া কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছাক্রমে সিজদা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করে থাকে।

قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ : উপরে ৬ ধরনের মানুষের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে একটি দল হলো মু'মিন,. আর বাকি পাঁচটি দল কাফের। এদিক দিয়ে মোট দুটি দল হলো একদল মু'মিন আর একদল কাফের। এ কারণে خَصْمَانِ দ্বিবাচনিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মু'মিনদের বিপরীতে পাঁচটি দলকে এক পক্ষের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর خَصْمٌ শব্দটি مَصْدَرٌ এটা এক ও একাধিক সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ اِخْتَصَمُوْا : এখানে বহুবচনের সীগা ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মু'মিনদের বিপরীত পক্ষটি কয়েক ধরনের মানুষ সম্বলিত। সুতরাং فَرِيْقٌ শব্দটি শাব্দিক বিচারে একবচন এবং অর্থের বিচারে বহুবচন। যেমন- قَوْمٌ وَرَهْطٌ শব্দদ্বয়।

قَوْلُهُ وَتَشْوِىْ بِهِ الْجُلُوْدَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, جُلُوْدَ শব্দটি উহ্য فِعْل -এর কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। কেননা مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ -এর উপর عَطْف বৈধ নয়। কারণ جِلْدٌ তথা চর্ম বিগলিত হওয়ার বস্তু নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَهُمْ مَقَامِعُ : এখানে لَهُمْ -এর যমীরে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর প্রতি ফিরেছে। এ সময় لَ টি اِسْتِحْقَاقْ তথা অধিকারজ্ঞাপক হবে। ২. এটা যাবানিয়া ফেরেশতার প্রতি ফিরেছে, বাক্যের ধরন দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

قَوْلُهُ الْمَقَامِعُ : এটা مَقْمَعَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ- হাতুড়ি, মুগুর, গদা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা প্রকাশ্যে দীন ইসলামের বিরোধিতা করতো, কিয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতো তাদের অবস্থা বর্ণনা করে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সেই সব লোকদের আলোচনা স্থান পেয়েছে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনতো না; বরং প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করলেও অন্তরে সন্দেহ পোষণ করতো। যদি জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ হতো, তাহলে দীন ইসলামে থাকতো, পক্ষান্তরে যদি তাদের কোনো স্বার্থ বিনষ্ট হতো, তবে ইসলাম ছেড়ে দিত।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ الْاَصْنَامَ الخ : শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কিছু লোক মদীনা মুনাওয়ারায় আসতো এবং ইসলাম গ্রহণ করতো। যদি এরপর তাদের আর্থিক উন্নতি হত এবং তাদের পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করতো, তবে বলতো, এ ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে যদি ইসলাম গ্রহণের পর কোনো প্রকার আর্থিক অসুবিধা দেখা দিত, তখন বলতো, এ ধর্ম ঠিক নয়, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম ও আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে গ্রামীণ লোকদের ব্যাপারে, যারা ছিল যাযাবর। তারা মদীনা শরীফে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, এরপর যদি তাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হতো, তারা আর্থিক উন্নতি লাভ

করতো, তখন বলতো, এই ধর্মটি ভালো। পক্ষান্তরে, যদি তাদের অবস্থা ভালো না হতো, তখন তারা বলতো, এই ধর্ম গ্রহণ করার পরই আমাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এরপর তারা মুরতাদ হয়ে যেতো। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ـ

حَرْفٌ -এর অর্থ হলো কিনারা, পাড়, তীর। যেভাবে কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি নিজেকে স্থির রাখতে পারে না; বরং তার মধ্যে টলটলায়মাণ অবস্থা থাকে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ ও নড়বড়তার শিকার হয় তারও একই অবস্থা হয়। এ ধরনের মানুষ ধর্মের উপর অটল থাকতে পারে না। কেননা তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভ করা। যদি তা পূর্ণ হয় তাহলে উক্ত ধর্মে বহাল থাকে, অন্যথায় পূর্বপুরুষের ধর্ম তথা শিরক ও কুফরের প্রতি ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে যারা খাঁটি মুসলমান হয়, তারা ঈমান ও একীনের উপর অবিচল থাকে। তারা দুঃখ-কষ্টের কোনো পরওয়ানা না করে ধর্মের উপর অটল অবিচল থাকে। তারা আল্লাহর মহান অনুগ্রহে ধন্য হলে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর দুঃখ কষ্টের শিকার হলে ধৈর্যধারণ করে।

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা যত চেষ্টাই করুক এবং যত হিংসা করুক প্রিয়নবী ﷺ -কে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের সাহায্য বন্ধ করতে পারবে না এবং পবিত্র কুরআন অবতরণেও বাধা দিতে পারবে না। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক কত সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন এবং সত্যকে কত যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছেন! কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই ভাগ্যাহত লোকের বোঝে না। শুধু তাই নয়; বরং তারা বুঝতে চায়ও না। বস্তুত হেদায়েত এবং গোমরাহী আল্লাহ পাকেরই হাতে।

قَوْلُهٗ مَنْ كَانَ يَظُنُّ : সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপে শত্রুদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদ বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাঁকে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনোরূপে আকাশে পৌঁছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারো পক্ষে আকাশে যাওয়া এবং আল্লাহ তা'আলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তাফসীর হুবহু দুররে মনসুর গ্রন্থে ইবনে সা'আদ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তাফসীর। -[বয়ানুল কুরআন]

ইমাম কুরতুবী (র.) এই তাফসীরকেই আবূ জাফর নাহহাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, এটা সবচেয়ে সুন্দর তাফসীর। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তাফসীর করেছেন যে, এখানে سَمَاءٌ বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো- যদি কোনো মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনো পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রোশের প্রতিকার এ ছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁসি নিয়ে মরে যাক। -[মাযহারী]

প্রথম আয়াতে বিশ্বের মুসলমান, কাফের অতঃপর কাফেরদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার ফয়সালা করে দিবেন।

তিনি প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত। ফয়সালা কি হবে, কুরআনে তা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জন্য চিরন্তন ও অক্ষয় সুখশান্তি আছে এবং কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব। দ্বিতীয় আয়াতে জীবিত আত্মাধারী অথবা জড় পদার্থ ও উদ্ভিদ ইত্যাদি সব সুস্পষ্ট বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল, তা 'সিজদা'র শিরোনামে ব্যক্ত করে মানবজাতির দুইটি শ্রেণি বর্ণনা করা হয়েছে। ১. আনুগত্যশীল ফরমাবরদার, সিজদায় সবার সাথে শরিক। ২. অবাধ্য বিদ্রোহী সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। আয়াতে আজ্ঞানুবর্তী হওয়াকে সিজদা করা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ বিনয়াবনত হওয়া। ফলে সৃষ্টজগতের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক প্রকারের সিজদা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা

তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সিজদা তার অবস্থা অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষের সিজদা হচ্ছে মাটিতে মস্তক রাখা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সিজদা হচ্ছে যে উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করা।

সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ : সমগ্র সৃষ্টজগৎ স্রষ্টার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দুই প্রকার। ১. সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, মৃত, জড় পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন ও ইচ্ছাধীন বিশ্ব-চরাচরের কোনো কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। ২. সৃষ্ট জগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ স্বইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল ফরমাবরদার তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে, তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরদের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সিজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনাই নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোনো সৃষ্ট বস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কমবেশি এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণ স্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণিও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেওয়া হয়েছে। মানবজাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণত অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়; কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কুরআন পাক আকাশ ও ভূমণ্ডল সম্পর্কে বলে যে, قَالَتَا اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে আদেশ করলেন তোমাদেরকে আমার আজ্ঞাবহ হতেই হবে। অতএব হয় স্বেচ্ছায় আনুগত্য অবলম্বন কর, না হয় বাধ্যতামুলকভাবেই অনুগত থাকতে হবে। উত্তরে আসমান ও জমিন আরজ করল, আমরা স্বেচ্ছায় ও খুশিতে আনুগত্য কবুল করলাম। অন্যত্র পর্বতের প্রস্তর সম্পর্কে কুরআন বলে وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে উপর থেকে নিচে গড়িয়ে গড়ে। এমনিভাবে অনেক হাদীসে পর্বতসমূহের পারস্পরিক কথাবার্তা এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিবেক ও চেতনার সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আলোচ্য আয়াতে যে আনুগত্যকে সিজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও [জিনসহ] সব সৃষ্ট বস্তু স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদা করে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১. মুমিন তথা আনুগত্য ও সিজদাকারী এবং ২. কাফের তথা অবাধ্য ও সিজদার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী। সিজদার তাওফীক না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা শেষোক্ত দলকে হেয় করেছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে দু'দল লোকেরা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১. যারা আল্লাহ পাককে সেজদা করে, তাঁর প্রতি অনুগত এবং কৃতজ্ঞ হয়। ২. যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, যাদের শাস্তি অবধারিত। আর আলোচ্য আয়াতে উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا الخ : শানে নুযূল : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত হামযা (রা.), হযরত ওবায়দা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং ওতবা, শায়বা এবং ওলীদ ইবনে ওতবা সম্পর্কে। প্রথম তিনজন মুমিন ছিলেন, আর শেষ তিনজন কাফের।

ইমাম বুখারী এবং হাকেম (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আমাদের সম্পর্কে। হাকেম (র.) অন্য এক সূত্রে হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বদরের রণাঙ্গনে যে দু'দল লোক যুদ্ধরত ছিল,

তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। একদিকে হযরত আলী (রা.) হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত ওবায়দা (রা.) ছিলেন। তাঁদের মোকাবিলায় কাফেরদের পক্ষ থেকে ছিল শায়বা ইবনে রাবীয়া, ওতবা ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ ইবনে ওতবা।

আল্লামা বগভী (র.) কায়েস ইবনে ওবাদের সূত্রে লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদের সঙ্গে বিতর্ক করবার জন্যে সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ পাকের রহমতের সম্মুখে বিনীত হয়ে হাজির হবো।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, বদরের দিন রণাঙ্গনে ওতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া এবং ওয়ালীদ ইবনে ওতবা বেরিয়ে আসে এবং তাদের মোকাবিলার জন্য হুঙ্কার দেয়। তখন তাদের মোকাবিলার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) এবং তিজন আনসারী যুবক আওফ, মাআজ এবং মোয়াওয়াজ বের হয়ে আসেন। এই তিন জন যুবক হারেসের পুত্র ছিলেন। কাফেররা তাদের নাম জিজ্ঞাসা করে এবং এরপর হযরত রাসূলে করীম ﷺ -কে ডাক দিয়ে বলে, আমাদের মোকাবিলায় তাদেরকে প্রেরণ করুন যারা আমাদের নিকট থেকে বের হয়ে গেছে। তখন হযরত ওবাদা ইবনে হারেস (রা.), হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) এবং হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) বের হয়ে আসলেন। হযরত আলী (রা.) ওয়ালীদ ইবনে ওতবার মোকাবিলা করে তাকে শেষ করে দিলেন। আর হযরত হামযা কাল বিলম্ব না করে তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাবে খতম করলেন, অবশ্য হযরত ওবাদা (রা.) এবং ওতবার মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। এই অবস্থা দেখে হযরত হামযা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) ওতবার উপর হামলা করে তাকে খতম করলেন। আর হযরত ওবাদা (রা.)-কে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর পা কেটে গিয়েছিল। যখন হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হযরত ওবাদা (রা.)-কে হাজির করা হলো, তখন তিনি আরজ করলেন, আমি কি শহীদ হবো না? হুজুর ﷺ -ইরশাদ করলেন, কেন নয়!

আয়াতের শানে নযূল সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণ দিয়েছেন উফির সূত্রে ইবনে জারীর। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর ইবনে মুনজির ও ইবনে আবী হাতেম কাতাদা (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে, মুসলমান ও আহলে কিতাবদের সম্পর্কে। আহলে কিতাব অর্থাৎ, ইহুদি নাসারারা বলেছে, আমরা তোমাদের চেয়ে আল্লাহ পাকের নিকট অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী। কেননা আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে নাজিল হয়েছে এবং আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করেছে। আহলে কিতাবদের এ কথার জবাবে মুসলমানগণ বলেছেন, আমরা আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী। কেননা, আমরা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি, তোমাদের নবীর প্রতি এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত আসমানি গ্রন্থের প্রতি ঈমান এনেছি, আর তোমরা আমাদের নবীর পরিচয় পেয়েছো এবং আমাদের কিতাব সম্পর্কেও অবগত হয়েছো; কিন্তু শুধু হিংসার কারণেই তোমরা অস্বীকার করছো। মুসলমান ও আহলে কিতাবদের মধ্যে এ বিষয়েই বিতর্ক ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তৃতীয় অভিমত হলো, ইতিপূর্বে إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا আয়াতে ছয়টি ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটিকে জান্নাতী আর বাকি পাঁচটিকে দোজখী ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা যদিও উপরিউক্ত আয়াতে, ছয়টি ধর্মের উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু তাদেরকে হক ও বাতিল বা সত্য ও মিথ্যা এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. মুমিন : যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, মনে প্রাণে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মানে। ২. যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করে না। যেমন, ইহুদি খ্রিস্টান মজুসি, মুশরিক প্রভৃতি। এই দুই দল চিন্তা ও কর্মে তথা জীবনধারায় একে অন্যের প্রতিপক্ষ। বদরের রণাঙ্গনে এই দুই দলের মধ্যেই হয়েছিল সংঘর্ষ । হক ও বাতিলের মধ্যে হয়েছিল সেদিন যুদ্ধ, সেদিন আল্লাহ পাক সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হককে করেছিলেন বিজয়ী, যদিও সত্যের অনুসারীদের সংখ্যা ছিল কম। বাতিল বা মিথ্যাকে করেছিলেন পরাজিত, যদিও তাদের সামরিক শক্তি ছিল অধিকতর।

অনুবাদ :

٢٣. وَقَالَ فِى الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط بِالْجَرِّ اَىْ مِنْهُمَا بِاَنْ يُّرَصَّعَ اللُّؤْلُؤُ بِالذَّهَبِ وَبِالنَّصَبِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ مِنْ اَسَاوِرَ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ـ هُوَ الْمُحَرَّمُ لُبْسُهُ عَلَى الرِّجَالِ فِى الدُّنْيَا ـ

২৩. আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের সম্পর্কে বলেন, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত সেথায় তাদেরকে অলঙ্কৃত করা হবে স্বর্ণ কঙ্কণ, স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা لُؤْلُؤٍ শব্দটি যেরযোগে। অর্থাৎ কঙ্কণ, স্বর্ণ ও মুক্তা দ্বারা প্রস্তুতকৃত হবে। আবার এটা لُؤْلُؤًا নসবযোগেও হতে পারে। তখন এটা مِنْ اَسَاوِرَ -এর مَحَلْ -এর উপর عَطْف হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের আর এটা পৃথিবীতে পুরুষের জন্য পরিধান করা হারাম।

٢٤. وَهُدُوْا فِى الدُّنْيَا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَهُدُوْآ اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ـ اَىْ طَرِيْقِ الْمَحْمُوْدِ وَ دِيْنِهٖ ـ

২৪. তাদেরকে অনুগামী করা হয়েছিল পৃথিবীতে পবিত্র বাক্যের আর তা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসিত পথ ও দীনের উপর।

٢٥. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَاعَتِهٖ وَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ مَنْسَكًا وَّمُتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ سَوَآءَ نِ الْعَاكِفُ الْمُقِيْمُ فِيْهِ وَالْبَادِ ط الطَّارِىْ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ الْبَاءُ زَائِدَةٌ بِظُلْمٍ اَىْ بِسَبَبِهٖ بِاَنْ اِرْتَكَبَ مَنْهِيًّا وَلَوْ شَتْمَ الْخَادِمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ مُؤْلِمٍ اَىْ بَعْضَهُ وَمِنْ هٰذَا يُؤْخَذُ خَبَرُ اِنَّ اَىْ نُذِيْقُهُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

২৫. যারা কুফরি করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে তাঁর আনুগত্য হতে ও মসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি হজের স্থান রূপে ও ইবাদতগাহ হিসেবে স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্য সমান রূপে, আর যে ইচ্ছা করে তাতে পাপকার্যের এখানে بَاءْ টি অতিরিক্ত সীমালঙ্ঘন করে অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনের কারণে যেমন কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলো যদিও তাকে নিজ সেবক বা ভৃত্যকে গালাগালের কারণেই হোক না কেন আমি তাকে আস্বাদন করাব মর্মন্তুদ শাস্তি। পীড়াদায়ক। অর্থাৎ তার কিছু অংশ। আর نُذِقْهُ হলো পূর্বোক্ত اِنَّ -এর خَبَرْ বা বিধেয়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির কিয়দংশ আস্বাদন করাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مِنْ اَسَاوِرَ : مِنْ تَبْعِيْضِيَّةٌ অর্থাৎ بَعْضُ الْاَسَاوِرِ আবার بَيَانِيَّةٌ এবং زَائِدَةٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ الْاَسَاوِرُ : শব্দটি اَسْوِرَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ- চুড়ি। আর سُوَارٌ পেশ বা যবরসহকারেও হতে পারে। لُؤْلُؤٌ শব্দটি مَجْرُوْرٌ হলে اَسَاوِرُ -এর উপর عَطْف হবে, আর مَنْصُوْبٌ হলে اَسَاوِرُ -এর مَحَلّ এরূপে عَطْف হবে অর্থাৎ يُحَلَّوْنَ لُؤْلُؤًا হবে। লেখন পদ্ধতিটি যেহেতু আলিফসহকারে, কাজেই নীতি অনুযায়ী এটি مَنْصُوْبٌ

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ : يَصُدُّوْنَ -এর ই'রাবের তিনটি ধরন হতে পারে। যথা–

১. এর عَطْف হলো كَفَرُوْا -এর উপর। এ সময় প্রশ্ন হতে পারে যে, মুযারের উপর مَاضِىْ -এর عَطْف ঠিক নয়। এর তিনটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে। ক. কখনও কখনও مُضَارِعْ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হয় না, বরং সার্বক্ষণিকতা উদ্দেশ্য হয়। আর এর মধ্যে مَاضِىْ -ও শামিল থাকে। খ. مُضَارِعْ -এর সীগাহটি مَاضِىْ -এর ব্যাখ্যায় হবে। গ. সীগাহটি নিজ অবস্থায় বহাল থাকবে। অবশ্য مَاضِىْ দ্বারা ভবিষ্যতকাল উদ্দেশ্য হবে।

২. يَصُدُّوْنَ শব্দটি كَفَرُوْا -এর فَاعِلْ -এর ضَمِيْر থেকে حَالْ , অবশ্য এটা স্পষ্টরূপে ভ্রান্ত। কেননা হ্যাঁ-বাচক مُضَارِعْ যদি حَالْ হয়, তাহলে তার উপর وَاوْ প্রবিষ্ট হয় না। অথচ এখানে তা উল্লেখ রয়েছে।

৩. يَصُدُّوْنَ -এর মধ্যে اِنَّ -এর خَبَرْ -এর উপর وَاوْ টি অতিরিক্ত। মূল বাক্য এরূপ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَصُدُّوْنَ এটা কুফীগণের মাযহাব মতে।

قَوْلُهُ مَنْسَكًا : এটা جَعَلْنَاهُ -এর مَفْعُوْلٌ فِيْهِ তথা কালের প্রতি ইঙ্গিত।

قَوْلُهُ سَوَاءً جَعَلْنَا : এর দ্বিতীয় مَفْعُوْلٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর سَوَاءً শব্দটি مُسْتَوِيًا -এর অর্থে হবে। এটা اَلْعَاكِفُ -এর কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর سَوَاءً শব্দটি حَالْ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْبٌ হতে পারে। অধিকাংশ আলেমগণ سَوَاءٌ -কে مُبْتَدَأٌ হিসেবে مَرْفُوْعٌ পড়েছেন। এর خَبَرْ হলো عَاكِفٌ অথবা এর বিপরীত হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ : ব্যাপকতার উদ্দেশ্যে يُرِدْ -এর مَفْعُوْلٌ উল্লিখিত হয়নি। মূলত এমন ছিল وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ مُرَادًا অভিধানে اِلْحَادٌ অর্থ সত্য ও ন্যায়-বিচ্যুত হওয়া।

قَوْلُهُ مِنْ هٰذَا اَىْ نُذِقْهُ : অর্থাৎ نُذِقْهُ -এর শব্দ দ্বারা اِنَّ -এর বিলুপ্ত خَبَرٌ বুঝা যেতে পারে। আর তা হলো– نُذِقُهُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا الخ : জান্নাতীদেরকে কংকণ পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কঙ্কণ পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্য একে দূষণীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাথায় মুকুট এবং হাতে কঙ্কণ পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি স্বতন্ত্রমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে মালেক অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ায় ঘোড়াটি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্‌রার কঙ্কণ যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কঙ্কণ অন্যান্য মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হয়, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবি করে বসেন এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা, সাধারণ পুরুষের

মধ্যে যেমন মাথায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই; বরং এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কঙ্কণ পরিধান করাকেও রাকজীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কঙ্কণ পরিধান করানো হবে। কঙ্কণ সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে ; কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেন, জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কঙ্কণ পরানো হবে স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ : রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম : আলোচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোনো অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযায ও বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরি হবে। –[মাযহারী]

ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَمَنْ شَرِبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبَاسُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَشَرَابُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاٰنِيَةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই বস্তুত্রয় জান্নাতীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। –[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে। –[কুরতুবী]

অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করে, পরকালে তা পরিধান করবে না, যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। অন্যান্য জান্নাতী রেশম পরিধান করবে : কিন্তু সে তা পরিধান করতে পারবে না। –[কুরতুবী]

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোনো বস্তু থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পতিাপের স্থান নয়। সেখানে কারো মনে বিষাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করায়ও কোনো উপকারিতা নেই। কুরতুবী (র.) এর চমৎকার জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্নরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভব করবে; কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোনো কিছুর পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতবাসীদের বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে জান্নাতের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভের কারণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসী ভাগ্যবান লোকেরা দুনিয়াতে পবিত্র কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করার তাওফীক পেয়েছিল। আল্লাহ

পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ্ পাঠের, তাঁর প্রশংসা করার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল, মানুষকে ভালো **কাজের নির্দেশ** দেওয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করেছিল। এমনিভাবে তারা লাভ করেছিল **সর্বগুণাকর** চির প্রশংসিত মহান আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথের সন্ধান। মূলত এ কারণেই তারা আখিরাতে ফেরেশতাদের **সালাম** লাভ করবে এবং বেহেশতবাসীগণ একে অন্যকে সালাম দিবেন। পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করবেন এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভ করে তারা শোকরগুজার হবেন।

قَوْلُهُ وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কলেমায়ে তাইয়োবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী] বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, এখানে এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

পূববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের দুই পক্ষের বিতর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই বিতর্কেরই একটি বিশেষ প্রকার এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, কোনো কোনো কাফের এমনও আছে, যারা নিজেরা গোমরাহীতে অটল এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে। এ ধরনের লোকেরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে ওমরার ইহরাম বেঁধে মসজিদে-হারামে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অথচ মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের ইবাদত, ওমরা ও হজ সম্পর্কিত অংশ তাদের মালিকানা ছিল না। ফলে কোনো রকম বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার তাদের ছিল না; বরং এসব জায়গা সব মানুষের জন্য সমান ছিল। এখানে হেরেমের অধিবাসী, বহিরাগত মুসাফির, শহরবাসী এবং বিদেশী সবার সমান অধিকার ছিল। এরপর তাদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদের-হারামে [অর্থাৎ, গোটা হেরেম শরীফে] কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ করবে, যেমন– মানুষকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া অথবা অন্য কোনো ধর্ম বিরোধী কাজ করা, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করানো হবে। বিশেষ করে যখন ধর্মবিরোধী কাজের সাথে জুলুম অর্থাৎ, শিরকও মিলিত থাকে। মক্কার মুশরিকদের অবস্থা তদ্রূপই ছিল। তারা মুসলমানদেরকে হেরেমে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। তাদের এ কাজও ধর্ম বিরোধী ও অবৈধ ছিল, এর সাথে তারা কুফর ও শিরকেও লিপ্ত ছিল। যদিও ধর্ম বিরোধী কাজ বিশেষত শিরক ও কুফর সর্বত্র ও সর্বকালে হারাম চূড়ান্ত অপরাধ ও শাস্তির কারণ; কিন্তু যারা এরূপ কাজ হেরেমের অভ্যন্তরে করে, তাদের অপরাধ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এখানে বিশষভাবে হেরেমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : سَبِيْلِ اللّٰهِ [আল্লাহর পথ] বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

قَوْلُهُ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ : এটা তাদের দ্বিতীয় গুনাহ। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। 'মসজিদে হারাম' ঐ মসজিদকে বলা হয় যা বায়তুল্লাহর চতুস্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোনো কোনো সময় মসজিদে হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়। যেমন আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি: বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কুরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে– وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তাফসীরে দুররে-মনসূরে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম শরীফ বোঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য : মসজিদে হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়। যেমন সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেফার গোটা ময়দান। এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য সাধারণ ওয়াকফ। কোনো ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনো হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফিকহবিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোনো কোনো ফিকহবিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোনো স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফিকহবিদের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা

হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়েজ। হযরত ওমর ফারূক (রা.) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) থেকে এ ব্যাপারে উপরিউক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেষোক্ত উক্তি অনুযায়ী। −[রূহুল মা'আনী]

ফিকহ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ : অভিধানে اِلْحَادٌ-এর অর্থ সরল পথ থেকে সরে যাওয়া। এখানে 'ইলহাদের' অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদহর মতে কুফর ও শিরক। কিন্তু অন্য তাফসীরকারগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানি এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি, চাকরকে গালি দেওয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা (র.) বলেন : 'হেরেমে ইলহাদ' বলে ইহরাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ-এমন কোনো কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোনো বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরিয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গুনাহ এবং আজাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ হলো− মক্কার হেরেমে সৎকাজের ছওয়াব যেমন অনেক বেশি হয়, তেমনি পাপকাজের আজাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।

−[মুজাহিদ (র.)-এর উক্তি]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এই আয়াতের এক তাফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপকাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়; কিন্তু হেরেমে শুধু পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেই গুনাহ লিখা হয়। কুরতুবী (র.) এই তাফসীরই হযরত ওমর (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হজ করতে গেলে দুটি তাঁবু স্থাপন করতেন; একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর নওকরদের মধ্যে কোনো কারণে শাসন করার প্রয়োজন হতো তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে গিয়ে এ কাজ করতেন। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, আমাদেরকে এটা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় كَلَّا وَاللّٰهِ অথবা بَلٰى وَاللّٰهِ ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে 'ইলহাদ' করার শামিল। −[মাযহারী]

অনুবাদ :

٢٦. وَ اذْكُرْ اِذْ بَوَّأْنَا بَيَّنَّا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيَهُ وَكَانَ قَدْ رُفِعَ زَمَنَ الطُّوْفَانِ وَاَمَرْنَاهُ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ مِنَ الْاَوْثَانِ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ الْمُقِيْمِيْنَ بِهٖ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ جَمْعُ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ اَيِ الْمُصَلِّيْنَ ـ

২৬. এবং স্মরণ করুন যখন আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম বর্ণনা করেছিলাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য সেই গৃহের স্থান তাকে নির্মাণের জন্য। কেননা হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের সময় কাবাগৃহকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আমি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কোনো শরিক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো মূর্তি থেকে তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায় তাতে সালাতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে। এবং রুকু' করে ও সিজদা করে رُكَّعٌ শব্দটি رَاكِعٌ -এর বহুবচন, আর اَلسُّجُوْدُ শব্দটি سَاجِدٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ, নামাজিগণ।

٢٧. وَاَذِّنْ نَادِ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ فَنَادٰى عَلٰى جَبَلِ اَبِىْ قُبَيْسٍ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَبَّكُمْ بَنٰى بَيْتًا وَاَوْجَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ اِلَيْهِ فَاَجِيْبُوْا رَبَّكُمْ وَالْتَفَتَ بِوَجْهِهٖ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا وَشَرْقًا وَغَرْبًا فَاَجَابَهٗ كُلُّ مَنْ كُتِبَ لَهٗ اَنْ يَّحُجَّ مِنْ اَصْلَابِ الرِّجَالِ وَاَرْحَامِ الْاُمَّهَاتِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَجَوَابُ الْاَمْرِ يَاْتُوْكَ رِجَالًا مُشَاةً جَمْعُ رَاجِلٍ كَقَائِمٍ وَقِيَامٍ وَ رُكْبَانًا عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ اَىْ بَعِيْرٍ مَهْزُوْلٍ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى يَاْتِيْنَ اَىِ الضَّوَامِرُ حَمْلًا عَلَى الْمَعْنٰى مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ـ طَرِيْقٍ بَعِيْدٍ ـ

২৭. এবং ঘোষণা দিন আহবান করুন মানুষের নিকট হজের তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) জাবালে কুবাইসে দাঁড়িয়ে আহবান করলেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক একটি ঘর নির্মাণ করেছেন। তোমাদের উপর তার হজ করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও। এবং তিনি স্বীয় চেহারাকে ডানে বামে পূর্বে পশ্চিমে ঘুরালেন। তখন যাদের ভাগ্যে হজ লিখা ছিল তাদের আত্মা পুরুষদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এবং নারীদের গর্ভাশয় থেকে জবাব দিয়েছিল "লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক'। আয়াতে اَمْرٌ -এর জবাব হচ্ছে يَاْتُوْكَ رِجَالًا তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে পায়ে হেঁটে رِجَالًا শব্দটি رَاجِلٌ -এর বহুবচন যেমন قِيَامٌ শব্দটি قَائِمٌ -এর বহুবচন। এবং আরোহণ করে সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে। অর্থাৎ, দুর্বল উট, আর এটা নর-মাদী উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তারা আসবে يَاْتِيْنَ -কে ضَامِرٌ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে দূরের পথ।

অনুবাদ :

٢٨. لِيَشْهَدُوْا اَىْ يَحْضُرُوْا ـ مَنَافِعَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا بِالتِّجَارَةِ اَوْ فِى الْاٰخِرَةِ اَوْ فِيْهِمَا اَقْوَالٌ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ اَىْ عَشَرِ ذِى الْحَجَّةِ اَوْ يَوْمِ عَرَفَةَ اَوْ يَوْمِ النَّحْرِ اِلٰى اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَقْوَالٌ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ج اَلْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الَّتِىْ تُنْحَرُ فِىْ يَوْمِ الْعِيْدِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا فَكُلُوْا مِنْهَا اِذَا كَانَتْ مُسْتَحَبَّةً وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ـ اَىِ الشَّدِيْدَ الْفَقْرِ ـ

২৮. যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হতে পারে পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অথবা পরকালে কিংবা উভয় স্থানে। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এবং তারা যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলো আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অর্থাৎ, জিলহজ্জের দশদিন, অথবা আরাফার দিন অথবা কুরবানির ঈদের দিন হতে আইয়ামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত। বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিজিক হিসেবে দান করেছেন তার উপর উট, গরু, বকরি যা কুরবানির দিনে জবাই করা হয় ও তার পরে সকল 'হাদী'সমূহ ও কুরবানির পশু হতে। অতঃপর তোমরা তা হতে আহার কর। এটা মোস্তাহাব এবং দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তকে আহার করাও অর্থাৎ, অতিশয় দরিদ্রকে।

٢٩. ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ اَىْ يُزِيْلُوْا اَوْسَاخَهُمْ وَشَعَثَهُمْ كَطُوْلِ الظُّفُرِ وَلْيُوْفُوْا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ نُذُوْرَهُمْ مِنَ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَلْيَطَّوَّفُوْا طَوَافَ الْاِفَاضَةِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ـ اَىِ الْقَدِيْمِ لِاَنَّهُ اَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ ـ

২৯. অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে অর্থাৎ তাদের ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি যেমন– লম্বা নখ দূরীভূত করতে পারে। এবং তাদের মানত পূর্ণ করে হাদী ও কুরবানির পশু জবাইয়ের মাধ্যমে। وَلْيُوْفُوْا শব্দের فَ বর্ণটি সাকিনযোগে ও তাশদীদযোগে উভয়ভাবে পঠিত হয়েছে। এবং তারা তওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের অর্থাৎ পুরাতন বা প্রাচীন ঘর। কেননা এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর। আর এখানে তওয়াফ দ্বারা তওয়াফে ইফাযাহ উদ্দেশ্য।

٣٠. ذٰلِكَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ اَىِ الْاَمْرُ اَوِ الشَّاْنُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ هِىَ مَا لَا يَحِلُّ انْتِهَاكُهُ فَهُوَ اَىْ تَعْظِيْمُهَا خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ فِى الْاٰخِرَةِ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اَكْلًا بَعْدَ الذَّبْحِ ـ

৩০. এটাই বিধান এটা হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ বাক্যটি এরূপ ছিল– اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ অথবা اَلشَّاْنُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ে তা পূর্ণ হয়েছে এবং কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর সম্মান করলে আর তা হলো সে সকল বস্তু যার মর্যাদাহানি করা জায়েজ নয়। এটাই অর্থাৎ তার সম্মান করা তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম। পরকালে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু। জবাই করার পর ভক্ষণ করা।

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ تَحْرِيْمُهُ فِي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْاٰيَةَ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلًا وَالتَّحْرِيْمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ مِنْ لِلْبَيَانِ اَيِ الَّذِيْ هُوَ الْاَوْثَانُ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ - اَيِ الشِّرْكَ فِيْ تَلْبِيَتِكُمْ اَوْشَهَادَةَ الزُّوْرِ -

অনুবাদ :

এইগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শোনানো হয়েছে। যার নিষিদ্ধতা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الخ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে اِسْتِثْنَاءٌ টি مُنْقَطِعٌ হয়েছে, আবার এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ -ও হতে পারে। আর হারাম হওয়াটা মৃত্যু ইত্যাদি জনিত কারণে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এখানে مِنْ টি بَيَانٌ -এর জন্য এসেছে। অর্থাৎ, অপবিত্রতা হলো মূর্তিসমূহ। এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে অর্থাৎ তালবিয়া পাঠে তাদের শিরক থেকে কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে।

৩১. حُنَفَاءَ لِلّٰهِ مُسْلِمِيْنَ عَادِلِيْنَ عَنْ كُلِّ سِوٰى دِيْنِهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ تَاكِيْدٌ لِمَا قَبْلَهُ وَهُمَا حَالَانِ مِنَ الْوَاوِ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ سَقَطَ - مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَيْ تَاْخُذُهُ بِسُرْعَةٍ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ اَيْ تُسْقِطُهُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ بَعِيْدٍ اَيْ فَهُوَ لَا يُرْجٰى خَلَاصُهُ -

৩১. আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে মুসলমান/ অনুগত হয়ে তাঁর মনোনীত ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম হতে বিমুখ হয়ে। এবং তার কোনো শরিক না করে এটা পূর্বের বক্তব্যের তাকিদ স্বরূপ। حُنَفَاءَ এবং غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ উভয়টি فَاجْتَنِبُوْا -এর وَاوْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। এবং যে কেউ আল্লাহর শরিক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছো-মেরে নিয়ে গেল। অর্থাৎ দ্রুত নিয়ে গেল। কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। দূরবর্তী। অর্থাৎ তার নিষ্কৃতি লাভের আশা করা যায় না।

৩২. ذٰلِكَ يُقَدَّرُ قَبْلَهُ الْاَمْرُ مُبْتَدَأً وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا اَيْ فَاِنَّ تَعْظِيْمَهَا وَهِيَ الْبُدْنُ الَّتِيْ تُهْدٰى لِلْحَرَمِ بِاَنْ تُسْتَحْسَنَ وَتُسْتَسْمَنَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ مِنْهُمْ وَسُمِّيَتْ شَعَائِرَ لِاِشْعَارِهَا بِمَا يُعْرَفُ بِهِ اَنَّهَا هَدْيٌ كَطَعْنٍ حَدِيْدَةٍ بِسَنَامِهَا -

৩২. এটাই আল্লাহর বিধান এর পূর্বে اَلْاَمْرُ মুবতাদা উহ্য রয়েছে। এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে এটাতো অর্থাৎ উট যেগুলোকে হরমে হাদী স্বরূপ কুরবানির জন্য প্রেরণ করা হয়। আর সেগুলোর সম্মান এভাবে যে, সেগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য রেখে মোটাতাজা করবে। তার হৃদয়ের তাকওয়ার নিদর্শন তাদের থেকে। এগুলোকে شَعَائِرُ বলার কারণ হলো এ জাতীয় পশুতে এমন চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে এগুলো চেনা যায়। যেমন– পশুর কুঁজে বর্শা দ্বারা আঘাত করে ক্ষত করে দেওয়া।

৩৩. لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَرُكُوْبِهَا وَالْحَمْلِ عَلَيْهَا مَا لَا يَضُرُّهَا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَقْتَ نَحْرِهَا ثُمَّ مَحِلُّهَا اَيْ مَكَانُ حِلِّ نَحْرِهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ - اَيْ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ الْحَرَمُ جَمِيْعُهُ -

৩৩. এই সমস্ত আনআমে তোমাদের জন্য নানাবিধি উপকার রয়েছে। যেমন তাতে আরোহণ করা, বোঝা বহন করা যা তার জন্য ক্ষতিকর না হয়। এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কুরবানি করার সময় পর্যন্ত। অতঃপর তাদের কুরবানির স্থান অর্থাৎ এগুলোকে কুরবানি করা হালাল হওয়ার স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট অর্থাৎ তার পার্শ্বে। আর হরম দ্বারা সমগ্র হরম উদ্দেশ্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَوَّأْنَا : এ শব্দটি بَوَّأَ تَبْوِيَةً থেকে مَاضِىْ مُطْلَقْ -এর جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। অর্থ– আমি স্থান দিয়েছি। যুজাজ (র.) বলেন بَوَّأْنَا -এর অর্থ بَيَّنَّا لَهُ مَكَانَ الْبَيْتِ لِيَبْنِيَهُ وَيَكُوْنُ مُبَانَةً لَهُ ব্যাখ্যাকার (র.) بَوَّأْنَا -এর ব্যাখ্যা بَيَّنَّا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لِإِبْرَاهِيْمَ -এর মধ্যকার لَامْ অতিরিক্ত নয়; বরং صِلَةْ স্বরূপ مُتَعَدِّىْ -এর জন্য। আর যদি اَنْزَلْنَا অর্থে হয় তাহলে لَامْ -কে অতিরিক্ত মানতে হবে। কেননা এ সময় بَوَّأْنَا নিজেই مُتَعَدِّىْ হবে।

قَوْلُهُ اَمَرْنَاهُ : শব্দটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِهِ -এর مَعْمُوْل আর এ বিলুপ্ত ক্রিয়াটির عَطْف হয়েছে بَوَّأْنَا -এর উপর। وَطَهِّرْ بَيْتِىَ -এর পূর্বে اَمَرْنَا অথবা قُلْنَا উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَاْتُوْكَ : এখানে حَاضِرْ -এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে এ কারণে যে, হাজীগণ বায়তুল্লাহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে হাজির হয়ে থাকেন। অথবা এখানে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَاْتُوْ بَيْتَكَ এখানে كَافْ -এর প্রতি بَيْتْ -এর সম্বন্ধ মূলত নির্মাণের কারণেই করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ضَامِرٌ : এর অর্থ হলো দুর্বল, যার কোমর চিকন হয়, শব্দটি ضُمُوْر থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। تَضْمِيْر বলা হয় ঘোড়াকে মোটা করার পরে তাকে দৌড়িয়ে দুর্বল করাকে, যাতে সে দ্রুতগামী ও তেজস্বী হয়।

قَوْلُهُ يَاْتِيْنَ : এটা বহুবচনের সীগাহ। ضَامِرْ -এর সিফত। অথচ ضَامِرْ হলো مُفْرَدْ আর كُلِّ ضَامِرٍ বহুবচনের অর্থে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে يَاْتِيْنَ -কে বহুবচন আনা হয়েছে। অন্যাথায় يَاْتِىْ আনা উচিত ছিল।

قَوْلُهُ لِيَشْهَدُوْا : এর সম্বন্ধ اَذِّنْ এবং يَاْتُوْكَ উভয়ের সাথে হতে পারে। তবে দ্বিতীয়টি অধিক স্পষ্ট। اِذَا كَانَتْ مُسْتَحَبَّةً ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট যেহেতু ওয়াজিব কুরবানির গোশত ধনীদের জন্য খাওয়া বৈধ নয়, এজন্য ব্যাখ্যাকার اِذَا كَانَتْ مُسْتَحَبَّةً বৃদ্ধি করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, জেনায়েতের দম তথা কোনো অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে পশু জবাই করা হয় তা ছাড়া অন্যান্য কুরবানী ধনীদের জন্য খাওয়া জায়েজ আছে। যেমন তামাত্তু ও কিরান হজের কুরবানি বা দম খাওয়া জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ طَوَافُ الْاِفَاضَةِ : এটা হলো তওয়াফের রোকন। এটাকে তওয়াফে জিয়ারতও বলা হয়। মুফাসসির (র.) এটাকে ইফাদা (اِفَاضَةْ) বলেছেন। এ সময়টি হলো আরাফাত থেকে বিদায় হওয়ার সময়।

قَوْلُهُ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : عَتِيْق -এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা– **ক.** প্রাচীন, যেহেতু ইবাদতখানা স্বরূপ পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর হলো বায়তুল্লাহ, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। **খ.** স্বাধীন, মুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এ ঘরকে জালিম শাসকদের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রেখেছেন, এ কারণেই তাকে আতীক বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের হস্তক্ষেপ বা বিধ্বস্ত করার ঘটনাটি মূলত হযরত জুবায়ের (রা.)-কে বায়তুল্লাহ থেকে বের করার জন্য ছিল, বায়তুল্লাহকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছিল না। এ কারণেই তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পরে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বাতুল্লাহকে পুনরায় নির্মাণ করে দেন। কেউ কেউ আতীক অর্থ সম্মানিত বলেছেন। –[হাশিয়াতুল জুমাল]

قَوْلُهُ تَحْرِيْمُهُ : এ শব্দটি বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يُتْلٰى -এর নায়েবে ফায়েল উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) যদি تَحْرِيْمُهُ উহ্য মানার পরিবর্তে اٰيَتُ التَّحْرِيْمِ বিলুপ্ত মানতেন তাহলে তা আরো উত্তম হতো। কেননা তেলাওয়াতকৃত বিষয় হলো আয়াতে তাহরীম, মূল তাহরীম নয়।

قَوْلُهُ فَالْاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ ; কেননা اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হলো وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ الْاٰيَةَ এটা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তথা اَلْاَنْعَامْ -এর সমজাতীয় নয়। আবার

-ও হতে পারে। তা এভাবে যে, إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ -এর মধ্যকার مَا দ্বারা ঐ সকল মৃত জন্তু উদ্দেশ্য যা মৃত্যুর কোনো কারণ সাপেক্ষে মরে গেছে। অথবা গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে। সুতরাং এ সময় مُسْتَثْنٰى مِنْهُ টা مُسْتَثْنٰى -এর শ্রেণিগত হবে। সুতরাং مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে।

قَوْلُهُ حُنَفَاءَ : এটা اِجْتَنِبُوْا -এর وَاوْ যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ شَعَائِرَ اللّٰهِ : شَعَائِرْ বলা হয় হজের কার্যাবলিকে। এর একবচন হলো شَعِيْرَةٌ বা شِعَارَةٌ আর مَشَاعِرْ শব্দটি হজ আদায়ের জায়গাসমূহের অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ هِيَ الْبُدْنُ : পূর্বের বাচনভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখে شَعَائِرْ -এর ব্যাখ্যা করেছেন بُدْنٌ দ্বারা। তবে এটাকে ব্যাপক অর্থে রাখলেই ভালো হতো। তাহলে হজের অন্যান্য কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হতো।

قَوْلُهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ مِنْهُمْ : مِنْهُمْ বৃদ্ধি করে ইশারা করেছেন যে, مَنْ يُعَظِّمْ -এর মধ্যকার مِنْ مَوْصُوْلَةٌ আর مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ বাক্য হয়ে صِلَةٌ , এর মধ্যে একটি ضَمِيْر থাকা আবশ্যক, আর তা হলো مِنْهُمْ

قَوْلُهُ طَعْنٌ : এর অর্থ হলো বর্শা দ্বারা আঘাত করা। سِنَامٌ অর্থ উটের পিঠের উঁচু অংশ তথা কুঁজ।

قَوْلُهُ كَرُكُوْبِهَا : এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে। আর হানাফীগণের মতে অপারগতা ছাড়া সওয়ার হওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ الْمُرَادُ الْحَرَمُ : এখানে নিকটবর্তী বস্তুকে হুবহু বস্তুর বিধান দান করা হয়েছে। কেননা হাদী বায়তুল্লাহে জবাই করা হয় না; বরং হেরেমের অভ্যন্তরে জবাই করা জরুরি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হেরেমের সীমারেখার মধ্যে জবাই করা আবশ্যক।

قَوْلُهُ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : অর্থাৎ কুরবানীর পশু জবাই করার জায়গা হলো বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী স্থান, অর্থাৎ, হেরেমের অভ্যন্তরে, চাই মক্কায় হোক বা মীনায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ : বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা : আভিধানে بَوَّأَ শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই– একথা উল্লেখযোগ্য ও স্মর্তব্য যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল্লাহর অবস্থানস্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাতুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। হযরত আদম (আ.) ও তৎপরবর্তী পয়গাম্বরগণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতেন। হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এই জায়গার মাঝেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেওয়া হয়– اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا অর্থাৎ আমার ইবাদতে কাউকে শরিক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ.) শিরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মূর্তি সংহার, মুশরিদের মোকাবিলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাবলি পূর্বেই ঘটে গিয়েছিল। তাই এখানে এরূপ সাধারণ মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্য, যাতে তারা শিরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেওয়া হয়– وَطَهِّرْ بَيْتِيَ অর্থাৎ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয় ; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ বলা হয়। এই ভূখণ্ড সব সময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জুরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করতো। –[কুরতুবী]

এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ হলো কুফর ও শিরক থেকেও পবিত্র রাখা বাহ্যিক ময়লা-আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট করা। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজেই এ কাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে ঐ কাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি তৃতীয় আদেশ : وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহর হজ তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। -[বগভী] ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হয় তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মতো কেউ নেই যেখানে জনবসতি আছে, সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌছবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। সারা বিশ্বে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হযরত ইবরাহীম (আ.) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আল্লাহ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি আবূ কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে আঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন, 'লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ ফরজ করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।' এই রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল তাদের সবার কান পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌছিয়ে দেওয়া হয়, যার যার ভাগ্যে আল্লাহ তা'আলা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ বলেছে অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আওয়াজের জবাবই হচ্ছে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। -[কুরতুবী, মাযহারী]

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে- يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ অর্থাৎ, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে চলে আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গাম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতে আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে বর্ণিত ছিল।

قَوْلُهُ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ : অর্থাৎ দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে مَنَافِعَ শব্দটি نَكِرَةٌ ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই, উপরন্তু পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয়িত হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে সঞ্চয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে; কিন্তু সারা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোনো ব্যক্তি হজ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন- বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃস্ব ও ফকির হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ তা'আলা হজ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোনো ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না; বরং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হজ ও ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত একটি কল্যাণ কোনো অংশে কম নয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গুনাহের কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে। অর্থাৎ জন্মের প্রথমাবস্থায় শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সেও তদ্রূপই হয়ে যায়। -[বুখারী, মুসলিম ও মাযহারী]

বায়তুল্লাহর কাছে হাজীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হলো যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে। দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে- وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ অর্থাৎ যাতে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরি কথা এই যে, কুরবানির গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত; বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর জিকির, যা এই দিনগুলোতে কুরবানি করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই ইবাদতের প্রাণ। কুরবানির গোশত তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নিয়ামত। 'নির্দিষ্ট দিনগুলো' বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কুরবানি করা জায়েজ। অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ -এর অর্থ ব্যাপক ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব- সব রকম কুরবানি এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ فَكُلُوْا مِنْهَا : এখানে كُلُوْا শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়: বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা। যেমন- কুরআনের وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতি দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাসআলা : হজের মওসুমে মক্কা মুয়ায্যমায় বিভিন্ন প্রকার জন্তু জবাই করা হয়। কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে এক প্রকার জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন- কেউ হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে শিকার করলে এর প্রতিদানে তার উপর কোনো জন্তুর কুরবানি ওয়াজিব হয়। শিকারকৃত কোনো জন্তুর পরিবর্তে কোন ধরনের জন্তু কুরবানি করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ, কেউ সেরূপ কোনো কাজ করে ফেললে তার উপরও জন্তু কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ফিকহবিদগণের পরিভাষায় এরূপ কুরবানিকে 'দমে-জিনায়াত' [ত্রুটিজনিত কুরবানি] বলা হয়। কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গরু অথবা উট কুরবানি করা জরুরি হয়, কোনো কোনো কাজের জন্য ছাগল-ভেড়াই যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজের জন্য কুরবানি ওয়াজিব হয় না, শুধু সদকা দিলেই চলে। এসব বিবরণ পেশ করার স্থান এটা নয়। 'আহকামুল হজ' পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ত্রুটি ও অপরাধের শাস্তি হিসেবে যে কুরবানি ওয়াজিব হয়, তার গোশত খাওয়া অপরাধী ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়; বরং এটা শুধু ফকির-মিসকিনদের হক। অন্য কোনো ধনী ব্যক্তির জন্যও তা খাওয়া জায়েজ নয়। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত। কুরবানির অবশিষ্ট প্রকার ওয়াজিব হোক কিংবা নফল সেগুলোর গোশত কুরবানিকারী নিজে, তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ধনী হলেও খেতে পারে। হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ীদের মতে 'তামাত্তু' ও 'কেরানে'র কুরবানিও ওয়াজিব কুরবানির অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে অবশিষ্ট প্রকার কুরবানিই বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সাধারণ কুরবানি এবং হজের কুরবানিসমূহের কমপক্ষে গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ ফকির-মিসকিনকে দান করা মোস্তাহাব। এই মোস্তাহাব আদেশই আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ
بَآئِسْ শব্দের অর্থ দুঃস্থ এবং فَقِيْر -এর অর্থ অভাবগ্রস্ত। উদ্দেশ্য এই যে, কুরবানির গোশত তাদেরকেও আহার করানো ও দেওয়া মোস্তাহাব ও কাম্য।

قَوْلُهُ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ : تَفَثْ এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডানো, চুল কাটা , উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নিচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজের কুরবানি সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ ইহরাম খুলে ফেল, মাথা মুণ্ডাও এবং নখ কাট। নাভীর নিজের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কুরবানি ও পরে ইহরাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কুরবানির পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুণ্ডানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ত্রুটিজনিত কুরবানি করতে হবে।

হজের ক্রিয়াকর্মে ক্রমধারার গুরুত্ব : হজের ক্রিয়াকর্মের যে ক্রমধারা কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, ফিকহবিদগণ তা বিন্যস্ত করেছেন। এই ক্রমধারা অনুযায়ী হজের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নত; ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করলে ত্রুটিজনিত কুরবানি ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সুন্নত। কাজেই বিরুদ্ধাচরণ করলে ছওয়াব হ্রাস পায়,

কুরবানি ওয়াজিব হয় না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে আছে- مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهٖ اَوْ اَخَّرَهٗ فَلْيُهْرِقْ دَمًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কোনোটিকে অগ্রে অথবা পশ্চাতে নিয়ে যায়, তার উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ইমাম তাহাভী (র.)-ও এই রেওয়ায়েতটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছে এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, নাখায়ী ও হাসান বসরী (র.)-এর মাযহাবও তাই। তাফসীরে হজের অন্যান্য মাসআলাও বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ : نُذُوْرٌ শব্দটি نَذْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ মানত। এর স্বরূপ এই যে, শরিয়তের আইনে যে কাজ কোনো ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি এ কাম করব অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে আমার জন্য এই কাজ করা জরুরি, তবে একেই নজর বা মানত বলা হয়। এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও মূলত তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কাজটি গুনাহ ও নাজায়েজ না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোনো গুনাহের কাজের মানত করে, তবে সেই গুনাহের কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরি হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রমুখ ফিকহবিদের মতে কাজটি উদ্দিষ্ট ইবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত। যেমন নামাজ, রোজা, সদকা, কুরবানি ইত্যাদি। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি নফল নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মাসআলা : স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ মুখে উচ্চারণ না করে। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে নযর ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : এই আয়াতে পূর্বেও হজের ক্রিয়াকর্ম, তথা কুরবানি ও ইহরাম খোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরেও তওয়াফে- যিয়ারত এর কথা বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে মানত পূর্ণ করার আলোচনা করা হয়েছে ; অথচ মানত পূর্ণ করা একটি স্বতন্ত্র বিধান। হজ ছাড়াও হেরেমে এবং হেরেমের বাইরে যে কোনো দেশে মানত পূর্ণ করা যায়। অতএব আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্বন্ধ কি?

উত্তর এই যে, মানত পূর্ণ করা যদিও একটি স্বতন্ত্র নির্দেশ এবং হজের দিন, হজের ক্রিয়াকর্ম ও হেরেমের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। কিন্তু হজের ক্রিয়া কর্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ যখন হজের জন্য রওয়ানা হয় তখন এই সফরে অধিক পরিমাণে সৎ কাজ ও ইবাদত করার স্পৃহা তার মনে জাগ্রত হয়। ফলে সে অনেক কিছুর মানতও করে, বিশেষত জন্তু কুরবানির মানত তো ব্যাপকভাবেই প্রচলিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এখানে মানতের অর্থ কুরবানির মানতই করেছেন। হজের বিধানের সাথে মানতের আরো একটি সম্বন্ধ এই যে, মানত ও কসমের কারণে যেমন মানুষের উপর শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব এমন অনেক বিষয় ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আসলে হারাম ও নাজায়েজ নয়, এমন অনেক বিষয় হারাম ও নাজায়েজ হয়ে যায় তেমনিভাবে হজের ক্রিয়াকর্ম, যা সারা জীবনে একবারেই ফরজ হয় কিন্তু হজ ও ওমরার ইহরাম বাঁধার কারণে সব ক্রিয়াকর্ম তার উপর ফরজ হয়ে যায়। ইহরামের সব বিধান প্রায় এমনি ধরনেরই। সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি ব্যবহার, চুল মুণ্ডানো, নখ কাটা ইত্যাদি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নাজায়েজ কাজ নয়; কিন্তু ইহরাম বাঁধার কারণে এ সবগুলোই হারাম হয়ে যায়। এ কারণেই হযরত ইকরিমা (রা.) এ স্থলে মানতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এখানে হজের ওয়াজিব কর্মসমূহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো হজের কারণে তার উপর জরুরি হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে যিয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কুরবানির পর করা হয়। এই তওয়াফ হজের দ্বিতীয় রোকন ও ফরজ। প্রথম রোকন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরো পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে যিয়ারতের পর ইহরামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ ইহরাম খুলে যায়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ : عَتِيْق শব্দের অর্থ- মুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাঁর গৃহের নাম بَيْت عَتِيْق রেখেছেন কারণ আল্লাহ একে কাফের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। -[রূহুল মা'আনী] কোনো কাফেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে ফীল তথা হস্তি বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ حُرُمَاتِ اللّٰهِ : حُرُمَاتِ اللّٰهِ বলে আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, শরিয়তের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

قَوْلُهُ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ : اَنْعَامْ বলে উট, গরু, ছাগল , মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইহরাম অবস্থায়ও হালাল। اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ বাক্যে যেসব জন্তুর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ, মৃত জন্তু যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম ইহরাম অবস্থায় হোক কিংবা ইহরামের বাইরে।

قَوْلُهُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ : رِجْسٌ শব্দের অর্থ– অপবিত্রতা, ময়লা। اَوْثَانٌ শব্দটি وَثَنٌ -এর বহুবচন; অর্থ– মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে। কারণ এরা মানুষের অন্তরকে শিরকের অপিবত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

قَوْلُهُ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ : قَوْلُ زُوْرٍ -এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থি, তাই বাতিলও মিথ্যাভুক্ত। শিরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারস্পরিক লেনদেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বৃহত্তম কবীরা গুনাহ হচ্ছে এগুলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قَوْلُ الزُّوْرِ -কে বার বার উচ্চারণ করেন। –[বুখারী]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ : شَعِيْرَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোনো বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শায়ায়েরে ইসলাম' বলা হয়। হজের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

قَوْلُهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ : অর্থাৎ, আল্লাহর আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক আল্লাহভীতির লক্ষণ। যার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে আল্লাহভীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজে-কর্মে পরিলক্ষিত হয়।

قَوْلُهُ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى : অর্থাৎ চতুস্পদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ারী, মাল পরিবহন ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্য তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হেরেম শরীফে জবাই করার জন্য উৎসর্গ না কর। হজ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি জবাই করার জন্য যে জন্তু সাথে নিয়ে যায়, তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোনো জন্তুকে হেরেমের হাদী হওয়ার জন্য উৎসর্গ করা হয়, তখন তা থেকে কোনো উপকার লাভ করা বিশেষ কোনো অপারগতা ছাড়া জায়েজ নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোনো জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

قَوْلُهُ ثُمَّ مَحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ : এখানের اَلْبَيْتُ الْعَتِيْقُ [সম্মানিত গৃহ] বলে সম্পূর্ণ হেরেম বোঝানো হয়েছে। হেরেম হলো বায়তুল্লাহরই বিশেষ আঙ্গিনা। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'মসজিদে হারাম' বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে। مَحَلٌّ অর্থাৎ, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে জবাই করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু জবাই করার স্থান বায়তুল্লাহর সন্নিকট অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হেরেম। এতে বোঝা গেল যে, হেরেমের ভিতরে হাদী জবাই করা জরুরি, হেরেমের বাইরে জায়েজ নয়। হেরেম মিনার কুরবানিগাহও হতে পারে, মক্কা মুকাররমার অন্য কোনো স্থানও হতে পারে। –[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٣٤. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَىْ جَمَاعَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلَفَتْ قَبْلَكُمْ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِفَتْحِ السِّيْنِ مَصْدَرٌ وَبِكَسْرِهَا اِسْمُ مَكَانٍ اَىْ ذَبْحًا قُرْبَانًا اَوْ مَكَانَهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ط عِنْدَ ذَبْحِهَا فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗ اَسْلِمُوْا ط اِنْقَادُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ . اَلْمُطِيْعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ .

৩৪. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত মুমিন দলের জন্য। আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি। مَنْسَكًا শব্দটির سِيْن বর্ণে যবর তখন এটা মাসদার হবে। আর س বর্ণে যের হলে এটা ظَرْف مَكَانْ অর্থাৎ কুরবানির পশু জবাই করা তা বা জবাই করার স্থান। তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেগুলো জবাই করার সময়। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা তারই নিকট আত্ম সমর্পণ কর। অনুগত হও। এবং সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে। অনুগত ও বিনয়ীগণকে।

٣٥. الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ خَافَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ اَصَابَهُمْ مِنَ الْبَلَايَا وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ فِىْ اَوْقَاتِهَا وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ . يَتَصَدَّقُوْنَ .

৩৫. আল্লাহর নাম স্মরণ হলে যাদের হৃদয় প্রকম্পিত হয় ভীত হয়। যারা তাদের আপদ-বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে তার নির্দিষ্ট সময়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে দান-খয়রাত করে।

٣٦. وَالْبُدْنَ جَمْعُ بَدَنَةٍ وَهِىَ الْاِبِلُ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ اَعْلَامِ دِيْنِهٖ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ نَفْعٌ فِى الدُّنْيَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَجْرٌ فِى الْعُقْبٰى فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا عِنْدَ نَحْرِهَا صَوَآفَّ ج قَائِمَةً عَلٰى ثَلٰثٍ مَعْقُوْلَةَ الْيَدِ الْيُسْرٰى فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا سَقَطَتْ اِلَى الْاَرْضِ بَعْدَ النَّحْرِ وَهُوَ وَقْتُ الْاَكْلِ مِنْهَا فَكُلُوْا مِنْهَا اِنْ شِئْتُمْ . وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ الَّذِىْ يَقْنَعُ بِمَا يُعْطٰى وَلَا يَسْاَلُ وَلَا يَتَعَرَّضُ وَالْمُعْتَرَّ ط اَلسَّائِلَ اَوِ الْمُتَعَرِّضَ كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ ذٰلِكَ التَّسْخِيْرِ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ بِاَنْ تُنْحَرَ وَ تُرْكَبَ وَاِلَّا لَمْ تُطِقْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ . اِنْعَامِىْ عَلَيْكُمْ .

৩৬. এবং উষ্ট্রকে এটা بَدَنَةٌ -এর বহুবচন অর্থ উট আমি তোমাদের জন্য করেছি আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। তার দীনের বিভিন্ন আলামত। তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে। পৃথিবীতে কল্যাণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরকালে প্রতিদান। সুতরাং তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর জবাই করার সময় সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় অর্থাৎ সেগুলো তিন পায়ে ভর করে দাঁড়ানো অবস্থায় ও বাম পা বাঁধা অবস্থায়। যখন সেগুলো কাত হয়ে পড়ে যায় নহর করার পর মাটিতে ভূপাতিত হয় তখন তা হতে ভক্ষণ করার সময়। তখন তোমরা তা হতে আহার কর যদি তোমরা খেতে চাও। এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে তাকে যা প্রদান করা হয় তাতেই সে তুষ্ট থাকে এবং কারো নিকট যাঞ্চ্ঞা করে না ও কারো নিকট যায় না। ও যাঞ্চ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক। এভাবেই অর্থাৎ এরূপ বাধ্যগত করার ন্যায় আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি এভাবে যে, যাতে নহর করতে ও আরোহণ করতে পার। অন্যথায় তোমরা সক্ষম হতে না যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তোমাদের উপর প্রদত্ত আমার অনুগ্রহের।

অনুবাদ :

৩৭. لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اَىْ لَا يُرْفَعَانِ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط اَىْ يُرْفَعُ اِلَيْهِ مِنْكُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْخَالِصُ لَهٗ مَعَ الْاِيْمَانِ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ اَرْشَدَكُمْ لِمَعَالِمِ دِيْنِهٖ وَمَنَاسِكِ حَجِّهٖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ـ اَىْ الْمُوَحِّدِيْنَ ـ

৩৭. আল্লাহর নিকট পৌঁছে না তাদের গোশত এবং রক্ত অর্থাৎ তাঁর নিকট এগুলোকে উঠানো হয় না। তবে পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া অর্থাৎ, তাঁর নিকট উঠানো হয় ঈমানের সাথে খাঁটি সৎকর্মসমূহ এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন তোমাদেরকে তার দীনের নিদর্শনাবলি আঞ্জাম দেওয়ার এবং নিজেদের হজ পালন করার তৌফিক দান করেছেন। সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে অর্থাৎ একত্ববাদে বিশ্বাসীগণকে।

৩৮. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط غَوَائِلَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ فِىْ اَمَانَتِهٖ كَفُوْرٍ ـ لِنِعْمَتِهٖ وَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ الْمَعْنٰى اَنَّهٗ يُعَاقِبُهُمْ ـ

৩৮. আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদেরকে মুশরিকদের বিপদাপদকে প্রতিহত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো বিশ্বাসঘাতককে তার আমানতের ক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞকে তাঁর নিয়ামতের। আর এরা হলো মুশরিকরা। অর্থ হচ্ছে– তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ مَنْسَكًا : এ শব্দটির س বর্ণে যবর হলে এটি মাসদার হবে। অর্থ কুরবানি করা, আর যেরযোগে হলে তা হবে اِسْم ظَرْف অর্থাৎ, কুরবানি করার স্থানে। مَنْسَكٌ এবং نُسُكٌ আরবি ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– ১. পশু কুরবানি করা। ২. হজের সকল কার্যকলাপ। ৩. স্বাভাবিক ইবাদত-বন্দেগী। এখানে তিনোটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে مَنْسَكٌ দ্বারা কুরবানির অর্থ নিয়েছেন। এ সময় অর্থ হবে কুরবানির বিধান যা এ উম্মতকে দেওয়া হয়েছে। এটা কোনো নতুন বিধান নয়, বরং পূর্বের উম্মতদেরকেও এমন বিধান দেওয়া হয়েছিল। হযরত কাতাদা (র.) দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এ সময় এর উদ্দেশ্য হবে হজের কার্যাবলি যেভাবে এ উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, পূর্বের উম্মতের উপরও তদ্রূপ এ বিধান আরোপিত ছিল। অর্থাৎ তাদের উপরও হজ ফরজ ছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, অর্থাৎ আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্বের উম্মতসমূহের উপরও ফরজ করেছিলাম।

قَوْلُهٗ ذَبْحًا قُرْبَانًا : এটা মাসদারের অর্থকে স্পষ্টকারী। قُرْبَانًا শব্দটি ذَبْحًا মাসদারের مَفْعُوْل بِهٖ ; اَوْ مَكَانَهٗ এটা দ্বিতীয় অর্থ তথা اِسْمُ ظَرْف -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهٗ الْمُطِيْعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ : مُطِيْعِيْنَ দ্বারা مُخْبِتِيْنَ -এর لَازِمْ مَعْنٰى তথা আবশ্যিক অর্থের বর্ণনা। আর مُتَوَاضِعِيْنَ এটা মূল অর্থের বর্ণনা। কেননা اِخْبَاتْ বলা হয় নিম্নভূমিতে অবতরণ করাকে।

قَوْلُهٗ وَهِىَ الْاِبِلُ : এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উক্তি। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উট এবং গরু উভয়ের উপর بَدَنَة শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং এ উক্তিটি অভিধান এবং শরিয়তের অনুকূলে। কামূস অভিধানে আছে যে– اَلْبَدَنَةُ مِنَ الْاِبِلِ

وَالْبَقَرْ আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফে হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সাথে হজের ইহরাম বেঁধে বের হলাম, তিনি আমাদেরকে গরু এবং উটের মধ্য থেকে প্রত্যেক বুদনায় (بُدْنَةٌ) সাতজনকে শরিক হওয়ার নির্দেশ দিলেন। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আমরা বুদনাকে সাতজনের পক্ষ থেকে জবাই করতাম। জিজ্ঞেস করা হলো গরুর মধ্যে? তিনি বললেন, গরুও বুদনার অন্তর্গত। –[জালালাইনের প্রান্তটীকা]

قَوْلُهُ صَوَآفَّ : শব্দটি صَافٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। وَجَبَتْ অর্থ سَقَطَتْ অর্থাৎ, পতিত হলো, এটা وَجَبَ الْحَائِطُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, অর্থ দেয়াল বিধ্বস্ত হয়েছে। এখানে অর্থ হলো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থির হওয়া।

قَوْلُهُ فَكُلُوْا مِنْهَا اِنْ شِئْتُمْ : اِنْ شِئْتُمْ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, كُلُوْا আমরের সীগাটি وُجُوْبٌ -এর জন্য নয় বরং اِبَاحَتٌ তথা বৈধতা বর্ণনার জন্য।

قَوْلُهُ غَوَائِلْ : এ শব্দটি বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, يُدَافِعُ -এর مَفْعُوْل বিলুপ্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ : এর মধ্যে مَا مَصْدَرِيَّةٌ -ও হতে পারে। আবার مَوْصُوْلَةٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ, عَلٰى مَا هَدَاكُمْ اِلَيْهِ এখানে عَلٰى -এর সম্বন্ধ হলো لِتُكَبِّرُوْا -এর সাথে, আর تَكَبُّرًا ক্রিয়াটি تَشْكُرُوْا -এর অর্থ বিশিষ্ট, যাতে তার صِلَةٌ টা عَلٰى -এর সাথে ব্যবহার করা বৈধ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : আরবি ভাষায় مَنْسَكٌ ও نُسُكٌ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– ১. জন্তু কুরবানি করা। ২. হজের ক্রিয়াকর্ম এবং ৩. ইবাদত। কুরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিনোটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিনোটি অর্থেই হতে পারে। এ কারণেই তাফসীরকারক মুজাহিদ (র.) প্রমুখ এখানে مَنْسَكٌ -এর অর্থ কুরবানি নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কুরবানির যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা কোনো নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কুরববানির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কাতাদা (র.) দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজে ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ ফরজ করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা (র.) তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর ইবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ করেছিলাম। ইবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল কিন্তু মূল ইবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

قَوْلُهُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ : আরবি ভাষায় خَبْتٌ শব্দর অর্থ– নিম্নভূমি। এ কারণে এমন ব্যক্তিকে خَبِيْثٌ বলা হয়, যে নিজেকে হেয় মনে করে। এ জন্যই কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.) مُخْبِتِيْنَ -এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমর ইবনে আউস (র.) বলেন, এমন লোকদেরকে مُخْبِتِيْنَ বলা হয় যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান (র.) বলেন, যারা সুখে দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব অনটনে আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مُخْبِتِيْنَ

قَوْلُهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ : وَجَلٌ -এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি , যা কারও মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অবস্থা এই যে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও ইবাদতকে شَعَآئِرُ বলা হয়। কুরবানিও এমন বিধানাবলির অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

قَوْلُهُ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ : صَوَافٌّ শব্দের অর্থ সারিবদ্ধভাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.)-এর এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কুরবানি করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় জবাই করা সুন্নত।

قَوْلُهُ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا : এখানে وَجَبَتْ এর অর্থ سَقَطَتْ যেমন বাকপদ্ধতিতে বলা হয় وَجَبَتِ الشَّمْسُ অর্থাৎ, সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ : যাদেরকে কুরবানির গোশত দেওয়া উচিত, পূর্ববর্তী আয়াতে তাদেরকে بَائِسْ فَقِيْرْ বলা হয়েছে। এর অর্থ– দুঃস্থ, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তৎস্থলে قَانِعْ وَمُعْتَرٌّ শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তাফসীর করা হয়েছে। قَانِعْ ঐ অভাবগ্রস্ত ফকিরকে বলা হয়, যে কারো কাছে যাঞ্চা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে مُعْتَرٌّ ঐ ফকিরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে মুখে সওয়াল করুক বা না করুক। –[মাযহারী]

ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য: لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কুরবানি একটি মহান ইবাদত; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌছে না এবং কুরবানির উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্য সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাজে উঠাবসা করা এবং রোজার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত ইবাদত প্রাণহীণ কাঠামো মাত্র। কিন্তু ইবাদতের শরিয়ত সম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্য এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে হজের বিধান এবং দুনিয়া আখিরাতে হজের উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে, আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদেরকে পবিত্র কাবা শরীফ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছে।

মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা : আর এ আয়াতে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের বাড়াবাড়ি বেশি দিন আর চলবে না। অদূর ভবিষ্যতেই এমন অবস্থা হবে যে, মুসলমানদেরকে হজ ও ওমরা পালনে কোনো শত্রুই বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহ পাক তাদের বিষ দাত ভেঙ্গে দিবেন, আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করবেন যে, কাফেররা মুসলমানদের গায়ে আচড় পর্যন্ত দিতে পারবে না। তাই ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক মুমিনগণ থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দিবেন এবং কাফেরদের অন্যায়-অনাচার বন্ধ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, পছন্দ না করার তাৎপর্য হলো, ঘৃণা করা। অর্থাৎ যারা অবাধ্য কাফের এবং যারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ তাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। মুমিনদেরকে আল্লাহ পাক সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করে অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ পাক কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? আর অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ অর্থাৎ "আর যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।" অতএব মুমিন মাত্রেরই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না।

তাফসীরকার জুরায়েজ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানির জন্তু জবাই করার সময় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নাম স্মরণ করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নামে কুরবানি করে এবং তাদের মূর্তিগুলোর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তাকেই আলোচ্য আয়াতে خَوَّانٍ كَفُوْرٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারাই হলো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ। আর এমন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না। অতএব যারা মুমিন, যারা সত্যপরায়ণ, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত এবং কাফেরদের পরাজয় অবধারিত।

অনুবাদ :

٣٩. اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ اَىْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يُقَاتِلُوْا وَهٰذِهٖ اَوَّلُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ فِى الْجِهَادِ بِاَنَّهُمْ اَىْ بِسَبَبِ اَنَّهُمْ ظُلِمُوْا بِظُلْمِ الْكَافِرِيْنَ اِيَّاهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ـ

৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনগণকে যুদ্ধ করার আর এটাই হলো জিহাদ সংক্রান্ত অবতীর্ণ প্রথম আয়াত কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাদের উপর কাফেরদের অত্যাচারের কারণে। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

٤٠. اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ فِى الْاِخْرَاجِ مَا اُخْرِجُوْا اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا اَىْ بِقَوْلِهِمْ رَبُّنَا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَهٰذَا الْقَوْلُ حَقٌّ وَالْاِخْرَاجُ بِهٖ اِخْرَاجٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بَدَلُ بَعْضٍ مِنَ النَّاسِ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ بِالتَّشْدِيْدِ لِلتَّكْثِيْرِ وَبِالتَّخْفِيْفِ صَوَامِعُ لِلرُّهْبَانِ وَبِيَعٌ كَنَائِسُ لِلنَّصَارٰى وَّصَلَوٰتٌ كَنَائِسُ لِلْيَهُوْدِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَّمَسٰجِدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ يُذْكَرُ فِيْهَا اَىِ الْمَوَاضِعُ الْمَذْكُوْرَةُ اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ بِخَرَابِهَا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اَىْ يَنْصُرُ دِيْنَهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَلٰى خَلْقِهٖ عَزِيْزٌ ـ مُنِيْعٌ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَقُدْرَتِهٖ ـ

৪০. তাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের বহিষ্কারের কোনোই কারণ ছিল না। শুধু এ কারণে যে, তারা বলে তাদের এ কথার কারণে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তিনি একক সত্তা। আর একথা সঠিক। আর এ কারণে বহিষ্কার করা অন্যায় বহিষ্কারই। আল্লাহ্ যদি মানব দলের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন بَعْضَهُمْ এটা مِنَ النَّاسِ থেকে بَدَلُ الْبَعْضِ হয়েছে। তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত لَهُدِّمَتْ -এর دال বর্ণে তাশদীদসহ অধিক বর্ণনা করার জন্য এবং তাশদীদবিহীনও পঠিত রয়েছে। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনার স্থান, গীর্জা খ্রিস্টানদের উপাসনালয়। ইহুদিদের উপাসনালয় ইবরানী ভাষায় صَلَوٰتٌ বলা হয় ইহুদিদের كَنِيْسَه -কে। এবং মসজিদসমূহ মুসলমানদের যাতে স্মরণ করা হয় অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানসমূহে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে সে সকল স্থানসমূহ বিরান হওয়ার ফলে ইবাদতও বন্ধ হয়ে যেত। আর আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন যে, তাঁকে সাহায্য করে অর্থাৎ যে তাঁর দীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয় শক্তিমান তাঁর সৃষ্টির উপর। পরাক্রমশালী স্বীয় শক্তি ও রাজত্বে অন্যকে প্রতিহতকারী।

অনুবাদ :

٤١. اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ بِنَصْرِهِمْ عَلٰى عَدُوِّهِمْ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط جَوَابُ الشَّرْطِ وَهُوَ وَجَوَابُهُ صِلَةُ الْمَوْصُوْلِ وَيُقَدَّرُ قَبْلَهُ هُمْ مُبْتَدَأً وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ اَىْ اِلَيْهِ مَرْجِعُهَا فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৪১. আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তাদের শত্রুর মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্যের মাধ্যমে এরা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দিবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। এটা হলো شَرْط -এর জবাব। আর شَرْط এবং جَوَابٌ شَرْط মিলে اَلَّذِيْنَ মওসুল-এর সেলাহ। এর পূর্বে هُمْ মুবতাদা উহ্য রয়েছে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাধীন অর্থাৎ পরকালে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

٤٢. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ تَانِيْثُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنٰى وَّعَادٌ قَوْمُ هُوْدٍ وَّثَمُوْدُ ـ قَوْمُ صَالِحٍ ـ

৪২. লোকেরা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে এ বাক্যে নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করা হচ্ছে। তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ সম্প্রদায় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে قَوْم -কে স্ত্রীলিঙ্গ ধরে كَذَّبَتْ ফে'লটিকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। এবং আদ হযরত হূদ (আ.)-এর সম্প্রদায় ও সামূদ হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়।

٤٣. وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ـ

৪৩. হযরত ইবরাহীম ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়।

٤٤. وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبٍ وَكُذِّبَ مُوْسٰى كَذَّبَهُ الْقِبْطُ لَا قَوْمُهُ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ اَىْ كَذَّبَ هٰؤُلَاءِ رُسُلَهُمْ فَلَكَ اُسْوَةٌ بِهِمْ فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِقَابِ لَهُمْ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ بِالْعَذَابِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ـ اَىْ اِنْكَارِىْ عَلَيْهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ بِاِهْلَاكِهِمْ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَىْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ ـ

৪৪. এবং মাদইয়ানবাসীরা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায়। আর মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল হযরত মূসা (আ.)-কেও। তাঁকে অস্বীকার করেছিল কিবতীরা। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলরা নয়। অর্থাৎ এরা নিজেদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুতরাং তাদের সাথে আপনার জন্য নমুনা রয়েছে। আমি কাফেরদেরকে অবকাশ দিয়েছি। তাদের জন্য শাস্তি বিলম্ব করে তাদেরকে সুযোগ দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম শাস্তি দ্বারা। অতএব, কেমন ছিল শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে ধ্বংসের ব্যাপারে আমার পাকাড়াও বা শস্তি প্রদান। এখানে اِسْتِفْهَام টি تَقْرِيْر -এর জন্য হয়েছে অর্থাৎ তা যথার্থ বাস্তবায়ন হয়েছে।

অনুবাদ :

٤٥. فَكَاَيِّنْ اَىْ كَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْتُهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ اَىْ اَهْلُهَا بِكُفْرِهِمْ فَهِىَ خَاوِيَةٌ سَاقِطَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا سُقُوْفِهَا وَ كَمْ مِنْ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ مَتْرُوْكَةٍ بِمَوْتِ اَهْلِهَا وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ـ رَفِيْعٍ خَالٍ بِمَوْتِ اَهْلِهٖ ـ

৪৫. আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এক কেরাতে اَهْلَكْنَاهَا রয়েছে। যেগুলোর অধিবাসী ছিল জালিম অর্থাৎ তার বাসিন্দারা কুফরির কারণে। এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল তাদের অধিবাসীদের মৃত্যুর কারণে। ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। উচ্চ প্রাসাদ। তার অধিবাসীদের মৃত্যুর ফলে।

٤٦. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ مَا نَزَلَ بِالْمُكَذِّبِيْنَ قَبْلَهُمْ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج اَخْبَارَهُمْ بِالْاِهْلَاكِ وَخَرَابِ الدِّيَارِ فَيَعْتَبِرُوْا فَاِنَّهَا اَىِ الْقِصَّةُ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ـ تَاكِيْدٌ ـ

৪৬. তারা কি ভ্রমণ করেনি অর্থাৎ মক্কার কাফেররা পৃথিবীতে, তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়ের অধিকারী। যার দ্বারা তাদের পূর্বে অস্বীকারকারীদের উপর কি আপতিত হয়েছে তা বুঝতে পারত। অথবা শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারত যা দ্বারা তারা শুনত তাদের ধ্বংস ও ঘরবাড়ি বিনষ্ট হওয়ার কাহিনী, ফলে তারা উপদেশ গ্রহণ করত। বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। এটা قُلُوْبُ -এর তাকীদ।

٤٧. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ بِاِنْزَالِ الْعَذَابِ فَاَنْجَزَهٗ يَوْمَ بَدْرٍ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ مِنْ اَيَّامِ الْاٰخِرَةِ بِسَبَبِ الْعَذَابِ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ـ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِى الدُّنْيَا ـ

৪৭. তারা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না। শাস্তি অবতীর্ণ করার ব্যাপারে। তিনি তা বদরের ময়দানে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট একদিন অর্থাৎ পরকালের শাস্তির একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান تَعُدُّوْنَ শব্দটি تَا এবং يَا উভয়ভাবেই পঠিত। পৃথিবীতে।

٤٨. وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا اَلْمُرَادُ اَهْلُهَا وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ اَلْمَرْجِعُ

৪৮. এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল জালিম, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। প্রত্যাবর্তনস্থল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ : এখানে مَأْذُوْن فِيْهِ তথা যে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তা উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) أَنْ يُقَاتِلُوْا বলে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর يُقَاتَلُوْنَ শব্দটি তার আলামত বহন করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সত্তরের অধিক আয়াতে জিহাদ না করে বরং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দানের পর এটাই সর্বপ্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যাতে জিহাদের অনুমতি দান করা হয়েছে। এ দিনটি যেন সাহাবায়ে কেরামের জন্য ঈদের দিন ছিল। এক কেরাতে يُقَاتِلُوْنَ শব্দটি مَا يَؤُلُ مَعْرُوْف তথা কর্তৃবাচ্য পঠিত হয়েছে। জিহাদের পূর্বেই মুমিনদেরকে মুকাতিল বা মুজাহিদ বলা হয়েছে হয়তো তথা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করে কিংবা তাঁরা জিহাদের যে সংকল্প করেছিলেন তার প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا : এর মধ্যকার بَاء বর্ণটি سَبَبِيَّة তথা কারণজ্ঞাপক। যেন এর দ্বারা এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, মু'মিনদেরকে জিহাদের অনুমতি দানের কারণ হলো তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করা । ইমাম রাযী (র.) বলেন- أَنْ يُقَاتِلُوْا-এর উদ্দেশ্য হলো أَنْ يُقَاتِلُوْا فِى الْمُسْتَقْبِلِ অর্থাৎ ভবিষ্যতে জিহাদ করা। এ সময় এ প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে যাবে যে, এ সূরাটি হলো মক্কী, আর জিহাদের অনুমতি লাভ হয়েছে মদীনায়। সুতরাং তা কিভাবে হলো? وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ এ বাক্যটি مُسْتَانِفَة এ আয়াতে ইঙ্গিতস্বরূপ গায়েবী সাহায্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هُمُ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا : ব্যাখ্যাকার (র.) هُمْ মেনে ইশারা করেছেন যে, اِسْم مَوْصُوْل টি مُبْتَدَأ مَحْذُوْف -এর সিফাত। এ ছাড়া আরো কতিপয় ই'রাবের ধরন হতে পারে। যথা-

১. প্রথম مَوْصُوْل-এর সিফাত বা বয়ান কিংবা বদল হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَجْرُوْر হতে পারে।

২. اَعْنِىْ অথবা اَمْدَحُ ইত্যাদি কোনো একটি উহ্য ক্রিয়াসহ বাক্য হয়ে مَنْصُوْب-ও হতে পারে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا : ব্যাখ্যাকার (র.) مَا اُخْرِجُوْا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা হলো مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ অর্থাৎ مَا اُخْرِجُوْا بِشَيْئٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا بِقَوْلِهِمْ رَبُّنَا اللّٰهُ অর্থাৎ মক্কা থেকে মুমিনদেরকে বহিষ্কার করার কোনো কারণ ছিল না, যা তাদের বহিষ্কার করাকে অনিবার্য করে। কেবল এটাই তাদের দোষ ছিল যে, তারা বলতো আল্লাহ আমাদের রব। এ কারণটি বস্তুত দোষের কোনো বিষয়ই নয়; বরং এটা তাদের আরো উত্তমরূপে স্থিতি ও অবস্থানের কারণ। এ কথাটি مَدْحٌ بِمَا يُشْبِهُ الذَّمَّ তথা দূষণীয় আকারে প্রশংসা করার অন্তর্গত। অর্থাৎ যে বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার কারণ সেটাই তাদের নিকট দোষের কারণ ছিল। যেমনটা কবি নাবিগা -এর কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে-

لَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ اَنَّ سُيُوْفَهُمْ * بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قَرَاعِ الْكَتَائِبِ

উর্দূতে এ ধরনের একটি ছন্দ রয়েছে- مجھ میں ایک عیب ہے * بڑا کہ وفادار ہوں میں

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا : এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ-ও হতে পারে। কেননা, اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا হলো مُسْتَثْنٰى আর এটা بِغَيْرِ حَقٍّ-এর সমজাতীয় নয়। তবে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ মানা সঙ্গত নয়। কেননা যদি বলা হয় مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তথা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ তাহলে এটা ঠিক হয় না। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) আমিল বিলুপ্ত মেনে এটাকে। مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ বানিয়েছেন। অর্থাৎ مَا اُخْرِجُوْا بِشَيْئٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا بِقَوْلِهِمْ رَبُّنَا اللّٰهُ আর مُضَارِعْ-এর সীগাটি ماضى অর্থে। ব্যাখ্যাকার بِقَوْلِهِمْ দ্বারা اَنْ يَقُوْلُوْا-এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ مَصْدَرِيَّة আর اَنْ يَقُوْلُوْا শব্দটি قَوْل মাসদার অর্থে بِقَوْلِهِمْ-এর بَاء হলো সববিয়া।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ : এখানে لَوْلَا হলো اِمْتِنَاعِيَّة আর لَهُدِّمَتْ হলো لَوْلَا-এর জবাব। دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ মুবতাদা, আর مَوْجُوْدٌ উহ্য, এটা হলো খবর دَفْعُ اللّٰهِ-এর মধ্যে فَاعِلْ-এর প্রতি মাসদারের ইযাফত ঘটেছে। অর্থাৎ বাক্যটি ছিল- لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مَوْجُوْدٌ لَهُدِّمَتْ

قَوْلُهُ صَوَامِعُ : صَوَامِعُ শব্দটি صَوْمَعَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো গীর্জা, যেখানে পাদ্রীগণ নির্জনে বসে ইবাদত ও সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। আর بِيَعٌ শব্দটি بِيْعَةٌ -এর বহুবচন, খ্রিস্টানরা যেখানে সমবেত আকারে উপাসনা করে। صَلَوٰتٌ শব্দটি صَلَوٰةٌ -এর বহুবচন। ইবরানী ভাষায় ইহুদীদের উপাসনালয়কে صَلَوٰتٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَتَنْقَطِعُ الْعِبَادَاتُ : এর عَطْف হলো لَهُدِمَتْ -এর উপর।

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ : পূর্বোল্লিখিত مَوْصُوْل -এর মধ্যে যে কয়টি সূরত বা বাক্যের ধরন উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও সেগুলো প্রযোজ্য। তবে আরো একটি পদ্ধতি এখানে বৈধ তা এই যে, مَنْ يَّنْصُرُهُ থেকে বদল হবে। اِنْ مَّكَّنَّا هُمْ فِى الْاَرْضِ হলো শর্ত। আর اَقَامُوا الصَّلٰوةَ তার مَعْطُوْف সমূহ মিলে جَزَاء অতঃপর شَرْط جَزَاء মিলে اَلَّذِيْنَ -এর صِلَة , আর صِلَة . مَوْصُوْل মিলে উহ্য هُمْ مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ , কেননা এ আয়াতে মুহাজিরদের সেসব গুণাবলির সংবাদ দেওয়া হয়েছে যেসব গুণাবলির অধিকারী হওয়ার দ্বারা তারা পৃথিবীর কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। وَكُذِّبَ مُوْسٰى এখানে পূর্বের বিপরীতে বাক্যের ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে। তা এভাবে যে, مَعْرُوْف -এর সীগার পরিবর্তে مَجْهُوْل -এর সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর কওমের লোকেরা মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়নি; বরং ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কিবতীরা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সকল নবীগণকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের লোকেরাই মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছিল।

قَوْلُهُ فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ : এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য اِسْم ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে স্পষ্ট আকারে তাদের কুফরি প্রকাশ হয়ে যায়, অন্যথায় فَاَمْلَيْتُهُمْ -ও বলা যেত। نَكِيْر অর্থ- আজাব, এটা মাসদার, অস্বীকার করা অর্থে। যেমন نَذِيْر শব্দটি কখনো কখনো اِنْذَارْ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ بِتَكْذِيْبِهِمْ : এটা হলো مَفْعُوْل আর بِاِهْلَاكِهِمْ এটা اِنْكَارِىْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, সম্বোধিত লোকদেরকে আমার আজাব সময়মতো হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করা উচিত।

قَوْلُهُ فَكَاَيِّنْ : এর মধ্যে اَيِّنْ হলো كَمْ অর্থে, এটা مُبْتَدَأ আর مِنْ قَرْيَةٍ হলো تَمْيِيْز - اَهْلَكْتُهَا হলো তার খবর। كَاَيِّنْ মূলত كَاَيٍّ ছিল। কুরআনী লেখন পদ্ধতিতে তানভীনকে ن আকারে লেখা হয়েছে। كَاَيِّنْ সব সময় সংবাদমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়। অস্পষ্ট আকারে এটা আধিক্য বুঝায়। অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য এরপরে تَمْيِيْز স্বরূপ অবশ্যই কোনো শব্দ উল্লিখিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে تَمْيِيْز টি مِنْ সহ আসে। যেমন- كَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ আর كَاَيِّنْ টা সব সময় বাক্যের শুরুতে আসে, আর তার خَبَرْ সর্বদা مُرَكَّبْ হয়। কখনো কখনো এটা জিজ্ঞাসার জন্যও আসে। অন্য এক কেরাতে اَهْلَكْتُهَا -এর স্থলে اَهْلَكْنَا এসেছে। আর كَاَيِّنْ শব্দটি স্থানগতভাবে مَنْصُوْب -ও হতে পারে। এ ব্যাপারে اَهْلَكْنَا তার প্রমাণ বহন করে। وَهِىَ ظَالِمَةٌ হলো حَالِيَة বাক্য। অর্থাৎ اَهْلُهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَمْ مِنْ بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ : ব্যাখ্যাকার (র.) كَمْ বিলুপ্ত মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِئْرٍ -এর عَطْف হলো قَرْيَةٍ -এর উপর। اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا -এর হামযাটি বিলুপ্ত শব্দের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর فَا হলো عَاطِفَة বাক্যটি এরূপ ছিল اَغَفَلُوْا فَلَمْ يَسِيْرُوْا ; وَكَاَيِّنْ এখানে وَاوْ সহ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পূর্বে فَا যোগে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ পূর্বেরটিতে فَا আনাই উচিত ছিল। কেননা তার পূর্বে فَكَيْفَ كَانَ -এর মধ্যে فَا ছিল, আর এখানে وَاوْ আনাই যথার্থ। কেননা এর পূর্বে وَاوْ রয়েছে। যেমন- وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করতো, অকথ্য নির্যাতন করতো, এমনকি তারা মুসলমানদেরকে মক্কা শরীফ থেকে বহিষ্কার করেছে। মুসলমানগণ কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মক্কা মোয়াজ্জামায় জিহাদের অনুমতি দেননি; বরং বিপদে ধৈর্য ধারণের এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার আদেশ দিতেন। এভাবে মুসলমানদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং এমন একটি পবিত্র দল তৈরি হয়েছে, যারা ফেরেশতাদের ন্যায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছেন, এদিকে কাফেরদের অত্যাচারও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পূর্ববর্তী আয়াতে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে তিনি কাফেরদেরকে মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করার আর সুযোগ দিবেন না এবং তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন দূরীভূত করবেন। আর এ অবস্থা শুধু জিহাদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হতে পারে। তাই আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا
অর্থাৎ যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কেননা তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا : শানে নুযূল : আল্লামা সয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে জারীর, ইবনে মুনজের, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, যখন প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা শরীফ থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছিলেন, أَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ অর্থাৎ, এরা তাদের পয়গাম্বরকে বহিষ্কার করেছে এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদীনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। -[কুরতুবী]

হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করলাম যে কাফেরদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, সর্বপ্রথম জেহাদ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি শায়বা, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহেদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কয়েকজন মুমিন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। তখন কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মূলত তখনই কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর সে সময়ই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, এ আয়াত হিজরতের পূর্বক্ষণে তথা মক্কার জীবনের শেষ দিকে নাজিল হয়েছে।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ : মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোনো দিন যেত না যে, কোনো-না কোনো মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ জবাবে বলতেন, সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। -[কুরতুবী]

যখন রাসূলে কারীম ﷺ মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্যগুলো উচ্চারিত হয়।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ : জিহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য : এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গাম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

قَوْلُهُ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ : বিগত জমানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা স্ব স্ব জমানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরজ ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোনো সময়ই নবুয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যেমন– অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা কোনো সময়ই সম্মানার্হ ছিল না।

صَوَامِعُ শব্দটি صَوْمَعَةٌ -এর বহুবচন। এটা খ্রিস্টানদের সংসারত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بِيَعٌ শব্দটি بِيْعَةٌ -এর বহুবচন। খ্রিস্টানদের সাধারণ গির্জাকে بِيْعَة বলা হয়। صَلَوٰتٌ শব্দটি صَلٰوةٌ -এর বহুবচন। ইহুদিদের ইবাদতখানাকে صَلَوٰتٌ এবং মুসলমানদের ইবাদতখানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোনো সময়েই কোনো ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। হযরত মূসা (আ.)-এর আমলে صَلَوٰتٌ, হযরত ঈসা (আ.)-এর আমলে صَوَامِعُ ও بِيَعٌ এবং শেষ নবী ﷺ -এর জমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ : খুলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার প্রকাশ : এই আয়াতে তাদের বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ আয়াতে ছিল অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত উসমান গণী (রা.) বলেন ثَنَاءٌ قَبْلَ بَلَاءٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটি কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসাকীর্তন করার শামিল। এরপর আল্লাহ তা'আলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করছে। চারজন খুলাফায়ে রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন।

তাঁরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, জাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এই কারণেই আলেমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীন সবাই এই সংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য বিশুদ্ধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল। –[রূহুল মা'আনী]

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলের ঘটনাভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই তাফসীরবিদ যাহহাক (র.) বলেন, এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকাকালে তাদের এমন সব কর্ম আঞ্জাম দেওয়া উচিত, যেগুলো খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের জমানায় আঞ্জাম দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম্য : اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ বাক্যে ইঙ্গিত আছে যে, অতীত কাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব অবস্থা

শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুত তাফাক্কুরে মালেক ইবনে দীনার (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশে দেন যে, লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরি কর এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত ঘোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি ভেঙ্গে যায়। -[রূহুল মা'আনী]

এই রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুষ্মানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

قَوْلُهُ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কাফের মুশরিকরা হলো মনের অন্ধ, তাদের অন্তর্দৃষ্টি বলতে কিছুই নেই, তারা পরিণামদর্শী নয়। আর আলোচ্য আয়াতে এ কথারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের আজাবকে তরান্বিত করার জন্যে তথা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনার জন্যে তারা তাড়াতাড়ি করছে, তা নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরের অন্ধত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ الخ : শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে নজর ইবনে হারেসের সম্পর্কে। সে দোয়া করেছিলো, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা যদি তোমার তরফ থেকে সত্য হয়, আর তিনি যদি সত্যবাদী হন [যা আমরা অস্বীকার করি] তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ অর্থাৎ আর কাফেররা আপনার নিকট আজাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে, অথচ ঐ আজাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কি মনে করে তাদের উপর থেকে আজাব চলে যাবে? অথবা তারা কি এই ধারণা করে যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সে আজাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং যে ওয়াদা করেছেন তার বরখেলাফ করবেন? এমনটি কখনও হবে না, আজাব অবশ্যই আসবে। আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা কখনও বরখেলাফ করেন না। তিনি আজাব সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

قَوْلُهُ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ : পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য : অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলি ও ভয়ঙ্কর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে।

বাস্তব ক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোনো কোনো হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নিঃস্ব মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি। আরো বলছি যে, তোমরা ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে। আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃস্বরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[মাযহারী]

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা মা'আরিজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ এতেও উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম বেশি হবে, তাই এই দিনটি কারো কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যত পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ এক আয়াতে এক হাজার বছর এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে। এই বিরোধিতার জবাব মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

অনুবাদ :

٤٩. قُلْ يَآيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ـ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ وَاَنَا بَشِيْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৪৯. বলুন, হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসী আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী সুস্পষ্টরূপে সাবধানকারী। আমি মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দানকারী।

٥٠. فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنَ الذُّنُوْبِ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ هُوَ الْجَنَّةُ ـ

৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা গুনাহ থেকে ও সম্মানজনক জীবিকা আর তা হলো জান্নাত।

٥١. وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِاِبْطَالِهَا مُعٰجِزِيْنَ مَنِ اتَّبَعَ النَّبِيَّ اَىْ يَنْسِبُوْنَهُمْ اِلَى الْعِجْزِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ اَوْ مُقَدِّرِيْنَ عِجْزَنَا عَنْهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ مُعْجِزِيْنَ مُسَابِقِيْنَ لَنَا يَظُنُّوْنَ اَنْ يَفُوْتُوْنَا بِاِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ وَالْعِقَابَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ـ النَّارِ ـ

৫১. যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতকে কুরআনকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়ার মাধ্যমে ব্যর্থ করার যারা মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করে অর্থাৎ তাদেরকে ব্যর্থতার প্রতি সম্বন্ধ করে এবং তাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। অথবা আমাকে তাদের পাকড়াও-এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। مُعْجِزِيْنَ শব্দটি অপর এক কেরাতে مُعَاجِزِيْنَ রয়েছে, যার অর্থ হলো مُسَابِقِيْنَ তথা আমাদের উপর বিজয় লাভকারী। তারা মনে করে যে, পুনরুত্থান ও শাস্তিকে তার অস্বীকার করে পার পেয়ে যাবে। তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী আগুনের অধিবাসী।

٥٢. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ هُوَ نَبِيٌّ اُمِرَ بِالتَّبْلِيْغِ وَّلَا نَبِيٍّ اَىْ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيْغِ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰى قَرَاَ اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ج قِرَاءَتِهٖ مَا لَيْسَ مِنَ الْقُرْاٰنِ مِمَّا يَرْضَاهُ الْمُرْسَلُ اِلَيْهِمْ ـ وَقَدْ قَرَاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُوْرَةِ النَّجْمِ بِمَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى بِاِلْقَاءِ الشَّيْطٰنِ عَلٰى لِسَانِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ ـ "تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى" ـ فَفَرِحُوْا بِذٰلِكَ ـ

৫২. আমি আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল তিনি হলেন এমন নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিংবা নবী যাকে তাবলীগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করেছে পড়েছে/ পড়তে চেয়েছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। তার পাঠে যা কুরআন নয় এমন কিছু। যাতে যাদের নিকট তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তারা আনন্দিত হয়। একদা রাসূল ﷺ কুরাইশদের কোনো এক মজলিসে সূরা নাজমের এ আয়াত– اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى পাঠ করার পর শয়তানের প্রক্ষেপণে পবিত্র রসনা থেকে একথা বেরিয়ে পড়ে যে– تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى [এ সকল উচ্চ মর্যাদাবান দেবতা অবশ্যই এদের সুপারিশের আশা করা যায়।] এতদ শ্রবণে কাফেররা খুবই আনন্দিত হয়।

ثُمَّ اَخْبَرَهُ جِبْرَئِيْلُ بِمَا اَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلٰى لِسَانِهٖ مِنْ ذٰلِكَ فَحَزِنَ فَسُلِّىَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ لِيَطْمَئِنَّ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ يُبْطِلُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ط يُثْبِتُهَا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِاِلْقَاءِ الشَّيْطَانِ مَا ذُكِرَ حَكِيْمٌ ـ فِىْ تَمْكِيْنِهٖ مِنْهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ـ

অনুবাদ :

অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) তাঁকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন যে, শয়তান আপনার অজান্তে মুখে একথা উচ্চারিত করে দিয়েছে। ফলে তিনি খবুই বিষণ্ন হলেন। তখন তাঁকে পরবর্তী এই আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করা হয়।, যেন তিনি শান্ত হন। আল্লাহ তা বিদূরিত করেন রহিত করেন শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুদৃঢ় করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ শয়তানের প্রক্ষিপ্ত বিষয়ে যা উল্লেখ করা হলো। প্রজ্ঞাময় নিজের পক্ষ থেকে শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।

٥٣. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً مِحْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ شَكٌّ وَّنِفَاقٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ اَىِ الْمُشْرِكِيْنَ عَنْ قَبُوْلِ الْحَقِّ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ـ خِلَافٍ طَوِيْلٍ مَعَ النَّبِىِّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ جَرٰى عَلٰى لِسَانِهٖ ذِكْرُ اٰلِهَتِهِمْ بِمَا يُرْضِيْهِمْ ثُمَّ اَبْطَلَ ذٰلِكَ ـ

৫৩. এজন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তাকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে নেফাক ও সংশয় যারা পাষাণ হৃদয় অর্থাৎ, মুশরিকরা সত্য গ্রহণ করা থেকে। নিশ্চয় জালিমরা কাফেররা দুস্তর মতভেদের মাঝে রয়েছে নবী ও মুমিনগণের সাথে মতভেদ রয়েছে, তাঁর পবিত্র মুখে কাফেরদের দেবতাদের পূর্বোক্ত কথা উচ্চারণের কারণে। যা তাদেরকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। অতঃপর তা বাতিল ও রহিত করেছেন।

٥٤. وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ التَّوْحِيْدَ وَالْقُرْاٰنَ اَنَّهُ اَىِ الْقُرْاٰنُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ تَطْمَئِنَّ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ اَىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

৫৪. এজন্য যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে তাওহীদ ও কুরআন সংক্রান্ত যে, তা অর্থাৎ কুরআন আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। প্রশান্তি লাভ করে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সরল পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের উপর।

٥٥. وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنْهُ اَىِ الْقُرْاٰنِ بِمَا اَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلٰى لِسَانِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَبْطَلَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَىْ سَاعَةُ مَوْتِهِمْ اَوِ الْقِيٰمَةُ فُجَاءَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ـ هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ لَا خَيْرَ فِيْهِ لِلْكُفَّارِ كَالرِّيْحِ الْعَقِيْمِ الَّتِىْ لَا تَاْتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَا لَيْلَ لَهٗ ـ

৫৫. যারা কুফরি করেছে তারা তাতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবে না অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে। নবী করীম ﷺ -এর পবিত্র মুখে শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করেছিল। অতঃপর তিনি তা রহিত করেছেন। যতক্ষণ না তাদের নিকট আকস্মিকভাবে নির্দিষ্ট সময় এসে পড়বে অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর সময় অথবা আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পড়বে। অথবা এসে পড়বে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। তা হলো বদরের দিন, তাতে কাফেরদের জন্য কোনোই কল্যাণ থাকবে না। যেমন বন্ধ্যা বায়ু বা অকল্যাণকর বায়ু যা কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। অথবা তা হলো কিয়ামতের দিন যাতে রাতের কোনোই অস্তিত্ব থাকবে না।

অনুবাদ :

٥٦. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِلّٰهِ ط وَحْدَهٗ وَمَا تَضَمَّنَهٗ مِنَ الْاِسْتِقْرَارِ نَاصِبٌ لِلظَّرْفِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ بِمَا بُيِّنَ بَعْدَهٗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ـ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ ـ

৫৬. সেদিনের কিয়ামতের দিনের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যই এ বাক্যটি যে اِسْتِقْرَار-এর অর্থ বিশিষ্ট, সেটিই يَوْمَئِذٍ-এর نَصْب দানকারী। তিনিই তাদের বিচার করবেন মুমিন ও কাফেদের মাঝে, পরে যা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখ-কাননে। আল্লাহর অনুগ্রহে।

٥٧. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ شَدِيْدٌ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ ـ

৫৭. আর যারা কুফরি করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি কঠিন শাস্তি, তাদের কুফরির কারণে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ بِاِبْطَالِهَا : এটা বৃদ্ধি করে مُضَاف উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, মূলত سَعَوْا فِىْ اِبْطَالِ مَنِ اتَّبَعَ النَّبِىَّ ছিল بِاِبْطَالِهَا اٰيَاتِنَا -এর মধ্যে بَا অর্থ فِىْ আর مُعٰجِزِيْنَ হলো سَعَوْا-এর যমীর থেকে حَال এবং হলো مُعٰجِزِيْنَ-এর مَفْعُوْل অথবা এর مَفْعُوْل হলো اَللّٰهُ , উদ্দেশ্য এই যে, আমার আয়াতসমূহকে বাতিল করার চেষ্টা করে, আমাকে আমার পাকড়াও -এর ব্যাপারে অক্ষম মনে করে। অন্য এক কেরাতে مُعَاجِزِيْنَ এসেছে। এর অর্থ হলো سَابِقِيْنَ তারা ধারণা করে, যে, তারা আমার পাকড়াও থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আর مُسَابَقَتْ -এর উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আল্লাহর আজাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আজাব নাজিল করা এবং তাদের পলায়ন করতে না দেওয়ায় প্রতিযোগিতা করেন।

قَوْلُهٗ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ : وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ-এর পরে এটা রাসূল ﷺ কে দ্বিতীয় সান্ত্বনা। مِنْ قَبْلِكَ-এর মধ্যে مِنْ اِبْتِدَاء غَايَتْ তথা সীমারেখার শুরু বুঝানোর জন্য। আর مِنْ رَّسُوْلٍ-এর মধ্যকার مِنْ হল অতিরিক্ত।

قَوْلُهٗ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ : اِذَا تَمَنّٰى হলো শর্ত। আর اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْۤ اُمْنِيَّتِهٖ হলো جَزَاء শর্তিয়া বাক্য হয়ে نَبِىّ থেকে حَال হয়েছে। বাক্যটি এরূপ ছিল- وَمَا اَرْسَلْنَا نَبِيًّا اِلَّا حَالُهٗ هٰذِهٖ ; এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهٗ اَلْغَرَانِيْقُ : غَرَانِيْقُ এর একবচন হলো غِرْنَوْقٌ এটা فِرْدَوْسٌ-এর ছন্দে। কেউ কেউ عُصْفُوْرٌ-এর ছন্দে বলেছেন। এর অর্থ হলো পাতি হাঁস। فَيَنْسَخُ اللّٰهُ এখানে نَسْخ দ্বারা শাব্দিক নস্‌খ উদ্দেশ্য। পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, এর অর্থ হলো দূরীভূত করা, মুছে ফেলা।

قَوْلُهٗ لِيَجْعَلَ : এর ل -এর মধ্যে এটা স্পষ্ট যে, এটা يُحْكِمُ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيَاتِهٖ لِيَجْعَلَ আর وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ হলো جُمْلَة مُعْتَرِضَة আবার لِيَجْعَلَ ফে'লটি يَنْسَخُ-এর সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে।

قَوْلُهٗ وَالْقَاسِيَةِ : অর্থ কঠিন হৃদয়, এর ال টি مَوْصُوْل , এর عَطْف হলো اَلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ-এর উপর।

قَوْلُهُ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ : এখানে অতিরিক্ত জঘন্যতা বুঝানোর জন্য ضَمِيْر -এর স্থলে প্রকাশ্য اِسْم আনা হয়েছে। মূলত إِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ-এর আমিলে নাসিব হলো اِسْتَقَرَّ অথবা এর সমার্থবোধক কোনো উহ্য ক্রিয়া।

قَوْلُهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَة এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, مَاذَا يَصْنَعُ بِهِمْ এর উত্তরে বলা হয়েছে- يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ; এটা আবার جُمْلَه حَالِيَه -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ بِمَا بَيَّنَ بَعْدَهُ : অর্থাৎ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ : হলো مُبْتَدَأ আর فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ হলো خَبَرْ এভাবে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا হলো مُبْتَدَأ আর فَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ বাক্য হয়ে خَبَرْ , প্রথম খবরের উপর فَاء উল্লেখ না করা এবং পরবর্তী খবরের উপর তা উল্লেখ করা এ কথা বুঝানোর জন্য যে, বেহেশতে প্রবেশ আমলের কারণে হবে না; বরং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের কারণে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যাখ্যাকার (র.) فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু দোজখের আজাব এর বিপরীত। তা কেবল আমলের উপরই নির্ভর করে হবে। এ কারণে فَاُولٰئِكَ -এর উপর فَا جَزَائِيَّة প্রবিষ্ট হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ : হে মুহাম্মদ! আপনি আজাব কামনায় যারা তাড়াহুড়া করেছে তাদেরকে বলে দিন, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী এবং সুসংবাদ দানকারী। আজাব ত্বরান্বিত করার কিংবা বিলম্বিত করার ব্যাপারে আমার কোনো ক্ষমতা নেই।

তোমাদেরকে সাবধান করাই আমার কাজ : আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি সম্পষ্ট ভাষায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমাদেরকে সাবধান করাই আমার কাজ, আজাব দেওয়া না দেওয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছার ব্যাপার। এ সম্পর্কে তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অকৃতজ্ঞ হয় এবং যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য বা নাফরমান হয়, যারা নিজেদের অন্যায় অনাচারের মাধ্যমে এই সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করে তোলে- তাদের শাস্তির ব্যবস্থা আল্লাহ পাকই করেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের ভক্ত অনুরক্ত বান্দা, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে জীবন যাপন করেন- তাদেরকে আল্লাহ পাক তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা অনুসারে পুরস্কৃত করবেন এবং বেহেশতের অনন্ত অসীম নিয়ামত তারা লাভ করবেন, শুধু তাই নয়; বরং তারা আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ অতএব, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি ইসলাম কবুল করলে তার পূর্বের কৃত গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। -[মুসলিম শরীফ]

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন, আমিতো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, তোমাদের হিসাব লওয়া আমাদের দায়িত্ব নয়, কার কিসমতে হেদায়েত রয়েছে, আর কার অদৃষ্টে আজাব রয়েছে তা আল্লাহ পাকই জানেন। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দিয়েছেন। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -এর দু'টি দায়িত্ব কাফেরকে ভয় প্রদর্শন করা এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করা। তাই মুমিনদের জন্য এ আয়াতে দু'টি সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ১. যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদেরকে মাগফেরাত দান করা হবে এবং উত্তম ও সম্মানজনক রিজিক দান করা হবে, যা হবে স্থায়ী এবং যেহেতু সেখানে রোজগার করার কোনো প্রয়োজন হবে না, তাই এই রিজিক হবে অত্যন্ত সম্মানজনক।

قَوْلُهُ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ : এ থেকে জানা যায় যে, রাসূল ও নবী এক নয়; বরং দুটি পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাঁকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে তাঁকে

কোনো স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হোক বা কোনো পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাঁকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত মূসা, ঈসা (আ.) ও শেষনবী মুহাম্মদ মোস্তাফা ﷺ -প্রমুখ আর যাঁকে পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন হযরত হারুন (আ.)। তিনি মূসা (আ.)-এর কিতাব তাওরাত ও তাঁরই শরিয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। অতএব 'রাসূল' তাঁকে বলা হয়, যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরিয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রাসূল হবেন, তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরি কিন্তু যিনি নবী হবেন ,তাঁর রাসূল হওয়া জরুরি নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রাসূল বলা এর পরিপন্থি নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهِ : এখানে تَمَنّٰى শব্দটি قَرَأَ অর্থে, আর اُمْنِيَّةٌ অর্থ হলো পাঠ করা, বা قِرَاتٌ আবু হাইয়্যান (র.) বাহরে মুহীত গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহু আলেম এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে এখানে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে, যা غَرَانِيْقُ -এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের নিকট এ ঘটনা ঠিক নয়। কেউ কেউ এটাকে মওজু বলেছেন এবং নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের আবিস্কৃত আখ্যা দিয়েছেন। যে সকল ব্যক্তি এ ঘটনাকে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছেন বা ধর্তব্য করেছেন, সে ক্ষেত্রে এর জাহেরী শব্দ দ্বারা যে সকল সন্দেহ কুরআন এবং হাদীসের অকাট্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেগুলোর বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এ ঘটনার উপর সীমাবদ্ধ নয়।

মুফাসসিরগণের একটি জামাত এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে গারানিকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উক্ত ঘটনার সারাংশ এই যে, একদিন নবী করীম ﷺ মক্কার মুশরিকদের এক মজলিসে গমন করেছিলেন। তার উপর সে সময় সূরা নাজম অবতীর্ণ হলো। তিনি সূরা নাজম পড়তে শুরু করলেন, যখন তিনি اَفَرَاَيْتُمْ পর্যন্ত পড়ছিলেন তখন শয়তানের প্রভাবে তার জবান মোবারক দ্বারা تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى বের হয়ে গেল। কুরাইশরা এ শব্দগুলো শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। নবী করীম তাঁর পাঠ বহাল রেখেছিলেন, এক পর্যায়ে সূরা শেষ করলেন। সর্বশেষ যখন তিনি সিজদা করলেন তখন মজলিসে উপস্থিত সবাই সিজদা করল। এ ঘটনার পরে মুশরিকরা আনন্দের সাথে নিজ গন্তব্যে চলে গেল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মদ ﷺ আজ আমাদের দেবতাদের প্রশংসা করেছে। এরপরে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেছেন, আপনি তো তাদের নিকট এমন কথা শুনিয়েছেন যা আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনিনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ঘটনার অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আয়াতের সারাংশ হচ্ছে- এমন ঘটনা শুধু আপনার বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে- তা নয়; বরং প্রত্যেক রাসূল ও নবীর বেলায়ই সংঘটিত হয়েছে। অতএব, চিন্তিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটি আদৌ ঠিক নয়; বরং আল্লাহর কিতাব দ্বারা এটা ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ এবং وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ইমাম বায়হাকী (র.) এ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, বর্ণনাসূত্রে এ ঘটনা মোটেই স্বীকৃত নয়। ইমাম ইবনে খুযাইমা (র.) বলেন- اِنَّ هٰذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ অর্থাৎ, এ কাহিনীটি কোনো নাস্তিকের উদ্ভাবিত। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার গারনিক -এর কাহিনীর সাথে হাবশা তথা আবিসিনিয়া থেকে মুহাজিরগণের ফিরে আসার কাহিনীকেও জুড়ে দিয়েছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ সূরা নাজমে আসবে। মূলত এখানে تَمَنّٰى -এর অর্থ হলো قَرَأَ বা পাঠ করা। আর اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِىْ تِلَاوَتِهِ وَقِرَاءَتِهِ অর্থাৎ তার তেলাওয়াত ও পাঠের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করা। ইবনে জারীর (র.) বলেন, এ উক্তিটি কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আয়াতের সারমর্ম এই যে, শয়তান মুশরিকদের কানে নবী করীম ﷺ -এর জবান মোবারকে উল্লিখিত শব্দগুলো উচ্চারিত হওয়া ছাড়াই নিজেই শব্দগুলো প্রবেশ করালো। -[ফাতহুল কাদীর] আল্লাহ তা'আলা শয়তানের ইলকাকৃত শব্দগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিলেন এবং নিজ আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দিলেন।

অনুবাদ :

٥٨. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيْ طَاعَتِهٖ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قُتِلُوْاۤ اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا هُوَ رِزْقُ الْجَنَّةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ - اَفْضَلُ الْمُعْطِيْنَ -

৫৮. এবং যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য মক্কা থেকে মদীনায় অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন আর তা হলো জান্নাতের রিজিক। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনি তো সর্বোৎকৃষ্ট রিজিকদাতা দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

٥٩. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَيْ اِدْخَالًا اَوْ مَوْضِعًا يَّرْضَوْنَهٗ ط وَهُوَ الْجَنَّةُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ بِنِيَّاتِهِمْ حَلِيْمٌ - عَنْ عِقَابِهِمْ -

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন। مُدْخَلًا শব্দটি مِيْم বর্ণে পেশও যবর উভয় হরকতই হতে পারে অর্থাৎ মাসদার বা اِسْمِ ظَرْف হবে। যা তারা পছন্দ করবে। আর তা হলো জান্নাত। এবং আল্লাহ তা'আলা সম্যক প্রজ্ঞাময় তাদের নিয়ত সম্পর্কে পরম সহনশীল তাদের শাস্তির ব্যাপারে।

٦٠. اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ ط الَّذِيْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمَنْ عَاقَبَ جَازٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ظُلْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَيْ قَاتَلَهُمْ كَمَا قَاتَلُوْهُ فِى الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ اَيْ ظُلِمَ بِاِخْرَاجِهٖ مِنْ مَنْزِلِهٖ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ غَفُوْرٌ - لَهُمْ عَنْ قِتَالِهِمْ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ -

৬০. বিষয়টি এমনই হয়ে থাকে যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি। কোনো ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ করলে মুমিনদের থেকে নিপীড়িত হয়ে জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ অন্যায়ভাবে মুশরিকদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় যেমনিভাবে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে মুহাররম মাসে। ও পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে তাদের পক্ষ হতে অর্থাৎ তাদের ঘর বাড়ি হতে তাদেরকে অন্যায় ভাবে বহিষ্কার করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী। মুমিনদের থেকে। ক্ষমাশীল তাদের জন্য নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

٦١. ذٰلِكَ النَّصْرُ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ اَيْ يُدْخِلُ كُلًّا مِنْهُمَا فِى الْاٰخَرِ بِاَنْ يَزِيْدَ بِهٖ وَذٰلِكَ مِنْ اَثَرِ قُدْرَتِهِ الَّتِيْ بِهَا النَّصْرُ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَصِيْرٌ - بِهِمْ حَيْثُ جَعَلَ فِيْهِمُ الْاِيْمَانَ فَاَجَابَ دُعَاءَهُمْ -

৬১. এটা এ জন্য যে, সাহায্য আল্লাহ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করান, এভাবে যে, এর দ্বারা তার মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটান। এটা তাঁর কুদরতের নিদর্শন যার দ্বারা তার সাহায্য লাভ হয়। এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা মুমিনের দোয়াকে। সম্যক দ্রষ্টা তাদের ব্যাপারে। যার ফলে তাদের মধ্যে ঈমান দান করেছেন। তাই তিনি তাদের আহবানে সাড়া দেন।

অনুবাদ :

٦٢. ذٰلِكَ النَّصْرُ اَيْضًا بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَهُوَ الْاَصْنَامُ هُوَ الْبَاطِلُ الزَّائِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ اَيِ الْعَالِيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِهٖ الْكَبِيْرُ ـ الَّذِيْ يَصْغُرُ كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ ـ

৬২. এটা সাহায্য ও এজন্য যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। আর তারা যাকে ডাকে تَدْعُوْنَ শব্দটি يَاء দ্বারা এবং تَاء দ্বারা উভয়রূপেই পঠিত। অর্থ– উপাসনা করে তার পরিবর্তে আর তা হলো মূর্তি তা তো অসত্য ধ্বংসশীল। এবং আল্লাহ তিনিই তো সমুচ্চ অর্থাৎ স্বীয় কুদরতে তিনি সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে মহান তাঁকে ছাড়া সকল বস্তুকে হেয় করে দেয়।

٦٣. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ط بِالنَّبَاتِ وَهٰذَا مِنْ اَثَرِ قُدْرَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ فِيْ اِخْرَاجِ النَّبَاتِ بِالْمَاءِ خَبِيْرٌ ـ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ عِنْدَ تَاخِيْرِ الْمَطَرِ ـ

৬৩. আপনি কি লক্ষ্য করেন না জানেন না। আল্লাহ আকাশ হতে বারি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে পৃথিবী উদ্ভিদের মাধ্যমে। আর এটা তাঁরই কুদরতের নিদর্শন। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী পানির দ্বারা উদ্ভিদ উৎপাদনে। পরিজ্ঞাত যে বিষয়ের উদ্ভব ঘটে তাদের হৃদয়ে বৃষ্টি বিলম্বের সময়।

٦٤. لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط عَلٰى جِهَةِ الْمِلْكِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ عِبَادِهٖ الْحَمِيْدُ ـ لِاَوْلِيَائِهٖ ـ

৬৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। মালিকানার দৃষ্টিকোণ হতে। এবং আল্লাহ, তিনিই তো অভাবমুক্ত তাঁর বান্দাদের থেকে প্রশংসার্হ তাঁর বন্ধুদের নিকট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا : এটা হলো মুবতাদা, আর لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ হলো এর খবর। وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا বাক্যটি যদিও اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর মধ্যে দাখিল রয়েছে, তবে তাদের উচ্চ মর্যাদার কারণে বিশেষভাবে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা যেন تَخْصِيْصٌ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ তথা ব্যাপক শব্দের পরে খাস শব্দের অন্তর্গত। لَيَرْزُقَنَّهُمْ এটা বিলুপ্ত কসমের জবাব। অর্থাৎ وَاللّٰهُ لَيَرْزُقَنَّهُمْ ছিল قَسَم ও جَوَاب قَسَم মিলে বাক্য হয়ে وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا-এর خَبَرْ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, جُمْلَه قَسْمِيَه টা خَبَرْ হতে পারে। لَيَرْزُقَنَّهُمْ বাক্যটি رِزْقًا حَسَنًا-এর দ্বিতীয় مَفْعُول এবং لَيَرْزُقَنَّهُمْ-এর مَفْعُول مُطْلَقْ -ও হতে পারে। এ সময় এটা তাকিদের জন্য হবে।

قَوْلُهٗ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ : এর পরে اَفْضَلُ الْمُعْطِيْنَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, خَيْرُ اِسْم تَفْضِيْل শব্দটি তার মূল অর্থে রয়েছে। কুরআনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে اِسْم تَفْضِيْل-এর সীগাহ اِسْم فَاعِلْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এখানে تَفْضِيْل -ই উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন রিজিক খাস যার প্রদানে অন্য কেউ সক্ষম নয়। আর রিজিকের মধ্যে এটাই আসল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বাহ্যিকভাবে গায়রুল্লাহ থেকে যে রিজিক লাভ হয় তা আল্লাহই দান করেন। কেননা আল্লাহর রিজিকের ভাণ্ডার থেকেই তা প্রদত্ত হয়। তৃতীয়ত গায়রুল্লাহ যে রিজিক দেয় তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বিনিময় কামনা করা, কমপক্ষে পরকালের প্রতিদানই হোক না কেন, আর আল্লাহ তা'আলা যে রিজিক দান করেন, তা নিছক অনুগ্রহস্বরূপ। এর কোনো বিনিময় তার লাভ হয় না।

قَوْلُهُ لَيُدْخِلَنَّهُمْ : এটা لَيَرْزُقَنَّهُمْ থেকে বদলও হতে পারে এবং مُسْتَأْنِفَةٌ বাক্যেও হতে পারে।

قَوْلُهُ مُدْخَلًا : এটা بَابُ اِفْعَالٌ -এর মাসদার। অর্থাৎ اِدْخَالًا وَمُدْخَلًا এসময় এটা لَيُدْخِلَنَّهُمْ -এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হবে। আর তার مَفْعُوْلٌ بِهٖ বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ لَيُدْخِلَنَّهُمُ الْجَنَّةَ اِدْخَالًا يَرْضَوْنَهُ আর মীম বর্ণে যবর পড়লে এটা اِسْمٌ ظَرْفُ مَكَانٍ হবে। অর্থাৎ مَوْضَعُ دُخُوْلٍ অর্থ হবে। এ সময় لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا শব্দটিই -এর مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হবে। অর্থাৎ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَكَانًا يَرْضَوْنَهُ হবে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা উহ্য مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ অর্থাৎ اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ কাফের মুমিনদের সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছে তা নিজ নিজ জায়গায় সঠিক এবং সত্য। যখন এক বাক্য থেকে অপর বাক্যের দিকে পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য হয় তখন اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ عَاقَبَ : এটা تَعَاقُبٌ থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো এক বস্তুর পরে অপর বস্তু আসা। অর্থাৎ অতিক্রম করা।

قَوْلُهُ اَىْ قَاتَلَهُمْ كَمَا قَاتَلُوْهُ فِى الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ : মুফাসসির (র.)-এর এ কথার মধ্যে শানে নুযূল -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। মুকাতিল (র.) বলেন, উল্লিখিত আয়াতটি মক্কার সেসব মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানদের এক জামাআতের সাথে যাদের সংঘর্ষ হয়েছিল। অথচ তখনো মুহাররম মাস শেষ হয়নি; বরং আরো দু'দিন বাকি ছিল। মুশরিকরা এ ধারণা করেছিল যে, মুহাম্মদের সাথীরা মুহাররম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে অন্যায় জানে এ মনে করে তারা তাদের উপর আক্রমণ করে বসল। মুসলমানরা মুহাররম মাসে তাদের উপর আক্রমণ না করার ব্যাপারে তাদের কসম দিয়েছিল; কিন্তু তারা তা শুনেনি। বাধ্য হয়ে মুসলমানরাও তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে তাদের মনে এক প্রকার অনুশোচনা ও অনুতাপ এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের মনের এ সংশয় ও সংকোচ দূরীভূত করার জন্য উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়াকে عَاقَبَ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এটা مَجَازٌ তথা রূপকার্থে বাহ্যিক মিলের কারণে বলা হয়েছে। যেমন- جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ -এর মধ্যে বলা হয়েছে। অথবা এটা تَسْمِيَةُ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبَّبِ -এর অন্তর্গত। অর্থাৎ মুশরিকদের নিজেদের জুলুমই তাদের থেকে এ প্রতিশোধ গ্রহণের কারণ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ عَاقَبَ : এটা হলো مُبْتَدَأٌ আর لَيَنْصُرَنَّهُ হলো خَبَرٌ আর এটা ঐ সময় হবে যখন مَنْ مَوْصُوْلَةٌ হবে। আর এটাও হতে পারে যে, مَنْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর لَيَنْصُرَنَّهُ হলো তার جَزَاءٌ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ النَّصْرُ : এটা مُبْتَدَأٌ আর بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ হলো এর خَبَرٌ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ مِنْ اَثَرِ قُدْرَتِهٖ : অর্থাৎ রাতকে দিনের মধ্যে আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করা এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিদর্শন। কারণ ক্ষমতা ব্যতিরেকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

قَوْلُهُ فَتُصْبِحُ : مَرْفُوْعٌ রূপে পঠিত। আর عَطْف হলো اَنْزَلَ -এর উপর। এ সময় بِهٖ যমীর বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ فَتُصْبِحُ بِهٖ আবার فَاءٌ টা سَبَبِيَّةٌ -ও হতে পারে। এ সময় যমীর বা عَائِدٌ -এর দরকার নেই।

প্রশ্ন : فَتُصْبِحُ হলো جَوَابُ اَمْرٍ , কাজেই শব্দটি مَنْصُوْبٌ না হয়ে مَرْفُوْعٌ হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : এ اِسْتِفْهَامٌ تَقْرِيْرِىٌّ টি খবর অর্থে। অর্থাৎ, اَلَمْ تَرَ হলো قَدْ رَاَيْتَ অর্থে। আর যে اِسْتِفْهَامٌ টি খবর অর্থে হয়, তা جَوَابُ اَمْرٍ হয় না।

এখন এ প্রশ্ন থেকে গেল যে, مَاضِىْ -এর স্থলে مُضَارِعْ -এর সীগাহ ব্যবহারের কারণ কি?

এর উত্তর এই যে, مُضَارِعْ -এর সীগাহ বৃষ্টি এর আছর বহাল থাকা বুঝায়, আর এটা পছন্দনীয় বিষয়। আর مَاضِىْ -এর সীগাহ এরূপ বুঝায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ নেককার মুমিনদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা ইসলামের জন্যে, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ি-ঘর, ভিটে-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, দেশ-খেশ সবকিছু ছেড়ে হিজরত করেছেন এবং যারা আল্লাহ রাহে জিহাদ করেছেন– এমন মুহাজির ও মুজাহিদদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পূর্ববর্তী আয়াতে মুহাজিরগণকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : অর্থাৎ, যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বাড়ি-ঘর ছেড়েছে, হিজরত করেছে তাদের এই অবদান অত্যন্ত মূল্যবান। তারা কাফেরদের সাথে জিহাদ করে শাহাদত বরণ করুক অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের মৃত্যু হোক সকল অবস্থায়ই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে রয়েছে তাদের জন্যে অশেষ নিয়ামত। তিনি তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করবেন তথা জান্নাতের রিজিক দান করবেন। আর তাদেরকে এমন স্থানে পৌঁছে দেবেন, যা তারা অত্যন্ত বেশি পছন্দ করে। কেননা বেহেশতে রয়েছে অনন্ত অসীম নিয়ামত আর সে নিয়ামত হবে চিরস্থায়ী, যার কোনো দৃষ্টান্ত কোথাও নেই।

قَوْلُهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ : নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি তাঁর মুহাজির বান্দাদের এবং তাদের দুশমনদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। মুহাজির ও মুজাহিদীনের কোনো ক্রটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি অবশ্যই তা ক্ষমা করবেন একথা সত্য। যদি কোনো ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার অনুরূপ বদলা নিয়ে নেয়, এরপর তার উপর কেউ বাড়াবাড়ি করে তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনা প্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি নির্যাতিত-উৎপীড়িত হওয়ার কারণে জালেম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এরপরও যদি জালেম পুনরায় জুলুম করে, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মজলুমকে সাহায্য করেন। আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে মজলুম ধন্য হয়। এজন্যে হাদীস শরীফে মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করার তাগিদ রয়েছে– اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

অর্থাৎ তোমরা মজলুমের বদ দোয়াকে ভয় কর, কেননা তার এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে কোনো পর্দা নেই।

মজলুমের পক্ষে তার প্রতি যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে, সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি থাকলেও তা উন্নত আদর্শ নয়, বরং প্রতিশোধ গ্রহণ হলো কু-প্রবৃত্তির তাড়না। আর ক্ষমা করা বিশেষ গুণ। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ "আর যে সবর করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা অত্যন্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।"

আলোচ্য আয়াতে প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ. অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক মার্জনাপ্রিয়, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"

আল্লাহ পাকের শাস্তি দেওয়ার সম্পূর্ণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অতএব, প্রকৃত মুমিন বান্দারও এ আদর্শই গ্রহণ করা উচিত। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ১৪১]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

مَنْ عَاقَبَ .... لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ.

অর্থাৎ, "যে মুশরিকদের সাথে লড়াই করে যেমন মুশরিক তার সাথে লড়াই করে। এরপর মুশরিক তার প্রতি অত্যন্ত বেশি বাড়াবাড়ি করে। যেমন তাকে দেশ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অবশ্য তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ পাক শাস্তি দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

অতএব, মুসলমানদের মধ্যে যারা মজলুম তারা ইচ্ছা করলে জালেমের জুলুমের সমপরিমাণ প্রতিশোধ নিতে পারে। কিন্তু ক্ষমা করাই হলো উত্তম আদর্শ। আল্লাহ পাক বান্দাকে শাস্তি দিতে পারেন যেকোনোভাবে, কিন্তু তবুও তিনি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ الخ : পূর্বের আয়াতে মজলুমের সাহায্যের আলোচনা ছিল। আর সাহায্য তিনিই করতে পারেন যিনি সাহায্যের ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমতার আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ উক্ত ক্ষমতার অধিকারী, দিনের আবর্তন-বিবর্তন এবং তাকে কমান বাড়ান একমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁরই হুকুমে কখনো রাত বড় আর দিন ছোট হতে থাকে, আবার কখনো এর বিপরীত দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। সে মহান ক্ষমতাধর আল্লাহ কি মজলুম জাতি বা ব্যক্তিকে সাহায্য করতে এবং জালিমদের উপর মজলুমদেরকে ক্ষমতা ও বলিয়ান করতে সক্ষম নন? এ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে খুব শীঘ্রই এ অবস্থা দিন-রজনীর পরিবর্তনের ন্যায় পরিবতর্তিত হতে যাচ্ছে। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা রাতকে দিনের দ্বারা পরিবর্তন করেন তদ্রূপ কাফেরদের ভূখণ্ডকে মুসলমানদের করতলগত করে দিবেন। তিনি মজলুমের ফরিয়াদ শুনেন এবং জালিমের কর্ম দেখেন।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ النَّصْرُ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ : অর্থাৎ এমন বিশাল পরিবর্তন ও আবর্তন মহামহিম উপাস্য ছাড়া আর কে করতে পারে? বাস্তব পক্ষে সঠিক ও সত্য উপাস্য থেকে থাকলে একমাত্র তিনিই আছেন। তাঁকে ছেড়ে অন্য যেসব মনগড়া উপাস্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা সব মিথ্যা ও ভ্রান্ত। কেবল এমন সত্ত্বাকেই উপাস্য বানানো উচিত যিনি সবার ঊর্ধ্বে, সর্বসময় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর সর্বসম্মতভাবে এমন সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহ।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ الخ : যে, আল্লাহ শুষ্ক ও মৃত ভূমিকে আকাশের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা সুফলা করে দেন এভাবে কুফরের শুষ্ক পতিত ভূমিকে ইসলামের বৃষ্টি দ্বারা সুজলা-সুফলা করবেন। এটা তাঁর মহা ক্ষমতার নিকট কিছুই নয়। তিনিই জানেন বৃষ্টি কিভাবে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ভেতরে ভেতরে এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যে, শুষ্কভূমি তার মধ্যে পানি পুষে নিয়ে বীজ দানার মধ্যে প্রবেশ করায়। ক্রমান্বয়ে তা থেকে চারার অঙ্কুর গজায়। আর তা থেকে ক্রমান্বয়ে মৃত ভূমি সবুজ-শ্যামাকার ধারণ করে। ঠিক এভাবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহ এবং সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি দ্বারা আদমজাতির অন্তরে ইসলামের বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত হৃদয়কে সতেজ-শ্যামল করেন।

قَوْلُهُ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের সকল বস্তু যখন তাঁর মালিকানাধীন এবং তাঁরই সৃজিত এবং সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে যেভাবে ইচ্ছা করেন পরিবর্তন করেন, এ ব্যাপারে কেউ তাঁর কর্মে বাধা সৃষ্টিকারী নেই। তাঁর সকল কাজ প্রসংশনীয় এবং তাঁর সত্ত্বা সকল উত্তম গুণাবলি সম্বলিত।

অনুবাদ :

٦٥. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالْفُلْكَ السُّفُنَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ لِلرُّكُوْبِ وَالْحَمْلِ بِاَمْرِهٖ بِاِذْنِهٖ وَيُمْسِكُ السَّمَاۤءَ مِنْ اَنْ اَوْ لِئَلَّا تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط فَتَهْلِكُوْا اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ . فِى التَّسْخِيْرِ وَالْاِمْسَاكِ .

৬৫. আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আল্লাহ আপনাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে জীব-জন্তু হতে তৎসমুদয়কে এবং নৌযানসমূহকে জলযান তথা নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি সমুদ্রে বিচরণশীল আরোহণ ও পরিবহনের জন্য। তার নির্দেশে তাঁর অনুমতিতে আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত। ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ নিশ্চয় মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু কাজে নিয়োজিত করা ও আটকে রাখার ক্ষেত্রে।

٦٦. وَهُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ بِالْاِنْشَاءِ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ اٰجَالِكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط عِنْدَ الْبَعْثِ اِنَّ الْاِنْسَانَ اَىِ الْمُشْرِكَ لَكَفُوْرٌ . لِنِعَمِ اللّٰهِ بِتَرْكِهٖ تَوْحِيْدَهٗ .

৬৬. এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। সৃষ্টির মাধ্যমে অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তোমাদের পৃথিবীতে অবস্থানের মেয়াদকাল শেষ হলে, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন পুনরুত্থানকালে মানুষতো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ মুশরিকরা আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর একত্ববাদকে পরিত্যাগ করে।

٦٧. لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا شَرِيْعَةً هُمْ نَاسِكُوْهُ عَامِلُوْنَ بِهٖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ يُرَادُ بِهٖ لَا تُنَازِعْهُمْ فِى الْاَمْرِ اَمْرِ الذَّبِيْحَةِ اِذْ قَالُوْا مَا قَتَلَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَاْكُلُوْهُ مِمَّا قَتَلْتُمْ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اَىْ اِلٰى دِيْنِهٖ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى دِيْنٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

৬৭. আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি। مَنْسَكًا শব্দের سِيْن বর্ণ টি যবর ও যের উভয়ই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো শরিয়ত। যা তারা অনুসরণ করে তার উপর আমলকারী। সুতরাং তারা যেন আপনার সাথে বিতর্ক না করে এর উদ্দেশ্য হলো- আপনারা তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবেন না। এই ব্যাপারে জবাইয়ের ব্যাপারে। যেহেতু তারা বলত যে, আল্লাহ যাকে হত্যা করেছেন তা খাওয়ার অধিক যোগ্য তোমায় যাকে হত্যা করেছ তা হতে। আপনি তাদেরকে আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন অর্থাৎ তাঁর দীনের দিকে। আপনি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। দীনে।

٦٨. وَاِنْ جَادَلُوْكَ فِىْ اَمْرِ الدِّيْنِ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ . فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ .

৬৮. তারা যদি আপনার সাথে বিতণ্ডা করে দীনের বিষয়ে তবে বলে দিন, তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক অবহিত ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান/ শাস্তি দিবেন। আর এটা ছিল জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বে।

অনুবাদ :

٦٩. اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكَافِرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ . بِاَنْ يَّقُوْلَ كُلٌّ مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ خِلَافَ قَوْلِ الْاٰخَرِ .

৬৯. আল্লাহ তোমাদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে দিবেন হে মুমিন ও কাফের সম্প্রদায় কিয়ামতের দিন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ। এভাবে যে, প্রত্যেক দলই বিপক্ষ দলের বিপরীত কথা বলে থাকে।

٧٠. اَلَمْ تَعْلَمْ اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّقْرِيْرِ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّ ذٰلِكَ اَىْ مَا ذُكِرَ فِىْ كِتٰبٍ ط هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ اِنَّ ذٰلِكَ اَىْ عِلْمَ مَا ذُكِرَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ . سَهْلٌ .

৭০. আপনি কি জানেন না? এখানে اِسْتِفْهَامْ টি تَقْرِيْر তথা কথাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে। যে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা জানেন। এ সবই রয়েছে অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হলো। একটি কিতাবে অর্থাৎ লৌহে মাহফুযে তথা সংরক্ষিত ফলকে। নিশ্চয় এটা অর্থাৎ, যা কিছু উল্লেখ করা হলো তার জ্ঞান আল্লাহর নিকট সহজ।

٧١. وَيَعْبُدُوْنَ اَىِ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ هُوَ الْاَصْنَامُ سُلْطٰنًا حُجَّةً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ط اَنَّهَا اٰلِهَةٌ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ بِالْاِشْرَاكِ مِنْ نَّصِيْرٍ . يَمْنَعُ عَنْهُمْ عَذَابَ اللّٰهِ .

৭১. তারা উপাসনা করে মুশরিকরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর যার সম্পর্কে তিনি কোনো দলিল প্রেরণ করেননি। অর্থাৎ মূর্তি ও দেব-দেবীর উপাসনা করে কোনো প্রমাণ ছাড়াই। এবং যাদের সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। শিরক করার কারণে কোনো সাহায্যকারী যে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

٧٢. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ بَيِّنٰتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ط اَىِ الْاِنْكَارَ لَهَا اَىْ اَثَرَهٗ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالْعُبُوْسِ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ط اَىْ يَقَعُوْنَ فِيْهِمْ بِالْبَطْشِ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ اَىْ بِاَكْرَهَ اِلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمَتْلُوِّ عَلَيْكُمْ هُوَ النَّارُ ط وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط بِاَنَّ مَصِيْرَهُمْ اِلَيْهَا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِىَ .

৭২. এবং তাদের নিকট কুরআন হতে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হলে بَيِّنٰتٌ শব্দটি حَالٌ হয়েছে। আপনি কাফেরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করবেন অর্থাৎ অপছন্দ ও অসন্তুষ্টির ছাপ। যারা তাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। অর্থাৎ তাদেরকে ধরে বসার উপক্রম হয়। আপনি বলুন! তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? অর্থাৎ কুরআন অপেক্ষা আরো অধিক অপছন্দনীয় বিষয় যা তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করা হয়। আর তা হলো নরকাগ্নি এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফেরদেরকে। যে, তার প্রতিই তারা ধাবিত হবে। এবং এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। অর্থাৎ দোজখের আগুন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ : تَرَ মূলত تَرَاى ছিল। এটা رُؤْيَتٌ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। শুরুতে لَمْ আসার কারণে শেষ থেকে يَاءْ পড়ে গেছে। تَرَ -এর ব্যাখ্যা تَعْلَمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, দেখা বলতে এখানে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখা তথা চিন্তা-গবেষণা করা উদ্দেশ্য। سَخَّرَ ক্রিয়াটি تَسْخِيْر থেকে مَاضِىْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো কর্তৃতাধীন করা, অনুগত করা, কাজে লাগানো, জোরপূর্বক কোনো কাজে নিয়েজিত করা।

قَوْلُهُ وَالْفُلْكَ : مَافِى الْاَرْضِ -এর عَطْف হওয়ার مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ تَجْرِىْ : এটা فُلْك -এর حَالْ , আবার اَللّٰه শব্দের উপরও এর عَطْف হতে পারে। এ সময় এটা اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ -এর অধীনে হবে। আর تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ এটা اَنَّ -এর خَبَرْ হবে। একবচনও বহুবচন সব ক্ষেত্রে فُلْك শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ مِنْ (اَنْ) اَوْ لِئَلَّا (تَقَعَ) : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) -এর উদ্দেশ্য হলো اَنْ تَقَعَ -এর اِعْرَاب -এর প্রতি ইঙ্গিত করা। এটা হয়তো جَرّ -এর স্থলে রয়েছে এর حَرْف جَرّ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ- مِنْ اَنْ تَقَعَ ছিল, আর تَقَعَ শব্দটি اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ এর কারণে وُقُوْع -এর অর্থে। অথবা এটা নসবের স্থলে পতিত হয়েছে। অথবা যেহেতু এটা اَلسَّمَاءْ থেকে بَدَل , الْاِشْتِمَالْ , অর্থাৎ, يَمْنَعُ وُقُوْعَهَا আর কেউ বলেন مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। বসরার নাহুবিদগণের মতে বাক্যটি এরূপ ছিল- يُمْسِكُ السَّمَاءَ كَرَاهَةَ اَنْ تَقَعَ আর কূফীগণের মতে ছিল يُمْسِكُ السَّمَاءَ لِئَلَّا تَقَعَ আমাদের মুফাসসির (র.) প্রথম ও তৃতীয় সম্ভাবনাকে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ : এটা مُسْتَثْنٰى مُفَرَّغْ -এর মধ্যে পতিত হয় না। আর এখন مُسْتَثْنٰى مِنْهُ তথা كَلَام مُوْجَبْ- نَفِى হলো كَلَامْ مُوْجَبْ এ আপত্তির উত্তর এই যে, يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ শক্তির দিক দিয়ে يُمْسِكُ السَّمَاءَ -এর মতো। বাক্যটি এরূপ ছিল- لَا يَتْرُكُهَا تَقَعُ فِىْ حَالَةٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا فِىْ حَالِ كَوْنِهَا مُتَلَبِّسَةً بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

بِاِذْنِهٖ -এর মধ্যে بَا টি مُلَابَسَتْ -এর জন্যে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ قَالَ الْجُنَيْدُ قُدِّسَ سِرُّهٗ اَحْيَاكُمْ بِمَعْرِفَةٍ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ بِاَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ وَالْفَتْرَةِ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ بِالْجَذْبِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো- তিনি তোমাদের আত্মাকে জীবিত করেন তাঁর মা'রিফাত দ্বারা, এরপর তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাঁর জিকির থেকে উদাসীন ও গাফেল থাকার সময়ের দ্বারা, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন জিকিরবিহীন সময়ের পরে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করার দ্বারা।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : এখানে উম্মত দ্বারা সে সকল মানুষ উদ্দেশ্য যাদের নিকট কোনো আসমানি ধর্ম ও কোনো নবীর শরিয়ত নেই। কাফের মুশরিকগণ উদ্দেশ্য নয়। جَعَلْنَا শব্দটি এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করছে। ব্যাখ্যাকার (র.) شَرِيْعَةٌ দ্বারা مَنْسَك -এর ব্যাখ্যা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلنَّسِيْكَةُ শব্দটি ইবাদত অর্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। কাজেই مَنْسَكًا শব্দকে ইবাদতখানা বা ইবাদতের সময় অর্থে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। نَاسِكُوْهُ শব্দটিও এ বিষয়ের ইঙ্গিত করছে। যদি ইবাদতখানা বা ইবাদতের সময় অর্থ হতো তাহলে نَاسِكُوْنَ فِيْهِ বলতেন।

قَوْلُهُ لَا يُنَازِعُنَّكَ : ব্যাখ্যাকার (র.) لَا تُنَازِعْهُمْ দ্বারা এর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করা উদ্দেশ্য। এটা كِنَايَةٌ তথা ইঙ্গিত স্বরূপ। কেননা বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব হয় দু'পক্ষ থেকে। মূলত এর দ্বারা রাসূল ﷺ -কে তাদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি যখন তাদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না তাহলে দ্বন্দ্ব এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। এক পক্ষকে নিষেধ করার দ্বারা কেনায়া স্বরূপ অপর পক্ষকেও নিষেধ করা বুঝায়।

قَوْلُهُ فِى الْاَمْرِ : ব্যাখ্যাকার (র.) اَمْر দ্বারা জবাইকৃত পশু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম খতীব (র.) বলেন, এ আয়াতটি বুদাইল ইবনে ওরাকা, বিশর ইবনে সুফিয়ান ও ইয়াজীদ ইবনে হুনাইস -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা রাসূল ﷺ -এর

সাহাবীদের নিকট বলেছিল– مَا لَكُمْ تَاكُلُوْنَ مِمَّا تَقْتُلُوْنَ وَلَا تَاكُلُوْنَ مِمَّا قَتَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ তোমরা নিজেরা মেরে তা ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ তা'আলার মারা তথা এমনিতেই মৃত জন্তুকে ভক্ষণ কর না? ব্যাখ্যাকার (র.)-এর فِى الْاَمْرِ -এর ব্যাখ্যা জবাই দ্বারা করা এ স্থলে সমীচীন হয়নি; বরং এখানে স্বাভাবিকভাবে শরিয়তের বিধান উদ্দেশ্য। অন্যথায় পূর্বের উম্মতদের মধ্যে মৃত পশু খাওয়া বৈধ হওয়া বোঝা যায়। আর তা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ : এখানে مَا হলো مَوْصُوْلَه এবং يَعْبُدُ -এর مَفْعُوْل بِهِ

قَوْلُهُ يَكَادُ يَسْطُوْنَ : এটা جُمْلَة حَالِيَة অথবা اَلَّذِيْنَ থেকে حَالْ, তবে এ সময় প্রশ্ন জাগে যে, اَلَّذِيْنَ হলো مُضَاف اِلَيْهِ আর উদ্দেশ্য হয় مُضَاف, সুতরাং مُضَاف اِلَيْهِ থেকে حَالْ হওয়া কিভাবে ঠিক হতে পারে?

উত্তর : مُضَاف যেহেতু مُضَاف اِلَيْهِ -এর অংশ হয়, কাজেই তার থেকে حَالْ হওয়া বৈধ আছে। অথবা এটা وُجُوْهٌ থেকে حَالْ আর وَجْه দ্বারা তার অধিকারী ব্যক্তি উদ্দেশ্য। ব্যাখ্যাকার (র.) يَسْطُوْنَ -এর ব্যাখ্যা بَطْش দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَسْطُوْنَ শব্দটি يَبْطِشُوْنَ -এর অর্থ বিশিষ্ট। এ কারণেই يَسْطُوْنَ -এর صِلَة স্বরূপ بَا আসা বৈধ হয়েছে। অন্যথায় এর সেলাহ্ আসে عَلٰى

قَوْلُهُ هُوَ النَّارُ : এখানে اَلنَّارُ হলো উহ্য هُوَ مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ এ সময় ওয়াকফ হবে ذٰلِكَ -এর উপর। আবার اَلنَّارُ শব্দটি مُبْتَدَأ এবং وَعَدَهَا اللّٰهُ হলো এর খবর। এ সময় ওয়াকফ হবে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ : **অর্থাৎ,** আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এ অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোনো কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেওয়ারই নামান্তর। এ কারণেই মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে تَسْخِيْر -এর অনুবাদ "কাজে নিয়োজিত করা" দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেওয়ার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্য ক্ষতিকর হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। জনৈক লেখক নদীকে কোনো এক নির্দিষ্ট দিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্য আর একজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হতো না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন। কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছিয়ে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا : এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে مَنْسَك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে نُسُك ও مَنْسَك কুরবানির অর্থে হজের বিধানবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এজন্য সেখানে واو সহকারে وَلِكُلِّ اُمَّةٍ বলা হয়েছিল। এখানে مَنْسَك -এর অন্য অর্থ [অর্থাৎ জবাই করার বিধানাবলি অথবা শরিয়তের বিধানাবলির জ্ঞান] বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে وَاوْ সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের এক তাফসীর কোনো কোনো কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের জবাই করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্কবিতর্ক করত। তারা বলত, তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক সে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন অর্থাৎ সাধারণ মৃত্যুজন্তু, তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াতে অবতীর্ণ হয়। –[রূহুল মা'আনী]

অতএব এখানে مَنْسَك -এর অর্থ হবে জবাই করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরিয়তের জন্য জবাইয়ের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর শরিয়ত একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত। এই শরিয়তের বিধি-বিধানের মোকাবিলা কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েজ নয়। অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মোকাবিলা করছ। এটা কিরূপে জায়েজ হতে পারে? মৃতজন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরিয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার উপর ভিত্তি করে পয়গাম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। –[রূহুল মা'আনী]

সাধারণ তাফসীরকারদের মতে مَنْسَكٌ শব্দের অর্থ এখানে শরিয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোনো বিশেষ ভালো অথবা মন্দ কাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজের বিধি-বিধানকে مَنَاسِكَ الْحَجِّ বলা হয়। কেননা এগুলোতে বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ইবাদত। কুরআনে وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مَنَاسِكُ বলে ইবাদতের বিধানাবলি বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই দ্বিতীয় তাফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রুহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, مَنْسَكٌ বলে শরিয়তের সাধারণ বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিক ও ইসলাম বিদ্বেষী মুহাম্মাদী শরিয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোনো পূর্ববর্তী শরিয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরিয়ত ও কিতাবের মুকাবিলা করা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরিয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোনো উম্মত ও শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরিয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরিয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরিয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরিয়তের কোনো বিধান পূর্ববর্তী শরিয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসূখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসিখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরিয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য- فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ -এর সারমর্মও তা-ই। অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষনবী ﷺ একটি স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরিয়তের বিধি বিধান নিয়ে তর্কবিতর্ক করার অধিকার কারো নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তাফসীর ও এই দ্বিতীয় তাফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আয়াত জবাই সম্পর্কিত তর্কবিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরিয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষায় ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তাফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরিয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোনো পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নাই যে, নতুন শরিয়ত সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবে; বরং নতুন শরিয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اُدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্কবিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না ; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের অপনোদন : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মাদী শরিয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরিয়ত মনসূখ হয়ে গেল। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কুরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা স্বয়ং কুরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরিয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। এ কথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরিয়তের কোনো বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরো সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে- وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন।

قَوْلُهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত ও হিকমতের উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, অতীতে আল্লাহ পাক প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদত-বন্দেগির ভিন্ন ভিন্ন রীতি-নীতি বা শরিয়ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা সে যুগের উপযোগী ছিল। তারা আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মোতাবেক বন্দেগী করতো অনুরূপভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে করীম ﷺ -কেও পরিপূর্ণ শরিয়ত ও সর্বশেষ শরিয়ত দান করেছেন, যাঁর অনুসরণ করা সর্বকালের সকল মানুষেরই কর্তব্য। কেননা প্রিয়নবী ﷺ সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোনো নবীর আগমন হবে না এবং তাঁর শরিয়ত সর্বশেষ শরিয়ত, এরপর আর কোনো শরিয়ত আসবে না। অতএব,

এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বিতর্কের অবকাশ নেই। যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ করবে, তারা নাজাত লাভ করবে। আর যারা তাঁর অনুসরণে অপ্রস্তুত হবে, তারা নাজাত লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাই ইরশাদ হয়েছে- فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ অর্থাৎ [হে রাসূল!] কেউ কেউ যেন আপনার সাথে দীনি ব্যাপারে বা শরিয়তের ব্যাপারে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়। কেননা আপনার দীন আল্লাহ পাকের মনোনীত, আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত, তাই তা কলহ-দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই কুরবানির জন্তু জবাই করার পন্থা নির্দিষ্ট ছিল। তারা সে পন্থাতেই জবাই করতো। হে রাসূল ! লোকদের উচিত হলো, জবাই করার ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যেই শরিয়তের রীতি-নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার مَنْسَكٌ শব্দটির অনুবাদ করেছেন পর্ব, বিশেষ অনুষ্ঠান। মুজাহিদ (র.) ও কাতাদা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো কুরবানির স্থান যেখানে তারা কুরবানি করতো। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, مَنْسَكٌ শব্দটির অর্থ হলো, ইবাদতের স্থান।

قَوْلُهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا الخ : শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বোদায়েল ইবনে ওরাকা, ইয়াজিদ ইবনে খুনাইস এবং বসর ইবনে সুফিয়ান নামক ব্যক্তিদের সম্পর্কে। এ কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের নিকট এসে বলেছিল, তোমরা যেসব জন্তুকে জবাই করে মার তা হালাল মনে করে খাও, আর যেসব জন্তুকে আল্লাহ পাক সরাসরি মৃত্যু দেন, সেগুলোকে মৃত মনে করে তোমরা সেগুলোর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ মনে কর, এর কারণ কি? আল্লাহ পাক তাদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে কাফেরদের সাথে কোনো ব্যাপারে বিতর্কে মশগুল না হয়ে শুধু ইসলাম গ্রহণের জন্যে তাদেরকে আহবান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ

অর্থাৎ হে রাসূল! তাদেরকে আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন, যেন তারা তাওহীদের মূল নীতিতে বিশ্বাস করে। কেননা নবী রাসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ যুগের মানুষকে তাওহীদে বিশ্বাস, স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। এ মূলনীতিতে কোনো মত পার্থক্য নেই। অতএব এ সম্পর্কে বিতর্ক সম্পূর্ণ আশোভনীয়। অবশেষে এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ অর্থাৎ "[হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনিই সরল সঠিক পথের হেদায়েতের উপর রয়েছেন"।

প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ : পৃথিবীর কোনো মানুষকে যদি হেদায়েত লাভ করতে হয় তবে অবশ্যই আপনার অনুসারী হতে হবে। দুনিয়াতে শান্তি লাভ করার, জীবন-সাধনাকে সার্থক করার এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাত পাওয়ার একমাত্র পথ হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পরিপূর্ণ অনুসরণ। কেননা আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- "[হে রাসূল!] নিশ্চয় আপনিই সঠিক পথে রয়েছেন"।

قَوْلُهُ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ : অর্থাৎ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ -এ আয়াতটি জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর কোনো কোনো আলেম বলেন, আয়াতটি মানসূখ নয়; বরং مُحْكَمٌ তথা সদা বহাল। এ সময় আয়াতের অর্থ হবে- তাদের সাথে তর্ক বিতর্ক বর্জন কর এবং এ বিষয়টিকে اَللّٰهُ اَعْلَمُ [আল্লাহ সর্বাধিক অবগত] বলে তাকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর।

قَوْلُهُ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ : সবচেয়ে বড় জুলুম ও অন্যায় হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো অংশীদার বানানো। এমন জালিম ও অন্যায় আচরণকারীদের মনে রাখা উচিত যে, তারা যাদেরকে ইবাদতে শরিক করত তারা বিপদে পড়লে যেসব শরিকরা তাদের কোনো কাজে আসবে না। আর অন্য কেউ তখন তাদেরকে সাহায্য করবে না।

قَوْلُهُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِينَ كَفَرُوا : وَعَدَ ক্রিয়াটি দুই مَفْعُوْل দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়। هَا ضَمِيْر টি দ্বিতীয় مَفْعُوْلٌ আর اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا হলো প্রথম مَفْعُوْل -এর বিপরীতেও বৈধ। ব্যাখ্যাকার (র.) তাঁর উক্তি بِاَنَّ مَصِيْرَهُمْ اِلَيْهَا দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -কে প্রতিশ্রুতি লাভকৃত তথা مَوْعُوْد بِه এবং اَلنَّارَ -কে مَوْعُوْد তথা প্রতিশ্রুত বিষয় সাব্যস্ত করেছেন।

অনুবাদ :

٧٣. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَهُوَ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا اِسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهٗ ذُبَابَةٌ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ط اَىْ لِخَلْقِهٖ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهِمْ مِنَ الطِّيْبِ وَالزَّعْفَرَانِ الْمُلَطَّخِيْنَ بِهٖ لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ يَسْتَرِدُّوْهُ مِنْهُ ط لِعَجْزِهِمْ فَكَيْفَ يَعْبُدُوْنَ شُرَكَاءَ لِلّٰهِ تَعَالٰى هٰذَا اَمْرٌ مُسْتَغْرَبٌ عُبِّرَ عَنْهُ بِضَرْبِ مَثَلٍ ضَعُفَ الطَّالِبُ الْعَابِدُ وَالْمَطْلُوْبُ الْمَعْبُوْدُ.

৭৩. হে মানুষ! অর্থাৎ মক্কাবাসীরা একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে মনেযোগ সহকারে শোন! আর হলো তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহবান কর উপাসনা কর অর্থাৎ মূর্তি ও প্রতিমাদের তারা তো কখনো একটি মাছি ও সৃষ্টি করতে পারবে না ذُبَابٌ শব্দটি اِسْمِ جِنْس -এর একবচন হলো ذُبَابَةٌ এটা স্ত্রী ও পুং লিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও অর্থাৎ তা সৃষ্টি করার জন্য। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে তাদের উপর যে সুগন্ধি জাফরান যা তারই সাথে লেগে থাকে। এটাও তারা তাদের নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তাদের অক্ষমতার কারণে। তবুও তারা কিভাবে আল্লাহর শরিকদের উপাসনা করে। এ বিষয়টি অদ্ভুত ধরনের। এটাকেই উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কতইনা দুর্বল অন্বেষক উপাসক ও অন্বেষিত উপাস্য।

٧٤. مَا قَدَرُوا اللّٰهَ عَظَّمُوْهُ حَقَّ قَدْرِهٖ عَظَمَتِهٖ اِذْ اَشْرَكُوْا بِهٖ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنَ الذُّبَابِ وَلَا يَنْتَصِفُ مِنْهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ غَالِبٌ.

৭৪. তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা সম্মান উপলব্ধি করেন। তার সম্মান ও বড়ত্ব । যখন তারা তার সাথে এমন সব বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে যারা মাছির প্রতিরোধেও সক্ষম নয় এবং তা থেকে কোনোরূপ প্রতিশোধও নিতে পারে না। আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রম বিজয়ী।

٧٥. اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ط رُسُلًا نَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُشْرِكُوْنَ ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِمَقَالَتِهِمْ بَصِيْرٌ. بِمَنْ يَتَّخِذُهٗ رَسُوْلًا كَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৭৫. আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্যে হতে মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য হতে ও। রাসূল! এ আয়াত তখনই অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুশরিকরা বলল যে, আমাদের মধ্য থেকেই একজনের উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হলো? আল্লাহ সর্বশ্রোতা তাদের কথার/ বক্তব্যের সম্যক দ্রষ্টা তাদেরকে যাদেরকে তিনি রাসূল মনোনীত করেন। যেমন– হযরত জিবরীল, মীকাঈল, ইবরাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ প্রমুখ।

٧٦. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط أَيْ مَا قَدَّمُوْا وَمَا خَلَّفُوْا أَوْ مَا عَمِلُوْا وَمَا هُمْ عَامِلُوْنَ بَعْدُ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ .	অনুবাদ : ৭৬. তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তিনি তা জানেন অর্থাৎ যে আমল অগ্রে প্রেরণ করেছ এবং যা পেছনে রেখে এসেছ, এবং যে আমল করে ফেলেছ এবং যা ভবিষ্যতে করবে এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তিত হবে।
٧٧. يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا أَيْ صَلُّوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَحِّدُوْهُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ كَصِلَةِ الرَّحِمِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . تَفُوْزُوْنَ بِالْبَقَاءِ فِي الْجَنَّةِ .	৭৭. হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর অর্থাৎ সালাত আদায় কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর, এবং সৎকর্ম কর যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন ও উত্তম চরিত্রের কার্যাবলি যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার অর্থাৎ জান্নাতে স্থায়ী হওয়ার মাধ্যমে সাফল্য পেতে পার।
٧٨. وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ لِإِقَامَةِ دِيْنِهِ حَقَّ جِهَادِهِ ط بِاسْتِفْرَاغِ الطَّاقَةِ فِيْهِ وَنَصْبُ حَقَّ عَلَى الْمَصْدَرِ هُوَ اجْتَبٰكُمْ اِخْتَارَكُمْ لِدِيْنِهِ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ أَيْ ضِيْقٍ بِأَنْ سَهَّلَهُ عِنْدَ الضَّرُوْرَاتِ كَالْقَصْرِ وَالتَّيَمُّمِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالْفِطْرِ لِلْمَرَضِ وَالسَّفَرِ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْكَافِ اِبْرٰهِيْمَ ط عَطْفُ بَيَانٍ هُوَ أَيِ اللّٰهُ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ط مِنْ قَبْلُ أَيْ قَبْلَ هٰذَا الْكِتَابِ وَفِيْ هٰذَا أَيِ الْقُرْاٰنِ لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَنَّهُ بَلَّغَكُمْ وَتَكُوْنُوْا أَنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ج أَنَّ رُسُلَهُمْ بَلَّغَتْهُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ دَاوِمُوْا عَلَيْهَا وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط ثِقُوْا بِهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ ج نَاصِرُكُمْ وَمُتَوَلِّيْ أُمُوْرِكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ . أَيِ النَّاصِرُ هُوَ لَكُمْ .	৭৮. এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য। যেভাবে জিহাদ করা উচিত অর্থাৎ এ ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। حَقَّ শব্দটি মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁর দীনের জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি অর্থাৎ, সংকীর্ণতা। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি বিধান সহজ করেছেন, যেমন– নামাজের কসর করার বিধান, তায়াম্মুমের বিধান, নিরুপায় অবস্থায় মৃতজন্তু ভক্ষণ এবং অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের জন্য রমজানের রোজা ভঙ্গের অনুমোদন। এটা তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত مِلَّةَ শব্দটি حَرْفُ جَار উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর اِبْرَاهِيْم এটা اَبِيْكُمْ -এর عَطْفُ بَيَانْ হয়েছে। তিনি অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম অর্থাৎ এ কিতাবের পূর্বে। এবং এ কিতাবেও অর্থাৎ কুরআনে যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হন। কিয়ামতের দিন যে, তিনি তোমাদের নিকট প্রচার করেছেন এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য যে তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট প্রচার করেছেন। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর সর্বদা এর পাবন্দি কর এবং জাকাত দাও এবং আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর অর্থাৎ তার উপর নির্ভরশীল হও। তিনিই তোমাদের অভিভাবক অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তোমাদের সকল কর্মের তত্ত্বাবধায়ক। কতইনা উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী তিনি অর্থাৎ তিনি তোমাদের সাহায্য-সহায়তাকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ : এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্বের وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আয়াতের সাথে। এ আয়াতে যদিও মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে এর দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদতকারী সকল মানুষ উদ্দেশ্য। ضُرِبَ مَثَلًا -এর মধ্যে مَثَلًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আশ্চর্যকারী বিষয়। আর উক্ত আশ্চর্যকর বিষয় হলো শিরক ও মূর্তিপূজার আহমকীকে এক স্পষ্ট উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করা। তা এই যে, তোমরা যেসব মূর্তিকে কার্যনিয়ন্তা তথা বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষমতার অধিকারী মনে করছ তারা তো এতো অসহায় ও অক্ষম যে, তারা সবাই মিলে মাছির ন্যায় একটি সাধারণ তুচ্ছ জিনিসকেও সৃষ্টি করতে পারে না। আর সৃষ্টি করা তো দূরের কথা তোমরা প্রতিদিন তাদের সামনে যে মিষ্টান্ন ও খাদ্যদ্রব্য রাখ আর মাছি এসে তা খেয়ে যায় তারা সে মাছিগুলোকেও তাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। অতএব তারা কোনো বিপদাপদ থেকে তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? অবশেষে আয়াতে তাদের এহেন নির্বুদ্ধিতামূলক আচরণ ও বোকামিকে এ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে যে- ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

قَوْلُهُ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ : এ বাক্যটি حَالٌ -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, اِنْتَفٰى خَلْقُهُمُ الذُّبَابَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَلَوْفِىْ حَالِ اِجْتِمَاعِهِمْ অর্থে।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا : يَسْلُبْ শব্দটি দু'মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ, এর প্রথম مَفْعُوْل হলো هُمْ আর দ্বিতীয়টি হলো شَيْئًا আর مُلَطَّخُوْنَ শব্দটি لَطْخٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ হলো মিশ্রণ করা, মেশা। مُلَطَّخُوْنَ মূলত طِيْبٌ وَالزَّعْفَرَانُ -এর সিফতে সববী। কাজেই এর স্থলে مُلَطَّخِيْنَ হওয়া উচিত ছিল। -[জুমাল]

قَوْلُهُ عُبِّرَ عَنْهُ بِضَرْبِ مَثَلٍ : এটা একটা প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : উদাহরণ পেশ করার নামে যা উল্লিখিত হয়েছে তা কোনো উদাহরণ নয় তথাপি তাকে উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বলা হলো কেন?

উত্তর : আরবিতে আশ্চর্যকর ও উন্নত বিষয়বস্তুকেও مَثَلٌ বলা হয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ رُسُلًا : رُسُلًا শব্দটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, আয়াতে শব্দ বিলুপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর কিয়াস করে رُسُلًا -কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَقَّ جِهَادِهٖ : মূলত جِهَادًا حَقًّا। এটা اِضَافَتُ الصِّفَتِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ هُوَ اَىْ اَللّٰهُ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ : এখানে هُوَ -এর مَرْجِعٌ -এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এর مَرْجِعٌ হলো اِبْرَاهِيْمُ ২. এর مَرْجِعٌ হলো اَللّٰهُ ব্যাখ্যাকার (র.)-এর পরে اَللّٰهُ শব্দ উহ্য মেনে দ্বিতীয় সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এর আলামত হলো- وَفِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ। কেননা কুরআনে মুসলমান নাম রাখাটা আল্লাহ তা'আলার কাজ, ইবরাহীম (আ.)-এর কাজ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ : একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা : ضُرِبَ مَثَلٌ এই শব্দটি সাধারণত কোনো বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্র হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদি

খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরো বেশি শক্তিহীন হবে। ইরশাদ হচ্ছে- مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

অর্থাৎ এই নির্বোধ নিমকহারামরা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরিক সাব্যস্ত করেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সূরা হজের সিজদায়ে তেলাওয়াত : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ - এ অংশটুকু সূরা হজে এক আয়াতে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লিখিত আয়াতে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সওরী (র.)-এর মতে এই আয়াতে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা এতে সিজদার সাথে রুকূ ইত্যাদিও উল্লিখিত হয়েছে। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে নামাজের সিজদা বোঝানো হয়েছে। যেমন- وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য! [এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) প্রমুখের মতে এই আয়াতেও সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে সূরা হজে অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দুইটি সিজদায়ে তেলাওয়াত আছে। ইমাম আযম (র.)-এর মতে এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ : جِهَادٌ ও مُجَاهَدَةٌ শব্দের অর্থ কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حَقَّ جِهَادِهٖ-এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নামযশ ও গনিমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- حَقَّ جِهَادِهٖ-এর অর্থ হলো জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার কর্ণপাত না করা। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে জিহাদের অর্থ সাধারণ ইবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ব্যয় করা।

যাহ্হাক ও মুকাতিল (র.) বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে- اِعْمَلُوْا حَقَّ عَمَلِهٖ وَاعْبُدُوْهُ حَقَّ عِبَادَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর ইবাদত কর যেমন করা উচিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, এ স্থলে জিহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই حَقَّ جِهَادٌ অর্থাৎ যথাযোগ্য জিহাদ। ইমাম বগভী (র.) প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ قَالَ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ لِهَوَاهُ অর্থাৎ তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ এখনও অব্যাহত আছে। এই হাদীসটি বর্ণনা করে ইমাম বায়হাকী (র.) বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য : তাফসীরে মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তাফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছে। তা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ তখনো চালু ছিল। কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বভাবতই এই জিহাদ শায়খে কামেলের সংসর্গ লাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ اجْتَبَاكُمْ الخ : উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহর মনোনীতে উম্মত : হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্যে থেকে কুরাইশকে, অতঃপর কুরাইশের মধ্যে বনী হাশিমকে এবং বনী-হাশিমের মধ্যে থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। -[মুসলিম, মাযহারী]

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোনো গুনাহ নেই যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গুনাহও ছিল, যা তওবা করলেও মাপ হতো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ কঠিন ও দুষ্কর বিধি-বিধান, যা বনী ইসরাইলের উপর আরোপিত হয়েছিল। কুরআন পাকে একে اِصْرٌ ও اَغْلَالٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উম্মতকে এমন কোনো বিধান দেওয়া হয়নি। কেউ কেউ বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এ ধর্মে এমন কোন অসহনীয় বিধান নেই। অল্পবিস্তর পরিশ্রম ও কষ্ট তো দুনিয়ার প্রত্যেক কাজেই হয়। শিক্ষালাভ, চাকরি, ব্যবসা ও শিল্পে কতইনা পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়; কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় না যে, কাজটি অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন। ভ্রান্ত ও বিরুদ্ধ পরিবেশ অথবা দেশগ্রামে প্রচলন না থাকার কারণে কোনো কাজে যে কঠিনতা দেখা দেয়, তাকে কাজের সংকীর্ণতা ও কঠোরতা বলা যাবে না। পরিবেশে তার সঙ্গী কেউ নেই, এ কারণে কর্মীর কাছে কাজটি কঠিন মনে হয়। যে দেশে রুটি খাওয়া ও রুটি তৈরি করার অভ্যাস নেই, সেই দেশে রুটি লাভ করা সত্যিই কঠিন হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে, রুটি তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ।

হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেন, ধর্মে সংকীর্ণতা নেই- এ কথার তাৎপর্য এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্য ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ ; বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষত অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারি কাজও হালকা পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজে আমার চক্ষু শীতল হয়।
-[আহমদ, নাসায়ী, হাকিম]

قَوْلُهُ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ : অর্থাৎ তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কুরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। এরপর কুরাইশদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফজিলতে শামিল হয়। যেমন হাদীসে আছে-

اَلنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّاْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ

অর্থাৎ সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কুরাইশদের অনুগামী। মুসলমানগণ মুসলমান কুরাইশদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কুরাইশদের অনুগামী। -[মাযহারী]

কেউ কেউ বলেন, আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম ﷺ হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মুমিনীন' অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম ﷺ যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর, একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

قَوْلُهُ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-ই কুরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদী এবং সমগ্র বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন : যেমন হযরত ইবরাহীম (রা.)-এর এই দোয়া কুরআনে বর্ণিত আছে- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ কুরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম। যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) নন ; কিন্তু কুরআনের পূর্বে তাঁর এই

নামকরণ কুরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি তাফসীরকার ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতানুযায়ী। তাঁর মতে আলোচ্য আয়াতে هُوَ যমীরের مَرْجِعْ হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। এ ব্যাপারে আরেকটি মত রয়েছে। আর তা হলো- هُوَ যমীরের مَرْجِعْ হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। জালালাইন গ্রন্থকার (র.) এ দ্বিতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। 'তাহকীক ও তারকীব' অংশে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

قَوْلُهُ لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ : অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম, তখন উম্মতে মুহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গাম্বর যখন এই দাবি করবেন, তখন তাঁদের উম্মতেরা অস্বীকার করে বসবে। এ সময় উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গাম্বরগণ নিশ্চিত রূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের জমানায় উম্মতে মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জবাবে বলা হবে, আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই ; কিন্তু আমরা আমাদের রাসূল ﷺ -এর মুখে এ কথা শুনেছি, যাঁর সত্যবাদিতায় কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বুখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে; তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলি পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া! বিধানাবলির মধ্যে এ স্থলে শুধু নামাজ ও জাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলির মধ্যে জাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরিয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ : অর্থাৎ সব কাজে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন, এই বাক্যের অর্থ এই যে, কুরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাবস্থায় এগুলোকে আঁকড়িয়ে থাক যেমন এক হাদীসে আছে–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দুটিকে অবলম্বন করে থাকবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হলো আমার সুন্নত। –[মাযহারী]

اَلْجُزْءُ الثَّامِنُ عَشَرَ অষ্টাদশ পারা

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ وَّثَمَانٌ اَوْ تِسْعَ عَشَرَةَ اٰيَةً

সূরা মু'মিনূন মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত : ১১৮/১১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. قَدْ لِلتَّحْقِيْقِ اَفْلَحَ فَازَ الْمُؤْمِنُوْنَ .

২. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ . مُتَوَاضِعُوْنَ .

৩. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ وَغَيْرِهٖ مُعْرِضُوْنَ .

৪. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ . مُؤَدُّوْنَ .

৫. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ عَنِ الْحَرَامِ .

৬. اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَيْ مِنْ زَوْجَاتِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اَيِ السَّرَارِيْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ج فِيْ اِتْيَانِهِنَّ .

৭. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ اَيْ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالسَّرَارِيْ كَالْاِسْتِمْنَاءِ بِيَدِهٖ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ج الْمُتَجَاوِزُوْنَ اِلٰى مَا لَا يَحِلُّ لَهُمْ .

৮. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ جَمْعًا وَمُفْرَدًا وَعَهْدِهِمْ اَوْ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ صَلٰوةٍ وَغَيْرِهَا رٰعُوْنَ . حَافِظُوْنَ .

৯. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ جَمْعًا وَمُفْرَدًا يُحَافِظُوْنَ . يُقِيْمُوْنَهَا فِيْ اَوْقَاتِهَا .

অনুবাদ :

১. অবশ্যই قَدْ টা تَحْقِيْق তথা দৃঢ়তাসূচক, সফলকাম হয়েছে কৃতকার্য হয়েছে মুমিন গণ্য।

২. যারা নিজেদের সালাতে বিনম্র বিনয়ী।

৩. যারা অসার ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তা ইত্যাদি হতে বিরত থাকে।

৪. যারা জাকাত দানে সক্রিয় আদায়কারী।

৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে হারাম থেকে।

৬. তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না তাদের সাথে যৌন মিলনে।

৭. এবং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে অর্থাৎ স্ত্রী ও বাঁদি ছাড়া যেমন– হস্তমৈথুন তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী অর্থাৎ যা তাদের জন্য বৈধ নয় তার সীমাতিক্রমকারী।

৮. যারা নিজেদের আমানত এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় উভয়রূপেই পঠিত। ও প্রতিশ্রুতি যা তাদের পরস্পর ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার নামাজ ইত্যাদি হতে রক্ষা করে সংরক্ষক।

৯. যারা নিজেদের সালাতে থাকে এ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপে পঠিত। যত্নবান অর্থাৎ যথাসময়েই তা কায়েম করে।

١٠. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ - لَا غَيْرُهُمْ -

١١. الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُوَ جَنَّةُ أَعْلَى الْجِنَانِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - فِيْ ذٰلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمَعَادِ وَ يُنَاسِبُهُ ذِكْرُ الْمَبْدَإِ بَعْدَهُ -

١٢. وَ اللّٰهِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اٰدَمَ مِنْ سُلٰلَةٍ هِيَ مِنْ سَلَلْتُ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ أَيْ إِسْتَخْرَجْتُهُ مِنْهُ وَهُوَ خُلَاصَتُهُ مِّنْ طِيْنٍ ج مُتَعَلِّقٌ بِسُلَالَةٍ -

١٣. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ أَيِ الْإِنْسَانَ نَسْلَ اٰدَمَ نُطْفَةً مَنِيًّا فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ - هُوَ الرَّحْمُ -

١٤. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً دَمًا جَامِدًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً لَحْمَةً قَدْرَ مَا يُمْضَغُ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ق وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَظْمًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَخَلَقْنَا فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ بِمَعْنٰى صَيَّرْنَا ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ أَيِ الْمُقَدِّرِيْنَ وَمُمَيِّزُ أَحْسَنَ مَحْذُوْفٌ لِلْعِلْمِ بِهِ أَيْ خَلْقًا -

١٥. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ -

١٦. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ - لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ -

অনুবাদ :

১০. এরাই হবে অধিকারী তাদের ছাড়া অন্যরা নয়।

১১. অধিকারী হবে ফেরদাউসের আর ফেরদাউস হলো সর্বোৎকৃষ্ট জান্নাত। যাতে তারা স্থায়ী হবে। এর দ্বারা পরিণামের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং এর পরে শুরুর অবস্থা বর্ণনা করাটা যথাযথ।

১২. আমার সত্তার শপথ! আমি তো মানুষকে আদমকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। سُلَالَةٍ শব্দটি سَلَلْتُ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ অর্থাৎ আমি এক বস্তু থেকে অপর বস্তু বের করেছি। আর তা হলো তার সারনির্যাস বা মূল উপাদান। مِنْ طِيْنٍ এটা سُلَالَةٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

১৩. অতঃপর আমি তাকে মানুষকে হযরত আদম (আ.)-এর বংশকে স্থাপন করি শুক্রবিন্দুরূপে বীর্যরূপে এক নিরাপদ আধারে। আর তা হলো জরায়ু/গর্ভাশয়।

১৪. পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি পিণ্ডে। চিবানোর পরিমাণ মাংসপিণ্ডে। এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে। অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা এক কেরাতে عِظَامًا -এর পরিবর্তে উভয় স্থানে عَظْمًا এসেছে। আর উপরের তিন স্থানেই خَلَقْنَا শব্দটি صَيَّرْنَا [আমি পরিণত করেছি] অর্থে হয়েছে। অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান অর্থাৎ সর্বোত্তম ক্ষমতা প্রদানকারী। আর أَحْسَنُ -এর تَمْيِيْز হলো خَلْقًا এটা অধিক জ্ঞাত হওয়ার কারণে উহ্য রয়েছে।

১৫. এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।

১৬. অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। হিসাব নিকাশ ও প্রতিদানের জন্য।

অনুবাদ :

١٧. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ج اَىْ سَمٰوٰتٍ جَمْعُ طَرِيْقَةٍ لِاَنَّهَا طُرُقُ الْمَلَائِكَةِ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ تَحْتَهَا غٰفِلِيْنَ ـ اَنْ تَسْقُطَ عَلَيْهِمْ فَتُهْلِكَهُمْ بَلْ نُمْسِكُهَا كَاٰيَةِ يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ ـ

১৭. আমি তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর অর্থাৎ আকাশসমূহ। طَرَآئِقَ শব্দটি طُرُقٌ -এর বহুবচন। যেহেতু আকাশ ফেরেশতাগণের চলাচলের পথ এ কারণে একে طَرَائِقُ বলা হয়েছে। এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে আকাশসমূহের নিচের অসতর্ক নই যে তা তাদের উপর পতিত হয়ে তাদেরকে বিনাশ করে দিবে; বরং আমি আকাশসমূহকে সুদৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছি। যেমনটা يُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

١٨. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ مِنْ كِفَايَتِهِمْ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ق وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ م بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ـ فَيَمُوْتُوْنَ مَعَ دَوَابِّهِمْ عَطْشًا ـ

১৮. আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে তাদের প্রয়োজন অনুসারে। অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম। ফলে তারা তাদের পশুসহ তৃষ্ণাকাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করবে।

١٩. فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ هُمَا اَكْثَرُ فَوَاكِهِ الْعَرَبِ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ صَيْفًا وَشِتَاءً ـ

১৯. অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। এ দু'টি হলো আরবের অধিক উৎপাদনশীল ফল। এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর তা হতে তোমরা আহার করে থাকো গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে।

٢٠. وَ اَنْشَاْنَا شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ جَبَلٌ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا مَنْعُ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ لِلْبُقْعَةِ تَنْبُتُ مِنَ الرُّبَاعِىِّ وَالثُّلَاثِىِّ بِالدُّهْنِ اَلْبَاءُ زَائِدَةٌ عَلَى الْاَوَّلِ وَمُعَدِّيَةٌ عَلَى الثَّانِىْ وَهِىَ شَجَرَةُ الزَّيْتُوْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ـ عَطْفٌ عَلَى الدُّهْنِ اَىْ اِدَامٌ يُصْبَغُ اللُّقْمَةُ بِغَمْسِهَا فِيْهِ وَهُوَ الزَّيْتُ ـ

২০. এবং আমি সৃষ্টি করি বৃক্ষ যা জন্মায় সিন্নাই পর্বতে سَيْنَاءَ শব্দটি سِيْن বর্ণে যবর ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। এতে عَلَمِيَّتْ থাকায় এবং এটা بُقْعَةٌ -এর অর্থে হওয়ায় তাতে تَانِيْث পাওয়া যাওয়ার কারণে এটা غَيْر مُنْصَرِف হয়েছে। এতে উৎপন্ন হয় এ শব্দটি ثُلَاثِىْ এবং رُبَاعِىْ উভয় থেকেই হতে পারে অর্থাৎ, نَبَتَ ও اَنْبَتَ দুটি থেকে হতে পারে। তৈল প্রথম ক্ষেত্রে تَنْبُتُ টা اَنْبَتَ হতে নিষ্পন্ন হলে بِالدُّهْنِ -এর ب টি অতিরিক্ত হবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তথা نَبَتَ থেকে নিষ্পন্ন হলে بِالدُّهْنِ -এর ب টি تَعْدِيَه -এর জন্য হবে আর তা হলো যায়তুন বৃক্ষ। এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন। এটা بِالدُّهْنِ -এর উপর عَطْف হয়েছে অর্থাৎ তরকারি যার মধ্যে খাদ্যগ্রাস ডুবালে তা রঙিন হয়ে যায়, আর তা হলো তৈল।

অনুবাদ :

٢١. وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَعِبْرَةً ط عِظَةً تَعْتَبِرُوْنَ بِهَا نُسْقِيْكُمْ بِفَتْحِ النُّوْنِ وَضَمِّهَا مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا اَىِ اللَّبَنَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ مِنَ الْاَصْوَافِ وَالْاَوْبَارِ وَالْاَشْعَارِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ .

২১. তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে উট, গরু, বকরিতে শিক্ষাণীয় বিষয় উপদেশ যা দ্বারা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। তোমাদেরকে আমি পান করাই نُسْقِيْكُمْ শব্দটির نُوْن বর্ণে যবর ও পেশ উভয়ই হতে পারে। তাদের উদরে যা আছে তা হতে অর্থাৎ দুধ হতে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা তার পশম, উল, চুল ইত্যাদি হতে। তোমরা তা হতে আহার কর।

٢٢. وَعَلَيْهَا اَىِ الْاِبِلِ وَعَلَى الْفُلْكِ اَىِ السُّفُنِ تُحْمَلُوْنَ .

২২. তোমরা তাতে অর্থাৎ উটে এবং নৌযানে নৌকায় জাহাজে আরোহণও করে থাক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَدْ : قَدْ অব্যয়টি تَحْقِيْق তথা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক। অর্থাৎ مَاضِىْ -এর পূর্বে প্রবিষ্ট হলে তা উক্ত ক্রিয়া সংঘটিত হওয়াকে জোরদার করে। এ কারণেই তা অতীতকালকে বর্তমানের নিকটবর্তী করে দেয় এবং আশান্বিত বিষয়কে সাব্যস্ত বা বাস্তবায়িত হওয়া বুঝায়। মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের আশাবাদী ছিল এ কারণে তাদের সুসংবাদকে قَدْ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর তাদের সে সুসংবাদের বাস্তবায়ন যেহেতু অবশ্যসম্ভাবী এ কারণে مَاضِىْ -এর সীগাহ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفْلَحَ : এটা فَلَاحٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অভিধানে এর অর্থ হলো উদ্দেশ্যে সফল হওয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়া। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো فَلَا بَقَاءَ فِى الْخَيْرِ তথা কল্যাণ ও মঙ্গলমতে থাকা।

قَوْلُهُ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ : زكوة শব্দটি তার ধাতুগত অর্থে তথা জাকাত আদায় করা এবং জাকাতের মালকে বলা হয়। এখানে مَعْنٰى مَصْدَرِىْ তথা ধাতুগত অর্থ উদ্দেশ্য। কারণ ফায়েল হয় مَعْنٰى حَدَثِىْ বা ধাতুগত অর্থের ; مَحَلّ فِعْل বা ক্রিয়া সংঘটিত স্থানের নয়। অর্থাৎ সে সকল মানুষ সফলতা লাভ করে যারা জাকাত আদায় করে।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, জাকাত আদায় সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ শব্দ যেমন يُؤْتُوْنَ، اِيْتَاءٌ বা اٰتُوْا না বলে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বললেন কেন?

উত্তর : এর উত্তর এই যে, আরবে এ ধরনের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। উমাইয়া ইবনে সলত -এর উক্তি রয়েছে যে–

اَلْمُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ فِى السَّنَةِ اللَّازِمَةِ وَالْفَاعِلُوْنَ لِلزَّكٰوةِ (رُوْحُ الْبَيَانِ)

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এর দ্বারা আয়াতের শেষাংশের ছন্দ বা গতি ঠিক রাখা উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন, এখানে মূল জাকাতও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এ সময় মুযাফ উহ্য মানতে হবে। অর্থাৎ– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِتَادِيَةِ الزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ : এ আয়াতের দ্বারা মুতা বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। اَخْرَجَ ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ قَالَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ عَادٍ

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ الْقُرْاٰنُ، ثُمَّ قَرَاَ الْاٰيَةَ قَالَتْ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذَالِكَ غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللّٰهُ اَوْ مَلَكَهُ يَمِيْنُهُ فَقَدْ عَدَا ـ

قَوْلُهُ اَىْ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَلٰى অব্যয়টি مِنْ অর্থে।

قَوْلُهُ اَوْ مَا مَلَكَتْ : এখানে مَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কৃতদাসী। مَنْ -এর স্থলে مَا ব্যবহারের উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, মহিলারা হলো نَاقِصَاتُ الْعَقْلِ তথা কম বুদ্ধিসম্পন্না বিশেষত কৃতদাসী হলে তো কোনো কথাই নেই এ ক্ষেত্রে তারা বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্যের দরুন مَا ব্যবহৃত হয়েছে। مَا مَلَكَتْ শব্দটি যদিও ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করে গোলাম ও বাঁদি উভয়কে শামিল করে তবে এখানে শুধু দাসী-বাঁদি উদ্দেশ্য। কেননা মহিলা মনিবদের জন্য তাদের কৃতদাসদের সাথে সহবাস করা জায়েজ নয়। غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ দ্বারা এখানে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এটাকেই মূল লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া কোনো প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়। তবে মানুষের মানবিক চাহিদা নিবারণার্থেই কেবল তাকে বৈধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَالْاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ : ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট হস্তমৈথুন হারাম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর মতে তিনটি শর্তসাপেক্ষে তা জায়েজ। যথা– ১. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ২. বিবাহের মোহর আদায় করা বিংবা দাসী ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকলে এবং ৩. নিজ হস্ত দ্বারা হস্তমৈথুন করলে অন্য কারো হস্তের দ্বারা নয়। –[জালালাইনের প্রান্তটিকা]

قَوْلُهُ سَرَارِىْ : শব্দটি سُرِّيَّةٌ -এর বহুবচন, অর্থ হলো দাসী, বাঁদি। শব্দটি سِرٌّ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো সহবাস করা বা গোপন করা। কেননা অনেক সময় মানুষ ক্রীতদাসের সাথে সহবাস করাকে নিজ স্বাধীন স্ত্রী থেকে গোপন রাখাতে চায়, এ কারণেই একে سُرِّيَّةٌ বলা হয়। অথবা, এটা سُرُوْرٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো সন্তুষ্টি, আনন্দ। যেহেতু মনিব ক্রীতদাসীর সাথে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে, এ কারণেই তাকে سُرِّيَّةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ : এটা اِسْتِثْنَاء -এর আলামত।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ لَا غَيْرُهُمْ : এখানে لَاغَيْرُهُمْ এ বৃদ্ধির দ্বারা বাক্যের আগে পরের অংশ থেকে যে সীমাবদ্ধতা প্রতিভাত হয়, স্পষ্ট করা উদ্দেশ্য। কোনো বাক্য যখন তার পূর্বাপরের অংশ দ্বারা কারো পরিচয় প্রকাশ করে যেমন– উল্লিখিত বাক্যে ঘটেছে তখন তা দ্বারা সীমাবদ্ধতা বুঝা যায়। উপরন্তু উভয় অংশে هُمْ ضَمِيْر -ও সীমাদ্ধতা বা حَصْر বুঝায়। এখানে حَصْر দ্বারা حَصْر اِضَافِىْ তথা তুলনামূলক সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য। حَقِيْقِىْ তথা প্রকৃত সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও যেমন শিশু, পাগল ইত্যাদি লোকও বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি حَصْر حَقِيْقِىْ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জান্নাতুল ফেরদাউস -এর দিক দিয়ে হবে। অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউসে কেবল উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ প্রবেশ করবেন। আর অন্যান্য জান্নাতে অন্য বেহেশতী প্রবেশ করবেন।

قَوْلُهُ وَيُنَاسِبُهُ ذِكْرُ الْمَبْدَاِ بَعْدَ : এই ইবারত বৃদ্ধি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ আয়াত এবং সামনের আয়াতের মাঝে যোগসূত্র বর্ণনা করা।

قَوْلُهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ خَلَقْنَا : এখানে اَللّٰهُ শব্দ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَاوْ টি শপথের জন্য। আর لَقَدْ -এর মধ্যকার لَامْ টি جَوَاب قَسَم -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ جَعَلْنَاهُ اَىِ الْاِنْسَانَ نَسْلَ اٰدَمَ : এখানে ه যমীরটি পূর্বে উল্লিখিত اِنْسَانْ -এর প্রতি ফিরেছে, তবে এর দ্বারা আদম জাতি উদ্দেশ্য। আর اِنْسَانْ দ্বারা আদম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে বাক্যে صَنْعَت اِسْتِخْدَامْ ঘটেছে। আর صَنْعَت اِسْتِخْدَامْ বলা হয় مَرْجِعْ দ্বারা এক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া এবং তার যমীর দ্বারা অন্য অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়াকে।

قَوْلُهُ وَاَنْشَأْنَا شَجَرَةً : এখানে اَنْشَأْنَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, شَجَرَةً -এর আতফ হলো جَنّٰتٍ -এর উপর।

قَوْلُهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ اَىِ الْمُقَدِّرِيْنَ : এখানে اَلْمُقَدِّرِيْنَ-এর বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, এ সন্দেহ দূর করা যে, اِسْم تَفْضِيْل পরস্পর অংশীদারিত্ব চায়। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। সুতরাং এ শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তর দিচ্ছেন যে, خَلْق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার আকৃতি বা দেহ অবয়ব গঠন করা নতুনভাবে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهٖ : যেহেতু خَالِقِيْنَ শব্দটি خَلْقًا তথা সৃষ্টি করার দিক দিয়ে এ অর্থ প্রকাশ করছে, এ কারণে تَمْيِيْز-কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ : এখানে فَوْقَ দ্বারা সাধারণভাবে উপর উদ্দেশ্য। মানুষের মাথার উপর হওয়া উদ্দেশ্য নয়, কেননা যে সময় আসমানসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তখন মানুষ বিদ্যমান ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরার প্রারম্ভে মুমিনগণের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল মুমিনুন। মুমিনগণের যে বৈশিষ্ট্য এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, মূলত এ সবই হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন সূরা মুমিনুন মক্কায় নাজিল হয়েছে।

নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি ওহী নাজিল হতো, তখন মধু মক্ষিকার আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শ্রুত হতো। একবার এমন অবস্থাই হলো। কিছুক্ষণ পর যখন ওহী নাজিল হলো, তখন প্রিয়নবী ﷺ কেবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে এ দোয়া করলেন।

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْنَا وَارْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে অধিকতর পরিমাণে দাও, আমাদেরকে কম দিয়ো না, আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না, আমাদেরকে নিয়ামত দান কর, বঞ্চিত করো না, অন্যদের উপর আমাদের পছন্দ কর, আমাদের উপর অন্যদের পছন্দ করো না, আমাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক, আর আমাদেরকে খুশি করে দাও!"

এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন "আমার প্রতি দশটি আয়াত নাজিল হয়েছে, যে এই দশটি আয়াতে বর্ণিত গুণাবলি অর্জন করলো সে জান্নাতী হয়ে গেল।" এরপর তিনি এই সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ১]

ইমাম বুখারী (র.) আদাবুল মুফরাদে, এবং ইমাম নাসায়ী, ইবনুল মুনজের, হাকেম, ইবনে মরদবিয়া, বায়হাকী (র.) প্রমুখ ইয়াজিদ ইবনে বাবনুসের বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মহান পূতঃপবিত্র চরিত্র মাধুর্যের বর্ণনা দিন! তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো কুরআনে কারীম। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পাঠ কর? এরপর তিনি এ সূরার প্রথম দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, এ ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর চরিত্র মাধুর্যের বৈশিষ্ট্য।

ইবনে জারীর তাবারী (র.) লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (র.) হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা শুধু তিনটি বস্তু স্বীয় হস্ত মোবারকে সৃষ্টি করেছেন। যথা- ১. আদম (আ.)-কে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। ২. তাওরাত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। ৩. জান্নাতে আদন । এরপর জান্নাতকে বলেছেন, তুমি কথা বল, জান্নাত তখন এই সূরার প্রথম আয়াতসমূহ পাঠ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে এ বর্ণনার আংশিক উল্লেখ করেছেন।"

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে নেক আমল করার নির্দেশ ছিল। ইরশাদ হয়েছে- وَافْعَلُوا الْخَيْرَ; এর শুভ পরিণতি স্বরূপ সাফল্য লাভের সুসংবাদ ছিল। ইরশাদ হয়েছে- لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ হয়তো তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হবে। আর এ আয়াতের শুরুতেই সেই ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, যারা জীবন সংগ্রামে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ৬০]

قَوْلُهُ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ : শানে নুযূল : হাকেম (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ নামাজের অবস্থায় কখনও আসমানের দিকে দেখতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী ﷺ আর নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকাননি।

ইবনে মরদবিয়ার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে এদিক সেদিক তাকাতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এরপর থেকে তাঁরা সিজদার স্থানে নজর করতেন।

ইবনে আবি হাতেম ইবনে সীরীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম নামাজের অবস্থায় আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখতেন, তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৬১]

قَوْلُهُ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - সাফল্য কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় : فَلَاحٌ [সাফল্য] শব্দটি কুরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আজান ও ইকামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাফল্যের দিকে আহবান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া। -[কামূস] এই শব্দটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। কোনো মানুষ এর চাইতে বেশি কোনো কিছু কামনাই করতে পারে না। বলা বাহুল্য, একটি মনোবাঞ্ছাও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা, এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করা জায়েজ কোনো মহত্তম ব্যক্তিরও আয়ত্তাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও পয়গাম্বর হোক, জগতে অবাঞ্ছিত কোনো কিছুর সম্মুখীন না হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারো জন্য সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নিয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের আশংকা এবং যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোনো বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জান্নাত। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা সর্বক্ষণ ও বিনা প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে। وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ অর্থাৎ তারা যা চাইবে, তাই পাবে। সেখানে কোনো সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই এ কথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন। এ আয়াতে আরো ইঙ্গিত আছে যে, বিশ্বজগতে প্রত্যেকে কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হবে। তাই জান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের দুঃখ দূর হলো। কুরআন পাক সূরা আ'লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র দিতে গিয়ে বলেছে- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ নিজেকে পাপকর্ম থেকে পবিত্র রাখা। এর সাথে সাথে আরো ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে সাফল্য কামনা করে তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়। বলা হয়েছে- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াকেই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক অথচ পরকাল উত্তম ও স্থায়ী; কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র জান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে দুনিয়াতে এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করা এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দান করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সেসব মুমিনকে সাফল্য দান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত মুমিনগণ পরকালে পূর্ণাঙ্গ সাফল্য পাওয়ার কথা তো বোধগম্য; কিন্তু দুনিয়াতে সাফল্য বাহ্যত কাফের ও পাপাচারীদেরই হাতের মুঠোয়। প্রত্যেক যুগের পয়গাম্বরগণ এবং তাঁদের পর সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাধারণত কষ্ট ভোগ করে গেছেন। এর কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট। আর তা হলো– দুনিয়াতে পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের ওয়াদা করা হয়নি যে, কোনোরূপ কষ্টের সম্মুখীন হবে না; বরং এখানে কিছু না কিছু কষ্ট প্রত্যেক পরহেজগার সৎ কর্মপরয়াণ ব্যক্তিকেও ভোগ করতে হয় এবং প্রত্যেক কাফের ও পাপাচারীদেরকেও ভোগ করতে হয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থা তা-ই; অর্থাৎ মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু লক্ষ্য অর্জিত হয়ই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাকে সাফল্য অর্জনকারী বলা হবে? অতএব পরিণামের উপরই এটা নির্ভরশীল।

দুনিয়ার অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, যেসব সজ্জন উল্লিখিত সাতটি গুণে গুণান্বিত, দুনিয়াতে তারা সাময়িকভাবে কষ্টের সম্মুখীন হলেও পরিণামে তাদের কষ্ট দ্রুত দূর হয়ে যায় এবং মনোবাঞ্ছা অর্জিত হয়। বিশ্ববাসী তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় এবং তারা মরেও অমর হয়ে যায়। ন্যায়ের দৃষ্টিতে দুনিয়ার অবস্থা যতই পর্যালোচনা করা হবে, প্রতি যুগে ও প্রতি ভূখণ্ডে ততই এর পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ : সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা রেখে এখানে অপরাপর সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত গুণগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

প্রথম গুণ– নামাজে 'খুশূ' তথা বিনয়-নম্র হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ 'খুশূ'র আভিধানিক অর্থ– স্থিরতা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকা। অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না করা। –[বয়ানুল কুরআন] বিশেষত এমন নড়াচড়া, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে নিষিদ্ধ করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া 'নামাজের মাকরূহসমূহ' শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে খুশূর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য মনীষী থেকে খুশূর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে, সেগুলো মূলত অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ। উদাহরণত হযরত মুজাহিদ বলেন, দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার নাম খুশূ। হযরত আলী (রা.) বলেন, ডানে বামে ভ্রুক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা খুশূ। হযরত আতা (র.) বলেন, দেহের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা খুশূ। হাদীসে হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নামাজের সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ না নামাজি অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে। যখন সে অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। –[আহমদ, নাসায়ী আবূ দাউদ, মাযহারী] নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে নির্দেশ দেন, সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ এবং ডানে বামে ভ্রুক্ষেপ করো না। –[বায়হাকী, মাযহারী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাজে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন– لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هٰذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهٗ অর্থাৎ এই ব্যক্তির অন্তরে খুশূ থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও স্থিরতা থাকত। –[মাযহারী]

নামাজে খুশূর প্রয়োজনীয়তার স্তর : ইমাম গাযালী, কুরতুবী এবং অন্য আরো কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজে খুশূ ফরজ। সম্পূর্ণ নামাজে খুশূ ব্যতীত সম্পন্ন হলে নামাজই হবে না। অন্যেরা বলেছেন, খুশূ নিঃসন্দেহে নামাজের প্রাণ। খুশূ ব্যতীত নামাজ নিষ্প্রাণ ; কিন্তু একে নামাজের রোকন মনে করে এ কথা বলা যায় না যে, খুশূ না হলে নামাজই হয় না এবং পুনর্বার পড়া ফরজ।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুশূ অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ নয় ; কিন্তু নামাজ কবুল হওয়া এর উপর নির্ভরশীল এবং এই পর্যায়ে খুশূ ফরজ। তাবারানী (র.) 'মু'জামে কবীরে' হযরত আবুদদারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সর্বপ্রথম যে বিষয় উম্মত থেকে অন্তর্হিত হবে, তা হচ্ছে খুশূ। শেষ পর্যন্ত লোকদের মধ্যে কোনো খুশূ বিশিষ্ট ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে না। –[বয়ানুল কুরআন]

দ্বিতীয় গুণ– অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ; এখানে لَغْو -এর অর্থ অনর্থক কথা অথবা কাজ, যাতে কোনো ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তর গুনাহ, যাতে ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসার্হ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ, 'মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে।' এ কারণেই আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ– জাকাত আদায়কারী হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ; زَكٰوة -এর আভিধানিক অর্থ– পবিত্র করা। পরিভাষায় মোট অর্থ সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে জাকাত বলা হয়। কুরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণত এই পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ নয়। কারণ মক্কায় জাকাত ফরজ হয়নি, মদীনায় হিজরতের পর ফরজ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জবাব এই যে, জাকাত মক্কাতেই ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে সবাই একমত। এই সূরায়ও أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এর সাথে وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি পর্যায়ে জাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং 'নিসাব' ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়। যারা জাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলির মধ্যে গণ্য করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও তা-ই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরপরই জাকাতের আদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তারা এ স্থানে জাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ পবিত্র করে নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, সাধারণত কুরআন পাকে যেখানে ফরজ জাকাতের উল্লেখ করা হয়, সেখানে إِيْتَاء - الزَّكٰوةَ ও يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ أَتُوا الزَّكٰوةَ ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ বলাই ইঙ্গিত করে যে, এখানে পরিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এছাড়া فَاعِلُوْنَ শব্দটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে فِعْل [কাজ]-এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক জাকাত فِعْل নয়; বরং অর্থকড়ির একটা অংশ فَاعِلُوْنَ শব্দ দ্বারা এই অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই। মোটকথা, আয়াতে জাকাতের পরিভাষিক অর্থ নেওয়া হলে জাকাত যে মু'মিনের জন্য অপরিহার্য ফরজ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে জাকাতের অর্থ আত্মশুদ্ধি নেওয়া হলে তাও ফরজই। কেননা শিরক, রিয়া, অহঙ্কার, হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গুনাহ। নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরজ।

চতুর্থ গুণ– যৌনাঙ্গকে হারাম থেকে সংযত রাখা : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلَّا عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ যারা স্ত্রী ও শরিয়ত সম্মত দাসীদের ছাড়া সব পরনারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণির সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারো সাথে কোনো অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ অথাৎ যারা শরিয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমায় রাখতে হবে; এটাকে জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এরূপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ : অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরিয়তসম্মত দাসীর সাথে শরিয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোনো পথ হালাল নয়। যেমন জেনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায়ও জেনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোনো পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এগুলো সব নিষিদ্ধও হারাম। অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের মতে إِسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ অর্থাৎ হস্তমৈথুনও এর অন্তর্ভুক্ত।

–[বয়ানুল কুরআন, কুরতুবী, বাহরে মুহীত]

পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুণ– আমানত প্রত্যর্পণ করা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা : ইরশাদ হচ্ছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ 'আমানত' শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোনো ব্যক্তি বহন করে এবং সে

বিষয়ে কোনো ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকূকুল ইবাদত তথা বান্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরিয়ত আরোপিত সকল ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা। বান্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে, অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত। অর্থাৎ কেউ কারো কাছে টাকা পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত। প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোনো গোপন কথা কারো কাছে বললে তাও তার আমানত। শরিয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্য পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরি ও চাকরির জন্য নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরিউক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

অঙ্গীকার বলতে প্রথমত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝানো যা কোনো ব্যাপারে উভয় পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ চুক্তি পূর্ণ করা ফরজ এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়। অর্থাৎ একতরফাভাবে একজন অন্যজনকে কিছু দেওয়ার অথবা অন্যজনের কোনো কাজ করে দেওয়ার ওয়াদা করা এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরিয়তের আইনে জরুরি ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে- اَلْعِدَةُ دَيْنٌ অর্থাৎ ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গুনাহ। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে; কিন্তু একতরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতীত এর খেলাফ করা গুনাহ।

সপ্তম গুণ- নামাজে যত্নবান হওয়া : ইরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ নামাজে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাজের পাবন্দি করা এবং প্রত্যেক নামাজ মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করা। -[রূহুল মা'আনী] এখানে صَلٰوة শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ এখানে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াক্তে পাবন্দি সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সেখানে নামাজে বিনয়-নম্র হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে صَلٰوة শব্দটির একবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ ফরজ হোক অথবা ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা নফল হোক নামাজ মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নম্র হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বান্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামিল মু'মিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের হকদার।

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, এ সাতটি গুণ শুরুও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামাজ দ্বারা। এতে ইঙ্গিত আছে যে, নামাজকে নামাজের মতো পাবন্দি ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা আপনি নামাজির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

قَوْلُهُ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ـ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ : উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায় আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাতে প্রবেশও সুনিশ্চিত। قَدْ اَفْلَحَ বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলি পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্যে আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জীবন-সংগ্রামে সফলকাম, ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মানবজাতির সৃষ্টির

ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে, আর অবশেষে কি হবে তার পরিণতি? এর বিবরণ আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে ও বলা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জীবন সাধনায় সফলকাম মুমিনদের জন্যে পরকালীন জিন্দেগীতে জান্নাতুল ফেরদৌস লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে; কিন্তু যারা পরকালীন জিন্দেগীতেই বিশ্বাস করে না, তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের কথা প্রমাণিত হয় এবং কিয়ামতের দিন মানবজাতির পুনরুত্থানের দলিল প্রমাণ প্রকাশিত হয়। আর মানুষ তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয় এবং মানুষকে তার জীবনের শুরু এবং শেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এভাবে তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে, আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে তার জন্য সম্বল সংগ্রহে সচেষ্ট হতে পারে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর বন্দেগীর আদেশ দিয়েছেন। আর একথাও ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাকের বন্দেগীর উপরই মানবজাতির জীবন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করে।

আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রতিটি মানুষ আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করতে পারে। -[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৬৪]

ইমাম রাযী (র.) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতসমূহের সম্পর্কের বিবরণ এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের ইবাদতের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের মারেফত হাসিল করা ব্যতীত তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা সম্ভব হয় না। মূলত এ কারণেই আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক কিভাবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার এক বিস্ময়কর ধারাবাহিক বিবরণ স্থান পেয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মানুষ আজ যত ক্ষমতা এবং যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন সে যেন এই সত্য ভুলে না যায় যে, সে মাটির মানুষ, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। আর আদম সন্তানদের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে মাটির উপাদানই। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ -

অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ : سُلَالَةٌ অর্থ সারাংশ এবং طِيْن অর্থ আদ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুক্র অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলে এ কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সূক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক তাফসীরবিদ আয়াতের এ তাফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা শুক্র সুখাদ্য থেকে উৎপন্ন হয় এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

মানবসৃষ্টির সপ্তস্তর : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর- سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ মৃত্তিকার সারাংশ, দ্বিতীয় স্তর- বীর্য, তৃতীয় স্তর- জমাট রক্ত, চতুর্থ স্তর- মাংসপিণ্ড, পঞ্চম স্তর- অস্থি-পঞ্জর, ষষ্ঠ স্তর- অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম স্তর- সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চারকরণ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তাফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই 'শবে কদর' নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার সমবেত সাহাবীগণকে প্রশ্ন করলেন, রমজানের কোন তারিখ শবে কদর? সবাই উত্তরে 'আল্লাহ তা'আলাই জানেন' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন। তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে কদর রমজানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে বললেন, এই বালকের মাথার চুলও এখন

পর্যন্ত পুরাপুরি গজায়নি অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবী শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত আছে–

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ; এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ أَبٌ জন্তুদের খাদ্য।

এটি কুরআন পাকের ভাষালঙ্কার যে, মানব সৃষ্টির সাতটি স্তরকে একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করেনি; বরং কোথাও এক স্তর থেকে অন্যস্তর বিবর্তনকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কিছু বিলম্বে হওয়া বোঝায় এবং কোথাও فَ অব্যায় দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা অবিলম্বে হওয়া বোঝায়। এতে সেই কর্মের প্রতি ইঙ্গিত আছে, যা দুই বিবর্তনের মাঝখানে স্বভাবত হয়ে থাকে। কোনো কোনো বিবর্তন মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হয়। সেমতে কুরআন পাক প্রাথমিক তিন স্তরকে ثُمَّ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে প্রথম মাটির সারাংশ এরপর একে বীর্যে পরিণত করা। এখানে ثُمَّ ব্যবহার করে ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً বলেছেন। কেননা মাটি থেকে খাদ্য সৃষ্টি হওয়া, এরপর তা দেহের অংশ হওয়া, অতঃপর তা বীর্যের আকার ধারণ করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে খুবই সময়সাপেক্ষ। এমনিভাবে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বীর্যের জমাট রক্তে পরিণত হওয়াও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। একেও ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর জমাট রক্তের মাংসপিণ্ড হওয়া, মাংসপিণ্ডের অস্থি হওয়া এবং অস্থির উপর মাংসের প্রলেপ হওয়া– এই তিনটি স্তর অল্প সময়ে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। তাই এগুলোতে فَ অব্যয় দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহ সঞ্চার ও জীবন সৃষ্টির কথা সর্বশেষে ثُمَّ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কেননা একটি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থে রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা মানববুদ্ধির দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় চায়।

মোটকথা, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে বিবর্তনের যে যে ক্ষেত্রে মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষে কাজ ছিল সেখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং যেখানে সাধারণ মানব বুদ্ধির দৃষ্টিতে সময়সাপেক্ষ ছিল না, সেখানে فَ অব্যয় প্রয়োগ করে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে সেই হাদীস দ্বারা আর সন্দেহ হতে পারে না, যাতে বলা হয়েছে যে, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌছায় চল্লিশ দিন করে ব্যয় হয়। কারণ এটা মানুষের ধারণাতীত আল্লাহর কুদরতের কাজ।

মানবসৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা : পবিত্র কুরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে– ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ অর্থাৎ, আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। 'এক বিশেষ ধরনের' বলার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর অন্য জগত অর্থাৎ রূহ জগত তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ : এখানে خَلْقًا آخَرَ-এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরামা, যাহহাক ও আবুল আলিয়া (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ 'রূহ সঞ্চার দ্বারা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, সম্ভবত এই রূহ বলে জৈব রূহ বোঝানো হয়েছে। কারণ এটাও বস্তুবাচক ও সুক্ষ্ম দেহ বিশেষ, যা জৈবদেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলে। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে ثُمَّ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। 'আলমে আরওয়াহ' তথা রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্কে সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনাদিকালে আল্লাহ তা'আলা এসব রূহকে সমবেত করে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলেছেন। উত্তরে সবাই সমস্বরে بَلٰى বলে আল্লাহর প্রতিপালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পর স্থাপিত হয়। এখানে 'রূহ সঞ্চার' দ্বারা যদি জৈব রূহের প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃত পক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

قَوْلُهُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ : خَلْق ও تَخْلِيْق-এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোনো সাবেক নমুনা ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহর তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خَالِقٌ [স্রষ্টা] একমাত্র আল্লাহ

তা'আলাই। অন্য কোনো ফেরেশতা অথবা মানব কোনো সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে خَلْق ও تَخْلِيْق শব্দ করিগরির অর্থেও ব্যবহার করা হয়। করিগরির স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরি করা। এ কাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোনো মানুষকেও কোনো বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেওয়া হয়। স্বয়ং কুরআন বলেছে تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলেছে- اِنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ এসব ক্ষেত্রে خَلْق শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে خَالِقِيْنَ শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষ কারিগরির দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোনো বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهٗ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ : পূর্ববর্তী তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন দুই আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। তোমরা সবাই এ জগতে আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামতরাজির অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ : طَرَآئِقَ শব্দটি طَرِيْقَةٌ -এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেওয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طَرِيْقَةٌ -এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ সবগুলো আকাশ হচ্ছে বিধানাবলি নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

قَوْلُهٗ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِيْنَ : এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষেকে শুধু সৃষ্টি করে ছেড়ে দেইনি এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেখবরও হতে পারি না; বরং তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্য খাদ্য ও ফল-মূল দ্বারা সুখের সর াম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা হয়েছে-

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে بِقَدَرٍ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আজাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশি বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জবিন-জীবিকার জন্য বিপদ ও আজাব হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়,. যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং বর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন।

এরপর অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনের পানি যদি দৈনন্দিন বর্ষিত হয়, তাতেও মানুষ বিপদে পতিত হবে। প্রাত্যহিক বৃষ্টি তার কাজকারবার ও স্বভাবের পরিপন্থি। যদি সম্বৎসর অথবা ছয় মাস অথবা তিন মাসের প্রয়োজনের পানি এক দফায় বর্ষণ করা হয় এবং মানুষকে নিজ নিজ বরাদ্দের পানি ছয় মাসের জন্য সঞ্চিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়, তবে অধিকাংশ মানুষও এই পরিমাণ পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে না। যদি কোনোরূপে বড় চৌবাচ্চা ও গর্তে পানি জমা রাখার ব্যবস্থা করেও নেয়, তবে কয়েকদিন পর পানি পচে যাবে যাবে, যা পান করা এবং ব্যবহার করাও কঠিন হবে। তাই আল্লাহর কুদরত এর এই ব্যবস্থা করেছে যে, পানি যে সময় বর্ষিত হয়, তখন সাময়িক ভাবে বৃক্ষ ও মৃত্তিকা সিক্ত

হয়ে যায়, অতঃপর ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন পুকুর, চৌবাচ্চা ও প্রাকৃতিক গর্তে এই পানি জমা থাকে। প্রয়োজনের সময় মানুষ ও জীবজন্তু তা ব্যবহার করে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই পানিতে বেশি দিন চলে না। তাই প্রত্যেক ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরকে প্রত্যহ তাজা পানি পৌঁছানোর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, পানির একটা বিরাট অংশকে বরফে পরিণত কবে পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ধূলিবালি এমন কি মানুষ ও জীবজন্তু পৌঁছতে পারে না। সেখানে পচে যাওয়া, নাপাক হওয়া এবং অব্যবহারযোগ্য হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই। এরপর এই বরফের পানি চুয়ে চুয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরা বয়ে মাটির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই প্রাকৃতিক ধারা মাটির কোণে কোণে পৌঁছে যায়। সেখান থেকে কিছু পানি নদীনালা ও নহরের আকারে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে পারে এবং কোটি কোটি মানুষ ও জন্তু জানোয়ারকে সিক্ত করে। অবশিষ্ট বরফ গলা পানি মাটির গভীর স্তরে নেমে গিয়ে ফল্গুধারার আকারে প্রবাহিত হতে থাকে। কূপ খনন করে এই পানি সর্বত্রই উত্তোলন করা যায়। কুরআন পাকের এই আয়াতে এই গোটা ব্যবস্থাকে একটি মাত্র বাক্যে অর্থাৎ- وَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ আয়াতাংশে ব্যক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাটির স্তর থেকে যে পানি কূপের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়, তাও অনেক বেশি গভীরে নয়; বরং অল্প গভীরে রেখেই সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা পানির স্বভাবিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মাটির গভীরতর অংশে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়াও সম্ভবপর ছিল। আয়াতের শেষে وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ বাক্যে এই বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর আরবের মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছু সংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ : এ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এসব বাগান তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোনো কোনো ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ বাক্যের মর্মার্থ তা-ই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। যয়তুনের বৃক্ষ তূর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে- وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاۤءَ ; সায়না ও সিনিন সেই স্থানের নাম যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ করা ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে- تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ; যয়তুন বৃক্ষের জন্য বিশেষত তূর পর্বতের উল্লেখ করার কারণে এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রপ্রথম তূর পর্বতেই উৎপন্ন হযেছিল। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন। -[মাযহারী]

এরপর আল্লাহ তা'আলা এমন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা জানেয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার আপনার শক্তি ও অপরিসীম রহমতের কথা স্মরণ করে তাওহীদ ও ইবাদতে মশগুল হয়। বলা হয়েছে- وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً অর্থাৎ তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। অতঃপর এর কিছু বিবরণ এভাবে দেওয়া হয়েছে- نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا অর্থাৎ এসবের পেটে আমি তোমাদের জন্যপাক সাফ দুধ তৈরি করেছি, যা মানুষের উৎকৃষ্ট খাদ্য। এরপর বলা হয়েছে : শুধু দুধই নয়, এসব জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক [অগণিত] উপকারিতা রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ ; চিন্তা করলে দেখা যায়, জন্তুর দেহের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি লোম মানুষের কাজে আসে এবং এর দ্বারা মানুষের জীবন ধারণের অসংখ্য প্রকার সরঞ্জাম তৈরি হয় জন্তুর পশম, অস্থি, অন্ত্র এবং সমস্ত অংশ দ্বারা মানুষ জীবিকার কত যে সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করে, তা গণনা করাও কঠিন। এসব উপকার ছাড়া আরো একটি বড় উপকার এই যে, হালাল জন্তুর গোশতও মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ পরিশেষে জন্তু-জানোয়ারের আরো একটি মহা উপকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের পিঠে আরোহণও কর এবং মাল পরিবহনের কাজেও নিযুক্ত কর। এই শেষ উপকারে মধ্যে জন্তুর সাথে নদীতে চলাচলকারী নৌকাও শরিক আছে। মানুষ নৌকায় আরোহণ করে এবং মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। তাই এর সাথে নৌকার কথাও আলোচনা করে বলা হয়েছে- وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ; উল্লেখ্য যে, চাকার মাধ্যমে চলে এমন সব যানবাহনও নৌকারে হুকুম রাখে।

অনুবাদ :

٢٣. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ اَطِيْعُوْهُ وَوَحِّدُوْهُ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَهُوَ اِسْمُ مَا وَمَا قَبْلَهُ الْخَبَرُ وَمِنْ زَائِدَةٌ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - تَخَافُوْنَ عُقُوْبَتَهٗ بِعِبَادَتِكُمْ غَيْرَهٗ -

২৩. আমি হযরত নূহ (আ.)-কে পাঠিয়ে ছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তাঁর আনুগত্য কর এবং তার একত্ববাদের ঘোষণা প্রদান কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই। এটা (اِلٰه) হলো مَا -এর ইসম আর পূর্ববর্তী অংশ হলো খবর। এর مِنْ টি অতিরিক্ত। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তাঁকে ছাড়া অন্যের উপাসনা করার কারণে তাঁর শাস্তিকে ভয় করবে না।

٢٤. فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِاَتْبَاعِهِمْ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لا يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ يَتَشَرَّفَ عَلَيْكُمْ ط بِاَنْ يَكُوْنَ مَتْبُوْعًا وَاَنْتُمْ اَتْبَاعَهٗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ اَنْ لَّا يُعْبَدَ غَيْرُهٗ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً بِذٰلِكَ لَا بَشَرًا مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا الَّذِىْ دَعَا اِلَيْهِ نُوْحٌ مِنَ التَّوْحِيْدِ فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ - اَىِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ -

২৪. তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা কুফরি করেছিল, তারা বলল তাদের অনুগত ও অধীনস্থদেরকে এতো তোমাদের মতো একজন মানুষই তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছেন। এভাবে যে, তিনি তোমাদের নেতা হবেন আর তোমরা তার অনুসারী হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না হোক ফেরেশতাই পাঠাতেন এ বাণী নিয়ে; মানুষ নয়। আমরা তো একথা শুনিনি যে একত্ববাদের প্রতি হযরত নূহ (আ.) আহবান করছেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এরূপ ঘটেছে। অর্থাৎ বিগত উম্মত বা সম্প্রদায় থেকে।

٢٥. اِنْ هُوَ مَا نُوْحٌ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ حَالَةُ جُنُوْنٍ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ اِنْتَظِرُوْهُ حَتّٰى حِيْنٍ - اِلٰى زَمَنِ مَوْتِهٖ -

২৫. এ তো এমন ব্যক্তি হযরত নূহ (আ.) যাকে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে উন্মাদ অবস্থা সুতরাং তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

٢٦. قَالَ نُوْحٌ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَيْهِمْ بِمَا كَذَّبُوْنِ - اَىْ بِسَبَبِ تَكْذِيْبِهِمْ اِيَّاىَ بِاَنْ تُهْلِكَهُمْ -

২৬. হযরত নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন তাদের বিপক্ষে কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে অর্থাৎ আমাকে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আপনি তাদেরকে বিনাশ করে দিন!

অনুবাদ :

২৭. قَالَ تَعَالَى مُجِيْبًا دُعَاءَهُ فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ السَّفِيْنَةَ بِاَعْيُنِنَا بِمَرْأَى مِنَّا وَحِفْظِنَا وَوَحْيِنَا ـ اَمْرِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا بِاِهْلَاكِهِمْ وَفَارَ التَّنُّوْرُ لِلْخُبَّازِ بِالْمَاءِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةً لِنُوْحٍ فَاسْلُكْ فِيْهَا اَيْ اَدْخِلْ فِي السَّفِيْنَةِ مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ ذَكَرٍ وَ اُنْثٰى اَيْ مِنْ كُلِّ اَنْوَاعِهَا اثْنَيْنِ ذَكَرًا وَ اُنْثٰى وَهُوَ مَفْعُوْلٌ وَمِنْ مُتَعَلِّقَةٌ بِاسْلُكْ وَفِي الْقِصَّةِ اِنَّ اللّٰهَ حَشَرَ لِنُوْحٍ السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَغَيْرَهُمَا فَجَعَلَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ فِيْ كُلِّ نَوْعٍ فَيَقَعُ يَدُهُ الْيُمْنٰى عَلَى الذَّكَرِ وَالْيُسْرٰى عَلَى الْاُنْثٰى فَيَحْمِلُهُمَا فِي السَّفِيْنَةِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ كُلٍّ بِالتَّنْوِيْنِ فَزَوْجَيْنِ مَفْعُوْلٌ وَاثْنَيْنِ تَاكِيْدٌ لَهُ وَاَهْلَكَ اَيْ زَوْجَتَهُ وَاَوْلَادَهُ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ج بِالْاِهْلَاكِ وَهُوَ زَوْجَتُهُ وَوَلَدُهُ كِنْعَانُ بِخِلَافِ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثٍ فَحَمَلَهُمْ وَزَوْجَاتِهِمْ ثَلٰثَةً وَفِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ قِيْلَ كَانُوْا سِتَّةَ رِجَالٍ وَنِسَاؤُهُمْ وَقِيْلَ جَمِيْعُ مَنْ كَانَ فِي السَّفِيْنَةِ ثَمَانِيَةٌ وَّسَبْعُوْنَ نِصْفُهُمْ رِجَالٌ وَنِصْفُهُمْ نِسَاءٌ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا بِتَرْكِ اَهْلَاكِهِمْ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ـ

২৭. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন– অতঃপর আমি তার নিকট ওহী পাঠালাম যে, আপনি নৌযান নৌকা, জাহাজ নির্মাণ করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী আমার হিকমত ও নির্দেশ মতে। অতঃপর যখন আমার নির্দেশ আসবে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে উনুন উথলে উঠবে রান্নাকারীর চুলার পানি, আর এটা ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর জন্য তাদের ধ্বংসের নিদর্শন স্বরূপ। তখন উঠিয়ে নাও অর্থাৎ নৌকায় প্রবেশ করাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া অর্থাৎ নর ও মাদীর প্রত্যেক শ্রেণির। এটা অর্থাৎ كُلٍّ زَوْجَيْنِ হলো اُسْلُكْ ফে'ল-এর মাফউল। আর مِنْ টি اُسْلُكْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। এ ঘটনার বিবরণ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর সম্মুখে সকল প্রকার পশু পাখি ইত্যাদি জমা করে দিলেন। অতঃপর তিনি তার উভয় হাত প্রত্যেক প্রকারের উপর রাখতেন। তখন তার ডান হাত নর প্রাণীর উপর এবং বাম হাত মাদী প্রাণীর উপর পড়ত আর সাথে তিনি তা নৌকায় উঠিয়ে নিতেন। অন্য কেরাতে كُلٍّ শব্দটি তানভীনসহ রয়েছে। তখন زَوْجَيْنِ হবে মাফউল আর اِثْنَيْنِ হবে তার তাকিদ। এবং আপনার পরিবার পরিজনকে অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদিকে। তাদেরকে ছাড়া, তাদের মধ্য হতে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ধ্বংসের ব্যাপারে। আর তারা হলো তাঁর স্ত্রী ও ছেলে কেনান। হাম, সাম ও ইয়াফিছ ব্যতিরেকে। হযরন নূহ (আ.) তাদেরকে ও তাদের তিন স্ত্রীকে উঠিয়ে নিলেন। আর সূরা হূদে বর্ণিত রয়েছে যে, এবং যারা ঈমান এনেছে। আর তাঁর উপর অল্প কয়েকজনই ঈমান এনেছিল। বলা হয় যে, তারা ছিলেন ছয়জন পুরুষ ও তাদের স্ত্রীগণ, আরো কথিত রয়েছে যে, নৌযানে সর্বমোট ৭৮ জন লোক ছিল। তাদের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী। আর তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলবেন না, যারা জুলুম করেছে। সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের মুক্তির ব্যাপারে। তারা তো নিমজ্জিত হবেই।

অনুবাদ :

٢٨. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اِعْتَدَلْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰىنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ الْكَافِرِيْنَ وَاِهْلَاكِهِمْ ـ

২৮. যখন আপনি ও আপনার সঙ্গি সাথীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবেন তখন বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন, জালিম সম্প্রদায় হতে। কাফেরদের থেকে ও তাদের ধ্বংস হতে।

٢٩. وَقُلْ عِنْدَ نُزُوْلِكَ مِنَ الْفُلْكِ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِ الزَّايِ مَصْدَرٌ اَوْ اِسْمُ مَكَانٍ وَبِفَتْحِ الْمِيْمِ وَكَسْرِ الزَّايِ مَكَانُ النُّزُوْلِ مُّبٰرَكًا ذٰلِكَ الْاِنْزَالُ اَوِ الْمَكَانُ وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ مَا ذُكِرَ ـ

২৯. আপনি বলুন নৌযান হতে অবতরণের সময় হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান مُنْزَلًا শব্দটি مِيْم বর্ণে পেশ এবং زَاء বর্ণে যবর এটা মাসদার অথবা اِسْم ظَرْف مَكَانْ হবে। এবং مِيْم বর্ণে যবর ও زَاء বর্ণে যের উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ– অবতরণস্থল। যা হবে কল্যাণকর উক্ত অবতরণ বা অবতরণস্থলে। আর আপনিই তো শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। যা উল্লিখিত হলো।

٣٠. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنْ اَمْرِ نُوْحٍ وَالسَّفِيْنَةِ وَاِهْلَاكِ الْكُفَّارِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَّاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاِسْمُهَا ضَمِيْرُ الشَّاْنِ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ـ مُخْتَبِرِيْنَ قَوْمَ نُوْحٍ بِاِرْسَالِهِ اِلَيْهِمْ وَوَعْظِهِ ـ

৩০. এতে অবশ্যই রয়েছে হযরত নূহ (আ.), নৌকা এবং কাফেরদের ধ্বংসের ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হলো নিদর্শন আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার প্রমাণবহ। اِنْ অব্যয়টি مُثَقَّلَه হতে مُخَفَّفَة তার ইসিম হলো ضَمِيْرُ الشَّاْنِ যা উহ্য রয়েছে। আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মাঝে তাঁকে প্রেরণ করে এবং তাঁর উপদেশের মাধ্যমে।

٣١. ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ هُمْ عَادٌ ـ

৩১. অতঃপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম তারা হলো আদ জাতি।

٣٢. فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ هُوْدًا اَنْ اَيْ بِاَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ عِقَابَهٗ فَتُؤْمِنُوْنَ ـ

৩২. এবং আমি তাদের একজনকে তাদের নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম অর্থাৎ হযরত হুদ (আ.)-কে। আর এখানে اَنْ অব্যয়টি بِاَنْ অর্থে হয়েছে। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না তাঁর শাস্তিকে। ফলে তোমরা ঈমান আনবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا : আল্লাহ তা'আলা এখান থেকে পাঁচটি ঘটনার বর্ণনা শুরু করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এখানে মোট ছয়টি ঘটনা রয়েছে। এর দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যাতে পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয় বিষয়াদিতে তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের কুকীর্তি সম্পর্কে বিরত থাকে। উপরন্তু এসব ঘটনায় রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আপনার সাথে আপনার আপনার কওমের পক্ষ থেকে যে সকল পরিস্থিতি সামনে আসছে তা পূর্বের নবীদের সম্মুখেও পেশ এসেছিল। অতএব আপনি তাদের এসব কাজকর্মে দুঃখিত হবেন না। এখানে যে পাঁচটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো ১. হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা। ২. হযরত হূদ (আ.)-এর ঘটনা। ৩. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনা। ৪. হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এ ঘটনা। ৫. হযরত ঈসা এবং তাঁর জননীর ঘটনা।

নূহ হলো উপাধি, তার নাম ছিল আব্দুল গাফফার অথবা আব্দুল্লাহ। কেউ কেউ ইয়াশকারও বলেছন। তিনি এক হাজার পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ৪০ বছর বয়সে তাঁকে নবুয়তে দান করা হয় এবং সাড়ে নয়শত বছর তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। প্লাবনের পরে ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। এ হিসেবে তাঁর সর্বমোট হায়াত বা জীবনকাল হচ্ছে- ১ হাজার ৫০ বছর হয়।

قَوْلُهُ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ : এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের ইল্লত বা কারণের পর্যায়ে।

قَوْلُهُ هُوَ اِسْمُ مَا : মুফাসসির (র.) এখান থেকে مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -এর তারকীব বর্ণনা করছেন। اِلٰهٍ হলো مَا -এর اِسْم مُؤَخَّرْ আর لَكُمْ হলো كَائِنًا -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে مَا -এর خَبَرْ ; غَيْرُهٗ -এর উপর رَفْع -ও হতে পারে। এ সময় اِلٰهٍ -এর مَحَلّ -এর অনুগামী হবে। আবার جَرّ হতে পারে। এ সময় اِلٰهٍ -এর শব্দের অনুগামী হবে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি مَا قَبْلَهٗ দ্বারা لَكُمْ উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকাংশের মতে, এ তারকীবটি দুর্বল। কারণ مَا হলো দুর্বল আমিল। কেননা এর اِسْم ও خَبَرْ এর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করলে এটা আমল করে না। অতএব اِلٰهٍ -কে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ এবং لَكُمْ -কে خَبَر مُقَدَّمْ স্থির করা উচিত ছিল।

قَوْلُهُ اَنْ لَا يُعْبَدَ غَيْرُهٗ : এ ইবারত উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَشِيْئَةٌ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بِذٰلِكَ لَا بَشَرًا : بِذٰلِكَ -এর সম্বন্ধ হলো اَنْزَلَ -এর সাথে। আর ذٰلِكَ এ দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদত না করার নির্দেশ বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ : এর মধ্যে اَنْ হলো تَفْسِيْرِيَّةٌ তথা বিবরণমূলক। কেননা এর পূর্বে اَوْحَيْنَا রয়েছে এটা قَوْل -এর অর্থ সম্বলিত।

قَوْلُهُ بِاَعْيُنِنَا : এটা اِصْنَعْ -এর خَبَرْ থেকে حَالْ আর عَيْن -কে مُبَالَغَة স্বরূপ বহুবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَرْاٰى مِنَّا وَحِفْظِنَا : এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতে مَجَاز مُرْسَلْ ঘটেছে। কেননা চোখে দেখার জন্য তা সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। অতএব مَلْزُوْم বলে لَازِم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفَارَ التَّنُّوْرُ : এটা جَاءَ اَمْرُنَا -এর عَطْف بَيَانْ আর চুলা থেকে পানি উথলে উঠা আজাবের আলামত স্বরূপ ছিল। বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আ.)-কে আলামতস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, যখন চুলা থেকে পানি উথলে উঠবে তখন বুঝতে হবে, আজাবের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ زَوْجَتَهُ : এখানে স্ত্রী ও সন্তানাদি দ্বারা যারা ঈমান এনেছিলেন তারা উদ্দেশ্য। হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী ছিল দুই জন। একজন ঈমানদার, তাকে কিস্তিতে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আর অপর স্ত্রী ছিল কাফের। সে নিজ পুত্র কেনানের সাথে কিস্তিতে আরোহণ করেনি। এ স্ত্রীর নাম ছিল ওয়াগিলা। হযরত নূহ (আ.)-এর ছেলে ছিল মোট চারজন, তাদের মধ্যে একজন ছিল কাফের, তার নাম ছিল কিনআন। সে তার পিতার সাথে কিস্তিতে আরোহণ করেনি। অপর তিন পুত্র ছিলেন মুমিন বা ঈমানদার, তাদের নাম হচ্ছে সাম, হাম ও ইয়াফিজ। সাম ছিলেন আরবদের পূর্বপুরুষ, হাম ছিলেন সুদানীদের পূর্বপুরুষ, আর ইয়াফিস ছিলেন তুর্কীদের পূর্বপুরুষ।

قَوْلُهُ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ : এটা إذا -এর জবাব। বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, فَقُلْ -এর স্থলে فَقُولُوْا বললে তা ভালো হতো, যাতে অবতরণকালে সকল মানুষ দোয়ায় শরিক থাকত। তবে তাঁর দোয়া যেহেতু সবার দোয়ার স্থলাভিষিক্ত ছিল, এ কারণে তখন শুধু তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের অনেক দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে আক্লান্ত সাধনা করেছেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত পূববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের কুদরতে ও রহমতে নৌযানে আরোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাক। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা হযরতু নূহ (আ.)-এর যুগ থেকেই নৌকা নির্মাণের শিল্প আরম্ভ হয়। এরপর অন্যান্য নবীগণের উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা এ সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে যে, নবী রাসূলগণ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে মানুষকে এই তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। যারা এই আহবানে সাড়া দেওয়ার স্থলে আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে তারও উল্লেখ রয়েছে, যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়ত এই সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থা বর্ণনা করেছেন যা ঈমান এবং ইয়াকীনের দিকে মানব মনকে আকৃষ্ট করে। এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে অবাধ্য কাফেদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর নাফরমান জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ وَفَارَ التَّنُّوْرُ : تَنُّوْر চুল্লিকে বলা হয়, যা রুটি পাকানোর জন্য তৈরি করা হয়। এই অর্থই প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এর অপর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। কেউ কেউ এ দ্বারা বিশেষ চুল্লীর অর্থই নিয়েছেন, যা কূফার মসজিদে এবং কারো কারো মতে সিরিয়ার কোনো এক জায়গায় ছিল। এই চুল্লী উথলিত হওয়াকেই হযরত নূহ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের আলামত নির্ধারণ করা হয়েছিল। -[মাযহারী]

উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আ.), তাঁর মহাপ্লাবন ও নৌকার ঘটনা পূর্ববর্তী সূরাসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রলয়ংকরী বন্যা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে একটি নৌযান নির্মাণ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে হযরত নূহ (আ.) নির্মিত নৌযানটি সম্পর্কে কিছু আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যথা-

১. হযরত নূহ (আ.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করছেন। আর শোকরগুজারীর যে ভাষা হবে তাও আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের যিনি আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।

২. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এই দোয়া কর- وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ .

অর্থাৎ আর বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমি উত্তম অবতারণকারী।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, নৌযানে বরকতময় অবতরণের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে দুশমনদের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহ পাকের ইবাদতে মশগুল থাকার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছেন। আর জমিনে বরকতের সাথে অবতরণের তাৎপর্য হলো এই যে, আল্লাহ পাক নিমজ্জিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধর রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাদেরকে অধিক পরিমাণে রিজিক বৃদ্ধি করেছেন এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সুযোগ দিয়েছেন।

এ দোয়া করার হুকুম হয়েছে একমাত্র হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি, তাঁর নিজের জন্য ও সাথীদের জন্য। এরূপ করার কারণ হলো– ১. এর দ্বারা হযরত নূহ (আ)-এ মাহাত্ম্যের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। ২. এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে হযরত নূহ (আ.)-এর দোয়াই তাঁর সাথীদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দোয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهٗ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ : পূর্বেকার আয়াতসমূহে হেদায়েতের আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্যান্য পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা সংক্ষেপে এবং নাম নির্দিষ্ট না করে বর্ণনা করা হয়েছে। তাফসীরকারগণ বলেন, লক্ষণাদি দৃষ্টে মনে হয় এসব আয়াতে আদ অথবা সামূদ অথবা উভয় সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। আদ সম্প্রদায়ের প্রতি হযরত হুদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সামূদ সম্প্রদায়ের পয়গাম্বর ছিলেন হযরত সালেহ (আ.)। এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, এসব সম্প্রদায় এক صَيْحَة অর্থাৎ, ভয়ংকর শব্দ দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যান্য আয়াতে সামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা মহাচিৎকার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এ থেকে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে قَرْنًا اٰخَرِيْنَ বলে সামূদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, صَيْحَة শব্দের অর্থ আজাব হলে আদ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

অনুবাদ :

৩৩. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ اَىْ بِالْمَصِيْرِ اِلَيْهَا وَاَتْرَفْنٰهُمْ اَنْعَمْنَا هم فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ .

৩৩. তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরি করেছিল ও অস্বীকার করেছিল আখিরাতের সাক্ষাৎ করাকে অর্থাৎ, পরকালে প্রত্যাবর্তনকে। এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনের প্রচুর ভোগ-সম্ভার তারা বলছিল, এতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা আহার কর, সে তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তা-ই পান করে।

৩৪. وَاللّٰهِ لَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ فِيْهِ قَسَمٌ وَشَرْطٌ وَالْجَوَابُ لِاَوَّلِهِمَا وَهُوَ مُغْنٍ عَنْ جَوَابِ الثَّانِىْ اِنَّكُمْ اِذًا اَىْ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُ لَّخٰسِرُوْنَ . اَىْ مَغْبُوْنُوْنَ .

৩৪. যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের আনুগত্য কর এখানে لَئِنْ -এ شَرْط ও قَسَم রয়েছে। আর এ দুটির প্রথমটি তথা قَسَم -এর جَوَاب উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ جَوَاب টি شَرْط ও قَسَم -এর جَوَاب -এর উল্লেখের প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে দিয়েছে। তবে তোমরা অর্থাৎ যদি তোমরা তার আনুগত্য কর অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ প্রতারিত হবে। [اِنَّكُمْ اِذًا... হলো جَوَاب قَسَم]

৩৫. اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ . هُوَ خَبَرُ اَنَّكُمُ الْاُوْلٰى وَاَنَّكُمُ الثَّانِيَةُ تَاكِيْدٌ لَهَا لِمَا طَالَ الْفَصْلُ .

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ -এর مُخْرَجُوْنَ হলো প্রথম اَنَّكُمْ তথা خَبَر আর দ্বিতীয় اَنَّكُمْ হলো প্রথম اَنَّكُمْ -এর তাকিদ। মাঝে ব্যবধান বেশি থাকায় তা উল্লিখিত হয়েছে।

৩৬. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ اِسْمُ فِعْلٍ مَاضٍ بِمَعْنٰى مَصْدَرٍ اَىْ بَعُدَ بَعُدَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ . مِنَ الْاِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُوْرِ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ لِلْبَيَانِ .

৩৬. একেবারেই অসম্ভব এটা اِسْم فِعْل مَاضِىْ অতীতকালীন ক্রিয়াজ্ঞাপক ইসমে মাসদার তথা بَعُدَ بَعُدَ অর্থে তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার কবর হতে বের করা সম্পর্কে। আর لِمَا -এর لَام টি অতিরিক্ত بَيَانْ -এর জন্য এসেছে।

৩৭. اِنْ هِىَ اَىْ مَا الْحَيٰوةُ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا بِحَيٰوةِ اَبْنَائِنَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ .

৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন আমরা মরি বাঁচি আমাদের সন্তানাদি বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমরা উত্থিত হবো না।

৩৮. اِنْ هُوَ اَىْ مَا الرَّسُوْلُ اِلَّا رَجُلُ نِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ . اَىْ مُصَدِّقِيْنَ فِى الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

৩৮. সে অর্থাৎ রাসূল এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই। অর্থাৎ সত্যায়নকারী নই মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে।

অনুবাদ :

٣٩. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ـ

৩৯. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।

٤٠. قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ وَمَا زَائِدَةٌ لَّيُصْبِحُنَّ لَيَصِيْرُنَّ نٰدِمِيْنَ ج عَلٰى كُفْرِهِمْ وَتَكْذِيْبِهِمْ ـ

৪০. আল্লাহ বললেন, অচিরেই সামান্য সময় পরেই এবং مَا হলো অতিরিক্ত তারা অনুতপ্ত হবে। এখানে لَيُصْبِحُنَّ টা لَيَصِيْرُنَّ অর্থে হয়েছে। তাদের অস্বীকার করার কারণে ও মিথ্যাবাদী বলার কারণে।

٤١. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَيْحَةُ الْعَذَابِ وَالْهَلَاكِ كَائِنَةٌ بِالْحَقِّ فَمَاتُوْا فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاۤءً ط وَهُوَ نَبْتٌ يَبِسَ اَىْ صَيَّرْنَاهُمْ مِثْلَهُ فِى الْيُبْسِ فَبُعْدًا مِنَ الرَّحْمَةِ لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ الْمُكَذِّبِيْنَ ـ

৪১. অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল। আজাব ও ধ্বংসের প্রকট শব্দ, ফলে তারা মৃত্যুবরণ করল। এবং আমি তাদেরকে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। غُثَاۤءً হলো শুষ্ক তৃণলতা, খড়কুটা। অর্থাৎ আমি তাদেরকে শুষ্ক খড়কুটার ন্যায় কর দিলাম। সুতরাং দূর হোক রহমত হতে। ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সম্প্রদায়।

٤٢. ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اَىْ اَقْوَامًا اٰخَرِيْنَ ـ

৪২. অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি।

٤٣. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا بِاَنْ تَمُوْتَ قَبْلَهُ وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ـ عَنْهُ ذُكِّرَ الضَّمِيْرُ بَعْدَ تَانِيْثِهِ رِعَايَةً لِلْمَعْنٰى ـ

৪৩. কোনো জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না যে এর পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করবে। বিলম্বিত ও করতে পারে না তার থেকে। مُؤَنَّثٌ -এর মধ্য مُذَكَّرٌ নেওয়ার পর يَسْتَاْخِرُوْنَ -এর যমীর আনা হয়েছে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে।

٤٤. ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ط بِالتَّنْوِيْنِ وَعَدَمِهِ اَىْ مُتَتَابِعِيْنَ بَيْنَ كُلِّ اِثْنَيْنِ زَمَانٌ طَوِيْلٌ كُلَّمَا جَاۤءَ اُمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَاوِ رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِى الْهَلَاكِ وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ج فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ـ

৪৪. অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করছি। تَتْرًا শব্দটি তানভীনসহ ও তানভীন ছাড়া উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে অনবরত। যদিও দু'জনের মাঝে দীর্ঘকালের ব্যবধানও ছিল। যখনই কোনো জাতির নিকট এসেছে এখানে উভয় হামযাকে ঠিক রেখে এবং দ্বিতীয় হামযা ও ওয়াও -এর মাঝামাঝি সহজ করে পাঠ রীতি রয়েছে। তার রাসূল তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।

অনুবাদ :

٤٥. ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ . حُجَّةٍ بَيِّنَةٍ وَهِيَ الْيَدُ وَالْعَصَا وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْاٰيَاتِ .

৪৫. অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.)-কে পাঠালাম। প্রকাশ্য দলিলসহ। তা হলো হাত শুভ্র হওয়া, লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া ইত্যাদি নিদর্শনাবলি।

٤٦. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَبِاللّٰهِ وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ . قَاهِرِيْنَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِالظُّلْمِ .

৪৬. ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করল। তার ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচারের স্ট্রীমরোলার পরিচালনাকারী।

٤٧. فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ . مُطِيْعُوْنَ خَاضِعُوْنَ .

৪৭. তারা বলল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মতো এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে অনুগত ও নত।

٤٨. فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ .

৪৮. অতঃপর তারা তাঁদেরকে অস্বীকার করল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

٤٩. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ لَعَلَّهُمْ اَىْ قَوْمَهُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ يَهْتَدُوْنَ . بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ اُوْتِيَهَا بَعْدَ هَلَاكِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ جُمْلَةً وَاحِدَةً .

৪৯. আমি হযরত মূসা (আ.)-কে কিতাব দিয়েছিলাম। তাওরাত। যাতে তারা অর্থাৎ তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলগণ। সৎপথ পায় এর মাধ্যমে ভ্রষ্টতা থেকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় বিনাশ হওয়ার পর হযরত মূসা (আ.)-কে একই সাথে পূর্ণ তাওরাত কিতাব দান করা হয়েছিল।

٥٠. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ عِيْسٰى وَاُمَّهٗ اٰيَةً لَمْ يَقُلْ اٰيَتَيْنِ لِاَنَّ الْاٰيَةَ فِيْهِمَا وَاحِدَةٌ وِلَادَتُهٗ مِنْ غَيْرِ فَحْلٍ وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ مَكَانٍ مُّرْتَفِعٍ وَهُوَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ اَوْ دَمِشْقُ اَوْ فِلَسْطِيْنُ اَقْوَالٌ ذَاتِ قَرَارٍ اَىْ مُسْتَوِيَةٍ لِيَسْتَقِرَّ عَلَيْهَا سَاكِنُوْهَا وَّمَعِيْنٍ . اَىْ مَاءٍ جَارٍ ظَاهِرٍ تَرَاهُ الْعُيُوْنُ .

৫০. এবং আমি মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন এখানে اٰيَتَيْنِ তথা দুটি নিদর্শন বলেননি। কেননা তাদের উভয়ের মধ্যে নিদর্শন একটিই ছিল। আর তা হলো পুরুষবিহীন তার জন্মগ্রহণ। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক উচ্চ ভূমিতে رَبْوَةٍ অর্থ- উচ্চ ভূমি। আর তা হলো বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা দামেশক কিংবা ফিলিস্তীন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিরাপদ অর্থাৎ সমতল যার উপর বসবাসকারীরা স্থিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। এবং প্রস্রবণ বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রবহমান পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি যা আঁখি দ্বারা অবলোকন করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْمَلَأُ : اَلْمَلَأُ এটা اِسْم جَمْع -اَلْاَمْلَاءُ হলো বহুবচন, এর অর্থ হলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

قَوْلُهُ وَاللّٰهِ لَئِنْ اَطَعْتُمْ : এখানে শপথ এবং শর্ত একত্র হয়েছে। যখন এ দুটি একত্র হয় তখন প্রথমটির জবাব আনা হয়। আর দ্বিতীয়টির জবাবকে প্রথমটির উপর অনুমান করে বিলোপ করা হয়। اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ এটা হলো جَوَاب قَسَم ; শর্তের জবাব নয়। কেননা এখানে اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ হলো جُمْلَه اِسْمِيَّة যদি শর্তের জবাব হতো তাহলে এর উপর। فَا প্রবিষ্ট হওয়া জরুরি ছিল। অথচ এখানে তা উল্লিখিত হয়নি।

قَوْلُهُ اِنَّكُمْ اِذًا : অর্থাৎ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُ لَخٰسِرُوْنَ এখানে كُمْ হলো اِنَّ-এর اِسْم আর خَاسِرُوْنَ হলো এর خَبَرْ ; لَامْ جُمْلَه اِبْتِدَائِيَّة আর اِذًا হলো اِنَّ-এর اِسْم এবং তার খবরের মাঝে শর্তের বিষয়বস্তুর জন্য তাকীদ। اِذًا-এর তানভীনটি লুপ্ত اَیْ اِنْ شَرْطِيَّة-এর পরিবর্তে এসেছে। যেমন- يَوْمَئِذٍ-এর মধ্যে হয়ে থাকে। ব্যাখ্যাকার (র.) এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য اَطَعْتُمُوْهُ বৃদ্ধি করেছেন। এ সময় এর জবাবের প্রয়োজন হয় না। কেননা এ সময় পূর্বের কথার শব্দের তাকিদস্বরূপ উল্লিখিত হয় আর কোনো বস্তুকে পুনরুল্লেখ করা তার সম অর্থের পর্যায়ে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ اَيَعِدُكُمْ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة; পূর্বের বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مُخْرَجُوْنَ : এটা প্রথম اِنَّ-এর خَبَرْ আর مِتُّمْ اِذًا হলো مُخْرَجُوْنَ-এর ظَرْف এটা اِنَّكُمْ-এর মা'মূল নয়। কেননা এটা পূর্বের اِنَّكُمْ-এর تَاكِيْد لَفْظِيْ

قَوْلُهُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ : এটা اِسْم فِعْل অতীতকালীন অর্থে। এ শব্দটি অধিকাংশ সময় বিলুপ্তসহ ব্যবহৃত হয়। প্রথমটির তাকীদের জন্য দ্বিতীয়টি উল্লিখিত হয়। যেহেতু এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এটা অতীতকালীন অর্থে নাকি মাসদার? এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য ব্যাখ্যাকার (র.) بَعُدَ-এর উপর দু'রাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : هَيْهَاتَ-কে اِسْم فِعْل বলা হয় কেন? এতে তো পরস্পর সংঘর্ষিক দুটি বিষয়ের সন্নিবেশ মনে হয়। কেননা اِسْم এবং فِعْل ভিন্ন ভিন্ন দুটি শব্দ।

উত্তর : যেহেতু এটা শাব্দিকভাবে اِسْم, এ কারণেই তো এর গর্দান বা রূপান্তর হয় না। আর অর্থের দিক দিয়ে এটা فِعْل, কারণ এর মধ্যে কাল পাওয়া যায়। উভয়দিকে লক্ষ্য করে এ নাম রাখা হয়েছে। আবার যেহেতু এটা মাসদার অর্থে ব্যবহৃত হয়, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) اِسْم فِعْل مَاضِىْ বলে প্রথম অর্থের দুদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর بِمَعْنٰى مَصْدَرْ বলে দ্বিতীয় অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ উভয় অর্থকে স্পষ্ট করার জন্য بَعُدَ-এর উপর দু ই'রাব লাগিয়েছেন।

সার সংক্ষেপ : هَيْهَاتَ শব্দটি اِسْم فِعْل, এটা بَعُدَ অর্থে। এ فِعْل-এর মধ্যে দুটি ধরন হতে পারে- ১. এর فَاعِلْ হলো তার উহ্য যমীর। বাক্যটি এরূপ হবে- بَعُدَ التَّصْدِيْقِ اَوِ الصِّحَّةِ اَوِ الْوُقُوْعِ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ইত্যাদি। ২. এর فَاعِلْ হলো مَا আর لَامْ অতিরিক্ত। এটা দূরবর্তীজ্ঞাপক। যেন বলা হয়েছে- এ দূরত্ব কিসের? এর উত্তর দেওয়া হয়েছে- لِمَا تُوْعَدُوْنَ اَلْبُعْدُ অর্থাৎ তোমাকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুত দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ পুনরুত্থান। কেউ কেউ বলেন, هَيْهَاتَ হলো মাসদার অর্থে মুবতাদা, আর لِمَا تُوْعَدُوْنَ হলো خَبَرْ, কেউ কেউ এটাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। প্রথম ক্ষেত্রে هَيْهَاتَ-এর কোনো مَحَلْ اِعْرَابْ থাকবে না।

قَوْلُهُ مِنَ الْاِخْرَاجِ مِنَ الْقُبُوْرِ : مَا تُوْعَدُوْنَ-এর মধ্যকার مَا হলো বিবরণমূলক।

قَوْلُهُ بِحَيَاتِ اَبْنَائِنَا : এটা একটি প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, نَمُوْتُ وَنَحْيَا তথা আমরা মৃত্যুবরণ করব ও জীবিত হবো বলা তো পুনরুত্থানকে স্বীকার করার শামিল। অথচ তারা তো পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) يَحْيَاتِ اَبْنَائِنَا বলে এর উত্তর দিয়েছেন যে, মুশরিকদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো, যখন আমরা মরে যাই, তখন আমাদের সন্তানাদি জীবিত থাকে। এছাড়া মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। কেউ কেউ এ উত্তর দিয়েছেন যে, আয়াতে বিষয়বস্তু বর্ণনায় অগ্র পশ্চাত ঘটেছে। অর্থাৎ نَحْيَا وَنَمُوْتُ ছিল।

قَوْلُهُ عَمَّا قَلِيْلٍ : কারো কারো মতে مَا অতিরিক্ত। অর্থাৎ عَنْ قَلِيْلٍ مِنَ الزَّمَانِ অর্থাৎ সামান্য সময়ে। কেউ বলেন, مَا অর্থ شَيْئٌ অথবা زَمَانٌ অর্থাৎ- عَنْ شَيْئٍ قَلِيْلٍ اَوْ عَنْ زَمَانٍ قَلِيْلٍ এখানে عَمَّا কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট, এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে- ১. لَيُصْبِحُنَّ -এর সাথে ২. نَادِمِيْنَ -এর সাথে ৩. উহ্য শব্দের সাথে। অর্থাৎ- عَمَّا قَلِيْلٍ نَنْصُرُهُ مَا قَبْلَ , অর্থাৎ اُنْصُرْنِيْ -এর দলিলের ভিত্তিতে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ صَيْحَةُ الْعَذَابِ : এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّة হয়েছে। অর্থাৎ, صَيْحَةُ الْعَذَابِ وَالْهَلَاكِ - صَيْحَة দ্বারা আজান উদ্দেশ্য। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর চিৎকার উদ্দেশ্য নয়। কেননা আ'দ জাতি জিবরাঈল (আ.)-এর চিৎকারে ধ্বংস হয়নি।

قَوْلُهُ كَائِنَةً : ব্যাখ্যাকার এটা বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِالْحَقِّ এটা كَائِنَةً -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে صَيْحَةً -এর حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ كَبُعْدًا : এর فِعْل -কে বিলোপ করে মাসদারকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এর فِعْل -কে বিলোপ করা জরুরি। মূলত فَبَعُدُوْا بُعْدًا এটা মুশরিকদের জন্য বদদোয়ার স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ ذُكِّرَ الضَّمِيْرُ الخ : অর্থাৎ, يَسْتَاْخِرُوْنَ -এর মধ্যে যমীরকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে। অথচ اَجَلَهَا -এর মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর : هَا যমীরটি اُمَّةٍ -এর প্রতি ফিরেছে, আর اُمَّةٍ দ্বারা قَوْم উদ্দেশ্য। আর এ শব্দটি পুংলিঙ্গ। এ কারণেই يَسْتَاْخِرُوْنَ -এর মধ্যে যমীরকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَتْرَا : এটা বিলুপ্ত মাসদার থেকে حَالٌ বা صِفَتْ অর্থাৎ اِرْسَالًا تَتْرًا ছিল। تَتْرًا মূলত وَاتِرًا ছিল। وَاوْ-কে ت দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে, এটাকে مُتَابَعَتٌ مَعَ الْمُهْلَتِ বলা হয়।

قَوْلُهُ اَحَادِيْثَ : এটা اُحْدُوْثَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো مَا يَتَحَدَّثُهُ النَّاسُ অর্থাৎ সে সকল কাহিনী যা মানুষ সময় কাটানোর জন্য বা আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে বলে থাকে।

قَوْلُهُ مِنْ اُمَّتِهِ : এখানে مِنْ এটা فَاعِلٌ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে। اُمَّةٌ হলো تَسْبِقُ -এর فَاعِلٌ

قَوْلُهُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ : প্রথম ধরন হলো, উভয় হামযাকে স্ব অবস্থায় বহাল রেখে পড়বে। দ্বিতীয় ধরণ হলো প্রথম হামযাকে ঠিক রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে সহজ করে পড়বে। অর্থাৎ হামযা এবং وَاوْ -এর মাঝামাঝি পড়বে।

قَوْلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً : এর সম্বন্ধ হলো اُوْتِيَهَا -এর সাথে। এ সময় অর্থ হবে ফেরাউনের ধ্বংসের পরে তাওরাত একই বার প্রদান করা হয়েছে। আবার এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটা ফেরাউনের ধ্বংস এবং তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সময় উদ্দেশ্য হবে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর তাওরাত দান করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির সলিল সমাধির পর আল্লাহ পাক অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এর দ্বারা কোনো জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল আদ জাতি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। -[তাফসীরে কাবীর : খ. ২৩, পৃ. ১৭]

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা ছিল সামূদ জাতি। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য স্বীয় রাসূল প্রেরণ করেন। আদ জাতি হলে হযরত হুদ (আ.) এবং সামূদ জাতি হলে হযরত সালেহ (আ.) তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করার ও তাঁর বন্দেগী করার আহবান জানান; কিন্তু তারা আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃত জানায়। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির ধ্বংস দেখেও তারা কোনো প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। সকল সঠিক পথে আসার জন্যে তারা প্রস্তুত হয়নি; বরং তারা আল্লাহ পাকের নাফরমান হয়েছে, তাঁর প্রেরিত নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, এবং তাদের নেতারা অন্যায়, অসুন্দর ও ভিত্তিহীন কথা বলেছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا الخ

অর্থাৎ তাঁর জাতির যে প্রধানরা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছে এবং আখিরাতে হাজির হওয়াকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে দান করেছিলাম অনেক ভোগ সম্পদ, তারা বলেছিল, এ-তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ তোমরা যা আহার কর সে তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তা-ই পান করে।

অতএব, তার এমন কোনো বিশেষত্ব নেই যার কারণে আমরা তার কথা মেনে চলবো। ঐ পথভ্রষ্ট জাতির প্রধানরা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলে, তারা একথাও বলে যে, যদি এ কথা তোমরা মেনে চল তবে তোমরা হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, তোমরা হবে অপমানিত। অতএব, অযথা কেন অপমানিত হবে, অকারণে কেন নিজেদের অপমান ডেকে আনবে?

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তারা ছিল অত্যন্ত বোকা ও মূর্খ। কেননা তারা তাদের ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে রাজি হয়নি এবং এ কাজকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করেছে। অথচ প্রাণহীন পাথরকে পূজা করতে অথবা হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করতে অপমানিত বোধ করেনি। ঐ ভাগ্যহত জাতির প্রধানরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করতো। এরপর যে আরো একটি জীবন আসবে এবং সে জীবনে বর্তমান জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে– একথা তারা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে রাজি হত না। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ

অর্থাৎ সে কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যখন তোমরা মৃত্যুর পর মাটিতে ও অস্থিতে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে?

আল্লাহর নবী আখিরাতের তথা চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা বলতেন; কিন্তু তারা আখিরাতে বিশ্বাস করতো না। তারা বলতো, মরণের পর পচে গেলে যখন অস্থি চূর্ণ হয়ে যাবে মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবে, তার পরে আবার জীবিত হবে– একথা কি করে বিশ্বাস করতে পারি!

قَوْلُهُ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ : পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোনো পুনরুজ্জীবন নেই– কিয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের বক্তব্য এটাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো প্রকাশ্য কাফেরই; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে উঠে। তারা পরকাল ও কিয়ামতের হিসাবের প্রতি কোনো সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন!

قَوْلُهُ مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত সালেহ (আ.) হযরত লূত (আ.) ও হযরত শুয়াইব (আ.) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরপর আদ জাতি বা সামুদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে আরো অনেক জাতিকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ যথাসময়ে ধ্বংস হয়েছে।

আর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যে জাতির ধ্বংসের জন্য আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, সে জাতি সে নির্দিষ্ট সময়েই ধ্বংস হয়েছে, এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি এবং তাদের ধ্বংসকে কেউ ঠেকিয়ে রাখাতে পারেনি।

قَوْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন- تَتْرًا শব্দটি মূলত وَتْرًا ছিল। আর تَوَاتُرٌ বলা হয় কোনো বস্তুর একের পর এক আসা তথা অনবরত আসাকে। হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে- لَا بَأْسَ بِقَضَاءٍ تَتْرًا

অর্থাৎ, রমজানের যেসব রোজা কাযা হয়েছে, সেগুলো বিভিন্নভাবে আদায় করায় কোনো ক্ষতি নেই। আর এজন্যেই خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ সেই হাদীসকে বলা হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, যাদের কোনো অসত্যের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়। تَتْرًا শব্দটির এই ব্যাখ্যা গ্রহণের পর ثُمَّ أَرْسَلْنَا আয়াতের অর্থ হবে, এরপর আমি একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করি। এরপর আমি অন্য একটি জাতি সৃষ্টি করি এবং তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন নবী সৃষ্টি করি। -[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ১৮৮-৮৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ এ কথাও লিখেছেন, আল্লাহ পাক একদিকে বিভিন্ন জাতির হেদায়েতের জন্য নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করতে থাকেন অন্যদিকে সে জাতির পাপিষ্ঠ লোকেরা আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করতে থাকে। এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা কোপগ্রস্ত হতে থাকে। তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করা হয় যে, পৃথিবীতে তাদের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকেনি। তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়, গল্প কাহিনীর উপাখ্যানে। তাদের পরবর্তী লোকদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ঐ কিচ্ছা কাহিনীগুলোই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هٰرُونَ ـ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ : এরপর ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর ভাই হযরত হারূন (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তদানীন্তনকালে ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আত্মগরিমা এবং অহংকারে এমনভাবে মেতে উঠেছিল যে, ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে ফেলেছিল এবং অহংকারের কারণে আল্লাহর নবীকে আমলে নিতে রাজি হয়নি।

আলোচ্য আয়াতের سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ শব্দটির অর্থ হলো সুস্পষ্ট দলিল, এমন দলিল যা প্রতিপক্ষকে নিশ্চুপ করে দেয়। অথবা سُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক লাঠিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা ঐ লাঠিটি তাঁর সর্বপ্রথম মুজেযা। এজন্যেই তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে, আর এজন্যে যে, ঐ লাঠি দ্বারা বিভিন্ন সময় একাধিক মুজেযা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঐ লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হতো। যাদুকররা রশি দ্বারা যে সাফ বানিয়ে ছেড়েছিল, ঐ লাঠিটি অজগর সর্পের আকৃতি ধারণ করে যাদুকরদের ছেড়ে দেওয়া সাফগুলোকে গিলে ফেলেছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের পানি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। আর ঐ লাঠির আঘাতেই আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে একটি ছোট পাথর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়েছিল, যার পানি ছয় লক্ষ বনী ইসরাঈলের জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর কাফেলা যেখানে বিশ্রামরত হতো, এ লাঠি চারিদিকে প্রদক্ষিণ কর তাদের হেফাজতের দায়িত্ব পালন করতো। আর ঐ লাঠিটি অন্ধকার রাত্রে প্রদীপের কাজ করতো। আর ঐ লাঠিটি এক সময় ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। আর ঐ লাঠিটি কূপ থেকে পানি উত্তোলনের জন্যে রাশি ও বালতির কাজও করেছে। এ সবই ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা। আর মুজেযা হলো নবীর নবুয়তের দলিল। আর কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের اٰيَاتٌ শব্দটির অর্থ বলেছেন, মুজেযা নয়'; বরং বিধান । অর্থাৎ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে তাঁর বিধান ও মুজিযাসহ প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দুরাত্মা কাফেররা ঈমান আনেনি। কেননা তারা ছিল অহংকারী। ইরশাদ হচ্ছে- فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ

"কিন্তু তারা অহংকার করলো, আর তারা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক সম্প্রদায়।" তাদের এই অহংকারের কারণেই তারা সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হলো। তাদের অহংকার ও আত্মগরিমা সত্য গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

قَوْلُهُ فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ : ঐ পাপিষ্ঠ দাম্ভিক লোকেরা বলল, যারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, যাদের স্বজাতি আমাদের পদানত গোলাম, আমরা কি এমন দুটি লোকের কথা মেনে চলবো? তা কখনো সম্ভব নয়। ফেরাউন ও তার দলবলের এই অহংকারই মূলত তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ : ফেরাউন এবং তার দলবলের ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাত দান করেন, যাতে বনী ইসরাঈল জাতি তাওরাত মোতাবেক জীবন যাপন করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে তারাই আখিরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর এজন্যই তওরাত অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً : পিতা ব্যতীত হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম নিঃসন্দেহে একটি নিদর্শন। কোনো পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতীত গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব এসব বিস্ময়কর নিদর্শন। এসব কিছু মানুষের কাছে বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট কোনো কিছুই কঠিন নয়। তিনি যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা– তাই করেন, তাঁর কুদরত হিকমতের কোনো সীমা নেই, তাই বিশ্ববাসীর জন্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম একটি নিদর্শন, হযরত মারইয়াম (আ.)-ও আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন।

قَوْلُهُ وَاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ : ربوة শব্দটির অর্থ হলো উচ্চস্থান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, এটি ছিল দামেশক। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) এবং মোকাতেল (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, এই স্থানটি ছিল দামেশক শহরের উপকণ্ঠে। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেছেন, رَبْوَةٍ দ্বারা রমলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আতা (রা.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, এ স্থানটি ছিল বায়তুল মোকাদ্দাস। আর কাতাদা (র.) এবং কা'আব (র.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, এটি ছিল মিশর। কেননা ইহুদি রাজা হিরুদোস যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করতে ইচ্ছা করে তখন হযরত মারইয়াম (আ.) ঈসা (আ.)-কে নিয়ে মিশর চলে যান। আর সুদ্দী (রা.) বলেছেন, এটি ছিল ফিলিস্তীন। –[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ১৯১-৯২]

সম্ভবত এটা ঐ উঁচু ভূমি গর্ভ খালাসের জন্য যেখানে হযরত মারইয়াম (আ.) গমন করেছিলেন। সূরা মারইয়ামে– فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَا আয়াতটি নির্দেশ করে, যে তা উঁচু ভূমি ছিল। নিচে ঝরনা বা নহর প্রবাহিত ছিল। তবে মুফাসসিরগণ লিখেন যে, এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর শৈশবের ঘটনা ছিল। হিরোদোস নামক জনৈক বাদশাহ জ্যোতিষীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) নেতৃত্ব লাভ করবেন। এ কারণে তাঁর শৈশবকাল থেকেই সে হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর হত্যার পেছনে লেগেছিল। হযরত মারইয়াম আল্লাহ তা'আলার ইলহামের সাহায্যে জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে মিশর চলে যান। উক্ত জালিম বাদশাহর মৃত্যুর পরে তিনি শামদেশে ফিরে আসেন। ইঞ্জীল কিতাবের মাত্তা সংকলনে এ ঘটনাও উল্লেখ রয়েছে। আর মিশর উঁচু ভূমি হওয়াটা নীলনদের প্রতি লক্ষ্য করে। অন্যথায় তা অনেক সময় প্লাবিত হয়ে যেত। আর مَاءٍ مَعِيْنٍ হলো নীলনদ। কেউ কেউ رَبْوَةٍ দ্বারা শাম অথবা ফিলিস্তীন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মোটকথা মুসলনাদের কেউই رَبْوَةٍ দ্বারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য নেননি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর কাশ্মীরে হওয়ার ব্যাপারেও কেউ মন্তব্য করেননি। তবে বর্তমানের কোনো কোনো বিপদগামী লেখক رَبْوَةٍ দ্বারা কাশ্মীর উদ্দেশ্য বলে থাকেন। আর তারা এটাকেই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বলেছেন। ঐতিহাসিকভাবে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ভারতের শ্রীনগরের মহল্লা খানইয়ার 'ইউযাসিফ' নামে যে প্রসিদ্ধ কবর রয়েছে তার সম্পর্কে 'তারীখে আ'যমী'-এর লেখক এটাকে মানুষের সাধারণ উক্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সাধারণ মানুষ তাকে নবীর কবর বলে থাকে। তা ছিল মূলত কোনো শাহজাদার কবর। সে অন্য কোনো দেশ থেকে এখানে এসেছিল। তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর বলার সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও বোকামির পরিচায়ক। এ ধরনের আজগুবি ও মনগড়া কথায় হযরত ঈসা (আ.) জীবিত থাকাকে অস্বীকার করাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। কেউ যদি এ কবরের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে চায়, যে ইউযাসিফ কে ছিল? তাহলে জনাব মুনশী জাবীহুল্লা সাহেব অমৃতশহরী-এর লিখিত পুস্তিকা দেখুক, যা বিশেষত এ বিষয়কে কেন্দ্র করে অত্যন্ত গবেষণামূলকভাবে লিখিত হয়েছে। তাতে এ ভ্রান্ত ধারণাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। –[ফাওয়াইদে উসমানী]

অনুবাদ :

٥١. يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ الْحَلَالَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ـ فَاُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ ـ

৫১. হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র হালাল বস্তু হতে আহার করুন এবং সৎকর্ম করুন ফরজ ও নফল হতে আপনারা যা করেন সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। কাজেই আমি আপনাদেরকে এর প্রতিদান দিব।

٥٢. وَاعْلَمُوْا اَنَّ هٰذِهٖٓ اَيْ مِلَّةَ الْاِسْلَامِ اُمَّتُكُمْ دِيْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُخَاطَبُوْنَ اَيْ يَجِبُ اَنْ تَكُوْنُوْا عَلَيْهَا اُمَّةً وَّاحِدَةً حَالٌ لَازِمَةٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَخْفِيْفِ النُّوْنِ وَفِيْ اُخْرٰى بِكَسْرِهَا مُشَدَّدَةً اِسْتِئْنَافًا وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ـ فَاحْذَرُوْنِ ـ

৫২. এবং জেনে রাখুন যে, এই যে, অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম তোমাদের ধর্ম। তোমাদের দীন হে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। তোমাদের এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জরুরি। একই জাতি اُمَّةً وَّاحِدَةً হলো حَالٌ لَازِمَةٌ অন্য এক কেরাতে اِنْ هٰذِهٖ -এর ن টি تَخْفِيْف তথা তাশদীদবিহীন রূপে পঠিত। অন্য এক কেরাতে جُمْلَه مُسْتَانِفَة হিসেবে হামযাটি যেরযোগে ও نُوْن তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, আমাকে ভয় কর।

٥٣. فَتَقَطَّعُوْا اَيِ الْاِتْبَاعُ اَمْرَهُمْ دِيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَقَطَّعُوْا اَيْ اَحْزَابًا مُتَخَالِفِيْنَ كَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَغَيْرِهِمَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ اَيْ عِنْدَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ فَرِحُوْنَ ـ مَسْرُوْرُوْنَ ـ

৫৩. কিন্তু তারা অর্থাৎ অনুসারীগণ তাদের বিষয়টিকে দীনকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। زُبُرًا শব্দটি تَقَطَّعُوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদের ন্যায় পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে অর্থাৎ তাদের নিকট যে দীন রয়েছে তা নিয়ে আনন্দিত।

٥٤. فَذَرْهُمْ اُتْرُكْ كُفَّارَ مَكَّةَ فِيْ غَمْرَتِهِمْ ضَلَالَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ـ اَيْ حِيْنَ مَوْتِهِمْ ـ

৫৪. সুতরাং তাদেরকে থাকতে দিন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদেরকে ছেড়ে দিন স্বীয় বিভ্রান্তিতে ভ্রষ্টতায় কিছুকালের জন্য অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত।

٥٥. اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ نُعْطِيْهِمْ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ـ فِي الدُّنْيَا ـ

৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ দান করছি, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি? পৃথিবীতে।

٥٦. نُسَارِعُ نَجْعَلُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط لَا بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ـ اَنَّ ذٰلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ لَهُمْ ـ

৫৬. তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না বরং তারা বুঝে না। যে এটা তাদের জন্য অবকাশ দান মাত্র।

٥٧. اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ خَوْفِهِمْ مِنْهُ مُّشْفِقُوْنَ ـ خَائِفُوْنَ مِنْ عَذَابِهٖ ـ

৫৭. নিশ্চয় যারা তার প্রতিপালককের ভয়ে সন্ত্রস্ত তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।

অনুবাদ :

٥٨. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ اَلْقُرْاٰنِ يُؤْمِنُوْنَ ـ يُصَدِّقُوْنَ ـ	৫৮. যারা তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিতে কুরআনে ঈমান আনে সত্যায়ন করে।
٥٩. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ـ مَعَهُ غَيْرَهُ ـ	৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শরিক করে না তাঁর সাথে অন্য কাউকে।
٦٠. وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ يُعْطُوْنَ مَآ اٰتَوْا اَعْطَوْا مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ خَائِفَةٌ اَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ يُقَدَّرُ قَبْلَهُ لَامُ الْجَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ـ	৬০. যারা যা দান করার তারা তা দান করে দান-সদকা ও সৎ আমল করে ভীত প্রকম্পিত হৃদয়ে ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদের উক্ত সৎকর্মসমূহ গৃহীত হবে না। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে– এই বিশ্বাসের কারণে। اَنَّهُمْ -এর পূর্বে لَامْ হরফে জার উহ্য রয়েছে। এটা মূলত ছিল– لِاَنَّهُمْ
٦١. اُولٰۤئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ـ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ ـ	৬১. তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়। আল্লাহর ইলমে।
٦٢. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اَىْ طَاقَتَهَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُصَلِّىْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ جَالِسًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَصُوْمَ فَلْيَاْكُلْ وَلَدَيْنَا عِنْدَنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ بِمَا عَمِلَتْهُ وَهُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ تُسْطَرُ فِيْهِ الْاَعْمَالُ وَهُمْ اَىِ النُّفُوْسُ الْعَامِلَةُ لَا يُظْلَمُوْنَ ـ شَيْئًا مِنْهَا فَلَا يَنْقُصُ مِنْ ثَوَابِ اَعْمَالِ الْخَيْرِ وَلَا يُزَادُ فِى السَّيِّاٰتِ ـ	৬২. আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। অর্থাৎ তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে অক্ষম সে যেন বসে সালাত আদায় করে। আর যে ব্যক্তি রোজা রাখতে অক্ষম সে যেন পানাহার করে। এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব, যা সত্য ব্যক্ত করে যা সে আমল করবে সে বিষয়ে, আর তা হলো লৌহে মাহফূজ- তাতে সকল আমল লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। এবং তাদের প্রতি আমলকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি জুলুম করা হবে না। সুতরাং কারো নেক কাজের প্রতিদান কমিয়ে দেওয়া হবে না এবং কারো পাপও বৃদ্ধি করা হবে না।
٦٣. بَلْ قُلُوْبُهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ فِىْ غَمْرَةٍ جَهَالَةٍ مِّنْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ ـ فَيُعَذَّبُوْنَ عَلَيْهَا ـ	৬৩. বরং তাদের অন্তর অর্থাৎ কাফেরদের অন্তর অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন এ বিষয়ে কুরআনের ব্যাপারে। এতদ ব্যতীত তাদের আরো কাজ আছে মুমিনগণের উল্লিখিত আমল যা তারা করে থাকে ফলে তাদেরকে সে ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া হবে।

অনুবাদ :

٦٤. حَتّٰٓى اِبْتِدَائِيَّةٌ . اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ اَغْنِيَائَهُمْ وَرُؤَسَائَهُمْ بِالْعَذَابِ اَيِ السَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ يَضِجُّوْنَ يُقَالُ لَهُمْ .

৬৪. এমনি সময় এখানে حَتّٰى টি اِبْتِدَائِيَّةٌ হয়েছে। আমি যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ধনী ও নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিদেরকে ধৃত করি শাস্তি দ্বারা অর্থাৎ বদরের দিন তরবারির আঘাতে তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে চিল্লাচিল্লি আরম্ভ করে দেয়। তাদেরকে বলা হবে–

٦٥. لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ . لَا تُمْنَعُوْنَ .

৬৫. আজ-আর্তনাদ করো না। তোমরা আমার সাহায্য পাবে না তোমাদের শাস্তি বারণ করা হবে না।

٦٦. قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ مِنَ الْقُرْاٰنِ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ . تَرْجِعُوْنَ قَهْقَرٰى .

৬৬. আমার আয়াত তো কুরআন থেকে তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হতো; কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরে সরে পড়তে পশ্চাতে ফিরে যেতে।

٦٧. مُسْتَكْبِرِيْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ اَيْ بِالْبَيْتِ اَوِ الْحَرَامِ بِاَنَّهُمْ اَهْلُهٗ فِيْ اَمْنٍ بِخِلَافِ سَائِرِ النَّاسِ فِيْ مَوَاطِنِهِمْ سٰمِرًا حَالٌ اَيْ جَمَاعَةً يَتَحَدَّثُوْنَ بِاللَّيْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ تَهْجُرُوْنَ . مِنَ الثُّلَاثِيْ تَتْرُكُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَمِنَ الرُّبَاعِيْ اَيْ تَقُوْلُوْنَ غَيْرَ الْحَقِّ فِي النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ .

৬৭. দম্ভ ভরে বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। তার কারণে অর্থাৎ তারাই বায়তুল্লাহ শরীফ ও হারাম শরীফের নিরাপত্তার অধিকারী, অন্যান্য স্থাপন মানুষের বিপরীত। এ বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করতে থাকতে। سٰمِرًا টি حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ দলবদ্ধভাবে রাত জেগে বায়তুল্লাহ-এর পার্শ্বে গল্পগুজব করতে। تَهْجُرُوْنَ ফে'লটি ثُلَاثِيْ হতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– তোমরা কুরআনকে ছেড়ে দিবে। আর رُبَاعِيْ হতে হলে অর্থ হবে– তোমরা নবী ও কুরআনের ব্যাপারে অসত্য কথা বল।

٦٨. قَالَ تَعَالٰى اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَصْلُهٗ يَتَدَبَّرُوْا فَاُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ الْقَوْلَ اَيِ الْقُرْاٰنَ الدَّالَّ عَلٰى صِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ جَاۤءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَاۤءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ .

৬৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন– তবে তারা কি অনুধাবন করে না يَدَّبَّرُوْا মূলত ছিল يَتَدَبَّرُوْا - تَا কে دَال -এর মধ্যে ইদগাম করার ফলে يَدَّبَّرُوْا হয়েছে। এই বাণী অর্থাৎ কুরআন, যা নবী করীম ﷺ -এর সত্যতার প্রমাণবহ। অথবা তাদের নিকট এমন কিছু আসে যা তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসেনি।

٦٩. اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ .

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে?

অনুবাদ :

٧٠. اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ط اَلْاِسْتِفْهَامُ فِيْهِ لِلتَّقْرِيْرِ بِالْحَقِّ مِنْ صِدْقِ النَّبِيِّ وَمَجِيْئِ الرُّسُلِ لِلْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَمَعْرِفَةِ رَسُوْلِهِمْ بِالصِّدْقِ وَالْاَمَانَةِ وَاَنْ لَا جُنُوْنَ بِهٖ بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ جَاۤءَهُمْ بِالْحَقِّ اَيِ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ـ

৭০. অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদনাগ্রস্ত। এখানে اِسْتِفْهَامْ টি সুদৃঢ়করণকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে নবীর সত্যতা, অতীতের উম্মতদের নিকট রাসূলগণের আগমন এবং তাদের রাসূলকে সত্য, বিশ্বস্ত ও তিনি উম্মাদনাগ্রস্ত নন বলে জানা ইত্যাদি বিষয়ে। বরং بَلْ টি اِنْتِقَالْ তথা কথা বা অবস্থার গতি পরিবর্তনের জন্য। তিনি তাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ তাওহীদ ও ইসলামি বিধি বিধান সম্বলিত কুরআন নিয়ে এসেছেন। আর তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে।

٧١. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَيِ الْقُرْاٰنُ اَهْوَاۤءَهُمْ بِاَنْ جَاۤءَ بِمَا يَهْوُوْنَهُ مِنَ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ لِلّٰهِ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط اَيْ خَرَجَتْ عَنْ نِظَامِهَا الْمُشَاهَدِ لِوُجُوْدِ التَّمَانُعِ فِى الشَّيْئِ عَادَةً عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ اَيْ بِالْقُرْاٰنِ الَّذِيْ فِيْهِ ذِكْرُهُمْ وَشَرَفُهُمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ـ

৭১. যদি সত্য অনুগামী হতো অর্থাৎ কুরআন তাদের কামনা-বাসনার অর্থাৎ তারা যা কামনা করে আল্লাহর অংশীদার ও সন্তান থাকা, যা থেকে তিনি মহা পবিত্র ও উর্ধ্বে। তবে বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়ত আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সবকিছুই অর্থাৎ এসবের মধ্যে যে শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় তা বিনষ্ট হয়ে যেত। শাসনকর্তার সংখ্যাধিক্যে স্বভাবতই একই বস্তুতে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের অসম্ভাব্যতা বিদ্যমান থাকার কারণে। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ। অর্থাৎ কুরআন যাতে তাদের জন্য উপদেশ ও মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٧٢. اَمْ تَسْاَلُهُمْ خَرْجًا اَجْرًا عَلٰى مَا جِئْتَهُمْ بِهٖ مِنَ الْاِيْمَانِ فَخَرَاجُ رَبِّكَ اَجْرُهٗ وَثَوَابُهٗ وَرِزْقُهٗ خَيْرٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ خَرْجًا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اُخْرٰى خَرَاجًا فِيْهِمَا وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ اَفْضَلُ مَنْ اَعْطٰى وَاَجَرَ ـ

৭২. আপনি কি তাদের নিকট কোনো ব্যয়ভার চান প্রতিদান। তাদের নিকট যে ঈমান নিয়ে এসেছেন তার বিনিময়ে আপনার প্রতিপালকের ব্যয়ভারই তার প্রতিদান, তার ছওয়াব ও তার জীবিকা শ্রেষ্ঠ অপর এক কেরাতে উভয় স্থানেই خَرْجًا এসেছে। আবার অন্য কেরাতে উভয় স্থানেই خَرَاجًا ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা সর্বোত্তম দাতা ও প্রতিদান প্রদানকারী।

٧٣. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ اَيْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

৭৩. আপনি তো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছেন। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে।

অনুবাদ :

৭৪. وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ بِالْبَعْثِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَنِ الصِّرَاطِ اَىِ الطَّرِيْقِ لَنٰكِبُوْنَ ـ عَادِلُوْنَ ـ

৭৪. যারা আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না পুনরুত্থান ছওয়াব এবং শাস্তি সম্পর্কে তারা তো সকল পথ হতে বিচ্যুত দূরে অবস্থানকারী।

৭৫. وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ اَىْ جُوْعٍ اَصَابَهُمْ بِمَكَّةَ سَبْعَ سِنِيْنَ لَّلَجُّوْا تَمَادَوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ ضَلَالَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ـ يَتَرَدَّدُوْنَ ـ

৭৫. আমি তাদেরকে দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ দৈন্য দূর করলেও অর্থাৎ তারা সাত বছর মক্কায় যে অভাব অনটনে পতিত হয়েছিল তা বিদূরিত করি। তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। পথভ্রষ্টতায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে।

৭৬. وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ الْجُوْعِ فَمَا اسْتَكَانُوْا تَوَاضَعُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ـ يَرْغَبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ فِى الدُّعَاءِ ـ

৭৬. আমি তাদেরকে শাস্তি ক্ষুৎপিপাসা দ্বারা ধৃত করলাম, কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনীত হলো না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না। দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুরক্ত হয় না।

৭৭. حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا صَاحِبَ عَذَابٍ شَدِيْدٍ هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ بِالْقَتْلِ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ـ اٰئِسُوْنَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ـ

৭৭. অবশেষে حَتّٰى টি اِبْتِدَائِيَّةٌ হয়েছে। যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেই তা হলো বদরের দিন হত্যার মাধ্যমে। তখনই তারা এতে হতাশ হয়ে পড়ে। সকল মঙ্গল হতে নিরাশ হয়ে পড়ে।

তাহকীক ও তারকীব

يَـٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ : এ আয়াতে যদিও বাহ্যিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে তবে এর দ্বারা প্রত্যেক নবীই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীরই তাঁর আমলে এ নির্দেশ ছিল।

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْا اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً : ব্যাখ্যাকার (র.) وَاعْلَمُوْا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنَّ-এর হামযাটি যবরযোগে হবে। আর هٰذِهٖ হলো اِنَّ-এর اِسْم এবং اُمَّتُكُمْ তার خَبَرٌ ; اُمَّةً হলো حَال لَازِمَة আর وَاحِدَةً তার صِفَت لَازِمَة ; অপর এক কেরাতে نُوْن লঘু আকারে তথা তাশদীদবিহীন এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এর اِسْم হলো বিলুপ্ত ضَمِيْر شَان ; তৃতীয় এক কেরাতে اِنَّ তাশদীদসহ এবং হামযাটি যেরযোগে পঠিত আছে। এ সময় এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَة হবে পূর্বের جُمْلَه مُسْتَانِفَة-এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ اَمْرَهُمْ : এটা تَقَطَّعُوْا যা قَطَّعُوْا-এর অর্থ বিশিষ্ট তার مَفْعُوْل ; যেমন- تَقَدَّمَ শব্দটি قَدَّمَ-এর অর্থে আসে। অর্থাৎ, جَعَلُوْا دِيْنَهُمْ اَدْيَانًا مُخْتَلِفَةً [তারা তাদের ধর্মকে অনেকগুলো ধর্মে পরিবর্তন করে ফেলেছে।]

قَوْلُهُ زُبُرًا : এটা زَبُوْرًا-এর বহুবচন। অর্থ হলো দল, গোষ্ঠী, লৌহখণ্ড। এটা تَقَطَّعُوْا-এর فَاعِل থেকে حَال অথবা তার مَفْعُوْل -

قَوْلُهُ فِيْ غَمْرَتِهِمْ : এটা فَذَرْهُمْ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل অর্থাৎ- أُتْرُكْهُمْ مُسْتَقِرِّيْنَ فِيْ غَمْرَتِهِمْ [তাদেরকে তাদের উদাসীনতার মধ্যে ছেড়ে দিন!]

قَوْلُهُ إِنَّمَا نُمِدُّهُمْ : এখানে مَا টি مَوْصُوْلَة কেননা مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ হলো এর বয়ান যা সামনে উল্লিখিত হয়েছে। এটা مَا مَوْصُوْلَة হওয়ার প্রমাণ। অতএব مَا -কে إِنَّ থেকে পৃথক করে লেখা উচিত ছিল। তবে মাসহাফে ওসমানীর লেখনী নীতির অনুকরণ করে إِنَّ -কে مَا -এর সাথে মিলিত করা হয়েছে। এ مَا হলো إِنَّ -এর إِسْم আর نُسَارِعُ হলো বাক্য হয়ে خَبَرْ আর رَابِطَة বা সম্পর্ক সৃষ্টিকারী এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- بِهِ -

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ : এখানে اَلَّذِيْنَ হলো إِنَّ -এর إِسْم আর هُمْ মুবতাদা তার খবর مُشْفِقُوْنَ -এর সাথে মিলে صِلَة অতঃপর مَوْصُوْل صِلَه মিলে إِنَّ -এর إِسْم এভাবে সামনের চারোটি مَوْصُوْل হলো إِنَّ -এর إِسْم আর أُولٰئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ বাক্য হয়ে إِنَّ -এর خَبَرْ

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ يُعْطُوْنَ مَا اَعْطَوْا : সাধারণ মুফাসসিরগণের মতে, يُؤْتُوْنَ শব্দটি إِيْتَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তারা তা প্রদান করে। হযরত ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা.) বলেন- يُؤْتُوْنَ مَا أَتَوْا এটা إِتْيَانٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ- يَفْعَلُوْنَ مَا فَعَلُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ [তারা যে সকল সৎকর্ম করেছে তারাও তা করে।] ব্যাখ্যাকার (র.) উভয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে مَا -এর বর্ণনায় দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। مِنَ الصَّدَقَةِ এ ব্যাখ্যা হলো অধিকাংশ মুফাসসিরগণের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে, আর اَعْمَال صَالِحَة -এর সম্পর্ক হলো হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর কেরাতের সাথে।

قَوْلُهُ وَجِلَةٌ : এটা يُؤْتُوْنَ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقَدَّرُ قَبْلَهُ لَامُ الْجَرِّ : أَنَّهُمْ -এর পূর্বে যদি لَامْ হরফে জার উহ্য মানা হয়, তাহলে تَوْجِلَة -এর ইল্লত হবে আর এটাই সঠিক। অর্থাৎ তাদের অন্তর এজন্য ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ : এটা মূলত وَهُمْ سَابِقُوْنَ لَهَا ছিল। فَاصِلَة তথা আয়াতের শেষে মিল রাখার জন্য لَهَا -কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বাক্যটি মুবতাদা ও খবর। وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এখানে هُمْ যমীরটি نَفْس -এর প্রতি ফিরেছে, যা لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا -এর মধ্যে রয়েছে। نَفْس যেহেতু نَفِيْ -এর অধীনে উল্লিখিত রয়েছে এ কারণে এটা ব্যাপকতা বুঝায়। অর্থাৎ এর মধ্যে বহুবচনের অর্থ নিহিত রয়েছে। এ কারণেই وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -কে বহুবচন ব্যবহার করা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَهُمْ الخ : অর্থাৎ মুমিনদের জন্য উল্লিখিত সৎকর্মসমূহ ছাড়া কাফেররা বিভিন্নরূপ কুকর্মও করত। কাতাদা (র.) বলেন- لَهُمْ -এর যমীর দ্বারা মুসলমানগণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুমিনদের জন্য উল্লিখিত নেক আমলসমূহ ছাড়াও আরো আমল রয়েছে। বগভী (র.) বলেন, প্রথম অর্থটি অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهُ حَتّٰى إِبْتِدَائِيَّةٌ : অর্থাৎ এরপর থেকে বাক্য শুরু হচ্ছে।

قَوْلُهُ إِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ : এটা হলো শর্ত, আর إِذَا هُمْ يَجْأَرُوْنَ হলো جَزَاء আর إِذَا مُفَاجَاتِيَة -টা فَا অর্থে, বাক্যটি এরূপ ছিল- حَتّٰى إِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ فَاجْئَرُوْا بِالصُّرَاخِ এখানে يَجْئَرُوْنَ শব্দটি جَئَرَ (ف) থেকে جَمْع مُذَكَّر غَائِب অর্থ- অস্থির হয়ে ফরিয়াদ করা, গরুর হাম্বা রব করা। تَنْكِصُوْنَ ক্রিয়াটি (ض) نُكُوْصٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা, ঘোরা।

قَوْلُهُ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ : এখানে بِهِ টা مُسْتَكْبِرِيْنَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। بَا سَبَبِيَّة অথবা سَامِرًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট. بَاء অর্থ فِيْ আর بِهِ -এর দ্বারা হয়তো কুরআন শরীফ উদ্দেশ্য, যা كَانَتْ اٰيَاتِيْ দ্বারা বুঝা যায়, অথবা এর দ্বারা হেরেম শরীফ উদ্দেশ্য। যদিও এ দুটি পূর্বে উল্লিখিত হয়নি, তবে বায়তুল্লাহ এবং হেরেম শরীফের ব্যাপারে তাদের গর্ব ও অহংকার করা এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাকে উল্লেখ করার মতোই মনে করা হয়।

قَوْلُهُ مُسْتَكْبِرِيْنَ وَسَامِرًا وَتَهْجُرُوْنَ : এ তিনোটি শব্দ يَنْكِصُوْنَ -এর যমীর -এর حَالٌ হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) -এর জন্য উচিত ছিল যে, حَالٌ -কে تَهْجُرُوْنَ -এর পরে উল্লেখ করা এবং حَالٌ -এর স্থলে أَحْوَالٌ বলা।

قَوْلُهُ بِأَنَّهُمْ أَهْلُهُ : এখানে بَا سَبَبِيَّة তথা কারণজ্ঞাপক। অর্থাৎ ঈমানের দ্বারা অহংকার করত। এ ইল্লত ও দলিল বর্ণনা করে বলতো যে, আমরা বায়তুল্লাহর ব্যবস্থাপক এবং মুতাওয়াল্লী।

قَوْلُهُ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ : এটা বিলুপ্ত হামযার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর فَا হলো আতেফা, বাক্যটি এমন ছিল- أَعَمُوْا فَلَمْ يَدَّبَّرُوْا অর্থাৎ তারা কি অন্ধ হয়ে গেছে যে, তাদের কোন চিন্তা ভাবনা নেই?

قَوْلُهُ عَادَةً : এখানে উচিত ছিল عَادَةً -এর স্থলে عَقْلًا বলা। কেননা মুশরিকদের অস্তিত্ব টিকে থাকা জগতের বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করে। অবশ্য এটা যুক্তিগতভাবে।

قَوْلُهُ لَلَجُّوْا : এ অংশটি لَوْ -এর জবাব।

قَوْلُهُ مُبْلِسُوْنَ : এটা اِبْلَاسٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো- নিরাশ হওয়া। এর থেকে ইবলীস শব্দ গঠিত। কেননা সে আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবী রাসূলগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নবী রাসূলগণ তাওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের আহবায়ক ছিলেন, তাঁরা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাগিদ করতেন। আর এ আয়াতসমূহে তাওহীদে বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের পাশাপাশি হালাল খাদ্য গ্রহণের এবং নেক আমল করার আহবান রয়েছে। আর এটিই সকল নবী রাসূলগণের পথ। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম এ পথের হেদায়েত করেছেন।

কিন্তু অহংকারী পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় নবী রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে। তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্যে তারা নিজেরদের পছন্দনীয় ভিন্ন ধর্মমতকে অনুসরণ করেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে রাসূলগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا অর্থাৎ হে রাসূলগণ! আপনারা পূত পবিত্র বস্তু থেকে আহার করুন, আর সৎ কাজ করতে থাকুন।

طَيِّبَاتٌ -এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামি শরিয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই এর দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে,. পয়গাম্বরগণকে তাদের সময়ে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যথা- ১. হালাল ও পবিত্র বস্তুর আহার করুন। ২. সৎকর্ম করুন। আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরো অধিক পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন, এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিসীম। খাদ্য হালাল হলে সৎকর্মের তাওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সৎ কর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে 'ইয়া রব! ইয়া রব!' বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? -[কুরতুবী]

এ থেকে বোঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

قَوْلُهُ وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً : اُمَّةٌ শব্দটি সম্প্রদায় ও কোনো বিশেষ পয়গাম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোনো সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়: যেমন وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ আয়াতে 'উম্মত' শব্দটি দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا : زُبُرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব পয়গাম্বর ও তাদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দিন ও তরিকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরিকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছেন। زُبُرٌ শব্দটি কোনো সময় زُبْرَةٌ -এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ– খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোনো মুজতাহিদের মতেই জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ : يُؤْتُوْنَ শব্দটি اِيْتَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেওয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তাফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে এর এক কেরাত يَاْتُوْنَ مَآ اَتَوْا ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার তা আমল করে। এতে দান-খয়রাত, নামাজ, রোজা ও সব সৎকর্ম শামিল হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কেরাত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সৎকর্ম; যেমন– এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে? তারা কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে সিদ্দীক তনয়া! এরূপ নয়; বরং এরা তারা, যারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং দান-খায়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে [আমাদের কোনো ত্রুটির কারণে] কবুল হবে না। এধরনের লোকই সৎ কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। –[আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মাযহারী]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এমন লোক দেখেছি যারা সৎ কাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না! –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ : দ্রুত সৎকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজ তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী থাকে।

قَوْلُهُ غَمْرَةٍ : এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غَمْرَة শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে غَمْرَة বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোনো দিক থেকেই আলোর কিরণ পৌঁছত না।

قَوْلُهُ وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ : অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুকর্মও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيْهِمْ শব্দটি تَرَفٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আজাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আজাব যখন আসে তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আজাবে আক্রান্ত করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে সেই আজাব বোঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারের উপর পতিত হয়েছিল।

কারো কারো মতে এই আজাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আজাব বুঝানো হয়েছে যা, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে কারীম ﷺ কাফেরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ –[বুখারী, মুসলিম ও কুরতুবী]

قَوْلُهُ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে بِهٖ শব্দের সর্বনাম হেরমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। سَامِرًا শব্দটি سَمَرٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سَمَرٌ শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سَامِر বলা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচনে হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার একটি কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক এবং এর তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব। দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোনো ঔৎসুক্য নেই।

تَهْجُرُوْنَ শব্দটি هُجْرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ। এটা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

ইশার পর কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ : রাত্রিকালে কিস্‌সা কাহিনী বলার প্রথা আরব আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রথা বন্ধের উদ্দেশ্যে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং ইশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, ইশার নামাজের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামাজ সারাদিনের গুনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি ইশার পর অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়। এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিন্দা, মিথ্যা এবং আরো কত রকমের গুনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) ইশার পর কাউকে গল্পগুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন, শীঘ্র নিদ্রা যাও, সম্ভবত শেষরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফীক হয়ে যাবে! -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوْنَ الْقَوْلَ اَمْ جَاۤءَهُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অহংকারী কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হচ্ছে। তারা কি কি কারণে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত তাও ইরশাদ হয়েছে আলোচ্য আয়াতেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যথা- পাঁচটি কারণে এ কাফেররা সত্য বিমুখ হয়েছে-

১. এ হতভাগ্য কাফেররা পবিত্র কোরআনের মহিমা ও মাধুর্য সম্পর্কে আদৌ ভেবে দেখেনি। তার সৌন্দর্য সম্পর্কেও তারা অবগত হয়নি। পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল। যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে তথা মানব কল্যাণ সাধনের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি নাজিল হয়েছে। যার মোকাবিলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। কেননা সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগর্ভ মহিমান্বিত আসমানি গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন।

২. এ দুরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর সত্যিকার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেনি।

৩. অথবা তারা তাঁর প্রকৃত অবস্থা এবং তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, উদারতা, মহানুভবতা, সাধুতা ও সত্যপরায়ণতা সম্পর্কে অবগত হয়নি। তারা শুধু শুনেছে যে, তিনি উম্মী, তিনি লেখাপড়া শিখেননি, অথচ ইলম এবং হিকমতের যে বিস্ময়কর ঝর্ণাধারা তাঁর নিকট থেকে প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা এতটুকু চিন্তা করেনি।

৪. অথবা এর কারণ হলো এই যে, তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো- হুজুর আকরাম ﷺ মজনু বা পাগল, অথচ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্রোতাধারা তাঁর নিকট থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

৫. তাদের আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, হুজুরে আকরাম ﷺ তাদের নিকট হয়তো কোনো আর্থিক সুবিধা চান, অথচ দূরাত্মা কাফেরদের এসব ধারণার মধ্যে কোনোটিই সত্য নয়। আল্লাহ পাক এ স্থলে তাদের প্রতিটি কথা উল্লেখ করে তার প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاۤءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَاۤءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ

আলোচ্য আয়াতের اَلْقَوْلُ শব্দ দ্বারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে কি কাফেররা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ভেবে দেখেনি। যদি তা করত, তবে পবিত্র কুরআনের

ভাষার অলংকার ও ভাবের মাহাত্ম্য দেখে প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালতের সত্যতায় বিশ্বাস করতো। যখন তারা পবিত্র কুরআনের তিনটি আয়াতের অনুরূপ আয়াত আনয়নে ব্যর্থ হলো, তখনই পবিত্র কুরআন যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ মহান বাণী– একথা তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ থেকে اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে– بَلْ جَاۤءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ অর্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোনো যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই, এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে; শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটি একটি।

قَوْلُهٗ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ : অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়; বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভ্রান্ততম কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র জমানা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোনো কর্ম, কোনো অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে 'সাদিক' ও 'আমীন' তথা 'সত্যবাদী' ও 'বিশ্বস্ত' বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনোদিন কোনো সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে তারা তাঁকে চেনে না।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আজাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আজাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই তারা আবার নারফরমানিতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আজাবে আক্রান্ত করা হয়। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ-এর বরকতে আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি; বরং কুফর ও শিরকেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আজাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয়ে বলে, আমি আপনাকে আল্লাহর আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি! আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবূ সুফিয়ান বলল, আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আজাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ আজাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অজাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। –[মাযহারী]

অনুবাদ :

٧٨. وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْاَسْمَاعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط الْقُلُوْبَ قَلِيْلًا مَا تَاكِيْدُ لِلْقِلَّةِ تَشْكُرُوْنَ .

৭৮. তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ সৃষ্টি করেছেন তোমরা অল্পই مَـا অব্যয়টি স্বল্পতার تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

٧٩. وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ خَلَقَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ . تُبْعَثُوْنَ .

৭৯. তিনিই তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে, এবং তোমাদেরকে তারই নিকট একত্র করা হবে। তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

٨٠. وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ بِنَفْخِ الرُّوْحِ فِى الْمُضْغَةِ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ط بِالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ . صَنِيْعَهُ تَعَالٰى فَتَعْتَبِرُوْنَ .

৮০. তিনিই জীবন দান করেন মাংসপিণ্ডে রূহ ফূঁকে দিয়ে এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকার দিবা-নিশির পরিবর্তন সাদা-কালো ও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানোর মাধ্যমে তবুও কি তোমরা বুঝবে না? মহান আল্লাহর কার্যাবলি সম্পর্কে, ফলে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে।

٨١. بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ .

৮১. এতদসত্ত্বেও তারা তা-ই বলে, যেমনটা বলেছিল পূর্ববর্তীগণ।

٨٢. قَالُوْٓا اَىِ الْاَوَّلُوْنَ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ . لَا وَفِى الْهَمْزَتَيْنِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ .

৮২. তারা বলে অর্থাৎ পূর্ববর্তীগণ আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা উত্থিত হবো? না। اِذَا এবং اَئِنَّا-এর হামযাদ্বয়কে ঠিক রেখে অথবা দ্বিতীয়টি تَسْهِيْل করে এবং উভয়টিতেই মাঝে একটি اَلِفْ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

٨٣. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا هٰذَا اَىِ الْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلُ اِنْ مَا هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ اَكَاذِيْبُ الْاَوَّلِيْنَ . كَالْاَضَاحِيْكِ وَالْاَعَاجِيْبِ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ .

৮৩. আমাদেরকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে। এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও। এটাতো সে কালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মিথ্যা কাহিনী, হাস্যকর ও আজগুবি কথা। اَسَاطِيْر শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ-এর বহুবচন।

অনুবাদ :

٨٤. قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا مِنَ الْخَلْقِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ خَالِقُهَا وَمَالِكُهَا ـ

৮৪. আপনি বলুন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে সৃষ্ট বস্তুসমূহ হতে এগুলো কার? যদি তোমরা জান। এর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক কে?

٨٥. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ـ بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الذَّالِ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْخَلْقِ اِبْتِدَاءً قَادِرٌ عَلَى الْاِحْيَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

৮৫. তারা বলবে, আল্লাহর। আপনি বলুন তাদেরকে তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না। تذكرون শব্দের ذَالْ অক্ষরে দ্বিতীয় تَاءْ -এর ইদগাম হয়েছে। ফলে তোমরা জানতে যে, যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সক্ষম তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতেও সক্ষম।

٨٦. قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ الْكُرْسِيِّ ـ

৮৬. আপনি জিজ্ঞাসা করুন কে সপ্ত আকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি? কুরসির।

٨٧. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ـ تَحْذَرُوْنَ عِبَادَةَ غَيْرِهٖ ـ

৮৭. তারা বলবে "আল্লাহ"। বলুন, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না। তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত হতে বিরত হবে না।

٨٨. قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ يَحْمِىْ وَلَا يُحْمٰى عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

৮৮. জিজ্ঞসা করুন, সকল কিছুর, কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে? تَاءْ বর্ণটি মুবালাগার জন্য যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই। তিনি সাহায্য সহায়তা করেন ; কিন্তু তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে না। যদি তোমরা জানতে।

٨٩. سَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ لِلّٰهِ بِلَامِ الْجَرِّ فِى الْمَوْضَعَيْنِ نَظْرًا اِلَى اَنَّ الْمَعْنٰى مَنْ لَهٗ مَا ذُكِرَ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ـ تُخْدَعُوْنَ وَتُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهٗ اَىْ كَيْفَ يُخَيَّلُ لَكُمْ اَنَّهٗ بَاطِلٌ ـ

৮৯. তারা বলবে, আল্লাহর অন্য কেরাতে لَامْ হরফে জরের সাথে لِلّٰهِ রয়েছে উভয় স্থানে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কার হাতে? এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছো। তোমরা প্রতারিত হচ্ছ এবং হক তথা আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদ হতে বিমুখ রয়েছ। অর্থাৎ তোমাদের কি করে এমন ধারণা হলো যে, এ সবকিছুই বাতিল ও নিরর্থক।

অনুবাদ :

٩٠. بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ـ فِىْ نَفْيِهٖ ـ

৯০. বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে।

٩١. وَهُوَ مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا اَىْ لَوْكَانَ مَعَهٗ اِلٰهٌ لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ اَىْ اِنْفَرَدَ بِهٖ وَمَنَعَ الْاٰخَرَ مِنَ الْاِسْتِيْلَاءِ عَلَيْهِ وَلَعَلٰى بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط مُغَالَبَةً كَفِعْلِ مُلُوْكِ الدُّنْيَا سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهٗ عَمَّا يَصِفُوْنَ ـ بِهٖ مِمَّا ذُكِرَ ـ

৯১. আর তা হলো– আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোনো ইলাহ নেই। অর্থাৎ যদি তাঁর সাথে কোনো ইলাহ থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। অর্থাৎ আলাদা হয়ে যেত এবং তার উপর অপরের কর্তৃত্ব প্রয়োগে বাধা দিত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। বল প্রয়োগপূর্বক যেমন দুনিয়ার রাজা-বাদশাহগণ করে থাকেন। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পূত-পবিত্র যা উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٢. عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ بِالْجَرِّ صِفَةٌ وَالرَّفْعِ خَبَرُ هُوَ مُقَدَّرًا فَتَعٰلٰى تَعَظَّمَ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ مَعَهٗ ـ

৯২. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা যা গোপন আছে আর যা প্রকাশ্যে আছে। عَالِمِ শব্দটি যেরযুক্ত হলে اَللّٰه শব্দের সিফত হবে। আর যদি পেশযুক্ত হয় তবে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। তারা যাকে শরিক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে তাঁর সাথে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ : এখানে مَا হলো قَلِيْلًا-এর تَنْوِيْنِ تَنْكِيْر-এর তাকিদের জন্য, قَلِيْلًا শব্দটি مَفْعُوْل مُطْلَق-এর সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। বাক্যটি এরূপ ছিল– تَشْكُرُوْنَ شُكْرًا قَلِيْلًا আর এটা কৃতজ্ঞতা আদায় না করার প্রতি ইঙ্গিতবহ। কেননা قِلَّتْ কখনো কখানো عَدَمْ তথা অস্তিত্বহীনের অর্থও বুঝায়। আর এ অর্থটিই কাফেরদের অবস্থার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।

قَوْلُهٗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : اَفَلَا-এর হামযাটি উহ্য ক্রিয়ার পূর্বে এসেছে। আর فَا হলো عَاطِفَةْ মূলত বাক্যটি ছিল–
اَغَفَلْتُمْ فَلَا تَعْقِلُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى اِنْشَاءِ الْخَلْقِ قَادِرٌ عَلٰى اِعَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ

قَوْلُهٗ بَلْ قَالُوْا : قَالُوْا-এর فَاعِلْ হলো মক্কার কাফেররা। এটা উহ্য পদ থেকে اِضْرَابْ اِنْتِقَالِىْ হয়েছে [অর্থাৎ বাক্যের ভঙ্গি পরিবর্তন ঘটেছে। বাক্যটি এরূপ ছিল– فَلَمْ يَعْتَبِرُوْا بَلْ قَالُوْا ব্যাখ্যাকার আবুস সাঊদ (র.) বলেন– بَلْ قَالُوْا-এর عَطْف ঘটেছে উহ্য শব্দের উপর। বাক্যটি মূলত فَلَمْ يَعْقِلُوْا بَلْ قَالُوْا ছিল।

قَوْلُهٗ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا : اٰبَاؤُنَا-এর عَطْف হয়েছে وُعِدْنَا-এর ضَمِيْر مُتَّصِلْ-এর উপর। আর নিয়ম হচ্ছে– ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ-এর عَطْف করতে হলে ضَمِيْر مُنْفَصِلْ-এর মাধ্যমে তাকিদ আনা জরুরি। তবে

এখানে نَحْنُ যমীর মাঝে আসার তার প্রয়োজন না থাকায় عطف সঙ্গত হয়েছে। هٰذَا হলো وُعِدْنَا -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل ; نَا যমীর হলো نَائِبْ فَاعِلْ বাক্যটি এরূপ ছিল– وَعَدْنَا اَلْاٰنَ مُحَمَّدٌ بِالْبَعْثِ وَعَدَ غَيْرَهُ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِنَا بِهٖ

قَوْلُهُ لَا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اَءِذَا مِتْنَا -এর হামযাটি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ -এর জন্য।

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : এটা হলো شَرْط ; এর جَوَابْ লুপ্ত রয়েছে, অর্থাৎ– اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَاَخْبِرُوْنِىْ بِخَلَاقِهَا

قَوْلُهُ مَلَكُوْتُ : এর মধ্যকার ت و হলো مُبَالَغَةْ -এর জন্য বর্ধিত। যেমন جَبَرُوْتْ- رَحَمُوْتْ ইত্যাদির মধ্যে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ : عَلٰى দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়েছে نُصِرْتُ বা সাহায্যের অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ نَظْرًا اِلَى اَنَّ الْمَعْنٰى مَنْ لَهُ : উপরে তিন জায়গায় اَللّٰهُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।। প্রথম জায়গায় لِ হরফে জারের সাথে নির্দিষ্ট। কারণ প্রশ্নের মধ্যে لَامْ স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। যেমন– قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا অতএব উত্তর হবে لِلّٰهِ

দ্বিতীয় স্থানে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে لَامْ উল্লিখিত হবে, আর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে لَامْ লুপ্ত হবে। কারণ প্রশ্ন হলো مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রতিপালক কে? উত্তর হবে– আল্লাহ। আর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ -এর উদ্দেশ্য হলো لِمَنِ السَّمٰوٰتُ আসমান [ও জমিন] সমূহ কার? সুতরাং উত্তর হবে– لِلّٰهِ [আল্লাহর]।

আর তৃতীয় স্থান হলো مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ؟ [প্রত্যেক বস্তুরা মালিকানা কার হাতে?] এখানেও যদি প্রশ্নের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে لَامْ লুপ্ত হবে। আর যদি প্রশ্নের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহলে لَامْ উল্লেখ হবে। কারণ এর অর্থ হলো– لِمَنْ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ সারকথা এই যে, উপরিউক্ত তিন স্থানের প্রথম স্থানে لَامْ جَارَّةْ উল্লেখ হওয়া নির্দিষ্ট। আর পরবর্তী দু স্থানে শব্দের বিচারে لَامْ লুপ্ত হবে, আর অর্থের বিচারে لَامْ উল্লেখ হবে।

قَوْلُهُ تَخْدَعُوْنَ : تُسْحَرُوْنَ -এর ব্যাখ্যা تَخْدَعُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন, যে রূপকার্থে تَخْدَعُوْنَ শব্দটি تُسْحَرُوْنَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ عِبَادَةِ اللّٰهِ : عِبَادَةُ اللّٰهِ এটা حَقْ থেকে بَدَلْ হয়েছে। এ কারণে তা مَجْرُوْرٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ كَيْفَ يُخَيَّلُ لَكُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنّٰى এখানে كَيْفَ অর্থে। আর تُسْحَرُوْنَ হলো تُخَيَّلُ অর্থে।

قَوْلُهُ مِنْ وَلَدٍ : مِنْ অব্যয়টি مَفْعُوْلْ -উপর অতিরিক্ত হয়েছে। আর مِنْ اِلٰهٍ -এর মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত হয়েছে كَانَ -এর اِسْمْ -এর উপর।

قَوْلُهُ اِذًا اَىْ لَوْ كَانَ مَعَهٗ اِلٰهٌ لَذَهَبَ : اِذًا -এর পরে لَوْكَانَ مَعَهٗ বৃদ্ধি করেছেন একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ।

প্রশ্ন : اِذًا এমন বাক্যের পূর্বে আসে যা شَرْط ـ جَزَاءْ সম্বলিত, অথচ এখানে لَذَهَبَ শুধু جَزَاءْ উল্লেখ রয়েছে। شَرْط কোথায়?

উত্তর : এখানে شَرْط উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) لَوْكَانَ مَعَهٗ اِلٰهٌ উহ্য মেনে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর اِذًا অব্যয়টি لَوْ اِمْتِنَاعِيَّةْ অর্থে।

قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ : এখানে উদ্দেশ্য হলো সন্তানাদি ও শরিকগণ।

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ : عَالِمْ শব্দটি مَجْرُوْرٌ হবে, اللّٰهُ শব্দের بَدَلْ বা صِفَتْ হওয়ার কারণে। আর مَرْفُوْعٌ পড়া হলে তা উহ্য هُوَ مُبْتَدَاْ -এর خَبَرْ হবে।

قَوْلُهُ فَتَعَالٰى : এর عَطْف হলো পূর্বের বিষয়বস্তুর উপর। অর্থাৎ– عٰلِمُ الْغَيْبِ فَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার বিবরণ ছিল, আর এর কারণ ছিল এই যে, তারা পরকালীন জীবনকে অস্বীকার করত এবং জীবনের কৃতকর্মের সুফল বা কুফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে- একথা বিশ্বাস করত না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে এবং আল্লাহ পাক তাঁর বিস্ময়কর কুদরত ও হিকমতের উল্লেখ করছেন, যাতে করে তারা এ বিষয়ে বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন কঠিন কিছুই নয় এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই হবে। যাঁর শক্তি ও ক্ষমতা বিস্ময়কর, বর্ণনাতীত, তাঁর পক্ষে মৃতকে জীবিত করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক চারটি দলিল বর্ণনা করেছেন। যথা-

প্রথম দলিল- قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ لَكُمْ :অর্থাৎ হে আত্মবিস্মৃত মানবজাতি! আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে দেখবার জন্যে চক্ষু, শ্রবণ করবার জন্যে কর্ণ এবং উপলব্ধি করার জন্যে হৃদয় দান করেছেন। যদি তিনি এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান না করতেন, তবে তোমরা দেখতেও পারতে না, শ্রবণও করতে পারতে না এবং কিছুই উপলব্ধি করতে পারতে না।

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এই নিয়ামতসমূহের সদ্ব্যবহার কর এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, জীবন সাধনায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা কর।

قَوْلُهُ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ : অর্থাৎ কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তোমাদের অত্যন্ত অল্প সংখ্যক লোকই আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা শোকর গুজারী বা কৃতজ্ঞতার তাৎপর্য হলো চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা এবং এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নিয়ামতসমূহকে তাঁর নাফরমানিতে ব্যয় করতে অভ্যস্ত, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তাদের অধিকাংশই অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। -[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ২০৬]

দ্বিতীয় দলিল- قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ : অর্থাৎ আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্র করা হবে।

মানুষ মাত্রকে উপলব্ধি করা উচিত যে, পৃথিবীতে তার অবস্থান আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকই মানুষকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রেখেছেন। ইতিপূর্বে যার অস্তিত্বই ছিল না, যে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিলনা, আজ আল্লাহ পাক তাকে শুধু যে অস্তিত্ব দান করেছেন তাই নয়; বরং দিয়েছেন তাকে শক্তি, সামর্থ্য এবং প্রভাব প্রতিপত্তি। এমনিভাবে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে ছড়িয়ে রেখেছেন, আর এমন এক দিন আসবে, যখন সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক তাঁর মহান দরবারে সমবেত করাবেন, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তৃতীয় দলিল- قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ : অর্থাৎ আর তিনিই তো জীবন ও মৃত্যু দান করেন। অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু এক আল্লাহ পাকেরই হাতে। যাকে ইচ্ছা তিনি জীবন দান করেন আর যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে জীবন ছিনিয়ে তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। কেউ জন্ম লাভ করে, আর কেউ মৃত্যুবরণ করে, উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই কার্যকর হয়।

চতুর্থ দলিল- قَوْلُهُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ আর রাত ও দিনের পবির্তন তাঁরই কাজ, তবু কি তোমরা বুঝতে পার না? প্রত্যহ যথানিয়মে যথাসময়ে রাতের অন্ধকারের পর আসে দিনের আলো, এরপর দিনের অবসান ঘটে, রাতের আগমন হয়, আর সারা বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অবস্থার এই পরিবর্তন শুধু

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই হয় এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরত ও হিকমতেরই বহিঃপ্রকাশ হয়। কুরআনে কারীমেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত ও হিকমতের অগণিত বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে।

অতএব, এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

قَوْلُهُ قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : **তাওহীদের প্রমাণ :** অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তা কার? যদি তোমরা জান তবে বলো?

এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর একত্ববাদের এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কথা ঘোষণা করছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এই পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে এসব কার? তারা অবশ্যই বলবে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের। হে রাসূল! আপনি তাদরেকে বলুন, যদি একথা সত্য হয় আর তা অবশ্যই সত্য, তাহলে তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ করো না? কেন তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করো না? কেন আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চল না? কেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নিকট মাথা নত কর?

قَوْلُهُ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ : অর্থাৎ যখন সব কিছুই আল্লাহ পাকের, তখন পুনরায় তোমাদেরকে তিনি কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না, কেন তোমরা এসব সত্যকে অস্বীকার কর? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

قَوْلُهُ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ : অর্থাৎ [হে রাসূল!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাত আসমান এবং মহান আরশের অধিপতি কে? তারা অবশ্যই বলবে, এক আল্লাহ পাক। হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যখন তোমরা একথা স্বীকার কর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের মালিক, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তবে কেন তাঁকে ভয় কর না? কেন তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান হও না? কেন তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক কর? কোন সাহসে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে হাতের বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত কর? অথচ আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব আধিপত্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করছো, এমন অবস্থায় কেন তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছো না?

قَوْلُهُ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ : আলোচ্য আয়াতের مَلَكُوْتَ শব্দটির অর্থ হলো ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, সম্মান এবং পরিপূর্ণ আধিপত্য, সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। এজন্যে এ শব্দটি শুধু আল্লাহ পাকের ক্ষমতার ব্যাপারেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর দ্বারা অগণিত ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, আজাব, মসিবত ও দুঃখকষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারো সাধ্য নেই যে, তার মোকাবিলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আজাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আজাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আজাব দেবেন, তাকে বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জান্নাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফিরাতে পারবে না। –[কুরতুবী]

অনুবাদ :

٩٣. قُلْ رَّبِّ اِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ مِنَ الْعَذَابِ هُوَ صَادِقٌ بِالْقَتْلِ بِبَدْرٍ ـ

৯৩. আপনি বলুন! হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি আমাকে দেখাতে চান এখানে اِمَّا -এর মধ্যে اِنْ شرطيه অতিরিক্ত مَا -এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। মূলত ছিল اِنْ - مَا যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। আর তা হলো শাস্তি। যা বদরের ময়দানে হত্যার মাধ্যমে সত্যে প্রমাণিত হয়েছে।

٩٤. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ فَاُهْلَكَ بِهَلَاكِهِمْ ـ

৯৪. তবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। ফলে তাদের ধ্বংসের কারণে আমিও বিনাশ হয়ে যাবো।

٩٥. وَاِنَّا عَلٰى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ـ

৯৫. আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি আমি তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

٩٦. اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اَىِ الْخَصْلَةَ مِنَ الصَّفْحِ وَالْاِعْرَاضِ عَنْهُمُ السَّيِّئَةَ اِذَاهُمْ اِيَّاكَ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ـ اَىْ يَكْذِبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ فَنُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ ـ

৯৬. মন্দের মোকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা অর্থাৎ, তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও এড়িয়ে চলার নীতি অবলম্বন দ্বারা। আপনাকেই তাদের কষ্ট দেওয়ার দ্বারা। এ নির্দেশ জিহাদের বিধান নাজিলের পূর্বেকার ছিল। তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত অর্থাৎ যা মিথ্যা বলে ও কষ্টদায়ক কথা বলেন । সুতরাং সে বিষয়ে আমি তাদেরকে বদলা দিব।

٩٧. وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ اَعْتَصِمُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ـ نَزَغَاتِهِمْ بِمَا يُوَسْوِسُوْنَ بِهٖ ـ

৯৭. বলুন, হে আমার প্রতিপলক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। শয়তানের প্ররোচনা হতে। তাদের প্ররোচনা হতে যার দ্বারা তারা কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

٩٨. وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ فِىْ اُمُوْرِىْ لِاَنَّهُمْ اِنَّمَا يَحْضُرُوْنَ بِسُوْءٍ ـ

৯৮. হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে। আমার কাজে-কর্মে। কারণ তারা অনিষ্ট নিয়ে উপস্থিত হয়।

٩٩. حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ اِذَا جَاۤءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وَرَاٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنَ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ـ اَلْجَمْعُ لِلتَّعْظِيْمِ ـ

৯৯. পরিশেষে এখানে حَتّٰى টি اِبْتِدَائِيَّةٌ হয়েছে। যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে দেখে তার অবস্থানস্থল জাহান্নামে এবং তার অবস্থানস্থল জান্নাতে যদি সে বিশ্বাস স্থাপন করে। তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন। এখানে اِرْجِعُوْا বহুবচনের সীগাহ আল্লাহ তা'আলার সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

١٠٠. لَعَلِّىٓ اَعْمَلُ صَالِحًا بِاَنْ اَشْهَدَ اَنْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ يَكُوْنُ فِيْمَا تَرَكْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ عُمْرِىْ اَىْ فِىْ مُقَابَلَتِهٖ قَالَ تَعَالٰى كَلَّا ط اَىْ لَا رُجُوْعَ اِنَّهَا اَىْ رَبِّ ارْجِعُوْنِ كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ط وَلَا فَائِدَةَ لَهٗ فِيْهَا وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ اَمَامِهِمْ بَرْزَخٌ حَاجِزٌ يَصُدُّهُمْ عَنِ الرُّجُوْعِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ وَلَا رُجُوْعَ بَعْدَهٗ ـ

١٠١. فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى اَوِ الثَّانِيَةُ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَفَاخَرُوْنَ بِهَا وَلَا يَتَسَآءَلُوْنَ ـ عَنْهَا خِلَافَ حَالِهِمْ فِى الدُّنْيَا لِمَا يَشْغَلُهُمْ مِنْ عِظَمِ الْاَمْرِ عَنْ ذٰلِكَ فِىْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيٰمَةِ وَفِىْ بَعْضِهَا يُفِيْقُوْنَ وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ـ

١٠٢. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ بِالْحَسَنَاتِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ الْفَائِزُوْنَ ـ

١٠٣. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ بِالسَّيِّئَاتِ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ج

অনুবাদ :

১০০. যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি। এভাবে যে, এ সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই। যা আমি পূর্বে করিনি। আমি নষ্ট করেছি, আমার জীবন হতে অর্থাৎ তার মোকাবিলায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন– না, এটা হওয়ার নয় অর্থাৎ পৃথিবীতে আর ফিরে যাওয়া যাবে না। এটা তো অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন একটি উক্তি মাত্র তার জন্য তাতে কোনো কল্যাণ নেই। তাদের সম্মুখে থাকে বরযখ প্রতিবন্ধক/ প্রাচীর যা তাদেরকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন হতে বাধা দিবে। কিয়ামত পর্যন্ত এরপরও আর প্রত্যাবর্তন হবে না।

১০১ এবং যেদিন শিঙ্গায় বাঁশিতে ফুৎকার দেওয়া হবে প্রথম ফুৎকার অথবা দ্বিতীয় ফুৎকার সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না যার দ্বারা পরস্পর বড়াই করবে। এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবে না। সে সম্পর্কে। তাদের দুনিয়ার অবস্থার বিপরীত। কিয়ামতের কোনো কোনো স্থানের মহাসঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতি তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখার কারণে। আর কোনো স্থানে তারা চৈতন্য ফিরে পাবে। অপর এক আয়াতে এসেছে তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

১০২. এবং যাদের পাল্লা ভারি হবে নেকীর কারণে তারাই হবে সফল কাম কৃতকার্য।

১০৩. এবং যাদের পাল্লা হালকা হবে গুনাহের কারণে। তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। সুতরাং তারা তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

অনুবাদ :

١٠٤. تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ تُحْرِقُهَا وَهُمْ فِيْهَا كَٰلِحُوْنَ - شُمِّرَتْ شِفَاهُهُمُ الْعُلْيَا وَالسُّفْلٰى عَنْ اَسْنَانِهِمْ -	১০৪. অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে জ্বালিয়ে দিবে। এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়। তাদের উপরের ও নিচের ঠোঁট দন্তরাজি থেকে কুঁচকে যাবে।
١٠٥. وَيُقَالُ لَهُمْ اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ مِنَ الْقُرْاٰنِ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ تُخَوَّفُوْنَ بِهَا فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ -	১০৫. আর তাদেরকে বলা হবে– তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ কুরআন হতে আবৃত্তি করা হতো না যার দ্বারা তোমাদেরকে ভয় দেখানো হতো। অথচ তোমরা সেই সকল আয়াতকে অস্বীকার করতে।
١٠٦. قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ شَقَاوَتُنَا بِفَتْحِ اَوَّلِهِ وَاَلِفٍ وَهُمَا مَصْدَرَانِ بِمَعْنًى وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ - عَنِ الْهِدَايَةِ -	১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অন্য কেরাতে شَقَاوَتُنَا রয়েছে। প্রথম বর্ণ তথা شِيْن -এর যবর এবং قَافْ -এর পর একটি আলিফ বৃদ্ধি করে উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট মাসদার। এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় সৎপথ বিচ্যুত।
١٠٧. رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا اِلَى الْمُخَالَفَةِ فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ -	১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় ফিরে যাই বিরোধিতার দিকে তবে তো অবশ্যই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী হবো।
١٠٨. قَالَ لَهُمْ بِلِسَانِ مَالِكٍ بَعْدَ قَدْرِ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ - اِخْسَئُوْا فِيْهَا اُقْعُدُوْا فِى النَّارِ اَذِلَّاءَ وَلَا تُكَلِّمُوْنِ - فِيْ رَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ فَيَنْقَطِعُ رَجَاؤُهُمْ -	১০৮. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন মালেক ফেরেশতার মুখ দিয়ে দুনিয়ার দ্বিগুণ পরিমাণ সময়ের পর। তোরা হীন অবস্থায়ই এখানেই থাক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় আগুনে বসে থাক এবং আমার সাথে কোনো কথা বলিস না তোদের থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারে। ফলে তাদের আশারও পরিসমাপ্তি ঘটবে।
١٠٩. اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِىْ هُمُ الْمُهَاجِرُوْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ -	১০৯. আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল তাঁরা হলো মুহাজির সম্প্রদায় যারা বলতেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন! আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

অনুবাদ :

١١٠. فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا بِضَمِّ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْهَزْءِ مِنْهُمْ بِلَالٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسَلْمَانُ حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِىْ فَتَرَكْتُمُوْهُ لِاشْتِغَالِكُمْ بِالْاِسْتِهْزَاءِ بِهِمْ فَهُمْ سَبَبُ الْاِنْسَاءِ فَنُسِبَ اِلَيْهِمْ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ـ

১১০. তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো বিদ্রূপ করতে যে, سُخْرِيًّا শব্দের سِيْن বর্ণে পেশ ও যের উভয় হরকতই হতে পারে। এটা মাসদার। অর্থ– বিদ্রূপ, উপহাস। তন্মধ্যে ছিলেন হযরত বিলাল, সুহাইব, আম্মার এবং হযরত খাব্বাব (রা.) তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল ফলে তোমরা তা [আমার স্মরণকে] ছেড়ে বসেছিলে। তাঁদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপে লিপ্ত থাকার কারণে। এ হিসেবে তাদের প্রতি ভুলিয়ে দেওয়ার সম্বন্ধ করে اَنْسَوْكُمْ বলা হয়েছে। তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।

١١١. اِنِّىْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ بِمَا صَبَرُوْا عَلٰى اِسْتِهْزَائِكُمْ بِهِمْ وَاَذٰكُمْ اِيَّاهُمْ اِنَّهُمْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ بِمَطْلُوْبِهِمْ اِسْتِئْنَافٌ وَبِفَتْحِهَا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ لِجَزَيْتُهُمْ ـ

১১১. আমি আজ তাদেরকে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম চির সুখময় দিন তাদের ধৈর্য ধারণের কারণে তাদের প্রতি তোমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের এবং নির্যাতনের উপর, বস্তুত তারাই হলো সফলকাম তাদের উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে। اِنَّهُمْ-এর হামযাটি যেরযোগে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হিসেবে এবং যবরযোগেও হতে পারে جَزَيْتُهُمْ ফে'লের দ্বিতীয় মাফঊল হিসেবে।

١١٢. قَالَ تَعَالٰى لَهُمْ بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ فِى الدُّنْيَا وَفِىْ قُبُوْرِكُمْ عَدَدَ سِنِيْنَ تَمْيِيْزٌ ـ

১১২. আল্লাহ বলবেন তাদেরকে মালেক ফেরেশতার জবানীতে, অন্য কেরাতে قُلْ রয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে দুনিয়ায় এবং কবরে। বছরের হিসেবে।

١١٣. قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ شَكُّوْا فِىْ ذٰلِكَ وَاسْتَقْصَرُوْهُ لِعِظَمِ مَا هُمْ فِيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ ـ اَىِ الْمَلَائِكَةَ الْمُحْصِيْنَ اَعْمَالَ الْخَلْقِ ـ

১১৩. তারা বলবে, আমরা অবস্থান করেছি একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ। তারা এ ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হবে। তারা ভয়ানক শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণে দুনিয়ার অবস্থানকে একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করবে। আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। অর্থাৎ সৃষ্টির আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

١١٤. قٰلَ تَعَالٰى بِلِسَانِ مَالِكٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ قُلْ اِنْ اَىْ مَا لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ مِقْدَارَ لُبْثِكُمْ مِنَ الطُّوْلِ كَانَ قَلِيْلًا بِالنِّسْبَةِ اِلٰى لُبْثِكُمْ فِى النَّارِ ـ

১১৪. তিনি বলবেন আল্লাহ তা'আলা মালেক ফেরেশতার জবানীতে। অন্য কেরাতে এসেছে قُلْ [আপনি বলুন!] তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমাদের দীর্ঘ অবস্থানের পরিমাণকে। অবশ্য জাহান্নামে অবস্থানের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থান কমই।

অনুবাদ :

١١٥. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا لَا لِحِكْمَةٍ وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ـ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ لَا بَلْ لِنَتَعَبَّدَكُمْ بِالْاَمْرِ وَالنَّهْىِ وَتُرْجَعُوْا اِلَيْنَا وَنُجَازِىْ عَلٰى ذٰلِكَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ـ

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। কোনো তাৎপর্য ছাড়াই। আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। تُرْجَعُوْنَ ফে'লটি مَعْرُوْف ও مَجْهُوْل উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। না, তা নয়; বরং এ জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে আমার দাসত্ব করবে। এরপর এক সময় আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আমি তোমাদেরকে কর্মের প্রতিফল প্রদান করব। ইরশাদ হচ্ছে– আমি মানব ও দানবকে একমাত্র আমার দাসত্বের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।

١١٦. فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَنِ الْعَبَثِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَلِيْقُ بِهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ الْكُرْسِىِّ هُوَ السَّرِيْرُ الْحَسَنُ ـ

১১৬. আল্লাহ অতি উর্ধ্বে অনর্থ ইত্যাদি তাঁর শানের অনুপোযোগী কর্ম থেকে। তিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। সম্মানিত আরশের তিনিই অধিপতি। আর তা হলো কুরসী। আর তা হলো উন্নত খাট বিশেষ।

١١٧. وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَا مَفْهُوْمَ لَهَا فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ جَزَاؤُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ج اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ لَا يَسْعَدُوْنَ ـ

১১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে। এ বিষয়ে তার কোনো সনদ নেই। لَا بُرْهَانَ لَهٗ হলো اِلٰهًا اٰخَرَ -এর صِفَتْ كَاشِفَةْ -এর مَفْهُوْم مُخَالِفْ তথা বিপরীতমুখী অর্থ ধর্তব্য নয়। তার হিসাব তার প্রতিফল তাঁর প্রতিপালকের নিকট আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। সৌভাগ্যশীল হবে না।

١١٨. وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ الرَّحْمَةِ زِيَادَةً عَلَى الْمَغْفِرَةِ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اَفْضَلُ رَحْمَةٍ ـ

১১৮. বলুন! হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন মুমিনদেরকে ক্ষমার উপর অনুগ্রহ অনুকম্পা বৃদ্ধির মাধ্যমে। আপনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। সর্বোত্তম দয়াবান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تُرِيَنِّىْ : তুমি আমাকে দেখাবে, এটা اِرَائَةٌ থেকে مضارع , وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ بَانُوْنْ ثَقِيْلَةْ : এটা যবরের উপর মাবনী দু' মাফউলের প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়েছে বাবে اِفْعَالْ-এর হামযার মাধ্যমে ضَمِيْرْ হলো প্রথম মাফউল, আর مَا مَوْصُوْلَةْ হলো দ্বিতীয় মাফউল।

قَوْلُهٗ فَلَا تَجْعَلْنِىْ : এটা جَوَابِ شَرْطْ ; فِىْ এখানে مَعْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিক বিনয় ও আবেগ প্রকাশের দরুন رَبِّ শব্দ পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। فَاُهْلِكَ بِهَلَاكِهِمْ হলো جَوَابْ نَهِىْ

قَوْلُهُ وَإِنَّا عَلٰى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُوْنَ : إِنَّ হলো حَرْفُ مُشَبَّهٌ -نَا হলো এর اِسْمٌ - عَلٰى হলো حَرْفُ جَارٍ-نُرِىَ ফে'ল ও ফায়েল, كَ প্রথম মাফঊল, مَا তার ফায়েল ও উভয় মাফঊল মিলে বাক্য হয়ে সিফত। সিফত মাওসূফ মিলে মাসদারের তাবীলে হয়ে দ্বিতীয় মাফঊল। نُرِىَ তার ফায়েল ও উভয় মাফঊল মিলে বাক্য হয়ে مَجْرُوْرٌ ; جَارٌ مَجْرُوْرٌ মিলে قَادِرُوْنَ -এর مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ অতঃপর قَادِرُوْنَ তার مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّمٌ মিলে إِنَّ -এর خَبَرٌ।

قَوْلُهُ خُلَّةٌ : خُلَّةٌ অর্থ– চরিত্র, অভ্যাস। ব্যাখ্যাকার (র.) خلة উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, ...اَلَّتِىْ হলো مَوْصُوْفٌ -এর صِفَتٌ আর اَلسَّيِّئَةَ হলো اِدْفَعْ -এর مَفْعُوْل بِهٖ বাক্যটি এরূপ হবে– اِدْفَعِ السَّيِّئَةَ بِالْخَصْلَةِ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

قَوْلُهُ مِنَ الصَّفْحِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ : এর মধ্যকার مِنْ হলো بَيَانِيَّةٌ আর اَلصَّفْحُ হলো خَصْلَةٌ -এর বয়ান।

قَوْلُهُ إِذَا هُمْ إِيَّاكَ : এটা اَلسَّيِّئَةَ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ هَمَزَاتُ : এটা هَمْز -এর বহুবচন, অর্থ– শয়তানী প্ররোচনা, রিপুতাড়িত কামনা বাসনা।

قَوْلُهُ حَتّٰى : এটা اِبْتِدَائِيَّةٌ অর্থাৎ এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশ থেকে পৃথক। এর দ্বারা কাফেরদের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ الْجَمْعُ لِلتَّعْظِيْمِ : মুফাসসির (র.) এর দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা একক সত্তা, কাজেই رَبِّ ارْجِعْنِىْ বলা উচিত ছিল। এখানে বহু বচনের সীগাহ ব্যবহার করা হলো কেন?

উত্তর :

১. সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

২. اِرْجِعُوْنِ -এর মধ্যে وَاوْ -কে تَكْرَارٌ বুঝানোর জন্য আনা হয়েছে। অর্থাৎ, اِرْجِعْنِىْ، اِرْجِعْنِىْ، اِرْجِعْنِىْ যেমন اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ -এর মধ্যে আলিফটি تَكْرَارٌ তথা اَلْقِ- اَلْقِ এর অর্থে।

৩. ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَرَائِهِمْ : هُمْ যমীর لِاَحَدِهِمْ -এর প্রতি ফিরেছে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এখানে বহুবচনের যমীর আনা হয়েছে। কারণ اَحَدَهُمْ এটা كُلُّهُمْ অর্থে, আর পূর্বে একবচন ব্যবহৃত হয়েছে اَحَدٌ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ : اَنْسَابٌ শব্দটি نَسَبٌ -এর বহুবচন, অর্থ আত্মীয়তা, বংশীয় সম্বন্ধ। প্রশ্ন জাগে যে, তাদের মাঝে আত্মীয়তা ও বংশীয় সম্পর্ক তো একটি অস্বীকার্য বিষয়। সুতরাং তাকে نَفِىْ করা যায় কিভাবে?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) يَتَفَاخَرُوْنَ ক্রিয়া বৃদ্ধি করে এর উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে বংশ সম্বন্ধকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার বিশেষণ (صِفَتْ) -কে অস্বীকার করা হয়েছে।। অর্থাৎ তাদের মাঝে গর্ব করার মতো কোনো সম্পর্ক থাকবে না, পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ হাশরের ময়দানের বিভীষিকা যখন তাদের সামনে চলে আসবে তখন পারস্পরিক দয়া-মায়া নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই নিজচিন্তায় ব্যাকুল থাকবে। এ অবস্থা চিত্রিত করে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে– يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ [স্মরণ রেখ সেদিনকে, যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই, তার মা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তানাদি থেকে।]

قَوْلُهُ لِمَا يَشْغَلُهُمْ : এটা وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ -এর ইল্লত। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়ার কারণ হলো তাদের নিজ নিজ বিষয়ে চিন্তিত থাকা।

قَوْلُهُ فِىْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْقِيَامَةِ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দ্বারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হাশরের ময়দানে মানুষের পরস্পরে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ [তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অগ্রসর হবে।] সুতরাং এর উত্তর কি হবে?

উত্তর : হাশরের ময়দানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতি হবে। যে সময় ভয়-ভীতি অতি তীব্র হবে তখন কেউ খোঁজ খবর নিবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। আর দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে যখন ভয়ভীতি কিছুটা লাঘব হবে তখন একে অন্যকে চিনবে এবং খোঁজ খবর নিবে।

قَوْلُهُ مَوَازِيْنُ : এটাকে হয়তো বিশালত্ব বুঝানোর জন্য বহুবচন আনা হয়েছে, অথবা ওজনের পাল্লা যা উপকরণের বিভিন্ন ধরনের প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন আনা হয়েছে। অর্থাৎ একেক প্রকার আমল ওজনের জন্য একে ধরনের মীযান পাল্লা থাকবে। যেমন দুনিয়ায় বস্তুভেদে পরিমাপ-যন্ত্র বিভিন্ন হতে দেখা যায়।

قَوْلُهُ بِالْحَسَنَاتِ : এর মধ্যকার بِا হলো সববিয়া বা কারণজ্ঞাপক। অর্থাৎ নেকীসমূহ ভারি হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ فَهُمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, فِيْ جَهَنَّمَ হলো উহ্য مُبْتَدأْ -এর خَبَرْ ; আল্লামা যমশখরী (র.) বলেন- فِى الَّذِيْنَ اَنْفُسَهُمْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ হলো خَسِرُوْا -এর بَدَلْ -

قَوْلُهُ تَلْفَحُ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ।

قَوْلُهُ شَمَّرَتْ : شَمَّرَ -এর অর্থ হলো জামার হাতা ইত্যাদি গুটান, সংকোচন করা।

قَوْلُهُ وَالسُّفْلٰى عَنْ اَسْنَانِهِمْ : এর পূর্বে اِسْتَرْخَتْ ক্রিয়া উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى بِلِسَانِ مَالِكٍ : মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ -এর মাধ্যমে কাফেরদেরকে সম্বোধন করাটা তাদের কাথোপকথন দাবি করে। অথচ অপর আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ এটা কথোপকথন না হওয়া দাবি করে, উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান কি?

উত্তর : যে আয়াত দ্বারা কথা না বলা প্রমাণিত হয়, তার উদ্দেশ্য হলো সরাসরি কথা বলা, আর যে আয়াতে কথা বলার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে তার দ্বারা অর্থ হলো মাধ্যম যোগে কথা বলা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ لَبِثْتُكُمْ مِقْدَارُ : এখানে لَوْ হলো اِمْتِنَاعِيَّةٌ , আর تَعْلَمُوْنَ -এর مَفْعُوْلْ উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مِقْدَارُ لُبْثِكُمْ উহ্য মেনে مَفْعُوْلْ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। جَوَابُ لَوْ -ও উহ্য রয়েছে, كَانَ قَلِيْلًا বলে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ- كَانَ قَلِيْلًا فِىْ عِلْمِكُمْ

قَوْلُهُ اَفَحَسِبْتُمْ : এর মধ্যে হামযাটি উহ্য ফে'লের পূর্বে এসেছে, আর فَ হলো عَاطِفَةٌ ; মূলত اَجَهِلْتُمْ শব্দটি فَحَسِبْتُمْ অর্থে আর اِسْتِفْهَامْ টি تَوْبِيْخْ -এর জন্য।

قَوْلُهُ عَبَثًا : হয়তো মাসদার اِسْمُ فَاعِلْ অর্থে, حَالْ -এর স্থলে ব্যবহৃত হওয়ায় مَنْصُوْبْ হয়েছে। অর্থাৎ عَابِثِيْنَ অর্থে অথবা خَلَقْنَا -এর مَفْعُوْلْ لَهُ

قَوْلُهُ لَا لِحِكْمَةٍ : এটা عَبَثًا -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ اِنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ : এর عَطْف হলো اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ -এর উপর।

قَوْلُهُ لَا بَلْ : এর উত্তরটি পূর্বে اِسْتِفْهَامْ হিসেবে উহ্য মেনেছেন।

قَوْلُهُ هُوَ سَرِيْرُ الْحَسَنِ : কোনো কোনো কপিতে এ ইবারতটি নেই।

قَوْلُهُ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ لَا مَفْهُوْمَ لَهَا : এ ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্ন নিরসন করা।

প্রশ্ন : وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ -দ্বারা বুঝা যায় যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে বস্তুত তাদের এ কর্ম হলো সম্পূর্ণ দলিল প্রমাণহীন কাজ। এর مَفْهُوْمْ مُخَالِفْ তথা বিপরীত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, যে শুধু গায়রুল্লাহর ইবাদত করে তার নিকট দলিল প্রমাণ আছে। অথচ এ বিষয়টি সঠিক নয়।

উত্তর : এখানে اٰخَرَ হলো اِلٰهًا -এর صِفَتْ كَاشِفَةٌ যা কেবল مَوْصُوْفْ -কে স্পষ্ট করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এর مَفْهُوْمْ مُخَالِفْ ধর্তব্য নয়, অবশ্য صِفَتْ مُخَصِّصَةٌ হলে তার مَفْهُوْمْ مُخَالِفْ ধর্তব্য হতে صِفَتْ كَاشِفَةٌ তো কেবল

তাকিদের জন্য আসে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– طَائِرٌ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ -এর মধ্যে, طَائِرٌ -এর صِفَتْ كَاشِفَةٌ হলো بِجَنَاحَيْهِ - [جَنَاحٌ অর্থ ডানা] প্রত্যেক পাখি তো ডানার সাহায্যেই উড়ে, এর অর্থ কি? ঠিক এভাবেই وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ দ্বারাও مَفْهُوْمٌ مُخَالِفٌ ধর্তব্য নয়; বরং এটি তাকীদস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। –[রূহুল বয়ান]

فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ এটা হলো جَوَابُ شَرْطٍ

قَوْلُهٗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ : জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে হামযা যেরযোগে, এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ -এর মধ্যে ইল্লতের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ : এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আজাবের ভয় প্রদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। কিয়ামতে এই আজাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই; দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যদি এই আজাব দুনিয়াতে হয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তার জমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোনো আজাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আজাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জালিমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সৎ লোকও এর কারণে পার্থিব কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোনো আজাব ভোগ করবে না; বরং এই পার্থিব কষ্টের কারণে তারা ছওয়াবও পাবে। কুরআন পাক বলে– اِتَّقُوْا فِتْنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ এমন আজাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জালিমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ! যদি তাদের উপর আপনার আজাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে তবে আমাকে এই জালিমদের সাথে রাখবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহর আজাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ছওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ : অর্থাৎ আমি আপনার সামনেই তাদের উপর আজাব আসা দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই উম্মতের উপর ব্যাপক আজাব না আসার ওয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আজাব আসা এর পরিপন্থি নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আজাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আজাব এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আজাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

قَوْلُهٗ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ : অর্থাৎ আপনি মন্দকে উত্তম দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ-কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জবাবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে গেছে; কিন্তু ঠিক জিহাদের অবস্থায়ও এই সচ্চরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। যেমন– কোনো নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত যারা মুসলমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার নাক, কান ইত্যাদি 'মুছলা' না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার বিরোধী কোনো কাজ প্রকাশ না পায়।

قَوْلُهُ وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে কাফেরদের জুলুম অত্যাচার ও মন্দ আচরণের মোকাবিলায় তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মন্দের মোকাবিলা মন্দ পন্থায় নয়; বরং উত্তম পন্থায় করার শিক্ষা দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে শয়তান চিরদিনই বাধা সৃষ্টি করেছে, তার প্ররোচনা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘৃণ্য কৌশল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। শয়তানের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সঠিক পথ হলো, মহান আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং আল্লাহ পাককে স্মরণ করা। শুধু আল্লাহ পাকই শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে পারেন। যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে; কিন্তু এতে শিক্ষা রয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। -[তাফসীরে কবীর খ. ২৩, পৃ. ১১৮]

আলোচ্য আয়াতের আলোকে প্রিয়নবী ﷺ শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, প্রিয়নবী ﷺ কখনো শয়তানের ধোঁকা এবং প্রবঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে অন্য দোয়াও পাঠ করতেন। যেমন–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

মূলত বান্দার কোনো কাজে তা পানাহার হোক বা অন্য কিছু, যখন সে আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, তখন শয়তান ঐ কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয় না।

আবূ দাউদ শরীফে হুজুর আকরাম ﷺ -এর অন্য একটি দোয়াও সংকলিত হয়েছে, কখনো তিনি এ দোয়াও করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطٰنُ عِنْدَ الْمَوْتِ

মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, প্রিয়নবী ﷺ আমাদেরক এ দোয়া শিক্ষা দিতেন যাদের অনিদ্রার কষ্ট থাকে তারা এ দোয়া পাঠ করতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর এ নিয়ম ছিল যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে যে বয়স্ক হতো, তাকে এ দোয়া শিক্ষা দিতেন। আর যে অবুঝ হতো, তার জন্যে এ দেয়া লিপিবদ্ধ করে গলায় ঝুলিয়ে দিতেন।

আবূ দাউদ ছাড়া তিরমিযী এবং নাসায়ী শরীফেও এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبِّ ارْجِعُوْنِ : অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আজাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস,আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সৎকর্ম করে এই আজাব থেকে রেহাই পেতাম।

ইবনে জারীর (র.) ইবনে জুরায়জের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব?

আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে– رَبِّ ارْجِعُوْنِ অর্থাৎ হে প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

قَوْلُهُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ : بَرْزَخٌ-এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে, বস্তু আড়াল হয়, তাকে বরযখ বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যর পর কিয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরযখ বলা হয়। কারণ এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমানা-প্রাচীর। আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোম্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা এখন আজাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোনো ফায়দা নেই। কারণ সে বরযখ পৌঁছে গেছে। বরযখ থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কিয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবন পায় না, এটাই আইন।

قَوْلُهُ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ : কিয়ামতের দিন দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের মাধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উত্থিত হবে। কুরআন পাকের فَإِذَا نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতে এ কথার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে নাকি দ্বিতীয় ফুৎকার? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুবায়েরের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন এবং আতার রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ভাষ্য এই যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবমণ্ডলীর জমজমাট সমাবেশের সামনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারো কোনো প্রাপ্য তার জিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের জিম্মায় নিজের কোনো প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারো জিম্মায় কারো প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সন্তুষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কারো প্রতি রহম করবে না। প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুও তা-ই−

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ -

অর্থাৎ, সেইদিনে প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশরে মুমিন ও কাফেরের অবস্থায় পার্থক্য : কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; মুমিনগণের নয়। কারণ উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন বলে যে− أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ তা'আলা [ঈমানদার হওয়াার শর্তে] তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপাসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতামাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যেই। −[মাযহারী]

এমনিভাবে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে [কেউ কারো উপকার করতে পারবে না] আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন, নবী করীম ﷺ -এর বংশের মধ্যে মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না; কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ : অর্থাৎ পরস্পর কেউ কারো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে− وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। এরপর কোনো অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। −[মাযহারী]

قَوْلُهُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ...... فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ : অর্থাৎ যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারি হবে, সেই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকবে। এই আয়াতে শুধু কামিল মু'মিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হবে এবং তারা সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে তাদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে।

কুরআন পাকের অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ স্থলে কামিল মু'মিনদের পাল্লা ভারি হওয়ার অর্থ এই যে, অপর পাল্লায় অর্থাৎ গুনাহের পাল্লায় কোনো ওজনই হবে না, তা শূন্য দৃষ্টিগোচর হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার অর্থ এই যে, নেকীর পাল্লায় কোনো ওজনই থাকবে না, শূন্যের মতোই হাল্কা হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম ওজনই করব না। কামিল মুমিনদের এই অবস্থা বর্ণিত হলো। পক্ষান্তরে যাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়নি কিংবা তওবা ইত্যাদির কারণে মার্জনা করা হয়েছে, তাদের গুনাহের পাল্লায় কিছুই থাকবে না। অপরদিকে কাফেরদের নেক আমলও ঈমানের শর্ত বর্তমান না থাকায় পাল্লার ওজন হাল্কা হবে। গুনাহগার মুসলমানদের নেকীর পাল্লায়ও আমল থাকবে এবং গুনাহের পাল্লায়ও আমল থাকবে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু বলা হয়নি; বরং কুরআন পাক সাধারণত তাদের শাস্তি ও প্রতিদান সম্পর্কে নীরবই বলা যায়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কুরআন অবতরণের সময় যেসব মু'মিন সাহাবী ছিলেন, তাঁরা সবাই কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্রই ছিলেন। কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলেও তিনি তওবা করেছেন। ফলে মাফ হয়ে গেছে।

কুরআন পাকের خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যাদের নেক ও বদ আমল মিশ্র। তাদের সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন যার নেকী গুনাহের চেয়ে বেশি হবে এক নেকী পরিমাণ বেশি হলেও সে জান্নাত যাবে। পক্ষান্তরে যার গুনাহ নেকীর চেয়ে বেশি হবে এক গোনাহ বেশি হলেও সে দোজখের যাবে। কিন্তু এই মুমিন গুনাহগারের দোজখে প্রবেশ পবিত্র করার উদ্দেশ্য হবে; যেমন লোহা স্বর্ণ ইত্যাদি আগুনে ফেলে ময়লা ও মরিচা দূর করা হয়। দোজখের অগ্নি দ্বারা যখন তার গুনাহের মরিচা দূরীকরণ হবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত হবে এবং তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, কিয়ামতের পাল্লা এমন নির্ভুল ওজন করবে যে, তাতে এক সরিষা পরিমাণও এদিক সেদিক হবে না। যার নেকী ও গুনাহ পাল্লায় সমান সমান হবে, সে আ'রাফে প্রবেশ এবং দোজখ ও জান্নাতের মাঝখানে দ্বিতীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। অবশেষে সে-ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। –[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এই উক্তিতে কাফেরদের উল্লেখ নেই, শুধু মুমিন গুনাহগারদের কথা আছে।

আসল ওজনের ব্যবস্থা : কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং মু'মিন ও কাফের ব্যক্তিকে পাল্লায় রেখে ওজন করা হবে। কাফেরের ওজনই হবেন না, সে যত মোটা ও স্থূলদেহীই হোক না কেন। –[বুখারী, মুসলিম] কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তাদের আমলনামা ওজন করা হবে। তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম (র.) এই বিষয়বস্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। আরও কিছু রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার ওজনহীন ও দেহহীন আমলসমূহকে হাশরের ময়দানে সাকার অবস্থায় পাল্লায় রাখা হবে এবং ওজন করা হবে। তাবারানী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ভাষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যায়। শেষোক্ত উক্তির সমর্থনে আব্দুর রাজ্জাক 'ফজলুল ইলম' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখায়ী (র.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে– কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলসমূহ ওজনের জন্য পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা হাল্কা হবে। এরপর মেঘের ন্যায় এক বস্তু এনে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দেওয়া হবে। ফলে পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। তখন সে ব্যক্তিকে বলা হবে। তুমি জান এটা কি? [যার দ্বারা পাল্লা ভারি হয়ে গেছে।]। সে বলবে, আমি জানি না। তখন বলা হবে, এটা তোমার ইলম যা তুমি অপরকে শিক্ষা দিতে। যাহাবী (র.) ইমরান ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন

শহীদদের রক্ত এবং আলেমদের কলমের কালি [যা দ্বারা তারা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লিখতেন] পরস্পরে ওজন করা হবে। আলেমদের কালির ওজন শহীদদের রক্তের চেয়েও বেশি হবে। -[মাযহারী]

আমল ওজনের অবস্থা সম্পর্কিত তিন প্রকার রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বয়ং মানুষকে তার সাথে রেখে ওজন করার মধ্যে কোনো অবান্তরতা নেই। তাই তিন প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই।

قَوْلُهُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ : كَالِحٌ অভিধানে এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ওষ্ঠদ্বয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক ওষ্ঠ উপরে উত্থিত এবং অপর ওষ্ঠ নিচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎসা আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলাও বেরিয়ে থাকা অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হবে।

قَوْلُهُ وَلَا تُكَلِّمُوْنَ : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা হবে। এরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে তারা কারো সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন, কুরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জবাব দেওয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জবাবে لَا تُكَلِّمُوْنَ বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর তারা কিছুই বলতে পারবে না। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ اَفَحَسِبْتُمْ : এ আয়াতসমূহের ফজিলত : اَفَحَسِبْتُمْ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত এই আয়াতসমূহের বহু ফজিলত হাদীস শরীফে রয়েছে। বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ জিহাদের জন্যে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল প্রেরণ করেন আর এ আদেশ দেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় এ আয়াত সমূহ পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, আমরা নির্দেশ মোতাবেক এ আয়াতসমূহ পাঠ করতে থাকি। ফলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসি। এক ব্যক্তির কানে অত্যন্ত কষ্ট ছিল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতসমূহ পাঠ করে তার কানে ফুঁক দিয়েছিলেন তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এ কথা জানতে পেরে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন, শপথ সেই পবিত্র সত্তার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি কেউ পূর্ণ একীন নিয়ে এই আয়াতসমূহ পাহাড়ের উপর পাঠ করে, তবে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যাবে।

قَوْلُهُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ : এখানে اِغْفِرْ ও اِرْحَمْ উভয়ের مَفْعُوْل তথা কর্মপদ উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ কি ক্ষমা করা হবে এবং কিসের প্রতি রহম করা হবে, তা বলা হয়নি। এতে করে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে এবং রহমতের দোয়া প্রত্যেক উদ্দিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। কেননা ক্ষতি দূরীকরণ ও উপকার আহরণ মানব জীবন ও তার উদ্দেশ্যসমূহের নির্যাস। উভয়টিই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। -[মাযহারী]। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষ্পাপ ও রহমত প্রাপ্তই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁকে মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তোমাদের এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান হওয়া উচিত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ : সূরা মু'মিনূনের সূচনা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াত দ্বারা হয়েছিল এবং এর সমাপ্তি لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, ফালাহ অর্থাৎ পরিপূর্ণ সফলতা মু'মিনগণেরই প্রাপ্য এবং কাফেররা এ থেকে বঞ্চিত।

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা নূর মদিনায় অবতীর্ণ

وَهِىَ ثِنْتَانِ اَوْ اَرْبَعٌ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً

আয়াত : ৬২/৬৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. هٰذِهٖ سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا لِكَثْرَةِ الْمَفْرُوْضِ فِيْهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلَالَةِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ . بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الذَّالِ تَتَّعِظُوْنَ .

২. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ اَىْ غَيْرُ الْمُحْصَنَيْنِ لِرَجْمِهِمَا بِالسُّنَّةِ وَاَلْ فِيْمَا ذُكِرَ مَوْصُوْلَةٌ وَهُوَ مُبْتَدَاٌ وَلِشِبْهِهٖ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِىْ خَبَرِهٖ هُوَ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص اَىْ ضَرْبَةٍ يُقَالُ جَلَدَهٗ ضَرَبَ جِلْدَهٗ وَيُزَادُ عَلٰى ذٰلِكَ بِالسُّنَّةِ تَغْرِيْبُ عَامٍ وَالرَّقِيْقُ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا ذُكِرَ وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَىْ حُكْمِهٖ بِاَنْ تَتْرُكُوْا شَيْئًا مِنْ حَدِّهِمَا اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج اَىْ يَوْمِ الْبَعْثِ فِىْ هٰذَا تَحْرِيْضٌ عَلٰى مَا قَبْلَ الشَّرْطِ وَهُوَ جَوَابُهٗ اَوْ دَالٌّ عَلٰى جَوَابِهٖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اَىِ الْجَلْدَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . قِيْلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيْلَ اَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُوْدِ الزِّنَا .

অনুবাদ :

১. এটা একটি সূরা, এটা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি। فَرَضْنَا ফেলের رَاءْ বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়রূপেই পঠিত। পাঠে অবশ্য পালনীয় বিষয়াদির আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি; সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যার অর্থ একেবারেই পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে দ্বিতীয় تَاءْ -কে ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থ উপদেশ গ্রহণ, শিক্ষা লাভ।

২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী অর্থাৎ গায়রে মুহসিন। [মুহসিন বলা হয় বিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষকে।] কারণ সুন্নাহর মাধ্যমে মুহসিনের জন্য রজমের বিধান সাব্যস্ত রয়েছে। اَلزَّانِيَةُ -এর ال টি হলো مَوْصُوْلَةٌ এবং সেটা মুবতাদা হয়েছে। আর তার খবরে فَاءْ বৃদ্ধি করা হয়েছে শর্তের সাথে এর সদৃশের কারণে। আর তা হলো তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। অর্থাৎ বেত্রাঘাত। বলা হয় جَلَدَهٗ অর্থাৎ ضَرَبَهٗ তথা সে তাকে প্রহার করল। এবং সুন্নাহর মাধ্যমে এর উপর এক বছরের দেশান্তর বৃদ্ধি করা হবে। আর গোলাম বাঁদির ক্ষেত্রে উল্লিখিত শাস্তির অর্ধেক প্রযোজ্য হবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। অর্থাৎ, তাঁর আদেশ পালনে যে, তোমরা তাদের শাস্তির কিছু অংশ ছেড়ে দিবে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবসে। এর মাধ্যমে শর্তের পূর্বের অংশ তথা এ ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন না করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর উক্ত অংশটিই শর্তের জবাব, অথবা তার জবাবকে বুঝায় মুমিনদের একটি দল যেন তাদের সাজা প্রত্যক্ষ করে। অর্থাৎ বেত্রাঘাত দেখে। বলা হয়েছে তিন জন অথবা চারজন ব্যভিচারের সাক্ষীর পরিমাণ।

অনুবাদ :

٣. اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ يَتَزَوَّجُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ج اَىْ الْمُنَاسِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ اَىْ نِكَاحُ الزَّوَانِىْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ . الْاَخْيَارِ نَزَلَ ذٰلِكَ لَمَّا هَمَّ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اَنْ يَتَزَوَّجُوْا بُغَايَا الْمُشْرِكِيْنَ وَهُنَّ مُوْسِرَاتٌ لِيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ فَقِيْلَ التَّحْرِيْمُ خَاصٌّ بِهِمْ وَقِيْلَ عَامٌّ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ .

৩. ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারিণীকে অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করো না এবং ব্যভিচারিণী তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই সমীচীন ও প্রযোজ্য। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ব্যভিচারিণীদেরকে বিবাহ করা মুমিনগণের জন্য উত্তম ও নেককারদের জন্য। যখন কতিপয় দরিদ্র মুহাজির সাহাবী ধনবতী চরিত্রহীনা নষ্ট নারীকে বিয়ে করার চিন্তা ভাবনা করলেন, যাতে তারা তাঁদের ব্যয়ভার গ্রহণ করতে পারে, তখন অবতীর্ণ হলো। কেউ কেউ বলেন, উক্ত মুহাজিরগণের সাথেই এই নিষেধাজ্ঞা সুনির্দিষ্ট ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, তা ব্যাপক ছিল। তবে وَاَنْكِحُوا اَيَامٰى مِنْكُمْ আয়াত দ্বারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে যায়।

٤. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْعَفِيْفَاتِ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلٰى زِنَاهُنَّ بِرُؤْيَتِهِمْ فَاجْلِدُوْهُمْ اَىْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً فِىْ شَىْءٍ اَبَدًا ج وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ . لِاِتْيَانِهِمْ كَبِيْرَةً .

৪. যারা সাধবী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে পবিত্র সতী নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। এবং চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে কশাঘাত করবে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না যে কোনো ব্যাপারে। এরাই তো সত্যত্যাগী/ফাসিক কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

٥. اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ج عَمَلَهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لَّهُمْ قَذْفَهُمْ رَحِيْمٌ . بِهِمْ بِاِلْهَامِهِمُ التَّوْبَةَ فَبِهَا يَنْتَهِىْ فِسْقُهُمْ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَقِيْلَ لَا تُقْبَلُ رُجُوْعًا بِالْاِسْتِثْنَاءِ اِلَى الْجُمْلَةِ الْاَخِيْرَةِ .

৫. তবে যদি এরপর তারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে তাদের আমলকে আল্লাহ তো অতিশয় দয়াশীল তাদের প্রতি। তাদের অপবাদের পাপের ক্ষেত্রে। পরম দয়ালু তাদের প্রতি। তাদের হৃদয়ে তওবা উদ্রেক করে। সুতরাং এর মাধ্যমে তাদের ফিসক বা কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পাপ শেষ হয়ে যাবে। এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এ অভিমতের অনুসারীরা اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا -কে বাক্যের শেষাংশ তথা فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ -এর প্রতি নিসবত করেন। [অর্থাৎ যারা তওবা করে নিজেদের আমলের সংশোধন করে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাদের পাপ ক্ষমা করবেন। সুতরাং সাক্ষ্য গ্রহণ করার সাথে এর সম্পর্ক নেই।

অনুবাদ :

٦. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ بِالزِّنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَقَعَ ذٰلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ مُبْتَدَأٌ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ نَصَبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ فِيْمَا رَمٰى بِهٖ زَوْجَتَهٗ مِنَ الزِّنَا ـ

৬. এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে ব্যভিচারের ব্যাপারে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই। এ বিষয়ে। এক জামাত সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে এ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে। এটি মুবতাদা সে আল্লাহর নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, شَهَادَاتٌ শব্দটি মাসদার তথা مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। সে অবশ্যই সত্যবাদী যে ব্যভিচারের বিষয়ে সে তার স্ত্রীকে অপবাদ দিচ্ছে সে বিষয়ে।

٧. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ـ فِيْ ذٰلِكَ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ ـ

৭. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত। এ ব্যাপারে। এবং مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ হলো উহ্য يَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ অর্থাৎ তার থেকে অপবাদের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

٨. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَىْ حَدَّ الزِّنَا الَّذِىْ ثَبَتَ بِشَهَادَاتِهٖ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ فِيْمَا رَمَاهَا بِهٖ مِنَ الزِّنَا ـ

৮. তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে। অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তি যা তার সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। ব্যভিচারের যে ব্যাপারে সে তাকে অপবাদ দিচ্ছে।

٩. وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ فِيْ ذٰلِكَ ـ

৯. এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গজব। এ বিষয়ে।

١٠. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ بِالسَّتْرِ فِيْ ذٰلِكَ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ بِقَبُوْلِهٖ التَّوْبَةَ فِيْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ حَكِيْمٌ ـ فِيْمَا حَكَمَ بِهٖ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ لِيُبَيِّنَ الْحَقَّ فِيْ ذٰلِكَ وَعَاجَلَ بِالْعُقُوْبَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا ـ

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এ বিষয়কে গোপন রাখার ক্ষেত্রে। তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। এবং আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী এ পাপ ও অন্যান্য বিষয়ে তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময় এ ক্ষেত্রে এবং আরো যেসব বিষয়ে তিনি বিধান দান করেন। যাতে এ বিষয়ে সত্য স্পষ্ট করেন এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে দ্রুত শাস্তি দেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذِهٖ سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا : ব্যাখ্যাকার (র.) هٰذِهٖ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, سُوْرَةٌ হলো উহ্য مُبْتَدَأٌ এর خَبَرٌ ; هٰذِهٖ এর مَرْجِعٌ যদিও পূর্বে উল্লেখ নেই তবে যেহেতু উল্লেখের নিকটবর্তী, যা حَاضِرٌ -এর পর্যায়ে শামিল। অতএব اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ তথা مَرْجِعٌ উল্লেখ ছাড়াই ضَمِيْرٌ ব্যবহারের প্রশ্ন দূরীভূত হয়ে গেল। [জুমাল] আবার এমনও হতে পারে যে, سُوْرَةٌ হলো مُبْتَدَأٌ আর اَنْزَلْنَاهَا বাক্যে তার صِفَتٌ আর صِفَتٌ -এর কারণে مُبْتَدَأٌ نَكِرَةٌ হওয়া সঙ্গত হয়েছে। এর خَبَرٌ -এর ক্ষেত্রে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ বাক্য হয়ে خَبَرٌ যেমন ইবনে আতিয়া (র.)-এর অভিমত।

২. خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। বাক্যটি এমন হবে– فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بَعْدَ سُوْرَةٍ এখানে اَنْزَلْنَا দু'বার উল্লিখিত হওয়ার কারণ হলো অধিক গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝানো।

قَوْلُهُ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রমাণাদি। এ সূরার সূচনায় শরয়ী দণ্ড [হদ] ও কতিপয় বিধানের উল্লেখ ছিল। আর সূরার শেষে একত্ববাদের দলিল প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ فَرَضْنَا : এর দ্বারা শরয়ী বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ দ্বারা দলিল প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَتَذَكَّرُوْنَ : প্রথমে تَاءْ -কে دَالْ -এর নিকটবর্তী মাখরাজ হওয়ার কারণে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে অতঃপর دَالْ -কে ذَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে অপর ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। يَذَّكَّرُوْنَ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ : এটা হলো مُبْتَدَأٌ আর فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بَعْدَ অথবা فَاجْلِدُوْا হলো خَبَرٌ -আর خَبَرٌ -এর উপর فَاءْ প্রবিষ্ট হয়েছে। اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ -এর মধ্যে اَلِفْ لَامْ যেহেতু اَلَّذِيْ অর্থে, যার ফলে مُبْتَدَأٌ টি شَرْط -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়েছে। আর مُبْتَدَأٌ যদি شَرْط -এর অর্থ বিশিষ্ট হয় তাহলে خَبَرٌ টা جَزَاءٌ -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়েছে। আর مُبْتَدَأٌ যদি شَرْط -এর অর্থবিশিষ্ট হয় তাহলে خَبَرٌ টা جَزَاءٌ -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়। এ কারণে خَبَرٌ -এর শুরুতে فَاء আসে।

قَوْلُهُ فِيْ هٰذَا تَحْرِيْضٌ عَلٰى مَا قَبْلَ الشَّرْطِ الخ : আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (الاية) এ আয়াতে شَرْط -এর পূর্বে অর্থাৎ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ [তোমাদেরকে যেন দয়ায় পেয়ে না বসে।] এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি ঈমান থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে কারো পক্ষপাতিত্ব করো না, কারো উপর দয়া বশীভূত হয়ো না। কূফী নাহু শাস্ত্রবিদগণ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ -কে جَزَاءٌ مُقَدَّمٌ বলেছেন। আর বসরীগণ جَزَاءٌ -কে উহ্য মানেন এবং উপরিউক্ত আয়াতকে جَزَاءٌ -এর নির্দেশিকা বলেন। অর্থাৎ যে বাক্যটি دَالٌّ عَلَى الْجَزَاءِ হবে হুবহু ঐটিই উহ্য جَزَاءٌ হবে।

قَوْلُهُ وَلْيَشْهَدْ : এ নির্দেশটি মোস্তাহাবমূলক, ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ قِيْلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيْلَ اَرْبَعَةٌ : এ উভয় উক্তি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর। অর্থাৎ কোড়া মারার সময় তিন/চার ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, চার কিংবা ততোধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে। ইমাম নাসায়ী, মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে কমপক্ষে দু'জন থাকা বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ الْمُنَاسِبُ لِكُلٍّ مِنْهَا : এটা তাদের জন্য ধমক ও সতর্কবাণী যারা ব্যভিচারিণী তথা পতিতাদেরকে বিবাহ করতে চায়।

قَوْلُهُ الْاَيَامٰى : শব্দটি اَيِّمٌ-এর বহুবচন। অর্থ– বিধবা ও স্বামীহীনা নারী, [চাই বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা] এবং স্ত্রীহীন পুরুষ উভয়কে বুঝায়।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ : এ অংশটি مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ হলো ৩টি। যথা– ১. فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ ২. جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ৩. وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এটা পূর্বে উভয় বাক্য لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً এবং اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ থেকে مُسْتَثْنٰى সুতরাং কোনো সতী-সাধ্বী নারী বা নির্দেশ পুরুষকে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের পর যদি খাঁটি মনে তওবা করে এবং নিজ আমল সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের মতে, এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের ফাসিক হওয়াও রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ اِسْتِثْنَاءٌ হলো শেষ বাক্য– اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অতএব ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর উপর থেকে فِسْق তথা ফাসিক হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

قَوْلُهُ وَقَعَ ذٰلِكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ : অর্থাৎ স্ত্রীকে অপবাদ আরোপের ঘটনা তিন জন সাহাবী থেকে ঘটেছিল। ১. হিলাল ইবনে উমাইয়া ২. উয়াইমির আজলানী ও ৩. আসিম ইবনে আদী। –[হাশিয়াতুল জুমাল]

قَوْلُهُ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ : এটা مَرْفُوْعٌ হওয়ার তিনটি কারণ থাকতে পারে। যথা–

১. এটা مُبْتَدَأٌ আর এর خَبَرٌ আগে উহ্য রয়েছে। যথা– فَعَلَيْهِمْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ অথবা পরে, যথা– فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ كَائِنَةٌ

২. مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ হবে। যথা– فَالْوَاجِبُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

৩. উহ্য ফে'লের ফায়েল হবে। যথা– فَيَكْفِيْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

চতুর্থ আরেকটি তারকীব হতে পারে যা আমাদের ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ শাহাদাত হলো مُبْتَدَأٌ আর تَدْفَعُ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ হলো خَبَرٌ ; তবে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে এটাকে قِيْلَ দ্বারা উল্লেখ করেছেন, যা দুর্বলতার পরিচায়ক।

অধিকাংশ আলেম اَرْبَعَ-কে মাসদার তথা مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ পড়েছেন। আর এর আমিল হল شَهَادَةٌ মাসদার اَرْبَعَ হলো লুপ্ত مَوْصُوْفٌ-এর صِفَتٌ অর্থাৎ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ شَهَادَةً اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ

সারকথা– فَشَهَادَةُ মাসদার তার ফায়েল اَحَدِهِمْ-এর প্রতি مُضَافٌ হয়েছে। মূলত يَشْهَدُ اَحَدُهُمْ অর্থে। এটা مَرْفُوْعٌ হওয়ার দুটি কারণ থাকতে পারে। যথা–

১. এটা উহ্য مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ বাক্যটি এরূপ ছিল– فَالْوَاجِبُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

২. شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ হলো مُبْتَدَأٌ আর এর خَبَرٌ লুপ্ত রয়েছে, অর্থাৎ– فَعَلَيْهِمْ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ

قَوْلُهُ ابع : اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ এটা خَبَرٌ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ-ও পঠিত আছে। فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ হলো مُبْتَدَأٌ আর হলো خبر ; এক্ষেত্রে বিলুপ্তির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। জমহুর তথা অধিকাংশের মতে اَرْبَعَ-কে مَنْصُوْبٌ-ও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ– يَشْهَدُ اَحَدُهُمْ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ

قَوْلُهُ بِاللّٰهِ : বসরীগণের মতে এটা شَهَادَاتٌ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। নিকটবর্তী হওয়ার কারণে। আর কূফীগণের মতে شَهَادَةٌ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা এটা আগে এসেছে।

قَوْلُهُ اِنَّهُ : এটা شَهَادَةٌ বা شَهَادَاتٌ-এর مَعْمُوْلٌ অর্থাৎ, يَشْهَدُ عَلٰى اَنَّهُ صَادِقٌ-এর থেকে عَلٰى-কে বিলোপ করা হয়েছে, আর اَنَّ-এর যবরকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং আমেলকে لَامْ تَاكِيْد-এর কারণে আমল থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْخَامِسَةُ لَعْنَةَ عَلَيْهِ : এটা مُبْتَدَأٌ আর أَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ হলো خَبَرٌ ; বাক্যটি এরূপ ছিল- وَالشَّهَادَةُ الْخَامِسَةُ أَنَّ

قَوْلُهُ أَنْ تَشْهَدَ : এটা يَدْرَءُ-এর فَاعِلٌ

قَوْلُهُ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ : لَوْلَا-এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি মূলত لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ لَفَضَحَكُمْ أَوْ لَهَلَكْتُمْ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নূরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ, শাসন-শৃঙ্খলা এবং তাওহীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। চরিত্রের পবিত্রতা অর্জন এবং নৈতিক মান উন্নয়নের উপর এ সূরায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এ সূরা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) কূফাবাসীর নামে একটি ফরমান জারি করেছিলেন। যা নিম্নরূপ- عَلِّمُوْا نِسَاءَكُمْ سُوْرَةَ النُّوْرِ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও, যাতে করে তারা অবহিত হয় যে, চরিত্রের পবিত্রতাই হলো নূর এবং চরিত্রের অপবিত্রতা হলো অন্ধকার।

হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, স্ত্রীলোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবে না, তাদেরকে লেখনী শিক্ষা দেবে না, তাদেরকে সূরা নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সূতো কাটা শিক্ষা দেবে। -[মারিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৯৩]

সায়ীদ ইবনে মনসূর, ইবনুল মুনজির, বায়হাকী মুজাহিদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে সূরা মায়েদা শেখাও; আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নূর শেখাও।

হারেসা ইবনে মেজরাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরা নিসা, সূরা আহযাব এবং সূরা নূর শেখাও। -[রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ৭৪]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা মু'মিনূন -এর প্রারম্ভে মুমিনগণের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুমিনগণের নৈতিক মান উন্নীত থাকে। তারা চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী হয়। কখনো তারা অন্যায় অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় না, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃন্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা অনেক দূরে থাকে। আর এমনি গুণাবলির অধিকারী হওয়ার কারণেই তারা হয় জান্নাতুল ফেরাদৌসের উত্তরাধিকারী। আর এ সূরার প্রারম্ভে সেসব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে এবং যারা এ পর্যায়ে সীমালঙ্ঘন করে।

যারা এমনি অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তর থেকে নূর দূরীভূত হয়ে যায়। আর যারা অনাচার, ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে, তাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন ঐ নূরই কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এজন্যে হাদীস শরীফে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, পুলসিরাতে পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর বিদায় নেবে, তারা আর পুলসিরাতের পথ দেখবে না। এজন্যে মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হবে যেন মুনাফিকদের ন্যায় মুমিনদের নূরও দূরীভূত না হয়। এ কারণেই মুমিনগণ আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নূরকে পরিপূর্ণ করার জন্যে মুনাজাত করে বলে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায়? এ কথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদ সমূহে, আল্লাহ জিকিরের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগীর মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায়-অনাচার ও ব্যভিচার এবং জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে। আর এ নূর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের নূর।

অতএব, মুমিনগণের নেক আমল হলো নূরানী এবং তার দ্বারা মুমিনের কলব থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমরাহীর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কিয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে যারা এ জীবনে অন্যায়-অনাচারে, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কিয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। যদি তওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতার পর্যবসিত। এজন্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহ পাককে ভয় করে, পরহেজগারী অবলম্বন করে, তারাই হবে [জীবন-সাধনায়] সফলকাম।

আলোচ্য সূরার মূল বক্তব্য : সর্বপ্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে যেসব মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তাওহীদের বিবরণ ও আখিরাতের স্মরণের তাগিদ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এ সূরার প্রথম আয়াত ভূমিকাস্বরূপ, যা দ্বারা এর বিধানাবলির বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি যা সূরার উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্যে দৃষ্টির হেফাজত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারো গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলি পরে বর্ণিত হবে। ব্যভিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিঙ্গিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমানায় উপনীত হওয়া এবং আল্লাহর বিধানাবলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপারাধসমূহের যেসব শাস্তি কুরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যভিচারের শাস্তি সবচেয়ে কঠোর ও অধিক। ব্যভিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপরি সে নিজের সাথে আরো শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলি সংঘটিত হয় অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোনো নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতা মূলোৎপাটনের জন্যে এর শরিয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যভিচার একটি চরম অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, তাই শরিয়তে এর শাস্তি সর্ববৃহৎ রাখা হয়েছে : কুরআন পাক ও মূতাওয়াতির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোনো বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর তা ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'হুদূদ' বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্য যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরিয়তের পরিভাষায় 'তা'যীরাত' [দণ্ড] বলা হয়। হুদূদ চারটি। যথা- চুরি, কোনো সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যভিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্ব স্থলে গুরুতর, জগতের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যভিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোনো অপরাধে নেই। যেমন-

১. কোনো ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামান্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কুরবানি করা ততটুকু কঠিন নয় যতুটুকু কঠিন তার অন্দর মহলের উপর হাত রাখা। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অন্দরহহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন পণ করে ব্যভিচারীর প্রাণ সংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধস্পৃহা বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

২. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারো বংশই সংরক্ষিত থাকে না। জননী, ভগিনী, কন্যা প্রমুখের সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যভিচারে চেয়েও কঠোরতর অপরাধ।

৩. চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশান্তি ও অনর্থ দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চেয়ে কম কারণ অর্থসম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বাইরে যেতে না দেয়, সেই আইনই বিশ্বশান্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। এটা ব্যভিচারে যাবতীয় অনিষ্ট ও অপকারিতা সন্নিবেশিত করা ও বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান নয়। মানব সমাজের জন্য এর ধ্বংসকারিতা জানার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তিকে অন্যান্য অপরাধের শাস্তির চেয়ে কঠোরতর করেছে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأَةَ جَلْدَةٍ এতে ব্যভিচারিণী নারীকে অগ্রে এবং ব্যভিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলি বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশ দান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কুরআনে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সঙ্গোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেওয়া হয়। যেমন- اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অগ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَا বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমত নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গত রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টত উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত নারীকে পুরুষের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে; এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টত উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবত নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যভিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ঔদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষেণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হিফাজতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে এ কাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা তার বিপরীত। পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্য খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। তাই সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

قَوْلُهُ فَاجْلِدُوْا : جَلْد শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি جِلْدٌ [চামড়া] থেকে উদ্ভূত। কারণ চাবুক সাধারণত চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন- جلد শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই কশাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কশাঘাতের শাস্তিকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, তাতে মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোনো কষ্টই অনুভূত না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষ্যসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ কশাঘাতের উল্লিখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা : স্মর্তব্য যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লঘু থেকে গুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে। যেমন- মদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কুরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আয়াতদ্বয় এই-

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا . وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا .

অর্থাৎ "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চারজন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করে দেন এবং তোমাদের মধ্যে যে পুরুষ এই অপকর্ম করে তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী দয়ালু।" এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তাফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যভিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগে জনসম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্য এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হলো। আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচারে প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্য গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্য কষ্ট প্রদান করা উল্লিখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ বিধান নয়; বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا অংশের মর্ম তা-ই।

উল্লিখিত শাস্তিতে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মতো যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের শাস্তিও যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোনো বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা হয়নি; বরং কুরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর, তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল। যার পরিমাণ শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্য অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মন্তব্য করলেন, সূরা নিসায় أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অন্য কোনো পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য একশ কশাঘাত করা শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একশ কশাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করে বললেন– يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ অর্থাৎ সেই পথ ও ব্যভিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ কশাঘাত করা হবে।

বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশ কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা– একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কোনো হাদীসের প্রমাণ থেকে জেনে থাকবেন। সেই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সুনানে নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় ওবাদা ইবনে সামিতের রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন কর, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্য সূরা নিসায় প্রতিশ্রুত পথ সূরা নূরে বলে দিয়েছেন। তা এই যে, অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য একশ কশাঘাত ও প্রস্তরঘাতে হত্যা। –[ইবনে কাসীর]

সূরা নূরে উল্লিখিত অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি একশ কশাঘাতের সাথে এই হাদীসে একটি বাড়তি সাজা উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, পুরুষকে এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। দেশান্তরিত করার এই শাস্তি পুরুষের জন্য একশ কশাঘাতের ন্যায় অপরিহার্য, নাকি বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল যে, তিনি প্রয়োজনবোধ করলে এক বছরের জন্য

দেশান্তরিতও করে দেবেন? এই ব্যাপারে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে শেষোক্ত মতই নির্ভুল। অর্থাৎ বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত এই হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও নারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা এর আগে একশ' কশাঘাতের শাস্তিও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যপ্রণালী থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, উভয় প্রকার শাস্তি একত্র হবে না। বিবাহিতকে শুধু প্রস্তরাঘাতে হত্যাই করা হবে। এই হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا আয়াতের তাফসীর করেছেন। তাফসীরে সূরা নূরের আয়াতে বিধৃত একশ কশাঘাতের উপর কতিপয় অতিরিক্ত বিষয়ও সংযুক্ত হয়েছে। ১. একশ কশাঘাতের শাস্তি অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া। ২. এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করা এবং ৩. বিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার বিধান । বলা বাহুল্য, সূরা নূরের আয়াতের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয়ের বাড়তি সংযোজন করেছেন, এগুলোও আল্লাহর ওহী ও আল্লাহর আদশে বলে ছিল। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে– إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحٰى ; পয়গাম্বর ও তাঁর কাছ থেকে যারা সরাসরি শোনে, তাদের পক্ষে পঠিত ওহী অর্থাৎ কুরআন ও অপঠিত ওহী উভয়ই সমান। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিপুল সমাবেশের সামনে এই বিধান কার্যে পরিণত করেছেন। মা'ইয ও গামেদিয়ার উপর তিনি প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান জারি করেছেন, যা সব হাদীসগ্রন্থে সহীহ সনদসহ বর্ণিত আছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানীর রেওয়ায়েতে আছে জনৈকা বিবাহিতা মহিলার সাথে তার অবিবাহিত চাকর ব্যভিচার করে। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আমি তোমাদের ব্যাপারে ফয়সালা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করব। অতঃপর তিনি আদেশ দিলেন যে, ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশ কশাঘাত কর। তিনি বিবাহিত মহিলাকে প্রস্তরঘাতে হত্যা করার জন্য হযরত উনায়সকে আদেশ দিলেন। উনায়স নিজে মহিলার জবানবন্দি নিলে সেও স্বীকারোক্তি করল। তখন তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করা হলো। –[ইবনে কাসীর]

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একজনকে একশ কশাঘাত এবং অপরজনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন। তিনি উভয় শাস্তিকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা বলেছেন। অথচ নূরের আয়াতে শুধু একশ কশাঘাতের শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে; প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি উল্লিখিত নেই। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে এই আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা পুরোপুরি বলে দিয়েছিলেন। কাজেই এই তাফসীর আল্লাহর কিতাবেরই অনুরূপ; যদিও তার কিছু অংশ আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত ও পঠিত নেই। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ভাষণ হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়তে উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষ্য নিম্নরূপ–

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشٰى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِهِ فَرِيْضَةً أَنْزَلَهَا اللّٰهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنَا إِذَا حَصُنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الْاِعْتِرَافُ .

অর্থাৎ হযরত ওমর ফারূক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাজিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। মনে রেখ, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে– একথা সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি তা প্রযোজ্য; যদি ব্যভিচারের শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। –[মুসলিম খ. ২, পৃ. ৬৫]

এই রেওয়ায়েত সহীহ বুখারীতে আরো বিস্তারিত বর্ণিত আছে। [বুখারী খ. ২, পৃ. ১০০৯] নাসায়ীতে এই রেওয়ায়েতের ভাষ্য নিম্নরূপ–

اِنَّا لَا نَجِدُ مِنَ الرَّجْمِ بُدًّا فَاِنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ اَلَا وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَلَوْلَا اَنْ يَقُوْلَ قَائِلُوْنَ اِنَّ عُمَرَ زَادَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَيْسَ فِيْهِ لَكَتَبْتُ فِيْ نَاحِيَةِ الْمُصْحَفِ وَشَهِدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ .

অর্থাৎ "শরিয়তের দিক দিয়ে আমরা ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে বাধ্য। কেননা এটা আল্লাহর অন্যতম হদ। মনে রেখে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং আমরা তাঁর পরেও রজম করেছি। যদি এরূপ আশংকা না থাকত যে, লোকে বলবে, ওমর আল্লাহর কিতাবে নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করেছেন, তবে আমি কুরআনের এক প্রান্তে এটা লিখে দিতাম। ওমর ইবনে খাত্তাব, আব্দুর রহমান ইবন আউফ এবং অমুক অমুক সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরা রজম করেছি।" –[ইবনে কাসীর]

হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর এই ভাষণ থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, সূরা নূরের আয়াত ছাড়া রজম সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত আছে। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) সেই আয়াতের ভাষ্য প্রকাশ করেননি। তিনি একথাও বলেননি যে, সেই স্বতন্ত্র আয়াতটি কুরআনে কেন নেই এবং তা পঠিত হয় না কেন? তিনি শুধু বলেছেন, আমি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করেছি এই মর্মে দোষারোপের আশংকা না থাকলে আমি আয়াতটি কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম। –[নাসায়ী]

এই রেওয়ায়েত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সেটা যদি বাস্তবিকই কুরআনের আয়াত হয় এবং পাঠ করা ওয়াজিব হয়, তবে হযরত ওমর (রা.) মানুষের নিন্দাবাদের ভয়ে একে কিরূপে ছেড়ে দিলেন, অথচ ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কঠোরতা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এখানে আরো প্রণিধানযোগ্য বিষয়ে এই যে, হযরত ওমর (রা.) একথা বলেননি যে, আমি এই আয়াতকে কুরআনে দাখিল করে দিতাম; বরং বলেছেন, আমি একে কুরআনের প্রান্তে লিখে দিতাম।

এসব বিষয় ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত ওমর (রা.) সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতের যে তাফসীর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছিলেন, যাতে তিনি একশ কশাঘাত করার বিধান অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন এবং বিবাহিতের জন্য রজমের বিধান দিয়েছিলেন, সেই তাফসীরকে এবং তদনুযায়ী রাসূল ﷺ -এর কার্যপ্রণালীকে তিনি আল্লাহর কিতাব ও কিতাবের আয়াত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাফসীর ও বিবরণ কিতাবের হুকুম রাখে, স্বতন্ত্র আয়াত নয়। নতুবা এই পরিত্যক্ত আয়াতকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে কোনো শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারত না। প্রান্তে লিখে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশও এ বিষয়ের প্রমাণ যে, সেটা স্বতন্ত্র কোনো আয়াত নয়; বরং সূরা নূরের আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এ স্থলে স্বতন্ত্র আয়াত বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়েত সনদ ও প্রমাণের দিক দিয়ে এরূপ নয় যে, এগুলোর ভিত্তিতে কুরআনে একে সংযুক্ত করা যায়। ফিকহবিদগণ একে 'তেলাওয়াত মনসূখ, বিধান মনসূখ নয়'–এর দৃষ্টান্তে পেশ করেছেন। এটা নিছক দৃষ্টান্তই মাত্র। এতে প্রকৃতপক্ষে এর কুরআনী আয়াত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

সারকথা এই যে, সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষের একশ কশাঘাতের শাস্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরের ভিত্তিতে অবিবাহিতদের জন্য নির্দিষ্ট এবং বিবাহিতদের শাস্তি রজম। এই বিবরণ আয়াতে উল্লিখিত না থাকলেও যে পবিত্র সত্তার প্রতি আয়াত নাজিল হয়েছিল, তাঁর পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত আছে। শুধু মৌখিক শিক্ষাই নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের সামনে একাধিকবার বাস্তবায়নও প্রমাণিত রয়েছে। এ প্রমাণ আমাদের নিকট পর্যন্ত 'তাওয়াতুর' তথা সন্দেহাতীত বর্ণনা পরম্পরার মাধ্যমে পৌছেছে। তাই বিবাহিত পুরুষ ও নারীর এই বিধান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বিধান। একথাও বলা যায় যে, রজমের শাস্তি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা আকাট্যরূপে প্রমাণিত। হযরত আলী (রা.) থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে। উভয় বক্তব্যের সারমর্মই একরূপ।

জরুরি জ্ঞাতব্য : এ স্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্য লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়র মুহসিন' অথবা 'সাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরিয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এই অর্থ বুঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যভিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিনটি স্তর : উপরিউক্ত রেওয়ায়েত ও কুরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, প্রথমে ব্যভিচারের শাস্তি লঘু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এ বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' কশাঘাত করতে হবে। কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামি আইনে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও কড়া রাখা হয়েছে : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের ব্যাভিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর এতদসঙ্গে ইসলামি আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্য শর্তাবলিও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যভিচারের চরম শাস্তি 'হদ' মাফ হয়ে শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অপরাধ অনুযায়ী অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ব্যভিচারে হদ জারি করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষীর চাক্ষুষ ও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য জরুরি; যেমনটা সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যে দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরি কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের উপর 'হদ্দে কযফ' জারি করা হবে; অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। তাই সামান্য সন্দেহ থাকলে কোনো ব্যক্তি এই সাক্ষ্যে দানে অগ্রসর হবে না। যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারের প্রমাণ না থাকে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা দুই জন পুরুষ ও নারীর অবৈধ অবস্থায় পরিলক্ষিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে বিচারক তাদের অপরাধের অনুপাতে দণ্ডমূলক শাস্তি তথা বেত্রাঘাত ইত্যাদি জারি করতে পারেন। এর শর্তাবলি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাবলি ফিকহগ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

পুরুষ কোনো পুরুষের সাথে অথবা জন্তুর সাথে অপকর্ম করলে তা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এবং এর শাস্তিও ব্যভিচারের শাস্তি কিনা? এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা নিসার তাফসীরে করা হয়েছে। তা এই যে, অভিধানে ও পরিভাষায় যদিও একে ব্যভিচার বলা হয় না, তাই হদ প্রযোজ্য নয়; কিন্তু এর শাস্তিও কঠোরতায় ব্যভিচারের শাস্তির চেয়ে কম নয়। সাহাবায়ে কেরাম এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ : ব্যভিচারের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর বিধায় শাস্তি প্রয়োগকারীদের পক্ষ থেকে দয়াপরবশ হয়ে শাস্তি ছেড়ে দেওয়ার কিংবা হ্রাস করার সম্ভাবনা আছে। তাই সাথে সাথে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান কার্যকরকরণে অপরাধীদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া বৈধ নয়। দয়া, অনুকম্পা ও ক্ষমা সর্বত্র প্রশংসনীয়; কিন্তু অপরাধীদের প্রতি দয়া করার ফল সমগ্র মানবজাতির প্রতি নির্দয় হওয়া। তাই এটা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

قَوْلُهُ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের একটি দল উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলামে সব শাস্তি বিশেষত হুদুদ প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে দর্শকরা শিক্ষালাভ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একদল লোককে উপস্থিত থাকার আদেশ দান ব্যভিচারের শাস্তির বৈশিষ্ট্য।

ইসলামে প্রথম পর্যায়ে অপরাধ গোপন রাখার বিধান আছে; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল অপরাধীদের পূর্ণ লাঞ্ছনাও সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা : অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ-কারবার দমনের জন্য ইসলামি শরিয়ত দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাহারা বসিয়েছে। মেয়েদের জন্য পর্দা অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অলংকারের শব্দ ও নারীকণ্ঠের গানের শব্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এটা নির্লজ্জ কাজে উৎসাহ যোগায়। সাথে সাথে যার মধ্যে এসব ব্যাপারে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাকে একান্ত বোঝাবার আদেশ আছে; কিন্তু লাঞ্ছিত করার অনুমতি নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি শরিয়ত আরোপিত সাবধানতাসমূহ ডিঙিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার অপরাধ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, তদবস্থায় তার অপরাধ গোপন রাখা অন্যদের সাহস বাড়ানোর কারণ হতে পারে। তাই এ পর্যন্ত অপরাধ গোপন রাখার জন্য শরিয়ত যতটুকু যত্নবান ছিল, এমন অপরাধীকে জনসমক্ষে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্যও ইসলাম ততটুকুই যত্নবান। এ

কারণেই ব্যভিচারের শাস্তি শুধু প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি; বরং মুসলমানদের একটি দলকে তাতে উপস্থিত থাকার ও অংশগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً الخ : ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান : পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত প্রথম বিধান ছিল ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত। এই দ্বিতীয় বিধান ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর সাথে বিবাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। এর সাথে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীর সাথে বিবাহেরও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। তন্মধ্যে অধিক সহজ ও নির্ভেজাল মনে হয় এই যে, আয়াতের সূচনাভাগে শরিয়তের কোনো বিধান নয়; বরং একটি সাধারণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যভিচার একটি অপকর্ম এবং এর অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ব্যভিচার একটি চারিত্রিক বিষ। এর বিষাক্ত প্রভাবে মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে যায়। ভালোমন্দের পার্থক্য লোপ পায় এবং দুশ্চরিত্রতাই কাম্য হয়ে যায়। হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোক ব্যভিচার ও ব্যভিচারে সম্মত করার উদ্দেশ্যই কোনো নারীকে পছন্দ করে। ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে অপারগ অবস্থায় বিবাহ করতে সম্মত হয়, কিন্তু সে মনেপ্রাণে বিবাহকে পছন্দ করে না। কেননা বিবাহের লক্ষ্য হচ্ছে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করা এবং সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়া। এর জন্য স্ত্রীর আজীবন ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ও অন্যান্য অধিকার মেনে নিতে হয়। চরিত্রভ্রষ্ট লোক এসব দায়িত্ব পালনকে সাক্ষাৎ বিপদ মনে করে। যেহেতু বিবাহ ঐ ধরনের লোকের উদ্দেশ্যই থাকে না, তাই তাদের আগ্রহ শুধু মুসলমান নারীদের প্রতিই নয়; বরং মুশরিকা নারীদের প্রতিও থাকে। মুশরিকা নারী যদি তার ধর্মের খাতিরে কিংবা কোনো সামাজিক প্রথার কারণে বিবাহের শর্ত আরোপ করে, তবে বাধ্য হয়ে তাকে বিবাহ করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়। এ বিবাহ হালাল ও শুদ্ধ কিনা অথবা শরিয়ত মতে বাতিল হবে কিনা, সেদিকে তারা বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ করে না। কাজেই এরূপ চরিত্রভ্রষ্ট লোকদের বেলায় একথা সত্য যে, তারা যে নারীকে পছন্দ করবে, সে মুসলমান হলে ব্যভিচারিণী হবে, পূর্ব থেকে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হোক কিংবা তাদের সাথে ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারিণী কথিত হোক। অথবা তারা কোনো মুশরিকা নারীকে পছন্দ করবে, যাকে বিবাহ করাই ব্যভিচারের নামান্তর। এ হচ্ছে আয়াতের প্রথম বাক্য অর্থাৎ اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً -এর অর্থ।

এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত এবং তওবা করে না, তার প্রতি কোনো সত্যিকার মু'মিন মুসলমানের আগ্রহ থাকতে পারে না। কারণ মু'মিন মুসলমানের আসল লক্ষ্য হলো বিবাহ এবং বিবাহের শরিয়তসম্মত উপকারিতা ও লক্ষ্য অর্জন। এরূপ নারী দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জন আশা করা যায় না; বিশেষত যখন একথাও জানা থাকে যে, এই নারী বিবাহের পরও ব্যভিচারের বদ-অভ্যাস ত্যাগ করবে না। হ্যাঁ, এরূপ নারীকে কোনো ব্যভিচারীই পছন্দ করবে, যার আসল লক্ষ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, বিবাহ উদ্দেশ্য নয়। যদি এই ব্যভিচারিণী নারী কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে তার সাথে মিলনের জন্য বিবাহের শর্ত আরোপ করে তবে অনিচ্ছা সহকারে বিবাহেও সম্মত হয়ে যায়। অথবা এরূপ নারীকে বিবাহ করতে কোনো মুশরিক সম্মত হবে। যেহেতু মুশরিকের সাথে বিবাহ শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারের নামান্তর, তাই এতে দুটি বিষয়ের সমাবেশ হবে অর্থাৎ সে মুশরিকও এবং ব্যভিচারীও। এ হচ্ছে আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য অর্থাৎ- وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ -এর অর্থ।

উল্লিখিত তাফসীর থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বলে এমন পুরুষ ও নারীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তওবা করে না এবং বদভ্যাসে অটল থাকে। যদি তাদের মধ্যে কোনো পুরুষ ঘর-সংসার কিংবা সন্তান-সন্ততি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করে কিংবা কোনো ব্যভিচারিণী নারী কোনো সৎপুরুষকে বিবাহ করে, তবে আয়াত দ্বারা এরূপ বিবাহের অশুদ্ধতা বোঝা যায় না। শরিয়ত মতে এরূপ বিবাহ শুদ্ধ হবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট ফিকহবিদের মাযহাব তাই। সাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ বিবাহ ঘটানোর ঘটনাবলি প্রমাণিত আছে। তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এরূপ ফতোয়াই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ : আয়াতের এই শেষ বাক্যে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে ذٰلِكَ বলে জেনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইশারা করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ এই যে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম, তাই মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। এই তাফসীরে অর্থের দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ذٰلِكَ শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বোঝানো

আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অবশ্যই সঙ্গতিহীন। তাই অন্যান্য তাফসীরকারক বলেন যে, ذَالِكَ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এছাড়া ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যভিচারিণী নারীর সাথে সৎপুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সৎপুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যভিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে। কেননা এমতাবস্থায় এটা হবে দায়্যূসী [ভেড়ুয়াপনা] যা শরিয়তে হারাম। এমনিভাবে কোনো সম্ভ্রান্ত সতী নারী যদি কোনো ব্যভিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যভিচারে সম্মত থাকে তবে তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারস্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরি নয়। শরিয়তের পরিভাষায় 'হারাম' শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. কাজটি গুনাহ। যে তা করে সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোনো পার্থিব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়। যেমন– কোনো মুশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবিরা গুনাহ এবং শরিয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যভিচার ও এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

২. কাজটি হারাম অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গুনাহ; কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোনো নারীকে ধোঁকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এবং শরিয়তানুযায়ী দুজন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতি ক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গুনাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সন্তানরা পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোনো পার্থিব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যভিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম; কিন্তু পার্থিব বিধানে তা বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরিয়তারোপিত ফলাফল যেমন ভরণপোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে حُرِّمَ শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ সঠিক। কোনো কোনো তাফসীরকারক আয়াতটি মনসূখ তথা রহিত বলেন; কিন্তু বর্ণিত তাফসীর অনুযায়ী আয়াতটি মনসুখ বলার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الخ : ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান : মিথ্যা অপবাদ একটি অপরাধ এবং তার হদ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরিয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চেয়ে বেশি কঠোর রেখেছে। এক্ষণে কেউ যাতে কোনো পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না করে, সেজন্য ব্যভিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। শরিয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্যে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরিয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোনো ব্যক্তি কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুৎসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজ চোখে এই অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চারজনের চেয়ে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া কোনো অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : এখানে কেউ বলতে পারে যে, ব্যভিচারের সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে এত কড়া শর্ত আরোপ করার ফলে অপরাধীরা নাগালের বাইরে চলে যাবে। কেউ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস করবে না এবং কোনো সময় শরিয়তসম্মত প্রমাণ উপস্থিত হবে না। ফলে এ ধরনের অপরাধী কখনো শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু বাস্তবে এই ধারণা ভ্রান্ত। কেননা এসব শর্ত হচ্ছে ব্যভিচারের হদ অর্থাৎ একশ বেত্রাঘাত অথবা রজমের শাস্তি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন গায়র মাহরাম পুরুষ ও নারীকে একত্রে আপত্তিকর অবস্থায় অথবা নির্লজ্জ কথাবার্তা বলা অবস্থায় দেখে এ ধরনের সাক্ষ্যদানের উপর কোনো শর্ত আরোপিত নেই। এ ধরনের যেসব বিষয় ব্যভিচারের ভূমিকা, সেগুলোও শরিয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে এক্ষেত্রে হদের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না: বরং বিচারক অথবা শাসনকর্তার বিবেচনা অনুযায়ী বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে।

কাজেই যে ব্যক্তি দুইজন পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখবে, অন্য সাক্ষী না থাকলে সে প্রকাশ্য ব্যভিচারের সাক্ষ্য দেবে না; কিন্তু অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে এবং বিচারক অপরাধ প্রমাণিত হলে তাদেরকে দণ্ডমূলক শাস্তি দিতে পারবে।

মুহসিনাত কারা? مُحْصَنَاتٌ শব্দটি اِحْصَانٌ থেকে উদ্ভূত। শরিয়তের পরিভাষায় اِحْصَانٌ দু' প্রকার। একটি ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ব্যভিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য اِحْصَانٌ এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় কোনো নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য اِحْصَانٌ এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালেগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং সৎ হতে হবে অর্থাৎ, পূর্বে কখনো তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই। -[জাসসাস]

قَوْلُهُ وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا : অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবির কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোনো মুকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা না করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাফী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হ্যাঁ, তবে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যাদের উপর অপবাদের হদ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোধরায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু।

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا : এ বাক্যের এই ব্যতিক্রম বিধান ইমাম আবূ হানীফা ও অন্য কয়েক জন্য ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে অর্থাৎ, وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ-এর সাথে অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক; কিন্তু যদি সে খাঁটি মনে তওবা করে এবং উল্লিখিতভাবে নিজের অবস্থা শোধরায়, তবে ফাসেক থাকবে না এবং তাঁর পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া- এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহাল থাকবে। কেননা প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তওবা দ্বারা হদ মাফ হয় না; যদিও পরকালীন আজাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি তথা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দ্বারা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লিখিত ব্যতিক্রম বিধান পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্কে রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাসসাস ও মাযহারীতে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি ও জবাব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ الخ : ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেয়ান : لِعَانٌ ও مُلَاعَنَتٌ শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরিয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ কয়েকটি শপথ দেওয়াকে লেয়ান বলা হয়। যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়; আর অপর পক্ষে স্ত্রী তার স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চারজন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চারজন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেয়ান করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে

উল্লিখিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা বলা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরিউক্ত ভাষায় পাঁচবার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচবার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচবার কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরিউক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেয়ান পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী? মিথ্যাবাদী পরকালে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেওয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না। লেয়ানের এই বিবরণ ফিকহগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামি শরিয়তে লেয়ানের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরি যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চারজন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টা তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চারজন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ করে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে; কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খুলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে আর যদি মুখ না খুলে তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন ধারণও দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা- বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, লেয়ান শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেয়ানের আয়াতের শানে নুযূল কোন ঘটনাটি? এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন, বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নববী (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে নুযূল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানীতে বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই জবানীতে মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন কুরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً আয়াতটি অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ এতে কোনো নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরি করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে; তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) রাসুলাল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাজিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কি শুনছ তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর এ কথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। অতঃপর হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) নিজেই আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ!

আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমার পুরাপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরি যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং তাদেরকে সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এ স্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপে বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই। -[কুরতুবী]

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াজের এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হিলাল ইবনে উমাইয়া ইশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন; কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্র হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে, কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরিয়তের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন, আল্লাহ কসম! আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলালের ব্যাপারে কুরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চার সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। উত্তরে তিনি আরজ করলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন , তাঁর কসম! আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন কোনো বিধান নাজিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবর্তা চলছিল, এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আ.) লেয়ানের আইন সম্বলিত আয়াত অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

আবূ ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরো বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্যার সমাধান নাজিল করেছেন। হিলাল আরজ করলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেওয়া হলো। সে বলল, আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তা'আলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আজাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হিলাল (রা.) আরজ করলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমি সম্পূর্ণ কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেয়ান করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, তুমি কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও! অর্থাৎ আমি আল্লাহকে হাজির ও নাজির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল (রা.) আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষ্য এরূপ- যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হিলাল (রা.)-কে বললেন, দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহর আজাব মানুষের দেওয়া শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরজ করলেন, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আজাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেওয়া হলো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহর আজাব মানুষের আজাব তথা ব্যভিচারের শাস্তির চেয়ে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ

অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লেয়ানের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরো ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে; সে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না। –[মাযহারী]

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন– অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাজিল হলে রাসূল ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোনো পুরুষর সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবারে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ওয়ায়মেরের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাতো বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওয়ায়মের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখেতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাতো ভাই ছিল। ওয়ায়মের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি......... পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমার নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! বিগত জুমায় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা আমার পরিবারে মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেয়ান করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। –[মাযহারী]

বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সাঈদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপে এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়ায়মের আজলানী রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাজিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এসো, বর্ণনাকারী সাহল বললেন, তাদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের মধ্যে লেয়ান করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেয়ান সমাপ্ত হলো, তখন ওয়ায়মের বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম। –[মাযহারী]

উপরিউক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হজর ও ইমাম নবভী (র.) উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ানের আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অভিযোগ পেশ করা হলো তখন তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে– فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ এবং ওয়ায়মেরের ঘটনায় ভাষ্য হচ্ছে– قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْكَ -এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাজিল করেছেন। –[মাযহারী]

অনুবাদ :

١١. اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْاِفْكِ اَسْوَءَ الْكِذْبِ عَلٰى عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا بِقَذْفِهَا عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ وَمِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ لَا تَحْسَبُوْهُ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ غَيْرَ الْعُصْبَةِ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط يَاْجُرُكُمُ اللّٰهُ بِهٖ وَيُظْهِرُ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ وَمَنْ جَاءَ مَعَهَا مِنْهُ وَهُوَ صَفْوَانُ فَاِنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةٍ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ فَفَرَغَ مِنْهَا وَرَجَعَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَاٰذَنَ بِالرَّحِيْلِ لَيْلَةً فَمَشَيْتُ وَقَضَيْتُ شَاْنِىْ وَاَقْبَلْتُ اِلَى الرَّحْلِ فَاِذَا عِقْدِىْ اِنْقَطَعَ هُوَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ الْقِلَادَةُ فَرَجَعْتُ اَلْتَمِسُهُ وَحَمَلُوْا هَوْدَجِىْ هُوَ مَا يُرْكَبُ فِيْهِ عَلٰى بَعِيْرِىْ يَحْسَبُوْنَنِىْ فِيْهِ وَكَانَتِ النِّسَاءُ خِفَافًا اِنَّمَا يَاْكُلْنَ الْعُلْقَةَ هُوَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُوْنِ اللَّامِ مِنَ الطَّعَامِ اَيِ الْقَلِيْلِ وَجَدْتُ عِقْدِىْ وَجِئْتُ بَعْدَ مَا سَارُوْا فَجَلَسْتُ فِى الْمَنْزِلِ الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ .

১১. যারা এই অপবাদ রচনা করেছেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর এই মিথ্যা অপবাদ আরোপের মাধ্যমে জঘন্যতম মিথ্যা বলেছে। তারা তো তোমাদেরই একটি দল অর্থাৎ মুমিনগণেরই একটি গ্রুপ। অর্থাৎ হযরত হাসসান ইবনে ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, মিসতাহ এবং হামযা বিনতে জাহশ। একে তোমরা মনে করিও না উক্ত দলটি ছাড়া অপরাপর মুমিনগণ তোমাদের জন্য অনিষ্টকর; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিষ্কলুষতা প্রকাশ করবেন। আর তাঁর সাথে যে সাহাবী ছিলেন তিনি হলেন হযরত সফওয়ান (রা.)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণের পরে আমি রাসূল ﷺ -এর সাথে কোনো এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, একরাতে তিনি কাফেলা রওয়ানা দেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলাম। আমি কাফেলার নিকট এসে দেখলাম যে, আমার গলার হারটি হারিয়ে গেছে। [عِقْدٌ শব্দের عَيْن বর্ণটি যেরযুক্ত, অর্থ– গলার মালা, হার।] আমি সেটিকে তালাশে ফিরে গেলাম। তারা আমার হাওদাজকে উঠিয়ে ফেলল। হাওদাজ হলো আমার উটের পিঠে আরোহণ করার জন্য যা স্থাপন করা হয়েছিল [পালকি জাতীয় বাহন] তারা মনে করেছিল যে, আমি তাতে রয়েছি। কারণ তৎকালীন নারীরা অল্প ভক্ষণের কারণে খুবই ছিপছিপে ও হাল্কা ধরনের ছিল। عُلْقَه শব্দে عَيْن বর্ণে পেশ এবং لَام বর্ণটি সাকিনযুক্ত, অর্থ– অল্প খাবার। আমি তথায় আমার হারটি পেয়ে গেলাম এবং তারা চলে যাওয়ার পর আমি ফিরে আসলাম। তখন আমি যে স্থানে ছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম।

وَظَنَنْتُ اَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُوْنَنِىْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَىَّ فَغَلَبَتْنِىْ عَيْنَاىَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ هُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ اَىْ نَزَلَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ لِلْاِسْتِرَاحَةِ فَسَارَ مِنْهُ فَاَصْبَحَ فِىْ مَنْزِلِىْ فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ اَىْ شَخْصَهُ فَعَرَفَنِىْ حِيْنَ رَاٰنِىْ وَكَانَ يَرَانِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهٖ حِيْنَ عَرَفَنِىْ اَىْ قَوْلَهٗ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ فَخَمَّرْتُ وَجْهِىْ بِجِلْبَابِىْ اَىْ غَطَّيْتُهٗ بِالْمُلَاءَةِ وَاللّٰهِ مَا كَلَّمَنِىْ بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اِسْتِرْجَاعِهٖ حِيْنَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهٗ وَوَطِئَ عَلٰى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُبِىَ الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُوْغِرِيْنَ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ اَىْ مِنْ اَوْغَرَ اَىْ وَاقِفِيْنَ فِىْ مَكَانٍ وَغْرٍ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِىَّ وَكَانَ الَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ ابْنِ سَلُوْلٍ اِنْتَهٰى قَوْلُهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ قَالَ تَعَالٰى لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَىْ عَلَيْهِ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج فِىْ ذٰلِكَ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ اَىْ تَحَمَّلَ مُعْظَمَهٗ فَبَدَأَ بِالْخَوْضِ فِيْهِ وَاَشَاعَهٗ وَهُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ هُوَ النَّارُ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

অনুবাদ :

এবং মনে মনে ভাবলাম যে, যখন তারা আমাকে পাবে না তখন তারা আমার তালাশে অবশ্যই এখানে আসবে। আমার চোখে নিদ্রা চলে আসায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হযরত সফওয়ান (রা.) পেছনে তল্লাশীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি শেষ রাতে রওনা হয়ে প্রভাতে আমার স্থানে পৌঁছলেন [عَرَّسَ এবং اِدَّلَجَ ফে'ল দুটো তাশদীদযুক্ত। عَرَّسَ অর্থ– শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করা আর اِدَّلَجَ অর্থ– যাত্রা করা। তিনি একজন নিদ্রিত মানুষের আকৃতি দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন। কেননা তিনি আমাকে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দেখেছিলেন। তখন তিনি "ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বললেন, তার এই শব্দে আমি জাগ্রত হয়ে সাথে সাথে উড়না বা চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমার সাথে আর একটি কথাও বলেননি এবং اِسْتِرْجَاعٌ তথা ইন্নালিল্লাহ ব্যতীত তার থেকে অন্য কোনো শব্দও আমি শুনিনি। তিনি তার উট বসিয়ে তার [উটের] হাত অর্থাৎ, উটের সামনের দু পা ধরে রাখলেন যাতে সে দ্রুত উঠে না যায়। অতঃপর আমি তাতে আরোহণ করালাম। তিনি আমাকে নিয়ে উটের লাগাম ধরে কাফেলা পানে ছুটে চললেন। এভাবে আমরা এমন সময় কাফেলার নিকট পৌঁছলাম, যখন তারা দ্বি-প্রহরের তীব্র গরমের কারণে যাত্র বিরতি করছিলেন। مُوْغِرِيْنَ শব্দটি اَوْغَرَ হতে নির্গত, যার অর্থ– তীব্র গরমে তপ্ত জায়গায় যাত্রা বিরতি করা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার সমালোচনা করে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা ধ্বংস হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। –[বুখারী-মুসলিম] আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল। এ ব্যাপারে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে উক্ত বিষয়ে ছিদ্রান্বেষণের পেছনে পড়েছে এবং তা প্রচার করেছে সে হলো [মুনাফিক নেতা] আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল'। তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। আর তা হলো পরকালে জাহান্নামের অগ্নিদাহন।

অনুবাদ :

١٢. لَوْلَآ هَلَّا إِذْ حِيْنَ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ أَيْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ. كِذْبٌ بَيِّنٌ فِيْهِ الْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ أَيْ ظَنَنْتُمْ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ.

১২. যখন তোমরা একথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করল না। অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি ধারণা করা। এবং তারা কেন বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা। এখানে خِطَابْ হতে غَيْبَتْ-এর দিকে اِلْتِفَاتْ হয়েছে। অর্থাৎ- ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَقُلْتُمْ [হে লোকজন! তোমরা কেন সুধারণা পোষণ করলে না ও বললে না।]

١٣. لَوْلَا هَلَّا جَآءُوْا أَيِ الْعُصْبَةُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ج شَاهَدُوْهُ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ أَيْ فِيْ حُكْمِهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ فِيْهِ.

১৩. তারা উক্ত দলটি কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি যারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। যেহেতু তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট অর্থাৎ তাঁর বিচারে মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে।

١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ أَيُّهَا الْعُصْبَةُ أَيْ خُضْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فِي الْاٰخِرَةِ.

১৪. দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত হয়েছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করতো হে লোকজন! অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ে ছিদ্রান্বেষণ করছিলে চরম শাস্তি পরকালে।

١٥. إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ أَيْ يَرْوِيْهِ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ وَحُذِفَ مِنَ الْفِعْلِ إِحْدَى التَّائَيْنِ وَإِذْ مَنْصُوْبٌ بِمَسَّكُمْ أَوْ بِأَفَضْتُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا لَا إِثْمَ فِيْهِ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ. فِي الْإِثْمِ.

১৫. যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে অর্থাৎ একে অপরের নিকট বর্ণনা করছিলে। تَلَقَّوْنَهٗ ফেলটিতে একটি تَاء-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর اِذْ অব্যয়টি مَنْصُوْبْ হয়েছে مَسَّكُمْ বা اَفَضْتُمْ-এর কারণে। এবং এমন বিষয় মুখে মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যে, এতে কোনো পাপ হবে না। যদিও আল্লাহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয় পাপের ক্ষেত্রে।

অনুবাদ :

١٦. وَلَوْلَآ هَلَّا اِذْ حِيْنَ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ مَا يَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ق سُبْحٰنَكَ هُوَ لِلتَّعَجُّبِ هُنَا هٰذَا بُهْتَانٌ كِذْبٌ عَظِيْمٌ .

১৬. তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। সমীচীন নয় আল্লাহ পবিত্র মহান سُبْحَانَكَ শব্দটি এখানে বিস্ময়সূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তো এক গুরুতর অপরাধ। মিথ্যা রটনা।

١٧. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . تَتَّعِظُوْا بِذٰلِكَ .

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন নিষেধ করেছেন বারণ করেছেন তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। এর দ্বারা উপদেশ লাভ কর।

١٨. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط فِى الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَاْمُرُ بِهٖ وَيَنْهٰى عَنْهُ حَكِيْمٌ فِيْهِ .

১৮. আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহকে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে। এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ যে ব্যাপারে তিনি আদশে করেন এবং যে বিষয় থেকে তিনি নিষেধ করেন। প্রজ্ঞাময় এ ব্যাপারে।

١٩. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ بِاللِّسَانِ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِنِسْبَتِهَا اِلَيْهِمْ وَهُمُ الْعُصْبَةُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا بِالْحَدِّ لِلْقَذْفِ وَالْاٰخِرَةِ ط بِالنَّارِ لِحَقِّ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنْتِفَاءَهَا عَنْهُمْ وَاَنْتُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ لَا تَعْلَمُوْنَ . وُجُوْدَهَا فِيْهِمْ .

১৯. যারা মুমিনদরে মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে মৌখিকভাবে। তাঁদের প্রতি অশ্লীলতার সম্বন্ধ করে। তারা হলো একটি দল। তাদের জন্য, রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি পৃথিবীতে অপবাদের সাজা প্রয়োগের মাধ্যমে। এবং আখিরাতে জাহান্নামে অগ্নি দ্বারা আল্লাহর হকের কারণে। এবং আল্লাহ জানেন তাদের ব্যাপারে এ বিষয়টি অসত্য হওয়াকে তোমরা হে লোক সকল! জান না তাদের মাঝে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে।

٢٠. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ بِكُمْ لَعَاجَلَكُمْ بِالْعُقُوْبَةِ .

২০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে হে লোক সকল! [এ বিষয়টি গোপন রাখার মাধ্যমে, তাহলে তোমরা কেউ অব্যাহতি পেতে না।] এবং আল্লাহ তা'আলা দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু তোমাদের সাথে শাস্তি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْإِفْكِ الخ : এখানে থেকে ১৮নং আয়াত পর্যন্ত إِفْك -এর আলোচনা করা হয়েছে। অভিধানে إِفْكٌ অর্থ হলো পরিবর্তন সাধন করা, পাল্টে ফেলা। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম মিথ্যা হলো যা সত্যকে আসত্যে ও অসত্যকে সত্যে পরিণত করে। সৎ নিষ্কলুষ ব্যক্তিকে ফাসিক ও ফাসিককে সৎ নিষ্কলুষ পরহেজগার বানিয়ে দেয়। শরিয়তে একে ইফক বলা হয়।

قَوْلُهُ عُصْبَةٌ : ছোট দল, উক্ত দলের লোক সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উক্তি রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَحْسَبُوْهُ : এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ , হযরত আবূ বকর, আয়েশা ও সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَنْ جَاءَ مِنْهُ : এখানে مَنْ দ্বারা সাফওয়ান ইবনে মুআত্তা সুলামী (রা.) উদ্দেশ্য। আর مِنْهُ দ্বারা إِفْك-এর ঘটনা উদ্দেশ্য। مِنْهُ -এর সম্পর্ক হলো بَرَاءَةٌ -এর সাথে।

قَوْلُهُ فِيْ غَزْوَةٍ : এর দ্বারা গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিক উদ্দেশ্য। এর অপর নাম হলো গাযওয়ায়ে মুরাইসী। বিশুদ্ধ উক্তি মতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা।

قَوْلُهُ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ : حِجَابٌ দ্বারা পর্দা সংক্রান্ত আয়াত উদ্দেশ্য। আর তা হলো- وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ

قَوْلُهُ قَدْ عَرَّسَ : تَعْرِيْسٌ বলা হয় বিশ্রামের জন্য শেষ রাতে অবতরণকে।

قَوْلُهُ اِدَّلَجَ : اِدَّلَجَ وَاِدْلَاجٌ অর্থ- শেষ রাতে সফর করা।

قَوْلُهُ هُمَا بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَالدَّالِ : عَرَّسَ ও اِدَّلَجَ সম্পর্কে ক্রমধারা (لَفٌّ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ) রূপে ইঙ্গিত করেছেন যে, رَاء ও دَال উভয়টি তাশদীদযোগে।

قَوْلُهُ نزل مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ لِلْاِسْتِرَاحَةِ : এটা عَرَّسَ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ فَسَارَ مِنْهُ : এটা হলো ادلج -এর ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকার (র.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর শব্দের ব্যাখ্যা করার জন্য এর মাঝে বিশ্লেষণমূলক শব্দ ব্যবহার করেছেন, নতুবা মূল ভাষ্য হত এরূপ-

كَانَ صَفْوَانُ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَّرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّلَجَ مِنْهُ فَاَصْبَحَ فِيْ مَنْزِلِيْ

قَوْلُهُ مُوْغِرِيْنَ : এটা وَغْرٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থ প্রচণ্ড গরম।

قَوْلُهُ بِالْمِلَاءَةِ : এমন চাদর যা শরীরকে আচ্ছাদিত করে রাখে।

قَوْلُهُ مُوْغِرِيْنَ : অর্থ হলো তীব্র গরমে প্রবেশকারী।

قَوْلُهُ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ : ঠিক দ্বিপ্রহরে।

قَوْلُهُ سَلُوْلٍ : সালূল হলো মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর মায়ের নাম।

قَوْلُهُ لِكُلِّ امْرِئٍ : ব্যাখ্যাকার (র.) عَلَيْهِ দ্বারা তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَامْ টি عَلٰى অর্থে।

قَوْلُهُ لَوْلَا هَلَّا : এ لَوْلَا টি تَوْبِيْخِيَّة বা ধমকমূলক। কেননা এটি مَاضِيْ -এর পূর্বে এসেছে। لَوْلَا মূলত ৩ ধরনের হয়ে থাকে।

১. مَاضِيْ -এর পূর্বে এলে تَوْبِيْخِيَّة তথা ধমকমূলক হয়। ২. مُضَارِعْ -এর পূর্বে এলে تَحْضِيْضِيَّة তথা উৎসাহজ্ঞাপক হয়। ৩. আর جُمْلَة اِسْمِيَّة -এর পূর্বে এলে اِمْتِنَاعِيَّة তথা পূর্ববর্তী অংশের অস্তিত্বের দরুন পরবর্তী অংশের অস্তিত্ব না হওয়া বুঝায়।

এখানে মোট ৬ জায়গায় لَوْلَا ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম, ২য়, ও ৪র্থটি تَوْبِيْخِيَّة ; এ কারণে এর جَوَابٌ -এর প্রয়োজন নেই। আর ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠটি شَرْطِيَّه বা اِمْتِنَاعِيَّه ৩য় ও ৬ষ্ঠটির ক্ষেত্রে جواب উল্লিখিত হয়েছে। আর ৫ম স্থানে جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। -[হাশিয়াতুস সাবী]।

قَوْلُهُ بِاَنْفُسِهِمْ اَىْ اَبْنَاءِ جِنْسِهِمْ فِى الْاِيْمَانِ : অর্থাৎ ঈমানী ভাইদের প্রসঙ্গে সু-ধারণা পোষণ করেনি কেন?

قَوْلُهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ : অর্থাৎ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ হিসেবে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ এবং قَالُوْا -এর স্থলে ظَنَنْتُمْ ও قُلْتُمْ বলা প্রয়োজন ছিল। এ জন্যে ব্যাখ্যাকার (র.) বলেছেন, এখানে اِلْتِفَاتٌ ঘটেছে। এখানে বস্তুত দু'ধরনের اِلْتِفَاتٌ ঘটেছে। ক. حَاضِرٌ থেকে غَائِبٌ -এর প্রতি। খ. এবং যমীর থেকে প্রকাশ্য ইসমের প্রতি। এ اِلْتِفَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَوْبِيْخٌ তথা ধমকের ক্ষেত্রে আধিক্যতা বুঝানো। অর্থাৎ মর্ম এই যে, এ ধরনের বিষয়ে ঈমানের দাবি এই ছিল যে, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। আর তার স্থলে তোমরা তাদের দোষত্রুটির অন্বেষণে ও দুর্নাম করার পেছনে লেগে রয়েছ। প্রয়োজন তো ছিল তাদের ব্যাপারে কেউ সমালোচনা ও কুমন্তব্য করলে তার প্রতিবাদ করা, যেভাবে নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করে থাক। বাক্যটি এরূপ ছিল-

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاِخْوَانِهِمْ خَيْرًا وَهَلَّا قُلْتُمْ اِفْكٌ مُبِيْنٌ

[তোমরা যখন তা শুনলে হে মুমিনগণ! তোমাদের ভাইদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করলে না কেন? তোমরা কেন বললে না যে, এটা স্পষ্ট মিথ্যা।

قَوْلُهُ لَوْلَا هَلَّا جَاؤُوْا عَلَيْهِ : এটা পূর্বের কথার পরিশিষ্টও হতে পারে, অর্থাৎ মু'মিন নারী পুরুষগণ মিথ্যা রচনাকারীদের নিকট ৪জন সাক্ষী পেশ করার দাবি জানাল কেন? অর্থাৎ অপবাদ শ্রবণের পর যেভাবে পরস্পরে সুধারণা পোষণ করা জরুরি ছিল তদ্রূপ অপবাদ আরোপকারীদের নিকট ৪জন সাক্ষী তলব করাও জরুরি ছিল। اَىْ وَقَالُوْا هَلَّا جَاءُوْا الْخَائِضُوْنَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى مَا قَالُوْا

দ্বিতীয় ধরন এ হতে পারে যে, لَوْلَا جَاءُوْا হলো جُمْلَة مُسْتَنَافِيَة । এ সময় قَالُوْا বিলুপ্ত মানার প্রয়োজন পড়বে না।

قَوْلُهُ اَىْ فِىْ حُكْمِهِ : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : মিথ্যা অভিযোগকারীদেরকে আল্লাহর সমীপে এজন্য মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে যে, তারা ৪জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ৪ জন সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হলেও তারা মিথ্যুকই ছিল।

উত্তর : সাক্ষী পেশ করতে না পারার ক্ষেত্রে শরিয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যুক ছিল, আর যদি সাক্ষী পেশ করত, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে বাহ্যত সত্যবাদী হতো। আর আল্লাহ তা'আলার যেহেতু তাদের জাহেরী ও বাতেনী উভয়ভাবেই মিথ্যুক সাব্যস্ত করার ইচ্ছা ছিল, এ জন্য ৪জন সাক্ষী তলব করেছেন। যাতে স্পষ্টাকারে তাদের মিথ্যা প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ لَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ : এর لَوْلَا টি اِمْتِنَاعِيَّه ; এর جَوَابٌ হলো لَمَسَّكُمْ

قَوْلُهُ فِيْمَا اَفَضْتُمْ : এখানে অব্যয়টি সবব অর্থে। اَىْ بِسَبَبِ مَا اَفَضْتُمْ আর مَا হলো مَوْصُوْلَة -এর দ্বারা ইফক সংক্রান্ত হাদীস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ لَمَسَّكُمْ بِسَبَبِ الَّذِىْ خُضْتُمْ فِيْهِ وَهُوَ الْاِفْكُ আর مَا টা مَصْدَرِيَّة ও হতে পারে। اَىْ لَمَسَّكُمْ بِسَبَبِ خَوْضِكُمْ

قَوْلُهُ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ : এখানে اِذْ হলো قُلْتُمْ -এর ظَرْف তথা مَفْعُوْل فِيْهِ مُقَدَّمٌ অর্থাৎ তোমাদের জন্য উচিত ছিল যে, অপবাদ শ্রবণ মাত্রই এমন কথা বলে দিতে যে, এ ধরনের সমালোচনা ও মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়।

قَوْلُهُ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَعُوْدُوْا : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, يَعِظُكُمْ ক্রিয়াটি عَنْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ -এর অর্থবিশিষ্ট। অতঃপর عَنْ -কে বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْعَوْدِ ; اَنْ হলো مَصْدَرِيَّة -এর কারণে تَعُوْدُوْا ক্রিয়াটি عَوْد অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ تَتَّعِظُوْنَ بِذَالِكَ : এ বাক্যটি مُؤْمِنُوْنَ -এর সিফত। অর্থাৎ তোমরা যদি উপদেশ গ্রহণকারী মু'মিন হও, তাহলে এমন আচরণ দ্বিতীয়বার আর করবে না। এখানে جَوَاب شَرْط লুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَلَا تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ

قَوْلُهُ بِاللِّسَانِ : এটা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারীদের নিকট এটা পছন্দনীয় ছিল যে, সবার মুখে মুখে অশ্লীল বিষয়ের প্রচার হোক। প্রকৃত অশ্লীলতার প্রসার ঘটা উদ্দেশ্য ছিল না।

قَوْلُهُ بِنِسْبَتِهَا اِلَيْهِمْ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আয়েশা (রা.) ও সাফওয়ান (রা.), আর وَهُمْ عُصْبَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক, যারা অশ্লীল বিষয়ের প্রচার কামনা করত।

قَوْلُهُ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : এটা হলো اِنَّ -এর خَبَرٌ

قَوْلُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ : এর عَطْف হলো فَضْلُ اللّٰهِ -এর উপর। আর لَعَاجَلَكُمْ হলো لَوْلَا -এর جَوَابٌ মা'তূফ ও مَعْطُوْف عَلَيْهِ মিলে مُبْتَدَا আর এর خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। তা হলো- مَوْجُوْدَانِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারকলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোনো সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরিতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরিউক্ত দশটি আয়াত নাজিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কুরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফ্‌ক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তাফসীর বোঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে-

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরিতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা চলে গেছে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের ফিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। বাহন

উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ও ক্ষীণাঙ্গিণী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজের জন্য নিযুক্ত করছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোনো কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশা (রা.)-কে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজি'উন" উচ্চারিত হয়ে গেল। এ বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান, মিসতা এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ (রা.) ছিলেন এ শ্রেণীভুক্ত। তাফসীরে দূররে মনসূরে ইবনে মরদুওয়াইহের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে– اَعَانَهُ اَىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ حَسَّانُ وَمِسْطَحُ وَحَمْنَةُ
যখন এই মুনাফিক রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। আয়াতগুলোর তাফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ হিসেবে বর্ণিত কুরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের উপর অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মরদুওয়াইহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনজন মুসলমান মিসতাহ, হামনাহ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী (র.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসলুল্লাহ ﷺ আসলে অপবাদ রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়েম থাকে। –[বয়ানুল কুরআন]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য : ইমাম বগভী উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীরে বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে , যেগুলো অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, এ আপনার স্ত্রী। –[তিরমিযী] কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল (আ.) তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : রাসূলুল্লাহ তাঁকে ছাড়া কোনো কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : রাসলূল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কখনো ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোনো বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি তাদেরও অন্যতমা।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর ফকীহ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মূসা ইবনে তালহা (রা.) বলেন, আমি আয়েশা সিদ্দীকার চেয়ে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি। -[তিরমিযী]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসূফ (আ.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের দশটি আয়াত নাজিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ : إِفْكٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ পাল্টিয়ে দেওয়া, বদলিয়ে দেওয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলিয়ে দেয় এবং ন্যায়পরায়ণ আল্লাহভীরুকে ফাসিকরূপে এবং ফাসিককে আল্লাহভীরু পরহেজগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও إِفْك বলা হয়। عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কমবেশির জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। مِنْكُمْ বলে মু'মিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন নয়, মুনাফিক ছিল। কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানি দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মু'মিনদের বাহ্যিক বিধানাবলি প্রযোজ্য হতো। তাই مِنْكُمْ শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিসতাহ (রা.) তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তাঁরা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না। যদিও তিনি অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলতেন, হাসসান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে কাব্য-প্রতিভা দ্বারা কাফেরদের চমৎকার মোকাবিলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোনো সময় হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আগমন করলে তিনি সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিতেন। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ : এতে নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা, সাফওয়ান ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মাহত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাদের দোষমুক্ততা নাজিল করে তাদের সম্মান আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাজিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ : অর্থাৎ যারা এই অপবাদে যতটুকু অংশ নিয়েছেন, সেই পরিমাণে তার গুনাহ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আজাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরো কম আজাবের যোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : كِبْرٌ শব্দের অর্থ বড়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ব্যক্তি এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ, একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আজাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। -[বগভী]

قَوْلُهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ ...... وَقَالُوْا هٰذَا إِفْكٌ مُبِيْنٌ : অর্থাৎ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য–

১. بِأَنْفُسِهِنَّ শব্দ দ্বারা কুরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানদের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন– এক জায়গায় বলা হয়েছে– لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য কোনো মুসলমান পুরুষও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে– لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোনো মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বোঝানো হয়েছে। আরেক এক জায়গায় আছে– وَلَا تُخْرِجُوْآ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ, কোনো মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরো বলা হয়েছে– وَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কুরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি । শায়খ সা'দী (র.) বলেন–

چو از قومے یکے بے دانشی کرد * نه که را منزلت ماند نه مه را

অর্থাৎ কুরআনের প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছেন, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছেন; অগ্রগতি লাভ করেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে।

২. এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ خَيْرًا সম্বোধন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন শুরুতে سَمِعْتُمُوْهُ সম্বোধন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে সম্বোধন পদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মু'মিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবি।

৩. আয়াতের শেষ বাক্য তথা هٰذَا إِفْكٌ مُبِيْنٌ বাক্যে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেওয়াই ছিল ঈমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসলমান সম্পর্কে কোনো গুনাহ অথবা দোষ শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গুনাহ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাত ঈমানের পরিচয়।

মাসআলা : এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরিয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ এটা নিছক গিবত [পরনিন্দা] এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ لَوْلَا جَآءُوْا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ..... عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ : এ আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা প্রচার করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, কোনো ব্যক্তি স্বচক্ষে কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষ্য পেল না– এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনোরূপেই বুঝে আসে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে? এ প্রশ্নের দুটি জবাব আছে। যথা–

১. এখানে, 'আল্লাহর কাছে' বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

২. অনর্থক কোনো কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য। বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনো দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে; কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে সে যেন দাবি করে যে, আমি মানবজাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরিয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না, এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন সে আল্লাহর কাছে উপরিউক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে মিথ্যাবাদী। কেননা শরিয়তের ধারা মোতাবেক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। –[মাযহারী]

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুশিয়ারি : উপরিউক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেওয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বেই সংবাদটিকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খণ্ডন করলেন না কেন? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেন রইলেন? এমন কি, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসলূল্লাহ ﷺ -এর এই কিংবকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থি নয়। কেননা তিনি খবরটির সত্যায়নও করেননি এবং তদনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেননি। সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে তিনি এ কথা বলেছেন যে– مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। –[তাহাভী]

রাসলূল্লাহ ﷺ -এর কর্মপন্থা উপরিউক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়– তাঁর এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আয়াত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

মোটকথা এই যে, কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন, এটা মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থি ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোনো কর্মও করেননি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং তা ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল।

قَوْلُهٗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ ..... فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ : যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোনো-না-কোনোরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খবুই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আজাব আসতে পারতো যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হতো। কিন্তু মুমিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমহত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তাওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আজাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গুনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তাওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

قوله اذ تلقونه بالسنتكم : تلقى শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোনো কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানো বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ : অর্থাৎ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করছিলে যে, যা শুনলে তা-ই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্দরুন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মাহত হয়, লাঞ্ছিত হয় এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

قَوْلُهُ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ .... سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ : অর্থাৎ তোমরা যখন এই গুজব শুনেছিলে, তখন একথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহ পবিত্র। পূর্বেকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরো প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থাৎ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোনো ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, ফলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোনো কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বোঝা যায় না। প্রত্যেক মুসলমানকে গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরিয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিনা দলিলে যে, কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু'মিন মুসলমানের প্রতি শরিয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা অপবাদ।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ .... فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ : যারা এই অপবাদে কোনো না কোনোরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্জতা দমনের কুরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরি উপায়, যার উপেক্ষার ফলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছে : কুরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্য এই বিশেষ কসর্মসূচি তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রটিত হতে পারবে না। রটিত হলেও শরিয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রটিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে 'সাধারণ সমাবেশে' ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করে রটনাকেই দমনের উপায় করে দেওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নিলর্জ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতা ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল গল্প-পত্রিকায় প্রত্যেহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রতিদিন প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দুষ্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উত্তেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরিয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কুরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোনো ব্যক্তি শর্তাবলির অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

অনুবাদ :

২১. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ طُرُقَ الشَّيْطَانِ ط اَىْ تَزْيِيْنِهِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ اَىِ الْمُتَّبَعُ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ اَىِ الْقَبِيْحِ وَالْمُنْكَرِ ط شَرْعًا بِاتِّبَاعِهَا وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ اَيُّهَا الْعُصْبَةُ بِمَا قُلْتُمْ مِنَ الْاِفْكِ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا اَىْ مَا صَلُحَ وَطَهُرَ مِنْ هٰذَا الذَّنْبِ بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ يُطَهِّرُ مَنْ يَّشَاۤءُ ط مِنَ الذَّنْبِ بِقَبُوْلِ تَوْبَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِمَا قُلْتُمْ عَلِيْمٌ ـ بِمَا قَصَدْتُمْ ـ

২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। অর্থাৎ, তার সৌন্দর্যমণ্ডিত পথে চলো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে সে তো অর্থাৎ অনুসৃত শয়তান নির্দেশ দেয় অশ্লীলতা জঘন্য ও মন্দের শরিয়তের দৃষ্টিতে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের হে লোক সকল! তোমরা যে, অপবাদমূলক কথা বলেছ তা হতে কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না। অর্থাৎ এই পাপ থেকে তওবার মাধ্যমে পূতপবিত্র ও সংশোধন হতে পারতে না। তার থেকে তওবার মাধ্যমে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন গুনাহ থেকে তার থেকে তওবা গ্রহণ করে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা যা তোমরা বলছ সর্বজ্ঞ যার তোমরা ইচ্ছা করেছ।

২২. وَلَا يَاْتَلِ يَحْلِفُ اُولُو الْفَضْلِ اَىْ اَصْحَابُ الْغِنٰى مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ لَا يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ق نَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ بَكْرٍ حَلَفَ اَنْ لَا يُنْفِقَ عَلٰى مِسْطَحٍ وَهُوَ ابْنُ خَالَتِهٖ مِسْكِيْنٌ مُهَاجِرٌ بَدْرِيٌّ لِمَا خَاضَ فِى الْاِفْكِ بَعْدَ اَنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اَقْسَمُوْا اَنْ لَا يَتَصَدَّقُوْا عَلٰى مَنْ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ مِنَ الْاِفْكِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط عَنْهُمْ فِىْ ذٰلِكَ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ لِلْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بَلٰى اَنَا اُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ وَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ مَا كَانَ يُنْفِقُهٗ عَلَيْهِ ـ

২২. তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি তাঁর খালাতো ভাই দরিদ্র মিসতাহ (রা.)-কে কোনোরূপ সহায়তা না করার শপথ করেন। অথচ তিনি ছিলেন বদরী মুহাজির সাহাবী। কারণ তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। এ ঘটনার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা.) তার ব্যয়ভার বহন করতেন। এবং আরো কতিপয় সাহাবা যারা শপথ করেছিলেন যে, যারা ইফকের ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাদেরকে কোনো রকমের দান সদকা করবেন না। তাদের ব্যাপারেও এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তাদের থেকে এ ব্যাপারে তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। মুমিনদের জন্য। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, "হ্যাঁ, আমি পছন্দ করি যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।" তিনি পূর্বের ন্যায় হযরত মিসতাহ (রা.)-এর ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন।

অনুবাদ :

٢٣. إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ بِالزِّنَا الْمُحْصَنَاتِ الْعَفَائِفَ الْغٰفِلٰتِ عَنِ الْفَوَاحِشِ بِأَنْ لَا يَقَعَ فِيْ قُلُوْبِهِنَّ فِعْلُهَا الْمُؤْمِنٰتِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

২৩. যারা অপবাদ আরোপ করে ব্যভিচারের সাধ্বী পবিত্রা সরলমনা অশ্লীল কার্যাবলি হতে পবিত্র, এমন কি তাদের হৃদয়ে তার কল্পনাও জাগ্রত হয় না। মুমিন নারীদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

٢٤. يَوْمَ نَاصِبُهُ الْاِسْتِقْرَارُ الَّذِىْ تَعَلَّقَ بِهٖ لَهُمْ تَشْهَدُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ.

২৪. যেদিন يَوْمَ-এর نَاصِبْ হলো اِسْتَقَرَّ যা উহ্য রয়েছে যার সাথে لَهُمْ টা مُتَعَلِّقْ হয়েছে। সাক্ষ্য দিবে يَشْهَدُ শব্দটি يَاء এবং تَاء উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহবা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। তাদের কথা ও কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে, আর সেটা হবে কিয়ামতের দিন।

٢٥. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ يُجَازِيْهِمْ جَزَاءَهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ. حَيْثُ حَقَّقَ لَهُمْ جَزَاءَهُ الَّذِىْ كَانُوْا يَشُكُّوْنَ فِيْهِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ وَالْمُحْصَنٰتُ هُنَا اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُذْكَرْ فِىْ قَذْفِهِنَّ تَوْبَةٌ وَمَنْ ذُكِرَ فِىْ قَذْفِهِنَّ اَوَّلَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ غَيْرُهُنَّ.

২৫. যেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দান করবেন অর্থাৎ তাদের উপর যে প্রতিফল আবশ্যক হয়েছে তা যথাযথ দান করবেন। এবং তারা জানবে আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। আর তা এভাবে যে, তাদের সম্মুখে তাদের প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল অবধারিত হয়ে যাবে। যে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ করত। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের অন্যতম। এখানে اَلْمُحْصَنٰتُ দ্বারা মহানবী ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। তাদের ব্যাপারে অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে তওবার উল্লেখ নেই। সূরার প্রারম্ভে যাদের ক্ষেত্রে অপবাদ আরোপ প্রসঙ্গে তওবার কথা উল্লিখিত হয়েছে তা দ্বারা ভিন্ন মহিলাগণ উদ্দেশ্য।

٢٦. اَلْخَبِيْثٰتُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمٰتِ لِلْخَبِيْثِيْنَ مِنَ النَّاسِ وَالْخَبِيْثُوْنَ مِنَ النَّاسِ لِلْخَبِيْثٰتِ ج مِمَّا ذُكِرَ وَالطَّيِّبٰتُ مِمَّا ذُكِرَ لِلطَّيِّبِيْنَ مِنَ النَّاسِ وَالطَّيِّبُوْنَ مِنْهُمْ لِلطَّيِّبٰتِ مِمَّا ذُكِرَ.

২৬. দুশ্চরিত্রা নারী ও কু-কথা দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য। যারা উল্লিখিত হলো। এবং সচ্চরিত্রা নারী পূর্বে উল্লিখিতদের মধ্য হতে। সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।

অনুবাদ :

أَيِ اللَّائِقُ بِالْخَبِيْثِ مِثْلُهُ وَبِالطَّيِّبِ مِثْلُهُ أُولَٰئِكَ الطَّيِّبُوْنَ وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنْهُمْ عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ط أَيِ الْخَبِيْثُوْنَ وَالْخَبِيْثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ فِيْهِمْ لَهُمْ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ - فِي الْجَنَّةِ وَقَدِ افْتَخَرَتْ عَائِشَةُ بِاَشْيَاءٍ مِنْهَا اَنَّهَا خُلِقَتْ طَيِّبَةً وَوُعِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا كَرِيْمًا -

অর্থাৎ দুশ্চরিত্রদের জন্য অনুরূপ চরিত্রের মানুষ এবং সচ্চরিত্রদের জন অনুরূপ চরিত্রের মানুষই উপযোগী। এরা অর্থাৎ সচ্চরিত্র পুরুষ ও সচ্চরিত্র নারী এবং হযরত আয়েশা (রা.) ও সফওয়ান (রা.) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা যা বলে তা হতে পবিত্র অর্থাৎ দুশ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্রা মানুষগণ যা বলে তা হতে। তাদের জন্য আছে সচ্চরিত্র নারী পুরুষের জন্য ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা জান্নাতে। হযরত আয়েশা (রা.) কতিপয় বিষয় নিয়ে গর্ব করতেন। তন্মধ্য হতে এটাও একটি বিষয় যে, তাকে পবিত্রা রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁর সাথে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ : خُطْوَةٌ শব্দটির আদ্যবর্ণে পেশসহ। অর্থ হলো পা।

قَوْلُهُ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ : এটা হলো শর্ত। এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। বাক্যটি এমন ছিল- مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَلَا يُفْلِحُ

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ : এটা جَوَاب شَرْط -এর ইল্লত বা কারণ।

قَوْلُهُ اَيِ الْمُتَّبِعُ : এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, ة সর্বনামের দ্বারা مَنْ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে। কেউ কেউ اِنَّهُ -এর সর্বনাম দ্বারা শয়তান উদ্দেশ্য বলেছেন। আর এটাই অধিক স্পষ্ট। আবার সর্বনামটি ضَمِيْر شَاْن -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ بِاتِّبَاعِهِمَا : এটা يَاْمُرُ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। مَا زَكٰى مِنْكُمْ এটা لَوْلَا -এর جَوَابٌ আর مِنَ الْاِفْكِ -এর مِنْ بَيَانِيَّة এবং مِنْ اَحَدٍ -এর মধ্যকার مِنْ অতিরিক্ত। اَحَدٍ শব্দটি فَاعِلٌ -এর স্থলে পতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَاْتَلِ : এটা(اِفْتِعَالٌ) اِيْتِلَاءٌ থেকে نَهِيْ غَائِبْ -এর সীগাহ্। অর্থ হলো শপথ না করে। মূলত يَاْتَلِيْ ছিল। لَا نَاهِيَة -এর কারণে يَا পড়ে গেছে। মূলধাতু হলো اِلِّي অর্থ- শপথ।

قَوْلُهُ اَيْ اَصْحَابُ الْغِنٰى : এটা اُولُوا الْفَضْلِ -এর ব্যাখ্যা। গ্রন্থকার (র.) ইমাম বগভী (র.)-এর অনুকরণে এ ব্যাখ্যা করেছেন। যদি فَضْلِ -এর ব্যাখ্যা فَضْلٌ فِي الدِّيْنِ দ্বারা করতেন তাহলে তা আরও উত্তম হতো। এটা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মর্যাদার ব্যাপারে দলিল হতো। اُولُوا الْفَضْلِ -এর ব্যাখ্যা اَصْحَابُ الْغِنٰى দ্বারা করার ক্ষেত্রে অহেতুক দ্বিরুক্তি অনিবার্য হয়। এজন্য যে, وَالسَّعَةِ -এর দ্বারাও স্বচ্ছলতা ও সম্পদের প্রাচুর্যতা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَنْ لَا يُؤْتُوْا : لَا -কে এমনিতেই বুঝে আসার কারণে বিলোপ করা হয়েছে। যেমন- تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ -এর لَا উহ্য রয়েছে। আর এটা حَرْف جَرّ উহ্য মেনে অর্থাৎ- عَلٰى اَنْ لَا يُؤْتُوْا

قَوْلُهُ وَنَاسٍ : -এর عَطْف হলো اَبِىْ بَكْرٍ -এর উপর। অর্থাৎ يَوْمَ نَزَلَتْ فِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ এখানে وَعَذَابٌ عَظِيْمٌ -এর নসবদানকারী আমিল লুপ্ত রয়েছে। বাক্যটি এমন ছিল- كَائِنٌ لَهُمْ يَوْمَ تَشْهَدُ الخ

প্রশ্ন : عَذَابٌ শব্দটি মাসদার দ্বারা مَنْصُوْب হয়নি কেন?

উত্তর : বসরীগণের মতে মাসদার আমল করার জন্য শর্ত হল মাসদারটি مَوْصُوْف না হওয়া, অথচ এখানে عَظِيْم -এর مَوْصُوْف হয়েছে। এ কারণে মাসদারটি নসব দান করতে সক্ষম নয়।

قَوْلُهُ اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ : এ বাক্যটি জুমলায়ে মুসতানিফা তথা নতুন বাক্য।

قَوْلُهُ مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْكَلِمَاتِ : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার বলতে চেয়েছেন যে, اَلْخَبِيْثٰتُ -এর দুটি ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে একটি হলো اَلنِّسَاءِ আর দ্বিতীয়টি হলো اَلْكَلِمَاتِ এবং এখানে وَاو বর্ণটি اَوْ অর্থে।

قَوْلُهُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ : এটাও জুমলায়ে মুসতানিফা তথা নতুন বাক্য হতে পারে। আবার اُولٰئِكَ -এর দ্বিতীয় খবরও হতে পারে। এ সময় এটা স্থানগতভাবে مَرْفُوْعٌ হবে, আর প্রথম খবর হবে مُبَرَّءُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ : আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, শয়তানের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা থেকে সতর্ক থাক। মুসলমানদের কাজ এটা হওয়া উচিত নয় যে, তারা জিন ও মানুষ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। কারণ এসব অভিশপ্তদের মিশন এই যে, তারা মানুষকে অন্যায় ও নির্লজ্জতার দিকে ধাবিত করে। তোমরা জেনে বুঝে কীভাবে তাদের প্রতারণার শিকার হও। লক্ষ্য কর, শয়তান কীভাবে সামান্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বড় ঝড় প্রবাহিত করেছে এবং সহজ-সরল মুসলমানগণকে কীভাবে তার প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ : অর্থাৎ শয়তান তো সবাইকে নষ্ট করে ছাড়ে। সে কাউকে সোজা রাস্তায় থাকতে দিতে চায় না। এটা আল্লাহ বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর মুখলেস বান্দাদের হাত ধরে তাদেরকে সঠিক পথে রাখেন এবং কাউকে অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার পর তওবার তাওফীক দান করে তাকে সঠিক পথে আনয়ন করেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ الخ : সাহাবায়ে কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে :
وَلَا يَأْتَلِ - اِئْتِلَاءٌ শব্দের অর্থ- কসম খাওয়া। হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াত নাজিল হওয়ারর পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাঁটি তওবার তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাজিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা এবং তাদেরকে ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ (রা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যাবৎসল পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোনো বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোনো বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে গুনাহের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের দলকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক

ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বভাবগত দুঃখের কারণে গরিবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাফফারা দিয়ে দেয়। গরিবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহ (রা.)-কে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবূ বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন– যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যায় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে أُولُوا الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ বাক্যাংশটি এ অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে– أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীকা (রা.) তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন– وَاللّٰهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِيْ অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতা (রা.)-এর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন, এ সাহায্য কোনোদিন বন্ধ হবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এই আয়াতে বাহ্যত ইতিপূর্বে অপবাদের আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই ; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহাকালের ও পরকালের অভিশাপ এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি। এমন কি, কুরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাজিল হওয়ার পরও তারা এই দুরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোনো মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোনো মুসলমানও কুরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফের মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهُ বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করেনি, তাদেরকে এই আয়াত উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছে। তওবাকরীদেরকে আজাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছে এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আজাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছে। তওবাকারীদেরকে إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি তাদেরকে পরবর্তী يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছে। –[বয়ানুল কুরআন]

একটি জরুরি হুশিয়ারী : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করছিলেন; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কুরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাজিল হয়নি। আয়াত নাজিল হওয়ার পর যে

ব্যক্তি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফের, কুরআনে অবিশ্বাসী। যেমন– শিয়াদের কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফের ।

قَوْلُهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহবা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহগার তার গুনাহ স্বীকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছেন, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্ত-পদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষী দেবে। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহবাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে; বরং তাদের জিহবা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় মুখও জিহবাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিহবাকে সত্যকথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে।

قَوْلُهُ اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ .... لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ : অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারিণী নারী দুশ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচচরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচ্চরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচ্চরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচ্চরিত্রা নারীদের প্রতি হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরূপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক পয়গাম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা পত্নী ও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গাম্বরকুল শিরোমনি হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত ভার্যকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যার ঈমান নেই, সে-ই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কুরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর বিবিগণ কাফের ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন– مَا بَغَتْ اِمْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ অর্থাৎ কোনো পয়গাম্বরের বিবি কোনো দিন ব্যভিচার করেননি। –[দুররে মনসুর] এ থেকে জানা গেল যে, পয়গাম্বরের বিবি কাফের হবে এটা তো সম্ভবপর; কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে এটা সম্ভবপর নয়। কেননা ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর স্বাভাবিকভাবে ঘৃণার কারণ হয় না। –[বয়ানুল কুরআন]

অনুবাদ :

٢٧. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا اَيْ تَسْتَاْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا فَيَقُوْلُ الْوَاحِدُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الدُّخُوْلِ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الذَّالِ خَيْرِيَّتَهُ فَتَعْمَلُوْنَ بِهِ -

২৭. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেরদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। একজন বলবে, আসসালামু আলাইকুম আমি কি ভিতরে প্রবেশ করতে পারি? যেমনটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার চেয়ে। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে تَاء বর্ণটি ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে। তার কল্যাণ। সুতরাং তোমরা এর মাধ্যমে জানতে পারবে।

٢٨. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا يَّاْذَنُ لَكُمْ فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ج وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ بَعْدَ الْاِسْتِيْذَانِ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَيِ الرُّجُوْعُ اَزْكٰى اَيْ خَيْرٌ لَّكُمْ ط مِنَ الْقُعُوْدِ عَلَى الْبَابِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مِنَ الدُّخُوْلِ بِاِذْنٍ وَغَيْرِ اِذْنٍ عَلِيْمٌ - فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ -

২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও। যে তোমাদেরকে অনুমতি দিবে। তবে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় অনুমতি চাওয়ার পর ফিরে যাও! তবে তোমরা ফিরে যাবে, আর এটাই অর্থাৎ ফিরে যাওয়া তোমাদের জন্য অতিশয় পবিত্র উত্তম দরজার সামনে বসে থাকার চেয়ে। এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। অনুমতি সাপেক্ষে বা অনুমতিহীন প্রবেশ করা সম্পর্কে। ফলে তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন।

٢٩. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ اَيْ مَنْفَعَةٌ لَّكُمْ ط بِاسْتِكْنَانٍ وَغَيْرِهِ كَبُيُوْتِ الرُّبُطِ وَالْخَانَاتِ الْمُسْبِلَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ تُظْهِرُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ - تُخْفُوْنَ فِيْ دُخُوْلِ غَيْرِ بُيُوْتِكُمْ مِنْ قَصْدِ صَلَاحٍ اَوْ غَيْرِهِ وَسَيَاْتِيْ اَنَّهُمْ اِذَا دَخَلُوْا بُيُوْتَهُمْ يُسَلِّمُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ -

২৯. যে গৃহে কেউ বসবাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী উপকারী কিছু থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই আরামে লুকিয়ে থাকার জায়গা ইত্যাদি শীত ও গরম হতে বেঁচে থাকার জায়গা, পান্থশালা স্বরূপ ব্যবহারের গৃহাদি ও দোকান প্রভৃতি। এবং আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর তোমাদের নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশের ব্যাপারে মঙ্গলজনক বা অন্য কোনো বিষয়ের সংকল্প করার। অচিরেই আসছে যে, তারা যখন তাদের ঘরে প্রবেশ করতেন তখন নিজেদেরকে সালাম করতেন।

অনুবাদ :

٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ نَظَرُهُ وَمِنْ زَائِدَةٌ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُمْ فِعْلُهُ بِهَا ذٰلِكَ اَزْكٰى اَىْ خَيْرٌ لَّهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - بِالْاَبْصَارِ وَالْفُرُوْجِ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ -

৩০. মুমিনদেরকে বলুন ! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে যা তাদের জন্য দেখা জায়েজ নয়, তা থেকে। আর مِنْ টি হলো অতিরিক্ত। এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার অবৈধ তা থেকে এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্র উত্তম তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। তাদের চোখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমে। সুতরাং তিনি তাদেরকে এর প্রতিফল দান করবেন।

٣١. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ نَظَرُهُ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ عَمَّا لَا يَحِلُّ فِعْلُهُ بِهَا وَلَا يُبْدِيْنَ يُظْهِرْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ فَيَجُوْزُ نَظَرُهُ لِاَجْنَبِيٍّ اِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً فِىْ اَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِيْ يَحْرُمُ لِاَنَّهُ مَظَنَّةُ الْفِتْنَةِ وَرُجِّحَ حَسْمًا لِلْبَابِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ط اَىْ يَسْتُرْنَ الرُّؤُوْسَ وَالْاَعْنَاقَ وَالصُّدُوْرَ بِالْمَقَانِعِ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ الْخَفِيَّةَ وَهِىَ مَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ - اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ جَمْعُ بَعْلٍ اَىْ زَوْجٍ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ -

৩১. আর মুমিন নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা তাদের জন্য বৈধ নয়, তা থেকে। ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে যে ক্ষেত্রে লজ্জাস্থানের ব্যবহার বৈধ নয় তা থেকে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তা হলো মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু তথা হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ। সুতরাং এক বর্ণনা মতে গায়রে মাহরামের জন্য তা দেখা জায়েজ আছে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। অন্য বর্ণনা মতে তা হারাম। কেননা তাতে ফেতনায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর পাপের পথ রুদ্ধ করার জন্য এ মতটিকেই প্রাধান্য দান করা হয়েছে। তাদের গ্রীবাও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে অর্থাৎ তাদের মাথা, ঘাড় এবং বক্ষদেশ উড়না দ্বারা ঢেকে রাখবে। তারা তাদের আবরণ যেন প্রকাশ না করে গোপন সজ্জা আর তা হলো হাত কব্জি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল। তবে তাদের স্বামীগণ بُعُوْلٌ শব্দটি بَعْلٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ স্বামী। অথবা পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী ব্যতীত।

فَيَجُوزُ لَهُمْ نَظْرُهُ اِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَيَحْرُمُ نَظْرُهُ لِغَيْرِ الْأَزْوَاجِ وَخَرَجَ بِنِسَائِهِنَّ الْكَافِرَاتِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمٰتِ الْكَشْفُ لَهُنَّ وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ الْعَبِيْدُ اَوِ التّٰبِعِيْنَ فِيْ فُضُوْلِ الطَّعَامِ غَيْرِ بِالْجَرِّ صِفَةٌ وَالنَّصْبِ اِسْتِثْنَاءٌ اُولِي الْاِرْبَةِ اَصْحَابِ الْحَاجَةِ اِلَى النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ بِاَنْ لَمْ يَنْتَشِرْ ذِكْرُ كُلٍّ اَوِ الطِّفْلِ بِمَعْنَى الْاَطْفَالِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا يَطَّلِعُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ لِلْجِمَاعِ فَيَجُوْزُ اَنْ يُبْدِيْنَ لَهُمْ مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ مِنْ خَلْخَالٍ يَتَقَعْقَعُ وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ مِمَّا وَقَعَ لَكُمْ مِنَ النَّظَرِ الْمَمْنُوْعِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ تَنْجُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ لِقَبُوْلِ التَّوْبَةِ مِنْهُ وَفِي الْاٰيَةِ تَغْلِيْبُ الذُّكُوْرِ عَلَى الْاِنَاثِ ـ

অনুবাদ :

সুতরাং তাদের জন্য এর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ ব্যতীত। সুতরাং স্বামী ছাড়া অন্যদের এতে দৃষ্টিপাত করা হারাম। আর بِنِسَائِهِنَّ -এর দ্বারা কাফের নারীগণ বের হয়ে গেছে। কাজেই মুসলিম মহিলাদের জন্য কাফের নারীদের সম্মুখে উক্ত অঙ্গ প্রকাশ করা জায়েজ হবে না। আর مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ -এর মধ্যে দাসগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ যারা তাদের অনুসরণ করে চলে। বেঁচে যাওয়া খাদ্যের ব্যাপারে غَيْرِ শব্দটি تَابِعِيْنَ -এর সিফত হলে যের যুক্ত হবে। আর اِسْتِثْنَاء হলে যবর বিশিষ্ট হবে। মহিলাদের প্রতি জরুরত রাখে এমন পুরুষ নয়। পুরুষদের মধ্যে থেকে প্রত্যক এমন ব্যক্তি যার লিঙ্গ নড়াচড়া করে না। অথবা এমন বালক এটা اَطْفَالُ অর্থে যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ সহবাসের জন্য সুতরাং তাদের সম্মুখে নাভী থেকে হাঁটু ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ প্রকাশ করা বৈধ তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্য সজোরে পদক্ষেপ না করে যেমন বাজনা বিশিষ্ট নুপুর হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর অবৈধ স্থানে তোমাদের দৃষ্টি পতিত হওয়া ও অন্যান্য পাপ হতে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার তা থেকে মুক্তি পেতে পার তওবা কবুলের মাধ্যমে। আর আয়াতে মহিলাদের উপর পুরুষদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ :

٣٢. وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ جَمْعُ اَيِّمٍ وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ بِكْرًا كَانَتْ اَوْ ثَيِّبًا وَمَنْ لَيْسَ لَهٗ زَوْجَةٌ وَهٰذَا فِى الْاَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ وَالصّٰلِحِيْنَ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ط وَعِبَادٍ مِنْ جُمُوْعِ عَبْدٍ اِنْ يَّكُوْنُوْا اَيِ الْاَحْرَارِ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ بِالتَّزَوُّجِ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ لِخَلْقِهٖ عَلِيْمٌ . بِهِمْ .

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা আইয়িম তথা স্বামীহীনা ও বিপত্নীক তাদেরকে বিবাহ দাও। أَيَامٰى শব্দটি أَيِّمٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো যে নারীর স্বামী নেই চাই সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক এবং যে পুরুষের স্ত্রী নেই। এটা স্বাধীন নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এবং তোদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও অর্থাৎ যারা মুমিন। আর عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ -এর বহুবচন তাঁরা স্বাধীন পুরুষগণ অভাবী হলে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন বিবাহের মাধ্যমে স্বীয় অনুগ্রহে। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময় স্বীয় সৃষ্টির জন্য সর্বজ্ঞ তাদের সম্পর্কে।

٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا اَيْ مَا يَنْكِحُوْنَ بِهٖ مِنْ مَهْرٍ وَنَفَقَةٍ مِنَ الزِّنَا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ يُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِهٖ ط فَيَنْكِحُوْنَ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ بِمَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالْاِمَاءِ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ق اَيْ اَمَانَةً وَقُدْرَةً عَلَى الْكَسْبِ لِاَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَصِيْغَتُهَا مَثَلًا كَاتَبْتُكَ عَلٰى اَلْفَيْنِ فِىْ شَهْرَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ اَلْفٌ فَاِذَا اَدَّيْتَهَا فَاَنْتَ حُرٌّ فَيَقُوْلُ قَبِلْتُ ذٰلِكَ وَاٰتُوْهُمْ اَمْرٌ لِلسَّادَةِ .

৩৩. যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই তারা যেন সংযম অবলম্বন করে অর্থাৎ যার দ্বারা বিবাহ করবে যেমন মহর ভরণ পোষণের ব্যয়ভার। ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত স্বচ্ছলতা দান করা পর্যন্ত। নিজ অনুগ্রহে তখন তারা বিয়ে করবে। আর যারা লিখিত চুক্তি চাইবে اَلْكِتَابَ এটা مُكَاتَبَةٌ অর্থে। তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে থেকে তার মুক্তির জন্য তবে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। অর্থাৎ তাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা এবং কিতাব ও চুক্তির মাল পরিশোধের জন্য উপার্জনের শক্তি রাখে। আর এর বাক্যগুলো এরূপ হতে যেমন আমি তোমাদের সাথে দু মাসে দু' হাজার দিরহাম পরিশোধ করার শর্তে 'কিতাবত চুক্তি'তে আবদ্ধ হলাম। প্রতি মাসে একহাজার দিরহাম করে পরিশোধ করবে। যখন তুমি এটা পরিশোধ করবে তখন থেকেই তুমি আজাদ হয়ে যাবে। তখন সে বলবে, আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। এবং তোমরা তাদেরকে দান করবে এ নির্দেশ মনিবদের জন্য।

مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ط مَا يَسْتَعِيْنُوْنَ بِهٖ فِيْ اَدَاءِ مَا الْتَزَمُوْهُ لَكُمْ وَفِيْ مَعْنَى الْاِيْتَاءِ حَطُّ شَيْءٍ مِمَّا الْتَزَمُوْهُ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ اَيْ اِمَائِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اَيِ الزِّنَا اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا تَعَفُّفًا عَنْهُ وَهٰذِهِ الْاِرَادَةُ مَحَلُّ الْاِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لِلشَّرْطِ لِّتَبْتَغُوْا بِالْاِكْرَاهِ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا نَزَلَتْ فِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ كَانَ يُكْرِهُ جَوَارِيَ لَهٗ عَلَى الْكَسْبِ بِالزِّنَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ لَّهُنَّ رَّحِيْمٌ بِهِنَّ ـ

অনুবাদ :

আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তা হতে। যার দ্বারা তারা তোমাদেরকে প্রদানের ব্যাপারে যা আবশ্যক করে নিয়েছে তা পরিশোধ সহায়তা লাভ করতে পারে। তোমরা তোমাদের যুবতীদেরকে অর্থাৎ দাসীদেরকে বাধ্য করো না যৌনকর্মে অর্থাৎ ব্যভিচারে যদি তারা সতীত্ব রক্ষা করতে চায় পবিত্র থাকতে চায়, তাদের এ ইচ্ছা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে। কাজেই তাদের পবিত্র থাকতে চাওয়ার শর্তের বিপরীত অর্থ ধর্তব্য নয় যে, তারা পবিত্র থাকতে না চাইলে যৌনকর্মে নিয়োগ করা বৈধ। পার্থিব জীবনের ধন লালসায় বাধ্যকরণ দ্বারা। এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার দাস-দাসীদেরকে ব্যভিচারের মাধ্যমে উপার্জন করতে বাধ্য করত। আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল তাদের জন্য পরম দয়ালু। তাদের প্রতি।

٣٤. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا فِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ بُيِّنَ فِيْهَا مَا ذُكِرَ اَوْ بَيِّنَةٌ وَّمَثَلًا اَيْ خَبَرًا عَجِيْبًا وَهُوَ خَبَرُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ اَيْ مِنْ جِنْسِ اَمْثَالِهِمْ اَيْ اَخْبَارِهِمُ الْعَجِيْبَةِ كَخَبَرِ يُوْسُفَ وَمَرْيَمَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ الخ لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ الخ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ الخ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا الخ وَتَخْصِيْصُهَا بِالْمُتَّقِيْنَ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا ـ

৩৪. আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত مُبَيِّنٰتٍ শব্দটির يَاء বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতই হতে পারে। যবর হলে অর্থ হবে উল্লিখিত, যা কিছু বর্ণিত হয়েছে। আর যের হলে অর্থ হবে সুস্পষ্ট। এবং দৃষ্টান্ত অর্থাৎ বিস্ময়কর সংবাদ। আর তা হলো হযরত আয়েশা (রা.)-এর সংবাদ বা ঘটনার বিবরণ। তোমাদের পূর্ববর্তীদের অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্তের অনুরূপ। অর্থাৎ পূর্বর্তীদের বিস্ময়কর ঘটনাবলি। যেমন– হযরত ইউসুফ ও মারইয়াম (আ.)-এর কাহিনী। এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا الخ [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে তাদের উভয়ের উপর করুণা যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।] এবং لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ ও وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ এবং الْمُؤْمِنُوْنَ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا আয়াতে মুত্তাকীগণকে নির্দিষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, এ সকল লোকেরাই উপদেশের মাধ্যমে উপকৃত হয়ে থাকেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا ...... تَسْتَاْنِسُوْا اَىْ تَسْتَـ : পূর্বের আয়াতসমূহে সতর, সচ্চরিত্রের বিধান সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। উক্ত বিধানসমূহের একটি হলো কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না সুতরাং সতর ও পর্দার বিধানের পরে এখন অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত মাসআলা বর্ণনা করেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা বেশের আদব ও নিয়ম উল্লেখ করেছেন। কেননা গায়রে মাহরাম তথা নারী-পুরুষের অবাধ চলাচল অনেক সময় র কারণে ঘটে।

قَوْلُهُ تَسْتَاْنِ : এটা تَسْتَاْذِنُوْا তথা তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর অর্থে। এটা اِسْتِيْذَانٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ অনুমতি নেওয়া, সখ্যতা সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُ : এটা لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا থেকে اِسْتِثْنَاء -এর পর্যায়ে।

قَوْلُهُ اِسْتِ : এটা كَنٌّ শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো লুকানো, গোপন হওয়া। অর্থাৎ, ঠাণ্ডা, গরম বৃষ্টি থেকে রক্ষাকল্পে কোনো আড়ালে গিয়ে স্বস্তি লাভ করা।

قَوْلُهُ : এটা رِبَاطٌ -এর বহুবচন। এর আসল অর্থ হলো গোয়াল ঘর বা ব্যারাক। কিন্তু এখানে এর দ্বারা সরাইখানা াবলিকের আশ্রয় শিবির উদ্দেশ্য, যেখানে জনসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি থাকে। اَلْمُسْبِلَةُ এমন রাস্তাকে বলা তে বহু মানুষের চলাচল থাকে। এ সম্পর্কের দরুন যেখানে বহু মানুষের আসা-যাওয়ার অনুমতি থাকে তাকেও مُسْبِلَةٌ য়। مُسْبِلَةٌ মূলত رُبُطٌ -এর সিফত বা বিশেষণ। সুতরাং এটাকে رُبُطٌ -এর সাথে উল্লেখ করলে তা আরো স্পষ্ট। خَانَاتٌ হলো خَانَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো দোকান-পাট, যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আসা-যাওয়ার ব্যাপক অনুমতি। اَلْمُسْبِلَةُ শব্দটি رُبُطٌ ও خَانَات উভয়ের সিফত হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

قَوْلُهُ بِالْمَقَ : এটা مِقْنَعٌ বা مِقْنَعَةٌ -এর বহুবচন। ওড়না, চাদর ইত্যাদি অর্থে।

قَوْلُهُ اَوِ التَّابِعِيْنَ اَىِ التَّابِعِيْنَ لِلْـ : অর্থাৎ সে সকল নির্বোধ ও অর্ধ পাগল মানুষ যারা খাদ্য দের জন্য নারীদের নিকট গমন করে। خَلْخَالٌ হলো পায়ের নূপুর, এর বহুবচন আসে خَلَاخِلُ, আর تَقَعْقَعَ يَتَقَعْقَعُ অর্থ হলো হাঁটা চলার সময় শব্দ করা।

قَوْلُهُ الصّٰلِحِيْنَ اَىِ الْمُؤْمِ : এখানে صَالِحِيْن দ্বারা সে সকল মুমিন উদ্দেশ্য যারা বিবাহের হক তথা অধিকারসমূহ আদায় করতে সক্ষম।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِ : اَلَّذِيْنَ হলো مَوْصُوْل صِلَة মিলে مُبْتَدَأ, শর্তের অর্থ বিশিষ্ট। এ কারণে স্থানগতভাবে مَرْفُوْع ; এ সময় فَكَاتِبُوْهُ তার خَبَر হবে। আর مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এটা يَبْتَغُوْنَ -এর যমীর حَال. আবার উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ هٰذِهِ الْاِرَادَةُ مَحَلُّ الْاِكْرَاهِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ لِلشَّـ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا -এর মধ্যে হরফে শর্ত দ্বারা বুঝা যায় যে, নারীরা যদি সতী-সাধ্বী থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে র্ম বা ব্যভিচারে বাধ্য করা যাবে না। আর যদি তারা তা না চায় তাহলে তাদেরকে উক্ত কর্মে বাধ্য করা বৈধ হবে। অথচ াদৌ ঠিক নয়।

: এখানে এর مَفْهُوْم مُخَالِف তথা বিপরীত অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা বাধ্য করার প্রয়োজন তো তখনই দেখা দিবে তারা পবিত্র তথা সতী-সাধ্বী থাকতে চাইবে, নইলে তো বাধ্য করার প্রয়োজনই পড়বে না; বরং তারা স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে হবে।

قَوْلُهُ اَوْ بَيِّنَةً : এটা مُبَيِّنَةً তথা স্পষ্টকারী অর্থে। শরয়ী বিধানসমূহকে স্পষ্টকারী আয়াতসমূহ।

قَوْلُهُ مَثَلًا : অর্থাৎ এ সূরায় বা এ কুরআনে আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর আশ্চর্যকর ঘটনাও উল্লেখ করেছি। যা বিস্ময়কর হওয়ার ক্ষেত্রে অতীতের মানুষের যেমন– হযরত ইউসুফ ও মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা তাদের উভয়ের উপরও অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কীয় বিধানের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে কারো গৃহে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করার নির্দেশ রয়েছে, যাতে করে ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অপবাদের পথ বন্ধ হয়।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا الخ : শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত আদি ইবনে সাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী স্ত্রীলোক প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করল, আমি আমার গৃহে কখনো এমন অবস্থায় থাকি যে আমি চাই না ঐ অবস্থায় কেউ আমাকে দেখুক। কিন্তু আমার বাড়ির লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা বাধায় আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে দেখে। এমন পরিস্থিতিতে আমি কি করব? এ প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

কুরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করো না : পরিতাপের বিষয় হলো– ইসলামি শরিয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কুরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গুনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে; কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামি বিধিবিধানের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শুরু হয়েছে। মোটকথা অনুমতি চাওয়া কুরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কুরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা। এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কুরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিল্লাহ............

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কুরআন পাক অমুল্য নিয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে– جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তিও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ন থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানবলির একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রার্থীরা। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোনো অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনোচিত পন্থায় কোনো ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার পাপে পাপী হবে।

তৃতীয় উপকরিতা হলো– নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোনো রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলিকে কুরআন পাক ব্যভিচার, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তির বিধি-বিধানের সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, সে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরবস্তি জানার চেষ্টা করাও গুনাহ এবং অপররের জন্য কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরিকা : আয়াতে حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا বলা হয়েছে : অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম اِسْتِيْنَاسٌ শাব্দিক অর্থ– প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তাফসীরকারগণের মতে এর অর্থ– অনুমতি হাসিল করা। এখানে اِسْتِيْنَاسٌ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়, সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোনো কোনো তাফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিকে দিয়ে আয়াতে অগ্রপশ্চাৎ নেই। আবূ আইয়ূব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদি (র.) বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোনো ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে তবে প্রথম সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরিকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী (র.) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিয়ো না। কারণ সে সুন্নত তরিকা ত্যাগ করেছে। –[রূহুল মা'আনী]

আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল– اَلِجُ অর্থাৎ আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন, লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলুক– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা শুনে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। –[ইবনে কাসীর]

বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন– لَا تَاْذَنُوْا لِمَنْ لَا يَبْدَاُ بِالسَّلَامِ অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। –[মাযহারী]

এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি সংশোধন করেছেন। প্রথমে সালাম করা উচিত এবং اَدْخُلُ -এর স্থলে اَلِجُ শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা اَلِجُ শব্দটি وُلُوْجٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। এটা মার্জিত ভাষার পরিপন্থি। মোটকথা , এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

জরুরি হুঁশিয়ারি : আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব বর্জনের গুনাহ। যারা সুন্নত তরিকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌছা মুশকিল হয়। তাই বুঝে নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পন্থা প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পন্থা তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনিভাবে যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শর্ত এই যে, ঘণ্টা বাজানোর পর

নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছে। এ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা কোনো স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েজ। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এ প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পন্থা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ الخ : শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম মোকাতেল ইবনে হাব্বানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন কারো ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি প্রার্থনার হুকুম নাজিল হলো, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কুরাইশের অনেক ব্যবসায়ী মক্কা মদীনা এবং সিরিয়ার মধ্যে যাতায়াত করেন। পথিমধ্যে তাদের অবস্থানের স্থান নির্দিষ্ট হয়। যেসব ঘরে কেউ থাকে না, সেখানে কার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবেন? কাকে সালাম দিবেন। এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا ...... فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ : مَتَاعٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও مَتَاعٌ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ, ভোগ করার অধিকার। শানে নুযূলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্তবিনোদন-কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলির আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুষম সামাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়−

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : কোনো ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোনো দরকারি কাজ অথবা নামাজে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সম্বোধন করা জায়েজ নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত। এ বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো−

ক. টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরজ করব। কারণ প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারি কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোনো নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

খ. কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনোরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থি এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে− اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার কথার জবাব দিন।

গ. কারো গৃহে পৌঁছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয় আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে অবগত না হোন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। −[বুখারী, মুসলিম]

অনুবাদ ﷺ যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীত না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। -[মাযহারী]

ঘ. উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায়। যদি দৈবাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত। -[মাযহারী]

ঙ. যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই দূতের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَالِكَ لَهُ إِذْنٌ অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভেতরে আসার অনুমতি। -[আবূ দাউদ, মাযহারী]

قَوْلُهُ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিচু করে রাখার নির্দেষ দেওয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে অনুরূপ ফরমান নারীদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী পুরুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো নিজের দৃষ্টির হেফাজত করা। নৈতিক মান উন্নয়নে চরিত্র সংশোধনে এর গুরুত্ব বাঁধিক। এজন্যে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ব্যভিচারের উপকরণ তথা নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা এবং একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে যেন প্রত্যেকে বিরত থাকে। এজন্যে দৃষ্টির হেফাজতের তথা কু-দৃষ্টিপাত করা থেকে আত্মরক্ষা করার বিশেষ তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। এ নির্দেশের উপর আমল করার মাধ্যমে শুধু যে দৃষ্টি হেফাজত হয় তা নয়; বরং ঈমানের নূরের হেফাজত হয়।

قَوْلُهُ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ الخ : শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম মুকাতেল (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছেন, একবার হযরত আসমা বিনতে মারছাদ [যিনি বনী হারেছার মহল্লায় বাস করতেন] -এর কাছে কয়েকজন মহিলা আসলো, তারা ইজার পরিহিত ছিল না। ফলে তাদের পায়ের গহনা দেখা যাচ্ছিল এবং তাদের বক্ষস্থলও খোলা ছিল। হযরত আসমা বললেন, কত নিকৃষ্ট এ আকৃতি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়- وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ অর্থাৎ "আর [হে রাসূল] মুমিন স্ত্রীলোকদেরকে বলে দিন যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নিচু রাখে।"

পর্দা প্রথা নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহযাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে তৃতীয় হিজরি এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরি। তাফসীরে ইবনে কাসীর ও 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে পঞ্চম হিজরিকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীতে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী মুস্তালিক যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদ ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলি প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তাফসীর লিখিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ .....يَصْنَعُوْنَ : يَغُضُّوْا শব্দটি غَضٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- কম করা এবং নত করা। -[রাগিব] দৃষ্টি নত রাখার অর্থ হলো- দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরিয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তাফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরূহ- এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল [চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত]। এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরিয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ : যৌনাঙ্গ সংঘত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু'টিকে স্পষ্টত উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বতী হারাম ভূমিকাসমূহ যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র.) হযরত ওবায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, كُلُّ مَا عَصَى اللّٰهَ بِهٖ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ الطَّرْفَيْنِ অর্থাৎ যা দ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবিরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত তথা সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهٖ অর্থাৎ দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোনো বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। -[ইবনে কাসীর]

হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে- প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে গুনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে তা ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শ্মশ্রুবিহীন বালকের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধানও অনুরূপ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শ্মশ্রুবিহীন বালকের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনিয়ত ও কামভাবে সহকারে দেখা হয়।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ : **বেগানাকে দেখা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ :** এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু আলোচনায় জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোনো পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলেমের মতে, নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম- কাম ভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হযরত উম্মে সালমার হাদীস যাতে বলা হয়েছে একদিন হযরত উম্মে সালমা ও মায়মূনা (রা.) উভয়েই রাসূলূল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম তথায় আগমন করলেন। এ ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) আরজ করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ। -[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

অপর কয়েকজন ফিকহবিদ বলেন, কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তার আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-ও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম। আয়াতের ভাষ্যদৃষ্টে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও

[illegible] : কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকিগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরজ। কোনো পুরুষ কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোনো নারী অপর কোনো নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোনো নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোনো পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরো সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থি। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরিয়ত নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..... اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ : অভিধানে زِيْنَتٌ এমন বস্তুকে বলা হয়, যা দ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোনো নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল। যেমন– বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোনো দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زِيْنَتٌ-এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান। অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহে প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব। –[রূহুল মা'আনী]

আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসেবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোনো সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়, এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। [ইবনে কাসীর] এতে কোন কোন অঙ্গ বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যে উপরের কাপড় যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোনো বস্তু প্রকাশ করা জায়েজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা কোনো নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েজ নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েজ। এ কারণে ফিকহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েজ নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েজ নয়। এমনিভাবে এব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাজে সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ এবং নামাজের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরজ তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ ও দুরস্ত হবে। কাযী বায়যাভী ও 'খাযেন' (র.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনো কিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোনো সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ; গুনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েজ; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরিয়তসম্মত ওজর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও

এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েজ নয়। 'যাওয়াজের' গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফেয়ী (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামাজ হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরিয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েজ নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকহবিদদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েজ, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েজ। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফ্যাসাদ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ অর্থাৎ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে; خُمُرٌ শব্দটি خِمَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جُيُوْبٌ শব্দটি جَيْبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীন কাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ মূর্খতার যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্খতার যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর রেখে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে তাদের গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। -[রূহুল মা'আনী]

এর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরিয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। যথা- ১. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোনো অনর্থের আশঙ্কা নেই, তারা মাহরাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে স্বয়ং তাদের পক্ষে থেকে কোনো অনর্থের সম্ভাবনা নেই। ২. সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম; গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাজে খোলা জায়েজ নয়, তা দেখা মাহরামের জন্যেও জায়েজ নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহযাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুঁশিয়ারি : স্মরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ- ১. স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন- مَا رَأَى مِنِّىْ وَلَا رَأَيْتُ مِنْهُ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বিশেষাঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর বিশেষাঙ্গ দেখিনি।

২. পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। ৩. শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৪. নিজ গর্ভজাত সন্তান। ৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ৬. ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়রে-মাহরাম। ৭. ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ৮. ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া বোনের পুত্র বোঝানো হয়েছে।

এই আট প্রকার হলো মাহরাম। ৯. أَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক উদ্দেশ্য; মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমন সব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান

থেকে; গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোনো মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েজ নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলাটা ভিন্ন কথা।

আয়াতে نِسَائِهِنَّ তথা মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফিরে মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন– এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোনো মুসলমান নারীর জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মতো। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন। অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের সব নারীই نِسَائِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন– هٰذَا الْقَوْلُ اَوْفَقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَاِنَّهُ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ اِحْتِجَابُ الْمُسْلِمَاتِ عَنِ الذِّمِّيَّاتِ অর্থাৎ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা আজকাল মুসলমান নারীদের কাফের নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

১০. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহরামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রা.) তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন– لَا يَغُرَّنَّكُمْ اٰيَةُ النُّوْرِ فَاِنَّهُ فِى الْاِمَاءِ دُوْنَ الذُّكُوْرِ অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ বাক্যাংশে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন (র.) বলেন, পুরুষ দাসের জন্য তার মনিব নারীর কেশ দেখা জায়েজ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী اَوْ نِسَائِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস (র.)-এর জবাবে বলেন– نِسَائِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

১১. اَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোনো আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই। –[ইবনে কাসীর]

ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবূ আব্দুলল্লাহ, ইবনে জুবাইর, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোনো আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোনো ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক– যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলির সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত– غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ -এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন। এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী (র.) 'মিনহাজ' গ্রন্থের টীকায় বলেন, পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ শব্দের সাথে التَّابِعِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত মেহমান হয়ে খাওয়া দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। এ কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহের মধ্যে প্রবেশ করত। স্মর্তব্য যে, এখানে বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর; অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

১২. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে 'মুরাহিক' অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী । তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। -[ইবনে কাসীর]

ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, এখানে طِفْل বলে এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিকে দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

قَوْلُهُ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ : অর্থাৎ নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারদির আওয়াজ ঝংকৃত হয় এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় : আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরো জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই, উপরন্তু গোপন সাজসজ্জা যে কোনোভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েজ নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্দরুন অলঙ্কার ঝংকৃত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বেজে উঠে কিংবা মাটিতে সজোরে পা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় এবং বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে নাজায়েজ। এ কারণেই অনেক ফিকহবিদ বলেন, যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো, তখন স্বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরো কঠোর এবং প্রশ্নাতীতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 'নাওয়াযিল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কুরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েজ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাজে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লা' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী মুসল্লি জামাতে উপস্থিত থাকলে সে মুখে আওয়াজ করতে পারবে না; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে ইমামকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান : নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েজ কিনা? এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম (র.) নাওয়াযিলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আজান মাকরূহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশুদ্ধ ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে তা নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশঙ্কা নেই, সেখানে জায়েজ। -[জাসসাস] কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া : নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধি হলো গোপন সাজ-সজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌঁছা নাজায়েজ। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েজ : ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, কুরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙ্গিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরো জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র। -[জাসসাস]

قَوْلُهُ وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপররের তা জানা কঠিন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোনো সময় যদি কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরি। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

قَوْلُهُ وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ : اَيَامٰى শব্দটি اَيِّمٌ-এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যেটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ নেই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভিঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজেদের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে– এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ আশংকা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরিয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহই বাতিল অর্থাৎ তার বিবাহ না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়; কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা? আয়াতটি এ ব্যাপারে নীরব। বিশেষত এ কারণেও যে, اَيَامٰى [বিবাহহীন লোক] শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয় অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ; কেউ একে বাতিল বলে না। এমনিভাবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব নাকি সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ? : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরিয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না; বরং গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য ও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরজ অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন গুনাহগার থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে, যেমন– কোনো উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয় ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, সে লাগাতার রোজা রাখবে। রোজার ফলে কামোত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওকাফ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্ত্রী আছে কি? তিনি বললেন, না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোনো শরিয়তসম্মত বাঁদি আছে কি? উত্তর হলো, না। প্রশ্ন হলো– তুমি কি আর্থিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যশীল? উত্তর হলো, হ্যাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যাঁ বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরো বললেন, বিবাহ আমাদের সুন্নত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে। –[মাযহারী]

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহের আশঙ্কা প্রবল, ফিকহবিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাফের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জনা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। -[মাযহারী]

এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকহবিদ একমত যে, কোনো ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা নিশ্চিত অন্য কোনো গুনাহ হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরূহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার গুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোনো গুনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চেয়ে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সত্তাগতভাবে পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মুবাহ তথা শরিয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও ছওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোনো মুবাহ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার ও নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সত্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ী (র.) ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চেয়ে উত্তম বলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গাম্বরদের ও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং এটা পয়গাম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে পানাহার ও নিদ্রাও তো পয়গাম্বরগণের সুন্নত। কারণ তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গাম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গাম্বরগণের সুন্নত; বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গাম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গাম্বরগণের সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুষম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোনো গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাও নেই, এরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার জিকির ও ইবাদতে অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ উত্তম। সকল পয়গাম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার এরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক জিকির ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কুরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ; এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

قَوْلُهُ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও মনিবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। صَالِحِيْنَ শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ হলো স্ত্রীর বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাৎক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মহর

আদায় করার যোগ্যতা। যদি صَالِحِيْنَ শব্দের সুবিদিত অর্থ সৎকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাঁদিদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ মনিবদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের খাহেশ করে, তবে কোনো কোনো ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা মুনিবদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করে বরং অনুমতি দেওয়া মনিবদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ ক্রীতদাস ও বাঁদিদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কুরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে- وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে। -[তিরমিযী]

সারকথা এই যে, মনিবরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেই জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের জিম্মায় ওয়াজিব এটা জরুরি নয়।

قَوْلُهُ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ : যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হেফাজতের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক; কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই, আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজত ও সুন্নতে রাসূল ﷺ পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন।

যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্রের কারণেই বিবাহ করতে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থ কড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে, এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন। -[ইবনে কাসীর]

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন- اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ -[ইবনে কাসীর]

সতর্কবাণী : তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্মতর্ব্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ হলো পরবর্তী আয়াত- وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুনাহগার হয় যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোজা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থসম্পদ দান করবেন।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাঁদিদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদিদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাঁদিরা যদি মালিকদের সাথে

মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও ছওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকহবিদ এই নির্দেশকে মুস্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ, অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয়; কিন্তু মোস্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ– কোনো গোলাম অথবা বাঁদি তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বেচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি মনিব ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব পেশ ও তা গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অংককে 'বদলে কিতাবত' বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরিয়ত এর কোনো সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কমবেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরিকৃত হবে, তা-ই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামি শরিয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাঁদি মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাঁদির সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ এবং তাকে মোস্তাহব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরিয়তসম্মত গোলাম ও বাঁদি, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফফারার মধ্যে গোলাম অথবা বাঁদি মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে– إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং অধিকাংশ ইমাম বলেছেন, এই কল্যাণের অর্থ হচ্ছে– উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ্ড হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নেই। উদাহরণত সে কাফের হলে এবং তার কাফের ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোনোরূপ ক্ষতির আশঙ্কাও না থাকা চাই। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। জাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কেরামের তা-ই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ অথবা আরো কম হ্রাস করে দিতেন। –[মাযহারী]

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা এবং সে সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা : আজকাল দুনিয়াতে বস্তুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকালবিস্মৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিট্যালজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চাক্ষুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা

যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনাও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। তাই বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরিউক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায় না। এগুলোর কোনো একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন। যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই; বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বস্তুপূজার উন্মাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এতটুকই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, নাকি এগুলো সাধারণ ওয়াফক ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে?

প্রথম মতবাদ তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফেরদের ছিল। তারা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েজ-নাজায়েজের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কুরআনের أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِىٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই।

দ্বিতীয় মতবাদ তথা সোশ্যালিজম মানুষকে কোনো বস্তুর উপর কোনোরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও করে দেওয়া হলো।

কুরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে এই মূলনীতি দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায়ানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করুন وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْ অর্থাৎ এই অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান করা, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। যথা–

১. ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ।

২. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন।

৩. তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোনো কানো ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিহার্য, ওয়াজিব, মোস্তাহাব, উত্তম করেছেন। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ : শানে নুযূল : মুসলিম শরীফে হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল তার বাঁদি দ্বারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতো। মুসলিম শরীফে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাইর দু'টি বাঁদি ছিল। একজনের নাম ছিল 'মুসাইকা'

এবং অপরজনের নাম ছিল 'উমাইমা'। আব্দুল্লাহ উভয়ের দ্বারা ব্যভিচারের অর্থ উপার্জন করতো। এই অবস্থায় উভয় বাঁদিই হুজুরে পাক ﷺ -এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে দিল। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

হযরত যাবের (রা.)-এর সূত্রে আবূ যুবাইরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে হাকেম (র.) বর্ণনা করেন যে, 'মুসাইকা' জনৈক নাসারার বাঁদি ছিল। সে অভিযোগ করেছিল যে আমার মালিক আমাকে ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে বাধ্য করছে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

বাজ্জার ও তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই -এর একটি বাঁদি ছিল। সে বর্বরতার যুগে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। তখন ঐ বাঁদিটি শপথ করে বললো, আমি আর কখনো ব্যভিচার করবো না। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়।

সাঈদ ইবনে মানছুর হযরত ইকরিমার কথার উদ্বৃতি দিয়েছেন যে, মুসাইকা ও মাআজা নাম্নী দু'টি বাঁদি ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই -এর। সে তাদের দ্বারা ব্যভিচার করাতো। অবশেষে যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন তাদের একজন বলল, যদি এ কর্মটি ভালো হয় তবে তা আমি অনেক করেছি। পক্ষান্তরে, যদি তা ভালো না হয় তবে তা বর্জন করাই উচিত। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, একথাও বর্ণিত আছে যে, একটি বাঁদি আব্দুল্লাহর কাছে ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত একটি চাদর নিয়ে উপস্থিত হলো এবং অপর বাঁদিটি একটি দীনার নিয়ে হাজির হলো। আব্দুল্লাহ বলল, যাও, আরো কিছু কামাই করে নিয়ে আসো। বাঁদিরা বললো, 'আল্লাহর কসম! আমরা এ কাজ আর করবো না। ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আল্লাহ পাক ব্যভিচারকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তবুও যখন আব্দুল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করার চেষ্টা করলো, তখন উভয়ে হুজুর পাক ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখের কথা বর্ণনা করলে এ আয়াত নাজিল হলো।

মুকাতেল (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক সা'লাবী (র.) বলেন যে, আব্দুল্লাহর কাছে কুকর্মের জন্যে ছয়টি বাঁদি ছিল এবং এদের ব্যাপারেই উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অন্যায় অনাচার, অশ্লীল, আসামাজিক কাজ পরিহার করার নির্দেশ রয়েছে। যারা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আর যেসব পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, সেসব পন্থা অবলম্বনেরও পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিশেষ নসিহত ও উপদেশ রয়েছে। যারা আত্ম-সংশোধন করে এবং অন্যায় অনাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, আত্ম-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়, তারাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলে নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে তারা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যত জীবনকে উজ্জ্বল ও সাফল্যমণ্ডিত করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা কল্যাণের পথ গ্রহণে দ্বিধা করে না। আলোচ্য আয়াতে তাই মুমিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের ইহসানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করা হয়েছে নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল আয়াতসমূহ নাজিল করেছি যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অতীতে যারা এ দুনিয়াতে ছিল তাদের দৃষ্টান্তও তুলে ধরা হয়েছে এবং মুত্তাকী পরহেজগারদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ নসিহত। আলোচ্য আয়াতে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যথা–

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, তাতে কোনো আড়ষ্টতা নেই, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালনে কোনো অসুবিধা নেই। বিষপানে যদি নীলকণ্ঠ হতে হয়, তবে পবিত্র কুরআনের বিধি-নিষেধ অমান্য করেও অবশেষে ধ্বংস হতে হয়।

আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে ইতিপূর্বে সেসব জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে সতর্ক করা হয়েছে।

যারা এ সমস্ত ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক হয়, তারা যেন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٣٥. اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَیْ مُنَوِّرُهُمَا بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مَثَلُ نُوْرِهٖ اَیْ صِفَتُهٗ فِیْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكٰوةٍ فِیْهَا مِصْبَاحٌ ط اَلْمِصْبَاحُ فِیْ زُجَاجَةٍ ط هِیَ الْقِنْدِیْلُ وَالْمِصْبَاحُ السِّرَاجُ اَیِ الْفَتِیْلَةُ الْمَوْقُوْدَةُ وَالْمِشْكٰوةُ الطَّاقَةُ غَیْرُ النَّافِذَةِ اَیِ الْاَنْبُوْبَةِ فِی الْقِنْدِیْلِ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا وَالنُّوْرُ فِیْهَا كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ اَیْ مُضِیْءٌ بِكَسْرِ الدَّالِ وَضَمِّهَا مِنَ الدَّرْءِ الْمَعْنٰی الدَّفْعُ لِدَفْعِهِ الظَّلَامَ وَبِضَمِّهَا وَتَشْدِیْدِ الْیَاءِ مَنْسُوْبٌ اِلَی الدُّرِّ اللُّؤْلُؤِ یُوْقَدُ الْمِصْبَاحُ بِالْمَاضِیْ وَفِیْ قِرَاءَةٍ بِمُضَارِعِ اُوْقِدَ مَبْنِیًّا لِلْمَفْعُوْلِ بِالتَّحْتَانِیَّةِ وَفِیْ اُخْرٰی بِالْفَوْقَانِیَّةِ اَیِ الزُّجَاجَةُ مِنْ زَیْتِ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَیْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَّلَا غَرْبِیَّةٍ بَلْ بَیْنَهُمَا فَلَا یَتَمَكَّنُ مِنْهَا حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ مُضِرَّیْنِ یَّكَادُ زَیْتُهَا یُضِیْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط لِصَفَائِهٖ نُوْرٌ بِهٖ عَلٰی نُوْرٍ ط بِالنَّارِ وَنُوْرُ اللّٰهِ اَیْ هُدَاهُ لِلْمُؤْمِنِ نُوْرٌ عَلٰی نُوْرِ الْاِیْمَانِ یَهْدِی اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ اَیْ دِیْنِ الْاِسْلَامِ مَنْ یَّشَآءُ ط وَیَضْرِبُ یُبَیِّنُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط تَقْرِیْبًا لِاَفْهَامِهِمْ لِیَعْتَبِرُوْا فَیُؤْمِنُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ . مِنْهُ ضَرْبُ الْاَمْثَالِ .

অনুবাদ :

৩৫. আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। অর্থাৎ উভয়টিকে সূর্য ও চন্দ্রের মাধ্যমে আলোকোজ্জ্বলকারী। তাঁর জ্যোতির উপমা অর্থাৎ এর গুণাগুণ মুমিনগণের অন্তরে এরূপ, যেন একটি দীপাধার; যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ। আর প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত। এখানে زُجَاجَةٌ অর্থ হচ্ছে কাঁচের আবরণ। اَلْمِصْبَاحُ হচ্ছে প্রদীপ, অর্থাৎ প্রজ্বলিত বাতি। আর اَلْمِشْكٰوةُ অর্থ হচ্ছে স্থির দীপাধার তথা প্রদীপের মধ্যে থাকা নল বা পাইপ। কাঁচের আবরণটি এবং তাতে বিদ্যমান আলো, যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। অর্থাৎ উজ্জ্বল, دُرِّیٌّ শব্দটি دَالْ বর্ণে যের ও পেশযোগে اَلدَّرْءُ থেকে উদগত। اَلدَّرْءُ অর্থ হচ্ছে দূরীভূত করা। কেননা প্রদীপ অন্ধকারকে দূর করে। এ শব্দটিকে دَالْ -এর মধ্যে পেশ ও یَا -এর মধ্যে তাশদীদ দিয়ে পড়লে, তা دُرٌّ -এর প্রতি সম্পর্কিত হবে। আর دُرٌّ অর্থ হচ্ছে মোতি। প্রজ্বলিত করা হয় প্রদীপটি تَوَقَّدَ শব্দটি بَاب تَفَعُّلٌ থেকে فِعْل مَاضِیْ -এর সীগাহ। অপর এক কেরাতে শব্দটিকে اُوْقِدَ থেকে یُوْقَدُ বানিয়ে অর্থাৎ فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর صِیْغَةٌ পড়া হয়, তখন এর نَائِب فَاعِلْ হবে اَلْمِصْبَاحُ শব্দটি। তৃতীয় আরেকটি কেরাতে یَا -এর স্থলে تَا দিয়ে পড়া হয়। অর্থাৎ, تُوْقَدُ ; তখন এর نَائِب فَاعِلْ হবে اَلزُّجَاجَةُ শব্দটি। পূত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়; বরং তা এ দুটির মাঝখানে বিদ্যমান রয়েছে। আর তাইতো গরম ও ঠাণ্ডা এ বৃক্ষের জন্য ক্ষতিকর হয় না। অগ্নি সেটাকে স্পর্শ না করলেও যেন এর তৈল স্বীয় পরিচ্ছন্নতার দরুন উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির উপর তেলের জ্যোতি আগুনের। আল্লাহর নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের নূরের উপর মুমিনদের জন্য আল্লাহর হেদায়েতের নূর। আল্লাহ তার নূরের পথ নির্দেশ দান করেন অর্থাৎ দীন ইসলামের যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন বর্ণনা করে থাকেন। যাতে তা মানুষের বোধগম্যের নিকটবর্তী হয়, মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। আল্লাহর এ ইলমের মধ্যে উপমা দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য; যা পূর্ববর্তী বাক্যের تَاكِيْد-এর জন্য আনা হয়েছে। এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা আর نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হচ্ছে তার خَبَرْ; আল্লাহর সত্তার উপর نُوْر শব্দটির প্রয়োগ হয়তো مُبَالَغَة হিসেবে করা হয়েছে। যেমনটা زَيْدٌ عَدْلٌ বাক্যে হয়েছে। অথবা এর مَحْذُوْف টি مُضَاف রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি মূলত এরূপ ছিল- اَللّٰهُ ذُوْ نُوْرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - কিংবা نُوْر শব্দটি مُتَّصِلٌ بِمَعْنٰى اِسْم فَاعِل তথা منور অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) এমনটিই বলেছেন।

قَوْلُهُ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ : مَثَلُ نُوْرِهٖ অংশটি تَرْكِيْب اِضَافِىْ হয়ে مُبْتَدَأ আর كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ হচ্ছে এর خَبَرْ; مِشْكٰوة-এর পূর্বে نُوْر শব্দটি مُضَاف হিসেবে مَحْذُوْف রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটির মূলরূপ এভাবে হবে- صِفَةُ نُوْرِهٖ تَعَالٰى فِىْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ كَنُوْرِ مِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

قَوْلُهُ زُجَاجَةٍ : زُجَاجَةٍ শব্দটি زَاء অক্ষরে তিন প্রকারের حَرَكَة তথা যবর, যের এবং পেশ যে কোনো একটি দিয়ে পড়া যায়। এর অর্থ হচ্ছে সীসা, সীসা দ্বারা নির্মিত পাত্র। زُجَاجَة শব্দটি قِنْدِيْل তথা প্রদীপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা তা সীসা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تُوْقَدُ : تُوْقَدُ শব্দটিতে তিন রকম কেরাত জায়েজ আছে। যথা-

১. تَوَقَّدَ بر وَزن تَفَعَّلَ - এ ক্ষেত্রে اَلْمِصْبَاحُ তার فَاعِلْ হবে। যেমন- بَاب تَفَعُّلْ থেকে فِعْل مَاضِى -এর صِيْغَة

২. يُوْقَدُ - এ ক্ষেত্রে اَلْمِصْبَاحُ যেমন- اَوْقَدَ-এর فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ-এর صِيْغَة উক্ত فِعْل-এর نَائِب فَاعِلْ হবে।

৩. تُوْقَدُ - এক্ষেত্রে اَلزُّجَاجَةُ শব্দটি যেমন- اَوْقَدَ-এর فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর صِيْغَة তার উহ্য مُضَاف সহ تُوْقَدُ-এর نَائِب فَاعِلْ হবে। অর্থাৎ نَائِب فَاعِلْ টির মূলরূপ হচ্ছে- فَتِيْلَةُ الزُّجَاجَةِ -

قَوْلُهُ زَيْتُوْنَةٍ : زَيْتُوْنَةٍ শব্দটি شَجَرَةٍ থেকে بَدَل-এটি সবচেয়ে সুস্পষ্ট অথবা কূফার নাহু শাস্ত্রবিদগণের মতে, এটি হচ্ছে- عَطْف بَيَانْ; কেননা তাদের মতে نَكِرَه-এর মধ্যেও عَطْف بَيَانْ জায়েজ আছে। شَجَرَةٍ হচ্ছে مَوْصُوْف আর مُبَارَكَةٍ হচ্ছে এর صِفَتْ; مَوْصُوْف তার صِفَتْ-এর সঙ্গে মিলে مُبْدَل مِنْه তার بَدَل; بَدَل হচ্ছে زَيْتُوْنَةٍ - مُبْدَل مِنْه তার جَارّ - مُضَاف اِلَيْه-এর সঙ্গে মিলে مَجْرُوْر হয়েছে। مُضَاف টি তার উহ্য زَيْت আর مُضَاف اِلَيْه-এর সঙ্গে মিলে مَجْرُوْر-এর সঙ্গে মিলে تُوْقَدُ-এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ : এ বাক্যটি شَجَرَةٍ-এর صِفَةْ -

قَوْلُهُ وَلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ : এ বাক্যটি হচ্ছে شَرْط আর جَوَاب شَرْط টি উহ্য রয়েছে। جَوَاب شَرْط হচ্ছে لِاَضَاءَ نُوْرِهٖ بِهٖ اَىْ بِالزَّيْتِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : মহান আল্লাহ বলেন- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের নূর বা জ্যোতি, উক্ত আয়াতের তাফসীর আলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথম نُوْر সম্পর্কে অবগতি লাভ করা একান্ত আবশ্যক। আরবি اَلنُّوْرُ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْوَارٌ ব্যবহৃত হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো- আলো, জ্যোতি, প্রদীপ ইত্যাদি।

আর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী (র.) বলেন– اَلظَّاهِرُ بِنَفْسِهِ وَالْمُظْهِرُ لِغَيْرِهٖ অর্থাৎ, যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায় এমন সব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে। অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে।

এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্য ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে مُنَوِّرٌ অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য দানকারী অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরবিশিষ্টকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে আরবিতে عَدْلٌ তথা ন্যায়পরায়ণতা বলে ব্যক্ত করা হয়। আর এখানে আয়াতের অর্থও তা-ই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এ নূর বলে হেদায়েতের নূর বুঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন– اَللّٰهُ هَادِىْ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

قَوْلُهُ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ : মহান আল্লাহ বলেন– مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ অর্থাৎ তাঁর জ্যোতি দীপাধার সদৃশ। এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন– ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন–

هُوَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ وَالْقُرْاٰنَ فِىْ صَدْرِهٖ فَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلَهٗ فَقَالَ اللّٰهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَبَدَأَ بِنُوْرِ نَفْسِهٖ ثُمَّ ذَكَرَ نُوْرَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ فَكَانَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُهَا مَثَلُ نُوْرِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ ـ

অর্থাৎ এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কুরআনের নূরে হেদায়েত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন– مَثَلُ نُوْرِهٖ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ ; হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এ আয়াতের কেরআতও مَثَلُ نُوْرِهٖ -এর পরিবর্তে مَثَلُ نُوْرِهٖ পড়তেন। সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা.) এ কেরাত এবং আয়াতের এ অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন– مَثَلُ نُوْرِهٖ -এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। যথা–

১. এ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে-হেদায়েত, যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত كَمِشْكٰوةٍ ; এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি।

২. সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এ অর্থ বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মতো এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তূন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হেদায়েতের দৃষ্টান্ত। যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তূন তৈল রাখা হলো নূরে হেদায়েত যখন তা আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এ নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এ সৃষ্টিগত নূরে হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরের রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জাগত স্বভাবে এই নূরে হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর

দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক; কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ হাদীস থেকে এ ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ ফিতরতের অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এ নূরে হেদায়েতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গাম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপক আকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কুরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক পায়, তারাই এ নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তৌফিক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক; বরং মাঝে মাঝে তা ক্ষতিকরও হয়।

قَوْلُهُ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ইমাম বগভী (র.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন– এ আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'বে আহবার (রা.) তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, زجاجة তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পূত পবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এ নবুয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হয়ে এটা এমন নূরে পরিণত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'ইরহাসাত' বলা হয়। কেননা 'মুজেযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলি বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'ইরহা-সা-ত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী 'খাসাইসে-কুবরা' গ্রন্থে, আবূ নু'আঈম 'দালাইলে-নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ الخ : মহান আল্লাহ বলেন– يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ অর্থাৎ এ প্রদীপকে প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা। زَيْتُوْنَةٍ শব্দটি بَدَل বা عَطْف بَيَانٌ হয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে– ঐ যয়তুন বৃক্ষ প্রাচ্যেরও নয় যে, দিনের প্রথম ভাগ হতে এর উপর রৌদ্র এসে পড়বে না এবং প্রতীচ্যেরও নয় যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এর উপর হতে ছায়া সরে যাবে; বরং বৃক্ষটি আছে মধ্যস্থলে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তা সূর্যের পরিষ্কার আলোতে থাকে। তাই এর তৈলও খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে– ঐ বৃক্ষটি মাঠের মধ্যে রয়েছে। কোনো গাছ, পাহাড়, গুহা বা অন্য কোনো জিনিস তাকে আড়াল করে না। এ কারণেই ঐ গাছের তৈল খুবই পরিষ্কার হয়।

হযরত ইকরিমা (র.) বলেন, খোলা বায়ু এবং পরিষ্কার রৌদ্র তাতে পৌঁছে থাকে। কেননা এটা খোলা মাঠের মধ্যস্থলে থাকে। **আর এ কারণেই** তার তৈল অত্যন্ত পাক-সাফ, উজ্জ্বল ও চকচকে হয়। এটাকে প্রাচ্যের গাছও বলা যাবে না এবং প্রতীচ্যেরও **নয়। এরূপ** গাছ খুবই তরতাজা ও সবুজ-শ্যামল হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ বৃক্ষ যেমন বিপদ-আপদ হতে রক্ষা পেয়ে থাকে, **অনুরূপভাবে** মুমিনও ফেতসা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষিত থাকে। যদি সে ফেতনার কোনো পরীক্ষায় পড়েও যায়, তবুও আল্লাহ তা'আলা তাকে ঈমানের উপর স্থির ও অটল রাখেন।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এ বৃক্ষটি যদি দুনিয়ার মাটিতে থাকতো, তবে তো অবশ্যই তা প্রাচ্যের হতো অথবা প্রতীচ্যের হতো। কিন্তু এটা তো আল্লাহর জ্যোতির উপমা!

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো ভালো লোকের দৃষ্টান্ত, যে ইহুদিও নয় এবং খ্রিস্টানও নয়। এসব উক্তির মধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম উক্তিটি যে, এটা জমিনের মধ্যভাগে রয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় বিনা বাধায় সেখানে রৌদ্র পৌঁছে থাকে। কেননা এর চারদিকে কোনো গাছ নেই। কাজেই এরূপ গাছের তৈল নিঃসন্দেহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পাতলা এবং উজ্জ্বল হবে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, এটা প্রজ্বলিত করা হয়েছে পূত-পবিত্র যয়তূন তৈল দ্বারা। এটা এমনই উজ্জ্বল যে, তাকে অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন তার তৈল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। তাই এটা জ্যোতির উপর জ্যোতি। সুতরাং মুমিন পাঁচটি নূর বা জ্যোতি লাভ করেছে। তার কথা জ্যোতি, তার আমল জ্যোতি, তার আগমন জ্যোতি, তার প্রস্থান জ্যোতি এবং তার শেষ ঠিকানাও জ্যোতি অর্থাৎ জান্নাত।

হযরত কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এটা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দৃষ্টান্ত। তাঁর নবুয়ত জনগণের উপর এমনভাবে প্রকাশমান যে, তিনি মুখে না বললেও জনগণের উপর তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন এ যয়তূন তৈল যে, এটাকে না জ্বালালেও নিজেই উজ্জ্বল। তাহলে এখানে দুটো জ্যোতি একত্র হয়েছে। একটি যয়তূনের এবং অপরটি আগুনের। এ দুটি যৌথভাবে আলো দেয়। অনুরূপভাবে কুরআনের জ্যোতি ও ঈমানের জ্যোতি একত্র হয়ে মুমিনের অন্তর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে।

যয়তূন তৈলের বৈশিষ্ট্য : মহান আল্লাহর বাণী– شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ হতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তূন ও যয়তূন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোনো যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না; আপনা-আপনি ফল থেকে তেল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যয়তূন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ। –[মাযহারী]

অনুবাদ :

٣٦. فِىْ بُيُوْتٍ مُتَعَلِّقٌ بِيُسَبِّحُ الْاٰتِىْ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ تُعْظَمَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ بِتَوْحِيْدِهٖ يُسَبِّحُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ كَسْرِهَا اَىْ يُصَلِّىْ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْغَدَوَاتِ اَىِ الْبُكَرِ وَالْاٰصَالِ. الْعَشَايَا مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ.

৩৬. সেসব গৃহে এটি পরবর্তী يُسَبِّحُ শব্দের সাথে সম্পর্কিত। যেগুলোকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সম্মান প্রদর্শন করতে এবং তাঁর নাম স্মরণ করার জন্য একত্ববাদ দ্বারা তাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অর্থাৎ নামাজ পড়ে, এখানে يُسَبِّحُ শব্দটি بَاء বর্ণে যবর এবং যের উভয় কেরাতে পঠিত সকাল বেলায় اَلْغُدُوُّ শব্দটি مَصْدَرٌ, এর অর্থ হচ্ছে غَدَاوَتٌ তথা সকাল। এবং সন্ধ্যা বেলায় সাঁঝ বেলায় সূর্য হেলার পর থেকে।

٣٧. رِجَالٌ فَاعِلُ يُسَبِّحُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَعَلٰى فَتْحِهَا نَائِبُ الْفَاعِلِ لَهٗ وَرِجَالٌ فَاعِلُ فِعْلٍ مُقَدَّرٍ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَاَنَّهٗ قِيْلَ مَنْ يُسَبِّحُهٗ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ اَىْ شِرَاءٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ حُذِفَ هَاءُ اِقَامَةٍ تَخْفِيْفًا وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ص يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ تَضْطَرِبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ. مِنَ الْخَوْفِ الْقُلُوْبُ بَيْنَ النَّجَاةِ وَالْهَلَاكِ وَالْاَبْصَارُ بَيْنَ نَاحِيَتَىِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ.

৩৭. সেসব লোক, এখানে يُسَبِّحُ-কে যখন بَاء-এর মধ্যে كَسْرَة দিয়ে পড়া হবে, তখন رِجَالٌ তার فَاعِل হবে। আর যদি بَاء-এর মধ্যে فَتْحَة দিয়ে পড়া হয়, তাহলে رِجَالٌ তার نَائِب فَاعِل হবে। رِجَالٌ এখানে একটি উহ্য فِعْل-এর فَاعِل এবং একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। যেন এমন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, কে তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে? আর এর জবাবে বলা হচ্ছে– رِجَالٌ الخ যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না, এবং নামাজ কায়েম করা থেকে -এ আয়াতে اِقَامَةٌ শব্দ থেকে ة অক্ষরটিকে রহিত করা হয়েছে, সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ও জাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন অন্তর মুক্তি ও ধ্বংসের ব্যাপারে অস্থির থাকবে এবং চোখ ডানে বামে তাকাতে থাকবে। আর সেটি হবে কিয়ামতের দিন।

٣٨. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا اَىْ ثَوَابَهٗ وَاَحْسَنَ بِمَعْنٰى حَسَنٌ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. يُقَالُ فُلَانٌ يُنْفِقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَىْ يُوَسِّعُ كَاَنَّهٗ لَا يَحْسَبُ مَا يُنْفِقُهٗ.

৩৮. তারা এজন্য এরূপ করতে থাকবে, যাতে তারা যে কর্ম করে, তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন তার প্রতিদান দেন। এ আয়াতে اَحْسَنَ শব্দটি حَسَنٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা প্রদান করেন। بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থ হচ্ছে প্রাচুর্য। যেমন– বলা হয়, অমুক ব্যক্তি বে-হিসাব খরচ করে। অর্থাৎ সে এত বেশি খরচ করে যে, যা কিছু খরচ করে, সে যেন এর কোনো হিসাবই রাখে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ : এ বাক্যটি بُيُوْتٍ-এর صِفَتْ - اَنْ تُرْفَعَ الخ বাক্যটি بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হয়ে উহ্য بَاء -এর مَجْرُوْر হবে। উহ্য عِبَارَةْ হচ্ছে এরূপ- اَمَرَ اللّٰهُ بِرَفْعِهَا يُسَبِّحُ ; يُسَبِّحُ -কে যদি حَرْف جَر বর্ণে فَتْحَة -এর সাথে পড়া হয়, তাহলে لَهُ তার نَائِب فَاعِلْ হবে এবং رِجَال শব্দটি فِعْل مَحْذُوْف -এর فَاعِلْ হবে। আর তখন এই উহ্য فِعْل টি একটি উহ্য سُوَالْ -এর جَوَابْ হবে। অর্থাৎ যখন বলা হবে যে, يُسَبِّحُ لَهُ তখন প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, مَنْ يُسَبِّحُ ? উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে- رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَهُمْ : এ বাক্যের টি হচ্ছে لَام عَاقِبَة অর্থাৎ عَاقِبَةُ اَمْرِهِمُ الْجَزَاءُ الْحَسَنُ ; এটি يُسَبِّحُ -এর সঙ্গেও مُتَعَلِّقْ হতে পারে। অর্থাৎ يُسَبِّحُوْنَ لِاَجْلِ الْجَزَاءِ এ বাক্যটি يُسَبِّحُ -এর مُتَعَلِّقْ -ও হতে পারে। অর্থাৎ এছাড়া এটি فِعْل مَحْذُوْف -এর مُتَعَلِّقْ -ও হতে পারে। তখন تَقْدِيْر عِبَارَتْ হবে এরূপ- يُسَبِّحُوْنَ لِاَجْلِ الْجَزَاءِ ; فَعَلُوْا ذٰلِكَ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে নিজের নূরে হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন, এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ চান ও তাওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনের আসল আবাসস্থল হচ্ছে যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়- সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী فِىْ بُيُوْتٍ -এর সম্পর্ক يَهْدِى اللّٰهُ بِنُوْرِهِ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يُسَبِّحُ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يُسَبِّحُ শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলার নূরে হেদায়েত পাওয়ায় স্থান সেসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদের গুরুত্ব : মসজিদ আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। ইমাম কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এ হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ اَحَبَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيُحِبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ فَلْيُحِبَّ اَصْحَابِىْ وَمَنْ اَحَبَّ اَصْحَابِىْ فَلْيُحِبَّ الْقُرْاٰنَ وَمَنْ اَحَبَّ الْقُرْاٰنَ فَلْيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ فَاِنَّهَا اَفْنِيَةُ اللّٰهِ اَذِنَ اللّٰهُ فِىْ رَفْعِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا مَيْمُوْنَةٌ مَيْمُوْنٌ اَهْلُهَا مَحْفُوْظَةٌ مَحْفُوْظٌ اَهْلُهَا هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ حَوَائِجِهِمْ هُمْ فِى الْمَسَاجِدِ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কুরআনকে মহব্বত করে। যে কুরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহর হেফাজতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহর হেফাজতে থাকে। যারা নামাজে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাজত করেন। -[কুরতুবী]

رَفْعِ مَسَاجِد -এর অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী- اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ -এর মধ্যে اَذِنَ শব্দটি اِذْنٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। تُرْفَعَ শব্দটি رَفْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। -[ইবনে কাসীর]

ইকরিমা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, رَفْع বলে মসজিদ নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। যেমন- কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে- وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ এখানে رَفْع قَوَاعِد বলে ভিত্তি নির্মাণ বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, رَفْع مَسَاجِد বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইজ্জত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বুঝানো হয়েছে। যেমন- এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোনো নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্চিত হয়, যেমন আগুনের সংস্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্চিত হয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরামি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন। -[ইবনে মাজাহ]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ নামাজ পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরি করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন। -[কুরতুবী]

প্রকৃত কথা এই যে, تُرْفَعَ শব্দের অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা, পাক পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরামি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছন। সাধারণ হাদীসগ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হুক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তদ্রূপ নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমনি নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারূকে আযম (রা.) বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পিঁয়াজের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি রসুন-পিঁয়াজ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায়, যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। তার নিজেরও উচিত, যতদিন এ রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামাজ পড়া।

رَفْعُ الْمَسَاجِد -এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে, মসজিদ নির্মাণ করা এবং মসজিদকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শান-শওকত ও সুষ্ঠ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত ওসমান (রা.) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শান-শওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাগণত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর এ কাজ অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহরা তো মসজিদ নির্মাণে অঢেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। তাঁর নির্মিত এ মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়; বরং আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরম্য, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং এর দ্বারা ছওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ফজিলত : আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি গৃহে অজু করে ফরজ নামাজের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার ছওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাজের পরে অন্য নামাজ ইল্লিয়্যীনে লিখিত হয়, যদি উভয়ের মাঝখানে কোনো কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। -[মুসলিম]

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুরুষের নামাজ জামাতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামাজ পড়ার চেয়ে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নত অনুযায়ী অজু করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাজের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্যাদা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামাতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাজেরই ছওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে, "হে আল্লাহ! তার প্রতি রহমত নাজিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার অজু না ভাঙ্গে।"

হযরত হাকাম ইবনে ওমায়র (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং [আল্লাহর ভয়ে] অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মত্ত হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত আবূদ দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন, তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনেছি– মসজিদ মুত্তাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে [অধিক জিকির দ্বারা] নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আরাম ও শান্তি নিশ্চিত করেন এবং পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার জিম্মাদার হয়ে যান।

আবূ সাদেক ইজদী শুয়াইব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্রে লিখেছেন, মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এ রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসিজদ পয়গাম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শেষ জমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে এবং দুনিয়া ও তার মহব্বতের কথাবার্তা বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা মসজিদে আগমনকারী এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নেই।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বের না করা তার দায়িত্ব। –[কুরতুবী]

মসজিদের পনেরটি আদব : আলেমগণ মসজিদের পনেরটি আদব উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. মসজিদে পৌঁছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামাজ, তেলাওয়াতে কুরআন, তাসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা নামাজ অবস্থায় সালাম করা জায়েজ নয়। ২. মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাজের জন্য মাকরূহ সময় না হয়। অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় না হয়। ৩. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। ৪. মসজিদে তীর-তরবারি বের না করা। ৫. মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি বা নিখোঁজ বস্তুর তল্লাশী ঘোষণা না করা। ৬. মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলা। ৭. মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। ৮. মসজিদে বসার জায়গায় কারো সাথে ঝগড়া না করা। ৯. যেখানে কাতারে পুরাপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। ১০. নামাজি ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। ১১. মসজিদে থুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। ১২. অঙ্গুলি না ফুটানো। ১৩. শরীরের কোনো অংশ নিয়ে খেলা না করা। ১৪. নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। ১৫. অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ পনেরটি আদব লিখার পর বলেন, যে ব্যক্তি এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্য পরিশোধ করে এবং এর ফলে মসজিদ তার জন্য হেফাজত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়।

মুফতি শফী (র.) মসজিদের আদব-কায়দা ও এর প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' নামক একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন।

যেসব গৃহ আল্লাহর জিকির, কুরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান (র.) বলেন, কুরআনের فِىْ بُيُوْتٍ শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহ কুরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসিহত অথবা জিকিরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, তা দ্বারা সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন– মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

اَذِنَ اللّٰهُ বাক্যে اَذِنَ শব্দের বিশেষ রহস্য : তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে اَذِنَ শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে حُكْم ও اَمَرَ শব্দের পরিবর্তে اَذِنَ শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রূহুল মা'আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

قَوْلُهُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُهُ : এখানে তাসবীহ [পবিত্রতা বর্ণনা], তাহমীদ [প্রশংসা কীর্তন], নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার জিকির বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ الخ : শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এ আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন, একদিন আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নামাজের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, এদের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়েছে–

رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সওদা ওজন করার সময় আজানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাজের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তপ্ত লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আজানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে কাঁধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাজে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতে না। তাঁদের প্রশংসায়ই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ الخ : মহান আল্লাহর বাণী– رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতে যেসব মু'মিন আল্লাহ তা'আলার নূরে হেদায়েতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে رجال শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য; পক্ষান্তরে নারীদের জন্য গৃহে নামাজ পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালাম (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তিজারত' শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই কোনো কোনো তফসীরবিদ বৈপরীত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে تِجَارَةٌ অর্থ ক্রয় এবং بَيْعٌ শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন।

কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থেই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بَيْعٌ -কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোনো বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর জিকির ও নামাজের বিপরীতে মু'মিনগণ কোনো বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসায়ী ছিলেন : এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পপতি ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা আল্লাহর স্মরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা এ কথা বলা অনর্থক হবে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ الخ : মহান আল্লাহর বাণী– يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর জিকির, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্যও হয়ে যায় না; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নূরে হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। মাতারুল অরাক (র.) বলেন যে, তাঁরা বেচাকেনা করতেন, নিক্তি হয়তো তাদের হাতে থাকতো এমতাবস্থায় আজান তাদের কানে আসলে তাঁরা নিক্তি ফেলে দিয়ে নামাজের উদ্দেশ্যে ধাবিত হতেন। জামাতের সাথে নামাজ পড়ার প্রতি তাঁদের খুবই আসক্তি ছিল। তাঁরা নামাজের সময়, রুকন এবং আদবের হেফাজতসহ নামাজের পাবন্দ ছিলেন। এটা এ কারণে যে, তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ঐ দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে তারা ছিলেন পূর্ণ ওয়াকিফহাল যে, সেই দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই তো তাঁরা থাকতেন সদা উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে– শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا الخ : এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাতে তারা যে কর্ম করে তজ্জন্যে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ "আল্লাহ অণুপরিমাণও জুলুম করেন না।" অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে তার জন্য দশগুণ পুণ্য রয়েছে।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেন, "কে এমন আছে, যে আল্লাহকে করজে হাসানা দিতে পারে?" তিনি আরো বলেন, "তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন [পুণ্য] বৃদ্ধি করে থাকেন।" এখানে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

বর্ণিত আছে, যে, একদা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে দুধ আনয়ন করা হয়। তিনি তাঁর মজলিসের সব লোককেই তা পান করাবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু সবাই রোজা অবস্থায় ছিলেন বলে পুনরায় দুধের পাত্রটি তাঁর কাছেই ফিরিয়ে আনা হয়। তখন তিনি তা পান করেন, কারণ তিনি রোজা অবস্থায় ছিলেন না। অতঃপর তিনি يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ -এ আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর বাণী– لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ [তিনি তাদেরকে পূর্ণভাবে তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং প্রাপ্যের অধিক দিবেন] -এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তাদের প্রতিদান এই যে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। আর তাদের প্রাপ্যের অধিক দিবেন, এর ভাবার্থ এই যে, যারা তাদের প্রতি ইহসান করেছিল তারা শাফাআতের হকদারও বটে, তাদের জন্য শাফাআত করার অধিকারও লাভ করবে।"

এরপর বলা হয়েছে– وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন। وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোনো সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিসীম রিজিক দান করবেন।

অনুবাদ :

٣٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ جَمْعُ قَاعٍ اَيْ فِيْ فَلَاةٍ وَهُوَ شُعَاعٌ يُرٰى فِيْهَا نِصْفُ النَّهَارِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ يُشْبِهُ الْمَاءَ الْجَارِيْ يَّحْسَبُهُ يَظُنُّهُ الظَّمْاٰنُ اَيِ الْعَطْشَانُ مَاۤءً حَتّٰٓى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا مِمَّا حَسِبَهٗ كَذٰلِكَ الْكَافِرُ يَحْسَبُ اَنَّ عَمَلَهٗ كَصَدَقَةٍ تَنْفَعُهٗ حَتّٰى اِذَا مَاتَ وَقَدِمَ عَلٰى رَبِّهٖ لَمْ يَجِدْ عَمَلَهٗ اَيْ لَمْ يَنْفَعْهُ وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِنْدَ عَمَلِهٖ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ اَيْ اَنَّهٗ جَازَاهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ اَيِ الْمُجَازَاةِ ـ

৩৯. যারা কুফরি করে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, بِقِيْعَةٍ শব্দটি قَاعٌ -এর বহুবচন। অতএব, بِقِيْعَةٍ অর্থ– হচ্ছে فِيْ فَلَاةٍ তথা মরুভূমিতে। سَرَابٌ -ঐ চাকচিক্যকে বলা হয়, যা গ্রীষ্মকালীন দুপুর বেলার প্রচণ্ড রোদে প্রবহমান পানির মতো মনে হয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে। কিন্তু সে যখন এর নিকট উপস্থিত হয়, তখন কিছুই পায় না। যা সে ধারণা করেছে, সেই বস্তু থেকে। অনুরূপভাবে কাফেররা মনে করে যে, নিশ্চয় তার আমল যেমন– সদকা তাকে উপকৃত করবে। কিন্তু সে যখন মৃত্যুবরণ করবে এবং আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে তার আমলকে উপকারী হিসেবে পাবে না। আর সে তার আমলের নিকট আল্লাহকে পাবে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই পূর্ণমাত্রায় দিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা হিসাব গ্রহণে তৎপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমলের প্রতিফল দানে অত্যন্ত তৎপর।

٤٠. اَوْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمُ السَّيِّئَةُ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ عَمِيْقٍ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ اَيِ الْمَوْجُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ اَيْ مَوْجُ الثَّانِيْ سَحَابٌ ؕ اَيْ غَيْمٌ هٰذِهٖ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ظُلْمَةُ الْبَحْرِ وَظُلْمَةُ الْمَوْجِ الْاَوَّلِ وَظُلْمَةُ الْمَوْجِ الثَّانِيْ وَظُلْمَةُ السَّحَابِ اِذَآ اَخْرَجَ النَّاظِرُ يَدَهٗ فِيْ هٰذِهِ الظُّلُمٰتِ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا اَيْ لَمْ يَقْرُبْ مِنْ رُؤْيَتِهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ اَيْ مَنْ لَّمْ يَهْدِهِ اللّٰهُ لَمْ يَهْتَدِ ـ

৪০. অথবা কাফেরদের বদ আমলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ; যাকে আচ্ছন্ন করে এক তরঙ্গের উপর দ্বিতীয় তরঙ্গ; যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর সমুদ্রের অন্ধকার, প্রথম তরঙ্গের অন্ধকার, দ্বিতীয় তরঙ্গের অন্ধকার, মেঘপুঞ্জের অন্ধকার– এসব অন্ধকারের মঝে দর্শক যদি নিজের হাত বের করে, তা আদৌ দেখতে পাবে না। অর্থাৎ সে মোটেই দেখার নিকটবর্তী হতে পারবে না। আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন না, কেউ তাকে হেদায়েত দান করতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ : وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا - مَوْصُوْل ও صِلَة মিলে مُبْتَدَأ اَوَّل এবং اَعْمَالُهُمْ হচ্ছে مُبْتَدَأ ثَانِيْ - অতঃপর كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ বাক্যটি كَائِنٌ -এর مُتَعَلِّقٌ হয়ে مُبْتَدَأ ثَانِيْ -এর خَبَرٌ হয়েছে। এরপর مُبْتَدَأ ثَانِيْ তার خَبَرٌ -এর সঙ্গে মিলে وَالَّذِيْنَ - مُبْتَدَأ اَوَّل -এর خَبَرٌ হয়েছে। মুবতাদা আওয়াল তার خَبَرٌ -এর সঙ্গে মিলে جُمْلَه اِسْمِيَّة خَبَرِيَّة হয়েছে।

প্রাসাঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ الخ : এ আয়াত থেকে মহান আল্লাহ কাফেরদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এটি হচ্ছে প্রথম দৃষ্টান্ত। আর প্রথমটি হচ্ছে ঐ কাফেরদের দৃষ্টান্ত যারা অন্যদেরকেও কুফরির দিকে আহ্বান করে থাকে এবং মনে করে যে, তারা হেদায়েতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; কিন্তু এটা শুধু তাদের কল্পনা মাত্র। তাদের দৃষ্টান্ত তো হলো এরূপ যেমন কোনো পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে দূর থেকে চকচকে বালু দেখতে পায় এবং তাকে পানির তরঙ্গ মনে করে বসে। উক্ত আয়াতে قِيْعَةٌ শব্দটি قَاعٌ শব্দের বহুবচন, যেমন جَارٌ শব্দটির বহুবচন হলো جِيْرَةٌ, আর قَاعٌ শব্দের বহুবচন قِيْعَانٌ -ও এসে থাকে, যেমন جَارٌ শব্দের বহুবচন جِيْرَانٌ -ও আসে। قَاعٌ শব্দের অর্থ হলো জনশূন্য প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এরূপ মরুভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। দুপুরের সময় এরূপই মনে হয় যে, পানির প্রশস্ত সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে। মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে চলতে যখন কোনো লোক পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করে এবং ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে যায়, আর উদ্ভ্রান্তের মতো পানির খোঁজে ফিরতে থাকে, তখন সে ওটাকে পানি মনে করে সেখানে পৌঁছে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে যে, সেখানে এক ফোঁটা পানিরও কোনো নাম-নিশানা নেই। তদ্রূপ এই কাফেররাও মনে করে নিয়েছে যে, তারা খুব ভালো কাজই করছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা দেখতে পাবে যে, তাদের কাছে একটা পুণ্যও নেই। হয়তো তাদের পুণ্য তাদের বদ নিয়তের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা শরিয়ত মোতাবেক না হওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। মোটকথা, সেখানে পৌঁছার পূর্বেই তারা জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সেখানে তারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ শূন্যহস্ত। হিসাব গ্রহণের সময় স্বয়ং মহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সেখানে বিদ্যমান। তিনি এক এক করে প্রত্যেকটি আমলের হিসাব গ্রহণ করছেন এবং ঐ কাফেরদের একটি আমলও পুণ্যের যোগ্যরূপে পাওয়া যাচ্ছে না।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ইহুদিদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, "দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে?" উত্তরে তারা বলবে, "আমরা আল্লাহর পুত্র [নাউযুবিল্লাহ] উযায়ের (আ.)-এর উপাসনা করতাম।" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, আল্লাহর কোনো পুত্র নেই।" তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, "আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও?" তারা জবাবে বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে পানি পান করিয়ে দিন!" তখন তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না [ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও না কেন?]" অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। সুতরাং তারা পানি মনে করে সেদিকে দৌড় দেবে এবং সেখানে পৌঁছলেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

قَوْلُهُ اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشٰهُ الخ : এ আয়াতে মহান আল্লাহ কাফেরদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আর এটা হলো অনুসরণকারী লোকদের দৃষ্টান্ত, যারা মোটেই জ্ঞান রাখতো না। তারা পূর্ববর্ণিত কাফেরদের অন্ধ অনুকরণ করতো। যাদের উপমা দেওয়া হয়েছে গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকারের সাথে, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে রয়েছে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ, স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। এই অবস্থা ঐ অনুসরণকারী কাফেরদের হবে যারা নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকে। যাদেরকে তারা অনুসরণ করে তাদেরকেও তারা সঠিকভাবে চিনে না। তারা ন্যায়ের উপর আছে নাকি অন্যায়ের উপর আছে? সেটাও তারা জানে না। তারা তাদের পিছনে চলতে থাকে; কিন্তু তারা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এ খবর তারা রাখে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে যে, কোনো একজন অজ্ঞ লোককে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?" উত্তরে সে বলে, "আমি এই লোকটির সাথে যাচ্ছি।" আবার তাকে প্রশ্ন করা হয়, "এ লোকটি কোথায় যাচ্ছে?" জবাবে সে বলে, "তা তো আমি জানি

না।" যেমন সমুদ্র তরঙ্গায়িত হচ্ছে তেমনই এই কাফেরের কানে এবং চোখের উপর পর্দা পড়ে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর ও কানের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন ....।"

অন্য আয়াতে রয়েছে–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوٰهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشٰوَةً

অর্থাৎ "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি যে তার প্রবৃত্তিকে তার মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে, আর আল্লাহ তাকে জ্ঞানের উপর পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কর্ণকুহরে ও অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন ও তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন?।" –[সূরা জাসিয়া : ২৩]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেছেন যে, এই ধরনের লোক পাঁচটি অন্ধাকারের মধ্যে থাকে। তার কথা, কাজ, যাওয়া, আসা এবং পরিণাম অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েতের জ্যোতি দান না করেন, সে হেদায়েতশূন্য থাকে এবং অজ্ঞতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন– مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো হেদায়েতকারী নেই।" এটা সে কথার মোকাবিলায় বলা হয়েছে যা মু'মিনদের উপমার বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আমরা মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি করেন এবং আমাদের ডানে এবং বামেও যেন নূর বা জ্যোতি দান করেন। তিনি যেন আমাদের জ্যোতি বাড়িয়ে দেন এবং ওটাকে খুবই বড় ও বেশি করেন।

قَوْلُهٗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا الخ : উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে কাফেরদের উভয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে– وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ এ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা নূরে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। আল্লাহর নূর কোথায় পাবে? আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা নিরেট আল্লাহর দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে। –[মাযহারী]

আয়াত সম্পর্কে দু'টি কথা : এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম হেদায়েতের নূরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে হেদায়েতের নূর লাভ হয় ইসলামি শরিয়তের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে। এরপর ইরশাদ হয়েছে, হেদায়েতের এ নূর লাভ করতে হলে আল্লাহর ঘর মসজিদে নিয়মিত হাজির হতে হবে এবং আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতে হবে। আর হেদায়েতের এ নূরকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকির এবং তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতে হবে। এজন্যে পন্থা হলো, যারা সকাল সন্ধ্যায় তথা দিবারাত্রি আল্লাহ পাকের জিকিরে মশগুল থাকে এবং তাদের দুনিয়াদারী বা ব্যবসা-বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে না, এমন লোকদের সান্নিধ্য লাভ করা। এমন লোকদের সংসর্গের কারণে সর্বদা জিকিরে ইলাহীতে মশগুল থাকার তাওফীক হবে। এরপর যারা সত্য-সাধক, তাদের উত্তম পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ : এখানে আল্লাহ পাকের প্রেমিক আউলিয়ায়ে কেরামের উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর পরবর্তী আয়াত– وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا..... থেকে কাফেরদের অবস্থা এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কাফেরদের কার্যকলাপের দু'টি দৃষ্টান্তও পেশ করা হয়েছে। কাফেরদের মধ্যে যারা কিছু সৎকাজ করে, যেমন– দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে দান-খয়রাত করে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে যে, তাদের এসব কাজ হলো মরীচিকার ন্যায়, যাকে তারা দূর থেকে দেখে পানি মনে করে; কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে পানির নামগন্ধও নেই। ঠিক এমনিভাবে কাফেররা যত দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করুক না কেন; কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, তাই আখিরাতে এর কোনো ফল তারা পাবে না। কেননা এর জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। আর কাফেরদের কুফর ও শিরক, অন্যায় অনাচার, জুলুম অত্যাচারকে অন্ধকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ অন্ধকারেই তারা থাকবে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। দুনিয়াতে এ অন্ধকারে থাকার কারণে তারা হেদায়েতের আলো পায় না, আর আখিরাতে তাদের জন্যে দোজখের চিরশাস্তি অবধারিত। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭]

অনুবাদ :

٤١. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِنَ التَّسْبِيْحِ صَلٰوةٌ وَالطَّيْرُ جَمْعُ طَائِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ صٰفّٰتٍ ط حَالٌ بَاسِطَاتٌ اَجْنِحَتَهُنَّ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ صَلٰوتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ـ فِيْهِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ ـ

৪১. তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে তারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর নামাজও এ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত। এবং পক্ষীকুল طَيْرٌ শব্দটি طَائِرٌ -এর বহুবচন, আকাশ ও পাতালের মাঝে উড়ন্ত তাদের পাখা বিস্তার করা অবস্থায় প্রত্যেকেই জানে আল্লাহকে তাঁর যোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত। এখানে জ্ঞানীদেরকে জ্ঞানহীনদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

٤٢. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج خَزَائِنُ الْمَطَرِ وَالرِّزْقِ وَالنَّبَاتِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ـ الْمَرْجِعُ ـ

৪২. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই বৃষ্টি, জীবিকা ও তৃণলতার ভাণ্ডার আল্লাহরই এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে ফিরে যেতে হবে।

٤٣. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا يَسُوْقُهُ بِرِفْقٍ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ يَضُمُّ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ فَيَجْعَلُ الْقِطَعَ الْمُتَفَرِّقَةَ قِطْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ فَتَرَى الْوَدْقَ الْمَطَرَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ ج مَخَارِجِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ زَائِدَةٌ جِبَالٍ فِيْهَا فِى السَّمَاءِ بَدَلٌ بِاِعَادَةِ الْجَارِ مِنْ بَرَدٍ اَىْ بَعْضَهُ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ ط يَكَادُ يَقْرُبُ سَنَا بَرْقِهِ لَمَعَانُهُ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ـ النَّاظِرَةِ لَهُ اَنْ يَخْطَفَهَا ـ

৪৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন কোমলতার সাথে পরিচালনা করেন অতঃপর তাকে পুঞ্জিভূত করেন একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে দেন। অতঃপর বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলোকে একই টুকরায় পরিণত করে দেন। অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন একটাকে অপরটার উপর রাখেন অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা বৃষ্টি নির্গত হয় তার গর্তসমূহ থেকে তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে বর্ষণ করেন এখানে مِنْ جِبَالٍ -এর مِنْ টি অতিরিক্ত। আর فِيْهَا অর্থ হলো فِى السَّمَاءِ হরফে জরকে পুনরায় এনে اَلسَّمَاءِ থেকে بَدَلٌ হয়েছে শিলা অর্থাৎ, কিছু অংশ এবং তার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। নিকটবর্তী করে দিতে চায়, তার বিদ্যুত চমক তার আলোর ঝলক দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন দর্শকের চক্ষুকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

অনুবাদ :

٤٤. يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط اَىْ يَأْتِىْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بَدَلَ الْاٰخَرِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ التَّقْلِيْبِ لَعِبْرَةً دَلَالَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ لِاَصْحَابِ الْبَصَائِرِ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪৪. আল্লাহ দিবানিশির পরিবর্তন ঘটান অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে প্রতিটিকে একটির পরিবর্তে অপরটি আনয়ন করেন নিশ্চয় এতে পরিবর্তনে উপকরণ বা শিক্ষা রয়েছে নির্দেশনা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নগণের জন্য জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, আল্লাহর কুদরতের উপর।

٤٥. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ اَىْ حَيَوَانٍ مِّنْ مَّآءٍ ج اَىْ نُطْفَةٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ج كَالْحَيَّاتِ وَالْهَوَامِّ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ج كَالْاِنْسَانِ وَالطَّيْرِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ط كَالْبَهَائِمِ وَالْاَنْعَامِ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৪৫. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক চলন্ত জীবকে প্রাণীকে পানি থেকে অর্থাৎ বীর্য ও শুক্র থেকে তাদের কতেক বুকে ভর দিয়ে চলে যেমন- সর্প ও পোকামাকড় বা কীট পতঙ্গ কতেক দু' পায়ে ভর দিয়ে চলে যেমন- মানুষ, পাখি কতেক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে যেমন- চতুষ্পদ প্রাণী আর আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى الخ : এখানে اَلَمْ تَرَ -এর হামযাহটি تَقْرِيْر -এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। আর رُؤْيَتٌ দ্বারা رُؤْيَت قَلْبِىْ তথা অন্তর্দৃষ্টি উদ্দেশ্য। কেননা সাধারণ দৃষ্টির সাথে تَسْبِيْح -এর কোনো সম্পর্ক নেই; বরং تَسْبِيْح -এর সম্পর্ক হচ্ছে قَلْب বা অন্তকরণের সাথে। অর্থ হলো হে মুহাম্মদ ﷺ! খুব ভালোভাবে অনুধাবন করুন যে, আকাশ পাতালের সকল সৃষ্টজীব আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। এমন কি পক্ষীকুলও হাওয়ায় ভেসে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর তাসবীহ জপতে থাকে। আর এখানে مَنْ শব্দটি জ্ঞানসম্পন্নকে জ্ঞানহীনের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আনয়ন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ طَيْرٌ : এখানে طَيْرٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে طَائِرٌ যেমন- رَكْبٌ বহুবচন, আর এর একবচন হলো رَاكِبٌ আর طَيْرٌ শব্দটি مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ -এর উপর عَطْف হয়েছে। এ তারকীবের উপর একটি প্রশ্ন এসে যায়। প্রশ্নটি হলো, যদি طَيْر -এর عَطْف টা مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ -এর উপর করা হয়, তবে عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ লাযেম আসে। কেননা مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ -এর মধ্যে পক্ষীকুলও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْهِ একই বস্তু হয়ে গেল।

মুসান্নিফ (র.)-এর بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ দ্বারা উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য। উত্তরের সারকথা হলো- এখানে مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ এক হয়নি; বরং এর মধ্যে পরিবর্তন রয়েছে। এভাবে যে, مَعْطُوْف عَلَيْهِ দ্বারা আসমান এবং জমিনের সৃষ্টজীব উদ্দেশ্য। কিন্তু পাখি যখন হাওয়ায় ভেসে উড়তে থাকে, তখন তা আকাশেও থাকে না। আবার জমিনেও থাকে না। কাজেই عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর সংশয় তিরোহিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ صَافَّاتٍ : এখানে صَافَّاتٍ শব্দটি طَيْرٌ থেকে حَالٌ হয়েছে। আর طَيْرٌ টি مَنْ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে এবং صَافَّاتٍ এটা حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ : এখানে عَلِمَ , صَلَاتَهُ এবং تَسْبِيْحَهُ তিনটি যমীরের مَرْجِعْ হলো كُلٌّ –[জুমাল]

قَوْلُهُ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, بَيْنَ শব্দটি একাধিকের মাঝে ব্যবহৃত হয়, অথচ এখানে শুধুমাত্র سَحَاب এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর سَحَاب হলো একবচন। মুসান্নিফ (র.) স্বীয় উক্তি يَضُمُّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْض দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ قَطْع سَحَابٌ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, প্রথম অভিমত হলো তিনটি ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ ই كُلٌّ হবে। অর্থাৎ- كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ আর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হলো আল্লাহ তা'আলা। আর صَلَاتَهُ এবং تَسْبِيْحَهُ -এর ضَمِيْر এর مَرْجِعْ হলো كُلٌّ [জুমাল] একটি مُضَاف উহ্য রয়েছে।

আর যদি سَحَاب -কে سَحَابَةٌ -এর বহুবচন ধরা হয় বা اِسْم جِنْس মেনে নেওয়া হয়, তবে উক্ত প্রশ্ন অবান্তর হবে। আর জবাবেরও কোনো প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ رُكَامًا : رُكَام শব্দটি اِسْم অর্থ হলো স্তরে স্তরে। আর يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ এ বাক্যটি الودق হতে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَالِ : এখানে خِلَالِ শব্দটিকে কেউ কেউ حِجَاب -এর ওজনে একবচন বলেছেন। আবার কেউ কেউ خِلَالٌ -কে خَلَلٌ -এর বহুবচন বলেছেন। যেমন- جِبَالٌ শব্দটি جَبَلٌ -এর বহুবচন خِلَالٌ অর্থ হচ্ছে- ছিদ্র, গর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ الخ : আল্লাহ তা'আলা اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ الخ আয়াতে ইরশাদ করেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে অর্থাৎ মানুষ, জিন, ফেরেশতা এমনকি অজৈব বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় লিপ্ত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ "সপ্ত আকাশ ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যত কিছু রয়েছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে থাকে।

উড্ডীয়মান পক্ষীকুলও আল্লাহ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে থাকে। এ সবগুলোর জন্য যথাযোগ্য তাসবীহ তিনি এগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের ইবাদতের বিভিন্ন পন্থাও তাদেরকে শিখিয়ে রেখেছেন। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি শাসনকর্তা, ব্যবস্থাপক, একচ্ছত্র মালিক, প্রকৃত উপাস্য এবং আসমান ও জমিনের বাদশাহ একমাত্র তিনিই। তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর হুকুম কেউ টলাতে পারে না। কিয়ামতের দিন সবাইকে তাঁরই সামনে হাজির হতে হবে। তিনি যা চাইবেন তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে হুকুম জারি করে দিবেন। মন্দ লোক মন্দ বিনিময় পাবে এবং ভালো লোক ভালো বিনিময় লাভ করবে। সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি তিনিই। তিনিই দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত হাকেম। তাঁরই সত্তা প্রশংসা ও গুণকীর্তনের যোগ্য।

قَوْلُهُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ : আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী প্রত্যেক সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। হযরত সুফিয়ান (র.)-এর বর্ণনা মতে এ পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথবীর প্রত্যেক বস্তু আসমান, জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে ব্যাপৃত আছে- এর চুল পরিমাণও বিরোধিত করে না। এ আনুগত্যকে তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবস্থাগত; উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপৃত আছে।

আল্লামা যামাখশারী (র.) ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন, এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে,

তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে মশগুল থাকে। كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও নামাজে সমগ্র সৃষ্টজগত ব্যাপৃত আছে; কিন্তু প্রত্যেকের নামাজ ও তাসবীহের পদ্ধতি ও আকার বিভিন্ন রূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদ অন্য পদ্ধতিতে নামাজ ও তাসবীহ আদায় করে। জড় পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্ন রূপ। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এ বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে- أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এটা ছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে ন্যস্ত কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্য সে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্য অত্যাশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

قَوْلُهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন। এই মেঘমালা তাঁর শক্তিবলে প্রথম প্রথম পাতলা ধোঁয়ার আকারে উঠে। তারপর ঐগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে মোটা ও ঘন হয়ে যায় এবং একে অপরের উপর জমে যায়। তারপর ঐগুলোর মধ্য হতে বৃষ্টি ধারা নির্গত হয়। বায়ু প্রবাহিত হয়, জমিনকে তিনি যোগ্য করে তুলেন। এরপর পুনরায় মেঘকে উঠিয়ে নেন এবং আবার মিলিত করেন। পুনরায় ঐ মেঘমালা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং বর্ষিতে শুরু করে। আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন।

এ বাক্যে প্রথম مِنْ টি اِبْتِدَاء غَايَت-এর জন্য, দ্বিতীয়টি تَبْعِيْض-এর জন্য এবং তৃতীয়টি جِنْس-এর বর্ণনার জন্য। এটা এ তাফসীরের উপর ভিত্তি করে যে, আয়াতের অর্থ করা হবে- শিলার পাহাড় আকাশে রয়েছে। আর যাঁদের মতে এখানে جَبَلٌ বা 'পাহাড়' শব্দটি রূপক অর্থে 'মেঘ' রূপে ব্যবহৃত, তাঁদের নিকট দ্বিতীয় مِنْ টিও اِبْتِدَاء غَايَت-এর জন্য এসেছে। কিন্তু এটা প্রথম مِنْ হতে বদল হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

قَوْلُهُ فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ الخ : মহান আল্লাহর বাণী- فَيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ-এর ভাবার্থ হচ্ছে- বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আল্লাহ তা'আলা যেখানে বর্ষাবার ইচ্ছা করেন সেখানেই তা তাঁর রহমতে বর্ষে থাকে এবং তিনি যেখানে চান না সেখানে বর্ষে না। অথবা ভাবার্থ এই যে, এই শিলা দ্বারা যার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি নষ্ট করার ইচ্ছা করেন, নষ্ট করে দেন এবং যার উপর তিনি মেহেরবানি করেন তার ক্ষেত্র ও বাগানকে তিনি বাঁচিয়ে নেন। পরবর্তী আয়াতে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিদ্যুতের চমক ও শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এটা দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

قَوْلُهُ يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনিই দিবস ও রজনীর পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। যখন তিনি ইচ্ছা করেন দিনকে ছোট করেন ও রাত্রিকে বড় করেন এবং ইচ্ছা করলে দিনকে বড় করেন ও রাত্রিকে ছোট করেন। এই সমুদয় নিদর্শনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এগুলো মহাক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতা প্রকাশ করেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন-

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে নিদর্শনাবলি রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে।" -[সূরা আলে ইমরান : ১৯০]

উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত اَلسَّحَابُ অর্থ মেঘমালা, আর جِبَالٌ অর্থ বড় বড় মেঘ খণ্ড, আর بَرَدٌ অর্থ- শিলা।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ : আল্লাহ তা'আলা وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ আয়াতে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি একই পানি দ্বারা নানা প্রকারের মাখলুক বা সৃষ্টজীব সৃষ্টি করেছেন। সাপ প্রভৃতি প্রাণীকে দেখা যায় যে, এগুলো পেটের ভরে চলে। মানুষ ও পাখী দুই পায়ে চলে এবং জন্তুগুলো চলে চার পায়ে। তিনি বড়ই ক্ষমতাবান; তিনি যা চান না, তা কখনো হয় না।

অনুবাদ :

٤٦. لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ط أَيْ بَيِّنَاتٍ
هِيَ الْقُرْاٰنِ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ إِلٰى
صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ . أَيْ دِيْنِ
الْإِسْلَامِ .

৪৬. আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি, অর্থাৎ
সুস্পষ্ট দলিল, আর তা হলো কুরআন। আল্লাহ যাকে
ইচ্ছা তাকে সরল পথে রাস্তায় পরিচালিত করেন।
অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের পথে।

٤٧. وَيَقُوْلُوْنَ أَيِ الْمُنَافِقُوْنَ اٰمَنَّا صَدَّقْنَا
بِاللّٰهِ بِتَوْحِيْدِهٖ وَبِالرَّسُوْلِ مُحَمَّدٍ
وَاَطَعْنَا هُمَا فِيْمَا حَكَمَا بِهٖ ثُمَّ
يَتَوَلّٰى يُعْرِضُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ
ذٰلِكَ ط عَنْهُ وَمَآ اُولٰٓئِكَ الْمُعْرِضُوْنَ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ . الْمَعْهُوْدِيْنَ الْمُوَافِقِ
قُلُوْبُهُمْ لِأَلْسِنَتِهِمْ .

৪৭. তারা বলে, অর্থাৎ মুনাফিকরা আমরা ঈমান এনেছি
আমরা সত্যায়ন করেছি, আল্লাহর উপর তাঁর
একত্ববাদের উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর মুহাম্মদ
ﷺ এবং আনুগত্য করি তাঁরা যে বিধান দান
করেছেন তার অতঃপর মুখ ফিরিয়ে নেয় বিমুখ হয়
এরপরও তাদের একদল তা থেকে এবং তারা নয়
বিমুখকারীগণ বিশ্বাসী। এমন অঙ্গীকারকারী নয় যাতে
তার হৃদয় রসনার সাথে একমত।

٤٨. وَإِذَا دُعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ الْمُبَلِّغُ
عَنْهُ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ . عَنِ الْمَجِيْءِ إِلَيْهِ .

৪৮. যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে
আহবান করা হয় আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দায়ী বা
মুবাল্লিগ তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তখন
তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় তাঁর নিকট আগমন
করা হতে।

٤٩. وَإِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوْٓا إِلَيْهِ
مُذْعِنِيْنَ . مُسْرِعِيْنَ طَائِعِيْنَ .

৪৯. সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের
কাছে ছুটে আসে দ্রুত অনুগত হয়ে।

٥٠. أَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ كُفْرٌ أَمِ ارْتَابُوْٓا أَيْ
شَكُّوْا فِيْ نُبُوَّتِهٖ أَمْ يَخَافُوْنَ أَنْ
يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ط فِي
الْحُكْمِ أَيْ يُظْلَمُوْا فِيْهِ لَا بَلْ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ . بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ .

৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? কুফরির না তারা
ধোঁকায় পড়ে আছে অর্থাৎ তারা তাঁর নবুয়তের
ব্যাপারে সন্দিহান নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও
তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ফয়সালার
ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফয়সালায় তাদের প্রতি অবিচার করা
হবে। না, এটা হতে পারে না বরং তারাই তো
অবিচারকারী। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার
কারণে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا الخ : এখানে لَقَدْ -এর لَامٌ টি হলো قَسَمِيَّة এবং قَسَم উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মূলরূপ ছিল– وَاللّٰهِ لَقَدْ اَنْزَلْنَا আর اَطَعْنَا -এর পর هُمَا যমীরকে এ কারণে বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, اَطَعْنَا -এর মাফউল উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمُبَلِّغُ عَنْهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হলো لِيَحْكُمَ -এর মধ্যে ضَمِير -কে একবচন কেন আনা হয়েছে, অথচ পূর্বে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা মূলত দুটি সত্তা।

জবাবের সারকথা হলো হুকুম বাস্তবিক পক্ষে যদিও আল্লাহর, তবে مُبَاشِرٌ بِالْحُكْمِ এবং مُبَالِغٌ بِالْحُكْمِ হলেন রাসূল ﷺ। আল্লাহর উল্লেখ শুধু সম্মানার্থে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُوْنَ الخ : এখানে اِذَا টি مُفَاجَاتِيَه যা এমন فَاء -এর স্থলাভিষিক্ত যেই فَاء জওয়াবে শর্তকে শর্তের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয়, অর্থাৎ اِذَا دُعُوْا হলো شَرْط আর اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ হলো তার جَزَاء

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الخ : **শানে নুযূল :** আলোচ্য আয়াত একটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী (র.) প্রমুখ এ ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিশর নামক জনৈক মুনাফিক ও এক ইহুদির মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদি তাকে বলল, চল, তোমাদেরই রাসূল দ্বারা এর মীমাংসা করে নিই। মুনাফিক বিশর অন্যায়ের উপর ছিল। সে জানত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এজলাসে মকদ্দমা গেল তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রাসূল ﷺ -এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদির নিকট মকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। ইহুদি রাসূল ﷺ-এর নিকট যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করল। অবশেষে উভয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে মকদ্দমা নিয়ে পৌছল। ন্যায়ের মূর্তপ্রতীক মহানবী ﷺ ইহুদির পক্ষে ফয়সালা দিলেন। রাসূল ﷺ -এর দরবার থেকে বের হয়ে মানুফিক বিশর বলল, চলো আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁর থেকে এ ব্যাপারে ফয়সালা গ্রহণ করি। সেহেতু তারা উভয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করলেন। তাঁর নিকট পৌছে ইহুদি বলল, হযরত এ বিষয়ে আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট গিয়েছিলাম এবং তিনি আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি; বরং এখন আপনার দ্বারস্থ হয়েছে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। হযরত ওমর (রা.) মুনাফিককে বললেন– اَكَذٰلِكَ [ব্যাপারটি কি এরূপই?] মুনাফিক বিশর বলল, জি-হ্যাঁ। হযরত ওমর (রা.) উভয়কে বললেন– رُوَيْدًا حَتّٰى اَخْرُجَ اِلَيْكُمَا [তোমরা আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর] এরপর হযরত ওমর (রা.) ঘরে গিয়ে তরবারি নিয়ে ফিরে আসলেন এবং এক আঘাতেই মুনাফিকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন। এরপর বললেন– هٰكَذَا اَقْضِى بَيْنَ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَضَاءِ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিচারে সন্তুষ্ট নয়, আমি তার বিচার এভাবেই করে থাকি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন– اِنَّ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ অর্থাৎ ওমর সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। আর এ কারণেই তাঁকে فَارُوْق নামে ভূষিত করা হয়।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হক বা সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট; কিন্তু হক গ্রহণের তাওফীক একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, কিছু লোক হেদায়েত পাবে আর কিছু লোক পাবে না। যারা হেদায়েত পাবে না, তাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবি করবে; কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হবে। এরাই হলো মুনাফিকের দল। ইসলামের সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করে না। আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিমুখী নীতির এবং তাদের

কলঙ্কময় জীবনের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তারা ইসলামের সত্যতার কথা প্রকাশ করত, প্রিয়নবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দাবিও করত, কিন্তু অন্তরে তাদের বিশ্বাস থাকত না, শুধু প্রতারণার লক্ষ্যেই তারা একথা প্রকাশ করত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- وَيَقُولُونَ

অর্থাৎ মুনাফিকরা মুখে অত্যন্ত ফলাও করে বলে সে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আনুগত্য প্রকাশ করেছে, অথচ এরপর তাদের একদল এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে তাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়েছে- وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ প্রকৃত পক্ষে, তারা মুমিন নয়। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ২০]

قَوْلُهُ وَيَقُولُونَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন, তারা মুখে তো ঈমান ও আনুগত্যের কথা স্বীকার করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই। কারণ তারা ঈমানদার নয়।

মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরো বলেন, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দিকে আহ্বান করা হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ যখন তাদেরকে হেদায়াতের দিকে আহবান করা হয় এবং কুরআন ও হাদীস মানতে বলা হয়, তখন তারা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا -

অর্থাৎ "তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও ওটা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়? তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূল ﷺ -এর দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।" -[সূরা নিসা : ৬০ - ৬১]

قَوْلُهُ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ الخ : মহান আল্লাহ বলেন- وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ অর্থাৎ যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল ﷺ -এর নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শরিয়তের ফয়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শরয়ী ফয়সালা তাদের মনের চাহিদার উল্টো, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থি, তবে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং এরূপ লোক পাকা কাফের। কেননা তাদের মধ্যে তিন অবস্থার যে কোনো একটি অবশ্যই রয়েছে। হয়তো অন্তরে বে-ঈমানী বদ্ধমূল হয়ে গেছে, কিংবা তারা আল্লাহর দীনের সত্যতায় সন্দিহান রয়েছে, অথবা তারা এ ভয় করে যে, না জানি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদের হক নষ্ট করেন এবং তাদের প্রতি জুলুম করেন। এ তিনটাই কুফরির অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই জানেন। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলোই পাপী ও অত্যাচারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এরূপ কাফেরের সংখ্যা অনেক ছিল, যারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল। যখন তারা দেখতো যে, কুরআন ও হাদীসমূলে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে, তখন তারা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে তাদের মকদ্দমা পেশ করতো। আর যখন দেখতো যে, তাদের প্রতিপক্ষের অনুকূলে রায় যাবে, তখন নবী করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিবাদ হয় এবং তাদেরকে ইসলামি হুকুম অনুযায়ী ফয়সালার দিকে আহ্বান করা হয়, আর তারা তা অস্বীকার করে তবে তারা জালিম এবং তারা অন্যায়ের উপর রয়েছে।"

পক্ষান্তরে সঠিক ও খাঁটি মুমিনের বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছুকেই দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। তারা তো কুরআন ও হাদীস শোনা মাত্রই এবং এগুলোর ডাক কানে আসা মাত্রই পরিষ্কারভাবে বলে থাকে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। এরাই সফলকাম ও মুক্তিপ্রাপ্ত লোক।

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) [যিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে একজন নেতৃস্থানীয় লোক] মৃত্যুর সময় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জানাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রা.)-কে বলেন, "তোমার উপর কি কর্তব্য এবং তোমার জন্য কি উপকারী তা কি আমি তোমাকে বলে দেবো না?" তিনি জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, বলুন!" তখন তিনি বললেন, "তোমার কর্তব্য হলো [ধর্মীয় উপদেশ] শ্রবণ করা ও মান্য করা কঠিন অবস্থায়ও এবং সহজ অবস্থায়ও, আনন্দের সময়ও এবং দুঃখের সময়ও, আর ঐ সময়েও যখন তোমার হক অন্যকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তোমার জিহ্বাকে তুমি ন্যায় ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে। যোগ্য শাসনকর্তার নিকট থেকে শাসনকার্য ছিনিয়ে নিবে না। তবে সে যদি প্রকাশ্যভাবে অবাধ্যতার হুকুম করে তবে, তা কখনো মানবে না। সে যদি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কিছু বলে তবে তা কখনো স্বীকার করবে না। সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করবে।"

হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া ইসলাম নেই। আর সমস্ত মঙ্গল নিহিত রয়েছে জামাতের মধ্যে এবং আল্লাহ, তদীয় রাসূল ﷺ, মুসলমানদের খলীফা এবং সাধারণ মুসলমানদের মঙ্গল কামনার মধ্যে।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, ইসলামের দৃঢ় রজ্জু হলো আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ প্রতিষ্ঠিত করা, জাকাত প্রদান করা এবং মুসলমানদের বাদশাহ তথা খলিফাদের আনুগত্য স্বীকার করা।

আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ-এর এবং মুসলমান বাদশাহদের আনুগত্যের ব্যাপারে যেসব হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা এত বেশি যে, সবগুলো এখানে বর্ণনা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুগত হবে, তাঁরা যা করতে আদেশ করেছেন, তা পালন করবে, যা করতে নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাকবে, যে পাপকার্য করে ফেলেছে তার জন্য সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে এবং আগামীতে ঐসব পাপকার্য হতে বিরত থাকবে, সে সমুদয় কল্যাণ অর্জনকারী এবং সমস্ত অকল্যাণ হতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত। দুনিয়া ও আখিরাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সফলকাম।

অনুবাদ :

٥١. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْآ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَيْ بِالْقَوْلِ اللَّائِقِ بِهِمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ط بِالْإِجَابَةِ وَأُولٰٓئِكَ حِيْنَئِذٍ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . النَّاجُوْنَ .

৫১. মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যে, যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয় অর্থাৎ এরূপ বলাই মুমিনদের উপযুক্ত শান যেন তারা বলে আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম এ কথার কারণে তারাই তখন সফলকাম মুক্তিপ্রাপ্ত।

٥٢. وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ يَخَافُهٗ وَيَتَّقْهِ بِسُكُوْنِ الْهَاءِ وَكَسْرِهَا بِأَنْ يُّطِيْعَهٗ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ . بِالْجَنَّةِ .

৫২. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তার প্রতি ভীত হয়ে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে। يَتَّقْهِ শব্দের ه বর্ণটি যেরযুক্ত বা সাকিনযুক্ত উভয়ভাবে পড়া যায় অর্থাৎ তার আনুগত্য করে তারাই কৃতকামী জান্নাত পেয়ে।

٥٣. وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ غَايَتَهَا لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ بِالْجِهَادِ لَيَخْرُجُنَّ ط قُلْ لَّهُمْ لَا تُقْسِمُوْا ج طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ ط لِلنَّبِيِّ خَيْرٌ مِّنْ قَسَمِكُمُ الَّذِيْ لَا تَصْدُقُوْنَ فِيْهِ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ . مِنْ طَاعَتِكُمْ بِالْقَوْلِ وَمُخَالَفَتِكُمْ بِالْفِعْلِ .

৫৩. তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে চূড়ান্ত পর্যায়ের আপনি তাদেরকে আদেশ করলে জিহাদের তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই, বলুন তাদেরকে তোমরা কসম খেয়ো না নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য নবীর জন্য, তোমাদের এ জাতীয় কসম খাওয়ার চেয়ে উত্তম। যাতে তোমরা সত্যবাদী নও। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত, তোমাদের কথার ক্ষেত্রে আনুগত্য আর কর্মের ক্ষেত্রে বিরোধিতা সম্পর্কে।

٥٤. قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ طَاعَتِهٖ بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ خِطَابٌ لَهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ مِنَ التَّبْلِيْغِ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ط مِنْ طَاعَتِهٖ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ . أَيِ التَّبْلِيْغُ الْبَيِّنُ .

৫৪. বলুন! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তার আনুগত্য হতে, এখানে تَوَلَّوْا শব্দের মধ্যে একটি تَا -কে হযফ করা হয়েছে। তাদেরকে সম্বোধন করে তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী প্রচারকার্যের এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী তার আনুগত্য করা থেকে তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর তবে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ : জমহুর ওলামায়ে কেরাম এখানে قَوْلَ -কে كَانَ -এর খবর হওয়ার ভিত্তিতে নসব দিয়েছেন। আর أَنْ يَّقُوْلُوْا -কে بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হিসেবে كَانَ -এর إِسْم বলেছেন। আর আলী, হাসান এবং ইবনে আবী ইসহাক قَوْلُ -কে كَانَ -এর ইসিম হিসেবে مَرْفُوْع পড়েছেন। আর أَنْ يَّقُوْلُوْا -কে بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হিসেবে كَانَ -এর খবর সাব্যস্ত করেছেন। তবে প্রথম কেরাতকে জমহুর ওলামা প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَوْلُهُ أَنْ يَّقُوْلُوْا : এটা جُمْلَه خَبَرِيَّة হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু এর দ্বারা শরিয়তের আদব শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। তাই এটা جُمْلَة إِنْشَائِيَّة -এর হুকুমে হয়েছে।

قَوْلُهُ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ الخ : এখানে جَهْدَ টি উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَق হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। তবে কেউ কেউ একে حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب পড়েছেন অর্থাৎ مُجْتَهِدِيْنَ فِيْ أَيْمَانِهِمْ

قَوْلُهُ لَيَخْرُجُنَّ : এটা কসমের জবাব হয়েছে।

قَوْلُهُ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ : এটা مُرَكَّب تَوْصِيْفِيْ হয়ে مُبْتَدَأ আর خَيْرٌ الخ হলো তার خَبَرْ মুসান্নিফ (র.) خَيْرٌ -কে উহ্য মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অথবা طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ এটা উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হতে পারে। অর্থাৎ- طَاعَتُهُمْ طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ : এ বাক্যটি পূর্বোক্ত বাক্যের عِلَّتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا : فَإِنْ تَوَلَّوْا -এর মধ্যে আদিষ্টদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ -এর মধ্যে যে সকল লোককে সম্বোধন করা হয়েছে তারা-ই تَوَلَّوْا -এর সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ الخ -এর মধ্যে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর فَإِنْ تَوَلَّوْا -এর মধ্যে অনুসারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ : এটা শর্তের জবাব হয়েছে। অন্য মতানুসারে جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। আর فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ঐ জবাবের ইল্লত হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ الخ : এটা পূর্ববর্তী বাক্যের تَاكِيْد হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ অর্থাৎ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই সফলকাম। উক্ত আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম।

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এ চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ওমর (রা.) একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল- أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ; হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? সে বলল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনো কারণ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আমি তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত আছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই

করত। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আয়াতটি কি? রুমী ব্যক্তি উল্লিখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তাফসীরও বর্ণনা করল যে, مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ আল্লাহর ফরজ কার্যাদির সাথে وَرَسُوْلَهٗ রাসূলের সুন্নতের সাথে وَيَخْشَ اللّٰهَ অতীত জীবনের সাথে এবং وَيَتَّقْهِ ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এ চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে أُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ -এর সুসংবাদ দেওয়া হবে। فَائِزٌ তথা সফলকাম সেই ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনে বললেন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুদূর প্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলি দান করেছেন, এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ الخ : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে নিজেদের ঈমানদারী ও শুভাকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করতো এবং শপথ করে বলতো যে, তারা জিহাদে গমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে; কিন্তু হুকুমের অপেক্ষায় রয়েছে। হুকুম হওয়া মাত্রই ঘরবাড়ি ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে জিহাদের মাঠে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, "তোমরা শপথ করো না। তোমাদের আনুগত্যের মূলতত্ত্ব আমার জানা আছে। তোমাদের অন্তরে এক কথা, মুখে অন্য কথা। সুতরাং তোমাদের শপথের হাকীকত আমার অজানা নয়। তোমাদের মুখ যতটা মুমিন, তোমাদের অন্তর ততটা কাফের। তোমাদের এ শপথগুলো শুধু মুসলমানদের সহানুভূতি লাভ করার জন্য। হে মুমিনগণ! এই মুনাফিকরা তাদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। তারা যে শুধু তোমাদের সামনে কসম করছে তা নয়; বরং কাফেরদের সামনেও তারা তাদের পক্ষ অবলম্বনের ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতার কসম খেয়ে থাকে। কিন্তু তারা এতো ভীরু ও কাপুরুষ যে, তাদের সাথেও তারা থাকতে পারে না।

এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, "হে মুনাফিকরা! তোমাদের জ্ঞানসম্মত ও পছন্দনীয় আনুগত্যের নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল, এভাবে শপথ করা মোটেই শোভনীয় নয়, তোমাদের সামনে মুসলমানরা বিদ্যমান রয়েছে। তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তারা না শপথ করছে, না অতি কথা বলছে; বরং কাজের সময় তারা সবারই আগে বেরিয়ে পড়ছে। বেশি কথা না বলে কাজই তারা বেশি করছে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। তোমাদের কোনো কাজই তাঁর কাছে গোপন নেই। প্রত্যেক অবাধ্য ও অনুগত তাঁর কাছে প্রকাশমান। প্রত্যেকের ভিতরের খবর তিনি তেমনই জানেন যেমন জানেন বাহিরের খবর। তোমরা বাহিরে যা কিছুই প্রকাশ কর না কেন, তিনি তোমাদের অন্তরের লুক্কায়িত খবরও পূর্ণমাত্রায় রাখেন।

قَوْلُهٗ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الخ : মহান আল্লাহ বলেন- قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الخ অর্থাৎ হে নবী ﷺ ! তুমি বলে দাও' তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য কর। অর্থাৎ তোমরা কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ যে, তোমাদের এ অপরাধের শাস্তি নবী ﷺ -এর উপর পতিত হবে না। তার কাজ তো শুধু আল্লাহর পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। তোমাদের উপর অর্জিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে রাসূল ﷺ -এর কথা মেনে নেওয়া এবং এর উপর আমল করা ইত্যাদি। হেদায়েত শুধু রাসূল ﷺ -এর আনুগত্যেই রয়েছে। কেননা সরল-সঠিক পথের দিকে আহ্বানকারী তিনিই। এ সরল-সোজা পথ ঐ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে, যাঁর রাজত্ব সমস্ত জমিন ও আসমানব্যাপী। রাসূল ﷺ-এর দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। সবারই হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব মহামহিমান্বিত আল্লাহর। যেমন- তিনি বলেন- فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ অর্থাৎ "অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।" -[সূরা গাশিয়া : ২১-২২]

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে হযরত শাইয়া (আ.) নামক একজন নবীর নিকট এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ করেন, "তুমি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমার মুখ দিয়ে যা বের করার বের করব।" আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশক্রমেই হযরত শাইয়া (আ.) দাঁড়িয়ে যান। তখন আল্লাহর হুকুমে তাঁর মুখ দিয়ে নিম্নলিখিত ভাষণ বের হয়-

"হে আকাশ! শুন, এবং হে জমিন! চুপ থাক। আল্লাহ তা'আলা একটা শান বা মাহাত্ম্য পূর্ণ করতে এবং একটা বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ইচ্ছা করেছেন। ওটা তিনি পূর্ণ করবেন। তিনি চান যে, জঙ্গলকে বাসযোগ্য করবেন, জনহীন মরুপ্রান্তরকে করবেন জনবসতিপূর্ণ, বালুকাময় মরুভূমিকে করবেন শ্যামল-সবুজ, দরিদ্রদেরকে করবেন সম্পদশালী এবং রাখালদেরকে তিনি বাদশাহ বানিয়ে দেবেন। তিনি অশিক্ষিতদের মধ্য হতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী করে পাঠাবেন, যিনি চরিত্রহীন হবেন না এবং কর্কশভাষীও হবেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল ও গোলমাল করবেন না।

তিনি এতো বিনয়ী ও নম্র হবেন যে, তাঁর বস্ত্রের আঁচলের বাতাসে ঐ প্রদীপ নির্বাপিত হবে না, যার পার্শ্ব দিয়ে তিনি গমন করবেন। তিনি যদি শুষ্ক বাঁশের উপর পা রেখেও চলেন, তবুও ঐ বাঁশের চড়চড়ি শব্দ কারো কানে পৌঁছে না। আমি তাঁকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠাবো। তাঁর মুখের ভাষা হবে মধুর ও পবিত্র। তাঁর আবির্ভাবের ফলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে এবং বধির ফিরে পাবে শ্রবণশক্তি। তাঁর বরকতে মোহরযুক্ত অন্তর খুলে যাবে। যাবতীয় কল্যাণকর কাজ দ্বারা আমি তাঁকে শোভনীয় করব। তাঁকে আমি সর্বদিক দিয়ে মধুর ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী করব। চিত্ত প্রশান্তি হবে তাঁর পোশাক। পুণ্য হবে তাঁর রীতিনীতি এবং তাঁর অন্তর হবে আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁর কথা হবে জ্ঞানপূর্ণ এবং সত্যবাদিতা ও প্রতিজ্ঞা পালন হবে তাঁর স্বভাব। তাঁর অভ্যাস ও প্রকৃতি হবে মার্জনা ও ক্ষমা এবং মঙ্গল কামনা। হক ও সত্য হবে তার শরিয়ত এবং আদল ও ইনসাফ হবে তাঁর চরিত্র। হেদায়েত হবে তাঁর ইমাম এবং ইসলাম হবে তাঁর মিল্লাত। তাঁর নাম হবে আহমদ ﷺ।

তাঁর কারণে আমি পথভ্রষ্টতার পরে হেদায়েত ছড়িয়ে দিব। অজ্ঞতার পরে জ্ঞান বিকশিত হবে। তার কারণে অবনতির পরে উন্নতি হবে। তাঁর মাধ্যমে অজানা জানার সাথে পরিবর্তিত হবে। স্বল্পতা আধিক্যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তাঁরই কারণে আমি দারিদ্র্যকে পরিবর্তিত করব ঐশ্বর্যে। যারা পরস্পর পৃথক পৃথক রয়েছে, তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরস্পর মিলিত করব। তাঁর মাধ্যমে আমি পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করব। তাদের পরস্পরের মতানৈক্যের পর তাঁর মাধ্যমে আমি তাদেরকে মতৈক্যে পৌঁছিয়ে দেব। তাঁর মাধ্যমে আমি পৃথক পৃথক হৃদয়কে এক হৃদয়ে পরিণত করব। অর্থাৎ তারা পরস্পর শত্রুতা ভুলে গিয়ে একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবে, মনে হবে যেন একই হৃদয়।

মহান আল্লাহর অসংখ্য বান্দা ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাঁর উম্মতকে আমি সমস্ত উম্মতের উপর মর্যাদা দান করব, যারা জনগণের জন্য উপকারী হবে। তারা ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে। তারা হবে একত্ববাদী খাঁটি মুমিন। আল্লাহ তা'আলার যত রাসূল তাঁর নিকট থেকে যা কিছু এনেছেন, এই শেষ নবী ﷺ তাঁদের সকলকেই স্বীকার করবেন; কাউকেও অস্বীকার করবেন না।

অনুবাদ :

٥٥. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ بَدْلًا عَنِ الْكُفَّارِ كَمَا اسْتَخْلَفَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بَدْلًا عَنِ الْجَبَابِرَةِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَهُوَ الْاِسْلَامُ بِاَنْ يُّظْهِرَهٗ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ وَيُوَسِّعَ لَهُمْ فِى الْبِلَادِ فَيَمْلِكُوْهَا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ اَمْنًا ط وَقَدْ اَنْجَزَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ لَهُمْ بِمَا ذَكَرَهٗ وَاَثْنٰى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهٖ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط هُوَ مُسْتَانِفٌ فِىْ حُكْمِ التَّعْلِيْلِ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْاِنْعَامِ مِنْهُمْ بِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. وَاَوَّلُ مَنْ كَفَرَ بِهٖ قَتَلَةُ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَصَارُوْا يَقْتَتِلُوْنَ بَعْدَ اَنْ كَانُوْا اِخْوَانًا.

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন কাফেরদের পরিবর্তে যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন এখানে اِسْتَخْلَفَ শব্দটি مَعْرُوْف এবং مَجْهُوْل উভয় কেরাতেই পাঠ করা যায় তাদের পূর্ববর্তীদেরকে বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে জালিমদের পরিবর্তে। তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন আর তা হলো ইসলাম ধর্ম, এভাবে যে, ইসলাম ধর্মকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করে দিবেন এবং তাদের জন্য রাজত্বের মধ্যে প্রশস্ততা দান করবেন, তখন তারা এর আধিকারী হয়ে যাবে। এবং অবশ্যই তিনি দান করবেন এখানে لَيُبَدِّلَنَّهُمْ শব্দটি تَخْفِيْف এবং تَشْدِيْد উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে কাফেরদের শান্তি ও নিরাপত্তা আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর উক্তি يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا দ্বারা তাদের প্রশংসা করেছেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর এ বাক্যটি مُسْتَانِفَةٌ যা عِلَّتْ -এর হুকুমে এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তাদের প্রদত্ত এ পুরস্কারের পরেও তারাই অবাধ্য আর সর্বপ্রথম যারা এ পুরস্কারের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকারী, তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ল।

٥٦. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. اَىْ رَجَاءَ الرَّحْمَةِ.

৫৬. তোমরা নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। অর্থাৎ অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশা রেখে।

অনুবাদ :

٥٧. لَا تَحْسَبَنَّ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ الرَّسُوْلُ ـ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ لَنَا فِى الْاَرْضِ ج بِاَنْ يَفُوْتُوْنَ وَمَاْوٰيهُمْ مَرْجِعُهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ هِىَ ـ

৫৭. আপনি মনে করবেন না এখানে يَحْسَبَنَّ শব্দটি يَاء এবং تَاء যোগে পড়া যায় এবং এর فَاعِلْ হলো রাসূল ﷺ কাফেরদেরকে পরাক্রমশালী আমার জন্য পৃথিবীতে যে তারা আমাকে পরাজিত করে ফেলবে তাদের ঠিকানা প্রত্যাবর্তন স্থল জাহান্নাম আর কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল ফেরার জায়গা বা ঘাঁটি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হলো اَعَدَ-এর প্রথম مَفْعُوْل আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَلْاِسْتِخْلَافُ فِى الْاَرْضِ وَتَمْكِيْنُ دِيْنِهِمْ وَتَبْدِيْلُ خَوْفِهِمْ بِالْاَمْنِ এসব مَعْطُوْف মিলিত হয়ে وَاعَدَ-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হবে। لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ হলো উহ্য قَسَم-এর جَوَابْ, বাক্যটি এমন ছিল وَاللّٰهِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ এটা দ্বিতীয় مَفْعُوْل উহ্য থাকার উপর নির্দেশ করছে।

قَوْلُهُ كَمَا اسْتَخْلَفَ : এর মধ্যেকার مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ اِسْتِخْلَافًا كَاِسْتِخْلَافِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ : এর সম্বন্ধ হলো وَعْدَهُ-এর সাথে, আর مَا ذُكِرَ দ্বারা উল্লিখিত বিষয় তিনটি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَعْبُدُوْنَنِىْ : এটা مُسْتَانِفَة বাক্য। ব্যাখ্যাকার (র.) هُوَ مُسْتَانِفٌ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এর মধ্যে বিভিন্নরূপ তারকীব হতে পারে। তবে ব্যাখ্যাকার (র.) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ বাক্যটি যেন একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন করা হয়েছে- مَا بَالُهُمْ يَسْتَخْلِفُوْنَ وَيُوْمِنُوْنَ ; এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে يَعْبُدُوْنَنِىْ ; উল্লিখিত বাক্যটি উহ্য। مُبْتَدَأ-এর خَبَرْ-ও হতে পারে। এ সময়ও বাক্যটি مُسْتَانِفَة থাকবে। বাক্যটি এমন হবে- هُمْ يَعْبُدُوْنَنِىْ

قَوْلُهُ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة হতে পারে। আবার يَعْبُدُوْنَنِىْ-এর فَاعِلْ-এর যমীর থেকে حَال-ও হতে পারে। অর্থাৎ- يَعْبُدُوْنَنِىْ مُوَحِّدِيْنَ

قَوْلُهُ مِنْهُمْ : এটা থেকে حَال আর هُمْ যমীরটি لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর প্রতি ফিরেছে।

قَوْلُهُ بِهِ : এর যমীরটি اِنْعَام-এর প্রতি ফিরেছে। অর্থাৎ اَلْاِنْعَامُ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ এবং কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিয়ামতের অস্বীকার করা। ঈমানের বিপরীত কুফর উদ্দেশ্য নয়। এ কারণেই اُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ বলেছেন এবং اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ বলেননি।

قَوْلُهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ : এটা উহ্য বাক্যের উপর مَعْطُوْف হয়েছে। বাক্যেরে বাচনভঙ্গি তার দাবি করছে। অর্থাৎ- فَاٰمِنُوْا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ

قَوْلُهُ لَا تَحْسَبَنَّ : এর فَاعِلْ হলো اَلرَّسُوْلُ আর اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا প্রথম মাফউল এবং مُعَاجِزِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। يَحْسَبَنَّ শব্দটি يَاء যোগে হলে প্রথম মাফউল বিলুপ্ত হবে। অর্থাৎ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْفُسَهُمْ আর مُعَاجِزِيْنَ হলো দ্বিতীয় মাফউল। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا হবে لَا يَحْسَبَنَّ-এর فَاعِلْ

قَوْلُهُ مُعَاجِزِيْنَ : অর্থাৎ গা বাঁচিয়ে বের হয়ে যাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে আধিপত্য দান করবেন, ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে থাকবে, বর্তমানে সে কাফের এবং মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কিংবা যুদ্ধ করে তাদের সকলকে আল্লাহ পাক মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেবেন। ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং কুফর ও নাফরমানি ভূলুণ্ঠিত হবে, তখন তোমাদেরকে আর অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে দিন রাত অতিবাহিত করতে হবে না। তোমরা হবে সম্মানিত এবং তোমাদের শত্রুরা হবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত, আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সম্মান দান করবেন আর তোমাদের হাতে কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ১৪২]

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ مِنْكُمْ الخ : শানে নুযূল : ইমাম কুরতুবী (র.) হযরত আবুল আলিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী অবতরণ ও নবুয়ত ঘোষণার পর দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। ঐ সময় তিনি দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। কিন্তু ঐ যুগটি ছিল গোপনীয়তা, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার যুগ। তখন পর্যন্ত জিহাদের হুকুম নাজিল হয়নি। মুসলমানরা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। এরপর হিজরতের হুকুম হয় এবং তাঁরা মদিনায় হিজরত করেন। অতঃপর জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল। মুসলমানরা ছিলেন ভীত-সন্ত্রস্ত। কোনো সময়ই বিপদশূন্য ছিল না। সকাল-সন্ধ্যায় সাহাবীগণ (রা.) অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত থাকতেন। একজন সাহাবী একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের জীবনের একটা মুহূর্তও কি শান্তিতে কাটবে না? হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ক্ষণিকের জন্যও কি আমরা অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়ে তৃপ্তি ও স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করতে পারব না?" রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দেন, "আরো কিছুদিন ধৈর্যধারণ কর। অতঃপর এমন শান্তি এবং নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে, মানুষ ভরা মজলিসে আরামে ও নিশ্চিন্তে বসে থাকবে, একজনের কাছে কেন, কারো কাছেই কোনো অস্ত্র থাকবে না।" ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। যথা–

১. আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে।

২. আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং

৩. মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোনো ভয়ভীতি থাকবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উম্মতে মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তওরাত ও ইঞ্জীলে দিয়েছিলেন। –[বাহরে মুহীত]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যময় শাসনামলে মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়েমেন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিযিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আম্মান ও আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিশর অভিমুখে সৈন্যাভিযান পরিচালনা করেন। বসরা ও দামেশক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ মুসলমানদের করতলগত হয়।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গাম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিশর ও পারস্যের অধিকাংশ মুসলমানদের করতলগত হয়। তাঁর হাতে

কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়। এরপর ওসমানী খিলাফতের আমলে ইসলামি বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্র করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌছবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খিলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। -[ইবনে কাসীর]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খিলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এর অর্থ খিলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এ খিলাফত হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ স্থলে সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হযরত জাবের ইবনে যামরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের এ কাজ অব্যাহত থাকবে- যে পর্যন্ত বারজন খলিফা থাকবেন। অতঃপর তিনি একটি বাক্য আস্তে বলেন, যা আমার কর্ণগোচর হয়নি। আমি ওটা আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, রাসূল ﷺ যে কথাটি আস্তে বলেছিলেন, তা হলো- এদের সবাই কুরাইশী হবেন। রাসূল ﷺ একথাটি দিনের সন্ধ্যায় বলেছিলেন। যেদিন হযরত মায়েয ইবনে মালিক (রা.)-কে রজম করা হয়েছিল। সুতরাং জানা গেল যে, এই বারজন খলীফা অবশ্যই হবেন, কিন্তু এটা স্মর্তব্য যে, এই বারজন খলীফা তারা নন, যাদেরকে শিয়া সম্প্রদায় ধারণা করেছে। কেননা শিয়াদের ইমামদের মধ্যে এমন বহু ইমাম রয়েছে যারা সারা জীবনও খিলাফত ও সালতানাতের কোনো অংশও লাভ করেনি। এই বারজন খলীফা সবাই হবেন কুরাইশ বংশের। তারা হবেন ন্যায়ের সাথে ফয়সালাকারী। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও তাদের সুসংবাদ রয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ হাদীসটি উম্মতের মধ্যে বারজন খলীফা হওয়ার সংবাদ দিচ্ছে। এর বাস্তবায়ন জরুরি। কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, তারা সবাই উপর্যুপরি ও সংলগ্নই হবেন; বরং কিছু বিরতির পরও হতে পারেন। তাদের মধ্যে চারজন খলীফা তো একের পর এক হয়ে গেছেন অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন। অতঃপর কিছুকাল বিরতির পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) খলীফা হয়েছেন। তাঁর পরেও বিভিন্ন সময়ে এরূপ খলীফা হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেন। সর্বশেষ খলীফা হবেন হযরত মাহদী (আ.)। রাফেযী সম্প্রদায় যে বারজন খলীফা নির্দিষ্ট করেছে, তার কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছেন, খিলাফতের সাথে যাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর এটাও জরুরি নয় যে, তাঁদের সবার মর্যাদা সমান হবে এবং সবার আমলে দুনিয়ার শান্তি ও শৃঙ্খলা সমান হবে; বরং শান্তির ওয়াদা ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও পূর্ণ অনুসরণের উপর ভিত্তিশীল।

এগুলো বিভিন্ন রূপ হলে রাষ্ট্রের প্রকার ও শক্তির মধ্যেও পার্থক্য ও বিভিন্নতা অপরিহার্য। ইসলামের চৌদ্দশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে যখন ও যেখানে কোনো ন্যায়পরায়ণ ও সৎকর্মী বাদশাহ হয়েছেন, তিনি তাঁর কর্ম ও সততার পরিমাণে এই আল্লাহর প্রতিশ্রুতির অংশ লাভ করেছেন। কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হয়েছে- أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর দলই প্রবল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।

হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) যখন প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি হীরা নামক দেশ দেখেছ?" উত্তরে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা.) বলেন, না, আমি হীরা দেখিনি, তবে নাম শুনেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আমার এই দীনকে পূর্ণরূপে ছড়িয়ে দেবেন। তখন এমনভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা এসে যাবে যে, হীরা হতে একজন মহিলা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে একাই বেরিয়ে পড়বে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছে তওয়াফ কার্য সম্পন্ন করত ফিরে আসবে। সে না কাউকে ভয় করবে এবং না কারো আশ্রয়ে থাকবে। জেনে রেখ যে, ইরানের বাদশাহ কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগার

বিজিত হবে।" হযরত আদী (রা.) বিস্ময়ের স্বরে বলেন, "ইরানের বাদশাহ কিসরা বিন হরমুযের কোষাগার মুসলমানরা জয় করবেন!" উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হরমুযের কোষাগারই বটে। ধন-সম্পদ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণকারী কেউ থাকবে না।" হযরত আদী (রা.) বলেন, "দেখুন, বাস্তবিকই স্ত্রীলোকেরা হীরা হতে কারো আশ্রয় ছাড়াই যাতায়াত করছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে আমি স্বচক্ষে দেখলাম। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও আমার চোখের সামনে বাস্তবায়ন হয়েছে। কিসরার ধনভাণ্ডার জয়কারীদের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিদ্যমান ছিলাম। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবে। কেননা এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই ভবিষ্যদ্বাণী।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই উম্মতকে ভূপৃষ্ঠে উন্নতি, উচ্চ মর্যাদা, দীনের প্রসার ও সাহায্যের সুসংবাদ দিয়ে দাও। তবে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের কাজ করবে তার জানা উচিত যে, পরকালে তার জন্য কোনো অংশ নেই।"

قَوْلُهُ يَعْبُدُوْنَنِيْ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করবে না।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উটের উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে বসেছিলাম। আমার ও তাঁর মাঝে জিনের [উটের গদীর] শেষ কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া কিছুই ছিল না [অর্থাৎ আমি নবী করীম ﷺ-এর খুবই সংলগ্ন ছিলাম]। তখন তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সামনে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলেন। আবার তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! আবার তিনি কিছুক্ষণ সামনে চললেন। পুনরায় তিনি বললেন, "হে মুআয (রা.)!" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি [এবার] বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক কি তা কি তুমি জান?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ অধিকতর ভাল জানেন ও জ্ঞাত আছেন। তিনি বলেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে এতটুকুও শরিক করবে না।" অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ সামনে গেলেন এবং আবার বললেন, "হে মুআয! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! লাব্বাইক ওয়া সা'দাইক! তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক কি তা তুমি জান কি?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সবচেয়ে ভালো জ্ঞাত আছেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর উপর বান্দার হক হচ্ছে এই যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী অর্থাৎ এর পরেও যারা আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করবে, সে আমার হুকুম অমান্য করলো এবং এটা খুবই কঠিন ও বড় পাপ।

আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, যেই যুগে ইসলামের শক্তি বেশি থেকেছে, সেই যুগে তিনি সাহায্যও বেশি করেছেন। সাহাবীগণ ঈমানে অগ্রগামী ছিলেন, কাজেই তাঁরা বিজয় লাভের ব্যাপারেও সবারই অগ্রে থেকেছেন। যখন ঈমানে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তখন পার্থিব অবস্থা, রাজত্ব এবং শান-শওকতও নীচে নেমে গেছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সদা সত্যের উপর থাকবে এবং তারা থাকবে সদা জয়যুক্ত। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থাই থাকবে।" আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা এসে যাবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এ দলটিই সর্বশেষে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে। আরেকটি হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ পর্যন্ত এ লোকগুলো কাফেরদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। এসব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ এবং সবগুলোরই ভাবার্থ একই।

আলোচ্য আয়াত খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত সত্য ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার প্রমাণ : এ আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ। কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রাসূল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; [যেমনটা রাফেযীদের ধারণা] তবে বলতে হবে যে, কুরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ কিছু নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, চৌদ্দশত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও

লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা রাজত্ব লাভ করবে। এ প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ! সত্য এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সমপূর্ণরূপে তাঁদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সৎকর্মের সেই মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই এবং খিলাফত ও রাজত্বের সেই গাম্ভীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ الخ : আল্লাহর বাণী– وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ আয়াতে كَفَرَ শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত অবস্থান। এখানে উভয় প্রকার অর্থ বুঝনো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনো যদি কোনো ব্যক্তি কুফরি করে অর্থাৎ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামি রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমালঙ্ঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা সর্বাবস্থায় মহাপাপ; কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শৌর্যবীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। তাই بَعْدَ ذٰلِكَ বলে একে জোরদার করা হয়েছে।

ইমাম বগভী (র.) বলেন, তাফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের এ বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এ মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত নিয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পরে ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। ইমাম বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এ ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই–

"যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় পদার্পণ করেন, সেদিন থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাজতে মশগুল আছে। যদি তোমরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্ত কর্তিত অবস্থায় হাজির হবে। সাবধান! আল্লাহর তরবারি এখনো পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহর কসম! যদি এ তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো আর কোষে ফিরে যাবে না। কেননা যখন কোনো নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোনো খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।" –[মাযহারী]

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে উম্মতের মধ্যে রক্ত প্রবাহের যে হোলিখেলা শুরু হলো তা আজও বিরামহীনভাবে বেড়েই চলছে।

قَوْلُهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, তারই জন্য তোমরা নামাজ সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং তাঁর সাথে তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ কর ও তাদের সাথে সৎ ব্যবহার কর। দুর্বল, দরিদ্র ও মিসকিনদের খবরা-খবর নিতে থাক। সম্পদের মধ্য হতে আল্লাহর হক অর্থাৎ জাকাত বের কর এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করতে থাক। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন, তা পালন কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। জেনে রেখ! আল্লাহর রহমত লাভের এটাই একমাত্র পন্থা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ ওরাই তারা যাদের উপর আল্লাহ সত্বরই করুণা বর্ষণ করবেন।

قَوْلُهُ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী ﷺ! আপনি ধারণা করবেন না যে, আপনাকে অবিশ্বাসকারীরা আমার উপর জয়যুক্ত হবে বা এদিক-ওদিক পালিয়ে গিয়ে আমার কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। আমি তাদের প্রকৃত অবস্থান জাহান্নামে ঠিক করে রেখেছি , যা বসবাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জঘন্য স্থান।

৫৮. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنَ الْعَبِيْدِ وَالْاِمَاءِ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ مِنَ الْاَحْرَارِ وَعَرَفُوْا اَمْرَ النِّسَاءِ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ فِيْ ثَلٰثَةِ اَوْقَاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ اَيْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ط ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ بِالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مُقَدَّرٍ بَعْدَهُ مُضَافٌ وَقَامَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ اَيْ هِيَ اَوْقَاتٌ وَبِالنَّصْبِ بِتَقْدِيْرِ اَوْقَاتٍ مَنْصُوْبًا بَدَلًا مِنْ مَحَلِّ مَا قَبْلَهُ قَامَ الْمُضَافُ اِلَيْهِ مَقَامَهُ وَهِيَ لِاِلْقَاءِ الثِّيَابِ فِيْهَا تَبْدُوْ فِيْهَا الْعَوْرَاتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ اَيِ الْمَمَالِيْكِ وَالصِّبْيَانِ جُنَاحٌ فِي الدُّخُوْلِ عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَانٍ بَعْدَهُنَّ اَيْ بَعْدَ الْاَوْقَاتِ الثَّلٰثَةِ هُمْ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلٰى بَعْضٍ ط وَالْجُمْلَةُ مُؤَكِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا كَذٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ مَا ذُكِرَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط اَيِ الْاَحْكَامَ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِاُمُوْرِ خَلْقِهِ حَكِيْمٌ . بِمَا دَبَّرَهُ لَهُمْ وَاٰيَةُ الْاِسْتِئْذَانِ قِيْلَ مَنْسُوْخَةٌ وَقِيْلَ لَا وَلٰكِنْ تَهَاوَنَ النَّاسُ فِيْ تَرْكِ الْاِسْتِئْذَانِ .

অনুবাদ :

৫৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা যেন তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে অর্থাৎ গোলাম ও দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা স্বাধীনদের মধ্য হতে, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে অবগত হয়েছে তিন সময়ে অর্থাৎ তিন সময়ের মধ্যে, ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের সময় এবং ইশার নামাজের পর। এ তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়; "ثَلٰثُ" শব্দটি পেশবিশিষ্ট। কেননা তা উহ্য মুবতাদার খবর, আর মুবতাদার পরে মুযাফ উহ্য রয়েছে এবং মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তখন ইবারত এভাবে হবে– هِيَ اَوْقَاتُ ثَلٰثِ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ। অথবা "ثَلٰثَ" শব্দটি যবরবিশিষ্ট, আর اَوْقَاتٌ শব্দটি উহ্য রয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ -এর মহল থেকে বদল হিসেবে যবরবিশিষ্ট হয়েছে, মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। তখন ইবারত এভাবে হবে– تِلْكَ الْاَوْقَاتُ الثَّلٰثَةُ لِاِلْقَاءِ الثِّيَابِ فِيْهَا مِنَ الْجَسَدِ অর্থাৎ এ তিন সময় এমন যে, তাতে কাপড় খোলার কারণে লজ্জাস্থান খুলে যায়। তোমাদের ও তাদের জন্য নেই অর্থাৎ ক্রীতদাস ও বালকদের জন্য কোনো দোষ অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রবেশ করার মধ্যে এ সময়ের পর অর্থাৎ এ তিন সময়ের পর। তারা তোমাদের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয় খেদমতের জন্য একে অপরের এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের তাকীদ হয়েছে। এমনিভাবে যেরূপ পূর্ববর্তী নির্দেশাবলি বর্ণনা করেছেন– আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন অর্থাৎ নির্দেশাবলি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ স্বীয় মাখলূকের অবস্থা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় যা তাদের জন্য ব্যবস্থা করেন সে বিষয়ে। অনুমতি প্রার্থনার আয়াতের ব্যাপারে কারো কারো অভিমত হলো– তা রহিত হয়ে গেছে। আর কারো কারো অভিমত হলো, তা রহিত হয়নি, তবে মানুষ অনুমতি প্রার্থনা বর্জনের ব্যাপারে অলসতা অবলম্বন করেছে।

অনুবাদ :

৫৯. وَإِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ اَيُّهَا الْاَحْرَارُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَىِ الْاَحْرَارُ الْكِبَارُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

৫৯. তোমাদের সন্তানসন্ততিরা যখন হয় হে স্বাধীন ব্যক্তিরা! বয়ঃপ্রাপ্ত, তারাও যেন অনুমতি চায় সব সময় তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা স্বাধীন বয়ঃপ্রাপ্ত। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬০. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ لِكِبَرِهِنَّ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا لِذٰلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ مِنَ الْجِلْبَابِ وَالرِّدَاءِ وَالْقِنَاعِ فَوْقَ الْخِمَارِ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ مُظْهِرَاتٍ بِزِيْنَةٍ ط خُفْيَةٍ كَقِلَادَةٍ وَسِوَارٍ وَخَلْخَالٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ بِاَنْ لَا يَضَعْنَهَا خَيْرٌ لَهُنَّ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ لِقَوْلِكُمْ عَلِيْمٌ. بِمَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ.

৬০. আর বৃদ্ধা নারী যারা বার্ধক্যের কারণে হায়েজ ও সন্তানসন্ততি হতে নিরাশ হয়ে গেছে, যারা বিবাহের আশা রাখে না, ঐ বার্ধক্যের কারণে যদি তারা তাদের বস্ত্র খুলে রাখে; এতে তাদের জন্য দোষ নেই যেমন- বোরকা, চাদর এবং এমন ওড়না যা ঘোমটার উপর হয় তাদের [সৌন্দর্য] প্রকাশ না করে জাহির না করে লুক্কায়িত সৌন্দর্য। যেমন- গলার হার, চুড়ি ও পায়ের মল [গহনা] তবে এ থেকে বিরত থাকাই অর্থাৎ তারা তাদের বস্ত্র খুলে না রাখাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা তোমাদের কথা সর্বজ্ঞ যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে সে সম্পর্কে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ : "ثَلٰثَ" শব্দটি নসববিশিষ্ট হওয়ার দুটি কারণ–

১. এটি لِيَسْتَاْذِنْكُمْ -এর মাফউলে ফীহ অর্থাৎ– لِيَسْتَاْذِنُوْا فِىْ ثَلٰثَةِ اَوْقَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ; তাফসীরকার (র.) فِىْ ثَلٰثِ اَوْقَاتٍ বাক্যটি বর্ধিত করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ثَلٰثَ مَرّٰتٍ টি যরফ আর مَرّٰتٌ অর্থ– اَوْقَاتٌ অর্থাৎ ثَلٰثَ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ হতে مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ পর্যন্ত অংশটুকু হলো لِيَسْتَاْذِنْكُمْ ثَلٰثَةَ اَوْقَاتٍ অতঃপর اَوْقَاتٍ -এর তাফসীর।

২. "ثَلٰثَ" শব্দটি নসববিশিষ্ট হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, তা لِيَسْتَاْذِنْكُمْ -এর মাফউলে মুতলাক অর্থাৎ اِسْتَاْذِنُوْا ثَلٰثَ اِسْتِيْذَانَاتٍ

قَوْلُهُ ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ : "ثَلٰثُ" শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে রফা'বিশিষ্ট হয়েছে। উহ্য মুবতাদার পরে اَوْقَاتٌ মুযাফ উহ্য রয়েছে; মুযাফকে বিলোপ করে মুযাফ ইলাইহি অর্থাৎ عَوْرَاتٍ -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এ সুরতে الْعِشَاءُ শব্দের উপর ওয়াকফ হবে, অর্থাৎ هِىَ ثَلٰثَةُ اَوْقَاتٍ كَائِنَةٌ لَكُمْ ; উল্লিখিত اَوْقَاتٌ -কে عَوْرَاتٍ বলা হয়েছে, অথচ উল্লিখিত তিন اَوْقَاتٌ তথা সময় عَوْرَاتٌ নয়। কিন্তু যেহেতু উল্লিখিত তিন সময় عَدَمِ تَسَتُّرٌ তথা كَشْفُ عَوْرَاتٌ [সতর খোলা] -এর সময়, তাই مَظْرُوْف বলে ظَرْف উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাকে تَسْمِيَةُ الشَّىْءِ بِاِسْمِ مَا يَقَعُ فِيْهِ বলা হয়।

আর "ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ" নসববিশিষ্ট হওয়ার সুরতে ثَلٰثُ عَوْرَاتٍ তার পূর্ববর্তী বাক্যাংশ অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ-এর মহল হতে বদল হয়েছে, আর মুযাফ ইলাইহি মুযাফের স্থলাভিষিক্ত। যেহেতু উল্লিখিত সময়ত্রয়ে অতিরিক্ত বস্ত্র খোলার কারণে লুক্কায়িত অংশ প্রকাশ পায়, এজন্য উল্লিখিত সময়ত্রয়কে عَوْرَاتٌ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ هِيَ : এটা হলো مُبْتَدَأ আর تَبْدُوْ فِيْهَا الْعَوْرَاتُ হলো خَبَرٌ আর لِإِلْقَاءِ الثِّيَابِ الخ : এ অংশটি تَبْدُوْ-এর অগ্রগামী ইল্লত, أَوْقَاتٌ-কে عَوْرَاتٌ নাম রাখার ইল্লতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ : এ বাক্যটি পূর্বের বাক্য طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ-এর তাকিদ।

قَوْلُهُ مُتَبَرِّجٰتٍ : এ ব্যাখ্যা مُظْهِرَاتٌ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, بِزِيْنَةٍ-এর মধ্যকার بَا অব্যয়টি تَعْدِيَة-এর জন্য। কেউ কেউ বলেছেন, এটা لَامٌ অর্থে। অর্থাৎ مُظْهِرَاتٍ لِزِيْنَةٍ ; جِلْبَابٌ অর্থ– চাদর, বোরকা ইত্যাদি যার দ্বারা সম্পূর্ণ দেহ আবৃত থাকে। এর বহুবচন হলো جَلَابِيْب

قَوْلُهُ مِنْ بُيُوْت مَنْ ذُكِرَ : এর সম্বন্ধ হলো قِنَاع-এর সাথে। এর অর্থ হলো ওড়না ইত্যাদি দোপল্লা কাপড়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الخ : **শানে নুযূল** : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত আছে–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মাদলাজ ইবনে ওমর নামীয় এক আনসারী ছেলেকে দ্বিপ্রহরের সময় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট পাঠালেন– যাতে সে হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে আনে। ছেলেটি হযরত ওমর (রা.)-এর গৃহে আচমকা প্রবেশ করল এবং হযরত ওমর (রা.)-কে এমন অবস্থায় দেখল যা তিনি পছন্দ করতেন না। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন আনসারী এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে মুরসিদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিছু খাদ্য তৈরি করেন। এমন সময় লোকেরা বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে। তখন হযরত আসমা (রা.) বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটাতো খুবই জঘন্য প্রথা যে, স্বামী স্ত্রী একই কাপড়ে রয়েছে এমতাবস্থায় তাদের গোলাম ঘরে প্রবেশ করে।" ঐ সময় يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الخ এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الخ : আলোচ্য আয়াতে নিকটাত্মীয়দেরকেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন অনুমতি নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। ইতোপূর্বে এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতে যে হুকুম ছিল তা ছিল পরপুরুষ ও অনাত্মীয়ের জন্যে। এখানে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিন সময়ে গোলামদেরকে এমনকি নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। ঐ তিন সময় হলো–

১. প্রথম হলো ফজরের নামাজের পূর্বে। কেননা এটা হলো ঘুমানোর সময়।
২. দ্বিতীয় হলো দুপুরের সময়, যখন মানুষ সাধারণত কিছুটা বিশ্রামের জন্য কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে থাকে।
৩. তৃতীয় হলো ইশার নামাজের পর। কেননা ওটাই হচ্ছে শিশুদেরকে নিয়ে শয়নের সময়।

সুতরাং এ তিন সময় যেন গোলাম ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরাও অনুমতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ না করে। তবে এ তিন সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাদের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের ঘরে যাতায়াত জরুরি। তারা বারবার আসে ও যায়। সুতরাং প্রত্যেকবার অনুমতি প্রার্থনা করা তাদের জন্য এবং বাড়ির লোকদের জন্যও বড়ই অসুবিধাজনক ব্যাপার। এজন্যেই নবী করীম ﷺ বলেছেন "বিড়াল অপবিত্র নয়। ওটা তো তোমাদের বাড়িতে তোমাদের আশে-পাশে সদা ঘোরাফেরা করেই থাকে।" –[এ হাদীসটি ইমাম মালেক (র.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এবং আহলুস সুনান বর্ণনা করেছেন।] হুকুম তো এটাই, কিন্তু এর উপর আমল খুব কমই হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "তিনটি আয়াতের উপর আমল মানুষ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো এ আয়াত। দ্বিতীয়টি হলো সূরা নিসার وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبٰى الخ এ আয়াতটি এবং তৃতীয়টি হলো সূরা হুজুরাতের

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ الخ এ আয়াতটি। শয়তান লোকদের উপর ছেয়ে গেছে এবং সে তাদেরকে এ আয়াতগুলোর উপর আমল করা হতে উদাসীন রেখেছে, যেন তাদের এ আয়াতগুলোর উপর ঈমান নেই। আমি তো আমার দাসটিকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, সে যেন এ তিন সময়ে বিনা অনুমতিতে কখনো না আসে।" প্রথম আয়াতটিতে দাসদাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকেও অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতটিতে ওয়ারিশদের মধ্যে মাল বণ্টনের সময় আত্মীয়স্বজন, এতিম ও মিসকিন এসে গেলে তাদেরকেও কিছু দেওয়া ও তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করার হুকুম করা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে বংশ ও আভিজাত্যের উপর গর্ব না করা; বরং আল্লাহভীরু লোককেই সম্মানপ্রাপ্তির যোগ্য মনে করার বর্ণনা রয়েছে।

হযরত মূসা ইবনে আবী আয়েশা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত শা'বী (র.)-কে জিজ্ঞেস করেন– لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ এ আয়াতটি কি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে? উত্তরে তিনি বলেন, "না, রহিত হয়নি।" তখন পুনরায় তিনি প্রশ্ন করেন, "কিন্তু জনগণ তো এর প্রতি আমল ছেড়ে দিয়েছে?" জবাবে তিনি বলেন, "এ আয়াতের প্রতি আমল করার জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।"

হযরত ইবনে আবী হাতিম (র.) কর্তৃক হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, দু জন লোক কুরআন কারীমে বর্ণিত তিন সময়ে অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, "এ আয়াতের উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার একটি বড় কারণ হলো লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও প্রশস্ততা। পূর্বে জনগণের আর্থিক অবস্থা এমন ভালো ছিল না যে, তারা ঘরের দরজার উপর পর্দা লটকাবে বা কয়েকটি কক্ষবিশিষ্ট একটি বড় ঘর নির্মাণ করবে; বরং তাদের একটি মাত্র ঘর থাকত এবং অনেক সময় দাসদাসীরা তাদের অজ্ঞাতে ঘরে প্রবেশ করত। ঐ সময় স্বামী স্ত্রী হয়তো ঘরে একত্রে থাকত, ফলে তারা খুবই লজ্জিত হতো এবং বাড়ির লোকেরাও এতে কঠিনভাবে অস্বস্তিবোধ করত। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে আর্থিক সচ্ছলতা দান করলেন এবং তারা পৃথক পৃথক কক্ষ বানিয়ে নিল ও দরজার উপর পর্দা লটকিয়ে দিল তখন তারা রক্ষিত হয়ে গেল। আর এর ফলে যে যৌক্তিকতায় অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়ে গেল। তাই জনগণ এ হুকুমের অনুসরণ ছেড়ে দিল এবং তারা এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করল।"

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, এ তিনটি এমন সময়, যখন মানুষ কিছুটা অবসর পায় এবং বাড়িতেই অবস্থান করে। আল্লাহ জানেন তারা তখন কি অবস্থায় থাকে। এজন্যেই দাসদাসীদেরও অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা সাধারণত ঐ সময়েই মানুষ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, যেন গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে বের হতে পারে এবং নামাজে শরিক হতে পারে। –[ইবনে কাসীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আদেশ দান করা তো বিধেয়; কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা তো শরিয়তের কোনো আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়, তাদেরকে এ আদেশ দেওয়া তো নীতিবিরুদ্ধ।

উত্তর : এর জবাব হলো, এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই- এই সময়ে জিজ্ঞাসা না করে ভিতরে এসো না; যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামাজ শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাজের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামাজ পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের মূল আদেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোনো جُنَاحٌ নেই। جُنَاحٌ শব্দটি সাধারণত গুনাহ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক 'অসুবিধা' ও 'দোষ' অর্থেও আসে। এখানে لَا جُنَاحَ -এর অর্থ তা-ই; অর্থাৎ কোনো অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গুনাহগার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল। –[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ : মহান আল্লাহ বলেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ অর্থাৎ 'এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোনো দোষ নেই।' কেননা সেসব সময় সাধারণত প্রত্যেকের কাজকর্মের ও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার সময়। এ সময়ে স্বভাবতই মানুষ স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও করে না। আলোচ্য আয়াত–اَلَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -এর অর্থে মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল আছে। দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে মাহরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী মনিবকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস, যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

এ বিশেষ অনুমিত গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব– না মোস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিধান এখনো কার্যকর আছে– না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে, আয়াতটি মুহকাম ও অরহিত এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব। –[কুরতুবী] কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এ তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে। এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করে এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনাও থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমিত গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এক রেওয়ায়েতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওজর বর্ণনা করেছেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

নারীদের পর্দার তাগিদ এবং এর মধ্যে আরো একটি ব্যতিক্রম বিধান : ইতিপূর্বে দুইটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে দুইটি ব্যতিক্রমও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ব্যতিক্রম দর্শকের দিকে দিয়ে এবং অপর ব্যতিক্রম যাকে দেখা হয়, তার দিক দিয়ে মাহরাম, দাসী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল এবং যে বস্তু দৃষ্টি থেকে গোপন করা উদ্দেশ্য, তার দিকে দিয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। এতে উপরি পোশাক তথা বোরকা অথবা বড় চাদর বোঝানো হয়েছিল এবং কারো কারো মতে নারীর মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্য পর্দার বিধান এরূপ শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামের কাছে, যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরি নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্য বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরি নয়। তাই বলা হয়েছে– اَلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الخ ; এর তাফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে যে, যেসব অঙ্গ মাহরামের সামনে খোলা যায়, যে মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে। কিন্তু শর্ত এই যে, যদি সে সাজসজ্জা না করে। পরিশেষে আরো বলা হয়েছে– وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ, সে যদি মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্য উত্তম।

قَوْلُهُ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الخ : আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত হচ্ছে– বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, অর্থাৎ যারা এমন বয়সে পৌঁছে গেছে যে, পুরুষদের প্রতি তাদের কোনোই আকর্ষণ নেই, তাদের জন্যে এটা অপরাধ নয়, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। অর্থাৎ অন্যান্য নারীদের মতো তাদের পর্দার দরকার নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এটি وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ الخ এ আয়াতটি হতে স্বতন্ত্র।

হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বোরকা এবং চাদর নামিয়ে দিয়ে শুধু দোপাট্টা এবং জামা ও পায়জামা পরে থাকার অনুমতি রয়েছে। তাঁর কেরাতও اَنْ يَّضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ এরূপই বটে। এর দ্বারা দোপাট্টার উপরের চাদরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বুড়ি স্ত্রীলোকেরা যখন মোটা, চওড়া দোপাট্টা পরে থাকবে, তখন তার উপরে অন্য চাদর রাখা জরুরি নয়। কিন্তু এর দ্বারাও যেন সৌন্দর্য প্রকাশ উদ্দেশ্য না হয়।

স্ত্রীলোকেরা হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বলেন, "তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জা অবশ্যই বৈধ; কিন্তু এটা যেন অপর পুরুষদের চক্ষু ঠাণ্ডা করার জন্য না হয়।"

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর স্ত্রী খুবই বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি তাঁর গোলামের দ্বারা তাঁর মাথায় মেহেদি লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি যে, আমার পুরুষদের প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই।"

পরিশেষে মহান আল্লাহ বলেন, [চাদর না নেওয়া তো এরূপ বুড়ি স্ত্রীলোকদের জন্য জায়েজ বটে, কিন্তু] এটা হতে তাদের বিরত থাকাই [অর্থাৎ বোরকা ও চাদর ব্যবহার করাই] তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। –[ইবনে কাসীর]

٦١. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ فِىْ مُؤَاكَلَتِهِ مُقَابِلِيْهِمْ وَلَا حَرَجٌ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اى بيوت اولادكم اَوْ بُيُوْتِ اٰبَائِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَىْ خَزَنْتُمُوْهُ لِغَيْرِكُمْ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ط وَهُوَ مَنْ صَدَّقَكُمْ فِىْ مَوَدَّتِهِ الْمَعْنٰى يَجُوْزُ الْاَكْلُ مِنْ بُيُوْتِ مَنْ ذُكِرَ وَاِنْ لَمْ يَحْضُرُوْا اَىْ اِذَا عَلِمَ رِضَاءَهُمْ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ اَوْ اَشْتَاتًا مُتَفَرِّقِيْنَ جَمْعُ شَتٍّ نَزَلَ فِيْمَنْ تَحَرَّجَ اَنْ يَاْكُلَ وَحْدَهٗ وَاِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَاكِلُهٗ يَتْرُكُ الْاَكْلَ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا لَكُمْ لَا اَهْلَ فِيْهَا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَىْ قُوْلُوْا اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَرُدُّ عَلَيْكُمْ وَاِنْ كَانَ بِهَا اَهْلٌ فَسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ تَحِيَّةً مَصْدَرُ حَيَّا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ط يُثَابُ عَلَيْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ اَىْ يُفَصِّلُ لَكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ لِكَىْ تَفْهَمُوْا ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ :

৬১. অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই নিজেদের বিপরীত তথা ওজরবিহীনদের সঙ্গে খাওয়ার মধ্যে এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদের গৃহে, অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অর্থাৎ ঐ গৃহে যা তোমরা অপরের জন্য সংরক্ষণ করেছ অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে আর বন্ধু হলো, যে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে আন্তরিক হয়। আয়াতের অর্থ হলো উল্লিখিতদের গৃহে তাদের অবর্তমানে [তাদের সম্পদ হতে] খাওয়া জায়েজ আছে। অর্থাৎ যখন খাওয়ার ব্যাপারে তাদের সন্তুষ্টি জানা যায়। তোমরা একত্রে আহার কর, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই সমবেত হয়ে অথবা পৃথকভাবে আহার কর অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে; اَشْتَاتًا শব্দটি شَتٌّ -এর বহুবচন। এ আয়াত ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে একাকী খেতে অসুবিধা মনে করত, আর যদি সঙ্গে খাওয়ার কাউকে না পেত, তাহলে খাবারই খেত না। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তোমাদের এমন গৃহে যাতে কেউ নেই, তখন তোমাদের নিজেদের প্রতি সালাম বলবে। অর্থাৎ বল اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ [আমাদের উপর এবং আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।] কেননা ফেরেশতারা তোমাদেরকে তার উত্তর দিবেন। আর যদি তাতে [গৃহের] বাসিন্দা থাকে, তাহলে তাদেরকে সালাম বলবে অভিবাদন স্বরূপ। এটা কল্যাণময় "تَحِيَّةً" শব্দটি حَيَّ -এর মাসদার আল্লাহর কাছ থেকে ও পবিত্র দোয়া এর উপর প্রতিদান দেওয়া হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তোমাদের দীনের নির্দেশাবলিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও যাতে তোমরা এ নির্দেশাবলি বুঝ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فِيْ مُوَاكَلَةِ مُقَابِلِيْهِمْ : مُوَاكَلَةِ শব্দটি মাসদার, এটা مَفْعُوْل -এর প্রতি مُضَافٌ হয়েছে। অর্থাৎ فِيْ اَكْلِهِمْ مَعَ مُقَابِلِيْهِمْ অর্থাৎ উপরিউক্ত তিনো প্রকার ত্রুটি থেকে যারা মুক্ত তাদের সাথে আহার করায়।

قَوْلُهُ وَلَا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة

قَوْلُهُ صَدِيْقِكُمْ : صَدِيْق অর্থ– বন্ধু। এটা একবচন ও বহুবচন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

قَوْلُهُ مِنْ بُيُوْتِ مَنْ ذُكِرَ : পূর্বে ১১টি ঘরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর সংখ্যা ওরফ ও স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ اِذَا عَلِمَ رِضَاءَ هُمْ بِهِ : এ সন্তুষ্টি স্পষ্ট আকারে হোক কিংবা এমন কোনো আলামত সাপেক্ষে হোক যা সন্তুষ্টি বুঝায়। আর উপরিউক্ত অনুমতি সাধারণ পানাহারের বস্তুর ক্ষেত্রে। যেমন– রুটি, তরকারি প্রভৃতি। এ অনুমতি এমন বস্তুর ক্ষেত্রে নয় যা বিশেষভাবে ব্যক্তি বিশেষ -এর জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং এ অনুমতি কেবল নিজের পানাহারের ক্ষেত্রে সীমিত, সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। একইভাবে যে সকল বস্তু খাদ্যদ্রব্য নয়, সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনধিকার চর্চা করা বা হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট অনুমতি লাভ না হবে।

قَوْلُهُ تَحِيَّةً : এটা উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل مُطْلَقٌ অর্থাৎ فَحَيُّوْا تَحِيَّةً এটা فَسَلِّمُوْا -এর مَعْمُوْل -ও হতে পারে। কেননা سَلِّمُوْا এবং تَحِيَّة -এর অর্থ কাছাকাছি। এক্ষেত্রে তা قَعَدْتُ جُلُوْسًا -এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ : এর সম্বন্ধ হলো تَحِيَّةً -এর উহ্য صِفَتْ -এর সাথে। তখন বাক্য হবে– تَحِيَّةً صَادِرَةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ আবার স্বয়ং تَحِيَّة -এর সাথেও সম্বন্ধ হতে পারে।

قَوْلُهُ يُثَابُ عَلَيْهَا : এটা مُبَارَكَةً -এর ব্যাখ্যা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ الخ : **শানে নুযূল** : মুফাসসিরীনে কেরাম আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোনো বিরোধ নেই। ঘটনাবলির সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবলি নিম্নরূপ–

১. ইমাম বগভী (র.) প্রখ্যাত তাফসীরবিদ হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের ও যাহহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ণ ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারো সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাই তারা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চেয়ে যেন বেশি না খায় এবং সবাই যেন সমান অংশ পায়। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবত অন্যের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মতো বসতে পারি না, দুজনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবত তার কষ্ট হবে। তাদের এ চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তারাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

২. ইমাম বগভী (র.) ইবনে জারীরের সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরিউক্ত ঘটনার বিপরীত। তা এই যে, কুরআন মাজীদে لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ –[অর্থাৎ তোমরা একে

অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।] আয়াতটি নাজিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ণ ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগল। তারা ভাবল, রুগ্ণ ব্যক্তি তো স্বভাবতই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোনটি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব, সম্ভবত তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশি খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। অথচ, যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলি কমবেশি হওয়ার চিন্তা করো না।

৩. হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (র.) বলেন, মুসলমানগণ জিহাদের যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশত তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মুসনাদে বায্যারে হযরত আয়েশা (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবীগণও তাঁর সাথে জিহাদে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাঁদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহভীতিবশত আপন মনের ধারণায় অনুমতি হয়নি আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত।

ইমাম বাগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের صَدِيْقِكُمْ [অর্থাৎ বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই] শব্দটি হারিস ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোনো এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারিস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি। -[মাযহারী]

বলা বাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনা আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ الخ : এ আয়াতে যে দোষ না হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত আতা (রা.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেন যে, এর দ্বারা অন্ধ ও খোঁড়াদের জিহাদে যোগদান না করা বুঝানো হয়েছে। যেমনটা 'সূরা ফাতহ'-এ রয়েছে। সুতরাং এ ধরনের লোক যদি জিহাদে গমন না করে, তবে তাদের শরিয়তসম্মত ওজর থাকার কারণে তাদের কোনো অপরাধ হবে না। সূরা বারাআতে রয়েছে, "যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা আর্থিক সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোনো অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো হেতু নেই; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তাদেরও কোনো অপরাধ নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্যে কোনো বাহন আমি পাচ্ছি না; তারা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত নেত্রে ফিরে গেল।" অতএব, এ আয়াতে তাদের জন্যে অনুমতি রইল যে, তাদের কোনো অপরাধ নেই।

হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, মানুষ যখন তার ভ্রাতা, ভগ্নি প্রমুখের বাড়ি যেত এবং স্ত্রীলোকেরা কোনো খাদ্য তার সামনে হাজির করত, তখন সে তা খেত না এই মনে করে যে, সেখানে বাড়ির মালিক তো নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ খাদ্য খেয়ে নেওয়ার অনুমতি দেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী- "তোমাদের নিজেদের জন্যেও কোনো দোষ নেই," এটা তো প্রকাশমানই ছিল, কিন্তু এর উপর অন্যগুলোর সংযোগ স্থাপনের জন্যে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তী বর্ণনা এ হুকুমের ব্যাপারে সমান। পুত্রদের বাড়ির হুকুমও এটাই, যদিও শব্দে এর বর্ণনা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আনুষঙ্গিকভাবে এটাও এসে যাচ্ছে। এমনকি এ আয়াত দ্বারাই দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, পুত্রের মাল পিতার মালেরই স্থলবর্তী।

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে কয়েকটি সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার [-ই মালিকানাধীন]।" আর যাদের নাম এসেছে তাদের দ্বারা দলিল গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, নিকটতম আত্মীয়দের একের খাওয়া পরা অপরের উপর ওয়াজিব। যেমন- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি এটাই। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ : আল্লাহ তা'আলার বাণী- أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ অর্থাৎ 'যার চাবি তোমাদের মালিকানায় রয়েছে' এ উক্তি দ্বারা গোলাম ও প্রহরীকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা তাদের মনিবের মাল হতে প্রয়োজন হিসেবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী খেতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জিহাদে গমন করতেন তখন প্রত্যেকেরই মনের বাসনা এটা হতো যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যদি যেতে পারত! জিহাদে যাওয়ার সময় তারা নিজেদের বিশিষ্ট বন্ধুদেরকে চাবি দিয়ে যেত এবং তাদেরকে বলে যেত, "প্রয়োজনবোধে তোমরা আমাদের মাল থেকে খেতে পারবে। আমরা তোমাদেরকে অনুমতি দিলাম।" কিন্তু এরপরেও এরা নিজেদেরকে আমানতদার মনে করে এবং এই মনে করে যে, তারা হয়তো খোলা মনে অনুমতি দেয়নি। পানাহারের কোনো জিনিসকে তারা স্পর্শই করত না। তখন এ হুকুম নাজিল হয়।

قَوْلُهُ أَوْ صَدِيْقِكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা তোমাদের বন্ধুদের গৃহেও খেতে পার, যখন তোমরা জানবে যে, তারা এটা খারাপ মনে করবে না এবং তাদের কাছে এটা কঠিনও ঠেকবে না। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, "যখন তুমি তোমার বন্ধুর বাড়িতে যাবে তখন তার অনুমতি ছাড়াই তুমি তার খাদ্য হতে খেতে পারবে।"

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا الخ : **শানে নুযূল** : আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সম্পদশালী লোকেরা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গেলে তারা আহার্য বস্তু সম্পদশালী লোকদের নিকট রাখতো। তখন সম্পদশালী লোকেরা বলত, আল্লাহর শপথ! আমরা পানাহারে তোমাদের সাথে শরিক হয়ে গুনাহ করব না। কেননা আমরা সম্পদশালী, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে বনী ইলিয়াছ ইবনে বকর কেনানী সম্পর্কে। এ গোত্রের এক ব্যক্তি মেহমান ব্যতীত খাবার গ্রহণ করত না। যদি কোনো মেহমান পাওয়া যেত তখন আহার করত। এমনও হতো যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো মেহমান পেত না- এজন্য খাবার গ্রহণ করত না। এমনকি তার উষ্ট্রির দুগ্ধ পরিপূর্ণ থাকত, কিন্তু কোনো মেহমান তার সঙ্গে পান করার জন্য না পেলে সে দুগ্ধ দোহন করত না। যখন কোনো মেহমান পেত, তখনই কেবল দোহন করে পান করত। অন্যথায় সন্ধ্যা নাগাদ ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় থাকত। তার সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে নূরুল কুরআন : খ. ১৮, পৃ. ৩১০]

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا الخ : উক্ত আয়াতে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যখন يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْآ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" -এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ পরস্পর বলাবলি করেন, "পানাহারের জিনিসগুলোও তো মাল, সুতরাং এটাও আমাদের জন্যে হালাল নয় যে, আমরা একে অপরের সাথে আহার করি।" কাজেই তাঁরা ওটা থেকেও বিরত হন। ঐ সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অনুরূপভাবে পৃথক পৃথকভাবে পানাহারকেও তাঁরা খারাপ মনে করতেন। কেউ সঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা খেতেন না। এজন্যে আল্লাহ তা'আলা এ হুকুমের মধ্যে দুটোরই অনুমতি দিলেন, অর্থাৎ অন্যদের সাথে খেতেও এবং পৃথক পৃথকভাবে খেতেও। বনূ কিনানা গোত্রের লোক বিশেষভাবে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত থাকত, তথাপি সঙ্গে কাউকেও না পাওয়া পর্যন্ত খেত না। সওয়ারির উপর সওয়ার হয়ে তারা সাথে আহারকারী সঙ্গীর খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা একাকী খাওয়ার অনুমতি দান সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ করে অজ্ঞতার যুগের ঐ কঠিন প্রথাকে দূর করে দেন।

এ আয়াতে যদিও একাকী খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, লোকদের সাথে মিলিত হয়ে খাওয়া নিঃসন্দেহে উত্তম। আর এতে বেশি বরকতও রয়েছে।

হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব (রা.) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল : "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না [এর কারণ কি?]।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, "সম্ভবত তুমি পৃথকভাবে একাকী খেয়ে থাক। তোমরা খাদ্যের উপর একত্র হও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খেতে শুরু কর, তোমাদের খাদ্যে বরকত দেওয়া হবে।" -[মুসনাদে আহমদ।]

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা সবাই একত্রে খাও, পৃথক পৃথকভাবে খেয়ো না। কেননা বরকত জামাতের উপর রয়েছে।" -[ইবনে মাজাহ]

قَوْلُهُ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি অভিবাদন স্বরূপ সালাম করবে।

হযরত জাবির (রা.) বলেন, "যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলার শেখানো বরকতময় উত্তম সালাম বলবে। আমি তো পরীক্ষা করে দেখেছি যে, এটা সরাসরি বরকতই বটে।"

হযরত ইবনে তাউস (র.) বলেন, "তোমাদের যে কেউ বাড়িতে প্রবেশ করবে, সে যেন বাড়ির লোকদেরকে সালাম দেয়।"

হযরত আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "এটা কি ওয়াজিব?" উত্তরে তিনি বলেন, "কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে আমি এটা খুবই পছন্দ করি যে, যখনই তোমরা বাড়িতে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি তো এটা কখনো ছাড়িনি। তবে কোনো সময় ভুলে গিয়ে থাকি, সেটা অন্য কথা।"

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, "যখন মসজিদে যাবে তখন বলবে- اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' যখন নিজের বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন নিজের ছেলেমেয়েদেরকে সালাম দিবে এবং যখন এমন কোনো বাড়িতে যাবে যেখানে কেউই নেই, তখন বলবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ 'আমাদের উপর ও আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এ সময়ে তোমাদের সালামের জবাব আল্লাহর ফেরেশতারা দিয়ে থাকেন।"

হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ আমাকে পাঁচটি অভ্যাসের অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে আনাস (রা.)! তুমি পূর্ণভাবে অজু কর, তোমার হায়াত বৃদ্ধি পাবে। আমার উম্মতের যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে তাকেই সালাম দেবে, এর ফলে তোমার পুণ্য বেড়ে যাবে। যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার পরিবারের লোককে সালাম দেবে, তাহলে তোমার বাড়ির কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। চাশতের নামাজ পড়তে থাকবে, তোমাদের পূর্ববর্তী দীনদার লোকদের এ নীতিই ছিল। হে আনাস (রা.)! ছোটদেরকে স্নেহ করবে এবং বড়দেরকে সম্মান করবে, তাহলে কিয়ামতের দিন তুমি আমার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"- [এ হাদীসটি হাফিয আবু বকর আল-বায্যার (র.) বর্ণনা করেছেন।]

মহান আল্লাহ বলেন, এটা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণ ও পবিত্র। অর্থাৎ এটা হলো দু'আয়ে খায়ের যা আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা কল্যাণময় ও পবিত্র।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি তাশাহ্হুদ তো আল্লাহর কিতাব হতেই গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি- فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

অর্থাৎ "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।" সুতরাং নামাজের তাশাহ্হুদ হলো-

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ .

অর্থাৎ "কল্যাণময় অভিবাদন ও পবিত্র সালাত আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। [হে নবী ﷺ!] আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারপর নামাজি ব্যক্তি নিজের জন্যে দোয়া করবে, অতঃপর সালাম ফিরাবে।"-[এটা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা কচ্ছেন।] আবার সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেই মারফূ' রূপে যা বর্ণিত আছে, তা এর বিপরীত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

অনুবাদ :

٦٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ
وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ اَيِ الرَّسُوْلِ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ
كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَذْهَبُوْا لِعُرُوْضِ عُذْرٍ
لَهُمْ حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْ۔
ذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ ج فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ
امرهم فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ بِالْاِنْصِرَافِ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

৬২. মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর সাথে মিলিত হলে অর্থাৎ রাসূলের সাথে কোনো সমষ্টিগত কাজে যেমন- জুমার খুতবা চলে যায় না অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া অবস্থায়ও তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোনো কাজের অনুমতি চাইলে তাদের কোনো বিষয়ের আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন প্রস্থানের এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।

٦٣. لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا ط بِاَنْ تَقُوْلُوْا يَا مُحَمَّدُ
بَلْ قُوْلُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ
لِيْنٍ وَتَوَاضُعٍ وَخَفْضِ صَوْتٍ قَدْ يَعْلَمُ
اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا اَىْ
يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِى الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِ
اِسْتِئْذَانٍ خُفْيَةً مُسْتَتِرِيْنَ بِشَيْءٍ وَقَدْ
لِلتَّحْقِيْقِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ
اَمْرِهٖٓ اَيِ اللّٰهِ اَوْ رَسُوْلِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ
بَلَاءٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الْاٰخِرَةِ ۔

৬৩. রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না এভাবে যে, বল 'হে মুহাম্মদ!' বরং বিনয়, নম্রতা ও নিম্নস্বরে 'হে আল্লাহর নবী', 'হে আল্লাহর রাসূল' বল। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্য হতে চুপিসারে সরে পড়ে। অর্থাৎ মসজিদ হতে খুতবা চলাকালীন অবস্থায় অনুমতি ছাড়া চুপিসারে কোনো বস্তুর আড়াল নিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে قَدْ শব্দটি তাহকীক [নিশ্চিতকরণ]-এর জন্য হয়েছে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের তাদেরকে স্পর্শ করবে বিপর্যয় অর্থাৎ বিপদ অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে পরকালে।

٦٤. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِلْكًا
وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ اَيُّهَا
الْمُكَلَّفُوْنَ عَلَيْهِ ط مِنَ الْاِيْمَانِ وَالنِّفَاقِ
وَ يَعْلَمُ يَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ
الْخِطَابِ اَىْ مَتٰى يَكُوْنُ فَيُنَبِّئُهُمْ فِيْهِ
بِمَا عَمِلُوْا ط مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِهَا عَلِيْمٌ ۔

৬৪. মনে রেখ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহরই মালিক হওয়া হিসেবে, সৃষ্টি করা হিসেবে ও দাস হওয়া হিসেবে। তোমরা হে দায়িত্বপ্রাপ্তরা! যে অবস্থায় আছ, তা তিনি জানেন অর্থাৎ ঈমান ও নেফাক অবস্থায়। আর তিনি জানেন যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে এখানে غَيْبَةٌ হতে خِطَابٌ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে অর্থাৎ জানেন তিনি যে, প্রত্যাবর্তনের দিন কখন হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দিবেন তারা যা করেছে ভালো ও মন্দ। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় তাদের আমল ইত্যাদি জানেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهُ : এটা مُبْتَدَأ আর اَلَّذِيْنَ - مَوْصُوْل , اٰمَنُوْا الخ - মা'তুফ আলাইহি এবং الخ মা'তুফ মিলে صِلَة , صِلَة মিলে مَوْصُوْل মিলে خَبَرٌ

قَوْلُهُ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ : এর মধ্যে اِسْنَاد مَجَازِىٌّ ঘটেছে। কেননা اَمْر হলো سَبَب جَمْع আর جَمْع হলো مُسَبَّب এখানে যেন সববের প্রতি মুসাব্বাবের সম্বন্ধ ঘটেছে।

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ اَىْ لَا تُنَادُوْهُ بِاِسْمِهٖ فَتَقُوْلُوْا يَا مُحَمَّدُ وَلَا بِكُنْيَتِهٖ فَتَقُوْلُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ، بَلْ نَادُوْهُ بِالتَّعْظِيْمِ بِاَنْ تَقُوْلُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম যেভাবে তার জীবদ্দশায় সম্মানের সাথে নেওয়া জরুরি ছিল, তদ্রূপ তার ইন্তেকালের পরেও জরুরি। রাসূলল্লাহ ﷺ -এর শানে কোনোরূপ কটূক্তিকারী কাফের অভিশপ্ত।

قَوْلُهُ لِوَاذًا : শব্দটি مُفَاعَلَة -এর মাসদার, একে অন্যের আড়াল গ্রহণ করা। এটা হয়তো, يَتَسَلَّلُوْنَ -এর সমার্থ হওয়ার কারণে মাসদার তথা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ অর্থাৎ يَتَسَلَّلُوْنَ لِوَاذًا অথবা উহ্য فِعْل -এর মাসদার। অর্থাৎ يُلَاوِذُوْنَ لِوَاذًا আর মাসদারটি حَالٌ -এর স্থলে হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। অর্থাৎ يَتَسَلَّلُوْنَ مُتَلَاوِذِيْنَ অর্থে।

قَوْلُهُ اَنْ يُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ : মাসদারের তাবিলে হয়ে فَلْيَحْذَرِ -এর مَفْعُوْل অর্থাৎ اِصَابَةَ فِتْنَةٍ

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ : এর আতফ হলো يَعْلَمُ -এর مَعْمُوْل তথা مَا اَنْتُمْ -এর উপর। যেমন ব্যাখ্যাকার (র.) يَعْلَمُ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মজলিসসমূহের আদব কায়দা, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে উপদেশ স্থান পেয়েছে, কোনো আগন্তুকের কারো বাড়িতে প্রবেশের সঠিক নিয়মও ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে হযরত রাসূলে করীম ﷺ -এর মজলিসের আদব এবং নিয়ম-কানুন পালন সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ-এর দরবার থেকে বের হওয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা একান্ত জরুরি। তিনি ডাকলে অনতিবিলম্বে সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁর পবিত্র মজলিস থেকে অনুমতি না নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার এবং তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে হাজির না হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ এবং মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ -এর তাজীম করা এবং তাঁর মজলিসের আদব রক্ষা করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

قَوْلُهُ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ الخ : শানে নুযূল : ইবনে ইসহাক, ইবনে মুনযির ও বায়হাকী (র.) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারযীর সূত্রে বর্ণনা করেন, পঞ্চম হিজরিতে অনুষ্ঠিত আহযাবের যুদ্ধে সারা আরবের কাফেররা যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মদিনা আক্রমণ করে। কাফেরদের সেনাপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। কাফেরদের আক্রমণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পূর্বাহ্নেই পৌঁছেছিল। তাই তিনি মদিনা মুনাওয়ারার সমতল ভূমিতে এক বিরাট পরিখা খননের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিন হাজার পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনিই এই পরিখা খননের কাজ আরম্ভ করেন। হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ নিজে মাটি কাটেন এবং মাটির বোঝা তুলে দেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা কাজে অলসতা করছিল। এমনকি পরিখা খননের নামে প্রতারণা করছিল। তারা সুযোগ বুঝে পেছন থেকে সরে পড়ত এবং বাড়ি চলে যেত। মুসলমানদের চোখে ধুলো দিয়ে তারা এসব করত। ঘটনাক্রমে যদি কোনো মুসলমান দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে বাসস্থানে যেতে বাধ্য হতেন তখন মুনাফিকরা এসে তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট খবর দিত। অবশ্য প্রয়োজন পড়লে মুসলমানরা প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুমতিক্রমে ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতেন এবং কাজ শেষে ফিরে আসতেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৪১৬]

قَوْلُهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ الخ : এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে আরো একটি আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যেমন তোমরা আগমনের সময় অনুমতি নিয়ে আগমন করে থাক, অনুরূপভাবে প্রস্থানের সময়ও আমার নবী ﷺ -এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রস্থান কর। বিশেষ করে যখন কোনো সমাবেশ হবে এবং কোনো জরুরি বিষয়ের উপর আলোচনা চলবে। যেমন– জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শ সভা ইত্যাদি। এরূপ স্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো এদিক-ওদিক যাবে না। কারণ এটাও পূর্ণাঙ্গ মুমিনের একটা নিদর্শন।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন, হে নবী ﷺ! তারা তাদের কোনো কাজে বাইরে যাবার জন্যে তোমার কাছে অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে যাবে তখন সে যেন মজলিসের লোকদেরকে সালাম করে। আর যখন সেখান হতে চলে আসার ইচ্ছা করবে, তখনো যেন সালাম দিয়ে আসে। মর্যাদার দিক দিয়ে দ্বিতীয়বারের সালাম প্রথমবারের সালামের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।"

[এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) ও ইমাম নাসায়ী (র.)-ও এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।] –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন : আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিস থেকে তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে যাওয়া হারাম। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে উপস্থিত থাকার পর যখন ইচ্ছা প্রস্থান করতেন ; তখন তারা এর জন্য অনুমতি নেওয়া জরুরি মনে করতেন না।

উত্তর : জবাব এই যে, আয়াতে সাধারণ মজলিসের বিধান বর্ণনা করা হয়নি; বরং কোনো প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে মজলিস ডাকা হয়, এটা হচ্ছে তার বিধান; যেমনটা খন্দক যুদ্ধের সময় হয়েছিল। এ বিশেষত্বের প্রতি আয়াতের শব্দ– عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ -এর মধ্যে ইঙ্গিত আছে।

اَمْرٍ جَامِعٍ বলে কি বুঝানো হয়েছে? : এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে; কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, এতে এমন কাজ বুঝানো হয়েছে, যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে একত্র করা জরুরি মনে করেন; যেমন আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজ ছিল। এছাড়াও জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, কোনো জামাত এবং পরামর্শসভা ইত্যাদি।

এ আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, নাকি ব্যাপক : ফিক্‌হবিদগণ সবাই একমত যে, এ আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামি প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এরূপ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মজলিসেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমির তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসের এ বিধান, তিনি সবাইকে একত্র হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েজ। –[কুরতুবী, মাযহারী ও বয়ানুল কুরআন]

বলা বাহুল্য, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসের জন্য এ আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামি সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এ আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভাসমিতির জন্যও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোনো মজলিসে কোনো সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তাভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য একত্র হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ الخ : শানে নুযূল : আবূ নু'আঈম দালায়েল গ্রন্থে যাহহাক (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, গ্রাম্য লোকেরা হুযূর ﷺ-কে 'ইয়া মুহাম্মদ!' কিংবা 'ইয়া আবাল কাসেম!' বলে ডাকত। এটা শিষ্টাচারের খেলাফ। এ প্রসঙ্গে নাম ধরে ডাকতে নিষেধপূর্বক এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الخ : শানে নুযূল : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, মুনাফিকরা জুমার দিনে খোতবার সময় বসে থাকাকে কষ্টদায়ক মনে করত। এজন্য তারা লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আড়ালে আবডালে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করত। আর কখনো হুজুর ﷺ তাদেরকে ডাকলে তাঁর মহান দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে তাদের যেন মরণ আসত। তাই কিভাবে ফাঁকি দেবে সেজন্য তারা বাহানা খুঁজত। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা মানুষকে ফাঁকি দিতে পার, তাদের দৃষ্টি এড়াতে পার, মানুষকে প্রতারণা করতে পার; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের কোনো কর্মই গোপন নেই। তোমাদের কোনো আচরণই তাঁর নিকট গোপনীয় নেই।

قَوْلُهُ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ الخ : হযরত যাহহাক (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'হে মুহাম্মদ ﷺ!' এবং 'হে আবুল কাসেম ﷺ!' বলে আহ্বান করত, যেমন তারা একে অপরকে ডেকে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ বেআদবি হতে নিষেধ করে দেন। তাদেরকে তিনি বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম ধরে ডেকো না; বরং 'হে আল্লাহর নবী ﷺ!' বা 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ!' এই বলে ডাকবে। তাহলে তাঁর বুজুর্গি, মর্যাদা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোও এ আয়াতের মতোই। আল্লাহ তা'আলা বলেন- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. অর্থাৎ "হে মুমিনগণ!" রাইনা [হে নির্বোধ] বলো না, এবং 'উনযুর না' [আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।] বল, আর শুনে রেখ, কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" -[সূরা বাকারা : ১০৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করেছেন; তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তবে তাই তাদের জন্য উত্তম হতো; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" -[সূরা হুজুরাত : ২-৫]

সুতরাং এসব আয়াত দ্বারা মুমিনদেরকে ভদ্রতা শিখানো হয়েছে যে, তাঁকে কিভাবে সম্বোধন করতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, কিভাবে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করতে হবে ইত্যাদি। এমনকি পূর্বে তো তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় সদকা করার হুকুম ছিল। এটা হচ্ছে এ আয়াতের একটি ভাবার্থ। দ্বিতীয় ভাবার্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়াকে তোমরা তোমাদের পরস্পরের দোয়ার মতো মনে করো না। তাঁর দোয়াতো কবুল হবেই। সুতরাং সাবধান! তোমরা আমার নবী ﷺ-কে কষ্ট দিয়ো না। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো বদ দোয়া যদি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, তবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এর পূর্ববর্তী বাক্যের তাফসীরে মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (র.) বলেন যে, জুমার দিন খুতবায় বসে থাকা মুনাফিকদের কাছে খুবই ভারি বোধ হতো। আর মসজিদে উপস্থিত হওয়ার এবং খুতবা শুরু হয়ে যাবার পর কেউ মহানবী ﷺ -এর অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারত না। কারো বাইরে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়লে সে নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইত এবং তিনি তাকে অনুমতি দিতেন। কেননা খুতবার সময় কথা বললে জুমা বাতিল হয়ে যায়। তখন এ মুনাফিকরা আড়ে আড়েই দৃষ্টি বাঁচিয়ে সটকে পড়ত। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন যে, জামাতে যখন এ মুনাফিকরা থাকত তখন একে অপরের আড়ালে হয়ে পালিয়ে যেত। আল্লাহর নবী ﷺ হতে এবং তাঁর কিতাব হতে সরে যেত। জামাতের সারি হতে বেরিয়ে গিয়ে ইসলামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যেত।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশের, তাঁর সুন্নতের, তাঁর হুকুমের, তাঁর নীতির এবং তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। মানুষের কথা ও কাজকে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সুন্নত ও হাদীসের সাথে মিলানো উচিত। যদি তা তাঁর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তো তা ভালো। আর যদি সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তা অবশ্যই অগ্রাহ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার উপর আমার আদেশ নেই তা অগ্রাহ্য।" [এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।] প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কেউই শরিয়তে মুহাম্মাদীর ﷺ বিপরীত করে, তার অন্তরে কুফরি, নিফাক, বিদআত ও মন্দের বীজ বপন করে দেওয়া হয়। তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়; হয়তো দুনিয়াতেই হত্যা, বন্দী, হদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা পরকালের পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : "আমি এবং মানুষের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালাল। আর আগুন যখন তার চারপাশ আলোকিত করল, পতঙ্গ ও যেসব প্রাণী আগুনে ঝাঁপ দেয়, সেগুলো ঝাঁপ দিতে লাগল। তখন সেই ব্যক্তি সেগুলোকে [আগুন থেকে] ফিরাবার চেষ্টা করল, তা সত্ত্বেও সেগুলো আগুনে পুড়ে মরে। সুতরাং এটাই আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত। আমিও তোমাদের কোমর ধরে আগুন থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি, কিন্তু তোমরা তাতে পতিত হও।"–[এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (র.) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)-ও এটা তাখরীজ করেছেন।]

قَوْلُهُ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যাতে ব্যাপৃত রয়েছ তিনি তা জানেন। তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন এবং যে আমল ও বিশ্বাসের উপর থাক না কেন, সবই তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আসমান ও জমিনের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর কাছে গোপন নেই। তোমাদের আমল ও অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর কাছে প্রকাশমান। ছোট বড় সমস্ত জিনিস স্পষ্ট কিতাবে রক্ষিত রয়েছে। বান্দাদের ভালো-মন্দ সমস্ত কাজ তিনি পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাক অথবা গোপনে গোপনে কিছু কর না কেন, আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন থাকবে না। প্রকাশ্যও গোপনীয় সবই তাঁর কাছে সমান। চুপি চুপি কথা এবং উচ্চৈঃস্বরের কথা সবই তাঁর কানে পৌঁছে যায়। সমস্ত প্রাণীর রিজিকদাতা তিনিই। প্রত্যেক প্রাণীর প্রত্যেক অবস্থার খবর তিনিই রাখেন। প্রথম থেকেই সবকিছু লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অদৃশ্যের চাবি তাঁরই হাতে আছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। জলে ও স্থলে অবস্থানরত সবকিছুর খবর একমাত্র তিনিই রাখেন। গাছের একটি পাতা ঝরে পড়লে সেটাও তাঁর অজানা থাকে না। জমিনের অন্ধকারের মধ্যে কোনো দানা নেই এবং শুষ্ক ও সিক্ত এমন কোনো জিনিস নেই, যা স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। এ বিষয়ের বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। যখন সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, ঐ সময় তাদের সামনে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্য ও পাপ পেশ করা হবে। তারা তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত আমল দেখতে পাবে। আমলনামা তারা ভীত ও কম্পিতভাবে দেখবে এবং তার মধ্যে তাদের সারা জীবনের কার্যাবলি দেখতে পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের স্বরে বলবে, "এটা কেমন কিতাব যে, এতে বড় তো বড়ই; এমনকি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কোনো কিছুও বাদ পড়েনি!" যে যা করেছে তার সবই সেখানে বিদ্যমান পাবে। যেমন মহামহিম ও প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন– يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ অর্থাৎ "সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গিয়েছে।' –[সূরা কিয়ামাহ : ১৩]

অন্যত্র তিনি বলেন–

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ

অর্থাৎ "আর হাজির করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে হাজির পাবে; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।" –[সূরা কাহাফ : ৪৯]

এ জন্যেই মহান আল্লাহ এখানে বলেন, যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। –[ইবনে কাসীর]

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ : সূরা ফুরকান মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِلٰى رَحِيْمًا فَمَدَنِيٌّ وَهِىَ سَبْعٌ وَسَبْعُوْنَ اٰيَةً

তবে وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ..................رَحِيْمًا আয়াতটি ছাড়া।

এটি মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত। এতে ৭৭ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. تَبٰرَكَ تَعَالٰى الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ الْقُرْاٰنَ لِاَنَّهٗ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ عَلٰى عَبْدِهٖ مُحَمَّدٍ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ اَىِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ دُوْنَ الْمَلٰئِكَةِ نَذِيْرًا ـ مُخَوِّفًا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ـ

১. কত মহান তিনি, যিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কেননা এটা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। তাঁর বান্দার প্রতি হযরত মুহাম্মদ -এর প্রতি যাতে তিনি হতে পারেন বিশ্বজগতের জন্য অর্থাৎ মানব ও দানবের জন্য। ফেরেশতাগণের জন্য নয়, সতর্ককারী আল্লাহর শাস্তি হতে ভীতি প্রদর্শনকারী।

٢. اِلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ شَاْنِهٖ اَنْ يُّخْلَقَ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا سَوَّاهُ تَسْوِيَةً ـ

২. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। যা সৃজিত হওয়ার উপযোগী এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। অর্থাৎ তাকে সঠিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

٣. وَاتَّخَذُوْا اَىِ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَىِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ اٰلِهَةً هِىَ الْاَصْنَامُ لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا اَىْ دَفْعَهٗ وَّلَا نَفْعًا اَىْ جَرَّهٗ وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً اَىْ اِمَاتَةً لِاَحَدٍ وَاِحْيَاءً لِاَحَدٍ وَّلَا نُشُوْرًا ـ اَىْ بَعْثًا لِلْاَمْوَاتِ ـ

৩. আর তারা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ কাফেররা তাঁর পরিবর্তে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহরূপে অর্থাৎ মূর্তিকে। যারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা অন্যের সৃষ্টি। তারা ক্ষমতা রাখে না নিজেদের অপকার করার অর্থাৎ তাকে প্রতিহত করার এবং উপকার করার অর্থাৎ লাভ করার এবং তারা ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু ও জীবনের অর্থাৎ কাউকে মৃত্যুদান করতে এবং কাউকে জীবন দান করতে এবং পুনরুত্থানের উপরও তারা কোনো ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ মৃতদেরকে জীবিত করার।

অনুবাদ :

٤. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِنْ هٰذَآ اَىْ مَا الْقُرْاٰنُ اِلَّآ اِفْكُ كِذْبٌ نِ افْتَرَاهُ مُحَمَّدٌ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ وَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ تَعَالٰى فَقَدْ جَآءُوْا ظُلْمًا وَّزُوْرًا ـ كُفْرًا وَكِذْبًا اَىْ بِهِمَا ـ

৪. কাফেররা বলে, এটা তো কিছুই নয় কুরআন তো কিছুই নয় মিথ্যা ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজেই এটাকে উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে আর তারা হলো কিতাবধারী সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরূপে তারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে। সত্য প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা বলা উভয় ক্ষেত্রেই।

٥. وَقَالُوْآ اَيْضًا هُوَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكَاذِيْبُهُمْ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ اكْتَتَبَهَا انْتَسَخَهَا مِنْ ذٰلِكَ الْقَوْمِ بِغَيْرِهٖ فَهِىَ تُمْلٰى تُقْرَأُ عَلَيْهِ لِيَحْفَظَهَا بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ غُدْوَةً وَّعَشِيًّا ـ

৫. তারা আরো বলে এগুলো তো সে কালের উপকথা মিথ্যা অলীক কাহিনী। اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ [হামযা বর্ণে পেশসহ]-এর বহুবচন। যা তিনি লিখিয়ে নিয়েছেন অন্যের সাহায্যে উক্ত সম্প্রদায় থেকে। এগুলো তার নিকট পাঠ করা হয়। যাতে তিনি মুখস্থ করে নিতে পারেন। সকাল-সন্ধ্যায়।

٦. قَالَ تَعَالٰى رَدًّا عَلَيْهِمْ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ الْغَيْبَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا بِهِمْ ـ

৬. আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন- বলুন! এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি সকল রহস্য অবগত আছেন অদৃশ্যের ব্যাপারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর। নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল মুমিনদের জন্য পরম দয়ালু তাদের ব্যাপারে।

٧. وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ط لَوْلَآ هَلَّا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا يُصَدِّقُهٗ ـ

৭. তারা বলে- এ কেমন রাসূল, যিনি আহার করেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করেন, তার নিকট কোনো ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হলো না যে, তার সঙ্গে থাকতো সতর্ককারী রূপে, যে তাঁকে সত্যায়ন করত।

٨. اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ مِنَ السَّمَاءِ يُنْفِقُهٗ وَلَا يَحْتَاجُ اِلَى الْمَشْىِ فِى الْاَسْوَاقِ لِطَلَبِ الْمَعَاشِ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ بُسْتَانٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ط اَىْ مِنْ ثِمَارِهَا فَيَكْتَفِىْ بِهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ نَاْكُلُ بِالنُّوْنِ اَىْ نَحْنُ فَيَكُوْنُ لَهٗ مَزِيَّةٌ عَلَيْنَا بِهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اَىِ الْكَافِرُوْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ مَا تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا مَخْدُوْعًا مَغْلُوْبًا عَلٰى عَقْلِهٖ ـ

৮. অথবা তাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন? আকাশ থেকে যা তিনি ব্যয় করতে পারতেন । ফলে জীবিকা অন্বেষণকল্পে তাকে বাজারে গমন করতে হতো না। অথবা তাঁর একটি বাগান নেই কেন? যা থেকে তিনি খাদ্য সংগ্রহ করতেন। অর্থাৎ তার ফলফলাদি হতে। ফলে তিনি তাতে যথেষ্ট করতে পারতেন। অন্য কেরাতে نَاْكُلُ রয়েছে يَاء -এর পরিবর্তে نُوْن দ্বারা অর্থাৎ আমরা তা থেকে খেতাম। এবং এর দ্বারা আমাদের উপর তার বিশেষ মর্যাদা লাভ হতো। সীমালঙ্ঘনকারীরা আরো বলে অর্থাৎ কাফেররা মুমিনগণকে তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। প্রতারিত ও বিবেক পরাভূত ব্যক্তিরই অনুসরণ করে থাকো।

অনুবাদ :

৯. قَالَ تَعَالَى أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْأَمْثَالَ بِالْمَسْحُوْرِ وَالْمُحْتَاجِ إِلَى مَا يُنْفِقُهُ وَإِلَى مَلَكٍ يَقُوْمُ مَعَهُ بِالْأَمْرِ فَضَلُّوْا بِذٰلِكَ عَنِ الْهُدٰى فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا طَرِيْقًا إِلَيْهِ.

৯. আল্লাহ তা'আলা বলন– দেখুন! এরা আপনার কি উপমা দেয়। জাদুগ্রস্ত, ব্যয়ভারের প্রতি মুখাপেক্ষী ও একজন ফেরেশতার সাথে, যে তার কাজে সহায়ক হতো। তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এর কারণে হেদায়েত থেকে ফলে তারা পথ পাবে না। তার প্রতি পৌঁছতে কোনো রাস্তা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

এ সূরাটি মক্কী, তবে তিনটি আয়াত হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। সকল সূরার নাম এবং তার ক্রমধারা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সবকিছুই تَوْقِيْفِيْ তথা আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর তরফ থেকে শ্রুত। তবে আয়াতের সংখ্যা এরূপ تَوْقِيْفِيْ নয়। এ সূরাটি তাওহীদ ও পুরুত্থানের বিষয়াদি সম্বলিত। –[জুমাল]

قَوْلُهُ إِلَى رَحِيْمًا : এ পর্যন্ত মোট তিনটি আয়াত রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : এটা تَبَارَكَ -এর ব্যাখ্যা, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তা ও গুণাবলি ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে সকল মাখলুকের ঊর্ধ্বে। تَبَارَكَ ক্রিয়াটি অতীতকালীন শব্দ। এর مُضَارِعْ ,اِسْم فَاعِلْ ও মাসদার ব্যবহৃত হয় না এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় না। বরকতের অর্থ হলো বৃদ্ধি পাওয়া চাই প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক। –[জুমাল]

قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ : এটা হলো কুরআনকে ফুরকান অভিহিত করার ইল্লত বা কারণ। এর অর্থ হলো পার্থক্য বিধানকারী। কুরআন যেহেতু হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধান করেছে এ কারণেই কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কুরআন যেহেতু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশে অবতীর্ণ হয়েছে এ কারণে কুরআনের অবতরণ প্রসঙ্গে نَزَّلَ বলা হয়েছে, যা অধিকরূপে পৃথক পৃথক অবতরণ করা বুঝায়। –[জুমাল]

قَوْلُهُ لِيَكُوْنَ : এটা অবতরণের ইল্লত বা কারণ। এর মধ্যকার যমীরটি عَبْد -এর প্রতি ফিরেছে। কেননা এটা এর নিকটবর্তী, আবার فُرْقَانْ -এর প্রতিও ফিরতে পারে। আবার مُنَزِّلْ তথা আল্লাহ তা'আলার প্রতিও ফিরতে পারে।

قَوْلُهُ لِلْعٰلَمِيْنَ : এটা نَذِيْرًا -এর সাথে সংশ্লিষ্ট। শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يُّخْلَقَ : এটা বৃদ্ধি করে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে মাখলুক হওয়া থেকে খারিজ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার সত্তা شَيْءٌ হওয়া স্বীকৃত। অন্যথায় তিনি যদি لَا شَيْءَ হন তাহলে اِرْتِفَاعِ نَقِيْضَيْن তথা ভিন্নমুখী দুটির কোনো একটি না হওয়া সাব্যস্ত হবে। কাজেই তাকে شَيْءٌ মানতে হবে। আর যখন আল্লাহ তা'আলার সত্তা شَيْءٌ হওয়া সাব্যস্ত হলো তখন خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ -এর অন্তর্গত হলো। সুতরাং তাঁর সত্তাও মাখলুক হওয়া সাব্যস্ত হলো। অথচ এটা অসম্ভব। এ প্রশ্ন নিরসনকল্পে ব্যাখ্যাকার (র.) مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يُّخْلَقَ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন।

উত্তরের সারাংশ এই যে, تَخْلِيْق বলা হয় কোনো বস্তু অস্তিত্বে আনাকে, আর অস্তিত্বহীনতা থেকে ঐ বস্তুই অস্তিত্বে আসা সম্ভব যা অস্তিত্বহীন ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো অস্তিত্বহীন ছিলেন না। অতএব আল্লাহ তা'আলার সত্তা মাখলুক বা সৃজিত হওয়া থেকে খারিজ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ سَوَّاهُ تَسْوِيَةً : এ বাক্যে বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্ন নিরসন করেছেন।

প্রশ্ন : وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا -এর মধ্যে قَلْب ঘটেছে। কেননা মূলত وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا فَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ হওয়া উচিত ছিল। কেননা তাকদীর হলো চিরন্তন বা অনাদি বিষয়, আর তাখলীক হলো নশ্বর বা হাদীস। কেননা তাকদীরের অর্থ হলো নির্ধারণ করা, পরিমিত করা, পরিকল্পনা করা। আর خَلْق -এর অর্থ হলো তৈরি করা, সৃষ্টি করা। আর এটা স্পষ্ট যে, পরিকল্পনা আগে হয়ে থাকে, আর সৃষ্টি এর পরে হয়ে থাকে। কোনো বিল্ডিং -এর প্ল্যান বা নকশা আগে হয়, আর বিল্ডিং পরে নির্মিত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আয়াতে ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখার কারণে অগ্র পশ্চাৎ বা قَلْب ঘটেছে।

উত্তর : আয়াতে قَلْب বা অগ্র-পশ্চাৎ ঘটেনি। কেননা قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا অংশটি سَوَّاهُ تَسْوِيَةً অর্থে। এর অর্থ হলো কোনো বস্তু তৈরি করার পর তা ঠিক করা। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীভূত করা, মজবুত করা ইত্যাদি। আর এটা সৃষ্টির পরে হয়ে থাকে। অতএব এখানে কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ بِهِمَا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ظُلْمًا وَّزُوْرًا শব্দদ্বয় হরফে জার উহ্য থাকার মাধ্যমে (بِنَزْعِ الْخَافِضِ) মানসুব হয়েছে। মূলত جَاءُوْا بِظُلْمٍ وَّزُوْرٍ ছিল। ব্যাখ্যাকার এটাই অবলম্বন করেছেন। আর কারো কারো মতে جَاءُوْا أَتٰى শব্দদ্বয় নিজেই مُتَعَدِّىْ; এ সময় مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে।

قَوْلُهُ هُوَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ : এখানে اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ উহ্য هُوَ মুবতাদার خَبَرْ টা ব্যাখ্যাকার (র.) যেমন বলেছেন। আর اِكْتَتَبَهَا বাক্যটি حَال -এর স্থলে এবং اِكْتَتَبَهَا তার খবরও হতে পারে।

قَوْلُهُ مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ : এখানে لَامْ -কে ভিন্ন লেখা হয়েছে। এটা সাধারণ আরবি رَسْمُ الْخَطِّ তথা আরবি লেখ্যনীতির পরিপন্থি। এর কারণ এই যে, বর্তমানে আমরা যে কুরআন পড়ে থাকি, তা মাসহাফে উসমানী অনুযায়ী। তাতে যেভাবে লিখিত আছে তার ব্যতিক্রম করা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ فَيَكُوْنَ : এটা যেহেতু لَوْلَا [যা هَلَّا -এর অর্থে ব্যবহৃত] -এর জবাব এ কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ : এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য اِسْم -কে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের জুলুম অত্যাচারকে স্পষ্ট করার জন্য; অন্যথায় وَقَالُوْا বলা যথেষ্ট ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ফুরকানের তাৎপর্য ও পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনি ভালোভাবেই জানেন যে অবস্থায় তোমরা আছ অর্থাৎ তোমাদের আকিদা বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। এরপর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে আসবে, সেদিন তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশ্যে, তাই এ সূরার শুরুতে ইরশাদ হয়েছে- تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
অর্থাৎ কত মহান, মহিমময় তিনি, যিনি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্যে তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন যা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় হিজরতের পূর্বে এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন আরবের কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল। তারা ছিল গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অনাচার, জুলুম অত্যাচার এক কথায় যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত, তারা এ কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না যে, আল্লাহ পাক এমন এক ব্যক্তির উপর তাঁর মহান বাণী নাজিল করেছেন, যিনি তাঁর জীবনের চল্লিশটি বসন্ত তাদেরই মাঝে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তাদের নিকট যেমন বিস্ময়কর ছিল, তেমনি ছিল অবিশ্বাস্য। অথচ এটিই ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং চিরসত্য। পৌত্তলিকরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের হাতে বানানো মূর্তিই ছিল তাদের উপাস্য, মিথ্যা ছিল তাদের নিকট প্রিয়। আর সত্য ও সুন্দর ছিল তাদের নিকট অপ্রিয়, এমনি অবস্থায় আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে,

আর যেহেতু এ সূরায় হক্ব ও বাতিল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিশেষভাবে পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে ফুরকান। এ সূরায় তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করত, তাদের যাবতীয় সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুগে প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যারা অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখও করা হয়েছে এ আয়াতে। যাতে করে পবিত্র কুরআনকে যারা অস্বীকার করে, প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে যারা অবিশ্বাস করে, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক বা পৌত্তলিকতা থেকে বিরত থাকে। -[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৮, পৃ. ৪৯]

এ সূরা প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ সূরায় বিশেষভাবে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককার মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে। -[দুররুল মানসূর খ. ৫, পৃ. ৬৮]

আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র.) এ সূরা সম্পর্কে লিখেছেন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ একমত যে এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, তিন আয়াত ব্যতীত সাতাত্তর আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাখানি মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিনটি আয়াত মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর যাহহাক (র.) বলেছেন, এ সূরার প্রথমাংশ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর অবশিষ্টাংশ মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ১৮, পৃ. ২৩০]

এই সূরার সারমর্ম কুরআনের মাহাত্ম্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুর পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব প্রদান করা।

قَوْلُهُ تَبَارَكَ : تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। فُرْقَانٌ কুরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ পার্থক্য করা। কুরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মুজেযার মাধ্যমে সত্যপন্থি ও মিথ্যাপন্থিদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে৷ তাই একে ফুরকান বলা হয়।

قَوْلُهُ لِلْعَالَمِيْنَ : এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য। পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুয়ত ও রিসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক।

قَوْلُهُ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا : تَخْلِيْق এর পর تَقْدِيْر উল্লেখ করা হয়েছে। تَخْلِيْق এর অর্থ কোনোরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ রহস্য : تَقْدِيْر -এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন প্রকৃতি, আকার আকৃতি, প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সেই কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্য বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমন সব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সেই কাজের উপযোগী, যার জন্য এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে তা ডুবে যায় এবং পাথর ও লোহার ন্যায় শক্ত করা হয়নি যে, তা খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করারও প্রয়োজন আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে, বাতাসও তরল; কিন্তু পানি থেকে পানি ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপনা-আপনি পৌঁছে না। এতে মানুষকে

কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তা'আলা বাধ্যতামূলক নিয়ামত করেছেন; কোনোরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌঁছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্য তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্টবস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ণ নমুনা। ইমাম গাযালী (র.) এ বিষয়ে اَلْحِكْمَةُ فِىْ مَخْلُوْقَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কুরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عَبْدِهٖ খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা কোনো সৃষ্ট মানবের জন্য এর চেয়ে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে 'আমার' বলে পরিচয় দেন।

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ الخ : এখানে থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছু দূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়: বরং মুহাম্মদ ﷺ নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরা কালের উপকথা ইহুদি, খ্রিস্টান প্রমুখের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর– লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলে দেন যে, এটা আল্লাহর কালাম।

কুরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে– اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ; এর সারমর্ম এই যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে, এর নাজিলকারী আল্লাহ তা'আলার সেই পবিত্র সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপনভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কুরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ দান করেছেন যে, যদি তোমরা এটাকে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর; বরং কোনো মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ। এর অনুরূপ কালাম বেশি না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধভাষী ও প্রাঞ্জলভাষী লোকদের জন্য এই চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কুরআনের এক আয়াতের মোকাবিলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারো হয়নি। অথচ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরোধিতায় নিজেদের ধনসম্পত্তি এমন কি সন্তান সন্ততি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কুরআনের অনুরূপ সূরা লিখে আনার মতো ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হলো না। এটা এ বিষয়রে জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, কুরআন কোনো মানব রচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ তা'আলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়াই এর অর্থসম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত সত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রাসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না; বরং ফেরেশতাদের মতো পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধনভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোনো চিন্তা করতে হতো না, হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতে হতো না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহর রাসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি; প্রথমত তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়ত কোনো ফেরেশতাও তাঁর সাথে থাকে না, যে তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয় তিনি জাদুগ্রস্ত। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং তিনি আগাগোড়াই বল্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত জবাব দেওয়া হয়েছে যে– اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا অর্থাৎ দেখুন, এরা আপনার শানে কেমন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোনো উপায় নেই। বিস্তারিত জবাব পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

অনুবাদ :

١٠. تَبٰرَكَ تَكَاثَرَ خَيْرًا الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَالُوْا مِنَ الْكَنْزِ وَالْبُسْتَانِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اَيْ فِي الدُّنْيَا لِاَنَّهُ شَاءَ اَنْ يُعْطِيَهُ اِيَّاهَا فِي الْاٰخِرَةِ وَيَجْعَلْ بِالْجَزْمِ لَّكَ قُصُوْرًا ـ اَيْضًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ اِسْتِئْنَافًا ـ

১০. কত মহান তিনি কত প্রাচুর্যময় যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু। যা তারা বলেছে ধনভাণ্ডার ও বাগান হতে। উদ্যানসমূহ যার নিম্নদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। অর্থাৎ পৃথিবীতে। কেননা, এটা তিনি আখিরাতে দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং তিনি আপনাকে প্রাসাদসমূহ ও দিতে পারেন। يَجْعَلْ শব্দটি জযম সহকারে। অন্য এক কেরাতে رَفْع সহকারে পঠিত হয়েছে جُمْلَه مُسْتَانِفَه হিসেবে।

١١. بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ الْقِيَامَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ج نَارًا مُسْعَرَةً اَيْ مُشْتَدَّةً ـ

১১. কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। অর্থাৎ, তীব্র উত্তপ্ত।

١٢. اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا غِلْيَانًا كَالْغَضْبَانِ اِذَا غَلَا صَدْرُهُ مِنَ الْغَضَبِ وَّزَفِيْرًا ـ صَوْتًا شَدِيْدًا وَسِمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهُ وَعِلْمُهُ ـ

১২. দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখাবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার تَغَيُّظ শব্দের অর্থ হলো উত্তেজনায় রাগান্বিতের ন্যায়, যখন ক্রোধে বুকের মধ্যে টগবগ করে উথলানোর ন্যায় শব্দ হয়। আর زَفِيْرً অর্থ হলো- প্রচণ্ড শব্দ বা আওয়াজ অথবা ক্রুদ্ধ স্বর শ্রবণ দ্বারা অর্থ হলো তাকে দেখা ও জানা।

١٣. وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِاَنْ يُضِيْقَ عَلَيْهِمْ وَمِنْهَا حَالٌ مِنْ مَكَانًا لِاَنَّهُ فِي الْاَصْلِ صِفَةٌ لَهُ مُّقَرَّنِيْنَ مُصَفَّدِيْنَ قَدْ قُرِنَتْ اَيْدِيْهُمْ اِلٰى اَعْنَاقِهِمْ فِي الْاَغْلَالِ وَالتَّشْدِيْدُ لِلتَّكْثِيْرِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ـ هَلَاكًا ـ

১৩. যখন তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে এর কোনো সঙ্কীর্ণ স্থানে ضَيِّقًا শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয় অবস্থায়ই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে। مِنْهَا হলো مَكَانْ থেকে حَالْ কারণ মূলত এটা হলো তার সিফত। শৃঙ্খলিত অবস্থায় শিকলে জড়িত। অর্থাৎ শিকল দ্বারা তাদের হাতকে স্কন্ধের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে তথা বেঁধে ফেলা হবে। আর তাশদীদটিকে আধিক্য বুঝানোর জন্য নেওয়া হয়েছে। তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে বিনাশ।

١٤. فَيُقَالُ لَهُمْ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدًا وَّادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا - كَعَذَابِكُمْ -

١٥. قُلْ أَذٰلِكَ الْمَذْكُورُ مِنَ الْوَعِيدِ وَصِفَةِ النَّارِ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ هَا الْمُتَّقُونَ ط كَانَتْ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ تَعَالَى جَزَاءً ثَوَابًا وَّمَصِيرًا مَرْجِعًا -

١٦. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خٰلِدِينَ ط حَالٌ لَازِمَةٌ كَانَ وَعْدُهُمْ مَا ذُكِرَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا - فَيَسْأَلُهُ مَنْ وَعَدَ بِهِ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ أَوْ يَسْأَلُهُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ -

١٧. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ بِالنُّونِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَيْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَعِيسٰى وَعُزَيْرٍ وَالْجِنِّ فَيَقُولُ تَعَالٰى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالنُّونِ لِلْمَعْبُودِينَ إِثْبَاتًا لِلْحُجَّةِ عَلَى الْعَابِدِينَ ءَأَنْتُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ أَلِفًا وَتَسْهِيلِهَا وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرٰى وَتَرْكِهِ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هٰؤُلَاءِ أَوْقَعْتُمُوهُمْ فِي الضَّلَالِ بِأَمْرِكُمْ إِيَّاهُمْ بِعِبَادَتِكُمْ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ - طَرِيقَ الْحَقِّ بِأَنْفُسِهِمْ -

অনুবাদ :

১৪. তখন তাদেরকে বলা হবে– আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করো না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাকো, তোমাদের বারবার শাস্তির মতো।

১৫. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন! এটাই শ্রেয় উল্লিখিত শাস্তির হুমকি ও জাহান্নামের আগুনের বিবরণ নাকি স্থায়ী জান্নাত যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মুত্তাকীগণকে। এটাই তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে পুরস্কার ছওয়াব, পুণ্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৬. সেথায় তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং তারা স্থায়ী হবে। خَالِدِيْنَ শব্দটি حَالٌ لَازِمَةٌ হয়েছে। এবং এই তাদের উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব। সুতরাং যাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে সে তাঁর নিকট তা পূরণ করার দাবি করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন আমাদেরকে তা প্রদান করুন। অথবা ফেরেশতাগণ তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে প্রবেশ করান সেই স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে প্রদান করেছেন।

১৭. এবং যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন يَحْشُرُ শব্দটি يَاء ও نُوْن উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করত তাদেরকে অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া ফেরেশতা। হযরত ঈসা, হযরত ওজায়ের এবং জিনদের সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন يَقُوْلُ শব্দটি يَاء ও نُوْن উভয়রূপেই পঠিত। উপাস্যদেরকে, উপাসকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সুদৃঢ় করার জন্য। তোমরাই কি ءَاَنْتُمْ এর দুটি হামযাকে আপন অবস্থায় বহাল রেখে, দ্বিতীয় টিকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে, দ্বিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃত ও অপরটির মাঝে একটি اَلِفٌ বৃদ্ধি করে এবং তা পরিত্যাগ করেও পাঠ করা যায়। আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে তোমরা তাদেরকে তোমাদের উপাসনা করার নির্দেশ দিয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিলে? নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? অর্থাৎ নিজেদের থেকেই সৎপথ বিচ্যুত হয়েছে।

অনুবাদ :

١٨. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ يَسْتَقِيْمُ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ اَىْ غَيْرِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ مَفْعُوْلٌ اَوَّلٌ وَمِنْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ النَّفْيِ وَمَا قَبْلَهُ الثَّانِيْ فَكَيْفَ نَاْمُرُ بِعِبَادَتِنَا وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ بِاِطَالَةِ الْعُمُرِ وَسَعَةِ الرِّزْقِ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ج تَرَكُوا الْمَوْعِظَةَ وَالْاِيْمَانَ بِالْقُرْاٰنِ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢ بُوْرًا هَلْكٰى -

১৮. তারা বলবে, পবিত্র ও মহান আপনি আপনার শানের অনুপযোগী বিষয়াদি হতে আপনি পূত-পবিত্র। আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারি না। অর্থাৎ আপনি ব্যতীত اَوْلِيَآءَ শব্দটি نَتَّخِذَ -এর প্রথম মাফঊল আর مِنْ অতিরিক্ত হয়েছে نَفْى -এর তাকিদের জন্য। এর পূর্ববর্তী অংশ হলো দ্বিতীয় মাফঊল। কাজেই কিভাবে আমরা আমাদের উপাসনার নির্দেশ দিতে পারি? আপনিই তো এদেরকে ও এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন। তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দীর্ঘায়ু ও সম্পদের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে। পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল তারা উপদেশ ও কুরআনে প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে পরিত্যাগ করেছিল। এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। বিপর্যয়ে।

١٩. قَالَ تَعَالٰى فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ اَىْ كَذَّبَ الْمَعْبُوْدُوْنَ الْعَابِدِيْنَ بِمَا تَقُوْلُوْنَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ اَنَّهُمْ اٰلِهَةٌ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ اَىْ لَا هُمْ وَلَا اَنْتُمْ صَرْفًا دَفْعًا لِلْعَذَابِ عَنْكُمْ وَّلَا نَصْرًا ج مَنْعًا لَكُمْ مِنْهُ وَمَنْ يَّظْلِمْ يُشْرِكْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا - شَدِيْدًا فِى الْاٰخِرَةِ -

১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন– তোমরা যা বলতে তা তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে অর্থাৎ উপাস্য দেবতাগণ অস্বীকার করবে। تَقُوْلُوْنَ শব্দটি تَاء যোগে পঠিত। তারা যে উপাস্য এ বিষয়টি। সুতরাং তোমরা পারবে না تَسْتَطِيْعُوْنَ শব্দটি يَاء এবং تَاء উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তারাও নয় এবং তোমরাও নও শাস্তি প্রতিহত করতে তোমাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করতে এবং সাহায্যও পাবে না অর্থাৎ তাঁর থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে। তোমাদেরকে মধ্যে যে সীমালঙ্ঘন করবে শিরক করবে তাকে আমি চরম শাস্তি আস্বাদন করাব পরকালে কঠিন শাস্তি।

٢٠. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ط فَاَنْتَ مِثْلُهُمْ فِىْ ذٰلِكَ وَقَدْ قِيْلَ لَهُمْ كَمَا قِيْلَ لَكَ -

২০. আপনার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল প্রেরণ করেছি তাঁরা সকলেই তো আহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন আপনিও তাদের মতোই এবং তাদেরকেও অনুরূপ বলা হয়েছে যেমনটি আপনাকে বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً بَلِيَّةً أُبْتُلِىَ الْغَنِىُّ بِالْفَقِيْرِ وَالصَّحِيْحُ بِالْمَرِيْضِ وَالشَّرِيْفُ بِالْوَضِيْعِ يَقُوْلُ الثَّانِىْ فِىْ كُلِّ مَا لِىْ لَا اَكُوْنُ كَالْاَوَّلِ فِىْ كُلِّ اَتَصْبِرُوْنَ ج عَلٰى مَا تَسْمَعُوْنَ مِمَّنْ أُبْتُلِيْتُمْ بِهِمْ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ اِصْبِرُوْا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ـ بِمَنْ يَصْبِرُوْنَ وَبِمَنْ يَجْزَعُ ـ

অনুবাদ :

হে মানুষ! আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। ধনীকে দরিদ্র দ্বারা, সুস্থকে অসুস্থতা দ্বারা, সম্ভ্রান্তকে ইতরের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। দ্বিতীয়জন প্রথমজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, কেন তাকে প্রথমজনের মতো করা হলো না। উপরের প্রতিটির মধ্যে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? যাদের সাথে তোমাদেরকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে তাদের থেকে যা শুনে থাক, তার উপর। এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি اَمْرٌ তথা নির্দেশ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছু দেখেন। কে ধৈর্যধারণ করে আর কে ধৈর্যধারণ করে না; বরং ছটফট করে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَبَارَكَ : এটা এমন একটি গুণ যা অন্যান্য সকল গুণাবলি সম্বলিত এবং সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়াকে অনিবার্য করে। এ কারণেই স্থানের প্রতি লক্ষ্য করে এর বিভিন্নরূপ তাফসীর করা হয়। সূরার সূচনায় যেহেতু আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা ছিল। এ কারণে সেখানে تَعَاظَمَ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। আর এটা যেহেতু দানের ক্ষেত্র, এ কারণে كَثُرَتْ خَيْرٌ তথা প্রভূত কল্যাণ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে। আর সূরার শেষ অংশ যেহেতু আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের ক্ষেত্র, এ কারণে সেখানে تَعَاظَمَ দ্বারা তাফসীর করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبَارَكَ : এটা অতীতকালীন ক্রিয়া اَلَّذِىْ মুযাফ বিলুপ্ত সহ এর فَاعِلْ অর্থাৎ تَبَارَكَ خَيْرُ الَّذِىْ

قَوْلُهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ : এ বাক্যটি خَيْرًا থেকে بَدَلْ হয়েছে। আর এটা মঙ্গল ও উত্তম হওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। কারণ মুশরিকরা যে বাগানের বিষয়ে বলেছিল তা ছিল সাধারণ বাগান। তাতে সংখ্যাধিক্য এবং ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ার কোনো শর্ত ছিল না, আর কারো মতে خَيْرًا থেকে عَطْف بَيَانْ -ও হতে পারে। আবার কেউ কেউ উহ্য اَعْنِىْ ক্রিয়ার কারণে جَنّٰتٍ -কে مَنْصُوْب স্থির করেছেন تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ এবং এ বাক্যটিকে جَنّٰتٍ -এর صِفَتْ সাব্যস্ত করেছেন।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ الخ : ব্যাখ্যাকার (র.) لِاَنَّهُ দ্বারা فِى الدُّنْيَا -এর قَيْد সংশ্লিষ্ট করার ইল্লত বর্ণনা করেছেন। ইল্লতের সারমর্ম এই যে, اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا -এর মধ্যে خَيْرِيَّتْ -কে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে ঝুলন্ত করা দুনিয়ার দিক দিয়ে এটি সঠিক। অন্যথায় পরকালে তা সুনিশ্চিত।

قَوْلُهُ يَجْعَلْ : এ ক্রিয়াটি জযমযোগে جَعَلَ -এর মহলের উপর عَطْف হবে, যা শর্তের جَزَاء হয়েছে। এ কারণে এটাও জযমযুক্ত হবে। অপর এক কেরাতে مَرْفُوْع মেনে নিয়ে, شَرْط যখন مَاضِىْ হয় তখন جَزَاء -এর মধ্যে রফা ও জযম উভয়টি বৈধ। এ কারণে তার উপর যেটা مَعْطُوْف হবে তার মধ্যেও উভয় ই'রাব বৈধ হবে। কেননা شَرْط যখন مَاضِىْ হয় তখন شَرْط -এর প্রভাব جَزَاء -এর মধ্যে দুর্বল হয়ে যায়। এ কারণে জযম ও রফা উভয় বৈধ হয়ে যায়। ইবনে মালিক (র.) বলেন- وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَاءَ اَحْسَنَ আর উভয় কেরাত, কেরাতে সাবআ -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ غَلَيَانًا : এখানে تَغَيُّظًا -এর ব্যাখ্যা غَلَيَانًا দ্বারা করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : غَيْظ তো শ্রবণের বস্তু নয়, তা হলো দেখার বস্তু।

উত্তর : এখানে غَيْظ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো غَلَيَانٌ অর্থাৎ উত্তেজিত হওয়া, টগবগ করা, যা শ্রবণ করা যায়। অতএব এখানে আর কোনো প্রশ্ন নেই।

قَوْلُهُ وَسِمَاعُ التَّغَيُّظِ رُؤْيَتُهُ عِلْمُهُ : এটি উল্লিখিত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর। অর্থাৎ রাগ শ্রবণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা দেখা ও অবগত হওয়া, আর এটা ক্রোধের ক্ষেত্রে সম্ভব। কেউ কেউ এর উত্তর দিয়েছেন যে, বাক্যটি মূলত এরূপ ছিল سَمِعُوْا وَرَاَوْا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا অতএব رَاَوْا -এর সম্পর্ক হলো تَغَيُّظْ -এর সাথে, আর زَفِيْرٌ -এর সম্পর্ক হলো سَمِعُوْا -এর সাথে। কেউ কেউ শ্রবণ দ্বারা সাধারণভাবে যে কোনো উপায়ে উপলব্ধি করার অর্থ নিয়েছেন। এ সময় سَمِعُوْا -এর সম্পর্ক تَغَيُّظْ ও زَفِيْرٌ উভয়ের সাথে বৈধ হবে। –[জুমাল]

قَوْلُهُ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا : এখানে مِنْهَا হলো مَكَانًا -এর صِفَتْ আর نَكِرَهْ -এর صِفَتْ -কে যখন আগে উল্লেখ করা হয়, তখন তা حَالْ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مُقَرَّنِيْنَ : এটা اُلْقُوْا -এর যমীরের حَالْ হয়েছে। مُصَفَّدِيْنَ ও (ض) مُصَفَّدِيْنَ উভয়টি বৈধ। এর অর্থ হলো বাঁধা, জড়ানো ইত্যাদি। صَفًّا অর্থ– বেড়ী।

قَوْلُهُ دَعَوْا هُنَالِكَ : এটা اِذَا اُلْقُوْا -এর جَزَاءْ আর هُنَالِكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংকীর্ণ স্থান।

قَوْلُهُ ثُبُوْرًا : এটা উহ্য فِعْل -এর مَفْعُول مُطْلَقْ অর্থাৎ ثَبَرْنَا ثُبُوْرًا অর্থে। কেউ কেউ বলেন, এটা وَعَوْا -এর مَفْعُوْل لَهٗ

قَوْلُهُ لِعَذَابِكُمْ اَىْ لِاَجَلِ دَوَامِ عَذَابِكُمْ .... دُعَائِكُمْ عَلٰى حَسْبِهٖ : এর দ্বারা আধিক্যের ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে তোমাদের আজাব চিরস্থায়ী এবং বিভিন্ন ধরনের এ হিসেবে তোমরা তোমাদের ধ্বংস আহবান করতে থাক। আর কোনো কোনো কপিতে আছে– لِعَذَابِكُمْ ; তখন বাক্যটির অর্থ হবে– মৃত্যুকে আহবান করার দ্বারা মৃত্যু কামনা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ هَا : এখানে صِلَهْ যেহেতু বাক্য হয়েছে, এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) هَا যমীরকে উহ্য মেনে رَابِطْ তথা সংযোগ স্থাপনকারীর প্রতি ইশারা করেছেন।

قَوْلُهُ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ : বিভিন্নরূপ ধমক ও দোজখাগ্নি বেশি উত্তম? নাকি চিরস্থায়ী বেহেশত? এখানে প্রশ্ন হয় যে, এর দ্বারা তো বুঝা গেল যে, আগুনের মধ্যেও মঙ্গল রয়েছে। অথচ বাস্তবে তা নেই।

উত্তর : ১. পবিত্র কুরআনে خَيْرٌ অধিকাংশ ক্ষেত্রে اِسْمُ فَاعِلْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

২. এটা এমনই যে, কোনো মনিব তার গোলামকে কিছু টাকা দিল, এ কারণে গোলাম দুষ্টামি ও বিরুদ্ধাচরণ শুরু করল। ফলস্বরূপ মালিক গোলামকে প্রহার করতে করতে বলল, এটা উত্তম নাকি ওটা?

প্রশ্ন : جَنَّةٌ বলা হয় চিরস্থায়ী আবাসকে। সুতরাং পরে আবার خُلْدٌ উল্লেখ করার প্রয়োজন কি?

উত্তর : ইযাফতের দ্বারা কখনো স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَلْخَالِقُ ও اَلْبَارِئُ এ দুটোও এ ধরনের।

قَوْلُهُ فِىْ عِلْمِهٖ تَعَالٰى : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ حَالٌ لَازِمَةٌ : উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের جَزَاءْ ও مَصِيْر ভবিষ্যতে হিসাব নিকাশের পরে হবে। তথাপি এটাকে অতীতকালীন সীগাহ্ দ্বারা ব্যক্ত করা হলো কেন?

উত্তর : ১. আল্লাহ তা'আলার ইলমের মধ্যে যেহেতু সবকিছুই বেষ্টিত রয়েছে, এ কারণে অতীতকালীন সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। ২. যে বিষয়টি ঘটা সুনিশ্চিত তাকে অতীতকালীন সীগাহ্ দ্বারা ব্যক্ত করেন।

قَوْلُهُ حَالٌ لَازِمَةٌ : এখানে لَهُمْ خٰلِدِيْنَ হলো لَهُمْ -এর যমীরের حَالٌ অথবা يَشَاءُوْنَ -এর فَاعِلْ -এর যমীরের حَالٌ لَازِمَةٌ ; আর حَالٌ لَازِمَةٌ -এর উদ্দেশ্য হলো পূর্বের অংশ দ্বারা যে অর্থ বুঝে আসে তাকে আরো জোরদার করা।

قَوْلُهُ وَعْدَهُمْ : এটা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো كَانَ -কে জাহির করা। অর্থাৎ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ থেকে যে وَعْدَةٌ বুঝা যায় সেটাই كَانَ -এর اِسْم ; কেউ কেউ مَا يَشَاءُوْنَ -এর মধ্যে যে مَا রয়েছে তাকে كَانَ -এর اِسْم সাব্যস্ত করেছেন।

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ : এটা اُذْكُرْ উহ্য فِعْل -এর ظَرْف হয়েছে এবং قُلْ -এর উপর عَطْف হয়েছে। نَحْشُرُهُمْ -এর مَفْعُوْل -এর যমীর দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদতকারীগণ উদ্দেশ্য। وَمَا يَعْبُدُوْنَ -এর عَطْف হলো هُمْ যমীরের উপর।

قَوْلُهُ اِثْبَاتًا لِلْحُجَّةِ عَلَى الْعَابِدِيْنَ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা তো সকল গায়েবী বিষয় অবগত, অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই তাঁর নিকট বর্তমান তুল্য। কাজেই উপাস্যদেরকে اَضْلَلْتُمْ -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : এ প্রশ্ন মূলত জিজ্ঞাসার জন্য নয় বরং তাদেরকে নিরুত্তর ও নির্বাক করা উদ্দেশ্য। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট প্রশ্ন করা হবে اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এভাবে وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ -এর মধ্যেও তাদেরকে নিরুত্তর করে দেওয়া উদ্দেশ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ بُوْرًا : এটা بَائِرٌ -এর বহুবচন। অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

قَوْلُهُ اِلَّا اِنَّهُمْ : এটা تَقُوْلُوْنَ -এর উক্তি বা مَقُوْلَةٌ আর مَا থেকে بَدَل ও হতে পারে। فَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ -এর মধ্যে যেহেতু ى ও ت যোগে দুটি কেরাত রয়েছে। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) لَاهُمْ وَلَا اَنْتُمْ বলেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا اِنَّهُمْ : ইবনে আম্বারী বলেন, এ বাক্যটি حال হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হবে। বাক্যটি এরূপ ছিল اِلَّا وَاِنَّهُمْ তার নিকট واو বিলুপ্ত থাকবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসির (র.)-এর মতে لَاِنَّهُمْ -এর হামযাকে যের দিয়ে পড়েছেন اِنَّهُمْ -এর খবরের উপর لَامْ আসার কারণে যদি اِنَّ -এর খবরে উপর لَامْ আসে তাহলে অধিকাংশের মতে اِنَّ যেরযুক্ত হবে। কেউ কেউ যবরও বৈধ বলেছেন। তবে তা ঠিক নয়। –[ফাতহুল কাদীর : শাওকানী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছুটা বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। এ সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলেছ যে, তিনি আল্লাহর রাসূল হলে তাঁর কাছে অগাধ ধনভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই দেওয়া যে. এরূপ করা আমার জন্য মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রাসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আ.)-কে অগাধ ধনদৌলত ও বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তি সামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গাম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্থিব ধনদৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও নিজের জন্য এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনদে আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত আবূ উমামার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পালনকর্তা! আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্য সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরজ করলাম: না, হে আমার পালনকর্তা! আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস যাপন করে সবর করব– এ অবস্থায়ই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি অভিপ্রায় প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে ঘোরাফেরা করত। –[মাযহারী]

সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গাম্বরগণ সাধারণত দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিত্তশালী ও

ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধনদৌলতের প্রতি তাঁদের কোনো ঔৎসুক্যই হয়নি। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাফেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গাম্বর হলে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাফেরের এই ধারণা যে, কোনো মানুষ আল্লাহর রাসূল হতে পারেন না, ফেরেশতাই রাসূল হওয়ার যোগ্য। কুরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গাম্বরকে তোমরাও নবী ও রাসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন, তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও হাট-বাজারে চলাফেরা করা নবুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থি নয়। উপরিউক্ত- وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ আয়াতে এই বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেসব লোক এ সকল বস্তু দাবি করে, তারা বাস্তবতা ও সত্য অন্বেষণের নিয়তে করে না; বরং দুষ্টামি ও বিরক্ত করার উদ্দেশ্য করে থাকে। তাদের দুষ্টামির কারণ এই যে, তাদের এখনও পর্যন্ত কিয়ামত এবং পুরস্কার ও তিরস্কারের উপর বিশ্বাস আসেনি। সুতরাং মনে রাখা উচিত যে, তাদের এ মিথ্যা আখ্যা দেওয়ার কারণে কিছুই আসে যায় না, কিয়ামত আসবেই। আর এসব মিথ্যাচারীদের জন্য আগুনের যে কয়েদখানা তৈরি করে রাখা হয়েছে অবশ্যই তাদেরক সেখানে প্রবেশ করতে হবে।

قَوْلُهُ اِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : অর্থাৎ দোজখের আগুন হাশরের ময়দানে দূর থেকে দোজখীদেরকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তার ক্রোধ ও ভয়ংকর শব্দে অনেক বড় বড় বীরপুরুষদের কলিজা পানি হয়ে যাবে। কাফেরদেরকে তার ভিতরে নেওয়ার জন্য চিৎকার করবে। দোজখের এ দেখা এবং চিৎকার করা প্রকৃতার্থেই; রূপকার্থে নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তার মধ্যে অনুভূতি সৃষ্টি করে দেওয়া কষ্টকর নয়। এটাই আহলে সুন্নত ও জামাতের আকীদা। আর মু'তাজিলা সম্প্রদায় যেহেতু দর্শন, কথোপকথন ও চিৎকার করাকে প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বলে থাকে। এ কারণে তারা উপরের বিষয়টি প্রকৃতার্থে হওয়া অস্বীকার করে থাকে। তারা তাকে রূপকার্থে বলে থাকে।

قَوْلُهُ وَكَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلًا : অর্থাৎ, এমন ওয়াদা যা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর ওয়াদা পালনকে জরুরি করে নিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি ঈমানদারদের জন্য এ মহাপুরস্কারকে নিজ জিম্মায় অবধারিত করে নিয়েছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া যেসব ব্যক্তি বা বস্তুর উপাসনা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও করা হবে তার মধ্যে জড়বস্তু যথা- পাথর, লোহা, কাঠ, সোনা-রূপা ও অন্যান্য ধাতু পদার্থও রয়েছে। এ সবগুলো বিবেকহীন। আর আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দারাও রয়েছেন, যাঁরা বিবেকসম্পন্ন। যেমন- হযরত উযাইর (আ.) হযরত ঈসা (আ.) এবং অন্যান্য আরো অনেক নেককার বান্দা, এভাবে ফেরেশতা ও জিনদেরকেও পূজা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা পরকালে বিবেকহীন জলজ পদার্থকে অনুভূতি ও বাকশক্তি দান করবেন। তিনি এসব উপাস্যদেরকে বলবেন, বল দেখি তোমরা কি আমার বান্দাদেরকে তোমাদের উপাসনার নির্দেশ দিয়েছিলে? নাকি তারা তাদের ইচ্ছামতো তোমাদের উপাসনা করে পথভ্রষ্ট হয়েছিল? সেদিন তারা উত্তর দিবে, আমরা নিজেরাই যেহেতু আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের স্রষ্টা মনে করতাম না। সুতরাং আমরা কীভাবে অন্যদেরকে আমাদের উপাসনা করার ও অভিভাবক ও কার্যনিয়ন্তা মনে করার নির্দেশ দিতে পারি?

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً : মানব সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যের অনুপস্থিতি বিরাট রহস্যের উপর ভিত্তিশীল : এতে ইঙ্গিত আছে যে, তা'আলার সবকিছু করার শক্তি রয়েছে। তিনি সকল মানবকে সমান বিত্তশালী করতে পারতেন, সবাইকে সুস্থ রাখতে পারতেন এবং সবাইকে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে পারতেন, কেউ হীনমনা ও নীচ থাকতে পারত না; কিন্তু এর কারণে বিশ্ব ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধনী ও কাউকে নির্ধন করেছেন, কাউকে সবল ও কাউকে দুর্বল করেছেন। কাউকে সুস্থ ও কাউকে অসুস্থ করেছেন এবং কাউকে সম্মানী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী আর কাউকে অখ্যাত করেছেন। শ্রেণি, জাতি ও অবস্থার এই বিভেদের মধ্যে প্রতি স্তরের লোকদের পরীক্ষা নিহিত আছে। ধনীর কৃতজ্ঞতার এবং দরিদ্রের সবরের পরীক্ষা আছে। রুগ্ণ ও সুস্থের অবস্থাও তদ্রূপ। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা এই যে, যখন তোমার দৃষ্টি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হয়, যে টাকা পয়সা ও ধন-দৌলতে তোমাদের অপেক্ষা বেশি কিংবা স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্মান ও সম্পত্তিতে তোমার চেয়ে বড়, তখন তুমি কালবিলম্ব না করে এমন লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যারা এসব বিষয়ে তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের, যাতে তুমি হিংসার গুনাহ থেকে বেঁচে যাও এবং নিজের বর্তমান অবস্থার জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে পার।

اَلْجُزْءُ التَّاسِعُ عَشَرَ : উনবিংশ পারা

অনুবাদ :

٢١. وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا لَا يَخَافُوْنَ الْبَعْثَ لَوْلَا هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ فَكَانُوْا رُسُلًا اِلَيْنَا اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ط فَيُخْبِرُنَا بِاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ تَعَالٰى لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا فِىْ شَانِ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا طَغَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا . بِطَلَبِهِمْ رُؤْيَةَ اللّٰهِ فِى الدُّنْيَا وَعَتَوْا بِالْوَاوِ عَلٰى اَصْلِهِ بِخِلَافِ عُتِىَ بِالْاِبْدَالِ فِىْ مَرْيَمَ .

২১. যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে, পুনরুত্থানকে ভয় পায় না আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না কেন। তারা আমাদের নিকট রাসূল হতেন। অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? অতঃপর তিনি আমাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দিবেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে নিজেদের ব্যাপারে অহমিকায় লিপ্ত। এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছে গুরুতররূপে। তারা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে প্রত্যক্ষ দেখতে চেয়ে। عَتَوْا ফে'লটি وَاوْ সহ মূল অবস্থায় রয়েছে। তবে সূরা মারইয়ামের عُتِىَ শব্দটি এর বিপরীত। সেখানে يَاءْ টি وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

٢٢. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ فِىْ جُمْلَةِ الْخَلَائِقِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَنَصَبُهُ بِاُذْكُرْ مُقَدَّرًا لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ اَىِ الْكَافِرِيْنَ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمُ الْبُشْرٰى بِالْجَنَّةِ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا . عَلٰى عَادَتِهِمْ فِى الدُّنْيَا اِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ شِدَّةٌ اَىْ عَوْذًا مُعَاذًا يَسْتَعِيْذُوْنَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ .

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে অন্যান্য সকল সৃষ্টির সাথে কিয়ামতের দিন। يَوْمَ শব্দটি اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য। মুমিনগণ এর ব্যতিক্রম, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ থাকবে। এবং তারা বলবে, রক্ষা কর রক্ষা কর! দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী। যখন তাদের উপর বিপদ এসে পড়ত। অর্থাৎ বাঁচাও! বাঁচাও! তারা ফেরেশতাদের থেকে আশ্রয় কামনা করবে।

٢٣. قَالَ تَعَالٰى وَقَدِمْنَا عَمَدْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ وَقِرٰى ضَيْفٍ وَاِغَاثَةِ مَلْهُوْفٍ فِى الدُّنْيَا فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا .

২৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব ভালো কাজের প্রতি, যেমন দান সদকা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অতিথিপরায়ণতা এবং পৃথিবীতে বিপদগ্রস্তের প্রতি সাহায্য সহানভূতি করা। অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।

هُوَ مَا يُرَى فِي الْكُوَى الَّتِي عَلَيْهَا الشَّمْسُ كَالْغُبَارِ الْمُفَرَّقِ أَيْ مِثْلَهُ فِي عَدَمِ النَّفْعِ بِهِ إِذْ لَا ثَوَابَ فِيْهِ لِعَدَمِ شَرْطِهِ وَيُجَازُوْنَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا .

অনুবাদ :

আর তা হলো যা দেখা যায় এমন ছিদ্রে, যাতে সূর্যের কিরণ নিপতিত হয়েছে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায়। অর্থাৎ তার মতো অনুপকারী। যেহেতু শর্ত তথা ঈমান না থাকার কারণে এতে কোনোরূপ ছওয়াব পাওয়া যায় না, তবে এর কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়।

٢٤. أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَأَحْسَنُ مَقِيْلًا ـ مِنْهُمْ أَيْ مَوْضِعَ قَائِلَةٍ فِيْهَا وَهِيَ الْاِسْتِرَاحَةُ نِصْفَ النَّهَارِ فِي الْحَرِّ وَأُخِذَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْقِضَاءُ الْحِسَابِ فِيْ نِصْفِ نَهَارٍ كَمَا وَرَدَ فِيْ حَدِيْثٍ ـ

২৪. জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে সেদিন কিয়ামতের দিন উৎকৃষ্ট বাসস্থান দুনিয়ার কাফেরদের চেয়ে এবং বিশ্রামস্থল মনোরম তাদের থেকে। অর্থাৎ জান্নাতে কায়লূলা করার স্থান, আর তা হলো গ্রীষ্মের দ্বি-প্রহরে বিশ্রাম করা। আর এ থেকে (أَحْسَنُ مَقِيْلًا) গৃহীত হয়েছে দ্বি-প্রহরে হিসাব শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

٢٥. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ أَيْ كُلُّ سَمَاءٍ بِالْغَمَامِ أَيْ مَعَهُ وَهُوَ غَيْمٌ أَبْيَضُ وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ تَنْزِيْلًا ـ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَنَصَبُهُ بِاذْكُرْ مُقَدَّرًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ شِيْنِ تَشَّقَّقُ بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِيْهَا وَفِيْ أُخْرٰى نُنْزِلُ بِنُوْنَيْنِ الثَّانِيَةُ سَاكِنَةٌ وَضَمِّ اللَّامِ وَنَصْبِ الْمَلَائِكَةِ ـ

২৫. আর সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আকাশ [মেঘপুঞ্জসহ] অর্থাৎ তার সাথে, আর غَمَامْ হলো সাদা মেঘ। এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে প্রতিটি আসমান থেকে, আর এটা হবে কিয়ামতের দিন। আর يَوْمَ শব্দটি উহ্য أُذْكُرْ ফে'লের কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। অন্য কেরাতে شِيْن বর্ণটি তাশদীদযুক্ত রয়েছে। তখন تَاءْ -কে شِيْن -এ পরিবর্তন করে شِيْن -কে شِيْن -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অপর কেরাতে نُنْزِلُ [বাবে اِفْعَالٌ হতে] দু' نُوْن -সহ এবং দ্বিতীয়টি সাকিনযুক্ত, لَام পেশযুক্ত এবং اَلْمَلَائِكَةُ মাফউল হিসেবে নসবযুক্ত হয়েছে।

٢٦. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ط لَا يُشْرِكُهُ فِيْهِ أَحَدٌ وَكَانَ الْيَوْمُ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ـ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

২৬. সেদিন কর্তৃত্ব হবে বস্তুত দয়াময়ের তাতে কেউই তাঁর অংশীদার থাকবে না এবং কাফেরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। মুমিনগণের বিপরীত।

٢٧. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ الْمُشْرِكُ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ كَانَ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ رِضَاءً لِأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ عَلٰى يَدَيْهِ نَدَمًا وَتَحَسُّرًا فِيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ مُحَمَّدٍ سَبِيْلًا طَرِيْقًا إِلَى الْهُدٰى ـ

২৭. জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, জালিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুশরিক উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত। প্রথমে সে কালেমায়ে শাহাদত পড়েছিল পরবর্তীতে উবাই ইবনে খলফের মনতুষ্টির জন্য ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে। হায়! يَا টি সতর্কীকরণের জন্য যদি রাসূলের সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম হেদায়েতের পথ।

অনুবাদ :

٢٨. يٰوَيْلَتٰى اَلِفُهُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ اَىْ وَيْلَتِىْ وَمَعْنَاهُ هَلَكَتِىْ لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا اَىْ اُبَيًّا خَلِيْلًا ـ

২৮. হায় দুর্ভোগ আমার! يٰوَيْلَتٰى -এর اَلِفٌ ইযাফতের يَاءٌ -এর পরিবর্তে এসেছে অর্থাৎ وَيْلَتِىْ অর্থ হলো হায় আমার ধ্বংস আমি যদি অমুককে উবাই ইবনে খলফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

٢٩. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ اَىِ الْقُرْاٰنِ بَعْدَ اِذْجَاءَنِىْ ط بِاَنْ رَدَّنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ قَالَ تَعَالٰى وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ الْكَافِرِ خَذُوْلًا ـ بِاَنْ يَّتْرُكَهُ وَيَتَبَرَّءَ مِنْهُ عِنْدَ الْبَلَاءِ ـ

২৯. আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর অর্থাৎ কুরআন আসার পর। এভাবে যে, সে আমাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক কাফেরের জন্য এভাবে যে, বিপদের সময় তাকে ত্যাগ করে ও তার থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে থাকে।

٣٠. وَقَالَ الرَّسُوْلُ مُحَمَّدٌ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ قُرَيْشًا اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا مَتْرُوْكًا ـ

৩০. রাসূল ﷺ বললেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো কুরাইশ গোত্র এই কুরআনকে পত্যিাজ্য মনে করে।

٣١. قَالَ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ كَمَا جَعَلْنَا لَكَ عَدُوًّا مِنْ مُشْرِكِىْ قَوْمِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ قَبْلَكَ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ ط الْمُشْرِكِيْنَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا لَّكَ وَنَصِيْرًا نَاصِرًا لَكَ عَلٰى اَعْدَائِكَ ـ

৩১. আল্লাহ তা'আলা বলেন- এভাবেই যেভাবে আপনার শত্রু বানিয়েছি আপনার মুশরিক সম্প্রদায় থেকে। প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছিলাম আপনার পূর্বে অপরাধীদেরকে মুশরিকদেরকে। সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেভাবে তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছেন। আপনার জন্য আপনার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। আপনার শত্রুর মোকাবেলায় আপনার জন্য সাহায্যকারী রূপে।

٣٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ج كَالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالزَّبُوْرِ قَالَ تَعَالٰى نَزَّلْنَاهُ كَذٰلِكَ ج اَىْ مُتَفَرِّقًا لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ نُقَوِّىْ قَلْبَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ـ اَىْ اَتَيْنَا بِهٖ شَيْئًا بِتَمَهُّلٍ وَتُؤَدَّةٍ لِيَتَيَسَّرَ فَهْمُهُ وَحِفْظُهُ ـ

৩২. কাফেররা বলে, সমগ্র কুরআন তার নিকট একবারেই অবতীর্ণ হলো না কেন? তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর -এর ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি এটাকে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি অল্প অল্প করে আপনার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য। আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করার জন্য। এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি। অর্থাৎ একটার পর একটা বিলম্বের সাথে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তা স্মরণ রাখা ও বুঝা সহজ হয়।

অনুবাদ :

٣٣. وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ فِىْ اِبْطَالِ اَمْرِكَ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ الدَّافِعِ لَهُ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا بَيَانًا هُمْ .

৩৩. তারা আপনার নিকট এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত করে না আপনার বিষয়টিকে রহিত করার জন্য যার সঠিক সমাধান তার প্রতিরোধক ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি। তাদের বিবরণ।

٣٤. اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَىْ يُسَاقُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ لا اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا هُوَ جَهَنَّمُ وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ـ اَخْطَأُ طَرِيْقًا مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ كُفْرُهُمْ ـ

৩৪. যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলাবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে তাড়িয়ে নেওয়া হবে। তারা স্থানের দিক দিয়ে অধিক নিকৃষ্ট আর তা হলো জাহান্নাম এবং অধিক পথভ্রষ্ট। অন্যদের তুলনায় অধিক ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। আর তা হলো তাদের কুফরি বা সত্য প্রত্যাখ্যান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا يَخَافُوْنَ : এটা তাহামার ভাষায় لَا يَرْجُوْنَ -এর ব্যাখ্যা, তবে এটাকে তার প্রকৃতার্থে ব্যবহার করাই উত্তম। এ সময় অর্থ হবে- لَا يَاْمَلُوْنَ لِقَاءَ مَا وَعَدْنَا عَلَى الطَّاعَةِ مِنَ الثَّوَابِ আর এটা স্পষ্ট যে, যে ছওয়াবের আশা রাখে না, সে আজাবেও ভয় পায় না। لَقَدِ اسْتَكْبَرَ -এর মধ্যকার لَامْ টি কসমিয়া

قَوْلُهُ وَعَتَوْا عَلٰى اَصْلِهِ : অর্থাৎ এটা এর মূল অবস্থায় রয়েছে। وَاوْ -কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়নি। পক্ষান্তরে সূরা মারইয়ামে আয়াতের ছন্দ ঠিক রাখার লক্ষ্যে وَاوْ -কে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا بُشْرٰى : এ বাক্যটি উহ্য قَوْلٌ -এর مَعْمُوْلٌ অর্থাৎ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ يَقُوْلُوْنَ لَا بُشْرٰى

قَوْلُهُ حِجْرًا : এ শব্দটি মাসদার, ক্ষমাপ্রার্থনা অর্থে। আর مَحْجُوْرًا হলো তার তাকিদ। যেমন- আরবরা বলে থাকে- حَرَامٌ অথবা, বলে- اَلْمُحَرَّمُ الْحَرَامُ

قَوْلُهُ عَمَدْنَا : এখানে قَدِمْنَا -এর তাফসীর عَمَدْنَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো قُدُوْمٌ -এর اِطْلَاقٌ আল্লাহ তা'আলার উপর বৈধ নয়। কেননা قُدُوْمٌ টা جِسْمَاتٌ -এর সিফত, আর আল্লাহ হলেন দেহমুক্ত।

قَوْلُهُ مَلْهُوْفٌ : এর অর্থ- অত্যাচারিত, ফরিয়াদকারী।

قَوْلُهُ كُوًى : كَافٌ -এর উপর যবর ও পেশ যে কোনোটি বৈধ। এমন ছিদ্র যার দ্বারা সূর্যের আলোক-রশ্মি প্রবেশ করে।

قَوْلُهُ هَبَاءً : এটা এমন সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র কণা যা ছিদ্রের মাধ্যমে প্রবেশকারী আলোক-রশ্মির মধ্যে উড়তে দেখা যায়। তবে হাত দ্বারা তা ধরা বা অনুভব করা সম্ভব হয় না।

قَوْلُهُ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا مِّنَ الْكَافِرِيْنَ : অর্থাৎ বেহেশতে মুমিনগণের অবস্থানস্থল দুনিয়ার কাফেরদের অবস্থানস্থল থেকে বহু উন্নত। এখানে خَيْرٌ اِسْمُ تَفْضِيْلٍ নিজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنَ الْكَافِرِيْنَ فِى الدُّنْيَا বলে ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা যেন ঐ প্রশ্নের উত্তর যে, দোজখীদের অবস্থানস্থল তথা দোজখে কোনো মঙ্গল নেই। কিন্তু خَيْرٌ اِسْمُ تَفْضِيْلٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের অবস্থানস্থল ও মঙ্গলজনক হবে। তবে তা বেহেশতীদের তুলনায় নিম্নমানের হবে। অথবা এর উদ্দেশ্য হবে যে, مُسْتَقَرٌّ তথা আবসস্থল দ্বারা উভয় পক্ষের পরকালের আবাসস্থল উদ্দেশ্য এ সময় خَيْرٌ -এর তুলনাবাচক অর্থ উদ্দেশ্য হবে না; বরং কাফেরদেরকে ধমক ও আজাবের হুমকি দেওয়া উদ্দেশ্য হবে। এ বাক্যটি আরবদের উক্তি- اَلْعَسَلُ اَحْلٰى مِنَ الْخَلِّ [মধু সিরকা অপেক্ষা মিষ্ট] -এর অন্তর্গত হবে। অথচ সিরকার মধ্যে কোনো মিষ্টতা থাকে না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, اِسْمُ تَفْضِيْلٍ দ্বারা সব সময় তুলনাবাচক অর্থ উদ্দেশ্য হয় না। অতএব এখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না।

قَوْلُهُ اَخَذَ مِنْ ذٰلِكَ الخ : অর্থাৎ اَحْسَنُ مَقِيْلًا দ্বারা একথা বুঝে আসে যে, হাশরের ময়দানে দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। কেননা বেহেশতে আরামের জন্য مَقِيْلًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর এর অর্থ হলো- দুপুরে আহার করার পর বিশ্রাম নেওয়া। অতএব বুঝা গেল যে, দুপুরের পূর্বেই হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোজখীগণ দোজখে বিশ্রাম গ্রহণ করবে। যদিও এ অর্ধদিন মুমিনদের জন্য এক নামাজের সময় পরিমাণ হবে, আর কাফেরদের নিকট অনেক দীর্ঘ মনে হবে।

قَوْلُهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ : এখানে يَوْمَ শব্দটি উহ্য اُذْكُرْ-এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। كُلُّ سَمَاءٍ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلسَّمَاءُ-এর মধ্যে اَلْ টি اِسْتِغْرَاقٌ-এর জন্য। আর مَعَهٗ দ্বারা ইশারা করেছেন যে, بَا টি مَعَ অর্থে। তবে এটা সববিয়া এবং عَنْ অর্থেও হতে পারে।

قَوْلُهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ : اَلْمُلْكُ হলো مُبْتَدَأٌ, اَلْحَقُّ হলো صِفَتٌ আর اَلرَّحْمٰنُ হলো خَبَرٌ অর্থাৎ- اَلْمُلْكُ الثَّابِتُ الَّذِىْ لَا يَزُوْلُ لِلرَّحْمٰنِ يَوْمَئِذٍ ; ব্যাখ্যাকার (র.) জালিমের ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ মুশরিক ওকবা ইবনে আবী মুঈত দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতটি এ বিশেষ মুশরিকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ : বাক্যটি يَعَضُّ-এর যমীরের حَالٌ হয়েছে। এখানে يَا হলো তাম্বীহ বা সতর্ক করার জন্য, نِدَا আহবানের উদ্দেশ্য নয়। কেননা মুনাদা اِسْم হওয়া শর্ত, আর যদি نِدَا জন্য মেনে নেওয়া হয় তাহলে نِدَا-কে বিলোপ মানতে হবে। অর্থাৎ- يَا قَوْمِ

قَوْلُهُ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ : এখানেও لَامٌ টি কসমিয়া। অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَضَلَّنِىْ

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, বাক্যটি مُسْتَانِفَةٌ, এখানে জালিমের উক্তি اِذْ جَاءَنِىْ দ্বারা শেষ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَوْلَا نُزِّلَ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً : এখানে نُزِّلَ ক্রিয়াটি اُنْزِلَ অর্থে। কেননা نُزِّلَ-এর অর্থ হলো অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা। আর اُنْزِلَ-এর অর্থ হলো একই সঙ্গে অবতীর্ণ করা। সুতরাং نُزِّلَ এবং جُمْلَةً وَّاحِدَةً-এর মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। এ জন্য বলতে হবে যে, نُزِّلَ ক্রিয়াটি اُنْزِلَ অর্থে كَذٰلِكَ نَزَّلْنَا এখানে نَزَّلْنَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, كَذٰلِكَ এটা উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْل, لِنُثَبِّتَ بِهٖ দ্বারা কুরআনকে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ করার তিনটি রহস্য বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَحْسَنَ : এর عَطْف হলো اَلْحَقُّ-এর উপর। শব্দটি مَحَلّ হিসেবে مَجْرُوْرٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ : এটা هُمْ উহ্য مُبْتَدَأٌ-এর خَبَرٌ, যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাত সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে যেসব প্রশ্ন করা হতো, তার জবাব দেওয়া হয়েছে এবং কাফেররা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন করতো, তার উপর সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আরো প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষা করে না, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের হিসেব দিতে হবে- একথাও মানে না, তারাই নিজেদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত রয়েছে। তাদের দৌরাত্ম্য এবং ধৃষ্টতার কোনো সীমা নেই। তাই তারা বলে, যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর সত্য নবী হন, তবে আমাদের নিকট আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য কেন প্রদান করে না? অথবা স্বয়ং আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখা দিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সত্যতার কথা যদি ঘোষণা করতেন, তবে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতাম। যেহেতু আমাদের নিকট ফেরেশতা আসেন না এবং আল্লাহ পাকের দীদারও হয় না, তাই তাঁকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। মূলত তারা নিজেকে অনেক বড় মনে করে, তাই তারা এসব অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অসুন্দর কথা বলছে এবং নিজেদেরকে পাপাচারে লিপ্ত রেখেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا : رَجَا শব্দের সাধরণ অর্থ কোনো প্রিয় ও কাম্য বস্তুর আশা করা এবং কোনো কোনো সময় এটা আশঙ্কা করার অর্থও ব্যবহৃত হয়। –[কিতাবুল আজদাদ : ইবনুল আম্বারী] এখানে এই অর্থই অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ যারা আমার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অনর্থক মূর্খতাসুলভ প্রশ্ন ও ফরমায়েশ করার দুঃসাহস সে-ই করতে পারে, যে এ পরকালে মোটেই বিশ্বাসী নয়। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর পরকালের ভয় এত প্রবল থাকে যে, সে ধরনের প্রশ্ন করার ফুরসতই তারা পায় না। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে অনেক লোক ইসলাম ও তার বিধানাবলি সম্পর্কে আপত্তি ও তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়। এটাও অন্তরে পরকালের সত্যিকার বিশ্বাস না থাকর আলামত। সত্যিকার বিশ্বাস থাকলে এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন অন্তরে দেখাই দিত না।

قَوْلُهُ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا : حِجْر -এর শাব্দিক অর্থ– সুরক্ষিত স্থান। مَحْجُوْرًا -এর তাকিদ। আরবীয় বাচনভঙ্গিতে শব্দটি তখন বলা হয়, যখন সামনে বিপদ থাকে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষকে বলা হয়– আশ্রয় চাই! আশ্রয় চাই! অর্থাৎ আমাকে এই বিপদ থেকে আশ্রয় দাও। কিয়ামেতের দিনেও যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে আজাবের সাজসরঞ্জাম আনতে দেখবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী একথা বলবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর অর্থ– حَرَامًا مُحَرَّمًا বর্ণিত আছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তারা ফেরেশতাদেরকে আজাবসহ দেখবে এবং তাদের কাছে ক্ষমা করার ও জান্নাতে যাওয়ার আবেদন করবে কিংবা অভিপ্রায় প্রকাশ করবে, তখন ফেরেশতারা তাদের উক্তির জবাবে– حِجْرًا مَحْجُوْرًا বলবে। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا : مُسْتَقَرًّا শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র আবাসস্থল। مَقِيْل শব্দটি قَيْلُوْلَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مَقِيْل -এর উল্লেখ সম্ভবত এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দ্বিপ্রহরে সময় সৃষ্টজীবের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দ্বিপ্রহরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌছে যাবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ : এখানে بِالْغَمَامِ -এর অর্থ مِنَ الْغَمَامِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হালকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে ফেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ তা'আলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে ফেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিদারণ নয়, যা শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্য হবে। কেননা আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহাল হয়ে যাবে। –[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ يَقُوْلُ يَا لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا : এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনা এই ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত মক্কার অন্যতম মুশরিক সর্দার ছিল। সে কোনো সফর থেকে ফিরে এলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথেও সাক্ষাৎ করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ এক, ইবাদতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। ওকবা এই কালেমা উচ্চারণ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে খালেক ছিল ওকবার ঘনিষ্ট বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হলো। ওকবা ওজর পেশ করল যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হতো। তাই আমি তাঁর মনোতুষ্টির জন্য এই কলেমা উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল, আমি তোমার এই ওজর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায় দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হলো এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাঞ্ছিত করছেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধ নিহত হয়। –[বগভী] পরকালে তাদের শাস্তির কথা আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা পরকালের শাস্তি সামনে দেখে পরিতাপ সহকারে হস্তদ্বয় দংশন করবে এবং বলবে, হায়! আমি যদি অমুককে অর্থাৎ উবাই ইবনে খালেককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। –[মাযহারী ও কুরতুবী]

দুষ্কর্মপরায়ণ ও ধর্মদ্রোহী বন্ধুর বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে : তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য সম্ভবত আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فُلَانًا [অমুক] শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্বলিত হয় এবং শরিয়ত বিরোধী কার্যাবলিতেও একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কিয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ مَالَكَ إِلَّا تَقِيٌّ কোনো অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ [বন্ধুত্বের দিক দিয়ে] যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবূ হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ প্রত্যেক মানুষ [অভ্যাসগতভাবে] বন্ধুর ধর্ম ও চালচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত। -[বুখারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি বললেন- مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللّٰهِ رُؤْيَتُهٗ وَزَادَ فِيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهٗ وَذَكَّرَكُمْ بِالْاٰخِرَةِ عَمَلُهٗ অর্থাৎ যাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজা হয়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا : অর্থাৎ রাসূল ﷺ বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহর দরবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই অভিযোগ কিয়ামতের দিন হবে, নাকি এই দুয়িাতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনই বিদ্যমান আছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যত ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং এর জবাবে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ আপনার শত্রুরা কুরআন অমান্য করলে তজ্জন্যে আপনার সবর করা উচিত। কেননা এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গাম্বরগণ তজ্জন্যে সবর করেছেন।

কুরআনকে কার্যত পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ : কুরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যাজ্য করার বাহ্যিক অর্থ কুরআনকে অস্বীকার করা, যা কাফেরদেরই কাজ। কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমতো তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّقَ مُصْحَفَهٗ لَمْ يَتَعَاهَدْهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهٖ يَقُوْلُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ إِنَّ عَبْدَكَ هٰذَا اتَّخَذَنِيْ مَهْجُوْرًا فَاقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে; কিন্তু এরপর তাকে বন্ধ করে গৃহে ঝুলিয়ে রাখে, রীতিমতো তেলাওয়াতও করে না এবং তার বিধানাবলিও পালন করে না, কিয়ামতের দিন সে গলায় কুরআন ঝুলন্ত অবস্থায় উত্থিত হবে। কুরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বান্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ الخ : সূরার শুরু থেকে কাফের ও মুশরিকদের আপত্তিসমূহের জবাব দেওয়া হচ্ছিল। এটা সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জবাবে কুরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক রহস্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতরণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। যথা- ১. এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়ে গেছে। একটি বৃহদাকার গ্রন্থ এক দফায় নাজিল হয়ে গেল এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনোরূপ পেরেশানী থাকে না। ২. কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোনো অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সান্ত্বনার জন্য কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কুরআন এক দফায় নাজিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সান্ত্বনা-বাণী কুরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বভাবত জরুরি ছিল না। ৩. আল্লাহ সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন করা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সঙ্গে আছেন। পর্যায়ক্রমে নাজিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং এর আরো অনেক রহস্য আছে।

অনুবাদ :

٣٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ج مُعِيْنًا .

৩৫. আমি তো হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব তাওরাত এবং তার সাথে তাঁর ভ্রাতা হযরত হারুন (আ.)-কে করেছিলাম সাহায্যকারী।

٣٦. فَقُلْنَا اذْهَبَآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ط اَىِ الْقِبْطِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ فَذَهَبَا اِلَيْهِمْ بِالرِّسَالَةِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا . اَهْلَكْنَاهُمْ اِهْلَاكًا .

৩৬. আমি বলেছিলাম তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নির্দশনাবলিকে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ কিবতীদের নিকট, তারা ফেরাউন বংশীয় লোক ছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের নিকট রিসালতের দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলাম। অর্থাৎ তাদেরকে পুরোপুরি বিনাশ করে ফেললাম।

٣٧. وَ اذْكُرْ قَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ بِتَكْذِيْبِهِمْ نُوْحًا لِطُوْلِ لُبْثِهٖ فِيْهِمْ فَكَاَنَّهٗ رُسُلٌ اَوْ لِاَنَّ تَكْذِيْبَهٗ تَكْذِيْبٌ لِبَاقِى الرُّسُلِ لِاِشْتِرَاكِهِمْ فِى الْمَجِيْئِ بِالتَّوْحِيْدِ اَغْرَقْنٰهُمْ جَوَابُ لَمَّا وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ بَعْدَهُمْ اٰيَةً عِبْرَةً وَاَعْتَدْنَا فِى الْاٰخِرَةِ لِلظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا . مُؤْلِمًا سِوٰى مَا يَحُلُّ بِهِمْ فِى الدُّنْيَا .

৩৭. এবং স্মরণ করুন হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়কেও যখন তারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার মাধ্যমে। কিংবা তাকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়ার মাধ্যমে অবশিষ্ট রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সাব্যস্ত হয়। কারণ তাওহীদের বাণী আনয়নে সকলেই অংশীদার দিলেন। তখন আমি তাদেরকে নিমিজ্জিত করলাম এটা لَمَّا -এর জবাব। এবং তাদেরকে মানব জাতির জন্য তাদের পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলাম শিক্ষণীয় উপদেশ। আর আমি প্রস্তুত রেখেছি পরকালে জালিমদের জন্য কাফেরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক। পৃথিবীতে তাদের উপর যে শাস্তি আপতিত হয়েছে তা ব্যতিরেকে।

٣٨. وَ اذْكُرْ عَادًا قَوْمَ هُوْدٍ وَّثَمُوْدَ قَوْمَ صَالِحٍ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ اِسْمِ بِئْرٍ وَنَبِيُّهُمْ قِيْلَ شُعَيْبٌ وَقِيْلَ غَيْرُهٗ كَانُوْا قُعُوْدًا حَوْلَهَا فَانْهَارَتْ بِهِمْ وَبِمَنَازِلِهِمْ وَقُرُوْنًا اَقْوَامًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا . اَىْ بَيْنَ عَادٍ وَّاَصْحٰبِ الرَّسِّ .

৩৮. এবং স্মরণ করুন, আমি ধ্বংস করেছিলাম আদকে হযরত হূদ (আ.)-এর জাতি। এবং ছামূদকে হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। এবং রাস্‌স -এর অধিবাসীকে رَسٌّ একটি কূপের নাম। তাদের নবী হলেন কারো কারো মতে হযরত শুয়াইব (আ.), আবার কারো মতে অন্য কেউ। তারা এই কূপের চতুস্পার্শ্বে বসবাস করত। তাদের এবং তাদের বাড়ি ঘরের সাথে এ কূপকেও ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কেও অর্থাৎ আদ এবং রাস্‌স -এর অধিবাসীদের মাঝে।

অনুবাদ :

٣٩. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ فِيْ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ نُهْلِكْهُمْ اِلَّا بَعْدَ الْاِنْذَارِ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ـ اَهْلَكْنَا اِهْلَاكًا بِتَكْذِيْبِهِمْ اَنْبِيَاءَ هُمْ ـ

৩৯. আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম তাদের বিপক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন না করে আমি ধ্বংস করিনি। আর তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম সমূলে ধ্বংস করেছিলাম, তাদের নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার করার কারণে।

٤٠. وَلَقَدْ اَتَوْا مَرُّوْا اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ مَصْدَرُ سَاءَ اَيْ بِالْحِجَارَةِ وَهِيَ عُظْمٰى قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ فَاَهْلَكَ اللّٰهُ اَهْلَهَا لِفِعْلِهِمُ الْفَاحِشَةَ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا فِيْ سَفَرِهِمْ اِلَى الشَّامِ فَيَعْتَبِرُوْنَ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ يَخَافُوْنَ نُشُوْرًا ـ بَعْثًا فَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

৪০. তারা তো যাতায়াত করে অতিক্রম করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সেই জনপদ দিয়েই, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি। اَلسَّوْءِ শব্দটি سَاءَ -এর মাসদার। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি। আর উক্ত জনপদটি ছিল হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ জনপদ। আল্লাহ তা'আলা তাদের অশ্লীল কার্যকলাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তবে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করে না? তাদের শামের যাত্রাপথে। ফলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করত। এখানে اِسْتِفْهَامْ টি تَقْرِيْر তথা জিজ্ঞাসাটির বিষয়বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত তারা পুনরুত্থানের আশঙ্কা করে না ভয় করে না। ফলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

٤١. وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ مَا يَتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط مَهْزُوًّا بِهِ يَقُوْلُوْنَ اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ـ فِيْ دَعْوَاهُ مُحْتَقِرِيْنَ لَهُ عَنِ الرِّسَالَةِ ـ

৪১. তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে। তারা বলে, এই-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? তাঁর দাবির ক্ষেত্রে। বস্তুত তারা রিসালতের বিষয়ে তাঁকে হেয় করার ছলে এমন বলত।

٤٢. اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَيْ اِنَّهُ كَادَ لَيُضِلُّنَا يَصْرِفُنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط لَصَرَفْنَا عَنْهَا قَالَ تَعَالٰى وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ عِيَانًا فِي الْاٰخِرَةِ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ـ اَخْطَاُ طَرِيْقًا اَهُمْ اَمِ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

৪২. ان -টি ثَقِيْلَةٌ থেকে خَفِيْفَةٌ -এ রূপান্তরিত হয়েছে, এর اِسْم উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اِنَّهُ সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাগণ হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম নিশ্চিতরূপে সে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন অচিরেই তারা জানবে যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে পরকালে চাক্ষুষ দেখবে কে অধিক পথভ্রষ্ট অধিক বিভ্রান্ত পথ অনুসরণে তারা নাকি মুমিনগণ?

অনুবাদ :

٤٣. اَرَاَيْتَ اَخْبِرْنِيْ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ط اَيْ مَهْوِيَّةً قُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ الثَّانِيْ لِاَنَّهٗ اَهَمُّ وَجُمْلَةُ مَنِ اتَّخَذَ مَفْعُوْلٌ اَوَّلُ لِرَاَيْتَ وَالثَّانِيْ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا - حَافِظًا تَحْفَظُهٗ عَنْ اِتِّبَاعِ هَوَاهُ لَا -

৪৩. আপনি কি দেখেন না আমাকে অবহিত করুন তার সম্পর্কে যে তার কামনা বাসনাকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে মনের চাহিদাকে। এখানে اِلٰهَهٗ দ্বিতীয় মাফঊলকে অগ্রে আনা হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে। আর مَنِ اتَّخَذَ বাক্যটি হলো প্রথম মাফঊল رَاَيْتَ ফে'লের। আর اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا হলো দ্বিতীয় মাফঊল। তবুও কি আপনি তার কর্মবিধায়ক হবেন? অর্থাৎ তাকে তার কু-রিপুর অনুসরণ হতে রক্ষার জিম্মাদার হবেন? না, আদৌ নয়।

٤٤. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط مَا تَقُوْلُ لَهُمْ اِنْ مَا هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا - اَخْطَأُ طَرِيْقًا مِنْهَا لِاَنَّهَا تَنْقَادُ لِمَنْ يَتَعَهَّدُهَا وَهُمْ لَا يُطِيْعُوْنَ مَوْلَاهُمُ الْمُنْعِمُ عَلَيْهِمْ -

৪৪. আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশই শুনে বুঝার জন্য শোনে অথবা অনুধাবন করে আপনি যা তাদেরকে বলেন এরাতো পশুর মতোই; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। এর চেয়েও আরো অধিক বিভ্রান্ত। কারণ তারা যাদের রাখালী করে তারা তাদের আনুগত্য করে; কিন্তু এরা তাদের অনুগ্রহশীল মনিবের আনুগত্য করে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اَيْ وَبِاللّٰهِ لَقَدْ اٰتَيْنَا : অর্থাৎ এখানে وَاوْ টি قَسَمِيَّةٌ , وَزِيْرًا শব্দটি وَزْرٌ-এর صِفَتْ مُشَبَّهَةٌ অর্থ সাহায্যকারী।

قَوْلُهٗ اَيْ الْقِبْطُ : اَلْقِبْطُ শব্দটি اَلْقَوْمَ থেকে بَدَلْ হওয়ার কারণে مَجْرُوْرٌ হয়েছে। فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ হলো قِبْطٌ-এর বিবরণ।

قَوْلُهٗ فَدَمَّرْنَاهُمْ : এর عَطْفٌ হলো উহ্য فَذَهَبَا اِلَيْهِمْ-এর উপর। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন। جَوَابُ شَرْطٍ কে-اَغْرَقْنٰهُمْ কে ধরে شَرْطِيَّةٌ لَمَّا আর সাব্যস্ত করেছেন, مَفْعُوْلٌ এর-فِعْلٌ উহ্য اُذْكُرْ কে-قَوْمُ نُوْحٍ তিনি স্থির করেছেন। لَمَّا কে যদি ظَرْفِيَّةٌ গণ্য করা হয়, তখন এটা مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বাক্যটি এমন হবে- اَغْرَقْنَا قَوْمَ نُوْحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ আর شَرْطِيَّةٌ গণ্য করলে مَا اُضْمِرَ-এর অন্তর্গত হবে না। কেননা لَمَّا-এর جَوَابٌ-এরও জন্য مُفَسِّرٌ হয় না। -[জুমাল]

قَوْلُهٗ لِطُوْلِ لُبْثِهٖ فِيْهِمْ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি নিম্নরূপ-

প্রশ্ন : كَذَّبُوا الرُّسُلَ-এর মধ্যে رُسُلٌ কে বহুবচন আনা হলো কেন? অথচ হযরত নূহ (আ.) ছিলেন তো একজন। ব্যাখ্যাকার এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

উত্তর : ১. হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের সময়কাল এত দীর্ঘ ছিল যে, এ সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসূল আসতে পারতেন। সুতরাং যেন কালের দিক দিয়ে লক্ষ্য করে হযরত নূহ (আ.)-কে কয়েক নবীর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে।

২ সকল নবী তাওহীদের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ছিলেন। এটা সকল নবীর সামাগ্রিক মাসআলা। সুতরাং একজনকে এ বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তা সকল নবীগকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যস্ত হয়।

قَوْلُهُ لِلظّٰلِمِيْنَ وَضْعَ الظَّاهِرِ الخ : অর্থাৎ এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য اِسْم উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচারের বিষয়কে জোরদার করার জন্য, অন্যথায় وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ বলা যথেষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ وَكُلًّا : এটা উহ্য عَامِلْ -এর কারণে مَنْصُوْبْ হয়েছে। এটা مَا اُضْمِرَ -এর অন্তগত। এর পূর্বে ضَرَبْنَا -এর সমার্থক কোনো فِعْلْ উহ্য রয়েছে। যেমন- اَنْذَرْنَا كُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ

قَوْلُهُ الْاَمْثَالُ : اَمْثَالْ এমন ঘটনা ও কাহিনীকে বলা হয় যা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ততুল্য।

قَوْلُهُ مَرُّوْا : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর দ্বারা একটি প্রশ্নের নিরসন করেছেন। প্রশ্নটি নিম্নরূপ-

প্রশ্ন : اَتَوْا ক্রিয়াটি নিজেই مُتَعَدِّىْ হয়। অথবা কখনও এর পরে اِلٰى আসে, অথচ এখানে عَلٰى ব্যবহৃত হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর : اَتَوْا ক্রিয়াটি مَرُّوْا -এর অর্থবিশিষ্ট। অতএব, এরপরে عَلٰى আসা সঙ্গত আছে।

قَوْلُهُ مَطَرَ السَّوْءِ : এটা اَمْطَرَتْ -এর مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ এটা اَلْاِمْطَارُ অর্থে, বাক্যটি এমন ছিল- اَمْطَرَتِ الْقَوْمَ رَمَيْتُ بِالْحِجَارَةِ -এর অর্থ- পাথরকণা, অর্থাৎ- سَوْء ; مَطَرُ السَّوْءِ

قَوْلُهُ مَهْزُوًّا بِهِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, هُزُوًا টি مَفْعُوْلْ অর্থে।

قَوْلُهُ لَصَرَفْنَا عَنْهَا : এটা لَوْلَا -এর جَوَابْ যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا : مَنْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ، مُبْتَدَأْ আর اَضَلُّ হলো خَبَرْ এবং سَبِيْلًا হলো তার তমীয। এসব মিলে বাক্য হয়ে يَعْلَمُوْنَ -এর দুই مَفْعُوْلْ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। يَعْلَمُوْنَ -কে আমল থেকে বিরত রাখা হয়েছে, যাতে مَنْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ -এর صَدَارَتْ বাতিল না হয়।

قَوْلُهُ اَرَاَيْتَ اَخْبِرْنِىْ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰىهُ : গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় مَفْعُوْلْ -কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত مَنِ اتَّخَذَ هَوٰىهُ اِلٰهًا ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতায় যাদের সন্দেহ ছিল, এ পর্যায়ে যারা বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেছে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে পূর্বকালের কয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাঁদেরকে তাঁদের জাতি অবিশ্বাস করেছিল, এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ বর্ণনা দ্বারা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য, যারা প্রিয়নবী ﷺ -কে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করে। আলোচ্য ঘটনাসমূহে বিশেষ শিক্ষাণীয় বিষয় রয়েছে, এ পর্যায়ে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا

অর্থাৎ আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার ভাই হারূনকে তার সাহায্যকারী বানিয়েছি।" আল্লাহর একত্ববাদের উজ্জ্বল দলিল প্রমাণসহ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ.)-কে সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করেন, যাতে করে তারা দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন, হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর নবুওয়তের মহান দায়িত্ব পালনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন।

قَوْلُهُ فَقُلْنَا اذْهَبَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ الخ : সমগ্র সৃষ্টিজগতে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তাওহীদের নিদর্শনসমূহ বিরাজমান রয়েছে, তারা তা দেখেও দেখে না এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করে না; বরং তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করে, দেব-দেবীর পূজা করে। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে লক্ষ্য করে

বলেন, তোমরা তাদের নিকট যাও এবং তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাও, শিরক ও মূর্তিপূজা পরিহার করার শিক্ষা দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের اٰيٰتِنَا শব্দটির আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হলো তারা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাসমূহকে অস্বীকার করত, তাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا : হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণের পর তাঁরা যখন তাদেরকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানায়, তখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাই তারা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, অবশেষে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর সলিল সমাধি হয়, ঠিক এভাবেই যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলকে অস্বীকার করে, তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হয়, তারা যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে পারে। অতএব, হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তকে যারা অস্বীকার করেছে, তাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে সকলেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৪৫১]

قَوْلُهُ وَقَوْمُ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ : হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যেহেতু একজন নবীকে অস্বীকার করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সকল নবীকে অস্বীকার করা হয়, এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে اَلرُّسُلُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো এই, যদি তাদের নিকট সমস্ত নবী রাসূলগণকেও প্রেরণ করা হতো, তবে তারা তাঁদেরকেও অস্বীকার করত। অবশ্য এ বাক্যটির অর্থ এই নয়, যে তাদের নিকট অনেক রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। কেননা তাদের নিকট শুধু হযরত নূহ (আ.)-কেই প্রেরণ করা হয়, যিনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দীনের তাবলীগ করেছেন, সত্য গ্রহণের জন্যে তিনি তাদেরকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আ.)-কে ঐতিহাসিক তরী নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের মাঝ থেকে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে। তাঁর তরীতে আরোহণ করে মাত্র ৪০ জোড়া মানুষ। আর অবশিষ্ট সমস্ত লোককে আল্লাহ পাক প্রলয়ংকরী প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। হযরত নূহ (আ)-এর তরীতে যারা আরোহণ করছিল, তাদের ব্যতীত তদানীন্তন পৃথিবীতে আর একটি মানুষও বেঁচে থাকেনি, এভাবে পাপিষ্ঠরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের অনুগত বান্দারা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। অতএব, হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতা কর, তবে তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

قَوْلُهُ وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ : অর্থাৎ "আর আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, সামুদ এবং কূপের অধিবাসী লোকদেরকে। বর্ণিত আছে যে, আজরবাইজানের মরুভূমিতে একটি কূপ রয়েছে, সেই কূপের চারিপার্শ্বে যারা বাস করতো, তারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল। অথবা এর অর্থ হলো রস্ নামক মরুভূমির অধিবাসী। এ শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা ঐ কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দাফন করেছিল। তাদের নিকট প্রেরিত নবীর নাম ছিল হানজালা সানআনী। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আসহাবুর রস" শব্দটি দ্বারা হযরত শুয়াইব (আ.) -এর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় একটি কূপের পার্শ্বে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছিল। এরা চতুষ্পদ জন্তু পালন করত এবং মূর্তিপূজা করত। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত শুয়াইব (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করলেন; কিন্তু তারা তাঁর আহবানে সাড়া দিল না; বরং হযরত শুয়াইব (আ.)-কে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের ঐ জমিন ধ্বসে গেল এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ বিবরণ পেশ করেছেন ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.)। ইবনে জরীর এবং ইবনে আসাকির (র.) হযরত কাতাদা (র.)-এর সূত্রে এ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কূপের কথা বলা হয়েছে, তা ইয়ামামা নামক এলাকায় ছিল। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করেছিল, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, ঐ সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, একটি বিপদে পড়েছিল। একটি পাখী যার ঘাড় অনেক লম্বা ছিল, তাকে 'আনকা' বলা হতো। ঐ পাখীটি মাঝে মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের নিকট প্রেরিত নবী হানজালাহ ঐ পাখীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। ফলে 'আনকা' নামক পাখীটি বজ্রপাতে ধ্বংস হলো; কিন্তু এরপর ঐ সম্প্রদায় তাদের নবীকে শহীদ করল। পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আজাব নাজিল হলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হলো।

তাফসীরকার কাব (র.) মোকাতেল (র.) এবং সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেছেন 'রস' কূপটি ছিল ইনতাকিয়া নামক স্থানে, লোকেরা হাবীব ইবনে নাজ্জারকে হত্যা করে ঐ কূপে নিক্ষেপ করে। হাবীব ইবনে নাজ্জার এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কথা সূরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে 'আসহাবুর রস' বলা হয়েছে, তারা আসহাবুল ওখদুদ, এরা সেই জালেম সম্প্রদায় যারা মুমিনদেরকে ধ্বংস করার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করেছিল। তাদের কথা সূরা বুরুজে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا : আলোচ্য আয়াতের قُرُوْنٌ শব্দটি قَرْنٌ শব্দের বহুবচন অর্থাৎ আদ জাতি, সামুদ জাতি সহ পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ছাড়াও যুগে যুগে বহু জাতিকে তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। قَرْنٌ শব্দটি প্রিয়নবী ﷺ -এর একখানি হাদীসেও ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

অর্থাৎ, সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। এরপর পরবর্তী যুগ, এরপর পরবর্তী যুগ। অর্থাৎ সর্বোত্তম যুগ হলো প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগ, এরপর যাঁরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছেন অর্থাৎ তাবেয়ীনদের যুগ, এরপর যারা তাবেয়ীনদের দেখেছেন, অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীনদের যুগ।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কত বছরকে এক قَرْنٌ বলা হয়? এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, চল্লিশ বছরের সময়কে এক قَرْنٌ বলা হয়। কারো কারো মতে, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর, পঞ্চাশ অথবা ষাট বছর। আর কারো মতে, সত্তর বছর, আর কারো মতে, নব্বই বছর, আর কারো কারো মতে, একশত বছর বা তার চেয়ে বেশি সময়কে قَرْنٌ বলা হয়। তবে সঠিক মত হলো এই, এক শতাব্দীকেই قَرْنٌ বলা হয়। কেননা প্রিয়নবী ﷺ একটি শিশুর জন্যে দোয়া করেছিলেন, সে যেন এক قَرْنٌ পর্যন্ত বাঁচে। ঐ শিশুটি একশত বছর বেঁচেছিল। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এক শতাব্দীকে قَرْنٌ বলা হয়। আয়াতের মর্মকথা হলো এই যে, হযরত নূহ (আ.) থেকে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া পর্যন্ত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অনেক কাফের মুশরিককে তাদের অন্যায়ের কারণে ধ্বংস করা হয়।

قَوْلُهُ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا : আল্লাহ পাক হঠাৎ কোনো জাতিকে ধ্বংস করেন না; বরং তাদের নিকট নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে সত্য গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে শিক্ষণীয় ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, সত্যকে উপলব্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যখন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রাসূলগণকে অমান্য করেছে, সত্যের বিরোধিতায় তৎপর হয়েছে, জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাতে সীমা লঙ্ঘন করেছে, তখন আল্লাহ পাকের আজাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং তিনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

তাফসীরকার জুযাজ (র.) বলেছেন, কোনো জিনিসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলাকে تَتْبِيْر বলা হয়। আর স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষুদ্র খণ্ডকে تِبْر বলা হয়।

যাহোক, পূর্বকালের এসব ঘটনার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যারা প্রিয়নবী ﷺ -কে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কুরআনকে অমান্য করে, তারা যেন এসব ঘটনা থেকে যথাসময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

قَوْلُهُ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ إِلَّا هُزُوًا : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ﷺ -এর সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব রয়েছে। এ আয়াত থেকে কাফেরদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। যারা মহানবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো তারা অতীতের কাফেরদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীর যে অন্ধকারে তারা ইতিপূর্বে ছিল, সেই অন্ধকারেই তারা নিমিজ্জিত রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা, তারা তাঁকে বিদ্রূপ করত। এ দুরাত্মা কাফেররা যখনই প্রিয়নবী ﷺ -কে দেখত, তখনই তাঁকে তারা বিদ্রূপ করত। অথচ তাঁর শান, তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর আমানতদারী, তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্য– এক কথায় অনেক গুণ সম্পর্কে তারা অবগত ছিল। তারা স্বচক্ষে দেখত যে, তিনি এতিম, মিসকিন, অনাথ, বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করতেন শুধু তাই নয়; বরং তাঁর ন্যায় আমানতদার এবং বিশ্বস্ত লোক কেউ ছিল না। তাই তাঁর শত্রুরাও তাদের ধন-রত্ন তাঁরই নিকট আমানত রাখত। কিন্তু এতদসত্ত্বে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনতো না; বরং তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করাকেই তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিদ্রূপের ভাষা ছিল এরূপ–

أَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا অর্থাৎ ইনিই কি তিনি, যাঁকে আল্লাহ পাক রাসূল করে পাঠিয়েছেন? সারা পৃথিবীতে পয়গাম্বরী প্রদানের জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকেই খুঁজে পেলেন? [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]

قَوْلُهُ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا : অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে, এ ব্যক্তির কথা মানব মনে রেখাপাত করে, তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করলে যাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, আমরা যদি অত্যন্ত যত্ম সহকারে আমাদের ঠাকুর দেবতার পূজা-অর্চনায় আত্মনিয়োগ না করতাম, তবে এ ব্যক্তির আহবানে আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কাফেরদের এ কথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রচারে মহানবী ﷺ কঠোর পরিশ্রম করেছেন, এ পর্যায়ে তিনি অসাধারণ সাধনা করেছেন। অনেক মুজেযাও তিনি দেখিয়েছেন। যার ফলে এ দুরাত্মা কাফেরদেরও ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; কিন্তু তাদের মূর্তিপূজা, তাদের জেদ এবং অহংবোধ তাদেরকে সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কাফেররা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম : চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞান নেই, আর কাফেদের জ্ঞান আছে, চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকলেও সে তার প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়, তার প্রতি অনুগত থাকে; কিন্তু এ দুরাত্মা কাফেররা নিজের জীবনের মালিককে চেনে না এবং তার অনুগতও হয় না এমনকি, তিনি তাদের হেদায়েতের জন্যে যখন নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মুজেযা প্রদর্শন করেন, তারপরও এ কাফেররা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয় না; বরং সত্যের বিরোধিতায় তৎপর থাকে।

চতুষ্পদ জন্তুরা সত্যকে সত্য জানে না, বাতিলকে বাতিল বোঝে না। কেননা তাদেরকে বোধশক্তি দেওয়া হয়নি; কিন্তু তারা হক্বকে বাতিল মনে করে না। এ দুরাত্মা কাফেররা হক্বকে বাতিল মনে করে এবং বাতিলকে হক্ব মনে করে। তাই তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম।

মূর্খতার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো, এক ব্যক্তি কিছুই জানে না; তবে একথা জানে যে, সে জানে না। এ মূর্খতা সহনীয়; কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক মূর্খতা হলো আরেক ব্যক্তি, যে কিছুই জানে না অথচ সে মনে করে যে, সে অনেক কিছু জানে। কাফেররা এ পর্যায়ের মূর্খ। যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বদা লালন পালন করেছেন, তারা অহরহ যার অনন্ত অসীম নিয়ামত মানুষ ভোগ করছে, তাঁর প্রতি ভক্তি অনুরক্তি এবং আনুগত্য প্রকাশ করে না, তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে না, তবে মাথা নত করে তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোর সম্মুখে, আর এ কাজকে তারা দুর্ভাগ্যবশত পুণ্যের কাজ মনে করে। এ কারণে তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলা হয়েছে। –[তাফসীরে মাযহারী : খ. ৮, পৃ. ৪৫৭]

ইমাম রাযী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, কাফেরদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম বলার কারণ হলো এই যে, তারা তাদের প্রভুকে চেনে এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুও তার উপকারী ও ক্ষতিসাধনকারীর মধ্যে পার্থক্য করে; শুধু তাই নয়; বরং যা দ্বারা তারা উপকৃত হয়, তা পেতে চায়, পক্ষান্তরে যা দ্বারা তাদের ক্ষতি হয়, তা থেকে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু এ দুরাত্মা, হতভাগা কাফেররা নিজেদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং তাদের চিরশত্রু ইবলিসের সঙ্গে তারা করে বন্ধুত্ব, তার অনুগত হয় এবং যে কাজে দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে তাদের লাভ হবে, তা থেকে তারা থাকে দূরে, আর যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হয়, তার প্রতি হয় তারা আকৃষ্ট। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলেছেন। আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো চতুষ্পদ জন্তুর মনে যেমন জ্ঞানের কোনো পরশ নেই; তেমনি মূর্খতারও কোনো স্থান নেই, কিন্তু কাফেরদের ব্যাপার ভিন্নধর্মী, তাদের নিকট একে তো ইলম বা জ্ঞান নেই, উপরন্তু তাদের অন্তর মূর্খতায় পরিপূর্ণ। কাফেররা জানে না, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, আর তারা যে জানে না, একথাও জানে না। এতদসত্ত্বেও তারা এ কথার দাবিদার যে, তারা জানে । দ্বিতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকা কারো জন্যে ক্ষতিকর হয় না; কিন্তু এ কাফেরদের মূর্খতা শুধু তাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর হয় না; বরং অন্যদের জন্যেও হয় বিরাট অনিষ্টের কারণ। কেননা তারা মানুষকে সত্যপথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে এবং মন্দের দিকে আহবান জানায়। পরিণামে অনেককেই তারা পথভ্রষ্ট করে।

তৃতীয়ত চতুষ্পদ জন্তুর ইলম বা জ্ঞান না থাকলে তার প্রতি দুনিয়াতে কোনো শাস্তি হয় না, আখিরাতেও হবে না; কিন্তু এ কাফেরদের জন্যে কঠিন ও কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ৮৭]

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, চতুষ্পদ জন্তু নিজের স্রষ্টাকে চেনে, তাঁর প্রতি অনুগত থাকে এবং আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে মশগুল থাকে। যদিও সাধারণ লোকেরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পারে না। বুখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ **ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি একটি গরু** নিয়ে যাচ্ছিল, চলতে চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গরুর উপর আরোহণ করে [**আল্লাহ পাক গরুটিকে বাকশক্তি দান করেন**] গরুটি তখন বলল, আমাকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি, আমাকে জমিনে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকেরা এ কথা শ্রবণ করে বলল, সুবহানাল্লাহ! গরু কি কথা বলে? রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, এ কথার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এবং আবূ বকর ও ওমরও একথা বিশ্বাস করে, অথচ তাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না।

অপর এক হাদীসে হুজুর ﷺ -ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি তার ছাগল নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটি বাঘ ছাগলটির উপরে আক্রমণ করল, ছাগলের মালিক উপস্থিত হয়ে ছাগলটিকে বাঘের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল, তখন বাঘটি বলল, কিয়ামতের দিন কে তাকে সাহায্য করবে? যখন আমি ব্যতীত তার কোনো রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকবে না, লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ বাঘ কি কথা বলতে পারে? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, এর উপর আমি বিশ্বাস করি এবং আবূ বকরও ওমরও বিশ্বাস করে। তারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

অনুবাদ :

٤٥. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلٰى فِعْلِ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج مِنْ وَقْتِ الْاِسْفَارِ اِلٰى وَقْتِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَوْ شَاۤءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا مُقِيْمًا لَا يَزُوْلُ بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ اَىِ الظِّلِّ دَلِيْلًا ـ فَلَوْلَا الشَّمْسُ مَا عُرِفَ الظِّلُّ ـ

৪৫. আপনি কি আপনার প্রতিপপালকের কর্মের প্রতি লক্ষ্য করেননি? কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? ফর্সা হওয়ার সময় থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তিনি ইচ্ছা করলে একে তো স্থির রাখতে পারতেন অবিচল, সূর্যোদয় দ্বারা তা দূরীভূত হতো না। অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর উপর অর্থাৎ ছায়ার উপর নির্দেশক সুতরাং সূর্য না থাকলে ছায়া চেনা যেত না।

٤٦. ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اَىِ الظِّلَّ الْمَمْدُوْدَ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ـ خَفِيًّا بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ ـ

৪৬. অতঃপর আমি এটাকে গুটিয়ে আনি অর্থাৎ, সম্প্রসারিত ছায়াকে আমার দিকে ধীরে ধীরে চুপিসারে সূর্য উদয়ের মাধ্যমে।

٤٧. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا سَاتِرًا كَاللِّبَاسِ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا رَاحَةً لِّلْاَبْدَانِ بِقَطْعِ الْاَعْمَالِ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ـ مَنْشُوْرًا فِيْهِ لِابْتِغَاءِ الرِّزْقِ وَغَيْرِهٖ ـ

৪৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ আবরণ পোশাকের ন্যায়। বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা শারীরিক প্রশান্তি লাভের জন্য কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে এবং সমুত্থানের জন্য দিয়েছেন দিবস তাতে জীবিকা ইত্যাদি অন্বেষণের লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

٤٨. وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الرِّيْحَ نُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ج اَىْ مُتَفَرِّقَةً قُدَّامَ الْمَطَرِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ تَخْفِيْفًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِهَا وَفَتْحِ النُّوْنِ مَصْدَرًا وَفِىْ اُخْرٰى بِسُكُوْنِهَا وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ بَدَلَ النُّوْنِ اَىْ مُبَشِّرَاتٍ وَمُفْرَدُ الْاُوْلٰى نُشُوْرٌ كَرَسُوْلٍ وَالْاٰخِيْرَةِ بَشِيْرٌ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا مُطَهِّرًا ـ

৪৮. তিনিই বায়ু প্রেরণ করেন اَلرِّيٰحُ শব্দটি اَلرِّيْحُ তথা একবচন রূপে রয়েছে। স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে। অন্য এক কেরাতে সহজার্থে نُشْر -এর شِيْن বর্ণে সাকিন রয়েছে। অপর এক কেরাতে نَشْر -এর شِيْن বর্ণে সাকিন ও نُوْن বর্ণে যবর সহ (نَشْر) মাসদার রূপে পঠিত রয়েছে। অপর কেরাতে شِيْن বর্ণে সাকিন এবং نُوْن -এর পরিবর্তে بَاءْ পেশ সহকারে بُشْرًا [সুসংবাদ] রূপে পঠিত রয়েছে। نُشُرٌ -এর একবচন نُشُوْرٌ আসে যেমন رُسُلٌ -এর একবচন رَسُوْلٌ ব্যবহৃত হয়। আর بُشْرًا -এর একবচন হলো بَشِيْرٌ দ্বিতীয় কেরাত অনুসারে। এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। পবিত্রকারী।

অনুবাদ :

৪৯. لِنُحْيِىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا بِالتَّخْفِيْفِ يَسْتَوِىْ فِيْهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ذَكَّرَهٗ بِاِعْتِبَارِ الْمَكَانِ وَنُسْقِيَهٗ اَىِ الْمَاءَ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا اِبِلًا وَبَقَرًا وَ غَنَمًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ـ جَمْعُ اِنْسَانٍ وَاَصْلُهٗ اَنَاسِيْنَ فَاُبْدِلَتِ النُّوْنُ يَاءً وَاُدْغِمَتْ فِيْهَا الْيَاءُ اَوْ جَمْعُ اِنْسِىٍّ ـ

৪৯. যা দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ড সঞ্জীবিত করি مَيْتًا শব্দটি تَخْفِيْف তথা লঘু করে তাশদীদবিহীনভাবে, এতে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই সমান। অথবা পুংলিঙ্গবাচক শব্দ নেওয়া হয়েছে مَكَانْ তথা স্থান অর্থের হিসেবে। এবং আমি তা পান করাই অর্থাৎ পানি আমার সৃষ্টির মধ্য হতে বহু জীবজন্তু উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। এবং বহু মানুষকে اَنَاسِىْ শব্দটি اِنْسَانٌ -এর বহুবচন। মূলত ছিল اَنَاسِيْن এরপর نُوْن কে يَاءْ দ্বারা পরিবর্তন করে يَاءْ -কে يَاءْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অথবা اِنْسَانٌ শব্দটি اِنْسِىٌّ -এর বহুবচন।

৫০. وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ اَىِ الْمَاءَ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ز اَصْلُهٗ يَتَذَكَّرُوْا اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الذَّالِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ لِيَذْكُرُوْا بِسُكُوْنِ الذَّالِ وَضَمِّ الْكَافِ اَىْ نِعْمَةَ اللّٰهِ بِهٖ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ـ جُحُوْدًا لِلنِّعْمَةِ حَيْثُ قَالُوْا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ـ

৫০. আমি একে পানিকে তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। يَذَّكَّرُوْا মূলত يَتَذَكَّرُوْا ছিল تَاءْ -কে ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়ায় يَذَّكَّرُوْا হয়েছে। অন্য কেরাতে يَذْكُرُوْا তথা ذَالْ বর্ণে সাকিন ও كَافْ বর্ণে পেশসহ পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। অর্থাৎ নিয়ামতকে অস্বীকার করে যেমন বলে অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

৫১. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيْرًا ـ يُخَوِّفُ اَهْلَهَا وَلٰكِنْ بَعَثْنَاكَ اِلٰى اَهْلِ الْقُرٰى كُلِّهَا نَذِيْرًا لِيَعْظُمَ اَجْرُكَ ـ

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। যে, তার অধিবাসীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। কিন্তু আমি সকল জনপদের জন্যই আপনাকে প্ররণ করেছি ভীতি প্রদর্শকরূপে যাতে আপনার প্রতিদান অনেক বেশি হয়।

৫২. فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ فِىْ هَوَاهُمْ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ جِهَادًا كَبِيْرًا ـ

৫২. সুতরাং আপনি কাফেরেদের আনুগত্য করবেন না। তাদের কামনা মতে এবং আপনি এর সাহায্যে কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান।

৫৩. وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ اَرْسَلَهُمَا مُتَجَاوِرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ شَدِيْدُ الْعُذُوْبَةِ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج شَدِيْدُ الْمُلُوْحَةِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا حَاجِزًا لَا يَخْتَلِطُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ وَحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ اَىْ سِتْرًا مَمْنُوْعًا بِهٖ اِخْتِلَاطُهُمَا ـ

৫৩. তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন অর্থাৎ পরস্পর পাশাপাশিভাবে উভয়টি সৃষ্টি করেছেন একটি মিষ্ট, সুপেয় অতি মিষ্ট এবং অপরটি লোনা, বিস্বাদ খুব বেশি লবণাক্ত উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায় অর্থাৎ প্রতিবন্ধক, যার ফলে একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান অর্থাৎ উভয়ের সংমিশ্রণ হতে বিশুদ্ধ অন্তরাল।

অনুবাদ :

٥٤. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا مِنَ الْمَنِيِّ اِنْسَانًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا ذَا نَسَبٍ وَصِهْرًا ط ذَا صِهْرٍ بِاَنْ يَتَزَوَّجَ ذَكَرًا كَانَ اَوْ اُنْثٰى طَلَبًا لِلتَّنَاسُلِ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ـ قَادِرًا عَلٰى مَا يَشَاۤءُ ـ

৫৪. তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে বীর্য হতে মানুষকে। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন মানুষ বংশ বিস্তারের জন্য বিয়ে করে চাই পুরুষ হোক বা নারী আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান যা করেন সে বিষয়ে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٥٥. وَيَعْبُدُوْنَ اَىْ الْكُفَّارُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ بِعِبَادَتِهٖ وَلَا يَضُرُّهُمْ ط بِتَرْكِهَا وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ـ مُعِيْنًا لِلشَّيْطَانِ بِطَاعَتِهٖ ـ

৫৫. তারা কাফেররা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে, যা তাদেরকে কোনো উপকার করতে পারে না তাদের উপসনার কারণে এবং তাদের অপকারও করতে পারে না। উপাসনা বর্জন করলে, আর তা হলো মূর্তিসমূহ। কাফেররা তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী শয়তানের আনুগত্যের ফলে তার সাহায্যকারী।

٥٦. وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَ نَذِيْرًا ج مُخَوِّفًا مِنَ النَّارِ ـ

৫৬. আমি তো আপনাকে কেবল জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাম থেকে সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।

٥٧. قُلْ مَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى تَبْلِيْغِ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ شَاۤءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ـ طَرِيْقًا بِاِنْفَاقِ مَالٍ فِىْ مَرْضَاتِهٖ تَعَالٰى فَلَا اَمْنَعُهٗ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৫৭. বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য অর্থাৎ আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি এর প্রচারের দরুন কোনো বিনিময় চাই না। তবে যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে ব্যয় করার মাধ্যমে নাজাতের পথ অনুসরণ করুক। এতে আমি বাধা দিব না।

٥٨. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهٖ ط اَىْ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ـ عَالِمًا تَعَلَّقَ بِهٖ بِذُنُوْبِ ـ

৫৮. আপনি নির্ভর করুন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। অর্থাৎ বলুন! "সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদু লিল্লাহ।" তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ অংশটি خَبِيْرًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

অনুবাদ :

٥٩. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَىْ فِىْ قَدْرِهَا لِاَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَمْسٌ وَلَوْ شَاءَ لَخَلَقَهُنَّ فِىْ لَمْحَةٍ وَالْعُدُوْلُ عَنْهُ لِتَعْلِيْمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتَ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ج هُوَ فِى اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اَلرَّحْمٰنُ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيْرِ اسْتَوٰى اَىْ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ فَاسْئَلْ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ بِهٖ بِالرَّحْمٰنِ خَبِيْرًا ـ يُخْبِرُكَ بِصِفَاتِهٖ ـ

৫৯. তিনি আকাশমণ্ডলী , পৃথিবী ও এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর দিবসের হিসেবে অর্থাৎ উক্ত পরিমাণ সময়ে। কেননা তখন সূর্য ছিল না, তবে তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যেও সৃষ্টি করতে পারতেন, তবে তা না করার কারণ হলো সৃষ্টজীবকে ধীরস্থিরতা অবলম্বনের শিক্ষা দান করা। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। অভিধানে আরশ বলা হয় রাজ সিংহাসন কে তিনিই রহমান আর اَلرَّحْمٰنُ এটা اِسْتَوٰى ফে'লের ضَمِيْر হতে بَدَلْ হয়েছে। আর সমাসীন হওয়ার দ্বারা তার শানের উপযোগী সমাসীন হওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং জিজ্ঞাসা করে দেখ হে মানুষ! তার সম্পর্কে যে অবগত আছে তাকে। সে তোমাকে তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে অবগত করবে।

٦٠. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ق اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْاٰمِرُ مُحَمَّدٌ وَلَا نَعْرِفُهٗ لَا وَزَادَهُمْ هٰذَا الْقَوْلُ لَهُمْ نُفُوْرًا ـ عَنِ الْاِيْمَانِ

৬০. যখন তাদেরকে বলা হয় মক্কার কাফেরদেরকে তোমরা সেজদাবনত হও রহমান -এর প্রতি তখন তারা বলে রহমান আবার কে তুমি কাউকেও সেজদা করতে বললেই কি আমরা সেজদা করব? এ ফে'লটি يَا এবং نُوْن উভয়টি যোগেই পঠিত রয়েছে আর নির্দেশকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমরা তাকে চিনি না। এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। এ কথার দ্বারা। ঈমান হতে বিমুখতা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ : এখানে تَنْظُرْ দ্বারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য, تَنْظُرْ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাছাড়া اِلٰى অব্যয় দ্বারাও এর সমর্থন লাভ হয়। কারণ رُؤْيَتْ بَصَرِىْ তথা চোখের দর্শনের ক্ষেত্রেই اِلٰى ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهٗ اِلٰى رَبِّكَ : এর মধ্যে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। কেননা দুনিয়ায় থেকে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়, এ কারণে বাক্যটি হবে- اَلَمْ تَرَ اِلٰى صَنِيْعِ رَبِّكَ [আপনি কি আপনার রবের কর্ম দেখেন না?] তবে কেউ কেউ رُؤْيَتْ [দর্শন] দ্বারা رُؤْيَتْ قَلْبِىْ [আত্মিক দর্শনও উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর اَلَمْ تَرَ কে اَلَمْ تَعْلَمْ অর্থে নিয়েছেন। এর দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে নবী করীম ﷺ এবং সে সকল ব্যক্তিবর্গকে, যারা বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা রাখেন। আল্লাহ তা'আলা এ কতিপয় আয়াতে একমাত্র তিনিই ইলাহ হওয়ার যোগ্য, অন্য কেউ নয়- এ কথার পাঁচটি দলিল পেশ করেছেন। যথা-

১ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ .২ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا .৩ هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ .৪ هُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
.৫ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ الْاِسْفَارِ اِلَى وَقْتِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর জন্য উচিত ছিল- مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ বলা। আর যদি এটাকে مُطْلَقْ [স্বাভাবিক] রাখতেন, কোনো قَيْدْ -এর সাথে مُقَيَّدْ না করতেন তাহলে তা আরো ভালো হতো। কারণ রাতে তো পৃথিবীর ছায়া হয়। আর দিনে বৃক্ষরাজি ইত্যাদির ছায়া পড়ে। সম্ভবত সহনীয় সময় হওয়ার কারণে খাছ করেছেন।

قَوْلُهُ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : এর ব্যাখ্যায় তিন ধরনের উক্তি রয়েছে। যথা–

১. مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ২. مِنَ الْمَغْرِبِ اِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ৩. مِنْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ

বাহ্র গ্রন্থকার প্রথম উক্তিকে জমহুরের অভিমত বলেছেন, আল্লামা মহল্লী (র.) যে তাফসীর করছেন তা অন্যান্য মুফাসসিরগণের অনুকূলে নয়। –[সাবী ও জুমাল]

قَوْلُهُ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا : এখানে রাতকে পোশাকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। وَجْهُ شِبْهٍ [তুলনার সূত্র] হলো سَاتِرٌ তথা আচ্ছাদানকারী হওয়া, وَجْهُ شِبْهٍ ও حَرْفُ تَشْبِيْهٍ কে বিলোপ করা হয়েছে। আর এ ধরনের تَشْبِيْهٍ -কে تَشْبِيْهٌ بَلِيْغٌ বলা হয়। যেমন زَيْدٌ اَسَدٌ -এর মধ্যে এরূপ تشبيه হয়েছে।

قَوْلُهُ بُشْرًا : এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর সামনে কুরআন মজীদের যে কপি ছিল, তাতে بُشْرًا -এর স্থলে نُشْرًا রয়েছে। আর এর মধ্যে ৪টি পাঠ রয়েছে। যথা– نُشُرًا، نُشْرًا، نَشْرًا ও بُشْرًا প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি হলো نُشُوْرًا -এর বহুবচন, তৃতীয়টি অর্থাৎ نَشْرًا হলো مَصْدَرٌ , আর চতুর্থটি بَشِيْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– সুসংবাদদাতা।

قَوْلُهُ مُفْرَدُ الْاُوْلٰى اَىْ وَالثَّانِيَةِ : অর্থাৎ ব্যাখ্যাকার (র.)-এর জন্য اُوْلٰى -এর সাথে وَالثَّانِيَةْ বলা উচিত ছিল। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয়টি একবচনে একই, আর তা হলো– نُشُوْرًا

قَوْلُهُ مَيْتًا : مَيْت এবং مَيِّت -এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, مَيْت বলা হয় যে মৃত্যু বরণ করেছে। আর مَيِّت বলা হয় মুমূর্ষ বা মৃত্যুমুখে পতিতকে।

قَوْلُهُ يَسْتَوِىْ فِيْهِ الخ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : بَلْدَةً হলো مَوْصُوْفٌ আর مَيْتًا হলো তার صِفَتْ অথচ উভয়ের মধ্যে লিঙ্গের দিক দিয়ে মিল নেই, صِفَتْ টি তো مَيْتَةً হওয়া দরকার ছিল। তাহলে উভয়ের মধ্যে تَطَابُقْ বা মিল হতো?

উত্তর : এর এক উত্তর এই দিয়েছেন যে– مَيْتٌ শব্দটি مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় উত্তর এই দিয়েছেন যে, وَذَكَرَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَكَانِ অর্থাৎ بَلْدَةً কে مَكَانْ [স্থান] এর প্রতি লক্ষ্য করে مُذَكَّرْ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এটা যেহেতু দ্বিতীয় উত্তর কাজেই وَذَكَرَهُ -এর স্থলে اَوْ ذَكَّرَهُ বললে তা আরো সমীচীন হতো।

قَوْلُهُ وَنُسْقِيَهُ : -এর عَطْف হলো نُحْيِىَ -এর উপর।

قَوْلُهُ وَاَنْعَامًا : এটা نُسْقِيَهُ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْلْ আর اَنْعَامًا শব্দটি خَلَقْنَا -এর আগে আসার কারণে حَالْ হয়েছে। মূলত خَلَقْنَا اَنْعَامًا ছিল। আর নিয়ম আছে যে, مَوْصُوْفْ যদি نَكِرَةٌ হয়, আর صِفَتْ কে আগে উল্লেখ করা হয়, তাহলে তা حَالْ রূপে গণ্য হয়।

قَوْلُهُ اَنَاسِىَّ : এটা اِنْسَانٌ -এর বহুবচন, এটা ইমাম সীবওয়াইহ -এর অভিমত, আর এটা প্রাধান্যযোগ্য। কেউ বলেন, এটা اِنْسِىٌّ -এর বহুবচন। এ হলো ফাররা (র.)-এর অভিমত। তবে এটা প্রশ্নমুক্ত নয়। কেননা اِنْسِىْ -এর يَاءْ টি نِسْبَتِىْ يَاءْ [সম্বন্ধের জন্য] আর يَاءْ نِسْبَتِىْ যুক্ত শব্দের বহুবচন فَعَالِىْ -এর ওযনে আসে না।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اَىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ صَرَّفْنَاهُ اِلَى الْمَاءِ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর মতে صَرَّفْنَاهُ-এর মধ্যে যমীরের مَرْجِعْ হলো مَاءٌ অর্থ এই যে, আমি বৃষ্টিকে বিভিন্ন শহরে এবং এলাকায় পরিমাণ মতো বন্টন করে দিয়েছি, এভাবে صِفَتْ-এর দিক দিয়েও বন্টন করেছি। কোথাও মুষলধার বৃষ্টি হয়, কোথাও হয় হালকা। একইভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভক্ত করেছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর مَرْجِعْ হলো কুরআন। এর قَرِيْنَةٌ বা আলামত হলো وَجَاهِدْهُمْ আর কারো মতে এর قَرِيْنَةٌ হলো اَلْمَطَرُ, জালালাইন গ্রন্থকার (র.)-এর মতও এটাই। قُرْاٰنٌ-কে ءُ-এর مَرْجِعْ ধরলে অর্থ হবে– আমি কুরআনে বিভিন্ন প্রকার উপমা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সুন্দর সুন্দর বিষয় বর্ণনা করেছি, বিভিন্ন প্রকার দলিল প্রমাণ দ্বারা মানুষকে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। –[সফওয়াতুত্ তাফাসীর]

قَوْلُهُ اَلنَّوْءُ : এর বহুবচন আসে اَنْوَاءٌ অর্থ ঝুঁকে পড়া, পতিত হওয়া, বলা হয়– نَاءَ بِهِ الْجَمَلُ অর্থাৎ উটকে তার বোঝা ভারি করে দিয়েছে, ঝুঁকিয়ে বা কাত করে ফেলেছে। জাহিলি যুগে আরবরা নক্ষত্রকে مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ তথা প্রকৃত কার্য নিয়ন্তা জ্ঞান করত। ঠাণ্ডা-গরম, বৃষ্টি প্রভৃতিকে কোনো কোনো তারকার উদয়াস্তের প্রতি সম্বন্ধ করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, শেষ রাতে বিশেষ একটি তারকা যখন পশ্চিমে অস্ত যায়, আর তার বিপরীতে পূর্বে দিকে আরেকটি উদয় হয় তখন বৃষ্টি হয়। মোটকথা তারা আল্লাহ তা'আলাকে সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা না মেনে তারকা-নক্ষত্রকে সবকিছুর নিয়ন্তা বা প্রভাবশীল মনে করত। এ কারণেই এটাকে কুফর অভিহিত করা হয়েছে। –[রূহুল বয়ান]

قَوْلُهُ مَرَجَ : এটা(ن) مُرُوْجًا হতে নিষ্পন্ন অর্থ- মুক্ত, ছেড়ে দেওয়া, প্রবাহিত করা। فُرَاتٌ অতি মিষ্ট, সুপেয় ও তৃপ্তিদায়ক, (ك)

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ : এ শব্দটি مَرْفُوْعٌ হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে। যথা–

১. اَلَّذِىْ خَلَقَ الخ হলো مُبْتَدَاٌ-এর خَبَرٌ ২. هُوَ উহ্য مُبْتَدَاٌ-এর خَبَرٌ

৩. اِسْتَوٰى-এর যমীর থেকে بَدَلْ ; এটাই ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত।

قَوْلُهُ فَاسْئَلْ بِهِ خَبِيْرًا : بِهِ-এর সম্বন্ধ হলো خَبِيْرًا-এর সাথে, فَوَاصِلْ তথা শ্লোকের সাথে মিল রাখার জন্য আগে আনা হয়েছে, অর্থাৎ فَاسْاَلْ خَبِيْرًا بِهِ ছিল। অথবা اِسْئَلْ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ اِسْئَلْ عَنْهُ خَبِيْرًا ছিল। অর্থাৎ দয়াময়ের গুণাবলি সম্পর্কে কোনো আলেমের নিকট জিজ্ঞেস কর।

قَوْلُهُ يُخْبِرُكَ بِصِفَاتِهِ : এটা হলো جَوَابُ اَمْرٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণিত হয়েছে। যা তাঁর তাওহীদের বা একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এ প্রমাণসমূহ কাফেররা অহরহ দেখতে পায়, যদি ক্ষণিকের জন্যেও তারা চিন্তা করে তবে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সত্যতা অনুধাবন করা কারো পক্ষেই আদৌ কঠিন হয়ে না। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ১৮৯]

ইমাম রাযী (রা.) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের বিবরণ রয়েছে, তাই এ আয়াত থেকে তাওহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৪, পৃ. ৮৮]

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলির সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ : রৌদ্র ও ছায়া দুটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে এবং রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনো দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বসময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গাম্বরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ আয়াতে গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকাল প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিত প্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্য অন্তশ্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তশ্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস সূর্যকে এমন অত্যুজ্জ্বল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়েম রাখল? যার সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্র-ছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র-ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত এবং যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا -এর অর্থ তা-ই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্য নির্ধারণ করারও মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে : وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا –উক্ত আয়াতে রাত্রিকে লেবাস শব্দ দ্বারা ব্যাক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর ফেলে দেওয়া হয়। سُبَاتًا শব্দটি سَبْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ– ছিন্ন করা। سُبَاتٌ হলো এমন বস্তু, যা দ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়।

নিদ্রাকে আল্লাহ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سُبَاتٌ -এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথমত নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্ষু খুলে যায়। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনভিাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা হলো দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ ও জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত থাকায় তা হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হতো। কারণ যে ব্যক্তির সাথে যখন আপনার কাজ, তখন হয়তো তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার জাগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্য একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বসময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনো কোনো প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ;

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا বাক্যে দিনকে نُشُوْر অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাত্রে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরা -এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا : طَهُوْر শব্দটি আরবি ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طَهُوْر বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোনো সময় বৃষ্টির আকারে ও কোনো সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই

পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি যেমন– পুকুর, হাউজ ও নদীর পানিতে কোনো অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তাফসীরে মাযহারী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাসআলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকহের সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাসআলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে সেগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا : اَنَاسِيّ শব্দটি اِنْسِيٌّ-এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, এটা اِنْسَانٌ-এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের ও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে 'অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি' বলার কারণ কি? এতে তো বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে 'অনেক মানুষ' বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নদীর কিনারায় কূপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ : আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোনো সময় এক জনপদে এবং কোনো সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয়ে এবং কোনো জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আজাব হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আজাব ও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا : কুরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ : এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে بِهٖ অর্থাৎ কুরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনো পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ..... وَحِجْرًا مَّحْجُوْرًا : مَرَجَ শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مَرَجْ বলা হয়, সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। عَذْبٌ মিঠা পানিকে বলা হয়। فُرَاتٌ-এর অর্থ সুপেয় مِلْحٌ-এর অর্থ লোনা এবং اُجَاجٌ-এর অর্থ তিক্ত, বিস্বাদ।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। যথা–

১. সর্ববৃহৎ দরিয়া, যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিস্বাদ।

২. পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই, মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চেয়ে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনাও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজসিক্রয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে, তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত এই নিয়ামত ও অনুগ্রহের উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী, অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়; কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোনো অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا : পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نَسَبٌ বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে صِهْرٌ বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ একা মানুষ কোনো কাজ করতে পারে না।

قَوْلُهُ قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ .... رَبِّهٖ سَبِيْلًا : অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোনো পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোনো উপকার নেই যে, যার মনে চায় সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। বলা বাহুল্য কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোনো বৃদ্ধ ও দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও, পান কর ও সুখে থাক এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর ছওয়াব তিনিও পাবেন যেমন সহীহ হাদীসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সৎ কাজ করে, এই সৎ কাজের ছওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا : অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোনো ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। 'ওয়াকিফহাল' বলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা অথবা জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গাম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ : رَحْمٰنٌ আরবি শব্দ। এর অর্থ আরবরা সবাই জানত। কিন্তু আল্লাহর জন্য শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান আবার কে?

٦١. قَالَ تَعَالٰى تَبٰرَكَ تَعَاظَمَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا اِثْنٰى عَشَرَ الْحَمَلَ وَالثَّوْرَ وَالْجَوْزَاءَ وَالسَّرَطَانَ وَالْاَسَدَ وَالسُّنْبُلَةَ وَالْمِيْزَانَ وَالْعَقْرَ وَالْقَوْسَ وَالْجَدْىَ وَالدَّلْوَ وَالْحُوْتَ وَهِىَ مَنَازِلُ الْكَوَاكِبِ السَّبْعَةِ السَّيَّارَةِ اَلْمَرِّيْخ وَلَهُ الْحَمَلُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّهْرَةُ وَلَهَا الثَّوْرُ وَالْمِيْزَانُ وَعُطَارِدُ وَلَهُ الْجَوْزَاءُ وَالسُّنْبُلَةُ وَالْقَمَرُ وَلَهُ السَّرَطَانُ وَالشَّمْسُ وَلَهُ الْاَسَدُ وَالْمُشْتَرِىْ وَلَهُ الْقَوْسُ وَالْحُوْتُ وَزحَلُ وَلَهُ الْجَدْىُ وَالدَّلْوُ وَجَعَلَ فِيْهَا اَيْضًا سِرٰجًا هُوَ الشَّمْسُ وَقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ وَفِىْ قِرَاءَةٍ سُرُجًا بِالْجَمْعِ اَىْ نَيِّرَاتٍ وَخُصَّ الْقَمَرُ مِنْهَا بِالذِّكْرِ لِنَوْعِ فَضِيْلَةٍ ـ

٦٢. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً اَىْ يَخْلُفُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْاٰخَرَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ كَمَا تَقَدَّمَ مَا فَاتَهُ فِىْ اَحَدِهِمَا مِنْ خَيْرٍ فَيَفْعَلُهُ فِى الْاٰخَرِ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ـ اَىْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ رَبِّهِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا ؛

অনুবাদ :

৬১. আল্লাহ তা'আলা বলেন কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র আর রাশিচক্র হলো ১২ টি। সেগুলো হলো– ১. মেষ রাশি। ২. বৃষরাশি। ৩. মিথুন রাশি। ৪. কর্কট রাশি। ৫. সিংহরাশি। ৬. কন্যা রাশি। ৭. তুলা রাশি ৮. বৃশ্চিক রাশি। ৯. ধনু রাশি ১০ মকর রাশি। ১১ কুম্ভ রাশি। ১২. মীন রাশি। আর এগুলো হলো ভ্রাম্যমান সপ্ত নক্ষত্রের গতিপথ। মঙ্গলগ্রহের গতিপথ হলো মেষ ও বৃশ্চিক রাশি। শুক্রগ্রহের গতিপথ হলো বৃষ ও তুলা রাশি, বুধগ্রহের গতিপথ হলো মিথুন ও কন্যা রাশি। চন্দ্রের গতিপথ হলো কর্কট রাশি। সূর্যের গতিপথ হলো সিংহ রাশি। বৃহস্পতির গতিপথ হলো ধনু ও মীন রাশি এবং শনির গতিপথ হলো মকর ও কুম্ভ রাশি আর তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ আর তা হলো সূর্য। এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র। অন্য কেরাতে سِرَاجًا -এর পরিবর্তে سُرُجًا [বহুবচন] রয়েছে। অর্থাৎ জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররাজি। এখানে চন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে চন্দ্রকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬২. তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে অর্থাৎ একটি অপরটির পশ্চাতে আসে তার জন্য যে, উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। يَذَّكَّرَ শব্দটি ذَال বর্ণে তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রাত এবং দিনের যে কোনোটির মধ্যে কল্যাণকর কোনো কাজ যদি ছুটে যায়, তবে অপরটির মধ্যে তা পূরণ করে নিতে পারে। অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায়। অর্থাৎ রাত দিনে তার উপর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بُرُوْجًا : بُرُوْجٌ শব্দটি بُرْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ– মনজিল, কক্ষপথ। সপ্ত নক্ষত্রের ১২ টি কক্ষপথ রয়েছে। সাতটির মধ্য হতে ৫টির রয়েছে ২টি করে কক্ষপথ অর্থাৎ মোট ১০টি, আর অবশিষ্ট দুটি নক্ষত্র তথা চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ হলো ১টি করে। এভাবে সপ্ত নক্ষত্রের মাঝে ১২ টি কক্ষপথ বিভক্ত হলো। مُشْتَرِىْ [বৃহস্পতি] হলো ষষ্ঠ আকাশে, مِرِّيْخ [মঙ্গলগ্রহ] পঞ্চম আকাশে, شَمْس [সূর্য] চতুর্থ আকাশে, زُهْرَةٌ [শুক্রগ্রহ/ শুকতারা] তৃতীয় আকাশে, عُطَارِدْ [বুধ] দ্বিতীয় আকাশে, আর قَمَرٌ [চন্দ্র] হলো প্রথম আকাশে। ব্যাখ্যাকার (র.) সপ্ত নক্ষত্রের যে ধারা বর্ণনা করেছেন তা প্রাচীন আকাশ বিজ্ঞানের প্রথম বৈজ্ঞানিক এরিস্টটল -এর উক্তি মতে। তার মতে বিশ্বজগতের কেন্দ্র হলো পৃথিবী। সকল নক্ষত্র, গ্রহ সবকিছুই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে। অধিকাংশ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক তার মতে একমত হন। বাতলিমিউসও এ মতের প্রবক্তা ছিলেন। প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত তার এ উক্তি স্বীকৃত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম স্থপতি মনে করা হয় প্রখ্যাত মহাকাশ গবেষক কোপারনেক্সা পোল্যাণ্ডী [১৪৭২-১৫৪৩] -কে। প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনিই সর্বপ্রথম সূর্যকে সবকিছুর কেন্দ্র হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন।

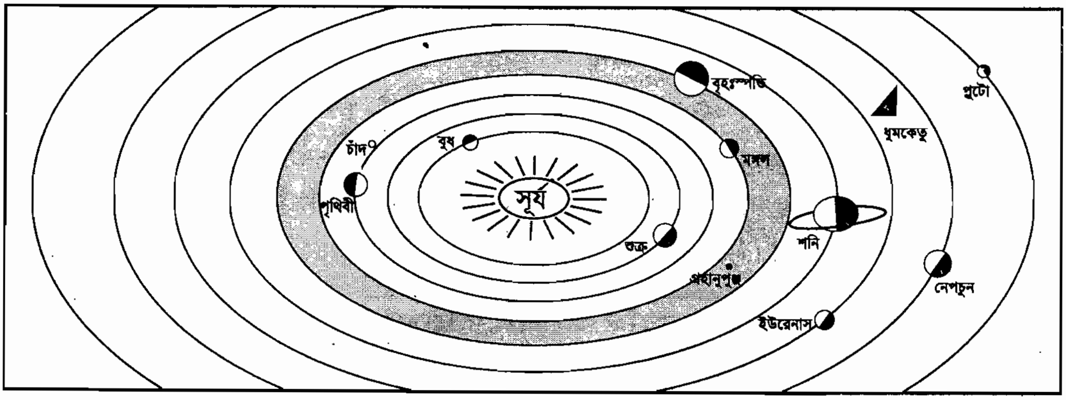

কোপারনেক্স মতাদর্শের বুনিয়াদি নীতি হলো দুটি। যথা–

১. নক্ষত্রসমূহের নিত্যদিনের আবর্তনের মূল কারণ হলো নিজ কেন্দ্রের চারিদিকে প্রত্যহ পৃথিবীর আবর্তন।

২. সমস্ত গ্রহ সূর্যের চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে। আর পৃথিবীও একটি গ্রহ। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহসমূহের প্রদক্ষিণের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ– ১. বুধ ২. শুক্র ৩. পৃথিবী ৪. মঙ্গল ৫. বৃহস্পতি ৬. শনি ৭. ইউরেনাস ৮. নেপচুন ও ৯. প্লুটো।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا اَىْ فِى السَّمَاءِ : سَمَاءٌ দ্বারা পারিভাষিক سَمَاءٌ তথা আসমান উদ্দেশ্য নয়; বরং উপর বা আকাশ উদ্দেশ্য। বলা হয় كُلُّ مَا هُوَ فَوْقَ رَاْسِكَ هُوَ السَّمَاءُ [মাথার উপরের সবই আকাশ] গ্রহগুলো মহাশূন্যে ঝুলন্ত রয়েছে, আসমানের সাথে মিলিত নয়। সপ্ত গ্রহের যে সপ্তাকাশে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে, তা হলো তাদের দূরত্বে থেকে আবর্তনের পথ। একে বুরুজ তথা কক্ষপথ বলা হয়। যেমন চন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি প্রথম আকাশে, বুধ দ্বিতীয় আকাশে ইত্যাদি। এর দ্বারা আসমান উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ جَعَلَ فِيْهَا : এর মধ্যকার هَا সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্য যদি বুরুজ বা কক্ষপথ হয় তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত। আর سَمَاءٌ দ্বারা আসমান উদ্দেশ্য নেওয়া হলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এর পরে, سِرَاجًا কে عَطْف করা হয়েছে। এটা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِه -এর অন্তর্গত। আর এটা সঙ্গত নয়। وَخُصَّ الْقَمَرُ الخ দ্বারা ব্যাখ্যাকার (র.) এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আরবদের নিকট যেহেতু চন্দ্রের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। কারণ তারা চন্দ্রের মাধ্যমে বছর গণনা করে। নতুন চন্দ্রের দ্বারা নতুন মাস গণ্য করে। তাছাড়া চন্দ্র মাসের সাথে বিভিন্ন ইবাদত সংশ্লিষ্ট। এ কারণে تَخْصِيْصُ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ -এর পর্যায়ে قَمَرٌ কে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনটা حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً : خِلْفَةً শব্দটি মাসদার, এটা نَوْع বা ধরন-প্রকৃতি জ্ঞাপক। যেমন– جِلْسَةً বিশেষ ধরনের উপবেশন বুঝায়, তদ্রূপ এর দ্বারা বিশেষ ধরনের একের পর এক আসা উদ্দেশ্য, যাতে একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হয়।

خِلْفَةً শব্দটি جَعَلَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل -ও হতে পারে যদি جَعَلَ কে صَيَّرَ অর্থে নেওয়া হয়। আর جَعَلَ -এর مَفْعُوْل -এর حَال -ও হতে পারে, যদি একে خَلَقَ অর্থে নেওয়া হয়। অথচ خِلْفَةً শব্দটি حَالٌ বা مَفْعُوْل হওয়া জরুরি। নতুবা অর্থ ঠিক থাকে না। কাজেই خِلْفَةً -এর পূর্বে مُضَافٌ উহ্য মানা জরুরি। অর্থাৎ ذُوْخِلْفَةٍ এ সময় خِلْفَةً মাসদারটি اِسْمُ فَاعِلْ অর্থে হবে। অর্থাৎ خِلْفَةً শব্দটি خَلِيْفَةً অর্থে হবে।

এর আরেক উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, কামূস অভিধানে আছে যে, خِلْفَةً শব্দটি مُخْتَلِفَةً অর্থে আসে। এ সময় مُضَافٌ উহ্য মানার প্রয়োজন পড়বে না। অর্থ হবে جَعَلَهُمَا مُخْتَلِفَيْنِ বাকি এ প্রশ্ন যে, خِلْفَةً শব্দটি দ্বিবাচনিক اِسْمِ فَاعِلْ -এর অর্থে নিলে خِلْفَةً -কে একবচন আনা হলো কেন? এর উত্তর এই যে, خِلْفَةً মাসদারের সম ওযনের শব্দ। আর মাসদারের মধ্যে সব বচন একই ধরনের। তাই خِلْفَةً কে একবচন আনা হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) يَخْتَلِفُ كُلٌّ مِنْهَا الْاٰخَرُ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَا فَاتَهُ : يَذْكُرُ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) مَا فَاتَهُ দ্বারা তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا : اَوْ এখানে تَقْسِيْم وَتَنْوِيْع তথা বিভক্তি ও শ্রেণি বিন্যাসকল্পে; تَخْيِيْر তথা পূর্বাপরের কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা-দানকল্পে নয়। অর্থাৎ مَانِعَةُ الْخُلُوْ উদ্দেশ্য, যার মধ্যে উভয়টির সমাবেশ ঘটতে পারে তবে কোনো একটি থেকে খালি হওয়া সঙ্গত হয় না। شُكُوْرًا মাসদারটি شُكْرًا অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا .... اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا : এসব আয়াতে মানুষকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অন্ধকার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তাওহীদের প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বান্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তাভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক অর্থাৎ ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায়; ছয় ভাগের এক অর্থাৎ দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে কুরআন পাক এ স্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কুরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্য করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর। এখন নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক কোনো মাসআলা জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্য সহজও নয়। যারা সারাজীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও কোনো অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়াম্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তাফসীরে এর চেয়ে বেশি কোনো আলোচনায় যাওয়াও কুরআনের জরুরি খেদমত নয়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্রে পৌঁছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা এবং গুহা ও পাহাড়ের ফটো

সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, কুরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টায় অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরো দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তাধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কুরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে এবং কেউ কুরআন পাকের সমর্থ বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নে প্রয়োজনমাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরি মনে করি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ–

নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে, নাকি বাইরে মহাশূন্যে? প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কুরআনে পাকের বাণী : جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, بُرُوْج অর্থাৎ গ্রহ-উপগ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা فِىْ অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনিভাবে সূরা নূহে আছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا .

এতে فِيْهِنَّ -এর সর্বনাম سَبْعُ سَمَاوَاتٌ কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় যে চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম কুরআনে سَمَاءٌ শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত আছে। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سَمَاءٌ শব্দটির আরো একটি অর্থ আছে। অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سَمَاءٌ বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سَمَاءٌ শব্দের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا এবং এমনি ধরনের অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তাফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, যেসব মেঘমালার উচ্চতার কোনো তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কুরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টত উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে– ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ

এতে مُزْنٌ শব্দটি مُزْنَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ শুভ্র মেঘমালা আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ্র মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করেছ নাকি আমি করেছি? অন্যত্র বলা হয়েছে– وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ; এখানে مُعْصِرَاتٌ -এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি। কুরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ سَمَاءٌ শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল। সারকথা এই যে, কুরআন ও তাফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী سَمَاءٌ শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فِى السَّمَاءِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোনো অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কুরআন নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে; বরং কুরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কুরআনের কোনো বর্ণনা তার পরিপন্থি হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কুরআন : এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরি যে, কুরআন পাক বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কুরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কুরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কুরআন পাক আকাশ, পৃথিবী,

নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও আলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরি নয়; বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বোঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির হ্রাস বৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য হয়নি– এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক অবশ্যই আছেন। এতটুকু বোঝার জন্য কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কুরআন পাকও এর প্রতি আহবান জানায়নি। কুরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়। হ্যাঁ, সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম মান-মন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোনো গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুরুত্ব না দেওয়া অসম্ভব ছিল। বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ.)-এর পাঁচশত বছর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেৎলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোনো সময় এ দিকে ভ্রূক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কুরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কুরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্ট-জগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কুরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরো বাড়ে, কুরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনজিলে-মকসূদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের ঊর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরি নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুতর মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নতুন নতুন আবিষ্কার এ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোনো মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মাখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কুরআন পাক কেবল এগুলোর নির্যাস ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যা দ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোনো বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কুরআনের তাফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থি আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোনো প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কুরআনের আয়াতে টানা হেঁচড়া ও সদার্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়; বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কুরআনে কোনো স্পষ্টোক্তি নেই; বরং কুরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে, সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কুরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত- جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوجًا। সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কুরআন পাক কোনো সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে কিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কুরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোনো সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্যে থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ, কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে যেমন আজকাল কোনো কোনো আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব, তবে কুরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কুরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশের দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ ইচ্ছা আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরিউক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনোরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনভিাবে কুরআন পাকের كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেৎলীমূসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাত্রে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেৎলীমূসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কুরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেৎলীমূসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু বোঝা যেত।

এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নূতন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোনো কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ত্রুটিবশত এগুলোকে কুরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (র.)-এর তাফসীরে রূহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তাফসীর। এই তাফসীরকার যেমন কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তাফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ শুকরী আলূসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ مِمَّا يَعْضُدُ الْهَيْئَةَ الْجَدِيْدَةَ الْقَوِيْمَةَ الْبُرْهَانَ এই গ্রন্থে কুরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলেমের ন্যায় কুরআনের আয়াতে কোনো প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন–

رَأَيْتُ كَثِيْرًا مِنْ قَوَاعِدِهَا لَا يُعَارِضُ النُّصُوْصَ الْوَارِدَةَ فِى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلٰى اَنَّهَا لَوْ خَالَفَتْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ اِلَيْهَا وَلَمْ نُؤَوِّلُ النُّصُوْصَ لِاَجْلِهَا وَالتَّاوِيْلُ فِيْهَا لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ الْحَرِّيَّةِ بِالْقَبُوْلِ بَلْ لَابُدَّ اَنْ نَقُوْلَ اَنَّ الْمُخَالِفَ لَهَا مُشْتَمِلٌ عَلٰى خَلَلٍ فِيْهِ فَاِنَّ الْعَقْلَ الصَّرِيْحَ لَا يُخَالِفُ النَّقْلَ الصَّحِيْحَ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَصْدُقُ الْاٰخَرَ وَيُؤَيِّدُهُ ـ

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কুরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কুরআন সুন্নাহর সদর্থ করব না। কেননা এরূপ সদর্থ পূববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই; বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী, তাতে কোনো না কোনো ত্রুটি আছে। কারণ সুস্থ বিবেক কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকারে-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজারো বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিশর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তাঁর পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেৎলীমূস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারখোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেৎলীমূসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ছিল। বেৎলীমূস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবি ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেৎলীমূসের মতবাদই আরবি গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তাফসীরকার কুরআনের আয়াতের তাফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরি একাদশ শতাব্দী ও খ্রিস্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতিলাভ করেন তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারি বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেৎলীমূসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারি বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষশক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারি বস্তু নিচে পতিত হবে; কিন্তু যদি কোনো বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাব বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবূ রায়হান আলবেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায় তখন তা আর নিচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকারে ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমানকালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমা ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমন শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁরই একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট' এ এবং তার উর্দ্‌ অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দূ মাসিক 'সায়রবীন' -এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বোঝায় যে, এমন কোনো শক্তি আছে, যা এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন–

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্বে থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তা দৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি লিখেন–

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোনো গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

অতঃপর তিনি সব ভ্রমণ পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন–

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম; কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্ট জগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজয়ীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরিউক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোনো মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই পয়গাম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারীগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্রগ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে? মানুষের চেষ্টা সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্হও; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থা নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোনো সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্য আত্মিক শান্তি ও আরামের কোনো উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জবাবে 'না' ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু'টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। যথা– ১. যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তারই নাম আল্লাহ। ২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য, কাজেই তা দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দুটি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি ফলপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কুরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিশরের মুফতী আল্লামা নজীত (র.) তাঁর গ্রন্থ 'তাওফীকুর রহমান' -এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত, তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ উপগ্রহের আকার আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরো লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত। চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কুরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পয়গাম্বরগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে–

زبان تازه کردن باقرار تو * نینگیختن علق از کار تو .

میندس بسے جویر از راز شاد * نوانر کچود کردی أغاز شاد

সুফী বুযুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সা'দী (র.) ব্যক্ত করেছেন:

چه شبها نشستم درین سیر گم * که حیرت گرفت أستینم کهقم

হাফেজ শিরাজী (র.) বলেছেন–

سخن از مطرب ومی گوئی وراز دهر کمترجو * که کس نکشود ونکشاید بحکمت این معمارا

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে। এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার করাও কুরআনের উদ্দেশ্য। কুরআনের প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের অভিমুখী একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কুরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে হুবহু কুরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থি আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কুরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কুরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কুরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কুরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কুরআনের পরিপন্থি বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।

অনুবাদ :

٦٣. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ صِفَاتٌ لَهُ اِلٰى اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ غَيْرَ الْمُعْتَرِضِ فِيْهِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا اَىْ بِسَكِيْنَةٍ وَتَوَاضُعٍ وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ بِمَا يَكْرَهُوْنَهُ قَالُوْا سَلٰمًا ـ اَىْ قَوْلًا يَسْلَمُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ ـ

৬৩. রহমানের বান্দা তারাই এটা হলো মুবতাদা আর পরবর্তী অংশ اُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ পর্যন্ত এর সিফত। তবে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ব্যতিরেকে। যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে অর্থাৎ প্রশান্তি ও বিনয়ের সাথে। এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে যাকে তারা অপছন্দ করে তখন তারা বলে সালাম। অর্থাৎ এমন কথা বলে যার দ্বারা সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

٦٤. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا جَمْعُ سَاجِدٍ وَقِيَامًا ـ بِمَعْنٰى قَائِمِيْنَ اَىْ يُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ ـ

৬৪. এবং যারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে। سُجَّدًا শব্দটি سَاجِدٌ-এর বহুবচন ও দণ্ডায়মান থেকে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে অর্থাৎ তারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে রাত কাটিয়ে দেয়।

٦٥. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اَىْ لَازِمًا ـ

৬৫. এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর। তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। অনিবার্য ধ্বংস।

٦٦. اِنَّهَا سَاءَتْ بِئْسَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا هِىَ اَىْ مَوْضِعَ اِسْتِقْرَارٍ وَاِقَامَةٍ ـ

৬৬. নিশ্চয় তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট। অর্থাৎ দোজখ অবস্থান ও আবাসনের স্থান হিসেবে।

٦٧. وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا عَلٰى عِيَالِهِمْ لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا بِفَتْحِ اَوَّلِهِ وَضَمِّهِ اَىْ يُضَيِّقُوْا وَكَانَ اِنْفَاقُهُمْ بَيْنَ ذٰلِكَ الْاِسْرَافِ وَالْاِقْتَارِ قَوَامًا وَسَطًا ـ

৬৭. এবং তারা, যারা যখন ব্যয় করে তাদের পরিবার-পরিজনের উপর তখন তারা অপব্যয়ও করে না এবং কার্পণ্যও করে না لَمْ يَقْتُرُوْا ফে'লের يَاءٌ বর্ণে যবর অথবা يَاءٌ বর্ণে পেশ ও تَاءٌ বর্ণে যের হতে পারে [বাবে اِفْعَالٌ থেকে] অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করে না, বরং তারা আছে অর্থাৎ তাদের ব্যয় হয়ে থাকে এতদুভয়ের মাঝে অপব্যয় ও কার্পণ্যতার মাঝামাঝি মধ্যম পন্থায়।

٦٨. وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ قَتْلَهَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ اَىْ وَاحِدًا مِنَ الثَّلٰثَةِ يَلْقَ اَثَامًا ـ اَىْ عُقُوْبَةً ـ

৬৮. এবং যারা আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে এ তিনটির যে কোনো একটি সে শাস্তি ভোগ করবে।

অনুবাদ :

٦٩. يُضٰعَفْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُضَعَّفُ بِالتَّشْدِيْدِ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ بِجَزْمِ الْفِعْلَيْنِ بَدَلاً وَبِرَفْعِهِمَا اِسْتِئْنَافًا مُهَانًا حَالٌ.

৬৯. দ্বিগুণ করা হবে অন্য কেরাতে عَيْن বর্ণে তাশদীদসহ يُضَعَّفُ রয়েছে। তার শাস্তি কিয়ামতের দিন এবং সে সেখানে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। يُضٰعَفُ এবং يَخْلُدْ উভয় ফে'লটি جَزْم -যুক্ত হবে يَلْقَ থেকে بَدَلْ الْاِشْتِمَالْ হওয়ার প্রেক্ষিতে। আবার এটা رَفْع যুক্ত হবে جُمْلَهْ مُسْتَأْنِفَهْ হিসেবে। আর مُهَانًا এটা يَخْلُدْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

٧٠. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا مِنْهُمْ فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمُ الْمَذْكُوْرَةِ حَسَنٰتٍ ط فِي الْاٰخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا . اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

৭০. তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের মধ্যে থেকে। আল্লাহ তা'আলা পরিবর্তন করে দিবেন তাদের উল্লিখিত পাপ পুণ্যের দ্বারা পরকালে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এগুণে গুণান্বিত।

٧١. وَمَنْ تَابَ مِنْ ذُنُوْبِهِ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا . اَيْ يَرْجِعُ اِلَيْهِ رُجُوْعًا فَيُجَازِيْهِ خَيْرًا .

৭১. আর যে ব্যক্তি তওবা করে স্বীয় গুনাহ থেকে। পূর্বে যার আলোচনা করা হলো সে ব্যতীত। এবং সৎকর্ম করে, সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন।

٧٢. وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ اَيِ الْكِذْبَ وَالْبَاطِلَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مِنَ الْكَلَامِ الْقَبِيْحِ وَغَيْرِهِ مَرُّوْا كِرَامًا مُعْرِضِيْنَ عَنْهُ .

৭২. এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না মিথ্যা অসার ও বাতিল সাক্ষ্য। এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে মন্দ কথা ইত্যাদি হতে। স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে তার থেকে বিমুখ হয়ে, পরিহার করে।

٧٣. وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ اَيِ الْقُرْاٰنِ لَمْ يَخِرُّوْا يَسْقُطُوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا . بَلْ خَرُّوْا سَامِعِيْنَ نَاظِرِيْنَ مُنْتَفِعِيْنَ .

৭৩. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত কুরআন স্মরণ করিয়ে দিলে এর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না; বরং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং উপকৃত হওয়ায় আশায় তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।

٧٤. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ قُرَّةَ اَعْيُنٍ لَنَا بِاَنْ نَرَاهُمْ مُطِيْعِيْنَ لَكَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا . فِي الْخَيْرِ .

৭৪. এবং যারা প্রার্থনা করে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান করুন, ذُرِّيّٰتِنَا শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয় রূপেই পঠিত। যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর আমরা যেন তাদেরকে আপনার অনুগত দেখতে পাই আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য কল্যাণকর কাজে।

৭৫. أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الْجَنَّةِ بِمَا صَبَرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَيُلَقَّوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيفِ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ فِيهَا فِي الْغُرْفَةِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا - مِنَ الْمَلَائِكَةِ -

৭৬. خَالِدِينَ فِيهَا ط حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا - مَوْضِعَ إِقَامَةٍ لَهُمْ وَأُولَٰئِكَ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الْمُبْتَدَأُ -

৭৭. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِأَهْلِ مَكَّةَ مَا نَافِيَةٌ يَعْبَؤُا يَكْتَرِثُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ج إِيَّاهُ فِي الشَّدَائِدِ فَيَكْشِفُهَا فَقَدْ أَيْ فَكَيْفَ يَعْبَؤُا بِكُمْ وَقَدْ كَذَّبْتُمُ الرَّسُولَ وَالْقُرْآنَ فَسَوْفَ يَكُونُ الْعَذَابُ لِزَامًا - مُلَازِمًا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ بَعْدَمَا يَحُلُّ بِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ وَجَوَابُ لَوْلَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا -

অনুবাদ :

৭৫. তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ বেহেশতের উন্নত মর্যাদা যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল। আল্লাহর আনুগত্যে তাদেরকে সেথায় অভ্যর্থনা প্রদান করা হবে يُلَقَّوْنَ শব্দটি قَافْ বর্ণে তাশদীদসহ। আর قَافْ বর্ণে তাশদীদ ছাড়া হলে يَاءْ বর্ণটি যবরযুক্ত হবে। জান্নাতের সে কক্ষে অভিবাদন ও সালাম সহকারে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে।

৭৬. সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট। مُقَامًا অর্থ হলো তাদের বসবাসের স্থান। আর أُولَٰئِكَ এবং তার পরবর্তী অংশ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ মুবতাদার খবর।

৭৭. আপনি বলুন ! হে মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসীদেরকে তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। তাকেই। বিভিন্ন বিপদাপদে অতঃপর তিনি তা বিদূরিত করে দেন। সুতরাং কিভাবে তিনি তোমাদেরকে পরোয়া করবেন তোমরা তো অস্বীকার করেছ রাসূল ও কুরআনকে। ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি। পরকালেও তা তোমাদের জন্য অবধারিত হবে। দুনিয়ায় তোমাদের উপর যে আজাব নেমে আসবে, তারপরে। সুতরাং বদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে ৭০ জন নিহত হয়েছিল, আর لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে, পূর্বের لَوْلَا তা বুঝাচ্ছে [অর্থাৎ- مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ] মূল ইবারত হবে- لَوْلَا دُعَائُكُمْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ। মুখলিস তথা আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণের গুণাবলি বর্ণনাকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে। عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ মুবতাদাটি مَوْصُوْف আর সামনের ৮টি اِسْمِ مَوْصُوْل অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ থেকে وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ পর্যন্ত সবগুলো صِلَةْ সহ صِفَتْ আর أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ বাক্য হলো خَبَرْ ; مُبْتَدَأْ ও خَبَرْ -এর মধ্যকার ৩টি বাক্য وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ থেকে مَا পর্যন্ত হলো مُعْتَرِضَةْ , هَوْنًا শব্দটি هَانَ -এর মাসদার। অর্থ- নম্রতা অবলম্বন করা, শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে কথা বলা।

قَوْلُهُ سُجَّدًا : এটা يَبِيْتُوْنَ -এর যমীরের حَالْ , আর لِرَبِّهِمْ হলো মুতা'আল্লিক। سُجَّدًا -কে فَوَاصِلْ তথা শেষের মিলের প্রতি লক্ষ্য করে قِيَامًا -এর আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا : অর্থাৎ খালিক ও মাখলুকের সাথে সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও তারা আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে সদা শংকিত থাকে। নিজেদের আমলের উপর ভরসা করে নির্ভয় হয় না। তারা এভাবে দোয়া করে- رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا [হে আল্লাহ ! আমাদের থেকে দোজখের আজাবকে দূরে রাখ।]

قَوْلُهُ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا : এ বাক্যে এবং سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا এ উভয়টি رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا الخ -এর ইল্লত বা কারণ বিশেষ।

قَوْلُهُ سَاءَتْ بِئْسَتْ : ব্যাখ্যাকার (র.) سَاءَتْ-এর তাফসীর بِئْسَتْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, سَاءَتْ হলো اَفْعَالُ الذَّمِّ-এর অন্তর্গত। এর فَاعِلْ হলো এর মধ্যকার هِىَ যমীর, আর مُسْتَقَرًّا হলো এর تَمْيِيْز যা هِىَ যমীর مُبْهَمْ-এর তাফসীর করেছে। مَخْصُوْصْ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ هِىَ কেউ কেউ سَاءَتْ কে اَحْزَنَتْ অর্থে নিয়েছেন। এ সময় এটা সাধারণ فِعْل-এর ন্যায় হবে এবং مَفْعُوْل কে نَصَبْ দিবে, যা এখানে উহ্য রয়েছে। তা হলো اَصْحَابَهَا কিংবা دَاخِلِيْهَا ; বাক্যটি এরূপ হবে- اِنَّهَا (جَهَنَّم) اَحْزَنَتْ اَصْحَابَهَا وَدَاخِلِيْهَا আর مُسْتَقَرًّا শব্দটি حَالْ বা تَمْيِيْز হতে পারে। প্রথমটিকে প্রাধান্যদানের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যাকার (র.) سَاءَتْ-এর ব্যাখ্যা করেছেন بِئْسَتْ দ্বারা। এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, এটা اَحْزَنَتْ অর্থে নয়। তার মতে مُسْتَقَرْ ও مَقَامْ উভয়টি একই বস্তু, কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাদের মতে مُسْتَقَرْ হলো পাপী মুমিনদের জন্য, অর্থাৎ তাদের জন্য দোজখ স্থায়ী আবাস, আর مَقَامٌ হলো কাফেরদের জন্য। কেননা তাদের জন্য দোজখ হলো স্থায়ী নিবাস।

قَوْلُهُ يَقْتُرُوْا : এটা يَضْرِبُوْا-এর ছন্দে, অথবা يَكْرُمُوْا-এর ছন্দে, يَاءْ যবর ও تَاءْ বর্ণে পেশ যোগে। বলা হয় قَتَرَ (ن - ض) اِلَى عِيَالِهِ -এর অর্থ হলো- ضَيِّقْ عَلَيْهِمْ فِى النَّفَقَةِ অর্থাৎ পরিবারের ব্যয়ভার সংকুচিত করল।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الخ : এর দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের পরে গুনাহ থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে يُضْعَفْ ও يَخْلُدْ উভয় ফে'ল يَلْقَ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ হিসেবে مَجْزُوْمْ হয়েছে, আবার مُسْتَانِفَةْ হিসেবে مَرْفُوْعْ পড়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ تَابَ : এটা يَلْقَ-এর যমীর থেকে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হয়েছে। অর্থাৎ اِلَّا مَنْ تَابَ فَلَا يَلْقَ اَثَامًا কেউ কেউ এটাকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ-ও বলেছেন। তবে নাহু শাস্ত্রবিদ আবূ হাইয়ান এটাকে অসঙ্গত বলেছেন। কারণ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ-এর উপর مُضَاعَفْ-এর বিধান আরোপ করা হয়েছে। এ সময় বাক্যটি এরূপ হবে- اِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَلَا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ আর عَذَابْ مُضَاعَفْ তথা দ্বিগুণ সাজাকে نَفِىْ করার দ্বারা عَذَابْ غَيْر مُضَاعَفْ [দ্বিগুণ আজাব ছাড়া অন্যান্য আজাব] -এর نَفِىْ বুঝায় না। সুতরাং مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ-ই উত্তম। اِلَّا এখানে لٰكِنْ অর্থে। -[ফতহুল কাদীর] مُهَانًا হলো يَخْلُدْ-এর যমীরের حَالْ ; কেউ কেউ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ কে شَرْط- جَزَاءْ এক হয়ে যাওয়ার ন্যায় বলেছেন। আর তা বৈধ নয়। কেননা مَنْ تَابَ فَاِنَّهُ يَتُوْبُ বলা হয় না। কেউ কেউ এর এ উত্তর দিয়েছেন যে, شَرْط দ্বারা মৌখিক তওবা উদ্দেশ্য। আমলের বিনিময় লাভের জন্য تَوْبَة مُؤَكَّدْ উদ্দেশ্য। এ কারণেই جَزَاءْ শব্দকে مَتَابًا মাসদার দ্বারা مُؤَكَّدْ করেছেন। তারা আয়াতের অর্থ এই বলেছেন- مَنْ اَرَادَ التَّوْبَةَ وَعَزَمَ عَلَيْهَا فَلْيَتُبْ اِلَى اللّٰهِ ; এখানে خَبَرْ টি আদেশজ্ঞাপক। -[ফতহুল কাদীর : শাওকানী]

قَوْلُهُ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, عَطْف টি مُغَايَرَتْ তথা ভিন্নতাজ্ঞাপক। অর্থাৎ প্রথম আয়াতে مَنْ تَابَ দ্বারা কাফের উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়টিতে মুমিন উদ্দেশ্য। কেউ কেউ تَخْصِيْصْ بَعْدَ التَّعْمِيْمِ বলেছেন।

قَوْلُهُ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ : এখানে لَا يَشْهَدُوْنَ কে যদি لَا يَحْضُرُوْنَ অর্থে নেওয়া হয়, যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.)-এর অভিমত, তাহলে زُوْرٌ শব্দটি مَفْعُوْل হবে। আর যদি شَهَادَتْ তথা সাক্ষ্য অর্থে নেওয়া হয় তাহলে زُوْرٌ শব্দটি مَنْصُوْبْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ [হরফে জার উহ্য থেকে নসব বিশিষ্ট] হবে। অর্থাৎ- لَا يَشْهَدُوْنَ بِالزُّوْرِ

قَوْلُهُ قُرَّةَ أَعْيُنٍ : قُرَّةُ الْعَيْنِ হলো চোখের খুশি ও আনন্দ। এর দ্বারা পরিবার পরিজনের সততা ও আনুগত্য দেখে আনন্দ ও খুশি হওয়া উদ্দেশ্য। এটাকে চোখের শীতলতা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاجْعَلْنَا إِمَامًا : إِمَامٌ শব্দটি একবচন ও বহুবচন রূপে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে اِجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا বলা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ : أُولٰئِكَ দ্বারা সেসব عِبَادُ الرَّحْمٰنِ তথা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা সামনের একের পর পর ৮টি مَوْصُوْل-এর অধীনে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত। اَلْغُرْفَةَ হলো اِسْمِ جِنْسٍ-এর দ্বারা বহুবচন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ : এটা এবং এর পরবর্তী অংশ হলো عِبَادُ الرَّحْمٰنِ মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ لَوْلَا دُعَائُكُمْ : لَوْلَا-এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। لَوْلَا-এর পরবর্তী অংশ উহ্য جَوَابٌ নির্দেশ করছে। অর্থাৎ- لَوْلَا دُعَائُكُمْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের আলোচনা রয়েছে, যারা করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা অহরহ ভোগ করেও তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং অবাধ্য থাকে। আলোচ্য আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের প্রকৃত বান্দাগণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যেভাবে অবাধ্য নাফরমানদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের তাবেদার এবং পেয়ারা বান্দাগণের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাদের শুভ পরিণতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ যেন উল্লিখিত গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহ পাকের প্রকৃত এবং প্রিয় বান্দা হতে পারে, তার জন্যে রয়েছে এ আয়াত সমূহে উদাত্ত আহবান রয়েছে। মানুষ যেন দয়াময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া মায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি শোকরগুজার হয় এ শিক্ষাও রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। আর যারা আল্লাহ পাকের শোকরগুজার বান্দা, তাদেরকে অনুসরণ করার জন্যেও এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, সমগ্র কুরআনে আল্লাহ পাক কোথাও হেদায়েতপ্রাপ্ত, সরল সঠিক পথের অনুসারীদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে দোজখের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। যারা সরল সঠিক পথের অনুসারী হয়েছেন, তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। যেমন- ১. বিনয় ২. ইবাদতে তাদের মনের একাগ্রতা ৩. আল্লহর ভয় ৪. পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ ৫. মধ্যপন্থা অবলম্বন ৬. তাওহীদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ৭. ইখলাস ৮. ফেতনা-ফ্যাসাদ পরিহার করা ৯. জুলুম-অবিচার না করা ১০. ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা এবং ১১. আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকা।

যখন এ আয়াত নাজিল হলো, তখন যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণ। এ আয়াতসমূহে নিঃসন্দেহে তাঁদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২০০-২০১]

কুরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান' [রহমানের গোলাম] উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্টজীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর গোলাম এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী, তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকেও আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গুনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলির মধ্য থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার

কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার রহমান [দয়াময়] গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলি ও আলামত : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিবারাত্রি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহভীতি, যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু শামিল আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ : عِبَادٌ হওয়া। عِبَادٌ শব্দটি عَبْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– বান্দা বা দাস, যে তার মনিবের মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম মনিবের আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ণ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ : يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। هَوْن শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাম্ভীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষ্য এরূপ– كَاَنَّمَا الْاَرْضُ تَطْوِىْ لَهٗ অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্য কুঞ্চিত হতো। –[ইবনে কাসীর]

এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর ফারূক (রা.) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি অসুস্থ? সে বলল, না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত হাসান বসরী (র.) يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا আয়াতের তাফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অজ্ঞ লোকেরা দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়: বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপৃত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ সে তো দুনিয়ার পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্য শাস্তি তৈরি রয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

তৃতীয় গুণ : وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে جَاهِلُوْنَ শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এ অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবর্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহহাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে تَسْلِيْم শব্দটি تَسَلُّم থেকে নয়; বরং سَلَامٌ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ– নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জবাবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গুনাহ্গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

চতুর্থ গুণ : وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও

আরামের। এতে নামাজ ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নাম-যশের আশঙ্কাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাজের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাসগত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী। –[মাযহারী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকাত পড়ে নেয়, بَاتَ لِلّٰهِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا অর্থৎ সে-ও তাহাজ্জুদের ফজিলতের অধিকারী –[মাযহারী, বগভী]।

হযরত উসমান (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারীরূপে গণ্য করা হবে। –[আহমদ, মুসলিম ও মাযহারী]

পঞ্চম গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্দরুন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ : وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ত্রুটিও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اِسْرَافٌ এবং এর বিপরীতে اِقْتَارٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

اِسْرَافٌ -এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরিয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اِسْرَافٌ তথা অপব্যয়, যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা تَبْذِيْرٌ তথা অনর্থক ব্যয় কুরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গুনাহ। আল্লাহ বলেন– اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ এ দিক দিয়ে এই তাফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখের তাফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ গুনাহের কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়। –[মাযহারী]

اِقْتَارٌ শব্দের অর্থ হলো– ব্যয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি ও কৃপণতা করা। শরিয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হলো যেসব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। [সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে]। এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। –[মাযহারী] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهٗ فِىْ مَعِيْشَتِهٖ অর্থাৎ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। –[আহমদ, ইবনে কাসীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়েম থাকে, সে কখনো ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না। –[আহমদ, ইবনে কাসীর]

সপ্তম গুণ : وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ।

অষ্টম ও নবম গুণ : لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ এখান থেকে কার্যগত গুনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গুনাহ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– وَمَنْ يَّفْعَلْ

ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবূ উবায়দা أَثَامٌ শব্দের তাফসীর করেছেন গুনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেন, أَثَامٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোনো কোনো হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। –[মাযহারী]

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা প্রথমে তো يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গুনাহগারদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তাদের এক গুনাহের জন্য একই শাস্তি কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্য হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا কথাটিও বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আজাবে লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকবে। কোনো মুমিন চিরকাল আজাবে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ী হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হলো, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সৎকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বিগত দিনের সেসব পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গুনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবাইর, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

ইবনে কাসীর এর আরো একটি তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফেররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোনো সময় অতীত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তাফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا : বাহ্যত এটা পূর্বোক্ত إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। ইমাম কুরতুবী (র.) কাফফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফেরও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাপীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَآمَنَ অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল; কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়; বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জবাবে শুধু يَتُوْبُ উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং এর জবাবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সৎকর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গুনাহ থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মে এর কোনো প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই

যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যা দ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দকাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে–

দশম গুণ : وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপকর্মও মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) বলেন, এখানে গান বাজনার অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। আমর ইবনে কায়্যিম (র.) বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

সত্যকথা এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখাও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত। –[মাযহারী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতের يَشْهَدُوْنَ শব্দটিকে شَهَادَةٌ অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবিরা গুনাহ, তা কুরআন ও সুন্নাহে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (র.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবিরা গুনাহ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারূক (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এ ছাড়া তার মুখে চুন কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। –[মাযহারী]

একাদশ গুণ : وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا : অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনোদিন গমন করে, তবে গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণার্হ জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসঊদ করীম তথা ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে। –[ইবনে কাসীর]

দ্বাদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহর আয়াত ও আখিরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না: বরং শ্রবণশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। যথা– ১. আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। ২. অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে; কিন্তু

বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজেদের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরিয়তের বিধানাবলি পাঠ করাই যথেষ্ট নয়; বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তাফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরি : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচারণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে, তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি আমি এমন কোনো মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাবো? হযরত শা'বী বললেন, না বুঝে না শুনে কোনো কাজে লেগে যাওয়া মুমিনদেগর জন্য বৈধ নয়; বরং বুঝে শুনে আমল করা তাদের জন্য জরুরি। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরিক হয়ে যাওয়া জায়েজ নয়।

এ যুগে যুব সম্প্রদায় ও নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে কুরআন পাঠ ও কুরআন বোঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কুরআনের অনুবাদ অথবা কারো তাফসীর দেখে কুরআনকে নিজেরা বোঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতি বিবর্জিত। ফলে তারা কুরআনকে বিশুদ্ধরূপে বোঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোনো সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোনো উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কুরআন ও কুরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তরজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোনো পারদর্শী উস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতি বিবর্জিত কুরআন পাঠও আল্লাহর আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহর তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তাওফীক দান করুন!

ত্রয়োদশ গুণ : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তাফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দুরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তারা তাদের সৎকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটি প্রনিধানযোগ্য وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য জাঁকজমকতা, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কুরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ। যেমন– এক আয়াতে আছে– تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا অর্থাৎ আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোনো কোনো আলেম এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন! তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা বলে অভিহিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি: বরং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, এই দোয়ায়

নিজের জন্য কোনো সর্দারি ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর ছওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী (র.) বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যা দ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। ইমাম কুরতুবী (র.) উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই। অর্থাৎ যে সর্দারি ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়; বরং জায়েজ। পক্ষান্তরে لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا আয়াতে সেই সর্দারি ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মুমিনদের প্রধান গুণাবলির বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয়গুলো বর্ণিত হচ্ছে–

قَوْلُهُ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ : غُرْفَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ উপরতলার কক্ষ। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবে, যা সাধারণ জান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা বা নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। –[বুখারী, মুসলিম ও মাযহারী]

মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবূ মালিক আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا : অর্থাৎ জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত খাঁটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এসবের প্রতিদান ও ছওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বার কাফির ও মুশরিকদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاۤؤُكُمْ : এই আয়াতের তাফসীর এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে– مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোনো মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে– فَقَدْ كَذَّبْتُمْ অর্থাৎ তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো গুরুত্ব নেই।

قَوْلُهُ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا : অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের গলার হার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আজাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে। وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ

একটি বিশেষ আমল : হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেছেন, যদি কেউ নিম্নোক্ত আয়াত প্রত্যেক নামাজের পর একবার পাঠ করে, তবে তার স্ত্রী, পুত্র ও পরিবার দীনদার হবে–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ : সূরা শু'আরা মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا وَالشُّعَرَآءُ إِلَى اٰخِرِهَا فَمَدَنِيٌّ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسَبْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

তবে وَالشُّعَرَآءُ... হতে শেষ পর্যন্ত অংশটি ব্যতিরেকে; এ আয়াতটি মাদানী। আয়াত : ২২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. طٰسٓمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ .

১. ত্বা-সীন-মীম। আল্লাহ তা'আলাই এর মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

٢. تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ اَلْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْمُبِيْنِ . اَلْمُظْهِرِ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ .

২. এগুলো এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত অর্থাৎ কুরআনের اٰيٰتُ الْكِتٰبِ -এর মধ্যকার ইযাফত হলো مِنْ অর্থে তথা اِضَافَةٌ مِنِّيَّةٌ আর اَلْمُبِيْنِ -এর অর্থ হলো ভ্রান্ত থেকে সত্য প্রকাশকারী।

٣. لَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدُ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ قَاتِلُهَا غَمًّا مِنْ اَجَلِ اَنْ لَّا يَكُوْنُوْا اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ مُؤْمِنِيْنَ . وَلَعَلَّ هُنَا لِلْاِشْفَاقِ اَىْ اَشْفِقْ عَلَيْهَا بِتَخْفِيْفِ هٰذَا الْغَمِّ .

৩. হয়তো আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ! মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন চিন্তায় নিজেকে বিনাশ করে ফেলবেন তারা মুমিন হচ্ছে না বলে অর্থাৎ মক্কাবাসীরা। এখানে لَعَلَّ টি اِشْفَاقْ তথা নিজের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছে। অর্থাৎ দুশ্চিন্তা কম করে নিজের প্রতি দয়ার্দ্র হও।

٤. اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ بِمَعْنَى الْمُضَارِعِ اَىْ تَدُوْمُ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ . فَيُؤْمِنُوْنَ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقُ بِالْخُضُوْعِ الَّذِىْ هُوَ لِاَرْبَابِهَا جُمِعَتِ الصِّفَةُ مِنْهُ جَمْعُ الْعُقَلَاءِ .

৪. আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত তার প্রতি ফলে তারা ঈমান আনতে। এখানে ظَلَّتْ ফে'লটি مَاضِىْ হওয়া সত্ত্বেও مُضَارِعْ -এর অর্থ হবে। অর্থাৎ تَدُوْمُ [সর্বদা হবে]। خُضُوْع [নত হওয়া] -এর সম্বন্ধ اَعْنَاقْ [গ্রীবা, গর্দান] -এর দিকে করা হয়েছে, যা মূলত গ্রীবা অধিকারী ব্যক্তির বিশেষণ। এ হিসেবে اَعْنَاقْ -এর বিশেষণ خَاضِعِيْنَ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ذَوِى الْعُقُوْل -এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে।

٥. وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ قُرْاٰنٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ .

৫. যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোনো নতুন উপদেশ আসে কুরআন। তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। مُحْدَثٍ শব্দটি ذِكْرٌ -এর صِفَتْ كَاشِفَهْ তথা স্পষ্টকারী বিশেষণ হয়েছে।

অনুবাদ :

٦. فَقَدْ كَذَّبُوْا بِهِ فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبٰؤُا عَوَاقِبُ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ـ

৬. তারা তো তাকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে তার প্রকৃত বার্তা পরিণাম যা নিয়ে তার ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

٧. اَوَلَمْ يَرَوْا يَنْظُرُوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا اَىْ كَثِيْرًا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ـ نَوْعٍ حَسَنٍ ـ

৭. তারা কি লক্ষ্য করে না তাকায় না জমিনের দিকে। আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেছি। অর্থাৎ বহু সংখ্যক। উত্তম প্রকারের।

٨. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط دَلَالَةً عَلٰى كَمَالِ قُدْرَتِهِ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيْهِ زَائِدَةٌ ـ

৮. নিশ্চয় এতে আছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার উপর নির্দেশক। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আল্লাহর ইলমে। সীবওয়াইহ -এর মতে এখানে كان টি অতিরিক্ত হয়েছে।

٩. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ ذُو الْعِزَّةِ يَنْتَقِمُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ الرَّحِيْمُ ـ يَرْحَمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৯. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, তিনি এক পরাক্রমশালী মহা ক্ষমতাধর, তিনি কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। পরম দয়ালু মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ طٰسٓمٓ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতে ط ـ س ـ م ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখিত।

قَوْلُهُ بَاخِعٌ : এটা اِسْمُ فَاعِلٍ -এর সীগাহ, (ف) بَخَعَ হতে নিষ্পন্ন, অর্থ চিন্তায় বা রাগে নিজেকে ধ্বংসে নিপতিতকারী। **بخعا** অর্থ– হারাম মগজ পর্যন্ত কর্তন করা, بَخْعٌ অর্থ– হারাম মগজ।

قَوْلُهُ لَعَلَّكَ : لَعَلَّ হলো حَرْفُ تَرَجِّىْ বা আশাব্যাঞ্জক অব্যয়। তবে এখানে যেহেতু تَرَجِّىْ -এর অর্থ সমীচীন নয় এবং তা উদ্দেশ্যও নয়। এ কারণে لَعَلَّ কে اِشْفَاقٌ অর্থে নেওয়া হয়েছে। আর اِشْفَاقٌ অর্থ হলো ভয়, আশঙ্কা। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আশঙ্কা থেকে মুক্ত, তাই এর দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির আশঙ্কা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এখানে এটা اَشْفِقْ বা اِرْحَمْ তুমি দয়ার্দ্র হও অর্থে ব্যবহৃত। কেননা এখানে ভয়ের কোনো বিষয় নেই। اِشْفَاقٌ শব্দটি مِنْ -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হলে তখন ভয় -এর অর্থ হয়। আর عَلٰى -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হলে তার অর্থ হয় দয়া ও মমতা।

قَوْلُهُ نُنَزِّلْ : اِنْ হরফে শর্ত نَشَأْ হলো ফে'লে শর্ত এবং نُنَزِّلْ জওয়াবে শর্ত।

قَوْلُهُ فَظَلَّتْ : فَاء -এর মাধ্যমে جَوَابُ شَرْطٍ -এর উপর عَطْفٌ -এর কারণে مَجْزُوْمٌ হয়েছে ظَلَّتْ -مَاضِىْ এর সীগার পূর্বে فَاءْ যুক্ত হওয়ায় مُضَارِعْ তথা نُنَزِّلْ -এর সাথে তার ব্যবহার বা প্রয়োগ সঙ্গত না হওয়ার কারণে مَاضِىْ -কে مُضَارِعْ -এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। ফলে عَطْفٌ সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمَّا وُصِفَتِ الْاَعْنَاقُ الخ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : اَعْنَاقٌ শব্দটি عُنُقٌ -এর বহুবচন। আর এটা ذَوِى الْعُقُوْلِ তথা বোধসম্পন্নের অন্তর্গত নয়। বিধায় এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর বিধানে গণ্য হয়। এ হিসেবে এর সিফত خَاضِعَةٌ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখানে خَاضِعِيْنَ উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : خُضُوْعٌ তথা অবনত হওয়া বিবেকসম্পন্ন বস্তুর বিশেষণ। আর বিবেকহীন বস্তুর প্রতি তার সম্বন্ধ হলে তাকে বিবেকবানের পর্যায়ে গণ্য করে তার বহুবচন ون দ্বারা উল্লেখ করা বৈধ হয়। যেমনটা আল্লাহ তা'আলার বাণী- رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ -এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

এর অপর একটি উত্তর এই যে, ظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ -এর দ্বারা ظَلَّتْ اَصْحَابُ اَعْنَاقِهِمْ তথা ঘাড় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। مُضَافٌ -কে বিলোপ করে مُضَافٌ اِلَيْهِ তথা خَبَرٌ -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرٍ : এর মধ্যে مِنْ অতিরিক্ত। আর مِنَ الرَّحْمٰنِ -এর মধ্যকার مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ مُحْدَثٌ : এটা ذِكْرٌ -এর صِفَتْ كَاشِفَةٌ [স্পষ্টকারক বিশেষণ], কেননা مَايَاتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ দ্বারা যে مَعْنَى حَدَثِيْ তথা অস্থায়ী বা ধাতু অর্থ বুঝে আসে مُحْدَثٌ দ্বারা তার تَاكِيْد উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَاٰيَةً : لَاٰيَةً হলো اِنَّ -এর اِسْمُ مُؤَخَّرٌ -এর لَامْ টি অতিরিক্ত। এ আয়াতটি এ সূরায় ৮বার উল্লিখিত হয়েছে। مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ -এর ব্যাখ্যা فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে কাফেরদের ঈমান না আনার বিষয়ে অবহিত করা। সুতরাং كَانَ [অতীতকালীন ক্রিয়া] দ্বারা তা উল্লেখ কিভাবে সঙ্গত হলো?

উত্তর : ১. এর অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ইলমে আগে থেকেই চূড়ান্ত রয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না। এ হিসেবে অতীতকালীন ক্রিয়া উল্লেখ করা হয়েছে। এ উত্তরটি كَانَ -কে اَصْلِىْ গণ্য করে দেওয়া হয়েছে।

২. মুফাসসির (র.) وَقَالَ سِيْبَوَيْهِ দ্বারা এর দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, এখানে كَانَ অতিরিক্ত। সুতরাং আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা ঈমান আনয়নকারী নয়।

জ্ঞাতব্য : وَكَانَ قَالَ سِيْبَوَيْهِ বাক্যটি অস্পষ্ট। বস্তুত قَالَ سِيْبَوَيْهِ كَانَ زَائِدَةً বললে তা স্পষ্ট হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করা যায়। আম্বিয়া কেরাম মানবজাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হন, পক্ষান্তরে কবিগণ শুধু সাময়িকভাবে কোনো কোনো মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফের মুশরিকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো, তাই তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হতেন। তার এ আকাঙ্ক্ষা হতো, যদি তার ঈমান আনতো তবে কত ভালো হতো! তাই এ সূরার প্রারম্ভে প্রিয়নবী ﷺ-কে একথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ! যদি এ কাফের মুশরিকরা ঈমান না আনে, তবে কি আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন? এরপর কয়েকজন প্রখ্যাত নবী রাসূলের বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁদের উম্মতিরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছে? তা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে যে, অবাধ্য কাফেরদের অন্যায় আচরণ নতুন কোনো বিষয় নয়; পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথেও এমন অন্যায় আচরণ করা হয়েছে; যা কাফের-মুশরিকদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়বনী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের সুস্পষ্ট দলিল ও জ্বলন্ত প্রমাণ। এরপর প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্যে এবং তাঁর নবুয়ত অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সাতজন পয়গাম্বরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলারপক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবী ﷺ -এর মুবারক কলবে নাজিল করা হয়েছে। এরপর একথাও ইরশাদ হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সম্পর্কে আহলে কিতাবদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অবগত, তারা খুব ভালো করেই জানে যে এটি আল্লাহ

তা'আলার ওহী; কাব্য বা জাদু নয়; বরং এটা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী যা দ্বারা সত্য-অসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যাতে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ। কাব্য ও জাদুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮, পৃ. ৫০৫]

স্বপ্নের তাবীর : যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে সে এ সূরা তেলাওয়াত করছে, তবে তার তাৎপর্য হবে এই– যদিও তার আর্থিক সংকট থাকবে, কিন্তু তাকে সর্বদা মিথ্যা এবং অহেতুক কথা থেকে হেফাজত করা হবে।

শানে নুযূল : মক্কাবাসীরা যখন প্রিয়নবী ﷺ -কে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের এ আচরণ তাঁর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। কেননা প্রিয়নবী ﷺ-এর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন মক্কাবাসীরা ঈমানদার হয়ে যায়। সম্ভবত প্রিয়নবী ﷺ মক্কাবাসীর ঈমান না আনার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, এজন্যে যে, হয়তো আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনে না দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনি কি তাদের দুশ্চিন্তায় নিজেকে শেষ করে দেবেন?

قَوْلُهُ طٰسٓمٓ : আল্লামা বগভী (র.) ইকরিমা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

আলী ইবনে তালহা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো শপথ, আল্লাহ পাকের নাম দ্বারা তিনি শপথ করেছেন, কেননা এ শব্দটি আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম। মুহাম্মদ ইবনে কারজী (র.) বলেছেন– ط -এর অর্থ হলো কুদরত বা শক্তি আর س অর্থ নূর এবং م অর্থ مَجْد বা শ্রেষ্ঠত্ব।

অতএব, এ অক্ষরগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা, তাঁর নূর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অক্ষরগুলো অন্যান্য 'মুকাত্তাআতের' ন্যায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর মধ্যে একটি রহস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। –[তাফসীরে তাবারী খ. ১৯, পৃ. ৩৭]

قَوْلُهُ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ : শব্দটি بَخْع থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জবাই করতে বিখা' [গর্দানের একটি শিরা] পর্যন্ত পৌঁছা। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশে পতিত করা। আল্লামা আসকারী (র.) বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার খবরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য নিষেধ করা। অর্থাৎ হে পয়গাম্বর! স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই কোনো কাফের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা জন্য অধিক দুঃখ না করা উচিত।

قَوْلُهُ إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ : আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে فَظَلُّوْا لَهَا خَاضِعِيْنَ অর্থাৎ কাফেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে اَعْنَاقٌ [গর্দান] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গর্দানে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তৌহিদ ও কুদরতের এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি ও আল্লাহর স্বরূপ জাজ্বল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার জো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাজ্বল্যমান না হওয়া বরং চিন্তাভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবি। চিন্তাভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই ছওয়াব ও আজাব বর্তিত। জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। এতে ইবাদত ও আনুগত্যের শান নেই। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ زَوْجٍ كَرِيْمٍ : زَوْج -এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে زَوْج বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে। সেগুলোকে এ দিক দিয়ে زَوْج বলা যায়। কোনো সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে زَوْج বলা যায়। كَرِيْم শব্দের অর্থ– উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

অনুবাদ :

١٠. وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى لَيْلَةً رَاَى النَّارَ وَالشَّجَرَةَ اَنِ اَىْ بِاَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ رَسُوْلًا .

১০ স্মরণ করুন হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার সম্প্রদায়ের কথা যখন আপনার প্রতিপালক হযরত মূসা (আ.)-কে ডেকে বললেন, যে রাতে হযরত মূসা (আ.) গাছে অগ্নি দেখতে পেলেন। তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও। রাসূল হিসেবে।

١١. قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط مَعَهُ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ بِاللّٰهِ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِاسْتِعْبَادِهِمْ اَلَا الْهَمْزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ يَتَّقُوْنَ . اَللّٰهَ بِطَاعَتِهٖ فَيُوَحِّدُوْنَهُ .

১১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট সে সহ তারা আল্লাহর সাথে কুফরি ও বনী ইসরাঈলকে ভৃত্য বানানোর কারণে নিজেদের উপর জুলুম করেছে। اَلَا -এর হামযাটি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তারা কি ভয় করে না? আল্লাহকে তার আনুগত্যে? ফলে তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী হতো।

١٢. قَالَ مُوْسٰى رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ .

১২. তখন তিনি হযরত মূসা (আ.) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশঙ্কা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে।

١٣. وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ مِنْ تَكْذِيْبِهِمْ لِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ بِاَدَاءِ الرِّسَالَةِ لِلْعُقْدَةِ الَّتِىْ فِيْهِ فَاَرْسِلْ اِلٰى اَخِىْ هٰرُوْنَ مَعِىْ .

১৩. এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে আমাকে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে। আমার জিহবা তো সাবলীল নয় রিসালত আদায়ে বা প্রকাশে তাঁর জিহ্বায় জড়তা থাকার কারণে। সুতরাং আমার ভাই হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান আমার সাথে।

١٤. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ بِقَتْلِ الْقِبْطِيِّ مِنْهُمْ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ بِهٖ .

১৪. আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ আছে তাদের মধ্য হতে এক কিবতীকে হত্যা করার কারণে। আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে সেই কারণে।

١٥. قَالَ تَعَالٰى كَلَّا ج اَىْ لَا يَقْتُلُوْنَكَ فَاذْهَبَا اَىْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ فَفِيْهِ تَغْلِيْبُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُوْنَ . مَا تَقُوْلُوْنَ وَمَا يُقَالُ لَكُمْ اُجْرِيَا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ .

১৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, না, কখনোই নয় অর্থাৎ তারা আপনাকে হত্যা করবে না অতএব আপনারা উভয়ে গমন করুন আপনি ও আপনার ভাই এখানে غَائِبْ -এর উপর حَاضِرْ তথা উপস্থিত ব্যক্তির تَغْلِيْبْ হয়েছে। আমার নিদর্শনসহ, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, শ্রবণকারী আপনারা যা বলেন এবং আপনাদেরকে যা বলা হয় সে সম্পর্কে। এখানে দ্বিবচনকে বহুবচনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

অনুবাদ :

١٦. فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا اِنَّا اَىْ كُلًّا مِّنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِلَيْكَ .

১৬. অতএব আপনারা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যান এবং বলুন আমরা অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। তোমার নিকট প্রেরিত।

١٧. اَنْ اَىْ بِاَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا اِلَى الشَّامِ بَنِىٓ اِسْرَائِيْلَ فَاَتَيَاهُ فَقَالَا لَهٗ مَا ذُكِرَ .

১৭. আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে শামদেশে যেতে দাও তখন তাঁরা উভয়ে তার নিকট এসে উল্লিখিত কথাগুলো বললেন।

١٨. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوْسٰى اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا فِىْ مَنَازِلِنَا وَلِيْدًا صَغِيْرًا قَرِيْبًا مِنَ الْوِلَادَةِ بَعْدَ فِطَامِهٖ وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ . ثَلَاثِيْنَ سَنَةً يَلْبَسُ مِنْ مَلَابِسِ فِرْعَوْنَ وَيَرْكَبُ مِنْ مَرَاكِبِهٖ وَكَانَ يُسَمّٰى اِبْنَهٗ .

১৮. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে আমাদের ঘরে লালন-পালন করিনি? শিশুকালে অর্থাৎ জন্মের নিকটবর্তী কালে দুধ ছাড়ানোর পর আর তুমি তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। ত্রিশ বছর। তিনি ফেরাউন-প্রদত্ত পোশাক পরিধান করতেন, তারই বাহনে আরোহণ করতেন এবং তাকে ফেরাউনের সন্তান বলা হতো।

١٩. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ هِىَ قَتْلُهُ الْقِبْطِىَّ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ . الْجَاحِدِيْنَ لِنِعْمَتِىْ عَلَيْكَ بِالتَّرْبِيَةِ وَعَدَمِ الْاِسْتِعْبَادِ .

১৯. এবং তুমি তোমার কর্ম যা করার তো করেছে আর তা হলো কিবতীকে হত্যা করা। তুমি অকৃতজ্ঞ তোমার প্রতি আমার যে অনুগ্রহ রয়েছে তোমাকে প্রতিপালন ও দাসে পরিণত না করার ব্যাপারে তা তুমি অস্বীকারকারী।

٢٠. قَالَ مُوْسٰى فَعَلْتُهَا اِذًا اَىْ حِيْنَئِذٍ وَاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ . عَمَّا اٰتَانِىَ اللّٰهُ بَعْدَهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالرِّسَالَةِ .

২০. হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন ছিলাম অনবধান। আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীকালে আমাকে যে জ্ঞান ও রিসালত প্রদান করেছেন, সেটা ছিল তার পূর্বের ঘটনা।

٢١. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا عِلْمًا وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .

২১. অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল মনোনীত করেছেন।

অনুবাদ :

٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَصْلُهُ تَمُنُّ بِهَا اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ ـ بَيَانٌ لِتِلْكَ النِّعْمَةِ اَيْ اتَّخَذْتَهُمْ عَبِيْدًا وَلَمْ تَسْتَعْبِدْنِيْ لَانِعْمَةَ لَكَ بِذٰلِكَ لِظُلْمِكَ بِاسْتِعْبَادِهِمْ وَقَدَّرَ بَعْضُهُمْ اَوَّلَ الْكَلَامِ هَمْزَةَ اِسْتِفْهَامٍ لِلْاِنْكَارِ ـ

২২. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ تَمُنُّهَا মূলত ছিল تَمُنُّ بِهَا তথা যার দ্বারা তুমি খোটা দিচ্ছ। তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ। এটা ঐ নিয়ামতের বিবরণ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তুমি দাসে পরিণত করেছ আর আমাকে দাসে রূপান্তরিত করনি। এটা তোমার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা হলো তোমার অত্যাচার ও অবিচার। কেউ কেউ উক্ত বাক্যের শুরুতে هَمْزَة اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ– اَتِلْكَ نِعْمَةٌ তথা এটা কি কোনো অনুগ্রহ?

٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوْسٰى وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الَّذِيْ قُلْتَ اِنَّكَ رَسُوْلُهُ اَيْ اَيُّ شَيْءٍ هُوَ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ سَبِيْلٌ لِلْخَلْقِ اِلٰى مَعْرِفَةِ حَقِيْقَتِهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا يَعْرِفُوْنَهُ بِصِفَاتِهِ اَجَابَ مُوْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِبَعْضِهَا ـ

২৩. ফেরাউন বলল হযরত মূসা (আ.)-কে জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কি? যা তুমি বলেছ যে, তুমি তাঁর রাসূল। তিনি কে? বা তা আবার কি জিনিস? যেহেতু মাখলুখের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত পরিচয় লাভ করার কোনো উপায় নেই; বরং তার গুণাবলি দ্বারা পরিচয় লাভ করতে পারে। তাই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কিছু সিফাত বা গুণাবলি উল্লেখ করেছেন।

٢٤. قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط اَيْ خَالِقُ ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ـ بِاَنَّهُ تَعَالٰى خَالِقُهُ فَاٰمِنُوْا بِهِ وَحْدَهُ ـ

২৪. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক অর্থাৎ এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও যে, তিনি এর সৃষ্টিকর্তা তবে তোমরা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন কর।

٢٥. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ اَشْرَافِ قَوْمِهِ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ـ جَوَابَهُ الَّذِيْ لَمْ يُطَابِقِ السُّؤَالَ ـ

২৫. ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে তার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে বলল, তোমরা শুনছ তো? তার উত্তর যা প্রশ্নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

٢٦. قَالَ مُوْسٰى رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ وَهٰذَا وَاِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيْمَا قَبْلَهُ يَغِيْظُ فِرْعَوْنَ ـ

২৬. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণেরও প্রতিপালক। এ কথাটি যদিও পূর্বের কথায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে যেহেতু এটি ফেরাউনকে ক্রোধান্বিত করে–

অনুবাদ :

২৭. وَلِذٰلِكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ـ

২৭. তাই ফেরাউন বলে উঠল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয় পাগল।

২৮. قَالَ مُوْسٰى رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ اِنَّهٗ كَذٰلِكَ فَاٰمِنُوْا بِهٖ وَحْدَهٗ ـ

২৮. হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক। যদি তোমরা বুঝতে যে, সত্যিই তিনি তাই, তবে সে একক সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে।

২৯. قَالَ فِرْعَوْنُ لِمُوْسٰى لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ كَانَ سِجْنُهٗ شَدِيْدًا يُحْبَسُ الشَّخْصَ فِىْ مَكَانٍ تَحْتَ الْاَرْضِ وَحْدَهٗ لَا يَبْصُرُ وَلَا يَسْمَعُ فِيْهِ اَحَدًا ـ

২৯. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলারূপে গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। তার কারাগার ছিল ভয়ানক কঠোর, সে মানুষকে মাটির নিচে একাকী আবদ্ধ করে রাখত। তথায় সে কাউকে দেখতোও না এবং কারো কথাও শুনত না।

৩০. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اَوَلَوْ اَىْ اَتَفْعَلُ ذٰلِكَ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ـ اَىْ بُرْهَانٍ بَيِّنٍ عَلٰى رِسَالَتِىْ ـ

৩০. হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তবুও কি? অর্থাৎ তুমি তাই করবে আমি যদি তোমার নিকট সুস্পষ্ট কোনো নিদর্শন আনয়ন করি। অর্থাৎ আমার রিসালতের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি।

৩১. قَالَ فِرْعَوْنُ لَهٗ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْهِ ـ

৩১. ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর। এ ব্যাপারে।

৩২. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ـ حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ ـ

৩২. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হলো। বিশালকায় সর্পে পরিণত হয়ে গেল।

৩৩. وَنَزَعَ يَدَهٗ اَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهٖ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ ذَاتُ شُعَاعٍ لِلنّٰظِرِيْنَ ـ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ ـ

৩৩. এবং হযরত মূসা (আ.) হাত বের করলেন তিনি তা স্বীয় বগলের নিচ হতে বের করলেন তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো অর্থাৎ পূর্বের বাদামী রঙের বিপরীত দেখা গেল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنْ اَىْ بِاَنْ : এ ব্যাখ্যার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ-এর পূর্বে بَا حَرْف جَرّ উহ্য রয়েছে। কেউ কেউ اَنْ-কে تَفْسِيْرِيَّةٌ-ও বলেছেন। কেননা نَادٰى [আহবান করল] শব্দটি হলো قَالَ অর্থে।

قَوْلُهُ رَسُوْلًا : এটা اِئْتِ-এর যমীরের حَالْ বা অবস্থাবাচক পদ। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেরাউন অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপরন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করার অর্থ হলো ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা। কেননা অন্যায় ও ফেতনা-ফ্যাসাদের মূল হোতা-ই হলো ফেরাউন।

قَوْلُهُ وَبَنِىْ اِسْرَائِيْل : এর عَطْف হলো اَنْفُسَهُمْ-এর উপর, اِسْتِعْبَادْ-এর অর্থ হলো গোলামের ন্যায় আচরণ করা। অর্থাৎ, তাদের দ্বারা দুরূহ কষ্টকর কাজ করানো। প্রকৃত গোলাম বানানো উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا الْهَمْزَةَ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِىْ : সঠিক কথা এই যে, এ হামযাটি تَعَجُّبْ তথা বিস্ময়জ্ঞাপক, اِنْكَارْ তথা অস্বীকারসূচক নয়। যেমন– মুফাসসির (র.) উল্লেখ করেছেন। কেননা لَا تَتَّقُوْنَ ক্রিয়াটি حَرْفُ نَفْىٍ তথা لَا-এর মাধ্যমে مُنْفِىْ বা নেতিবাচক হয়েছে। এর উপর هَمْزَةُ اِنْكَارِىْ প্রবিষ্ট হলে نَفْىُ النَّفِىْ হিসেবে اِثْبَاتْ হয়ে যায়। আর তা সঠিক নয়। কেননা এ সময় অর্থ হবে– "হে মূসা! তুমি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট গমন কর! কারণ সে আল্লাহকে ভয় করে।" আর এ অর্থ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

قَوْلُهُ قَالَ مُوْسٰى اِنِّىْٓ اَخَافُ الخ : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের সম্মুখে তিনটি আপত্তি পেশ করেছেন। যথা– ১. আমাকে মিথ্যাবাদী বলার আশঙ্কা করছি। ২. আমাকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করলে মন খারাপ হয়ে যাবে। ৩. আমার মুখে জড়তা রয়েছে। বস্তুত আল্লাহর নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে এসব আপত্তি করেননি; বরং রিসালতের গুরু দায়িত্ব পালনে স্বীয় অপারগতা, অযোগ্যতা এবং বাস্তবতা প্রকাশকল্পে এবং এ মর্মে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য কামনাকল্পে এ আপত্তি ছিল।

قَوْلُهُ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ : এটা হয়তো جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ হিসেবে مَرْفُوْعٌ হবে অর্থাৎ পূর্বের সাথে এর কোনো সম্বন্ধ নেই; বরং আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিজ অবস্থার বর্ণনা। অথবা اِنِّىْ اَخَافُ-এর মধ্যকার اِنَّ-এর خَبَرْ হওয়ার কারণে তা مَرْفُوْعٌ হবে।

قَوْلُهُ اُجْرِيَا مَجْرَى الْجَمَاعَةِ : এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : হযরত মূসা ও হারূন ছিলেন দু'ব্যক্তি। কাজেই দ্বিবাচনিক শব্দ তথা اِنَّا مَعَكُمَا উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল অথচ مَعَكُمْ তথা বহু বাচনিক শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : সম্মানার্থে দ্বিবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ كُلًّا مِنَّا : এ বাক্য দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

প্রশ্ন : اِنَّا-এর اِسْمٌ ও خَبَرٌ-এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা নেই। কেননা رَسُوْل হলো خَبَرٌ এটা مُفْرَدٌ; আর যে বিষয়ে খবর দেওয়া হয়েছে (مُخْبَرٌ عَنْهُ) হলো اِنَّا এর মধ্যকার نَا যমীর, আর এটা বহুবচন।

উত্তর : اِنَّا মূলত كُلًّا مِنَّا-এর অর্থ বিশিষ্ট, আর এটা مُفْرَدٌ-এর বিধানে শামিল। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ فَاَتَيَاهُ : এ বাক্য উহ্য মানার কারণ হলো এটা বুঝানো যে, قَالَ فِرْعَوْنُ বাক্যটিকে উহ্য ফে'লের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আরো কথা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ قَرِيْبًا مِنَ الْوِلَادَةِ بَعْدَ فِطَامِهِ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : وَلِيْدٌ বলা হয় নবজাতক দুগ্ধ পোষা শিশুকে। আর হযরত মূসা (আ.) তো এ সময় তার মায়ের নিকট ছিলেন। সুতরাং ফেরাউনের প্রতিপালনে থাকার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : وَلِيْدٌ দ্বারা দুধ ছাড়ানোর সময়কাল উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, আয়াতকে স্বাভাবিক অর্থে রাখলেই ভালো হয়। তখন এর ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা দুধপানের সময়কালে যদিও তিনি তাঁর মায়ের নিকট ছিলেন; কিন্তু তত্ত্বাবধান ও ব্যয়ভার ফেরাউনের উপর ছিল। কাজেই ফেরাউনের نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا "শৈশবে তোমাকে আমি আমাদের মাঝে লালন করেছি" বলাটা যথার্থ।

قَوْلُهُ مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ : এখানে مِنْ تَبْعِيْضِيَّةٌ আর مِنْ عُمْرِكَ হলো سِنِيْنَ -এর সিফত। আগে আসার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়ে حَالٌ হয়েছে। কেননা نَكِرَةٌ -এর সিফত আগে আসলে তা حَالٌ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ : অর্থাৎ যখন তোমাদের থেকে নির্যাতনের আশঙ্কাবোধ করলাম তখন আমি পলায়ন করলাম। হযরত মূসা (আ.) সে সময় নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন যখন তাকে জানানো হলো যে– اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ অর্থাৎ "লোকজন তোমাকে হত্যার শলাপরামর্শ করছে।" [সূরা কাসাস : ২০] مِنْكُمْ -এর যমীরটি বহুবচন উল্লেখের কারণ লোকজনের শলা-পরামর্শের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, অন্যথা مِنْكَ বলতেন। কারণ আলাপ হচ্ছে কেবল ফেরাউনের সাথে।

قَوْلُهُ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ : এটা একটা অনুগ্রহ, যাকে কেন্দ্র করে তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ। এখানে تِلْكَ দ্বারা তার প্রতিপালনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা اَلَمْ نُرَبِّكَ দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে। تِلْكَ হলো مُبْتَدَأٌ আর نِعْمَةٌ হলো مَوْصُوْف ; تَمُنُّهَا বাক্য হয়ে সিফত হয়েছে– صِفَتْ . مَوْصُوْف মিলে خَبَرْ আর مُبْتَدَأ–خَبَرْ মিলে مُبَيِّنْ – اَنْ হলো عَطْفُ بَيَانٍ . تَمُنُّهَا মূলত تَمُنُّ بِهَا ছিল। حَرْفُ جَرٍّ কে বিলোপ করে যমীরকে ফে'লের সাথে মিলিত করা হয়েছে। কেমন যেন এটা حَذْفُ وَاتِّصَالُ -এর অন্তর্গত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে তোমার ভৃত্য না বানানো আমার উপর তোমার বিশেষ করুণা নয়। কারণ আমার জাতির অন্য সবাইকে ভৃত্যে পরিণত করে রেখে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। অতএব বেশি থেকে বেশি এটা বলতে পার যে তোমাকেও ভৃত্য না বানিয়ে তোমার উপর অত্যাচার করিনি। আর অত্যাচার না করা কোনো দয়া– অনুকম্পা নয়; বরং অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকা তো সবার মৌলিক অধিকার।

কেউ কেউ وَتِلْكَ -এর পূর্বে একটি هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامٍ উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ মূলত ছিল اَوْ تِلْكَ نِعْمَةٌ এটা কি কোনো দয়া-অনুকম্পা? যাকে কেন্দ্র করে তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ যে, আমাকে ছেড়ে দিয়ে গোটা জাতিকে দাসে পরিণত করেছ। তাদেরকে তুমি দুঃসাধ্য কাজে বাধ্য করেছ এবং তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার বানাচ্ছ?

قَوْلُهُ فَاٰمِنُوْا بِهٖ : ব্যাখ্যাকার (র.) এ বাক্যটি উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ -এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ [ফেরউন প্রশ্ন করল- রাব্বুল আলামীন কে?] ফিরআউন مَا -এর মাধ্যমে প্রশ্ন করেছে। এটা প্রশ্নকৃত বস্তুর হাকিকত বা তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন বুঝায়। সুতরাং এখানে اَىْ দ্বারা প্রশ্ন করাই সঙ্গত ছিল, যা সিফত বা বিশেষণ বুঝায়; কিন্তু ফেরআউন তার মূর্খতার দরুন مَا هُوَ দ্বারা প্রশ্ন করেছে। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের মূর্খতার প্রতি ইঙ্গিত স্বরূপ উত্তরে সিফত তথা বিশেষণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহান আল্লাহর হাকীকত ও তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত নয়। দুনিয়ায় থেকে তার হাকীকত ও তত্ত্ব জানা সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ وَمَا بَيْنَهُمَا : **প্রশ্ন :** هُمَا দ্বারা سَمٰوٰتٌ ও اَرْضٌ তথা আসমান ও জমিন উদ্দেশ্য। আর سَمٰوٰتٌ শব্দটি বহুবচন; অতএব بَيْنَهُنَّ বলা সঙ্গত ছিল।

উত্তর : سَمٰوٰتٌ হলো একই জিন্স বা শ্রেণিগত, আর اَرْضٌ হলো আরেক শ্রেণি। সুতরাং উভয় শ্রেণি বুঝানোর জন্য هُمَا উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالَ فِرْعَوْنُ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ [ফেরআউন পার্শ্বের লোকজনকে বলল, তোমরা কি শুনছ না?] ফেরাউন তার এ উক্তি দ্বারা তার সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনদের মনে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে, দেখ! এ নবী দাবিদারের মধ্যে তো প্রশ্ন বুঝারই যোগ্যতা নেই। সুতরাং তার নবী হওয়ার দাবি কিভাবে সঠিক হতে পারে? আমি তাকে প্রশ্ন করেছি- রাব্বুল আলামীনের তত্ত্ব ও হাকীকত সম্পর্কে, আর সে উত্তর দিচ্ছে তার গুণাবলি দ্বারা। বস্তুত হযরত মূসা (আ.) যে এর দ্বারা ফেরাউনের প্রশ্নই যথার্থ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সে তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। আর যে এতটুকু বুঝার যোগ্যতা রাখে না, সে রব হওয়ার দাবি করতে পারে কোন মুখে? قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ [হযরত মূসা (আ.) বললেন, তিনি তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষদের প্রতিপালক।] এটা দ্বিতীয় উত্তর যদিও পূর্বে رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا -এর অধীনে চলে এসেছে তথাপি ফেরাউনকে রাগান্বিত করার উদ্দেশ্যে পুনরায় এ উত্তর দিলেন যে, তিনি শুধু আসমান ও জমিনেরই প্রতিপালক নন; বরং তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের স্রষ্টাও তিনিই। তাই ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে বলে উঠল اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ [তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল নিশ্চয় পাগল] ব্যাখ্যাকার (র.) এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তবে তাফসীরে কবীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) লিখেছেন আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কথা থেকে ধরন পরিবর্তন করে আল্লাহর পরিচয়দানের কারণ এই ছিল যে, ফেরাউন এ কথা বলার সম্ভাবনা ছিল যে, আসমান ও জমিন কারো সৃজিত নয়; বরং তা وَاجِبُ الْوُجُوْدِ তথা এমনিতেই অস্তিত্ব অবধারিত সত্তা কারো সৃজিত নয়। আর এ কথা বলা কোনো বিবেকবানের পক্ষে সম্ভব নয় যে, সে তার পিতা ও পূর্বপুরুষদেরকে وَاجِبُ الْوُجُوْدِ আখ্যা দিবে। কেননা এটা বাস্তবের পরিপন্থি। কারণ নাস্তির পরে তারা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, পরে আবার তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। আর যার উপর নাস্তি ভর করে তা নশ্বর হয়ে থাকে। কাজেই অবিনশ্বর এক সত্তার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় পরিচয়টি প্রথম পরিচয় থেকে অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : অতঃপর হযরত মূসা (আ.) সাথে সাথে তৃতীয় উত্তরের অবতারণা করলেন। এটা দ্বিতীয়টি থেকে আরো স্পষ্ট যে, "তিনি উদয় ও অস্তাচলের স্রষ্টা।" مَشْرِقٌ দ্বারা সূর্যোদয়, আর مَغْرِبٌ দ্বারা সূর্যাস্ত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দিনের উদয়াচল ও অস্তাচল ভিন্ন হয়ে থাকে। এ উদয়াস্ত কোটি কোটি বছর যাবত কোনোরূপ পার্থক্যও ত্রুটি ব্যতীত একইভাবে চলে আসছে। কোনো নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া তা আদৌ সম্ভব নয়। আর উক্ত নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক সত্তা হলেন আল্লাহ।

قَوْلُهُ الْاُدْمَةُ : اُدْمَةٌ -এর অর্থ হলো গমের রং, সোনালী ও বাদামীর মাঝামাঝি বর্ণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আনুগত্যের জন্য সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয় : ইরশাদ হচ্ছে-

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ . وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ . وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ .

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো আদেশ পালনের ব্যাপারে কোনো সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অন্বেষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর আদেশকে নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেরি করলেন কেন? কারণ হযরত মূসা (আ.) যা করেছেন তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ : হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য ضَلَالٌ শব্দের অর্থ : তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে; ফেরাউনের এই অভিযোগের জবাবে হযরত মূসা (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই হত্যা করেছিলাম ; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘুষি মেরেছিলাম, যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুয়তের পরিপন্থি। আর এই হত্যাকাণ্ড

অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضَلَالٌ শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদা ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় ضَلَالٌ শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ : মহিমান্বিত আল্লাহর সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের জন্য সম্ভবপর নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। হযরত মূসা (আ.) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা। −[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَائِيْلَ : বনী ইসলাঈল ছিল শাম দেশের বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফিরাউন বাধা দিত। এভাবে চারশত বছর ধরে তারা ফেরাউনের বন্দীশালায় গোলামির জীবন যাপন করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ ত্রিশ হাজার। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌঁছানোর সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। −[কুরতুবী]

পয়গাম্বরসুলভ বিতর্কের একটি নমুনা, বিতর্কের কার্যকরী রীতিনীতি : দুই ভিন্নমুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয় প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি হার-জিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবি সর্বাবস্থায় উচ্চে থাকতে হবে যদিও এর ভ্রান্তি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এর দাবিকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও মেধাশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে। এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোনো দাবি সত্য ও নির্ভুল হলেও তা খণ্ডনই করতে হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধন কার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করুন। হযরত মূসা ও হারূন (আ.) যখন ফেরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ীর দাবিদারকে তার দরবারে সত্যের পয়গাম পৌঁছালেন, তখন সে হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যক্তিগত দুইটি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূত্রপাত করল। যেমন সুচতুর প্রতিপক্ষ সাধারণত যখন আসল বিষয়ের জবাব দিতে সক্ষম হয় না, তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা খোঁজ করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। এখানেও ফেরাউন দুইটি বিষয় বর্ণনা করল। যথা− ১. তুমি আমাদের লালিত পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল? ২. তুমি একজন কিবতীকে অহেতুকে হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম তেমনি নিমকহারামি ও কৃতঘ্নতা। তুমি যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে পদার্পণ করেছ। তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে হযরত মূসা (আ.)-এর পয়গাম্বরসুলভ জবাব দেখুন। প্রথমত তিনি জবাবে প্রশ্নের ক্রম পরিরবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জবাব প্রথমে দিলেন, যা ফেরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত, পালিত হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জবাব পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এরূপ মনে হয় যে, হত্যা ঘটনার ব্যাপারে তাঁর একটি দুর্বলতা অবশ্যই ছিল। আজকালকার বিতর্কে এরূপ বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এর জবাবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জবাবও মোটামুটি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে দিলেন। স্বীকারোক্তি শুনে প্রতিপক্ষ যে বলবে, তিনি দোষ স্বীকার করে পরাজয় মেনে নিয়েছেন, এদিকে তিনি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেননি।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর জবাবে একথা স্বীকার করে নিলেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল বিচ্যুতি হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে এটা একটা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদপেক্ষ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম করা থেকে বিরত করা। এ লক্ষ্যেই তাকে একটি ঘুষি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল ভ্রান্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুয়ত দাবির

সত্যতায় এটা কোনোরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জানতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুয়ত ও রিসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

চিন্তা করুন, শত্রুর বিপক্ষে তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট জবাব এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, যদি তিনি কিবতীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে তার হত্যার বৈধতার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতেন। তবে তাঁকে মিথ্যারোপ করার মতো ত কেউ সেখানে বিদ্যমান ছিল না। হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলে অন্য কেউ হলে সে তা-ই করত। কিন্তু সেখানে তো আল্লাহ তা'আলার একজন নিষ্ঠাবান এবং সততার মূর্তমান প্রতীক পয়গাম্বর ছিলেন, যিনি সত্য ও সততা প্রকাশ করাকেই বিজয় বলে গণ্য করতেন। তিনি শত্রুর জনাকীর্ণ দরবারে একদিকে নিজের বিচ্যুতি স্বীকার করে নিলেন এবং অপরদিকে এর কারণে নবুয়ত ও রিসালতে যে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিতে পারত, তারও জবাব প্রদান করলেন। এরপর প্রথমোক্ত বিষয় অর্থাৎ গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জবাব প্রদানে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের বাহ্যিক অনুগ্রহের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, চিন্তা কর, আমি কোথায় এবং ফেরাউনের দরবার কোথায়! যে কারণের উপর ভিত্তি করে আমি তোমার গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। তুমি বনী ইসরাঈলের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিলে এবং তাদের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা করছিলে। বাহ্যত তোমার এই জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আমার জননী আমাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করেন। ঘটনাক্রমে তুমি আমার সিন্দুক দরিয়া থেকে উদ্ধার করে আমাকে স্বগৃহে লালন-পালন কর। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহ তা'আলার বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থা এবং তোমার নির্যাতনের অদৃশ্য শাস্তি ছিল। যে ছেলের বিপদাশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তুমি হাজারো ছেলেকে হত্যা করেছিলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমারই গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন। এখন চিন্তা কর, আমার লালন-পালনে তোমার কি অনুগ্রহ ছিল। এই পয়গাম্বরসুলভ জবাব থেকে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী এ কথা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিল যে, ইনি প্রগলভ নন, সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেন না। এরপর বিভিন্ন মুজেযা দেখে এ কথার সত্যতা আরো পরিস্ফুট হয়ে গেল। তারা মুখে স্বীকার করেনি বটে; কিন্তু ভীত ও প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না। ফলে একদিকে মাত্র দুজন ব্যক্তি, যাদের অগ্র-পশ্চাতে তৃতীয় কোনো সাহায্যকারী ছিল না এবং অপরদিকে দরবারটি ফেরাউনের, শহর ও দেশ ফেরাউনের; কিন্তু ভয় ও আশঙ্কা এই যে, এরা দুইজন আমাদেরকে এই দেশ ও রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে ছাড়বে।

এ হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত প্রভাব এবং সততা ও সত্যের ভয়ভীতি। পয়গাম্বরগণের বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক এবং সততাও প্রতিপক্ষের ধর্মীয় হিতাকাঙ্খায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এরূপ বিতর্কই অন্তরে স্থায়ী আসন নিয়ে নিতে সক্ষম হয় এবং বড় বড় পাষণ্ডকে বশীভূত করে ছাড়ে।

হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার তাৎপর্য : তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে দুটি মুজেযা দান করেছেন। একটি হলো লাঠি, এর দ্বারা কাফের মুশরিক তথা পাপিষ্ঠদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর পর কবরে অজগর সর্প তাদেরকে লাগাতার দংশন করতে থাকবে, যতদিন লোকটি কবরে থাকবে, ততদিন বিষাক্ত সর্পের দংশন অব্যাহত থাকবে। আর হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মুজেযা হলো, তাঁর শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত। আর তার তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে নূরের নমুনা পেশ করা হয়েছে, যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যাদের অন্তর অন্ধ হয়ে থাকে তারা সূর্যের আলো কখনো দেখে না। লাঠির মুজেযা ছিল আজাবের প্রতীক, আর সমুজ্জ্বল হাতের মুজেযা হলো আলোর প্রতীক। আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েতের নূর দান করেন, তাঁর জীবনই হয় সার্থক এবং সুন্দর।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৪, পৃ. ২১৮-১৯]

অনুবাদ :

٣٤. قَالَ فِرْعَوْنُ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ - فَائِقٌ فِيْ عِلْمِ السِّحْرِ -

৩৪. ফেরাউন বলল তার পরিষদবর্গকে এতো এক সুদক্ষ জাদুকর জাদু বিদ্যায় সকলের শীর্ষে।

٣٥. يُرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ -

৩৫. সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার জাদু বলে বহিষ্কৃত করতে চায়। এখন তোমরা কি করবে বল?

٣٦. قَالُوْا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ أَخِّرْ أَمْرَهُمَا وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ جَامِعِيْنَ -

৩৬. তারা বলল, তাকেও তার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দাও অর্থাৎ তাদের উভয়ের বিষয়টি প্রলম্বিত কর। এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও।

٣٧. يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ - يَفْضُلُ مُوْسٰى فِيْ عِلْمِ السِّحْرِ -

৩৭. যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুকর উপস্থিত করে। যে জাদু বিদ্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

٣٨. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ - وَهُوَ وَقْتُ الضُّحٰى مِنْ يَّوْمِ الزِّيْنَةِ -

৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো। আর সেটা ছিল ঈদের দিন পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর।

٣٩. وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ -

৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হলো, তোমরাও সমবেত হচ্ছো কি?

٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ - اَلْاِسْتِفْهَامُ لِلْحَثِّ عَلَى الْاِجْتِمَاعِ وَالتَّرَجِّيْ عَلٰى تَقْدِيْرِ غَلَبَتِهِمْ لِيَسْتَمِرُّوْا عَلٰى دِيْنِهِمْ فَلَا يَتَّبِعُوْا مُوْسٰى -

৪০. যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়। هَلْ أَنْتُمْ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ আনা হয়েছে মূলত উপস্থিতির ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। আর তাদের বিজয় লাভের সম্ভাবনা থাকার দরুন تَرَجِّيْ তথা لَعَلَّ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে তারা স্বীয় ধর্মের উপর অটল থাকে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণ না করে।

٤١. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ -

৪১. অতঃপর জাদুকররা এসে ফেরাউনকে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? أَئِنَّ -এর হামযাদ্বয়কে সর্বাবস্থায় বহাল রেখে এর দ্বিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয় ক্ষেত্রে হামযাদ্বয়ের মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

٤٢. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا حِيْنَئِذٍ لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ -

৪২. ফেরাউন বলল, হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুবাদ :

٤٣. قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى بَعْدَ مَا قَالُوْا لَهٗ اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ـ فَالْاَمْرُ مِنْهُ لِلْاِذْنِ بِتَقْدِيْمِ اِلْقَائِهِمْ تَوَسُّلًا بِهٖ اِلٰى اِظْهَارِ الْحَقِّ ـ

৪৩. হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তাঁকে তাদের একথা বলার পর যে, হয়তো আপনি আগে আপনার জাদুর প্রদর্শনী দেখান, নতুবা আমরা আগে আমাদের জাদু প্রদর্শন করি। তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা তোমরা নিক্ষেপ কর। হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রথমে নিক্ষেপের অনুমতিদানের কারণ হলো যাতে এ অনুমতি সত্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে যায়।

٤٤. فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ـ

৪৪. অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল, ফেরাউনের ইজ্জতের শপথ আমরাই বিজয়ী হবো।

٤٥. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ تَبْتَلِعُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ يُقَلِّبُوْنَهٗ بِتَمْوِيْهِهِمْ فَيَتَخَيَّلُوْنَ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ اَنَّهَا حَيَّاتٌ تَسْعٰى ـ

৪৫. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন; সহসা তা গ্রাস করতে লাগল تَلْقَفُ -এর মধ্যে একটি تَاءْ -কে বিলুপ্ত করে পঠিত। তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে ঐ জিনিসগুলো স্বীয় নজরবন্দী করে ভেলকি সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাদের রশি ও লাঠিগুলোকে দ্রুত ধাবমান সর্পের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

٤٦. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ـ

৪৬. তখন জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে পড়ল।

٤٧. قَالُوْآ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

৪৭. তারা বলল, আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি।

٤٨. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ـ لِعِلْمِهِمْ بِاَنَّ مَا شَاهَدُوْهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَتَاَتّٰى بِالسِّحْرِ ـ

৪৮. যিনি হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর প্রতিপালক তাদের এ বিষয়টি উপলব্ধির ফলে যে, তারা লাঠির যে কীর্তি আলোকন করল তা জাদু বলে সম্ভব নয়।

٤٩. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَاٰمَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا لَهٗ لِمُوْسٰى قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ج اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَعَلَّمَكُمْ شَيْئًا مِنْهُ وَغَلَبَكُمْ بِاٰخَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ط مَا يَنَالُكُمْ مِنِّيْ ـ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ اَيْ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ الْيُمْنٰى وَرِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

৪৯. ফেরাউন বলল, কী ! তোমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে? ءَاٰمَنْتُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে। মূসার প্রতি আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই? সেই তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং সে তোমাদেরকে কিছু শিক্ষা দিয়েছে এবং অপর কিছুর দ্বারা [যা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়নি।] তোমাদের উপর বিজয় লাভ করেছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমার পক্ষ থেকে তোমরা কি [শাস্তি] পেতে যাচ্ছো। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কেটে দিব। অর্থাৎ প্রত্যেকের ডান হাত ও বাম পা এবং তোমাদের সকলকে শূলিবিদ্ধ করবোই।

৫০. قَالُوْا لَا ضَيْرَ زلَا ضَرَرَ عَلَيْنَا فِيْ ذٰلِكَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا بَعْدَ مَوْتِنَا بِاَيِّ وَجْهٍ كَانَ مُنْقَلِبُوْنَ ـ رَاجِعُوْنَ فِي الْاٰخِرَةِ ـ

৫১. اِنَّا نَطْمَعُ نَرْجُوْ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا اَنْ اَيْ بِاَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ زَمَانِنَا ـ

অনুবাদ :

৫০. তারা বলল, কোনো ক্ষতি নেই এতে আমাদের কোনোই ক্ষতি নেই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট মৃত্যুর পর যেভাবেই মৃত্যু আসুক প্রত্যাবর্তন করব পরকালে তাঁরই নিকট ফিরে যাব।

৫১. আমরা আশা পোষণ করি কামনা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করে দিবেন কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে অগ্রণী। আমাদের যুগে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْمَلَا : এটা اِسْمُ جِنْسٍ ; অর্থ- নেতৃবর্গ, পরিষদ। এর বহুবচন হলো- اَمْلَاءٌ

قَوْلُهُ اَرْجِهْ : এটা اِرْجَاءٌ মাসদার থেকে اَمْرٌ وَاحِدٌ حَاضِرٌ আর যমীরটি مَفْعُوْلٌ অর্থ অবকাশ দাও, ঢিল দাও।

قَوْلُهُ تَامُرُوْنَ : এটা মূলত تَامُرُوْنَنِيْ ছিল। [অর্থাৎ তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও]

قَوْلُهُ يَاتُوْكَ : এটা اَمْرٌ -এর جَوَابٌ হওয়ার কারণে مَجْزُوْمٌ হয়েছে [ফলে ن বর্ণটি বিলুপ্ত হয়েছে।]

قَوْلُهُ وَادْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ : এখানে বস্তুত وَعَلٰى تَرْكِ الْاِدْخَالِ বলা উচিত ছিল। তাহলে ৪টি কেরাত হতো।

قَوْلُهُ فَالْاَمْرُ فِيْهِ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর-

প্রশ্ন : হযরত মূসা (আ.) اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ বলে জাদুর ন্যায় একটি অন্যায় কাজের আদেশ দিলেন কিভাবে? কোনো নবীর পক্ষে এ ধরনের গর্হিত কুফরি কাজের আদেশ দেওয়া কিভাবে শোভনীয় হতে পারে?

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে নির্দেশ নয়। নির্দেশ আকারে অনুমতি প্রদান ছিল। কেননা জাদুকররা জিজ্ঞেস করেছিল যে, আপনি আগে নিক্ষেপ করবেন নাকি আমরা করব? হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে আগে শুরু করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই। তবে এ উত্তরের উপরও প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কুফরি কাজের অনুমতিও কুফর বলে বিবেচিত হয়, কাজেই অনুমতি দান করা কি সমীচীন হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য প্রকাশের জন্য জাদুকরদেরকে জাদু প্রদর্শনের অনুমতিদানের প্রয়োজন ছিল। যাতে তারা তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে। আর হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযা তাদের বাতুলতা ও ভ্রান্ত ধারণা নস্যাত করে উপস্থিত জনতাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কথার প্রতি আস্থাশীল বানাতে পারেন। ফলে তাদের সামনে হক ও বাতিল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর উদাহরণ হলো- মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা যদিও অন্যায়; কিন্তু পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে ফেলা দূষণীয় নয়; বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম কাজ। হযরত মূসা (আ.)-এর এ নির্দেশও এ পর্যায়ের ছিল।

قَوْلُهُ وَابْدَالُ الثَّانِيَةِ اَلِفًا : এখানে সঠিক ইবারত হলো- اِبْدَالُ الثَّالِثَةِ اَلِفًا কেননা তৃতীয় হামযাটিই আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত।

قَوْلُهُ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ : এ সবগুলো বাক্য رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -এর بَدَلٌ বা স্থলাভিষিক্ত পদ।

قَوْلُهُ يَافِكُوْنَ : এটা (ض) اِفْكٌ থেকে جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ -এর সীগাহ, অর্থ- গড়াগড়ি করা।

قَوْلُهُ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ الخ : অর্থাৎ জাদুকররা অযাচিতভাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে ভীত হলো যে, হয়তো তার পরিষদবর্গ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে ফেলবে, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার লক্ষ্যে বলল, এ হলো একজন সুদক্ষ জাদুকর, জাদুকরি বিদ্যায় সে নিঃসন্দেহে পারদর্শী। হযরত মূসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সে বলল, এ ব্যক্তি তার জাদুবিদ্যার বলে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়, এমন অবস্থায় তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও?

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে খোদায়ী দাবি করেছিল এবং একদল লোককে বশীভূত করে রেখেছিল, সে এখন হযরত মূসা (আ.)-এর দু'টি মুজেযা দেখে নিজেকে এত অসহায় মনে করেছে যে, আত্মরক্ষার জন্য তার পরিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাইছে। ফেরাউনের অন্তরে এ ভয় সৃষ্টি হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) অবশেষে বিজয় লাভ করবেন এবং তার সকল জারি জুরি ফাঁস হয়ে যাবে, তাই সে তাদেরকে বলেছে, মূসা জাদু বলে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়, এবং নিজে তোমাদের বাদশাহ হতে চায়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মানুষ অন্যের সম্পর্কে ধারণা করে নিজের উপর বিচার করে অর্থাৎ সে যেমন, অন্যকেও তেমনি মনে করে। ফেরাউন মানুষের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছিল। বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, সর্বত্র তার ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। হযরত মূসা (আ)-কে দেখে সে প্রথম এ ধারণাই করেছে যে, হয়তো তিনি এসেছেন তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে এবং নিজের রাজত্ব কায়েম করতে। অথচ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, তাকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসতে, তাকে চিরশান্তি প্রদান করতে। কিন্তু ফেরাউন ছিল হতভাগা, তাই হযরত মূসা (আ.)-এর সম্পর্কে সে ভুল ধারণা করেছে। আর সে জন্যে সে তার আপন লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করল।

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ : অর্থাৎ তারা বলল, তাঁকে ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে নকীব প্রেরণ কর। ফেরাউনের মোসাহেবরা তাকে এ পরামর্শ দিল যে, আপাতত মূসা ও তাঁর ভাইকে কিছু অবকাশ দিয়ে সারা দেশ থেকে বড় বড় জাদুকরদেরকে একত্র করা হোক।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে ফেরাউন শুধু যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল, তাই নয়; বরং ঐ মুহূর্তে তার পূর্বের আত্মম্ভরিতা কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায় এবং সে তার মোসাহেবদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হক্ব বা সত্যের একটা নিজস্ব শক্তি থাকে, বাতিল যত শক্তিশালীই হোক না কেন, হক্বের মুখোমুখি হওয়া বাতিলের পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র সাথী ছিলেন হযরত হারূন (আ.)। তাঁর কোনো সৈন্যবাহিনী ছিল না, কোনো প্রকার জাগতিক শক্তি তাঁর ছিল না; কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যসাধক, তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহবায়ক, আর তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূল। তাঁর নিকট রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী ফেরাউন তাই তাঁর মোকাবিলা করত সাহস করেনি; সে তাঁকে জাদুকর মনে করেছে এবং দেশের সমস্ত বড় বড় জাদুকরদেরকে তাঁর মোকাবেলা করার জনর‍্য একত্র করেছে।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ : এরপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো বর্ণিত আছে, মোসাহেবদের পরামর্শের পর ফেরাউন সারা দেশে তার লোকদেরকে প্রেরণ করল এবং দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বড় বড় জাদুকরদের একত্র করার ব্যবস্থা করল।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সেদিন ছিল শনিবার, তাদের জাতীয় উৎসবের দিন; সকাল বেলা চতুর্দিক ফর্সা হলে জাদুকররা এবং জনসাধারণ একত্র হলো।

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ : ফেরাউন শুধু জাদুকরদেরকেই একত্র করেনি; বরং তাদের পাশাপাশি জনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশেরও ব্যবস্থা করে, উন্মুক্ত ময়দানে অতি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সকলে একত্র হলো।

قَوْلُهُ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ : অর্থাৎ জাদুকররা যদি জয়লাভ করে তবে হয় আমরা তাদের অনুসরণ করতে পরি, আর জাদুকরদের পথই যে সত্য পথ, এতেও কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

কোনো কোনো তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে জাদুকর বলতে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে। কেননা ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে তাঁকে সুদক্ষ জাদুকর বলেছিল। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ; যদি জাদুকরদের মোকাবিলায় হযরত মূসা ও হারূন (আ.) বিজয়ী হন, তবে হয়তো আমরা তাঁদের অনুসরণ করব।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইতিপূর্বে ফেরাউনের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন কার্যত হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে ফেরাউনের জাদুকরদের মোকাবিলা হবে। তাদের উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ পাকের নূরকে নিষ্প্রভ করা, আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো ঐ নূরকে উদ্ভাসিত করা। তাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই বিজয় লাভ করল, আর কাফেরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। একথা সর্বজনবিদিত যে, যখনই ঈমান এবং কুফরিরর মোকাবিলা হয়েছে, তখন ঈমানই বিজয় লাভ করেছে। কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা বাতিলের মোকাবিলায় হক্বকে বিজয় দান করে থাকেন। হক্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রত্যেক শহরে ফেরাউন তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দক্ষ জাদুকরদের একত্র করা হয়েছে।

জাদুকরদের সংখ্যা : জাদুকরদের সংখ্যার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ১২ অথবা ১৫ অথবা ১৭ অথবা ১৯ অথবা ৩০ অথবা ৮০,০০০ অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ পাকই জানেন। সকলের উস্তাদ বা নেতা ছিল চারজন। যথা– সাবুর, আজুর, হতহত ও মাসহাফী।

যেহেতু এ ঘটনা সারা দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাই চতুর্দিক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বহু লোক একত্র হয়, সকলের মুখে একই কথা জাদুকরদের বিজয় হলে আমরা তাদের অনুসারী হবো। কারো মুখে এ কথা ছিল না যে, আমরা সত্যের অনুসারী হবো বাতিল বা অসত্যের অনুসারী হবো না।

قَوْلُهُ اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) জাদুকরদেরকে বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, তা প্রদর্শন কর। এতে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না; বরং তাদের যা কিছু করার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কোনো আল্লাহদ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমাদের আল্লাহদ্রোহিতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। বলা বাহুল্য, একে আদৌ আল্লাহদ্রোহিতায় সম্মতি বলা যায় না।

قَوْلُهُ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ : এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্য কসম পর্যায়ের। মূর্খতার যুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয় হলো আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চেয়েও মন্দ। উদাহরণত বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরিয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েজ; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম খাওয়াও তার চেয়ে কম পাপ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ : অর্থাৎ যখন ফেরাউন জাদুকরদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূলে চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, তুমি যা করতে পার, তা কর। আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাব। আর সেখানে আরামই আরাম! এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আজীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে ফেরাউনের মতো স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রঙও প্রকাশ পেয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। তারা পরকালের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোনো শাস্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা فاقض ما انت قاض [তোমার যা করবার করে ফেল] বলে দিয়েছে। এটাও প্রকৃতপক্ষে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা, যা লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মুজেযার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এ ধরনের ঘটনা আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতেও প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সত্তর বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং ঈমান আনয়নের পরক্ষণেই যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

٥٢. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى بَعْدَ سِنِيْنَ اَقَامَهَا بَيْنَهُمْ يَدْعُوْهُمْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَى الْحَقِّ فَلَمْ يَزِيْدُوْا اِلَّا عُتُوًّا اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَوَصْلِ هَمْزَةِ اَسْرِ مِنْ سَرٰى لُغَةٌ فِىْ اَسْرٰى اَىْ سِرْبِهِمْ لَيْلًا اِلَى الْبَحْرِ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُوْنَ ـ يَتَّبِعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ فَيَلِجُوْنَ وَرَاءَكُمُ الْبَحْرَ فَاُنْجِيْكُمْ وَاُغْرِقُهُمْ ـ

٥٣. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ حِيْنَ اُخْبِرَ بِسَيْرِهِمْ فِى الْمَدَائِنِ قِيْلَ كَانَ لَهٗ اَلْفُ مَدِيْنَةٍ وَاِثْنَتَا عَشَرَةَ اَلْفَ قَرْيَةٍ حٰشِرِيْنَ ج جَامِعِيْنَ الْجَيْشَ ـ

٥٤. قَائِلًا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ طَائِفَةٌ قَلِيْلُوْنَ قِيْلَ كَانُوْا سِتَّمِائَةِ اَلْفٍ وَسَبْعِيْنَ اَلْفًا وَمُقَدَّمَةُ جَيْشِهٖ سَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ فَقَلَّلَهُمْ بِالنَّظْرِ اِلٰى كَثْرَةِ جَيْشِهٖ ـ

٥٥. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ ـ فَاعِلُوْنَ مَا يُغِيْظُنَا ـ

٥٦. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ـ مُتَيَقِّظُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ حَاذِرُوْنَ مُسْتَعِدُّوْنَ ـ

অনুবাদ :

৫২. আমি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এই মর্মে ওহী করেছিলাম কয়েক বছর তাদের মাঝে অবস্থান করার পর। আর এসময় তিনি তাদের মাঝে আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শনাবলির মাধ্যমে তাদেরকে সত্যের প্রতি ডাকতে থাকেন। কিন্তু এতে করে তাদের হঠকারিতাই বৃদ্ধি পেতে থাকল। আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হোন বনী ইসরাইলকে নিয়ে। অপর এক কেরাতে اَنْ-এর نُوْن-এর নিচে যের এ اَسْرِ-এর هَمْزَة টি وَصْل-এর সাথে পঠিত রয়েছে; هَمْزَة (ض) سَرٰى হতে নিষ্পন্ন। যা اَسْرٰى-এর অপর এক লোগাতে রয়েছে [سَيْر তথা ভ্রমণ অর্থে] অর্থাৎ তাদেরকে নিয়ে রাতের আঁধারে সমুদ্র পানে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী আপনাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সমুদ্রে নেমে পড়বে, তখন আমি আপনাদেরকে পরিত্রাণ দিব এবং তাদেরকে ডুবিয়ে মারব।

৫৩. অতঃপর ফেরাউন প্রেরণ করল যখন তাদের নৈশ ভ্রমণ তথা রাতের আঁধারে পলায়নের সংবাদ অবগত হলো শহরে শহরে বলা হয় যে, তার কর্তৃত্বাধীন শহরের সংখ্যা ছিল এক হাজার এবং গ্রামের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। সংগ্রহকারী সৈন্য জমায়েতকারী।

৫৪. আর তাদেরকে এ বলে উৎসাহিত করল যে, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল কথিত আছে যে, তারা ছিলেন ছয় লক্ষ সত্তর হাজার অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়। আর ফেরাউনের অগ্রজ দলেই ছিল সাতলক্ষ। ফেরাউন সম্প্রদায় নিজেদের সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদেরকে অতি অল্প ও নগণ্য মনে করল।

৫৫. তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে। আমাদের রাগান্বিত হওয়ার কর্ম করেছে।

৫৬. এবং আমরা সকলেই সদা শঙ্কিত সতর্ক। অন্য কেরাতে حَاذِرُوْنَ রয়েছে। যার অর্থ– প্রস্তুত।

অনুবাদ :

٥٧. قَالَ تَعَالٰى فَاَخْرَجْنَاهُمْ اَىْ فِرْعَوْنَ وَجُنُوْدَهُ مِنْ مِصْرَ لِيَلْحَقُوا مُوْسٰى وَقَوْمَهُ مِنْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ كَانَتْ عَلٰى جَانِبَى النِّيْلِ وَّعُيُوْنٍ ـ اَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِى الدُّوْرِ مِنَ النِّيْلِ ـ

৫৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন পরিণামে আমি তাদেরকে বহিষ্কৃত করলাম অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে মিশর হতে। যাতে তারা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হতে পারে। উদ্যানরাজি নীল নদের দু'পার্শ্বে অবস্থিত। ও প্রস্রবণ হতে। যা নীলনদ হতে তাদের ঘর বাড়িতে প্রবাহিত ছিল।

٥٨. وَكُنُوْزٍ اَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسُمِّيَتْ كُنُوْزًا لِاَنَّهُ لَمْ يُعْطَ حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهَا وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ ـ مَجْلِسٍ حَسَنٍ لِلْاُمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ يَحْفِهِ اَتْبَاعُهُمْ ـ

৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা كُنُوْز হলো প্রকাশ্য ও বাহ্যিক সম্পদ যেমন স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি كُنُوْز নামকরণের কারণ হলো তা থেকে আল্লাহর হক আদায় করা হয়নি। রাজা-বাদশাহ ও মন্ত্রীদের জন্য নির্মিত সুদর্শন মিলনায়তন যাকে তাদের অনুসারীরা ঘিরে রাখে।

٥٩. كَذٰلِكَ ج اَىْ اِخْرَاجُنَا كَمَا وَصَفْنَا وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ـ بَعْدَ اِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ـ

৫৯. এরূপেই ঘটেছিল অর্থাৎ আমার বহিষ্কার এরূপই যেমনটি বর্ণনা করলাম এবং বনী ইসলাঈলকে করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মারার পর।

٦٠. فَاَتْبَعُوْهُمْ لَحِقُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ـ وَقْتَ شُرُوْقِ الشَّمْسِ ـ

৬০. তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল। তাদের সাথে মিলিত হলো সূর্য উদয়ের সময়ে।

٦١. فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ اَىْ رَاٰى كُلٌّ مِّنْهُمَا الْاٰخَرَ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ج يُدْرِكُنَا جَمْعُ فِرْعَوْنَ وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ

৬১. অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে দেখল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। আমাদেরকে ফেরাউন বাহিনী পেয়ে যাবে অথচ তাদের মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই।

٦٢. قَالَ مُوْسٰى كَلَّا ج اَىْ لَنْ يُّدْرِكُوْنَا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ بِنَصْرِهٖ سَيَهْدِيْنِ ـ طَرِيْقَ النَّجَاةِ ـ

৬২. হযরত মূসা (আ.) বললেন, কখনো নয় অর্থাৎ তারা কখনোই আমাদেরকে ধরতে পারবে ন আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক অর্থাৎ তাঁর সাহায্য সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন। মুক্তির পথ।

٦٣. قَالَ تَعَالٰى فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَضَرَبَهٗ فَانْفَلَقَ انْشَقَّ اِثْنَىْ عَشَرَ فِرْقًا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ج الْجَبَلِ الضَّخْمِ بَيْنَهَا مَسَالِكُ سَلَكُوْهَا لَمْ يَبْتَلَّ مِنْهَا سُرُجُ الرَّاكِبِ وَلَا لِبْدُهٗ.

٦٤. وَاَزْلَفْنَا قَرَّبْنَا ثَمَّ هُنَالِكَ الْاٰخَرِيْنَ. فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ حَتّٰى سَلَكُوْا مَسَالِكَهُمْ.

٦٥. وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ج بِاِخْرَاجِهِمْ مِنَ الْبَحْرِ عَلٰى هَيْئَتِهِ الْمَذْكُوْرَةِ.

٦٦. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ. فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهٗ بِاِطْبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ لَمَّا تَمَّ دُخُوْلُهُمُ الْبَحْرَ وَخُرُوْجُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْهُ.

٦٧. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ اِغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ لَاٰيَةً عِبْرَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. بِاللّٰهِ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ غَيْرُ اٰسِيَةَ اِمْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَحِزْقِيْلَ مُؤْمِنِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ نَامُوْسٰى الَّتِىْ دَلَّتْ عَلٰى عِظَامِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

٦٨. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ فَانْتَقَمَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ بِاِغْرَاقِهِمْ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فَاَنْجَاهُمْ مِنَ الْغَرَقِ.

অনুবাদ :

৬৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর! তিনি তাতে আঘাত করলেন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে বার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। বৃহৎ পাহাড়ের মতো, সেগুলোর মাঝে রাস্তা হয়ে গেল। আর তারা উক্ত রাস্তা বেয়ে পার হয়ে গেল। অথচ আরোহীর গাদি এবং তাদের জিন পর্যন্ত সিক্ত হলো না।

৬৪. আমি সেথায় উপনীত করলাম নিকটবর্তী করলাম অপর দলটিকে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায় [সেনাবাহিনী] -কে এবং তারা বনী ইসরাঈলের উক্ত পথে চলতে লাগল।

৬৫. এবং আমি উদ্ধার করলাম হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গী সকলকে। উল্লিখিত সুরতে তাদেরকে সমুদ্র পার করিয়ে দিয়ে।

৬৬. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় [বাহিনী]-কে তাদের উপর সমুদ্রের পানি চাপিয়ে দিয়ে যখন তাদের সমুদ্রে প্রবেশ ও বনী ইসরাঈলদের তা থেকে বের হওয়া পূর্ণ হলো।

৬৭, এতে অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করার মধ্যে নিদর্শন তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী নয়। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, ফেরাউন বংশীয় হিযকীল নামক জনৈক মুমিন এবং মারাইয়াম বিনতে নামূসা, যিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দেহাবশেষের ব্যাপারে নির্দেশনা দান করেছিলেন, এ কজন ছাড়া কেউই ঈমান আনয়ন করেনি।

৬৮. আপনার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী তিনি কাফেরদেরকে নিমজ্জিতকরণের মাধ্যমে প্রতিশোধ নিয়েছেন, পরম দয়ালু মুমিনদের প্রতি। তাইতো তাদেরকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ شِرْذِمَةٌ : এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র দল। বহুবচন شَرَاذِمُ আর لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ-এর মধ্যে মূলত لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلَةٌ হওয়া সঙ্গত ছিল। কারণ قَلِيْلٌ হলো شِرْذِمَةٌ-এর সিফত। কিন্তু شِرْذِمَةٌ যেহেতু اَسْبَاطٌ-এর অর্থ সম্বলিত, আর তার মধ্য থেকে প্রত্যেক سِبْطٌ [দল] হলো قَلِيْلٌ তথা স্বল্প সংখ্যক। এ কারণেই جَمْعٌ ব্যবহার করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী] قَلِيْلُوْنَ শব্দটি اِنَّ-এর দ্বিতীয় خَبَرٌ-ও হতে পারে।

قَوْلُهُ لَجَمِيْعٌ بِمَعْنَى جَمْعٌ اَيْ جَمَاعَةٌ : جَمِيْع শব্দটি تَاكِيْد -মূলক শব্দ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, حَرْفُ تَاكِيْد তো অন্য শব্দের تابع হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এখানে تَابِعٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। উত্তরের সারসংক্ষেপ এই যে, এটা তাকীদের শব্দাবলির অন্তর্গত নয়; বরং جَمَاعَةٌ বা দল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ حَاذِرُوْنَ : আবূ উবায়দা বলেন, حَاذِرُوْنَ ও حَذِرُوْنَ উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। উভয়টির অর্থ হলো সতর্ক, সজাগ। কেউ কেউ এ পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, حَذِرٌ অর্থ হলো সজাগ, আর حَاذِرٌ-এর অর্থ হলো ভীত। কেউ বলেন, حَذِرٌ সেসব সৃষ্টিকে বলা হয় যারা জন্মগতভাবে সতর্ক হয়। যেমন কাক। আর حَاذِرٌ বলা হয় যারা জন্মগতভাবে সতর্ক নয়, বরং পরবর্তী সময়ে চতুর ও সতর্ক হয়।

قَوْلُهُ مَقَامٍ كَرِيْمٍ : كَرِيْمٌ-এর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্নরূপ উক্তি করেছেন। যথা– ১. কেউ উন্নত দালান-কোঠা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ২. কেউ আমীর-উমারা তথা বড়দের মজলিস উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমনটা ব্যাখ্যাকার মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ : এটা স্থানগতভাবে مَنْصُوْبٌ-ও হতে পারে। তখন বাক্যটি এমন হবে– اَخْرَجْنَاهُمْ مِثْلَ ذٰلِكَ الْاِخْرَاجِ আবার مَقَامٌ كَرِيْمٌ-এর সিফাত হিসেবে مَجْرُوْرٌ-ও হতে পারে, তখন বাক্যটি হবে– مَقَامٌ ذٰلِكَ الْمَقَامِ الَّذِيْ وَصَفْنَا আর যদি مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ-এর خَبَرٌ গণ্য হয় তাহলে مَرْفُوْعٌ হবে অর্থাৎ– اَلْاَمْرُ كَذٰلِكَ ; كَانَ لَهُمْ

قَوْلُهُ وَاَوْرَثْنَاهَا : এর عَطْف হলো فَاَخْرَجْنَا-এর উপর।

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ : এর দ্বারা সেসব লোকদের অধিকাংশ উদ্দেশ্য নয়, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর পশ্চাদ্ধাবনে গিয়েছিল। কেননা তারা সবাই তো পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল; বরং এর দ্বারা সেসব লোক উদ্দেশ্য, যারা ফেরাউনের ধর্ম ও তার আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক ঈমানও এনেছিল। যেমন হিযকীল, ফেরআউনের কন্যা, তার স্ত্রী আছিয়া এবং নামূসার কন্যা– যে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবর চিহ্নিত করে দিয়েছিল। ইমাম সীবওয়াইহ كَانَ-কে অতিরিক্ত বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى : মিশরে হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থানকাল যখন দীর্ঘ হয়ে গেল এবং সর্বদিক দিয়ে তিনি ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গের নিকট তাঁর সত্যতার ও আল্লাহর একত্ববাদের দলিল সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনতে সম্মত হলো না, তখন তাদেরকে আজাব ও সাজা দ্বারা সমুচিত শিক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে রাতের আঁধারে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। বললেন, ফেরাউন তোমার পশ্চাদ্ধাবন করবে, তাতে বিচলিত হবে না। বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন তুচ্ছভাবে شِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ [ক্ষুদ্র দল] অভিহিত করেছিল। অন্যথায় তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষাধিক।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ : এখানে لَنَا-কে حَصْرٌ [সীমিতরকণ] ও ছন্দ ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত وَاِنَّهُمْ لَغَائِظُوْنَ لَنَا ছিল। অর্থাৎ প্রথমত তারা আমার অনুমতিবিহীন চলে গেছে। দ্বিতীয়ত প্রতারণা করে কিবতীদের অলঙ্কারাদি নিয়ে গেছে। তাদের এ কীর্তি আমাদের উত্তেজিত ও রাগান্বিত করেছে।

قَوْلُهُ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ : এ আয়াতে বাহ্যত বলা হয়েছে যে, ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি, বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে করে দেওয়া হয়; কিন্তু এতে

একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কুরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল মিশরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্র ভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জিহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশপ্রাপ্ত হয়। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আজাব হিসেবে তীহের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তারা সেই ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গাম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ.) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী ইসরাঈল কোনো সময় দলবদ্ধ ও জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিশরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরাউন সম্প্রদায়ের বিষয়- সম্পত্তি ও ধনভাণ্ডারের উপর বনী ইসরাঈলের অধিকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এই আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দুটি জবাব তাফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরাউনের ধ্বংসের তাৎক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিশরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনোরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিশরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তিটি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ তখনকার ইতিহাস ইহুদি ও খ্রিস্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এর কারণে কুরআনের আয়াতে কোনোরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, এই ঘটনাটি কুরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন- সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দুখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শু'আরার আলোচ্য ৫৯ নম্বর আয়াতে এ ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে ফেরাউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগবাগিচা ও বিষয়- সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য বনী ইসরাঈলের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরি। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান আছে যে, বনী ইসরাঈলকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগবাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্য তাদের মিশরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগবাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াতে الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا শব্দ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, শামদেশই বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে بَارَكْنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদা (র.) বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কুরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দুরস্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর বনী ইসরাঈল কোনো সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিশর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদা (র.)-এর তাফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত সব আয়াত দ্বারা শামদেশে তার বাগবাগিচা ও অর্থভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ قَالَ اَصْحَابُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ـ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ : পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে গেল, তখন সমগ্র বনী ইসরাঈল চিৎকার করে উঠল, হায়! আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহে ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অমিতবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি হযরত মূসা (আ.)-এরও আগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তখনও সজোরে বললেন- كَلَّا অর্থাৎ আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ.)-এর চোখেমুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঘটেছিল। পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নিচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন- لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا অর্থাৎ চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা এই যে, হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন- اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ অর্থাৎ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে مَعَنَا বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ আছেন। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মতের ব্যক্তিবর্গও তাদের রাসূলের সাথে আল্লাহর সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

অনুবাদ :

٦٩. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ نَبَأَ خَبَرَ اِبْرٰهِيْمَ ـ وَيُبْدَلُ مِنْهُ ـ

৬৯ তাদের নিকট বর্ণনা করুন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকট বৃত্তান্ত সংবাদ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর। এর থেকে بَدَل হলো পরবর্তী আয়াতটি।

٧٠. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ ـ

৭০. তিনি যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কিসের ইবাদত কর?

٧١. قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا صَرَّحُوْا بِالْفِعْلِ لِيَعْطِفُوْا عَلَيْهِ فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ـ اَىْ نُقِيْمُ نَهَارًا عَلٰى عِبَادَتِهَا زَادُوْهُ فِى الْجَوَابِ اِفْتِخَارًا بِهٖ ـ

৭১. তারা বলল, আমরা মূর্তির পূজা করি। এখানে نَعْبُدُ ফেলটি স্পষ্ট করে উল্লেখের কারণ হলো সামনের কথার উপর عَطْف শুদ্ধ হওয়া। এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকি অর্থাৎ আমরা দিনের বেলায় তাদের উপাসনায় লিপ্ত থাকি। তাদের পূজার গর্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে উত্তরে এ অংশটি বৃদ্ধি করেছে।

٧٢. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ حِيْنَ تَدْعُوْنَ ـ

৭২. তিনি বললেন, তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে?

٧٣. اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اِنْ عَبَدْتُمُوْهُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ـ كُمْ اِنْ لَمْ تَعْبُدُوْهُمْ ـ

৭৩. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করতে পারে? যদি তোমরা তাদের পূজা কর অথবা অপকার করতে পারে যদি তোমরা তাদের পূজা না কর।

٧٤. قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ـ اَىْ مِثْلَ فِعْلِنَا ـ

৭৪. তারা বলল, না তবে আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। অর্থাৎ আমাদের কর্মের মতো

٧٥. قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ز

৭৫. তিনি বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ কিসে পূজা করতেছ।

٧٦. اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ـ

৭৬. তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা।

٧٧. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ لَا اَعْبُدُهُمْ اِلَّا لٰكِنْ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ فَاِنِّىْ اَعْبُدُهٗ ـ

৭৭. তারা সকলেই আমার শত্রু আমি তাদের উপাসনা করি না, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত। আমি তাঁর উপাসনা করি।

٧٨. الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ـ اِلَى الدِّيْنِ ـ

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন। দ্বীন তথা ধর্মের প্রতি।

٧٩. وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ـ

৭৯. তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।

٨٠. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ص

৮০. আমি রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন।

অনুবাদ :

٨١. وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ـ

৮১. এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন।

٨٢. وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَرْجُوْا اَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ اَيْ الْجَزَاءِ ـ

৮২. এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দিবেন। অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে।

٨٣. رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا عِلْمًا وَاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ اَيْ النَّبِيِّيْنَ ـ

৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অর্থাৎ নবীগণের মধ্যে গণ্য করুন।

٨٤. وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ ثَنَاءً حَسَنًا فِي الْاٰخِرِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يَاْتُوْنَ بَعْدِيْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

৮৪. আমাকে যশস্বী করুন অর্থাৎ উত্তম প্রশংসার অধিকারী করুন। পরবর্তীদের মধ্যে যারা কিয়ামত পর্যন্ত আমার পরে আগমন করবে।

٨٥. وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ـ اَيْ مِمَّنْ يُعْطَاهَا ـ

৮৫. এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। অর্থাৎ যাদেরকে তা দেওয়া হবে, তাদের।

٨٦. وَاغْفِرْ لِاَبِيْ ج اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ـ بِاَنْ تَتُوْبَ عَلَيْهِ فَغَفَرَ لَهٗ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يَّتَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ اللّٰهِ كَمَا ذُكِرَ فِيْ سُوْرَةِ بَرَاءَةٍ ـ

৮৬. আর আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করুন, তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ আপনি তার তওবা কবুল করুন। এ দোয়ার অসিলায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার আহ্বান করাটা তার পিতা আল্লাহর শত্রু বলে প্রকাশ পাওয়ার পূর্বের ঘটনা। যেমনটি সূরা বারাআতে উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٧. وَلَا تُخْزِنِيْ تَفْضَحْنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ اَيْ النَّاسُ ـ

৮৭. এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থান দিবসে। অর্থাৎ লোকদেরকে পুনরুত্থান দিবসে।

٨٨. قَالَ تَعَالٰى فِيْهِ ـ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنٌَ اَحَدًا ـ

৮৮. আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সম্পতি কোনো কাজে আসবে না কারো।

٨٩. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ـ مِنَ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ وَهُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْفَعُهٗ ذٰلِكَ ـ

৮৯. সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তকরণ নিয়ে। শিরক ও নেফাক থেকে। এটা হলো মুমিনের অন্তর। কেননা এগুলো তাকে উপকৃত করবে।

٩٠. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قُرِّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَيَرَوْنَهَا ـ

৯০. সেদিন নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত খোদাভীরুদের জন্য। ফলে তারা তা দেখতে পাবেন।

অনুবাদ :

٩١. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ أُظْهِرَتْ لِلْغٰوِيْنَ - الْكَافِرِيْنَ -

৯১. এবং পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম কাফেরদের জন্য।

٩٢. وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ -

৯২. তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়? তোমরা যাদের ইবাদত করতে।

٩٣. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط أَيْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَصْنَامِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ - بِدَفْعِهِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا -

৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্যান্য মূর্তিসমূহের। তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে? তোমাদের থেকে শাস্তি প্রতিরোধকল্পে। অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম নিজেদের থেকে তা প্রতিহত করতে? না, তারা তা পারে না।

٩٤. فَكُبْكِبُوْا أُلْقُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ -

৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

٩٥. وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَتْبَاعُهُ وَمَنْ أَطَاعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعُوْنَ -

৯৫. ইবলীসের বাহিনীর তার অনুসারীদের এবং যেসব মানুষ ও জিন তার অনুসরণ করে সকলকেও।

٩٦. قَالُوْا أَيِ الْغَاوُوْنَ وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ مَعَ مَعْبُوْدِيْهِمْ -

৯৬. তারা অর্থাৎ পথভ্রষ্টরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে তাদের উপাস্যদের সাথে।

٩٧. تَاللّٰهِ إِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ أَيْ إِنَّهُ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ -

৯৭. আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় এখানে إِنْ টি ثَقِيْلَةٌ হতে خَفِيْفَةٌ আর এর ইসম উহ্য রয়েছে অর্থাৎ إِنَّهُ আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। প্রকাশ্য।

٩٨. إِذْ حَيْثُ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ج فِي الْعِبَادَةِ -

৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। ইবাদতের ক্ষেত্রে।

٩٩. وَمَا أَضَلَّنَا عَنِ الْهُدٰى إِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ أَيِ الشَّيَاطِيْنُ أَوْ أَوَّلُوْنَ الَّذِيْنَ اقْتَدَيْنَا بِهِمْ -

৯৯. আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল সৎপথ হতে দুষ্কৃতিকারীরাই অর্থাৎ শয়তান বা সে সকল পূর্বপুরুষরা, আমরা যাদের অনুসরণ করতাম।

١٠٠. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ - كَمَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ -

১০০. পরিণামে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। যেমন মুমিনদের পক্ষে সুপারিশের জন্য ফেরেশতা, নবীগণ এবং মুমিনগণ রয়েছেন।

١٠١. وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ - أَيْ يُهِمُّهُ أَمْرُنَا -

১০১. এবং কোনো সুহৃদ বন্ধুও নেই। যাকে আমাদের অবস্থা চিন্তিত করে দিবে।

অনুবাদ :

١٠٢. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً رَجْعَةً اِلَى الدُّنْيَا فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّيْ وَنَكُوْنَ جَوَابُهُ ـ

১০২. হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত! অর্থাৎ পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম। তাহলে আমরা মুমিনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। এখানে لَوْ টি تَمَنِّيْ-এর জন্য এসেছে। আর এর جَوَابْ হলো نَكُوْنَ

١٠٣. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ مِنْ قِصَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَوْمِهِ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

১০৩. এতে অবশ্যই রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাহিনীতে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٠٤. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

১০৪. আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ : وَاتْلُ-এর وَاوْ টি عَاطِفَةْ, পূর্বে উহ্য اُذْكُرْ-এর উপর عَطْف হয়েছে যা اِذْ نَادٰى مُوْسٰى-এর আমিল। এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ-এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ : এ অংশটি نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ-এর بَدَلْ এবং উহ্য সংক্ষিপ্ত কথার বিবরণ।

قَوْلُهُ صَرَّحُوْا بِالْفِعْلِ لِيَعْطِفُوْا عَلَيْهِ : এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : যুক্তির দাবি মতে مَاتَعْبُدُوْنَ-এর জবাবে اَصْنَامًا বলা উচিত ছিল। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কেননা প্রশ্নের মধ্যে فِعْل উল্লেখ থাকলে উত্তরে فِعْل উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

উত্তর : এখানে نَعْبُدُ ফে'ল উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ-এর عَطْف বৈধ হয়ে যায়। নতুবা اِسْم-এর উপর فِعْل-এর عَطْف হয়ে যায়। আর তা সঙ্গত নয়।

قَوْلُهُ نُقِيْمُ نَهَارًا : এটা نَظَلُّ-এর অর্থের বর্ণনা, এখন প্রশ্ন হলো نَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ বলার কি প্রয়োজন হলো?

উত্তর : মুশরিকরা যেহেতু মূর্তিপূজার ব্যাপারে গর্ববোধ করত। তাই তার উপর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে আরো গর্ব করত। এ কারণেই তারা فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ বলেছে যে, আমরা তো সর্বদা তাদের সম্মুখে মস্তকাবনত করে থাকি, আর এটা আমাদের গর্বের বিষয়ও।

قَوْلُهُ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ : এখানে মুযাফ লুপ্ত রয়েছে, বাক্যটি এমন ছিল هَلْ يَسْمَعُوْنَ دُعَائَكُمْ তারা কি তোমার ডাক শোনে? কেননা সত্তা শ্রবণের কোনো প্রশ্নই উঠে না।

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمْ : এ হামযাটি উহ্য ফে'লের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর مَا হলো عَاطِفَة; বাক্যটি এমন ছিল– اَتَاَمَّلْتُمْ فَاَبْصَرْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ [তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, কিসের উপাসনা করছ?]

قَوْلُهُ وَاٰبَائُكُمْ : এর عَطْف হলো تَعْبُدُوْنَ-এর ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِل-এর উপর, এ করণে ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِل দ্বারা মাঝে একটি তাকীদ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ : কেননা তারা আমার শত্রু। হযরত ইবরাহীম (আ.) শত্রুতার সম্বন্ধকে নিজের প্রতি করেছেন। এটা হলো تعريض; আর উপদেশের ক্ষেত্রে تَصْرِيْح [স্পষ্ট উল্লেখ] থেকে تَعْرِيْض [ইঙ্গিতমূলক উল্লেখ] অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। অর্থাৎ তিনি عَدُوٌّ لَّكُمْ-এর স্থলে عَدُوٌّ لِّيْ বলেছেন।

قَوْلُهُ اِلَّا لٰكِنْ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ : اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ ; এর অর্থ হলো- لٰكِنَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ لَيْسَ بِعَدُوِّىْ بَلْ هُوَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ [রাব্বুল আলামীন আমার দুশমন নন; বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি আমার পরম বন্ধু!]

قَوْلُهُ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ : এটা رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -এর সিফত, কিংবা بَدَلْ কিংবা عَطْفُ بَيَانْ অথবা هُوَ উহ্য مُبْتَدَأْ -এর خَبَرْ -এর পরবর্তী অংশ এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ : [আমি অসুস্থ হলে তিনি আমায় সুস্থ করেন] এখানে অসুস্থতা বা রোগ-ব্যাধিকে নিজের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন; আল্লাহর প্রতি নয়। এটা বিশেষ আদবের পরিচায়ক।

قَوْلُهُ لِسَانَ صِدْقٍ : এটা مَوْصُوْف -এর প্রতি صِفَتْ -এর ইযাফতের অন্তর্গত। অর্থাৎ মূলত اَللِّسَانُ الصِّدْقُ ছিল।

قَوْلُهُ قَالَ تَعَالٰى فِيْهِ اَىْ فِىْ شَاْنِ ذَالِكَ الْيَوْمِ : কেউ কেউ বলেন- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ এটাও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাণী এবং يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ থেকে بَدَلْ ; প্রথম ক্ষেত্রে بدل বলেছেন, কিন্তু তা প্রশ্নমুক্ত নয়।

قَوْلُهُ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ : [তবে যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।] দাবি এই যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে। উভয়ের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা রয়েছে। তবে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, যদি مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ -কে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ স্থির করা হয় তাহলে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হবে, আর اَحَدًا -কে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ স্থির করা হয় তাহলে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে। কেননা مَنْ اَتَى اللّٰهَ যা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ এটা اَحَدًا -এর جِنْس -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ : اَيْنَ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ আর مَا مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ এটা اَلَّذِىْ অর্থে كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ হলো حال বাক্যটি এরূপ হবে- اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَهُ [তোমরা যাদের উপাসনা করতে, তারা কোথায়?]

قَوْلُهُ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً : অর্থাৎ হায়! যদি আমাদের একবার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলত!

قَوْلُهُ لَوْ هُنَا لِلتَّمَنِّىْ : এখানে لَوْ হলো تَمَنِّىْ বা আকাঙ্ক্ষাজ্ঞাপক, আর فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ [তাহলে আমরা মুমিনদের দলভুক্ত হতাম] হলো এর جَوَابٌ ; কেউ কেউ বলেন- لَوْ হলো شَرْطِيَّةٌ আর এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে فَنَكُوْنَ হলো كَرَّةً -এর উপর مَعْطُوْفٌ ; বাক্যটি এরূপ হবে- لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَرَجَعْنَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ অথবা لَخَلَصْنَا مِنَ الْعَذَابِ এর جَوَابٌ হলো

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর রিসালতের দায়িত্ব পালনে কি কি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার কিছুটা উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতসমূহে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার পথভ্রষ্টতার কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় বাবেল এলাকায় বাস করতো। তারা নক্ষত্রপুঞ্জের পূজারী ছিল এবং কিছু লোক মূর্তি পূজাও করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবর্তনে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) অকাট্য যুক্তি এবং বলিষ্ঠ দলিল প্রমাণ দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ অর্থাৎ [হে নবী!] আপনি মক্কাবাসীর নিকট ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন, মক্কাবাসীরা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার ব্যাপারে গৌরব বোধ করে। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন তাওহীদে বিশ্বাসী। তিনি এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই জীবনের যাবতীয় কাজ করতেন এবং তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখতেন। শিরক ও পৌত্তলিকতার অন্ধকারকে দূরীভূত করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এই ঘটনা হয়তো মক্কার কাফেরদের অন্তরের রুদ্ধদ্বার উম্মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করেছেন এবং মূর্তিগুলো যে নিতান্ত অসহায় একথাও বলেছেন। এরপর বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে হেদায়েত দেওয়া,

রিজিক পৌঁছানো বা জীবিত রাখা সবই আল্লাহপাকের কর্তৃত্বাধীন। অতএব, মানুষের ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ পাকই, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নয়।

তাই তিনি পিতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন- مَا تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কার পূজা করছো? হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্যে প্রশ্ন করেননি; কেননা তিনি জানতেন যে তারা মূর্তিপূজা করে। তিনি প্রশ্ন করেছেন তাদেরকে একথা জানাবার জন্যে যে, তোমরা যেসব বস্তুর পূজা কর এবং যেসব বস্তুর সম্মুখে ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশ কর, সেগুলো আদৌ এর যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি হলো মানুষ। অতএব, সৃষ্টির সেরা মানুষ কখনো অন্য কোনো সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করতে পারে না। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কিসের পূজা কর?

তারা বলল- نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ অর্থাৎ আমরা মূর্তি পূজা করি, আর সারাদিন তাদের কাছেই বসে থাকি। আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি তাদেরই সম্মুখে, আর সারাদিন ধরে ভক্তিভরে তাদেরই সম্মুখে আমরা বসে থাকি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত; কিন্তু তারা মূর্তিপূজার উপর গর্ব প্রকাশার্থে দীর্ঘ জবাব দিয়েছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)বলেন- هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ـ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে তাদেরকে ডাক, তারা কি তোমাদের ডাক শ্রবণ করতে পারে? তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে? অথবা তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে ঐ মূর্তিগুলো কারো কোনো কথা শ্রবণও করতে পারে না, কোনো কিছু বুঝতেও পারে না এবং কারো ভালো-মন্দ কোনো কিছুই করতে সক্ষম হয় না ; এমনকি, যদি তাদের দেহে একটি মশা মাছিও বসে তবে তা তাড়াবারও ক্ষমতা তারা রাখে না, এমন অক্ষম, অসহায় বস্তুকে তোমরা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কর কোন যুক্তিতে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) هَلْ يَسْمَعُوْنَ -এর অর্থ করেছেন এভাবে- তারা কি তোমাদের কথা শ্রবণ করতে পারে? আর اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা কর, তবে তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে? اَوْ يَضُرُّوْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা না কর, তাহলে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে?

قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ তারা বলে না, এসব কারণে আমরা তাদের পূজা করি না। আমরা এসব যুক্তি তর্কেরও ধার ধারি না। আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি, তাই আমরাও এদের পূজা করি।

قَوْلُهٗ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ : কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া : এই আয়াতে لِسَان বলে আলোচনা বোঝানো হয়েছে এবং এর লাম উপকারার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন সুন্দর তরিকা ও উত্তম নিদর্শন দান করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উৎকৃষ্ট আলোচনা ও সৎ-গুণাবলি দ্বারা স্মরণ করে। -[ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী]

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ফলে ইহুদি, খ্রিস্টান এমন কি মক্কার মুশরিকরা পর্যন্ত ইবরাহীমী মিল্লাতকে ভালোবাসে এবং নিজেদেরকে এর অনুসারী বলে। যদিও তাদের ধর্মমত ইবরাহীমী মিল্লাতের বিপরীতে কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ তথাপি তাদের দাবি এই যে, আমরা ইবরাহীমী মিল্লাতে আছি। মুসলিম সম্প্রদায় তো যথার্থরূপেই মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়াকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করে ।

খ্যাতি-যশপ্রীতি নিন্দনীয়, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে বৈধ : যশপ্রীতি অর্থাৎ মানুষের কাছে নিজের সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কুরআন পাক পরকালের নিয়ামত লাভকে যশোপ্রীতি বর্জনের উপর নির্ভরশীল ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে- تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ; আর আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করেছেন যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার প্রশংসা ও গুণকীর্তন হোক। এটা বাহ্যত যশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। কিন্তু আয়াতের ভাষার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এই দেওয়ার আসল লক্ষ্য যশোপ্রীতি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়া যে, আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দান করুন, যা আমার আখিরাতের সম্বল হয়, যা দেখে অন্যদের মনেও প্রেরণা জাগে এবং আমার পরেও মানুষ সৎকর্মে আমার অনুসরণ করে।

সারকথা এই যে, এই দোয়া দ্বারা কোনো সুখ্যাতি ও যশলাভের উপকার লাভ করা উদ্দেশ্যই নয়। কুরআন ও হাদীসে যে যশপ্রীতি নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়, তার অর্থ পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও তা দ্বারা পার্থিব মুনাফা অর্জন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র.) হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর জবানীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘ ছাগলের পালে ছেড়ে দিলে তারা ছাগলপালের এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, যতটুকু দুইটি অভ্যাস মানুষের ধর্মের ক্ষতি করে। ১. অর্থসম্পদের ভালোবাসা এবং ২. সম্মান ও যশ অন্বেষণ। দায়লামী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যশ ও প্রশংসাপ্রীতি মানুষকে অন্ধ-বধির করে দেয়। এসব রেওয়ায়েতে সেই যশপ্রীতি ও প্রশংসা অন্বেষণ বোঝানো হয়েছে, বা পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কাম্য হয়ে থাকে কিংবা যার খাতিরে ধর্মে শৈথিল্য প্রদর্শন অথবা কোনো গুনাহ করতে হয়। এগুলো না হলে যশপ্রীতি নিন্দনীয় নয়। হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই দোয়া বর্ণিত আছে– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ فِىْ عَيْنِىْ صَغِيْرًا وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র এবং অন্য লোকদের দৃষ্টিতে মহান করে দিন।" এখানেও অন্য লোকদের দৃষ্টিতে বড় করার লক্ষ্য এই যে, মানুষ সৎকর্মে আমার ভক্ত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। এ কারণেই ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে সৎকর্মপরায়ণ, মানুষের দৃষ্টিতে সৎ হওয়ার জন্য সে যেন লৌকিকতা প্রদর্শন না করে। সে যদি মানুষের প্রশংসা ও গুণকীর্তনকে ভালোবাসে, তবে তা নিন্দনীয় নয়।

ইবনে আরাবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সৎকর্মের কারণে মানুষের মধ্যে প্রশংসা হয়, সেই সৎকর্ম অন্বেষণ করা জায়েজ। ইমাম গাযালী (র.) বলেন, দুনিয়াতে সম্মান ও যশপ্রীতি তিনটি শর্তসাপেক্ষে বৈধ। যথা– ১. যদি নিজেকে বড় এবং অন্যদেরকে ছোট ও হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হয়; বরং এরূপ পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হয় যে, মানুষ তার ভক্ত হয়ে সৎকর্মে তার অনুসরণ করবে। ২. মিথ্যা গুণকীর্তন লক্ষ্য না হওয়া চাই। অর্থাৎ যে গুণ নিজের মধ্যে নেই, তার ভিত্তিতে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা না করা। ৩. যদি তা অর্জন করার জন্য কোনো গুনাহ অথবা ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অবলম্বন করতে না হয়।

মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয় : সূরা তওবার ১১৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِىْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ; কুরআন পাকের এই ফরমান জারি হওয়ার পর এখন যার মৃত্যু কুফরের উপর নিশ্চিত ও অবধারিত, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্য মুশরিকদের মাগফিরাতের দোয়া কামনা করা দ্ব্যর্থহীনরূপে নাজায়েজ। যদিও তারা নিকটাত্মীয়ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : وَاغْفِرْ لِاَبِىْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য কেন মাগফিরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজেই কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ۗ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ـ

জবাবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পিতার জন্য তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তাওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফিরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আ.)-এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শিরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পেরেছিলেন, নাকি তার মৃত্যুর পর, নাকি কিয়ামতের দিন জানবেন? এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায়ে উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো অর্থ সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারো কোনো উপকারে আসবে না। একমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে।

এই আয়াতের اِسْتِثْنَاءْ -কে اِسْتِثْنَاءْ مُنْقَطِعْ সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যে সেদিন কারো অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শিরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হলো, যদি কেউ যায়েদ সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যায়েদের কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্তুতি ও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোনো কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সৎকর্ম। একেই 'সুস্থ অন্তঃকরণ' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের কাছে প্রসিদ্ধ তাফসীর এই যে, আয়াতের اِسْتِثْنَاءْ টি مُتَّصِلْ এবং অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কিয়ামতের দিনও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যই উপকারী হবে; কাফেরের কোনো উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে وَلَا بَنُوْنَ বলা হয়েছে, যার অর্থ– পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবত এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যাসন্তানের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কিয়ামতের দিন বিশেষ করে পুত্রসন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা করা হত।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قَلْبٌ سَلِيْمٌ -এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কালেমায়ে তাওহীদের সাক্ষ্য দেয় এবং শিরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মু'মিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রুগ্‌ণ হয়ে থাকে। যেমন কুরআন বলে– فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে: আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তাফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোনো সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব হাশরের ময়দানেও হিসাবের দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোনো সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারটিও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা ছওয়াব পৌঁছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের ছওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে। যেমন কোনো কোনো হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার মতো উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কুরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ আমি আমার সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গাম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গাম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোনো উপকার হবে না। যেমন হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র, লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার ব্যাপারে তাই হবে। কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তা-ই হতে পারে–

١. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ . ٢. اِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ . ٣. لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَالِدِهٖ .

অনুবাদ :

١٠٥. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ج بِتَكْذِيْبِهِمْ لَهُ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَجِيْءِ بِالتَّوْحِيْدِ اَوْ لِاَنَّهُ لِطُوْلِ لُبْثِهِ فِيْهِمْ كَاَنَّهُ رُسُلٌ وَتَانِيْثُ قَوْمٍ بِاِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ وَتَذْكِيْرِهِ بِاِعْتِبَارِ لَفْظِهِ ـ

১০৫. হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। তারা হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দরুন। সকল রাসূল তাওহীদের বার্তা আনায় শরিক থাকার কারণে অথবা তিনি দীর্ঘদিন তাদের মাঝে অবস্থানের ফলে মনে হয় তিনি একাই অনেক রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। قَوْمٌ শব্দটি অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে স্ত্রীলিঙ্গ এবং শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে পুংলিঙ্গ।

١٠٦. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نَسَبًا نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج اللّٰهَ ـ

১০৬. যখন তাদের বংশীয় ভ্রাতা হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করবে না? আল্লাহকে।

١٠٧. اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ عَلٰى تَبْلِيْغِ مَآ اُرْسِلْتُ بِهِ ـ

১০৭. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা প্রচারে।

١٠٨. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ فِيْمَا اٰمُرُكُمْ بِهِ مِنْ تَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَطَاعَتِهِ ـ

১০৮. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে যা নির্দেশ করি, তা পালন কর।

١٠٩. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلٰى تَبْلِيْغِهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ مَا اَجْرِيَ اَيْ ثَوَابِيْ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১০৯. আমি তোমাদের নিকট এর কোনো প্রতিদান চাই না এর প্রচারের বিনিময়ে। আমার পুরস্কার তো অর্থাৎ আমার ছওয়াব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকটই রয়েছে।

١١٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ كَرَّرَهُ تَاكِيْدًا ـ

১১০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এটা তাকিদ স্বরূপ দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে।

١١١. قَالُوْآ اَنُؤْمِنُ نُصَدِّقُ لَكَ لِقَوْلِكَ وَاتَّبَعَكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ وَاَتْبَاعُكَ جَمْعُ تَابِعٍ مُبْتَدَأٌ الْاَرْذَلُوْنَ ـ اَلسَّفَلَةُ كَالْحَاكَةِ وَالْاَسَاكِفَةِ ـ

১১১. তারা বলল, আমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করব? সত্যায়ন করব তোমার প্রতি তোমার কথায় অথচ ইতর ব্যক্তিরা তোমার অনুসরণ করছে। وَاتَّبَعَكَ শব্দটি অন্য কেরাতে اَتْبَاعُكَ রয়েছে, যা تَابِعٌ -এর বহুবচন এটা মুবতাদা। [আর اَرْذَلُوْنَ হলো তার খবর] اَرْذَلُوْنَ অর্থ– ইতর শ্রেণির লোকজন যেমন– তাঁতী, মুচী প্রমুখ।

١١٢. قَالَ وَمَا عِلْمِيْ اَيْ عِلْمٍ لِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ج

১১২. হযরত নূহ (আ.) বললেন, তারা কি করত তা আমার জানা নেই।

অনুবাদ :

١١٣. اِنْ مَا حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ فَيُجَازِيْهِمْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ج تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا عِبْتُمُوْهُمْ -

১১৩. তার হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ ফলে তিনি তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। যদি তোমরা বুঝতে। তাহলে তাদের দোষ তালাশ করতে না।

١١٤. وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

১১৪. মুমিনদের তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।

١١٥. اِنْ مَا اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ط بَيِّنُ الْاِنْذَارِ -

১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

١١٦. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ عَمَّا تَقُوْلُ لَنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ - بِالْحِجَارَةِ اَوْ بِالشَّتْمِ -

১১৬. তারা বলল, হে নূহ! তুমি যা বলছ তা থেকে যদি বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তারাঘাতে নিহতদের মাঝে শামিল হবে। প্রস্তরসমূহ কিংবা গালমন্দের মাধ্যমে।

١١٧. قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ج

১১৭. হযরত নূহ (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়তো আমাকে অস্বীকার করছে।

١١٨. فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا اَىْ اُحْكُمْ وَنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

১১৮. সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে রক্ষা করুন!

١١٩. قَالَ تَعَالٰى فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ج اَلْمَمْلُوْءِ مِنَ النَّاسِ وَالْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ -

১১৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌযানে যা মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ও পশু-পাখিতে ভরপুর ছিল।

١٢٠. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ اَىْ بَعْدَ اِنْجَائِهِمُ الْبَاقِيْنَ ط مِنْ قَوْمِهٖ -

১২০. তৎপর নিমজ্জিত করলাম অর্থাৎ তাদেরকে রক্ষা করার পর, অবশিষ্ট সকলকে তাঁর সম্প্রদায়ের।

١٢١. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

১২১ এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।

١٢٢. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

১২২. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِتَكْذِيْبِهِمْ لَهُ الخ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

প্রশ্ন : নূহ (আ.)-এর ক্ষেত্রে مُرْسَلِيْنَ বহুবাচনিক শব্দ চয়ন করার কারণ কি? তিনি তো সংখ্যায় একজন।

উত্তর : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দুটি উত্তর দিয়েছেন।

১. সকল নবী ও রাসূল দ্বীনী উসূল তথা তাওহীদ, রিসালত, পুনরুত্থান ও পরকালীন সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে একই আকিদার বিশ্বাসী। এ হিসেবে একজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দ্বারা সকল নবী রাসূলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সাব্যস্ত হয়।

২. ব্যাখ্যাকার (র.) أَوْ لِأَنَّهُ দ্বারা দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর নবুয়তের আমল ছিল অতি দীর্ঘ। স্বাভাবিকভাবে ৯৫০ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে কয়েকজন নবীর আগমন ঘটতে পারে, অতএব তিনি একাই যেন কয়েকজন নবীর স্থলাভিষিক্ত। এ লক্ষ্যে তাঁর একার ক্ষেত্রেই বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَانِيْثُ قَوْمٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ : এখানে قَوْمٌ-কে স্ত্রীলিঙ্গ ধরে فِعْل-কে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। কেননা قَوْمٌ শব্দটি অর্থ [তথা جَمَاعَةٌ] -এর বিচারে স্ত্রীলিঙ্গ, আর শাব্দিক বিচারে পুংলিঙ্গ। قَوْم-এর تَصْغِيْر [ক্ষুদ্রবাচক শব্দ] আসে قُوَيْمَةٌ : এর দ্বারাও শব্দটি অর্থের বিচারে স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া বুঝা যায়। সে সব إِسْمُ جَمْع শব্দেরও এ একই অবস্থা যেগুলোর একবচন কোনো শব্দ নেই। যেমন– رَهْط ، نَفَر প্রভৃতি। এ কারণেই لَهُمْ ، اَخُوْهُمْ ও تَتَّقُوْنَ-এর মধ্যে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَجْرٍ : এখানে مِنْ অব্যয়টি مَفْعُوْل-এর পূর্বে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِتْبَاعُكَ : এটা مُبْتَدَأٌ আর اَرْذَلُوْنَ হলো خَبَرٌ ; মুবতাদা খবর মিলে বাক্য হয়ে اَنُؤْمِنُ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) যেখানে وَفِىْ قِرَاءَةٍ اُخْرٰى উল্লেখ করেন, সেখানে قِرَاءَةٌ سَبْعَةٌ উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁর এ নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সর্বক্ষেত্রে নয়। কারণ এখানে اِتْبَاعُكَ কেরাত قِرَاءَةٌ سَبْعَةٌ-এর অন্তর্গত হবে।

قَوْلُهُ سَفَلَةٌ : سَفَلَةٌ শব্দটি سَافِلَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। اَلْحَائِكُ অর্থ তাঁতী, কামূস অভিধান প্রণেতা লিখেন حَاكَ الثَّوْبَ حَوْكًا وَحِيَاكًا نَسَجَهٗ فَهُوَ حَائِكٌ ; আর اَلْاَسَاكِفَةُ শব্দটি اِسْكَافٌ-এর বহুবচন। অর্থ- মুচী।

قَوْلُهُ وَمَا عِلْمِىْ : এখানে দু'টি সূরত হতে পারে। ১. مَا হলো اِسْتِفْهَامِيَّةٌ اِنْكَارِيَّةٌ মুবতাদা, আর عِلْمِىْ হলো خَبَرٌ - بَا মুতাআল্লিক হয়েছে عِلْمِىْ-এর সাথে। ব্যাখ্যাকার (র.) اَىْ عِلْمَ لِىْ বলে প্রথম সূরতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। عِلْمِىْ মূলত عِلْم بِىْ ছিল। সহজার্থে بَاءٌ বিলুপ্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ اَحْكُمْ : এ বাক্য বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَافْتَحْ শব্দটি اَلْفَتَّاحَةُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো– রাজত্ব করা, اَلْفَتَّاحُ অর্থ– اَلْحَاكِمُ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধান। কারণ– يَفْتَحُ الْمُغْلَقَ مِنَ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রের বন্ধ তথা কঠিন বিষয়াদির দ্বার উন্মুক্ত করেন বা সমাধান করেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ : সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নয়। তাই মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন; কিন্তু পরবর্তীগণ অপারগ অবস্থায় একে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ– لَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

জ্ঞাতব্য : এ স্থলে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ আয়াতটি তাকীদের জন্য এবং একথা ব্যক্ত করার জন্য আনা হয়েছে যে, রাসূলের আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার জন্য কেবল রাসূলের বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণত অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু যে রাসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যামান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে ভয় করা তো আরো অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

قَالُوْا نُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ...... كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র; পরিবার ও জাঁকজমকতা নয় : এই আয়াতে প্রথমত মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচু লোক। আমরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একান্ত হতে পারি? হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। হযরত নূহ (আ.) জবাবে বললেন, আমি তাদের কাজ-কর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা-ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমকতাকে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর। এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতর বলে দেওয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতর এবং কে ভদ্র? আমি তার ফয়সালা করতে পারি না। –[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতের أَرْذَلُوْنَ শব্দটি أَرْذَلُ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো ইতর, নীচু শ্রেণির লোক, সমাজে যার সম্মান বা প্রতিপত্তি নেই। –(قَامُوْس) আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, যার সম্মান নেই এবং যার অর্থ সম্পদও কম, তাকেই ارذل বলা হয়। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেনম, নিম্ন শ্রেণির লোককে أَرْذَلُ বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন أَرْذَلُ-এর অর্থ হলো স্বর্ণকার। ইকরিমা (র.) বলেছেন, কাপড় বুননকারী বা তাঁতী এবং চামারকে أَرْذَلُ বলা হয়।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির কথাবার্তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তারা ছিল নির্বোধ। কেননা তারা বলেছিল যে, নিম্ন শ্রেণির লোকেরা শুধু অর্থ সম্পদ অর্জনের লোভেই হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তাদের সাথে মিলে মিশে তাঁর প্রতি ঈমান আনব? –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৮. পৃ. ৫৩৬]

এ আয়াতসমূহের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ হয় এবং লোকেরা শয়তানের পথে চলতে শুরু করে, তখন আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়েতের জন্য হযরত নূহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেকালের মানুষকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হলে যে শাস্তি হবে, সে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাতও করেনি এবং তাদের অন্যায় অনাচার থেকে বিরতও হয়নি; বরং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁর শত্রু হয়েছে এবং তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে।

এরপর হযরত নূহ (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। তখন তাঁর জাতি বলল, সমাজের কিছু ইতর শ্রেণির লোকই তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি?

قَوْلُهُ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ : হযরত নূহ (আ.) সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর জাতিকে সত্যের দিকে আহবান করতে থাকেন; কিন্তু তাদের নাফরমানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তারা হযরত নূহ (আ.)-কে হুমকি ধমকি দিতে থাকে। তারা বলল, যদি তুমি উপদেশ বিতরণে ক্ষান্ত না হও, যদি তোমার এ কাজ অব্যাহত রাখ, তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে মেরে শেষ করে দেব। যদি প্রাণ রক্ষা করতে চাও তবে আমাদেরকে উপদেশ দেওয়া পরিত্যাগ কর।

হযরত নূহ (আ.) যখন দেখলেন, তারা কখনো হেদায়েত গ্রহণ করবে না এবং তারা তাঁর প্রাণ-সংহারে উদ্যত হতে চায়, এমন অবস্থায় হযরত নূহ (আ.)-এর হাত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে উঠে। তিনি মুনাজাত করলেন এভাবে– رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنَ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। অতএব, তাদের এবং আমার মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও!

হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত হেদায়েত করার পরও তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করল না। অবশেষে যখন কাফেররা পাথর মেরে তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিল এবং তিনি যখন তাদের হেদায়েত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন, তখনই তিনি আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে এ আরজি পেশ করলেন– হে পরওয়ারদেগার! এ জাতিকে বুঝাবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা আমাকে শুধু মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তাদের হেদায়েত গ্রহণের কোনো আশাই রয়নি। অতএব তাদের এবং আমার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও।

অনুবাদ :

١٢٣. كَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِيْنَ .

১২৩. আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিলেন।

١٢٤. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج

১২৪. যখন তাদের ভ্রাতা হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٢٥. اِنِّى لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ .

১২৫. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٢٦. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ج

১২৬. অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٢٧. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ مَا اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১২৭. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

١٢٨. اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ اٰيَةً بِنَاءً عَلَمًا لِلْمَارَّةِ تَعْبَثُوْنَ . بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ وَتَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَبْنُوْنَ .

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ পথিকদের জন্য স্মৃতিফলক নির্মাণ করছ নিরর্থক। যারা তোমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে তাদের সাথে খেল তামাশা কর ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ কর। تَعْبَثُوْنَ বাক্যটি تَبْنُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

١٢٩. وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لِلْمَاءِ تَحْتَ الْاَرْضِ لَعَلَّكُمْ كَاَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ج فِيْهَا لَا تَمُوْتُوْنَ .

১২৯. আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ মাটির নিচে পানির জন্য। এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে তথায় পৃথিবীতে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না।

١٣٠. وَاِذَا بَطَشْتُمْ بِضَرْبٍ اَوْ قَتْلٍ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ مِنْ غَيْرِ رَأْفَةٍ .

১৩০. যখন তোমরা আঘাত হান কাউকে প্রহার বা হত্যার জন্য তখন কঠোরভাবে আঘাত হেনে থাক। কোনো নম্রতা ও দয়া-মায়াহীনভাবেই।

١٣١. فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ ذٰلِكَ وَاَطِيْعُوْنَ ج فِيْمَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ .

১৩১. তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এ ব্যাপারে এবং আমার আনুগত্য কর। যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করি।

١٣٢. وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ اَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ج

১৩২. ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন তোমাদের প্রতি নিয়ামত দিয়েছেন। সেসব [নিয়ামত] যা তোমরা জান।

١٣٣. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ .

১৩৩. তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন জীব-জন্তু ও সন্তান-সন্ততি।

١٣٤. وَجَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَعُيُوْنٍ ج اَنْهَارٍ .

১৩৪. উদ্যান বাগবাগিচা ও প্রস্রবণ নদনদী।

অনুবাদ :

١٣٥. اِنِّیْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنْ عَصَيْتُمُوْنِىْ.

১৩৫. আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি মহাদিবসের শাস্তির পৃথিবীতেও পরকালে যদি তোমরা আমার অবাধ্যাচরণ কর।

١٣٦. قَالُوْا سَوَاۤءٌ عَلَيْنَا مُسْتَوٍ عِنْدَنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِيْنَ. اَصْلًا اَىْ لَا نَرْعَوِىْ لِوَعْظِكَ.

১৩৬. তারা বলল, উভয়ই আমাদের জন্য সমান আমাদের নিকট বরাবর তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও। আদৌ, অর্থাৎ আমরা তোমাদের উপদেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না।

١٣٧. اِنْ مَا هٰذَا الَّذِىْ خَوَّفْتَنَا بِهٖ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ. اَىْ اِخْتِلَاقُهُمْ وَكِذْبُهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْخَاءِ وَاللَّامِ اَىْ مَا هٰذَا الَّذِىْ نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ لَا بَعْثَ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ. اَىْ طَبِيْعَتُهُمْ وَعَادَتُهُمْ.

১৩৭. এটাতো যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছ কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব। অর্থাৎ তাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথাবার্তা। অপর এক কেরাতে خَاءٌ এবং لَامٌ বর্ণে পেশের সাথে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ যার উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত রয়েছি তা অনর্থক নয়; বরং তা পূর্বসূরীদের স্বভাব তথা অভ্যাস-প্রকৃতি ছিল।

١٣٨. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ج

১৩৮. আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই।

١٣٩. فَكَذَّبُوْهُ بِالْعَذَابِ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ط فِى الدُّنْيَا بِالرِّيْحِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

১৩৯. অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল আজাবকে ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম পৃথিবীতে ঝড়-ঝাঞ্ঝা দ্বারা এতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٤٠. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

১৪০. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ عَادٌ : عَادَ শব্দটি গোত্রের অর্থ বিশিষ্ট হওয়ায় স্ত্রীলিঙ্গ হয়েছে। এ কারণে ফে'লকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে। আ'দ হলো উক্ত গোত্রের ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম। হযরত নূহ (আ.) যেহেতু তাদেরই বংশের অন্তর্গত ছিলেন, এ কারণে তাঁকে اَخُوْهُمْ বলা হয়েছে। হযরত হূদ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত সুন্দর ও সুগঠনের অধিকারী। পেশা হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, হযরত আদম (আ.)-এর সাথে তাঁর দেহাবয়বের বেশ মিল ছিল। তিনি ৪৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। –[জুমাল]

قَوْلُهُ بِكُلِّ رِيْعٍ : رِيْع-এর رَاءٌ বর্ণে যের-যবর যে কোনোটি হতে পারে। অর্থ– উঁচু স্থান যেমন– পাহাড়, টিলা প্রভৃতি। আবূ উবায়দার বর্ণনা মতে এর অর্থ হলো সড়ক, পথ। اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ-এর মধ্যকার اِسْتِفْهَام বা জিজ্ঞাসাটি মূলত ধমক স্বরূপ। আর এ ধমকের আসল লক্ষ্য হলো تَعْبَثُوْنَ শব্দটি। এটা جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ; এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, উঁচু জায়গায় গৃহ নির্মাণ করা দূষণীয়। অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে হলে তা দূষণীয়। وَتَتَّخِذُوْنَ-এর عَطْف হলো تَبْنُوْنَ-এর উপর, এভাবে وَاِذْ بَطَشْتُمْ-এরও উদ্দেশ্য এই যে, কওমে হুদকে তিনটি বিষয়ে ধমক দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ ذَالِكَ : এর দ্বারা উক্ত ধমক প্রদত্ত তিন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। যথা– ১. اَلْبِنَاءُ [নিষ্প্রয়োজনে ভবন নির্মাণ] ২. اِتِّخَاذُ الْمَذْكُوْرِ [বিনা প্রয়োজন মাটির নিচে পানির ট্যাংকী তৈরি এবং ৩. اَلتَّجَبُّرُ [মানুষের সাথে কঠোর আচরণ]।

قَوْلُهُ اَمَدَّكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ : এ বাক্যের দু'ধরনের তারকীব হতে পারে। যথা– ১. দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের বিবরণ। ২. بِاَنْعَامٍ শব্দটি بِمَا تَعْمَلُوْنَ ফে'লের পুনরুল্লেখসহ بَدَلٌ-কে تَكْرَار তথা পুনরুল্লেখের পর্যায়ে গণ্য করা হয়।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا : এটা مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর اَوَعَظْتَ হলো مُفْرَدٌ-এর তাবীলে خَبَرٌ مُقَدَّمٌ অর্থাৎ اَلْوَعْظُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا অর্থে।

قَوْلُهُ نَرْعَوِىْ : نَرْعَوِىْ শব্দটি اِرْعِوَاءٌ হতে নিষ্পন্ন, অর্থ হলো বিরত থাকা।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ خَلَقَ الْاَوَّلِيْنَ : اَوَّلِيْنَ যেমন হযরত শীস (আ.) ও হযরত নূহ (আ.) اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ হলো **পূর্বের কথার ইল্লত বা কারণ। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তোমার উপদেশ ও নসিহতকে এ জন্য গ্রহণ করব না যে, এসব হলো আগেকার লোকদের রচিত কথাবার্তা।**

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ عَادُنِ الْمُرْسَلِيْنَ : এ আয়াত থেকে এ পর্যায়ে চতুর্থ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আ.)-কে আদ জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেন। এ জাতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, শুধু নিজের নাম, যশ, খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে তারা বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করতে, আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। আহকাফ ইয়েমেনের হাজারামুত এলাকায় পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের নাম। সূরা আ'রাফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির পরই আদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। তাদের সম্পদ ছিল অঢেল, ক্ষেত-খামার, বাগান, ফল-ফসল, নদ নদী, ঝর্ণা এককথায় সর্ব প্রকার নিয়ামতই তারা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পেয়েছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ ছিল, তারা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করত, হযরত হুদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহর নবীকে তারা মিথ্যাজ্ঞান করে, শিরক ও কুফরিতে লিপ্ত থাকে। হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানান এবং দুনিয়ার এ জীবন যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হতে হবে, এ বিষয়ে তাদেরকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর কোনো কথা মানতেই রাজি হয়নি। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

অর্থাৎ যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। মানুষকে মন্দ পথ থেকে দূরে রাখার একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহর ভয়। যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করার গুণ অর্জন করতে পারে, তবে তার পক্ষে নেক আমল করা এবং মন্দ কাজ পরিহার করা সহজ হয়। এজন্যে হযরত হুদ (আ.) তাঁর জাতিকে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা জান আমি আমানতদার, আমি বিশ্বস্ত, অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল, আর যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করি তার উপর তোমরা আমল কর।

قَوْلُهُ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : হযরত হুদ (আ.) তাঁর কওমকে বললেন, আমি যে তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করছি, এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই, কোনো কিছুর লাভে বা লোভে আমি এ কাজ করছি না। কেননা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল।

قَوْلُهُ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ - وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : কতিপয় দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা : ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, رِيْع দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رِيْع উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই رِيْعُ النَّبَاتِ উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদ। اٰيَةٌ -এর আসল অর্থ নিদর্শন। এ স্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبَثُوْنَ শব্দটি عَبْثٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোনো প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَانِعٌ শব্দটি مَصْنَعٌ -এর বহুবচন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন- مَصَانِعٌ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ : ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لَعَلَّ শব্দটি تَشْبِيْه অর্থাৎ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- كَاَنَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ অর্থাৎ যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। -[রূহুল মা'আনী]

বিনা প্রয়োজন অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজন গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরিয়ত মতে দূষণীয়। হযরত আনাস (রা.)-এর ভাষ্যে ইমাম তিরমিযী (র.) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসের অর্থও তাই اَلنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ অর্থাৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। হযরত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়- اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهٖ اِلَّا مَا لَا يَعْنِىْ اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে নির্মিত তা বিপদ নয়। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরিয়তেও নিন্দনীয় ও দূষণীয়।

অনুবাদ :

١٤١. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ج

১৪১. ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

١٤٢. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج

১৪২. যখন তাদেরকে তাদের ভ্রাতা হযরত সালেহ (আ.) বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٤٣. اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ -

১৪৩. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٤٤. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ج

১৪৪. অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٤٥. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ مَا اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

১৪৫. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

١٤٦. اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا مِنَ الْخَيْرِ اٰمِنِيْنَ -

১৪৬. তোমাদেরকে কি আরাম-আয়েশের সামগ্রীর মাঝে নিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে। যা এখানে আছে তাতে।

١٤٧. فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ -

১৪৭. উদ্যানে ও প্রস্রবণে।

١٤٨. وَزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ لَطِيْفٌ لَيِّنٌ -

১৪৮. শস্যক্ষেত্র এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে। هَضِيْم অর্থ সূক্ষ্ম নরম।

١٤٩. وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَرِهِيْنَ ج بَطِرِيْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَارِهِيْنَ حَاذِقِيْنَ -

১৪৯. তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছ। অন্য কেরাতে فَرِهِيْنَ -এর স্থলে فَارِهِيْنَ রয়েছে। অর্থ– হলো নৈপুণ্যের সাথে।

١٥٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ - فِيْمَا اٰمُرُكُمْ بِهٖ -

১৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করি।

١٥١. وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ -

১৫১. তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না।

١٥٢. الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِالْمَعَاصِىْ وَلَا يُصْلِحُوْنَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

১৫২. যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। অন্যায় ও নাফরমানির মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করে না। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মাধ্যমে।

অনুবাদ :

١٥٣. قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ـ الَّذِيْنَ سُحِّرُوْا كَثِيْرًا حَتّٰى غَلَبَ عَلٰى عَقْلِهِمْ ـ

১৫৩. তারা বলল, তুমি জাদুগ্রস্তদের অন্যতম যাদেরকে অতিমাত্রায় জাদু-টোনা করার ফলে তাদের বিবেক লোপ পেয়ে গেছে।

١٥٤. مَآ اَنْتَ اَيْضًا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ج فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْ رِسَالَتِكَ ـ

১৫৪. তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষই। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর। তোমার রিসালাতের ব্যাপারে।

١٥٥. قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ نَصِيْبٌ مِنَ الْمَاءِ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُوْمٍ ج

১৫৫. হযরত সালেহ (আ.) বললেন। এই একটি উষ্ট্রী এর জন্য আছে পানি পানের পালা পানির এক অংশ এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা।

١٥٦. وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ بِعَظْمِ الْعَذَابِ ـ

১৫৬. এর উষ্ট্রীর কোনো অনিষ্ট সাধন করো না, করলে মহা দিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। মহা শাস্তি নিয়ে।

١٥٧. فَعَقَرُوْهَا اَىْ عَقَرَهَا بَعْضُهُمْ بِرِضَاهُمْ فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ عَلٰى عَقْرِهَا ـ

১৫৭. কিন্তু তারা তাকে বধ করল অর্থাৎ তাদের মধ্যে হতে কেউ কেউ তাদের সম্মতিক্রমে। পরিণামে তারা অনুতপ্ত হলো তাকে বধ করার কারণে।

١٥٨. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ط الْمَوْعُوْدُ بِهٖ فَهَلَكُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

১৫৮. অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল যে শাস্তির ব্যাপারে তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। প্রতিশ্রুত শাস্তি। ফলে তারা ধ্বংস হয় গেল। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٥٩. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

১৫৯. তোমার প্রতিপালক ! তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ : ফে'লকে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহারের কারণে এই যে, ثَمُوْدُ শব্দটি গোত্রের অর্থে, عَادٌ-এর ন্যায় ثَمُوْدُ ও উক্ত সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম। তার নামানুসারে উক্ত সম্প্রদায়ের সবাইকে সামূদ সম্প্রদায় বলা হয়। তার বংশ পরম্পরা এরূপ সামূদ ইবনে উবায়দ ইবনে আ'উস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ। সামূদ হলো হযরত সালেহ (আ.) এর উম্মত। হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর জীবিত ছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও হযরত হূদ (আ.)-এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

قَوْلُهُ فِيْمَا هٰهُنَا مِنَ الْخَيْرِ : هٰهُنَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ায়, আর مِنَ الْخَيْرِ হলো مَا -এর বিবরণ, এর দ্বারা পার্থিব সুখ-শান্তি উদ্দেশ্য। اٰمِنِيْنَ হলো تَكُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ

قَوْلُهُ فِيْ جَنّٰتٍ الخ : حَرْف جَرّ -এর পুনরুল্লেখসহ فِيْمَا هٰهُنَا থেকে بَدَل হয়েছে।

قَوْلُهُ طَلْعُهَا : অর্থ– ফলের সূচনায় যে অঙ্কুর উদগম হয় তা, অতঃপর بَلَح অতঃপর بُسْر অতঃপর رُطَب নাম ধারণ করে, সর্বশেষ হলো تَمْرٌ ; هَضِيْم অর্থ– কোমল, নরম।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ : এটা مُسْرِفِيْنَ-এর صِفَتْ كَاشِفَةْ কেননা এখানে مُسْرِفِيْنَ-এর স্বাভাবিক অর্থ [সীমালঙ্ঘনকারী] উদ্দেশ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে সামুদ জাতির উল্লেখ রয়েছে। সামুদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। সামুদ জাতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, শস্য শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ ছিল তাদের এলাকা। বাগ-বাগিচা ঝরনায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল তাদের চতুর্দিকে। কিন্তু এ হতভাগা জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিল। মূর্তি পূজা ও ডাকাতি-রাহজানিতে লিপ্ত ছিল, তাই হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ : **সামুদ জাতির আবাস :** সামুদ জাতি হজর নামক শহরের অধিবাসী ছিল। এ শহরটি ওয়াদিউল কোরা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। নবম হিজরিতে অনুষ্ঠিত তাবুক অভিযানের সময় প্রিয়নবী ﷺ তাদের এলাকা অতিক্রম করেছিলেন।

হযরত সালেহ (আ.) সামুদ জাতিকে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান করেন। ইরশাদ হয়েছে–

اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ ـ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ـ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ـ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে فَارِهِيْنَ-এর তাফসীর বলা হয়েছে অহংকারী। আবূ সালেহ ও ইমাম রাগিবের মতে فَارِهِيْنَ-এর তাফসীর হলো حَاذِقِيْنَ অর্থাৎ নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নিয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তা দ্বারা উপকার লাভ করা জায়েজ। কিন্তু তা দ্বারা যদি গুনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন নাজায়েজ। যেমন– পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ : এটা একটা উষ্ট্রী ছিল। তাদের কামনা মোতাবেক আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এক পাথর থেকে মুজেযা স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছিল। পানি পানের জন্য উক্ত উষ্ট্রীর একদিন, আর অন্যান্য সকল প্রাণীর জন্য একদিনের পালা নির্ধারিত ছিল। সাথে সাথে তাদেরকে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ এর প্রতি হাত উত্তোলন করবে না এবং এর ক্ষতি সাধনের কোনো অপচেষ্টা করবে না। কিছু দিন যাবত এ অবস্থা চলতে থাকল। পরে তারা এটাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করল। একদিন রাতের আঁধারে কুদার নামক জনৈক ব্যক্তি গোত্রের লোকজনের প্রস্তাবে তাকে মেরে ফেলে। এ উষ্ট্রীটি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন এবং সালেহ (আ.)-এর নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু সামূদ জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং শিরক ও কুফরের উপর অটল থাকে। উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর সালেহ (আ.) বললেন, এখন তোমাদের মাত্র তিন দিনের অবকাশ রয়েছে। চতুর্থ দিন তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তারা মঙ্গলবারে উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল। আর শনিবারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হযরত সালেহ (আ.) আজাব নাজিল হওয়ার কতিপয় নিদর্শনও জানিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো এভাবে প্রকাশ পায় যে, বুধবারে তাদের মুখমণ্ডল বিবর্তিত হয়ে যায়। বৃহস্পতিবারে তা লাল হয়ে যায়, আর শুক্রবারে কালো হয়ে যায়। আর শনিবারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও বিকট শব্দে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যায়।

অনুবাদ :

١٦٠. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

১৬০ হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

١٦١. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ـ

১৬১. যখন তাদের ভ্রাতা হযরত লূত (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٦٢. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ـ

১৬২. আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

١٦٣. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ج

১৬৩. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٦٤. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

১৬৪. আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

١٦٥. اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ اَىِ النَّاسِ ـ

১৬৫. বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সাথে উপগত হও। অর্থাৎ মানুষের মধ্য থেকে।

١٦٦. وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ ط اَىْ اَقْبَالَهُنَّ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ـ مُتَجَاوِزُوْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ ـ

১৬৬. এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন করে থাকো। অর্থাৎ তাদের যৌনাঙ্গকে। তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। হালালকে ছেড়ে হারামের প্রতি ধাবমান।

١٦٧. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ عَنْ اِنْكَارِكَ عَلَيْنَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ مِنْ بَلْدَتِنَا ـ

১৬৭. তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও আমাদের ব্যাপারে কু-মন্তব্য করা থেকে তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। আমাদের শহর থেকে।

١٦٨. قَالَ لُوْطٌ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ الْمُبْغِضِيْنَ ـ

১৬৮. হযরত লূত (আ.) বললেন, আমি তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি। বিদ্বেষ পোষণকারী।

١٦٩. رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ـ اَىْ مِنْ عَذَابِهٖ ـ

১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা করুন! অর্থাৎ তার শাস্তি থেকে।

١٧٠. فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ ـ

১৭০. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম।

١٧١. اِلَّا عَجُوْزًا اِمْرَأَتَهٗ فِى الْغٰبِرِيْنَ ج الْبَاقِيْنَ اَهْلَكْنَاهَا ـ

১৭১. এক বৃদ্ধা ব্যতীত তাঁর এক স্ত্রী ব্যতীত সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অবশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। আমি তাকে ধ্বংস করলাম।

অনুবাদ :

١٧٢. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ـ اَهْلَكْنَاهُمْ ـ

১৭২. অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম তাদেরকে বিনাশ করলাম।

١٧٣. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ـ حِجَارَةً مِنْ جُمْلَةِ الْاِهْلَاكِ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ مَطَرُهُمْ ـ

১৭৩. তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি। এটা তাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়াসমূহের একটি। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। তাদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি।

١٧٤. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ـ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

১৭৪. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٧٥. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

১৭৫. আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ : হযরত লূত (আ.)-এর কওমে লূতের সাথে না বংশীয় সম্বন্ধ ছিল, না ধর্মীয় সম্পর্ক। কেননা হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের বাবেলের অধিবাসী। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে তথায় এসেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) শাম দেশের মাকামে খলীলে অধিবাস গ্রহণ করেন, আর হযরত লূত (আ.) তার নিকটবর্তী অর্থাৎ সেখান থেকে একদিনের রাস্তার দূরবর্তী 'সাদূম' নামক স্থানে অধিবাস গ্রহণ করেন। হযরত লূত (আ.) সাদুমের লোকজনের সাথে বসবাস করেন এবং উক্ত এলাকায়ই বিবাহ করেন। এ কারণেই হযরত লূত (আ.)-কে তাদের ভ্রাতা বলা হয়েছে।।

قَوْلُهٗ مَا خَلَقَ لَكُمْ اَىْ اُحِلَّ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ : এটা مَا -এর বিবরণ, ব্যাখ্যাকার مِنْ اَزْوَاجِكُمْ -এর ব্যাখ্যা اِقْبَالَهُنَّ দ্বারা করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা– ১. مَاخَلَقَ لَكُمْ -এর মধ্যকার مَا -এর প্রতি লক্ষ্য রাখা উদ্দেশ্য। কেননা এর স্থলে যদি مَنْ থাকত তাহলে তার ব্যাখ্যা مِنْ اَزْوَاجِكُمْ বলাই যথেষ্ট হতো। [কারণ مَنْ বিবেকসম্পন্ন সত্তা বা প্রাণী বুঝায়, আর مَا বিবেকহীন বস্তু ও প্রাণী বুঝায়। এ কারণেই اِقْبَالَهُنَّ তথা যোনী দ্বারা مَا -এর ব্যাখ্যা করেছেন। ২. اِقْبَالَهُنَّ দ্বারা এটাও ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমাদের স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল قُبُلْ তথা যোনীপথই নির্দিষ্ট, গুহ্যদ্বার বৈধ নয়। কেননা যোনীপথই কেবল حَرْثٌ [শস্য] তথা সন্তান জন্ম নেওয়ার ক্ষেত্র, আর গুহ্যদ্বার নাপাকী তথা মল ত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট।

قَوْلُهٗ عَدُوْنَ : এটা عَادٍ-এর বহুবচন, অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ ন্যায় ছেড়ে অন্যায় এবং হালাল ছেড়ে হারাম গ্রহণকারী।

قَوْلُهٗ مِنَ الْقَالِيْنَ : এটা اَلْقَالِىْ-এর বহুবচন, মূল অক্ষর হলো قَوْلُوْ বা قَلْى -এর অর্থের মধ্যে ঘৃণা ও বিরাগতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূল অর্থ হলো নিক্ষেপ করা, ভূনা করা, مِنَ الْقَالِيْنَ উহ্য قَالَ -এর مُتَعَلِّقْ হয়ে اَنْ -এর خَبَرٌ

قَوْلُهٗ مِنْ عَذَابِهٖ : এর দ্বারা مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ– مِنْ عَذَابِ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ অর্থে। কেননা তাদের কু-কর্মের প্রতিফলে যে আজাব অবতীর্ণ হবে তা থেকে আমাকে ও আমার সংশ্লিষ্টদেরকে রক্ষা করুন।

قَوْلُهُ اِلَّا عَجُوْزًا : এটা শাব্দিক দিক দিয়ে اَهْل -এর মধ্যে শামিল হওয়ার কারণে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِل হবে, আর যেহেতু সে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আর হযরত লূত (আ.)-এর اَهْل ছিল প্রকৃত ঈমানদার, এ দিক দিয়ে এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হবে اِمْرَاَتَهٗ থেকে; عَجُوْزًا হলো بَدَلْ হযরত লূত (আ.)-এর কাফের স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়িলা। আর তাফসীরে রূহুল বয়ানে ওয়ালিহা লিখিত হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর এক স্ত্রী ছিলেন ঈমানদার। কাফের স্ত্রী যেহেতু সাধারণ গোত্রের সমমনা ছিল এবং তাদের অশ্লীল কাজের প্রতি সম্মত ছিল, এ কারণে গোত্রের সবার সাথে সেও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, কওমে লূতকে পাথর বৃষ্টি, ভূমি উল্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আজাব দ্বারা ধ্বংস করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ .... اَلَا تَتَّقُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সামুদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁকে আল্লাহ পাক সাদুম এলাকার জন্য নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন।

সাদূম শহরটি সিরিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় অবস্থিত। এ এলাকার অধিবাসীরা শুধু যে মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়; বরং তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল তারা সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত লূত (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তারা পথে আসেনি, তাঁর কোনো উপদেশ তারা গ্রহণ করেনি। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে– كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ লূতের জাতিও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

হযরত লূত (আ.)-কে সেই জাতির ভাই বলা হয়েছে; তবে তিনি তাদের বংশীয় সূত্রে বা ধর্মের দিক থেকে ভাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাদের দেশী ভাই। তাদেরকে মন্দ পথ পরিহার করার জন্য তিনি উপদেশ দেন; কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ পাককে ভয় কর না? কেননা প্রত্যেকটি মানুষকে কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে, ভালো কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে, তেমনি মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হয়। হযরত লূত (আ.)-এর জাতি অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাই তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে সাবধান করেছেন। তিনি কওমে লূতের উদ্দেশ্যে বলেছেন– اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَا تَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট বিশ্বস্ত রাসূল।' তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে তথা রিসালতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি আমানতদার, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সংগে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং আমার কথা মেনে চল! কেননা জীবন-সাধনার সার্থকতার জন্যে, পরকালীন জীবনে পরম সাফল্য লাভের জন্যে এটিই একমাত্র পথ।

قَوْلُهُ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, হযরত লূত (আ.)-এর পুরো নাম ছিল লূত ইবনে হারাম ইবনে আজর। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ.)-কে তাঁর জীবদ্দশায়ই আল্লাহ পাক নবী মনোনীত করেছিলেন। হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন তাদের ঘৃণ্য কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে রাজি হলো না, তখন আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি আপতিত হয়। এ স্থানটি আজো বিশ্বাবাসীর উপদেশ গ্রহণের জন্যে একটি বিরাট পরিত্যক্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। অথচ এ স্থানটি হযরত লূত (আ.)-এর জাতির আবাসস্থল ছিল, হযরত লূত (আ.) তাদেরকে বার বার বললেন, দেখ তোমাদের অর্থ-সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমাদের কাছে আমি কোনো প্রকার প্রতিদানও চাই না; আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান। আমি শুধু চাই তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তাঁর নাফরমানি বর্জন কর এবং ঘৃণ্য কুকর্ম পরিহার কর।

قَوْلُهُ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ : অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম : আয়াতের مِنْ অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুত পরিণত করছ। এটা হীনমান্যতার পরিচায়ক। مِنْ অব্যয়টি এখানে تَبْعِيْض -এর জন্যও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এ দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন । نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ।
–[ফতওয়ায়ে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَابِرِيْنَ : এখানে عَجُوْز বলে হযরত লুত (আ.)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লূতের এ কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল। হযরত লূত (আ.)-এর এই কাফের স্ত্রী বাস্তবে বৃদ্ধ হলে তার জন্য عَجُوْز শব্দের ব্যবহার যথার্থই। পক্ষান্তরে বয়সের দিক দিয়ে সে যদি বৃদ্ধা না হয়ে থাকে , তবে তাকে عَجُوْز শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, পয়গাম্বরের স্ত্রী উম্মতের জন্য মাতার স্থলাভিষিক্ত। এ ছাড়া অধিক সন্তানের জননীকে বৃদ্ধা বলে অভিহত করাটা অসঙ্গত নয়।

قَوْلُهُ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেওয়া জায়েজ। হানাফী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা লূত–সম্প্রদায়কে এমনিভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টো করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। –[ফতওয়ায়ে শামী : কিতাবুল হুদূদ]

অনুবাদ :

١٧٦. كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَاِلْقَاءِ حَرَكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَفَتْحِ الْهَاءِ هِىَ غَيْضَةُ شَجَرٍ قُرْبَ مَدْيَنَ الْمُرْسَلِيْنَ ج

১৭৬. 'আয়কা'বাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল অন্য এক কেরাতে হামযাকে উহ্য করে হামযার হরকত ل কে দিয়ে ة যবরসহ (لَيْكَةَ) পঠিত রয়েছে। আর আয়কা হলো মাদায়েনের নিকটতবর্তী বৃক্ষ বাগান।

١٧٧. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَمْ يَقُلْ اَخُوْهُمْ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اَلَا تَتَّقُوْنَ ج

১৭৭. যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, এখানে اَخُوْهُمْ তথা তাদের ভাই বলেননি, কেননা তিনি তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তোমরা কি সাবধান হবে না?

١٧٨. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ .

১৭৮. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

١٧٩. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ج

১৭৯. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

١٨٠. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

১৮০. আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে।

١٨١. اَوْفُوا الْكَيْلَ اَتِمُّوْهُ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ج النَّاقِصِيْنَ .

১৮১. তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দিবে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ করবে। যারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। অর্থাৎ যারা মাপে কম দেয়।

١٨٢. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ج الْمِيْزَانِ السَّوِىِّ .

১৮২. ওজন করবে সঠিক দাড়িপাল্লায় সমান পাল্লায়।

١٨٣. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ لَا تَنْقُصُوْهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ شَيْئًا . وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ . بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ عَثِىَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ وَمُفْسِدِيْنَ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِمَعْنٰى عَامِلِهَا تَعْثَوْا .

১৮৩. লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না অর্থাৎ, তাদের পাওনা থেকে কোনো কিছু কম দিয়ো না। এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে عَثِىَ বাবে سَمِعَ হতে অর্থ- اَفْسَدَ তথা বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আর مُفْسِدِيْنَ শব্দটি حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ হয়েছে তার আমেল تَعْثَوْا -এর অর্থের জন্য।

١٨٤. وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْخَلِيْقَةَ الْاَوَّلِيْنَ ط

১৮৪. এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

অনুবাদ :

١٨٥. قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ـ

১৮৫. তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

١٨٦. وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَيْ اِنَّهُ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ج

১৮৬. তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ। اِنْ টি ثَقِيْلَةٌ থেকে خَفِيْفَةٌ -এর اِسْمٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِنَّهُ আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

١٨٧. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا بِسُكُوْنِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا قِطْعَةً مِنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِيْ رِسَالَتِكَ ـ

১৮৭. আমাদের উপর একখণ্ড মেঘমালা ফেলে দাও كِسَفًا শব্দটি سِيْن বর্ণে সাকিন এবং যবর উভয়ই হতে পারে। অর্থ– খণ্ড, টুকরা। আকাশ থেকে, যদি তুমি সত্যবাদী হও। তোমার রিসালতে।

١٨٨. قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

১৮৮. তিনি বললেন, আমার প্রতিপালক ভালো জানেন তোমরা যা কর। সুতরাং তিনি তোমাদেরকে এর প্রতিদান প্রদান করবেন।

١٨٩. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ط هِيَ سَحَابَةٌ اَظَلَّتْهُمْ بَعْدَ حَرٍّ شَدِيْدٍ اَصَابَهُمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ نَارًا فَاحْتَرَقُوْا اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

১৮৯. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করল। ظُلَّةٌ হলো মেঘমালা, যা তাদেরকে ছায়া দিয়ে রেখেছিল প্রচণ্ড গরমের পরে। অতঃপর উক্ত মেঘমালা হতে তাদের উপর অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে তারা জ্বলে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে গেল। এটা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি।

١٩٠. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

১৯০. এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।

١٩١. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

১৯১. এবং আপনার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَيْكَةَ : অন্য এক কেরাতে لَيْكَةَ পঠিত আছে। اَيْكَةٌ অর্থ– জঙ্গল। اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ দ্বারা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম ও মাদায়েনের পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসী লোকজন উদ্দেশ্য। কারো মতে ঘন বৃক্ষকেও اَيْكَةٌ বলা হয়। غَيْضَةٌ শব্দটির আদ্যবর্ণে যবর, অর্থ বন, গাছের ঝাড়। মাদায়েন হলো হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জনপদের নাম। মাদায়েন ইবনে ইবরাহীম উক্ত শহরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিধায় তার অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয়। মাদায়েন ও মিশরের মাঝে আটদিনের রাস্তা সমান দূরত্ব।

قَوْلُهُ مُفْسِدِيْنَ : এটা تَعْثَوْا -এর অর্থ থেকে حَالٌ مُؤَكِّدَه ; حَالٌ ـ ذُوالْحَالِ -এর শব্দটি যদিও ভিন্ন, তবে অর্থ এক কেননা تَعْثَوْنَ ক্রিয়া عَثِيَ থেকে নিষ্পন্ন, এর অর্থ হলো ফ্যাসাদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ الْجِبِلَّةَ : جِبِلَّةٌ ও جِبِلٌّ অর্থ মাখলূক, সৃষ্টবস্তু। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ اَضَلَّ جِبِلًّا كَثِيْرًا অর্থাৎ শয়তান বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে।

قَوْلُهُ فَاَسْقِطْ الخ : এটাকে কেউ কেউ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ শর্তের جَوَابْ কে مُقَدَّمْ তথা পূর্বের অংশ স্থির করেছেন। আর কেউ কেউ উহ্য বলেছেন, আর فَاَسْقِطْ হলো তার নির্দেশকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ : আসহাবুল আয়কা : اَيْكَةٌ অর্থ- জঙ্গল, অরণ্য। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম মাদায়েন এলাকায় বসবাস করত। কেউ বলেন- اَيْكَةٌ অর্থ- ঘন বৃক্ষ, [বট গাছ] যাকে دَوْمٌ -ও বলা হয়। মাদায়েন এলাকায় এ ধরনের একটি বৃক্ষ ছিল, মানুষেরা তার পূজা করত। তাই তথাকার অধিবাসীদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নবুয়তের গণ্ডি এবং দাওয়াত ও তাবলীগের সীমানা মাদায়েন থেকে উক্ত জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানকার লোকেরা আয়কা [বট] বৃক্ষের পূজা করত। এর দ্বারা জানা গেল যে, আসহাবে আয়কা ও আহলে মাদায়েনের নবী একইজন অর্থাৎ হযরত শুয়াইব (আ.) ছিলেন। আয়কা যেহেতু কোনো সম্প্রদায় নয়, বরং একটি বৃক্ষ। এ কারণে পূর্বের ন্যায় اَخُوْهُمْ বলে তাদের ভাই বলা হয়নি। তবে যেখানে মাদায়েনের অধীনে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার বংশগত ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধও উল্লিখিত হয়েছে। কারণ মাদায়েন হলো এক সম্প্রদায়ের নাম, যেমন ইরশাদ হয়েছে- وَالٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا অর্থাৎ মাদায়েনে তাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে। -[সূরা আ'রাফ : ৮৫]

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার আয়কা ও মাদায়েনকে ভিন্ন ভিন্ন জনপদ আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দুটি উম্মত। হযরত শুয়াইব (আ.)-কে নবুয়ত দান করে একবার মাদায়েনে ও একবার আয়কায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

ইবনে কাসীর (র.) বলেন, বিশুদ্ধ মতে তারা একই উম্মত ছিল। اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ [তোমরা ওজন ও পরিমাপ পূর্ণরূপে কর] বলে যে উপদেশ মাদায়েনবাসীকে দেওয়া হয়েছিল তা এখানে আসহাবে আয়কাকেও দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা একই উম্মত।

قَوْلُهُ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ : কারো কারো মতে قِسْط গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবি শব্দ قِسْط থেকে উদ্ভূত বলেছেন। এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমনি ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে পরিমাপে কম হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

قَوْلُهُ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ : অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চেয়ে কম দেওয়া হারাম; তা কোনো মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো শ্রমিক কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক (র.) মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারূক (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাজে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজুহাত পেশ করল, হযরত ওমর (রা.) বললেন- طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামাজ ওজনের বস্তু নয়, তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক (র.) বলেন- وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে। শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়; বরং কারো হক কম দেওয়া তা যেভাবেই হোক না কেন তা হারাম। وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ : আল্লাহর অপরাধী নিজ পায়ে হেঁটে আসে গ্রেফতারী পরোয়ানা দরকার হয় না : এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এই মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। -[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

١٩٢. وَاِنَّهٗ اَيِ الْقُرْاٰنُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط

১৯২. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।

١٩٣. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ جِبْرِيْلُ .

১৯৩. হযরত জিবরীল (আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন–

١٩٤. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ .

১৯৪. আপনার হৃদয়ে; যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন।

١٩٥. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ط بَيِّنٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ نَزَّلَ وَنَصْبِ الرُّوْحِ وَ الْفَاعِلُ اللّٰهُ .

১৯৫. অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় অপর কেরাতে نَزَلَ -এর رَاء বর্ণে তাশদীদ এবং اَلرُّوْحُ শব্দটি নসবযুক্ত রূপে পঠিত রয়েছে। আর فَاعِلٌ হলেন আল্লাহ।

١٩٦. وَاِنَّهٗ اَيْ ذِكْرُ الْقُرْاٰنِ الْمُنَزَّلِ عَلٰى مُحَمَّدٍ لَفِيْ زُبُرِ كُتُبِ الْاَوَّلِيْنَ . كَالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ .

১৯৬. আর নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআনের উপদেশ যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– তাওরাত, ইঞ্জীল।

١٩٧. اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اٰيَةً عَلٰى ذٰلِكَ اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ط كَعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ مِمَّنْ اٰمَنُوْا فَاِنَّهُمْ يُخْبِرُوْنَ بِذٰلِكَ وَيَكُنْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَنَصْبِ اٰيَةٍ وَبِالْفَوْقَانِيَّةِ وَرَفْعِ اٰيَةٍ .

১৯৭. এটা কি তাদের জন্য নয়? মক্কার কাফেরদের জন্য নিদর্শন এ ব্যাপারে যে, বনী ইসরাঈলের পণ্ডিতগণ এটা অবহিত আছে। যেমন– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছেন, কেননা তারা এ ব্যাপারে তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। يَكُنْ ফে'লটি يَاء সহকারে এবং اٰيَةً পদটি নসবযুক্ত। অথবা تَكُنْ অর্থাৎ تَاء যোগে এবং اٰيَةٌ টি পেশযুক্ত হবে। উভয়টি বৈধ রয়েছে।

١٩٨. وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ . جَمْعُ اَعْجَمَ .

১৯৮. যদি আমি একে কোনো 'আজমী'র [অনারব ব্যক্তির] উপর অবতীর্ণ করতাম اَعْجَمِيْنَ পদটি اَعْجَمُ -এর বহুবচন।

١٩٩. فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ اَيْ كُفَّارِ مَكَّةَ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ . اَنَفَةً مِنْ اِتِّبَاعِهٖ .

১৯৯. এবং তা তিনি তাদের নিকট পাঠ করতেন অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকট তবে তারা তাতে ঈমান আনত না। তার অনুসরণকে ঘৃণা করার কারণে।

অনুবাদ :

٢٠٠. كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِدْخَالِنَا التَّكْذِيْبَ بِهٖ بِقِرَاءَةِ الْاَعْجَمِ سَلَكْنٰهُ اَدْخَلْنَا التَّكْذِيْبَ بِهٖ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ بِقِرَاءَةِ النَّبِىِّ ـ

২০০. এভাবে অর্থাৎ অনারবের পাঠের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যা আখ্যাদানের স্বভাব প্রবেশ করানোর ন্যায় আমি আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছি তার প্রতি মিথ্যা আখ্যাদানের স্বভাব প্রবিষ্ট করেছি। অপরাধীদের হৃদয়ে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অন্তরে মহানবী ﷺ -এর পাঠের ব্যাপারে।

٢٠١. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

২০১. তারা এতে ঈমান আনবে না যতক্ষণ তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করে।

٢٠٢. فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ـ

২০২. ফলে তা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে; কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

٢٠٣. فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ـ لِنُؤْمِنَ فَيُقَالُ لَهُمْ لَا ـ قَالُوْا مَتٰى هٰذَا الْعَذَابُ ـ

২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে? যাতে আমরা ঈমান আনতে পারি। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, না। তারা বলবে, শাস্তি কখন আসবে?

٢٠٤. قَالَ تَعَالٰى اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ـ

২০৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

٢٠٥. اَفَرَأَيْتَ اَخْبِرْنِىْ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ـ

২০৫. তুমি ভেবে দেখ আমাকে সংবাদ জানাও যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ বিলাস করতে দেই।

٢٠٦. ثُمَّ جَاۤءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ ـ

২০৬. এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে। শাস্তি হতে।

٢٠٧. مَاۤ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ بِمَعْنٰى اَىُّ شَىْءٍ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ط فِىْ دَفْعِ الْعَذَابِ اَوْ تَخْفِيْفِهٖ اَىْ لَمْ يُغْنِ ـ

২০৭. তখন তাদের ভোগ বিলাসের উপকরণ তাদের কোনো কাজে আসবে কি? শাস্তি প্রতিহত করার কিংবা হাল্কা করার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ কোনোই কাজে আসবে না। এখানে مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ; অর্থ– اَىُّ شَىْءٍ

٢٠٨. وَمَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ـ رُسُلٌ تُنْذِرُ اَهْلَهَا ـ

২০৮. আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলেন না। রাসূলগণ, যাঁরা তার অধিবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন।

অনুবাদ :

٢٠٩. ذِكْرٰى عِظَةٌ لَهُمْ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ فِيْ اِهْلَاكِهِمْ بَعْدَ اِنْذَارِهِمْ .	২০৯. এটা উপদেশ স্বরূপ তাদের জন্য নছিহত আর আমি অন্যায়চারী নই। তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করার পর।
٢١٠. وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ بِالقران الشَّيٰطِيْنُ ج	২১০. মুশরিকদের উক্তি খণ্ডনকল্পে অবতীর্ণ হয়- তা সহ অবতীর্ণ হয়নি কুরআনসহ শয়তানরা।
٢١١. وَمَا يَنْبَغِيْ يَصْلَحُ لَهُمْ اَنْ يَنْزِلُوْا بِهِ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ط ذٰلِكَ .	২১১. তারা এ কাজের যোগ্য নয় কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হওয়ার এবং তারা এর সামর্থও রাখে না এটা করতে।
٢١٢. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لِكَلَامِ الْمَلَائِكَةِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ط مَحْجُوْبُوْنَ بِالشُّهُبِ .	২১২. তাদেরকে তো ফেরেশতাগণের কথা শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। তারা তো উল্কাপিণ্ড দ্বারা প্রতিহত কৃত।
٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ . اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ الَّذِيْ دَعَوْكَ اِلَيْهِ .	২১৩. অতএব আপনি অন্য কোনো ইলাহকে আল্লাহর সাথে ডাকবেন না। ডাকলে আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যদি তা করেন, তারা যার প্রতি আপনাকে আহবান করছে।
٢١٤. وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ . وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَقَدْ اَنْذَرَهُمْ جِهَارًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .	২১৪. আপনি আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন। তা হলো বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব, তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করেছিলেন। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে।
٢١٥. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ اَلِنْ جَانِبَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج الْمُوَحِّدِيْنَ .	২১৫. তাদের জন্য আপনার বাহু অবনমিত করুন বিনয়ী হন যারা আপনার অনুসরণ করে মুমিনগণের মধ্য হতে একত্ববাদে বিশ্বাসীগণ।
٢١٦. فَاِنْ عَصَوْكَ اَيْ عَشِيْرَتُكَ فَقُلْ لَهُمْ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ . مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ .	২১৬. যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে অর্থাৎ আপনার আত্মীয়স্বজন তবে আপনি বলে দিন তাদেরকে তোমরা যা কর তা হতে আমি দায়মুক্ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর উপাসনা হতে আমি মুক্ত।

অনুবাদ :

٢١٧. وَتَوَكَّلْ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهِ اَىْ فَوِّضْ اِلَيْهِ جَمِيْعَ اُمُوْرِكَ ـ

২১৭. আপনি নির্ভর করুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার উপর। অর্থাৎ সকল বিষয় তাঁর নিকটই সোপর্দ করে দিন।

٢١٨. اَلَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ـ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। নামাজের জন্য।

٢١٩. وَتَقَلُّبَكَ فِىْ اَرْكَانِ الصَّلٰوةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا فِى السّٰجِدِيْنَ اَىِ الْمُصَلِّيْنَ ـ

২১৯. এবং দেখেন আপনার উঠাবসা [পরিবর্তন]-কে নামাজের রুকৃসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে দাঁড়ানো, বসা, রুকূ করা ও সিজদা করাকে। সিজদাকারীদের সাথে অর্থাৎ মুসল্লীগণের সাথে।

٢٢٠. اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

২২০. তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

٢٢١. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ـ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ ـ

২২১. তোমাদেরকে কি আমি জানাব? হে মক্কার কাফেররা কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়। تَنَزَّلُ -এর মধ্যে দুটি تَا، হতে একটি تَا، -এর বিলুপ্তি ঘটেছে।

٢٢٢. تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ كَذَّابٍ اَثِيْمٍ ـ فَاجِرٍ مِثْلَ مُسَيْلَمَةَ وَغَيْرِهٖ مِنَ الْكَهَنَةِ ـ

২২২. তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট যেমন– মুসায়লামাতুল কাযযাব ও অন্যান্য গণকরা।

٢٢٣. يُلْقُوْنَ اَىِ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ اَىْ مَا سَمِعُوْهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلَى الْكَهَنَةِ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ـ يَضُمُّوْنَ اِلَى الْمَسْمُوْعِ كِذْبًا كَثِيْرًا وَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ حُجِبَتِ الشَّيَاطِيْنُ عَنِ السَّمَاءِ ـ

২২৩. তারা পেতে রাখে অর্থাৎ শয়তানরা কর্ণ অর্থাৎ ফেরেশতাদের নিকট হতে যা শুনে তা গণকদের নিকট বলে দেয়। এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। তাদের শ্রুত বিষয়ের সাথে অনেক মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে দেয়। আর এটা ছিল শয়তানদেরকে আকাশে গমন থেকে বাধাদানের পূর্বের কথা।

٢٢٤. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ـ فِىْ شِعْرِهِمْ فَيَقُوْلُوْنَ بِهٖ وَيَرْوُوْنَ عَنْهُمْ فَهُمْ مَذْمُوْمُوْنَ ـ

২২৪. এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই তাদের কবিতায়। তারা কবিতা পাঠ করে এবং কবিদের থেকে তা বর্ণনা করে। আর এটাই তো দোষের ব্যাপার।

অনুবাদ :

٢٢٥. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ مِنْ اَوْدِيَةِ الْكَلَامِ وَفُنُوْنِهٖ يَهِيْمُوْنَ يَمْضُوْنَ فَيُجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ مَدْحًا وَهِجَاءً.

২২৫. আপনি কি দেখেন না? জানেন না তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় কথা এবং তার প্রকারভেদের উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় ফলে প্রশংসা ও কুৎসা বর্ণনায় সীমাতিক্রম করে।

٢٢٦. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ فَعَلْنَا مَا لَا يَفْعَلُوْنَ اَىْ يَكْذِبُوْنَ.

২২৬. তারা বলে আমরা করেছি যা তারা করে না অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে।

٢٢٧. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا اَىْ لَمْ يَشْغَلْهُمُ الشِّعْرُ عَنِ الذِّكْرِ وَّانْتَصَرُوْا بِهَجْوِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ط بِهَجْوِ الْكُفَّارِ لَهُمْ فِىْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسُوْا مَذْمُوْمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يُحِبُّ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا مِنَ الشُّعَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ اَىَّ مُنْقَلَبٍ مَرْجِعٍ يَّنْقَلِبُوْنَ. يَرْجِعُوْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

২২৭. কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে কবিদের মধ্যে থেকে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে অর্থাৎ কবিতা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে ফিরিয়ে রাখে না এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করে কাফেরদের পক্ষ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার পর কাফেররা মুমিনদের কুৎসা বর্ণনার পর তারা দোষী নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা কোনো কুৎসামূল কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, তবে যারা অত্যাচারিত হয়।" সুতরাং যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে তোমরাও তাদের উপর তাদের অত্যাচার অনুরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ কর। যারা অত্যাচার করে কবি ও অন্যান্যদের মধ্য হতে তারা শীঘ্রই জানবে তারা কোন স্থলে প্রত্যাবর্তনস্থলে প্রত্যাবর্তন করবে মৃত্যুর পর ফিরে যাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ : এটা بِهٖ -এর যমীর থেকে حَرْف جَرّ পুনরুল্লেখ সহ بَدَل হয়েছে। আবার اَلْمُنْذِرِيْنَ-এর মুতা'আল্লিকও হতে পারে। অর্থাৎ যাতে আপনি সেসব রাসূলের অন্তর্গত হন যারা আরবি ভাষায় মানুষকে সতর্ক করতেন ও সুসংবাদ দান করতেন। যেমন– হযরত হুদ, সালেহ, শুয়াইব ও ইসমাঈল আলায়হিমুস সালাম।

قَوْلُهُ اَىْ ذِكْرُ الْقُرْاٰنِ : এ ইবরাত বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য–

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন হুবহু পূর্বের আসমানি কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে, অথচ তা যথার্থ নয়।

উত্তর : এখানে হুবহু কুরআন পূর্বের কিতাবসমূহ বিদ্যমান থাকা উদ্দেশ্য নয়, বরং তার উল্লেখ ও বর্ণনা থাকা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهٖ : আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের ৪জন সঙ্গী ইহুদি ধর্ম থেকে মুসলমান হয়েছিলেন। তারা হলেন ১. আসাদ ২. উসায়দ ৩. সা'লাবা ও ৪. ইবনে ইয়ামীন। এ চারজনের সবাই ইহুদি ছিলেন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ يَكُنْ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَنَصْبِ اٰيَةً : اٰيَةً হলো يَكُنْ -এর خَبَر مُقَدَّمٌ - আর এর اِسْم হলো اَنْ ; اٰيَةً শব্দটি مرفوع হয়ে এটা تَكُنْ -এর اِسْم مُؤَخَّرٌ এবং لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمٌ আর اَنْ يَعْلَمَهٗ এটা اِسْم থেকে بَدَل হবে। يَعْلَمَهٗ

قَوْلُهُ جَمْعُ اَعْجَمَ : অর্থাৎ, اَعْجَمِيْنَ শব্দটি اَعْجَمُ -এর বহুবচন।

প্রশ্ন : فَعْلَ ও فَعْلَاءُ -এর বহুবচন তো ين ও ون দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। অতএব, اَعْجَمِيْنَ শব্দটি اَعْجَمِيْنَ -এর বহুবচন কথাটি সঠিক নয়।

উত্তর : শব্দটি মূলত اَعْجَمِىٌّ -এর يَاءِ نِسْبَتِىْ -কে সহজার্থে বিলোপ করা হয়েছে। কাজেই اَعْجَمِىْ -এর বহুবচন اَعْجَمِيْنَ সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ : এর عَطْف হলো فَيَقُوْلُوْنَ -এর উপর। মাঝের বাক্যটি جُمْلَة مُعْتَرِضَه

قَوْلُهُ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ : এটা বাক্য হয়ে قَرْيَة -এর সিফাত হয়েছে। قَرْيَة -এর حَال -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ مِنْ قَرْيَةٍ : এর মধ্যে مِنْ মাফউলের উপর অতিরিক্ত হয়েছে। পূর্বে نَفِىْ থাকার কারণে এটা সঙ্গত হয়েছে

প্রশ্ন : اِلَّا এর পরে وَاوْ উল্লেখ না করার কারণ কি? অথচ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنَ الْقَرْيَةِ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوْمٌ -এর মধ্যে وَاوْ উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর : وَاوْ উল্লেখ না করাই নীতিসঙ্গত। কেননা বাক্যটি قَرْيَة -এর সিফত, مَوْصُوْف صِفَتْ -এর মাঝে وَاوْ না থাকাই নিয়ম। কোথাও وَاوْ উল্লেখ করা হলে তা মওসূফের সাথে সিফতের সংশ্লিষ্টতাকে দৃঢ় করা জন্য হয়। যেমন– سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ-এর মধ্যে। لَهَا উহ্য فِعْل বা شِبْه فِعْل -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে خَبَر مُقَدَّمٌ আর مُنْذِرُوْنَ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّر উভয়টি মিলে বাক্য হয়ে হয়তো قَرْيَة -এর সিফত অথবা حَال হবে। যদি خَبَرٌ হয় তাহলে বাক্যটি এরূপ হবে– اِلَّا كَائِنًا لَهَا مُنْذِرُوْنَ আর حَال হওয়ার ক্ষেত্রে বাক্য হবে– قَدْ اَنْذَرَ اَهْلَهَا مُنْذِرُوْنَ

قَوْلُهُ ذِكْرٰى : এটা হয়তো مُنْذِرُوْنَ -এর যমীর থেকে حَال অর্থাৎ مُنْذِرُوْنَ ذوى ذكرى অথবা مُذَكِّرِيْنَ ذِكْرٰى আর যদি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা হয় তাহলে مُبَالَغَة স্বরূপ গণ্য হবে। যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ , অথবা ذِكْرٰى মানসূব হবে مَصْدَرٌ তথা مَفْعُوْل مُطْلَق হিসেবে, এ সময় مُنْذِرُوْنَ শব্দটি مُذَكِّرِيْنَ -এর অর্থে হবে। বাক্যটি এরূপ হবে– مُذَكِّرُوْنَ ذِكْرٰى اَىْ تَذْكِرَةً ; আর ذِكْرٰى শব্দটি مُنْذِرُوْنَ -এর ইল্লত তথা مَفْعُوْل لَهٗ -ও হতে পারে। অর্থাৎ يُنْذِرُهُمْ لِاَجْلِ تَذْكِيْرِهِمُ الْعَوَاقِبَ আবার ذِكْرٰى উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرٌ -ও হতে পারে। অর্থাৎ هٰذِهٖ ذِكْرٰى এ সময় এটা جُمْلَة مُعْتَرِضَة হবে।

قَوْلُهُ لَهُ رَدًّا لِقَوْلِ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে قَوْل -এর مَقُوْلَه উহ্য রয়েছে। আর তা হলো إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقُوْنَ الْقُرْاٰنَ إِلَيْهِ

قَوْلُهُ شُهُبٌ : এটা شِهَابٌ -এর বহুবচন । অর্থ হলো অগ্নিচ্ছটা, উল্কাপিণ্ড।

قَوْلُهُ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ : এটা উহ্য শর্তের جَزَاء مُقَدَّمٌ যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) إِنْ فَعَلْتَ ذَالِكَ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ : অর্থাৎ تَوَكَّلْ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। وَاوْ সহ ও فَاء সহ, وَاوْ সহ হলে أَنْذِرْ -এর উপর عَطْف হবে। আর فَاء সহ হলে جَوَاب شَرْط অর্থাৎ فَقُلْ إِنِّىْ بَرِيْئٌ থেকে بَدَل হবে।

قَوْلُهُ تَقَلُّبَ : এটা يَرَاكَ -এর كَاف -এর উপর مَعْطُوْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِى السَّاجِدِيْنَ : এর মধ্যে فِىْ অব্যয়টি مَعَ অর্থে।

قَوْلُهُ عَلٰى مَنْ : এটা مُتَعَلِّقْ হয়েছে تَنَزَّلُ -এর সাথে। أُنَبِّئُكُمْ যদি তিন مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়, তাহলে كُمْ ضَمِيْر হলো প্রথম مَفْعُوْل আর প্রথম مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর প্রথম مَفْعُوْل হলো تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ বাক্যাংশটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর যদি দুই مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّىْ হয়, তাহলে বাক্যটি দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হবে। مَنْصُوْب

قَوْلُهُ مِثْلَ مُسَيْلَمَةَ : ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে এ উদাহরণ পেশ করা সঙ্গত হয়নি। কেননা প্রথমত মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের পরে নবী হওয়ার দাবি করেছিল। আর সে সময় শয়তানদেরকে আকাশে অবাধে যাওয়া আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কাজেই তার নিকট শয়তানদের আসমানি সংবাদ পৌঁছানো সঠিক নয়। দ্বিতীয়ত মুসায়ালামা জ্যোতিষ বা গণক ছিল না; বরং সে ছিল ভণ্ড ও মিথ্যুক। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (র.)-এর مِنَ الْكَهَنَةِ বলাটা সঙ্গত মনে হয় না।

قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ : যেমন সাতীহ ছিল গণক আর كَاهِنْ [গণক] বলা হয় অগ্রিম সংবাদ প্রদানকারীকে । عَرَّافٌ বলা হয় অতীতের সংবাদদাতাকে । -[জুমাল]

قَوْلُهُ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ : এখানে اَىْ অব্যয়টি حَرْف نِدَا ও হতে পারে, যেমনটা স্বাভাবিভাবে বুঝে আসছে। আবার تَفْسِيْرِيَّة -ও হতে পারে। এ সময় مُفَسَّرٌ তথা ব্যাখ্যেয় বিষয় হবে أُنَبِّئُكُمْ -এর ضَمِيْر টি।

قَوْلُهُ يَهِيْمُوْنَ : এটা اَنَّ -এর خَبَرْ আর فِىْ كُلِّ وَادٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ

قَوْلُهُ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : এটা উহ্য مَذْمُوْمُوْنَ থেকে إِسْتِثْنَاء হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচান

قَوْلُهُ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ..... زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ : শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কুরআন : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবি ভাষায় লিখিত কুরআনই কুরআন। অন্য যে কোনো ভাষায় কুরআনের কোনো বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা যাবে না।

وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ থেকে বাহ্যত এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় থাকলে তাও কুরআন। কেননা اِنَّهٗ -এর সর্বনামটি বাহ্যত কুরআনকে বোঝায় زُبُرٌ শব্দটি زَبُوْرٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কুরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলা বাহুল্য, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবুর ইত্যাদি পূববর্তী কিতাব আরবি ভাষায় ছিল না। কেবল কুরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লিখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোনো সময় শুধু কুরআনের বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক অর্থে কুরআন বলে দেওয়া হয়। কারণ কোনো কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কুরআন উল্লিখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কুরআনের কোনো কোনো বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে সূরা বাকারা' 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেওয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা طٰسٓ দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা حٰمٓ দ্বারা শুরু হয়,

সেগুলো মূসা (আ.)-এর ফলক থেকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সূরা ফাতিহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মুলক তাওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিসমা সম্পর্কে তো স্বয়ং কুরআন বলে যে, إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-এর সহিফাসমূহে আছে।

এসব আয়াত ও রেওয়ায়াতের সারমর্ম এই যে, কুরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরি নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কুরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কুরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারেরও নাম নয়। যদি কেউ কুরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে– خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ তবে একে কেউ কুরআন বলতে পারবে না। এমনিভাবে শুধু কুরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোনো ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কুরআন বলা যায় না।

নামাজে কুরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ : এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাজে ফরজ তেলাওয়াতের স্থলে কুরআনের শব্দাবলির অনুবাদ ফার্সী, উর্দু, ইংরেজি ইত্যাদি কোনো ভাষায় পাঠ করা অপারগ অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয় । কোনো কোনো ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে; কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কুরআনের উর্দু অনুবাদকে ‘উর্দু কুরআন’ বলা জায়েজ নয় : এমননিভাবে আরবি মূল বাক্যাবলি ছাড়া শুধু কুরআনের অনুবাদ কোনো ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কুরআন বলা জায়েজ নয়। যেমন আজকাল অনেকেই শুধু উর্দু, অনুবাদকে ‘উর্দু কুরআন ’ ইংরেজি অনুবাদকে ‘ইংরেজি কুরআন’ বলে দেয়। এটা নাজায়েজ ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলি ছাড়া কুরআনকে অন্য কোনো ভাষায় ‘কুরআন ’ নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েজ।

قَوْلُهُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ : এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামত। কিন্তু যারা এই নিয়ামতের নাশোকরী করে, বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘজীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোনো কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) প্রতিদিন সকালে তার শ্মশ্রু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন– أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ এর পর অঝোরে কাঁদতে থাকতেন এবং এই কবিতা পাঠ করতেন–

نَهَارُكَ بِالْغُرُوْرِ سَهْوٌ وَغَفْلَةٌ * وَلَيْلُكَ نَوْمٌ وَالرَّدٰى لَكَ لَازِمٌ
فَلَا أَنْتَ فِى الْإِيْقَاظِ يَقْظَانُ حَازِمٌ * وَلَا أَنْتَ فِى النَّوْمِ نَاجٍ وَسَالِمٌ
وَتَسْعٰى إِلٰى مَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّهٗ * كَذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا تَعِيْشُ الْبَهَائِمُ

অর্থাৎ তোমার সমগ্র দিন গাফিলতিতে এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অপরিহার্য। তুমি জাগ্রতদের মধ্যে হুশিয়ার ও জাগ্রত নও এবং নিদ্রামগ্নদের মধ্যে তোমার মুক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত নও। তোমার চেষ্টাচরিত্র এমন কাজের জন্য, যার অশুভ পরিণাম শীঘ্রই সামনে আসবে। দুনিয়াতে চতুষ্পদ জন্তুরাই এমনিভাবে জীবন ধারণ করে।

قَوْلُهُ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ : عَشِيْرَةٌ শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। اَقْرَبِيْنَ বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তা সাপেক্ষে বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রিসালাত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরজ ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তাবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভালো ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চেয়ে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোনো মিথ্যা দাবিদার সুবিধা করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিধিত, তার সত্য দাওয়াত কবূল করা তাদের জন্য সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোনো আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা ও সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সততার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয় ও স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলি পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরি হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নমের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ ও সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহে যদি একজন লোক পূর্ণরূপে নামাজ পড়তে চায়, তবে পাকা নামাজির পক্ষেও নামাজের যথাযথ হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ কঠিন কাজ; বরং এর কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতিগোষ্ঠি যে ক্ষেত্রে গুনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সবাইকে একত্র করে সত্যের এই পয়গাম শুনিয়ে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ঈমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে ফেলে।

قَوْلُهُ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ : কবিতার সংজ্ঞা : অভিধানে এমন বাক্যাবলিকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর ছন্দ, ওযন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রে এ ধরনের বিষয়বস্তুকে "কবিতাধর্মী প্রমাণ" এবং কবিতা-দাবিযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণত কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলিকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকার কুরআনের شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهٖ شَاعِرٌ مَجْنُوْنٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ওযন বিশিষ্ট ও সমিল শব্দ বিশিষ্ট বাক্যাবলি নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ তারা কবিতার রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, কুরআন কবিতাবলির সমষ্টি নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে [নাউযুবিল্লাহ] মিথ্যাবাদী বলা। কারণ شِعْر [কবিতা] মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَاذِبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شَاعِرٌ বলা হয়। তাই মিথ্যা প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যবলিকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলিকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ -আয়াতে কবিতার পারিভাষিক ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা ওযনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলি রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল বারীর এক রেওয়ায়েত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, এই আয়াত নাজিল হবার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় না। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। -[ফতহুল বারী]

ইসলামি শরিয়তে কাব্যচর্চার মান ও অবস্থান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে

বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গুনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র, সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ –আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে ইবাদত ও ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে– إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً অর্থাৎ কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে। –[বুখারী]

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই রেওয়াতে 'হিকমত' বলে সত্য ভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার একত্ব, তাঁর জিকির এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরিউক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরো সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়– ১. উমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবূ সলতের একশ লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। ২. মুতারিক বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শুনাতেন। ৩. তাবারী (র.) প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন এবং শুনাতেন। ৪. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হযরত আয়েশা(রা.) কবিতা বলতেন। ৫. আবূ ইয়ালা ইবনে ওমর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভালো এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গুনাহের হলে কবিতা মন্দ।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার জ্ঞান-গরিমায় সেরা দশজন ফিকহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়ের ইবনে বাক্কারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) আবূ আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারে না। কেননা ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবীগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ও কুরআন থেকে গাফিল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বুখারী (র.) একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন– لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا অর্থাৎ, পুঁজ দ্বারা পেটভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চেয়ে উত্তম। ইমাম বুখারী (র.) বলেন আমার মতে, এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ কুরআন তেলাওয়াত ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ অথবা শরিয়ত বিরোধী অন্য কোনো বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও নাজায়েজ। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।

খলীফা হযরত ওমর (রা.) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) আমর ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমর ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়। –[কুরতুবী]

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফিল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরাহ (র.) বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হয়ে যায় : وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ –আয়াতে কবিদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে যে, তাদের অনুসারীরা পথভ্রষ্ট। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, পথভ্রষ্ট হলো অনুসারীরা, তাদের কর্মের দোষ অনুসৃত অর্থাৎ, কবিদের প্রতি কিরূপে আরোপ করা হলো? এর কারণ এই

যে, সাধারণত অনুসারীদের পথভ্রষ্টতা অনুসৃতদের পথভ্রষ্টতার আলামত ও চিহ্ন হয়ে থাকে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, একথা তখন প্রযোজ্য, যখন অনুসারীর পথভ্রষ্টতার মধ্যে অনুসৃতের অনুসরণের দখল থাকে। উদাহরণত অনুসৃত ব্যক্তি মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচানোর প্রতি যত্নবান নয়। তার মজলিসে এ ধরনের কথাবার্তা হয়। সে বাধা-নিষেধ করে না। ফলে অনুসারীর মধ্যেও মিথ্যা ও পরনিন্দার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অনুসারীর গুনাহ স্বয়ং অনুসৃতের গুনাহের আলামত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার যে কারণ, সেই কারণে অনুসরণ না করে অন্য কারণে অনুসরণ করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে অনুসারীর পথভ্রষ্টতার অনুসৃতের পথভ্রষ্টতার আলামত হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি আকিদা-বিশ্বাস ও মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে কোনো আলেমের অনুসরণ করে এবং এসব ব্যাপারে অনুসারীর মধ্যে কোনো পথভ্রষ্টতা নেই। কিন্তু কর্ম ও চরিত্র গঠনের ব্যাপারে এই আলেমের অনুসরণ করে না এবং এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। এক্ষেত্রে তার কর্ম ও চরিত্রগত পথভ্রষ্টতা এই আলেমের পথভ্রষ্টতার দলিল হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ : শানে নুযূল : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই কুরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অন্তরে নাজিল করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় অলংকার দেখে কাফেররা বিস্মিত হতো। কেননা প্রিয়নবী ﷺ কখনো কারো নিকট কোনো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি, অথচ তাঁর জবান মুবারক থেকে এক অদ্বিতীয় কালাম বের হয়ে আসছে। তাই কোনো কোনো কাফের বলতে লাগল যে, হয়তো কোনো জিন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কুরআনে কারীম শিখিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন হুজুর ﷺ -এর নিকট ওহীর আগমন বন্ধ ছিল। তখন এক কাফের মহিলা প্রিয়নবী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল, "আপনার শয়তানটি কি আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে"? কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الخ : পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের মহান বাণী, এটি কোনো জিন বা শয়তানের কথা নয়। কেননা শয়তান বা জিনেরা সর্বদা মন্দ কাজের কথা বলে, অথচ পবিত্র কুরআন হলো হেদায়েতের মূল উৎস। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাক্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র বিশ্ববাসীর সামনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিশ্ববাসী তাঁদের দৃষ্টান্ত আর কখনো দেখেনি। পক্ষান্তরে শয়তান হলো পথভ্রষ্টতার মূল উৎস। সে মানুষকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, সৎকাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে। অতএব, পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়ত শয়তানের পক্ষে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করাও সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন অবতরণকালে জিন শয়তানদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআন নাজিল শুরু হওয়ার পূর্বে জিন শয়তানরা আসমানে যাওয়ার সুযোগ পেত। সেখান থেকে কোনো কথা শ্রবণ করে তারা গণকদেরকে বলতো। আর গণকরা ঐ একটি কথার সঙ্গে একশটি মিথ্যা কথা মিশিয়ে মানুষকে বলতো। কিন্তু যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়, তখন আসমানে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিন শয়তানদের আসমানে গমন চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ـ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ

অর্থাৎ আর তারা কুরআন নিয়ে অবতরণ করেনি, আর তাতে তারা সক্ষমও হয়নি। নিশ্চয় শয়তানদেরকে আসমানি কথা শ্রবণের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে।

অতএব পবিত্র কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কালাম তাঁর মহান বাণী, পবিত্র কুরআনের অনুশীলন এবং অনুসরণ মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ২৪৭-৪৮]

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ : সূরা নামল মক্কায় অবতীর্ণ

وَهِيَ ثَلَاثٌ اَوْ اَرْبَعٌ اَوْ خَمْسٌ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً

আয়াত : ৯৩/৯৪/৯৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. طٰسٓ تف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ تِلْكَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ اَىْ اٰيَاتٌ مِنْهُ وَكِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ مُظْهِرُ الْحَقِّ مِنَ الْبَاطِلِ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ ـ

১. তা-সীন আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত। এগুলো এ আয়াতগুলো আয়াত আল কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের যা বাতিল হতে হককে প্রকাশকারী। এখানে অতিরিক্ত সিফতসহ عَطْف করা হয়েছে।

٢. هُوَ هُدًى اَىْ هَادٍ مِنَ الضَّلَالَةِ وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ اَلْمُصَدِّقِيْنَ بِهٖ بِالْجَنَّةِ ـ

২. পথনির্দেশ অর্থাৎ ভ্রষ্টতা হতে হেদায়েতের পথ নির্দেশকারী এবং সুসংবাদ মুমিনদের জন্য। অর্থাৎ তাঁর সত্যায়নকারীদের জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদ।

٣. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ يَاْتُوْنَ بِهَا عَلٰى وَجْهِهَا وَيُؤْتُوْنَ يُعْطُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ يَعْلَمُوْنَهَا بِالْاِسْتِدْلَالِ وَاُعِيْدَهُمْ لِمَا فُصِّلَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْخَبَرِ ـ

৩. যারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ তা যথাযথভাবে আদায় করে ও জাকাত দেয় আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী দলিল প্রমাণসহ তা বিশ্বাস করে। এখানে هُمْ সর্বনামটি পুনরুল্লেখ করা হয়েছে মুবতাদা ও খবরের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে।

٤. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ الْقَبِيْحَةَ بِتَرْكِيْبِ الشَّهْوَةِ حَتّٰى رَاَوْهَا حَسَنَةً فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ط يَتَحَيَّرُوْنَ فِيْهَا لِقُبْحِهَا عِنْدَنَا ـ

৪. যারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করে দিয়েছি। রিপুর বাসনাকে জড়িত করে। ফলে তারা তাকে ভালো মনে করে থাকে। ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়; উক্ত মন্দ কর্মে অস্থির হয়ে। আমার নিকট তা মন্দ হওয়ার কারণে

٥. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ اَشَدُّهٗ فِى الدُّنْيَا الْقَتْلُ وَالْاَسْرُ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ـ لِمَصِيْرِهِمْ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ـ

৫. এদের জন্যই রয়েছে জঘন্য শাস্তি কঠিন শাস্তি পৃথিবীতে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। চিরস্থায়ী দোজখের আগুনে তাদের প্রত্যাবর্তনের কারণে।

٦. وَاِنَّكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ . لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ اَىْ يُلْقٰى عَلَيْكَ بِشِدَّةٍ مِنْ لَّدُنْ مِنْ عِنْدِ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ فِىْ ذٰلِكَ .

٧. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ زَوْجَتِهٖ عِنْدَ مَسِيْرِهٖ مِنْ مَدْيَنَ اِلٰى مِصْرَ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ اَبْصَرْتُ مِنْ بَعِيْدٍ نَارًا ط سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ عَنْ حَالِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ ضَلَّهَا اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ بِالْاِضَافَةِ لِلْبَيَانِ وَتَرْكِهَا اَىْ شُعْلَةَ نَارٍ فِىْ رَاْسِ فَتِيْلَةٍ اَوْ عُوْدٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ . وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ مِنْ صَلِىَ بِالنَّارِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا تَسْتَدْفِئُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ .

٨. فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ اَىْ بِاَنْ بُوْرِكَ اَىْ بَارَكَ اللّٰهُ مَنْ فِى النَّارِ اَىْ مُوْسٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ط اَىِ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوِ الْعَكْسُ وَبَارَكَ يَتَعَدّٰى بِنَفْسِهٖ وَبِالْحَرْفِ وَيُقَدَّرُ بَعْدَ فِىْ مَكَانٌ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . مِنْ جُمْلَةِ مَا نُوْدِىَ وَمَعْنَاهُ تَنْزِيْهُ اللّٰهِ مِنَ السُّوْءِ .

٩. يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَىِ الشَّاْنُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

অনুবাদ :

৬. নিশ্চয় আপনাকে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআন দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আপনার উপর কঠোর উপায়ে অবতীর্ণ করা হচ্ছে প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞের নিকট হতে। এ ব্যাপারে।

৭. স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর পরিবারবর্গকে বলে ছিলেন তাঁর স্ত্রীকে মাদায়েন থেকে মিশর যাত্রাপথে আমি তো আগুন দেখেছি দূরে লক্ষ্য করছি সত্বর আমি সেথা হতে কোনো খবর আনব তোমাদের জন্য রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে। আর তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অথবা তোমাদের জন্য আনব জ্বলন্ত আঙ্গার بِشِهَابٍ قَبَسٍ -এর মধ্যে اِضَافَتْ بَيَانِيَّة আকারে বা ইযাফতবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ, সলতা বা কাষ্ঠখণ্ডের মাথায় করে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসব। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। تَصْطَلُوْنَ শব্দে طَاء টি اِفْتِعَالْ -এর تَا হতে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। এটা صَلِىَ بِالنَّارِ থেকে নিষ্পন্ন। এর لَامْ বর্ণে যের বা যবরযোগে। অর্থ– যাতে তোমরা ঠাণ্ডা প্রতিরোধকল্পে তাপ গ্রহণ করতে পার।

৮. অতঃপর তিনি যখন এর নিকট আসলেন তখন ঘোষিত হলো– ধন্য তিনি আল্লাহ বরকত দিয়েছেন যিনি আছেন এই আলোর মধ্যে অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) এবং যারা আছে এর চতুষ্পার্শে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বা এর বিপরীত। আর بَارَكَ ফে'লটি কখনো নিজে নিজেই مُتَعَدِّىْ হয় আবার কখনো হরফের মাধ্যমেও مُتَعَدِّىْ হয়। আর فِىْ -এর পর مَكَان উহ্য রয়েছে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। اَلْعٰلَمِيْنَ পর্যন্ত অংশটিও ঘোষণার অন্তর্গত। আর سُبْحَانَ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো মন্দ থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করা।

৯. হে মূসা! আমি তো আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় اِنَّهٗ -এর যমীরটি হলো যমীরে শান।

অনুবাদ :

١٠. وَالْقِ عَصَاكَ ط فَأَلْقَاهَا فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ تَتَحَرَّكُ كَاَنَّهَا جَآنٌّ خَفِيْفَةٌ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ط يَرْجِعْ قَالَ تَعَالٰى يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ قف مِنْهَا اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ عِنْدِىْ الْمُرْسَلُوْنَ ق مِنْ حَيَّةٍ وَّغَيْرِهَا .

১০. আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন ফলে তিনি তা ফেললেন, অতঃপর তিনি যখন এটাকে সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন جَانٌّ বলা হয় ছোট সাপকে। তখন তিনি পেছনের দিকে ছুটতে লাগলেন এবং ফিরেও তাকালেন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– হে মূসা! আপনি ভীত হবেন না এতে। নিশ্চয় আমি এমন আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পান না। সর্প ইত্যাদি হতে।

١١. اِلَّا لٰكِنْ مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا اَتَاهُ بَعْدَ سُوْءٍ اَىْ تَابَ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . اَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَاَغْفِرُ لَهٗ .

১১. তবে যারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে অর্থাৎ তওবা করে তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু অর্থাৎ আমি তার তওবা গ্রহণ করি ও তাকে ক্ষমা করে দেই।

١٢. وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ طَوْقَ الْقَمِيْصِ يَخْرُجْ خِلَافَ لَوْنِهَا مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضَاۤءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ بَرَصٍ لَهَا شُعَاعٌ يَغْشِى الْبَصَرَ اٰيَةً فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ مُرْسَلًا بِهَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ .

১২. এবং আপনার হাত আপনার বগলে রাখুন জামার আস্তীনের নিচে বের হয়ে আসবে বাদামী বর্ণের বিপরীত বর্ণ শুভ্র নির্মল অবস্থায় শ্বেত রোগ ইত্যাদি ছাড়াই তাতে ঔজ্জ্বল্য হবে, যাতে চোখ ঝলসে যায়। একটি নিদর্শন ও মুজেযা এটা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত যা সহ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

١٣. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً اَىْ مُضِيْئَةً وَاضِحَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ج بَيِّنٌ ظَاهِرٌ .

১৩. অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসল। অর্থাৎ আলোকিত ও প্রকাশ্য তারা বলল, এটা সুস্পষ্ট জাদু। প্রকাশ্য ও স্পষ্ট।

١٤. وَجَحَدُوْا بِهَا اَىْ لَمْ يُقِرُّوْا وَقَدْ اسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ اَىْ تَيَقَّنُوْا اَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا ط تَكَبُّرًا عَنِ الْاِيْمَانِ بِمَا جَاۤءَ بِهٖ مُوْسٰى رَاجِعٌ اِلَى الْجُحْدِ فَانْظُرْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ الَّتِىْ عَلِمْتَهَا مِنْ اِهْلَاكِهِمْ .

১৪. তারা নিদর্শনগুলো প্রত্যাখান করল অর্থাৎ স্বীকার করল না, অথচ তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিল যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যায় ও উদ্ধতভাবে অহঙ্কারবশত হযরত মূসা (আ.) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হতে। আপনি দেখুন! হে মুহাম্মদ ﷺ ! বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে যা আপনি অবগত হয়েছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عَطْفٌ بِزِيَادَةِ صِفَةٍ : লেখক এ বাক্য দ্বারা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : اقُرْاٰن -এর উপর কিতাবের عطف করা عَطْفُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ -এর অন্তর্গত মনে হয়, আর তা বৈধ নয়। কেননা উভয়টির অর্থ উদ্দেশ্য একই।

উত্তর : مَعْطُوْف যদি কোনো অতিরিক্ত সিফত বিশিষ্ট হয়, তখন তার উপর عَطْف করা বৈধ হয়। কারণ তখন তা অনর্থক হয় না।

قَوْلُهُ يُؤْتُوْنَ : এটা اِيْتَاءٌ থেকে مُضَارِعْ مَعْرُوْف এর সীগা, অর্থ তারা দেয়।

قَوْلُهُ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ : هُمْ হলো مُبْتَدَأ . يُوْقِنُوْنَ হলো خَبَرْ আর يُوْقِنُوْنَ -এর সাথে بِالْاٰخِرَةِ অগ্রগামী مُتَعَلِّقْ এখানে مُبْتَدَأ ও خَبَرْ -এর মাঝে جارمجرور -এর ব্যবধান ঘটায় هم যমীরকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। যাতে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে مُبْتَدَأ -এর সাথে خَبَرْ -এর اِتِّصَالْ বা সংযোগ ঘটে। ব্যাখ্যাকার (র.) وَاُعِيْدَهُمْ الخ বৃদ্ধি করে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

قَوْلُهُ يَعْمَهُوْنَ : এটা عَمَهٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে অর্থ– সংশয়, সন্দেহ, অস্থিরতা, বিভ্রান্তি।

قَوْلُهُ لِقُبْحِهَا عِنْدَنَا : এ ইবারত দ্বারা এ প্রশ্ন নিরসন করেছেন যে, কাফেরদের নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সংশয় ও বিভ্রান্ত হওয়ার উদ্দেশ্য কি? কারণ তারা তো বুঝেশুনে স্বেচ্ছায় স্ব-জ্ঞানেই কুফরি করে থাকে।

উত্তর : আমাদের কাছে তারা সংশয়ে লিপ্ত, তাদের নিজেদের কাছে নয়। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তানের প্রতারণা ও বিভ্রান্তিকর কথা ও কাজ এবং দয়াময় আল্লাহর গায়বী সংবাদাদির মাঝে স্পষ্ট সংঘাতের দরুন তারা বিভ্রান্তি ও সংশয়ে লিপ্ত। তাদের মধ্যে এ পরিমাণ জ্ঞান নেই যার মাধ্যমে তারা ভালো-মন্দ ও সত্য-অসত্যের মাঝে প্রভেদ করবে। তারা কুফরি মতবাদের উপরই দৃঢ় থাকবে নাকি তা পরিহার করে সত্য দ্বীন গ্রহণ করবে– এ বিষয়ে তারা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাখ্যাটি প্রশ্নমুক্ত নয়। কেননা কাফেররা যখন তাদের কর্মকে সঠিক ও উত্তম জ্ঞান করে, কাজেই তাদের সন্দিহান হওয়ার কোনো প্রশ্ন উঠে না। এ কারণে অন্যান্য মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই উত্তম। তা এই যে, يَعْمَهُوْنَ ক্রিয়াটি يَسْتَمِرُّوْنَ وَيُدَاوِمُوْنَ عَلَيْهَا তথা কুফর ও শিরকের উপর অনড় থাকা অর্থে। –[আবুস সাউদ] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদা يَعْمَهُوْنَ -এর ব্যাখ্যা করেছেন يَلْعَبُوْنَ খেল-তামাশায় বিভোর থাকা দ্বারা। –[জুমাল-সংক্ষেপিত]

قَوْلُهُ لِمَصِيْرِهِمْ : এটা اَخْسَرُوْنَ -এর ইল্লত বা কারণ اَخْسَرُ হলো اِسْم تَفْضِيْل مُبَالَغَه বা আধিক্যজ্ঞাপক, অংশীদারিত্বজ্ঞাপক নয়। কেননা মুমিনদের জন্য ক্ষতি বা লোকসানের কিছুই নেই। কেউ কেউ বলেন– مُفَضَّلْ عَلَيْهِ তথা যাদের উপর প্রাধান্য বুঝাবে তারা কাফের গোষ্ঠী-ই, তবে স্থান-কালের পার্থক্য থাকতে পারে। অর্থাৎ কাফেররা দুনিয়ার তুলনায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

قَوْلُهُ لَتُلَقّٰى : অর্থ– তোমাকে তালকীন করা হচ্ছে, শিখানো হচ্ছে। মূলত تُتَلَقّٰى ছিল بَاب تَفَعُّلْ থেকে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ, একটি تَاء -কে বিলোপ করা হয়েছে। এটা দু' مَفْعُوْل -এর প্রতি مُتَعَدِّیْ প্রথমটি فَاعِلْ -এর স্থলাভিষিক্ত। مُضَارِعْ مَجْهُوْل দ্বিতীয় مَفْعُوْل হলো اَلْقُرْاٰنَ

قَوْلُهُ بِشِدَّةٍ : কেননা সেখানে ভীষণ কষ্ট রয়েছে, অবতীর্ণের সময়ও এবং আমলের ক্ষেত্রেও।

قَوْلُهُ بِالْاِضَافَةِ : জালালাইন -এর বর্তমান কপিতে ইজাফতবিহীন রয়েছে। এ সময় قَبَسٍ শব্দটি مَقْبُوْسٍ অর্থে شِهَابٍ -এর بَدَلْ বা نَعْتْ হবে। আর ইযাফত আকারে হলে এটা اِضَافَتْ بَيَانِيَّة হবে।

قَوْلُهُ شُعْلَةَ نَارٍ : এটা مُضَافْ اِلَيْه ও مُضَافْ উভয়ের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ شِهَابٍ অর্থ– কুণ্ডলী, আর قَبَسٍ অর্থ– অগ্নি। فَتِيْلَةٌ অর্থ– সলতা, বটা বস্তু।

قَوْلُهُ نُوْدِيَ: এর نَائِب فَاعِل হলো مُوْسٰى এ সময় اَنْ تَفْسِيْرِيَّهْ হবে। কেননা পূর্বে نُوْدِيَ টি قِيْلَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, اَنْ تَفْسِيْرِيَّةْ উদ্দেশ্য নেওয়ার জন্য জরুরি হলো পূর্বে قَوْل বা তার থেকে নিষ্পন্ন কোনো শব্দ বা তার অর্থ বিশিষ্ট কোনো শব্দ বিদ্যমান থাকতে হবে। আর এখানে যদিও قَوْل থেকে গঠিত কোনো শব্দ নেই, তবে তার অর্থবোধক نُوْدِيَ শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব اَنْ تَفْسِيْرِيَّةْ হবে। আবার مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ -ও হতে পারে। আর তার اِسْم হবে ضَمِيْر شَانْ আর بُوْرِكَ হবে তার خَبَرْ আবার اَنْ مَصْدَرِيَّةْ -ও হতে পারে। তখন حَرْف جَرّ উহ্য থাকবে। অর্থাৎ بِاَنْ হবে, আর اَنْ -এর পরের অংশ مَصْدَرْ -এর অর্থ বিশিষ্ট হবে। বাক্যটি এরূপ হবে– نُوْدِيَ بِبَرَكَةِ مَنْ فِى النَّارِ বَارَكَ শব্দটি مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهِ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– بَارَكَ الرَّجُلَ অর্থাৎ লোকটির জন্য বরকতের দোয়া করেছে। আবার لَامْ , فِىْ ও عَلٰى -এর সাথে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়– بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ، بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا نُوْدِيَ : এর উদ্দেশ্য এই যে, যে জিনিসের আহবান করা হয়েছে তার মধ্যে تَنْزِيْه তথা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতামূলক বাক্য যথা سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -ও অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ تَهْتَزُّ : এটা رَاٰهَا -এর مَفْعُوْل -এর যমীর থেকে حَالْ আর وَلّٰى مُدْبِرًا হলো لَمَّا -এর جَوَابْ

قَوْلُهُ اِلَّا لٰكِنْ مَنْ ظَلَمَ : মুফাসসির (র.) اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ অর্থাৎ مَنْ ظَلَمَ দ্বারা غَيْر مُرْسَلِيْنَ তথা রাসূল নয় এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَنْ ظَلَمَ : এটা مُبْتَدَأ আর فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ হলো خَبَرْ

قَوْلُهُ مُبْصِرَةً : এটা اٰيَاتُ -এর حَالْ আর اٰيَاتْ -এর প্রতি مُبْصِرَةٌ -এর সম্বন্ধ হলো مَجَازِىْ বা রূপক। কেননা اٰيَاتُ দর্শনকারী হতে পারে না, বরং তার আলোকে দর্শন করা যায়। যেমন– نَهْرٌ جَارٍ -এর মধ্যে اِسْنَاد مَجَازِىْ হয়েছে, অদ্রূপ কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন– مُبْصِرَةٌ যদিও اِسْم فَاعِل তবে এটা اِسْم مَفْعُوْل অর্থে।

قَوْلُهُ اِسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُكُمْ : এটা جَحَدُوْا -এর وَاوْ থেকে قَدْ উহ্যসহ حَالْ

قَوْلُهُ ظُلْمًا وَعُلُوًّا : -এর সম্বন্ধ হলো جَحَدُوْا -এর সাথে। অর্থাৎ, তাদের অস্বীকারের ইল্লত হলো জুলুম ও অহংকার।

قَوْلُهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ : كَيْفَ হলো كَانَ -এর خَبَر مُقَدَّمْ এবং عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ হলো اِسْم مُؤَخَّرْ আর পূর্ণ বাক্যটি اُنْظُرْ বা চিন্তা-ভাবনা অর্থে, তার مُتَعَلِّقْ হওয়ায় مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নামলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু, ১১৪৯ বাক্য এবং ৪৭৬৭ অক্ষর রয়েছে। নামল শব্দটির অর্থ হলো পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় নামল বা পিপীলিকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন নামল'। পিপীলিকার এ ঘটনা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ বহন করে, তাই এ ঘটনার গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হিজরতের রাতে যখন তিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ গুহার মুখে মাকড়সা তার জাল বিস্তার করেছিল, আর তা ছিল মহানবী ﷺ -এর মুজেযা ও নবুয়তের দলিল। ঠিক তেমনিভাবে হুদহুদ নামক পাখির চিঠি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং বিলকিস রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রভৃতি ছিল হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এ সূরায় আল্লাহ পাক হযরত সুলায়মান (আ.)-এর তাবলীগের পন্থা উল্লেখ করেছেন। পিপীলিকার এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী মাত্রই এ সম্পর্কে অবগত যে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণ কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেন না।

এ সূরায় তাওহীদ এবং নবুয়ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মুয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে হক্কানী পারা. ১৯, পৃ. ৩]

এই সূরার আমল : যদি কেউ এই সূরা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে স্বগৃহে হেফাজত করে তবে সেই গৃহ সাপ বিচ্ছুসহ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে সংরক্ষিত থাকেব। -[দুরারুন নাজিম]

স্বপ্নের তাবীর : সুফুরী (র.) বলেন, যদি কেউ স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে সে তার সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআন ও প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালতের সত্যতা সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রিসালতের প্রমাণ বর্ণিত হবার পর তাওহীদ এবং তার দলিলের বিবরণ স্থান পেয়েছে। পরে রয়েছে আখেরাত সম্পর্কীয় আলোচনা।

قَوْلُهُ طٰسٓ : এ অক্ষসমূহকে মুকাত্তায়াত বলা হয়, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।

আব্দুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ এবং ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া-সীন" হলো পবিত্র কুরআনের নাম সমূহের অন্যতম। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১১১]

قَوْلُهُ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ : অর্থাৎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এখানে اَعْمَالَهُمْ বলে তাদের সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সৎকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু জালিমরা এদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি; বরং কুফর ও শিরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তাফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ প্রথমত সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

১. زُيِّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ২. وَزُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ৩. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

সৎকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম। যেমন- حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ দ্বিতীয়ত আয়াতে উল্লিখিত اَعْمَالَهُمْ [তাদের কর্ম] শব্দও এ কথা বোঝায় যে, এর অর্থ হলো- কুকর্ম; সৎকর্ম নয়।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ اِنِّيْ ...... لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ : মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : হযরত মূসা (আ.) এ স্থলে দুটি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। ১. বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। ২. অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তূর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবি করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবত এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত- পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা। -[রুহুল মা'আনী]

এ স্থলে হযরত মূসা (আ.) تَصْطَلُوْنَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শুয়াইব (আ.)-এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্য সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করে বরং ইশারা ইঙ্গিতে বলা উত্তম : আয়াতে قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖ বলা হয়েছে। اَهْل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ স্থলে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন অন্য কেউ ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া

যায় যে মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন– সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ ..... اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : মূসা (আ.)-এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ : হযরত মূসা (আ.)-এর এই ঘটনা কুরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দুইটি বাক্য চিন্তাসাপেক্ষ– ১. بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এবং ২. اَنَّهُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে– اِذْ رَاٰى نَارًا থেকে نُوْدِىَ يَامُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ـ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ

এসব আয়াতেও দুইটি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ– ১. اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ এবং ২. اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ ; সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

এই সূরাত্রয়ের বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন রূপে হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মূসা (আ.)-এর আগুনের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলার তূর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এই আওয়াজ শুনা গেল– ١. اِنَّهُ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ ٢. اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ ٣. اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ٤. اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا

এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বারবার হয়েছে একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যান (র.) এবং রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একই রূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোনো বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে– শুধু কর্ণ নয়; বরং হাত, পা এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা বিশেষ মুজেযা।

এই গায়বি আওয়াজ নির্দিষ্ট কোনো দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো। কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্য বিভ্রান্তি ও তা প্রতিমা পূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনায় তাওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশও সাথে সাথে করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে سُبْحَانَ اللّٰهِ শব্দ এই হুশিয়ারির জন্যই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا এবং সূরা কাসাসে اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্য আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছিলেন বলেই তাকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কালাম ও আল্লাহর সত্তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তা'আলার একটি সৃষ্টবস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে– اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ ধন্য সে, যে অগ্নিতে আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরিউক্ত কারণেই এর তাফসীরে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে– مَنْ فِى النَّارِ বলে হযরত মূসা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে হযরত মূসা (আ.) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই হযরত মূসা (আ.) অগ্নির মধ্যে হলেন। وَمَنْ حَوْلَهَا বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে– مَنْ فِى النَّارِ বলে ফেরেশতা এবং وَمَنْ حَوْلَهَا বলে হযরত মূসা (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

অনুবাদ :

١٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِبْنَهٗ عِلْمًا ج بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْطِقِ الطَّيْرِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَقَالَا شُكْرًا لِلّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَتَسْخِيْرِ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالشَّيَاطِيْنِ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج

১৫. আমি অবশ্যই হযরত দাউদ ও তাঁর ছেলে সুলায়মান (আ.)-কে দান করেছিলাম জ্ঞান মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করা এবং পাখিদের সাথে কথা বলা ইত্যাদির জ্ঞান। তারা উভয়ে বলেছিলেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নবুয়ত এবং জিন, মানুষ ও শয়তানকে অনুগত করার মাধ্যমে বহু মুমিন বান্দাদের উপর।

١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ النُّبُوَّةَ وَالْعِلْمَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اَيْ فَهْمَ اَصْوَاتِهٖ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ط يُؤْتَاهُ ه الْاَنْبِيَاءُ وَالْمُلُوْكُ اِنَّ هٰذَا الْمُؤْتٰى لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ.

১৬. হযরত সুলায়মান (আ.) হয়েছিলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী। নবুয়ত ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং তিনি বলেছিলেন, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শব্দ বুঝার জ্ঞান। এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে। যা নবী ও বাদশাহগণকে দান করা হয়। এটা অবশ্যই প্রদত্ত বিষয়াদি সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

١٧. وَحُشِرَ جُمِعَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فِيْ مَسِيْرٍ لَهٗ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ يُجْمَعُوْنَ ثُمَّ يُسَاقُوْنَ.

১৭. হযরত সুলামান (আ.)-এর সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে তাঁর সাথে চলার জন্য এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন ব্যূহে। একত্র করা হলো। এরপর রওয়ানা দেওয়া হলো।

١٨. حَتّٰى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ لا هُوَ بِالطَّائِفِ اَوْ بِالشَّامِ نَمْلَةٌ صِغَارٌ اَوْ كِبَارٌ قَالَتْ نَمْلَةٌ مَلِكَةُ النَّمْلِ وَقَدْ رَاَتْ جُنْدَ سُلَيْمَانَ يٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ يُكَسِّرَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. بِهَلَاكِكُمْ نَزَلَ النَّمْلُ مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ فِي الْخِطَابِ بِخِطَابِهِمْ.

১৮. যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল আর তা হলো তায়েফ বা সিরিয়া। ছোট বড় সকল পিপিলিকাকেই نَمْل বলা হয়। তখন এক পিপীলিকা বলল, পিপীলিকাদের রাণী, সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষ করেছিল। হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। ভেঙ্গে না ফেলে হযরত সুলায়মান (আ.) এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি। এখানে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পিপীলিকাদেরকে বিবেকবানদের পর্যায়ে আনা হয়েছে।

١٩. فَتَبَسَّمَ سُلَيْمَانُ اِبْتِدَاءً ضَاحِكًا اِنْتِهَاءً مِّنْ قَوْلِهَا وَقَدْ سَمِعَهُ مِنْ ثَلٰثَةِ اَمْيَالٍ حَمَلَتْهُ الرِّيْحُ اِلَيْهِ فَحَبَسَ جُنْدَهُ حِيْنَ اَشْرَفَ عَلٰى وَادِيْهِمْ حَتّٰى دَخَلُوْا بُيُوْتَهُمْ وَكَانَ جُنْدُهُ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِىْ هٰذَا الْمَسِيْرِ وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَلْهِمْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ـ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ ـ

২০. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ لِيَرَى الْهُدْهُدَ الَّذِىْ يَرَى الْمَاءَ تَحْتَ الْاَرْضِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَقْرِهٖ فِيْهَا فَتَسْتَخْرِجُهُ الشَّيٰطِيْنُ لِاحْتِيَاجِ سُلَيْمَانَ اِلَيْهِ لِلصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرَهُ فَقَالَ مَا لِىَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ـ اَىْ اَعَرَضَ لِىْ مَا مَنَعَنِىْ مِنْ رُؤْيَتِهٖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ـ فَلَمْ اَرَهُ لِغَيْبَتِهٖ فَلَمَّا تَحَقَّقَهَا قَالَ ـ

٢١. لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا اَىْ تَعْذِيْبًا شَدِيْدًا بِنَتْفِ رِيْشِهٖ وَذَنَبِهٖ وَرَمْيِهٖ فِى الشَّمْسِ فَلَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْهَوَامِّ اَوْ لَاَ اذْبَحَنَّهُ بِقَطْعِ حُلْقُوْمِهٖ اَوْ لَيَاْتِيَنِّىْ بِنُوْنٍ مُشَدَّدَةٍ مَكْسُوْرَةٍ اَوْ مَفْتُوْحَةٍ يَلِيْهَا نُوْنٌ مَكْسُوْرَةٌ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ـ برهان بين ظاهر على عذره ـ

অনুবাদ :

১৯. তার উক্তিতে হযরত সুলায়মান (আ.) মৃদু হেসে ফেললেন প্রথমত মুচকি হাসি দিলেন, এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে অট্টহাসি দিলেন। তিনি একথা তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। বাতাস তার নিকট তা পৌছে দিয়েছিল। তিনি পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছলে তার বাহিনীকে থামালেন। যাতে তারা তাদের গর্তে প্রবেশ করতে পারে। এ ভ্রমণে তাঁর বাহিনী আরোহী ও পদাতিক ছিল এবং বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য প্রদান করুন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। নবী ও ওলীগণের।

২০. হযরত সুলায়মান (আ.) বিহঙ্গদলের সন্ধান নিলেন হুদহুদকে দেখার জন্য। যে মাটির নিচে পানি দেখলে সেখানে চঞ্চু দ্বারা ঠোকর দিয়ে পানির তার সন্ধান দিত। আর শয়তান খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নামাজ আদায়ের জন্য পানির প্রয়োজন হতো। কিন্তু তিনি হুদহুদকে দেখতে পেলেন না। এবং বললেন, ব্যাপারকি হুদহুদকে দেখছি না যে, অর্থাৎ আমার এমন কি হলো? যা আমাকে তার দেখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হচ্ছে নাকি সে অনুপস্থিত? তার অনুপস্থিতির কারণে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না যখন তার অনুপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত হলো তখন তিনি বললেন–

২১. আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব তার পালক ও লেজ উৎপাটন ও রোদ্রে নিক্ষেপের মাধ্যমে। ফলে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। অথবা অবশ্যই তাকে জবাই করব। তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলার মাধ্যমে সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে। لَيَاْتِيَنِّىْ ফে'লটি যের বিশিষ্ট নূন সহকারে অথবা তার সাথে যের বিশিষ্ট নূন মিলিত আকারে পঠিত রয়েছে। সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ তার ওজরের বিষয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اٰتَيْنَا : এটা اَعْطَيْنَا [আমি দান করলাম] অর্থে। طَيْرٌ হলো طَائِرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– পাখি, বিমান। قَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ [সে বলল, হে লোক সকল! আমাকে পাখির কথা বুঝার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।] اَلنُّوْنُ نُوْنُ الْوَاحِدِ الْمُطَاعُ عَلَى الْمُلُوْكِ فَإِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُوْنَ مِثْلَ ذٰلِكَ رَعِيَّتُهُ لِقَاعِدَةِ السِّيَاسَةِ এখানে সুলায়মান (আ.)-এর নিজের একার ক্ষেত্রে عُلِّمْنَا তথা جَمْع مُتَكَلِّمْ শব্দ ব্যবহার করাটা শাহী সম্বোধনসুলভ ছিল, অহংকারবশত নয়। –[রূহুল বয়ান]

কেউ কেউ বলেন عُلِّمْنَا-এর দ্বারা তিনি নিজেকে ও তাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে এ ব্যাখ্যাটা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পাখিদের ভাষা বুঝার বিশেষত্বের পরিপন্থি। হযরত সুলায়মান (আ.) যদিও পাখিসহ অন্যান্য প্রাণীর ভাষাও বুঝতেন, তবে পাখি সব সময় তার সঙ্গে থাকার দরুন এখানে পাখিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَيْ عِلْمًا الْقَضَاءِ وَبِمَنْطِقِ الطَّيْرِ শব্দের مَنْطِقَ হলো عَطْف -এর উপর قَضَاء -এর অধীনে بَاء -এর অধীনে আসার কারণে مَجْرُوْر হয়েছে।

قَوْلُهُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পাখিদের কথা বুঝার শক্তি ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীদের ভাষা বুঝার জ্ঞানও দান করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا : এটা উহ্য ফে'লের غَايَتْ বা সীমানা জ্ঞাপক। বাক্যটি এরূপ ছিল– فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا [তারা যাত্রা করল, এক পর্যায়ে যখন তারা আগমন করল] আর কেউ কেউ يُوْزَعُوْنَ -এর غَايَتْ বলেছেন, এ সময় বাক্য হবে– فَهُمْ يَسِيْرُوْنَ مَمْنُوْعًا بَعْضُهُمْ مِنْ مُفَارَقَةِ بَعْضٍ حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلَةِ

قَوْلُهُ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ : এখানে مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ف আর صَالِحِيْنَ দ্বারা এখানে পূর্ণাঙ্গ সালেহ তথা নেককারগণ উদ্দেশ্য, আর তারা হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম। কাজেই এ প্রশ্ন তিরোহিত হয়ে গেল যে, সালিহীনের অন্তর্গত হওয়ার অর্থ কি? নবীগণ তো সালিহীনের মর্যাদার চেয়ে বহু উর্ধ্বের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا : বলা বাহুল্য এখানে পয়গাম্বরগণের নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবান্তর নয়। যেমন হযরত দাউদ (আ.)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গাম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুয়ত ও রিসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্ব ও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়; বরং তিনি জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানরূপী নিয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নিয়ামত অন্যান্য সব নিয়ামতের উর্ধ্বে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ : পয়গাম্বরগণের সম্পদে উত্তরাধিকার হয় না : وَرِثَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে, আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন– نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ وَلَا نُوَرِّثُ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবূ দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ অর্থাৎ আলেমগণ পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী। কিন্তু পয়গাম্বরগণের জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে; তাঁদের আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবূ আব্দুল্লাহর রেওয়ায়েত এই বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) হলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উত্তরাধিকারী। –[রূহুল মা'আনী]

যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ হযরত দাউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশজন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোনো অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সুলায়মান (আ.)-ই উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর রাজত্বও হযরত সুলায়মান (আ.)-কে দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু-জানোয়ার ও বিহঙ্গকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারের কোনো কোনো ইমামের বরাত দিয়ে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ, বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদিরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশি ছিল। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا الخ : অহংকার না হলে নিজের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করা জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্য ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্যে শৈথিল্য প্রদর্শনা না করে। এমনিভাবে গভর্নর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজেদের জন্য বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয় অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য না হয়।

বিহঙ্গকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে পশুপক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরিয়তের নির্দেশাবলি পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোনো বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। সে শীতকালের জন্য তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে। -[কুরতুবী]

জ্ঞাতব্য : আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنْطِقَ الطَّيْرِ অর্থাৎ বিহঙ্গকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। 'হুদহুদ' পাখী জাতীয় প্রাণী। আর হযরত সুলায়মান (আ.)-কে তো সমস্ত পশুপক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলিই শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এ স্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সুলায়মান (আ.) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোনো-না কোনো উপদেশ বাক্য।

قَوْلُهُ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : আভিধানিক দিক দিয়ে كُلّ শব্দের মধ্যে কোনো বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোনো বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়। যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ি ইত্যাদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে ছিল না।

قَوْلُهُ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ : এটা وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোনো সময় পৃথক না হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগের আয়াতে فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ বাহিনীকে প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ : এখানে رِضَا-এর অর্থ কবুল বা গ্রহণ করা। অর্থাৎ যে আল্লাহ আমাকে এমন সৎকর্মের তাওফীক দিন, যা আপনার কাছে মকবুল হয়। রূহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, সৎকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরি নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গাম্বরগণ তাঁদের সৎকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার জন্যও দোয়া করতেন। যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا এতে বোঝা গেল যে, কোনো সৎকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ : **সৎকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না :** সৎকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কৃপা দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জান্নাতে যাবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও । কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেষ্টন করে আছে। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত সুলায়মান (আ.) ও এসব বাক্যে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করেছেন। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে সেই কৃপাও দান কর, যা দ্বারা আমি জান্নাতের উপযুক্ত হই।

قَوْلُهُ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ : تَفَقَّدَ -এর শাব্দিক অর্থ কোনো জনসমাবেশ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির খবর নেওয়া । তাই এর অনুবাদ খোঁজ নেওয়া ও পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা মানব, জিন, জন্তু ও পশুপক্ষীদের উপর রাজত্ব দান করেছিলেন। রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা করা ও খোঁজখবর নেওয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে- وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর পক্ষী-প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও এই সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্য তশরিফ নিয়ে যেতেন, তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোনো কষ্টে থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্য জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শিদের জন্য শিষ্য ও মুরিদদের খোঁজখবর নেওয়া জরুরি : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বস্তরে প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি; বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তার প্রশ্ন করার একটি কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কমসংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারূক (রা) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গাম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোনো ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ مَا لِىَ لَا اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ : হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমার কি হলো যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না?

আত্মসমালোচনা : এখানে স্থান ছিল একথা বলার "হুদহুদের কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই?" বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবত এই যে, হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, সম্ভবত আমার কোনো ত্রুটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণির পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়েব

হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো? সুফী-বুজুর্গদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোনো নিয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোনো কষ্ট উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনকল্পে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোনো ত্রুটি হলো, যদ্দরুন এই নিয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী (র.) ইবনে আরবী (র.)-এর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুজুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে- إِذَا فَقَدُوْا اٰمَالَهُمْ تَفَقَّدُوْا اَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলির খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ত্রুটি হয়ে গেছে? এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তাভাবনার পর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন- أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ এখানে أَمْ শব্দটি بَلْ -এর সমার্থবোধক। অর্থাৎ হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি; বরং সে উপস্থিত নয়। -[কুরতুবী]

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাস করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বল-লেন, হযরত সুলায়মান (আ.) তখন এমন এক জায়গায় অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত ঝরনাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে? হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্রগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- قِفْ يَا وَقَّافُ كَيْفَ يَرَى الْهُدْهُدُ بَاطِنَ الْاَرْضِ وَهُوَ لَا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فِيْهِ অর্থাৎ হে জ্ঞানীগণ! এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কারো জন্য যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তব রূপ লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। কোনো ব্যক্তি জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

قَوْلُهُ لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهُ : যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুষম শাস্তি দেওয়া জায়েজ : প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলভ নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হালাল করে দিয়েছিলেন। যেমন সাধারণ উম্মতের জন্য জন্তুদেরকে জবাই করে তাদের গোশত, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখনো হালাল। এমনিভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজন মাফিক প্রহারের সুষম শাস্তি দেওয়া এখনো জায়েজ। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেওয়া আমাদের শরিয়তে নিষিদ্ধ। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ : অর্থাৎ হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোনো উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত উযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

٢٢. فَمَكَثَ بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا غَيْرَ بَعِيْدٍ اَىْ يَسِيْرًا مِنَ الزَّمَانِ وَحَضَرَ لِسُلَيْمَانَ مُتَوَاضِعًا بِرَفْعِ رَاْسِهِ وَاِرْخَاءِ ذَنَبِهِ وَجَنَاحَيْهِ فَعَفَا عَنْهُ وَسَأَلَهُ عَمَّا لَقِىَ فِىْ غَيْبَتِهِ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ اَىْ اِطَّلَعْتُ عَلٰى مَالَمْ تَطَّلِعْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ قَبِيْلَةٌ بِالْيَمَنِ سُمِّيَتْ بِاسْمِ جَدٍّ لَهُمْ بِاعْتِبَارِهِ صُرِفَ بِنَبَاٍ بِخَبَرٍ يَّقِيْنٍ.

অনুবাদ :

২২. অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে গেল অর্থাৎ কিছুক্ষণের মধ্যেই এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সম্মুখে বিনীতভাবে মাথা উঁচু করে লেজ ও উভয় ডানা নিচু করে উপস্থিত হলো। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে তার অনুপস্থিতিকালে কি ঘটেছে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিলেন। তখন সে বলল, আপনি যা আয়ত্ত করতে পারেননি তা আমি আয়ত্ত করেছি। অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে অবগত নন আমি সে বিষয়ে অবগত হয়েছি আমি সাবা হতে আপনার নিকট এসেছি سَبَا শব্দটি مُنْصَرِفْ এবং غَيْر مُنْصَرِف উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। ইয়েমেনের একটি গোত্রের নাম। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে তারা এ নামে অভিহিত হয়েছে। এ হিসেবে এটা مُنْصَرِفْ সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে।

٢٣. اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ اَىْ هِىَ مَلِكَةٌ لَّهُمْ اِسْمُهَا بِلْقِيْسُ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ تَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْمُلُوْكُ مِنَ الْاٰلَةِ وَالْعُدَّةِ وَّلَهَا عَرْشٌ سَرِيْرٌ عَظِيْمٌ. طُوْلُهُ ثَمَانُوْنَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهُ اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَارْتِفَاعُهُ ثَلٰثُوْنَ ذِرَاعًا مَضْرُوْبٌ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُكَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَالْيَقُوْتِ الْاَحْمَرِ وَالزَّبَرْجَدِ الْاَخْضَرِ وَالزُّمُرُّدِ وَقَوَائِمُهُ مِنَ الْيَاقُوْتِ الْاَحْمَرِ وَالزَّبَرْجَدِ الْاَخْضَرِ وَالزُّمُرُّدِ عَلَيْهِ سَبْعَةُ بُيُوْتٍ عَلٰى كُلِّ بَيْتٍ بَابٌ مُغْلَقٌ.

২৩. আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে অর্থাৎ সে হলো তাদের রাণী তার নাম বিলকীস তাকে সকল কিছু হতেই দেওয়া হয়েছে। রাজা-বাদশাহগণের যা প্রয়োজন হয় যেমন হাতিয়ার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি। এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। তার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত, প্রস্থ ছিল চল্লিশ হাত, উচ্চতায় ছিল ত্রিশ হাত; সেটি স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত এবং মণি-মুক্তা, লাল চুনি, সবুজ গোমেদ ও পান্না [পাথর বিশেষ] দ্বারা কারুকার্যকৃত। তার পায়াগুলো ছিল লাল চুনি ও সবুজ গোমেদ বিজড়িত। তাতে ছিল সাতটি কক্ষ এবং প্রত্যেক কক্ষের দরজা বন্ধ ছিল।

٢٤. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْحَقِّ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ.

২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলি তাদের নিকট শোভন করছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে। ফলে তারা সৎপথ পায় না।

অনুবাদ :

২৫. اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ اَىْ اَنْ يَسْجُدُوْا لَهُ فَزِيْدَتْ لَا وَاُدْغِمَ فِيْهَا نُوْنُ اَنْ كَمَا فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ وَالْجُمْلَةُ فِىْ مَوْضِعِ مَفْعُوْلِ يَهْتَدُوْنَ بِاِسْقَاطِ اِلٰى ـ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَخْبُوْءِ مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَمَا تُعْلِنُوْنَ بالسنتهم ـ

২৫. নিবৃত্ত করেছে এজন্য যে, তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে اَلَّا يَسْجُدُوْا মূলত اَنْ يَسْجُدُوْا অর্থে لَا অতিরিক্ত আর তাতে اَنْ -এর نُوْن -কে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি আল্লাহর বাণী- لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ -এর মধ্যে হয়েছে। اِلٰى হরফে জরকে বিলুপ্ত করে يَهْتَدُوْنَ -এর মাফউল -এর স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। اَلْخَبْاَ টি মাসদার اَلْمَخْبُوْءُ অর্থ- লুক্কায়িত পানি ও উদ্ভিদ। এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর। তোমাদের হৃদয়ে এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর তোমাদের রসনার মাধ্যমে।

২৬. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اِسْتِئْنَافٌ جُمْلَةُ ثَنَاءٍ مُشْتَمِلٍ عَلٰى عَرْشِ الرَّحْمٰنِ فِىْ مُقَابَلَةِ عَرْشِ بِلْقِيْسَ وَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ عَظِيْمٌ ـ

২৬. আল্লাহ; তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি মহা আরশের অধিপতি। একটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه বা নতুন বাক্য। বিলকীসের সিংহাসনের বিপরীতে দয়াময় আল্লাহর সিংহাসন স্তুতি সম্বলিত। আর উভয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে।

২৭. قَالَ سُلَيْمَانُ لِلْهُدْهُدِ ـ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ فِيْمَا اَخْبَرْتَنَا بِهِ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ اَىْ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ فَهُوَ اَبْلَغُ مِنْ اَمْ كَذَبْتَ فِيْهِ ـ ثُمَّ دَلَّهُمْ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتُخْرِجَ وَارْتَوَوْا تَوَضَّؤُوْا وَ صَلُّوْا ثُمَّ كَتَبَ سُلَيْمَانُ كِتَابًا صُوْرَتُهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ اِلٰى بِلْقِيْسَ مَلِكَةِ سَبَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَلَا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَائْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ثُمَّ طَبَعَهُ بِالْمِسْكِ وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْهُدْهُدِ ـ

২৭. হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে বললেন, আমি দেখব তুমি কি সত্য বলেছ যে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে খবর দিয়েছ সে ব্যাপারে নাকি তুমি মিথ্যাবাদী অর্থাৎ তুমি মিথ্যুক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ বাক্যটি اَمْ كَذَبْتَ فِيْهِ নাকি এ বিষয়ে তুমি মিথ্যা বলেছ থেকে অধিক অলঙ্কারপূর্ণ। এরপর হুদহুদ পাখি পানির সন্ধান দিল এবং হযরত সুলায়মান (আ.) পানি বের করলেন। আর তখন লোকজন পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। তারা অজু করলেন এবং নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ.) একটি চিঠি লিখলেন। চিঠির ধরন এরূপ ছিল- আল্লাহর বান্দা সুলায়মান ইবনে দাউদের পক্ষ থেকে সাবা সম্রাজ্ঞী বিলকীসের প্রতি- পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। সত্যের অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তুমি আমার মোকাবেলায় অবাধ্যতা অবলম্বন করো না; বরং অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো! এরপর তাতে মেশক দ্বারা ছাপ দিয়ে স্বীয় সীলমোহর মেরে দিলেন। তার পর হুদহুদকে বললেন-

অনুবাদ :

২৮. اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهِ اِلَيْهِمْ اَىْ بِلْقِيْسَ وَقَوْمِهَا ثُمَّ تَوَلَّ اِنْصَرِفْ عَنْهُمْ وَقِفْ قَرِيْبًا مِنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ـ يَرُدُّوْنَ مِنَ الْجَوَابِ فَاَخَذَهُ وَاَتَاهَا وَحَوْلَهَا جُنْدُهَا فَاَلْقَاهُ فِىْ حِجْرِهَا فَلَمَّا رَاَتْهُ اِرْتَعَدَتْ وَخَضَعَتْ خَوْفًا ثُمَّ وَقَفَتْ عَلٰى مَا فِيْهِ ـ

২৮. তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর অর্থাৎ বিলকীস ও তার সম্প্রদায়ের নিকট অতঃপর তাদের নিকট হতে সরে যাও এবং তাদের অনতি দূরে অবস্থান কর এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি? তারা কি উত্তর দেয়? হুদহুদ চিঠিটি নিয়ে বিলকীসের নিকট আসল। সে ছিল তার বাহিনী পরিবেষ্টিত। হুদহুদ চিঠিটিকে তার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করল। যখন রাণী বিলকিস এটাকে দেখল, তখন প্রকম্পিত হলো এবং ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। অতঃপর সে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হলো।

২৯. قَالَتْ لِاَشْرَافِ قَوْمِهَا يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًا مَكْسُوْرَةً اِنِّىْ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ مَخْتُوْمٌ ـ

২৯. সেই নারী বলল তার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে হে পরিষদবর্গ! উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে যেরযুক্ত واو দ্বারা পরিবর্তন করে পঠিত। আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হয়েছে। সিলমোহরকৃত।

৩০. اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهُ اَىْ مَضْمُوْنُهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

৩০. এটা সুলায়মানের নিকট হতে, আর এটা এই অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু– পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

৩১. اَلَّا تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ

৩১. অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করো না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَبْلَغُ مِنْ اَنْ كَذَبْتَ فِيْهِ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : اَمْ كَذَبْتَ বলা সংক্ষিপ্ত ছিল এবং এমন বলাটা প্রসিদ্ধ ও অধিক ব্যবহৃত তথাপি তা পরিহার করে اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ বললেন কেন, অথচ এটা অপ্রসিদ্ধ ও দীর্ঘবাক্য?

উত্তর : اَمْ كَذَبْتَ এটা কখনো কখনো মিথ্যা প্রকাশিত হওয়া বুঝায়, আর اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ সব সময় মিথ্যা বলা বা মিথ্যায় অভ্যস্ত হওয়া বুঝায়। এ কারণেই সংক্ষিপ্ত পরিহার করে দীর্ঘ বাক্য অবলম্বন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَانْظُرْ : اُنْظُرْ ক্রিয়াটি اِنْتَظِرْ [অপেক্ষা কর] অর্থে, مَا হলো اَلَّذِىْ অর্থে صِلَه টি যেহেতু বাক্য, এ কারণে عَائِدْ বিলুপ্ত হয়েছে। বাক্যটি এরূপ হবে– اِنْتَظِرِ الَّذِىْ يَرْجِعُوْنَ [তারা প্রতি উত্তরে কি করে তার অপেক্ষা করবে।]

قَوْلُهُ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًا مَكْسُوْرًا : এখানে তাসহীল তথা সহজাকার দ্বারা প্রসিদ্ধ তাসহীল উদ্দেশ্য নয়; বরং দ্বিতীয় হামযাকে وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ– يَا اَيُّهَا الْمَلَاوِىْ

قَوْلُهُ أُلْقِيَ كِتَابٌ كَرِيْمٌ : এর দ্বারা সিলমোহরকৃত পত্র উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- كَرَمُ الْكِتَابِ خَتْمُهُ [পত্র গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া হলো তার মোহরাঙ্কন]

قَوْلُهُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ : এটা جُمْلَة مُسْتَانِفَة অর্থাৎ উহ্য প্রশ্নের উত্তর। বিলকীস যখন বলল إِنِّيْ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ [আমার নিকট একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে] তখন সহসা এ প্রশ্ন উঠে যে, مَا هُوَ؟ [তা কি?] এর উত্তরে বলা হয়েছে- إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ الخ

قَوْلُهُ أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ : এটা হয়তো كِتَابٌ থেকে بَدَل হওয়ার কারণে স্থানগতভাবে مَرْفُوْع অথবা উহ্য مُبْتَدَأ -এর খবর হিসেবে مَرْفُوْع হয়েছে। অর্থাৎ- مَضْمُوْنُهُ أَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ ....

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ : অর্থাৎ হুদহুদ তার ওজর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গাম্বরগণ 'আলেমুল গায়ব' নন : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গাম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

قَوْلُهُ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيْنٍ : 'সাবা' ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়েমেনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিনদিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি? হুদহুদের উপরিউক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোনো শাগরিদ তার ওস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোনো ব্যক্তি আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চেয়ে আমার বেশি; যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে পীর ও মুরুব্বিদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার বিরোধী। কাজেই বর্জনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং ওজরকে জোরদার করার জন্য এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোনো কথা বললে তাতে দোষ নেই।

قَوْلُهُ إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ : অর্থাৎ আমি এক নারীকে পেয়েছি সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী অর্থাৎ তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান। -[কুরতুবী]

তার পিতামহ হুদাহুদ ছিল সমগ্র ইয়েমেনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভেই বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে কৌলীন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়। -[কুরতুবী]

প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান বলে স্বীকার করেনি। সম্ভবত এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তারা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে লিখেছেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানবজাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্য হালাল কিনা? এতে ফিকহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েজ বলেছেন। কেউ কেউ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায়, ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ 'আহকামুল মারজান ফী আহকামিল জান' কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না। তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনা প্রয়োজন নেই। কেননা তার কর্ম দ্বারা এই বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরিয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব-নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোনো রেওয়ায়েতে হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ বিলকীস নিজে জিন ছিল না। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরো বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্য বাদশাহ হওয়া অথবা কোনো সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েজ কিনা? সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন- لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً অর্থাৎ যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ বিষয়ে একমত যে, কোনো নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খিলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাজের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসন কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামি শরিয়তের কোনো বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) বিল্কীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, একথা কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নেই।

قَوْلُهُ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : অর্থাৎ কোনো সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্য যেসব সাজসরঞ্জাম দরকার, তার সবই বিদ্যমান ছিল। অবশ্য সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ : আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল। আর মোতি, ইয়াকূত ও মণিমানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

قَوْلُهُ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ : এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের ইবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, তারা অগ্নিপূজারী ছিল। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الخ : اَلَّا يَسْجُدُوْا -এর সম্পর্ক زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ অথবা صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ -এর সাথে। অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্যপথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, তারা আল্লাহকে সিজদা করবে না।

قَوْلُهُ اِذْهَبْ بِكِتَابِيْ هٰذَا : লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরিয়তসম্মত দলিল : হযরত সুলায়মান (আ.) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তার সাথে দলিল সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যেক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ জরুরি, ফিকহবিদগণ সেই ক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা পত্র ও টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোনো আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

মুশরিকদের কাছে পত্র লিখে পাঠানো জায়েজ : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র দ্বারা দ্বিতীয় মাসআলা এই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রচার ও দাওয়াতের জন্য মুশরিক ও কাফেরদের কাছে পত্র লেখা জায়েজ। সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কাফেরদের কাছে পত্র লেখা প্রমাণিত আছে।

قَوْلُهُ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ : কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত : হযরত সুলায়মান (আ.) হুদহুদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে তার মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম । এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

قَوْلُهُ قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّيْ أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ : كَرِيْمٌ -এর শাব্দিক অর্থ– সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোনো পত্রকে তখনই সম্ভ্রান্ত বলা হয়, যখন তা মোহরাঙ্কিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে كِتَابٌ كَرِيْمٌ -এর তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, যুহাইর (র.) প্রমুখ كِتَابٌ مَخْتُوْمٌ তথা 'মোহরাঙ্কিত পত্র' দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রাসূল ﷺ যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্য মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কিসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামান্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্য হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পূরে প্রেরণ করা সুন্নতের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আ.)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল? হযরত সুলায়মান (আ.) আরববাসী ছিলেন না; কিন্তু আরবি ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি বিহঙ্গকুলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সেক্ষেত্রে আরবি ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেই অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আ.) আরবি ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ প্রাপক [বিলকীস] আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। আর এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দোভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : পত্র লেখার কতিপয় আদব : কুরআন পাক মানবজীবনের কোনো দিক সম্পর্কেও দিকনির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরি বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গাম্বরের চিঠি। কুরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এরপর প্রাপকের নাম : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিকনির্দেশ এই যে, পত্রটি হযরত সুলায়মান (আ.) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন? কুরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণত পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে, চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে? এরূপ খোঁজাখুজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোনো বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, উস্তাদ, পীর অথবা কোনো মুরব্বির কাছে পত্র লেখে তখন প্রেরক হিসেবে তার নাম অগ্রে থাকাটা আদবের খেলাফ হবে কিনা এবং তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারা দিয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রূহুল মা'আনীতে বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (র.)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে–

مَا كَانَ اَحَدٌ اَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَصْحَابُهُ اِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ كِتَابًا بَدَأَ بِاَنْفُسِهِمْ قُلْتُ وَكِتَابُ عَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ يَشْهَدُ لَهُ عَلٰى مَا رُوِيَ ـ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিলেন না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে আ'লাউল হাযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রূহুল মা'আনীতে উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম-অনুত্তম সম্পর্কে; বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে দেয়, তবে তাও জায়েজ। ফকীহ আবুল-লাইস (র.) 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দ্বিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেওয়া পয়গাম্বরগণের সুন্নত : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, কারও পত্র হস্তগত হলে তার জবাব দেওয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জবাবকে সালামের জবাবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। −[কুরতুবী]

চিঠিপত্রে বিসমিল্লাহ লেখার বিধান : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লিখিত সব পত্রদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। এখন বিসমিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে, নাকি পরে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্রাবলি সাক্ষ্য দেয় যে, বিসমিল্লাহ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কুরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম পূর্বে ও বিসমিল্লাহ পরে লিখিত আছে। বাহ্যত এ থেকে বিসমিল্লাহ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়; কিন্তু ইবনে আবী হাতেম (র.) ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেন− بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ اِلٰى بِلْقِيْسَ اِبْنَةِ ذِىْ شَرْحٍ وَقَوْمِهَا اَنْ لَا تَعْلُوْا الخ কিন্তু বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। আর কুরআনে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আসল পত্রে বিসমিল্লাহ আগে ছিল নাকি পরে? কুরআনে ঐ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভিতরে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র পড়ে শোনানোর সময় বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

কুরআনের আয়াত সম্বলিত লেখা কোনো কাফের ও মুশরিকের হাতে দেওয়া জায়েজ কিনা? উপরিউক্ত পত্র হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের কাছে তখন প্রেরণ করেন, যখন সে মুসলমান ছিল না। অথচ পত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখিত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, এরূপ করা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব অনারব বাদশাহর নামে চিঠিপত্র লিখেছেন, তারা মুশরিক ছিল। তাঁর পত্রে কুরআনের কোনো কোনো আয়াত লিখিত থাকত। এর কারণ এই যে, কুরআন পাক তো কোনো কাফেরের হাতে দেওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু যে গ্রন্থ অথবা কাগজে অন্য বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে কোনো আয়াত লিখিত হয়, সাধারণ পরিভাষায় তাকে কুরআন বলা হয় না। কাজেই এর বিধানও কুরআনের অনুরূপ হবে না। এরূপ গ্রন্থ কাফেরের হাতেও দেওয়া যায় এবং অজু ছাড়াও তা স্পর্শ করা যায়। −[ফতওয়ায়ে আলমগীরী]

পত্র সংক্ষিপ্ত, ভাবপূর্ণ, অলংকারপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী হওয়া উচিত : হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এই পত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মাত্র কয়েক লাইনের মধ্যেই সব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে এবং অলংকারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মাপকাঠিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাফেরের মোকাবিলায় নিজের রাজকীয় শান-শওকতও প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার পূর্ণত্ববোধক গুণাবলি ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতও রয়েছে। সাথে সাথে অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার নিন্দাও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে এই পত্রও কুরআনী অলৌকিকতার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, পত্র লিখনে সব পয়গাম্বরের সুন্নতও এই যে, লেখা দীর্ঘ না হওয়া চাই এবং কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত না হওয়া চাই। −[রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٣٢. وَقَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بِقَلْبِهَا وَاوًا اَىْ اَشِيْرُوْا عَلَيَّ فِيْٓ اَمْرِيْ ج مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا قَاضِيَتَهُ حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ تَحْضُرُوْنَ .

৩২. সেই নারী বলল, হে পরিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। উভয় হামযা বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে وَاو দ্বারা পরিবর্তন করে সহজভাবে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আমি কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত।

٣٣. قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ اَصْحَابُ شِدَّةٍ فِي الْحَرْبِ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ نُطِعْكِ .

৩৩. তারা বলল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা। রণাঙ্গনে শৌর্যবীর্যের অধিকারী। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন, আমরা আপনার আনুগত্য করব।

٣٤. قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا بِالتَّخْرِيْبِ وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ اَىْ مُرْسِلُوا الْكِتَابِ .

৩৪. সে বলল, রাজা-বাদশাহগণ যখন কোনো শহরে প্রবেশ করে তখন সেটাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। ধ্বংসলীলার দ্বারা এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিকে অপদস্ত করে, এরাও এরূপই করবে। অর্থাৎ পত্র প্রেরকগণ।

٣٥. وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ . مِنْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ اَوْرَدِّهَا اِنْ كَانَ مَلِكًا قَبِلَهَا اَوْ نَبِيًّا لَمْ يَقْبَلْهَا فَاَرْسَلَتْ خَدَمًا ذُكُوْرًا وَاِنَاثًا اَلْفًا بِالسَّوِيَّةِ وَخَمْسَمِاَةٍ لَبِنَةً مِنَ الذَّهَبِ وَتَاجًا مُكَلَّلًا بِالْجَوَاهِرِ وَ مِسْكًا وَعَنْبَرًا وَغَيْرَ ذٰلِكَ مَعَ رَسُوْلٍ بِكِتَابٍ فَاَسْرَعَ الْهُدْهُدُ اِلٰى سُلَيْمَانَ يُخْبِرُهُ الْخَبَرَ .

৩৫. আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। দেখি, দূতরা কি নিয়ে ফিরে আসে? উপঢৌকন গ্রহণ করে নাকি ফিরিয়ে দেয়। যদি সে রাজা হয়, তবে তা গ্রহণ করবে। আর যদি নবী হন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তখন সে একহাজার খাদেম প্রেরণ করল। তন্মধ্যে পাঁচশতজন যুবক ও পাঁচশত জন যুবতী ছিল। স্বর্ণের পাঁচশত ইট। মুক্তাখচিত একটি মুকুট এবং মেশক ইত্যাদি মূল্যবান বহু সামগ্রীর সাথে দূতের নিকট একটি চিঠিও পাঠিয়েছিল। হুদহুদ দ্রুত এসে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে এ সংবাদ অবহিত করল।

فَاَمَرَ اَنْ تَضْرِبَ لَبِنَاتِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ تَبْسُطَ مِنْ مَوْضِعِهٖ اِلٰى تِسْعَةِ فَرَاسِخَ مَيْدَانًا وَاَنْ يَبْنُوْا حَوْلَهٗ حَائِطًا مُشَرَّفًا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ يُؤْتٰى بِاَحْسَنِ دَوَابِّ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَعَ اَوْلَادِ الْجِنِّ عَنْ يَمِيْنِ الْمَيْدَانِ وَشِمَالِهٖ ـ

অনুবাদ :

হযরত সুলায়মান (আ.) স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট তৈরি করে তার প্রসাদ থেকে নয় ফরসখ [এক ফরসখ প্রায় ৮ কি: মি:] পর্যন্ত মাঠে তা বিছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং মাঠের চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দ্বারা উঁচু প্রাচীর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। আর জিনদের সন্তানাদিসহ ময়দানের ডানে বামে জল-স্থলের সর্বোৎকৃষ্ট সওয়ারী উপস্থিত করতেও নির্দেশ দিলেন।

٣٦. فَلَمَّا جَآءَ الرَّسُوْلُ بِالْهَدِيَّةِ وَمَعَهٗ اَتْبَاعُهٗ سُلَيْمٰنَ قَالَ سُلَيْمٰنُ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز فَمَآ اٰتٰىنِيَ اللّٰهُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْمُلْكِ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰىكُمْ ج مِنَ الدُّنْيَا بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ لِفَخْرِكُمْ بِزَخَارِفِ الدُّنْيَا ـ

৩৬. যখন সেই দূত ও তার অনুচরবৃন্দ উপঢৌকনসহ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট আসল, তখন হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, তোমরা কি আমাকে ধন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন নবুয়ত ও রাজত্ব থেকে তা তোমাদেরকে যা দিয়েছে না তা হতে উত্তম অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ হতে। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ। পার্থিব ঐশ্বর্যে তোমাদের গর্ব থাকার দরুন।

٣٧. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ بِمَآ اَتَيْتَ بِهٖ مِنَ الْهَدِيَّةِ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ مِنْ بَلَدِهِمْ سَبَا سُمِّيَتْ بِاسْمِ اَبِيْ قَبِيْلَتِهِمْ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ اَيْ اِنْ لَّمْ يَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ فَلَمَّا رَجَعَ اِلَيْهَا الرَّسُوْلُ بِالْهَدِيَّةِ جَعَلَتْ سَرِيْرَهَا دَاخِلَ سَبْعَةِ اَبْوَابٍ دَاخِلَ قَصْرِهَا وَقَصْرُهَا دَاخِلَ سَبْعَةِ قُصُوْرٍ وَاَغْلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا حَرَسًا وَتَجَهَّزَتْ لِلْمَسِيْرِ اِلٰى سُلَيْمَانَ لِتَنْظُرَ مَا يَاْمُرُهَا بِهٖ فَارْتَحَلَتْ فِيْ اِثْنَيْ عَشَرَ اَلْفِ قِيْلٍ مَعَ كُلِّ قَيْلٍ اُلُوْفٌ كَثِيْرَةٌ اِلٰى اَنْ قَرُبَتْ مِنْهُ عَلٰى فَرْسَخٍ شَعُرَ بِهَا ـ

৩৭. তাদের নিকট ফিরে যাও যে উপঢৌকন নিয়ে এসেছ তা সহ আমি অবশ্য তাদের নিকট নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী, যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তথা হতে তাদেরকে বহিষ্কার করব তাদের সাবা নগর হতে। তাদের পূর্বপুরুষের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অবনমিত। অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান হয়ে আমার নিকট আগমন না করে। যখন প্রেরিত দূত উপঢৌকনসহ রাণীর নিকট ফিরে গেল, তখন বিলকীস তার সিংহাসনকে তার প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাখল তার প্রাসাদটি অপর সাতটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছিল। আর ফটকসমূহকে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে প্রহারী নিযুক্ত করল। তারপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নিল তিনি তাকে কি নির্দেশ দেন তা জানার/ দেখার জন্য। অতঃপর সে বার হাজার নেতৃস্থানীয় লোকজন নিয়ে যাত্রা করল। প্রত্যেক নেতার সাথে ছিল হাজার হাজার লোক। এভাবে সে হযরত সুলায়মান (আ.) থেকে মাত্র এক ফরসখ দূরত্বে পৌঁছে গেল। ইতোমধ্যে হযরত সুলায়মান (আ.) তার আগমন সম্পর্কে অবগত হলেন।

অনুবাদ :

٣٨. قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ فِى الْهَمْزَتَيْنِ مَا تَقَدَّمَ يَاْتِيْنِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَاْتُوْنِى مُسْلِمِيْنَ . اَىْ مُنْقَادِيْنَ طَائِعِيْنَ فَلِى اَخْذُهُ قَبْلَ ذٰلِكَ لَا بَعْدَهُ .

৩৮. তিনি বললেন, হে আমার পরিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে اَلْمَلَأُ اَيُّكُمْ এখানে হামযাদ্বয়ের মাঝে পূর্বোল্লিখিত দুটি ধরন প্রযোজ্য। তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করে ও অনুগত হয়ে আসার পূর্বে। তারা মুসলমান হয়ে আসার পূর্বে তা নেওয়া আমার জন্য বৈধ হবে, পরে নয়।

٣٩. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ هُوَ الْقَوِىُّ الشَّدِيْدُ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج الَّذِىْ تَجْلِسُ فِيْهِ لِلْقَضَاءِ وَهُوَ مِنَ الْغَدَاةِ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَىْ عَلٰى حَمْلِهٖ اَمِيْنٌ . اَىْ عَلٰى مَا فِيْهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا .

৩৯. এক শক্তিশালী জিন বলল, عِفْرِيْت অর্থ হলো দুর্বার শক্তিশালী। আপনি আপনার স্থান হতে উঠবার পূর্বেই আমি তা এনে দিব। অর্থাৎ যেখানে আপনি বিচারের জন্য বসে আছেন। আর তা হলো সকাল হতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত সময়। এবং আমি এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান অর্থাৎ এটা বহন করে আনতে বিশ্বস্ত অর্থাৎ তাতে যেসব মণি-মুক্তা ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ مَاذَا تَامُرِيْنَ : مَاذَا হলো تَأْمُرِيْنَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل , আর এর প্রথম مَفْعُوْل লুপ্ত রয়েছে। বাক্যটি এরপ ছিল- تَأْمُرِيْنَنَا

قَوْلُهُ فَضَحِكَ : এটা فَانْظُرِىْ -এর উহ্য جَوَاب ; جَوَاب اَمْر হিসেবে مَجْزُوْم হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَا يَرْجِعُوْنَ : بِمَ হলো يَرْجِعُوْنَ -এর مُتَعَلِّقْ

قَوْلُهُ مِنْ قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ : এটা بِمَ -এর مَا -এর বিবরণ। نَاظِرَةٌ -এর عَطْف হলো مُرْسِلَةٌ -এর উপর। কারো মতে مِيْم -এর সম্পর্কে হলো نَاظِرَةٌ -এর সাথে। তবে এটা সঠিক নয়। কেননা مَا اِسْتِفْهَامِيَّه বাক্যে صَدَارَتْ বা প্রথমে আসার দাবি করে। আর এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না।

قَوْلُهُ اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُوْنَ : اَذِلَّةً হলো উক্ত বাক্যের প্রথম حَالْ আর وَهُمْ صَاغِرُوْنَ হলো দ্বিতীয় حَالْ ; এটা হলো حَال مُؤَكِّدَة

قَوْلُهُ اَىْ اِنْ لَمْ يَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ : এটা উহ্য ইঙ্গিত করেছেন যে, وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ হলো شَرْط مَحْذُوْف مُؤَخَّر -এর جَزَاء 'সাবা'বাসীকে সাবা থেকে উৎখাত করাটা ঈমান আনার শর্ত সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ঈমান আনলে তাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করা হবে না।

قَوْلُهُ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِنَ الْجِنِّ : এ জিনসের নাম ছিল যাকওয়ান কিংবা সখর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ .... حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ : গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্নত : افتونى শব্দটি فتوى থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো বিশেষ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। এখানে পরামর্শ দেওয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্র করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত! সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এ কথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জবাবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল–

نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ সভার সদস্য তিনশ' তের ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন! ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোনো পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্য সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে– وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায়ে কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয় অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকিদও হয়ে যায়।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পত্রের জবাবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়া : রাষ্ট্রের আমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরিক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল– হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গাম্বর কিনা? তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, নাকি তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গাম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবিলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এই রূপ স্থির করল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপঢৌকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গাম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তুটি ইবনে জারীর (র.) একাধিক সনদে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– اِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব যেসব দূত উপঢৌকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের দূতদের উপস্থিতি : ঐতিহাসিক ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে বিলকীসের দূত ও উপঢৌকনের বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। যে বিষয়টুকু সব রেওয়ায়েতেই পাওয়া যায়, তা এই যে, উপঢৌকনে কিছু স্বর্ণের ইট, কিছু মণিমানিক্য এবং একশ বাঁদি ছিল। কিন্তু বাঁদিদেরকে পুরুষের পোশাক এবং ক্রীতদাসদেরকে মেয়েলী পোশাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সাথে বিলকীসের একটি পত্রও ছিল, যাতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন লিখিত ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে আদেশ করলেন, দরবার থেকে নয় ফরসখ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সোনা-রূপার ইট দ্বারা বিছানা করে দাও। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও, তাদের প্রস্রাব পায়খানাও যেন সোনা-রূপার বিছানার উপর হয়! এমনিভাবে

তিনি নিজ দরবারকেও বিশেষ যত্নসহকারে সুসজ্জিত করলেন। ডানে বামে চার হাজার করে স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করা হলো। একদিকে পণ্ডিতদের জন্য এবং অপরদিকে মন্ত্রীবর্গ ও রাজকর্মচারীদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হলো। মণিমানিক্য দ্বারা সম্পূর্ণ হল সুশোভিত করা হলো। বিলকীসের দূতরা যখন স্বর্ণের ইটের উপর জন্তুদেরকে দণ্ডায়মান দেখল, তখন তারা নিজেদের উপঢৌকনের কথা চিন্তা করে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে গেল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তারা তাদের স্বর্ণের ইট সেখানে ফেলে দিল। অতঃপর তারা যতই সামনে অগ্রসর হতে লাগল, দুই দিকে জীবজন্তু ও বিহঙ্গকুলের কাতার দেখতে পেল। এরপর জিনদের কাতার দেখে তারা ভীত-বিহবল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন তারা শাহী দরবারে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে হাজির হলো তখন তিনি হাসিমুখে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের আদর-আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু তাদের উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং বিলকীসের সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন। -[কুরতুবী -সংক্ষেপিত]

হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকিসের উপঢৌকন গ্রহণ করলেন না : যখন বিলকীসের দূত উপঢৌকন নিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ অর্থাৎ তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন, তা তোমাদের অর্থ সম্পদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপঢৌকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোনো কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? : হযরত সুলায়মান (আ.) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপঢৌকন কবুল করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল নাজায়েজ কিংবা জায়েজ হলেও অনুত্তোম। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোনো স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েজ নয়। -[রূহুল মা'আনী] হ্যাঁ, যদি উপঢৌকন গ্রহণ করলে কোনো ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়, যেমন এর মাধ্যমে কোনো কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোনো অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রাসূল ﷺ -এর সুন্নত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোনো কোনো কাফেরের উপঢৌকন কবুল করেছেন এবং কারো কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুখারীর টীকা 'উমদাতুল-কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালিক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোনো প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে দুইটি অশ্ব এবং দুইটি বস্ত্রজোড়া উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। তিনি এ কথা বলে তার উপঢৌকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপঢৌকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপঢৌকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপঢৌকন এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়ায়েতও বিদ্যমান আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রিস্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপঢৌকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে শামসুল আইম্মা (র.) বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারো কারো উপঢৌকন গ্রহণ করার মধ্যে তাঁর মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপঢৌকন কবুল করেছেন। -[উমদাতুল কারী]

বিলকীস উপঢৌকন প্রত্যাখান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্য মুশরিকের উপঢৌকন কবুল করা জায়েজ নয়; বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘুষ হিসেবে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলে, যাতে এর মাধ্যমে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি : কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়াতের বরাত দিয়ে লিখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোনো সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। এ কথা বলে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে হাজির হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিল, বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে একলক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল বলে আগমন করছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তখন সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবার থেকে এক ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আ.) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গাম্বরসুলভ মুজেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মুজেযা দান করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনো রূপে এখানে পৌছা দরকার। তাই পরিষদবর্গকে [তাদের মধ্যে জিনও ছিল] সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধনসম্পদের মধ্যে থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেওয়াও সম্ভবত এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এতদূরবর্তী স্থানে পৌছে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অগাধ শক্তিবলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যম্ভাবী ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর পক্ষে থেকেই কোনো বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

قَوْلُهُ قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ : مُسْلِمِيْنَ শব্দটি مُسْلِمٌ -এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী অনুগত। কারণ তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং কিছু আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কুরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষ্য থেকে তাই বোঝা যায়।

٤٠. قَالَ سُلَيْمَانُ أُرِيْدُ أَسْرَعَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ الْمُنْزَلِ وَهُوَ اٰصِفُ بْنُ بَرْخِيَا كَانَ صِدِّيْقًا يَعْلَمُ اِسْمَ اللّٰهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهٖ اَجَابَ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ طَرْفُكَ ط اِذَا نَظَرْتَ بِهٖ اِلٰى شَيْءٍ مَا قَالَ لَهٗ اُنْظُرْ اِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ رَدَّ بِطَرْفِهٖ فَوَجَدَهٗ مَوْضُوْعًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَفِيْ نَظْرِهٖ اِلَى السَّمَاءِ دَعَا اٰصِفُ بِالْاِسْمِ الْاَعْظَمِ اَنْ يَّاْتِيَ اللّٰهُ بِهٖ فَحَصَلَ بِاَنْ جَرٰى تَحْتَ الْاَرْضِ حَتّٰى ارْتَفَعَ عِنْدَ كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا اَيْ سَاكِنًا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا اَيِ الْاِيْتَانُ لِيْ بِهٖ مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ قف لِيَبْلُوَنِيْ لِيَخْتَبِرَنِيْ ءَاَشْكُرُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَمْ اَكْفُرُ ط النِّعْمَةَ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج اَيْ لِاَجْلِهَا لِاَنَّ ثَوَابَ شُكْرِهٖ لَهٗ وَمَنْ كَفَرَ النِّعْمَةَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ عَنْ شُكْرِهٖ كَرِيْمٌ بِالْاِفْضَالِ عَلٰى مَنْ يَّكْفُرُهَا .

অনুবাদ :

৪০. হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আমি এর চেয়েও দ্রুত কামনা করছি। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল, তিনি হলেন আসিফ বরখিয়া। তিনি সিদ্দিকিয়্যাতের স্তরে উপনীত ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। যার মাধ্যমে কোনো প্রার্থনা করা হলে তা মঞ্জুর হয়। আপনি চক্ষুর পালক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। যখন আপনি কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন তা থেকে দৃষ্টি ফেরানোর পূর্বেই হযরত আসিফ বরাখিয়া হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বললেন, আপনি আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! তিনি তাকালেন। এরপর দৃষ্টি ফেরালেন। সাথে সাথে তিনি তা তাঁর সম্মুখে স্থাপিতরূপে দেখতে পেলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপকালে হযরত আসিফ বরখিয়া ইসমে আযমের মাধ্যমে সিংহাসনটি নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেন। ফলে সাথে সাথে তার দোয়া কবুল হয়ে গেল এবং সিংহাসনটি মাটির তলদেশ দিয়ে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কুরসির সম্মুখে আবির্ভূত হলো হযরত সুলায়মান (আ.) যখন তা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বললেন, এটা অর্থাৎ আমার জন্য এটা উপস্থিত করা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ নাকি অকৃতজ্ঞ নিয়ামতের। এখানে উভয় হামযাকে বহাল রেখে। দ্বিতীয়টিকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে লঘু আকারে অথবা লঘুকৃতটিও অপরটির মাঝে اَلِفْ প্রবিষ্ট করে কিংবা اَلِفْ প্রবিষ্ট না করে পঠিত রয়েছে। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অর্থাৎ তার নিজের কারণে বা স্বার্থে। কেননা তার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান তারই জন্য তথা সে নিজেই ভোগ করবে আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে নিয়ামতের। সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে, মহানুভব যে তার অকৃতজ্ঞ হয় তার প্রতি অনুগ্রহ করার ব্যাপারে।

অনুবাদ :

٤١. قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا اَىْ غَيِّرُوْهُ اِلٰى حَالٍ تُنْكِرُهُ اِذَا رَاَتْهُ نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْٓ اِلٰى مَعْرِفَتِهٖ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ـ اِلٰى مَعْرِفَةِ مَا يُغَيَّرُ عَلَيْهِمْ قَصَدَ بِذٰلِكَ اِخْتِبَارَ عَقْلِهَا لَمَّا قِيْلَ لَهٗ اِنَّ فِيْهِ شَيْئًا فَغَيَّرُوْهُ بِزِيَادَةٍ اَوْ نَقْصٍ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ ـ

৪১. হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, তার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করে বদলে দাও। অর্থাৎ এমন অবস্থায় পরিবর্তন কর যাতে সে যখন এটাকে দেখে অপরিচিত মনে করে। দেখি সে সঠিক দিশা পায় এটার পরিচয়ের ব্যাপারে নাকি সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ এর পরিচয় লাভে। তাতে যে পরিবর্তন আনা হবে তার পরিচয় লাভে। এর দ্বারা তিনি বিলকীসের জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কেননা তার নিকট বলা হয়েছিল যে, তার মধ্যে এ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি রয়েছে। ফলে তারা তাতে কিছু কম বেশি করে বা অন্য কোনোভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

٤٢. فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ لَهَا اَهٰكَذَا عَرْشُكِ اَىْ اَمِثْلُ هٰذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ج اَىْ فَعَرَفَتْهُ وَشَبَّهَتْ عَلَيْهِمْ كَمَا شَبَّهُوْا عَلَيْهَا اِذَا لَمْ يَقُلْ اَهٰذَا عَرْشُكَ وَلَوْ قِيْلَ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ سُلَيْمَانُ لَمَّا رَاٰى لَهَا مَعْرِفَةً وَعِلْمًا وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ـ

৪২. সেই নারী যখন আসল তখন তাকে বলা হলো তোমার সিংহাসন কি এরূপই অর্থাৎ তোমার সিংহাসন কি এ সিংহাসনের মতোই সে বলল এটাতো যেন সেটাই অর্থাৎ সে এটা চিনে ফেলল। তারা যেরূপ তার নিকট তার সদৃশ্যতামূলক প্রশ্ন করেছিল তদ্রূপ সেও তাদের নিকট সদৃশ্যতামূলক জবাব দিল। যেহেতু তারা একথা বলেনি যে, এটাই কি তোমার সিংহাসন? যদি এরূপ বলা হতো, তবে সে বলত, হ্যাঁ! হযরত সুলায়মান (আ.) তার জ্ঞান-বুদ্ধি যাচাই করার পর তাকে বললেন যে, আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি।

٤٣. وَصَدَّهَا عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ـ

৪৩. তাকে নিবৃত্ত করেছে আল্লাহর ইবাদত হতে আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা-ই সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

٤٤. قِيْلَ لَهَا اَيْضًا ادْخُلِى الصَّرْحَ ج هُوَ سَطْحٌ مِنْ زُجَاجٍ اَبْيَضَ شَفَّافٍ تَحْتَهٗ مَاءٌ جَارٍ فِيْهِ سَمَكٌ اِصْطَنَعَهٗ سُلَيْمَانُ لَمَّا قِيْلَ لَهٗ اِنَّ سَاقَيْهَا وَرِجْلَيْهَا كَقَدَمَىْ حِمَارٍ ـ

৪৪. তাকে আরো বলা হলো এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। প্রাসাদটি উপরিভাগ ছিল সাদা স্বচ্ছ কাঁচের, তার নিচে ছিল প্রবহমান পানি, তাতে ছিল জীবন্ত মৎস বিচরণশীল। হযরত সুলায়মান (আ.) এটাকে এ কারণে নির্মাণ করেছিলেন যে, বিলকীসের উভয় পা ও পায়ের গোছা গর্দভের পায়ের ন্যায় ছিল।

فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً مِنَ الْمَاءِ وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ط لِتَخُوْضَهُ وَكَانَ سُلَيْمَانُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ فِىْ صَدْرِ الصَّرْحِ فَرَاٰى سَاقَيْهَا وَقَدَمَيْهَا حَسَّانًا قَالَ لَهَا اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مُّمَلَّسٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ط اَىْ زُجَاجٍ وَدَعَاهَا اِلَى الْاِسْلَامِ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ بِعِبَادَةِ غَيْرِكَ وَاَسْلَمْتُ كَائِنَةً مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَاَرَادَ تَزَوَّجَهَا فَكَرِهَ شَعْرَ سَاقَيْهَا فَعَمِلَتْ لَهُ الشَّيَاطِيْنُ النُّوْرَةَ فَاَزَالَتْهُ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا وَاَحَبَّهَا وَاَقَرَّهَا عَلٰى مُلْكِهَا وَكَانَ يَزُوْرُهَا كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَيُقِيْمُ عِنْدَهَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَانْقَضٰى مُلْكُهَا بِانْقِضَاءِ مُلْكِ سُلَيْمَانَ رُوِىَ اَنَّهٗ مَلَكَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً فَسُبْحَانَ مَنْ لَا اِنْقِضَاءَ لِدَوَامِ مُلْكِهٖ ـ

অনুবাদ :

যখন সে তা দেখল, তখন সে তাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল পানি ভর্তি এবং সে তার পদদ্বয় অনাবৃত করল পানিতে অবতরণের জন্য। তখন হযরত সুলায়মান (আ.) প্রাসাদের প্রধান ফটকের নিকট কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার উভয় পা ও পায়ের গোছা সুন্দর। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে বললেন, এটা স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত প্রাসাদ। অর্থাৎ কাঁচের। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম। তুমি বিনে অন্যের উপাসনা করে আমি সুলায়মানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করছি। হযরত সুলায়মান (আ.) তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করলেন; কিন্তু তার পায়ের গোছার পশম অপছন্দ করলেন। তখন শয়তান তার জন্য লোমনাশক দ্রব্য তৈরি করল। বিলকীস তার দ্বারা পশম পরিষ্কার করল। এরপর তিনি তাকে বিয়ে করেন এবং তার প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। তাকে তার রাজত্বে বহাল রাখেন। তিনি প্রতি মাসে একবার তাঁর সাক্ষাৎ করতেন এবং তার নিকট তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের পরিসমাপ্তিকালে তার রাজত্বেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। বর্ণিত আছে যে, তিনি তের বৎসর বয়সে রাজত্বে অধিষ্ঠিত হন এবং ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মহান পবিত্র সে সত্তা, যার রাজত্বের স্থায়িত্বে কখনো অস্থিতি স্পর্শ করে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اٰصِفُ بْنُ بَرْخِيَا : কথিত আছে যে, আসিফ ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খালাতো ভাই। তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট নবী, তার হাতে বহু অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড তথা কারামত প্রকাশ পেত।

قَوْلُهٗ ثُمَّ رَدَّ بِطَرْفِهٖ : بِطَرْفِهٖ -এর بَاء অব্যয়টি অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ بِالْاِفْضَالِ عَلٰى مَنْ يَكْفُرُهَا : তিনি তার সাধারণ নিয়ামতসমূহকে কুফর ও অকৃতজ্ঞতার দরুন ছিনিয়ে নেন না। قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا -এর عَطْف হলো قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ -এর উপর।

قَوْلُهُ فَنَنْظُرْ : এটা جَوَاب اَمْر হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَرِهَ شَعْرَ سَاقَيْهَا : এর তাফসীরটি পূর্বের তাফসীর حَسَنًا فَرَاٰى سَاقَهَا وَقَدَمَيْهَا -এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, কেউ কেউ এভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, পশমের প্রতি লক্ষ্য না করলে তার পা ও পায়ের গোছা ছিল বেশ সুন্দর। তবে এ ব্যাখ্যা মনঃপূত নয়।

قَوْلُهُ مُمَرَّدٌ : এটা تَمْرِيْد থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো মসৃণ, তৈলাক্ত। এ থেকে اَمْرَدُ শব্দের উৎপত্তি, অর্থ শ্মশ্রুহীন বালক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ : অর্থাৎ যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল। কিন্তু এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বয়ং হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপাটাই একটা মুজেযা এবং বিলকীসকে পয়গাম্বরসুলভ মু'জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোনো কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা (র.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে ইবনে জারীর (র.) বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক (র.) তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলায়মান (আ.)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যা-ই চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরি নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা এটা অবাস্তব নয় যে, হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোনো ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরো বেশি প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বাধন করে বলেছেন– اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ [ফুসূসুল হিকাম] এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হিসেবে গণ্য হবে।

মুজেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মুজেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কুরআন পাকে বলা হয়েছে– وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ; কারামতের অবস্থাও হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোনো দখল থাকে না; বরং সরাসরি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কোনো কাজ হয়ে যায়। মুজেযা ও কারামত প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোনো অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গাম্বরের হাতে প্রকাশ পায় তবে তাকে মুজেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্যকোনো নেককার মুসলমানের হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়ায়েত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলি তাঁর পয়গাম্বরের গুণাবলির প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায় সেগুলো পয়গাম্বরের মুজেযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ : শায়েখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র.) একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ হলো কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এইজন্য নবী, ওলী এমনকি, মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সুফী বুযুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্তে মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গাম্বরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কুরআন পাক এই তাসাররুফকে عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ [কিতাবের জ্ঞান] -এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থেই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোনো দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

قَوْلُهُ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ : আমি এই সিংহাসন চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব- আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা কারামাত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জবাব এই যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি এ কাজটি এত দ্রুত করে দেব।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিতা হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কুরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞাসা করল, সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপারটি اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ কুরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসাকির হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে তার রাজত্বে বহাল রেখে ইয়েমেনের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সুলায়মান (আ.) সেখানে গমন করতেন এবং তিনদিন অবস্থান করতেন। হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকীসের জন্য ইয়েমেনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।

অনুবাদ :

٤٥. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ مِنَ الْقَبِيْلَةِ صٰلِحًا اَنِ اَىْ بِاَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحِّدُوْهُ فَاِذَاهُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ ـ فِى الدِّيْنِ فَرِيْقٌ مُؤْمِنُوْنَ مِنْ حِيْنَ اِرْسَالِهِ اِلَيْهِمْ وَفَرِيْقٌ كَافِرُوْنَ ـ

৪৫. আমি অবশ্যই ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের বংশীয় ভ্রাতা হযরত সালেহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম এই আদেশসহ যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁকে এক বলে স্বীকার কর; কিন্তু তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো। দীনের ব্যাপারে। একদল তাঁকে প্রেরণ করার সময় থেকেই ঈমান আনয়ন করল। আর একদল স্বীয় কুফরির উপর অটল রইল।

٤٦. قَالَ لِلْمُكَذِّبِيْنَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ج اَىْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ حَيْثُ قُلْتُمْ اِنْ كَانَ مَا اَتَيْتَنَا بِهٖ حَقًّا فَاْتِنَا بِالْعَذَابِ لَوْلَا هَلَّا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ مِنَ الشِّرْكِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ فَلَا تُعَذَّبُوْنَ ـ

৪৬. তিনি বললেন, অবিশ্বাসীদেরকে। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন, কল্যাণের পূর্বেই অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? অর্থাৎ অনুগ্রহ ও রহমতের পূর্বেই শাস্তিকে। কেননা তোমরা বলেছ যে, তুমি যা নিয়ে আমাদের নিকট এসেছ তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে শাস্তি নিয়ে এসো! কেন তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না? শিরক থেকে যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। ফলে তোমরা শাস্তির সম্মুখীন হবে না।

٤٧. قَالُوا اطَّيَّرْنَا اَصْلُهٗ تَطَيَّرْنَا اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الطَّاءِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ وَصْلٍ اَىْ تَشَاءَمْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ط اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ قُحِطُوا الْمَطَرَ وَجَاعُوْا قَالَ طٰئِرُكُمْ شُؤْمُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَاكُمْ بِهٖ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ تُخْتَبَرُوْنَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ ـ

৪৭. তারা বলল, আমরা অমঙ্গল মনে করি اطَّيَّرْنَا। -এর মূলরূপ হলো تَطَيَّرْنَا এরপর تَاء কে طَاء -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়ে শুরুতে একটি হামযায়ে ওয়াসল নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমরা অশুভ মনে করি। তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অর্থাৎ মুমিনগণকে। যেহেতু তারা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের স্বীকার হয়েছিল। তিনি বললেন, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে তিনিই তা তোমাদের নিকট নিয়ে আসেন। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গলের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

٤٨. وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ ثَمُوْدَ تِسْعَةُ رَهْطٍ اَىْ رِجَالٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِالْمَعَاصِىْ مِنْهَا قَرْضُهُمُ الدَّنَانِيْرَ وَالدَّرَاهِمَ وَلَا يُصْلِحُوْنَ بِالطَّاعَةِ ـ

৪৮. আর সেই শহরে ছামূদের শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত অন্যায় আচরণ ও নাফরমানির মাধ্যমে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা কর্তন তন্মধ্যে অন্যতম। তারা সংশোধন করত না আনুগত্যের মাধ্যমে।

অনুবাদ :

٤٩. قَالُوْا اَىْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَاسَمُوْا اَىْ اَحْلِفُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمِّ التَّاءِ الثَّانِيَةِ وَاَهْلَهٗ اَىْ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ اَىْ نَقْتُلُهُمْ لَيْلًا ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ بِالنُّوْنِ وَالتَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ الثَّانِيَةِ لِوَلِيِّهٖ اَىْ وَلِيِّ دَمِهٖ مَا شَهِدْنَا حَضَرْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَىْ اِهْلَاكُهُمْ اَوْ هَلَاكُهُمْ فَلَا نَدْرِىْ مَنْ قَتَلَهٗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

৪৯. তারা বলল, অর্থাৎ তারা পরস্পর একে অপরকে বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা অবশ্যই রাত্রিবেলা আক্রমণ করব তাকে لَنُبَيِّتَنَّهٗ সীগাহটি نُوْن -এর সাথে এবং نُوْن -এর স্থানে تَاء দিয়ে এবং দ্বিতীয় تَاء-এ পেশ দিয়ে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। এবং তার পরিবার-পরিজনকে অর্থাৎ যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাদেরকে রাতের আঁধারে হত্যা করব অতঃপর নিশ্চয় বলব لَنَقُوْلَنَّ ফে'লটি نُوْن যোগে এবং نُوْن -এর স্থানে تَاء দিয়ে এবং দ্বিতীয় لَامْ কে পেশ দিয়ে [لَتَقُوْلُنَّ] পঠিত রয়েছে। তার অভিভাবককে, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি অর্থাৎ আমরা উপস্থিত হইনি। مَهْلِكَ শব্দটির مِيْم বর্ণে পেশ ও যবর উভয়টিই বৈধ অর্থাৎ اِهْلَاكُهُمْ [তাদের ধ্বংস করা] অথচ هَلَاكُهُمْ [তাদের ধ্বংস হওয়া] আমরা জানি না যে, কে তাদেরকে হত্যা করেছে। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

٥٠. وَمَكَرُوْا فِىْ ذٰلِكَ مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا اَىْ جَازَيْنَاهُمْ بِتَعْجِيْلِ عُقُوْبَتِهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

৫০. তারা এ ব্যাপারে এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করেছিলাম। অর্থাৎ আমিও তাদেরকে প্রতিদান দিলাম তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করে; কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

٥١. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ اَهْلَكْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ. بِصَيْحَةِ جِبْرِيْلَ اَوْ بِرَمْيِ الْمَلٰۤئِكَةِ بِحِجَارَةٍ يَرَوْنَهَا وَلَا يَرَوْنَهُمْ.

৫১. অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। হযরত জিবরীল (আ.)-এর বিকট আওয়াজ দ্বারা কিংবা ফেরেশতাদের প্রস্তর নিক্ষেপণের মাধ্যমে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে দেখতেন; কিন্তু তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পেত না।

٥٢. فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً خَالِيَةً وَنَصْبُهٗ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْاِشَارَةِ بِمَا ظَلَمُوْا ط بِظُلْمِهِمْ اَىْ كُفْرِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَعِبْرَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ قُدْرَتَنَا فَيَتَّعِظُوْنَ.

৫২. এই তো তাদের ঘর বাড়ি যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে উজার হয়ে পড়ে আছে। এখানে خَاوِيَةً শব্দটি حَالْ হওয়ার ভিত্তিতে নসবযুক্ত হয়েছে। আর এর আমেল হলো اِسْم اِشَارَه -এর مَعْنٰى বা অর্থ তথা اُشِيْرَ তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে অর্থাৎ তাদের কুফরির কারণে এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জানে ও উপদেশ গ্রহণ করে।

অনুবাদ :

٥٣. وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِصَالِحٍ وَهُمْ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ـ الشِّرْكَ

৫৩. এবং আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছি যারা ছিল মুমিন ও বিশ্বাসী হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি তারা ছিলেন চার হাজার এবং তারা ছিল মুক্ত/সতর্ক শিরক হতে।

٥٤. وَلُوْطًا مَنْصُوْبٌ بِاُذْكُرْ مُقَدَّرًا قَبْلَهُ وَيُبْدَلُ مِنْهُ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ اَيِ اللِّوَاطَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ يُبْصِرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِنْهِمَاكًا فِى الْمَعْصِيَةِ ـ

৫৪. স্মরণ করুন, হযরত লূত (আ.)-এর কথা لُوْطًا শব্দটি مَنْصُوْب হয়েছে পূর্বে اُذْكُرْ ফে'ল উহ্য থাকার কারণে আর তার থেকে بَدَل হলো– যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ? অর্থাৎ, পুং মৈথুন/সমকামিতা জেনে শুনে একে অপরকে দেখিয়ে চরম অবাধ্যতামূলক ভাবে।

٥٥. اَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ عَاقِبَةَ فِعْلِكُمْ ـ

৫৫. তোমরা কি اَئِنَّكُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযা বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি করে উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। কাম তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায় তোমাদের কুকর্মের পরিণতি সম্পর্কে।

٥٦. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ اَىْ اَهْلَهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ج اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ مِنْ اَدْبَارِ الرِّجَالِ ـ

৫৬. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর। এরাতো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়। সমকামিতা থেকে।

٥٧. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز قَدَّرْنٰهَا جَعَلْنَاهَا بِتَقْدِيْرِنَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ ـ

৫৭. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম আমার ভাগ্য নির্ধারণীতে অবশিষ্টদের ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ শাস্তিতে নিপতিতগণের অন্তর্গত।

٥٨. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ج هُوَ حِجَارَةُ السِّجِّيْلِ اَهْلَكَتْهُمْ فَسَآءَ بِئْسَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ بِالْعَذَابِ مَطَرُهُمْ ـ

৫৮. এবং তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর তা হলো পাথর বৃষ্টি যা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কতই না নিকৃষ্ট। তাদের বৃষ্টি যা আজাবের মাধ্যমে হয়েছিল।

٥٩. قُلْ يَا مُحَمَّدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى هَلَاكِ كُفَّارِ الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى هُمْ ءٰآللّٰهُ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَإِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرٰى وَتَرْكُهُ خَيْرٌ لِمَنْ يَعْبُدُهُ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ اَهْلُ مَكَّةَ بِهِ الْاٰلِهَةَ خَيْرٌ لِعَابِدِيْهَا ـ

অনুবাদ :

৫৯. আপনি বলুন হে মুহাম্মদ ﷺ ! সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অতীতের কাফের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করায় এবং শান্তি তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ নাকি তারা? অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা যাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে তারা? ءٰآللّٰهُ-এর মধ্যে উভয় হামাযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয়টিকে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করে অথবা দ্বিতীয়টিকে লঘু করে এবং লঘুকৃতটি ও অপরটির মাঝে اَلِف বৃদ্ধি করে বা তা পরিহার করে পঠিত রয়েছে। আর يُشْرِكُوْنَ শব্দটি يَاء এবং تَاء উভয়রূপে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ মক্কাবাসীরা তাঁর সাথে যাদের শরিক করে তারা তাদের উপাসনাকারীদের জন্য উৎকৃষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ : সামূদ হলো উক্ত সম্প্রদায়ের উর্ধ্বতন পুরুষের নাম। সালিহ (আ.) ও উক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। এখানে সামূদ দ্বারা উক্ত নামের সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত সামূদকে দ্বিতীয় আ'দ [عَادٌ ثَانِيَةٌ] -ও বলা হয়। عَادٌ اُوْلٰى [প্রথম আদ] হলো হুদ সম্প্রদায়ের নাম। প্রথম আ'দ ও দ্বিতীয় আ'দ -এর মাঝে ১০০ বছরের ব্যবধান ছিল। –[জুমাল]

قَوْلُهُ صَالِحًا : এটা اَخَاهُمْ থেকে بَدَلٌ কিংবা عَطْفُ بَيَانٍ ; হযরত সালেহ (আ.) ২৮০ বছর হায়াত লাভ করেছিলেন। হযরত হুদ (আ.) হায়াত পেয়েছিলেন ৪৬৪ বছর। হযরত হুদ (আ.) ও হযরত নূহ (আ.)-এর মাঝে ৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল।

فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ : এখানে فَرِيْقَانِ দ্বারা হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিছু মানুষ ঈমান আনল আর কিছু মানুষ ঈমান আনল না। আর আল্লামা যমখশরী (র.) বলেছেন, দু'দলের দ্বারা একদল হলো হযরত সালেহ (আ.) ও আরেক দল দ্বারা তাঁর উম্মত উদ্দেশ্য। তিনি فَاء দ্বারা عَطْف হওয়ার দরুন এ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা فَاء অব্যয়টি تَعْقِيْبٌ بِالْاِتِّصَالِ বুঝায়। অর্থাৎ রাসূল হওয়ার দাবির সাথে সাথেই দু'দল হয়ে গেছে। এক পক্ষে হলো হযরত সালেহ (আ.) আর আরেক পক্ষে তার কওমের লোকজন।

قَوْلُهُ يَخْتَصِمُوْنَ : অর্থের দিক দিয়ে এটা فَرِيْقَانِ -এর সিফত। অর্থাৎ فَرِيْقَانِ শব্দটি শাব্দিক বিচারে যদিও দ্বিবচন তবে প্রত্যেক দল যেহেতু কিছু সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এদিক দিয়ে তার মধ্যে বহুবাচনিক অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এ হিসেবে তার সিফতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِمَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ : অর্থাৎ بِطَلَبِ السَّيِّئَةِ আর سَيِّئَةٌ দ্বারা আজাব এবং حَسَنَةٌ দ্বারা রহমত উদ্দেশ্য। যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ قُحِطُوا الْمَطَرَ اَىْ حُبِسُوْا : অর্থাৎ তোমাদের কুলক্ষণে হওয়ার কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مَدِيْنَةِ ثَمُوْدَ : কথিত আছে যে, সামূদের শহরের নাম ছিল হিজর। কারো মতে হিজর হলো মদীনা ও শামের মধ্যকার এক উপত্যকা। সামূদ জাতি সেখানকার অধিবাসী ছিল।

قَوْلُـهُ رَهْـطٍ : দশ থেকে কম সংখ্যক পুরুষ লোকের সমষ্টিকে رَهْط বলা হয়। رَهْط -এর ব্যাখ্যা رِجَالٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে. رَهْطٍ শব্দটি تِسْعَةٌ থেকে অর্থের দিক দিয়ে تَمْيِيز ; শব্দের দিকে দিয়ে যদিও এটা একবচন তবে অর্থের দিকে দিয়ে বহুবচন। এর কারণে تمييز হওয়া সঙ্গত হয়েছে। تِسْعَة رَهْط -এর মধ্যকার اِضَافَت টি بَيَانِيَّة অর্থাৎ, تِسْعَةٌ هُمْ رَهْطٌ

قَوْلُـهُ تَـقَـاسَـمُـوْا : تَقَاسَمُوْا -এর ব্যাখ্যা اَحْلِفُوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اَمْر -এর সীগাহ্। অর্থ এই যে, নয়জন মানুষ হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করল যে, আমরা সালিহ (আ.) ও তার উষ্ট্রীর উপর রাতে চড়াও হব। تَقَاسَمُوْا ক্রিয়াটি অতীতকালীনও হতে পারে। এ সময় এটা لَقَالُوْا -এর তাফসীর হবে। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে- مَا قَالُوْا তারা কি বলল? উত্তরে বলা হয়েছে- تَقَاسَمُوْا ; আর نُبَيِّتَنَّهٗ ক্রিয়াটি مُضَارِعْ جَمْع مُتَكَلِّمْ بَانُوْن تَاكِيْد -এর সীগাহ। যমীরটি مَفْعُوْل এটা بَاب تَفْعِيْل থেকে। অর্থ- আমরা অবশ্যই রাতে তার উপর আক্রমণ করব।

قَوْلُـهُ بِـمَـا ظَـلَـمُـوْا -এর ব্যাখ্যা بِظُلْمِهِمْ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে رُؤْيَتْ তথা দেখার দ্বারা চোখের দর্শন উদ্দেশ্য। [অর্থাৎ তারা একে অন্যের সামনে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতো।]

قَوْلُـهُ لَـتَـاْتُـوْنَ الـرِّجَـالَ شَـهْـوَةً مِّـنْ دُوْنِ الـنِّـسَـاۤءِ : اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ -এর মধ্যে যে অস্পষ্টতা রয়েছে এর দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রথমত অস্পষ্ট রাখার এ ইঙ্গিত ছিল যে, তাদের এ আচরণ উচ্চারণ করারও যোগ্য নয়; বরং তা অতিশয় ঘৃণিতও জঘন্য বিষয়। বিবেকবান কোনো মানুষ এ কথা স্বীকারও করবে না যে, মানুষের দ্বারা এমন জঘন্যতম আচরণ প্রকাশ পেতে পারে।

قَوْلُـهُ مِـنْ دُوْنِ الـنِّـسَـاۤءِ : এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে দু'পক্ষ থেকে পাপ রয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার এবং নারীদেরকে বর্জন করার।

قَوْلُـهُ تَـجْـهَـلُـوْنَ : **প্রশ্ন** : تَجْهَلُوْنَ হলো قَوْمٌ -এর সিফত, অথচ مَوْصُوْف صِفَتْ -এর মধ্যে تَطَابُقْ তথা সঙ্গতি নেই কেননা قَوْم হলো غَائِبْ আর تَجْهَلُوْنَ হলো حَاضِرْ

উত্তর : কোথাও غَيْبْ ও مُخَاطَبْ তথা নাম পুরুষ ও মধ্যমপুরুষ একত্র হলে مُخَاطَبْ বা মধ্যমপুরুষ জোরদার হওয়ার কারণে তাকে غَيْبْ তথা নামপুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। -[জুমাল]

এ উত্তরও দেওয়া যেতে পারে যে, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে যেহেতু قَوْم কে, এ কারণে তাকে حَاضِرْ -এর স্থলে রেখে সিফতকে حَاضِرْ -এর সীগাহ দ্বারা আনা হয়েছে।

قَوْلُـهُ عَـاقِـبَـةَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, تَجْهَلُوْنَ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে।

قَوْلُـهُ فَـمَـا كَـانَ جَـوَابُ قَـوْمِـهٖ : اِلَّا اَنْ قَالُوْا এখানে كَانَ -এর خَبَرْ আগে এসেছে, এর اِسْم হলো- اِلَّا اَنْ قَالُوْا ইবনে আবূ ইসহাক جَوَابُ -কে كَانَ -এর اِسْم সাব্যস্ত করে مَرْفُوْع পড়েছেন। আর পরবর্তী অংশকে তার خَبَرْ স্থির করেছেন।

قَوْلُـهُ وَاَمْـطَـرْنَـا عَـلَـيْـهِـمْ مَّـطَـرًا : এ তাকিদটি বৃষ্টিপাতে তীব্রতা বুঝানোর জন্য উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ সে বৃষ্টি ছিল অসাধারণ ও অস্বাভাবিক। بِالْعَذَابِ এটা মুতা'আল্লিক হয়েছে مُنْذَرِيْنَ -এর সাথে । আর مَطَرِهِمْ হলো مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُـهُ وَلَـقَـدْ اَرْسَـلْـنَـاۤ اِلٰـى ثَـمُـوْدَ اَخَـاهُـمْ : এটা এ সূরার চতুর্থ কাহিনী, কুরআন মজীদে ৮ স্থানে হযরত সালেহ (আ.)-এর নাম উল্লিখিত হয়েছে। হযরত সালেহ (আ.) যে গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাকে সামূদ বলা হয়। হযরত সালেহ (আ.) এর থেকে তার বংশ পরম্পরা ছয় পুরুষের মাধ্যমে সামূদ পর্যন্ত পৌঁছে। এটা ইমাম বগভী (র.)-এর অভিমত। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ মতে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মনে হয়। -[কাসাসুল কুরআন]

এর দ্বারা এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সামূদ জাতির ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম হলো সামূদ। সামূদ থেকে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত বংশ-পরম্পরার ব্যাপারে দুটি উক্তি রয়েছে। ১. সামূদ ইবনে আমির, আমির ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ। ২. সামূদ ইবনে আ'দ ইবনে আউস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.)। আল্লামা আলুসী (র.) লিখেন, ইমাম সা'লাবী (র.) দ্বিতীয় উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সামূদ জাতি হলো সামীয় গোত্রসমূহেরই একটি শাখা। عَادُ الْأُوْلٰى তথা প্রথম আ'দ -এর ধ্বংসের সময় হযরত হূদ (আ.)-এর সাথে সে বেঁচে গিয়েছিল। এ সামূদ -এর বংশকেই عَادْ ثَانِيَة বা দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়।

সামূদ জাতির বসতি : সামূদ জাতি কোথায় বসবাস করত? এ বিষয়ে এটা নিশ্চিত যে, তারা হিজর এলাকার অধিবাসী ছিল। হেজায ও শাম -এর মাঝে ওয়াদিউলু কুরা পর্যন্ত যে এলাকা দেখা যায়, এ সবই হলো তাদের আবাসভূমি। বর্তমানে তা 'ফাজ্জুন্নাকা' নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

সামূদ জাতির ধর্ম : সামূদ জাতি তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় পৌত্তলিক তথা মূর্তিপূজক ছিল। আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করত। তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরই গোত্র থেকে হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। উক্ত জাতির প্রায় ৪ হাজার মানুষ তাঁর উপর ঈমান এনেছিল, আজাব আসার আগে তিনি তাদেরকে নিয়ে বর্তমান 'হাজারা মাউত' নামক স্থানে চলে গিয়েছিলেন। হযরত সালেহ (আ.) পরবর্তীতে সেখানেই ইন্তেকাল করায় উক্ত এলাকাটি 'হাজারা মাউত' [মৃত্যু উপস্থিত হলো] নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আল্লাহ তাআলার উষ্ট্রী : হযরত সালেহ (আ.) তার জাতিকে বহু বুঝালেন। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ গ্রহণ এবং মূর্তিপূজা বর্জনের পরিবর্তে আরো বেশি শত্রুতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত হলো। যদিও নিরীহ সহজ-সরল কিছু মানুষ তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল, তবে নেতৃত্বস্থানীয় ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ধনী শ্রেণির লোকজন ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রইল। তারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস তথা পৌত্তলিকতার উপর অটল রইল। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সর্বপ্রকার নিয়ামত ও অনুগ্রহের অকৃতজ্ঞতাকে নিজেদের পেশা বানিয়েছিল। তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে শুধু মিথ্যাবাদীই আখ্যা দেয়নি; বরং তাকে বিভিন্নভাবে উপহাস ও কটুক্তি করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তারা তাঁর দাওয়াত ও নসীহতকে অগ্রাহ্য করে তাঁর নিকট নবুয়তের বিশেষ নিদর্শন বা প্রমাণ চাইল।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উষ্ট্রীর ঘটনার বিবরণ : হযরত সালেহ (আ.)-এর কাহিনীর বিবরণ হচ্ছে, হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমের লোকজন যখন তাঁর দাওয়াতের দরুন বিরক্ত হয়ে গেল, তখন তাদের নেতৃত্বস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি জনতার সামনে হযরত সালেহ (আ.)-কে বলল যে, সত্যিই যদি তুমি আল্লাহর প্রেরিত হও, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো নিদর্শন বা মুজেযা দেখাও। একে আমরা তোমার সত্যতায় বিশ্বাস করব। হযরত সালেহ (আ.) বললেন, এমন যেন না হয় যে, উক্ত নিদর্শন দর্শনের পরও তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধর্ম বিশ্বাসের উপর অনড় থাক। নেতৃবর্গ তখন জোরালোভাবে বলল, না, আমরা তা দেখামাত্রই ঈমান আনয়ন করব। হযরত সালেহ (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন ধরনের নিদর্শন চাও? তারা জবাবে বলল– সামনের পাহাড় বা বসতির এ পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাও, আর উক্ত উষ্ট্রীটি বের হওয়ার পর পরই সবার সামনে বাচ্চাও প্রসব করবে।

হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন। ফলে তখনই উক্ত পাথর থেকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বেরিয়ে এলো এবং সাথে সাথে তা একটি বাচ্চা প্রসব করল। এ থেকে তাদের নেতৃবর্গের মধ্যে হতে জুনদা ইবনে ওমর তো তখনই ঈমান নিয়ে এলো, আর অন্যান্যরাও যখন তার অনুকরণে ঈমান আনবে এমন সময় তাদের মন্দিদের ঠাকুর ও পুরোহিতরা তাদেরকে নানা কথা বলে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখল।

হযরত সালেহ (আ.) কওমের সকলকে বিভিন্নভাবে বুঝালেন। তিনি বললেন– দেখ, তোমাদের কামনা মতেই এ উষ্ট্রী প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এটাই সিদ্ধান্ত যে, এর জন্য পানি পানের পালা নির্দিষ্ট থাকবে। একদিন এই উষ্ট্রীর,

আরেকদিন অন্য সকল লোকজন ও তাদের পালিত পশুর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর সাবধান! এর যেন কোনোরূপ কষ্ট না হয়। এর যদি কোনোরূপ কষ্ট হয় তাহলে তোমাদের কোনো নিস্তার নেই। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এ ধারা বহাল ছিল। বহু লোক তার দুধ দ্বারা উপকৃত হতো। তবে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে এ বিষয়টি অসহনীয় হয়ে উঠে। তাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র হতে থাকে যে, এ উষ্ট্রীকে মেরে ফেলতে হবে। যাতে পালাবণ্টন থেকে মুক্তি লাভ হয়। কেননা এটা আমাদের নিজেদের ও আমাদের পশু-পাখিদের জন্য অত্যন্ত দুর্বিসহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই এর দরুন কষ্টের শিকার হচ্ছি। তবে তাকে হত্যা করার কারো হিম্মত হচ্ছিল না।

পরে সাদূক নামক জনৈক সুন্দরী ধনবতী রমণী নিজেকে 'মিসদা' নামক ব্যক্তির সামনে এবং অপর এক ধনবতী রমণী উনায়যা তার সুন্দরী কন্যাকে কায়দার [কুদার] নামক ব্যক্তির সামনে এ কথা বলে পেশ করল যে, তারা যদি উক্ত উষ্ট্রীকে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে এরা তাদের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। তাদেরকে বিবাহ করে আনন্দ উপভোগ করবে। তাদের এ উত্তেজনাকর প্রস্তাবে কায়দার ইবনে সালিফ ও মিসদা উদ্বুদ্ধ হয়ে এর জন্য প্রস্তুতি নিল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, উষ্ট্রীর চলাচল পথে আত্মগোপন করে বসে থাকবে। উষ্ট্রীটি যখন মাঠের দিকে যাওয়ার জন্য বের হবে, তখন অতর্কিত তার উপর আক্রমণ করবে। এ ব্যাপারে তারা আরো কয়েকজনের সহায়তা কামনা করল এবং তারা তাতে সম্মত হলো।

মোটকথা উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত মাফিক উষ্ট্রীকে হত্যা করে ফেলল। তারা পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করল যে, রাতে আমরা সবাই একত্র হয়ে সালেহ (আ.) ও পরিবারের সবাইকে হত্যা করব। তাদের অলী তথা অভিভাবকদের কেউ আমাদেরকে সন্দেহ বা দোষরোপ করলে আমরা বলব যে, এ কাজ আমরা করিনি। আমরা তো সেখানে হাজিরই ছিলাম না । উষ্ট্রীকে হত্যা করার পর তার বাচ্চাটি পালিয়ে পাহাড়ে উঠে গিয়ে চিৎকার করতে করতে এক পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত সালেহ (আ.)-এ বিষয়ে অবগত হওয়ার পর বললেন, অবশেষে তা-ই হলো আমি যার আশঙ্কা করেছিলাম। এখন তোমরা আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা কর। তিনদিনের মধ্যে আল্লাহর আজাব এসে তোমাদেরকে অনিবার্য ধ্বংস করে ফেলবে। এরপর বজ্রপাতের আজাব আপতিত হলো এবং রাতে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলল, আর ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এক শিক্ষণীয় কাহিনী হয়ে রয়ে গেল।

তাফসীরে রূহুল মা'আনী প্রণেতা আল্লামা আলূসী (র.) লিখেন, সামূদ জাতির উপর পূর্বের দিনের ভোরবেলা থেকেই আজাবের নিদর্শনাবলি প্রকাশ পেয়েছিল। প্রথম দিন তাদের সকলের মুখমণ্ডল এমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল যেমন ভয়ের প্রাথমিক পর্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয় দিন সবার চেহারা রক্তিমাকার ধারণ করল। এটা ভয়-ভীতির দ্বিতীয় পর্যায় ছিল। আর তৃতীয় দিন সবার চেহারা সম্পূর্ণ কাল বর্ণের হয়েছিল। এটা ছিল ভয়-ভীতির তৃতীয় পর্যায় । যার পরে কেবল মৃত্যুই বাকি থেকে যায়।

মোটকথা এ তিন দিনের পরে আজাবের প্রতিশ্রুত মুহূর্ত এসে গেল। রাত্রিকালে এক ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ তাদের সবাইকে যে যে অবস্থায় ছিল উক্ত অবস্থায় ধ্বংস করে ফেলল। কুরআন মজীদে এ ভয়ঙ্কর আওয়াজকে কোথাও صَاعِقَةٌ [বজ্র], কোথাও زَلْزَلَةٌ বা কম্পন সৃষ্টি, কোথাও اَلطَّاغِيَةُ [ভীতিকর পরিস্থিতি] এবং কোথাও صَيْحَةٌ [চিৎকার] দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এ সবই একই বাস্তবতার বিভিন্নরূপ প্রকাশমাত্র। যাতে এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তা কত মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর ছিল। একদিকে সামূদ জাতির উপর এ আজাব অবতীর্ণ হলো। অপরদিকে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর অনসুসারী মুসলমানগণকে আল্লাহ তা'আলা নিজ হেফাজতে নিয়ে নিলেন। তাদেরকে তিনি এ আজাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন।

قَوْلُهُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ الخ : হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী : ইতিপূর্বে হযরত লূত (আ.)-এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে যে, হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত লূত (আ.)-এর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে, হযরত ইবরাহীম (আ.) এর হিজরতকালে হযরত লূত তাঁর সফর-সঙ্গী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন মিশর গমন করেন তখনো তিনি তার সঙ্গে

ছিলেন এবং একই সঙ্গে মিশরে অবস্থান করেন। তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো যে, লূত (আ.) মিশর থেকে হিজরত করে شَرْق أُرْدُنْ তথা উর্দুন -এর পূর্বাঞ্চলের সাদূম ও সামূরা এলাকায় চলে যাবেন। সেখানে থেকে তিনি আল্লাহর বান্দাদের নিকট দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করবেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তন করবেন।

قَوْلُهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ : رَهْط শব্দের অর্থ– দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رَهْط বলার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা তাদের অর্থসম্পদ, জাঁকজমকতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হতো এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয়জন ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শাম দেশের একটি স্থানের নাম।

قَوْلُهُ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ .... وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ : উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জাতিগোষ্ঠির উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবিদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদি গণ্য হব। কারণ রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং তারা যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গুনাহ! বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর ওলী তথা দাবিদার বলেছে, সে তো হযরত সালেহ (আ.)-এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখল? জবাব এই যে, সম্ভবত সে পারিবারিক দিকে দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবি করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল; কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ : পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রাসূলে আকরাম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আজাব থেকে নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে এই বাক্যটিও হযরত লূত (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰى বাক্যে বাহ্যত পয়গাম্বরগণকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন– অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এই মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে اَلَّذِيْنَ صْطَفٰى বলে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গাম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বিস্তারিত তথ্য পেশ করা হবে।

اَلْجُزْءُ الْعِشْرُوْنَ : বিংশতিতম পারা

٦٠. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ج فَاَنْبَتْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ مِنَ الْغَيْبَةِ اِلَى التَّكَلُّمِ بِهٖ حَدَآئِقَ جَمْعُ حَدِيْقَةٍ وَهُوَ الْبُسْتَانُ الْمُحَوَّطُ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج حُسْنٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا لِعَدَمِ قُدْرَتِكُمْ عَلَيْهِ ءَاِلٰهٌ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيْ مَوَاضِعِهِ السَّبْعَةِ مَّعَ اللّٰهِ ج اِعَانَةً عَلٰى ذٰلِكَ اَيْ لَيْسَ مَعَهُ اِلٰهٌ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَهُ.

অনুবাদ :

৬০. বল দেখি কে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি? অতঃপর আমি সৃষ্টি করি এখানে غَائِبٌ তথা নাম পুরুষ হতে مُتَكَلِّمٌ তথা উত্তম পুরুষের দিকে اِلْتِفَاتٌ তথা বাক্যের ধারার পরিবর্তন হয়েছে। এর দ্বারা মনোরম উদ্যান حَدَائِقُ শব্দটি حَدِيْقَةٌ -এর বহুবচন; অর্থ- চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যান। তার বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এ ব্যাপারে তোমাদের ক্ষমতা না থাকার কারণে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? এ বিষয়ে কোনো সাহায্যের জন্য অর্থাৎ তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। اِلٰهٌ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে লঘু করে এবং উভয়ের মাঝে একটি اَلِفٌ বৃদ্ধি করে এর সাত স্থানেই। তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে।

٦١. اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا لَا تَمِيْدُ بِاَهْلِهَا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ فِيْمَا بَيْنَهَا اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ جِبَالًا اَثْبَتَ بِهَا الْاَرْضَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ط بَيْنَ الْعَذْبِ وَالْمِلْحِ لَا يَخْتَلِطُ اَحَدُهُمَا بِالْاٰخَرِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ تَوْحِيْدَهُ.

৬১. অথবা কে পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করেছেন ফলে পৃথিবী তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে নড়াচড়া করে না এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাবিহত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত পাহাড় এবং তার দ্বারা পৃথিবীকে স্থির করেছেন এবং দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায় লবণাক্ত ও মিষ্টি পানির মধ্যে; একটি অপরটির সাথে মিশে যায় না। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না তাঁর একত্ববাদকে।

অনুবাদ :

٦٢. اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ الْمَكْرُوْبَ الَّذِىْ مَسَّهُ الضُّرُّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاۤءَ الْاَرْضِ ط اَلْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى فِىْ اَىْ يَخْلُفُ كُلُّ قَرْنٍ الْقَرْنَ الَّذِىْ قَبْلَهُ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَتَّعِظُوْنَ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الذَّالِ وَمَا زَائِدَةٌ لِتَقْلِيْلِ الْقَلِيْلِ ـ

৬২. অথবা কে আর্তের আহবান সাড়া দেন অর্থাৎ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তি আহবানে সাড়া দেন। যখন সে তাঁকে ডাকে এবং আপদবিপদ দূরীভূত করেন তার থেকে ও অন্যান্যদের থেকে। এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। এখানে ইযাফতটি فِىْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক পরবর্তী বংশকে পূর্ববর্তী বংশের স্থালাভিষিক্ত করেন। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাক। تَذَكَّرُوْنَ ফে'লটি يَاء এবং تَاء উভয়ভাবেই পঠিত। আর এতে تَاء টা ذَال -এর মধ্যে প্রবিষ্ট বা ইদগাম হয়েছে। আর مَا অতিরক্তি হয়েছে যা অতি সামান্য ও নগণ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٣. اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ يُرْشِدُكُمْ اِلٰى مَقَاصِدِكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِالنُّجُوْمِ لَيْلًا وَبِعَلَامَاتِ الْاَرْضِ نَهَارًا وَ مَنْ يُّرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط اَىْ قُدَّامَ الْمَطَرِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهٖ غَيْرَهُ ـ

৬৩. অথবা যে সত্তা তোমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ তোমদেরকে তোমাদের লক্ষ্যস্থলের প্রতি দিক নির্দেশনা দান করেন জল ও স্থলের অন্ধকারে রাতের বেলায় তারকারাজির মাধ্যমে এবং দিবসে পৃথিবীর বিভিন্ন নিদর্শনসমূহের মধ্যে। এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে। আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? তারা যাকে শরিক করে আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে। তাঁর সাথে অন্যকে

٦٤. اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ فِى الْاَرْحَامِ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ يُعِيْدُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوْا بِالْاِعَادَةِ لِقِيَامِ الْبَرَاهِيْنِ عَلَيْهَا وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ بِالْمَطَرِ وَالْاَرْضِ ط بِالنَّبَاتِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ اَىْ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا اِلٰهَ مَعَهُ قُلْ يَا مُحَمَّدُ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ حُجَّتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ اِنَّ مَعِىَ اِلٰهًا فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ ـ

৬৪. অথবা যিনি মাখলুককে আদিতে সৃষ্টি করেন মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দু থেকে। অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন মৃত্যুর পরে যদিও তারা পুনরুত্থানকে স্বীকার করে না। কারণ এ ব্যাপারে অনেক প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। কে তোমাদের কে আকাশ থেকে বৃষ্টির সাহায্যে এবং পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ ও তরুলতার সাহায্যে জীবনোকরণ দান করেন? আল্লাহর সাথে কোনো ইলাহ আছে কি? অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না এবং তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো! অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে, আমার সাথে অন্য ইলাহ রয়েছে, সে উল্লিখিত কাজের কোনটি আঞ্জাম দিয়েছে?

অনুবাদ :

٦٥. وَسَأَلُوْهُ عَنْ وَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ فَنَزَلَ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ الْغَيْبَ اَىْ مَا غَابَ عَنْهُمْ اِلَّا لٰكِنَّ اللّٰهُ ط يَعْلَمُهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ كَغَيْرِهِمْ اَيَّانَ وَقْتَ يُبْعَثُوْنَ .

৬৫. মুশরিকরা কিয়ামতের ক্ষণ ও কাল সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলে অবতীর্ণ হয়– আপনি বলুন! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অর্থাৎ ফেরেশতা ও মানুষদের থেকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। আল্লাহ ছাড়া অর্থাৎ একমাত্র তিনিই সে জ্ঞান রাখেন। এবং তারা জানে না অর্থাৎ কাফেররা অন্যান্যদের ন্যায় কখন তারা উত্থিত হবে?

٦٦. بَلِ بِمَعْنٰى هَلْ ادّٰرَكَ بِوَزْنِ اَكْرَمَ فِىْ قِرَاءَةٍ وَفِىْ اُخْرٰى اِدَّارَكَ بِتَشْدِيْدِ الدَّالِ وَاَصْلُهُ تَدَارَكَ اُبْدِلَتِ التَّاءُ دَالًا وَاُدْغِمَتْ فِى الدَّالِ وَاجْتُلِبَتْ هَمْزَةُ الْوَصْلِ اَىْ بَلَغَ وَلَحِقَ اَوْ تَتَابَعَ وَتَلَاحَقَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ قف اَىْ بِهَا حَتّٰى سَاَلُوْا عَنْ وَقْتِ مَجِيْئِهَا لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا قف بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ مِنْ عَمَى الْقَلْبِ وَهُوَ اَبْلَغُ مِمَّا قَبْلَهُ وَالْاَصْلُ عَمِيُوْنَ اُسْتُثْقِلَتِ الضَّمَّةُ عَلَى الْيَاءِ فَنُقِلَتْ اِلَى الْمِيْمِ بَعْدَ حَذْفِ كَسْرَتِهَا .

৬৬. আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে। এখানে بَلْ টি هَلْ অর্থে হয়েছে এবং اِدّٰرَكَ শব্দটি اَكْرَمَ ওজনে। অন্য কেরাতে اِدَّارَكَ তাশদীদযুক্ত دَالْ -সহ মূলত ছিল تَدَارَكَ ; এরপর تَاء -কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে دَالْ -কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে শুরুতে সাকিন হওয়ায় একটি হামযায়ে ওয়াসল আনা হয়েছে ফলে ادارك হলো। অর্থ– মিলিত হলো, উপনীত হলো। এ অর্থ প্রথম কেরাত অনুপাতে আর পরবর্তী কেরাত অনুপাতে অর্থ হলো– একের পর এক আসা, মিলিত হওয়া। আর এ ক্ষেত্রে ক্লান্তি অপরিহার্য হয়। অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা কিয়ামত আগমনের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে– বিষয়টি এরূপ নয়। তারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ; বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ। عَمُوْنَ শব্দটি عَمَى الْقَلْبِ তথা অন্তর অন্ধ হওয়া থেকে গৃহীত। এটা পূর্বের فِىْ شَكٍّ -এর তুলনায় مُبَالَغَه পূর্ণ বা আধিক্যজ্ঞাপক। এটা মূলত عَمِيُوْنَ ছিল। يَاء -এর উপর পেশ কঠিন হওয়ায় তা তার পূর্বের বর্ণে স্থানান্তর করা হয়েছে তার পূর্বের বর্ণের তথা مِيْم -এর كَسْرَة ফেলে দেওয়ার পর। এরপর দু সাকিন একত্র হওয়ায় يَاء -কে ফেলে দিয়ে عَمُوْنَ বানানো হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ : এখানে اَمْ হলো مُنْقَطِعَة ; আবূ হাতিম বলেন– এর আসল রূপ হলো– اَعِبَادَةُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ اَوْثَانِكُمْ خَيْرٌ اَمْ عِبَادَةُ خَلَقَ ; আর কেউ কেউ বলেন– اِلٰهَتُكُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ ; এ সময় اَمْ مُتَّصِلَة হবে। এ ক্ষেত্রে تَوْبِيْخ وَتَهَكُّم তথা ধমক ও হুমকি অর্থে হবে। السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ

قَوْلُهُ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ : এটা عَدْل থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ হলো বরাবর করা, সমপর্যায়ের করা। ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে এ অর্থেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আবার عُدُوْل থেকেও নিষ্পন্ন হতে পারে। যার অর্থ হলো বের হওয়া, সীমাতিক্রম

করা। অর্থাৎ তোমরা হলে সীমাতিক্রমকারী জাতি। কেউ কেউ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا এবং পরবর্তী এ ধরনের বাক্যত্রয়কে أَمَّنْ جَعَلَ السَّمٰوٰتِ থেকে بَدْل স্থির করেছেন। তবে এটাই বিশুদ্ধ মনে হয় যে, তিনো জায়গায় بَلْ অব্যয়টি تَبْكِيْت তথা প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করার এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَالَهَا : এটা جَعَلَ -এর ظَرْف -ও হতে পারে, যদি جَعَلَ -কে خَلَقَ অর্থে নেওয়া হয়। আবার جَعَلَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل -ও হতে পারে যদি এটাকে صَيَّرَ অর্থে নেওয়া হয়। -[জুমাল]

قَوْلُهُ وَيَكْشِفُ : এর عَطْف হলো وَيُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ -এর উপর। এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। মুসান্নিফ (র.) وَعَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهٖ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ تَقْلِيْلًا لِقَلِيْلٍ : এটা عَدَمٌ بِالْكُلِّيَّةِ [সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা] -এর প্রতি ইঙ্গিত। অর্থাৎ تَذَكُّرٌ -কে সম্পূর্ণরূপে نَفِيٌّ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوْا بِالْاِعَادَةِ : এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর-

প্রশ্ন : কাফেররা যখন পুনরুত্থানে বিশ্বাসীই নয়, সুতরাং তাদেরকে এ কথা বলা যে, 'যে সত্তা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন, তিনি উত্তম নাকি তাদের দেবতারা কতুটুক সঙ্গত?

উত্তর : কাফেররা যদিও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, তবে প্রাথমিক সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। আর সূচনার মাধ্যমে পুনরুত্থান বুঝাটা অতি সহজ বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে বিশ্বাসী ধরে নিয়ে এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ : এ বাক্যটি এখানে পরপর পাঁচ স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি بَلْ هُمْ يَعْدِلُوْنَ -এর উপর সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টি সমাপ্ত হয়েছে بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -এর উপর, তৃতীয়টি قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ -এর উপর, চতুর্থটি عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -এর উপর এবং পঞ্চমটি শেষ হয়েছে قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -এর উপর।

قَوْلُهُ اِمْ مَعِىَ اِلٰهًا : এর স্থলে اِنَّ مَعَهٗ اِلٰهًا বলা সঙ্গত ছিল। কারণ পূর্বে اٰلِهَةٌ مَّعَ اللّٰهِ বলা হয়েছে। কোনো কোনো কপিতে مَعَهٗ -এর স্থলে مَعَ اللّٰهِ উল্লেখ আছে। এটা অধিক স্পষ্ট। اِلَّا -এর ব্যাখ্যা لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتِثْنَاء টি مُنْقَطِعٌ ; কেননা مُتَّصِلٌ সাব্যস্ত করা হলে اَللّٰهُ -কে مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর অন্তর্গত মানতে হবে। আর আসমান ও জমিনে থাকার জন্য مَكَانٌ বা স্থান [আধার] এর প্রয়োজন পড়ে। কাজেই আল্লাহর জন্যও مَكَانٌ বা আধার থাকা সাব্যস্ত হবে। অথচ এটা ঠিক নয়। এ কারণেই مُسْتَثْنٰى -কে مُنْقَطِعٌ স্থির করতে হবে।

قَوْلُهُ فِى الْاٰخِرَةِ : فِى الْاٰخِرَةِ -এর ব্যাখ্যা بِهَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِىْ অব্যয়টি بَاء অর্থে, অর্থাৎ পরকালের বিষয়ে তাদের জ্ঞান কি অক্ষম হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, بَلْ অব্যয়টি هَلْ তথা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ অর্থে। অর্থাৎ বাক্যটি এরূপ- لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ عِلْمٌ بِالْاٰخِرَةِ اَىْ لَمْ يُصَدِّقُوْا بِهَا وَلَمْ يَعْتَقِدُوْهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের তাওহীদে বিশ্বাস করতো না, যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে স্বীকার করতো না। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে, হয়তো এ হতভাগারা শিরক ও কুফর থেকে বিরত হবে। অতএব, তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের নাফরমানির কারণে যারা ধ্বংস হয়েছে, তাদের অবস্থা দেখে নিজদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করা এবং নিখিল বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

কেননা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণু তাঁরই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের জীবন্ত সাক্ষী। তাই পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো শিরক ও কুফর থেকে খাঁটি তওবা করা এবং এক আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হওয়া। পূববর্তী পারার সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- آللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকই উত্তম? নাকি তারা যাদের শরিক করে সেই অসহায় জড় পদার্থ মূর্তিগুলো উত্তম? এ প্রশ্নের জবাব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যিনি সৃষ্টি করেছেন নিখিল বিশ্বকে, যিনি সবকিছুর পালনকর্তা, তিনিই উত্তম, তিনিই সব কিছুর অধিকর্তা, তাঁর এক আদেশেই সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

তাওহীদের প্রমাণ : বল দেখি, কে আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন? وَاَنْزَلَ لَكُمْ আর কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান? আর ঐ বর্ষণের মাধ্যমে আল্লাহ পাকই জমিনে তরুলতা উৎপাদন করেন, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে আর কারো নেই। বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ অহরহ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

"নিশ্চয় আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিজীবিমহলের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে"। -[সূরা আলে ইমরান]

আরো ইরশাদ হয়েছে- وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ "এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।" -[সূরা জারিয়াত]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ "এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহর অস্তিত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে, তা কেন তোমরা দেখছো না"? -[সূরা জারিয়াত]

বস্তুত মানুষের শৈশব, কৈশোর এবং বার্ধ্যক্যের বিভিন্ন অবস্থায় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের কুদরতের বহু নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ পাক জমিনকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দেন, তাতে উদ্যান তৈরি করে দেন। এ পৃথিবীতে সামান্য তরুলতা উৎপাদনের ক্ষমতা কি তোমাদের আছে? বস্তুত এসব কিছুই ধ্রুব সত্য। এতদসত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ পাকের স্থলে অন্যের পূজা করতে যাও কোন যুক্তিতে? কোন বুদ্ধিতে?

তবু কি বলবে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য প্রভু রয়েছে? বরং তারা এমন লোক যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছেন। অক্ষম অসহায় জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করা, এমনকি আল্লাহ পাকের সমান এবং সমকক্ষ মনে করা এবং তাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلٰلَهَا اَنْهٰرًا : লক্ষ্য করে দেখ, এ পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করেছেন কে? আল্লাহ পাকই পৃথিবীকে মানুষের অবস্থান এবং বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়েছেন, তদুপরি তার ফাঁকে ফাঁকে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং পৃথিবী যেন নড়াচড়া না করে, তজ্জন্যে পাহাড়গুলোকে পৃথিবীর উপর বসিয়ে দিয়েছেন। তখন থেকে পৃথিবী স্থবির হয়ে আছে, আর দু'টি নদীকে পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও একটিকে আরেকটি থেকে পৃথক করে রেখেছেন, যাতে করে একের পরিচয় অন্যের মধ্যে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কাছাকাছি থেকেও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। এসব একমাত্র আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতেরই জীবন্ত নিদর্শন।

قَوْلُهُ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ : مُضْطَرّ শব্দটি اِضْطِرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো অভাব হেতু অপারগ ও অস্থির হওয়া। এটা তখনই হয় যখন কোনো হিতকামী, সাহায্যকারী ও সহায় না থাকে। কাজেই এমন ব্যক্তিকে مُضْطَرّ বলা হয়, যে দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলাকেই সাহায্যকারী মনে করে এবং তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়। এই তাফসীর সুদ্দী, যুন্নুন মিসরী, সহল ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى طَرْفَةِ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَاْنِىْ كُلَّهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত আশা করি। অতএব আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না। তুমিই আমার সবকিছু ঠিকঠাক করে দাও। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। –[কুরতুবী]

অসহায়ের দোয়া একান্ত আন্তরিকতার কারণে অবশ্যই কবুল হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণাও করেছেন। এর আসল কারণ এই যে, দুনিয়ার সব সহায় থেকে নিরাশ এবং সম্পর্কাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই কার্যোদ্ধারকারী মনে করে দোয়া করাটাই হলো ইখলাস। আল্লাহ তা'আলার কাছে, ইখলাসের বিরাট মর্তবা রয়েছে। মুমিন কাফের, পরহেযগার ও পাপিষ্ঠ নির্বিশেষে যার কাছে থেকেই ইখলাস পাওয়া যায়, তার প্রতিই আল্লাহর রহমত নিবিষ্ট হয়। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তারা যখন নৌকায় সওয়ার হয়ে সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করে এবং চতুর্দিক থেকে প্রবল ঢেউয়ের চাপে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন তারা যেন মৃত্যুকে চোখের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়। সেই সময় তারা পূর্ণ ইখলাস সহকারে আল্লাহকে ডেকে বলে, আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলে আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করে যখন তাদেরকে স্থলভাগে নিয়ে আসেন, তখন তারা পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয় এতে সন্দেহ নেই। ১. উৎপীড়িতের দোয়া। ২. মুসাফিরের দোয়া এবং ৩. সন্তানদের জন্য বদদোয়া। ইমাম কুরতুবী এই হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, এই দোয়াত্রয়ের মধ্যেও কবুল হওয়ার পূর্বোক্ত কারণ অসহায়ত্ব বিদ্যমান আছে। কোনো উৎপীড়িত ব্যক্তি কখন দুনিয়ার সব সহায় ও সাহায্যকারী থেকে নিরাশ হয়ে উৎপীড়ন দূর করার জন্য আল্লাহকে ডাকে, তখন সেও নিঃসহায়ই হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও দরদীস্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্য পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনো বদদোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবূ যর (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনো রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়। –[কুরতুবী]

যদি কোনো নিঃসহায়, মজলুম ও মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কুধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও কল্যাণবশত দেরিতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার ইখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগে কোনো ত্রুটি আছে কিনা। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল স্বরূপ তাঁর কুদরত ও হিকমতের কয়েকটি নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও আল্লাহ পাকের কুদরতের আরো কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে যা এক আল্লাহ ব্যতীত কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ

"[বল,] মাঠে-ময়দানে এবং সমুদ্রের অন্ধকারে কে তোমাদেরকে পথ দেখান? কে তাঁর রহমতের পূর্বে সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।"

অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সামুদ্রিক ভাগে বা স্থলভাগে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে যখন কোনো দিকেরই সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন কে তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন? এ প্রশ্নের একই জবাব, তা হলো আল্লাহ পাকই পথ দেখিয়ে থাকেন। এমনিভাবে বৃষ্টির জন্যে যখন মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে, তখন আল্লাহ পাকই সুখবরবাহী বায়ু প্রেরণ করে থাকেন।

قَوْلُهُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে যেমন ফেরেশতা, যত মাখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন জাতি ইত্যাদি তাদের কেউ গায়েবের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো ফেরেশতা অথবা নবী-রাসূলও শরিক হতে পারেন না। এ বিষয়ের জরুরি ব্যাখ্যা সূরা আন'আমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ : اِدّٰرَكَ শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাতও আছে এবং এর অর্থ সম্পর্কেও নানাজনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তাফসীরে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোনো তাফসীরকার اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ নিয়েছেন- تَكَامُلْ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হওয়া এবং فِى الْاٰخِرَةِ -কে اِدّٰرَكَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোনো কাজে লাগবে না। কারণ দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে اِدّٰرَكَ শব্দের অর্থ ضَلَّ ও غَابَ এবং فِى الْاٰخِرَةِ শব্দটি عِلْمُهُمْ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بَلْ শব্দটি لَوْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে যে ইলম তাঁরা আখিরাতে অর্জন করবে, তা যদি দুনিয়াতেই অর্জিত হতো, তবে তারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করতো না। কিন্তু এখন যেহেতু কিয়ামত সম্পর্কে একীন নেই, তাই তারা সন্দেহে পড়ে আছে।

قَوْلُهُ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ : "বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে।" অর্থাৎ, অন্ধ ব্যক্তি যেমন তার সম্মুখে কোনো কিছুই দেখে না, ঠিক তেমনিভাবে কাফেররাও তাদের ভবিষ্যতের কিছুই দেখে না।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ব্যতীত গায়েবের ইলম কারোরই নেই; বরং এরপর ইরশাদ করেছেন, এ কাফেরদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি নেই। এরপর ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ দেখে তারা এ সত্য উপলব্ধি করে যে, কিয়ামত অবশেষে হবে, কিন্তু কবে হবে তা কেউ জানে না। এরপর ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দলিল প্রমাণ রয়েছে; কিন্তু কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহের ঘোরে আচ্ছন্ন রয়েছে। আর এ সন্দেহের নিরসন তারা করতে পারে না। এরপর ইরশাদ করেছেন, এই কাফেররা অন্ধ হয়ে রয়েছে। এ অবস্থা হলো মুশরিকদের । -[মাযহারী খ. ৯, পৃ. ৬৮-৬৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র.) লিখেছেন, যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করে, তাদের তিনটি দল রয়েছে, এক দল যাদের প্রকাশ্যে আখিরাত সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই এবং এ অবস্থায়ই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ "বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে"।

আর কাফেরদের দ্বিতীয় দল যারা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا অর্থাৎ বরং তারা তাতে সন্দেহে রয়েছে। আর কাফেরদের তৃতীয় দলের পথভ্রষ্টতায় আরো উন্নতি হয়েছে। অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে তারা অন্ধ হয়ে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ অর্থাৎ বরং তারা এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে রয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৭৭৪]

অনুবাদ :

٦٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَيْضًا فِىْ اِنْكَارِ الْبَعْثِ ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ اَىْ مِنَ الْقُبُوْرِ .

৬৭. কাফেররা বলে অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে এ কথাও বলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে উত্থিত করা হবে? অর্থাৎ কবর থেকে।

٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ اَىْ مَا سُطِرَ مِنَ الْكِذْبِ .

৬৮. এই বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটাতো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়। اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ -এর বহুবচন; অর্থ- যে সকল মিথ্যা কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

٦٩. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ . بِاِنْكَارِهِمْ وَهِىَ هَلَاكُهُمْ بِالْعَذَابِ .

৬৯. আপনি বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল? তাদের অস্বীকার করার কারণে। আর তা হলো শাস্তি দ্বারা বিনাশ হয়ে যাওয়া।

٧٠. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىْ لَا تَهْتَمَّ بِمَكْرِهِمْ عَلَيْكَ فَاِنَّا نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ .

৭০. তাদের সম্পর্কে আপনি দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। এর দ্বারা মহানবী ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে তাদের কৃত ষড়যন্ত্রে আপনি অস্থির হবেন না। কারণ তাদের বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

٧١. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ .

৭১. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, কখন এই আজাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে? এ বিষয়ে।

٧٢. قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ قَرُبَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ فَحَصَلَ لَهُمُ الْقَتْلُ بِبَدْرٍ وَبَاقِى الْعَذَابِ يَاْتِيْهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ .

৭২. আপনি বলুন, তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবত তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। বদর যুদ্ধে তাদের হত্যার মাধ্যমে কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর অবশিষ্ট আজাব আসবে মৃত্যুর পরে।

٧٣. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَمِنْهُ تَاْخِيْرُ الْعَذَابِ عَنِ الْكُفَّارِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ . فَالْكُفَّارُ لَا يَشْكُرُوْنَ تَاْخِيْرَ الْعَذَابِ لِاِنْكَارِهِمْ وُقُوْعَهٗ .

৭৩. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল তন্মধ্য হতে কাফেরদের শাস্তিকে বিলম্ব করাও একটি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। কাফেররা শাস্তি বাস্তবায়িত হওয়াকে অস্বীকার করার কারণে শাস্তি বিলম্বিত হওয়ায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

অনুবাদ :

٧٤. وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ تُخْفِيْهِ وَمَا يُعْلِنُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ .

৭৪. তাদের অন্তরে যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তাদের রসনার মাধ্যমে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।

٧٥. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَلتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ اَيْ شَيْءٌ فِيْ غَايَةِ الْخَفَاءِ عَلَى النَّاسِ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ وَمَكْنُوْنُ عِلْمُهٗ تَعَالٰى وَمِنْهُ تَعْذِيْبُ الْكُفَّارِ .

৭৫. আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। এখানে غَائِبَةٍ -এর تَاء টি মুবালাগার জন্য অর্থাৎ মানুষের নিকট যা অতি গোপন। আর كِتَابٍ مُّبِيْنٍ তথা সুস্পষ্ট গ্রন্থ দ্বারা এখানে লওহে মাহফূয উদ্দেশ্য। অথবা যা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমে রয়েছে তা উদ্দেশ্য। কাফেরদের শাস্তিও উক্ত সংরক্ষিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

٧٦. اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِيْ زَمَنِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ . اَيْ بِبَيَانِ مَا ذُكِرَ عَلٰى وَجْهِهِ الرَّافِعِ لِلْاِخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ لَوْ اَخَذُوْا بِهٖ وَاَسْلَمُوْا .

৭৬. এই কুরআন বনী ইসরাঈলের নিকট বিবৃত করে আমাদের মহানবী ﷺ -এর যুগে বিদ্যমান বনী ইসরাঈলীদের নিকট। তাদের অধিকাংশ বিষয়কে যেসব নিয়ে তারা মতভেদ করে। অর্থাৎ উল্লিখিত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, তারা যদি তা মানত ও গ্রহণ করত তবে তাদের পারস্পরিক মতভেদ বিদূরীত হয়ে যেত।

٧٧. وَاِنَّهٗ لَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْعَذَابِ .

৭৭. এবং নিশ্চয় এটা মুমিনদের জন্য হেদায়েত ভ্রষ্টতা থেকে এবং রহমত আজাব হতে।

٧٨. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ كَغَيْرِهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِحُكْمِهٖ ج اَيْ عَدْلِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْعَلِيْمُ . بِمَا يَحْكُمُ بِهٖ فَلَا يُمْكِنُ اَحَدًا مُخَالِفَتُهٗ كَمَا خَالَفَ الْكُفَّارُ فِي الدُّنْيَا اَنْبِيَاءَهٗ .

৭৮. আপনার প্রতিপালক তো তাঁর বিধান অর্থাৎ ইনসাফ অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন অন্যদের ন্যায় কিয়ামতের দিন। তিনি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ। যে বিষয়ে তিনি ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে। কাজেই কারো জন্য তার ফয়সালার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। যেমন কাফেররা পৃথিবীতে তাঁর নবীগণের বিরোধিতা করে থাকে।

٧٩. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ق ثِقْ بِهٖ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ . اَيِ الدِّيْنِ الْبَيِّنِ فَالْعَاقِبَةُ لَكَ بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّارِ .

৭৯. অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর করুন! আপনি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সুস্পষ্ট সত্য দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব পরিণামে কাফেরদের বিপরীতে বিজয় আপনারই জন্য নির্ধারিত।

অনুবাদ :

٨٠. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ اَمْثَالًا بِالْمَوْتٰى وَالصُّمِّ وَالْعُمْىِ فَقَالَ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ.

৮০. এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত, বধির ও অন্ধের সাথে উপমা দিয়ে বলেন– মৃতকে আপনি কথা শোনাতে পারবেন না। বধিরকেও পারবেন না আহবান শোনাতে। যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। اَلدُّعَآءَ اِذَا -এর হামযাদ্বয় বহাল রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে হামযা ও يَاء -এর মাঝে লঘু করে পঠিত।

٨١. وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ مَا تُسْمِعُ سِمَاعَ اِفْهَامٍ وَقَبُوْلٍ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ مُخْلِصُوْنَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ.

৮১. আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবেন না। আপনি শোনাতে পারবেন বুঝার ও মান্য করার শোনা তবে কেবল তাদেরকে যারা আমার নিদর্শনাবলিতে কুরআনে বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে একনিষ্ঠ।

٨٢. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ حَقَّ الْعَذَابُ اَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ فِىْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَىْ تُكَلِّمُ الْمَوْجُوْدِيْنَ حِيْنَ خُرُوْجِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ تَقُوْلُ لَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهَا نَائِبَةً عَنَّا اَنَّ النَّاسَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَتْحِ هَمْزَةِ اَنَّ بِتَقْدِيْرِ الْبَاءِ بَعْدَ تُكَلِّمُهُمْ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ اَىْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ وَبِخُرُوْجِهَا يَنْقَطِعُ الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا يُؤْمِنُ كَافِرٌ كَمَا اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى نُوْحٍ اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ.

৮২. যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর আসবে আজাব এসে যাবে অর্থাৎ অন্যান্য কাফেরদের সাথে তাদের উপর আজাব অবতীর্ণ হবে। তখন আমি মৃত্তিকার গর্ভ হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে অর্থাৎ তার আবির্ভাবের সময় যারা বিদ্যমান থাকবে, তাদের সাথে সে আরবি ভাষায় কথা বলবে, সে তাদের সাথে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ সব কথা বলবে। এ জন্য যে, মানুষ অর্থাৎ মক্কার কাফেররা অন্য কেরাতে اَنَّ -এর হামযা যবরসহ একটি بَاء উহ্য মনে করে। আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না যা পুনরুত্থান, হিসাব ও শাস্তি সম্বলিত। আর 'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়ার সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিধান রহিত হয়ে যাবে। আর তখন কোনো কাফেরও আর নতুন করে ঈমান আনবে না। যেমন– আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে প্রত্যাদেশ করেছিলেন তোমাদের সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছে, এরা ব্যতীত আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : আল্লাহ তা'আলা এখানে যমীর বা সর্বনামের স্থলে اَلَّذِيْنَ - اِسْم مَوْصُوْل উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ قَالُوْا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا -এর স্থলে قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا উল্লেখ করেছেন এ জন্যে যাতে صِلَة -এর মাধ্যমে তাদের কু-স্বভাব উল্লেখের দ্বারা কুফর -এর প্রতি ইঙ্গিত হয়ে যায়, সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত উক্তির ইল্লত বা কারণের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে যায়। -[রূহুল মাআনী]

ءَاِذَا হলো উহ্য ফে'লের ظَرْف বা আধার। مُخْرَجُوْنَ শব্দটি এটি নির্দেশ করছে। বাক্যটি এরূপ হবে- اَنُخْرَجُ اِذَا كُنَّا تُرَابًا এখানে اِذَا -কে لَمُخْرَجُوْنَ -এর ظَرْف সাব্যস্ত করা সঙ্গত হবে না। কারণ পূর্বে আমল করার তিনটি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে لَامْ ، اِنَّ ، ءَ এগুলোর প্রত্যেকটি তার পরবর্তী শব্দকে পূর্ববর্তী শব্দে আমল করতে দেওয়ার প্রতিবন্ধক। আর তিনটিই একত্রে আসলে তো আমলের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। কেউ কেউ বলেন- اِنَّ -এর خَبَرْ যদি لَامْ -এর সাথে মিলিত হয় তাহলে তখন সেটি পূর্ববর্তী শব্দে আমল করতে পারে। যেমন- اِنَّ زَيْدًا طَعَامَكَ لَاٰكِلٌ তবে এরপরও দুটি প্রতিবন্ধক থেকেই যায়। কাজেই এটা স্বীকার করতেই হবে যে, اِذَا لَمُخْرَجُوْنَ -এর مَعْمُوْل নয়; বরং এর عَامِلْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَنُخْرَجُ

قَوْلُهُ وَاٰبَائُنَا : এর عَطْف হলো كَانَ -এর اِسْم -এর উপর, এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে- ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ -এর উপর عَطْف করার জন্য ضَمِيْر مُنْفَصِلْ -এর মাধ্যমে تَاكِيْد উল্লেখ করা জরুরি। অথচ এখানে তা নেই?

উত্তর : এখানে যেহেতু মাঝে تُرَابًا -এর فَصْل বা ব্যবধান ঘটেছে, কাজেই تَاكِيْد -এর প্রয়োজন নেই। ءَاِنَّا -এর মধ্যে হামযার দ্বিরুক্তি প্রত্যাখ্যানের তীব্রতাজ্ঞাপক। -[রূহুল মা'আনী]

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ : এখানে ভ্রমণের এ নির্দেশটি تَهْدِيْد বা ধমকমূলক এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ যে, তোমাদের পূর্বের উম্মতরাও আল্লাহর প্রতি রুজু হয়নি। পরিশেষে তাদেরকে আজাবে আক্রান্ত করা হয়েছে। তোমরাও যদি আল্লাহর প্রতি রুজু না হও তাহলে তোমাদেরকেও ধ্বংস করে ফেলা হবে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ : এখানে বহুবচন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ কেবল নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : পুনরুত্থানের সংবাদদানের ব্যাপারে মুমিনগণও রাসূল ﷺ -এর সাথে শরিক ছিলেন। এ জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ عَسٰى اَنْ يَكُوْنَ : এখানে عَسٰى একীন অর্থে فِعْل مُقَارِبْ হিসেবে নয়। কাযী বায়যাভী (র.) বলেন- عَسٰى ، لَعَلَّ ও سَوْفَ বড়দের প্রতিশ্রুতিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একীন বা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক হয়। আর এটাও বুঝা যে, তাদের ইঙ্গিতই অন্যদের স্পষ্ট বর্ণনার পর্যায়ে হয়।

قَوْلُهُ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ : رَدِفَ এমন একটি ক্রিয়ারূপ অর্থ বিশিষ্ট হয় যা لَامْ -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়। যেমন- دَنَا ، قَرُبَ কেননা رَدِفَ এর ব্যবহার لَامْ -এর সাহায্যে হয়নি। এ কারণে ব্যাখ্যাকার (র.) رَدِفَ -এর তাফসীর করেছেন قَرُبَ দ্বারা আর بَعْضُ الَّذِىْ হলো رَدِفَ-এর فَاعِلْ

قَوْلُهُ مَا تُكِنُّ : এটা اِكْنَانٌ শব্দমূল হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। বাবে اِفْعَالْ হতে مُضَارِعْ -এর সীগাহ। অর্থ- লুকানো, গোপন করা। এখানে এর فَاعِلْ যেহেতু صُدُوْر শব্দ যা اِسْم ظَاهِرْ مُكَسَّرْ -এ কারণে فِعْلْ -কে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ غَائِبَةٍ : এ শব্দটি যদিও সিফত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে مَوْصُوْف -বিহীন ব্যবহৃত হয়। কারো মতে এটা صِفَتْ থেকে اِسْمِيَّتْ-এর প্রতি প্রবর্তিত নয়। তবে اِسْمِيَّتْ-এর প্রাধান্য ঘটেছে। যেমনটা مُؤْمِنْ ও كَافِرْ -এর মধ্যে ঘটেছে। এ

কারণে غَائِبَةٍ -এর ة টি স্ত্রীলিঙ্গের জন্যে নয়। কেননা এর কোনো مَوْصُوْف স্ত্রীলিঙ্গ নেই যে, এটি তার সিফত হবে। যেমন অধিক রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীকে رَاوِيَة বলা হয় এটাও তদ্রূপ। অতএব এ ة টি مُبَالَغَة বা আধিক্যজ্ঞাপক। আর কেউ কেউ এটাকে صِفَتْ থেকে اِسْمِيَّتْ -এর প্রতি প্রবর্তিত বলেছেন। সুতরাং যে বস্তুটি অদৃশ্য ও গুপ্ত হয় তাকে غَائِبَة বলা হয়। আর এ ة কে تَانِى نَقْل বলা হয় ; [যেমন فَاتِحَة ، ذَبِيْحَة ও نَطِيْحَة -এর تَاء -এর মধ্যে বলা হয়।

قَوْلُهُ فِىْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ : ব্যাখ্যাকার (র.) এর দু'টি ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। **ক.** লওহে মাহফূয **খ.** আল্লাহ তা'আলার ইলম। وَمَكْنُوْن -এর মধ্যকার وَاو টি اَوْ অর্থে, অর্থাৎ আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয়াদি লওহে মাহফূযে রয়েছে। অথবা আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ইলমের অধীনে রয়েছে। اَىْ بِبَيَانِ مَا ذُكِرَ বাক্যাংশে جَار مَجْرُوْر টি يَقُصُّ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট, আর مَاذُكِرَ দ্বারা সেসব বিষয় উদ্দেশ্য যে সব বিষয়ে তারা বেশিরভাগ মতানৈক্য করত।

عَلٰى وَجْهِ এটা مُتَعَلِّقْ হলো بِبَيَانِ -এর সাথে। اَلرَّافِعُ হলো بَيَانٌ -এর সিফত। لَوْاَخَذُوْا بِهٖ -এর সম্পর্ক اَلرَّافِعُ -এর সাথে। অর্থাৎ কুরআন তাদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদিকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, যদি তারা উক্ত বর্ণনাকে গ্রহণ করে তাহলে তাদের মতপার্থক্য তিরোহিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِلٰى عَدْلِهٖ : حُكْمِهٖ -এর তাফসীর عَدْلِهٖ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন–

প্রশ্ন : يَقْضِىْ -এর পরে بِحُكْمِهٖ উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা উভয়টি একই অর্থ বিশিষ্ট। এর অর্থ হয় يَقْضِىْ يَحْكُمُ بِحُكْمِهٖ বা بِقَضَائِهٖ

উত্তর : এখানে حُكْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حُكْمٌ بِالْعَدْلِ তথা ন্যায়-নিষ্ঠাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সুতরাং উভয়টি مُتَرَادِفٌ বা সমার্থবোধক নয়।

قَوْلُهُ فَلَا يُمْكِنُ اَحَدًا مُخَالِفَتُهُ : এটা وَهُوَ الْعَزِيْزُ -এর বিশ্লেষণ, মুসান্নিফ (র.) এটাকে وَهُوَ الْعَزِيْزُ -এর সাথে মিলিত করে উল্লেখ করলে তা আরো উত্তম হতো।

قَوْلُهُ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى : এ আয়াতটি কাফেরদের ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হেদায়েতের আশাকে তিরোহিত করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কাফেরদেরকে মৃতদের সাতে তুলনা করে তাদের থেকে সঠিক পথ গ্রহণের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের থেকে যেভাবে কোনো কিছু আশা করা যায় না, তদ্রূপ এরাও কলব বা আত্মার বিচারে মৃততুল্য। কেননা তাদের অন্তরে মোহারাঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তা থেকে কুফরও বের হতে পারে না এবং তাতে ঈমানও প্রবেশ করতে পারে না। [এখানে মৃতদের শ্রবণ করা না করার কোন মাসআলা নেই। তাই মৃতদের জীবিতদের কথা শ্রবণ না করতে পারার ব্যাপারে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা সঙ্গত হবে না।

قَوْلُهُ وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ : অর্থাৎ একে তো বধির, উপরন্তু তারা পিঠও ঘুরিয়ে নিয়েছে, যার ফলে হেদায়েত লাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে। কেননা শুধু শ্রবণ করার সম্ভাবনা তো বধির হওয়ার কারণে দূরীভূত হয়েছে। তবে বধির মানুষও কখনো কখনো ইশারা ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝে নেয়। কিন্তু সে যখন মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তখন ইশারায় বুঝার আশাও দূর হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بِهَادِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ : هِدَايَة শব্দের صِلَه সাধারণত عَنْ ব্যবহৃত হয় না। এখানে هِدَايَتْ যেহেতু صَرْف -এর অর্থবিশিষ্ট, এ কারণেই এর صِلَة স্বরূপ عَنْ আসা সঙ্গত হয়েছে।

قَوْلُهُ حَقَّ الْعَذَابُ الخ : এটা وَقَعَ الْقَوْلُ -এর ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً : কিয়ামতের সন্নিকটকালে হযরত ঈসা (আ.) ও ইমাম মাহদী (র.)-এর ইন্তেকালের পরে সাফা পর্বত থেকে এক আজব প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে। কোনো কোনো আলেম হিজর ও তায়েফকে তার আবির্ভাবস্থল বলেছেন। সে প্রাণীটি মানুষের সাথে আরবিতে কথা বলবে। তার কথাবার্তার মধ্য থেকে কিছু কথা আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্বস্বরূপ হবে। যেমন সে আল্লাহ তা'আলার হয়ে বলবে– اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيَاتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرَابًا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পরকালীন জিন্দেগীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, কাফেররা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং তারা এ ব্যাপারে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে না যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে, তাই তাদের অজ্ঞানতার কারণে তারা এমন পরম সত্যটিকে অস্বীকার করত। ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ অর্থাৎ আর কাফেররা বলে , আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে? তাদের এসব কথা তাদের মনের অন্ধত্বেরই প্রমাণ বহন করে।

তাদের কর্তব্য ছিল পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, পরিণামদর্শী হওয়া, বাস্তববাদী হওয়া এবং নিজেদের কল্যাণ কামনা করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা আখিরাতের জিন্দেগীকে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, এসব হলো নিতান্ত পুরাতন কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও এসব কথা বলা হয়েছে। অথচ যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল; কিন্তু কোনো মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করতে দেখা যায়নি। অতএব, আখিরাতের কথা নতুন কিছু নয়, বরং পুরাতন কথা। কাফেরদের এসব অন্যায় কথার জবাবেই তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতের বিশেষ সতর্কবাণী।

قَوْلُهُ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : [হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে, তা লক্ষ্য করে দেখ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যুগে যুগে বহু জাতি উন্নতি অগ্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে, কিন্তু তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি। আখিরাতকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি তারা ভোগ করেছে, তাদের নির্মিত আকাশচুম্বি ইমারতগুলোর ধ্বংসাবশেষ আজো রয়েছে পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং এসব ধ্বংসাবশেষ পরিণামদর্শী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট। তাই আলোচ্য আয়াতে আখিরাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদেরকে পূর্বকালের অবাধ্য লোকদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে- سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর।"

তত্ত্বজ্ঞাণীগণ বলেছেন, যদি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে এমন ভ্রমণ ইবাদতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি শুধু আনন্দ লাভের জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়, তবে তা মোটেই ইবাদত নয়।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন যখন নাজিল হয়েছে, তখন যেভাবে কাফেররা আখিরাতকে অবিশ্বাস করত, ঠিক তেমনি এ আধুনিক কালে অনেক লোকই দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আর আখিরাতকে শুধু ভুলে যায় না; বরং অবিশ্বাসও করে। তাদের উদ্দেশ্যেও পবিত্র কুরআনের একই নির্দেশ- পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে দেখ। ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদের দৃষ্টান্ত যদি চোখে না-ও পড়ে, তবে হিটলার মুষোলিনী এবং [সাবেক] সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকেই দৃষ্টিপাত কর এবং আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআন যে মহাসত্যের ঘোষণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়ন লক্ষ্য কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগের কাফেরদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ইতিপূর্বে যেসব জাতি কোনো নবী-রাসূলকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়েছে। অতএব, তোমরা এমন অন্যায় থেকে বিরত হও।

قَوْلُهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ : প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : বর্ণিত আছে, মক্কার কোনো কোনো কাফের প্রিয়নবী ﷺ -কে শুধু যে অস্বীকার করত তাই নয়; বরং তাঁর প্রতি বিদ্রূপও করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হে রাসূল ! কাফেদের এ অন্যায় আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না। যেহেতু কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, তাই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না, হেদায়েত যদি তাদের নছীবে না থাকে, তবে তাদের জন্যে করার কিছুই নেই।

দ্বিতীয়ত তারা আপনার প্রতি যে বিদ্রূপ করে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এ ব্যাপারেও আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা তাদের শাস্তি অবধারিত, এ অন্যায়ের শাস্তি তারা অবশ্যই ভোগ করবে।

দুরাত্মা কাফেরদের ঔদ্ধত্য : কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হলে তাদের কর্তব্য ছিল সাবধান হওয়া কিন্তু সেই স্থলে তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে- وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ "তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল সেই প্রতিশ্রুত কিয়ামত কবে আসবে?"

এটা নিঃসন্দেহে দুরাত্মা কাফেরদের চরম ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবীতে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝাবার জন্যে তথা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করার জন্য বহু নিদর্শন বর্তমান রয়েছে। পৃথিবীর বুকে কত জাতি এসেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের উন্নতি এবং অধঃপতনের ঘটনাবলি ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। যারা ভাগ্যবান তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না। তাই কাফেরদের আস্ফালনের জবাবে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ

"[হে রাসূল, আপনি] ঘোষণা করুন, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছো বিচিত্র নয় যে, তা তোমাদের শিয়রেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

অর্থাৎ তোমরা যে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে চাও তা অতি সত্বরই তোমাদের নিকট পৌঁছে যেতে পারে। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কাফেরদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধেই তারা সেই আজাব সম্পর্কে টের পেয়েছে, যেখানে তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছে এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছে। আখিরাতের কঠিন শাস্তি তো অপেক্ষা করছেই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কখনো কখনো অবাধ্য কাফেরদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব করা হয়, তা আদৌ শাস্তির ঘোষণার অসত্যতার প্রমাণ নয়; বরং আল্লাহ পাকের একান্ত করুণার কারণেই তিনি অপরাধীকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষ মাত্রই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু হতভাগা কাফেররা তার পরিবর্তে আজাবকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে আজাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো বদরের যুদ্ধের শাস্তি, যে যুদ্ধে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াসমূহে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোনো যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা পয়গাম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রমাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা স্বয়ং কুরআন এবং কুরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কুরআনপাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলা বাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে

বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরি। এতে বুঝা গেল যে, কুরআন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা আল্লাহ সত্যকে সাহায্যে করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাতো নিশ্চিত।

قَوْلُهُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى الخ : সমগ্র মানবজাতির প্রতি আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ -এর স্নেহ মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারো সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কুরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াসমূহে وَلَا تَحْزَنْ এবং وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ বাক্যসমূহ এই সান্ত্বনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোনো দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্দরুন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। **এক.** তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারো কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। **দুই.** তাদের উদাহরণ বধিরের মতো, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। **তিন.** তারা অন্ধের মতো। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ : অর্থাৎ আপনি তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহর আয়াসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে আওয়াজ পৌঁছা নয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কুরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌঁছানোই হতো, তবে কুরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা কাফেরদের কানে আওয়াজ পৌঁছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জবাব দেওয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, সুতরাং যদি কোনো সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুল করতে চায়, তবে এটা তাদের জন্য উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেররাই ঈমান ও সৎকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে। কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারো কোনো কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারো কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা : সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেসব বিষয়ে পরস্পরে মতভেদ করেছেন. মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কুরআন পাকে প্রথমত এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়ত সূরা রূমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতিরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে- وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

এই আয়াতদ্বয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোনো আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; বরং তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনিটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সেই জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তাঁরা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়স্বজনদের সম্পর্কেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ মৃতদের জন্য নয়, তবে এর জবাব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতি ও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকি থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্কে দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন।

মৃতদের শ্রবণের মত দানের প্রবক্তা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল। হাদীসটি এই–

مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِى الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ حَتّٰى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোনো মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ তা'আলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জবাব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জবাব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হলো। **এক.** মৃতরা শুনতের পারে এবং **দুই.** তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলেছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ তা'আলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জবাব দেওয়ারও শক্তি দান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শুনবে কিনা? তাই ইমাম গাযালী ও আল্লামা সুবকী (র.) প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ হাদীস ও উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথাবার্তা শোনে: কিন্তু এর কোনো প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা এক সময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে; এবং অন্য সময় শুনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের শোনে না অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা সূরা নামল, সূরা রূম ও সূরা ফাতিরের আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে। অকাট্য রূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

قَوْلُهُ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ : ভূগর্ভের জীব কি এবং তা কোথায় এবং কবে নির্গত হবে?
মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া ২. ধূম্র নির্গত হওয়া ৩. জীবের আবির্ভাব হওয়া, ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ৬. দাজ্জাল ৭. তিনটি চন্দ্রগ্রহণ এক. পশ্চিমে **দুই.** পূর্বে এবং **তিন.** আরব উপদ্বীপে, ৮. এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্য অবস্থান করবে, অগ্নি সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভে থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। دابة শব্দের تنوين দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট হবে। আরো জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মুতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না: বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর (র.) আবূ দাউদ তোয়ালিসার বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে উমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইবরাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন একে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে। -[ইবনে কাসীর]

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি প্রথমে প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। -[ইবনে কাসীর]

শায়খ জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' -এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোনো কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। [মাযহারী] এ স্থলে ইবনে কাসীর (র.) প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলো অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটি কিম্ভূতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে। অতঃপর সে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়েই বিশ্বাস রাখা দরকার। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরি নয় এবং তাতে কোনো উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জবাবে الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون এই বাক্যটিই সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই ; অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করত না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সেই সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনগতভাবে ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে। -[ইবনে কাসীর]

٨٣. وَ اذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا
جَمَاعَةً مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا وَهُمْ
رُؤَسَاؤُهُمُ الْمَتْبُوْعُوْنَ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ .
اَىْ يُجْمَعُوْنَ بِرَدِّ اٰخِرِهِمْ اِلٰى اَوَّلِهِمْ
ثُمَّ يُسَاقُوْنَ .

٨٤. حَتّٰى اِذَا جَاۤءُوْا مَكَانَ الْحِسَابِ قَالَ
تَعَالٰى لَهُمْ اَكَذَّبْتُمْ اَنْبِيَائِىْ بِاٰيٰتِىْ
وَلَمْ تُحِيْطُوْا مِنْ جِهَةِ تَكْذِيْبِهِمْ
بِهَا عِلْمًا اَمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ اَمْ فِىْ مَا
الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ ذَا مَوْصُوْلٌ اَىْ مَا
الَّذِىْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِمَّا اُمِرْتُمْ .

٨٥. وَوَقَعَ الْقَوْلُ حَقَّ الْعَذَابُ عَلَيْهِمْ
بِمَا ظَلَمُوْا اَىْ اَشْرَكُوْا فَهُمْ لَا
يَنْطِقُوْنَ . اِذْ لَا حُجَّةَ لَهُمْ .

٨٦. اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا خَلَقْنَا الَّيْلَ
لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ كَغَيْرِهِمْ وَالنَّهَارَ
مُبْصِرًا ط بِمَعْنٰى يُبْصَرُ فِيْهِ
لِيَتَصَرَّفُوْا فِيْهِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ . خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاِنْتِفَاعِهِمْ
بِهَا فِى الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ .

অনুবাদ :

৮৩. স্মরণ করুন সেই দিনের কথা যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখ্যান করত তারা হলো তাদের নেতৃবৃন্দ যাদের এরা অনুসরণ করে চলতো। আর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। অর্থাৎ আগে পিছে করে সমবেত করা হবে। অতঃপর তাড়িয়ে নেওয়া হবে।

৮৪. যখন তারা সমাগত হবে হিসাবের জায়গায় তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন তাদেরকে তোমরা কি আমার নিদর্শন নবীগণকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে অথচ তা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বিষয়ে; বরং তোমরা আরো কিছু করতে ছিলে? যে সব বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে أَمَّا -এর মধ্যে أَمْ টা مَا اِسْتِفْهَامِيَّة -এর মধ্যে ইদগাম হয়েছে, ذَا হলো اِسْم مَوْصُوْل অর্থাৎ- مَا الَّذِىْ

৮৫. তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে আজাব অবধারিত হয়েছে। তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে অর্থাৎ তাদের শিরকের কারণে ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না। যেহেতু তাদের নিকট কোনোই দলিল প্রমাণ নেই।

৮৬. তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি, তাদের বিশ্রামের জন্য অন্যান্যদের ন্যায়। এবং দিবসকে করছি আলোকপ্রদ অর্থাৎ যাতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের কাজ-কর্ম করার সুবিধার্থে। এতে রয়েছে নিদর্শন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার নির্দেশিকা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। কাফেরদের বিপরীতে মুমিনগণ বিশেষভাবে ঈমান দ্বারা উপকৃত হওয়ার কারণে তাদের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٧. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ الْقَرْنِ النَّفْخَةُ الْأُوْلَى مِنْ إِسْرَافِيْلَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَيْ خَافُوْا الْخَوْفَ الْمُفْضِيَ إِلَى الْمَوْتِ كَمَا فِيْ اٰيَةٍ أُخْرٰى فَصَعِقَ وَالتَّعْبِيْرُ فِيْهِ بِالْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ط أَيْ جِبْرَئِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَإِسْرَافِيْلُ وَعَزْرَائِيْلُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هُمُ الشُّهَدَاءُ إِذْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ وَكُلٌّ تَنْوِيْنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَيْ كُلُّهُمْ بَعْدَ إِحْيَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَتَوْهُ بِصِيْغَةِ الْفِعْلِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ دٰخِرِيْنَ. صَاغِرِيْنَ وَالتَّعْبِيْرُ فِي الْإِتْيَانِ بِالْمَاضِيْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهِ.

অনুবাদ :

৮৭. যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এটা হলো হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার সেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল হয়ে পড়বে অর্থাৎ এতই ভীত হয়ে পড়বে যে, তা তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে فَصَعِقَ [ফলে তারা মূহ্যমান হয়ে পড়বে] এটার বস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে এটাকে ফে'লে মাযী দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ যাদেরকে চাবেন তারা ব্যতীত। অর্থাৎ হযরত জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আ.) ব্যতীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তারা হলেন শহীদগণ। কেননা তারা হলেন জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে জীবিকাপ্রাপ্ত। বরং সকলেই এখানে كُلٌّ -এর তানভীনটি হলো تَنْوِيْن عِوَض যা مُضَاف إِلَيْه -এর পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ كُلُّهُمْ [তাদের প্রত্যেকেই] কিয়ামতের দিন তাদেরকে জীবিত করার পর তাঁর নিকট আসবে أَتَوْهُ এটি فِعْل এবং ইসমে ফায়েল উভয়ই হতে পারে। বিনীত অবস্থায়। আর أَتَوْهُ -কে ফে'লে মাযী আনা হয়েছে তার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে।

٨٨. وَتَرَى الْجِبَالَ تُبْصِرُهَا وَقْتَ النَّفْخَةِ تَحْسَبُهَا تَظُنُّهَا جَامِدَةً وَاقِفَةً مَكَانَهَا لِعِظَمِهَا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ الْمَطَرِ إِذَا ضَرَبَتْهُ الرِّيْحُ أَيْ تَسِيْرُ سَيْرَهُ حَتّٰى تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَتَسْتَوِيْ بِهَا مَبْثُوْثَةً ثُمَّ تَصِيْرُ كَالْعِهْنِ ثُمَّ تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا صُنْعَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ أُضِيْفَ إِلٰى فَاعِلِهِ بَعْدَ حَذْفِ عَامِلِهِ أَيْ صَنَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ صُنْعًا الَّذِيْ أَتْقَنَ احكم كُلَّ شَيْءٍ ط صَنْعَهُ إِنَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ. بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَيْ أَعْدَاؤُهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَأَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الطَّاعَةِ.

৮৮. আপনি পর্বতমালাকে দেখছেন, মনে করেছেন যে, তা অচল। বিশালত্বের কারণে স্বীয় অবস্থানে অবিচল রয়েছে অথচ সিঙ্গায় ফুৎকারকালে তাকে দেখতে পাবেন তারা হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমাণ যখন তাকে বায়ু আঘাত করে, অর্থাৎ তা বায়ুর গতিতে চলতে থাকবে। অবশেষে মাটিতে পতিত হয়ে তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তা ধুনিত তুলার ন্যায় হবে। পরে তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। এটা আল্লাহরই সৃষ্টি নৈপুণ্য। এটা মাসদার, যা তার পূর্বের বাক্যের পূর্ণ বিষয়বস্তুর জোর তাকিদ সৃষ্টিকারী। তার আমেলকে ফেলে দিয়ে তার فَاعِلْ -এর দিকে ইযাফত করা হয়েছে। অর্থাৎ صَنَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ صُنْعًا অর্থে। যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম অর্থাৎ সকল কর্ম-কীর্তিকে। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। تَفْعَلُوْنَ শব্দটি يَاء ও تَاء উভয়টি যোগে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তার শত্রুরা সে সকল অবাধ্য আচরণ করে এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণ যে সকল সৎকর্ম করে, সে বিষয়ে তিনি অবগত।

٨٩. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ اَىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ ثَوَابٌ مِّنْهَا ج اَىْ بِسَبَبِهَا وَلَيْسَ لِلتَّفْضِيْلِ اِذْ لَا فِعْلَ خَيْرٌ مِنْهَا وَفِىْ اٰيَةٍ اُخْرٰى عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَهُمْ اَىِ الْجَاۤئُوْنَ بِهَا مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ بِالْاِضَافَةِ وَكَسْرِ الْمِيْمِ وَبِفَتْحِهَا وَفَزَعٍ مُنَوَّنًا وَفَتْحِ الْمِيْمِ اٰمِنُوْنَ.

٩٠. وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اَىِ الشِّرْكِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ ط بِاَنْ وُلِّيَتْهَا وَذُكِرَتِ الْوُجُوْهُ لِاَنَّهَا مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَوَاسِ فَغَيْرُهَا مِنْ بَابِ اَوْلٰى وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيْتًا هَلْ اَىْ مَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَآءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِىْ.

٩١. قُلْ لَهُمْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ اَىْ مَكَّةَ الَّذِىْ حَرَّمَهَا اَىْ جَعَلَهَا حَرَمًا اٰمِنًا لَا يُسْفَكُ فِيْهَا دَمُ اِنْسَانٍ وَلَا يُظْلَمُ فِيْهَا اَحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَذٰلِكَ مِنَ النِّعَمِ عَلٰى قُرَيْشٍ اَهْلِهَا فِىْ رَفْعِ اللّٰهِ عَنْ بَلَدِهِمُ الْعَذَابَ وَالْفِتَنَ الشَّائِعَةَ فِىْ جَمِيْعِ بِلَادِ الْعَرَبِ وَلَهٗ تَعَالٰى كُلُّ شَىْءٍ ز فَهُوَ رَبُّهٗ وَخَالِقُهٗ وَمَالِكُهٗ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ . لِلّٰهِ بِتَوْحِيْدِهٖ.

অনুবাদ :

৮৯. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উপস্থিত হবে। সে তা হতে উৎকৃষ্ট ফল পাবে অর্থাৎ এর কারণে। এখানে خَيْرٌ টি تَفْضِيْل বা তুলনামূলক আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত নয়। যেহেতু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর তুলনায় উত্তম কোনো আমল নেই। অপর আয়াতে রয়েছে যে, সে তার দশগুণ লাভ করবে। এবং সেদিন তারা অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর সাক্ষ্য প্রদানকারীরা শঙ্কা হতে নিরাপদ থাকবে। فَزَعِ يَّوْمَئِذٍ এটা ইযাফত আকারে আর مِيْم বর্ণে যবর বা যেরযোগে। অথবা فَزَعٍ তানভীনসহ এবং مِيْم বর্ণ যবরযোগে।

৯০. এবং যে কেউ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে অর্থাৎ শিরক নিয়ে তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে এভাবে যে, মুখমণ্ডলকে আগুনের কাছে সোপর্দ করা হবে। মুখমণ্ডল উল্লেখের কারণ হচ্ছে তাহলো ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত স্থান। কাজেই অন্যান্য অঙ্গ আরো উত্তমভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য এটা বলা হবে। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ, শিরক ও বিরুদ্ধাচরণের।

৯১. আপনি তাদেরকে বলুন, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর অর্থাৎ মক্কার প্রভুর ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। অর্থাৎ তিনি একে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। এখানে কোনো মানুষের রক্তপাত ঘটানো হবে না। কারো প্রতি কোনো রূপ নির্যাতন চালানো হবে না, এর কোনো প্রাণী শিকার করা হবে না এবং এর ঘাসও কর্তন করা হবে না। আর এটা তথাকার অধিবাসী কুরাইশদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ; তাদের থেকে আজাব আরবের সকল নগরে ব্যাপৃত ফেতনা ফ্যাসাদকে উঠিয়ে নেওয়ার কারণে। সমস্ত কিছু তাঁরই তিনি তার প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা ও স্বত্বাধিকারী আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। আল্লাহর নিকট তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার মাধ্যমে।

অনুবাদ :

٩٢. وَاَنْ اَتْلُوا الْقُرْاٰنَ عَلَيْكُمْ تِلَاوَةَ الدَّعْوَةِ اِلَى الْاِيْمَانِ ـ فَمَنِ اهْتَدٰى لَهٗ فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ج اَيْ لِاَجْلِهَا لِاَنَّ ثَوَابَ اِهْتِدَائِهٖ لَهٗ وَمَنْ ضَلَّ عَنِ الْاِيْمَانِ وَاَخْطَاَ طَرِيْقَ الْهُدٰى فَقُلْ لَهٗ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ الْمُخَوِّفِيْنَ فَلَيْسَ عَلَيَّ اِلَّا التَّبْلِيْغُ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْقِتَالِ ـ

৯২. আমি আরো আদিষ্ট হয়েছি কুরআন তেলাওয়াত করতে তোমাদের নিকট ঈমানের প্রতি আহবানের জন্য। অতএব যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে সে সৎপথ অনুসরণ করে নিজের কল্যাণের জন্যই অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থে। কেননা সৎপথ অনুসরণের ছওয়াব তার নিজেরই হবে। আর কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে ঈমান থেকে এবং হেদায়েতের পথ বিচ্যুত হবে। আপনি বলুন আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন। অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী। আমার দায়িত্ব কেবলমাত্র পৌঁছে দেওয়া। এটা জিহাদের বিধান অবতীর্ণের পূর্বের কথা।

٩٣. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ط فَاَرَاهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ بَدْرٍ الْقَتْلَ وَالسَّبْيَ وَضَرْبَ الْمَلَائِكَةِ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَعَجَّلَهُمُ اللّٰهُ اِلَى النَّارِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ وَاِنَّمَا يُمْهِلُهُمْ لِوَقْتِهِمْ ـ

৯৩. আর আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তিনি তোমাদেরকে অতিসত্বর তাঁর নিদর্শন দেখাবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তা দেখিয়ে ছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে তাদেরকে হত্যা, বন্দী এবং ফেরেশতা কর্তৃক তাদের মুখে ও পশ্চাতে প্রহারের মাধ্যমে। আর তাদেরকে জাহান্নাম পানে ত্বরান্বিত করেছিলেন তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালক গাফিল নন تَعْمَلُوْنَ শব্দটি يَاء এবং تَاء যোগে পঠিত। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا : مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ -এর مِنْ অব্যয়টি بَيَانِيَّة হলো مِنْ যা فَوْجًا -এর বিবরণ বুঝাচ্ছে। فَوْج এর অর্থ যদিও দ্রুত ধাবমান দল, আর مِمَّنْ يُكَذِّبُ -এর مِنْ হলো تَبْعِيْضِيَّة তবে এখানে সাধারণ দল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ দলের দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নেতৃবর্গ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ بِرَدِّ اٰخِرِهِمْ اِلٰى اَوَّلِهِمْ : ব্যাখ্যাকার (র.) যদি بِرَدِّ اَوَّلِهِمْ اِلٰى اٰخِرِهِمْ বলতেন তাহলে তা আরো উপযোগী হতো। অর্থাৎ আগে গমনকারীদেরকে বাধা দেওয়া হবে। যাতে পিছনের লোকজন তাদের সঙ্গী হতে পারে এবং একত্রে চলতে পারে। –[সাবী]

قَوْلُهٗ اَكَذَّبْتُمْ اَنْبِيَائِيْ : এ জিজ্ঞাসাটি ধমকমূলক। অর্থাৎ তোমরা আয়াতকে কেন মিথ্যা অভিহিত করেছিলে? بِاٰيَاتِيْ হলো كَذَّبْتُمْ -এর مَفْعُوْل আর بَا অব্যয়টি تَعْدِيَة -এর জন্য। ব্যাখ্যাকার (র.) كَذَّبْتُمْ -এর مَفْعُوْل হিসেবে اَنْبِيَائِيْ -কে উহ্য মেনেছেন, অথচ এর কোনো প্রয়োজন নেই। এর জন্য অহেতু কৃত্রিমতার শিকার হতে হয়।

قَوْلُهٗ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا : এ বাক্যটি كَذَّبْتُمْ -এর যমীরের حَال এবং পূর্বের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের তাকিদ। অর্থাৎ তোমরা কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা ছাড়াই আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করলে। মনে রেখ! এটা তোমাদেরকে পাকড়াও করার অন্যতম কারণ হবে।

قَوْلُهُ اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : এ বাক্যের আসল রূপ এমন হবে- اَىُّ الشَّيْئِ الَّذِىْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ بِهٖ এখানে আর مَوْصُوْل صِلَة মিলে مَا مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ অর্থাৎ তোমরা এ কথার উত্তর দাও যে, তোমরা কি করতে, যার দরুন আমার আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগই পাওনি?

قَوْلُهُ وَقَعَ الْقَوْلُ اَىْ قَرُبَ وُقُوْعُهُ : অর্থাৎ বাস্তাবায়ন অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে مَاضِىْ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। وَجَعَلْنَا الَّيْلَ -এর পরে مُظْلِمًا উহ্য রয়েছে। এর আলামত বা নির্দেশক হলো وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا অর্থাৎ যেভাবে لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ -এর উপর কিয়াস বা অনুবাদ করে। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا থেকে لِيَتَصَرَّفُوْا فِيْهِ বাক্যাংশকে বিলোপ করা হয়েছে এখানেও তদ্রূপ مُظْلِمًا শব্দকে বিলোপ করা হয়েছে। পরিভাষায় এটাকে صَنْعَت اِحْتِبَاكْ বলা হয়।

قَوْلُهُ فَفَزِعَ : প্রথম ফুৎকারকে نَفْخَةُ الصَّعْقِ ও نَفْخَةُ الْفَزَعِ বলা হয়। সুরায় জুমার -এর মধ্যে প্রথম ফুৎকারকে صَعِقَ বলা হয়েছে। صَعِقَ বলা হয় এমন মূর্ছা যাওয়াকে যার পরে আর হুঁশ ফিরে আসে না, বরং উক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। প্রথম ফুৎকারে প্রথমত সকল প্রাণী বেহুঁশ হয়ে যাবে, অতঃপর এ অবস্থায় সব প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। তবে কেবল সে সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এর থেকে مُسْتَثْنٰى বা ব্যতিক্রম আকারে প্রকাশ করছেন।

আর দ্বিতীয় ফুৎকারে সকল মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে। উভয় ফুৎকারের মাঝে ৪০ বছরের ব্যবধান থাকবে। কোনো কোনো মনীষী মোট তিন ফুৎকার উল্লেখ করেছেন। যথা- ১. نَفْخَةُ زَلْزَلَة [ভূ-কম্পনের ফুৎকার] অর্থাৎ প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীতে প্রচণ্ড ভূকম্পন সৃষ্টি হবে। এমনকি পর্বতরাজি ধুনিত তুলার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে। ২. نَفْخَةُ مَوْت [মৃত্যুর ফুৎকার] দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। ৩. نَفْخَةُ حَيَاتْ [পুনর্জীবনের ফুৎকার] অর্থাৎ তৃতীয়বার ফুৎকার সকল প্রাণী নিজ নিজ সমাধি বা মৃত্যুস্থল হতে জীবিত হয়ে উঠবে। তবে এ বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। বিশুদ্ধ হাদীস মতে মোট দু'বার ফুৎকার ঘটবে।

قَوْلُهُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ الْمَطَرِ : মুফাসসির (র.) سَحَابٌ -এর তাফসীর مَطَرٌ [বৃষ্টি] দ্বারা করেছেন । অথচ এটা না অভিধানসম্মত, আর না জ্ঞান-বিবেক বা যুক্তিসম্মত, বরং سَحَابٌ দ্বারা এর স্বাভাবিক অর্থ তথা মেঘ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, صُنْعَ اللّٰهِ হলো পূর্বের বাক্যের বিষয়বস্তুর تَاكِيْد অর্থাৎ সিঙ্গায় ফুৎকার, অতঃপর সকলের বেহুঁশ হয়ে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করা, পাহাড়-পর্বত তুলার ন্যায় উড়তে থাকা এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলা করবেন।

قَوْلُهُ بِالْاِضَافَةِ : অর্থাৎ فَزَعٍ -এর প্রতি يَوْمَ শব্দটি مُضَافْ হয়েও যবরযুক্ত হতে পারে فَتْح -এর উপর মবনী হওয়ার কারণে। কেননা يَوْمَ শব্দটি اِذْ -এর প্রতি مُضَافْ হয়েছে, আর اِذْ হলো مَبْنِىُّ الْاَصْلِ কেমন যেন يَوْم -এর مِيْم বর্ণে দুটি কেরাত রয়েছে, যবর ও যের।

قَوْلُهُ وَفَزَعٍ مُنَوَّنًا : مُنَوَّنًا -এর عَطْف হলো اِضَافَتْ -এর উপর, অর্থাৎ يَوْمَ -কে اِضَافَتْ সহ বা اِضَافَتْ -বিহীন উভয়রূপে পড়া যায়। اِضَافَتْ আকারে পড়লে يَوْمَ -এর مِيْم যেরযুক্ত হবে, আর اِضَافَتْ -বিহীন পড়লে যবরযুক্ত হবে।

قَوْلُهُ مَوْضِعُ الشَّرْفِ مِنَ الْحَوَاسِّ : حَوَاسّ শব্দটি حَاسَّةٌ -এর বহুবচন, এর অর্থ হলো ইন্দ্রিয়, حَوَاسّ خَمْسَه بَاطِنَة বা গুপ্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সব ক'টি মাথায় অবস্থিত। যেমন- ১. دِمَاغ বা মস্তিষ্ক, এটা ত্রিভূজ আকৃতি। এর রয়েছে ৩টি অংশ, সেগুলোকে بُطُوْنٌ বলা হয়। ১. بَطْن مُؤَخَّر এটা বক্রকোণের নিকটবর্তী অংশ ২. بَطْن اَوْسَط ঃ এটা দু' بَطْن -এর মধ্যবর্তী অংশ। ৩. بَطْن مُقَدَّمْ এ অংশটি অন্য দু'টি থেকে বড়। এবং এ অংশটিই حِسّ مُشْتَرَكْ বা সমন্বিত ইন্দ্রিয়ানুভূতি শক্তি] ও قُوَّة خَيَالْ বা কল্পনাশক্তির মূলকেন্দ্র। পিছনে ঘাড়ের দিকে যে, بَطْن مُؤَخَّرْ রয়েছে উক্ত অংশটি بَطْن مُقَدَّمْ -এর তুলনায় ছোট, এটা হলো قُوَّة حَافِظَة বা স্মৃতিশক্তির স্থান। بَطْن اَوْسَطْ হলো সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, এ অংশটি হলো قُوَّة وَاهِمَه ও قُوَّة مُتَصَرِّفَة তথা কার্য পরিচালনা ও চিন্তাশক্তির স্থান।

قَوْلُهُ حَوَاسَ خَمْسَةَ ظَاهِرَةَ : তথা বাহ্যিক বা প্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে হতে কেবল قُوَّةُ لَامِسَة [স্পর্শ শক্তি] ছাড়া অবশিষ্ট ৪টির অবস্থানও মাথায়। সেগুলো হলো– ১. قُوَّةُ بَاصِرَة [দৃষ্টি শক্তি] ২. قُوَّةُ سَامِعَة [শ্রবণ শক্তি] ৩. قوة شَامَّة [ঘ্রাণ শক্তি] ও ৪. قُوَّةُ رَائِقَة [আস্বাদন শক্তি]; قُوَّةُ لَامِسَة বা স্পর্শ শক্তি [ত্বক] সমস্ত শরীরে বিরাজমান। এটা অন্যান্য শক্তিসমূহের তুলনায় সর্বাপেক্ষা নিস্তেজ ও অসাড়। কেননা স্পর্শ না করা পর্যন্ত কোনো কিছু অনুভব করতে পারে না।

قَوْلُهُ فَقُلْ لَهُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ : এ বাক্যটি مَنْ ضَلَّ -এর جَزَاء আর لَهُ হলো رَابِطَه বা যোগসূত্র-স্থাপক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ : এ শব্দটি وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেওয়া অর্থাৎ অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোকও তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ وَزْعٌ শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেওয়া অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং গুরুতর অপরাধ ও গুনাহ; বিশেষত যখন কেউ চিন্তা-ভাবনা ও বোঝা–শোনার চেষ্টা না করেই মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার ভ্রান্তি ক্ষমা করা হবে না।

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ الخ : فَزِعَ শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্বিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে فزع শব্দের পরিবর্তে صعق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ– অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, শিঙ্গা ফুঁক দেওয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্বিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদা (র.) প্রমুখ তাফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যার পর সকল মৃত পুনর্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীত-বিহবল অবস্থায় উত্থিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিনবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়েম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। –[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

ইবনে মোবারক (র.) হাসান বসরী (র.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারে মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ : উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীত বিহ্বল হবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনর্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না। –[কুরতুবী]

সাঈদ ইবনে জুবায়রও বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি বাঁধা অবস্থায় আরশের চার পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গাম্বরগণ আরো উত্তমরূপে এই শ্রেণিভুক্ত। কারণ তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুয়তের মর্যাদাও। –[কুরতুবী]

সূরা যুমারে আছে– وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ এখানে فَزِعَ শব্দের পরিবর্তে صَعِقَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ– সংজ্ঞা হারানো। এখানে সংজ্ঞা হারিয়ে মরে যাওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানেও إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সহীহ হাদীস অনুযায়ী ছয়জন ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে।

তাঁরা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। যে সকল তাফসীরবিদ فَزَعَ ও صَعِقَ -কে একই অর্থে ধরেছেন, তাঁরা সূরা যুমারের অনুরূপ এখানে ব্যতিক্রম দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে বুঝিয়েছেন। যাঁরা পৃথক পৃথক অর্থে ধরেছেন, তাঁদের মতে শহীদগণ فَزَعَ তথা অস্থিরতা থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবেন, যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ : উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘমালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই বস্তু যখন কোনো একদিকে চলমান হয়, তখন তা যতই দ্রুত গতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। যেমন– সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কালো মেঘ সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কালো মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তাফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই সাব্যস্ত করেছেন । কিন্তু তাফসীরের সার সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, এই দুইটি অবস্থা দুই সময়কার। পাহাড়কে দেখে প্রত্যেক দর্শক যখন মনে করে যে, এই পাহাড় স্বস্থান থেকে কখনো টলবে না, অচল হওয়া সেই সময়কার। আর تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ কথাটি কিয়ামত দিবসের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পাহাড়সমূহের অবস্থা কুরআন পাকে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রকম্পিত হওয়া হবে পাহাড়সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর অবস্থা। ইরশাদ হচ্ছে– إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا ও اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

২. পাহাড়ের বিশাল শিলাখণ্ডের ধুনো করা তুলার ন্যায় হয়ে যাওয়া। ইরশাদ হচ্ছে– وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ; এটা তখন হবে, যখন উপর থেকে আকাশও গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে পাহাড় তুলার ন্যায় উপরে উঠে যাবে, উপর থেকে আকাশ নীচে পতিত হবে এবং উভয়ে মিলিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–
يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

৩. পাহাড়সমূহ ধুনো করা তুলার মতো একত্র হওয়ার পরিবর্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا

৪. চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া। ইরশাদ হচ্ছে– قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا

৫. চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিকণার ন্যায় সারা বিশ্বে বিস্তৃত পাহাড়সমূহকে বাতাস উপরে নিয়ে যাবে। তখন যদিও তা মেঘমালার ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন হবে; কিন্তু দর্শক তাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পাবে। ইরশাদ হচ্ছে– وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ; তন্মধ্যে কতক অবস্থা শিংগায় প্রথম ফুৎকারের সময় হবে এবং কতক দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে হবে। তখন ভূপৃষ্ঠকে সমতল স্তরের মতো করে দেওয়া হবে। তাতে কোনো গুহা, পাহাড়, দালান কোঠা ও বৃক্ষ থাকবে না। ইরশাদ হচ্ছে– قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيْهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী।

قَوْلُهُ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ : صُنْعٌ শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা, শিল্প। اَتْقَنَ শব্দটি اِتْقَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো কিছুকে মজবুত ও সংহত করা। বাহ্যত এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়সবস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ দিবারাত্রির পরিবর্তন এবং শিঙ্গায় ফুৎকার থেকে নিয়ে হাশর-নশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা এগুলোর স্রষ্টা কোনো সীমিত জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা ফেরেশতা নয়; বরং এগুলোর স্রষ্টা হলেন বিশ্বজাহানের পালনকর্তা।

যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا আয়াতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল; কিন্তু বাস্তবে চলমান ও গতিশীল হওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা এটা বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

قَوْلُهُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا : এটা হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা। হযরত কাতাদা (র.)-এর মতে حَسَنَة বলে এখানে কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ সাধারণ ইবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে, সে তার কর্মের চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। বলা বাহুল্য, সৎকর্ম তখনই সৎকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত তথা ঈমান বিদ্যমান থাকে। 'উৎকৃষ্টতর প্রতিদান' বলে জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ এবং আজাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ : فزع বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক আল্লাহভীরু- পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না এবং থাকা উচিতও নয়। যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ অর্থাৎ পালনকর্তার আজাব থেকে কেউ নিশ্চিন্ত ও ভাবনামুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই পয়গাম্বরগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও ওলীগণ সদাসর্বদা ভীত ও কম্পিত থাকতেন। কিন্তু সেই দিন হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সৎকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে بَلْدَة বলে মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তো বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মক্কার পালনকর্তা বলার কারণ হচ্ছে মক্কার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্তু প্রকাশ করা। حَرَّمَ শব্দটি تَحْرِيْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মানও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মক্কা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন- কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েজ নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েজ নয়। এসব বিধানের কতকাংশ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়িদার শুরুতে এবং কতকাংশ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ : অর্থাৎ আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বে-খবর নন। তোমরা মনে করো না যে, তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ পাকের অজানা রয়েছে, তা কখনো নয়; বরং পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় দান করবেন, আর তা তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই হবে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, এমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন-

اِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ * خَلَوْتُ وَلٰكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيْبٌ .
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ يَغْفُلُ سَاعَةً * وَلَا اَنَّ مَا يَخْفٰى عَلَيْهِ يَغِيْبُ .

অর্থাৎ যখন তুমি কখনো একাকী হও, তখন কিন্তু নিজেকে একা মনে করো না; বরং আল্লাহ পাককে সেখানেও হাজির নাজির জানবে। তিনি ক্ষণিকের জন্যেও তোমাদের ব্যাপারে গাফেল নন, আর কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

سُوْرَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ : সূরা কাসাস মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ بِالْجُحْفَةِ وَاِلَّا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ اِلٰى لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ وَهِىَ سَبْعٌ اَوْ ثَمَانٌ وَثَمَانُوْنَ اٰيَةً.

তবে اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ الخ আয়াতটি জুহফা নামক স্থানে অবতীর্ণ হয় এবং اِلَّا الَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ .... لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ আয়াতটি ব্যতীত। আয়াত : ৮৭/ ৮৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. طٰسٓمٓ . اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ .

২. تِلْكَ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ اَلْاِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ الْمُبِيْنِ . اَلْمُظْهِرِ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ .

৩. نَتْلُوْا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ خَبَرِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ . لِاَجْلِهِمْ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهٖ .

৪. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا تَعَظَّمَ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا فِرَقًا فِىْ خِدْمَتِهٖ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ وَهُوَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَ هُمُ الْمَوْلُوْدِيْنَ وَيَسْتَحْيٖ نِسَاءَهُمْ يَسْتَبْقِيْهِنَّ اَحْيَاءً لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ لَهٗ اِنَّ مَوْلُوْدًا يُوْلَدُ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ يَكُوْنُ سَبَبَ ذَهَابِ مُلْكِكَ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهٖ .

অনুবাদ :

১. ত্বা-সীন-মীম এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

২. এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের اٰيٰتُ الْكِتَابِ -এর মধ্যে ইযাফতটা مِنْ অর্থে তথা اِضَافَت مِنِّيَّة হয়েছে, যা বাতিল থেকে হককে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশকারী।

৩. আমি আপনার নিকট হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। এ কারণে যে, মুমিনরাই এর মাধ্যমে উপকৃত হয়।

৪. ফেরাউন পৃথিবীতে মিশরের ভূমিতে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তার সেবায় তাদের একটি শ্রেণিকে হীনবল করেছিল। তারা ছিল বনী ইসরাঈল সে তাদের পুত্রগণকে হত্যা করত যারা জন্মগ্রহণ করত/সদ্য ভূমিষ্ট এবং নারীগণকে জীবিত থাকতে দিত। তাদের জীবিত রাখত। কারণ কতিপয় গণক এসে ফেরাউনকে বলল যে, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে এক পুত্রসন্তান জন্ম নিবে, যে তোমার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে।

٥. وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً يَقْتَدِىْ بِهِمْ فِى الْخَيْرِ وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ مُلْكَ فِرْعَوْنَ .

٦. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ وَيَرَى بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَالرَّاءِ وَرَفْعِ الْاَسْمَاءِ الثَّلٰثَةِ مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ . يَخَافُوْنَ مِنَ الْمَوْلُوْدِ الَّذِىْ يَذْهَبُ مُلْكُهُمْ عَلٰى يَدَيْهِ .

٧. وَاَوْحَيْنَآ وَحْىَ اِلْهَامٍ اَوْ مَنَامٍ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى وَهُوَ الْمَوْلُوْدُ الْمَذْكُوْرُ وَلَمْ يَشْعُرْ بِوِلَادَتِهٖ غَيْرُ اُخْتِهٖ اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ الْبَحْرِ اَىِ النِّيْلِ وَلَا تَخَافِىْ غَرْقَهٗ وَلَا تَحْزَنِىْ لِفِرَاقِهٖ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . فَاَرْضَعَتْهُ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ لَا يَبْكِىْ وَخَافَتْ عَلَيْهِ فَوَضَعَتْهُ فِىْ تَابُوْتٍ مَطْلِىٍّ بِالْقَارِ مِنْ دَاخِلٍ مُمَهَّدٍ لَهٗ فِيْهِ وَاَغْلَقَتْهُ وَاَلْقَتْهُ فِىْ بَحْرِ النِّيْلِ لَيْلًا .

অনুবাদ :

৫. আমি ইচ্ছা করলাম সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে اَئِمَّةً শব্দের উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় টি يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা হবে। এবং উত্তরাধিকারী করতে ফেরাউন সাম্রাজ্যের।

৬. এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে মিশর ও সিরিয়ার ভূমিতে আর ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে দেখিয়ে দিতে। অন্য কেরাতে نُرِىَ -এর পরিবর্তে يَرٰى তথা يَاء ও رَاء বর্ণদ্বয় যবরযোগে আর اِسْم তিনটি তথা فِرْعَوْن، هَمَان ও جُنُوْد মারফূ' রূপে পঠিত রয়েছে। যা তাদের নিকট তারা আশঙ্কা করত। তারা ভয় করত সেই শিশুর ব্যাপারে যার হাতে তাদের রাজত্বের পতন ঘটবে।

৭. মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম এখানে ওহী দ্বারা ইলহাম কিংবা স্বপ্নে পাওয়া ইঙ্গিত উদ্দেশ্য। এই হলো উল্লিখিত সেই ছেলে; তার জন্ম সম্পর্কে তার বোন ছাড়া আর কেউই জানতে পারেনি। শিশুটিকে স্তন্যদান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন একে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও অর্থাৎ নীলনদে। এবং ভয় করো না ডুবে যাওয়ার এবং দুঃখ করো না তাঁর বিরহে আমি অবশ্যই একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং একে রাসূলগণের একজন করব। হযরত মূসা (আ.)-এর জননী তাকে তিন মাস দুগ্ধ পান করালেন। তিনি কখনো কান্নাকাটি করতেন না। এরপর তাঁর মাতা তাঁর প্রতি শঙ্কাগ্রস্ত হলেন। ফলে তাঁকে আলকাতরা প্রলেপকৃত ও বিছানা সজ্জিত একটি সিন্দুকের ভেতরে রেখে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন এবং রাতের আঁধারে অতি সঙ্গোপনে তা নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন।

অনুবাদ :

٨. فَالْتَقَطَهُ بِالتَّابُوْتِ صَبِيْحَةَ اللَّيْلِ اٰلُ اَعْوَانُ فِرْعَوْنَ فَوَضَعُوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَتَحَ وَاَخْرَجَ مُوْسٰى مِنْهُ وَهُوَ يَمُصُّ مِنْ اِبْهَامِهٖ لَبَنًا لِيَكُوْنَ لَهُمْ اَىْ فِىْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ عَدُوًّا لِيَقْتُلَ رِجَالَهُمْ وَّحَزَنًا ط يَسْتَعْبِدَا نِسَاءَهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُوْنِ الزَّاىِ لُغَتَانِ فِى الْمَصْدَرِ وَهُوَ هُنَا بِمَعْنٰى اِسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ حَزِنَهُ كَاَحْزَنَهُ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَزِيْرَهُ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ . مِنَ الْخَطِيْئَةِ اَىْ عَاصِيْنَ فَعُوْقِبُوْا عَلٰى يَدِهٖ .

৮. ফেরাউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল সিন্দুকসহ উক্ত রাতের [পরবর্তী] সকালে। তারা তাকে ফেরাউনের সামনে রেখে খুলল এবং হযরত মূসা (আ.)-কে সিন্দুক থেকে বের করল। তখন তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে দুধ চুষছিলেন। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। অর্থাৎ শেষ পরিণামে তিনি তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবেন এবং তাদের নারীদেরকে দাসীতে রূপান্তর করবেন। অপর কেরাতে حَزَنًا শব্দটির حَاء বর্ণে পেশ ও زَاء বর্ণ সাকিনসহ পঠিত। উভয়টিই মাসদার। এখানে এটা اِسْمِ فَاعِلْ অর্থে حَزِنَهُ (س) হতে নিষ্পন্ন। যা اَحْزَنَهُ অর্থে। ফেরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী হামান ছিল ফেরাউনের মন্ত্রী। خَاطِئِيْنَ শব্দটি اَلْخَطِيْئَةُ হতে গঠিত। অর্থাৎ বিরুদ্ধাচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর হাতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

٩. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ وَقَدْ هَمَّ مَعَ اَعْوَانِهٖ بِقَتْلِهٖ هُوَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوْهُ ق عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا فَاَطَاعُوْهَا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِعَاقِبَةِ اَمْرِهِمْ مَعَهٗ .

৯. ফেরাউনের স্ত্রী বলল, অথচ তখন ফেরাউন ও তার লোকজন তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল। এ আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর হবে। তোমরা একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। সুতরাং তারা তার অনুগত হলো/ তার কথা মেনে নিল। প্রকৃত পক্ষে এর পরিণাম তারা বুঝতে পারেনি।

١٠. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى لَمَّا عَلِمَتْ بِالْتِقَاطِهٖ فٰرِغًا مِمَّا سِوَاهُ اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّهَا كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ اَىْ بِاَنَّهُ اِبْنُهَا لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا بِالصَّبْرِ اَىْ سَكَّنَّاهُ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . اَلْمُصَدِّقِيْنَ بِوَعْدِ اللّٰهِ وَجَوَابُ لَوْلَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهَا .

১০. মূসা জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল যখন তিনি ফেরাউন কর্তৃক তাকে উঠিয়ে নেওয়ার সংবাদ জানতে পারলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ছাড়া তার হৃদয়ে অন্য কিছু স্থান পায় না। এমন কি সে তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতই অর্থাৎ সে যে তার পুত্র তা। এখানে اِنْ টি ثَقِيْلَةٌ থেকে خَفِيْفَةٌ বানানো হয়েছে। আর এর ইসিম উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اِنَّهَا আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে ধৈর্য্য দ্বারা অর্থাৎ যদি তাকে প্রবোধ না দিতাম। যাতে সে আস্থাশীল হয় আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির উপর। لَوْلَا -এর পূর্ববর্তী অংশ তথা لَوْلَا لَتُبْدِىْ -এর জবাব নির্দেশ করেছে।

অনুবাদ :

١١. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ مَرْيَمَ قُصِّيْهِ ز اِتَّبِعِيْ أَثَرَهُ حَتّٰى تَعْلَمِيْ خَبَرَهُ فَبَصُرَتْ بِهِ اَيْ اَبْصَرَتْهُ عَنْ جُنُبٍ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ اِخْتِلَاسًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اَنَّهَا اُخْتُهُ وَاَنَّهَا تَرْقُبُهُ.

১১. তার ভগ্নী মারইয়াম-কে বললেন, এর পেছনে পেছনে যাও। তুমি এর অনুসরণ কর যাতে তার সংবাদ জানতে পার। সে তাকে দেখতেছিল দূর হতে অতি সঙ্গোপনে। তাদের অজ্ঞাতসারে। অর্থাৎ সে যে তার ভগ্নী এবং তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে, তারা তা জানত না।

١٢. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اَيْ قَبْلَ رَدِّهِ اِلٰى اُمِّهِ اَيْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَبُوْلِ ثَدْيِ مُرْضِعَةٍ غَيْرِ اُمِّهِ فَلَمْ يَقْبَلْ ثَدْيَ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرَاضِعِ الْمُحْضَرَةِ فَقَالَتْ اُخْتُهُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ لَمَّا رَاَتْ حُنُوَّهُمْ عَلَيْهِ يَكْفُلُوْنَهُ لَكُمْ بِالْاِرْضَاعِ وَغَيْرِهِ وَهُمْ لَهُ نٰصِحُوْنَ. وَفُسِّرَتْ ضَمِيْرُ لَهُ بِالْمَلِكِ جَوَابًا لَهُمْ فَاُجِيْبَتْ فَجَاءَتْ بِاُمِّهِ فَقَبِلَ ثَدْيَهَا وَاَجَابَتْهُمْ عَنْ قَبُوْلِهِ بِاَنَّهَا طَيِّبَةُ الرِّيْحِ طَيِّبَةُ اللَّبَنِ فَاَذِنَ لَهَا بِاِرْضَاعِهِ فِيْ بَيْتِهَا فَرَجَعَتْ بِهِ.

১২. এবং পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীর স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম অর্থাৎ তার মায়ের নিকট প্রত্যাবর্তনের পূর্বে অর্থাৎ আমি তাকে তার মা ব্যতীত অন্য ধাত্রীর স্তন্যপান হতে বিরত রেখেছিলাম। ফলে সে উপস্থিত অন্য কোনো ধাত্রীর স্তন্য গ্রহণ করেনি। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বোন বলল, তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের কথা বলব এ কথা তখনই বলল, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তাদের মায়া-মমতা ও আকর্ষণ লক্ষ্য করল যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে স্তন্য পান ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করবে এবং তারা এর জন্য মঙ্গলকামী হবে لَهُ -এর যমীরটি তাদের প্রশ্নের জবাব স্বরূপ বাদশাহকে বুঝিয়েছে। তার কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করা হলে সে তার মাকে নিয়ে এলো। হযরত মূসা (আ.) তার স্তন্য গ্রহণ করলেন। শিশু তার স্তন্য গ্রহণের কারণ হিসেবে মূসা জননী বললেন যে, তিনি সুঘ্রাণ ও সুপেয় স্তন্যের অধিকারিণী। ফেরাউন তাকে বাড়িতে নিয়ে স্তন্যদানের অনুমতি দিল। ফলে তিনি তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

١٣. كَمَا قَالَ تَعَالٰى فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا بِلِقَائِهِ وَلَا تَحْزَنَ حِيْنَئِذٍ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِرَدِّهِ اِلَيْهَا حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ اَيِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ. بِهٰذَا الْوَعْدِ وَلَا بِاَنَّ هٰذِهِ اُخْتُهُ وَهٰذِهِ اُمُّهُ فَمَكَثَ عِنْدَهَا اِلٰى اَنْ فَطَمَتْهُ وَاَجْرٰى عَلَيْهَا اُجْرَتَهَا لِكُلِّ يَوْمٍ دِيْنَارٌ وَاَخَذَتْهَا لِاَنَّهَا مَالُ حَرْبِيٍّ فَاَتَتْ بِهِ فِرْعَوْنَ فَتَرَبّٰى عِنْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالٰى حِكَايَةً عَنْهُ فِيْ سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ.

১৩. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার মায়ের নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায় তাঁর সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যমে সে দুঃখ না করে সে সময় এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তাঁকে তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না। এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে। আর এ কথাও জানতে পারেনি যে, সে তার বোন আর দুগ্ধ দানকারিনী তার মা। হযরত মূসা (আ.) দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত তার নিকট অবস্থান করলেন। আর ফেরাউন স্তন্যদানের পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রতিদিনের বিনিময় এক দীনার ভাতা চালু করল। আর মূসার জননী এটা হরবীর সম্পদ হওয়ায় তা গ্রহণ করলেন। স্তন্যদান শেষ হওয়ার পর তিনি তাকে ফেরাউনের নিকট নিয়ে এলেন, তখন থেকে তিনি ফেরাউনের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা শু'আরাতে এ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "তোমাকে কি আমরা শৈশবে আমাদের মাঝে লালন পালন করিনি? এবং আমাদের মাঝে তোমার জীবনের বেশ কয়েকটি বছর অবস্থান করনি?

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ نَتْلُوْ عَلَيْكَ اَىْ بِوَا سِطَةِ جِبْرَائِيْلَ الخ : مِنْ نَّبَإِ -এর مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْضِيَّة অর্থাৎ نَتْلُوْ عَلَيْكَ بَعْضَ نَبَإِ مُوْسٰى আপনার নিকট মূসার কিছু সংবাদ বর্ণনা করছি। مَفْعُوْل উহ্যও হতে পারে। তখন বাক্যটি এমন হবে نَتْلُوْا عَلَيْكَ شَيْئًا فِىْ مُوْسٰى আর নাহব শাস্ত্রবিদ আখফাশ-এর মতে مِنْ অতিরিক্তও হতে পারে। অর্থাৎ- نَتْلُوْا عَلَيْكَ نَبَأَ مُوْسٰى

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : এটা نَتْلُوْ -এর যমীরের حَالْ অর্থাৎ كَوْنِنَا مُتَلَبِّسِيْنَ بِالصِّدْقِ অথবা نَتْلُوْ -এর مَفْعُوْل হলো ذُوالْحَالِ আর এটা তার حَالْ অর্থাৎ বাক্যটি হলো- كَوْنُ الْخَبَرِ مُتَلَبِّسًا

قَوْلُهُ لِاَجْلِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِقَوْمٍ -এর لَامْ টি تَعْلِيْلِيَّة বা কারণজ্ঞাপক। এটা مُتَعَلِّقْ হলো نَتْلُوْ -এর সাথে। অর্থাৎ উল্লেখের মূল লক্ষ্য হলো মুমিনগণ। কারণ তারাই এর দ্বারা উপকৃত হয়।

قَوْلُهُ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا : এটা مُسْتَانِفَه বাক্য। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে যে, মূসা ও ফিরআউনের ঘটনাটি কী ছিল? উত্তরে বলা হয়- اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا

قَوْلُهُ يُذَبِّحُ اَبْنَائَهُمْ : এ অংশটি يَسْتَضْعِفُ থেকে بَدْل ; لِقَوْلِ بَعْضِ الْكَهَنَةِ এটা يُذَبِّحُ -এর ইল্লত বা কারণ।

قَوْلُهُ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ : এখানে نُمَكِّنَ لَهُمْ বাক্যটি نُسَلِّطَهُمْ অর্থে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কর্তৃত্ব বা রাজত্ব দান করব। আর اَرْض দ্বারা এখানে মিশর ও শামদেশ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ نُرِىَ فِرْعَوْنَ : এটা এবং এর সকল مَعْطُوْف হলো نُرِىْ -এর প্রথম مَفْعُوْل আর وَمَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ হলো দ্বিতীয় مَفْعُوْل . جُنُوْدَهُمَا এর মধ্যে اِضَافَتْ টি تَغْلِيْب তথা প্রাধান্যদান স্বরূপ। অর্থাৎ বাহিনী ছিল যদিও ফেরাউনের, কিন্তু হামান ছিল তার মন্ত্রী আর রাজার সৈন্যদেরকে تَغْلِيْب বা প্রাধান্য স্বরূপ তার মন্ত্রীর সৈন্য বলা হয়েছে। তাছাড়া হামানের নিজস্ব কিছু সৈন্য থাকারও সম্ভাবনা আছে। অপর এক কেরাতে يَرٰى রয়েছে। এ সময় তিনোটি শব্দ اِسْم فِعْل হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হবে।

قَوْلُهُ اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى :হযরত মূসা (আ.)-এর মায়ের নামের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ইউহানিয ছিল। সা'লাবী সূত্রে কুরতুবীর বর্ণনা মতে তা নাম ছিল লূখা বিনতে হানিফ ইবনে লাবী ইবনে ইয়াকূব। এছাড়া আরো বিভিন্ন মত রয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ اَرْضِعِيْهِ : اَنْ এখানে تَفْسِيْرِيَّه বা مَصْدَرِيَّة যে কোনোটি হতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَا تَخَافِىْ غَرْقَهُ : পূর্বে বলা হয়েছিল فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ এখানে বলা হচ্ছে- وَلَا تَخَافِىْ , কাজেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে? এ দ্বন্দ্বটি لَا تَخَافِىْ -এর ব্যাখ্যা غَرْقَه দ্বারা করে নিরসন করা হয়েছে। فَاِذَا خِفْتِ -এর মধ্যে জবাই -এর আশঙ্কা উদ্দেশ্য। আর لَا تَخَافِىْ -এর মধ্যে ডুবে যাওয়ার ভয়ের نَفِىْ উদ্দেশ্য। অতএব উভয় জায়গায় একই ধরনের আশঙ্কা নেই। সুতরাং দ্বন্দ্বও নেই। اَلْقَارُ হলো আলকাতরা, যা নৌকা ও জাহাজে লাগানো হয়। যাতে নৌকার ভিতরে পানির কোনো আছর বা প্রভাব না পড়ে।

قَوْلُهُ مُمَهَّدٍ : এটা تَابُوْت -এর দ্বিতীয় সিফত। প্রথম সিফত হলো مَطْلِى অর্থাৎ কাঠের বাক্সে আলকাতারা লাগিয়ে দিল, যাতে পানির প্রভাব না পড়ে, এবং তাতে ধুনিত তুলা তথা ছোট তোষক বিছিয়ে দিল যাতে হযরত মূসা (আ.)-এর কষ্ট না হয়। مُمَهَّدْ অর্থ- বিছানা।

قَوْلُهُ فِىْ عَاقِبَةِ الْاَمْرِ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, لِيَكُوْنَ -এর لَامْ টি عَاقِبَتْ তথা পরিণামজ্ঞাপক। عِلَّتْ বা কারণজ্ঞাপক নয়। কেননা বাক্স উঠিয়ে নেওয়ার সময় তো পুত্ররূপে বরণ করে নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল, যুবক হওয়ার পর তিনি ফেরাউন ও তার পরিবার বা অনুসারীদের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ اِنَّ قَارُوْنَ وَهَامَانَ الخ : এ বাক্যটি فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ ; مَعْطُوْف عَلَيْه এবং وَقَالَتِ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ - مَعْطُوْف -এর মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة -[জুমাল]

قَوْلُهُ قَالَتِ امْرَاةُ فِرْعَوْنَ : ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিল আছিয়া। [اٰسِيَةُ] বিনতে মুযাহিম ইবনে উবায়দা ইবনে রাইয়্যান ইবনে ওয়ালীদ।

قَوْلُهُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ : هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, قُرَّةُ عَيْنٍ হলো উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ

قَوْلُهُ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا الخ : এখানে لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে, لولا -এর পূর্ববর্তী অংশ তথা لَتُبْدِىْ তার প্রতি دَلَالَتْ বা নির্দেশ করছে। বাক্যটি এরূপ ছিল- لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لَاَبْدَتْ اَنَّهُ اِبْنُهَا

قَوْلُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ : এ বাক্যটি آلُ فِرْعَوْن -এর حَالْ

قَوْلُهُ لِاُخْتِهٖ مَرْيَمَ : মারইয়াম হলো হযরত মূসা (আ.)-এর সহোদর বোন। কেউ কেউ মারইয়াম -এর স্থলে কুলসূমা বা কুলসুম উল্লেখ করেছেন। তার মায়ের নাম হলো ইউহানিয এবং পিতার নাম ইমরান। তবে এ ইমরান হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী মারইয়ামের পিতা ইমরান নন। উভয় ইমরানের মধ্যে ১৮০০ বছরের ব্যবধান ছিল। -[জুমাল]

قَوْلُهُ فِىْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جُنُبٍ হলো উহ্য مَوْصُوْف -এর صِفَتْ অর্থাৎ عَنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ আর اِخْتِلَاسْ অর্থ হলো- اِخْتِفَاء বা গোপন থাকা।

قَوْلُهُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ : এখানে حَرَّمْنَا ক্রিয়াটি مَنَعْنَا তথা বিরত রাখলাম, নিষেধ করলাম অর্থে। এটা تَحْرِيْم থেকে রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এখানে تَحْرِيْم -এর শরয়ী অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া সহীহ নয়। কারণ শিশুরা শরয়ী বিধি বিধানের মুকাল্লাফ বা দায়নির্ভর নয়। مَرَاضِعَ শব্দটি مَرْضَعٌ -এর বহুবচন। স্তন্যদান করা যেহেতু নারীদের সাথে খাছ। তাই ة বর্জিত হয়েছে। যেমনটা حَائِضٌ -এর মধ্যে হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাসাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহফা [রাবেগ]-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জুহফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ে বৈ কি! অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে। ইরশাদ হচ্ছে- اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

হযরত হাসান বসরী (র.) আতা (র.), তাউস (র.), ইকরামা (র.) বলেছেন, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মোকাতেল (র.) বলেছেন, এতে একটি আয়াত মদনী রয়েছে। আয়াতটি এই-

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ ......لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ

পর্যন্ত এ আয়াত নাজিল হয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -এর হিজরতের সময় 'জুহফা' নামক স্থানে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা শরীফে এবং জুহফার মধ্যস্থলে। -[রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৪১]

আল্লামা সুয়ূতি (র.) লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

আহমদ, তাবারানী হযরত মাদীকারব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বললাম, আমাদেরকে এ সূরাটি শুনিয়ে দিন, তখন তিনি বললেন, তোমরা বরং হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর নিকট যাও এবং তাঁর নিকট থেকে এ সূরা শ্রবণ কর! কেননা স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ সূরা শিখিয়েছেন। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৫, পৃ. ১৩০]

এ সূরায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এতে কারূনের ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) কিভাবে দুশমনদের দেশ থেকে বের হয়ে মাদায়েনে পৌঁছলেন, যেখানে আল্লাহ পাকের নবী এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন, হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ পাক দুশমনের কবল থেকে কিভাবে রক্ষা করলেন এবং তাঁর সম্মান-মর্যাদা ও

আরামের কি ব্যবস্থা করলেন, এ সূরায় তার বিবরণও স্থান পেয়েছে। এরপর যখন তিনি পুনরায় মিশরের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নবুয়ত ও রিসালত প্রদানে ধন্য করলেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা নামলের প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা রয়েছে। আর ঐ সূরার শেষে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে। এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার ঘোষণা দিয়েই শুরু করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এ সূরার শুরুতেও পূর্বের সূরার ন্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরে বিস্তারিত পরিসরে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপণ করা এবং তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা।

তৃতীয়ত পূর্ববর্তী সূরা নামলে যেভাবে নবী রাসূলগণের ঘটনার বিবরণের পর তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে, এরপর আখিরাতের উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর তাওহীদের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এরপর আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাওহীদের আলোচনা দ্বারা সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরায় যেভাবে রাণী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বিস্তারিতভাবে ফেরাউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে রাণী বিলকিসের দেশ ফেরাউনের দেশ থেকে অনেক বড় ছিল; কিন্তু সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মুজেযা দেখে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে, ফেরাউনের রাজত্ব রাণী বিলকিসের রাজত্ব থেকে ক্ষুদ্র ছিল, সে হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর মুজেযাসমূহ দেখেও ঈমান আনেনি। এতে একথা প্রমণিত হয় যে, হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতার সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়, যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেন, সে-ই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। আর এজন্যেই পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতেহায় দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদেরকে সরল-সঠিক পথ গ্রহণের তাওফীক দান কর"।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ফেরাউন ছিল ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ আর কারুন ছিল ধন-সম্পদের মোহে আত্মাহারা। এ দু'টি মোহ মানব চরিত্রকে কিভাবে কলুষিত করে এবং মানুষকে কিভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রকৃত চিত্র লক্ষ্য করা যায় এ দু'টি ঘটনায়।

পবিত্র কুরআন বিশ্ব মানবের সম্মুখে এ দু'টি চিত্র তুলে ধরেছে, যাতে করে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা এ অত্যাধুনিক যুগেও এ দু'টি রোগই মানব চরিত্রকে কলুষিত করে রেখেছেন। এ দু'টি চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করার মাধ্যমেই মানবতার বিকাশ ও উন্মেষ ঘটে, মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হয়। এ শিক্ষাই রয়েছে পবিত্র কুরআনে, আর এ কারণেই বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশে পবিত্র কুরআনের অবদান অসামান্য।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহাফে তাঁর কাহিনী হযরত খিযির (আ.)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লিখিত হয়েছে। এরপর সূরা ত্বা-হায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এর কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে, অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরালোচনা রয়েছে। সূরা ত্বা-হায় হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বলা হয়েছে- وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا; ইমাম নাসায়ী (র.) প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মুফতি শফী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে ইবনে কাসীরের বরাত দিয়ে এই বিবরণ সূরা ত্বা-হায় উল্লেখ করেছেন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের পূর্ণ আলোচনা, জরুরি মাসআলা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদি কিছু সূরা ত্বা-হায় এবং কিছু সূরা কাহাফে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের শুধু শব্দ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তাফসীর লিপিবদ্ধ করা হবে।

قَوْلُهُ وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً : এই আয়াতে বিধিলিপির মোকাবিলায় ফেরআউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফেরাউন শংকিত হয়েছিল এবং যার কারণে বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ তা'আলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনতুষ্টির জন্য তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌঁছিয়ে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ, যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে- আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাফের হরবীর কাছে থেকে তার

সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনোরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল। অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে আগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হলো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ থেকে مَا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তা-ই।

قَوْلُهُ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো নির্যাতিত বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশের নেতৃত্ব দান করবেন এবং ফেরাউনের পরিবর্তে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। এ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হলো বনী ইসরাঈলকে তাদের দেশ তথা সিরিয়া ও মিশরের ক্ষমতা দান করবেন। আর ফেরাউন, হামান ও তাদের দলবল যে আশঙ্কা করছিল যে, বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তি ফেরাউন ও তার দলের ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেবে, আল্লাহ পাক তাদের সে আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে দেখিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই, তাঁর সিদ্ধান্ত সর্বদা অটুট থাকে।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে এই প্রথম হামান নামটির উল্লেখ করা হলো। কথিত আছে যে হামান ছিল ফেরাউনের প্রধানমন্ত্রী। ফেরাউনের যাবতীয় অন্যায় অনাচারে সে ছিল তার দক্ষিণ হস্ত, নিষ্ঠুর আচরণে হামান ছিল সিদ্ধহস্ত।

قَوْلُهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوْسَى أَنْ أَرْضِعِيْهِ : আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার নাম ছিল ইউখাবিজ বিনতে লাদী। আর লাদী ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পুত্র। আলোচ্য আয়াতের أَوْحَيْنَا শব্দটি وحى থেকেই নিষ্পন্ন, তবে এই ওহী নবুওয়তের ওহী নয়, কেননা কোনো স্ত্রীলোক নবী হয়নি।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) এ জন্যে এ শব্দটির অর্থ করেছেন, 'আমি তার মনে একথাটি এনে দিলাম''। সুফীবাদের ভাষায় এটিকে ইলহাম বলা হয়। আর ইলহামের আরেকটি পন্থা হলো সত্য স্বপ্ন, যা মানুষের অন্তরে একীন এবং প্রশান্তি এনে দেয়। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ইলহামও জ্ঞান অর্জনের একটি পন্থা।

যারা পুণ্যাত্মা, যাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন, তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ইলহাম করেন এবং তারা তা দ্বারা প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন বা অন্য কোনো পন্থায় এ নির্দেশ প্রদান করলেন- "শিশুটিকে তুমি স্তন্য পান করাতে থাক''।

শিশু হযরত মূসা (আ.) কখনো কাঁদতেন না : হযরত মূসা (আ.)-তাঁর মাননীয়া মাতার স্তন্য কত দিন পান করেছিলেন? এ সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি আট মাস মায়ের দুধ পান করেছেন। কারো কারো মতে, এ সময় ছিল চার মাস, আর অন্য একটি মতে, এ সময় ছিল মাত্র তিন মাস। মা তাঁর এ শিশুকে কোলে নিয়ে দুধ পান করাতেন, কখনো তিনি কাঁদতেন না, এমনকি নড়াচড়াও করতেন না। এ বিবরণটি দিয়েছেন আল্লামা বগভী (র.)।

قَوْلُهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ : আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতাকে একথাও বললেন যে, যখন তুমি এ শিশুটির প্রাণের আশঙ্কা কর, তখন তাকে একটি বাক্সে পুরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। আর তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তার সম্পর্কে তোমার আশঙ্কা করার কিছুই নেই, তুমি দুঃখিতও হয়ো না। কেননা আমি তাকে পুনরায় তোমার কোলে পৌঁছিয়ে দেব। আমি তাকে শুধু রক্ষা করেই ক্ষান্ত হবো না; বরং ভবিষ্যতে তাকে আমার রাসূল হিসেবেও মনোনীত করব।

আলোচ্য আয়াতের اَلْيَمّ শব্দটি দ্বারা মিশরের নীলনদকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপাতত তুমি তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দাও, এরপর আমি তাকে যথাসময়ে তোমার নিকট পৌঁছে দেব।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : তাফসীরকার আতা (র.) এবং যাহহাক (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মিশরে যখন বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তার মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার শুরু করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হয়, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দিত না এবং মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখত না। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদের উপর কিবতীদেরকে বসিয়ে দিলেন, কিবতীরা তাদের উপর জুলুম অত্যাচার করলো এবং

তাদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতে লাগলো। এ অবস্থায় বহুদিন অব্যাহত রইলো। অবশেষে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল জাতিকে কিবতীদের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা হলো এই, যখন হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মগ্রহণের সময় হলো তখন তাঁর মাতা একজন ধাত্রীকে ডাকলেন। এই ধাত্রী সেই ধাত্রীদের অন্যতম, যাদেরকে ফেরাউনের লোকেরা নিযুক্ত করে রেখেছিল, যে বাড়িতে কোনো শিশুর জন্ম হতো, তাদের কাজ ছিল ফেরাউনের লোকদেরকে নবজাত শিশুর জন্মের সংবাদ দেওয়া। এ খবরের ভিত্তিতেই ফেরাউনের ঘাতক বাহিনী এসে নবজাত শিশুকে হত্যা করতো। কিন্তু এ ধাত্রীটির সঙ্গে মুসা জননীর অন্তরঙ্গতা ছিল। যথাসময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হলে তাকে ডাকা হয়, সে আসে। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা তাকে বলেন, আমার যে এ অবস্থা, তা তুমি জান, তবে তোমার বন্ধুত্বের দ্বারা আমি উপকৃত হতে চাই, ধাত্রী তার দায়িত্ব পালন করলো। হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন। ধাত্রী তাকে কোলে নিল। তখন মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান দিয়ে একটি নূর বের হয়। এ দৃশ্য দেখে ধাত্রী অত্যন্ত বিস্মিত হলো, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান হলো, আর হযরত মূসা (আ.)-এর মায়া মহব্বত দ্বারা তার অন্তর পরিপূর্ণ হলো। তখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর মাকে বলল, আমাকে যখন ডাকা হয় এবং আমি তোমার নিকট আসি, তখন আমার পেছনে তোমার সন্তানের ঘাতকরা ছিল। অর্থাৎ, আমার ইচ্ছা ছিল জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ঘাতকদের হাতে অর্পণ করবো; কিন্তু এখন আমার অন্তরে তোমার সন্তানের জন্য এমন মায়া সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবনে এমন মায়া আমি কারো জন্যে উপলব্ধি করিনি। এজন্যে আমি বলছি, তোমার পুত্রের হেফাজত করো! এরপর যখন ধাত্রী হযরত মূসা (আ.)-এর গৃহ থেকে বের হচ্ছিল তখন ফেরাউনের একজন গোয়েন্দা তাকে দেখে ফেলেছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হলো এবং ঘরে প্রবেশ করতে চাইলো। তখন মূসা (আ.)-এর ভগ্নি দ্রুত এসে তার মাতাকে খবর দিল যে, সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বোন তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে চুলোয় নিক্ষেপ করল, সে বুঝতেই পারেনি যে সে কি করছে। এরই মধ্যে সৈন্যরা ভিতরে প্রবেশ করল, চুলোয় আগুন জ্বলছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার চেহারায় কোনো ভাবান্তর হলো না। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করল, ধাত্রী এখানে কেন এসেছিল? তিনি বললেন, সে আমার বান্ধবী, আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। এরপর তারা ফিরে গেল। তখন চুলোর কাছে গিয়ে মা দেখলেন, এরই মধ্যে চুলোর আগুন নিভে গেছে এবং শিশু মূসা নিরাপদ রয়েছেন, তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদিন পর ফেরাউনের সৈন্যরা ঘরে ঘরে শিশু সন্তানের অনুসন্ধান করতে লাগল, তখন তিনি তার পুত্রের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় আল্লাহ পাক তার অন্তরে ইলহাম করলেন যে শিশুটিকে একটি কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে রেখে নীলনদে ভাসিয়ে দাও। আলোচ্য আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে- وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰى অর্থাৎ, আমি মূসা-জননীর নিকট এ প্রত্যাদেশ করলাম যে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ কর, তথা নীলনদে ভাসিয়ে দাও। হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ ধারণা আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক কাঠ মিস্ত্রিকে বাক্সে তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি বলল, এমন বাক্সের তোমার কি প্রয়োজন? তখন মূসা জননী মিথ্যা বলেননি। তিনি জবাব দিলেন, আমার একটি শিশু সন্তান রয়েছে, তাকে এর মধ্যে লুকিয়ে রাখব। কাঠ মিস্ত্রি জিজ্ঞাসা করল, লুকিয়ে রাখবে কেন? তিনি বললেন, ফেরাউনের সৈন্যদের ভয়ে। যাহোক, তিনি বাক্সটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে মিস্ত্রি সৈন্যদের নিকট এ খবর দেওয়ার জন্যে হাজির হলো। সে কিছু বলতে চাইল; কিন্তু আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি ছিনিয়ে নিলেন। এরপর সে হাতের ইশারায় কিছু বুঝাতে চাইল; কিন্তু যখন সে তাতেও ব্যর্থ হলো তখন সৈন্যদের সর্দার তাকে পিটিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিল। যখন সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করল, তখন আল্লাহ পাক তার বাকশক্তি তাকে ফেরত দিলেন। আর সে তখন পুনরায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্য সৈন্যদের নিকট হাজির হলো। কিন্তু এবারও তার বাকশক্তি চলে গেল, তার দৃষ্টিশক্তিও চলে গেল। অবশেষে লোকেরা তাকে মেরে বহিষ্কার করে দিল। এখন সে চরম দুরবস্থার সম্মুখীন। হাঁটতে হাঁটতে সে একটি ময়দানে উপস্থিত হলো এবং মনে মনে এ নিয়ত করলো যে যদি আল্লাহ পাক তার দর্শন ও বাকশক্তি ফিরিয়ে দেন তবে সে আর কখনো সেই শিশুটির ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি করবে না। আল্লাহ পাক তার এ নিয়তের কারণে তার দর্শন ও বাকশক্তি ফেরত দিলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়ে গেল এবং দোয়া করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার এই নেক বান্দার ঠিকানা জানিয়ে দাও। আল্লাহ পাক তাকে মূসা (আ.)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। সে তাঁর নিকট পৌঁছলো এবং ঈমান আনলো। সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর মাতা যখন অন্তঃসত্ত্বা হলেন তখন তিনি তার অবস্থা গোপন রাখলেন। কেউ এ সম্পর্কে অবগত হলো না। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি ইহসান করতে ইচ্ছা করলেন, তাই তিনি পৃথিবীতে হযরত মূসা (আ.)-এর আগমনের অবস্থাকে গোপন করে রাখলেন। এখানে উল্লেখ্য, যখন বনী ইসরাইলের অনেক পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হলো, তখন ফেরাউনের জাতির পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করা হয় এ মর্মে যে, যদি তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়, তবে অবশেষে আমরা গোলাম কোথায় পাবো। এবং পরিণামে আমাদেরকেই যাবতীয় কাজ করতে হবে। ফেরাউনের জাতি কিবতীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এ দাবির প্রেক্ষিতে ফেরাউন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, এক বছর বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে না, আর এক বছর করা হবে। যে বছর হত্যা না করার সিদ্ধান্ত ছিল সে বছর হযরত হারুন (আ.) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর যে বছর হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল, সে বছরই হযরত মূসা (আ.)-এর জন্ম হলো। যেহেতু ফেরাউনের লোকেরা বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের ব্যাপারে ধাত্রীদেরকে গোয়েন্দাগিরির কাজে ব্যবহার করে, তাই প্রতি মুহূর্তে ঘরে ঘরে অনুসন্ধান কার্য চলত। আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে এ ব্যবস্থা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর মাতার দেহে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যখন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর ভগ্নি মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ তা জানতেই পারল না। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার অন্তরে এ কথার ইলহাম করলেন যে, তুমি শিশু সন্তানটিকে দুধ পান করাতে থাক, যখন ফেরাউনের লোকদের তরফ থেকে কোনো প্রকার আশঙ্কা হয়, তখন তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিও। মূসা (আ.)-এর মাতা শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে লুকিয়ে দুধ পান করাতে থাকেন। শিশু মূসা কাঁদতেন না এমনকি, নড়াচড়াও করতেন না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও মূসা জননীর আশঙ্কা হলো যে, ফেরাউনের লোকেরা যে কোনো মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি একটি সিন্দুক তৈরি করালেন এবং সিন্দুকের মধ্যে শিশু সন্তানকে রেখে তাকে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ফেরাউনের শুধু একটি কন্যাসন্তান ছিল, পুত্রসন্তান ছিল না। ঐ কন্যাসন্তানটিও শ্বেতরোগে আক্রান্ত ছিল, তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও সে সুস্থ হয়নি। জাদুকররা বলেছিল, তার আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হবে নীলনদের দিক থেকে। মানবাকৃতির কোনো প্রাণী এ নীলনদে পাওয়া যাবে, তার মুখের লালা যদি ব্যবহার করা যায়, তবে শ্বেতরোগগ্রস্ত এ কন্যাটি সুস্থ হবে। আর তা পাওয়া যাবে অমুক দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময়। ঐদিন ছিল সোমবার। ফেরাউন নীলনদের তীরে তার বসবার স্থান তৈরি করালো, তার সাথে ছিলো স্ত্রী আছিয়া বিনতে মোজাহেম। ফেরাউনের এ অসুস্থ কন্যাটিও ছিল। হঠাৎ একটি সিন্দুক ভাসমান অবস্থায় দেখা গেল, ফেরাউন আদেশ দিল ভাসমান বস্তুটি নিয়ে আসতে, ক্ষণিকের মধ্যে তার পরিচালকরা সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খোলার চেষ্টা করল; কিন্তু ব্যর্থ হলো। পরে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া কাছে আসলেন এবং তিনি সিন্দুকের ভেতর একটি নূর দেখতে পেলেন, যা অন্য কেউ দেখতে পারেনি।

যাহোক, তিনি সিন্দুকটি খুলে ফেললেন, যার ভিতর একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু শায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। যার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি নূর চমকাচ্ছিল। আল্লাহ্ পাক তাঁর রিজিক তাঁর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলেন, সে এ আঙ্গুল চুষে দুধ পান করত, এ নিষ্পাপ শিশুটির প্রতি অসাধারণ স্নেহমায়া আছিয়ার অন্তরে সৃষ্টি হলো, এমনকি ফেরাউনও তাকে ভালোবাসতে লাগল। সিন্দুক থেকে শিশুটিকে বের করা হলো, তার অসুস্থ কন্যা এসে পড়ল। সে এ নবজাত শিশুর মুখের লালা নিয়ে তার শ্বেতরোগগ্রস্ত দেহে মালিশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হলো। ঐ কন্যা শিশুটিকে চুম্বন করলো এবং টান দিয়ে বুকে টেনে এনে আদর করল। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

এরপর ইরশাদ হচ্ছে– فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ عَدُوًّا وَحَزَنًا

"এরপর ফেরাউনের পরিবারের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেয়, যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হয়"।

অর্থাৎ, ভবিষ্যতে হযরত মূসা (আ.) তাদের দুশমন হবেন এবং তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হবেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে– اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ۔

অর্থাৎ "নিশ্চয় ফেরাউন, হামান এবং তাদের সৈন্যবাহিনী ভুল করেছিল।"

আর তাদের ভুল প্রত্যেক ব্যাপারেই ছিল, যেমন হযরত মূসা (আ.) জন্ম গ্রহণ করবেন, এই ভয়ে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তারা হত্যা করেছে। এটি ছিলো তাদের মারাত্মক ভুল।

দ্বিতীয়ত শিশু মুসাকে তারা নীলনদ থেকে তুলে নিয়েছে এবং নিজের বাড়িতেই লালন-পালন করেছে, পরবর্তীকালে যা হবার তা হয়েছে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, নিশ্চয় ফেরাউন এবং হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপরাধী। হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করার মতো বড় অপরাধ আর কি হতে পারে! আর এজন্যেই আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বারা শাস্তি দিয়েছেন এবং যে শিশু থেকে আত্মরক্ষার জন্যে হাজার হাজার শিশুকে ফেরাউন হত্যা করেছে, সেই শিশুটিকে আল্লাহ পাক তার বাড়িতে, তারই নাকের ডগায়, তারই দ্বারা লালন পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ২০ - ২১]

যে শিশুটির ভয়ে ফেরাউন বহুদিন ধরে আতংকিত ছিল, যাকে প্রতিরোধ করতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, ঐ শিশুটিই আজ আল্লাহ পাকের হুকুমে তার আদরের কোলে স্থান নিয়েছেন এবং তার বুকের উপর বসে গেছেন। আর নিরাপদে নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল অতিক্রম করছেন। ফেরাউন ও তার দলবল তার ভয়ে যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তা যে কত বড় ভুল ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চক্রান্ত বা কৌশল দ্বারা অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না– এ ঘটনা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাতিল ফেরকা "কাদরিয়া" তকদিরে বিশ্বাস করতো না। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্য যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে হযরত মূসা (আ.)-এর এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারিত তাকদীরকে খণ্ডন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, তা এ ঘটনা দেখলে বুঝতে বিলম্ব হয় না।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] খ. ২০, পৃ. ২০]

বর্ণিত আছে, যখন সিন্দুকটি ফেরাউনের সামনে উন্মুক্ত করা হলো এবং তাতে সংরক্ষিত সুন্দর শিশুটি তারা দেখলো তখন ফেরাউনের দরবারের গণকরা বলল, এটিই সেই শিশু যার সম্পর্কে তুমি আতংকগ্রস্ত। এটি নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈলের সন্তান, তোমার ভয়ে তাকে নীলনদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তখন ফেরাউন তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করে; কিন্তু তার স্ত্রী তাতে বাধা দেয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ

"আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ যে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি] তাকে হত্যা করো না।"

ওহাব ইবনে মোনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, ফেরাউন শিশু মুসাকে দেখেই রাগান্বিত হয়ে বলল, এ শিশুটি এখনো কিভাবে বেঁচে গেছে? তার স্ত্রী আছিয়া ছিলেন অত্যন্ত নেককার, নবী রাসূলগণের বংশধর, এতিম মিসকিনদের মা, অত্যন্ত বড় দানশীল। ফেরাউন যখন শিশু মুসাকে হত্যা করতে ইচ্ছা করল তখন তিনি বললেন– قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَاتَقْتُلُوْهُ

অর্থাৎ "সে আমার এবং তোমার চক্ষু শীতলকারী [নয়নের মণি], তাকে হত্যা করো না।" ফেরাউন বলল, তোমার নয়নের মণি হতে পারে, আমার নয়। এ পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি ফেরাউন এ কথা বলতো যে, যেমন তোমার নয়নের মণি, আমার জন্যও শান্তি ও তৃপ্তির উপরকণ, তাহলে আল্লাহ পাক আছিয়ার ন্যায় ফেরাউনকেও হেদায়েত করতেন।"

আছিয়া ফেরাউনকে বললেন, শিশুটি আমাকে দিয়ে দাও। এ শিশুটি বড়ই সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত মনে হয়। আছিয়া আরো বললেন– عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

অর্থাৎ "সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।"

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আছিয়া শিশু মূসা (আ.)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝে একটি নূর দেখেছিলেন যার কারণে প্রিয়দর্শন শিশু মূসার (আ.)-এর জন্যে তাঁর অন্তরে আল্লাহ পাক স্নেহের ঢেউ তুলে দিয়েছিলেন, এজন্যে তিনি বলেছিলেন এ শিশুটিকে দেখে আমার নয়ন জুড়াবো। আছিয়া আরো বলেছেন, অগণিত শিশু হত্যা করেছ, একটি শিশু বেঁচে গেলে সে আর কি করতে পারবে! বিশেষত আমাদের নিকট লালিত পালিত হলে, তার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হবে।

অনুবাদ :

١٤. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَنَةً أَوْ وَثَلٰثٍ وَاسْتَوٰى اَىْ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا حِكْمَةً وَّ عِلْمًا ط فِقْهًا فِى الدِّيْنِ قَبْلَ اَنْ يُبْعَثَ نَبِيًّا وَكَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ -

১৪. যখন হযরত মূসা (আ.) পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন আর তা হলো ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর এবং পরিণত বয়স হলো অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছলেন তখন আমি তাকে হিকমত প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম দীনের বুঝ, নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে। এভাবে যেমনিভাবে তাকে প্রতিদান দিয়েছি আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি। তাদের নিজেদের আত্মার প্রতি।

١٥. وَدَخَلَ مُوْسٰى الْمَدِيْنَةَ مَدِيْنَةَ فِرْعَوْنَ وَهِىَ مُنْفُ بَعْدَ اَنْ غَابَ عَنْهُ مُدَّةً عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا وَقْتَ الْقَيْلُوْلَةِ فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ اَىْ اِسْرَائِيْلِىٌّ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج اَىْ قِبْطِىٌّ يُسَخِّرُ اِسْرَائِيْلِىٌّ لِيَحْمِلَ اِلٰى مَطْبَخِ فِرْعَوْنَ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَقَالَ لَهٗ مُوْسٰى خَلِّ سَبِيْلَهٗ فَقِيْلَ اِنَّهٗ قَالَ لِمُوْسٰى لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَحْمِلَهٗ عَلَيْكَ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى اَىْ ضَرَبَهٗ بِجُمْعِ كَفِّهٖ وَكَانَ شَدِيْدَ الْقُوَّةِ وَالْبَطْشِ فَقَضٰى عَلَيْهِ ز قَتَلَهٗ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُ قَتْلِهٖ وَدَفَنَهٗ اَىْ فِى الرَّمَلِ قَالَ هٰذَا اَىْ قَتْلُهٗ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط الْمُهَيِّجِ غَضَبِىْ اِنَّهٗ عَدُوٌّ لِابْنِ اٰدَمَ مُّضِلٌّ له مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِضْلَالِ -

১৫. তিনি হযরত মূসা (আ.) নগরীতে প্রবেশ করলেন ফেরাউনের শহরে। আর তা হলো 'মুনফ'; দীর্ঘদিন তা থেকে দূরে অবস্থান করার পর যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। দ্বি-প্রহরের আরামের সময় সেথায় তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন; একজন তার নিজের দলের অর্থাৎ ইসরাঈলী এবং অপরজন তার শত্রুদলের অর্থাৎ কিবতী সম্প্রদায়ের। সে ইসরাঈলী ব্যক্তিকে ফেরাউনের রন্ধনশালায় কাঠ বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য করছে। হযরত মূসা (আ.)-এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তাকে তার পথে ছেড়ে দাও। কথিত রয়েছে যে, তখন কিবতী হযরত মূসা (আ.)-কে বলল, আমি তো বরং তোমার উপরে তা চাপানোর ইচ্ছা করছি। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে ঘুষি মারলেন অর্থাৎ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে তাকে আঘাত করলেন। আর তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে বসলেন অর্থাৎ তিনি তাকে মেরে ফেললেন অথচ তাকে হত্যা করা তার ইচ্ছা ছিল না এবং তাকে তিনি বালুতে পুঁতে ফেললেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলা শয়তানের কাণ্ড যা আমার ক্রোধকে উত্তেজিতকারী। সে তো প্রকাশ্য শত্রু আদম সন্তানের জন্য ও স্পষ্ট বিভ্রান্তকারী তাঁকে।

অনুবাদ :

١٦. قَالَ نَادِمًا رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ بِقَتْلِهٖ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَىِ الْمُتَّصِفُ بِهِمَا اَزَلًا وَّاَبَدًا ۔

১৬. তিনি বললেন লজ্জিত হয়ে হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; তাকে হত্যা করার মাধ্যমে। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ অনাদি অনন্তকাল তিনি এ গুণে গুণান্বিত।

١٧. قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ بِحَقِّ اِنْعَامِكَ عَلَىَّ بِالْمَغْفِرَةِ اَعْصِمْنِىْ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا عَوْنًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ۔ الْكَافِرِيْنَ بَعْدَ هٰذِهٖ اِنْ عَصَمْتَنِىْ ۔

১৭. তিনি আরো বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমার উপর আপনার ক্ষমার অনুগ্রহের দাবি এই যে, আমি কখনো দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্যকারী হবো না। অর্থাৎ কাফেরদের, আপনি আমাকে রক্ষা করার পর।

١٨. فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ يَنْتَظِرُ مَا يَنَالُهٗ مِنْ جِهَةِ الْقَتِيْلِ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ط يَسْتَغِيْثُ بِهٖ عَلٰى قِبْطِىٍّ اٰخَرَ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ۔ بَيِّنُ الْغَوَايَةِ لِمَا فَعَلْتَهٗ اَمْسِ وَالْيَوْمَ ۔

১৮. অতঃপর ভীত সতর্কাবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হলো নিহতের পক্ষ থেকে কি ঘটে, তার অপেক্ষায়। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, আগের দিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে অপর এক কিবতীর বিরুদ্ধে সে তাকে সাহায্য করার জন্য আহবান জানাচ্ছে। হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। তুমি গতকাল এবং আজ যা করছ তার কারণে।

١٩. فَلَمَّآ اَنْ زَائِدَةٌ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لِمُوْسٰى وَالْمُسْتَغِيْثِ بِهٖ قَالَ الْمُسْتَغِيْثُ ظَانًّا اَنَّهٗ يَبْطِشُ بِهٖ لَمَّا قَالَ لَهٗ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ق اِنْ مَا تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۔ فَسَمِعَ الْقِبْطِىُّ ذٰلِكَ فَعَلِمَ اَنَّ الْقَاتِلَ مُوْسٰى فَانْطَلَقَ اِلٰى فِرْعَوْنَ فَاَخْبَرَهٗ بِذٰلِكَ ۔ فَاَمَرَ فِرْعَوْنُ الذَّبَّاحِيْنَ بِقَتْلِ مُوْسٰى فَاَخَذُوا الطَّرِيْقَ اِلَيْهِ ۔

১৯. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হলেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ও সাহায্যপ্রার্থীর শত্রুকে। সে বলল সাহায্যপ্রার্থী, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তিনি তাকেই ধরে ফেলবেন, যেহেতু একটু পূর্বেই তাকে কটুকথা বলেছেন। হে মূসা গতকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছো, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না। কিবতী এটা শুনে জানতে পারল যে, গতকালের হত্যাকারী হযরত মূসা (আ.)-ই। কাজেই সে দ্রুত ফেরাউনের দরবারে গিয়ে এ মর্মে তাকে অবহিত করল। এটা শুনে ফেরাউন তৎক্ষণাৎ জল্লাদদেরকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে দিল। তারা তাকে আটক করার জন্য রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল।

অনুবাদ :

٢٠. قَالَ تَعَالَى وَجَاءَ رَجُلٌ هُوَ مُؤْمِنُ اٰلِ فِرْعَوْنَ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ اٰخِرِهَا يَسْعٰى زِ يُسْرِعُ فِىْ مَشْيِهٖ مِنْ طَرِيْقٍ اَقْرَبَ مِنْ طَرِيْقِهِمْ قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ يَتَشَاوَرُوْنَ فِيْكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ فِى الْاَمْرِ بِالْخُرُوْجِ .

২০. আল্লাহ তা'আলা বলেন– এক ব্যক্তি আসল সে ছিল ফেরাউন সম্প্রদায়ের এক মুমিন ব্যক্তি শহরের দূর প্রান্ত হতে শেষ প্রান্ত হতে ছুটে দ্রুত বেগে জল্লাদের রাস্তার তুলনায় নিকটবর্তী এক রাস্তা ধরে। সে বলল, হে মূসা! ফেরাউনের পরিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি বের হয়ে যান শহর থেকে আমি তো আপনার মঙ্গলকামী। বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দানে।

٢١. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ لُحُوْقَ طَالِبٍ اَوْ غَوْثَ اللّٰهِ اِيَّاهُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ .

২১. তিনি ভীত সতর্ক অবস্থায় তথা হতে বেরিয়ে পড়লেন কোনো অনুসন্ধানকারীর সাক্ষাতের ভয়ে অথবা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকামী হয়ে তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি জালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاسْتَوٰى : মুসান্নিফ (র.) এর ব্যাখ্যা করেছেন– اَىْ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ৪০ বছর বয়সে উপনীত হলেন। বস্তুত এর ব্যাখ্যা– اِنْتَهٰى شَبَابُهٗ وَتَكَامَلَ عَقْلُهٗ দ্বারা করলে তা আরো সমীচীন হতো। কেননা ১০ বছর মাদায়েনে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর খেদমত করার পর হযরত মূসা (আ.) মিশর চলে আসেন। তখন হযরত মূসা (আ.)-এর বয়স হয়েছিল তখন ৪০ বছর। অর্থাৎ মূসা (আ.) মিশরে ৩০ বছর অবস্থান করেন। যদি তিনি মিশরে ৪০ বছর ছিলেন এ কথা মেনে নেওয়া হয়, যেমনটা ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লেখ করেছেন তাহলে মাদায়েন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত মূসা (আ.)-এর বয়স হওয়া উচিত ছিল ৫০ বছর। অথচ তা উল্লিখিত কথার পরিপন্থি।

قَوْلُهُ مُنْف : ফেরআউন যে নগরীতে থাকত এটা উক্ত নগরীর নাম। এটা عَلَمِيَّتْ ও عُجْمَةْ -এর কারণে কিংবা عَلَمِيَّتْ ও تَانِيْث -এর কারণে غَيْر مُنْصَرِفْ ; এটাকে مَنُوْف শহরও বলা হয়।

قَوْلُهُ فَقَضٰى عَلَيْهِ : এটা اَوْقَعَ الْقَضَاءَ অর্থে হওয়ার কারণে عَلٰى -এর সাহায্যে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ قَصْدُهٗ : এটা নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : হযরত মূসা (আ.) শরিয়ত বিরোধী এ হত্যা কিভাবে করলেন যে, হত্যাযোগ্য নয়, এমন ব্যক্তিকে মেরে ফেললেন?

উত্তর : এটা قَتْل عَمْد [স্বেচ্ছায় হত্যা] নয়; বরং এটা ছিল قَتْل خَطَأ [ভুলবশত হত্যা]। আর হত্যার কারণে তার ক্ষমা প্রার্থনা করাটা حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ [তথা সাধারণ নেককারদের অনেক ভালো কাজ আল্লাহর নৈকট্যভাজনদের জন্য পাপরূপে বিবেচিত] -এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ هٰذَا اَىْ قَتْلُهُ : اَىْ قَتْلُهُ বলে هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এর দ্বারা হত্যাক্রিয়া উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য স্থির করেছেন নিহত ব্যক্তির ক্রিয়াকে। অর্থাৎ নিহত লোকটির ক্রিয়া অর্থাৎ ইসরাইলীকে বাধ্য করাটা শয়তানী কাজ তথা অন্যায় ছিল এবং সাজাযোগ্য অপরাধ ছিল।

আবার কেউ কেউ স্বয়ং কিবতীকেই এর مُشَارٌ اِلَيْهِ বলেছেন। অর্থাৎ কিবতী নিজেই শয়তানের বাহিনী ও তার সাঙ্গ পাঙ্গদের সদস্য ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-এর اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ বলা নিজ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ স্বরূপ ছিল।

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ بِحَقِّ اِنْعَامِكَ عَلَىَّ : মুসান্নিফ (র.) بِمَآ اَنْعَمْتَ -এর ব্যাখ্যা بِحَقِّ اِنْعَامِكَ দ্বারা করে দুটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যথা- ১. بِمَا -এর مَا হলো مَصْدَرِيَّة অর্থাৎ اَنْعَمْتَ ক্রিয়াটি اِنْعَامِكَ অর্থে, আর বাক্যে বিলুপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ بِحَقِّ اِنْعَامِكَ ২. اَعْصِمْنِىْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, جَارْ مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّقْ হয়েছে اَعْصِمْنِىْ -এর সাথে। বাক্যটি এরূপ হবে- اَعْصِمْنِىْ بِحَقِّ اِنْعَامِكَ عَلَىَّ بِالْمَغْفِرَةِ

قَوْلُهُ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ : এ বাক্যটি উহ্য شَرْط -এর جَوَابْ ; বাক্যটি এরূপ হবে- اِنْ عَصَمْتَنِىْ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

قَوْلُهُ بَعْدَ هٰذِهٖ اَىْ بَعْدَ هٰذِهِ الْمَرَّةِ : মুসান্নিফ (র.)-এর مُجْرِمِيْنَ -এর ব্যাখ্যা كَافِرِيْنَ দ্বারা করাটা সমীচীন হয়নি। কেননা এ ব্যাখ্যা মোতাবেক ইসরাঈলী লোকটি কাফের হওয়া সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ ব্যাখ্যা না করে স্বঅবস্থায় রাখাই উচিত ছিল'। -[জুমাল]

قَوْلُهُ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ : এখানে مَدِيْنَة দ্বারা সে শহর উদ্দেশ্য যেখানে قِبْطِىْ নিহত হয়েছিল।

قَوْلُهُ خَآئِفًا : এটা اَصْبَحَ -এর خَبَرْ আর فِى الْمَدِيْنَةِ হলো তার مُتَعَلِّقْ; يَتَرَقَّبُ -এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَتَرَقَّبُ الْمَكْرُوْهَ অথবা اَلْفَرَجَ অথবা اَلْخَبَرَ

قَوْلُهُ اِذَا الَّذِىْ : এখানে اِذَا টি مُفَاجَاتِيَه বা আকস্মিকতাজ্ঞাপক। اَلَّذِىْ . مَوْصُوْل আর اِسْتَنْصَرَهٗ হলো صِلَة উভয়টি মিলে উহ্য اَلْاِسْرَائِيْلِىُّ . مَوْصُوْف -এর صِفَتْ অতঃপর مَوْصُوْف . صِفَتْ মিলে مُبْتَدَأ এবং يَسْتَصْرِخُهٗ হলো خَبَرْ এখানে بِالْاَمْسِ মুতা'আল্লিক হলো اِسْتَنْصَرَهٗ -এর সাথে। বাক্যটি এরূপ ছিল- اِذَا الْاِسْرَائِيْلِىُّ الَّذِىْ اِسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ

قَوْلُهُ يَسْعٰى : এটা رَجُلٌ -এর صِفَتْ আর يَسْعٰى . رَجُلٌ -এর حَالْ -ও হতে পারে। কেননা رَجُلٌ শব্দটি مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ -এর সাথে مُتَّصِفْ বা গুণান্বিত হওয়ায় مَعْرِفَة হয়েছে। এ হিসেবে ذُوالْحَالْ হওয়া সঙ্গত হয়েছে। اَلْمَلَاُ হলো اِسْم جِنْس - ভদ্র ও সুসভ্য দল, নেতৃবর্গ يَاْتَمِرُوْنَ ক্রিয়াটি اِيْتِمَارٌ থেকে গঠিত। অর্থ- পরামর্শ করা, اِيَّاهُ যমীর مُوْسٰى -এর প্রতি ফিরেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ.) এর জন্ম, তাঁর নিরাপত্তার অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা এবং দুশনের গৃহে তাঁর লালন-পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, আর এ আয়াতে তাঁর যৌবনের কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

اَشُدٌّ -এর শাব্দিক অর্থ শক্তি ও জোরের চরম সীমায় পৌছা। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি- সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে যখন তাঁর অস্তিত্বে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই اَشُدٌّ বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজায অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারো এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারো দেরীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে اَشُدٌّ -এর জমানা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে

দেহের বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে থেমে যায়। এরপর চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিরতিকাল। একে إِسْتَوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, أَشُدٌّ তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا : حُكْم বলে নবুয়ত ও রিসালত এবং عِلْم বলে বিধি বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে مَدِيْنَةٌ বলে মিশর নগরী বুঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) মিশরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল। অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে হযরত মূসা (আ.) তাঁর সত্যধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারী দল বলা হতো। مِنْ شِيْعَتِهٖ শব্দটি এরই সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে ইসহাক ও ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, হযরত মূসা (আ.) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্যধর্মের কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফিরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু স্ত্রী আছিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর হযরত মূসা (আ.) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিশর নগরীতে আগমন করতেন। عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا বলে অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে দ্বি-প্রহর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ দিবানিদ্রায় মশগুল থাকত। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى : وَكَزَ শব্দের অর্থ ঘুষি মারা। فَقَضٰى عَلَيْهِ : বাক পদ্ধতিতে قَضَاءٌ ও قَضٰى عَلَيْهِ তখন বলা হয় যখন কারো ভবলীলা সম্পূর্ণ সাঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَلَهٗ : এই আয়াতের সারমর্ম এই যে, হযরত মূসা (আ.) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুয়ত ও রিসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থি এবং তাঁর পয়গাম্বরসুলভ মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর গুনাহ সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমাও করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাফের শরিয়তের পরিভাষায় হরবী কাফের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা সে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রের জিম্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথেও তার কোনো চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ.) একে 'শয়তানের কাজ ও গুনাহ' কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যত ছওয়াবের কাজ হওয়া উচিত ছিল। কারণ সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্য এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোনো সময় লিখিত হয় এবং কোনো সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জিম্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তির স্বরূপ : যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোনো রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয় পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে, সেই স্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তিরূপে গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার একটি দীর্ঘ হাদীস এর প্রমাণ। হাদীসটি ইমাম বুখারী شُرُوْط অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ঘটনা এই যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা একদল কাফেরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতেন। কিছুদিন পর তিনি তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পত্তি দখল করে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। তিনি কাফেরদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন, তা

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- أَمَّا الْإِسْلَامُ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِيْ شَيْءٍ আবূ দাউদের রেওয়াতের এর ভাষ্য এরূপ- أَمَّا الْمَالُ فَمَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ অর্থাৎ তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, এখন তুমি একজন মুসলমান। কিন্তু এই ধন-সম্পদ বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের পথে অর্জিত হয়েছে। কাজেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ শান্তির অবস্থায় লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। কেননা এক জনপদের অধিবাসী অথবা যারা একসাথে কাজ করে, তারা একে অপরের কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। তাদের এই কার্যগত চুক্তি একটি আমানত। এই আমানত আমানতকারীকে অর্পণ করা ফরজ, সে কাফের হোক কিংবা মুসলিম। একমাত্র লড়াই ও জয়লাভের আকারেই কাফেরদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল হয়। শান্তিকালে যখন একে অপরের কাছে থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, তখন কাফেরদের ধন-সম্পদ লুটে নেওয়া জায়েজ নয়। বুখারীর টীকাকার আল্লামা কুস্তল্লানী (র.) বলেন-

إِنَّ أَمْوَالَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنْ كَانَتْ مَغْنُوْمَةً عِنْدَ الْقَهْرِ فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا عِنْدَ الْأَمْنِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ مُصَاحِبًا لَهُمْ فَقَدْ أَمَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاحِبَهُ فَسَفَكَ الدِّمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ مَعَ ذٰلِكَ غَدْرٌ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ.

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুশরিকদের ধন-সম্পদ যুদ্ধাবস্থায় হালাল; কিন্তু শান্তির অবস্থায় হালাল নয়। কাজেই যে মুসলমান কাফেরদের সাথে বসবাস করে এবং কার্যগতভাবে একে অপরের কাছ থেকে নিরাপদ থাকে, তদবস্থায় কোনো কাফেরকে হত্যা করা কিংবা জোর প্রয়োগে তার অর্থ-সম্পদ নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও হারাম, যে পর্যন্ত তাদের এই কার্যগত চুক্তি প্রত্যাহার করার ঘোষণা না করা হয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েজ হতো না; কিন্তু হযরত মূসা (আ.) তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবত হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। হযরত মূসা (আ.) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরো কম মাত্রার প্রহারই যথেষ্ট ছিল। কাজেই এই বাড়াবাড়ি আমার জন্য জায়েজ ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাজ আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

কোনো তাফসীরকার বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল; কিন্তু পয়গাম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এ ক্ষেত্রে হযরত মূসা (আ.) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গুনাহ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ : হযরত মূসা (আ.)-এর বিচ্যুতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকর আদায় করণার্থে আরজ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে এ কাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহপ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আববাস (রা.) থেকে এ স্থলে مُجْرِمِيْنَ [অপরাধী] -এর তাফসীরে كَافِرِيْنَ [কাফের] বর্ণিত আছে। কাতাদা (র.)-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তাফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত মূসা (আ.) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর এই উক্তি থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা প্রমাণিত হয়-

১. মজলুম কাফের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। ২. কোনো জালিম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েজ নয়। আলেমগণ এই আয়াতদৃষ্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার অধীনে চাকরিকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূববর্তী মনীষীগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। -[রূহুল মা'আনী]

কাফের অথবা জালিমদের সাহায্য-সযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফিকহের গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। মুফতি শফী (র.) আরবীতে লিখিত 'আহকামুল কুরআন'-এ এ আয়াতের প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছেন। জানান্বেষী বিজ্ঞজন তা দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهُ فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ : কিবতী ব্যক্তির হত্যার ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। কেননা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিশোধ নিতে পারে, এ আশঙ্কা অতি স্বাভাবিক। বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের নিকট নিহত কিবতীর উত্তরাধিকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল। এমনি অবস্থায় তাঁর ভীত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ফেরাউনের নিকট অনেক লোক হাজির হয়ে বলল, বনী ইসরাঈলরা আমাদের একজনকে হত্যা করেছে। আমরা এ হত্যার বিচার চাই। ফেরাউন বলল, ঘাতকের অনুসন্ধান কর এবং হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সাক্ষ্য পেশ কর, এতদ্ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। লোকেরা তখন ঘাতকের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ল।

قَوْلُهُ فَاِذَا الَّذِىْ اسْتَنْصَرَهُ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ الخ : এমনি অবস্থায় পরদিন আরেকটি ঘটনা ঘটে। তিনি দেখতে পান, গতকাল যার সাহায্যে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিটি আজ আরেক কিবতীর সঙ্গে লড়াই রত রয়েছে এবং গতকালের ন্যায় আজও সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য কামনা করলো।

হযরত মূসা (আ.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমিই সকল নষ্টের মূল, তা না হলে প্রতিদিন শুধু তোমার সঙ্গেই কেন মানুষের ঝগড়া হয়? হযরত মূসা (আ.) গতকালের ঘটনার নিজেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। কেননা তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর হাতে একজন কিবতী নিহত হয়েছে। আর ঐ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল এ বনী ইসরাঈলী ব্যক্তিটি, আজ সে পুনরায় অপর এক কিবতীর সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছে, তাই মূসা (আ.) তাকে বললেন- اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট, তুমিই সকল নষ্টের মূল কারণ। একথা বলে যখন তিনি অত্যাচারী কিবতী লোকটিকে প্রহার করার জন্যে হাত তুলতে ইচ্ছা করলেন তখন ইসরাঈলী ব্যক্তিটি মনে করছিল, তিনি ধমক যখন আমাকে দিয়েছেন, হয়তো আমাকেই তিনি প্রহার করতে চান, তাই 'সে বলল, হে মূসা! আপনি কি আমাকে হত্যা করতে চান? যেমন গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, আপনি দেখি দেশের মধ্যে বলপ্রয়োগ তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে চান, আপনি শান্তি সৃষ্টির প্রয়াসী নন। ইসারাঈলী ব্যক্তিটি একথা বলে গতকালের ঘটনা প্রকাশ করে দেয় এবং গতকালের ঘাতকের সন্ধান দেয়। অথচ হযরত মূসা (আ.) চেয়েছিলেন তাকে সাহায্য করতে এবং জালেম কিবতীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে; কিন্তু সে ভুল বুঝে এ মন্তব্য করে বসে। এরপর যা হবার তাই হয়, অর্থাৎ এ রহস্য উদঘাটিত হয় যে, হযরত মূসা (আ.)-এর হাতেই কিবতীর নিহত হবার ঘটনা ঘটেছে। দাবানলের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ফেরাউনের গোচরীভূত হয়। এদিকে ফেরাউনের পরিষদবর্গ ফেরাউনকে এ পরামর্শ দেয় যে, মূসার দুঃসাহস উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, এমনকি আজ রাজার জাতির বিরুদ্ধে হাত তুলতে এবং তাদেরকে হত্যা করতেও তার বাঁধেনি। অতএব, তার কঠোর শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড একান্ত জরুরি। ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং তাকে ধরে আনার জন্য লোকও প্রেরিত হয়। এদিকে ফেরাউনের দরবারেই এক ব্যক্তির মন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি সহমর্মিতায় এবং তাঁর কল্যাণ কামানায় উদ্বেলিত হয়ে উঠে, সে অনতিবিলম্বে সকলের অলক্ষ্যে ছুটে আসে এবং হযরত মূসা (আ)-কে অতিসত্বর শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। তাফসীরকারগণ তাঁর নামোল্লেখ করেছেন হাজঈল। ফেরাউনের জাতির মধ্যে এ ব্যক্তি ছিলো মুমিন। কেউ কেউ তাঁর নাম বলেছেন শামউন। আর কেউ বলেছেন সামআ।

তাঁর অন্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য ছিল গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি এবং মহব্বত, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَجَاۤءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসে এবং বলে, হে মূসা রাজার পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে, তুমি [এ মুহূর্তে] নগর থেকে বাইরে চলে যাও, নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রাখ যে, আমি তোমার একান্ত কল্যাণকামী। আর এজন্যেই আমি তোমাকে সতর্ক করার জন্যে দৌড়ে এসেছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) ঐ ব্যক্তির পরামর্শ মোতাবেক অনতিবিলম্বে মিশর ছেড়ে যান। তিনি তখন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, আর এ আশঙ্কা করছিলেন যে, ফেরাউনের সৈন্যরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করবে।

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

আল্লামা আলুসী (র.) বলেছেন; যে ব্যক্তিটি হযরত মূসা (আ.)-কে সতর্ক করার জন্যে এসেছিলেন, তাঁর নাম ছিল হিজকীল, আর কেউ বলেছেন, শামউন ইবনে ইসহাক। আর তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাতো ভাই। একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি এ মহান দায়িত্ব পালন করেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ৫৮]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ফেরাউনের লোকেরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু ধাওয়া করল, এ ব্যক্তিও হয়তো কিছুটা আগে ঐ একই পরামর্শ সভা থেকে বের হয়ে আসে, তারা হযরত মূসা (আ.)-কে পেল না, অথচ তিনি কি করে পেলেন?

ইমাম তাবারী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় দিন যে কিবতী লোকটির সঙ্গে ইসরাঈলী ব্যক্তির সংঘর্ষ চলছিল, যখন সে ইসরাঈলী ব্যক্তি থেকে একথা শ্রবণ করে যে, 'হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছো? তখনই সে দ্রুতবেগে ফেরাউনের দরবারে এসে বলল, গতকালের ঘাতকের সন্ধান পেয়েছি, সে হলো মূসা। তখন ফেরাউন তার জল্লাদদেরকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করল, তারা রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হলো, তারা নিশ্চিত ছিল যে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব তারা অনায়াসে পালন করভে পারবে।

কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর হিতাকাংখী ঐ ব্যক্তি রাজপথ দিয়ে নয়; বরং ছোট ছোট গলি দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে তাদের পূর্বেই হযরত মূসা (আ.)-কে সতর্ক করে দিয়ে ফিরে যান। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২০, পৃ. ৩৩]

ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে : তত্ত্বজ্ঞাণীগণ বলেছেন, প্রথম দিনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং আল্লাহ পাক ক্ষমাও করেছিলেন। এরপর তিনি আল্লাহ পাকের সঙ্গে একটি ওয়াদা করেছিলেন যে– رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! যেহেতু তুমি আমাকে নিয়ামত দান করেছো, তাই আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

এ শপথের সময় হযরত মূসা (আ.) 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি ব্যবহার করেননি, আর এ কারণেই পরদিন সকালে তিনি পুনরায় একই বিপদে পড়েছেন এবং তিনি তাঁর সংকল্পে স্থির থাকতে পারেননি।

–[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৩০৫]

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন : আলোচ্য ঘটনায় প্রিয়নবী ﷺ -এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের জল্লাদরা হত্যা করতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে মক্কার দুরাত্মা কাফেররা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও হত্যা করার অপচেষ্টা করবে। আর যেভাবে আল্লাহ পাক তাঁর নবী হযরত মূসা (আ.)-কে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনী ষড়যন্ত্রগুলোকে বানচাল করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে মক্কার কাফেরদের সকল চক্রান্তকেও তিনি নস্যাৎ করে দেবেন এবং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও হেফাজত করবেন। আর অবেশেষে তা-ই হয়েছিল।

অনুবাদ :

٢٢. وَلَمَّا تَوَجَّهَ قَصَدَ بِوَجْهِهِ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ جِهَتَهَا وَهِيَ قَرْيَةُ شُعَيْبٍ مَسِيْرَةَ ثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ مِنْ مِصْرَ سُمِّيَتْ بِمَدْيَنَ ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ طَرِيْقَهَا قَالَ عَسٰى رَبِّيْ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ - اَيْ قَصْدَ الطَّرِيْقِ اَيِ الطَّرِيْقَ الْوَسَطَ اِلَيْهَا فَاَرْسَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِيَدِهِ عَنَزَةٌ فَانْطَلَقَ بِهِ اِلَيْهَا .

২২. যখন হযরত মূসা (আ.) মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করলেন স্বীয় মুখমণ্ডলকে মাদায়েন অভিমুখী করার সংকল্প করলেন। আর তা হলো হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গ্রাম, মিশর থেকে আট দিনের দূরত্বের পথ। মাদায়েন ইবনে ইবরাহীম -এর নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে, আর তিনি এর রাস্তাও চিনতেন না। তখন তিনি বললেন, আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ মাদায়েন গমনের সোজা রাস্তা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন, তার হাতে ছিল একটি বর্শা। উক্ত ফেরেশতা তাকে মাদায়েন নিয়ে গেলেন।

٢٣. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ بِئْرٍ فِيْهَا اَيْ وَصَلَ اِلَيْهَا وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً جَمَاعَةً كَثِيْرَةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ز مَوَاشِيَهُمْ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ اَيْ سِوَاهُمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ ج تَمْنَعَانِ اَغْنَامَهُمَا عَنِ الْمَاءِ قَالَ مُوْسٰى لَهُمَا مَا خَطْبُكُمَا اَيْ شَاْنُكُمَا لَا تَسْقِيَانِ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ سكته جَمْعُ رَاعٍ اَيْ يَرْجِعُوْا مِنْ سَقْيِهِمْ خَوْفَ الزِّحَامِ فَنَسْقِيْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُصْدِرُ مِنَ الرُّبَاعِيْ اَيْ يَصْرِفُوْا مَوَاشِيَهُمْ عَنِ الْمَاءِ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَقْدِرُ اَنْ يَسْقِيَ .

২৩. যখন তিনি মাদায়েনের কূপের নিকট পৌঁছলেন, তখন দেখলেন একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে তাদের ব্যতীত দু'জন নারীকে তাদের পশুগুলো আগলিয়ে রাখছে পানি থেকে বিরত রাখছে। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান করাচ্ছ না? তারা বলল, আমরা আমাদের জানোয়ার গুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলো নিয়ে সরে না যায়। اَلرِّعَاءُ শব্দটি رَاعٍ -এর বহুবচন। অর্থ– রাখাল। অর্থাৎ পান করানো শেষে চলে যায়। ভীড়ের আশঙ্কায়। তারপর আমরা পান করাব। অপর এক কেরাতে يُصْدِرُ তথা رُبَاعِيْ হতে রয়েছে। অর্থাৎ, পানি হতে তাদের পশুগুলোকে যতক্ষণ ফিরিয়ে না নেয়। আর আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ তিনি এগুলোকে পানি পান করাতে সক্ষম নন।

٢٤. فَسَقٰى لَهُمَا مِنْ بِئْرٍ اُخْرٰى بِقُرْبِهَا رَفَعَ حَجَرًا عَنْهَا لَا يَرْفَعُهُ اِلَّا عَشَرَةُ اَنْفُسٍ ثُمَّ تَوَلّٰى اِنْصَرَفَ اِلَى الظِّلِّ سَمُرَةٍ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الشَّمْسِ وَهُوَ جَائِعٌ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ طَعَامٍ فَقِيْرٌ . مُحْتَاجٌ فَرَجَعَتَا اِلٰى اَبِيْهِمَا فِيْ زَمَنٍ اَقَلَّ مِمَّا كَانَتَا تَرْجِعَانِ فِيْهِ فَسَاَلَهُمَا عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَتَاهُ بِمَنْ سَقٰى لَهُمَا فَقَالَ لِاِحْدٰهُمَا اُدْعِيْهِ لِيْ .

٢٥. قَالَ تَعَالٰى فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز اَيْ وَاضِعَةً كُمَّ دِرْعِهَا عَلٰى وَجْهِهَا حَيَاءً مِنْهُ قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَاَجَابَهَا مُنْكِرًا فِيْ نَفْسِهِ اَخْذَ الْاُجْرَةِ وَكَاَنَّهَا قَصَدَتِ الْمُكَافَاةَ اِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرِيْدُهَا فَمَشَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَتِ الرِّيْحُ تَضْرِبُ ثَوْبَهَا فَتَكْشِفُ سَاقَهَا فَقَالَ لَهَا اِمْشِيْ خَلْفِيْ وَدُلِّيْنِيْ عَلَى الطَّرِيْقِ فَفَعَلَتْ اِلٰى اَنْ جَآءَ اَبَاهَا وَهُوَ شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

অনুবাদ :

২৪. অতঃপর হযরত মূসা (আ.) তখন তাদের পক্ষে জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালেন নিকটস্থ অপর একটি কূপ থেকে তিনি একাই সে কূপের মুখের পাথর সরিয়ে ফেললেন, যা দশজন ব্যতীত সরানো সম্ভব ছিল না, এরপর ছায়ার নিচে আশ্রয় নিলেন ফিরে গেলেন, বাবুল বৃক্ষের নিচে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে। আর তখন তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন আমি তার কাঙ্গাল। মুখাপেক্ষী। এরপর নারীদ্বয় উভয়েই তাদের পিতার নিকট ফিরে গেলেন। প্রাত্যহিক ফিরে যাওয়ার সময়ের পূর্বেই ফিরে গেলেন। ফলে তাদের পিতা তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা উভয়ে যিনি তাদেরকে পানি পান করিয়ে দিয়েছেন, তার সম্পর্কে বললেন। তখন তিনি তাদের একজনকে বললেন, তাঁকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসো!

২৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন– তখন নারীদ্বয়ের একজন লাজুক চরণে অর্থাৎ তার প্রতি লজ্জায় ওড়নার আঁচল মুখের উপর অবনমিত করে তার নিকট এসে বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য। হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক গ্রহণকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও তার আহবানে সাড়া দিলেন। যেন সেই মহিলার উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আ.) পারিশ্রমিক কামনা করলে তাঁকে তা প্রদান করার। এরপর সে হযরত মূসা (আ.)-এর অগ্রে চলতে লাগল। এ সময় বাতাসে তার কাপড় উড়ানোর ফলে তার পায়ে গোছা প্রকাশ পেয়ে যেতে লাগল। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে চলো এবং পেছন থেকে আমাকে রাস্তা বলে দিতে থাকো। সে তা-ই করল। এভাবে মূসা (আ.) মহিলার পিতা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট পৌঁছলেন।

وَعِنْدَهُ عَشَاءٌ قَالَ لَهُ اِجْلِسْ فَتَعَشَّ قَالَ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ عِوَضًا مِمَّا سَقَيْتُ لَهُمَا وَاَنَا اَهْلُ بَيْتٍ لَا نَطْلُبُ عَلٰى عَمَلٍ خَيْرٍ عِوَضًا قَالَ لَا عَادَتِىْ وَعَادَةُ اٰبَائِىْ نَقْرِى الضَّيْفَ وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ فَاَكَلَ وَاَخْبَرَهُ بِحَالِهِ قَالَ تَعَالٰى فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَقْصُوْصِ مِنْ قَتْلِهِ الْقِبْطِىَّ وَقَصْدِهِمْ قَتْلَهُ وَخَوْفِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ اِذْ لَا سُلْطَانَ لِفِرْعَوْنَ عَلٰى مَدْيَنَ ـ

অনুবাদ :

তখন তাঁর নিকট রাতের খাবার প্রস্তত ছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁকে বললেন, এসো, বসো। খাবারে অংশগ্রহণ কর। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ খাবার আমি যে পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছি তার পারিশ্রমিক না হয়ে যায়। কেননা আমি এমন পরিবারের মানুষ যে, নেক কাজের বিনিময়ে আমরা কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করি না। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, না এমনটি নয়; বরং এটা আমার ও আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রচলিত রীতি হচ্ছে এই- আমরা অতিথিদের আতিথেয়তা করে থাকি। তাদেরকে আহার করাই। অতঃপর হযরত মূসা (আ.) খাবার নিলেন এবং তার নিকট নিজের সকল বৃত্তান্ত খুলে বললেন। আল্লাহ বলেন, অতঃপর যখন হযরত মূসা (আ.) তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন اَلْقَصَصُ শব্দটি মাসদার; এটা اَلْمَقْصُوْصُ বা ঘটিত বিষয় অর্থে। অর্থাৎ কিবতী তার নিকট নিহত হওয়া, তাদের কর্তৃক তাকে হত্যা করার সঙ্কল্প এবং ফেরাউনের ভয়ে পলায়নের কাহিনী। তখন হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ। কেননা মাদায়েনে ফেরাউনের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

٢٦. قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا وَهِىَ الْمُرْسَلَةُ الْكُبْرٰى اَوِ الصُّغْرٰى يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ز اتَّخِذْهُ اَجِيْرًا يَرْعٰى غَنَمَنَا اَىْ بَدَلَنَا اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ اَىْ اِسْتَاْجِرْهُ لِقُوَّتِهِ وَاَمَانَتِهِ فَسَاَلَهَا عَنْهُمَا فَاَخْبَرَتْهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ رَفْعِهِ حَجَرَ الْبِئْرِ وَمِنْ قَوْلِهِ لَهَا اِمْشِىْ خَلْفِىْ وَزِيَادَةٍ اَنَّهَا لَمَّا جَاءَتْهُ وَعَلِمَ بِهَا صَوَّبَ رَاْسَهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ فَرَغِبَ فِىْ اِنْكَاحِهِ ـ

২৬. তাদের একজন বলল, সে হলো হযরত মূসা (আ.)-কে ডেকে আনার জন্য প্রেরিত জন ছোটজন বা বড়জন, হে পিতা! আপনি তাঁকে মজুর নিযুক্ত করুন অর্থাৎ তাকে মজুর হিসেবে রাখুন, তিনি আমাদের পরিবর্তে আমাদের ছাগলগুলো ছড়াবেন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। অর্থাৎ তার শক্তি ও আমানতদারীর কারণে তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। হযরত শুয়াইব (আ.) তখন কন্যার নিকট এ দু ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, সে পূর্বে ঘটে যাওয়া কয়েকটি বিষয়ে তাঁকে অবহিত করল। যেমন- হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক কূপের পাথর সরিয়ে ফেলা এবং "তুমি আমার পেছনে হাঁট" উক্তিটি। উপরন্তু সে যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট এসেছিল, আর তিনি তার ব্যাপারে অবগত হলেন তখন তিনি যে মস্তকাবনত করেছিলেন তারপর থেকে তিনি তার প্রতি মাথা উত্তোলন করেননি। এতদ শ্রবণে হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর নিকট কন্যা বিবাহদানের প্রতি আগ্রাহান্বিত হলেন।

অনুবাদ :

٢٧. قَالَ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ وَهِيَ الْكُبْرٰى اَوِ الصُّغْرٰى عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِيْ تَكُوْنُ اَجِيْرًا لِيْ فِيْ رَعْيِ غَنَمِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ج اَيْ سِنِيْنَ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا اَيْ رَعْيَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَمِنْ عِنْدِكَ ج اَلتَّمَامُ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ط بِاِشْتِرَاطِ الْعَشْرِ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ لِلتَّبَرُّكِ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ الْوَافِيْنَ بِالْعَهْدِ .

২৭. তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই। সে হলো বড়জন বা ছোট জন। এ শর্তে যে, তুমি আমার কাজ করবে। অর্থাৎ তুমি আমার বকরি চড়ানোর মজুর হবে আট বৎসর; যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর অর্থাৎ দশবছর চড়ানো সে তোমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না দশ বৎসরের শর্তারোপ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। অর্থাৎ অঙ্গীকার পূর্ণকারীদের অন্তর্গত। এখানে اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ মূলত বরকত হাছিলের জন্য বলা হয়েছে।

٢٨. قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ الَّذِيْ قُلْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ط اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ الثَّمَانَ اَوِ الْعَشْرَ وَمَا زَائِدَةٌ اَيْ رَعْيَهُ قَضَيْتَ بِهِ اَيْ فَرَغْتَ عَنْهُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ اَنَا وَاَنْتَ وَكِيْلٌ . حَفِيْظٌ اَوْ شَهِيْدٌ فَتَمَّ الْعَقْدُ بِذٰلِكَ وَاَمَرَ شُعَيْبٌ اِبْنَتَهٗ اَنْ تُعْطِيَ مُوْسٰى عَصًا يَدْفَعُ بِهَا السِّبَاعَ عَنْ غَنَمِهٖ وَكَانَتْ عِصِيُّ الْاَنْبِيَاۤءِ عِنْدَهٗ فَوَقَعَ فِيْ يَدِهَا عَصَا اٰدَمَ مِنْ اٰسِ الْجَنَّةِ فَاَخَذَهَا مُوْسٰى بِعِلْمِ شُعَيْبٍ .

২৮. হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা অর্থাৎ যা আপনি বললেন আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি রইল অর্থাৎ আট বা দশ বৎসর। আর اَيَّمَا -এর مَا টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ উক্ত মেয়াদ চরানো। এই দুই মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার উপর কোনো অভিযোগ থাকবে না তার চেয়ে অতিরিক্তের ব্যাপারে। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আমি ও আপনি আল্লাহ তার সাক্ষী। রক্ষক বা সাক্ষী। এ ব্যাপারে চুক্তি চূড়ান্ত হয়ে গেল। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে নির্দেশ দিলেন হযরত মূসা (আ.) কে একটি লাঠি প্রদান করতে, যার দ্বারা তিনি তাঁর ছাগপালের উপর হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করবেন। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট নবীগণের লাঠি সুরক্ষিত ছিল। তার হাত হযরত আদম (আ.)-এর বেহেশতের মাওরো বৃক্ষের ডালের যে লাঠি ছিল তার উপর পতিত হলো। হযরত মূসা (আ.) তা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর অবগতির সাথে গ্রহণ করলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سَوَاءَ السَّبِيْلِ : এখানে اِضَافَتُ الصِّفَتِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ ঘটেছে। অর্থাৎ سَوَاءَ الطَّرِيْقَ الْوَسْطُ আর قَصْدُ السَّبِيْلِ এর ব্যাখ্যা করেছেন قَصْدُ السَّبِيْلِ দ্বারা, এটা এ কথা বুঝানোর জন্য যে, اِضَافَتُ الْمَوْصُوْفِ হিসেবে اَلطَّرِيْقُ الْوَسْطُ -এর ব্যাখ্যা হয় اَلطَّرِيْقُ

قَوْلُهُ عَنَزَة : عَنَزَهٌ অর্থ ছড়ি; যা عَصَا থেকে বড় ও বর্শা থেকে ছোট। এর নিচের মাথায় লোহার ফলক থাকে।

قَوْلُهُ مَاءَ مَدْيَنَ : এর ব্যাখ্যা بِئْر দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে حَالٌ বলে مَحَلٌ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পানি দ্বারা পানির স্থান উদ্দেশ্য। আর بِئْر -এর পূর্বে هُوَ مُبْتَدَأ. উহ্য রয়েছে। بِئْرٌ হলো তার خَبَرٌ অর্থাৎ- هُوَ بِئْرٌكَانَ فِيْهَا

قَوْلُهُ اُمَّةً : এর ব্যাখ্যা جَمَاعَةً كَثِيْرَةً দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তানভীনটি تَكْثِيْر বা আধিক্যজ্ঞাপক।

قَوْلُهُ تَذُوْدَانِ : এটা اِمْرَاَتَيْنِ -এর সিফাত। وَجَدَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل নয়। কেননা وَجَدَ এখানে لَقِىَ অর্থে

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত ক্রিয়া চতুষ্টয়ের مَفْعُوْل -গুলোকে বিলোপ করা হয়েছে কেন? يَسْقُوْنَ، تَذُوْدَانِ، وَلَا نَسْقِىْ এবং يَصْدُرُ الرِّعَاءُ

উত্তর : যেহেতু فِعْل -ই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে مَفْعُوْل নয়, এ কারণে চারোটি ফে'লের مَفْعُوْل -কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ : এটা فَاعِلْ অথবা مَفْعُوْل হয়েছে। অর্থাৎ مَشْرُوْطًا عَلٰى বা عَلَيْكَ ذَالِكَ

قَوْلُهُ التَّمَامُ : এটা উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ عِنْدِكَ যে, مِنْ عِنْدِكَ উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ

قَوْلُهُ ذَالِكَ : এটা مُبْتَدَأٌ আর بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ হলো خَبَرٌ

قَوْلُهُ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ : اَىّ হলো شَرْطِيَّةٌ আর مَا অতিরিক্ত , فَلَا عُدْوَانَ হলো جَوَابُ شَرْط

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ : শামদেশের একটি শহরের নাম মাদায়েন। মাদয়েন ইবনে ইবরামীম (আ.)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিশর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশঙ্কাবোধ করে মিশর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলা বাহুল্য, এই আশঙ্কাবোধ নবুয়ত ও তাওয়াক্কুল কোনোটিরই পরিপন্থি নয়। মাদায়েনের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, মাদায়েনেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। হযরত মূসা (আ.)-ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত মূসা (আ.) সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় মিশর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বললেন- عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ অর্থাৎ আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই দোয়া কবুল করলেন। তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন, এই সফরে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা ছিল হযরত মূসা (আ.) -এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা।

قَوْلُهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ : مَاءَ مَدْيَنَ বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ অর্থাৎ দুইজন রমণীকে দেখলেন তারা তাদের ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَوْلُهُ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِىْ .... وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ : خَطْبٌ শব্দের অর্থ- শান, অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করাও না কেন? তারা জবাব দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তাঁরা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোনো পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে এ কাজে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি এ কাজ করতে পারেন না। তাই আমরা তা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যথা-

১. দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। হযরত মূসা (আ.) যখন দুইজন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না, তখন তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন।

২. বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশত কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত কোনো অনর্থের আশঙ্কা না হয়।

৩. আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদীনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্য পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনো স্বভাবগত ভদ্রতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমণীদ্বয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে মেলামেশা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে।

৪. এ ধরনের কাজের জন্য নারীদের বাইরে যাওয়া তখনো পছন্দনীয় ছিল না। এ কারণেই রমণীদ্বয় তাদের পিতার বার্ধক্যের ওজর বর্ণনা করেছে।

قَوْلُهُ فَسَقٰى لَهُمَا : অর্থাৎ মূসা (আ.) রমণীদ্বয়ের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কূপ থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারি পাথর দ্বারা কূপের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারি পাথরটি দশজনে মিলে স্থানান্তরিত করত। কিন্তু হযরত মূসা (আ.) একাই, পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। সম্ভবত এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, সে শক্তিশালী। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ : হযরত মূসা (আ.) সাত দিন পর্যন্ত থেকে কোনো কিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। خَيْر শব্দটি কোনো কোনো সময় ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ আয়াতে হয়েছে। কোনো কোনো সময় শক্তির অর্থেও আসে। যেমন- اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ আয়াতে। আবার কোনো সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তা-ই উদ্দেশ্য। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ : কুরআনী রীতি অনুযায়ী এখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ- নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কন্যাদ্বয় বাড়ি পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কন্যারা ঘটনা খুলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অনুগ্রহ করেছে; তাকে এর প্রতিদান দেওয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলি অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীগণ পুরুষদের সাথে বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলত না। তাই প্রয়োজনবশত সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোনো কোনো তাফসীরে বলা হয়েছে যে, সে আস্তিন দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তাফসীরে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) তার

সাথে পথচলার সময় বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং রাস্তা বলে দাও। বলা বাহুল্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকাই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবত এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এ বালিকাদ্বয়ের পিতা কে ছিলেন? এ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শুয়াইব (আ.)। যেমন এক আয়াতে আছে- وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ : বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ কোনো বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থি ছিল।

قَوْلُهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ : অর্থাৎ শুয়াইব (আ.)-এর এক কন্যা তাঁর পিতার নিকট আরজ করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ চাকরের মধ্যে দুইটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা-

১. কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং ২. বিশ্বস্ততা। আমরা পাথর তুলে পানি পান করানো দ্বারা তাঁর শক্তি-সমার্থ্য এবং পথিমধ্যে বালিকাকে পশ্চাতে রেখে পথচলা দ্বারা তাঁর বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

কোনো চাকরি অথবা পদ ন্যস্ত করার জন্য জরুরি শর্ত হলো দুইটি : হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যার মুখে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বিজ্ঞসুলভ কথা উচ্চারিত করিয়েছেন। আজকাল সরকারি পদ ও চাকরির ক্ষেত্রে কাজের যোগ্যতা ও ডিগ্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হলেও বিশ্বস্ততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ সাধারণ অফিস ও পদসমূহের কর্মতৎপরতায় পূর্ণ সাফল্যের পরিবর্তে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কারণে আইন-কানুন অচলাবস্থার সম্মুখীন হয়ে গেছে। আফসোস! এই কুরআনী পথনির্দেশের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলে সবকিছু ঠিক হয়ে যেত।

قَوْلُهُ قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ : অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের পিতা হযরত শুয়াইব (আ.) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বিবাহ দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা; বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গাম্বরগণের সুন্নত। উদাহরণত হযরত ওমর (রা.) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত উসমান গনি (রা.)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। -[কুরতুবী]

হযরত শুয়াইব (আ.) উভয় কন্যার মধ্য থেকে কোনো একজনকে নির্দিষ্ট করে কথা বলেননি; বরং ব্যাপারটি অস্পষ্ট রেখে কোনো একজনকে বিবাহ দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই আলোচনা বিবাহের নিয়মিত আলোচনা ছিল না, যাতে ইজাব কবুল ও সাক্ষীদের উপস্থিত জরুরি হয়; বরং এটা ছিল আদান-প্রদানের আলোচনা যে, এই বিবাহের বিনিময়ে তুমি আট বছর আমার চাকরি করতে স্বীকৃত হলে আমি বিবাহ পড়িয়ে দিব। হযরত মূসা (আ.) এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর নিয়মিত বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার কথা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। কুরআন পাক সাধারণত কাহিনীর সেই অংশ উল্লেখ করে না, যা পূর্বাপর বর্ণনা থেকে আপনা-আপনি বুঝা যায়। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে এরূপ সন্দেহ অমূলক যে, বিবাহিতা স্ত্রীকে নির্দিষ্ট না করেই বিবাহ কিরূপে হয়ে গেল অথবা সাক্ষীদের উপস্থিত ব্যতিরেকেই বিবাহ কিরূপ সংঘটিত হলো? -[রূহুল মা'আনী, বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ : এই আট বছরের চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা হয়। স্ত্রীর চাকরিকে স্বামী তার মোহরানা সাব্যস্ত করতে পারে কিনা? এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থের সূরা কাসাসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে,

মোহরানার এই ব্যাপারটি মুহাম্মদী শরিয়তে জায়েজ না হলেও হযরত শুয়াইব (আ.)-এর শরিয়তে জায়েজ ছিল। বিভিন্ন শরিয়তে এ ধরনের শাখাগত পার্থক্য হওয়া কুরআন হাদীসে প্রমাণিত আছে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, স্ত্রীর চাকরিকে মোহরানা সাব্যস্ত করা তো স্বামীর মান-সম্মানের খেলাফ; কিন্তু স্ত্রীর যে কাজ বাড়ির বাইরে করা হয়, যেমন– পশুচারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি এ ধরনের কাজে ইজারার শর্তানুযায়ী মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হলে চাকরিকে মোহরানা করা জায়েজ। যেমন– আলোচ্য ঘটনায় আট বছরের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট মেয়াদের বেতন আদায় করা স্ত্রীর যিম্মায় জরুরি। একে মোহরানা গণ্য করা জায়েজ। –[বাদায়েউস সানায়ে'অ]

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মোহরানা স্ত্রীর প্রাপ্য। স্ত্রীর অথবা অন্য কোনো স্বজনকে স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে মোহরানার অর্থ হাতে দিয়ে দিলে মোহর আদায় হয় না। আলোচ্য ঘটনায় أَنْ تَأْجُرَنِىْ শব্দ সাক্ষ্য দেয় যে, পিতা তাকে নিজের কাজের জন্য চাকর নিযুক্ত করেন। অতএব চাকরির ফল পিতা লাভ করেছেন। এটা স্ত্রীর মোহরানা কিরূপে হতে পারে? উত্তর এই যে, প্রথমত এটাও সম্ভবপর যে,এই ছাগলগুলো বালিকাদের মালিকানাধীন ছিল। অতএব চাকরির এই ফল বালিকারাই লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত যদি হযরত মূসা (আ.) পিতারই কাজ করেন এবং পিতার জিম্মায়ই তার বেতন আদায় করা জরুরি হয়, তবে মোহরানার এই টাকা কন্যার হয়ে যাবে এবং কন্যার অনুমতিক্রমে পিতাও একে ব্যবহার করতে পারেন। বলা বাহুল্য আলোচ্য ব্যাপারটি কন্যার অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাসআলা : أُنْكِحَكَ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপারটি পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফিকহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবেন; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোনো কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরস্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযমের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোনো ফয়সালা দেয়নি।

তিনজন বুদ্ধিমান : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির ন্যায় বুদ্ধিমান এবং পরিণামদর্শী পাওয়া যায় না। আর তাঁরা হলেন–

এক. হযরত আবূ বকর (রা.) তিনি তাঁর পরে হযরত ওমর (রা.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে নির্বাচন করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

দুই. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ক্রেতা, তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে চিনে ফেলেছিলেন এবং চড়া মূল্যে ক্রয় করে তাঁর স্ত্রীর নিকট বলেছিলেন, একে ভালোভাবে রাখ।

তিন. হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কন্যা, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর সম্পর্কে সুপারিশ করেছিলেন যে, তাঁকে আমাদের কাজে নিযুক্ত করুন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে এক নজরেই তিনি চিনে ফেলেছিলেন।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১০-১১১]

হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির ইতিকথা : চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে হুকুম দিলেন যে, মূসাকে লাঠি এনে দাও, যেন সে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বকরিদের হেফাজত করতে পারে। এই লাঠিটি কিরূপ এবং কোনটি ছিল? এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। ইকরিমা (রা.)-এর ধারণা হলো যে, হযরত আদম (আ.) এই লাঠিটি জান্নাত থেকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত জিব্রাঈল (আ.) এই লাঠিটি নিজের কাছে রেখে দেন। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এক রাত্রিতে এসে তাঁকে দান করেন।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে, লাঠিটি ছিল জান্নাতের 'আস' নামক একটি বৃক্ষের। হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে লাঠিটি সঙ্গে এনেছিলেন। এরপর নবীগণ ক্রমান্বয়ে এর উত্তরাধিকারী হতে থাকেন। নবী ব্যতীত কেউ এই লাঠি লাভ করেননি। এভাবে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত আসে। অতঃপর ইব্রাহীম (আ.) পর্যন্ত আসে। তারপর হযরত শুয়াইব (আ.) লাভ করেন। অবশেষে শুয়াইব (আ.) তা হযরত মূসা (আ.)-কে দান করেন।

সুদ্দী (র.) বর্ণনা করেন যে, একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে এসে এ লাঠিটি হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কাছে আমানত রেখেছিলেন। যখন হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর কন্যাকে লাঠি আনার হুকুম দিলেন তখন সে এই লাঠিটিই নিয়ে আসে। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, এই লাঠি ফেরত নিয়ে যাও, অন্যটি নিয়ে এসো! কন্যা লাঠি ফেরত নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল এবং অন্য লাঠি উঠাতে চাইল। কিন্তু আগের ঐ লাঠিটি ছাড়া আর কোনো লাঠি হাতে উঠলো না। শেষে এ লাঠিটিই উঠিয়ে নিয়ে আসলো। হযরত শুয়াইব (আ.) আবার তা ফেরত দিলেন। এভাবে তিন বার আনা নেওয়া হলো। অবশেষে হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে সে লাঠিটিই দিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ.) তা নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) বিবেকের কাছে লজ্জিত হয়ে বললেন, এটাতো এক ব্যক্তির আমানত ছিল। আমি এটা কেমন কাজ করলাম? তিনি তখন হযরত মূসা (আ.)-এর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে লাঠি ফেরত চাইলেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, এই লাঠি এখন আমার হয়ে গেছে। উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। অবশেষে উভয়ে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাদের সামনে আসবে তার ফায়সালা আমরা মেনে নেব। তখন একজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের সামনে আসলো। তিনি ফয়সালা করলেন যে এই লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন, তারপর যে সর্বপ্রথম লাঠিটি ধরতে পারবে, লাঠি তারই হবে। হযরত মূসা (আ.) লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) লাঠিটি আগে ধরার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হলেন না। হযরত মূসা (আ.) লাঠি ধরে ফেললেন। এভাবে হযরত শুয়াইব (আ.) লাঠিটি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

এরপর যখন হযরত মূসা (আ.) চুক্তির সময়সীমা পূর্ণ করলেন এবং হযরত শুয়াইব (আ.) নিজের কন্যাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন, তখন হযরত মূসা (আ.) স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিতাকে বল যেন তিনি আমাদেরকে কিছু বকরি প্রদান করেন। স্ত্রীর তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বকরি প্রার্থনা করলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, এ বছর দুই বর্ণ বিশিষ্ট যত বাচ্চা হবে তা তোমাদের হবে।

হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর আন্তরিক খেদমতের বিনিময় দিতে এবং নিজ কন্যার রক্তের দাবি মেটাতে ইচ্ছা করেছিলেন বলেই তিনি কন্যাকে বলেছিলেন, এ বছর যত দুই রংগা বাচ্চা হবে, সে নর হোক অথবা মাদী উভয় প্রকারই তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। তাই আল্লাহ পাক স্বপ্নে হযরত মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন, বকরির দল যেখান থেকে পানি পান করে, সেই পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত কর। হযরত মূসা (আ.) জাগ্রত হয়ে সেই পানিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন এবং বকরীর পালকে সেই পানি পান করানো হলো, যত বকরি সেই পানি পান করেছিল তাদের সব বাচ্চাই সাদা-কালো বর্ণের পয়দা হয়েছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) বুঝলেন এটা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নছীব। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যে এ রিজিক দান করেছেন। তাই হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং সকল সাদা-কালো বর্ণের বাচ্চা হযরত মূসা (আ.)-কে দান করলেন। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১৩-১৫]

অনুবাদ :

٢٩. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ اَىْ رَعْيَهُ وَهُوَ ثَمَانٍ اَوْ عَشْرٍ سِنِيْنَ وَهُوَ الْمَظْنُوْنُ بِهِ وَسَارَ بِاَهْلِهِ زَوْجَتِهِ بِاِذْنِ اَبِيْهَا نَحْوَ مِصْرَ اٰنَسَ اَبْصَرَ مِنْ بَعِيْدٍ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ اِسْمُ جَبَلٍ نَارًا ط قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا هُنَا اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ عَنِ الطَّرِيْقِ وَكَانَ قَدْ اَخْطَاهَا اَوْ جَذْوَةٍ بِتَثْلِيْثِ الْجِيْمِ قِطْعَةٍ اَوْ شُعْلَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ـ تَسْتَدْفِئُوْنَ وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ مِنْ صَلِىَ بِالنَّارِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا ـ

২৯. হযরত মূসা (আ.) যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করলেন অর্থাৎ ছাগল চরানোর মেয়াদ। আর তা হলো আট কিংবা দশ বছর আর প্রবল ধারণা মতে দশ বছরই। এবং তার পরিবার পরিজন নিয়ে যাত্রা নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। হযরত শুয়াইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে মিশর পানে। তখন তিনি অনুভব করলেন দূরে দেখতে পেলেন তূর পর্বতের দিকে তূর একটি পাহাড়ের নাম। আগুন। তিনি তার পরিজনবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর এখানে আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি রাস্তা সম্পর্কে। কারণ তিনি রাস্তা ভুল করে ফেলেছিলেন অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি جَذْوَةٌ শব্দের جِيْم বর্ণে তিনো হরকতই বৈধ। অর্থ– খণ্ড আঙ্গার। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। উত্তাপ গ্রহণ করতে পার। تَصْطَلُوْنَ -এর طَاءٌ টি اِفْتِعَالٌ -এর تَاءٌ -এর পরিবর্তে এসেছে। এটা صَلِىَ النَّارُ [لَامٌ বর্ণে যের ও যবর] হতে নিষ্পন্ন।

٣٠. فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ جَانِبِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ لِمُوْسٰى فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ لِمُوْسٰى لِسِمَاعِهِ كَلَامَ اللّٰهِ فِيْهَا مِنَ الشَّجَرَةِ بَدَلٌ مِنْ شَاطِئِ بِاِعَادَةِ الْجَارِ لِنَبَاتِهَا فِيْهِ وَهِىَ شَجَرَةُ عِنَابٍ اَوْ عُلَّيْقٍ اَوْ عَوْسَجٍ اَنْ مُفَسِّرَةٌ لَا مُخَفَّفَةٌ يٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

৩০. হযরত মূসা (আ.) যখন আগুনের নিকট পৌঁছলেন তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত একটি বৃক্ষের দিক হতে তাকে আহবান করে বলা হলো ভূমির পবিত্রতা মূলত হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য বিশেষত তথায় আল্লাহর বাণী শ্রবণের কারণে, আর مِنَ الشَّجَرَةِ এটা مِنْ شَاطِئِ -এর থেকে حَرْف جَارّ পুনরুল্লেখের মাধ্যমে بَدَل হয়েছে। উক্ত উপত্যকায় বৃক্ষটি উৎপন্ন হওয়ায়, বৃক্ষটি ছিল ইনাব বা ইল্লীক কিংবা আউসাজ তথা ঝাউ গাছ। হে মূসা! আমিই আল্লাহ জগৎসমূহের প্রতিপালক। এখানে اَنْ টি হরফে তাফসীর; مُخَفَّفَه তথা তাশদীদযুক্ত থেকে লঘুকৃত নয়।

অনুবাদ :

٣١. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ط فَالْقَاهَا فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ تَتَحَرَّكُ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَهِيَ الْحَيَّةُ الصَّغِيْرَةُ مِنْ سُرْعَةِ حَرَكَتِهَا وَلّٰى مُدْبِرًا هَارِبًا مِنْهَا وَلَمْ يُعَقِّبْ اَيْ يَرْجِعْ فَنُوْدِيَ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ.

৩১. তুমি তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন অতঃপর যখন তাকে সর্পের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন আর جَآنٌّ হলো ছোট সাপ; দ্রুতগতির কারণে। তখন পেছনের দিকে ছুটতে লাগলেন তা থেকে পালিয়ে এবং ফিরে তাকালেন না তখন পুনরায় তাকে আহবান করা হলো। হে মূসা! সম্মুখে অগ্রসর হও। ভয় করো না। তুমি তো নিরাপদ।

٣٢. اُسْلُكْ اَدْخِلْ يَدَكَ الْيُمْنٰى بِمَعْنَى الْكَفِّ فِيْ جَيْبِكَ هُوَ طَوْقُ الْقَمِيْصِ وَاَخْرِجْهَا تَخْرُجْ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْاُدْمَةِ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ز اَيْ بَرَصٍ فَاَدْخَلَهَا وَاَخْرَجَهَا تُضِيْٓئُ كَشُعَاعِ الشَّمْسِ تُغْشِي الْبَصَرَ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ بِفَتْحِ الْحَرْفَيْنِ وَسُكُوْنِ الثَّانِيْ مَعَ فَتْحِ الْاَوَّلِ وَضَمِّهِ اَيِ الْخَوْفِ الْحَاصِلِ مِنْ اِضَاءَةِ الْيَدِ بِاَنْ تُدْخِلَهَا فِيْ جَيْبِكَ فَتَعُوْدَ اِلٰى حَالَتِهَا الْاُوْلٰى وَعُبِّرَ عَنْهَا بِالْجَنَاحِ لِاَنَّهَا لِلْاِنْسَانِ كَالْجَنَاحِ لِلطَّائِرِ فَذٰنِكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اَيِ الْعَصَا وَالْيَدُ وَهُمَا مُؤَنَّثَانِ وَاِنَّمَا ذُكِّرَ الْمُشَارُ بِهِ اِلَيْهِمَا الْمُبْتَدَاُ لِتَذْكِيْرِ خَبَرِهِ بُرْهَانٰنِ مُرْسَلَانِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ.

৩২. তুমি তোমার ডান হাত অর্থাৎ হাতের তালু/অগ্রভাগ তোমার বগলে রাখ প্রবেশ করাও جَيْبٌ হলো জামার হাতা এবং তাকে বের কর বের হয়ে আসবে তার যে পীত বর্ণ ছিল তার ব্যতিক্রম শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দেশ হয়ে অর্থাৎ শ্বেতরোগ ছাড়াই। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) বগলে হাত ঢুকিয়ে তা বের করে আনলে তা সূর্যের জ্যোতির ন্যায় আলোক বিচ্ছুরণ করতে লাগল, যা চোখ ঝলসে দেয়। এবং ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চেপে ধর। اَلرَّهْبُ শব্দের প্রথম দু'বর্ণ যবর যোগে, প্রথমটি যবর ও দ্বিতীয়টি সাকিন অথবা প্রথমটি পেশ যোগেও পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ হাত সমুজ্জ্বল হওয়ার কারণে যে ভয় সঞ্চারিত হয়েছিল তা। এভাবে চেপে ধর যে, হাতকে তোমার বগলে প্রবেশ করাও! ফলে তা পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। আর হাতকে جَنَاحٌ [ডানা] এজন্য বলা হয়েছে যে, মানুষের জন্য হাত পাখির ডানার পর্যায়ে। এই দুটি فَذٰنِكَ-এর نُوْنٌ বর্ণটি তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত। অর্থাৎ লাঠি এবং হস্ত। উভয়টি স্ত্রীলিঙ্গ তবে مُشَارٌ اِلَيْهِ তথা মুবতাদাকে পুংলিঙ্গ আনা হয়েছে তার খবর তথা بُرْهَانَانِ শব্দটি পুংলিঙ্গ হওয়ার কারণে। তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। এরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَذْوَةٌ : এ শব্দে তিনো প্রকার اِعْرَابٌ হতে পারে। جَذْوَةٌ অর্থ– মাথায় আগুন বিশিষ্ট ডাল বা কাষ্ঠখণ্ড, মোটা কাষ্ঠ, مِنَ نَارٍ হলো جَذْوَةٌ -এর বয়ান, فَلَمَّا اَتَاهَا -এর মধ্যকার هَا দ্বারা উদ্দেশ্য আগুন।

قَوْلُهُ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِئِ : এর মধ্যকার مِنْ অব্যয়টি اِبْتِدَاءُ غَايَةٌ তথা সীমারেখার শুরু বুঝানোর জন্য, اَيْمَنْ হলো وَادِئْ বা شَاطِئْ -এর সিফত। جَانِبُ يَمِيْنِ তথা ডান দিক দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর ডান দিক উদ্দেশ্য। فِى الْبُقْعَةِ হলো نُوْدِىَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ

قَوْلُهُ لِسِمَاعِهِ كَلَامَ اللّٰهِ : অর্থাৎ উক্ত ময়দানটি হযরত মূসা (আ.)-এর জন্য এ কারণে মোবারক ছিল যে, উক্ত ময়দানে তাকে নবুয়ত দান করা হয়েছিল এবং মহান আল্লাহর নূরের দীদার ও তাঁর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল।

قَوْلُهُ مِنَ الشَّجَرَةِ : এটা شَاطِئٌ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالْ আর وَجْهُ مُلَابَسَةِ তথা مُبْدَلْ مِنْهُ -এর সংশ্লিষ্ট বস্তু নির্দেশকল্পে ব্যাখ্যাকার (র.) لِنَبَاتِهَا فِيْهِ বলে ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত বৃক্ষটি যেহেতু شَاطِئْ [প্রান্তে] ছিল। তাই যেন উক্ত বৃক্ষ থেকেই আহবান করা হয়েছিল। সেটা কোনো বৃক্ষ ছিল এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি রয়েছে। যথা–

১ عِنَابٌ [উনাব], এ বৃক্ষের ফলকেও উনাব বলা হয়। ফলের রং হলো লাল খয়েরী।

২. عِلِّيْقٌ [ইল্লীক] আলোক লতা, যা অন্য গাছের উপর বিস্তার লাভ করে, যে গাছের উপর ছেয়ে যায় তার রস চুষে নেয়, ফলে ক্রমান্বয়ে সেটি শুকিয়ে যায়। উক্ত লতার রং হয় হলুদ। উর্দুতে আকাশ বেল ও আমরবেল এবং ফার্সিতে ইশকপেচা বলে।

৩. عَوْسَجٌ [আওসাজ] কাঁটাযুক্ত বন্য বৃক্ষ। এর ফল ছোট টক মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। উর্দূতে এটাকে ঝটরবেরী বলা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اِنْ مُفَسِّرَةٌ : কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এটাকে مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ বলেছেন। বস্তুত এটা ঠিক নয়; বরং এটা مُفَسِّرَةٌ ; এর পূর্বে যেহেতু نُوْدِىَ রয়েছে, যা قَوْلٌ -এর সমার্থ বিশিষ্ট। কাজেই এটা مُفَسِّرَةٌ হওয়া সুনিশ্চিত। অর্থাৎ نُوْدِىَ بِاَنْ يَا مُوْسٰى

جَانٌّ অর্থ ছোট সাপ, ثُعْبَانٌ বড় সাপ, আর حَيَّةٌ যে কোনো সাপকে বলে। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যে সাপে পরিণত হয়েছিল, তাকে কুরআন মজীদে একেক জায়গায় একেক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং সবগুলোর অর্থের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে যে, সূচনালগ্নে তা جَانٌّ [ছোট সাপ] ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা ثُعْبَانٌ [বড় সাপ] -এ পরিণত হতো। অথবা ক্ষিপ্রগতিতে তা جَانٌّ এবং দৈহিক গঠনে তা ثُعْبَانٌ তথা বিশাল আকৃতির ছিল।

قَوْلُهُ ذِكْرُ الْمُشَارِ بِهِ اِلَيْهَا : এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর–

প্রশ্ন : عَصَا এবং يَدٌ উভয়টি স্ত্রীলিঙ্গ, কাজেই এর জন্য اِسْمُ اِشَارَةٌ - تَانِ উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। অথচ এখানে ذَانِ উল্লেখ করা হয়েছে। আর خَبَرٌ হলো بُرْهَانَانِ এটা পুংলিঙ্গ। তাই এখানে খবরের প্রতি رِعَايَتْ করে মুবতাদাকেও مُذَكَّرْ আনা হয়েছে। যাতে মুবতাদা ও খবরের মাঝে مُطَابَقَتْ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مِنْ رَّبِّكَ : এটা উহ্য শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। ব্যাখ্যাকার (র.) مُرْسَلَانِ উল্লেখ করে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর কেউ কেউ كَائِنَانِ উহ্য বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ : **মিশরের পথে হযরত মূসা (আ.) :** হযরত মূসা (আ.) হযরত শুয়াইব (আ.)-এর নিকট অবস্থানের মেয়াদ পূর্ণ করলেন, অর্থাৎ দশ বছর যাবত হযরত শুয়াইব (আ.)-এর

সান্নিধ্যে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত রইলেন এবং তাঁর বকরিগুলোর দেখাশোনা করলেন। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো, তখন হযরত শুআইব (আ.)-এর অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাদায়েনে থেকে মিশরের দিকে রওয়ানা হন। যখন তাঁরা তূর পর্বতের নিকট পৌছেন, তখন রাত হয়ে যায়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন চতুর্দিক, তুহীন শীত, এদিকে তিনি পথও হারিয়ে ফেলেছিলেন, শুধু তাই নয়; ঐ সময় তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনাও শুরু হয়, শীতের প্রকোপের দরুন একটু আগুনের প্রয়োজন ছিল ঐ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি, তিনি তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন।

তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, أُمْكُثُوْا إِنِّيْ آنَسْتُ نَارًا তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি একটি আগুন দেখতে পেয়েছি, হয়তো তোমাদের জন্যে সেখান থেকে কোনো খবর অথবা আগুন নিয়ে আসতে পারব। হযরত মূসা (আ.) আগুন দেখে বুঝলেন, হয়তো সেখানে কেউ আছে যার দ্বারা আমি সাহায্য পেতে পারি, সে আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে, যদি সেখানে কোনো পথ-প্রদর্শক পাওয়া না যায় তবে এতটুকু উপকার হবে যে, কিছু জ্বলন্ত অংগার হলেও নিয়ে আসতে পারব, যাতে করে তুমি শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার কাতাদা এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের جَذْوَةٌ শব্দটি সেই জ্বলন্ত লাকড়িকে বলা হয়, যার কিছু অংশ জ্বলে গেছে। এর বহুবচন হচ্ছে- جُذًى

قَوْلُهُ فَلَمَّا أَتٰهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ : যখন হযরত মূসা (আ.) আগুনের নিকট পৌছলেন, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বের বরকতময় ভূমির একটি বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হলো, হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, বিশ্ব প্রতিপালক।

অর্থাৎ, হে মূসা! যে আগুন তুমি দেখছ তা আমার নূরের তাজাল্লী, আর যে কথা তুমি শ্রবণ করছ, তা আমারই মহান বাণী, আর এ বৃক্ষ এ স্থান আর যেদিক থেকে তুমি এ শব্দ শ্রবণ করছ সেদিক, এসব কিছুই আমার তাজ্জাল্লী অবতরণের স্থান, আমার পবিত্র সত্তার স্থান নয়; কেননা তা স্থান, কাল ও দিক থেকে পবিত্র এবং উর্ধ্বে।

হযরত মূসা (আ.)-এ নবুয়ত লাভ : আলোচ্য আয়াতে اَلْبُقْعَةُ الْمُبَارَكَةُ বলে পবিত্র ও বরকতময় স্থান উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এ স্থানেই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নবুয়ত ও রিসালত দানে ধন্য করেছেন।

তাফসীরকার আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মোবারাকাহ শব্দটির অর্থ হলো মোকাদ্দাস বা পবিত্র, কেননা অন্যত্র এর স্থলে 'আল মোকাদ্দাস' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلشَّجَرَةُ অর্থ- বৃক্ষ। এ বৃক্ষটি ঐ পবিত্র স্থানের এক পার্শ্বে ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, এ বৃক্ষটি ছিল সবুজে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত চমকদার।

তাফসীরকার কাতাদা, কালবী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ বৃক্ষটির নাম ছিল আওজাহ। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, এর নাম ছিল আলীক। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি ছিল আজব বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে- أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং সূরা ত্বা-হায় ইরশাদ হয়েছে- أَنَا رَبُّكَ

তাফসীরকারগণ বলেছেন, তিনটি সূরায় যদিও ভাষার পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই। যদিও বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি একই অর্থ এবং উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট রয়েছে। অথবা কথা বলার সময় আল্লাহ পাক উল্লিখিত সমস্ত গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআন কারীমে যখন এর বিবরণ প্রদান করেছেন, তখন অল্প অল্প করে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের

উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা ত্বো-হায় ইরশাদ হয়েছে- فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ طُوًى অর্থাৎ [হে মূসা!] তোমার জুতা খুলে নাও, কেননা তুমি পবিত্র ভূমিতে রয়েছ।

আর সূরা নামলে ইরশাদ হয়েছে- بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ "যিনি আগুনের অনুসন্ধানে রয়েছেন, তিনি মোবারক।" এমন অবস্থায় এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ, "যারা তার চারপার্শ্বে" এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক হযরুত মূসা (আ.)-কে নবুওয়ত ও রিসালতের মর্যাদায় ধন্য করেছেন। আর এ আয়াত থেকে নবুওয়তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁকে যে মুজেযা প্রদান করা হয়েছে, তার উল্লেখ রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ

হে মূসা! তোমার লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ কর! যখন হযরত মূসা (আ.) তার লাঠিটি ফেলে দিলেন, তখন তা সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট আজগরে পরিণত হলো।

এরপর যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখলেন, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করলেন, আর পশ্চাতে ফিরেও তাকালেন না। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ হলো- يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ অর্থাৎ হে মূসা ! সম্মুখের দিকে এসো, আর ভয় করো না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদে থাকবে, তোমার কোনো আশঙ্কা নেই।

অর্থাৎ, এ অজগর দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, দুশমনকে ভয় প্রদর্শন করার নিমিত্তেই তোমাকে এ মুজেযা দেওয়া হয়েছে। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে মানুষ হিসেবে যে ভীতি ছিল তা দূরীভূত হয়।

বর্ণিত আছে যে, এ ভয়ংকর অজগরটি যখন মুখ খুলত, তখন মনে হতো এখনি সব কিছু গিলে ফেলবে। আর যেদিক থেকে তা যাতায়াত করত, সেদিকের পাথরগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। এসব দেখে হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত ভীত হলেন, এজন্যে তিনি আর সেখানে দাঁড়াতে পারেননি, আর পেছনেও তাকাননি। যখন আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে অভয় দান করলেন, তখন তিনি নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হলেন এবং আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন।

قَوْلُهُ اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত হযরত মুসা (আ.)-এর একটি মুজেযার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে তাঁর আরেকটি মুজেযার কথা বলা হয়েছে। প্রথম মুজেযা ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি যা মাটিতে ফেললেই ভয়ংকর অজগরে পরণিত হতো এবং দুশমনের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াত। হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় মুজেযা হলো তাঁর হাত থেকে নূর প্রকাশিত হওয়া। হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর বগলে হাত দিয়ে তা বের করে আনতেন, তখন তা আলোয় ঝলমল করত এবং তা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতো।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ মুজেযাটি ছিলো হযরত মূসা (আ.)-এর আলোকময় অন্তরের আলোর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ দু'টি হলো হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়ত ও রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা তাঁকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে। লাঠি দ্বারা দুষ্টের দমন বা পাপাচার বন্ধ করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দীপ্তিমান হাত দ্বারা মনকে আলোকিত করে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। এমনি নিদর্শন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ দিতে পারে না। যেভাবে এ দু'টি নিদর্শন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে, ঠিক তেমনিভাবে তূর পর্বতে ঐ নূরানী বৃক্ষ থেকে তুমি যা শ্রবণ করেছ তা-ও আমারই বাণী। আর যে অগ্নি তুমি দেখেছ তা আমারই নূরের তাজাল্লী, যা তোমাকে অগ্নির আকৃতিতে দেখানো হয়েছে। যেহেতু তখন তুমি অগ্নির অনুসন্ধানে ছিলে, তাই তোমাকে অগ্নির আকৃতিতেই নূরের তাজাল্লী দেখানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর হাত যে আলোকময় হতো, তা কোনো রোগের কারণে নয়; যেমন শ্বেতরোগের কারণে মানুষের হাত সাদা হয়ে যায়; বরং এটি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযা। যেহেতু পরিবর্তিত তাওরাতে হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের মুজেযাকে শ্বেতরোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ বাক্য দ্বারা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, এটা কোনো রোগ নয়; বরং আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত মূসা (আ.)-এর হাত নূরানী হতো। এটি ছিল তাঁর অন্যতম মুজেযা।

قَوْلُهُ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ : **ভয় দূর করার পন্থা :** তাফসীরকার আতা (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। অর্থাৎ তোমার হাতকে তোমার বক্ষের উপর স্থাপন কর! যাতে করে তোমার মনের ভয় দূরীভূত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর পর যে কোনো ভীত সন্ত্রস্ত ব্যক্তিই নিজ হাত তার বক্ষের উপর রাখে, তার ভয় দূর হয়ে যায়। আর তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু'বাহু নিজের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে তার ভয় দূর হয়ে যাবে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ দ্বারা শান্তি, দৃঢ়তা এবং সৎসাহস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে এভাবে বক্ষের উপর হাত রাখবে, সে এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারবে।

আল্লামা বগভী (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি তোমার ভয়কে দূর কর। কেননা ভীত ব্যক্তির মন চরম অস্থির হয় এবং তার দেহ কম্পমান হয়। আর বক্ষের উপর হাত রাখলে এ অবস্থা দূরীভূত হয়।

ফাররা (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশে جَنَاحٌ শব্দটি দ্বারা লাঠি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ লাঠিকে তোমার কাছে টেনে নাও। যেহেতু লাঠিটি অজগর সর্পে পরিণত হয়েছে এবং লাঠিকে ছেড়ে দিয়ে হাতকে ছড়িয়ে রেখেছেন, তাই ইরশাদ হয়েছে যে, তুমি লাঠিকে নিজের দিকে টেনে নাও, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গে অজগর রূপী লাঠিটি পুনরায় লাঠিতে পরিণত হয়।

قَوْلُهُ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ : অর্থাৎ এই লাঠি এবং আলোকময় হাত– এ দু'টি মুজেযা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার নবুয়তের দলিল প্রমাণ হিসেবে প্রদান করা হলো। ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাওয়ার জন্যে এ দু'টি হলো তোমার নিকট দলিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা অত্যন্ত নাফরমান, পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়। তোমার নবুয়ত ও রিসালতের এ দুটি জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে তুমি তাদের নিকট যাও! –[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১১৭-১১৮]

	অনুবাদ :
٣٣. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا هُوَ الْقِبْطِىُّ السَّابِقُ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ بِهٖ .	৩৩. হযরত মূসা (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। সে ছিল পূর্বোক্ত কিবতী ফলে আমি আশঙ্কা করছি, তারা আমাকে হত্যা করবে। তার পরিবর্তে কিসাস রূপে।
٣٤. وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا اَبْيَنَ فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا مُعِيْنًا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الدَّالِ بِلَا هَمْزَةٍ يُّصَدِّقُنِىْٓ ز بِالْجَزْمِ جَوَابُ الدُّعَاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ وَجُمْلَةُ صِفَةُ رِدْءًا اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ .	৩৪. আমার ভ্রাতা হারূন আমার অপেক্ষা বাগ্মী স্পষ্টভাষী অতএব তাকে আমার সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন। رِدْءًا শব্দটি অন্য কেরাতে دَالْ বর্ণে যবর দিয়ে হামযাবিহীনভাবে গঠিত রয়েছে। সে আমাকে সমর্থন করবে। يُصَدِّقُنِىْ -এর قَافْ বর্ণটি জযমযুক্ত। এটা دُعَاءْ -এর জবাব। অপর কেরাতে قَافْ বর্ণটি পেশ যুক্ত রয়েছে। আর বাক্যটি رِدْءًا -এর সিফত হয়েছে। আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।
٣٥. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ نُقَوِّيْكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا غَلَبَةً فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ج بِسُوْءٍ اِذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا ج اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ لَهُمْ .	৩৫. আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে। তোমরা উভয়ে গমন কর আমার নিদর্শনাবলি নিয়ে। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা তাদের উপর প্রবল হবে।
٣٦. فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ حَالٌ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى مُخْتَلَقٌ وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا كَائِنًا فِىْٓ اَيَّامِ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ .	৩৬. হযরত মূসা (আ.) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসলেন, তারা বলল, এটাতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। অর্থাৎ নিজের তৈরিকৃত। আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে কখনো এরূপ কথা শুনিনি।
٣٧. وَقَالَ بِوَاوٍ وَبِدُوْنِهَا مُوْسٰى رَبِّىْٓ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ الضَّمِيْرُ لِلرَّبِّ وَمَنْ عَطْفٌ عَلٰى مَنْ يَّكُوْنُ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط اَىْ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فِى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ اَىْ وَهُوَ اَنَا فِى الشِّقَّيْنِ فَاَنَا مُحِقٌّ فِيْمَا جِئْتُ بِهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ .	৩৭. হযরত মূসা (আ.) বললেন, قَالَ ফে'লটি وَاوْ সহ এবং وَاوْ বিহীন উভয়রূপেই পঠিত। আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত অর্থাৎ জ্ঞাত আছেন কে তাঁর নিকট হতে পথনির্দেশ এনেছেন عِنْدِهٖ -এর যমীর رَبّ -এর দিকে ফিরেছে। এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। আর مَنْ -এর عَطْف হয়েছে بِمَنْ -এর উপর আর يَكُوْنُ শব্দটি يَاءْ এবং تَاءْ দ্বারা উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ পরকালের আবাসে সুপরিণতি কার হবে? আর উভয় অবস্থায় আমিই। সুতরাং আমার আনীত বিষয়ে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। জালেমরা কখনোই সফলকাম হবে না কাফেররা।

٣٨. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ج فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاطْبَخْ لِيَ الْاٰجُرَّ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا قَصْرًا عَالِيًا لَعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَقِفُ عَلَيْهِ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْ اِدِّعَائِهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَاَنَّهُ رَسُوْلُهُ ـ

٣٩. اِسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يَرْجِعُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ ـ

٤٠. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَذْنٰهُمْ طَرَحْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ الْبَحْرِ الْمَالِحِ فَغَرِقُوْا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ـ حِيْنَ صَارُوْا اِلَى الْهَلَاكِ ـ

٤١. وَجَعَلْنٰهُمْ فِي الدُّنْيَا اَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً رُؤَسَاءَ فِي الشِّرْكِ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج بِدُعَائِهِمْ اِلَى الشِّرْكِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ـ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ ـ

٤٢. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ج خِزْيًا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ الْمُبْعَدِيْنَ ـ

অনুবাদ :

৩৮. ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে, হামান! আমার জন্য ইট পোড়াও ইট পরিপক্ক কর এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর। হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার ইলাহ সম্পর্কে অবগত হতে পারি। দেখতে পারি ও তার সম্পর্কে জানতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী। তার এ দাবিতে যে, অন্য ইলাহ রয়েছে এবং সে তাঁর রাসূল হওয়ার বিষয়ে।

৩৯. ফেরাউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। لَا يَرْجِعُوْنَ ফে'লটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

৪০ অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম লোনা সমুদ্রে, ফলে তার নিমজ্জিত হলো। দেখুন জালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে। যখন তারা ধ্বংসের কবলে পড়েছিল।

৪১. আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। পৃথিবীতে। اَئِمَّةً শব্দটির উভয় হামযা বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করে উভয়ভাবেই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ শিরকের ক্ষেত্রে নেতা বানিয়েছি। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত শিরকের প্রতি ডাকার মাধ্যমে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তাদের থেকে শাস্তি প্রতিহত করার ব্যাপারে।

৪২. এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত। লাঞ্ছনা, এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। দূরে নিক্ষিপ্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رِدْءًا : এটা أَرْسِلْهُ-এর যমীরের حَالٌ অর্থ- সাহায্যকারী। جَوَابُ الدُّعَاءِ না বলে মূলত جَوَابُ أَمْرٍ বলা উচিত ছিল। তবে আদবস্বরূপ جَوَابُ دُعَاءٍ বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে আমরের সীগাহ ব্যবহৃত হলে তাকে دُعَاءٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ : এর মধ্যে مَجَازٌ مُرْسَلٌ ঘটেছে, سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা বাহুর শক্তি ব্যক্তির শক্তিকে অনিবার্য করে।

قَوْلُهُ بِاٰيَاتِنَا : এখানে اٰيَاتٌ দ্বারা عَصَا ও يَدٌ উদ্দেশ্য, তবে দু'টির ক্ষেত্রেই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা এ দুটির প্রত্যেকটি কয়েকটি মুজেযা সম্বলিত ছিল। بَيِّنَاتٌ হলো اٰيَاتٌ-এর حَالٌ

قَوْلُهُ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ : اَعْلَمُ-এর ব্যাখ্যা عَالِمٌ দ্বারা করে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন-

প্রশ্ন : اِسْمُ تَفْضِيْلٍ সাধারণত اِسْمُ ظَاهِرٌ-কে نَصَبٌ দেয় না। কিন্তু এখানে نَصَبٌ দিল কেন?

উত্তর : اِسْمُ تَفْضِيْلٍ টি এখানে اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ وَتَكُوْنُ : অধিকাংশ কারীগণ এটাকে تَاءٌ যোগে পড়েছেন, لَهُ হলো تَكُوْنُ-এর خَبَرٌ আর عَاقِبَةٌ হলো এর اِسْمٌ আবার এমনো হতে পারে যে, تَكُوْنُ-এর هِىَ যমীরটি তার اِسْمٌ আর لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ বাক্য হয়ে خَبَرٌ-এর স্থলে হয়েছে। شِقَّيْنِ শব্দটি شِقٌّ-এর দ্বিবচন; অর্থ- কিনারা, পার্শ্ব। এখানে এর দ্বারা مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى এবং مَنْ يَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ হলো مَقْبُوْحِيْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে উহ্য শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াটাই অধিক স্পষ্ট। বাক্যটি এরূপ হবে- قُبِحُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ এখানে مَقْبُوْحِيْنَ শব্দটি উহ্য قُبِحُوْا-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। مَقْبُوْحِيْنَ শব্দটি مَقْبُوْحٌ-এর বহুবচন। অর্থ হলো উদ্ভ্রান্ত, পরিবর্তিত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিবসে তাদের মুখমণ্ডল বিবর্তিত হয়ে কালো ও চক্ষু নীল বর্ণের হয়ে যাবে। مَقْبُوْحٌ এটা اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর সীগাহ بَابُ كَرُمَ وَفَتَحَ থেকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ : ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) একজন মজলুম বনী ইসরাঈলীকে সাহায্য করতে গিয়ে জনৈক জালেম কিবতীকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন, পরিণামে তার মৃত্যু হয়েছে। তখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। ফেরাউনের জল্লাদরা এ আদেশ কার্যকর করার জন্যে বের হয়েছিল। দশ বছর পূর্বে এ অবস্থায় হযরত মূসা (আ.)-কে মিশর থেকে বের হয়ে মাদায়ানে চলে যেতে হয়েছিল। এখন হযরত মূসা (আ.)-কে যখন আল্লাহ পাক নবী ও রাসূল মনোনীত করে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তখন তাঁর পূর্বের ঘটনা মনে পড়ে। তাই তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজি পেশ করেন যে, অনিচ্ছাকৃত অবস্থায় আমার হাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যে লোকটির মৃত্যু হয়েছিল, আমার আশঙ্কা হয়, হয়তো তারা দেখামাত্রই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এমননি অবস্থায় আমি তাদের নিকট আপনার পয়গাম কি করে পৌছাবো। তাদেরকে তাবলীগ করার পূর্বেই আমার কাজ তারা শেষ করে দেবে। আল্লাহ পাক তখন হযরত মূসা (আ.)-কে সান্ত্বনা দেন যে, এমন অবস্থা কখনো হবে না। আল্লাহ পাক তখন ইরশাদ করেছেন- لَا تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى অর্থাৎ তোমরা কোনো ভয় করো না! কেননা আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি তোমাদের এবং তার মধ্যে যে সব কথাবার্তা হবে তা আমি শুনতে পাব এবং তোমাদের সাথে সে যে আচরণ করবে তাও আমি দেখতে পাব।

قَوْلُهُ وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً : বর্ণিত আছে, শৈশবে একবার হযরত মূসা (আ.) জ্বলন্ত অংগার মুখে নিয়েছিলেন, যে কারণে তাঁর জিহবা পুড়ে গিয়েছিল এবং তাঁর রসনায় জড়তা সৃষ্টি হয়েছিল। এজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজি পেশ করেছেন যে, আমার ভাই হারূনকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে দিন, যাতে করে সে সুস্পষ্ট ভাষায় আপনার মহান বাণী ফেরাউনের নিকট পৌঁছাতে পারে এবং রিসালতের দায়িত্ব পালনে আমার সাহায্যকারী হয়!

قَوْلُهُ يُصَدِّقُنِىْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ : অর্থাৎ আমার ভাই আমাকে সত্যায়িত করবেন এবং আমার কথাকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করবেন এবং তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত করবেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি হারূনকে আমার সাথে নবী মনোনীত করে প্রেরণ কর, তবে তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথা শ্রবণ করে ফেরাউন আমার প্রতি ঈমান আনতেও পারে। তবে আমি আশঙ্কা করি যে, সে আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে এবং তোমার নবী রাসূল হিসেবে সে আমাকে মেনে নেবে না।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যদি হারূন আমার সঙ্গে থাকে তবে সে আমার সাহায্যকারী এবং পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবে এবং আমার কথাগুলো সে মানুষকে বুঝিয়ে দেবে আর তার কারণে আমার হাত শক্তিশালী হবে।

এতদ্ব্যতীত, একজনের স্থলে দু'জন হলে এ মহান দায়িত্ব পালন অনেকটা সহজ হবে। পক্ষান্তরে যদি আমি একা থাকি, এমন অবস্থায় আমার আশঙ্কা হয় যে ফেরাউন এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমার নবুয়তের দাবিকে মিথ্যাজ্ঞান করবে।

قَوْلُهُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। এমন অবস্থায় তারা তোমার নিকট পৌঁছতেই পারবে না।

অর্থাৎ হে মূসা! আমি তোমার আরজি কবুল করেছি, তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করব, তোমাদেরকে এমন প্রাধান্য দেব যে, তোমাকে হত্যা করার তো প্রশ্নই উঠে না; এমনকি কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়ার জন্যে তোমাদের কাছেও আসতে পারবে না। অতএব, এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

এরপর পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ

অর্থাৎ তুমি আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে ফেরাউনের নিকট যাও! তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীগণ অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করবে। আমার প্রদত্ত মুজেযাসমূহের কারণে তোমরা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। আমার মহিমা বলে তোমরা আধিপত্য লাভ করবে, ফেরাউন এবং তার দল তোমাদের ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

আল্লামা সয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে আবি হাতেম (র.) তাফসীরকার মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ফেরাউনের ব্যাপারে একটু ভয় ছিল। কেননা সে ছিল অত্যন্ত জালিম ও স্বেচ্ছাচারী। সে যা ইচ্ছা তা করত, তাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না, এমনি অবস্থায় হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এজন্যে হযরত মূসা (আ.) যখন তাকে দেখতেন, একটি দোয়া পাঠ করতেন। এর বরকতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর অন্তর থেকে ফেরাউনের ভয় দূরীভূত করে দিলেন এবং ফেরাউনের অন্তরে মূসা (আ.)-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দিলেন। ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আ.)-কে দেখত তখন সংগে সংগে তার প্রস্রাব শুরু হয়ে যেত, আর তা হতো গর্ধভের প্রস্রাবের ন্যায়।

বায়হাকী তাফসীরকার যাহহাক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের উদ্দেশ্যে যখন দোয়া করেছেন, তখন তা যেমন কবুল হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হুনাইনের যুদ্ধে দুশমনের বিরুদ্ধে রাসূলে কারীম ﷺ যখন দোয়া করেছিলেন, তা-ও তেমনি কবুল হয়েছিল। আর এভাবে যে কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দোয়া করে তবে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন।

দোয়াটি হলো এই–

كُنْتَ وَتَكُوْنُ وَاَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوْتُ تَنَامُ الْعُيُوْنُ وَتَنْكَدِرُ النُّجُوْمُ وَاَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ -

قَوْلُهُ فَاَوْقِدْ لِيْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ : ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উজির হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। অন্যান্য মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর বাইরে। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে পরে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাৎ করে দিলেন। ফলে ফেরাউনের হাজারো সিপাহী এর নিচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের পরিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত। এখানে অধিকাংশ তাফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহ্বান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ জাহান্নাম বলে কুফরি কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়েদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর সুচিন্তিত অভিমত [ইবনে আরাবীর অনুকরণে] এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সৎকর্মসমূহ পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান হয়ে জান্নাতের নিয়ামতে পরিণত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কর্মসমূহ সর্প, বিচ্ছু, এবং নানারকম আজাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহবান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহবান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোনো রূপকথা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকথার আশ্রয় নেওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে : উদাহরণত مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ এবং وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا আয়াতদ্বয়ে।

قَوْلُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ : مَقْبُوْحٌ শব্দের বহুবচন مَقْبُوْحِيْنَ অর্থাৎ বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালোবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

অনুবাদ :

٤٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى قَوْمَ نُوْحٍ وَعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَغَيْرِهِمْ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ حَالٌ مِنَ الْكِتٰبِ جَمْعُ بَصِيْرَةٍ وَهِيَ نُوْرُ الْقَلْبِ اَيْ اَنْوَارًا لِلْقُلُوْبِ وَهُدًى مِنَ الضَّلَالَةِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ وَرَحْمَةً لِمَنْ اٰمَنَ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ . يَتَّعِظُوْنَ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ .

৪৩. আমি হযরত মূসা (আ.)-কে দিয়েছিলাম কিতাব তাওরাত পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর। অর্থাৎ, নূহ, আদ ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে। মানবজাতির জন্যে জ্ঞানবর্তিকা بَصَآئِرُ শব্দটি اَلْكِتٰبُ থেকে حَالٌ হয়েছে। এটা بَصِيْرَةٌ -এর বহুবচন। আর তা হলো- কলবের জ্যোতি। অর্থাৎ اَنْوَارًا لِلْقُلُوْبِ অর্থে। পথনির্দেশ পথভ্রষ্টতা থেকে যে এর উপর আমল করে। এবং অনুগ্রহ স্বরূপ যে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে এতে যে সকল উপদেশ রয়েছে তা দ্বারা।

٤٤. وَمَا كُنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِجَانِبِ الْجَبَلِ اَوِ الْوَادِيْ اَوِ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ مِنْ مُوْسٰى حِيْنَ الْمُنَاجَاةِ اِذْ قَضَيْنَآ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ بِالرِّسَالَةِ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ . لِذٰلِكَ فَتَعْرِفُهُ فَتُخْبِرُ بِهِ .

৪৪. হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি উপস্থিত ছিলেন না পশ্চিম প্রান্তে পাহাড় অথবা উপত্যকা অথবা স্থানের, যখন হযরত মূসা (আ.) অতি সঙ্গোপনে আলাপরত ছিলেন, যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে রিসালতের বিধান। এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। এ ব্যাপারে যে, আপনি জেনে শুনে সে বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছেন।

٤٥. وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا اُمَمًا بَعْدَ مُوْسٰى فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ج اَيْ طَالَتْ اَعْمَارُهُمْ فَنَسُوا الْعُهُوْدَ وَانْدَرَسَتِ الْعُلُوْمُ وَانْقَطَعَ الْوَحْيُ فَجِئْنَا بِكَ رَسُوْلًا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْكَ خَبَرَ مُوْسٰى وَغَيْرِهِ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا مُقِيْمًا فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا خَبَرٌ ثَانٍ فَتَعْرِفَ قِصَّتَهُمْ فَتُخْبِرُ بِهَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ . لَكَ وَاِلَيْكَ بِاَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ .

৪৫. বস্তুত আমি অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম হযরত মূসা (আ.)-এর পরে বহু জাতির। অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের বয়স সুদীর্ঘ হয়েছে। ফলে তারা তাদের অঙ্গীকারসমূহ ভুলে গেছে এবং জ্ঞান-গরিমা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর ওহীও বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং আপনার কাছে হযরত মূসা (আ.) ও অন্যান্যদের সংবাদ প্রত্যাদেশ করেছি। আপনি তো মাদায়েনবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন না অবস্থান করছিলেন না। তাদের নিকট আমার নিদর্শন বর্ণনা কররার জন্য। اٰيٰتِنَا হলো দ্বিতীয় খবর। অর্থাৎ তাদের ঘটনা অবগত হয়ে এ ব্যাপারে সংবাদ দিচ্ছেন। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। আপনাকে এবং আপনার নিকট পূর্ববর্তীদের সংবাদকে।

٤٦. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ الْجَبَلِ اِذْ حِيْنَ نَادَيْنَا مُوْسٰى اَنْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَلٰكِنْ اَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ وَهُمْ اَهْلُ مَكَّةَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ.

٤٧. وَلَوْلَا اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ عُقُوْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهٖ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَا هَلَّا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ الْمُرْسَلَ بِهَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوْفٌ وَمَا بَعْدَهَا مُبْتَدَأٌ وَالْمَعْنٰى لَوْلَا الْاِصَابَةُ الْمُسَبَّبُ عَنْهَا قَوْلُهُمْ اَوْ لَوْلَا قَوْلُهُمُ الْمُسَبَّبُ عَنْهَا لَعَاجَلْنَاهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ وَلَمَّا اَرْسَلْنَاكَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلًا.

٤٨. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مُحَمَّدٌ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا هَلَّا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوْسٰى ط مِنَ الْاٰيَاتِ كَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَالْعَصَا وَغَيْرِهِمَا اَوِ الْكِتَابِ جُمْلَةً وَاحِدَةً قَالَ تَعَالٰى اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ج حَيْثُ قَالُوْا فِيْهِ وَفِيْ مُحَمَّدٍ ﷺ سَاحِرَانِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ سِحْرَانِ اَيِ التَّوْرٰىةُ وَالْقُرْاٰنُ تَظَاهَرَا تَعَاوَنَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ مِنَ النَّبِيَّيْنِ وَالْكِتَابَيْنِ كٰفِرُوْنَ.

অনুবাদ :

৪৬. আপনি তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি আহবান করেছিলাম মূসাকে এ বলে যে, আমার কিতাবকে শক্তভাবে আকড়ে ধর! বস্তুত আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে দয়া স্বরূপ। যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। আর তারা হলো মক্কাবাসীরা যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৪৭. তাদের উপর কোনো বিপদ হলে শাস্তি হলে তাদের কৃতকর্মের কারণে কুফর ইত্যাদির কারণে তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? করলে আমরা আপনার নির্দেশ মেনে চলতাম যা আমাদের নিকট প্রেরণ করা হতো। এবং আমরা হতাম মুমিন। لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে। তার পরের অংশটি মুবতাদা। অর্থ হলো বিপদ হওয়াটা যদি যা তোমাদের উক্তি لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا -এর সবব বা কারণ না হতো, তাহলে আমি তাদের শাস্তিকে দ্রুত করতাম। অথবা যদি তাদের উক্তি– لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا মূলত বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণ সাপেক্ষ বিষয় তা না হতো, তাহলে আমি আপনাকে তাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করতাম না।

৪৮. অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ আসল, তারা বলতে লাগল হযরত মূসা (আ.)-কে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল তাকে সেরূপ দেওয়া হলো না কেন? অর্থাৎ নিদর্শনসমূহ হতে যেমন শুভ্র হস্ত, লাঠি ইত্যাদি। অথবা একই সাথে সম্পূর্ণ কিতাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন কিন্তু পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? কেননা তারা বলেছিল তার ব্যাপারে ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে দুটিই জাদু অন্য কেরাতে রয়েছে سِحْرَانِ অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআন একে অপরকে সমর্থন করে সাহায্য করে [এবং তারা বলেছিল আমরা সকলকেই নবীগণ এবং কিতাবসমূহকে প্রত্যাখ্যান করি।

৪৯. قُلْ لَّهُمْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا مِنَ الْكِتَابَيْنِ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِكُمْ .

৫০. فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ دُعَاءَكَ بِالْاِتْيَانِ بِكِتَابٍ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ ط فِىْ كُفْرِهِمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اَىْ لَا اَضَلَّ مِنْهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ .

অনুবাদ :

৪৯. আপনি বলুন তাদেরকে আল্লাহর নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এতদুভয় হতে কিতাব দুটি থেকে উৎকৃষ্টতর হবে। আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের উক্তিতে।

৫০. অতঃপর তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয় আপনার কিতাব আনয়নের ডাকে। তা হলে জানবেন তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। তাদের কুফরির ক্ষেত্রে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কেউ নেই। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। অর্থাৎ কাফের তথা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَعَادًا : এর عَطْف হলো قَوْم-এর উপর; نُوْح এর উপর নয়। কেননা نُوْح-এর উপর عَطْف হলে عَادْ-এর জন্য কওম হওয়া অনিবার্য হয়। অথচ আদই হলো একটি কওম। বাক্যটি এরূপ হবে- مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ [আমি নূহ -এর কওম এবং আদ ও সামূদের কওমকে ধ্বংস করার পরে......] সুতরাং عَادْ -কে আলিফ সহকারে লিখলে তা যথোচিত হতো। কেননা এ সময় نُوْح-এর উপর عَطْف হওয়ার সন্দেহ থাকত না।

قَوْلُهُ بَصَائِرُ : এটা مُضَافْ বিলুপ্তিসহ كِتَابْ -এর حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ ذَا بَصَائِرَ আর যদি مُضَافْ উহ্য না হয় তাহলে مُبَالَغَةْ স্বরূপও حَالْ হতে পারে। আবার كِتَابْ -এর مَفْعُوْلُ لَهُ -ও হতে পারে। هُدًى এবং رَحْمَةً শব্দদ্বয়েও উপরিউক্ত তিনো তারকীব হতে পারে।

قَوْلُهُ بِجَانِبِ الْجَبَلِ اَوِ الْوَادِىْ اَوِ الْمَكَانِ : এ ইবারত দ্বারা বসরী নাহভীগণের মাযহাব মতে আরোপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : اَلْغَرْبِىِّ-এর প্রতি جَانِبْ -এর ইযাফতটি اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ -এর অন্তর্গত। আর বসরী নাহভীগণের মতে তা বৈধ নয়। কেননা صِفَتْ ও مَوْصُوْفْ একই বস্তু হয়ে থাকে। ফলে এতে اِضَافَةُ الشَّيْئِ اِلٰى نَفْسِهٖ অনিবার্য হয়, আর এটা অবৈধ। কেননা جَانِبْ এবং غَرْبِىْ একই বস্তু।

উত্তর : এ প্রশ্ন থেকে রক্ষাকল্পে غَرْبِىّ -এর মওসূফ اَلْجَمَلْ -কে উহ্য মেনেছেন। যাতে جَانِبْ -এর ইযাফত جَبَلْ -এর প্রতি হয়; اَلْغَرْبِىّ -এর প্রতি না হয়। মুসান্নিফ (র.) এখানে তিনটি শব্দ উহ্য মেনেছেন। এ তিনটির কোনো একটিকে جَانِبْ -এর مُضَافْ اِلَيْهِ বলা যেতে পারে। কূফীগণের মতে উপরিউক্ত প্রশ্ন আরোপিত হবে না। কুরআন-হাদীসে এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে।

قَوْلُهُ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ لِذٰلِكَ : অর্থাৎ আর আপনি সেসব ঘটনাকে দেখেননি।

প্রশ্ন : পূর্বে বলা হয়েছে যে, পাহাড়ের পশ্চিম দিকে বিদ্যমান ছিলেন না, এর দ্বারা তো দেখার বিষয়টি এমনিতেই বাদ হয়ে যায়, কাজেই وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ বলার প্রয়োজন কি?

উত্তর : হাজির হওয়ার জন্য দেখা জরুরি নয়। কখনো এমনো হয় যে, মানুষ হাজির থাকে সত্য; কিন্তু দেখা সম্ভব হয় না। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- لَمْ تَحْضُرْ ذَالِكَ الْمَوْضِعَ وَلَوْ حَضَرْتَهُ مَا شَاهَدْتَ وَمَا وَقَعَ فِيْهِ

قَوْلُهُ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا : এটা বাক্য হয়ে كُنْتَ -এর দ্বিতীয় خَبَرْ আবার كُنْتَ -এর যমীরের حَالْ -ও হতে পারে। هم যমীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কাবাসী। অর্থাৎ আপনি যখন মক্কাবাসীকে মাদায়েনবাসীদের ঘটনাবলি শুনাচ্ছিলেন তখন আপনি মাদায়েনবাসীদের সাথে বসবাসরত ছিলেন না যে, তাদের ঘটনাবলি দেখে দেখে মক্কাবাসীদেরকে শুনাচ্ছেন, বরং হাজার হাজার বছর পূর্বের ঘটনা ও মানুষের অবস্থাদি ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই তা শুনিয়ে থাকেন। এটা আপনার নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

قَوْلُهُ اَنْ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ : اَنْ হলো تَفْسِيْرِيَّةٌ অর্থাৎ نِدَاءٌ -এর ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকার (র.) اَنْ خُذِ الْكِتَابَ -কে তাওরাত দানের [اِيْتَاءُ تَوْرَاتْ -এর] এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। আর পূর্বের আয়াত- وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ -কে اِرْسَالْ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। অথচ اِرْسَالْ [রাসূল বানানো] এবং اِيْتَاءُ تَوْرَاتْ -এর মাঝে ৩০ বছরের ব্যবধান ছিল। আবার কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন।

قَوْلُهُ لَوْلَا اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُصِيْبَةٌ : এখানে لَوْلَا হলো اِمْتِنَاعِيَّةٌ যা وُجُوْدْ اَوَّلْ তথা তার পরে উল্লিখিত প্রথমটির অস্তিত্বের দরুন اِنْتِفَاءْ ثَانِىْ তথা তার পরবর্তীটির অস্তিত্ব না হওয়া বুঝায়। اَنْ تُصِيْبَهُمْ -এর মধ্যকার اَنْ হলো مَصْدَرِيَّةٌ এটা لَوْلَا اَصَابَةُ الْمُصِيْبَةِ لَهُمْ -এর অর্থ হয়ে مُبْتَدَأْ এর خَبَرْ হলো উহ্য مَوْجُوْدٌ ; لَوْلَا -এর جَوَابْ হলো উহ্য مَا اَرْسَلْنَا ; দ্বিতীয় لَوْلَا টি تَحْضِيْضِيَّةٌ ; এর জবাব হলো فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ ; বাক্যটি এরূপ হবে-

لَوْلَا قَوْلُهُمْ هٰذَا اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ لَمَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رَسُوْلًا (خَلَاصَةٌ)

اِصَابَةٌ عَقَبَةٌ হলো قَوْل -এর سَبَبْ আর قَوْل হলো اِرْسَالْ -এর سَبَبْ । যেহেতু سَبَبْ -এরও سَبَبْ হয়, এর কারণে اصَابَةٌ مُصِيْبَةٌ হলো قَوْلْ -এর মাধ্যমে سَبَبْ হয়েছে اِرْسَالْ -এর। এ কারণে لَوْلَا -কে اِصَابَةٌ -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর فَا سَبَبِيَّةٌ -এর মাধ্যমে فَيَقُوْلُوْا -এর عَطْف হয়েছে اِصَابَةٌ এর উপর, অর্থাৎ আপনাকে প্রেরণের কারণ হলো মক্কাবাসীদের এ উক্তি। যদি মক্কাবাসীদের এ উক্তি না হতো তাহলে আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করতাম না। অর্থাৎ عَدَمْ اِرْسَالْ -এর اِنْتِفَاءٌ (اِرْسَالْ) -এর سَبَبْ হলো اِصَابَةٌ مُصِيْبَةٌ

জ্ঞাতব্য : عَدَمْ اِرْسَالْ [রাসূল রূপে প্রেরণ না করা] এর اِنْتِفَاءٌ [না হওয়া] نَفِىُ النَّفِىْ হিসেবে اِثْبَاتْ [ইতিবাচক] এর অর্থ বিশিষ্ট হওয়ার ارسال -এর অর্থ বুঝায়।

قَوْلُهُ اَوْ لَوْ لَا قَوْلُهُمُ السَّبَبُ الخ : অর্থাৎ اَصَابَتْ مُصِيْبَةٌ [বিপদের সম্মুখীন হওয়া] এর সময় তাদের উক্তি- اِنْتِفَاءٌ عَدَمُ رِسَالَتْ -এর سَبَبْ না হতো, তাহলে আমি তাদের আজাব প্রদানে ব্যস্ততা অবলম্বন করতাম না এবং আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করতাম না। এ ব্যাখ্যা মূলত حَاصِلْ مَعْنٰى -এর প্রতি লক্ষ্য করে। এর সার এই যে, لَوْلَا -এর جَوَابْ -এর اِنْتِفَاءْ -এর কারণ হলো তাদের উল্লিখিত উক্তি। এ কারণেই মুফাসসির (র.) اَلْمُسَبَّبُ عَنْهَا قَوْلُهُمْ বলেছেন।

قَوْلُهُ مَا اَرْسَلْنَاكَ : এটা نَفِىْ -এর جَوَابْ ; এটা وُجُوْدْ شَرْط -এর কারণে اِنْتِفَاءُ جَوَابْ বুঝায়, فَالْمَعْنٰى اِنْتَفٰى عَدَمَ اِرْسَالِكَ اِلَيْهِمْ لِقَوْلِهِمُ الْمَذْكُوْرِ যাতে আজাব অবতীর্ণের সময় তাদের ওজর-আপত্তি শেষ হয়ে যায়, অন্যথায় আজাব নাজিল করলে তারা বলতে পারত যে, যদি আমাদের নিকট পূর্বের নবীগণের ন্যায় নবী আগমন করতেন; তাহলে আমরাও ঈমান আনতাম। তাহলে আজ এ আজাবে পতিত হতাম না। রাসূলে কারীম ﷺ -কে প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ওজর পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, তাদের বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং উল্লিখিত উক্তি তো হাশরের ময়দানে উপস্থাপিত হবে। আর لَوْلَا -এর অস্তিত্ব বাস্তবপক্ষে হওয়ার কারণে তা দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব না হওয়া (اِنْتِفَاءٌ) বুঝায়। অথচ এখানে এ বিষয়টি এমন নয়।

উত্তর : مَانِعٌ [প্রতিবন্ধক] কখনো বাস্তবে হয়, কখনো তা مَفْرُوْضٌ তথা ধরে নিতে হয়। এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيْرِ (جُمَلٌ)

قَوْلُهُ اَوِ الْكِتَابُ : এর দ্বারা مِثْلَ مَا اُوْتِىَ -এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। اَوِ الْكِتَابُ -এর **عَطْف হলো** اَلْاٰيَاتُ -এর উপর।

قَوْلُهُ سَاحِرَانِ : এটা উহ্য هُمَا মুবতাদার خَبَرْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ .... بَصَائِرَ لِلنَّاسِ : পূর্ববর্তী সম্প্রদায়' বলে নূহ, হুদ, সালেহ ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَائِرُ শব্দটি بَصِيْرَةٌ -এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ- জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। بَصَائِرَ لِلنَّاسِ এখানে نَاسٌ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত বোঝানো হলে তাতে কোনো খটকা নেই। কারণ সেই উম্মতের জন্য তাওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি نَاسٌ শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর যুগে যে তাওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতের মুহাম্মদীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এছাড়া এ থেকে জরুরি হয় যে, মুসলমানদেরও তাওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হাদীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারুক (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাওরাতের উপদেশাবলি পাঠ করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে হযরত মূসা (আ.) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। বলা যায় যে, সেই যুগে আহলে কিতাবের হাতে তাওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং সেটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ, যাতে কুরআন অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কুরআনের পূর্ণ হেফাজতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কুরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোনো রহিত আসমানীগ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থি ছিল। এ থেকে জরুরি নয় যে, সর্বাবস্থায় তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সেই সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবীগণও তাদের এ কাজ অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলা বাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারে। তাঁরা হলেন বিশেজ্ঞ আলেম শ্রেণি। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিধান তা-ই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে ক্ষতি নেই।

قَوْلُهُ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ : এখানে কওম বলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাঈলের পর থেকে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো পয়গাম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ অর্থাৎ এমন কোনো উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোনো পয়গাম্বর আসেননি। এই বাণী আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সুদীর্ঘকাল ধরে হযরত ইসমাঈলের পর তাদের মধ্যে কোনো নবী আসেননি। কিন্তু নবী-রাসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উম্মতও নয়।

প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ : এ আয়াতসমূহে প্রিয়নবী ﷺ--এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এমন এক মহান ব্যক্তি যিনি কোনো মানুষের কাছে কিছুই শেখেননি এবং পূর্বকালে অবতীর্ণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও তিনি অবগত হননি এবং অতীতকালের ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেফহাল হননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানের মহাসাগর, তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট অলংকারপূর্ণ ভাষায় অতীতের সঠিক তথ্য এবং ঘটনাসমূহ এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন যেন ঐগুলো তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব কথা বলেছেন। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ.

অর্থাৎ "আর [হে রাসূল!] আপনি তখন পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি মূসার প্রতি নির্দেশ প্রদান করি, আর আপনি দর্শকও ছিলেন না।"

তাফসীরকার কাতাদা (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, পশ্চিম প্রান্ত বলে পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা সে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ পাকের সংগে কথা বলেছিলেন। আর আলোচ্য আয়াতের وَمَا كُنْتَ শব্দ দ্বারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আল্লাহ পাক যখন হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর اَلشَّاهِدِيْنَ শব্দ দ্বারা সেই ৭০ জন লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে তুর পর্বতে গিয়েছিলেন, সেখানেও আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না; অথচ সেসব ঘটনা আপনি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকই আপনাকে এসব গায়েবী ইলম দান করেছেন। কেননা আপনি তাঁর প্রেরিত নবী, আর এসব সত্য ঘটনার সঠিক ইলম আল্লাহ পাক আপনাকে [মুজেযা স্বরূপ] দান করেছেন। এজন্যেই প্রিয়নবী ﷺ -ইরশাদ করেছেন- أُوتِيتُ عِلْمَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ

অর্থাৎ আমাকে পূর্বকালের এবং পরবর্তী কালের সমস্ত ইলম দান করা হয়েছে। আর এজন্যেই পৃথিবীতে যত জ্ঞান-সাধনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল উৎস হলো প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহান বাণী।

قَوْلُهُ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ...... وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবী রাসূলগণের আবির্ভাব এবং তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে বিষয়টিকে আরো দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে পেশ করা হয়েছে যে, নবী রাসূল প্রেরণ একটি চূড়ান্ত দলিল। অর্থাৎ এটা সর্বশেষ দলিল যার মধ্য দিয়ে বান্দার জন্যে সকল প্রমাণ প্ররিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের কয়েকটি ওজর-আপত্তির উল্লেখ করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল প্রেরণ করার পর কাফেররা কিয়ামতের দিন আর এ ওজর পেশ করতে পারবে না যে, আমাদেরকে কেন অকারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে, দলিল পরিপূর্ণ হওয়ার পরই আজাব এসে থাকে এবং রাসূল প্রেরণই হচ্ছে এ পর্যায়ের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত দলিল। এরপর অপরাধীর জন্যে আর কোনো ওজর আপত্তির সুযোগ থাকে না। তাই ইরশাদ হয়েছে ....وَلَوْلَا أَنْ

অর্থাৎ "আর যদি রাসূল প্রেরণ না করা হতো এবং তাদের কীর্তিকলাপের পরিণতিতে কোনো বিপদ আপতিত হতো তবে তারা বলতো, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করলে না? যদি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরিত হতেন এবং তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করতেন তবে আমরা সে অনুসারে সৎকাজ করতাম।"

এ দাবি অনুযায়ী তাদের উচিত রাসূলের আগমনকে একটি বড় নিয়ামত এবং সৌভাগ্য মনে করা এবং আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ দীনকে তৎক্ষণাৎ কবুল করে নেওয়া। কিন্তু তাদের অবস্থা হলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যদি কোনো নবী প্রেরণের পূর্বে কাফেরদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, তবে তারা বলবে আমাদের নিকট কোনো রাসূল প্রেরিত হলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যখন তাদের নিকট রাসূলের আগমন হলো তখন তারা তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। যখন তাদের কাছে 'সত্য' নিজেই এসে গেল, তখন তারা তাঁর প্রতি নানা রকম সন্দেহ পোষণ করে বলতে লাগল, আপনাকে সেই সকল মুজেযা কেন দেওয়া হয়নি যা আপনার পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল? যেমন– হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং আলোকময় হাত প্রভৃতি। যদি আপনার নিকটও এমন মুজেযা থাকতো, তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনতাম। শুধু তাই নয়, বরং কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে একথাও বলতো, কুরআন যদি তাওরাতের ন্যায় একই সঙ্গে নাজিল হতো তবে আমরা আপনার প্রতি এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনতাম।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ কাফেরদের এসব মূর্খতাপ্রসূত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এসব প্রশ্ন নিতান্ত অমূলক। কেননা সকল নবী রাসূলের মুজেযা একই প্রকার হওয়া জরুরি নয়, আর সমস্ত আসমানি গ্রন্থা একইভাবে নাজিল হওয়া ও জরুরি নয়। অথচ পবিত্র কুরআন হলো সমস্ত আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি হলো বিশ্বগ্রন্থ, সর্বকালের মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে এ মহান গ্রন্থে।

আবদ ইবনে হামিদ, ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবি হাতেম মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদেরকে বলতো যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তোমরা বল, ইনি কেমন রাসূল? যদি তিনি সত্য রাসূল হন, তবে তাঁকে মূসার ন্যায় মুজেযা কেন দেওয়া হলো না, আর এই কিতাবই বা কেমন কিতাব, যদি এটি সত্যিই আল্লাহর কিতাব হয় তবে তা তাওরাতের ন্যায় এক সঙ্গে কেন নাজিল হয়নি? একটু একটু করে কেন নাজিল হয়?

আল্লাহ পাক তাদের এসব মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তার জবাবে ইরশাদ করেছেন– أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ

কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলছে মূসা যেমন মুজেযা পেয়েছিল এ রাসূল কেন তা পাননি, তাই তাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য হলো যে তারা কি ইতিপূর্বে হযরত মূসাকে (আ.) অস্বীকার করেনি? প্রকৃত অবস্থা হলো, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা তাদের সম্পূর্ণ মজ্জাগত, তাই রাসূল প্রেরণ না করলে তারা বলতো, আমাদের নিকট কোনো রাসূল কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি রাসূল প্রেরণ করা হতো তবে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম, আর যখন রাসূল প্রেরণ করা হলো তখন তারা এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছে।

قَوْلُهُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ : অর্থাৎ "তারা বলেছিল, দু'টিই জাদু; একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করছি।

তাফসীরকারগণ "দু'টিই জাদু"–এ কথার তাৎপর্য সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত হারূন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাঁরা উভয়েই ফেরাউনের নিকট তাওহীদের বাণী নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য বাক্য দ্বারা হযরত মূসা (আ.) এবং প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো তাওরাত এবং কুরআনে কারীম; আর তাওরাত ও কুরআন একে অন্যের সত্যায়নকারী।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর উর্দূ পারা- ২০, পৃ. ৩৪]

আর তারা বলতো আমরা উভয়কেই মানি না। মক্কার কুরাইশরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযার কথা শ্রবণ করতো তখন তারা বলতো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর যদি অনুরূপ মুজেযা থাকতো তবে আমরা ঈমান আনতাম। আর কাফেররা ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারতো যে, হুজুর আকরাম ﷺ সত্য নবী, তাঁর প্রতিটি কথা সত্য, পবিত্র কুরআন

আল্লাহ পাকের মহান বাণী, ধ্রুব সত্য। তখন তারা বলতো, আমরা কিছুই মানি না, পবিত্র কুরআন ও তাওরাত আমরা উভয়টিকেই অস্বীকার করি, আর উভয়টিকেই জাদু মনে করি, [হযরত] মূসা এবং [হযরত] মুহাম্মদ ﷺ উভয়েই জাদুকর। [নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক]

قَوْلُهُ قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا অর্থাৎ "[হে রাসূল!] আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এমন কিতাব আনয়ন কর যা উভয় গ্রন্থ থেকে উত্তম তবে তা আমি মেনে চলবো।"

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে পবিত্র কুরআন ও তাওরাত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো কিতাব নিয়ে এসো, যা কোনো কিতাবেরই সমকক্ষ হবে না, তবে আমি তা মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করবো না।

قَوْلُهُ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ : "এরপর [হে রাসূল] তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয় তবে জেনে রাখবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ করে"।

অর্থাৎ যদি তারা তা আনতে না পারে আর একথা সত্য যে কখনও তা পারবে না, তবে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা আসলে তোমাদের খেয়াল খুশিরই অনুসরণ কর, তোমাদের মন যা চায় তাই কর, তোমরা হেদায়েত কবুল করতে চাও না। এটি তোমাদের দুর্ভাগ্য যে, তোমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত রহমত এবং হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকতে চাও আর যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয় তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?

অনুবাদ :

٥١. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا بَيَّنَّا لَهُمُ الْقَوْلَ الْقُرْاٰنَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَتَّعِظُونَ فَيُؤْمِنُونَ -

৫১. আমি তো পৌঁছে দিয়েছি বর্ণনা করেছি তাদের নিকট বাণী কুরআন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ফলে তারা ঈমান আনয়ন করবে।

٥٢. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ - اَيْضًا نَزَلَ فِىْ جَمَاعَةٍ اَسْلَمُوْا مِنَ الْيَهُوْدِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهٖ وَمِنَ النَّصَارٰى قَدِمُوْا مِنَ الْحَبْشَةِ وَمِنَ الشَّامِ -

৫২. ইতিপূর্বে কুরআনের পূর্বে, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ আয়াতটি ইহুদিদের সে সকল ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। আর খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে সে সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা আবিসিনিয়া ও সিরিয়া থেকে আগমন করেছিলেন।

٥٣. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ الْقُرْاٰنُ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ مُوَحِّدِيْنَ -

৫৩. যখন তাদের নিকট কুরআন আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলাম।

٥٤. اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِاِيْمَانِهِمْ بِالْكِتٰبَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا بِصَبْرِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِمَا وَيَدْرَءُوْنَ يَدْفَعُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ مِنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ يَتَصَدَّقُوْنَ -

৫৪. তাদেরকেই দু বার প্রতিদান দেওয়া হবে। দুটি কিতাবের উপর ঈমান আনয়নের কারণে। যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। উভয়ের উপর আমলের ক্ষেত্রে তাদের ধৈর্যের কারণে এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে তাদের মধ্য হতে এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে সদকা করে।

٥٥. وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ الشَّتْمَ وَالْاَذٰى مِنَ الْكُفَّارِ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ز سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ز سَلَامُ مُتَارَكَةٍ اَىْ سَلِمْتُمْ مِنَّا مِنَ الشَّتْمِ وَغَيْرِهٖ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ لَا نَصْحَبُهُمْ -

৫৫. তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে কাফেরদের পক্ষ হতে গালমন্দ ও নির্যাতনের তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। এটা একে অন্যের পেছনে লেগে না থাকাটা সালাম-জ্ঞাপক। অর্থাৎ তো[illegible] আমাদের গালমন্দ ইত্যাদি থেকে নিরাপদ। আম[illegible] অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। অর্থাৎ তাদের সা[illegible] থাকব না।

অনুবাদ :

٥٦. وَنَزَلَ فِيْ حِرْصِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِيْمَانِ عَمِّهِ اَبِيْ طَالِبٍ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ هِدَايَتَهٗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ اَيْ عَالِمٌ بِالْمُهْتَدِيْنَ ـ

৫৬. রাসূল ﷺ -এর চাচা আবূ তালিবের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তাঁর অধিক আগ্রহের কারণে অবতীর্ণ হয়– আপনি যাকে ভালোবাসেন যার হেদায়েত কামনা করেন। ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে আনয়ন করেন তিনিই ভালো জানেন অবগত আছেন সৎপথ অনুসারীদের ব্যাপারে।

٥٧. وَقَالُوْا اَيْ قَوْمُهٗ اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ط اَيْ نُنْتَزَعْ مِنْهَا بِسُرْعَةٍ قَالَ تَعَالٰى اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يَأْمَنُوْنَ فِيْهِ مِنَ الْاِغَارَةِ وَالْقَتْلِ الْوَاقِعِيْنَ مِنْ بَعْضِ الْعَرَبِ عَلٰى بَعْضٍ يُجْبٰۤى بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ كُلِّ اَوْبٍ رِزْقًا لَهُمْ مِنْ لَّدُنَّا اَيْ عِنْدِنَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ مَا نَقُوْلُهٗ حَقٌّ ـ

৫৭. তারা বলে অর্থাৎ তার সম্প্রদায় আমরা যদি আপনার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করা হবে। অর্থাৎ আমাদের থেকে তা দ্রুত ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি। যেখানে লুটপাট ও হত্যা থেকে নিরাপদ থাকে; যাতে আরবরা একে অন্যের সাথে নিপতিত রয়েছে। যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় সর্বদিক থেকে। يُجْبٰى শব্দটি تَاءْ এবং يَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। রিজিক স্বরূপ তাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। যে, আমি যা বলি তা-ই সত্য।

٥٨. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۢ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا اَيْ عَيْشَهَا وَاُرِيْدَ بِالْقَرْيَةِ اَهْلُهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ط لِلْمَارَّةِ يَوْمًا اَوْ بَعْضَهٗ وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ مِنْهُمْ ـ

৫৮. আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা নিজেদের ভোগসম্পদের দম্ভ করত। অর্থাৎ তাদের সুখ-সামগ্রীর উপর। এখানে اَلْقَرْيَةُ দ্বারা তার অধিবাসী উদ্দেশ্য। এগুলো তো তাদেরই ঘরবাড়ি; তাদের পর এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে। অর্থাৎ গমনকারীরা একদিন বা তার কিছু অংশ পরিমাণ। আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। তাদের থেকে।

অনুবাদ :

٥٩. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ أَهْلِهَا حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ أُمِّهَا اَىْ اَعْظَمِهَا رَسُوْلاً يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ج وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰى اِلاَّ وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ بِتَكْذِيْبِ الرُّسُلِ ـ

৫৯. আপনার প্রতিপালক জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না। তার অধিবাসীদের অত্যাচারের কারণে তার কেন্দ্রে সর্ববৃহৎ অংশে রাসূল প্রেরণ না করে যিনি তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করবেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন এর অধিবাসীরা জুলুম করে। রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে।

٦٠. وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ط اَىْ تَتَمَتَّعُوْنَ وَتَتَزَيَّنُوْنَ بِهٖ اَيَّامَ حَيٰوتِكُمْ ثُمَّ يَفْنٰى وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ ثَوَابُهٗ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ـ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَنَّ الْبَاقِىَ خَيْرٌ مِنَ الْفَانِىْ ـ

৬০. তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা অর্থাৎ যা দ্বারা তোমরা পার্থিব জীবনে উপভোগ কর এবং সজ্জিত হও। অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যায়। এবং যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, আর তা হলো এর পুণ্যফল তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না। যে, স্থায়ী বস্তু অস্থায়ী বস্তু হবে উৎকৃষ্ট تَعْقِلُوْنَ শব্দটি تَاءْ এবং يَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهٗ وَصَّلْنَا : এটা (تَفْعِيْل) مَاضِىْ جَمْعُ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ, অর্থ– আমি একের পর এক প্রেরণ করেছি, সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ : صِلَةْ মিলে مَوْصُوْل, مُبْتَدَأْ আর هُمْ হলো দ্বিতীয় مُبْتَدَأْ-এর خَبَرْ হলো يُؤْمِنُوْنَ ; بِهٖ-এর সম্পর্ক হলো يُؤْمِنُوْنَ-এর সাথে, দ্বিতীয় مُبْتَدَأْ তার خَبَرْ সহ প্রথম مُبْتَدَأْ-এর خَبَرٌ

قَوْلُهٗ اَيْضًا : অর্থাৎ তাদের কিতাবের উপর যেরূপ ঈমান এনেছে তদ্রূপ।

قَوْلُهٗ بِصَبْرِهِمْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতের مَا-টি مَا مَصْدَرِيَّةْ

قَوْلُهٗ يَدْرَئُوْنَ : يَدْرَءُوْنَ, يُنْفِقُوْنَ ও وَاِذَا سَمِعُوْا এ সবগুলোর عَطْف হলো يُؤْتَوْنَ-এর উপর।

قَوْلُهٗ وَالْاَذٰى مِنَ الْكُفَّارِ : এটা خَاصْ-এর উপর عَامْ-এর عَطْف-এর অন্তর্গত।

قَوْلُهٗ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ : এখানে اِيْصَالٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ তথা হেদায়েত দ্বারা গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার অর্থকে نَفِىْ করা হয়েছে ; اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ [পথ প্রদর্শন] -কে নয়। সুতরাং اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-এর সাথে এর কোনো সংঘাত নেই।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا اَىْ قَوْمَهُ : এখানে কওম দ্বারা নবী করীম ﷺ-এর কওম উদ্দেশ্য। আর এর কথক হলো হারিস ইবনে উসমান ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফ।

قَوْلُهُ يُجْبٰى : এর অর্থ হলো বহন করে আনা হয়, আমদানি করা হয়। مِنْ كُلِّ اَوْبٍ অর্থ– প্রত্যেক দিক তথা অঞ্চল থেকে।

قَوْلُهُ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْئٍ : এর দ্বারা আধিক্য উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ -এর মধ্যে সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু উদ্দেশ্য, দুনিয়ার সকল বস্তু উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ مَعِيْشَتَهَا اَىْ عَيْشَتَهَا : مَعِيْشَتَهَا -এর মধ্যে مُضَافٌ বিলোপ করে ظَرْف তথা مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) عَيْش দ্বারা مَعِيْشَةٌ -এর ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং বাক্যটি এরূপ হবে– بَطِرَتْ فِىْ زَمَنِ حَيَاتِهَا

قَوْلُهُ لَمْ تَسْكُنْ : এটা বাক্য হয়ে حَالٌ হয়েছে, আমিল হলো [اُشِيْرَ -এর অর্থবোধক] تِلْكَ ; আর تِلْكَ শব্দটি مُبْتَدَأٌ -এর দ্বিতীয় خَبَرٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا : এর মধ্যকার مَا হলো شَرْطِيَّةٌ আর مِنْ شَيْئٍ হলো এর বিবরণ। جَوَابُ شَرْط উহ্য هُوَ হলো فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এর- مُبْتَدَأٌ এবং বাক্য হয়ে خَبَرٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মানুষের হেদায়েতের জন্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন, আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন, এভাবে মানুষের হেদায়েতের যাবতীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাতে করে কেউ কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পারে যে, রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে যদি আমাদের হেদায়েতের সুযোগ দেওয়া হতো, তবে আমরাও মুমিন হতাম। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আমি হক্ব বা সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছি, আর তাদের হেদায়েতের জন্যে আমার বাণীকে বার বার প্রেরণ করেছি, কুরআনে কারীমকে ধারাবাহিকভাবে অনবরত নাজিল করেছি, যাতে করে মানুষ তার মর্মবাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং তা স্মরণ করতে পারে। একই সঙ্গে পবিত্র কুরআন নাজিল করলে এ সুযোগ হতো না। তাই ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অর্থাৎ আর নিশ্চয় আমি তাদের নিকট আমার বাণী প্রেরণ করতে থাকি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ الخ : শানে নুযূল : ইবনে জারীর কাতাদা (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে আহলে কিতাবের দশজন লোক সত্যের অনুসারী ছিলেন, যখন প্রিয়নবী ﷺ-এর শুভাগমন হয়, তখন তারা সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁদেরই অন্যতম। আলোচ্য আয়াত তাঁদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। –[বগভী, ইবনে মরদবিয়া]

তাবারানী (র.) আওসাত গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর (র.) সাথীদের মধ্যে থেকে চল্লিশ ব্যক্তি এসেছিলেন, তাঁরা সপ্তম হিজরিতে অনুষ্ঠিত খায়বারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

তাঁদের মধ্যে কিছু লোক আহত হয়েছিলেন। খায়বারের ঘটনার পর তাঁরা দেখলেন, মুসলমানগণ অত্যন্ত দারিদ্রপীড়িত, তাই তাঁরা প্রিয়নবী ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা অর্থ-সম্পদশালী লোক, আমাদেরকে অনুমতি দান করুন আমরা যেন অর্থ সম্পদ নিয়ে আসতে পারি এবং মুসলমানগণের সাহায্য করতে পারি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবি হাতেম (র.) সাঈদ ইবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন হযরত জাফর (রা.) এবং তাঁর সাথীগণ যখন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট গমন করেন, তখন নাজ্জাশী তাঁদের মেহমানদারী করেন এবং তাঁদের সাথে অত্যন্ত

ভালো ব্যবহার করেন। যখন তাঁরা সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন নাজ্জাশীর দেশের সীমান্তের অধিবাসী কিছু লোক নাজ্জাশীর নিকট বলেন যে, আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরা যেন তাঁদের সঙ্গে যেতে পারি এবং সামুদ্রিক সফরে তাঁদের খেদমত করতে পারি। এরপর প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে পুনরায় আমরা ঈমান আনব, নাজ্জাশীর অনুমতিক্রমে তাঁরা হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হলেন এবং উহুদ, খায়বর ও হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গেই শরিক হলেন। এরপর তারা অনুমতি প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, আমাদেরকে দেশে ফেরত যেতে দিন, আমাদের অর্থ সম্পদ রয়েছে, তা দেশ থেকে এনে আমরা মুসলমান ভাইদের মধ্যে বিতরণ করতে চাই। কেননা মুহাজিরগণ আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত কষ্টে রয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা দেশে চলে গেলেন এবং অর্থ সম্পদ নিয়ে এসে মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন, তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ : وَصَّلْنَا শব্দটি تَوْصِيْل থেকে উদ্ভূত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতারা প্রভাবান্বিত হয়।

তাবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি : এ থেকে জানা গেল যে সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গাম্বরগণের তাবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মাসক্তিতে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারো মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেওয়ার সাধ্য তো কোনো সুহৃদ উপদেশদাতার নেই; কিন্তু নিজের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোসহীন। আজকালও যারা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাঁদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

'মুসলিম' শব্দটি উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, নাকি সব উম্মতের জন্য ব্যাপক? اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আহলে কিতাবের এই আলেমগণ বললেন, আমরা তো কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে 'মুসলিম' শব্দের আভিধানিক অর্থ [অনুগত, আজ্ঞাবহ] নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে কুরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই 'ইসলাম' ও 'মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি নয়; বরং সব পয়গাম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'ইসলাম ও 'মুসলিম' শব্দ এই উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি স্বয়ং কুরআনেই আছে যে- هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

আল্লামা সুয়ূতী (র.) এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা। এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্ব থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গাম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি- এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং 'মুসলিম' উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণত সিদ্দীক, ফারূক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর উপাধি; কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অন্যরাও সিদ্দীক ও ফারূক হতে পারেন।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : অর্থাৎ আহলে কিতাবের মুমিনদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে বা প্রতিদান দেওয়া হবে। কুরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্রা ভার্যাগণ সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্য দুবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- ১. যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। ২. যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন মনিবেরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের ফরমাবরদারী করে। ৩. যার মালিকানায় কোনো বাঁদি ছিল। এই বাঁদির সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েজ ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই, কয়েক প্রকার লোককে দুবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আসল যেহেতু দু'টি তাই তাদেরকে দুবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, পূর্বে এক পয়গাম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনুগত্য ও মহব্বত রাসূল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য তথা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং মনিবের আনুগত্য। বাঁদিকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জবাবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফভিত্তিক হওয়ার কারণ সবার জন্য ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মু'মিন অথবা পবিত্রাগণের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই; বরং যে কেউ দুই আমল করবে সে দুই পুরস্কার পাবে। কুরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এইযে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু পুরস্কার নয়। কেননা এটা প্রত্যেক আমলকারীর জন্য সাধারণ কুরআনিক বিধি- لَا يُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো আমল কারীর আমল বিনষ্ট করেন না; বরং সে যতই সৎকর্ম করবে, তারই হিসাবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লিখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে তাদের প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে। প্রত্যেক নামাজের দ্বিগুণ, রোজা, সদকা, হজ ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ ছওয়াব তারা লাভ করবে। কুরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল أَجْرَيْنِ ; কিন্তু কুরআন এর পরিবর্তে বলেছে- أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য প্রত্যেক আমল দুইবার লেখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্য দুই ছওয়াব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জবাব এই যে, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা আছে তিনি বিশেষ কোনো আমলকে অন্যান্য আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারো এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তা'আলা রোজার ছওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? জাকাত ও সদকার ছওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তবা অন্যান্য আমলের চেয়ে কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে বেশি। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোনো কোনো আলেম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্য- بِمَا صَبَرُوْا-এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রমে সবর করা দ্বিগুণ ছওয়াবের কারণ।

قَوْلُهُ وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ : অর্থাৎ তারা মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে? সে সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভালো বলে ইবাদত এবং মন্দ বলে গুনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা পুণ্য কাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে বলেন- أَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا অর্থাৎ গুনাহের পর নেক কাজ কর। নেক কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভালো বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনুবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা অপরের অজ্ঞতার জবাব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা এগুলো সবই ভালো ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে। যথা- ১. কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেল তার প্রতিকার এই যে, এরপর সৎকাজে সচেষ্ট হতে হবে। সৎকাজ গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। যেমনটা উপরে মুয়াজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. কেউ কারো প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরিয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভালো এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকৃষ্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ .

অর্থাৎ, মন্দ ও জুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর [জুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর]। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ : অর্থাৎ তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র এই যে, তারা কোনো অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শুনে, তখন তার জবাব দেওয়ার পরিবর্তে এ কথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাস্‌সাস (র.) বলেন, সালাম দুই প্রকার। এক মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। দুই সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে বলে দেওয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নিব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ الخ : শানে নুযূল : যখন হুজুর ﷺ-এর বিশেষ পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিবের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট গমন করে অশ্রুসিক্ত নয়নে আরজ করলেন, চাচাজান! আপনি একটি বার মুখে এ কথা বলুন যে, লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহু; যাতে আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারি। কিন্তু সে সময় পার্শ্বে কতিপয় কুরাইশ নেতৃবর্গও উপস্থিত ছিল। তাদের কারণে তিনি কালিমা শরীফ পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন। তবে এ কথা বলেছিলেন যে, ভাতিজা ! আমি জানি যে, তুমি সত্যবাদী, কিন্তু আমি একথা সহ্য করতে পারি না যে, লোকেরা আমার মৃত্যুর পর এ কথা বলবে যে, আবূ তালিবকে মৃত্যুর ভয় পেয়ে বসেছে। যদি এ আশঙ্কা না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমার চক্ষুশীতল করে দিতাম। কারণ আমি তোমার মনের আক্ষেপ ও কল্যাণকামিতা প্রত্যক্ষ করছি। এরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন–

لَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ * مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا

لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ حِذَارُ مُسَبَّةٍ * لَوَجَدْتَنِىْ سَمَاحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا

তবে এরপর তিনি বলেন– لٰكِنْ سَوْفَ اَمُوْتُ عَلٰى مِلَّةِ الْاَشْيَاخِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهَاشِمٍ وَعَبْدِ مَنَافٍ ثُمَّ مَاتَ

অর্থাৎ "তবে আমি মৃত্যুবরণ করছি আমার পূর্বসূরিদের ধর্মের উপর, আর তারা হলেন আব্দুল মুত্তালিব, হাশিম, ও আবদে মানাফ" অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন।

এতে নবী করীম ﷺ অতিশয় ব্যথিত হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন–اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ অর্থাৎ কাউকে ঈমানদার বানানো এবং হৃদয়ে ঈমান প্রবিষ্ট করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। আপনার কাজ হলো কেবল চেষ্টা পরিশ্রম করতে থাকা। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে যে, খাজা আবূ তালিবের কুফর ও ঈমানের ব্যাপারে কোনো আলোচনা পর্যালোচনা ও মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ এতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর মনে কষ্ট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। [এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত]

قَوْلُهٗ قَالُوْا اِنْ نَتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا : অর্থাৎ হারিস ইবনে উসমান প্রমুখ কাফের তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আমরা আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি; কিন্তু আমাদের আশঙ্কা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেওয়া হবে। –[নাসায়ী]

কুরআন পাক তাদের এই খোড়া অজুহাতের নিম্নোক্ত তিনটি জবাব দিয়েছে–

প্রথম জবাব : أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হেফাজতের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হেরেম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘোরতর হারাম। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্পৃহা সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব, যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মূর্খতা বৈ কিছুনয়। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হেরেমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেওয়া রিজিক স্বাচ্ছন্দ্যে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের ইবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হলো না, উল্টা ভয় হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে। -[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতে হেরেমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। যথা- ১. এটা শান্তির আবাসস্থল ২. এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হেরেমে প্রত্যেক প্রকার ফলমূল আমদানি হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন : মক্কা মুকাররামা যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজ গৃহ হিসেবে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন। এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোনো বস্তু সহজে পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। কেননা গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফলমূল, তরকারি ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরো বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনো শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোনোদিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে; বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবারাত্রির সকল সময় প্রচুর পরিমাপে তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কুরআন পাকের ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَمَرَاتٌ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থানটি ছিল এরূপ বলার- ثَمَرَاتُ كُلِّ شَجَرٍ ; এর পরিবর্তে ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ বলার মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, ثَمَرَاتٌ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফলমূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোনো উৎপাদন। মিল কারখানার নির্মিত সামগ্রী ও মিল-কারখানার ثَمَرَاتٌ তথা উৎপন্ন দ্রব্য। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, মক্কার হেরেমে শুধু আহার্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানি হবে না; বরং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কায় যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোনো দেশেই বোধ হয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জবাব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এ দেশে কোনো কিছু উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্যসামাগ্রী এখানে এনে একত্র করেছেন, সেই বিশ্বস্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে- এরূপ আশঙ্কা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়।

দ্বিতীয় জবাব : তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জবাব হলো- وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শিরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শিরকের কারণে বিপাদাশঙ্কা বোধ কর না; কিন্তু ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর।

তৃতীয় জবাব : তাদের অজুহাতের তৃতীয় জবাব হলো– وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী এবং কারো কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী সম্পদ ও নিয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

قَوْلُهُ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا : অর্থাৎ অতীত সম্প্রদায়সমূহের যেসব জনপদকে আল্লাহর আজাব দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জাজের উক্তি অনুযায়ী এই 'সামান্য'-এর অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোনো বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'সামান্য'-এর অর্থ সামান্য ক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্য ক্ষণ থাকে, যেমন– কোনো পথিক অল্পক্ষণের জন্য কোথাও বসে জিরিয়ে নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

قَوْلُهُ اُمٌّ حَتّٰى يَبْعَثَ فِيْ اُمِّهَا رَسُوْلًا : اُمٌّ শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। اُمِّهَا-এর সর্বনাম দ্বারা قُرٰى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোনো রাসূলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌছিয়ে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করেন না, তখন জনপদসমূহের উপর আজাব নেমে আসে। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পয়গাম্বরগণ সাধারণত বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণত শহরের অধীন হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও। প্রধান শহরে কোনো বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই কোনো বড় শহরে রাসূল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহর পয়গাম কবুল করা ফরজ হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আজাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন : এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোনো নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার উপর গ্রহণযোগ্য হয় না।

এজন্যে রমজান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফিকহবিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরিয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের তা মেনে নেওয়া জরুরি। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্য এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারি না করা পর্যন্ত জরুরি হবে না। –[ফতোয়ায়ে গিয়াসিয়া]

قَوْلُهُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى : অর্থাৎ দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-বাসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকারে দিতে পারে না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশি করে : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরিয়তসম্মত প্রাপক হবে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা বুদ্ধির দাবি এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারাই। এই মাসআলা হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুররে মুখতারেও উল্লিখিত আছে।

অনুবাদ :

٦١. اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ مُصِيْبُهُ وَهُوَ الْجَنَّةُ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَيَزُوْلُ عَنْ قَرِيْبٍ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ . اَلنَّارُ اَلْاَوَّلُ الْمُؤْمِنُ وَالثَّانِى الْكَافِرُ اَىْ لَا تَسَاوِىْ بَيْنَهُمَا .

৬১. যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে পাবে আর তা হলো জান্নাত সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি। যা অতি নিকটকালেই নিঃশেষ হয়ে যাবে যাকে পরে কিয়ামতের দিন হাজির করা হবে জাহান্নামের আগুনে। এখানে প্রথমজন হলো মুমিন, আর দ্বিতীয়জন হলো কাফের। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে কোনো সমতা নেই।

٦٢. وَاذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَائِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ هُمْ شُرَكَائِىْ .

৬২. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন তিনি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আহবান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে শরিক আমার অংশীদার। গণ্য করতে তারা কোথায়?

٦٣. قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِدُخُوْلِ النَّارِ وَهُمْ رُؤَسَاءُ الضَّلَالَةِ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا ج مُبْتَدَأٌ وَصِفَتُهُ اَغْوَيْنٰهُمْ خَبَرُهُ فَغَوُوْا كَمَا غَوَيْنَا ج لَمْ نُكْرِهْهُمْ عَلَى غَىٍّ تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ ز مِنْهُمْ مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ . مَا نَافِيَةٌ وَقُدِّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلْفَاصِلَةِ .

৬৩. যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, নরকাগ্নিতে প্রবেশ করার। তারা হলো চরম পথভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হে আমাদের প্রতিপালক! এদেরকেই আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদা এবং সিফত এদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম এটি মুবতাদার খবর, ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে বাধ্য করিনি আমরা আপনার সমীপে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি তাদের থেকে। এরা তো আমাদের উপাসনা করত না এখানে مَا টি হলো نَافِيَةٌ আর আয়াতের শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য মাফউলকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦٤. وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ اَىِ الْاَصْنَامَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ شُرَكَاءُ اللّٰهِ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ دُعَاءَهُمْ وَرَاَوُا هُمُ الْعَذَابَ اَبْصَرُوْهُ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ فِى الدُّنْيَا مَا رَاَوْهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৬৪. তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের দেবতাগুলোকে আহবান কর। অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরিক বলে মনে করতে তখন এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে চাক্ষুষ দেখবে হায়! এরা যদি সৎপথ অনুসরণ করত। পৃথিবীতে অবস্থানকালে। তবে তারা পরকালে শাস্তি প্রত্যক্ষ করত না।

অনুবাদ :

٦٥. وَ اذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَيْكُمْ .

৬৫. এবং স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন এদেরকে ডাকবেন আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়েছিলে? তোমাদের নিকট প্রেরিতগণকে।

٦٦. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ الْاَخْبَارُ الْمُنْجِيَةُ فِى الْجَوَابِ يَوْمَئِذٍ اَىْ لَمْ يَجِدُوْا خَبَرًا لَهُمْ فِيْهِ نَجَاةٌ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ . عَنْهُ فَيَسْكُتُوْنَ .

৬৬. সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে উত্তরের ক্ষেত্রে নাজাত দানকারী তথ্যাবলি। অর্থাৎ এমন কোনো তথ্য পাবে না যার মধ্যে তাদের মুক্তি নিহিত রয়েছে। আর এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না সে সম্পর্কে; বরং নীরব হয়ে থাকবে।

٦٧. فَاَمَّا مَنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ وَاٰمَنَ صَدَّقَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اَدَّى الْفَرَائِضَ فَعَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ النَّاجِيْنَ بِوَعْدِ اللّٰهِ .

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তওবা করেছে শিরক হতে এবং ঈমান এনেছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করেছে ফরজসমূহ পালন করেছে আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুপাতে মুক্তিপাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

٦٨. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ط مَا يَشَآءُ مَا كَانَ لَهُمْ لِلْمُشْرِكِيْنَ الْخِيَرَةُ ط الْاِخْتِيَارُ فِىْ شَىْءٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ عَنْ اِشْرَاكِهِمْ .

৬৮. আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের মুশরিকদের কোনো হাত নেই। এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। তাদের শরিক স্থাপন থেকে।

٦٩. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ تُسِرُّ قُلُوْبُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْلِنُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْكِذْبِ .

৬৯. আর আপনার প্রতিপালক জানেন তাদের অন্তরে যা গোপন করে অর্থাৎ তাদের হৃদয় কুফর ইত্যাদি হতে যা লুকিয়ে রাখে। এবং তারা যা ব্যক্ত করে। তাদের রসনার মাধ্যমে, মিথ্যা ইত্যাদি।

٧٠. وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ الْجَنَّةِ وَلَهُ الْحُكْمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالنُّشُوْرِ .

৭০. তিনিই আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সকল প্রশংসা তাঁরই ইহকালে পৃথিবীতে ও পরকালে জান্নাতে বিধান তাঁরই সর্ববিষয়ে জারিকৃত সিদ্ধান্ত তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

অনুবাদ :

٧١. قُلْ لِاَهْلِ مَكَّةَ ـ اَرَاَيْتُمْ اَىْ اَخْبِرُوْنِىْ وَانْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا دَائِمًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ بِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ ط نَهَارٍ تَطْلُبُوْنَ فِيْهِ الْمَعِيْشَةَ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ذٰلِكَ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ فَتَرْجِعُوْنَ عَنِ الْاِشْرَاكِ ـ

৭১. আপনি বলুন! মক্কাবাসীকে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? অর্থাৎ আমাকে জানিয়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন। তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ আছে যে, তোমাদের আলোক এনে দিতে পারে? দিন যাতে তোমরা জীবিকা অন্বেষণ করবে তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না। বুঝার জন্য। ফলে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণ হতে ফিরে আসবে।

٧٢. قُلْ لَهُمْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ بِزَعْمِكُمْ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ تَسْتَرِيْحُوْنَ فِيْهِ ط مِنَ التَّعْبِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَاءِ فِى الْاِشْرَاكِ فَتَرْجِعُوْنَ عَنْهُ ـ

৭২. আপনি বলুন তাদেরকে তোমরা কি ভেবে দেখেছ? আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন তোমাদের ধারণা মতে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে? যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার আরাম গ্রহণ করতে পার ক্লান্তি থেকে। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না? আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকরণের কারণে তোমরা ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছ, ফলে তার থেকে ফিরে আসবে।

٧٣. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ تَعَالٰى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ فِى الَّيْلِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ فِى النَّهَارِ بِالْكَسْبِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ النِّعْمَةَ فِيْهِمَا ـ

৭৩. তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছেন রজনী ও দিবস যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার রজনীতে এবং তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার দিবসে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। রাতে দিনে তার নিয়ামতের ।

অনুবাদ :

٧٤. وَ اُذْكُرْ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَائِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ذُكِرَ ثَانِيًا لِيَبْنِىَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ .

৭৪. স্মরণ করুন সেদিনকে, যেদিন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরিক গণ্য করতে তারা কোথায়? সামনের কথাকে এর উপর ভিত্তি করার উদ্দেশ্যে এটাকে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

٧٥. وَنَزَعْنَا اَخْرَجْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا وَ هُوَ نَبِيُّهُمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِمَا قَالُوْهُ فَقُلْنَا لَهُمْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ عَلٰى مَا قُلْتُمْ مِنَ الْاِشْرَاكِ فَعَلِمُوْٓا اَنَّ الْحَقَّ فِى الْاِلٰهِيَّةِ لِلّٰهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيْهَا اَحَدٌ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ . فِى الدُّنْيَا مِنْ اَنَّ مَعَهُ شَرِيْكًا تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ .

৭৫. প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী বের করে আনব আর তিনি হলেন তাদের নবী। তিনি তাদেরকে যা বলেছেন সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং বলব তাদেরকে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর শিরক সম্পর্কে তোমরা যা বলতে সে বিষয়ে তখন তারা জানতে পারবে যে, ইলাহ হওয়ার অধিকার আল্লাহরই তাতে কেউই অংশীদার নয়। এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে। পৃথিবীতে যে, তাঁর সাথে অংশীদার রয়েছে। আল্লাহ তা থেকে ঊর্ধ্বে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ; এটা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের জবাব স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে–

প্রশ্ন : সেদিন মুশরিকদরেকে বলা হবে যে, আমার শারকগণ কোথায়, যাদের তোমরা উপাসনা ও পূজা-অর্চনা করতে? এ প্রশ্নের উত্তরদানের পরিবর্তে মুশরিকদের নেতৃবর্গের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যাবে। অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে দোষারোপ করবে, আর অনুসৃতগণ অনুসারীদেরকে দোষ চাপাবে।

قَوْلُهُ مُبْتَدأ وَصِفَتُهُ : এখানে هٰؤُلَاءِ হলো مَوْصُوْف আর اَلَّذِيْنَ হলো اِسْمُ مَوْصُوْل আর اَغْوَيْنَا জুমলা হয়ে তার صِلَةٌ এখানে عَائِدٌ هُمْ. উহ্য রয়েছে, বাক্যটি এরূপ ছিল– مَوْصُوْل صِلَةٌ . اَغْوَيْنَاهُمْ মিলে صِفَتْ আর مَوْصُوْف مُبْتَدأ এবং اَغْوَيْنَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا হলো خَبَرٌ মিলে صِفَتْ

قَوْلُهُ قَدَّمَ الْمَفْعُوْلُ لِلْفَاصِلِ : মূলত বাক্যটি ছিল– مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَنَا আয়াতের শেষের ছন্দ ঠিক রাখার জন্য مَفْعُوْل-কে আগে আনা হয়েছে। ফলে مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا رَاَوْهُ فِى الْاٰخِرَةِ : এটা হলো لَمْ-এর جَوَابٌ, কেউ কেউ ذَالِكَ لَا نجاهم-কে উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় হেদায়েতের উপর থাকত তাহলে তাদের হেদায়েত পরকালে তাদেরকে কামিয়াব করে দিত।

قَوْلُهُ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ : এখানে বাক্যে قَلْبٌ বা স্থানচ্যুতি ঘটেছে। আর এটা বাক্যের অলংকার বিবেচিত হয়। মূলত فَعَمُوْا عَنِ الْاَنْبَاءِ ছিল। ব্যাখ্যাকার (র.)-এর উক্তি لَمْ يَجِدْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ : এখানে عَمّى -এর صِلَةْ - عَلىٰ আসায় তা خَفِىْ -এর অর্থ বিশিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ : عَسٰى এখানে تَحْقِيْقْ -এর জন্য, تَقْرِيْب -এর জন্য নয়। কেননা বড়দের পক্ষ থেকে আশা প্রদান করাটা তা বাস্তবায়িত হওয়ার একীন বুঝায়। আর আল্লাহ তা'আলা তো اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ [সকল দয়ালুদের দয়ালু] অতএব, আল্লাহ তা'আলার বাণীতে عَسٰى শব্দটি حَقّقْ অর্থে হবে। আর যদি تَرَجّى তথা সন্দেহসূচক অর্থেই নেওয়া হয় তাহলে তা তওবাকারীদের বিবেচনায় হবে।

قَوْلُهُ سَرْمَدًا : سَرْمَدًا শব্দটি جَعَلَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْلٌ সদা অর্থে, এটা سَرْدٌ হতে নিষ্পন্ন। অর্থাৎ আবিরত হওয়া, একের পর এক হওয়া, এতে مِيْمٌ -টি অতিরিক্ত। আরবগণ হারাম মাসগুলো সম্পর্কে বলতেন- ثَلَاثَةٌ سَرْدٌ وَاحِدٌ فَرْدٌ তিনটি মাস ধারাবাহিক, আর একটি পৃথক।

قَوْلُهُ قُلْ لَهُمْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا : এটা تَنَازُعُ الْفِعْلَانِ -এর অন্তর্গত اَرَاَيْتُمْ এবং جَعَلَ উভয়টি اَللَّيْلَ -কে مَعْمُوْلٌ বানাতে চায়, উভয়টি চায় তার مَفْعُوْلٌ তথা اَللَّيْلَ -কে আমল দিতে। এখানে দ্বিতীয়টির আমল দেওয়া হয়েছে, আর প্রথম فِعْل -এর مَفْعُوْلٌ বিলুপ্ত গণ্য করা হয়েছে। আর সেটা হলো اَرَاَيْتُمُوْهُ -এর মধ্যকার ه যমীর। এর দ্বিতীয় مَفْعُوْلٌ হলো পরে উল্লিখিত প্রশ্নবোধক বাক্যটি। দ্বিতীয় ফে'লের দ্বিতীয় মাফউল হলো جَعَلَ -এর اَللَّيْلَ، فَاعِلٌ হলো اَللّٰهُ- فِعْل شَرْط হলো তার جَعَلَ- حَرْفُ شَرْط হলো اِنْ আর سَرْمَدًا প্রথম مَفْعُوْلٌ এবং سَرْمَدًا দ্বিতীয় مَفْعُوْلٌ এখানে جَوَابُ شَرْط উহ্য রয়েছে, তা হলো اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ مَاذَا تَفْعَلُوْنَ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا مَاذَا تَفْعَلُوْنَ [আল্লাহ যদি তোমাদের উপর স্থায়ী করে দিত তাহলে তোমরা কি করতে?]

قَوْلُهُ ذَكَرَ ثَانِيًا : অর্থাৎ দ্বিতীয়বার উল্লেখের কারণ হলো তার উপর পরবর্তী কথার ভিত্তি করা।

قَوْلُهُ اَيْنَ شُرَكَائِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ : এটাকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। হুবহু এ আয়াত সূরার শুরুতে উল্লিখিত হয়েছিল। ইমাম বায়যাভী (র.) বলেন- تَقْرِيْعٌ بَعْدَ تَقْرِيْعٍ অর্থাৎ এটা হলো তিরস্কারের পর তিরস্কার। কেননা শিরকের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় কোনো বিষয় নেই অথবা প্রথমটি তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও ধারণা বর্ণনা করার জন্যে, আর দ্বিতীয়টি এ কথা বলার জন্যে যে, শিরকী মতবাদ কোনো গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত বিষয় নয়; বরং তা নিছক কাল্পনিক ও স্বরচিত বিষয় মাত্র।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমান আনয়ন এবং হেদায়েত গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, এমনিভাবে কুফর ও নাফরমানির পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যেভাবে ঈমান ও হেদায়েতের সুফল কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে, ঠিক তেমনিভাবে কুফর ও নাফরমানির শোচনীয় পরিণতিও ভোগ করতে হবে আখিরাতে। আলোচ্য আয়াতের প্রারম্ভে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানের পার্থক্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত রয়েছে।

তাই ইরশাদ হয়েছে- اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ পাক তার ঈমান এবং নেক আমলের কারণে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে তা অবশ্যই পাবে। সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যাকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার ধন-সম্পদ দান করেছেন, এ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ হয়ে সে জীবনকে অতিবাহিত করেছে, গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায় এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবন যাপন করেছে, উভয়ে কখনো সমান হতে পারে না, যেমন সমান হতে পারে না আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং হক ও বাতিল।

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরিকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শিরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরিক বলতে এবং তাঁদের কথামতো চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোনো সাহায্য করতে পারে

কি? জবাবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোনো দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে এ কথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই; কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গাম্বরগণও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গাম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো ধর্তব্য ওজর নয়।

قَوْلُهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ : শানে নুযূল : যখন নবী করীম ﷺ নবুয়তের দাবি করলেন, তখন মানুষের নিকট তার কথা বিস্ময়কর মনে হলো। বিশেষ করে অলীদ ইবনে মুগীরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল, আল্লাহ তা'আলার যদি কাউকে নবী বানানোর প্রয়োজনই হতো তাহলে মক্কা ও তায়েফের দু'নেতার মধ্য হতে একজনকে বানালেন না কেন? তারাই তো এর যোগ্য ছিল, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[জুমাল]

قَوْلُهُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ : يَخْتَارُ-এর অর্থ– বিধান জারির ক্ষমতা। আল্লাহ তা'আলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোনো শরিক নেই, তখন বিধান জারিতেও তিনি একক, তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান জারি করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোনো শরিক নেই, তেমনি বিধান জারি করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী (র.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়্যিম (র.) যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, يَخْتَارُ-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা সম্মান দানের জন্য মনোনীত করেন। বগভী (র.)-এর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জবাব যে– لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ অর্থাৎ এই কুরআন আরবের দুটি বড় শহর মক্কা ও তায়েফের মধ্য থেকে কোনো প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হলো না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হতো। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাজিল করার রহস্য কি? এ জবাবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্টজগতকে কোনো অংশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোনো বান্দাকে বিশেষ দানের জন্য মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক বক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা : হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (র.) এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধি উদ্ধার করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ঊর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গাম্বরগণকে সমগ্র আদম সন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গাম্বরগণকে অন্য পয়গাম্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও তাঁর হাবীব মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গাম্বরগণের উপর, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কুরাইশকে তাদের সবার উপর, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সব বনী হাশিমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও দান করাও আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ও ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা

সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দুটি। একটি ইচ্ছাধীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (র.) এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর, অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব, অতঃপর উসমান গনী এবং অতঃপর আলী মুর্তজা (রা.)-এর ক্রমকে উপরিউক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। এই বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (র.)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। بَعْدَ التَّفْصِيْلِ لِمَسْئَلَةِ التَّفْضِيْلِ নামে মুফতী শফী (র.)-এর উর্দূ তরজমা প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া তিনি আহকামুল কুরআন গ্রন্থের সূরা কাসাসেও আরবি ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিষয়টি সুধীবর্গের জন্য রুচিকর। তাঁরা সেখানে দেখে নিতে পারেন।

قَوْلُهُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا .... أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাত্রির সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ রাত্রিতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضِيَاءٍ বলে তার কোনো উপকারিতা উল্লেখ করেন নি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সত্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলো যে উত্তম, তা সুবিদিত। আলোর অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত্রি হচ্ছে অন্ধকার, যা সত্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়; বরং শুধুমাত্র মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تَسْمَعُوْنَ এবং রাত্রির ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশি যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই أَفَلَا تَسْمَعُوْنَ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতায় তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ বলা হয়েছে। -[মাযহারী]

অনুবাদ :

٧٦. اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى ابْنِ عَمِّهٖ وَابْنِ خَالَتِهٖ وَاٰمَنَ بِهٖ فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص بِالْكِبَرِ وَالْعُلُوِّ وَكَثْرَةِ الْمَالِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْءُ تُثْقِلُ بِالْعُصْبَةِ الْجَمَاعَةِ اُولِى اَصْحَابِ الْقُوَّةِ اَىْ تُثْقِلُهُمْ فَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ وَعَدَّتُهُمْ قِيْلَ سَبْعُوْنَ وَقِيْلَ اَرْبَعُوْنَ وَقِيْلَ عَشَرَةٌ وَقِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ اُذْكُرْ اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهُ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لَا تَفْرَحْ بِكَثْرَةِ الْمَالِ فَرَحَ بَطَرٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ بِذٰلِكَ ـ

৭৬. কারূন তো ছিল হযরত মূসা (আ) এর সম্প্রদায়ভুক্ত। তার চাচাতো ও খালাতো ভাই। সে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করোছিল। অহংকার, উন্নতি ও সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান ও শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। অর্থাৎ তাদেরকে কষ্টে ফেলে দিত। এখানে تَعْدِيَةْ টি بَاءْ এর- بِالْعُصْبَةِ -এর জন্য তথা تَنُوْءُ ক্রিয়াটি স্বকর্ম ক্রিয়ায় পরিণত করার জন্য। তাদের লোকসংখ্যা ৭০ জন, কারো মতে ৪০ জন, কারো মতে ১০ জন ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। স্মরণ করুন, যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মুমিনগণ দম্ভ করো না সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে, দাম্ভিকতামূলক আনন্দ উদ্দেশ্য। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। এর দ্বারা।

٧٧. وَابْتَغِ اُطْلُبْ فِيْمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ مِنَ الْمَالِ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ بِاَنْ تُنْفِقَهٗ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَلَا تَنْسَ تَتْرُكْ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اَىْ اَنْ تَعْمَلَ فِيْهَا لِلْاٰخِرَةِ وَاَحْسِنْ لِلنَّاسِ بِالصَّدَقَةِ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ تَطْلُبِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط بِعَمَلِ الْمَعَاصِىْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ بِمَعْنٰى اَنَّهٗ يُعَاقِبُهُمْ ـ

৭৭. আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন সম্পদ থেকে তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এভাবে যে, তুমি তা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করবে এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না অর্থাৎ, দুনিয়ায় থেকে পরকালের জন্য কাজ করবে। তুমি অনুগ্রহ কর মানুষের জন্য সদকার মাধ্যমে যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। গুনাহ ও অবাধ্যাচরণের মাধ্যমে। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

অনুবাদ :

٧٨. قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ اَىِ الْمَالَ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ ط اَىْ فِىْ مُقَابَلَتِهٖ وَكَانَ اَعْلَمَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِالتَّوْرٰىةِ بَعْدَ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ قَالَ تَعَالٰى اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْثَرُ جَمْعًا ط لِلْمَالِ اَىْ وَهُوَ عَالِمٌ بِذٰلِكَ وَيُهْلِكُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ لِعِلْمِهٖ تَعَالٰى بِهَا فَيَدْخُلُوْنَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ.

৭৮. সে বলল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি অর্থাৎ জ্ঞানের বিনিময়ে। সে হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর পরে বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাওরাত সম্পর্কে অবগত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক অর্থাৎ এ বিষয়ে সে ছিল অভিজ্ঞ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবহিত থাকার কারণে। কাজেই তারা বিনা হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٧٩. فَخَرَجَ قَارُوْنُ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط بِاَتْبَاعِهِ الْكَثِيْرِيْنَ رُكْبَانًا مُتَحَلِّيْنَ بِمَلَابِسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلٰى خُيُوْلٍ وَبِغَالٍ مُتَحَلِّيَةٍ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ فِى الدُّنْيَا اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ نَصِيْبٍ عَظِيْمٍ وَافٍ فِيْهَا.

৭৯. কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমকতা সহকারে স্বর্ণ ও রেশমি পোশাক পরিধান করে তার অনুগত বিপুল সংখ্যক লোকের সমভিব্যহারে সুসজ্জিত অশ্ব ও খচ্চরে আরোহণ করে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহ! কারূনকে যেরূপ দেওয়া হয়েছে, আমাদেরকেও যদি তা দেওয়া হতো! পৃথিবীতে। প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।

٨٠. وَقَالَ لَهُمُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَيْلَكُمْ كَلِمَةُ زَجْرٍ ثَوَابُ اللّٰهِ فِى الْاٰخِرَةِ بِالْجَنَّةِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج مِمَّآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ فِى الدُّنْيَا وَلَا يُلَقّٰهَآ اَىِ الْجَنَّةَ الْمُثَابَ بِهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ. عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ.

৮০. এবং বলল তাদেরকে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা যে ব্যাপারে আল্লাহ পরকালে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন ধিক্ তোমাদেরকে। وَيْلَكُمْ শব্দটি ধিক্কারজ্ঞাপক পদ। আল্লাহর পুরস্কার পরকালের জান্নাত শ্রেষ্ঠ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য কারূনকে পৃথিবীতে যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে এবং এটা কেউ পাবে না অর্থাৎ ঈমান ও আমলের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত আনুগত্য প্রকাশ ও পাপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে।

অনুবাদ :

٨١. فَخَسَفْنَا بِهِ بِقَارُوْنَ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِهِ بِاَنْ يَّمْنَعُوْا عَنْهُ الْهَلَاكَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ مِنْهُ ـ

৮১. অতঃপর আমি তাকে কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না যারা তাকে সাহায্য করতে পারত। যারা তার ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে। এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না তা থেকে।

٨٢. وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ اَىْ مِنْ قَرِيْبٍ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يُوَسِّعُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ج يُضَيِّقُ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ وَوَىْ اِسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنٰى اَعْجَبُ اَىْ اَنَا وَالْكَافُ بِمَعْنَى اللَّامِ لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ لِنِعْمَةِ اللّٰهِ كَقَارُوْنَ ـ

৮২. পূর্বদিনে যারা তার মতো হওয়ার কামনা করেছিল অর্থাৎ সামান্যকাল পূর্বে তারা বলতে লাগল, দেখলে তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন وَىْ হলো اِسْمُ فِعْل বা ক্রিয়া পদের অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য اَعْجَبُ অর্থে, অর্থাৎ আমি বিস্ময় প্রকাশ করছি। আর كَافٌ হলো لَامٌ অর্থে। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন خَسَفَ ফে'লটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। দেখলে তো কাফেররা সকলকাম হয় না আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকারকারীরা; যেমন– কারূন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّ قَارُوْنَ : قَارُوْن [কারূন] শব্দটি অনারবী [ইবরানী] ভাষা। অনারবী (عُجْمَة) ও নামবাচক (عَلَمِيَّتْ)-এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। কারূন প্রসঙ্গে এতটুকু কথা সর্বস্বীকৃত যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর স্ববংশীয় ছিল। বাকি আত্মীয়তার সম্বন্ধ কি ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন– ১. চাচাতো ভাই ২. খালাতো ভাই। আর উভয়টিই সত্য হতে পারে। কারণ হযরত মূসা (আ.)-এর খালা হযরত মূসা (আ.)-এর চাচার বিবাহাধীন হতে পারে। এছাড়া আরো বিভিন্নরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারূন এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ–

কারূন ইবনে ইয়াসহার, ইবনে কাহিস। আর হযরত মূসা (আ.)-এর বংশ-পরম্পরা হচ্ছে– মূসা ইবনে ইমরান, ইবনে কাহিস।

قَوْلُهُ تَنُوْءُ : শব্দটি (ن) نَاءَ يَنُوْءُ نَوْءًا থেকে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ অর্থ– অবনমিত হওয়া, ঝুকে যাওয়া, বোঝা ভারি হওয়া।

قَوْلُهُ اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ : لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ-এর মধ্যে দু'টি ধরন হতে পারে। ক. بَاءٌ হলো تَعْدِيَةٌ-এর জন্য। এ সময় অর্থ হবে لَتَنُوْءُ الْمَفَاتِحُ الْعُصْبَةَ الْاَقْوِيَاءَ অর্থাৎ চাবি এতো বিপুল পরিমাণ ছিল যে, শক্তিশালী একদল মানুষকেও তা অবনমিত করে ফেলত। এ সময় বাক্যে قَلْبٌ হবে না। খ. বাক্যে قَلْبٌ বা পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ لَتَنُوْءُ الْمَفَاتِحُ الْعُصْبَةَ ছিল। অর্থাৎ চাবিগুলো একদল শক্তিশালী মানুষকে ক্লান্ত করে দিত। কেননা বাক্যে قَلْبٌ গণ্য না করলে অর্থ হবে– শক্তিশালী মানুষের দল চাবিগুলোকে ক্লান্ত করে দিত। আর এটা অযৌক্তিক হওয়া তো সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ : প্রশ্ন : এক আয়াতে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ বলা হয়েছে। প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পাপীদেরকে তাদের পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তারা দোজখে প্রবিষ্ট হবে। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল পাপী-অপরাধীদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং এ উভয়টি তো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল?

উত্তর : প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাবাদ দু'ধরনের।

ক. سُوَالُ اِسْتِعْتَابٌ বা তিরস্কারমূলক প্রশ্ন। এ ধরনের প্রশ্নের পর স্বভাবত ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো পাপী মুমিনদের ক্ষেত্রে এমন ঘটবে।

খ. سُوَالُ تَقْرِيْعٍ বা বিপজ্জনক প্রশ্ন। এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের পরে দোজখে প্রবিষ্ট করা হবে। এখানে প্রথম প্রকারের জিজ্ঞাসাবাদ এর نَفِیْ করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফের-মুশরিকদেরকে তিরস্কারমূলক প্রশ্ন করা হবে না। সুতরাং উভয় আয়াতে কোনো সংঘাত নেই।

قَوْلُهُ فَخَرَجَ : এর عَطْف হলো قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ -এর উপর মাঝের বাক্যটি جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ

قَوْلُهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ : فِئَةٍ হলো كَانَ -এর اِسْم যদি كَانَ নাকিসা হয়, আর لَهُ তার خَبَر হবে। আর যদি تَامَّةٌ হয় তাহলে فِئَةٌ তার فَاعِلْ হবে। يَنْصُرُوْنَهُ হবে فِئَةٌ -এর صِفَتْ ; فِئَةٌ শাব্দিকভাবে مَجْرُوْر হবে। আর অর্থের দিক দিয়ে مَرْفُوْعٌ হবে । কারণ مِنْ হলো অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : এটা فِئَةٌ -এর حَالْ

قَوْلُهُ بِالْاَمْسِ : এর দ্বারা এর মূল অর্থ তথা গতকাল উদ্দেশ্য নয়, বরং নিকটবর্তীকাল উদ্দেশ্য। নিকটবর্তীকালকে রূপকার্থে গতকাল বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْكَاَنَّ : এটা বিস্ময় ও ধমকসূচক পদ, وَیْ -এর সমন্বিত রূপ। হলো و ضَمِيْر خِطَابْ আর اِنَّ হলো حَرْف مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ; কেউ কেউ বলেন– وَا হলো اِسْم এটা বিস্ময়জ্ঞাপক, এরপরে কখনো কখনো هَا বৃদ্ধি করা হয়। তবে অর্থ একই থাকে। কখনো وَا-কে وَیْ পড়া হয়, আর এর পরে كَانَ যুক্ত করা হয়। যেমন বলা হয়–

وَيْكَاَنَّ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْبَبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِيْشُ عَيْشَ ضُرٍّ -

অর্থাৎ আরে! যার নিকট প্রচুর স্বর্ণ-মুদ্রা থাকে তার সাথে বন্ধুত্ব করা হয়, আর যে অভাবী হয় সে দুঃখ-কষ্টের জীবন অতিবাহিত করে। –[লুগাতুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** এ সূরার শুরুতে আল্লাহ পাক ফেরাউনের দম্ভ এবং অশান্তি সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। আর এ সূরার শেষ পর্যায়ে আরেক অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারী কারূনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফেরাউনের ন্যায় কারূনও ছিল দাম্ভিক এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টিকারী, ফেরাউনকে দান করা হয়েছিল অগাধ ধন-সম্পদ যে কারণে সে-ও অহংকার করেছিল, আর অহংকার যখন কোনো মানুষের চরিত্রে প্রবেশ করে, তখন সে অশান্তি, উপদ্রব এবং উৎপাত আরম্ভ করে , সমাজ ও জাতির জন্যে সে ডেকে আনে বিপদ, এজন্যে এসব চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষা করার আহবান জানায় পবিত্র কুরআন, আর এ প্রসঙ্গেই কারূনের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে যে পূববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর একান্ত রহমতে তোমাদের জন্যে দিন রাতের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– কারূন যেভাবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে নিজেকে ধ্বংস করেছিল, তোমরা এমনটি করো না। অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে দুনিয়ার জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার আসবাবপত্রও নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর। অতএব কোনো বুদ্ধিমান লোক দুনিয়ার অবস্থা লক্ষ্য করে দুনিয়ার ভোগ সম্পদে মুগ্ধ থাকতে পারে না। কেননা যে কোনো সময় দুনিয়া থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বাজতে পারে। আর

আলোচ্য আয়াতে কারূনের ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কেউ যেন কারূনের ন্যায় ভোগবাদের সুরা পান করে নিজেকে ধ্বংস না করে।

অথবা বিষয়টিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যায়। যেভাবে ফেরাউনের ঘটনা হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের দলিল ও প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে কারূনের ঘটনা ও হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে ধনকুবের কারূনের বাড়িঘর ও ধন-সম্পদসহ তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর এসব কিছু হযরত মূসা (আ.)-এর বদ দোয়ার কারণেই হয়েছে, যা জনগণ স্বচক্ষে দেখেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির মুজেযার ন্যায় এ মুজেযাটিও প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। হযরত মূসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল, আর তাঁর মোকাবিলা ছিল ফেরাউন এবং কারূনের সঙ্গে। ফেরাউন ছিল স্বেচ্ছাচারী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, আর কারূন ছিল অঢেল অর্থ সম্পদের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ কুদরতে হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাস্বরূপ ইতিহাসের দু'জন অহংকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীকে ধ্বংস করে দেন। ফেরাউনকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং কারূনকে তার ধন-সম্পদসহ জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়। ফেরাউনের সলিল সমাধি হওয়া হযরত মূসা (আ.)-এর সামুদ্রিক মুঁজেযা ছিল, আর কারূনের ধ্বংস হওয়া ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলভাগের মুজেযা। ফেরাউন তার ক্ষমতার দর্পে হেদায়েতের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর কারূন তার অগাধ সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে হেদায়েতকে উপেক্ষা করেছিল। অবশেষে বিশ্বাবাসী দেখেছে– ক্ষমতা, আধিপত্য বা অর্থ-সম্পদ কোনোটিই কাজে লাগে না, এসবই নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। মানুষের জীবন আল্লাহ পাকের নিয়ামত, এ নিয়ামতের শোকরগুজারী হয় আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মাধ্যমে, আর এভাবেই মানব জীবন সার্থক ও সুন্দর হয়। আর এ সার্থকতা লাভের জন্যে নবী রাসূলগণের অনুসরণ পূর্বশর্ত। যারা এতে অবহেলা করে অথবা অস্বীকৃতি জানায়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়; যেমন– ফেরাউন এবং নমরূদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এতে রয়েছে বিশ্বমানবের জন্যে এক মহান শিক্ষা।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায় যে–

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারূনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ধনসম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইরশাদ হচ্ছে– وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الخ

আর কারূনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধনসম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃতঘ্নতা করে এবং ধনসম্পদে ফকির-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধন–ভাণ্ডারসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হয়।

قَارُونْ সম্ভবত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কুরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তথা বনী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক কি ছিল? এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে হযরত মূসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন উক্তি আছে। –[কুরতুবী, রূহুল মা'অনী]

রূহুল মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারূন তাওরাতের হাফেজ ছিল এবং অন্য সবার চেয়ে বেশি তার তাওরাত মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হলো। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্থিব সম্মান ও জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায় মোহ । হযরত মূসা (আ.) ছিলেন সমগ্র বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ.) ছিলেন তাঁর জ্ঞাতি ভাই এবং নিকট-স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু কারূন এতে সন্তুষ্ট হলো না; বরং সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল।

قَوْلُهُ فَبَغٰى عَلَيْهِمْ : بَغٰى শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ– জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধনসম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা.) বলেন, কারূন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকা অবস্থায় সে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়। –[কুরতুবী]

এর অপর অর্থ– অহংকার করা। অনেক তাফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারূন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী ইসরাঈলের মোকাবিলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ : كُنُوْز শব্দটি كَنْز-এর বহুবচন। এর অর্থ– ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার। শরিয়তের পরিভাষায় كَنْز এমন ধনভাণ্ডারকে বলা হয়, যার জাকাত দেওয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছিল। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ : نَاءَ শব্দের অর্থ বোঝার ভারে ঝুঁকিয়ে দেওয়া। আর عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধনভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিক সংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলা বাহুল্য, চাবি সাধারণত হালকা ওজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুর সংখ্যক হওয়ার কারণে কারূনের চাবির ওজন এত বেশি ছিল, যা একদল লোকও সহজ বহন করতে পারত না। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ : فَرَحٌ-এর শাব্দিক অর্থ– উল্লাস। কুরআন পাক অনেক আয়াতে এই فَرَحٌ-কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে। যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ; অন্য এক আয়াতে আছে– لَا تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ আরো এক আয়াতে আছে– فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু কোনো কোনো আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে। যেমন يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ আয়াতে এবং فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দম্ভ ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নয়; বরং একদিক দিয়ে কাম্য। কারণ এতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ : আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে জুলুম অত্যাচার করো না, কেননা পাপাচারের পরিণতিই হলো অশান্তি। তাফসীরকারগণ লিখেছেন, দুনিয়ার নিয়ামত দ্বারা আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য কামনা করা হলো প্রকৃত মর্দে মুমিনের কাজ। তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, 'দুনিয়াতে তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা ভুলে যেয়ো না'– কথাটির অর্থ হলো, আল্লাহর রাহে দান করা এবং আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যাংশের অর্থ হলো, নিজের স্বাস্থ্য, শক্তি, যৌবন এবং অর্থ-সম্পদকে আখিরাতের জিন্দেগীর জন্যে ব্যয় করতে ভুলে যেয়ো না।

প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ অর্থাৎ পাঁচটি জিনিসকে পরবর্তী পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ মনে কর। যথা– ১. বৃদ্ধকাল আসার পূর্বে যৌবনকে ২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে ৩. আর দারিদ্র আসার পূর্বে অর্থ– সম্পদকে ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে ৫. জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। –[হাকেম, বায়হাকী]

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার প্রয়োজনের চেয়ে অধিক যে সম্পদ রয়েছে, তা আল্লাহর রাহে দান কর। আর মনসুর ইবনে যাজান (র.) বলেছেন, দুনিয়াতে তোমার যে অংশ রয়েছে তা ভুলে যেয়ো না, অর্থাৎ তোমার নিজের এবং পরিবারবর্গের প্রতি ব্যয় করাকে ভুলে যেয়ো না।

বস্তুত মানুষের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তখন সর্বপ্রথম তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, সে তার নিজের সম্পর্কে ভুল এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, শুধু তাই নয়; বরং ঐ মুহূর্তে সে কারো হিতোপদেশও গ্রহণ করে না, নিজের কল্যাণকেও তার দৃষ্টিতে অকল্যাণকর মনে হয়। ঠিক এ অবস্থায়ই হয়েছিল কারূনের। তার সম্প্রদায় তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছে, স্বয়ং হযরত মূসা (আ.) তাকে বার বার সরল-সঠিক পথ অবলম্বনের তাগিদ করেছেন; কিন্তু তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করেনি। তিনি তাকে বলেছেন, ধন-সম্পদ আল্লাহ পাকের দান, এ দানের জন্যে তুমি আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, ধন সম্পদ নিয়ে কখনো গর্ব করো না। যারা গর্ব বা অহংকার করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ পাক তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তা ভোগ করতে কেউ তোমাকে নিষেধ করে না; কিন্তু তোমার যা করণীয় তা হলো এই যে, তোমার প্রয়োজন মিটানোর পর যা তোমার নিকট অবশিষ্ট থাকে, তা আল্লাহর রাহে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিতরণ

করতে থাক। এর ফলে তুমি আখিরাতের সাফল্য লাভ করবে। দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের দিকে তুমি অধিকতর মনযোগ দাও। যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমারও কর্তব্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা, তাদের দুঃখ নিবারণ করা। এতদ্ব্যতীত অর্থ সম্পদ আছে বলেই তার দ্বারা দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, যারা অশান্তি সৃষ্টি করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না, আর একথা সর্বজনবিদিত যে আল্লাহ পাক যাদেরকে পছন্দ করেন না, তারাই হয় অভিশপ্ত, তাঁর রহমত থেকে হয় বঞ্চিত, তারাই হয় কোপগ্রস্ত যেমন কারূন হয়েছিল।

قَوْلُهُ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِيْ : কারো কারো মতে এখানে 'ইল্‌ম' বলে তাওরাতের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়ায়েতে আছে যে, কারূন তাওরাতের হাফেজ ও আলেম ছিল। হযরত মূসা (আ.) যে সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন, কারূন তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে বসে। তার উপরিউক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারো অনুগ্রহ নেই। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে ইলম বলে 'অর্থনৈতিক কলাকৌশল' বোঝানো হয়েছে। উহাদরহণত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের কোনো দখল নেই। এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারূন এ কথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা বাণিজ্য এগুলোও তো আল্লাহ তা'আলারই দান ছিল। তার নিজস্ব গুণ-গরিমা ছিল না।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ : কারূনের উপরিউক্ত উক্তির আসল জবাব তো তা-ই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে : অর্থাৎ যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, তোমার ধনসম্পদ তোমার বিশেষ কর্ম তৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ তা'আলার দান। এই জবাব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কুরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জবাব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কুরআন পাক অতীতের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাধ্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আজাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ الخ : এই আয়াতে اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ তথা আলেমদের বিপরীতে اَلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালে চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে কারূনের সম্পদ প্রথিত হওয়া : ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ) উপর ন্যস্ত ছিল এবং হযরত মূসা (আ.) স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.)-কে বায়তুল কুরবান তথা কুরবানি ও উৎসর্গীত দ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করলেন। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে উৎসর্গের জন্য যেসব সামগ্রী আসবে তা হযরত হারূন (আ.)-এর মারফত তা কুরবানগাহে রাখা হবে। সে সময় আসমানি আগুন এসে তা পুড়িয়ে ফেলত। আর এটাই ছিল কুরবানি ও নযর-নেওয়াজ আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার নিদর্শন। এ বিষয়ে কারূনের হিংসা হলো। সে বলল, আপনি নবীও আবার কওমের সর্দারও, আর হারূন কুরবানগাহ' -এর তত্ত্ববধায়ক হবে; কিন্তু কোনো বিষয়ে আমার কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে না, তা কি করে সহ্য করা যায়? অথচ আমি তাওরাতের হাফেজ ও আলেম? হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত; এ বিষয়ে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। কারূন তখন বলল, এটা অবশ্যই জাদু বলে ঘটেছে। এ কথার পর বনী ইসরাঈলের অনেক সরদারকে বিভিন্ন প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সে তার দলভুক্ত করে নিল। এভাবেই উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হলো।

এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জাকাত ওয়াজিব করলেন, তখন হযরত মূসা (আ.) কারূনের নিকট এসে প্রতি হাজারে এক দীনার [স্বর্ণমুদ্রা] জাকাত তলব করলেন। কারূন হিসাব করে দেখল, এতে তার প্রচুর অর্থ হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে সে চিন্তিত হয়ে বনী ইসরাঈলকে একত্র করে বলল, এতদিন যাবৎ মূসা যা বলেছেন, তা তোমরা মেনে নিয়েছ। কিন্তু সে তাতে সন্তুষ্ট

হয়নি। এখন সে তোমাদের মাল-সম্পদ গ্রাস করার ফন্দি করছে। লোকজন বলল, আপনি আমাদের সরদার, জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিমান। সুতরাং আপনি যা বলেন, আমরা তা মানতে প্রস্তুত আছি।

কারূন নির্দেশ দিল যে, অমুক ব্যভিচারিণীকে নিয়ে এসো, তাকে তার চাহিদা মতো অর্থ-সম্পদ দিয়ে তাকে এ কথা বলতে সম্মত কর যে, সে মূসার উপর তার সঙ্গে ব্যভিচারের অভিযোগ তুলবে। লোকজন যখন এ কথা শুনবে, তখন তার থেকে দূরে সরে যাবে এবং তাঁর বিদ্রোহী হয়ে যাবে। ফলে আমাদের সবার জন্য তার গোলামী থেকে নিষ্কৃতি মিলবে।

নরাধম কারূনের নির্দেশ মতে উক্ত ব্যভিচারিণীকে নিয়ে আসা হলো। তাকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়ে এ বিষয়ে সম্মত করা হলো। কারূন এবং তার লোকজন বনী ইসরাঈলকে সমবেত করে মূসা (আ.)-এর নিকট গেল এবং বলল, এসব লোকজন সমবেত হয়েছে এদের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়াজ-নসিহত করুন। হযরত মূসা (আ.) বাইরে এসে তাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ শুরু করলেন। ওয়াজের মধ্যে বিভিন্ন শরয়ী দণ্ডবিধি সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। তার মধ্যে চোরের সাজা হস্ত কর্তন, ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের সাজা ৮০ কোড়া এবং ব্যভিচারী বিবাহিত ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন না হলে ১০০ কোড়া আর বিবাহিত ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হলে তাকে 'সঙ্গেসার' তথা পাথর মেরে জীবনপাত করার বিধানও উল্লেখ করলেন।

এ সময় কারূন দাঁড়িয়ে বলে উঠল, এ অপকর্ম যদি আপনি করেন তাহলে তার সাজা কি হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর বিধান সবার জন্য সমান। কারূন তখন বলল, আপনি অমুক মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এসো! যদি সে স্বীকার করে তাহলে সত্য হবে। সুতরাং উক্ত মহিলাকে হাজির করা হলো, হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন হে মহিলা! সত্যিই কি আমি তোমার সাথে কখনো এ অপকর্ম করেছি, যা এরা বলছে? আমি তোমাকে সে সত্তার দোহাই দিচ্ছি, যিনি বনী ইসরাইলের জন্য সমুদ্রে রাস্তা করে দিয়েছিলেন এবং তাওরাত নাজিল করেছিলেন! তুমি ঠিক ঠিক বলবে। উক্ত মহিলা তখন তাদের শেখানো কথা ভুলে গেল এবং বলল, এরা মিথ্যাবাদী। কারূন আমাকে এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে আপনার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করতে বলেছিল। কারূন এ কথা শ্রবণে চিন্তাগ্রস্ত হলো এবং মাথা নিচু করে ফেলল। অন্যান্য নেতারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সবাই তখন আল্লাহর আজাবের ভয়ে ভীত হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেরগার! এ দুশমন আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। আমাকে সে লাঞ্ছিত অপমানিত করতে চেয়েছে। যদি আমি সত্য রাসূল হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে তার উপর ক্ষমতাবান কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী এলো, হে মূসা! মাথা উত্তোলন কর এবং জমিনকে নির্দেশ দাও যা তুমি চাও, সে তা পালন করবে। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) জমিনকে নির্দেশ দিলেন যে, কারূনকে গ্রাস করে নাও! সাথে সাথে মাটি কারূনকে গ্রাস করতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সে মাটির মধ্যে দেবে যেতে লাগল। কারূন 'মূসা! মূসা!' বলে চিৎকার শুরু করল। অপরিসীম কান্নাকাটি করতে লাগল। এমনকি ৭০ বার সে হে মূসা! বলে ডাকল। কিন্তু তার ডাকে কোনো উপকার হলো না। অবশেষে সে মাটির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। –[তাফসীর মাযহারী]

এ ঘটনার পর বনী ইসরাঈলের কতিপয় লোক মন্তব্য করল যে, হযরত মূসা (আ.) কারূনের সম্পদ লাভ করার জন্য তাকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। এ কথা জানতে পেরে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! কারূনের ধন-ভাণ্ডারকেও মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দাও। ফলে তার সমস্ত ধন-ভাণ্ডারও মাটির নিচে ধ্বসে গেল। আর এ ধ্বস কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। –[খোলাসাতুত্তাফাসীর : তাইব লক্ষ্মৌভী]

قَوْلُهُ وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ : অর্থাৎ যে সকল লোক কারূনের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে আক্ষেপ করে বলেছিল যে, হায়! আমাদেরও যদি এমন অর্থ সম্পদ হতো! আজ তারা তার কু-পরিণাম দেখে হতচকিত হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞান ফিরে এসেছে যে, এ সম্পদ বস্তুত চিত্তাকর্ষক সর্পতুল্য। যার মধ্যে প্রাণনাশক বিষাক্ত বিষ লুকিয়ে রয়েছে। কারো পার্থিব উন্নতি ও উৎকর্ষ দেখে আমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। পার্থিব উন্নতি অগ্রগতি কারো আল্লাহর দরবারে মাকবুল বা অভিশপ্ত হওয়ার দলিল নয়; বরং বহু ক্ষেত্রে তো তা ধ্বংস ও চিরবঞ্চিত হওয়ারও কারণ ঘটে। কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন–

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ اَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ * وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا

هٰذَا الَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ حَائِرَةً * وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا

অর্থাৎ ১. বহু জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবীর চলার পথ সংকুচিত হয়ে গেছে। আর বহু নির্বোধ অজ্ঞ-মূর্খকে তুমি দেখবে প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে।

২. এ বিষয়টি মানুষের চিন্তাশক্তিকে হতবাক করে দিয়েছে। এমন কি বিদগ্ধ আলেমকে নাস্তিকে পরিণত করেছে।

অনুবাদ :

٨٣. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ اَىِ الْجَنَّةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ بِالْبَغْيِ وَلَا فَسَادًا ط بِعَمَلِ الْمَعَاصِىْ وَالْعَاقِبَةُ الْمَحْمُوْدَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ عِقَابَ اللّٰهِ بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ ـ

৮৩. এটা আখিরাতের সেই নিবাস অর্থাৎ জান্নাত যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে জুলুম নির্যাতনের মাধ্যমে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না বিরুদ্ধাচরণ করে শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্য আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব থেকে।

٨٤. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ج ثَوَابٌ بِسَبَبِهَا وَهُوَ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا جَزَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَىْ مِثْلَهٗ ـ

৮৪. যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম ফল। উক্ত কাজের কারণে এবং তার দশ গুণ। আর যে মন্দ কর্ম নিয়ে উপস্থিত হয়; তবে যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তারা যা করেছে তারই শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ তার সমপরিমাণ।

٨٥. اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ اَنْزَلَهٗ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ط اِلٰى مَكَّةَ وَكَانَ قَدِ اشْتَاقَهَا قُلْ رَّبِّىْ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ـ نَزَلَ جَوَابًا لِقَوْلِ كُفَّارِ مَكَّةَ لَهٗ اِنَّكَ فِىْ ضَلَالٍ اَىْ فَهُوَ الْجَائِىْ بِالْهُدٰى وَهُمْ فِى الضَّلَالِ وَاَعْلَمُ بِمَعْنٰى عَالِمٌ ـ

৮৫. যিনি আপনার জন্য কুরআনকে বিধান করেছেন অবতীর্ণ করেছেন তিনি আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন জন্মভূমিতে অর্থাৎ মক্কায়! রাসূল ﷺ মক্কায় ফিরে আসার প্রবল আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছেন এবং কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে। এ আয়াতটি মক্কার কাফেরদের কথার উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মহানবী ﷺ সম্পর্কে বলত যে, তিনি বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। অর্থাৎ তিনিই তো প্রকৃত হেদায়েত আনয়নকারী, আর তারা রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। এখানে اَعْلَمُ শব্দটি عَالِمٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٨٦. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ الْقُرْاٰنُ اِلَّا لٰكِنْ اُلْقِىَ اِلَيْكَ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا مُعِيْنًا لِلْكٰفِرِيْنَ ـ عَلٰى دِيْنِهِمُ الَّذِىْ دَعَوْكَ اِلَيْهِ ـ

৮৬. আপনি আশা করেননি যে, আপনার প্রতি কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হবে, তবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এটা তো কেবল আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং আপনি কখনো কাফেরদের সহায় হবেন না। তাদের ধর্মের প্রতি যার দিকে তারা আপনাকে আহবান করে।

অনুবাদ :

٨٧. وَلَا يَصُدَّنَّكَ اَصْلُهُ يَصُدُّوْنَنَكَ حُذِفَتْ نُوْنُ الرَّفْعِ لِلْجَازِمِ وَالْوَاوُ الْفَاعِلِ لِالْتِقَائِهَا مَعَ النُّوْنِ السَّاكِنَةِ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ اَىْ لَا تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ وَادْعُ النَّاسَ اِلٰى رَبِّكَ بِتَوْحِيْدِهٖ وَعِبَادَتِهٖ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ج بِاِعَانَتِهِمْ وَلَمْ يُؤَثِّرِ الْجَازِمَ فِى الْفِعْلِ لِبِنَائِهٖ .

৮৭. তারা যেন কিছুইতেই আপনাকে বিমুখ না করে يَصُدَّنَّكَ শব্দটি মূল ছিল يَصُدُّوْنَنَكَ এখন رَفْع-এর نُوْن টি جَازِمْ তথা لَائِىْ نَهِىْ-এর কারণে পড়ে গেছে এবং فَاعِلْ-এর وَاوْ-টিও نُوْن سَاكِنْ-এর সাথে একত্র হওয়ায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আপনার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সেগুলো হতে। অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের প্রতি ফিরে যাবেন না। আপনি আহবান করুন মানুষকে আপনার প্রতিপালকের প্রতি তাঁর একত্ববাদ ও ইবাদতের প্রতি আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার মাধ্যমে। لَا تَكُوْنَنَّ ফে'লটি مَبْنِىْ হওয়ার কারণে তাতে لَائِىْ جَازِمْ টি কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

٨٨. وَلَا تَدْعُ تَعْبُدُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ط اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ الْحُكْمُ الْقَضَاءُ النَّافِذُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالنُّشُوْرِ مِنَ الْقُبُوْرِ .

৮৮. আপনি আহবান করবেন না ইবাদত করবেন না আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই কার্যকর সিদ্ধান্ত এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যবর্তিত হবে কবর থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ : تِلْكَ হলো مَوْصُوْف যা মুবতাদা হয়েছে। আর اَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ হলো সিফত مَوْصُوْف; صِفَتْ মিলে সিফত হয়েছে তِلْكَ মওসূফের, نَجْعَلُهَا বাক্য হয়ে خَبَرْ

قَوْلُهٗ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ : এখানে مَعَادْ দ্বারা অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার মক্কা নগরী উদ্দেশ্যে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ সম্মানিত স্থান উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهٗ وَلَا يَصُدَّنَّكَ : এখানে لَا হলো نَاهِيَةْ বা নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক, আর يَصُدَّنَّكَ হলো فِعْل مُضَارِعْ مَجْزُوْم ; এর মধ্যে হলো عَلَامَتْ نُوْن اِعْرَابِىْ বিলুপ্ত হওয়া। আর বিলুপ্ত وَاوْ যমীর হলো فَاعِلْ এবং শেষে وَاوْ যুক্ত نُوْن ثَقِيْلَةْ-টি مَفْعُوْل-এর আলামত।

قَوْلُهٗ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ : এখানে مُضَافْ উহ্য হয়েছে। মূলত عَنْ تَبْلِيْغِ آيَاتِ اللّٰهِ ছিল।

قَوْلُهٗ لَمْ يُؤَثِّرِ الْجَازِمُ : وَلَا تَكُوْنَنَّ-এর মধ্যে لَا جَازِمَةْ টি শব্দের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া করেনি। তবে مَحَلْ-এর মধ্যে আছর করেছে। শব্দে কোনোরূপ আছর [প্রভাব] না করার কারণ হলো تَكُوْنَنَّ ক্রিয়াটি نُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَةْ-এর কারণে মবনী হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَعْبُدُ : تَدْعُ -এর ব্যাখ্যা تَعْبُدُ দ্বারা করে খারেজীদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা খারেজী সম্প্রদায় বলে থাকে যে, জীবিত বা মৃত কারো নিকট কোনো কিছু কামনা করা শিরক। বস্তুত এটা তাদের বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা গায়রুল্লাহ্‌কে مُؤَثِّرٌ بِالذَّاتِ তথা প্রকৃতার্থে প্রভাব সৃষ্টিকারী মনে করলে তা শিরক হবে। তবে সেটাকে সবব তথা কারণ বা মাধ্যম -এর পর্যায়ে গণ্য করলে তা শিরক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا : এই আয়াতে পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও অনর্থের ইচ্ছা করে না। عُلُوٌّ শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। فَسَادٌ বলে অপরের উপর জুলুম বোঝানো হয়েছে। –[সুফিয়ান সওরী]

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, গুনাহ মাত্রই পৃথিবীতে ফাসাদের শামিল। কারণ গুনাহের কুফল স্বরূপ বিশ্বময় বরকত হ্রাস পায়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যারা অহংকার জুলুম অথবা গুনাহের ইচ্ছা করে পরকালে তাদের অংশ নেই।

জ্ঞাতব্য : যে অহংকারে নিজেকে অপরের চেয়ে বড় ও অপরকে হেয় করা উদ্দেশ্য থাকে, আলোচ্য আয়াতে সেই অহংকারের অবৈধতা ও কুফল বর্ণিত হয়েছে। নতুবা অপরের সাথে গর্ব উদ্দেশ্য না হলে নিজে ভালো পোশাক পরাটা, উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করা এবং সুন্দর বাসগৃহের ব্যবস্থা নিন্দনীয় নয়; যেমনটা সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে।

গুনাহের দৃঢ় সংকল্প গুনাহ : আয়াতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদের ইচ্ছার কারণে পরকাল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় থেকে জানা গেল যে, কোনো গুনাহের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার পর্যায়ে দৃঢ় সংকল্পও গুনাহ। –[রূহুল মা'আনী]

তবে পরে যদি আল্লাহর ভয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করে, তবে গুনাহের পরিবর্তে তার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোনো ইচ্ছা-বহির্ভূত কারণে সে গুনাহ করতে সক্ষম না হয় কিন্তু চেষ্টা ষোল আনাই থাকে, তবে গুনাহ না করলেও তার আমলনামায় গুনাহ লেখা হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ এর সারমর্ম এই যে, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের জন্য দুইটি বিষয় জরুরি। যথা– ১. ঔদ্ধত্য ও অনর্থ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা এবং ২. তাকওয়া তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা। শুধু এই দুইটি বিষয় থেকে বিরত থাকা যথেষ্ট নয়; বরং যেসব ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম রয়েছে সেগুলো সম্পাদন করাও পরকালীন মুক্তির জন্য শর্ত।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** সূরার উপসংহারে এসব আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দান করা হয়েছে এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে অবিচল থাকার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পূববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্ক এই যে, এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর বিস্তারিত কাহিনী তথা ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শত্রুতা, তাঁর ভয় এবং পরিশেষে স্বীয় কৃপায় তাঁকে ফেরাউন ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ী কারার কথা আলোচনা করেছেন। অতএব সূরার শেষভাগে শেষনবী রাসূল ﷺ -এর এমনি ধরনের অবস্থার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার কাফেররা তাঁকে বিব্রত করেছে, তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং মক্কায় মুসলমানদের জীবন দুঃসহ করেছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন রীতি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সবার উপর প্রকাশ্য বিজয় ও প্রাধান্য দান করেছেন এবং যে মক্কা থেকে কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, সেই মক্কায় পুনরায় তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– اَلَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন তথা তেলাওয়াত, প্রচার ও মেনে চলা ফরজ করেছেন, তিনিই পুনরায় আপনাকে "মা'আদে" ফিরিয়ে নেবেন। সহীহ

বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে 'মাআদ' বলে মক্কা মোকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে প্রিয় জন্মভূমি বিশেষত হেরেম ও বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরজ করেছেন তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তাফসীরবিদ মুকাতেল বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সওর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহফা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হলো এবং বায়তুল্লাহ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে আব্বাসের এক রেওয়াতে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিধায় এটি মক্কী নয়, মদনীও নয়। –[কুরতুবী]

কুরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কুরআন ফরজ করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

قَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ : এখানে وَجْهَهُ বলে আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন– وَجْهَهُ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহর জন্য খাঁটিভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

سُورَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আনকাবূত মক্কায় অবতীর্ণ

وَهِيَ تِسْعٌ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً – আয়াত : ৬৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. الٓمّٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

১. আলিফ লাম-মীম। আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

٢. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اَىْ بِقَوْلِهِمْ اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ يُخْتَبَرُوْنَ بِمَا يَتَبَيَّنُ بِهٖ حَقِيْقَةُ اِيْمَانِهِمْ ـ

২. মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এ কথা বললেই এ উক্তির তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? অর্থাৎ তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করা হবে যার মাধ্যমে তাদের ঈমানের বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

٣. نَزَلَ فِىْ جَمَاعَةٍ اٰمَنُوْا فَاٰذَاهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا فِىْ اِيْمَانِهِمْ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ فِيْهِ ـ

৩. নিম্নোক্ত আয়াত এমন একদল লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তারা যখন ঈমান এনেছে তখনই মুশরিকরা তাদেরকে সীমাহীন নির্যাতন করেছে। আমি তো এদের পূর্ববর্তীগণকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন তাদের ঈমানের ব্যাপারে চাক্ষুষ জ্ঞানের ভিত্তিতে। এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন যে, কারা মিথ্যাবাদী? এ ব্যাপারে। অর্থাৎ ঈমানের ব্যাপারে।

٤. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَلشِّرْكَ وَالْمَعَاصِىَ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط يَفُوْتُوْنَا فَلَا نَنْتَقِمُ مِنْهُمْ سَآءَ بِئْسَ مَا الَّذِىْ يَحْكُمُوْنَهٗ حُكْمُهُمْ هٰذَا ـ

৪. তবে কি যারা মন্দ কাজ করে অর্থাৎ শিরক ও গুনাহের কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। আমার থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো না। তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ। তাদের এই সিদ্ধান্ত।

٥. مَنْ كَانَ يَرْجُوْا يَخَافُ لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ بِهٖ لَاٰتٍ ط فَلْيَسْتَعِدَّ لَهٗ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِ الْعِبَادِ الْعَلِيْمُ بِاَفْعَالِهِمْ ـ

৫. যে কামনা করে ভয় করে আল্লাহর সাক্ষাতের সে জেনে রাখুক! আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবেই। কাজেই সে যেন তার জন্য প্রস্তুতি নেয়। তিনি সর্বশ্রোতা বান্দার কথা শ্রবণে সর্বজ্ঞ তাদের কর্মের ব্যাপারে।

অনুবাদ :

٦. وَمَنْ جَاهَدَ جِهَادَ حَرْبٍ اَوْ نَفْسٍ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط لِاَنَّ مَنْفَعَةَ جِهَادِهٖ لَهٗ لَا لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ - الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ -

৬. যে কেউ জিহাদ/সাধনা করে শত্রুর মোকাবিলায় জিহাদ বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ সে তো নিজের জন্যই জিহাদ/ সাধনা করে কেননা জিহাদের লাভ ও উপকারিতা তো তার জন্যই, আল্লাহর জন্য নয়। আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী মানুষ, জিন এবং ফেরেশতা ও তাদের ইবাদত থেকে।

٧. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ بِعَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ بِمَعْنٰى حَسَنٍ وَنَصَبُهٗ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْبَاءِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ وَهُوَ الصَّالِحَاتُ -

৭. এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আমি তাদের থেকে তাদের মন্দকর্মগুলো মিটিয়ে দিব সৎকর্মের কারণে এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দিব, তারা যে উত্তম কর্ম করত তার আর তা হলো সৎকর্ম। এখানে اَحْسَنْ শব্দটি حَسَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তাতে مَنْصُوْب بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা হরফে জার بَاءْ -কে ফেলে দেওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

٨. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط اَىْ اِيْصَاءً ذَاحُسْنٍ بِاَنْ يَّبُرَّهُمَا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ بِاِشْرَاكِهٖ عِلْمٌ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهٗ فَلَا تُطِعْهُمَا ط فِى الْاِشْرَاكِ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَاُجَازِيْكُمْ بِهٖ -

৮. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে অর্থাৎ ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ এভাবে যে, তাদের অনুগত থাকবে ও তাদের সাথে সদাচরণ করবে। তবে তারা যদি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরিক করতে যার যাকে শরিক করা সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই বাস্তব অনুযায়ী। এর দ্বারা مَفْهُوْم مُخَالِفْ তথা বিপরীত বিষয় উদ্দেশ্য নয়। তখন তুমি তাদের অনুসরণ করো না শিরকের ক্ষেত্রে আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তোমরা কি করছিলে। সুতরাং আমি তোমাদের কর্মের প্রতিদান দিব।

٩. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصَّالِحِيْنَ - الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ بِاَنْ نَحْشُرَهُمْ مَعَهُمْ -

৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অব্যশ্যই তাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব। নবী এবং ওলীগণের। এভাবে যে, তাঁদের সাথে তাদের হাশর করব।

অনুবাদ :

١٠. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ اَىْ اَذَاهُمْ لَهُ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط فِى الْخَوْفِ مِنْهُ فَيُطِيْعُهُمْ فَيُنَافِقُ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ جَآءَ نَصْرٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِّنْ رَّبِّكَ فَغَنِمُوْا لَيَقُوْلُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى النُّوْنَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط فِى الْاِيْمَانِ فَاَشْرِكُوْنَا فِى الْغَنِيْمَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ اَىْ بِعَالِمٍ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالنِّفَاقِ بَلٰى .

১০. মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নিগৃহীত হয় তখন তারা মানুষের পীড়নকে অর্থাৎ তাদের নির্যাতনকে নিজের জন্য আল্লাহর শাস্তির মতো গণ্য করে সেটাকে ভয় করে এবং এ কারণেই তাদের অনুকরণ করে এবং নেফাকে জড়িয়ে পড়ে। আর আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে কোনো সাহায্য আসলে মুমিনদের জন্য যার ফলে তারা গণিমতের মাল প্রাপ্ত হয় তখন তারা বলতে থাকে لَيَقُوْلُنَّ-এর মধ্যে رَفْع-এর نُوْن-কে ধারাবাহিকভাবে তিন نُوْن একত্র হওয়ার কারণে এবং وَاوْ [যা বহুবচনের যমীর] -কে দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম ঈমানের ক্ষেত্রে। কাজেই আমাদেরকে গনিমতে অংশীদার কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বিশ্ববাসীর অন্তকরণে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? তাদের হৃদয়ে ঈমান ও নিফাক হতে যা কিছুর রয়েছে তা? হ্যাঁ।

١١. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِقُلُوْبِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فَيُجَازِىْ الْفَرِيْقَيْنِ وَاللَّامُ فِى الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسَمٍ .

১১. আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে বিশুদ্ধ অন্তকরণে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক। অতঃপর উভয় দলকেই প্রতিদান দিবেন আর উভয় ফে'লের মধ্যেই لَامْ বর্ণটি শপথের জন্য হয়েছে।

١٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا طَرِيْقَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ط فِىْ اِتِّبَاعِنَا اِنْ كَانَتْ وَالْاَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ قَالَ تَعَالٰى وَمَاهُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَىْءٍ ط اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِىْ ذٰلِكَ .

১২. কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, আমাদের পথ অনুসরণ কর দীনের ব্যাপারে আমাদের মতাদর্শ তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব যদি আমাদের অনুসরণের কারণে তোমাদের কোনো পাপ হয়েই যায়। এখানে اَمْر টা খবরের অর্থে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এ ব্যাপারে।

অনুবাদ :

١٣. وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ اَوْزَارَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ بِقَوْلِهِمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَاِضْلَالِهِمْ مُقَلِّدِيْهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ يَكْذِبُوْنَ عَلَى اللّٰهِ سُؤَالَ تَوْبِيْخٍ فَاللَّامُ فِى الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسَمٍ وَحُذِفَ فَاعِلُهُمَا الْوَاوُ وَنُوْنُ الرَّفْعِ .

১৩. তারা নিজেদের ভার বহন করবে তাদের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা মুমিনগণকে একথা বলার কারণে যে, তোমরা আমাদের মতাদর্শ গ্রহণ কর এর তাদের অনুসারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার কারণে আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ব্যাপারে যে মিথ্যা রটনা করে। এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে ধমকি স্বরূপ। আর উভয় ফে'লের মধ্যে لَامْ বর্ণটি শপথের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয়ের ফায়েল তথা وَاوْ এবং رَفْع -এর نُوْن -কে হযফ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىْ بِقَوْلِهِمْ : এটা مَا অব্যয়টি মাসদারিয়া হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং بَاءْ উহ্য রয়েছে। আর اَنْ يُتْرَكُوْا ফে'লটি حَسِبَ -এর দু' মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ نَزَلَ فِىْ جَمَاعَةٍ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত আম্মা ইবনে ইয়াসির, আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ এবং সালমান ইবনে হিশাম (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এ সকল দরিদ্রজনেরা মক্কায় ইসলাম গ্রহণের কারণে সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।

قَوْلُهُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ : এই ইবারত বৃদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা। প্রশ্নটি হলো– এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের تَجَدُّدْ -কে বুঝায়। অথচ আল্লাহ তা'আলার ইলম হলো قَدِيْم غَيْرُ حَادِثٌ জবাবের সার-সংক্ষেপ হলো عِلْم দ্বারা উদ্দেশ্য হলো عِلْمُ ظُهُوْر ; আর عِلْمُ مُشَاهَدَة আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদের সততা এবং মিথ্যুকদের মিথ্যা প্রকাশ করে দিবেন। যাতে করে مَعْلُوْمْ টা আল্লাহর ইলম অনুযায়ী হওয়া প্রকাশ হয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষের কাছে আল্লাহর ইলমও مَعْلُوْمْ -এর অনুযায়ী হওয়া জ্ঞাত হয়ে যায়, যা مَعْلُوْم টা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে অস্পষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ يَحْكُمُوْنَ : এটা جُمْلَهْ হয়ে مَا بِمَعْنَى الَّذِىْ -এর সেলাহ হয়েছে। ه যমীর উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) যেমনটা আলোচনা করেছেন। আর حَكَمَهُمْ هٰذَا হলো مَخْصُوْص بِالذَّمِّ

قَوْلُهُ فَلْيَسْتَعِدَّ : এটা مَنْ كَانَ -এর جَوَابُ شَرْط আর اَحْسَنْ শব্দটি হরফে জার উহ্য থাকার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে; শব্দটি মূলত بِاَحْسَنْ ছিল।

قَوْلُهُ اِيْصَاءُ ذَاحُسْنٍ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حُسْنًا হলো وَصَّيْنَا -এর উহ্য মাসদারের সিফত উহ্য মুযাফের সাথে। আর যদি মুযাফকে উহ্য মানা না হয় তবে مُبَالَغَة সিফত মানাও বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ : এ বাক্যাংশটি হলো মুবতাদা। আর لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ উহ্য শপথের সাথে মিলে মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হলো– وَاللّٰهِ لَنُكَفِّرَنَّ ; আবার এটাও হতে পারে যে, وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ উহ্য ফে'লের কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে– وَنُخَلِّصُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ سَيِّاٰتِهِمْ

قَوْلُهُ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ : এটা উহ্য বাক্যের কারণ। মূল ইবারত হলো– وَذُكِرَ هٰذَا الْقَيْدُ مُوَافَقَةً لِلْوَاقِعِ

قَوْلُهُ فَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এর مَفْهُوْمُ مُخَالِفْ উদ্দেশ্য নয়– একথা বুঝানো। অর্থাৎ যার মাবুদ হওয়ার ব্যাপারে তোমার নিকট কোনো দলিল নেই তাকে আমার অংশীদার করিও না। আর যার মাবুদ হওয়ার উপর প্রমাণ রয়েছে, তাকে অংশীদার করা যেতে পারে [এখানে এটা উদ্দেশ্য নয়] । কেননা তিনি ব্যতীত এমন কোনো মাবুদ নেই, যার অস্তিত্বের উপর প্রমাণ রয়েছে। আর এমন কোনো মাবুদও নেই, যার অস্তিত্বের উপর প্রমাণ নেই; বরং তিনি তো এক ইলাহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণ : এ সূরায় শিরকের বাতুলতা প্রকাশের জন্যে আল্লাহ পাক আনকাবুত তথা মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তাই উক্ত সূরাটিকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ আয়াতে মক্কা বিজয়ের তথা মুসলমানদের বিরাট সাফল্যের সুসংবাদ রয়েছে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হেয়েছে, সাফল্য সহজলভ্য বস্তু নয়; তার জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম, অক্লান্ত সাধনা এবং ত্যাগ তিতিক্ষা, যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ শুরু হয়, তাই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া উচিত নয়; বরং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়াই একান্ত কর্তব্য। কঠোর সাধনা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমেই ঈমান সুদৃঢ় হয়, শুধু মৌখিক লৌকিক ঈমানের দাবিদার হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে এ দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হয়। বিভিন্ন সময় ঈমানদারগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, নির্যাতিত উৎপীড়িত হন, এ সবকিছু ঈমানের পরীক্ষা স্বরূপ হয়। আর ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা এ পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় মুমিনদের জন্যে এ মর্মে সান্ত্বনা রয়েছে যে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারে যেন মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত না হয়। কেননা ফেরাউন বনী ইসরাঈলের উপরে যে জুলুম করেছে, তা ছিল বর্ণনাতীত; কিন্তু অবশেষে সেই জুলুমের অবসান হয়েছে এবং মজলুম বনী ইসরাঈল জাতি জালেম ফেরাউনের হাত থেকে নাজাত লাভ করেছে, ঠিক এমনিভাবে যদিও বর্তমানে মক্কার কাফেররা জুলুম করছে, কিন্তু অবশেষে মুসলমানগণ বিজয়ী হবে এবং কাফেররা পরাজিত ও ব্যর্থ হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় ফেরাউনের ফেতনা-ফ্যাসাদের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় মক্কার কাফেরদের ফেতনা-ফ্যাসাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, এসব সাময়িক কষ্টে কেউ যেন ভীত সন্ত্রস্ত না হয়।

যাহোক, এ সূরার মূল বক্তব্য হলো মুসলমানগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে যা অবশেষে মক্কা বিজয়ের কারণ হবে। এরপর পারস্য সাম্রাজ্যে এবং রোমক সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে তোমরা লাভ করবে, সে সময় দূরে নয়, যখন পারস্য ও রোমক সাম্রাজ্য তোমাদের করতলগত হবে।

এতএব, কখনো দুনিয়ার নিয়ামতে মুগ্ধ হয়ে আখিরাতের কথা ভুলে যাবে না, অহংকার করো না; বরং প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, আর একথা মনে রাখবে যে, দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আখিরাতের অনন্ত অসীম নিয়ামতের তুলনায় মাকড়সার জালের চেয়ে বেশি কিছু নয়। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র) খ. ৫ পৃ. ৩৫০]

শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম শা'বীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে মক্কা মোয়াজ্জমায় কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম মক্কাবাসী মুসলমানদের নিকট চিঠি লিখলেন, যে পর্যন্ত আপনারা হিজরত করে না আসবেন, সে পর্যন্ত আপনাদের ইসলাম পূর্ণ হবে না। এ চিঠি পাওয়া মাত্র মক্কা শরীফের মুসলমানগণ মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদেরকে মক্কা শরীফ ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়– اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে শুধুমাত্র 'ঈমান এনেছি' বললেই রেহাই পেয়ে যাবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?"

মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের এ আয়াত লিখে পাঠান। তখন মক্কার মুসলমানগণ বলেন, এখন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলেই যেতে হবে। যদি কেউ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, তবে আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তাই তারা মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েন। কাফেররা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে, পথে যুদ্ধ হয়, কয়েকজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেন, আর কিছু মুসলমান আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং মদীনা শরীফ চলে যান। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا : শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম কাতাদা (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত কিছু মক্কাবাসী মুসলমানের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাঁরা প্রিয়নবী ﷺ-এর খেদমতে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু মুশরিকরা তাদেরকে বাধা দিলে তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম আলোচ্য আয়াত লিখে পাঠিয়ে দেন, তখন তারা মক্কা শরীফ থেকে পুনরায় বের হন। কাফেররা তাদেরকে বাধা দেয় এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। ফলে কিছু লোক শহীদ হন। আর কিছু লোক জীবিত থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا : আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্র উল্লেখ করে লিখেছেন, সূরা আনকাবূতের প্রথম আয়াতের اَلنَّاسُ শব্দটি দ্বারা মক্কাবাসী মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তাঁরা হলেন সালমা ইবনে হিশাম, ইয়াশ ইবনে রবীয়া, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রমুখ।

ইবনে সাঈদ, ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম (র.) হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহর রাহে তাকে চরম কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- اَحَسِبَ النَّاسُ الخ

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, ইবনে জোরাইজ (র.)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত ওমর (রা.)-এর আজাদ করা গোলাম হযরত মাহজা ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে। এ উম্মতের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি যাকে জান্নাতের দুয়ারের দিকে ডাকা হবে। বদরের যুদ্ধের দিন সর্বপ্রথম তিনিই মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাফেরদের মুকাবিলার জন্যে বের হয়ে এসেছিলেন। আমের ইবনে হাজরামী তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এদিকে থেকে তিনিই সর্বপ্রথম শহীদ। যখন তাঁর পিতা মাতা এবং স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন নাজিল হয়, তখন প্রথম দিকে আল্লাহ পাক শুধু ঈমানের আদেশ দিয়েছেন, এরপর ধীরে ধীরে নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ এবং অন্যান্য বিধি-নিষেধ জারি হয়। কোনো কোনো লোকের জন্যে এসব বিধি-নিষেধের উপর আমল করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। শানে নুযূল সম্পর্কীয় এ বিবরণ গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এরূপ "মানুষ কি এ ধারণা করেছে যে শুধু ঈমান আনয়নের পরই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে; অন্যান্য বিধি-নিষেধ দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?

এখানে একথা উল্লেখ যে, শুধু ঈমান দোজখের চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে নাজাতের কারণ হয়। আর কখনো না কখনো জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আমলের অভাবে তথা ফরজ ওয়াজিব আদায় না করার কারণে সাময়িকভাবে শাস্তি ভোগ করতে হয়, তাই আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা পেতে হলে দুটি বিষয় একান্ত জরুরি। যথা- ১. আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা,। ২. মন যা চায় তা না করা; বরং মনের চাওয়াকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধি নিষেধের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৫৫]

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে তাফসীরকারগণ আরো বিবরণ দিয়েছেন। একদিন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কা'বা শরীফের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। তখন কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের ব্যাপারে এই অভিযোগ করলেন যে, তারা মুসলমানদের উপর চরম জুলুম অত্যাচার করে এবং তাঁরা একথাও বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক কাফেরদের এ জুলুম অত্যাচার বন্ধ করে দেন।" প্রিয়নবী ﷺ তাদের এ বক্তব্য শ্রবণ করে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "তোমাদের পূর্বকালের দীনদার লোকেরা এর চেয়ে অধিক পরিমাণে জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাদের মাথার মাঝখান দিয়ে করাত চালিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু তবু তারা তাদের দীন পরিত্যাগ করেননি। আবার কারো কারো মাথা লৌহ শলাকার চিরুণী দিয়ে এমন ভাবে আঁচড়ানো হয়েছে যে, গোশত চিরে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তবু তারা দীন পরিত্যাগ করেনি। আল্লাহ পাকের শপথ করে বলেছি, এই দীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করবেই। সেদিন অবস্থা এমন হবে যে, ছাফা পাহাড় থেকে একজন যাত্রী হাজারামাউত নামক স্থান পর্যন্ত এত নিরাপদে সফর করবে তার বিপদের কোনো আশংকাই থাকবে না। কিন্তু তোমরা সেই অবস্থার জন্যে বড় তাড়াহুড়া করছো!" -[বুখারী শরীফ]

অর্থাৎ তোমরা তাড়াহুড়া করো না, সবর অবলম্বন কর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ পাকের ওয়াদা পরিপূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় থাক। কাফেরদের পক্ষ থেকে যত কষ্ট তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে তা হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ, যেন কে প্রকৃত মুমিন এবং কে মুনাফিক তার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। সুতরাং কিছু সংখ্যক মুসলমান যখন কাফেরদের দেওয়া কষ্টে বিচলিত হয়ে হুজুর পাক ﷺ -এর কাছে অভিযোগ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে- الٓمّٓ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ অর্থাৎ কেউ কি ভেবেছে যে, শুধুমাত্র মুখে "আমরা ঈমান এনেছি এবং মুমিন হয়েছি" বলে দেওয়াই যথেষ্ট হবে? অতঃপর তাদের আর পরীক্ষা নেওয়া হবে না? এবং বিপদ ও দুঃখ কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না? অথচ এ দুঃখ কষ্ট দ্বারাই তাদের ঈমানের পরীক্ষা করা হবে এবং ইখলাছ ও নেফাকের পার্থক্য প্রকাশিত হবে। তাই তাদের এ ধারণা যে "দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবে না" সঠিক নয়, তাদের পরীক্ষা অবশ্যই হবে।

পরীক্ষা তিনভাবে হবে। প্রথমত আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত রোগ ও কষ্ট দ্বারা। তৃতীয়ত কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতন উৎপীড়নের মাধ্যমে।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : "আর নিশ্চয় আমি তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করেছিলাম।" অর্থাৎ তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবি সঠিক কিনা? তা পরীক্ষা করেছিলাম। এ পরীক্ষা দ্বারা আল্লাহ পাক এ সকল লোকদের অবস্থা প্রকাশ করে দেন যারা তাদের ঈমানদার হওয়ার দাবিতে সত্য এবং ঐ সকল লোকদের অবস্থাও প্রকাশ করে দেন, যাদের ঈমানদার হওয়ার দাবি মিথ্যা। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক ঐ সকল লোককে সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা এ ধারণা পোষণ করেছিল যে শুধুমাত্র ঈমানের দাবি করাই যথেষ্ট হয়, এটা ভুল ধারণা। ইসলাম গ্রহণের দাবির সাথে সাথে ঈমানের পরীক্ষাও জরুরি হয়ে পড়ে যেন ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী? তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদি পরীক্ষা না করা হতো, তবে সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদী সকলেই সমপর্যায়ের হয়ে যেতো। কারো মনের গভীরে সত্য আছে, নাকি মিথ্যা, তা কেউ জানতে পারতো না। মোট কথা, দুঃখ কষ্ট দিয়ে সত্য এবং মিথ্যাকে প্রকাশ করার জন্যে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা করা ব্যতীতও আল্লাহ পাক জানেন যে, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী; কিন্তু দুনিয়ার লোকেরা তা জানে না। তাই আল্লাহ পাক পরীক্ষার দ্বারা দুনিয়ার লোকদেরকেও জানিয়ে দেন, কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী।

قَوْلُهٗ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا : অর্থাৎ এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মাথ্যমে আল্লাহ তা'আলা খাঁটি-অখাঁটি এবং সৎ ও অসাধুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন। কেননা খাঁটিদের সাথে কপট বিশ্বাসীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সৎ-অসৎ এবং খাঁটি-অখাঁটির মধ্যকার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জেনে নেবেন করা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা আছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও তিনি প্রকাশ করে দেবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব (র.) থেকে এর আরো একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করে, কুরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদুভয়ের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে খাঁটি এবং কে খাঁটি নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলার জানা আছে।

قَوْلُهٗ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ : হিতাকাঙ্ক্ষা ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অপরকে কোনো কাজ করতে বলাকে وَصِيَّتْ বলা হয়। -[মাযহারী]

قَوْلُهٗ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا : حُسْنٌ শব্দটি মূলধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حُسْنٌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

قَوْلُهٗ وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ : অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরি যে, তাতে যেন আল্লাহর নির্দেশাবলির অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্তই পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু তারা যদি সন্তানকে

কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না। যেমন হাদীসে আছে– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতা করে কোনো মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবূ সুফিয়ান স্বীয় পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মাহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করলেন যে, আমি তখন পর্যন্ত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনিভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহন্তা রূপে বিশ্বাবাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। –[মুসলিম ও তিরমিযী] এই আয়াত হযরত সা'দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়ায়েত আছে, হযরত সা'দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহর ফরমানের মোকাবিলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, আম্মাজান! যদি আপনার দেহে একশ' আত্মা থাকত এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন! আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অশেষে অনশন ভঙ্গ করল।

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا الخ কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কখনো শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনো সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমনি একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালের শাস্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শাস্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শাস্তি হবে আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমনি ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজমের শেষ রুকূতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে– اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ; এতে উল্লিখিত আছে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাফের সঙ্গীরা এ বলে প্রতারিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কিয়ামতের দিন তোমার আজাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকড়ি দেওয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নির্বুদ্ধিতা ও বাজে কাজ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাফেরদের এমনি ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে বলেছেন, যারা এরূপ বলে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। ইরশাদ হচ্ছে– وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব দেখে তারা তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নাজমে আরো বলা হয়েছে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কেননা একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়নীতির পরিপন্থি।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে একথা তো ভ্রান্ত ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টাও স্বয়ং একটি বড় পাপ। এ পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সেও পাপী : আসল পাপীর যে শাস্তি হবে তার প্রাপ্যও তা-ই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবূ হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সৎকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সৎকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের ছওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং এতে সৎকর্মীদের ছওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপকাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়েও চাপবে এবং এতে আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না। –[কুরতুবী]

অনুবাদ :

১٤. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ وَعُمْرُهٗ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً اَوْ اَكْثَرَ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ط يَدْعُوْهُمْ اِلٰى تَوْحِيْدِ اللّٰهِ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ اَىِ الْمَاءُ الْكَثِيْرُ طَافَ بِهِمْ وَعَلَاهُمْ فَغَرِقُوْا وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ مُشْرِكُوْنَ .

১৪. আমি তো হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর বা তার চেয়ে বেশি। তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ কম হাজার বছর তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহবান করতেন, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে অর্থাৎ অথৈ পানি তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং তা তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো। ফলে তারা ডুবে মরল। কারণ তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী মুশরিক।

১٥. فَاَنْجَيْنٰهُ اَىْ نُوْحًا وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ اَىِ الَّذِيْنَ كَانُوْا مَعَهٗ فِيْهَا وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً عِبْرَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ . لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّاسِ اِنْ عَصَوْا رُسُلَهُمْ وَعَاشَ نُوْحٌ بَعْدَ الطُّوْفَانِ سِتِّيْنَ سَنَةً اَوْ اَكْثَرَ حَتّٰى كَثُرَ النَّاسُ .

১৫. আমি তাঁকে হযরত নূহ (আ.)-কে এবং তরীতে আরোহণকারীদেরকে অর্থাৎ যারা তাঁর সাথে নৌকায় অবস্থান করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন শিক্ষণীয় বিষয়। তাদের পরবর্তীতে আগত মানুষের জন্য, যদি তারা তাদের রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে। হযরত নূহ (আ.) প্লাবনের পরে ৬০ বছর বা তার চেয়ে অধিক জীবিত ছিলেন ফলে মানুষের বিস্তৃতি ঘটে।

١٦. وَ اذْكُرْ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط خَافُوْا عِقَابَهٗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا اَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْخَيْرَ مِنْ غَيْرِهٖ .

১৬. এবং স্মরণ করুন! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয় তোমরা যে মূর্তিগুলোর পূজা অর্চনা কর তা থেকে। যদি তোমরা জানতে উত্তমকে অনুত্তম থেকে।

١٧. اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط تَقُوْلُوْنَ كِذْبًا اِنَّ الْاَوْثَانَ شُرَكَاءُ لِلّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَقْدِرُوْنَ اَنْ يَّرْزُقُوْكُمْ فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ اُطْلُبُوْهُ مِنْهُ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

১৭. তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করতেছ। মিথ্যা বলতেছ এ মর্মে যে, এ মূর্তিগুলো আল্লাহ তা'আলার অংশীদার, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। তারা তোমাদেরকে জীবিকা দিতে সক্ষম নয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটই জীবনোপকরণ কামনা কর তাঁর থেকেই তা অনুসন্ধান কর। তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

অনুবাদ :

١٨. وَاِنْ تُكَذِّبُوْا اَىْ تُكَذِّبُوْنِىْ يٰاَهْلَ مَكَّةَ فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِىْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - اَلْاِبْلَاغُ الْبَيِّنُ فِىْ هَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ تَسْلِيَةً لِلنَّبِىِّ ﷺ -

১৮. যদি তোমরা অস্বীকার কর অর্থাৎ হে মক্কাবাসীরা! যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর [এটা কোনো নতুন বিষয় নয়] তবে তো তোমাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যাবাদী বলেছিল যারা আমার পূর্বে ছিলেন তাঁদেরকে। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেওয়া ব্যতীত রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ শুধুমাত্র স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া। এ দুটো ঘটনা বর্ণনা করে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে।

١٩. وَقَالَ تَعَالٰى فِىْ قَوْمِهٖ اَوَلَمْ يَرَوْا بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَنْظُرُوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ بِضَمِّ اَوَّلِهٖ وَقُرِئَ بِفَتْحِهٖ مِنْ بَدَاَ وَاَبْدَاَ بِمَعْنًى اَىْ يَخْلُقُهُمْ اِبْتِدَاءً ثُمَّ هُوَ يُعِيْدُهٗ ط اَىْ اَلْخَلْقَ كَمَا بَدَاَهٗ اِنَّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ مِنَ الْخَلْقِ الْاَوَّلِ وَالثَّانِىْ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ فَكَيْفَ يُنْكِرُوْنَ الثَّانِىَ -

১৯. আল্লাহ তা'আলা তাঁর [মুহাম্মদ ﷺ -এর] সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন– তারা কি লক্ষ্য করে না لَمْ يَرَوْا শব্দটি تَاءْ এবং يَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। অর্থ– তারা কি দেখে না কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন يُبْدِئُ শব্দটির يَاءْ বর্ণে পেশসহ এবং يَاءْ বর্ণে যবর দিয়েও পঠিত রয়েছে بَدَاَ ও اَبْدَاَ হতে উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ তিনি তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি তা পুনরায় সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টকে যেভাবে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এটা তো উল্লিখিত প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য সহজ কাজেই তোমরা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে কেন অস্বীকার কর।

٢٠. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ لِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَاَمَاتَهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط مَدًّا وَ قَصْرًا مَعَ سُكُوْنِ الشِّيْنِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَمِنْهُ الْبَدْءُ وَالْاِعَادَةُ -

২০. আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। যারা তোমাদের পূর্বে ছিল এবং তাদেরকে মৃত্যুদান করেছেন। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। نَشْاَةً শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন ش বর্ণটি সাকিন সহকারে। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। প্রথম ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাও এরই অন্তর্ভুক্ত।

٢١. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ تَعْذِيْبَهٗ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ج رَحْمَتَهٗ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ تُرَدُّوْنَ -

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

অনুবাদ :

٢٢. وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ رَبَّكُمْ عَنْ اِدْرَاكِكُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ز لَوْ كُنْتُمْ فِيْهَا اَىْ لَا تَفُوْتُوْنَهُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ مِنْ وَلِيٍّ يَمْنَعُكُمْ مِنْهُ وَلَا نَصِيْرٍ يَنْصُرُكُمْ مِنْ عَذَابِهٖ .

২২. তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না তোমাদের প্রতিপালককে তোমাদের পাকড়াও করা থেকে। না পৃথিবীতে, না আকাশে যদি তোমরা আকাশে থাক, অর্থাৎ তোমরা তার থেকে বেঁচে বের হয়ে যেতে পারবে না আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই যিনি তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা করবেন এবং সাহায্যকারীও নেই। যিনি তোমাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষায় সাহায্য করতে পারবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نُوْحًا : হযরত নূহ (আ.)-এর নাম নিয়ে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা– ১. আব্দুল গাফফার ২. ইয়াশকুর ৩. আস সাকান। নূহ হলো তাঁর উপাধি; অতিশয় রোদনকারীকে নূহ বলা হয়। যেহেতু হযরত নূহ (আ.) স্বীয় উম্মতের অবস্থা দেখে অনেক বেশি কান্নাকাটি করতেন এজন্য তাঁর উপাধি নূহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

قَوْلُهُ اِبْرَاهِيْمَ : সাধারণ কারীগণ اِبْرَاهِيْمَ-কে نَصَبْ-এর সাথে পাঠ করেছেন। نَصَبْ হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে, প্রথমত এটা نُوْحًا-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এর পূর্বে নসব দানকারী عَامِلْ উহ্য থাকায় তা مَنْصُوْبْ হয়েছে। ব্যাখ্যাকার (র.) اُذْكُرْ উহ্য মেনে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তৃতীয়ত এটা اَنْجَيْنَاهُ-এর যমীরের উপর আতফ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

আবার কেউ কেউ اِبْرَاهِيْمُ-কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে مَرْفُوْعْ পড়েছেন। আর এর খবরটি উহ্য রয়েছে, মূল ইবারত হলো– وَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِبْرَاهِيْمُ

قَوْلُهُ اَوْثَانٌ : এটা وَثَنٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পাথর ইত্যাদি হতে নির্মিত মূর্তি, যার উপাসনা করা হয়।

قَوْلُهُ يَرْزُقُوْكُمْ : এ বাক্যটি বৃদ্ধি করে মুফাসসির (র.) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, رِزْقًا শব্দটি مَفْعُوْلُ مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে– لَا يَمْلِكُوْنَ اَنْ يَرْزُقُوْكُمْ رِزْقًا

قَوْلُهُ تُكَذِّبُوْنِىْ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, تُكَذِّبُوْا-এর মাফউলটি উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَا اَهْلَ مَكَّةَ : এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য হয়, এই আয়াত এবং আগত আয়াতটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ, আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া।

قَوْلُهُ اِنْ تُكَذِّبُوْا : এটা হলো شَرْط আর তার جَزَاءْ হলো فَلَا يَضُرُّنِىْ تَكْذِيْبُكُمْ

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلُ : এখানে مَنْ হলো مَوْصُوْلَهْ যা كِذْب ফে'লের মাফউল হয়েছে।

قَوْلُهُ هَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত নূহ (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَوْا : এখানে رُؤْيَتْ দ্বারা عِلْمُ يَقِيْنِىْ উদ্দেশ্য। অন্যথায় প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টির সময় কোনো দ্রষ্টাই ছিল না। কাজেই اَوَلَمْ يَرَوْا দ্বারা প্রশ্ন করা তো অর্থহীন।

قَوْلُهُ اَلنَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ مَدًّا وَقَصْرًا : মদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো شِيْن -এর পর اَلِفْ বৃদ্ধি করে আর قَصْر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلِفْ ব্যতীত পাঠ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াসমূহে কাফেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্যাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্যাতনমূলক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থিদের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোনো সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাফেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রিসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গাম্বর, যিনি কুফর ও শিরকের মোকাবিলা করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তিনি যতটুকু নির্যাতিত হয়েছিলেন, অন্য কোনো পয়গাম্বর ততটুকু হননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাফেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কুরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয় শ' বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স; এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরো বয়স রয়েছে।

মোটকথা, এই অসাধরণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাফেরদের পক্ষ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোনো সময় সাহস না হারানো– এগুলোর সব হযরত নূহ (আ.)-এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনীটিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরুলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান এবং স্বীয় আদরের দুলালকে জবাই করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর উম্মতের ঘটনাবলি এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গাম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। এগুলো সব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মাদীর সান্ত্বনার জন্য এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্য বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতিকে যুক্তির ভাষায় তাওহীদের কথা বলেছিলেন। এ পর্যায়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন। আর তোমাদের সকলকে অবশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে।"

এ পর্যায়ে কোনো দুরাত্মা কাফের, মুরতাদ যদি এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হবো না, আমার অন্যান্য ইচ্ছা যেমন কার্যকর হয়, তেমিন এ ইচ্ছা কার্যকর হবে। এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পেই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আর তোমরা জমিন ও আসমানে কোথাও আল্লাহ পাকের শাস্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, যদি কেউ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তবে তার দু'টি পন্থা হতে পারে। যথা– ১. পলায়ন করার মাধ্যমে। ২. হাজির থেকে আজাব মোকাবিলা করার মাধ্যমে। একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি নেই যে আল্লাহ পাকের আজাবের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে, অতএব এ পন্থা কল্পনাও করা

যায় না। আর পলায়ন পৃথিবীতে কোথায় করবে? পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে পলায়ন করে থাকা যায়। তাই ইরশাদ হয়েছে– فِى ٱلْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে আল্লাহর পাকের আজাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, এমনকি সমুদ্রের অতল তলেও যদি কেউ আত্মগোপন করে সেখানেও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে– وَلَا فِى السَّمَآءِ অর্থাৎ জমিনে আত্মগোপনের স্থান না থাকার কারণে যদি কেউ [রকেটে আরোহণ করে] আসমানে তথা মহাশূন্যে পলায়নের চেষ্টা করে তবে তা-ও সম্ভব হবে না। কেননা আসমান জমিনের কোনো স্থানই আল্লাহ পাকের গোপন নেই। অতএব কোনো অপরাধীই আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

قَوْلُهٗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ : আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবকও নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই। প্রকাশ্যে যারা সাহায্যকারী বলে পরিচয় দেয়, অবশেষে তারা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁর কুদরতের সম্মুখে নিতান্ত অসহায়-অক্ষম। আলোচ্য আয়াতে একটি বিষয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যেমন اَلْاَرْضُ শব্দটিকে اَلسَّمَآءُ শব্দটির পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা স্বভাবত কোনো অপরাধী যদি পলায়ন করতে চায় তবে সর্বপ্রথম পৃথিবীতেই পলায়নের চেষ্টা করবে। যদি সারা পৃথিবীতে কোনো গোপন স্থান না পাওয়া যায় তবে পরবর্তীকালে মহাশূন্যে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রথম اَلْاَرْضُ এবং পরে اَلسَّمَآءُ ব্যবহার করা হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৫, পৃ. ৪৯-৫০]

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি মুশরিক হোক বা মুরতাদ, কেউই তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, জমিন আসমান কোথাও না। ত্রিভুবনে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে আল্লাহর কোনো দুশমন আশ্রয় নিতে পারে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আল্লাহর দুশমন বা আল্লাহর কুরআনের দুশমন, আসমান জমিনে তাদের জন্যে পলায়নের কোনো স্থান নেই, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরতের পরিসীমার বাইরে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ "আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক বা বন্ধু নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।"

অর্থাৎ আসমানি জমিনী বালা-মসিবত থেকে রক্ষাকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ নেই, আর তিনিই যখন রক্ষা করবেন না, তবে কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু তাদের কোনো অভিভাবক নেউ, সাহায্যকারী নেই, তাই জমিনে বা আসমানে এমন কেউ নেই, যে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে ঘোষণা করা হয়েছে– জমিনে বা আসমানে কোথাও কাফেরদের জন্যে পলায়নের বা আত্মগোপন করার কোনো আশ্রয়স্থল নেই, যেখানে তারা আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং আজাবকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে পাবে। আর এ আয়াতাংশে ঘোষণা করা হয়েছে– কাফেররা শুধু যে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে বাঁচতে পারবে না, তাই নয়; বরং তাদের এমন কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই, যারা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আসমানি জমিনী আজাব থেকে রক্ষা করতে পারে। কাফের, মুশরিক ও মুরতাদ-নাস্তিকদেরকে মানুষের হাত থেকে হয়তো অন্য মানুষ রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে; কিন্তু আল্লাহ পাকের আজাব থেকে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারে না; বরং যারা এমন হতভাগাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তারাও ধ্বংস হয়। –[তাফসীর রূহুল মা'আনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯]

অনুবাদ :

٢٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖ اَىْ الْقُرْاٰنِ وَالْبَعْثِ اُولٰۤئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ اَىْ جَنَّتِىْ وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ مُؤْلِمٌ ـ

২৩. যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে অর্থাৎ কুরআন ও পুনরুত্থানকে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয় অর্থাৎ আমার জান্নাত হতে আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক।

٢٤. قَالَ تَعَالٰى فِىْ قِصَّةِ اِبْرَاهِيْمَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ط الَّتِىْ قَذَفُوْهُ فِيْهَا بِاَنْ جَعَلَهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَّسَلَامًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اَىْ اِنْجَائِهٖ مِنْهَا لَاٰيٰتٍ هِىَ عَدَمُ تَاْثِيْرِهَا فِيْهِ مَعَ عِظَمِهَا وَاِخْمَادُهَا وَاِنْشَاءُ رَوْضٍ مَكَانَهَا فِىْ زَمَنٍ يَسِيْرٍ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ يُصَدِّقُوْنَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا ـ

২৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন– উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় শুধু এই বলল, একে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর; কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে রক্ষা করলেন। যাতে তারা তাঁকে নিক্ষেপ করেছিল। এভাবে যে, সেটাকে তার জন্য শীতল ও শান্তিময় করে দিলেন। এতে অবশ্যই রয়েছে অর্থাৎ অগ্নি হতে তাঁকে পরিত্রাণদানের মধ্যে নিদর্শন বিরাট অগ্নিকুণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া না হওয়া এবং তা নির্বাপিত হয়ে যাওয়া এবং সেই অগ্নিকুণ্ডের স্থলে অতি অল্প সময়েই তা বাগিচায় পরিণত হয়ে যাওয়া। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী, কেননা তারাই এর দ্বারা লাভবান হয়ে থাকে।

٢٥. وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا تَعْبُدُوْنَهَا وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ مَّوَدَّةُ بَيْنِكُمْ خَبَرُ اِنَّ وَعَلٰى قِرَاءَةِ النَّصَبِ مَفْعُوْلٌ لَهٗ وَمَا كَافَّةٌ الْمَعْنٰى تَوَادَدْتُمْ عَلٰى عِبَادَتِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ يَتَبَرَّاُ الْقَادَةُ مِنَ الْاَتْبَاعِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز يَلْعَنُ الْاَتْبَاعُ الْقَادَةَ وَمَاْوٰىكُمْ مَصِيْرُكُمْ جَمِيْعًا النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ ق مَانِعِيْنَ مِنْهَا ـ

২৫. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ তোমরা এর উপাসনা কর, আর مَا টা হলো মাসদারিয়া। مَوَدَّةُ بَيْنِكُمْ তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে বাক্যাংশটি اِنَّ -এর খবর, আবার এক কেরাতে نَصَبْ -এর সাথে রয়েছে, তখন এটা মাফউলে লাহু হবে। আর مَا টি হলো مَاءْ كَافَّةْ ; আয়াতের অর্থ হলো– এই মূর্তিগুলোর উপাসনার কারণে তোমাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পার্থিব জীবনে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ নেতৃবৃন্দ তাদের অধীনস্থদের থেকে দায়িত্বমুক্ততা প্রকাশ করবে। এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে অভিশাপ দিবে। তোমাদের সকলের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। অগ্নি হতে রক্ষাকারী থাকবে না।

অনুবাদ :

٢٦. فَاٰمَنَ لَهٗ صَدَّقَ بِاِبْرَاهِيْمَ لُوْطٌ وَهُوَ ابْنُ اَخِيْهِ هَارَانَ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ مِنْ قَوْمِيْ اِلٰى رَبِّيْ ط اَيْ اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَبِّيْ وَهَجَرَ قَوْمَهٗ وَهَاجَرَ مِنْ سَوَادِ الْعِرَاقِ اِلَى الشَّامِ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ فِيْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهٖ .

২৬. তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন হযরত লূত (আ.) সে তাঁর ভাই হারূনের পুত্র ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমি দেশ ত্যাগ করছি আমার সম্প্রদায় থেকে আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য অর্থাৎ যেদিকে যেতে আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দেন এবং তিনি তার সম্প্রদায়কে ত্যাগ করে ইরাকের পার্শ্ব ঘেষে সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করলেন। তিনি তো পরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তাঁর কর্মে।

٢٧. وَوَهَبْنَا لَهٗ بَعْدَ اِسْمَاعِيْلَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ بَعْدَ اِسْحَاقَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ فَكُلُّ الْاَنْبِيَاءِ بَعْدَ اِبْرَاهِيْمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَالْكِتٰبَ بِمَعْنٰى الْكُتُبِ اَيِ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَالزَّبُوْرَ وَالْقُرْاٰنَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ فِيْ كُلِّ اَهْلِ الْاَدْيَانِ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ الَّذِيْنَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلٰى .

২৭. আমি তাঁকে দান করলাম ইসমাঈলের পরে ইসহাক এবং ইয়াকূবকে ইসহাকের পরে এবং তাঁর বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর আগমনকারী প্রত্যেক নবীই তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত এবং কিতাব এখানে كُتُبْ টি كِتَابْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও আল কুরআন। এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরাই তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে উল্লেখ করে। আর আখিরাতেও তিনি নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবেন। যাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

٢٨. وَ اذْكُرْ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمَوْضَعَيْنِ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ اَيْ اِدْبَارَ الرِّجَالِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ . الْاِنْسِ وَالْجِنِّ .

২৮. এবং স্মরণ করুন হযরত লূত (আ.)-এর কথা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা তো اَئِنَّكُمْ -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয়ের মাঝে উভয় সুরতে উভয় স্থানে আলিফ বৃদ্ধি করে। এমন অশ্লীল কর্ম করছ অর্থাৎ পুরুষের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হও। যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। মানব ও দানব হতে কেউ।

অনুবাদ :

٢٩. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ طَرِيْقَ الْمَارَّةِ بِفِعْلِكُمُ الْفَاحِشَةَ بِمَنْ يَمُرُّ بِكُمْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمَمَرَّ بِكُمْ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمْ مُتَحَدِّثِكُمُ الْمُنْكَرَ ط فِعْلَ الْفَاحِشَةِ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ - فِىْ اِسْتِقْبَاحِ ذٰلِكَ وَاَنَّ الْعَذَابَ نَازِلٌ لِفَاعِلِيْهِ -

২৯. তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক। তোমরা পথ অতিক্রমকারীদের সাথে নির্লজ্জ কর্মে লিপ্ত হচ্ছ এবং মুসাফিরের পথে প্রতিবন্ধক হচ্ছ। ফলে লোকেরা তোমাদের পথ পরিহার করেছে। তোমরাই তো নিজেদের কথাবার্তার মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করে থাক অশ্লীল কর্ম একে অপরের সাথে। উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। এটাকে মন্দ কর্ম গণ্য করার ব্যাপারে। এবং এ ব্যাপারে যে, এ কর্ম সম্পাদনকারীর উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হবে।

٣٠. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِتَحْقِيْقِ قَوْلِىْ فِىْ اِنْزَالِ الْعَذَابِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ - الْعَاصِيْنَ بِاِتْيَانِ الرِّجَالِ فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَاءَهٗ.

৩০ তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে সাহায্য করুন। শাস্তি অবতীর্ণ করার ব্যাপারে আমার বক্তব্যকে সত্যায়ন করার মাধ্যমে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার মাধ্যমে আবাধ্যাচরণকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَىِ الْقُرْاٰنِ وَالْبَعْثِ : এখানে اٰيٰتٌ দ্বারা اَلْقُرْاٰنُ-এর তাফসীর করা হয়েছে। আর لِقَائِهٖ দ্বারা اَلْبَعْثُ-এর তাফসীর করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ : অর্থাৎ এরা হলো সে সকল লোক যারা কিয়ামতের দিন আমার রহমত হতে নিরাশ হবে। এটা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে مَاضِىْ-এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ : এখানে حَرْفُ تَرْدِيْد তথা اَوْ-এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ সূরা আম্বিয়াতে শুধু মাত্র حَرِّقُوْهُ উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ কি?

জবাব : এখানে মূলত তাদের পরামর্শের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। আর সূরা আম্বিয়াতে তাদের পরামর্শের পর গৃহীত সিদ্ধান্তের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ الَّتِىْ قَذَفُوْهُ فِيْهَا : মুফাসসির (র) এই ইবারতের মাধ্যমে উহ্য বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মূল ইবারত হলো– فَقَذَفُوْهُ فِى النَّارِ فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ

আর بَعْدَ اِنْجَائِهِ مِنَ النَّارِ -এর- فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ এর আতফ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ-

قَوْلُهُ اِنْ مَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا : এর মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি তারকীব হতে পারে-

প্রথম তারকীব : مَا হলো مَوْصُوْل যা اَلَّذِيْ অর্থে হয়েছে। আর عَائِدْ হলো উহ্য। আর তা اِتَّخَذْتُمْ -এর প্রথম মাফউল। আর اَوْثَانًا হলো দ্বিতীয় মাফউল। আর مَوَدَّةَ হলো اِنْ -এর খবর। মূল ইবারত হলো- اِنَّ الَّذِيْ اتَّخَذْتُمُوْهُ আর এই সূরতে مَوَدَّةٌ -কে- اَوْثَانًا -এর উপর মুবালাগা স্বরূপ হামল করা হবে। আর مَوَدَّةٌ -এর পূর্বে ذَوْ উহ্য মানা হবে। তবেই حَمْل বৈধ হবে। আর مَوَدَّةٌ -এর উপর নসব হওয়ার সূরতে اِنْ -এর খবর উহ্য থাকবে। মূল ইবারত হবে- اَلَّذِيْ اتَّخَذْتُمُوْهُ اَوْثَانًا لِاَجْلِ الْمَوَدَّةِ لَا يَنْفَعُوْكُمْ

দ্বিতীয় তারকীব : مَا টা হলো كَافَّهْ যা اِنَّ -কে আমল করা হতে বিরত রেখেছে। আর اَوْثَانًا হলো اِتَّخَذْتُمْ -এর মাফউলে বিহী,যদি اِتَّخَذْتُمْ -কে- مُتَعَدِّيْ بِدُوْ مَفْعُوْل ধরা হয়। আর যদি مُتَعَدِّيْ بِيَكْ مَفْعُوْل ধরা হয় তবে দ্বিতীয় মাফউল হলো مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর যদি مَوَدَّةٌ -কে মারফূ পড়া হয় তবে তা উহ্য মুবতাদা هِيَ -এর খবর হবে। অর্থাৎ هِيَ مَوَدَّةٌ -এ সুরতে বাক্যটি اَوْثَانًا -এর সিফত হবে। আবার এটা جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ -ও হতে পারে। আর যদি مَوَدَّةً -এর উপর নসব পড়া হয় তবে তা اِتَّخَذْتُمْ -এর مَفْعُوْلٌ لَهُ হবে। আবার উহ্য اَعْنِيْ -এর কারণেও মানসূব হতে পারে।

তৃতীয় তারকীব : مَا -কে মাসদারিয়া মানা হবে। এরপর দুই সুরত হবে। হয়তো اِتِّخَاذْ -এর পূর্বে سَبَبْ মুযাফ উহ্য মানা হবে। তখন উহ্য ইবারত হবে- اِنَّ سَبَبَ اِتِّخَاذِكُمْ اَوْثَانًا مَوَدَّةٌ আবার এটাও হতে পারে যে, মুযাফ উহ্য মানা হবে না; বরং মুবালাগা স্বরূপ اِتِّخَاذْ -কেই مَوَدَّةْ স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আর مَوَدَّةٌ নসবের সুরতে খবর উহ্য থাকবে। যেমনটি প্রথম সুরতে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى : উল্লিখিত কেরাতের মূল অর্থ হলো এই প্রতিমাগুলোর উপাসনার কারণেই তোমরা ঐকমত্য হয়ে পড়েছ।

قَوْلُهُ صَدَّقَ بِاِبْرَاهِيْمَ : অর্থাৎ হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়তের সত্যায়ন করেছেন। এটা নয় যে, نَفْس اِيْمَانْ -এর সত্যায়ন করেছেন। কেননা হযরত লুত (আ.) তো মুমিন ছিলেন। আয়াতে لُوْط শব্দটির উপর ওয়াকফ আব্যশ্যক।

قَوْلُهُ اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَبِّيْ : ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংশয়ের উত্তর দান। আর তা হলো اِلٰى رَبِّيْ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক প্রমাণিত হয়। অথচ جِهَاتْ বা দিক হতে তিনি পবিত্র। তাই اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِيْ رَبِّيْ বলে এরই জবাব দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ سَوَادُ الْعِرَاقِ : এর অর্থ হলো তার কিনারা, পার্শ্ব। বলা হয় سَوَادُ الْبَلَدِ অর্থাৎ শহরের পার্শ্ব বা কিনারা।

قَوْلُهُ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : এর অর্থ হলো اَلصَّالِحِيْنَ الْكَامِلِيْنَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা- ১. তাওহীদ ২. আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে- "এ পৃথিবীতে কেউ আল্লাহ পাকের হাত থেকে রেহাই পাবে না এবং কাফেদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর আজাব।" ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থাৎ আর যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ তাওহীদকে অমান্য করে এবং তাঁর মোলাকাতের কথাও অবিশ্বাস করে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনেও বিশ্বাস করে না, তারাই সেসব লোক যারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তাঁর স্রষ্টার প্রমাণ, তথা সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার নিদর্শন। অতএব, যে তাঁর সাথে শিরক করে সে আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। আর যে হাশরের দিনকে অস্বীকার করে, সে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

আয়াতের মর্মকথা : যারা আল্লাহ পাকের কথা মানে না, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, এ জীবন নিয়েই ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না এবং একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে– একথাও বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও করে না। তারা নিশ্চয় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, এটি স্বাভাবিক, আর এ কথারই ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'রহমত' অর্থ– জান্নাত। অর্থাৎ তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা কাফের, মুশরিক ও মুরতাদরা জান্নাতে বিশ্বাস করে না, কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে, তাই তারা আখিরাতে আল্লাহ পাকের রহমত তথা জান্নাত থেকে মাহরুম হবে। যাদের এ অবস্থা তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তি।

পক্ষান্তরে, মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতের প্রতি তথা আল্লাহ পাকের সাথে মোলাকাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে, তাই তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে।

আল্লাহর রহমত অনন্ত অসীম : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের রহমত এবং গজব উভয়টিরই ঘোষণা রয়েছে। তবে রহমতকে আল্লাহ পাক তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত করে ঘোষণা করেছেন– رَحْمَتِیْ অর্থাৎ আমার রহমত। পক্ষান্তরে আজাবের ঘোষণায় বলেছেন– لَهُمْ عَذَابٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে আজাব।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আজাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। কেননা তাঁর রহমত অনন্ত অসীম। –[তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ২০, পৃ. ১৪৯]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দরদভরা উপদেশ ছিল, যা তিনি তাঁর জাতির উদ্দেশ্য পেশ করছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি তাঁর কথায় আদৌ কর্ণপাত করেনি; বরং তাঁর যুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ বক্তব্য শ্রবণ করে তারা অধিকতর উগ্র হয়ে উঠে, তারা তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে পড়ে। তারা বলে, আমাদের একই দাবি– হয়তো ইবরাহীমকে হত্যা কর, না হয় পুড়িয়ে ফেল।

বস্তুত যারা যুক্তিতর্কে পরাজিত হয়, সত্যের মুখোমুখি হতে যারা অপারগ হয়, সর্বদা তারা এমন জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি করেছিল।

قَوْلُهُ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ : অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি সিদ্ধান্ত করল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পুড়িয়ে ফেলবে, এক জাতীয় অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে তাঁকে তাতে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করলেন, তিনি অগ্নিকে নির্দেশ প্রদান করলেন– يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ হে অগ্নি! তুমি শীতল হও এবং ইবরাহীমের প্রতি শান্তিদায়ক হও।

قَوْلُهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ নশ্চয় এতে রয়েছে বহু নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে। বস্তুত আল্লাহ পাক কিভাবে তাঁর প্রিয় বান্দাগণের হেফাজত করেন, তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ ঐতিহাসিক ঘটনায়।

দ্বিতীয়ত বস্তু মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেমন অগ্নি পুড়িয়ে ফেলে, পানি ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর সকল প্রতিক্রিয়া আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এজন্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নমরূদের তৈরি করা অগ্নিকুণ্ড পুড়তে পারেনি। কেননা অগ্নি আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, তাঁর অনুগত। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আর যাকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন নিরাপদে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পুনরায় উপদেশ দিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপদেশেরই বিবরণই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۔

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যে তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর পূজা করছো এবং তাদের সম্মুখে মাথানত করছো, কোনো সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এমন অন্যায় কাজ সমর্থন করতে পারে না। কেননা এটি যে নিতান্তই অযৌক্তিক ও অসুন্দর কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা শুধু সামাজিক বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যেই মূর্তিপূজার মতো কাজকে ধর্ম বলে গ্রহণ করছো। এর পেছনে কোনো যুক্তি যে নেই, একথা তোমরাও স্বীকার কর, শুধু প্রথা এবং পরস্পরের সম্পর্ক বজায় রাখার প্রয়োজনেই তোমরা মূর্তিপূজা করছো। অথচ কিয়ামতের দিন তোমরাই একে অন্যকে অস্বীকার করবে, শুধু তাই নয়; বরং কিয়ামতের দিন তোমরা একে অন্যকে লানত দেবে।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, ভক্তি অনুরক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অপব্যবহারই মূর্তিপূজা তথা পৌত্তলিকতার মূলভিত্তি। সাধরণত দেখা যায় কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে ভক্তরা তার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তার ছবি সংরক্ষণ করে এবং কিছুদিন তার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনকল্পে ঐ ছবিটির পূজা শুরু করে দেয়। বলাবাহুল্য, এভাবেই মূর্তি পূজার এ প্রথা শুরু হয়। এর পিছনে কোনো যুক্তি নেই; বরং এর দ্বারা একটি প্রচলিত প্রথা অব্যাহত রাখা হয়। শুধুমাত্র পরস্পরের সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যে, সামাজিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে তোমরা মূর্তি পূজা করছো।

এরপর তাদের পরিণতি সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ.) বলেন– وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ অর্থাৎ "আর তোমাদের সকলের ঠিকানা হবে দোজখ।" অর্থাৎ মূর্তি এবং তার পূজারী সকলেরই ঠিকানা হবে দোজখ। "আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না" যারা তোমাদেরকে দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারে। অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর রাখার উদ্দেশ্যে, পরস্পরের ভালোবাসা অটুট রাখার প্রয়োজনে তোমরা যে মূর্তিপূজা কর, মনে রেখো যে, তোমাদের এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক অবশেষে টিকে থাকবে না, এটা শুধু দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পর্যন্তই। এরপর এ সম্পর্কের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত কিয়ামতের কঠিন দিনে তোমাদের পরস্পরের এ প্রীতির সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হবে, তখন তোমরা একে অন্যকে লা'নত দিতে থাকবে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে–

يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তারা একে অন্যের বিরোধিতা করবে আর একে অন্যকে লা'নত দেবে।

قَوْلُهُ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي : হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাগিনা। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মুজেযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি তাঁর চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গী হন। কূফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন– إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي অর্থাৎ আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশে দেশত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোনো জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার ইবাদতে কোনো বাধা নেই।

হযরত নাখায়ী ও কাতাদা (র.) বলেন– إِنِّي مُهَاجِرٌ বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি। কেননা এর পরবর্তী বাক্য وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ তো নিশ্চিতরূপে তাঁরই অবস্থা। কোনো কোনো তাফসীরকার إِنِّي مُهَاجِرٌ -কে হযরত লূত (আ.)-এর উক্তি প্রতিপন্ন কছেন। কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে প্রথম তাফসীরই উপযুক্ত। উল্লেখ্য যে, হযরত লূত (আ.)-ও এই হিজরতে শরিক ছিলেন; কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অধীন হওয়ার.কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আ.)-এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম পয়গাম্বর, যাকে দীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো কর্মের প্রতিদান দুয়িাতেও পাওয়া যায় : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا। অর্থাৎ আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদি, খ্রিস্টান ও প্রতিমাপূজারী– সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদেরকে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে; কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেওয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে বহু সৎকর্মের পার্থিব উপকারিতা ও অসৎ কর্মের পার্থিব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ৭৫৯-৬০]

দুনিয়াতে বৃদ্ধকালে তাঁর সন্তান হওয়া তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান ছিল। এমনিভাবে নবুয়ত ও রিসালত তাঁর বংশে সংরক্ষিত থাকা তাঁর প্রতি মহাসম্মান ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ ব্যাখ্যা করেছেন তাফসীরকার সুদ্দী (র.)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, দুনিয়াতে উত্তম বিনিময় বা اَجْرٌ -এর অর্থ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে সর্বদা নবুয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত থাকা, ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ– সকলের নিজেদের ধর্মকে দীনে ইবরাহীমী দাবি করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা, যেমন– নামাজের তাশাহহুদের শেষে তা উল্লেখ করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ নিয়ামত : আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) বলেছেন, যা কিছু ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে তা ছাড়াও আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে নিয়ামত দান করেছিলেন তা হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকির করার তাওফীক এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতে তিনি বিশেষ স্বাদ লাভ করতেন।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৬৯-৭০]

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন সে সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তা হলো তাঁকে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে নাজাত দেওয়া এবং জালেম নমরূদের হাত থেকে রক্ষা করা।

তাফসীরকার ইবনে জুরায়েজ (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে উত্তম বিনিময় দান করেছেন, তা হলো বৃদ্ধকালে তাঁর পুত্র সন্তান লাভ, দ্বিতীয়ত তাঁর বংশেই নবুয়ত সংরক্ষিত রাখা।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, সেই নিয়ামত হলো তিনি দুনিয়াতে থাকতেই তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দুনিয়াতেই যে বিনিময় দান করেছেন তা হলো আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের তাওফীক –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২০ পৃ. ১৫২-৫৩]

قَوْلُهٗ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মান এবং মর্যাদা শুধু যে দুনিয়াতেই রয়েছে তা নয়; বরং আখিরাতেও তিনি শীর্ষস্থানীয়, মহাসম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সংবর্ধনা লাভ করবেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি এটি আল্লাহ পাকের অত্যন্ত বড় নিয়ামত যে, তাওহীদ ও আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রচারে তাঁর বংশধরগণ যুগ যুগ ধরে আত্মনিয়োগ করেছেন। দুনিয়াতে তিনি ছিলেন অতি ভাগ্যবান, আর আখিরাতে তিনি আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক যদি দুনিয়াতে তাঁর কোনো প্রিয় বান্দাকে কোনো বিশেষ নিয়ামত দান করেন, তবে তা তাঁর আখিরাতের মর্যাদা কম করার কারণ হয় না। হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে যে ঘোষণা রয়েছে, তা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ.৭৮৩]

قَوْلُهُ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ : হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত লূত (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে হিজরত করে এসেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে 'সুদম' নামক শহর এবং তার উপকণ্ঠের জন্যে নবী করে প্ররণ করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিল। তাই তিনি তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা এতো অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছো যা পৃথিবীতে তোমাদের পূর্বে আর কেউ করেনি।"

আলোচ্য আয়াত সমূহে হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অপকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তারা জঘন্যতম ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হতো, তারা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধ পন্থায় যৌন সম্ভোগ করতো, শুধু তাই নয়; তারা ডাকাতি রাহাজানি, করতো মানুষের পথ রোধ করে তাদের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করতো।

এখানে হযরত লূত (আ.) তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. পুংমৈথুন ২. রাহাজানি এবং ৩. মজলিসে সবার সামনে প্রকাশ্যে অপকর্ম করা। কুরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোনো গুনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। কোনো কোনো তাফসীরকারক এ স্থলে সেসব গুনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণত পথিকদের গায়ে পাথর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দেওয়া। উম্মে হানী (রা.)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপন নয়, প্রকাশ্য মজলিসে সবার সামনে করত। [না'উযুবিল্লাহ]

আয়াতে উল্লিখিত প্রথম গুনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে ব্যভিচারের চেয়েও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।

–[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৬, পৃ. ৭৬২-৬৩]

আল্লামা বগভী হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি এবং আরজ করেছি, তারা কোন মন্দ কাজটি করতো? তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, তারা সদর রাস্তার উপরেই তাদের সভা অনুষ্ঠান করতো, মানুষের গতিরোধ করতো, তাদের গায়ে পাথর নিক্ষেপ করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপ করতো। –[আহমদ, তিরমিযী]

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে, লূত সম্প্রদায় সদর রাস্তার উপর তাদের আসর জমিয়ে বসতো, প্রত্যেকের নিকট একটি পাত্র থাকতো, তাতে ছোট ছোট পাথর রাখা হতো, যখন কোনো পথচারীকে দেখতো, তখন একে অন্যকে বলতো শিকার কর। এরপর ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতো। যার পাথর ঐ ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করত ঐ পথিক পাথর নিক্ষেপকারীর মতো হয়ে যেত, তখন সে তার সব ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতো, এরপর সে তার সাথে অশ্লীল কাজ করতো, অবশেষে তাকে মাত্র তিন দেরহাম দিয়ে বিদায় দিত।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন, তারা প্রকাশ্য সভায় বসে উচ্চৈঃস্বরে উদরের বাতাস বের করতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেছেন, তারা একে অন্যের প্রতি থুথু দিত।

মাকহুল (র.) বলেছেন, তারা মজলিসের মধ্যেই নগ্ন হয়ে যেত, মানুষের প্রতি কংকর নিক্ষেপ করতো এবং মন্দ ও ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতো। তাই হযরত লূত (আ.) এ দুর্বৃত্তদের হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণে রাজি হয়নি; বরং তারা হযরত লূত (আ.)-কে বলেছে, তোমার এসব উপদেশ রাখ, যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো! এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে– فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু একথা বলল যে, আমাদের উপর আল্লাহর আজাব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও। অর্থাৎ তুমি যে আজাবের হুমকি দিচ্ছ তা নিয়ে এসো, যদি তুমি তোমার নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হও, অথবা আজাবের দাবিতে

সত্যবাদী হও, অথবা আমাদের কর্মকে মন্দ বলার ব্যাপারে যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ পাকের আজাব নিয়ে এসো! –[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দূ), পারা ২০, পৃ. ৫৯, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭০-৭১]

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ : অর্থাৎ "আর আমি তাঁকে ইসহাক এবং ইয়াকূব দান করি এবং তাঁর বংশে নবুয়ত রেখে দেই এবং আসমানি কিতাব দান করি; আর তাঁকে পৃথিবীতেই উত্তম বিনিময় দান করি; আর নিশ্চয় সে আখিরাতেও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হিজরতের পর সিরিয়ায় সুসন্তান দান করেন, যাতে করে তাদেরকে দেখে তাঁর নয়ন ও মন তৃপ্তি লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কথা আয়াতে উল্লেখ করা হইনি; কারণ এ হিজরতের সফরে তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে ছিলেন না। আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁদেরকে ইতিপূর্বেই মক্কার পবিত্র ভূমিতে রেখে আসা হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)-এর চৌদ্দ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন।

মোটকথা, হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নেক সন্তান দান করেন এবং এ কথাও ইরশাদ করেন যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে নবুয়ত এবং আসমানি কিতাব রেখে দিয়েছি। অর্থাৎ আগামীতে যাঁরা এ নবুয়তের নিয়ামত ও আসমানি কিতাব লাভ করবেন, তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরই হবেন।

সুতরাং নবুয়ত প্রথম পর্যায়ে বনী ইসরাঈলে [হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বংশধারায়] ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে বনী ইসমাঈলে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ প্রেরিত হন এবং তাঁর উপরই নবুয়তের আগমন-ধারা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং এভাবে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং কুরআন– এ সকল কিতাব সমন্বিতভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর বংশেই নাজিল হয়। আর যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশেই নবুয়ত ও রিসালত সংরক্ষিত ছিল, তাই তাঁকে আবুল আম্বিয়া বা 'নবীগণের পিতা' বলে উল্লেখ করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পর তাঁর বংশ ব্যতীত একজন নবীও অন্য কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهُ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে اَلْمُفْسِدِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো অশান্তি সৃষ্টিকারী। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বিষয়ের দিকে যে, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা আল্লাহ পাকের আজাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের উপর অতি শীঘ্র আজাব হওয়া একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, 'সাদূম' নামক শহরের অদিবাসীরা অস্বভাবিক পন্থায় পুরুষের যৌন সম্ভোগের যে জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেছে, তা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি। দ্বিতীয়ত হযরত লূত (আ.) যখন তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাবের কথা বলেছেন, তখন তারা বিদ্রূপ করে বলেছে, "আজাব এখনই নিয়ে এসো"। তাই তাদের প্রতি আজাব ত্বরান্বিত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মাআনী খ. ২০ পৃ. ১৫৪, তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ১৭১]

অনুবাদ :

٣١. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ بَعْدَهٗ قَالُوْآ إِنَّا مُهْلِكُوْآ أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ط أَىْ قَرْيَةِ لُوْطٍ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ كَافِرِيْنَ.

৩১. যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট আসলেন ইসহাকের এবং তারপর ইয়াকুবের তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করব। অর্থাৎ হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে এর অধিবসীরা তো জালিম কাফের।

٣٢. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا أَىِ الرُّسُلُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ز لَنُنَجِّيَنَّهٗ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ وَأَهْلَهٗ إِلَّا امْرَأَتَهٗ ز كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ.

৩২. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, এই জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বললেন, অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। সেথায় কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবই। তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত لَنُنَجِّيَنَّهٗ শব্দটি তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে তো শাস্তির উপযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣. وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْءَ بِهِمْ حَزِنَ بِسَبَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا صَدْرًا لِأَنَّهُمْ حِسَانُ الْوُجُوْهِ فِىْ صُوْرَةِ أَضْيَافٍ فَخَافَ عَلَيْهِمْ قَوْمَهٗ فَأَعْلَمُوْهُ بِأَنَّهُمْ رُسُلُ رَبِّهٖ وَقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قف إِنَّا مُنَجُّوْكَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. وَنُصِبَ أَهْلَكَ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ الْكَافِ.

৩৩. এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-এর নিকট আসলেন, তখন তাদের জন্য তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন তাদের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলেন। কেননা আগত মেহমানগণ খুবই সুদর্শন চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন, সেহেতু তাদের ব্যাপারে স্বীয় সম্প্রদায় থেকে আশঙ্কা করতে লাগলেন, তখন তারা তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা তাঁর প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। তাঁরা বললেন, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না; আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করব; তবে আপনার স্ত্রীকে ব্যতীত مُنَجُّوْكَ শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবেই পঠিত। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। كَافْ-এর مَحَلْ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে أَهْلَكَ শব্দটি নসবযুক্ত হয়েছে।

٣٤. إِنَّا مُنْزِلُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ عَلٰى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا عَذَابًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا بِالْفِعْلِ الَّذِىْ كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ. بِهٖ أَىْ بِسَبَبِ فِسْقِهِمْ.

৩৪. আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাজিল করব مُنْزِلُوْنَ শব্দটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। কারণ তারা পাপাচার করছিল। অর্থাৎ তাদের ফিসক তথা পাপাচারের কারণে।

٣٥. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً ظَاهِرَةً هِىَ اٰثَارُ خَرَابِهَا لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

৩৫. আমি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি অর্থাৎ তাদের অবস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিহ্নসমূহ। বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। যারা চিন্তাভাবনা করে।

অনুবাদ :

٣٦. وَ اَرْسَلْنَا اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ اِخْشَوْهُ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ . حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِىَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَةِ اَفْسَدَ .

৩৬. এবং আমি পাঠিয়েছিলাম মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা হযরত শুয়াইব (আ.)-কে। তিনি বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শেষ দিবসকে ভয় কর। আর তা হলো কিয়ামতের দিন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এটা তার আমেল عَثِىَ [ثَاءْ বর্ণে যেরযুক্ত] হতে حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ হয়েছে যা اَفْسَدَ অর্থে হয়েছে।

٣٧. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيْدَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ . بَارِكِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ مَيِّتِيْنَ .

৩৭. কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল, অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো اَلرَّجْفَةُ শব্দের অর্থ হলো ভীষণ কম্পন। ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। হাঁটুগেড়ে বসা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

٣٨. وَ اَهْلَكْنَا عَادًا وَّثَمُوْدَا بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهٖ بِمَعْنَى الْحَىِّ وَالْقَبِيْلَةِ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ اِهْلَاكُهُمْ مِنْ مَّسٰكِنِهِمْ قف بِالْحِجْرِ وَالْيَمَنِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِىْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ سَبِيْلِ الْحَقِّ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ . ذَوِىْ بَصَائِرَ .

৩৮. এবং আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ ও ছামূদকে এ শব্দ দুটি غَيْرُ مُنْصَرِفْ এবং مُنْصَرِفْ উভয়ই হতে পারে। اَلْحَىُّ অর্থে হলে مُنْصَرِفْ হবে, আর اَلْقَبِيْلَةْ অর্থে হলে غَيْرُ مُنْصَرِفْ হবে। তাদের বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিজর এবং ইয়েমেনে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল কুফর ও অবাধ্যাচরণকে এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। অভিজ্ঞ।

٣٩. وَ اَهْلَكْنَا قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ قف وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ج فَائِتِيْنَ عَذَابَنَا .

৩৯. এবং আমি সংহার করছিলাম কারূন, ফেরাউন ও হামানকে, তাদের নিকট এসেছিলেন হযরত মুসা (আ.) ইতিপূর্বে, সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ। তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।

অনুবাদ :

٤٠. فَكُلًّا مِنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ ج فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ج رِيْحًا عَاصِفًا فِيْهَا حَصْبَاءُ كَقَوْمِ لُوْطٍ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ج كَثَمُوْدَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ج كَقَارُوْنَ وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا ج كَقَوْمِ نُوْحٍ وَفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَيُعَذِّبَهُمْ بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِارْتِكَابِ الذَّنْبِ .

৪০. তাদের প্রত্যেককেই উল্লিখিতদের মধ্য হতে আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা অর্থাৎ ঝঞ্ঝা বায়ু যাতে ছিল কঙ্কর। যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর। তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ যেমন ছামূদ সম্প্রদায়ের উপর। কাউকেও আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে যেমন কারূন এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত যেমন নূহ সম্প্রদায় এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি যার ফলে তিনি তাদেরকে কোনো অপরাধ ছাড়াই শাস্তি দিবেন। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

٤١. مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ اَىْ اَصْنَامًا يَرْجُوْنَ نَفْعَهَا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط لِنَفْسِهَا تَاْوِىْ اِلَيْهِ وَاِنَّ اَوْهَنَ اَضْعَفَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ـ لَا يَدْفَعُ عَنْهَا حَرًّا وَلَا بَرْدًا كَذٰلِكَ الْاَصْنَامُ لَا تَنْفَعُ عَابِدِيْهَا لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا عَبَدُوْهَا .

৪১. যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে; যাদের থেকে কল্যাণ ও উপকারের আশা পোষণ করে থাকে। তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় যাতে সে অবস্থান করবে, এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম। সেই ঘর তো তার থেকে গরম ও ঠাণ্ডা কোনো কিছুকেই প্রতিরোধ করতে পারে না। অনুরূপভাবে মূর্তিগুলোও, সে তার উপাসকদেরকে কেনো ধবনেরই উপকার করতে সক্ষম হবে না। যদি তারা জানত। এ ব্যাপারে, তবে তারা মূর্তির উপাসনা করত না।

٤٢. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا بِمَعْنَى الَّذِىْ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ دُوْنِهٖ غَيْرِهٖ مِنْ شَىْءٍ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ .

৪২. তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে আহবান করে, আল্লাহ তো তা জানেন مَا শব্দটি اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহৃত। আর يَدْعُوْنَ শব্দটি يَاءْ এবং تَاءْ উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। তিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজত্বে প্রজ্ঞাময় স্বীয় কাজ-কর্মে।

অনুবাদ :

٤٣. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ فِى الْقُرْاٰنِ نَضْرِبُهَا نَجْعَلُهَا لِلنَّاسِ ج وَمَا يَعْقِلُهَا اَىْ يَفْهَمُهَا اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ الْمُتَدَبِّرُوْنَ.

৪৩. এ সকল দৃষ্টান্ত কুরআনে আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গই এটা বুঝে।

٤٤. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط اَىْ مُحِقًّا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً دَلَالَةً عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ. خُصُّوْا بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِهَا فِى الْاِيْمَانِ بِخِلَافِ الْكَافِرِيْنَ.

৪৪. আল্লাহ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতার উপর দিকনির্দেশনা। মুমিনদের জন্য। মুমিনদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো এ দলিল প্রমাণ দ্বারা মুমিনগণই উপকৃত হন। কাফেরদের বিপরীতে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ : সুরা হূদের মধ্যে দু'টি বিষয়ের সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদ এবং লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সংবাদ। কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) এখানে একটিকেই উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেন পূর্বের বিস্তারিত বিবরণের কারণে اِجْمَالْ -এর উপর নির্ভর করেছেন। জামালাইন গ্রন্থকারের মতে, بَعْدَهٗ -এর পরিবর্তে ব্যাখ্যাকার যদি وَلَدَهٗ বলতেন, তবে তা অধিক উপযুক্ত হতো। কেননা হযরত ইয়াকূব (আ.) হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র। بَعْدَهٗ -এর যমীর হযরত ইসহাক (আ.)-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত ইসহাক (আ.)-এর পরে হযরত ইয়াকূত (আ.)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা এ ধারণা হতে পারে যে, হযরত ইয়াকূব (আ.)ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র। অথচ হযরত ইয়াকূব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পৌত্র ছিলেন।

قَوْلُهُ قَرْيَةِ لُوْطٍ : এই জনপদের নাম ছিল 'সাযূম'। –[জুমাল]

কারো কারো মতে এর নাম ছিল 'সাদূম। এটা ছিল লূত সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় স্থান। হযরত লূত (আ.) এখানেই অবস্থান করতেন।

قَوْلُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ : এর অর্থ হলো– فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ الْاَزَلِىْ

قَوْلُهُ سِيْئَ بِهِمْ : এর তাফসীর حَزِنَ بِسَبَبِهِمْ দ্বারা করে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, سِيْئَ -এর যমীরের مَرْجِعْ হলেন হযরত লূত (আ.)। আল্লামা কাজী বায়যাভী (র.) سِيْئَ -এর যমীরের مَرْجِعْ নির্ধারণ করেছেন مَسَاءَةٌ মাসদারকে। অর্থাৎ– جَاءَتِ الْمَسَاءَةُ بِهِمْ ; কিন্তু ব্যাখ্যাকার (র.) প্রথম মতটিকে গ্রহণ করেছেন এবং সাথে সাথে এ বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, بِهِمْ -এর بَاءْ টি سَبَبِيَّهْ

قَوْلُهُ صَدْرًا : ذَرْعًا -এর তাফসীর صَدْرًا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, حَاصِلْ مَعْنٰى -এর মাধ্যমে এই তাফসীর করা হয়েছে। অন্যথায় ذَرْعًا -এর অর্থ হলো- শক্তি ও বল। আর ذَرْعًا টা ضَاقَ -এর নিসবতে تَمْيِيْزْ হয়েছে। যা فَاعِلْ থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। মূল ইবারত হলো– ضَاقَ اَمْرُهٗ بِهِمْ

قَوْلُهُ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ : لِقَوْمٍ-এর সম্পর্ক হয়তো تَرَكْنَا-এর সাথে হবে অথবা بِاٰيَةٍ-এর সাথে হবে অথবা بَيِّنَةٍ-এর সাথে হবে। আর এ তিনটির মাঝে তৃতীয়টি অধিক স্পষ্ট।

قَوْلُهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ : رَجَاءٌ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হলো আশা-আকাঙ্ক্ষা। কারণ অধিকাংশ মুফাসসির এটাই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। এর একটি অর্থ ভয়ও রয়েছে। মুফাসসির (র.) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় করো। প্রথম সুরতে উদ্দেশ্য হবে– তোমরা পরকালের পুণ্যের আশা করো।

قَوْلُهُ مِنَ الْعَثِيِّ : এটা বাবে سَمِعَ ও نَصَرَ হতে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো– বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

قَوْلُهُ مُفْسِدِيْنَ : এটা لَا تَعْثَوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ হয়েছে। কেননা عَثِيَ অর্থ হলো اَفْسَدَ; যেন এটা اَبُوْكَ عَطُوْفًا-এর মতো।

قَوْلُهُ الرَّجْفَةُ : এর অর্থ হলো ভীষণ কম্পন। সূরা হূদে রয়েছে– فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ; এই উভয়টির মধ্যে কোনো দূরত্ব ও পার্থক্য নেই। অথচ ঘটনা একই। অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.)-এর চিৎকারের কারণে সম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং কম্পনের কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এক স্থানে ধ্বংস হওয়ার সম্পর্ক سَبَبْ তথা صَيْحَةٌ-এর দিকে করা হয়েছে। অন্যত্র مُسَبَّبْ তথা رَجْفَةٌ-এর দিকে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالصَّرْفِ وَتَرْكِهِ : এ উভয়টির সম্পর্ক শুধুমাত্র ثَمُوْد-এর সাথে হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْحَجَرِ : এটা একটি উপত্যকার নাম। যা মদীনা ও সিরিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত। এটা ছামূদ সম্প্রদায়ের জনপদ ছিল। আর ইয়েমেনে আদ সম্প্রদায়ের আবাস ছিল। এই উভয় সম্প্রদায়ই আল্লাহর আজাবে নিপতিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ ذَوِىْ بَصَائِرُ : এর অর্থ– অভিজ্ঞ, জ্ঞানী। অর্থাৎ তারা কোনো পাগল বা মাতাল নয়। পার্থিব কাজ-কর্মে তারা খুবই হুশিয়ার ছিল। তারা যদি ইচ্ছা করত তবে পরকালীন বিষয়েও স্বীয় জ্ঞান গরিমা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা কাজ করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু পার্থিব লোভ ও সাম্প্রদায়িকতা তাদেরকে নির্বোধ বানিয়ে রেখে ছিল।

قَوْلُهُ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ : এখানে কারূনকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মন্দচারিতা ও অহঙ্কারের ক্ষেত্রে ফেরাউন কারূন থেকেও এগিয়ে ছিল। যেহেতু কারূন হযরত মূসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই হওয়ার কারণে এক ধরনের মর্যাদার অধিকারী ছিল। এ কারণেই কারূনকে ফেরাউনের অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْعَنْكَبُوْتَ : بَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ দ্বারা মাকড়সার জাল উদ্দেশ্য। মাকড়সা কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। এখানে সেই মাকড়সা উদ্দেশ্য, যারা সাধারণত মানুষের বসত ঘরে জাল বুনে। এরা খুবই অল্পতুষ্টে সন্তুষ্ট প্রাণী, স্বীয় নির্মিত জালে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বসে থাকে, এ কারণেই খুবই লোভী প্রাণী যথা মাছিকে তার খাদ্য বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা তাদের জালে আটকে গিয়ে তাদের খাদ্যে পরিণত হয়। عَنْكَبُوْتٌ শব্দটিতে نُوْنٌ হলো আসলী নূন এবং وَاوْ আর تَاءٌ হলো অতিরিক্ত। এ কারণেই এর বহুবচন عَنَاكِبُ আসে আর تَصْغِيْر হলো عُنَيْكِيْبٌ; এটা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন এবং পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ সকলের উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে স্ত্রীলিঙ্গে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مَا عَبَدُوْهَا : এটা لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-এর جَزَاءٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا بِمَعْنَى الَّذِىْ : এটা হলো يَعْلَمُ-এর মাফঊল। অর্থাৎ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَهُمْ আবার কেউ কেউ مَا-কে اِسْتِفْهَامِيَّةٌ تَوْبِيْخِيَّةٌ-ও বলেছেন। এ সুরতে يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ বাক্যটি এবং وَهُوَ এটা اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-এর মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হবে।

قَوْلُهُ مُحِقًّا : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, بِالْحَقِّ-এর মধ্যকার بَاء টা جَارْ مَجْرُوْرْ مُلَابَسَتْ-এর জন্য হয়েছে এবং এটা اَللّٰهُ শব্দ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ– مُحِقًّا غَيْرُ قَاصِدٍ بِهٖ بَاطِلاً

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْئَ بِهِمْ : আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে কথা বলার পর প্রিয়দর্শন আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট নওজোয়ানের আকৃতি ধারণ করে লূত (আ.)-এর নিকট হাজির হয়। হযরত লূত (আ.) প্রথমে তাদেরকে চিনতে পারেননি, তাই তাদেরকে দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। কেননা যদি সমাগত মেহমানদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে দেন, তবে কাফেররা খবর পেয়ে হাজির হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেবে, আর যদি তাদেরকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে না দেন তবুও কাফেররা তাদের পেছনে পড়বে এবং তাদের চরম কষ্টের কারণ হবে। কেননা তাঁর জাতির ঘৃণ্য আচরণ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। হযরত লূত (আ.)-এর এ ব্যাকুলতা দেখে ফেরেশতাগণ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন- لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ অর্থাৎ "আপনি করবেন না, চিন্তিতও হবেন না; নিশ্চয় আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তবে আপনার স্ত্রী রক্ষা পাবে না, কেননা সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী যদিও মন্দ কাজে অংশীদার ছিল না, কিন্তু অন্যায়কারীদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল, আর সে তাদের প্রতি রাজি ছিল, তাই সে কোপগ্রস্ত লোকদের সাথেই থাকবে।

যাহোক, ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমাদের ব্যাপারে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা আমরা মানুষ নই, ফেরেশতা।

قَوْلُهُ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ : অর্থাৎ আমরা এ জনপদবাসীর প্রতি আসমান থেকে বিশেষ আজাব অবতরণের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। এতএব, আমাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করার কোনো কারণ নেই যে, কাফেররা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। কেননা তাদের অন্যায় অনাচারের শাস্তি দেওয়ার জন্যে তথা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যেই আমরা হাজির হয়েছি।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, رِجْز-এর অর্থ হলো জমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া, জমিনকে উল্টিয়ে দেওয়া, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করা প্রভৃতি। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ.) 'সাদুম' নামক জনপদটিকে পৃথিবী থেকে উপরে তুলে আসমান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে ফেলে দিলেন। আল্লাহ পাক এভাবে এ দুরাত্মা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন। তারা চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হলো আর তাদের প্রতি পাথরও বর্ষণ করা হয়েছিল। যে আজাবকে তারা অনেক দূরে মনে করতো তা তাদের প্রতি আপতিত হলো।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ : বস্তুত যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধানকে উপেক্ষা করে, তাদের পরিণাম এভাবেই শোচনীয় হয়। এ পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী, বাস্তববাদী এবং কল্যাণকামী তারা এমনি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। অনাগত ভবিষ্যতের বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এ ঘটনাটি হয়েছে অত্যন্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আ.) বলেছেন, এর অর্থ হলো লূত সম্প্রদায়ের সেই বিরাট জনপদটি বিশ্ববাসীর জন্যে হয়েছে শিক্ষণীয়, আর আলোচ্য আয়াতে এগুলোকেই اٰيَةً بَيِّنَةً তথা 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' বলা হয়েছে।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলতে সেই পাথরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আকাশ থেকে তাদের প্রতি বর্ষণ করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক এ পাথরগুলোকে অনেক দিন রেখে দিয়েছিলেন, উম্মতে মুহাম্মদীর প্রথম যুগে অনেক লোকই সেগুলো দেখেছিলেন।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শন বলে জমিনের অভ্যন্তর থেকে যে কালো রং এর পানি বের হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, দুরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসের এ ঘটনা সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাই এটি হলো 'সুস্পষ্ট নিদর্শন।'

قَوْلُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ : হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনার পর এ আয়াত থেকে হযরত শুয়াইব (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এক পুত্রের নাম ছিল মাদইয়ান, তাঁর নামেই এ শহরটির নামকরণ করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাতুরা নাম্নী স্ত্রীর ঘরে মাদইয়ানের জন্ম। হযরত শুয়াইব (আ.) তাঁরই সন্তানদের অন্যতম। আল্লাহ পাক হযরত শুয়াইব (আ.)-কে মাদয়ান এলাকায় নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। এই শহরের অধিবাসীরা মূর্তি পূজা করতো, কিয়ামতের কথা বিশ্বাস করতো না, হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে উৎপাত, উপদ্রব বা অশান্তি সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। হযরত শুয়াইব (আ.) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুগত হও, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সকলকে একত্র করবেন, তখন তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে এবং তোমাদের মন্দ কাজের জন্যে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর আখিরাতের আজাব হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর, যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয়। কিন্তু হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় মাদায়েনবাসী তাদের দৌরাত্ম্য এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রাখলো

–[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫ পৃ. ৩৬৮]

قَوْلُهُ فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মাদায়েনবাসী লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত শুয়াইব (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগী করার, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাঁর উপদেশ সত্ত্বেও তারা অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি নাজিল হয়। ভূমিকম্প এসে তাদেরকে নিপাত করে। রাত্রি শেষ হওয়াব পূর্বেই তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এ অবস্থা হলো তাদের, যারা ধরাকে সরা মনে করতো, যারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যা জ্ঞান করতো, আল্লাহর বিধান অমান্য করতো।

قَوْلُهُ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِيْنَ : اِسْتِبْصَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– চক্ষুষ্মানতা। مُسْتَبْصِرٌ-এর অর্থ চক্ষুষ্মান। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শিরক করে করে আজাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উন্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুঁশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকি বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বুঝেনি যে, সৎ ও অসতের পুরস্কার এবং শাস্তির কোনো দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালিম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং মজলুম বিপদগ্রস্ত ও কোণঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কিয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

সূরা রুমেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হবে। সেখানকার আয়াতটি হচ্ছে– يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং তাকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্থিব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

قَوْلُهُ فَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ : মাকড়সাকে عَنْكَبُوْت বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোনো কোনো মাকড়সা মাটিতে বাসস্থান তৈরি করে। বাহ্যত এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সেই মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরি করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলা

বাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেত পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জালসদৃশ, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনিভাবে যারা কোনো প্রতিমা অথবা কোনো মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা : মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিষ্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেওয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব বাগদাদী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়্যা (র.) হযরত আলী (রা.) থেকেই বর্ণনা করেন যে- طَهِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ مِنْ نَسْجِ الْعَنْكَبُوْتِ فَاِنَّ تَرْكَهُ يُوْرِثُ الْفَقْرَ অর্থাৎ মাকড়সার জাল থেকে তোমাদের গৃহ পরিষ্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে এতে সংসারে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়ায়েতের সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়াতের সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখ। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ : মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপাস্যদের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তাওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করেন। অন্যরা চিন্তাভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় না।

আল্লাহর কাছে আলেম কে? ইমাম বগভী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাঁর ইবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বুঝে নিলেই কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কুরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকে আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝেন।

হযরত আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোনো আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা আল্লাহ বলেছেন- تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ -[ইবনে কাসীর]

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٥. اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط شَرْعًا اَىْ مِنْ شَاْنِهَا ذٰلِكَ مَادَامَ الْمَرْءُ فِيْهَا وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط مِنْ غَيْرِهٖ مِنَ الطَّاعَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

৪৫. আপনি আপনার প্রতি ওহী মারফত প্রেরিত কিতাব কুরআন পাঠ করুন এবং নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও শরিয়ত মতে গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। অর্থাৎ মানুষ যতক্ষণ নামাজে মগ্ন থাকবে ততক্ষণ নামাজের বৈশিষ্ট্য হলো এই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। অতএব তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় দিবেন।

٤٦. وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ اَىْ بِالْمُجَادَلَةِ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ كَالدُّعَاءِ اِلَى اللّٰهِ بِاٰيَاتِهٖ وَالتَّنْبِيْهِ عَلٰى حُجَجِهٖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ بِاَنْ حَارَبُوْا وَاَبَوْا اَنْ يَقِرُّوْا بِالْجِزْيَةِ فَجَادِلُوْهُمْ بِالسَّيْفِ حَتّٰى يُسْلِمُوْا اَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَقُوْلُوْٓا لِمَنْ قَبِلَ الْاِقْرَارَ بِالْجِزْيَةِ اِذَا اَخْبَرُوْكُمْ بِشَىْءٍ مِمَّا فِىْ كُتُبِهِمْ اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَلَا تُصَدِّقُوْا هُمْ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ فِىْ ذَالِكَ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ مُطِيْعُوْنَ .

৪৬. তোমরা কিতাবীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবেনা কিন্তু উত্তম পন্থায় অর্থাৎ এমন তর্ক-বিতর্ক যা উত্তম যেমন, আল্লাহর দিকে তার নিদর্শনের মাধ্যমে আহ্বান করা ও তার প্রমাণাদির উপর অবগত করা। তবে তাদের সাথে নয় যারা তাদের মধ্যে অত্যাচার করে যুদ্ধের মাধ্যমে ও তারা জিযিয়া আদায়ে অস্বীকার করে অতঃপর তোমরা তাদেরকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা কর যতক্ষণ তারা ইসলাম গ্রহণ না করে বা কর আদায় না করে এবং বল তাদেরকে যারা কর আদায় করতে সম্মতি দিয়েছে যখন তারা তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিবে যা তাদের কিতাবে আছে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি তার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা নাজিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি এবং তাদের এই সংবাদের প্রতি তোমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাস কোনোটাই রেখনা এবং আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তারই আজ্ঞাবহ অনুগত।

٤٧. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ط الْقُرْاٰنَ اَىْ كَمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِمُ التَّوْرٰىةَ وَغَيْرَهَا فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ .

৪৭. এভাবেই আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব কুরআন অর্থাৎ যেমন, আমি অবতীর্ণ করেছি তাদের প্রতি তাওরাত ও অন্যান্য কিতাব অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব তাওরাত দিয়েছিলাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهٖ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ج بِالْقُرْاٰنِ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ بَعْدَ ظُهُوْرِهَا اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ وَظَهَرَ لَهُمْ اَنَّ الْقُرْاٰنَ حَقٌّ وَّالْجَائِىْ بِهٖ مُحِقٌّ وَجَحَدُوْا ذٰلِكَ ـ

যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও অন্যান্য তারা তার প্রতি কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদেরও মক্কাবাসীদেরও অনেকে এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রকাশ হওয়ার পর অস্বীকার করে না কেবল কাফেররাই অর্থাৎ ইহুদিগণ এবং তাদের নিকট স্পষ্ট প্রকাশ হলো যে, কুরআন সত্য এবং তার বাহকও সত্য তা সত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার করেছে।

٤٨. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ اَىِ الْقُرْاٰنِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا اَىْ لَوْ كُنْتَ قَارِئًا كَاتِبًا لَّارْتَابَ شَكَّ الْمُبْطِلُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ فِيْكَ وَقَالُوا الَّذِىْ فِى التَّوْرٰىةِ اِنَّهٗ اُمِّىٌّ لَا يَقْرَاُ وَلَا يَكْتُبُ ـ

৪৮. আপনি তো এর কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি। এবং স্বীয় হাত দ্বারা কোনো কিতাব লিখেননি যদি আপনি লিখা ও পড়া জানতেন তাহলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করতো। ইহুদিগণ আপনার প্রতি এবং তারা বলতো তাওরাতে যার উল্লেখ রয়েছে তিনি উম্মি তথা মূর্খ হবেন লিখা ও পড়া কিছু জানবেন না।

٤٩. بَلْ هُوَ اَىِ الْقُرْاٰنُ الَّذِىْ جِئْتَ بِهٖ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ط اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَحْفَظُوْنَهٗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ الْيَهُوْدُ وَجَحَدُوْهَا بَعْدَ ظُهُوْرِهَا لَهُمْ ـ

৪৯. বরং তা কুরআন যা আপনি নিয়ে এসেছেন স্পষ্ট আয়াত তাদের অন্তরে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুমিনদের অন্তরে তারা তা সংরক্ষণ করে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে না কিন্তু জালেমগণ। ইহুদিগণ তাদের নিকট তা স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা তা অস্বীকার করে।

٥٠. وَقَالُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ لَوْلَا هَلَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ اٰيَاتٌ كَنَاقَةِ صَالِحٍ وَعَصَا مُوْسٰى وَمَائِدَةِ عِيْسٰى قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط يُنَزِّلُهَا كَمَا يَشَاءُ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ مُظْهِرٌ اِنْذَارِىْ بِالنَّارِ اَهْلَ الْمَعْصِيَةِ ـ

৫০. তারা মক্কার কাফেরগণ বলে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না কেন? অন্য কেরাতে اٰيَاتٌ যেমন হযরত সালেহ (আ.) -এর উটনি ও হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি ও হযরত ঈসা (আ.)-এর দস্তরখান ইত্যাদি আপনি বলুন, নিশ্চয়ই নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন তিনি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি অবতীর্ণ করেন আমি তো একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। আমার সতর্কতা জাহান্নামের গুনাহগারদের প্রতি।

٥١. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ فِيْمَا طَلَبُوْهُ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ط فَهُوَ اٰيَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لَا انْقِضَاءَ لَهَا بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْاٰيَاتِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْكِتَابِ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى عِظَةً لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

৫১. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে যে বিষয়ে তারা তালাশ করেছে আমি আপনার প্রতি কিতাব কুরআন নাজিল করেছি যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। তা একটি স্থায়ী নিদর্শন যা কখনো বিলুপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে অন্যান্য আয়াতসমূহ যা উল্লেখ করা হয়েছে নিশ্চয়ই এই কিতাবে রয়েছে রহমত ও উপদেশ বিশ্বাসী লোকদের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ : হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনাকে যদি স্বীয় সম্প্রদায়ের ধর্মহীনতার কারণে আফসোস ও চিন্তাক্লিষ্ট করে তবে আপনি কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকুন। ফলে আপনি একথা জেনে সান্ত্বনা পাবেন যে, হযরত নূহ (আ.) হযরত লূত (আ.) সহ অন্যান্য নবীগণের এ অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল যেমনটি সম্মুখীন আপনি হচ্ছেন। এতদ সত্ত্বেও তারা দাওয়াতি কাজ ও প্রমাণ উপস্থাপনে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও স্বীয় সম্প্রদায়কে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা হতে মুক্তি দিতে অক্ষম হননি। যখন আপনি কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উল্লিখিত নবীগণের অবস্থা জ্ঞাত হবেন তখন আপনার এক ধরনের সান্ত্বনা মিলবে।

قَوْلُهُ اَلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ : فُحْش এমন মন্দকর্মকে বলে যাকে সমাজে খারাপ মনে করা হয়। সে ব্যাপারে শরিয়তের বিধান থাক বা না থাক। আর مُنْكَرٌ এমন মন্দকর্মকে বলা হয় যাকে শরিয়ত খারাপ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সমাজের প্রচলিত রীতি তাকে ভালো মনে করলেও।

قَوْلُهُ مَادَامَ الْمَرْءُ فِيْهَا : এটা একটা উক্তি মাত্র। অন্যথা বিশুদ্ধ কথা হলো অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা নামাজের বৈশিষ্ট্য। তবে শর্ত হলো নামাজের শর্তাবলি ও আদবসহ পাবন্দির সাথে নামাজ আদায় করতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি পাবন্দির সাথে নামাজ আদায় করা সত্ত্বেও অশ্লীলতা থেকে বিরত না হয় তবে বুঝে নিবে যে, তার নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি রয়েছে; নামাজের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ : এটা কলমের ভ্রান্তি মাত্র। কেননা এ সূরাটি হলো মাক্কী সূরা। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কাজেই এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর উপমা পেশ করা ঠিক হয়নি। হ্যা, তবে এটা সম্ভব যে আল্লাহ তা'আলা اِخْبَارٌ بِالْغَيْبِ-এর ভিত্তিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর ঈমান গ্রহণের সংবাদ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ مِنْ كِتَابٍ : كِتَابٌ টা تَتْلُوْ-এর মাফউল, আর مِنْ হলো অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ لَوْ كُنْتَ قَارِئًا كَاتِبًا : এটা لَفّ نَشر مُرَتَّبْ-এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ اَلْيَهُوْدُ : مُبْطِلُوْنَ-এর তাফসীরে ইহুদিদের নির্দিষ্ট করা সমীচীন হয়নি। কেননা খ্রিস্টানদেরও এ অবস্থাই ছিল। কাজেই যদি يَهُوْد-এর পরিবর্তে كَالْيَهُوْدِ বলতেন তবে বেশি সমীচীন হতো, যাতে করে ইহুদিরা ছাড়া প্রত্যেক কুরআন অস্বীকারকারী এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

قَوْلُهُ اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ : হামযাটা উহ্যের উপর প্রবেশ করেছে এবং وَاوٌ টা হলো عَاطِفَه আর يَكْفِهِمْ-এর عَطْف উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اِسْتِفْهَام تَوْبِيْخِيْ اَجَهِلُوْا وَلَمْ يَكْفِهِمْ আর এটা হলো

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْزَلْنَا : اَنَّ এবং যার উপর اَنَّ প্রবেশ করে তা মাসদারের তাবীলে হয়ে থাকে এবং يَكْف-এর فَاعِلٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اِنْزَالُنَا

Free@www.eilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক :

قَوْلُهُ اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধত কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন আজাবের বর্ণনা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের জন্য সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধী দলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোনো অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংরক্ষিত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এ পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধাবিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দুটি অংশ আছে, কুরআন তেলাওয়াত করা ও নামাজ কায়েম করা। উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্য উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাজকে অন্যান্য ফরজ কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্য বর্ণিত ও হয়েছে যে, নামাজ স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে, নামাজ তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فَحْشَاءُ শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দকাজ, যাকে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে। যেমন– ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে مُنْكَرٌ এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তবিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকহবিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোনো এক দিককে مُنْكَرٌ বলা যায় না। فَحْشَاءُ ও مُنْكَرٌ শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ দাখিল হয়ে গেছে, যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামাজ যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ : একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাজের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে সে গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে। তবে শর্ত এই যে, শুধু নামাজ পড়লে চলবে না; বরং কুরআনের ভাষা অনুযায়ী اِقَامَتْ صَلٰوةِ হতে হবে। اِقَامَتْ -এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোনো একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اِقَامَتْ صَلٰوةِ -এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামাজ আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামাজ আদায় করা অর্থাৎ শরীর, পরিধানবস্ত্র ও নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়া এবং নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্দরভাবে সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ কায়েম করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তাওফীকপ্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজ পড়া সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাজের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইরমান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ এ আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন– مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে তার নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামাজ কিছুই নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নামাজের আনুগত্য করে না, তার নামাজ কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাই নামাজের আনুগত্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, যার নামাজ তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামাজ তাকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইবনে কাছীর উপরিউক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে তারা এসব উক্তি করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামাজ তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।

–[ইবনে কাছীর]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জবাব : এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাজের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয় কি?

এর জবাব কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামাজ নামাজিকে গুনাহ করতে বাধা প্রদান করে। কিন্তু কাউকে কোনো কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরি নয়। কুরআন হাদীস ও যেসব মানুষকে গুনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই গুনাহ করতে থাকে। তাফসীরের সারসংক্ষেপে এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, নামাজের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাজের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিকপ্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তৌফিক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাজে কোনো ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামাজ কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ : অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে আল্লাহর স্মরণ -এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাজে অথবা নামাজের বাইরে আল্লাহকে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশে স্মরণ করেন। فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ আল্লাহর এ স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামাজ পড়ার মধ্যে গুনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হলো আল্লাহ স্বয়ং নামাজির দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গুনাহ থেকে মুক্তি পায়।

قَوْلُهُ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا : অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক কর। উদাহরণত কঠোর কথাবার্তার জবাব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জবাব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জবাব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا : কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে– তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবিলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জবাব দেওয়া জায়েজ। যদিও তখনও তাদের অসদাচারণের জবাব অসদাচরণ না করা এবং জুলুমের জবাব জুলুম না করাই শ্রেয়। যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ অর্থাৎ তোরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে। কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্কবিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নাহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য যাতে বলা হয়েছে– আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোনো অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে– قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্কবিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্য তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গাম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সাথে বিরোধিতার কোনো কারণ নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে **বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি?** এ আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা এসব কিতাবে যা কিছু নাজিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরি হয় না যে, বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তু প্রতি, যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই : সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন কিতাবধারীরা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করতো এবং মুসলমানদেরকে আরবি অনুবাদ শুনাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদীও বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং এ কথা বল- اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গাম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তাফসীরগ্রন্থসমূহে তাফসীরকারগণ কিতাবধারীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোনো কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

قَوْلُهٗ مَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ :
অর্থাৎ আপনি কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোনো কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন উম্মী। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্য অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কুরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়।

নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি বড় শ্রেষ্ঠত্ব ও বড় মোজেজা : আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্য যেসব সুস্পষ্ট মোজেজা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোনো কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এ অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোনো সময় কিতাবধারীদের সাথেও মেলামেশা করেন নি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ মক্কায় কোনো কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে, যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে যেমন ছিল মোজেজা তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোনো কোনো আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথম দিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়াশিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তাঁরা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন, যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রাসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাজা (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ লিখে দিলেন।

এ রেওয়ায়েতে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে লিখে দিয়েছেন' বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও "সে লিখেছে" বলা হয়ে থাকে। এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এ ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মোজেজা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামাজের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষরতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখা জানতেন- বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٥٢. قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ج بِصِدْقِىْ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمِنْهُ حَالِىْ وَحَالُكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَهُوَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ مِنْكُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ فِىْ صَفْقَتِهِمْ حَيْثُ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ .

٥٣. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّهٗ لَجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ط عَاجِلًا وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ اِتْيَانِهٖ .

٥٤. يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ط فِى الدُّنْيَا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ .

٥٥. يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ فِيْهِ بِالنُّوْنِ اَىْ نَاْمُرُ بِالْقَوْلِ وَبِالْيَاءِ اَىْ يَقُوْلُ الْمُوَكَّلُ بِالْعَذَابِ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاءَهٗ فَلَا تَفُوْتُوْنَنَا .

٥٦. يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ فِىْ اَىِّ اَرْضٍ تَيَسَّرَتْ فِيْهَا الْعِبَادَةُ بِاَنْ تُهَاجِرُوْا اِلَيْهَا مِنْ اَرْضٍ لَمْ تَتَيَسَّرْ فِيْهَا نَزَلَ فِىْ ضُعَفَاءِ مُسْلِمِىْ مَكَّةَ كَانُوْا فِىْ ضَيْقٍ مِنْ اِظْهَارِ الْاِسْلَامِ بِهَا .

অনুবাদ :

৫২. বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আমার সত্যবাদীতার উপর আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে এবং তিনি আমার ও তোমাদের অবস্থা জানেন। আর যারা মিথ্যায় এবং তা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর অর্চনা করা হয় বিশ্বাস করে এবং তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর কুফরি করে তারাই তাদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত কেননা তারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে খরিদ করেছে।

৫৩. তারা আপনাকে আজাব দ্রুত করতে বলে। যদি আজাবের সময় নির্ধারিত না থাকত তবে আজাব তাদের এসে যেত দ্রুত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আজাব এসে যাবে এবং তাদের এর আগমনের সময় সম্পর্কে খবরও থাকবে না।

৫৪. তারা আপনাকে দুনিয়াতে আজাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ঘেরাও করেছে।

৫৫. যেদিন আজাব তাদেরকে ঘেরাও করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে আজাবের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ বললেন, يَقُوْلُ-এর মধ্যে ن ও ى উভয়ভাবে পড়া যায় যদি ن দ্বারা نَقُوْلُ পড়া হয় তখন তার ভাবার্থ হলো, আমরা ফেরেশতাদেরকে নিম্নের উক্তি বলার নির্দেশ দেই। আর ى দ্বারা يَقُوْلُ পড়লে তার অর্থ হলো, আজাবের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ বলবেন তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। অর্থাৎ তার শাস্তি অতঃপর তোমরা আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে না।

৫৬. হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর। যে জমিনে ইবাদতের সুযোগ আছে আর যেখানে ইবাদতের সুযোগ নেই সেখান থেকে তোমরা হিজরত কর। উক্ত আয়াতটি মক্কার ঐসব দুর্বল মুসলমানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা ইসলাম ধর্ম প্রকাশ করতে বাধাগ্রস্ত ছিলেন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

٥٧. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ بَعْدَ الْبَعْثِ.

৫৭. প্রত্যেক জীবনই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা জীবিত হওয়ার পর আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُوْنَ -এর মধ্যে ى ও ت উভয়ের সংযুক্তিতে পড়া যাবে।

٥٨. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ نُنْزِلَنَّهُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ بَعْدَ النُّوْنِ مِنَ الثَّوٰى الْاِقَامَةُ وَتَعْدِيَتُهُ اِلٰى غُرَفٍ بِحَذْفِ فِيْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ مُقَدِّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا ط نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ هٰذَا الْاَجْرُ هُمْ.

৫৮. যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে অবতরণ করাব। অন্য কেরাত অনুযায়ী نُبَوِّئَنَّ -এর মধ্যে ن -এর পর ث পড়বে তখন তা اَلثَّوٰى থেকে নির্গত, যার অর্থ অবস্থান করা এবং তা غُرَفٌ -এর দিকে নিসবত হয় فِيْ -এর বিলুপ্ত হয়ে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে আমরা তাদের জন্য জান্নাতের বালাখানাতে চিরকাল থাকার নির্ধারণ করে দিয়েছি কত উত্তম এই পুরস্কার কর্মীদের পুরস্কার।

٥٩. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا عَلٰى اَذَى الْمُشْرِكِيْنَ وَالْهِجْرَةِ لِاِظْهَارِ الدِّيْنِ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُوْنَ.

৫৯. যারা ধৈর্য ধারণ করে দীন প্রকাশ করতে গিয়ে মুশরিকদের নির্যাতনের উপরও হিজরতের কষ্টের উপর ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। ফলে তিনি তাদেরকে এমনভাবে রিজিক দান করবেন যা তারা কল্পনাও করবে না।

٦٠. وَكَاَيِّنْ كَمْ مِنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لِضُعْفِهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ز اَيُّهَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ زَادٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِقَوْلِكُمْ الْعَلِيْمُ بِضَمَائِرِكُمْ.

৬০. এবং এমন অনেক জন্তু আছে যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না তাদের দুর্বলতার কারণে আল্লাহই তাদের এবং তোমাদেরকে রিজিক দেন। হে মুহাজিরগণ যদিও তোমাদের সাথে কোনো আসবাব ও অর্থ না থাকে এবং তিনি তোমাদের কথা সর্বশ্রোতা ও তোমাদের অন্তরের ভেদ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

٦١. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ اَيِ الْكُفَّارَ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنْ تَوْحِيْدِهِ بَعْدَ اِقْرَارِهِمْ بِذٰلِكَ.

৬১. যদি আপনি তাদেরকে কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন? لَئِنْ -এর মধ্যে লাম অক্ষরটি শপথের অর্থ বুঝানোর জন্য এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাহলে তারা একত্ববাদের স্বীকারের পর একত্ববাদের ধর্ম ছেড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٢. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ يُضَيِّقُ لَهٗ بَعْدَ الْبَسْطِ اَىْ لِمَنْ يَّشَاءُ اِبْتِلَاءً اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ وَمِنْهُ مَحَلُّ الْبَسْطِ وَالتَّضْيِيْقِ .

৬২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন পরীক্ষামূলকভাবে এবং প্রশস্তের পরে তার জন্যে বা যার জন্যে ইচ্ছা পরীক্ষামূলকভাবে হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। এবং সে জ্ঞাত বিষয়ে রিজিক প্রশস্ত ও হ্রাস করার বিষয়ও রয়েছে।

٦٣. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط فَكَيْفَ يُشْرِكُوْنَ بِهٖ قُلْ لَهُمْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ثُبُوْتِ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ تَنَاقُضَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ .

৬৩. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, لَئِنْ -এর মধ্যে লাম অক্ষরটি শপথের অর্থ প্রদান করে কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। অতঃপর কিভাবে তারা তাঁর সাথে শরিক করে আপনি তাদেরকে বলুন, তোমাদের কাছে প্রমাণাদি প্রমাণ হওয়ায় আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহরই কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা তাদের যুক্তির বৈপরীত্য বুঝে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ صَفْقَةُ : এর অর্থ হলো হাতের উপর হাত মারা [করমর্দন করা], তালি বাজানো, লেনদেন করা। আরবীয়দের অভ্যাস ছিল যে, বেচাকেনা পরিপূর্ণ হওয়াকে বুঝানোর জন্য بَيْع -এর শেষে পরস্পর হাত মিলাতেন। এখানে مُطْلَقًا بَيْع উদ্দেশ্য যাকে ব্যবসায়ের ভাষায় সওদা বলা হয়।

قَوْلُهٗ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ : اِيَّاىَ টা তার পূর্বে উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। পরবর্তী ফে'ল তার তাফসীর করছে। উহ্য ইবারত হবে– فَاعْبُدُوْا اِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ

قَوْلُهٗ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ : এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর تَبْوِئَة মাসদার হতে لَامِ تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة -এর جَمْع مُتَكَلِّم -এর সীগাহ। মূলবর্ণ হলো بَوْءٌ অর্থ– ঠিকানা দেওয়া, জায়গা ঠিক করা। অন্য এক কেরাতে রয়েছে لَنُثْوِيَنَّهُمْ অর্থাৎ اَلثَّوَاءُ হতে مُشْتَقّ হয়েছে। অর্থ– প্রতিষ্ঠা করা। আর দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী لَنُثْوِيَنَّهُمْ যা غُرَفًا টা مَفْعُوْل بِهٖ হবে। نُنْزِلُ টা نُثْوِى -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হবে। আর প্রথম مَفْعُوْل হলো هُمْ আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل হলো غرفا যা উহ্য فِىْ -এর সাথে হয়েছে। অর্থাৎ فِىْ غُرَفٍ مِنَ الْجَنَّةِ প্রথম কেরাতে غُرَفًا টা দ্বিতীয় مَفْعُوْل আর هُمْ হলে প্রথম মাফউল। কেননা بَوَّاَ টা مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل

আল্লাহ তা'আলা বলেন– تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ এবং কখনো لَام দ্বারাও হয় যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

قَوْلُهٗ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ : এটা বাক্য হয়ে غُرَفًا -এর صِفَتْ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এটা হলো মুবতাদা আর لَنُبَوِّئَنَّهُمْ হলো তার খবর وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب ও হতে পারে। পরবর্তী ফে'লটি যার উপর বুঝাচ্ছে। এ সুরতে এটা بَابِ اِشْتِغَالْ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, خَالِدِيْنَ টা حَال مُقَدَّرَة হয়েছে অর্থাৎ إِنَّهُمْ حِيْنَ الدُّخُوْلِ يُقَدِّرُوْنَ الْخُلُوْدَ

قَوْلُهُ هٰذَا الْأَجْرُ : এটা হলো مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ আর اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا হলো উহ্য هُمْ মুবতাদার খবর। যেমনটি ব্যাখ্যাকার প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর এটা اَلْعَامِلِيْنَ -এর সিফতও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ : كَاَيِّنْ হলো মুবতাদা مُمَيِّزْ আর مِنْ دَابَّةٍ হলো তার تَمْيِيْز আর لَا تَحْمِلُ হলো دَابَّةٍ -এর সিফত আর اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا জুমলা হয়ে كَاَيِّنْ মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থিদের পথে নানা রকম বাধাবিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্য কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধিবিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন : إِنَّ أَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ আল্লাহ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারো এ ওজর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহর জন্য সেই দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোনো স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহর নির্দেশাবলি নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত দু প্রকার আশঙ্কা ও বাধার সম্মুখীন হয়। এক. নিজের প্রাণের আশঙ্কা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এ আশঙ্কার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। হেফাজতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষত আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এ সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দু আয়াতে এর উল্লেখ আছে- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا الخ

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশঙ্কা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুজি-রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবন নির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জবাব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাসপত্রকে রিজিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই রিজিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিজিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে- وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীবজন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোনো ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীবজন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে; কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা অন্য খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্য তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পশুপক্ষী সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেতখোলা, না আছে জমি ও বিষয়সম্পত্তি। তারা কোনো কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেট-চুক্তি খাদ্য লাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপারে নয় বরং তাদের আজীবনের কর্মধারা।

রিজিকের আসল উপায় আল্লাহর দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র সূর্য কার আজ্ঞাধীন পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্ট দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জবাবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ। আপনি বলুন তাহলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরের পূজাপাটি ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোটকথা হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজসরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজসরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজসরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরজ অথবা ওয়াজিব হয়? হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসার ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধিবিধান এ সূরারই ৮৯ নং আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আল্লাহর নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরজে আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরজই নয়, মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। সূরা নিসার ৮৯ নং আয়াতে অর্থাৎ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলাম হিজরতের মর্যাদা ছিল কালেমায়ে শাহাদাতের অনুরূপ। এই কালেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরিউক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার ৯৮ নং আয়াতে তথা إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ থেকে فَأُولٰۤئِكَ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরিউক্ত আদেশ রহিত হয়ে যায়। কারণ তখন মক্কা স্বয়ং দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই মর্মে আদেশ জারি করেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কুরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরজ হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকহবিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন–

মাসআলা : যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরিয়তের বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতাসম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব। তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই পাওয়া না যায়, তাহলে এমতাবস্থায় তার ওজর আইনত গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা : কোনো দারুল কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলি পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্য দারুল কুফর হওয়া জরুরি নয়, বরং 'দারুল ফিসক' [পাপাচারের দেশ] যেখানে প্রকাশ্যে শরিয়তের নির্দেশাবলি অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইবনে হজর ফতহুল বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোনো ধারাই এর পরিপন্থি নয়। মুসনাদে আহমদে আবূ ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ حَيْثُمَا اَصَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ অর্থাৎ সব নগরীই আল্লাহর নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহর বান্দা। কাজেই যেখানেই তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর। –[ইবনে কাসীর]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেন, যে শহরে ব্যাপক হারে গুনাহ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা (র.) বলেন, কোনো শহরে তোমাকে গুনাহ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٤. وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاَمَّا الْقُرَبُ فَمِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ لِظُهُوْرِ ثَمَرَتِهَا فِيْهَا وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ بِمَعْنَى الْحَيَاةِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ مَا اٰثَرُوا الدُّنْيَا عَلَيْهَا .

৬৪. এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া তো কিছুই নয় শুধুমাত্র ইবাদতসমূহ আখেরাতের কর্ম কেননা এর ফলাফল পরকালে প্রকাশ পায় এবং পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন। যদি তারা তা জানত তবে দুনিয়ার জীবনকে কখনো আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিতেন না।

٦٥. فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَىِ الدُّعَاءَ اَىْ لَا يَدْعُوْنَ مَعَهُ غَيْرَهُ لِاَنَّهُمْ فِىْ شِدَّةٍ وَلَا يَكْشِفُهَا اِلَّا هُوَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ بِهِ .

৬৫. তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহকে ডাকে তারা তার সাথে অন্য কাউকে ডাকে না কেননা তখন তারা বিপদে, তিনি ব্যতীত কেউ তাদেরকে উদ্ধার করবে না। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা শরিক করতে থাকে।

٦٦. لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِنَ النِّعْمَةِ وَلِيَتَمَتَّعُوْا نه بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلٰى عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ اللَّامِ اَمْرُ تَهْدِيْدٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ ذٰلِكَ .

৬৬. যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দেওয়া নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করে এবং তারা একত্রে মূর্তিপূজায় লিপ্ত থেকে ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। অন্য কেরাত মতে لِيَتَمَتَّعُوْا-এর মধ্যে লামকে সাকিন সহকারে পড়বে এবং এখানে সীগাহে আমরটি ধমক ও تَهْدِيْد -এর জন্য। সত্বরই তারা এর পরিণাম জানতে পারবে।

٦٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا بَلَدَهُمْ مَكَّةَ حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ط قَتْلًا وَسَبْيًا دُوْنَهُمْ اَفَبِالْبَاطِلِ الصَّنَمِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ بِاِشْرَاكِهِمْ .

৬৭. তারা কি জানে না যে, আমি তাদের শহর মক্কাকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুষ্পার্শ্বের মানুষদেরকে হত্যা ও বন্দির মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই মূর্তিই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নিয়ামত শিরকের মাধ্যমে অস্বীকার করবে?

٦٨. وَمَنْ اَظْلَمُ اَىْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِاَنْ اَشْرَكَ بِهِ اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ النَّبِىِّ اَوِ الْكِتَابِ لَمَّا جَآءَهُ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَاْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ اَىْ فِيْهَا ذٰلِكَ وَهُوَ مِنْهُمْ .

৬৮. কে বড় জালেম অর্থাৎ কোনো বড় জালেম নেই তার চেয়ে যে আল্লাহর প্রতি শিরকের মাধ্যমে মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা তার কাছে সত্য নবী বা কিতাব আসার পর তাকে অস্বীকার করে। কাফেরদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নাম নয়? এসব ব্যক্তি জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত।

٦٩. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا فِيْ حَقِّنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط اَىْ طُرُقَ السَّيْرِ اِلَيْنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْعَوْنِ.

৬৯. যারা আমার পথে শুধুমাত্র আমার জন্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে আমার দিকে আসার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের মুমিনদের সাথে আছেন সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اللَّهْوُ : দুনিয়া উপভোগে ডুবে যাওয়া। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, অহেতুক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়াকে لَهْو বলা হয়।

قَوْلُهُ حَيَوَانٌ : জিন্দেগি, জন্ম নেওয়া, এটা বাবে سَمِعَ-এর মাসদার। মূলে ছিল حَيَيَانٌ দ্বিতীয় يَاء-কে وَاوٌ দ্বারা পরিবর্তন করায় حَيَوَانٌ হয়েছে। এটি حَيَاةٌ থেকে অধিক بَلِيْغ কেননা فَعَلَانٌ-এর ওজনের মধ্যে নড়াচড়া এবং পেরেশানির অর্থ রয়েছে যা حَيَاتٌ-এর জন্য আবশ্যক। এ কারণেই এ স্থানে حَيَاةٌ-এর পরিবর্তে حَيَوَانٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ : ذٰلِكَ হলো يَعْلَمُوْنَ-এর মাফউল لَوْ হলো হরফে শর্ত। আর مَا اٰثَرُوا الدُّنْيَا عَلَيْهَا হলো জবাবে শর্ত।

قَوْلُهُ اَىِ الدُّعَاءَ : এটা অর্থ নির্দিষ্টকরণের জন্য হয়েছে। دِيْن-এর যেহেতু অনেক অর্থ রয়েছে। এখানে اَلدُّعَاءُ-এর মাধ্যমে তাফসীর করে একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ : এটা فَلَمَّا-এর জবাব। উদ্দেশ্য হলো এই যে, ডুবে যাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই শিরক আরম্ভ করে দেয়।

لِيَكْفُرُوْا-এর মধ্যে لَامْ টা হলো لَامِ كَىْ আর لِيَتَمَتَّعُوْا টা لِيَكْفُرُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে।

বি. দ্র. এ لَامْ টিকে لَامِ كَىْ-এর পরিবর্তে যদি لَامِ عَاقِبَة ধরা হয় তবে অধিক সমীচীন হতো। (جَمَلْ) এক কেরাতে لَامْ সাকিন রয়েছে। এ সুরতে এটা لَامِ اَمْر হবে উভয় ফে'লের মধ্যেই। কিন্তু এখানে এ সংশয়ের সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহর ফে'ল মন্দকর্মের আদেশ করা আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন হাকীম আর হাকীম মন্দকর্মের নির্দেশ দিতে পারেন না।

اَمْرِ تَهْدِيْد বলে এর উত্তর দিয়েছেন অর্থাৎ اَمْر দ্বারা اَمْرِ اِمْتِثَالْ উদ্দেশ্য নয়, বরং ভীতি প্রদর্শন ও ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য। আর فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ টা اَمْرِ تَهْدِيْدِىْ হওয়ার প্রমাণ।

قَوْلُهُ وَيُتَخَطَّفُ : جُمْلَة حَالِيَة-এর পূর্বে هُمْ উহ্য মুবতাদা রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَهُمْ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ الخ

قَوْلُهُ فِيْهَا ذٰلِكَ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ-এর মধ্যে هَمْزَة টি اِنْكَارْ-এর জন্য হয়েছে। আর এটা اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ এজন্য হয়েছে যে, لَيْسَ হলো حَرْف نَفِىْ যখন তার উপর هَمْزَة اِنْكَارِىْ প্রবেশ করে তখন نَفِىْ এবং نَفِىْ মিলে اِثْبَاتْ হয়ে গেল। কাজেই তাতে تَقْرِيْر-এর অর্থ সৃষ্টি হয়ে গেল। উদ্দেশ্য হলো নিঃসন্দেহে কাফেরদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তা দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরিক মনে করে না, কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জবাব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার বৈষয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তাভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এ পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ এখানে حيوان শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন। –[কুরতুবী]

এতে পার্থিব জীবনকে ক্রীড়া-কৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়া-কৌতুককের যেমন কোনো স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোনো বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিব জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরো একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহকে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এ অবস্থায় চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোনো বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং তা নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন এ আশঙ্কা দূর করার জন্য কোনো প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরিক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফেরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এ বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা সে مُضْطَرٌ তথা অসহায়। আল্লাহ তা'আলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন। –[কুরতুবী]

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফেররা আজাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا الْاٰيَة : উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তাঁর খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ তা'আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তারই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোনো কোনো মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হতো যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা অনুভব করে। কারণ সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসারশূন্য। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোনো স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে তা জুটেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হারাম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এতে খুন-খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোনো ব্যক্তি হারামে প্রবেশ করলে সেও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোড়া অজুহাত বৈ নয়।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا : جِهَادٌ-এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধাবিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানরে পক্ষ থেকে আগত বাধাবিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জিহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভালো মন্দ, সত্য অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে কোন পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা জিহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন, অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত সেই পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে : এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য যারা জিহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়েল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্য আমলও সহজ করে দেই। -[মাযহারী]

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ : সূরা রূম মক্কায় অবতীর্ণ

وَهِيَ سِتُّوْنَ اَوْ تِسْعٌ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً : ৬০ অথবা ৫৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. الٓمٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ۔

٢. غُلِبَتِ الرُّوْمُ وَهُمْ اَهْلُ كِتَابٍ غَلَبَتْهَا فَارِسُ وَلَيْسُوْا اَهْلَ كِتَابٍ بَلْ يَعْبُدُوْنَ الْاَوْثَانَ فَفَرِحَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِذٰلِكَ وَقَالُوْا لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحْنُ نَغْلِبُكُمْ كَمَا غَلَبَتْ فَارِسُ الرُّوْمَ ۔

٣. فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ اَيْ اَقْرَبِ اَرْضِ الرُّوْمِ اِلٰى فَارِسَ بِالْجَزِيْرَةِ الْتَقٰى فِيْهَا الْجَيْشَانِ وَالْبَادِيْ بِالْغَزْوِ الْفُرْسُ وَهُمْ اَيِ الرُّوْمُ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ اُضِيْفَ الْمَصْدَرُ اِلَى الْمَفْعُوْلِ اَيْ غَلَبَةِ فَارِسٍ اِيَّاهُمْ سَيَغْلِبُوْنَ فَارِسَ ۔

٤. فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ط هُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ اِلَى التِّسْعِ اَوِ الْعَشْرِ فَالْتَقَى الْجَيْشَانِ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْاِلْتِقَاءِ الْاَوَّلِ وَغَلَبَتِ الرُّوْمُ فَارِسَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ط اَيْ مِنْ قَبْلِ غَلَبِ الرُّوْمِ وَمِنْ بَعْدِهٖ الْمَعْنٰى اَنَّ غَلَبَةَ فَارِسَ اَوَّلًا وَغَلَبَةَ الرُّوْمِ ثَانِيًا بِاَمْرِ اللّٰهِ اَيْ اِرَادَتِهٖ وَيَوْمَئِذٍ اَيْ يَوْمَ تَغْلِبُ الرُّوْمُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۔

অনুবাদ :

১. আলীফ, লাম, মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত রয়েছেন।

২. রোমকরা পরাজিত হয়েছে। তারা আহলে কিতাব ছিলেন আর তাদেরকে পারসিকরা পরাজিত করেছেন এবং পারসিকরা আহলে কিতাব ছিলেন না; বরং তারা মূর্তি পূজা করত। অতএব সে সংবাাদে মক্কার কাফেরগণ আনন্দিত হয়েছে এবং তারা মুসলমানদেরকে বলল : আমরা তোমাদের উপর বিজয় হবো যেমন পারস্যরা রুমের উপর বিজয় হয়েছে।

৩. নিকটবর্তী এলাকায় অর্থাৎ রূম ভূখণ্ডের ঐ এলাকায় যা পারস্যের অনেক নিকটবর্তী যেখানে উভয়দলের সৈন্যদল মুখোমুখি হয়েছে এবং যুদ্ধের প্রারম্ভকারী পারসিকগণ এবং তারা রোমকরা তাদের পরাজয়ের পর এতে মাসদারকে মাফউল -এর দিকে ইজাফত করা হয়েছে অর্থাৎ غَلَبَةَ فَارِسٍ اِيَّاهُمْ তথা পারসিকরা তাদের উপর বিজয় হওয়ার পর অতিসত্বর তারা পারসিকদের উপর বিজয় হবেন।

৪. কয়েক বছরের মধ্যে তা তিন থেকে নয় বা দশ বছরের মধ্যে। অতঃপর প্রথম যুদ্ধের সাত বছর পর উভয় দলের পুনরায় মোকাবিলা ও মুখোমুখি হয় কিন্তু এতে রোমকরা পারসিকদের উপর বিজয় হয়েছেন। অগ্র পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। অর্থাৎ রোমকদের বিজয়ের আগে ও পরে, যার অর্থ হলো, নিশ্চয়ই পারসিকদের প্রথম বিজয় হওয়া ও রোমকদের দ্বিতীয়বারে বিজয় হওয়া সবই আল্লাহর হুকুম ও ইচ্ছায় এবং সেদিন যেদিন রোমকগণ বিজয়ী হবেন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫. بِنَصْرِ اللّٰهِ ط اِيَّاهُمْ عَلٰى فَارِسَ وَقَدْ فَرِحُوْا بِذٰلِكَ وَعَلِمُوْا بِهٖ يَوْمَ وُقُوْعِهٖ يَوْمَ بَدْرٍ بِنُزُوْلِ جِبْرَئِيْلَ بِذٰلِكَ فِيْهِ مَعَ فَرَحِهِمْ بِنَصْرِهِمْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ .

৫. আল্লাহর সাহায্যে পারসিকদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতি এবং মুসলমানগণ এতে আনন্দিত হয়েছেন। সে সাহায্য আসার প্রতি তাদের ধারণা লাভ হয়েছে বদরের দিন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ওহী আনয়নের মাধ্যমে এবং এই আনন্দ মুসলমানদের বদরের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্যের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

৬. وَعْدَ اللّٰهِ ط مَصْدَرٌ بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ وَالْاَصْلُ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ النَّصْرَ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ بِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ وَعْدَهٗ تَعَالٰى بِنَصْرِهِمْ .

৬. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে وَعْد শব্দটি মাসদার এবং فعل থেকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এর আসল হলো وَعَدَهُمُ اللّٰهُ النَّصْرَ তথা আল্লাহ তাদেরকে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক মক্কার কাফেরগণ মুমিনদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা জানে না।

৭. يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا صلے اَىْ مَعَايِشَهَا مِنَ التِّجَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ اِعَادَةُ هُمْ تَاكِيْدٌ .

৭. তারা পার্থিবজীবনের বাহ্যিক দিক অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পদ্ধতি তথা ব্যবসা, ক্ষেত, কৃষি, দালান নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। এতে هُمْ সর্বনামকে তাকীদ তথা দৃঢ়তার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

৮. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وقف لِيَرْجِعُوْا عَنْ غَفْلَتِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط لِذٰلِكَ تَفْنٰى عِنْدَ انْتِهَائِهٖ وَبَعْدَ الْبَعْثِ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ اَىْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

৮. তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, যাতে তারা তাদের উদাসীনতা থেকে ফিরে আসে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তাই নির্দিষ্ট সময়ের পর এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরে উঠবে। কিন্তু অনেক মানুষ মক্কার কাফেরগণ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। তারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।

٩. أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْأُمَمِ وَهِيَ إِهْلَاكُهُمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً كَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ حَرَثُوْهَا وَقَلَّبُوْهَا لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ وَعَمَرُوْهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط بِالْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ بِإِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ.

৯. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না অতঃপর দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের সাবেক উম্মতদেরকে কি কি হয়েছে? এবং তা তাদের নবীদের অবিশ্বাস করার কারণে ধ্বংস হওয়া তারা তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল যেমন আদ ও সামূদ গোত্র এবং তারা জমিন চাষ করতো বৃক্ষ রোপণ ও ক্ষেত করার উদ্দেশ্যে জমিন উলটপালট করতো এবং তারা তাদের মক্কার কাফেরগণের চেয়ে বেশি আবাদ করতো। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রকাশ্য দলিলাদি নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ অন্যায়ভাবে তাদের ধ্বংস করে তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি তাদের নবীদেরকে অস্বীকার করে জুলুম করেছিল।

١٠. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ أَسَاءُوا السُّوْأٰى تَانِيْثُ الْأَسْوَاءِ الْأَقْبَحِ خَبَرُ كَانَ عَلٰى رَفْعِ عَاقِبَةُ وَاسْمُ كَانَ عَلٰى نَصْبِ عَاقِبَةَ وَالْمُرَادُ بِهَا جَهَنَّمُ وَإِسَاءَتُهُمْ أَنْ أَيْ بِأَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ.

১০. অতঃপর যারা মন্দকর্ম করতো তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। اَلسُّوْاٰى শব্দটি اَسْوَاٰى -এর স্ত্রীলিঙ্গ যার অর্থ اَقْبَحُ তথা মন্দ। যদি عَاقِبَةُ -কে পেশবিশিষ্ট পড়া হয় তবে سُوْاٰى টি كَانَ -এর খবর হবে আর যদি নসববিশিষ্ট হয় তবে سُوْاٰى টি كَانَ -এর اِسْم হবে। আর এখানে মন্দ পরিণাম থেকে উদ্দেশ্য জাহান্নাম। তাদের মন্দ পরিণামের কারণ তারা আল্লাহর কুরআনের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলতো এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ غُلِبَتِ الرُّوْمُ : রোম একটি গোত্রের নাম যা তাদের সম্মানিত দাদা রূম ইবনে ঈসু ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম -এর নামে সুপ্রসিদ্ধ। ঈসু স্বীয় ভাই ইয়াকূবের সাথে তার মায়ের উদরে অবস্থান করছিল। যখন তাদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হলো তখন ঈসু হযরত ইয়াকূব (আ.)-কে বলল, আমাকে প্রথমে বের হতে দাও। যদি তুমি আমাকে প্রথমে বের হতে না দাও তবে আমি তোমার সমপর্যায়ের হয়ে বের হবো। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) দয়াপরবশ হয়ে পিছে সরে গেলেন। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) اَبُوْ الْاَنْبِيَاءِ হয়েছেন এবং ঈসু اَبُوْ الْجَبَّارِيْنَ [অবাধ্যদের গুরু] তে পরিণত হয়েছে। (جَمَل)

قَوْلُهُ الْجَزِيْرَةِ : দজলা এবং ফুরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে জাযীরা বলা হয়। এখানে 'জাযীরাতুল আরব' উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ بِالْجَزِيْرَةِ : এটা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে اَلْاَرْضِ -এর সিফত হয়েছে। অর্থাৎ

أَرْضُ الرُّوْمِ الْكَائِنَةُ بِالْجَزِيْرَةِ وَقَدْ فَرِحُوْا بِذٰلِكَ لِيْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يَوْمَ وُقُوْعِهِ يَوْمَ بَدْرٍ : এখানে يَوْمَ بَدْرٍ টা يَوْمَ وُقُوْعِهِ থেকে بَدْل হয়েছে।

قَوْلُهُ بِنُزُوْلِهٖ : এটা عَلِمُوْا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ রোমকদের বিজয় সম্পর্কে বদর যুদ্ধের দিন জানা গেছে এবং রোমীয়দের বিজয় সেদিনেই হয়েছে যেদিন মুসলমানগণ বদর রণাঙ্গনে চিরশত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। আর মুসলমান ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত এ সংবাদ জানতে পেরেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের দলিল উল্লিখিত হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা প্রিয়নবী ﷺ রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছিল। অবশেষে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বিগত সূরার শেষে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আর এ সূরায়ও ঘোষণা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয় দান করেন, এরপর সেই বিজয়ীকে আবার পরাজিতও করেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো বিজয় তার সত্যতার দলিল নয়। এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার এ জীবনে সম্মান মর্যাদা বা অপমান সবই আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্বাধীন, এ সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা কেন আজাবকে ত্বরান্বিত করতে চায় এবং মুসলমানদের সাময়িক দারিদ্র্য দেখে কেন তাদেরকে হেয় মনে করে, কেননা মুসলমানদের এখন একটি ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করছে, অথচ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের এ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত সৈনিকগণ রোমক সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের ধনসম্পদ মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসে বিতরণ করবে।

তৃতীয়ত বিগত সূরার শেষে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে হিজরত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। হিজরতের কারণে যে কষ্ট হবে, তার উপর সবর অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর বর্তমান সূরায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে, পৃথিবীতে যত পরিবর্তন হচ্ছে এবং পৃথিবীতে যত ক্ষমতা হাতবদল হচ্ছে, এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

قَوْلُهُ الٓمّٓ - غُلِبَتِ الرُّوْمُ الخ : সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী : সূরা আনকাবূতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্য উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রোম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই আল্লাহ তা'আলারই সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এ সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারো বিজয় এবং কারো পরাজয় বাহ্যত ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনো কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খ্রিস্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা ধর্মের অনেক মূলনীতি যথা পরকালে বিশ্বাস, রিসালাত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কুরআনের এ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন- تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (الاٰية) আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শামদেশের আযরুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হলো এই যে, তখনকার মতো পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমনকি তারা কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানদের আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।

-[ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম]

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর দুশমন তুই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্য বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয় তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো [বলা বাহুল্য, এটা ছিল জুয়া। কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।] একথা বলে হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনের এর জন্য بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ উষ্ট্রীর বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর (রা.) আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিকে সম্মত হলো।

-[ইবনে জারীর, তিরমিযী]

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খালফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর (রা.) তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ উষ্ট্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে উবাই যখন আশঙ্কা করল যে, হযরত আবূ বকর (রা.)ও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আব্দুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবূ বকর (রা.) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবূ ইয়া'লা ও ইবনে আসাকীর বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে- هٰذَا السُّحْتُ تَصَدَّقْ بِهٖ এটা হারাম। একে সদকা করে দাও। -[রূহুল মা'আনী]

জুয়া : কুরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে 'শয়তানি অপকর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়।

قَوْلُهٗ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ : এ আয়াতে مَيْسِرٌ ও الازلام বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা.) উবাই ইবনে খালফের সাথে যে দু-তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও একপ্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سُحْتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফিকহবিদগণ এর জবাবে বলেন, এ মাল যদিও তখন হালাল ছিল, কিন্তু জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মর্যাদার পরিপন্থি মনে করে এ মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) কখনো মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে سُحْتٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমত হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ মেনে নেওয়া হয়, তবে سُحْتٌ শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ এখানে অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে سُحْتٌ-এর অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল কুরআনে এবং ইবনে আসীর 'নিহায়া' গ্রন্থে শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকহবিদদের এই জবাব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরি যে, বাস্তবে এ মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেওয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোনো শরিয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।

قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ : অর্থাৎ যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত এখানে রোমকদের সাহায্য বুঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর, বিশেষত যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বুঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। এক. মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কুরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ রূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। দুই. তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাদের একেক অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ : অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেঁচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে– এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখন থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্য এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলা বাহুল্য, এ সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।

এবার কুরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ-এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে ظَاهِرٌ -কে نَكِرَةٌ এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না– এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় : কুরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশালী ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আজাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে শক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-বাসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সামর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়, যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কুরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ ও পরকাল চিনে, তার জন্য আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে– জীবনের লক্ষ্য বানায় না। إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا (الآية) আয়াতের অর্থ তাই।

قَوْلُهُ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ الخ : উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাম-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানায় স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোনো মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। এ কথাও বলা বাহুল্য যে, এ উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরি। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থি। এ কথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভালো অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসিখুশি জীবনযাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরি, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভালো ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। এ সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তাভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়– ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগৎ আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ এ বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে– أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়েমেনে সফর করে– এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তা দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তা দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি করত। তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আজাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে চিন্তা কর, এই আজাবে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আজাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১১. اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ اَىْ يُنْشِئُ خَلْقَ النَّاسِ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اَىْ خَلْقَهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ.

১২. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ يَسْكُتُ الْمُشْرِكُوْنَ لِاِنْقِطَاعِ حُجَّتِهِمْ.

১৩. وَلَمْ يَكُنْ اَىْ لَا يَكُوْنُ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ مِمَّنْ اَشْرَكُوْهُمْ بِاللّٰهِ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لِيَشْفَعُوْا لَهُمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا اَىْ يَكُوْنُوْنَ بِشُرَكَائِهِمْ كٰفِرِيْنَ اَىْ مُتَبَرِّئِيْنَ مِنْهُمْ.

১৪. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ تَاكِيْدٌ يَّتَفَرَّقُوْنَ اَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكَافِرُوْنَ.

১৫. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ جَنَّةٍ يُّحْبَرُوْنَ يُسَرُّوْنَ.

১৬. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ الْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ.

১৭. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ اَىْ سَبِّحُوا اللّٰهَ بِمَعْنٰى صَلُّوْا حِيْنَ تُمْسُوْنَ اَىْ تَدْخُلُوْنَ فِى الْمَسَاءِ وَفِيْهِ صَلَاتَانِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ تَدْخُلُوْنَ فِى الصَّبَاحِ وَفِيْهِ صَلٰوةُ الصُّبْحِ.

অনুবাদ :

১১. আল্লাহ তা'আলাই প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা। এরপর তোমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُوْنَ শব্দকে ت ও ى উভয়ের সাথে পড়া যাবে।

১২. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। মুশরিকগণ দলিলবিহীন হওয়ার কারণে নিশ্চুপ ও নীরব হয়ে যাবে।

১৩. তাদের দেবতাগুলোর যেসব দেবতাকে তারা আল্লাহর সাথে শরিক করতো যাতে এগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করে মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশকারী হবে না। এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। অর্থাৎ তাদের থেকে নিজেদের পবিত্রতা প্রকাশ করবে।

১৪. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরগণ বিভক্ত হয়ে পড়বে। يَوْمَئِذٍ শব্দটি পূর্বের يَوْمَ-এর তাকিদ।

১৫. যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে।

১৬. আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূহ কুরআন ও পরকালের সাক্ষাতকারকে তথা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন ও অন্যান্য মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আজাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।

১৭. অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর অর্থাৎ এতে سُبْحٰنَ اللّٰهِ টি سَبِّحُوا اللّٰهَ আদেশসূচক ফে'লের অর্থ প্রদান করবে এবং سَبِّحُوا اللّٰهَ অর্থ صَلُّوْا তথা তোমরা নামাজ পড় সন্ধ্যায় তথা যখন তোমরা বিকালের সময়ে প্রবেশ করবে তখন দুটি নামাজ মাগরিব ও ইশার নামাজ এবং সকালে যখন তোমরা সকালের সময়ে উপনীত হবে এবং তখন ফজরের নামাজ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৮. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ اِعْتِرَاضٌ وَمَعْنَاهُ يَحْمَدُهُ أَهْلُهُمَا وَعَشِيًّا عَطْفٌ عَلٰى حِيْنَ وَفِيْهِ صَلٰوةُ الْعَصْرِ وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ تَدْخُلُوْنَ فِي الظَّهِيْرَةِ وَفِيْهِ صَلٰوةُ الظُّهْرِ .

১৮. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁরই প্রশংসা এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য তথা جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ যার অর্থ হলো, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা তারই প্রশংসা করে এবং অপরাহ্নে এখানে عَشِيًّا শব্দটি حِيْنَ -এর উপর আতফ হয়েছে এবং অপরাহ্নের নামাজ পড় এবং তা আছরের নামাজ এবং যখন তোমরা মধ্যাহ্নের সময়ে উপনীত হবে। এবং তখন জোহরের নামাজ।

১৯. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ كَالْإِنْسَانِ مِنَ النُّطْفَةِ وَالطَّائِرِ مِنَ الْبَيْضَةِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ النُّطْفَةَ وَالْبَيْضَةَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ بَعْدَ مَوْتِهَا ط أَيْ يُبْسِهَا وَكَذٰلِكَ الْإِخْرَاجِ تُخْرَجُوْنَ مِنَ الْقُبُوْرِ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ .

১৯. তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন যেমন মানুষকে এক ফোটা পানি থেকে ও পক্ষিকূলকে ডিম থেকে এবং মৃতকে নুতফা ও ডিমকে জীবিত থেকে বের করেন এবং ভূমিকে শস্য দ্বারা জীবিত করেন তার মৃত্যুর শুকে যাওয়ার পর এবং এভাবে তোমরা উত্থিত হবে কবর থেকে। এখানে تَخْرُجُوْنَ সীগাহকে فِعْل مَعْرُوْف ও فِعْل مَجْهُوْل উভয় ধরনের পড়া যাবে। কিন্তু পার্থক্য হলো مَعْرُوْف -এর ক্ষেত্রে تَخْرُجُوْنَ তিন হরফবিশিষ্ট بَاب نَصَرَ থেকে হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ : এখানে تَجَدُّدْ -কে বুঝানোর জন্য مَاضِيْ -এর পরিবর্তে مُضَارِعٌ -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন। কেননা بَدَأ এবং خَلَقَ প্রতি মুহূর্তেই হতে থাকে। আর যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন تَجَدُّدْ ও হতে থাকবে يَبْدَؤُا -এর وَاوْ টি جَمْع -এর নয়; বরং مُشَابَه جَمْع হওয়ার কারণে তার শেষে اَلِفْ লেখা হয়েছে, কিন্তু এটা পড়া যায় না আর না পড়ার নিদর্শনরূপে ঐ اَلِفْ -এর উপর একটি ছোট গোল রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ يُنْشِئُ : يَبْدَأُ -এর অর্থ বর্ণনা করার জন্য يُنْشِئُ দ্বারা এর তাফসীর করা হয়েছে। এর অর্থ হলো– প্রকাশ করা, অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনা। يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এটা يُبْلِسُ -এর ظَرْف مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَكُوْنُ : لَمْ يَكُنْ -এর তাফসীর لَا يَكُوْنُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لَمْ يَكُنْ টা যদিও مَاضِيْ -এর অর্থে কিন্তু এখানে مُضَارِعْ -এর অর্থই উদ্দেশ্য। بِشُرَكَائِهِمْ এটা كَافِرِيْنَ -এর مُتَعَلِّقْ مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ يُحْبَرُوْنَ : এটা বাবে نَصَرَ -এর حَبْرٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ- তাদেরকে খুশি করা হবে, তাদেরকে সম্মানিত করা হবে।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى صَلُّوْا : سَبِّحُوْا -এর তাফসীর صَلُّوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, قَوْلِيْ . فِعْلِيْ এবং قَلْبِيْ তিন পদ্ধতিতেই তাসবীহ হয়ে থাকে। আর صلوة এ সবগুলোকেই একত্র করে থাকে। আর سُبْحٰنَ اللّٰهِ -এর তাফসীর سَبِّحُوْا سُبْحَانًا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, خَبَرْ টা اَمْرْ -এর অর্থে হয়েছে। আর سُبْحٰنَ হলো মাসদার এর পূর্বে فِعْل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ سَبِّحُوْا سُبْحَانًا

قَوْلُهُ تُمْسُوْنَ : تُمْسُوْنَ এবং تُصْبِحُوْنَ -এর তাফসীর تَدْخُلُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয়টি فِعْل تَامْ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ اِعْتِرَاضٌ : অর্থাৎ مَعْطُوْف عَلَيْه এবং مَعْطُوْف -এর মধ্যে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ : يُحْبَرُوْنَ শব্দটি حُبُوْرٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– আনন্দ, উল্লাস। জান্নাতিগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এ শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের অধীনে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তু উল্লেখ করেছেন। এগুলো সব এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ . سُبْحَانَ শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে অর্থাৎ سَبِّحُوا اللّٰهَ سُبْحَانًا حِيْنَ تُمْسُوْنَ অর্থাৎ সন্ধ্যায় حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ সকালে وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ এ বাক্যটি প্রমাণ হিসেবে মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরি। কারণ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষ ভাগে عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বলে আরো দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্নে তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামি তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে জোহরের অগ্রে রাখার এক কারণে সম্ভবত এই যে, আসরের সময় সাধারণত কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তাসবীহ অথবা নামাজ সম্পন্ন করা স্বভাবত কঠিন। এ কারণেই কুরআনে صَلٰوةِ وُسْطٰى তথা আসরের নামাজের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এ আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিবের নামাজ, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দে ফজরের নামাজ, عَشِيًّا শব্দে আসরের নামাজ এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে জোহরের নামাজ উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে ইশার নামাজের প্রমাণ আছে অর্থাৎ مِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন– حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও ইশা উভয় নামাজ ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কুরআন পাকে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে– وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى হযরত ইবরাহীম (আ.) সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবূ দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحَانَ اللّٰهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এ তিন আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়া পাঠ করে তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়ে তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেওয়া হয়।

–[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২০. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ تَعَالٰى الدَّالَّةِ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ اَىْ اَصْلَكُمْ اٰدَمَ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِنْ دَمٍ وَلَحْمٍ تَنْتَشِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ.

২১. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا فَخُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِ اٰدَمَ وَسَائِرُ النِّسَاءِ مِنْ نُطَفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَتَاْلَفُوْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ جَمِيْعًا مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِىْ صُنْعِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

২২. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ اَىْ لُغَاتِكُمْ مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَعَجَمِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا وَاَلْوَانِكُمْ ط مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِهِمَا وَاَنْتُمْ اَوْلَادُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لِّلْعٰلَمِيْنَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا اَىْ ذَوِى الْعُقُوْلِ وَاُولِى الْعِلْمِ.

২৩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِاِرَادَتِهٖ تَعَالٰى رَاحَةً لَّكُمْ وَابْتِغَاؤُكُمْ بِالنَّهَارِ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اَىْ تَصَرُّفُكُمْ فِىْ طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ بِاِرَادَتِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ سَمَاعَ تَدَبُّرٍ وَّاعْتِبَارٍ.

অনুবাদ :

২০. তার নিদর্শনাবলির যা তার কুদরতের প্রমাণ বহনকারী মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের তোমাদের মূল হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমরা এখন রক্ত ও মাংসের গড়া মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ।

২১. আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের সঙ্গীনিদের সৃষ্টি করেছেন, অতএব হযরত হাওয়া (আ.)-কে হযরত আদম (আ.)-এর পাজরের হাড় থেকে এবং অন্যান্য সকল নারীদেরকে নারী ও পুরুষ উভয়ের মিশ্রিত পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তাদেরকে ভালোবাস এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে নিদর্শনাবলি রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যারা চিন্তা করে তাদের জন্যে।

২২. তার আরো এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ভাষার বিভিন্নতা কেউ আরবি, কেউ অনারবী ও অন্যান্য ও বর্ণের বৈচিত্র্য। কেউ সাদা, কেউ কালো ও অন্যান্য অথচ তোমরা সবই এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্ট। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলি যা তার কুদরতের উপর প্রমাণস্বরূপ রয়েছে। لِّلْعٰلِمِيْنَ শব্দের মধ্যে লামের যের ও যবর উভয় ধরনের পড়া যাবে। যদি যের পড়ে তখন অর্থ হবে 'জ্ঞানীব্যক্তি।

২৩. তার আরো নিদর্শন রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা তোমাদের আরাম ও আয়েশের জন্যে আল্লাহর ইচ্ছায় এবং দিনের বেলায় তোমাদের তার কৃপা অন্বেষণ। জীবিকা অন্বেষণের জন্যে তোমাদের শ্রম ও মেহনত আল্লাহর ইচ্ছায় নিশ্চয় এতে মনোযোগী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। চিন্তা ও শিক্ষার জন্য শ্রবণকারীদের।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٤. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ اَىْ اِرَاءَ تُكُمُ الْبَرْ
خَوْفًا لِلْمُسَافِرِ مِنَ الصَّوَاعِقِ وَطَمَعًا
لِلْمُقِيْمِ فِى الْمَطَرِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَا
مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اَىْ
يُبْسِهَا بِاَنْ تُنْبِتَ اِنَّ فِى ذٰلِكَ الْمَذْكُوْ
لَاٰيٰتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

২৪. তার আরো নিদর্শন তিনি তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ ভয় যেমন মুসাফিরদেরকে বিজলী থেকে ও ভরসার মুকীমদেরকে বৃষ্টির প্রতি জন্যে এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন অতঃপর তদ্দ্বারা ভূমির মৃত্যুর শুকানো পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এতে শষ্য উৎপন্ন করে নিশ্চয়ই এতে উল্লিখিত বিষয়াবলিতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

٢٥. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ
بِاَمْرِهٖ ط بِاِرَادَتِهٖ مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ ثُمَّ اِ
دَعَاكُمْ دَعْوَةً ز مِّنَ الْاَرْضِ بِاَنْ يَنْفُ
اِسْرَافِيْلُ فِى الصُّوْرِ لِلْبَعْثِ مِنَ الْقُبُوْ
اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ مِنْهَا اَحْيَا
فَخُرُوْجُكُمْ مِنْهَا بِدَعْوَةٍ مِنْ اٰيَاتِهٖ تَعَالٰى.

২৫. তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী কোনো খুঁটিবিহীন প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক দেবেন, কবর থেকে উঠার জন্যে ইসরাফিল (আ.)-এর সিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার মাধ্যমে তখন তোমরা উঠে আসবে। জীবিত অবস্থায় অতঃপর তার ডাকে কবর থেকে তোমাদের বের হয়ে আসা তারই অন্যতম নিদর্শন।

٢٦. وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مِلْكًا
وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ مُطِيْعُوْنَ

২৬. নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই তার মালিকানা, সৃষ্ট ও দাস হিসেবে সবাই তার অনুগত।

٢٧. وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ط لِلنَّاسِ ثُ
يُعِيْدُهٗ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ مِ
الْبَدْءِ بِالنَّظْرِ اِلٰى مَا عِنْدَ الْمُخَاطَبِيْ
مِنْ اَنَّ اِعَادَةَ الشَّيْءِ اَسْهَلُ مِنْ اِبْتِدَائِ
وَاِلَّا فَهُمَا عِنْدَهٗ تَعَالٰى سَوَاءٌ فِ
السُّهُوْلَةِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج اَىِ الصِّفَةُ الْعُلْيَا
وَهِىَ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِ
مُلْكِهٖ الْحَكِيْمُ فِىْ خَلْقِهٖ.

২৭. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে মানুষকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তাদের ধ্বংসের পর তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তার জন্য সহজ। প্রথমবারের চেয়ে। এখানে এ উক্তিটি শ্রোতাদের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কেননা কোনো বস্তুকে পুনরায় সৃষ্টি করা অতি সহজ প্রথমবার সৃষ্টির চেয়ে। কিন্তু আল্লাহর নিকট উভয়টি [অর্থাৎ প্রথম ও পুনর্বার সৃষ্টি] সহজ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তো তারই। সর্বোচ্চ গুণটি হলো এই তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। এবং তিনি পরাক্রমশালী, তার রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তার সৃষ্টির মধ্যে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَصْلِكُمْ : اَصْلِكُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, خَلَقَكُمْ-এর মধ্যে كُمْ-এর পূর্বে مُضَاف উহ্য রয়েছে আর এটাও বলে দিয়েছেন যে, اَصْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত আদম (আ.)।

قَوْلُهُ ثُمَّ : এখানে ثُمَّ দ্বারা ব্যক্ত করে تَاخِير تَغَيُّرَاتْ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা اِذَا غِذَا প্রথমত نُطْفَة হয় এরপর عَلَقَة এরপর مُضْغَة এ সকল বিবর্তনের ব্যবধান হলো ৪০ দিন পরপর। আর যখন ১২০ দিন হয়ে যায় তখন সেই গোশ্‌তের টুকরায় রূহ ফুকে দেওয়া হয়। আর রূহ ফুঁকে দেওয়ার সাথে সাথেই তা بَشَرْ [মানুষ]-এ পরিণত হয়ে যায়। اِذَا টা হলো مُفَاجَاتِيَة যদিও اِذَا مُفَاجَاتِيَة অধিকাংশ ক্ষেত্রে فَاء-এর পরে আসে। তবে কোনো কোনো সময় وَاوْ-এর পরেও আসে। اِذَا مُفَاجَاتِيَة নেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, যখন উল্লিখিত তিনটি বিবর্তনই পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন بَشَرْ [মানুষ] হতে আর বিলম্ব হয় না। একদিকে রূহ ফুকে দেওয়া হয় অপরদিকে মানুষের আকৃতিও তৈরি হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ : يُرِيْكُمْ মূলে ছিল اَنْ يُرِيْكُمْ যার কারণে يُرِيْكُمْ টা اِرَاءَتُكُمْ মাসদারের অর্থে হয়েছে। اَنْ مَصْدَرِيَة-কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মুফাসসির (র.) يُرِيْكُمْ-এর তাফসীর اِرَاءَتُكُمْ দ্বারা করে এই উহ্য اَنْ مَصْدَرِيَة-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর اَنْ مَصْدَرِيَة কে আরবি ভাষায় উহ্য করা বহুল প্রচলিত যেমন– تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِيْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاهُ অর্থাৎ اَنْ تَسْمَعَ আর مِنْ اٰيَاتِهٖ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ خَوْفًا وَطَمَعًا : এটা يُرِيْكُمْ-এর مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ : এর مَرْجِعْ হলো اِعَادَة যা يُعِيْدُهٗ হতে বুঝা যায়। هُوَ-এর যমীরকে خَبَرْ-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে مُذَكَّرْ নেওয়া হয়েছে। هُوَ اَهْوَنُ হলো মুবতাদা খবর।

قَوْلُهُ بِالنَّظْرِ اِلٰى مَا عِنْدَ الْمُخَاطَبِيْنَ : মুফাসসির (র.) এই ইবারত দ্বারা একটি সংশয়ের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। সংশয় হলো– আল্লাহ তা'আলার জন্য اِبْتِدَاء এবং اِعَادَة উভয়টাই সমান অর্থাৎ সহজ। কিন্তু عَلَيْهِ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য اِعَادَة [পুনরায় সৃষ্টি করা] اِبْتِدَاء থেকে সহজতর।

উত্তর : জবাবের সারকথা হলো এতে মানুষের হিসেবে একটি মূলনীতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর জ্ঞানের চাহিদাও এটা যে কোনো কিছু প্রথমবার তৈরি করার চেয়ে দ্বিতীয়বার তৈরি করা সহজ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় জবাব এই দেওয়া হয়েছে যে, اَهْوَنُ ইসমে তাফযীল هَيِّنٌ অর্থে হয়েছে। আবার কেউ কেউ এই উত্তর দিয়েছেন যে, هُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ-এর মধ্যে عَلَيْهِ-এর যমীরের مَرْجِعْ মাখলুকের দিকে ফিরেছে আল্লাহর দিকে নয়। আর উদ্দেশ্য হলো যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন সৃষ্টজীবের জন্য ফিরে আসাটা اِبْتِدَاء-এর হিসেবে সহজ হবে। কেননা একদিকে রূহের সম্পর্ক শরীরের সাথে হলো এদিকে اِعَادَة হয়ে গেল। اِبْتِدَاء-এর বিপরীত, কেননা তাতে বিভিন্ন বিবর্তনের পরে প্রাণের স্পন্দন এসে থাকে। যেমন প্রথম ৪০ দিন عَلَقَة [রক্ত পিণ্ড] এরপর দ্বিতীয় ৪০ দিন مُضْغَة [মাংস পিণ্ড] হয়। এমনিভাবে তাতে বিলম্ব ঘটে থাকে। যা عَوْد-এর হিসেবে কঠিন। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারতো, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার, অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তার কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গাম্বরদের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহ এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলি' শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের প্রথম নিদর্শন : মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলা এটিই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টিতে উপাদান যে মৃত্তিকা, এ কথা হযরত আদম (আ.)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তারই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য উপাদান দ্বারা গঠিত তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহর কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন : দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলা জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষদের সঙ্গিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দুইটি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্য এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যতো প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কুরআন পাক একটি মাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলা বাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরিয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতিনীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু জানোয়ারের ন্যায় সামগ্রিক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য শান্তি এর পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া জরুরি : আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা। যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তা-ই করা হয়েছে অর্থাৎ একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোনো জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কুরআনে সর্বত্র اِتَّقُوا اللّٰهَ - وَاخْشَوْا ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে কোনো আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না এবং কোনো আদালতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করেছেন, যেগুলোকে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহভীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার জামিন হতে পারে।

তদুপরি আল্লাহ তা'আলার আরো একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি। বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রূপ করা হয়েছে তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালোবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে– وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি; বরং তাদের অন্তরে সম্প্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন। مَوَدَّةٌ ও وُدٌّ -এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালোবাসা ও প্রীতি। এখানে আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, এক. مَوَدَّةٌ ও দ্বিতীয় رَحْمَةٌ সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, مَوَدَّةٌ তথা ভালোবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালোবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

এরপর বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লিখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয় বহু নিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন : তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য। যেমন কোনো বস্তু শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে এখানে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষায় বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবি, ফারসি, হিন্দি, তুর্কী, ইংরেজি ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভাষা পরস্পর এতো ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ -

এমনিভাবে বর্ণ বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতামাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানবজাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তাভাবনা দ্বারা অনেক রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী, ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা ও এবং বিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে– اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ অর্থাৎ এতে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন : মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিন-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাতে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্য স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোনো কোনো তাফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ সংসার-বিমুখতা এবং তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান। আমরা দিনরাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে। কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিজিকতাদা হিসেবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ অর্থাৎ যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণ সম্ভবত এই যে, দৃশ্যত নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরি, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গাম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যই উপকারী, যারা পয়গাম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়, কোনো হঠকারিতা করে না।

আল্লাহর কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন : পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশঙ্কা থাকে এবং এর পশ্চাতে সৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টি দ্বারা শুষ্ক ও মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাকে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফলফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদ ও ফলফুলের সৃজন যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

আল্লাহ কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন : ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা'আলারই আদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তারই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্য এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ : যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার مَثَلٌ বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মতো হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার যে مَثَلٌ আছে, একথা কুরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এ আয়াতে বলা হয়েছে- مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوٰةٍ কিন্তু مِثَالٌ ও مَثَلٌ থেকে আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র এবং বহু ঊর্ধ্বে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

Free @ www.e-ilmweebly.com

٢٨. ضَرَبَ جَعَلَ لَكُمْ اَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ مَثَلًا
كَائِنًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط وَهُوَ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ
مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَىْ مِنْ مَمَالِيْكِكُمْ
مِنْ شُرَكَاءَ لَكُمْ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنَ
الْاَمْوَالِ وَغَيْرِهَا فَاَنْتُمْ وَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ
تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ط اَىْ
اَمْثَالَكُمْ مِنَ الْاَحْرَارِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى
النَّفْيِ الْمَعْنٰى لَيْسَ مَمَالِيْكُكُمْ شُرَكَاءَ لَكُمْ
اِلٰى اٰخِرِهٖ عِنْدَكُمْ فَكَيْفَ تَجْعَلُوْنَ بَعْضَ
مَمَالِيْكِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ لَهٗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ
الْاٰيٰتِ نُبَيِّنُهَا مِثْلَ ذٰلِكَ التَّفْصِيْلِ
لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ يَتَدَبَّرُوْنَ.

٢٩. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِالْاِشْرَاكِ اَهْوَاءَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ج فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ط
اَىْ لَا هَادِىَ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ
مَانِعِيْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

٣٠. فَاَقِمْ يَا مُحَمَّدُ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط
مَائِلًا اِلَيْهِ اَىْ اَخْلِصْ دِيْنَكَ لِلّٰهِ اَنْتَ وَمَنْ
تَبِعَكَ فِطْرَتَ اللّٰهِ خِلْقَتَهُ الَّتِىْ فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا ط وَهِىَ دِيْنُهٗ اَىْ
اِلْزَمُوْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط لِدِيْنِهٖ اَىْ
لَا تُبَدِّلُوْهُ بِاَنْ تُشْرِكُوْا ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق
الْمُسْتَقِيْمُ تَوْحِيْدُ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ تَوْحِيْدَ اللّٰهِ.

অনুবাদ :

২৮. হে মুশরিকগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, তা হলো এই তোমাদের আমি যে রিজিক মাল সম্পদ দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি তাতে তোমাদের সমান সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর, যে রূপ নিজেদের লোককে তোমাদের মতো স্বাধীন ব্যক্তিদেরকে ভয় কর? এখানে اِسْتِفْهَام তথা প্রশ্নবোধক অব্যয়টি نَفِيْ বা না বোধক অর্থের জন্যে এসেছে। অর্থাৎ তোমাদের কোনো দাসদাসী তোমাদের সাথে অংশীদার নয় তোমাদের নিকট। اِلٰى اٰخِرِهٖ তথা শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ তোমাদের সম্পদে তোমাদের সাথে তোমাদের কোনো দাসদাসী অংশীদার নেই যেমন তোমাদের মতো অন্য স্বাধীন ব্যক্তি নেই। অতএব তোমরা কিভাবে আল্লাহর অনেক দাসদেরকে তার সাথে অংশীদার বানাও? এমনিভাবে আমি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করি। যাতে তারা সেখানে চিন্তা করে।

২৯. বরং শিরককারী অত্যাচারীগণ অজ্ঞানবশতঃ তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে থাকে। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে পথ দেখাবে? অর্থাৎ কেউ তাকে পথের সন্ধানদাতা নেই। তাদের কোনো সাহায্যকারী আজাব থেকে রক্ষাকারী নেই।

৩০. হে মুহাম্মাদ ﷺ ! তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। অর্থাৎ তুমিও তোমার অনুসারীগণ নিজেদের ধর্মকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য খাঁটি কর। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। তা তারই ধর্ম অর্থাৎ তোমরা এর উপর অটল থাক। আল্লাহর সৃষ্টির তার ধর্মের কোনো পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ তোমরা শিরকের মাধ্যমে তা পরিবর্তন করো না। এটাই সরল ধর্ম। আল্লাহর একত্ববাদ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর তৌহিদ জানে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩১. مُنِيْبِيْنَ رَاجِعِيْنَ اِلَيْهِ تَعَالٰى فِيْمَا اَمَرَ بِهٖ وَنَهٰى عَنْهُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ اَقِمْ وَمَا اُرِيْدَ بِهٖ اَىْ اَقِيْمُوْا وَ اتَّقُوْهُ خَافُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

৩১. সবাই তার অভিমুখী হও যাতে তিনি আদেশ করেছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন। এখানে مُنِيْبِيْنَ শব্দটি اَقِمْ -এর ফায়েল ও তা থেকে উদ্দেশ্য অর্থাৎ اَقِيْمُوْا -এর ফায়েল থেকে حَالٌ এবং তাকে ভয় কর, এবং নামাজ কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৩২. مِنَ الَّذِيْنَ بَدَلٌ بِاِعَادَةِ الْجَارِ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِيْمَا يَعْبُدُوْنَهٗ وَكَانُوْا شِيَعًا ط فِرَقًا فِىْ ذٰلِكَ كُلُّ حِزْبٍ مِنْهُمْ بِمَا لَدَيْهِمْ عِنْدَهُمْ فَرِحُوْنَ مَسْرُوْرُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَارَقُوْا اَىْ تَرَكُوْا دِيْنَهُمُ الَّذِىْ اُمِرُوْا بِهٖ ـ

৩২. যারা তাদের ধর্মে তাদর মাবুদ -এর ব্যাপারে মতানৈক্যের মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। مِنَ الَّذِيْنَ শব্দটি হরফে জারের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পূর্বের مُشْرِكِيْنَ থেকে بَدَلٌ হয়েছে। এবং দীনের ব্যাপারে অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লাসিত। অন্য এক কেরাতে فَرَّقُوْا -কে- فَارَقُوْا পড়া হয়েছে। যার অর্থ– তারা ত্যাগ করে তাদের ঐ ধর্ম যার ব্যাপারে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৩. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ ضُرٌّ شِدَّةٌ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيْبِيْنَ رَاجِعِيْنَ اِلَيْهِ دُوْنَ غَيْرِهٖ ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً بِالْمَطَرِ اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ـ

৩৩. যখন মানুষকে মক্কার কাফেরদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা পালনকর্তাকে আহ্বান করে তারই অন্যান্য ব্যতীত অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ বৃষ্টির মাধ্যমে আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে।

৩৪. لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ ط اُرِيْدَ بِهِ التَّهْدِيْدُ فَتَمَتَّعُوْا قف فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ تَمَتُّعِكُمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ ـ

৩৪. যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। এতে اَمْرٌ -এর সীগাহ দ্বারা ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য। অতএব উপভোগ করে লুঠে নাও, স্বত্বরই জানতে পারবে তোমাদের উপভোগ করে নেওয়ার পরিণাম। এখানে গায়েব এর সীগাহ থেকে خِطَابٌ তথা সরাসরি সম্বোধনের দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩৫. اَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا حُجَّةً وَكِتَابًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ تَكَلُّمَ دَلَالَةٍ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ اَىْ يَاْمُرُهُمْ بِالْاِشْرَاكِ لَا ـ

৩৫. এখানে اَمْ অব্যয়টি هَمْزَةُ اِنْكَارٍ তথা অস্বীকার অর্থের হামযার অর্থ প্রদান করে আমি কি তাদের কাছে এমন কোনো দলিল কিতাব বা প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি, যা তাদেরকে আমার শরিক করতে বলে? আমার সাথে শিরক করার নির্দেশ দেয়। এটাকে تَكَلُّمَ دَلَالَتٍ বলা হয়েছে অর্থাৎ ইঙ্গিতে কথা বলা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٦. وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ كُفَّارَ مَكَّةَ وَغَيْرَهُمْ رَحْمَةً نِعْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ط فَرْحَ بَطَرٍ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ شِدَّةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ يَيْاَسُوْنَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَمِنْ شَاْنِ الْمُؤْمِنِ اَنْ يَّشْكُرَ عِنْدَ النِّعْمَةِ وَيَرْجُوْ رَبَّهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ ـ

৩৬. আর যখন আমি মানুষকে মক্কার কাফের ও অন্যান্যদেরকে রহমতের নিয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয়। অহংকারের আনন্দ এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদেরকে কোনো দুর্দশা পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে আর মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো নিয়ামতের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আর দুর্দশার সময় তার প্রভুর রহমতের আশা রাখা।

٣٧. اَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ ط وَيُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِبْتِلَاءً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ بِهَا ـ

৩৭. তারা কি দেখে জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক বর্ধিত করেন পরীক্ষামূলকভাবে এবং যার জন্যে ইচ্ছা পরীক্ষামূলকভাবে হ্রাস করেন। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।

٣٨. فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى الْقَرَابَةِ حَقَّهُ مِنَ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط الْمُسَافِرِيْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَاُمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ تَبَعٌ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز اَيْ ثَوَابَهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ ـ

৩৮. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন সদ্ব্যবহার ও সৎ কর্মের মাধ্যমে এবং মিসকিন ও মুসাফিরদেরও সদকা দান করার মাধ্যমে। উক্ত আমরের মধ্যে নবী ﷺ -এর উম্মতগণও শামিল। এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্থাৎ তাদের আমলের পুণ্যের কামনা করে, তারাই সফলকাম।

٣٩. وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا بِاَنْ يُّعْطٰى شَيْئًا هِبَةً اَوْ هَدِيَّةً لِيَطْلُبَ اَكْثَرَ مِنْهُ فَسُمِّيَ بِاسْمِ الْمَطْلُوْبِ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ لِيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ الْمُعْطِيْنَ اَيْ يَزِيْدُ فَلَا يَرْبُوْا يَزْكُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج اَيْ لَا ثَوَابَ فِيْهِ لِلْمُعْطِيْنَ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ صَدَقَةٍ تُرِيْدُوْنَ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ثَوَابَهُمْ بِمَا اَرَادُوْهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ ـ

৩৯. মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও তার পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ কোনো জিনিস দান বা হাদিয়া হিসেবে এজন্যে দেওয়া যাতে তার বিনিময়ে অতিরিক্ত নিতে পারে। যাতে বিনিময়কৃত সম্পদে তার মাল বৃদ্ধি হয়। আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর দাতাদের জন্য কোনো ছওয়াব নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। তাদের ছওয়াব যা তারা আশা করেছে তার চেয়েও দ্বিগুণ। এখানে সম্বোধন সূচক শব্দ থেকে পরিবর্তন করে غَائِبٌ বলা হয়েছে।

٤٠. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مِمَّنْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ط لَا سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

৪০. আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অতঃপর রিজিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরিকদের আল্লাহর সাথে তোমরা যাকে শরিক কর মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে এসব কাজের মধ্যে কোনো একটিও করতে পারবে? কক্ষনো না তারা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَائِنًا : كَائِنًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مِنْ اَنْفُسِكُمْ টা كَائِنًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে مَثَلًا -এর সিফত হয়েছে। আর مِنْ টি হলো اِبْتِدَائِيَّةْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ : এটা مِنْ شُرَكَاءَ থেকে حَالْ مُقَدَّمْ হয়েছে। প্রথম مِنْ টা হলো اِبْتِدَائِيَّةْ আর দ্বিতীয়টি হলো تَبْعِيْضِيَّةْ আর তৃতীয়টি হলো زَائِدَةْ তথা অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ اَنْتَ وَمَنْ تَبِعَكَ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَقِمْ وَجْهَكَ -এর মধ্যে সম্বোধন যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো উম্মত।

قَوْلُهُ فِطْرَتَ اللّٰهِ : এটা উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে, আর তা হলো اَلْزَمُوْا যেমনটি ব্যাখ্যাকার (র.) উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। فِطْرَتْ -এর অর্থ জন্মগত যোগ্যতা ও আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত। লম্বা تَاءْ -এর সাথে فِطْرَتْ শব্দটি পূর্ণ কুরআনের মধ্যে শুধু এ জায়গায়ই এসেছে।

قَوْلُهُ لَا تُبَدِّلُوْهُ : এর দ্বারা ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لَا تَبْدِيْلَ -এটা خَبَرْ টা اَمْرْ যা -এর অর্থে হয়েছে। এটা বলা যেতে পারে যে, نَفِىْ টা نَهِىْ অর্থে হয়েছে। فِطْرَةْ -এর দুটি তাফসীর রয়েছে। এক. জন্মগত যোগ্যতা, দুই. দীন ইসলাম। দ্বিতীয়টির দিকে ব্যাখ্যাকার وَهِىَ دِيْنُهٗ বলে ইঙ্গিত করেছেন। যার কারণে উভয় তাফসীরের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তবে যদি وَهِىَ دِيْنُهٗ -এর وَاوْ -কে যদি و অর্থে নেওয়া হয় তবে এই তালগোলের নিরসন হয়ে যায়। (جُمَلْ)

قَوْلُهُ مُنِيْبِيْنَ : এটা اَقِمْ এবং اَقِمْ দ্বারা যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ اَقِيْمُوْا থেকে حَالْ হয়েছে। কেননা اَقِمْ -এর মধ্যে যদিও রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হলো উম্মত।

قَوْلُهُ لِيَكْفُرُوْا : এর পরে اُرِيْدَ بِهِ التَّهْدِيْدِ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, لِيَكْفُرُوْا -এর মধ্যে لَامْ হলো اَمْرْ -এর জন্য। আবার لَامْ عَاقِبَتْ ও হতে পারে। অর্থ শেষ পরিণামে সে অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে।

قَوْلُهُ تَكَلَّمَ دَلَالَةً : এখানে تَكَلَّمْ দ্বারা রূপকভাবে دَلَالَتْ উদ্দেশ্য অন্যথায় দলিল বা কিতাব তো কথা বলতে পারে না। অবশ্য রূপকভাবে বলা যায়– كِتَابٌ نَاطِقٌ . وَيُقَالُ هٰذَا مِمَّا نَطَقَ بِهِ الْقُرْاٰنُ

بَطَرْ অর্থ সীমাহীন খুশির প্রকাশ করা যা অহঙ্কার ও উত্তেজিত হওয়ার সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। ব্যাখ্যাকার فَرَحَ بَطَرٍ -এর বৃদ্ধি করে এই সংশয়ের জবাব দিয়েছেন যে, আল্লাহর নিয়ামতে আনন্দ প্রকাশ করা কোনো তিরস্কারমূলক বিষয় নয়। বরং اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রশংসনীয়। তখন এর জবাব দিয়েছেন اِظْهَارُ نِعْمَتْ -এর ভিত্তিতে تَحْدِيْثُ نِعْمَتْ করা যদিও প্রশংসনীয় কিন্তু অহঙ্কার ও উত্তেজিত হওয়ার ভিত্তিতে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ : اَللّٰهُ হলো মুবতাদা আর اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ মওসূল সেলাহ মিলে মুবতাদার খবর হয়েছে। আর মুবতাদা ও খবর উভয়টি مَعْرِفَةْ হওয়ায় বাক্যটি حَصْرْ -এর ফায়দা দিচ্ছে।

قَوْلُهُ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ : এটা হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ আর مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ হলো مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতোই মানুষ। আকার-আকৃতি, হাত-পা মনের চাহিদা সব বিষয়ে তোমাদের শরিক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম অংশীদারিত্বেও অধিকার দাও না। কোনো ক্ষুদ্র ও মামুলী শরিককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগৎ আল্লাহর সৃজিত ও তারই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তার শরিক কিরূপে বিশ্বাস কর?

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার, কিন্তু প্রতিপক্ষ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোনো জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এখানে فِطْرَةَ اللّٰهِ বাক্যটি পূর্ববর্তী فَاَقِمْ বাক্যের ব্যাখ্যা এবং دِيْنِ حَنِيْف -এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ دِيْنِ حَنِيْف হচ্ছে دِيْنِ فِطْرَتْ। পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরাত বলে সেই ফিতরাত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরাত বলে কি বুঝানো হয়েছে? এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

এক. ফিতরাত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোনো কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবে পিতামাতা তাকে ইসলাম বিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

দুই. ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। এক. এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে– لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এখানে خَلْقَ اللّٰهِ বলে পূর্বোল্লিখিত فِطْرَةَ اللّٰهِ -কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর এই ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপরে পিতামাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। সর্বত্রই মুসলমানদের চেয়ে কাফের বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিজির (আ.) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরি। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থি।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোনো বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় হলো না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের ছওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে? কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই ছওয়াব পাওয়া যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীসের অনুরূপ কিফহবিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতামাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতামাতা কাফের হলে সন্তানকেও কাফের ধরা হয় এবং কাফন-দাফন ইসলামি নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তুরপুশতী 'মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতামাতা অথবা অন্য কারো প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের যোগ্যতা চিনে নেওয়ার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। হযরত খিজির (আ.)-এর হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরি হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট ছওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতামাতা সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরাতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহপ্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত। কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যত মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) মেশকাতের টীকা 'লামআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে লিখিত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেযাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবকে স্রষ্টা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ-প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদ্দ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

قَوْلُهٗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ : উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিল পন্থিদের সংঘর্ষ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরজ : لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থিদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

قَوْلُهٗ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ : পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামাজ কায়েম করতে হবে। কেননা নামাজ কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে- وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ যারা শিরক করে, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে। مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্যধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شِيَعًا শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। কোনো একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাবধর্ম ছিল তাওহীদ।

এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতি এক দল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মাযহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মাযহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিজিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ প্রদত্ত রিজিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে তবে এর কারণে রিজিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং হাসান বসরী (র.)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না। বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। **এক.** আত্মীয়স্বজন, **দুই.** মিসকিন, **তিন.** মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরো বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য যা আল্লাহ তোমাদের ধনসম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি, কোনো অনুগ্রহ নয়।

ذَوِى الْقُرْبٰى বলে বাহ্যত সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহরাম হোক বা না হোক। حَقٌّ বলেও ওয়াজিব যেমন পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হোক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হোক সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চেয়ে বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। এমন কি তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরিব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয়। বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য; হযরত হাসান (র.) বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হলো আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য। -[কুরতুবী]

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকিন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সচ্ছলতা থাকলে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

قَوْلُهٗ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ : এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয়, তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রতাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করে উপহার উপঢৌকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না। এবং কোনো প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধনসম্পদ আত্মীয়ের ধন সম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে আসবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার দানের কোনো মর্যাদা ও ছওয়াব নেই। কুরআন পাকে এই 'বেশি' কে ربوا [সুদ] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতোই ব্যাপার।

মাসআলা : প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্য নৈতিক শিক্ষা এই যে, সেও সুযোগ মতো এর প্রতিদান দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কেউ কোনো উপঢৌকন দিলে সুযোগ মতো তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তার অভ্যাস। -[কুরতুবী] তবে এই প্রতিদান এভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

Free @ www.eelm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤١. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ اَىِ الْقِفَارِ بِقَحْطِ الْمَطَرِ وَقِلَّةِ النَّبَاتِ وَالْبَحْرِ اَىِ الْبِلَادِ الَّتِىْ عَلَى الْاَنْهَارِ بِقِلَّةِ مَائِهَا بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِىْ لِيُذِيْقَهُمْ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا اَىْ عُقُوْبَتَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

৪১. স্থলে অর্থাৎ মাঠে ময়দানে অনাবৃষ্টি ও ক্ষেতের অনবাদির মাধ্যমে ও জলে অর্থাৎ ঐ সমস্ত শহর যা সাগর বা নদীর তীরে অবস্থিত পানির স্বল্পতার মাধ্যমে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের পাপের কারণে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। তওবা করে, এতে نُذِيْقَ শব্দটি ن ও يَاءْ অর্থাৎ يُذِيْقَ ও نُذِيْقَ উভয় ধরনের পড়া যাবে।

٤٢. قُلْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ط كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِيْنَ فَاُهْلِكُوْا بِاِشْرَاكِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ خَاوِيَةٌ.

৪২. বলুন, মক্কার কাফেরদেরকে তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। অতঃপর তারা তাদের শিরকের কারণে ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের আবাসস্থল ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

٤٣. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ دِيْنِ الْاِسْلَامِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ يَتَفَرَّقُوْنَ بَعْدَ الْحِسَابِ اِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ.

৪৩. আপনি সরল ধর্মে ইসলাম ধর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন সে দিবসের পূর্বে যে দিবস আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাহৃত হওয়ার নয়। তা কিয়ামতের দিবস সেদিন মানুষ হিসাবের পর জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে বিভক্ত হয়ে পড়বে। يَصَّدَّعُوْنَ মূলে يَتَصَدَّعُوْنَ ছিল ت কে ص -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

٤٤. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ج وَبَالُ كُفْرِهٖ هُوَ النَّارُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ يُوَطِّئُوْنَ مَنَازِلَهُمْ فِى الْجَنَّةِ.

৪৪. যে কুফরি করে, তার কুফরের শাস্তির জন্যে তা হলো জাহান্নাম জন্যে সেই দায়ী। এবং যে সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। তারা জান্নাতে তাদের ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

٤٥. لِيَجْزِىَ مُتَعَلِّقٌ بِيَصَّدَّعُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ط يُثِيْبُهُمْ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ اَىْ يُعَاقِبُهُمْ.

৪৫. যাতে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন لِيَجْزِىَ -এর হরফে জারের সম্পর্ক يَصَّدَّعُوْنَ -এর সাথে তাদেরকে যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছওয়াব দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি কাফেরদের ভালোবাসেন না। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٦. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ تَعَالٰى اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ
مُبَشِّرٰتٍ بِمَعْنٰى لِتُبَشِّرَكُمْ بِالْمَطَرِ
وَلِيُذِيْقَكُمْ بِهَا مِنْ رَّحْمَتِهٖ الْمَطَرِ
وَالْخِصْبِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ السُّفُنُ بِهَا
بِاَمْرِهٖ بِاِرَادَتِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا مِنْ
فَضْلِهٖ الرِّزْقِ بِالتِّجَارَةِ فِى الْبَحْرِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ هٰذِهِ النِّعَمَ يَا اَهْلَ
مَكَّةَ فَتُوَحِّدُوْنَهٗ ـ

৪৬. তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু مُبَشِّرَاتٍ টি لِتُبَشِّرَكُمْ -এর অর্থে অর্থাৎ যা তোমাদের বৃষ্টির সুসংবাদ দেয় প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তার রহমতে বৃষ্টি ও বৃক্ষরাজিতে তোমাদের আস্বাদন করান। এবং তার নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ নদীতে ব্যবসার মাধ্যমে রিজিক তালাশ কর এবং যাতে তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। এ সমস্ত নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে তোমরা তার একত্ববাদে বিশ্বাসী হও। হে মক্কাবাসী।

٤٧. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى
قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ
الْوَاضِحَاتِ عَلٰى صِدْقِهِمْ فِىْ رِسَالَتِهِمْ
اِلَيْهِمْ فَكَذَّبُوْهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ
اَجْرَمُوْا ط اَهْلَكْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْهُمْ وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى
الْكَافِرِيْنَ بِاِهْلَاكِهِمْ وَاِنْجَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৪৭. আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি এমন প্রমাণাদি যা রাসূলদের রিসালাতের দাবিতে সত্যবাদীতার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে নিয়ে আগমন করেন। কিন্তু তারা তাদেরকে অস্বীকার করে অতঃপর আমি যারা পাপ করেছে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আমি ধ্বংস করেছি যারা নবীদেরকে অস্বীকার করেছে এবং মুমিনদের কাফেরদের বিরুদ্ধে মুমিনদের রক্ষা করে আর কাফেরদের ধ্বংস করে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

٤٨. اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا
تُزْعِجُهٗ فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ
يَشَآءُ مِنْ قِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا
بِفَتْحِ السِّيْنِ وَسُكُوْنِهَا قِطَعًا مُتَفَرِّقَةً
فَتَرَى الْوَدْقَ الْمَطَرَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ط
اَىْ وَسْطِهٖ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ بِالْوَدْقِ مَنْ
يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ
يَفْرَحُوْنَ بِالْمَطَرِ ـ

৪৮. আল্লাহ ঐ সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাতে সঞ্চারিত করেন। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা বেশি ও স্বল্প আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। كِسَفًا শব্দটি س -এর মধ্যে যবর ও সাকিন উভয়রূপে পড়া যাবে। এর অর্থ বিভিন্ন টুকরা, খণ্ড বা স্তর। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্যে থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তা পৌছান। তখন তারা আনন্দিত হয়। তারা বৃষ্টির কারণে আনন্দিত হয়।

٤٩. وَاِنْ وَقَدْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهٖ تَاكِيْدٌ لِمُبْلِسِيْنَ اٰيِسِيْنَ مِنْ اِنْزَالِهٖ ـ

৪৯. তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে তা থেকে নিরাশ ছিল। مِنْ قَبْلِهٖ -এর قَبْلِ শব্দটি পূর্বের قَبْلِ শব্দ থেকে تَاكِيْد ।

٥٠. فَانْظُرْ اِلٰى اَثَرِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ اَىْ نِعْمَتِهٖ بِالْمَطَرِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اَىْ يُبْسِهَا بِاَنْ تُنْبِتَ اِنَّ ذٰلِكَ الْمُحْىِ الْاَرْضَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৫০. অতএব, আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির মাধ্যমে তার নিয়ামতের ফল দেখে নাও, اَثَرِ শব্দটি অন্য কেরাতে اٰثَارِ পড়বে। কিভাবে তিনি মৃত্তিকায় মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। অর্থাৎ তা শুকে যাওয়ার পর ক্ষেত জন্মানোর মাধ্যমে নিশ্চয় তিনি মৃত্তিকা জীবিতকারী মৃতদেরকে জীবনদানকারী। এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

٥١. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَرْسَلْنَا رِيْحًا مُضِرَّةً عَلٰى نَبَاتٍ فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوْا صَارُوْا جَوَابُ الْقَسَمِ مِنْ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ اِصْفِرَارِهٖ يَكْفُرُوْنَ يَجْحَدُوْنَ النِّعْمَةَ بِالْمَطَرِ ـ

৫১. আমি যদি এমন বায়ু যা শস্যের জন্য ক্ষতিকর প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। বৃষ্টির নিয়ামতের কথা অস্বীকার করে। উক্ত আয়াতে لَئِنْ -এর ل শপথসূচক অব্যয় আর لَظَلُّوْا জবাবে কসম।

٥٢. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْيَاءِ وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ

৫২. অতএব আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। উক্ত আয়াতে اِذَا শব্দকে উভয় হামযাকে হামযার সাথে বা দ্বিতীয় হামযাকে হামযা ও يَاءٌ -এর মধ্যখানে তাসহীল করে পড়া যাবে।

٥٣. وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ط اِنْ مَا تُسْمِعُ سَمَاعَ اِفْهَامٍ وَقَبُوْلٍ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ مُخْلِصُوْنَ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ ـ

৫৩. আপনি অন্ধদেরকে তাদের গুমরাহী থেকে পথ দেখাতে পারবেন না। আপনি শুনাতে পারবেন না বুঝা ও গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শুনা আর এখানে اِنْ অব্যয়টি مَا না বোধকের অর্থ প্রদান করে। কিন্তু তাদেরকে যারা আমার আয়াতসমূহ কুরআন বিশ্বাস করে। কারণ তারা মুসলমান। যারা আল্লাহর একত্ববাদে খালেস বিশ্বাসী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قِفَارٌ : قَفْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ– জনশূন্য প্রান্তর। قَفَارٌ قَافٌ -এর যবরযোগে অর্থ এমন রুটি যাতে তরকারি নেই।

بِمَا كَسَبَتْ -এর بَاءٌ হলো سَبَبِيَّةٌ আর مَا হলো مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ بِسَبَبِ كَسْبِهِمْ

لِيُذِيْقَهُمْ -এর لَامٌ টি হলো عَاقِبَتْ -এর জন্য এবং এটা ظَهَرَ الْفَسَادُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَىْ عُقُوْبَتَهُ : এখান থেকে উহ্য مُضَافٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ عُقُوْبَةَ مَا عَمِلُوْا রূপক হিসেবে سَبَبٌ -এর ইতলাক مُسَبَّبٌ -এর উপর করা হয়েছে। যেহেতু اِعْمَالٌ হলো মন্দ পরিণামের কারণ। কাজেই سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ اللّٰهِ : مِنَ اللّٰهِ -এর সম্পর্ক হলো يَاْتِىْ -এর সাথে।

قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ : يَوْمَئِذٍ -এর তানভীনটি বাক্যের পরিবর্তে হয়েছে। অর্থাৎ يَوْمَ اِذَا يَاْتِىْ هٰذَا الْيَوْمُ

قَوْلُهُ يَصَّدَّعُوْنَ : এটা مُضَارِعٌ -এর جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ -এর সীগাহ, মূলে ছিল يَتَصَدَّعُوْنَ তারপর تَاء -কে صَاد দ্বারা পরিবর্তন করে صَادٌ কে صَادٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে। বাবে تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّصَدُّعُ অর্থ– বিক্ষিপ্ত হওয়া, কোনো শক্ত বস্তু ফেটে যাওয়া।

وَبَالُ كُفْرِهِ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা مُضَافٌ উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُوَطِّئُوْنَ : অর্থ– পরিপাটি করা, সুসজ্জিত হওয়া, তৈরি করা। وَطَّأَ تَوْطِئَةً অর্থ– ঠিক করা, বিছানো।

قَوْلُهُ لِيَجْزِىَ : এটা يَصَّدَّعُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ يَصَّدَّعُوْنَ لِيَجْزِىَ هُمْ তথা তারা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে, যাতে করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দেন।

قَوْلُهُ يُثِيْبُهُمْ : এটা দ্বারা لِيَجْزِىَ -এর তাফসীর করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى لِتُبَشِّرَكُمْ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা। প্রশ্ন হলো– لِيُذِيْقَكُمْ -এর عَطْف হয়েছে مُبَشِّرَاتٍ -এর উপর, আর এটা বৈধ নয়। কেননা তখন فِعْل -এর عَطْف ইসিম এর উপর হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। ব্যাখ্যাকার -এর জবাব দিয়েছেন যে, مُبَشِّرٌ টা تُبَشِّرُ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই কোনো আপত্তি থাকে না।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ : এ আয়াতটি اٰيَاتٌ مُنْفَصِلَةٌ অর্থাৎ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ يُرْسِلُهُ এবং اٰيَاتٌ مُنْفَصِلَةٌ অর্থাৎ اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ -এর মাঝে مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, وَمِنْ اٰيَاتِهٖ হলো مُفَصَّلٌ আর তার تَفْصِيْلٌ আর الخ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ আয়াতে مُعْتَرِضَةٌ আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া।

قَوْلُهُ فَانْتَقَمْنَا : এর আতফ হয়েছে উহ্যের উপর। ব্যাখ্যাকার فَكَذَّبُوْا দ্বারা উহ্য مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ فَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ : كَانَ হলো فِعْل نَاقِص আর حَقًّا হলো তার خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ হলো اِسْمٌ مُؤَخَّرٌ আর عَلَيْنَا টা حَقًّا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ وَقَدْ : শারেহ (র.) اِنْ -এর তাফসীর قَدْ দ্বারা করে আল্লামা বাগাবী (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। এই সুরতে وَاو টা হলো حَالِيَةٌ আর অন্যান্যরা اِنْ -কে مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ বলেছেন। আর তার ইসিম هُمْ যমীরে শান উহ্য মেনেছেন। আর বাক্যকে اِنَّ -এর خَبَرٌ বলেছেন। আর لَمُبْلِسِيْنَ -এর মধ্যে لَامٌ টি فَارِقَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَظَلُّوْا : এটা شَرْط যা جَوَابُ قَسَمٍ -এর স্থলাভিষিক্ত। কেননা কায়দা আছে যে, যখন شَرْط এবং قَسَم উভয়টি একত্রিত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে প্রথমটির জবাব উল্লেখ হয়ে থাকে। আর অপরটি উহ্য থাকে। আর প্রথমটির জবাবই দ্বিতীয়টির জবাবের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। এখানে لَئِنْ -এর মধ্যে قَسَم এবং شَرْط উভয়টি একত্রিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ : অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বিপর্যয় বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সবকিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া। উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ বিপদ বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গুনাহ ও কু-কর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচেয়ে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গুনাহ আসে। অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গুনাহ তো আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ার বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গুনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গুনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গুনাহের কারণেই বিপদ আসে না; বরং অনেক গুনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো গুনাহের কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গুনাহের কারণে বিপদ এলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না; বরং অনেক গুনাহ তো আল্লাহ তা'আলাই মাফ করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে- لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বান করান। এরপর বলা হয়েছে কু-কর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফিল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্য উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গুনাহের কারণে আসে : তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গুনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ তার গুনাহের কারণে অনাবৃষ্টিও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এবং সবাই গুনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না, বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। -[রূহুল মা'আনী]

কারণ প্রথম একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়ত তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্দ্বারা সব মানুষই কম বেশি প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জবাব : সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত। কাফেরকে তার সৎকাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। আরো বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে- اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ অর্থাৎ দুনিয়াতে পয়গাম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ হাদীস বাহ্যত আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায়, মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গুনাহের কারণে হতো, তবে ব্যাপার উল্টা হতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জবাব এই যে, আয়াতে গুনাহকে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারো উপর কোনো বিপদ এলে তা একমাত্র গুনাহের কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গুনাহগার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হয়ে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনো অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণেই প্রস্তাব জাহের হয় না। যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ঔষধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এ স্থলে ঠিক; কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ঔষধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ঔষধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গুনাহের কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গুনাহের আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো গুনাহ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ আয়াতে বলা হয়নি যে, গুনাহ না করলে কেউ কোনো বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোনো কারণেও বিপদাপদে আসা সম্ভবপর; যেমন পয়গাম্বরও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গুনাহ নয়; বরং তাদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কুরআন পাক সব বিপদাপদকেই গুনাহের ফল সাব্যস্ত করেনি; বরং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেসব বিপদাপদকে সাধারণত গুনাহের এবং বিশেষত প্রকাশ্য গুনাহের ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়; বরং এ ধরনের বিপদ কখনো পরীক্ষার জন্যও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মসিবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্য রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গুনাহগার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুজুর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপকারের বিপদাপদ– যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গুনাহ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

জ্ঞাতব্য : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভালো-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার। এক. বাহ্যিক ও দুই. আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বুঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, [মৌসূমী বায়ু] যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয় এবং অতঃপর সূর্য কিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্ব নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং অভ্যান্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম উভয় প্রকার হতে পারে। কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ সাহেব (র.) বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণ প্রকৃত-বৈষয়িক, যা সৎ অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন নমরূদের অগ্নিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওজন বিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্য। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহ আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারো জন্য সুখবর হয় এবং কারো জন্য বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালোমন্দ কর্মকাণ্ডও বিপদাপদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণ মাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ড বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে; কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণ মাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখশান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোনো কোনো সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোনো উচ্চস্তরের নবী-রাসূল ও ওলীয়ে কামিলের জন্য প্রতিকূল করে তার পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আজাবের মধ্যে পার্থক্য : বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয়। এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফ্ফারার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ তার অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ঔষধ খেতে অথবা অপারেশনে করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মতো সন্তুষ্ট থাকে; বরং এর জন্য সে টাকা পয়সাও ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসেবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈয়ের অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমনকি, কুফরি বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও ইস্তেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানি এবং কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকর্মে অধিক উৎসাহী হয়, তবে বিপদ আল্লাহ তা'আলার গজব ও আজাবের আলামত। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা কৃপা বশত মুমিনদের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত এর ফলে কাফেরদের মোকাবিলায় মুসলমানদের কোনো সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জবাব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে জিহাদ করে, তাদের বুঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোনো কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে। যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনে আছে– اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন- যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তা-ই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলির অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গুনাহ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি না, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে কি না? সূরা নামলের তাফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

٥٤. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ مَاءٍ مَهِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ اٰخَرَ وَهُوَ ضُعْفُ الطُّفُوْلِيَّةِ قُوَّةً اَىْ قُوَّةَ الشَّبَابِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً ضُعْفَ الْكِبَرِ وَشَيْبَ الْهَرَمِ وَالضُّعْفُ فِى الثَّلَاثَةِ بِضَمِّ اَوَّلِهٖ وَفَتْحِهٖ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ مِنَ الضُّعْفِ وَالْقُوَّةِ وَالشَّبَابِ وَالشَّيْبَةِ وَهُوَ الْعَلِيْمُ بِتَدْبِيْرِ خَلْقِهٖ الْقَدِيْرُ عَلٰى مَا يَشَاۤءُ.

অনুবাদ :

৫৪. আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে দুর্বল এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানি থেকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর দুর্বলতার জন্য দুর্বলতা অর্থাৎ শিশুত্বের দুর্বলতার পর শক্তি যৌবনের শক্তি দান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য বার্ধক্যের দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কারণে চুলের সাদা হওয়া। এখানে ضُعْف শব্দকে তিন স্থানে ض-এর মধ্যে যবর ও পেশ উভয় হরকত দিয়ে পড়া যাবে। তিনি যৌবনের শক্তি ও বার্ধক্যের দুর্বলতা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এবং তিনি তার সৃষ্টের সৃষ্টির উপর সর্বজ্ঞ তিনি যা ইচ্ছা করেন তার উপর সর্ব শক্তিমান।

٥٥. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ يَحْلِفُ الْمُجْرِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ مَا لَبِثُوْا فِى الْقُبُوْرِ غَيْرَ سَاعَةٍ ط قَالَ تَعَالٰى كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْحَقِّ الْبَعْثِ كَمَا صُرِفُوْا عَنِ الْحَقِّ الصِّدْقِ فِىْ مُدَّةِ اللُّبْثِ.

৫৫. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কাফেররা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশি কবরে অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্য বিমুখ হতো। যেমনিভাবে তারা কবরের অবস্থানের সত্যতা অস্বীকার করেছে তেমনি তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সত্যতা অস্বীকার করতো।

٥٦. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ وَغَيْرِهِمْ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ فِيْمَا كَتَبَهٗ فِىْ سَابِقِ عِلْمِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ الَّذِىْ اَنْكَرْتُمُوْهُ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ وُقُوْعَهٗ.

৫৬. ফেরেশতা ও অন্যান্যদের মধ্যে যাদের ঈমান ও জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাব মতে ঐ লিখিত মতে যা আল্লাহ তা'আলার ইলমে বিদ্যমান পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই পুনরুত্থান দিবস যা তোমরা অস্বীকার করতে কিন্তু তোমরা তা সংঘটিত হওয়ার কথা জানতে না।

٥٧. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ فِىْ اِنْكَارِهِمْ لَهٗ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ لَا يُطْلَبُ مِنْهُمُ الْعُتْبٰى اَىِ الرُّجُوْعُ اِلٰى مَا يَرْضَى اللّٰهُ.

৫৭. সেদিন জালেমদের ওজর আপত্তি তাদের তা অস্বীকার করার ব্যাপারে তাদের কোনো উপকারে আসবে না। تَنْفَعُ-কে ت ও ى উভয়ের সাথে পড়া যাবে। এবং তাদের থেকে তওবা তলব করা হবে না। তওবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদের দেওয়া হবে না

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٨. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا جَعَلْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تَنْبِيْهًا لَهُمْ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ جِئْتَهُمْ يَا مُحَمَّدُ بِاٰيَةٍ مِثْلِ الْعَصَا وَالْيَدِ لِمُوْسٰى لَيَقُوْلَنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النُّوْنَاتِ وَالْوَاوُ ضَمِيْرُ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ مَا أَنْتُمْ أَيْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا مُبْطِلُوْنَ أَصْحَابُ أَبَاطِيْلَ .

৫৮. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য তাদের সজাগ করার জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি ও হস্তের নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে তাদের মধ্যে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মুহাম্মদ ও তার সাথীগণ মিথ্যাপন্থি বাতিলপন্থি।

٥٩. كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ التَّوْحِيْدَ كَمَا طَبَعَ عَلٰى قُلُوْبِ هٰؤُلَاءِ .

৫৯. এমনিভাবে আল্লাহ তাওহীদের জ্ঞানহীনদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন। যেমন ঐ সমস্ত লোকদের অন্তরসমূহ।

٦٠. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِنَصْرِكَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ أَيْ لَا يَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْخِفَّةِ وَالطَّيْشِ بِتَرْكِ الصَّبْرِ أَيْ لَا تَتْرُكْنَهُ .

৬০. অতএব আপনি সবর করুন। নিশ্চয় তাদের বিপক্ষে আপনাকে সাহায্য করার ব্যাপারে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে। আপনাকে উত্তেজিত করে দ্রুত রাগান্বিত না করে অর্থাৎ তারা কখনো আপনাকে ধৈর্যের বাঁধন থেকে বের করতে পারবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَاءٍ مَهِيْنٍ : এটা ضُعْفٌ -এর তাফসীর দ্বারা একটি আপত্তির নিরসন করা উদ্দেশ্য। আপত্তি এই যে, ضُعْفٌ হলো صِفَتْ এর থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হতে পারে না।

উত্তর. উত্তরের সার সংক্ষেপ হলো ضُعْفٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أَصْلٌ ضَعِيْفٌ যেমন نُطْفَةٌ হলো أَصْلٌ ضَعِيْفٌ অর্থাৎ ضُعْفٌ মাসদারটা ذُوْ ضُعْفٍ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ : এই বাক্যটি মুবতাদা এবং খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ شَيْبَةً : চুলের শুভ্রতা, যা সাধারণত ৪৩ বৎসরে প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর এটাই বার্ধক্যের সূচনা করে থাকে।

قَوْلُهُ مِنَ الضُّعْفِ وَالْقُوَّةِ : এটা مَا -এর بَيَانٌ হয়েছে- قَوْلٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ أَيِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ

قَوْلُهُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ الخ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর اِسْتِعْتَابٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ তাদের থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা করা হবে না। কতিপয় মুফাসসির অনুবাদ করেছেন যে, তাদের ওজর গ্রহণ করা হবে না। আল্লামা মহল্লী (র.) এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন لَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْعُتْبٰى অর্থাৎ اَلرُّجُوْعُ إِلٰى مَا يَرْضَى اللّٰهُ এই জালেমদের থেকে তওবা চাওয়া হবে না। অর্থাৎ এরূপ আমলের দিকে ফিরে আসার জন্য বলা হবে না। যার দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। ইমাম বগভী (র.) مَعَالِمٌ -এ লিখেছেন لَا يُكَلَّفُوْنَ أَنْ يَرْضَوْا رَبَّهُمْ لِأَنَّ الْاٰخِرَةَ لَيْسَتْ بِدَارِ التَّكْلِيْفِ কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহকে সন্তুষ্টর করার مُكَلَّفٌ হবে না। কেননা পরকাল دَارُ تَكْلِيْفٍ নয়। বরং প্রতিদান

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পাওয়ার স্থান। صَاوِىْ বলেছেন اَلْعُتْبٰى হলো اَلرُّجْعٰى -এর মতো ওজন ও অর্থের ক্ষেত্রে। আর لَا يُسْتَعْتَبُوْنَ অর্থ হলো পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হবে না। অন্যান্য আয়াতেও এ বিষয় বস্তুটি উল্লিখিত হয়েছে যে, কাফের মুশরিকরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করবে যে, আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে একটু সুযোগ দিন। যাতে অতীতের কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ করতে পারি।

قَوْلُهُ لَيَقُوْلَنَّ : এর পরের ইবারত ব্যাখ্যাকারের কলমের পদস্খলন মাত্র। সম্ভবত جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبْ -এর সীগাহ মনে করে উল্লিখিত تَعْلِيْل করেছেন। অন্যথা সকল কারীগণের ঐক্যমত্যে لَيَقُوْلَنَّ -এর لَامْ বর্ণে যবর হয়েছে আর اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا হলো فَاعِلْ

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ : এটা شَرْط مَحْذُوْف -এর جَزَاء হয়েছে। অর্থাৎ اَىْ اِذَا عَلِمْتَ حَالَهُمْ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ فَاصْبِرْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই সূরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোনোভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যুক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্য সে শক্তি লাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির জমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

قَوْلُهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ : বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও কতটুকু দুর্বল; বরং তুমি তো সাক্ষাৎ দুর্বলতা ছিলে। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরো বেশি চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়; বরং ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোনো বিশাল ওয়ার্কশপে নয়; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা না খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ : এরপর আল্লাহ তা'আলার তার বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হলো। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতাপিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাড়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার অবর্তমান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট এ দুটি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারো এরূপ করার শক্তি ছিল না। এতো এক ক্ষীণ শিশু। একটা বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোনো প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোনো কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবনকাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নমুনা সামনে আসবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ ضُعْفٍ قُوَّةً : এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে। এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً [আমার চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে?] এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তার বিধানাবলির অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন- ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয় নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ অর্থাৎ এগুলো সব সেই রাব্বুল ইজ্জতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছে وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলিতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাসের মধ্যে হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরজখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপার উল্টা হয়ে গেছে। আমরা বরজখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাজির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্য সুখকর নয়; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আজাব ভোগ করবে, কিন্তু কিয়ামতের আজাবের তুলনায় সেই আজাব আজাব-ই নয়, সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

হাশরে আল্লাহ তা'আলার সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশি থাকি না। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে- وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ তারা কসম খেয়ে বলবে, আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা যে কোনো বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণ মাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হবে এবং তার হস্তপদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোনো প্রমাণ আবশ্যক হবে না। اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا الخ আয়াতের অর্থ তা-ই। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে, মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন- ইরশাদ হয়েছে- لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না : এর বিপরীতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে? তখন সে বলবে هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِيْ অর্থাৎ হায়, হায় আমি কিছু জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে আমার পালনকর্তা আল্লাহ, বলে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফেররা আল্লাহর সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তারা রাখে না। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফের ও পাপাচারীই কবরের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনোরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

سُوْرَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ : সূরা লোকমান মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ الْآيَتَيْنِ فَمَدَنِيَّتَانِ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَثَلٰثُوْنَ آيَةً

وَلَوْ مَا فِي الْأَرْضِ الخ এতে থেকে দুটি আয়াত ব্যতীত এতে ৩৪টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. الٓمّٓ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهٖ -

٢. تِلْكَ أَيْ هٰذِهِ الْآيَاتُ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ذِي الْحِكْمَةِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنٰى مِنْ هُوَ -

٣. هُدًى وَّرَحْمَةً بِالرَّفْعِ لِلْمُحْسِنِيْنَ وَفِيْ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ بِالنَّصَبِ حَالًا مِنَ الْآيَاتِ الْعَامِلُ فِيْهَا مَا فِيْ تِلْكَ مِنْ مَعْنَى الْإِشَارَةِ -

٤. اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ بَيَانٌ لِلْمُحْسِنِيْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ هُمُ الثَّانِيْ تَاكِيْدٌ -

٥. أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ -

٦. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ أَيْ مَا يُلْهِيْ مِنْهُ عَمَّا يَعْنِيْ لِيُضِلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَرِيْقِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا بِالنَّصَبِ عَطْفًا عَلٰى يُضِلَّ وَبِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى يَشْتَرِيْ هُزُوًا ط مَهْزُوًّا بِهَا أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ إِهَانَةٍ -

অনুবাদ :

১. আলিফ লাম মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত রয়েছেন।

২. এগুলো অর্থাৎ এই আয়াতসমূহ প্রজ্ঞাময় কিতাব কুরআনের আয়াত। এতে اٰيٰتُ الْكِتٰبِ-এর ইজাফতটি إِضَافَتْ بِمَعْنٰى مِنْ তথা مِنْ-এর অর্থ প্রদানকারী ইজাফত।

৩. হেদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। رَحْمَةٌ টি পেশবিশিষ্ট এবং অধিকাংশ কেরাত মতে তা নসব পড়বে তখন তা اٰيَاتٌ থেকে حَالٌ তথা অবস্থাবোধক পদ হবে। তখন এতে আমলকারী পদ তথা عَامِلٌ হলো تِلْكَ ইসমে ইশারা থেকে অর্থগতভাবে সৃষ্ট ক্রিয়া বা فِعْلٌ অর্থাৎ أُشِيْرُ।

৪. যারা সালাত কায়েম করে, তা مُحْسِنِيْنَ-এর بَيَانٌ বা স্পষ্টকারী পদ জাকাত দেয় এবং আখেরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এতে দ্বিতীয় هُمْ সর্বনামটি তাকিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. এসব লোকই তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আগত হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম।

৬. এক শ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ইসলামের পথ থেকে গুমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথাবার্তা অর্থাৎ ঐ সমস্ত বস্তু যার কারণে মানুষ মূল উদ্দেশ্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে। সংগ্রহ করে মূর্খতার কারণে لِيُضِلَّ-এর ى-এর মধ্যে যবর ও পেশ উভয়টা পড়া যায়। এবং তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে يَتَّخِذَ-এর ذ-এর মধ্যে যবর পড়লে يُضِلَّ-এর উপর আতফ হবে আর পেশ পড়লে يَشْتَرِيْ-এর উপর আতফ হবে এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا مُتَكَبِّرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ صَمَمًا وَجُمْلَتَا التَّشْبِيْهِ حَالَانِ مِنْ ضَمِيْرِ وَلّٰى اَوِ الثَّانِيَةُ بَيَانٌ لِّلْاُوْلٰى فَبَشِّرْهُ اَعْلِمْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ . مُؤْلِمٍ وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ بِهٖ وَهُوَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ كَانَ يَاْتِى الْحِيْرَةَ يَتَّجِرُ فَيَشْتَرِىْ كُتُبَ اَخْبَارِ الْاَعَاجِمِ وَيُحَدِّثُ بِهَا اَهْلَ مَكَّةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُكُمْ اَحَادِيْثَ عَادٍ وَثَمُوْدَ وَاَنَا اُحَدِّثُكُمْ اَحَادِيْثَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ فَيَسْتَمْلِحُوْنَ حَدِيْثَهٗ وَيَتْرُكُوْنَ اِسْتِمَاعَ الْقُرْاٰنِ .

৭. যখন ওদের সামনে আমার আয়াতসমূহ কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা অহংকারের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওদের দু'কান বধির। এখানে তাশবীহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত উল্লিখিত উভয়টি বাক্য অর্থাৎ كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ও كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا - وَلّٰى -এর সর্বনাম থেকে حَالٌ বা দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের জন্য بَيَانٌ হবে। সুতরাং তাদেরকে কষ্টদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। এখানে তাদের সাথে বিদ্রূপমূলক শাস্তির সংবাদকে বাশারাত তথা সু-সংবাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সে হলো, নযর ইবনে হারেস তিনি ব্যবসায়িক কাজে খিয়ারাহ যেত এবং সেখান থেকে আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনত এবং মক্কার অধিবাসীদের নিকট তা পাঠ করে শুনাতো এবং বলতেন, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, ছামূদ সম্প্রদায়ের কাহিনী শোনায় এবং আমি তোমাদেরকে পারস্য ও রূমের কাহিনী শোনাব। এবং তারা তা পছন্দ করল ও কুরআন শোনা থেকে বিরত থাকল।

٨. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ .

৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতে ভরা জান্নাত।

٩. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا اِذَا دَخَلُوْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط اَىْ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ وَحَقَّهٗ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الَّذِىْ لَا يَغْلِبُهٗ شَىْءٌ فَيَمْنَعُهٗ عَنْ اِنْجَازِ وَعْدِهٖ وَ وَعِيْدِهٖ الْحَكِيْمُ الَّذِىْ لَا يَضَعُ شَيْئًا اِلَّا فِىْ مَحَلِّهٖ .

৯. যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এখানে خٰلِدِيْنَ শব্দটি حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ তাদের সর্বদা জান্নাতে অবস্থান করা নির্ধারণ হয়ে গেছে যখন তারা সেখানে প্রবেশ করে। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা যথার্থ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যথার্থ ওয়াদা করেছেন। তিনি পরাক্রমশালী কেউ তাকে পরাজয় করতে পারে না। অতএব কেউ তাকে তার ওয়াদা পূরণ করতে বাধা দিতে পারবে না। ও প্রজ্ঞাময় যিনি প্রত্যেক বস্তু তার উপযুক্ত স্থানেই রাখে।

١٠. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اَىِ الْعَمَدَ جَمْعُ عِمَادٍ وَهُوَ الْاُسْطُوَانَةُ وَهُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَّا عَمَدَ اَصْلًا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ جِبَالًا مُرْتَفِعَةً اَنْ لَا تَمِيْدَ تَتَحَرَّكَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ط وَاَنْزَلْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ صِنْفٍ حَسَنٍ .

১০. তিনি খুঁটি ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। اَلْعَمَدُ শব্দটি عِمَادٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ খুঁটি। যখন কোনো খুঁটি হয় না তখন বাক্যটি বলা হয়। যেমন তোমরা তা দেখছ! তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন উঁচু উঁচু পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে নড়াচড়া না করে। এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জন্তু। আমি এখানে غَائِبٌ থেকে مُتَكَلِّمٌ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর তাতে উদগত করেছি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١. هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ اَىْ مَخْلُوْقُهٗ فَاَرُوْنِىْ اَخْبِرُوْنِىْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط غَيْرِهٖ اَىْ اٰلِهَتُكُمْ حَتّٰى اَشْرَكْتُمُوْهَا بِهٖ تَعَالٰى وَمَا اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ مُبْتَدَأٌ وَذَا بِمَعْنَى الَّذِىْ بِصِلَتِهٖ خَبَرُهٗ وَاَرُوْنِىْ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ وَمَا بَعْدَهٗ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ بِاِشْرَاكِهِمْ وَاَنْتُمْ مِنْهُمْ -

১১. এটা আল্লাহর সৃষ্টি অর্থাৎ তার মাখলূক, মাসদার خَلْق مَفْعُوْل -এর অর্থে। অতঃপর হে আহলে মক্কা তোমরা আমাকে দেখাও খবর দাও তিনি ব্যতীত অন্যরা অর্থাৎ তোমাদের মাবুদগণ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক কর যা সৃষ্টি করেছে। এখানে مَا শব্দটি অস্বীকারমূলক প্রশ্নবোধক শব্দ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ হয়ে মুবতাদা আর ذَا শব্দটি اَلَّذِىْ অর্থে اِسْمُ مَوْصُوْل অতঃপর اَرُوْنِىْ তার পরবর্তী صِلَةٌ সহ খবর। এবং اِسْمُ مَوْصُوْل তার আমল থেকে বিরত রয়েছে। আর পরবর্তী বাক্য দুটি মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। বরং জালেমরা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। এখানে بَلْ ইনতিকাল এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَىْ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ : تِلْكَ ইসমে ইশারা بَعِيْد -এর তাফসীর। هٰذِهٖ ইসমে ইশারা قَرِيْب দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, সূরাসমূহের আয়াত আল্লাহ তা'আলর নিকট মর্যাদার দিক থেকে উচ্চ মর্যাদাশীল। যদিও মেধা থেকে নিটবর্তী হয়। هُوَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, هُدًى وَّرَحْمَةً হলো উহ্য মুবতাদার খবর। আর যদি هُدًى এবং رَحْمَةً মানসূব হয় তবে আয়াত থেকে حَالٌ হবে। আর تِلْكَ টা يُشِيْرُ -এর অর্থে হয়ে আমেল হবে।

قَوْلُهٗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ : এর পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার মুমিনদের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে تَقَابُلْ -এর ভিত্তিতে বদকার মুশরিকদের আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে নেককারদের গুণাবলির উল্লেখ ছিল। আর এই আয়াতে মুশরিকদের গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে। وَمِنَ النَّاسِ -এর মধ্যস্থ مِنْ টি تَبْعِيْضِيَّةٌ শানে নুযূলের ভিত্তিতে যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি নজর ইবনে হারেছ ইবনে কালদাহ উদ্দেশ্য। কিন্তু শব্দ ব্যাপক যাতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর সাথে সম্পর্কশীল প্রত্যেক ব্যক্তিই এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ لَهْوَ : এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এরূপ অহেতুক কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে উপকারী কর্ম ছুটে যায়। এখানে মাসদারটা اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সেই বেহুদা কথাবার্তা গাফেল করে দেয়। لَهْوَ الْحَدِيْثِ এটা اِضَافَتْ مِنِيَّةٌ -এর অন্তর্গত। যেমনটি ব্যাখ্যাকার مِنْهُ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন মূলে لَهْوًا مِنَ الْحَدِيْثِ ছিল।

قَوْلُهٗ مَا يُلْهِىْ : এটা বাবে سَمِعَ -এর مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ।

قَوْلُهٗ عَمَّا : অর্থাৎ সেই বস্তু যা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখন لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর অর্থ হবে ঐ বস্তু যা ফলদায়ক ও কার্যকর বিষয় হতে গাফেল করে দেয়।

قَوْلُهٗ لِيُضِلَّ : لِيَضِلَّ এবং لِيُضِلَّ উভয় কেরাতই প্রচলিত রয়েছে। لِيَضِلَّ -এর সুরতে অনুবাদ হবে যে, সে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -কে এইজন্য ক্রয় করে যে, বাজে কথা ও বেহুদা কিসসা কাহিনীতে সর্বদা লিপ্ত থেকে পথভ্রষ্ট থাকবে। আর দ্বিতীয় সুরতে অর্থ হবে– যাতে সে অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। অর্থাৎ নিজেও পথভ্রষ্ট এবং অপরকেও ভ্রষ্টকারী।

قَوْلُهٗ صَمَمًا : এটা وَقْرًا -এর তাফসীর। وَقْر বধিরকে বলে যা অনুভূত ও খারেজী বস্তু। এখানে مَعْنَوِىْ বধিরতা উদ্দেশ্য। আর তা হলো ভাবত্ব এবং বধিরতা শ্রবণ না করা বা শ্রবণ করে আমল না করাকে وَقْر দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْهُ اَىْ اَعْلِمْهُ : بَشِّرْهُ -এর তাফসীর اَعْلِمْهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে সুসংবাদ প্রদান করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা عَذَابٍ اَلِيْمٍ -এর সুসংবাদের কোনো অর্থই হতে পারে না। কেননা সুসংবাদ ভালো সংবাদেরই হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হলো مُطْلَقًا সংবাদ দেওয়া।

قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْبِشَارَةِ تَهَكُّمٌ : এটা فَبَشِّرْهُ -এর দ্বিতীয় তাফসীর। ব্যাখ্যাকার (র.) -এর জন্য উচিত ছিল এখানে وَاوْ -এর পরিবর্তে اَوْ বলা। দ্বিতীয় তাফসীরের সার হলো এই যে, এখানে সুসংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুসংবাদই তবে এটা বিদ্রূপাত্মক হবে।

قَوْلُهُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا : এটা جَنّٰتٌ অথাব لَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالْ مُقَدَّرَةٌ হয়েছে। কেননা حَالْ এবং ذُو الْحَالِ -এর জমানা এক হওয়া জরুরি।

قَوْلُهُ وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ : এই তাফসীর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, وَعْدًا হলো মাসদার স্বীয় ফে'লের স্থানে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ ফে'ল কে ফেলে দিয়ে মাসদারকে তার জায়গায় রেখে দিয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَعَدَ هُمُ اللّٰهُ وَعْدًا আর وَعْدًا মাসদার مُؤَكِّدٌ لِنَفْسِهٖ হয়েছে। কেননা আল্লাহর বাণী لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ অর্থের ক্ষেত্রে وَعَدَهُمُ اللّٰهُ ذٰلِكَ আর حَقًّا হলো মাসদার مُؤَكِّدٌ لِغَيْرِهٖ কেননা প্রতিটি ওয়াদা সত্য হয় না।

قَوْلُهُ اَسْطُوَانَةٌ : একবচন; বহুবচনে اَسَاطِيْنُ অর্থ– স্তম্ভ, খুঁটি, পিলার।

قَوْلُهُ هُوَ صَادِقٌ بِاَنْ لَّا عَمَدَ اَصْلًا : ব্যাখ্যাকার (র.) উল্লিখিত ইবারত দ্বারা بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا -এর দুটি অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা আসমানকে এমন স্তম্ভসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা তোমরা দেখতে পাও না। এর অপর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আসমানকে কোনো স্তম্ভ ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন যাকে তোমরা দেখ না। আর এর তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো আকাশকে স্তম্ভবিহীন সৃষ্টি করেছেন। কেননা যখন আকাশের খুটিই নেই তখন দৃষ্টিতে কোথা থেকে আসবে? কেননা سَالِبَةٌ বাক্য যেভাবে مَوْضُوْعٌ -এর জন্য مَحْمُوْلٌ -কে প্রমাণিত না হওয়ার সুরতে صَادِقٌ আসে তেমনিভাবে مَوْضُوْعٌ শুরু থেকেই বিদ্যমান না হওয়ার সুরতেও صَادِقٌ আসে। যায়দ যদি বসা হয় তাহলে زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ বলা বৈধ। আর যদি জায়েদ পৃথিবীতে না-ই থাকে তবুও زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ সাদেক আসে।

قَوْلُهُ لِاَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ : মুফাসসির (র.) لَامْ تَعْلِيْل এবং لَائِے نَافِيَةٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর কম্পন রোধ করা।

قَوْلُهُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ : غَيْرَهٗ হলো دُوْنَهٗ -এর তাফসীর। আর اٰلِهَتُكُمْ হলো اَلَّذِيْنَ -এর তাফসীর। আর مَاذَا -এর মধ্যস্থ مَا টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ এবং মুবতাদা আর ذَا হলো اَلَّذِىْ অর্থে। اَلَّذِىْ স্বীয় صِلَةٌ সহ খবর হয়েছে। আর عَائِدْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مَا الَّذِىْ خَلَقَهٗ আর اَرُوْنِىْ হলো শাব্দিকভাবে مَمْنُوْعُ الْعَمَلِ কেননা مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ এর প্রথমে পতিত হয়েছে। যদি اَرُوْنِىْ -কে আমল দেওয়া হয় তবে مَائے اِسْتِفْهَامِيَّةٌ -এর صَدَارَتْ كَلَامْ [বাক্যের শুরুতে হওয়া] বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ مَا بَعْدَهٗ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ : এটা সেই সুরতে বৈধ হবে যখন اَرُوْنِىْ কে مُتَعَدِّىْ بِهٖ مَفْعُوْلٌ মানা হবে। এই সুরতে প্রথম মাফউল হলো اَرُوْنِىْ -এর ى আর পরের বাক্য দু'মাফউলের স্থলাভিষিক্ত হবে। কিন্তু এটা তার বিপরীত যা বর্ণনা করা হয়েছে। আর اَرٰى যখন اَخْبِرْ -এর অর্থে হবে তখন مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْلْ হবে। যেমনটি এখানে হয়েছে। কাজেই এই সুরতে ব্যাখ্যাকারের سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ বলা সমুচিত মনে হয় না, বরং سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ বললে উত্তম হতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ সূরার নামকরণ :

এ সূরায় লোকমান হাকীমের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাই সূরাটির এ নামকরণ করা হয়েছে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত লোকমান অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। শুধু ইকরিমার অভিমত উদ্ধৃত করা হয় যে, তিনি নবী ছিলেন। তবে এর সূত্র অত্যন্ত দুর্বল। তিনি সুদানের অধিবাসী ছিলেন। তার পেশা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক অভিমত পোষণ করেছেন। কেউ বলেন, তিনি জীবনের সূচনায় কাঠ মিস্ত্রির কাজ করতেন। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দর্জী। আর কেউ বলেন, তিনি বকরি চরাতেন। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ভাগ্নেয়। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত আইয়ূব (আ.)-এর খালাতো ভাই। আর তিনি হযরত আইয়ূব (আ.)-এর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তিনি সুদীর্ঘ বয়স পেয়েছেন। এমনকি তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর জমানা পেয়েছেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুয়ত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বনী ইসরাঈলের কাজী এবং মুফতি ছিলেন। যখন হযরত দাউদ (আ.) প্রেরিত হলেন তখন তিনি ফতোয়া প্রদান পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন, নবীর বর্তমান থাকাই যথেষ্ট অর্থাৎ নবীর বর্তমানে অন্যেরা ফতোয়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। জনসাধারণের হেদায়েতের জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী সূরার শেষ আয়াতে .... وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং অলৌকিকত্বের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কুরআনের সত্যতার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে। এ মর্মে যে, এই কিতাব কুরআনে কারীম হলো, রহমতের কিতাব, হেদায়েতের কিতাব এবং এর প্রত্যেকটি কথা হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত। অতএব, এই গ্রন্থকে গ্রহণ করা এবং এর প্রতি ঈমান আনা সৌভাগ্যের লক্ষণ।

পক্ষান্তরে এই কিতাব গ্রহণ না করা এবং গান-বাজনা, নভেল-নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হওয়া দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

- ✪ আল্লাহ পাক এ সূরায় লোকমান হাকীমের মূল্যবান উপদেশের উল্লেখ করেছেন এবং তাতে তৌহীদের সত্যতা, শিরকের বাতুলতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং নেক আমলের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং মন্দ কাজ পরিহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ✪ পূর্ববর্তী সূরায় আখেরাতের উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আখেরাতের উল্লেখের পাশাপাশি তার কিছু দলিল প্রমাণও বর্ণিত হয়েছে।
- ✪ পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে সে সব লোকের কথার উল্লেখ ছিল যারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর আস্থা স্থাপন করে। আর এই সূরার শুরুতে সেসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা রক্ষা করে।
- ✪ পূর্ববর্তী সূরার শেষে কিয়ামতের উল্লেখ ছিল। আর এ সূরার শেষে ঘোষণা করা হয়েছে, কিয়ামত সম্বন্ধে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা।

মোটকথা, এ সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা নেককার বদকারের অবস্থা এবং পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। যেহেতু এ সূরা মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে, আর নাজিল হওয়ার সময় মক্কা শরীফে উভয় দল উপস্থিত ছিল। তাই নেককার হলেন সে যুগের মুহাজিরগণ, আর বদকার হলো যারা ইসলামে সেদিন বাধা দিয়েছিল।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, ইবনে মরদবিয়া, বায়হাকী দালায়েলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরায়ে লোকমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য অন্য সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আর একটি কথাও বর্ণিত হয়েছে সে সূরায়ে লোকমানের তিনটি আয়াত ব্যতীত সবই মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য সূরায় ৪ রুকূ, ৩৪ আয়াত, ৭৪৮ বাক্য ও ২১১০খানি অক্ষর রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ : মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে জাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল জাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হিজরতের দ্বিতীয় সনে জাকাতের বিধান কার্যকর হয় বলে যে খ্যাতি আছে, এর অর্থ এই যে, জাকাতের নিসাব নির্ধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরি দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

সূরা মুজ্জাম্মিলের اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ আয়াতের অধীনে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) এ বক্তব্যই সপ্রমাণ করেছেন। কেননা সূরা মুজ্জাম্মিল কুরআন অবতরণের প্রাথমিককালে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ থেকে জানা যায় যে, কুরআন পাকের আয়াতসমূহ যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাজ ও জাকাত একত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি এগুলো ফরজও সাথে সাথেই হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ : اِشْتَرَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোনো কোনো সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اِشْتَرَاءٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। اِشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে সফর করতো। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে আদ, ছামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসফেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না, যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়। বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক যারা এর আগে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখতো এবং গোপনে শুনতও তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুঁতা পেয়ে গেল।

-[রূহুল মা'আনী]

দূররে মানসূর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফিরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শুনাবার জন্য সে বাঁদীকে আদেশ করতো ও বলতো মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামাজ পড়া, রোজা রাখা এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিস্সা কাহিনী অথবা গায়িকা বাদী ক্রয় করা। শানে নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اِشْتَرَاءٌ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ-এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اِشْتَرَاءٌ শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এতে দাখিল।

لَهْوَ الْحَدِيْثِ বাক্যটিতে حَدِيْثٌ শব্দের অর্থ কথা, কিস্সা-কাহিনী গাফেল হওয়া, যেসব মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয়, সেগুলোকে لَهْو বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لَهْو বলা হয়, যার কোনো উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ-এর অর্থ ও তাফসীর কি এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এর তাফসীর করা হয়েছে গানবাদ্য করা। -[হাকিম, বায়হাকী]

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিস্সা কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْثِ বুখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْثِ-এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন- لَهْوَ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهٗ অর্থাৎ لَهْوَ الْحَدِيْثِ বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বুঝানো হয়েছে [যা আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়]। বায়হাকীতে আছে- لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, ইবনে জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي আয়াত নাজিল হয়েছে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, অপমানজনক শাস্তি বলার কারণে মুমিন এবং কাফেরদের শাস্তির পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। আখেরাতে গুনাহগার মু'মিনদেরও শাস্তি হবে, তবে তা হবে তাদেরকে পবিত্র করার জন্য, অপমান করার জন্যে নয়, আর কাফেরদের শাস্তি হবে অপমানজনক, অর্থাৎ তারা শুধু শাস্তিই ভোগ করবে না; বরং অপমানিতও হবে।

নাফরমানির শাস্তি দুনিয়াতেও হয় : আলোচ্য আয়াতে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা শুধু যে আখেরাতে হবে তাই নয়, দুনিয়াতেও উপরোল্লিখিত অন্যায় অনাচারের শাস্তি হতে পারে। হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক মদ্য পান করবে এবং মদের অন্য কোনো নাম দিয়ে দেবে। তাদের সম্মুখে বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেবেন তাদের কিছু কিছু লোককে বানর এবং শুকরেও পরিণত করবেন। -[ইবনে মাজাহ]

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আমার উম্মত পনেরোটি কাজ করবে তখন তাদের উপর বালা-মসিবত নাজিল হবে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! ঐ কাজগুলো কি কি? তিনি ইরশাদ করলেন-

১. যখন গণিমতের মালকে সম্পদ মনে করা হবে। [অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ রোজগারের জন্যে জিহাদ করা হবে।]

২. যখন আমানতের মালকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মনে করা হবে।

৩. যখন জাকাতকে বোঝা মনে করা হবে।

৪. যখন স্বামী স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে।

৫. সন্তান তার মায়ের অবাধ্য হবে।

৬. বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।

৭. নিজের পিতার উপর জুলুম করবে।

৮. যখন মসজিদে শোরগোল হবে।

৯. যখন সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

১০. মন্দ ও দুষ্ট লোকের সম্মান এজন্যে করা হবে যেন তার দুষ্টুমি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

১১. মদ্য পান করা হবে।

১২. রেশমী কাপড় পরিধান করা হবে। [অর্থাৎ পুরুষেরা রেশমী কাপড় পরবে]।

১৩. গায়িকাদেরকে রাখা হবে।

১৪. বাজনা, ঢোল, তবলা ব্যবহার করা হবে।

১৫. পরবর্তী কালের লোকেরা পূর্ব কালের লোকদেরকে লা'নত দিবে, এমন সময় ঝড়-তুফান এবং জমিন ধ্বসিয়ে দেওয়ার শাস্তি আপতিত হতে পারে।

কোনো কোনো তাফসীরকার লিখেছেন, আখেরাতের সকল আজাবই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে তবে উপরোল্লিখিত অন্যায়কারীদের শাস্তি কঠোর হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত অপমানজনকও হবে যে বা যারা সারা জীবন ইসলামের অবমাননা করেছে সত্য দীনের প্রতি উপহাস করেছে তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা থাকাই যুক্তিযুক্ত।

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, উপরোল্লিখিত অপরাধসমূহের প্রকৃত শাস্তি তো আখেরাতেই হবে তবে দুনিয়াতেও এমন লোকদের জন্যে কঠিন-কঠোর শাস্তি রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দূরারোগ্য ব্যাধি, মহামারীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

-[তাফসীরে মাজেদী]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে বহু হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমরা তন্মধ্যে থেকে এ পর্যায়ে দু'একখানি উদ্ধৃতি দেওয়া জরুরি মনে করি।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইবনে আবিদদুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত নাফে'র কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। পথে পথে একস্থানে একটি বাজনার আওয়াজ শ্রুত হলো। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তার দুই কানে দুটি আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এরপর অন্য পথে চললেন। তখন একথা জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, "হে নাফে' এখন সেই বাজনার আওয়াজ শুনা যায়? আমি যখন না সূচক জবাব দিলাম তখন তিনি তার কান থেকে অঙ্গুলি বের করলেন. এবং বললেন, আমি স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি তিনিও এমনিভাবে কর্ণ কুহরে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়েছেন।

ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে ব্যক্তির সম্পর্কে যে একটি গায়িকা ক্রয় করে, আর ঐ গায়িকা দিন রাত গান গাইতো। [অর্থাৎ নজর ইবনে হারেছ]।

হযরত রাফে ইবনে হাবসুল মাদানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারজন মহিলার দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না, তন্মধ্যে জাদুকর ও গায়িকা রয়েছে। -[তাফসীরে আদ্ দুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ১৭৪]

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মাকরূহ হওয়া। -[রূহুল মা'আনী, কাশশাফ]

আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلٰثَةً اِنْتِضَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَادِيْبُكَ لِفَرَسِكَ وَمُلَاعَبَتُكَ لِاَهْلِكَ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ. অর্থাৎ পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল। কিন্তু তিনটি বাতিল নয়- ১. তীরধনুক নিয়ে খেলা, ২. অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং ৩. নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরস্যের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল, সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোনো উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী কাজ। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত আছে। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যত ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলে দেওয়া হয়েছে, নতুবা প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলাই নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরো অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যত সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ বরং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা অর্থাৎ যাতে কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো সব অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মাকরূহ তানযিহী অর্থাৎ অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনোটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর হাদীসে একথা পরিষ্কার ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসের ভাষ্য এরূপ-

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ ثَلَاثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ اَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ.

এ হাদীস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিন্দনীয়। অতঃপর খেলার নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

১. যে খেলা দীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর, যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আজাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। কারণ আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্টর করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

২. যে খেলা মানুষকে ইসলামি বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোনো হারাম কাজে ও গুনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়। কিন্তু হারাম ও কঠোর গুনাহ, যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতের সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামাজ রোজা ইত্যাদি ফরজ কর্মের অন্তরায় হয়।

অশ্লীল ও বাজে নভেল, অশ্লীল কবিতা এবং বাতিল পন্থিদের পুস্তক পাঠ করাও নাজায়েজ : বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক অশ্লীল নভেল, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরিউক্ত হারাম খেলার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিল পন্থিদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় নাজায়েজ তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জবাব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তি নেই।

৩. যে সব খেলায় কুফর নেই কোনো প্রকার গুনাহ নেই, সেগুলো মাকরূহ। কারণ এতে অনর্থক কাজে আপন শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান : উপরিউক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজসরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজসরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয় সেগুলো ক্রয় বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা : পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেই খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় ও পার্থিক উপকারিতা লাভের জন্য অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য খেলা হয়, সেই খেলা শরিয়ত অনুমোদন করে যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে ছওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে, তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, خَيْرُ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ السِّبَاحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ অর্থাৎ মুমিনের শ্রেষ্ঠ সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা।

সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারতো না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন, কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় অনুশীলন করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।

–[আবূ দাউদ]

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলাকৌশল অনুশীলন কল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেরায় প্রবৃত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে নিজের পশ্চাতে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন– اِلْهُوا وَالْعَبُوا অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। –[বায়হাকী, কানয]

কতক রেওয়ায়েতে আরো আছে– فَإِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ يُرَى فِيْ دِيْنِكُمْ غِلْظَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক। এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কতক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তারা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্য মাঝে মাঝে আরবের প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً অর্থাৎ তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে। –[আবূ দাউদ] এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্য কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হলো।

এসব বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের নিয়তেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো لَهْو তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ : এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়। যেমন- দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলে হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। -[নসবুররায়াহ]

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। -[আবূ দাউদ, কান্‌য]

এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরি কাজকর্ম এমনকি নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লিখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ-এর তাফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক তাফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন প্রত্যেক খেলা বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়। তাঁদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে।

কুরআন পাকের لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেম زُوْر শব্দের তাফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান বর্ণিত হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ اللّٰهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ. আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি-বিকৃত করে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরো বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম। -[আহমদ, আবূ দাউদ]

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَعَقَّ اُمَّهُ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهُ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন জিহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, জাকাতকে জরিমানার মতো কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লালবর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমি ধ্বসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশমান হতে থাকবে, যেমন কোনো মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্র যেসব গুনাহ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সংবাদ দিয়ে গেছেন এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপীদের উপর আসমানি আজাব নাজিল হবে এবং কিয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যাবে। মেয়েদের নৃত্যগীত এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ যথা– তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও এ পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতদভিন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে যাতে গানবাদ্য হারাম ও নাজায়েজ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় : অপর পক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরিউক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোনো কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোনো নারী বা কিশোর না হয়, তবে জায়েজ।

কোনো কোনো সুফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এ ধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা তাদের শরিয়তের অনুসরণ ও রাসূল ﷺ -এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সুফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا : এই একই বিষয়ে পূর্ব আলোচিত সূরায়ে রা'দের প্রথমদিকে এক আয়াত রয়েছে– اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ব্যাকারণগত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের দুটি অর্থ হতে পারে–

১. تَرَوْنَهَا -কে عَمَدٌ -এর صِفَتٌ [বিশেষণ] রূপে পরিগণিত করে এর ضَمِيْرٌ [সর্বনাম]-কে عَمَدٌ -এর প্রতি ধাবিত করা তখন অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তখন বোঝা গেল যে, বিশাল ছাদরূপে এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এ তাফসীর হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) কৃত। –[ইবনে কাছীর]

২. تَرَوْنَهَا -এর ضَمِيْرٌ [সর্বনাম] سَمٰوٰتٌ -এর দিকে ধাবিত। এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বাক্য বলে পরিগণিত হবে। অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে পাচ্ছ, মহান আল্লাহ সেগুলোকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম বাক্য প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আকাশ স্তম্ভসমূহের উপর সংস্থাপিত, সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও; সেগুলো অদৃশ্য বস্তু। এটা হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র.) কৃত তাফসীর। –[ইবনে কাছীর]

সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোনো স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তার অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতিবিজ্ঞানীগণ বলেন এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুকে সাধারণত কোনো স্তম্ভ থাকে না। তা হলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বিশেষত্ব আছে?

এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, কুরআনে কারীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে, যা বাহ্যত গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই কুরআনে কারীম একে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মতো পরিদৃষ্ট হয় যা নির্মাণের জন্য সাধারণত স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণতভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে কাছীর এবং কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কুরআন হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না; বরং কুরআনের কতক আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা গুম্বুজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য আরশের পাদদেশে পৌছে সিজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে আকাশ ও পূর্ণ গোলাকার না হলে পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধ্ব ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে। পরিপূর্ণ গোলকের কোনো দিককে উপর বা নিচ বলা চলে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٢. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالدِّيَانَةُ وَالْاِصَابَةُ فِى الْقَوْلِ وَحِكْمَةٌ كَثِيْرَةٌ مَأْثُوْرَةٌ كَانَ يُفْتِىْ قَبْلَ بِعْثَةِ دَاؤُد وَادْرَكَ زَمَنَهُ وَاَخَذَ مِنْهُ الْعِلْمَ وَتَرَكَ الْفُتْيَا وَقَالَ فِىْ ذٰلِكَ اَلَا اَكْتَفِىْ اِذَا كُفِيْتُ وَقِيْلَ لَهُ اَىُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ الَّذِىْ لَا يُبَالِىْ اَنْ رَاٰهُ النَّاسُ مُسِيْئًا اَنْ اَىْ وَقُلْنَا لَهُ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ط عَلٰى مَا اَعْطَاكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج لِاَنَّ ثَوَابَ شُكْرِهٖ لَهُ وَمَنْ كَفَرَ النِّعْمَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْ خَلْقِهٖ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ فِىْ صُنْعِهٖ .

١٣. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ تَصْغِيْرُ اِشْفَاقٍ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ بِاللّٰهِ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ فَرَجَعَ اِلَيْهِ وَاَسْلَمَ .

١٤. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج اَمَرْنَاهُ اَنْ يَبَرَّهُمَا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ فَوَهَنَتْ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ اَىْ ضَعُفَتْ لِلْحَمْلِ وَضَعُفَتْ لِلطَّلْقِ وَضَعُفَتْ لِلْوِلَادَةِ وَفِصٰلُهٗ فِطَامُهٗ فِىْ عَامَيْنِ وَقُلْنَا لَهٗ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ اَىِ الْمَرْجِعُ .

অনুবাদ :

১২. আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা ইলম , দিয়ানত ও সত্যবাদিতা দান করেছি। তার অনেক প্রজ্ঞাময় কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি হযরত দাউদ (আ.) -এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগে ছিলেন ও তার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, আমি কি পরিসমাপ্তি হব না যখন আমাকে পরিসমাপ্ত করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি? তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট যে এর পরোয়া করে না যে, লোকেরা তাকে মন্দ বলবে। এই মর্মে যে, অর্থাৎ আমি তাকে বলেছি তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও তিনি তোমাকে যা হিকমত দান করেছেন তার উপর এবং যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। কেননা তার কৃতজ্ঞতার ছওয়াব তার জন্যেই আর যে অকৃতজ্ঞ হয় নিয়ামতের উপর নিশ্চয় আল্লাহ তার সৃষ্ট থেকে অভাবমুক্ত, প্রশংসিত তার কর্মের উপর।

১৩. তুমি উল্লেখ কর যখন হযরত লোকমান (আ.) উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস! اِبْن টি بُنَىَّ -এর তাসগীর দয়া ও অনুগ্রহমূলক তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা মহা অন্যায়। অতঃপর সে হযরত লোকমান (আ.)-এর কথা গ্রহণ করল এবং ইসলাম কবুল করল।

১৪. আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে অর্থাৎ গর্ভধারণের কষ্ট, জন্ম দেওয়ার কষ্ট ও স্তন্যদানের কষ্ট গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٥. وَإِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ مُوَافِقَةٌ لِلْوَاقِعِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز أَيْ بِالْمَعْرُوْفِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ طَرِيْقَ مَنْ أَنَابَ رَجَعَ إِلَيَّ ج بِالطَّاعَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. فَأُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ وَجُمْلَةُ الْوَصِيَّةِ وَمَا بَعْدَهَا اِعْتِرَاضٌ.

১৫. পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক করতে বাধ্য করে যার জ্ঞান অর্থাৎ বাস্তবসম্মত জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব مَعْرُوْفٌ অর্থাৎ কল্যাণ ও সদ্ব্যবহার সহ অবস্থান করবে। এবং তুমি অনুসরণ কর তাদের যে আমার অভিমুখী হয় অনুগত হয়। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করব। আমি তোমাদেরকে তার প্রতিদান দেব এবং আলোচ্য আয়াতের অসিয়ত সংক্রান্ত আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াতসমূহ স্বতন্ত্র বাক্য তথা جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ।

١٦. يٰبُنَيَّ إِنَّهَا أَيِ الْخَصْلَةَ السَّيِّئَةَ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ أَيْ فِيْ أَخْفٰى مَكَانٍ مِنْ ذٰلِكَ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ط فَيُحَاسِبُ عَلَيْهَا إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ بِاسْتِخْرَاجِهَا خَبِيْرٌ بِمَكَانِهَا.

১৬. হে বৎস! নিশ্চয়ই কোনো বস্তু মন্দ কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে জমিনের গোপনীয় স্থানে তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন অতঃপর তার হিসাব নেওয়া হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বের করার গোপন ভেদ জানেন ও সবকিছুর জায়গার খবর রাখেন।

١٧. يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ط بِسَبَبِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِنَّ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ أَيْ مَعْزُوْمَاتِهَا الَّتِيْ يُعْزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوْبِهَا.

১৭. হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর, এবং আদেশ ও নিষেধ করতে গিয়ে তোমার কাছে যে বিপদাপদ আসবে তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা উল্লিখিত বিষয় সাহসিকতার কাজ। এই ধৈর্য ঐ সমস্ত কাজের মধ্যে যা আবশ্যক হওয়ার কারণে তাকীদ দেওয়া হয়েছে।

١٨. وَلَا تُصَعِّرْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لَا تُمِلْ وَجْهَكَ عَنْهُمْ تَكَبُّرًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط أَيْ خُيَلَاءَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ مُتَبَخْتِرٍ فِيْ مِشْيَتِهٖ فَخُوْرٍ عَلَى النَّاسِ.

১৮. তুমি মানুষকে অহংকারবশে অবজ্ঞা করো না। অন্য কেরাতে تُصَاعِرْ রয়েছে। অর্থাৎ অহংকারমূলক তাদের থেকে তোমার চেহারা ফিরিয়ে নিও না। এবং পৃথিবীতে খুশিতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দাম্ভিক চলার মধ্যে অহংকারকারী অহংকারী মানুষের উপর কে পছন্দ করেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৯. وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ تَوَسَّطْ فِيْهِ بَيْنَ الدَّبِيْبِ وَالْاِسْرَاعِ وَعَلَيْكَ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَارُ وَاغْضُضْ اَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ اَقْبَحَهَا لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ اَوَّلُهُ زَفِيْرٌ وَاٰخِرُهُ شَهِيْقٌ.

১৯. তোমার পদচারণায় মধ্যবর্তিতা ধীরগতি ও দৌড়ানোর মধ্যবর্তী অবলম্বন কর। এবং তোমাদের উচিৎ শান্ত ও মর্যাদাপূর্ণ পন্থায় চলা এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। যার প্রথম স্বর যাফীর ও শেষাংশ শাহীক তথা বিকট ও শ্রুতিকটু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ : হযরত লোকমান (র.) সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা عُجْمِى শব্দ اَلِفْ عَلَمِيَّتْ এবং عُجْمَةٌ عَلَمِيَّةٌ-এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটা আরবি শব্দ اَلِفْ عَلَمِيَّتْ এবং وَنُوْن زَائِدَتَانِ-এর কারণে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হয়েছে। হযরত লোকমান (আ.)-এর বংশ সূত্রের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, লোকমান ইবনে বাগুর ইবনে নাখূর ইবনে তারেখ। আর তারেখ আযরেরই নাম। এই বংশসূত্র হিসেবে হযরত লোকমান (র.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভাইপো হন। আবার কেউ কেউ হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ভাগ্নে বলেছেন, আবার কেউ কেউ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খালাতো ভাই বলেছেন। বর্ণিত আছে যে, হযরত লোকমান (আ.) এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর যুগ পেয়েছেন। জমহূর এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত লোকমান হাকীম ছিলেন, নবী ছিলেন না। তবে ইকরিমা এবং শা'বী তিনি নবী ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

قَوْلُهُ اَنْ اَىْ وَقُلْنَا لَهُ : শারেহ (র.) এই তাফসীরী ইবারত দ্বারা যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, প্রথম হলো اَنْ টি تَفْسِيْرِيَّةٌ দ্বিতীয় হলো এই যে, উহ্য قُلْنَا-এর মাধ্যমে اَنِ اشْكُرْ-এর আতফ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ-এর উপর হয়েছে। হযরত লোকমান (আ.)-এর সন্তানের নামের ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। কেউ কেউ ثَارَانْ বলেছেন আর কালবী مَشْكَمْ বলেছেন। আর কেউ কেউ اَنْعَم বলেছেন, বলা হয় যে, হযরত লোকমানের স্ত্রী ও সন্তান কাফের ছিল। তার উপদেশ দানের ফলে মুসলমান হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ فَرَجَعَ وَاَسْلَمَ : এটা হলো عَطْف تَفْسِيْرِىْ

قَوْلُهُ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ : এই দুই আয়াত হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর এই দুই আয়াত হযরত লোকমানের কথার মাঝে مُعْتَرِضَةٌ স্বরূপ।

قَوْلُهُ وَهَنَتْ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ : মুফাসসির (র.) وَهْنًا-এর পূর্বে وَهَنَتْ ফে'ল উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَهْنًا হলো উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ আর عَلٰى وَهْنٍ এটা كَائِنًا-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে وَهْنًا-এর সিফত হয়েছে। অর্থাৎ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ ذَاتَ وَهْنٍ আর صَاوِىْ বলেছেন যে, অতি উত্তম হলো اُمُّهُ থেকে حَالْ স্বীকৃতি দেওয়া অর্থাৎ وَهْنًا كَائِنًا عَلٰى وَهْنٍ

قَوْلُهُ مُوَافَقَةٌ لِلْوَاقِعِ : ব্যাখ্যাকার (র.) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ-এর ব্যাপারে বলতেছেন যে, ঘটনার বর্ণনার জন্য এই قَيْدْ বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষেই তার কোনো শরিক নেই। এরপরও তার عِلْم এবং دَلِيْل কোথা থেকে হবে। এটা قَيْد اِحْتِرَازِىْ নয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য এই হলো যে, যার শরিক হওয়ার তোমার নিকট কোনো দলিল নেই তাকে শরিক করো না। আর যার শরিক হওয়ার দলিল বিদ্যমান রয়েছে তার সাথে শরিক করতে পার। এটা তার مَفْهُوْم مُخَالِفْ হবে। যা ধর্তব্য নয়/গ্রহণযোগ্য নয়। এটাকেই বলা হয় لَا مَفْهُوْمَ لَهُ অর্থাৎ তার مَفْهُوْم مُخَالِفْ উদ্দেশ্য নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ : এখান থেকে দুই আয়াত হযরত লোকমানের বক্তব্যের মাঝে جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ হিসেবে হয়েছে। এর দ্বারা হযরত লোকমানের উক্তির تَاكِيْد করা উদ্দেশ্য।

يَا بُنَيَّ এটা হযরত লোকমানের স্বীয় সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার দিকে ফিরবে।

قَوْلُهُ فِىْ صَخْرَةٍ : صَخْرَةٌ সাধারণত পাথরের কঙ্করময় ভূমিকে বলা হয় এবং সপ্ত জমিনের নিচে যেই শক্ত পাথর রয়েছে সেটাকেও বলা হয়।

قَوْلُهُ لَا تُصَعِّرْ : فِعْل نَهِىْ অর্থ তুমি বক্রতা করো না। এখানে অহংকারের কারণে মুখ ফিরানো হতে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তার খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। বায়যাবী ও অন্যান্য তাফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন। একথা অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকেও প্রমাণিত যে, মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ.)-এর কালেও বর্তমান ছিলেন।

তাফসীরে দুররে মানসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন, কাঠ চেরার কাজ করতেন। [ইবনে আবী শায়বাহ, আহমদ, জারীর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ যুহদ্ নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন।] হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর নিকটে তার [লোকমান] অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও থেবড়া নাক বিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (র.) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁট বিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। -[ইবনে কাছীর]

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খেদমতে কোনো মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে হাজির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকূলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত; হযরত বিলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত হামজা এবং লোকমান (আ.)।

প্রাচীন ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের মতে হযরত লোকমান কোনো নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন : ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, প্রাচীন ইসলামি মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনা সূত্র [সনদ] দুর্বল। ইমাম বাগাবী (র.) বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। -[মাযহারী]

ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত লোকমান (আ.)-কে নবুয়ত ও হিকমত [প্রজ্ঞা] দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হিকমতই [প্রজ্ঞা] গ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরজ করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনি হিকমতকে [প্রজ্ঞা] নবুয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোনো একটা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীতই প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো। -[ইবনে কাছীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তার প্রতি কুরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ اَنِ اشْكُرْ لِيْ [আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর] তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে, যা আল্লাহর ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরিয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আ.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদানকার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (র.) বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চেয়েও বেশি অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি। -[কুরতুবী]

একদিন হযরত লোকমান (আ.)-কে বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কি সেই ব্যক্তি যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতো। লোকমান বললেন, হ্যাঁ, আমি সে লোকই। অতঃপর লোকটি বলল, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহর গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শুনার জন্য দূরদূরান্ত থেকে লোক এসে জমায়েত হয়? প্রতি উত্তরে হযরত লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ- ১. সর্বদা সত্যকথা বলা, ২. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান (আ.) বলেছেন, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই, নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা। নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশির প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।

-[ইবনে কাছীর]

হযরত লোকমান (আ.)-কে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? : حِكْمَتٌ শব্দটি কুরআনে কারীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বিদ্যা, বিবেক, গাম্ভীর্য, নবুয়ত, মতের বিশুদ্ধতা।

আবূ হাইয়ান বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় যদ্দারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকট পৌছায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, হিকমত অর্থ- বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন, জ্ঞানানুসারে কাজ করার নাম হিকমত। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোনো প্রকারের বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত।

উল্লিখিত আয়াতে হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা [হিকমত] প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে- اَنِ اشْكُرْ لِيْ [আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর] এতে এক সম্ভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে قُلْنَا [আমরা বললাম] শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া। অর্থ হবে এই যে, আমি [আল্লাহ] লোকমানকে প্রজ্ঞা [হিকমত] প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন যে, اَنِ اشْكُرْ لِيْ স্বয়ং হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ লোকমানকে যে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশে, যা সে কার্যে পরিণত করেছে। তখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণাবলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমত। অতঃপর এ বিষয় অবহিত করে দেন যে, আমি যে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম তা আমার কোনো নিজস্ব লাভের জন্য নয়। আমার কারো কৃতজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এ নির্দেশ তারই উপকারার্থে দিয়েছি। কারণ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।

অতঃপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কুরআন কারীমও সেসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো, কোনো প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ তা'আলাকে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মতো গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন– يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর অংশী স্থির করো না। অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম।] পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য উপদেশ্য ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন ; শিরক যে গুরুতর অপরাধ। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরজ কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বিরোধী হলে অন্য কারো আনুগত্য জায়েজ নয় : আল্লাহ তা'আলা ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতামাতাকে মানা করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকিদ রয়েছে এবং নিজের [আল্লাহর] প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক এমন গুরুতর অন্যায় ও মারাত্মক অপরাধ যে, মাতাপিতার নির্দেশে এমনকি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েজ হয়ে যায় না। যদি কারো পিতামাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন এ বিষয়ে পিতামাতার কথাও রক্ষা করা জায়েজ নয়।

এখানে যখন পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হিকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং একারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহায়েছেন, যাতে দিনরাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তার দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়, সেজন্য শরিয়তে মায়ের স্থানও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে– وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম তাই। অতঃপর وَاِنْ جَاهَدَاكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন বিষয়ে পিতামাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি : যদি পিতামাতা আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহর নির্দেশ হলো তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবত সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতামাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ প্রদর্শন করে তাদেরকে অপমানিত করার আশঙ্কা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক, প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতামাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে– صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ দান সংক্রান্ত ব্যাপারে তো তাদের কথা মানবে না। কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবাযত্ন বা ধনসম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়; বরং পার্থিব বিষয়াদিতে সাধারণ নিয়মানুযায়ী কাজকর্ম করবে। তাদের প্রতি বেয়াদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিও না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক কুফরির ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপারগতা হেতু বরদাশত করবে। কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনো কষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর কাল যে দু'বছর বলা হয়েছে তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী। এখানে এর কোনো ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, এর চেয়ে অধিকতর দুধ পান করালে তার কি হুকুম। এ মাসআলার ব্যাখ্যা ও বিবরণ সূরায়ে আহকাফ এর حَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا আয়াতে ইনশাআল্লাহ করা হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

মহাত্ম লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে : অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানের আওতাধীন; এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোনো বস্তু যতো ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোনো বস্তু যতো দূরই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোনো বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন মহান আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোনো বস্তুকে যখন ও যেখানে চান উপস্থিত করতে পারেন– يٰبُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ (الاية)-এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহর জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মহাত্ম লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে : অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কাজের পরিশুদ্ধির কারণ ও মাধ্যমও বটে। যেমন নামাজ সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছে– إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [নিশ্চয়ই নামাজ যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।] এজন্য অবশ্য করণীয় সৎকাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাজের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ হে বৎস! নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামাজ পড়ে নেওয়া নয়; বরং যাবতীয় অঙ্গসমূহ ও নিয়মাবলি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা এসবই নামাজ প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত।

মহাত্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে : ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম। ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন ও জীবন ব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এজন্য নামাজের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখ। এক. নিজের পরিশুদ্ধি, দ্বিতীয়. গোটা মানবকূলের পরিশুদ্ধি এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকূলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ অর্থাৎ এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে তাতে ধৈর্য ধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সমাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে : وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ - لَا تُصَعِّرْ-এর উৎপত্তি صَعْرٌ ধাতু থেকে যার অর্থ– উটের এক প্রকার ব্যাধি, যার ফলে এর ঘার বেঁকে যায়। যেমন মানুষের 'লাকওয়া' নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থি। وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا - مَرَحٌ শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সাথে বিচরণ করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকার ভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন– إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ আল্লাহ তা'আলা কোনো অহংকারী আত্মভিমানীকে পছন্দ করেন না।

قَوْلُهُ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ : অর্থাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড় ধাপসহও চলো না, যা ভব্যতা ও শালীনতার পরিপন্থি। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুত গতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর [জামে সগীরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত।] এরূপভাবে চলার ফলে নিজেও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যাধিক মন্থর গতিতেও চলো না। যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস যারা অন্যান্য মানুষের চেয়ে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যাধিক লজ্জা সংকোচের দরুন দ্রুত গতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না জায়েজ। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ফরমান যে সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদিদের মতো দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খ্রিস্টানদের ন্যায় ধীরে গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চালচলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকের নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে তারা বলল যে, সে কারীগণের একজন; সে যুগে যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম ছিলেন, সাথে সাথে কুরআনের আলেমও ছিলেন তাদেরকেই কারী বলে আখ্যায়িত করা হতো। সারকথা সে একজন আলেম ও কারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর চেয়ে অনেক উন্নতমানের কারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন দ্রুতগতিতে চলতেন। [কিন্তু এমন দ্রুত নয় যেমন দ্রুত চলা নিষেধ।] তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়। এমন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন শ্রোতামণ্ডলীর তা আবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়।]

قَوْلُهُ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ : অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এইমাত্র ফারূকে আজম (রা.) সম্পর্কে বলা হতো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোনো প্রকারের অসুবিধা না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে– إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চিৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। ১. লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। ২. ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। ৩. মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৪. উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আচার আচরণের এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রা.) ইরশাদ করেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মানুষের সাথে উঠাবসা ও মেলামেশার কালে রাসূল ﷺ -এর আচার ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন–

كَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مُشَاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيبُ فِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ اَلْمِرَاءُ وَالْإِكْبَارُ وَمَا لَا يَعْنِيهِ .

অর্থাৎ নবীজী ﷺ -কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো, তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তার স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপূত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু [সেগুলো হালাল হলে এবং তার কারো আকর্ষণ থাকলে] তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না এবং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করতেন না। [বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন], তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে [চিরতরে] বর্জন করেছিলেন। ১. ঝগড়া-বিবাদ, ২. অহংকার, ৩. অপ্রয়োজনীয়ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

লোকমান হাকীমের আরো কিছু উপদেশ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, লোকমান হাকীম বলতেন যে, কেউ আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কিছু আমানত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তা হেফাজত করেন। –[আহমদ]

অতএব, মুসলমান মাত্রই কর্তব্য হলো তার ঈমান এবং ইসলাম আল্লাহ তা'আলার নিকট আমানত রাখা যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে তা সংরক্ষিত থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- লোকমান তার পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, হে বৎস! তুমি যখন কোনো মজলিসে যাও তখন তাদেরকে সালাম দাও এবং এক কোণে নীরব অবস্থায় বসে পড় এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ. যদি তারা আল্লাহ তা'আলার জিকির সম্পর্কে কথা বলে তবে তুমিও তাতে অংশগ্রহণ কর, আর যদি তারা জিকরে ইলাহী ব্যতীত অন্য কথায় মশগুল হয়, তবে তুমি অন্যত্র চলে যাও।

খাতিবে শারবিনী তার "তাফসীরে সিরাজে মুনীরে" লোকমান হাকীমের আরো কয়েকটি উপদেশের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. হে বৎস! তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন কর, তাহলে পুঁজি ব্যতীত ব্যবসায় যেমন লাভ হয়, তেমনি তুমি লাভবান হবে।

২. হে বৎস! জানাযায় হাজির হও, তবে বিয়ের মজলিসে নয়, কেননা জানাযার কারণে তুমি আখেরাতকে স্মরণ করবে, আর বিয়ের মজলিশে তুমি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী হবে।

৩. হে বৎস! পেট পুরে আহার করো না, তোমার উচ্ছিষ্ট কুকুরের সামনে রেখে দাও।

৪. হে বৎস! মোরগের প্রতি লক্ষ্য কর, সে ভোরে উঠে আজান দেয়, আর সে সময় তুমি বিছানায় নিদ্রিত থাক, অতএব, মোরগের চেয়ে অধিকতর অসহায় হয়ো না।

৫. হে বৎস! তওবা করতে বিলম্ব করো না, কেননা মৃত্যু হঠাৎ আসে, খবর দিয়ে আসে না।

৬. হে বৎস! কখনো মূর্খ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না, তোমাকে যে দেখবে সে উপলব্ধি করবে যে, তুমিও ঐ মূর্খ লোকের কথায় ও কাজে সন্তুষ্ট, এভাবে লোকেরা তোমার ব্যাপারে প্রতারিত হবে।

৭. হে বৎস! সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক, তাকওয়ার পরহেজগারীকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর, কিন্তু এভাবে জীবন যাপন কর যেন মানুষের নিকট তোমার পরহেজগারী প্রকাশ না পায়, মানুষ মনে করে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, এজন্য তারা তোমাকে সম্মান করে, আর এ অবস্থায় এমন যেন না হয় যে তুমি মন্দ কাজে লিপ্ত হও।

৮. হে বৎস! নীরবতা পালন কর, নীরবতার কারণে কখনো তোমাকে লজ্জিত হতে হবে না। যদি তোমার কথা রৌপ্য হয় তবে নীরবতা হলো খাঁটি স্বর্ণ।

৯. হে বৎস! মন্দ কাজ থেকে দূরে থাক, একটি মন্দের পর আরেকটি মন্দ আসে।

১০. হে বৎস! অতি ক্রোধ থেকে বিরত থাক, কেননা ক্রোধের আধিক্য মন খারাপ করে, এর দ্বারা মনের আলো দূরীভূত হয়।

১১. হে বৎস! সর্বদা ওলামায়ে কেরামের মজলিসে হাজির থাকবে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা শুনবে, কেননা আল্লাহ তা'আলা হেকমতের নূর দ্বারা মৃত অন্তরকে জীবিত করে দেন, যেমন বৃষ্টি দ্বারা মৃত শুষ্ক জমিনকে জীবিত করেন, আর যে মিথ্যা কথা বলে তার চেহারার রৌশনী বিদায় হয়ে যায়। চরিত্রহীন লোককে অনেক সময়ই বিপদগ্রস্ত হতে হয়। পাহাড় থেকে পাথর তুলে আনা সহজ, কিন্তু নির্বোধ লোককে বোঝানো সহজ নয়।

১২. হে বৎস! কোনো নির্বোধ লোককে দূতরূপে প্রেরণ করো না, যদি কোনো বুদ্ধিমান লোক না পাও তবে নিজেই চলে যাও।

১৩. হে বৎস! কখনো কোনো বাঁদীকে বিয়ে করো না, [যদি তা কর] তবে তোমার সন্তাদেরকে তুমি চির গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করবে।

১৪. হে বৎস! এমন সময় আসবে, যখন জ্ঞানী ব্যক্তিদের নয়ন মন শান্তি পাবে না।

১৫. হে বৎস! এমন মজলিসে অংশগ্রহণ করবে যেখানে আল্লাহ তা'আলার জিকির হয়। কেননা ঐ মজলিসের লোকদের প্রতি যখন আল্লাহ তা'আলার রহমত হবে তখন তুমিও তার কিছু অংশ পাবে। আর এমন মজলিসে বসবেনা যেখানে আল্লাহর জিকির না হয়। কেননা যদি তাদের উপর আল্লাহর কোনো গজব আসে, তবে তাতে তুমিও ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৬. হে বৎস! তোমার খাবার যেন শুধু মোত্তাকী পরহেগারী লোক খায়, মন্দ লোকেরা যেন তোমার খাবার গ্রহণ না করে।

১৭. হে বৎস! জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর।

Free @ www.eilmweebly.com

১৮. হে বৎস! দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র, যাতে বহুলোক নিমজ্জিত হয়ে গেছে, যদি তুমি এর থেকে নাজাত পেতে চাও, তবে আল্লাহর ভয়কে তোমার নৌকারূপে তৈরি কর, আর ঈমানের আসবাবপত্র দ্বারা ঐ নৌকাকে পরিপূর্ণ কর। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসাকে তার লঙ্গর বানাও। এভাবে হয়তো এই সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে তুমি বাঁচতে পার।

১৯. হে বৎস! আমি বড় বড় পাথর এবং বড় বড় লোহা বহন করেছি, কিন্তু মন্দ প্রতিবেশির চেয়ে কঠিন এবং ভারি কোনো বোঝা দেখিনি।

২০. হে বৎস! আমি অনেক কষ্ট ভোগ করেছি কিন্তু দরিদ্র এবং পরমুখাপেক্ষীতা থেকে কষ্টকর কোনো কিছু দেখিনি।

২১. হে বৎস! জ্ঞান গুণ এবং বুদ্ধি অনেক ফকির মিসকিনকেও রাজা বাদশাহের আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

২২. হে বৎস! তুমি সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের প্রশংসার প্রার্থী হয়।

২৩. হে বৎস! যখন তুমি ইলম হাসিল কর, তখন তার উপর আমল করার সর্বাত্মক চেষ্টা কর।

২৪. হে বৎস! ওলামায়ে কেরাম এবং নেককার লোকদের সংসর্গে থাকা অবশ্য কর্তব্য মনে কর এবং তাদের নিকট শিখতে চেষ্টা কর।

২৫. হে বৎস! যখন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা হয় তখন তাকে পরীক্ষা করে নাও এবং তাকে রাগান্বিত কর এবং দেখ রাগান্বিত অবস্থায় সে তোমার সাথে কি ব্যবহার করে, যদি তখন সুবিচার করে, তবে সে বন্ধুত্বের যোগ্য, আর যদি সে সুবিচার না করে তবে তার নিকট থেকে আত্মরক্ষা করা তোমার কর্তব্য।

২৬. ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করবে, কেননা ঋণ দিনের বেলা অবমননা আর রাতের বেলা দুশ্চিন্তা।

২৭. হে বৎস! মনে রেখ, যখন তুমি পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়েছ তখন থেকে তোমাকে পৃষ্ঠদেশ দুনিয়ার দিকে রয়েছে, আর তোমার মুখমণ্ডল আখেরাতের দিকে অতএব, যে ঘরের দিকে তুমি যাচ্ছ, তা এই ঘর থেকে অনেক নিকটবর্তী যে ঘর থেকে তুমি বিদায় হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২০. اَلَمْ تَرَوْا تَعْلَمُوْنَ يَا مُخَاطَبِيْنَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ لِتَنْتَفِعُوْا بِهَا وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنَ الثِّمَارِ وَالْاَنْهَارِ وَالدَّوَابِّ وَاَسْبَغَ اَوْسَعَ وَاَتَمَّ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَهِىَ حُسْنُ الصُّوْرَةِ وَتَسْوِيَةُ الْاَعْضَاءِ وَغَيْرُ ذٰلِكَ وَّبَاطِنَةً ط هِىَ الْمَعْرِفَةُ وَغَيْرُهَا وَمِنَ النَّاسِ اَىْ اَهْلِ مَكَّةَ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى مِنْ رَسُوْلٍ وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ بَلْ بِالتَّقْلِيْدِ.

২১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط قَالَ تَعَالٰى اَيَتَّبِعُوْنَهٗ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ اَىْ مُوْجِبَاتِهٖ لَا.

২২. وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ اَىْ يُقْبِلْ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّدٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط بِالطَّرَفِ الْاَوْثَقِ الَّذِىْ لَا يُخَافُ اِنْقِطَاعُهٗ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ مَرْجِعُهَا.

২৩. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ يَا مُحَمَّدُ كُفْرُهٗ لَاتَهْتَمَّ بِكُفْرِهٖ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَىْ بِمَا فِيْهَا كَغَيْرِهٖ فَمُجَازٍ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

২০. হে সম্বোধিত ব্যক্তিগণ! তোমরা কি দেখ না জান না আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডলে যেমন, সূর্য চন্দ্র ও তারকাসমূহ ও ভূমণ্ডলে যেমন ফলমূল, নদীনালা ও পশুপাখি ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা তা থেকে উপকৃত হও এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য নিয়ামত যেমন সুন্দর চেহারা, অবয়ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ যথা– জ্ঞানবুদ্ধি ইত্যাদি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অনেক লোক মক্কার কাফেরগণ যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন ছাড়াই নবী ও কুরআন ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বাক বিতণ্ডা করে। বরং তাকলীদের কারণেই ঝগড়া করে।

২১. তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যা নাজিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর তখন তারা বলে বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি তার অনুসরণ করবে? শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির শাস্তি ওয়াজিবকারী কর্ম দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি?

২২. যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ একত্ববাদের বিশ্বাসী হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ তা'আলার অভিমুখী করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে জীবন পরিচালনা করে সে এক মজবুত হাতল মজবুত হাতল যা ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় নেই ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ তা'আলার দিকে।

২৩. যে ব্যক্তি কুফরি করে হে মুহাম্মদ ﷺ! তার কুফরি যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। তুমি তার কুফরিতে চিন্তা করো না। আমার দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। অতএব এর প্রতিদান দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٤. نُمَتِّعُهُمْ فِى الدُّنْيَا قَلِيلًا اَيَّامَ حَيٰوتِهِمْ ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهُ مَحِيْصًا .

২৪. আমি তাদেরকে দুনিয়াতে স্বল্পকালের জন্যে তাদের দুনিয়ার হায়াত পরিমাণ ভোগবিলাস করতে দেব। অতঃপর তাদেরকে আখেরাতে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি জাহান্নামের আগুন যা থেকে তারা কখনো মুক্তি পাবে না ভোগ করতে।

٢٥. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى الْاَمْثَالِ وَوَاوُ الضَّمِيْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط عَلٰى ظُهُوْرِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِالتَّوْحِيْدِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ وُجُوْبَهُ عَلَيْهِمْ .

২৫. আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ। لَيَقُوْلُنَّ-এর মধ্যে نُون إعْرَابِى ও وَاو جَمْع উভয়টি বিলোপ করা হয়েছে লাগাতার কয়েকটি نُون ও দুটি সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে তা আসলে لَيَقُوْلُوْنَنَّ ছিল। বলুন, আল্লাহ তাদের উপর তাওহীদের সকল প্রমাণাদি প্রকাশ করার কারণে সকল প্রশংসাই আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশ তাদের উপর আল্লাহর তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপন ওয়াজিব হওয়ার জ্ঞান রাখে না।

٢٦. لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ فِيْهِمَا غَيْرُهُ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ عَنْ خَلْقِهِ الْحَمِيْدُ الْمَحْمُوْدُ فِى صُنْعِهِ .

২৬. নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর মাখলুক, সৃষ্ট ও দাস হিসেবে অতএব উভয় জগতে তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের হকদার নয় নিশ্চয় আল্লাহ তার মাখলুক থেকে অভাবমুক্ত ও তার কর্মে প্রশংসিত।

٢٧. وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ عَطْفٌ عَلٰى اِسْمِ اَنَّ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مِدَادٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط الْمُعَبَّرُ بِهَا عَنْ مَعْلُوْمَاتِهِ بِكُتُبِهَا بِتِلْكَ الْاَقْلَامِ بِذٰلِكَ الْمِدَادِ وَلَا بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لِاَنَّ مَعْلُوْمَاتِهِ تَعَالٰى غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ لَا يُعْجِزُهُ شَىْءٌ حَكِيْمٌ لَا يَخْرُجُ شَىْءٌ عَنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ .

২৭. পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্রযুক্ত কালি হয় اَلْبَحْرُ শব্দটি اَنَّ-এর ইসমের উপর আতফ তবুও তার বাক্যাবলি লিখে শেষ করা যাবে না। كَلِمَاتُ اللّٰهِ থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহর জ্ঞান ও মালুমাত এবং উক্ত কলম দ্বারা লিখতে গেলে সাগরের পানি পরিমাণ কালি বা এর চেয়ে অধিক কালি শেষ হয়ে যাবে কেননা আল্লাহ তা'আলার মালুমাত ও জ্ঞান অসীম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী তাকে কোনো বস্তু দুর্বল করতে পারে না প্রজ্ঞাময় অর্থাৎ তার জ্ঞান থেকে কোনো বস্তু বের হতে পারে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٨. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ خَلْقًا وَبَعْثًا لِاَنَّهُ بِكَلِمَةِ كُنْ فَيَكُوْنُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ يَسْمَعُ كُلَّ مَسْمُوْعٍ بَصِيْرٌ يُبْصِرُ كُلَّ مُبْصَرٍ لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ.

২৮. তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। কেননা সকল বস্তু তার كُنْ অর্থাৎ হও বাক্যের সাথে সাথে হয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শুনেন ও দেখেন। কোনো কিছু তাকে কোনো কিছু থেকে ফিরাতে পারে না।

٢٩. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ يَا مُخَاطَبُ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ يُدْخِلُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ يُدْخِلُهُ فِى اللَّيْلِ فَيَزِيْدُ كُلَّ مِنْهُمَا بِمَا نَقَصَ مِنَ الْاٰخَرِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَجْرِىْ فِىْ فَلَكِهِ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

২৯. হে শ্রোতা! তুমি কি দেখ জান না যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? অতএব দিন ও রাতে প্রত্যেকটি এতটুকু বৃদ্ধি হয় যতটুকু অন্যটি থেকে হ্রাস পায়। তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করে। এবং নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তার খবর রাখেন।

٣٠. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الثَّابِتُ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ الزَّائِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ عَلٰى خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ الْكَبِيْرُ الْعَظِيْمُ.

৩০. এটাই উল্লিখিত দলিলসমূহ প্রমাণ যে, আল্লাহই হক সত্য ও চিরস্থায়ী এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সবই বাতিল মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী تَدْعُوْنَ সীগাহটি يَدْعُوْنَ ও পড়া যাবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সৃষ্টির উপর বিজয়ী হিসেবে সর্বোচ্চ মহান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ : এটা رَدٌّ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ-এর পূর্বের مَضْمُوْن-এর দিক থেকে رُجُوْع করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَا مُخَاطِبِيْنَ : এটা مُنَادٰى مُفْرَدْ হওয়ার কারণে কিয়াসের চাহিদা ছিল يَا مُخَاطَبُوْنَ হওয়া। কেননা مُنَادٰى مُفْرَدْ টা ضَمَّة-এর উপর مَبْنِىْ হয়ে থাকে। তবে হতে পারে نَكِرَة غَيْر مَقْصُوْدَة হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ يُقْبِلُ عَلٰى طَاعَتِهِ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, وَجْه দ্বারা মুখমণ্ডল উদ্দেশ্য নয় বরং ذات উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مُوَحِّدٌ : مُحْسِنٌ-এর তাফসীর مُوَحِّدْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে اِحْسَانْ দ্বারা اِحْسَان كَامِلْ উদ্দেশ্য নয়, যা اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ-এর মর্যাদায়। এখানে তো একত্ববাদের প্রবক্তা মুসলমান উদ্দেশ্য। যাতে করে সাধারণ মুসলমান ও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ : এই বাক্যটি উহ্য قَسَمْ-এর جَوَابْ আর جَوَاب شَرْط কায়দা অনুযায়ী উহ্য রয়েছে। اَللّٰهُ শব্দটি হয়তো উহ্য ফে'লের فَاعِلْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো خَلَقَهُنَّ اللّٰهُ আর এই উহ্য হওয়ার قَرِيْنَة হলো خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ অথবা উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য ইবারত হলো اَلْخَالِقُ لَهُنَّ اللّٰهُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ : এই পূর্ণ বাক্যটি اَنَّ-এর اِسْم হয়েছে। আর اَقْلَامٌ হলো তার খবর

قَوْلُهُ وَالْبَحْرُ : এটা اِسْم اَنَّ-এর উপর عَطْف হয়েছে। এটা اَلْبَحْرُ নসবযুক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাকার (র) رَفْع -এর বিশ্লেষণ ছেড়ে দিয়েছেন। رفع হওয়ার ব্যাখ্যা এটা হতে পারে যে, اَلْبَحْرُ-এর আতফ اَنَّ এবং তার اِسْم ও خَبَرْ মিলে পঠিত বাক্যের উপর হয়েছে। এই জন্য যে, বাক্যটি উহ্য ফে'লের فَاعِلْ হওয়ার কারণে رَفْع -এর مَحَلَ -এ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- لَو ثَبَتَ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ

অথবা اَلْبَحْرُ হলো মুবতাদা আর يَمُدُّهُ হলো তার খবর আর বাক্যটি হলো جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ

قَوْلُهُ مِدَادٌ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। অর্থাৎ اَلْجَمِيْعُ مِدَادٌ এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَانَفِدَتْ الخ : এটা لَوْ-এর জবাব। তবে لَوْ টা এখানে তার প্রসিদ্ধ অর্থ অর্থাৎ اِنْتِفَاء شَرْط -এর কারণে اِنْتِفَاء جَزَاء-এর জন্য হয়নি।

قَوْلُهُ بِكُتُبِهَا بِتِلْكَ الْاَقْدَام الخ : এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, বাক্যের মধ্যে حَذْف রয়েছে। আর كَلِمَاتُ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার مَدْلُوْلَاتْ -এর كَلَامٌ نَفْسِىٌّ قَدِيْمٌ قَائِمٌ بِالذَّاتِ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ : এখানে ذٰلِكَ হলো মুবতাদা بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ হলো তার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরুতে তাওহীদের প্রমাণ এবং শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরপর লোকমান হাকীমের উপদেশের উল্লেখ রয়েছে, আর তাতেও সর্বপ্রথম তাওহীদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখন এ আয়াত থেকে পুনরায় মূল বক্তব্য তাওহীদে সম্পর্কেই আলোচনা শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম দানের উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে- اَلَمْ تَرَوْا .... অর্থাৎ হে মানবজাতি! তোমরা কি দেখনা যে যা কিছু আসমানে আছে, যথা চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র-পুঞ্জ সবই তোমাদের উপকারার্থে নিয়োজিত করে রেখেছি। আর যা কিছু জমিনে আছে তাও তোমাদের কল্যাণার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলা তার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ তোমাদেরকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তোমাদেরকে দান করেছেন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য প্রভৃতি। এমনিভাবে তোমাদের হেদায়েতের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন, পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন, ইসলামকে জীবন-বিধান রূপে তোমাদের জন্যে পছন্দ করেছেন, তোমাদেরকে বিচার-বুদ্ধি দান করেছেন, এককথায় হে মানব জাতি! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জৈবিক, বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তার নিয়ামতসমূহের জন্যে শুকর গুজার হওয়া।

একখানি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে বনী আদম! তোমাদের এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর মাধ্যমে, অতএব তোমাদের নিকট মৃত্যু আসার পূর্বেই আখেরাতের জন্যে আমল কর। হে বনী আদম! আমি তোমার এমন কোনো অঙ্গ সৃষ্টি করিনি যার জন্যে আমি রিজিক সৃষ্টি করিনি। হে বনী আদম! যদি আমি তোমাকে মূক করে সৃষ্টি করতাম তবে তুমি বাকশক্তির জন্যে আক্ষেপ করতে, আর যদি আমি তোমাকে অন্ধ করে সৃষ্টি করতাম তবে তুমি চক্ষুষ্মান হওয়ার জন্যে আক্ষেপ করতে, আর যদি আমি তোমাকে বধির করে সৃষ্টি করতাম, তবে তুমি শ্রবণ শক্তির জন্যে দুঃখ করতে। অতএব তুমি আমাদের নিয়ামতের কদর কর এবং আমার শুকরগুজার হও, অবাধ্য নাফরমান হয়োনা, নিমক হারামী করো না, অবশেষে তোমাদের সকলকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।

-[আল আহাদীসুল কুদসিয়্যাহ, কৃত ইউনুস আস শেখ ইবরাহীম আস সামরাঈ, পৃ. ৮১]

মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলি অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফের ও মুশরিকগণ স্বীয় শিরক ও কুফরিতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী ছিল। আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুমিনগণের প্রশংসা স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলিও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তার অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, অনুগত করে দেওয়ার অর্থ কোনো বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেওয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মার্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تَسْخِيْر অর্থ কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেওয়া হয়েছে তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে তা মানব সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত; কিন্তু প্রতিপালকোচিত হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টিবাদল প্রভৃতি, যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলির বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো। অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু মানব সেবায় নিয়োজিত অবশ্যি রেখেছেন। কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্ব করণই বটে।

قَوْلُهُ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً : اسباغ অর্থ পরিপূর্ণ করে দেওয়া। যার অর্থ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামতকেই বুঝায় মানুষ যা পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অঙ্গ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরি করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোনো প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন সম্পদ, জীবন যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা এ সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেওয়া, আল্লাহ-রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তাওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নিয়ামত সেগুলো যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত যথা– ঈমান, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ এবং জ্ঞানবুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিত শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ : এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তার ক্ষমতার ব্যবহার এবং তার নিয়ামত [কৃপা ও দয়াসমূহ] যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত কোনো ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোনো কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তার ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবুও তার অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্র ও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ তা'আলার মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كلمات الله -এর ভাবার্থ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলি। –[রূহ ও মাযহারী]

Free @ www.eilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলার মহিমা, কৃপা ও করুণাবলিও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং এর অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয় তা সত্ত্বেও এগুলোর পানি দিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে, সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কুরআনের অন্য এক আয়াত যেখানে বলা হয়েছে- قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا অর্থাৎ আল্লাহ মহিমা কীর্তনসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমূদ্র নয় অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে। এ আয়াতে بِمِثْلِهٖ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্ত হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা, অনুরূপ চতুর্থটা মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন এগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহ তা'আলার মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে, সমুদ্র সাতটি কেন, সাত হাজারও যদি হয় তবুও তা সীমাবদ্ধ শেষ অবশ্যই হবে কিন্তু كَلِمَاتُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাক্যাবলি অসীম ও অনন্ত, কোনো সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদি পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনেন তখন কিছু সংখ্যক ইহুদি পাদ্রী হাজির হয়ে কুরআনের আয়াত وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে। প্রসঙ্গে আপত্তির সুরে বলল, আপনি [নবীজী] বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন? মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বললেন, আমার উদ্দেশ্যে সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতিও এবং ইহুদি খ্রিস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বলল, আমাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা তাওরাত প্রদান করেছেন যা تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর [রহস্য] বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তাওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানি গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীর সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে- وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ الْاٰيَةُ -[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩১. اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ السُّفُنَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ يَا مُخَاطَبِيْنَ بِذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِهٖ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ عِبَرًا لِّكُلِّ صَبَّارٍ عَنْ مَعَاصِى اللّٰهِ شَكُوْرٍ لِنِعَمِهٖ.

৩২. وَاِذَا غَشِيَهُمْ اَىْ عَلَا الْكُفَّارَ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ كَالْجِبَالِ الَّتِىْ تُظِلُّ مَنْ تَحْتَهَا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ع اَىِ الدُّعَاءَ بِاَنْ يُنْجِيَهُمْ اَىْ لَا يَدْعُوْنَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ وَمِنْهُمْ بَاقٍ عَلٰى كُفْرِهٖ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا وَمِنْهَا الْاِنْجَاءُ مِنَ الْمَوْجِ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ غَدَّارٍ كَفُوْرٍ لِنِعَمِ اللّٰهِ.

৩৩. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ يُغْنِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ فِيْهِ شَيْئًا وَّلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ فِيْهِ شَيْئًا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا عَنِ الْاِسْلَامِ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ فِىْ حِلْمِهٖ وَاِمْهَالِهِ الْغَرُوْرُ الشَّيْطٰنُ.

অনুবাদ :

৩১. তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে হে শ্রোতাগণ যাতে তিনি তা দ্বারা তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক পাপ থেকে বিরত থাকার উপর সহনশীল, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩২. যখন তাদেরকে কাফেরদেরকে মেঘমালা সদৃশ এমন পাহারের ন্যায় যা তার নিচে ছায়া দান করে তরঙ্গ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাটি মনে আল্লাহ তা'আলাকে ডাকতে থাকে। যাতে তিনি তাদেরকে মুক্তি দেয় অর্থাৎ তখন তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে ডাকে না। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যম পথে অর্থাৎ কুফর ও ঈমানের মধ্যপন্থি রাস্তায় চলে, আবার কেউ কেউ কুফরের উপর অবিচল থাকে কেবল মিথ্যাচারি, অকৃতজ্ঞ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতি ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলি যেমন তাদেরকে তরঙ্গ থেকে মুক্তি দেওয়া ইত্যাদি অস্বীকার করে।

৩৩. হে মানব জাতি! মক্কাবাসী তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না পিতাপুত্রের থেকে কোনো আজাব সরাতে পারবে না এবং পুত্র ও তার পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুনরুত্থান সত্য, অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ইসলাম থেকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٤. إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج مَتٰى تَقُوْمُ وَيُنَزِّلُ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ الْغَيْثَ ج بِوَقْتٍ يَعْلَمُهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ ط أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثٰى وَلَا يَعْلَمُ وَاحِدًا مِنَ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَيَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ط وَيَعْلَمُهُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِكُلِّ شَىْءٍ خَبِيْرٌ بِبَاطِنِهِ كَظَاهِرِهِ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسَةٌ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلٰى أٰخِرِ السُّوْرَةِ ـ

৩৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছেই কিয়ামতের কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান আছে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন বৃষ্টি বর্ষণের সময় জানেন। يُنَزِّلُ -এর زا. তে তাশদীদ ও তাখফীফ উভয়টা পড়া যাবে। এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। ছেলে না মেয়ে তিনি জানেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এই তিনটি কেউ জানেন না। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে ভালো না মন্দ এবং তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন এবং জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহই জানেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ের জাহির ও বাতিন সম্যক জ্ঞাত। ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسَةٌ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ الخ : উল্লিখিত উভয় বাক্য يَوْمًا -এর صِفَتْ হয়েছে। আর عَائِدْ উহ্য রয়েছে। যেমনটি ব্যাখ্যাকার فِيْهِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَا مَوْلُوْدٌ : এটা হলো প্রথম মুবতাদা আর هُوَ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর جَازٍ হলো দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। এরপর বাক্য হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রশ্ন. مَوْلُوْد হলো نَكِرَة এটা মুবতাদা হওয়া বৈধ হলো কিভাবে?

উত্তর. نَكِرَة যখন تَحْتَ النَّفْيِ হয় তখন সেটা মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়ে যায়। আর এখানেও مَوْلُوْدٌ টা لَا -এর অধীনে হয়েছে। বিধায় مولود টা মুবতাদা হতে পেরেছে।

قَوْلُهُ شَيْئًا : এটা تَنَازُع فِعْلَانِ -এর অন্তর্গত। شَيْئًا কে يَجْزِىْ এবং جَازٍ উভয় ফে'ল مَفْعُوْل বানাতে চায়। অতঃপর দ্বিতীয় ফে'ল তথা جَازٍ কে আমল করতে দেওয়া হয়েছে। এবং يَجْزِىْ -এর জন্য مَفْعُوْل উহ্য মেনে নিয়েছেন। যেমনটি শারেহ (র.) شَيْئًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ غَرُوْر : এটা صِيْغَة صِفَتْ অর্থ- প্রতারক, মিথ্যা আশাদানকারী শয়তান।

قَوْلُهُ بِاللّٰهِ : بَاء টি سَبَبِيَّة আর مُضَاف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ بِسَبَبِ حِلْمِ اللّٰهِ যেমনটি শারেহ (র.) উহ্য মুযাফের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ : এই আয়াত হারেছ ইবনে ওমর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ : এটা عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ -এর উপর عَطْف হয়েছে। যা إِنَّ -এর খবর হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِوَقْتٍ : অর্থাৎ فِيْ وَقْتٍ

قَوْلُهُ وَاحِدًا : এটা لَا يَعْلَمُ -এর مَفْعُوْل مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। আর غَيْرُ اللّٰهِ হলো এর فَاعِلْ

قَوْلُهُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا : এখানে مَا টি হলো اِسْتِفْهَامِيَّة মুবতাদা। আর ذَا হলো اِسْم مَوْصُوْلَه আর تَكْسِبُ غَدًا হলো সেলাহ। এখন সেলাহ ও মওসূল মিলে মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পর আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা সম্পর্কে। সে মক্কা থেকে পলায়ন করে সমুদ্র পথে রওয়ানা হয়েছিল। তখন তাদের তরী ঝড়ের সম্মুখীন হয়। ইকরিমা অত্যন্ত বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ ফরিয়াদ করেছিল, হে আল্লাহ! যদি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর, তাহলে আমি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে তার হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করবো। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাকে রক্ষা করেছিলেন। এরপর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম কবুল করেছিলেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে মাযহারী খ. ৯, পৃ. ২৬৩]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا الخ : উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ অর্থাৎ হে মানবজাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার মূল বা অন্য কোনো গুণবাচক নামের স্থলে 'রব' [পালনকর্তা] বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে সেরূপ ভয় নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদের পালনকর্তা, সুতরাং তার সম্পর্কে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এ স্থলে সে ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাদের মানমর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এঁরা তার শত্রু বা ক্ষতি সাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা ও উস্তাদের অনুসরণে ও নির্দেশ পালনে বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে যেন আল্লাহ তা'আলার মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তার অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

قَوْلُهُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهٖ شَيْئًا : অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর, যেদিন কোনো পিতাও স্বীয় পুত্রের উপকার সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোনো পুত্রও স্বীয় পিতার কোনো কল্যাণ সাধন করতে পারবে না। এখানে ঐ শ্রেণির পিতা-পুত্রকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন মুমিন অপরজন কাফের। কেননা মুমিন পিতা স্বীয় কাফের পুত্রের শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না এবং তার কোনো উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে মুমিন পুত্র কাফের পিতার কোনো কাজে আসবে না।

এরূপ নির্দিষ্ট করণের কারণ, কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতসমূহে এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পিতামাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবেন। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কুরআনে কারীমে রয়েছে- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে। আমি এ সন্তান সন্ততিদেরকে তাদের পিতামাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলি এ স্তরে পৌছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতামাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে যে, পিতামাতার স্তরে তাদেরকে পৌছে দেওয়া হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে যদিও কাজকর্মে কোনো ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে– جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ অর্থাৎ তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসেবে প্রতিপন্ন পিতামাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতা ও সন্তান-সন্তুতি অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণিভুক্ত হয় তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েতে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে, হাশর ময়দানে কোনো পিতা সন্তানের বা কোনো সন্তান পিতার কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না, তা শুধু সে ক্ষেত্রেই যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের হবে। –[মাযহারী]

ফায়েদা : এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুত্রের কোনো উপকার সাধন রতে পারবে না এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত.** এখানে وَلَدٌ শব্দের পরিবর্তে مَوْلُوْدٌ শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনামূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চেয়ে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাক্যের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা অধিকতর গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালোবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর এখানে হাশর ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোনো উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর وَلَدٌ শব্দের স্থলে مَوْلُوْدٌ শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, مَوْلُوْدٌ বলতে শুধু সন্তানকেই বুঝানো হয় আর وَلَدٌ শব্দ অধিকতর ব্যাপক। সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, স্বয়ং ঔরশজাত পুত্রও পিতার কোনো কাজে আসবে না। তাহলে পৌত্র ও প্রপৌত্রের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোনো সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে [অর্থাৎ কোন বছর কোন তারিখে সংঘটিত হবে] এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন [অর্থাৎ কন্যা না পুত্র, কোন আকৃতি-প্রকৃতির] এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোনো ব্যক্তি জানে না [অর্থাৎ ভালো মন্দ কি লাভ করবে] অথবা কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বুঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আন'আমের আয়াতে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ, বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে– وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ কেবল আল্লাহ তা'আলার নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। হাদীসে একে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে– مَفَاتِحُ ও مَفَاتِيْحُ . مِفْتَاحٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ তালা খোলার চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল যার সাহায্যে অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা সাজদা, মক্কায় অবতীর্ণ

وَهِىَ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً : আর তা ৩০ আয়াতবিশিষ্ট

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. الٓمٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ خَبَرٌ اَوَّلٌ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَبَرٌ ثَانٍ .

٣. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ج مُحَمَّدٌ لَا بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا مَّآ نَافِيَةٌ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ بِاِنْذَارِكَ .

٤. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ اَوَّلُهَا الْاَحَدُ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط وَهُوَ فِى اللُّغَةِ سَرِيْرُ الْمَلِكِ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ مَا لَكُمْ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ مِنْ دُوْنِهٖ غَيْرِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ اِسْمُ مَا بِزِيَادَةِ مِنْ اَىْ نَاصِرٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يَدْفَعُ عَنْكُمْ عَذَابَهٗ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ هٰذَا فَتُؤْمِنُوْنَ .

অনুবাদ :

১. আলিফ লাম মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত রয়েছেন।

২. এ কিতাবের কুরআন অবতরণ বিশ্ব পালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ মুবতাদা আর لَا رَيْبَ فِيْهِ প্রথম খবর ও مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ টি দ্বিতীয় খবর।

৩. বরং তারা বলে, এটা সে মুহাম্মদ ﷺ মিথ্যা রচনা করেছে। না বরং এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। এখানে مَا টি نَافِيَة তথা নাবোধক সম্ভবতঃ এরা আপনার সতর্কতায় সুপথ প্রাপ্ত হবে।

৪. আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন এর প্রথম দিন শনি আর শেষ দিন শুক্রবার অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। আভিধানিক অর্থে আরশ বলা হয় বাদশাহর সিংহাসনকে। তিনি এতে তার শান মুতাবেক বিরাজমান ছিলেন। তিনি ব্যতীত হে মক্কার কাফেরগণ তোমাদের কোনো অভিভাবক সাহায্যকারী, এখানে مِنْ وَّلِيٍّ টি مِنْ হরফে জারসহ مَا -এর ইসিম। ও সুপারিশকারী যিনি তোমাদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করবেন নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? অর্থাৎ তোমরা ঈমান গ্রহণ কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مُدَّةَ الدُّنْيَا ثُمَّ يَعْرُجُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ وَالتَّدْبِيرُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فِي الدُّنْيَا وَفِي سُورَةِ سَأَلَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لِشِدَّةِ أَهْوَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكَافِرِ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَكُونُ أَخَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلٰوةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ.

৫. তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার সময় পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন। অতঃপর তা সমস্ত বস্তু ও তদবীর তার কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। এবং সূরায়ে সাআলায় (سُوْرَةُ سَأَلَ) পঞ্চাশ বছরের উল্লেখ রয়েছে এবং কিয়ামতের দিবস, সেদিনটি কাফেরদের নিকট অত্যন্ত ভয়াবহের কারণে অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের নিকট সেদিনটি দুনিয়ার মধ্যে আদায়কৃত এক ওয়াক্তের নামাজের চেয়েও কম মনে হবে। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

৬. ذٰلِكَ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَيْ مَا غَابَ عَنِ الْخَلْقِ وَمَا حَضَرَ الْعَزِيزُ الْمَنِيعُ فِي مُلْكِهِ الرَّحِيمُ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ.

৬. তিনিই সেই স্রষ্টা ও পরিচালনাকারী দৃশ্য ও অদৃশ্যের অর্থাৎ যা সৃষ্টির মধ্যে অনুপস্থিত ও উপস্থিত জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, আপনার রাজত্বে পরম দয়ালু তার আনুগত্যকারীদের উপর।

৭. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ بِفَتْحِ اللَّامِ فِعْلًا مَاضِيًا صِفَةً وَبِسُكُونِهَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ آدَمَ مِنْ طِينٍ.

৭. যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন خَلَقَهُ -এর মধ্যে লামে যবর পড়লে তখন فِعْل مَاضِيْ হিসেবে বাক্য হয়ে كُلَّ شَيْءٍ -এর সিফত আর লামের মধ্যে সাকিন পড়লে তখন তা كُلَّ شَيْءٍ থেকে بَدَل اِشْتِمَال হবে। এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির হযরত আদম (আ.)-এর সূচনা করেছেন।

৮. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ذُرِّيَّتَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ عَلَقَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ضَعِيفٍ هُوَ النُّطْفَةُ.

৮. অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির বীর্য নির্যাস থেকে।

৯. ثُمَّ سَوّٰهُ أَيْ خَلَقَ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ أَيْ جَعَلَهُ حَيًّا حَسَّاسًا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمَادًا وَجَعَلَ لَكُمُ أَيِ الذُّرِّيَّةِ السَّمْعَ بِمَعْنَى الْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط الْقُلُوبَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مَا زَائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِلْقِلَّةِ.

৯. অতঃপর তিনি তাকে সুষম সৃষ্টি করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন অর্থাৎ তাকে জীবিত ও অনুভূতিশীল বানিয়েছেন তা জড় পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও এবং তোমাদেরকে আদম সন্তানদেরকে দেন কর্ণ, এখানে سَمْع টি أَسْمَاع -এর অর্থে চক্ষু ও অন্তরসমূহ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত ও قَلِيْلًا -এর তাকীদের জন্য আনা হয়েছে।

١٠. وَقَالُوْٓا اَىْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ غِبْنَا فِيْهَا بِاَنْ صِرْنَا تُرَابًا مُخْتَلِطًا بِتُرَابِهَا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِى الْمَوْضِعَيْنِ قَالَ تَعَالٰى بَلْ هُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّهِمْ بِالْبَعْثِ كٰفِرُوْنَ.

১০. তারা কিয়ামতের অস্বীকারকারীগণ বলে, আমরা মৃত্তিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও অর্থাৎ আমরা মাটি হয়ে মাটির সাথে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃজিত হবে কি? এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি অস্বীকারমূলক প্রশ্ন আর উভয় স্থানে ءَاِذَا -এর উভয় হামযাকে হামযার সাথে বা দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল করে বা উভয়ের মধ্যে আলিফ এনে উচ্চারণ করা যাবে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

١١. قُلْ لَهُمْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ اَىْ بِقَبْضِ اَرْوَاحِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ اَحْيَاۤءً فَيُجَازِيْكُمْ بِاَعْمَالِكُمْ.

১১. বলুন, তাদেরকে তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। জীবিত অবস্থায় অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

তাহকীক ও তারকীব

সূরা সাজদাহ মক্কী, এতে ত্রিশ আয়াত রয়েছে। তবে কারো কারো নিকট ২৯ আয়াত। তবে তিনটি আয়াত মদনী এটা কালবী এবং মুকাতিলের অভিমত। অন্যদের মতে পাঁচটি আয়াত মদনী। যার শুরু হলো- تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ হতে আর শেষ হলো اَلَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

الٓمّٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে বিভিন্ন ধরনের তারকীব হতে পারে। তবে উত্তম এবং সহজটি ব্যাখ্যাকার বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ হলো মুবতাদা আর لَا رَيْبَ فِيْهِ হলো প্রথম খবর। আর مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো দ্বিতীয় খবর। মুবতাদা আর উভয় খবরকে নিয়ে خَبَرٌ হলো الم মুবতাদার।

قَوْلُهٗ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ : এখানে اَمْ হলো مُنْقَطِعَه যা بَلْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ অর্থে হয়েছে। এতে هَمْزَة হলো اِنْكَارِىْ মুফাসসির (র.) শুধু بَلْ লিখেছেন। সম্ভবত কাতেব থেকে هَمْزَة রয়ে গেছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, এতে মুশরিকদের সেই দাবির অস্বীকার রয়েছে যে, কুরআন শরীফ রাসূল ﷺ -এর স্বরচিত গ্রন্থ। এটা রহিত ও অস্বীকার করে বলেছেন যে, বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা এ ধরনের কালাম রচনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহিত্যিকগণ এর সমকক্ষ উপস্থাপনে অক্ষম হয়ে পড়েছে। আজও কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ রয়েছে যে, ছোট থেকে ছোট তিন আয়াত সম্বলিত কোনো সূরা রচনা করে উপস্থাপন করুক দেখি!

قَوْلُهٗ بَلْ هُوَ الْحَقُّ : اِفْتِرَاء -এর نَفِىْ করার পরে বাস্তবতা কে সুপ্রমাণিত করার জন্য এটা اِضْرَاب اِنْتِقَالِىْ হয়েছে। এটা اِضْرَاب اِبْطَالِىْ -ও হতে পারে। অর্থাৎ মুশরিকদের উক্তি اِفْتِرَاء কে বাতিল করে বলা হয়েছে। এই সুরতে উহ্য ইবারত হবে- كُلُّ مَا فِى الْقُرْاٰنِ مِنَ الْاِضْرَابِ اِنْتِقَالِىْ এখন এই مَقُوْلَه থাকল যে, لَيْسَ هُوَ كَمَا قَالُوْا بَلْ هُوَ الْحَقُّ তবে এটা ছাড়া অন্যের উপরও محمول হবে। [সাবী] আয়াতের অর্থ হবে যে, কুরআনে যা কিছু আছে তা সত্য। আর এই বাক্য সীমাবদ্ধকরণ (بَلْ هُوَ الْحَقُّ) مُسْتَفَادٌ مَعْرِفَةُ الطَّرَفَيْنِ থেকে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لِتُنْذِرَ قَوْمًا : تُنْذِرَ দুই মাফঊলকে نَصْب দেয়। প্রথম মাফঊল হলো قَوْمًا আর দ্বিতীয়টি উহ্য রয়েছে, যাকে মুফাসসির (র.) স্বীয় উক্তির দ্বারা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় মাফঊল اَلْعِقَابَ কে উহ্য মেনেছেন। উহ্য ইবারত হবে لِتُنْذِرَ قَوْمًا الْعِقَابَ আর مَا اَتَاهُمْ الخ এটা قَوْمًا-এর সিফত হবে।

قَوْلُهُ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ : এই تَرَجِّىْ রাসূল ﷺ -এর হিসেবে। উদ্দেশ্যে এই যে, আপনি সম্প্রদায়ের হেদায়েতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সাথে ভয় করতে থাকুন এবং নিরাশ হবেন না।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ الخ : বাক্যটি মুবতাদা এবং খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ مَالَكُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ : مِنْ دُوْنِهِ হলো مَا-এর اِسْم আর مِنْ হলো অতিরিক্ত। এই ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, مَا হলো حِجَازِيَّة আর مِنْ وَّلِيٍّ হলো اِسْم مُوَخَّرْ আর مِنْ دُوْنِهِ হলো خَبَر مُقَدَّمْ তবে তাতে এই প্রশ্ন হবে যে, مَا টি عَامِلْ হওয়ার জন্য তার اِسْم ও خَبَرْ-এর মধ্যে তারতীব জরুরি। অথচ এখানে তারতীব ঠিক নেই?

এর উত্তর এভাবে দেওয়া যায় যে, নাহুবিদদের দুর্বল মতানুযায়ী আমল করেছে। কেননা দুর্বল মতানুযায়ী مَا-এর আমল করার জন্য তারতীব শর্ত নয়। উত্তম হলো مَا-কে تَمِيْمِيَّة মানা। আর مِنْ دُوْنِهِ কে خَبَر مُقَدَّمْ এবং وَلِيٍّ কে مُبْتَدَأ مُوَخَّرْ মানা। কেননা কুরআনের ক্ষেত্রে قَوْل ضَعِيْف-এর উপর حَمْل করা অনুচিত।

قوله اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ : هَمْزَة উহ্যের উপর প্রবেশ করেছে। আর فَاء হলো عَاطِفَة উহ্য ইবারত হলো اَغَفَلْتُمْ فَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ هٰذَا এখানে هٰذَا হলো تَتَذَكَّرُوْنَ-এর মাফঊল।

قَوْلُهُ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যিনি সৃষ্টিকর্তা ও সকল কর্মবিধায়ক তিনি স্বীয় ইচ্ছা এবং عِلْم اَزَلِىْ অনুযায়ী মাখলুকের মধ্যে تَصَرُّفْ করেন অর্থাৎ প্রতিটি সময়েই তার একটি شَانْ রয়েছে তথা كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَانٍ প্রত্যেক জিনিস তারই ফয়সালার মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مُدَّةُ الدُّنْيَا : বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। আর রাসূল ﷺ -এর প্রেরণ হয়েছে ষষ্ঠ হাজারের শুরুতে। আবার কতিপয় اٰثَارْ এটার উপর বুঝাচ্ছে যে, রাসূল ﷺ-এর উম্মতের বয়স হাজার বছর হতে বেশি হবে তবে এই বৃদ্ধি পাঁচশত বছরের বেশি হবে না।

قَوْلُهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ : এখানে يَوْم দ্বারা প্রসিদ্ধ يَوْم উদ্দেশ্য নয়। যা দুই রাতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। বরং সুদীর্ঘ সময় ও যুগ উদ্দেশ্য। কেননা আরবগণ সুদীর্ঘ সময়কে يَوْم দ্বারা ব্যক্ত করতো। نُحَاسْ বলেছেন অভিধানে মুতলাক সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাজেই এখন দ্বন্দ্বের সেই প্রশ্নের নিরসন হয়ে গেল যা সূরায়ে سَأَلَ তে خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ এবং এখানে اَلْف سَنَة এসেছে, নিম্নোক্ত কবিতায় يَوْم টি মুতলাক সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَاَنْدِيَةٍ * وَيَوْمُ سَيْرٍ اِلَى الْاَعْدَاءِ تَاْدِيْبٌ (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা মুবতাদা। আর عَالِمُ হলো প্রথম খবর। আর اَلْعَزِيْزُ হলো দ্বিতীয় খবর। আর اَلرَّحِيْمُ তৃতীয় খবর এবং اَلَّذِىْ اَحْسَنَ হলো চতুর্থ খবর।

قَوْلُهُ خَلَقَهُ : ফে'লে মাযীর সুরতে জুমলা হয়ে شَئٍ-এর صِفَتْ হলে مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে। আর যদি كُلَّ-এর صِفَتْ হয় তবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। আর যদি خَلْقَهُ তথা لَامْ টি سُكُوْن সহকারে হয় যেমনটি কোনো কোনো কেরাতে রয়েছে তবে كُلَّ হতে بَدَل اِشْتِمَال হবে।

قَوْلُهُ بَدَاَ : এর আতফ হয়েছে اَحْسَنَ-এর উপর। আর اَلْاِنْسَانُ হলো مَفْعُوْل بِه এবং مِنْ طِيْنٍ টা خَلَقَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। اِنْسَانْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত আদম (আ.) এবং ، যমীরের مَرْجِعْ হলেন হযরত আদম (আ.)। نَسْل ও মারজি হতে পারে অর্থাৎ نَسْل اٰدَمْ কে মায়ের গর্ভে ঠিক করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مِنْ رُوْحِهِ : এর মধ্যে ইযাফতটা تَشْرِيْف -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ جَعَلَ لَكُمْ : এতে غَائِبْ হতে خِطَابْ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ হয়েছে। কেননা مُضْغَةْ -কে রূহ ফুঁকে দেওয়ার পর مُخَاطَبْ হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

قَوْلُهُ اِدْخَالُ الْفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ : এখানে وَتَرْكُهَا শব্দটি ছুটে গেছে। এভাবে মোট চারটি কেরাত হবে।

قَوْلُهُ فِى الْمَوْضِعَيْنِ : اَلْمَوْضِعَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَضَلَلْنَا اَاِذَا এবং اَاِنَّا

قَوْلُهُ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُوْنَ : এটা اِنْكَار بَعْث থেকে اِنْكَار لِقَاء -এর দিকে اِضْرَابْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা সাজদা প্রসঙ্গে : ইমাম বুখারী (র.) 'কিতাবুল জুমা'য় হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাজে এ সূরা এবং সূরা দাহর পাঠ করতেন।

অন্য একখানা হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে সূরা সাজদা এবং সূরা মূলক পাঠ করতেন। -[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী]

এ সূরার ফজিলত : তাবারানী এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজের পর চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করে এবং তার প্রথম দু রাকাতে সূরা কাফেরুন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করে আর শেষ দু'রাকাতে সূরা মূলক এবং সূরা সাজদা পাঠ করে, এতে এমন ছওয়াব হয় যেন সে লাইলাতুল কদরে চার রাকাত নামাজ আদায় করলো।

ইবনে মারদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরায়ে মূলক এবং সূরা সাজদা মাগরিব এবং ইশার মধ্যে পাঠ করে, সে যেন লাইলাতুল কদরে নামাজ আদায় করল।

ইবনে মারদবিয়া হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা সাজদা, সূরা ইয়াসিন এবং সূরা কমর পাঠ করে, তার জন্যে তা নূর হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং কিয়ামতের দিন তার মরতবা বুলন্দ হবে।

হযরত ইবনে রাফে (রা.) বর্ণিত অন্য একখানা হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সূরায়ে সাজদা এভাবে আসবে যে, তার দুটি ডানা থাকবে এবং এ সূরা ঐ ডানা দ্বারা তার পাঠকদেরকে ছায়া দেবে।

-[তাফসীরে আদ্দুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ১৮৫, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২১, পৃ. ১১৬]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। এরপর তাওহীদের দলিল প্রমাণ ও হাশর নাশরের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর তাওহীদ এবং হাশর নাশরের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর নেককার ও বদকারদের জীবন-ধারা ও তাদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

অথবা, বিষয়টিকে এভাবেও উপস্থাপন করা যায়, সূরা লোকমানে আসমান জমিন সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ সূরায় বিশ্বসৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ : এখানে نَذِيْر ভয়প্রদর্শক বলে রাসূল ﷺ কে বুঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পূর্বে মক্কার কুরাইশগণের নিকট কোনো নবী আগমন করেন নি। কিন্তু এর দ্বারা একথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌঁছেনি। কেননা কুরআন কারীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে- وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার মাঝে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কোনো ভয়প্রদর্শক এবং তার পক্ষ থেকে কোনো দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِيْرٌ শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি আহ্বানকারী চাই তিনি রাসূল ও পয়গাম্বর হোন বা তাদের কোনো প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে

Free @ www.eilm.weebly.com

তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা স্বস্থানে সম্পূর্ণ ঠিক এবং আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবূ হাইয়্যান (র.) বলেন যে, তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোনো কালে, কোনো স্থানে এবং কোনো সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণ্ন হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ নিতান্ত নগণ্য সংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি অপর নবী বা রাসূল প্রেরিত হতেন। এ দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবত তাওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই অবশ্য পৌঁছেছিল। কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোনো নবী বা রাসূল বহন করে এনেছিলেন, হতে তাদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে পৌঁছেছিল। সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসীন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আরবের কুরাইশ গোত্রে তার পূর্বে কোনো نَذِيْرٌ [ভয়প্রদর্শক] আগমন করেননি, তখন نَذِيْرٌ বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রাসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ এই হবে যে, এ সম্প্রদায়ে আপনার পূর্বে কোনো রাসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌঁছেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর দীনের [জীবন বিধান] উপর অবস্থিত ছিলেন। তাওহীদের [একত্ববাদ] প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কুরবানি করতে তারা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রূহুল মা'আনীতে মূসা বিন ওকবা হতে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর বিন নফায়েল যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তার সাথে সাক্ষাৎও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কুরাইশগণ বায়তুল্লাহ পুনঃনির্মাণ করেন এবং এটা তার নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। মূসা বিন ওকবাহ তার সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কুরবানি করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতেন না।

আবূ দাউদ তায়ালীসী ওমর বিন নুফায়েল তনয় হযরত সাঈদ ইবনে ওমর (রা.) হতে [যিনি আশারায়ে মুবাশশারা সাহাবী ছিলেন] এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজির খেদমতে আরজ করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে তিনি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান যে হ্যাঁ, তার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েজ। তিনি কিয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। -[রূহুল মা'আনী]

অনুরূপভাবে ওরাকা বিন নাওফল যিনি হুজুর ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পর্বে বর্তমান ছিলেন, তিনি তাওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তা বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাদের মাঝে কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এ তিন আয়াত কুরআন যে সত্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য : فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর এবং সূরায়ে মা'আরিজের আয়াতে রয়েছে- فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

এর এক সহজ উত্তর তো এই- যা 'বয়ানুল কুরআনে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বলে মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমল অনুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট দীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কতক লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে। আবার সেদিনটি অন্যদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে ওলামা ও সূফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনোটাই কুরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ- তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাদের জানা নেই, একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَقُوْلَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ অর্থাৎ এ দুদিন এমন যা আল্লাহ তা'আলা নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ তা'আলার গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি [এটা আব্দুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।]

দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা শুধু তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণে : اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্ব জগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এ প্রতিটি বস্তুই মূলত এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যত যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, ভাগ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণত দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলো কোনোটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়। জনৈক কবি বলেন– نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں * کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

অর্থাৎ বিশ্বমাজারে পাবে না কিছু অকেজো অসার, অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেত্রে আল্লাহর।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষাঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَىْءٍ-এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যে সব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা– প্রাণীজগত, উদ্ভিদ জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষাঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা– স্বভাব-চরিত্র ও আমরসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন কামনা প্রভৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুণ এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়। যথাস্থানে ব্যবহৃত হলে এগুলোর কোনোটই খরাপ ও অমঙ্গলজনক নয়। কিন্তু এ দ্বারা এসব বস্তুর সৃষ্টিগত দিকই উদ্দেশ্য যা নিঃসন্দেহে শুভ ও সুন্দর কিন্তু আমলের অপর দিক মানব কর্তৃক তা সাধন ও অর্জন অর্থাৎ কোনো কাজ সম্পর্কে নিজের ইচ্ছা নিয়োজিত করা। এ দিক দিয়ে সবকিছু শুভ ও সুন্দর নয়। আল্লাহ তা'আলা যেগুলো করতে অনুমতি দেননি সেগুলো সুন্দর ও কল্যাণকর নয়। অশ্লীল ও অপকৃষ্ট।

قَوْلُهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ : ইতিপূর্বে এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে এ কথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম সেরা সৃষ্টি করে তৈরি করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়; বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু– বীর্য। অতঃপর তার অন্য ক্ষমতাও অসাধারণ সৃষ্টি কৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

قَوْلُهٗ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ : পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুঅন্তে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পূনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময় তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তাভাবনা কর তবে এতে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে কামেলা ও অন্যান্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত একথা মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে। এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে হযরত আজরাঈল (আ.)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণীজগতের মৃত্যু তার উপর ন্যস্ত, যে ব্যক্তির মৃত্যু যখন এবং যে স্থান নির্ধারিত রয়েছে ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে। এখানে مَلَكُ الْمَوْتِ একবচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায় এখানে مَلٰٓئِكَةٌ বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আজরাঈল (আ.) একাকী এ কাজ সম্পন্ন করেন না বহু ফেরেশতা তার অধীনে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আত্মবিয়োগ ও মালাকুল মাউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ : প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ (র.) বলেন, মালাকুল মাউতের সম্মুখে গোটা বিশ্ব কোনো ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার ন্যায় তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক 'মারফূ' হাদীসেও আছে [ইমাম কুরতুবী 'তাযকিরা'তে এটা বর্ণনা করেছেন]। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী ﷺ একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মাউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল মাউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন– আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বা সমুদ্রে বসবাস করছে– আমি এদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচবার দেখে থাকি এজন্য এদের ছোট বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহ তা'আলার হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত আমি কোনো মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল মাউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণবিয়োগ ঘটান? : উল্লিখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল-মাউতই ঘটায়। ইমাম মালেক (র.)ও এক প্রশ্নের উত্তরে এরকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট, কেবল তা মান-মর্যাদা রক্ষার্থে অন্যান্য জীবন-জন্তু আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীতই আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করবে। –[কুরতুবীর বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়া বর্ণনা করেন]

এ বিষয়ই আবুশশায়েখ, উকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা স্তুতিতে মগ্ন [এ-ই এগুলোর জীবন]। যখন এদের গুণ কীর্তন বন্ধ হয়ে যায় তখনই আল্লাহ তা'আলা এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মাউতের উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। –[তাফসীরে মাযহারী]

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আজরাঈল (আ.)-এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি [হযরত আজরাঈল (আ.)] আরজ করেন, হে প্রভু, আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্বজগত ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসঙ্গ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে হক তা'আলা বললেন, আমি এর সুরাহা এরূপভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য রূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। –[কুরতুবী]

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যত প্রকারের রোগ-ব্যাধি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে এসবই মৃত্যুর দূত মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসে তখন মালাকুল মউত মৃত্যুপথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহর বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ ব্যাধি ও দুর্যোগ দুর্বিপাক রূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোনো সংবাদ প্রদানকারী বা কোনো দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক। –[মাযহারী]

মাসআলা : কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল মাউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। –[আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত। মাযহারী]

Free @ www.eilmweebly.com

١٢. وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط مُطَاطِئُوْهَا حَيَاءً يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا مَا اَنْكَرْنَا مِنَ الْبَعْثِ وَ سَمِعْنَا مِنْكَ تَصْدِيْقَ الرُّسُلِ فِيْمَا كَذَّبْنَاهُمْ فِيْهِ فَارْجِعْنَا اِلَى الدُّنْيَا نَعْمَلْ صَالِحًا فِيْهَا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ الْاٰنَ فَمَا يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ وَلَا يَرْجِعُوْنَ وَجَوَابُ لَوْ لَرَاَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا.

١٣. قَالَ تَعَالٰى وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا فَتَهْتَدِيْ بِالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ ط وَهُوَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ الجن وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

١٤. وَتَقُوْلُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ اِذَا دَخَلُوْهَا فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اَىْ بِتَرْكِكُمُ الْاِيْمَانَ بِهِ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ تَرَكْنَاكُمْ فِى الْعَذَابِ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ الدَّائِمِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ.

١٥. اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا مُتَلَبِّسِيْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اَىْ قَالُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ.

অনুবাদ :

১২. যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা কাফেররা তাদের পালনকর্তার সামনে লজ্জায় নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম পুনরুত্থানকে যা আমরা অস্বীকার করেছি ও শ্রবণ করলাম আপনার পক্ষ থেকে রাসূলদের ঐ সমস্ত কথার সত্যতা যা আমরা অস্বীকার করেছি। এখন আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, আমরা সেখানে সৎকর্ম করব। এখন আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি। কিন্তু তাদের এই স্বীকারোক্তি কোনোই উপকারে আসবে না; বরং তাদেরকে দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা হবে না। এবং لَوْ-এর জবাব لَرَاَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا উহ্য রয়েছে।

১৩. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে তাদের সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম অতএব তারা ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণ করে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।

১৪. যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে জাহান্নামের প্রহরী তাদেরকে বলবে অতএব এই দিবসকে ভুলে যাওয়ার এর প্রতি ঈমান না আনার কারণে তোমরা মজা আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম অর্থাৎ তোমাদেরকে আজাবে ছেড়ে দিলাম তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম কুফর ও মিথ্যাবাদীতা এর কারণে স্থায়ী আজাবে ভোগ কর।

১৫. কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের কুরআনের প্রতি ঈমান আনে যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকার মুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার প্রশংসা পবিত্রতা বর্ণনা করে। অর্থাৎ তারা বলে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ এবং তারা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অহংকার করে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٦. تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ تَرْتَفِعُ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَوَاضِعِ الْاِضْطِجَاعِ بِفُرُشِهَا لِصَلَاتِهِمْ بِاللَّيْلِ تَهَجُّدًا يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهٖ وَّطَمَعًا فِيْ رَحْمَتِهٖ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ يَتَصَدَّقُوْنَ.

১৬. তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। অর্থাৎ তারা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্য শয়নকক্ষে বিছানা শয্যা রাতের বেলায় ত্যাগ করে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে আজাবের ভয়ে ও রহমতের আশায় এবং তারা ব্যয় করে সদকা করে আমি তাদরেকে যা রিজিক দিয়েছি তা থেকে।

١٧. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ خُبِئَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج مَا تَقَرُّ بِهٖ اَعْيُنُهُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْيَاءِ مُضَارِعٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

১৭. কেউ জানেনা তার জন্যে তার কৃতকর্মের প্রতিদানে কি কি নয় প্রীতিকর যা তার চক্ষুকে শীতল ও শান্ত করে প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। ভিন্ন কেরাতে أُخْفِيَ -এর يَاء -এর মধ্যে সাকিনের সাথে مُضَارِعْ -এর সীগাহ পড়বে।

١٨. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَا يَسْتَوٗنَ اَيِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْفَاسِقُوْنَ.

১৮. ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাধ্যের অনুরূপ? তারা অর্থাৎ মুমিন ও কাফের সমান নয়।

١٩. اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًا وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلضَّيْفِ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়ন স্বরূপ বসবাসের জান্নাত। نزلا অর্থাৎ যা মেহমানের জন্য তৈরি করা হয়।

٢٠. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا بِالْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ط كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ.

২০. পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয় কুফরি ও মিথ্যার মাধ্যমে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আজাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর।

٢١. وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى عَذَابِ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْاَسْرِ وَالْجَدْبِ سِنِيْنَ وَالْاَمْرَاضِ دُوْنَ قَبْلَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ لَعَلَّهُمْ اَيْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ.

২১. বড় শাস্তির পরকালের আজাবের পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি হত্যা, বন্দি, দুর্ভিক্ষ ও রোগ-ব্যাধির দ্বারা আস্বাদন করাব, যাতে তারা তাদের মধ্যে যারা বাকি রয়েছে প্রত্যাবর্তন করে। ঈমানের দিকে।

٢٢. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ط اَيْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ مِنْهُ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ اَيِ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ.

২২. যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ কুরআন দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে জালেম আর কে? অর্থাৎ কেউ তার চেয়ে বড় জালেম নেই। আমি অপরাধীদেরকে মুশরিকদেরকে শাস্তি দেব।

Free @ www.e-ilmweebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ : কিয়ামতের দিন অপরাধীদেরকে সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করার জন্য এই বাক্যটি مُسْتَأْنِفَهْ রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। অথবা প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা হয়েছে যার সম্বোধিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। এই আয়াতে অপরাধীদেরকে এ কিয়ামতের দিনের অব্যক্ত অবস্থার চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। এবং তাদের مَعْنَوِىْ অবস্থাকে مَحْسُوْس এবং مُجَسَّمْ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। لَوْ এবং اِذْ যদিও مَاضِىْ-এর জন্য হয়ে থাকে কিন্তু এখানে مُضَارِعْ-এর উপর এসেছে। কেননা অপরাধীদের উল্লিখিত অবস্থাতে নিপতিত হওয়া সুনিশ্চিত এ কারণে এটার مُضَارِعْ-এর উপর আসা বৈধ হয়েছে। আর আবুল বাকা বলেছেন যে, اِذْ টা اِذَا-এর স্থানে পতিত হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمُجْرِمُوْنَ : এটা মুবতাদা আর نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ তার খবর। جُمْلَة فِعْلِيَّة-এর স্থানে جُمْلَة اِسْمِيَّة নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাদের অবনত মস্তক ও লজ্জিত অবস্থার دوام-এর উপর দালালত করা।

قَوْلُهُ تَرٰى : تَرٰى-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। কেননা رُؤْيَتْ দ্বারা رُؤيَت بَصَرْ উদ্দেশ্য। উহ্য ইবারত হলো- لَوْ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ - لَوْ-এর জবাব উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَرَاَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا لَايُمْكِنُ وَصْفُهُ আর আল্লামা যমখশরী (র.) لَوْ-কে تَمَنِّىْ-এর জন্য বলেছেন। এই সুরতে جَوَابْ-এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ : মুফাসসির (র.) يَقُوْلُوْنَ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, رَبَّنَا টা قَوْلْ উহ্য থাকার সাথে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ قَائِلِيْنَ يَا رَبَّنَا

قَوْلُهُ اَبْصَرْنَا : এটা فِعْل এবং فَاعِلْ আর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَبْصَرْنَا صِدْقَ وَعْدِكَ وَوَعِيْدِكَ

قَوْلُهُ سَمِعْنَا : এর আতফ اَبْصَرْنَا-এর উপর হয়েছে। سَمِعْنَا-এর مَفْعُوْل ও উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ سَمِعْنَا مِنْكَ تَصْدِيْقَ رَسُوْلِكَ মাফউল উহ্য না মানাও যেতে পারে। অর্থাৎ صِرْنَا مِمَّنْ يُبْصِرُ وَيَسْمَعُ وَكُنَّا مِنْ قَبْلُ صُمًّا وَعُمْيَانًا

قَوْلُهُ نَعْمَلْ : এটা جَوَاب اَمْر হওয়ার কারণে جَزْم যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَهْتَدِىْ : এটা لَوْ-এর জবাব যাকে ব্যাখ্যাকার প্রকাশ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ بِتَرْكِكُمْ : মুফাসসির (র.) نِسْيَانْ-এর তাফসীর تَرْك দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, উভয় স্থানেই نِسْيَانْ দ্বারা لَازِمْ অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা نِسْيَانْ-এর জন্য تَرْك আবশ্যক। অন্যথায় نِسْيَانْ-এর উপর ধরপাকর নেই। আর আল্লাহ তা'আলার দিকে نِسْيَانْ-এর নিসবত করা অসম্ভব। مَجَاز مُرْسَلْ বা اِسْتِعَارَه-এর ভিত্তিতেই হতে পারে।

قَوْلُهُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ : এর তাকরার প্রথম ذُوْقُوْا-এর মাফউল উহ্য হওয়া বুঝানোর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ بِمَا كُنْتُمْ : এর মধ্যে بَاء হলো سَبَبِيَّه আর مَا হলো مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ-এর بَيَانْ

قَوْلُهُ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ : تَجَافٰى হতে مُضَارِعْ-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ অর্থ- দূরে থাকে, পৃথক থাকে। এটা جُمْلَة مُسْتَأْنِفَة ও হতে পারে। আর يَسْتَكْبِرُوْنَ-এর যমীর থেকে حَالْ ও হতে পারে। এমনিভাবে يَدْعُوْنَ-এর মধ্যেও এই দুই সম্ভাবনা রয়েছে। يَدْعُوْنَ-কে حَالْ বলার সুরতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, حَال ثَانِيَة হবে। এবং এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, جُنُوْبُهُمْ-এর যমীর থেকে حَالْ হবে।

قَوْلُهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا : এই উভয়টিই مَفْعُوْل لَهْ এবং حَالْ ও হতে পারে এবং উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ ও হতে পারে অর্থাৎ اَخْفٰى لِاَجْلِ جَزَائِهِمْ এবং جُوْزُوْا جَزَاءً - اَخْفٰى-এর مَفْعُوْل لَهْ ও হতে পারে। অর্থাৎ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا : মুমিনদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে মুমিনদের অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে।

১. মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলার কথাকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

২. যখন তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন তারা দরবারে ইলাহীতে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

অর্থাৎ মুমিনের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশ করা হয়।

৩. আর সেজদারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার হামদ, তাসবীহ তাহলীলে মুমিনের রসনা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এভাবে শিরক থেকে পবিত্রতা অর্জন করা হয়।

৪. আর তারা অহংকার করে না; বরং বিনয়ী হয়।

৫. মুমিনদের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই- تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ অর্থাৎ তাদের পাঁজর বিছানা থেকে পৃথক থাকে।' অর্থাৎ তারা বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করে রাত অতিবাহিত করে না; বরং রাত্রিকালে তারা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে।

قَوْلُهُ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিক ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুমিনগণের বিশেষ গুণাবলি ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও দোয়াায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা এরা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তার করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে জিকির ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে তোলে।

তাহাজ্জুদের নামাজ : অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে জিকির ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। [এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান, মুজাহিদ, মালেক ও আওযায়ী (র.)-এর বক্তব্যও ঠিক একই রূপ] এবং হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত আছে । তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি তাঁর [নবীজীর] সন্নিকটে গেলাম এবং আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোজখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যার তরে তা সহজ লভ্য করে দেন তার জন্য তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করবে না। নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত প্রদান করবে, রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন, এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, [তা এই যে,] রোজা ঢাল স্বরূপ। [যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়] এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামাজ। এই বলে কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) কাতাদাহ (র.) ও যাহহাক (রা.) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা ইশা ও ফজর উভয় নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ الخ যারা ইশার নামাজের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে ইশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে।

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামাজ আদায় করে করে কাটান [মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন।] এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে, বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উম্মিলনের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার জিকিরে লিপ্ত হন, তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে কাছীর ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাজই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। 'বয়ানুল কুরআনও' এটাই গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন. কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন, হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা অবহিত হতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে] এরূপ গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহ্বান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন, যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। –[ইবনে কাসীর]

এই রেওয়াতেরই কোনো কোনো শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের থেকে হিসাব গ্রহণ করা হবে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : أَدْنٰى অর্থ নিকটতম عَذَابُ الْأَدْنٰى [নিকটতম শাস্তি] বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (عَذَابُ الْأَكْبَرُ) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমত স্বরূপ : এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন। যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ– যার ফলে স্বীয় নির্লিপ্ততা ও অসবাধনতা থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ধাবিত না হয়– তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, একটা দুনিয়াতেই নগদ, দ্বিতীয়টা পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ– যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। তার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধির সময়ও তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে যায় : إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ বাহ্যত প্রত্যেক শ্রেণির অপরাধকারী مُجْرِمِيْنَ শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরকালের– উভয় এর অন্তর্গত। কিন্তু হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। ১. ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, ২. পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, ৩. অত্যাচারীর সহযোগিতা করা [হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে হযরত ইবনে জারীর (রা.) বর্ণনা করেছেন]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِّنْ لِّقَائِهٖ وَقَدِ الْتَقَيَا لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ وَجَعَلْنٰهُ اَىْ مُوْسٰى اَوِ الْكِتٰبَ هُدًى هَادِيًا لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ج

٢٤. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ يَاءً قَادَةً يَّهْدُوْنَ النَّاسَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا عَلٰى دِيْنِهِمْ وَعَلَى الْبَلَاءِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا الدَّالَّةِ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَّتِنَا يُوْقِنُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ.

٢٥. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ.

٢٦. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ اَىْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ اِهْلَاكُنَا كَثِيْرًا مِّنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ بِكُفْرِهِمْ يَمْشُوْنَ حَالٌ مِّنْ ضَمِيْرِ لَهُمْ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ ط فِىْ اَسْفَارِهِمْ اِلَى الشَّامِ وَغَيْرِهَا فَيَعْتَبِرُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ط دَلَالَاتٍ عَلٰى قُدْرَتِنَا اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ سَمَاعَ تَدَبُّرٍ وَّاتِّعَاظٍ.

অনুবাদ :

২৩. আমি মূসাকে কিতাব তাওরাত দিয়েছি, অতএব আপনি তার সাথে সাক্ষাতের কোনো সন্দেহ করবেন না। এবং তারা উভয়ের মাঝে [হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও হযরত মূসা (আ.)-এর মাঝে] মেরাজের রাত্রে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবং আমি একে হযরত মূসা (আ.) বা তাওরাত বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক করেছিলাম।

২৪. তারা তাদের ধর্মের আনুগত্যে ও তাদের শত্রুদের অত্যাচারে সবর করতো বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে ইমাম মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো। اَئِمَّةً শব্দটি শুরুতে দুই হামযা বা দ্বিতীয় হামযাকে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া যাবে অর্থ– নেতা এবং তারা আমার আয়াতসমূহে যা আমার কুদরত ও একত্ববাদের উপর প্রমাণস্বরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। لَمَّا ভিন্ন কেরাতে لِمَا অর্থাৎ লামের মধ্যে যের ও মীমের মধ্যে তাশদীদবিহীন।

২৫. তারা যে বিষয়ে ধর্মের ব্যাপারে মতবিরোধ করছে, আপনার পালনকর্তা সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দিবেন।

২৬. এতেও কি তাদের হেদায়েত হয়নি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের নিকটে কি প্রকাশ হয়নি যে, পূর্বেকার অনেক সম্প্রদায়কে তাদের কুফরির কারণে আমি ধ্বংস করেছি যাদের বাড়ি ঘরে এরা বিচরণ করে যেমন, তারা সিরিয়া ও অন্যান্য এলাকায় ভ্রমণ করে, অতএব তোমরা তা থেকে শিক্ষা নাও অবশ্যই এতে আমার কুদরতের নির্দেশনাবলি রয়েছে। তারা কি শোনে না। উপদেশ গ্রহণ ও চিন্তার জন্য শোনা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৭. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ الْيَابِسَةِ الَّتِي لَا نَبَاتَ فِيهَا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ط أَفَلَا يُبْصِرُونَ . هٰذَا فَيَعْلَمُونَ أَنَّا نَقْدِرُ عَلَى إِعَادَتِهِمْ .

২৭. তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি ঊষর ভূমিতে শুষ্ক ভূমি যেখানে কোনো শষ্য নেই পানি প্রবাহিত করে শষ্য উদগত করি। যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুরা ও এবং তারা। তারা কি এটা দেখে না অতএব তারা তাদের পুনরুত্থানের ব্যাপারে জানে।

২৮. وَيَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَتَى هٰذَا الْفَتْحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ .

২৮. তারা বলে মুমিনদেরকে কবে হবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে এই ফয়সালা? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৯. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِإِنْزَالِ الْعَذَابِ بِهِمْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ يُمْهَلُونَ لِتَوْبَةٍ أَوْ مَعْذِرَةٍ .

২৯. আপনি বলুন! ফয়সালার দিনে তাদের নিকট আজাব অবতরণের মাধ্যমে কাফেরদের ঈমান তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে তওবা ও আপত্তি পেশ করার জন্য কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না।

৩০. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنْزَالَ الْعَذَابِ بِهِمْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بِكَ حَادِثَ مَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ فَيَسْتَرِيحُونَ مِنْكَ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ .

৩০. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং তাদের উপর আজাব অবতরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারাও তাদের মৃত্যু ও হত্যার অপেক্ষা করছে। যাতে তারা আপনার থেকে শান্তিতে মুক্তি পায়। এই নির্দেশটি জিহাদের নির্দেশের পূর্বের হুকুম।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ مِرْيَةٍ : এটা اِسْم مَصْدَرٌ অর্থ– সন্দেহ, সংশয়।

قَوْلُهُ لِقَائِهِ : এর যমীরের مَرْجِعٌ -এর ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি রয়েছে–

১. হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ফিরেছে এবং لِقَاء মাসদার স্বীয় مَفْعُوْل -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো–

مِنْ لِقَائِكَ مُوْسٰى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

২. কিতাবের দিকে ফিরেছে। এ সময় মাসদারের ইযাফত فَاعِلْ এবং مَفْعُوْل উভয়ের দিকেই বৈধ হবে। فَاعِلْ -এর দিকে ইযাফতের সুরতে উহ্য ইবারত হবে– مِنْ لِقَاءِ الْكِتَابِ لِمُوْسٰى এবং مَفْعُوْل -এর দিকেও বৈধ। উহ্য ইবারত হবে مِنْ لِقَاءِ مُوْسَى الْكِتَابَ এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, لِقَائِهِ -এর যমীর আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরবে অর্থাৎ لِقَاءِ مُوْسَى اللّٰهَ। এই সুরতে মাসদারের ইযাফত মাফউলের দিকে হবে এবং এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, لِقَائِهِ -এর যমীর হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ফিরবে। এই সুরতে ইযাফত فَاعِلْ -এর দিকে হবে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না। অথবা আল্লাহ তা'আলার হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না। (إِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِأَبِى الْبَقَاءِ) এসকল উক্তি ছাড়াও আরো কিছু উক্তি রয়েছে কিন্তু সেগুলো দুর্বলতামুক্ত নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَئِمَّةً : এতে একটি কেরাত রয়েছে هَمْزَة-কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে অর্থাৎ اَيِمَّة আর এই কেরাত عَرَبِيَّتْ হিসেবে قِرَاءَت سَبْعَة-এর হিসেবে নয়। শরহে আকায়েদে রয়েছে اَيِمَّة মূলে اَئْمِمَةٌ ছিল। কেননা এটা اِمَامٌ-এর বহুবচন দুই مِيْم একত্রিত হওয়ার কারণে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে। এবং হরকতকে পরিবর্তন করে হামযাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং দুই হামযা একত্রিত হওয়ায় যের যুক্ত হামযাকে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করায় اَيِمَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ قَادَةً : এটা قَائِدٌ-এর বহুবচন যেমন سَادَةٌ টা سَيِّدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পথ প্রদর্শক, রাহবর।

قَوْلُهُ وَلَمَّا صَبَرُوْا : জমহুরে কেরাত হলো لَامٌ যবরের সাথে এবং مِيْم টি তাশদীদযুক্ত। حِيْنَ অর্থে হয়েছে। এবং لَمَّا جملة جزائية হয়েছে অর্থাৎ جَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً حِيْنَ صَبَرُوْا এখানে صَبَرُوْا-এর যমীর اَئِمَّة-এর দিকে ফিরেছে। আর لَمَّا صَبَرُوْا-এর জবাব উহ্য রয়েছে। যার উপর جَعَلْنَا مِنْهُمْ বুঝাচ্ছে। উহ্য ইবারত হলো– جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً হামযা এবং কিসায়ীর কেরাতে لَامٌ টি যের যুক্ত ও مِيْم টি তাশদীদ বিহীন। এই সুরতে لَامٌ টি تَعْلِيْلِيَّة হবে। আর مَا হলো মাসদারিয়া অর্থাৎ بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ عَلٰى دِيْنِهِمْ وَعَلَى الْبَلَاءِ مِنْ عَدُوِّهِمْ

قَوْلُهُ بَيْنَهُمْ : হয়তো এর দ্বারা নবীগণ এবং তাদের উম্মত উদ্দেশ্য অথবা মুমিনগণ ও মুশিরকরা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ : এর আতফ হয়েছে উহ্যের উপর অর্থাৎ اَغَفَلُوْا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ অথবা اَلَمْ يَتَّعِظُوْا

قَوْلُهُ يَهْدِ لَهُمْ : এর ফায়েল হলো مَضْمُوْن جُمْلَة যেমনটি মুফাসসির (র.) هَلَاكُنَا বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। যদি فَاعِلٌ উহ্য থাকার উপর قَرِيْنَة বিদ্যমান থাকে তবে فَاعِلٌ কে উহ্য করা জায়েজ।

قَوْلُهُ فِيْ ذٰلِكَ : অর্থাৎ فِيْ كَثْرَةِ اِهْلَاكِ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ

قوله الجرز : الجرز এমন ভূমিকে বলে যার ঘাস ইত্যাদি কেটে মসৃণ করে ফেলা হয়েছে। يَابِسَة হলো এর لَازِمِىْ অর্থ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا تَكُنْ مِنْ مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ : لِقَاء শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ। এ আয়াতে কার সাথে কার সাক্ষাৎ বুঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لِقَائِهِ-এর 'যমীর' [সর্বনাম] কিতাব অর্থাৎ কুরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না। যেরূপভাবে কুরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى যে, لِقَائِهِ-এর যমীর [সর্বনাম] হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ধাবিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মিরাজের রাতে এক সাক্ষাতকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। অতঃপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ব্যাখ্যা এরূপভাবে করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-কে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেরূপভাবে মানুষ তাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিন্ত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ যন্ত্রণার ফলে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দুটি শর্ত : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম। যারা তাদের পয়গাম্বরের প্রতিনিধি হিসেবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দুটি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দুটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে– ১. ধৈর্য ধারণ করা, ২. আল্লাহ আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবি ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ পালনে অটুট ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন, সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরিয়তের যাবতীয় নির্দেশই এর অন্তর্গত– যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন– আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করা এবং অনুধাবনান্তে তা উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন– করা উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলার নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয় দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এ স্থলে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবত কর্মের পূর্বে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই।

ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। তা এই– بِالصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ تُنَالُ الْاِمَامَةُ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

قَوْلُهُ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا : অর্থাৎ তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্দ্বারা নানা প্রকারের শস্য সমুদগত হয়। جُرُزٌ শুষ্ক ভূমিকে বলা হয়, যেখানে কোনো বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা : শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহের অনন্তর সেখানে নানাবিদ উদ্ভিদ ও তরুলতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এরূপভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয় ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্টের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ অন্য কোনো ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান কোঠা বিধ্বস্ত হবে, গাছপালা মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। যেমন মিসরের ভূমি। কিছু সংখ্যক তাফসীরকার ইয়েমেনের ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ হতে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌঁছে, সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীগণ সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানিও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ : অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমগণের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? আমরা তো এর কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ফরমান– قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের প্রত্যুত্তরে একথা বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো, সেদিন তোমাদের জন্য তা সমূহ বিপদ বহন করে আনবে। কেননা যখন আমরা বিজয় লাভ করবো সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। চাই ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে বা পরকালে এবং যে মুহূর্তে কারো উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি আপতিত হয় তখন তার ঈমান আর গৃহীত হয় না। ইবনে কাছীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো বিজ্ঞজন مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ -এর অর্থ কিয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আহযাব এটা মাদানী

وَهِيَ ثَلٰثٌ وَّسَبْعُوْنَ اٰيَةً : আর তাতে ৭৩টি আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ دُمْ عَلٰى تَقْوَاهُ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ط فِيْمَا يُخَالِفُ شَرِيْعَتَكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِمَا يَكُوْنُ قَبْلَ كَوْنِهٖ حَكِيْمًا فِيْمَا يَخْلُقُهٗ.

১. হে নবী আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভীতির উপর অটল থাকুন এবং কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ করবেন না যা আপনার শরিয়তের পরিপন্থি নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বে থেকে সৃষ্টের উপর সর্বজ্ঞ, তার সৃষ্টির ব্যাপারে প্রজ্ঞাময়।

٢. وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط اَيِ الْقُرْاٰنُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ.

২. আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ কুরআন আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়ে খবর রাখেন। অন্য কেরাতে يَعْلَمُوْنَ -এর মধ্যে ت -এর সাথে অর্থাৎ تَعْلَمُوْنَ

٣. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط فِيْ اَمْرِكَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا حَافِظًا لَكَ وَاُمَّتُهٗ تَبَعٌ لَهٗ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ.

৩. আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন তোমার কাজের মধ্যে কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট তিনি তোমার রক্ষক এবং আপনার উপম্মতগণ এতে আপনার অনুগত।

٤. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ج رَدًّا عَلٰى مَنْ قَالَ مِنَ الْكُفَّارِ اَنَّ لَهٗ قَلْبَيْنِ يَعْقِلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا اَفْضَلُ مِنْ عَقْلِ مُحَمَّدٍ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰئِيْ بِهَمْزَةٍ يَاءٍ وَبِلَا يَاءٍ تُظٰهِرُوْنَ بِلَا اَلِفٍ قَبْلَ الْهَاءِ وَبِهَا وَالتَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْاَصْلِ مُدْغَمَةٌ فِي الظَّاءِ مِنْهُنَّ.

৪. আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। এটা অনেক কাফেরদের জবাবে বলা হয়েছে। যারা বলে, নিশ্চয়ই তার বক্ষে দুটি অন্তর রয়েছে যার সাহায্যে তিনি মুহাম্মদের জ্ঞানের চেয়ে বেশি বুঝে। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'যিহার কর تُظٰهِرُوْنَ -এর মধ্যে ، -এর পূর্বে আলিফ ব্যতীত অথবা আলিফ সহ এবং এটা تَتَظَهَّرُوْنَ ছিল দ্বিতীয় 'তা' কে ط -এর সাথে পরিবর্তন করে ইদগাম করা হয়েছে। এবং الّٰئِيْ -এর মধ্যে দুই কেরাত হামযা ও ইয়া অথবা শুধুমাত্র হামযার সাথে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِقَوْلِ الْوَاحِدِ مَثَلًا لِزَوْجَتِهِ اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ اُمَّهٰتِكُمْ ج اَىْ كَالْاُمَّهَاتِ فِىْ تَحْرِيْمِهَا بِذٰلِكَ الْمُعَدِّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ طَلَاقًا وَاِنَّمَا تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ بِشَرْطِهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ سُوْرَةِ الْمُجَادَلَةِ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ جَمْعُ دَعِىٍّ وَهُوَ مَنْ يُدْعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ اِبْنًا لَهُ اَبْنَاۤءَكُمْ ط حَقِيْقَةً ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط اَىِ الْيَهُوْدِ وَالْمُنَافِقِيْنَ قَالُوْا لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِىْ كَانَتْ اِمْرَأَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الَّذِىْ تَبَنَّاهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالُوْا تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ اِمْرَءَةَ اِبْنِهِ فَاَكْذَبَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ فِىْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ سَبِيْلَ الْحَقِّ.

যেমন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে বলল, اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ [অর্থাৎ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো] অর্থাৎ যিহারের কারণে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয় না, জাহেলী যুগে এটাকে তালাক গণ্য করা হতো। এবং যিহারের কারণে কাফফারা তার শর্ত মতে ওয়াজিব হবে যেমন সূরায়ে মুজাদালাতে উল্লেখ হয়েছে। এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। اَدْعِيَاۤءَ শব্দটি دَعِىٌّ -এর বহুবচন। এবং এটা ঐ ব্যক্তি যাকে তার পিতা ছাড়া অন্যের দিকে পুত্রের নিসবত করা হয় তথা পালক সন্তান। এগুলো তাদের অর্থাৎ ইহুদি ও মুনাফিকদের মুখের কথা মাত্র। যখন মহানবী ﷺ যায়নব বিনতে জাহাশকে যিনি হুজুর ﷺ -এর পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার স্ত্রী ছিলেন বিবাহ করলেন তখন ইহুদি ও মুনাফিকরা বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ তার সন্তানের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করলেন আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে ন্যায় কথা বলেন এবং তিনি সত্যের পথ প্রদর্শন করেন।

৫. لٰكِنْ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ اَعْدَلُ عِنْدَ اللّٰهِ ج فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْۤا اٰبَاۤءَهُمْ فَهُمْ اِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ط بَنُوْ عَمِّكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ فِىْ ذٰلِكَ وَلٰكِنْ فِىْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ فِيْهِ وَهُوَ بَعْدَ النَّهْىِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِمَا كَانَ مِنْ قَوْلِكُمْ قَبْلَ النَّهْىِ رَحِيْمًا بِكُمْ فِىْ ذٰلِكَ.

৫. তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ তা'আলার কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে চাচাতো ভাই গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো ত্রুটি হলে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। তবে নিষেধের পরে তোমাদের অন্তরসমূহ যা ইচ্ছাকৃত করেছে। তাতে গুনাহ হবে আল্লাহ তা'আলা নিষেধের পূর্বে তোমাদের মিথ্যা অপবাদসমূহের গুনাহ ক্ষমাশীল, এ ব্যাপারে তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

٦. اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ
فِيْمَا دَعَاهُمْ اِلَيْهِ وَدَعَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ اِلٰى
خِلَافِهٖ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ط فِىْ حُرْمَةِ
نِكَاحِهِنَّ عَلَيْهِمْ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ ذَوُوا
الْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِى الْاِرْثِ
فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اَىْ
مِنَ الْاِرْثِ بِالْاِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ الَّذِىْ كَانَ اَوَّلَ
الْاِسْلَامِ فَنُسِخَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْاۤ اِلٰۤى
اَوْلِيٰۤئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ط بِوَصِيَّةٍ فَجَائِزٌ كَانَ
ذٰلِكَ اَىْ نَسْخُ الْاِرْثِ بِالْاِيْمَانِ وَالْهِجْرَةِ
بِاِرْثِ ذَوِى الْاَرْحَامِ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا
وَاُرِيْدَ بِالْكِتَابِ فِى الْمَوْضِعَيْنِ اللَّوْحَ
الْمَحْفُوْظَ.

৬. নবী মুমিনদের উপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক দয়ালু ঘনিষ্ঠ ঐ বিষয়ে যার দিকে তিনি তাদের ডাকেন এবং তাদের নফসসমূহ তার বিপরীত দিকে ডাকে এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা। তাদের সাথে তাদের বিবাহ করা হারাম হওয়া হিসেবে মুমিন ও মুহাজিরদের মধ্যে যারা আত্মীয় আল্লাহ তা'আলার বিধান মতে ওয়ারিস হওয়ার ক্ষেত্রে তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের ঈমান ও হিজরতের কারণে উত্তরাধিকার হওয়া যেতো কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যদি বন্ধুদের প্রতি অসিয়তের মাধ্যমে দান করতে চাও। তবে তা জায়েজ এটা অর্থাৎ ঈমান ও হিজরতের কারণে উত্তরাধিকার হওয়ার বিধান রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় মিরাস পাওয়ার বিধান দ্বারা রহিত হওয়া। কিতাবের মধ্যে লিখিত আছে। এখানে উভয়স্থানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য লাওহে মাহফূজ।

٧. وَ اذْكُرْ اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ
حِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ صُلْبِ اٰدَمَ كَالذَّرِّ جَمْعُ ذَرَّةٍ
وَهِىَ اَصْغَرُ النَّمْلِ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ
وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص بِاَنْ
يَّعْبُدُوا اللّٰهَ وَيَدْعُوا النَّاسَ اِلٰى عِبَادَتِهٖ
وَذِكْرُ الْخَمْسَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى
الْعَامِّ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا شَدِيْدًا
بِالْوَفَاءِ بِمَا حَمَلُوْهُ وَهُوَ الْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ
تَعَالٰى ثُمَّ اَخَذَ الْمِيْثَاقَ.

৭. তুমি উল্লেখ কর যখন যখন তাদেরকে আদমের পিঠ থেকে ছোট পিপীলিকার মতো বের করা হয়েছে। আমি পয়গাম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসা (আ.)-এর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম তারা যেন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে ও মানুষকে তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। এখানে বিশেষ করে পাঁচজন নবীর নাম উল্লেখ করা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ তথা ব্যাপকতার পর বিশেষ ব্যক্তির আতফ এর নিয়ম অবলম্বনে এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার। তারা যেন তাদের ওয়াদা ও অর্পিত দায়িত্ব পুরা করে এবং এটা আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৮. لِيَسْئَلَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ فِيْ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ تَبْكِيْتًا لِلْكَافِرِيْنَ بِهِمْ وَاَعَدَّ تَعَالٰى لِلْكٰفِرِيْنَ بِهِمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا هُوَ عَطْفٌ عَلٰى اَخَذْنَا .

৮. অতঃপর তিনি অঙ্গীকার নিয়েছেন সত্যবাদীদেরকে রেসালতের দায়িত্ব আদায়ে তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে তাদের ব্যাপারে কাফেরদেকে নিরুত্তর করার জন্যে তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। এখানে اَعَدَّ ফে'লের আতফ اَخَذْنَا -এর উপর হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ : আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -কে অন্যান্য নবীগণের ন্যায় সম্বোধন করেননি। অন্যান্য নবীগণকে হে মূসা, হে ঈসা, হে দাঊদ বলে সম্বোধন করেছেন। কেননা রাসূল ﷺ কোনো সন্দেহ সংশয় ব্যতীতই সকল সৃষ্টির সেরা মহামানব। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করেছেন যেমন বলেছেন– يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ [হে নবী!] يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ [হে রাসূল!] যদি কোথাও তাঁর নাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তবে তার সাথে সম্মানসূচক শব্দ যোগ করেই তা উল্লেখ করেছেন। যেমন– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ . وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ دُمْ عَلٰى تَقْوَاهُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَحْصِيْلُ حَاصِلٌ -এর সংশয়ের জবাব প্রদান করা। কেননা তিনি তো প্রথম থেকেই تَقْوٰى -এর উপর ছিলেন এরপরও তাকে তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়াই তো تَحْصِيْلُ حَاصِلٌ আবশ্যক হওয়া।

জবাবের সার হলো– উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা اِنْشَاءِ تَقْوٰى উদ্দেশ্য নয়। অথবা যদিও রাসূল ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য হলো উম্মতে মুহাম্মদী।

قَوْلُهُ كَفٰى بِاللّٰهِ : এতে اَللّٰهُ শব্দটি كَفٰى -এর ফায়েল হওয়ায় رَفْع -এর مَحَلّ -এ হয়েছে। ফায়েলের উপর بَاء টি অতিরিক্ত হলে وَكِيْلًا তَمْيِيْز বা حَالٌ

قَوْلُهُ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ : এই আয়াত হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা বিন শূরাহবীল -এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। دَعِيٌّ অর্থ হলো– مَدْعُوٌّ অর্থাৎ فَعِيْلٌ টা مَفْعُوْلٌ অর্থে হয়েছে। دَعِيٌّ মূলত ছিল دَعِيْوٌ এখন وَاوْ এবং يَاء একত্রিত হয়েছে এবং সাকিন তাই وَاوْ কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে يَاء কে يَاء -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছে, ফলে دَعِيٌّ হয়েছে। তবে دَعِيٌّ -এর বহুবচন اَدْعِيَاءُ এটা খেলাফে কিয়াস হয়েছে। কেননা فَعِيْلٌ - مُعْتَلُ لَامْ -এর বহুবচন اَفْعِلَاءُ সেই সময় আসে যখন فَاعِلٌ -এর অর্থে হয়। যেমন تَقِيٌّ -এর বহুবচন اَتْقِيَاءُ - غَنِيٌّ -এর বহুবচন اَغْنِيَاءُ। دَعِيٌّ টা যদিও مُعْتَلُ لَامْ কিন্তু مَفْعُوْلٌ অর্থে হয়েছে। কাজেই কিয়াসের দাবি ছিল এর বহুবচন فَعْلٰى -এর ওজনে اَدْعٰى হওয়া। যেমন– قَتِيْلٌ -এর বহুবচন قَتْلٰى এবং جَرِيْحٌ -এর বহুবচন جَرْحٰى আসে। কাজেই এটা شَاذٌّ

قَوْلُهُ بَنُوْ عَمِّكُمْ : مَوَالِيْكُمْ -এর তাফসীর بَنُوْ عَمِّكُمْ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো অর্থ নির্দিষ্ট করা। কেননা مَوْلٰى -এর অনেক অর্থ রয়েছে এবং তন্মধ্যে اِبْنُ عَمٍّ ও অন্তর্ভুক্ত। হযরত জাকারিয়া (আ.) বললেন– فَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ এখানে مَوَالِيْ দ্বারা بَنُوْ عَمٍّ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ مَا تَعَمَّدَتْ : এতে مَا টি পূর্বের مَا -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে। অথবা اِبْتِدَاء -এর কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। আর খবর উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হবে এরূপ– وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ تُؤَاخِذُوْنَ بِهٖ

قَوْلُهُ اَرْحَامٌ : এটা رَحِمٌ -এর বহুবচন অর্থ– আত্মীয়তা, নৈকট্যতা।

اَوْلٰى بِبَعْضٍ অর্থাৎ بِاِرْثِ بَعْضٍ ব্যাখ্যাকার (র.) فِى الْاِرْثِ বৃদ্ধি করে উহ্য مُضَافٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ এটা أَوْلٰى -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে অর্থাৎ هٰذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ ثَابِتٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -এর সম্পর্ক أَوْلٰى -এর সাথে হয়েছে।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْا : শারেহ (র.) إِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ أَنْ تَفْعَلُوْا : এটা بِتَاوِيْلِ مَصْدَرٌ মুবতাদা হয়েছে, তার খবর উহ্য রয়েছে। শারেহ (র.) فَجَائِزٌ উহ্য মেনে খবর উহ্য হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। تَفْعَلُوْا যেহেতু تُوَاصِلُوْا -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী কাজেই এর সেলাহ إِلٰى নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ : এটা نَسْخ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذْنَا : এটা উহ্য أُذْكُرْ -এর কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ ও হতে পারে। আবার এটা فِي الْكِتَابِ -এর مَحَلّ -এর উপর আতফ হওয়াও জায়েজ আছে। সে সময় আমেল হবে مَسْطُوْرًا অর্থাৎ كَانَ هٰذَا الْحُكْمُ مَسْطُوْرًا فِيْ كِتَابٍ وَقْتَ أَخَذْنَا

قَوْلُهُ وَأَعَدَّ : এর عَطْف হয়েছে أَخَذْنَا -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহযাব প্রসঙ্গে : বায়হাকী দালায়েলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে সূরায়ে আহযাব মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মারদবিয়া ইবনে যোবায়ের থেকে অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২১, পৃ. ১৪২, তাফসীরে আদদুরুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ১৯৫]

নামকরণ : আহযাব শব্দটি হিযবুন -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো জামাত বা দল। যেহেতু কাফেররা পঞ্চম হিজরিতে যুক্তফ্রন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, আর এই সূরায় ঐ যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে। এ জন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুল আহযাব'। আল্লাহ তা'আলা এই জিহাদে প্রিয়নবী ﷺ -কে বাতাস এবং ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন এই জিহাদের আরেকটি নাম হলো 'খন্দক' অর্থাৎ পরীখা, কেননা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের সমতল পথে প্রিয়নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরীখা খনন করেছিলেন। এভাবে মুসলমানগণ হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেন।

–[নূরুল কুরআন খ. ২১, পৃ. ৩১৬]

মদীনায়ে মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ ৭৩ আয়াতের এ সূরাতে আল্লাহ তা'আলা সত্যসাধক ও নেককারদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, আর মুনাফিকদেরকে বিভিন্নধর্মী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, হানাদার দুশমনদের আক্রমণের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা রাখুন।

এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি স্বরূপ, পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের উপর সবর অবলম্বনের নির্দেশ ছিল এবং মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতির দেওয়া হয়েছিল। তখন কাফের মুনাফেকরা বলেছিল, এ বিজয় কবে আসবে। আল্লাহ তা'আল সংক্ষিপ্তভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন। আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়েছিল, আর তা হয়েছিল প্রকাশ্য উপকরণ ব্যতীত এক আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সাহায্যে। আর এ সাহায্য ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর মোজেজা যা তাঁর নবুয়ত ও রেসালাতের দলিল ছিল।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়নবী ﷺ -কে কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ তা'আলা তরফ থেকে বিজয় এবং সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত ছিল। যেমন–

১. তাকওয়া পরহেজগারীর গুণ অর্জন করা।

২. সবর অবলম্বন করা।

৩. আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা।

৪. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে ভয় না করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫. আর অন্য কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করা।

৬. আর শুধু আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাদেশের অনুসরণ করা। কাফের মুনাফেকদের কথা না মানা। কেননা কাফের মুনাফেকদের পরামর্শ মেনে চলা ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী সূরার শুরু এবং শেষে প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের বর্ণনা রয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরার প্রারম্ভে এবং পরিসমাপ্তিতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ -কে যে কষ্ট দেবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অভিশপ্ত এবং কোপগ্রস্ত হবে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যায়, পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কাফেরদেরকে দুনিয়ার আজাব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এ সূরায় আহযাবের যুদ্ধে তাদের যে শাস্তি হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলবী(র.) খ. ৫, পৃ. ৭৫৮]

এ সূরার ফজিলত :

যে ব্যক্তি সর্বদা এই সূরা পাঠ করবে ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর উপাধী হবে শাকুর অর্থাৎ অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

শানে নুযূল : এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরিফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশেপাশে কুরায়জা, নযীর, বনূ কায়নুকা প্রভৃতি কতিপয় ইহুদি গোত্র বসবাস করতো। রাহমাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদির মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজী ﷺ -এর খেদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী ﷺ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোনো অশালীন ও অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী]

ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওয়ালীদ বিন মুগীরা, মুগীরা ও শায়বা বিন রাবীয়াহ মদীনায় পৌঁছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হুজুরে আকরাম ﷺ -এর খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদিগণ এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবি ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফেরগণ ও নবীজী ﷺ -এর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান, ইকরিমা বিন আবূ জেহেল ও আবূ আওয়ার সালামী মদীনায় পৌঁছে নবীজীর খেদমতে নিবেদন করতো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল একথা বলুন যে, [পরকালে] এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমস্ত মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

এসব রেওয়ায়েত যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনাও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে। **প্রথম**. اِتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, দ্বিতীয় لَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা, চুক্তিভঙ্গের শামিল– যা সম্পূর্ণ হারাম। আর কাফেরদের কথা অনুসরণ না করার নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনা সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ : এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কুরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন- يَا اٰدَمُ . يَا اِبْرَاهِيْمُ . يَا مُوْسٰى . يَا نُوْحُ প্রভৃতি; বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন ﷺ -কে কুরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা হয়েছে– তাঁর উপাধি নবী ও রাসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রাসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যা একান্ত জরুরি ছিল।

এস্থলে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– ১. আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লঙ্ঘন করা না হয়। ২. মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদিদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তি ভঙ্গ করা মহাপাপ [কবীরা গুনাহ] এবং উপরে শানে নুযূল প্রসঙ্গে কাফের মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ। আর তিনি [নবীজী ﷺ] এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা, যেমনিভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন। আর اِتَّقِ اللّٰهَ-এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। সুতরাং চুক্তি লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اِتَّقِ اللّٰهَ-এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোনো মুসলমান মুশরিক কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে বলা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত। তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচারণের কোনো আশঙ্কাই ছিল না কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার রাসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে কোনো মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে কাছীর (র.) বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ না করেন, তাদেরকে অত্যধিক উঠা বসা, মেলা-মেশার সুযোগ না দেন। কেননা এদের সাথে অত্যধিক মেলামেশা ও পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান থেকেও নবীজী ﷺ -কে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এ ক্ষেত্রে اِطَاعَتْ [অনুসরণ করা] শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বভাবত তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং এ স্থলে পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোনো সুযোগও যাতে না হয় তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরিয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থি উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফিকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোনো ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফিক থাকে না। পরিষ্কার কাফের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফিকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোনো উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরের সমর্থনে কথা বলতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শানে নুযূল প্রসঙ্গে মুনাফিকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে তো কোনো কথাই থাকে না। কেননা এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদি কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে মহানবী ﷺ বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا বলে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্বে বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল তার পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফিকদের কোনো কোনো কথা এমনও ছিল যদ্দারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণও মঙ্গলের পরিপন্থি বলে আল্লাহ তা'আলা নবীজী ﷺ -কে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

قَوْلُهُ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا : এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশে, যেন আপনি কাফের ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন; বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু পৌছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْلَمُوْنَ ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا : এটাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোনো কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জন কেবল আল্লাহ তা'আলার উপরে ভরসা করুন। কেননা অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করাও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমত বর্বর যুগে আরববাসীগণ অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দুটি অন্তকরণ আছে বলে মনে করতো। দ্বিতীয়ত নিজ পত্নীগণ সম্পর্কে এ প্রথা বিরাজমান ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তা মার পিঠ বা অন্য কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় যিহার' বলা হতো, তবে 'যিহার'কৃত সে স্ত্রী তার কাছে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظِهَارٌ -এর উৎপত্তি ظَهْرٌ থেকে যার অর্থ– পিঠ।

তৃতীয়ত তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তবে এ পোষ্য পুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো; এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো। এ পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা– তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মিরাশের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্তগত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম এ পোষ্য পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন– বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামি শরিয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তকরণ থাকে, না দুটি অন্তকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সম্ভবত এর অসারতার বর্ণনা অপর দুটো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানষের বক্ষ মাঝে দুটি অন্তরকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতাও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'জিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

Free @ www.eilm.weebly.com

অবশিষ্ট দুটি বিষয়, যিহার ও পালকপুত্রের হুকুম, এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি পর্যন্ত কুরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজী ﷺ -এর উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'ব্যাপারে বর্বর আবরগণ নিজেদের খেয়াল খুশি মতো হালাল হারাম ও জায়েজ না জায়েজ সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য, তা উদঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল তাই বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِي تُظٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهٰتِكُمْ অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ্য বলে ঘোষণা করে তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'জিহারের দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার অন্ধকার যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরিয়তের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মুজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফফারা আদায় করে, তবে স্ত্রী তার তরে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মুজাদালায়' জিহারের কাফফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে–

দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট : এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ - أَدْعِيَاءُ - دَعِيٌّ -এর বহুবচন, যার পালক ছেলে আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোনো মানুষের দুটি অন্তকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না। অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না অর্থাৎ অন্য সন্তানদের ন্যায় সে মিরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাস'আলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্য পুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনিভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশঙ্কা রয়েছে।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ বলে সম্বোধন করতাম। [কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন।] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

قَوْلُهُ النَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الخ : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, 'সূরায়ে আহযাবের' অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রাসূল ﷺ -এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদের প্রদত্ত জ্বালা যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়ার পর রাসূলুলাহ ﷺ -কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণাদান সংশ্লিষ্ট ছিল। কেননা কাফেরগণ হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নাব (রা.)-এর সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কালে বর্বরযুগের এই পোষ্য পুত্র জনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে এরূপ অপবাদ দেওয়া যে, তিনি নিজ ছেলের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজী ﷺ -কে যন্ত্রণা প্রদান সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে– اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ

أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এরসারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আপনার ﷺ নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতামাতার নির্দেশের চেয়েও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতামাতার হুকুম তাঁর ﷺ হুকুমের পরিপন্থি হয় তবে তা পালন করা জায়েজ নয়। এমনকি তার ﷺ নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়েও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সহীহ বুখারী প্রমুখ হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে পাক ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَاَنَ اَوْلَى النَّاسِ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ .

অর্থাৎ এমন কোনো মুমিনই নেই, যার পক্ষে আমি ﷺ ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চেয়ে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নেই। যদি তোমাদের মনে চায় তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত- اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ পাঠ কর।

যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানদের জন্য গোটা সৃষ্টিকুলের চেয়ে অধিক স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যম্ভাবী ফল এরূপ হওয়া উচিত যে, নবীজী ﷺ -এর প্রতি প্রত্যেক মুমিনের ভালোবাসা সর্বাধিক গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ . (بُخَارِىْ . مُسْلِم مَظْهَرِىْ) অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অন্তরে আমার ভালোবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। -[বুখারী ও মুসলিম, মাযহারী]

قَوْلُهٗ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ : তার পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ- ভক্তি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা ছেলের সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা- পরস্পর বিয়েশাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মিরাশে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আর নবীজী ﷺ -এর শুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠানে হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া বা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরি নয়।

মাসআলা : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজী ﷺ -এর পুণ্যবতী বিবিগণের (রা.) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বেআদবী ও অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তারা উম্মতের মা। উপরন্তু তাদেরকে দুঃখ দিলে নবীজী ﷺ কেও দুঃখ দেওয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

قَوْلُهٗ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ : وَاُولُوا الْاَرْحَامِ শব্দগত অর্থানুযায়ী সকল আত্মীয় স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত, চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে ফকীহগণ 'আসবাত' (عَصَبَاتْ) বলে আখ্যায়িত করেছেন যা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী 'আসাবাতে'র মোকাবিলায় اُولُوا الْاَرْحَامِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কুরআনি আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফিকহের এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চেয়েও উন্নতর ও অগ্রস্থানীয় কিন্তু মিরাশের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্থান নেই; বরং মিরাশ বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মিরাশের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং কুরআনে কারীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে اَلْمُؤْمِنِيْنَ এর পরে আবার اَلْمُهَاجِرِيْنَ এর উল্লেখ এ ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো মনীষীর মতে এ স্থলে মুমিনীন (مُؤْمِنِيْنَ) বলে আনসারগণকে বুঝানো হয়েছে। এখানে 'মুমিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মোকাবিলায় মুমিনীন শব্দ ব্যবহার থেকে বুঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মিরাশের অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী [নাসেখ] বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী ﷺ হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংশ্লিষ্ট সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيَاۤئِكُمْ مَعْرُوْفًا : অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে লাভ করা যাবে। কোনো অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্বজনিত সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ الخ : সূরার শুরুতে নবী করীম ﷺ -কে তার উপর অবতারিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে যে ওহী অবতারিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। আর পূর্ববর্তী আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এর মাধ্যমে মু'মিনগণের উপর সাহেবে ওহী পয়গাম্বর ﷺ -এর নির্দেশাবলি পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়েও দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অথাৎ সাহেবে ওহীর পক্ষে তার উপর অবতারিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ : উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকূল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মিশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে–

خُصُّوْا بِمِيْثَاقِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ (الاٰية) অর্থাৎ রিসালাত ও নবুয়ত সংশ্লিষ্ট অঙ্গীকার নবী ও রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা– আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ (الاٰية) .

নবীগণ ﷺ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রিসালাত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর একে অপরের সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের ﷺ এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তারা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রাসূল তার পরে কোনো নবী আসবেন না।

নবীগণের এ অঙ্গীকারও 'আমল' জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন সমগ্র মানবকুল থেকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল। –[রূহুল বায়ান ও মাযহারী]

قَوْلُهُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ (الاٰية) : সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা ﷺ উল্লেখের পর পাঁচজনের নাম আবার বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকূলের মধ্যে তারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মাঝে রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও مِنْكَ শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসের মধ্যে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে– كُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ . (رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ)

অর্থাৎ আমি [নবীকুলের মাঝে] সৃষ্টিগতভাবে সকলের আগে, কিন্তু আবির্ভাবগতভাবে নবুয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে। –[মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤءَتْكُمْ جُنُوْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ مُتَحَزِّبُوْنَ اَيَّامَ حَفْرِ الْخَنْدَقِ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط مَلَاۤئِكَةً وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ مِنْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ وَبِالْيَاءِ مِنْ تَحْزِيْبِ الْمُشْرِكِيْنَ بَصِيْرًا.

৯. হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যখন শত্রু বাহিনী কাফেরগণ খন্দকের যুদ্ধের সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর যেমন পরিখা খনন, এটা تَعْلَمُوْنَ পড়ার ক্ষেত্রে; আর يَعْلَمُوْنَ পড়লে তখন অর্থ হবে তারা যা করে যেমন মুশরিকদের আক্রমণ আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন।

١٠. اِذْ جَاۤءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ مِنْ اَعْلَى الْوَادِيْ وَاَسْفَلِهِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ مَالَتْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰى عَدُوِّهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ جَمْعُ حَنْجَرَةٍ وَهِيَ مُنْتَهَى الْحُلْقُوْمِ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا الْمُخْتَلِفَةَ بِالنَّصْرِ وَالْيَأْسِ.

১০. যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্ন ভূমি থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে উচ্চ ও নিম্নাঞ্চল এলাকা থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টি ভ্রম হচ্ছিল প্রত্যেকদিক থেকে আগত শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি পড়েছে এবং প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল অধিক ভয়ের কারণে, حَنَاجِرْ শব্দটি حَنْجَرَةٌ-এর বহুবচন, যার অর্থ কণ্ঠের শেষভাগ এবং তোমরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা যেমন সাহায্য করা ও নৈরাশ্য হওয়া পোষণ করতে শুরু করেছিলে।

١١. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ اُخْتُبِرُوْا لِيَتَبَيَّنَ الْمُخْلِصُ مِنْ غَيْرِهِ وَزُلْزِلُوْا حُرِّكُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا مِنْ شِدَّةِ الْفَزَعِ.

১১. সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল যাতে তাদের মধ্য হতে মুখলিস বান্দাগণ অন্যান্যদের থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল অধিক ভয়ঙ্কর অবস্থার দরুন।

١٢. وَ اذْكُرْ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ضُعْفُ اِعْتِقَادٍ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ بِالنَّصْرِ اِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا.

১২. এবং তুমি স্মরণ কর যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ দুর্বল বিশ্বাস ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।

١٣. وَاِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَىِ الْمُنَافِقِيْنَ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ هِىَ اَرْضُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ تَنْصَرِفْ لِلْعَلَمِيَّةِ وَ وَزْنِ الْفِعْلِ لَا مُقَامَ لَكُمْ بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا اَىْ لَا اِقَامَةَ وَلَا مَكَانَةَ فَارْجِعُوْا ج اِلٰى مَنَازِلِكُمْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا خَرَجُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى سَلْعٍ جَبَلٍ خَارِجَ الْمَدِيْنَةِ لِلْقِتَالِ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ فِى الرُّجُوْعِ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ط غَيْرُ حَصِيْنَةٍ يَخْشٰى عَلَيْهَا قَالَ تَعَالٰى وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ج اِنْ مَّا يُرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا مِنَ الْقِتَالِ.

১৩. এবং যখন তাদের মুনাফিকদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিব বাসী يَثْرِبُ মদীনা শরীফকে বলা হয় এবং এটা عِلْم ও وَزْن فِعْل -এর কারণে গায়রে মুনসারিফ এটা তোমাদের জায়গা অবস্থানের জায়গা নয়। مُقَام শব্দের প্রথম মীমে যবর ও পেশ উভয় কেরাতে পড়া যাবে অর্থাৎ অবস্থান ও স্থান অতএব তোমরা ফিরে চলো। তোমাদের বাড়ি মদীনার দিকে। এবং তারা নবী ﷺ -এর সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়ে সালা পাহাড় পর্যন্ত গিয়েছিল। তাদেরই একদল নবীর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি ঘর খালি পাহারাদারবিহীন, আমরা আমাদের ঘর বাড়িতে শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা করছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, অথচ সেগুলো খালি ছিল না যুদ্ধ থেকে পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।

١٤. وَلَوْ دُخِلَتْ اَىِ الْمَدِيْنَةُ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا نَوَاحِيْهَا ثُمَّ سُئِلُوْا اَىْ سَاَلَهُمُ الدَّاخِلُوْنَ الْفِتْنَةَ الشِّرْكَ لَاٰتَوْهَا بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ اَىْ اَعْطَوْهَا وَفَعَلُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَا اِلَّا يَسِيْرًا.

১৪. যদি শত্রু পক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করতো অতঃপর তারা ফিতনায় জিজ্ঞাসিত হতো প্রবেশকারীগণ তাদেরকে শিরকের প্রতি আহ্বান করতো তবে তারা অবশ্যই তা মেনে নিত لَاٰتَوْهَا এর মধ্যে মাদ্দ ও মাদ্দবিহীন উভয়টি পড়া যাবে অর্থাৎ তারা তা মেনে নিতো ও করতো এবং তারা ঘরে খুব কম সময় অবস্থান করেছিল।

١٥. وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا عَنِ الْوَفَاءِ بِهٖ.

১৫. অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

١٦. قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا اِنْ فَرَرْتُمْ لَا تُمَتَّعُوْنَ فِى الدُّنْيَا بَعْدَ فِرَارِكُمْ اِلَّا قَلِيْلًا بَقِيَّةَ اٰجَالِكُمْ.

১৬. বলুন তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন যদি তোমরা পলায়ন কর তোমাদের সামান্যই তোমাদের অবশিষ্ট জিন্দেগী ব্যতীত ভোগ করতে দেওয়া হবে না দুনিয়ায় তোমাদের পলায়নের পর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@ www.e-ilm.weebly.com

١٧. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ يُجِيْرُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا هَلَاكًا اَوْ هَزِيْمَةً اَوْ يُصِيْبُكُمْ بِسُوْءٍ اِنْ اَرَادَ اللّٰهُ بِكُمْ رَحْمَةً ط خَيْرًا وَ لَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ وَلِيًّا يَنْفَعُهُمْ وَلَا نَصِيْرًا يَدْفَعُ الضَّرَّ عَنْهُمْ.

১৭. বলুন কে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ধ্বংস বা হত্যা ইচ্ছা করেন অথবা কে তোমাদের ক্ষতি করবে যদি তিনি তোমদের প্রতি রহমতের ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত নিজেদের কোনো অভিভাবক যিনি তাদের সাহায্য করবেন ও সাহায্যদাতা যিনি তাদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন পাবে না।

١٨. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ الْمُثَبِّطِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ تَعَالَوْا اِلَيْنَا ج وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ الْقِتَالَ اِلَّا قَلِيْلًا رِيَاءً وَسُمْعَةً.

১৮. আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এসো। এবং তারা যুদ্ধে আসে না কিন্তু খুবই কম সংখ্যক মানুষদেরকে দেখানো ও শুনানোর জন্য।

١٩. اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ج بِالْمُعَاوَنَةِ جَمْعُ شَحِيْحٍ وَهُوَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يَاْتُوْنَ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ كَنَظَرِ اَوْ كَدَوَرَانِ الَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ج اَىْ سَكَرَاتِهِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ وَحِيْزَتِ الْغَنَائِمُ سَلَقُوْكُمْ اٰذَوْكُمْ اَوْضَرَبُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ط اَىْ الْغَنِيْمَةِ يَطْلُبُوْنَهَا اُولٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا حَقِيْقَةً فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ الْاِحْبَاطُ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا بِاِرَادَتِهِ.

১৯. সাহায্য করার ব্যাপারে তারা তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণ কৃপণ। اَشِحَّةً শব্দটি شَحِيْحٌ-এর বহুবচন এবং এটা يَاْتُوْنَ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন, তারা আপনার প্রতি তাদের চোখ উল্টিয়ে তাকায় মৃত্যুর ভয়ে অচেতন ব্যক্তির চোখ উল্টিয়ে তাকানোর ন্যায়। অতঃপর তারা যখন বিপদ চলে যায় ও গনিমতের মাল একত্রিত হয় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তোমাদেরকে কষ্ট দেয় তারা বাস্তবিকই মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা নিষ্ফল করে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার জন্যে সহজ তার ইচ্ছাধীন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ مِنَ الْكُفَّارِ لَمْ يَذْهَبُوْا ج اِلٰى مَكَّةَ لِخَوْفِهِمْ مِنْهُمْ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ كَرَّةً اُخْرٰى يَوَدُّوْا يَتَمَنَّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ اَىْ كَائِنُوْنَ فِى الْبَادِيَةِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْبَائِكُمْ ط اَخْبَارِكُمْ مَعَ الْكُفَّارِ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ هٰذِهِ الْكَرَّةَ مَا قٰتَلُوْا اِلَّا قَلِيْلًا رِيَاءً وَخَوْفًا مِنَ التَّعْيِيْرِ .

২০. তারা মনে করে শত্রুবাহিনী কাফেরগণ চলে যায়নি মক্কার দিকে, তাদের ভয়ের কারণে যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করতো এবং কাফেরদের সাথে তোমাদের যুদ্ধের সংবাদ জেনে নিত, তবেই ভালো হতো যদি তখনই তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করতো। লোক দেখানোর জন্য ও লজ্জার ভয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جُنُوْدٌ : جُنُوْدٌ শব্দটি جُنْدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– সৈন্য সামন্ত। কুরাইশ, গাতফান, ইহুদি বনূ নযীর ইত্যাদি সৈন্য উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اِذْ جَاءَتْكُمْ : এটা نِعْمَةَ اللّٰهِ থেকে بَدَل হয়েছে। ظُنُوْنَا-এর মধ্যে নাফে ইবনে আমের এবং আবূ বকর (রা.) মাসহাফে উসমানীর রেওয়ায়েতে ওয়াকফ এবং ওয়াসাল উভয় অবস্থায়ই اَلِفْ-এর সাথে পড়েছেন। আর আবূ আমর এবং হামযা উভয় অবস্থায় اَلِفْ বিহীন পড়েছেন।

قَوْلُهُ بِالنَّصْرِ وَالْيَاْسِ : সাহায্যের আশা পোষণকারীগণ খাটি মুমিন ছিলেন। আর নৈরাশ্য পোষণকারীগণ মুনাফিক ছিল।

قَوْلُهُ زِلْزَالًا : زَاءْ বর্ণে যের দিয়ে এটা হলে عَامْ قِرَاءَتْ আবার কেউ কেউ زَاءْ বর্ণে যবর দিয়ে পড়েছেন। কেননা فِعْلَالٌ উভয় মাসদার আসে। যেমন– صَلْصَالٌ . قَلْقَالٌ . زِلْزَالٌ কখনো زَلْزَالٌ [زَاءْ যবর সহ] اِسْمُ فَاعِلٍ অর্থেও আসে যেমন زَلْزَالٌ অর্থ مُزَلْزِلٌ

قَوْلُهُ يَثْرِبُ : হাদীসে মদীনাকে ইয়াসরিব বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা يثرب শব্দটি ثرب থেকে নির্গত যার অর্থ– ভর্ৎসনা, তিরস্কার। বর্ণিত আছে যে, আমালেকা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম يَثْرِبُ ছিল ঐ স্থানে সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। একারণেই এই স্থানের নাম يَثْرِبُ হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ-এর নাম قُبَّةُ الْاِسْلَامِ . طَابَةُ . طَيْبَةُ এবং দারুল হিজরত রেখেছেন।

قَوْلُهُ اِذْ قَالَتِ الْمُنَافِقُوْنَ : এর قَائِلٌ হলো মুনাফিক আউস ইবনে কায়যী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

لَا مُقَامَ হাফসের কেরাত অনুপাতে مِيْمٌ বর্ণে পেশসহ হবে। আর অন্যদের নিকট যবরের সাথে হবে। ব্যাখ্যাকারের উক্তি لَا اِقَامَةَ অর্থ অবস্থান করা এটা مُقَامٌ [مِيمٌ বর্ণে পেশযোগে] এর তাফসীর। এবং لَا مَكَانَةَ অর্থ– অবস্থানের স্থান এটা مَقَامٌ بِالْفَتْحَةِ-এর তাফসীর।

قَوْلُهُ سَلْعٌ : মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। আর শারেহ (র.)-এর উক্তি سَلْعٌ جَبَلٌ خَارِجَ الْمَدِيْنَةِ হলো سَلْعٌ-এর তাফসীর।

قَوْلُهُ فَارْجِعُوْا : এতে فَاءْ টি হলো نَصِيْحَةٌ অর্থাৎ اِنْ سَمِعْتُمْ نُصْحِىْ فَارْجِعُوْا যদি তুমি আমার উপদেশ শোন তবে ফিরে আসো।

وَيَسْتَأْذِنُ -এর আতফ قَالَ -এর উপর হয়েছে حِكَايَتْ حَالٌ مَاضِيَةٌ -এর ভিত্তিতে مُضَارِعٌ -এর সীগাহ নেওয়া হয়েছে। يَقُولُونَ হলো جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ বা مُفَسِّرَةٌ যা يَسْتَأْذِنُ -এর তাফসীর করতেছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَوْ دَخَلَتِ الْمَدِيْنَةَ : অর্থাৎ لَوْ دَخَلَتِ الْاَحْزَابُ الْمَدِيْنَةَ ثُمَّ سُئِلُوْا اَىْ الْمُنَافِقُوْنَ

قَوْلُهُ الْفِتْنَةَ : অর্থাৎ اَلْكُفْرُ وَالرِّدَّةُ

قَوْلُهُ لَاَتَوْهَا : এর মধ্যে لَامْ টি جَوَابُ قَسَمٍ -এর উপর প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ কুফর এবং ردة -কে কাল বিলম্ব না করে মঞ্জুর করে নিবে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, كُفْر এবং رِدَّةٌ -এর চাহিদা পূরণের পর মদীনাতে বেশি সময় অবস্থান করবে না তাৎক্ষণিকভাবেই বহিষ্কার করা হবে কিংবা হত্যা করা হবে। -[বায়যাভী, জুমাল]

قَوْلُهُ لَا يُوَلُّوْنَ : এটা جَوَابُ قَسَمٍ কেননা عَاهَدُوْا টা اَقْسَمُوْا -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ فَرَرْتُمْ : এটা শর্ত, তার জবাব لَنْ يَنْفَعَكُمْ টা مُقَدَّمٌ হয়েছে। অথবা পূর্বের দালালতের কারণে উহ্যও হতে পারে।

قَوْلُهُ الْمُعَوِّقِيْنَ : এটা مُعَوِّقٌ ইসমে ফায়েলের বহুবচন। এর অর্থ হলো– বাধা প্রদানকারী।

قَوْلُهُ هَلُمَّ اَىْ تَعَالَوْا : বনূ তামীম এবং হেজাজীদের নিকট هَلُمَّ টি فِعْلُ اَمْرٍ তবে পার্থক্য হলো এই যে, বনূ তামীমের নিকট তাতে تَثْنِيَةٌ . جَمْعٌ এবং مُذَكَّرٌ এবং مُؤَنَّثٌ -এর আলামতযুক্ত হয়। অর্থাৎ هَلُمَّا . هَلُمُّوْا . هَلُمِّىْ ইত্যাদি সংযুক্ত হতে পারে। আর বনূ হিজাজীদের নিকট শুধু মাত্র وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ -এর সীগাই ব্যবহৃত হয়। ব্যাখ্যাকার هَلُمَّ -এর তাফসীর اَعْطُوْا দ্বারা করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি هَلُمَّ -এর ব্যাপারে হেজাজীদেরই অনুসারী।

قَوْلُهُ اَشِحَّةً : এটা شَحِيْحٌ -এর বহুবচন, এর অর্থ হলো حَرِيْصٌ مَعَ الْبُخْلِ - اَشِحَّةً টা مَنْصُوْبٌ بِالذَّمِّ হয়েছে অথবা حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কেউ কেউ هُمْ উহ্য মুবতাদার কারণে مَرْفُوْعٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ رَاَيْتَهُمْ اِلَيْكَ : এটা মুনাফিকদের ভীরুতাও তাদের ভীতির অবস্থার বিবরণ। ভীরুতা ও ভয়ের দুটি কারণ ছিল। প্রথম মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ভয়, দ্বিতীয় হলো– রাসূল ﷺ -এর বিজয় লাভ করার ভয়।

يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ خَوْفًا مِنَ الْقِتَالِ -এর সম্পর্ক প্রথম সূরতের সাথে আর تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ -এর সম্পর্ক দ্বিতীয় সূরতের সাথে।

قَوْلُهُ يَنْظُرُوْنَ : এটা جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ কেননা উদ্দেশ্য হলো– رُؤْيَتْ بَصَرِيَّةٌ

قَوْلُهُ كَنَظَرٍ اَوْ دَوَرَانٍ : ব্যাখ্যাকার (র.)-এর এই ইবারত দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ -এর মধ্যে দুটি সুরত রয়েছে। এক. এটা يَنْظُرُوْنَ -এর উহ্য মাসদারের صِفَتْ হবে। অর্থাৎ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرًا كَنَظَرِ الَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ দুই. এটা تَدُوْرُ -এর উহ্য মাসদারের صِفَتْ হবে। অর্থাৎ تَدُوْرُ دَوَرَانًا كَدَوَرَانِ عَيْنِ الَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ

قَوْلُهُ سَلَقَ : এটা বাবে ضَرَبَ -এর سَلْقًا মাসদার হতে অর্থ হলো রসনা দ্বারা তার কথা বলা। سَلَقَهُ بِالْكَلَامِ অর্থ– তাকে তীব্র কথা বলেছে, ভর্ৎসনা দিয়েছে।

قَوْلُهُ بَادُوْنَ : এটা بَادٍ -এর বহুবচন, অর্থ– গ্রাম্য, গ্রামের অধিবাসী। অর্থাৎ হায় যদি সে গ্রামের অধিবাসী হতো। يَسْئَلُوْنَ জুমলা টা بَادُوْنَ হয়ে -এর খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যান্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণে ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাবের [সম্মিলিত বাহিনী] যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কুরআন পাকের এ দু'রুকু অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে মুসলমানদের উপর কাফের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলার নানাবিধ অনুগ্রহরাজি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিভিন্ন মোজেজার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হেদায়েত ও নির্দেশাবলি রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলির দরুন বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ আহযাবের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তাফসীরকার। তাই এখানে সেসব নির্দেশাবলি সমেত আহযাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

Free @ www.eelm.weebly.com

আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ : حِزْبٌ أَحْزَابٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ পার্টি বা দল। এ যুদ্ধে কাফেরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও করেছিল বলে এর নাম আহযাবের [সম্মিলিত বাহিনীর] যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শত্রুদের আগমন পথে নবীজী ﷺ -এর নির্দেশানুযয়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক [পরিখার] যুদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেহেতু বনূ কুরায়জার যুদ্ধও সংঘটিত হয়– উল্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এ যুদ্ধও আহযাব যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহুদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফেরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হযরত ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চেয়ে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সঙ্কুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মতো ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র ছিল তিন হাজার তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রহীন– তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কুরআনে কারীমে ঘটনার ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে– زَاغَتِ الْاَبْصَارُ [চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল।] وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ [হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত] وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا [এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়।]

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সংকটময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য সাহায্য সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইহুদি ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং মুসলমানদের উপর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত ফয়সালার যুদ্ধ যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরিতে মদীনার মূল ভূ-খণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবীজী ﷺ ও মুসলমানগণের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী বনূ নাযীর ও আবূ ওয়ায়েল গোত্রভুক্ত বিশজন ইহুদি মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মনে করতো যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূজাকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপকৃষ্ট বলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণাও ঠিক একই রকম। সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহুদিদেরকে প্রশ্ন করলো যে, মুহাম্মদ ﷺ ও আমাদের মাঝে ধর্মের ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে তা আপনারা জানেন– আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রজ্ঞাবান লোক। সুতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের [মুসলমানদের] ধর্ম।

রাজনীতি ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয় : সেসব ইহুদিরা নিজেদের অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচ ও উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্মের চেয়ে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করলো। এতদসত্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন ইহুদি পঞ্চাশজন কুরাইশ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর দেয়ালে নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য : আল্লাহ তা'আলার ঘরে– সে ঘরেরেই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহ তা'আলার শত্রুরা তদীয় রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার ধৈর্য ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এই ইহুদিরা মক্কায় কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোত্র বনূ গাতফানের নিকটে পৌঁছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরাইশদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রসারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসেবে এ প্রস্তাবও পেশ করলো যে, এক বছরে খায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণটুকু কোনো কোনো বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বনূ গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উয়াইনা বিন হাসান উপরিউক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পারস্পরিক চুক্তিপত্র মুতাবিক আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সহ তিনশ ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরাইশ সৈন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনূ আসলাম, বনূ আশজা, বনূ মুররাহ, বনূ কেনানাহ, বনূ ফাযারাহ, বনূ গাতফান প্রমুখ গোত্রের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোনো সূত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোনো সূত্রানুযায়ী বার হাজার, আবার কোনো সূত্রানুযায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ : বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফের সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওহুদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চেয়ে অনেক বেশি। সাজ সরঞ্জামও প্রচুর আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদি গোত্রের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি ১. আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীলতা। ২. পারস্পরিক পরামর্শ। ৩. সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখনিঃসৃত সর্বপ্রথম বাক্যটি ছিল– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক। অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই, তিনি সরাসরি বিধাতার ইঙ্গিত ও অনুমতি সাপেক্ষে কাজ করেন। কিন্তু পরামর্শে দু-ধরনের লাভ রয়েছে– ১. উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, ২. মুমিনগণের অন্তঃকরণে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতার প্রেরণা পুনর্জাগরণ। উপরন্তু যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। যিনি সদ্য জনৈক ইহুদির দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খেদমতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের রণকৌশল হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্য পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিখা খনন : শত্রুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার 'সালা' পর্বতের পশ্চাৎবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নকশা নবীজী ﷺ স্বয়ং অঙ্কন করেন। এই পরিখা 'শায়খাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা 'বাতহান' উপত্যকাও 'রাতুনা' উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোনো রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত অবশ্যই ছিল, যাতে শত্রু সৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরিখা খনন প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যেক পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন। –[মাযহারী] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিখার গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা : এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬টি।

পূর্ণ বয়স্কতা লাভের জন্য পনের বছর নির্দিষ্ট হয় : মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পনের বছরের চেয়ে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত আব্দুললাহ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবূ সাঈদ খুদরী, বারা ইবনে আযেব (রা.) প্রমুখ এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো তারা গড়িমসি করতে লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক মিথ্যা ওজর পেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এসব মুনাফিকের প্রসঙ্গ কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী]

সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও **শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ ইসলামি ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থি নয়** : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে এবং আনসারদের পতাকা হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদাহ (রা.)-কে প্রদান করেন। এ সময় মুহাজির ও আনসারের মধ্যকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পস্পর ভাই ভাই ছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ইসলামি ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থি নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ যুদ্ধের সর্বপ্রথম কাজ পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিখা খননের দায়িত্বভার বণ্টন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সম্বলিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চল্লিশ গজ পরিমাণ খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী ﷺ এই মীমাংসা করলেন- سَلْمَانُ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ অর্থাৎ সালমান আমার পরিবারভুক্ত।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, স্থানীয় ও বহিরাগত বৈষম্য : অধুনা বিশ্বে মানুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরজনক বলে মনে করতো। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে নিজ পরিবারভুক্ত করে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভুক্ত করে দশজনের পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) হযরত হুযায়ফা (রা.) প্রমুখ মুহাজির ও সম্মিলিত দলের অন্তর্গত ছিলেন।

একটি বিশেষ মোজেজা : পরিখার যে অংশ হযরত সালমান (রা.) প্রমুখের উপর ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন মসৃণ ও সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়। হযরত সালমান (রা.)-এর সহকারী হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) বলেন যে, এ প্রস্তরখণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম হয়ে পড়ি। অতঃপর আমি হযরত সালমান (রা.)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্কিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে।

বিধাতার সতর্ক সংকেত : এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে কোনো খননকারীই কোনো দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন হলেন পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান (রা.) স্বয়ং। আল্লাহ তা'আলা এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তার সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই, যাবতীয় যন্ত্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক ও বস্তুগত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরজ। কিন্তু এগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যাবতীয় বস্তুগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মুমিনের কেবল আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

হযরত সালমান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্যে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যে, নবীজী ﷺ -এর শরীর ধূলো বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তা পেট ও পিঠের চামড়া পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় হযরত সালমান (রা.)-কে কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা না দিয়ে নবীজী ﷺ স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ করে হযরত সালমান (রা.)-এর নেতৃত্বে খননকার্যে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন- تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا [অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে।] প্রথম আঘাতেই পাথরের এক তৃতীয়াংশ কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করেন অর্থাৎ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا দ্বিতীয়বারের আঘাতে পাথরের এক তৃতীয়াংশ কেটে যায় ও পূর্বের ন্যায় আবার আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্শ্বে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা.) আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালমান (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছ? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইয়েমেন ও কিসরার [পারস্য] বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.) আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার উম্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী ﷺ -এর এই ইরশাদ শুনে মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো।

মুনাফিকদের কটাক্ষপাত : সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বলতে লাগলো, তোমাদের কি মুহাম্মদ ﷺ -এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? তিনি তোমাদেরকে কিরূপ অবাস্তব ও অমূলক [ভবিষ্যদ্বাণী শুনাচ্ছেন] যে, মদীনার পরিখা গহ্বরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছেন। আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে। নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু তাকাও। তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মতো হুঁশজ্ঞান নেই। পায়খানা প্রস্রাব করার মতো সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কটাক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হয়– إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগলো যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ বাক্যে সেসব কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন।

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চরম বিপদ ও দুর্যোগের মুখোমুখি পরিখা খননের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নেই, হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আয়াস সাপেক্ষে পরিখা খননের এরূপ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থাবান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু সমস্ত আমল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিবেশ পরিস্থিতি বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ -এর ইরশাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা শঙ্কা দ্বিধার উদ্রেক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ : একথা কারো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবীজী ﷺ -এর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন। তারা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের মনের সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তি এবং উম্মতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সসমভাবে অংশ নেন। নবীজী ﷺ -এর জন্য তা সাহাবায়ে কেরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তার অনন্য ও অনুপম গুণাবলি এবং নবুয়ত ও রিসালাতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু দৃশ্যমান কারণসমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখ কষ্টে পুরোপুরি শরিক থাকতেন, শাসক শাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোনো ধারণাও সেখানে ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে। নানাবিধ অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার আমোঘ বিধান : উল্লিখিত ঘটনায় নবীজী ﷺ এই দুর্জেয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কুরআনের আয়াত– تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهِ পাঠ করেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ আয়াত যে কোনো কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের এক আমোঘ ব্যবস্থাপত্র ও অব্যর্থ বিধান।

সাহাবায়ে কেরামের অনন্য ত্যাগ : উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, কতক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাদের খনন কার্যের নির্ধারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেতো তারা তাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতেন না; বরং যাদের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন। –[কুরতুবী, মাযহারী]

দীর্ঘ পরিখা ছ'দিনে সমাপ্ত হয় : সাহাবায়ে কেরামের শ্রম সাধনার ফলাফল ছ'দিনেই প্রকাশিত হলো। এই সুদীর্ঘ প্রশস্ত গভীর পরিখা ছ'দিনেই সম্পন্ন হয়ে গেল। –[মাযহারী]

হযরত জাবের (রা.)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মোজেজা : এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবের (রা.) নবীজী ﷺ -কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, রান্না করার মতো কিছু থাকলে তা রান্না কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা' [সাড়ে তিন সের] পরিমাণ যব আছে তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে পাকাতে গেলেন। বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবের (রা.) তা জবাই করে তৈরি করে ফেললেন। অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ডেকে আনতে রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজী ﷺ -এর সাথে তো সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী ﷺ -কে চুপে চুপে একা ডেকে আনবেন। সাহাবায়ে কেরামের এই বিশাল জামাত এলে কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। হযরত জাবের (রা.) নবীজী ﷺ -এর নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে। কিন্তু নবীজী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিশাল জামাতকে সম্বোধন করে বললেন, হযরত জাবের (রা.)-এর বাড়িতে দাওয়াত, সবাই চলো। হযরত জাবের (রা.) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌছে স্ত্রীকে অবহিত করায় তিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবীজী ﷺ -কে খাবারের পরিমাণ জ্ঞাত করেছেন কিনা? হযরত জাবের (রা.) বললেন যে, হ্যাঁ, তা করেছি। মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ নেই। নবীজী ﷺ স্বয়ংই এখন মালিক; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার সবিস্তারে বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন এবং জমাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেট পুরে খান। হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, এই বিশাল জামাত খাওয়ার পরও হাঁড়ির গোশত বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না এবং মথিত আটা অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। আমরা পরিবারের সকল সদস্য পেট পুরে খেয়ে অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে বণ্টন করে দিলাম।

এরূপভাবে ছ'দিনে পরিখার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শত্রু সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী এসে পড়লো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সালা' (سَلْعٌ) পর্বত পর্যন্ত নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন।

কুরায়জা গোত্রের ইহুদিদের চুক্তি লঙ্ঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলম্বন : এসময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মোকাবিলা যুক্তি বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। তদুপরি আবার নতুন কিছুর সংযোজন হলো। সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনূ নযীর গোত্রপতি হুইয়াই ইবনে আখতাব যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল, মদীনা পৌছে ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়জাকেও নিজেদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বনূ কুরায়জা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন ছিল। বনূ কুরায়জার নেতা ছিল কা'ব ইবনে আসাদ। হুইয়াই ইবনে আখতাব তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো। এ সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল যাতে হুইয়াই সে পর্যন্ত পৌছতে না পারে। কিন্তু হুইয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কা'ব দুর্গের ভিতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তাঁরা চুক্তির শর্তাবলি পুরোপুরি পালন করে আসছে। চুক্তির পরিপন্থি কোনো আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হুইয়াই ইবনে আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগলো, কিন্তু কা'বকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দেওয়ায় অবশেষে সে দরজা খুলে হুইয়াইকে ভিতরে ডেকে নিল, হুইয়াইর মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল ও সম্মিলিত বাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করলো। কিন্তু কা'ব যখন গোত্রের অন্য নেতৃবৃন্দের নিকট একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গ

Free @ www.eilm.weebly.com

করে মারাত্মক ভুল করেছ। কা'বও তাদের কথায় নিজের ভুল অনুধাবন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলো। কিন্তু পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশেষে এ চুক্তি লঙ্ঘনই বনূ কোরায়জার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যার বিবরণ পরে আসছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই সংকটময় মুহূর্তে বনূ নাযীরের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্র মদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান করেছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। কুরআন কারীমে কাফেরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের উপর চড়াও করে ফেলে, এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে– مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো কোনো বিশিষ্ট তাফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, فَوْقَ তথা উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা বনূ কুরায়জাকে এবং أَسْفَلُ তথা নিম্নদিক থেকে আগমনকারী দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনসারের আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবনে মা'আজ (রা.)-এবং খাজরাজ গোত্রের নেতা হযরত সাদ ইবনে ওবায়দা (রা.)-কে কা'বের সাথে আলোচনার জন্য প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে। আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতে বলবে যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উদ্রেক না করে। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ওখানে পৌঁছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। ফিরে এসে পূর্বনির্দেশ মতো আকার ইঙ্গিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বলে হুজুর ﷺ -কে অবহিত করেন।

এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়জা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান করেছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো। কেউ কেউ তো খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ আবার কত মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো। যার বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতে إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ الخ বাক্যে রয়েছে।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান করছিল। সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল। এ অবস্থায়ই প্রায় একমাস কেটে যায়, খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোনো যুদ্ধও হচ্ছিল না আবার কখনো নিশ্চিন্তে শঙ্কামুক্ত থাকাও যাচ্ছিল না। দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম পরিখা প্রান্তে অবস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিত থাকছেন যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ংও এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে শরিক ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কেরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত নবীজী ﷺ -এর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি যুদ্ধ কৌশল : হুজুর ﷺ এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, গাতফান গোত্রপতি খায়বারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহুদির সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বনূ গাতফানের অপর দুটি গোত্রপতি উয়াইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি স্বীয় সহচরবৃন্দসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন ফলের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভয় নেতা সম্মতিও প্রদান করেছিল, চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অভ্যাস মুতাবেক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা হযরত সা'দ ইবনে মায়াজ ও সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-কে ডেকে তাদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত সা'দ (রা.)-এর ঈমান জোশ : উভয় নেতাই আরজ করলেন যে, হুজুর আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই, তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা আপনার স্বাভাবিক মত না আমাদের পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করেছেন?

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা আমার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরূপ নয়; বরং তোমাদের দুঃখ কষ্টের কথা বিবেচনা করে এপথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত। আমি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষদলের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। হযরত সা'দ (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা যে সময়ে প্রতিমা পূজারী ছিলাম মহান আল্লাহ তা'আলাকে চিনতাম না, তার উপাসনা আরাধনাও করতাম না সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোনো ফলের একটি দানা পর্যন্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেতো না অবশ্য যদি না তারা আমাদের মেহমান হয়ে আসতো এবং মেহমান হিসেবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম অথবা খরিদ করে নিতো আজ যখন আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানিপূর্বক তার পরিচয় প্রদান করে ধন্য করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব। তাদের সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা তাদেরকে তরবারির আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা না করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দ (রা.)-এর সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা যা চাও তাই করতে পার। হযরত সা'দ (রা.) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজপত্র নিয়ে তার লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। গাতফান গোত্রপতি হারিস ও উয়াইনা যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে কেরামের শৌর্যবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মনে মনে দোদুল্যমান হয়ে পড়লো।

আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মা'আজের দোয়া : এদিকে পরিখার উভয় দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল। হযরত সা'দ ইবনে মা'আজ (রা.) মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তার মায়ের নিকটে যান। হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম। তখন পর্যন্ত নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাজিল হয়নি। আমি হযরত সা'দ (রা.)-কে একটি ছোট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম, যার মধ্য থেকে তার হাত বের হয়ে পড়েছিল এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্ত্বর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশে চলে যাও। আমি তার মাকে বললাম যে, বর্মটা আরো কিছুটা বড় হলে ভালো হতো। তার বর্ম বহির্ভূত হাত পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মা বললেন, কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ তা'আলা যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

হযরত সা'দ ইবনে মাআজ (রা.) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতঃপর হযরত সা'দ (রা.) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ! ভবিষ্যতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যদি কুরাইশদের আরো কোনো আক্রমণ নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন। কেননা এটাই আমার একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজী ﷺ -এর প্রতি নানাভাবে নির্যাতন করেছে, মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে এবং তার আদর্শকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদী মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যন্ত বনূ কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন। আহযাবের এ যুদ্ধকেই কাফেরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন। এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা হয়, প্রথমে খায়বার, অতঃপর মক্কা মুকাররামাহ এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নগর অধিকারভুক্ত হয়। এবং বনূ কুরায়জার ঘটনা যা পরবর্তী মীমাংসার ভার হযরত মা'আজ (রা.)-এর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর মীমাংসানুযায়ী এদের যুবক শ্রেণিকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দী করে রাখা হয়।

আহযাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত পরিখা দেখাশোনা করতেন। কোনো সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোনো দিক থেকে ক্ষীণতম হট্টগোলের আভাস পেলেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে চলে আসতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) ইরশাদ করেছেন যে, একই রাতে কয়েকবার এমন হতো যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তশরিফ আনতেন এবং কোনো শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন। আবার ফিরে এসে আরামের জন্য শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোনো শব্দ পেয়েই বাইরে তশরিফ নিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা (রা.) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে– যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু তিনি অন্য কোনো যুদ্ধে খন্দকের [পরিখার] যুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হননি। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয় প্রচণ্ড শীতের কারণে ভীষণ যন্ত্রণা পোহাতে হয় তদুপরি খাওয়া দাওয়ার দ্রব্যসামগ্রী ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। -[মাযহারী]

এই জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায় : একদিন বিপক্ষ কাফেররা স্থির করলো যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোনো প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নামাজ পড়ার পর্যন্ত সুযোগ পাননি। সুতরাং ইশার সময় চার ওয়াক্ত নামাজ একই সাথে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়া : যখন দুঃখ যন্ত্রণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে, তখন নবীজী ﷺ সম্মিলিত কাফের বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য মসজিদে ফাতবের ভিতরে সোম, মঙ্গল ও বুধ একাধারে এই তিনদিন বিরামহীনভাবে দোয়া করতে থাকেন। তৃতীয় দিন জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সহাস্য বদনে প্রফুল্লচিত্তে সাহাবায়ে কেরামের নিকটে তশরিফ এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, এরপর থেকে কোনো মুসলমানের কোনো প্রকারের কষ্ট হয়নি। -[মাযহারী]

সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূত্রসমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনা : গাতফান গোত্র ছিল শত্রুপক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ তা'আলা তার অসীম কুদরতে এ গোত্রভুক্ত 'নুয়াইম ইবনে মাসুদ' নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তরে ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত করে দেন। তিনি হুজুর ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার গোত্রের কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেনি। এখন আমাকে মেহেরবানি করে বলে দিন যে, আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খেদমত করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তুমি একা মানুষ এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই করো। নুয়াইম (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। মনে মনে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্ব-গোত্রীয়দের মাঝে গিয়ে যা ভালো বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন। হুজুর ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন।

বনূ কুরায়জার সাথে নুয়াইমের অন্ধকার যুগ থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন, হে বনূ কুরায়জা! তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু,। তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব ও কল্যাণবোধ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) বনূ কুরায়জার নেতৃবৃন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ কামনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরায়শ হোক বা আমাদের গাতফাত গোত্র হোক বা অন্যান্য ইহুদি গোত্র হোক এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ অংশগ্রহণ কর পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা তাদের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে জিম্মি হিসেবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না, যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তার এ পরামর্শ বনূ কুরায়জার বেশ মনঃপূত হলো এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন।

অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) কুরাইশ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম, আপনাদের একান্ত সুহৃদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশ্যই আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনূ কুরায়জা আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং তারা মুহাম্মদ ﷺ -কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাকে হত্যা করবেন, অতঃপর আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। মুহাম্মদ ﷺ তাদের এ প্রস্তাব তাদের নিকট সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাচ্ছেন। এখন আপনাদের ব্যাপার নিজেরা ভালোভাবে ভেবে চিন্তে দেখুন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) নিজের গোত্র বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদেরকেও এ সংবাদই শোনালেন। এর সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ান কুরাইশদের পক্ষ থেকে ওয়ারাকা ইবনে গাতফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কুরায়জার নিকট গিয়ে একথা বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে। আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত উত্তরে বনূ কুরায়জা বলল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে জিম্মি হিসেবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরিমা ও ওয়ারাকা এ সংবাদ আবূ সুয়িানের নিকট পৌছালে পর গাতফান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পূর্ণভাবে বিশ্বাস করলো যে, নুয়াইব ইবনে মাসুদ (রা.)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বনূ কুরায়জার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোনো লোক আপনাদের হাতে সমর্পণ করা হবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের উপর বনূ কুরায়জার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হলো। এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন।

তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক প্রচণ্ড বায়ু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাবুগুলো ভূলুণ্ঠিত করে দিল, চুলোর হাঁড়ি পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিন্নভিন্ন করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ। তদুপরি অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ তা'আলা তদীয় ফেরেশতা মণ্ডলীকে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার এই উভয়বিধ সাহায্যের বর্ণনা এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে– فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো পথ ছিল না।

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর শত্রু সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনা : অপর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে হযরত নুয়াইম (রা.) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য বিবরণ এবং শত্রু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলির সংবাদ পৌছলে পর তিনি নিজেদের কোনো লোক পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলামনগণও এই ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রাত্রিকালে সাহাবায়ে কেরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম ও শত্রুর মোকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, শত্রু পক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, যার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সমাবেশ– কিন্তু অবস্থা এমন অপারগ করে রেখেছিল যে, কেউ দাড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রাসূল ﷺ নামাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ নামাজে লিপ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, শত্রু সৈন্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি? প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, এবার গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কেউ দাঁড়ালেননা। হুজুর ﷺ আবার নামাজে দাঁড়ালেন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সারাদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দরুন এমন কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পারছিলেন না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও। আমার অবস্থাও অন্য সকলের মতোই ছিল। কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরুন তা পালন করা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তিনি তার হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলিয়ে বললেন, শত্রু সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেবে এবং আমার নিকট ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। অতঃপর তিনি আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন। আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রু শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম। তাবুতে অবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোনো গরম গোসলখানার ভেতরে আছি। এভাবে আমি শত্রু সেনাদের মাঝে পৌঁছে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, ঝড়ে তাদের তাবু উৎপাটিত হয়ে গেছে, হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে। আবূ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করবে না। আবূ সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্তু হুজুর ﷺ -এর ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। আবূ সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। নিথর স্তিব্ধ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাদের মাঝে কোনো গুপ্তচর অবস্থান করে তাদের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। তাই আবূ সুফিয়ান এরূপ হুশিয়ারী প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী লোককে চিনে নেয়, যাতে বহিরাগত কোনো লোক আমাদের পরামর্শ শুনতে না পায়।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, এখন আমি প্রমাদ গুণতে লাগলাম যে, যদি আমার সম্মুখবর্তী লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তবে হয়তো আমি ধরা পড়ে যাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের সম্মুখস্ত ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক সে হাওয়াযিন গোত্রের লোক ছিল। আল্লাহ তা'আলা এভাবে হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

আবূ সুফিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের নিজস্ব লোকদেরই অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলি, বনূ কুরায়জার বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি বিবৃত করে বললেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে চলছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল এবং সবাই ফিরে চলল।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন যে, আমি যখন এখান থেকে ফিরে রওয়ানা করলাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোনো গরম গোসলখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। ফিরে গিয়ে হুজুর ﷺ -কে নামাজরত দেখতে পেলাম। সালাম ফেরানোর পর আমি তার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আনন্দে হেসে ফেললেন। এমনকি রাতের আঁধারেও তাঁর দাঁতগুলো চমকে উঠছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন قُمْ يَا نَوْمَانُ "হে ঘুমকাতুর উঠ"!

আগামীতে কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার সুসংবাদ : বুখারী শরীফে হযরত সুলায়মান বিন সারদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহযাব ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান (بُخَارِيْ) اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহসী হবে না। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌঁছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করবো। এরূপ ইরশাদ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সহ মদীনায় ফিরে আসেন এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তারা নিরস্ত্র হন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : হযরত হুযায়ফা (রা.) সংশ্লিষ্ট এ ঘটনা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ। নানাবিধ উপদেশাবলি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বেশ কিছুসংখ্যক মোজেজা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই।

বনূ কুরায়জার যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় পৌঁছার পর পরই হঠাৎ করে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত দাহইয়ায়ে কালবী (রা.)-এর আকৃতি ধারণ করে তশরিফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন, ফেরেশতাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংবরণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে বনী কুরায়জার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে সেখানে যাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক সাহাবী ﷺ -কে প্রেরণ করেন যে, لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ অর্থাৎ কোরায়জা গোত্রে না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামাজ না পড়ে। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ কুরায়জা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম নবীজী ﷺ -এর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আছরের নামাজ আদায় করলেন না; বরং নির্দিষ্ট স্থল বনূ কুরায়জা পর্যন্ত পৌঁছে আদায় করলেন। আবার কতক সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুজুর ﷺ -এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে বনূ কুরায়জায় পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামাজ আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌঁছে যাই তবে হুজুর ﷺ -এর হুকুম অমান্য করা হবে না। তাই তারা আসরের নামাজ যথাসময়ে পথিমধ্যেই আদায় করে নিলেন।

পরস্পর বিরোধী মত পোষণকারীর কোনো পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভর্ৎসনা পাওয়ার যোগ্য নন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোনো পক্ষকেও ভর্ৎসনা করেননি। উভয় পক্ষই সঠিক পন্থি বলে সাব্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এই মূলনীতি বের করেছেন যে, যারা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং যাদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগ্যতা রয়েছে তাদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনোটাই ভ্রান্ত ও অপকৃষ্ট বলে মন্তব্য করা চলে না। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

বনূ কুরায়জার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন। বনূ কুরায়জা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দূর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী এ দূর্গ অবরোধ করেন।

কুরায়জা গোত্রপতি কা'বের বক্তৃতা : কুরায়াজা গোত্রপতি কা'ব যে নবীজী ﷺ -এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহযাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্রের সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করে–

১. তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি ﷺ সত্য নবী যা তোমরাও জান এবং তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তা পাঠ করেছ। যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধন প্রাণ ও সন্তান সন্তুতিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালও শুভ ও শান্তিময় হবে।

২. অথবা তোমরা নিজেদের পুত্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।

৩. তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই তারা সেদিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। আমরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

গোত্রপতি কা'বের এ বক্তৃতার পর গোত্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, প্রথম প্রস্তাব অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা আমরা তাওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে আমরা তাদেরকে হত্যা করব। অবশিষ্ট্য তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হলো এটা স্বয়ং তাওরাতের হুকুম ও আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থি। তাই এটাও আমরা করতে পারি না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তিনি যা করবেন তাতেই রাযি থাকবো। আনসারদের মধ্যে যারা আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন, তারা প্রাচীনকাল থেকেই বনূ কুরায়জার সাথে একটা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাই আউস গোত্রভুক্ত সাহাবায়ে কেরাম হুজুর ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে রাজি আছ কি না? তারা এতে রাজি হয়ে গেলে পর নবীজী ﷺ বললেন যে, তোমাদের সে নেতা সা'আদ ইবনে মুআজ এর নিকট আমি এই মীমাংসার ভার ন্যাস্ত করছি। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ ইবনে মুআজ (রা.) বিশেষভাবে ক্ষত বিক্ষত হন। তার সেবা যত্নের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর গণ্ডীতেই তাবু টানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ মুতাবিক বনূ কুরায়জাভুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার হযরত সা'আদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যারা যুবক যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী শিশু ও বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন। ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এ রায় দেওয়ার অব্যবহিতর পরেই হযরত সা'আদ (রা.)-এর ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো এবং এর ফলেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তার তিনটি দোয়াই কবুল করেছেন। প্রথমত আগামীতে কুরাইশ আর যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর আক্রমণ করতে সাহস না পায়। দ্বিতীয় বনূ কুরায়জা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যেন পেয়ে যায় যা আল্লাহ তা'আলা তার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদী মৃত্যুবরণ করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ায় তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাজী (রা.)-ও এঁদের অন্যতম। হযরত যুবায়ের ইবনে বাতাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) রাসূল ﷺ -এর নিকটে দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, অন্ধকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অন্ধকার যুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) যুবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুবায়ের তাঁকে হত্যা না করে তার মাথার চুল কেটে মুক্ত করে দেয়।

অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দুটি অনন্য ও বিস্ময়কর উদাহরণ : হযরত সাবেত ইবনে কায়েস যুবায়ের ইবনে বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে তার নিকট গিয়ে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলে তারই প্রতিদান হিসেবে তোমার এই মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। যুবায়ের বলল, সম্ভ্রান্তজন অপর সম্ভ্রান্তজনের প্রতি এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু একথা বল দেখি যে, যে ব্যক্তির পরিবার পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? একথা শুনে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) হুজুর ﷺ -এর খেদমতে গিয়ে তার পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। যুবায়ের আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোনো মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত ইবনে কায়েস পুনরায় হযরত নবী কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মুমিনের শালীনতা ও কৃতজ্ঞতা বোধের উদাহরণ হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতঃপর যখন যুবায়ের ইবনে বাতা স্বীয় পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হলো তখন সে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-এর নিকট ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদা মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ইবনে আবিল হুকায়েক, কুরায়জা গোত্রপতি কা'ব ইবনে কুরায়জা ও আমর ইবনে কুরায়জার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, তাদের সবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আরো দুটি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো।

একথা শুনে যুবায়ের ইবনে বাতা হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা.)-কে বলল যে, আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরোপুরিই পালন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াষয় জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। হযরত সাবেত (রা.) তাকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশ্য তার পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এটাই ছিল জনৈক কাফেরের জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ যে সকল কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করল না। একজন মুমিন ও অপর কাফেরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্মারকরূপে বিদ্যমান থাকবে।

বনূ কুরায়জার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরিতে জিলকদ মাসের শেষে ও জিলহজ মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। -[কুরতুবী]

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : আহযাব [সম্মিলিত বাহিনী] ও বনূ কুরায়জার যুদ্ধদ্বয়কে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং কুরআনেও এর সবিস্তারে বর্ণনা দু'রুকু ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুস্পষ্ট মোজেজাসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। এখানে কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

১. এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয় যেমন মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য, বাঁচার আর কোনো উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছাবহির্ভূত ধারণাও কল্পনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

২. মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগলো- اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগলো যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের এসব অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কুফরির বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যত বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল তাদের দু'শ্রেণির বর্ণনা রয়েছে। প্রথম শ্রেণি যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগলো, যারা বলতে লাগলো يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا অর্থাৎ হে ইয়াসরিববাসীগণ! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই সুতরাং ফিরে চল। আর অপর শ্রেণি যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। যাদের অবস্থা এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ [অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজী ﷺ -এর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিতাবস্থায় রয়েছে।] কুরআন কারীম এদের ছলচাতুরী স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এসব কিছু মিথ্যা, আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়। اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি ও অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা, অতঃপর এদের করুণ ও মর্মন্তুদ পরণতির বর্ণনা রয়েছে।

অনুবাদ :

٢١. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا حَسَنَةٌ اِقْتِدَاءٌ بِهِ فِى الْقِتَالِ وَالثَّبَاتِ فِىْ مَوَاطِنِهِ لِمَنْ بَدَلٌ مِنْ لَكُمْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ يَخَافُهُ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذٰلِكَ .

২১. তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুসরণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অটল থাকার মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। أُسْوَةٌ শব্দটি হামযার মধ্যে যের ও পেশ উভয়ভাবে পড়া যায় যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য পক্ষান্তরে যারা এর ব্যতিক্রম তাদের জন্য নয়। এখানে لِمَنْ শব্দটি পূর্বের لَكُمْ থেকে بَدَلْ।

٢٢. وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ لَا مِنَ الْكُفَّارِ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنَ الْاِبْتِلَاءِ وَالنَّصْرِ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز فِى الْوَعْدِ وَمَا زَادَهُمْ ذٰلِكَ اِلَّاۤ اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا بِوَعْدِ اللّٰهِ وَتَسْلِيْمًا لِاَمْرِهِ .

২২. যখন মুমিনরা কাফের শত্রু বাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তার রাসূল আমাদেরকে সাহায্য ও পরীক্ষার ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল ওয়াদাতে সত্য বলেছেন। এতে তাদের কিছুই বৃদ্ধি পেল না কিন্তু ঈমান। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার প্রতি সত্যতা ও তার হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পণ।

٢٣. مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج مِنَ الثَّبَاتِ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ مَاتَ اَوْ قُتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ ز ذٰلِكَ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا فِى الْعَهْدِ وَهُمْ بِخِلَافِ حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ .

২৩. মুমিনদের মধ্যে কতক ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। রাসূলের সাথে যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকার মাধ্যমে তাদের কেউ কেউ তাদের নজর পূর্ণ করেছে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প পূর্ণ করার ক্ষেত্রে মোটেই পরিবর্তন করেনি। পক্ষান্তরে মুনাফিকগণ ওয়াদা রক্ষা করেনি।

٢٤. لِيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاۤءَ بِاَنْ يُمِيْتَهُمْ عَلٰى نِفَاقِهِمْ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنْ شَاۤءَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا لِمَنْ تَابَ رَحِيْمًا بِهِ .

২৪. এটা এজন্য যাতে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদের শাস্তি দেন তাদের মুনাফিকীর কারণে মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের প্রতি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٥. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَىِ الْاَحْزَابَ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ط مُرَادَهُمْ مِنَ الظَّفَرِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط بِالرِّيْحِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَلٰى اِيْجَادِ مَا يُرِيْدُهُ عَزِيْزًا غَالِبًا عَلٰى اَمْرِهِ.

২৫. আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে শত্রুবাহিনীকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কেনো কল্যাণ পায়নি তাদের উদ্দেশ্যে তথা মুমিনদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন হয়নি যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। বাতাস ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তার উদ্দেশ্যে অর্জনে শক্তিধর, তার হুকুম প্রতিষ্ঠায় পরাক্রমশালী।

٢٦. وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اَىْ قُرَيْظَةَ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ حُصُوْنِهِمْ جَمْعُ صِيْصِيَةٍ وَهُوَ مَا يُتَحَصَّنُ بِهِ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ الْخَوْفَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ مِنْهُمْ وَهُمُ الْمُقَاتِلَةُ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا مِنْهُمْ اَىِ الذَّرَارِىَ.

২৬. যে সমস্ত কিতাবী অর্থাৎ বনী কুরাইযা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেছিল তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন। صَيَاصِىْ শব্দটি صِيْصِيَةٍ -এর বহুবচন যার অর্থ– দুর্গ তথা ঐ নির্মাণ যার দরুণ হেফাজত করা হয়। এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যাকৃতদেরকে হত্যা করেছ এবং একদলকে বন্দীদেরকে বন্দী করেছ।

٢٧. وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطَئُوْهَا ط بَعْدُ وَهِىَ خَيْبَرُ اُخِذَتْ بَعْدَ قُرَيْظَةَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا.

২৭. তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি, ধনসম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা অভিযান করনি। তাহলো খায়বরের ভূমি যা বনূ কুরাইযার পরে মুসলমানগণ দখল করে আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٢٨. يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَهُنَّ تِسْعٌ وَطَلَبْنَ مِنْهُ مِنْ زِيْنَةِ الدُّنْيَا مَا لَيْسَ عِنْدَهُ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ اَىْ مُتْعَةَ الطَّلَاقِ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا اُطَلِّقْكُنَّ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ.

২৮. হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তারা নয়জন এবং তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকট পার্থিব সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। যা তার নিকট ছিল না। তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে ভোগের অর্থাৎ তালাকের মুতা দিয়ে ব্যবস্থা করে দেই। এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তালাক দিয়ে দেই।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৯. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ اَىِ الْجَنَّةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ بِاِرَادَةِ الْاٰخِرَةِ اَجْرًا عَظِيْمًا اَىِ الْجَنَّةَ فَاخْتَرْنَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا .

২৯. পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ তার রাসূল ও পরকাল জান্নাত কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব তারা দুনিয়ার উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

৩০. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا اَىْ بُيِّنَتْ اَوْ هِىَ بَيِّنَةٌ يُّضٰعَفْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ يُضَعَّفْ بِالتَّشْدِيْدِ وَفِىْ اُخْرٰى نُضَعِّفْ بِالنُّوْنِ مَعَهٗ وَنَصَبِ الْعَذَابَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط ضِعْفَىْ عَذَابِ غَيْرِهِنَّ اَىْ مِثْلَيْهِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا .

৩০. হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে مُبَيِّنَةٍ -এর মধ্যে ى তে যবরর ও যের উভয়ভাবে পড়া যাবে তাকে দিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে অন্য নারীদের চেয়ে অর্থাৎ অন্যদের দ্বিগুণ। يُضٰعَفْ শব্দকে অন্য কেরাত মতে يُضَعَّفْ পড়া যাবে ও অন্য কেরাতে نُضَعِّفْ এবং اَلْعَذَابُ -এর মধ্যে যবর এর সাথে পড়বে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اُسْوَةٌ : আমলের নমুনা اِسْم মাসদার অর্থে। اَلْاِئْتِسَاءُ অনুসরণ করা। ব্যাখ্যাকার اِقْتِدَاءُ বৃদ্ধি করার দ্বারা ইঙ্গিত করেছে যে, اُسْوَةٌ ইসিমটি মাসদার অর্থে হয়েছে। যেমন قُدْوَةٌ যা اِقْتِدَاءُ অর্থে হয়েছে। বলা হয় اِئْتَسٰى فُلَانٌ بِفُلَانٍ অর্থাৎ اِقْتَدٰى بِهٖ

قَوْلُهٗ فِى الْقِتَالِ وَالثَّبَاتِ : এই উভয় قَيْد টি اِتِّفَاقِىْ -এর مَفْهُوْمْ مُخَالِفْ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো এই যে, আপনার জীবন চরিত সর্বাবস্থায় সর্বোত্তম আমলের নমুনা। চাই যুদ্ধরত অবস্থায় হোক অথবা নিরাপত্তার অবস্থায় হোক অথবা রণাঙ্গনে সুদৃঢ়পদ থাকার অবস্থায়ই হোক অথবা বীরত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্রেই হোক।

قَوْلُهٗ فِىْ مَوَاطِنِهٖ : অর্থাৎ مَوَاطِنِ قِتَالٍ ; কোনো আরেফ কতইনা সুন্দর বলেছেন–

وَخَصَّكَ بِالْهُدٰى فِىْ كُلِّ اَمْرٍ * فَلَسْتَ تَشَاءُ اِلَّا مَا يَشَاءُ .

قَوْلُهٗ بَدَلٌ مِنْ لَكُمْ : অর্থাৎ لِمَنْ টা لَكُمْ হতে হরফে জারের পুনরাবৃত্তি সহ بَدَلُ الْبَعْضِ হয়েছে।

قَوْلُهٗ مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ : আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ উদ্দেশ্যে। এবং قَوْلُ رَسُوْلٍ দ্বারা রাসূল ﷺ -এর বাণী– اِنَّ الْاَحْزَابَ سَائِرُوْنَ بَعْدَ تِسْعِ لَيَالٍ اَوْ عَشْرٍ এবং রাসূল ﷺ -এর বাণী سَيَشْتَدُّ الْاَمْرُ بِاِجْمَاعِ الْاَحْزَابِ عَلَيْكُمْ وَالْعَاقِبَةُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ صَدَقَ اللّٰهُ : অর্থাৎ ظَهَرَ صِدْقُهٗ

قَوْلُهٗ صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ : ইসমে যমীরের স্থানে اِسْمٌ ظَاهِرٌ নিয়েছেন।

প্রশ্ন. উপরে আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এখানে যমীর নেওয়া অর্থাৎ صَدَقَا বলাই যথেষ্ট ছিল। তদুপরি اِسْمٌ ظَاهِرٌ নেওয়ার কি কারণ?

উত্তর. ১. আল্লাহর নামের ইজ্জত ও সম্মানের কারণে আল্লাহ তা'আলার নামকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যমীরের নেওয়ার সুরতে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের নাম একই শব্দে একত্রিত হয়ে যায়। কেননা উভয়ের জন্য দ্বিবচনের শব্দ صِدْقًا নেওয়া হয়, যা থেকে শিরকের গন্ধ পাওয়া যায়। তা ছাড়া রাসূল ﷺ উভয় নামকে একই শব্দে একত্রিত করতে বারণ করেছেন। যে খতীব مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى বলেছিল তাকে তিরস্কার করে রাসূল ﷺ বলেছিলেন بِئْسَ خَطِيْبُ الْقَوْمِ اَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

قَوْلُهٗ نَحْبَهٗ : نَحْب অর্থ নজর। মান্নত, এটা দ্বারা মৃত্যু থেকে كِنَايَة করা হয়ে থাকে। কেননা প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মানতের মতো মৃত্যুও আবশ্যক।

قَوْلُهٗ صِيْصَةٍ وَهُوَ مَا يَتَحَصَّنُ بِهٖ : অর্থাৎ যার দ্বারা হেফাজত করা হয় চাই তা দুর্গ হোক বা অন্য কোনো বস্তু যেমন শিং, মোরগের কাটা ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ : নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য মুসলিম নারীদের ইসলামি অবস্থান বর্ণনা করার জন্য এটি كَلَام مُسْتَأْنِف হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَتَعَالَيْنَ : তোমরা এসো, এটা تَعَالٰى হতে اَمْر -এর جَمْعُ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ -এর সীগাহ, যা سُكُوْن -এর উপর مَبْنِى হয়েছে। এই বাক্যটি অধিক ব্যবহারের কারণে اِقْبِلْ [শোন] অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে।

قَوْلُهٗ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ : আম কেরাতে এই উভয় সীগাহ جَزْم -এর সাথে রয়েছে। مَجْزُوْمْ হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে। প্রথমত جَوَابُ شَرْط হওয়ার কারণে مَجْزُوْمْ হয়েছে। আর كُنْتُنَّ হলো شَرْط এবং শর্ত ও جَوَابُ شَرْط -এর মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হলো এই যে, فَتَعَالَيْنَ জবাবে শর্ত এবং اُمَتِّعْكُنَّ জবাবে اَمْر হবে।

قَوْلُهٗ مِنْكُنَّ : এখানে مِنْ টি بَيَانِيَة কেননা সমস্ত স্ত্রীগণই مُحْصَنَات এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের একটি দলের শানে অবতীর্ণ হয়। যাদের মধ্যে অনেকে কোনো অসুবিধার দরুন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি কিন্তু তারা আল্লাহর রাসূলের সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি সামনে আমরা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি তাহলে আমরা যুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে দিব। যেমন তাদের মধ্যে নজর বিন আনাস অন্যতম। পরিশেষে তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তার শানে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ অর্থাৎ তাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে। আবার অনেকে প্রতীক্ষা করছে তাদের শানে বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ [তাফসীরে খাজেন]

اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বনূ কুরাইযার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বনূ কুরায়যার যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ছিল। এটা ৫ম হিজরির জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফজরের নামাজের পর ফিরে এসে সকল সাহাবীসহ নিজের হাতিয়ার খুলে রাখলেন। ঐদিন জোহরের সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। অতঃপর তিনি হুজুর ﷺ -কে পুনরায় অস্ত্র পরিধান করে বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ কুরাইযাকে তাদের দুর্গতে প্রায় ২৫ দিন বন্দী করে রাখলেন অতঃপর বিজয় বেশে তাদের দুর্গ দখল করে নিলেন।

–[সীরাতে মুস্তাফা থেকে সংক্ষেপিত]

শানে নুযূল : يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ নিম্নের ঘটনা উল্লেখ করেন। ১. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদিন পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে তাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

২. বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ হাইয়্যান উল্লেখ করেছেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যার বিজয় এবং গনিমতের মাল বণ্টনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) ভাবলেন যে, মহানবী ﷺ হয়তো এসব গনিমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তারা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন যে, আপনি আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাজিল হয়। অতএব উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে নবীজী ﷺ পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ যেন তাদের কোনো কথা ও কাজের দ্বারা হুজুর ﷺ -এর প্রতি দুঃখ যন্ত্রণা না পৌঁছে সে দিকে যখন তারা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে যখন তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন।

قَوْلُهُ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا : উক্ত আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা.) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তারা নবীজী ﷺ -এর বর্তমান দারিদ্র পীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাবরণ করে হয় তাঁর ﷺ সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে স্বসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে। তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আমার নিকট অধিকার প্রদানের আয়াত শুনালেন ও এ ব্যাপারে আমাকে আমার পিতামাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করতে বারণ করলেন। এবং এ আয়াত শোনার সাথে সাথে আমি বললাম যে, এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। অতঃপর আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা.) কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো এবং তারা সবাই আমার মতো একই মত ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দকে কেউ গ্রহণ করলেন না। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ : এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দ জেনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না যদিও আরবি ভাষায় فَاحِشَةٌ শব্দটি অশ্লীলতা, ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবী পত্নীকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত নবীদের স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দের সাথে مُبَيِّنَةٌ শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কেননা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয়না; বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ -এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কষ্ট দেওয়া। –[জামালাইন]

Free@www.e-ilmweebly.com

অনুবাদ :

٣١. وَمَنْ يَّقْنُتْ يُطِعْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اَىْ مِثْلَىْ ثَوَابِ غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ فِىْ تَعْمَلْ وَنُؤْتِهَا وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا فِى الْجَنَّةِ زِيَادَةً

৩১. তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব অর্থাৎ অন্য মহিলাদের ছওয়াবের দ্বিগুণ দেব এবং অন্য কেরাত মতে يُؤْتِهَا ও يَعْمَلْ পড়বে এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিজিক জান্নাতে অতিরিক্ত রিজিক প্রস্তুত রেখেছি।

٣٢. يٰنِسَاءَ النَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ كَجَمَاعَةٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ اللّٰهَ فَاِنَّ كُنَّ اَعْظَمُ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ لِلرِّجَالِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ نِفَاقٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا مِنْ غَيْرِ خُضُوْعٍ .

৩২. হে নবীপত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো সাধারণ নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তোমরা বড় সম্মানী হবে অতএব তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সে ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি [নিফাক] রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা কোমল ব্যতীত সঙ্গত কথা বলবে।

٣٣. وَقَرْنَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِهَا فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنَ الْقَرَارِ وَاَصْلُهُ اِقْرِرْنَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مِنْ قَرَرْتُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا نُقِلَتْ حَرَكَةُ الرَّاءِ اِلَى الْقَافِ وَحُذِفَتْ مَعَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَلَا تَبَرَّجْنَ بِتَرْكِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنْ اَصْلِهٖ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى اَىْ مَا قَبْلَ الْاِسْلَامِ مِنْ اِظْهَارِ النِّسَاءِ مَحَاسِنَهُنَّ لِلرِّجَالِ وَالْاِظْهَارُ بَعْدَ الْاِسْلَامِ مَذْكُوْرٌ فِىْ اٰيَةِ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .

৩৩. তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। [قَرْنَ শব্দটি ق-এর মধ্যে যবর ও যের অর্থাৎ قَرْنَ ও قِرْنَ উভয় ধরনের পড়া যাবে। এটা قَرَارٌ থেকে নির্গত; এটা মূলে اِقْرِرْنَ বা اِقْرَرْنَ [رَاء-এর মধ্যে যবর ও যের দ্বারা] ছিল। رَاء-এর হরকতকে তার পূর্বে ق-এর মধ্যে দিয়ে হামযাকে সহ رَاء বিলুপ্ত করা হয়েছে।] মূর্খতা যুগের অনুরূপ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষদের জন্য নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করার ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। ইসলামের ধর্মমতে সৌন্দর্য প্রদর্শনের বিধান لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الْاِثْمَ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ اى نِسَاءَ النَّبِيِّ وَيُطَهِّرَكُمْ مِنْهُ تَطْهِيْرًا ج

তোমরা নামাজ কায়েম করবে এবং অল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ অর্থাৎ হে নবীপত্নীগণ আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা পাপসমূহ দূর করতে এবং তোমাদেরকে তা থেকে পূর্ণরূপে পুত পবিত্র রাখতে।

٣٤. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ وَالْحِكْمَةِ ط السُّنَّةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا بِاَوْلِيَائِهٖ خَبِيْرًا ء بِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ .

৩৪. আল্লাহর আয়াত কুরআন ও জ্ঞানগর্ভ কথা হাদীস যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তার বন্ধুদের প্রতি সূক্ষ্মদর্শী, তার সমস্ত সৃষ্টের প্রতি খবর রাখেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ اِنْ : হলো হরফে শর্ত اِتَّقَيْتُنَّ হলো শর্ত مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে। جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। যেমনটি শারেহ (র.) فَاِنَّكُنَّ اَعْظَمُ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। কতিপয় মুফাসসির فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ -কে- جَوَاب شَرْط বলেছেন। অর্থাৎ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تُكَلِّمْنَ كَلَامًا لَيِّنًا خَاضِعًا مَعَ الرِّجَالِ كَكَلَامِ الْمُرِيْبَاتِ .

قَوْلُهٗ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ : ফার্সিতে এর অর্থ হলো ارا مر بگرید درخانہائے خویش অর্থাৎ স্বীয় ঘরে শান্তিতে অবস্থান কর। وَقَرْنَ -এর মধ্যে وَاوْ টি হলো عَاطِفَه আর قَرْنَ হলো اَمْر حَاضِرْ -এর- جَمع مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ মূলে ছিল اِقْرَرْنَ (رَاء বর্ণে যবরযুক্ত) বা اِقْرِرْنَ (رَاء বর্ণে যের যুক্ত) رَاء -এর- اِقْرَرْنَ -এর হরকতকে قَافْ -এর উপর দিয়ে এবং رَاء، هَمْزَه কে ফেলে দেওয়ার ফলে قَرْنَ গঠিত হয়েছে। অর্থ– তোমরা অবস্থান কর।

বায়যাবী, যমখশারী এবং নিশাপুরী লিখেছেন قَارَ يَقَارُ এটা خَافَ يَخَافُ -এর ওজনে হয়েছিল। অর্থাৎ তোমরা জমে বসে থাকো। কেউ কেউ وَاوْ কে মূল অক্ষর ধরে নিয়ে وَقَرَ يَقِرُ থেকে مُشْتَقْ বলেন। অর্থ– শান্তির সাথে অবস্থান করতে থাকো। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ) تَبَرَّجْنَ মূলে ছিল تَتَبَرَّجْنَ অর্থ–গর্ব অহঙ্কারের সাথে চলা। স্বীয় রূপ সৌন্দর্য পরপুরুষের জন্য ফুটিয়ে তোলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে উম্মাহাতুল মুমিনীন বা মোমিন জননীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণের পাশাপাশি তাঁদের উচ্চমর্যাদার ঘোষণাও ছিল। আর এ আয়াতে তাঁদের উচ্চ মর্যাদার কথা পুনরায় ঘোষণা করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে- وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا অর্থাৎ এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে ও নেক আমল করবে, তাকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবো, আর তার জন্য আমি রেখেছি সম্মানজনক উপজীবিকা'।

এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী ﷺ -এর জীবন সঙ্গীনীগণের বিশেষ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন, যেন তাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি অধিকতর আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং তাকওয়া পরহেজগারী ও অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জনের পাশাপাশি নিজেদের অন্তর সমূহকে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভোগ-বিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রাখেন এবং আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির জন্যে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও প্রকাশ করা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে যে আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলুন, তাঁরা যেন দুনিয়া অথবা আখেরাত-এর যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে। তাঁরা দুনিয়ার স্থলে আখেরাতকেই বেছে নেয় এবং চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েও প্রিয়নবী ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে। এজন্যে আল্লাহ পাক সরাসরি তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাঁর মহান বাণী প্রেরণ করেছেন, যেমন পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে-

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ الخ

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়ত : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে এমন দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের থেকে তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (اَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتٌ) জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমসগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে ﷺ বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহকাম তো সমস্ত মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ দ্বারা এ বিশেষত্বই বোঝানো হয়েছে।

নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলি দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বাণী এই اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। এর দ্বারা হযরত মরিয়ম (আ.) সমস্ত নারীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফিরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া (আ.)-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিনজনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আযওয়াজে মুতাহহারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যদার কথা বলা হয়েছে তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায় নবী-পত্নী হিসাবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এর দ্বারা সর্বদিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না– যা অনান্য কুরআনের আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থি। –[তাফসীরে মাযহারী]

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ এরপর اِنِ اتَّقَيْتُنَّ আল্লাহ পাক তাঁদের নবী-পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত, এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যেন তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর পত্নী হওয়ার সম্পর্কের উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাকওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।

–[তাফসীরে কুরতুবী]।

এরপর আযওয়াজে মুতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হেদায়েত রয়েছে।

প্রথম হেদায়েত : নারীদের পর্দা সম্পর্কিত তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট : فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন– এরপরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ অর্থাৎ এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বভাবিক। কিন্তু কোনো লোক খাঁটি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে সে মুনাফিক নয় সত্য; কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই [নিফাকের] শাখা বিশেষ। কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি ঈমান বিশিষ্ট লোক কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না।– [তাফসীরে মাযহারী]

প্রথম হেদায়তের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূ[illegible] পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোনো কামনা ও বাসনার উদ্রেক তো করবেই না; বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এই সূরারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এখানে নবীজীর সহ-ধর্মিণীগণের বিশেষ হেদায়েতসমূহের সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথা-বার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন–যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَكَلَّمَ النِّسَاءُ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন।

–[তাফসীরে তাবারানী-মাযহারী]

মাস'আলা : এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের কণ্ঠস্বর সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপুরুষ শুনতে পায়, নারীদেরকে এমন উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। নামাজের সময় ইমাম কোনো ভুল করলে মুকতাদিদের মৌখিকভাবে লুকমা দেওয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু মেয়েদের মৌখিক লুকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত করবে মুখে কিছু বলবে না।

দ্বিতীয় হেদায়েত : পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত। وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলিয়াত যুগের নারীদের ন্যায় দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী অন্ধযুগ বলে ইসলাম-পূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে–যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোনো অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় এই প্রকার নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত এ যুগের অজ্ঞতাই যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে [অর্থাৎ শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে বের না হয়]। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّجٌ শব্দের মূল অর্থ– প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে]। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য–গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত শরিয়তকাম্য আসল পর্দা হলো গৃহের অভ্যন্তর অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত, একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে– এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন সামনে সূরা আহযাবেরই وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় : قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে । এর মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়; বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, এই সূরায়ে আহযাবেরই পরবর্তীতে উল্লিখিত يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোনো প্রকারে পর্দা করে ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এতদ্ভিন্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ অর্থাৎ "প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এতদ্ভিন্ন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন হজ ও ওমরার সময় হুজুর পাক ﷺ -এর সাথে তাঁর সহধর্মিণীগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহরিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল।

শুধু হুজুর পাক ﷺ -এর সাথেও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি; বরং নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.) ব্যতীত অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-ও কোনো আপত্তি তোলেন নি; বরং ফারুকে আযম (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদের হজে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান গনী (রা.) ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) -কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন। হুজুর ﷺ -এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহশের হজ ও ওমরায় না যাওয়া এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না; বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সাথে সহধর্মিণীগণকে হজ সমাপনান্তে ফেরার পথে বলেন هٰذِهٖ ثُمَّ لُزُوْمُ الْحُصُرِ -এখানে هٰذِهٖ দ্বারা হজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং حَصِيْرٌ - حُصُرٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ চাটাই। হাদীসের মর্ম এই যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই আঁকড়ে ধরবে-সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা (রা.) ও যয়নাব (রা.) হাদীসের অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজের জন্যই বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েজ নেই। বাকি অন্য সহধর্মিণীগণ, যাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরূপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ী ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া জায়েজ। অন্যথায় গৃহেই অবস্থান করা অবশ্যই কর্তব্য।

সারকথা এই যে, কুরআনে পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা (সর্বসম্মত মত) অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ-ওমরাহও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতামাতা, মুহরিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোনো পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো-অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের আসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য:

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কুরআন পাকের ইঙ্গিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ইজমা [সর্বসম্মত রায়] দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের আওতাবহির্ভূত হজ ও ওমরাহ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রা.) হজ উপলক্ষে মক্কায় তশরিফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত নোমান বিন বশীর, হযরত কা'ব বিন আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা.) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌঁছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

কেননা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীগণ এঁদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এঁরা বিদ্রোহীদের সাথে শরিক হতে পারেননি; বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এঁদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌছেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর খিদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলী (রা.)-কে পরিবেষ্টন করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু তিনি তাদের প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মু'মিনীন পরিস্থিতি আয়ত্বে এনে শৃঙ্খলা বিধান করতে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মু'মিনীন তাদের প্রতিকার ও প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাবৃন্দ এ কথায় রাজি হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা সে সময় তথায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ তথায় যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর খেদমতে আরজ করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর শরিয়তী শাস্তি প্রয়োগ অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল–বালাগাতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মু'মিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতাদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারি করে দেই তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) একদিকে আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছেন যে, সম্পর্কেও পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীরা আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর মজলিস-সমূহে সশরীরে শরিক থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোনো অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল মু'মিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ -অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি (হযরত আয়েশা সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্যে স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন (রা.)–হযরত কা'কার (রা.) নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মু'মিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনি খেদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর স্বীয় মুহরিম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরার গমনকে কেন্দ্র করে "তিনি কুরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন" বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে তবে তার কোনো যৌক্তিকতা ও সারবত্ত আছে কি?

মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কোনো ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তাফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। উষ্ট্র যুদ্ধের [জঙ্গে জামাল] সবিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মাত্র।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব -কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থা সৃষ্টি হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুষ্মান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ গাফেল ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম সমেত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মদীনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুষ্টকৃতকারীরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর সমীপে বিবৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ফিতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা (রা.)-কে এ পরামর্শ দেন যে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। হযরত আলী (রা.)ও এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অপকৃষ্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এঁরা বসরার সন্নিকটে পৌছে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে হযরত কা'কা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে আরজ করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকা (রা.) বলেন أَيْ بُنَيَّ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস! মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-কেও হযরত কা'কা (রা.)-এর আলোচনা সভায় ডেকে আনা হলো। হযরত কা'কা (রা.) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযরত কা'কা (রা.)– তাঁদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, যে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আপস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য।

এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন। হযরত কা'কা (রা.) ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তি চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের অনুপস্থিতিতে হযরত তালহা ও হযরত যুবরায়ের সাথে আমীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাতকারের পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপুত ছিল না। তাই তারা এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর দলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করবে, যাতে তিনি [হযরত আয়েশা সিদ্দীকা] ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কূট-কৌশল সফল হলো। হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হলো, তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তুদ ঘটনা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেল إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ; তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরূপভাবেই হযরত হাসান (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। (رُوْحُ الْمَعَانِيْ)

মোটকথা দুষ্কৃতকারী পাপাচারীদের দূরভিসন্ধি ও কূট–কৌশলের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরাপরাধ ও পূত-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে গেল, কিন্তু ফিতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তুদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা (রা.) -এর স্মরণ হলে তিনি এখন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.) ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন। ফিতনা ও দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তশরিফ নেন তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভালো হতো।

Free @ www.eilm.weebly.com

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা.) যখন কুরআনের আয়াত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। ফলে তাঁর দোপাট্টা অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। [রূহুল মা'আনী]

উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই ছিল এর কারণ [এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তাফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে সংগৃহত হয়েছে]

নবীজীর সহধর্মিণীগণের প্রতি কুরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েত :

وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ কর। দু'-হেদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার, বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হেদায়েত। এ হলো সর্বমোট পাঁচ হেদায়েত যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচ হেদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য : উপরিউক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী সহধর্মিণীগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো মুসলিম নারী-পুরুষই নামাজ, জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা বহির্ভূত নয়। বাকি রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু-হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীগণের প্রতিও একই হুকুম। এখন কথা হলো এসব হেদায়েত বর্ণনার পূর্বেই কুরআনে পাকে বলা হয়েছে যে, لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ যদি তাকওয়া ধারণ করে তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এদ্বারা বাহ্যত এ হেদায়েতসমূহ নবী-পত্নীগণের জন্যই নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্পষ্ট জওয়াব এই যে, এ নির্দিষ্টকরণ আহকামের দিক দিয়ে নয়; বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন; বরং এঁদের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উর্ধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের প্রতি ফরজ, এগুলোর প্রতি এঁদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ্ মহীয়ান গরিয়ানই সর্বাধিক জ্ঞাত।

قَوْلُهٗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো যদিও তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না; বরং গোটা উম্মতের প্রতিই এসব হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এ আয়াতে এই বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় কলুষতা বিমুক্ত করে দেওয়া رِجْس শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় رِجْس প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আজাব অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক জায়গায় رِجْس প্রতিমা ও বিগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আজাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থেই বোঝানো হয়েছে। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

আয়াতে আহলে বায়তের মর্ম কি? উপরিউক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতামাতাও আহলে বায়তের (اَهْل بَيْت) অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গ পদ عَنْكُمْ وَيُطَهِّرَكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে আহলে বায়ত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইকরামা এবং হযরত মুকাতিল এ মতই পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহলে বায়তের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ পেশ করেছেন [ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন] এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে نِسَاۤءَ النَّبِيِّ দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা (রা.) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত দ্বারা পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এ আয়াত তঁদের শানেই নাজিল হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা (পুত্র-পরিজনের মাথায় হাত রেখে শপথ) করে বললে বলতেও প্রস্তুত আছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান-হুসায়নও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি থেকে বাইরে তশরিফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসায়ন, হযরত ফাতিমা ও হযরত আলী (রা.) এঁরা সবাই একের পর এক তশরিফ আনেন। নবীজী ﷺ এদের সবাইকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا তেলাওয়াত করেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ [অর্থাৎ হে আল্লাহ এরাই আমার আহলে বায়ত।

-[তাফসীরে ইবনে জারীর]

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতাবলির মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। যারা একথা বলেন যে, আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাজিল হয়েছে এবং আহলে বায়ত বলে তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মত অন্যান্যগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থি নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহলে বায়তের অন্তর্গত। কেননা এ আয়াতের শানে নুযূলও এই। শানে নুযূলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর ইরশাদ মুতাবিক হযরত ফাতিমা, আলী, হাসান-হুসায়ন (রা.) আহলে বায়তের অন্তর্গত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় স্থলে نِسَاءَ النَّبِىِّ শিরোনামে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এজন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى -তেও স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিক্রম করে পুংলিঙ্গ পদ يُطَهِّرَكُمْ ও عَنْكُمْ -এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্তর্ভুক্ত নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا দ্বারা স্পষ্টত একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এসব হেদায়েতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আহলে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দেবেন। মোটকথা এখানে শরিয়তগত পবিত্র করণকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিত্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বুঝানো হয়নি। কিন্তু এর দ্বারা একথা বুঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ এবং নবীগণ -এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপরই নয়। জন্মগত শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতার যা বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহলে বায়ত শব্দ কেবল রাসূলের সন্তান-সন্ততিদের জন্যই নির্দিষ্ট বলে এবং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এদের হেত থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত : উল্লিখিত আয়াতে পবিত্রকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিষ্কলুষতা বলে মন্তব্য করে আহলে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহযাব অধ্যায়ে রয়েছে, যাতে নিষ্কলুষতার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ী প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে। বিদগ্ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন, সাধারণ লোকের জন্য তা নিষ্প্রয়োজন।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ : اٰيٰتِ اللّٰهِ অর্থ কুরআন আর حِكْمَتْ অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নতও আদর্শ যেমন অধিকাংশ তাফসীরকার حِكْمَتْ -এর তাফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اُذْكُرْنَ শব্দের দুটি ভাবার্থ হতে পারে (১) এসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রাখা যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কুরআন পাকের যা কিছু তাঁদের গৃহে তাঁদের সামনে নাজিল হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٥. اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ الْمُطِيْعَاتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ فِى الْاِيْمَانِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْخٰشِعِيْنَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ الْمُتَوَاضِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ عَنِ الْحَرَامِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً لِلْمَعَاصِىْ وَّاَجْرًا عَظِيْمًا عَلَى الطَّاعَاتِ .

৩৫. নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, ঈমানে সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, আনুগত্যের উপর ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজাপালনকারী পুরুষ, রোজাপালনকারী নারী, হারাম কর্ম থেকে যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ, ও জিকিরকারী নারী, আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন পাপসমূহ থেকে ক্ষমা ও আনুগত্যের উপর মহা পুরস্কার।

٣٦. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ تَكُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَهُمُ الْخِيَرَةُ الْاِخْتِيَارُ مِنْ اَمْرِهِمْ خِلَافَ اَمْرِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ نَزَلَتْ فِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ وَاُخْتِهٖ زَيْنَبَ خَطَبَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَعَنٰى لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَكَرِهَا ذٰلِكَ حِيْنَ عَلِمَاهُ لِظَنِّهِمَا قَبْلُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَهَا لِنَفْسِهٖ ثُمَّ رَضِيَا لِلْاٰيَةِ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا .

৩৬. আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশের পরিপন্থি ভিন্ন ক্ষমতা নেই আলোচ্য আয়াতটি আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ও তার বোন যয়নব -এর শানে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যয়নব বিনতে জাহশকে যায়েদ বিন হারেসার নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান তখন তারা উভয়ে এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কেননা তারা প্রথমে মনে করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য প্রস্তাব দেন। অতঃপর উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর তারা সম্মতি দেন। এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ لِزَيْدٍ ثُمَّ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا بَعْدَ حِيْنٍ فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ حُبُّهَا وَفِي نَفْسِ زَيْدٍ كَرَاهَتُهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُرِيْدُ فِرَاقَهَا فَقَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى ـ	অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যায়েদের সাথে যয়নবকে বিবাহ দেন। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত যয়নবের সাথে যায়েদের মনোমালিন্য দেখা দেয় ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যয়নবের মহব্বত সৃষ্টি হয় অতঃপর যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে যয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে তোমার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ রাখ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,
٣٧. وَإِذْ مَنْصُوْبٌ بِاذْكُرْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بِالْإِعْتَاقِ وَهُوَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ كَانَ مِنْ سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ اِشْتَرَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الْبِعْثَةِ وَاَعْتَقَهُ وَتَبَنَّاهُ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ فِيْ أَمْرِ طَلَاقِهَا وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ مُظْهِرُهُ مِنْ مَحَبَّتِهَا وَأَنْ لَوْ فَارَقَهَا زَيْدٌ تَزَوَّجْتَهَا وَتَخْشَى النَّاسَ ج أَنْ يَقُوْلُوْا تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ زَوْجَةَ ابْنِهٖ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ط فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَيُزَوِّجُكَهَا وَلَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَيْدٌ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا حَاجَتَهُ زَوَّجْنٰكَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا وَلَحْمًا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ط وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مقضيه مَفْعُوْلًا ـ	৩৭. আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন, ইসলামের দ্বারা আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, আজাদের মাধ্যমে এবং তিনি হলেন যায়েদ বিন হারেসা, তিনি জাহেলী যুগে বন্দীদের মধ্যে ছিলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুওতের পূর্বে তাকে ক্রয় করেন এবং মুক্তি দিয়ে নিজের পালকপুত্র হিসেবে সম্বোধন করেন তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, এখানে إِذْ শব্দটি উহ্য أُذْكُرْ ফে'লের মাফঊল হিসেবে মানসূব তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং তালাকের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। আপনি আপনার অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। তোমার অন্তরে যয়নবের মহব্বত ও যায়েদ তাকে তালাক দেওয়ার পর আপনি তাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন এবং আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন, লোকেরা বলবে মুহাম্মদ ﷺ তার পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছে অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত প্রত্যেক বিষয়ে, অতএব তিনি তোমাকে তার সাথে বিবাহ দেবেন এবং এতে লোকনিন্দায় তোমার কোনো ক্ষতি নেই। অতঃপর যায়েদ তাকে তালাক দিলেন এবং যয়নব ইদ্দতের সময় পুরা করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে অনুমতি বিহীন [আকদ ও মহর ব্যতীত] বাসর রাত সম্পন্ন করলেন ও মুসলমানদেরকে রুটি ও গোস্ত দ্বারা ওলীমার দাওয়াত আপ্যায়ন করালেন যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে।

٣٨. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ ط سُنَّةَ اللّٰهِ اَىْ كَسُنَّةِ اللّٰهِ فَنُصِبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ط مِنَ الْاَنْبِيَاءِ اَنْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ تَوْسِعَةً لَهُمْ فِى النِّكَاحِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ فِعْلُهُ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا مَقْضِيًّا.

৩৮. আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ (হালাল) করেন, তাতে তার কোনো বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। (এখানে سُنَّةَ اللّٰهِ টি كَسُنَّةِ اللّٰهِ -এর অর্থে যা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ যেরদানকারী আমেলকে বিলুপ্ত করে এটাকে নসবের স্থলে রাখা হয়েছে এবং তাদের বিবাহের বিধান ব্যাপক হওয়ার জন্য এতে তাদের কোনো বাধা নেই এবং আল্লাহর নির্দেশ নির্ধারিত, অবধারিত।

٣٩. اَلَّذِيْنَ نَعْتٌ لِلَّذِيْنَ قَبْلَهُ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ط فَلَا يَخْشَوْنَ مَقَالَةَ النَّاسِ فِيْمَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا حَافِظًا لِاَعْمَالِ خَلْقِهٖ وَمُحَاسِبَهُمْ.

৩৯. সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাকে ভয় করতেন। اَلَّذِيْنَ শব্দটি তার صِلَه সহ মিলে পূর্বের اَلَّذِيْنَ -এর সিফত তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বৈধকৃত বিষয়ে মানুষের নিন্দাকে ভয় করতেন না হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তার সৃষ্টের কর্মের হেফাজত কারী ও হিসাবকারী

٤٠. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ فَلَيْسَ اَبَا زَيْدٍ اَىْ وَالِدَهُ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّزَوُّجُ بِزَوْجَتِهٖ زَيْنَبَ وَلٰكِنْ كَانَ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط فَلَا يَكُوْنُ لَهُ ابْنٌ رَجُلٌ بَعْدَهُ يَكُوْنُ نَبِيًّا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ التَّاءِ كَاٰلَةِ الْخَتْمِ اَىْ بِهٖ خُتِمُوْا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا مِنْهُ بِاَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَاِذَا نَزَلَ السَّيِّدُ عِيْسٰى يَحْكُمُ بِشَرِيْعَتِهٖ.

৪০. মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন তিনি যায়েদের পিতা নন অতএব তার জন্য যায়েদের স্ত্রী যয়নবকে বিবাহ করা হারাম নয়; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। অতএব তার কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে নেই যাতে সে তার পরে নবী হয়। خَاتَمَ শব্দটি অন্য ক্বেরাত মতে ت-এর মধ্যে যবর দ্বারা অর্থাৎ মোহর তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দ্বারা নবুয়তের ধারাবাহিকতা মোহর করা হয়েছে আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত আল্লাহ জানেন তার পরে কোনো নবী আসবে না। যখন হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় আগমন করবেন তখন তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর শরিয়ত মুতাবেক ফয়সালা করবেন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন. اَلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ -এর আতফ হয়েছে اَلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ-এর উপর অথচ শরিয়তের দৃষ্টি উভয়টি একই আর عَطْف -এর জন্য مُغَايَرَتْ জরুরি।

উত্তর. مَفْهُوْم-এর হিসেবে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা রাসূল ﷺ যা সহ প্রেরিত হয়েছেন সেগুলোকে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে شَهَادَتَيْنِ কে মুখে উচ্চারণ করার নাম হলো ইসলাম। আর ঈমান বলা হয় نُطْقٌ بِاللِّسَانِ-এর শর্তের সাথে اِذْعَان قَلْبِىْ -এর নাম। আর عَطْف-এর জন্য اَدْنٰى مُغَايَرَتْ যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَالْحَافِظَاتِ : এর মাফউলকে পূর্বের দালালতের কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَالْحَافِظَاتِ فُرُوْجَهُنَّ

قَوْلُهُ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ : আল্লাহর নাম সম্মানার্থে এবং এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ -এর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা। কেননা রাসূল ﷺ নিজের পক্ষ হতে কোনো সমাধান দেন না।

قَوْلُهُ وَلِمُؤْمِنٍ : এটা كَانَ -এর خَبَر مُقَدَّم হয়েছে। এবং وَلَا مُؤْمِنَةٍ-এর উপর আতফ হয়েছে। اِذَا হলো ظَرْفِيَّه টা اِذَا مُتَضَمِّنْ بِمَعْنَى الشَّرْط আর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। যার উপর نَفِى مُقَدَّمْ দালালত করতেছে। ظَرْفِيَّه مُخَصَّصَة-এর জন্য হতে পারে। এই সুরতে উহ্য اِسْتَقَرَّ -এর مَعْمُوْل হবে যার সাথে كان -এর খবর টা مُتَعَلِّقْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হবে وَمَا كَانَ مُسْتَقِرًّا لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَقْتَ قَضَاءِ اللّٰهِ كَوْنُ خِيَرَةٍ لَهُ فِىْ اَمْرِهِ

قَوْلُهُ الْاِخْتِيَارُ : اَلْخِيَرَةُ-এর তাফসীর اَلْاِخْتِيَارُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَلْخِيَرَةُ টা غَيْر قِيَاسِىْ মাসদার হয়েছে।

قَوْلُهُ خِلَافَ اَمْرِ اللّٰهِ : এটা اَلْخِيَرَةُ -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَمْرِهِمْ : এটা اَلْخِيَرَةُ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ مَحَبَّتِهَا : এটা হলো مَا اَبْدَاهُ -এর বয়ান।

قَوْلُهُ سُنَّةَ اللّٰهِ : এটা মাসদার হওয়ার কারণে ও مَنْصُوْب হতে পারে।

قَوْلُهُ قَدَرًا مَقْدُوْرًا : مَقْدُوْرًا হলো قَدَرًا-এর تَاكِيْد যেমন– ظِلًّا ظَلِيْلًا এবং وَلَيْل اَلْيَل

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ : জমহুরের কেরাত কিন্তু تَخْفِيْف-এর সাথে আর উহ্য كَانَ-এর খবর হওয়ার কারণে رَسُوْلَ মানসূব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক** : পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে উম্মাহাতুল মুমিনীনের সম্পর্কে বিশেষ সুসংবাদের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে সাধারণভাবে সুসংবাদ রয়েছে, সমস্ত মুসলিম নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে , আল্লাহ পাক তাদেরকে মাগফেরাত দান করবেন এবং তাদের জন্যে অনেক নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শানে নুযূল : আল্লামা বগভী (র.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর কোনো কোনো স্ত্রী তাঁর খেদমতে আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! পবিত্র কুরআনে পুরুষদের সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা রয়েছে, কিন্তু নারীদের সম্পর্কে কি এমন কোনো ভালো কথা আছে? অথবা নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো কল্যাণ নেই। আমাদের আশঙ্কা হয়, হয়তো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমাদের কোনো ইবাদত কবুল হয় না', তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

তাবারানী এবং ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে যে, নারীদের একটি দল প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! পবিত্র কুরআনে ঈমানদার পুরুষদের কথা রয়েছে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে তো কোনো কথা নেই; তখন এ আয়াত নাজিল হয়'।

ইবনে জারীর কাতাদার (র.) সূত্রেও একথা বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)-এর কথার বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারের হাজির হয়ে আরজ করলেন "পবিত্র কুরআনের সব কিছু পুরুষদের ব্যাপারেই লক্ষ্য করছি, কিন্তু নারীদের ব্যাপারে ভালো কিছুর উল্লেখ নেই, এর কারণ অনুধাবন করতে পারছি না; তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) মোকাতেল (র.)-এর সূত্রে লিখেছেন যে, হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া এবং হযরত আসিয়া বিনতে কাব আনসারিয়া হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের প্রতিপালক [পবিত্র কুরআনে] পুরুষদের উল্লেখ করেন, কিন্তু নারীদের কোনো উল্লেখ থাকে না, আমরা আশঙ্কা করি যে নারীদের মধ্যে হয়তো কোনো কল্যাণ নেই', তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[মারেফুল কুরআন আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৫. পৃ. ৫০০]

কুরআনে পাক সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য : যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কুরআনে পাকের সাধারণ নির্দেশাবলির আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারীজাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত সর্বত্র يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কুরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীলোকের নাম কুরআনে পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা- اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ও اِمْرَاَةُ نُوْحٍ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোনো পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকেই সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই তাঁর (মরিয়মের) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।

কুরআন করীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল, কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীগণের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যাতে নারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এ মর্মে আরজ করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি- আল্লাহ পাক কুরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোনো প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। [পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থেকে ইমাম বাগবী রেওয়ায়েত করেছেন] এবং তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মারা থেকে, আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে। আর এসব রেওয়ায়েতে এ আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক সমীপে মানমর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎ কার্যাবলি, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারীপুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের ইবাদত যথা– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কুরআনে এর মধ্যে থেকে কোনো ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কুরআনে পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহর জিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুমু'আ এবং এই সূরায় وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ [অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিণীগণ] বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, প্রথমত আল্লাহর জিকির সকল ইবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মা'আজ বিন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও ছওয়াবের অধিকারী কোন ব্যক্তি হবে? তিনি [রাসূলে কারীম ﷺ] বললেন, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর জিকির করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোজাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ বেশি করবে। এরূপভাবে নামাজ, জাকাত, হজ, সদকা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করবে, সেই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে [ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন]।

দ্বিতীয়ত, যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে এটাই (জিকির) সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরিয়তও কোনো শর্ত আরোপ করেনি অজুসহ বা বিনা অজুতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহর জিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোনো পরিশ্রমই করতে হয় না, কোনো অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি [ধর্ম] ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ি থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি ফিরে আসার দোয়া, কোনো কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত দোয়া– প্রভৃতি দোয়ার সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোনো সময়েই আল্লাহ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোনো কাজ না করে, আর তাঁরা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয় তবে পার্থিব কাজ দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ -এর শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতটি যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ের শানে নাজিল হয়। হযরত যায়েদ বিন হারেসা জন্মসূত্রে আরবী ছিলেন কিন্তু পাচারকারী দল তাকে বাল্য অবস্থায় অপহরণ করে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ বন্ধনের পূর্বে হযরত খাদীজার ভাতিজা হাজমি ইবনে হিজাম হযরত খাদীজার জন্য যায়েদকে ক্রয় করেন। হযরত খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহের পরে তিনি যায়েদকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপহার দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আজাদ করে দিলেন ও নিজের পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। আরবের লোকেরা তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকত। কুরআনে কারীমে জাহেলী যুগের সে কুধারণাকে খণ্ডন করে বলেছে, اُدْعُوهُمْ لِاٰبَائِهِمْ অর্থাৎ তোমরা পালকপুত্রকে তাদের প্রকৃত পিতার নামে ডাক। অতএব সাহাবায়ে কেরাম উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর যায়েদ ইবনে হারেছা নামে ডাকতে লাগলেন। যায়েদ যৌবনে পদার্পণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ ফুফাতোবোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশকে (রা.) তার নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তার ভ্রাতা আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ এ প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ হযরত যয়নব ও তার ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মোহর দশটি লাল দীনার [প্রায় চার তোলা স্বর্ণ] ও ষাট দেরহাম [প্রায় আঠারো তোলা রূপা] একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থলী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। অপরদিকে নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নবকে তালাক দিবেন অতঃপর যয়নব (রা.) হুজুর পাক ﷺ -এর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। যাতে আরববাসীর বর্বর যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী পালকপুত্রের স্ত্রী বিবাহ করা হারাম হওয়ার কুধারণাটি রহিত হয়। সে প্রেক্ষিতেই ঘটনা তেমনিভাবে ঘটল। আল্লাহ তা'আলা সে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে নাজিল করেন لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ الخ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا : সমগ্র কুরআনে নবীগণ ﷺ ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ ইবনে হারেসার (রা.) নাম রয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরকারক এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরআনের নির্দেশানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখনই তিনি [রাসূলে কারীম ﷺ] যায়েদ বিন হারেসাকে কোনো সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ, শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ : আলোচ্য আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে (রা.) নবীজির সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নব (রা.)-কে তালাক দেওয়ার পর নবীজির সাথে তার বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তার প্রতি পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করতো। এ ভ্রান্তি ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ নন; বরং তার পিতা হারেসা (রা.) কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকিদ দিয়ে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কোনো পুরুষ নেই তার প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তি সঙ্গত হতে পারে যে, তার পুত্রবধু রয়েছে।

বিয়ে শাদীতে কুফু বা সমতা রক্ষা করা জরুরি : বিয়ে শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, পরস্পর কলহ বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরিয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উভয়পক্ষে বংশগত সমতা ও সামঞ্জস্য না থাকার কারণে হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ (রা.) প্রথমে যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে যয়নবের বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে। যে অসম্মতির কারণ সম্পূর্ণ শরিয়ত সম্মত। বিয়ে শাদীতে সমতা রক্ষা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই সংঘটিত হওয়া উচিত অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে করা সঙ্গত নয়। লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অন্যান্য অবিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিতাবুল আসারে লিখেন যে, হযরত ফারুকে আযম (রা.) বলেন, আমি এ মাসে ফরমান জারি করে দেব যেন, কোনো সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেওয়া না হয়। তেমনিভাবে হযরত আয়েশা ও আনাস (রা.)-এর প্রতি বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন, যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অতএব বিয়ে শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা শরিয়তের বিশেষভাবে কাম্য যাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনো উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মান-মর্যাদার মূল ভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্ম পরায়ণতা। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে বিয়ে শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলির উত্তরের সূচনা : سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে কি উদ্দেশ্যে নিহিত ছিল? ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্যই নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোকের পানি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) -এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

-এর বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়েসহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা নবুয়ত ও রিসালতের মহান মর্যাদা ও তাকওয়া পরহিজগারীর পরিপন্থিও নয়। সর্বশেষ বাক্যে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এ ক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুষ্টি পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এসব কিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে অতীতকালে যেসব নবী (আ.)-এর বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবীগণ (আ.) সবাই আল্লাহ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ় তত্ত্ব : সম্ভবত এতে নবীগণ (আ.)-এর বহু সংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এঁদের (আ.) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র-পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যে সব ওহী নাজিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী ﷺ যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোনো কাজ করেছেন এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উম্মতের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল। পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতামুক্ত নয়। তাই নবীগণ (আ.)-এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপরেখা সাধারণত উম্মত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হবে।

নবীগণ (আ.)-এর যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ এসব মহাত্মা আল্লাহ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোনো কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোনো প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোনো মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোনো পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে যখন সমগ্র নবীরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে تَخْشَى النَّاسَ [অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন]– এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ (আ.)-এর আল্লাহ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা এটা কেবল রিসালত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তাবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব কাজ। তাবলীগ ও রিসালতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তাবলীগ এবং রিসালতের অংশ বিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফেরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে বাস্তব রূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুত অদ্যাবধি ও এ সম্পর্কেও বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا لا ـ

৪১. হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

٤٢. وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اَوَّلَ النَّهَارِ وَاٰخِرَهٗ .

৪২. এবং তার পবিত্রতা বর্ণনা কর সকাল ও বিকালে দিনের প্রথম ও শেষ প্রান্তে তথা সব সময়।

٤٣. هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ اَىْ يَرْحَمُكُمْ وَمَلٰۤئِكَتُهٗ اَىْ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُدِيْمَ اِخْرَاجَهٗ اِيَّاكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اَىِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ ط اَىِ الْاِيْمَانِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا .

৪৩. তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন তোমাদেরকে অন্ধকার কুফর থেকে আলোর ঈমানের দিকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

٤٤. تَحِيَّتُهُمْ مِنْهُ تَعَالٰى يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ج بِلِسَانِ الْمَلٰۤئِكَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا هُوَ الْجَنَّةُ .

৪৪. যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অভিবাদন হবে ফেরেশতাদের শ্লোগানে সালাম। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন।

٤٥. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى مَنْ اُرْسِلْتَ اِلَيْهِمْ وَّمُبَشِّرًا مَنْ صَدَّقَكَ بِالْجَنَّةِ وَّنَذِيْرًا لا مُنْذِرًا مَنْ كَذَّبَكَ بِالنَّارِ .

৪৫. হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী উম্মতের উপর সু-সংবাদ দাতা জান্নাতের আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের উপর এবং আপনার মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি।

٤٦. وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ اِلٰى طَاعَتِهٖ بِاِذْنِهٖ بِاَمْرِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا اَىْ مِثْلَهٗ فِى الْاِهْتِدَاءِ بِهٖ

৪৬. এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে তার আনুগত্যের দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং হেদায়েতের মধ্যে উজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় প্রেরণ করেছি।

٤٧. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا هُوَ الْجَنَّةُ .

৪৭. আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ জান্নাত রয়েছে।

٤٨. وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ فِيْمَا يُخَالِفُ شَرِيْعَتَكَ وَدَعْ اُتْرُكْ اَذٰهُمْ لَا تُجَازِهِمْ عَلَيْهِ اِلٰى اَنْ تُؤْمَرَ فِيْهِمْ بِاَمْرٍ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط فَهُوَ كَافِيْكَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا مُفَوَّضًا اِلَيْهِ .

৪৮. আপনি শরিয়তের পরিপন্থি বিষয়ে কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন তাদের নির্যাতনের কোনো প্রতিশোধ নিবেন না যতক্ষণ আল্লাহর কোনো আদেশ না হয় ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন কেননা তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৪৯. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَفِىْ قِرَاءَةٍ تُمَاسُّوْهُنَّ اَىْ تُجَامِعُوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا تُحْصُوْنَهَا بِالْاَقْرَاءِ اَوْ غَيْرِهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ اَعْطُوْهُنَّ مَا يَتَمَتَّعْنَ بِهٖ اَىْ اِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُنَّ اَصْدِقَةً وَاِلَّا فَلَهُنَّ نِصْفُ الْمُسَمّٰى فَقَطْ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِىُّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا خَلُّوْا سَبِيْلَهُنَّ مِنْ غَيْرِ اِضْرَارٍ ـ

৪৯. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার সহবাস করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও অন্য ক্বেরাত মতে تَمَسُّوْهُنَّ শব্দটি تُمَاسُّوْهُنَّ পড়বে তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। ইদ্দত মাসিক ঋতুস্রাব বা অন্যান্য পদ্ধতিতে তোমরা গণনা কর অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে সামান্য সম্পদ যা দিয়ে তারা উপকৃত হয়। অর্থাৎ এটা যখন আক্বদের সময় মোহরানা ধার্য না হয়। নতুবা অর্ধেক মোহর দেবে। এটাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ফতোয়া এবং ইওমাম শাফেয়ী তা গ্রহণ করেছেন এবং উত্তম পন্থায় কোনো কষ্ট দেওয়া ব্যতীত বিদায় দেবে।

৫০. يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالسَّبْىِ كَصَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْنَ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق يَطْلُبُ نِكَاحَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَلنِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ صَدَاقٍ ـ

৫০. হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে কাফেরদের মধ্যে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দেন যেমন সাফিয়্যাহ ও জুয়াইরিয়াহ এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি মামাতো ভগ্নি, ও খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। পক্ষান্তরে যারা হিজরত করেনি তারা বৈধ নয় কোনো মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে মোহরানা ব্যতীত বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা মোহরানা ব্যতীত হেবার মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন করা বিশেষ করে আপনারই জন্য বৈধ, অন্য মুমিনদের জন্য বৈধ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ اَزْوَاجِهِمْ مِنَ الْاَحْكَامِ بِاَنْ لَا يَزِيْدُوْا عَلٰى اَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَلَا يَتَزَوَّجُوْا اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُوْدٍ وَمَهْرٍ وَّ فِىْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ مِنَ الْاِمَاءِ بِشِرَاءٍ اَوْ غَيْرِهٖ بِاَنْ تَكُوْنَ الْاَمَةُ مِمَّنْ تَحِلُّ لِمَالِكِهَا كَالْكِتَابِيَّةِ بِخِلَافِ الْمَجُوْسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَاَنْ تَسْتَبْرَأَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِكَيْلَا مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَ ذٰلِكَ يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط ضِيْقٌ فِى النِّكَاحِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا فِيْمَا يَعْسِرُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ رَحِيْمًا بِالتَّوْسِعَةِ فِىْ ذٰلِكَ

আমি মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে তাদের উপর মুমিনদের উপর যা আহকাম নির্ধারিত করেছি যেমন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে একত্রে চারের অধিক স্ত্রী না রাখা ও মোহর, অভিভাবক ও সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ না করা ও দাসীদের ক্ষেত্রে দাসী এমন হওয়া যা মালিকের জন্য বৈধ হয় যেমন কিতাবী আর মাজূসী ও মূর্তিপূজারী হালাল নয় এবং মালিক সহবাসের পূর্বে দাসীকে ইদ্দতের মাধ্যমে পরিষ্কার করা ইত্যাদি তা আমার জন্য আছে। যাতে বিবাহের ক্ষেত্রে আপনার অসুবিধা না হয়। لِكَيْلَا-এর সম্পর্ক পূর্বের اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ-এর সাথে আল্লাহ এ বিষয়ে যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর ক্ষমাশীল, এটাতে ব্যাপক সুবিধা দেওয়া হিসেবে দয়ালু।

৫১. تُرْجِىْ بِالْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ بَدْلَهٗ تُؤَخِّرُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ اَىْ اَزْوَاجِكَ عَنْ نَوْبَتِهَا وَتُؤْوِىْٓ تَضُمُّ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ فَتَاتِيْهَا وَمَنِ ابْتَغَيْتَ طَلَبْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ مِنَ الْقِسْمَةِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ط فِىْ طَلَبِهَا وَضَمِّهَا اِلَيْكَ خُيِّرَ فِىْ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ كَانَ الْقَسْمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ذٰلِكَ التَّخْيِيْرُ اَدْنٰى اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ مَا ذُكِرَ الْمُخَيَّرُ فِيْهِ كُلُّهُنَّ تَاكِيْدٌ لِلْفَاعِلِ فِىْ يَرْضَيْنَ.

৫১. আপনি তাদের মধ্যে আপনার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সময় দেওয়া হিসেবে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। تُرْجِىْ শব্দটির শেষে ى ও উভয়ভাবে পড়া যাবে। অর্থ হলো তুমি দূরে রাখবে আপনি ভাগ দেওয়া হিসেবে যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে অতঃপর তাতে দূরে রাখা ও কামনা করা আপনার কোনো দোষ নেই। প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর স্ত্রীদের অধিকার অংশ মতো আদায় করা ওয়াজিব ছিল অতঃপর তা হুজুরে পাক ﷺ -এর নিজের ইচ্ছাধীন করে দেওয়া হয় এতে উক্ত স্বাধীনতাতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু শীতল থাকবে, তারা দুঃখ পাবেনা এবং আপনি আপনার ইচ্ছা স্বাধীন যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। كُلُّهُنَّ শব্দটি يَرْضَيْنَ ফেলের فَاعِلْ থেকে تَاكِيْد স্ত্রীদের বিষয়ে এবং কেউ কেউ এর প্রতি অধিক ভালোবাসার আকর্ষণে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ط مِنْ اَمْرِ النِّسَاءِ وَالْمَيْلِ اِلٰى بَعْضِهِنَّ وَاِنَّمَا خَيَّرْنَاكَ فِيْهِنَّ تَيْسِيْرًا عَلَيْكَ فِىْ كُلِّ مَا اَرَدْتَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَلِيْمًا عَنْ عِقَابِهِمْ .

তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ জানেন। আমি আপনার সুবিধার্থে স্ত্রীদের ব্যাপারে আপনাকে ইচ্ছাধীন স্বাধীনতা দিয়েছি আল্লাহ তার মাখলুকের প্রতি সর্বজ্ঞ তাদের শাস্তির ব্যাপারে সহনশীল।

৫২. لَا تَحِلُّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ بَعْدَ التِّسْعِ اللَّاتِىْ اخْتَرْنَكَ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِتَرْكِ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الْاَصْلِ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ بِاَنْ تُطَلِّقَهُنَّ اَوْ بَعْضَهُنَّ وَتَنْكِحَ بَدَلَ مَنْ طَلَّقْتَ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط مِنَ الْاِمَاءِ فَتَحِلُّ لَكَ وَقَدْ مَلَكَ بَعْدَهُنَّ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ وَوَلَدَتْ لَهٗ اِبْرَاهِيْمَ وَمَاتَ فِىْ حَيٰوتِهٖ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا حَفِيْظًا .

৫২. আপনার জন্য এই নয় স্ত্রী যাদের ব্যাপারে আপনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে তা ব্যতীত কোনো নারী হালাল নয়। لَا تَحِلُّ -এর মধ্যে ي ও ت উভয়ভাবে পড়া যাবে এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও অর্থাৎ তাদের সবাইকে তালাক দিয়ে বা কাউকে তালাক দিয়ে তার পরিবর্তে অন্যকে গ্রহণ করা হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে। تَبَدَّلَ মূলে تَتَبَدَّلَ ছিল একটি ت বিলোপ করা হয় তবে দাসীর ব্যাপারে ভিন্ন [অর্থাৎ দাসী তোমার জন্য হালাল, এপর তিনি মারিয়্যাহ কিবতীয়ার মালিকানা গ্রহণ করেন ও এটার ঔরসে ইবরাহীম জন্ম নেয় ও হুজুরের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ : এটা جُمْلَهْ مُسْتَانِفَه হয়েছে এবং জিকির ও তাসবীহ -এর নির্দেশের عِلَّتْ হয়েছে। অর্থাৎ যখন জিকির ও তাসবীহ -এর হুকুম দেওয়া হলো তখন প্রশ্ন উত্থিত হলো যে, জিকির এর তাসবীহ কেন করা হবে? তখন উত্তর দেওয়া হয়েছে যে যেহেতু তিনি তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

قَوْلُهٗ اَنْ يَرْحَمَكُمْ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো একথা বর্ণনা করা যে, صَلٰوة-এর নিসবত যখন আল্লাহর দিকে হয় তখন রহমত নাজিল হওয়া উদ্দেশ্য হয়।

قَوْلُهٗ مَلَائِكَتُهٗ : এর আতফ হয়েছে يُصَلِّىْ -এর উহ্য যমীরের উপর কিন্তু এখানে এই اِعْتِرَاضْ হবে যে, ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ-এর উপর عَطْف করার জন্য ضَمِيْر مُنْفَصِلْ দ্বারা تَاكِيْد নেওয়া জরুরি হয়। যা এখানে হয়নি।

উত্তর. উত্তর হচ্ছে এই যে, যেহেতু عَلَيْكُمْ -এর فَاصِلْ বিদ্যমান রয়েছে এ কারণে যমীরের মাধ্যমে تَاكِيْد নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আর مَلَائِكَتُهٗ -এর পরে يَسْتَغْفِرُوْنَ-এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো এই যে, صَلٰوة-এর নিসবত যখন ফেরেশতার দিকে হয় তখন উদ্দেশ্য হয় اِسْتِغْفَارْ তথা ক্ষমা প্রার্থনা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لِيُخْرِجَكُمْ : এর তাফসীর لِيُدِيْمَ দ্বারা করার উদ্দেশ্যে হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া :

প্রশ্ন. ঈমানদারদের কুফরের অন্ধকার হতে বের হওয়া نَفْسِ اِيْمَانْ দ্বারাই প্রমাণিত। এরপর পুনরায় বের করার কি উদ্দেশ্য? এটা তো تَحْصِيْل حَاصِلْ হয়ে গেল।

উত্তর. উত্তরের সারকথা হলো এই তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো একথার দিকে ইঙ্গিত করা যে, خُرُوْج দ্বারা دَوَامْ এবং اِسْتِقْرَارْ উদ্দেশ্য। কেননা যখন খালেক থেকে গাফলত অধিক হয়ে যায় তখন ঈমান থেকে বের হওয়ার কারণ হয়ে যায়।

প্রশ. اَلظُّلُمَاتُ কে বহুবচন এবং اَلنُّوْرُ কে একবচন নেওয়ার কি কি কারণ?

উত্তর. কুফরের প্রকার যেহেতু বিভিন্ন হয়ে থাকে যার কারণে তার ظُلُمَاتٌও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর ঈমান যেহেতু شَيْ وَاحِدْ এতে تَعَدُّدْ হয়ে না, যারা تَعَدُّدْ-এর প্রবক্তা তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বহির্ভূত।

قَوْلُهُ بِاِذْنِهِ : بِاِذْنِهِ এর তাফসীর بِاَمْرِهِ দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

প্রশ্ন. অনুমতি তো اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا দ্বারাই বুঝা যায় এরপর পুনরায় অনুমতির কি প্রয়োজন?

উত্তর. এখানে اِذْنٌ দ্বারা اَمْرٌ (হুকুম) উদ্দেশ্য। আর اِذْنٌ এবং اَمْرٌ-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ دَعْ اَذَاهُمْ : اِضَافَتُ مَصْدَرٍ اِلَى الْفَاعِلِ-এর অন্তর্ভুক্ত। উহ্য ইবারত হলো دَعْ اِذْيَتَهُمْ اِيَّاكَ অর্থাৎ আপনি তাদের কষ্ট দেওয়াকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। তাদের থেকে তাদের কষ্ট দেওয়ার প্রতিশোধ নেবেন না। অথবা এরপর এটা اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْمَفْعُوْلِ-এর অন্তর্গত অর্থাৎ اُتْرُكْ اِذْيَتَكَ لَهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ত্বরা করবেন না। যতক্ষণ না আপনি অনুমতি পেয়ে যান। সুতরাং যুদ্ধের আয়াতের মাধ্যমে অনুমতি পেয়ে গেছেন। এবং ক্ষমা করার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ : مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ-এর উদাহরণে মুফাসসির (র.) সফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব এবং জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ আল খুযাইয়াহ কে উপস্থান করেছেন। এর চাহিদা হলো مَلَكَتْ-এর আতফ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ-এর উপর হবে। তবে এটা জাহিরের খেলাফ। জাহির হলো এর আতফ اَزْوَاجَكَ-এর উপর হবে। তবে এই সুরতে مَامَلَكَتْ-এর উপমাতে সফিয়া এবং জুয়াইরিয়াকে উপস্থাপন করা বৈধ নয়। কেননা এরা مَلَكَتْ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা হলেন পুণ্যবতী রমণীগণের অন্তর্ভুক্ত। সফিয়া এবং জুয়াইরিয়ার পরিবর্তে মারিয়া কিবতিয়া এবং রায়হানাকে উপস্থাপন করা উচিত। যেহেতু এরা দু'জন রাসূল ﷺ-এর বাদী ছিলেন।

قَوْلُهُ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ : مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ হলো مَامَلَكَتْ-এর কারণ টা قَيْدِ اِحْتِرَازِىْ নয়; বরং تَغْلِيْبِىْ যেহেতু তাঁর অধিকাংশ বাদী গনিমতের সম্পদের মাধ্যমে তিনি পেয়েছিলেন- এই জন্য مَامَلَكَتْ-এর قَيْد লাগানো হয়েছে। অন্যথায় ক্রয়কৃত বাদীরও সেই বিধান যে বিধান গনিমতের মাধ্যমে অর্জিত বাদীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ হালাল হওয়া।

قَوْلُهُ اِمْرَاَةً مُؤْمِنَةً : এর আতফ ও اَحْلَلْنَالَكَ-এর مَفْعُوْل তথা اَزْوَاجَكَ-এ উপর হয়েছে। উদ্দেশ্যে হলো আপনার জন্য মুমিন নারী বৈধ, কাফেরাহ নারী নয়।

قوله اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ : এটা وَهَبَتْ نَفْسَهَا-এর শর্ত অর্থাৎ বিবাহ পূর্ণ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র নারীর নিজেকে দান করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তাঁর কবুল করাও শর্ত।

قَوْلُهُ خَالِصَةً لَكَ : এখানে خَالِصَةً টা مَنْصُوْب হওয়ার তিনটি কারণ হতে পারে-

১. وَهَبَتْ-এর فَاعِلْ হতে حَالْ হওয়ার কারণে অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهَا خَالِصَةً لَكَ دُوْنَ غَيْرِكَ

২. اِمْرَاَةً থেকে حَالْ হওয়ার কারণে। উভয় সুরতে একই অর্থ হবে।

৩. উহ্য মারসদারের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ هِبَةً خَالِصَةً لَكَ دُوْنَ غَيْرِكَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لِكَيْلَا : এটা তার পূর্বের অর্থাৎ خَالِصَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ

قَوْلُهُ تُرْجِي : এটা إِرْجَاءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعٌ -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ্। অর্থ– তুমি ঢিল দাও, তুমি বিলম্ব কর।

قَوْلُهُ تُؤْوِي : এটা إِيْوَاءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعٌ -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ্। অর্থ তুমি জায়গা দাও, তুমি সাথে রাখ, তুমি মিলিয়ে দাও।

قَوْلُهُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ : এখানে مَنْ হলো شَرْطِيَّه এটা اِبْتَغَيْتَ -এর مَفْعُول مُقَدَّمٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে فَلَا جُنَاحَ হলো جَوَاب شَرْط আবার এটাও হতে পারে যে, مَنْ মওসূলাহ এবং মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ হলো মুবতাদার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ الخ :

আল্লাহর জিকির এমন এক ইবাদত যা সর্বাবস্থায় ফরজ এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহ পাক জিকির ব্যতীত এমন কোনো ফরজই আরোপ করেননি যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামাজ, দিনে পাঁচবার এবং প্রত্যেক নামাজের রাকাত নির্দিষ্ট, রমজানের রোজা নির্ধারিত কালের জন্য, হজ ও বিশেষস্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম ক্রিয়ার নাম। জাকাতও বছরে একবারই ফরজ হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর জিকির এমন ইবাদত যার কোনো সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ানো বা বসার কোনো বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং অজুসহ থাকারও কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। প্রতি মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর জিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে, সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই এটা বর্জন করলে বর্জনকারীর কোনো কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপরাগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা তা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু জিকরুল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোনো শর্ত আরোপ করেন নি। তাই তা বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফজিলত-বরকতও অগণিত। ইমাম আহমদ (রা.) হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দেব না, যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা–রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মোকাবিলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদাত বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেটা কি বস্তু! কোন আমল? রাসূলুল্লাহ ফরমান ذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ "মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ পাকের জিকির।'–(ইবনে কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ফরমান : আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি, যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ (ابن كثير) অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার অধিক পরিমাণে তোমার জিকির করার এবং তোমার অসিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।–[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর জিকিরের তাওফীক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলো যে, ইসলামের আমল সমূহ, ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংরক্ষিত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সক্ষম হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান- لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللّٰهِ (مُسْنَد اَحْمَدْ. اِبْن كَثِيْر) অর্থাৎ " তোমার কণ্ঠ সর্বদা আল্লাহর জিকিরে সরব ও তরতাজা থাকা চাই।" -[মুসনদ আহমদ, ইবনে কাছীর]। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন। اُذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ (مُسْنَد اَحْمَدْ. اِبْن كَثِيْر) অর্থাৎ "তুমি আল্লহর জিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।" -[মুসনাদে আহমদ, ইবনে কাছীর] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি এমন কোনো আসরে বসে যেখানে আল্লাহর জিকির নেই, তবে কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।

-[আহমদ, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا : অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকিদ রয়েছে বলে আয়াতেও এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহর জিকির কোনো বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهُ : অর্থাৎ "যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় জিকির করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহর নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদা লাভ করবে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।"

উল্লিখিত আয়াতে "صَلٰوة" শব্দটি আল্লাহ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে উহার অর্থ এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহর "صَلٰوة" অর্থ তিনি রহমত নাজিল করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ তো নিজের তরফ থেকে কোনো কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং তাঁদের "صَلٰوة" অর্থ এই যে, তাঁরা আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পক্ষে صَلٰوة অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া صَلٰوة এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যারা عُمُوْم مُشْتَرِكْ তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাঁদের মতে "صَلٰو" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ বিধি অনুসারে عُمُوْم مُشْتَرِكْ যাদের নিকট বৈধ নয় তাদের মতে عُمُوْم مَجَازْ অর্থাৎ বিশেষ অর্থবোধক হিসেবে আলোচ্য সকল অর্থেই এটার ব্যবহার রীতিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ : এটা এই صَلٰوة এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোনো কোনো মুফাসসির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল -মউত যখন কোনো মু'মিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন তখন তাঁর প্রতি এ সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর لِقَا. শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

মাস'আলা : এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পাস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্সালামু আলাইকুম হওয়া উচিত, চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

Free @ www.eilm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি গুণ ব... করা হয়েছে। অর্থাৎ سِرَاجٌ مُنِيرٌ ، شَاهِدٌ إِلَى اللَّهِ ، مُبَشِّرٌ ، نَذِيرٌ ، دَاعِي অর্থ : তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য স... প্রদান করবেন। যেমন সহীহ বুখারী, মুসলিমন নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যার কিয়দাংশ হলো এই : কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ.) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা... যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকট পৌঁছিয়েছিলেন কি? তিনি আরজ করবেন যে, আমি যথার্... পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি তাদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌঁছিয়েছেন। অতঃ... হযরত নূহ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কি? তিনি আরজ করবেন যে, মুহা... ﷺ এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করা... এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহ (আ.)-এর উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদে... ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে সে সময় এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘকাল পর এদের জন্ম। উম্মতের মুহাম্ম... নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদে... রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে শুনেছি, যার উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাব রয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ... নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সারকথা : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদের... এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উম্মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভালো-ম... আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যায় অ... রেওয়ায়েতে সপ্তাহে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলে... মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে উম্মতের সাক্ষী স্থির করা হবে [সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনু... মোবারক রেওয়ায়েত করেছেন।- [তাফসীরে মাযহারী]।

আর "مُبَشِّرٌ" অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্যে থেকে সৎ ও শরিয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেবেন এবং "نَذِيرٌ" অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী অর্থাৎ তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আজাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করবেন।

قَوْلُهُ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ : -এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবেন। دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ -কে بِإِذْنِهِ -এর সংঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করবেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য যা আল্লাহর অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। سِرَاجٌ অর্থ প্রদীপ مُنِيرٌ জ্যোতিষ্মান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী سِرَاجٌ مُنِيرٌ এর মর্মার্থ কুরআনে পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনে পাকের বর্ণনাধারা প্রকাশভঙ্গি দ্বারা একথাই বোঝা যায় যে, এটাও হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাসসির কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে-মাযহারীতে ফরমান যে, তিনি রাসূলে কারীম তো প্রকাশ্যভাবে ভাষার দিক দিয়ে دَاعِيْ إِلَى اللَّهِ [আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। এর অভ্যন্তরীণ ভাবে হৃদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সামগ্র মুমিনের হৃদয় তাঁর অন্তর রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়ে-কেরাম যারা ইহজগতে নবী করীম ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। কেননা তাদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোনো মাধ্যমে ব্যতীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিষ্ট্য উম্মত এ নূর সাহাবায়ে-কেরামের মাধ্যম পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা যায় যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে রাসূলে কারীম ﷺ এ ধরাধাম থেকে অন্তর্ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারণ লোকের কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ তাঁর পূত-পবিত্র অন্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্নবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো সূর্যের আলোর চাইতে ঢের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই আলোকিত হয়। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং মু'মিনদের অন্তর আলোকিত হয়। এই উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ যে উপকার লাভ করা যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌছানো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা যায় না।

কুরআনে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই গুণাবলি কুরআনের ন্যায় তাওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইমাম বুখারী (র.) নকল করেছেন যে, হযরত আতা বিন ইয়াসার (রা.) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসের (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব গুণের উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবানিপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহর শপথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব গুণের বর্ণনা কুরআনে রয়েছে, তা তাওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন–

إِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ لَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحُ بِهِ اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا .

অর্থাৎ হে নবী ﷺ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম مُتَوَكِّلٌ [আল্লাহর উপর ভরসাকারী] রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিদানকারী; বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুটি কয়েক অনন্যগুণাবলি এবং তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর যেসব বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণ উম্মতের তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ইতিপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য। উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে তিনটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হুকুম : কোনো মহিলার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস (خَلْوَتْ صَحِيْحَهْ) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোনো কারণে তাকে তালাক দেওয়া হয়: তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (স্ত্রী) সহবাস। সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম। শরিয়ত অনুমোদিত সহবাস (صُحْبَتْ حُكْمِىْ) যথার্থ নির্জন বাস (خَلْوَتْ صَحِيْحَهْ)-এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় হুকুম : তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে সৌজন্যমূলকভাবে শিষ্ঠাচারের মাধ্যমে কিছু উপঢৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপঢৌকন প্রদানপূর্বক বিদায় করা মোস্তাহাব এবং কোনো কোনো অবস্থায় ওয়াজিব। যার বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে বাক্বারার আয়াত لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে চলে গেছে। অত্র কুরআনের বাক্যে مَتَاعٌ শব্দটি গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, 'মাতা' مَتَاعٌ শব্দটি অর্থগতভাবে অত্যন্ত ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক যে কোনো বস্তু এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্যই প্রাপ্য حُقُوْق (وَاجِبَةٌ মোহরানা প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি অদ্যাবধি মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য যথা- তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া মোস্তাহাব। [মাবসূত, মুহীত, রূহ] এ প্রেক্ষিতে مَتِّعُوْهُنَّ নির্দেশবাচক ক্রিয়া (صِيْغَةُ اَمْرٍ) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বাহির্ভূত উভয় শ্রেণিই এর অন্তর্গত। -[রূহ] প্রতিযশা মুহাদ্দিস হযরত আবদ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে مَتَاعٌ প্রদান করা মোস্তাহাব। চাই তার সাথে যথার্থ নির্জন বাস[خَلْوَتْ صَحِيْحَةٌ হয়ে থাকে বা না থাকে, তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

তালাকের সময় দেয় পোশাকের বিবরণ : بَدَائِعٌ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তালাকের পর দেয় مُتْعَةٌ ঐ পোশাক যা স্ত্রীলোকগণ বাড়ি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে- পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র শরীর আবৃত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তর্ভুক্ত আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক-শাড়ী, জামা, বোরকা অথবা আপাদমস্তক আবৃত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে-।] যেহেতু পোশাক উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণিরই হয়, সুতরাং ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হয় তবে উত্তম শ্রেণির পোশাক দিতে হবে। আর যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিম্ন মানের, আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরিব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে হবে [নাফাকাত نَفَقَاتٌ অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের (خَصَّافٌ) উক্তি]।

ইসলামে সদাচারের নজিরবিহীন শিক্ষা : গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিত্র ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল এটুকুই নয়। বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শত্রুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকিদ বিধান কেবল ইসলামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিদ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিশ্বের জাতিসমূহ থেকে পুঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো [বৃহৎ পরাশক্তিসমূহের] রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্বার্থ ভাবে নয়। অবার সব জায়গায় বা সকল দেশও নয়; বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধ হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; তবুও এসব সাহায্য কোনো এলাকায় কেবল তখনই পৌছে যখন সে এলাকা কোনো সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ যন্ত্রণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজ্ঞাময় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকেই এর উৎপত্তি। সাধারণত যার ফলশ্রুতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি যেসব নির্দেশবলি প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা ও জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে, তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তা থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু কুরআনে কারীম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক দানকারীর প্রতি ফরজ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকিদ রয়েছে যেন সে এ সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচপত্র বহন স্বামীর উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ তাকিদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্ত্রীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য স্বামীর প্রতি অধিক তাকিদ রয়েছে। এরই তৃতীয় হুকুম এই যে, سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর যাতে এরূপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন মৌখিকভাবে কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোনো প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে।

বিরোধ ও মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে পারে, যার স্বীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الخ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বতন্ত্র মর্যদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু ছোট খাটো শর্তাবলি রয়েছে, যা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট। এখন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন।

প্রথম হুকুম : اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি । এ হুকুম বাহ্যত সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়াকালে নবী করীম ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয়; বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবী করীম ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন, নবী করীম ﷺ তাঁদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকি রাখেন নি। নবী করীম ﷺ -এর স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল তা কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

দ্বিতীয় হুকুম : وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ মালিকানাধীন যেসব নারী রয়েছে তাঁর জন্য তা হালাল। এ আয়াতে اَفَاءَ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে فَيْئٌ ধাতু থেকে, পারিভাষিক অর্থে فَيْئٌ সে সব মালকে বুঝায় যা কাফেরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো فَيْئٌ শব্দ সাধারণ গনিমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোনো শর্ত হিসেবে নয় যে আপনার জন্য কেবল যেসব দাসীই হালাল যা 'ফায়' (فَيْئٌ) বা গনিমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত। কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোনো স্বাতন্ত্র বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনিমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রাসলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রূহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া প্রসঙ্গেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহীয়সী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েজ নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে রোম সম্রাট মাকুকাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে নবী করীম ﷺ -এর পরে মহীয়সী স্ত্রীগণের কারো কারো সাথে বিয়ে জায়েজ ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েজ রাখা হয়নি।

হযরত হাকীমুল উম্মত (র.) 'বয়ানুল কুরআনের' মাঝে আরো দুটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট
প্রথমত : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, গনিমতের মাল বন্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোনো জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা নবী করীম ﷺ বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় صَفِيُّ النَّبِيِّ [নবীজীর পছন্দ] বলে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন খায়বর যুদ্ধের গনিমত থেকে হুজুর ﷺ হযরত সাফিয়া (রা.)-কে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাস'আলার ক্ষেত্রে এটা কেবল নবী করীম ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য ছিল।
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 'দারুল হরবের' কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোনো হাদিয়া [উপঢৌকন] মুসলমানদের আমিরুল মু'মিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না; বরং শরিয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবী করীম ﷺ -এর জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন– মারিয়া কিবতিয়ার (রা.) ঘটনা যাকে সম্রাট মাকুকাস হাদিয়া রূপে তাঁর খেদমতে প্রেরণ করার পর তিনি নবী করীম ﷺ -এর মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়েছিলেন।
তৃতীয় হুকুম : (الْاٰيَةَ) بِنْتَ عَمِّكَ وَبَنٰتُ عَمّٰتِكَ এ আয়াতে عَمٌّ ও خَالٌ একবচন এবং عَمّٰتٌ ও عَمَّ خَالٰتٌ বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনী, আবূ হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবি পরিভাষায় এরূপ আরবি কবিতাই এর প্রমাণ যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।
আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃবংশীয় সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষত্ব নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তাঁরা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য।
সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোনো শর্ত ছাড়াই হালাল হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রাসলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কেবল তাঁরাই হালাল যারা তাঁর সাথে হিজরত করে। 'সাথে হিজরত' করার জন্য সফরে সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরি নয়; বরং যে কোনো প্রকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোনো কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল রাখা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচা আবূ তালিবের কন্যা উম্মে হানী (রা.) বলেন, আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে 'তোলাকা' বলা হতো।
–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, জাসসাস]

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরিউক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃবংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারে মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সেই নারীই করবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহর পথে সহ্য করা দুঃখ কষ্ট সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।
মোটকথা এই যে, মাতৃ-পিতৃকুলের বিবাহ করার বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদের মক্কা থেকে হিজরত করতে হবে।
চতুর্থ বিধান : وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ
অর্থাৎ যদি কোনো মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, মানে দেনমোহর ব্যতিরেকেই আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেভাবে আপনার জন্য অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

উপরিউক্ত বিধান যে একান্তভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোনো নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোনো পুরুষ বলে, দেন মোহর দেব না এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরিয়তের আইনে অসার হবে এবং 'মোহরে মিছাল' ওয়াজিব হবে। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়।

জ্ঞাতব্য : উপরিউক্ত বিধান অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ দেনমোহর ব্যতিরেকে কোনো বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এই উক্তির সারকথা এই যে, তিনি কোনো মহিলাকে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করেন নি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরূপ বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً لَّكَ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'যমখশরী' প্রমুখ তাফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হলো। উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্নী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হতো। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান : আয়াতের مُؤْمِنَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় তা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল নয়; বরং এ ক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়ার শর্ত। রাসূলে করীম ﷺ -এর উপরিউক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরজ করেছি, তা আমি জানি উদাহরণত সাধারণত মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদি নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহের জন্য জরুরি সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অবশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে আপনাকে এসব বিশেষ বিধান দেওয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলো আপনার আত্মিক পেরেশানিও মনোকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরও দুটি বিধান বর্ণিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ বিধান : تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ - تُرْجِيْ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ– পেছনে রাখা এবং تُؤْوِيْ শব্দটি اِيْوَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে কম বেশি করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ বাক্যের অর্থ তাই। আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মানার্থে তাঁকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন। ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) বলেন, হাদীস থেকে একথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতঃপর ইমাম জাসসাস স্বীয় সনদ সহকারে মুসনাদে আহমদ, তিরমীযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন :

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ هٰذَا قِسْمِيْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا لَا اَمْلِكُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ يَعْنِيْ الْقَلْبَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল পত্নীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, [অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন] কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না [অর্থাৎ আন্তরিক ভালোবাসা কারও প্রতি বেশি এবং কারও প্রতি কম থাকার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই]।

সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পত্নীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোনো পত্নীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ওজর দেখা দিলে তিনি তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময় تُؤْوِيْ إِلَيْكَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্‌ণাবস্থায় প্রত্যহ পত্নীগণের গৃহে গমন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন।

পয়গম্বরগণ বিশেষত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁরই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দন করা হতো, আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেসব কাজে 'আযীমত' পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যাহতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন।

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ : এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতা দানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর চক্ষু শীতল থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যত পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীদের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হলো? এর জবাব হচ্ছে এই যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার ব্যক্তি দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোনো পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধান করা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য জরুরি নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গদান করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবাহের সাথে কোনো না কোনো দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোনো সম্পর্ক রাখে না। রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য চারের অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানি কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এখানে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অবকাশ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ : ইসলামের শত্রুরা সব সময় বহু বিবাহ বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম [illegible] তার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসালতের বিপক্ষে কথা বলার অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) কে, তিনি ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়স্কা ও সন্তানের জননী। এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীরূপে আগমন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই বয়স্কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপরে নির্যাতনের এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে নি। তাঁকে জাদুকর বলেছে, উন্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শত্রুর মুখ থেকেও কোনো সময় এমন কথা বের হয়নি, যা তাঁর আল্লাহভীতি ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে।

পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত সওদা (রা.) তাঁর স্ত্রীরূপে আসেন তিনিও বিধবা ছিলেন।

মদিনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ন বছর হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নববধূ বেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে আগমন করেন। এর এক বছর পর হযরত হাফসা (রা.)-এর সাথে এবং কিছুদিন পর যয়নব বিনতে খুযায়মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর যয়নবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ হিজরিতে সন্তানের জননী ও বিধবা হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর অন্তঃপুরে আসেন। পঞ্চম হিজরিতে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাঁর বিবাহ হয়। এ সম্পর্কে সূরা আহযাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়ঃক্রম ছিল আটান্ন বছর। অবশিষ্ট পাঁচ বছরে অন্যান্য পত্নী তাঁর হেরেমে প্রবেশ করেন। পয়গম্বরের পারিবারিক জীবন আচার-আচরণের সাথে অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে। এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে হলে এটাই যথেষ্ট যে, একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে তিনশ আটষট্টি টি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম "ই'লামুল মুকেয়ীন" গ্রন্থে লিখেন এগুলো একত্রিত করা হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কেরাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকার শিষ্য ছিলেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন।

অনেক পত্নীকে নবী কারীম ﷺ -এর হেরেমে দাখিল করার পশ্চাতে তাদের পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রাসূলে করীম ﷺ -এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি সামনে রাখা হলে কারও পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকে কি যে, এই বহুবিবাহ কোনো মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল? এরূপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তারপর একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন বেছে নেওয়া হলো? এ বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ এবং শরিয়তগত, বুদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা নিসায় তৃতীয় আয়াতের তাফসীরে করা হয়েছে।

সপ্তম বিধান : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ অর্থাৎ অতঃপর আপনার জন্য অন্য মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্নীদের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর স্থলে অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়।

এ আয়াতে مِنْ بَعْدُ শব্দের দু'রকম তাফসীর হতে পারে– ১. সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। কতক সাহাবী ও তাফসীরবিদ থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী পত্নীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন, সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর স্ত্রী ত্যাগ করা অথবা দুঃখ কষ্ট ও সুখ যা-ই পাওয়া যায়, তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পত্নীগণ সকলেই অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্নীত্বে থাকাকেই বেছে নেন। এরই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্তাকেও এই নয় পত্নীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা (রা.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে।

২. অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ থেকে مِنْ بَعْدُ শব্দের দ্বিতীয় তাফসীর مِنْ بَعْدِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। উদাহরণত আয়াতের শুরুতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, কেবল তাঁদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং যারা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ করা হালাল রাখা হয়নি। অনুরূপভাবে مُؤْمِنَةً তথা ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং مِنْ بَعْدُ শব্দের অর্থ এই যে, যে সব প্রকার নারী তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে। কেবল তাঁদের মধ্যে আপনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোনো নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, বরং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকিদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় নি; বরং মু'মিন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র। অবশিষ্ট নারীগণকে আরও বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইখতিয়ার বহাল রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতও এই দ্বিতীয় তাফসীর সমর্থন করে, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, আরও বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

قَوْلُهُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ : আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েজ, কিন্তু এটা জায়েজ নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোনো বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ম ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তাফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোনো মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবে না অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবে না।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ
النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ فِي الدُّخُوْلِ
بِالدُّعَاءِ اِلٰى طَعَامٍ فَتَدْخُلُوْا غَيْرَ نٰظِرِيْنَ
مُنْتَظِرِيْنَ اِنٰهُ نَضْجَهٗ مَصْدَرُ اَنٰى يَاْنِيْ
وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوْا وَلَا تَمْكُثُوْا مُسْتَاْنِسِيْنَ
لِحَدِيْثٍ ط مِنْ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ
اَلْمَكْثُ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ
مِنْكُمْ ز اَنْ يُّخْرِجَكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ
الْحَقِّ ط اَنْ يُّخْرِجَكُمْ اَيْ لَا يَتْرُكُ بَيَانَهٗ
وَقُرِئَ يَسْتَحْيٖ بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ
اَيْ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ
حِجَابٍ ط سَتْرٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ
وَقُلُوْبِهِنَّ ط مِنَ الْخَوَاطِرِ الْمُرِيْبَةِ وَمَا كَانَ
لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِشَيْءٍ وَلَآ اَنْ
تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ
كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ ذَنْبًا عَظِيْمًا .

৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা দাওয়াতবিহীন নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু যদি তোমাদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে খাওয়ার জন্য প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় তবে তোমরা আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে প্রবেশ কর اِنٰهُ শব্দটি اَنٰى يَاْنِيْ -এর মাসদার তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ কর অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো। একে অপরের সাথে কথা-বার্তায় মশগুল হয়োনা। দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করোনা নিশ্চয় এটা দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে তোমাদেরকে বের করার ব্যাপারে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্যকথা তোমাদের বের করার কথা বলতে সংকোচ করেন না অর্থাৎ এর বর্ণনা তিনি বাদ দেননি يَسْتَحْيٖ শব্দটি অন্য ক্বেরাত মতে يَسْتَحْيِيْ পড়বে তোমরা তাঁদের পত্নীগণের নবী পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে কোনো কু-ধারণা সৃষ্টি হওয়া থেকে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তার ওফাতের পর তার পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদরে জন্য কখনো বৈধ নয়। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।

٥٤. اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ مِنْ نِكَاحِهِنَّ
بَعْدَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا
فَيُجَازِيْكُمْ عَلَيْهِ .

৫৪. তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ নবী করীম ﷺ -এর পরে তার পত্নীদের ব্যাপারে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ অতএব তিনি এর প্রতিদান দেবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٥. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ اَىِ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ مِنَ الْاِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ اَنْ يَّرَوْهُنَّ وَيُكَلِّمُوْهُنَّ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ط فِيْمَا اُمِرْتُنَّ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ .

৫৫. নবী কারীম ﷺ -এর পত্নীগণের জন্যে তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র সহধর্মিণী নারী অর্থাৎ মুমিন নারী এবং অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গুনাহ নেই। তারা তাদেরকে দেখবে ও তাদের সাথে কথা বলবে পর্দাবিহীন তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলিতে আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয় প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর কাছে কোনো জিনিস লুক্কায়িত নয়।

٥٦. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ ﷺ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا اَىْ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ .

৫৬. আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দোয়া কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর অর্থাৎ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ বল

٥٧. اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَهُمُ الْكُفَّارُ يَصِفُوْنَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ مُنَزَّهٌ عَنْهُ مِنَ الْوَلَدِ وَالشَّرِيْكِ وَيُكَذِّبُوْنَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَبْعَدَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ذَا اِهَانَةٍ وَهُوَ النَّارُ .

৫৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় [কাফেরগণ তাঁরা আল্লাহকে বিশেষিত করে এমন গুণাবলির সাথে যা থেকে তিনি পবিত্র যেমন সন্তান হওয়া, অংশীদার হওয়া এবং তারা তাদের নবীকে অস্বীকার করেন আল্লাহ তাঁদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন। রহমত থেকে দূরে রাখেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি জাহান্নাম।

٥٨. وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا يَرْمُوْنَهُمْ بِغَيْرِ مَا عَمِلُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا تَحَمَّلُوْا كَذِبًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا بَيِّنًا .

৫৮. যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের কষ্ট দেয় অর্থাৎ তাদের প্রতি বিনা অপরাধে অপবাদ দেয়। তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ : এটা عُمُوْمِ اَحْوَالْ থেকে اِسْتِثْنَاء হয়েছে, অর্থাৎ لَا تَدْخُلُوْهَا فِىْ حَالٍ مِنَ الْاَحْوَالِ اِلَّا حَالَ كَوْنِكُمْ مَاذُوْنًا لَكُمْ

قَوْلُهُ اِلٰى طَعَامٍ : يُؤْذَنَ টা يَدْعُوْنَ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে اِلٰى طَعَامٍ-এর تَعَلُّقْ হয়েছে يُؤْذَنَ-এর সাথে। ব্যাখ্যাকার بِالدُّعَاءِ-কে এ কারণে বৃদ্ধি করেছেন যে, يُؤْذَنَ টা يَدْعُوْنَ-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যথায় يُؤْذَنَ-এর সেলাহ اِلٰى আসে না। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই আয়াত হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর অলিমার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَاهُ : এটা اَنٰى يَانِىْ-এর মাসদার رَمَى يَرْمِىْ ওযনে অর্থ পেকে যাওয়া, তৈরি হওয়া। اَنِي (بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ) এটা اَنٰى يَانِىْ (ض)-এর মাসদার অর্থ পাকা এবং সময় আসা اَنٰى মাসদার হলো سِمَاعِىْ আর اَنٰى মাসদার হলো قِيَاسِىْ হবে এটা শোনা যায় নি।

قَوْلُهُ فَانْتَشِرُوْا : এটা اِذَا طَعِمْتُمْ-এর جَوَابْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا مُسْتَانِسِيْنَ : এর আতফ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ-এর উপর হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেন। উহ্য حَالْ-এর উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ لَا تَدْخُلُوْهَا هَاجِمِيْنَ وَلَا مُسْتَانِسِيْنَ আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন مُسْتَانِسِيْنَ টা نَاظِرِيْنَ-এ উপর مَعْطُوْفْ হওয়ার কারণে مَجْرُوْرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَسْتَحْيِىْ : এর তাফসীর لَا يَتْرُكُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَسْتَحْيِىْ অর্থ হলো لَا يَتْرُكُ যা لَازِمْ অর্থ। কেননা حَيَا-এর নিসবত আল্লাহর দিকে বৈধ নয়।

قَوْلُهُ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ : ذَالِكُمْ-এর مَرْجِعْ হলো অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করা এবং কথা বার্তায় মন লাগিয়ে জমে বসে না থাকা। এবং পর্দার বাইর থেকে মাল সামানা না চাওয়া। অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয় গুলো তুহমত এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা প্রতিহত করার জন্য খুবই উপকারী।

قَوْلُهُ مَاكَانَ لَكُمْ : অর্থাৎ مَاصَحَّ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا ; اَنْ تُؤْذُوْا হলো كَانَ-এর ইসিম আর لَكُمْ হলো তার খবর وَاَنْ تَنْكِحُوْا-এর আতফ كَانَ-এর ইসিমের উপর হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يَّرَوْهُنَّ وَيُكَلِّمُوْهُنَّ : এর বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে হলো এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যে, فِىْ اٰبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَائِهِنَّ الخ মুযাফ উহ্যের সাথে হয়েছে অর্থাৎ সে সকল লোকদের দেখা ও তাদের সাথে বাক্যালাপের মধ্যে কোনো গুনাহ নেই।

قَوْلُهُ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ : এর আতফ হয়েছে উহ্যের উপর অর্থাৎ امتقلن مَا اُمِرْتُنَّ بِهٖ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ

قَوْلُهُ صَلٰوةٌ : এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে– রহমত, দোয়া, সম্মান, প্রশংসা। এগুলো একই সময় উদ্দেশ্য নেওয়াকে عُمُوْمْ مُشْتَرَكْ বলা হয়। কতিপয়ের নিকট এখানে এটা জায়েজ নেই। এ কারণে এটা বলা হবে যে, শব্দের এই স্থানে একই অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাঁর সম্মান ও প্রশংসা। যখন এই অর্থ আল্লাহর দিকে مَنْسُوْبْ হবে তখন রহমত উদ্দেশ্যে হবে। আর ফেরেশতাদের দিকে নিসব হলে দোয়া ও ইস্তেগফার উদ্দেশ্য হবে। আর সাধারণ মুমিনের দিকে নিসব হলো দোয়া, প্রশংসা ও সম্মান সমষ্টিগতভাবে উদ্দেশ্য হবে। سَلَامٌ শব্দটি মাসদার অর্থ শান্তি, যেমন مَلَامٌ অর্থ তিরস্কার ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা তার সাথেই রয়েছে। আরবি রীতি অনুযায়ী এটা عَلٰى-এর স্থান নয়। কিন্তু যেহেতু سَلَامٌ শব্দটি প্রশংসার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তাই عَلَيْكَ বা عَلَيْكُمْ বলা হয়ে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি সামাজিকতার কতিপয় রীতিনীতি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্কে এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতিনীতিগুলো প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতিনীতি–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ

এ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী কারীম ﷺ -এর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না! বলা হয়েছে।

لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ

দ্বিতীয়রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ - نَاظِرٌ শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং إِنًا শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوا নিষেধাজ্ঞা থেকে দুটি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে– একটি إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ -এর إِلَّا শব্দ দ্বারা এবং অপরটিকে غَيْرِ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ কর। বলা হয়েছে وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পর কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে– فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ

মাসআলা : এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়; যেমন সে একাজ সেরে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে। আয়াতেও পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে–

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ অর্থাৎ আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দর মহলে করা হতো। সেখানে মেহমানদের বেশিক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতেন; কিন্তু নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

মাস'আলা : এই বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব জানা গেল। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

এতে শানে-নুযূলের বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেওয়া জরুরি হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পর্দার বিশেষ গুরুত্ব : এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ আয়াত এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অপরদিকে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও ঊর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে নবী করীম ﷺ -এর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোনো অনিষ্টের কারণ হবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ : এসব আয়াতের শানেনুযূলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলির সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে-নুযূল এই যে, এই আয়াত এমন ভারি ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

ইমাম আবদে ইবনে হোমায়েদ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশগুল থাকত। অতঃপর আহার্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাদ্বিধায় তাতে শরিক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত নির্দেশ তাঁদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানেনুযূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার কাছে সৎ-অসৎ বিভিন্ন ধরনের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাজিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারূকে আজম (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

وَافَقْتُ رَبِّىْ فِىْ ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اتَّخَذْتَ فِىْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاتَّخِذُوْا مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ حَجَبْتَهُنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ وَقُلْتُ لِاَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ لَمَّا تَمَالَانِ عَلَيْهِ فِى الْغَيْرَةِ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ كَذٰلِكَ.

"আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌছেছি ১. আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ নাজিল করলেন, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নাও। ২. আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো। ৩. নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষাই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

জ্ঞাতব্য : হযরত ফারুকের আজম (রা.)-এর কথার শিষ্টাচার লক্ষণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার প্রতিপালককে তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌছেছেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বিবাহের পর বধূবেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অলিমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রা.) ও বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন পূর্ববৎ বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এলো এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। [তিরমিযী]

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কারও সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয় :

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ -এর পূর্বের বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম হয়েছিল। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলি সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা সাধারণ উম্মতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণের জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মু'মিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তাঁরা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এ রূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোনো জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপারাপর বিধবা নারীদের মতো হয়নি।

আরও একটি রহস্য এই যে, শরিয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রা.) তাঁর পত্নীকে অসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে। -[কুরতুবী]

তাই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন। এছাড়া কোনো স্বামী স্বাভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তাঁর স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের আইনে জরুরি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন, উপরিউক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকহবিদ একমত। কিন্তু যাঁদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোনো কারণে যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের সম্পর্কে ফিকহবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

قَوْلُهُ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ তা'আলার কাছে গুরুতর পাপ।

قَوْلُهُ إِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا : আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোনো কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহর সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলির ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া হয় এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

পর্দার বিধানাবলি, অশ্লীলতা দমনে ইসলামি ব্যবস্থা : অশ্লীলতা, অপকর্ম, ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলির ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয়; বরং গোত্র, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুণ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোনো নারী ও যৌন বিকৃতির জাল বিস্তৃত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিষ্ট।

দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাঁদের ধর্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যভিচারকে সত্তাগতভাবে কোনো অপরাধই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্তু এর কুফলেও অশুভ পরিণতিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে বেশ্যাবৃত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ করার জন্য খড়ি স্তূপীকৃত করল, অতঃপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উত্থিত হতে লাগল, তখন এর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করত ও একে নিবৃত্ত করতে তৎপর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যাবলির উপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে দৃষ্টি নত রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়ও বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়ে, তাঁর জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার কোনো পাপিষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়।

ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অশ্লীলতার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অভিহিত করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কূটতর্কের অবতারণা করেছে। তাদের বিস্তারিত জওয়াব আলেমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোনো অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খুবই লাভ জনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে আসে, তখন কোনো ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন এক উপকারী বলা কোনো জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান : তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল পয়গম্বরের শরিয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম, অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলি প্রত্যেক শরিয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকরণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোনো অপরাধ বাস্তবরূপ লাভ না করত, সেই পর্যন্ত এগুলো হারাম ছিল না। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকারী শরিয়ত। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এর হেফাজতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাপকর্ম তো হারাম আছেই, সেসব কারণ ও উপায়-উপকরণাদিকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্বভাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরি করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকহবিদগণ অনুমোদিত কাজ-কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপকৃষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কুরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এর কারণও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সূর্যের উদয় অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব সময়ের নামাজ পড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতঃপর এই সাদৃশ্য কোনো সময় নামাজি ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরিয়ত এসব সময়ের নামাজ ও সিজদা হারাম ও নাজায়েজ করে দিয়েছে। প্রতিমা, মূর্তি ও চিত্র মূর্তিপূজার নিকটবর্তী উপায়। তাই মূর্তি নির্মাণ ও চিত্র তৈরি হারাম এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েজ করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে শরিয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকটবর্তী কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছে। কোনো বেগানা নারী অথবা শ্মশ্রুবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের জেনা, তার কথা শুনাকে কানের জেনা, তাকে সম্পর্শ করাকে হাতের জেনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের জেনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ হাদীসে তদ্রূপই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলি অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দেবে। এটা এই শরিয়তের মেযাজের বিপরীত। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়নি। তাই কারণ উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, শরিয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরি হয় না; কিন্তু পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না কিছু দখলে আছে, শরিয়ত এ ধরনের কারণ ও উপকরণাদিকে মকরূহ ও গর্হিত সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরও দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব বিরল, শরিয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ্য বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবর্তী কারণ। ফলে শরিয়ত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে। কোনো বেগানা নারীকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা সাক্ষাৎ জেনা না হলেও ও জেনার নিকটবর্তী কারণ। তাই শরিয়ত একে জেনার ন্যায় হারাম করেছে।

দ্বিতীয় কারণে উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করা হবে। এটা মদ্য বিক্রয়ের অনুরূপ হারাম না হলে মকরূহ ও গর্হিত কাজ। সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই লেনদেনের সময় যদি জানা যায় যে, গৃহটি নাজায়েজ কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া মকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েজ।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরিয়তের আইনে এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় মোবাহ ও বৈধ। এখানে স্মরণ রাখা জরুরি যে, শরিয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক এখন তা শরিয়তের এমন স্বতন্ত্র বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ পর্দা না করা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। উদাহরণত কোনো যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনাবৃত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্যের মতোই। তাই শরিয়তের আইনে এটাই জেনার অনুরূপ হারাম। কারণ শরিয়ত এ কাজকে অশ্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় হারাম, যদিও তা কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্ম-সংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে অঙ্গ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মূল অবৈধতার উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে।

পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরূপ করা বাস্তব অনর্থের কারণ হলে নাজায়েজ এবং যে ক্ষেত্রে অনর্থের ভয় নেই; সেখানে জায়েজ। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোনো অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আবৃত হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমনে বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে নামাজ পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে নামাজপড়া তাদের জন্য অধিক ছওয়াবের কাজ। অনর্থের ভয় না থাকার কারণে তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামাতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়; বরং তিনি যেসব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে।

কুরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহযাবের চারটি আয়াতের মধ্যে একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম সম্বলিত সত্তরটির অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

পর্দার হুকুম প্রসঙ্গ : নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী ﷺ পর্যন্ত কোনো যুগেই বৈধ মনে করা হয়নি। কেবল শরিয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবার সমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইয়ান সফরের সময় দুজন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তাঁরা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছিল। আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে তাঁরা গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে وَهِيَ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا اِلَى الْحَائِطِ অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যত্রতত্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কুরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ [জাহিলিয়াতে উলা] এবং তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা [তাবাররুজ] বর্ণিত আছে, তাও আরবের অভিজাত পরিবারসমূহেও নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরনের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা একে দূষণীয় মনে করত। আরবের ইতিহাসই এর সাক্ষী। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ

Free @ www.e-ilmweebly.com

মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে ঐ ক্লাবসমূহে দেখাসাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও তাদের অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মন-মনস্তিষ্কে স্বভাবগত লজ্জাও নিহিত রেখেছেন, যা তাকে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আবৃত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লজ্জা-শরম সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রকার পর্দাই প্রচলিত ছিল।

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোনো শরিয়তসম্মত কারণে বাইরে গেলে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে বাইরে যেতে হবে নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরিতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলেমগণের ঐকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত হযরত যয়নব বিনতে জাহশের বিবাহ ও তাঁর পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'ইসাবা' গ্রন্থে এবং ইবনে আব্দুল বার 'ইস্তিয়াব' গ্রন্থে তৃতীয় হিজরি অথবা পঞ্চম হিজরি উভয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরির উক্তি অগ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হযরত আনাস (রা.) থেকেও পঞ্চম হিজরি বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতক রেওয়ায়েত থেকেও তাই জানা যায়।

এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরালে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোনো কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

কুরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হযেছে চারটি সূরা আহযাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ আয়াতটি পর্দা সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সূরা আহযাবে وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াত যদিও কুরআনের ক্রমিকে প্রথমে; কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সূরা আহযাবের প্রথম আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল যখন নবী কারীম ﷺ -এর স্ত্রীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ এ দু'য়ের যে কোনো একটি বেছে নেওয়া ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনায় আরও উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত যয়নব বিনতে জাহশও ছিলেন। এ থেকে বোঝা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াতসমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল, যা বনী মুস্তালিক অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত যয়নব (রা.)-এর বিবাহে আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়।

গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য : পুরুষ ও নারীদের সেই অংশ যাকে আরবিতে 'আওরাত' এবং উর্দুতে 'সতর' বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরিয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরজ। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় ফরজ হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরজ এবং সকল পয়গম্বরের শরিয়তে তা ফরজ ছিল, বরং শরিয়তসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষ ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ.)–এর জান্নাতী পোশাক খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও হযরত আদম (আ.) গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখা বৈধ মনে করেন নি। তাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ আয়াতের অর্থও তাই। দুনিয়াতে আগমনের পর হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী রাসূলে কারীম ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরজ রয়েছে। গুপ্তাঙ্গ নির্দিষ্টকরণের মতভেদ হতে পারে; কিন্তু আসল ফরজ সকল শরিয়তে স্বীকৃত ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরজ, কেউ দেখুক অথবা না দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়ে, তবে এ নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ; অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে না। [বাহরুর রায়েক] অনুরূপভাবে কেউ দেখে না এরূপ নির্জন জায়গায় নামাজ পড়লে যদি গুপ্তাঙ্গ খুলে যায়, তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

নামাজের বাইরে মানুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা যে ফরজ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই; কিন্তু নির্জনতায় শরিয়ত সিদ্ধ অথবা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতিরেকে গুপ্তাঙ্গ খুলে বসা জায়েজ নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি। -[বাহ্‌র]

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে ফরজ এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও সমান ফরজ।

কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের আড়ালে থাকবে। এ ব্যাপারেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গম্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত ছিল যে, বেগানা পুরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কুরআনে উল্লিখিত হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কন্যাদ্বয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুগে এবং তাঁর শরিয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরি হয়, এমন কোনো কাজেই নারীদেরকে সোর্পদ করা হতো না। মোটকথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এরূপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরিতে নারীদের উপর এই পর্দা ফরজ করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা চিরন্তন ফরজ এবং পর্দা পঞ্চম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরজ এবং পর্দা কেবল নারীদের উপর ফরজ গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরজ এবং পর্দা কেবল বেগানা পুরুষদের উপস্থিতিতে ফরজ। এই বিবরণ লি-পিবদ্ধ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কুরআনের বিধানাবলি বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের মতেই গুপ্তাঙ্গ বহির্ভূত। তাই নামাজে এগুলো খোলা থাকলে নামাজ সকলের মতেই জায়েজ। এ দু'টি অঙ্গ কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যতিক্রমভুক্ত। ফিকহবিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রেও মুখমণ্ডল এবং হাতের তালা ব্যতিক্রম ভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সূরা নূরের لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শরিয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাল্লির বিবরণ : পর্দা সম্পর্কে কুরআন পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরিয়তের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সত্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকা। এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় ও পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরিয়তের আসল কাম্য এবং যার অর্থ নারীদের গৃহে অবস্থান করা। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আবৃত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলেম ও ফিকহবিদগণ একমত।

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকহবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে পারবে যদি দেহ আবৃত থাকে। পর্দার এই স্তরত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দা : কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ স্তরই আসল কাম্য। সূরা আহযাবের আলোচ্য وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ আয়াত এর উজ্জ্বল প্রমাণ। আরও উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এ সূরারই শুরুর আয়াত। وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ এসব আয়াতের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপে সামনে এসে যায়।

Free @ www.eilm.weebly.com

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত যয়নব (রা.) -এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক জ্ঞাত আছি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের সামনে একটি চাদর টাঙ্গিয়ে হযরত যয়নব (রা.)-কে তাঁর ভেতরে আবৃত করে দেন, বোরকা অথবা চাদরে আবৃত করেন নি। শানে নুযূলের ঘটনায় হযরত ওমর (রা.)-এর যে উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল নবী কারীম ﷺ -এর পত্নীগণ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দূরে অন্দর মহলে থাকুক। তাঁর يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ বাক্যের মর্ম তাই।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত মূতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে উপস্থিত ছিলেন তাঁর চোখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কষ্টের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.)- এই বিপত্তির সময়ও বোরকা পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি; বরং দরজার ছিদ্র দিয়ে সভাস্থল পরিদর্শন করেন।

'বুখারী কিতাবুল মাগাযী' 'ওমরাতুল কাযা' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা.) ভগ্নীপুত্র ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মসজিদে নববীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। ইবনে ওমর (রা.) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর মেসওয়াক করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম। এ রেওয়ায়েত থেকেও জানা যায় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী কারীম ﷺ -এর পত্নীগণ গৃহে থেকে পর্দা করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানির এক পাত্রে কুলি করে আবূ মূসা আশআরী ও বেলাল (রা.) -কে তা পান করতে ও মুখমণ্ডলে লাগাতে দিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) পর্দার আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বয়কে বললেন, এই তাবাররুকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর [অর্থাৎ আমার] জন্যও রেখে দিও।

এ হাদীসটিও সাক্ষ্য দেয় যে, পর্দা অবতরণের পর নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ গৃহে এবং পর্দার অভ্যন্তরে থাকতেন।

জ্ঞাতব্য : এ হাদীসের আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণও অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাবাররুকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে অবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ স্বাভাবতই অসম্ভব।

বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ও আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়ই মাটিতে পড়ে গেলেন। হযরত আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যেয়ে বললেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কোনো আঘাত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা.)-এর খবর নাও। হযরত আবূ তালহা (রা.) প্রথমে বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করেছেন, অতঃপর হযরত সাফিয়া (রা.)-এর কাছে পৌছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আবূ তালহা (রা.) তাঁকে পর্দাবৃত অবস্থায়ই উটে সওয়ার করে দিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধেও সাহাবায়ে কেরাম এবং নবী করীম ﷺ -এর পত্নীগণের পর্দার সযত্ন প্রয়াস এর গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। তিরমিযী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ নারী যখন গৃহ থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে তাক করে নেয় [অর্থাৎ অনিষ্ট সাধনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান এ হাদীসে আরও বর্ণনা করেন وَاَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই নারীদের আসল কাজ। [প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ فِى الْخُرُوْجِ اِلَّا مُضْطَرَّةً অর্থাৎ নিরুপায় হওয়া ছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, اَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন কোনো জবাব দিলেন না। অতঃপর আমি গৃহে পৌঁছে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, لَا يَرَوْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকেও দেখবে না। আমি তাঁর এই জবাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোচরীভূত করলে তিনি বললেন, صَدَقَتْ اِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّىْ অর্থাৎ সে সত্য বলেছে। সে তো আমরাই অংশ বিশেষ।

নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না; বরং তাঁরা সফরেও উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন। হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া হতো এবং এমনিভাবে নামানো হতো।

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপবাদের ঘটনায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা.) হাওদায় আছেন এই মনে করে খাদেমরা হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না; রবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। এই ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) জঙ্গলে একাকিনী থেকে যান।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পত্নীগণ পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসত্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সফরে অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে কতটুকু গুরুত্ব হবে।

দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দা : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের হলে কোনো বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ সূরা আহযাবের এই আয়াত–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ .

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন 'জিলবাব' ব্যবহার করে। 'জিলবাব' সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, যদ্দারা নারীর আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে 'জিলবাব' ব্যবহারের প্রকৃতি এই বর্ণনা করেছেন যে, নারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্যে তা বর্ণিত হয়ে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকহবিদগণের ঐকমত্যে জায়েজ। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে এই পন্থা অবলম্বন করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে; যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলংকার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

পর্দার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকহবিদগণের মতভেদ রয়েছে : সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে, কিন্তু মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ মণ্ডল ও হাতের তালু দ্বারা اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যের তাফসীর করেন, তাঁদের মতে এগুলো খোলা রাখা জায়েজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যাঁরা বোরকা চাদর ইত্যাদি দ্বারা তাফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েজ মনে করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। যাঁরা জায়েজ বলেছেন, তাঁদের মতেও অনর্থের আশঙ্কা না থাকা শর্ত। নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশঙ্কা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই পরিণামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা জায়েজ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এই তিনজন প্রথম মাযহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোনো অবস্থাতেই অনুমতি দেননি অনর্থের আশঙ্কা হোক বা না হোক। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) অনর্থের আশঙ্কা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মাযহাব অবলম্বন করেছেন। তবে স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকহবিদগণও বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশঙ্কায় নিষেধাজ্ঞার বিধান সম্বলিত হানাফী মাযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

اِعْلَمْ اَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهِ لَيْسَ عَوْرَةً وَجَوَازُ النَّظْرِ اِلَيْهِ فَحَلَّ النَّظْرُ مَنُوْطٌ لِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ اِنْتِفَاءِ الْعَوْرَةِ وَلِذَا حَرُمَ النَّظْرُ اِلٰى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْاَمْرَدِ اِذَا شَكَّ فِى الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ ـ

কোনো অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হয়ে যাবে না। কেননা দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল; যদিও সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমণ্ডল অথবা কোনো শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম যদি কামভাবে হওয়ার আশঙ্কা থাকে; অথচ মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় [ফতহুল কাদীর]

এ উদ্ধৃতি থেকে কামভাবের আশঙ্কার তাফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কামপ্রবৃত্তি থাকা জরুরি নয়; বরং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেষ্ট। এরূপ সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়; বরং শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমুযে' এই করা হয়েছে যে, মনে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য মনে এতটুকু প্রবণতা সৃষ্টি হবে না এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা উপরিউক্ত বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত আছে? শামসুল আয়েম্মা 'সুরখসী' এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর লেখেন, وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظْرُ عَنْ شَهْوَةٍ فَاِنْ كَانَ يَعْلَمُ اَنَّهُ اِنْ نَظَرَ اِشْتَهٰى لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّظْرُ اِلٰى شَيْءٍ مِنْهَا মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, দেখলে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নয়। [মবসূত]

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে লেখেন–

فَاِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ اَوْ شَكَّ اِمْتَنَعَ النَّظْرُ اِلٰى وَجْهِهَا فَحِلُّ النَّظْرِ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَاِلَّا فَحَرَامٌ وَهٰذَا فِى زَمَانِهِمْ وَاَمَّا فِى زَمَانِنَا فَمُنِعَ مِنَ الشَّابَّةِ اِلَّا النَّظْرَ لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ وَيَشْهَدُ وَاَيْضًا قَالَ فِى شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ وَتُمْنَعُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَا لِاَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ـ

যদি কামভাবের আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। এ শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম। এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ; তবে কোনো পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোনো ব্যাপারে নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাজের শর্তাবলি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যুবতী নারীদের বেগনা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; বরং অনর্থের আশঙ্কার কারণে।

এই আলোচনা ও ফিকহবিদগণের মতভেদের সারসংক্ষেপ এই যে, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনর্থের কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। শরিয়তের অনেক বিধানে এ নজির পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর স্বভাবত কষ্ট ও শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোনো ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাজের কসর ও রোজার রুখসত তাকে শামিল করবে। অনুরূপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে। ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার অজু ভেঙ্গে যাবে বাস্তবে বায়ু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেন নি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশঙ্কা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েজ হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল। তাই পরবর্তী হানাফী ফিকহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে পর্দার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমোক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে। **এক.** নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। **দুই.** বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া প্রয়োজনের সময় ও প্রয়োজন পরিমাণে।

মাস'আলা : পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলিতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত মাহরাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণত বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে। এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছুটা সূরা আহযাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে।

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ الخ : সালাত ও সালামের অর্থ : আরবি ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাজিল করেন। 'ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন' কথার অর্থ তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তাফসীরবিদগণ এ অর্থেই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার সালাতের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আজান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তাঁর ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তাঁর শরিয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরিয়তের হেফাজতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোনো পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে 'মাকামে মাহমূদা' বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহর সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরিক করা যায়? এর জওয়াব রূহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসা কীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মু'মিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াব : এক. সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ– রহমত, দোয়া ও প্রশংসা নেওয়াকে পরিভাষায় عُمُوْمُ مُشْتَرَكٌ বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েজ নয়। কাজেই এ স্থলে 'সালাত' শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া ও ইস্তিগফার এবং সাধারণ মু'মিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

'সালাম' শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্যে ক্রটি দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। 'আসসালামু আলাইকা' বাক্যের অর্থ এই যে, দোষক্রটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা عَلٰى অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে عَلٰى অব্যয় যোগে عَلَيْكَ অথবা عَلَيْكُمْ বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে 'সালাম' শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহর সত্তা। কেননা এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব 'আসসালামু আলাইকুম' বাক্যের অর্থ– এই হবে যে, আল্লাহর হেফাজত ও দেখাশোনার জিম্মাদার।

দরূদ ও সালামের পদ্ধতি : হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত কাব ইবনে আজরা (রা.) বলেন, [আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পদ্ধতি আমরা জানি এবং তা হচ্ছে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলা। কিন্তু সালাত তথা দরূদের নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন, দরূদের জন্য তোমরা এ কথাগুলো বলবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সালাম করার পদ্ধতি তাদেরকে নামাজের তাশাহহুদে পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা। তাই সালাতের ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেন নি; বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দরূদের বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরূদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোনো ভাষায় এ আদেশ পালিত হতে পারে সেই ভাষা হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হওয়াও জরুরি নয়। বরং যে কোনো বাক্যে দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতিপালিত ও দরূদের ছওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রাসূলুল্লপহ ﷺ থেকে বর্ণিত বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও ছওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছেই দরূদের ভাষা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মাসআলা : নামাজের বৈঠক উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরূদ ও সালাম পাঠ করা সুন্নত। নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা উচিত; যেমন– তাঁর জীবদ্দশায় তাই বলা হতো। তাঁর ওফাতের পর পবিত্র রওযার সামনে সালাম আরজ করা হলেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা সুন্নত। এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে; যথা– صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হাদীসবিদগণের কিতাবসমূহ এ বাক্যে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

দরূদ ও সালামের এই পদ্ধতির রহস্য : দরূদ ও সালামের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করব। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্যে ছিল আমরা স্বয়ং তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করব; কিন্তু এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য আমাদের নেই। তাই দোয়া করাই আমাদের জন্য জরুরি করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

দরূদ ও সালামের বিধানাবলি : নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সকলের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ওয়াজিব।

মাস'আলা : অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সে দরূদ পাঠ করে না।

একই মজিলিসে বারবার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মোস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে, তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেননি। অধিকাংশ ছোটখাটো হাদীসে দু' এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনে একাধিক বার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম আসে কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেননি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

✪ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'সা' লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মোস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে তাতে কোনো গুনাহ নেই। ইমাম নববী একে মাকরূহ বলেছেন। হযরত ইবনে হাজার হায়সমীর মতে এর অর্থ মাকরূহ তানযীহী। আলেমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোনো একটি পাঠ করেন।

পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারও জন্য সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেমের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন। لَا يُصَلِّىْ عَلىٰ اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لٰكِنْ يَدَّعِىْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْاِسْتِغْفَا. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মাকরূহ। ইমাম আযম (র.) -এর মাযহাবও তাই। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী অথবা মুমিনগণকে শরিক করায় কোনো দোষ নেই।

ইমাম জুওয়াইনী (র.) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা জায়েজ ও সুন্নত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলাহিস সালাম বলা জায়েজ নয়। -[খাসায়েস কুবরা]

কাজী আয়াজ (র.) বলেন, অনুসন্ধানী আলেমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই ঠিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ তাই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে দরূদ ও সালাম পয়গাম্বরগণের বৈশিষ্ট্য, অপরের জন্য জায়েজ নয়; যেমন সুবহানাহু তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দোয়া করা উচিত; যেমন- কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ বলা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٩. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ جَمْعُ جِلْبَابٍ وَهِيَ الْمُلْحَفَةُ الَّتِيْ تَشْتَمِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ اَيْ يُرْخِيْنَ بَعْضَهَا عَلَى الْوُجُوْهِ اِذَا خَرَجْنَ لِحَاجَتِهِنَّ اِلَّا عَيْنًا وَاحِدَةً ذٰلِكَ اَدْنٰى اَقْرَبُ اِلٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ بِاَنَّهُنَّ حَرَائِرُ فَلَا يُؤْذَيْنَ بِالتَّعَرُّضِ لَهُنَّ بِخِلَافِ الْاِمَاءِ فَلَا يُغَطِّيْنَ وُجُوْهَهُنَّ وَكَانَ الْمُنَافِقُوْنَ يَتَعَرَّضُوْنَ لَهُنَّ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا لِمَا سَلَفَ مِنْهُنَّ مِنْ تَرْكِ السَّتْرِ رَّحِيْمًا بِهِنَّ اِذَا سَتَرْهُنَّ .

৫৯. হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন তারা যেন তাদের জিলবাব নিজেদের উপর টেনে নেয়। অর্থাৎ চাদরের কিয়দাংশ মাথার নিচে ঝুলিয়ে দেয়। جَلَابِيْبُ শব্দটি جِلْبَابٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। যা দ্বারা মহিলারা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং কেবল এক চোখ খোলা রাখবে এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। তারা হলো আজাদ রমণীগণ ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করে কষ্ট দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে দাসীগণ মুখমণ্ডল ঢাকবে না এবং মুনাফিকগণ তাদেরকে উত্যক্ত করে আল্লাহ পর্দার বিষয়ে পূর্বের তাদের ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমাশীল, যখন তারা পর্দা করবে তাদের উপর পরম দয়ালু।

٦٠. لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ عَنْ نِفَاقِهِمْ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ بِالزِّنَا وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِقَوْلِهِمْ قَدْ اَتَاكُمُ الْعَدُوُّ وَسَرَايَاكُمْ قُتِلُوْا اَوْ هُزِمُوْا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ يُسَاكِنُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ .

৬০. যদি বিরত না হয় মুনাফিকরা তাদের নিফাক থেকে এবং যাদের অন্তরে ব্যভিচারের রোগ আছে এবং মদিনায় মুমিনদের মাঝে শত্রুবাহিনী আক্রমণ করবে, তোমাদের সৈন্যরা হত্যা হয়েছে বা পরাজয় হয়েছে বলে গুজব রটনাকারীরা, তবে তাদের অপকর্ম থেকে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অবস্থান করবে না কিন্তু অল্প সময়। অতঃপর তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে।

٦١. مَلْعُوْنِيْنَ ج مُبْعَدِيْنَ عَنِ الرَّحْمَةِ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا وجدوا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا اَيِ الْحُكْمُ فِيْهِمْ هٰذَا عَلٰى جِهَةِ الْاَمْرِ بِهِ .

৬১. অভিশপ্ত অবস্থায় রহমত থেকে বিতাড়িত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে এই আদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٢. سُنَّةَ اللّٰهِ اى سَنَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ج مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فِىْ مُنَافِقِيْهِمُ الْمُرْجِفِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا مِنْهُ.

৬২. যারা অতীত হয়ে গেছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে যে সমস্ত মুনাফিকরা মুমিনদের মাঝে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবে না।

٦٣. يَسْئَلُكَ النَّاسُ اى اَهْلُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ ط مَتٰى تَكُوْنُ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ط وَمَا يُدْرِيْكَ يُعْلِمُكَ بِهَا اى اَنْتَ لَا تَعْلَمُهَا لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ تُوْجَدُ قَرِيْبًا.

৬৩. লোকেরা মক্কাবাসী আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছে। আপনি কি জানেন? [অর্থাৎ আপনার জানা নেই।] সম্ভবত কিয়ামত নিকটে।

٦٤. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ اَبْعَدَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا نَارًا شَدِيْدَةً يَدْخُلُوْنَهَا.

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিসম্পাত করেছেন রহমত থেকে দূর করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি। প্রচণ্ড আগুন সেখানে তারা প্রবেশ করবে।

٦٥. خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَآ اَبَدًا ج لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا يَحْفَظُهُمْ عَنْهَا وَّلَا نَصِيْرًا يَدْفَعُهَا عَنْهُمْ.

৬৫. তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কোনো অভিভাবক যিনি তাদেরকে এটা থেকে রক্ষা করবে ও সাহায্যকারী যিনি তাদের থেকে আজাব দূর করবে পাবে না।

٦٦. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا.

৬৬. যেদিন অগ্নিতে তাদের মুখমণ্ডল ওলট পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায় আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রাসূলের আনুগত্য করতাম। يٰلَيْتَنَا-এর মধ্যে يَا অব্যয়টি সজাগ করার অর্থে।

٦٧. وَقَالُوْا اَيِ الْاَتْبَاعُ مِنْهُمْ رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ سَادَاتِنَا جَمْعُ الْجَمْعِ وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا طَرِيْقَ الْهُدٰى.

৬৭. তারা তাদের মধ্যে অনুসারীগণ আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম। ভিন্ন ক্বেরাতে سَادَاتِنَا এবং এটা বহুবচনের বহুবচন অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।

٦٨. رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اى مِثْلَىْ عَذَابِنَا وَالْعَنْهُمْ عَذِّبْهُمْ لَعْنًا كَثِيْرًا عَدَدُهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْمُوَحَّدَةِ اى عَظِيْمًا.

৬৮. হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে আমাদের আজাবের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। এবং তাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন। ভিন্ন ক্বেরাত মতে كَبِيْرًا অর্থাৎ মহান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُدْنِيْنَ : এটা إِدْنَاءٌ মাসদার থেকে مُضَارِعٌ -এর جَمع مُؤَنَّث غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ– সে নিচু করে নেবে মূলবর্ণ হলো دُنُوٌّ. يُدْنِيْنَ -এর মধ্যে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এটা قَوْل -এর مَقُوْلَه হবে এবং, خَبَرْ টা أَمْر অর্থে হবে এবং এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, جَوَاب أَمْر হবে যেমন– قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

قَوْلُهُ لَا يُؤْذَيْنَ : এটা إِيْذَاءٌ মাসদার থেকে نَفِى فِعْل مُضَارِعٌ مَجْهُوْل -এর جَمع مُؤَنَّث غَائِبْ -এর সীগাহ। তাদের সকল নারীকে কষ্ট দেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ الْمُرْجِفُوْنَ : এটা إِرْجَاف মাসদার থেকে إِسْم فَاعِل যা رَجْفَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ– নড়াচড়া দেওয়া। মিথ্যা সংবাদ এবং মুখে মুখে প্রচারিত বিষয় কে ও رَجْفَةٌ বলতে থাকে। কেননা মৌখিক প্রচারিত কথার মাধ্যমেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যে

قَوْلُهُ مَلْعُوْنِيْنَ : উহ্য ফেলের فَاعِلْ থেকে حَالٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ يَخْرُجُوْنَ مَلْعُوْنِيْنَ ব্যাখ্যাকার (র.) يَخْرُجُوْنَ উহ্য মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَا يُدْرِيْكَ : এখানে مَا হলে মুবতাদা আর يُدْرِيْكَ জুমলা হয়ে খবর হয়েছে; اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىٌ ব্যাখ্যাকার اَنْتَ لَا تَعْلَمُهَا দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ : এটা يَقُوْلُوْنَ -এর ظَرْف مُقَدَّمْ হয়েছে। خَالِدِيْنَ এবং نَصِيْرًا -এর ظَرْف ও হতে পারে। (جَمَلْ)

قَوْلُهُ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব রয়েছে যা পূর্বের বাক্যের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে যখন জাহান্নামীদের গোপন অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে তখন প্রশ্নের সৃষ্টি হলো যে, তখন তারা কি করবে? তখন যা ছুটে গেছে তার উপর আফসোসের ভঙ্গিতে বলবে يَا لَيْتَنَا [হায় আফসোস] এবং وُجُوْهُهُمْ -এর যমীর نَفْس وُجُوْه থেকে حَالٌ ও হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদের সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক। কিছু সংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশত অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হতো; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুঁশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হতো। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফেরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নবী কারীম ﷺ -এর স্ত্রীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হতো। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা প্রভাব গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবত পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণত বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু কাফেররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌঁছত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম করা।

অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রাসূলের পক্ষে আল্লাহকে কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কুরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তাফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ পূর্বেও রাসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্টই যে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট, একথা আব্দুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (র.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা আর যে তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমার ভালোবাসার কারণে তাদেরকে ভালোবাসে আর যে, তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন। -[মাযহারী]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্টের কারণে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোনো সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্ট হয়।

এক রেওয়ায়েত বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের দিনগুলোতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকের গৃহে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন, লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়। -[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সাফিয়া (রা.)-এর সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রূপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত সফিয়া (রা.)-এর বিবাহের কারণে বিদ্রূপ ও দোষারোপ সবই দাখিল আছে। এ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে কোনো প্রকারে কষ্ট দেওয়া কুফরি : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলিতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোনো দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও। -[তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোনো একজন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোনো অপকর্মে জড়িত হওয়ারও আশঙ্কা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কষ্ট দেওয়া শরিয়তের আইনে জায়েজ। প্রথম আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরিউক্ত শর্তযুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

কোনো মুসলমানকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম :

اَلَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াত দ্বারা কোনো মুসলমানকে শরিয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ কেবল সেই মুসলমান, যার হাত মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, কেউ কষ্ট পায় না। কেবল সে-ই মু'মিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধনসম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে। -[তাফসীরে মাযহারী]

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا مَعَ
نَبِيِّكُمْ كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى بِقَوْلِهِمْ مَثَلاً
مَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلَّا اَنَّهُ اٰدَرُ
فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ط بِاَنْ وَضَعَ ثَوْبَهُ
عَلٰى حَجَرٍ لِيَغْتَسِلَ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِهِ حَتّٰى
وَقَفَ بَيْنَ مَلَاٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَاَدْرَكَهُ
مُوْسٰى فَاَخَذَ ثَوْبَهُ وَاسْتَتَرَ بِهِ فَرَأَوْهُ لَا
اُدْرَةَ بِهِ وَهِىَ نَفْخَةٌ فِى الْخُصْيَةِ وَكَانَ
عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ذَاجَاهٍ وَمِمَّا اُوْذِىَ بِهِ
نَبِيُّنَا ﷺ اَنَّهُ قَسَمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ
هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَغَضِبَ
النَّبِىُّ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ وَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ
مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ
رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৬৯. হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নবীদের সাথে এমন হয়োনা যেমন যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে। যেমন- তারা হযরত মূসা (আ.) -কে বলেছিল, তাকে আমাদের সাথে উলঙ্গ গোসল করা থেকে বিরত রাখে না কিন্তু তার অণ্ডকোষ স্ফীত রোগে তারা যা বলেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। একদা হযরত মূসা (আ.)- গোসল করার জন্যে কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন অতঃপর পাথরটি তার কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল অবশেষে বনী ঈসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল এবং হযরত মূসা (আ.) তাকে পেলেন ও কাপড় নিয়ে তাঁর সতর ঢাকলেন। এখন তারা হযরত মূসা (আ.)-কে দেখল যে, তার কোনো একশিরা রোগ নেই অর্থাৎ এক অণ্ডকোষ স্ফীত রোগ নেই এবং তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। যে সমস্ত কথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেয়েছেন তাদের মধ্যে একটি হলো যে, একদিন তিনি গনিমতের মাল বণ্টন করতে লাগলেন তখন এক ব্যক্তি বললেন যে, এটা এমন বণ্টন যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য নয়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহ মূসাকে রহম করুন। এর চেয়ে অধিক কষ্ট তাকে দেওয়া হয়েছে তবুও তিনি সহ্য করেছেন। উক্ত ঘটনা বুখারী শরীফে বর্ণিত।

٧٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا
قَوْلًا سَدِيْدًا لا صَوَابًا

৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

٧١. يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ يَتَقَبَّلْهَا وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا نَالَ غَايَةَ مَطْلُوْبِهِ .

৭১. তিনি তোমাদের আমলসমূহ সংশোধন করবেন কবুল করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। শেষ সাফল্যে উপনীত হবে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٧٢. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ الصَّلَوَاتِ وَغَيْرَهَا مِمَّا فِىْ فِعْلِهَا مِنَ الثَّوَابِ وَتَرْكِهَا مِنَ الْعِقَابِ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ بِاَنْ خَلَقَ فِيْهَا فَيْهِمَا وَنُطْقًا فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ خِفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اٰدَمُ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا لِنَفْسِهٖ بِمَا حَمَلَهٗ جَهُوْلًا بِهٖ .

৭২. আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত নামাজ ও নামাজের পুণ্য ও নামাজ না পড়ার শাস্তি ইত্যাদি পেশ করেছিলাম। অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল আল্লাহ তাদের নিকট বুঝা ও বলার শক্তি সৃষ্টি করেন এবং এতে ভীত হলো কিন্তু মানুষ আদম তাঁর নিকট পেশ করার সাথে সাথে তা বহন করল। নিশ্চয় সে তাঁর নিজের উপর তা বহন করার কারণে জালেম, অজ্ঞ। আমানত বহনের পরিণাম সম্পর্কে।

٧٣. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ اللَّامُ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَرَضْنَا الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ حَمْلُ اٰدَمَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الْمُضَيِّعِيْنَ الْاَمَانَةَ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ الْمُؤَدِّيْنَ الْاَمَانَةَ وَكَانَ غَفُوْرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا بِهِمْ .

৭৩. যাতে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ যারা আমানত নষ্ট করে মুশরিক নারীদের শাস্তি দেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করেন। لِيُعَذِّبَ এর লামের সম্পর্কে عَرَضْنَا ফেলের সাথে। যার সাথে আদমের আমানত বহনের মর্মার্থ সম্পৃক্ত আল্লাহ মুমিনদের জন্যে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لَا اُدْرَةَ بِهٖ : اُدْرَةٌ এক ধরনের রোগ যাতে مَادَّةٌ غَلِيْظٌ অথবা رِيْحٌ غَلِيْظٌ অণ্ডকোষে নেমে আসে। যার কারণে অণ্ডকোষ অনেক ফুলে যায়। এরূপ ব্যক্তিকে اٰدَرُ বলে যা اٰدَمُ -এর ওযনে আসে।

قَوْلُهٗ مِمَّا قَالُوْا : এখানে مَا টা হয়তো মাসদারিয়া হবে। তখন উহ্য ইবারত হবে فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِنْ قَوْلِهِمْ অথবা مَا مَوْصُوْلَه টি হবে তখন উহ্য ইবারত হবে فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ اَىْ مِنَ الَّذِىْ قَالُوْا

قَوْلُهٗ بِهٖ : অর্থাৎ بِالثَّوَابِ

قَوْلُهٗ مِمَّا : এখানে مِنْ টা مَعَ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ مَعَ مَافِىْ فِعْلِهَا

قَوْلُهٗ مِنَ الثَّيَابِ : এটা مَا-এর বয়ান হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَبَيْنَ : এটা اِبَاءٌ মাসদার হতে فِعْل مَاضِىْ -এর جَمْع مُؤَنَّث غَائِب-এর সীগাহ।

প্রশ্ন. اَبَيْنَ , يَحْمِلْنَ এবং اَشْفَقْنَ এই তিনটিই جَمْع مُؤَنَّث -এর সীগাহ। আর এগুলোর مَرْجِع হলো سَمٰوٰت, اَرْض এবং اَرْض হলো مُؤَنَّث আর جِبَال হলো مُذَكَّر এতে বুঝা যায় যে, مُؤَنَّث -এর প্রাধান্য দিয়ে -এর যমীর নেওয়া হয়েছে। অথচ مُذَكَّر দেওয়া উচিত ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উত্তর. যেহেতু سَمٰوٰتٌ এবং جِبَالٌ হলো جَمْعِ تَكْسِيْرِ غَيْرِ عَاقِلٍ কাজেই তাদের জন্য مُؤَنَّثْ-এর যমীর নেওয়া জায়েজ হয়েছে فَعَرَضْنَاهَا فَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো مَعْطُوْف عَلَيْهِ এর : حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ব্যাখ্যাকার (র.) স্বীয় উক্তি بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ ظَلُوْمًا لِنَفْسِهٖ : অর্থাৎ اَتْعَبَهُ اِيَّاهَا অর্থাৎ নিজেই নিজেকে কষ্টে ফেলে দেওয়া। ব্যাখ্যাকার (র.) স্বীয় উক্তি حُمْلَه দ্বারা এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, আর এই জুলুম প্রশংসনীয়। আর যারা এর বর্ণনা করা থেকে تَوَقُّفْ করেছেন তারা ظُلْمٌ দ্বারা হাকীকী জুলুম বুঝেছেন। আর এটা শরিয়তের সীমালঙ্ঘন।

قَوْلُهُ بِهٖ : অর্থাৎ بِعَاقِبَتِهٖ [শেষ পরিণাম]

قَوْلُهُ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ : এখানে لَامٌ টা عَاقِبَتْ-এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ بَعْضَ اَفْرَادِ الَّذِيْنَ لَمْ يُرَاعُوْهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا الخ : পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এই বিরোধিতা তাঁদের কষ্টের কারণ।

হযরত মূসা (আ.) -এর সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এর জন্য জরুরি নয় যে, মুসলমানরা এরূপ কোনো কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কতক সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তার অর্থ এই যে, তারা কখনও এদিকে লক্ষ্য করেননি যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোনো সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এরূপ আশঙ্কা ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর কর্তা মুনাফিক সম্প্রদায়। হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত মূসা (আ.) কারও সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোনো খুঁত আছে হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। [অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত।] নতুবা তিনি অন্য কোনো ব্যধিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন হযরত মূসা (আ.) নির্জনে গোসল করার জন্য কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি [আল্লাহর আদেশে] নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পেছনে পেছনে 'আমার কাপড়, আমার কাপড়" বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না, যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌছে থেমে গেল। তখন সে সব লোক হযরত মূসা (আ.)-কে আপাদমস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল। এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। [এতে তাদের বর্ণিত কোনো খুঁত বিদ্যমান ছিল না।] এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরিধান করে নিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম, হযরত মূসা (আ.)-এর আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুরআনের এই আয়াতের এটাই অর্থ। কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত আরও একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা এ আয়াতের তাফসীরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে যে তাফসীর হয়, তাই অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا : অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান ছিলেন। আল্লাহর কাছে কারও মর্যাদাবান হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। হযরত মূসা (আ.) যে এরূপ ছিলেন, তাঁর প্রমাণ কুরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে পয়গাম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রিসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রিসালতের পদ কাউকে কারও সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না। -[ইবনে কাসীর]

পয়গম্বরগণকে সব প্রকার দৈহিক দোষ থেকে মুক্ত রাখা আল্লাহর রীতি : এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং হযরত মূসা (আ.) নিরুপায় অবস্থায় মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে হাজির হয়েছেন। এ গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গাম্বরগণের দেহকে ঘৃণাত্মক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গাম্বরকেই উচ্চবংশে জন্ম দান করা হয়েছে। কেননা সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গাম্বরগণের ইতিহাসে কোনো পয়গাম্বরের অন্ধ, কানা, মূক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা আল্লাহর রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ .... ذُنُوْبَكُمْ : قَوْل سَدِيْدًا -এর তাফসীর কেউ কেউ সত্য কথা, কেউ সরল কথা, কেউ সঠিক কথা করেছেন। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। কুরআন পাক এস্থলে صَادِقٌ - مُسْتَقِيْم ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে سَدِيْد শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সব গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই কাশেমী রূহুল-বয়ানে বলেন, قَوْل سَدِيْد এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে ঠাট্টা ও রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কর্ম সংশোধনের কার্যকর উপায় : এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহ ভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আল্লাহভীতির এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে আল্লাহভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে; যেমন এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ -এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কুরআনি বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব : কুরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোনো কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নজির। এর পূর্বের আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহভীতি সহজ হয়ে যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اِتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ এতে আল্লাহভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহর ওলী। আরও এক আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের সাথে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত, সে আগামীকল্য অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা আল্লাহভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাজ ঠিক করে দেয় : হযরত শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী (র.)-এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়, কখনও মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষত্রুটি মুক্ত কথা বলে, প্রতারণা করে না এবং অন্যের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে। হযরত শাহ সাহেবের অনুবাদ এই: সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমার জন্যে তোমার কর্ম।

قَوْلُهٗ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ : সমগ্র সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এ আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলি পালনকে 'আমানত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে বর্ণিত হবে।

আমানতের উদ্দেশ্য কি : এস্থলে আমানত শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী তাবেয়ী প্রমুখ তাফসীরবিদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরিয়তের ফরজ কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাজত, ধনসম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এ আমানতের মধ্যে দাখিল আছে। -[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরিয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আবূ হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন, اَلظَّاهِرُ اَنَّهَا كُلُّ مَا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ مِنْ اَمْرٍ وَنَهْيٍ وَشَأْنٍ وَدِيْنٍ وَدُنْيَا وَالشَّرْعُ كُلُّهٗ اَمَانَةٌ وَهٰذَا قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরিয়ত আমানত। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরিয়তের বিধানাবলি দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আজাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধানাবলির ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এ বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এ যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই مَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَعْلُوْمٌ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতেও হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দুটি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আমরা চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাজিল করা হয়েছে, অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, ফলে মুমিনগণ কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় হাদীস এই যে, [এক সময় আসবে যখন] মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহ্নমাত্র থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল। [অঙ্গার তো দূরে সরে গেল কিন্তু] তার চিহ্ন ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অগ্নির কোনো অংশ নেই........... মানুষ পরস্পরে লেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আমানতের হক কেউ আদায় করবে না। [আমানতদার লোকের এমন অভাব দেখা দেবে যে,] মানুষ বলবে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার আছে। এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরিয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি বস্তু এমন যে, এগুলো অর্জিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তু অর্জিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুলো এই– আমানতের হেফাজত, সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, হালাল খাদ্য। –[ইবনে কাসীর]

আমানত কিরূপে পেশ করা হবে : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তাঁরা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যত অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হলো?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কুরআন পাক এক জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে– لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি এ কুরআন পর্বতের উপর নাজিল করলে আপনি দেখতেন যে, পবর্তও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহর ভয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এ উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। اِنَّا عَرَضْنَا আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কুরআন পাক لَوْ শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না। তবে তা কুরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ কুরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই– وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, আল্লাহকে চেনা এবং তাকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতনা ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এ উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোনো অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পবর্তমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোনো উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলক নয় : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হলো? আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কুরআনের আয়াত اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সাননন্দে উপস্থিত আছি।

Free @ www.eilm.weebly.com

এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাজি হও অথবা না হও, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে কাসীর ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে অতঃপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষ পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হলো, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলি পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, ছওয়াব এবং আল্লাহর কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলি পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আজাব ও শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা ছওয়াবও চাই না এবং আজাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনময়ে এ আমানত বহন করতে সম্মত আছ? হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হলো, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে [যা আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে]। পক্ষান্তরে যদি এ আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পবর্তমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এ আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

বাহ্যত বোঝা যায় যে, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এ আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এ অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরি ছিল : আল্লাহ তা'আলা আদি তাকদিরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে আল্লাহর বিধানাবলি মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা এ প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর বিধানাবলির আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আ.) এই আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا : ظَلُوْم অর্থ নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং جَهُوْل-এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এ অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কুরআনি বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আ.) বুঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গাম্বর। তিনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে

আল্লাহর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বুঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গাম্বর রয়েছেন এবং কোটি কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই আল্লাহর আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কুরআন পাক মানব জাতিকে 'আশরাফুল মখলুকাত' আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত আদম (আ.) ও সমগ্র মানব জাতি কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তাফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরিউক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ জালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে জালিম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরিয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের বসরী (র.) প্রমুখ থেকে একই তাফসীর বর্ণিত আছে। -[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন ظَلُوْم ও جَهُوْل শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যও হতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) ও অন্যান্য সুফী বুযুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ : এখানে لَامْ অব্যয়টি কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে لَام عَاقِبَتْ বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবি কবিতায় এই لَامْ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্যে এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

قَوْلُهُ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ : এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষ যে আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দুদলে বিভক্ত হয়ে যাবে- **এক.** কাফের, মুনাফিক ইত্যাদি, যাঁরা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। **দুই.** মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যাঁরা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظَلُوْم ও جَهُوْل শব্দদ্বয়ের এক তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরিউক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তাফসীরের সমর্থন রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ : সূরা সাবা মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الْآيَةَ وَهِيَ أَرْبَعٌ أَوْ خَمْسٌ وَّخَمْسُوْنَ آيَةً

তবে وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ আয়াত ব্যতীত এবং এতে ৫৪ বা ৫৫টি আয়াতবিশিষ্ট।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. اَلْحَمْدُ حَمِدَا لِلّٰهِ تَعَالٰى نَفْسَهُ بِذٰلِكَ وَالْمُرَادُ بِهِ الثَّنَاءُ بِمَضْمُوْنِهِ مِنْ ثُبُوْتِ الْحَمْدِ وَهُوَ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَمَافِي الْاَرْضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ كَالدُّنْيَا يَحْمَدُهُ اَوْلِيَاؤُهُ اِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ وَهُوَ الْحَكِيْمُ فِيْ فِعْلِهِ الْخَبِيْرُ بِخَلْقِهِ

২. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ يَدْخُلُ فِي الْاَرْضِ كَمَاءٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَنَبَاتٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ وَغَيْرِهِ وَمَا يَعْرُجُ يَصْعَدُ فِيْهَا ط مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الرَّحِيْمُ بِاَوْلِيَائِهِ الْغَفُوْرُ لَهُمْ.

৩. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ط الْقِيَامَةُ قُلْ لَهُمْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ج بِالْجَرِّ صِفَةٌ وَالرَّفْعِ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ عَلَّامُ بِالْجَرِّ.

অনুবাদ :

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আল্লাহ তা'আলা এ বাক্য দ্বারা তার প্রশংসা করেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁর ভাবার্থ দ্বারা প্রশংসা প্রমাণের মাধ্যমে তারীফ করা এবং এটা আল্লাহর গুণাবলির দ্বারা গুণান্বিত করা যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক অধিকার সৃষ্টি ও দাস হিসেবে এবং তারই প্রশংসা পরকালে যেমন দুনিয়াতে, আল্লাহর বন্ধুগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তার প্রশংসা করবে। তিনি তার তার কর্মে প্রজ্ঞাময় তার সৃষ্টিজীবের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।

২. তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যেমন পানি ও অন্যান্য যা সেখান থেকে নির্গত হয় যেমন, শস্য ও অন্যান্য এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় রিজিক ও অন্যান্য এবং যা আকাশে উত্থিত হয় মানুষের আমল ইত্যাদি তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তার বন্ধুদের প্রতি।

৩. কাফেররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ অবশ্যই তোমাদের উপর কিয়ামত আসবে। তিনি গায়েব সম্পর্ক জ্ঞাত। عَالِمُ الْغَيْبِ শব্দের মীমের মধ্যে যের পড়লে رَبِّيْ-এর সিফত হবে আর পেশ পড়লে উহ্য মুবতাদার খবর হবে। অন্য কেরাত মতে عَلَّامُ الْغَيْبِ মীমের মধ্যে যেরের সাথে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَا يَعْزُبُ يَغِيْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ وَزْنُ ذَرَّةٍ اَصْغَرُ نَمْلَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ لا بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ ـ

নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তার অগোচরে নেই অণু পরিমাণ কিছু ذرة অর্থ পিপড়ার চেয়ে ছোট বস্তু না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ সমস্তই কিছু আছে সুস্পষ্ট কিতাবে লাওহে মাহফূযে।

٤. لِّيَجْزِىَ فِيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط اُولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ حَسَنٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

৪. তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।

٥. وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْٓ اِبْطَالِ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ مُعٰجِزِيْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ هُنَا وَفِيْمَا يَاْتِىْ مُعَاجِزِيْنَ اَىْ مُقَدِّرِيْنَ عِجْزَنَا اَوْ مُسَابِقِيْنَ لَنَا فَيَفُوْتُوْنَنَا لِظَنِّهِمْ اَنْ لَا بَعْثَ وَلَا عِقَابَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ سَيِّئِ الْعَذَابِ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ صِفَةٌ لِرِجْزٍ اَوْ عَذَابٍ ـ

৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে কুরআন বাতিল করে রাসূলকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায় অন্য কেরাত মতে এখানে ও পরবর্তীতে مُعَاجِزِيْنَ পড়বে। مُعَاجِزِيْنَ অর্থ আমাকে অপারগ গণ্য করে, আমাকে পরাজিত মনে করে আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে অথবা তাদের ধারণা কোনো আজাব বা শাস্তি হবে না তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। اَلِيْمٌ অর্থ مُؤْلِمٌ এর মীমের মধ্যে যের না পেশ পড়বে এবং এটা তারকীবে رِجْزٍ বা عَذَابٌ -এর সিফত হবে।

٦. وَيَرَى يَعْلَمُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مُؤْمِنُوْ اَهْلِ الْكِتَابِ كَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اَىِ الْقُرْاٰنِ هُوَ فَصْلُ الْحَقَّ لا وَيَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطِ طَرِيْقِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ اَىِ اللّٰهِ ذِى الْعِزَّةِ الْمَحْمُوْدَةِ ـ

৬. যারদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে কিতাব প্রাপ্তদের মধ্যে ঈমানদারগণ যেমন– আব্দুল্লাহ বিন সালাম ও তার সাথীগণ তারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কুরআনকে সত্য মনে করে এবং তারা জানে এটা মানুষকে পরাক্রমশালী , প্রশংসিত আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে। هُوَ সর্বনামটি يَرٰى -এর দুই মাফঊলের মধ্যে পৃথককারী ضَمِيْر فَصْل

٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَىْ قَالَ بَعْضُهُمْ عَلٰى جِهَةِ التَّعَجُّبِ لِبَعْضٍ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ هُوَ مُحَمَّدٌ يُّنَبِّئُكُمْ يُخْبِرُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ قُطِّعْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ لا بِمَعْنٰى تَمْزِيْقٍ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ

৭. আর কাফেরগণ অর্থাৎ আশ্চর্য করে একে অপরকে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির মুহাম্মদের সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে, তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। مُمَزَّقٍ অর্থ تَمْزِيْقٌ

Free @ www.e-ilmweebly.com

৮. أَفْتَرٰى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَاسْتَغْنٰى بِهَا عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فِىْ ذٰلِكَ أَمْ بِهٖ جِنَّةٌ جُنُوْنٌ تَخَيَّلَ بِهٖ ذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ فِى الْعَذَابِ فِيْهَا وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ مِنَ الْحَقِّ فِى الدُّنْيَا .

৮. সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, أَفْتَرٰى এর হামযা যবর বিশিষ্ট প্রশ্নবোধক তথা اِسْتِفْهَامْ এর هَمْزَه অর প্রশ্নবোধক হামযার কারণে হামযায়ে ওছলকে বিলুপ্ত করা হয়েছে না হয় সে উন্মাদ যার কারণে সে মনগড়া কথা-বার্তা বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বরং বাস্তবে যারা পরকালের ও তার সংশ্লিষ্ট হাশর ও হিসাবের প্রতি অবিশ্বাসী তারা আজাবে ও দুনিয়াতে ঘোর পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে।

৯. أَفَلَمْ يَرَوْا يَنْظُرُوْا إِلٰى مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مَا فَوْقَهُمْ وَمَا تَحْتَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط إِنْ نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا بِسُكُوْنِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا قِطْعَةً مِّنَ السَّمَاءِ ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ فِى الْأَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ بِالْيَاءِ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَرْئِىْ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ رَاجِعٍ إِلٰى رَبِّهٖ تَدُلُّ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَى الْبَعْثِ وَمَا يَشَاءُ .

৯. তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? ভূমি ধ্বসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোনো খণ্ড তাদের উপর পতিত করব كِسَفًا -এর সীনের মধ্যে সাকিন ও যবর উভয়ভাবে পড়া যাবে। অন্য কেরাত মতে পূর্বের তিন ফে'লে يَاء -এর সাথে পড়বে নিশ্চয় আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দাদের জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে। যা আল্লাহ পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়ের উপর সক্ষম হওয়ার প্রমাণ করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا : يَعْرُجُ -এর সেলাহ إِلٰى আসে فِىْ নয়। যেহেতু يَعْرُجُ টা اِسْتِقْرَاء-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে এজন্য فِىْ দ্বারা এটাকে مُتَعَدِّىْ করা বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهٗ قُلْ لَهُمْ بَلٰى : بَلٰى টা نَفِىْ কে রদ করার জন্য এবং مَنْفِىْ কে اِثْبَاتْ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মুশরিকরা বলেছিল لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ তাদের উক্তিকে প্রতিহত করে বলেছেন بَلٰى কেন নয়? নিশ্চিত রূপে কিয়ামত আসবেই। অর্থাৎ لَيْسَ الْأَمْرُ اِلَّا اِتْيَانُهَا

قَوْلُهٗ وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ : এতে وَاوْ টি হলো قَسَمِيَّة جَارَّة এটা اِثْبَات نَفِىْ -এর تَاكِيْد-এর জন্য হয়েছে لَا তাকিদ। تَأْتِيَنَّكُمْ হলো فِعْل مُضَارِعْ مَبْنِى بِفَتْحَةٍ بِنُوْنِ تَاكِيْد ثَقِيْلَة এটা তৃতীয় তাকিদ। হলো جَوَاب قَسَمْ -এর জন্য। এবং كُمْ হলো مَفْعُول بِهٖ

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ : جَرّ সুরতে رَبّ-এর صِفَت বা بَدَل হবে عَالِمُ উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হতে পারে। অর্থাৎ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ : عَالِمُ الْغَيْبِ হলো মুবাতাদা لَا يَعْزُبُ হলো তার খবর। يَعْزُبُ শব্দটি জমহুরের কেরাত অনুপাতে زَا، তে ضَمَّه সহ পঠিত রয়েছে। আর কেসায়ীর নিকট زَا، বর্ণে যের হবে। বাবে ضَرَبَ ও نَصَرَ হতে মাসদার عُزُوْبًا অর্থ- গুপ্ত হওয়া, দূর হওয়া।

قَوْلُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এটা لَتَاْتِيَنَّكُمْ-এর ইল্লত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আসবে যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিদান দান করেন।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ : এটা মুবতাদা لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّم আর مَغْفِرَةٌ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّر এ উভয়টি মিলে جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে اُولٰئِكَ মুবতাদার খবর হয়েছে। رِزْقٌ كَرِيْمٌ এটা মওসূফ সিফত মিলে مَغْفِرَةٌ-এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا : মওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা। আর اُولٰئِكَ এবং তার পরবর্তী অংশ হলো খবর। অন্য তারকীব এভাবেও হতে পারে যে, وَالَّذِيْنَ سَعَوْا-এর আতফ হলো পূর্বের وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর উপর। অর্থাৎ وَيَجْزِي الَّذِيْنَ سَعَوْا এই সুরতে পরবর্তী اُولٰئِكَ টা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হবে। এবং পূর্বের اُولٰئِكَ দুই مَعْطُوْف এবং মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَة হবে।

قَوْلُهُ فِيْمَا يَاْتِيْ : অর্থাৎ فِيْ اٰخِرِ السُّوْرَةِ

قَوْلُهُ مُقَدِّرِيْنَ عَجْزَنَا اَوْ مُسَابِقِيْنَ لَنَا : এতে لَفّ وَنَشْر مُرَتَّب হয়েছে مُقَدِّرِيْنَ হলো প্রথম কেরাতে ব্যাখ্যা। আর مُسَابِقِيْنَ لَنَا হলো দ্বিতীয় কেরাতের ব্যাখ্যা। مُقَدِّرِيْنَ-এর উদ্দেশ্যে হলো مُعْتَقِدِيْنَ

قَوْلُهُ مُعَاجِزِيْنَ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُسَابِقِيْنَ ; مُسَابَقَه-এর উপর مُعَاجَزَه-এর اِطْلَاقْ এ জন্য করে দিয়েছেন যে, মুসাবাকাত কারী- পরস্পর একে অপরকে অক্ষম করতে চেষ্টা করে থাকে। তবে এখানে বাবে مُفَاعَلَة স্বীয় অর্থে হয়নি। কেননা আল্লাহকে অক্ষম করা সম্ভব নয়। কাজেই এই অক্ষম করা স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত; বাস্তবে নয়।

قَوْلُهُ وَيَرَى الَّذِيْنَ : এটা হয়তো يَجْزِيْ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হবে। يَرٰى টা يَعْلَمُ-এর অর্থে হয়েছে। আর اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ হলো يَرٰى-এর ফায়েল। আর اَلَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ হলো প্রথম মাফউল আর اَلْحَقَّ হলো দ্বিতীয় মাফউল এবং هُوَ টা মাফউলদ্বয়ের মাঝে فَصْل হয়েছে। আর يَهْدِيْ -এর আতফ হয়েছে। اَلْحَقَّ-এর উপর অর্থাৎ يَرَوْنَهُ حَقًّا وَهَادِيًا

প্রশ্ন. এই সুরতে فِعْل-এর আতফ ১. اِسْم-এর উপর হওয়া আবশ্যক হচ্ছে, যা বৈধ নয়।

উত্তর. فِعْل টা যখন اِسْم-এর تَاوِيْل এ হবে তখন عَطْف বৈধ হয়। এখানে يَهْدِيْ টা هَادِيًا অর্থে হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقَّ وَهَادِيًا

يَرٰى টা يَجْزِيْ-এর উপর আতফ হওয়ার সুরতে এই প্রশ্ন হয় যে, يَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের জন্য পৃথিবীতে عِلْم প্রমাণিত করা। আর يَجْزِيْ-এর উপর عَطْف-এর চাহিদা হলো এই যে, عِلْم পরকালে সাব্যস্ত হওয়া যা উদ্দেশ্য বহির্ভূত। এর দ্বারা জানা যায় যে, اِسْتِيْنَافْ ওয়ালা তারকীব সহীহ।

قَوْلُهُ بِمَعْنٰى تَمْزِيْق : এর দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اِسْم فَاعِل টা মাসদারের অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلٰثِ بِالْيَاءِ : অর্থাৎ نَشَأْ ، نَخْسِفْ ، نُسْقِطْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সাবা প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু একটি আয়াত সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একদল বলেছেন যে, এটি মদিনায়ে মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি হলো وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ .... وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ; আর এ আয়াতের اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের আরেক দল উপরিউক্ত আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। আর اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ বাক্য দ্বারা 'আহলে কেতাবের আলেমদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মোকাতেল (র.) এ মত পোষণ করতেন। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এর দ্বারা সকল মোমেন বিশেষত তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

-[তাফসীরে কুরতুবী, খ.- ৪, পৃ-২৫৮, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ-৫৫৫]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নামকরণ : এ সূরার নাম সাবা। এটি একটি স্থানের নাম। সাবা এলাকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তারা ছিল অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক সমৃদ্ধি দান করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল। ইতিপূর্বে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনায় রাণী বিলকিসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিলকিস এ সাবারই রাণী ছিলেন। সাবা এলাকাবাসীর সমৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ পাকের প্রতি শোকর গুজার হওয়া ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু এ কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। পরিণামে তারা হয়েছিল অভিশপ্ত, ভাগ্য বিড়ম্বিত। এ সূরায় তাদের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেন অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ তাদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে 'আমানতের' উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আমানতের খেয়ানতকারীদের শোচনীয় পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন সাবা জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছিল, কিন্তু নাফরমানি, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা এবং অহংকার তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছিল, যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণে অবহেলা করবে, সেই মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে আজাব দেওয়া হবে। এ পর্যায়ে 'সাবা' জাতির মুশরিক ও মুনাফিকদের শাস্তির ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

সাবা জাতির ঘটনার পূর্বে এ সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাকের এ দুজন মনোনীত বান্দা কিভাবে তাঁদের প্রতি অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণ করেছেন, তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে এ সূরায়। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.) শুধু নবীই ছিলেন না; বরং সে যুগের বাদশাহও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। আর সে ক্ষমতা সাধারণ রাজা বাদশাহ ক্ষমতার আনুরূপ নয়; বরং অসাধারণ ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। জিন জাতি হযরত সোলায়মান (আ.)–এর অনুগত ছিল, পশু-পক্ষী তাঁর তাবেদার ছিল, আল্লাহ পাক বাতাসকেও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত থাকতেন, আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা মশগুল থাকতেন, তাঁর শোকরগুজারীতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন।

আলোচ্য সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনার পরই 'সাবা' জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ–৫, পৃ. -৫৫৫-৫৭]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী 'দালায়েলে' এর উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ.-৫, পৃ–২৪৫]

আল্লামা আলুসী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একবার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে কাতাদা (র.) এ মতই পোষণ করতেন।

আল্লামা আলুসী (র.) আরো লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে ইরশাদ হয়েছে। يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ 'কাফেররা বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেয়ামত হবে'? আর এ সূরায় ইরশাদ হয়েছে وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ। অর্থাৎ কাফেররা কিয়ামতকে সরাসরি অস্বীকার করে বলতো যে, 'কিয়ামত আমাদের নিকট আসবেনা' তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে এ সূরায়।

শানে নুযূল : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াত لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ যখন নাজিল হলো [আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিক নারী পুরুষকে শাস্তি দেবেন] একথা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ানসহ মক্কার অন্যান্য কাফেররা বলল, হযরত মোহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে যে, 'আমাদের মৃত্যু হবে এবং এরপর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হাজির করা হবে এবং আমাদের শাস্তি হবে, অথচ কিয়ামত কখনও আমাদের নিকট আসবেনা', তারই জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন। قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ [হে রাসূল!] আপনি বলুন, 'কেন নয়' অবশ্যই আসবে' শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তা তোমাদের নিকট আসবে' এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর দ্বারাও উভয় সূরার মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবন করা যায় –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খ ২২, পৃ. –১০২-০৩]

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ : 'যিনি আসমান জমীনের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি যাঁর কৃত্বাধীন, তাঁরই জন্যে সমস্ত প্রশংসা'।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, সূরা সাবা আরম্ভ করা হয়েছে اَلْحَمْدُ দ্বারা তথা 'প্রশংসা মাত্রইও এক আল্লাহ পাকের জন্যে ' একথা দ্বারা। পবিত্র কুরআনের ১১৪টি সূরা মধ্যে পাঁচটি সূরা 'আলহামদু' বাক্য দ্বারা শুরু করা হয়েছে ১. সূরা ফাতেহা, ২. সূরা আনআম, ৩. সূরা কাহাফ, ৪. সূরা সাবা। ৫. সূরা ফাতের।

মূলত : মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নিয়ামত অনন্ত অসীম। এ নিয়ামতের উল্লেখ যেখানে করা হয়েছে সেখানে আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে হয়েছে এবং ২. যে নিয়ামত অব্যাহত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত নিয়ামত ইতিপূর্বে ছিলনা, তা সৃষ্টি করা হয়েছে, আর শেষোক্ত নিয়ামত ইতিপূর্বে ছিল আর অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ নিয়ামত সমূহ পুনরায় দু'প্রকার ১. দুনিয়ার নিয়ামত ২. আখেরাতের নিয়ামত। এমনিভাবে, আরো দু' প্রকার নিয়ামত রয়েছে ১. দৈহিক, ২. আধ্যাত্মিক।

যে পাঁচটি সূরা 'আলহামদু' দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকটিতে কোন এক প্রকার নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি সূরায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামতের জন্যে শোকর আদায়ের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন এ সূরা শুরু করা হয়েছে 'আলহামদু' দ্বারা এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসমান জমিনের যাবতীয় নিয়ামত ও সকল রহমত আল্লাহ পাকেরই দান। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার একচ্ছত্র মালিকানা শুধু আল্লাহ পাকেরই। সমগ্র সৃষ্টি জগতে তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত কার্যকর রয়েছে এবং সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই। আর শুধু যে আসমান জমিনের নিয়ামত সমূহই আল্লাহই পাকের তাই নয়; বরং আখেরাতের নিয়ামত সমূহও শুধুমাত্র, এজন্যে আখেরাতের সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারীও তিনিই।

عَالِمُ الْغَيْبِ : এটা رب শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিরর মধ্য থেকে এ স্থলে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সকল মানুষ মরে মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলে সেই মৃত্তিকার কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্র করা, অতঃপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কিরূপে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সব কিছু তিনি জানেন। কোনো বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোনো কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গম্বর কারও এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞানসম্পন্ন সত্তার জন্য মানুষের কণা সমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

قَوْلُهُ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী لَتَاْتِيَنَّكُمْ বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ্য মুমিনদেরকে প্রতিদান ও উত্তম রিজিক অর্থাৎ জান্নাত দান করা। তাদের বিপরীতে اَلَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْ اٰيٰتِنَا অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে আপত্তি তুলেছে এবং মানুষকে তা থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে। مُعٰجِزِيْنَ অর্থাৎ তারা যেমন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার জন্য। اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ মর্মন্তুদ শাস্তি।

قَوْلُهُ وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ : এতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিপরীতে কিয়ামতে বিশ্বাসী মুমিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهٗ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ الخ : এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা ও উপহাসের ছলে বলত, এসো, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে. অতঃপর তোমাদেরকে এই আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি বলে এখানে নবী কারীম ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে, যিনি কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফেররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِّقْتُمْ : শব্দটি **مَزْقٌ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। **كُلَّ مُمَزَّقٍ** -এর অর্থ– মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতঃপর কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

قَوْلُهٗ اِفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ : উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় জেনে শুনে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, না হয় সে উন্মাদ, যার কথার কোনো সঠিক ভিত্তি থাকে না।

قَوْلُهٗ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ : এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বিশালকায় সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আজাবে রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط نُبُوَّةً وَكِتَابًا وَقُلْنَا يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ رَجِّعِيْ مَعَهٗ بِالتَّسْبِيْحِ وَالطَّيْرَ ط بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى مَحَلِّ الْجِبَالِ اَيْ وَدَعَوْنَاهَا لِلتَّسْبِيْحِ مَعَهٗ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ فَكَانَ فِيْ يَدِهٖ كَالْعَجِيْنِ .

১১. وَقُلْنَا اَنِ اعْمَلْ مِنْهُ سٰبِغٰتٍ دُرُوْعًا كَوَامِلَ يَجُرُّهَا لَابِسُهَا عَلَى الْاَرْضِ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ اَيْ نَسْجِ الدُّرُوْعِ قِيْلَ لِصَانِعِهَا سَرَّادٌ اَيْ اِجْعَلْهُ بِحَيْثُ تَتَنَاسَبُ حَلَقُهٗ وَاعْمَلُوْا اَيْ اٰلَ دَاوٗدَ مَعَهٗ صَالِحًا ط اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ فَاُجَازِيْكُمْ بِهٖ .

১২. وَ سَخَّرْنَا لِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ بِتَقْدِيْرِ تَسْخَرُ غُدُوُّهَا سَيْرُهَا مِنَ الْغُدْوَةِ بِمَعْنَى الصَّبَاحِ اِلَى الزَّوَالِ شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا سَيْرُهَا مِنَ الزَّوَالِ اِلَى الْغُرُوْبِ شَهْرٌ ج اَيْ مَسِيْرَتُهٗ وَاَسَلْنَا اَذَبْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ط اَيِ النُّحَاسِ فَاُجْرِيَتْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ بِلَيَالِيْهِنَّ كَجَرْيِ الْمَاءِ وَعَمَلُ النَّاسِ اِلَى الْيَوْمِ مِمَّا اُعْطِيَ سُلَيْمَانُ .

অনুবাদ :

১০. আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ নবুয়ত ও কিতাব দান করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম যে, হে পর্বতমালা তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর ওহে পক্ষীসকল তোমরাও طَيْرَ শব্দটি নসববিশিষ্ট جِبَالُ -এর অবস্থার উপর আতফ অর্থাৎ তাদেরকেও দাউদের সাথে তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছি এবং আমি তার জন্যে লৌহকে নরম করেছিলাম অতএব লৌহ তার হাতে ভেজানো ময়দার মতো হয়ে যেত।

১১. এবং আমি তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, পূর্ণ লোহার পোষাক যার পরিধানকারী ভূমিতে হামাগুড়ি দেয় কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর লোহার জামার কারিগরকে سَرَّادٌ বলা হয় অর্থাৎ এমন জামা তৈরি কর যাঁর কড়া যথাযথ সংযোগ হয় এবং হে দাউদ পরিবার তোমরা তাঁর সাথে সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর আমি তা দেখি অতএব তোমাদের এর প্রতিদান দেব।

১২. আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে অন্য কেরাত মতে اَلرِّيْحُ -এর মধ্যে পেশ পড়বে تَسْخَرُ ফে'লের সাথে যা সকালে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক মাসের পথ আর বিকালে সূর্যাস্ত থেকে ডুবা পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। غُدُوٌّ শব্দটি اَلْغُدْوَةُ থেকে নির্গত যার অর্থ সকাল আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। অতএব তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবহমান ছিল সুলায়মানকে মোজেজা স্বরূপ দান করা হয়েছে এবং লোকেরা আজ পর্যন্ত তা ব্যবহার করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ بِأَمْرِ
رَبِّهِ ط وَمَنْ يَزِغْ يَعْدِلْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَهُ
بِطَاعَتِهِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ النَّارِ فِي
الْآخِرَةِ وَقِيْلَ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَضْرِبَهُ مَلَكٌ
بِسَوْطٍ مِنْهَا ضَرْبَةً تُحْرِقُهُ ـ
١٣. يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ أَبْنِيَةٍ
مُرْتَفِعَةٍ يُصْعَدُ إِلَيْهَا بِدُرْجٍ وَتَمَاثِيْلَ
جَمْعُ تِمْثَالٍ وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ مَثَّلْتَهُ بِشَيْءٍ أَيْ
صُوَرٌ مِنْ نُحَاسٍ وَزُجَاجٍ وَرُخَامٍ وَلَمْ يَكُنْ
اِتِّخَاذُ الصُّوَرِ حَرَامًا فِيْ شَرِيْعَتِهِ وَجِفَانٍ
جَمْعُ جَفْنَةٍ كَالْجَوَابِ جَمْعُ جَابِيَةٍ وَهِيَ
حَوْضٌ كَبِيْرٌ يَجْتَمِعُ عَلَى الْجَفْنَةِ أَلْفُ
رَجُلٍ يَأْكُلُوْنَ مِنْهَا وَقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ ثَابِتَاتٍ
لَهَا قَوَائِمُ لَا تَتَحَرَّكُ عَنْ أَمَاكِنِهَا تُتَّخَذُ
مِنَ الْجِبَالِ بِالْيَمَنِ يُصْعَدُ إِلَيْهَا بِالسَّلَالِمِ
وَقُلْنَا اعْمَلُوْا يَا آلَ دَاوُدَ بِطَاعَةِ اللّٰهِ شُكْرًا
لَهُ عَلَى مَا آتَاكُمْ وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ
الْعَامِلُ بِطَاعَتِيْ شُكْرًا لِنِعْمَتِيْ ـ
١٤. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ عَلَى سُلَيْمَانَ
الْمَوْتَ أَيْ مَاتَ وَمَكَثَ قَائِمًا عَلَى عَصَاهُ
حَوْلًا مَيِّتًا وَالْجِنُّ تَعْمَلُ تِلْكَ الْأَعْمَالَ
الشَّاقَّةَ عَلَى عَادَتِهَا لَا تَشْعُرُ بِمَوْتِهِ
حَتّٰى أَكَلَتِ الْأَرَضَةُ عَصَاهُ فَخَرَّ مَيِّتًا ـ

কতক জিন তার সামনে তার পালনকর্তার নির্দেশে কাজ করত। তাদের যে কেউ আমার আদেশ সুলায়মানের আনুগত্যে অমান্য করবে, আমি তাদের জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির আস্বাদন করাব। পরকালে জাহান্নামের আগুন দ্বারা, আর বর্ণিত আছে যে, দুনিয়াতে তাদেরকে একজন ফেরেশতা আগুনের লৌহ দিয়ে আঘাত করবে অতঃপর আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দেবে।

১৩. তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী নির্মাণ করত মাহারিব তথা দুর্গ উঁচু দালান যেখানে সিঁড়ি দিয়ে উঠা হয় তামাছীল তথা ভাস্কর্য تَمَاثِيْلَ শব্দটি تِمْثَالٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ কোনো বস্তুর চিত্র নির্মাণ করা তামা বা সিসা বা মরমর পাথর দ্বারা এবং তার শরিয়তে ফটো বা ছবি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র جِفَانٍ শব্দটি جَفْنَةٌ-এর বহুবচন আর جَوَابِ শব্দটি جَابِيَةٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ বড় হাউজ যেখানে পাত্রসহ হাজার মানুষ একত্রিত হয়ে সেখান থেকে আহার করে এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ এমন বড় ডেগ যার খুটি থাকত ও নিজ স্থান থেকে সরানো যেত না। এটা ইয়েমেনের পাহাড়ে নির্মাণ করা হতো এবং এতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হতো এবং আমরা বললাম, হে দাউদ পরিবার তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত আল্লাহর আনুগত্য কর আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

১৪. যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম অর্থাৎ সোলায়মান মৃত্যুবরণ করলেন এবং তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে এক বৎসর পর্যন্ত মৃত্যু অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। জিনরা তাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজে মশগুল ছিল। তারা সোলায়মানের মৃত্যুর বিষয়ে অবগত হয়নি। শেষ পর্যন্ত উই পোকা তার লাঠিখানা খেয়ে ফেলে অতএব তিনি মৃত্যু অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ مَصْدَرُ
اُرِضَتِ الْخَشَبَةُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ اَكَلَتْهَا
الْاَرَضَةُ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ط بِالْهَمْزَةِ وَتَرْكِهَا
بِاَلِفٍ عَصَاهُ لِاَنَّهَا تَنْسَأُ اَيْ يَطْرُدُ وَيُزْجَرُ
بِهَا فَلَمَّا خَرَّ مَيْتًا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ
اِنْكَشَفَ لَهُمْ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَيْ اَنَّهُمْ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ وَمِنْهُ مَا غَابَ عَنْهُمْ مِنْ
مَوْتِ سُلَيْمَانَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ
الْمُهِيْنِ الْعَمَلِ الشَّاقِّ لَهُمْ لِظَنِّهِمْ حَيَاتَهٗ
خِلَافَ ظَنِّهِمْ عِلْمَ الْغَيْبِ وَعُلِمَ كَوْنُهٗ سَنَةً
بِحِسَابِ مَا اَكَلَتْهُ الْاَرَضَةُ مِنَ الْعَصَا بَعْدَ
مَوْتِهٖ يَوْمًا وَلَيْلَةً مَثَلًا ـ

তখন ঘুন পোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। الْاَرْضِ শব্দটি اُرِضَتِ الْخَشَبَةُ থেকে مَصْدَر مَجْهُوْل অর্থাৎ ঘুন পোকা তা খেয়ে ফেলে তারা সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল مِنْسَاَتَهٗ শব্দটি হামযা ও হামযাবিহীন আলিফ দ্বারা مِنْسَاَة অর্থাৎ তার লাঠি এবং তিনি উক্ত লাঠি দ্বারা কোনো কিছু সরাতেন, দূর করতেন ও ধমকাতেন। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন মৃত্যু অবস্থায় তখন জিনেরা বুঝতে পারল। যদি জিনেরা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখত তাহলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। এবং তাদের ইলমে গায়েব জানার দাবি এটা দ্বারা খণ্ডন হয়। তাদের কাছে সোলায়মানের মৃত্যু অজানা ছিল অর্থাৎ তারা ইলমে গায়েবের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও হযরত সোলায়মানকে জীবিত মনে করে কঠিন কাজে মগ্ন থাকতেন না। এক বছর কাজে মগ্ন থাকার পরিমাণ, তার মৃত্যুর পর একদিনে রাতে ঘুন পোকার লাঠির পরিমাণ খাওয়া হিসাবে করে বের করা হয়। উল্লেখ্য যে, হযরত সোলায়মানের যুগে জিন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ছিল যে, জিনরা ইলমে গায়েব রাখত। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধারণা খণ্ডন করার জন্য সোলায়মানের মৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত করলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَوِّبِىْ : এটা تَاْوِيْبٌ মাসদার হতে اَمْر-এর وَاحِد مُؤَنَّث-এর সীগাহ تَرْجِيْع অর্থে তথা বার বার দোহরানো, পুনরাবৃত্তি করা, তাকরার করা। اَوِّبِىْ মূলত اَوِّبِيْنَ ছিল। اَمْر-এর কারণে শেষের نُوْن টি পড়ে গেছে।

قَوْلُهٗ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا : এখানে وَاوْ টি اِسْتِيْنَافِيَه এবং لَامْ টি উহ্য কসমের জবাবের উপর প্রবেশ করেছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, عِزَّتِنَا وَجَلَالِنَا لَقَدْ اٰتَيْنَا مِنَّا ; আর مِنَّا টা اٰتَيْنَا-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অথবা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে حَالْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো كَائِنًا مِنَّا فَضْلًا ; আর فَضْلًا মূলত -এর সিফত হয়েছে। مُقَدَّمْ হওয়ার কারণে حَالْ হয়ে গেছে। فَضْلًا হলো দ্বিতীয় মাফঊল এবং دَاوٗدَ হলো প্রথম মাফঊল।

قَوْلُهٗ قُلْنَا يَا جِبَالُ : يَاجِبَالُ হলো قُلْنَا উহ্য ফে'লের مَقُوْلَه- এবং اٰتَيْنَا -এর উপর এর আতফ হয়েছে। وَالطَّيْرَ-এর আতফ جِبَالٌ -এর উপর হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা مُنَادٰى مُفْرَدْ টা مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়ে থাকে। অথবা مَفْعُوْل مَعَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর جِبَالُ শব্দের উপর عَطْف হওয়ার কারণে مَرْفُوْع রূপেও পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهٗ دُرُوْعًا : ব্যাখ্যাকার (র.) دُرُوْعًا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন سَابِغَاتٍ হলো সিফত دُرُوْعًا তার মওসূফ যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ سَرْدٍ : এটা লৌহবর্মকে বলা হয়। বর্ম নির্মাণকারীকে سَرَّادٌ বলা হয়।

Free @ www.eilmweebly.com

قَوْلُهُ لِسُلَيْمَانَ : মুফাসসির (র.) سَخَّرْنَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, جَار مَجْرُوْر-এর সম্পর্ক سَخَّرْنَا-এর সাথে হয়েছে। আর الرِّيْح টা مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর رَفْع-এর সুরতে الرِّيْح টা উহ্য মুযাফের সাথে হয়েছে। আর وَتَسْخِيْرُ الرِّيْحِ كَائِنَةٌ لِسُلَيْمَانَ উহ্য ইবারত হলো لِسُلَيْمَانَ হলো خَبَر مُقَدَّمْ হয়েছে। আর مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ মুযাফকে ফেলে দিয়ে مُضَاف اِلَيْه কে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ : مِنَ الْجِنِّ উহ্য ফে'লের مُتَعَلِّقْ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَسَخَّرْنَا لَهُ مِنَ مَنْ আর مَنْ يَعْمَلُ উহ্য ফে'লের مفعول به হবে। আবার এটাও জায়েজ যে, مِنَ الْجِنِّ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর الْجِنِّ يَعْمَلُ হলে مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ قُدُوْرٍ : এটা قِدْرٌ-এর বহুবচন, অর্থ হাড়ি পাতিল, رَاسِيَاتٍ অর্থাৎ ثَابِتَاتٍ

قَوْلُهُ اعْمَلُوْا : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হয়েছে اٰلَ دَاوُد হলো مُنَادٰى আর حَرْف نِدَاء উহ্য রয়েছে এবং شُكْرًا হলো مَفْعُوْل لَهٗ

قَوْلُهُ قَلِيْلٌ : এটা خَبَر مُقَدَّمْ আর مِنْ عِبَادِىْ তার সিফত এবং اَلشَّكُوْرُ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ مِنْسَاَةَ : এটা مِفْعَلَةٌ-এর ওজনে এক কেরাতে اَلِف সহ রয়েছে। অর্থ লাঠি, প্রতিহত করার যন্ত্র।

قَوْلُهُ دَابَّةُ الْاَرْضِ : সাদা পিঁপড়া, পিপড়া বিশেষ যা কিতাব ও কাঠ নষ্ট করে ফেলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে আসমান ও জমিন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছিল যে, এ বিশাল বিস্তৃত আসমান জমিনের সৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের কুদরতের, তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের বহু বিস্ময়কর জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। অবশ্যই এ নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার সে বান্দাদের জন্যে যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার এমন দুজন বান্দার আলোচনা স্থান পেয়েছে, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম নিয়ামত দান করেছিলেন, একদিকে তাঁদেরকে দান করেছিলেন নবুয়ত, অন্যদিকে দুনিয়ার রাজত্ব বা ক্ষমতাও দান করেছিলেন। দীন ও দুনিয়ার এতসব নিয়ামত লাভের পরও তাঁরা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হননি; বরং সর্বদা আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শোকর গুজার থাকতেন। যদি রাষ্ট্র পরিচালনার কঠিন ও জটিল দায়িত্ব পালনের কারণে কখনও কোনো ভুল-ত্রুটি বা গাফলত হয়ে থাকে, তখন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সেজদারত হতেন এবং এস্তেগফার করতেন। আর এটিই হলো প্রকৃত বান্দার বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত : এ ঘটনার শেষ বিচারের দিন বা কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কথার জবাবও রয়েছে। আল্লাহ পাক যখন কোনো বান্দার জন্যে কোনো পাহাড় পর্বতকে অনুগত করে দেন এবং লৌহকে কোমল করে দেন, তখন তিনি কি মৃত মানুষের হাড় অস্থিকে একত্রিত করে তাঁকে পুনর্জীবন দান করতে পারেন না? তাই ইরশাদ হয়েছে- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا : অর্থাৎ দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম। فَضْل-এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলি যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কতক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলি দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ গুণাবলি এই ছিল যে, তাঁকে রিসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহর জিকির অথবা যাবুর তিলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুল ও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মোজেজা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

قَوْلُهُ يَاجِبَالُ اَوِّبِىْ : শব্দটি تَاْوِيْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বারবার করা। আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আ.) আল্লাহর জিকির ও তাসবীহ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেই সব বাক্য বারবার আবৃত্তি কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ শব্দের তাফসীর তাই করেছেন। -[ইবনে কাসীর]

হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পবর্তমালার এই তাসবীহ পাঠ সেই সাধারণ তাসবীহ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে; وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অর্থাৎ জগতের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তাসবীহ হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মোজেজার মর্যাদা রাখে। তাই এ তাসবীহ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মোজেজা হতো না।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোনো গম্বুজে অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা কুরআন পাক একে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে কারও শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফেরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَالطَّيْرَ : এ শব্দটি ব্যাকরণিক দিক দিয়ে উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়াপদের مَفْعُوْل হয়ে مَنْصُوْب হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী] অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরূপ তাশবীহ পাঠ করত। অন্য এক আয়াত আছে, اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً অর্থাৎ আমি পর্বতমালাকে হযরত দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে দিয়েছিলাম।

قَوْلُهٗ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ : অর্থাৎ আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মোজেজা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মোজেজারূপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মতো নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোনো কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হতো না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোনো হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরি করতে পারেন সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরও আছে, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী قَدِّرْ فِي السَّرْدِ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট। قَدِّرْ শব্দটি تَقْدِيْرٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা। سَرْد-এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তাঁর কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –[ইবনে কাসীর]

এ থেকে আরও জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ قَدِّرْ فِي السَّرْدِ-এর অর্থ এই দিয়েছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত। সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে ইবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা।

শিল্প ও কারিগরির ফজিলত : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا অর্থাৎ আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরূপভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহবী রচিত 'আত্তিব্বুন্নবী' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, বৃক্ষরোপণ, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা নেওয়া যার জন্য চাকা বিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবি মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ : আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোনো শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হতো না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হতো না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল ভারতীয় হিন্দুদের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথার শিকড় গেড়ে বসেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত দাউদ (আ.)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্য : তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে হযরত দাউদ (আ.) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোনো অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হতো, সেই হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা গুণকীর্তন ও ন্যায়বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানববেশে প্রেরণ করেন। হযরত দাউদ (আ.) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হলো। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুবক ভালো লোক। নিজের জন্য এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামিল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারি ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোনো হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মতো নরম করে দেওয়া হলো, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

قَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ : হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দিয়েছিলেন। হযরত সোলায়মার (আ.)- তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও বহু সংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, একটি কর্মের প্রতিদানে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামাজ কাযা হয়ে গেল। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই, এ কারণ খতম করার জন্য অশ্বসমূহকে কুরবানি করে দিলেন। কেননা তাঁর শরিয়তে গরু-মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানিও জায়েজ ছিল। এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তাই, সরকারি ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কুরবানি করার কারণে নিজের ধনসম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। সূরা ছোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর আরোহণের জন্য কুরবানি করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরোও উত্তম বস্তু দান করলেন। -[কুরতুবী]

غُدُوٌّ শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رَوَاحٌ শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতঃপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, হযরত সোলায়মান (আ.) সকালে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌছে আহার করতেন। অতঃপর সেখান থেকে জোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিতে কাবুল পৌছতেন। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ইস্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে এক মাসে অতিক্রম করতে পারে। অনুরূপভাবে ইস্তাখার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও এক মাসে অতিক্রম করা যায়। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ : অর্থাৎ আমি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জন্য পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হতো এবং উত্তপ্ত ছিল না। অনায়াসেই এর পাত্র ইত্যাদি তৈরি করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইয়েমেনে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিনদিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়েমেনের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিনদিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قِطْر শব্দের অর্থ গলিত তামা। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ : এ বাক্যটিও উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়া-পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কতক জিনকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যাঁরা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার ন্যায় জিনকে সোলায়মান (আ.)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-নওকরের মতো অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

জিন অধীন করা কিরূপ : এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। কতক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল যা কারামতরূপে তাঁদেরকে দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও অজিফার কোনো প্রভাব ছিল না। আল্লামা শরবিনী 'সিরাজুল মুনীর' তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবূ হুরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, ওমর ইবনে খাত্তাব, আবূ আইউব আনসারী, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিন্তু এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অনুরূপ কতক জিনকে তাঁদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন। কিন্তু আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলেমগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা শরিয়তে জায়েজ কি না, তা চিন্তার বিষয় বটে। অষ্টম শতাব্দীর আলেম কাজী বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে "আ-কামুল মারজান ফী আহকামিল জান" নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। এতে বর্ণিত আছে যে, জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহর আদেশক্রমে মোজেজারূপে করেছেন। পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সাথে সম্পর্কশীল 'আসিফ ইবনে বরখিয়া' প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলি খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাত আবূ নসর আহমদ ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে। তাঁদের থেকে জিনদের সেবা গ্রহণের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলি বর্ণিত আছে। হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সামনে পেশকৃত জিনদের বাক্যাবলি এবং তাঁর সাথে জিনদের চুক্তি ও অঙ্গীকারনামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরও লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুফরি কলেমা ও জাদুকে কাজে লাগায়। কাফের জিন ও শয়তান এ গুলো খুব পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গূঢ়তত্ত্ব এতটুকুই যে, তারা আলেমদের কুফরি শিরকি আমলে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুষস্বরূপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলেমরা কুরআনের আয়াত নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে। এতে কাফের জিন ও শয়তান খুশি হয়ে তাদের কাজ করে দেয়। তবে খলিফা মু'তাযিদ বিল্লাহর আমলে ইবনুল ইমাম নামক ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন। এতে কোনো শরিয়ত বিরোধী কথা ছিল না।

সারকথা এই যে, যদি কোনো ইচ্ছা ও আমল ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর মেহেরবানিতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন হযরত সোলায়মান (আ.) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মোজেজা ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমলের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরি বাক্য অথবা কুফরি কর্ম থাকে, তবে এরূপ বশীকরণ কুফর হবে। কেবল গুনাহ সম্বলিত আমল হলে কবিরা গুনাহ হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও ফিকহবিদগণ নাজায়েজ বলেছেন। কারণ এগুলোতে কুফর, শিরক অথবা গুনাহ থাকা বিচিত্র নয়। কাজী বদরুদ্দীন আ-কামুল মারজানে অবোধগম্য বাক্যাবলির ব্যবহারকেও নাজায়েজ লেখেছেন।

বশীকরণের আমল যদি আল্লাহর নামসমূহ অথবা কুরআনি আয়াতের মাধ্যমে হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু ব্যবহারের মতো গুনাহ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েজ যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই, উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসাবে এরূপ আমল করা নাজায়েজ। কারণ এতে اِسْتِرْقَاقٌ অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো জরুরি হয়ে পড়ে, যা হারাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ : অর্থাৎ কোনো জিন যদি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে পরকালের জাহান্নামের আজাব বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত। [কুরতুবী] এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুন দ্বারা সৃজিত। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জওয়াব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সৃজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। কিন্তু তাকে মৃত্তিকা ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান অগ্নি। কিন্তু নির্ভেজাল ও তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَيَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ : এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা হযরত সোলায়মান (আ.) জিনদের দ্বারা করাতেন। مَحَارِيْبَ শব্দটি مِحْرَابٌ-এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকের নিজেদের জন্য যে, সরকারি বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও مِحْرَابٌ বলা হয়। এ শব্দটি حَرْبٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এধরনের বাসভবনকে সাধারণত অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে مِحْرَابٌ বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই مِحْرَابٌ বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই مَحَارِيْبُ শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে مَحَارِيْبُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ এবং ইসলাম যুগে مَحَارِيْبُ صَحَابَةٌ বলে তাঁদের মসজিদ বুঝানো হতো।

মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত ইমামের দাঁড়াবার স্থানকে আলাদারূপে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম শতাব্দীর পর সুলতানগণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রবর্তন করেন। আরও একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায়। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায়। নামাজিদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ সমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ইমামের দাঁড়াবার স্থান কিবলার দিকস্থ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পেছনে সকল কাতার নামাজিদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ প্রশ্নে 'এলামুল আরানিব ফী বিদ'আতিল মাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্য এই যে, নামাজিদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের মেহরাব নির্মাণ করলে এবং একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করা না হলে একে বিদ'আত আখ্যা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং যারা এর খেলাফ করে তাদের বিরূপ সমালোচনা করা হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে একে বিদ'আত বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ جِفَانٌ : শব্দটি جَفْنَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন তসলা, টব ইত্যাদি। جَوَابٌ শব্দটি جَابِيَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সামনে পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। قُدُوْرٌ শব্দটি قِدْرٌ-এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

رَاسِيَاتٌ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এমন বড় ও ভারি ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবত এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হতো, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তাফসীরবিদ যাহহাক এ তাফসীরই করেছেন। اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান : কুরতুবী বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নিয়ামত দাতার নিয়ামত স্বীকার করা ও তাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারও দেওয়া নিয়ামতকে তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবূ আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, নামাজ কৃতজ্ঞতা, রোজা কৃতজ্ঞতা এবং প্রত্যেক সৎকর্ম কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাযী বলেন, আল্লাহভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা। -[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ করার জন্য أُشْكُرُوْنِيْ সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اِعْمَلُوْا شُكْرًا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবত ইঙ্গিত করেছে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সে মতে হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোনো মুহূর্ত যেত না, যাতে ঘরের কেউ না কেউ ইবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে হযরত দাউদ (আ.)-এর জায়নামাজ কোনো সময় নামাজি থেকে খালি থাকত না। –[ইবনে কাসীর]

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন, অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদতের দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোজা রাখতেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত ফুযায়েল (র.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরজ করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার শোকর কিভাবে আদায় করব? আমার উক্তিগত অথবা কর্মগত শোকর তো আপনারই দান। এর জন্যও তো শোকর আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, اَلْاٰنَ شَكَرْتَنِيْ يَا دَاوُدُ অর্থাৎ হে দাউদ! এখন তুমি আমার শোকর আদায় করেছ। কেননা যথাযথ শোকর আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ।

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাসসাস হযরত আতা ইবনে ইয়াসির (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। اعملوا ال داود شكرا আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে হযরত দাউদ (আ.)-এর পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সে তিনটি কাজ কি? তিনি বললেন, ১. সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা ২. সাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং ৩. গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। [কুরতুবী, আহকামুল কুরআন জাস্‌সাস্]

قَوْلُهُ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ : শোকরের আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মু'মিনদেরকে শোকরে উৎসাহিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ : আয়াতে مِنْسَاةٌ শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারও মতে আরবি শব্দ نَسَاءٌ শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেওয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে مِنْسَاةٌ অর্থাৎ সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথ নির্দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণত হযরত সোলায়মান (আ.) অদ্বিতীয় ও অনুপম সম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কেবল সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয়; বরং জিন জাতি, বিহঙ্গকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর আদেশ কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেন না। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত দাউদ (আ.) শুরু করেছিলেন এবং হযরত সোলায়মান (আ.) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহর নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহরাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো তিনি ইবাদতে মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তাঁরা জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে লাগল। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজও সমাপ্ত হয়ে গেল। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর লাঠিতে আল্লাহ তা'আলা উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফারসিতে দেওক, উর্দুতে দীমকে বলা হয়। কুরআন পাকে একে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খেয়ে ফেলল। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আ.)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিনরা জানতে পারল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়েবের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়েবের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব [অদৃশ্য জ্ঞানী] নয়। কারণ তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে হযরত সোলায়মান (আ.) -এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। একে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ বলে সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করার জন্য হযরত সোলায়মান (আ.) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষা অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। আরও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সত্ত্বেও হযরত সোলায়মান (আ.)-কে পূর্ণ এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের দ্বারা কাজ সমাপ্ত করিয়ে নেওয়া হয়েছে। আরও জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকার মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তিও বাহ্যত গায়েবি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলি দেখে এ বিষয়ের আশঙ্কা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশঙ্কার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে হযরত সোলায়মান (আ.) দুটি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ১. বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং ২. মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশঙ্কা না থাকে। -[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত সোলায়মান (আ.) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনান্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাজের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে [অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না।] মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আরও আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে হযরত সোলায়মান (আ.) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার হাজার গরু ও বিশ হাজার ছাগল কুরবানি করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদযাপন করেন। অতঃপর 'ছখরার' উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে এসব দোয়া করেন– হে আল্লাহ, আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে এই নিয়ামতের শোকর আদায় করার তাওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন। হেদায়েতপ্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোনো বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি।

১. গোনাহগার ব্যক্তি তওবা করার জন্য মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ মাফ করুন।

২. যে ব্যক্তি কোনো ভয় ও আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিন।

৩. রুগ্ণ ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন।

৪ নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫. এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোনো অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়। –[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর জীবদ্দশায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ববর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ বড় বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজ বাকি ছিল। এর জন্য হযরত সোলায়মান (আ.) উপরিউক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর হযরত সোলায়মান (আ.) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। –[কুরতুবী] কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, হযরত সোলায়মান (আ.) অনেক পূর্বেই মারা গেছেন কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্য একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, হযরত সোলায়মান (আ.) -এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছরকাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়েসে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছর বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। –[মাযহারী, কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٥. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ بِالصَّرْفِ وَعَدَمِهِ قَبِيْلَةٌ سُمِّيَتْ بِاسْمِ جَدٍّ لَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ فِيْ مَسْكَنِهِمْ بِالْيَمَنِ اٰيَةٌ ج دَالَّةٌ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ جَنَّتٰنِ بَدَلٌ عَنْ يَمِيْنٍ وَّشِمَالٍ عَنْ يَمِيْنِ وَادِيْهِمْ وَشِمَالِهِ وَقِيْلَ لَهُمْ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط عَلٰى مَا رَزَقَكُمْ مِنَ النِّعْمَةِ فِيْ اَرْضِ سَبَا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ لَيْسَ بِهَا سَبَاخٌ وَلَا بَعُوْضَةٌ وَلَا ذُبَابَةٌ وَلَا بَرْغُوْثٌ وَلَا عَقْرَبٌ وَلَا حَيَّةٌ وَيَمُرُّ الْغَرِيْبُ بِهَا وَفِيْ ثِيَابِهِ قُمَّلٌ فَيَمُوْتُ لِطِيْبِ هَوَائِهَا وَاللّٰهُ رَبٌّ غَفُوْرٌ -

১৫. সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ইয়েমেনে ছিল এক নিদর্শন যা আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ বহন করে দুটি উদ্যান ডানদিকে ও বামদিকে অর্থাৎ তাদের ময়দানের ডান ও বাম দিকে। سَبَاٌ শব্দটি غَيْرُ مُنْصَرِفْ ও مُنْصَرِفْ উভয়টি পড়া যাবে। একটি গোত্রের নাম। তাদের আরব পূর্বপুরুষের নামে নাম রাখা হয়। جَنَّتَانِ শব্দটি اٰيَةٌ থেকে بَدَل তাদেরকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিজিক খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমাদের প্রতি সারা ভূমিতে দেওয়া রিজিক ও নিয়ামত সমূহের উপর এটা স্বাস্থ্যকর শহর অর্থাৎ উক্ত শহরে কোনো দূষিত শব্দ ছিলনা ও এতে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ -বিচ্ছুর মতো ইতর প্রাণীর নাম গন্ধও ছিলনা বাইরে থেকে কোনো মুসাফির শরীরে ও কাপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে আসলে সেগুলো শহরে মুক্ত আবহাওয়ার কারণে মরে যেত এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল পালনকর্তা।

١٦. فَاَعْرَضُوْا عَنْ شُكْرِهٖ وَكَفَرُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ جَمْعُ عَرِمَةٍ وَهُوَ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهٖ اِلٰى وَقْتِ حَاجَتِهٖ اَيْ سَيْلَ وَادِيْهِمُ الْمَمْسُوْكِ بِمَا ذُكِرَ فَاَغْرَقَ جَنَّتَيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ تَثْنِيَةُ ذَوَاتٍ مُفْرَدٍ عَلَى الْاَصْلِ اُكُلٍ خَمْطٍ مُرٍّ بَشِعٍ بِاِضَافَةِ اُكُلٍ بِمَعْنٰى مَاْكُوْلٍ وَتَرْكِهَا وَيُعْطَفُ عَلَيْهِ وَاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ -

১৬. অতঃপর তারা অবাধ্যতা করল আমার কৃজ্ঞতা প্রকাশ থেকে ও তারা কুফরি করল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রবল বন্যা। عَرِم শব্দটি عَرِمَةٌ এর বহুবচন, ঐ দালান ও প্রাচীরকে বলা হয়, যেখানে প্রয়োজনের স্বার্থে পানি আটকিয়ে জমা রাখা হয় অর্থাৎ সেই উদ্যানের স্টককৃত পানি সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয়, অতঃপর সে পানি দ্বারা তাদের উদ্যান ও সম্পদসমূহ ডুবিয়ে দেয় এবং তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল ذَوَاتَيْ শব্দটি ذَوَاتٌ একবচনের তাছনিয়্যাহ। اُكُلٍ শব্দটি ইযাফত দ্বারা অর্থ مَاْكُوْل বা ইযাফতবিহীন ব্যবহৃত হয়েছে : اُكُلٍ-এর উপর اَثْلٍ কে আতফ করা হয়েছে। ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٧. ذٰلِكَ التَّبْدِيْلُ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ط بِكُفْرِهِمْ وَهَلْ نُجْزِيْ اِلَّا الْكَفُوْرَ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ مَعَ كَسْرِ الزَّايِ وَنَصْبِ الْكَفُوْرِ اَيْ مَا يُنَاقِشُ اِلَّا هُوَ ـ

১৭. এটা এই পরিবর্তন ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেইনা। [نُجَازِىْ ফে'লকে يُجَازِىْ ও نُجَازِىْ -এর মধ্যে যের ও اَلْكَفُوْرِ কে নসব দ্বারা পড়বে -زَاءٌ] অর্থাৎ কাফেরকেই শাস্তি দিই।

١٨. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ سَبَا وَهُمْ بِالْيَمَنِ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا بِالْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَهِيَ قُرَى الشَّامِ الَّتِيْ يَسِيْرُوْنَ اِلَيْهَا لِلتِّجَارَةِ قُرًى ظَاهِرَةً مُتَوَاصِلَةً مِنَ الْيَمَنِ اِلَى الشَّامِ وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ط بِحَيْثُ يَقِيْلُوْنَ فِيْ وَاحِدَةٍ وَيَبِيْتُوْنَ فِيْ اُخْرٰى اِلٰى اِنْتِهَاءِ سَفَرِهِمْ وَلَا يَحْتَاجُوْنَ فِيْهِ اِلٰى حَمْلِ زَادٍ وَمَاءٍ وَقُلْنَا سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فِيْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ ـ

১৮. আমি তাদের সবাবাসীদের তারা ইয়েমেনে থাকা অবস্থায় ও যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি পানি ও গাছপালা দিয়ে অনুগ্রহ করেছিলাম সিরিয়ার ঐ সমস্ত এলাকা যেখানে তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে যেত সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম। যা ইয়েমেন ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে খুব কাছাকাছি ছিল। এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারণ করেছিলাম তারা একগ্রামে বিশ্রাম নিত এবং অন্য গ্রামে রাত্রিযাপন করত এমনিভাবে তাদের সফরের সময় অতিক্রম করত। এবং সফর কালে কোনো পানি ও সরঞ্জামাদি বহন করতে হতো না আমি বললাম, তোমরা এসব জনপদে রাত্রে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর। অর্থাৎ রাতে ও দিনে কোনো ভয় নেই।

١٩. فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا اِلَى الشَّامِ اِجْعَلْهَا مَفَاوِزَ لِيَتَطَاوَلُوْا عَلَى الْفُقَرَاءِ بِرُكُوْبِ الرَّوَاحِلِ وَحَمْلِ الزَّادِ وَالْمَاءِ فَبَطَرُوا النِّعْمَةَ وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ فِيْ ذٰلِكَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ط فَرَّقْنَاهُمْ بِالْبِلَادِ كُلَّ التَّفْرِيْقِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ عِبَرًا لِكُلِّ صَبَّارٍ عَنِ الْمَعَاصِيْ شَكُوْرٍ عَلَى النِّعَمِ ـ

১৯. অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ভ্রমণের পরিসর সিরিয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে দাও। অন্য কেরাত মতে بَاعِدْ পড়বে, অর্থাৎ এ সমস্ত জনপদকে মরুভূমি বানিয়ে দিন যাতে তারা সফরের সরঞ্জামাদি ও সাওয়ারি নিয়ে দরিদ্র ব্যক্তিদের পরিবর্তে গৌরবের সাথে ভ্রমণ করতে পারে। অতঃপর তারা নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করল তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল কুফরি দ্বারা ফলে আমি তাদেরকে পরবর্তী লোকদের জন্যে উপাখ্যানে পরিণত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। তাদের এলাকাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিলাম নিশ্চয় এতে উল্লিখিত ঘটনাবলির মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল গুনাহের উপর কৃতজ্ঞ ব্যক্তির নিয়ামতের প্রতি জন্যে নিদর্শনাবলি উপদেশ রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. وَلَقَدْ صَدَقَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ اَىْ الْكُفَّارِ مِنْهُمْ سَبَا اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ اِنَّهُمْ بِاِغْوَائِهِ يَتَّبِعُوْنَهُ فَاتَّبَعُوْهُ فَصَدَقَ بِالتَّخْفِيْفِ فِىْ ظَنِّهِ اَوْ صَدَّقَ بِالتَّشْدِيْدِ ظَنَّهُ اَىْ وَجَدَهُ صَادِقًا اِلَّا بِمَعْنٰى لٰكِنْ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْبَيَانِ اَىْ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَمْ يَتَّبِعُوْهُ

২০. আর তাদের কাফেরদের যেমন, সাবা উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ও অনুগত বানিয়ে ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। صَدَقَ ফে'লটি তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদ বিহীন উভয় কেরাতে পড়বে। صَدَقَ তাশদীদ বিহীন হলে অর্থ হবে, তার ধারণা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। صَدَّقَ তাশদীদযুক্ত হলে অর্থ হবে, সে তর ধারণা সত্য করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর اِلَّا টি لٰكِنْ-এর এবং فَرِيْقًا টি مُؤْمِنِيْنَ এর بَيَانْ অর্থাৎ সে সমস্ত মুমিনগণ তার অনুসরণ করেনি।

٢١. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ تَسْلِيْطٍ مِنَّا اِلَّا لِنَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ ط فَنُجَازِىْ كُلًّا مِنْهُمَا وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ رَقِيْبٌ.

২১. তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত শয়তানের কোনো ক্ষমতা ছিল না যে, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। যাতে আমি প্রত্যেককে প্রতিদান দেই] আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اُكُلٌ : এর অর্থ ফল, خَمْطٌ অর্থ পিলুবৃক্ষের ফল, প্রত্যেক টক ও তিক্ত বস্তু।

قَوْلُهُ بَشِعٌ : বিস্বাদ ও তিক্ত বস্তু।

قَوْلُهُ اَثْلٍ : ঝাঁউ গাছ, বহুবচনে اَثْلَاثٌ, اَثَالٌ, اُثُوْلٌ

قَوْلُهُ ذَوَاتَىْ : এটা হলো ذُوْ-এর مُؤَنَّثْ যা দ্বিবচন, একবচনে ذَوَاتٌ মূলে ছিল ذَوَيَةٌ এতে ة হলো عَلَامَةُ تَانِيْثْ এখন يَا এবং তার পূর্বে مَفْتُوْحْ হওয়ার কারণে يَا কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করায় ذَوَاتٌ হয়ে গেছে। এরপর সহজ করণার্থে مُتَحَرِّكْ وَاوْ কে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ফলে ذَاتٌ হয়েছে। وَاحِدْ مُؤَنَّثْ এর সুরত দুটি ১. ذَاتٌ ২. ذَوَاتٌ মুফাসসির (র.)-এর উক্তি ذَوَاتَىْ আসলে ذَوَاتٌ-এর দ্বিবচন এর অর্থ হলো وَاوْ কে ফেলে দেওয়ার পূর্বের অবস্থার দ্বিবচন। যদি واو ফেলে দেওয়ার পরের দ্বিবচন হয় তা হলে হতো ذَاتَىْ

قَوْلُهُ بَشِعٌ : এটা كَشْفٌ-এর ওজনে অর্থ বিস্বাদ, স্বাদহীন اُكُلِ خَمْطٍ এটা اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ-এর অন্তর্গত। এবং ইযাফত বিহীনও পড়া হয়েছে। অর্থাৎ اُكُلٍ خَمْطٍ এই সুরতে اُكُلٍ মাওসূফ এবং خَمْطٍ সিফত হবে।

قَوْلُهُ يَعْطِفُ عَلَيْهِ : অর্থাৎ اُكْلٍ ;عَلٰى اُكُلٍ-এর كَافْ-এ সাকিন ও পেশ উভয়টি قِرَاءَتْ سَبْعَة-এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ : এখানে ذٰلِكَ টা جَزَيْنَا-এর দ্বিতীয় মাফউল যা مُقَدَّمْ হয়েছে। প্রথম মাফউল হলো هُمْ অর্থাৎ جَزَيْنٰهُمْ ذٰلِكَ التَّبْدِيْلَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِكُفْرِهِمْ : অর্থাৎ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ : এটা عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ -এর অন্তর্গত অর্থাৎ প্রথম দান جَنَّتَيْنِ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উল্লিখিত تَبْدِيْل-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ سِيْرُوْا فِيْهَا : অর্থাৎ فِيْ هٰذِهِ الْمَكَانَةِ এটা اَمْر যা خَبَر অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তারা নিরাপত্তার সাথে সফর করত لَيَالِيَ এবং اَيَّامًا টা حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا بِمَعْنٰى لٰكِنْ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ কেননা মুমিনগণ কাফেরদের جِنْس -এর অন্তর্গত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রিসালত ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মোজেজা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষণ, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আজাব অবতরণের আলোচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতরাজি : ইবনে কাসীর বলেন, ইয়েমেনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় নেতা। সূরা নমলে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সাথে নারী বিলকিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শোকর আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে তাঁরা আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফেল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন।' কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বন্যার আজাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা ছারখার হয়ে যায়। -[ইবনে কাসীর]

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল। কুরআনে উল্লিখিত 'সাবা' কোনো পুরুষের নাম না নারীর, না কোনো ভূ-খণ্ডের নাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয়জন ইয়েমেনে এবং চারজন শামদেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়েমেনে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশআরী, আনমার, হিমইয়ার, [তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে] এবং শামদেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাসসান [তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত]। এ রেওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আব্দুল বারও তাঁর "আলকাসদু ওয়াল উমামু বিমারেফতে আস সাবিল আরবে ওয়াল আজম" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষ আলেমগণের বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা দশজন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না; বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়েমেনে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শামস। সাবা আবদে শামস ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহতান থেকে তার বংশতালিকা বুঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লিখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমেনর সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবত তাওরাত ও ইঞ্জীল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিল অথবা জ্যোতিষী ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে সে কয়েক লাইন আরবি কবিতাও বলেছিল। এ সব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাবার সন্তানদের ইয়েমেনে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আজাব আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। -[ইবনে কাসীর] কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সময়কাল হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ আরবি অভিধানে عَرِم শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তাফসীরকারকগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়ে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। কিন্তু কামূস, সেহাহ, জওহরী ইত্যাদি অভিধানে বর্ণিত অর্থ কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এসব অভিধানে عرم এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও عرم এর অর্থ বাঁধ বর্ণনা করেছেন। -[কুরতুবী]

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এই : ইয়েমেনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মঞ্জিল দূরে মাআরেব শহর অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ [তাদের মধ্যে রাণী বিলকিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।] উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরি করে দিল। পাহাড়ের বৃষ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে লাগল। বাঁধের উপরে-নিচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হলো যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃঙ্খলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হতো। উপরের পানি শেষ হয়ে গেল মাঝখানের এবং সর্বশেষে নিচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হতো। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নিচে একটি সুবৃহৎ পুকুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হতো এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বামে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফলমূলের বাগান নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হতো। এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কুরআন পাক جَنَّتَانِ অর্থাৎ দুই বাগান বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ এক সারির সমস্ত বাগানকে পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। কাতাদাহ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নারী মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত। হাত লাগানোরও প্রয়োজন হতো না। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ : আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মতো ইতর প্রাণীর নামগন্ধ ছিল না। বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি শরীর ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। -[ইবনে কাসীর]

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ-এর সাথে رَبٌّ غَفُوْرٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়; বরং শোকর আদায় করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা আছে। কারণ এসব নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শোকর আদায়ে ঘটনাক্রমে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

قَوْلُهُ فَأَعْرَضُوْا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সুবিস্তৃত নিয়ামত ও পয়গাম্বরগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহর আদেশ পালনে বিমুখ হলো, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাজত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মসিবতের কারণ করে দিলেন। তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধভাঙ্গা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। বৃষ্টি মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিত্তিতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত গৃহ বিধ্বস্ত হলো এবং বৃক্ষ উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনরায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাঁধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সেমতে বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল লালন-পালন করল, যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর তাকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুররা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। -[ইবনে কাসীর]

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সেস্থান পরিত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল তাদের কিছু বিবরণ উপরে মুসনাদে আহমদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়েমেনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদিনার বসতিও তাদের কতক। গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে-

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের মূল্যবান ফলমূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে خَمْط -এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবূ ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটা বিশিষ্ট বৃক্ষকে خَمْط বলা হয়। أَثْل শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোনো ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন أَثْل এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটা বিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

سِدْر -এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্পষ্ট সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদগত ও কাঁটা বিশিষ্ট ঝাড়ে হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশি ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْر শব্দের সাথে قَلِيْل যুক্ত করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদগত ছিল যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا : অর্থাৎ আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম। كُفْر শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার করাও হয়ে থাকে। এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর। কেননা তারা অকৃতজ্ঞতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গাম্বরকে মিথ্যারোপও করেছিল।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তা'আলা তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে فَتْرَتْ-এর কাল বলা হয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে এ সময়ে কোনো নবী-রাসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তেরজন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জওয়াবে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরি হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বর্তীকালে তাদের উপর নাজিল করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَهَلْ نُجَازِىْ اِلَّا الْكَفُوْرَ : كَفُوْر শব্দের অর্থ কতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকেই শাস্তি দেইনা, এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থি, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমান গুনাহগারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে, যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোনো শাস্তি উদ্দেশ্যে নয়; বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আজাব বুঝানো হয়েছে। এরূপ আজাব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট মুসলমানদের উপর এরূপ আজাব আসে না। -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.eilm.weebly.com

এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খায়রাহর উক্তিতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, جَزَاءُ الْمَعْصِيَةِ الْوَهْنُ فِى الْعِبَادَةِ وَالضِّيْقُ فِى الْمَعِيْشَةِ وَالتَّعَسُّرُ فِى اللَّذَّةِ قَالَ لَا يُصَادِفُ لَذَّةً حَلَالًا اِلَّا جَاءَهُ مَنْ يُنَغِّصُهُ . অর্থাৎ গুনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, যখন সে কোনো হালাল ভোগ্যবস্তু পায়, তখন কোনো-না কোনো কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উপভোগকে মলিন করে দেয়। –[ইবনে কাসীর] এতে জানা গেল যে, মুসলমান গুনাহগারের শাস্তি দুনিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোনো খোলাখুলি আজাব আসে না। এরটা কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ لَا يُعَاقِبُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ اِلَّا الْكَفُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না। –[ইবনে কাসীর] মু'মিনকে তার গুনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়।

রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসাবে শাস্তি কেবল কাফেরকেই দেওয়া যায় মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোনো মু'মিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হয়।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ .... وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ : এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আরও একটি নিয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। اَلْقُرَى الَّتِىْ بَارَكْنَا বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর করতে হতো। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মা'আরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً দৃশ্যমান জনপদ বলা হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোনো মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোনো জনপদে পৌঁছে নিয়মত খাদ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতঃপর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য বস্তিতে পৌঁছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ। বাক্যের অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে পৌঁছা যেত।

قَوْلُهُ فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ............ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ : অর্থাৎ জালিমরা আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত নিয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক। যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনোরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না ও সালওয়া রিজিক হিসাবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারি দান করুন। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বাঁধভাঙ্গা বন্যার শাস্তি দেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্বর্যের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

مَزَّقْنَاهُمْ শব্দটি تَمْزِيْق থেকে উদ্ভূত। অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ মা'আরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলত تَفَرَّقُوْا اَيَادِيْ سَبَا অর্থাৎ তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ইবনে কাসীর প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদীর নাতিদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আজাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি সব বিক্রয় করে দিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার করায়ত্ব হয়ে গেলে সে তাঁর সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বন্যা ও আজাব সম্পর্কে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাঁচতে চাইলে অবিলম্বে এখান থেকে সরে যাও। সে আরও বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আম্মানে চলে যাও, যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুর্সরা নামক স্থানে গিয়ে বসবার কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদিনায় স্থানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। তার সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইযদ গোত্র আম্মানে, গাসসান গোত্র বসরায় এবং আউস, খাযরাজ ও বনূ উসমান মদিনায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। বাতনেমূর নামক স্থানে পৌছে বনূ উসমান সেখানেই থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় খুযায়া। আউস ও খাযরাজ মদিনায় পৌছে সেখানে বসতি স্থাপন করল। ইবনে কাসীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, এভাবে সাবা সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা مَزَّقْنَاهَا বাক্যে বিধৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : অর্থাৎ সাবা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোনো নিয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহর শোকর আদায় করে। এভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই উপকার লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে আদেশই জারি করেন, সব মঙ্গলেই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোনো নিয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তাঁর পরকালের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোনো কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও ছওয়াব সে পায়। ফলে বিপদেও তাঁর জন্য উপকারী হয়ে যায়। -[ইবনে কাসীর]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ صَبَّارٌ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন, যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী মুমিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٢. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِكُفَّارِ مَكَّةَ ادْعُوا الَّذِيْنَ
زَعَمْتُمْ اَىْ زَعَمْتُمُوْهُمْ اٰلِهَةً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج
اَىْ غَيْرِهِ لِيَنْفَعُوْكُمْ بِزَعْمِكُمْ قَالَ تَعَالٰى
فِيْهِمْ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ وَزْنَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ
اَوْ شَرٍّ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ
فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ شِرْكَةٍ وَمَا لَهُ تَعَالٰى
مِنْهُمْ مِنَ الْاٰلِهَةِ مِنْ ظَهِيْرٍ مُعِيْنٍ.

২২. হে মুহাম্মদ! মক্কার কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা তাঁদেরকে আহ্বান কর যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা মাবুদ মনে করতে, তোমাদের ধারণা মতে তোমাদেরকে উপকার করার জন্যে। আল্লাহ বলেন, তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ কোনো কিছুর ভালো ও মন্দের মালিক নয়। এতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের মাবুদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়।

٢٣. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ تَعَالٰى رَدًّا
لِقَوْلِهِمْ اَنَّ اٰلِهَتَهُمْ تَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا لِمَنْ
اَذِنَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا لَهُ ج فِيْهَا حَتّٰى
اِذَا فُزِّعَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ عَنْ
قُلُوْبِهِمْ كُشِفَ عَنْهَا الْفَزَعُ بِالْاِذْنِ فِيْهَا
قَالُوْا قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اِسْتِبْشَارًا مَاذَا
قَالَ رَبُّكُمْ ط فِيْهَا قَالُوا الْقَوْلَ الْحَقَّ ج اَىْ
قَدْ اَذِنَ فِيْهَا وَهُوَ الْعَلِىُّ فَوْقَ خَلْقِهِ
بِالْقَهْرِ الْكَبِيْرُ الْعَظِيْمُ.

২৩. যার জন্যে অনুমতি হয় সে ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না। তাদের উক্তি "নিশ্চয় তাদের মাবুদসমূহ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে" খণ্ডন করা হয়েছে। اَذِنَ ফে'লটি مَعْرُوْف ও مَجْهُوْل উভয়ভাবে পড়াবে যা যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হবে তখন তারা পরস্পর বলবে فُزِّعَ ফে'লটি مَعْرُوْف ও مَجْهُوْل উভয়ভাবে পড়া যাবে। অর্থাৎ যখন অনুমতি দানে তাদের অন্তর থেকে সংকোচ দূর হবে তখন তারা সুসংবাদের আশায় পরস্পরে বলবে তোমাদের পালনকর্তা কি বললেন? তারা বলবে, তিনি সত্য বলেছেন অর্থাৎ সুপারিশের অনুমতি প্রদান করেছেন এবং তিনি সবার উপরে মহান। তার সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান হিসেবে।

٢٤. قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ الْمَطَرِ
وَالْاَرْضِ ط اَلنَّبَاتِ قُلِ اللّٰهُ لا اِنْ لَمْ يَقُوْلُوْهُ لَا
جَوَابَ غَيْرُهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ اَىْ اَحَدَ الْفَرِيْقَيْنِ
لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ فِى
الْاِبْهَامِ تَلَطُّفٌ بِهِمْ دَاعٍ اِلَى الْاِيْمَانِ اِذَا وُفِّقُوْا لَهُ.

২৪. বলুন! নভোমণ্ডল সৃষ্টি ও ভূমণ্ডল শষ্য থেকে কে তোমাদেরকে রিজিক দান করেন? যদি তারা উত্তর না দেয় তাহলে আপনি নিজেই উত্তর দিন বলুন, আল্লাহ। কেননা এটা ব্যতীত অন্য কোনো উত্তর নেই আমরা অথবা তোমরা দুদল থেকে কোনো একদল সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ? এখানে বাক্যটি অস্পষ্ট হিসেবে তাদের প্রতি নরমসুর ও ঈমানের দিকে আহ্বান উদ্দেশ্য, যখন তাদের ঈমানের তাওফীক হয়।

٢٥. قُلْ لَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا اَذْنَبْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ لِاَنَّا بَرِيْئُوْنَ مِنْكُمْ .

২৫. বলুন, আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবো না। কেননা আমরা তোমাদের কৃতকর্ম থেকে পবিত্র।

٢٦. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَفْتَحُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط فَيُدْخِلُ الْمُحِقِّيْنَ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلِيْنَ النَّارَ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْحَاكِمُ الْعَلِيْمُ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ .

২৬. বলুন, আমাদের পালনকর্তা কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। অতএব মুমিনদেরকে জান্নাতে আর কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তিনি ফয়সালাকারী, তার বিচারকার্যে সর্বজ্ঞ।

٢٧. قُلْ اَرُوْنِىَ اَعْلِمُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ فِى الْعِبَادَةِ كَلَّا ط رَدْعٌ لَهُمْ عَنْ اِعْتِقَادِ شَرِيْكٍ لَهُ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ تَدْبِيْرِهِ لِخَلْقِهِ فَلَا يَكُوْنُ لَهُ شَرِيْكٌ فِىْ مُلْكِهِ .

২৭. বলুন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে ইবাদতে অংশীদাররূপে সংযুক্ত করেছ তাদেরকে এনে আমাকে দেখাও। কখনো না, এটা কাফেরদের প্রতি তাদের শিরকের আক্বীদার উপর ধমক বরং তিনিই ইনশাআল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় অতএব তার রাজত্বে কেউ তার সাথে শরিক হতে পারে না।

٢٨. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً حَالٌ مِنَ النَّاسِ قُدِّمَ لِلْاِهْتِمَامِ بِهِ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا مُبَشِّرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا مُنْذِرًا لِلْكَافِرِيْنَ بِالْعَذَابِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

২৮. আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা মুমিনদের জন্যে জাহান্নাতের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কাফেরদের জন্যে আজাবের সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি [كَافَّةً শব্দটি اَلنَّاسَ থেকে حَالٌ বিশেষ গুরুত্বের জন্য حَالٌ কে আগে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আধিকাংশ মানুষ মক্কার কাফেরগণ তা জানে না।

٢٩. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْعَذَابِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ .

২৯. তারা বলে, তোমরা যদি এতে সত্যবাদী হও, তবে বল, এ আজাবের ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে?

٣٠. قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ .

৩০. বলুন! তোমাদের জন্যে একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে যাকে তোমরা এক মুহূর্ত ও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না। এটাই হলো কিয়ামতের দিবস।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ زَعَمْتُمُوْهُمْ اٰلِهَةً : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, زعمتم -এর উভয় মাফউল مَوْصُوْل بَاصِلَه দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে উহ্য রয়েছে। প্রথম মাফউলকে ফেলে দিয়েছে আর দ্বিতীয় মাফউল তথা اٰلِهَةٌ কে صِفَتٌ অর্থাৎ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ফেলে দিয়েছে। প্রথম মাফউল হলো هُمْ আর দ্বিতীয় মাফউল হলো اٰلِهَةٌ

قَوْلُهُ لِيَنْفَعُوْكُمْ : এটা اُدْعُوْا -এর مُتَعَلِّقْ অর্থাৎ اُدْعُوْا لِيَكْشِفُوْا عَنْكُمُ الضُّرَّ

قَوْلُهُ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ : এখানে مَا হলো نَافِيَهٌ আর لَهُمْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ , مِنْ হলো অতিরিক্ত شِرْكٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ শাব্দিকভাবে مَجْرُوْرْ তবে مَحَلًّا مَرْفُوْعْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فُزِّعَ مَبْنِى لِلْمَفْعُوْلِ : অর্থাৎ তাদের হৃদয়ের ভয় দূর করে দিয়েছেন تَضْعِيْف টা سَلْب-এর জন্য হয়েছে। বলা হয় قَرَّدْتُ الْبَعِيْرَ অর্থাৎ اَزَلْتُ قِرَادَهٗ আমি উটের রক্ত খেকো কীট দূর করে দিয়েছি।

قَوْلُهُ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فِيْهَا : অর্থাৎ فِى الشَّفَاعَةِ

قَوْلُهُ الْقَوْلَ الْحَقَّ : এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْحَقَّ হলো উহ্য মাসদারের সিফত।

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُ : এখানে اَللّٰهُ হলো মুবতাদা يَرْزُقُنَا হলো তার খবর যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ اَرُوْنِىَ اَعْلِمُوْنِىْ : এতে একটি কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, رُؤْيَتْ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো رُؤْيَتْ قَلْبِيَّهْ এবং مُتَعَدِّىْ بِدُوْمَفْعُوْل হয়েছে। যখন তার শুরুতে هَمْزَهْ নেওয়া হয়েছে তখন مُتَعَدِّىْ بِسِهْ مَفْعُوْل হয়ে গেছে। প্রথম মাফউল হলো اَرُوْنِىْ -এর ى দ্বিতীয় মাফউল اِسْمِ مَوْصُوْل আর তৃতীয় হলো شُرَكَاءَ صِلَهْ -এর ضَمِيْر عَائِدْ যা উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اَلْحَقْتُمُوْهُمْ

قَوْلُهُ كَافَّةً : অর্থাৎ جَمِيْعًا টা اَرْسَلْنٰكَ -এর كَاف থেকে حَالْ হয়েছে অর্থাৎ اَرْسَلْنٰكَ جَامِعًا لِلنَّاسِ فِى الْاِنْذَارِ والابلاغ আর ة হলো মুবালাগার জন্য যেমন عَلَّامَةٌ -এর মধ্যে ة মুবালাগার জন্য হয়েছে। আর كَافَّةً لِلنَّاسِ থেকে حَالْ مُقَدَّمْ হতে পারে অর্থাৎ كَافَّةً لِلنَّاسِ এটা হলো সে সকল লোকদের নিকট যারা جَارْ مَجْرُوْرْ -এর حَالْ -এর উপর مُقَدَّمْ করা জায়েজ মনে করেন। তা ছাড়া উহ্য মাসদারের صِفَتْ ও হতে পারে অর্থাৎ اِرْسَالَةً كَافَّةً لِلنَّاسِ

قَوْلُهُ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا : এই দুটি اَرْسَلْنٰكَ -এর كَاف থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ : -এর মধ্যে لَكُمْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ আর مِيْعَادُ يَوْمٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে সাবা জাতির অবাধ্যতা এবং শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতে মুশরিকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বলে তৌহীদের যৌক্তিকতা বর্ণিত হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বিপদমুহূর্তে এক আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে শরিক করছো, তারা তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। ইরশাদ হয়েছে, ...قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ হে রাসূল! আপনি বলুন, তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে ডাক, আসমান জমিনে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়; আসমান জমিনে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ সহায়কও নেই। অতএব এরা কখনো তোমাদের কোনো উপকার আসতে পারবে না, কেননা তাদের নিকট সামন্যতম ক্ষমতাও নেই। তাই তারা তোমাদের কোনো প্রকার উপকারে আসবেনা, কোনো প্রকার ক্ষতি থেকেও তারা তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা। কেননা আসমান জমিনের কোনো কিছুর উপর তাদের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই। তারা কারো সহায়কও হতে পারেনা; তারা নিজেরাই অসহায়, অতএব তারা কারো উপাস্য হতে পারেনা। এমন অবস্থায় তাদেরকে 'উপাস্য' মনে করে ডাকা এবং তাদের নিকট কোনো প্রকার আশা পোষণ করা নিতান্ত বোকামি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূলত : এ আয়াতে কাফের মুশরিক বেদ্বীনদেরকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যে সব হীন বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মনে কর তাদেরকে ডাক দিয়ে দেখ তারা জবাব দেয় কি না? তোমাদের কোনো উপকারে আসে কিনা? তাদেরকে ডাকলে তোমরা উপলব্ধি করবে যে, তারা সম্পূর্ণ অসহায়, আসমান জমিনে কোথাও তাদের সামান্যতম ক্ষমতাও নেই, অতএব কোন যুক্তিতে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ পাকের সাথে শরিক কর? যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর কোনো শরিক নেই, যাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই, যাঁর কোনো উজির নেই, যাঁর কোনো পরামর্শদাতা নেই, যিনি কোনো সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী নন। অতএব, পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর উদ্ধৃত রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোনো আদেশ জারি করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে [এবং সংজ্ঞাহীনের মতো হয়ে যায়।] অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতার ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারি করেছেন।

মুসলিম উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যখন কোনো আদশে দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। তাদের তাসবীহ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠ করে। অতঃপর তাদের তাসবীহ শুনে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করে। এ ভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ পাঠে রত হয়ে যায়। অতঃপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নিচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌছে যায়। -[মাযহারী]

বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা :

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ এতে মুশরিক ও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কুরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তাবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিতর্ককারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোনো সমঝদার ব্যক্তি তাওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তাওহীদপন্থি ও শিরকপন্থি উভয়কে সত্যপন্থি আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্য পথে ও অপর দল ভ্রান্ত পথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফের ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাকে কঠোর প্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়।

-[কুরতুবী, বয়ানুল কুরআন]

আলেমগণের উচিত এই পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত, উপদেশ ও বিতের্কর পন্থাটি সদাসর্বদা সামনে রাখা। এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও তাদের পথভ্রষ্টতা আরও পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের এবং আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلَهُ كَافَّةً لِلنَّاسِ : كَافَّةً শব্দটি আরবি বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে শামিল করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোনো ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্য প্রকরণে শব্দটি حَالٌ বিধায় لِلنَّاسِ كَافَّةً বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে প্রেরিত পয়গাম্বরগণের রিসালত ও নবুয়ত বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল। এটা শেষ নবী রাসূলে কারীম ﷺ -এরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক। কেবল মানবজাতিই নয়, জিনদেরও তিনি রাসূল। তাঁর রিসালত শুধু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলিল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরিয়ত ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শরিয়ত ও স্বীয় কিতাব কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোনো নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই।

বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো পয়গাম্বরকে দান করা হয়নি। **এক.** আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে। **দুই.** আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। [পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়ত ইবাদতে নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা উপাসনালয়েই হতো; ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হতো না। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামাজ আদায় করতে পারবে। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূপৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা অজুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।] **তিন.** আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোনো উম্মতের জন্য এরূপ সম্পদ হালাল ছিল না। [তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফেরদের যে সম্পদ হস্তগত হবে, তা একত্রিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দিবে। সেখানে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুরআন বর্ণিত নীতি অনুযায়ী বন্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েজ করা হয়েছে।] **চার.** আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে [অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোনো পয়গম্বর সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে]। **পাঁচ.** আমার পূর্বে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣١. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ط اَىْ تَقَدَّمَهُ كَالتَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ الدَّالَّيْنِ عَلَى الْبَعْثِ لِاِنْكَارِهِمْ لَهُ قَالَ تَعَالٰى فِيْهِمْ وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ن الْقَوْلَ ج يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا الْاَتْبَاعُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا الرُّؤَسَاءُ لَوْلَا اَنْتُمْ صَدَدْتُمُوْنَا عَنِ الْاِيْمَانِ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ بِالنَّبِىِّ .

অনুবাদ :

৩১. মক্কাবাসীদের মধ্যে যারা কাফের তারা বলে, আমরা কখনো এ কুরআনে বিশ্বাস করব না, এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবেও নয়। যেমন তাওরাত ও ইঞ্জিল যা পুনরুত্থানের প্রমাণ বহন করে কেননা তারা এটার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন, হে মুহাম্মদ আপনি যদি পাপিষ্ট কাফেরদেরকে দেখতেন, যখন তাদেরকে পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো অনুগত ব্যক্তি তারা অহংকারীদেরকে নেতাদেরকে বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই নবীর প্রতি মুমিন হতাম। তোমরা আমাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছ।

٣٢. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ لَا بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ

৩২. অহংকারীরা দুর্বলদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে হেদায়েত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম? [না] বরং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী নিজেদের প্রতি।

٣٣. وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَىْ مَكْرٌ فِيْهِمَا مِنْكُمْ بِنَا اِذْ تَامُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا ط شُرَكَاءَ وَاَسَرُّوْا اَىِ الْفَرِيْقَانِ النَّدَامَةَ عَلٰى تَرْكِ الْاِيْمَانِ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ط اَىْ اَخْفَاهَا كُلٌّ عَنْ رَفِيْقِهِ مَخَافَةَ التَّعْيِيْرِ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط فِى النَّارِ هَلْ مَا يُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فِى الدُّنْيَا .

৩৩. দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি আমাদের প্রতি চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তার অংশীদার সাব্যস্ত করি। যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন উভয়দল তাদের ঈমান না আনার কৃতকর্মের অনুতাপ অন্তরে গোপন করবে। প্রত্যেক দলেই তার বিপক্ষের কাছে লজ্জা পাওয়ার ভয়ে নিজের অনুতাপ নিজের অন্তরে রাখবে। বস্তুত : আমি কাফেরদের গলায় জাহান্নামে বেড়ি পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা দুনিয়াতে তারা করত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٤. وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا رُؤَسَاءُهَا الْمُتَنَعِّمُوْنَ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ـ

৩৪. কোনো জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তার বিত্তশালী নেতাগণ বলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।

٣٥. وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا مِمَّنْ اٰمَنَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ـ

৩৫. তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ ঈমানদার থেকে সুতরাং আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না।

٣٦. قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِمْتِحَانًا وَّيَقْدِرُ يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِبْتِلَاءً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ـ

৩৬. বলুন! আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন পরীক্ষামূলক এবং যাকে ইচ্ছা পরিমিত দেন পরীক্ষার জন্যে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মক্কার কাফেরগণ তা বোঝেনা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَى : لَوْ-এর জবাব এবং تَرٰى মাফউল উহ্য রয়েছে উহ্য ইবারত হলো- وَلَوْ تَرٰى حَالَ الظّٰلِمِيْنَ وَقْتَ وُقُوْفِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَرَاَيْتَ اَمْرًا فَظِيْعًا এখানে حَالَ হলো মাফউল আর لَرَاَيْتَ الخ হলো جَوَابُ لَوْ

قَوْلُهُ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ : এটা تَرٰى-এর ظَرْف হয়েছে।

قَوْلُهُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ : এটা مَوْقُوْفُوْنَ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا : এটা يَرْجِعُ-এর তাফসীর হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْلَا : এটা মুবতাদা, এর খবর উহ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকার স্বীয় উক্তি صَدَدْتُمُوْنَا দ্বারা উহ্য খবরের প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ হলো لَوْلَا-এর জবাব।

قَوْلُهُ اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ : এর পরে ব্যাখ্যাকার لا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَنَحْنُ-এর মধ্যে হামযাটা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ-এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ : এখানে مَكْرٌ টা উহ্য ফে'লের ফায়েল হয়েছে উহ্য ইবারত হলো بَلْ صَدَّنَا مَكْرُكُمْ بِنَا فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ; مَكْرُكُمْ-এর كُمْ এর মুযাফ ইলাইহিকে حَذْفْ করে দিয়েছেন এবং اِتِّسَاعًا যরফকে مُضَافْ اِلَيْهِ-এর স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا : এটা مَكْر-এর যরফ হয়েছে অর্থাৎ مَكْرُكُمْ وَقْتَ اَمْرِكُمْ لَنَا

قَوْلُهُ اِلَّا قَالُوْا مُتْرَفُوْهَا : এটা قَرْيَةٌ হতে حَالٌ হয়েছে قَرْيَةٌ যদিও نَكِرَةٌ যেহেতু এটা سِيَاقْ نَفِىْ তে পতিত হয়েছে তাই ذُوالْحَالِ হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مُتْرَفُوْهَا : মূলে ছিল مُتْرَفُوْنَ بِهَا ইযাফতের কারণে نُوْن টি পড়ে গেছে, এটা اِتْرَافٌ মাসদার থেকে اِسْم مَفْعُوْل -এর جَمْع مُذَكَّر -এর সীগাহ। অর্থ পরিতৃপ্ত, স্বচ্ছন্নশীল ব্যক্তিবর্গ।

قَوْلُهُ بِمَآ اُرْسِلْتُمْ : এটা كَافِرُوْنَ থেকে مُتَعَلِّقْ হয়েছে, গুরুত্ব এবং رِعَايَتْ فَوَاصِلْ -এর কারণে مُقَدَّمْ করে দেওয়া হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- كَافِرُوْنَ بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ : অর্থাৎ যারা কাফের তাদেরকে যখন কিয়ামতের দিনের কথা, হিসাব নিকাশের কথা বলা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এই কিতাব কুরআনে কারীমকে মানিনা, এ কিতাবে আখেরাতের এবং কিয়ামতের দিনের কথা রয়েছে। শুধু এ কিতাবই নয়; বরং ইতিপূর্বে যে সব আসমানি গ্রন্থ নাজিল হয়েছে যেমন, তৌরাত ও ইঞ্জিল, সেগুলোও আমরা মানিনা। আর কখনো মানবো না বলে তারা সংকল্প করে। কেননা এসব গ্রন্থে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের কথা রয়েছে, শিরকের নিন্দা রয়েছে। অতএব পবিত্র কুরআন বা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ সব আসমানি গ্রন্থই আমাদের নিকট সমান।

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা শুধু যে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতকে অস্বীকার করতো তাই নয়; বরং তারা কারো নবুয়তকেই মেনে নিতে রাজি ছিলনা। এর পাশাপাশি তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও তাহীদেও বিশ্বাস করতো না। পবিত্র কুরআনের সত্যতার অগণিত দলিল প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না। আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে তাদের এ চরমে ধৃষ্টতার জবাব এভাবে ইরশাদ করেছেন- وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلِ ۚ [হে রাসূল!] যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন এ জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের দরবারে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে'।

কাফেরদের চিৎকার এবং আস্ফালন দুনিয়ার এ জীবন পর্যন্তই সীমিত। এরপর শুরু হবে তাদের চরম দুর্গতি। হে রাসূল! আপনি তাদের সে অসহায় অবস্থা দেখতেন, যখন এ পাপীষ্ঠদেরকে হিসাব নিকাশের জন্যে কিয়ামতের কঠিন দিনে তাদের প্রতিপালকের মহান দরবারে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো মানুষ যদি নিরাশ এবং অসহায় হয়ে পড়ে তখন সে তাদের নিজের দোষ অপরের উপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চায়, কিয়ামতের কঠিন দিনে কাফেররাও অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করবে অর্থাৎ তাদের নিজেদের দোষের জন্যে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকবে। নিজেদের পাপাচারের জন্যে অন্যকে দায়ী করতে থাকবে।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা দুর্বল ছিল এবং ছোট বলে পরিগণিত ছিল, তাদেরকে বড়দের কথা মেনে চলতে হতো, তারা তাদের মাতব্বর এবং সমাজপতিদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, 'শুধু তোমাদের জন্যেই আজ আমাদের এ দুদর্শা, তোমাদের কারণেই আমাদের এই বিপদ, দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের কথা মেনেছিলাম, তাই আজ তাঁর প্রতি ঈমান এনে তথা মুমিন হয়ে জীবনকে ধন্য করতাম'।

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ.................. بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ : অর্থাৎ তথাকথিত নেতারা তাদের অনুসারীদের কথার জবাবে বলবে, 'দুনিয়ার জীবন তোমাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও তোমরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছো, তোমরা ইচ্ছা করলেই তা গ্রহণ করতে পারতে, সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমরা তোমাদেরকে কখনও বাধ্য করিনি, তোমরা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে সত্যকে বর্জন করেছ এবং আজ আমাদের প্রতি দোষারোপ করছো, আমাদেরকে দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা তোমরা ইচ্ছা করলেই আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীর অনুসরণ করতে পারতে, কিন্তু তা করনি। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমরা আদতেই ছিল অপরাধী। আর সে অপরাধের শাস্তি অবশ্যই তেমাদেরকে ভোগ করতে হবে'।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করতো এবং কিয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করতো। আর এ আয়াতে সে সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা অর্থ-সম্পদের মোহ মায়ায় মুগ্ধ থাকার কারণে সত্যকে প্রত্যাখান করতো। অর্থ সম্পদ এবং ক্ষমতার কারণে তারা অহংকার করতো এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার গর্বে এতটা মেতে থাকতো যে, তারা আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতো না, তারা ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অহংকারে এত অন্ধ হয়ে পড়তো যে, সমাজের দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষের সঙ্গে তারা একসঙ্গে বসতেও রাজি হতো না।

শানে নুযূল : ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম সুফিয়ান আসেমের সূত্রে আবূ রাযীনের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কা শহরে দু'ব্যক্তি [ব্যবসা-বাণিজ্যে] অংশীদার ছিল। একজন সিরিয়া গমন করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মক্কায় রয়ে গেল। যখন প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাব হয়, তখন মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি তার সিরিয়াগামী অংশীদারকে এ খবর লিখে জানিয়ে দেয়। ঐ ব্যক্তি সিরিয়া থেকে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে লিখল, যিনি নবুয়তের দাবি করেছেন, তাঁর কি অবস্থা হয়েছে? তখন মক্কায় অবস্থানকারী ব্যক্তি লিখল যে, নিচু শ্রেণির দারিদ্র্য-প্রপীড়িত কিছু লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে। এ খবর পাওয়া মাত্র সে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে অনতিবিলম্বে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল এবং তার বন্ধুকে বলল, 'আমাকে ঐ ব্যক্তির ঠিকানা দাও'। এ ব্যক্তি পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব পাঠ করেছিল। এরপর সে রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো এবং জিজ্ঞাসা করল যে আপনি কি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন? রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে জবাব দিলেন। ঐ ব্যক্তি জবাব শ্রবণ মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল, 'আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ পাকের রাসূল', রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিভাবে এ সত্য অবগত হলে'? তখন তিনি বললেন, 'ইতিপূর্বে যে নবীই প্রেরিত হয়েছেন নিচু এবং দরিদ্র শ্রেণির লোকেরাই তাঁর অনুসারী হয়েছেন', তখন এ আয়াত নাজিল হয়। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দু) , পারা . পৃ. ৬০ তাফসীরে মাযহারী , খ. ৯. পৃ. ৪৮০,২৯-২২]

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে প্রিয়নী ﷺ -কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এ মর্মে যে [হে রাসূল!] মক্কার সমৃদ্ধশালী লোকেরা আপনার বিরোধিতা করছে , এজন্যে আপনি ব্যথিত, মর্মাহত হবেননা। কেননা এটি নতুন কিছু নয়, ইতিপূর্বে আল্লাহ পাক যখনই কোনো নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তখনই সমৃদ্ধশালী লোকেরা এবং সমাজপতিরা তাঁদের বিরোধিতা করেছে, তাদের ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার গর্বে তারা এমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলে, তখন সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির লোকেরাই নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছিল।

সমৃদ্ধশালী কাফেররা তাদের স্বপক্ষে যে বক্তব্য পেশ করতো, পরবর্তী আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ 'আর তারা আরো বলেছে, 'আমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি, এবং কখনো আমাদেরকে আজাব দেওয়া হবেনা, অর্থাৎ তারা বলতো, যদি আমরা পথভ্রষ্ট হতাম, আল্লাহ পাকের অপ্রিয় হতাম, তবে তিনি আমাদেরকে কখনও এত ধন-সম্পদ, এত সন্তান-সন্ততি এবং এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করতেন না, তাঁর এসব নিয়ামত একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আমরা ভুল পথে নেই; বরং আমরা সঠিক পথেই রয়েছি। আমরা তাঁর প্রিয় এবং পছন্দনীয়, আমাদের সম্মান এবং মর্যাদা একথারই প্রমাণ যে, আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা অতি সম্মানিত, আর এ কারণেই আখেরাতে আমাদেরকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, কেননা আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যাকে সম্মানিত করেছেন, আখেরাতে তাকে অপমানিত করবেন না।

ধনবল বা জনবল বড় কথা নয় : আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে দূরাত্মা কাফের মুশরিকরা মানুষের ধনবল এবং জনবলকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে বড় বিষয় মনে করতো, শুধু তাই নয়; তারা ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতাকে আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হওয়ার মানদণ্ডও মনে করতো। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা, এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নবী রাসূলগণ আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয়জন, অথচ, দু' একজন ব্যতীত তাঁদের কেউই ধন-সম্পদের অধিকারি ছিলেন না, একই অবস্থা আউলিয়ায়ে কেরামেরও, তাঁদের মধ্যে অতি সামন্য সংখ্যক লোক ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁরা ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করাও পছন্দ করতেন না। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল নবী কারীম ﷺ যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যিনি নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন তিনি কি ধনী ব্যক্তি ছিলেন? তাঁর স্ত্রী উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এ ইন্তেকাল হয়েছে অথচ তাঁর পরিবারবর্গ কখনও একাধারে দু'বেলা উদরপূর্ণ করে আহার করেননি'। অতএব, অর্থ সম্পদ আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় হওয়ার মানদণ্ড নয়, স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ' হে রাসূল! আপনার চক্ষু দ্বয় কখনো সেই সম্পদের দিকে প্রসারিত করবেন না, যা আমি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ তাদেরকে দান করেছি, এর দ্বারা আমি তাদের পরীক্ষা করতে চাই, আর আপনার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিজক উত্তম এবং স্থায়ী'।

আরো ইরশাদ হয়েছে, وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ –[সূরা তওবা, ১০, ৮৫]

'আর হে রাসূল! তাদের ধনশক্তি এবং জনশক্তি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহ পাক এর দ্বারা পার্থিব জীবনে তাদেরকে শাস্তি দিতে চান, আর কাফের অবস্থায় যেন তাদের প্রাণ বের হয়'। এমনিভাবে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ –[সূরা আলে ইমরান ৪, ১৯৬-৯৭]

'[হে রাসূ!] কাফেরদের দেশে বিদেশে অবাধে বিচরণ যেন কোনোভাবেই আপনাকে প্রতারিত না করে, এতো অত্যন্ত সামান্য সম্পদ, এরপর দোজখই হবে তাদের আবাসস্থল এবং কত নিকৃষ্ট সে আবাসস্থল'।

অতএব, একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কারো ধনবল বা জনবল আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হবার প্রমাণ নয়; বরং এটি বিপদেরও কারণ হতে পারে। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে। قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ 'হে রাসূল! আপনি বলুন আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তার রিজিক স্বচ্ছল করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পরিমিত আকারে জীবিকা দান করে থাকেন, তবে অনেক লোকেই তা জানেনা'।

বস্তুত : কারো রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা তার রিজিক বাড়িয়ে দেন আর যাকে ইচ্ছা তার রিজিক কমিয়ে দেন, তবে উভয় অবস্থাই হলো পরীক্ষামূলক। যার রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাকে পরীক্ষা করা হয় যে সে কৃতজ্ঞ হয় কি অকৃতজ্ঞ, আর যার রিজিক কমিয়ে দেওয়া হয় তাকে পরীক্ষা করা হয় যে সে সবর অবলম্বন করে কি-না।

নৈকট্য-ধন্য হবার মাধ্যম : এ পৃথিবী মানুষের জন্যে পরীক্ষাগার। প্রতিটি কথা ও কাজে মানুষের পরীক্ষা হয়। এ পৃথিবী মানুষের কর্মস্থল, তবে কর্মফল আখেরাতে, এখানে নয়। আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবার মাধ্যম হলো ঈমান ও নেক আমল, যাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ পাওয়া যাবে, তারা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে, আর যার মধ্যে ঈমান ও নেক আমল যত বেশি হবে, সে আল্লাহ পাকের দরবারে ততবেশি প্রিয় ও পছন্দনীয় হবে। ধনী বা নির্ধন হওয়া কখনও কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপকরণ নয়।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : 'কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা', তথা এ সত্য উপলব্ধি করেন, এজন্যে তারা ধনবল ও জনবলকে সম্মানের কারণ মনে করে এমনকি, আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় হওয়ার দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। রাসূলে কারীম ﷺ -ইরশাদ করেছেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের চেহারা এবং অর্থ-সম্পদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তোমাদের অন্তর এবং আমলের দিকে লক্ষ্য রাখেন'। –[মুসলিম শরীফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহর প্রিয়পত্র হওয়ার দলিল মনে করা ধোকা : পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদায় সত্যের বিরোধিতা এবং পয়গম্বর ও সৎ লোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থিদের মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দলিলও উপস্থাপন করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসনক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কুরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধরনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলিলের জওয়াব দান করা হয়েছে।

مُتْرَفٌ শব্দটি تَرَفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। مُتْرَفِيْنَ বলে বিত্তশালী সরদারকে বোঝানো হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মধ্যমে তাঁর মোকাবিলা করেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে : نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ অর্থাৎ আমরা ধনেজনে সব দিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আজাবে পতিত হবো না। [বাহ্যত তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩৭. وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى قُرْبٰى اَىْ تَقْرِيْبًا اِلَّا لٰكِنْ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا اَىْ جَزَاءُ الْعَمَلِ الْحَسَنَةِ مَثَلًا بِعَشْرٍ فَاَكْثَرَ وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِنُوْنَ مِنَ الْمَوْتِ وَغَيْرِه وَفِىْ قِرَاءَةٍ الْغُرْفَةِ وَهِىَ بِمَعْنَى الْجَمْعِ .

৩৮. وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِالْاِبْطَالِ مُعٰجِزِيْنَ لَنَا مُقَدِّرِيْنَ عِجْزَنَا وَاَنَّهُمْ يَفُوْتُوْنَنَا اُولٰۤئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ .

৩৯. قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِه اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ يُضَيِّقُهُ لَهٗ ط بَعْدَ الْبَسْطِ اَوْ لِمَنْ يَّشَاءُ اِبْتِلَاءً وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فِى الْخَيْرِ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ يُقَالُ كُلُّ اِنْسَانٍ يَرْزُقُ عَائِلَتَهٗ اَىْ مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ .

৪০. وَاذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا اَلْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اَهٰۤؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الْاُوْلٰى يَاءً وَاِسْقَاطِهَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ .

অনুবাদ :

৩৭. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে। অর্থাৎ সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ বা এর অধিক এবং তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। মৃত্যু ইত্যাদি থেকে, অন্য ক্বেরাতে اَلْغُرْفَةُ একবচন যা বহুবচনের অর্থ প্রদান করে।

৩৮. যারা আমার আয়াতসমূহকে কুরআনকে বাতিল করেব ব্যর্থ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় তারা মনে করে তারা আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে তাদেরকে আজাবে উপস্থি করা হবে।

৩৯. বলুন! আমার পালনকর্তা তা'র বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন পরীক্ষামূলক এবং বাড়ানোর পর তাকে সীমিত পরিমাণে দেন অথবা যাকে ইচ্ছা সীমিত পরিমাণ দেন পরীক্ষার জন্যে তোমরা যা কিছু ব্যয় কর সৎপথে, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিজিকদাতা বর্ণিত আছে যে, মানুষ আল্লাহর রিজিক থেকে তার পরিবার পরিজনকে রিজিক দেয়।

৪০. তুমি উল্লেখ কর যেদিন তিনি তাদের মুশরিকদের সবাইকে একত্রিত করবেন অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? اَهٰۤؤُلَاۤءِ اِيَّاكُمْ-এর মধ্যে দুই হামযার বা প্রথম হামযা ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে বা বিলুপ্ত করে পড়বে।

٤١ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ الشَّرِيْكِ
اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ج اَىْ لَا مُوَالَاةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ مِنْ جِهَتِنَا بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ كَانُوْا
يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ج الشَّيٰطِيْنَ اَىْ يُطِيْعُوْنَهُمْ
فِىْ عِبَادَتِهِمْ اِيَّانَا اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ
مُصَدِّقُوْنَ فِيْمَا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ ـ

৪১. ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র শিরক থেকে আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয় অর্থাৎ আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বরং তারা জিনদের শয়তানদের পূজা করত অর্থাৎ তারা আমার ইবাদতে শয়তানের আনুগত্য করত তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী অর্থাৎ শয়তান যা বলে তাতে বিশ্বাস করে।

٤٢ قَالَ تَعَالٰى فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ اَىْ بَعْضُ الْمَعْبُوْدِيْنَ لِبَعْضِ
الْعَابِدِيْنَ نَفْعًا شَفَاعَةً وَّلَا ضَرًّا ط تَعْذِيْبًا
وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ
النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ـ

৪২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের এক মাবুদ অন্য মাবুদের কোনো উপকার ও অপকার সুপারিশ ও শাস্তি করার অধিকারী হবে না। আর আমি জালেমদেরকে কাফেরদের বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।

٤٣ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ
بَيِّنٰتٍ وَاضِحَاتٍ بِلِسَانِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا
كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ج مِنَ الْاَصْنَامِ وَقَالُوْا مَا
هٰذَا اَىِ الْقُرْاٰنُ اِلَّاۤ اِفْكٌ كَذِبٌ مُّفْتَرًى ط عَلَى
اللّٰهِ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ الْقُرْاٰنِ لَمَّا
جَآءَهُمْ اِنْ مَا هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ ـ

৪৩. যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মদের ভাষায় আয়াত কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার মূর্তিসমূহ ইবাদত করত এ লোকটি তা থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এই কুরআন আল্লাহর নামে মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর সত্য কুরআন অস্বীকার কারীগণ বলে, যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করে এতো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছুই না।

٤٤ قَالَ تَعَالٰى وَمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ
يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ
نَّذِيْرٍ فَمِنْ اَيْنَ كَذَّبُوْكَ ـ

৪৪. আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেনি। অতএব, তারা কিভাবে আপনাকে অস্বীকার করবে?

Free @ www.eIlm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٥. وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ لا وَمَا بَلَغُوْا اَىْ هٰؤُلَاءِ مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ وَطُوْلِ الْعُمُرِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ نف اِلَيْهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ اِنْكَارِىْ عَلَيْهِمْ بِالْعُقُوْبَةِ وَالْاِهْلَاكِ اَىْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ.

৪৫. তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম শক্তি, সম্পদের প্রাচুর্যতা ও অধিক হায়াত ইত্যাদি এরা তার এক দশমাংশ ও পায়নি। এরপরও তারা তাদের প্রতি প্রেরিত আমার রাসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি। অর্থাৎ আমার শাস্তি উপযুক্ত ব্যক্তির জন্যে হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى : وَمَا اَمْوَالكم হলো جُمْلَه مُسْتَانِفَه যা পূর্বের اِسْم مَعْطُوف এবং تَقْرِير -এর জন্য নেওয়া হয়েছে। আর مَا হলো مُشَابَه بِلَيْسَ আর اَمْوَالُكُمْ আর স্বীয় সহ তার تَحْقِيْق আর মওসূল সেলাহ মিলে بِالَّتِىْ এবং اَمْوَالُ এবং اَوْلَادُ এর সিফত। যদি صِفَتْ ও مَوْصُوْف-এর মধ্যে প্রকাশ্য ও কোনো مُطَابَقَتْ নেই কিন্তু যেহেতু جَمْع تَكْسِيْر চাই তা ذَوِى الْعُقُوْلِ হোক বা غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ - এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর হুকুমে হয়ে থাকে। এই দিক থেকে মওসুফ-সিফতের মাঝে مُطَابَقَتْ রয়েছে। আবার এটাও হতে পারে যে, بِالَّتِىْ উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো بِالْاَحْوَالِ الَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ মুফাসসির (র.) زُلْفٰى-এর তাফসীর قُرْبٰى দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, زُلْفٰى হলো تُقَرِّبُكُمْ-এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِه অর্থাৎ تُقَرِّبُكُمْ تَقْرِيْبًا

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ : এটা اِسْم اِشَارَه মুবতাদা আর مُشَارٌ اِلَيْه আর اُولٰئِكَ হলো مَنْ এর- مَنْ اٰمَنَ আর مَنْ হলো مَنْ -এর বহুবচনের অর্থের হিসেবে। উভয় ফে'লকে مَنْ শাব্দিক দিকের প্রতি লক্ষ্য করে مُفْرَدْ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ : لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর جَزَاءُ الضِّعْفِ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّر جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে اُولٰئِكَ মুবতাদার খবর হয়েছে। اَلْغُرْفَةُ এক কেরাতে لَهُمُ الْجَزَاءُ الْمُضَاعَفُ অর্থাৎ اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ-এর অন্তর্গত এটা جَزَاءُ الضِّعْفِ রয়েছে, اَلِف لَامْ টা جِنْس-এর হওয়ার কারণে جَمْع-এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ مُقَدِّرِيْنَ عِجْزَنَا : অর্থাৎ مُتَعَقِّدِيْنَ اِنَّا عَاجِزُوْنَ فَلَا نَقْدِرُ عَلَيْهِمْ

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ الخ : এই আয়াতের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, এই আয়াতটি পূর্বের مُكَرَّرْ-تَاكِيْد-এর জন্য হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা প্রথমটার বিপরীত। প্রথমটি বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের জন্য অর্থাৎ কারো জীবিকায় প্রশস্ততা, কারো সংকীর্ণ করেন। আর এই আয়াত এক ব্যক্তির জন্য অর্থাৎ একই ব্যক্তির জীবিকা এক সময় প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং এক সময় সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত বস্তুর বদল এবং বিনিময় দান করেন।

قَوْلُهُ يُقَالُ كُلُّ اِنْسَانٍ يَرْزُقُ عَائِلَتَهُ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. হলো- رَازِقِيْنَ বহুবচন নেওয়া হয়েছে এর দ্বারা জানা যায় যে, رَازِقٌ [জীবিকা দাতা] অনেক। অথচ رَازِقٌ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

উত্তর. প্রকৃত রিজিক দাতা তো আল্লাহ। তা'আলাই যেহেতু বাহ্যত বান্দা আল্লাহর দেওয়া জীবিকা হতে স্বীয় পরিবার-পরিজন, চাকর বাকদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকেন এই জন্য বান্দাকেও রূপকভাবে رَازِقٌ বলে দেওয়া হয়। একারণেই বান্দাকে رَازِقٌ বলা যেতে পারে رَزَّاقٌ নয়। কেননা رَزَّاقٌ টা হলো اَسْمَاء حَسَنَه مُخْتَصَّه-এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ : اَكْثَرُهُمْ হলো মুবতাদা مُؤْمِنُوْنَ তার খবর بِهِمْ টা مُؤْمِنُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে এবং اَكْثَرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كُلّ

قَوْلُهُ نَقُوْلُ : এর عَطْف হলো لَا يَمْلِكُ -এর উপর

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে যমীর নেওয়াও যথেষ্ট হতো। কেননা কাফের ও মুশরিকদের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। অর্থাৎ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর পরিবর্তে وَقَالُوْا বলত। যেহেতু এতে তাদের صِفَت كُفْر কে প্রকাশ করার কারণে قَبَاحَتْ এবং شَنَاعَتْ বেশি এ কারণে اِسْم ضَمِيْر -এর পরিবর্তে اِسْم ظَاهِرْ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ الْمِعْشَارَ : অর্থাৎ দশম অংশ এখানে সীমাবদ্ধকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বল্পতার বিবরণ উদ্দেশ্য, যদি فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ -এর আতফ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ হয় তবে مَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَا اٰتَيْنَاهُمْ মাতূফ ও মা'তূফ আলাইহি এর মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَه হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ এবং مَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ الْاٰيَة এখানে পূর্বের نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا الخ আয়াতে উত্থিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলিল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলিল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছে اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক! [কখনই নয়।] বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বেখবর। [অর্থাৎ যে ধনসম্পদ ও সন্তাসন্ততি মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়, তা তার জন্য শাস্তিস্বরূপ]

অন্য এক আয়াতে আছে : فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ অর্থাৎ কাফেরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দেবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফের অবস্থায়ই বের হয়ে যাবে, যার ফলে হবে পরকালের চিরস্থায়ী আজাব। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে, নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, যার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী আজাব। অনেক ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই মাধ্যমে হাজারো বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শাস্তি ও আজাব তো এ জগৎ থেকেই শুরু হয়ে যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রূপ ও ধনসম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। -[আহমদ, ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ : এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহর প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। ضِعْف অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা পরকালে মুমিন ও সৎকর্মদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতিদান তার দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাতাশ গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত রয়েছে; বরং তার বেশিও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে غُرْفَةٌ বলে। এরই বহুবচন غُرُفَاتٌ –[মাযহারী]

قَوْلُهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ الخ : এ আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যত এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, এখানে مَنْ يَشَاءُ শব্দের পরে مِنْ عِبَادِهٖ এবং يَقْدِرُ শব্দের পরে لَهٗ অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। مِنْ عِبَادِهٖ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিনগণ যেন ধনসম্পদের মহব্বতে এমন ডুবে না যায় যে. আল্লাহ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফের ও মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলিল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি হয়নি।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিজিক বণ্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিজিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ একই ব্যক্তি কখনও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে يَقْدِرُ শব্দের পরে বর্ণিত لَهٗ সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে তারা বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়। মানুষ ও জীবজন্তু অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে। এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ভূগর্ভে কূপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা যতই ব্যয় করা হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহ্যত খাদ্য-খাবার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তৎস্থলে অন্য খাদ্য সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের যে উপাদানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মোটকথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে অন্য বস্তুকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহর নীতির পরিপন্থি নয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَاَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا অর্থাৎ হে আল্লাহ, যে ব্যয় করে, তাকে তার বিনিময় দান করে এবং যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট করে। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, আপনি মানুষের জন্য ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব।

যে ব্যয় শরিয়তসম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই : হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সংকাজ সদকা। মানুষ নিজেরও পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবের (রা.)-এর শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা। -[কুরতুবী]

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদন ও হ্রাস পায় : এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরবকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো জবাই করে গোশত খাওয়া হয়। কুরবানি, কাফফারা, মান্নত ইত্যাদিতে জবাই করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ তা'আলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নিচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যা বেশিই হওয়া উচিত। কারণ এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু-ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দুটি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই জবাই করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর-বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা জবাই না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে সওয়ারী ও মালপত্র পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কুরবানির মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশঙ্কা ব্যক্ত আজকাল যে, বিধর্মীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَابَلَغُوْا مِعْشَارَ مَا اٰتَيْنَاهُمْ : কারও মতে مِعْشَارَ শব্দের অর্থ عُشْر অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ। কারও মতে عُشْرُ الْعُشْرِ অর্থাৎ একশ' ভাগের এক ভাগ এবং কারও মতে عُشْرُ الْعَشِيْرِ অর্থাৎ এক হাজার ভাগের এক ভাগ। বলা বাহুল্য, শব্দটি عُشْر এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা অশুভ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা পয়গাম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আজাবে পতিত হয়েছিল এবং সেই আজাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধনৈশ্বর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোনো কাজেই আসেনি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٦. قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ج هِيَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ اَيْ لِاَجْلِهٖ مَثْنٰى اَيْ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وَفُرَادٰى اَيْ وَاحِدًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا قف فَتَعْلَمُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مُحَمَّدٍ مِّنْ جِنَّةٍ ط جُنُوْنٍ اِنْ مَا هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ قَبْلَ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فِي الْاٰخِرَةِ اِنْ عَصَيْتُمُوْهُ .

৪৬. বলুন! আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, এটা হলো তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর জন্যে দু'জন ও একজন করে দাঁড়াও অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর অতএব তোমরা জানতে পারবে যে, তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ মধ্যে কোনো উম্মাদনা নেই। তিনিতো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র। আখেরাতে যদি তোমরা তার নাফরমানি কর।

٤٧. قُلْ لَهُمْ مَا سَاَلْتُكُمْ عَلَى الْاِنْذَارِ وَالتَّبْلِيْغِ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ط اَيْ لَا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِيَ مَا ثَوَابِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ مُطَّلِعٌ يَعْلَمُ صِدْقِيْ .

৪৭. তাদেরকে বলুন, আমি তোমাদের কাছে এই দাওয়াত ও সতর্কতার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; বরং তা তোমরাই রাখ। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটার পারিশ্রমিক চাইব না আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। তিনি প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত তিনি অবগত ও আমার সত্যতা তিনি জানেন।

٤٨. قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ج يُلْقِيْهِ اِلٰى اَنْبِيَائِهٖ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا غَابَ عَنْ خَلْقِهٖ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .

৪৮. বলুন! আমার পালনকর্তা সত্য দীন তার নবীদের প্রতি অবতরণ করেছেন। তিনি আসমান জমিনের সৃষ্টিজীবের সকল অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন।

٤٩. قُلْ جَآءَ الْحَقُّ الْاِسْلَامُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ الْكُفْرُ وَمَا يُعِيْدُ اَيْ لَمْ يَبْقَ لَهٗ اَثَرٌ .

৪৯. বলুন, সত্য ইসলাম আগমন করেছে এবং অসত্য কুফর পারে না নতুন কিছু সৃজন করতে এবং পারে না পুনঃপ্রত্যাবর্তিত হতে। অর্থাৎ তার কোন নিশানা থাকবে না।

٥٠. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ عَنِ الْحَقِّ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ج اَيْ اِثْمُ ضَلَالِيْ عَلَيْهَا وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ط مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ لِلدُّعَاءِ قَرِيْبٌ .

৫০. বলুন! যদি আমি হক্ব থেকে পথভ্রষ্ট হই তাহলে নিজের ক্ষতির জন্যেই পথভ্রষ্ট হব। অর্থাৎ আমার পথভ্রষ্টতার পাপ আমার জন্য আর যদি আমি সৎপথ প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্যে সে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি ওহী কুরআন ও হিকমত প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি দোয়ার সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী।

Free @ www.eilm.weebly.com

٥١. وَلَوْ تَرٰى يَا مُحَمَّدُ اِذْ فَزِعُوْا عِنْدَ الْبَعْثِ لَرَأَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا فَلَا فَوْتَ لَهُمْ مِنَّا اَىْ لَا يَفُوْتُوْنَنَا وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ اَىِ الْقُبُوْرِ.

৫১. হে মুহাম্মদ যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে পুনরুত্থানের সময়, তখন আপনি ভয়াবহ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন অতঃপর তারা আমার কাছ থেকে পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান কবর থেকে ধরা পড়বে।

٥٢. وَقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ج اَىْ بِمُحَمَّدٍ اَوِ الْقُرْاٰنِ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ بِالْوَاوِ وَبِالْهَمْزَةِ بَدَلَهَا اَىْ تَنَاوُلَ الْاِيْمَانِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ عَنْ مَحَلِّهٖ اِذْهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَمَحَلُّهُ الدُّنْيَا.

৫২. তারা বলবে, আমরা সত্যের প্রতি অর্থাৎ মুহাম্মদ বা কুরআন বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এতদূর থেকে তার ঈমানের নাগাল পাবে কেমন করে? অর্থাৎ তারা যখন আখেরাতে আর ঈমানের স্থান দুনিয়াতে। اَلتَّنَاؤُشُ ও اَلتَّنَاوُشُ উভয়ভাবে পড়া যাবে।

٥٣. وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ج فِى الدُّنْيَا وَيَقْذِفُوْنَ يَرْمُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ اَىْ بِمَا غَابَ عِلْمُهُ عَنْهُمْ غَيْبَةً بَعِيْدَةً حَيْثُ قَالُوْا فِى النَّبِىِّ سَاحِرٌ شَاعِرٌ كَاهِنٌ وَفِى الْقُرْاٰنِ سِحْرٌ شِعْرٌ كَهَانَةٌ.

৫৩. অথচ তারা পূর্ব থেকে দুনিয়াতে সত্যকে অস্বীকার করছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। অর্থাৎ এমন মন্তব্য করতে যার জ্ঞান সম্পর্কে তারা অনেক দূরে। যেমন তারা নবী কারীম ﷺ সম্পর্কে বলত, তিনি জাদুকর, কবি ও গণক ইত্যাদি এবং কুরআন সম্পর্কে বলত, এটা জাদু, কবিতা ও গণনা ইত্যাদি।

٥٤. وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ مِنَ الْاِيْمَانِ اَىْ قَبُوْلِهٖ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ اَشْبَاهِهِمْ فِى الْكُفْرِ مِّنْ قَبْلُ اَىْ قَبْلَهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ مُوْقِعِ الرِّيْبَةِ لَهُمْ فِيْمَا اٰمَنُوْا بِهِ الْاٰنَ وَلَمْ يَعْتَدُّوْا بِدَلَائِلِهٖ فِى الدُّنْيَا.

৫৪. তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে ঈমান গ্রহণের প্রতি অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন এর পূর্বে কুফরের মধ্যে তাদের সতীর্থদের সাথেও এরূপ করা হয়েছে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত। যার উপর এখন তারা ঈমান এনেছে এতে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে অথচ দুনিয়াতে এটার ঈমানের প্রতি তারা কোনো লক্ষ্য ও করেনি।]

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِوَاحِدَةٍ : اَنْ تَقُوْمُوْا এটা উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ بِخَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ এবং উহ্যের উপর قَرِيْنَه হলো اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ আর اَنْ تَقُوْمُوْا এটা بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হয়ে هِىَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে, যেমনটি শারেহ (র.) هِىَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অথবা اَنْ تَقُوْمُوْا টা بِتَاوِيْلِ مَصْدَرْ হয়ে بِوَاحِدَةٍ -এর عَطْف بَيَانْ অথবা بَدَل হয়েছে। এই দুই সুরতে اَنْ تَقُوْمُوْا টা مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا : ثُمَّ হলো حَرْف عَطْف যা تَاخِيْر এবং تَرْتِيْب -এর জন্য হয়েছে আর تَتَفَكَّرُوْا -এর আতফ اَنْ تَقُوْمُوْا -এর উপর হয়েছে আর مَثْنٰى এবং فُرَادٰى টা হাল হওয়ার কারনে مَنْصُوْب হয়েছে بِصَاحِبِكُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর مِنْ জِنَّةٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّر যা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে এবং শাব্দিকভাবে مَجْرُوْر হয়েছে। আর مِنْ হলো অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ : مَا হলো شَرْطِيَّة আর سَاَلْتُكُمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল مُقَدَّمْ হয়েছে। আর مِنْ اَجْرٍ হলো مَا -এর بَيَان আর فَهُوَ لَكُمْ হলো جَوَاب شَرْط আবার এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, مَا হলো مَوْصُوْل যা মুবতাদা আর فَهُوَ لَكُمْ তার খবর। আর যেহেতু مَوْصُوْل টা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী এজন্য فَهُوَ-এর فَاء টা رَابِطَه-এর জন্য হয়েছে اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ একথার উপর বুঝাচ্ছে যে, তিনি ভীতি প্রদর্শন ও তাবলীগের বিনিময়ে কিছুই প্রার্থনা করেন নি।

قَوْلُهُ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ : يقذف-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَقْذِفُ الْبَاطِلَ بِالْحَقِّ দ্বিতীয় তারকীব। যেভাবে ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন, এটা হতে পারে যে, بَا টা مُلَابَسَتْ -এর জন্য এবং মাফউল উহ্য হবে। উহ্য ইবারত হলো– يَقْذِفُ الْوَحْىَ اِلٰى اَنْبِيَائِهٖ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

قَوْلُهُ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ : এটা ان-এর দ্বিতীয় খবর অথবা উহ্য هُوَ মুবতাদার খবর এবং يَقْذِفُ -এর যমীর থেকে بَدَل ও হতে পারে।

قَوْلُهُ مَا غَابَ عَنْ خَلْقِهٖ : আল্লাহর তা'আলা অদৃশ্য বিষয়াবলি খুব ভালো করেই জানেন مَا غَابَ-এর উপর مَغِيْبَاتْ-এর اِطْلَاقْ মাখলুকের হিসেবে হয়েছে। অন্যথায় তার নিকট مَاضِىْ,حَالْ সবই উপস্থিত। এই প্রশ্নের উত্তর দান কল্পেই ব্যাখ্যাকার (র.) مَا غَابَ عَنْ خَلْقِهٖ -এর বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ فَبِمَا يُوْحِىْ اِلَىَّ رَبِّىْ : مَا টা মাসদারিয়াও হতে পারে এবং بَاء হলো سَبَبِيَّه অর্থাৎ بِسَبَبِ اِيْحَاءِ رَبِّىْ এবং مَوْصُوْل ও হতে পারে অর্থাৎ بِسَبَبِ الَّذِىْ يُوْحِيْهِ اِلَىَّ الْحَقُّ

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرٰى : এতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, تَرٰى-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো لَوْ تَرٰى حَالَهُمْ وَقْتَ نَزْعِهِمْ

قَوْلُهُ لَرَاَيْتَ اَمْرًا عَظِيْمًا : উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, لَوْ-এর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ تَنَاوُشُ : এতে দুটি কেরাত রয়েছে وَاوْ তে পেশ দিয়ে এবং وَاوْ কে হামযা দ্বারা বদল করে تَفَاعُلْ -এর ওজনে; نَاشَ يَنُوْشُ বাবে نَصَرَ হতে মাসদার نَوْشًا অর্থ–নেওয়া, ধরা।

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا : এটা جُمْلَه حَالِيَه হয়েছে অবস্থা হলো এই যে, তারা দুনিয়াতে কুফরি করেছিল।

قَوْلُهُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ : এটা حِكَايَت حَال مَاضِيَة -এর ভিত্তিতে قَدْ كَفَرُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ بِاَشْيَاعِهِمْ : অর্থাৎ اَشْبَاهِهِمْ فِى الْكُفْرِ ; اَشْيَاعُ টা شِيَاعٌ -এর এবং شِيَعٌ টা شِيْعَةٌ -এর বহুবচন, এমনিভাবে اَشْيَاعُ টা شِيْعَةٌ এর جَمْعُ الْجَمْعِ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَحِيْلَ : এটা مَاضِىْ مَجْهُوْل -এর সীগাহ اِسْتِقْبَالْ-এর অর্থে হয়েছে। مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য مَاحَصَلَ ও اِسْتِقْبَالْ -এর অর্থে হয়ে থাকে। ظَرْف হলো نَائِب فَاعِلْ কেউ কেউ বলেছেন নায়েবে ফায়েল সেই যমীর যা فِعْل থেকে বুঝা যায় মাসদারের দিকে ফিরেছে كَاَنَّهٗ قِيْلَ وَحِيْلَ هُوَ اَىِ الْحَوْلُ এবং ظَرْف টা حِيْلَ -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ قَبْلُ : এটা اَشْيَاعْ -এর সিফত।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْتَدُوْا : এটা اٰمَنَّا -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : এ সূরার শুরু থেকে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। এখন একটি উপদেশ দিয়ে সূরা শেষ করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, যে সব মৌলিক বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা মর্দে মুমিনের একান্ত কর্তব্য, তন্মধ্যে তাওহীদ, রিসালত এবং কিয়ামত বিশেষ গুরুত্বের অধিকারি। এ সূরায় এ তিনটি বিষয় এ পর্যন্ত বিস্তারিভাবে বর্ণিত হয়েছে, এরপর ইরশাদ হয়েছে- قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ [হে রাসূল!] আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি নসিহত করছি, তোমরা দু'জন, এক একজন করে আল্লাহ পাকের নামে উঠে দাঁড়াও, এরপর চিন্তা করে দেখ যে, তোমার সঙ্গী উন্মাদ নন, তিনি তো তোমাদেরকে এক আসন্ন ভয়ঙ্কর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন মাত্র। কাফের মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা ক্ষণিকের জন্যে হলেও হিংসা-বিদ্বেষ, জেদ, শত্রুতা ও হঠকারিতা পরিহার কর এবং ইনসাফের ভিত্তিতে আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের নামে একটি বিষয় চিন্তা করার জন্যে উঠে দাঁড়াও, অর্থাৎ প্রস্তুত হও আর তা একা একাও করতে পারে, অথবা দু'জন দু'জন একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতে পার।

'চিন্তার বিষয়টি হলো এই যে, তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ যিনি অতি শৈশব থেকে বিগত চল্লিশটি বছর তোমাদের সঙ্গেই অতিবাহিত করেছেন, তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্বস্ততায় তোমরা সকলেই ইতিপূর্বে মুগ্ধ ছিলে, তাঁর প্রশংসায় তোমরা ছিলে পঞ্চমুখ, তাঁকে তোমরাই 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত বলে উপাধি দিয়েছিলে, জীবনে কখনো তাঁর মধ্যে তোমরা স্বার্থপরতা বা অসাধুতা লক্ষ্য করনি। এমতবস্থায় তোমরাই বল, তাঁর ন্যায় এমন মহান ব্যক্তি কি উন্মাদ হতে পারেন? তোমরা সারা জীবন যার প্রশংসা করেছ আজ যখন তিনি আল্লাহ পাকের নবুয়ত লাভ করেছেন, তোমাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন, তোমাদের কল্যাণার্থেই তোমাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন, এমন অবস্থায় কিভাবে তোমরা তাঁকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ? মূলত : যে তাঁকে উন্মাদ বলে, সে নিজেই উন্মাদ।

মানুষ দু'টি উদ্দেশ্যে কাজ করে, কোনো বিষয়ে উপকৃত হবার লক্ষ্যে, অথবা কোনো প্রকার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। সাধারণত : এ দু'টি জাগতিক উদ্দেশ্যেই মানুষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ এ দু'টি জাগতিক উদ্দেশ্যের কথা পূর্বাহ্নেই অস্বীকার করেছেন। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন আমার এই কাজের জন্যে আমি কোনো বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহ পাকের কাছেই রয়েছে।

অতএব, দীন ইসলামের প্রচারে প্রিয়নবী ﷺ -এর জাগতিক কোনো স্বার্থ নেই। এমনকি, কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও তিনি এ কাজ করছেন না, কেননা তিনি যখন আরববাসীকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন, তখন সারা আরব তথা সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁর শত্রু হয়ে গেল। কিন্তু তিনি যেহেতু এক আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে আশা করতেন না এবং এক আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করতেন না, তাই মানুষের শত্রুতারও তিনি পরোয়া করতেন না।

মক্কার কাফেদের প্রতি দাওয়াত : إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ এতে মক্কাবাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশে সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দু'জন ও এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও। এখানে "আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোনো কাজের জন্য তৎপর হওয়া। এখানে لِلَّهِ [আল্লাহর উদ্দেশ্যে] শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য একথা বলা যে, একান্তভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দু'দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তাভাবনা করা যায়, এক. একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তাভাবনা করা এবং দুই, বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমতো যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বন কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا এটা أَنْ تَقُوْمُوْا বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য না মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই তা কর অথবা অন্যান্যের সাথে পরামর্শক্রমেই কর।

অতঃপর এই চিন্তাভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগ যুগ ব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে যাতে তারা একমতও বটে কোনো ঘোষণা দেয়, তবে তা দু'উপায়েই সম্ভব। **এক.** হয় ঘোষণাকারী বদ্ধপাগল ও উন্মাদ হবে। ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে। **দুই.** তাঁর ঘোষণা অমোঘ সত্য। কারণ তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাই আল্লাহর আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচারণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা ও গোটা কুরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মাঝেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাম্ভীর্য ও শালীনতার পরিপন্থি পায়নি। কেবল এক কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোনো কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী وَمَا بِصَاحِبِكُمْ الخ বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। صَاحِبِكُمْ [তোমাদের সঙ্গী] শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোনো বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোনো অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর নির্ভীক রাসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ তিনি তো কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। إِنَّ رَبِّىْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ علام الغيوب অর্থাৎ আমার আলিমুল-গায়েব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ : قَذْف শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি قَذْف শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোনো ভারি বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ অর্থাৎ সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোনো বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

قَوْلُهُ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এটা হাশর দিবসের অবস্থা। তখন কাফের ও পাপাচারীরা ভীত-বিহবল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না। দুনিয়াতে কোনো অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্ব-স্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন,। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; বরং স্ব-স্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : تَنَاوُشْ অর্থ হাত বাড়িয়ে কোনো কিছু উঠানো। বলা বাহুল্য, যে বস্তু বেশি দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে উঠানো যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কুরআনের প্রতি অথবা রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকালে কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোনো কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : قَذْف অর্থ কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা। আরবি বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে رَجْمٌ بِالْغَيْبِ অথবা قَذْفٌ بِالْغَيْبِ বলে ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ সে অন্ধকারে তীর চলায়, যার কোনো লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ-এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে, মনে তার বিশ্বাস রাখে না।

قَوْلُهُ وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ : অর্থাৎ তাদের ও তাদের প্রিয় ও উদ্দিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কিয়ামতে তারা মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ : اَشْيَاعٌ শব্দটি شِيْعَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের অভীষ্ট ও ঈপ্সিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতোই কুফরি কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত এবং কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার বিষয় তাদের বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না।

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ : সূরায়ে ফাতির মক্কায় অবতীর্ণ
وَهِىَ خَمْسٌ اَوْ سِتٌّ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً
আর তাতে ৪৫ বা ৪৬টি আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

---

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمِدَ تَعَالٰى نَفْسَهٗ بِذٰلِكَ
كَمَا بُيِّنَ فِىْ اَوَّلِ سَبَا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ خَالِقِهِمَا عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ
جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اِلَى الْاَنْبِيَاءِ اُولِىْٓ
اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ط يَزِيْدُ فِى
الْخَلْقِ فِى الْمَلٰئِكَةِ وَغَيْرِهَا مَا يَشَآءُ ط
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

٢. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ كَرِزْقٍ
وَّمَطَرٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ج وَمَا يُمْسِكْ مِنْ
ذٰلِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ اَىْ بَعْدَ
اِمْسَاكِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهٖ
الْحَكِيْمُ فِىْ فِعْلِهٖ.

٣. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط بِاِسْكَانِكُمُ الْحَرَمَ وَمَنْعِ
الْغَارَاتِ عَنْكُمْ.

অনুবাদ :

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর আল্লাহ তা'আলা উক্ত বাক্য দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন যেমন সূরায়ে সাবার প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা উভয়ের স্রষ্টা কোনো পূর্বের নমুনা ব্যতীত এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক নবী-রাসূলের নিকট তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির ফেরেশতাগণ ও অন্যান্য মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম।

২. আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্যে থেকে যা খুলে দেন, যেমন, বৃষ্টি ও রিজিক ইত্যাদি তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি তার হুকুম ও কর্মে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

৩. হে মানুষ মক্কাবাসী! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ নিরাপদ স্থানে তোমাদেরকে বসবাসের সুযোগ করে দিয়ে তোমাদেরকে লুটতরাজ থেকে হেফাজত রাখা স্মরণ কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

هَلْ مِنْ خَالِقٍ مِنْ زَائِدَةٌ وَخَالِقٍ مُبْتَدأٌ غَيْرُ اللّٰهِ بِالرَّفْعِ وَالْجَرِّ نَعْتٌ لِخَالِقٍ لَفْظًا وَمَحَلاًّ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ الْمَطَرَ وَ مِنَ الْاَرْضِ النَّبَاتَ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَيْ لَا خَالِقَ رَازِقَ غَيْرُهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ مِنْ اَيْنَ تَصْرِفُوْنَ عَنْ تَوْحِيْدِهِ مَعَ اِقْرَارِكُمْ بِاَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ .

আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি? مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত আর خَالِقٍ মুবতাদা এবং غَيْرِ اللّٰهِ শব্দটি রফা ও জর উভয় অবস্থায় خَالِقٍ থেকে সিফত যে তোমাদেরকে আসমান বৃষ্টি ও জমিন শস্য থেকে রিজিক দান করেন। يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ خَالِقٍ পূর্বের মুবতাদার খবর। প্রশ্নবোধক পদটি প্রমাণ করার জন্যে যে, তিনি ব্যতীত কোনো স্রষ্টা ও রিজিকদাতা নেই তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? অর্থাৎ আল্লাহ স্রষ্টা ও রিজিকদাতা হওয়ার প্রতি তোমাদের স্বীকারোক্তির পরও তার তাওহীদ ছেড়ে তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?

٤. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ يَا مُحَمَّدُ فِيْ مَجِيْئِكَ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ط فِيْ ذٰلِكَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُجَازِي الْمُكَذِّبِيْنَ وَيَنْصُرُ الْمُرْسَلِيْنَ .

৪. হে মুহাম্মদ! আপনার তাওহীদ, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তির দাওয়াতের ব্যাপারে তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে এতে আপনার পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদেরকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। অতএব, আপনি সবর করুন যেমন তারা সবর করেছে আখেরাতে আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবির্তত হয়। অতএব তিনি মিথ্যুকদের শাস্তি দিবেন ও নবীগণকে সাহায্য করবেন।

٥. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَغَيْرِهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا نف عَنِ الْاِيْمَانِ بِذٰلِكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ فِيْ حِلْمِهِ وَاِمْهَالِهِ الْغَرُوْرُ الشَّيْطَانُ .

৫. হে মানুষ, নিশ্চয় পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক শয়তান যেমন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। এই বলে। যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

٦. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَلَا تُطِيْعُوْهُ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ اَتْبَاعَهٗ فِي الْكُفْرِ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ النَّارِ الشَّدِيْدَةِ .

৬. তোমরা জেনে রাখ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু অতএব আল্লাহর আনুগত্যে তাকে শত্রুরূপে গ্রহণ কর। অতএব তার অনুসরণ করিওনা সে তার দলবলকে তার অনুগতদেরকে কুফরির দিকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ فَهٰذَا بَيَانُ مَا لِمُوَافِقِى الشَّيْطَانِ وَمَا لِمُخَالِفِيْهِ وَنَزَلَ فِىْ اَبِىْ جَهْلٍ وَغَيْرِهٖ .

৭. যারা কুফরি করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আজাব। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। এটা ঐ প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা যা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণকারী ও অনুগামীদের জন্যে রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

সূরায়ে ফাতিরের অপর নাম সূরায়ে মালাইকা।

قَوْلُهٗ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ : অর্থাৎ خَالِقُهَا عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ - فِطْر -এর মূল অর্থ হলো مُطْلَقًا شَقّ

وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) مَا كُنْتُ اَدْرِىْ مَا فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى اخْتَصَمَ اِلَىَّ اَعْرَابِيَّانِ فِىْ بِئْرٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَنَا فَطَرْتُهَا اَىْ اَبْتَدَأْتُهَا وَابْتَدَعْتُهَا

প্রশ্ন. فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর মধ্যে اِضَافَةٌ لَفْظِىْ হয়েছে। কাজেই এটা تَعْرِيْف এর ফায়দা দেয় না। অথচ এই জুমলা اَللّٰهُ শব্দের صِفَتْ হয়েছে যা মা'রেফা।

উত্তর. যেহেতু فَاطِرٌ ফে'লে মাযীর অর্থে হয়েছে যার কারণে এই ইযাফত مَعْنَوِىْ হয়েছে। কাজেই اَللّٰهُ -এর সিফত হওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهٗ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ : এটা اَللّٰهُ শব্দের দ্বিতীয় সিফত হয়েছে।

প্রশ্ন. جَاعِلِ এটা مَاضِىْ -এর অর্থে হয়েছে অথবা حَالْ বা اِسْتِقْبَالْ অর্থে। যদি مَاضِىْ -এর অর্থে হয় তবে তার আমেল হওয়া বৈধ নয় অথচ এটা رُسُلًا-এর মধ্যে عَامِلْ হয়েছে। যদি حَالْ বা اِسْتِقْبَالْ অর্থে হয় তবে اِضَافَتْ لَفْظِىْ হবে যা مَعْرِفَة -এর ফায়দা দেয় না। এই সুরতে اَللّٰهُ শব্দের সিফত হওয়া বৈধ নয়।

উত্তর. এখানে جَاعِلِ টা اِسْتِمْرَارِىْ-এর অর্থে হয়েছে। কাজেই مَاضِىْ -এর অর্থে হওয়ার কারণে اِضَافَتْ مَعْنَوِىْ হবে এবং مَعْرِفَة এর ফায়দা দিবে। যার ফলে اَللّٰهُ শব্দের সিফত হওয়া বৈধ হবে। আর যেহেতু حَالْ এবং اِسْتِقْبَالْ -এর অর্থেও হয়েছে কাজেই তার عَامِلْ হওয়াও বৈধ হয়েছে। এখন আর কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

قَوْلُهٗ اُوْلِىْ : এটা حَالَتْ نَصْبِىْ এবং جَرِّىْ তে হয়েছে, حَالَتْ رَفْعِىْ তে اُوْلُوْ ব্যবহৃত হয় অর্থ ওয়ালা, ধারী। এটা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একবচন আসেনা, কেউ কেউ এর একবচন ذُوْ বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ اُوْلِىْٓ اَجْنِحَةٍ : এটা جَنَاحٌ -এর বহুবচন। এটা رُسُلًا-এর সিফত উভয়টি যেহেতু শব্দের হিসেবে نَكِرَه তাই مُطَابَقَتْ ও বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তাতে এই সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে পর/পাখা হওয়া সেই ফেরেশতার জন্য নির্দিষ্ট যারা নবী রাসূলগণের নিকট প্রেরিত হতেন। অথচ সকল ফেরেশতারই পর রয়েছে। কাজেই একে مَلَائِكَة-এর সিফত বা حَالْ বলা বেশি উপযোগী হবে।

قَوْلُهٗ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ : এটা اَجْنِحَةٍ হতে بَدَل হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে اِنَّ-এর فَتْحَه টা غَيْر مُنْصَرِفْ -এর কারণে হয়েছে। কেননা এই তিন কালিমাতে وَصْفِيَتْ এবং عَدْل হওয়ার কারণে نِيَابَتْ-এর كَسْرَه হয়েছে। এই কালিমাগুলো تَكْرَارْ থেকে مَعْدُوْل করে এসেছে যেমন- مَثْنٰى টা اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ থেকে مَعْدُوْل হয়ে। এমনিভাবে অন্যগুলোও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ : এটা مُسْتَانِفٌ বাক্য যা পূর্বের তাকিদের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا : এর মধ্যে لَهَا এবং فَلَا مُرْسِلَ لَهُ-এর মধ্যে لَهُ উভয়টির مَرْجِعٌ হলো مَا ; لَهَا-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এবং لَهُ-এর শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ هَلْ مِنْ خَالِقٍ : هَلْ টা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ-এর জন্য এবং تَوْبِيْخ-এর জন্যও হতে পারে, আর مِنْ হলো অতিরিক্ত। আর خَالِقٍ হলো مُبْتَدَا যা শব্দগতভাবে مَجْرُوْر হয়েছে এবং مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর غَيْرُ اللّٰهِ এটা رَفْع -এর সাথে خَالِقٍ-এর সিফত হয়েছে مَحَلّ-এর হিসেবে غَيْرُ اللّٰهِ সিফত হয়েছে শব্দের হিসেবে خَالِقٍ মুবতাদার খবর হলো يَرْزُقُكُمْ: কেউ কেউ বলেন, لَكُمْ হলো তার খবর যা উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ تُؤْفَكُوْنَ : এটা أَفْكٌ [হামযা যবরযুক্ত] থেকে নির্গত এর অর্থ– পথভ্রষ্ট হওয়া এবং উদ্দেশহীনভাবে এদিকে ওদিক ঘোরা ফেরা করা। আর إِفْكٌ [হামযা যের যুক্ত] অর্থ মিথ্যা ও অপবাদ।

تُؤْفَكُوْنَ এটা مُضَارِعٌ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُوْلِ আর وَاوْ হলো نَائِب فَاعِلٌ অর্থ তোমরা কোথায় চক্কর দিচ্ছ, আবর্তন করছ।

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا : এটা মূলত اَنْ يُكَذِّبُوْا-এর جَزَاء হয়েছে। আর فَاء হলো جَزَائِيَّه কিন্তু جَزَاء-এর سَبَبْ কে যা হলো فَقَدْ كُذِّبَتْ তাকে جَزَاء-এর স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : 'ফাতের' শব্দটির অর্থ স্রষ্টা। এ সূরার শুরুতেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কথা রয়েছে, তাই এ সূরার নাম 'ফাতের' হয়েছে।

এ সূরাকে 'সূরাতুল মালায়েকা'ও বলা হয়। কেননা এ সূরায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। সূরায়ে সাবা-এর শেষের দিকে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা মনে করে [না'উজুবিল্লাহি মিন জালিক]।

মুশরিকদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে স্বস্থানে। এ সূরায় ফেরেশতাদের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি যারা আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, সর্বক্ষণ তারা আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল এবং তাঁর হুকুম পালনে ব্যস্ত। এ সূরাটি সেই পাঁচটি সূরার অন্যতম যা আরম্ভ করা হয়েছে হামদ দ্বারা। যিনি বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি রিজিকদাতা, ভাগ্য নিয়ন্তা যাঁর এক আদেশে বিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাঁর আরেক আদেশে সমগ্র সৃষ্টি জগত লয় প্রাপ্ত হবে, আমরা যার অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য, তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। যারা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার এবং নেককার হয়, তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ রয়েছে এ সূরায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুশরিকদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিরাট নিয়ামত। তাই এ নিয়ামতের শোকর আদায়ের ইঙ্গিত করে এ সূরাকে হামদ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামত সমূহের উল্লেখ করে শোকরগুজারীর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং অকৃতজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী. খ. ২২, পৃ. ১৬১]

এ সূরার অধিকাংশ আয়াতে তৌহীদের প্রমাণ এবং শিরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের উল্লেখ করে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেহেতু কাফেরদের বিরোধিতা এবং নানা চক্রান্তের কারণে প্রিয়নবী ﷺ কোনো কোনো সময় চিন্তিত হয়ে পড়তেন, তাই তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ সূরাকে আল্লাহ পাক হামদ এবং শোকরের কথা দ্বারা শুরু করেছেন। প্রথমত এ সূরায় আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত এবং অসাধারণ কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে। এতে তাওহীদের প্রমাণ রয়েছে। এপর প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালতের ঘোষণা রয়েছে এবং অবশেষে কিয়ামতের কঠিন দিনের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সূরায়ে ফাতের' মক্কায় নাজিল হয়েছে।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সূরায়ে ফাতেরকে 'সূরাতুল মালায়েকা' ও বলা হয়, আর এটি মক্কায় অবতীর্ণ।

আবদ ইবনে হোমায়েদ, ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি এ সূরার فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ বাক্যটির فَاطِرِ শব্দটির অর্থ জানতাম না, ঘটনাক্রমে দু'জন বেদুইন ব্যক্তিকে একটি কূপের মালিকানা নিয়ে কলহরত দেখলাম, তন্মধ্যে একজন বলল اَنَا فَطَرْتُهَا অর্থাৎ 'এ কূপটি প্রথমে আমিই তৈরি করেছিলাম', অতএব, এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে কোনো প্রকার নমুনা না দেখে প্রথম সৃষ্টি করা।

–[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ২৬৫, তাফসীরে ইবন কাসীর (উর্দু), পারা ২২, পৃ. ৬৮]

قَوْلُهُ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا : ফেরেশতাগণকে রাসূল অর্থাৎ বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহর দূত নিযুক্ত করে পয়গাম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহর ওহী ও হুকুম আহকাম পৌঁছে দেয়। রাসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকে সৃষ্টির মধ্যে পয়গাম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহর রহমত অথবা আজাব পৌঁছানোর কাজেও ফেরেশতাগণই মাধ্যম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্দারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বারবার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ছয়শ পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। –[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

আয়াতের এমন অর্থও হতে পারে যে, যেসব ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার বার্তা বহন করে দুনিয়াতে পৌঁছায়, তারা কখনও দুই দুই, কখনও তিন তিন এবং কখনও চার চার করে আগমন করে। এমতাবস্থায়ও চার সংখ্যাটি সীমাবদ্ধতা বুঝায় না; বরং একটা উদাহরণ মাত্র। কেননা কুরআনেই প্রমাণিত আছে যে, আরও বেশিসংখ্যক ফেরেশতা দুনিয়াতে আগমন করে থাকে। –[বাহরে মুহীত]

قَوْلُهُ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে যত বেশি ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যত এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের পাখা দু'চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশিও হতে পারে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলির সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হাইয়ান বাহরে মুহীতে এ মতের আলোকেই তাফসীর করেছেন। এ তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ তা'আলার দান ও নিয়ামত। এজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا : এখানে রহমত বলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বুঝানো হয়েছে। যেমন– ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিজিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ, ইজ্জত -আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যার জন্য স্বীয় অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণবশত কোনো বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।

–[আবূ হাইয়ান]

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। একবার হযরত মু'আবিয়া (রা.) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা (রা.) -কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তুমি রাসূল ﷺ -এর কাছ থেকে শুনেছ। এরূপ কোনো হাদীস আমাকে লিখে পাঠাও। হযরত মুগীরা তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজ আদায়ের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ অর্থাৎ হে আল্লাহ! যে বস্তু আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং আপনি যা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোনো চেষ্টা কার্যকর হতে পারে না। –[মুসনাদে আহমদ]

মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরিউক্ত বাক্যগুলো তিনি রুকূ' থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহর উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় : উল্লিখিত আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আল্লাহর প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। এর মাধ্যমেই মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস (রা.) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কুরআন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ দ্বিতীয় আয়াত এরই সমর্থবোধক– سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا তৃতীয় আয়াত اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ এবং চতুর্থ আয়াত وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ অতঃপর مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ مِنْ رَّحْمَةٍ আয়াত পাঠ করতেন। এতে আরবদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলত, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তিনি বৃষ্টির সময় এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। –[মুয়াত্তা মালেক]

قَوْلُهُ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ : غَرُوْر শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ অতি প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে, তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গুনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়' এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গুনাহ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না। –[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ بِالتَّمْوِيْهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ط مَنْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَمَنْ هَدَاهُ اللّٰهُ لَا دَلَّ عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ز فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُزَيَّنِ لَهُمْ حَسَرَاتٍ ط بِاغْتِمَامِكَ اَنْ لَا يُؤْمِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ.

٩. وَاللّٰهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا الْمُضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ اَيْ تُزْعِجُهُ فَسُقْنٰهُ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ لَا نَبَاتَ بِهَا فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ مِنَ الْبَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهَا ط يَبْسِهَا اَيْ اَنْبَتْنَا بِهِ الزَّرْعَ وَالْكَلَأَ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ اَيِ الْبَعْثُ وَالْاِحْيَاءُ.

١٠. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ط اَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَا تُنَالُ مِنْهُ اِلَّا بِطَاعَتِهِ فَلْيُطِعْهُ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ يَعْلَمُهُ وَهُوَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَحْوُهَا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ يَقْبَلُهُ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ الْمَكَرَاتِ السَّيِّاٰتِ بِالنَّبِيِّ فِيْ دَارِ النَّدْوَةِ مِنْ تَقْيِيْدِهِ اَوْ قَتْلِهِ اَوْ اِخْرَاجِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْاَنْفَالِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ط وَمَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ يَهْلِكُ.

অনুবাদ :

৮. আগত আয়াতটি আবূ জাহলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি তার সমান যাকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন? না এতে مَنْ মুবতাদা এবং তার খবর হলো উহ্য كَمَنْ هَدَاهُ যার উহ্যতার উপর প্রমাণ বহন করে পরবর্তী আয়াত فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি যাদেরকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে তাদের জন্যে এই মর্মে তারা ঈমান আনে না কেন? অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তারা যা করে। অতএব তিনি তাদেরকে এর উপর শাস্তি দিবেন।

৯. আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন অন্য কেরাত মতে اَلرِّيْحَ অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। এখানে مُضَارِعٌ-এর ব্যবহার অতীত কালের অবস্থাকে বর্ণনা করার জন্যে অর্থাৎ বায়ু মেঘকে নাড়া দেয় অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। سُقْنَا গায়েব থেকে পরিবর্তন করে مُتَكَلِّمْ বলা হয়েছে। مَيِّتٌ শব্দটি তাশদীদ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পড়বে। অর্থাৎ শস্য বিহীন ভূমি অতঃপর তদ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। অর্থাৎ তাতে শস্য ও ঘাস ইত্যাদি উৎপন্ন করি এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবনদান।

১০. কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুক, সমস্ত সম্মান আল্লাহর জন্যে। দুনিয়াতে ও আখেরাতে অতএব তার অনুসরণ ব্যতীত সম্মান অর্জন হয় না। অতএব তুমি তারই অনুসরণ কর তারই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য অর্থাৎ তিনি তা জানেন এবং এটা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এ জাতীয় বাক্য এবং সৎকর্ম, তিনি তাকে তুলে নেন। অর্থাৎ কবুল করে যারা মন্দকার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে দারুন নদওয়ায় নবীকে বন্দী, হত্যা বা দেশান্তর করার জন্যে চক্রান্তমূলক পরামর্শ করেছিল, যেমন– সূরায়ে আনফালে বর্ণিত তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ بِخَلْقِ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ اَىْ مَنِيٍّ بِخَلْقِ ذُرِّيَّتِهٖ مِنْهَا ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ط ذُكُوْرًا وَّاِنَاثًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط حَالٌ اَىْ مَعْلُوْمَةٌ لَهٗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ اَىْ مَا يُزَادُ فِىْ عُمُرِ طَوِيْلِ الْعُمُرِ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اَىْ مِنْ ذٰلِكَ الْمُعَمَّرِ اَوْ مُعَمَّرٍ اٰخَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ط هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ هَيِّنٌ .

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তোমাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টির মাধ্যমে অতঃপর বীর্য থেকে আদম সন্তানকে বীর্য থেকে সৃষ্টির মাধ্যমে তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল নারী ও পুরুষ কোনো নারী গর্ভ ধারণ করেনা এবং সন্তান প্রসব করেনা কিন্তু তার জ্ঞাত অনুসারে। এখানে اِلَّا بِعِلْمِهٖ বাক্যটি جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ তথা অবস্থাবোধক বাক্য অর্থাৎ بِعِلْمِهٖ অর্থ مَعْلُوْمَةٌ لَهٗ কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায়না। অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যক্তির বয়সে বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার বয়স হ্রাস পায়না, কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে তথা লাওহে মাহফুযে নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

١٢. وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ شَدِيْدُ الْعُذُوْبَةِ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ شُرْبُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ط شَدِيْدُ الْمُلُوْحَةِ وَمِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا هُوَ السَّمَكُ وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ مِنَ الْمِلْحِ وَقِيْلَ مِنْهُمَا حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج هِىَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ وَتَرَى تُبْصِرُ الْفُلْكَ السُّفُنَ فِيْهِ فِىْ كُلٍّ مِّنْهُمَا مَوَاخِرَ تَمْخُرُ الْمَآءَ اَىْ تَشُقُّهٗ بِجَرْيِهَا فِيْهِ مُقْبِلَةً وَّمُدْبِرَةً بِرِيْحٍ وَّاحِدَةٍ لِتَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا مِنْ فَضْلِهٖ تَعَالٰى بِالتِّجَارَةِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَلٰى ذٰلِكَ .

১২. দু'টি সমুদ্র সমান হয়না একটি অধিক মিঠা ও তৃষ্ণা নিবারক এবং অপরটি অধিক লোনা, উভয়টি থেকে তোমরা তাজা গোশত মাছ আহার কর এবং লবণাক্ত পানি থেকে বা উভয়টি থেকে পরিধানে ব্যবহার্য গয়না মণি-মুক্তা ও মারজান আহরণ কর। তুমি তাতে উভয় সাগরে জাহাজসমূহ দেখ, যা পানি চিরে চলে। অর্থাৎ একই বাতাসের মাধ্যমে তা পানিকে চিরে সামনে ও পশ্চাতে চলে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ কর ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

١٣. يُوْلِجُ يُدْخِلُ اللّٰهُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ فَيَزِيْدُ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ يُدْخِلُهُ فِى الَّيْلِ فَيَزِيْدُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَجْرِيْ فِى فَلَكِهٖ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ وَهُمُ الْاَصْنَامُ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ لِفَافَةِ النَّوَاةِ ـ

১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন অতঃপর তা দীর্ঘ হয় এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন অতঃপর তা দীর্ঘ হয় এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি তারা নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্ট মেয়াদে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। ইনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক যে সমস্ত মূর্তির উপাসনা কর তারা তুচ্ছ খেজুর আটির ও অধিকারী নয়।

١٤. اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاۤءَكُمْ ج وَلَوْ سَمِعُوْا فَرْضًا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط مَا اَجَابُوْكُمْ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ط بِاِشْرَاكِكُمْ اِيَّاهُمْ مَعَ اللّٰهِ اَىْ يَتَبَرَّؤُوْنَ مِنْكُمْ وَمِنْ عِبَادَتِكُمْ اِيَّاهُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ بِاَحْوَالِ الدَّارَيْنِ مِثْلُ خَبِيْرٍ عَالِمٍ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

১৪. তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনেনা। যদিও মেনে নিলাম শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। বরং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে তোমরা আল্লাহর সাথে তাদেরকে অংশীদার করা থেকে নিজেদের পবিত্রতার দাবি করবে বস্তু আল্লাহর ন্যায় উভয় জাহানের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না। অর্থাৎ একমাত্র অবহিতকারী আল্লাহই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَمَنْ زُيِّنَ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه পূর্বে যেই দুই দলের পরিণামের ব্যাপারে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে এর تَائِيْد হয়েছে। مَنْ মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلِّ رَفْع তে হয়েছে। এর খবর উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْءُ عَمَلِهٖ كَمَنْ لَّمْ يُزَيَّنْ لَهٗ কেসায়ী বলেন, ذَهَبَتْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ হলো খবর যা উহ্য রয়েছে। আর আল্লাহর বাণী فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ টা এর উপর প্রমাণবহ। আর ইমাম যুজাজ كَمَنْ هَدَاهُ اللّٰهُ কে উহ্য খবর [মেনেছেন। প্রথম সুরত শব্দও অর্থের ক্ষেত্রে مُطَابَقَتْ-এর কারণে উত্তম।

قَوْلُهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ : অর্থাৎ عَمَلِهِ السَّيِّئِ এটা اِضَافَتُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ-এর অন্তর্গত।

قَوْلُهُ لَا : لَا বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছে اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ-এর দিকে ইঙ্গিত করার জন্য।

قَوْلُهُ حَسَرَاتٍ : এটা فَلَا تَذْهَبْ-এর مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে এবং বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে অধিক পেরেশানি বুঝানোর জন্য।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ : এটা تَذْهَبْ -এর صِلَةٌ হয়েছে যেমন– বলা হয় مَاتَ عَلَيْهِ حُزْنًا ; عَلَيْهِمْ-এর تَعَلُّقْ حَسَرَاتٍ-এর সাথে বৈধ নয়। কেননা মাসদারের مَعْمُوْل মাসদারের উপর مُقَدَّمْ হতে পারে না।

قَوْلُهُ اَنْ لَّايُؤْمِنُوْا : অর্থাৎ عَلٰى اَنْ لَّا يُؤْمِنُوْا

قَوْلُهُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ : এটা মূলত একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন এই যে, এর পূর্বে اَرْسَلَ মাযীর সীগাহ ব্যবহার করেছেন এবং এই বিষয়েই তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তীতে فَتُثِيْرُ মুযারের সীগাহ ব্যবহার করেছেন। এতে ফায়দা কি?

এই প্রশ্নের জবাবের সার হলো এই যে, মুযারের সীগাহ যা حَالْ -এর উপর দালালত করে, আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা সেই عَجِيْب وَغَرِيْب সুরতের উপস্থিত করতে চেয়েছেন যা তার পূর্ণ ক্ষমতা ও হিকমত কে বুঝায়। কোনো সুরতে হাল অথবা ঘটনা এমনভাবে উপস্থাপন করা যার দ্বারা বিগত ঘটনা চোখের সামনে এমনভাবে ফুটে উঠে যে, মনে হয় যেন এই ঘটনা এরখনই সংঘটিত হচ্ছে, এটাকেই حِكَايَتْ حَالْ مَاضِيَة বলা হয়।

قَوْلُهُ تُثِيْرُ : এটা اِشَارَةٌ থেকে مُضَارِعْ-এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ অর্থ– উত্তেজিত করে উঠায়, নড়াচড়া দেয়। اِلْتِفَاتْ عَنِ الْغَيْبَتِ اِلَى التَّكَلُّمْ -এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা اَرْسَلَ টা غَائِبْ -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন এবং سُقْنَا -এর মধ্যে مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন, عَظْمَتْ -এর ভিত্তিতে جَمْعْ -এর ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ بَلَدٍ : স্ত্রী লিঙ্গ ও পুং লিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই بَلَدْ -এর ব্যবহার হয়ে থাকে। بَلَدٌ এবং بَلْدَةٌ আবাদি ও অনাবাদি উভয় প্রকার জমির ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। এখানে بَلَدْ مَيِّتْ দ্বারা সেই ভূমি উদ্দেশ্য যাতে লতা পাতা কিছুই জন্মায় না, মৃত ভূমি দ্বারা শুষ্ক পানিহীন প্রান্তর উদ্দেশ্য। ভূমিকে জীবিত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাকে সবুজ শ্যামল করে তোলা।

قَوْلُهُ مِنَ الْبَلَدِ : এতে مِنْ টি بَيَانِيَه হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذَالِكَ النُّشُوْرُ : এতে মুর্দাদের কে শুষ্ক ভূমির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এবং মুর্দাদেরকে জীবিত করাকে ভূমিকে সবুজ শ্যামল করার সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلْيَطْلُبْهُ : ব্যাখ্যাকার এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন مَنْ كَانَ-এর মধ্যে مَنْ টি شَرْطِيَه আর فَلْيَطْلُبْهُ এর জবাব উহ্য রয়েছে। আল্লাহর বাণী فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا -এটা جَوَاب شَرْط -এর ইল্লত।

قَوْلُهُ بِعِلْمِهِ : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كَلَامْ এর মধ্যে مَجَازْ হয়েছে আর عِلْمْ টা صُعُوْد অর্থে হয়েছে عِلْمْ কে صُعُوْد দ্বারা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য হলো قَبُوْلِيَتْ -এর দিকে ইঙ্গিত করা। কেননা مَوْضِعْ ثَوَابْ হলো উপরে আর مَوْضِعْ عَذَابْ হলো নিচে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ : كَلِمَاتْ طَيِّبَة বর্ণনা করার পর এটা كَلِمَاتْ خَبِيْثَة -এর بَيَانْ

قَوْلُهُ وَالسَّيِّئَاتِ : এটা উহ্য মাফউলে মুতলাকের সিফত। উহ্য ইবারত যেমনটি শারেহ (র.) اَلْمَكَرَاتِ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ يَمْكُرُوْنَ الْمَكَرَاتِ السَّيِّئَاتِ ; اَلسَّيِّئَاتِ টা مَفْعُوْل بِهٖ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হওয়া বৈধ নয়। কেননা يَمْكُرُوْنَ হলো فِعْل لَازِمْ যা مَفْعُوْل بِهٖ কে নসব দিতে পারে না। কেউ কেউ বলেন يَمْكُرُوْنَ টা يَكْسِبُوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে তা مُتَعَدِّيْ কাজেই তার اَلسَّيِّئَاتِ কে مَفْعُوْل بِهٖ হিসেবে نَصَبْ দেওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ وَمَكْرُ اُولٰئِكَ : তারকীবের ইযাফী মুবতাদা। আর يَبُوْرُ হলো তার খবর। আর هُوَ হলো ضَمِيْر فَصْل খবরের পূর্বে ضَمِيْر فَصْل হওয়ার জায়েজ না জায়েজের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। জায়েজ হওয়ার মতই প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

يَبُوْرُ হলো مُضَارِعْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ বাবে نَصَرَ মাসদার بَوْرًا ,بَوَارًا অর্থ– ধ্বংস হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فُرَاتٌ شَدِيْدُ الْعُذُوْبَةِ : অর্থ অত্যন্ত মিষ্ট পানি।

قَوْلُهُ أُجَاجٌ شَدِيْدُ الْمُلُوْحَةِ : অর্থ খুবই লবণাক্ত।

قَوْلُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ : مَا হলো نَافِيَه আর يُعَمَّرُ হলো فِعْل مُضَارِعٌ আর مِنْ হলো অতিরিক্ত আর مُعَمَّرٍ হলো نَائِب فَاعِلٌ

قَوْلُهُ قِطْمِيْرٍ : সেই পাতলা ঝিল্লিকে বলে যা খেজুরের দানার উপর পেচানো থাকে। আবার কেউ কেউ সেই লম্বা সূক্ষ্ম সূত্রকে বলেছেন যা দানার লম্বালম্বিতে হয়ে থাকে। কেউ কেউ ঐ তন্তুকে বলেছেন যা সেই গর্তে/ ছিদ্রে হয়ে থাকে যা দানার পিঠে হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হলো যাদেরকে তোমরা ডাকো এবং যাদের থেকে সাহায্যের আশা রাখা এটা তো একটি সামান্য ও মামুলি জিনিসেরও ক্ষমতা রাখে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ : আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ওমর ইবনুল খাত্তাব বা ওমর বিন হিশাম [আবূ জাহল] দ্বারা ইলামকে শক্তিশালী করুন। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এবং এ দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা.) ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করেন। -[রূহুল মাআনী]

قَوْلُهُ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ : পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছেন, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ কালেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সৎকর্ম। অর্থাৎ অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরিয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ আব্দুল কাদির (র.) 'মুযিহুল কুরআনে' বলেন, সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর জিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই জিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়েছে, সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌছায়। اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তাফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তাফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক শহর ইবনে হাওশাব প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কালেমায়ে তাওহীদ হোক অথবা অন্য কোনো জিকির-তাসবীহ হোক কোনোটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ' কিংবা অন্য কোনো জিকির মকবুল নয়।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার জিকির ও কালেমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আজাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়াত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আজাব ভোগ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোনো কথা ও কাজকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না। -[কুরতুবী]

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, যে কোনো কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মুতাবিক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার উপরিউক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণ এই বলেছেন যে, يَرْفَعُهٗ শব্দের فَاعِلْ ضَمِيْر হচ্ছে كَلِم طَيِّبٌ এবং ضَمِيْر مَفْعُوْل হচ্ছে عَمَل صَالِحٌ অতএব অর্থ এই যে, সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায়। অর্থাৎ কবুল যোগ্য করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এর সারমর্ম এই হবে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহর জিকিরও তার এই জিকির করে তার কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবুলযোগ্য করে তোলে।

বাস্তব সত্য এই যে, কালেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলাও জিকির ব্যতীত ফুটে উঠে না; প্রচুর জিকিরই সৎ কর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

قَوْلُهٗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِیْ كِتَابٍ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লওহে মাহফূজে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফূযে লিবিপদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং গোটা মানব জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহহাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া যায় তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তাফসীর শা'বী, ইবনে জুবায়র, আবূ মালিক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে। -[রূহুল মা'আনী] এ বিষয়বস্তুটি নিম্নোক্ত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا * مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا انْتَقَصَتْ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুনতি কয়েকটি নিঃশ্বাসের নাম। কাজেই যখনই একটি শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসাঈ বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালিকের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِیْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَ فِیْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ "যে ব্যক্তি চায় যে তার রিজিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক তাঁর উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, [বয়স তো আল্লাহ তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত] নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে; [অর্থাৎ মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় ফায়দা লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে কাসীর উভয় রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।] সারকথা, যেসব হাদীসে কোনো কোনো কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا : অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশত অর্থাৎ মৎস্য খাওয়ার জন্য পাও। আয়াতে মৎস্যকে গোশত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশত একে জবাই করার প্রয়োজন হয় না। স্থলভাগের অন্যান্য জন্তু এর বিপরীত। সেগুলো জবাই না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশত। حِلْيَة শব্দের অর্থ গয়না। এখানে মোতি বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমিন মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায়। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত মত এই যে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কুরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়।

تَلْبَسُوْنَهَا : শব্দে পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যবহার করা পুরুষের জন্যও জায়েজ। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকাররূপে ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ : অর্থাৎ তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কত নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; বিপদ মূহুর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমত তারা শুনতেই পারবেনা। কেননা মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নন এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্য সুপরিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ج .১৫ ١٥
بِكُلِّ حَالٍ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ خَلْقِهٖ
الْحَمِيْدُ الْمَحْمُوْدُ فِيْ صُنْعِهٖ بِهِمْ ۔

১৫. হে মানুষ, তোমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তিনি মাখলুক থেকে অভাবমুক্ত, সৃষ্টিজীবের তার অনুগ্রহের কারণে প্রশংসিত।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ .১৬ ١٦
بَدَلَكُمْ ۔

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে তার স্থলে এক নতুন সৃষ্টির উদ্ভব করবেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ شَدِيْدٍ ۔ .১৭ ١٧

১৭. এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়।

وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَازِرَةٌ اٰثِمَةٌ اَيْ لَا تَحْمِلُ .১৮ ١٨
وِزْرَ نَفْسٍ اُخْرٰى ط وَاِنْ تَدْعُ نَفْسٌ مُّثْقَلَةٌ
بِالْوِزْرِ اِلٰى حِمْلِهَا مِنْهُ اَحَدًا لِيَحْمِلَ
بَعْضَهٗ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ الْمَدْعُوْ
ذَا قُرْبٰى ط قَرَابَةٍ كَالْاَبِ وَالْاِبْنِ وَعَدَمُ
الْحَمْلِ فِي الشِّقَّيْنِ حُكْمٌ مِّنَ اللّٰهِ اِنَّمَا
تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ اَيْ
يَخَافُوْنَهٗ وَمَا رَاَوْهُ لِاَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ
بِالْاِنْذَارِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ط اَدَامُوْهَا وَمَنْ
تَزَكّٰى تَطَهَّرَ مِنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهٖ فَاِنَّمَا
يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ط فَصَلَاحُهٗ مُخْتَصٌّ بِهٖ
وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ فَيُجْزٰى
بِالْعَمَلِ فِي الْاٰخِرَةِ ۔

১৮. কোনো পাপী ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না, এবং যদি কেউ তার পাপের গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না, যদি সে আহবানকৃত ব্যক্তি নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। যেমন, পিতা, ছেলে-সন্তান ইত্যাদি। উভয় অবস্থায় বোঝা বহন না করা আল্লাহর নির্দেশ। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করুন, যারা তাদের প্রভুকে না দেখেও ভয় করে, অর্থাৎ তারা আল্লাহকে ভয় করে অথচ তারা তাকে দেখেনি কেননা তারা সতর্কবাণী থেকে উপকৃত হয় এবং নামাজ কায়েম করে সর্বদা। যে কেউ নিজের সংশোধন করে নিজেকে শিরক ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখে অর্থাৎ তার সংশোধনের উপকারীতা তার জন্যই নির্দিষ্ট আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতএব পরকালে কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ الْكَافِرُ .১৯ ١٩
وَالْمُؤْمِنُ ۔

১৯. দৃষ্টিমান মুমিন ও দৃষ্টিহীন কাফের সমান নয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

٢٠. وَلَا الظُّلُمٰتُ الْكُفْرُ وَلَا النُّوْرُ الْاِيْمَانُ ـ

২০. অন্ধকার কুফর ও আলো ঈমান সমান নয়।

٢١. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ـ

২১. ছায়া জান্নাত ও তপ্তরোদ জাহান্নাম সমান নয়।

٢٢. وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَاۤءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ط الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْكُفَّارُ وَزِيَادَةُ لَا فِي الثَّلٰثَةِ تَاكِيْدٌ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاۤءُ ط هِدَايَتَهُ فَيُجِيْبُهُ بِالْاِيْمَانِ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ اَيِ الْكُفَّارِ شَبَّهَهُمْ بِالْمَوْتٰى فَلَا يُجِيْبُوْنَ ـ

২২. আরও সমান নয় জীবিত মুমিন ও মৃত কাফের, উক্ত তিন বাক্যে অতিরিক্ত لا তাকীদের জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার হেদায়েত শ্রবণ করান অতঃপর সে ঈমানের উপর লাব্বায়েক বলে আপনি কবরে শায়িতদেরকে কাফেরদেরকে শুনাতে সক্ষম নন। অর্থাৎ কাফেরদেরকে মৃত্যুব্যক্তির সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা দাওয়াত কবুল করে না

٢٣. اِنْ مَا اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُنْذِرٌ لَهُمْ ـ

২৩. আপনি তো কেবল তাদের জন্য একজন সতর্ককারী।

٢٤. اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بِالْهُدٰى بَشِيْرًا مَنْ اَجَابَ اِلَيْهِ وَنَذِيْرًا ط مَنْ لَمْ يُجِبْ اِلَيْهِ وَاِنْ مَا مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا سَلَفَ فِيْهَا نَذِيْرٌ نَبِيٌّ يُنْذِرُهَا ـ

২৪. আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ হেদায়েত দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা যারা গ্রহণ করে তাদের জন্য ও সতর্ককারীরূপে যারা কবুল করে না তাদের জন্য এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী এমন নবী যিনি তাদেরকে সতর্ক করে আসেনি।

٢٥. وَاِنْ يُكَذِّبُوْكَ اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ج جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ وَبِالزُّبُرِ كَصُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ هُوَ التَّوْرَاةُ وَالْاِنْجِيْلُ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْا ـ

২৫. তারা আহলে মক্কা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, মুজিজা সমূহ সহীফা, যেমন, ইবরাহীমের সহিফাসমূহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসমূহ তাওরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে এসেছিলেন। অতএব তুমি ধৈর্য ধর যেমন তারা ধরেছে।

٢٦. ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِتَكْذِيْبِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ اِنْكَارِيْ عَلَيْهِمْ بِالْعُقُوْبَةِ وَالْاِهْلَاكِ اَيْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ ـ

২৬. অতঃপর আমি কাফেরদেরকে তাদের মিথ্যার কারণে ধৃত করেছিলাম। কেমন ছিল তাদের প্রতি আমার আজাব। তা উপযুক্ত স্থানেই পতিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ : আয়াতে মানুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে অথচ প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। এর কারণ হলো এই যে, মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো সৃষ্টি এরূপ নয় যারা غِنَاء এবং اِسْتِغْنَاء -এর দাবি করে এজন্যই বিশেষভাবে আয়াতে মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে- يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ اَشَدُّ اِفْتِقَارًا وَاحْتِيَاجًا اِلَى اللّٰهِ فِيْ اَنْفُسِكُمْ وَعِيَالِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَفِيْمَا يُعْرَضُ لَكُمْ مِنْ سَائِرِ الْاُمُوْرِ فَلَا غِنَى لَكُمْ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ

মানুষ স্বীয় সত্তা, সিফত, পরিবার পরিজনে, সম্পদে মোটকথা সকল ব্যাপারে প্রতি মূহূর্তে মুখাপেক্ষী, যার যতটুকু প্রয়োজন হয় সে সে পরিমাণই মুখাপেক্ষী হয়। সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে মানুষের প্রয়োজন বেশি হওয়ায় তার মুখাপেক্ষীতা সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ইরশাদ করেছেন خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا আর এ হতেই হযরত আবূ বকর (রা.) এর উক্তি مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ অর্থাৎ যে নিজের দারিদ্রতা, প্রয়োজন, লাঞ্ছনা ও অক্ষমতাকে জানতে পারল সে আল্লাহর ইজ্জত, অমুখাপেক্ষীতা, ক্ষমতাকেও জানতে পারল।

قَوْلُهُ اِلَى اللّٰهِ : এটা فُقَرَاءُ -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে فُقَرَاءُ হলো فَقِيْرٌ -এর বহুবচন صِيْغَه صِفَتْ কাজেই এর সাথে مُتَعَلِّقْ হওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন. ফকিরের মোকাবিলায় غَنِىٌّ নেওয়ার পর কোনো উদ্দেশ্যে اَلْحَمِيْدُ কে বৃদ্ধি করা হয়েছে?

উত্তর. বান্দার ফকির হওয়া এবং আল্লাহর ধনী হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তবে غَنِىٌّ টা ততক্ষণ পর্যন্ত উপকারী হয় না যতক্ষণ সে দানবীর না হয়। আর যখন غَنِىٌّ , سَخِىٌّ এবং جَوَادٌ হয় مُنْعِمٌ عَلَيْهِمْ তার হামদ ও ছানা করে থাকে এবং অনুদান দাতা اَلْحَمِيْدُ -এর প্রশংসার অধিকারী হয়। কাজেই আল্লাহ সে غَنِىٌّ এবং نَافِعٌ এ কথার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য مُنْعِمٌ عَلَيْهِمْ শব্দটির বৃদ্ধি করেছেন। (جَمَلْ)

قَوْلُهُ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ : এটা আল্লাহ তা'আলা مُطْلَقْ غِنَاء -এর بَيَانٌ অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস তার ইচ্ছার উপর এবং বেচে থাকা তার অনুগ্রহের উপর মওকুফ। এতে অন্য কারো হাত নেই, আর স্বীয় উক্তি وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ দ্বারা অতিরিক্ত اِسْتِغْنَاء -এর বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যেন এটা না বুঝে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে ধ্বংস করে দেন তবে তার كَمَالِ مُلْك -এর মধ্যে ক্ষতি হবে। কেননা তিনি সে বিষয়ে সক্ষম যে, নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে দিবেন। যারা এদের থেকেও উত্তম ও সুন্দর হবে।

وَمَاذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ اِذْهَابٌ এবং اِتْيَانٌ তার জন্য কোনো কঠিন বিষয়ই নয়।

قَوْلُهُ وَازِرَةٌ : এটা تَزِرُ -এর فَاعِلْ -এর মওসূফ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) স্বীয় উক্তি نَفْس দ্বারা উহ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ কোনো গুনাহগার ব্যক্তি কোনো গুনাহগারের ভার বহন করবে না [কিয়ামতের দিন]

প্রশ্ন. এই আয়াতে وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى এবং وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। تَطْبِيْق -এর কি সুরত হবে?

উত্তর. এই আয়াত مُضِلِّيْن এবং ضَالِّيْن -এর ব্যাপারে উদ্দেশ্য এই যে, এ সকল লোকেরা ضَالْ এবং اِضْلَالْ অর্থাৎ পথভ্রষ্ট হওয়া ও পথভ্রষ্ট করার বোঝা উঠাবে। এই পদ্ধতিতে নিজেই নিজের গুনাহের বোঝা বহনকারী হবে।

قَوْلُهُ عَدَمِ الْحَمْلِ فِى الشِّقَّيْنِ : شِقَّيْن দ্বারা حَمْل اِجْبَارِىْ যা وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। এবং حَمْلِ اِخْتِيَارِىْ হয় যা وَاِنْ تَدْعُ ذَا قُرْبٰى -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে তা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এবং حَمْل اِجْبَارِىْ -এর অনুমতি না হওয়া আল্লাহর হুকুমেই হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُوْنَ بِالْإِنْذَارِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্ন হলো كَلِمَه حَصر যা اِنَّمَا -এর দ্বারা اِنْذَار কে اَهْل خَشْيَت -এর সাথে خَاص করার কি কারণ? অথচ প্রত্যেক مُكَلَّف -এর জন্যই اِنْذَار রয়েছে।

জবাবের সার হলো– যেহেতু উপদেশ ও اِنْذَار দ্বারা اَهْل خَشْيَت ই উপকৃত হয় তাই اَهْل خَشْيَت কে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। মনে হয় যেমন এরূপ চলেছেন যে, اِنَّمَا يَنْفَعُ اِنْذَارُكَ اَهْلَ الْخَشْيَةِ

قَوْلُهُ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ : এটা মুমিন ও কাফেরের উদাহরণ, প্রথমে مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ দ্বারা মুমিন এবং কাফেরদের সত্তার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত : وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ দ্বারা উভয়ের সিফতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ দ্বারা পরকালে উভয়ের ঠিকানার মধ্যে পার্থক্য কে বর্ণনা করেছেন। তিনটি বাক্যেই تَاكِيْد نَفِىْ -এর জন্য لا বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা نَفْس نَفِىْ তো مَا نَافِيَه দ্বারা বুঝা যায়।

قَوْلُهُ اَنْ يَسْمَعَ : থেকে فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ পর্যন্ত রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ : এতে কাফেরদেরকে اَثَرْ [প্রতিক্রিয়া] কবুল না করার মধ্যে মুর্দাদের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَا يُجِيْبُوْنَ : এর বহুবচনের যমীর অর্থের হিসেবে مَنْ-এর দিকে ফিরেছে। এ কারণে মুফাসসির (র.) مَنْ-এর তাফসীর كُفَّار দ্বারা করেছেন। কোনো কোনো নুসখায় فَيُجِيْبُوْنَ রয়েছে।

قَوْلُهُ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ : উদ্দেশ্য হলো এই যে, আপনার দায়িত্ব শুধু মাত্র তাবলীগ করা। হেদায়েত আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করে থাকেন।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : এটা اَرْسَلْنٰكَ -এর كَاف থেকে حَالٌ হয়েছে এবং حَقّ টা هِدَايَتْ অর্থে হয়েছে আর هَادِيًا টা هَادِيًا অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ اَرْسَلْنٰكَ حَالَ كَوْنِكَ هَادِيًا

قَوْلُهُ اَجَابَ اِلَيْهِ : اِلَيْهِ-এর যমীর هِدَايَتْ -এর দিকে ফিরেছে। আর اَجَابَ اِلَيْهِ অর্থ জবাব দেওয়া। কবুল করা اَجَابَ অর্থ হলো قَبِلَهُ আর لَمْ يُجِبْ اِلَيْهِ অর্থ হলো لَمْ يَقْبَلْهُ

قَوْلُهُ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ-এর মধ্যে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىّ হয়েছে। [হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ : এটা কাফেরদের দ্বিতীয় তাশবীহ প্রথমটি থেকে اَبْلَغْ; প্রথম তাশবীহ কাফেরদেরকে عَدَم نَفْع -এর ক্ষেত্রে অন্ধের সাথে দেওয়া হয়েছিল। আর এতে মুর্দাদের সাথে দেওয়া হয়েছে। অন্ধের মধ্যে কিছুনা কিছু نَفْع থাকে, মুর্দাদের বিপরীত। যে, তাকে কোনোরূপ উপকারই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবূতে বলা হয়েছে وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে; বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে। কিন্তু পথভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। একটি পথভ্রষ্ট হওয়ার ও অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্য পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতঃপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মিনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দেবে।

হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى বাক্যের অর্থ তাই। কুরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে, لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ সে দিন কোনো পিতা তার পুত্রকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং কোনো পুত্র পিতাকে বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্যে এই যে, কেউ অপরের পাপভার নিজে বহন করে তাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে পালাতে থাকবে। পালানো অর্থ এই যে, সে আশঙ্কা করবে, না জানি কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোনো পুণ্য চেয়ে বসে। –[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهٗ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ : এ আয়াতের শুরুতে কাফেরদেরকে মৃতদের সাথে এবং মুমনিগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَنْ فِى الْقُبُوْرِ [কবরস্থ লোক] -এর অর্থ হবে কাফের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফেরদেরও বুঝাতে পারবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো। নতুবা সাধারণভাবে কাফেরদেরকে সর্বদাই শোনানো হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মৃতদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। কারণ তারা পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়, তেমনি কাফেরদেরকেও সৎপথে আনা সম্ভবপর নয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে "মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না" বলে ফলপ্রসূ শোনানো বুঝানো হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো সম্পর্কিত আলোচনার সাথে এই আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে কিনা, তা পৃথক এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা রূম ও সূরা নমলে করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٧. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ج فَاَخْرَجْنَا فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا كَاَخْضَرَ وَ اَحْمَرَ وَاَصْفَرَ وَغَيْرِهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ جَمْعُ جُدَّةٍ طَرِيْقٍ فِى الْجَبَلِ وَغَيْرِهٖ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ وَصُفْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا بِالشِّدَّةِ وَالضُّعْفِ وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ عَطْفٌ عَلٰى جُدَدٌ اَىْ صُخُوْرٌ شَدِيْدَةُ السَّوَادِ يُقَالُ كَثِيْرًا اَسْوَدُ غِرْبِيْبٌ وَقَلِيْلًا غِرْبِيْبٌ اَسْوَدُ .

২৭. তুমি কি দেখনি জাননি আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের সবুজ, লাল হলুদ ইত্যাদি ফলমূল উদগত করি। اَخْرَجْنَا ফেয়েল দ্বারা গায়েব থেকে মুতাকাল্লিমের দিকে اِلْتِفَاتٌ করা হয়েছে পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ এর বহুবচন অর্থাৎ পাহাড়ের গিরিপথ যেমন, সাদা, লাল ও হলুদ, হালকা ও গাঢ় রংয়ের ও নিকষ কালোকৃষ্ণ। غَرَابِيْبُ এর আতফ جُدَدٌ-এর উপর, অর্থাৎ গাঢ় কালো বর্ণের মরুভূমি। অধিকাংশ সময় اَسْوَدُ غَرَابِيْبُ ব্যবহৃত হয় এবং কখনো غَرَابِيْبُ اَسْوَدُ ব্যবহৃত হয়।

٢٨. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَاۤبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ط كَاخْتِلَافِ الثِّمَارِ وَالْجِبَالِ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰۤؤُا ط بِخِلَافِ الْجُهَّالِ كَكُفَّارِ مَكَّةَ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ فِىْ مُلْكِهٖ غَفُوْرٌ لِذُنُوْبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

২৮. অনুরূপভাবে বিভিন্ন ফলমূল ও পাহাড়ের ন্যায় বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। পক্ষান্তরে জাহেলগণ যেমন মক্কার কাফের আল্লাহকে ভয় করে না নিশ্চয় আল্লাহ তার রাজত্বে পরাক্রমশালী ও তার ঈমানদার বান্দাদের গুনাহসমূহকে ক্ষমাশীল।

٢٩. اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ يَقْرَؤُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اَدَامُوْهَا وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً زَكٰوةً وَغَيْرَهَا يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ تَهْلِكَ .

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও সর্বদা নামাজ কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে জাকাত ইত্যাদি ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না।

٣٠. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ ثَوَابَ اَعْمَالِهِمُ الْمَذْكُوْرَةِ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ غَفُوْرٌ لِذُنُوْبِهِمْ شَكُوْرٌ لِطَاعَتِهِمْ .

৩০. পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রতিদান তাদের উল্লিখিত কর্মের ছওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশি দেবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমাশীল, তাদের আনুগত্যে গুণগ্রাহী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣١ ৩১. وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ
هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ط تَقَدَّمَهُ
مِنَ الْكُتُبِ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ
عَالِمٌ بِالْبَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ ـ

৩১. আমি আপনার প্রতি যে কিতব কুরআন প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী। নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে জাহের ও বাতেন সব জানেন, দেখেন।

٣٢ ৩২. ثُمَّ اَوْرَثْنَا اَعْطَيْنَا الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ
الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج وَهُمْ اُمَّتُكَ
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج بِالتَّقْصِيْرِ فِى
الْعَمَلِ بِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ج يَعْمَلُ بِهٖ فِى
اَغْلَبِ الْاَوْقَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ
يَضُمُّ اِلَى الْعَمَلِ بِهِ التَّعْلِيْمَ وَالْاِرْشَادَ
اِلَى الْعَمَلِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط بِاِرَادَتِهٖ ذٰلِكَ اَىْ
اِيْرَاثُهُمُ الْكِتَابَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ـ

৩২. অতঃপর আমি কিতাবের কুরআনের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছি এবং তারা হলো আপনার উম্মত তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী উক্ত কিতাব মতে আমল করতে অবহেলা করার কারণে কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন কারী অধিকাংশ সময় কিতাব মতে আমল করে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ যারা কুরআনের উপর আমল করার পাশাপাশি তালীম ও দাওয়াতের কাজ করেছেন এটাই তাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকার বানানো মহা অনুগ্রহ।

٣٣ ৩৩. جَنّٰتُ عَدْنٍ اِقَامَةٍ يَّدْخُلُوْنَهَا اَىِ الثَّلَاثَةُ
بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَلِلْمَفْعُوْلِ خَبَرُ جَنَّاتٍ
اَلْمُبْتَدَأُ يُحَلَّوْنَ خَبَرٌ ثَانٍ فِيْهَا مِنْ بَعْضِ
اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ج مُّرَصَّعٍ بِالذَّهَبِ
وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ـ

৩৩. তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে অর্থাৎ এই তিন দলই জান্নাতে প্রবেশ করবে। يَدْخُلُوْنَ সীগাহটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয়ভাবে পড়বে। এবং يَدْخُلُوْنَهَا টি جَنَّاتٍ মুবতাদার খবর তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত মোতিখচিত কঙ্কণ দ্বারা অলঙ্কৃত হবে। يُحَلَّوْنَ দ্বিতীয় খবর সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের।

٣٤ ৩৪. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا
الْحَزَنَ جَمِيْعَهُ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ لِلذُّنُوْبِ
شَكُوْرٌ لِلطَّاعَاتِ ـ

৩৪. এবং তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের সকল দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা পাপসমূহের ক্ষমাশীল, আনুগত্যের উপর গুণগ্রাহী।

Free @ www.eilm.weebly.com

٣٥. الَّذِىٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ اَىِ الْاِقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ج لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ تَعَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ اِعْيَاءٌ مِنَ التَّعَبِ لِعَدَمِ التَّكْلِيْفِ فِيْهَا وَذِكْرُ الثَّانِىْ التَّابِعُ لِلْاَوَّلِ لِلتَّصْرِيْحِ بِنَفْيِهٖ .

৩৫. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। জান্নাতে কষ্ট না হওয়ার কারণে কষ্টের কোনো ধরনের ক্লান্তি থাকবেনা। দ্বিতীয় لُغُوْبٌ প্রথম نَصَبٌ এর তাবে হিসেবে উল্লেখ করে স্পষ্টভাবে ক্লান্তিকে নফী করা হয়েছে।

٣٦. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ج لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ بِالْمَوْتِ فَيَمُوْتُوْا يَسْتَرِيْحُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ط طَرْفَةَ عَيْنٍ كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُمْ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ كَافِرٍ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ الْمَفْتُوْحَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاىِ وَنَصَبِ كُلَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ج يَسْتَغِيْثُوْنَ بِشِدَّةٍ وَعَوِيْلٍ يَقُوْلُوْنَ .

৩৬. আর যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে অতঃপর আরাম উপভোগ করবে এবং তাদের থেকে শাস্তিও সামান্য সময়ের জন্যও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই যেমন, তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি শাস্তি দিয়ে থাকি। نَجْزِىْ সীগাহটি ن ও ى অর্থাৎ نَجْزِىْ - يُجْزٰى - زَاء তে যের এবং كُلَّ-এর মধ্যে যবর দ্বারা পড়বে। সেখানে তারা আজাবের ভয়াবহতার কারণে আর্ত চীৎকার করে বলবে, রক্ষা চাইবে

٣٧. رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ط فَيُقَالُ لَهُمْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا وَقْتًا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ط الرَّسُوْلُ فَمَا اَجَبْتُمْ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ يَدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْهُمْ .

৩৭. হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে এখান থেকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম তা চিন্তা করব না তাদেরকে বলা হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স সময় দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় তা চিন্তা করতে পারতে? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারী রাসূলও আগমন করেছিল। তবুও তোমরা সাড়া দাওনি অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের কাফেরদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই যিনি তাদের থেকে আজাব প্রতিহত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَلَمْ تَرَ : এটা كَلَام مُسْتَانِفٌ এটা غَالِب قُدْرَتْ এর كَمَال حِكْمَتْ এবং عَجِيْب صَنْعَتْ কে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। আর رُؤْيَتْ দ্বারা رُؤْيَتْ قَلْبِىْ উদ্দেশ্য যেমন মুফাসসির (র.) تَرٰى -এর তাফসীর تَعْلَمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। اَنَّ তার اِسْم ও خَبَر কে নিয়ে تَرٰى যা تَعْلَمْ অর্থে হয়েছে তার দুই মাফউলের قَائِم مَقَامْ হয়েছে। আর مُخَاطَبْ হলেন রাসূল ﷺ এবং প্রত্যেক ব্যক্তিও مُخَاطَبْ হতে পারে যার মধ্যে مُخَاطَبْ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَاخْرَجْنَا بِهِ اَىْ بِالْمَاءِ : فَاخْرَجْنَا-এর মধ্যে غَيْبَتْ থেকে تَكَلُّمْ-এর দিকে اِلْتِفَاتٌ হয়েছে। এবং এই اِلْتِفَاتٌ-এর মধ্যে نُكْتَه صَنْعَت بَدِيع-এর দিকে عِنَايَتْ এর প্রকাশ। কেননা اِنْزَالْ-এর মোকাবিলায় اِخْرَاجْ-এর মধ্যে অধিক صَنْعَت بَدِيع এবং اِحْسَان রয়েছে।

قَوْلُهُ جُدَدٌ : এটা جُدَّةٌ-এর বহুবচন অর্থ রাস্তা। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, جُدَّةٌ টা قِطْعَة অর্থে হয়েছে। বলা হয় جَدَدْتُ الشَّىَٔ اَىْ قَطَعْتُهُ এবং জওহারী বলেছেন যে, ঐ রেখা সমূহ কে বলা হয় যা জঙ্গলী গাধার পিঠে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا : مُخْتَلِفٌ হলো اَلْوَانُهَا-এর فَاعِلْ এরপর جُمْلَه হয়ে جُدَدٌ-এর সিফত। আর غَرَابِيْبُ-এর আতফ جُدَدٌ এর উপর হয়েছে, سُوْدٌ টা غَرَابِيْبُ- হতে بَدَل হয়েছে। অর্থাৎ খুবই কালো কঙ্করময় ভূমি غِرْبِيْب اَسْوَد-এর মধ্যে قَانِىْ টা اَحْمَر- এর সিফত হয়েছে। অথবা تَاكِيْد মুবালাগার জন্য صِفَتْ বা تَاكِيْد-এর যেমন -اَلْاَحْمَرُ الْقَانِىْ কে অর্থাৎ مُؤَكَّد টা تَاكِيْد কে مُقَدَّمْ করে দিয়েছেন। অন্যথায় সাধারণত صِفَتْ মওসূফের পরে এবং تَاكِيْد صِفَتْ-এর পরে হয়ে থাকে এবং এটা আসলের অনুযায়ী হয়েছে। এ কারণেই اَسْوَد غِرْبِيْب বহুল ব্যবহৃত। এবং غِرْبِيْب اَسْوَد খেলাফে কেয়াস হওয়ার কারণে কম ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ : এটা خَبَر مُقَدَّمْ হয়েছে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ صِنْفٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ مِنَ النَّاسِ

قَوْلُهُ كَذَالِكَ : উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে অর্থাৎ اِخْتِلَافًا كَذَالِكَ

قَوْلُهُ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ : যেহেতু خَشْيَتْ-এর تَعَلُّقْ টা مَعْرِفَتْ শাঈ এর উপর মওকুফ থাকে। যার যতটুকু مَعْرِفَتْ অর্জিত হবে সে সেই পরিমাণই ভীতু হবেন। কাজেই হাদীসে এসেছে اَنَا اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ এবং شَاذْ কেরাতে اَللّٰهُ কে رَفْع দিয়ে এবং عُلَمَاء কে নসব দিয়ে পড়া হয়েছে। তবে সেই সুরতে يَخْشٰى টা يُعَظِّمُ অর্থে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর প্রতি ভীতুদেরকে মর্যাদা দান করেন।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ : এই وُجُوْب টা خَشْيَتْ-এর ইল্লত। উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মানুষের তাকে এই জন্য ভয় করা উচিত যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান এবং গুনাহগারদের ক্ষমাকারী।

قَوْلُهُ يَرْجُوْنَ تِجَارَةً : এটা اِنَّ-এর খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً : এটা نَزْع خَافِض- এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ এবং حَالْ হওয়ার কারণেও مَنْصُوْب হতে পারে। অর্থাৎ مُسِرِّيْنَ وَمُعْلِنِيْنَ আর لَنْ تَبُوْرَ টা فِعْل مُضَارِعْ যা لَنْ এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে এবং جُمْلَه হয়ে تِجَارَة- এর সিফত হয়েছে। আর مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يَرْجُوْنَ ثَوَابَ تِجَارَةٍ لَنْ تَبُوْرَ আর تَبُوْرَ নাসারা বাবে نَصَرَ হতে بَوَارٌ মাসদার অর্থ ধ্বংস হওয়া, মিটে যাওয়া। تَبُوْرَ অর্থ হলো সে ধ্বংস হয়ে গেছে। বিনিষ্ট হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ : এর মধ্যে لَامْ টি عَاقِبَه- এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِىْ : اَلَّذِىْ হলো মওসূল اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ বাক্য হয়ে সেলাহ, মওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা مِنَ الْكِتَابِ-এর مِنْ টি হলো هُوَ بَيَانِيَه হলো মুবাতাদা اَلْحَقُّ হলো খবর, মুবাতাদা খবর মিলে জুমলা হয়ে اَلَّذِىْ মুবতাদার খবর হয়েছে। কেউ কেউ هُوَ কে ضَمِيْر فَصْل বলেছেন আর اَلْحَقُّ কে اَلَّذِىْ মুবতাদার খবর বলেছেন। (جَمَلْ)

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا : এটা اَلْكِتَاب থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اَوْرَثْنَا اَعْطَيْنَا : ثُمَّ টা بُعْد رُتَبِى কে বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। আর اَوْرَثْنَا-এর তাফসীর اَعْطَيْنَا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, যেমনিভাবে কোনো কষ্ট ক্লেশ বিহীনভাবে মিরাশ অর্জন হয়। এমনিভাবে কুরআন ও উম্মতের কষ্ট কষ্ট ক্লেশ ছাড়াই অর্জিত হয়েছে।

Free @ www.eelm.weebly.com

قَوْلُهُ مِنْ عِبَادِنَا : এর মধ্যে مِنْ টা تَبْعِيْضِيَّه এবং بَيَانِيَه উভয়ই হতে পারে।

قَوْلُهُ اَوْرَثْنَا : এটা فِعْل এবং فَاعِل আর اَلْكِتَابَ হলো مَفْعُوْل بِهٖ ثَانِىْ যা مُقَدَّمْ হয়েছে এবং اَلَّذِيْنَ হলো প্রথম মাফউল যা مُؤَخَّرْ হয়েছে। আর اِصْطَفَيْنَا বাক্য হয়ে اَلَّذِيْنَ-এর সেলাহ হয়েছে। আর مِنْ عِبَادِنَا হলো حَالْ

قَوْلُهُ مُقْتَصِدٌ : এটা اِقْتِصَادٌ মাসদার হতে اِسْم فَاعِل-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ অর্থ– সঠিক রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। মধ্যম পন্থা।

قَوْلُهُ مُرَصَّعٍ بِالذَّهَبِ : এই তাফসীর لُؤْلُؤٍ যেরের সাথের কেরাতের সুরতে আর لُؤْلُؤًا নসবের সাথে হলে مِنْ اَسَاوِرَ-এর مَحَلّ-এর উপর আতফ হবে يُحَلَّوْنَ এবং يَدْخُلُوْنَ এটা تَغْلِيْبًا হয়েছে। অন্যথায় নারীদেরও এই একই বিধান।

قَوْلُهُ اَلْحَزَنَ : এটা বাবে سَمِعَ-এর মাসদার অর্থ চিন্তা, পেরেশানি এবং চিন্তিত হওয়া । ব্যাখ্যাকার جَمِيْعَه বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রত্যেক ধরনের চিন্তা পেরেশানি দূর করা উদ্দেশ্য, চাই এটা غَمِّ مَعَاشْ হোক বা غَمِّ مَعَادْ হোক। মোটকথা জান্নাতে কোনো ধরনের চিন্তা থাকবে না।

قَوْلُهُ قَالُوْا : মাযীর সীগাহ وُقُوْعِ يَقِيْنِىْ-এর কারণে নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَحَلَّنَا : এটা حَلَّ يَحِلُّ حُلُوْلًا থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো প্রবেশ করা।

قَوْلُهُ اَلْمَقَامَةِ : এটা বাবে اِفْعَالْ থেকে مَصْدَرِمِيْمِى অর্থ– সর্বদা অবস্থান।

قَوْلُهُ نَصَبٌ : ক্লান্তি, কষ্ট।

قَوْلُهُ لُغُوْبٌ : لُغُوْبٌ মাসদার এর اِسْم مَصْدَرٌ অর্থ অলসতা, কাপুরুষতা, মন্থরতা ক্লান্তি, শান্তি, অসুস্থতা।

قَوْلُهُ وَذِكْرِ الثَّانِى التَّابِعِ لِلْاَوَّلِ : এই ইবারত দ্বারা মুফাসসিরের উদ্দেশ্যে একটি সংশয়ের অপনোদন করা।

সংশয় : সংশয় হলো نَصَبٌ (ক্লান্তি) হলো سَبَبٌ আর لُغُوْب (অলসতা) আর مُسَبَّبٌ আর سَبَبٌ-এর اِنْتِفَاء টা مُسَبَّبٌ-এর اِنْتِفَاء আবশ্যক করে। আর لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ-এর মধ্যে سَبَبٌ এর نَفِىْ হয়েছে। কাজেই لُغُوْب-এর ও نَفِىْ হয়ে গেছে। পুনরায় لُغُوْب-এর نَفِىْ-এর কি প্রয়োজন?

উত্তর. উত্তরের সার হলো যদিও سَبَبٌ-এর নَفِىْ টা مُسَبَّبٌ-এর نَفِىْ কে আবশ্যক করে তবে এই نَفِىْ টা ضِمْنًا এবং تَبْعًا হয়ে থাকে। لُغُوْب-এর نَفِىْ করে مُسْتَقِلًا نَفِىْ-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَصْطَرِخُوْنَ : এটা اِصْطِرَاخٌ হতে جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ, অর্থ তারা চিৎকার করবে। اِصْطِرَاخٌ এটা বাবে اِفْتِعَالْ-এর মাসদার. تَا কে طَاء দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْعَوِيْلُ : رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْبُكَاءِ অর্থাৎ জোরে জোরে কান্নাকাটি করা।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ : এই বাক্যটি উহ্য قَوْل-এর مَقُوْلَه হয়েছে অর্থাৎ فَيُقَالُ لَكُمْ আর هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ টা اِنْكَارِىْ যা تَوْبِيْخ-এর জন্য হয়েছে। وَاوْ আতেফার মাধ্যমে উহ্যের উপর আতফ হয়েছে। অর্থাৎ اَلَمْ نُمْهِلْكُمْ وَنُؤَخِّرْكُمْ عُمْرًا

مَا تَذَكَّرُ فِيْهِ مِنْ تَذَكَّرَ আর হলো نَكِرَه مَوْصُوْفَه যা وَقْت অর্থে হয়েছে। আর يَتَذَكَّرُ বাক্য হয়ে صِفَتْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا اَجَبْتُمْ : এই ইবারত বৃদ্ধি করণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা। সংশয় হলো–প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, اِذَاقَت عَذَابْ-এর تَرَتُّبْ রাসূল আসার উপর مُرَتَّبْ অথচ এটা বাস্তবতার বিপরীত।

জবাবের সার হলো اِذَاقَت عَذَابْ টা উহ্যের উপর مُرَتَّبْ হয়েছে। রাসূল আসার উপর নয়; আর উহ্য হলো فَمَا اَجَبْتُمْ

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে তাওহীদের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে তাওহীদের একাধিক প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের যে অনন্ত মহিমা রয়েছে তা দেখে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নানা বর্ণের মানুষ, নানা রং এর ফল-মূল সাদা, কালো, লাল নানা প্রকৃতির কীট-পতঙ্গ, বিচিত্র অবস্থায় পাহাড় পর্বত বর্তমান রয়েছে। এসব কিছুর মধ্যে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের বহু নির্দশন রয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا 'তুমি কি দেখনি যে আল্লাহ পাক আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এরপর আমি এর দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি। পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে সাদা লাল এবং গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ তথা বিচিত্র বর্ণের অঞ্চল।

আসমান জমিন আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। পুনরায় আসমান থেকে জমিনে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক পানি বর্ষণ করেছেন। লক্ষ্যণীয়, বৃষ্টির পানি একই, আর ঐ এক পানি দ্বারাই সারা পৃথিবীতে যে ফলমূল উৎপন্ন হচ্ছে তা বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তার বর্ণ ভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন, কোথাও আকৃতি এক. কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। এর দ্বারাই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে মানুষ, কীট-পতঙ্গ এবং চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায় যে, একই প্রকার প্রাণীর মধ্যে কত বর্ণ এবং কত আকৃতি রয়েছে। এ সবই মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত মহিমা। এর কোনো শেষ নেই, নেই কোনো সীমা। মূলত আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। সমগ্র বিশ্ব ভূবন তাঁর কুদরত হেকমতে পরিপূর্ণ।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, ইতিপূর্বে মুমিন ও কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর এ আয়াতে বিশ্ব সৃষ্টির বিচিত্র রূপের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। যেভাবে সৃষ্টির মধ্যে রূপ ও প্রকৃতিতে পার্থক্য রয়েছে, যদিও সব কিছু এক পানি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে মানুষের মধ্যেও কেউ মুমিন আর কেউ কাফের রয়েছে, মুমিনের গন্তব্যস্থল জান্নাতে মুমিন আল্লাহ তা'আলার অনুগত, কৃতজ্ঞ, আর কাফের আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ। –[তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৮৭৭]

তাফসীরকার আবূ হাইয়ান (র.) বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাকের তাওহীদ বা একত্ববাদের বর্ণনা রয়েছে। মানব জাতিকে বিশ্ব সৃষ্টির অপরূপ রূপ দেখে বিশ্ব স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। রং বেরংয়ের ফল ফুল, সাদা কালো লাল, আর এ অবস্থা শুধু ফল ফুলে নয়; বরং মানব জাতির মধ্যেও একই অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। আর এ বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতি জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গেও পরিলক্ষিত হয়। এ সবই এক আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন।

আবদ ইবনে হোমায়েদ, ইবনে জারীর, কাতাদা (র.)– থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২২, পৃ. ১৮৮-৮৯]

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তাওহীদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গে وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে বিষয়রই বিশদ বিশ্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ব্যাপার। এ পার্থক্য উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল আকার ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে।

قَوْلُهُ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا : ফলমূলের اِخْتِلَافُ اَلْوَانٍ তথা বর্ণ বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে مُخْتَلِفًا শব্দটিকে مَنْصُوْب উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির اِخْتِلَافُ তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে صِفَتْ -এর আকারে مُخْتَلِفٌ অর্থাৎ مَرْفُوْع বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফলমূলের বর্ণ-বৈচিত্র এক অবস্থায় স্থির থাকে না প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তুর বর্ণ সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جَادَّةٌ ও বলা হয়। কেউ কেউ جُدَّةٌ এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কালো রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি সাদা ও কালো। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রণে গঠিত হয়।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে كذلك শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিসয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, كَذٰلِكَ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ ফলমূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার আল্লাহ ভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে। -[রূহুল মা'আনী]

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ এতে নবী কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচ্য اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। اِنَّمَا শব্দটি আরবিতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়া প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, اِنَّمَا শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার মধ্যে আল্লাহভীতি না থা জরুরি হয় না। -[বাহরে-মুহীত, আবূ হাইয়ান]

আয়াতে عُلَمَاءُ বলে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবি ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারেফত উপরিউক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنَّ الْعِلْمَ بِكَثْرَةِ الْخَشْيَةِ অর্থাৎ অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইলম নয়; বরং সে জ্ঞানই ইলম যা আল্লাহর ভয়সমৃদ্ধ।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়। -[ইবনে কাসীর]

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি (র.) বলেন, এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, সে আলেম নয়। -[মাযহারী]

প্রাচীন মনীষীগণের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত রবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন مَنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলেম নয়। মুজাহিদ (র.) বলেন اِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِىَ اللّٰهَ অর্থাৎ কেবল সেই আলেম যে আল্লাহকে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মদিনায় সর্বাধিক আলেম কে? তিনি বললেন, اَتْقَاهُمْ لِرَبِّهٖ অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুর্তযা (রা.) ফকীহ ও আলেমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন إِنَّ الْفَقِيهَ حَقَّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِيْ مَعَاصِي اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْاٰنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلٰى غَيْرِهِ إِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيْ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيْهَا وَلَا عِلْمَ لَا فِقْهَ فِيْهِ وَلَا قِرَاءَةَ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا . অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গুনাহ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহ আজাব থেকে নিশ্চিন্ত করে না এবং কুরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে না। তিনি আরও বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই, ফিকহ ব্যতীত ইলমের কোনো কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কুরআন পাঠ করার মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই। -[কুরতুবী]

আল্লাহর ভয় নেই: এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায় উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবি জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কুরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয়ে কোনো সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরিয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌছে যায়। এ পর্যায়ে শরিয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপারে হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্য জরুরি। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম জরুরি নয়। -[বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ الخ : পূর্ববর্তী এক আয়াতে আল্লাহ তত্ত্ব-জ্ঞানী হক্কানী আলেমগণের একটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্কে দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কুরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করে। مُضَارِعٌ পদবাচ্যে يَتْلُوْنَ ক্রিয়াপদটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকর্মে কুরআনের অনুশ্রবণ করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য। তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নির্দিষ্ট যে, সে তেলাওয়াত ধর্তব্য যা কুরআন অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু তেলাওয়াত শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থেই ধর্তব্য হবে। হযরত মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, هٰذِهِ اٰيَةُ الْقُرَّاءِ অর্থাৎ এ আয়াতটি কারীগণের জন্য যারা কুরআন তেলাওয়াতকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় গুণ নামাজ কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরি হয়ে যায়। যেমন- মিনারে আজান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জামাতে নামাজ আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহর পথে প্রকাশ্য দান করা জরুরি হয়ে যায়। নামাজ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ বলেন, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামাজ ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরিউক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর যারা বলা হয়েছে- يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ : تَبُوْرَ শব্দটি بَوَارٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশঙ্কা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মু'মিনের জন্য কোনো সৎকাজে ছওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিশ কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহর মহিমা ও প্রাপ্য ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফিরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানি অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোনো মন্দ কর্মেও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে يَرْجُوْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সৎকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে বিশ্বাসী হওয়ার অধিকার কারও নেই বেশি থেকে বেশি আশাই করতে পারে। [রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে : এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন– অন্য এক আয়াতে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদকে ব্যবসা বলা হয়েছে। আয়াতটি এই– هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশঙ্কা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে لَنْ تَبُوْرَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসানে ও ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মতো কোনো ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। 'তারা প্রার্থী' একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষা বেশি দান করবেন। বলা হয়েছে– لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ এখানে لِيُوَفِّيَهُمْ শব্দটি لَنْ تَبُوْرَ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ তাদের প্রতিদান ও ছওয়াব পুরোপুরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহ তাদের ধারণাতীত অনেক বেশি দেবেন।

এই বেশির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশির পক্ষে সাতশ গুণ বরং যা তার চেয়েও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে। [মাযহারী]

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্য হতে পারবে, কাফেরের জন্য সুপরিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

قَوْلُهٗ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا : ثُمَّ অব্যয়টি পূর্বাপর সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফলে বুঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্নগুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু আগে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বুঝায়। অতঃপর এই আগপাছ কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়ে থাকে। এ আয়াতে ثُمَّ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত اَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عَطْف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কুরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআন ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মুহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কুরআনের অধিকারী করার অর্থ ও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্য অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গম্বরগণ দিরহাম ও দীনার উত্তরাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার স্বরূপ ইলম বা জ্ঞান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলেম ও জ্ঞানীগণকে পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরিউক্ত অগ্র-পশ্চাৎকালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি। অতঃপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে । একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোনো কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কুরআন পাকের এই ধনও মনোনীত বান্দাদেরকে কোনো কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলেগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমান আলেমগণের মধ্যস্থতা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। [অর্থাৎ কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সহজ ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানি কিতাবেরই উত্তরাধিকারী হওয়া।] অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَسَابِقُهُمْ يُدْخَلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ এ উম্মতের জালিমদেরকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে মধ্যপন্থিদের হিসাবে সহজভাবে নেওয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। -[ইবনে কাসীর]

আয়াতের اِصْطَفَيْنَا শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কুরআন পাকে পয়গাম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ অন্য এক আয়াতে আছে اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে اِصْطِفَاء অর্থাৎ মনোনয়নে পয়গাম্বরগণের সাথে শরিক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়নের উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার : فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা। অর্থাৎ আমি যাদেরকে মনোনীত করে কুরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালিম, মধ্যপন্থি ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাছীর এই প্রকারত্রয়ের তাফসীর এভাবে করেছেন জালিম সে ব্যক্তি যে কোনো কোনো ফরজ ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থি সে ব্যক্তি, যে সমস্ত ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোনো কোনো মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোনো কোনো মোবাহ বিষয় ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়। -[ইবনে কাসীর]

অন্যান্য তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। রূহুল মা'আনীতে তেতাল্লিশটি উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উক্তির সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাছীর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : উল্লিখিত তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, জালেমও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যত অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালিম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اِصْطَفَيْنَا গুণের বাইরে নয়। এটি হলো উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিন বান্দাদের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যত ত্রুটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাছীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতের اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا তে বর্ণিত তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই স্তরভুক্ত এবং জান্নাতী। [ইমাম আহমদ, ইবনে কাসীর]

অর্থাৎ মাগফেরাত সবারই হবে এবং সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

Free @ www.eilm.weebly.com

ইবনে জারীর আবূ সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি [আবূ সাবেত] মসজিদে পৌছে হযরত আবূদ্দারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পান। তিনি তাঁর বরাবর গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেন اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ وَارْحَمْ غُرْبَتِىْ وَيَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার আন্তরিকতা পেরেশানী দূর করুন, আমার প্রবাসী অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে একজন সৎ কর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। [এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গ গণের মধ্যে সৎসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারি বিষয় বলে গণ্য হতো। তারা সৎসঙ্গীকে প্রধান লক্ষ্য ও যাবতীয় পেরেশানির প্রতিকার মনে করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর জন্য দোয়া করতেন।] আবূদ্দারদা (রা.) এই দোয়া শুনে বললেন, আপনি এ দোয়া ও অন্বেষণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার মতো সৎসঙ্গী চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।] তিনি আরও বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনেছি। এ পর্যন্ত কারও কাছে বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি। হাদীসটি এই রাসূলে করীম ﷺ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا আয়াতখানি তেলায়ওয়াত করে বলেছেন, এই তিন রকম লোকের মধ্যে সৎকর্মে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যম পন্থিদের কাছ থেকে হালকা হিসেবে নেওয়া হবে এবং জালিম এস্থলে খুব দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে। অবশেষে সেও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে তার দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।

তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, وَكُلُّهُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই হবে উম্মতে মুহাম্মদী থেকে।

আবূ দাউদ ওকবা ইবনে সাহবান হেনায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- বৎস! এ প্রকার লোকই জান্নাতী। তাদের মধ্যে অগ্রগামী তারা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানার প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন। মিত্যাচারী বা মধ্যপন্থি তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতঃপর আমাদের ও তোমাদের মতো লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি।

বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। নতুবা সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অগ্রগামীদের প্রথম সারির একজন।

ইবনে জারীর মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এর জালিমও ক্ষমাপ্রাপ্ত। মিথ্যাচারী জান্নাতী এবং সৎকাজে অগ্রগামী দলে আল্লাহর কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের (রা.) জালিমের তাফসীরে বলেন اَلَّذِىْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অসৎ উভয় কর্মে সংমিশ্রিণ ঘটায় সে জালিম পর্যায়ভুক্ত।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কিতাবও রাসূল ﷺ -এর শিক্ষার উত্তরাধিকারী হচ্ছে ওলামায়ে কেরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ -এর সারমর্ম এই যে, যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাবা ইবনে হাকাম (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্য রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই করনা কেন তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে আলিমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ ভীতির রঙ্গে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসাবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুলত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফিরাত তোমাদের জন্য অবধারিত। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাশরে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে একত্র করবেন, অতঃপর আলিমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন, اِنِّىْ لَمْ اَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ اِلَّا لِعِلْمِىْ بِكُمْ وَلَمْ اَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ لِاُعَذِّبَكُمْ اِنْطَلِقُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্য রেখেছিলাম যে, আমি জানতাম [ও যে, তোমাদের এই আমানতের হক আদায় করবে।] তোমাদের আজাব দেওয়ার জন্য তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। –[তাফসীরে মাযহারী]

জ্ঞাতব্য : আয়াতে সর্বপ্রথম জালিম, অতঃপর মিথ্যাচারী বা মধ্যপন্থি ও সর্বশেষে সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবত এই যে, আলিমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিথ্যাচারী-মধ্যপন্থি এবং আরও কম সৎকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ অর্থাৎ শুরুতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছিল। তারপর বলেছেন, ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কঙ্কণ এবং মুক্তার অলঙ্কার পরানো হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের অলঙ্কার ও রেশমী পোশাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলঙ্কার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্য শোভনীয় নয়। কেননা দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)–এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত হবে। –[তাফসীরে মাযহারী]

তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কঙ্কণ থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তাফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই। –[তাফসীরে কুরতুবী]

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোশাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোন-রূপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরি বরতনে আহার করো না। কারণ এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং তোমাদের জন্য পরকালে।

–[বুখারী, মুসলিম]

হযরত ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে; সে পরকালে তা পরিধান করতে পারবে না। –[বুখারী, মুসলিম]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধানকারী পুরুষ পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে যদিও সে জান্নাতে প্রবেশ করে। –[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهٗ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ : অর্থাৎ জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃত পক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

دریں دنیا کسے غم نباشد

وگر باشد بنی ادم نباشد

এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে কোনো সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরই নিস্তার নেই। একারণেই সুধীবর্গ দুনিয়াকে 'দারুল-আহযান' দুঃখ-কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমত দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়ত কিয়ামত ও হাশর-নাশরের দুঃখ-কষ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথায়ও উৎকণ্ঠা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ বলতে বলতে উঠছে। [তাফসীরে তাবারাবীন, মাযহারী]

উপরে বর্ণিত হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত জালিম শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা এই উক্তি করবে। কেননা হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষ জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা জালিম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিথ্যাচারী ও জালিম সকল শ্রেণির জান্নাতিই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদা হওয়া অবান্তর নয়।

ইমাম জাস্‌সাস (রা.) বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মু'মিনের শান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য কয়েদখানা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রধান প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাঁদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্শ দেখা যেত।

اَلَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। এক. জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। দুই. সেখানে কেউ কোনো দুঃখের সম্মুখীন হবে না। তিন. সেখান কেউ ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে। জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোনো কোনো হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে।-[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهٗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ : অর্থাৎ জান্নামে যখন কাফেররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আজাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ আঠারো বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরিয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালোমন্দ বুঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরিউক্ত কথাটি বলা হবে তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গাম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যে পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আজাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহর প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গুনাহ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

হযরত আলী মূর্তযা (রা.) বলেন আল্লাহ তা'আলা যে বয়সে গুনাহগার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্য কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতেও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সতের আঠারো বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরিয়তের বিধানাবলি পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওজর আপত্তি করার কোনো অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে : أَعْمَارُ أُمَّتِىْ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ অর্থাৎ আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হবে। খুব কম লোকই এই সীমা অতিক্রম করবে।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্য মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্য ভীতি-প্রদর্শনকারী ও প্রেরণ করেছেন। 'নাযীর' শব্দের অর্থ ভীতি-প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নাযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে আপন লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কুরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গাম্বরগণ ও তাঁদের নায়েব আলেমগণকে বুঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্য আমি জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাফর বাকের (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত نَذِيْرٌ [সতর্ককারীর] অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য, পয়গাম্বর ও আলেমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে। এতে কোনো বিরোধ নেই।

সত্য এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সত্তার ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ককারী ভূমিকা পালন করে।

অনুবাদ :

٣٨. اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ فَعِلْمُهٗ بِغَيْرِهٖ اَوْلٰى بِالنَّظَرِ اِلٰى حَالِ النَّاسِ ـ

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞাত। অতএব অন্তরের বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ের জ্ঞানতো থাকবেই। অবশ্যই হওয়ার হুকুম মানুষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

٣٩. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ط جَمْعُ خَلِيْفَةٍ اَىْ يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ط اَىْ وَبَالُ كُفْرِهٖ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ج غَضَبًا وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا لِلْاٰخِرَةِ ـ

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। خَلِيْفَةٌ শব্দটি خَلٰٓئِفَ-এর বহুবচন অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে একজন আরেকজনের স্থলাভিষিক্ত হওয়া অতএব তোমাদের থেকে যে কুফরি করবে তার কুফরি তার কুফরের পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। কাফেরদের জন্য তাদের কুফর তাদের পালনকর্তার নিকট বৃদ্ধি করে না ক্রোধ ব্যতীত অন্য কিছু এবং কাফেরদের কুফর কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে আখেরাতে।

٤٠. قُلْ اَرَاَيْتُمْ شُرَكَآئَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ وَهُمُ الْاَصْنَامُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ شُرَكَآءُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَرُوْنِىْ اَخْبِرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ شِرْكَةٌ مَعَ اللّٰهِ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ ج اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ حُجَّةٍ مِّنْهُ بِاَنَّ لَهُمْ مَعِىْ شِرْكَةً لَا شَىْءَ مِنْ ذٰلِكَ بَلْ اِنْ مَا يَعِدُ الظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا بَاطِلًا بِقَوْلِهِمُ الْاَصْنَامُ تَشْفَعُ لَهُمْ ـ

৪০. বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরিকদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত তোমরা ডাক পূজা কর এবং ঐ সমস্ত মূর্তিসমূহ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরিক বলে মনে কর তোমরা আমাকে দেখাও খবর দাও যা তারা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে। না আসমান সৃষ্টিতে আল্লাহর সাথে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার দলিলের উপর কায়েম রয়েছে আমার সাথে তাদের অংশ রয়েছে এতে তাদের কোনো দলিল নেই বরং জালেমরা কাফেরগণ একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। তাদের ওয়াদা যে, মূর্তিসমূহ তাদের সুপারিশ করবে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤١. إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ج اَىْ يَمْنَعُهُمَا مِنَ الزَّوَالِ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ زَالَتَا اِنْ مَا اَمْسَكَهُمَا يُمْسِكُهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اَىْ سِوَاهُ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا فِىْ تَاخِيْرِ عِقَابِ الْكُفَّارِ .

৪১. নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন যাতে টলে না যায় অর্থাৎ উভয়কে টলে যাওয়া থেকে বিরত রাখে যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? لَئِنْ -এর মধ্যে ل শপথ এর অর্থ প্রদান করে তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল কাফেরদের শাস্তি বিলম্ব করতে।

٤٢. وَاَقْسَمُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اَىْ غَايَةَ اِجْتِهَادِهِمْ فِيْهَا لَئِنْ جَاۤءَهُمْ نَذِيْرٌ رَسُوْلٌ لَيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج اَلْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَغَيْرِهِمَا اَىْ اَىَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا لَمَّا رَأَوْا مِنْ تَكْذِيْبِ بَعْضِهَا بَعْضًا اِذْ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَىْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ نَذِيْرٌ مُحَمَّدٌ ﷺ مَازَادَهُمْ مَجِيْئُهٗ اِلَّا نُفُوْرًا تَبَاعُدًا عَنِ الْهُدٰى .

৪২. তারা মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর নামে জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী রাসূল আগমন করলে তারা অন্য যে কোনো সম্প্রদায় ইয়াহুদি, নাসারা ও অন্যান্য অর্থাৎ যে কোনো সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎপথের পথিক হতো। অর্থাৎ তাদের এই উক্তি যখন তারা দেখে ইহুদি ও নাসারা একে অপরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে। ইহুদিরা বলে নাসারা সত্যের উপর নেই আর নাসারাগণ বলে ইহুদিরা সত্যের উপর নেই অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী মুহাম্মদ ﷺ আগমন করলেন, তখন তার আগমন তাদের ঘৃণাই হেদায়েত থেকে পলায়ন কেবল বাড়িয়ে দিল।

٤٣. اِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ عَنِ الْاِيْمَانِ مَفْعُوْلٌ لَهٗ وَمَكْرَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ مِنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهٖ وَلَا يَحِيْقُ يَحِيْطُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ط وَهُوَ الْمَاكِرُ وَوَصْفُ الْمَكْرِ بِالسَّيِّئِ اَصْلٌ وَاِضَافَتُهٗ اِلَيْهِ قَبْلُ اِسْتِعْمَالٌ اٰخَرُ قُدِّرَ فِيْهِ مُضَافٌ حَذَرًا مِنَ الْاِضَافَةِ اِلَى الصِّفَةِ .

৪৩. পৃথিবীতে ঈমান থেকে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং কুচক্রের শিরক ইত্যাদি বদ আমলের কারণে। اِسْتِكْبَارًا শব্দটি نُفُوْرًا থেকে مَفْعُوْل لَهٗ। পরিণাম কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। মূল ব্যবহার অনুযায়ী اَلسَّيِّئْ টি مَكْر -এর সিফত। আয়াতের মধ্যে اَلسَّيِّئْ এর দিকে مَكّر -এর اِضَافَتْ বিকল্প ব্যহার। এবং এতে اِضَافَتُ الْمَوْصُوْفِ اِلَى الصِّفَةِ থেকে বিরত থাকার জন্যে একটি مُضَافْ اِلَيْهِ অতিরিক্ত করা হয়েছে। যেমন, مَكْرُ الْعَمَلِ السَّيِّئِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ج سُنَّةَ اللّٰهِ فِيْهِمْ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا اَىْ لَا يُبْدَلُ بِالْعَذَابِ غَيْرُهُ وَلَا يُحَوَّلُ اِلٰى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ ـ

তারা কেবল পূর্ববর্তীদের দশারই তারা নবীদেরকে অস্বীকার করার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহর আজাবের অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধানে পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি নীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। অর্থাৎ আজাবকে অন্য কিছু তথা শাস্তি দিয়ে ও আজাবের উপযুক্তকে আজাবের অনুপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরিবর্তন করে না।

٤٤. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً فَاَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ بِتَكْذِيْبِهِمْ رُسُلَهُمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَىْءٍ يَسْبِقُهُ وَيَفُوْتُهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا بِالْاَشْيَاءِ كُلِّهَا قَدِيْرًا عَلَيْهَا ـ

৪৪. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? যাতে তারা দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল তবুও আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন তাদের নবীদের অস্বীকার করার কারণে আকাশ ও জমিনে কোনো কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। অতএব কেউ তার কাছ থেকে বাঁচতে ও অগ্রসর হতে পারবে না নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

٤٥. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مِنَ الْمَعَاصِىْ مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَىِ الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ نَسَمَةٍ تَدُبُّ عَلَيْهَا وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ج اَىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا فَيُجَازِيْهِمْ عَلٰى اَعْمَالِهِمْ بِاِثَابَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعِقَابِ الْكَافِرِيْنَ ـ

৪৫. যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের পাপের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠে চলমান কোনো প্রাণী ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহর সব বান্দা তার দৃষ্টিতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের কর্মপ্রতিদান মুমিনদেরকে পূণ্যের মাধ্যমে আর কাফেরদেরকে শস্তির মাধ্যমে দিবেন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : এটা عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-এর ইল্লত, অর্থাৎ যেই সত্তা অন্তরের ভেদ সম্পর্কে অবগত তিনি তো তা ব্যতীত সম্পর্কেও অবগত إِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ এটা হলো দাবি। আর إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ হলো দাবির দলিল, فَعِلْمُهُ بِغَيْرِهِ أَوْلٰى এটা নতীজা।

قَوْلُهُ بِالنَّظْرِ اِلٰى حَالِ النَّاسِ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো আল্লাহর ইলমে أَوْلَوِيَّتْ এবং أَوَّلِيَّتْ -এর হিসেবে কোনো পার্থক্য হয় না; বরং তার সামনে সকল জিনিসই সমানভাবে প্রস্ফুটিত। আল্লাহর عِلْمُ حُضُوْرِىْ তে এ কথার দ্বারা কোনো পার্থক্য পড়েনা; যাতে করে কিছু জিনিস মানুষের জন্য অস্পষ্ট হয় এবং কিছু জিনিস প্রকাশ্য হয়।

উত্তর. আল্লাহর দিকে أَوْلَوِيَّتْ-এর নিসবত মানুষের অভ্যাসের হিসেবে যে, মানুষ যখন গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয় তখন প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে তো আরো ভালোভাবেই অবগত হয়।

قَوْلُهُ وَلَا يَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ الخ : এটা কুফরের শাস্তি ও তার পরিণামের বর্ণনা।

قَوْلُهُ اَرَاَيْتُمْ : এতে اِعْرَابْ-এর হিসেবে দুটি সুরত হতে পারে

১. হামযাটা হলো اِسْتِفْهَامِيَّةٌ আর قَوْلُهُ اَرُوْنِىْ টা اَمْر تَعْجِيْز-এর জন্য جُمْلَهْ مُعْتَرِضَهْ- এই সুরতে এটা تَنَازُعْ টা اَخْبِرُوْنِىْ অর্থাৎ فِعْلَانِ থেকে হবেনা, আর اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ এটা اَرَاَيْتُمْ থেকে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। অর্থাৎ اَرُوْنِىْ اَىَّ شَيْءٍ خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ حَتّٰى يَسْتَحِقُّوا الْاِلٰهِيَّةَ وَالشِّرْكَةَ টা عَنْ شُرَكَائِكُمْ কেউ কেউ বলেন مُبْدَلْ اَرَاَيْتُمْ থেকে بَدَلُ الْكُلِّ হয়েছে। তবে আবূ হাইয়ান بَدَلْ কে নাজায়েজ বলেছেন। তার বক্তব্য হলো এই যে, যখন مِنْهُ-এর উপর هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ আসে তখন بَدَل-এর উপরও هَمْزَهْ اِسْتِفْهَامْ হওয়া জরুরি। আর এখানে এরূপ হয়নি। তাছাড়া اِبْدَالُ جُمْلَةٍ عَنِ الْجُمْلَةِ তার ভাষায় مَعْهُوْدْ নয়। তাছাড়া بَدَلْ টা تَكْرَارُ عَامِلٍ-এর নিয়তে নিয়ে থাকে। আর এখানে مُبْدَلْ مِنْهُ অর্থাৎ اَرَاَيْتُمْ-এর মধ্যে কোনো আমেলই নেই। [روح المعانى]

২. দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো এই যে, এই বাক্যটি تَنَازُعْ فِعْلَانِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এই সুরতে اَرَاَيْتُمْ বাবে اِفْعَالْ থেকে হবে আর اَخْبِرُوْنِىْ-এর অর্থে হয়ে مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْل হবে, প্রথম মাফঊল হলো نِىْ আর তার দ্বিতীয় মাফঊলের প্রয়োজন। দ্বিতীয় ফে'ল হলো اَرُوْنِىْ এটাও مُتَعَدِّىْ بِدُوْمَفْعُوْل হয়েছে। একটা মাফঊল হলো তার সাথে মিলিত نِىْ আর দ্বিতীয়টির প্রয়োজন। আর দ্বিতীয় মাফঊল যাতে تَنَازُعْ হয়েছে, আর তা হলো مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ যার মধ্যে اَرَاَيْتُمْ এবং اَرُوْنِىْ টা تَنَازُعْ করতেছে। বসরীদের পছন্দনীয় মাযহাব অনুযায়ী দ্বিতীয় ফে'ল اَرُوْنِىْ কে আমল করতে দিয়েছে।

قَوْلُهُ شُرَكَائُهُمْ : এই ইযাফত اَدْنٰى مُنَاسَبَتْ-এর কারণে হয়েছে। কেননা মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছিল। অথবা اِضَافَتْ এ কারণে যে, মুশরিকরা মূর্তিদেরকে বাস্তবিক পক্ষে স্বীয় সম্পদে শরিক করে নিয়েছিল। এবং নিয়মিত স্বীয় সম্পদে মূর্তিদের অংশ রাখত এবং তাদের নামে কুরবানি করত।

قَوْلُهُ اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ : هُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুশরিকরা। কেউ কেউ বলেন যে, شُرَكَاءْ উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমি কি মুশরিকদের বা شُرَكَاءْ কে এমন কোনো কিতাব দিয়েছি যে, যাতে এটা লিখা আছে যে, আমার ক্ষমতায় আমার সাথে কোনো শরিক রয়েছে?

قَوْلُهُ لَا شَيْءَ مِنْ ذٰلِكَ : দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ আর এই বাক্যটি উল্লিখিত তিনটি اِسْتِفْهَامْ -এর জবাবও।

قَوْلُهُ شِرْكَةٌ : شِرْك-এর তাফসীর شِرْكَةٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, شِرْك মাসদারটা شِرْكَةٌ ইসিমের অর্থে হয়েছে (لُغَاتُ الْقُرْاٰن)

قَوْلُهُ بَعْضُهُمْ : এটা ظَالِمُوْنَ থেকে بَدَل হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنَ الزَّوَالِ : এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَنْ تَزُوْلَا হরফে জার مِنْ -এর استفهام -এর সাথে يُمْسِكُ হয়ে يُمْسِكُ -এর দ্বিতীয় মাফঊল। আর يُمْسِكُ টা يَمْنَعُ -এর অর্থে হয়েছে। এবং যুজাজ (র.) বলেছেন যে, اَنْ تَزُوْلَا হয়েছে অর্থাৎ مَفْعُوْل لَهُ মাফঊলে লাহু بِتَاوِيْلِ مَصْدَرٍ

قَوْلُهُ وَلَئِنْ زَالَتَا : এতে قَسَم এবং شَرْط উভয়টি একত্রিত হয়েছে اِنْ اَمْسَكَهُمَا হলো جَوَابُ قَسَمٍ আর প্রসিদ্ধ নীতিমালার দৃষ্টি কোণ থেকে شَرْط উহ্য রয়েছে। যার উপর جَوَابُ قَسَمٍ টা বুঝাচ্ছে।

وَاحْذَفْ لَدَى اِجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمٍ * جَوَابَ مَا اَخَّرْتَ فَهُوَ مُلْتَزَمٌ.

قَوْلُهُ مِنْ اَحَدٍ : مِنْ টা فَاعِلْ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে। আর اَحَدٍ হলো শব্দিকভাবে مَجْرُوْر আর مَحَلْ হিসেবে مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ سِوَاهُ : এটা مِنْ بَعْدِهٖ -এর তাফসীর অর্থাৎ بَعْدُ হলো غَيْر অর্থে আর مِنْ بَعْدِهٖ -এর মধ্যে مِنْ হলো اِبْتِدَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا : এটা يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ -এর ইল্লত হয়েছে। অর্থাৎ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ হওয়ার কারণে জমিন ও আকাশ কে পতিত হওয়া থেকে বারণ করে রেখেছেন অর্থাৎ কুফর ও শিরক বাস্তবিক পক্ষে এমন অপরাধ যে, তার শাস্তিতো তাৎক্ষণিক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তিনি তার সিফত রহমত ও মাগফেরাতের কারণে শাস্তিতে বিলম্ব করতেছেন।

قَوْلُهُ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ : মুফাসসির (র.) جَهْد -এর তাফসীর غَايَةَ اَيْمَانِهِمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, جَهْدَ টা اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ -এর কারণে مَصْدَرِيَّةٌ হয়েছে। আবার حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হওয়াও বৈধ। অর্থাৎ جَاهِدِيْنَ جَهْدَ [جِيْم -এর যবরসহ] অর্থ পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা।جُهْد(جِيْم এর পেশ সহ) অর্থ শক্তি। মক্কার মুশরিকদের এই অভ্যাস ছিল যে, সাধারণভাবে স্বীয় বাপ-দাদা বা মূর্তির শপথ করত। কিন্তু যখন তাদেরকে কোনো বিষয়ে বিশ্বাস করানো, ইয়াকীন দেওয়া উদ্দেশ্য হতো তখন কসম কে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করত।

قَوْلُهُ لَيَكُوْنُنَّ : এটা حِكَايَتْ حَالْ بِالْمَعْنٰى হয়েছে অন্যথায় স্থানের চাহিদা ছিল لَتَكُوْنُنَّ হওয়া।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ : لَمَّا হলো حَرْفُ شَرْط আর مَازَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا হলো جَوَابُ شَرْط এখানে لَمَّا কে ظَرْفِيَّةٌ মানা বৈধ নয়। কেননা مَا نَافِيَة -এর مَا بَعْد টা مَا قَبْل -এর মধ্যে আমল করে না। আর অধিক ঘৃনার اِسْنَادْ টা نَذِيْر -এর দিকে অথবা مَجِيْئَتٌ -এর দিকে اِسْنَادْ مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা نَذِيْر হলো نَفْرَتْ -এর কারণ। অন্যথায় نَذِيْر -এর কাজ হলো نَفْرَتٌ সৃষ্টি করা বা نَفْرَتْ -এর মধ্যে বৃদ্ধি করা হয় না।

قَوْلُهُ اِسْتِكْبَارًا : এটা نُفُوْرًا -এর مَفْعُوْل لَهُ অর্থাৎ মুশরিকদের ঈমানের মোকাবিলায় অহঙ্কার ও বড়াই করার কারণে তাদের نَفْرَتْ -এর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর زَادَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالْ ও হতে পারে অর্থাৎ مَازَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا كَوْنِهِمْ مُسْتَكْبِرِيْنَ

قَوْلُهُ اِلَّا سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ : এর তাফসীর سُنَّةَ اللّٰهِ فِيْهِمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, মাসদার مَفْعُوْل -এর দিকে মুযাফ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ -এর মধ্যে وَاوْ টি হলো عَاطِفَةٌ আর هَمْزَةٌ উহ্যের উপর এসেছে। উহ্য ইবারত হলো اَتَرَكُوْا السَّفَرَ وَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ -এই বাক্যটি সেই কথার সাক্ষী যে, আল্লাহর নিয়মাবলিতে কোনো পরিবর্তন নেই, আল্লাহ তা'আলা পূর্বের মুশরিক ও মুনকিরদের সাথে যে মোয়ামালা করেছেন তা তাদের সাথেও হবে। هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ হয়েছে। যার কারণে نَفْىُ النَّفْىِ টা اِثْبَاتْ -এর ফায়দা দিয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই লোকেরা সফর করে এবং সালেহ, লূত ও শুয়ায়েব সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

قَوْلُهُ بِمَا كَسَبُوْا : এতে بَاءْ টি হলো سَبَبِيَّةْ আর مَا হলো مَصْدَرِيَّةْ বা مَوْصُوْلَهْ অর্থাৎ بِسَبَبِ كَسْبِهِمْ এবং بِسَبَبِ الَّذِىْ كَسَبُوْهُ

قَوْلُهُ نَسَمَةً : ذِىْ رُوْحٍ مُتَنَفِّسٍ-কে বলে, বহুবচনে نَسَمٌ

قَوْلُهُ فَيُجَازِيْهِمْ : মুফাসসির (র.) এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ হলো শর্ত আর তার جَزَاءْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো فَيُجَازِيْهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তাওহীদের প্রমাণ এবং শিরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত এবং গুণাবলির বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক তাঁর পরিপূর্ণ ইলম সম্পর্কে অবগত। শুধু তাই নয়; বরং মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে সব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও আল্লাহপাক সম্পূর্ণ অবহিত। তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই, মানুষের জীবনের সকল অবস্থা তার নিকট সুস্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। পূর্ববর্তী আয়াতে দোজখীদের আর্তনাদের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তারা দোজখের শাস্তি-যন্ত্রণায় অধৈর্য হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে এই ফরিয়াদ করবে যে, একটিবার অন্তত: তাদের দোজখ থেকে বের হয়ে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেওয়া হোক। তাহলে তারা পূর্বের ন্যায় আর মন্দ কাজ করবে না, বরং এবার সৎ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে।

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের এ অন্যায় আবদারের জবাব দিয়ে ইরশাদ করেছেন মানুষের অবস্থা, তাদের মনের সব গোপন কথা, তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আল্লাহ পাক ভালো করেই জানেন। কাফেররা যত শপথ করেই বলুক না কেন যে, আর অন্যায় করবে না, নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণেই তারা একথা বলে, একটু ছাড় পেলেই তারা তাদের পুরনো অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করবে, একথা আল্লাহ পাক খুব ভালোভাবেই জানেন। এজন্য অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ 'যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবে তারা পুনরায় সে মন্দ কাজই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল'।

আর যেহেতু আল্লাহ পাক তাদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, তাঁর নিকট পৃথিবীর কোনো কিছুই গোপন নেই, তাই তাঁর জ্ঞান মোতাবেকই তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং তাদেরকে দোজখ থেকে বের হতে দেওয়া হবেনা

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ.২২,পৃ.২০১-২০২]

ইমাম রাযী (র.) এ পর্যায়ে লিখেছেন, যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে কাফেররা যতদিন পৃথিবীতে ছিল ততদিন কুফরি ও নাফরমানি করেছে, তাদের শাস্তি হলে তাদের জীবনের দিনগুলোর হিসাব মোতাবেকই হবে, এর বেশি নয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের পূর্বাপর সব কিছু জানেন, তাই তিনি একথাও জানেন, যদি তাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হতো, তবে তারা চিরদিনই কাফের থাকত, এজন্যে তাদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু আল্লাহ পাক খুব ভালো ভাবেই জানেন যে কাফেরদেরকে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করানো হলে তারা পুনরায় কুফরি, নাফরমানি ও যাবতীয় পাপাচারে লিপ্ত হবে, তাই তাদের শাস্তি সর্বদা অব্যাহত থাকবে। –[তাফসীরে কবীর খ. ২৬,পৃ.-৩০]

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ .... مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ع **আয়াতের শানে নুযূল :** ইবনে আবি হাতেম ইবনে আবি হেলালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে মক্কার কুরাইশরা বলতো যে, যদি আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে কোনো নবী প্রেরণ করেন, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে তাঁর অধিকতর অনুসরণ করবো। ইতিপূর্বে যত উম্মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি আমরা এই নবীর অনুগত থাকবো। তাই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রিয়নবী ﷺ -এর পূর্বে মক্কার কুরায়শরা জানতে পেরেছিল যে, ইহুদি নাসারারা তাদের নিকট প্রেরিত নবী রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল। এজন্যে তারা বলেছিল, ইহুদি নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত হোক, তাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নবী রাসূলগণ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। এরপর মক্কার কুরায়শরা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিল, যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের প্রতি কোনো নবী রাসূল আগমন করেন, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে তাঁর অধিকতর অনুসরণ করবো। ইতিপূর্বে যত উম্মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি আমরা এই নবীর অনুগত থাকবো। তাই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

প্রিয়নবী ﷺ -এর পূর্বে মক্কার কুরায়শরা জানতে পেরেছিল যে, ইহুদি নাসারারা তাদের নেকট প্রেরিত নবী রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল। এজন্যে তারা বলেছিল, ইহুদি নাসারাদের উপর আল্লাহর লানত হোক, তাদের নিকট আল্লাহর পাকের তরফ থেকে নবী রাসূলগণ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। এপর মক্কার কুরায়েশরা আল্লাহ পাকের নামে শপথ করে বলেছিল যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের প্রতি কোনো নবী রাসূল আগমন করেন, তবে আমরা পূর্ববর্তী যে কোনো উম্মতের চেয়ে সে নবীর অধিকতর অনুসারী হবো।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ : خَلَائِفُ শব্দটি خَلِيْفَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্য শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগক হেলায় নষ্ট করো না।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ : আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। اَنْ تَزُوْلَا শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল এ বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই।

قَوْلُهُ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ : لَا يَحِيْقُ অর্থ لَا يُحِيْطُ কিংবা لَا يُصِيْبُ অর্থাৎ কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না– কুচক্রীর উপর পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা ধর্মীয় ক্ষতি। আর কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আজাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করাও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন, তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তি কবল থেকে রেহাই পাবে না। এক. কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেওয়া, দুই. জুলুম করা এবং তিন. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেওয়া যায়নি।

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ইয়াসীন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নামকরণের কারণ : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরাসমূহের নাম রাখা হয় সাধারণত সে সূরায় উল্লিখিত কোনো বিশেষ শব্দ বা ঘটনা দ্বারা অথবা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। সূরা ইয়াসীন -এর বেলায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সূরাটির শুরুতে يٰسٓ শব্দ উল্লেখ থাকায় তার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতু ইয়াসীন। তা ছাড়া আরবি প্রবাদ- تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ তথা 'কোনো বস্তুর অংশবিশেষের দ্বারা পূর্ণ বস্তুটি নামকরণ করা' হিসেবে অত্র সূরাকে সূরা ইয়াসীন বলে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে।

এ সূরার অন্যান্য নাম : আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত নামটি ছাড়াও সূরাটির কতিপয় নাম প্রদান করেছেন। যেমন- ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটির নাম قَلْبُ الْقُرْاٰنِ রেখেছেন। ইমাম বায়হাকী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাওরাতে এরূপ সূরাকে اَلْمُعِمَّةُ তথা উভয়জগতের কল্যাণের সমষ্টি নামে অভিহিত করা হতো। আরো এরূপ সূরাকে اَلْمُدَافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ তথা প্রত্যেকের দুঃখ নিবারণকারী এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণকারী নামে অভিহিত করা হতো।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা ইয়াসীনের মধ্যে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে- ১. রিসালাতের প্রমাণ, ২. হাশরের প্রমাণ ও ৩. তাওহীদের প্রমাণ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা (সূরায়ে ফাতির) -এর সমাপ্তিতে কাফেরগণ কর্তৃক মহানবী ﷺ -এর রিসালাতের অস্বীকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর সূরা ইয়াসীনের প্রারম্ভে নবী করীম ﷺ -এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কাফেরদের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে, কাজেই উপরিউক্ত সূরা ও এ সূরার পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মহানবী ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ এ সূরার আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গির উপর গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ সূরার وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ আয়াত খানা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন মদীনার বনী সালামা গোত্র মসজিদে নববীর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا আয়াত খানাকে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা ইয়াসীনে ছোট বড় মোট ৮৩টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এর প্রতিটি আয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কিত পর্যালোচনায় ভরপুর।

সূরার আলোচ্য বিষয় : এ সূরায় মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ-এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে। আর যারা নবীর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করত সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সূরায় তিনটি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে-

১. **তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে :** প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে।

২. **পরকাল সম্পর্কে :** প্রাকৃতিক নিদর্শন, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের সাহায্যে।

৩. **মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে :** এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অসহনীয় কষ্ট, দুর্ভোগ, নির্যাতন সহ্য করে এ মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ও বিবেক সম্মত দাওয়াত অনবরত দিয়ে যাচ্ছেন। আর এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে তাদের নিজেদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরার সার-সংক্ষেপ : সূরা ইয়াসীনের শুরুতেই ওহী এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতা পবিত্র কুরআনের সাথে শপথ করার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী চরম গোমরাহে লিপ্ত কুরাইশী কাফেরদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যাদের জন্য কঠিন আজাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

- এ সূরাতে রাসূলগণকে অস্বীকারকারী ইনতাকিয়াবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে মক্কার পৌত্তলিকরা নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মহানবী ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতে বিরত থাকে।
- এ সূরাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগকারী একনিষ্ঠ দীন প্রচারক হাবীবে নাজ্জারের কথা, যিনি স্বীয় কওমকে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন এবং পরকালের অফুরন্ত শান্তি লাভ করেন। আর তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর অবধারিত আজাব ও ধ্বংসলীলা নেমে আসে।
- এ সূরাতে প্রাকৃতিক নিদর্শন যথা– নির্জীব ভূমিতে জীবনের সঞ্চার করত সুজলা-সুফলা করে তোলা, রাত দিনের গমনাগমন, চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত ও চলাচল ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।
- এ সূরাতে আরো আলোচনা করা হয়েছে কিয়ামত ও সে দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থা সম্পর্কে; যেমন– পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের আলোচনা, কিয়ামত দিবসে মু'মিন ও অপরাধীদের মধ্যকার বিচ্ছেদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মু'মিনগণ জান্নাতে আর অপরাধী কাফের মুশরিকরা জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।
- অবশেষে উপসংহারের ন্যায় মৌলিক আলোচ্য বিষয় যথা– পুনরুত্থান, প্রতিদান ইত্যাদির উপর অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা ইয়াসীনের ফজিলত : এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো–

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ . (تِرْمِذِيْ حَاشِيَةُ جَلَالَيْنِ ص ٣٦٨)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক জিনিসের অন্তঃকরণ রয়েছে, আর কুরআনের অন্তঃকরণ হলো সূরা ইয়াসীন। আর যে ব্যক্তি এ সূরা একবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে দশ খতম কুরআন তেলাওয়াত করার ছওয়াব দান করবেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْقُرْاٰنِ سُوْرَةً تَشْفَعُ لِقَارِئِهَا وَتَسْتَغْفِرُ لِمُسْتَمِعِهَا اَلَا وَهِيَ سُوْرَةُ يٰسٓ . تُدْعٰى فِى التَّوْرَاةِ الْمُعِمَّةُ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُعِمَّةُ . قَالَ تَعُمُّ صَاحِبَهَا بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَتَدْفَعُ عَنْهُ اَهْوَالَ الْاٰخِرَةِ؟ وَتُدْعٰى اَيْضًا الدَّافِعَةُ وَالْقَاضِيَةُ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ ذٰلِكَ؟ قَالَ تَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوْءٍ وَتَقْضِيْ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ -

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তার শ্রবণকারীর জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। আর তা হচ্ছে সূরায়ে ইয়াসীন। তাওরাতে একে اَلْمُعِمَّةُ [আল-মুইম্মাহ] বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! মুইম্মাহ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকারীকে একাধারে দুনিয়ার কল্যাণ দান করবে এবং পরকালের বিপদাপদ হতে রক্ষা করবে। আর একে اَلدَّافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ ও বলে। আরজ করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আবার কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকের উপর হতে সর্বপ্রকার বিপদাপদকে প্রতিহত করে এবং তার সকল ধরনের প্রয়োজন পূর্ণ করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অন্যত্র এসেছে যে, যে ব্যক্তি রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যূষে নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করো। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ সূরার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, কোনো জটিল কাজে ৪১ বার এ সূরা পাঠ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেবেন।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি অভাব-অনটনের বেলায় কোনো ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে তার অভাব দূর হয়ে যাবে।

ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে ও স্বস্তিতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ সূরা পাঠ করবে সে ভোর পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমি এটি এমন ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছি যিনি এ ব্যাপারে পরীক্ষিত।

তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় একটি দীর্ঘ হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেক বস্তুরই কলব বা হৃদপিণ্ড রয়েছে, আর কুরআনে কারীমের হৃদপিণ্ড হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তার আমলনামায় দশ খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব লেখা হবে। আর যদি কোনো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা আগমনের সময় এ সূরা তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে তার প্রতিটি হরফের বিনিময় দশজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁরা তার নিকট সারিবদ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন, তার গোসলে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর জানাযা ও দাফনেও উপস্থিত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি সাকারাতুল মউতের সময় সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে জান্নাতের শুভ সংবাদ পাওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি : মুফাসসিরীনে কেরামের মতে এ সূরাটি মাক্কী জীবনের ক্রান্তি লগ্নে অবতীর্ণ হয়েছে। ইতিহাসের আলোকে জানা যায় যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের ফিকিরে মানসিকভাবে ভীষণ কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। কারণ সুদীর্ঘ দশ দশটি বছর মক্কার অলিতে-গলিতে দাওয়াতি কাজ করে হাতে গোনা গুটি কয়েকজন লোক ব্যতীত তেমন কেউই দীনি দীক্ষা গ্রহণ করেনি। সাধারণ জনগণ পূর্বেও যেমন কুফর ও শিরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এখনো অনুরূপই রয়ে গেছে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ও খাজা আবূ তালিব পরপারে পাড়ি জমান। এরপর মক্কাবাসীদের দীন গ্রহণের প্রতি নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনি দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তায়েফের পৌত্তলিকরা প্রিয় নবীর দাওয়াত তো গ্রহণই করেনি উপরন্তু তারা প্রস্তরাঘাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র বদনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মানসিক অবস্থা কতটুকু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যুগের এক ক্রান্তি লগ্নে সূরা ইয়াসীন অবতীর্ণ হয়। এতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় নবী করীম ﷺ -এর রিসালাতকে প্রমাণ করা হয়েছে। কাফিরদের দাওয়াত বিমুখতায় উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য পেয়ারা নবী ﷺ -কে পরমার্শ প্রদান করা হয়েছে। তাওহীদ ও আখেরাতকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দীন-প্রচারকদের ঘটনা উল্লেখ করত এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত।

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ : সূরা ইয়াসীন মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا قَوْلَهُ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوْا الْآيَةَ أَوْ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَثَمَانُوْنَ آيَةً خَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

তবে وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوْا الخ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ

অথবা পূর্ণাঙ্গ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত- ৮৩; রুকূ- ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰسٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .	১. ইয়াসীন। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।
٢. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ الْمُحْكَمِ بِعَجِيْبِ النَّظْمِ وَبَدِيْعِ الْمَعَانِيْ .	২. প্রজ্ঞাময় কুরআনের শপথ। যা আশ্চর্য শব্দ ভাণ্ডার [ভাষা] ও অপূর্ব ভাবের সমন্বয়ে সুদৃঢ়।
٣. اِنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .	৩. নিশ্চয় আপনি হে মুহাম্মদ ﷺ রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।
٤. عَلٰى مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهٗ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اَىْ طَرِيْقِ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ التَّوْحِيْدُ وَالْهُدٰى وَالتَّاكِيْدُ بِالْقَسَمِ وَغَيْرِهٖ رَدٌّ لِقَوْلِ الْكُفَّارِ لَهٗ لَسْتَ مُرْسَلًا .	৪. আপনি প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এটা তার পূর্ববর্তী বক্তব্যের (اِنَّكَ) সাথে সংশ্লিষ্ট সঠিক সরল পথে। অর্থাৎ আপনার পূর্ববর্তী নবীদের পথ তথা হেদায়েত ও তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। শপথ ইত্যাদি দ্বারা তাকিদ নেওয়ার কারণ হচ্ছে কাফিরদের উক্তি لَسْتَ مُرْسَلًا [তুমি প্রেরিত নও]-কে খণ্ডন করা।
٥. تَنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ الرَّحِيْمِ بِخَلْقِهٖ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ اَىِ الْقُرْاٰنُ .	৫. সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সত্তার পক্ষ হতে অবতারিত স্বীয় রাজত্বে যিনি দয়াময় তার সৃষ্টির প্রতি। এটা اَلْقُرْاٰنُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।
٦. لِتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا مُتَعَلِّقٌ بِتَنْزِيْلَ مَا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ اَىْ لَمْ يُنْذَرُوْا فِىْ زَمَنِ الْفَتْرَةِ فَهُمْ اَىِ الْقَوْمُ غٰفِلُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ وَالرُّشْدِ .	৬. যাতে আপনি এর দ্বারা এমন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাতে পারেন এটা পূর্বোক্ত تَنْزِيْل-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ যাদের পূর্বপুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। অর্থাৎ فَتْرَةٌ তথা দুই নবীর গমনাগমনের মধ্যবর্তী সময়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। ফলে তারা কুরাইশ সম্প্রদায় গাফেল অজ্ঞ রয়েছে ঈমান ও সঠিক পথ হতে।
٧. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ وَجَبَ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ اَىِ الْاَكْثَرُ .	৭. অবশ্যই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে সাব্যস্ত হয়েছে তাদের অধিকাংশের উপর ফলে তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

ইয়াসীন শব্দের বিভিন্ন কেরাত :

- মদীনাবাসী ও ইমাম কেসায়ীর মতে, يٰسٓ -এর ن অক্ষরটি পরবর্তী وَاوْ-এর সাথে اِدْغَام করে পড়তে হবে।
- কারী আবূ আমর আ'মাশ ও হামযাহ -এর মতে يٰسٓ -এর ن অক্ষরটিকে اِظْهَار করে পড়তে হবে।
- ঈসা ইবনে ওমরের মতে, يٰسٓ -এর ن অক্ষটিকে যবর দিয়ে পড়তে হবে।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে আবূ ইসহাক ও নসর ইবনে আসিমের মতে يٰسٓ -এর ن অক্ষরটিকে যের যোগে পড়তে হবে।

يٰسٓ শব্দটি তারকীবগত অবস্থান : يٰسٓ শব্দটির তারকীবগত অবস্থান কয়েকটি হতে পারে–

১. يٰسٓ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে। যথা– هٰذِهٖ يٰسٓ

২. يٰسٓ শব্দটির يَا অক্ষরটি হরফে নেদা আর س মুনাদায়ে মুফরাদ হিসেবে রফার উপর মাবনী হয়েছে। বাহ্যত তার উপর রফা হলেও বস্তুতপক্ষে এটি اُدْعُوْ ফে'লের মাফউল হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হবে।

৩. يٰسٓ শব্দটি اُتْلُ ফে'লের মাফউল হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হবে।

ই'রাবের ক্ষেত্রে اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -এর অবস্থান : وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এখানে وَاوْ টি কসমিয়া আর اَلْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ মাওসূফ সিফাত মিলে مُقْسَمٌ بِهٖ আর اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ টা জবাবে কসম বা مُقْسَمٌ عَلَيْهِ।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -এর ই'রাব : এ আয়াতে তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে–

১. عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ বাক্যটি তার পূর্ববর্তী বাক্য اَلْمُرْسَلِيْنَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। আর এ অবস্থায় বাক্যটি হবে اِنَّكَ لَمِنَ الَّذِيْنَ اُرْسِلُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ [নিশ্চয় আপনি সে দলের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে পাঠানো হয়েছে] এমতাবস্থায় عَلٰى অক্ষরটি اِلٰى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. অথবা, এ বাক্যটি اَلْمُرْسَلِيْنَ -এর যমীর থেকে হাল হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তখন বাক্যটি এরূপ হবে যে, اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ حَالَ كَوْنِكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ [নিশ্চয় আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত এমতাবস্থায় যে, আপনি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।]

৩. অথবা, এটি اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর, যার প্রথম খবর হলো لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ তখন পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে যে, اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ [নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত এবং নিঃসন্দেহে আপনি সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত] এমতাবস্থায় এটা مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে।

তারকীবে تَنْزِيْلَ শব্দের অবস্থান : تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ -এর মধ্যে তিন ধরনের তারকীব হতে পারে–

১. এটা উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَرْفُوْعٌ হবে, তখন পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে اَلْقُرْاٰنُ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ অথবা এটা يٰسٓ মুবতাদার খবর হবে। যদি يٰسٓ -কে সূরার নাম ধরা হয়।

২. অথবা, এটা উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক হয়ে মানসূব হবে। তখন বাক্যটি হবে– نُزِّلَ الْقُرْاٰنُ تَنْزِيْلًا

৩. অথবা, এটা اَلْقُرْاٰنُ হতে বদল হয়ে মাজরূর হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

تَنْزِيْلَ শব্দটির কিরাত : উল্লেখ্য যে, تَنْزِيْلَ শব্দটি ৩টি কেরাতে পড়া যায়–

১. হযরত হামযাহ্, কেসাই, ইবনে আমির ও হাফস (র.)-এর মতে, এটা নসবের সাথে تَنْزِيْلَ পড়া হবে।

২. হযরত নাফে', ইবনে কাছীর, আবূ আমর ও আবূ বকর (র.)-এর মতে, এটা রফা'-এর সাথে تَنْزِيْلُ পড়া হবে।

৩. হযরত শায়বা, আবূ জা'ফর ইয়াযীদ ইবনে কা'কা' ও আবূ হাইওয়া তিরমিযী (র.)-এর মতে এটা যেরের সাথে تَنْزِيْلِ পড়া হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহর বাণী لِتُنْذِرَ قَوْمًا **-এর মধ্যে** لَامْ **টি কিসের সাথে** مُتَعَلِّقْ **হবে? :** لِتُنْذِرَ قَوْمًا বাক্যটি পূর্বোল্লিখিত تَنْزِيْلَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে এবং এ বাক্যটি تَنْزِيْلَ -এর মাফউলে লাহু হয়েছে।

আল্লাহর বাণী فَهُمْ غٰفِلُوْنَ **-এর মধ্যে** فَاءْ **নেওয়ার কারণ :** পূর্ববর্তী مَآ اُنْذِرَ -এর مَا টি نَافِيَة হলে তা فَهُمْ غٰفِلُوْنَ سَبَبْ একটি উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হবে। তখন বাক্যটি হবে لَمْ يُنْذَرُوْا فَهُمْ غٰفِلُوْنَ এমতাবস্থায় فَاءْ বর্ণটি غٰفِلُوْنَ سَبَبْ -এর উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

অথবা, এটা لِتُنْذِرَ -এর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। তখন বাক্যটি হবে لِتُنْذِرَ ..... فَهُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে এ জন্য ভয় দেখাবেন যে, তারা গাফেল। এমতাবস্থায় فَاءْ বর্ণটি تَعْلِيْلِيَّةْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা মহানবী ﷺ উচ্চৈঃস্বরে সূরা সাজদাহ্ তেলাওয়াত করছিলেন, এতে কতিপয় দুষ্কৃতি কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ উত্তেজিত হয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আল্লাহর কুদরতে তখনই তাদের হাতগুলো অকেজো ও অবশ হয়ে পড়ে, আর চোখগুলো যায় অন্ধ হয়ে। এতে নিরুপায় হয়ে কুরাইশ ব্যক্তিবর্গ দরবারে নববীতে এসে ক্ষমা ভিক্ষা করে। দয়ার সাগর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য দোয়া করলে তারা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইয়াসীনের প্রথম চারটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, পরবর্তীকালে এ দুষ্কৃতকারীদের প্রত্যেকেই বেঈমান অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

يٰسٓ **শব্দের বিশ্লেষণ :** পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার শুরুতে يٰسٓ এবং এ জাতীয় আরো অনেক শব্দ রয়েছে যথা– الٓرٰ . الٓمٓ . حٰمٓ . قٓ ইত্যাদি এগুলোকে حُرُوْفْ مُقَطَّعَاتْ বলা হয়। এ জাতীয় সকল حُرُوْفْ গুলো مُتَشَابِهَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত। জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে حُرُوْفْ مُقَطَّعَاتْ -এর মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ ও حُرُوْفْ مُقَطَّعَاتْ -এর মর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন, অন্যথা خِطَابْ (সম্বোধন) অনর্থক হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা (لَغْو) অনর্থক হতে পবিত্র। অবশ্য কতিপয় তাফসীরকারক حُرُوْفْ مُقَطَّعَاتْ -এর মর্ম উদ্‌ঘাটনে প্রয়াস নিয়েছেন, ফলে তাদের একেকজন একেক ধরনের মর্ম প্রকাশ করেছেন।

- ইবনে আরাবী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে ইমাম মালিক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এটা আল্লাহর একটি নাম।
- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাঈ গোত্রের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে يَا اِنْسَانُ হে মানুষ! আর এখানে মানুষ বলতে মহানবী ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে।
- হযরত ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর মতে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি নাম।
- মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মতে এর অর্থ– হে মুহাম্মদ ﷺ। পবিত্র কুরআনে মহানবী ﷺ -এর ৭টি নাম এসেছে।

যথা– ১. مُحَمَّدٌ ২. اَحْمَدُ ৩. طٰهٰ ৪. يٰسٓ ৫. مُزَّمِّلٌ ৬. مُدَّثِّرٌ ৭. عَبْدُ اللّٰهِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

- কারো কারো মতে, এটা কুরআনের একটি নাম।
- আবূ বকর আল-আবরাক বলেছেন, এর অর্থ يَا سَيِّدَ النَّاسِ অর্থ- হে মানুষের নেতা।
- কারো কারো মতে, এর অর্থ يَا رَجُلُ অর্থ- হে ব্যক্তি।
- ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এর অর্থ يَا مُحَمَّدُ অর্থ- হে মুহাম্মাদ ﷺ।
- কারো মতে, এটা সূরাটির ভূমিকা। -কুরতবী, ফাত্‌হুল কাদীর, খাযিন, ইবনে কাছীর

يٰسٓ দ্বারা কারো নাম রাখা বৈধ কিনা? : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে যেহেতু এটা আল্লাহর নাম তাই এর দ্বারা কোনো মানুষের নাম রাখা যাবে না। কেননা, এর সঠিক অর্থ আমাদের জানা নেই। কাজেই এটা এমনও হতে পারে যে, এটা আল্লাহর এমন একটি নাম যা শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যথা- خَالِقٌ ـ رَزَّاقٌ অবশ্য যদি অন্য পদ্ধতিতে يَاسِيْن লেখা হয়, তাহলে তার দ্বারা মানুষের নাম রাখা যেতে পারে।

ইয়াসীন শব্দটি আরবি না অনারবি? يٰسٓ শব্দটি আরবি না আজমি এ নিয়ে মুফাসসিরীনদের মাঝে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

- তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে এটা আরবীয় বনূ কিলাব গোত্রের ভাষা।
- হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.)-এর মতে, এটা আরবি নয়; বরং এটা হাবশী শব্দ। অর্থ হচ্ছে- মানুষ।
- ইমাম শা'বী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আরবীয় গোত্র বনূ তাঈ-এর ভাষা।
- ইমাম কালবী (র.)-এর মতে, এটা সুরিয়ানী শব্দ। পরবর্তীতে আরবিতে অধিক ব্যবহারের ফলে এটা আরবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।
- হারুন আল-আ'ওয়ার ও ইবনে সামাইক প্রমুখগণের মতে, يٰسٓ-এর ن অক্ষরটিকে পেশ যোগে পড়তে হবে। আর তখন يٰسٓ টা উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَرْفُوعٌ হবে। -[বায়যাবী ও কুরতুবী]

মুফাসসিরদের উক্তি اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ-এর বিশ্লেষণ : يٰسٓ এটা আরবি বর্ণমালার সমষ্টি। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয়। ১. مُحْكَمْ ও ২. مُتَشَابِهْ, আবার مُتَشَابِهْ-কেও দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথমত এমন مُتَشَابِهْ যার আভিধানিক অর্থ জ্ঞাত, কিন্তু পারিভাষিক বা ভাবার্থ অজ্ঞাত।

দ্বিতীয়ত এমন مُتَشَابِهْ যার আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থই অজ্ঞাত। আর يٰسٓ শব্দটি শেষোক্ত শ্রেণিভুক্ত। সূরার সূচনাতে ব্যবহৃত এ অর্থ অজ্ঞাত বর্ণসমষ্টিকে حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ বলা হয়।

এজন্যেই তাফসীরে জালালাইন প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) يٰسٓ শব্দের তাফসীরে লেখেছেন- اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ; অর্থাৎ এই يٰسٓ শব্দ দ্বারা আল্লাহর কি উদ্দেশ্য, তা তিনিই ভালো জানেন। অবশ্য মুহাক্কিক তাফসীরকারগণ উল্লেখত করেছেন যে, নবী করীম ﷺ -এর অর্থ জানতেন। অন্যথায় তাঁকে এসব শব্দ দ্বারা সম্বোধন অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবে সাধারণ মু'মিনগণের এর অর্থ জানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং তাদের জন্যে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য আয়াত হিসেবে এসেছে। তথাপি কোনো কোনো মুফাসসির অনুমানের উপর ভিত্তি করে এর নানারূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিক অর্থে এর মর্মার্থ সম্বন্ধে আল্লাহই ভালো জানেন।

হাকীম বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর গুণ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সিফাত হাকীম আনলেন কেন? উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, এখানে حَكِيْمٌ [যা বিবেক সম্পন্ন প্রাণীর গুণ]-কে রূপক অর্থে কুরআনের সিফাত নেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কারণ কুরআনকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও জড়পদার্থ মনে হয় কিন্তু গভীর দৃষ্টিকোণ হতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ পবিত্র কুরআনের মধ্যেও বিবেকবানদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। এটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি ভাণ্ডার যা মৃত অন্তরকে সজীব করে তোলে। হৃদয়ের চোখ খুলে দেয় আর অন্তহীন অজানা জগতকে মানুষের চোখের সামনে উন্মোচন করে দেয়, যা অন্য কোনো গ্রন্থের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আর এই নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই কুরআনকে হাকীম বিশেষণের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা غَيْرِ اللّٰهِ -এর নামে কসম করার যথার্থতা : মানুষের জন্যে ইসলামি শরিয়তের হুকুম হলো, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা হরাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে উক্ত আয়াতে ও অপরাপর আয়াতসমূহে সৃষ্ট বস্তুর নামে কসম করেছেন, তা গায়রুল্লাহর নামে কসম করা জায়েজের উপর দলিল নয় কি? এ মাসআলার জবাবে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন- إِنَّ اللّٰهَ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْسِمَ إِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট যে কোনো বস্তুর নামে কসম করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারো জন্যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুর নামে শপথ করা জায়েজ নেই।' –[মাযহারী]

উপরিউক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা মুফতি শফী (র.) বলেন, "মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ মনে করে তবে তা ভ্রান্ত ও বাতিল বলে বিবেচিত হবে। কেননা শরিয়ত মানবমণ্ডলীর জন্যে। তাই শরিয়ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কাজকর্মকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল বলে গণ্য হবে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে ইমাম আয্যাহাবী (র.) বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- নবীর নামে কসম, কা'বার কসম, ফেরেশেতার কসম, আকাশের কসম, পানির কসম, জীবনের কসম, আমানতের কসম, প্রাণের কসম, মাথার কসম, অমুকের মাজারের কসম ইত্যাদি।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে আবূ দাউদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষদের নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কসম যদি করতেই হয় তবে আল্লাহর নামেই কসম করবে, নচেৎ চুপ থাকবে।"

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা দেব-দেবীর নামে বা বাপ-দাদার নামে কসম করো না। আমার কথা সত্য না হলে আমি অমুকের সন্তান নই," এরূপ বলা বাপ-দাদার নামে কসমের পর্যায়ভুক্ত। আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও হাকিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এভাবে কসম করে যে, আমার কথা সত্য না হলে আমি মুসলমান নই, সে মিথ্যুক হলে যা বলেছে তাই হবে [অর্থাৎ সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে] আর সে সত্যবাদী হলেও সম্পূর্ণ নিরাপদেই ইসলামের পথে বহাল থাকতে পারবে না।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, " কেউ অভ্যাসবশত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে ভুলক্রমে কসম করলে তৎক্ষণাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বলবে।" –[কিতাবুল কাবায়ের]

অস্বীকারকারীদের জন্য শপথের ফায়দা : আল্লাহ তা'আলা শপথের মাধ্যমে রাসূল ﷺ -এর রিসালাতকে সাব্যস্ত করেছেন। আর এটা রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদানকারীদের জন্য যথেষ্ট হওয়া স্পষ্ট। কিন্তু এ শপথ কাফেরদের জন্য কিসের ফায়দা দিবে। মুফাস্সিরীনে কেরামগণ এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে,

- কাফেররা যদিও কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলতে অস্বীকার করে, তবুও এটা যে একটি অলৌকিক গ্রন্থ তা স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে তাদের সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে কুরআনের অতি ছোট একটি সূরার ন্যায় সূরা রচনা করতে বলেছেন। তারা শতটা চেষ্টা সত্ত্বেও এর সমকক্ষ কোনো সূরা এমনকি একটি আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। এ কারণে এখানে কুরআনের শপথ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

✪ এ শপথের মাধ্যমে কাফের–মুশরিকদের যদিও কোনো উপকার সাধিত হয়নি তথাপি এর দ্বারা মু'মিনগণ তথা সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আরো দৃঢ় ও মজবুত হয়েছে। আর এ কারণেই বিরুদ্ধবাদীদের অব্যাহত অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার মুখেও সাহাবায়ে কেরাম সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেননি। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহানবী ﷺ-এর রিসালাতকে অস্বীকারকারী কাফের মুশরিকদের মধ্যে যারা বিবেকের দ্বারা তাড়িত হয়ে একে অনুধাবন করতে চেয়েছে তাদের জন্য এটা অবশ্যই ফলপ্রসূ ছিল।

كَيْفِيَّةُ اِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ بِالْقَسَمِ : শপথের মাধ্যমে রিসালাত সাব্যস্তকরণ পদ্ধতি :

✪ কাফিরদের ধারণা ছিল যে, মিথ্যা শপথের ধ্বংস অনিবার্য। মহানবী ﷺ ও তাদের উক্ত বিশ্বাসের সাথে ঐকমত্য ছিলেন। এরপর রাসূল ﷺ বারবার বিভিন্নভাবে শপথ করে স্বীয় বক্তব্য তাদের সামনে তুলে ধরে বুঝাতে চেয়েছেন যে, যদি আমি [আল্লাহ না করুক] মিথ্যাবাদী হতাম তবে তো তোমাদের ধারণা মতে ধ্বংস হয়ে যেতাম! অথচ ধ্বংস হওয়া তো দূরের কথা এত শপথ করার পরও দিন দিন আমার মান-মর্যাদা প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমাদের চোখের সম্মুখে বেড়েই চলছে। কাজেই আমার নবুয়তের সত্যতা স্বীকারে তোমাদের এত কুণ্ঠা কেন?

✪ মহানবী ﷺ ইতোপূর্বে নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে বহু বহু দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু মুশরিকরা বিভিন্ন বাহানায় এটাকে উড়িয়ে দিয়ে কখনো যাদুকর কখনো গণক ইত্যাদি ভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলেছে। যেহেতু তারা যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল তাই তাদের নিকট শপথ করে বক্তব্য উপস্থাপন করা ছাড়া অন্য কোনো পথই খোলা ছিল না।

✪ এটা একাধারে শপথ ও দলিল। কারণ যে কুরআনের শপথ করা হয়েছে তা-ই মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের অকাট্য প্রমাণ। যেহেতু মানুষ নিছক দলিলের প্রতি ঝুঁকতে চায় না তাই শপথ আকারে দলিল উপস্থাপনের মাধ্যমে এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে শপথের কারণে যখন লোকদের এর প্রতি ঝোঁক হবে তখন তারা দলিলের মর্ম উপলব্ধিতেও সক্ষম হবে।

مَا اُنْذِرَ الخ এটা কোন শ্রেণির বাক্য : মুফাসসিরগণের মতে বাক্যটি ইতিবাচক তথা مُثْبَتْ ও হতে পারে, আবার নেতিবাচক তথা مَنْفِىْ ও হতে পারে। কাজেই যদি এটা নেতিবাচক বাক্য তথা كَلَامْ مَنْفِىْ হয়, তাহলে এর অর্থ হবে لَمْ يُنْذَرْ اٰبَائُهُمْ بِالْوَحْىِ অর্থাৎ তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ওহীর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়নি।

আর যদি এটা ইতিবাচক বাক্য তথা كَلَامْ مُثْبَتْ হয়, তখন এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে–

ক. لِتُنْذِرَ قَوْمًا الَّذِىْ اُنْذِرَ اٰبَائُهُمْ : অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণের কারণ হচ্ছে– আপনি এর দ্বারা এমন জাতিকে ভয় দেখাবেন যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। এমতাবস্থায় مَا اُنْذِرَ -এর مَا টি اِسْمُ مَوْصُوْلْ তথা اَلَّذِىْ-এর অর্থে হবে।

খ. অথবা, বাক্যটির অর্থ হবে– আপনি তাদেরকে এমন শাস্তির ভয় দেখাবেন যে সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষগণ তাদেরকে সতর্ক করে গেছে।

বর্ণিত আয়াত দুটির সমন্বয় সাধন করো : উল্লিখিত আয়াত দুটিতে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মতবিরোধ দেখা যায়। কেননা, প্রথম আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি কিংবা তাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী কোনো নবী বা রাসূল আগমন করেনি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি জাতির মধ্যেই ভীতি প্রদর্শনকারী নবী বা রাসূল আগমন করেছেন। এর সমাধান কল্পে বলা যায় যে, তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি এর ভাবার্থ হচ্ছে– তাদের নিকটতম পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়নি। তবে "তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে" এর ভাবার্থ হবে– তাদের দূরবর্তী পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

অথবা, مَا اُنْذِرَ اٰبَائُهُمْ -এর অর্থ হবে তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী কোনো নবী আগমন করেনি। এর অর্থ এটা নয় যে, তাদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী কেউই ছিল না। নবী বা রাসূল আগমন না করলেও তাদের অনুসারীদের মধ্যে এমন লোকজন অতিবাহিত হয়েছিল যারা তাদেরকে ভয় দেখিয়ে ছিল। আর এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় আয়াতের সারকথা। কাজেই উভয় আয়াতের মধ্যে কোনোরূপ অসামঞ্জস্য আর থাকল না। –[ফাতুহাতে ইলাহিয়া]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুফাসসিরগণ আয়াতের এ অংশটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে বলে তাফসীর করেছেন, তাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এর সমাধান কি? مَآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ -এর مَا টি যদি না বাচক হয় তবে অর্থ হবে– "তাদের পূর্ব পুরুষদের ভয় দেখানো হয়নি"। আর যদি এটি اِسْمُ مَوْصُوْلٌ হয়, তখন অর্থ হবে "তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল"? এখন দু'টি অর্থের মধ্যে স্পষ্টই বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা বলব যে, এ উভয় অর্থের মধ্যে মূলত কোনো তফাৎ নেই। কেননা ইমাম রাযী (র.) বলেন, আমাদের বর্ণনানুযায়ী না বাচক হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে "তাদের পূর্ব পুরুষদের ভয় দেখানো হয়নি।" আর তাদের প্রথম যুগের লোকদেরকে ভয় দেখানো এ কথার পরিপন্থি নয় যে, তাদের আদি পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে তবে তাদের নিকটতম পূর্ব পুরুষদেরকে ভয় দেখানো হয়নি।

বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব পুরুষদের ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অধস্তন পুরুষদের ভীতি প্রদর্শন বাতিল করে না : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনি এমন জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করবেন যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি। এর দ্বারা একথা বুঝা উচিত হবে না যে, যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তাদের অধস্তন পুরুষদেরকে ভয় দেখানোর প্রয়োজন নেই। কাজেই ইয়াহুদি-খ্রিস্টান ও নবী রাসূল এসে যাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন তাদেরকে ভয় দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। আর মহানবী ﷺ যেভাবে মক্কাবাসীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন তদ্রূপ ইয়াহুদি-খ্রিস্টান তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে– وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি।

তবে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতি মিশন সর্বপ্রথম স্বীয় জাতি কুরাইশদের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে, তাই এখানে বিশেষভাবে তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা তাদেরকে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই মহানবী ﷺ তাঁর যুগ এবং তার পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি যুগের প্রতিটি মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনাকারী রাসূল। তাঁর দাওয়াতি মিশন বিশেষ কোনো দেশ, জাতি, বর্ণ বা গোত্রের জন্য সীমিত নয়; বরং বর্ণ, গোত্র ও ভাষা নির্বিশেষে সকল দেশ ও জাতির সমস্ত লোকদের জন্যই তিনি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী নবী ও রাসূল।

আল্লাহর বাণী اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর বাণী– لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ আয়াতে اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

- কারো কারো মতানুযায়ী এর দ্বারা আল্লাহর বাণী– لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ উদ্দেশ্য।
- কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কারা ঈমান আনবে ও কারা ঈমান আনবে না সে সকল লোক।
- কতিপয় মুফাসসিরের মতে, اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা নবী করীম ﷺ ব্যক্ত করেছেন তথা তাওহীদ, রিসালাত ইত্যাদি।
- অথবা, এখানে اَلْقَوْلُ দ্বারা কাফিরদের জন্য নির্ধারিত পার্থিব আজাব উদ্দেশ্য।
- তবে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে اَلْقَوْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী– لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ [এখানে শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।] অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের ব্যাপারে উক্ত বাণী সাব্যস্ত হয়েছে।

اَلْفَتْرَةُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? উল্লেখ্য যে, দুই নবীর গমনাগমনের মধ্যবর্তী সময়কে ফিতরাত বলা হয়। যদি আলোচ্য আয়াতে قَوْمٌ দ্বারা শুধু কুরাইশগণ উদ্দেশ্য হয়, তবে فَتْرَةٌ বলতে হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ -এর মধ্যবর্তী সময়কে বুঝানো হয়েছে। আর তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে– নিকটবর্তীকালে তাদের নিকট কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী নবী পাঠানো হয়নি।

আর যদি قَوْمٌ দ্বারা কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য জাতি উদ্দেশ্য হয়, তবে فَتْرَةٌ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) -এর তীরোধান হতে নিয়ে মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হবে।

আয়াতটি কিসের দিকে ইঙ্গিত করেছে? এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, রাসূল প্রেরণ ও ওহী অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষদেরকে সতর্ক করা। আর لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ الخ আয়াতটি সে সত্য উক্তিটির দিকেই ইঙ্গিত করেছে যে, মহানবী ﷺ সমগ্র জাতির প্রতি সত্যের আহ্বায়ক ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছেন। তার হেদায়েতের বদৌলতে উম্মতকে হেদায়েত পেতেই হবে এমনটি কোনো জরুরি বিষয় নয়। নবীর দায়িত্ব তো হলো কেবলমাত্র সতর্ক করা। তাঁর উপর তাদের হেদায়েত জরুরি নয়। কারণ সতর্ককৃত মানুষের মাঝে অনেকেই ঈমান গ্রহণ করেনি। -[কাবীর]

সিরাতে মুস্তাকীম দ্বারা উদ্দেশ্য কি? اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ অর্থ হচ্ছে- সরল সোজা সঠিক পথ।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে হাদীস নকল করেছেন যে, একদা মহানবী ﷺ একটি সরল রেখা অঙ্কন করলেন এবং এর ডানে ও বামে আরো অনেকগুলো রেখা আঁকলেন। এরপর বললেন, এ সরল রেখাটি হলো- صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ আর ডান-বামের রেখাগুলো হলো গোমরাহীর ও ভ্রষ্টতার পথ। এদের মোড়ে মোড়ে শয়তান অবস্থান নিয়ে আছে। তারা লোকদেরকে ঐ পথের দিকে ডাকতে থাকে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেয় তারাই পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আর যারা তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সোজা চলে যায়, শুধুমাত্র তারাই صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ-এর উপর অটল থাকে।

- ✪ আল্লামা বায়যাবী (র.)-এর মতে, صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ-এর অর্থ হচ্ছে- طَرِيْقُ الْاِيْمَانِ বা ঈমানের পথ।
- ✪ কারো কারো মতে, পবিত্র কুরআনের প্রদর্শিত পথকেই صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ বলা হয়েছে।
- ✪ আল্লামা যমখশরী (র.)-এর মতে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসৃত পথকে صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ বলা হয়।
- ✪ কিছু কিছু মুফাসসিরের মতে, নবী রাসূলগণের অনুসৃত পথই হচ্ছে صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ তথা সরল সঠিক পথ।

বর্তমান সামাজিক অবস্থার উপর উল্লিখিত আয়াতগুলোর প্রভাব : আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ কুরাইশদের নিকট দাওয়াতি মিশন নিয়ে গেলে তাদের অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করে। যারা তাকে আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল তারাই তাকে তাচ্ছিল্যের সাথে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তারা জড়বাদী ধ্যান-ধারণা ও বস্তুবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে মহানবী ﷺ -কে রিসালাতের অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে তারা ভয়াবহ পরিণামের শিকার হয়।

বর্তমানে সমাজের প্রতি তাকালেও একই চিত্র ফুটে উঠে। বাতিলের কাণ্ডারীরা আজও জাগতিক ধ্যান-ধারণায় আপ্লুত হয়ে দীনকে প্রত্যাখ্যান করার মতো দুঃসাহস আজও দেখাচ্ছে। রাসূলের ﷺ উত্তরাধিকারী ও আহলে হককে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় বর্তমানে কতিপয় নামধারী মুসলমানও আধুনিকতার প্রবক্তা সেজে প্রগতির দোহাই দিয়ে দীনের সাথে চরম বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করছে।

বর্তমান এই সমস্যা সংকুল সমাজে আলোচ্য আয়াতগুলো হতে শিক্ষা নিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ উপেক্ষা করে বাতিল শক্তিকে পরাভূত করে সত্যের ঝাণ্ডা নিয়ে নায়েবে নবীদেরকে দুর্বার গতিতে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ, সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন- وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا 'সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত; মিথ্যা তো বিতাড়িত হবেই।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨. اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا بِاَنْ تَضُمَّ اِلَيْهَا الْاَيْدِىْ لِاَنَّ الْغَلَّ يُجْمِعُ الْيَدَ اِلَى الْعُنُقِ فَهِىَ اَىِ الْاَيْدِىْ مَجْمُوْعَةٌ اِلَى الْاَذْقَانِ جَمْعُ ذَقَنٍ وَهُوَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ رَافِعُوْنَ رُءُوْسَهُمْ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ خَفْضَهَا وَهٰذَا تَمْثِيْلٌ وَالْمُرَادُ اَنَّهُمْ لَا يُذْعَنُوْنَ لِلْاِيْمَانِ وَلَا يُخْفِضُوْنَ رُءُوْسَهُمْ لَهٗ .

৮. আমি তাদের গর্দানে শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছি। এভাবে যে, ঘাড়ের সাথে উভয় হাতকে বেঁধে দেওয়া হবে। কেননা غَلٌّ [বেড়ি] বলে ঘাড়ের সাথে হাতকে জড়িয়ে দেওয়া। কাজেই এটা অর্থাৎ উভয় হাত একত্রিত হয়ে রয়েছে থুতনির দিকে اَذْقَانٌ টা ذَقَنٌ -এর বহুবচন। আর তা হলো চোয়ালের হাড়দ্বয়ের মিলনস্থল কাজেই তারা উর্ধ্বমুখী। তারা মাথাগুলোকে উর্ধ্বে উত্তোলন করে রয়েছে। তাদেরকে অধঃগামী করতে পারছে না। এটা একটি উপমা। এর ভাবার্থ হলো– তারা ঈমানের প্রতি আস্থাবান হচ্ছে না এবং ঈমানের প্রতি তাদের মাথা নত করে না।

٩. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فِى الْمَوْضَعَيْنِ فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ تَمْثِيْلٌ اَيْضًا لِسَدِّ طُرُقِ الْاِيْمَانِ عَلَيْهِمْ .

৯. আর আমি স্থাপন করেছি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং তাদের পিছনে আরেকটি প্রাচীর। উভয় স্থানে سَدًّا শব্দটির সীনে যবর অথবা পেশ উভয় পড়া যায়। সুতরাং আমি তাদেরকে ঢেকে ফেলেছি যার কারণে তারা দেখতে পায় না। এখানেও কাফিরদের জন্য ঈমানের পথসমূহ রুদ্ধ করে দেওয়াকে উপমাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

١٠. وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

১০. আর তাদের জন্য উভয়ই সমান আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন এখানে اَنْذَرْتَهُمْ শব্দটির উভয় হামযাহকে বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাহকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে। দ্বিতীয় হামযাহকে সহজ করে সহজীকৃত হামযাহ [দ্বিতীয় হামযাহ] ও অন্য হামযার মাঝে একটি আলিফ বাড়িয়ে এবং সহজীকরণ পরিহার করত [বিভিন্ন কেরাতে] পড়া জায়েজ। অথবা আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন না করুন তারা ঈমান আনবে না।

١١. اِنَّمَا تُنْذِرُ يَنْفَعُ اِنْذَارُكَ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ج خَافَهٗ وَلَمْ يَرَهٗ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ هُوَ الْجَنَّةُ .

১১. আপনি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন অর্থাৎ আপনার সতর্কীকরণ কেবলমাত্র তাদেরই উপকারে আসতে পারে– যারা উপদেশ মেনে চলে অর্থাৎ কুরআন মেনে চলে এবং আল্লাহকে না দেখেই ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে অথচ তাঁকে দেখেনি। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানিত পুরস্কারের শুভ সংবাদ দিন। আর তা হলো জান্নাত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٢. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى لِلْبَعْثِ وَنَكْتُبُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مَا قَدَّمُوْا فِىْ حَيٰوتِهِمْ مِنْ خَيْرٍ وَّشَرٍّ لِيُجَازُوْا عَلَيْهِ وَاٰثَارَهُمْ ط مَا اسْتَنَّ بِهٖ بَعْدَهُمْ وَكُلَّ شَىْءٍ نَصَبُهٗ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهٗ اَحْصَيْنٰهُ ضَبَطْنَاهُ فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ كِتَابٍ بَيِّنٍ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ.

১২. আমিই মৃতকে জীবিত করি পুনরুত্থানের জন্য এবং লিপিবদ্ধ করি লাওহে মাহফূযে যা তারা সম্মুখে পেশ করে অর্থাৎ তাদের জীবদ্দশায় ভালোমন্দ যা করে যাতে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া যায়। আর তাদের অনুসৃত কার্যাদি অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর পর তাদের অনুসরণ করতঃ পরবর্তী লোকেরা যা করে আর প্রতিটি বস্তুকে এমন একটি فِعْل-এর কারণে শব্দটি মানসূব হয়েছে পরবর্তী শব্দটি যার ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছে। আমি তাকে সংরক্ষণ করেছি লিপিবদ্ধ করেছি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে অর্থাৎ স্পষ্ট গ্রন্থে আর তা হলো লাওহে মাহ্ফূয।

তাহকীক ও তারকীব

سَدًّا শব্দটিতে বর্ণিত কেরাত এবং তার اِعْرَابٌ-এর মহল : سَدًّا শব্দটির س-এর মধ্যে দুটি হরকত হতে পারে অর্থাৎ سُدًّا পেশ যোগে পড়া যাবে, অথবা سَدًّا যবর যোগে পড়া হবে। উভয় অবস্থায় অর্থ একই হবে অর্থাৎ পাহাড়, প্রাচীর, বাধা ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ বলেন– اَلسُّدُّ بِالضَّمِّ مَا كَانَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَبِالْفَتْحِ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ بَنِىْ اٰدَمَ অর্থাৎ سَدًّا সীন অক্ষর পেশ যোগে হলে অর্থ হবে আল্লাহর সৃষ্টি পাহাড় বা প্রাচীর। আর যদি সীন অক্ষরে যবর হলে অর্থ হবে মানব নির্মিত প্রাচীর ও পাহাড়। سَدًّا শব্দটি جَعَلْنَا-এর মাফঊল হিসেবে নসব বিশিষ্ট হয়েছে।

فَاَغْشَيْنٰهُمْ-এর তাহকীক : এখানে فَاء অক্ষরটি تَفْسِيْر [ব্যাখ্যা] বা تَعْلِيْل (কারণ, বর্ণনা করা বা ফলাফল (نَتِيْجَةٌ) বর্ণনা করার জন্য এসেছে।

اَغْشَيْنَاهُمْ-এর মধ্যে اَغْشَيْنَا হচ্ছে جَمْعُ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ্ অর্থ– আমি ঢেকে দিলাম, আচ্ছাদিত করে দিলাম। আর هُمْ হচ্ছে যমীর যা তারকীবে মাফঊলে বিহী হয়েছে।

فَاَغْشَيْنَاهُمْ-এর বিভিন্ন কেরাত : এ আয়াতে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. فَاَغْشَيْنَاهُمْ (غ-এর সাথে) এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত। اَلْاِغْشَاءُ অর্থ– আবৃত করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে– আমি তাদের দৃষ্টি শক্তিকে আবৃত করে দিয়েছি, যার ফলে তারা সত্য পথ দেখতে পাচ্ছে না।

২. فَاَعْشَيْنَاهُمْ (ع-এর সাথে] এটা অপ্রসিদ্ধ কেরাত। এটা اَلْعِشَاءُ হতে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো দুর্বল করে দেওয়া। তখন আয়াতের অর্থ হবে– আমি তাদের দৃষ্টি শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।

سَوَاءٌ শব্দটি رَفْع হওয়ার কারণ : سَوَاءٌ শব্দটি দু'টি কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে–

১. سَوَاءٌ শব্দটি مُسْتَوٍ-এর অর্থে اِنْذَارُكَ وَعَدَمُهٗ মুবতাদা মুয়াখখার হতে খবরে মুকাদ্দাম হওয়ায় مَرْفُوْعٌ হয়েছে অর্থাৎ مُسْتَوٍ عَلَيْهِمْ اِنْذَارُكَ وَعَدَمُهٗ–

২. سَوَاءٌ শব্দটি مُسْتَوُوْنَ অর্থে هُمْ উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে মারফূ' হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

أَأَنْذَرْتَهُمْ শব্দের বিভিন্ন কেরাত : أَأَنْذَرْتَهُمْ-এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত রয়েছে–

✪ ইবনে আমের ও কূফীগণের মতে, উভয় হামযাকে স্ব-স্ব অবস্থায় অপরিবর্তিত রেখে পড়া হবে। যথা– أَأَنْذَرْتَهُمْ

✪ হযরত নাফে' (র.)-এর মতে, দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া হবে। যথা– آنْذَرْتَهُمْ

✪ আবূ আমের (র.) ও ইবনে কাছীর (র.)-এর মতে, উভয় হামযাকে তাসহীল করে পড়া হবে।

✪ তাসহীলকৃত হামযাদ্বয়ের মাঝে আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া হবে।

✪ একটি হামযাকে তাসহীল করে এবং অপরটিকে আপন অবস্থায় অপরিবর্তিত রেখে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বাড়িয়ে পড়া হবে।

✪ হিশাম ইবনে আমের (র.)-এর মতে, তাসহীল বর্জন করে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বাড়িয়ে পড়া হবে। যথা– أَاأَنْذَرْتَهُمْ

✪ প্রথম হামযাহ বিলুপ্ত করে পড়া হবে। যথা– أَنْذَرْتَهُمْ

✪ প্রথম হামযাকে তার মাখরাজ হতে আদায় করে দ্বিতীয় হামযাকে নিম্ন স্বরে পাঠ করা।

✪ দ্বিতীয় হামযার হরকত তার পরবর্তী অক্ষরে দিয়ে দ্বিতীয় হামযাকে বিলুপ্ত করে পড়া। যথা– أَنَذَرْتَهُمْ

✪ প্রথম হামযাকে হরফে লীন ও দ্বিতীয় হামযাকে মুদগাম করে পাঠ করা।

ইমাম বায়যাবী ও আবূ হাইয়ান (র.) -এর মতে শুধুমাত্র প্রথম কেরাতটি মুতাওয়াতির বাকিগুলো শায।

فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ الخ -এর মধ্যস্থ هِيَ-এর প্রত্যাবর্তনস্থল : এখানে هِيَ যমীরের মারজি' দুটি হতে পারে–

১. هِيَ-এর মারজি' হলো উহ্য أَيْدِيْ-এর দিকে। অর্থাৎ তাদের হাতসমূহ চিবুকের দিকে অধঃগামী হওয়ার তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

২. هِيَ যমীরটি اَلْأَغْلَالُ-এর দিকে ফিরেছে। এ মতটিই আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.) পছন্দ করেছেন। তখন অর্থ হবে– আমি তাদের গলায় ভারী শিকল পরিয়ে দিয়েছি, যা তাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ফলে কাফিররা মাথা নিচু করতে পারছে না তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى-এর তারকীব : إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর نَا হলো ইসমে ইন্না, نَحْنُ হলো মুবতাদা। আর نُحْيِ হলো ফে'ল ফায়েল الْمَوْتٰى মাফউল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর হলো। এখন মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে ইন্না-এর খবর। এখন إِنَّ তার ইসম ও খবর নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো।

كُلَّ شَيْءٍ الخ -এর মধ্যস্থ كُلَّ-এর إِعْرَابْ-এর স্থান : এ আয়াতে كُلَّ শব্দটি شَرِيْطَةُ التَّفْسِيْرِ-এর ভিত্তিতে মানসূব হয়েছে। মূল বাক্যটি হবে– أَحْصَيْنَا كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ -

আল্লাহর বাণী إِمَامٍ مُبِيْنٍ-এর তাহকীক : এখানে إِمَامٌ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ-এর মাসদার। এটা ইসমে মাফউল অর্থে ব্যবহৃত হয়ে ইসমে জামিদের রূপ লাভ করেছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– পেশ করা, সম্মুখে উপস্থাপন করা। যেহেতু এটি اِسْمٌ مَفْعُوْلٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাই অর্থ হবে যাকে সামনে পেশ করা হয়েছে। এ কারণেই ইমামকে ইমাম বলা হয়। পরবর্তী এটা নেতা ও সর্দার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতে إِمَامٌ অর্থ হলো এমন কিতাব যাতে মানুষের সারা জীবনবৃত্তান্ত লিখিত রয়েছে।

আর مُبِيْنٍ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ হতে اِسْمُ فَاعِلٍ-এর সীগাহ। অর্থ– স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। এখানে إِمَامٍ مُبِيْنٍ দ্বারা লাওহে মাহফূযকে বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ .... اَجْرٍ كَرِيْمٍ আয়াতের শানে নুযূল : কুরতুবী, খাযিন ও ফতূহাতে ইলাহিয়া ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থসমূহে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, একদা পাপিষ্ঠ আবূ জাহল শপথ করে বলল, সে যখনই মহানবী ﷺ -কে নামাজরত দেখতে পাবে তখনই প্রস্তর নিক্ষেপ করে মহানবী ﷺ -এর মুবারক মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। এরপর একবার রাসূল ﷺ কে নামাজরত দেখতে পেয়ে পাপিষ্ঠ আবূ জাহল তার কুমতলব হাসিলের জন্য পাথর নিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়। এমন সময় পাথরটি তার হাতে আটকে যায় আর তার হাত থুতনির সাথে জড়িয়ে ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে যায়। ফলে হাতটি তার ঘাড়ে শক্ত বেড়ির ন্যায় হয়ে যায়। তখন তার চোখদ্বয় বন্ধ হয়ে মাথা উর্ধ্বমুখী হয়ে পড়ে।

তথা হতে পলায়ন করে আবূ জাহল তার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ ও অপর এক ব্যক্তিকে এ ঘটনা জানায়। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ এতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, আমিই সুযোগ বুঝে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব। কাজেই একদা মহানবী ﷺ -কে নামাজরত দেখে নরাধম ওয়ালীদ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে প্রস্তরখণ্ড নিয়ে রাসূল ﷺ -এর মাথায় আঘাত হানতে উদ্যত হলো অমনি তার চক্ষুদ্বয় অন্ধ হয়ে গেল, ফলে সে মহানবীর ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেল কিন্তু তাঁকে দেখতে পেল না। বিফল মনোরথ হয়ে সে তার পাপী সহযোগীদ্বয়ের নিকট ফিরে আসল। কিন্তু তাদেরকেও দেখতে পেল না। তখন তার দুষ্কর্মের সাথীদ্বয় তাকে জিজ্ঞাসিল ব্যাপার কি ওয়ালীদ? জবাবে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ ﷺ -এর কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছি কিন্তু তাকে দেখতে পাইনি।

তখন তৃতীয় ব্যক্তি আরো দম্ভোক্তি করে মহানবী ﷺ -এর মস্তক চূর্ণ করার দৃঢ় শপথ নিল। সে একটি পাথর নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে লাত উয্যার শপথ করে বলল, আমি যখন মহানবী ﷺ-এর নিকটবর্তী হতে ইচ্ছা করলাম তখন একটি বিরাটকায় হিংস্র ষাঁড় আমায় তাড়া করল। এমন ষাঁড় আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি। আমি আর একটু অগ্রসর হলে সে আমায় পেটে পুরে ফেলত।

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দান ও মানুষকে সতর্ক করার জন্য .... اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى .... اِمَامٍ مُّبِيْنٍ : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, বনূ সালামা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববী হতে কিছুটা দূরে বসবাস করতেন। তাই তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে বাসস্থান নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানবী ﷺ তাদের আবেদন মঞ্জুর না করে বললেন যে, তোমাদের প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ছওয়াব লেখা হয়। তখন তাদের শানে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

اِنَّا جَعَلْنَا ...... فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ আয়াতে বর্ণিত কেরাতসমূহ : উল্লিখিত আয়াতে দু'টি কেরাত বর্ণিত রয়েছে–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) اَعْنَاقِهِمْ -এর স্থলে اَيْمَانِهِمْ পড়েছেন।

২. ইমাম যুজাজ (র.) اَعْنَاقِهِمْ -এর স্থলে اَيْدِيْهِمْ পড়েছেন।

মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, উল্লিখিত কেরাত শুধুমাত্র তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পঠনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা, এটা মাসহাফে ওসমানীর পরিপন্থি।

সুতরাং এখানে اَيْدِيْهِمْ কিংবা اَيْمَانِهِمْ -কে উহ্য মেনে তাফসীর করা হবে। মূল বাক্য এরূপ হবে যে, اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَفِىْٓ اَيْدِيْهِمْ اَغْلَالًا অথবা মূলবাক্য এরূপ হবে যে, اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَفِىْٓ اَيْمَانِهِمْ اَغْلَالًا আর اَلْاَذْقَانِ শব্দটি اَيْدِىْ কিংবা اَيْمَانٌ হতে কিনায়া হয়েছে, এটা اَلْاَعْنَاقُ হতে কিনায়া হয়নি। আরবি ভাষায় অনুরূপ উহ্য বাক্যের প্রচলন রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত কারো গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো– তার হাতে ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন যখন فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ -এর উল্লেখ করেছেন তখন এতে প্রতীয়মান হয় যে, اَلْاَذْقَانِ -এর দ্বারা اَيْدِىْ-কে বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে উল্লিখিত اَلْاَعْنَاقُ এবং اَلْاَغْلَالُ-এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না উপমা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْاَعْنَاقُ এবং اَلْاَغْلَالُ-এর দ্বারা প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না উপমা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে–

১. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এদের প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য। এটাই পূর্বোল্লিখিত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রমাণিত হয়।

২. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে اَغْلَالٌ ও اَعْنَاقٌ দ্বারা এদের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য তথা এগুলোকে উপমা দেওয়ার জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা বিশ্বাস স্থাপনের বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কথা বুঝানো হয়েছে এবং তাদের ঈমান আনয়ন হতে বিমুখ হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

إِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

✪ কতিপয় ওলামায়ে কেরামের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্নমুখী বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করত তাদেরকে আল্লাহর পথে খরচ করা হতে বিরত রেখেছে। অপর একটি আয়াতেও اَلْاَغْلَالُ فِى الْاَعْنَاقِ দ্বারা عَدَمُ الْاِنْفَاقِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহর পথে ব্যয় না করা)-কে বুঝানো হয়েছে। কাজেই আল্লাহর বাণী– لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ অর্থ– তোমার হাতকে তোমার গলার বেড়ি বানিয়ো না তথা কৃপণতা কর না। সুতরাং এখানেও কৃপণতার অর্থ গ্রহণীয় হবে। যেরূপভাবে গলায় বেড়ি লাগানো ব্যক্তি উর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে এবং মাথা নিচু করতে পারে না তদ্রূপ কাফির মুশরিকরাও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে অক্ষম। মনে হয় যেন আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে তাদের হাতকে আটকে রাখা হয়েছে।

✪ অপর একদল তাফসীর কারকের মতে, কাফিরদের গলায় বেড়ি ও শিকল পরিয়ে জাহান্নামে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে সে দিকেই আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

✪ কতিপয় মুফাসসিরের মতে, কাফিররা সত্য গ্রহণে আগ্রহী না হওয়া এবং তাদের সত্য হতে বিমুখ হওয়াকে অত্র আয়াতে শিকল পরা ব্যক্তির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। গলায় শিকল পরা ব্যক্তি যেভাবে মাথা নত করতে অক্ষম তদ্রূপ কাফিররাও সত্যের সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করে সত্যকে মাথা পেতে নিতে অপারগ।

اَلسَّدُّ-এর অর্থ এবং কাফিরদের সম্মুখে তা সৃষ্টির কারণ : اَلسَّدُّ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– বাধা প্রদানকারী বস্তু, দেয়াল, বাধা, প্রতিবন্ধক, প্রাচীর, তবে আয়াতে এ অর্থগুলো উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি, আয়াতে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এর রূপক অর্থ। আর তা হচ্ছে– অত্র আয়াতে কাফেরদেরকে এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যাকে অগ্র পশ্চাত সকল দিক হতে প্রাচীর দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়েছে, ফলে সে আশে পাশের কোনো কিছু দেখতেও পাচ্ছে না এবং সম্মুখ পানে অগ্রসরও হতে পারছে না। ঠিক তেমনি কাফেরদের চতুর্দিকেও এক অদৃশ্য প্রাচীর বিদ্যমান যার কারণে কাফিররা ঈমান আনতে সক্ষম হচ্ছে না। এমনকি ঈমান ও সত্যকে দেখতেও পাচ্ছে না। বস্তুত দীনের প্রতি কাফেরদের চরম অনীহা ও উদাসীনতাকে এখানে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এ পরিণতি তাদের বেপরোয়া অপকর্মের কারণেই উদ্ভব হয়েছে। এ জন্য মহান রাব্বুল আলামীন মোটেই দায়ী নয়।

অত্র আয়াতে কাফেরদের পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপনের হিকমত : এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেরদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করা হয়েছে। সামনে প্রাচীর স্থাপনের অর্থ হচ্ছে তারা সম্মুখপানে অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু পিছনে প্রাচীর স্থাপনের তাৎপর্য অনেকটাই অস্পষ্ট। নিম্নে এ সম্পর্কে তাফসীরকারকদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরা হলো–

১. মানুষ দু ধরনের হেদায়েত পেয়ে থাকে–

ক. هِدَايَةٌ فِطْرِيَّةٌ [স্বভাবগত হেদায়েত] অর্থাৎ মানুষ যে হেদায়েতের উপর জন্মগতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে এরপর পরিবেশের চাপে কিংবা অসৎ লোকদের সংস্পর্শে এসে বিপথগামী হয়ে পড়ে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে রাসূল ﷺ বলেছেন– كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ প্রতিটি আদম সন্তানই ইসলামি স্বভাবের উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। এরপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কাফেরদের ধ্যান-ধারণার মূল্যায়ন করলে বুঝা যায় যে, তারা কখনো উক্ত ধ্যান-ধারণাকে পরিত্যাগ করে থাকে।

খ. هِدَايَةُ نَظَرِيَّةٌ [প্রমাণাদির ভিত্তিতে হেদায়েত] অর্থাৎ মহান রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদের নিদর্শনাবলি দেখে মানুষ যে হেদায়েত অর্জন করে থাকে, কাফেরদের ভাগ্য-ললাটে এ ধরনের হেদায়েতও জোটেনি।

কাজেই আয়াতে, বাহ্যিকরূপ হতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ সত্যের প্রতিই আল্লাহ তা'আলা وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا বলে ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন যে, কাফিররা তাঁর নিদর্শনাবলি দেখে সঠিক হেদায়েতের উপর জীবন যাপন করতে প্রস্তুত নয়। আর وَجَعَلْنَا مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا বলে একথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, বাস্তবিকই তারা স্বভাবগত হেদায়েতের উপর প্রত্যাবর্তন করতে রাজি নয়।

২. এ আয়াতে কাফেরদের ধ্বংসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, যদি কোনো ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে না পারে এবং পিছনের ফিরে যেতে না পারে তবে নিশ্চিতরূপেই তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। তদ্রূপ কাফেরদের ধ্বংসও সুনিশ্চিত।

৩. অথবা, এ আয়াত দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, যেহেতু কাফেররা পরকাল ও পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করে না তাই তাদের সামনে যেন একটি প্রাচীর স্থাপিত রয়েছে। ফলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোনো পথ দেখছে না। অপরদিকে জীবনের এ গতিকে পেছনের দিকে ধাবিত করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মনে হয় তাদের পিছনে যেন একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আর উপরিউক্ত আয়াতে وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. অথবা, এখানে وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, কাফিররা তাদের অতীত ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা করে কর্মে উদ্বুদ্ধ হয় না। মনে হয় যেন তাদের সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক হতেই প্রাচীর প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আর তারা মিথ্যা, অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও হিংসা-বিদ্বেষে এমন বিভোর হয়ে রয়েছে যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে তারা সত্যকে দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারছে না। কাজেই তাদের চোখে যেন পর্দা পড়ে রয়েছে। -[মা'আরিফ, কাবীর]

আয়াতে ডানে ও বামে উল্লেখ না করে তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীরের কথা কেন উল্লেখ করা হলো? আয়াতে ডানে ও বামে উল্লেখ না করে সামনে ও পিছনে প্রাচীর রয়েছে এর উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ একাধিক হিকমতের উল্লেখ করেছেন–

১. হেদায়েত দু প্রকার : ক. স্বভাবগত হিদায়েত, খ. নিদর্শনাদি ও প্রমাণাদির সাহায্যে প্রাপ্ত হেদায়েত। এখানে সামনে ও পিছনের হেদায়েত উল্লেখ করে উল্লিখিত দু প্রকার হেদায়াত হতে বঞ্চিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই ডানে ও বামে প্রাচীর রয়েছে এ কথা উল্লেখের কোনোই প্রয়োজন নেই।

২. অথবা, সামনে ও পিছনের প্রাচীর রয়েছে উল্লেখ করার দ্বারা ডান ও বামের প্রাচীরের কথা تَغْلِيْبًا উল্লেখ রয়েছে। কারণ, আরবিতে দু'দিক উল্লেখ করে চতুর্দিক বুঝানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ ছাড়া এ স্থানে কোনো প্রাচীর বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং কাফেরদের হেদায়েত হতে বঞ্চিত হওয়া বুঝানেই মূল উদ্দেশ্য যা "সামনে পিছনে প্রাচীর রয়েছে" উল্লেখ করার দ্বারাই বুঝে আসে।

৩. অথবা, তাদের সম্মুখের ও পিছনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা এমন বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে, তাদের ডান বামে প্রাচীর রয়েছে এ কথা বলার কোনোই প্রয়োজন নেই।

বাহ্যিক আয়াত প্রমাণ করে যে, তাদেরকে ভয় দেখানো আর না দেখানো বরাবর তথাপিও আল্লাহ আয়াতে তাদেরকে ভয় দেখানোর নির্দেশ দিলেন কেন? سَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা ও না করা উভয়ই সমান তথাপিও তাদেরকে কেন ভীতি প্রদর্শনের জন্য মহানবী ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হলো? এর জবাবে মুফাসসির ওলামায়ে কেরামগণ বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, কাফেরদেরকে ভয় দেখান আর না দেখান উভয়েই সমান যে, তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তথাপিও অন্যান্য আয়াতে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তার প্রতি আরোপিত দায়িত্ব হতে তিনি নিষ্কৃতি পেতে পারেন। আর পরকালে কাফেররা যেন এ ওজর করতে না পারে যে, আমাদেরকে সতর্ক করার জন্য তো কোনো নবী রাসূল প্রেরিত হননি। যদি কোনো নবী বা রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করা হতো তবে কিছুতেই আমরা বিপথগামী হতাম না।

সার কথা হলো আল্লাহর বাণী- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا এবং رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ এ ধরনের অন্যান্য আয়াতের বাস্তবতা প্রমাণের জন্য মহানবী ﷺ -কে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই হেদায়েত কবুল করার যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। তবে পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে মানুষ সে যোগ্যতাকে নষ্ট করে ফেলে। যেমন হাদীসে এসেছে- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ অর্থাৎ প্রতিটি নবজাতক ফিতরতের উপরই জন্মলাভ করে এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে। কাজেই তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনের ফলে তাদের অন্তর্নিহিত ফিতরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটারও অবকাশ রয়েছে।

৩. আল্লামা বায়যাবী (র.) তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু মানুষ ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন আর সে ইচ্ছা করেই কুফরি গ্রহণ করেছে। কাজেই তাবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তার ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। ফলে সে সত্য ধর্মে ফিরেও আসতে পারে। এ কারণেই তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

৪. ঈমান আনার পথে দু'টি অন্তরায় অন্তরায় রয়েছে- ১. মৌলিক অন্তরায় ২. কৃত্রিম অন্তরায়। ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ الخ আয়াতে প্রথম প্রকার অন্তরায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আর لِتُنْذِرَ الخ এবং এর ন্যায় অন্যান্য আয়াত দ্বারা কৃত্রিম অন্তরায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সার কথা হলো, যদি তারা কৃত্রিম অন্তরায় তথা পারিপার্শ্বিক কারণে ঈমান গ্রহণ না করে থাকে, তবে তারা আপনার তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর যদি মৌলিক অন্তরায়ের কারণে কুফরিকে আঁকড়ে ধরে রাখে তথা কুফরির উপর তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে থাকলে তারা ঈমান আনবে না। তাদের ক্ষেত্রে আপনারা ভয় দেখানো আর না দেখানো সমান। অর্থাৎ তাদের মাঝে এই উভয় প্রকারের লোকজন বিদ্যমান। কিন্তু আপনি তো জানেন না যে, কে কোন প্রকারের অন্তর্গত। তাই আপনি ব্যাপকভাবে দাওয়াতি মিশন চালিয়ে যান যাতে করে দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকে প্রথম প্রকারের লোকজন হতে ছাটাই করে নেওয়া যায়।

৫. অথবা, এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে কুফরি রেখাপাত করেছে। অর্থাৎ এটি অনেকটাই অতিশয়োক্তির মতোই। অন্যথা তাদের ঈমান আনার সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়।

আল্লাহর বাণী سَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ এটা কাফেরদের কোনো দলের জন্য খাস না আম? উল্লিখিত আয়াত দ্বারা কাফেরদের কোনো বিশেষ দলকে বুঝানো হয়েছে নাকি ব্যাপকভাবে সকল কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসির গণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে-

১. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতটি عَامٌّ বা ব্যাপক। যত লোকই আল্লাহর অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌছেছে তাদের সকলের অবস্থা এক ও অভিন্ন।

২. কোনো কোনো তাফসীর কারকের মতে, উক্ত আয়াতটি মহানবী ﷺ-এর সমকালীন কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট, ব্যাপকভাবে নয়।

৩. আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.)-এর মতে, এ আয়াত দ্বারা কাফের, মুশরিক, মুনাফিক এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিসহ সকলেই উদ্দেশ্য।

৪. ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা আবূ জাহল, আবূ লাহাব, ওতবা, শায়বা, উমাইয়া ইবনে খালফ ও উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কাফেরবর্গ উদ্দেশ্য।

৫. কারো কারো মতে, শুধুমাত্র তৎকালীন মক্কার কাফেরগণই উদ্দেশ্য।

Free @ www.eilm.weebly.com

আল্লাহর বাণী لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ الخ **এবং আল্লাহর বাণী** إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الخ **-এর মধ্যে সমন্বয় :** পবিত্র কুরআনের لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ الخ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে জাতির পূর্ব পুরুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি [কুরাইশ] মহানবী ﷺ তাদের সকলের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী। আর আল্লাহর বাণী- إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ الخ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা কুরআনের অনুসরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে মহানবী ﷺ কেবল তাদেরই জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী। কাজেই আয়াত দ্বয়ের মাঝে প্রকাশ্য মতবিরোধ দেখা দেয়। বিজ্ঞ তাফসীরকারকগণ এর সমাধান কল্পে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১. প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, হে নবী! সকলকে আল্লাহর আজাব ও গজবের ব্যাপারে সতর্ক করে দিবেন। চাই এ সতর্কীকরণ তাদের জন্য সুফল বয়ে আনুক বা না আনুক।

আর শেষোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা পবিত্র কুরআনের অনুকরণ করে ও আল্লাহকে ভয় করে শুধুমাত্র তারাই আপনার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা উপকৃত হবে। সার কথা হলো, প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা সাধারণ ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য চাই তা উপকারী হোক বা না হোক। আর শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বিশেষ ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য যা উপকারী, কাজেই এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকে না।

২. কাফেরদের মধ্যে দু' ধরনের লোক বিদ্যমান (ক) এমন কাফের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হলেও ঈমান আনয়ন করবে না (খ) এমন কাফের যাদের ভয় দেখানো হলে ঈমান আনয়ন করবে। আর রাসূল ﷺ -এর দায়িত্ব তো কেবল সকলকে পথ দেখানো, মনযিলে মকসূদে পৌছে দেওয়া তাঁর দায়িত্ব নয়। তাই প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথম দলের কথা আর দ্বিতীয় আয়াতে দ্বিতীয় দলের কথা বর্ণিত হয়েছে। কাজেই উভয় আয়াতে কোনো দ্বন্দ্ব বাকি থাকে না।

৩. মহানবী ﷺ -এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রথমোক্ত আয়াতে অবহিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে রাসূল ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে যে, যদি কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয় আপনার ভয় দেখানোর ফলে প্রভাবিত হয়ে হেদায়েত কবুল না করে, তবে আপনি বিচলিতও হবেন না এবং ধৈর্যচ্যুতও হবেন না। কারণ আপনি তো আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। মূলত যারা পবিত্র কুরআনের অনুকরণ অনুসরণ করে এবং না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে শুধুমাত্র তারাই আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনার ভীতি প্রদর্শন কেবলমাত্র তাদেরকেই উপকৃত করবে।

৪. প্রথমোক্ত আয়াতে গড়ে সকলকে ঈমান আনয়নের জন্য উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতে যারা ঈমান এনেছে শুধুমাত্র তাদেরকে ঈমানের শাখা প্রশাখা জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, উভয় আয়াতে কোনোরূপ দ্বন্দ্ব নেই। -[কাবীর, মা'আরিফ]

আল্লাহর বাণী إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ **-এর মধ্যে** ذِكْر **এবং** غَيْب **দ্বারা উদ্দেশ্য কি?**
উল্লিখিত আয়াতে ذِكْر দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন।

১. আল্লামা ইমাম রাযী (র.), জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) ও অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, اَلذِّكْر দ্বারা এখানে اَلْقُرْاٰنِ الْحَكِيْم -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ذِكْر শব্দটি اَلِفْ لَامْ যোগে مَعْرِفَة হওয়ার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। কেননা পূর্বে اَلْقُرْاٰن ও اَلْحَكِيْم اَلِفْ لَامْ যোগে মা'রিফা হয়েছে।

২. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, আয়াতে اَلذِّكْر বলে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহান রাব্বুল আলামীনের নিদর্শনাবলিকে বুঝানো হয়েছে- পবিত্র কুরআনের অন্যত্র وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, উক্ত আয়াতে اَلذِّكْر দ্বারা بَرَاهِيْن قَاطِعَة তথা অকাট্য দলিলসমূহকে বুঝানো হয়েছে। কারণ মানুষের হৃদয়ে কোনো বিষয় অকাট্য দলিলের মাধ্যমেই সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْغَيْبَ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلْغَيْبَ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. اَلْغَيْبَ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে مَاغَابَ عَنْهُ যা আমাদের অগোচরে রয়েছে যথা– কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থাবলি।

২. অথবা আয়াতে اَلْغَيْبَ দ্বারা তাওহীদ তথা মহান রাব্বুল আলামীনের একত্ববাদ উদ্দেশ্য।

আল্লাহকে না দেখে ভয় করার পদ্ধতি : মানুষ স্বীয় চর্ম চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পায় না। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ -এর মুখে আল্লাহর গুণগানের বর্ণনা শুনে বিশ্বাস করতঃ তার বিধিবিধান অনুযায়ী কর্ম করে।

আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বিষয়াবলি যত লোভনীয় ও মোহনীয়ই হোক না কেন তাঁর আজাব ও গজবের ভয়ে তা হতে বিরত থাকে। অসত্যের সম্মুখে কিছুতেই মাথা নত করে না।

আল্লাহ কিভাবে اِنَّا দ্বারা নিজের পরিচয় পেশ করলেন, অথচ পরিচয়ের জন্য এটা যথেষ্ট নয়? আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى -এর মধ্যে اِنَّا দ্বারা নিজের পরিচয় প্রদান করলেন কেন? অথচ اِنَّا -এর মাধ্যমে কারো সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। আর এ কারণেই মহানবী ﷺ اِنَّا বলে পরিচয় দেওয়াকে অপছন্দ করেছেন।

উক্ত আয়াতে انا বলার আল্লাহর পরিচয় অস্পষ্ট হয়নি। কেননা, اِنَّا -এর সাথেই এমন একটি সিফাতের উল্লেখ রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। আর তা হচ্ছে اِحْيَاءُ مَوْتٰى তথা মৃতকে জীবিত করা। আর এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। অন্য কারো পক্ষে এটা আদৌ সম্ভব নয়। এর ফলেই এতে সম্ভাব্য সকল অস্পষ্টতা বিদূরিত হয়েছে এবং اِنَّا দ্বারা আল্লাহর পরিচয় দান পূর্ণ হয়ে গেছে। আর এর দ্বারা পরোক্ষভাবে তথা اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, পুনরুত্থানের একমাত্র অধিপতি আল্লাহ তা'আলা। অন্য কোনো দেব-দেবীর এতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। এ কথার মাধ্যমে একদিকে আল্লাহর জন্য উক্ত গুণাবলিকে সাব্যস্ত করা হয়েছে আর অন্যদিকে তাঁর বিরোধীদের থেকে এটাকে দূরীভূত করা হয়েছে।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا الخ দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরে কাবীরে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এর তিনটি অর্থ হতে পারে।

১. দুনিয়াতে বান্দা ভালোমন্দ যে আমলই করুক না কেন আল্লাহ তা'আলার দফতরে তা লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হয়। এখানে مَا قَدَّمُوْا বলে শুধু ভালো কাজেরই উল্লেখ করা হয়েছে বলে বুঝা যায়। বাস্তবিক পক্ষে مَا قَدَّمُوْا বাক্যে উহ্য اَخَّرُوْا ধরে নিতে হবে। তখন পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হবে যে, مَا قَدَّمُوْا وَاَخَّرُوْا এটা কুরআনের বাণী– سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ বাক্যের মতো একটি বাক্য হবে, যাতে بَرْدٌ শব্দটিও উহ্য ধরে নিতে হয়।

২. আল্লাহ তা'আলা বান্দার সকল কাজকর্ম আপন দফতরে লিপিবদ্ধ করে নেন। চাই তা নেক হোক বা বদ হোক। আর مَاقَدَّمُوْا আয়াতের অংশটি مَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ -এর অনুরূপ একটি বাক্য।

৩. মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, আমরা তাদের মনের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও কল্পনা বা নিয়ত তারা যা কোনো কাজের পূর্বে করে থাকে তাও আমাদের দফতরে লিখিত থাকে।

কাজেই ভবিষ্যৎ জীবনে এটা তোমাদের ভোগ করতে হবে। কর্ম ভাল হলে তা জান্নাতের বাগ-বাগিচায় পরিণত হবে আর খারাপ হলে তা জাহান্নামের অগ্নি শিখার রূপ লাভ করবে।

আল্লাহর বাণী وَاٰثَارَهُمْ -এর اٰثَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতে اٰثَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি সে ব্যাপারে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে–

- এখানে اٰثَارٌ -এর দ্বারা এমন ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া উদ্দেশ্য যা পরবর্তীতে প্রকাশ পায় এবং অবশিষ্ট থাকে। যেমন– কোনো ব্যক্তি মানুষদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দিল, ধর্মীয় বিধিবিধান জানিয়ে দিল, ধর্ম সম্পর্কে কোনো পুস্তক রচনা করল যার মাধ্যমে জনসাধারণ উপকৃত হয়। অথবা কোনো কিছু ওয়াকফ করল যা থেকে পরবর্তীতে জন সাধারণ উপকৃত হলো। অথবা এমন কোনো কর্ম সম্পাদন করল যা মুসলমানদের উপকার সাধন করে, তাহলে যতদূর পর্যন্ত তার এ ভালো কর্মটির প্রভাব পৌঁছবে এবং যত দিন এটা পৌঁছতে থাকবে তা তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপরদিকে খারাপ কাজ, যার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে বাকি থাকে। যথা– অন্যায় আইন কানুন রচনা বা প্রচলন করল কিংবা জনসাধারণকে বিপথগামী করল, তবে যতদূর পর্যন্ত তার এই খারাপ কাজের প্রভাব পড়বে এবং এর কারণে যতদিন ফিতনা সৃষ্টি হতে থাকবে ততদিন তার আমল নামায় তা জমা হতে থাকবে।

এ আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে হযরত জাবির (রা.) মহানবী ﷺ -এর ইরশাদ নকল করেছেন যে–

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ثُمَّ تَلَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের প্রচলন করল সে তো এর প্রতিদান পাবেই এবং যারা এর উপর তার পরবর্তীতে আমল করবে তাদের সমপরিমাণ প্রতিদানও পাবে। অথচ তাদের কারো ভাগ থেকে কিছুই কমিয়ে নেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের প্রচলন করে সে উহার গুনাহ পাবে এবং তার পরবর্তী যারা এর উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহও সে পাবে অথচ তাদের গুনাহ হতে সামান্যতম গুনাহও কম করা হবে না।

এরপর মহানবী ﷺ পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ অর্থ– আমি তারা যে ভালোমন্দ সামনে প্রেরণ করে তা লিখে রাখি এবং তাদের আমলের প্রতিক্রিয়া যা পৃথিবীতে বাকি থাকে তাও লিখে রাখি।

–[ইবনে আবী হাতিম ইবনে কাছীর কর্তৃক উদ্ধৃত]

* اٰثَارٌ -এর অপর একটি অর্থ হচ্ছে– পদচিহ্ন। এখানে اٰثَارَهُمْ দ্বারা তাদের আনুগত্য ও নাফরমানির দিকে পা বাড়ানোর চিহ্নসমূহকে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে এসেছে– মানুষ নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করলে তার প্রতিটি পদচিহ্নের বিনিময় প্রতিদান লিপিবদ্ধ করা হয়।

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) ইমাম রাযী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মদীনার যেসব সম্প্রদায়ের বাসস্থান মসজিদে নববী হতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল তারা মহানবী ﷺ -এর নিকট মসজিদে নববীর নিকটে বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী ﷺ তাদের এ আবেদন নামঞ্জুর করে যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে বললেন। আরো বললেন– اِنَّ اللّٰهَ يَكْتُبُ خُطُوَاتِكُمْ وَيُثِيْبُكُمْ عَلَيْهِ فَالْزَمُوْا بُيُوْتَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিখে রাখেন এবং এর উপর তোমাদেরকে ছওয়াব প্রদান করা হবে। কাজেই তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর।

অবশ্য এ শেষোক্ত ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে। কেননা, এ সূরাটি মাক্কী, আর বর্ণিত ঘটনা ছিল মদীনার। উক্ত সন্দেহের অপনোদন কল্পে বলা যেতে পারে যে, এ আয়াতের ব্যাপকার্থ হলো– আমলের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। আর অত্র আয়াতখানা মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর মদীনায় যখন উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হয় তখন নবী করীম ﷺ প্রমাণ দিতে গিয়ে আলোচ্য আয়াতের উদ্ধৃতি দেন। আর পদচিহ্নকেও অবশিষ্ট প্রতিক্রিয়ার মধ্যে শামিল করেন যা লেখার উল্লেখ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

আর এ আলোচনার দ্বারা উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যকার বাহ্যিক বিরোধেরও অবসান হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর, মা'আরিফ]

আল্লাহ তা'আলা وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا **বলেছেন** وَنَكْتُبُ مَا اَخَّرُوْا **কেন বলেননি?** এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দ্বারা যদিও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দফতরে শুধুমাত্র মানুষের পূর্বের কৃত হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয় পরেরটি লিপিবদ্ধ করা হয় না, তবে বাস্তব এটা নয়। বরং মানুষের পূর্বাপরের সকল কর্মই লিপিবদ্ধ করা হয় যা অন্যান্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়। আর অত্র আয়াতে مَاقَدَّمُوْا -এর পরে مَا اَخَّرُوْا শব্দটি উহ্য রয়েছে। এরূপ উহ্য থাকার প্রচলন আরবিতে একাধিক রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রয়েছে যে, سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ অর্থাৎ এমন পোশাক যা তোমাদেরকে গরম [ও ঠাণ্ডা] হতে রক্ষা করবে। এখানে اَلْحَرَّ -এর পর اَلْبَرْدَ শব্দটি উহ্য রয়েছে। এটা আরবি ভাষার একটি বিশেষ রীতি।

আমল লেখার পূর্বে পুনরুত্থানের উল্লেখের কারণ : পুনরুত্থানের বিষয়টি আমল লেখার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৃত্যুর পর মানুষকে পুনঃজীবিত করে তার কৃতকর্ম তাকে দেখিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা বা দণ্ড প্রদান করাই হচ্ছে আমল সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, كِتَابَةُ الْاَعْمَالِ -এর কার্যকারিতা اِحْيَاءُ مَوْتٰى উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পুনরুত্থানের বিষয়টি আমল লিপিবদ্ধকরণ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এদিকে লক্ষ্য করেই كِتَابَةُ اَعْمَالٍ -এর পূর্বে اِحْيَاءُ مَوْتٰى -কে বর্ণনা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. وَاضْرِبْ اجْعَلْ لَهُمْ مَثَلًا مَفْعُوْلٌ اَوَّلُ اَصْحٰبَ مَفْعُوْلٌ ثَانٍ الْقَرْيَةِ اِنْطَاكِيَةَ اِذْ جَآءَهَا اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ اَصْحَابِ الْقَرْيَةِ الْمُرْسَلُوْنَ اَىْ رُسُلُ عِيْسٰى ـ

১৩. আর আপনি বর্ণনা করুন উপস্থাপন করুন তাদের জন্য উপমা এটা প্রথম মাফউল বসবাসকারীগণ এটা দ্বিতীয় মাফউল এলাকার এন্তাকিয়ার। যখন তথায় আগমন করেছিলেন শেষ পর্যন্ত اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ হতে বদলে ইশতিমাল হয়েছে। দূতগণ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর দূতগণ।

١٤. اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدَلٌ مِنْ اِذِ الْاُوْلٰى الخ فَعَزَّزْنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ قَوَّيْنَا الْاِثْنَيْنِ بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ـ

১৪. যখন আমি তাদের নিকট দুজনকে পাঠালাম তখন তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এখানে থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথমোক্ত إذ ও তৎপরবর্তী বাক্য হতে بدل হয়েছে। এরপর আমি শক্তিশালী করলাম এখানে عززنا-এর প্রথম ز -কে তাশদীদ ছাড়া এবং তাশদীদসহ উভয়ভাবেই পড়া যায় অর্থাৎ আমি ঐ দুজনকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজন দূত প্রেরণ করে, তারা বললেন আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

١٥. قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ـ

১৫. তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। দয়াময় আল্লাহ তোমাদের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা শুধু শুধু মিথ্যাই বলছ।

١٦. قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ جَارٍ مَجْرَى الْقَسَمِ وَزِيْدَ التَّاكِيْدُ بِهٖ وَبِاللَّامِ عَلٰى مَا قَبْلَهُ لِزِيَادَةِ الْاِنْكَارِ فِىْ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ـ

১৬. দূতগণ বললেন, আমাদের প্রতিপালক জানেন এটা শপথের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে কাফেরদের অস্বীকৃতির কারণে পূর্বোক্ত বক্তব্যের উপর শপথ ও لام দ্বারা তাকিদ বাড়ানো হয়েছে নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট অবশ্যই দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

١٧. وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ التَّبْلِيْغُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ بِالْاَدِلَّةِ الْوَاضِحَةِ وَهِىَ اِبْرَاءُ الْاَكْمَهِ وَالْاَبْرَصِ وَالْمَرِيْضِ وَاِحْيَاءُ الْمَيِّتِ ـ

১৭. আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে প্রচার করাই সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য ও দ্ব্যর্থহীন প্রচার-ই আমাদের দায়িত্ব। আর তা [অর্থাৎ উক্ত প্রমাণাদি] হলো– জন্মান্ধ, শ্বেত ও অন্যান্য রোগীদেরকে আরোগ্য দান এবং মৃতকে জীবিতকরণ।

তাহকীক ও তারকীব

فَعَزَّزْنَا শব্দে বর্ণিত কেরাত : এখানে দুটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে–

১. জুমহুর কারীগণের মতে, فَعَزَّزْنَا-এর প্রথম ز -কে তাশদীদ যোগে পড়া হবে, এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. আসিম এবং আবূ বকর (র.) মতে, فَعَزَزْنَا -এর প্রথম ز -কে তাখফীফ করে পড়া হবে।

ইমাম জাওহারী (র.) বলেন যে, فَعَزَّزْنَا তাশদীদ যোগে পড়া হলে অর্থ হবে غَلَبْنَا وَقَهَرْنَا আর তাখফীফ করে পড়া হলে অর্থ হবে قَوَّيْنَا وَكَثَّرْنَا।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ -এর ই'রাবগত অবস্থান : وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ আয়াতে উল্লেখিত أَصْحَابَ শব্দটি উহ্য مِثْلَ শব্দের মুযাফ ইলাইহ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُورٌ হয়েছে অর্থাৎ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا مِثْلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ উল্লিখিত বাক্যে مِثْلَ শব্দটি উহ্য রেখে তদস্থলে أَصْحَابَ শব্দটি আনা হয়েছে। যথা অন্যত্র এসেছে- وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ অর্থাৎ وَاسْئَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ উল্লিখিত বাক্যে أَهْلَ শব্দটিকে উহ্য রাখা হয়েছে।

অথবা, مِثْلَ শব্দটিকে উহ্য মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তখন বাক্যটি এরূপ হবে-

اِجْعَلْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ لَهُمْ مَثَلًا (أَوْ) مِثْلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ لَهُمْ.

অথবা, أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ বাক্যটি اِضْرِبْ ফে'লের দ্বিতীয় মাফউলও হতে পারে। তখন أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ টি مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হবে।

অথবা, أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ বাক্যটি مَثَلًا হতে বদল হওয়ার কারণে মানসূবের মহলে হবে। এমতাবস্থায় মুযাফকে উহ্য মেনে নিতে হবে।

إِذْ শব্দের মহল্লে ই'রাব : إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ আয়াতে إِذْ টি أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। যেহেতু সর্বদা بَدَلْ এবং مُبْدَلْ مِنْهُ -এর إِعْرَابُ একই হয়ে থাকে। এখানে أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ হলো مُبْدَلْ مِنْهُ আর إِذْ হলো بَدَلْ অর্থাৎ اِضْرِبْ لَهُمْ وَقْتَ مَجِيْئِ الْمُرْسَلِيْنَ وَمِثْلَ ذٰلِكَ الْوَقْتِ بِوَقْتِ مَجِيْئِكَ অর্থাৎ কাফেরদের সামনে সেই প্রেরিত লোকদের আগমনের সময়টা বর্ণনা করুন এবং আপনার আগমনের সময় দৃষ্টান্ত হিসেবে ঐ যুক্তিটি পেশ করুন যাতে কাফেররা সতর্ক হয়ে যায়। আর আপনি স্বীয় চিন্তা-ভাবনা বিদূরীত করে শান্ত হতে পারেন অথবা إِذْ টি اِضْرِبْ -এর ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হয়েছে। অথবা, إِذْ টি পরবর্তী جَآءَ ফে'লের ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আল্লামা বাগবী (র.) লিখেছেন, ইতিহাসবেত্তাগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) সত্যের দাওয়াত দিতে তাঁর দু'জন সাথীকে এন্তাকিয়া শহরে প্রেরণ করলেন। যখন তারা এন্তাকিয়ার নিকটবর্তী হলেন, তখন দেখলেন, জনৈক বৃদ্ধ বকরি চরাচ্ছে। (এ ব্যক্তির নাম ছিল হাবীব, পরবর্তীকালে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হয়েছিলেন) তারা উভয়ে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সালাম করলেন। সে তাদেরকে তাদের পরিচয় এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। তারা বললেন, 'আমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত, তোমাদেরকে মূর্তি পূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করার আহ্বান জানাতে এসেছি'। বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'তোমাদের নিকট কি কোনো নিদর্শন রয়েছে?' তারা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রুগণ ব্যক্তিকে সুস্থ করি, জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করি'। বৃদ্ধ লোকটি বলল, আমার এক পুত্র দু'বছর ধরে অসুস্থ, তারা বললেন, 'আমাদেরকে তার নিকট নিয়ে চল'। তারা উভয়ে যখন ঐ ব্যক্তির পুত্রের দেহ স্পর্শ করলেন, তখন সে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ সংবাদ সমগ্র জনপদে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁদের হাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক রোগীকে আরোগ্য দান করলেন।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেছেন, 'এন্তাকিয়া' জনপদের রাজার নাম ছিল আনতাফাস। সে ছিল মূর্তি পূজক। রাজা এ দু' ব্যক্তির সংবাদ পেয়ে তাদেরকে তার দরবারে তলব করলো এবং তাদের পরিচয় জানতে চাইলো, তখন তারা বললেন, 'আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর বাণীবাহক'। রাজা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?' তাঁরা বললেন, 'আমরা তোমাকে আহ্বান করি এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করতে, আর মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে, কেননা এ মূর্তিগুলো কিছু শ্রবণও করতে পারে না, দেখতেও পারে না। অতএব, মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এমন পবিত্র সত্তার ইবাদত কর, যিনি সব কিছু শ্রবণ করেন সব কিছু দেখেন'। রাজা বলল, 'আমাদের উপাস্য ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য রয়েছে কি?' তারা বললেন, 'জী-হ্যাঁ' সেই পবিত্র সত্তা, যিনি তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে সৃষ্টি করেছেন', তখন রাজা বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যাও, পরে তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করব'। তখন প্রেরিত ব্যক্তিগণ উঠে আসেন, অনেক লোক তাদের পিছন পিছন আসে এবং বাজারে এসে তাদের উভয়কে প্রহার করে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ.) যে দুই ব্যক্তিকে এন্তাকিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন, তারা এন্তাকিয়া পৌঁছলেও রাজার নিকট যেতে পারেনি, অনেক দিন তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। একদিন রাজা শহরে বের হয়, তখন তাঁরা উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলেন, উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ তা'আলার জিকির করায় রাজা রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে গ্রেফতার ও একশত বেত্রাঘাত করার আদেশ দেয়, যখন তাঁদের উভয়কে মিথ্যাজ্ঞান করা হয় এবং তাঁদেরকে প্রহার করা হয়, তখন হযরত ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের নেতা শামউনকে তাদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ছদ্মবেশে শামউন সে জনপদে হাজির হলেন। রাজার নিকটস্থ লোকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং তাদের মাঝে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তখন তারা রাজাকে শামউনের ব্যাপারে অবহিত করল। রাজা শামউনকে দরবারে ডেকে পাঠালে তিনি হাজির হলেন। শামউনের সঙ্গে আলোচনায় রাজা মুগ্ধ হলো, তাঁর যথোচিত সম্মান সে করল, কিছুদিন পর শামউন রাজাকে বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি যে দু'ব্যক্তিকে আপনি কারাবন্দী করে রেখেছেন, তারা যখন আপনার ধর্মের বিরোধী কথাবার্তা বলেছে, তখন আপনি তাদের প্রহার করিয়েছেন এবং বন্দী করেছেন। আপনি কি তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলেছিলেন?' রাজা বলল, 'আমি এত বেশি রাগান্বিত হয়েছিলাম যে, তাদের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারিনি'। তখন শামউন বলল, 'রাজা যদি সমীচীন মনে করেন, তবে তাদেরকে তলব করে জিজ্ঞাসা করতে পারেন'। শামউনের পরামর্শে রাজা ঐ দু'জন বাণী বাহককে তলব করল। শামউন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদেরকে এখানে কে প্রেরণ করেছে?' তারা জবাব দিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কোনো শরিক নেই'। শামউন তাদেরকে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর'। তারা বললো, 'তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁর যেমন মর্জি হয় তেমনি আদেশ দেন'। শামউন বললেন, 'তোমাদের নিকট কোনো নিদর্শন রয়েছে কি?' তারা বললো, 'যে কোনো নিদর্শন ইচ্ছা তলব করতে পারেন'। একথা শ্রবণ করা মাত্র রাজা একটি ছেলেকে ডেকে আনল যার চক্ষুর কোনো নমুনাই ছিল না, কপাল যেমন সমান, চক্ষুর স্থানও তেমনি সমান। তখন ঐ দু'ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করতে থাকলেন, অবশেষে ঐ ছেলেটির চক্ষুর স্থান ফেটে গেল এবং একটু পরে সে চক্ষুষ্মান হয়ে গেল। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলো শামউন রাজাকে বললেন, 'যদি আপনি আপনার উপাস্যকে এরূপ করতে বলেন, আর উপাস্যরা এরূপ করতে পারে, তবে আপনার প্রাধান্য বিস্তার হবে'। রাজা বলল, 'তোমার কাছে তো কোনো কিছু গোপন নেই, আমরা যেসব মূর্তির পূজা করি, তারা কোনো কিছু শোনেও না, দেখেও না, কোনো প্রকার ক্ষতি কিংবা উপকার কিছুই তারা করতে পারে না'।

রাজা যখন মূর্তি পূজা করত, তখন শামউন নামাজ আদায় করত এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাকুতি-মিনতি করতে থাকত। লোকেরা মনে করত শামউন তাদের ধর্মে রয়েছে। এরপর রাজা ঐ দু'জন বাণী বাহককে বলল, 'তোমাদের খোদা যদি মৃতকে জীবিত করতে পারে তবে আমি তাঁকে মানব'। তারা বললেন, 'তিনি সর্বসময় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী', তখন রাজা একটি শিশুর লাশ হাজির করল, যার মৃত্যু হয়েছিল এক সপ্তাহ পূর্বে, পিতার অনুপস্থিতি হেতু তাকে দাফন করা হয়নি, মৃত লাশটি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এমন অবস্থায় তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রকাশ্যে দোয়া করল আর শামউন চুপিসারে দোয়া করতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরই মৃত শিশুটি জীবিত হয়ে বসে পড়ল এবং বলল, 'মুশরিক অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়েছিল সাত দিন পূর্বে, আমাকে অগ্নির সাতটি ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি তোমাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করার জন্য বলছি, তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন'। এরপর সে বলেছে, 'আসমানের দরজা খোলা হয়, আর আমি একজন অতি সুন্দর যুবককে দেখেছি যে, এই তিনজনের সুপারিশ করছে', রাজা জিজ্ঞাসা করল, 'তিনজন কে?' সে বলল, 'শামউন এবং এই দুজন', রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলো শামউন যখন দেখলেন যে, এ ঘটনা রাজার মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তখন তিনি রাজাকে বললে, 'আপনি এ দু' ব্যক্তিকে বলুন, তারা যেন আপনার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দেয়।' রাজা তাই করল, তখন বাণী বাহকদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দণ্ডায়মান হলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করতে লাগল। শামউনও চুপিসারে দোয়া করতে থাকল। কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ তা'আলা রাজার মৃত কন্যাকে জীবিত করে দিলেন, কবর ফেটে গেল, মেয়েটি বের হয়ে এল এবং বললো, 'আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, এ দু'ব্যক্তি সত্যবাদী। তবে আমার আশঙ্কা আপনারা তাদের কথা মানবেন না'। এরপর সে তাদেরকে অনুরোধ করল যে, আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিন, তারা তাকে কবরে পৌঁছে দিল।

ইবনে ইছহাক কা'ব এবং ওয়াহাব (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাজা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি আর তার জাতিও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছে। এ জন্য সে উভয় রাসূলকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে। এ খবর পেয়ে বৃদ্ধ হাবীব দ্রুতবেগে এসে রাজা এবং তার পারিষদের উপদেশ দিয়েছে। এটিই হলো এন্তাকিয়ার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

–[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩২-৩৪

ضَرَبَ -এর অর্থ উপমা বর্ণনার তাৎপর্য : ضَرَبَ -এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে তিনটি–

১. প্রহার করা, মারা, আঘাত করা। যথা– ضَرَبَ بَكْرٌ زَيْدًا অর্থ– বকর যায়েদকে মেরেছে। আর এ অর্থটি অধিক প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ।

২. উপমা পেশ করা। যথা– ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا অর্থ– আল্লাহ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

৩. ভ্রমণ করা। যথা– ضَرَبَ خَالِدٌ فِي الْاَرْضِ অর্থ– খালিদ পৃথিবীতে ভ্রমণ করল।

উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রারম্ভে ওহী, রিসালাত, পুনরুত্থান এবং তার নিকট জবাবদিহিতার কথা উল্লেখ করেছেন। আর সাথে সাথে প্রমাণাদির মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতাও ফুটিয়ে তুলেছেন। এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল আল্লাহর প্রতি কাফেরদের বিশ্বাস স্থাপন করা ও মহানবী ﷺ -এর অনুগত্য মেনে নেওয়া, কিন্তু ঐ হতভাগাদের নিকট আল্লাহর আহ্বান নিরর্থক ছিল। ফলে তারা ঈমান তো আনয়ন করেইনি বরং উদ্যত ভরে নবীকে প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতদের ঘটনা কাহিনী আকারে বর্ণনা করে এদিকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা নবীর প্রতি অসদাচরণের কারণে তারা যে ভয়াবহ শাস্তির মুখে পড়েছিল, যদি তোমরা মহানবী ﷺ -এর সাথে অনুরূপ অশোভন আচরণ কর তবে তোমাদের জন্যও প্রস্তুত রয়েছে পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় ভয়ানক শাস্তি।

অপরদিকে মহানবী ﷺ-কে একথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি মক্কার কাফেরদের যে অশোভন আচরণ এটা কোনো নতুন কিছু নয়। আপনার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের সাথেও এরূপ জঘন্য আচরণ করা হয়েছিল। কাজেই আপনার ব্যথিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই।

এ ছাড়াও উপমা বর্ণনার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে ও মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার, মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য। যার ফলে তারা পূর্বোক্ত কাহিনী দেখে মুক্তি পাবার আশায় ঈমান গ্রহণ করতে পারে। –[ইবনে কাছীর]

اَلْقَرْيَةُ এবং مُرْسَلُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ ও তাদের মর্যাদা : উল্লিখিত আয়াতে اَلْقَرْيَةُ দ্বারা কোন জনপদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর বিশদ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'বে আহবার ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (র.) প্রমুখগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, উক্ত জনপদের নাম এন্তাকিয়া। এটাকেই জমহুর মুফাসসিরগণ গ্রহণ করেছেন।

আবূ হাইয়ান ও ইবনে কাছীর (র.) বর্ণনা করেন যে, কোনো মুফাসসিরই উপরিউক্ত অভিমতে, বিরোধিতা করেননি। মা'জামুল বুলদান নামক কিতাবে রয়েছে যে, এন্তাকিয়া হচ্ছে সিরিয়ার একটি বড় শহর। হাবীবে নাজ্জারের মাজারও এই এন্তাকিয়ায় অবস্থিত।

আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে লিখেছেন যে, কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্য উক্ত শহর নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন নেই। কুরআনে যেহেতু এটাকে অস্পষ্ট রেখেছে কাজেই সেভাবেই রেখে দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে সলফে সালেহীনের বক্তব্য হচ্ছে– اِبْهَمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ যা অস্পষ্ট রেখেছেন তোমরাও তা অস্পষ্ট রাখ।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمُرْسَلُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : পবিত্র কুরআনে مُرْسَلٌ এবং রাসূল সাধারণত আল্লাহর নবী ও পয়গম্বরগণকে বলা হয়েছে। এ আয়াতে বর্ণিত ঘটনায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রেরণের নিসবত নিজের দিকে করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা নবী বা রাসূল ছিলেন। ইবনে ইসহাক, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার (র.) এবং ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা রাসূল (পয়গম্বর) ছিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এখানে مُرْسَلُوْنَ শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে তথ দূত-এ ব্যবহৃত হয়েছে; এরা তিনজনের কেউই পয়গম্বর ছিলেন না। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী ছিলেন। তিনি তাদেরকে এন্তাকিয়াবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আর যেহেতু এ প্রেরণ করা আল্লাহর নির্দেশে ছিল তাই কুরআনে প্রেরণের নিসবত আল্লাহর দিকে করা হয়েছে।

তাঁদের নাম সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বর্ণনানুপাতে তাঁদের নাম হলো- ১. সাদেক, ২. সাদুক, ৩. সালুম এক বর্ণনায় তৃতীয়জনের নাম শামউন এসেছে। অন্য এক বর্ণনায় তাদের নাম বলা হয়েছে- ১. ইউহান্না, ২. বুলিস, ৩. শামউন। -[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, মা'আরিফ]

তাঁদের মর্যাদা : হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব দিয়ে এন্তাকিয়া নগরীতে প্রেরণ করেছিলেন। আর এ কারণের তাদের প্রেরণের নিসবত স্বয়ং আল্লাহ নিজের দিকেই করেছেন। কাজেই বুঝা গেল যে, তাঁদের মর্যাদা নবীগণের মর্যাদার মতোই হতে পারে।

اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ الخ কালামটি যে ফিকহী মাসআলকে অন্তর্ভুক্ত করে : কুরআনের এ বাক্যটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিকহী মাসআলাকে শামিল করে, তা হলো- وَكِيْلُ الْوَكِيْلِ بِاِذْنِ الْمُوَكِّلِ وَكِيْلُ الْمُوَكِّلِ لَا وَكِيْلَ حَتّٰى لَا يَنْعَزِلَ بِعَزْلِ الْوَكِيْلِ اِيَّاهُ يَنْعَزِلُ اِذْ اَعْزَلَهُ الْمُوَكِّلُ الْاَوَّلُ. অর্থাৎ উকিলের উকিল যদি মুয়াক্কিলের অনুমতিক্রমে নিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে প্রথম মুয়াক্কিলের উকিল উকিল নয়। এমনকি ঐ নিযুক্ত করা উকিল দ্বিতীয় উকিলের বরখাস্তের মাধ্যমে বরখাস্ত হবে না। প্রথম মুয়াক্কিল বরখাস্ত করলেই বরখাস্ত হবে।

আল্লাহর বাণী فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ-এর মধ্যে ثَالِثٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : অত্র আয়াতে ثَالِثٌ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে-

১. এখানে ثَالِثٌ দ্বারা হযরত শামউনকে বুঝানো হয়েছে। এন্তাকিয়াবাসী কর্তৃক প্রথম দুজন বন্দি হলে তাদের সাহায্যার্থে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

২. কারো কারো মতে, এখানে ثَالِثٌ দ্বারা হাবীবে নাজ্জার উদ্দেশ্য। তিনি দূতদ্বয়ের আহ্বানে তাওহীদে দীক্ষিত হয়ে তাদেরকে দাওয়াতি মিশনে সহযোগিতা করেন।

৩. কারো কারো মতে, তিনি হচ্ছেন শামউনে সখর, যিনি হযরত ঈসা (আ.) অন্তর্ধানের পর হাওয়ারীদের আমির নিযুক্ত হন।

৪. কারো কারো মতে, ثَالِثٌ দ্বারা এন্তাকিয়ার বাদশাহ উদ্দেশ্য, যিনি গোপনে ঈমান এনেছিলেন। -[রুহুল বয়ান]

কাফেরদের নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পদ্ধতি : রাসূলগণকে নানা টালবাহানা ও অনর্থক অজুহাত তুলে যুগে যুগে কাফেররা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নবীগণের দাওয়াতি জিন্দেগী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল নবীকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে কাফেররা একই অজুহাত বারবার তুলে ধরেছে। আর তাদের সেই অজুহাতগুলো হলো- রাসূল তো তাদের মতোই একজন রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। সে কি করে তাদের পথ প্রদর্শক হতে পারে?

হযরত নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত দিয়েছিল তখন তারা প্রতিউত্তরে বলেছিল- مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ এ লোকতো তোমাদের ন্যায় মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমাদের উপর সে মর্যাদাশীল হতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো ফেরেশতাই অবতীর্ণ করতে পারতেন। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে তো আমরা এরূপ কিছু শ্রবণ করিনি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত হূদ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিলেন তখন তারা বলেছিল- مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ অর্থাৎ এ লোকটি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সেও তাই খায়। আর তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের অনুগত্য কর; তবে নিশ্চিতই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

হযরত সালিহ (আ.)-এর দাওয়াতের জবাবে তাঁর জাতি বলেছিল- اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ অর্থাৎ আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন মানুষের আনুগত্য করব?

তাদের জবাবে রাসূলগণ বলেন- اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ আমরা যদিও তোমাদের মতোই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন।

উপরিউক্ত চিন্তা চেতনার ফলেই আল্লাহর পক্ষ হতে যুগে যুগে নেমে এসেছিল আজাব ও গজব। ইরশাদ হচ্ছে-

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ . ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا . فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا .

অর্থাৎ তোমাদের নিকট কি পূর্বেকার কাফেরদের সংবাদ পৌঁছেনি। কাজেই তারা তাদের কৃত কর্মের (পাপের) স্বাদ ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর তা এ জন্য যে, তাদের নিকট রাসূলগণ প্রমাণাদিসহ আসতেন। অথচ তারা বলত, একজন মানুষই কি আমাদেরকে হেদায়েত করবে? ফলে তারা কুফরি পছন্দ করল এবং সত্য বিমুখ হয়ে পড়ল।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন- وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا

অর্থাৎ হেদায়েত আসার পর লোকজনদের ঈমান আনয়ন করতে এটাই বাধা হয়ে দাড়িয়েছে যে, তারা বলল- আল্লাহ কি মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠালেন।

মহান রাব্বুল আলামীন তাদের ভ্রান্ত উক্তি খণ্ডন করত: ঘোষণা করলেন যে, একমাত্র মানুষই রাসূল হতে পারে; অন্য কেউ নয়। ফেরেশতা বা কোনো অলৌকিক সত্তা মানুষের হেদায়েতের ভারপ্রাপ্ত রাসূল হতে পারে না।

قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا .

অর্থাৎ হে নবী আপনি বিরোধীদেরকে বলে দিন যে, যদি ফেরেশতাগণ নির্বিঘ্নে জমিনে চলাফেরা করতেন তবে আমি অবশ্যই তাদের নিকট ফেরেশতাকে রাসূল করে পাঠাতাম।

মক্কার কাফেরগণও মহানবী ﷺ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তি নকল করে বলেন- وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ অর্থাৎ আর তারা (মক্কার কাফিররা) বলত ইনি কেমন রাসূল তিনি খাবারও গ্রহণ করেন এবং বাজারেও চলাফেরা করেন। অন্য আয়াতে এসেছে-

وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ .

অর্থাৎ আর জালিমরা [কাফিররা] চুপিসারে বলে, এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা দেখে শুনে কি যাদুতে জড়িয়ে পড়বে।

সারকথা হলো, এটা মানুষেরও একটি চিরাচরিত অভ্যাস হয়ে রয়েছে; বারংবার কুরআনে এটাই বলা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে এটা মহানবী ﷺ -এর জন্য সান্ত্বনাও ছিল।

মুফাসসির তার বক্তব্য جَارٍ مَجْرَى الْقَسَمِ দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং এতে ফায়দা কি? জালালাইনের মুসান্নেফ (র.) এখানে رَبُّنَا يَعْلَمُ الخ বলে جَارٍ مَجْرَى الْقَسَمِ এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দ্বারা রাসূলগণ তাদের বক্তব্যের উপর জোর প্রদান করেছেন। এ ছাড়া এর জবাব এভাবে প্রদান করা হয়েছে যেভাবে কসমে জবাব দেওয়া হয়। এ জন্যই তিনি رَبُّنَا يَعْلَمُ আয়াতাংশটি শপথের জবাব বলেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

رَبُّنَا يَعْلَمُ বাক্যটিকে শপথের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হলে পরবর্তী বাক্যটিকে শপথের জবাব হিসেবে গণ্য করা যাবে। আর তাতে এর মধ্যে তাকিদ সৃষ্টি হবে। উক্ত তাকিদ অন্যান্য তাকিদের সাথে মিলে বাক্যটি কাফেরদের উক্তির যথাযথ জবাবের রূপ লাভ করবে।

মহানবী ﷺ বাদশাহদের নিকট দীনের দাওয়াত নিয়ে একজন প্রেরণ করেছেন। অথচ হযরত ঈসা (আ.) দুজন দূত পাঠালেন এর হেকমত কি? ইমাম রাযী (র.) আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর বলেন যে, মহানবী ﷺ দীনের শাখা-প্রশাখার দাওয়াত নিয়ে দূত পাঠিয়েছেন। আর এ জন্য একজনের সংবাদই যথেষ্ট ছিল। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ.) উক্ত দূতগণকে দীনের মৌলিক বিষয়ের দাওয়াতসহ পাঠিয়েছিলেন এ জন্য একাদিক লোকের প্রয়োজন ছিল। এমনকি হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ যে অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছিলেন, তাও তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল।

আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে এটাও বলা যায় যে, মহানবী ﷺ একজন দূতের সাথে তার সিলমোহরসহ পত্রও পাঠিয়েছিলেন, তাই একজনই যথেষ্ট ছিল। এ ছাড়াও ইতঃপূর্বে ইজমালীভাবে মহানবী ﷺ -এর দাওয়াত সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছিল। আর করীনা পাওয়া গেলে একজনের খবরও একীনের স্তরে পৌছতে পারে।

"وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ" **-এর তাৎপর্য :** রাসূলগণের উপর আল্লাহ তা'আলার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাঁরা সে দায়িত্ব যথাসাধ্য পালনে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ, যুক্তি ও আল্লাহ প্রদত্ত মোজেজার মাধ্যমে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন। রাসূল খুবই সচেতনতার সাথে তাদের সম্মুখে অকাট্য দলিল পেশ করেছেন। মু'জিযা দ্বারা কাফির মুশরিকদেরকে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের কিছু হয়নি। উপরন্তু এসব স্পষ্ট নিদর্শনসমূহকে তারা জাদু-মন্ত্র বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে রাসূলগণ বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমাদের দায়িত্ব তো কেবলমাত্র তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে খোদায়ী বিধান পৌছে দেওয়া। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। তোমরা তা অমান্য করলে আমাদের কিছুই করার নেই। জোর করে তোমাদেরকে আনুগত্য স্বীকার করানো আমাদের দায়িত্ব নয়।

مُبِيْنٌ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ : مُبِيْنٌ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ এর সীগাহ, বাবে اِفْعَالْ অর্থ হচ্ছে- স্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুফাসসিরগণ কয়েকভাবে এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।

✪ সুস্পষ্টভাবে সত্যের পয়গাম পৌছে দেওয়া এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ধারণ করে দেওয়া।

✪ সত্যের দাওয়াত সর্বশ্রেণির মানুষের নিকট পৌছে দেওয়া।

✪ হকের দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। সত্যকে গ্রহণ না করলে বিরোধীদের বিনাশ সাধন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٨. قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا تَشَاءَمْنَا بِكُمْ
لِانْقِطَاعِ الْمَطَرِ عَنَّا بِسَبَبِكُمْ لَئِنْ لَامُ
قَسَمٍ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ بِالْحِجَارَةِ
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ.

১৮. তারা বলল, আমরা অকল্যাণ মনে করি কুলক্ষণে মনে করি তোমাদের কারণে কেননা তোমাদের কারণে আমাদের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। যদি কসমের লাম তোমরা বিরত না হও তবে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো পাথর দ্বারা আর আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি ভীষণ পীড়াদায়ক শাস্তি আপতিত হবে اَلِيْمٌ শব্দটি مُؤْلِمٌ অর্থে অর্থ- কষ্টদায়ক

١٩. قَالُوْا طَائِرُكُمْ شُؤْمُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ
هَمْزَةُ اِسْتِفْهَامٍ دَخَلَتْ عَلٰى اِنِ الشَّرْطِيَّةِ
وَفِيْ هَمْزَتِهَا التَّحْقِيْقُ وَالتَّسْهِيْلُ
وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهَا بِوَجْهَيْهَا وَبَيْنَ
الْاُخْرٰى ذُكِّرْتُمْ ط وُعِظْتُمْ وَخُوِّفْتُمْ وَجَوَابُ
الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ اَيْ تَطَيَّرْتُمْ وَكَفَرْتُمْ وَهُوَ
مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ
بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ مُتَجَاوِزُوْنَ الْحَدَّ
بِشِرْكِكُمْ.

১৯. দূতগণ বললেন, তোমাদের অমঙ্গল অলক্ষুণে তোমাদের সাথে। যদি এখানে হামযাটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ যা اِنِ الشَّرْطِيَّةُ-এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে আর উক্ত হামযাকে অপরিবর্তিত রেখে পড়া যায়, তাসহীল (সহজ) করে পড়া যায় এবং তার ও অপর হামযার মাঝে উভয় অবস্থায় [তাহকীক ও তাসহীল] একটি আলিফ বৃদ্ধি করেও পড়া যায়। তোমাদেরকে নসিহত করা হয় তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয় ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়। শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তবে কি তোমরা দুর্ভাগ্য মনে করবে এবং কুফরি করবে? শর্তের জবাব প্রশ্নবোধক অবস্থায় , আর এর দ্বারা তিরস্কার করা উদ্দেশ্য। বরং তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় তোমরা তোমাদের শিরকের কারণে সীমা অতিক্রমকারী।

٢٠. وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ هُوَ
حَبِيْبُ النَّجَّارِ كَانَ قَدْ اٰمَنَ بِالرُّسُلِ
وَمَنْزِلُهُ بِاَقْصَى الْبَلَدِ يَّسْعٰى ز يَشْتَدُّ
عَدْوًا لَمَّا سَمِعَ بِتَكْذِيْبِ الْقَوْمِ الرُّسُلَ
قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ.

২০. আর নগরীর উপকণ্ঠ হতে এক ব্যক্তি আগমন করল তিনি হাবীবে নাজ্জার ছিলেন। তিনি দূতগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন আর শহরের সীমান্ত এলাকায় তার বাড়ি ছিল। দৌড়ে দ্রুতবেগে ছুটে। যখন শুনতে পেলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা দূতগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ করো।

٢١. اِتَّبِعُوْا تَاكِيْدٌ لِلْاَوَّلِ مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ
اَجْرًا عَلٰى رِسَالَتِهِ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ فَقِيْلَ
لَهُ اَنْتَ عَلٰى دِيْنِهِمْ.

২১. তোমরা অনুসরণ করো এটা প্রথমোক্ত اِتَّبِعُوْا-এর তাকিদ। এমন লোকদের যারা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চান না। রিসালতের বিনিময়। আর তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত তখন তাকে বলা হলো তুমি তাদের [রাসূলগণের] দীনের অনুসারী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَالُوْا طَائِرُكُمْ -এর মধ্যস্থিত طَائِرُكُمْ -এর বিভিন্ন কেরাত : এ আয়াতে তিনটি কেরাত রয়েছে–

১. মাসহাফে ওসমানীতে طَائِرُكُمْ রয়েছে।

২. কোনো কোনো কারী طَيْرُكُمْ পড়েছেন। তখন অর্থ হবে–

سَبَبُ شُؤْمِكُمْ مَعَكُمْ وَهُوَ كُفْرُهُمْ اَوْ اَسْبَابُ شُؤْمِكُمْ مَعَكُمْ وَهُوَ كُفْرُهُمْ وَمَعَاصِيْهِمْ .

অর্থাৎ তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমাদের সাথেই বিরাজমান রয়েছে। আর তা হলো তাদের কুফর। অথবা তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমাদের নিজেদের সাথেই বিরাজমান রয়েছে। তা হলো তাদের কুফর ও নাফরমানি।

৩. হযরত হাসান (র.)-এর মতে কেরাত হবে اَطَّيَّرُكُمْ অর্থাৎ تَطَيُّرُكُمْ তখন অর্থ হবে– তোমাদের নিজেদের কর্মফলের কারণেই তোমাদের দুর্ভাগ্যে নিপতিত হওয়া।

اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ -এর মধ্যস্থ اَئِنْ -এর কেরাতসমূহ : এ আয়াতে বর্ণিত اَئِنْ -এর দু'টি হামযার মধ্যে মোট চারটি কেরাত রয়েছে–

১. উভয় হামযাহ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে তথা হামযা দু'টি স্ব-স্ব মাখরাজ হতে অবিকৃত অবস্থায় উচ্চারিত হবে।

২. শর্তের হামযাকে তাসহীল তথা সহজ করে পড়া।

৩. শর্তের ও ইস্তেফহামের হামযা উভয়টিকে অপরিবর্তিত রেখে এদের মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া।

৪. শর্তের হামযাটিকে তাসহীল করে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া।

আল্লাহর বাণী اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ -এর মধ্যে নাহবী মতপার্থক্য : এ আয়াতে شَرْط এবং اِسْتِفْهَامْ -এর হামযা একত্রিত হওয়ায় নাহুবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

- ইমাম সীবওয়াইহ (র.)-এর মতে, شَرْط এবং اِسْتِفْهَامْ যদি একত্রিত হয়, তবে اِسْتِفْهَامْ -এর জবাব দেওয়া হয়। তাই তাঁর নিকট বাক্যটি হবে– اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ تَطَيَّرْتُمْ -
- ইউনুস নাহুবিদের মতে, شَرْط এবং اِسْتِفْهَامْ একত্রিত হলে শর্তের জবাব দেওয়া হয়। তখন বাক্যটি এরূপ হবে– اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ تَطَيَّرُوْنَ [জযমের সাথে]।

يَسْعٰى -এর মহল্লে ই'রাব এবং اَلسَّعْىُ -এর অর্থ : يَسْعٰى শব্দটি জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে পূর্ববর্তী رَجُلٌ হতে হাল হয়েছে তাই এটা মহল্লে নসবে হয়েছে।

سَعْى শব্দের অর্থ– দ্রুত চলা, তাফসীর রুহুল বয়ানে এর অর্থ বলা হয়েছে– اَلسَّعْىُ اَلْمَشْىُ السَّرِيْعُ وَهُوَ دُوْنَ الْعَدْوِ অর্থাৎ সায়ী অর্থ হলো দ্রুত চলা। আর তা দৌড়ানো হতে নিম্নস্তরের, তবে এখানে يَسْعٰى -এর উল্লেখ দ্বারা সৎকাজের সহযোগিতায় দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَطَيُّرٌ -এর অর্থ ও تَطَيُّرٌ এবং تَفَاؤُلٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য : اَلتَّطَيُّرُ -এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে অশুভ মনে করা। এ শব্দটি طَيْرٌ (পাখি) হতে নির্গত। বর্ণিত আছে তৎকালে মক্কার লোকেরা সফরে বের হওয়ার প্রাক্কালে একটি পাখি উড়িয়ে দিত। যদি পাখিটি ডান দিকে চলে যেত তবে তারা তাদের মঙ্গলজনক মনে করে সফরে বের হয়ে যেত। আর যদি পাখিটি বাম দিকে যেত তবে তারা এটাকে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে করত ফলে তারা এ সফরে বের হতে বিলম্ব করত। পরবর্তীতে এ শব্দটি শুধুমাত্র দুর্ভাগ্যের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلتَّفَاؤُلُ -এর অর্থ হচ্ছে- طَرِيْقُ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে ভালো ধারণা পোষণ পদ্ধতি। কথিত আছে যে, মহানবী ﷺ মদীনায় হিজরত করার জন্য বের হলে পথিমধ্যে বুরাইদ ইবনে আসলামের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন মহানবী ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন যে, برد امرنا অর্থাৎ আমাদের অভিপ্রায় সহজে অর্জিত হবে।

تَفَاؤُلٌ জায়েজ তবে تَطَيُّرٌ মাকরূহ বা হারাম। রাসূল ﷺ تَطَيُّرٌ অপছন্দ করতেন এবং تَفَاؤُلٌ-কে পছন্দ করতেন হাদীসে আছে كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْفَالَ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ অর্থাৎ রাসূল ﷺ اَلْفَالُ-কে ভালবাসতেন আর اَلطِّيَرَةُ-কে অপছন্দ করতেন।

কাফেরদের اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ বলার কারণ : উক্ত দূতগণের দাওয়াত এন্তাকিয়াবাসীগণ শুনেওনি এবং গ্রহণও করেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ না করার ফলে তাদের সেই জনপদে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আর বস্তিবাসী এ জন্য রাসূলগণকে অলক্ষুণে বলেছিল। অথবা তারা অন্য কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে থাকবে।

এ ছাড়াও তাদের রাসূলগণকে অলক্ষুণে বলার কারণ এটাও হতে পারে যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ রাসূলগণের দাওয়াত গ্রহণ করেছিল। ফলে অন্যান্যদের সাথে তাদের মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণেই তা এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করে।

মোটকথা হলো, যুগে যুগে কাফেরদের উপর যখনই কোনো আজাব নেমে আসত তখনই তারা এটাকে রাসূলগণ কিংবা সৎ লোকদের দিকে নিবসত করে দিত। আর এ ধারায়-ই এন্তকিয়াবাসীগণ রাসূলদের দিকে অলক্ষুণের নিসবত করে দিল।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ السَّيِّئَةُ يَطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ অর্থাৎ যখন তাদের নিকট কোনো কল্যাণ আসত তারা বলত এটা আমাদের কারণে হয়েছে। আর যখন তারা কোনো অনিষ্টতার মুখোমুখি হতো, তখন মূসা ও তার সঙ্গীসাথীদের উপর দোষারোপ করত।

হযরত সালিহ (আ.)-এর ছামূদ সম্প্রদায় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিল- تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ অর্থ- তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে আমরা অশুভ মনে করি।

কাজেই তাদেরকে طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ (তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে) বলে একথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, এ বিপদ ও বিপর্যয় তোমাদের অপকর্ম ও রাসূলগণের অবাধ্য হওয়ারই ফসল।

শহরের সীমান্ত হতে আগত ব্যক্তির ঘটনা : শহরের সীমান্ত এলাকা হতে আগত ব্যক্তিটির পরিচিতি কুরআনে কারীমে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার (র.) ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, তবে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি নাজ্জার বা কাঠ মিস্ত্রী ছিলেন। এ ব্যক্তি মহানবী ﷺ -এর উপর [হুযূরের আগমনের ছয় শত বছর পূর্বে] ঈমান এনেছিলেন।

ঐতিহাসিক বিবরণ : এ ব্যক্তি ছিলেন হাবীবে নাজ্জার, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেকার ব্যক্তি, শহরের এক প্রান্তে নির্জনে থেকে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। রাসূলগণের সঙ্গে কাফেরদের দুর্ব্যবহার দেখে তিনি নীরব থাকতে পারলেন না, তাই তাঁদের সাহায্যে ছুটে আসেন এবং তাঁদের অনুসরণের জন্যে তার সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন-

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

'তোমরা অনুসরণ কর এমন লোকের, যারা তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চায় না এবং যারা হেদায়েত প্রাপ্ত', যারা সঠিক পথের দিশারী।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, হাবীব রেশমী বস্ত্র তৈরি করতেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

সুদ্দী (র.) বলেছেন, পেশায় তিনি ছিলেন একজন ধোপা। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। এ জন্য শহরের শেষ প্রান্তে তিনি বসবাস করতেন। একজন দানশীল মর্দে মু'মিন ছিলেন তিনি। তাঁর পুরো দিনের রোজগারের এক ভাগ আল্লাহর রাহে দান করতেন, অন্যভাগ আপনজনদের মাঝে ব্যয় করতেন। তিনি যখন এ দুঃসংবাদ পেলেন যে, দুরাত্মা কাফেররা রাসূলগণকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তখন তিনি ছুটে আসলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে রাসূলগণের অনুসরণ করার এবং অন্যায় পথ পরিহার করার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানালেন। –[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩৬]

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, হাবীব সত্তর বছর ধরে মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাঁর কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য সে এগুলোর কাছে মিনতি জানিয়েছে। যখন রাসূলগণ তাঁকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদের নিকট কোনো নিদর্শন রয়েছে কি?' তখন তারা হাবীবের জন্যে দোয়া করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার তাঁকে আরোগ্য দান করলেন আর এভাবে তাঁর ঈমান লাভের তৌফিক হয়। যখন তিনি রাসূলগণের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন, তখন ছুটে এসে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

–[তাফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড- ২২, পৃষ্ঠা-২২৫]

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, সিরিয়ার 'এন্তাকিয়া' নামক জনপদে যখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রেরিত রসূলগণ তৌহীদের পয়গাম নিয়ে পৌছেন তখন ঐ জনপদবাসী তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁদেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ সংবাদ পেয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে একজন মর্দে কামিল দ্রুত তাদের নিকট ছুটে আসেন এবং তাদেরকে বলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তিদেরকে অনুসরণ কর, তাঁরা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চায়না অথচ তাঁরা হেদায়েত প্রাপ্ত, তাঁরা তোমাদের কল্যাণকামী, তাঁরা তোমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিতে এসেছেন'। তিনি ছিলেন হাবীব নাজ্জার। তখন তাঁর জাতি তাঁকে বলে, 'এ ব্যক্তি আমাদের ধর্মের বিরোধী হয়ে পড়েছে, এ রাসূলগণের অনুসারী হয়েছে। এ রাসূলগণ যাঁর বন্দেগি করতে বলে এ ব্যক্তিও তাই বলে'।

কাফেরদের এ কথার জবাবে হাবীব নাজ্জার যা বলেছিলেন এ আয়াতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

অর্থাৎ আমার কি হয়েছে যে, আমি সে পবিত্র মহান সত্তার বন্দেগি করব না, যিনি আমাকে এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন, শুধু তাই নয়, বরং অবশেষে তোমাদের আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। এমন অবস্থায় আমি তাঁর বন্দেগী করব না, তবে কার বন্দেগী করব? যাঁর করুণায় ধন্য হয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব লাভ করেছি, অহরহ যাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামত আমরা ভোগ করে চলেছি, তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।

হাবীবে নাজ্জার এভাবে তাঁর জাতিকে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর কথার বর্ণনা-ভঙ্গি ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। নিজেকে নসিহত করার ভাষায় তিনি অন্যদেরকে নসিহত করেছেন।

ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতিম তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হাবীব নাজ্জার একটি গর্তের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। রাসূলগণের বিরুদ্ধে তাঁর জাতির ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে তিনি দ্রুত সেখানে হাজির হন এবং তাদেরকে এভাবে উপদেশ দান করেন। এর পাশাপাশি তাদের ভ্রান্ত নীতির সমালোচনা করেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, হাবীব যখন লোকদেরকে রাসূলগণের অনুসরণের আহ্বান জানান তখন লোকেরা তাঁকে পাকড়াও করে বাদশাহর নিকট নিয়ে যায়। বাদশাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি রাসূলগণের অনুসারী হয়েছ?' তখন তিনি বাদশাহর প্রশ্নের জবাবে বলেন– وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করব না, তবে কার ইবাদত করব'? অথচ আমাদের এবং তোমাদের সকলকেই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে'।

–[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৩৭]

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবী রাসূলগণের পর এমনি একটি দল রয়েছে, যাঁরা সত্যের সন্ধান লাভ করেন, তাঁদের রসনায় কালিমায়ে হক্ব উচ্চারিত হয়, তাঁরা নবী রাসূলগণের অনুসরণ করে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন, আখেরাতে নবী রাসূলগণের পরে যে মর্তবা রয়েছে, তা তাঁদেরকেই দান করা হবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-২৩, পৃষ্ঠা-৮৪]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা, মর্দে কামেল হাবীব নাজ্জার তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, শুধু তাই নয়; বরং আমাদের সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এমন অবস্থায় আমি কি করে তাঁর ইবাদত না করে থাকি! তাঁর নিকট থেকে বিমুখ হয়ে জড় পদার্থের সম্মুখে মাতা নত করব? মানবতার এমন অবমাননা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ.

'আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্য গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে কষ্ট দিতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজেই আসবে না, আর তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না'।

বস্তুত যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি দয়াময়, করুণাময় তাঁকে বাদ দিয়ে এমন অসহায়, অক্ষম জড় পদার্থকে উপাস্য মনে করব? যারা এত অসহায় যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কষ্ট দিতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারই করতে পারবে না, কেননা উপকার বা অপকার করার কোনো শক্তিই তাদের মধ্যে নেই, এমন অবস্থায় আমি যদি তাদের সম্মুখে মাথা নত করি তবে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হব। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ 'এমন অবস্থায় আমি স্পষ্টত পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হব'।

কোনো কোনো মুশরিক এ ধারণা পোষণ করে যে, এ মূর্তিরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করে তাদের পূজারীদের নাজাতের ব্যবস্থা করবে। পূর্ববর্তী আয়াতে এ ভুল ধারণার নিরসন করে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মূর্তিরা কোনো প্রকার সুপারিশ করতে পারবে না, যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে আজাব দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এ মূর্তিরা সুপারিশ করে কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না। প্রথমত সুপারিশ করারই তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না, দ্বিতীয়ত তাদের কোনো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, তৃতীয়ত তারা কোনো পূজারীকে বিপদ থেকে উদ্ধারও করতে পারবে না, এক কথায় এ মূর্তিরা তাদের পূজারীদের কোনো উপকার সাধনেই সক্ষম হবে না। এমন অবস্থায় এ অসহায় মূর্তিদের সম্মুখে মাথা নত করা পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ পথভ্রষ্টতাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট, কারো নিকট তা গোপন নয়।

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ. এরপর হাবীবে নাজ্জার সকলের সম্মুখে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, জেনে রাখ, নিশ্চয় আমি ঈমান এনেছি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমার এ কথা শুনে রাখ'।

এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. ঐ নেককার ব্যক্তি তাঁর জাতির ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে রসূলগণকে সাক্ষী করে বললেন, 'আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছি'।

দুই. অথবা, তিনি তাঁর পথভ্রষ্ট জাতিকে বললেন, 'তোমরা শুনে রাখ, তোমরা মান বা না মান, আমি তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছি, যিনি তোমাদের প্রতিপালক'। এভাবে তিনি তাঁর জাতিকে ঈমান আনয়নে অনুপ্রাণিত করলেন। আর পূর্বোক্ত অর্থে রাসূলগণকে তাঁর ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষী করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হাবীবে নাজ্জার একথাটুকু বলতে পেরেছিলেন, এরই মধ্যে দুরাত্মা কাফেররা তাঁকে প্রহার করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তাঁকে ধরাশায়ী করে পদদলিত করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, তাঁকে এত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় যে, তাঁর নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বের হয়ে গিয়েছিল।

আর তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, কাফেররা তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে, আর ঐ অবস্থায়ও তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হেদায়েত কর'।

Free @ www.e-ilmweebly.com

হাসান বসরী (র.) বলেছেন, তাঁর ঘাড় কর্তন করে শহরের ফটকের সম্মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর কবর এন্তাকিয়া শহরে রয়েছে

তাঁর শাহাদতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। ইরশাদ হয়েছে- قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ 'তাঁকে বলা হয়, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর'। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়ার সকল দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে নাজাত দিলেন এবং চিরশান্তির নীড় জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিলেন, জান্নাতের দ্বার তাঁর জন্যে উন্মুক্ত করা হলো, তাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো. জান্নাতের অনন্ত অসীম নিয়ামত এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে যে কথাটি উচ্চারিত হয়, তা হলো তাঁর জাতির জন্যে আক্ষেপ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ـ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ

সে বলে উঠল, 'হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারত, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং তিনি আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন'।

অর্থাৎ যে জাতি তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তাদের জন্যে তাঁর দরদের অন্ত ছিল না, তাই জান্নাতের নিয়ামত দেখে তিনি বলেছেন, 'যদি আমার জাতি জানত যে, কি কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে জান্নাতের এত অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, তাহলে তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনত এবং তাঁর রসূলগণের অনুসরণ করত'।

قَالُوْا طَائِرُكُمْ الخ -এর বিশদ ব্যাখ্যা : এন্তাকিয়াবাসীগণ রাসূলগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে বলল, তোমাদেরকে আমরা অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করছি। কারণ তোমাদের কারণেই আমাদের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমাদের মাঝে পরস্পর রক্তপাত ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে গেছে।

রাসূলগণ প্রতি উত্তরে বললেন, তোমাদের অশুভ ও অলক্ষুণ তোমাদের সাথেই জড়িয়ে রয়েছে। তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করাই তো তোমাদের বিপদ ও ক্ষতির কারণ। যদি তোমরা সত্য গ্রহণে ঐকমত্য হতে তবে এ ধরনের বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হতো না এবং এ দুর্ভিক্ষও দেখা দিত না। তোমরা পূর্বে যে পৌত্তলিকতার উপর ঐকমত্য ছিলে তা এমন ঐক্য যা স্বয়ং বিপর্যয় ও বিনাশ আর তা বর্জন করা অপরিহার্য। আর তখন দুর্ভিক্ষ দেখা না দেওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে সুযোগ প্রদান উদ্দেশ্য ছিল।

অথবা তা এজন্য ছিল যে, তাদের নিকট তখনো পর্যন্ত সত্য প্রকাশিত হয়নি। আর আল্লাহর বিধান হচ্ছে কারো নিকট সত্যকে পরিস্ফুট না করে তাদেরকে শাস্তি দেন না।

আর সেই সুযোগ প্রদান করা বা সত্য প্রকাশিত না হওয়াও তোমাদেরই গাফিলতি, মূর্খতা ও কর্মের কুফল ছিল। এর দ্বারা জানা যায় যে, দুর্ভাগ্য ও অকল্যাণের কারণ সর্বাবস্থায়ই তোমাদের কর্ম ছিল।

তোমরা কি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদানকেই দুর্ভাগ্য হিসেবে গণ্য করতে চাও? অথচ এটা হলো সৌভাগ্যের বুনিয়াদ। মূলত শরিয়তের বিরোধিতা করার কারণেই তোমাদের উপর দুর্ভোগ নেমে এসেছে। আর সকলের বিরোধিতার কারণে তোমরা এর কারণ নির্ণয়ে ভুল করে যাচ্ছ। মোট কথা হলো, তারা যে অজ্ঞ ও বিপথগামী ছিল তা তারা জানত না এবং জানার চেষ্টাও করত না। আর তাদের সীমা লঙ্ঘন ও সত্য গ্রহণ না করার এটাই মূল কারণ ছিল।

নববী দাওয়াত ও সংশোধন পদ্ধতি এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য বিশেষ হেদায়েত : এন্তাকিয়াবাসীদের নিকট প্রেরিত তিনজন দূত কাফিরদেরকে যেভাবে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের নির্যাতন, হুমকি ধমকি ও অপপ্রচারের যেভাবে জবাব দিয়েছেন; তদ্রূপ তাদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী হাবীবে নাজ্জার নিজের জাতিকে যেভাবে যুক্তির নিরীখে মিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করেছেন এতে দীনের দায়ীদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

রাসূলদের তাবলীগের জবাবে মুশরিকরা তিনটি বক্তব্য দিয়েছে।

১. তোমরা আমাদের মতোই মানুষ! আমরা তোমাদের আনুগত্য কেন করব?

২. মহান রাব্বুল আলামীন কারো উপর কোনো বিধান বা কোনো কিতাব অবতীর্ণ করেননি।

৩. তোমরা তো পূর্ণরূপেই মিথ্যুক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রাসূলগণের নিঃস্বার্থ উপদেশের জবাবে তারা যে ধৃষ্টতাপূর্ণ উত্তর প্রদান করল এরপরও তাঁরা ক নরম সূরে বললেন– رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক জানেন নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকটই প্রেরিত হয়েছি। আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আমরা নিরলসভাবে পালন করেছি। তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে খোদায়ী বিধান পৌঁছে দিয়েছি। মান্য করা না করা তোমাদের দায়িত্ব। তিরস্কারের কোনো পরোয়া নেই। কি স্নেহ মমতাপূর্ণ জবাব!

তখন এন্তাকিয়াবাসীগণ আরো দাম্ভিকতার সাথে বলল, তোমরা হতভাগা, অলক্ষুণে। তোমাদের কারণেই আজ আমরা মসিবতে নিপতিত। তোমাদের কারণেই আজ মহা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এত ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার পরও রাসূলগণ কতইনা ধৈর্যের সাথে এজমালীভাবে যা বললেন তাতে তাদের অলুক্ষণে হওয়াকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তারা বললেন– طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুর্ভোগ তোমাদের সাথেই রয়েছে। এরপর রাসূলগণ আরো একধাপ এগিয়ে দরদসহ বললেন যে, তোমরা ভেবে দেখ আমরা তোমাদের এমন কি ক্ষতি করেছি। আমরা তো শুধুমাত্র তোমাদেরকে কল্যাণ ও মুক্তির উপদেশ দিচ্ছি মাত্র। তাদের কথার মধ্যে শুধু এতটুকুই রুষ্ট কথা বলা হয়েছে যে, তোমরা তো কেবল সীমালঙ্ঘনকারী।

হাবীবে নাজ্জারের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য : রাসূলগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপনকারী হাবীবে নাজ্জার রাসূলগণের উপর নির্যাতনের খবর জানতে পেরে শহরের সীমান্ত হতে ছুটে এসে স্বীয় জাতিকে অত্যন্ত হিকমতের সাথে দু'টি উপদেশ প্রদান করলেন।

১. তোমরা ভেবে দেখ এ রাসূলগণ বহুদূর দূরান্ত থেকে তোমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য এসেছেন। অথচ তারা তোমাদের নিকট কোনোরূপ বিনিময়ও চান না।

২. তারা যে বক্তব্য প্রদান করছেন তা সম্পূর্ণরূপে ইনসাফ ও হেদায়েতপূর্ণ কথা।

এরপর তিনি স্বীয় জাতিকে তাদের বিশ্বাস জনিত ভুল-ত্রুটিগুলোকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, তোমরা তোমাদের মহান প্রভু আল্লাহকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া প্রতিমা পূজায় লিপ্ত রয়েছ। তোমরা তাদেরকে তোমাদের ত্রাণকর্তা মনে করছ। এটাতো নিরেট মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা নিজেদেরই কোনো ভালো মন্দ করতে পারে না এবং তারা আল্লাহর সমীপে সুপারিশ করতেও সক্ষম হবে না। তারা কি করে সুপারিশ করবে? তারা নিজেরাই তো সেদিন আসামীর কাঠগড়ায় উপস্থিত হবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে হাবীবে নাজ্জার এসব কথা বলার পর নিজেকে লক্ষ্য করে বললেন, এত কিছুর পরেও যদি আমি স্বীয় প্রতিপালকের উপাসনা না করি, তবে তো নিশ্চিতভাবেই আমি গভীর গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছি।

এত কিছুর পরও যখন তার সম্প্রদায় তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো, তখন বদদোয়া না দিয়ে তিনি বললেন– رَبِّ اهْدِ قَوْمِيْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জাতিকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বজাতির এ সীমাহীন নির্যাতনের স্বীকার হয়ে শাহাদাত প্রাপ্ত লোকটি যখন সম্মান, পুরস্কার ও জান্নাতের অসীম নিয়ামত দেখতে পেলেন তখন তাঁর জালিম সম্প্রদায়ের কথা মনে করে অধীর হয়ে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা যদি আমার প্রাপ্ত পুরস্কার ও নিয়ামত দেখতে, পেতে এর কথা জানতে তবে নিশ্চিতই গোমরাহী ছেড়ে দিয়ে ঈমান গ্রহণ করত আমার এ প্রাপ্ত নিয়ামতে শরিক হতো।

সুবহানাল্লাহ্! কত আশ্চর্যের বিষয়, হাজারো অত্যাচারে পরও তার সম্প্রদায়ের হিতাকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে কত বদ্ধমূল ছিল! এটা এমন বস্তু যা সম্প্রদায়ের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। কুফর ও পথভ্রষ্টতা হতে বের করত সম্প্রদায়কে এমন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যার কারণে ফেরেশতাগণও তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল।

শেষ কথা হলো, বর্তমানের দায়ী ও মুবাল্লিগণ যদি এভাবে ধৈর্যের সাথে দীনের কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন, তবে আজও পৃথিবীতে দীনের প্রসার তেমনিভাবে হবে। যেমনিভাবে নবী রাসূলগণের যুগে হয়েছিল। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সে দলের পথে চলার তৌফিক দান কর। আমীন।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ-এর মধ্যে رَجُلٌ-কে নাকেরা নেওয়ার কারণ : দুটি কারণে আয়াতে رَجُلٌ শব্দটিকে নাকেরা নেওয়া হয়েছে।

১. رَجُلٌ শব্দটিকে নাকেরা নেওয়ার মাধ্যমে লোকটির সম্মান ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

২. লোকটি রাসূলগণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিল না এবং এ কাজের জন্য তাকে পূর্ব হতে নিযুক্তও করে রাখা হয়নি।

اَلْجُزْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُوْنَ : তেইশতম পারা

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٢. فَقَالَ وَمَا لِىَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ خَلَقَنِىْ اَىْ لَا مَانِعَ لِىْ مِنْ عِبَادَتِهِ الْمَوْجُوْدُ مُقْتَضِيْهَا وَاَنْتُمْ كَذٰلِكَ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُجَازِيْكُمْ كَغَيْرِكُمْ .

২২. তদুত্তরে তিনি বললেন, আমার কি হলো যে, যে সত্তা আমায় সৃষ্টি করলেন আমি তার উপাসনা করি না ; আমাকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ আমার সম্মুখে তার ইবাদত করার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধক নেই; বরং ইবাদত করার যৌক্তিকতা প্রমাণকারী বস্তুসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। আর তোমাদেরও একই অবস্থা। আর তারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে মৃত্যুর পর। অতঃপর অন্যান্যদের ন্যায় তোমাদেরকেও প্রতিদান দেওয়া হবে।

٢٣. ءَاَتَّخِذُ فِى الْهَمْزَتَيْنِ مِنْهُ مَا تَقَدَّمَ فِىْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ وَهُوَ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْىِ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَىْ غَيْرِهٖٓ اٰلِهَةً اَصْنَامًا اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ الَّتِىْ زَعَمْتُمُوْهَا شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنَ صِفَةُ اٰلِهَةٍ .

২৩. আমি কি গ্রহণ করবো? এখানে পূর্বে বর্ণিত ءَاَنْذَرْتَهُمْ -এর ন্যায় কেরাতগুলো প্রযোজ্য হবে। আর এটা اِسْتِفْهَام যা نَفِىْ- এর অর্থে হয়েছে। তিনি ব্যতীত অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে দেবতাগুলোকে যদি দয়াময় আল্লাহ আমার ক্ষতিসাধন করতে চান তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনোই উপকারে আসবে না। যার ধারণা তোমরা করছ। কোনো কিছুই আর তারা আমায় রক্ষা করতেও সক্ষম হবে না। এটা اٰلِهَةً শব্দের সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٤. اِنِّىْٓ اِذًا اِنْ عَبَدْتُ غَيْرَ اللّٰهِ لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ .

২৪. এমতাবস্থায় আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি তবে সুনিশ্চিত বিভ্রান্তিতে পতিত হবো। প্রকাশ্য গোমরাহী।

٢٥. اِنِّىْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ اَىْ اِسْمَعُوْا قَوْلِىْ فَرَجَمُوْهُ فَمَاتَ .

২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। কাজেই আমার কথা শোনো! তোমরা আমার কথা শ্রবণ করে তা মান্য করো। কিন্তু তারা সকলেই তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করল, ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

٢٦. قِيْلَ لَهٗ عِنْدَ مَوْتِهٖ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط وَقِيْلَ دَخَلَهَا حَيًّا قَالَ يَا حَرْفُ تَنْبِيْهٍ لَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ .

২৬. বলা হলো তাকে তার মৃত্যুর সময় তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো কারো মতে তিনি জীবিতাবস্থায়ই জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। তিনি বললেন হায়! হরফে তাম্বীহ্ আফসোস যদি আমার সম্প্রদায় জানত!

٢٧. بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ بِغُفْرَانِهٖ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ .

২৭. কি কারণে আমার প্রতিপালক আমায় ক্ষমা করলেন তাঁর করুণা ও ক্ষমা সম্পর্কে এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৮. وَمَا نَافِيَةٌ أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ اَىْ حَبِيْبٍ مِنْ بَعْدِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ اَىْ مَلَائِكَةٍ لِاِهْلَاكِهِمْ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ مَلَائِكَةً لِاِهْلَاكِ اَحَدٍ ـ

২৮. আর আমি অবতীর্ণ করিনি এখানে مَا টি নেতিবাচক তার সম্প্রদায়ের উপর অর্থাৎ হাবীবে নাজ্জারের সম্প্রদায়ের উপর তার পরে তার মৃত্যুর পর আকাশ হতে কোনো সৈন্য ফেরেশতাদেরকে তাদের ধ্বংস করার জন্য আর আমার প্রেরণ করার প্রয়োজনও ছিল না। ফেরেশতাদেরকে কাউকেও ধ্বংস করার জন্য।

২৯. اِنْ مَا كَانَتْ عُقُوْبَتُهُمْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً صَاحَ بِهِمْ جِبْرَئِيْلُ فَاِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ سَاكِتُوْنَ مَيِّتُوْنَ ـ

২৯. এটাতো ছিল তাদের শাস্তি এতদ্ভিন্ন ছিল না اِنْ টি নেতিবাচক। একটিমাত্র বিকট আওয়াজ যা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের উপর একটি বিকট আওয়াজ দিয়েছিলেন। ফলে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল নিস্তব্ধ ও মৃত হয়ে গেল।

তাহকীক ও তারকীব

আল্লাহ তা'আলার বাণী أَأَتَّخِذُ -এর বিভিন্ন কেরাত : أَأَتَّخِذُ -এর উভয় হামযা পড়ার ক্ষেত্রে ৬টি কেরাত রয়েছে।

১. উভয় হামযকে অপরিবর্তিত রেখে পড়া।

২. দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفْ -এর রূপ ধারণ করবে।

৩. দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল করে পড়া হবে।

৪. দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল করে উভয় হামযার মাঝে একটি اَلِفْ বাড়িয়ে পড়া।

৫. উভয় হামযাকে অপরিবর্তিত রেখে মাঝে একটি اَلِفْ বাড়িয়ে পড়া।

৬. উভয় হামযাকে উচ্চারণ না করে পূর্বের تُرْجَعُوْنَ -এর সাথে যুক্ত করে পড়া।

اِنْ يُّرِدْنِ الخ -এর মধ্যস্থ বিভিন্ন কেরাত : اِنْ يُّرِدْنِ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. يَاءِ مُتَكَلِّمْ -কে উহ্য রেখে اِنْ يُّرِدْنِ পাঠ করা।

২. يَاءِ مُتَكَلِّمْ -কে উল্লেখ করে اِنْ يُّرِدْنِىْ পাঠ করা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী صَيْحَةً -এর বিভিন্ন কেরাত : উল্লেখ্য যে صَيْحَةً -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে–

১. صَيْحَةً -কে মানসূব হিসেবে পড়া। ২. صَيْحَةٌ -কে মারফূ' হিসেবে পড়া।

وَلَا يُنْقِذُوْنَ -এর مَعْطُوْف কোনটি? : পবিত্র কুরআনের আয়াত لَا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنَ -এর মধ্যস্থ وَلَا يُنْقِذُوْنَ টি لَا تُغْنِ عَنِّىْ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর পূর্ণ বাক্যটি মা'তূফ আলাইহি মা'তূফ মিলে جَزَاء হচ্ছে اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ -এর। কাজেই শব্দটি لَا يُنْقِذُوْنَ হবে যা মূলত لَا يُنْقِذُوْنَ ছিল جَمْع -এর نُوْن এবং يَاءِ مُتَكَلِّمْ পড়ে গেছে। বর্তমান অবস্থিত نُوْن টি হচ্ছে নূনে বিকায়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُوْنَ-এর তারকীব : এখানে يَا টি হলো حَرْف نِدَاء আর لَيْتَ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। আর إِسْم মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে إِسْمُ لَيْتَ আর يَعْلَمُوْنَ হলো خَبَر لَيْتَ এখন لَيْتَ তার إِسْم এবং خَبَر -কে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়ে মুনাদা। নেদা মুনাদা মিলে জুমলায়ে নেদাইয়্যাহ হয়েছে। আর এর জওয়াবে নেদা উহ্য রয়েছে তা হলো- يَكُوْنَ حَسَنًا

بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ-এর মুতা'আল্লাক : بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ এখানে جَارّ এবং مَجْرُوْر মিলে يَعْلَمُوْنَ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। এরপর يَعْلَمُوْنَ-এর যমীর হলো ফায়েল। এখন ফে'ল ফায়েল ও مُتَعَلِّقْ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইবাদতের অর্থ ও আবিদের শ্রেণিবিভাগ : اَلْعِبَادَةُ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- غَايَةُ التَّذَلُّلِ তথা চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়া।

اَلْعِبَادَةُ-এর **পারিভাষিক অর্থ-** ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় মানব জীবনে আল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণ আনুগত্য করাকে ইবাদত বলে।

মনীষীগণ আবিদকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন-

- প্রথম শ্রেণির আবিদ হচ্ছেন- যারা শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই তাঁর ইবাদত করে না; বরং আল্লাহ তা'আলাকে তাদের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিক মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদত করেন। চাই তিনি তাঁদেরকে পুরস্কার দেন বা শাস্তি প্রদান করেন। এ দলটিকে এমন ভৃত্যের সাথে তুলনা করা যায় যে সর্বাবস্থায় মনিবের আনুগত্য করে; মনিব তার সাথে ভালো ব্যবহার করুক বা না করুক।
- দ্বিতীয় শ্রেণির আবিদ হচ্ছেন- যারা তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা প্রদানের কারণে তাঁর উপাসনা করেন।
- তৃতীয় শ্রেণির আবিদ হচ্ছেন- যারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর ইবাদত বন্দেগি করে।

এ আয়াতে হাবীবে নাজ্জারের উক্তি وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রথম শ্রেণির আবিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা তিনি আল্লাহকে তার স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিক জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত বন্দেগি করতেন।

-[তাফসীরে কাবীর]

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ **আয়াতের মর্মার্থ :** হাবীবে নাজ্জার আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শালীনতাপূর্ণ পদ্ধতিতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত আল্লাহ তা'আলা এটাকে প্রতীয়মান করত অবশেষে সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এটাকে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়টিকে নিজের দিকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, আল্লাহ আমায় সৃষ্টি করলেন তাঁর ইবাদত করতে আমার কি করে আপত্তি থাকতে পারে? এখানে ওজর করার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। কারণ সৃষ্টি করেছেন যিনি ইবাদতও পাবেন তিনি। তাই তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদত পেতে পারে না। কথাটিকে তিনি নিজের দিকে সম্বোধন করলেও সম্প্রদায়ের সকলকে যে এ একই পথ গ্রহণ করতে হবে তা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন।

এ ছাড়াও তিনি আয়াতটির শেষাংশে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের এ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের ভেবে দেখা দরকার যে মৃত্যুর পর তোমাদের মহা প্রভু আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন। কাজেই তোমাদের তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর রাসূলগণের আনুগত্য করা উচিত। তার এ পদ্ধতিতে দাওয়াত পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- যাতে বিরোধীরা উত্তেজিত হয়ে না পড়ে এবং তারা উত্থাপিত বিষয়ে যেন ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَأَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً -এর মধ্যে প্রশ্নাকারে বক্তব্য উত্থাপনের কারণ কি? উল্লিখিত আয়াতে হাবীবে নাজ্জারের প্রশ্নাকারে বক্তব্য উপস্থাপনের কারণ হচ্ছে– যদি প্রশ্ন না করে তিনি সোজা বলতেন যে لا اتخذ الخ অর্থাৎ আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বানাব না, তবে প্রশ্ন করার অবকাশ থেকে যেত– কেন বানাবে না? এখন তার ব্যবহৃত পদ্ধতিতে বিরোধীদের পক্ষ হতে পুনরায় প্রশ্ন উত্থাপনের কোনোই অবকাশ রইল না।

সারকথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে হাবীবে নাজ্জারের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি বিনে কেউ ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে না।

اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : বাতিল মাবুদদের অসারতার কথা বর্ণনা করে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মোটেই সেসব দেবদেবীর অর্চনা করা সমীচীন নয় যারা আল্লাহর নিকট কোনো অপরাধীর ব্যাপারে সুপারিশ করে তাকে মুক্ত করতে পারে না। অথবা তার এমন কোনো ক্ষমতাও নেই যার ফলে সে তাকে নিষ্কৃতি পাইয়ে দিবে। এরা না কারো উপকার করতে পারে না কারো অপকার সাধন করতে পারে। কাজেই এদের উপাসনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়ে চরম বোকামি আর কি হতে পারে?

আয়াতে اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّىْ না বলে بِرَبِّكُمْ কেন বললেন? আয়াতে দু'টি কারণে بِرَبِّىْ না বলে بِرَبِّكُمْ বলা হয়েছে।

✪ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِظْهَار حَقِيْقَتْ তথা বাস্তব বিষয়ের প্রকাশ করা। যদিও তারা তা সমর্থন করে না।

✪ হাবীবে নাজ্জার উক্ত বক্তব্যের দ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন যে, যে আল্লাহর প্রতি আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান করছি তিনি যেরূপে আমার প্রতিপালক অনুরূপভাবে তোমাদেরও প্রতিপালক। কাজেই তোমাদেরও আমার ন্যায় তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। দাওয়াতি পদ্ধতির এটা একটি বিশেষ কৌশল।

আয়াতে فَاسْمَعُوْنِ বলে কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ আয়াতে কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ হতে একাধিক মতামত রয়েছে।

✪ কতিপয় তাফসীরকারকের মতে, অত্র আয়াত দ্বারা রাসূলগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। যখন হাবীবে নাজ্জার দেখল যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা তার উপদেশ বাণী গ্রহণ তো দূরের কথা উল্টো তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তখন তিনি রাসূলগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনারা শুনে রাখুন! আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তার একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– রাসূলগণ যেন দরবারে ইলাহীতে তার ঈমান আনয়নের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

✪ কারো কারো মতে, এ আয়াতে হাবীবে নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন। তিনি তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি এ কারণে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। হাবীবে নাজ্জার যখন নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে, তার স্বজাতি তাকে হত্যা করবেই তখন তিনি তাঁর ঈমান গ্রহণের কথা সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। –[মা'আরিফ, ইবনে কাছীর, কাবীর]

হাবীবে নাজ্জারকে কখন বলা হলো যে, 'তুমি বেহেশতে প্রবেশ করো'? হাবীবে নাজ্জারকে কখন বলা হয়েছিল যে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ করো? এ নিয়ে মুফাসসিরগণের অভিমত নিম্নরূপ–

✪ জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলার অর্থ হলো তাকে সুসংবাদ দেওয়া যে, তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে, যথা সময়ে তা প্রাপ্ত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অথবা এমনও হতে পারে যে, মৃত্যুর পরপরই তার স্থান বেহেশতে দেখানো হয়েছে। এছাড়া আলমে বরযখে জান্নাতীগণ জান্নাতের আপ্যায়ন পেয়ে থাকেন। কাজেই তার বরযখে পৌঁছা এক হিসেবে জান্নাতে পৌঁছারই নামান্তর।

এ আয়াতে اُدْخُلِ الْجَنَّةَ [অর্থাৎ, 'জান্নাতে প্রবেশ কর' উক্তি দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, হাবীবে নাজ্জারকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ বেহেশতে প্রবেশ করা কিংবা জান্নাতের আলামত পরিলক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র মৃত্যুর পরেই হওয়া সম্ভব।

- কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, জীবিত অবস্থায়ই হাবীবে নাজ্জারকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে শহীদ করতে দৃঢ় মনস্থ হলো তখন দয়াময় আল্লাহ তাকে নিজ কুদরতে জান্নাতে উঠিয়ে নিলেন।

قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ আয়াতে আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে মুফাসসিরগণের অভিমত : يَا لَيْتَ قَوْمِىْ আয়াতে تَمَنِّىْ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে—

১. আফসোস করে হাবীবে নাজ্জার বলেছেন— يَا لَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ "হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত"। তার এ হায় বা আকাঙ্ক্ষাসূচক শব্দের অর্থ হলো— তিনি চেয়েছেন যে তাঁর জাতি তার এ শুভ পরিণতির কথা তথা জান্নাতে প্রবেশ ও অফুরন্ত মর্যাদা লাভের কথা যদি জানতো, তারা তার সৎ ইচ্ছা ও সৎ আকাঙ্ক্ষার কথা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরে লজ্জিত হতো।

২. কতিপয় তাফসীর কারকের মতে হাবীবে নাজ্জারের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার জাতি তার অবস্থা সম্পর্কে জেনে নিক যাতে তারা তাঁর মতোই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাদের অবস্থাকেও অনুরূপ বানিয়ে নেয় এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে যেন তারা প্রবেশ করতে পারে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

আল্লাহর বাণী بِمَا غَفَرَلِىْ-এর মধ্যস্থ مَا-এর অর্থ : আলোচ্য আয়াতে مَا-এর অর্থের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

- একদল মুফাসসিরের মতে, উক্ত مَا মাসদারের অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে— আমার প্রভুর আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া।
- কারো কারো মতে, এখানে مَا টি মওসূলের অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ দাড়ায় بِالَّذِىْ غَفَرَهُ لِىْ رَبِّىْ অর্থাৎ সেই বস্তুর বদৌলতে আমার প্রভু আমায় ক্ষমা করেছেন।
- ফাররা নাহবীর মতে, এখানে مَا টি اِسْتِفْهَامْ-এর জন্য হয়ে تَعَجُّبْ-এর অর্থ প্রদান করেছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে— بِاَىِّ شَىْءٍ غَفَرَلِىْ رَبِّىْ কোন জিনিসের বিনিময়ে আমার প্রভু আমায় ক্ষমা করে দিলেন।

তবে নাহবী কেসায়ী ফাররার বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেছেন, নাহবী ফাররার বক্তব্য তখনই সঠিক হতো যদি بِمَا না হয়ে بِمَ হতো। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে مَا-এর সাথে اَلِفْ বহাল থেকেও তা ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে।

কিভাবে মৃত্যুর পর উল্লিখিত ব্যক্তি তার জাতির ব্যাপারে কথা বলল? যখন হাবীবে নাজ্জার তার সম্প্রদায়ের জন্য আফসোস করেন, তখন তিনি আলমে বরখে অবস্থান করছিলেন। এ আয়াত এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখে মানুষ মৃত থাকবে না। তথায় তার প্রয়োজনীয় অনুভূতি ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকবে। কেউ কেউ বলেন, তখন দেহ ব্যতীত তার রূহ জীবিত থাকে। আর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের অনুভূতি এবং পৃথিবীবাসীদের প্রতি তার আগ্রহও বিরাজমান থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِه -এর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক : পূর্ব বর্ণিত بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ -এর মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর এক মু'মিন বান্দার শুভ হাল ও প্রশংসনীয় মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তার বিপরীতে এ আয়াতে কাফের, মুশরিক ও খোদাদ্রোহীদের দূরবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনকে নিয়ে গবেষণা করলে আল্লাহ তা'আলার একটি চির সুদৃঢ় নীতি পরিলক্ষিত হয় যে, যেখানে তিনি বিশ্বাসীদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান করেছেন, তার সাথে সাথেই কাফেরদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা আরবি প্রবাদের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। প্রবাদটি হচ্ছে– وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ অর্থাৎ, কোনো বস্তুর পাশাপাশি তার বিপরীত বস্তুর উল্লেখকরণ দ্বারা তাকে স্পষ্ট করে তোলে।" যেমনিভাবে আলোকে বুঝার জন্য অন্ধকারের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তেমনিভাবে ঈমানকে সম্যক উপলব্ধির জন্য কুফরের ধারণা লাভ করা একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া লোকেরা যেন ঈমান গ্রহণ করার সাথে সাথে ঈমান না আনার কু-পরিণতি সম্পর্কেও যেন জানতে ও বুঝতে পারে।

وَمَا اَنْزَلْنَا আয়াতে ক্রিয়াকে আল্লাহর নিজের দিকে নিসবত করা ও قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ আয়াতে না করার কারণ : উল্লেখ যে, وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِه مِنْ بَعْدِه الخ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার اِنْزَال فِعْل -কে নিজের দিকে নিসবত করার কারণ হচ্ছে এটা শাস্তি প্রদানের ব্যাপার যা তার দিকে সম্পর্কিত হওয়াকে এবং فِعْل মা'রূফ ও قَوِىْ হওয়াকে কামনা করে। আর قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ আয়াতে ফি'লে মাজহূল দ্বারা উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– যাতে ফেরেশতার কথার দ্বারা সে কিছুটা হীন ও দুর্বল হয়। যখন প্রত্যেক ফেরেশতা ও সৎ ব্যক্তি তাকে দেখতে পায় যে, তাকে স্থায়ীভাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আর আয়াতটি সম্মানজনক প্রবেশের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِه الخ আয়াতে কওমকে رَجُلٌ -এর দিকে নিসবত করার হিকমত : মুফাসসিরীনে কেরাম উক্ত নিসবতের দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কওমকে হাবীবে নাজ্জারের প্রতি নিসবত করার মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা একই সম্প্রদায়ের একটি ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ঈমান আনয়নের কারণে কিরূপ মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন। অপর দিকে বিশ্বাস স্থাপন না করে পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত থাকার কারণে সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদেরকে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগে নিপতিত করেছেন। একই সম্প্রদায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও আদর্শের পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে কিরূপ আকাশ-পাতাল ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে।

২. অথবা, এর নিসবতকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– উক্ত আজাব ও শাস্তি হাবীবে নাজ্জারের কওমের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেহেতু রাসূলগণের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তাই তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হয়নি। এ কারণেই রাসূলগণের দিকে কওমকে ইযাফত না করে হাবীবে নাজ্জারের দিকে করা হয়েছে।

হাবীবে নাজ্জারের পরে তার জাতির উপর ঐশীবাহিনী প্রেরিত না হওয়াকে খাস করার কারণ? এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ হাবীবে নাজ্জারের তীরোধানের পর তার সম্প্রদায়ের উপর কোনো ঐশী বাহিনী প্রেরিত হয়নি। অথচ হাবীবে নাজ্জারের মৃত্যুর পূর্বেও তার জাতির প্রতি কোনো ঐশী বাহিনী প্রেরিত হয়নি। সুতরাং একটিকে নির্দিষ্ট করার কারণ কি?

এর কারণ হচ্ছে– আল্লাহ পাক কোনো সম্প্রদায়কে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তথায় রাসূল পাঠিয়ে প্রথমে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। যথা, আল্লাহ বলেন– وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا অর্থাৎ রাসূল পাঠিয়ে সতর্ক করার পূর্ব পর্যন্ত আমি কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করি না। আর এন্তাকিয়াবাসীর নিকট যেহেতু পূর্বে রাসূল পাঠানো হয়নি তাই তাদের প্রতি আজাব

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পাঠানোর প্রশ্নই উঠে না। আর এ কারণেই আজাব নাজিল হওয়ার আলোচনা করাও অবান্তর বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে যেহেতু হাবীবে নাজ্জারের পরে রাসূলগণও হাবীবে নাজ্জার তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। তাদেরকে বারবার বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন কিন্তু এরপরও তারা ঈমান আনেনি। এ কারণেই তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতির প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ কারণেই ঐশী বাহিনী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে হাবীবে নাজ্জারের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ঐশীবাহিনী পাঠানোর হিকমত ও বিশেষ ঘটনার সাথে এটা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ : কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ অনেক সময় মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে ঐশীবাহিনী প্রেরণ করেছেন। আবার কখনো বাহিনী প্রেরণ না করে অন্যভাবে মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছেন এর মূল হেতু কি? বিভিন্নভাবে এর জবাব প্রদান করা যেতে পারে।

- মহান রাব্বুল আলামীন কাফির মুশরিকদেরকে কোথায় কোন পদ্ধতিতে শায়েস্তা করবেন এটা পূর্ণরূপে তারই ইচ্ছাধীন। তিনিই সকল ক্ষমতার আধার। যে কোনো স্থানে যে কোনোভাবে তিনি অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারেন। কাজেই শাস্তি বিধানে বৈচিত্র্য পন্থা অবলম্বনের কারণেই বিভিন্ন সময় কাফির মুশরিকদেরকে বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করেছেন।
- যেখানে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মু'মিনের দল বিদ্যমান ছিল তথায় তাদের সাহায্যার্থে ঐশী বাহিনী প্রেরণ করেছেন। আর যেখানে এমন দল ছিল না সেখানে অন্যভাবে শাস্তি অবতীর্ণ করে বেঈমানদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

হাবীবে নাজ্জারের জাতিকে বিকট শব্দে ধ্বংস করা এবং বদর খন্দক ও অপরাপর যুদ্ধে ফেরেশতা অবতীর্ণ করে মুশরিকদের ধ্বংস করার হিকমত : কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ অনেক সময় মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে ঐশীবাহিনী প্রেরণ করেছেন। আবার কখনো বাহিনী প্রেরণ না করে অন্যভাবে মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছেন এর মূল হেতু কি? বিভিন্নভাবে এর জবাব প্রদান করা যেতে পারে।

- এটা আল্লাহর খেয়াল-খুশির উপর নির্ভরশীল এবং প্রশ্নাতীত ব্যাপার।
- ঐশীবাহিনীর মাধ্যমে সাহায্য করা মহানবী ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ বহন করে।
- হাবীবে নাজ্জারের সময় কাফেরদের মোকাবিলা করার জন্য কোনো বাহিনী ছিল না বিধায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বিকট শব্দ ধ্বনি দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٠. يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج هٰؤُلَاءِ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَاُهْلِكُوْا وَهِيَ شِدَّةُ التَّأَلُّمِ وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ اَيْ هٰذَا اَوَانُكِ فَاحْضُرِيْ مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ مَسُوْقٌ لِبَيَانِ سَبَبِهَا لِاشْتِمَالِهٖ عَلٰى اِسْتِهْزَائِهِمُ الْمُؤَدِّيْ اِلٰى اِهْلَاكِهِمُ الْمُسَبَّبِ عَنْهُ الْحَسْرَةُ.

অনুবাদ :

৩০. বান্দাদের জন্য পরিতাপ সেসব লোক ও তাদের ন্যায় অনুরূপ সবার প্রতি যারা রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তা হলো কঠোর যন্ত্রণা। আর তার পূর্বে নেদা প্রবিষ্ট হওয়া রূপক হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ হে পরিতাপ! এটা তোমার উপস্থিত হওয়ার সময়। সুতরাং তুমি উপস্থিত হয়ে যাও। তাদের নিকট কোনো রাসূল আগমন করা মাত্রই তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত এ বাক্য দ্বারা তাদের উপর আফসোস করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা অত্র বাক্যে রাসূলের প্রতি তাদের বিদ্রূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে পৌঁছে দিয়েছে। আর সে ধ্বংস তাদের প্রতি পরিতাপ ও আক্ষেপের কারণ হয়েছে।

٣١. اَلَمْ يَرَوْا اَيْ اَهْلُ مَكَّةَ الْقَائِلُوْنَ لِلنَّبِيِّ لَسْتَ مُرْسَلًا وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ اَيْ عَلِمُوْا كَمْ خَبَرِيَّةٌ بِمَعْنٰى كَثِيْرًا، مَعْمُوْلَةٌ لِمَا بَعْدَهَا، مُعَلِّقَةٌ لِمَا قَبْلَهَا عَنِ الْعَمَلِ وَالْمَعْنٰى اَنَّا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرُوْنِ الْاُمَمِ اَنَّهُمْ اَيِ الْمُهْلَكِيْنَ اِلَيْهِمْ اَيِ الْمَكِّيِّيْنَ لَا يَرْجِعُوْنَ اَفَلَا يَعْتَبِرُوْنَ بِهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهٗ بِرِعَايَةِ الْمَعْنَى الْمَذْكُوْرِ.

৩১. তারা কি দেখেনি অর্থাৎ মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল তুমি রাসূল নও। আর বক্তব্যকে সাব্যস্ত করার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা জেনেছে। কত এখানে كَمْ টি খবরিয়া অর্থ– অনেক। এটা তৎপরবর্তী শব্দের মা'মূল। এটার পূর্ববর্তী শব্দকে আমল হতে বারণকারী। আর এর অর্থ হলো– আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি অনেক যুগকে অর্থাৎ জাতিকে যে তারা অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তরা তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট ফিরে আসবে না। তারা কি তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। اَنَّهُمْ الخ। বাক্যটি উল্লিখিত অর্থের দিক বিবেচনায় তার পূর্ববর্তী বাক্য হতে بَدَلْ হয়েছে।

٣٢. وَاِنْ نَافِيَةٌ اَوْ مُخَفَّفَةٌ كُلٌّ اَيْ كُلُّ الْخَلَائِقِ مُبْتَدَأٌ لَمَّا بِالتَّشْدِيْدِ بِمَعْنٰى اِلَّا وَبِالتَّخْفِيْفِ فَاللَّامُ فَارِقَةٌ وَمَا مَزِيْدَةٌ جَمِيْعٌ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ اَيْ مَجْمُوْعُوْنَ لَدَيْنَا عِنْدَنَا فِي الْمَوْقِفِ بَعْدَ بَعْثِهِمْ مُحْضَرُوْنَ لِلْحِسَابِ خَبَرٌ ثَانٍ.

৩২. আর নয় এখানে নেতিবাচক অথবা তাশদীদবিহীন করা হয়েছে। তারা সকলেই অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি। এটা (كُلٌّ) মুবতাদা, তবে (এখানে لَمَّا) তাশদীদযুক্ত। এটা اِلَّا -এর অর্থে হয়েছে। অথবা তাশদীদ ছাড়া। এমতাবস্থায় لَامْ পার্থক্যকারী আর مَا হবে অতিরিক্ত। সকলেই এটা মুবতাদার খবর হয়েছে। অর্থাৎ সকলে একযোগে আমার নিকট আমার কাছে তাদের পুনরুত্থানের পর হাশরের মাঠে হাজির করা হবে হিসাব-নিকাশের নিমিত্তে এটা দ্বিতীয় খবর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

مَا يَأْتِيْ -এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে مِنْ টি অতিরিক্ত। কাজেই মূল বাক্যটি হবে- مَا يَأْتِيْهِمْ رَسُوْلٌ এখানে مِنْ رَسُوْلٍ -মিন রাসূল হলো ফি'ল هُمْ হলো মাফউল رَسُوْلٍ হলো ফায়িল। আর ফায়িল হওয়ার কারণে رَسُوْلٍ শব্দটি মহল্লান মারফূ' হবে। যদিও مِنْ -এর কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাজরূর হয়েছে।

كَمْ -এর মহল্লে ই'রাব : اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا বাক্যে كَمْ শব্দটি দু' হিসেবে মানসূব হবে।

১. اَلَمْ يَرَوْا ফি'লের মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। তখন كَمْ অর্থ كَثْرَتْ হবে। বাক্যটি এরূপ হবে- اَلَمْ يَرَوْا كَثْرَةً اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ

২. كَمْ শব্দটি اَهْلَكْنَا ফি'লের মাফউল হিসেবেও মানসূব হতে পারে। তখন বাক্যটি হবে- اَلَمْ يَرَوْا اَهْلَكْنَا كَثِيْرًا مِنَ الْقُرُوْنِ

قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ -এ বর্ণিত তিনটি যমীরের মারজি' : এ আয়াতে قَبْلَهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْمَوْجُوْدُوْنَ আর اَنَّهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْمُهْلَكُوْنَ এবং اِلَيْهِمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْمَوْجُوْدُوْنَ পূর্ণ বাক্যটি নিম্নরূপ হবে- اَلَمْ يَرَوْا الْمَوْجُوْدُوْنَ اَنَّا اَهْلَكْنَا كَثِيْرًا مِنَ الْاُمَمِ قَبْلَ الْمَوْجُوْدِيْنَ اَنَّ الْمُهْلَكِيْنَ اِلَى الْمَوْجُوْدِيْنَ لَايَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ বর্তমান লোকেরা কি অবগত নয় যে, তাদের পূর্বে খোদাদ্রোহীতার কারণে বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। সে ধ্বংসপ্রাপ্তরা বর্তমান জীবিতদের নিকট ফিরে আসবে না।

اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ -এর তারকীব : এখানে اَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফি'ল আর هُمْ হলো এর ইসম। اِلَى হরফে জার هُمْ মাজরূর। জার মাজরূর মিলে لَايَرْجِعُوْنَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। لَايَرْجِعُوْنَ ফি'ল ও ফায়িল ও مُتَعَلِّقْ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে اَنَّ -এর خَبَرْ হয়েছে। এখন اَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো। তবে অর্থগত দিক হতে اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَايَرْجِعُوْنَ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য كَمْ اَهْلَكْنَا الخ বাক্য হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ায় مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

جَمِيْعٌ এবং مُحْضَرُوْنَ -এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে جَمِيْعٌ এবং مُحْضَرُوْنَ উভয়টি كُلٌّ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে মহল্লান মারফূ' হয়েছে।

বাক্যটির তারকীব হবে- اِنْ হরফে মুশাব্বাহ্ বিল ফি'ল, এর ইসম হলো উহ্য ، যমীর। كُلٌّ হলো মুবতাদা جَمِيْعٌ হলো প্রথম খবর। আর لَدَيْنَا যরফ, মুতা'আল্লিক হয়েছে مُحْضَرُوْنَ -এর সাথে। مُحْضَرُوْنَ টি তার যরফ মুতা'আল্লিক নিয়ে দ্বিতীয় খবর। মুবতাদা তার উভয় খবরকে নিয়ে خَبَرِ اِنْ হলো। اِنْ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

وَاِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيْعٌ الخ -এর মধ্যস্থ اِنْ -এর তাহকীক : এখানে اِنْ -এর ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে-

১. اِنْ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফি'ল। এর তাশদীদকে ফেলে দিয়ে তাখফীফ করা হয়েছে। আর তখন ، উহ্য যমীর-এর ইসিম হবে। لَمَّا তাখফীফের সাথে لَامْ উক্ত اِنْ -কে নেতিবাচক اِنْ হতে পৃথক করবে। مَا হবে অতিরিক্ত। আর অবশিষ্ট বাক্যটি اِنْ -এর খবর হবে। আয়াতের অর্থ হবে- আর নিশ্চয় তাদের সকলকে একযোগে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

২. اِنْ টি নেতিবাচক বা نَافِيَه হবে। আর لَمَّا তাশদীদ যুক্ত হবে, আর اِلَّا -এর অর্থে হবে। মূল আয়াতটি এরূপ হবে- مَا كُلٌّ اِلَّا جَمِيْعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ অর্থ- তাদের সকলকেই আমার নিকট সম্মিলিতভাবে উপস্থিত করা হবে।

সারকথা হলো উভয় অবস্থায় আয়াতের মূল ভাবের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَسْرَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اَلْحَسْرَةُ فِي اللُّغَةِ اَشَدُّ التَّلَهُّفِ عَلَى الشَّيْءِ الْفَائِتِ অর্থাৎ অভিধানে হারানো বস্তুর উপর কঠোর মানসিক যন্ত্রণাকে حَسْرَةٌ বা আফসোস বলা হয়।

কেউ কেউ বলেছেন- اَنْ يَلْحَقَ اِنْسَانٌ مِنَ النَّدَمِ مَا يَصِيْرُ بِهِ حَسْرًا। অর্থাৎ মানুষ এরূপ লাঞ্ছিত হওয়া যার ফলে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়।

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ الخ-এর মধ্যে আক্ষেপকারী কে? يَا حَسْرَةً عَلَى الخ আয়াতে আক্ষেপকারীকে এ নিয়ে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়।

- হযরত যাহ্হাক (র.) -এর মতে, এ আয়াতে পরিতাপকারী হচ্ছে ফেরেশতাগণ। অর্থাৎ কাফেররা যখন রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল তখন ফেরেশতাগণ আক্ষেপ করে উক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন।
- কতিপয় মুফাসসিরের মতে আক্ষেপকারী হলেন রাসূলগণ। অর্থাৎ এন্তাকিয়াবাসী যখন হাবীবে নাজ্জারকে হত্যা করল ফলে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসল, তখন রাসূল আক্ষেপ করে উক্ত কথা বললেন।
- কারো কারো মতে, হাবীবে নাজ্জার নিজেই স্বীয় জাতির ঔদ্ধত্য আচরণের উপর আফসোস করে উপরিউক্ত বক্তব্য দিয়েছেন।
- কারো কারো মতে, এন্তাকিয়াবাসীরা নিজেরাই আজাবে গ্রেফতার হওয়ার পর আক্ষেপ করেছে।
- ইমাম মুজাহিদ বলেন, হাবীবে নাজ্জারের জাতি ধ্বংসে নিমজ্জিত হওয়ার সময় উপরিউক্ত আফসোস করেছিল। আবুল আলিয়া হযরত আনাস (রা.) হতে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।
- বাস্তবিক পক্ষে কোনো আফসোসকারী ছিল না; বরং এটা আফসোসের উপযোগী সময় তা-ই বলা উদ্দেশ্য।
- কারো কারো মতে, স্বয়ং আল্লাহ হচ্ছেন আফসোসকারী। হাসি-বিদ্রূপ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ক্রিয়াকে যেভাবে আল্লাহর প্রতি সম্বোধন করা হয় রূপকভাবে, তদ্রূপ حَسْرَةً তথা আফসোসকেও রূপকার্থে আল্লাহর শানে প্রযোজ্য হবে।
- অথবা, বলা যেতে পারে যে, মহান রাব্বুল আলামীন حَسْرَةً-এর শুধুমাত্র সংবাদদাতা; নিজে আফসোসকারী নন।
- তাফসীরে খাযিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে কাফেরদের উপর আফসোস করে বলবেন- يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ হায় আফসোস! বান্দাদের উপর তাদের নিকট আগত সকল রাসূলের সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। ফলে আজ তারা ভয়ানক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হলো।

عِبَادٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে اَلْعِبَادِ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে-

- কারো কারো মতে, اَلْعِبَادِ দ্বারা এখানে হাবীবে নাজ্জারের জাতিকে বুঝানো হয়েছে।
- কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, اَلْعِبَادِ দ্বারা এন্তাকিয়া শহরে প্রেরীত তিনজন রাসূল উদ্দেশ্য। কাফেরদের উপর যখন বিভিন্ন প্রকার বালা-মসিবত আসতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় যেন তারা বলতে চাচ্ছিল- হায় আফসোস! তারা যদি আজ উপস্থিত থাকত তবে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতাম।
- العباد দ্বারা প্রত্যেক এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি কুফরি করেছে এবং কুফরিতে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর অহংকারে মত্ত হয়ে রাসূলগণকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

আফসোসের কারণ : এ আয়াতে আক্ষেপের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন– مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ অর্থাৎ সে বান্দাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হচ্ছে– তাদের নিকট যত রাসূলই আগমন করেছেন তারা সকলের সাথে উপহাস করেছে, অপমান করেছে, তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে তাদের উপর মহা শাস্তি নেমে এসেছে। তারা নিপতিত হয়েছে ধ্বংস লীলায়। আর তাদের জন্য তো পূর্ব হতেই আখিরাতে সীমাহীন দুর্গতি তো রয়েছেই।

এখানে মূলত পরোক্ষভাবে মক্কার কাফেরদেরকে হুশিয়ার করে দেওয়া উদ্দেশ্য। রাসূলগণের উপর মিথ্যারোপের ফলে যেমন এন্তাকিয়াবাসী সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে, ঠিক তদ্রূপ যদি মক্কার কাফির মহানবী ﷺ -কে মিথ্যারোপ করার উপর অটল থাকে, তবে তাদের ললাটেও সে চরম দুর্গতি অপেক্ষা করছে। আর এটাই আল্লাহর অমোঘ নীতি।

وَمَا يَأْتِيهِمْ الخ আয়াতে هُمْ যমীরের مَرْجِعْ : এ আয়াতে هُمْ-এর مَرْجِعْ সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. هُمْ-এর মারজি' হবে হাবীবে নাজ্জারের সম্প্রদায়। অর্থাৎ হাবীবে নাজ্জারের সম্প্রদায় এন্তাকিয়াবাসীদের নিকট আগত তিনজন রাসূলের সকলকেই তারা প্রত্যাখ্যান করল। সকলের সাথেই তারা বিদ্রূপ করল।

২. هُمْ-এর مَرْجِعْ হবে ব্যাপকভাবে সকল কাফির সম্প্রদায়। তখন অর্থ হবে– কাফেরদের নিকট যত রাসূলই এসেছেন তারা সকলের সাথেই বিদ্রূপে মেতে উঠেছে। কোনো নবী রাসূলই তাদের উপহাস হতে রেহাই পায়নি।

وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ আয়াতে কাফেরদের পরকালের শাস্তির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, রাসূলগণকে কাফেরদের উপহাস করার ও মিথ্যারোপ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে পৃথিবীতে তাদের উপর আজাব ও গজব অবতীর্ণ হয়েছে, ফলে তারা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, পার্থিব শাস্তিই যে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্য হয়ে গেছে এটা মনে করার কোনোই কারণ নেই। তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করবে। আর তখনই তাদেরকে জাহান্নামের অন্তহীন আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৩৩. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ عَلَى الْبَعْثِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَحْيَيْنٰهَا بِالْمَاءِ مُبْتَدَأٌ وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا كَالْحِنْطَةِ فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ـ

৩৩. আর তাদের জন্য রয়েছে একটি নিদর্শন- পুনরুত্থানের ব্যাপারে। এটা পূর্বে উল্লিখিত খবর। মৃত শুষ্ক জমিন (اَلْمَيْتَةُ শব্দটি দু ভাবে পড়া যায়) তাশদীদ ছাড়া এবং তাশদীদসহ। আমি একে জীবিত (সজীব) করেছি পানি দ্বারা, তা মুবতাদা। আর আমি তা হতে শস্য-দানা বের করেছি। যেমন- গম। সুতরাং তা হতে তারা ভক্ষণ করে।

৩৪. وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لا اَيْ بَعْضَهَا ـ

৩৪. আর আমি তাতে বাগ-বাগিচার সৃষ্টি করেছি। বাগানসমূহ খেজুর ও আঙ্গুরের আর তাতে আমি নদী-নালাও প্রবাহিত করেছি। অর্থাৎ তার কোনো কোনো অংশে।

৩৫. لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ط بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمَّتَيْنِ اَيْ ثَمَرِ الْمَذْكُوْرِ مِنَ النَّخِيْلِ وَغَيْرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَيْ لَمْ تَعْمَلِ الثَّمَرَ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ اَنْعُمَهٗ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ ـ

৩৫. যাতে তারা তার ফল-মূল হতে ভক্ষণ করতে পারে (এখানে ثَمَرٌ শব্দটির প্রথম দুই অক্ষর) উভয় যবরবিশিষ্ট এবং পেশবিশিষ্টও হতে পারে। অর্থাৎ উল্লিখিত খেজুর ও অন্যান্য ফলমূল হতে। আর তাদের হাত তাকে সৃষ্টি (তৈরি) করেনি। অর্থাৎ (তাদের হাত) ফল সৃষ্ট করেনি। সুতরাং তারা কি শুকরিয়া আদায় করবে না? তাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহের (শুকরিয়া কি তারা আদায় করবে না)।

৩৬. سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ الْاَصْنَافَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنَ الْحُبُوْبِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ مِنَ الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ الْغَرِيْبَةِ الْعَجِيْبَةِ ـ

৩৬. পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি যুগলসমূহ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের এদের সমস্তকে যা জমিন উৎপাদন করে- শস্য দানা ইত্যাদি এবং তাদের নিজেদের হতে নারী ও পুরুষ এবং যা তারা অবহিত নয় বিস্ময়কর আশ্চর্যজনক সৃষ্টিকুল।

তাহকীক ও তারকীব

سُبْحَانَ শব্দের অর্থ : سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ الخ আয়াতে سُبْحَانَ শব্দটি ইসমে মাসদার হয়েছে। এর অর্থ পবিত্রতা, এটা একটি ফে'লে মাহযূফ হতে মাফউলে মুতলাক হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। এর মূলরূপ হবে اُسَبِّحُ سُبْحَانَ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি যথাযথভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর দিকে কাফের মুশরিকগণ যেসব অযৌক্তিক বিষয়াবলিকে সম্পৃক্ত করে থাকে যথা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, আল্লাহর সন্তান-সন্তুতি নির্ধারণ করা ইত্যাদি হতে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পূত-পবিত্র।

কারো কারো মতে, سُبْحَانَ -এর পূর্বে سَبِّحُوْا (আমরের সীগাহ) উহ্য রয়েছে। তখন অর্থ এরূপ হবে- سَبِّحُوْا سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا لَا يَلِيْقُ لِشَانِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর শানে যা প্রযোজ্য নয় তা হতে আল্লাহ পূত-পবিত্র কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সার কথা হচ্ছে- কোনো মানবিক দুর্বলতাকে আল্লাহর দিকে নিসবত করা। আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টিকে গুণগতভাবে বা সত্তাগতভাবে ইবাদতে অংশীদার করা। আল্লাহর ইচ্ছায় কারো হাত রয়েছে বলে মনে করা চরম মূর্খতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এ সবকিছু হতে পূর্ণরূপে পবিত্র।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا -এর তারকীব : অত্র আয়াতে وَ হরফে আতফ اٰيَةٌ لَّهُمُ হলো খবরে মুকাদ্দাম আর اَلْاَرْضُ মাওসূফ اَلْمَيْتَةُ হলো সিফত মাওসূফ সিফাত মিলে মুবতাদা এবং اَحْيَيْنٰهَا এটা জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ হলো। خَبَر مُقَدَّمٌ ও مُبْتَدَأ مُؤَخَّرٌ মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়েছে।

مِنْ ثَمَرِهٖ -এর ، যমীরের মারজি' কি? لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ আয়াতে ، যমীরের মারজি' নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

- কারো কারো মতে, ثَمَرِهٖ -এর যমীরের মারজি' হলো نَخِيْل এবং اَعْنَابٌ ।
- কারো মতে, এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো مَاءُ الْعُيُوْنِ
- কারো মতে, এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো اَللّٰهُ অর্থাৎ مِنْ ثَمَرِ اللّٰهِ
- কারো মতে, এটা وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ বাক্যের দিকে ফিরেছে।
- কারো মতে, وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ -এর মধ্যস্থিত تَفْجِيْر -এর অর্থের দিকে ثَمَرِهٖ -এর যমীরের মারজি' ফিরেছে।

وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ -এর মধ্যস্থিত مَا শব্দের অর্থ কি? এ আয়াতে مَا শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

১. مَا টি নেতিবাচক অর্থে হবে। অর্থাৎ ফল-মূল সৃষ্টি ও নদী প্রবাহিত করার বিষয়টি তারা করেনি।

২. مَا টি اِسْم مَوْصُوْل -এর অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে- وَالَّذِىْ عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الْغَرْسِ بَعْدَ التَّفْجِيْرِ يَاْكُلُوْنَ مِنْهُ اَيْضًا وَيَاْكُلُوْنَ مِنْ ثَمَرِ اللّٰهِ الَّذِىْ اَخْرَجَهٗ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ পানি প্রবাহের পর মানুষ তাদের হাতে বীজ বপন করে যা উৎপাদন করেছে তারা তা হতে খায় এবং আল্লাহর দেওয়া ঐ ফল-মূলও তারা খায় যা মানুষের কোনো প্রকার চেষ্টা তদবীর ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

৩. مَا টি মাসদারের অর্থে হবে। তখন আয়াতের অর্থ হবে- لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِ اللّٰهِ وَعَمِلَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহর ফল এবং নিজেদের হাতে উৎপাদিত (হতে) ভক্ষণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও এর ন্যায় অন্যান্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণের উদ্দেশ্য : সূরা ইয়াসীনের অধিকাংশ আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতের নিদর্শনাবলি, তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে আখেরাতের উপর দলিল উপস্থাপন করা এবং হাশর-নাশরের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা সম্পর্কীয়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর কুদরতের অনুরূপ নিদর্শনাবলিরই আলোচনা করা হয়েছে। একদিকে যা আল্লাহর কুদরতের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ অন্য দিকে মানবজাতি ও সাধারণ সৃষ্টজীবের উপর আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত এবং তাঁর আশ্চর্য জনক কৌশলাদির বিবরণ রয়েছে।

প্রথম আয়াতে জমিনের একটি উপমা পেশ করা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের সম্মুখে যা সদা সর্বদা বিদ্যমান। শুষ্ক জমিনে আল্লাহ তা'আলা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে জমিনে এক প্রকার জীবনের সঞ্চার হয়। এর মধ্যে গাছ-পালা, ফল-ফলাদি, তরুলতা ইত্যাদি উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে যার নিদর্শন প্রকাশ পায়। আর এদের জীবন ধারণের জন্য জমিনের নিচে এবং উপরিভাগে নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন।

বায়ু মেঘ ও জমিনের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে- লোকেরা যেন তা হতে জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। আর এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহর আনুগত্য করে তাওহীদে বিশ্বাস করে।

এ ছাড়াও আল্লাহর আরো একটি বড় কুদরত হলো- তিনি প্রতিটি বস্তুকে শ্রেণিবিন্যাস করত নারী-পুরুষ, ঝাল-টক ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন।

নিষ্প্রাণ মাটি যেভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব একত্ববাদের উপর দলিল বা নিদর্শন হতে পারে : মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম ক্ষমতাবলির নিদর্শন ও তাওহীদের প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে– শুষ্ক জমিনকে বৃষ্টির পানি দ্বারা সজীব করে এতে গাছ-পালা শস্য-দানা ও ফল-ফলাদি উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষের জীবিকার ব্যবস্থাকরণ।

যেহেতু এ প্রক্রিয়াটি প্রতিনিয়ত আমাদের সম্মুখে ঘটছে তাই আল্লাহ তা'আলা সর্বাগ্রে এটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া এটা এমন একটি বিষয় যা বুঝার জন্য কোনোরূপ চিন্তা গবেষণার জরুরত হয় না। কিন্তু প্রতিনিয়ত চোখে পড়ার কারণে আমরা আল্লাহর এই অসীম কুদরতটির ব্যাপারে কখনো আগ্রহ ভরে ভেবে দেখছি না।

আল্লাহ তা'আলা এ শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ ভূমিতে বৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণের সঞ্চার করেন। এরপর তা হতে হরেক রকম বাগ-বাগিচার সৃষ্টি করেন এবং তাতে পানি সিঞ্চন করার জন্য বিভিন্ন নদী-নালা ও ঝরণা প্রবাহের ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষ এগুলো হতে উৎপাদিত ফসল ও ফল-মূল খেয়েই জীবন ধারণ করে থাকে।

এ নিষ্প্রাণ ভূমি হতে কিভাবে চির সবুজ সজীব বৃক্ষরাজির সৃষ্টি হয়? সে ব্যাপারে গবেষকগণ কতিপয় কারণ বর্ণনা করেছেন।

- শূন্যে আল্লাহ বায়ু স্থাপন করে রেখেছেন তা আকাশের বিপদাপদ হতে ভূমিকে রক্ষা করে এবং বৃষ্টি বর্ষণে সাহায্য করে।
- ভূমি সূর্য হতে প্রয়োজনীয় উত্তাপ শোষণ করে; বৃক্ষ রাজির উৎপাদন ও বিকাশে সাহায্য করে।
- জমিনের উপরিভাগে আল্লাহ তা'আলা নদী-নালা প্রবাহিত করে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর তলদেশেও পানির ভাণ্ডার জমা রেখেছেন এদের থেকে পানি সিঞ্চন করে ফসলাদি উৎপাদান সাহায্য পাওয়া যায়।
- ভূমির উপরিভাগে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি বিশেষ স্তর সৃষ্টি করেছেন যা হতে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় খাদ্য শোষণ করতে পারে।

গবেষকদের মতে উপরিউক্ত কারণগুলোর সাথে আরো কারণ যুক্ত হয়ে মৃত নিষ্প্রাণ ভূমি হতে সজীব-সতেজ বৃক্ষরাজি উৎপন্ন হয়। মোট কথা হচ্ছে– নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়ে যায় যে, এগুলো আপনা আপনিই উৎপন্ন হতে পারে না। নিশ্চয় এর উপর এক অদৃশ্য শক্তির হাত রয়েছে। পূর্ব হতেই যিনি মানব এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই এ সকল ব্যবস্থাপনা। কৃষক জমিতে চাষাবাদা করে বীজ বপন করে পানি দেয় তাই বলে তো সে বীজ হতে বৃক্ষ গজানো, ডাল ছড়ানো, পত্র-পল্লবের সৃষ্টি ইত্যাদির কোনোটিই করতে পারে না। আর এগুলো সবই তো হয় মহা কৌশলীর কুদরতি হাতে। এদিকে ইঙ্গিত করেই সূরায়ে ওয়াকি'আতে উল্লেখ হয়েছে– বল তো তোমরা যে ক্ষেত-খামার কর তাতে তোমরাই ফসল উৎপাদন কর না আমি করি?

উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মৃত ভূমিকে সঞ্জীবিত করার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের নিদর্শন রয়েছে।

সকল ফলের মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরকে খাস করার কারণ : দুনিয়ার অসংখ্য ফল-মূল হতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে খেজুর এবং আঙ্গুরকে নির্দিষ্ট করলেন কেন? এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেন–

- পবিত্র কুরআনকে নিয়ে গবেষণা করলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন উপমা প্রসঙ্গে সাধারণত সে সকল বস্তুসমূহের উল্লেখ করেছেন যা মক্কাবাসীদের সুপরিচিত ছিল। এখানেও সে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ আরববাসীগণ খেজুর ও আঙ্গুরের সাথে অধিক পরিচিত ছিলেন। এ কারণেই আয়াতে এ দুটিকে উল্লেখ করেছেন।
- ফল-মূল দু ধরনের– ১. যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত, ২. যা পরিতৃপ্তির জন্য খাওয়া হয়। এখানে প্রথম প্রকার হতে খেজুর এবং দ্বিতীয় প্রকার হতে আঙ্গুরের উল্লেখ করা হয়েছে।

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে اَزْوَاجٌ শব্দটি زَوْجٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো– জোড়া। জোড়ার মধ্যে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু থাকে। এদের প্রত্যেকটিকে অপরটির زَوْجٌ বলে। যথা– নারী-পুরুষ। নারীকে পুরুষের আর পুরুষকে নারীর زَوْجٌ বলে। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রাণীর স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ পরস্পর زَوْجٌ অনেক গাছ-গাছালি ও তরুলতার মধ্যেও স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা মতে ফল-ফুল বিশিষ্ট গাছের মধ্যে স্ত্রী লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রজনন পদ্ধতি বিরাজমান রয়েছে। তদ্রূপ অন্যান্য জড় পদার্থ ও সৃষ্টিকুলের মধ্যেও যদি প্রজননের এই গোপন ধারা অব্যাহত থাকে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এ দিকেই وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাফসীরকারকগণ সাধারণভাবে أَنْوَاعٌ দিয়ে أَزْوَاجٌ-এর তাফসীর করেছেন। أَنْوَاعٌ অর্থ হলো- প্রকারসমূহ। কারণ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গকে যেভাবে পরস্পর زَوْجَيْنِ (যুগল) বলা হয় তেমনিভাবে দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তুকেও زَوْجَيْنِ বলা হয়। যথা- ঠাণ্ডা-গরম, শুষ্ক-আর্দ্র, আনন্দ-বেদনা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকটি আবার উচ্চ, মধ্য নিম্ন-এর হিসেবে অনেক স্তর, শ্রেণিবিভাগ ও প্রকারভেদ রয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মাঝেও বর্ণ, আকার, ভাষা ও জীবন ধারণ পদ্ধতির দিক বিবেচনায় অনেক প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান। أَزْوَاجٌ শব্দটির মধ্যেও উপরোক্ত সকল শ্রেণিবিভাগ বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ। উল্লেখ করে বৃক্ষরাজির প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করেছেন। এরপর مِنْ أَنْفُسِهِمْ الخ হতে মানুষের নফসের প্রকরণ বর্ণনা করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ-এর মধ্যে অসংখ্য সৃষ্টজীব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আজ পর্যন্ত জানা-জানি হয়নি। ভূ-মণ্ডলের নিম্ন দেশে সমুদ্র, পাহাড়-পর্বতে কত অসংখ্য পরিমাণ জীব-জন্তু, গাছ-পালা ও জড় পদার্থ রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার সবকিছুই জানেন।

পরস্পরের জন্য জুড়ি হওয়া এবং তাদের মিলনের ফলে নবতর জিনিসের অস্তিত্ব লাভ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও একত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করে : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, সমস্ত বস্তু নিচয়কে তিনি জুটি করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক বস্তুকে স্ত্রী ও পুরুষ এ দু লিঙ্গে এবং বহু শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন- যেমন মানবজাতিকে নারী-পুরুষ এ দু শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে যৌনশক্তি, প্রেম-ভালবাসা ও একের প্রতি অপরের দুর্বার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। নারী-পুরুষ প্রেম-প্রীতির বন্ধনে যৌবনের প্রচণ্ড আকর্ষণে অন্তহীন আবেগে মিলিত হয়। তাদের এ মিলনের ফসল হিসেবে এক নবতর প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। আর উভয়ে আনন্দচিত্তে হাজারো কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে এ নব প্রজন্মের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। মানবজাতির বংশ ধারা এভাবেই অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

সৃষ্টি জগতের এ সুশৃঙ্খল ধারা অব্যাহত থাকাটা কি কোনো দুর্ঘটনার ফল? নাকি এটা কোনো পরিকল্পনা ছাড়া এমনিতেই চলছে? এটা হতে পারে না। কারণ কোনো দুর্ঘটনা তো সুশৃঙ্খলভাবে ঘটতে পারে না। আর একটি সামান্য কর্মও কোনো পরিকল্পনা ছাড়া সম্পাদন করা যায় না। তবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে- সে পরিকল্পনাকারী কে? এটা তো মানুষ হতে পারে না। তবে নিশ্চয় এর পিছনে এক মহাশক্তির হাত রয়েছে। আর সেই শক্তিই হলেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা। আমরা আরো দেখতে পাই যে, এসব কিছুই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলছে; এর কোনোরূপ ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আর এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় এগুলো সব একমাত্র সত্তারই নিয়ন্ত্রণাধীন। কাজেই জুটি করে সৃষ্টি করা এবং তাদের মিলনের ফলে নব প্রজন্মের আবির্ভাব আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

أَفَلَا يَشْكُرُونَ-এর মধ্যস্থ হামযা ও ফা-এর অর্থ : এখানে হামযাটি اِسْتِفْهَامٌ তথা প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর فَا টি হরফে আত্ফ হিসেবে এসেছে। এর মা'তূফ আলাইহ উহ্য রয়েছে। ইবারতটি এরূপ হচ্ছে যে, أَيُنْكِرُونَ نِعْمَةَ فَلَا يَشْكُرُونَ অর্থাৎ- তারা কি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করতেন তারা যার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে না।

আল্লাহর বাণী أَفَلَا يَشْكُرُونَ বাক্যটিকে হামযায়ে ইস্তিফহামের সাথে বর্ণনা করলেন কেন? এখানে কাফের মুশরিকদের কার্যকলাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য اِسْتِفْهَامٌ-এর হামযার সাথে বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফেররা এতই কৃতঘ্ন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সুখ শান্তির জন্য এত সব উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে রেখেছেন তারা এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। যার প্রথম দাবি হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া। কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করা। বড়ই পরিতাপের বিষয় সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছেড়ে এরা এমন কতিপয় বস্তুর উপাসনায় তারা লিপ্ত যারা একটি লতাপাতা তৈরি করতেও সক্ষম নয়। এর চেয়ে চরম গোমরাহী আর কি হতে পারে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٧. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ عَلَى الْقُدْرَةِ الْعَظِيْمَةِ اللَّيْلُ ج نَسْلَخُ نَفْصِلُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ دَاخِلُوْنَ فِى الظَّلَامِ .

٣٨. وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ الخ مِنْ جُمْلَةِ الْاٰيَةِ لَهُمْ اَوْ اٰيَةٌ اُخْرٰى وَالْقَمَرُ كَذٰلِكَ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط اَىْ اِلَيْهِ لَا يَتَجَاوَزُهٗ ذٰلِكَ جَرْيُهَا تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ الْعَلِيْمِ بِخَلْقِهٖ .

٣٩. وَالْقَمَرَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَهُوَ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهٗ مَا بَعْدَهٗ قَدَّرْنٰهُ مِنْ حَيْثُ سَيْرِهٖ مَنَازِلَ ثَمَانِيَةً وَّعِشْرِيْنَ مَنْزِلًا فِىْ ثَمَانٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَسْتَتِرُ لَيْلَتَيْنِ اِنْ كَانَ الشَّهْرُ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِنْ كَانَ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا حَتّٰى عَادَ فِىْ اٰخِرِ مَنَازِلِهٖ فِىْ رَاْىِ الْعَيْنِ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ اَىْ كَعُوْدِ الشَّمَارِيْخِ اِذَا عَتَقَ فَاِنَّهٗ يَدِقُّ وَيَتَقَوَّسُ وَيَصْفَرُّ .

٤٠. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ يَسْهُلُ وَيَصِحُّ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ فَتَجْتَمِعُ مَعَهٗ فِى اللَّيْلِ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط فَلَا يَاْتِىْ قَبْلَ اِنْقِضَائِهٖ وَكُلٌّ تَنْوِيْنُهٗ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ فِىْ فَلَكٍ مُّسْتَدِيْرٍ يَّسْبَحُوْنَ يَسِيْرُوْنَ نُزِّلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ .

অনুবাদ :

৩৭. আর একটি নিদর্শন তাদের জন্য মহান কুদরতের উপর রাত্রি। আমি ছিন্ন করি, পৃথক করি, তা হতে দিবসকে। ফলে তারা অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে।

৩৮. আর সূর্য পরিভ্রমণ করে– [আয়াতের শেষ পর্যন্ত তাদের [পূর্বোক্ত] মোট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অথবা এটা [তাদের জন্য] পৃথক একটি নিদর্শন। আর চন্দ্রের অবস্থাও তদ্রূপ। এটা নির্ধারিত কক্ষপথে তা পর্যন্ত তাকে অতিক্রম করতে পারে না। তা সূর্যের পরিভ্রমণ– নির্ধারিত মহাপরাক্রমশালীর তাঁর রাজত্বে মহাজ্ঞানীর তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে।

৩৯. আর চন্দ্র اَلْقَمَرُ শব্দটিতে رَفْع ও نَصْب উভয়টি হতে পারে। এটা এমন একটি فِعْل-এর সাহায্যে مَنْصُوْب তার পরবর্তী শব্দ যার ব্যাখ্যা করে। তার জন্যও আমি নির্ধারণ করেছি। তার ভ্রমণের দিক বিবেচনায় মঞ্জিল গন্তব্যস্থল সমূহ। প্রত্যেক মাসের আটাশ রাত্রির জন্য আটাশটা মঞ্জিল [নির্ধারণ করেছি] আর মাস ৩০ দিনের হলে দুটি এবং ২৯ দিনের হলে একটি রাত্রি গোপন থাকে। এমনকি প্রত্যাবর্তন [রূপ ধারণ] করে চোখের দৃষ্টিতে তার শেষ মঞ্জিলে শুষ্ক বাঁকা পুরানো খেজুরের শাখার ন্যায় অর্থাৎ খেজুরের শাখার ন্যায়। যখন তা পুরানো হয়ে যায়, তখন অত্যন্ত সরু ও কামানের ন্যায় বাঁকা হয়ে যায় এবং হলুদ রং ধারণ করে।

৪০. সূর্যের জন্য সম্ভবপর নয়– সম্ভব (সহজ) ও সঠিক নয়– চন্দ্রের নাগাল পাওয়া– যাতে রাত্রি বেলায় তার সাথে একত্রিত হতে পারে। আর রাত্রির পক্ষে দিবসকে অতিক্রম করা অসম্ভব– কাজেই তা দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আগমন করে না। তাদের প্রত্যেকেই كُلٌّ-এর তানবীন মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে হয়েছে। (অর্থাৎ মুযাফ ইলাইহকে হযফ করত তানবীন দেওয়া হয়েছে।) অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি কক্ষ পথে বৃত্তের মধ্যে সাঁতার কাটছে পরিভ্রমণ করছে। তাদেরকে বিবেকবানদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

তাহকীক ও তারকীব

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ আয়াতে الْقَمَرَ-এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতের اَلْقَمَرَ শব্দটির মহল্লে ইরাব সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে।

১. আবূ আমির, ইবনে কাছীর, নাফে' ও আলী প্রমুখগণের মতে اَلْقَمَرَ শব্দটি مَرْفُوْع হবে, তখন এটা মুবতাদা হবে। আর وَآيَةٌ لَهُمُ الخ বাকীট তার খবর হবে।

২. অপরাপর কারীগণ এটাকে مَنْصُوْب পড়েছেন। তখন এর পরবর্তী ফে'ল তার عَامِلْ হবে। অথবা এটা এমন একটি উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে যে ফে'লটির ব্যাখ্যা পরবর্তী ফে'লটি করেছে। বাক্যটি এরূপ হবে যে, وَقَدَّرْنَا الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : نَسْلَخُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- চামড়া উপড়িয়ে ফেলা। কোনো বস্তুর উপরের গেলাফ বা কোনো প্রাণীর চামড়া উপড়িয়ে ফেললে ভিতরের বস্তু বের হয়ে পড়ে।

এ উপমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এ পৃথিবীতে মৌলিক হলো অন্ধকার আর আলো হলো অমৌলিক বা আরজী যা অন্যান্য নক্ষত্ররাজি হতে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এই আলো আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়েই পৃথিবীতে এসে পড়ে এবং নির্দিষ্ট সময়েই এটাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এরপর অন্ধকার থেকে যায়। একেই পরিভাষায় রাত বলা হয়। এটা মহান আল্লাহর একটি বিশেষ কুদরত, অসীম ক্ষমতা, বান্দার এতে কোনোই হাত নেই। কাজেই তা হতে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদ প্রমাণিত হয়।

اَلْمُسْتَقَرُّ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য এবং আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের ভাবার্থ হলো সূর্য তার গন্তব্য পানে চলতে থাকে। مُسْتَقَرٌّ বলে স্থিতির স্থান ও সময় উভয়টিকে। আবার ভ্রমণের শেষ সীমাকেও مُسْتَقَرٌّ বলা হয়। তবে আলোচ্য আয়াতে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

- কতিপয় মুফাসসিরের মতে এখানে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা مُسْتَقَرٌّ زَمَانِيٌّ তথা স্থিতির সময়কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সেই সময় যখন সূর্য তার নির্ধারিত গতির সমাপ্তি ঘটাবে। আর তা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে-

সূর্য এমন দৃঢ়তা ও মজবুত শৃঙ্খলার সাথে এর কক্ষ পথে চলছে যে, এতে কখনো এক সেকেণ্ডের তারতম্য হয় না। এভাবে হাজার বছর ধরে চলে আসছে তবুও এর গতি অব্যাহত রয়েছে। তবে এ গতিরও শেষ সীমা রয়েছে। তথায় পৌছলে এ ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আর সেই সীমা হলো কিয়ামতের দিন। সূরায়ে যুমারের একটি আয়াত এর দিকে ইঙ্গিত করেছে। আয়াতটি হচ্ছে-

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى .

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। রাতকে দিনের উপর দিনকে রাতের উপর ঢেকে দেন। আর তিনি চাঁদ সুরুজকে অনুগত বাধ্যগত করে রেখেছেন। একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। এ আয়াতে أَجَل مُسَمّٰى দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। আর সূরায়ে ইয়াসীনে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা أَجَل مُسْتَقَرٌّ তথা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য।

- কোনো তাফসীর কারকের মতে, এখানে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা مُسْتَقَرٌّ مَكَانِيٌّ তথা স্থিতির উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা বুখারী ও মুসলিমের একটি সহীহ হাদীসের ভিত্তি করে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে- হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) একদা সূর্যাস্তের সময় মহানবী ﷺ -এর সাথে মসজিদে ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "আবূ যর তুমি কি জান সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কোথায় যায়।" উত্তরে হযরত আবূ যার গিফারী (র.) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে গিয়ে সিজদাবনত হয়। এরপর মহানবী ﷺ বললেন- وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এখানে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সিহাহ সিত্তাহে রয়েছে যে, হযরত আবূ যার (রা.) একদা রাসূল ﷺ কে وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا -এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিলেন মহানবী ﷺ বললেন– مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ অর্থাৎ সূর্যের স্থিতি হলো আরশের নিচে।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে– যাতে উল্লেখ আছে যে, অস্ত যাওয়ার পর সূর্য আরশের নিচে সেজদা করে। এবং পরবর্তী কক্ষে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় চলা আরম্ভ করে। এমনিভাবে এক দিন আসবে যেদিন সূর্য পরবর্তী কক্ষে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। বরং তাকে বলা হবে যেদিক থেকে এসেছো সেদিকেই চলে যাও। আর এটা হলো কিয়ামতের একটি নিদর্শন।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সূর্য স্বীয় ইচ্ছাধীন চলতে পারে না; বরং মহান রাব্বুল আলামীনের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুপাতে তা চলমান। রাসূল ﷺ হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)-কে তাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। সারকথা হলো, সূর্যের উদয় অস্তের সময় বিশ্ব জগতে এক বিশাল পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় যা সূর্যের কারণে হয়ে থাকে। মহানবী ﷺ এ পরিবর্তনশীল সময় দ্বারা মানুষকে সতর্ক করার সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা সূর্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বেচ্ছাচারী মনে কর না। আল্লাহর ইচ্ছায়ই সূর্য অনুগামী হাদীসে আল্লাহর অনুগত হওয়াকেই সেজদাবনত হয় বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বস্তুর সেজদা তার অবস্থা মাফিক হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন– كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার ইবাদত ও তাসবীহের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত। যেমনিভাবে মানুষকে তার সালাত ও তাসবীহের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে তার ইবাদত ও তাসবীহের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সূর্যের সেজদা করার দ্বারা মানুষের জমিনে মাথা ঠেকানো বুঝা সঠিক হবে না।

কুরআন হাদীসের উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সূর্য ও চন্দ্র গতিশীল। একটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এরা পরিভ্রমণ করবে। আধুনিক জড়বিজ্ঞানীগণও এ ধারণা পোষণ করেন। তবে পূর্বেকার বিজ্ঞানীদের ধারণা যে, 'সূর্য স্থির' এটা কুরআন হাদীস অনুযায়ী না হওয়ায় এটা ভুল প্রমাণিত হলো।

চন্দ্র ও সূর্যের মঞ্জিলসমূহের বিবরণ : مَنَازِلُ এটা مَنْزِلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অবতরণের স্থল। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলাচলের জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। চন্দ্র ও সূর্যের ভ্রমণের জন্য আল্লাহ আকাশে বারটি রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাকে বুরূজ বলা হয় এবং চন্দ্র ও সূর্য এ বারটি বুরূজ দিয়েই চলাচল করে। এ ছাড়া এদের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন মঞ্জিলও রয়েছে। চাঁদ তার মঞ্জিলসমূহকে ২৮ রাতে অতিক্রম করে। প্রত্যেক রাতে একটি করে ২৮ রাত পর্যন্ত অতিক্রম করার পর চাঁদ দু' রাত অদৃশ্য থাকে। আর মাস যদি ২৯ দিনে হয়, তবে এক রাত অদৃশ্য থাকে। এ মঞ্জিলগুলো বার বুরূজে বিভক্ত।

তদ্রূপ সূর্যেরও ২৮টি মনজিল রয়েছে। সে সকল মঞ্জিলগুলো ও বার ভাগে বিভক্ত। সূর্যের চেয়ে চন্দ্রের গতি অনেক দ্রুত এ জন্য চন্দ্র মাত্র একমাসের মধ্যেই তার মঞ্জিলসমূহ পরিভ্রমণ করে ফেলে। অথচ এ কাজ সমাধা করতে সূর্যের এক বছর সময় লেগে যায়। যথা– ঘড়ির মিনিটের কাটা ঘণ্টায় ৬০ মঞ্জিল অতিক্রম করে অথচ ততক্ষণে ঘণ্টার কাটা মাত্র পাঁচ মঞ্জিল অতিক্রম করে।

উল্লেখ্য যে, চন্দ্র ও সূর্যের মঞ্জিলসমূহের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– চাঁদের মঞ্জিলগুলো চোখে দেখা যায়, আর সূর্যের মঞ্জিলগুলো হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জানা যায়।

স্বয়ং চাঁদের মঞ্জিল হওয়া না হওয়া : وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ চাঁদকেই মঞ্জিল হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। অথচ বাস্তব কথা তা নয় বরং চাঁদের পরিভ্রমণের জন্য মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত রয়েছে।

ইমাম যমখশরী (র.) বলেন– وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ আয়াতে قَدَّرْنَا -এর পরে এবং ه যমীরের পূর্বে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ বাক্যটি হবে– وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا سَيْرَهٗ مَنَازِلَ অর্থাৎ আমরা চাঁদের পরিভ্রমণকে মঞ্জিল হিসেবে নির্ধারণ করেছি।

অথবা, قَدَّرْنٰهُ -এর ه যমীরের পরে একটি ذَا উহ্য রয়েছে তখন ইবারত হবে وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ ذَا مَنَازِلَ অর্থাৎ আমরা চাঁদকে অনেক মঞ্জিলে নির্ধারণ করেছি। এ অবস্থায় পূর্বোক্ত প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। কেননা, ذُو الشَّيْءِ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّيْءِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর মালিক ঐ জিনিসের নিকটবর্তী। আর এ কারণেই আল্লাহ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ বলেছেন। –[কাশশাফ, কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ -এর ব্যাখ্যা : এ আয়াতে العرجون শব্দটির অর্থ হলো– খর্জুর গাছের এমন ডাল, যা বেঁকে কামানের মতো হয়ে যায়। এখানে মাসের শেষভাগের চাঁদের আকারের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্ণিমার পর যা হ্রাস পেতে পেতে কামানের আকার ধারণ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে একে আরবীয়গণ খেজুরের শুষ্ক ডালের সাথে তুলনা করেছেন।

চাঁদ হ্রাস-বৃদ্ধি পায় কিনা? বাস্তবিক পক্ষে চাঁদের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এটা একটাই চাঁদ গতিশীল এবং বিভিন্ন সময় তা বিভিন্ন মঞ্জিলে অবস্থান করায় আমরা দূর হতে আমাদের চর্ম চোখে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি দেখতে পাই। তাই কখনো আমরা চাঁদকে ছোট দেখি, কখনো বড় দেখি, কখনো আবার দেখতেই পাই না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও এ মত প্রকাশ করেছেন যে, চাঁদ মূলত ছোট বড়, মোটা-চিকন হয় না।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

- চন্দ্রকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনে আনার ক্ষমতা সূর্যের নেই। অথবা সূর্য চন্দ্রের পরিভ্রমণ কক্ষে প্রবেশ করে চাঁদের সাথে সংঘর্ষ জড়িয়ে যেতে পারে না।
- আল্লাহ তা'আলা চাঁদের উদয় অস্তের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সময়ে সূর্যের পক্ষে আগমন করা সম্ভব নয়। তাই চাদনী রাতে হঠাৎ করে সূর্যের আগমন ঘটা সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব। অপর দিকে দিবসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই রজনীর আবির্ভাব ঘটা এবং রাতের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই দিনের আগমন ঘটাও অসম্ভব।

فَلَكٌ -এর অর্থ এবং প্রত্যেক নক্ষত্রের জন্য فَلَكٌ রয়েছে কিনা? فَلَكٌ-এর আভিধানিক অর্থ– আকাশ। তবে এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে فَلَكٌ দ্বারা নক্ষত্র বিচরণকারী পথকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, চাঁদ কোথাও স্থিতিশীল থাকে না; বরং আকাশের নিচে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে চাঁদ বিচরণ করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চাঁদে মানুষের পদার্পণের ঘটনাসমূহ এটাকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে। শুধু চাঁদই নয় বরং সূর্য সহ অন্যান্য নক্ষত্রসমূহ আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করছে।

এ আয়াতে চারটি মহা সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১. চন্দ্র-সূর্যসহ আকাশের সকল নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহই সর্বদা গতিশীল।

২. গ্রহ ও নক্ষত্র প্রত্যেকেরই নিজস্ব কক্ষ পথ রয়েছে।

৩. নক্ষত্রসহ আকাশ মণ্ডল আবর্তিত হয় না; বরং নক্ষত্ররাজি আকাশমণ্ডলে আবর্তিত হয়।

৪. যেরূপে কোনো তরল প্রবহমান বস্তুতে কোনো বস্তু সাতার কাটে অনেকটা সেরূপ হচ্ছে আকাশমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির গতির প্রকৃতি।

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি গ্রহ ও নক্ষত্রের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষপথ রয়েছে। আর প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ পথে পরিভ্রমণ করছে। চন্দ্র ও সূর্য তাদের কক্ষপথে বারটি স্থান পরিভ্রমণ করে। এদেরকে بُرْج বলা হয়। এগুলো হলো–

١. سُنْبُلَةٌ . ٢. مِيْزَانٌ . ٣. عَقْرَبٌ . ٤. قَوْسٌ . ٥. جَدْيٌ . ٦. دَلْوٌ . ٧. حَمَلٌ . ٨. ثَوْرٌ . ٩. جَوْزَا . ١٠. سَرَطَانٌ . ١١. اَلْاَسَدُ . ١٢. حُوْتٌ .

يَسْبَحُوْنَ -এর মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলো غَيْر عَاقِلَة হওয়া সত্ত্বেও কেন نُوْن ও وَاوْ দ্বারা বহুবচন নেওয়া হলো? নাহবী বিধান মতে সাধারণত عَاقِلَة বা বিবেকবানদের বহুবচন وَاوْ এবং نُوْن দ্বারা নেওয়া হয়। এখানে চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এরা কোনোটাই বিবেকবান নয় তারপরও কেন يَسْبَحُوْنَ-এর মধ্যে وَاوْ এবং نُوْن দ্বারা বহুবচন নেওয়া হলো?

জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে বিবেকহীনকে বিবেকবানের স্থলাভিষিক্ত করেছেন বিধায় وَاوْ এবং نُوْن দ্বারা বহুবচন নিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতেও এরূপ উপমা রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤١. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ عَلٰى قُدْرَتِنَا اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ ذُرِّيَّاتِهِمْ اَىْ اٰبَاءَهُمُ الْاُصُوْلَ فِى الْفُلْكِ اَىْ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ الْمَشْحُوْنِ الْمَمْلُوْءِ .

৪১. আর তাদের জন্য নিদর্শন আমার কুদরতের উপর এই যে, আমি আরোহণ করিয়েছি। তাদের বংশধরদেরকে এক কেরাত রয়েছে ذُرِّيَّاتِهِمْ বহুবচনের সাথে অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষগণকে নৌকার মধ্যে অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় বোঝাই করা পরিপূর্ণ।

٤٢. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ اَىْ مِثْلِ فُلْكِ نُوْحٍ وَهُوَ مَا عَمِلُوْهُ عَلٰى شَكْلِهٖ مِنَ السُّفُنِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ بِتَعْلِيْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا يَرْكَبُوْنَ فِيْهِ .

৪২. আর তাদের জন্য তার ন্যায় সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর নৌকার ন্যায়। তা হলো লোকেরা আল্লাহর তালিমে সেই (নূহের) নৌকার আকারে যেসব ছোট বড় নৌকাসমূহ [পরবর্তীতে] তৈরি করেছে। যাতে তারা আরোহণ করে– যার মধ্যে।

٤٣. وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ مَعَ اِيْجَادِ السُّفُنِ فَلَا صَرِيْخَ مُغِيْثَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ يَنْجُوْنَ .

৪৩. অথচ আমি চাইলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি নৌকা আবিষ্কার করা সত্ত্বেও। তখন নালিশ শ্রবণ করার মতো কেউ থাকবে না। কোনো সাহায্যকারী তাদের জন্য। আর তারা পরিত্রাণ পাবে না– নাজাত পাবে না।

٤٤. اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ اَىْ لَا يُنْجِيْهِمْ اِلَّا رَحْمَتُنَا لَهُمْ وَتَمْتِيْعُنَا اِيَّاهُمْ بِلَذَّاتِهِمْ اِلٰى اِنْقِضَاءِ اٰجَالِهِمْ .

৪৪. তবে যদি আমার রহমত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে উপভোগের সুযোগ দান করি তাহলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ তা রক্ষা পাবে না তবে দু অবস্থায় রক্ষা পাবে। এক. আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহ হলে এবং দুই. মৃত্যু অবধি তাদেরকে আমার পক্ষ হতে সুযোগ দানের মাধ্যমে।

٤٥. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا كَغَيْرِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ اَعْرَضُوْا .

৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমাদের সম্মুখে যা রয়েছে তাকে ভয় করো। (অর্থাৎ) দুনিয়ার আজাব অন্যান্যদের ন্যায় এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে তাকেও ভয় করো। অর্থাৎ আখেরাতের আজাব। যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা যেতে পারে। তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

٤٦. وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ .

৪৬. আর যখনই তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে কোনো নিদর্শন আগমন করে, তখনই তা হতে তারা বিমুখ হয়ে যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٧. وَاِذَا قِيْلَ اَىْ قَالَ فُقَرَاءُ الصَّحَابَةِ لَهُمْ اَنْفِقُوْا عَلَيْنَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ مِنَ الْاَمْوَالِ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِسْتِهْزَاءً بِهِمْ اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ ۚ فِىْ مُعْتَقَدِكُمْ هٰذَا اِنْ مَا اَنْتُمْ فِىْ قَوْلِكُمْ لَنَا ذٰلِكَ مَعَ مُعْتَقَدِكُمْ هٰذَا اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ وَالتَّصْرِيْحُ بِكُفْرِهِمْ مَوْقِعٌ عَظِيْمٌ ـ

৪৭. আর যখন বলা হয় অর্থাৎ দরিদ্র সাহাবীগণ (রা.) বলে তাদেরকে লক্ষ্য করে ব্যয় করো আমাদের উপর– যা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রিজিক হিসেবে দান করেছেন– অর্থাৎ যেই সম্পদ তোমাদেরকে দান করেছেন। তখন কাফেররা প্রত্যুত্তরে ঈমানদারগণকে বলে– তার সাথে বিদ্রূপ করত যাকে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন আমি কি তাকে খাওয়াবো? তোমরা তো এরূপ ধারণা পোষণ কর। তোমরা তো– তোমাদের এ আকিদা-বিশ্বাস সত্ত্বেও আমাদের নিকট ঐ বক্তব্য পেশ করার ব্যাপারে স্পষ্ট গোমরাহীতে [বিভ্রান্তিতে] লিপ্ত রয়েছে। (مُبِيْنٍ অর্থ) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। অত্র আয়াতে খোলাখুলিভাবে তাদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করায় প্রতীয়মান হয় যে, এটা জঘন্য কুফর [সাংঘাতিক অপরাধ]।

তাহকীক ও তারকীব

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا আয়াতে رَحْمَةً-এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে رَحْمَةً শব্দটি মহল্লান মানসূব হয়েছে। তবে মানসূব হওয়ার কারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

✪ কেসায়ীর মতে, رَحْمَةً টি مُسْتَثْنٰى হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

✪ ইমাম যুজাজের মতে, مَفْعُوْلٌ لَهٗ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ-এর মধ্যে اِلٰى حِيْنٍ-এর অর্থ : এখানে اِلٰى حِيْنٍ-এর অর্থ নিয়ে দুটি মত পরিলক্ষিত হয়।

✪ হযরত কাতাদাহ (র.)-এর মতে, اِلٰى حِيْنٍ অর্থ হচ্ছে– اِلَى الْمَوْتِ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত।

✪ ইয়াহইয়া ইবনে সালাম (র.)-এর মতে, اِلٰى حِيْنٍ অর্থ اِلَى الْقِيَامَةِ এ সুরতে আয়াতের অর্থ হবে–

اِلَّا اَنْ نَرْحَمَهُمْ وَنُمَتِّعَهُمْ اِلٰى اٰجَالِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَجَّلَ عَذَابَ الْاُمَمِ السَّابِقَةِ وَاَخَّرَ عَذَابَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاِنْ كَذَّبُوْهُ اِلَى الْمَوْتِ وَالْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ, তবে আমার অনুগ্রহের কারণে তাদেরকে তার মৃত্যু অবধি সুযোগ প্রদানের ফলে তারা রেহাই পাচ্ছে ও স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করছে আর আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সাথে সাথে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু শেষ নবীর উম্মতদের শাস্তিকে মৃত্যু ও কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন যদিও তারা রাসূল ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক না কেন।

وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيَاتِ الخ আয়াতে اٰيَةٍ-এর অর্থ : এখানে اٰيَةٍ শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে।

১. আল্লাহর কিতাবের আয়াত যার দ্বারা মানুষকে উপদেশ প্রদান করা হয়।

২. বিশ্ব প্রকৃতির এবং স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব ও ইতিহাসে বিদ্যমান নিদর্শনাবলি যা হতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে।

১. এ আয়াতটি মক্কার কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূল ﷺ -এর দরিদ্র সাহাবায়ে কেরাম যখন তাদেরকে বললেন যে, তোমরা আল্লাহর জন্য তোমাদের সম্পদের যে অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ তা হতে দান কর। তারা তখন উপহাস ও তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে খাওয়াতে পারেন আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব? এটা হতে পারে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন– وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا অর্থাৎ তারা তাদের পশু ও ফসলের একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিল।" তবুও তারা তাদেরকে বঞ্চিত করল। আর বলল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে খাওয়াতে পারেন। যে বিশ্বাস তোমরা পোষণ করে থাক। তাই কেন আমরা তোমাদেরকে খাওয়াব। তোমাদের আল্লাহর প্রতি এত অগাধ বিশ্বাস থাকার পরও খাদ্যের জন্য আমাদের নিকট ধন্না দেওয়া স্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

২. যখন বিশ্বাসীগণ কাফেরদেরকে অসহায় দরিদ্রদেরকে সাহায্য করার জন্য উপদেশ দিতেন তখন তারা বলল, আল্লাহই তো তোমাদের বিশ্বাস অনুপাতে রিজিকদাতা। তিনি তাদেরকে কেন রিজিক হতে মাহরুম করলেন? তাদেরকে যদি আমরা রিজিক প্রদান করি তবে আমরাই রিজিকদাতা হয়ে যাই। কাজেই আমাদেরকে দান-সদকার উপদেশ করার মাধ্যমে তোমরা স্পষ্টতই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

৩. আয়াতটি মক্কার মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তাদেরকে দরিদ্র-অসহায়দের প্রতি দান-সদকা করার জন্য বলা হতো তখন তারা বলত। আল্লাহর কসম! আমরা কিছুতেই তাদেরকে দান করতে পারব না। তাদেরকে আল্লাহ অসহায় দরিদ্র করবেন আর আমরা তাদেরকে খাওয়াব তা হতে পারে না। অনুরূপই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে।

৪ হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) একদা দরিদ্র মুসলমানদেরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছিলেন, তখন সেখানে আবূ জাহল উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবূ বকর! তুমি কি মনে কর যে, আল্লাহ এদেরকে খাওয়াতে সক্ষম? হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা বিশ্বাস করি। আবূ জাহল বলল, তবে আল্লাহ এদেরকে খাওয়াচ্ছেন না কেন? জবাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অভাব-অনটন দিয়ে পরীক্ষা করেন যে, তারা ধৈর্য ধরতে পারে কিনা? আবার কাউকে অঢেল ধনসম্পদ দান করেও পরীক্ষা করেন যে, সে কি সম্পদের মোহে পড়ে অহংকারী হয়ে যায়, না আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যয় করে। আর ফকির মিসকিনদেরকে দান খয়রাত করে। এ কথা শুনে আবূ জাহল হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, শপথ খোদার! হে আবূ বকর তুমি নিশ্চিতভাবে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছ। তুমি কি করে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ তাদেরকে খাওয়াতে সক্ষম, অথচ তিনি তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন না; বরং তুমি তাদেরকে খাওয়াচ্ছ, তখনই উপরিউক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, অভাবীদের প্রতি তোমাদের দান-সদকা করার উপদেশ দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তোমাদেরকে তাদের জন্য রিজিকদাতা বানিয়ে দেওয়া হবে। অথবা আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষণ করাতে অক্ষম। আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক হতেই তো তাদেরকে দিতে বলা হয়েছে। আর তোমাদের জন্য তো এতে রয়েছে এক মহাপরীক্ষা। তা হচ্ছে– নিষ্কলুষ হৃদয়ে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে দান-খয়রাত করতে পার কি-না? আর তাদের জন্য রয়েছে অভাব অনটন সত্ত্বেও ধৈর্যধারণের কঠিন পরীক্ষা। অন্যথায় তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে অতিরিক্ত দান করতে সক্ষম হয়েছেন অনুরূপভাবে তাদেরকেও দান করতে পারতেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الخ -এর সাথে পূর্বোক্ত আয়াতের সম্পর্ক : ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর তিনটি সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেছেন।

১. পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ ও অন্যান্য জীব যে মাটিতে বসবাস করে সেই নিষ্প্রাণ মাটিতে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর আরেকটি অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ মানুষকে বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন ও লাভবান হওয়ার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আবার তাদের জন্য স্থল ভাগেও বাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২. পূর্বের আয়াতে আকাশের কতেক নিদর্শনাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে পৃথিবীর কতিপয় নিদর্শনাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাগণের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ দান করেছেন তা দু'ধরনের। প্রথমটি অত্যাবশ্যক। আর দ্বিতীয়টি হলো– অত্যাবশ্যক নয় তবে কল্যাণকর ও সৌন্দর্য বর্ধক। কাজেই প্রথমটি সৃষ্টি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। আর দ্বিতীয় হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধির ও উপভোগ করার জন্য। আর জমিন সৃষ্টি ও এতে প্রাণের সঞ্চার করা প্রথমোক্ত পর্যায়ভুক্ত। কারণ যদি মাটি সৃষ্টি করা না হতো এবং এতে প্রাণের সঞ্চার না করা হতো, তবে মানবের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেত। রাত-দিনও প্রথম শ্রেণিভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহে প্রথমোক্ত শ্রেণির কতিপয় বস্তুর উল্লেখ করার পর এ আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির কয়েকটি বস্তুর বর্ণনা করেছেন। কাজেই জলযান ও স্থলযানের মাধ্যমে ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া শেষোক্ত শ্রেণিভুক্ত হবে। এটা মানুষের আবশ্যক বস্তুসমূহের উপর বাড়তি অনুদান যা মানবের জন্য কল্যাণকর ও সৌন্দর্য বর্ধক। –[কাবীর]

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ الخ আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বের আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহর হিকমত ও কুদরতের প্রকাশ স্থলসমূহের উল্লেখ করে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। তা গ্রহণ করলে পরকালে বেহেশত লাভের মাধ্যমে সীমাহীন শান্তি পাওয়ার ও প্রত্যাখ্যান করলে জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতে মক্কার কাফেরদের বক্রতার বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের অবস্থা হচ্ছে– ছওয়াব ও শান্তির প্রত্যাশা তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আজাব ও গজবের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারে না। তাদের মন মগজ এতই কলুষিত হয়ে রয়েছে যে, কোনো জিনিসই তাদের মাঝে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : প্রথমে পৃথিবীর সৃষ্টি রাজি ও পরবর্তীতে আকাশের বিবরণ এবং এদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও সুনিপুণ কৌশলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সমুদ্র ও তার সংশ্লিষ্ট বস্তু নিয়ে তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশের আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত ভারি ও বোঝাই করা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা নৌযানকে সমুদ্র পৃষ্ঠে চলাচলের উপযোগী করে বানিয়েছেন। পানি তাদেরকে নিমজ্জিত না করে দূরদেশে নিয়ে যায়। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি তাদের সন্তানদেরকে আরোহণ করিয়েছি। বাস্তবিক পক্ষে আরোহণকারী তারা নিজরাই ছিল। মানুষের বোঝা সন্তান-সন্তুতি হওয়ার কারণে এখানে সন্তানদের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে যখন সন্তান চলাফেরার উপযোগী না হয়।

আয়াতের অর্থ হচ্ছে– তোমরাই যে তাতে আরোহণ কর তা নয়; বরং ছোট ছেলে মেয়ে দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকজন এবং তাদের সামনে সবই এসব নৌকায় বহন করা হয়।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ -এর সার হচ্ছে– মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য আল্লাহ শুধু নৌযানই সৃষ্টি করেননি, এর সাথে বাহনও সৃষ্টি করেছেন । আরববাসীগণ এর দ্বারা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী উটকে বুঝেছেন। কারণ অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় উট অধিক বোঝা বহনে সক্ষম হতো। উট বিশাল বিশাল বোঝার স্তূপ বহন করে দেশ দেশান্তরে ছুটে যায়। তাই তারা উটকে سَفِيْنَةُ الْبَرِّ বা মরুর জাহাজ বলত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের আলোকে কুরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ : وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ আয়াতে উট বা অন্য কোনো আরোহী প্রাণীর কথা উল্লেখ না করে তা অস্পষ্ট রেখেছেন। এতে সকল বাহনই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা মানুষের বোঝাসমূহ দূর-দূরান্তে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারে। বর্তমান যুগের উড়োজাহাজও প্রমাণ করে যে, مِنْ مِّثْلِهٖ -এর সবচেয়ে বড় উপমা এটাই। আর নৌযানের সাথে এর সামঞ্জস্য অত্যধিক। সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ সাতার কাটে অথচ ডুবে যায় না। তদ্রূপ উড়োজাহাজও আকাশের বায়ুমণ্ডলে সাতার কাটে অথচ পড়ে যায় না। আর এ কারণেই আল্লাহ مِنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ -কে উহ্য রেখেছেন। যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল যানবাহন তাতে শামিল হতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

"وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ" **-এর তাফসীর :** আল্লাহর নিদর্শনাবলি বিশেষ একদল কাফেরের মন-মস্তিষ্কে কোনোরূপ পরিবর্তন ও প্রভাব ফেলতে পারে না। আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাওহীদ সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করতে সাহায্য করে না। তবে যারা নিরপেক্ষভাবে এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করার ইচ্ছা করে সত্য গ্রহণে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার জন্য তৈরি থাকে। তার হৃদয়ে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর নিদর্শনাবলি প্রভাব বিস্তার করবে। এছাড়া পবিত্র কুরআন তাদেরকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে সত্যকে বিবেচনা করে দেখার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হচ্ছে– তারা এটা দেখতে রাজি নয়। এত কিছুর পরও আল্লাহর অনুগ্রহ তাদেরকে পরিত্যাগ করেনি; বরং তাদেরকে রাসূলগণের মাধ্যমে বারংবার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে।

مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াত দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাফসীর কারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ "যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে"-এর দ্বারা দুনিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আখেরাতের জন্য নেক আমল সংগ্রহ কর আর দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান থেকো। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।
- তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ্ (র.) বলেন, ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যে সকল কাফের মুশরিক আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়েছে, তাদের সেসব ঘটনাবলিকে مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর وَمَا خَلْفَكُمْ দ্বারা আখেরাতের আজাবকে বুঝানো হয়েছে।
- কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, এর দ্বারা আসমানি জমিনি বালা-মসিবতকে বুঝানো হয়েছে।
- কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন– مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ হলো দুনিয়ার আজাব, আর وَمَا خَلْفَكُمْ হলো আখেরাতের আজাব।
- কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো আগের পরের গুনাহসমূহ।
- কেউ কেউ বলেন, مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ অর্থ যা তোমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে, আর وَمَا خَلْفَكُمْ অর্থ যা অপ্রকাশিত রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত উভয় বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর।

"وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ الخ" -এর বিশদ ব্যাখ্যা :

একদলকে অপরের মাধ্যমে রিজিক দানের হিকমত : যখন মুসলমানগণ কাফেরদেরকে গরিব-অভাবীদেরকে সাহায্য করতে এবং ভুখা-নাঙ্গাদেরকে খাওয়াতে বলে– তোমাদেরকে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে অভাবীদেরকে দান কর– তখন তারা বিদ্রূপ করে বলে, যখন তোমরা দাবি কর যে, সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা অথচ তিনি তাদেরকে দেননি– তখন আমরা কেন তাদেরকে দান করব? তোমরা যে আমাদেরকে নসিহত কর যে, তাদেরকে দান করার জন্য; এটাতো তোমাদের বিভ্রান্তি। তাতে আমাদেরকে রিজিকদাতা বানাতে চাচ্ছ। অথচ মূলতঃ এ কাফেররা ও আল্লাহকে রিজিকদাতা হিসেবে স্বীকার করে। যেমন একটি আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়– "وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ" অর্থাৎ আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আকাশ হতে কে পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করে? যদ্দরুন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর জমিনকে ঐ পানির দ্বারা সজীব করেন। জবাবে তারা অবশ্যই বলবে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তারাও আল্লাহ তা'আলাকেই রিজিকদাতা মনে করতেন। কিন্তু মুসলমানদের সাথে বিদ্রূপ করতে গিয়ে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছে মাত্র। আল্লাহ যখন রিজিকদাতা সুতরাং তিনিই গরিবদেরকে দান করবেন। আমরা তাদেরকে দিতে যাব কেন? যেন ঐ আহমকেরা আল্লাহর পথে ব্যয় করা ও গরিব-মিস্‌কিনদেরকে দান করাকে আল্লাহর রিজিকদাতা হওয়ার বিরোধী মনে করেছে। অথচ তারা এটা বুঝিয়ে উঠতে পারেনি যে, সর্ব রিজিকদাতা আল্লাহ তা'আলা কৌশলপূর্ণ রীতি হলো, এক জনকে দান করত তাকে অন্যান্যদের জন্য মাধ্যম বানিয়ে থাকেন। আর উক্ত মাধ্যম-এর দ্বারা অন্যদেরকে রিজিক দান করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর এই ক্ষমতা রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তিনি প্রত্যেককেই বিনা মাধ্যমে সরাসরি রিজিক প্রদান করতে পারেন। যেমন- অসংখ্য কীট-পতঙ্গ ও প্রাণীকূলকে আল্লাহ তা'আলা বিনা মাধ্যমে সরাসরি রিজিক দান করেন। তাদের মধ্যে ধনী-গরিবের নেই। কেউ কাউকে দান করে না। সকলেই কুদরতি দস্তরখান হতে আহার গ্রহণ করে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে জীবন-ধারণের শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার প্রাণ সঞ্চারের নিমিত্তে রিজিক প্রদানের জন্য এক দলকে অপর দলের জন্য মাধ্যম বানিয়েছেন। যাতে ব্যয়কারী ছওয়াবের অধিকারী হয় এবং যাদেরকে দেওয়া হবে তারা কৃতজ্ঞতা পালনকারী হয়। কেননা পরস্পরের প্রয়োজনের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতা নির্ভরশীল। আর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপরই বিশাল মানব সভ্যতার সৌধ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব ঘটলে মুহূর্তের মধ্যে উক্ত সৌধ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে বাধ্য।

মোটকথা, গরিবের প্রয়োজন ধনবানদের সম্পদের আর ধনীদের প্রয়োজন গরিবের পরিশ্রমের। তাদের প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষী। আর চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কারও অন্যের উপর অনুগ্রহেরও তেমন কিছু নেই। যা কিছু একে অপরকে দেয় তার গরজেই দেয়।

মুসলিমগণ কাফেরদেরকে ব্যয় করতে বলার কারণ : প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলিমগণ কাফেরদেরকে কিসের ভিত্তিতে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য বলেছিলেন? অথচ তারা তো আল্লাহর উপর ঈমানই আনেনি। তা ছাড়া শাখামূলক আহকাম দ্বারা তাদেরকে সম্বোধনও করা হয়নি।

তার জবাবে বলা যেতে পারে যে, মুসলিমগণ কোনো শরয়ী নির্দেশ হিসেবে তাদেরকে তা বলেননি; বরং মানবিক সাহায্য এবং ভদ্রতার প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী তা বলেছেন।

ذُرِّيَّةً শব্দে বর্ণিত অর্থসমূহ : কুরআনের আয়াত إِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةً -এর মধ্যস্থ ذُرِّيَّةً -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন।

- ذُرِّيَّةً -এর অর্থ হলো اَلْاٰبَاءُ وَالْاَجْدَادُ তথা পূর্ব পুরুষগণ।
- আল্লামা ওয়াহেদীর মতে, اَلذُّرِّيَّةُ تَقَعُ عَلَى الْاٰبَاءِ كَمَا تَقَعُ عَلَى الْاَبْنَاءِ অর্থাৎ ذُرِّيَّةً শব্দটি যেরূপভাবে অধঃস্তন পুরুষকে বুঝায় অনুরূপভাবে উর্ধ্বতন পুরুষকেও বুঝায়।
- শায়খ আবূ ওসমানের মতে, سُمِّيَ الْاٰبَاءُ ذُرِّيَّةً لِاَنَّ مِنْهُمْ ذَرْءَ الْاَبْنَاءِ অর্থাৎ যেহেতু পূর্বপুরুষগণ হতে সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে তাই তাদেরকে ذُرِّيَّةً বলা হয়।
- ذُرِّيَّةً -এর অর্থ হচ্ছে নারীদের পেটের জমাট বীর্য। ঐ পেটকে পরিপূর্ণ নৌকার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।
- কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তিটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]
- কারো মতে ذُرِّيَّةً দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল পূর্ব পুরুষ যাদেরকে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করানো হয়েছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ -এর মধ্যস্থিত যমীরের মারজি' : উক্ত আয়াতে যমীরদ্বয়ের প্রত্যাবর্তনস্থল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে।

১. হযরত নাফে' (র.) ذُرِّيَّاتِهِمْ বহুবচনের সাথে পড়েছেন। তখন اٰيَةٌ لَّهُمْ -এর هُمْ এর যমীরের মারজি' হবে اَهْلِ مَكَّةَ আর وَاٰيَةٌ هُمْ -এর যমীরের মারজি' হবে اَلْاُمَمُ الْمَاضِيَةُ তথা পূর্ববর্তী জাতিসমূহ। আয়াতটির অর্থ এরূপ হবে যে, ذُرِّيَّتَهُمْ -এর لِاَهْلِ مَكَّةَ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অর্থাৎ মক্কাবাসীদের আরেকটি নিদর্শন হলো– আমি বিগত জাতিসমূহের সন্তানদেরকে বোঝাই করা নৌকায় আরোহণ করেছি।

২. আয়াতস্থ উভয় যমীরের মারজি' হলো اَهْلِ مَكَّةَ তখন আয়াতের অর্থ হবে– وَاٰيَةٌ لِاَهْلِ مَكَّةَ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةَ اَهْلِ مَكَّةَ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অর্থাৎ মক্কাবাসীদের আরেকটি নিদর্শন হলো– আমি মক্কার সন্তানদেরকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ আয়াতে مِثْلِهِ -এর অর্থ : এখানে مِثْلِهِ শব্দটির একাধিক অর্থ হতে পারে :

✪ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) ও কাতাদাহ (র.)-এর মতে আয়াতে مِثْل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উট। অর্থাৎ আল্লাহ উটকে মরুর জাহাজের ন্যায় বানিয়েছেন।

✪ অথবা, আয়াতে مِثْل দ্বারা যে সকল প্রাণীর পরিবহনের ক্ষমতা রয়েছে তাদের সকলকেই বুঝানো হয়েছে।

✪ হযরত যাহহাক (র.)-এর মতে, হযরত নূহ (আ.)-এর পরে যে সকল নৌকা তৈরি করা হয়েছে তাদেরকে مِثْل দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

✪ আবূ মালিক (র.) বলেছেন, এখানে مِثْل দ্বারা সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌযানকে বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বড় বড় নৌযানের অনুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছে।

✪ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, এ আয়াতে مِثْل অর্থ নৌকা হবে। কেউ কেউ এটাকেই সহীহ বলেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٨. وَيَقُولُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ بِالْبَعْثِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ .

৪৮. আর তারা বলে কখন এ ওয়াদা কার্যকর হবে? পুনরুত্থানের ব্যাপারে [কৃত ওয়াদা] যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক এ ব্যাপারে।

٤٩. قَالَ تَعَالٰى مَا يَنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً وَهِيَ نَفْخَةُ إِسْرَافِيْلَ الْأُوْلٰى تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ أَصْلُهُ يَخْتَصِمُوْنَ نُقِلَتْ حَرَكَةُ التَّاءِ إِلَى الْخَاءِ وَأُدْغِمَتْ فِي الصَّادِ أَيْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ عَنْهَا بِتَخَاصُمٍ وَتَبَايُعٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يَخْصِمُوْنَ كَيَضْرِبُوْنَ أَيْ يَخْصِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

৪৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- তারা অপেক্ষা করছে না - প্রতীক্ষা করছে না- তবে একটি বিকট ধ্বনির আর তা হলো হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার। তা তাদেরকে ধরাশায়ী করবে এমতাবস্থায় যে, তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকবে। (يَخِصِّمُوْنَ -এর ص অক্ষরটি) তাশদীদ যোগে হবে। এর প্রকৃত রূপ يَخْتَصِمُوْنَ . تَا -এর হরকতকে স্থানান্তর করতঃ خ -এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং تَا -কে ص -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ (বিকট ধ্বনিটি হলো) এমতাবস্থায় যে, তারা তা হতে বেখবর ছিল পরস্পর বাক-বিতণ্ডা, লেন-দেন ও পানাহার ইত্যাদিতে মশগুল থাকার কারণে। অন্য এক কেরাতে يَخْصِمُوْنَ [বাবে ضَرَبَ হতে] يَضْرِبُوْنَ -এর ওজনে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ তারা একে অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে।

٥٠. فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً أَيْ بِأَنْ يُوْصُوْا وَلَا إِلٰى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ وَأَشْغَالِهِمْ بَلْ يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا .

৫০. আর তারা না অসিয়ত করতে সক্ষম হবে (تَوْصِيَةً) অর্থাৎ অসিয়তকরণ। আর না তারা তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেতে পারবে। তাদের বাজারসমূহ ও কর্মক্ষেত্রসমূহ হতে; বরং তথায় তারা মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَخِصِّمُوْنَ -এর মধ্যে বর্ণিত কেরাতসমূহ : يَخِصِّمُوْنَ শব্দটি পাঁচটি কেরাত রয়েছে-

১. يَخَصِّمُوْنَ অর্থাৎ يَا . এবং خ তে যবর আর ص -এ তাশদীদযুক্ত যবর দ্বারা পড়া। এটা আবূ আমের ও ইবনে কাছীর (র.)-এর অভিমত।

২. يَخْصِمُوْنَ অর্থাৎ يَا . -এর উপর যবর خ সাকিন এবং ص -এর নিচে যের এটা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ওয়াছছাব, আ'মাশ ও হামযা (র.)-এর অভিমত।

৩. يَخِصِّمُوْنَ অর্থাৎ يا যবরযুক্ত, خ -এর নিচে যের এবং ص -এর নিচে তাশদীদযুক্ত যের। এটা আসিম ও কেসায়ী (র.)-এর অভিমত।

৪. ইবনে জুবায়ের, আবূ বকর ও হাম্মাদ (র.) কর্তৃক আসিম-এর বর্ণনা মতে يَا . এবং خَا . -এর নিচে যের এবং ص -এর উপর তাশদীদসহ যের যোগে পড়া يِخِصِّمُوْنَ।

৫. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর কেরাতে يَخْتَصِمُوْنَ রয়েছে। তাশদীদের অবস্থায় মূলত يَخْتَصِمُوْنَ ছিল। تَا . -এর হরকতকে তার পূর্বের خ এ দিয়ে تَا -কে ص দ্বারা পরিবর্তন করে ص কে ص এর মধ্যে إِدْغَامْ করা হয়েছে ফলে يَخَصِّمُوْنَ হয়েছে।

إِنْ كُنْتُمْ الخ শর্তের جَزَاء কোথায় এবং এর দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? إِنْ كُنْتُمْ শর্তে জাযা হচ্ছে উহ্য। মূল বাক্যটি এরূপ হবে- قَالُوْا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِىْ دَعْوَا كُمْ بِوُقُوْعِ الْبَعْثِ فَقُوْلُوْا مَتٰى يَكُوْنُ ذٰلِكَ অর্থাৎ পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কৃত দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে বল তা কখন সংঘটিত হবে।

এ আয়াতে কাফেররা নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীগণকে সম্বোধন করত উপরিউক্ত বক্তব্য প্রদান করেছে। কেননা তারাই তো কিয়ামত পুনরুত্থান ও হাশর-নাশরের দাবিদার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে কাফেরদের চিন্তাধারা এবং আকীদা বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আজাব ও গজবের যে ভয় প্রদান করেছেন এবং নিয়ামত ও পুরস্কারের যে অঙ্গীকার করেছেন একাধিকবার পুনরুত্থানের যে উল্লেখ করেছেন কাফেরদের ধারণা মতে এর কোনোই বাস্তবতা নেই তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ধারণা পূর্ণরূপে অবাস্তব মনে করে এর প্রতি কটাক্ষ করারও দুঃসাহস দেখিয়েছে।

কিয়ামতের ব্যাপারে কাফেররা প্রশ্ন করল কেন? পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কাফেররা কিয়ামতের ব্যাপারে উপহাসছলে প্রশ্ন করেছে বাস্তবতা জানার উদ্দেশ্যে নয়। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তারা জানার জন্যই প্রশ্ন করেছে তবুও আল্লাহর হিকমতের চাহিদা হচ্ছে- কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কাউকেও দান করবেন না। এমনকি এ জ্ঞানের খবর তাঁরই প্রেরিত পয়গম্বরগণকেও প্রদান করেননি।

যদি ঐ ব্যক্তিদের উক্ত প্রশ্ন বাস্তব ঘটনা জানার জন্যও হয় তবুও অনর্থক হবে। কাজেই এর জবাবে কিয়ামতের বর্ণনা না দিয়ে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যা নিশ্চিতভাবে সংঘটিতব্য তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হচ্ছে বিবেকবানদের কাজ। কবে হবে কখন হবে এ সকল নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনোই যুক্তি থাকতে পারে না।

মোটকথা হলো, মানুষের চাহিদার কারণে আল্লাহর পরিকল্পনায় কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী কিয়ামত যথা সময়েই সংঘটিত হবে। কেউ কোনো ব্যাপারে তাঁকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কারো মর্জি মতো এটাকে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হবে না।

কিভাবে ও কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে? কিয়ামত সংঘটিত হবে এত বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে এর দিন তারিখ গোপন রেখেছেন। এতদ্ব্যতীত এর সন তারিখ জানার মধ্যেও কোনো কামিয়াবি নেই।

কিয়ামত কিভাবে হবে? কিয়ামত এমন অবস্থায় আসবে যখন লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মশগুল থাকবে। কেউ হয়তো ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এমনকি কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকবে। কিয়ামত যে কায়েম হবে এ কথাটি কখনও তাদের স্মরণ হয় না। এমন অবস্থাতেই কিয়ামত এসে যাবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দু' ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে, ব্যবসা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বিক্রেতা এখন কাপড় সরিয়ে নেয়নি। এমন আকস্মিক অবস্থায় কেয়ামত কায়েম হবে। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, মানুষ উটের দুধ নিয়ে আসবে, পান করার পূর্বেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়। মানুষ খাবারের লোকমা মুখে দিবে কিন্তু খাওয়ার পূর্বেই কিয়ামত হয়ে যাবে। আর খেতে পারবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ফারিবাবীর সূত্রে অন্য একখানা হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- কিয়ামত এমন অবস্থায় হবে যখন লোকেরা বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকবে, কাপড় পরিমাপ করবে উটের দুধ দোহন করবে এবং এমনি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবে। [আর এমন অবস্থায় কিয়ামত হবে।] -[তাফসীরে নূরুল কুরআন খণ্ড ২৩; পৃ. ৩২-৩৩]

উল্লিখিত আয়াতে اَلْوَعْدُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতে اَلْوَعْدُ দ্বারা পুনরুত্থান সম্পর্কিত অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে। মহানবী ﷺ যে ব্যাপারে কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

সারকথা হলো, মহানবী ﷺ -এর কিয়ামত, ভালো মন্দের হিসাব-নিকাশ, পুনরুত্থান, ছওয়াব ও আজাবের ব্যাপারে কৃত সকল প্রতিশ্রুতিই এখানে اَلْوَعْدُ -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিশ্চয় কাফেররা কিয়ামতকে স্বীকারই করে না এরপরও مَا يَنْظُرُوْنَ **আয়াতে আল্লাহ কিভাবে বললেন তারা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে?** মহানবী ﷺ-কে যদিও কাফেররা বারবার অহেতুক প্রশ্ন করে জর্জরিত করছিল। তবে তারা একবারের জন্যও ব্যাপারটির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা ও চিন্তা করেনি। এর সন তারিখ জানার চেয়েও যে, কিয়ামতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা অধিক শ্রেয় তা একবারের জন্যও ভেবে দেখেনি; বরং তারা এতই অসতর্ক ও বেখবর হয়ে রয়েছে যে, তারা কেবলমাত্র এরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত আসুক পরে দেখা যাবে কি করতে হয়? আল্লাহ তা'আলা এ কারণেই বলেছেন যে, তারা কেয়ামতের অপেক্ষা করছে। আর এটাই এ আয়াতের সঠিক অর্থ। এর অর্থ এটা নয় যে, কাফেররা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে এর জন্য অপেক্ষা করছে এটা বুঝানো এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً **হতে** اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ **পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ -এর সাথে কাফেরদের তাওহীদ ছাড়া কিয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কেও মতবিরোধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করছেন যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। কেবলমাত্র একটি বিকট ধ্বনির মাধ্যমে তা সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে কাফেররা পূর্ব কোনো সতর্ক বার্তাই সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে না। নিশ্চিতরূপে তারা ধারণা করে থাকবে যে, কিয়ামত বলতে কিছুই হবে না। তখন তারা নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত থাকবে। হাতের কাজও সমাধা করার সুযোগ পাবে না। হঠাৎ করেই কিয়ামত এসে যাবে। পৃথিবীর সব কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। কেউ কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়ারও অবকাশ পাবে না। আর কেউ কর্মস্থল হতে স্বীয় বাড়ি ফিরে যাওয়ারও ফুরসত পাবে না।

সারকথা হলো, তোমরা যে কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছ তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর এমন হঠাৎ করে সংঘটিত হবে যে, তোমরা বুঝেই উঠতে পারবে না। আর এর ছোবল ও আঘাত এতই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ হবে যে, এর ধকল কেউই সহ্য করতে সক্ষম হবে না। ছোট বড় সকলকেই তার হস্তে অসহায়ের মতো জীবন দিতে হবে।

আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতে যে বিকট শব্দের কথা বলা হয়েছে তা হযরত ইস্রাফীল (আ.)-এর শিঙ্গার ফুৎকার। এটা হবে প্রথম ফুৎকার। এর মাধ্যমেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এর পরবর্তী ফুঁকে পুনরুত্থান হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫১. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ هُوَ قَرْنُ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ لِلْبَعْثِ وَبَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً فَاِذَاهُمْ الْمَقْبُوْرُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ الْقُبُوْرِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ يَخْرُجُوْنَ بِسُرْعَةٍ ـ

৫২. قَالُوْا اَىِ الْكُفَّارُ مِنْهُمْ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكُنَا وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا فِعْلَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا لِاَنَّهُمْ كَانُوْا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ نَائِمِيْنَ لَمْ يُعَذَّبُوْا هٰذَا اَىِ الْبَعْثُ مَا اَىِ الَّذِىْ وَعَدَ بِهِ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ فِيْهِ الْمُرْسَلُوْنَ اَقَرُّوْا حِيْنَ لَا يَنْفَعُهُمُ الْاِقْرَارُ وَقِيْلَ يُقَالُ لَهُمْ ذٰلِكَ ـ

৫৩. اِنْ مَا كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا عِنْدَنَا مُحْضَرُوْنَ ـ

৫৪. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

অনুবাদ :

৫১. আর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে. এটা পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার। উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। তখন তারা কবরস্থ লোকজন কবরসমূহ হতে সমাধিস্থল হতে তাদের প্রভুর নিকট দৌড়ে আসবে, তড়িঘড়ি বের হয়ে আসবে।

৫২. তারা বলবে অর্থাৎ তাদের মধ্যকার কাফেররা বলবে হায়! অবহিতকরণের জন্য নিপাত আমাদের ধ্বংস আমাদের। এটা মাসদার, তবে এটার শব্দ হতে কোনো فِعْل নির্গত হয় না। আমাদেরকে কে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে জাগ্রত করল? কেননা, কিয়ামত ও পুনরুত্থানের ফুৎকারদ্বয়ের মাঝামাঝি সময় তারা নিদ্রিত ছিল। তাদেরকে তখন আজাব দেওয়া হয়নি। এটা অর্থাৎ পুনরুত্থান তা (অর্থাৎ) যা ওয়াদা করেছেন– তার সাথে দয়াময় (আল্লাহ) আর সত্য বলেছেন– এর ব্যাপারে রাসূলগণ। এমন সময় তারা তা স্বীকার করবে যখন উক্ত স্বীকৃতি তাদের কোনো উপকারে আসবে না। কেউ কেউ বলেছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে তা বলা হবে।

৫৩. নয় (اِنْ শব্দটি مَا এর অর্থে ব্যবহৃত) তা তবে একটি বিকট ধ্বনি। সুতরাং তখন তাদেরকে একযোগে আমার কাছে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

৫৪. আজ কারও উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না তবে সে প্রতিদানই দেওয়া হবে যা তোমরা আমল করেছ।

তাহকীক ও তারকীব

يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا الخ আয়াতে يَاوَيْلَنَا -এর কেরাতসমূহ : এখানে তিনটি কেরাত প্রসিদ্ধ রয়েছে।

১. يَا وَيْلَنَا এটাই বিশুদ্ধ কেরাত যা মাসহাফে ওসমানীতে বিদ্যমান।

২. يَا وَيْلَتَنَا অর্থ وَيْل এবং نَا-এর মাঝে একটি تَ বৃদ্ধি করে পড়া। এটা ইবনে আবী লায়লা হতে বর্ণিত।

৩. يَا وَيْلَتَا অর্থাৎ শেষে نُوْن-এর স্থানে تَاء এনে পাঠ করা। এটা হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا -এর মধ্যস্থ مَنْ -এর কেরাতসমূহ : এখানে مَنْ -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে।

১. مَنْ بَعَثَنَا অর্থাৎ مَن -এর মীমে যবর এবং بَعَثَنَا -এর ث -এর মধ্যেও যবর হবে। এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত ও মাসহাফে ওসমানীতে বিদ্যমান।

২. مِنْ بَعْثِنَا অর্থাৎ মীম ও ث উভয়ের নিচে যের হবে। এরূপ কেরাত হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।

৩. مَنْ وَهَبَنَا এ কেরাত হযরত উবাই ইবনে জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ الخ **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আয়াতের অর্থ হচ্ছে– আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া মাত্র তারা কবর হতে বের হয়ে প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে। অর্থাৎ যখন দ্বিতীয়বার হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন তখন সাথে সাথে অনতিবিলম্বে সকল মানুষ কবর হতে বের হয়ে আল্লাহর মহান দরবারে হাজির হওয়ার জন্য চলতে থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান থাকবে।

ইবনে আবী হাতিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দিলে সমস্ত মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। আর এর চল্লিশ বছর পর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিলে সকলে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে নিয়ে যাবেন।

আলোচ্য আয়াতে اجداث এটা جدث -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো কবর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সকল মানুষ জীবিত হবে এবং হাশরের ময়দানের দিকে দ্রুত গমন করতে থাকবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে লোকেরা সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়বে। কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতির তুলনায় তারা কবরের কষ্টকে সহজ মনে করবে।

দুটি বিরোধী বিষয়ের মধ্যে ফুদ্বয়ের প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি : প্রলয় এবং পুনরুত্থান মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার কুদরত ও সীমাহীন কৌশলেরই পরিচায়ক। মূলত শিঙ্গায় ফুৎকার একটি সংকেত মাত্র। এর না প্রলয় সাধনের ক্ষমতা আছে আর না পুনরুত্থান সংঘটনের সামর্থ্য; বরং প্রলয় ও পুনর্জীবন আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় কুদরতে করে থাকেন।

আর যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, শিঙ্গার ফুৎকারের প্রভাবেই তা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই তা অসম্ভব নয় যে, তিনি একই বস্তুর প্রভাবে দ্বিবিধ কার্য সম্পন্ন করে নিবেন। এ পর্যায়ে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, শিঙ্গার কার্য হলো বস্তুর মধ্যে কম্পন ও স্থানান্তরের সৃষ্টি করা।

যেহেতু প্রথম ফুৎকার কার্যকরী হয়েছে মানুষ ও অন্যান্য জীবিত প্রাণী ও সংঘটিত বস্তুর উপর সেহেতু তাদের মধ্যে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে এরা লণ্ডভণ্ড হয়ে প্রলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় ফুৎকার কার্যকরী হয়েছে ধ্বংস প্রাপ্ত বস্তুরাজির উপর। তাদের বিভিন্ন অংশে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে তারা মিলিত হয়ে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে– তথা পুনর্জীবনের সৃষ্টি হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

দু ফুৎকারের মধ্যবর্তী ব্যবধান ও ফুৎকারের সংখ্যা : জালালাইন গ্রন্থকার (র.) আল্লামা মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশ বৎসর সময়ের দূরত্ব রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) এ মতের সমর্থনে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসখানা নিম্নরূপ–

رَوَى الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً اَلْاُوْلٰى يُمِيْتُ اللّٰهُ بِهَا كُلَّ حَيٍّ وَالْاُخْرٰى يُحْيِي اللّٰهُ بِهَا كُلَّ مَيِّتٍ.

অর্থাৎ হযরত হাসান হতে মোবারক ইবনে ফাযালাহ বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান হবে। প্রথম ফুৎকারে আল্লাহ সকল জীবিতকে মৃত্যু দিবেন এবং দ্বিতীয় ফুৎকারে সকলকে পুনর্জীবিত করবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গা মুখে নিয়ে আকাশ পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনবার ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথমটিকে نَفْخَةُ الْفَزْعِ তথা ভীতির ফুৎকার বলে। এটা আকাশ পাতালের সকল কিছুকে প্রকম্পিত করে তুলবে। এতে সবকিছু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় ফুৎকারকে نَفْخَةُ الْخَفْىِ বা বেহুঁশির ফুৎকার বলে। এটা শোনা মাত্রই সকল কিছু বেহুঁশ ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ ছাড়া তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমূল পরিবর্তন করে জমিনকে ভিন্নরূপ প্রদান করা হবে। উকাজ বাজারে বিক্রীত চাদরের ন্যায় তাকে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হবে যে তার কোথাও সামান্যতম ভাঁজও থাকবে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা জমিনকে একটু ধাক্কার মতো দেবেন। এটা শুনে যে যেখানে মৃত্যুবরণ করে পড়ে রয়েছিল তথা হতে পরিবর্তিত জমিনের বুকে উঠে দাঁড়াবে। আর এটাই হচ্ছে তৃতীয় ফুৎকার। এটাকে বলা হয় نَفْخَةُ الْقِيَامِ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ফুৎকার।

Free @ www.e-ilmweebly.com

يَنْسِلُوْنَ ... فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ এবং فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার সমন্বয় : رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কবরবাসী কবর হতে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে। অন্য আয়াত فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা কবর হতে উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। আয়াতদ্বয়ের মাঝে প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বৈপরীত্য দেখা যায়। এর সমাধান কল্পে মুফাসসিরগণ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছেন। অর্থাৎ তারা কবর হতে উঠেই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকবে। এরপর দ্রুত হাশরের মাঠের দিকে ছুটে চলবে।

অন্যান্য আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ মানুষদেরকে ডেকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে।

মোটকথা হলো, তারা প্রথমবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং পরবর্তীতে ফেরেশতাগণের আহ্বানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দৌড়ে ময়দানে মাশহারে যেতে বাধ্য থাকবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, দাড়ানো আর দৌড়ানো এক জিনিস নয় এ কথা সত্য, কিন্তু দাঁড়ানো সম্পূর্ণরূপে দৌড়ানোর পরিপন্থি নয়। আর দাঁড়ানো দৌড়ানোকেই অস্বীকার করে না। অর্থাৎ কারো দাঁড়িয়ে থাকা দৌড়ানোকে অস্বীকার করে না। কারণ পথচারী দাঁড়ানো অবস্থায় হাঁটে এবং প্রয়োজনে দৌড় দিয়ে থাকে। কাজেই আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনোই গরমিল নেই।

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর তাদের কবর কোথায় হবে? : কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর তাদের কবর কোথায় হবে এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের অভিমত হলো, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের দেহের অংশসমূহ জমাট করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখবেন। যেখানে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল সেখান থেকে সে বের হয়ে আসবে। অথবা اَجْدَاثٌ দ্বারা আলমে বরযখকে বুঝানো হয়েছে।

পাপী অনুগ্রহকারীর দিকে দৌড়ে আসে না। এরপরও আল্লাহ কিভাবে বললেন যে, কাফেররা আল্লাহর দিকে দৌড়ে যাবে? মুফাসসিরগণ এর জবাবে বলেছেন– কাফেররা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে ছুটে যাবে না; বরং তাদেরকে ফেরেশতাগণ তাড়িয়ে নেওয়ার কারণে তারা দৌড়ে যেতে বাধ্য হবে। যেরূপ অন্য আয়াতে রয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ অর্থাৎ প্রত্যেকের সাথেই একজন বিতাড়নকারী রয়েছে।

কাফেররা কিভাবে বলবে "يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا الخ" অথচ কবরে তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে?

১. কেউ কেউ বলেছেন, যদিও কাফেরদেরকে কবরের আজাব দেওয়া হবে কিন্তু দুই ফুৎকারের মাঝামাঝি সময়ে তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে না। সুতরাং হাশরের ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তারা হায় হুতাশ করে বলবে হায়! ধ্বংস আমাদের (জন্য অবধারিত) কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল হতে জাগ্রত করল।

২. কাফেররা যদিও কবরে আজাবে নিপতিত ছিল এবং তথায় তাদের আরামের জিন্দেগী ছিল না। তথাপি কিয়ামতের প্রথমদিকের আজাবের তুলনায়ও কবরের সেই আজাব অতি নগণ্য মনে হবে। মনে হবে তা যেন কোনো আজাবই ছিল না। সুতরাং তারা আফসোস করে বলবে– কে আমাদেরকে কবর হতে উত্তোলন করল, কবরে থাকাই আমাদের জন্য শ্রেয় ছিল।

আলোচ্য আয়াতে وَيْل-কে আহ্বানের হিকমত : বিপদ অত্যাসন্ন হয়ে পড়লে অথবা মসিবতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে মানুষ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এমন বিপদ সংকুল মুহূর্তে অস্থির হয়ে তখন সে ধ্বংসকে ডাকতে উদ্যত হয়; লয় ও ধ্বংস হয়ে যাওয়াকেই তখন সে বিপদ হতে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে মনে করে থাকে। সম্ভবত হাশরের ময়দানে উপরিউক্ত কারণে কাফেররা ধ্বংস (وَيْل) -কে আহ্বান করবে হাশরের কঠিন শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মৃত্যুকে কামনা করবে।

আল্লাহর বাণী 'مَنْ بَعَثَنَا' -এর মধ্যস্থিত প্রশ্নের উত্তর : কিয়ামতের দিবস হযরত ইস্রাফীল (আ.)-এর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার পর সমস্ত মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে যাবে। তারা হাশরের ময়দানের দিকে ত্রস্ত পদে ছুটবে আর বলবে– يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا হায়রে আমাদের নিপাত (হোক) কে নিদ্রাস্থল হতে আমাদেরকে জাগিয়ে আনল। এক মহা বিভীষিকার সামনে আমাদেরকে কে দাঁড় করিয়ে দিল।

উক্ত প্রশ্নের জবাব বিলুপ্ত রয়েছে। পরবর্তী আয়াত– "هٰذَا مَا وَعَدَ الخ" দ্বারা তা বোধগম্য হয়। আর তা হলো هٰذَا بَعْثٌ অর্থাৎ যা তোমাদেরকে শয়নস্থল হতে উঠিয়ে হাশরে আল্লাহর বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তা হলো পুনরুত্থান– এটা আল্লাহর কৃত ওয়াদার প্রতিফলন।

অত্র আয়াতে مَنْ بَعَثَنَا -এর সাথে يَا وَيْلَنَا -এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তাদেরকে শয়নস্থল হতে জাগ্রত করার নিদ্রাস্থল হতে উঠিয়ে আনার কারণে ধ্বংস কামনার কি সূত্র থাকতে পারে?

এটা তো দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পরে আলমে বারযখে তাদের মধ্যে অনুভূতির সঞ্চার করে দেওয়া হলো যাতে তারা সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করতে পারত। তখন তাদেরকে সীমিত পরিমাণ আজাবও দেওয়া হয়েছে। যদিও কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী হযরত ইস্রাফীল (আ.)-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকার তথা কিয়ামত হতে পুনরুত্থান এর মাঝামাঝি সময় তাদেরকে কোনো আজাব দেওয়া হয়নি। সে যাই হোক, হাশরের আজাবের তুলনায় কবরের আজাব ছিল অতি নগণ্য। তা ছাড়া এ প্রথম তারা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করতে পারল যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণ তাদেরকে যে অন্তহীন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা সমাগত। সুতরাং তখন তারা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে বলতে থাকবে এটাই কি সেই পুনরুত্থান? তাহলে তো এ অনন্ত শাস্তি হতে আমাদের জন্য ধ্বংস হয়ে যাওয়াই শ্রেয় হবে।

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ -এর প্রবক্তা কে? এ আয়াতের প্রবক্তা নির্ণয়ে মুফাসসিরগণ একাধিক মন্তব্য করেছেন।

- হযরত মুজাহিদ (র.)-এর সমর্থিত মতানুযায়ী এ আয়াতের প্রবক্তা হচ্ছেন মু'মিনগণ তারা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে একথা বলবেন।
- হযরত কাতাদাহ্ (র.) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতানুসারে আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দিয়েছেন তিনি কাফেরদেরকে সম্বোধন করে এ কথা বললেন।
- হযরত ফাররা ও অপর একদল মুফাসসিরের মতে ফেরেশতাগণ কাফেরদেকে লক্ষ্য করে এ উক্তি করেছেন।
- কারো কারো এর প্রবক্তা কাফেররা নিজেই তারা সেদিন পুনরুত্থান দিবসকে স্বীকার করে বলবে– এটাতো সেই পুনরুত্থান আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশ্য তাদের তখনকার স্বীকারোক্তির কোনোই কাজে আসবে না।

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ الخ আয়াতে هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কি? এখানে هٰذَا -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ণয়ে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে–

- পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত مَرْقَدِنَا হচ্ছে এর মারজি' তখন এটা مَرْقَدِنَا -এর সিফাত হবে। আর বাক্যটি هٰذَا পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যাবে। আর مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ الخ বাক্যটি পৃথক বাক্য হবে। অর্থ– কে আমাদেরকে এ শয্যাস্থান হতে তুলে আনল।
- অথবা اَلْبَعْثُ হচ্ছে– هٰذَا এর মারজি'। তখন বাক্যটি অর্থ এরূপ হবে– এটা সেই পুনরুত্থান করুণাময় আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর রাসূলগণ যার সততা ঘোষণা করেছেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٥. اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ بِسُكُوْنِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا عَمَّا فِيْهِ اَهْلُ النَّارِ مِمَّا يَلْتَذُّوْنَ بِهٖ كَافْتِضَاضِ الْاَبْكَارِ لَا شَغْلَ يَتْعَبُوْنَ فِيْهِ لِاَنَّ الْجَنَّةَ لَا نَصَبَ فِيْهَا فٰكِهُوْنَ نَاعِمُوْنَ خَبَرٌ ثَانٍ لِاِنَّ وَالْاَوَّلُ فِىْ شُغُلٍ ـ

৫৫. নিঃসন্দেহে জান্নাতীগণ মগ্ন হয়ে– (شُغُلٍ -এর) غ অক্ষরটি সাকিনও হতে পারে। পেশ যোগেও হতে পারে অর্থাৎ জাহান্নামিরা যেই [মসিবতের] অবস্থায় থাকবে জান্নাতিরা তা হতে মুক্ত থাকবে। উপভোগ্য বিষয়াদিতে [মশগুল থাকবে] যেমন কুমারী মেয়েদেরকে উপভোগ করা। এমন কিছুতে লিপ্ত হওয়া নয় যা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হবে। কেননা, জান্নাতে কোনোরূপ কষ্টের বালাই নেই। উপভোগ করবে। সম্ভোগ করবে। এটা (فٰكِهُوْنَ) اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর। তার প্রথম خَبَرٌ হলো فِىْ شُغُلٍ।

٥٦. هُمْ مُبْتَدَأٌ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ اَوْ ظِلٍّ خَبَرٌ اَىْ لَا تُصِيْبُهُمُ الشَّمْسُ عَلَى الْاَرَآئِكِ جَمْعُ اَرِيْكَةٍ وَهِىَ السَّرِيْرُ فِى الْحَجَلَةِ اَوِ الْفُرُشِ فِيْهَا مُتَّكِـُٔوْنَ ـ خَبَرٌ ثَانٍ مُتَعَلِّقٌ عَلٰى ـ

৫৬. তারা (هُمْ) মুবতাদা এবং তাদের স্ত্রীগণ ছায়া তলে থাকবে (ظِلٰلٍ শব্দটি) ظُلَّةٌ অথবা ظِلٌّ -এর বহুবচন। এটা خَبَرٌ অর্থাৎ তাদেরকে সূর্যের কিরণ স্পর্শ করবে না। খাটসমূহের উপর– এটা (اَرَآئِكَ) اَرِيْكَةٌ -এর বহুবচন। আর তা হলো (নব দম্পত্তির জন্য তৈরি) গম্বুজ (বা মশারি) বিশিষ্ট শোয়ার খাট। অথবা, তৎ মধ্যস্থ (পাতানো) বিছানা। তারা হেলান দিয়ে থাকবে। (مُتَّكِـُٔوْنَ) দ্বিতীয় খবর। তা عَلٰى -এর সাথে মুতা'আল্লিক।

٥٧. لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ فِيْهَا مَا يَدَّعُوْنَ يَتَمَنَّوْنَ ـ

৫৭. তাদের জন্য তথায় ফল-ফলাদি থাকবে। আর তাদের জন্য তথায় আরো থাকবে যা তারা কামনা করবে– আকাঙ্ক্ষা করবে।

٥٨. سَلَامٌ مُبْتَدَأٌ قَوْلًا اَىْ بِالْقَوْلِ خَبَرُهٗ مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ بِهِمْ اَىْ يَقُوْلُ لَهُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ـ

৫৮. তাদের প্রতি সালাম (سَلَامٌ) মুবতাদা। বক্তব্যের আকারে– قَوْلًا শব্দটি بِالْقَوْلِ -এর অর্থে হয়েছে। তার خَبَرٌ হলো– দয়াময় প্রভুর পক্ষ হতে তাদের উপর। অর্থাৎ তাদেরকে [আল্লাহ তা'আলা] বলবেন, "তোমাদের প্রতি সালাম"।

٥٩. وَيَقُوْلُ امْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ اَىْ اِنْفَرِدُوْا عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ ـ

৫৯. আরো বলবেন– হে পাপীরা আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। অর্থাৎ তারা ঈমানদারগণের সাথে মিশ্রিত থাকা অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা ঈমানদারদের হতে আলাদা হয়ে যাও।

٦٠. اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ اٰمُرْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ عَلٰى لِسَانِ رُسُلِىْ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج لَا تُطِيْعُوْهُ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ ـ

৬০. আমি কি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেইনি? তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করিনি? হে বনু আদম! আমার রাসূলগণের ভাষায়– তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না। অর্থাৎ তার অনুসর করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সুস্পষ্ট শত্রুতা [রয়েছে তার সাথে]।

٦١. وَاَنِ اعْبُدُوْنِیْ ط وَحِّدُوْنِیْ وَاَطِیْعُوْنِیْ هٰذَا صِرَاطٌ طَرِیْقٌ مُّسْتَقِیْمٌ -

৬১. আর ইবাদত করো আমার অর্থাৎ আমার একত্ববাদে বিশ্বাস পোষণ করো এবং আমার অনুসরণ করো। এটাই পথ– রাস্তা-সরল-সঠিক।

٦٢. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا خَلْقًا جَمْعُ جَبِیْلٍ كَقَدِیْمٍ وَفِیْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْبَاءِ كَثِیْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ عَدَاوَتَهٗ وَاِضْلَالَهٗ اَوْ مَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فَتُؤْمِنُوْنَ -

৬২. অথচ শয়তান তোমাদের মধ্য হতে বিভ্রান্ত গোমরাহ করেছে লোকজনকে মানুষদেরকে (جِبِلَّةً) এটা جَبِیْلٌ -এর বহুবচন। যেমন– قَدِیْمٌ অন্য এক কেরাত بَا অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট। অনেক তোমরা কি বুঝে উঠতে পার না? শয়তানের শত্রুতা ও তার পথভ্রষ্টকরণ। অথবা, তাদের উপর যে আজাব নেমে আসে তা। যাতে তোমরা ঈমান আনয়ন করতে পার।

তাহকীক ও তারকীব

شُغُلٍ শব্দের কেরাতসমূহ : এখানে شُغُلٍ শব্দটিতে দুটি কেরাত পড়া যেতে পারে–

১. মাসহাফে ওসমানীতে রয়েছে شُغُلٍ অর্থাৎ س এবং غ উভয় অক্ষরে পেশ হবে। আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. আবূ আমির নাফি' ও ইবনে কাছীর প্রমুখগণ شُغْلٍ অর্থাৎ ش পেশ যোগে এবং غ -কে সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ আয়াতে سَلَامٌ -এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতে سَلَامٌ শব্দটির বিভিন্ন إِعْرَابٌ হতে পারে–

- ✪ এটা উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হবে অর্থাৎ هُوَ سَلَامٌ
- ✪ سَلَامٌ হলো মুবতাদা, আর قَوْلًا -এর নসবদাতা-এর খবর। মূল বাক্যটি হবে– سَلَامٌ يُقَالُ لَهُمْ قَوْلًا
- ✪ سَلَامٌ টি مَا يَدَّعُوْنَ মুবতাদার খবর হবে।
- ✪ سَلَامٌ টি مَا يَدَّعُوْنَ মুবদাল মিনহু হতে বদল হয়েছে।
- ✪ سَلَامٌ টি مَا يَدَّعُوْنَ -এ যে ও مَا আছে তার صِفَتٌ হবে, যখন مَا টি মওসূফা হবে। তবে যদি مَا টি اَلَّذِیْ বা মাসদারিয়া হয়, তবে এ ই'রাব হবে না।
- ✪ سَلَامٌ টি মুবতাদা, আর مِنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ হলো এর খবর। আর قَوْلًا উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক যা তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তখন পুরো বাক্যটি জুমলায়ে মু'তারাযাহ হবে।
- ✪ কারো মতে, سَلَامٌ টি مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَدْحِ হবে। –[কুরতুবী, জালালাইন, কাবীর]

"جِبِلًّا" -এর মধ্যে পঠিত বিভিন্ন কেরাতসমূহ : جِبِلًّا -এর মধ্যে কয়েকটি কেরাত হতে পারে।

- ✪ প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী جِبِلًّا অর্থাৎ ب এবং ج এর নিচে যের ل -এর উপর তাশদীদসহ যবর হবে। এটাই হযরত আসেম ও মদীনার কারীদের অভিমত।
- ✪ অপর একদল কারী جُبُلًا অর্থাৎ ج এবং ب -এর উপর পেশ দিয়ে এবং "ل" কে তাখফীফ করে পড়েছেন।
- ✪ ইবনে আবী ইসহাক, হাসান, ঈসা ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ এবং নসর ইবনে আনাস (রা.) প্রমুখগণ جُبُلًّا অর্থাৎ ج এবং ب -এর উপর পেশ আর ل -কে তাশদীদযুক্ত করে পড়েছেন।
- ✪ আবূ আমির বাসরী ও ইবনে আমির শামী (র.)-এর মতে, جُبْلًا অর্থাৎ ج -এর উপর পেশ ب সাকিন এবং ل -কে তাখফীফ করে পড়া হবে।
- ✪ আবূ ইয়াহইয়া ও আশহাব উকাইলী (র.)-এর মতে, جِبْلًا অর্থাৎ ج -এর নিচে যের ب -এর উপর জযম এবং ل -কে তাখফীফ করে পড়া হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ الخ -এর বিশদ ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় فِىْ شُغُلٍ -এর বিবিধ অর্থ মুফাসসিরগণ হতে বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তাদের বিবরণ দেওয়া হলো।

১. এর অর্থ হলো জাহান্নামীরা যেসব বিপদ-আপদ ও অস্থিরতায় থাকবে ঈমানদারগণ তা হতে মুক্ত থাকবেন।

২. জান্নাতীগণ যে শুধু আজাব হতে মুক্ত থাকবে তাই নয়; বরং তদুপরি তারা জান্নাতের নিয়ামত রাজি উপভোগে এমন মগ্ন থাকবে যে, অবসরের গ্লানি তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

৩. দুনিয়াতে অবস্থান কালে ঈমানদারগণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট বহু কিছুর আবেদন জানাবে বলে আশা করেছিল। কিন্তু আখেরাতে জান্নাতে তাদের জন্য প্রদত্ত নিয়ামত রাজির উপভোগে এমন মগ্ন ও বিভোর হয়ে পড়বে যে, তাদের আর বেশি কিছুর আবেদন করার অবকাশই থাকবে না।

৪. ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার জাঁক-জমকপূর্ণ মেহমানদারিতে মশগুল হয়ে পড়বে।

৫. ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ (র.) ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখগণের মতে شُغُلُهُمْ اِفْتِضَاضُ الْعَذَارٰى অর্থাৎ বেহেশতবাসী নব যৌবনা কুমারীদের সাথে সহবাস ও সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে।

৬. জান্নাতীগণ বেহেশ্তের নিয়ামত রাজিতে এমনভাবে মশগুল থাকবেন যে, দোজখীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি একটুও দৃষ্টিপাত করবার সুযোগ পাবে না। যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হোক না কেন। -[মা'আরিফ, কাবীর, কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ কখন বলা হবে? হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে এক আহ্বানকারী মু'মিন ও গায়রে মু'মিনদেরকে ডেকে বলবেন– আমার সে সকল মাহবুব বান্দাগণ কোথায়? যারা আমারই ইবাদত করেছে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে? তখন মু'মিনগণ পূর্ণিমার চাঁদ ও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অবয়বে আত্মপ্রকাশ করবে। ইয়াকুত পাথরের নোখ বিশিষ্ট নূরের তৈরি উটে তারা আরোহণ করবেন এবং তাতে চড়ে সারা হাশরের ময়দান পরিভ্রমণ করে আরশের ছায়ার নিচে পৌঁছবেন। তখন মহান রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সম্বোধন করে বলবেন–

اَلسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَطَاعُوْنِىْ وَحَفِظُوْا عَهْدِىْ بِالْغَيْبِ اَنَا اصْطَفَيْتُكُمْ وَاَنَا اَجْتَبَيْتُكُمْ وَاَنَا اخْتَرْتُكُمْ اِذْهَبُوْا فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.

অর্থাৎ আমার সেই বান্দাগণের প্রতি সালাম যারা আনুগত্য করেছে এবং আমার প্রতিশ্রুতি গোপনেও রক্ষা করেছে। তাদেরকে আমি নির্বাচিত করেছি, পছন্দ করেছি এবং সম্মানিত করেছি। তোমরা যাও আর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করো। আজ তোমাদের কোনো ভয়ও নেই এবং চিন্তারও কোনোই কারণ নেই।

এরপর তারা বিদ্যুৎ গতিতে বেহেশতের পানে ছুটে যাবে। অবশিষ্ট লোকজন হাশরের ময়দানে পড়ে থাকবে। পরস্পর তারা বলাবলি করবে যে, আমাদের মধ্য থেকে অমুক অমুক ব্যক্তি কোথায় গেল। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে এক ঘোষক বলবেন– إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে জান্নাতীরা আজ সম্ভোগে ব্যস্ত রয়েছে।

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ ... هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -এর ব্যাখ্যা : 'পরম করুণাময় প্রতিপালকের তরফ থেকে বলা হবে, 'সালাম'। হযরত জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীগণ তাদের আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকবেন, হঠাৎ তাদের উপর একটি নূর প্রকাশিত হবে, তারা তা দেখতে থাকবেন এবং তারা জানতে পারবেন, এটি হলো আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লী। তখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীগণকে সম্বোধন করে সরাসরি অথবা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বলবেন, 'আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আহলাল জান্নাহ' অর্থাৎ হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখন সমস্ত জান্নাতবাসীগণ ঐ নূর দেখায় মশগুল হয়ে পড়বে, অন্য কোনো দিকে তাদের মনযোগ থাকবে না। কিছুক্ষণ পর সে নূর সরে যাবে, কিন্তু তার বরকতসমূহ বর্তমান থাকবে। -[ইবনে মাজাহ, আবিদদুনিয়া]

আল্লামা বগবী (র.) লিখেছেন, জান্নাতের প্রত্যেকটি দুয়ার থেকে ফেরেশতাগণ জান্নাতবাসীগণকে 'সালাম' পৌঁছাবেন।

মুকাতিল (র.) বলেছেন, জান্নাতের প্রত্যেকটি দুয়ার থেকে ফেরেশতাগণ একথা বলে প্রবেশ করবেন যে, হে জান্নাতবাসীগণ! করুণাময় প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি সালাম। وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ 'আর (ঘোষণা করা হবে) হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা আজ [মু'মিনগণ থেকে] পৃথক হয়ে যাও'।

দোজখীদেরকে পৃথক হওয়ার আদেশ হবে। দুনিয়াতে ভালো-মন্দ পাশাপাশি থাকে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তা সম্ভব হবে না, নেককারদের থেকে বদকার লোকদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে। তাফসীরকার মুকাতিল (র.)-এর সুদ্দী (র.) এবং যুজ্জাত্ত (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, পাপীষ্ঠদেরকে বলা হবে, তোমরা নেককার লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো মু'মিনদেরকে জান্নাতের দিকে এবং কাফেরদেরকে দোজখের দিকে প্রেরণ করা হবে।

যাহহাক (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দোজখে প্রত্যেক কাফেরের জন্যে একটি গৃহ নির্দিষ্ট থাকবে, যখন কোনো দোজখী তার গৃহে প্রবেশ করবে, তখন ঐ গৃহের অগ্নি দুয়ার সর্বকালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে, ভেতর থেকে সে দেখতে পারবে না, আর তাকেও দেখা যাবে না।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যারা দোজখের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে, তাদেরকে লৌহ নির্মিত সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ঐ সিন্দুকগুলোকে নতুন লোহার সিন্দুকে প্রবেশ করানো হবে, এরপর দোজখের তলদেশে তা নিক্ষেপ করা হবে। এ জন্য কোনো দোজখী অন্য দোজখীর আজাবও দেখতে পাবে না, সে ধারণা করবে যে, শুধু তাকেই এত কঠিন আজাব দেওয়া হয়। আর অন্যের আজাব দেখে সান্ত্বনা পাবারও কোনো ব্যবস্থা থাকবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা দূরে সরে যাও, জান্নাতের চিরসুখে তোমাদের কোনো অংশ নেই, বেহেশতবাসীদের থেকে তোমরা তফাত থাক, তোমাদের স্থান অন্যত্র, তোমরা সেখানেই থাকবে।

ইবনে আবি হাতিম হযরত হাসান (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে পাপীষ্ঠরা! তোমরা নেককার লোকদের থেকে দূরে সরে যাও। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৫৫৭]

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

অর্থাৎ 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে মু'মিনদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তিরস্কার করা হবে এভাবে যে, নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করিনি যে, তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়ো না, শয়তান তোমাদের জঘন্য শত্রু, সে তোমাদের চির বৈরী এবং প্রকাশ্য শত্রু, তার একমাত্র লক্ষ্য হলো তোমাদের সর্বনাশ করা। আমি নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো- وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

'আর তোমরা শুধু আমারই বন্দেগি করো, এটিই সরল সঠিক পথ।' ইহকাল পরকালের শান্তি, কল্যাণ নিহিত রয়েছে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে, কিন্তু তোমরা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর নি, শয়তানের অনুগামী হয়েছ, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ﷺ -এর অনুসরণের স্থলে তাঁর বিরোধিতা করেছ। অতএব, এর শাস্তি ভোগ কর, দুনিয়াতে সরল-সঠিক পথ পরিহার করে বক্র পথ অবলম্বন করেছ, আজ তার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ দোজখের শাস্তি ভোগ কর। এ জন্য সর্বপ্রথম নেককারদের থেকে পৃথক হয়ে যাও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ" আয়াতে "شُغُلٍ" -কে নাকেরাহ নেওয়ার কারণ : এখানে شُغُلٍ -এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই এটা নাকেরাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বেহেশতবাসীগণ চিত্তবিনোদন ও সম্ভোগের হরেক রকম বিষয়াদিতে সদা ব্যাপৃত থাকবে এর ফলে সকল প্রকারের চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-বেদনা তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর জান্নাতে নিয়ামতের মধ্যে সর্বোত্তম নিয়ামত হবে আল্লাহর দীদার লাভ করা।

"هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ الخ" আয়াতে "اَزْوَاجُهُمْ" দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতে اَزْوَاجٌ শব্দটি দ্বারা দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে-

১. اَزْوَاجٌ -এর অর্থ হবে اَمْثَالٌ বা সাদৃশ্য ও اَشْكَالٌ বা অনুরূপ অর্থাৎ اَشْكَالُهُمْ فِى الْاِحْسَانِ وَاَمْثَالُهُمْ فِى الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ইহসানের দিক দিয়ে তাদের তুল্য এবং ঈমানের দিক দিয়ে তাদের অনুরূপ।

২. اَزْوَاجٌ -এর অর্থ হবে জোড়া বা জুটি। তথা নর-নারী বা স্বামী-স্ত্রী। এ অর্থ কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। যেমন- اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ অর্থাৎ তবে তাদের স্ত্রীদের সাথে। আর اَزْوَاجٌ এর মধ্যে জান্নাতের হুর ও মু'মিনদের মু'মিন সতী স্ত্রীগণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

"وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ" -এর বিশদ ব্যাখ্যা : دَعْوَةٌ মাসদার হতে يَدَّعُوْنَ শব্দটিকে বের করা হয়েছে। دَعْوَةٌ -এর অর্থ হলো আহ্বান করা। অর্থাৎ জান্নাতীবাসীগণ যাই আহ্বান করবে তা-ই পাবে। এখানে يَدَّعُوْنَ -এর স্থলে يَسْئَلُوْنَ ব্যবহার করেননি। কারণ প্রার্থনাও এক ধরনের কষ্টের শামিল। আর জান্নাত সকল কষ্ট হতে পূর্ণরূপে মুক্ত। তাই সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই তার সন্নিকটে বিদ্যমান থাকবে।

ইবাদত আনুগত্য হওয়া হিসেবে নবী-রাসূলগণের জন্য ইবাদত জায়েজ হবে কিনা? উপরিউক্ত আয়াতে- اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ -এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ ইবাদতকে আনুগত্য (اِطَاعَةٌ) -এর অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো যে, اِطَاعَةٌ ও عِبَادَةٌ যদি সমার্থক হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণী "اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ" -এর মধ্যে আমাদেরকে নবী-রাসূল ও ইমামগণের ইবাদত করার নির্দেশ প্রদান করছেন। তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাযী (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, নবী রাসূল ও নেতাগণের আনুগত্য যদি আল্লাহ তা'আলার অনুমোদিত বিষয়াদিতে হয়, তাহলে তা পক্ষান্তরে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য হিসাবে গণ্য হবে। এর দ্বারা নবী-রাসূল ও শাসকবর্গের ইবাদত লাযেম হবে না। হ্যাঁ, এমন কোনো বিষয়াদিতে যদি তাদের আনুগত্য করা হয় যা আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেননি, তাহলে তা তাদের ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে [এবং তা শিরক এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়বে]।

উপরিউক্ত বিষয়টিকে হাদীস শরীফে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে- "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" "স্রষ্টার নাফরমানি হয় এমন কোনো ব্যাপারে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" আরো বলা হয়েছে- "اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ" আনুগত্য করা যাবে কেবলমাত্র শরিয়ত সিদ্ধ কাজে।

ইমাম রাযী (র.) একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে এভাবে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন, ধর তোমার নিকট কোনো ব্যক্তি এসে তোমাকে কোনো কার্যের আদেশ করল। এখন তোমাকে ভেবে দেখতে হবে যে, তার উক্ত হুকুম শরিয়ত সিদ্ধ কিনা। যদি তা শরিয়ত কর্তৃক অনুমোদিত না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে, তার সাথে শয়তানের যোগসাজোশ রয়েছে। সুতরাং তুমি এটা করলে শয়তানের ইবাদত করা হবে। অপরদিকে তা যদি শরিয়ত সম্মত হয় তাহলে তা পালনে কোনো বাধা নেই। তা উক্ত ব্যক্তি বা শয়তানের আনুগত্য না হয়ে (বরং) আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে। অনুরূপভাবে নাফস যদি কোনো কার্যের প্ররোচনা দেয় তাকেও উপরিউক্তভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

শয়তানের উপাসনার বিভিন্ন ধাপ : শয়তানের উপাসনার কয়েকটি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে।

১. শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় এবং তার মন ও মুখ সেই কর্মে তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে।

২. মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনো পাপ কর্মে লিপ্ত হয় তবে মন ও মুখ এর স্বীকৃতি দেয় না। অর্থাৎ সে ভুলবশত এতে লিপ্ত হলেও মন ও মুখ সে পাপ কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করে না।

৩. সুস্থ মস্তিষ্কে সর্বদা পাপ কর্মে লিপ্ত থাকা এবং এটা করার কারণে আনন্দিত ও পুলকিত হওয়া। এটা মহা অন্যায় যা কুফরিতে পৌঁছে দেয়। আর এটাই শয়তানের উপাসনা রূপে গণ্য হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلَمْ اَعْهَدْ الخ আয়াতে اَلْعَهْدُ -এর অর্থ ও এর দ্বারা উদ্দেশ্য : عَهْد শব্দটির অর্থ হচ্ছে- চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও সদুপদেশ তবে সদুপদেশ, অর্থটি অধিক প্রযোজ্য। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে- اَلَمْ اُوْصِ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ الخ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে সদুপোদেশ দেইনি।

এ আয়াতে اَلْعَهْدُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সে ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এখানে العهد দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতিই উদ্দেশ্য।

২. অথবা, এখানে عَهْد দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- আলমে আরওয়াহতে আল্লাহ তা'আলা সকল আদম সন্তানের রূহকে একত্রিত করে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ [আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?] বলে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৩. অথবা রাসূলগণের মাধ্যমে প্রতিটি সম্প্রদায়কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, পৃথিবীর অনেক লোকই এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, ইবলিস শয়তান অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করেছে। আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং নিজেদের সর্বনাশের পথ বেছে নিয়েছে। যদি তারা বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী হতো, যদি তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করত, তবে আজ এ মহা বিপদের সম্মুখীন হতো না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে- সেদিন তারা জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি সত্যকে গ্রহণ করেনি। নবী ও রাসূলগণের অনুসারী হয়নি। তাই আজ তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত।

আল্লাহর বাণী 'جِبِلًّا كَثِيْرًا' দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ আয়াতে جِبِلًّا كَثِيْرًا শব্দ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে-

১. হযরত কালবী (র.)-এর মতে, جِبِلًّا كَثِيْرًا শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- اُمَمًا كَثِيْرًا তথা বহু জাতি।

২. তাফসীরে জালালাইনের গ্রন্থকার লিখেন যে, جِبِلًّا كَثِيْرًا দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- خَلْقًا كَثِيْرًا তথা বহু মাখলুক বা সৃষ্টিকুল। ইমাম মুজাহিদ (র.) ও এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

৩. হযরত কাতাদাহ (র.)-এর মতে, جِبِلًّا كَثِيْرًا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- جُمُوْعًا كَثِيْرًا তথা বহু জমাত বা দল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٣. وَيُقَالُ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ بِهَا .

৬৩. আর তাদেরকে আখেরাতে সম্বোধন করে বলা হবে- এটা সেই দোজখ [জাহান্নাম] যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল- যা সম্পর্কে।

٦٤. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ .

৬৪. অদ্য তোমরা তাতে প্রবেশ করো। কেননা তোমরা তাকে অস্বীকার করেছিলে।

٦٥. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ اَىِ الْكُفَّارِ لِقَوْلِهِمْ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ وَغَيْرُهَا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَكُلُّ عُضْوٍ يَنْطِقُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ .

৬৫. আজ আমি মোহর এঁটে দেবো তাদের মুখে অর্থাৎ কাফেরদের মুখে। কেননা তারা তখন বলবে আমাদের রব- আল্লাহর কসম। আমরা মুশরিক ছিলাম না। আর আমার সাথে তাদের হস্তসমূহ কথা বলবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করবে তাদের পা-সমূহ এমনকি অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদিও। যা তারা করেছে (সেই সম্পর্কে) সুতরাং প্রতিটি অঙ্গ তা বলে দেবে যা তা হতে প্রকাশ পেয়েছে।

٦٦. وَلَوْ نَشَاۤءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ لَاَعْمَيْنَاهَا طَمْسًا فَاسْتَبَقُوا ابْتَدَرُوا الصِّرَاطَ الطَّرِيْقَ ذَاهِبِيْنَ كَعَادَتِهِمْ فَاَنّٰى فَكَيْفَ يُبْصِرُوْنَ حِيْنَئِذٍ اَىْ لَا يُبْصِرُوْنَ .

৬৬. আর আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুসমূহ মুছে নিষ্প্রভ করে দিতে পারি। অর্থাৎ অবশ্যই তাদের চক্ষুসমূহকে নিষ্প্রভ করে অন্ধ করে দিতে পারি। অতঃপর তারা চলত দৌড়াত রাস্তায় পথে গিয়ে তাদের অভ্যাস অনুযায়ী। সুতরাং কিভাবে কি করে তারা দেখতে পেত এমতাবস্থায় অর্থাৎ তারা তখন কিছুই দেখতে পেত না।

٦٧. وَلَوْ نَشَاۤءُ لَمَسَخْنٰهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ اَوْ حِجَارَةً عَلٰى مَكَانَتِهِمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ مَكَانَاتِهِمْ جَمْعُ مَكَانَةٍ بِمَعْنٰى مَكَانٍ اَىْ فِىْ مَنَازِلِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ اَىْ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى ذَهَابٍ وَّلَا مَجِىْءٍ .

৬৭. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাস্‌খ (রূপ বিকৃত) করে দিতে পারতাম। বানর, শূকর অথবা পাথরে রূপান্তরিত করে দিতে পারতাম। তাদের জায়গায় অন্য এক কেরাত مَكَانَاتِهِمْ এসেছে। তা مَكَانَةٌ (مَكَانَاتٌ) -এর বহুবচন। অর্থাৎ مَكَانٌ মানে তাদের আবাস- স্থলসমূহে। যাতে তারা না সামনে চলতে পারত আর না পিছে ফিরে যেতে পারত। অর্থাৎ তারা যাওয়া-আসা [গমনাগমন] করতে পারত না।

তাহকীক ও তারকীব

"فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ" -এর তাহকীক : আল্লামা যমখশারী (র.) এ আয়াতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করেছেন-

✪ এ আয়াতে اَلصِّرَاطَ -এর পূর্বে একটি اِلٰى উহ্য রয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে- فَاسْتَبِقُوْا اِلَى الصِّرَاطِ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে অন্ধ করে দিতে পারতাম। ফলে তারা রাস্তার পানে ছুটে যেত কিন্তু কিছুই দেখতে পেত না।

Free @ www.eilm.weebly.com

✪ এখানে اِسْتِبَاقٌ টা اِبْتِدَارٌ -এর অর্থে হয়েছে। তাই আমলও اِبْتِدَارٌ -এর ন্যায় হয়েছে।

✪ اِسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ -এর صِرَاطَ -কে- مُسْتَبِقٌ (অতিক্রমরত) বানানো হয়েছে مُسْتَبِقٌ اِلَيْهِ (এর দিকে ছুটে যাচ্ছে এরূপ) বানানো হয়নি। যেমন বলা হয়েছে- اَلصِّرَاطُ الَّذِيْ هُوَ مَعَهُمْ لَيْسُوْا طَالِبِيْهَا لَهُ قَاصِدِيْنَ اِيَّاهُ وَاِنَّمَا هُمْ عَلَيْهِ اِذَا طَمَسَ اللّٰهُ عَلٰى اَعْيُنِهِمْ لَا يُبْصِرُوْنَهُ فَكَيْفَ اِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا عَلَى الصِّرَاطِ অর্থাৎ এটা সে পথ যা তাদের সাথেই রয়েছে তারা না একে অনুসন্ধান করে না এর প্রতি মনোনিবেশ করে দিবেন। তখন তারা তা দেখতে পাবে না। কাজেই (ভেবে দেখ) তারা যদি রাস্তার উপরই না থাকত তবে তাদের অবস্থা কি দাঁড়াত।

لَطَمَسْنَا এবং لَمَسَخْنَا শব্দদ্বয়ের অর্থ : لَطَمَسْنَا -এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম কিসায়ী বলেন- طَمَسَ يَطْمِسُ ভাষাবিদদের নিকট اَلْمَطْمُوْسُ এবং اَلطَّمِيْسُ এর অর্থ হলো- এমন অন্ধ ব্যক্তি যার চোখে কোনোরূপ খুঁত নেই তথা চোখ বন্ধ অন্ধ ব্যক্তি। لَمَسَخْنَا -এর অর্থ হচ্ছে- اَلْمَسْخُ হলো সৃষ্ট জিনিসের পরিবর্তন অর্থাৎ এটাকে পাথর অথবা কংকর অথবা জানোয়ারে রূপান্তরিত করা। হযরত হাসান (রা.) বলেন, আমরা অবশ্যই তাদের বসিয়ে দিব যাতে তারা সামনে অগ্রসর না হতে পারে এবং পিছনে ফিরেও যেতে না পারে। যথা পাথর ও কঙ্কর সামনেও অগ্রসর হতে পারে না এবং পিছনেও যেতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ" -এর সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক : আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতীদের বিভিন্ন নিয়ামত ও পুরস্কারের উল্লেখ করেছেন। জান্নাতীগণ বেহেশতের বিভিন্ন নিয়ামত ও আনন্দ উপভোগে মশগুল থাকবেন। তারা ও তাদের স্ত্রীগণ ছায়াশীতল পরিবেশে শাহী খাটে হেলান দিয়ে উপবেশন করবেন। তারা তাদের হাতের কাছেই সকল প্রয়োজনীয় বস্তু পাবেন। তথায় তাদের প্রভুর সাথে সম্মুখ সাক্ষাৎ ঘটবে। আল্লাহ মু'মিনদেরকে সালাম দিবেন। এর চেয়ে খুশির বিষয় আর কি হতে পারে।

আর আল্লাহ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের শাস্তির উল্লেখ করেছেন। সারকথা হলো, আল্লাহ বিচার দিবসে সকলের ব্যাপারেই কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন। ঈমানদারদের সাথে কৃত জান্নাতের ওয়াদা জান্নাত দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ করবেন। তদ্রূপ কাফেরদেরকেও জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে তাঁর কৃত প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। তাই আল্লাহ বলবেন- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ এটাই সেই জাহান্নাম তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ দ্বারা কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে? এখানে كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ বলে সে সকল কাফের ও নাফরমান বান্দাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও আখেরাতকে অবিশ্বাস করেছিল। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, তারা যদি বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং সৎ কর্ম না করে তাদেরকে পরকালে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে অগ্নি দাহন সহ্য করতে হবে। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না। সুতরাং আল্লাহ তখন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে, এটা সেই জাহান্নাম যার ওয়াদা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম অথচ তোমরা তা বিশ্বাস করিনি। আজ চাক্ষুস দেখে তাতে প্রবেশ করে আমার ওয়াদার সত্যতা যাচাই করে নাও। স্বীয় কৃতকর্মের ফল হাতে নাতে বুঝে নাও।

এটা তাদের মানসিক যাতনা উসকে দেওয়া এবং তাদেরকে তিরস্কার করাই এ সম্বোধনের মূল উদ্দেশ্য।

"اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় কাফেরদের ভর্ৎসনা করা হয়েছেন।

✪ এখানে আল্লাহ তা'আলা اِصْلَوْهَا (জাহান্নামে প্রবেশ কর) আমরের সীগাহ ব্যবহার করেছেন। অপমান ও লাঞ্ছনার জন্য উপরিউক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে অন্যত্র বলেন- ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ তুমি আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর, কেননা পৃথিবীতে তো তুমি নিজেকে সম্মানিত মনে করতে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

- "আজ তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর" এর দ্বারা কাফেরদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা করা হয়েছিল, তা মূলত আজ থেকেই শুরু হবে। ইতপূর্বে যে শাস্তি ভোগ করেছ এর মোকাবিলায় সেই আজাব কোনোই ধর্তব্য নয়। তোমাদের উপর আজ হতে যে শাস্তি শুরু হচ্ছে এর শুরু থাকলে শেষ নেই।
- بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ -এর মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি প্রদানের কারণও বলে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাউকে কোনো শাস্তি দেওয়া হলে সাধারণত শাস্তি দেওয়ার সময় তার কারণ দর্শনো হয়ে থাকে। তাদেরকে আল্লাহ অহেতুক শাস্তি দিচ্ছেন না; বরং তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পিছনে যে যথার্থ কারণ রয়েছে তা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এগুলো ছাড়াও এর দ্বারা তাদেরকে লজ্জা দেওয়া উদ্দেশ্য। এটাও তাদের জন্য এক ধরনের শাস্তি। এরপর তাদের মুখ ফুটে আর কিছু বলার অবকাশ থাকবে না।

"اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ .... بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" -এর ব্যাখ্যা : 'আজ আমি তাদের মুখ সীল করে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, তাদের পা তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে'।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, কিয়ামতের দিন কাফের এবং মুনাফিকরা তাদের পাপাচারের কথা অস্বীকার করবে এবং শপথ করে বলবে যে, আমরা এসব পাপকার্যে লিপ্ত হইনি তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বাকশক্তি রহিত করে দেবেন।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির ছিলাম, তিনি তখন মুচকি হাসলেন এবং আমাকে বললেন, 'তুমি কি জান আমি কেন মুচকি হাসলাম'? আমি আরজ করলাম, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলই তা জানেন'। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, 'এ বিষয়ে আমি মুচকি হেসেছি যে, কিয়ামতের দিন এক বান্দা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরজ করবে, 'হে পরওয়ারদেগার তুমি কি আমাকে জুলুম করা থেকে আশ্রয় দাওনি'? (অর্থাৎ তুমি কি একথা ঘোষণা করোনি যে, কিয়ামতের দিন কারো প্রতি জুলুম করা হবেনা) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, 'অবশ্যই,' তখন বন্দা আরজ করবে, 'হে পরওয়ারদেগার! আজ আমার বিরুদ্ধে আমি কারো সাক্ষ্য মেনে নেব না, তবে যে সাক্ষ্য আমার নিজের দেহের অংশ হবে, তা মানব'। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, 'আজ তুমি নিজে এবং তোমার আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা (কিরামুন কাতিবীন) সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট'। এরপর তার মুখ সীল করা হবে এবং ঐ ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তার কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যেভাবে মানুষ রসনা দ্বারা কথা বলে, ঠিক তেমনিভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বাকশক্তি দান করবেন। এরপর তাকে তার বাকশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'তোমাদের জন্যে ধ্বংস, আমি তো তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যেই যা কিছু বলেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেরাই আমার শত্রু হয়ে পড়েছ'।

নাসাঈ শরীফে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে, যখন তোমাদের রসনা বন্ধ থাকবে, সর্ব প্রথম তোমাদের উরু এবং হাতকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তুমি কে?' সে আরজ করবে, 'আমি তোমার বান্দা, তোমার নবীর প্রতি এবং তোমার কিতাবের প্রতি আমি ঈমান এনেছিলাম, নামাজ, রোজা, জাকাত প্রভৃতি আদায় করেছি'। এমনি আরো বহু নেক আমলের উল্লেখ করবে, তখন তাকে বলা হবে, 'আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি সাক্ষী হাজির করছি'। সে চিন্তা করবে, কাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে। তখন হঠাৎ দেখবে, তার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে, এরপর তার উরুকে বলা হবে, 'তুমিই সাক্ষ্য দাও', তখন উরু, হাড় এবং গোশত বলে উঠবে এবং ঐ মুনাফিকের মুনাফিকী এবং যাবতীয় গোপন পাপাচারগুলোর সুস্পষ্ট বিবরণ দেবে।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, রসনা বন্ধ করে দেওয়ার পর মানুষের বাহু সর্বপ্রথম কথা বলবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাকে তার গুনাহ সমূহের বিবরণ সম্মুখে রেখে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এ সব ঠিক?' সে আরজ করবে, 'জী হ্যাঁ, সবই ঠিক'। আমার দ্বারা এসব গুনাহ হয়েছে', তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, 'যাও আমি এসব মাফ করে দিলাম', তখন এভাবে কথা হবে যে, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ জানবে না, অন্য কারো নিকট তার গুনাহ প্রকাশ পাবে না, এরপর তার নেকীসমূহ হাজির করা হবে এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে। (হে ক্ষমা প্রিয় প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ মাফ করে দিও, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত কর না, আমাদের গুনাহসমূহকে গোপন রেখ, আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়ায় স্থান দিও, হে দয়াবান প্রতিপালক! তোমার দরবার থেকে আজ পর্যন্ত কেউ মাহরুম হয়নি, আমাদেরকেও তোমার রহমত থেকে মাহরুম কর না। তোমার শাস্তি থেকে আমাদেরকে নাজাত দিও, তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে নাজাত দিও এবং দোজখের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। হে দয়াময় পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে জান্নাত নসিব কর এবং তোমার দীদার লাভের সৌভাগ্য দান কর)। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণিত এ হাদীস ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতিম সংকলন করেছেন।

এভাবে কাফের এবং মুনাফিকদেরকেও আল্লাহ তা'আলা হাজির করে তাদের কৃতকর্মের বিবরণ সম্মুখে রেখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এসব ঠিক?' সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবে এবং শপথ করে বলবে, 'হে পরওয়ারদেগার! এসব তোমার ফেরেশতারা অসত্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে'। তখন ফেরেশতা বলবেন, 'হায়! সে কি বলে?' তুমি কি অমুক দিন এ কাজ করনি"? ঐ কাফের বলবে, 'অবশ্যই নয়'। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের রসনা বন্ধ করে দেবেন এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-২৩, পৃষ্ঠা-১৫-১৬, তফসীরে মাযহারী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৫৯-৬০]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ বিবরণ স্থান পেয়েছে, তবে তিনি একথাও বলেছেন, আমার ধারণা এই যে, হুযূর ﷺ একথা বলেছেন যে, সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির ডান উরু কথা বলবে, এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আবূ ইয়া'লা এবং হাকিম হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন কাফেরদেরকে তাদের পাপাচারের কারণে তিরস্কার করা হবে, কিন্তু কাফের তার পাপাচারের কথা অস্বীকার করবে এবং ঝগড়া করবে, তখন আদেশ দেওয়া হবে যে শপথ করা কাফেররা শপথও করবে, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিস্তব্ধ করে দেবেন, (রসনার কার্যকারিতা স্তব্ধ করে দেবেন), এরপর তারা তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে। পরে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

মোহর এঁটে দেওয়ার কাজকে আল্লাহর দিকে এবং বাক্যালাপ ও সাক্ষ্যের কাজকে হাত ও পায়ের দিকে সম্বোধন করার রহস্য : মহান রাব্বুল আলামীন বলেন- نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো। পরবর্তীতে বললেন- وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ الخ অর্থাৎ তাদের হাত আমাদের সাথে বাক্যালাপ করবে, তাদের পা আমার নিকট তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। এরূপ বলা হয়নি যে, আমি হাতকে কথা বলাবো আর পা দ্বারা সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করবো।

এর রহস্য হচ্ছে- যখন কাফেররা হাশরের মাঠে রাসূল ও ফেরেশতাগণের বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করে নিজেদের সাফাই গাইতে শুরু করবে আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের বাক স্বাধীনতাকে বিলোপ করে দিবেন। নিজ ইচ্ছাধীনে তাদের কোনো কথা বলার শক্তি থাকবে না। এরপর তাদের ব্যাপারে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সাক্ষী নিয়োগ করা হবে। তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অঙ্গসমূহ সাক্ষ্য প্রদান করবে। এগুলোকে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা হবে না। এ কারণেই বলা হয়েছে (কথা বলার শক্তি পাওয়ার পর) তাদের হাত স্বেচ্ছায় আল্লাহর সাথে কথা বলবে এবং পদরাজি দরবারে ইলাহীতে সাক্ষ্য প্রদান করবে। কাজেই এ সাক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় হবে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

হাতের জন্য কথা বলা ও পায়ের জন্য সাক্ষ্য নির্ধারণের হিকমত : এ আয়াতে হাতের দিকে কথা বলার এবং পায়ের দিকে সাক্ষ্য দেওয়ার নিসবত করা হলো কেন এর হেকমত কি?

এর হেকমত হচ্ছে– তাদের হাত তাদের কুফর হতে শুরু করে সকল অপকর্মের বিবরণ দিবে। কারণ অধিকাংশ কর্ম হাতের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়ার ফলে সাধারণত সকল কর্মকে হাতের দিকে নিসবত করার প্রথা চালু রয়েছে। যথা অন্য একটি আয়াতে এসেছে مَا عَمِلَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাদের হাত যা উপার্জন করেছে। এ কারণে হাতই তাদের সকল অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরবে। আর যেহেতু হাতের বিবরণের সমর্থক হিসেবে ন্যূনতম পক্ষে একজন সাক্ষীর প্রয়োজন তাই তাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কাজেই কথা বলার সম্পর্ক হাতের দিকে করা এবং সাক্ষ্য দেওয়ার নিসবত পায়ের দিকে করা যথার্থই হয়েছে।

হাত-পা উভয়ে অপরাধী! কাজেই তাদের সাক্ষ্য কিরূপে গ্রহণীয় হবে? কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো পাপ কর্ম হলে তার হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকলেই সমভাবে এতে দোষী হিসেবে গণ্য হবে। কাজেই সে ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য কিরূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেন–

- এটা মূলত তাদের স্বীকারোক্তির নামান্তর। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তারা তাদের কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করে নিবে।
- তারা তাদের কৃতকর্মের কথা স্বীকার করে সাক্ষী দিবে। কিন্তু তাদের এ সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই যে, চূড়ান্ত ফয়সালা হবে তা তো বলা হয়নি।

আল্লাহর নিকট হাত কখন বিবরণ দেবে এবং পা ও অন্যান্য অঙ্গসমূহ সাক্ষ্য দেবে? ময়দানে মাহশরে বিচারের সম্মুখীন হয়ে কাফেররা তাদের সকল পাপের কথা অস্বীকার করবে। উপরন্তু ফেরেশতাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলবে যে, আমলনামায় যা লিখা আছে এর সাথে আমাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তখন আল্লাহর হুকুমে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ বিবরণ পেশ করবে এবং সাক্ষ্য দিবে।

এ আয়াতে শুধুমাত্র হাত ও পায়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে অন্যান্য অঙ্গ সমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। যথা এক আয়াতে এসেছে– يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তার জিহ্বা, হাত, পা সেদিন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।

অন্যত্র এসেছে– تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাদের কান, চোখ ও চামড়া তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

"اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ" ও "يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ" -এর মধ্যে সমন্বয় : প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের তথা বিচারের দিবস কাফির-মুশ্রিকদের মুখ বন্ধ করে দিবেন– যাতে তারা কথা বলতে পারবে না। অথচ শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সেদিন কাফের-মুশরিকদের জিহ্বাও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। আপাত দৃষ্টিতে উভয় আয়াতের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। মুফাস্সিরগণ নিম্নোক্তভাবে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

১. তারা তাদের ইচ্ছামতো কথা বলবার ক্ষমতা বিলোপ করা হবে। তবে মুখের মাধ্যমে তারা যেসব কুফর ও ফিসকের কথাবার্তা বলেছে তা মুখ আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে দিবে।

২. তাদের হতে মিথ্যা ও অবান্তর কথা বলবার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। কাজেই জিহ্বার সত্য সাক্ষ্য প্রদানে কোনো বাধা-বিপত্তি থাকবে না।

"اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى الخ" -এর সাথে সংশ্লিষ্ট বর্ণনা : তাফসীরে খাযিন ও ইবনে কাছীরে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবীগণ (রা.) একবার নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবেন কিনা? হুযুর ﷺ তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, উজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশে তোমাদের সূর্য দেখতে কি অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। হুযুর ﷺ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্র দেখতে তোমাদের কি কোনো অসুবিধা হয়? সাহাবীগণ (রা.) জওয়াব দিলেন, না। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, সে পবিত্র সত্তার শপথ যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, তোমরা উজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্র-সূর্যকে যদ্রূপ দেখতে পাও আখেরাতে তোমাদের রবকেও তদ্রূপ দেখতে পাবে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সেই কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে বলবেন- আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি? আমি কি তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করিনি? তোমার জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাকার জীব সৃষ্টি করে তোমার উপকার করিনি? বান্দা উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, হে প্রভু! অবশ্যই আপনি তা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার কি ধারণা ছিল যে, আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে? বান্দাহ বলবে- না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যদ্রূপ সেদিন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তদ্রূপ আমিও আজ তোমাকে ভুলে যাব। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? তোমার দাম্পত্য সুখের জন্য জুটি তৈরি করিনি? তোমার জন্য উট-ঘোড়া ইত্যাদি সৃষ্টি করত তোমাকে ভোগের অনুমতি প্রদান করিনি? বান্দা বলবে, হে প্রভু! অবশ্যই তুমি তা প্রদান করেছ। আবার আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি সেদিন আমাকে যদ্রূপ ভুলে গিয়েছিলে আমিও তদ্রূপ তোমাকে ভুলে থাকব। আবারও আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তখন সে বলবে, হে রব! আমি তোমার ও তোমার রাসূল এবং আসমানি কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করেছি, তোমার রাসূলের আনুগত্য করেছি, নামাজ-রোজা পালন করেছি, জাকাত দান করেছি। তা ছাড়া অন্যান্য সৎকার্যেরও যথাসম্ভব বিবরণ পেশ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, ঠিক আছে, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আমার সাক্ষ্যদাতাদেরকে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য হাজির করছি। তখন বান্দা মনে মনে ভাববে যে, কে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাংস এমনকি হাড়সমূহ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

কুরতুবী ও ইবনে কাছীর (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে আরও একটি বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, একবার আমরা (কতিপয় সাহাবী) নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় হুযূর ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন, তোমরা কি বুঝতে পারছ? কেন আমি হাসছি? আমরা বললাম আল্লাহ ও তদীয় রাসূলই ভালো জানেন। হুযূর ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি হাসছি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে কি নির্যাতন হতে রেহাই দিবেন না? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে অত্যাচার হতে নিষ্কৃতি দিব। বান্দা বলবে, হে রব! আমার নিজের পক্ষ হতে সাক্ষী দিন অন্য কাউকে সাক্ষ্য প্রদানে অনুমতি দিবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন- "كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا" . অর্থাৎ তোমার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তুমি নিজে এবং কিরামুন-কাতিবুনই যথেষ্ট।

অতঃপর তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে কথা বলবার নির্দেশ দেওয়া হবে। তারা তার কাজ-কর্মের সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দিবে। তখন সে তার অঙ্গসমূহকে ভর্ৎসনা করবে।

"وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى الخ" -এর বিশদ ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- "وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ" আয়াতের অর্থ হলো "لَاَعْمَيْنَاهُمْ عَنِ الْهُدٰى" অর্থাৎ আমি তাদেরকে হেদায়েতের পথ হতে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবে না।

খ. ইমাম সুদ্দী (র.) ও হাসান (র.) বলেছেন, অত্র আয়াতের অর্থ হলো, আমি তাদেরকে অন্ধ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি- যাতে তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সুতরাং তারা সঠিকভাবে জীবন-যাপনের কোনো পথ ও পন্থা খুঁজে পাচ্ছে না।

গ. সাইয়েদ কুতুব (র.) লিখেছেন, অত্র আয়াতে কাফেরদের দুটি অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

১. তাদের চক্ষুকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে। অতঃপর উক্ত অবস্থায় যখন তারা রাস্তায় বের হবে তখন অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় পথে পথে ঘুরতে থাকবে। আর দৌড়ানোর চেষ্টা করলে পা পিছলে পড়ে যাবে। সুতরাং কোথা হতে তারা পথের সন্ধান লাভ করবে?

২. কিছু কাল অন্ধ থাকবার পর তারা অকস্মাৎ নিজেদের স্থানসমূহ আঁকড়ে স্থবির হয়ে যাবে। তাদের অবস্থা মূর্তির ন্যায় হয়ে যাবে। না সামনে অগ্রসর হতে পারবে আর না পিছনে ফিরে যেতে পারবে। তাদের লাঞ্ছনা ও অপমানের আর শেষ থাকবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٨. وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ بِإِطَالَةِ أَجَلِهِ نُنَكِّسْهُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّشْدِيْدِ مِنَ التَّنْكِيْسِ فِي الْخَلْقِ ط أَيْ خَلْقَهُ فَيَكُوْنُ بَعْدَ قُوَّتِهِ وَشَبَابِهِ ضَعِيْفًا وَهَرِمًا أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ إِنَّ الْقَادِرَ عَلٰى ذٰلِكَ الْمَعْلُوْمِ عِنْدَهُمْ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ فَيُؤْمِنُوْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ .

৬৮. আর যাকে আমি অধিক বয়স দান করি– তার আয়ু দীর্ঘ করে তাকে পরিবর্তন করে দেই– অন্য এক কেরাতে তাশদীদ যোগে রয়েছে তা تَنْكِيْس মাসদার হতে গৃহীত। সৃষ্টির মধ্যে অর্থাৎ তার [শারীরিক] গড়নে ও প্রভাবে। সুতরাং তার শক্তিমত্তা ও যৌবন দুর্বলতা এবং বার্ধক্যে পর্যবসিত হয়ে যায়। তারপরও কি তারা উপলব্ধি করতে পারে না? এই যে, তার উপর ক্ষমতাবান যা তাদের জানা রয়েছে– পুনরুত্থানের উপরও ক্ষমতা রাখে। সুতরাং তাদের ঈমান গ্রহণ করা সমীচীন। অপর এক কেরাতে تَاء -এর সাথে (تَعْقِلُوْنَ) রয়েছে।

٦٩. وَمَا عَلَّمْنٰهُ أَيِ النَّبِيَّ الشِّعْرَ رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ إِنَّ مَا أَتٰى بِهِ مِنَ الْقُرْاٰنِ شِعْرٌ وَمَا يَنْبَغِيْ يَتَسَهَّلُ لَهُ ط الشِّعْرُ إِنْ هُوَ لَيْسَ الَّذِيْ أَتٰى بِهِ إِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ مُظْهِرٌ لِلْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا .

৬৯. আমি শিক্ষা দান করিনি তাকে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -কে, কবিতা-কাব্য রচনার জ্ঞান– এটা দ্বারা তাদের বক্তব্য– "مَا أَتٰى بِهِ مِنَ الْقُرْاٰنِ شِعْرٌ" [মুহাম্মদ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ কুরআন কাব্য বৈ কিছু নয়] -কে খণ্ডন করা হয়েছে। আর তা শোভনীয়ও নয় সহজ সাধ্য নয়– তার জন্য (অর্থাৎ) কাব্য রচনা করা। নয় তা অর্থাৎ হুযূর ﷺ যা নিয়ে আগমন করেছেন তা নয়– তবে উপদেশ– নসিহত এবং প্রকাশকারী কুরআন– আহকাম ইত্যাদি প্রকাশকারী।

٧٠. لِّيُنْذِرَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بِهِ مَنْ كَانَ حَيًّا يَعْقِلُ مَا يُخَاطَبُ بِهِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ وَهُمْ كَالْمَيِّتِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ مَا يُخَاطَبُوْنَ بِهِ .

৭০. যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন। (تُنْذِرَ শব্দটি] تَا ও يَا উভয়ের সাথে হতে পারে। তার দ্বারা তাদেরকে যারা জীবিত– যা দ্বারা তাদেরকে সম্বোধন করা হয় তা তারা উপলব্ধি করে। আর তারা হলো ঈমানদারগণ। যাতে যথার্থ প্রমাণিত হতে পারে বক্তব্য শাস্তি-বিষয়ক– কাফেরদের উপর [ব্যাপারে]। আর কাফেররা হলো মৃততুল্য। তাদেরকে যা বলা হয় তা তারা উপলব্ধি করে না। উপলব্ধি করার চেষ্টাও করে না।

তাহকীক ও তারকীব

لِيُنْذِرَ ও نُنَكِّسْهُ -এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : نُنَكِّسْهُ শব্দটির মধ্যে দ্বিবিধ কেরাত রয়েছে।

এক. হযরত আসিম (র.) ও হামযা (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ تَنْكِيْس [তানকীসুন] মাসদার হতে نُنَكِّسْهُ পড়েছেন। অর্থাৎ প্রথম ن পেশ যোগে, দ্বিতীয় ن যবর যোগে এবং ك তাশদীদ যুক্ত হয়ে যের যোগে ও س পেশ বিশিষ্ট হবে।

দুই. অপরাপর ক্বারীগণ পড়েছেন– نَنْكُسْهُ বাবে نَصَرَ -এর نَكْسٌ মাসদার হতে। অর্থাৎ প্রথম ن যবরবিশিষ্ট। দ্বিতীয় ن জযমবিশিষ্ট এবং ك তাশদীদবিহীন পেশ যোগে।

Free @ www.eilm.weebly.com

لِيُنْذِرَ-এর মধ্যে আবার দুই কেরাত রয়েছে।

এক. لِيُنْذِرَ ى যোগে। সাধারণ ক্বারীগণ এটাই পড়েছেন। এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

দুই. لِتُنْذِرَ تَا যোগে। এটা হযরত নাফে মাদানী ও ইবনে আমর শামী (র.)-এর কেরাত।

উল্লেখ্য যে, لِتُنْذِرَ ت যোগে হলে এর ফায়েল হবে নবী করীম ﷺ তখন অর্থ হবে- لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ। অর্থাৎ কুরআন এ জন্য নাজিল করা হয়েছে যাতে আপনি সতর্ক করতে পারেন তাদেরকে যারা আল্লাহর ইলমে ঈমানদার হওয়া নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।

অপরদিকে لِيُنْذِرَ ى যোগে হলে এর فَاعِلٌ -এর ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

এক. এর فَاعِلٌ হবে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দিতে পারেন।

দুই. উক্ত (لِيُنْذِرَ) فِعْلٌ -এর فَاعِلٌ হবে নবী করীম ﷺ অর্থাৎ যাতে নবী করীম ﷺ ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দিতে পারেন।

তিন. উক্ত فِعْلٌ -এর فَاعِلٌ হবে কুরআনে হাকীম। অর্থাৎ যাতে কুরআনে হাকীম তাদেরকে সতর্ক করে দিতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ الخ" -এর নাজিল হওয়ার কারণ : নবী করীম ﷺ কুরআনে কারীম মক্কার মুশরিকদের নিকট পেশ করার পর তারা বিভিন্ন ছল-ছাতুরীর মাধ্যমে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল।

তারা বলত হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী নন এবং কুরআনও আল্লাহর নাজিলকৃত ঐশীগ্রন্থ নয়। বরং হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন কবি এবং কুরআন একটি কাব্য গ্রন্থ মাত্র। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচারকে খণ্ডন করবার জন্য আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত কয়টি নাজিল করেন। স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, আমি না মুহাম্মদ ﷺ -কে কাব্যগাঁথা শিক্ষা দান করেছি আর না এটা তার জন্য শোভা পায়। বরং কুরআন তো একটি জীবন-বিধান ও উপদেশ গ্রন্থ মাত্র। আর মহানবী ﷺ -কে আমি পাঠিয়েছি ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমার আজাবের দলিল (যৌক্তিকতা) পাকা-পোক্ত করার জন্য।

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ও বর্ণনাদি হতে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ যে শুধু কবিতা রচনা করতে অক্ষম ছিলেন তাই নয়; বরং তিনি অপরাপর কবিদের রচিত কবিতা ও সঠিকভাবে পড়তে পারতেন না। খলীল ইবনে আহমদ হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ কবিতা পছন্দ করতেন, তবে তিনি নিজে তা রচনা বা আবৃত্তি করতেন না।

নিম্নোক্ত কয়েকটি ঘটনা হতে দেখা যায় রাসূলে কারীম ﷺ কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে তাদের সুর-ছন্দ ও শব্দ অটুট রাখতে পারেন নি।

একবার নবী করীম ﷺ তোরফার একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে গিয়ে পড়েছেন-

سَتُبْدِىْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا * وَيَأْتِيْكَ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ بِالْاَخْبَارِ

অথচ মূলত শ্লোকটি হবে নিম্নরূপ- سَتُبْدِىْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا * وَيَأْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ

যা হোক উক্ত বয়েতটি রদ-বদল করে পড়ার পর নবী করীম ﷺ -এর নিকট হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বয়েতটি আপনি যদ্রূপ পড়েছেন তদ্রূপ নয়। তখন নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, আমি কবি নই। আর কবিতার আবৃত্তি ও রচনা আমার জন্য শোভাও পায় না। ইমাম জাস্‌সাস (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে সহীহ সনদে উক্ত ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

হযরত হাসান ইবনে আবুল হাসান (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে, একবার নবী করীম ﷺ আবৃত্তি করেছেন-

كَفٰى بِالْاِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, কবি তো বলেছেন–

هُرَيْرَةُ وَدِّعْ اَنْ تَجَهَّزْتَ غَادِيًا ✱ كَفَى الشَّيْبُ وَالْاِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) অথবা হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি নিঃসন্দেহ আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতখানা– وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ الخ নাজিল করেন।

"وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ الخ" **-এর পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে যোগসূত্র :** ইসলামি জীবন-বিধানের তিনটি মৌলিক দিক রয়েছে, তারা হচ্ছে তাওহীদ। রিসালাত ও আখেরাত। উল্লেখ্য যে, মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে বেশির ভাগ উক্ত তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন– "اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ اٰدَمَ الخ" -এর মধ্যে তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ الخ -এর মধ্যে আখেরাতের আলোচনা করা হয়েছে। এরপর وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ الخ [এর মধ্যে আখেরাত ও] পুনরুত্থানের উপর যে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতাবান তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তারপর আলোচ্য আয়াত "وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ الخ" -এর মধ্যে রেসালতকে সাব্যস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নবী করীমের রিসালাতের উপর আরোপিত কাফেরদের সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা অপবাদ مُحَمَّدٌ ﷺ شَاعِرٌ وَالْقُرْاٰنُ شِعْرٌ হযরত মুহাম্মদ ﷺ কবি এবং কুরআন একটি কাব্যগ্রন্থকে খণ্ডন করা হয়েছে।

"وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ الخ" **-এর বিশদ ব্যাখ্যা : نُعَمِّرْ** শব্দটি تَعْمِيْرٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ– দীর্ঘায়ু দান করা। আর نُنَكِّسْ শব্দটি تَنْكِيْسٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো– উপুড় বা বিপরীত করে দেওয়া।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সীমাহীন কুদরত ও অসীম হিকমতের আরও একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। প্রত্যেক মানুষ এবং জীব-জন্তু সদা-সর্বদা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহর কুদরতের আমল অবিরাম তার মধ্যে জারি রয়েছে। এক ফোঁটা নিষ্প্রাণ অপবিত্র বীর্য হতে তার অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। মাতৃ উদরের তিন-তিনটি অন্ধকার স্তরে এই বিশ্ব-বক্ষাণ্ডের নির্যাস ও ক্ষুদে বিশ্বের [তথা-মানুষের] সৃষ্টি হয়েছে, অসংখ্য সূক্ষ্ম মেশিনসমূহ তার সৃষ্টিতে যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর প্রাণ দান করত তাকে জীবিত করা হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ মাতৃগর্ভে প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালনের পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়েছে। তারপর এ বিশ্ব-বৃক্ষাণ্ডে পদার্পণ করেছে। তখন পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ ও অংশ ছিল অতি দুর্বল-নাজুক। আল্লাহ তা'আলা তার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার মায়ের বুকে খাদ্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন পূর্ব হতেই। এতে সে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠল। তখন হতে শুরু করত যৌবনের কতই না সিঁড়ি অতিক্রম করে তার প্রতিটি অঙ্গ হয়েছে শক্ত-সামর্থ্য, তার দেহে সঞ্চিত হয়েছে সিংহ সম শক্তি। বল-বীর্য আর রূপ-লাবণ্যের এক অভূতপূর্ব সমাহার ঘটিয়েছে তার শরীরে। সব দিক মিলিয়ে যে কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বির মোকাবিলার জন্য সে হয়ে উঠেছে অধিকতর যোগ্য।

পুনরায় যখন স্রষ্টা ও মালিকের ইচ্ছায় তার সমস্ত শক্তির মধ্যে ভাটার আভাস পরিলক্ষিত হলো। ভাটায় ভাটায় শেষাবধি বৃদ্ধাবস্থার শেষ সীমায় গিয়ে উপনীত হলো। তথায় গিয়ে চিন্তা করলে সে দেখতে পাবে পুনরায় সে ঐ মঞ্জিলে গিয়ে পৌঁছেছে যা শিশুকালে ডিঙ্গিয়ে এসেছিল। সমস্ত আদত অভ্যাসে পরিবর্তন দেখা দিল। যা এক সময় অত্যন্ত প্রিয় মনে হতো তা এখন ঘৃণ্য ও তিক্ত মনে হতে লাগল। যাতে আরাম পাওয়া যেত তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। কুরআনে মজীদে তাকেই تَنْكِيْسٌ (বিপরীত করে দেওয়া) বলা হয়েছে। কবি যথার্থই বলেছেন– مَنْ عَاشَ اَخْلَقَتِ الْاَيَّامُ جِدَّتَهُ ✱ وَخَانَهُ ثِقَتَاهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিত থাকবে যুগ তার নতুনত্ব ও শক্তি-সামর্থ্যকে পুরানো ও দুর্বল করে ছাড়বে। আর তা সর্বাধিক দুই জন বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিও তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতঃ পৃথক হয়ে যাবে।

পৃথিবীতে মানুষ চোখে দেখা ও কর্ণে শুনা বস্তুর উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অথচ বৃদ্ধকালে তাদের নির্ভরযোগ্যতাও থাকে না। কান ভারি হয়ে যাওয়ার দরুন কথা পুরোপুরি বুঝে উঠা মুশকিল। দৃষ্টির দুর্বলতার কারণে সঠিকভাবে দেখা কঠিন। মুতানাববীর ভাষায়– وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيْلًا تَقَلَّبَتْ ✱ عَلٰى عَيْنِهِ حَتّٰى يَرٰى صِدْقَهَا كِذْبًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অধিক আয়ু পাবে পৃথিবী তার চোখের সামনেই পাল্টে যাবে। এমন কি যাকে সে পূর্বে সত্য (সঠিক) জানত তাও মিথ্যা মনে হতে থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মানব অস্তিত্বে এই আমূল পরিবর্তন আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের সাক্ষ্য তো বহনই করে; উপরন্তু তাতে মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার একটি বিরাট অনুগ্রহও নিহিত রয়েছে। বিশ্ব স্রষ্টা মানুষের মধ্যে যেসব শক্তি আমানত রেখেছেন, মূলত তা সরকারি মেশিন যা তাকে দান করা হয়েছে। আর এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা তোমার মালিকানাধীন নয় এবং স্থায়ীও নয়। পরিশেষে তা তোমার নিকট হতে ফেরত নেওয়া হবে। তার বাহ্যিক চাহিদা তো এটা ছিল যে, যখন নির্ধারিত সময় আসবে তখন তার নিকট হতে একই সময়ে সব ফেরত নিয়ে যাওয়া, কিন্তু দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদের ফেরত দানের জন্যও দীর্ঘ কিস্তির ব্যবস্থা করেছেন এবং পর্যায়ক্রমে তা ফেরত নেওয়ার নিয়ম করেছেন। যাতে মানুষ তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করত আখেরাতের সফরের উপাদান (পাথেয়) সংগ্রহ করে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ الخ -এর ব্যাখ্যা : কুরআনে মাজীদের যে সকল অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া এবং বাস্তবধর্মী আবেদন মানুষের মনে সুগভীর রেখাপাত করেছিল মক্কার মুশরিকদের পক্ষে তা অস্বীকার করার কোনো পথ ছিলনা। সুতরাং তারা কখনো কখনো একে জাদু এবং নবী করীম ﷺ -কে জাদুকর বলতে লাগল এবং কোনো কোনো সময় কুরআনকে কাব্য ও রাসূলে কারীম ﷺ -কে কবি বলে অপপ্রচার চালাতে শুরু করল। উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের মূল স্পিরিট হতে লোকদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ লোকেরা যেন ধরে নেয় যে, এটার এ প্রতিক্রিয়া ও আবেদন ঐশীবাণী হওয়ার দরুন নয়, বরং জাদু-মন্ত্র অথবা কাব্য গাঁথা হওয়ার কারণে। মানুষের অন্তরকে তা নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমি নবী করীম ﷺ -কে কবিতা-কাব্য শিক্ষা দান করিনি। আর তা আমার হাবীবের জন্য শোভাও পায় না। ঐশী জ্ঞানের ভাণ্ডার নবীর সাথে অলীক কল্পনার জালে আবদ্ধ কবির কি-ই-বা সম্পর্ক থাকতে পারে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, আরবীয়রা তো এমন এক জাতি, কবিতা ও কাব্য রচনা যাদের মজ্জাগত ব্যাপার। মহিলা এমনকি শিশুরাও অকপটে-অনায়াসে কবিতা বলতে পারে। কবিতার হাকীকতের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অবহিত। তারা (জেনে-শুনে) কিভাবে নবী করীম ﷺ -কে কবি এবং কুরআনকে কাব্যগ্রন্থ বলতে পারে? কেননা কবিতার ওজন, ছন্দ ও সুর-তালের সাথে তো এর কোনো মিল নেই। কোনো মূর্খ– কবিতা সম্পর্কীয় জ্ঞানের সাথে যার এতটুকু যোগসাজোস নেই সেও তাকে কবিতা– কাব্যগাঁথা বলে দাবি করতে পারে না।

এর জবাবে মুফাস্সিরগণ বলেছেন, شِعْر (কাব্য) মূলত অলীক কল্পনাপ্রসূত বিষয়াবলিকে বলা হয়– চাই পদ্যে হোক অথবা গদ্যে হোক। তারা কুরআনকে কাব্য এবং নবী করীম ﷺ কে কবি বলার পিছনে উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা নিছক কাল্পনিক ও মনগড়া। আর যদি شِعْر -এর দ্বারা পদ্যকে বুঝানোই তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাকে এ হিসেবে পদ্য বলা হয়েছে যে, পদ্যের ন্যায় এরও আশ্চার্যজনক প্রভাব ও আসর রয়েছে।

ইমাম জাস্সাস (র.) স্বীয় সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল নবী করীম ﷺ কোনো সময় কবিতা আবৃত্তি করেছেন কিনা? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বললেন, না। তবে তোরফার রচিত নিম্নোক্ত শ্লোকটি একবার তিনি আবৃত্তি করেছিলেন–

سَتُبْدِىْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا * وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ

তাকে তিনি ছন্দের ওজন ভেঙ্গে "مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ بِالْاَخْبَارِ" পড়েছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) আরজ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শ্লোকটি আপনি যদ্রূপ পড়েছেন তদ্রূপ নয়। জবাবে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কবি নই। আর কাব্য রচনা আমার জন্য শোভনীয়ও নয়। ইমাম ইবনে কাছীর (র.) স্বীয় তাফসীরে এই বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ প্রমুখগণও তা বর্ণনা করেছেন। তা হতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং কোনো কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা তিনি অন্যদের কবিতা আবৃত্তি করাও পছন্দ করতেন না।

অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় খোদ নবী করীম ﷺ হতে যে কিছু শ্লোক বর্ণিত রয়েছে তার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো তা কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং হঠাৎ (ঘটনাক্রমে) মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছিল। আর কদাচিৎ অকস্মাৎ মুখ হতে দু' একটি শ্লোক বের হয়ে পড়লে কবি বলা হয় না। কাজেই নবী করীম ﷺ ও তার দ্বারা কবি হয়ে যাননি।

উল্লেখ্য যে, বিশেষ একটি হিকমতের প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ -কে কাব্য রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়নি। তবে এতে কাব্য রচনা করা সর্বাংশে নিন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং স্বয়ং নবী করীম ﷺ নিজ পবিত্র মুখে বহু কবি ও তাদের কবিতার প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে কবিতা শিক্ষা না দেওয়ার কারণ : আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে কেন কবিতা শিক্ষা দেননি? মুফাস্সিরগণ এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

এক. সাধারণত কাব্য ও কবিতা অলীক ও কাল্পনিক বিষয়াবলির উপর নির্ভর করত রচিত হয়ে থাকে। উক্ত বিষয়াদির সাথে সত্য ও বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক তো থাকেই না; বরং তা অসত্য ও গোমরাহীর দিকেই মানুষের মন-মগজকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সূরায়ে শুয়ারায় আল্লাহ তা'আলা ফরমান– وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ . أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ . وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ অর্থাৎ "গোমরাহ ও পথভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। (হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন না তারা বক্তব্যের প্রতি ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত করে থাকে। আর তারা এমন কিছু বলে বেড়ায় যা নিজেরা করে না।"

সুতরাং কাব্য ও কবিতা এবং তা চর্চাকারীদের সাধারণ অবস্থা যখন এরূপ তখন ঐশী জ্ঞানের ধারক ও বাহকের সাথে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? তার জন্য তা কিভাবে শোভনীয় ও বরণীয় হতে পারে?

দুই. নবী করীম ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা যদি কবিতা রচনার ক্ষমতা প্রদান করতেন তাহলে কাফের মুশরিকরা কুরআনের মূল দাবি হতে লোকদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে পারত। এই সুযোগে কুরআনে কারীমকেও নিছক একটি কাব্য গ্রন্থ বলে চালিয়ে দিতে সক্ষম হতো। সুতরাং যাতে কুরআনে কারীমের মুখ্য উদ্দেশ্য পণ্ড না হয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য করে রাসূলে করীম ﷺ -কে কবিতা শিক্ষা দেওয়া হয়নি; কাব্য রচনার ক্ষমতা প্রদান করা হয় নি।

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ الخ -এর মধ্যে মহল্লী (র.) يَنْبَغِي -এর তাফসীর يَتَسَهَّلُ -এর দ্বারা করার কারণ : মুফাস্সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন–

এক. তৎকালে আরবি ভাষা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। বড় বড় কবি-সাহিত্যিকগণ প্রতিযোগিতা মূলকভাবে কবিতা রচনা করেছিলেন। তাদের মোকাবিলায় কবিতা রচনা করা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ন্যায় একজন নিরক্ষর মানুষের জন্য মোটেই সহজ সাধ্য তথা সম্ভবপর ছিল না।

দুই. মক্কার সমস্ত কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুণীরা মিলে যেই কুরআনের একটি আয়াতের সমতুল্য একটি বাক্য ও রচনা করতে সক্ষম হলো না সেই কুরআন নবী করীম ﷺ -এর ন্যায় একজন নিরক্ষর ব্যক্তি কিভাবে রচনা করতে পারেন? সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর জন্য এ কুরআন– যাকে তারা কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে– রচনা করা মোটেই সহজ তথা সম্ভবপর ছিল না।

মহানবী ﷺ -এর উপর কাফেররা পাগলামি, জাদু, গণক ইত্যাদির অপবাদ দেওয়া সত্ত্বেও অত্র আয়াতে বিশেষভাবে কবিতা শিক্ষা দেওয়ার প্রতিবাদ করা হলো কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতেন এবং তা পরবর্তীতে বাস্তবের সাথে হুবহু মিলে যেত তখন কাফেররা বলত হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন গণক। আবার যখন মহানবী ﷺ স্বীয় নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ কোনো মোজেজা দেখাত তখন তারা বলত হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন জাদুকর। আবার নবী করীম ﷺ যখন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন ফলে কাফেররা আবিভূত হয়ে যেত তখন রাসূল ﷺ কে তারা বলত তিনি একজন কবি। এত অপবাদ দেওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলা আয়াতে কেন শুধুমাত্র কবিতার নফী করলেন। এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

- এ আয়াতে যদিও শুধু কবিতার প্রতিবাদ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে অপরাপর অপবাদসমূহেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। কাজেই একই আয়াতে সবগুলোর প্রতিবাদ করা জরুরি নয়।
- রাসূল ﷺ -এর সবচেয়ে বড় মোজেজা হলো পবিত্র কুরআন, এ কারণেই কুরআনের বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদকে প্রথমে খণ্ডন করা হয়েছে।
- এ আয়াত দ্বারা মূলত মহানবী ﷺ -এর রিসালাতকে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য আর তাঁর রিসালাত প্রমাণিত হয়ে গেলে অন্যান্যগুলো আপনাতে মিটে যাবে। এ কারণেই এখানে কবিতার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কাফেরদের উক্তি "কুরআন কাব্য গ্রন্থ" এটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। পবিত্র কুরআন হচ্ছে একটি উপদেশ ও আহকাম সম্বলিত কিতাব। মানবজাতির জন্য এতে সদুপদেশ ও জীবন বিধান নিহিত রয়েছে। বোধ সম্পন্ন লোকদের সতর্ক হওয়া এবং কাফেরদের উপর আল্লাহর শাস্তির ঘোষণা সপ্রমাণিত হওয়াই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মূল উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মু'মিনদেরকে জীবিত ও কাফেরদেরকে মৃত ঘোষণা করেছেন। কুরআনের পরিভাষায় ঈমানকে জীবন এবং কুফরকে মৃত্যু হিসেবে গণ্য করেছে। মনে হয় যেন ঈমানদারগণ জীবিত এবং ঈমানবিহীন অন্তর মৃতের ন্যায়। অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে।

কাজেই এ আয়াতে বলা হয়েছে রাসূল ﷺ যেন জীবিত তথা ঈমানদারদেরকে সতর্ক করতে পারেন তাই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু মহানবী ﷺ তো এ কুরআনের মাধ্যমে কাফেরদেরকেও সতর্ক করেছেন। তথাপিও ঈমানদারদেরকে খাস করার কারণ হচ্ছে– এ সতর্কীকরণ শুধুমাত্র মু'মিনদেরই কাজে এসেছে। এর দ্বারা শুধুমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে– কাফেরদের উপর আল্লাহর আজাবের ঘোষণাকে স-প্রমাণিত করা। এর অর্থ এটা হতে পারে যে, আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ আমি জিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব। কাফেরদের ব্যাপারে এ বাণী যথার্থই প্রমাণিত হবে। অথবা এর অর্থ হবে যে নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে কথা দিয়েছেন যে, তাঁর ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান না আনলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এর যথার্থতা যেন কাফেরদের ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়। আল্লাহর আদালতে কাফেররা যেন কোনো রূপ ওজর আপত্তি করতে না পারে। কাজেই কুরআনের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর পরও যারা কুফরিতে আঁকড়ে থাকবে তার দায়-দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে। তাদেরকেই এর পরিণাম ফল ভোগ করতে হবে। অন্য কারো ঘাড়ে এর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আজাব হতে নিস্তার লাভের আর কোনোই সুযোগ বাকি থাকবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧١. اَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْا وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهَا لِلْعَطْفِ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ فِيْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَيْ عَمِلْنَاهُ بِلَا شَرِيْكٍ وَلَا مُعِيْنٍ اَنْعَامًا هِيَ الْاِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ ضَابِطُوْنَ ـ

৭১. আর তারা কি দেখে না? তারা কি জানে না? এখানে اِسْتِفْهَامْ সাব্যস্তকরণের জন্য হয়েছে। এর মধ্যে প্রবিষ্ট وَاوْ আত্ফের জন্য হয়েছে। আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি অন্য সকল মানুষের ন্যায় যা আমার কুদরতি হাতে সৃষ্টি অর্থাৎ কোনো অংশীদার ও সাহায্যকারী ছাড়াই চতুষ্পদ জন্তু তা হলো উট, গরু ও ছাগল ইত্যাদি অতঃপর তারা তাদের মালিক হয়েছে তাদেরকে আয়ত্তকারী হয়েছে।

٧٢. وَذَلَّلْنَاهَا سَخَّرْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ مَرْكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ـ

৭২. আর আমি তাদেরকে অনুগত করে দিয়েছি অর্থাৎ বাধ্যগত করে দিয়েছি তাদের জন্য। সুতরাং তাদের কোনো কোনোটি তাদের সওয়ারি তাদের বাহন এবং তাদের মধ্য হতে কোনো কোনোটিকে তারা ভক্ষণ করে।

٧٣. وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَاَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا وَمَشَارِبُ مِنْ لَبَنِهَا جَمْعُ مَشْرَبٍ بِمَعْنَى شُرْبٍ اَوْ مَوْضِعِهِ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ الْمُنْعِمَ عَلَيْهِمْ بِهَا فَيُؤْمِنُوْنَ اَيْ مَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ـ

৭৩. আর সেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে উপকারিতা– যেমন– উটের পশম, গরুর লোম ও ছাগলের লোম এবং পানীয়সমূহ তাদের দুগ্ধ হতে। তা (مَشَارِبُ) مَشْرَبٌ -এর বহুবচন। এটা অর্থ পানীয় অথবা পান করার স্থল। সুতরাং এতদসত্ত্বেও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করছে না? তাদের দ্বারা যিনি তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। যাতে তারা ঈমান গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তারা এটা করেনি।

٧٤. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهِ اٰلِهَةً اَصْنَامًا يَعْبُدُوْنَهَا لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ يُمْنَعُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ بِشَفَاعَةِ اٰلِهَتِهِمْ بِزَعْمِهِمْ ـ

৭৪. আর তারা বানিয়েছে আল্লাহকে ছাড়া আল্লাহকে ব্যতীত উপাস্যসমূহ প্রতিমাসমূহ যাদের তারা উপাসনা করে। এ উদ্দেশ্যে যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ তাদের ধারণা হলো তাদের উপাস্য প্রতিমাগুলো সুপারিশ করত তাদের হতে আল্লাহর আজাবকে প্রতিহত করবে।

٧٥. لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَيْ اٰلِهَتُهُمْ نَزَلُوْا مَنْزِلَةَ الْعُقَلَاءِ نَصْرَهُمْ وَهُمْ اَيْ اٰلِهَتُهُمْ مِنَ الْاَصْنَامِ لَهُمْ جُنْدٌ بِزَعْمِهِمْ نَصْرَهُمْ مُحْضَرُوْنَ فِى النَّارِ مَعَهُمْ ـ

৭৫. তারা সক্ষম হবে না অর্থাৎ তাদের উপাস্য দেব-দেবীরা সক্ষম হবে না। এখানে দেব-দেবীদেরকে বিবেকবানদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে (শব্দরূপ ব্যবহারে)। তাদের সাহায্য করতে বরং তারা অর্থাৎ তাদের উপাস্য দেব-দেবীসমূহ তাদের জন্য বাহিনীরূপে তাদের ধারণানুযায়ী যারা তাদের সাহায্যকারী বাহিনী হাজির করা হবে তাদের সাথে জাহান্নামে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٦. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ . لَكَ لَسْتَ مُرْسَلًا وَغَيْرَ ذٰلِكَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ وَغَيْرِهٖ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهِ .

৭৬. সুতরাং আপনাকে যেন ব্যথিত না করে তাদের বক্তব্য "তুমি রাসূল নও" ইত্যাদি। আমি ভালো করেই জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। তা এবং অন্যান্য বিষয়াবলি। সুতরাং তদনুযায়ী তাদেরকে আমি প্রতিফল প্রদান করবো।

তাহকীক ও তারকীব

مَشَارِبُ ও مَنَافِعُ-এর অর্থ : مَنَافِعُ এটা مَنْفَعٌ-এর বহুবচন। চতুষ্পদ জন্তু হতে বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ। যেমন- তাদের পশম, চামড়া ও হাড় ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন জিনিস-পত্র তৈরি করা হয়।

مَشَارِبُ এটা مَشْرَبٌ-এর বহুবচন। এটা মাসদার তথা شُرْبٌ-এর অর্থেও হতে পারে। আবার ইসমে যরফ তথা "مَوْضِعُ الشُّرْبِ" (পান করবার স্থান)-এর অর্থেও হতে পারে।

"لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ" -এর মধ্যকার যমীরসমূহের মারজি' : অত্র আয়াতে যমীরসমূহের মারজি'র ব্যাপারে একাধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান।

প্রথমত "لَايَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ" এখানে হয়তো لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো اَلْكُفَّارُ আর هُمْ-এর مَرْجِعٌ হলো اَلْاٰلِهَةُ ইবারত হবে- "اَلْكُفَّارُ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ الْاٰلِهَةِ" কাফেররা তাদের উপাস্যদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।

অথবা, لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-এর মারজি' হবে اَلْاٰلِهَةُ এবং هُمْ-এর মারজি' হবে اَلْكُفَّارُ ইবারত দাঁড়াবে- لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْاٰلِهَةُ نَصْرَ الْكُفَّارِ কাফেরদের উপাস্যরা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।

দ্বিতীয়ত "وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ" এখানেও প্রথম هُمْ-এর মারজি' হবে اَلْكُفَّارُ এবং দ্বিতীয় هُمْ-এর মারজি' হবে اَلْاٰلِهَةُ ইবারত হবে- "وَالْكُفَّارُ لِلْاٰلِهَةِ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ" কাফেররা উপাস্য দেব-দেবীর জন্য সমুপস্থিত সেনাবাহিনী।

অথবা, প্রথমোক্ত هُمْ-এর মারজি' হলো اَلْاٰلِهَةُ এবং শেষোক্ত هُمْ-এর মারজি' হলো اَلْكُفَّارُ ইবারত হবে- وَالْاٰلِهَةُ لِلْكُفَّارِ جُنْدٌ مُحْضَرُوْنَ. উপাস্যরা কাফেরদের জন্য সমুপস্থিত বাহিনী (তথা প্রতিপক্ষ) হবে! وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আয়াতের মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ الخ-এর মধ্যে وَاوٌ টি حَالِيَهْ বা অবস্থাজ্ঞাপক। কাজেই বাক্যটি অবস্থা ব্যাপক হয়ে মহল্লান মানসূব হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ (م) إِنَّا نَعْلَمُ الخ" -এর শানে নুযূল : মুশরিকরা নবী করীম ﷺ-কে নানাভাবে কষ্ট দিত। তারা তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন করত। গাল-মন্দ করত ও নানা কটূক্তি করত। কখনও বলত মুহাম্মদ ﷺ পাগল, কখন বলত জাদুকর, গণৎকার আবার কখনো বলত মুহাম্মদ ﷺ কবি আর কুরআন হলো তাঁর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। আবার কখনো রটনা করত যে, তাঁকে জিনে পেয়েছে- নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তাদের অত্যাচারে নবী করীম ﷺ মাঝে মধ্যে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়তেন। মুশরিকদের এহেন দুর্ব্যবহারে তাঁর হৃদয়-মন ব্যথিত ও হতাশ হয়ে পড়ত। সবচেয়ে পীড়াদায়ক বিষয় ছিল তারা নিজেরা তো ঈমান আনেই নি; বরং অন্যান্যদেরকেও ঈমান আনতে বাধা দিত। যারাই ঈমান আনত তারাই তাদের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হতো। হরহামেশাই নীরিহ ঈমানদারদের বুক ফাটানো আর্তনাদে দয়াল নবী ﷺ শিহরিয়ে উঠতেন। এমনতর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পরিস্থিতিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের কতিপয় আয়াত নাজিল করতঃ রাসূলে কারীম ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। আলোচ্য আয়াতখানা সেই সব আয়াতের একটি। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাঁর হাবীবকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি মুশরিকদের দুর্ব্যবহার ও কটূক্তিতে ব্যথিত হবেন না। তাদের সকল আচরণ সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত রয়েছি। আমি তাদের থেকে অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেবো।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ الخ আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনে তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ১. আল্লাহর একত্ববাদ ২. রাসূল ﷺ -এর রিসালাত ৩. আখেরাত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহের নসিহত। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী আয়াতে মহানবী ﷺ ও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কাফেরদের একটি ভুল ধারণার নিরসন করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে পুনরায় আল্লাহর একত্ববাদের কথা শুরু করা হয়েছে। মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের মধ্যে এ আয়াতে কয়েকটির উল্লেখ রয়েছে এবং আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এবং তার প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ অর্থাৎ মানুষ কি দেখে না যে তারা আল্লাহর অনন্ত অসীম নিয়ামত অহরহ ভোগ করে চলছে। এ নিয়ামতসমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুগুলো অন্যতম। আল্লাহ মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন উট, ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি। আল্লাহ এ চতুষ্পদ জন্তুকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন। একটি ছোট বালক অনায়াসে বড় বড় জন্তুকে তার লাগাম ধরে হাটিয়ে নিয়ে যায়। মানুষ এগুলোর দুধ পান করে গোশত খায়। এগুলোর চামড়া এবং পশম দ্বারা পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে, শীতের তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করে। তারা এ জীবজন্তু থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে। এগুলোর দ্বারা তাদের অনেক প্রয়োজনের আয়োজন হয়। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও অশেষ দান। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, যথা নিয়মে তাঁর বন্দেগি করা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়।

"مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا" -এর মধ্যে হস্তদ্বয়কে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করার রহস্য : কুরআনে হাকীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার হাত-এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সৃষ্টিকুলের ন্যায় কায়াবিশিষ্ট নন। সুতরাং তাঁর হাত বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে?

মুতাকাদ্দিমীনে ওলামায়ে কেরাম (র.) উক্ত প্রশ্নের জওয়াবে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যা বলেছেন তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার হাত, চোখ, কান ইত্যাদি আছে। তবে তার সৃষ্টির হাত-পা বা কান, চোখের ন্যায় মোটেই নয়; বরং যদ্রূপ তার জন্য শোভনীয় তদ্রূপ রয়েছে। তার মূল অবস্থা আমাদের জানা নেই।

আর মুতায়াখ্খিরীনে ওলামায়ে কেরাম তার বিভিন্ন তাবীল করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁরা অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, "আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন" এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের সৃষ্টির ব্যাপারে কেউই তাঁর শরিক বা অংশীদার নেই।" আল্লাহই ভালো জানেন।

"وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا الخ" -এর ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বান্দার উপর তাঁর একটি বিরাট ইহসানের উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, অধিকাংশ জীব-জন্তু যেমন উট, গরু, হাতি, মহিষ ইত্যাদি মানুষ হতে অনেক বড় ও বহু গুণে বেশি শক্তিশালী। তাদের মোকাবিলায় মানুষ অতিশয় দুর্বল ও হীনকায়। কাজেই মানুষ তাদেরকে বশীভূত করতে না পেরেই ছিল স্বাভাবিক। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে শুধু উক্ত জানোয়ারদের সৃষ্টিই করেননি; বরং এই বন্য ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলোকে মানুষের অনুগতও বানিয়ে দিয়েছেন। একটি বালক একটি বিরাটকায় শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়। অতঃপর তার পিঠে সওয়ার হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এটা মানুষের নিজস্ব কোনো গুণ নয়; বরং শুধুমাত্র আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الخ আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করে, তার গোশত ভক্ষণ করে। এখানে ইরশাদ করেছেন যে, শুধু তাই নয়; বরং তাদের হতে তারা আরও নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। তাদের পশম, চামড়া ও হাড়কে তারা বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করে থাকে। তারা তাদের দুগ্ধ পান করে থাকে। দুগ্ধ হতে নানা ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলার এত নিয়ামত উপভোগ করেও তারা এতটুকু শুকরিয়া আদায় করে না। কেননা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা হলো তাঁর বড় শুকরিয়া আদায় করা। অথচ তারা তা হতে দূরে সরে রয়েছে। আল্লাহর অপার রহমত ও অসংখ্য নিয়ামতে নিমজ্জিত থেকে তারা নিষ্প্রাণ জড় প্রতিমা ও কাল্পনিক দেব-দেবীর পূজা-উপাসনায় লিপ্ত রয়েছে। তা হতে অধিক বোকামি ও অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে? শুধু তাই নয়, তা হতেও অধিক দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হলো তারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে আল্লাহর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর নিয়ামতের মৌখিক স্বীকৃতি ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেই শোকরের হক আদায় হয়ে যাবে না; বরং কার্যত তা দেখিয়ে দিতে হবে। মোটকথা, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলে, তাঁর আদেশাবলি মান্য করলে ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলি হতে বিরত থাকলেই প্রকৃতপক্ষে শুকরিয়া আদায় করেছে বলে গণ্য হবে, অন্যথা নয়। সুতরাং গায়রুল্লাহর ইবাদত করা, তাদের জন্য ভেট ও নযর-নেওয়াজ দেওয়া, তাদের নিকট কিছু চাওয়া ইত্যাদির সবকিছুই আল্লাহর না শোকর তথা কুফরানে নিয়ামতের শামিল।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الخ-এর ব্যাখ্যা : কাফের মুশরিকদেরকে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। উক্ত নিয়ামত রাজির শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করা ছিল তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অথচ তারা আল্লাহর সাথে এমন কতিপয়কে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে যারা তাদের মোটেই কোনো উপকার করতে পারবেনা। যদিও তাদের আশা যে, ঐ উপাস্যরা আখেরাতে আল্লাহর আজাব ও গজব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে। বরং ঐ উপাস্য দেবতারা তাদের জন্য [অর্থাৎ উপাসনাকারীদের জন্য] সেনাবাহিনী হিসেবে সমুপস্থিত হবে।

এখানে মুফাসসিরগণ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ-এর দুটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

এক. এখানে جُنْدٌ-এর দ্বারা বিরোধী বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে : অর্থাৎ কাফের-মুশরিকরা যেসব গায়রুল্লাহর ইবাদত করছে কিয়ামত দিবসে তারা ঐ কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

দুই. হযরত হাসান ও কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, তারা দেব-দেবীকে তো তাদের সাহায্যের জন্য পূজা করেছিল। অথচ প্রকৃত অবস্থা হলো, তারা তো কাফের-মুশরিকদের সাহায্য করতে সক্ষম-ই নয়; বরং উপাসনাকারীরাই তাদের খাদেম এবং তাদের সেনাবাহিনী হিসেবে দিবা-রাত্রি তাদের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে–তাদের সাহায্য করে যাচ্ছে। তারাই বরং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে তারাই তো অস্ত্র ধারণ করে। –[কুরতুবী]

আয়াতে কারীমা "فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ الخ" -এর বিশদ ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে خِطَابٌ (সম্বোধন) করা হয়েছে। এখানে প্রকাশ্য ও গোপন কথা বলে ইঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে যে, মক্কার কাফের ও মুশরিক নেতৃবৃন্দ নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা চালাত তা সম্পর্কে তাদের স্পষ্টই জানা ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ বিরুদ্ধে তারা যে দোষারোপ করছে, যে অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন– সর্বাংশেই মিথ্যা ও বানোয়াট। এমনকি নিজেদের ঘরোয়া মিটিংয়ে তারা তা স্বীকারও করত। মূলত নিজেদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অটুট রাখার জন্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ও তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া ছিল এ অপপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে তাদের এ মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ও অহেতুক অপবাদের মুখে ধৈর্য ধারণের এবং তাতে ব্যথিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের এ অপতৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত রয়েছেন। তিনি তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সত্যকে অচিরেই প্রতিষ্ঠিত করবেন– তা কাফের-মুশরিকদের নিকট যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন। মোটকথা, বিজয় শেষ পর্যন্ত আপনারই হবে। আর তাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও দুর্গতি এবং পরকালের সীমাহীন ভোগান্তি। কাজেই হে-হাবীব! আপনার চিন্তিত ও ব্যথিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনার এবং আপনার অনুসারীদের জন্য রয়েছে ইহকালে মর্যাদা ও সম্মানের আসন আর পরকালে অনন্ত শান্তি– এতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧٧. اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ يَعْلَمُ وَهُوَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِيٍّ اِلٰى اَنْ صَيَّرْنَاهُ شَدِيْدًا قَوِيًّا فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ لَنَا مُّبِيْنٌ بَيِّنُهَا فِىْ نَفْيِ الْبَعْثِ .

৭৭. মানুষ কি দেখে না? তথা জানে না? আর [সে এখানে মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য] হলো আস ইবনে ওয়ায়েল। আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীর্য হতে ধাতু হতে– এমনকি অতঃপর আমি তাকে কঠিন ও শক্তিশালী করেছি। অথচ সে ঝগড়াকারী– আমার সাথে প্রচণ্ড ঝগড়ায় লিপ্ত প্রকাশ্য পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি প্রশ্নে সে প্রকাশ্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে অর্থাৎ সে সরাসরি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বসেছে।

٧٨. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا فِىْ ذٰلِكَ وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ ط مِنَ الْمَنِىِّ وَهُوَ اَغْرَبُ مِنْ مِثْلِهٖ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ اَىْ بَالِيَةٌ وَلَمْ يَقُلْ بِالتَّاءِ لِاَنَّهٗ اِسْمٌ لَا صِفَةٌ رُوِىَ اَنَّهٗ اَخَذَ عَظْمًا رَمِيْمًا فَفَتَّتَهٗ وَقَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَتَرَى يُحْيِ اللّٰهُ هٰذَا بَعْدَ مَا بَلِىَ وَرَمَّ فَقَالَ ﷺ نَعَمْ وَيُدْخِلُكَ النَّارَ .

৭৮. আর আমার সামনে একটি উদাহরণ পেশ করেছে ঐ ব্যাপারে এবং ভুলে বসেছে তার সৃষ্টির ঘটনাকে– বীর্য হতে। অথচ তা তার পেশকৃত উদাহরণ হতে অধিকতর আশ্চার্যজনক। সে বলল, কে হাড়গুলোকে জীবিত করবে? এমতাবস্থায় যে, জরাজীর্ণ হয়ে (পচে-গলে) গিয়েছে। অর্থাৎ পুরানো হয়ে গিয়েছে। আর تَا যোগে (رَمِيْمَةٌ) বলেননি। কেননা তা ইসম, সিফাত নয়। বর্ণিত আছে যে, আস ইবনে ওয়ায়েল একটি পুরানো হাড় নিল। তারপর তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল। অতঃপর নবী করীম ﷺ -কে বলল, তুমি কি মনে কর যে, এ হাড়টি পুরানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনঃ জীবিত করবেন? জবাবে নবী করীম ﷺ বলবেন, হ্যাঁ, আর তোমাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

٧٩. قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ اَىْ مَخْلُوْقٍ عَلِيْمٌ مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا قَبْلَ خَلْقِهٖ وَبَعْدَ خَلْقِهٖ .

৭৯. হে হাবীব! আপনি তাকে বলে দিন, উক্ত হাড়গুলোকে তিনিই পুনঃ জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্পর্কে অর্থাৎ মাখলুক সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন– এজমালিভাবে এবং বিশদভাবে। তা সৃষ্টির পূর্বে এবং তা সৃষ্টির পরে।

٨٠. اِلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ فِىْ جُمْلَةِ النَّاسِ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ الْمَرْخِ وَالْعَفَارِ اَوْ كُلِّ شَجَرٍ اِلَّا الْعِنَابَ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ تَقْدَحُوْنَ وَهٰذَا دَالٌّ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ فَاِنَّهٗ جَمَعَ فِيْهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْخَشَبِ فَلَا الْمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ وَلَا النَّارُ تُحْرِقُ الْخَشَبَ .

৮০. যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য– অপরাপর মানুষের ন্যায় সবুজ বৃক্ষ হতে মারখ ও আফার নামক গাছ হতে অথবা আঙ্গুর ব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষ হতে অগ্নি। সুতরাং তোমরা তা হতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর চুলা ধরাও। অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে থাক। আর এটা পুনরুত্থানের শক্তি ও সম্পর্ক প্রমাণ করে। কেননা তিনি তাতে পানি, অগ্নি ও কাঠের সমাহার করেছেন। অথচ না পানি আগুনকে নিভিয়ে দিচ্ছে আর না আগুন কাঠকে পুড়িয়ে ফেলেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ, ইকরামা, উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের এবং সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত. আর বায়হাকী আবূ মালিকের সূত্রে, এমনিভাবে আল্লামা বাগবী (র.) বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ আয়াত উবাই ইবনে খলফ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা সে একটি পঁচা হাড় নিয়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয় এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে বলে, সে এভাবে ধ্বংস হওয়ার পর কে তাকে পুনর্জীবন দান করবেন? মহানবী ﷺ ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তোকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং দোজখে নিক্ষেপ করবেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আয়াতের মর্মকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শুক্র বিন্দু থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার তাকে সৃষ্টি করা আদৌ কঠিন নয়। -[মাযহারী]

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে- মানুষ কি তার সৃষ্টির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে না? কিভাবে সে তার অস্তিত্ব লাভ করেছে তা কি সে ভুলে গেছে? তার স্মরণ করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা একটি শুক্র বিন্দু থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যখন তার কোনোই অস্তিত্ব ছিল না, কোনো নমুনা ছিলনা, এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দয়ায় সে জীবনের যাবতীয় উপকরণ লাভ করেছে। ঠিক এমনিভাবে যখন মানুষ মৃত্যুর পর কঙ্কালে পরিণত হবে, তখন পুনরায় আল্লাহ তা'আলাই তাকে নবজীবন দান করবেন।

বস্তুত মানুষ যদি তার প্রথম সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়। যদি সে এ মহা সত্য সম্পর্কে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাকে অনস্তিত্বের শূন্য গর্ভ থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছেন, তবে এ সত্য উপলব্ধি করতে বিলম্ব হবে না যে, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষকে জীবন দান করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। যিনি একটি শুক্র বিন্দুকে জীবন্ত মানুষে পরিণত করেছেন সে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অতি সহজ কাজ। মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করলেই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, একদিন এমনও ছিল, যখন তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আর এখন সে এক বাস্তব সত্য। কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তার উপর মৃত্যুর আলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হবে এবং এ পৃথিবীতে তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। আর তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হবে। এরপর আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন এবং তার জীবনের যাবতীয় কর্মের হিসাব-নিকাশ নিবেন। কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন যে, مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى অর্থাৎ এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনব। আবার পুনরায় এ মাটি থেকে বের করব।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাই এতে কার্যকর হবে। বিস্ময়কর বিষয় এই যে, যাকে আল্লাহ তা'আলা এক ফোঁটা অপবিত্র পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সে আজ প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে উপলব্ধি করতে চায় না। বিতর্কে লিপ্ত হতে চায়। যিনি অপবিত্র উপকরণ দ্বারা এত সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করেন তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দেওয়া আদৌ কঠিন কাজ নয়।

-[মাযহারী ৯ খণ্ড, পৃ. ৫৬৭]

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ الخ আয়াতে إِنْسَانٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এ আয়াতে إِنْسَانٌ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে-

১. তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাযী (র.) লিখেন- إِنْسَانٌ দ্বারা এখানে কুরাইশ নেতা আবূ জাহল, উবাই ইবনে খলফ, আস ইবনে ওয়ায়েল ও ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. তাফসীরে রুহুল বয়ানের ভাষ্যমতে, এখানে إِنْسَانٌ দ্বারা পরকাল অবিশ্বাসকারী সকল মানুষকেই বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

৩. জালালাইনের লেখক জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) -এর মতে, এখানে اَلْإِنْسَانُ দ্বারা শুধুমাত্র আস ইবনে ওয়ায়েলকে বুঝানো হয়েছে।

৪. ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর شُعَبُ الْإِيْمَانِ গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াতে اَلْإِنْسَانُ দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে বুঝানো হয়েছে।

সারকথা হলো, এ আয়াতটি যার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোক না কেন এর দ্বারা সকল কাফেরই উদ্দেশ্য। কারণ তারা সকলেই পরকালকে অস্বীকার করে।

اَلنُّطْفَةُ উল্লেখের রহস্য : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে اَلنُّطْفَةُ শব্দের উল্লেখ করার মাধ্যমে স্বীয় কুদরতের প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ نُطْفَةٌ এমন একটি বস্তু যার রং-রূপ, আকার-আকৃতি এক ও অভিন্ন। অথচ আল্লাহ তা'আলা তা হতে বিভিন্ন রং-রূপ ও আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করছেন। স্বীয় ইচ্ছা মাফিক কেউই জন্ম লাভ করতে পারে না। সন্তানের বাবা মাও স্বীয় ইচ্ছাধীনে সন্তান জন্ম দিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছাধীনেই তা করে থাকেন। মূলত এতে কারোই হাত নেই। যে আল্লাহ নির্দিষ্ট (একই) আকার-আকৃতির বীর্য হতে বিভিন্ন রং-রূপ ও আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন তিনি সন্দেহাতীতভাবে পুনরুত্থানেও সক্ষম।

'وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا .... فَإِذَآ اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُوْنَ' **আয়াতের ব্যাখ্যা :** দুরাত্মা কাফেররা আল্লাহ তা'আলার শানে ঔদ্ধত্বপূর্ণ মন্তব্য করে এবং নিজের সৃষ্টির ইতিকথাই ভুলে যায়, তারা বলে যে, মানুষের পুনরুত্থান কি করে সম্ভব? একটি হাড় যখন পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন কার এ শক্তি আছে যে, তাকে নব জীবন দান করবে? অর্থাৎ যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব মনে করা হয়, তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষেও তাকে তেমনি অসম্ভব মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম শক্তিকে মানুষের শক্তির ন্যায় মনে করে, তাই তারা এমন অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ. অর্থাৎ '(হে রাসূল!) আপনি বলুন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই পুনর্জীবিত করবেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।'

অর্থাৎ এ হাড়গুলোকে সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলাই পুনর্জীবন দান করবেন, যিনি প্রথম এগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন।

পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান : এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করবেন, মৃত্যুর সময় রূহকে দেহ থেকে পৃথক করা হয়, কিন্তু পুনরায় মানুষকে জীবিত করা হবে আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষে এ কাজ আদৌ কঠিন কিছু নয়। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হতভাগা কাফের আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে, অথচ তার নিজের সৃষ্টি তত্ত্বই সে ভুলে যায়, যদিও এ আয়াত উবাই ইবনে খালফ অথবা আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতের মধ্যে জবাব রয়েছে সকল যুগের কাফের মুশরিকদের, যারা এমন বেয়াদবিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রকৃত অবস্থা এই, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, যা সৃষ্টি নিজেও তার সম্পর্কে জানে না স্রষ্টা তা জানেন। তাই ইরশাদ হয়েছে- وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ 'তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত'।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, পঁচাগলা হাড়গুলোকে একত্রিত করা এবং তাতে জীবন সঞ্চার করা এত বিস্ময়কর নয়, যত বিস্ময়কর হলো মানব দেহের নির্যাস রূপে শুক্রকে বের করা এবং এ অপবিত্র বস্তু থেকে একজন সম্মানিত মানুষ তৈরি করা। ঐ একটি অপবিত্র বস্তুর মধ্যেই থাকে মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ এক কথায় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এসব কিছুই ছিল আল্লাহ তা'আলার অসীম জ্ঞানে যা মানব সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ দূরাত্মা কাফেররা তাদের সৃষ্টির ইতিকথাকে ভুলে গিয়ে বলেছে, 'কে এই পঁচাগলা কঙ্কালে প্রাণ সঞ্চার করবে'? আলোচ্য আয়াতে সরাসরি তাদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করবেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা প্রথমবারের সৃষ্টি থেকে কঠিনও নয়, বিস্ময়করও নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ 'তিনিই তো তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন, তোমরা তা থেকেই অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক'।

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম কুদরতের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আরবে দু'প্রকার বৃক্ষ রয়েছে, এক প্রকারকে বলা হয়, 'মীরখ', আর এক প্রকার হলো 'ইফার'। এ দু'প্রকার বৃক্ষের ডালাগুলো সবুজ হয় এবং তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পানি পড়তে থাকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয় প্রকার বৃক্ষের ডালাগুলোর পরস্পরের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। এটি কতবড় বিস্ময়কর বিষয় যে, আগুন পানি এক হতে পারে না, অথচ এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হয় এবং এভাবে তোমরা অগ্নি প্রজ্বলিত করে থাক। যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন বের করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করা আদৌ কঠিন কিছু নয়।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, একবার আকাবা ইবনে আমর হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে বললেন, আমাকে একটি হাদীস শুনিয়ে দিন, যা আপনি প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বললেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, সে তার উত্তরাধিকারীদেরকে অসিয়ত করল যে, আমার মৃত্যু হলে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আমার লাশকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে, এরপর ঐ ছাইগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেবে। তারা তাই করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতে তার ছাইগুলোকে একত্রিত করে তাকে পুনর্জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এমনটি কেন করলে'? সে আরজ করল 'হে পরওয়ারদেগার! আপনার ভয়ে'। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুর ﷺ পথ চলার সময় এ হাদীস ইরশাদ করেছিলেন যা আমি নিজে তাঁর জবান মোবারক থেকে শ্রবণ করেছি। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সে ব্যক্তি বলেছিল, আমার দেহের ছাইগুলোকে দু'ভাগ করবে, একভাগ বাতাসে ছেড়ে দেবে, আরেকভাগ সমুদ্রে ফেলে দেবে। এরপর আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে সমুদ্র এবং বাতাস তার ছাইগুলো একত্রিত করে হাজির করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনর্জীবন দান করেন। আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বৃক্ষ উৎপাদন করেন এবং এ সবুজ বৃক্ষ থেকে তিনি অগ্নি বের করেন, আর এটি কোন কঠিন কাজ নয়, এমনিভাবে জীবিতকে মৃত্যুমুখে পতিত করা এবং মৃতকে পুনর্জীবন দান করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়। এ জন্য আরবে একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে– لِكُلِّ شَجَرٍ نَارٌ اِسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَارُ– তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আঙ্গুর বৃক্ষ ব্যতীত সকল বৃক্ষেই অগ্নি রয়েছে।

যাহোক, আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর পক্ষে মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করা এবং তাকে পুনর্জীবন দান করে তাঁর দরবারে হাজির করা সবই সহজ এবং সবই সম্ভব। এ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মু'মিন মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। আর পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা-২৩, পৃষ্ঠা-২০,২১, তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড– ৯, পৃষ্ঠা-৬৭১]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨١. اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مَعَ عِظَمِهِمَا بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط اَىِ الْاَنَاسِىَّ فِى الصِّغَرِ بَلٰى ق اَىْ هُوَ قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ اَجَابَ نَفْسَهٗ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْكَثِيْرُ الْخَلْقِ الْعَلِيْمُ بِكُلِّ شَىْءٍ.

৮১. তাহলে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল– তাদের বিশালতা সত্ত্বেও তিনি তাদের ন্যায় (জীব)-কে সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অর্থাৎ মানুষকে ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও। হ্যাঁ, অবশ্যই অর্থাৎ তিনি তা করতে সক্ষম। আল্লাহ নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আর তিনি বহু সৃষ্টিকারী– অত্যধিক সৃষ্টিকারী সম্পূর্ণ অবহিত সব কিছুর ব্যাপারে।

٨٢. اِنَّمَآ اَمْرُهٗ شَاْنُهٗ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَىْ خَلْقَ شَىْءٍ اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ اَىْ فَهُوَ يَكُوْنُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلٰى يَقُوْلَ.

৮২. নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যাপার (অর্থাৎ) তাঁর অবস্থা হলো যখন তিনি কিছু করার ইচ্ছা করেন অর্থাৎ কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাকে বলেন, "হও" তাতে তা হয়ে যায়। অর্থাৎ ফলে সে বস্তু (অস্তিত্বসম্পন্ন) হয়ে যায়। অন্য এক কেরাতে يَقُوْلَ -এর উপর আতফ হয়ে নসবের সাথে (فَيَكُوْنَ) হয়েছে।

٨٣. فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ مُلْكُ زِيْدَتِ الْوَاوُ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ اَىِ الْقُدْرَةُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُرَدُّوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ.

৮৩. সুতরাং পূত-পবিত্র সে সত্তা যার হস্তে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা (مَلَكُوْتُ শব্দটি আসলে ছিল) مُلْكُ মুবালাগাহ বা আধিক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে এর সাথে واو এবং تا -কে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কুদরত (ক্ষমতা)। প্রত্যেক বস্তুর উপর। আর তারই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ আখেরাতে তার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তাহকীক ও তারকীব

بِقَادِرٍ -এর বিভিন্ন কেরাত : بِقَادِرٍ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে–

১. প্রসিদ্ধ কেরাত হচ্ছে মাসহাফে উল্লিখিত بِقَادِرٍ -

২. আল্লামা আবুল মুনযির, সাল্লাম ও ইয়াকুব হাযরামী প্রমুখের মতে কেরাতটি يَقْدِرُ -

اَلْخَلّٰقُ শব্দের বিভিন্ন কেরাত : এখানেও দুটি কেরাত রয়েছে–

* মাসহাফে উল্লিখিত اَلْخَلّٰقُ আর এটা প্রসিদ্ধ কেরাত।

* হযরত হাসান (র.) اَلْخَلّٰقُ -এর পরিবর্তে اَلْخَالِقُ পড়েছেন।

فَيَكُوْنُ -এর বিভিন্ন কেরাত : فَيَكُوْنُ শব্দটির শেষের ن -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত হতে পারে–

১. মাসাহাফে উল্লিখিত فَيَكُوْنُ অর্থাৎ শেষের ن টি পেশ যোগে হয়ে আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. ইমাম কেসায়ী (র.) فَيَكُوْنَ অর্থাৎ শেষের ن টিকে যবরের সাথে পড়েছেন। তখন এটা পূর্বের يَقُوْلَ -এর উপর আতফ হবে।

"مَلَكُوْتُ" -এর মধ্যে পঠিত কেরাত : এখানেও দুটি কেরাত রয়েছে–

১. মাসহাফে উল্লিখিত مَلَكُوْتُ আর এটাই প্রসিদ্ধ।

২. তালহা ইবনে মুদারিক ইব্রাহীম তামীমী প্রমুখ কারীদের মতে مَلَكُوْتُ -এর স্থানে শব্দটি مَلَكَةُ হবে।

"تُرْجَعُوْنَ" -এর মধ্যকার কেরাত : تُرْجَعُوْنَ শব্দটিতেও দুটি কেরাত রয়েছে–

১. মাসহাফে উল্লিখিত تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ শব্দের প্রথম অক্ষরটি হবে تَا যোগে আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. হযরত সুলামী, যিররু, ইবনে হুযায়ফা ও আব্দুল্লাহ প্রমুখগণ এখানে يُرْجَعُوْنَ অর্থ শব্দের প্রথম বর্ণটি يَا যোগে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَوَ لَيْسَ الَّذِيْ .... وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ" -এর ব্যাখ্যা : 'যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না? হ্যাঁ, নিশ্চয় পারেন, তিনিই প্রকৃত স্রষ্টা আর তিনিই সর্বজ্ঞ'।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হিকমতের বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন, যিনি বিশাল আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার অস্তিত্ব প্রদান করা কোনো অবস্থাতেই কঠিন হতে পারে না। তোমরা বিরাট বিস্তৃত নীলাভ আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং বিশাল বিস্তৃত জমিনের দিকেও তাকাও, যিনি আসমান জমিনের ন্যায় মহাসৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে পাঁচ/ছয় ফুট ক্ষুদ্র মানুষের পুনঃসৃষ্টি কি আদৌ কঠিন হতে পারে? আসমানের নিচে জমিনের উপর কোটি কোটি মানুষ বাস করছে, আসমান জমিনের সৃষ্টির তুলনায় মানুষের সৃষ্টি নিতান্ত সামান্য ব্যাপার, এরপরও কি কোনো বুদ্ধিমানের পক্ষে একথা চিন্তা করা সম্ভব হয় যে, মানুষকে পুনর্জীবন দেওয়া আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কঠিন হবে? অবশ্যই নয়, তিনি মহান স্রষ্টা, তিনি মহাজ্ঞানী, সৃষ্টি জগতের সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখদর্পণে। তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্য বিস্ময়কর, এ জন্যে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ 'মানুষের সৃষ্টি থেকে আসমান জমিনের সৃষ্টি অত্যন্ত বড় ব্যাপার'।

وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ তিনি মহান স্রষ্টা, তিনি একের পর এক সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ 'আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থা তো এমনই, যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তার সম্পর্কে বলেন, 'হও', আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও', অমনি ঐ বস্তুটি অস্তিত্ব লাভ করে। তিনি যা কিছু করতে চান, তার জন্যে তাঁর একটি আদেশই যথেষ্ট।

মুসনাদে সংকলিত একখানি হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বন্দাগণ! তোমরা সকলেই গুণাহগার, তবে যাকে আমি ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব, তোমরা সকলেই ফকির, যাকে আমি ধনী করি, আমি অত্যন্ত বড় দাতা, আমি যা ইচ্ছা তা করি। আমার পুরস্কারও একটি কথা, আর আমার আজাবও একটি কথা, আমি যা কিছু করতে চাই, আমি শুধু বলি, 'হও' তখন তা হয়ে যায়। সকল মন্দ বস্তু থেকে আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। যিনি আসমান জমিনের বাদশাহ, যাঁর হাতে আসমান জমিনের চাবি রয়েছে, তিনি সকলের স্রষ্টা, তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাবান। কিয়ামতের দিন সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তিনিই সুবিচারক, তিনিই নিয়ামতদাতা, তিনিই মানুষকে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেবেন, তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যাঁর হাতে সব কিছুর ক্ষমতা রয়েছে। তাই কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ 'বরকতময় সে আল্লাহ তা'আলা যাঁর হাতে রয়েছে সমস্ত ক্ষমতা, আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বোপরি শক্তিমান।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ কথার তাৎপর্য হলো এই যে, সমগ্র বিশ্বজগতের সব কিছুর সমূহ কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হাতে রয়েছে। অতএব মানুষকে পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান করা তাঁর জন্যে কঠিন কোনো বিষয়ই নয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন, সে বিচক্ষণ ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু একবার নয়; বরং হাজার বার সৃষ্টি করতে, মৃত্যুমুখে পতিত করতে এবং পুনর্জীবন দান করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'অতএব, পবিত্র, মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'। অর্থাৎ যখন এ সত্য জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটি শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং একথাও প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা মরা পঁচা হাড়গুলোতে পুনরায় প্রাণ দিতে সক্ষম, আর এ সত্যও উদ্ভাসিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন এবং কোনো কিছুকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলে তিনি শুধু আদেশ দেন 'হও' বলে, তখন তা হয়ে যায়। এমন অবস্থায় প্রত্যেকের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা। কাফেররা তাদের মূর্খতা বশত তাঁর শানে যেসব আপত্তিকর মন্তব্য করে, তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর রহমত সবার উপরে রয়েছে অব্যাহত।

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 'আর তাঁরই নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, এ বাক্যটির মধ্যে দু'টি কথা রয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, তার জন্যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে তাদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। -[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড- ৯, পৃষ্ঠা-৫৭৩]

এ সূরার মর্মকথা : তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

এক. প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের কথা এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে।

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ [হে রসূল!] 'নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্যতম'।

দুই. তৌহীদের অনেক দলিল প্রমাণ বর্ণনা করে ঘোষণা করা হয়েছে–

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ 'অতএব, পবিত্র সে আল্লাহ তা'আলা, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা', তাই প্রত্যেককে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য।

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ তিন. 'আর তাঁরই নিকট সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'। অর্থাৎ প্রত্যেককেই পুনর্জীবন দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকেরই পুনরুত্থান হবে, এভাবে হাশরের ময়দানে হাজির হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আস্-সাফ্‌ফাত

নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত اَلصّٰفّٰتِ দ্বারা সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'আস-সাফফাত'। যার অর্থ হলো- সারিবদ্ধ। যেহেতু এ সূরার শুরুতে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সূরাটি শুরু করেছেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য সূরাটিকে 'আস্-সাফ্ফাত' নামকরণ করেছেন। অথবা, অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ (অংশবিশেষের নামের দ্বারা সম্পূর্ণ বস্তুর নামকরণ) মূলনীতির অনুকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ করেছেন।

মুফাস্সিরীনে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট একটি পবিত্র ও অনুগত জাতি। মুহূর্তকালের জন্যও তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হতে গাফেল হন না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে আদেশ করা হয় সাথে সাথেই তাঁরা তা পালন করতে লেগে যান। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই রাসূলে কারীম ﷺ সূরাটির নামকরণ করেছেন সূরা 'আস্-সাফ্ফাত'।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : সূরা 'আস্-সাফ্ফাত' তাওহীদ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রুকূ'তে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থাসমূহের সাথে সাথে রিসালাতের বর্ণনাও করা হয়েছে। মোটকথা, সম্পূর্ণ সূরার মধ্যে ঘুরে-ফিরে এ তিনটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইয়াসীনেও উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমষ্টিগত যোগসূত্রের দ্বারা পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। -[কামালাইন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : সূরাটি হিজরতের পূর্বে রাসূলে কারীম ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে একথা সুস্পষ্ট বর্ণিত নেই যে, নবুয়তের কোন সালে তা অবতীর্ণ হয়েছে। হ্যাঁ বিষয়বস্তু ও ভাব-ভঙ্গি পর্যালোচনা দ্বারা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না যে, মাক্কী যুগের শেষভাগে তা অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ঘটনাসমূহের ব্যাপক উদ্ধৃতির মাধ্যমে হুযূর ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার দ্বারা এটাই অনুমান করা যায় যে, তখন নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার সীমা অতিক্রম করেছিল এবং স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ও সে সময় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা আস্-সাফ্ফাতে সর্বমোট ১৮২টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এ সূরার প্রতিটি আয়াত মানব জীবনের এক একটি দিক-নির্দেশনা

সূরার বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত লূত (আ.) ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনাবলি কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাঁদের আনুগত্যের গুণাবলি উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর যেসব ঐতিহাসিক কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে, মুসলিম জাতির জনক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান জীবনেতিহাস। তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে ইঙ্গিত পেয়ে একমাত্র স্নেহের পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। উক্ত ঘটনা রাসূলে কারীম ও তাঁর সাহাবীগণকে মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারের মুখে সান্ত্বনা লাভের প্রেরণা জোগিয়েছিল; তাঁদের নিরাশ অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়েছিল।

সূরার শেষ আয়াতসমূহে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের সাময়িক প্রতাপ-প্রতিপত্তি দেখে শঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কেননা অচিরেই তাদের সকল শক্তি ও দম্ভ নিঃশেষ করে দেওয়া হবে এবং তারা লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে। আর শেষ ফলে ঈমানদারগণই কামিয়াব হবেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। -[মা'আরিফুল কুরআন]

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আস্-সাফফাত মক্কায় অবতীর্ণ

وَهِيَ مِائَةٌ وَّاِثْنَتَانِ وَثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَخَمْسُ رُكُوْعَاتٍ

এতে ১৮২ আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ۙ اَلْمَلٰٓئِكَةُ تَصُفُّ نُفُوْسَهَا فِى الْعِبَادَةِ اَوْ اَجْنِحَتَهَا فِى الْهَوَاءِ تَنْتَظِرُ مَا تُؤْمَرُ بِهٖ ـ

অনুবাদ :

১. শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়নো। ফেরেশতাদের শপথ যারা ইবাদতের জন্য নিজেদেরকে সারিবদ্ধ কিংবা শূন্যলোকে আল্লাহ তা'আলার আদেশের প্রতীক্ষায় ডানাসমূহ সারিবদ্ধকারী।

২. فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ اَلْمَلٰٓئِكَةُ تَزْجُرُ السَّحَابَ اَىْ تَسُوْقُهٗ ـ

২. অতঃপর শপথ তাদের যারা ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারী। সেই ফেরেশতাগণ যারা মেঘকে শাসন করে তথা তাড়িয়ে নিয়ে যায়।

৩. فَالتّٰلِيٰتِ جَمَاعَةُ قُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ تَتْلُوْهُ ذِكْرًا ۙ مَصْدَرٌ مِنْ مَعْنَى التّٰلِيٰتِ ـ

৩. অতঃপর শপথ তাদের যারা আবৃত্তিতে রত কুরআন আবৃত্তিকারী দল যারা তা তেলাওয়াত করে, জিকিরের। [এখানে ذِكْرًا শব্দটি] تَالِيَاتِ -এর অর্থ হতে মাসদার।

٤. اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ـ

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক।

٥. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشٰرِقِ ۙ اَىْ وَالْمَغَارِبِ لِلشَّمْسِ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ ـ

৫. তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অর্থাৎ সূর্যের অস্তস্থলেরও [রব তিনি-ই]। প্রত্যহ সূর্যের একেকটি [পৃথক] উদয়স্থল ও অস্তস্থল রয়েছে।

٦. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ۙ اَىْ بِضَوْئِهَا اَوْ بِهَا وَالْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ كَقِرَاءَةِ تَنْوِيْنِ زِيْنَةٍ الْمُبَيَّنَةِ بِالْكَوَاكِبِ ـ

৬. নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করছি। অর্থাৎ তারকারাজির আলো দ্বারা কিংবা খোদ তারকার দ্বারা। আর ইযাফত বয়ানের জন্য, যদ্রূপ زِيْنَةٍ যার বয়ান আনা হয়েছে كَوَاكِبِ -এর দ্বারা তা তানবীন হওয়ার অবস্থায় [স্পষ্টত বয়ান] হয়ে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. وَحِفْظًا مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ حَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ مِنْ كُلِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُقَدَّرِ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ عَاتٍ خَارِجٍ عَنِ الطَّاعَةِ.

৭. আর তাকে সংরক্ষিত করেছি حِفْظًا শব্দটি একটি উহ্য فِعْل -এর দ্বারা মানসূব হয়েছে অর্থাৎ حَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ আমি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দ্বারা তাকে হেফাজত করেছি, প্রত্যেক [এখানে مِنْ كُلِّ জার-মাজরূর মিলে পূর্বোক্ত] উহ্য فِعْل -এর সাথে মুতা'আল্লিক অবাধ্য শয়তান থেকে। অবাধ্য, যে আনুগত্য হতে বের হয়ে গিয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الخ আয়াতে اَلْكَوَاكِبُ -এর মহল্লে ই'রাব : اَلْكَوَاكِبُ -এর মহল্লে ই'রাব সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে–

১. ইমাম হাফস, হামযাহ ও আবূ বকর (র.) প্রমুখগণের মতে, اَلْكَوَاكِبُ শব্দটি মহল্লে মানসূবে হয়েছে। তখন এটা زَيَّنَّا অথবা اَعْنِىْ উহ্য ফে'লের মাফউল হবে।

২. মাজরূর হবে। এমতাবস্থায় তা زِيْنَةٌ হতে বদল অথবা আতফে বয়ান হবে। অথবা, اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْفَاعِلِ হবে। কিংবা اِضَافَةُ الْمَصْدَرِ اِلَى الْمَفْعُوْلِ হওয়ার দরুন মাজরূর হবে।

৩. মারফূ' হবে। সে ক্ষেত্রে তা উহ্য মুবতাদা তথা هِىَ -এর খবর হবে।

وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ الخ আয়াতের শব্দটির মহল্লে ই'রাব : حِفْظًا শব্দটি দু-দিকে লক্ষ্য করে মানসূব হতে পারে–

১. উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক হবে। তথা حَفِظْنَا حِفْظًا [আমি ভালোভাবে হেফাজত করেছি]।

২. অর্থের দিকে লক্ষ্য করে زِيْنَة -এর উপর আতফ হয়ে মানসূব হবে। তথা زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا زِيْنَةً وَّحِفْظًا [আমি সৌন্দর্য ও হেফাজতের দিক দিয়ে নিকটতম আকাশকে সুশোভিত করেছি]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالصّٰفّٰتِ ..... اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ -এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতসমূহে একত্ববাদের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা। তবে তাওহীদের ঘোষণার পূর্বে তিনটি শপথ বর্ণনা করা হয়েছে– ১. তাদের কসম যারা সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান। ২. বিতাড়িতগণের শপথ। ৩. জিকির পাঠকারীগণের শপথ। কিন্তু এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মানগণ, বিতাড়িতকারীগণ ও জিকির পাঠকারীগণ কারা? কুরআনে কারীমে তা প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত হয়নি। এ জন্য তাদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

১. কিছুসংখ্যক মুফাসসিরীনে কেরামের মতে তারা হলেন, সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণকারী, যারা ইসলাম বিদ্বেষীদের শক্তি ধ্বংস করে দেয়। আর সারিবদ্ধ হওয়া কালীন আল্লাহ তা'আলার জিকির, তাসবীহ, তাহলীল ও তেলাওয়াতে কুরআনে লিপ্ত থাকেন।

২. কিছুসংখ্যক মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, তারা হলেন সেই নামাজ আদায়কারীগণ যারা শয়তানি কুচিন্তা-ভাবনা ও অবৈধ কার্যাদিকে প্রতিহত করে এবং নিজের সকল ধ্যান-ধারণাকে জিকির ও তেলাওয়াতের কাজে ব্যাপৃত করে।

৩. জমহুরে মুফাসসিরীনের মতে, তাঁরা হলেন ফেরেশতাগণ। আলোচ্য আয়াতে তাঁদের তিনটি গুণাবলির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ফেরেশতাদের প্রথম গুণ : "وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا" শব্দটি صَفٌّ হতে নির্গত। এটার অর্থ হলো– কোনো দলকে একটি সরল রেখার উপর সন্নিবেশিত করা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে– কাতারের পর কাতার বেঁধে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত পালনের নিমিত্তে দণ্ডায়মান ফেরেশতাগণ। যাদের শানে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ করেছেন যে, ফেরেশতাগণ নিজেই বলেছেন– وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ 'নিঃসন্দেহে আমরা (আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদতে) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।' ফেরেশতাগণ কখন এবং কোথায় এরূপ করে থাকে? এ প্রশ্নের জবাবে মুফাসসিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.) ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখগণের মতে ফেরেশতাগণ শূন্যলোকে সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। যখন কোনো নির্দেশপ্রাপ্ত হন সঙ্গে সঙ্গে তা পালনে রত হয়ে যান।

২. কারো কারো মতে, এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়ে থাকে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন ইবাদত, জিকির ও তাসবীহ-তাহলীলে লিপ্ত হয়ে যান, তখনই তাঁরা সারিবদ্ধ হন।

নিয়ম-নীতির অনুসরণ করাও দীনি দায়িত্ব : উল্লিখিত আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিটি কাজে নিয়ম-নীতির অনুসরণ করা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও দীনি দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। এটা তো সুস্পষ্ট যে, চাই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হোক বা অন্য কোনো বিধান পালন হোক তা এভাবে অর্জিত হতে পারত যে, ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ না হয়ে এলোমেলো ও ছড়ানো-ছিটানোভাবে একত্রিত হতো। কিন্তু উল্লিখিত বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর তাঁদের উত্তম গুণাবলির সর্বোচ্চ স্থানে তার উল্লেখ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের এ বিশেষ গুণটি আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

নামাজে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ইসলামি মতাদর্শ ও ভাবমূর্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কবুল করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। যারা ঐ আহবানে সাড়া দিয়েছে তারা উত্তম জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার পর পরই নামাজের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছে। এ ইবাদত সুশৃঙ্খলও সারিবদ্ধভাবে পালন করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা নামাজে তদ্রূপ সারিবদ্ধ হও না কেন, যদ্রূপ ফেরেশতাগণ তদের প্রভুর নিকট হাজিরা দেওয়ার সময় সারিবদ্ধ হয়ে থাকে? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়ার সময় কিভাবে সারিবদ্ধ হয়ে থাকেন? রাসূলে কারীম ﷺ উত্তর দিলেন, তাঁরা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় [অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না]।

হযরত আবূ মাসউদ বসরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন– রাসূলে কারীম ﷺ নামাজে আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলতেন, 'সোজা থাকো, আগে পিছনে যেয়ো না, তা না হলে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে।' এ প্রসঙ্গে আরো বহু নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় গুণ : "فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا" এটা زَجْر হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো– বারণ করা, বিরত রাখা। হুমকি-ধমকি দেওয়া, তাড়িত করা ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ হবে– তাদের শপথ যারা ধমক ও শাসনবাণী শুনায় এবং বারণ করে। এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরেশতাগণ কি বারণ করে? অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরাম এটার জবাবে বলেছেন যে, বারণ করা দ্বারা ফেরেশতাগণের ঐ তৎপরতাকে বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে ঊর্ধ্ব জগতে পৌঁছতে বারণ করে থাকে। স্বয়ং কুরআন মাজীদে এর বিস্তারিত বিবরণ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ফেরেশতাগণের তৃতীয় গুণ : "فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا" অর্থাৎ ফেরেশতাগণ "ذِكْر" পাঠকারী। ذِكْر -এর অর্থ হলো– 'উপদেশবাণী' বা 'আল্লাহর স্মরণ'। প্রথমোক্ত অর্থ অনুসারে আয়াতটির অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলা আসমানি কিতাবের মাধ্যমে যে উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছেন তারা তা পাঠকারী। এ তেলাওয়াত বরকত হাসিল ও ইবাদতের জন্যও হতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে আয়াতটির অর্থ হবে– ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করেন, তাঁরা তাসবীহ-তাহলীলে সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের উক্ত তিনটি গুণাবলির উল্লেখ করে ইবাদত-বন্দেগির সমস্ত গুণাবলির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ১. ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হওয়া। ২. তাগুতী শক্তিকে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থেকে বিরত রাখা। ৩. আল্লাহ তা'আলার আহকাম ও উপদেশাবলি নিজে পাঠ করা এবং অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। প্রকাশ থাকে যে, ইবাদত-বন্দেগির কোনো আমলই এ তিন শাখা বহির্ভূত নয়। অতএব উল্লিখিত আয়াত চতুষ্টয়ের মর্মার্থ হলো, 'যে ফেরেশতাগণ বন্দেগির সকল গুণাবলির ধারক-বাহক তাঁদের শপথ, তোমাদের প্রকৃত মাবুদ বা ইলাহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।'

ফেরেশতাগণের শপথ করার তাৎপর্য : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক হলো, মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে অভিহিত করত। সে মতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলি সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়; বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতের অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতা ইত্যাদির শপথ করেছেন কেন? আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণের শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন?

'ইতকান'-এ আবুল কাসেম কুশায়রী (র.) থেকে এ প্রশ্নের জবাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার জন্য শপথ করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণা তাঁকে শপথ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে তারা কোনো না কোনো উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আজাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী– وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ আয়াত শুনে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলার মতো মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষের এই পরিচিত পন্থা নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شَهَادَتٌ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন, যেমন– شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ এবং কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা এ কাজ করেছেন, যেমন– إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ –[মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের মর্যাদা তাঁর চেয়ে কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাখলুকের শপথ করলেন কেন? উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো, আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বড় কোনো সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মতো হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন, যেমন– إِي وَرَبِّي এ ধরনের শপথ কুরআন মাজীদে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে– কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলি এবং কুরআনের শপথ করেছেন, যেমন– وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টবস্তু আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে আল্লাহর সত্তা থেকে পৃথক নয়। –[ইবনে কাইয়্যিম]

বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোনো সৃষ্টবস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন– কুরআন মাজীদে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছে– لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ইবনে মারদুবিয়্যাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কুরআনে কোনো নবী ও রাসূলের সত্তার শপথ উল্লিখিত হয়নি। কেবল রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ -এর শপথও তূর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তুর শপথ করা হয়। যেমন- وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয় এ জন্য যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্য শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এ প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। -[মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শপথ করা হারাম, তাহলে কিভাবে আল্লাহ তা'আলা গায়রুল্লাহর শপথ করলেন? সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের প্রসিদ্ধ বিধান হলো, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা যে সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যও গায়রুল্লাহর শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন- إِنَّ اللّٰهَ يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ اَنْ يُقْسِمَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট যে কোনো বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারও জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুর শপথ করা বৈধ নয়। -[মাযহারী] উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে অল্লাহ তা'আলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরিয়ত সাধারণ মানুষের জন্য গায়রুল্লাহর শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল। -[মা'আরিফুল কুরআন]

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ **আয়াতের ব্যাখ্যা :** তিনি পালনকর্তা আসমান সমূহের, জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব, যে সত্তা এতসব মহা সৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, ইবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলিল। এখানে مَشَارِقُ শব্দটি مَشْرِقٌ -এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

আলোচ্য আয়াতের مَشَارِقُ শব্দ দ্বারা শুধু পূর্বাকাশে সূর্যের উদিত হবার স্থানের কথা বলা হয়েছে, পশ্চিমাকাশে অস্ত যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হলো, দু'টি পরস্পর বিরোধী বস্তুর মধ্যে একটির উল্লেখ করলেই অন্যটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। এতদ্ব্যতীত অস্তের তুলনায় উদয়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের মহিমার অধিকতর প্রকাশ ঘটে। তাই مَشَارِقُ বা উদয়ের স্থানের উল্লেখই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। -[তাফসীরে নূরুল কুরআন]

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ **-এর আয়াতের ব্যাখ্যা :** এখানে اَلسَّمَاءُ الدُّنْيَا অর্থ- পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য হলো, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরি নয় যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই অবস্থিত হবে; বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই অবস্থিত মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এ তারকা, শোভিত আকাশ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। অতএব, আল্লাহকে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও জুলুম! -[মা'আরিফুল কুরআন]

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ **-এর তাফসীর :** উল্লিখিত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজসজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তান গায়বি সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেওয়া হয় না। কোনো শয়তান যৎসামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৮. لَا يَسَّمَّعُوْنَ اَىِ الشَّيَاطِيْنُ مُسْتَانَفٌ وَسَمَاعُهُمْ هُوَ فِى الْمَعْنٰى الْمَحْفُوْظُ عَنْهُ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى الْمَلٰئِكَةِ فِى السَّمَاءِ وَعُدِّىَ السَّمَاءُ بِاِلٰى لِتَضَمُّنِهٖ مَعْنَى الْاِصْغَاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الْمِيْمِ وَالسِّيْنِ اَصْلُهُ يَتَسَمَّعُوْنَ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى السِّيْنِ وَيُقْذَفُوْنَ اَيِ الشَّيَاطِيْنُ بِالشُّهُبِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ اٰفَاقِ السَّمَاءِ.

৯. دُحُوْرًا مَصْدَرٌ دَحَرَهٗ اَىْ طَرَدَهٗ وَاَبْعَدَهٗ وَهُوَ مَفْعُوْلٌ لَهٗ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ وَّاصِبٌ دَائِمٌ.

১০. اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ مَصْدَرٌ اَيِ الْمَرَّةَ وَالْاِسْتِثْنَاءُ مِنْ ضَمِيْرِ يَسَّمَّعُوْنَ اَىْ لَا يَسَّمَّعُ اِلَّا الشَّيْطَانُ الَّذِىْ سَمِعَ الْكَلِمَةَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ فَاَخَذَهَا بِسُرْعَةٍ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ كَوْكَبٌ مُضِيْءٌ ثَاقِبٌ يَثْقُبُهٗ اَوْ يُحْرِقُهٗ اَوْ يُخَبِّلُهٗ.

১১. فَاسْتَفْتِهِمْ اِسْتَخْبِرْ كُفَّارَ مَكَّةَ تَقْرِيْرًا اَوْ تَوْبِيْخًا اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَمَا فِيْهِمَا وَفِى الْاٰيَتَانِ بِمَنْ تَغْلِيْبُ الْعُقَلَاءِ.

অনুবাদ :

৮. তারা কোনো কিছু শ্রবণ করতে পারে না অর্থাৎ শয়তানরা, এটা নতুন [স্বতন্ত্র] বাক্য। আর তাদের শ্রবণ করা– প্রকৃতপক্ষে তা হতে [আকাশকে] হেফাজত করা হয়ে থাকে। ঊর্ধ্বজগতের অর্থাৎ আকাশের ফেরেশতাকুলের। আর سَمَاءٌ শব্দটির দিকে اِلٰى-এর দ্বারা مُتَعَدِّىْ করা হয়েছে। কেননা এতে اِصْغَاءٌ [মনোযোগের সাথে শ্রবণ করার] অর্থ নিহিত রয়েছে। অন্য এক কেরাতে মীম ও সীন অক্ষরদ্বয় তাশদীদ যোগে রয়েছে। এটার আসল হলে يَتَسَمَّعُوْنَ - تَاءٌ -কে س -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ শয়তানদেরকে অগ্নিপিণ্ড [উজ্জ্বল তারকা] নিক্ষেপ করা হয় চারদিক থেকে আকাশের দিগন্তসমূহ হতে।

৯. তাদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। এখানে دُحُوْرًا শব্দটি دَحَرَهٗ [যা বিলুপ্ত রয়েছে তা]-এর মাসদার। অর্থাৎ তাকে বিতাড়িত করল এবং দূরে সরিয়ে দিল। আর এটা (অর্থাৎ دُحُوْرًا) মাফউলে লাহু হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। সর্বদা [অনন্তকাল]-এর জন্য।

১০. তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে– এটা (اَلْخَطْفَةَ) মাসদার। অর্থাৎ একবার। আর يَسَّمَّعُوْنَ -এর ضَمِيْر হতে (اِلَّا -এর দ্বারা) اِسْتِثْنَاءٌ করা হয়েছে। অর্থাৎ শ্রবণ করতে পারে না। তবে সে শয়তান যে ফেরেশতার নিকট হতে [এক-আধ] কথা শুনে ফেলেছে এবং তড়িৎবেগে তা আয়ত্ত করে ফেলেছে। উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে– উজ্জ্বল নক্ষত্র যা জ্বলন্ত। তা শয়তানকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে অথবা জ্বালিয়ে ফেলে কিংবা ক্ষত-বিক্ষত করে ছাড়ে।

১১. আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন– মক্কাবাসী কাফিরদের নিকট হতে জেনে নিন, প্রমাণার্থে কিংবা ভয় প্রদর্শনার্থে। তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? যেমন– ফেরেশতার জগৎ, আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে। আর আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিবেকবানদের অগ্রাধিকার প্রদান করত [مَا -এর পরিবর্তে] مَنْ ব্যবহার করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ اَىْ اَصْلَهُمْ اٰدَمَ مِنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ لَازِمٍ يَلْصِقُ بِالْيَدِ الْمَعْنٰى اَنَّ خَلْقَهُمْ ضَعِيْفٌ فَلَا يَتَكَبَّرُوْا بِاِنْكَارِ النَّبِىِّ وَالْقُرْاٰنِ الْمُؤَدِّىْ اِلٰى هَلَاكِهِمُ الْيَسِيْرِ ـ

আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ তাদের আদি পিতা আদমকে– এঁটেল মাটি থেকে। এমন মাটি যা হাতের সাথে লেগে থাকে। অর্থাৎ তাদের সৃষ্টি [গঠন] দুর্বল; সুতরাং অহঙ্কারবশত তারা যেন কুরআনে কারীম ও মহানবী ﷺ -কে অস্বীকার না করে, যা [সে অস্বীকৃতি] তাদেরকে সহজেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلْمَلَاُ الْاَعْلٰى : এখানে اَلْمَلَاُ الْاَعْلٰى-এর অর্থ হলো জগৎ, আর اَلْاَعْلٰى -এর অর্থ হলো– ঊর্ধ্ব। অতএব اَلْمَلَاُ الْاَعْلٰى-এর সমষ্টিগত অর্থ হলো– ঊর্ধ্বজগৎ। আলোচ্য আয়াতে ঊর্ধ্বজগতের দ্বারা ফেরেশতাগণের জগৎকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা ফেরেশতাকুল আকাশে বসবাস করে। এর বিপরীত শব্দ হলো اَلْمَلَاُ الْاَسْفَلُ তথা নিম্নজগৎ। জিন ও মানুষের জগৎকে নিম্নজগৎ বলা হয়। কেননা তারা নিম্নজগৎ তথা জমিন বা পৃথিবীতে বসবাস করে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى دُحُوْرًا : এটা فُعُوْلٌ -এর ওজনে মাসদার। এর অর্থ হলো– বিতাড়িত করা, বহিষ্কার করা, প্রতিহত করা ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতে دُحُوْرًا শব্দটি মাফঊলে লাহু হয়ে নসব বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ শয়তানদেরকে আকাশের দিগন্তসমূহ হতে চতুর্দিক থেকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। আর তা করা হয় তাদেরকে বহিষ্কার করার জন্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلْخَطْفَةَ : শব্দটির অর্থ হলো– ছিনিয়ে নেওয়া, আকস্মিকভাবে ছো মেরে কিছু নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ কোনো শয়তান যদি ঘটনাক্রমে ফেরেশতাদের কোনো আলোচনা শুনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড তাকে পশ্চাদ্ধাবন করে এবং ভস্ম করে ফেলে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى شِهَابٌ : শব্দটির অর্থ হলো– অগ্নিপিণ্ড, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এটা একবচন, বহুবচনে شُهُبٌ।

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثَاقِبٌ : শব্দটির অর্থ হলো– প্রজ্বলিত, তেজস্বী, ছিদ্রকারী, ছিন্নভিন্নকারী।

قَوْلُهُ فَاسْتَفْتِهِمْ : আলোচ্য আয়াতাংশে فَاءْ হরফে আতফ, আর اِسْتَفْتِ সীগায়ে اَمْر حَاضِر وَاحِد مُذَكَّر বহছ مَعْرُوْف বাবে اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ অর্থ– ফতোয়া তলব করা, জানতে চাওয়া। هُمْ যমীর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– হে হাবীব! আপনি মক্কার কাফেরদের নিকট জানার জন্য জিজ্ঞাসা করুন, তারাই কি সবচেয়ে শক্তিশালী? না আমার অপরাপর সৃষ্টি। যেমন– আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল, ফেরেশতাজগৎ ইত্যাদি অধিক শক্তিশালী। আলোচ্য আয়াতে জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, তাদের থেকে এ ব্যাপারে স্বীকৃতি আদায় করা, অথবা তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى طِيْنٍ لَّازِبٍ : طِيْنٌ অর্থ হলো– মাটি, আর لَازِبٌ অর্থ হলো– আঠালো বা নিকৃষ্ট। অতএব, শব্দদ্বয়ের সমষ্টিগত অর্থ হলো– আঠালো বা নিকৃষ্ট মাটি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَا يَسَّمَّعُوْنَ -এর মধ্যকার বিভিন্ন কেরাত : উল্লিখিত আয়াতে لَا يَسَّمَّعُوْنَ -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত হতে পারে-

১. لَا يَسَّمَّعُوْنَ এটা মূলে لَا يَتَسَمَّعُوْنَ (বাবে تَفَعُّلٌ হতে تَسَمُّعٌ মাসদার) تَا -কে س -এর দ্বারা পরিবর্তন করে س -কে অপর س -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আলোচ্য কেরাতটি হযরত হামযাহ, কিসাঈ ও হাফস (র.) হযরত আসিম (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ উসাইদ (র.) ও উক্ত কেরাতটি গ্রহণ করেছেন। এ কেরাতের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেছেন- سَمِعَ (ثُلَاثِىْ مُجَرَّدٌ) হতে প্রচলিত فِعْل বা ক্রিয়া اِلٰى -এর দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয় না। তাই এটা বাবে تَفَعُّلٌ হতে ব্যবহৃত হবে।

২. আম কারীগণ لَا يَسْمَعُوْنَ -কে বাবে سَمِعَ হতে পড়েছেন, আর এটাই সুপ্রসিদ্ধ কেরাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ .... كُلِّ جَانِبٍ আয়াতের মর্মার্থ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, জিন শয়তানরা ঊর্ধ্বজগৎ তথা ফেরেশতা জগতের কিছুই শ্রবণ করতে পারে না; বরং তারা সেখানকার কোনো কথা শ্রবণ করতে মনস্থ করলে চতুর্দিক হতে তাদেরকে প্রতিহত করা হয়। ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, জাহিলিয়া যুগে মক্কা তথা সমগ্র আরবভূমিতে গণকদের অসম্ভব দৌরাত্ম্য ছিল। ইসলামের প্রারম্ভ যুগে জাহেলিয়াতের অপরাপর বদ-রুসুমের মতো তার প্রভাব ও প্রচলনও অবশিষ্ট থেকে যায়। সে যুগের গণকেরা দাবি করত যে, তারা জিনের মারফত দূর-অতীত এবং ভবিষ্যতের অনেক খবরা-খবর বলতে সক্ষম। তাদের প্রচারকৃত খবরা-খবরের কিয়দংশ কোনো কোনো সময় সত্যও হতো। কেননা তখন শয়তানরা [জিন] আকাশে গিয়ে ফেরেশতাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করত এবং সে সকল আলাপ-আলোচনা উক্ত গণকদের নিকট এসে অবহিত করত।

রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি লোকদেরকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মারফত প্রাপ্ত আল-কুরআন লোকদের মাঝে পেশ করতে লাগলেন। আর আল-কুরআনেই অতীত ও ভবিষ্যতের বহু ঘটনাবলি বিধৃত হয়েছে। এ কারণেই মক্কার লোকেরা কুরআন মাজীদকে গণকদের প্রদত্ত খবরা-খবরের সাথে তুলনা করতে লাগল। রাসূল ﷺ -কে গণক আখ্যা দিয়ে উপহাস করতে লাগল। তারা আরও বলতে লাগল যে, জিন শয়তানের যোগসাজসেই রাসূল ﷺ এ সকল তথ্যাবলি প্রচার করছেন। আলোচ্য আয়াতে তাদের সে সকল অমূলক দাবিকে খণ্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জিন শয়তানের মাধ্যমে আকাশের যে সংবাদাদি গণকরা সংগ্রহ করত তার পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আকাশের খবরা-খবর সংগ্রহ করা হতে জিন শয়তানদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করা হয়েছে। যখনই কোনো জিন শয়তান ঊর্ধ্বজগৎ তথা আসমান হতে কোনো তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তৎক্ষণাৎ তাকে প্রতিহত করা হয়। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয় এবং তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বলেছেন, শয়তান বিতাড়নে যে তারকা ব্যবহৃত হয়, অন্য তারকা থেকে স্বতন্ত্র। এ তারকাগুলোর মধ্যে আগ্নেয় দাহিকা শক্তি থাকে, যা ইবলীস শয়তান ও তার অনুচরদের উপর নিক্ষেপ করা হয় যেন ইবলীস শয়তান বা তার কোনো অনুচর ফেরেশতাদের কোনো কথা শ্রবণ করতে না পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ইতঃপূর্বে শয়তানগুলো আসমানে পৌঁছে ওহী শ্রবণ করত, একটি কথা শ্রবণ করে আর নয়টি মিথ্যা কথা তার সঙ্গে যুক্ত করে গণকদের নিকট পৌঁছাত। যখন প্রিয়নবী ﷺ -কে নবুয়ত দান করা হলো, তখন শয়তানদেরকে আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হলো, যদি যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন আগ্নেয় দাহিকা শক্তি সম্পন্ন তারকা তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়, এ সংবাদ যখন অভিশপ্ত ইবলীস পায়, তখন সর্বত্র সে তার অনুচরদের প্রেরণ করে, যারা আরবের দিকে যায়, তারা নাখলার দু'টি পাহাড়ের মধ্যখানে প্রিয়নবী ﷺ -কে নামাজে রত অবস্থায় দেখতে পায়। ইবলীসকে যখন এ সংবাদ দেওয়া হয়, তখন ইবলীস বলে, এ ব্যক্তির কারণেই আমাদের আসমানে যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতএব, একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পর শয়তানের জন্য আসমানে হানা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। কাজেই রাসূল ﷺ নিজেও গণক ছিলেন না এবং তাঁর কোনো জিন শয়তানের সাথে যোগসাজসও ছিল না। এটা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদ্ব্যতীত আল-কুরআনের মাধ্যমে রাসূল ﷺ যে তথ্যাদি প্রচার করতেন তা ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্ভেজাল সত্য। অন্যদিকে জিন শয়তানের মারফত গণকরা যেসব তথ্যাদি প্রকাশ করত তার এক-আধটা ঘটনাক্রমে সত্য হলেও তাতে মিথ্যার অংশই ছিল অধিক। তাই রাসূল ﷺ গণক ছিলেন– তাদের এরূপ অমূলক দাবি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয়।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ ..... مِنْ كُلِّ جَانِبٍ আয়াতের ব্যাখ্যা : তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তারকারাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন– ১. আসমানের সৌন্দর্য বর্ধনে, ২. শয়তানদেরকে মারার জন্যে ও ৩. পথ-প্রদর্শনের জন্যে। এতদ্ব্যতীত তারকারাজি সৃষ্টির অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আসমানে কোনো বিষয়ের আদেশ প্রদান করেন, তখন ফেরেশতাগণ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাদের ডানা ঝাপটান, কোনো পাথরের উপর জিঞ্জির স্পর্শ করলে যেমন শব্দ হয়, ফেরেশতাগণের ডানা ঝাপটানোর তেমনি শব্দ শ্রুত হয়। যখন ফেরেশতাদের অন্তর থেকে অপেক্ষাকৃত কিছু ভয় দূর হয়, তখন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি আদেশ করেছেন'। তখন অন্য ফেরেশতাগণ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ফরমান সত্য, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী।' ফেরেশতাদের একথা কিছু শয়তান চুরি করে শ্রবণ করে এবং তাদের নিকট অন্যরাও এভাবে শ্রবণ করে। এভাবে উপরের শয়তান নিচের শয়তানকে জানিয়ে দেয়। একের পর এক শুনতে থাকে। যে শয়তান সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে, সে ঐ কথাটি জাদুকর কিংবা গণকের নিকট পৌঁছে দেয়। পরিণামে ঐ কথাটি জাদুকর গণকের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। এদিকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করা হয়। অন্যদিকে জাদুকর এবং গণকেরা ঐ কথার সঙ্গে আরো একশটি মিথ্যা কথা একত্রিত করে মানুষের নিকট বর্ণনা করে [এমন হবে, এমন হবে] গণকদের কথামতো যদি একটি কথাও সত্য হয়, তবে ঐ একটি কথার কারণেই ঐ গণকের প্রচার হয় এবং তার কথার সত্যায়ন হয়, এভাবে তার সম্পর্কে কথা বলা হয় যে, অমুক গণক এ বিষয়ে এমন কথা বলেছিল।

তবে জিন শয়তান কিভাবে আকাশে তথ্য সংগ্রহের জন্য হানা দেয়, আর কিভাবেই বা এক-আধটু শ্রবণ করে অথবা কিভাবে অগ্নিপিণ্ড তাকে ভস্মীভূত করে ফেলে, তা আমাদের বোধশক্তির বাইরে। তার সঠিক অবস্থা ও ধরন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। কোনো কিছুই তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে নেই। আর তাঁর কুদরতের সকল রহস্য অনুধাবন করা মানুষের দুর্বল মস্তিষ্কের আওতা বহির্ভূত। সুতরাং তিনি ও তাঁর রাসূল ﷺ যা বলেছেন, তা বিনা বাক্য-ব্যয়ে দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত আয়াতে পরোক্ষভাবে কাফের-মুশরিকদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা জিনদেরকে খুবই শক্তিশালী মনে করে থাকে। এমনকি দেব-দেবী বিশ্বাসে তাদের পূজা-অর্চনাও করে– তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। তাদের ধারণা এ জিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার বংশগত সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, উল্লিখিত আয়াতে মুশরিকদের অনুরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে বলা হয়েছে যে, জিন শয়তানের সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কোনো সম্পর্কই নেই; বরং তারা আল্লাহ তা'আলার চির শত্রু হিসাবেই পরিচিত। ঊর্ধ্বজগত তথা যেখানে ফেরেশতাগণ সমগ্র জাহানের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন– সেখানে এ সকল জিন শয়তানের প্রবেশেরও অনুমতি নেই। তারা সেখানে অনুপ্রবেশের অপচেষ্টা করলে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পূর্বের আয়াতের সাথে আলোচ্য আয়াতের যোগসূত্র : উল্লিখিত আয়াতের সাথে পূর্বোক্ত আয়াতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিদ্রোহী শয়তানের কবল হতে আকাশমণ্ডলকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আকাশে এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনা করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে কোনো বিদ্রোহী জিন তথা শয়তানের পক্ষে সেখানে হানা দিয়ে কোনো তথ্য সংগ্রহের সুযোগ নেই। অতএব, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গণকদের সাথে তুলনা করে যে, বলে থাকে- 'তিনি জিনের মারফত বিভিন্ন আসমানি খবরা-খবর সংগ্রহ করত তা ওহীর নামে পেশ করেছেন'- তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও সত্যের পরিপন্থি ছাড়া বাস্তবের সাথে তার সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

উক্ত আয়াতে সে একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, ফেরেশতাকুলের জগতের সমগ্র জাহানের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির পরিকল্পনা সম্পর্কিত যে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে তার কণা পরিমাণও শয়তানরা শুনতে পায় না। এমনকি কোনো শয়তান যদি ঘটনাক্রমে দু'-একটি শুনেও ফেলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে সে শয়তানকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে তারা অন্য কারও নিকট তা পৌঁছাতে সক্ষম হয় না। অতএব, প্রতীয়মান হলো, আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো বড় ধরনের পার্থক্য নেই; বরং আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও মর্মার্থ অভিন্ন।

আকাশে ফেরেশতাদের বাক্যালাপ শোনার জন্য যে সকল শয়তানরা চেষ্টা করে তাদের অবস্থাদির বিবরণ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা অপবাদ দিত তার মধ্যে অন্যতম অপবাদ ছিল, তারা নবী করীম ﷺ -কে গণক বলে আখ্যা দেয়। আর তারা বলত যে, গণকদের মতো রাসূল ﷺ -এরও জিন শয়তানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি সে সকল জিন শয়তানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যাদি আকাশ হতে সংগ্রহ করেন এবং তা ঐশী বাণী বলে জনসম্মুখে প্রচার করেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে যেসব শয়তান আসমানি খবরা-খবর সংগ্রহে সচেষ্ট হয়ে থাকে তার বাস্তবিক অবস্থা ও অবস্থান আলোকপাত করে মুশরিকদের উল্লিখিত দাবির অমূলকতা প্রমাণ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে উক্ত শয়তানদের তিনটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

১. لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ শয়তানরা ঊর্ধ্বজগৎ তথা ফেরেশতা জগতের আলাপ-আলোচনা শ্রবণে সক্ষম নয়।

২. وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوْرًا অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য চতুর্দিক হতে (অগ্নিপিণ্ড) নিক্ষেপ করা হয়। যাতে তারা অবধারিত ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়।

৩. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ অর্থাৎ (পরকালে) তাদের জন্য চিরস্থায়ী আজাব রয়েছে। যার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

অতএব উপরে শয়তানের যে তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা ঊর্ধ্বজগতে সাধারণত পৌঁছতে পারে না। আর ঘটনাক্রমে যদি পৌঁছেও যায় এবং সেখান হতে ফেরেশতাদের কোনো কথাবার্তা শুনার জন্য চেষ্টা করে, তখন সাথে সাথে একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।

সুতরাং প্রতীয়মান হলো, শয়তান ঊর্ধ্বজগৎ তথা ফেরেশতাজগৎ হতে কিছুই শুনতে পারে না এবং শয়তান (জিন)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কোনো তথা বংশীয় কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই এ ব্যাপারে কাফের-মুশরিকদের ধারণা ও দাবি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন।

উল্লিখিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ কি নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরে হয়েছে না পূর্বেও ছিল? وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ : আর [যখন শয়তানরা ঊর্ধ্বজগতের কোনো কথা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে তখন] চতুর্দিক হতে তাদেরকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। আর এতে তারা জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, শয়তানদের প্রতি এ জাতীয় আচরণ কি রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরে শুরু হয়েছে না পূর্ব হতেই চলে আসছিল? এ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে-

- একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মত অনুসারে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরবর্তী সময় হতে উল্লিখিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপকরণ আরম্ভ হয়েছে- এর পূর্বে তা ছিল না। সূরা জিনে বর্ণিত আয়াত দ্বারাও অনুরূপ প্রমাণিত হয়। বরং রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এ সময়েই শয়তানকে নিক্ষেপ করার জন্য অগণিত অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি করা হয়। এর পূর্বে তা ছিল না। যখনই কোনো শয়তান আসমানি কোনো তথ্য বা আলোচনা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য আকাশে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে সাথে সাথে উক্ত জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকেক ধ্বংস করে দেওয়া হতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

✪ অন্য একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেও শয়তানকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো। তবে সর্বদা নিক্ষেপ করা হতো না; বরং কোনো কোনো সময় অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হতো আবার সময় সময় তা করা হতো না। এতদ্ব্যতীত তা চতুর্দিক হতে নিক্ষেপ করা হতো না; বরং কোনো কোনো দিক হতে নিক্ষেপ করা হতো, আর কোনো কোনো দিক হতে নিক্ষেপ করা হতো না। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পরবর্তী সময় হতে সর্বদা ও চতুর্দিক হতে শয়তানের উপর অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের বন্দোবস্ত করা হয়।

✪ অপর একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, শয়তানকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের এ পদ্ধতি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেও ছিল এবং তার ধারাবাহিকতা তাঁর নবুয়ত লাভের পরেও বলবৎ থাকে। পূর্ববর্তী যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সাধারণ জনগণের ভাষ্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতা হতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বেও তা প্রচলিত থাকে, তবে তা কিভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মোজেজা হতে পারে? তাই এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অভিমতটি সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কেননা উক্ত মতানুসারে যদিও পূর্বেও অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের প্রচলন ছিল, কিন্তু তা সর্বদা ও চতুর্দিক হতে ছিল না; বরং কখনো কখনো ও কোনো কোনো দিক হতে ছিল। অন্যদিকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পর তা চতুর্দিক হতে এবং সর্বদা নিক্ষেপ করা হতো। কাজেই তা এদিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মোজেজা হতে কোনো অন্তরায় নেই। মোটকথা হলো, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের সময়কালে কোনো শয়তানের পক্ষে কোনো আসমানি তথ্য আহরণের কোনো সুযোগই আর বাকি থাকেনি। আল্লাহ তা'আলা এ সময় আকাশকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কোনো বিদ্রোহী শয়তান আকাশ হতে যদিও বা ঘটনাক্রমে দু'-একটি কথা শুনে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি অগ্নিপিণ্ড তাকে ধাওয়া করে এবং ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে।

উল্লিখিত অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপকরণ নবুয়তের কারণে ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা স্থায়ী হলো কেন? পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা আসমানের সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তারকারাজির মাধ্যমে আসমানের হেফাজতের জন্য এমন নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে, কোনো জিন শয়তানের পক্ষে আসমান হতে কোনো তথ্য বা আলোচনা সংগ্রহ করা অসম্ভব। যখনই কোনো জিন শয়তান আকাশ তথা ফেরেশতা জগৎ হতে কোনো তথ্য সংগ্রহের মনস্থ করে তৎক্ষণাৎ একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে এবং তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তকে গণকদের কথার সাথে সংমিশ্রণ হতে সংরক্ষণের জন্য উল্লিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাহলে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর উক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা অপরিবর্তিত ও বলবৎ থাকল কেন? এর রহস্য বা কারণ কি?

ইমাম কুরতুবী (র.) উক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলবৎ থাকার দুটি কারণ বর্ণনা করেছেন–

১. গণক বিদ্যা যাতে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় তথা শয়তানরা পরবর্তী যুগেও যেন আকাশের কোনো তথ্য বা আলোচনা সংগ্রহ করে ফাসিক ও ফাজির গণকদের মাধ্যমে লোকদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে না পারে। রাসূলে কারীম ﷺ গণকদের পেশা এবং গণকের নিকট যাওয়াকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন– لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ অর্থাৎ যে গণকদের পেশা অবলম্বন করে বা গণকের নিকট যায় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বযুগে মানুষ সচরাচর গণকদের প্রতি খুবই উৎসাহী ও আস্থাশীল ছিল। রাসূলে কারীম ﷺ তাকে সমূলে উপড়ে ফেলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর পরবর্তী সময়ে পুনরায় যদি এ শাস্ত্রের কিছুটা আস্থাশীলতা বা যথার্থতা লোক সমাজে প্রকশ পায়, তাহলে মানুষের ধারণা হতে পারে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে নবুয়তের [যুগের] পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং পুনঃ গণকদের যুগের সূচনা হয়েছে।

অতএব, উল্লিখিত দু'টি কারণে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও শয়তানকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপের ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে। কাজেই অদ্যাবধি কোনো শয়তানের পক্ষে আসমানি তথ্য বা আলোচনা সংগ্রহ করে কোনো গণকের নিকট পৌঁছানোর সামান্যতম সুযোগ নেই। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমান গণক বিদ্যার কোনোরূপ নির্ভরযোগ্যতা বা আস্থাশীলতা নেই।

আয়াতে বর্ণিত অগ্নিপিণ্ডসমূহ ঐ সকল তারকারাজির অন্তর্গত কিনা যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আসমানকে সুসজ্জিত করেছেন? আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ الخ অর্থাৎ আমি বাতিসমূহ তথা তারকারাজির মাধ্যমে নিকটবর্তী আকাশ তথা পৃথিবীর আকাশকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করেছি। আর আমি তারকারাজিকে শয়তানকে নিক্ষেপকরণের মাধ্যমও বানিয়েছি।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যে তারকারাজি আকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে শয়তানকে প্রতিহত করা হয়, নাকি শয়তানকে প্রতিহত করার জন্য অন্য তারকারাজি বিদ্যমান রয়েছে?

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এর উত্তরে বলেছেন, যে অগ্নিপিণ্ডের মাধ্যমে আকাশকে অনুপ্রবেশকারী শয়তানদেরকে প্রতিহত করা হয়ে থাকে তারা ঐসব তারকারাজির অন্তর্ভুক্ত নয় যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আকাশকে শোভাবর্ধন করেছেন। কেননা নিক্ষেপের পর উক্ত অগ্নিপিণ্ড নিঃশেষ হয়ে যায়। আর যদি নিক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ডসমূহ শোভাবর্ধনকারী তারকারাজির অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে আকাশের তারকারাজির মধ্যে অত্যধিক ঘাটতি পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। কেননা আমরা স্বচক্ষে অবলোকন করছি যে, আকাশে কোনোরূপ ঘাটতি বা পরিবর্তন ছাড়াই সর্বদা বিদ্যমান। কজেই প্রতীয়মান হলো যে, নিক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ডগুলো সেসব তারকারাজির অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيٰطِيْنِ অর্থাৎ আমি নিকটতম আকাশ তথা দুনিয়ার আকাশকে বাতিসমূহ (তারকারাজির) দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সে তারকারাজিকেই শয়তানের জন্য রজম নিক্ষেপকারী বানিয়েছি। এ আয়াত দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝে আসে যে, যে তারাকারাজির দ্বারা আকাশকে সুসজ্জিত করা হয়েছে সে তারকারাজিকেই শয়তান প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেননা আলোচ্য আয়াতে وَجَعَلْنَاهَا -এর মধ্যকার هَا -এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো مَصَابِيْحَ যা দ্বারা সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী তারকারাজিকেই বুঝানো হয়েছে। অতএব এ বিশ্লেষণ অনুসারে ইমাম রাযী (র.)-এর জবাব ভুল সাব্যস্ত হয়। তবে ইমাম রাযী (র.)-এর পক্ষ হতে জবাব দেওয়া যেতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে هَا যমীরের পূর্বে মুযাফ বিলুপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ وَجَعَلْنَا مِثْلَهَا আর আমি উল্লিখিত তারকারাজির ন্যায় তারকাকে শয়তান প্রতিহত করার জন্য বানিয়েছি।

এতদ্ব্যতীত মুফাস্সিরীনে কেরামের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে শয়তানকে তারকা নিক্ষেপ করা হয় না; বরং তারকা হতে একটি অগ্নিপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে শয়তানকে প্রতিহত করে ও ভস্ম করে দেয়। তারকার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই উক্ত অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি করে রেখেছেন। অতএব, তা তারকারই একটি অংশের ন্যায় হওয়ার দিকে লক্ষ্য করলে তাকেও তারকা বলে অবহিত করা হয়। আর তা তারকা হতে বিচ্ছিন্ন বস্তু হওয়া এবং তার কারণে তারকা ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ার দিকে লক্ষ্য করলে তা তারকা ছাড়া অন্য বস্তু বললে ভুল হবে না। অতএব, আলোচ্য আয়াতের এবং ইমাম রাযীর বক্তব্যের মধ্যে বাস্তবিক কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট, তবে তাকে কিভাবে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে? কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট। যেমন শয়তানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন- خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ তুমি আমাকে অগ্নি হতে সৃষ্টি করেছ আর আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছ। [সুতরাং আমি কিভাবে আদমকে সিজদা করতে পারি?] অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ অর্থাৎ আর ইতঃপূর্বে আমি জ্বলন্ত অগ্নি হতে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যে শয়তান আগুনের সৃষ্টি তাকে অগ্নিপিণ্ড দ্বারা কিভাবে ভস্ম করে দেওয়া যেতে পারে? এতদ্ব্যতীত আখেরাতে কিভাবেই বা তাকে অগ্নি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে?

মুফাস্‌সিরীনে কেরামগণ উপরিউক্ত প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন–

১. যে আগুন দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার তুলনায় অগ্নিপিণ্ড এবং পরকালের আগুন অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী হবে, যাতে তারা ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যায় এবং আজাব অনুভব করে।

২. শয়তান আগুনের সৃষ্টি– এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে, শয়তানের সর্বাঙ্গই আগুন; বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তানের মূলধাতু আগুন। যেভাবে মানুষের মূলধাতু মাটি হলেও মানুষ সর্বাংশেই মাটি নয়। অতএব যেভাবে মানুষকে মাটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া যায়, ঠিক তেমনিই শয়তানকেই আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া যায়। কাজেই অগ্নিপিণ্ড দ্বারা শয়তানকে ভস্ম করে দেওয়া কিংবা অগ্নি দ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া মোটেও যুক্তিহীন কিছু নয়।

মানুষকে আঠালো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার মর্মার্থ কি? : মানুষকে আঠালো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করার দু'টি মর্মার্থ হতে পারে–

১. মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সকল মানুষই যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান সেহেতু তাদের সকলকেই যেন মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. মানুষ বীর্য হতে মাতার গর্ভে অনেক স্তর অতিক্রম করে পৃথিবীর মুখ দর্শন করে। আর অন্যদিকে বীর্য সৃষ্টি হয় রক্ত হতে, আর রক্ত সৃষ্টি হয় নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য হতে। খাদ্য প্রস্তুত হয় ফল-মূল ও শস্যদানা হতে। ফল-মূল ও শস্যদানা সৃষ্টি হয় মাটি হতে। অতএব, উপরিউক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মানুষকে মাটি হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ অর্থাৎ আমি মানুষকে আঠালো মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের সৃষ্টি হলো খুবই দুর্বল ও নিকৃষ্ট। তাই তাদের অহঙ্কার করার মতো কিছুই নেই। অতএব তাদের অহঙ্কার করা অনুচিত। অহঙ্কারের কারণে রাসূল ﷺ -কে প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অমান্য করা একেবারেই উচিত নয়। তাদের জেনে রাখা আবশ্যক যে, তারা যদি রাসূলে কারীম ﷺ -কে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, আল-কুরআনকে ঐশীগ্রন্থ হিসেবে মান্য না করে, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে এতে রাসূলে কারীম ﷺ ও আল-কুরআনের কোনোই ক্ষতি সাধিত হবে না। আর আল্লাহর উলূহিয়াতেও কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। এতে শুধুমাত্র তাদেরই ক্ষতি সাধন হবে। যার ফলশ্রুতিতে অচিরেই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাদের এ জাতীয় আচরণ আল্লাহ তা'আলার আজাব ও গজবকে অবধারিত করবে। তা প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই।

لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ আয়াতাংশের দুটি (উহ্য) সুরত রয়েছে : "لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ" আয়াতাংশের দুটি উহ্য সুরত হতে পারে। যথা–

১. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ এটা মূলে ছিল– لِئَلَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ অর্থাৎ যাতে তারা ঊর্ধ্বজগতের তথা আসমানের কোনো আলোচনা শুনতে না পারে। নসব প্রদানকারী হরফ اَنْ বিলুপ্ত হওয়ার পর فِعْل টি তার মূল অবস্থায় তথা রফা'-এর অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ এটা لَا يَسَّمَّعُونَ হয়ে গেছে। যেমন নিম্নবর্ণিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

ক. يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ জন্য আহকাম সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।

খ. رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ..... অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পাহাড়-পর্বতকে খুঁটি স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। যাতে জমিন তোমাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া করতে না পারে; বরং স্থির থাকে।

২. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ এটা জুমলায়ে মুসতানিফাহ বা স্বতন্ত্র বাক্য। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই।

আলোচ্য মাযহাবদ্বয়ের প্রথমটি প্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি ইমাম যামাখশারী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

১২. بَلْ لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ غَرْضٍ اِلٰى اٰخَرَ وَهُوَ الْاِخْبَارُ بِحَالِهِ وَحَالِهِمْ عَجِبْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ اَىْ مِنْ تَكْذِيْبِهِمْ اِيَّاكَ وَ هُمْ يَسْخَرُوْنَ مِنْ تَعَجُّبِكَ ـ

১২. বরং এখানে بَلْ শব্দটি এক উদ্দেশ্য হতে অন্য উদ্দেশ্যের দিকে স্থানান্তরের দিকে হয়েছে। আর তা হলো, তাঁর ও তাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা আপনি বিস্ময়বোধ করেন – عَجِبْتَ শব্দের تَ অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট হবে। রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এ জন্য আপনি বিস্মিত হয়েছেন। আর তারা বিদ্রূপ করে আপনার বিস্মিত হওয়ার কারণে।

১৩. وَاِذَا ذُكِّرُوْا وُعِظُوْا بِالْقُرْاٰنِ لَا يَذْكُرُوْنَ لَا يَتَّعِظُوْنَ ـ

১৩. যখন তাদেরকে বুঝানো হয়, কুরআনের মাধ্যমে ওয়াজ-নসিহত করা হয়– তখন তারা বুঝে না– ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ করে না।

১৪. وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ يَسْتَسْخِرُوْنَ يَسْتَهْزِءُوْنَ بِهَا ـ

১৪. তারা যখন কোনো নিদর্শন দেখে– যেমন– চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া– তখন বিদ্রূপ করে– মোজেজা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

১৫. وَقَالُوْٓا فِيْهَا اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ ـ

১৫. এবং বলে, মোজেজা প্রসঙ্গে– কিছুই নয়, এ যে সুস্পষ্ট জাদু– সুস্পষ্ট জাদু।

১৬. وَقَالُوْا مُنْكِرِيْنَ لِلْبَعْثِ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ فِى الْهَمْزَتَيْنِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ ـ

১৬. তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলে– আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো? (اذا ও انا) উভয় স্থলে হামযাদ্বয় ১. স্বঅবস্থায় [অপরিবর্তিত] থাকবে। ২. দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে পড়া যাবে। ৩. উক্ত দু অবস্থায়ই হামযাদ্বয়ের মধ্যখানে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পাঠ করা যায়।

১৭. اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ بِسُكُوْنِ الْوَاوِ عَطْفًا بِاَوْ وَبِفَتْحِهَا وَالْهَمْزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَالْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ مَحَلُّ اِنَّ وَاسْمِهَا اَوِ الضَّمِيْرِ فِىْ لَمَبْعُوْثُوْنَ وَالْفَاصِلُ هَمْزَةُ الْاِسْتِفْهَامِ ـ

১৭. আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? [اَوْ শব্দটির] وَاوْ জযমের সাথে পড়া যায়। তখন اَوْ -এর দ্বারা আতফ হবে। আর وَاوْ -এর মধ্যে যবরও হতে পারে। তখন হামযা اِسْتِفْهَام -এর জন্য (তথা প্রশ্নবোধক) হবে, আর আতফ واو -এর দ্বারা হবে। مَعْطُوْف عَلَيْهِ টা اِنَّ ও তার ইসমের মহল হবে। অথবা, مَعْطُوْف عَلَيْهِ টা لَمَبْعُوْثُوْنَ -এর মধ্যকার যমীর হবে। আর فَاصِلْ তথা ব্যবধানকারী হলো ইস্তিফহামের হামযাহ।

১৮. قُلْ نَعَمْ تُبْعَثُوْنَ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ صَاغِرُوْنَ ـ

১৮. হে রাসূল ﷺ! বলুন, হ্যাঁ তোমাদেরকে পুনঃ জীবিত করা হবে– এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত– দীনহীন হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٩. فَإِنَّمَا هِيَ ضَمِيْرٌ مُبْهَمٌ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ زَجْرَةٌ أَيْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ أَيْ الْخَلَائِقُ أَحْيَاءٌ يَنْظُرُوْنَ مَا يُفْعَلُ بِهِمْ .

১৯. বস্তুত সে উত্থান হবে এখানে هِيَ অস্পষ্ট যমীর, তার পরবর্তী বাক্য তাকে বিশ্লেষণ করে- বিকট শব্দ ধ্বনি মাত্র একটি- যখন তারা অর্থাৎ সকল সৃষ্টিজীব জীবিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করতে থাকবে- তাদের সাথে যে আচরণ করা হবে।

٢٠. وَقَالُوْا أَيْ الْكُفَّارُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكَنَا وَهُوَ مَصْدَرٌ لَا فِعْلَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَتَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ أَيْ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ .

২০. এবং বলবে, অর্থাৎ কাফেররা হায়! এখানে يا তাম্বীহের জন্য হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের ধ্বংস। ويل শব্দটি মাসদার, তার শব্দ হতে কোনো فعل হয় না। আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে- এটাই তো প্রতিফল দিবস- হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের দিন।

٢١. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ .

২১. বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন- সমগ্র সৃষ্টিজীবের মধ্যকার- যাকে তোমরা মিথ্যা বলবে।

তাহকীক ও তারকীব

আল্লাহর বাণী عَجِبْتَ-এর মধ্যকার কেরাতের বিভিন্নতা : উল্লিখিত আয়াতে عَجِبْتَ শব্দের মধ্যে দু জাতীয় কেরাতে বর্ণিত হয়েছে-

১. আবূ আমর আসিম ও মদীনাবাসী কারীগণের মতে, عَجِبْتَ শব্দের تَاءٌ অক্ষর যবর যোগে হবে। এ ক্ষেত্রে এর দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হবে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করছেন যে, হে রাসূল! কাফের মুশরিকেরা যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করার পরও আল-কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করার কারণে আপনি বিস্মিত হয়ে পড়েছেন অথচ তারা সে সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করছে। জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার (র.) এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

২. হযরত আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.) এবং কূফার অন্যান্য কারীগণ, আবূ উবায়েদ ও ফাররা প্রমুখ কারীগণের মতে উক্ত عَجِبْتُ শব্দের تَاءٌ অক্ষর পেশ যোগে হবে। এ ক্ষেত্রে এর فَاعِلٌ তথা কর্তার ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। এর فَاعِلٌ আল্লাহ তা'আলা হবেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, আমি তো কাফের ও মুশরিকদের স্পর্ধা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে অথচ তারা হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসে লিপ্ত রয়েছে। অথবা এর فَاعِلٌ রাসূলে কারীম ﷺ হবেন। তখন আয়াতটির উহ্যরূপ হবে- قُلْ يَا مُحَمَّدُ بَلْ عَجِبْتُ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি বলুন যে, আমি তো তোমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি, অথচ তোমরা হাসি-ঠাট্টা ও উপহাসে ব্যস্ত রয়েছ। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ -এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে কাফের-মুশরিকদের নিকট পুনঃ জীবনকে প্রমাণিত করেছেন। তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের তুলনায় অসংখ্য শক্তিশালী ও বৃহৎ আকৃতির বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। আর মুহূর্তে তাদের ধ্বংস করা এবং সাথে সাথে তাদের জীবন দান করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার জন্য একেবারেই মামুলি ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা যে মানুষকে নিকৃষ্ট মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন সে মানুষের জন্য স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসূলের রিসালাত ও কুরআনে কারীমের সত্যতাকে অস্বীকার করা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার।

অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বুঝানো হোক, তারা বুঝে না। কুফরি ও খোদাদ্রোহীতায় তারা এতটুকু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যে, সত্যকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা বরং সত্যের প্রতি উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অতএব, তাদের সৎপথ প্রদর্শনের কাজ যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার তা বুঝিয়ে বলার অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হওয়ার নিসবত করা জায়েজ কিনা? সাধারণত মানুষ যখন কোনো ব্যতিক্রমধর্মী বস্তু দেখে তখন আশ্চর্যবোধ করে থাকে, আর এটা মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তবে আল্লাহ তা'আলার দিকে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার নিসবত করা জায়েজ কিনা? এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয়।

ইমাম রাযী (র.) উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, উক্ত عَجِبْتَ ফে'লটিকে যদি পেশসহ পড়া হয়, তাহলে তার ফায়িল বা কর্তা হবেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু আমরা এ বক্তব্য গ্রহণ করতে পারি না। কেননা মূলত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে উক্তিটি করেছেন। বাক্যটি মূলে ছিল- قُلْ يَا مُحَمَّدُ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ -যেমন অপর দু'টি আয়াতাংশ লক্ষণীয়।

১. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ [আপনি তাদের কথা শুনুন এবং তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন], ২. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ কিভাবে তারা জাহান্নামের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারল।

অবশ্য عَجِبْتَ ফি'লটিকে পেশযুক্ত করে পড়লে যে নাজায়েজ হবে তা নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রতি تَعَجُّبٌ বিস্মিত হওয়ার নিসবত করা জায়েজ। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- হে রাসূল! আপনি যে শুধু তাদের কার্যকলাপে বিস্মিত হয়েছেন তা নয়; বরং আমিও তাদের আচার-আচরণে আশ্চর্যবোধ করেছি। তবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্যান্বিত হওয়ার প্রকৃতি ও মানুষের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার মতো নয়। আল্লাহ তা'আলার উদার ও মহান সত্তায় না কোনা কিছু ঘৃণার সঞ্চার করতে পারে আর না কোনো কিছু ব্যাপক অনুভূত হতে পরে। অতএব, আল্লাহ তা'আলার মন্দ কাজের উপর বিস্মিত হওয়ার মর্মার্থ হলো তার শাস্তি প্রদান করা। আর ভালো কাজের উপর বিস্মিত হওয়ার মর্মার্থ হলো তার পুরস্কার প্রদান করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ এবং وَاللّٰهُ خَادِعُهُمْ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কাফেরদের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র করার অর্থ হলো তাদেরকে স্বীয় ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের শাস্তি প্রদান করা হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রমাণ উপস্থাপনের পর কিয়ামত ও হাশরের প্রসঙ্গে কাফের-মুশরিকদের অবস্থা : আল্লাহ তা'আলা অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে পুনর্জীবন ও হাশরকে প্রমাণিত করেছেন। তারপরও কাফের ও মুশরিকগণ তা মেনে নেয়নি; বরং উপহাস করে তা উড়িয়ে দিয়েছে। বিরোধিতা হতে তারা কিঞ্চিৎ পরিমাণও পিছিয়ে আসেনি। ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে আলোচ্য অবস্থায় কাফেরদের কিছু সংখ্যক আচার-আচরণের উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে অকাট্য ও সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পর তাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান-এর নীতি আরও মজবুত হলো। এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ খুবই বিস্মিত হলেন। অথচ কাফেররা রাসূল ﷺ -এর প্রতি তাদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এতে প্রতীয়মান হলো যে, তাদের হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া সুদূর পরাহত। তারা কোনো প্রকারেই রাসূল ﷺ -কে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। মিথ্যার শিকড় তাদের মনের গভীরে এমন গেড়ে বসেছে যে, সত্যের খোঁচায় তা আরও বদ্ধমূল হয়ে যায়। মোটকথা, কাফের-মুশরিকরা রাসূলে কারীম ﷺ -কে স্বীকার করবে না, এটাই তাদের শেষ কথা।

২. রাসূলে কারীম ﷺ যখন তাদেরকে সত্য সম্পর্কে বুঝাতেন তখন তারা তা বুঝার চেষ্টাই করত না। যেন তারা সত্যকে শুনেও শুনে না, দেখেও দেখে না। এ জন্যই আল-কুরআনে তাদেরকে صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ [তারা বধির, মূক, অন্ধ কাজেই কিছু বুঝে না।] বলা হয়েছে। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ [তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করা হলেও তারা তা গ্রহণ করে না।]

৩. কিয়ামত ও পরকালকে তারা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব ব্যাপার মনে করে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই কোনো মোজেজা ও নিদর্শনও এ প্রসঙ্গে তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُوْنَ অর্থাৎ 'তারা কোনো মোজেজা বা নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়।' তা হতে শিক্ষা গ্রহণের কোনোরূপ উদ্যোগ তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তা দ্বারা তাদের মন-মগজ কিঞ্চিৎ পরিমাণও পরিবর্তন হয় না; বরং তারা বলে– إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ [এটা তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছু নয়]।

ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, মক্কার কাফের-মুশরিকরা কিয়ামত ও পুনর্জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা বিস্মিত হতো এবং বলত যে, যে লোকটি মৃত্যুবরণ করে মাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে পুনরায় কিভাবে জীবন লাভ করতে পারে? এটা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। এমনকি এ বিষয়ে তারা অস্বীকৃতির এমন চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, যারা তা বিশ্বাস করত তারা তাকে উপহাস ও বিদ্রূপ করতো, তাকে বড় বোকা মনে করত। তাদেরকে উক্ত অস্বীকৃতির পথ হতে ফিরিয়ে আনার শুধুমাত্র দু'টি পদ্ধতিই বাকি ছিল।

১. তাদের সম্মুখে কিয়ামত ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা। যেমন তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের কি জানা নেই পুনরুত্থানের তুলনায় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি অধিক কঠিন কাজ। সুতরাং যিনি এ কঠিন কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি সে তুলনায় সহজ কাজটি তথা পুনরুত্থানের কাজটি করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন। এতদ্ব্যতীত কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করার তুলনায় তা ভেঙ্গে যাওয়ার পর পুনরায় তৈরি করা সহজ। সুতরাং যে স্রষ্টা মানুষকে কোনোরূপ পূর্ব নমুনা ছাড়া প্রথমবার সৃজন করেছেন, তিনি তাদেরকে পুনরায় পূর্বের অপেক্ষা সহজেই পুনর্জীবিত করতে পারবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

তবে বাস্তব কথা হলো আলোচ্য প্রমাণ অত্যন্ত শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত হওয়ার পরও তা হতে মুশরিকরা উল্লেখযোগ্য কোনো উপকৃত হতে পারেনি। কেননা উল্লিখিত দলিলের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা তারা উপলব্ধি করা দূরের কথা উপলব্ধি করার চেষ্টাও করেনি। অতএব তা কিভাবে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. রাসূলে কারীম ﷺ মোজেজা ও নিদর্শনের মাধ্যমে তাঁর রিসালাতকে প্রতিষ্ঠা করবেন, তাদের আস্থা অর্জন করবেন। যাতে পরে হাশর-নশর, কিয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম-এর ঘটনাবলি রাসূল ﷺ -এর মুখে শ্রবণ করেই বিশ্বাস করে নিবে। তা তাদের বুঝে আসুক বা না আসুক তারা তার পরোয়া করবে না। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, শত মোজেজা ও অলৌকিক নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের পাথরসম অন্তর এতটুকু নরম হয়নি; বরং আরো অধিক কঠিন হয়েছে। সমস্ত অলৌকিক নিদর্শনাবলি ও প্রমাণাদিকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিয়েছে।

৩. জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দাওয়াতকে নিষ্প্রভ করার উদ্দেশ্যে মক্কার কাফের ও মুশরিক নেতারা বহু অপপ্রচার ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে গণক, জিনে পাওয়া ব্যক্তি, পাগল ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। অবশেষে যখন তারা দেখল যে, এ সকল অপপ্রচারেও কাজ হচ্ছে না, তখন প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ একজন জাদুকর আর কুরআন হলো জাদু বিদ্যা। অতএব, কুরআনে কারীমকে লক্ষ্য করে তারা প্রচার করতে লাগল– إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোজেজা ও নিদর্শনাদি নিয়ে মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত কেন? রাসূলে কারীম ﷺ যখন মক্কার কাফের ও মুশরিকদের সম্মুখে মোজেজা ও নিদর্শন উপস্থাপন করতেন, বিভিন্ন নিদর্শনাবলি উত্থাপন করতেন এবং পরকাল ও পুনরুত্থানের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিতেন তখন তারা তাকে অস্বীকার তো করতই, সাথে সাথে তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাদের তিরস্কারের পশ্চাতে বিশেষ কারণ ছিল তারা পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস ও অবাস্তব বলে মনে করত এবং রাসূল ﷺ -এর মোজেজাসমূহকে মনে করত নিছক জাদু। তাদের এ ব্যাপারটি বুঝে আসত না যে, একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে, মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় তাকে কিভাবে জীবিত করা যেতে পারে? কিভাবে তাকে হিসাব-নিকাশের জন্য বিচারের সম্মুখীন করা যেতে পারে? সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার কাজ-কর্মের তালিকাই বা কোথায় পাওয়া যাবে? এ সকল বিষয় কখনো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি মুশরিকদেরকে বলে দিন– نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে। আর এ অমান্য ও অবিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে সেই পুনরুত্থানের দিন তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে, অসীম আজাবে নিপতিত হতে হবে। আফসোস ও হায়-হুতাশ সেদিন তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। শাস্তি হতে পরিত্রাণের কোনো পথই সেদিন আর তোমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে না।

"وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লামা আলূসী (র.) এ পর্যায়ে আরবের বিখ্যাত বীর কুস্তিগীর রোকানার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মক্কার অধিবাসী রোকানাকে রাসূলে কারীম ﷺ একটি পাহাড়ের পাদদেশে বকরি চরাতে দেখলেন, তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, সে বলল, 'আমি এসব কথা বুঝি না, আমি কুস্তিগীর, আমাকে কুস্তিতে পরাভূত করতে পারলে আমি বিষয়টি চিন্তা করব'। রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যদি তোমাকে কুস্তিতে পরাজিত করি, তবে ইসলাম কবুল করবে তো'? সে বলল, 'জী হ্যাঁ'। এরপর রাসূলে কারীম ﷺ -কে রোকানার সঙ্গে কুস্তি লড়তে হলো, তিনি একে একে তিনবার ধরাশায়ী করলেন। এরপরও সে আরও কিছু মোজেজা দেখার জন্যে আবেদন করল। তখন তিনি বৃক্ষকে ডাকলেন, বৃক্ষটি তাঁর নিকট হাজির হলো। তারপর রোকানা মক্কাবাসীর নিকট এসে বলল, ইনি বিরাট জাদুকর, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় [অবশ্য পরবর্তীকালে রোকানা ইসলাম গ্রহণ করেন]।

তাফসীরে যিলালে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের আশ-পাশে এমনকি তাদের সত্তার সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে অসীম কুদরত রয়েছে, তার প্রতি তারা একবারও ফিরে তাকায়নি, একটুও চিন্তা-ভাবনা করেনি। যদি তারা এ ব্যাপারে একটু চিন্তাও করত, তবে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, বেহেশত-দোজখ কিছুই তাদের নিকট অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হতো না। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান, তা যদি একবারও তারা মনের চক্ষু দ্বারা অবলোকন করত, তাহলে তাদের বিবেক তাদেরকে একথা বলতে বাধ্য করত যে, যে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি পুনরুত্থানেও সক্ষম। হাশর-নাশর, হিসাব-নিকাশ ও বেহেশত-দোজখ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর জন্য কোনো কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু চিন্তা-ভাবনাকে না ফিরানোর দরুন তারা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে বলতে আরম্ভ করল, 'এটা তো জাদু-মন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ অর্থাৎ কিয়ামত তো কেবল একটি বিরাট আওয়াজ। আরবি ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার বুঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে চালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য এ ফুঁৎকার দেওয়া হবে। -[কুরতুবী]

যদিও আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নাশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। [তাফসীরে কাবীর] কাফেরদের উপর ফুঁৎকারের প্রভাব হবে এই যে, وَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ - সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম ছিল, তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। -[কুরতুবী]

রাসূলে কারীম ﷺ-এর মোজেজার সত্যতা প্রমাণ এবং তা অস্বীকারকারীদের অভিমত খণ্ডন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকরা কোনো আয়াত [নিদর্শন] দেখলে তাকে উপহাস করে। এখানে آيَةً -এর দ্বারা নিদর্শন তথা মোজেজা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সর্বশ্রেষ্ঠ যে মোজেজা দান করেছেন তা হচ্ছে আল-কুরআন বা আল্লাহর বাণী। এতদ্ব্যতীত আরো বহু মোজেজা রাসূলে কারীম ﷺ -কে দান করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এর অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

কতেক ভ্রান্ত দল ও ব্যক্তিবর্গ রাসূলে কারীম ﷺ -এর অন্যান্য মোজেজাসমূহকে অস্বীকার করেছে। তাদের মতানুসারে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোনো মোজেজা অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতের আলোকে তাদের উক্ত দাবি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কেননা আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকরা কোনো মোজেজা প্রত্যক্ষ করলে তার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

অপর দিকে বাতিল মতামতের প্রবক্তারা আলোচ্য আয়াতের অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়েছে। তারা উক্ত আয়াতে মোজেজার অন্য অর্থ গ্রহণ করার অপচেষ্টা করেছে।

তাদের মধ্যকার কারো কারো অভিমত হলো যে, উল্লিখিত আয়াতে آيَةً -এর অর্থ হলো- যুক্তিভিত্তিক দলিল- মোজেজা নয়। কিন্তু তাদের উক্ত দাবি মোটেও সঠিক নয়। কেননা পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে- وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ অর্থাৎ আর কাফের মুশরিকরা বলে এটা তো নিছক সুস্পষ্ট জাদু। অতএব, কোনো যুক্তিভিত্তিক দলিলকে আর যাই বলুক না কেন- কমপক্ষে সুস্পষ্ট জাদু বলে কেউই অভিহিত করে না বা করতে পারে না।

তাদের মধ্যকার অন্য আরেক দলের অভিমত হলো, উক্ত আয়াতে آيَة -এর অর্থ হলো আল-কুরআনের আয়াত। কেননা কাফের ও মুশরিকরা আল-কুরআনের আয়াতকে জাদু-মন্ত্র বলে আখ্যা দিত। কিন্তু এটাও সঠিক অর্থ নয়। কেননা আলোচ্য আয়াতে رَأَوْا শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো- দেখা, প্রত্যক্ষ করা। আল-কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে এ শব্দটি মোটেও প্রযোজ্য নয়। কেননা আল-কুরআনের আয়াত দেখার বস্তু নয় বরং শ্রবণযোগ্য বিষয়। আল-কুরআনের যেখানেই আয়াতের কথা উল্লেখ হয়েছে সেখানেই শোনার কথা এসেছে, সেখানে দেখার কথা বলা হয়েছে।

অন্যান্য আল্লাহর নবীদের বেলায়ও তদ্রূপ ব্যবহার হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) যখন ফেরাউনের নিকট নবুয়তের দাবি উপস্থাপন করলেন, তখন ফেরাউন বলল- إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ অর্থাৎ 'যদি [নবুয়তের পক্ষে] তুমি কোনো মোজেজা এনে থাক তাহলে তা দেখাও- যদি তোমার দাবিতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।' আলোচ্য আয়াতে দু'টি লক্ষণীয়। প্রথমত এখানে آيَةً দ্বারা মোজেজাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে কারো দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ নেই। দ্বিতীয়ত ফিরআউন মোজেজা দেখাতে বললে হযরত মূসা (আ.) লাঠিকে সর্পে পরিণত করে চাক্ষুস দেখিয়ে দেন- শুনিয়ে দেননি। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, আল-কুরআনের আয়াত শোনা ও অনুধাবন করার বিষয়, আর মোজেজা দেখা ও প্রত্যক্ষ করার বিষয়।

মোটকথা, অত্র আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে আল-কুরআন ছাড়া আরও অসংখ্য মোজেজা দান করা হয়েছে। আর যারা তা অস্বীকার করে তাদের দাবি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। অতএব কারণে তারা বিপথগামী ও বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত। -[কুরতুবী, মা'আরিফ]

কোনো কোনো সময় রাসূলে কারীম ﷺ মোজেজা উপস্থাপন করতে কেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন? আল-কুরআনের কিছু সংখ্যক আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, কোনো কোনো সময় রাসূলে কারীম ﷺ কাফের ও মুশরিকদের মোজেজা উপস্থাপন করার আবেদন মেনে নেননি। অথচ রাসূল ﷺ যে কাফের ও মুশরিকদের সামনে অসংখ্য মোজেজা উপস্থাপন করেছেন তা তো কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত রয়েছে। এ বিরোধের কারণ কি?

আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এটা তো সন্দেহহীনভাবে প্রমাণিত যে, রাসূলে কারীম ﷺ কাফের ও মুশরিকদের সম্মুখে অসংখ্য মোজেজা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু যে সকল আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মোজেজা উপস্থাপন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, তার কারণ হলো, তারা সর্বক্ষণ নিজেদের মনগড়া নতুন নতুন মোজেজা প্রার্থনা করত। সে সকল মোজেজা উপস্থাপন করতে রাসূল ﷺ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। কেননা সে ক্ষেত্রে দীন-ইসলাম একটি খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত হতো। আর আল্লাহর রাসূল তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী মোজেজা দেখাবেন, কাফের ও মুশরিকদের মর্জি মাফিক নয়। অতএব সর্বক্ষণ একেকটি নতুন নতুন মোজেজা উপস্থাপন যেভাবে রাসূলে কারীম ﷺ -এর ভাব-গাম্ভীর্যের পরিপন্থি, অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরোধী।

আরও একটি উত্তর এটাও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে, যা তিনি পূর্ববর্তী অন্যান্য নবী-রাসূলদের ব্যাপারে প্রয়োগ করেছেন- কোনো সম্প্রদায়কে কাঙ্ক্ষিত মোজেজা উপস্থাপন করার পর যদি তারা ঈমান গ্রহণ না করে, তবে ফলশ্রুতিতে আম গজব [আজাব]-এর মাধ্যমে তাদেরকে নির্মূল করে দেন। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেহেতু আম গজব [আজাব] হতে হেফাজত করা ও তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিল, তাই তাদের প্রার্থিত মোজেজা তাদেরকে দেখানো হয়নি। কেননা প্রার্থিত মোজেজা প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান গ্রহণ করলে পূর্বে প্রচলিত নিয়মানুসারে তাদের উপর আম গজব (আজাব) আপতিত হতো এবং এতে তারা ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যেত। -[মা'আরিফ]

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ আয়াতের বক্তা ও সম্বোধিত ব্যক্তি কে? আলোচ্য কথাটি হাশরের দিন কাকে লক্ষ্য করে বলবে? এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরীনে কেরাম হতে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়-

১. কতেক মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এটা কাফেরদের লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের অংশ বিশেষ।

২. কতেক মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এটা কাফেরদরে বক্তব্য। তারা পরস্পরের মধ্যে এ জাতীয় কথা বলাবলি করবে। এটা সত্য প্রত্যক্ষের কারণে তাদের নিছক আফসোস ও হা-হুতাশ মাত্র।

৩. কারো মতে, এটা ফেরেশতাদের বক্তব্য। ফেরেশতারা মুশরিকদের লক্ষ্য করে এ উক্তি করবেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে ফেরেশতারা বলবেন যে, অদ্য তোমাদের মধ্যে ফয়সালা ও মীমাংসার দিন। সকল মকদ্দমার ফয়সালা আজ সমাধা হবে। আজ পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারও দিবস। আজ তোমরা পরস্পর আলাদা হয়ে যাবে। কেউ জান্নাতের অফুরন্ত শান্তিতে প্রবেশ করবে, আর কেউ জাহান্নামের সীমাহীন আজাবের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে।

৪. কারো মতে, হাশরের ময়দানে ঈমানদারগণ কাফেরদের লক্ষ্য করে উক্ত বক্তব্য বলবে। কেননা দুনিয়াতে সৃষ্টিকর্তা, পরকাল, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ে ঈমানাদরদের সাথে কাফের ও মুশরিকদের মতানৈক্য ও বিতর্ক ছিল, দুনিয়ার আদালতে তার মীমাংসা করার অবকাশ ছিল না, তাই সেই বিতর্ক মীমাংসার জন্য ঈমানদারগণ সুদীর্ঘ সময় যাবৎ এ দিনের অধীর অপেক্ষায় ছিল।

৫. কারো মতে, হাশরের ময়দানের সমগ্র পরিবেশই যবানে হাল তথা নীরব ভাষায় উক্ত বক্তব্য বলতে থাকবে।

যা হোক, উল্লিখিত বক্তব্যের প্রবক্তা যেই হোক না কেন, তা দ্বারা যে, কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হবে, তাতে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٢. وَيُقَالُ لِلْمَلٰئِكَةِ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ وَاَزْوَاجَهُمْ قُرَنَاءَهُمْ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ.

২২. আর ফেরেশতাদের বলা হবে– একত্র করো গুনাহগারদেরকে– শিরকের মাধ্যমে নিজেদের উপর। তাদের দোসরদেরকে– তাদের শয়তান সঙ্গীদেরকেও হাজির করো এবং যাদের ইবাদত তারা করত [তাদেরকেও হাজির করো]।

٢٣. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهِ مِنَ الْاَوْثَانِ فَاهْدُوْهُمْ دُلُّوْهُمْ وَسُوْقُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ط طَرِيْقِ النَّارِ.

২৩. আল্লাহ ব্যতীত। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যে সকল প্রতিমার তারা উপাসনা করত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত করো– পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, হাঁকিয়ে নিয়ে যাও– জাহান্নামের পথে দোজখের রাস্তার দিকে।

٢٤. وَقِفُوْهُمْ اِحْبِسُوْهُمْ عِنْدَ الصِّرَاطِ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ ط عَنْ جَمِيْعِ اَقْوَالِهِمْ وَاَفْعَالِهِمْ.

২৪. আর তাদেরকে থামাও– তাদেরকে পথের নিকট থামাও– তারা জিজ্ঞাসিত হবে– তাদের সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে।

٢٥. وَيُقَالُ لَهُمْ تَوْبِيْخًا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ لَا يَنْصُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَحَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا.

২৫. আর তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলা হবে– তোমাদের কি হলো যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? পরস্পরের সাহায্য করছ না কেন? যেভাবে দুনিয়ার জীবনে করতে।

٢٦. وَيُقَالُ لَهُمْ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ مُنْقَادُوْنَ اَذِلَّاءُ.

২৬. তাদেরকে আরও বলা হবে– বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পণকারী। অবনত ও লাঞ্ছিত।

٢٧. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ يَتَلَاوَمُوْنَ وَيَتَخَاصَمُوْنَ.

২৭. তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। একে অপরকে অভিযুক্ত করবে ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং সতীর্থদেরকে একত্র কর। এখানে সতীর্থদের জন্য اَزْوَاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল পরিমাণ ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে اَزْوَاجٌ অর্থ– সতীর্থই। হযরত ওমর (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বাইহাকী, আব্দুর রায্যাক প্রমুখ তাফসীরবিদ এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমরের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এখানে اَزْوَاجَهُمْ -এর অর্থ মুশরিকদের সমমনা লোক। সে মতে সুদখোরকে অন্য সুদখোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্যপায়ীদের সাথে একত্র করা হবে। –[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এছাড়া وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ বাক্য দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্র করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া মুশরিকরা যাদের ইবাদত করত : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন মুশরিকদের সাথে তাদের ঐ সকল মাবুদকেও একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিবেন যাদেরকে তারা আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে মাবুদ তথা উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল। মুশরিকরা যে সকল গায়রুল্লাহর ইবাদত করত [বা বর্তমানেও করে] তাদেরকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়-

১. এমন সকল মানুষ ও শয়তান যারা ইচ্ছা পোষণ করত যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া তাদের উপাসনা করুক। অতএব অন্যের উপাসনা কামনা করার কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে তারা জাহান্নামী হবে।

২. যে সকল জড় ও গায়রে মুকাল্লাফ বিষয়াদির তথা মূর্তি, বৃক্ষ, পাথর ইত্যাদির মুশরিকরা উপাসনা করে থাকে, তারা যদিও বাস্তবিক দোষী নয় তথাপি মুশরিকদের আফসোস ও হা-হুতাশ বর্ধিত করার কারণে তাদেরকেও ঐ সকল মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৩. এমন সকল মুকাল্লাফ যাদের উপাসনা মুশরিকরা করেছে, কিন্তু তারা এ উপাসনা তো কামনাই করে না; বরং তার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং মানুষদেরকে এ জাতীয় উপাসনা হতে বারণ করেছেন। তারা সর্বদা এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত তথা বিশুদ্ধ তাওহীদের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। এ তৃতীয় শ্রেণির মাবুদ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হুকুমের আওতাধীন হবে না। কেননা তাদের উপাসনার ব্যাপারে এ সকল মাবুদরা সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। এ সকল মাবুদ হচ্ছেন ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও আল্লাহর ওলীগণ; শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অজ্ঞতাবশত মানুষরা তাদের উপাসনা করেছে।

"وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ" আয়াতের মর্মার্থ : শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করবেন, মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যে সকল মূর্তি ও প্রতিমার উপাসনা করেছে তাদের সকলকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও। এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ অর্থাৎ 'তোমরা ঐ অগ্নিকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।' এ আয়াতে মানুষ দ্বারা মুশরিকরা উদ্দেশ্য আর পাথর দ্বারা মূর্তি ও প্রতিমাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা, আয়াতের মর্মার্থ হলো, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা ঐ সকল শয়তানগণকে মুশরিকদের সঙ্গে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও, মানুষ যাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের উপাসনা করত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِيْ آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ অর্থাৎ হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা কর না। [অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছি।] আর ব্যাপক অর্থে শয়তানের উপাসনা করার অর্থ হলো তার কুমন্ত্রণা অনুসারে চলা, তার কুমন্ত্রণায় পড়ে শিরকে লিপ্ত হওয়া।

মূর্তিকে বিনা অপরাধে কিভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে? দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমা মুশরিকরা যাদের উপাসনা [পূজা] করে থাকে তাদেরকেও মুশরিকদের সঙ্গে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদি এরা তো নির্বোধ, গায়রে মুকাল্লাফ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কি কারণ থাকতে পারে? মুফাসসিরীনে কেরাম এর দু'টি জবাব প্রদান করেছেন-

১. এ বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। আর তার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারীও তিনিই। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি যেভাবেই ব্যবহার করুন না কেন- তাতে কারো কোনো প্রশ্ন করার অবকাশ নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. আলোচ্য নির্জীব ও নির্বোধ পদার্থসমূহকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার মূল উদ্দেশ্য আজাব দেওয়া নয়; বরং মুশরিকদের শাস্তি ও হা-হুতাশকে বাড়িয়ে দেওয়াই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। কেননা মুশরিকরা যখন তাদের সাথে তাদের উপাস্য দেব-দেবী ও প্রতিমাসমূহ উপস্থিত করা হয়েছে প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের আফসোস ও দুঃখের কোনো অন্ত থাকবে না। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নির মধ্যেও শান্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা।

পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা দেব-দেবী ও প্রতিমাসমূহকে যদিও জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, কিন্তু তাদেরকে আজাব দিবেন না। কেননা তিনি কারো প্রতি এক বিন্দু পরিমাণও অন্যায়-অবিচার করেন না।

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ...... بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ **আয়াতের মর্মার্থ :** অর্থাৎ তাদেরকে সেদিন ধমক দিয়ে বলা হবে যে, এ কঠিন বিপদ মুহূর্তে তোমরা কেন একে অন্যকে সাহায্য করছ না? যদি সাহায্য করার সাধ্য থাকে, তবে সাহায্য কর না কেন? এ কথাটি সম্পূর্ণ বিদ্রূপাত্মক। কেননা সেখানে সাহায্য করার সাধ্য যে কারো নেই, একথা সকলেরই জানা; বরং সেদিন তারা অত্যন্ত অসহায় হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) مُسْتَسْلِمُوْنَ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন خَاضِعُوْنَ অর্থাৎ কাফেররা সেদিন অসহায় অবস্থায় থাকবে। আর হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাঁবেদার ও অনুগত হবে।

এরপর তারা নিজেরাই পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে। একে অপরকে অভিযুক্ত ও দোষারোপ করবে। কিন্তু তাতে কোনোরূপ লাভবান হবে না। নেতা ও অনুসারী সকলেই কঠোর আজাবে আবদ্ধ হবে। তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাফাই কোনো উপকারে আসবে না। এমনকি হাজারো দুঃখ প্রকাশ, আফসোস, হা-হুতাশ ও ক্ষমা-প্রার্থনাও তাদেরকে অফুরন্ত শাস্তি হতে মুক্তি দিতে পারবে না।

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٨. قَالُوْا اَىِ الْاَتْبَاعُ مِنْهُمْ لِلْمَتْبُوْعِيْنَ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ عَنِ الْجِهَةِ الَّتِىْ كُنَّا نَاْمَنُكُمْ مِنْهَا بِحَلْفِكُمْ اِنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ فَصَدَّقْنَاكُمْ وَاتَّبَعْنَاكُمْ الْمَعْنٰى اَنَّكُمْ اَضْلَلْتُمُوْنَا .

২৮. তারা বলবে অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে অনুসারীরা নেতাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। তোমরা এমন পদ্ধতিতে আমাদের নিকট আসতে যে, আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছি এবং তোমাদের অনুসরণ করেছি। অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে বিপথগামী করছ।

٢٩. قَالُوْا اَىِ الْمَتْبُوْعُوْنَ لَهُمْ بَلْ لَمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّمَا يَصْدُقُ الْاِضْلَالُ مِنَّا اَنْ لَوْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَرَجَعْتُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ اِلَيْنَا .

২৯. তারা বলবে অর্থাৎ নেতারা অনুসারীদেরকে বলবে বরং তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না। আর আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছি এটা তোমাদের এ দাবি কেবল তখনই যথার্থ হতো যদি পূর্ব হতে তোমরা ঈমানদার থাকতে এবং [আমাদের ফুসলানোর কারণে] ঈমান হতে আমাদের আকিদা তথা শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে।

٣٠. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ج قُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ تَقْهَرُكُمْ عَلٰى مُتَابَعَتِنَا بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِيْنَ ضَالِّيْنَ مِثْلَنَا .

৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না, অর্থাৎ শক্তি ও সামর্থ্য ছিল না যা তোমাদেরকে আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করতে পারে। বরং তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়– তোমরাও আমাদের ন্যায়ই বিপথগামী ছিলে।

٣١. فَحَقَّ وَجَبَ عَلَيْنَا جَمِيْعًا قَوْلُ رَبِّنَا ق بِالْعَذَابِ اَىْ قَوْلُهُ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ اِنَّا جَمِيْعًا لَذَائِقُوْنَ الْعَذَابَ بِذٰلِكَ الْقَوْلِ وَنَشَاَ عَنْهُ قَوْلُهُمْ .

৩১. সুতরাং সত্য হয়েছে– অনিবার্য হয়েছে আমাদের বিপক্ষে সকলের আমাদের পালনকর্তার উক্তি– শাস্তি সম্পর্কিত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী 'নিশ্চয় আমি মানুষ ও জিনের দ্বারা একযোগে জাহান্নামকে পূর্ণ করবো'– আমাদের অবশ্যই স্বাদ আস্বাদন করতে হবে– আজাবের স্বাদ। আল্লাহ তা'আলার বাণীর কারণে।

٣٢. فَاَغْوَيْنٰكُمْ الْمُعَلَّلُ بِقَوْلِهِمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ .

৩২. আর তা হতে তাদের বক্তব্য সৃষ্টি হয়েছে– আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। যা তাদের এ বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয়– কারণ আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম।

٣٣. قَالَ تَعَالٰى فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ لِاِشْتِرَاكِهِمْ فِى الْغَوَايَةِ .

৩৩. আল্লাহ তা'আলার বাণী– সুতরাং তারা সবাই সেদিন– কিয়ামতের দিন– শাস্তিতে শরিক হবে– কেননা দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতার মধ্যে তারা অংশীদার ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٤. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا نَفْعَلُ بِهٰؤُلَاءِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ غَيْرَ هٰؤُلَاءِ اَىْ نُعَذِّبُهُمُ التَّابِعَ مِنْهُمْ وَالْمَتْبُوْعَ.

৩৪. আমি এমনি – যেরূপ এ মুশরিকদের সাথে ব্যবহার করেছি– অপরাধীদের সাথে ব্যবহার করে থাকি– এদের মতো অন্যান্য অপরাধীদের সাথেও অর্থাৎ আমি তাদের মধ্য হতে নেতা ও অনুসারী উভয় দলকেই শাস্তি প্রদান করবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ" আয়াতের বিশ্লেষণ : শেষ বিচারে দিন মুশরিক নেতাদেরকে তাদের অনুসারীরা বলবে, অথবা কাফেররা তাদের শয়তানদের বলবে, তোমরা তো অনেক শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে যে, আমরা বাধ্য হয়ে তোমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি।

উল্লিখিত আয়াতে মুফাস্‌সিরগণ يَمِيْن -এর বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন–

১. শক্তি ও বল– এ অর্থের বিবেচনায় আয়াতের অর্থ হবে– তোমরা প্রবল প্রতাপের সাথে আমাদের নিকট আসতে, তোমরা শক্তি প্রয়োগ করে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ বিশ্লেষণই সর্বাধিক সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য।

২. শপথ ও কসম– এ অর্থের বিচারে কোনো কোনো মুফাস্‌সির আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– 'তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। তোমরা শপথ করে বলতে যে, তোমাদের ধর্মই সঠিক, আর রাসূলের শিক্ষা মিথ্যা।' এ বিশ্লেষণও সরাসরি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে يَمِيْن -এর অর্থ হলো– اَلزَّيْنُ তথা সৌন্দর্য। অর্থাৎ অনুগামীরা তাদের মুশরিক নেতাদেরকে সম্বোধন করে বলবে– 'তোমরা আমাদের নিকট পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীকে আকর্ষণীয় করে দেখাতে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।'

৪. কল্যাণ ও মঙ্গল– এ অর্থের বিবেচনায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে– 'তোমরা কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে আমাদের সাথে প্রতারণা করেছিলে। তোমরা দাবি করতে যে, তোমরা যে পথ ও ধর্মে আছ, সেটাই হক ও সত্য। আর আমাদের মঙ্গল কামনাই তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

৫. ডান বা ডান দিকের পথ– এ অর্থের বিবেচনায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে–'তোমরা আমাদের ডান দিকের পথ দিয়ে আসতে অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট নিজেদেরকে ডানপন্থি বা হকপন্থি বলে উপস্থাপন করতে।

মুফাস্‌সিরীনদের সর্দার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রথম মতকেই গ্রহণ করেছেন।

যে সকল কারণে ডান দিককে বাম দিকের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত يَمِيْن -এর একটি অর্থ– ডান হাতও রয়েছে। অনেক মুফাসসিরীনের মতে এটাই يَمِيْن -এর বাস্তবিক অর্থ। তবে বিভিন্ন কারণে ডান হাত বা ডান দিক– বাম দিকের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নিম্নে তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. রাসূলে কারীম ﷺ সকল ভালো কাজই ডান হাত ও ডান দিক হতে শুরু করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কেও তদ্রূপ করার নির্দেশ দিতেন।

২. বিবেকবান ও বিশুদ্ধ রুচিবোধের অধিকারী সব মানুষই সকল ভালো কাজ ডান হাতে সমাধা করে থাকে। আর নিম্ন কাজগুলো বাম হাতে করে থাকে।

৩. সাধারণত সকল বিবেকবান লোকই এ ব্যাপারে একমত যে, বাম হাত ডান হাত থেকে উত্তম।

৪. হাশরের ময়দানে [আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক] ঈমানদারদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, আর কাফের ও মুশরিকদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে।

৫. ডান কাঁধের ফেরেশতারা ভালো কাজের হিসাব রাখেন আর বাম কাঁধের ফেরেশতারা মন্দ কাজের হিসাব রাখেন।

৬. বাস্তবিকই সাধারণত ডান হাত বাম হাত হতে অধিক শক্তিশালী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হাশরের ময়দানে মুশরিক নেতা ও তাদের অনুগামীদের মধ্যকার কথোপকথন : হাশরের ময়দানে যখন মুশরিক নেতাদের সাথে তাদের অনুসারীদের সাক্ষাৎ ঘটবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবেই নেতাদেরকে লক্ষ্য করে তাদের অনুসারীরা দোষারোপ করে বলবে- إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট শিরকের দাবি নিয়ে আসতে এবং শপথ করতে যে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতাম। তোমরা আমাদেরকে চরমভাবে প্রতারিত করে আজ জাহান্নাম মুখী করেছ তোমাদের কারণেই আজ আমরা জাহান্নামের পথিক হয়েছি। তখন মুশরিক নেতারা তাদের অনুসারীদের অভিযোগের জবাব দিবে এবং পাল্টা তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দেবে। অতএব তারা তাদের অনুসারীদেরকে বলবে-

১. মুশরিক নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলবে- بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ বরং আমাদের আহ্বানের পূর্বেও তো তোমরা ঈমানদার ছিলে না। তোমাদের দাবি তো তখনই যুক্তিযুক্ত হতো যদি এরূপ হতো যে, পূর্ব হতে তোমরা ঈমান এনেছিলে, অতঃপর আমাদের কুমন্ত্রণায় পড়ে ঈমান পরিত্যাগ করে শিরকের দিকে দিয়ে আসতে। কিন্তু ব্যাপারটি তো মোটেও তদ্রূপ নয়; বরং পূর্বেও তোমরা ঈমানদার ছিলে না।

২. তারা তাদের অনুসারীদের জবাবে আরো বলবে- وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ তোমাদের উপর তো আমাদের কোনো জোর-জবরদস্তি ছিল না, যার কারণে আমরা তোমাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে পথভ্রষ্ট করতে পারি। অতএব আমরা তোমাদেরকে বিপথগামী করেছি বলে তোমরা যে অভিযোগ করেছ তা মোটেও সত্য নয়। বরং আমাদের আহ্বানের পর তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় শিরককে গ্রহণ করেছ।

৩. মুশরিক নেতারা আরো বলবে- بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِيْنَ বরং তোমরা নিজেরাই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ছিলে। তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় শিরককে গ্রহণ করেছ।

৪. তারা তাদের অনুসারীদেরকে আরো বলবে- فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ অর্থাৎ 'আমাদের উপর আমাদের প্রভুর বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। আমাদের সকলকেই আজাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।' আজ কারো আজাব হতে মুক্তির পথ নেই।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "قَوْلُ رَبِّنَا" 'আমাদের প্রভুর বাণী' -এর দ্বারা আয়াতে কারীমা- لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ (শয়তানকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলবেন) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা একযোগে জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব।

মোটকথা, মুশরিকরা একে অপরকে যতই দোষারোপ করুক না কেন এবং যতই সাফাই বর্ণনা করুক না কেন তাতে কোনো ফল হবে না। তাদের সকলকেই অনন্ত কালের কঠিন আজাবে আক্রান্ত হতে হবে।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ **আয়াতের বিশ্লেষণ :** এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহ্বান জানানোর একথা বলে আজাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সেও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে; বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়। -[মা'আরিফুল কুরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٥. اِنَّهُمْ اَىْ هٰؤُلَاءِ بِقَرِيْنَةِ مَا بَعْدَهُ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ .

৩৫. নিশ্চয়ই তারা অর্থাৎ এ কাফেররা যা পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় – তাদেরকে যখন বলা হতো, 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই', তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।

٣٦. وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا فِىْ هَمْزَتَيْهِ مَا تَقَدَّمَ لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ اَىْ لِاَجْلِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩৬. আর তারা বলত, আমরা কি এটার অর্থাৎ اَئِنَّا-এর হামযাদ্বয়ে পূর্ববর্তী তাহকীক প্রযোজ্য হবে (যা অনুরূপ স্থলে ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবো? অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর বাণীর কারণে।

٣٧. قَالَ تَعَالٰى بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ الْجَائِيْنَ بِهٖ وَهُوَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

৩৭. আল্লাহ তা'আলার বাণী– না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। যারা ইতঃপূর্বে হক তথা সত্যসহ আগমন করেছেন। আর তা (অর্থাৎ সত্য) হলো– 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই।'

٣٨. اِنَّكُمْ فِيْهِ الْتِفَاتٌ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ .

৩৮. তোমরা অবশ্যই এখানে اِلْتِفَاتٌ বাক্যের গতি বা রীতির পরিবর্তন করা হয়েছে– বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করবে।

٣٩. وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

৩৯. আর তোমরা প্রতিফল পাবে তবে তার প্রতিফল দেওয়া হবে– যা তোমরা পৃথিবীতে করতে।

٤٠. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ اَىْ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَىْ ذِكْرُ جَزَاؤُهُمْ فِىْ قَوْلِهٖ .

৪০. তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর বাছাই করা বান্দা অর্থাৎ ঈমানদারগণ। এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ হয়েছে।

٤١. اُولٰئِكَ لَهُمْ فِى الْجَنَّةِ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا .

৪১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে তাদের প্রতিফলের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে – জান্নাতে নির্ধারিত রুজি সকাল-সন্ধ্যা।

٤٢. فَوَاكِهُ ج بَدَلٌ اَوْ بَيَانٌ لِلرِّزْقِ وَهِىَ مَا يُؤْكَلُ تَلَذُّذًا لَا لِحِفْظِ صِحَّةٍ لِاَنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ مُسْتَغْنُوْنَ عَنْ حِفْظِهَا بِخَلْقِ اَجْسَامِهِمْ لِلْاَبَدِ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ بِثَوَابِ اللّٰهِ .

৪২. ফলমূল– এটা রিজিক হতে بَدَلْ অথবা بَيَانْ হয়েছে। আর তা হলো যা তৃপ্তি ও স্বাদের জন্য এমন করা হয়, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নয়। কেননা জান্নাতবাসীগণ স্বাস্থ্য রক্ষার মুখাপেক্ষী নন। কারণ তাদের শরীরকে চিরদিনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা সম্মানিত হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতিদানের কারণে।

٤٣. فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ .

৪৩. নিয়ামতের উদ্যানসমূহ।

٤٤. عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ لَا يَرٰى بَعْضُهُمْ قَفَا بَعْضٍ .

৪৪. মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন একে অপরের পৃষ্ঠদেশ দেখতে হবে না।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٥. يُطَافُ عَلَيْهِمْ عَلٰى كُلٍّ مِنْهُمْ بِكَاْسٍ هُوَ الْإِنَاءُ بِشَرَابِهٖ مِنْ مَّعِيْنٍ مِنْ خَمْرٍ يَجْرِيْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ كَأَنْهَارِ الْمَاءِ .

৪৫. তাদেরকে ঘুরেফিরে পরিবেশন করা হবে– তাদের প্রত্যেককে আশ-পাশে পেয়ালার মাধ্যমে তা (كَأْسٌ) হলো পানীয় ভর্তি পেয়ালা– সুরা মদ অর্থাৎ মদ– যা পানির নহরসমূহের ন্যায় ভূমির উপর প্রবাহিত হবে।

٤٦. بَيْضَاءَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ لَذَّةٍ لَذِيْذَةٍ لِلشّٰرِبِيْنَ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا كَرِيْهَةٌ عِنْدَ الشُّرْبِ .

৪৬. সুশুভ্র– দুধ হতেও সাদা হবে স্বাদযুক্ত– সুস্বাদু হবে পানকারীদের জন্য দুনিয়ার মদের বিপরীত। কেননা এটা পান করার সময় বিস্বাদ মনে হয়।

তাহকীক ও তারকীব

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ . عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ . يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ **বাক্যাংশসমূহের মহল্লে ই'রাব কি?**
অত্র আয়াতে فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ বাক্যাংশটুকু مُكْرَمُوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হতে পারে, তা ছাড়া এটা هُمْ-এর مُكْرَمُوْنَ-এর দ্বিতীয় খবরও হতে পারে, আবার حَالٌ ও হতে পারে। عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ বাক্যাংশে পরবর্তী مُتَقٰبِلِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হতে পারে। আর এটা حَالٌ ও হতে পারে আর يُطَافُ عَلَيْهِمْ পূর্ববর্তী মুতা'আল্লাক দ্বয়ের যে কোনো একটি হতে حَالٌ হতে পারে। –[কামালাইন]

غَيْرُ إِلَّا শব্দটি وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-এর মধ্যে مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ **-এর মহল্লে ই'রাব কি?** আল্লাহর বাণী -এর অর্থে হয়েছে। সুতরাং এটা مُضَافٌ আর مَا ইসমে মাওসূল -এর صِلَةٌ-এর সাথে মিলিত হয়ে মুযাফ ইলাইহ হওয়ার কারণে মহল্লান মাজরূর হয়েছে। অথবা, এটা جَزَاءٌ বিলুপ্ত মুযাফের মুযাফ ইলাইহি হয়ে মাজরূর হয়েছে। বাক্যটি হবে– وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا جَزَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু তোমাদের কৃত অপকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشّٰرِبِيْنَ : **আয়াতে بَيْضَاءَ এবং لَذَّةٍ-এর মহল্লে ই'রাব কি?** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ . بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشّٰرِبِيْنَ .

'সাদা ধাঁটি সূরাপূর্ণ পাত্র জান্নাতীদেরকে পরিবেশন করা হবে। যা পানকারীদের নিকট সুস্বাদু হবে।' অত্র আয়াতে بَيْضَاءَ শব্দটি مَعِيْنٍ-এর সিফাত হিসেবে مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হয়েছে। কিন্তু এটা غَيْرُ مُنْصَرِفٍ হওয়ার কারণে তাতে যবর হয়েছে। আর لَذَّةٍ শব্দটিও مَعِيْنٍ-এর দ্বিতীয় সিফাত হয়ে مَجْرُوْرٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** উল্লিখিত আয়াতটি মক্কার মুশরিক নেতাদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মক্কার মুশরিক নেতারা তার শয্যাপাশে একত্রিত হয়েছিল। তারা জীবনের শেষলগ্নে বাপ-দাদার ধর্ম তথা শিরকের উপর অটল থাকার পরামর্শ দিল। এ সুযোগে নবী করীম ﷺ তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন– قُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ تَمْلِكُوْا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِيْنُ بِهَا الْعَجَمُ অর্থাৎ "তোমরা বলো, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই– তাহলে তোমরা এর দ্বারা আরবের উপর নেতৃত্ব লাভ করবে এবং অনারবরাও তোমাদের অনুগত হয়ে যাবে।" কিন্তু তারা নবীজীর ডাকে সাড়া দিল না; বরং তারা অহঙ্কার করে বলল– "একজন পাগল ও কবির পিছনে পড়ে আমরা কি আমাদের মা'বুদদের উপাসনা ছেড়ে দেবো– বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করবো?"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল করে আল্লাহ ফরমান– এরা তো এমন সম্প্রদায় যখন তাদেরকে দুনিয়াতে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হতো– বাতিল দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমার পূজা পরিত্যাগ করত এক আল্লাহ– সত্যিকার মাবুদের ইবাদতের জন্য আহ্বান জানানো হতো তখন তারা অহঙ্কার বশত তা প্রত্যাখান করত। –[কবীর, সাবী, কুরতুবী ইত্যাদি]

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন যে, একটি জাতি অহঙ্কার ও গরিমায় পড়ে তা গ্রহণ করেনি অতঃপর প্রমাণ হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতখানা তেলাওয়াত করেন– إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ এ মুশরিকরা এমন যে, যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার মা'বুদ নেই তখন অহঙ্কার বশত তারা তা প্রত্যাখ্যান করত।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا" .

"সে সময়কে স্মরণ করো, যখন কাফেররা তাদের অন্তরে অহঙ্কার স্থান দিয়েছিল– জাহেলিয়াতের অহঙ্কার, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন। আর তাদের উপর তাকওয়ার বাণী তথা "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ" -কে লাযেম তথা অত্যাবশ্যক [বা বদ্ধমূল] করে দিলেন। বস্তুত তারাই ছিল এর সর্বাধিক হকদার ও যোগ্য।"

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মক্কার মুশরিকরা যে অহঙ্কার ও গোয়ার্তুমীর পরিচয় দিয়েছিল এবং তার মোকাবিলায় নবী করীম ﷺ ও তদীয় সাহাবীগণ সেই চরম ধৈর্য অবলম্বন করেছেন এখানে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মোটকথা, অহঙ্কার অহমিকাবোধই মুশরিকদেরকে দীন ও তাওহীদ হতে তথা আল্লাহ তা'আলার খাস করুণা হতে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

আলোচ্য আয়াতের বিশ্লেষণ : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা রাসূলে কারীম ﷺ -কে পাগল ও কবি বলে আখ্যায়িত করত। তারা বলত যে, একজন কবি ও পাগলের কথা ধরে কি আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? তা কখনো হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ পাগলও নন, কবিও নন। বরং তিনি তো সত্যবাণী নিয়ে আগমন করেছেন। আর তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা তো নতুন কিছু নয়; বরং ইতঃপূর্বে হাজারো– লাখো নবী এ তাওহীদের দাওয়াত সত্যের পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন।

"صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ" অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-কে সত্যায়িত করেছেন– এটার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. তিনি পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করেননি। সুতরাং পূর্ববর্তী কোনো নবীর উম্মত তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদগার করার– তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লাগার যুক্তিযুক্ত কোনো কারণই থাকতে পারে না। তিনি তো পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকেই সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

২. তাঁর দাওয়াত নতুন কোনো কিছু নয়; বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও এ একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং এতে বিস্মিত হওয়ার এবং একে অসম্ভব কিছু ভাববার কি যুক্তি থাকতে পারে?

৩. তাঁর পূর্ববর্তী যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তাঁরা সকলেই রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যায়িত করেছেন। তিনি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মূর্ত প্রতীক।

মোটকথা, রাসূলে কারীম ﷺ যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন তা ইতঃপূর্বে আদি পিতা আদম (আ.) হতে হাজারো যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ আম্বিয়ায়ে কেরামের মুখে উচ্চারিত অসংখ্য বনী আদমের কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। সুতরাং এর দরুন যারা মুহাম্মদ ﷺ -কে পাগল ও কবি বলে আখ্যায়িত করছে মূলত তারা নিজেরাই পাগলামি ও কাল্পনিক কাব্যে বিভোর রয়েছে– তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

أُولَـٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ আয়াতের বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর খাঁটি ঈমানদার বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট রিজিক (رِزْقٌ مَّعْلُومٌ) রয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন–

১. কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন– رِزْقٌ مَّعْلُومٌ -এর দ্বারা জান্নাতী খাদ্যের সেই বিস্তারিত তালিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বিভিন্ন সূরায় বিক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ রয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এ তাফসীরটিই পছন্দ করেছেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন– "رِزْقٌ مَّعْلُومٌ" -এর অর্থ হলো তার সময় জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিবেশন করা হবে। যেমন অন্য আয়াতে غَدْوَةً ও عَشِيَّةً শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. কিছু সংখ্যক মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে, "رِزْقٌ مَّعْلُومٌ" -এর অর্থ নিশ্চিত ও সার্বক্ষণিক হবে। সেখানকার অবস্থা পৃথিবীর মতো হবে না। দুনিয়াতে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে, আগামীকাল সে কি খাবে এবং কি পরিমাণ খাবে। আর যার নিকট খাদ্য রয়েছে সে নিশ্চিত জ্ঞাত নয় যে, উক্ত খাদ্য তার নিকট কত সময় থাকবে? প্রত্যেকের মধ্যেই এ আশঙ্কা থাকে যে, যা এখন তার নিকট রয়েছে তা পরক্ষণেই তার নিকট নাও থাকতে পারে। জান্নাতের অবস্থা এরূপ হবে না; বরং তথাকার খাদ্য নিশ্চিত ও স্থায়ী হবে। –[কুরতুবী]

তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীদের খাদ্য পরীক্ষিত হবে। ঈমানদারগণের নেক আমল অনুসারে তাদেরকে জান্নাতে পরিমিত রিজিক দেওয়া হবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক পরিমাণে দান করবেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বেহেশতে তথাকার বাসিন্দারা কোনোরূপ টানাপড়েন ও অনিশ্চয়তা অনুভব করবেন না।

"فَوَاكِهُ" -এর বিশ্লেষণ : فَوَاكِهُ শব্দের দ্বারা খোদ কুরআন মাজীদ জান্নাতের রিজিকের তাফসীর বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তা হবে মেওয়া-ফলফলাদি। فَوَاكِهُ এটা فَاكِهَةٌ -এর বহুবচন; আরবিতে এমন খাদ্যকে فَاكِهَةٌ বলে যা তৃপ্তি স্বাদের জন্য ভক্ষণ করা হয়; পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়। বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় "ফল-ফলাদি" দ্বারা– কেননা ফল-ফলাদি স্বাদ এবং তৃপ্তির জন্য খাওয়া হয়। নতুবা ফল-ফলাদি হতে فَاكِهَةٌ -এর ভাব অনেক ব্যাপক।

ইমাম রাযী (র.) এ فَوَاكِهُ শব্দ হতে একটি রহস্য উন্মোচন করেছেন। তা এই যে, জান্নাতে যত খাদ্য দেওয়া হবে সবই স্বাদ ও তৃপ্তির জন্য দেওয়া হবে– ক্ষুধা নিবারণের জন্য নয়। কেননা জান্নাতে কোনো বস্তুর প্রয়োজন হবে না। জান্নাতে জীবন-যাপন অথবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কোনো খাদ্য ভক্ষণের প্রয়োজন হবে না। অবশ্য খাওয়ার ইচ্ছা হবে। সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার কারণে তৃপ্তি পাওয়া যাবে। আর জান্নাতের সব খাবার-খাদ্যে নিয়ামতের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি প্রদান করা। –[মা'আরিফ, কাবীর]

"وَهُمْ مُّكْرَمُونَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আর তারা সম্মানিত হবে। এটা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে উক্ত রিজিক সম্পূর্ণ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে দেওয়া হবে। কেননা মর্যাদা ও সম্মানের সাথে না হলে অতি সুস্বাদু বস্তুও তিক্ত ও বিস্বাদ মনে হয়। এটা হতে আরও প্রমাণিত হয় যে, শুধু খাবার খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না; বরং মেহমানকে তা'জীম ও সম্মান করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

"عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে জান্নাতীগণের মজলিসের একটি চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। তাঁরা মুখোমুখি হয়ে আসন গ্রহণ করবেন। কেউ কারো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। তবে প্রশ্ন হলো তা বাস্তবে কিরূপে সম্ভব? এর সঠিক জবাব আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তবে মুফাস্‌সিরগণ হতে তার দু'টি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

১. একদল মুফাস্‌সির বলেছেন, মজলিসের বেষ্টনী এত বিশাল হবে যে, একে অপরের প্রতি পৃষ্ঠ ফেরানোর প্রয়োজন হবে না।

২. অন্য দলের মতে, তাদের আসন এরূপ হবে যে, ইচ্ছা করলে প্রয়োজন মতো এদিক সেদিক ঘুরানো যাবে। সুতরাং যার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করবে তার দিকে ঘুরে যাবে।

"يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِيْنٍ" আয়াতের বিশ্লেষণ : জান্নাতীদেরকে বিশুদ্ধ স্বাদ পূর্ণ গ্লাস ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে। লক্ষণীয় যে, كَأْسٌ -এর অর্থ হলো– পানীয় ভর্তি পাত্র। আর সাধারণত শরাবের [মদের] পাত্রকেই كَأْسٌ বলে।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে বিশুদ্ধ মদ পূর্ণ গ্লাস ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে। কিন্তু কারা পরিবেশন করবে? এর উল্লেখ নেই। অবশ্য অন্য একটি আয়াত হতে তার জবাব পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

"وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُوْنٌ"

"আর জান্নাতীদের সেবার জন্য তাদের জন্য নিযুক্ত খাদেমগণ ঘুরতে থাকবে। তারা এমন সুশ্রী হবে যেন সুরক্ষিত মুক্তা।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُوْرًا"

"আর জান্নাতীদের খেদমতের জন্য এমন সব বালক ঘুরতে থাকবে যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে বিক্ষিপ্ত মুক্তা [ছড়িয়ে রয়েছে]।"

কিন্তু আবারও প্রশ্ন উঠে যে, এ غِلْمَانٌ যাদেরকে অন্য আয়াতে "وِلْدَانٌ مُخَلَّدُوْنَ" বলা হয়েছে তারা কারা? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, মুশরিকদের সেসব ছেলে যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে জান্নাতীদের খাদেম হিসেবে নিয়োগ করা হবে। সুতরাং হযরত আনাস (রা.) ও সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুশরিকদের বালকরা– যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করে তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে।

অন্য এক দল মুফাস্‌সিরে কেরামের মতে, তারা ভিন্ন একটি জাতি। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীগণের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। চিরদিন তারা বালকই থাকবে। তাদের শারীরিক গঠনের কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না।

উল্লেখ্য যে, সনদের দিক বিবেচনায় উপরোল্লিখিত আনাস (রা.) ও সামুরাহ (রা.)-এর হাদীসখানা দুর্বল। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিকেই অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ প্রাধান্য দিয়েছেন।

"لَذَّةٍ لِلشّٰرِبِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে لَذَّةٌ শব্দটি মাসাদর। এর অর্থ হলো– সুস্বাদু হওয়া। এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন– এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। মূলত শব্দটি ছিল "ذَاتُ لَذَّةٍ" অর্থাৎ সুস্বাদু বিশিষ্ট। নাহুবিদ যুজাজের মতও এটাই।

কারো কারো মতে, এখানে لَذَّةٌ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এরূপ ব্যবহার আরবি ভাষায় ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। অর্থাৎ তা পালনকারীদের জন্য সুপেয় হবে।

অন্য এক দল মুফাস্‌সিরের মতে, এটা সিফাতের সীগাহ হবে। কেননা لَذَّةٌ -এর সিফাত যদ্রূপ لَذِيْذٌ হয়ে থাকে তদ্রূপ لَذٌّ ও হয়। আর এখানে لَذَّةٌ সেই لَذٌّ -এর সিফাত হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে তা পানকারীদের নিকট সুস্বাদু মনে হবে।

"اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" আয়াতে কোন প্রকারের اِسْتِثْنَاءٌ হয়েছে? আল্লাহর বাণী "اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ হয়েছে। মূল বাক্যটি হবে–

"اِنَّ الْكَفَرَةَ يُجْزَوْنَ بِقَدْرِ اَعْمَالِهِمْ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ فَاِنَّهُمْ يُجْزَوْنَ اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً".

অর্থাৎ, কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের সমপরিমাণে প্রতিফল তথা আজাব দেওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহর মুখলিস বান্দা তথা ঈমানদারদের কথা আলাদা। কেননা তাদেরকে কৃতকর্ম অপেক্ষা বহুগুণে বেশি ছওয়াব দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٧. لَا فِيْهَا غَوْلٌ مَا يَغْتَالُ عُقُوْلَهُمْ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ بِفَتْحِ الزَّاءِ وَكَسْرِهَا مِنْ نَزَفَ الشَّارِبُ وَاَنْزَفَ اَىْ لَا يَسْكَرُوْنَ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا .

৪৭. এতে মাথাব্যথা হবে না যা তাদের জ্ঞানকে বিকৃত করতে পারে। এর কারণে তারা মাতালও হবে না يُنْزَفُوْنَ শব্দটির ز অক্ষরটি যবর যোগেও হতে পারে আবার যের যোগেও হতে পারে। এটা نَزَفَ الشَّارِبُ ও اَنْزَفَ الشَّارِبُ হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তারা মাতাল হবে না। যা দুনিয়ার মদের বিপরীত।

٤٨. وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ حَابِسَاتُ الْاَعْيُنِ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ لَا يَنْظُرْنَ اِلٰى غَيْرِهِمْ لِحُسْنِهِمْ عِنْدَهُنَّ عِيْنٌ ضِخَامُ الْاَعْيُنِ حِسَانُهَا .

৪৮. আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না যারা কেবল- স্বীয় স্বামীদের প্রতি চক্ষু নিবদ্ধকারী। স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি তারা তাকাবে না। কেননা তাদের নিকট স্বীয় স্বামীদেরকে [সর্বাধিক] সুন্দর মনে হবে। ডাগর ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা রমণী ডাগর ডাগর চোখ সুদর্শন হয়ে থাকে।

٤٩. كَاَنَّهُنَّ فِى اللَّوْنِ بَيْضٌ لِلنَّعَامِ مَّكْنُوْنٌ مَسْتُوْرٌ بِرِيْشِهٖ لَا يَصِلُ اِلَيْهِ غُبَارٌ وَلَوْنُهٗ وَهُوَ الْبَيَاضُ فِىْ صُفْرَةٍ اَحْسَنُ اَلْوَانِ النِّسَاءِ .

৪৯. যেন তারা রঙের দিক দিয়ে ডিম উটপাখির সুরক্ষিত লুক্কায়িত ডিম উটপাখি স্বীয় পাখা দ্বারা যাকে ঢেকে রাখে- যার গায়ে ধুলাবালি পড়তে পারে না। আর তার রঙ হলো হলুদ মিশ্রিত সাদা- এটাই মহিলাদের সর্বাধিক সুন্দর [ও উৎকৃষ্ট] রঙ।

٥٠. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ اَهْلِ الْجَنَّةِ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ عَمَّا مَرَّ بِهِمْ فِى الدُّنْيَا .

৫০. মুখোমুখি হবে তাদের একদল জান্নাতীদের একদল অপর দলের এমতাবস্থায় যে, পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সেই ঘটনাবলি সম্পর্কে যা দুনিয়াতে থাকাবস্থায় ঘটেছিল।

٥١. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ صَاحِبٌ يُنْكِرُ الْبَعْثَ .

৫১. তাদের একজন বলবে আমার একজন সঙ্গী ছিল এমন সঙ্গী যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত।

٥٢. يَقُوْلُ لِىْ تَبْكِيْتًا اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ بِالْبَعْثِ .

৫২. সে বলত, আমাকে ভর্ৎসনা নিমিত্তে তুমি কি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত? পুনরুত্থানের উপর।

٥٣. اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا اَئِنَّا فِى الْهَمْزَتَيْنِ فِىْ ثَلٰثَةِ مَوَاضِعَ مَا تَقَدَّمَ لَمَدِيْنُوْنَ مَجْزِيُّوْنَ وَمُحَاسَبُوْنَ اَنْكَرَ ذٰلِكَ اَيْضًا .

৫৩. আমরা যখন মৃত্যুবরণ করবো এবং হাড়সর্বস্ব মাটি হয়ে যাবো তখন কি- উক্ত তিন স্থলে হামযাদ্বয়ে সেসব কেরাত প্রযোজ্য যা ইতঃপূর্বে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে? আমাদেরকে কি প্রতিদান দেওয়া হবে? আমাদের কি হিসাব-নিকাশ হবে? সে তাকেও অস্বীকার করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

٥٤. قَالَ ذٰلِكَ الْقَائِلُ لِإِخْوَانِهِ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُوْنَ مَعِيْ اِلَى النَّارِ لِنَنْظُرَ حَالَهُ فَيَقُوْلُوْنَ لَا ـ

৫৪. সে বলবে উক্ত বক্তা তার জান্নাতি ভাইদেরকে বলবে, তোমরা কি ঝুঁকে দেখবে? আমার সাথে জাহান্নামের দিকে। যাতে আমরা তার অবস্থা দেখতে পারি। তখন তারা বলবে, না, আমরা দেখবো না।

٥٥. فَاطَّلَعَ ذٰلِكَ الْقَائِلُ مِنْ بَعْضِ كُوَى الْجَنَّةِ فَرَاٰهُ اَيْ رَاٰى قَرِيْنَهُ فِيْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ اَيْ وَسْطِ النَّارِ ـ

৫৫. অতঃপর সে (নিজে) ঝুঁকে দেখবে- সেই বক্তা জান্নাতরে কোনো দরজা হতে। তখন দেখতে পাবে তাকে অর্থাৎ তার সেই (দুনিয়ার) সাথিকে জাহান্নামের মধ্যখানে অর্থাৎ জাহান্নামের মাঝখানে।

তাহকীক ও তারকীব

"اَلْمُصَدِّقِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : اَلْمُصَدِّقِيْنَ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. তা تَصْدِيْق হতে নির্গত হবে। তখন ص অক্ষরটির মধ্যে তাশদীদবিহীন যবর হবে। অর্থাৎ বিশ্বাসীগণ। এটাই জমহুরের কেরাত।

২. تَصَدُّقٌ হতে ইসমে ফায়িল-এর সীগাহ। এমতাবস্থায় এটা মূলে ছিল اَلْمُتَصَدِّقِيْنَ পরে- تاء কে- ص -এর দ্বারা পরিবর্তন করে ص -কে- ص -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ সদ্কাকারীগণ। এ কেরাতে ص অক্ষরটি তাশদীদযুক্ত হবে। এটা আলী ইবনে কায়সান, সোলায়মান ও হামযাহ প্রমুখগণের কেরাত।

ইমাম নাহাম (র.) দ্বিতীয় কেরাতটির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এখানে সদকার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু ইমাম কুশায়রী (র.) বলেছেন, উক্ত কেরাতে সহীহ। কেননা এটা নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে।

"قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ" -এর মধ্যকার اَلطَّرْفُ -এর মহল্লে ই'রাব : এখানে اَلطَّرْفَ -এর মধ্যে দু প্রকারের ই'রাব হতে পারে।

১. এটা মহল্লান মারফূ' হবে। তখন قَاصِرَاتٌ শব্দটিকে সিফাতে মুশাব্বাহ হিসেবে গণ্য করা হবে।

২. এটা মহল্লান মানসূব হবে। এমতাবস্থায় قَاصِرَاتٌ শব্দটি ইসমে ফায়িলের সীগাহ হবে।

আয়াতে তাশবীহের বিশ্লেষণ : এখানে كَاَنَّ হরফে তাশবীহ هُنَّ হলো مُشَبَّهٌ এবং "بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ" হলো مُشَبَّهٌ بِهٖ আর وَجْهُ التَّشْبِيْهِ হলো ডিমের খোসা ও কুসুমের মধ্যকার ঝিলির রং যদ্রূপ স্বচ্ছন্দ, কোমল, উজ্জ্বল ও মসৃণ ঠিক জান্নাতে হুরদের রং তদ্রূপ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا فِيْهَا غَوْلٌ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতখানার সরল অর্থ হলো- জান্নাতীদেরকে যে মদ পরিবেশন করা হবে তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তা পান করে তারা মাতাল হয়েও পড়বেন না। মুফাস্সিরগণ হতে غَوْلٌ শব্দটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ, ইবনে আবী নাজিহ ও মুজাহিদ প্রমুখ মুফাস্সিরগণ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, غَوْلٌ -এর অর্থ হলো পেটের ব্যথা।

কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ হলো দুর্গন্ধ।

কারো কারো মতে, তার অর্থ হলো আকল বিকৃত হয়ে যাওয়া।

প্রকৃতপক্ষে غَوْلٌ শব্দটি উপরোক্ত সব কয়টি অর্থকেই শামিল করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হাফিজ ইবনে জারীর (র.) বলেছেন যে, এখানে غَوْلٌ শব্দটি বিপদ (মসিবত)-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মদের ন্যায় আখেরাতের মদের কোনো বিপদ (ক্ষতি) হবে না। মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা, দুর্গন্ধ অথবা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাওয়া কিছুই তার মধ্যে থাকবে না। –[তাফসীরে ইবনে জারীর]

"لَا يُنْزَفُوْنَ" অর্থাৎ উক্ত মদ পান করার দরুন তারা মাতাল হয়ে পড়বে না। আরবি ভাষায় প্রবাদ আছে– "اَلْخَمْرُ غَوْلٌ لِلْحِلْمِ وَالْحَرْبُ غَوْلٌ لِلنُّفُوْسِ" অর্থাৎ মদ বিনষ্ট করে মানুষের আকল-বুদ্ধিকে আর যুদ্ধ ধ্বংস করে মানুষের জীবনকে। মাতাল ও মস্তিষ্ক বিকৃত লোককে مَنْزُوْفٌ বলে।

জাহেলিয়াতের যুগের প্রখ্যাত আরব কবি তার নিম্নোক্ত দু'টি শ্লোকে উক্ত অর্থেই এ শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন।

وَاِذْ هِيَ تَمْشِيْ كَمَشْيِ النَّزِ * يْفِ يَصْرَعُهُ بِالْكَثْبِ الْبَهَرِسِ
نَزِيْفٌ اِذَا قَامَتْ لِوَجْهٍ تَمَايَلَتْ * تَرَاشِي الْفُوَادِ الرَّخِصِ اِلَّا تَخَتَرَا

উপরিউক্ত শ্লোক দু'টিতে কবি তার প্রেমিকাকে মাতালের সাথে তুলনা করতে গিয়ে نَزِيْف শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা, জান্নাতের মদ পান করার দরুন মাতাল হয়ে পড়বে না; যদ্রূপ দুনিয়ার মদের বেলায় হয়ে থাকে। দুনিয়ার মদে সাধারণত দু'টি দোষ দেখা যায়।

১. এক প্রকার দোষ হলো, তা কাছে নিলেই এক ধরনের দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। তার বিস্বাদ মানুষকে তিক্ত করে। তা পান করলে পেট ব্যথা করে, মস্তিষ্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মোটের উপর মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে।

২. দ্বিতীয় দোষ হচ্ছে– তা পান করলে মানুষের জ্ঞান-বিবেক লোপ পায়। মানুষ মাতাল হয়ে পড়ে, ক্ষণিকের মাদকতা ও স্ফূর্তি লাভের জন্য মানুষ এত সব ক্ষতিকে বেমালুম ভুলে যায়।

কিন্তু জান্নাতের মদের মধ্যে এসব ক্ষতির তো কিছুই থাকবে না, বরং স্ফূর্তি ও তৃপ্তি থাকবে তদপেক্ষা হাজারো গুণ বেশি।

"قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে জান্নাতের হুরদের সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে। "তারা আনত নয়না হবে।" এর একাধিক অর্থ হতে পারে।

যে পুরুষদের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাম্পত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিবেন তাদের ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের দিকে তারা চোখ তুলে দেখবেন না।

আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) বর্ণনা করেছেন, সে হুরগণ তাঁদের স্বামীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন– "আমার প্রভুর ইজ্জতের শপথ করে বলছি যে, জান্নাতে তোমার অপেক্ষা উত্তম অন্য কাউকে আমি দেখছি না। যে আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী বানিয়েছেন সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।"

আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) "আনত নয়না হওয়ার" অন্য একটি ব্যাখ্যাও করেছেন, তা হচ্ছে– তারা তাদের স্বামীর নয়নকে অবনমিত রাখবে। অর্থাৎ তারা এত সুন্দর এবং অনুগত হবে যে, তাদের স্বামীদের ছাড়া অন্য কারো প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার ইচ্ছাই হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.), ইকরামা (র.) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ আল্লামা ইবনে জাওযী (র.)-এর প্রথমোক্ত অভিমতের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

عِيْنٌ -এর অর্থ হলো বড় চক্ষুবিশিষ্টা রমণীগণ। সাধারণত বড় চক্ষুবিশিষ্টা রমণীরা সুন্দরী হয়ে থাকে।

Free @ www.eilm.weebly.com

"كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য জান্নাতের হুরদেরকে লুক্কায়িত বা আবৃত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবি ভাষাভাষীগণের এরূপ উপমার প্রয়োগ প্রসিদ্ধ ছিল। যেসব ডিম পালক দ্বারা আবৃত থাকত তাদের মধ্যে বাইরের ধুলাবালি পড়তে পারত না। কাজেই তারা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হতো। এতদ্ব্যতীত তাদের রং হতো হলুদ মিশ্রিত সাদা যা আরবদের নিকট মহিলাদের সর্বাধিক আকর্ষণীয় রং হিসেবে গণ্য ছিল। এ জন্য হুরদের রংকে তাদের রংয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়নি; বরং ডিমের সেই ঝিলির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা খোসার ভিতরে লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ উক্ত রমণীগণ সেই ঝিলির ন্যায় নরম, নাযুক ও স্বচ্ছ হবে। -[রুহুল মা'আনী]

হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। একটি মারফূ' হাদীস হতে শেষোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছি। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেছেন, হুরদের মসৃণতা ও স্বচ্ছতা হবে ডিমের সেই ঝিলির ন্যায় যা তার খোসার ও কুসুমের মাঝখানে হয়ে থাকে।

মোটকথা উপরিউক্ত কয়টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের সম্ভোগের জন্য কয়েকটি বস্তুর উল্লেখ করেছেন।

ক. তথায় তাদেরকে রিজিকের নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

খ. জান্নাতীদেরকে ইজ্জত ও সম্মান দেওয়া হবে।

গ. জান্নাত তাদের জন্য বিলাসবহুল ও সুখময় হবে।

ঘ. খাঁটি নেশাবিহীন তৃপ্তিদায়ক শরাব পরিবেশন করা হবে।

ঙ. পতিপরায়ণতা সুন্দরী-রমণী তাদের সঙ্গিনী হবে। -[রুহুল মা'আনী, ইবনে জারীর, মা'আরিফ, সাফওয়াহ]

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যা : জান্নাতে জান্নাতিরা গল্প-গুজবে মশগুল থাকবে। তারা বিলাশবহুল আসনে সমাসীন হয়ে মুখোমুখি বসে গল্পের মজলিস করবে। তারা পরস্পরের নিকট পৃথিবীর জীবনের স্মৃতিচারণ করবে। পৃথিবীতে তারা কে কোন অবস্থায় জীবনযাপন করেছে তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন হবে। তারা যখন আলোচনায় মশগুল থাকবে তখন জান্নাতি খাদেমগণ তাদেরকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করবে। জান্নাতিদেরকে এমন খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা হবে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কর্ণ শুনেনি, কোনো অন্তর যার কল্পনাও করতে পারেনি।

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে জান্নাতির কি অবস্থা হবে তার আলোচনা করতে গিয়ে মাযী (مَاضِى) -এর সীগাহ ব্যবহার করেছেন। কেননা যদিও তা পরে সংঘটিত হবে তথাপি তা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। যদ্রূপ অতীতকালে অনুষ্ঠিত কোনো ঘটনার ব্যাপারে সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই।

এক জান্নাতি ও তার কাফের সঙ্গী : এখানে প্রথম দশটি আয়াতে জান্নাতীদের সাধারণ অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে একজন জান্নাতী লোকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সে ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছার পর তার এক কাফের সঙ্গীর কথা স্মরণ হবে। সে দুনিয়াতে আখেরাতকে অবিশ্বাস করত। তারপর আল্লাহর অনুমতি পেয়ে সে জান্নাতী তার জাহান্নামী বন্ধুর সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ পাবে। কুরআন মাজীদের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির নাম-ঠিকানার উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই তিনি কে? তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন তার নাম ইয়াহুদা এবং তার কাফের সঙ্গীর নাম مَطْرُدْس আর তারা হলেন সেই দু'জন সাথী সূরায়ে কাহাফে "وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ الخ" -এর মধ্যে যাদের আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার জন্য কতিপয় তাবেয়ী হতে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, দুজন মানুষ কোনো কারবারে শরিক ছিল। তাদের আট হাজার দিনার মুনাফা হলো। চার হাজার করে তারা পরস্পরের মধ্যে তা বণ্টন করে নিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এক শরিক তার টাকা হতে এক হাজার টাকা দিয়ে একটি জমিন ক্রয় করল। অপর সাথী ছিল অত্যন্ত খোদাভীরু। সে দোয়া করল, "হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দিনার দিয়ে একটি জমিন ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট হতে এক হাজার টাকার বিনিময়ে জান্নাতের একটি জমি ক্রয় করেছি। এই বলে সে এক হাজার দীনার সদকা করে দিল। অতঃপর তার সাথী এক হাজার দিনার ব্যয় করে একটি ঘর নির্মাণ করল। তখন সে বলল, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দিনার খরচ করত একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। "আমি এক হাজার দিনারের বিনিময়ে আপনার নিকট হতে জান্নাতের একটি গৃহ খরিদ করছি।" এটা বলে সে আরও এক হাজার দিনার সদকা করে দিল। অতঃপর তার সঙ্গী এক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। আর বিয়ের কাজে এক হাজার দিনার খরচ করে দিল। তখন সেই লোকটি আল্লাহর নিকট দোয়া করল "হে আল্লাহ অমুক ব্যক্তি বিবাহের কার্যে এক হাজার দিনার খরচ করেছে। আর আমি জান্নাতী মহিলাদের এক জনের সাথে বিবাহের পয়গাম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দিনার মান্নত করছি।" এই বলে আরও এক হাজার দনার সদকা করে দিল। তারপর তার সঙ্গী এক হাজার দিনার খরচ করে কিছু গোলাম ও সামগ্রী ক্রয় করল। তখন সে বাকি এক হাজার দনার সদকা করত আল্লাহর নিকট জান্নাতের গোলাম ও সামগ্রীর প্রার্থনা জানাল।

তারপর হঠাৎ সে ঈমানদার ব্যক্তি খুব অভাবে পড়ে গেল। সে ভাবল, তার পূর্বের বন্ধুর নিকট গেলে হয়তো সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সুতরাং তার নিকট গিয়ে নিজের প্রয়োজনের উল্লেখ করল। সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করল, তোমার সম্পদের কি হয়েছে? সে তার নিকট সব ঘটনা খুলে বলল। বন্ধুটি তাজ্জব হয়ে বলল– "সত্যিই কি বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুবরণ করে ধুলায় মিশে যাওয়ার পর পুনরায় আমাকে জীবিত করা হবে"। আর তথায় আমাদের আমলের হিসাব-নিকাশও নেওয়া হবে? যাও, আমি তোমাকে কিছুই দিব না। তারপর উভয় মৃত্যুবরণ করল।

আলোচ্য আয়াতে জান্নাতী দ্বারা সেই মু'মিন বান্দাকে বুঝানো হয়েছে যে পরকালের তরে তার সমস্ত সম্পদ সদ্‌কা করে দিয়েছে। আর জাহান্নামী দ্বারা উদ্দেশ্য তার সেই ব্যবসায়ী শরিক যে আখেরাত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে তাকে উপহাস করেছে।

অসৎ সঙ্গ বর্জনের তাগিদ : যা হোক, আলোচ্য ঘটনা উল্লেখের মূল কারণ হলো, মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে, সে যেন তার সাথী-সঙ্গীগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে। তাকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে যে, তার সাথে এমন কেউ রয়েছে কিনা যে তাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

অসৎ সঙ্গে যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হয় তা তো শুধু আখেরাতেই সঠিকভাবে জ্ঞাত হওয়া যাবে। কিন্তু তখন তো সে ক্ষতি হতে পরিত্রাণের কোনো পথই খোলা থাকবে না। সুতরাং খুব যাচাই-বাছাই করে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কোনো নাফরমান ও কাফেরের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করত তার দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ বেমালুম গোমরাহী ও ধ্বংসে নিপতিত হয়। যাতে করে পরকালে জাহান্নামী হয়ে পড়ে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٦. قَالَ لَهُ تَشْمِيْتًا تَاللّٰهِ اِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ كِدْتَّ قَارَبْتَ لَتُرْدِيْنِ لِتُهْلِكَنِىْ بِاِغْوَائِكَ .

৫৬. সে বলবে তাকে তিরস্কার করে আল্লাহর কসম নিঃসন্দেহে إِنْ অব্যয়টিকে তাশদীদযুক্ত হতে তাশদীদবিহীন করা হয়েছে। তুমি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছ তুমি কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে– আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করার– তোমার বিভ্রান্তিকরণের দ্বারা আমাকে ধ্বংস করার কাজ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলে।

٥٧. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ اَىْ اِنْعَامُهُ عَلَىَّ بِالْاِيْمَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ مَعَكَ فِى النَّارِ .

৫৭. আর যদি আমার প্রভুর নিয়ামত না হতো অর্থাৎ আমার প্রতি অনুগ্রহ না করতেন ঈমান দান করে তাহলে আমিও হাজিরকৃতদের দলভুক্ত হয়ে পড়তাম তোমার সাথে জাহান্নামে।

٥٨. وَيَقُوْلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ .

৫৮. আর জান্নাতিরা বলবে আমরা কি আর মৃত্যুবরণ করবো না?

٥٩. اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى اَىِ الَّتِىْ فِى الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ هُوَ اِسْتِفْهَامُ تَلَذُّذٍ وَتَحَدُّثٌ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ تَابِيْدِ الْحَيَاةِ وَعَدَمِ التَّعْذِيْبِ .

৫৯. আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত অর্থাৎ যা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। আর কি আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না? এটা তৃপ্তির প্রশ্ন এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ ও চিরস্থায়ী জীবন দান করত আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার বহিঃপ্রকাশ।

٦٠. اِنَّ هٰذَا الَّذِىْ ذُكِرَ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

৬০. নিশ্চয় এটা যা জান্নাতিদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে– অবশ্যই তা মহাবিজয়।

٦١. لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ قِيْلَ يُقَالُ لَهُمْ ذٰلِكَ وَقِيْلَ هُمْ يَقُوْلُوْنَهُ .

৬১. অনুরূপ (ব্যক্তি)-এর জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত কথিত আছে যে, তা তাদেরকে বলা হবে। কেউ কেউ বলেছেন, তারা নিজেরাই তা বলবে।

٦٢. اَذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ لَهُمْ خَيْرٌ نُزُلًا وَهُوَ مَا يُعَدُّ لِلنَّازِلِ مِنْ ضَيْفٍ وَغَيْرِهِ اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ الْمُعَدَّةِ لِاَهْلِ النَّارِ وَهِىَ مِنْ اَخْبَثِ الشَّجَرِ الْمُرِّ بِتِهَامَةَ يُنْبِتُهَا اللّٰهُ فِى الْجَحِيْمِ كَمَا سَيَاْتِىْ .

৬২. এটাই কি যা তাদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে উত্তম আপ্যায়ন– আর তা (نُزُلٌ) হলো মেহমান ও অন্যান্য আগন্তুকের জন্য যা তৈরি করা হয় না যাককুম বৃক্ষ? যা জাহান্নামিদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আর এটা [অর্থাৎ যাককুম বৃক্ষ] হলো তেহামাহ এলাকার নিকৃষ্টতম তিক্ত বৃক্ষ। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে তা উৎপন্ন করবেন। যার আলোচনা শীঘ্রই আসছে।

٦٣. اِنَّا جَعَلْنَاهَا بِذٰلِكَ فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ اَىِ الْكَافِرِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اِذْ قَالُوا النَّارُ تُحْرِقُ الشَّجَرَ فَكَيْفَ تُنْبِتُهُ .

৬৩. নিশ্চয় আমি নির্ধারণ করেছি তাকে [অর্থাৎ] তাতে পরীক্ষা জালিমদের জন্য অর্থাৎ কাফেরদের জন্য মক্কাবাসীদের মধ্য হতে। কেননা [এতদশ্রবণে] তারা বলেছে– আগুন তো বৃক্ষকে জ্বালিয়ে ফেলে। সুতরাং তা কিভাবে বৃক্ষ উৎপন্ন করবে।

তাহকীক ও তারকীব

"لَتُرْدِيْنِ" -এর মধ্যস্থিত একাধিক কেরাত : অত্র শব্দটির মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. হযরত নাফে (র.) ও একদল ক্বারী "لَتُرْدِيْنِ" শব্দটিকে ى মুতাকাল্লিম সহ (لَتُرْدِيْنِىْ) পড়েছেন।

২. জমহুর ক্বারীগণ ى মুতাকাল্লিমকে হযফ করে পড়েছেন।

"مَيِّتِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত একাধিক কেরাত : আল্লাহর বাণী "اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত مَيِّتِيْنَ শব্দে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুরের মতে "مَيِّتِيْنَ" হবে [আলিফ ব্যতীত।]

২. হযরত যায়েদ ইবনে আলী (র.) "بِمَايِتِيْنَ" পড়েছেন। –[কুরতুবী ও ফাতহুল কাদীর]

"ذٰلِكَ" দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং نُزُلًا কি জন্য মানসূব হয়েছে? ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো ঐসব নিয়ামত যা জান্নাতে জান্নাতীগণকে দেওয়া হবে। نُزُلًا তারকীবে تَمْيِيْز হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। এখানে ذٰلِكَ মুবতাদা এবং خَيْر খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে مُمَيَّز আর نُزُلًا তামীঈয।

"اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" -এর মা'তূফ আলাইহি : অত্র আয়াত তথা "اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" আয়াতখানা هَمْزَهٔ اِسْتِفْهَامْ -এর পরে একটি উহ্য বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। মূলত ছিল– "اَنَحْنُ مُخَلَّدُوْنَ فِى الْجَنَّةِ مُنَعَّمِيْنَ فَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ" আমরা কি চিরকাল জান্নাতে নিয়ামত প্রাপ্ত হব? যদ্দরুন আমাদের মৃত্যু হবে না।

"مَوْتَةً" শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ কি? অত্র আয়াতে مَوْتَةً শব্দটি مُسْتَثْنٰى হওয়ার দরুন مَنْصُوْب হয়েছে। এটা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ আর اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ -এর মধ্যে مُسْتَثْنٰى মানসূব হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَوْلَا نِعْمَةُ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : একজন জান্নাতি তার এক সঙ্গীকে জাহান্নামে দেখে বলবে– হায়রে! দুনিয়াতে তো আমাকে গোমরাহ করার চক্রান্ত করেছিলে। তুমি তো আমার সর্বনাশ করার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিলে। আল্লাহ তা'আলার যদি অশেষ অনুগ্রহ আমার প্রতি না হতো এবং আমি শিরক পরিহার করত ঈমান না আনতাম তাহলে আমিও তোমার সাথে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।

এ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলেছেন যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই হেদায়েত লাভ করতে পারে এবং গোমরাহী হতে বেঁচে থাকতে পারে। কেউই আপন ক্ষমতা বলে হেদায়েত লাভ করতে পারে না এবং গোমরাহী হতে বেঁচে থাকতে পারে না। এটা ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি অনুগ্রহ ও দয়া। কাফের ও মুশরিকরা তা হতে বঞ্চিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু বাতিলপন্থিরা বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ ঈমানদার ও কাফেরদের উপর সমভাবে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সাথে যা করেন কাফেরদের সাথেও তা করেন।

বিরোধীদের মতবাদকে খণ্ডন করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, যদি হেদায়েতের নিয়ামত ঈমানদার ও কাফের উভয়ের জন্যই সাধারণভাবে হতো, তাহলে তো কাফেররা গোমরাহ হবার কোনো কারণই থাকতে পারে না। যখন বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, কাফেররা ঈমান ও হেদায়েত হতে বঞ্চিত রয়েছে তখন এটাই মেনে নিতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েতের নিয়ামত দান করেননি।

মোটকথা, আল্লাহর খাস অনুগ্রহের কারণেই ঈমানদারগণ ঈমান ও হেদায়েতের দৌলত লাভে ধন্য হয়েছে এবং শিরক ও কুফরির অভিশাপ হতে পরিত্রাণ লাভ করেছে। অবশ্য এখানে তাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টিকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

"أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلٰى" আয়াতের ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তিটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে যে, সে তার জাহান্নামী সঙ্গীকে দেখার জন্য জাহান্নামে ঝুঁকে দেখবে তার ব্যাপারেই এখানে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের অতিশয্যে বলে উঠবে– "আমরা কি কখনো মৃত্যুবরণ করব না?" এর অর্থ এই নয় যে, জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর মূলতই তার বিশ্বাস নেই; বরং এটা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে চরম আনন্দ লাভ করার পর যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না যে, এমন চরম নিয়ামত তার লাভ হয়ে গেছে। পরিশেষে কুরআনে আলোচ্য ঘটনার প্রকৃত শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– "لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ" এরূপ সফলতার জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।

কবরের আজাবকে অস্বীকারকারীরা কিভাবে এ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছে? আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের কথা উদ্ধৃত করে ইরশাদ করেছেন– أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلٰى দুনিয়ার প্রথম বারের মৃত্যু ব্যতীত আমরা কি আর মৃত্যুবরণ করব না? আলোচ্য আয়াত দ্বারা কবরের আজাবকে অস্বীকার করে এভাবে দলিল পেশ করে থাকে যে, তা হতে প্রকাশ্য প্রতীয়মান হয়, দুনিয়ার মৃত্যুর পর তাদের আর মৃত্যু হবে না। এটা হতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার মৃত্যুর পর হাশরের পুনরুত্থান পর্যন্ত তারা মৃত অবস্থায়ই থাকবে। সুতরাং কবরে কিভাবে তাদের আজাব হবে? কেননা কবরে প্রাণহীন দেহের মধ্যে তাকে আজাব দেওয়া সম্ভবপর নয়।

ইমাম রাযী (র.) উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, উক্ত আয়াতে দুনিয়ার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে; আখেরাতের কথা বলা হয় নি। সুতরাং দুনিয়ার মৃত্যু তো মাত্র একবার-ই হয়ে থাকে।

অথবা, বলা যেতে পারে যে, কবরে শুধুমাত্র এমন অনুভূতির সৃষ্টি করে দেওয়া হবে যাতে শাস্তি অনুভব করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জীবন দান করা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, কবরের আজাব শুধু রূহের উপর হবে, দেহ ও রূহের একত্রে মিলনের কোনো প্রয়োজন নেই। যদি দেহ ও রূহ মিলিত হতো তবেই তাকে জীবন বলা যেত।

আর কবরের আজাব এরূপ মুতাওয়াতির বর্ণনাসমূহের দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত যে, উহাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

"أَذٰلِكَ خَيْرٌ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করার পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তুলনা করে দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন যে, এতদুভয়ের মধ্য হতে কোনটি উত্তম? সুতরাং ইরশাদ হয়েছে– "أَذٰلِكَ خَيْرٌ الخ"। জান্নাতের যে নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা হয়েছে তা উত্তম, না যাক্কুমের বৃক্ষ যা জাহান্নামীদেরকে খাওয়ানো হবে?

যাক্কুমের হাকীকত : আরবের তেহামা এলাকায় যাক্কুম নামক একটি বৃক্ষ দেখা যায়। আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এটা অপরাপর মরুভূমিতেও দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। অবশ্য এলাকা ও ভাষাভেদে এটার নামের তারতম্যও হতে পারে।

তবে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যে, জাহান্নামীদেরকে যে বৃক্ষ খাওয়ানো হবে তা দুনিয়ার এ যাক্কুম বৃক্ষই না অন্য ধরনের কোনো বৃক্ষ যাকে যাক্কুম নাম দেওয়া হবে।

কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) বলেছেন, তা দুনিয়ার এ যাক্কুম বৃক্ষই হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপর একদল মুফাসসির কেরাম (র.)-এর মতে জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ হবে অন্য ধরনের; তা দুনিয়ার যাক্কুম বৃক্ষের ন্যায় হবে না। দুনিয়ার যাক্কুম বৃক্ষের সাথে এটার কোনো তুলনা হয় না। যেমন দুনিয়াতে যদ্রূপ সর্প-বিচ্ছু রয়েছে তদ্রূপ দোজখেও সর্প-বিচ্ছু রয়েছে। কিন্তু দোজখের সর্প-বিচ্ছু দুনিয়ার সর্প-বিচ্ছু অপেক্ষা হাজারো গুণে ভয়ানক ও ভয়াবহ হবে। তদ্রূপ জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ ও দুনিয়ার যাক্কুম বৃক্ষ অপেক্ষা বহুগণে বিস্বাদ হবে। যদিও উভয় একই জাতীয় হোক না কেন।

"إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : "আমি যাক্কুম বৃক্ষকে সেই জালিমদের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়েছি।" আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

- একদল মুফাস্সির বলেছেন যে, অত্র আয়াতে فِتْنَةً দ্বারা আজাবকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত বৃক্ষটিকে আজাবের মাধ্যমে বানিয়ে দিয়েছি।

- জমহুর মুফাস্সিরে কেরামের মতে, এখানে فِتْنَةً শব্দটি "পরীক্ষা"-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছি যে, কারা এর উপর ঈমান আনে আর কারা ঈমান না এনে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে? সুতরাং আরবের লোকেরা উক্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। তারা উক্ত আজাবে ভীত হয়ে ঈমান আনার পবিরর্তে উপহাস ও বিদ্রূপের পন্থা অবলম্বন করেছে।

বর্ণিত আছে যে, যখন যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কীয় আয়াতগুলো নাজিল হলো তখন আবূ জাহল তার সঙ্গীদেরকে বলল– "তোমাদের বন্ধুরা (অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথীবর্গ) বলে যে, অগ্নিতে একটি বৃক্ষ রয়েছে। অথচ আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে ফেলে। আল্লাহর শপথ, আমরা তো জানি যাক্কুম খেজুর ও মাখনকে বলে। সুতরাং আম এবং খেজুর ও মাখন খাও।" আসলে বর্বরী ভাষায় মাখন ও খেজুরকে যাক্কুম বলে। এ জন্য সে উপহাসের উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

- ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরে উক্ত আয়াতের তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন। দু'টি উপরে উল্লিখিত তাফসীরের ন্যায়। আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে– যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন যাক্কুম বৃক্ষ খাওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। আর তা খাওয়া তাদের জন্য দুষ্কর হবে। কাজেই এমতাবস্থায় যাক্কুম বৃক্ষটি তাদের জন্য ফেতনায় পরিণত হবে।

জাহান্নামে কিভাবে বৃক্ষ জন্মাবে অথচ অগ্নি বৃক্ষকে জ্বালিয়ে ফেলে? যাক্কুম বৃক্ষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তা জাহান্নামের মধ্যে গজাবে। কিন্তু এ বক্তব্যই কাফেরদের ফেতনার মধ্যে ফেলেছে। বাহ্যিক জ্ঞান সম্পন্ন বস্তুবাদী কাফের-মুশরিকরা বুঝে উঠতে পারেনি যে, যেই আগুন বৃক্ষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে তাতে কিভাবে বৃক্ষ জন্মিতে পারে? আর জড়বিজ্ঞানীদের নিকট আপাত দৃষ্টিতে প্রশ্নটি যুক্তিসঙ্গতও বটে। মুসলিম মনীষী ও মুফাস্সিরগণ বিভিন্নভাবে উক্ত প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

- ইমাম রাযী (র.) তার উত্তরে বলেছেন যে, আগুনের সৃষ্টিকর্তা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বৃক্ষ পোড়াতে আগুনকে নিষেধ করবেন। সুতরাং আগুন আর বৃক্ষকে পোড়াবে না।

এখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অগ্নি পরীক্ষার ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাফেররা প্রাণে মেরে ফেলার জন্য যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে অগ্নিতে ফেললেন, তখন আল্লাহ তা'আলা অগ্নিকে নির্দেশ দিলেন যেন তাকে স্পর্শও না করে বরং আগুন যেন এরূপ হয়ে যায় যাতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে– "قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ" আমি বললাম, হে অগ্নি! ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর শীতল ও প্রশান্তিদায়ক হয়ে যাও। আর সাথে সাথে অগ্নি তাই হয়ে গেল। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর একটি পশম পোড়ানোর শক্তিও আর তার বাকি রইল না।

অন্যান্য মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, যখন এর জন্যই হয়েছে অগ্নি তখন আল্লাহ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুন দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে থাকে, সবুজ-সতেজ হয়ে থাকে। যেমন কিছু প্রাণী রয়েছে যা আগুনে জীবিত থাকে এবং সেখানেই প্রতিপালিত হয়ে থাকে। –[তাফসীরে কাবীর, মা'আরিফুল কুরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٤. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ قَعْرِ جَهَنَّمَ وَاَغْصَانُهَا تَرْتَفِعُ اِلٰى دَرَكَاتِهَا .

৬৪. যাককুম এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামের তলদেশ হতে উত্থিত হবে। জাহান্নামের গহ্বর হতে আর তার ডালপালাসমূহ জাহান্নামের সর্বস্তরে প্রসারিত হবে।

٦٥. طَلْعُهَا الْمُشَبَّهُ بِطَلْعِ النَّخْلِ كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ اَىِ الْحَيَّاتِ الْقَبِيْحَةِ الْمَنْظَرِ .

৬৫. তার মোচা (ছড়া) যা খেজুরের মোচার সদৃশ হবে যেন শয়তানের মাথা অর্থাৎ বিশ্রী দৃশ্যের সর্পসমূহ।

٦٦. فَاِنَّهُمْ اَىِ الْكُفَّارُ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا مَعَ قُبْحِهَا لِشِدَّةِ جُوْعِهِمْ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ .

৬৬. সুতরাং নিশ্চয় তারা অর্থাৎ কাফেররা অবশ্যই তা হতে ভক্ষণ করবে। এটা বিস্বাদ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার তীব্রতার কারণে। আর তা দ্বারা তারা পেট ভর্তি করবে।

٦٧. ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ اَىْ مَاءٍ حَارٍّ يَشْرَبُوْنَهٗ فَيَخْتَلِطُ بِالْمَاْكُوْلِ مِنْهَا فَيَصِيْرُ شَوْبًا لَهٗ .

৬৭. তারপর এটার সাথে তাদেরকে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ দেওয়া হবে। অর্থাৎ গরম পানি যা তারা পান করবে। ফলে তা ভক্ষিত বৃক্ষের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। আর এভাবে তা তার জন্য মিশ্রণ হবে।

٦٨. ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ يُفِيْدُ اَنَّهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا لِشُرْبِ الْحَمِيْمِ وَاَنَّهٗ لَخَارِجُهَا .

৬৮. অতঃপর অবশ্যই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে প্রজ্বলিত অগ্নি [জাহান্নাম]। এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, গরম পানি পান করানোর জন্য জাহান্নামিদেরকে জাহান্নামের বাইরে আনা হবে। আর পানি হবে জাহান্নামের বাইরে।

٦٩. اِنَّهُمْ اَلْفَوْا وَجَدُوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ .

৬৯. নিঃসন্দেহে তারা লাভ করেছে– পেয়েছে তাদের পিতৃপুরুষদের বিপথগামী।

٧٠. فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ يُزْعَجُوْنَ اِلَى اتِّبَاعِهِمْ فَيُسْرِعُوْنَ اِلَيْهِ .

৭০. সুতরাং তারা তাদের পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে। তাদের অনুসরণে ব্যস্ত হয়ে তার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

٧١. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ .

৭১. তাদের পূর্বেও বিপথগামী হয়েছিল অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ অতীতকালের জাতিসমূহের মধ্য হতে।

٧٢. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ مِنَ الرُّسُلِ مُخَوِّفِيْنَ .

৭২. আর আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারীদেরকে। ভয় প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٣. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ الْكَافِرِيْنَ اَىْ عَاقِبَتُهُمُ الْعَذَابُ .

৭৩. সুতরাং ভেবে দেখ কি পরিণতি হয়েছিল তাদের যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে। [অর্থাৎ] কাফেরদের অর্থাৎ তাদের পরিণাম ছিল আজাব।

٧٤. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّهُمْ نَجَوْا مِنَ الْعَذَابِ لِاِخْلَاصِهِمْ فِى الْعِبَادَةِ اَوْ لِاَنَّ اللّٰهَ اَخْلَصَهُمْ لَهَا عَلٰى قِرَاءَةِ فَتْحِ اللَّامِ .

৭৪. তবে আল্লাহ তা'আলার খালেস বান্দাগণের কথা আলাদা অর্থাৎ ঈমানদারগণ। সুতরাং তারা আজাব হতে নাজাত পাবে ইবাদতের মধ্যে তাদের ইখলাসের কারণে। অথবা, এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইবাদতের জন্য খালিস [নির্দিষ্ট] করেছেন। لَامْ অক্ষরটি যবরবিশিষ্ট হওয়া অবস্থায় শেষোক্ত অর্থটি হবে।

তাহকীক ও তারকীব

"اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহর বাণী "اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত "الْمُخْلَصِيْنَ" -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. اَلْمُخْلَصِيْنَ -এর ل অক্ষরটি যবর যোগে اَلْمُخْلَصِيْنَ হবে। এটা জমহুরের কেরাত। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের জন্য খালিস (খাস) করেছেন।

২. اَلْمُخْلِصِيْنَ -এর ل অক্ষরটি যের বিশিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় আয়াতখানার অর্থ হবে– যারা আল্লাহর ইবাদতকে রিয়া ইত্যাদি হতে খালিস করেছে।

"اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ কি? আল্লাহর বাণী– "اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" -এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে।

১. এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ তাদের পূর্বে বহু পূর্ববর্তীরাই বিপথগামী হয়েছে তবে আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ বিপথগামী হননি।

২. এর مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো "كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ" অর্থাৎ রাসূলগণ যাদেরকে সতর্ক করেছেন তাদেরকে পরিণামে আজাব ভোগ করতে হয়েছে। তবে আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ তথা ঈমানদারগণকে আজাব ভোগ করতে হয়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اِنَّهَا شَجَرَةٌ ... الْجَحِيْمِ" আয়াতের শানে নুযূল : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কুরআন মাজীদে সেই আয়াতসমূহ নাজিল হলো যাতে যাক্কুম বৃক্ষের কথা রয়েছে তখন আবূ জাহল তার সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলল, তোমাদের বন্ধু তথা মোহাম্মদ ﷺ বলে যে, অগ্নিতে একটি বৃক্ষ জন্মাবে– অথচ অগ্নি তো বৃক্ষকে ভস্ম করে জ্বালিয়ে ফেলে। আল্লাহর কসম, আমরা তো জানি যে, খেজুর এবং মাখনকে যাক্কুম বলে।

আল্লাহ তা'আলা তার জবাবে ইরশাদ করেছেন– اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ الخ অর্থাৎ যাক্কুম খেজুর ও মাখন নয়; বরং যাক্কুম হলো এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামে জন্ম নিবে এবং তথায় থাকবে।

"اِنَّهَا شَجَرَةٌ ... الْجَحِيْمِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইতঃপূর্বেই জাহান্নামীদের অন্যতম খাদ্য হিসেবে যাক্কুম গাছের উল্লেখ করেছেন। এখানে পরপর কয়েকটি আয়াতে যাক্কুম গাছ সম্পর্কে মুশরিকদের মধ্যে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝির অবসানের নিমিত্তে এর বিবরণ পেশ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যাক্কূম এমন বৃক্ষ যা জাহান্নামের গহ্বরে জন্মাবে। আল্লাহ স্বীয় কুদরতে তাকে অগ্নিতেই সৃষ্টি করবেন এবং অগ্নিতেই এটা লালিত-পালিত হবে ও বৃদ্ধি পাবে।

যাক্কূম বৃক্ষের ছড়া [মোচা] বিভৎস দৃশ্যের সর্পের মাথার ন্যায় হবে।

ইমাম যামাখ্শরী (র.) লিখেছেন যে, সাধারণত খেজুর গাছের মোচাকে طَلْعٌ বলে। এখানে اِسْتِعَارَةٌ তথা রূপকার্থে যাক্কূম বৃক্ষের জন্য طَلْعٌ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থগত ও শব্দগত উভয় দিক দিয়েই اِسْتِعَارَةٌ হতে পারে।

ইবনে কুতাইবা (র.) বলেছেন যে, যাক্কূমের ছড়া প্রতি বৎসর বের হয় বিধায় তাকে طَلْعٌ বলা হয়েছে। এটা অত্যন্ত বিস্বাদ ও তিক্ত হবে। তা ভক্ষণের কারণে পেট ফুলে যাবে। নাড়িভুঁড়ি পচে যাবে।

জাহান্নামীদের যাক্কূম খাওয়ার কারণ : জাহান্নামীরা যে শখ করে যাক্কূম ফল খাবে তা নয়; বরং জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে থাকবে, তখন তাদেরকে যাক্কূম বৃক্ষ ভক্ষণ করতে দেওয়া হবে। তারপর গরম পানি পানীয় হিসেবে দেওয়া হবে। মূলত এটাও তাদের জন্য এক প্রকারের শাস্তি হবে। তাদের পেটে এমন ক্ষুধার জ্বালা ও তাড়নার সৃষ্টি করা হবে যে, তারা তা ভক্ষণ করতে বাধ্য হবে। তা খাওয়ার পর গলা ফুলে ফোস্কা পড়ে যাবে। তখন তাদের ভীষণ পানির পিপাসা হবে। আর পান করার জন্য তাদেরকে দেওয়া হবে উত্তপ্ত গরম পানি। –[খাযিন, কাবীর]

طَلْعُهَا طَلْعُهَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা যাক্কূম বৃক্ষের ছড়ার উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন– "طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ" অর্থাৎ এটার ছড়া শয়তানের মস্তকের ন্যায় বিশ্রী ও বিভৎস।

দুটি অজ্ঞাত বস্তুর মধ্যে কিভাবে তুলনা করা সম্ভব হলো? এখানে আল্লাহ তা'আলা যাক্কূম বৃক্ষের ছড়াকে শয়তানের মস্তকের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ যাক্কূম এমন একটি বৃক্ষ যা জাহান্নামে জন্মাবে এবং তথায় বড় হবে। মূলতঃ দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষের সাথে তার তুলনাই হয় না। দ্বিতীয়ত শয়তানের মাথার সাথে তাকে তুলনা করা হয়েছে অথচ মানুষ না শয়তানকে দেখেছে আর না শয়তানের মাথা অবলোকন করেছে। সুতরাং দু'টি অদেখা ও অচেনা বস্তুর মধ্যকার তুলনা মানুষ কিভাবে উপলব্ধি করতে পারবে? মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

* যাক্কূম বৃক্ষ যদিও তিক্ততা ও বিস্বাদের দিক দিয়ে দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষ হতে অত্যধিক জঘন্য ও মারাত্মক তথাপি আকার-আকৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষের সাথে এটা সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন– দুনিয়ার সর্প-বিচ্ছু অপেক্ষা আখেরাতের সর্প-বিচ্ছু কোটি গুণ অধিক বিষধর হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আকারগত একটি মিল বিদ্যমান। সুতরাং দুনিয়ার যাক্কূম বৃক্ষের মাধ্যমে আমরা জাহান্নামের যাক্কূম বৃক্ষের মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করতে পারি।

অপর দিকে শয়তান যদিও অদৃশ্য তথাপি তার সম্পর্কে সেই আদিকাল হতেই মানুষের মধ্যে একটি ধারণা রয়েছে। মানুষ সাধারণত ফেরেশতাকে সুন্দরের প্রতীক ও উপমা এবং শয়তানকে অসুন্দর ও কদর্যতার প্রতীক এবং উপমা হিসেবে গণ্য করে।

সুতরাং মানুষের মধ্যে প্রচলিত উক্ত চিরাচরিত ধারণার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'আলা যাক্কূম ফলের চরম কদর্যতা ও বিভৎসতাকে প্রকাশ করার জন্য তাকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করেছেন। বালাগাত তথা আরবি অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় এরূপ তুলনা করাকে "اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ" বা কাল্পনিক তুলনা বলে।

* এক দল মুফাস্সির (র.) এখানে "رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ" -এর অর্থ করেছেন– "বিভৎস দৃশ্যের সর্পের মাথা", আর এটা তো মানুষের জানাশুনা রয়েছে।

কারো কারো মতে, "رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ" বিশ্রী মাথাবিশিষ্ট এক প্রকার গুল্ম। তার সাথে যাক্কূম গাছকে তুলনা করা হয়েছে। –[কাশ্শাফ, কাবীর, মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ الخ **আয়াতের ব্যাখ্যা :** ইমাম রাযী (র.) বলেছেন– এখানে ثُمَّ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবহ। তিনি আয়াতখানার দু'টি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

এক. জাহান্নামবাসীরা অত্যন্ত বিস্বাদ ও তিক্ত যাক্কূম গাছের ফল দ্বারা তাদের উদর পূর্তি করবে। এতে তাদের গলায় ফোসকা পড়ে যাবে। তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন তারা পিপাসায় আর্তনাদ করতে থাকবে। এর সুদীর্ঘ কাল পর তাদেরকে জাহান্নামের বহির্ভাগে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তথায় গরম উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে।

দুই. আল্লাহ তা'আলা এখানে জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়ের বিবরণ পেশ করেছেন। প্রথমত তাদের নিকৃষ্টতা ও কদর্যতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পানীয়ের জঘন্যতা ও ভয়াবহতার উল্লেখ করেছেন। এখানে ثُمَّ শব্দটি উল্লেখের তাৎপর্য হলো তাদের খাদ্য অপেক্ষাও পানীয় নিকৃষ্ট হবে। –[কাবীর, কুরতবী ও জালালাইন]

"ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ" **আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "গরম পানি পান করানোর পর পুনরায় জাহান্নামীরা জাহান্নামেই ফিরে যাবে।" সুতরাং তা হতে প্রমাণিত হয় যে, ফুটন্ত পানি পান করার সময় জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের হাঁকিয়ে জাহান্নাম হতে এমন একটি ঝর্ণার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যার পানি টগবগ করে উতরাতে থাকবে। পানি পান করানোর পর পুনরায় তাদেরকে জাহান্নামের অভ্যন্তরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

–[কাশ্শাফ, কুরতুবী, কাবীর ও জালালাইন]

إِنَّهُمْ ...... يُهْرَعُونَ **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "কাফের ও মুশরিকরা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে গোমরাহ পেয়েছে এবং তারা পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করে কুফরির পথে দৌড়ে চলেছে।"

কাফেররা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা কখনো চিন্তা করে দেখেনি যে, বাপ-দাদার যুগ হতে যেসব রেওয়াজ ও পদ্ধতিসমূহ চলে এসেছে তা সঠিক না ভুল; বরং তারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণে ছুটে চলেছে দ্রুতবেগে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) তাফসীরে ইবনে কাছীরে লিখেছেন, আল্লাহ এখানে বলতে চেয়েছেন যে, আমি কাফের ও মুশরিকদেরকে এ জন্য উপরিউক্ত আজাব দিয়েছি যে, তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে গোমরাহ পেয়েছে এবং না বুঝে শুনে তাদের অনুকরণ করেছে। মূলত বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণই তাদেরকে ইহ-পরকালের কঠিন আজাবের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে অতীতাকালের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। মক্কার মুশরিকরাই যে, প্রথম খোদাদ্রোহীতার সবক গ্রহণ করেছে তা নয় বরং তাদের পূর্বেও অধিকাংশ লোকেরাই বিপথগামী হয়েছে। আমি এ লোকদের ন্যায় তাদের নিকটও রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা রাসূলের আনুগত্য করেনি, তাদের কথা মানেনি। রাসূলগণ (আ.) তাদেরকে হাজারোভাবে বুঝিয়েছিলেন। তাদেরকে দিবা-রাত্রি দীনে হকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। রাসূলগণের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। বরং উল্টো তাদের এই চরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও পরম বন্ধু রাসূলগণের উপর তারা অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়েছিল। পরিণামে তাদের উপর নেমে এসেছিল আল্লাহর পক্ষ হতে আজাব ও গজব, ধ্বংস যজ্ঞে পরিণত হয়েছিল তাদের বিলাস বহুল বাড়ি-ঘর। সুতরাং তোমরা তাদের হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার এবং নিঃসন্দেহে জেনে রাখ! রাসূলের বিরোধিতায় অটল থাকলে তোমাদেরও হবে সেই একই পরিণতি তোমাদের ধ্বংসও হবে অনিবার্য।

হ্যাঁ, আমার কিছু মুখলিস বান্দা যারা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে তারা যেমন সে কালেও ছিল তেমনটি এ কালেও আছে। তারা আজাব হতে পরিত্রাণ লাভ করে চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧٥. وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ بِقَوْلِهٖ رَبِّ اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ لَهٗ نَحْنُ اَىْ دَعَانَا عَلٰى قَوْمِهٖ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِالْغَرَقِ.

৭৫. আর অবশ্যই আমাকে নূহ আহ্বান করেছিল তার এ উক্তির দ্বারা "প্রভু হে! আমি পরাস্ত হয়ে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন"। সুতরাং কতই না উত্তম সাড়াদানকারী আমি তার জন্য। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে আমার নিকট ফরিয়াদ করেছিল। তখন আমি তার জাতিকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছি।

٧٦. وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ اَىْ الْغَرَقِ.

৭৬. আর আমি তাকে এবং তার আহল সম আদর্শে বিশ্বাসীদের -কে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি; অর্থাৎ পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে।

٧٧. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ نَسْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ لَهٗ ثَلٰثَةُ اَوْلَادٍ سَامٍ وَهُوَ اَبُو الْعَرَبِ وَفَارِسَ وَالرُّوْمِ وَحَامٍ وَهُوَ اَبُو السُّوْدَانِ وَيَافِثُ اَبُو التُّرْكِ وَالْخَزَرِ وَيَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَمَا هُنَالِكَ.

৭৭. আর আমি তার বংশধরদেরকেই (পৃথিবীতে) অবশিষ্ট রেখেছি। সুতরাং (বর্তমান পৃথিবীর) সকল মানুষই তাঁর নসল (বংশধর) হতে সৃষ্টি হয়েছে। হযরত নূহের তিন সন্তান (জীবিত) ছিল। এক. সাম– তিনি আরব, পারস্য (ইরান) ও রোমের জনক। দুই. হাম– তিনি হলেন সুদানের জনক। তিন. ইয়াফাস– তিনি তুর্কী, খাযরাজ, ইয়াজুজ-মাজূজ ও তথাকার অন্যান্য বংশের জনক।

٧٨. وَتَرَكْنَا اَبْقَيْنَا عَلَيْهِ ثَنَاءً حَسَنًا فِى الْاٰخِرِيْنَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاُمَمِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

৭৮. আর আমি রেখেছি বাকি রেখেছি তার জন্য উত্তম প্রশংসা পরবর্তীগণের মধ্যে আম্বিয়াগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত জাতিসমূহের জন্য।

٧٩. سَلٰمٌ مِّنَّا عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ.

৭৯. শান্তি বর্ষিত হোক আমার পক্ষ হতে নূহের উপর সমগ্র বিশ্বের মাঝে।

٨٠. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

৮০. নিশ্চয় আমি তদ্রূপ যদ্রূপ প্রতিদান দিয়েছি তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি সৎকর্মশীলদেরকে।

٨١. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

৮১. নিঃসন্দেহে সে আমার ঈমানদার বান্দাগণের মধ্যে অন্যতম ছিল।

٨٢. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ كُفَّارَ قَوْمِهٖ.

৮২. আর আমি ডুবিয়ে দিয়েছিলাম অন্যদেরকে (অর্থাৎ) তার জাতির কাফেরদেরকে।

٨٣. وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ اَىْ مِمَّنْ تَابَعَهٗ فِىْ اَصْلِ الدِّيْنِ لَاِبْرٰهِيْمَ وَاِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ اَلْفَانِ وَسِتُّمِائَةٍ وَاَرْبَعُوْنَ سَنَةً وَكَانَ بَيْنَهُمَا هُوْدٌ وَصَالِحٌ.

৮৩. আর তার অনুসারীদের মধ্যে অর্থাৎ দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল তাদের মধ্যে– অবশ্যই ইবরাহীম (আ.)ও একজন ছিলেন। যদিও তাঁদের উভয়ের মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে। আর তা হলো দু হাজার ছয়শত চল্লিশ বৎসর। তাঁদের উভয়ের মাঝে হযরত হূদ ও সালিহ (আ.) অতিবাহিত হয়েছেন।

٨٤. اِذْ جَآءَ اَىْ تَابَعَهُ وَقْتَ مَجِيْئِهِ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ مِنَ الشَّكِّ وَغَيْرِهِ ـ

৮৪. যখন তিনি আগমন করেছিলেন, অর্থাৎ আগমনের সময় তাঁর অনুসরণ করেছেন– তাঁর প্রভুর নিকট বিশুদ্ধ অন্তরসহ-সন্দেহ ইত্যাদি হতে বিশুদ্ধ চিত্তে।

٨٥. اِذْ قَالَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ لَهُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مُوَبِّخًا مَاذَا مَا الَّذِىْ تَعْبُدُوْنَ ـ

৮৫. যখন তিনি বলেছিলেন তাঁর উক্ত অবস্থায়, যা তাঁর মধ্যে সর্বক্ষণ থাকত– তাঁর পিতা ও জাতিকে লক্ষ্য করে তিরস্কার করার জন্য কিসের কোন বস্তুর তোমরা ইবাদত কর?

তাহকীক ও তারকীব

"وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত "تَرَكْنَا" -এর مَفْعُوْلٌ কি? আলোচ্য আয়াতাংশে "تَرَكْنَا" -এর مَفْعُوْلٌ -এর ব্যাপারে দ্বিবিধ সম্ভাবনা রয়েছে।

ক. "تَرَكْنَا" -এর مَفْعُوْلٌ হলো "ثَنَاءً حَسَنًا" [অর্থাৎ উত্তম প্রশংসা] যা মাহযূফ [উহ্য] রয়েছে।

খ. "تَرَكْنَا" -এর مفعول হলো "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ" অর্থাৎ "تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ اَنْ يُّسَلِّمُوْا عَلَيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" আমি পরবর্তীদের মধ্যে তার সম্পর্কে এ ব্যবস্থা করে রেখেছি যেন কিয়ামত পর্যন্ত তারা তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হওয়ার জন্য দোয়া করে।

"سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ" -এর নাহবী তারকীব : এখানে سَلَامٌ মুবতাদা এবং عَلٰى نُوْحٍ এটা نَازِلٌ -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এর خَبَرٌ মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

আবার তারকীবে উক্ত বাক্যটির অবস্থান সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. আলোচ্য বাক্য "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ" এটা পূর্ববর্তী تَرَكْنَا ফে'লের مُفَسِّرٌ

২. এটা تَرَكْنَا ফি'লের مَفْعُوْلٌ -এর مُفَسِّرٌ অর্থাৎ "تَرَكْنَا عَلَيْهِ شَيْئًا" আমি তার ব্যাপারে কিছু অবশিষ্ট রেখেছি। আর তা (شَيْئًا) হলো "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ"

৩. এটার পূর্বে قُلْنَا শব্দটি মাহযূফ রয়েছে। বাক্যটি হবে– قُلْنَا سَلَامٌ عَلٰى الخ এমতাবস্থায় এটা قُلْنَا -এর مَفْعُوْلٌ হবে।

কাশশাফ প্রণেতা আল্লামা যামাখশারী (র.) নিম্নোক্তভাবে এর তাফসীর করেছেন– وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ وَهِىَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ আর আমি পরবর্তীতে মধ্যে এ উক্তিটির প্রচলন করে দিয়েছি তা হলো "سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ"

"وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَاِبْرَاهِيْمَ" আয়াতে "شِيْعَتِهِ" -এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল : এখানে شِيْعَتِهِ -এর "ه" যমীরের مَرْجِعٌ বা প্রত্যাবর্তনস্থল-এর ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. شِيْعَتِهِ -এর "ه" যমীরের مَرْجِعٌ হলো হযরত নূহ (আ.)। যার উল্লেখ পূর্বে রয়েছে। অর্থাৎ وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ نُوْحٌ لَاِبْرَاهِيْمَ দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পূর্ববর্তী নবী হযরত নূহ (আ.)-এর পন্থানুসারী। এ ব্যাপারে তাঁদের উভয়ের মত ও পথ এক ও অভিন্ন। ইমাম যামাখশরী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, তাদের উভয়ের মধ্যে– ২৬৪০ বৎসরের ব্যবধান ছিল। হযরত হূদ (আ.) ও হযরত সালিহ (আ.) তাদের মাঝখানে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছেন। এটাই জমহুরের মাযহাব এবং গ্রহণযোগ্যও বটে। কেননা, ইতঃপূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদের প্রকাশ্য প্রকাশভঙ্গী এটাকেই সমর্থন করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. شِيْعَتِهٖ -এর "ه" যমীরের مَرْجِعْ হলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ। অর্থাৎ "وَاِنَّ مِنْ شِيْعَةِ مُحَمَّدٍ لَاِبْرَاهِيْمُ" হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর মত ও পথের অনুসারী। এটা ইমাম কালবী (র.)-এর মাযহাব। কিন্তু কুরআনের প্রকাশভঙ্গির বিরোধী হওয়ার দরুন এটা গ্রহণযোগ্য নয়। -[জালালাইন, কাশশাফ, কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের নিকট সতর্ককারী নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়নি; বরং তাদের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহ হতে উক্ত ইজমালী আলোচনার বিশদ বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকজন নবী ও রাসূলের ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সূরা নূহ, হূদ ও অন্যান্য সূরায়ও হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কিত কাহিনীসমূহ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে দু'জন নবীর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমেই হযরত নূহ (আ.)-এর জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অতএব আমরাও প্রথমত তাঁর সংক্ষিপ্তাকারে জীবন কাহিনী উপস্থাপন করলাম।

হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী : মতান্তরে এক লাখ কি দুই লাখ নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. হযরত আদম (আ.) হতে হযরত নূহ (আ.) পর্যন্ত। এ শ্রেণির নবী ও রাসূলগণের কোনো শরিয়ত ছিল না। তাঁরা শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিতেন এবং আদব-কায়দা ও জীবন-যাপন প্রণালী শিক্ষা দিতেন।

দুই. হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত। এ শ্রেণির নবী-রাসূলগণকে সংক্ষিপ্ত শরিয়ত তথা হালাল-হারাম ও ইবাদতের বিধান প্রদান করা হয়েছে।

তিন. হযরত মূসা (আ.)-এর পর হতে মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত। এ যুগে শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ বিধান নাজিল হয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর বংশ পরিচিতি : নূহ ইবনে লামেক ইবনে মাতুশালেহ ইবনে আখনুক ইবনে ইয়ারুদ মুহালয়িল ইবনে কিনান ইবনে আনুশ ইবনে শিছ ইবনে আদম (আ.)। হযরত নূহ (আ.)-এর আসল নাম ছিল আব্দুল গাফ্ফার। তিনি সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতেন বলে তার উপাধি হয়েছে নূহ।

কুরআন মাজীদের ২৮টি সূরায় ৪৩টি স্থানে হযরত নূহ (আ.)-এর আলোচনা রয়েছে।

কথিত আছে যে, হযরত আদম (আ.) হতে হযরত নূহের যুগের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বৎসর যাবৎ শিরক ছিল না। মানুষ তখন এক আল্লাহর ইবাদত করত। বহু দিন পর মানুষ তাওহীদ হতে বিচ্যুত হয়ে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে রাসূল করে পাঠান। হযরত নূহ (আ.) লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর জাতি উদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নসর প্রভৃতি প্রতিমা ও সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদির পূজা করছে।

হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয় শত বৎসর পর্যন্ত তাঁর জাতিকে হেদায়েত করেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে মাত্র ৪০ জন নারী ও ৪০ জন পুরুষ তার উপর ঈমান আনয়ন করে। অন্যান্যরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করে। পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতির হেদায়েত হতে নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন তিনি গোত্রের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট বদদোয়া করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে একটি বিরাট নৌকা তৈরি করার জন্য নির্দেশ দিলেন। শীঘ্রই যে, মহা প্লাবন আসছে তাও জানিয়ে দিলেন। নৌকা তৈরির পর হযরত নূহ (আ.) ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিলেন। শুরু হলো মহাপ্লাবন। সেই প্লাবনে সমস্ত কাফের ও মুশরিকরা ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু ঈমানদারগণ যারা তাঁর সাথে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তারাই রেহাই পেলেন। দীর্ঘ সাত মাস পর হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকা জুদী পাহাড়ে এসে অবস্থান নেয়। উল্লেখ্য যে, হযরত নূহ (আ.)-এর একজন পুত্র কেনান মুশরিক ছিল, তুফানে সেও নিহত হয়। তার জন্য হযরত নূহ (আ.) পিতৃস্নেহে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সুপারিশ তো গৃহীত হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা এ জন্য নবীকে তিরস্কার করেছেন।

হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত ও বরকতে জাহাজের সমস্ত ঈমানদার নারী-পুরুষ ও প্রাণীকুলসহ জাহাজ হতে সহীহ সালামতে অবতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে পরবর্তী প্রজন্ম হযরত নূহ (আ.)-এর আওলাদ হতে সৃষ্টি হয়েছে। অপরাপর ঈমানদারগণ হতে বংশধারা অবশিষ্ট ছিল না। এ জন্য হযরত নূহ (আ.)-কে দ্বিতীয় আদম বলা হয়ে থাকে।

হযরত নূহ (আ.) নবী-রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয়ু লাভ করেছেন। তিনি মতান্তরে মোট ১৩০০ বৎসর হায়াত পেয়েছিলেন। ইন্তেকালের পর তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফন করা হয়।

হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির মধ্যে প্রতিমা-পূজা অনুপ্রবেশ পদ্ধতি : সূরা নূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন- "وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا" - আর হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির মুশরিক লোকেরা বলাবলি করতে লাগল- "তোমরা তোমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মোটেই পরিত্যাগ করবে না। বিশেষত উদ, সুয়া, ইয়াগুছ ও ইয়াউকের ইবাদত পরিহার করো না।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আদম (আ.) হতে হযরত নূহ (আ.)-এর পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত কতিপয় জাতি একেশ্বরবাদী ও সৎকর্মশীল ছিলেন। তাদের মধ্যে বহু বুজুর্গ ও দীনদার লোক অতিবাহিত হয়েছে। সেই বুজুর্গদের বহু অনুসারী ও অনুগামী ছিল। অনুসারীরা তাদের বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাদের মূর্তি তৈরি শুরু করল। তাদের ধারণা ছিল এতে উক্ত বুজুর্গগণের অনুসরণ ও অনুকরণে সুবিধা হবে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের উত্তরসূরিদেরকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করল। তাদেরকে বুঝাল যে, এ প্রতিমাগুলোর পূজার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। এতে তাদের আত্মা শান্তি পাবে। এভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর গোত্রের মধ্যে মূর্তি পূজা তথা শিরক অনুপ্রবেশ করল। প্রথম প্রথম তো তারা প্রতিমা পূজার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতও করত। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহর ইবাদত পরিহার করে পুরোপুরি মূর্তি পূজায় আত্মনিয়োগ করল।

"وَلَقَدْ نَادَانَا ... الْمُجِيبُونَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করেছেন, আর হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির হেদায়েত হতে নিরাশ হয়ে এবং তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট বদদোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাঁর জাতির কাফেরদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

অত্র আয়াতে উল্লেখ নেই যে, হযরত নূহ (আ.) কখন এবং কি জন্য আল্লাহ তা'আলাকে ডেকেছেন। সুতরাং এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন।

- **কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ যেন নৌকায় উঠে পড়েন। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আ.) তাই করলেন। অতঃপর প্রচণ্ড ঝড়সহ বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো এবং জমিনের নিম্নদেশ হতে পানি বের হতে শুরু করল। মোটকথা এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হলো। সমস্ত পৃথিবী সেই প্লাবনের পানিতে সম্পূর্ণ তলিয়ে গেল। তখন হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই প্লাবন হতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অত্র আয়াতে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।**

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

✪ এক দল মুফাস্সির (র.) বলেছেন যে, হযরত নূহ (আ.) সাড়ে নয় শত বৎসর যাবৎ তাঁর কওমকে হেদায়েত করেছিলেন– তাদেরকে তাওহীদের পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু গুটি কতেক নর-নারী ব্যতীত কেউই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি; বরং তারা তাঁর উপর নির্যাতন চালিয়েছিল; তাঁকে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তিনি বাধ্য হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করেছিলেন। তাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন।

বস্তুত হযরত নূহ (আ.)-এর উক্ত দোয়াকে অপর দু'টি আয়াতে আরও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি আয়াতে তার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ হয়েছে– "رَبِّيْ اِنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ" অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) বলেছেন, হে প্রভু! আমি তো পরাস্ত হয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। অন্যত্র বলা হয়েছে– "رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا" "হে প্রভু! জমিনের উপর কাফেরদের একটি ঘর-বাড়িও অবশিষ্ট রেখো না......"।

দোয়া কবুল করা মহা নিয়ামত ছিল : আল্লাহ অত্র আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ.) আমার নিকট দোয়া করেছিলেন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছি। আল্লাহ "নূহের দোয়া কবুল করেছেন" এটা বুঝাতে যেয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ" [সুতরাং আমি কতইনা উত্তম জবাব প্রদানকারী।]

আলোচ্য বাক্যটি বিভিন্ন দিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ–

✪ উক্ত দোয়া কবুল করতে গিয়ে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে বহুবচনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

✪ আলোচ্য আয়াতে فَاءْ অক্ষরটি নতীজাহ বা ফলাফল বুঝানোর জন্য হয়েছে। যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর আন্তরিক যথার্থ আবেদনের ফলেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন।

✪ আল্লাহ তা'আলা নিজেই উক্ত জবাবকে উত্তম হিসেবে গণ্য করেছেন।

আলোচ্য বাক্যে لَامْ -এর অর্থ : আলোচ্য বাক্যে فَلَنِعْمَ -এর মধ্যে لَامْ অক্ষরটি একটি অনুক্ত কসমের জবাব হয়েছে। তা ছাড়া এখানে مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ ও অনুক্ত রয়েছে। মূলত বাক্যটি এরূপ হবে– "فَوَاللّٰهِ لَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ نَحْنُ" "আল্লাহর শপথ নিশ্চয় আমি তার উত্তম জবাবদাতা।"

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্য আরবিতে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলায় অনুবাদে একবচন হবে। নতুবা, বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

"وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبَاقِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, "আমি নূহ (আ.)-এর বংশধরদেরকেই কেবলমাত্র অবশিষ্ট রেখেছি।"

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন–

১. এক দল মুফাস্সির বলেছেন, এখানে শুধুমাত্র আরবের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তীতে একমাত্র নূহ (আ.)-এর আওলাদের দ্বারা আরবকে আবাদ করা হয়েছে। কেননা অন্যান্যরা তুফানে মৃত্যুবরণ করেছে। আর হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার তুফান শুধুমাত্র আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যত্র তা বিস্তার লাভ করেনি।

২. আরেক দল মুফাস্সিরের মতে, এখানে "বংশধর" দ্বারা হযরত নূহ (আ.)-এর উপর যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের সকলকে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কার তুফান বিশ্বব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে যারা হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল শুধু তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে আবাদ করেছেন।

৩. জমহুর মুফাস্সিরে কেরামের মতে, এখানে "বংশধর"-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর রক্ত সম্পর্কীয় তথা তার সন্তানগণকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের মতে আল্লাহ তা'আলা প্লাবনোত্তর কালে হযরত নূহ (আ.)-এর তিন ছেলে– সাম, হাম ও ইয়াফসের বংশধরগণের দ্বারা জমিনকে আবাদ করেছেন। তাঁর উক্ত তিন পুত্রই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। অবশিষ্ট এক পুত্র কেনান– তাঁর উপর ঈমান আনেনি। ফলে সে প্লাবনের সময় মৃত্যুবরণ করেছে। এমনকি হযরত নূহ (আ.)-এর সুপারিশেও আল্লাহ তা'আলা কেনানকে রেহাই দেননি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সুতরাং সাম হলেন আরব ও পারস্যবাসী ও অন্যান্যগণের জনক। আরেক পুত্র হাম-এর বংশধর হলো আফ্রিকার অধিবাসীগণ কেউ কেউ হিন্দুস্থানের অধিবাসীগণকেও তার বংশধর বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র ইয়াফসের বংশধর হলো তুর্কী-মঙ্গোলীয় ও ইয়াজুজ-মাজুজ-এর সন্তান-সন্ততি। যারা নৌকায় আরোহণ করে আত্মরক্ষা করেছেন তাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-এর উক্ত তিন পুত্র ব্যতীত অন্য কারো সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করেনি।

কুরআনে কারীমের প্রকাশভঙ্গি এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তৃতীয় অভিমতটিই সর্বাধিক শক্তিশালী। জমহুর মুফাস্‌সিরগণ তাকেই গ্রহণ করেছেন। সুতরাং উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম তিরমিযী (র.) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ (র.) একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে– হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'সাম আরবদের জনক, হাম আফ্রিকাবাসী ও ইয়াফস রোমীয়দের জনক।' উক্ত হাদীসখানাকে ইমাম তিরমিযী (র.) হাসান বলেছেন। ইমাম হাকিম (র.) বলেছেন, এটা সহীহ হাদীস। –[রূহুল মা'আনী]

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "আমি পরবর্তীদের মধ্যে এ কথাটির প্রচলন রেখে দিয়েছি যে, বিশ্বে হযরত নূহ (আ.)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" অর্থাৎ নূহের (আ.) পরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে আমি তাদের নিকট হযরত নূহ (আ.)-কে এত সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছি যে, তারা কিয়ামত পর্যন্ত হযরত নূহ (আ.)-এর জন্য শান্তির দোয়া করতে থাকবে। এ কারণেই বাস্তবেও দেখা যায় যারা নিজেদেরকে আসমানি কিতাবের ধারক ও বাহক বলে দাবি করে তারা সকলেই হযরত নূহ (আ.)-এর পবিত্রতা ও নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করে। মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান সকলেই তাঁকে নেতা হিসেবে গণ্য করে থাকে।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর এমন দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেই ঘটনাদ্বয়ে তিনি নিছক আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ পাওয়ার জন্য মহা কুরবানি দিয়েছেন। প্রথম ঘটনাটি হলো তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলার জন্য কাফেরদের ষড়যন্ত্রের বিষয় সম্পর্কীয়।

সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত নূহ (আ.)-এর পন্থানুসারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আয়াতে উল্লেখিত "شِيْعَةٌ" শব্দটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। আরবি ভাষায় "شِيْعَةٌ" এমন দল ও সম্প্রদায়কে বলে যারা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে এক ও অভিন্ন।

আর প্রকাশ্যতঃ এখানে شِيْعَتِهٖ যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো হযরত নূহ (আ.)। এমতাবস্থায় অর্থ হবে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পূর্ববর্তী নবী হযরত নূহ (আ.)-এর পথ ও পন্থার উপর ছিলেন। আর দীনের বুনিয়াদী বিষয়াদিতে উভয় এক ও অভিন্ন ছিলেন। তাছাড়া তাঁদের উভয়ের শরিয়তের মধ্যেও সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল।

উল্লেখ যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) ও হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর মাঝখানে ২৬৪০ বৎসরের ব্যবধান ছিল। আর তাঁদের উভয়ের মাঝখানে হযরত হূদ ও সালিহ (আ.) নবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। –[জালালাইন, কাশ্‌শাফ]

"اِذْ جَاءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতখানার অর্থ দাঁড়ায়– "যখন তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট পরিষ্কার-নির্মল অন্তঃকরণসহ আগমন করলেন।" এখানে তাঁর প্রতিপালকের নিকট আগমন করার অর্থ হলো– "আল্লাহর দিকে রুজু করা, আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া। তাঁর ইবাদত করা। অত্র আয়াতে 'কালবে সালীম' নির্মল অন্তরের শর্তারোপ করত এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতকারীর অন্তর গলদ আকীদা-বিশ্বাস নিন্দনীয় জযবা হতে মুক্ত না হবে। যদি গলদ আকীদা-বিশ্বাসের সাথে কোনো ইবাদত করে, তাহলে যত মেহনতই করুক না কেন তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রূপ যদি ইবাদতকারীর আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের পরিবর্তে লোক দেখানো অথবা কোনো পার্থিব ফায়েদা হাসিলের উদ্দেশ্যে হয় তবে তাও প্রশংসনীয় হবে না। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর "রুজূ ইলাল্লাহ" (আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া) সম্পূর্ণ রূপে ত্রুটিমুক্ত ও খালিস ছিল। তার অন্তঃকরণে না ছিল কোনোরূপ ভ্রান্ত আকীদার ছাপ, আর না ছিল কপটতা ও কৃত্রিমতার সংমিশ্রণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨٦. اَئِفْكًا فِىْ هَمْزَتَيْهِ مَا تَقَدَّمَ اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ وَاِفْكًا مَفْعُوْلٌ لَهُ وَاٰلِهَةً مَفْعُوْلٌ بِهِ لِتُرِيْدُوْنَ وَالْاِفْكُ اَسْوَءُ الْكِذْبِ اَىْ اَتَعْبُدُوْنَ غَيْرَ اللّٰهِ .

৮৬. তবে কি মিথ্যা-মনগড়া – এর হামযাদ্বয়ে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত কেরাতসমূহ প্রযোজ্য হবে। উপাস্যদেরকে কামনা করছ আল্লাহ ব্যতীত? এখানে اِفْكًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ بِهِ এর- اٰلِهَةً এবং مَفْعُوْلٌ لَهُ এর- تُرِيْدُوْنَ হয়েছে। আর اِفْكًا হলো নিকৃষ্টতম মিথ্যা। অর্থাৎ তোমরা কি গায়রুল্লাহর ইবাদত করছ?

٨٧. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِذْ عَبَدْتُمْ غَيْرَهُ اَنَّهُ يَتْرُكُكُمْ بِلَا عِقَابٍ لَا وَكَانُوْا نَجَّامِيْنَ فَخَرَجُوْا اِلٰى عِيْدٍ لَهُمْ وَتَرَكُوْا طَعَامَهُمْ عِنْدَ اَصْنَامِهِمْ زَعَمُوْا التَّبَرُّكَ عَلَيْهِ فَاِذَا رَجَعُوْا اَكَلُوْهُ وَقَالُوْا لِلسَّيِّدِ اِبْرَاهِيْمَ اُخْرُجْ مَعَنَا .

৮৭. তাহলে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা? তোমরা যদি গায়রুল্লাহর ইবাদত কর তবে কি তিনি তোমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবেন? কখনই না। আর তারা নক্ষত্রভক্ত (বা জ্যোতিবির্দ্যায় বিশ্বাসী) ছিল। সুতরাং একবার তারা তাদের এক মেলায় গমন করল এবং তাদের খাবার তাদের প্রতিমাগুলোর সম্মুখে রাখল। এটাকে তারা বরকত মনে করত। সুতরাং মেলা হতে ফিরে এসে তা ভক্ষণ করত। নেতা ইবরাহীম (আ.)-কেও তারা বলল, আমাদের সাথে চলুন।

٨٨. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ اِيْهَامًا لَهُمْ اَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا لِيَتَّبِعُوْهُ .

৮৮. অনন্তর তিনি তারকারাজির প্রতি একবার তাকালেন – তাদের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি করার জন্য যে, তিনি তাদের উপর নির্ভর করেন। যাতে তারা তাঁর কথা মেনে নেয়।

٨٩. فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ عَلِيْلٌ اَىْ سَاَسْقَمُ .

৮৯. অতঃপর বললেন, আমি অসুস্থ রুগ্‌ণ, অর্থাৎ শীঘ্রই আমি অসুস্থ হয়ে পড়বো।

٩٠. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ اِلٰى عِيْدِهِمْ مُدْبِرِيْنَ .

৯০. সুতরাং তারা চলে গেল তাঁর নিকট হতে তাদের মেলার দিকে তাকে পশ্চাতে রেখে।

٩١. فَرَاغَ مَالَ فِىْ خُفْيَةٍ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ وَهِىَ الْاَصْنَامُ وَعِنْدَهَا الطَّعَامُ فَقَالَ اِسْتِهْزَاءً اَلَا تَاْكُلُوْنَ فَلَمْ يَنْطِقُوْا فَقَالَ .

৯১. অতঃপর তিনি গমন করলেন গোপনে গেলেন তাদের উপাস্য দেবতাগুলোর নিকট। আর তারা হলো প্রতিমা– তাদের সম্মুখে ছিল খাবার এবং বললেন, উপহাস করে– তোমরা ভক্ষণ করতেছ না কেন? কিন্তু প্রতিমাগুলো কিছুই বলল না। তখন তিনি বললেন–

٩٢. مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ فَلَمْ يُجِبْ .

৯২. তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কথা বলছ না কেন? তারপরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

٩٣. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ بِالْقُوَّةِ فَكَسَرَهَا فَبَلَغَ قَوْمَهُ مَنْ رَاٰهُ .

৯৩. অতঃপর তিনি তাদের উপর সজোরো আঘাত করলেন, শক্তিমত্তার সাথে। সুতরাং তাদের ভেঙ্গে ফেললেন। এ ঘটনা যে প্রত্যক্ষ করল সে তার সংবাদ তার কওমের নিকট পৌঁছে দিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩٤. فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ اَىْ يُسْرِعُوْنَ الْمَشْىَ فَقَالُوْا نَحْنُ نَعْبُدُهَا وَاَنْتَ تُكَسِّرُهَا .

৯৪. তখন কওমের লোকেরা তার নিকট ছুটে আসল; অর্থাৎ তারা দ্রুত ছুটে আসল এবং তারা বলল, আমরা তাদের ইবাদত করি, আর তুমি তাদের ভেঙ্গে ফেলবে?

তাহকীক ও তারকীব

" اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ الخ " এর মধ্যে اِفْكًا শব্দের মহল্লে ই'রাব কি? অত্র আয়াতে اِفْكًا শব্দটি বিভিন্ন কারণে মহল্লান মানসূব হয়েছে।

ক. এটা تُرِيْدُوْنَ ফি'লের مَفْعُوْل لَهٗ মূল বাক্যটি হবে- "اَتُرِيْدُوْنَ اٰلِهَةً مِنْ دُوْنِهٖ اِفْكًا" তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কি মিথ্যা উপাস্য কামনা কর। এখনে অধিক গুরুত্বারোপের জন্য مَفْعُوْل لَهٗ -কে- مَفْعُوْل بِهٖ ও فِعْل -এর পূর্বে নেওয়া হয়েছে।

খ. এটা تُرِيْدُوْنَ ফে'লের مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। অর্থাৎ "تُرِيْدُوْنَ اِفْكًا"

গ. এটা تُرِيْدُوْنَ ফে'লের যমীর হতে حَالٌ হতে পারে। অর্থাৎ "اَتُرِيْدُوْنَ اٰلِهَةً مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰفِكِيْنَ"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

" فَنَظَرَ نَظْرَةً الخ " আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কওম বৎসরের একটি বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। সে দিবস যখন আসল তখন কওমের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দাওয়াত দিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইব্রাহীম (আ.) মেলায় অংশ গ্রহণ করলে তাদের দীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে। আর তার নতুন দীনের দাওয়াত হতে ফিরে আসবে।

কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.) উক্ত ঘটনা হতে অন্যভাবে উপকৃত হওয়ার পরিকল্পনা করলেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন যে, যখন গোত্রের লোকেরা মেলায় চলে যাবে তখন তিনি প্রতিমার ঘরে ঢুকে তাদের ভেঙ্গে ফেলবেন। যাতে তারা ফিরে এসে স্বচক্ষে তাদের মাবুদদের অক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। হয়তো দেবতাদের অপরাগতা ও দুর্দশা দেখে তাদের কেউ কেউ ঈমানও গ্রহণ করতে পারে এবং শিরক হতে বিরত থাকতে পারে। এ কারণে তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু এভাবে অস্বীকার করলেন যে, প্রথমত তারকাদের প্রতি একবার গভীরভাবে নজর করলেন তারপর বললেন, "আমি অসুস্থ"। কওমরে লোকেরা তাঁকে অপারগ মনে করে মেলায় চলে গেল।

ইবরাহীম (আ.) নক্ষত্রের প্রতি তাকালেন কেন? হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কওমের লোকেরা যখন তাঁকে মেলায় যেতে বলল তখন তিনি নক্ষত্রের প্রতি তাকালেন এবং অসুস্থতার অজুহাতে যেতে অপারগ বলে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি নক্ষত্রের দিকে কেন তাকালেন? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে একাধিক মতামত পাওয়া যায়।

১. এক দল মুফাস্সিরের মতে এটা একটি গতানুগতিক ব্যাপার ছিল। ঘটনাচক্রেই তা সংঘটিত হয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে যেয়ে মানুষ কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন তার কওমের লোকেরা মেলায় যাওয়ার আহ্বান করল তখন তিনি ভাবছিলেন যে, কিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা যায়। উক্ত চিন্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি অকস্মাৎ আকাশের দিকে তাকালেন এবং তাদের জবাব দিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. জমহুর মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ঘটনাক্রমে সিতারার দিকে তাকাননি; বরং এর পিছনে বিশেষ রহস্য নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে– তাঁর জাতি জ্যোতির্বিদ্যার সাথে অত্যন্ত পরিচিত এবং তার ভক্ত ছিল। তারা তারকা দেখে তাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করত। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) সিতারার দিকে তাকিয়ে এ জন্য জাওয়াব দিয়েছেন– যাতে কওমের লোকেরা বুঝে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তার অসুস্থতার ব্যাপারে যা বলছে তা মনগড়া নয়; বরং সে তারকার গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা বলেছে। যদিও খোদ হযরত ইবরাহীম (আ.) জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না; তবুও মেলায় অংশ গ্রহণ করতে বিরত থাকার জন্য তিনি উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন– যা কওমের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি মুখে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনো হাওলা দেননি, আর এটাও বলেননি যে, নক্ষত্র দেখে আমি তাদের হতে সাহায্য গ্রহণ করেছি। বরং শুধু তারকার প্রতি তাকিয়ে দেখেছেন সেহেতু এতে তাঁর মিথ্যার সাথে জড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠবে না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এটার দ্বারা কি জ্যোতিষশাস্ত্রের সহযোগিতা করেছেন? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত ঘটনা দ্বারা সন্দেহ হতে পারে যে, তিনি তার উক্ত কর্মকাণ্ডের দ্বারা তাঁর সেই কওমকে সহযোগিতা করেছেন যারা শুধুমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং নক্ষত্রকে পৃথিবীর ঘটনাবলির ব্যাপারে– مُؤَثِّرْ حَقِيْقِيْ (প্রকৃত সংঘটক) মনে করত।

তবে উক্ত সন্দেহ সঠিক নয়। কেননা যদি ইব্‌রাহীম (আ.) পরবর্তীতে স্পষ্টভাবে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে হুশিয়ার করে না দিতেন তাহলে উক্ত অভিযোগ যথার্থ হতো। তা ছাড়া তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই তো এসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং এ অস্পষ্ট আমলের দ্বারা কাফেরদের সহযোগিতা করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। এখানে মূল উদ্দেশ্য হলো মেলায় অংশ গ্রহণ হতে বিরত থাকা। যাতে হকের দাওয়াত দানের জন্য অধিক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কৌশল ছিল। কাজেই তার উপর কোনো যথার্থ অভিযোগ উঠতে পারে না।

শরিয়তে জ্যোতিষশাস্ত্রের স্থান : এটা তো সকলেরই জানা যে, আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নিহিত রেখেছেন যা মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রত্যেকেই পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমন– সূর্যের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়ার কারণে গরম ও ঠাণ্ডার সৃষ্টি হওয়া। চন্দ্রের উঠা-নামার দ্বারা সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হওয়া। এখানে কেউ কেউ তো বলে থাকেন যে, ঐ নক্ষত্ররাজির প্রভাব তো তাই যা বাহ্যত অনুভূত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে কেউ কেউ দাবি করে থাকে যে, তা ব্যতীতও তারকারাজির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষের জীবনের অধিকাংশ বিষয়কে প্রভাবিত করে থাকে। কোনো নক্ষত্র বিশেষ কোনো কক্ষে গমন করলে বিশেষ কিছু লোকের জীবনে সফলতা ও সুখ-শান্তি বিরাজ করে। আর তাই অপর কিছুলোকের জন্য ব্যর্থতা ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আবার মানুষের আকীদা দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক দলের মতে উক্ত প্রভাব ফেলার ব্যাপারে তারকা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে অন্য কারো হাত নেই। অপর দলের মতে বস্তুত এটা আল্লাহ তা'আলাই তারকার মাধ্যমে করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলাই তারকারাজির মধ্যে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ দান করেছেন। সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুর ন্যায় এগুলোও ব্যর্থতা ও সফলতার সবব বা কারণ–মূল নিয়ামক শক্তি নয়।

যারা নক্ষত্ররাজিকে মূল নিয়ামক শক্তি মনে করে এবং ধারণা করে যে, পৃথিবীর ঘটনাবলি ও পট পরিবর্তন তারকারাজির প্রভাবের কারণেই হয়ে থাকে। নক্ষত্রই তাবৎ দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে থাকে। নিঃসন্দেহে তাদের উক্ত আকীদা ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। অনুরূপ আকীদা মানুষকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। বৃষ্টির ব্যাপারে আরবের লোকদের আকীদা ছিল যে, একটি বিশেষ নক্ষত্র যাকে "নাউ" বলে– তা বৃষ্টি নিয়ে আগমন করে। আর বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতা তার অধীনে রয়েছে। নবী করীম ﷺ জোরালোভাবে এর প্রতিবাদ করেছেন এবং উক্ত আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপরপক্ষে যারা নক্ষত্রকে ক্ষমতার মূল নিয়ামক মনে করেন; বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে এর মূল নিয়ামক মনে করে আর নক্ষত্রকে অসিলা ও সবব হিসেবে গণ্য করে তাদের আকীদায় শিরকের স্তরে পৌঁছে না। তাদের বক্তব্য হলো বৃষ্টি তো আল্লাহ তা'আলাই বর্ষণ করেন কিন্তু এর বাহ্যিক সবব বা কারণ হলো মেঘ। তদ্রূপ সমস্ত কামিয়াবী ও ব্যর্থতার প্রকৃত উৎস তো হলো আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি উক্ত কামিয়াবী ও ব্যর্থতার সবব হয়ে থাকে মাত্র। সুতরাং অনুরূপ ধারণা ও আকীদা পোষণ করা শিরক নয়। কুরআন ও হাদীস এটাকে সমর্থনও করে না আবার প্রত্যাখ্যানও করে না। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ পাক নক্ষত্ররাজির বিবর্তন ও সেগুলোর উদয়-অস্তের মধ্যে এমন কিছু শক্তি নিহিত রেখেছেন যা মানুষের ভালো-মন্দের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু সে প্রভাবকারী শক্তিকে অনুসন্ধান করার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করা, এর উপর নির্ভরশীল হওয়া, বিশ্বাস স্থাপন করা, তদনুযায়ী ভবিষ্যদ্বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় নাজায়েজ ও নিষিদ্ধ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَأَمْسِكُوْا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِىْ فَأَمْسِكُوْا -

"তাক্‌দীরের আলোচনা শুরু হলে বিরত থাকো (অর্থাৎ এর খুঁটি-নাটি পর্যালোচনা ও চুল-চেরা বিশ্লেষণে লেগে যেয়ো না।) নক্ষত্ররাজির চুল-চেরা বিশ্লেষণ হতে বিরত থাকো এবং আমার সাহাবীগণের মতভেদ সম্পর্কীয় খুঁটি-নাটি পর্যালোচনা হতে আত্মরক্ষা কর।" –[তাবরানী এহইয়ায়ে উলূম]

হযরত ওমর (রা.) ইরশাদ করেন– "تَعَلَّمُوْا مِنَ النُّجُوْمِ مَا تَهْتَدُوْنَ بِهِ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوْا"

"জোতির্বিদ্যা ততটুকু শিক্ষা কর যতটুকু দ্বারা জলে-স্থল পথ চলতে সক্ষম হবে। এর বেশি গভীর পর্যালোচনায় লেগে যেয়ো না।"

উপরিউক্ত নিষিদ্ধকরণের দ্বারা তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এদের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে মশগুল হওয়া হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

জোতির্বিদ্যা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দানের হিকমত : শরিয়ত কেন জোতির্বিদ্যা হতে দূরে থাকার পরামর্শ দান করেছে? إِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ নামক গ্রন্থে ইমাম গাযালী (র.) এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. মানুষ যখন জোতির্বিদ্যায় গভীর আলোচনা ও চর্চায় মশগুল হয়ে যায় তখন ধীরে ধীরে সে নক্ষত্ররাজিকে মূল শক্তির নিয়ামক মনে করতে থাকে। আর তা ক্রমান্বয়ে তাকে শিরকের দিকে ধাবিত করে।

২. মূলত ঐশীবাণী ব্যতীত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঠিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এতদসম্পর্কীয় কিছু জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্তু আজ তা পাওয়া যায় না। আজকাল জ্যোতির্বিজ্ঞানী যা বলেন, তা শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করেই বলেন। নিশ্চিতভাবে তাঁরা কিছুই বলতে পারে না। এ ব্যাপারে জনৈক মনীষী যথার্থই বলেছেন– . مُفِيْدُهُ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ وَمَعْلُوْمُهُ غَيْرُ مُفِيْدٍ" অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের যা উপকারী তা অজ্ঞাত আর যা জ্ঞাত তা মোটেও উপকারী নয়।

সুতরাং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুশিয়ারার দায়লমী জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তদীয় গ্রন্থ– "اَلْمُجْمَلُ فِى الْاَحْكَامِ" -এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন– "জোতির্বিদ্যা একটি প্রমাণহীন বিদ্যা। এতে ওয়াস্‌ওয়াসাহ এবং নিছক ধারণার বিরাট অবকাশ রয়েছে।"

আল্লামা আলূসী (র.) তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এমন কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বসম্মত নিয়মাবলি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

৩. এর চর্চার মাধ্যমে জীবনের মূল্যবান সময় অনর্থক কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। যেহেতু এর দ্বারা কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না সেহেতু এটা পার্থিব কাজ-কর্মে তেমন উপকারী নয়। এমন একটি অনর্থক কাজের পিছনে পড়া ইসলামি আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতে। এ জন্যই এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বাণী "আমি অসুস্থ"-এর মর্মার্থ : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন তাঁর কওমের লোকেরা মেলায় যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল তখন তিনি "আমি অসুস্থ" বলে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সত্যিকারই কি তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন? কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু নেই। তবে সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীস হতে জানা যায় যে, তিনি তখন এত অসুস্থ ছিলেন না যে কওমের সাথে যেতে পারতেন না। কাজেই স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, তিনি কিভাবে বলেছেন- "আমি অসুস্থ"?

মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন-

✪ জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর দ্বারা "তাওরিয়াহ" করেছেন। "তাওরিয়াহ" বলে এমন কথা বলা যা বাহ্যত ঘটনার বিপরীত (বাস্তব বিরোধী)। কিন্তু বক্তা এর দ্বারা এমন সূক্ষ্ম কোনো অর্থ বুঝিয়ে থাকেন যা বাস্তব। এখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.) যা বলেছেন তার প্রকাশ্য (বাহ্যিক) অর্থ তো হলো "আমি অসুস্থ"। কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য তা ছিল না। তবে মূল উদ্দেশ্য কি ছিল- সে ব্যাপারে আবার তাফসীরকারদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

ক. একদল মুফাস্সিরের মতে এর দ্বারা তিনি তাঁর মানসিক সংকোচ-মনোবেদনার কথা বুঝিয়েছেন- যা গোত্রের শিরক ও কুফর দেখতে দেখতে তাঁর অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ জন্যই এখানে مَرِيْضٌ শব্দ ব্যবহার না করে سَقِيْمٌ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা سَقِيْمٌ শব্দের অর্থ হলো সাধারণ ও স্বাভাবিক অসুস্থতা। সরল বাংলায় এর অর্থ হবে- "আমার মন খারাপ"। এর দ্বারা সাধারণত মানসিক ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

খ. অন্য একদল মুফাস্সিরের মতে, إِنِّيْ سَقِيْمٌ-এর দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল- "আমি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব।" কেননা আরবি ভাষায় ইসমে ফায়িলের সীগাহ অধিকাংশ সময় ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদের অন্যত্র রয়েছে- "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ" অর্থাৎ আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং ইব্রাহীম (আ.)ও এখানে বলতে চেয়েছেন যে, আমি শীঘ্রই (ভবিষ্যতে) অসুস্থ হয়ে পড়ব। কেননা মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেকেরই অসুস্থ হয়ে পড়া নিশ্চিত। যদি বাহ্যিক রোগ দেখা নাও যায় তথাপি মানসিক অস্থিরতা দেখা দেওয়া অনিবার্য।

✪ অথবা বলা যেতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মানসিক অবস্থা কমবেশি অসুস্থ ছিল। কিন্তু তিনি এত অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় অংশ গ্রহণ করতে অপারগ ছিলেন। তবে তিনি স্বাভাবিক অসুস্থতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, কওমের লোকজন তাকে মেলায় অংশ গ্রহণে অক্ষম মনে করেছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরোক্ত উক্তিকে كِذْبَةٌ (মিথ্যা) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সেখানে كِذْبَةٌ-এর দ্বারা মূলত তাওরিয়াহকে বুঝানো হয়েছে।

ইসলামি শরিয়তে তাওরিয়ার হুকুম : প্রকাশ থাকে যে, তাওরিয়াহ দু প্রকারে বিভক্ত-

১. قَوْلِيٌّ [বক্তব্যমূলক] অর্থাৎ এমন কথা বলা যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব বিরোধী, কিন্তু অপ্রকাশ্য অর্থ সম্পূর্ণ বাস্তব সম্মত।

২. عَمَلِيٌّ [কর্মমূলক] অর্থাৎ এমন কাজ করা যার উদ্দেশ্য দর্শক এরূপ মনে করবে। অথচ কাজটি সমাধাকারীর উদ্দেশ্য হবে অন্য কিছু। এটাকে إِيْهَامٌ ও বলে। অধিকাংশ মুফাস্সিরে কেরামের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়েছেন তা ছিল إِيْهَامٌ। আর তিনি যে নিজেকে অসুস্থ বলে প্রকাশ করেছিলেন তা ছিল বক্তব্যমূলক তাওরিয়াহ।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপরিউক্ত ঘটনা ও বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে তাওরিয়াহ জায়েজ। খোদ নবী করীম ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় উপরিউক্ত দু প্রকারের তাওরিয়াহ করেছেন। হিজরতের সময়কার একটি ঘটনা এখানে প্রণিধানযোগ্য। মদীনায় যাওয়ার পথে প্রিয়নবী ﷺ -কে দেখিয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইনি কে? হযরত আবূ বকর (রা.) জবাবে বলেছেন- "هُوَ هَادٍ يَهْدِيْنِيْ" অর্থাৎ তিনি পথ প্রদর্শনকারী, আমাকে পথ দেখান। প্রশ্নকর্তা মনে করেছিল সাধারণ পথ প্রদর্শনকারী। এ জন্য সে কেটে পড়ল। অথচ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল দীনি ও রুহানী পথ প্রদর্শক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) বলেন, হুযূর ﷺ যে দিকে জিহাদের জন্য বের হবেন বলে পরিকল্পনা করতেন মদীনা হতে সে দিকে বের না হয়ে অন্য দিকে হতে বের হতেন, যাতে লোকেরা তাঁর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবহিত হতে না পারে। এটা ছিল নবী করীম ﷺ -এর اِيْهَامْ-

হাস্যরস ও কৌতুকের ব্যাপারেও নবী করীম ﷺ তাওরিয়াহ করতেন। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এক বৃদ্ধাকে বলেছেন, "কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না"। বৃদ্ধা তা শুনে কাঁদতে শুরু করল। নবী করীম ﷺ বুড়িকে বুঝিয়ে বললেন, এর অর্থ হলো বৃদ্ধাগণ বৃদ্ধা থাকা অবস্থায় জান্নাতে যাবেন না; বরং তারা যুবতী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

নক্ষত্ররাজির উপর আস্থা স্থাপন করা নাজায়েজ– তথাপি হযরত ইবরাহীম (আ.) কিভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন? : উপরের বিভিন্ন আলোচনায় উক্ত প্রশ্নটির জবাব প্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেছে। তথাপি ব্যাপারটি আরও অধিক সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা নিম্নে বিস্তারিতভাবে তার জবাব পেশ করলাম।

কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা, এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নক্ষত্ররাজির উপর আস্থা স্থাপন করত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ। তথাপি হযরত ইব্রাহীম (আ.) নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিভাবে মেলায় অংশ গ্রহণ না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলেন? যা দ্বারা প্রকাশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নক্ষত্রের উপর নির্ভর করেই উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে তাদের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ পেশ করা হলো–

১. রাত ও দিনের একটি বিশেষ সময়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) অসুস্থ হয়ে পড়তেন– জ্বরে ভুগতেন। সুতরাং তিনি তারকার দিকে তাকিয়ে জানতে চেয়েছেন তা সেই সময় কিনা। কেননা তৎকালে ঘড়ির ব্যবহার ছিল না। সুতরাং রাত্রিকালে তারকার অবস্থানের দ্বারা সময় নির্ণয় করা হতো। কাজেই যখন দেখলেন এটা তাঁর জ্বর আগমনের সময় তখন তাকেই মেলায় অংশ গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য অজুহাত হিসেবে পেশ করলেন। যদিও আসলে তিনি মূর্তি ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে এমন মেলার অশ্লীলতা হতে নিজেকে হেফাজত করার জন্য মেলায় যেতে অস্বীকার করেছিলেন তথাপি তাঁর পেশকৃত ওজরও অসত্য ছিল না।

২. হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর জাতির লোকজন জোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী ও নক্ষত্রভক্ত ছিল। সুতরাং তাদেরকে স্বীয় বক্তব্য সহজেই বিশ্বাস করানোর জন্য তিনি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

৩. হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কুদরত অবলোকন করার জন্য তারকারাজির প্রতি তাকিয়েছিলেন।

৪. হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর একটি নির্দিষ্ট তারকা ছিল। যখন এটা বিশেষ একটি স্থানে উদিত হতো তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সুতরাং সে তারকাটিকে যথাস্থানে দেখে তিনি বললেন– "আমি অসুস্থ।"

৫. নক্ষত্ররাজিকে مُؤَثِّرْ حَقِيْقِيْ মূলনিয়ামক শক্তি মনে না করে তাদের প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়া জায়েজ। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের মধ্যে তেমন কোনো প্রভাবকারী শক্তি নিহিত রেখে থাকেন, তবে এটা তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই পরিগণিত হবে।

৬. হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) অনেকটা গতানুগতিকভাবে তারকারাজির প্রতি তাকিয়েছিলেন। তিনি কিভাবে মেলায় অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে পারবেন এবং আপাতত একটা ওজর পেশ করত গোত্রের লোকদের হাত হতে রেহাই পেতে পারবেন তা চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তিনি অকস্মাৎ আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহর বাণী " فَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِ يَزِفُّوْنَ " এবং " مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا الخ " -এর মধ্যকার বিরোধের সমাধান কি?
প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যে মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছিল তা কওমের লোকেরা পূর্ব হতে জানতে পেরেছিল। কেননা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) মূর্তিগুলোকে ভাঙ্গার সময় কওমের এক লোক তা দেখে ফেলেছিল এবং সে-ই তাদেরকে জানিয়েছিল। যদ্দরুন তারা ছুটে এসে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল আমরা তো তাদের ইবাদত করি, অথচ তুমি কেন তাদের ভেঙ্গে ফেললে?

পক্ষান্তরে শেষোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর নিকট জানতে চেয়েছে যে, কে তাদের দেবতাদের সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে? অর্থাৎ কে তাদেরকে ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলেছে?

বাহ্যিকভাবে উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ পরিদৃষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ বা গরমিল নেই। কেননা–

ক. কওমের কিছু লোক জানতে পেরেছিল যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছে। কাজেই তারা প্রথমোক্ত বক্তব্য পেশ করেছে। অন্যদিকে কিছু লোকের নিশ্চিত জানা ছিল না যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) মূর্তি ভেঙ্গেছেন কিনা? সুতরাং তারা শেষোক্ত ভাষায় প্রশ্ন করেছে।

খ. কওমের সকলেই যদিও লোকমুখে শুনেছিল যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে তথাপি তারা নানা জনে নানা ভাষায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর প্রতি প্রশ্নবান ছুঁড়ে মেরেছিল। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে তাদের ভাষার বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩٥. قَالَ لَهُمْ مُوَبِّخًا اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْحِجَارَةِ وَغَيْرِهَا اَصْنَامًا .

৯৫. তিনি বললেন তাদেরকে তিরস্কার করে কেন তাদের পূজা কর যাদের তোমরা খোদাই করে বানাও? পাথর ইত্যাদি দ্বারা প্রতিমারূপে।

٩٦. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ نَحْتِكُمْ وَمَنْحُوْتِكُمْ فَاعْبُدُوْهُ وَحْدَهٗ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ وَقِيْلَ مَوْصُوْلَةٌ وَقِيْلَ مَوْصُوْفَةٌ .

৯৬. আর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং যা তোমরা কর তাদেরকেও অর্থাৎ তোমাদের খোদাই করা ও খোদাইকৃত সব-কে। কাজেই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো। এখানে مَا শব্দটি মাসদারের অর্থে হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে مَوْصُوْل হয়েছে। আবার অন্যান্যরা বলেছে مَوْصُوْف হয়েছে।

٩٧. قَالُوْا بَيْنَهُمْ ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَامْلَؤُهُ حَطَبًا وَاَضْرِمُوْهُ بِالنَّارِ فَاِذَا الْتَهَبَ فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ النَّارِ الشَّدِيْدَةِ .

৯৭. তারা বলল পরস্পরের মধ্যে তাঁর জন্য একটি সৌধ নির্মাণ কর। অতঃপর তাকে লাকড়ি দ্বারা বোঝাই করো এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করে দাও। তারপর অগ্নি যখন লেলিহান শিখায় পরিণত হবে তখন তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো ভীষণ অগ্নিতে।

٩٨. فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا بِاِلْقَائِهٖ فِى النَّارِ لِتُهْلِكَهٗ فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ الْمَقْهُوْرِيْنَ فَخَرَجَ مِنَ النَّارِ سَالِمًا .

৯৮. তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে মনস্থ করেছিল অগ্নিতে নিক্ষেপ করত তাঁকে ধ্বংস করার জন্য। সুতরাং আমি তাদেরকে অপদস্থ [অকৃতকার্য] করলাম। পর্যুদস্ত করলাম। কাজেই তিনি নিরাপদে অগ্নি হতে বের হয়ে আসলেন।

٩٩. وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ مُهَاجِرًا اِلَيْهِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ سَيَهْدِيْنِ اِلٰى حَيْثُ اَمَرَنِىْ بِالْمَصِيْرِ اِلَيْهِ وَهُوَ الشَّامُ فَلَمَّا وَصَلَ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ .

৯৯. আর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট চললাম কুফরের দেশ হতে তাঁর দিকে হিজরত করেছিলাম। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন যথায় তিনি আমাকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলো শাম [সিরিয়া]। সুতরাং যখন তিনি সেই পবিত্র জমিনে গমন করলেন তখন দোয়া করলেন।

١٠٠. قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ وَلَدًا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

১০০. হে আমার প্রভু! আমাকে দান করুন একটি সন্তান সৎকর্মশীল।

١٠١. فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ اَىْ ذِىْ حِلْمٍ كَثِيْرٍ .

১০১. সুতরাং আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল [বিচক্ষণ] পুত্রের শুভ সংবাদ দান করলাম অর্থাৎ অধিক ধৈর্যশীল [বিচক্ষণ]।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন তার গোত্রের লোকেরা মূর্তি ভাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত করল এবং প্রশ্নবানে জর্জরিত করে ছাড়ল তখন তিনি তাদের নিকট মূর্তি পূজার অসারতা তুলে ধরলেন। তিনি তাদেরকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন যে, তোমরা নিজেদের হাতের গড়া প্রতিমাসমূহের পূজা কর কেন? যাদেরকে তোমরাই সৃষ্টি করেছ তারা তোমাদের সৃষ্টি করেনি। এগুলো না কথাবার্তা বলতে পারে আর না একটু নড়া-চড়া করার ক্ষমতা রাখে। উপরন্তু যারা নিজেদেরকে হেফাজত করতে পারে না তারা কিভাবে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে? আল্লাহর আজাব ও গজব হতে কিভাবে তোমাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করতে পারবে? তোমাদের যদি একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকত তবে এরূপ বোকামি করতে না; বরং এ সকল প্রতিমাদের বাদ দিয়ে একমাত্র সেই আল্লাহর ইবাদত করাই তোমাদের উচিত, যিনি তোমাদের এবং সমস্ত সৃষ্টজীবের স্রষ্টা। সৃষ্টি যিনি করেছেন ইবাদতের প্রাপ্যও তিনি। অন্য কেউ ইবাদতের হকদার হতে পারে না।

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সংগ্রাম : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি ছিল প্রতিমা পূজারী। তারা পাথর ইত্যাদি দ্বারা মূর্তি তৈরি করত এবং পূজা-অর্চনা করত। তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করত। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার কওমকে মূর্তিপূজা হতে সরিয়ে এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আনয়নের প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলেন। এর জন্য তিনি একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথমে নানাভাবে তাদেরকে এর অসারতা বুঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের কাহিনী নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন–

"وَاِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ـ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ" ـ

"আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে স্মরণ কর যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছেন, আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে– যদি তোমরা জ্ঞান রাখ। নিঃসন্দেহে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা তো প্রতিমা পূজার পিছনে পড়ে রয়েছ। আর তোমরা মিথ্যা উপাস্যসমূহের সৃষ্টি করে রেখেছ। তোমরা যেসব গায়রুল্লাহর উপাসনা করছ তারা তোমাদেরকে রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই রিজিক অনুসন্ধান কর তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর শুকরিয়া আদায় কর। কেননা তাঁর নিকটই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর যদি তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন কর তবে জেনে রাখ যে, [এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয় বরং] তোমাদের পূর্বেও বহু জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। রাসূলগণের দায়িত্ব তো হলো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সব বুঝানোর পরও যখন ঈমান আনল না এবং শিরকের পথ হতে ফিরে আসল না তখন তিনি আরও কঠোর হলেন। সম্প্রদায়ের লোকজন একদিন মেলায় চলে গেল। সুযোগ বুঝে তিনি তাদের কেন্দ্রীয় প্রতিমাঘরে গেলেন। প্রতিমাদেরকে প্রথমে খুব ভর্ৎসনা করলেন। অতঃপর বড় প্রতিমাটি ব্যতীত বাকি সব কয়টিকে কুঠারের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কুঠারটি বড় প্রতিমাটির স্কন্ধে রেখে চলে আসলেন। সম্প্রদায়ের লেকেরা এটা নিয়ে তার সাথে যথেষ্ট বিতর্ক করল। পরিশেষে একটি বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তথায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিক্ষেপ করল। হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর রহমতে সম্পূর্ণ নিরাপদে অগ্নি হতে বের হয়ে চলে আসলেন। তারপর আল্লাহর নির্দেশে স্বদেশ ইরাক ছেড়ে হিজরত করে সিরিয়া চলে যান।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপের ঘটনা : হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কওমের বার্ষিক মেলার দিন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেও তারা দাওয়াত করল। অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তিনি মেলায় যেতে অস্বীকার করলেন। প্রতিমারা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রাণের শত্রু। তিনি প্রতিমা ও তার প্রতিমা পূজারী গোত্র উভয়কেই মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন।

কওমের লোকেরা মেলায় অংশগ্রহণের জন্য শহরের বাইরে চলে গেল। সুযোগ বুঝে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাদের কেন্দ্রী প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করলেন। নানাভাবে প্রতিমাগুলোকে তিরস্কার করলেন। মেলায় যাওয়ার পূর্বে কওমের লোকেরা প্রতিমাদে সামনে নানা প্রকারে খাদ্য-দ্রব্য রেখে গিয়েছিল; ফিরে এসে বরকত হিসেবে খাওয়ার জন্য। হযরত ইবরাহীম (আ.) মূর্তিদে বললেন, "তোমাদের কি হয়েছে তোমরা খাচ্ছ না কেন?" পুনরায় বললেন, "কি ব্যাপার তোমাদের মুখে কথা সরছে না কেন?"

হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি কুঠার হাতে নিয়ে সব কয়টি মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। কেবল বড় মূর্তিটি বাকি রাখলেন কুঠারখানা বড় মূর্তিটির কাঁধে রেখে দিলেন। লোকজন মেলা হতে ফিরে আসার পূর্বেই বাড়ি ফিরলেন।

মেলা হতে লোকজন ফিরে এসে যখন তাদের প্রতিমাদের অবস্থা দেখল তখন তারা এর উৎস খুঁজতে শুরু করল। সকলের মু একই কথা কার এত বড় স্পর্ধা? কে মূর্তিদের সাথে এরূপ আচরণ করেছে? সমবেত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠল ইবরাহীম (আ.) নামের এক যুবক মূর্তিদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে থাকে। সম্ভবত এটা তার কাজ।

যা হোক, তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে জনসমক্ষে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করল। তারা বলল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমাদের মূর্তি (মাবুদ) দের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ? হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, "বরং তাদের বড় জনই ত করেছে। তাদেরকে জিজ্ঞেসা কর, যদি তারা কথা বলতে পারে।" ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তর শুনে তাদের মধ্যে কিছুট অনুশোচনা ও উপলব্ধির সৃষ্টি হলেও মূর্তিপূজা পরিহারের সৎ সাহস হলো না। হযরত ইবরাহীম (আ.) আরও বললেন- "তোমর কি এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে এমন বস্তুর পূজা করবে যারা না তোমাদের উপকার করতে পারে আর না ক্ষতি করতে পারে; তোমাদের জন্য এবং তোমাদের মাবুদদের জন্য আফসোস, তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই?"

পরিশেষে তারা পরামর্শ করল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে কি শাস্তি দেওয়া যায়? কেউ কেউ বলল, তাকে হত্যা করতে হবে। আবার অন্যান্যরা মত প্রকাশ করল যে, তাকে পুড়ে মারতে হবে। শেষ পর্যন্ত পুড়ে মারার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দীর্ঘদিন যাবৎ বিশাল লাকড়ির স্তূপ করা হলো। তারপর তাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ডিতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নিক্ষেপ করা হলো। তামাশা দেখার জন্য জমায়েত হলো হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে হযরত ইব্রাহীম (আ.) রক্ষা পেলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ আমি আগুনকে বললাম, হে আগুন! ইবরাহীমের জন্য শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাও।

হযরত ইবরাহীম (আ.) নিরাপদে আগুন হতে বের হয়ে আসলেন। আল্লাহর কুদরতের জাজ্বল্যমান প্রকাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও পাপিষ্ঠ কওমের চোখ খুলল না। তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল না।

উক্ত ঘটনা হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কোনো দ্রব্যের স্বাভাবিক গুণ রহিত করে দিতে পারেন; বরং তার স্বাভাবিক গুণের বিপরীত গুণ তা হতে প্রকাশ করাতে পারেন- "إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

আল্লাহর বাণী "فَقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا" -এর ব্যাখ্যা : মূর্তি ভাঙ্গার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যখন লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে জনসমক্ষে হাজির করল, তখন তিনি মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে এমন শাণিত ও জোরালো বক্তব্য পেশ করলেন যে, তারা তার কোনো যুক্তি সঙ্গত জবাব দিতে পারল না। সাধারণত মানুষ যখন কোনো বিষয়ে যুক্তি পেশ করতে অপারগ হয় তখন শক্তির পথ বেছে নেয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কওমের ব্যাপারেও তাই ঘটল। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সপ্রমাণ বক্তব্যকে খণ্ডন করতে না পেরে তারা নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করল। তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল- "ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ" তার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর এবং তাকে তাতে নিক্ষেপ কর।

কিভাবে সেই অগ্নিকুণ্ড বানানো হয়েছিল কুরআনে কারীমে তার বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে এতদবিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, কাফেররা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে পাথর দ্বারা একটি দেয়া [বেষ্টনী] উঠিয়েছিল। তার উচ্চতা ছিল ত্রিশ গজ এবং পরিধি ছিল বিশ গজ। তা লাকড়ি দ্বারা ভর্তি করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অত্র আয়াতে আগুনের স্তূপকে جَحِيم বলা হয়েছে। ইমাম মুজাজ (র.) বলেছেন- আগুনের উপর আগুনের স্তূপকে جَحِيم বলে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ কঠিন মুহূর্তে তাঁর প্রভুকে স্মরণ করলেন। একমাত্র তার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহর অসীম রহমত ও কুদরতে আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে গেল। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্য সাপেবর হলো।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করার ফায়দা : এখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করার পিছনে দু'টি ফায়েদা থাকতে পারে।

১. মক্কার কুরাইশদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর মতাদর্শ ও আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া মক্কার মুশরিক (কুরাইশ)-রা নিজেদেরকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরি বলে দাবি করত। সুতরাং তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তো খাঁটি একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিমা পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ তোমরা মূর্তি পূজায় আপাদমস্তক ডুবিয়ে রয়েছ। সুতরাং কোন মুখে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকারী দাবি করছ? হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সত্যিকার উত্তরাধিকারী হতে হলে তোমাদের নিখাদ তাওহীদে বিশ্বাসী হতে হবে, মূর্তি পূজা বর্জন করতে হবে।

২. হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ -এর দাওয়াত এক অভিন্ন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মূর্তি পূজা পরিত্যাগের জন্য আহ্বান করছেন। ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দাওয়াত গ্রহণে তথা পৌত্তলিকতাকে পরিহার করে একত্ববাদকে গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করেছিল। তারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বিজয়ী করেছিলেন। তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তোমরা যদি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দাওয়াত গ্রহণ না কর, তার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠ, তা হলে তোমাদেরকেও ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে। এতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর কোনো ক্ষতি হবে না। যেমনভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তার মুশরিক কওমের মধ্যে ঘটেছিল।

"قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন- "وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ" হযরত ইব্রাহীম (আ.) বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট যাচ্ছি, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

অত্র আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) আগুন হতে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আমার প্রতিপালকের একত্ববাদ প্রচার করার ফলে আজ গোটা জাতি আমার দুশমনে পরিণত হয়ে গিয়েছে। অথচ তাদের সাথে আমার বৈষয়িক কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কাজেই আমি এখন আমার রবের হয়ে গিয়েছি। তিনি আমাকে যথায় যাওয়ার নির্দেশ দেন আমি তথায় চলে যেতে এক পায়ে খাড়া। এ নির্দয় মুশরিক কওমের দেশে আর আমি থাকতে চাই না। তাদের অসৎ সঙ্গ হতে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর কওম হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে উক্ত উক্তি করেছিলেন। কেননা এত বৎসরের সাধনার পর একমাত্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ.) ছাড়া কেউই তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি।

মুফতি শফী (র.) মা'আরিফুল কুরআনে বলেন, "এখানে আল্লাহ তা'আলার দিকে যাওয়ার অর্থ হলো দারুল কুফর পরিত্যাগ করে আমার রব আমাকে যেথায় যাওয়ার হুকুম করেন আমি সেথায় চলে যাব। তথায় যেয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করব। সুতরাং তিনি বিবি সারা ও ভাতিজা হযরত লূত (আ.)-কে সঙ্গে করে ইরাকের বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করে সিরিয়া চলে যান।

তাফসীরে যিলালের গ্রন্থকার (র.) বলেন, এটা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর হিজরত পূর্ব প্রতিক্রিয়া। যে সময় তিনি দীর্ঘ অতীতের সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তখন তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, মাতা-পিতা, বাড়ি-ঘর, দেশ-মাটি সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল অবশ্যই তাঁর রব তাকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিবেন। তাঁর ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দিবেন। যথায় তিনি নির্বিঘ্নে তাঁর ঈমান-আকীদার হেফাজত করতে পারবেন, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে পারবেন। মনের সেই গভীর প্রত্যাশায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

" إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّيْ " **আয়াত হতে নির্গত মাসআলা :** আলোচ্য আয়াত তথা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, যেথায় দীন ঈমানের হেফাজত করা যায় না, দীনের দাওয়াত প্রদান করতে গেলে জীবন নাশের হুমকি আসে তথা হতে হিজরত করে তুলনামূলক নিরাপদ জায়গায় যাওয়া জায়েজ। কেননা উপরিউক্ত অবস্থায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) স্বদেশ ত্যাগ করে সিরিয়া চলে গেছেন।

আয়াতের ব্যাখ্যা : সিরিয়া গমনের পূর্ব পর্যন্ত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। যখন তিনি নিজের দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন সব ছেড়ে সিরিয়া পৌঁছলেন তখন তিনি অনেকটা একাকীত্ব অনুভব করলেন। তাঁর সাথে একমাত্র বিবি সারা ও ভাতিজা লূত (আ.) ব্যতীত আর কেউই ছিলেন না। এ সময় তাঁর মনে সন্তান লাভের বাসনা জাগল। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনো বাক্যে দোয়া করলেন– "رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ" হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একজন সুসন্তান দান করুন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। তাঁকে একজন সুসন্তানের শুভ সংবাদ দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে– "فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ" সুতরাং আমি তাঁকে একজন ধৈর্যশীল সন্তানের খোশখবর দিলাম।

حَلِيْمٌ (ধৈর্যশীল) বলে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সন্তান তার জীবনে এমন ধৈর্যের পরিচয় দিবেন এবং বিচক্ষণতা দেখাবে যে, পৃথিবী তার উপমা উপস্থাপন করতে পারবে না।

উক্ত সন্তান জন্মলাভের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হচ্ছে– হযরত সারা দেখলেন যে, তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি হচ্ছে না। তিনি ভাবলেন যে, তিনি বন্ধ্যা– তার কোনো সন্তান-সন্ততি হবে না। এদিকে মিশরের প্রেসিডেন্ট তার কন্যা হাজেরাহকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করলেন। হযরত সারা (আ.) হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়ে দিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) হাজেরাকে বিবাহ করলেন। এ হাজেরা (আ.) উদর হতেই সেই প্রতিশ্রুত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আর তিনিই হলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। যিনি আজীবন মহা ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিলেন।

" وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ " আয়াতে مَا শব্দটি কয় অর্থে হতে পারে? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর মূর্তিপূজারী কওমকে নসিহত করতে যেয়ে বলেছেন– "وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ" অর্থাৎ [তোমরা কেন প্রতিমাদের পূজা কর? অথচ] আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তাকে সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য আয়াতে مَا অব্যয়টি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবকাশ রাখে।

১. مَا ইসমে মাওসূল (তথা اَلَّذِيْ)-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ "خَلَقَ الَّذِيْ تَصْنَعُوْنَهٗ" যা তোমরা তৈরি কর তার স্রষ্টাও মূলত তিনিই।

২. مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ হবে। অর্থাৎ خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ اَعْمَالَكُمْ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আমলকেও সৃষ্টি করেছেন। উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে বান্দার আমলের সৃষ্টিকর্তাও মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা। বান্দা নিজে নয়। আর এটাই গ্রহণীয় মাযহাব।

৩. مَا শব্দটি اِسْتِفْهَامٌ-এর অর্থে হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامٌ ও হবে تَوْبِيْخٌ বা ভর্ৎসনার জন্য, অর্থাৎ "وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَاَيَّ شَيْءٍ تَعْمَلُوْنَ" আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর যা তোমরা করছ?

৪. مَا শব্দটি এখানে نَفِيْ-এর অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে– কাজের মূলকর্তা তোমরা নও, তোমরা মূলত কিছুই করতে সক্ষম নও।

" فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ " আয়াতখানা একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট– তা কি? আল্লাহর বাণী "فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ" বাক্যটি একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আর তা হলো "فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ" সুতরাং আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করলাম। –[কাবীর, জালালাইনের হাশিয়া]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠٢. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ اَىْ اَنْ يَّسْعٰى مَعَهُ وَيُعِيْنُهُ قِيْلَ بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَقِيْلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَنَةً قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْٓ اَرٰى اَىْ رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّىْٓ اَذْبَحُكَ وَ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ حَقٌّ وَاَفْعَالُهُمْ بِاَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط مِنَ الرَّأْيِ شَاوَرَهٗ لِيَاْنَسَ بِالذَّبْحِ وَيَنْقَادَ لِلْاَمْرِ بِهٖ قَالَ يٰٓاَبَتِ التَّاءُ عِوَضٌ عَنْ يَاءِ الْاِضَافَةِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز بِهٖ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ عَلٰى ذٰلِكَ.

অনুবাদ :

১০২. অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো অর্থাৎ তাঁর সাথে চলাফেরা করতে পারে এবং তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর বয়স ছিল সাত বৎসর কারো কারো মতে তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তের বৎসর। তিনি বললেন, হে আমার প্রিয় পুত্র, আমি দেখি অর্থাৎ আমি স্বপ্নযোগে দেখেছি আমি তোমাকে জবাই করছি নবীগণের স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে। আর তাঁদের কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকে। সুতরাং ভেবে দেখ, তোমাদের কি মত? تَرٰى ফে'লটি এখানে رَاْى [অর্থাৎ মত] হতে উদ্ভূত। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সাথে পরামর্শ করেছেন যাতে সে জবাইয়ের প্রতি আগ্রহী হয় এবং তার ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, হে আমার পিতা! এখানে تَا অক্ষরটি ইযাফতের ى-এর পরিবর্তে হয়েছে। আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা করুন। আল্লাহ চাহে শীঘ্রই আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন সে ব্যাপারে।

١٠٣. فَلَمَّآ اَسْلَمَا خَضَعَا وَانْقَادَا لِاَمْرِ اللّٰهِ وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ صَرَعَهٗ عَلَيْهِ وَلِكُلِّ اِنْسَانٍ جَبِيْنَانِ بَيْنَهُمَا الْجَبْهَةُ وَكَانَ ذٰلِكَ بِمِنٰى وَاَمَرَّ السِّكِّيْنَ عَلٰى حَلْقِهٖ فَلَمْ تَعْمَلْ شَيْئًا بِمَانِعٍ مِنَ الْقُدْرَةِ الْاِلٰهِيَّةِ.

১০৩. যখন তাঁরা উভয়ে আত্মসমর্পণ করলেন– আল্লাহর আদেশের সামনে নত হলেন এবং আনুগত্য প্রদর্শন করলেন এবং তাকে কাত করিয়ে [এক পাশের উপর] শায়িত করলেন এক পাশের উপর তাকে শোয়ায়ে দিলেন। আর প্রত্যেক মানুষের সম্মুখভাগের দুটি অংশ থাকে, যার মাঝখানে থাকে ললাট। আর এ ঘটনাটি মিনায় সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ইসমাঈলের গলদেশে ছুরি চালালেন। কিন্তু ছুরি কোনো কাজই করল না। আল্লাহর কুদরতে পক্ষ হতে প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে।

١٠٤. وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ.

১০৪. তখন আমি তাকে আহ্বান করলাম, হে ইবরাহীম।

١٠٥. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ج بِمَا اَتَيْتَ بِهٖ مِمَّا اَمْكَنَكَ مِنْ اَمْرِ الذَّبْحِ اَىْ يَكْفِيْكَ ذٰلِكَ فَجُمْلَةُ نَادَيْنٰهُ جَوَابُ لَمَّا بِزِيَادَةِ الْوَاوِ اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ بِامْتِثَالِ الْاَمْرِ بِاِفْرَاجِ الشِّدَّةِ عَنْهُمْ.

১০৫. তুমি তো অবশ্যই স্বপ্নাদেশ বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। জবাই করার যা ক্ষমতা তোমার ছিল তা প্রয়োগ করে। অর্থাৎ এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং "نَادَيْنٰهُ" (আমি তাকে আহ্বান করেছি।) বাক্যটি অতিরিক্ত واو সহযোগে لَمَّا-এর জবাব হয়েছে। নিশ্চয় আমি তদ্রূপ যদ্রূপ তোমাকে প্রতিদান দিয়েছি– প্রতিদান দিয়ে থাকি সদ্ব্যবহারকারীদেরকে নিজের নাফসের সাথে [আল্লাহর] আদেশ পালন করত তাদের হতে মসিবতকে লাঘব করত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠٦. اِنَّ هٰذَا الذَّبْحَ الْمَامُوْرَ بِهٖ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ اَىِ الْاِخْتِبَارُ الظَّاهِرُ . ১০৬. নিশ্চয় এটা আদিষ্ট জবাই– অবশ্যই তা সুস্পষ্ট পরীক্ষা অর্থাৎ প্রকাশ্য পরীক্ষা।

তাহকীক ও তারকীব

আল্লাহর বাণী "يَا اَبَتِ"-এর মহল্লে ই'রাব কি? يَا اَبَتِ বাক্যাংশটুকু মূলত ছিল "يَا اَبِىْ" (হে আমার পিতা!) এখানে تَ অক্ষরটি "ى" মুতাকাল্লিম-এর পরিবর্তে হয়েছে। সুতরাং এটা مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর স্থলে হয়েছে। يَا হরফে নেদা। এটা اُدْعُوْ (বা اَطْلُبُ)-এর অর্থে হয়ে থাকে। কাজেই اَبَتِ (বা اَبِىْ) اَطْلُبُ ফে'লের مَفْعُوْلٌ হয়ে মহল্লে মানসূব হয়েছে।

এখানে يَا হরফে নিদা اَبَتِ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مُنَادٰى হয়েছে। نِدَاءٌ ও مُنَادٰى মিলে قَالَ ফে'লের مَفْعُوْلٌ হয়েছে। সুতরাং বাক্যটি مَفْعُوْلٌ হয়ে مَنْصُوْبٌ-এর মহল্লে হয়েছে।

"جَوَابُ الخ فَجُمْلَةُ نَادَيْنَاهُ" বক্তব্য দ্বারা গ্রন্থকার (র.) কি বুঝিয়েছেন? জালালাইনের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, "وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ" বাক্যটি পূর্ববর্তী لَمَّا-এর জবাব হয়েছে। তবে এখানে وَاوٌ অক্ষরটি অতিরিক্ত হয়েছে। সুতরাং فَلَمَّا اَسْلَمَا الخ শর্ত আর نَادَيْنَاهُ الخ জবাব (বা জাযা)। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়াহ হয়েছে।

আর واو কে যদি অতিরিক্ত ধরা না হয়, তা হলে এটা স্বতন্ত্র বাক্য হবে। এমতাবস্থায় لَمَّا-এর জবাব বিলুপ্ত হবে।

"اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ" আয়াতের মধ্যকার كَذٰلِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কি? আলোচ্য আয়াতে كَذٰلِكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো ঐ সকল নিয়ামত ও প্রতিদান যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যেরূপ প্রতিদান দিয়েছি আমার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে আমি অনুরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকি। (كَمَا جَزَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ (ع) وَلِدُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ) এ স্থলে جَزَاءُ اِبْرَاهِيْمَ হলো مُشَبَّهٌ بِهٖ আর جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ হলো مُشَبَّهٌ এবং كَافٌ হরফে তাশবীহ ও اِطَاعَةُ اللّٰهِ [আল্লাহর আনুগত্য ও ইখলাস] হলো ওয়াজহে তাশবীহ।

"تَرٰى" শব্দটির বিভিন্ন কেরাত : فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى আয়াতের মধ্যকার تَرٰى শব্দের মধ্যে দু'ধরনের কেরাত হতে পারে–

১. জমহুর কারীগণের অভিমত হলো, ت অক্ষরটি যবরের সাথে হবে।

২. ইমাম হামযাহ ও কিসায়ী (র.)-এর মতে, ت অক্ষরটি পেশ যোগে ও ر অক্ষরের নিচে যের দিয়ে تُرِىْ পড়বে।

"مَا تُؤْمَرُ بِهٖ" আয়াতের মধ্যকার مَا কোন অর্থে হয়েছে? আলোচ্য আয়াতাংশে مَا শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. مَا শব্দটি মাসদারের অর্থে হবে। এক্ষেত্রে مَا تُؤْمَرُ بِهٖ অর্থ হবে "اَلْمَامُوْرُ بِهٖ" [যা আপনি আদিষ্ট হয়েছেন]।

২. مَا শব্দটি মাওসূফা হবে এবং পরবর্তী বাক্যটি তার সিফাত হবে।

"وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ" আয়াতের মধ্যকার لَامٌ টি কোন অর্থে হয়েছে? আলোচ্য আয়াতের মধ্যকার لِلْجَبِيْنِ-এর لَامٌ অক্ষরটি عَلٰى অর্থে হয়েছে, অর্থাৎ তাকে কপালের এক পার্শ্বের উপর শুয়ে দিয়েছিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ .... إِنِّي أَذْبَحُكَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে চলাফেলা করার মতো বয়সে উপনীত হলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রকে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করতেছি।

কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় হযরত ইব্রাহীম (আ.) উপর্যুপরি তিন দিন উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর সর্বসম্মভাবে নবীগণের স্বপ্ন ওহী। সুতরাং উক্ত স্বপ্নের মর্মার্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে জবাই করেন।

স্বপ্নযোগে কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেন? আল্লাহ তা'আলা তো কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে সরাসরি উপরিউক্ত নির্দেশ তথা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ হযরত ইব্রাহীমের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে স্বপ্নযোগে কেন উক্ত নির্দেশ প্রদান করলেন? মুফাস্সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. যাতে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়। স্বপ্নযোগে প্রদত্ত নির্দেশে তাবীল [অপব্যাখ্যা] করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাবীলের আশ্রয় গ্রহণ না করে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিয়েছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা এখানে মূলত হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জবাই হওয়ার কামনা করেননি; বরং জবাইয়ের আয়োজন চেয়েছিলেন মাত্র। সুতরাং উপরিউক্ত নির্দেশ যদি মৌখিক দেওয়া হতো, তাহলে তাতে পরীক্ষা হতো না। কাজেই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে জবাই করেছেন। আর এতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বুঝেছিলেন যে, জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি জবাইয়ের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও হয়ে গেল এবং স্বপ্নও সত্য হলো। যদি তাঁকে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হতো, তাহলে এটা হয়তো পরীক্ষা হতো নতুবা নির্দেশটিকে পরবর্তীতে মানসূখ (রহিত) করতে হতো। পরীক্ষাটি কতইনা কঠিন ছিল! এ দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ" যে পুত্র সন্তানটিকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর নিকট হতে আরজু করে নিয়েছিলেন তাকে কুরবানি করার নির্দেশ তখন আসল যখন ছেলেটি পিতার সাথে চলাফেরা করার যোগ্য হয়েছিল। লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করার পর তখন সে পিতার সাহায্যকারী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিল মাত্র। কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, তখন তার বয়স হয়েছিল তের বৎসর। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ইসমাঈল (আ.) তখন বালেগ হয়ে গিয়েছিলেন।

"فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى" **আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্রের সাথে পরামর্শ করলেন কেন?** আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর মতামত জানতে চেয়েছেন। তাঁর সাথে এতদ্বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে যেয়ে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সাথে পরামর্শ করতে গেলেন কেন? এখানে ইসমাঈল (আ.)-এর মতামত চাওয়ার প্রয়োজনই বা কি ছিল?

এর জবাবে মুফাস্সিরগণ দু'টি কারণের উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বীয় পুত্রের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন যে, পুত্র পরীক্ষায় কতটুকু কৃতকার্য হয়।

২. নবীগণের চিরন্তন নীতি এই ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা তৈরি থাকতেন। কিন্তু এ আনুগত্যের ব্যাপারে সর্বদা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন যা হিকমত মাফিক ও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হতো। যদি ইব্রাহীম (আ.) পূর্ব হতে কিছু না বলে পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন, তাহলে তা পিতা-পুত্র উভয়ের জন্যই সংকটের সৃষ্টি করত। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আ.) ব্যাপারটি পুত্রের নিকট পরামর্শ ও মতামত চাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করত এ জন্য পেশ করেছেন যে, পুত্র পূর্ব হতে তা যে আল্লাহর নির্দেশ তা অবগত হয়ে জবাই হওয়ার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবে। তা ছাড়া পুত্রের মনে যদি কোনো সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয় তাও বুঝিয়ে শুনিয়ে নিরসন করা যাবে। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) তো ছিলেন খলিলুল্লাহর পুত্র এবং নবীর পদে তার নিয়োগ ছিল মাত্র সময়ের ব্যাপার। তিনি বললেন, আপনি আপনার আদিষ্ট কর্ম শীঘ্রই পালন করুন।

Free @ www.eilm.weebly.com

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মতামত এ জন্য জানতে চাননি যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। নবীর ব্যাপারে এরূপ কল্পনাও করা যায় না।

اَذْبَحُكَ -এর অর্থ এবং তারবিয়াহর দিনগুলোকে তারবিয়াহ নামকরণের কারণ : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ইরশাদ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন– "اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ" "আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি তোমাকে জবাই করছি।" এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বক্তব্য– "انى اذبحك" আমি তোমাকে কুরবানি (জবাই) করছি, এর দুটি অর্থ হতে পারে–

১. আমি জবাই বা কুরবানির কাজ করছি।

২. তোমাকে কুরবানি করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا" তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ। এর দ্বারা প্রথমোক্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর "اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ" তোমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা তুমি পালন কর। এর দ্বারা শেষোক্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, তারবিয়ার রাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে বলছে যে, হে ইব্‌রাহীম (আ.)! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার পুত্র কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ঘুম হতে জাগার পর হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ভাবতে লাগলেন সত্যিই কি আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁকে পুত্র কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে না শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে। পরবর্তী রাত্রিতেও তিনি অনুরূপ স্বপ্নে দেখলেন। তখন তার বিশ্বাস জন্মিল যে, আল্লাহর পক্ষ হতেই তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই স্বপ্ন তিনি তৃতীয় রাত্রেও দেখলেন। এরপর তিনি ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে পূর্ব হতে প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্য ব্যাপারটি তার সাথে আলোচনা করলেন। সুতরাং তাঁকে বললেন, "হে প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে কুরবানি করছি। চিন্তা করে দেখ তো এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি?"

যা হোক, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্বপ্নের তিনটি রাত্রির দিনকে তারবিয়ার দিন– "اَيَّامُ التَّرْوِيَةِ" হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার নির্দেশ প্রদানের হিকমত : আল্লাহ তা'আলা কেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন? এর মধ্যে বিরাট হিকমত ও রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর চরম ও পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে خَلِيْلُ اللّٰهِ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে উক্ত উপাধির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন নেক সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। তাকে একজন সৎ সন্তান দান করলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বৃদ্ধকালে পুত্র সন্তান পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খুশির সীমা রইল না। আল্লাহ তা'আলা এবার হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করতে চাইলেন যে, পুত্রের প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভালোবাসা বেশি, না আল্লাহ তা'আলার প্রতি। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে স্বপ্নযোগে নির্দেশ দিলেন, তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করার জন্য।

এ সুকঠিন পরীক্ষায় ও পরিশেষে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) পূর্ণাঙ্গভাবে সফলকাম হলেন। দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসাই যে তাঁর অন্তরে অধিক– পুত্র কুরবানিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আরেকবার তিনি তা প্রমাণ করলেন। ফলে তাঁর خَلِيْلُ اللّٰهِ উপাধি সার্থক হলো।

"يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বললেন, "আব্বাজান! আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– তা আপনি অতিশীঘ্র করে ফেলুন।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এর দ্বারা একদিকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) আত্ম উৎসর্গের এক নজিরবিহীন উদাহরণ পেশ করেছেন; অপরদিকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যল্প বয়সে তাঁকে আশ্চর্যজনক মেধাশক্তি ও ইলম দান করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর নিকট আল্লাহর নির্দেশের হাওলাও দেননি; বরং শুধুমাত্র একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) বুঝে ফেললেন যে, নবীগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। আর প্রকৃত পক্ষে ইহা আল্লাহর নির্দেশের একটি রূপ মাত্র। সুতরাং হযরত ইসমাঈল (আ.) উত্তরে স্বপ্ন না বলে আল্লাহর নির্দেশের কথা বলেছেন।

ওহীয়ে গায়রে মাতলু-এর দলিল : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা হাদীস অস্বীকারকারীদের মতবাদের অসারতা ও ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে থাকে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আ.) পুত্র কুরবানির নির্দেশ স্বপ্নযোগে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত ইসমাঈল (আ.) স্পষ্ট ভাষায় তাকে "আল্লাহর নির্দেশ" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং নবীগণের স্বপ্ন ও বাণীও ওহীর মর্যাদাপ্রাপ্ত।

"سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الخ" আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা : কুরবানির ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ.) তাঁর পিতাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আল্লাহ চাহে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। এখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর চরম শিষ্টাচার ও নম্রতা লক্ষণীয়–

প্রথমত ইনশাআল্লাহ বলে বিষয়টিকে আল্লাহর উপর হাওলা করে দিয়েছেন। এ হওয়ালার মধ্যে আত্ম গর্বের বাহ্যিক যে রূপটি প্রকাশিত হতে পারত তা দূর করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত তিনি এভাবেও বলতে পারতেন যে, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। কিন্তু তা না বলে তিনি বলেছেন– "আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" যার দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীতে ধৈর্যশীল আমি একা নই; বরং আমার ন্যায় আরও বহু ধৈর্যশীল রয়েছে। আমি শুধু তাদের জমাতে শামিল হতে চাই। –[রুহুল মা'আনী]

আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সবরকে সম্পৃক্ত করার কারণ : বরকত ও শক্তি হাসিলের জন্য হযরত ইসমাঈল (আ.) তার صَبْر বা ধৈর্যকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহ ব্যতীত না কোনো ভালো কাজ করা যায় আর না কোনো মন্দ কার্য হতে আত্মরক্ষা পাওয়া যায়।

"فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) যখন আল্লাহর আদেশের সামনে আত্মসমর্পণ করলেন এবং ইব্রাহীম (আ.) পুত্রকে কাত করে শোয়ায়ে দিলেন ....।

اَسْلَمَ শব্দের অর্থ হলো, ঝুঁকে যাওয়া, বাধ্যগত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যখন তাঁরা উভয়ে আল্লাহর আদেশের সামনে ঝুঁকে গেলেন, পিতা-পুত্রকে জবাই করার জন্য এবং পুত্র জবাই হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। এখানে لَمَّا -এর জবাবের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এসব প্রকাশিত হওয়ার পর কি এক আশ্চর্যজনক হৃদয়-বিদারক ঘটনার অবতারণা হয়েছে তা ভাষায় অবর্ণনীয়।

কতিপয় তাফসীরকারক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, শয়তান হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে বিভ্রান্ত করার জন্য তিন বার চেষ্টা করেছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করে শয়তানকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আজও হাজীগণ মিনাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করে।

পিতা-পুত্র যখন কুরবানি দেওয়ার জন্য মিনার নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে লক্ষ্য করে হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, পিতা! আপনি আমাকে কুরবানির পূর্বে শক্ত করে বেঁধে নিন। আপনার ছুরি ধারাল করে নিন। আর ইচ্ছা করলে আমার পরিত্যক্ত জামাটি আমার মায়ের নিকট পৌঁছে দিবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা প্রশান্তি লাভ করবেন। আর আম্মাকে আমার সালাম বলবেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন– "পুত্র! আল্লাহর নির্দেশ পূর্ণ করার ব্যাপারে তুমি আমার কতই না উত্তম সাহায্যকারী" এই বলে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে চুমু খেলেন এবং বেঁধে ফেললেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর কপালের এক পার্শ্বে তাঁকে শোয়ায়ে দিলেন। এখানে "وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ" -এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে এভাবে কাত করে শোয়ায়ে দিলেন যে, তার কপালের এক পার্শ্ব জমিনকে স্পর্শ করেছিল। অভিধানের দৃষ্টিতেও এ ব্যাখ্যা অগ্রগণ্য। কেননা আরবি ভাষায় কপালের দুই পাশকে جَبِيْن বলে। আর কপালকে বলে جَبْهَةٌ।

কিন্তু কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– "তাকে উপুড় করে জমিনে শোয়ায়ে দিলেন।"

মুহাক্কিকগণ উভয় বক্তব্যের মধ্যে তাতবীক বা সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে বলেছেন যে, প্রথমত হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কাত করিয়ে শোয়ায়ে ছিলেন। কিন্তু পরে যখন বারংবার ছুরি চালিয়ে কাবু করতে পারলেন না তখন উপুড় করে শোয়ায়ে দিলেন।

–[মা'আরিফ, মাযহারী, রূহুল মা'আনী]

"وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বললাম, হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নাদেশকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়েছ। আল্লাহর নির্দেশকে বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে তোমার যা করার ছিল তা তুমি করেছ। তোমার দায়িত্ব পালনে তুমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করনি। স্বপ্নে তো হযরত ইব্রাহীম (আ.) এটাই দেখিয়েছেন যে, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করছেন। এখন সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাকে ছেড়ে দাও।

"اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জবাই করার ঘটনা উল্লেখ করে পরিশেষে ইরশাদ করেছেন– "আমি মুখলিস বান্দাদেরকে অনুরূপভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি– পুরস্কৃত করে থাকি"। অর্থাৎ যখন আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেয়, নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে কুরবানি দিয়ে আল্লাহর হুকুম পালনে ব্রতী হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াবী বিপদ-আপদ হতে হেফাজত করেন। তদুপরি আখেরাতের ছওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٠٧. وَفَدَيْنٰهُ اَىِ الْمَامُوْرَ بِذَبْحِهٖ وَهُوَ اِسْمَاعِيْلُ اَوْ اِسْحَاقُ قَوْلَانِ بِذِبْحٍ بِكَبْشٍ عَظِيْمٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ الَّذِىْ قَرَّبَهُ هَابِيْلُ جَاءَ بِهٖ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَبَحَهُ السَّيِّدُ اِبْرَاهِيْمُ مُكَبِّرًا .

১০৭. আর আমি ছাড়িয়ে নিলাম তাকে অর্থাৎ যাকে জবাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল অথবা হযরত ইসহাক (আ.), এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। একটি মহান কুরবানির বিনিময়ে– দুম্বা, যা বেহেশত হতে পাঠানো হয়েছে। এটা সেই দুম্বা যাকে হাবীল কুরবানি স্বরূপ পেশ করেছেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে নিয়ে এসেছেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহু আকবার বলে তাকে জবাই করেছেন।

١٠٨. وَتَرَكْنَا اَبْقَيْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ثَنَاءً حَسَنًا .

১০৮. আর আমি অবশিষ্ট রেখেছি– বাকি রেখেছি তার ব্যাপারে পরবর্তীদের মধ্যে উত্তম প্রশংসা।

١٠٩. سَلَامٌ مِنَّا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ .

১০৯. শান্তি আমার পক্ষ হতে ইবরাহীমের উপর।

١١٠. كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ .

১১০. তদ্রূপ-যদ্রূপ আমি তাকে প্রতিদান দিয়েছি– প্রতিদান দিয়ে থাকি– সদ্ব্যবহারকারীদেরকে– নিজেদের নফসের সাথে।

١١١. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ .

১১১. নিশ্চয় সে আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত।

١١٢. وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ اُسْتُدِلَّ بِذٰلِكَ عَلٰى اَنَّ الذَّبِيْحَ غَيْرُهٗ نَبِيًّا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ يُوْجَدُ مُقَدَّرًا نُبُوَّتُهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

১১২. আর আমি শুভ সংবাদ দিয়েছি তাকে (পুত্র) ইসহাকের– এটা হতে প্রমাণ করা হয় যে, অন্য জনকে কুরবানি করা হয়েছে। নবীরূপে এটা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ (نَبِيًّا) হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব এমতাবস্থায় হবে যে, তার নবুয়ত নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। (আর) সে সৎকর্মশীলদের একজন হবে।

١١٣. وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ بِتَكْثِيْرِ ذُرِّيَّتِهٖ وَعَلٰى اِسْحٰقَ ط وَلَدِهٖ بِجَعْلِنَا اَكْثَرَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَسْلِهٖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ مُؤْمِنٌ وَّظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ كَافِرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْكُفْرِ .

১১৩. আর আমি তাঁকে বরকত দান করেছি– তাঁর সন্তানসন্ততি প্রবৃদ্ধির আধিক্যের মাধ্যমে এবং ইসহাককেও (যিনি) তাঁর সন্তান। অধিকাংশ নবী তাঁর বংশ হতে নির্ধারণ করার মাধ্যমে। আর তাঁদের উভয়ের সন্তানসন্ততিতে কতক সৎকর্মশীল– ঈমানদার এবং কতক স্বীয় নাফসের উপর জুলুমকারী কাফের স্পষ্টরূপে– যাদের কুফর সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি বড় কুরবানি দান করেছি। বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) উক্ত আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকালেন। তখন দেখলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) একটি দুম্বা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কতিপয় বর্ণনামতে এটা সেই দুম্বা ছিল যা হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র হাবীল কুরবানি হিসেবে পেশ করেছিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যা হোক এ জান্নাতী দুম্বা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে দান করা হয়েছে, আর তিনি হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে তাকে জবাই করেছেন। তাকে এ জন্য عَظِيْم (মহান) বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। তা ছাড়া তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়-এর অবকাশ নেই। -[মা'আরিফ]

যাবীহ-এর ব্যাপারে মতপার্থক্য এবং অগ্রগণ্য মাযহাব : উপরে আয়াতসমূহের তাফসীর এ নিরিখে করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যে পুত্র কুরবানি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে ছিল হযরত হযরত ইসমাঈল (আ.)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক ও মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং-

(ক) হযরত ওমর (রা.), আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), আব্বাস (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার (রা.), সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.), কাতাদাহ (রা.), মাসরূক (র.), ইকরামাহ (র.), আতা (র.), মুকাতেল (র.), যুহরী (র.) ও সুদ্দী (র.) প্রমুখ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুসলিম মনীষীগণের মতে যবীহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)।

(খ) অপরদিকে হযরত ইবনে ওমর (রা.), আবূ হুরায়রাহ (রা.), আবূ তোফায়েল (র.), সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.), হাসান বসরী (র.), মুজাহিদ (র.), ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.), শা'বী (র.), মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কারজী (র.) তথা জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে যবীহ ছিলেন হযরত ইসমাইল (আ.)।

পরবর্তী মুফাস্সিরগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী (র.)ও প্রথমোক্ত মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপরদিকে হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) ও অন্যান্যগণ শেষোক্ত মাযহাবকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা কঠোরভাবে প্রথমোক্ত মাযহাবের প্রতিবাদ করেছেন।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সাহাবী ও তাবেয়ীনের মধ্যে কতিপয় এমন ব্যক্তিগণ রয়েছেন যাদের হতে পরস্পর বিরোধী মতামত বর্ণিত হয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আলী (রা.), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.), হাসান বসরী (র.) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ। সম্ভবত তারা একেক সময় একেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

যা হোক, কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গি এবং হাদীস ও ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যে পুত্র জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। এ মতের পক্ষে প্রসিদ্ধ দলিলসমূহ নিম্নরূপ-

১. কুরআন মাজীদে সে পুত্রের কুরবানির পূর্ণাঙ্গ ঘটনা পেশ করার পর বলা হয়েছে- وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ [আমি অতঃপর তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছি যিনি নবী ও সালিহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এটা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যে পুত্রকে কুরবানি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি অবশ্যই ইসহাক ভিন্ন অন্য কেউ হবেন। যার কুরবানির ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর হযরত ইসহাক (আ.)-এর জন্মের খোশখবর দেওয়া হয়েছে।

২. হযরত ইসহাক (আ.) সম্পর্কীয় উক্ত খোশখবরে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি নবী হবেন। তা ছাড়া অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, হযরত ইসহাকের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ঔরষে হযরত ইয়াকূব (আ.) জন্মগ্রহণ করবেন। فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ আমি সারাকে ইসহাকের সুসংবাদ পাঠালাম এবং ইসহাকের ঔরষে ইয়াকূবের জন্মলাভের কথাও জানিয়ে দিলাম। এটা হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বড় হবেন। এমনকি তাঁর আওলাদ হবে। সুতরাং বাল্যকালে নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়ার কি অর্থ হতে পারে? আর যদি বাল্যকালে নবুয়ত লাভের পূর্বেই তাঁকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হতো তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ.) বুঝে ফেলতেন যে, অদ্যাবধি তো সে নবুয়ত পায় নি এবং তার ঔরষে হযরত ইয়াকূবও জন্মলাভ করেনি। কাজেই জবাইয়ের মাধ্যমে তার মৃত্যু হতে পারে না। এটা তো স্পষ্ট এমতাবস্থায় তা না কোনো বড় পরীক্ষা হতো আর না তা সম্পন্ন করার দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রশংসার পাত্র হতে পারতেন। পরীক্ষা তো তখনই হতে পারে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) মনে করতেন যে, জবাই করার দ্বারা আমার এ সন্তান খতম হয়ে যাবে। আর এ মানসিকতা নিয়েই তিনি কুরবানি করতে উদ্যত হবেন। সুতরাং এটা কেবল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ব্যাপারেই সত্য প্রতিপন্ন হতে পারে। কেননা না তার নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আর না দীর্ঘজীবি হওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. কুরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গি হতে প্রতীয়মান হয় যে, যে পুত্রের কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে হলো হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র। কেননা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ইরাক হতে হিজরত করে যাওয়ার সময় একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন। উক্ত দোয়ার জবাবে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে حَلِيْمٌ অর্থাৎ অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, উক্ত ছেলে যখন তার পিতার সাথে চলা-ফেরা করার বয়সে উপনীত হলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জবাই করার জন্য স্বপ্নযোগে নির্দেশ দিলেন। ঘটনার এ ধারাবাহিকতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ছেলেটি ছিল হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র। আর সর্বসম্মতভাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। অথচ হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। কাজেই এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই ছিলেন যাবীহ।

৪. এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত যে, কুরবানির উক্ত ঘটনাটি মক্কার আশেপাশে সংঘটিত হয়েছে। কেননা তা তো সংঘটিত হয়েছে মিনায়। তা ছাড়া যুগ যুগ ধরে হজের মওসুমে মক্কায় কুরবানি করার প্রথা চালু রয়েছে। যে দুম্বাটিকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে জবাই করেছেন তার শিং কা'বা শরীফে ঝুলন্ত রয়েছিল। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.)-এর সমর্থনে একাধিক বর্ণনার হাওলা দিয়েছেন। হযরত আমের শা'বী (র.) বলেছেন– "আমি নিজে কা'বা শরীফে উক্ত শিং দেখেছি।"

সুফিয়ান সাওরী (র.) বলেছেন, সেই দুম্বার শিং যুগ যুগ ধরে কা'বা শরীফে লটকানো ছিল। অতঃপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন বায়তুল্লাহে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তখন তা পুড়ে যায়। আর এটা তো জানা কথা যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই মক্কায় বসবাসরত ছিলেন, হযরত ইসহাক (আ.) নয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই যাবীহ ছিলেন।

৫. নবী করীম ﷺ একটি হাদীসে ইরশাদ করেছেন– "اَنَا ابْنُ الذَّبِيْحَيْنِ" 'আমি দুই যাবীহের পুত্র' হাদীসখানার তাৎপর্য হচ্ছে– হযরতের ﷺ আপন পিতা আব্দুল্লাহকে তার পিতা আব্দুল মুত্তালিব কুরবানির জন্য মানত করেছিলেন। অতঃপর তৎকালীন বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানী গুণীগণের পরামর্শক্রমে তাঁর প্রাণের বিনিময়ে একশত উট সদকা করেছিলেন। সুতরাং এক যাবীহ পাওয়া গেল। আর অনিবার্যভাবেই অপর যাবীহ হলেন হযরত ইসমাইল (আ.)। কেননা নবী করীম ﷺ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশের। আর অত্র হাদীসে নবী করীম ﷺ দ্বিতীয় যাবীহ দ্বারা সে ইসমাঈল (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা নিশ্চিত বলা যায়।

বিরোধীগণের দলিলসমূহের জবাব এবং যেসব মুসলিম মনীষী তাকে সমর্থন করে তাদের সংশয়ের নিরসন : যেসব সাহাবী, তাবেয়ী ও মুসলিম মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন যাবীহ তাদের বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে হাফিজ ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন–

এর গূঢ়-রহস্য তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে বাহ্যত যা প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে– এ সব বক্তব্যের উৎস হলো হযরত কা'বে আহবার। কেননা যখন তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে মুসলমান হলেন তখন হযরত ওমর (রা.)-কে তাঁর পুরানো কিতাব সমূহের বক্তব্য শুনাতে আরম্ভ করলেন। কোনো কোনো সময় হযরত ওমর (রা.) তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু তা হতে কেউ কেউ সুযোগ গ্রহণ করল। তারা ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে কা'বে আহবারের নিকট হতে যা শুনেছেন তাই বর্ণনা করে দিয়েছেন।

ইবনে কাছীরের উপরিউক্ত বক্তব্য বাস্তবিকই যথার্থ। কেননা হযরত ইসহাক (আ.)-কে মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই যাবীহ বলে দাবি ও প্রচার করে থাকে। বর্তমান বাইবেলে উক্ত জবাইয়ের ঘটনাটি নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

"এরপর আল্লাহ তা'আলা আবরাহাম (আ.)-কে পরীক্ষা করলেন এবং বললেন, হে আবরাহাম! তিনি বললেন, আমি উপস্থিত : আল্লাহ অতঃপর বললেন, তুমি তোমার পুত্র ইসহাক (আ.) যে তোমার "একমাত্র সন্তান" এবং যাকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ কর। তাকে নিয়ে সুরিয়া দেশে চলে যাও এবং তথায় একটি পাহাড়ে– যেই পাহাড়ের কথা আমি তোমাকে বলে দিব তথায় কুরবানি হিসেবে পেশ করে দাও।"

Free @ www.e-ilmweebly.com

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইহুদিরা স্বজন-প্রীতি করতে যেয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে হযরত ইসহাক (আ.)-এর নামোল্লেখ করেছেন। তারা মূল তাওরাতের ভাষা বিকৃত করেছেন। কেননা এখানেই তাকে একমাত্র সন্তান বলা হয়েছে। অথচ একমাত্র সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) নন। কেননা সর্বসম্মতভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রথম সন্তান এবং তাঁর জন্ম হয়েছিল হযরত ইসহাক (আ.)-এর বহু পূর্বে। খোদ বর্তমানের বাইবেল হতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাফিজ ইবনে কাছীর (র.) বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার জন্য আরও লেখেন–

ইহুদিদের পবিত্র কিতাবসমূহে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বৎসর। অপরদিকে যখন হযরত ইসহাক (আ.) জন্মলাভ করেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বয়স হয়েছিল একশত বৎসর। তাদের কিতাবে আরও উল্লেখ আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে তাঁর একমাত্র সন্তান জবাই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক নসখায় [সংস্করণে] "একমাত্র"-এর পরিবর্তে "প্রথম সন্তান" কথাটির উল্লেখ রয়েছে। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদিরা এখানে– "ইসহাক" শব্দটি নিজেদের পক্ষ হতে মনগড়াভাবে জুড়ে দিয়েছে। আর এর কারণ হচ্ছে– হযরত ইসহাক (আ.) ছিলেন ইহুদিদের পরদাদা। অপরদিকে হযরত ইসমাঈল (আ.) ছিলেন আরবদের পরদাদা।

হাফেজ ইবনে কাছীর এতদ্বিষয়ে আরও একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর খেলাফতের যুগে এক ইহুদি আলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কোন সন্তানকে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! খোদার কসম, তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। ইহুদিরা তা ভালোভাবেই জানে। তবে আরবদের প্রতি ঈর্ষার দরুন তারা ইসহাকের নাম প্রচার করে থাকে।

উপরিউক্ত প্রমাণাদির দ্বারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই ছিলেন যাবীহ।

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ.

আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো এমন কিছুর নির্দেশ দেন মূলত যার বাস্তবায়ন চান না: আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নযোগে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার জন্য। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করতে উদ্যত হলেন, এমনকি পুত্রের গলায় ছুরি চালাতে আরম্ভ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আর তা কার্যকর করতে দিলেন না। সুতরাং এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মাঝে-মধ্যে এমন কিছু নির্দেশ দেন মূলত যা সংঘটিত হওয়া কামনা করেন না। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতও তা-ই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানি হওয়া যখন আল্লাহ তা'আলা চাননি তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে তা করার জন্য নির্দেশ দিলেন কেন?

মুফাসসিরগণ এর জবাবে বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র যাকে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনে পেয়েছেন– বহু আবেদন-নিবেদন করত যাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে চেয়ে নিয়েছেন তাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানি করতে প্রস্তুত কিনা তা যাচাই করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর সেই পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আ.) যে একশত ভাগই সফল হয়েছেন তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তবায়নের পূর্বেই হুকুম রহিত হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আলিমগণের মতামত বর্ণনা কর : আলোচ্য আয়াত হতে সাব্যস্ত হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করার পূর্বেই জবাইয়ের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পরিবর্তে একটি জান্নাতী দুম্বা পাঠিয়েছিলেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকেই জবাই করেছেন। সুতরাং এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো হুকুম বাস্তবায়নের পূর্বেই রহিত হয়ে যেতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অধিকাংশ মুজতাহিদ ও ফকীহগণ উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু হানাফী ফকীহগণ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী অধিকাংশ আলিম ও মু'তাযেলীদের মতে বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে তথা অমলের সময় আসার পূর্বে কোনো হুকুম বা শরয়ী বিধান মানসূখ (রহিত) হতে পারে না।

উপরিউক্ত দলিলের জবাবে তারা বলেন যে, মূলত হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কুরবানি করার হুকুমই দেওয়া হয়নি, বরং হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখেছেন যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করছেন। আর বাস্তবেও তিনি তা করেছেন। যদিও কুদরতে ইলাহী প্রতিবন্ধক হওয়ার দরুন হযরত ইসমাঈল (আ.) মৃত্যুবরণ করেননি।

"وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ" আর তাঁর ব্যাপারে আমি পরবর্তী লোকদের মধ্যে উত্তম প্রশংসার প্রথা চালু করে রাখলাম।

আয়াতে এটা স্পষ্ট উল্লেখ নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কি অবশিষ্ট রেখেছেন? সুতরাং মুফাস্‌সিরগণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী লোকজনদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্য উত্তম প্রশংসার প্রবর্তন করে রেখেছেন। সুতরাং সকল আহলে কিতাবই তার উপর সালাম পৌঁছায় ও তার জন্য দোয়া করেন।

২. আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর উপর সালাম পাঠানোর প্রচলন রেখেছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার বিপদ-আপদ হতে তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং তাকে দুর্নাম হতে হেফাজত করেছেন।

আর হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছিলেন– "وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ" আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য সত্য কথনের প্রচলন রাখুন। উক্ত দোয়া কবুল করত আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

"كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আমি হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে যদ্রূপ প্রতিফল দান করেছি সৎলোক ও মুখলিস লোকদেরকে আমি অনুরূপভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। আর তাদের সীমাহীন বিপদাপদেও নিপতিত করি।

যারা 'ইহসান' (ইখলাস)-এর পথ গ্রহণ করে– আমার বন্ধুত্বের দাবি করে আমি তাদের উপর কঠিন পরীক্ষা চাপিয়ে দেই। আর তা তাদের অনাহূত দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করার জন্য নয়; বরং ক্রমান্বয়ে তাদের মর্যাদা উঁচু করার জন্যই এ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। যাতে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হতে পারে। আর পরীক্ষার কারণে যেসব বিপদ-আপদে তাদেরকে নিমজ্জিত করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সহজেই তা হতে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসি। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছিল। এমন কি তাঁর ন্যায় অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও সৎলোকদের ব্যাপারেও তা-ই ঘটে থাকে।

"وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর আওলাদের মধ্যে কিছু সৎলোকও রয়েছে। আবার এমন কিছু লোকজন রয়েছে যারা স্পষ্টত নিজেদের ক্ষতি করছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের এ ভ্রান্ত আকিদাকে খণ্ডন করেছেন যে, তারা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর আওলাদ হওয়ার মর্যাদাবান ও পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সৎলোকের সাথে সম্পর্ক থাকাই পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং পরিত্রাণ লাভের মূল ভিত্তি হলো আকিদা-বিশ্বাস ও আমল। খালেস আকিদা-বিশ্বাস ও সৎকর্মের গুণেই শুধুমাত্র মর্যাদাবান হতে পারে এবং আখেরাতে পরিত্রাণের আশা করতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবানির ঘটনা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যের প্রতিও পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর ঔরষ হতে দুটি বড় বড় জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত ইসহাক (আ.)-এর বংশধরগণ হলেন বনূ ইসরাঈল। তাদের হতে দুটি বড় ধর্মীয় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উদ্ভব হয়েছে। উক্ত দুটি ধর্ম পৃথিবীর এক বিশাল এলাকা দখল করে রেখেছে। অপর জাতি হলো বনূ ইসমাঈল তথা মক্কাবাসীগণ। কুরআন মাজীদ নাজিল হওয়ার সময় তারাই ছিল সমগ্র আরবের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। আর তাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন কুরাইশগণ। বস্তুত এ দু'টি জাতির ভাগ্যে যে মর্যাদা-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ হয়েছিল তা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উক্ত দু'জন মহান পুত্রের সাথে সম্পর্কের কারণেই হয়েছিল। পৃথিবীতে কত জাতি কত সভ্যতার উত্থান-পতন হয়েছে কিন্তু নিমিষেই আবার তা তলিয়ে গেছে ইতিহাসের অতল গহ্বরে। কিন্তু এ দু জাতির উত্থান আজও পতনের মুখ দেখেনি। কিয়ামতের পূর্বে দেখবেও না। আর সেই খোদানুগত্য, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আত্ম উৎসর্গের বরকতেই সম্ভব হয়েছে যা তোমাদের আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন তা মূলত বংশগত কারণে নয়। বরং তাদের ঈমান-আকিদা খালেস হওয়া এবং তাদের আমল ভালো হওয়া তথা খাঁটি খোদা প্রেমিক হওয়ার কারণেই একমাত্র তারা মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এখন তোমরাও যদি তাদের ন্যায় মর্যাদাবান হতে চাও তাহলে তোমাদেরকেও তাদের গুণাবলির অধিকারী হতে হবে– বহু কঠিন কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধুমাত্র বংশের দোহাই দিয়ে না দুনিয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে আর না আখেরাতে আল্লাহর আজাব হতে পরিত্রাণ পাবে। কেননা হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.) উভয়ের আওলাদে ঈমানদার ও কাফের দুই শ্রেণির লোকজনই [অন্তর্ভুক্ত] হতে পারে। মোটকথা হযরত ইব্রাহীম বা হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর দোহাই দিয়ে কিছুই হবে না বরং যেমন কর্ম করবে তেমন ফল ভোগ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١٤. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ بِالنُّبُوَّةِ.

১১৪. আর আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম – নবুয়ত দান করে

١١٥. وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ اَىْ اِسْتِعْبَادِ فِرْعَوْنَ اِيَّاهُمْ.

১১৫. আর আমি নাজাত দিয়েছিলাম তাঁদের উভয়কে এবং তাঁদের কওমকে [অর্থাৎ] বনূ ইসরাঈলকে মহাবিপদ হতে অর্থাৎ তাদেরকে ফেরাউনের গোলামি হতে।

١١٦. وَنَصَرْنٰهُمْ عَلَى الْقِبْطِ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ.

১১৬. আমি তাঁদেরকে সাহায্য করেছি কিবতীদের বিরুদ্ধে সুতরাং তাঁরাই বিজয়ী হয়েছিল।

١١٧. وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ اَلْبَلِيْغَ الْبَيَانِ فِيْمَا اَتٰى بِهٖ مِنَ الْحُدُوْدِ وَالْاَحْكَامِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ التَّوْرٰةُ.

১১৭. আর আমি তাঁদের উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছিলাম যা স্পষ্ট বর্ণনাকারী ঐ সব বিষয়কে যা তার মধ্যে রয়েছে যেমন- ফৌজদারি দণ্ডবিধি, আহকাম ইত্যাদি। আর তা হলো তাওরাত।

١١٨. وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ.

১১৮. আমি প্রদর্শন করেছি পথ-রাস্তা সহজ-সরল।

١١٩. وَتَرَكْنَا اَبْقَيْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ثَنَاءً حَسَنًا.

১১৯ আর আমি অবশিষ্ট রেখেছি- বাকি রেখেছি তাদের উভয়ের ব্যাপারে পরবর্তীগণের মধ্যে উত্তম প্রশংসা।

١٢٠. سَلٰمٌ مِنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

১২০. শান্তি আমার পক্ষ হতে মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর উপর।

١٢١. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنٰهُمَا نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

১২১. আমি তদ্রূপ-যদ্রূপ তাদের উভয়কে প্রতিদান দিয়েছি- সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

١٢٢. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

১২২. তাঁরা উভয়ে আমার মু'মিন বান্দাগণের অন্যতম ছিল।

١٢٣. وَاِنَّ اِلْيَاسَ بِالْهَمْزَةِ اَوَّلَهٗ وَتَرْكِهٖ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ قِيْلَ هُوَ ابْنُ اَخِىْ هَارُوْنَ اَخِىْ مُوْسٰى وَ قِيْلَ غَيْرُهٗ وَاُرْسِلَ اِلٰى قَوْمٍ بِبَعْلَبَكَّ وَنَوَاحِيْهَا.

১২৩. নিশ্চয় ইলইয়াস (আ.) اِلْيَاسْ শব্দটির প্রথমে হামযাসহ এবং হামযা ব্যতীত উভয় অবস্থায় পঠিত হয়েছে। অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন- তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হারুন (আ.)-এর ভাতিজা। তাঁকে বা'লাবাক্কা ও তার আশ-পাশের এলাকায় পাঠানো হয়েছিল।

١٢٤. اِذْ مَنْصُوْبٌ بِاذْكُرْ مُقَدَّرًا قَالَ لِقَوْمِهٖ اَلَا تَتَّقُوْنَ اللّٰهَ.

১২৪. স্মরণ করো যখন (اِذْ) একটি উহ্য اُذْكُرْ ফে'লের দ্বারা مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তিনি তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন। তোমরা কি ভয় করবে না? আল্লাহ তা'আলাকে।

١٢٥. اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا اِسْمُ صَنَمٍ لَّهُمْ مِنْ ذَهَبٍ وَبِهٖ سُمِّيَ الْبَلَدُ مُضَافًا اِلٰى بَكَّ اَيْ اَتَعْبُدُوْنَهُ وَتَذَرُوْنَ تَتْرُكُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ فَلَا تَعْبُدُوْنَهُ.

১২৫. তোমরা কি আহ্বান করবে বা'লকে? বা'ল তাদের একটি স্বর্ণনির্মিত মূর্তি (প্রতিমা)। আর بك -এর দিকে ইযাফত করত এর দ্বারা শহরের নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি এর ইবাদত কর? আর পরিহার করবে পরিত্যাগ করবে সর্বোত্তম স্রষ্টাকে সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে না?

Free @ www.eilmweebly.com

তাহকীক ও তারকীব

"وَنَصَرْنٰهُمْ" -এর মধ্যকার যমীরের مَرْجِعٌ কি? نَصَرْنٰهُمْ -এর هُمْ -এর মারজি'র ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. এখানে هُمْ যমীরের مَرْجِعٌ হলো হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) এবং তাদের জাতি। এটাই জমহুরের মত এবং গ্রহণযোগ্য। কেননা এর পূর্বে "وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا" রয়েছে।

২. "هُمْ" যমীরের মারজি' হলো, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)। এটা ইমাম ফার্রার (র.)-এর মাযহাব। তাঁর মতে দুয়ের অধিক হলেই جَمْعٌ হিসেবে গণ্য করা যায়। কেননা এর পরে ধারাবাহিকভাবে "وَاٰتَيْنٰهُمَا" এবং وَهَدَيْنٰهُمَا রয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত ইসহাক (আ.)-এর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্ম-উৎসর্গের উল্লেখ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) নমরূদ ও তার কুচক্রী বাহিনীর হাত হতে পরিত্রাণ দিয়ে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তার নব জীবন লাভের উল্লেখ করেছেন।

এখানে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর জীবনী উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের জীবনীর সাথে হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আ.)-এর জীবন বৃত্তান্তের গভীর মিল রয়েছে। প্রথমত বড় মিল হলো হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) ছিলেন ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের ন্যায় হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে জীবনে কম আত্মত্যাগ করতে হয়নি– যৎসামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিতে হয়নি। তা ছাড়া হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যদ্রূপ নমরূদ ও তার অনুসারীদের হাত হতে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) কেও তদ্রূপ ফেরাউন ও তার অনুগামীদের হাত হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তৎসংশ্লিষ্টদের প্রতি যদ্রূপ আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হয়েছিল তদ্রূপ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-এর উপরও আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্য করেছেন।

"وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছি।" এখানে আল্লাহ তা'আলা অতি সংক্ষিপ্তাকারে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের বিবরণ পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে নবুয়তের নিয়ামত দান করেছেন। তাদেরকে এবং তাদের জাতি বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউন ও কিবতীদের সীমাহীন নির্যাতন হতে পরিত্রাণ দিয়েছেন। ফিরআউন ও তার সহযোগী কিবতীরা হযরত মূসা (আ.)-এর গোত্র বনূ ইসরাঈলকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছিল। বনূ ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে তারা হত্যা করত আর মেয়েদেরকে তাদের সেবার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে জীবিত রাখত।

Free @ www.eilm.weebly.com

হযরত মূসা (আ.) যখন ফেরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং বনূ ইসরাঈলকে মুক্তি দানের আহ্বান জানালেন তখন ফেরাউন অত্যন্ত চটে গেল। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলেন। পরিশেষে হযরত মূসা (আ.)-এর দলই বিজয়ী হলেন। ফেরাউন ও তার সহযোগীরা নিপাত গেল- দলবলসহ ফেরাউন নীল নদে ডুবে মরল।

তাদের মরণোত্তর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এক আশ্চর্যজনক গরমিল পরিলক্ষিত হয়। ফেরাউন ও তার সাথীদেরকে যুগ যুগ ধরে মানুষ ঘৃণা ও নিন্দার সাথে স্মরণ করছে অথচ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে স্মরণ করছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে। মূলত এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরতেরই কারিশমা। কিয়ামত অবধি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে স্মরণ করতে যেয়ে মানুষ বলতে থাকবে- سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর উপর শান্তি ......।

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের প্রকাশ : আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন নবীগণের কাহিনীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ে। হযরত মূসা (আ.) তদীয় ভ্রাতা হযরত হারূন (আ.) এবং গোটা বনূ ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের অনুগ্রহ করেছেন।

এক. তাঁকে নবুয়ত ও অন্যান্য বহু নিয়ামত দান করেছেন।

দুই. অসীম বিপদ-আপদ হতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা উভয় ধরনের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- "وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ" আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি অনুগ্রহ করেছি। এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপর দিকে "وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ" [আমি তাদেরকে এবং তাদের গোত্রকে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি] এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বিপদ-মসিবত হতে তাঁকে নাজাত দিয়েছেন। গোটা বনূ ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সহযোগীদের অত্যাচার হতে নাজাত দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে পার্থিব ও দীনি উভয় প্রকারের কল্যাণই দান করেছেন। পার্থিব কল্যাণ যেমন- জীবন, বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, কৃতিত্ব ও মর্যাদা। আর দীনি কল্যাণ হলো ঈমান, সৎকর্ম, নবুয়ত ও রিসালাত এবং মোজেজা ইত্যাদি।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-কে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধনে ধনী করেছেন। খোদাদ্রোহীদের সকল প্রকার নির্যাতন হতে নিষ্কৃতি প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত ও করুণা বর্ষিত হয়েছে তাদের উপর।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে যে সকল নিয়ামত দান করেছেন তাদের বিস্তারিত বিবরণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর উপর অনুগ্রহ করেছি। অতঃপর কয়েকটি আয়াতে তিনি সেই অনুগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। নিম্নে আমরা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ ও ইতিহাসের আলোকে তাদের মোটামুটি বিস্তারিত রূপ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

এক. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) এবং তাঁর জাতি বনূ ইসরাঈলকে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি। এটার প্রতি ইঙ্গিত করত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ" আর আমি তাদেরকে এবং তাদের জাতিকে মহাবিপদ হতে পরিত্রাণ দিয়েছি। এখানে "اَلْكَرْبِ الْعَظِيمِ" মহাবিপদ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্টভাবে কুরআনে উল্লেখ নেই। মুফাস্সিরগণ হতে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. নীল নদে ডুবে যাওয়া হতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) ও তাঁদের গোত্রকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। আর ফেরাউন ও তার সহযোগীদেরকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর জাতি বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউন ও তার সহযোগী কিবতীদের জুলুম নির্যাতন হতে নাজাত দিয়েছিলেন।

দুই. আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে সাহায্য করেছিলেন। ফলে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর জাতি ফেরাউন ও কিবতীদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। আল্লাহর বাণী- "وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ" [আর আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম সুতরাং তারাই হয়েছে বিজয়ী।]

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের নিকট গিয়েছিলেন। ফেরাউন ক্ষমতার দম্ভে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন এবং মোজেজা তলব করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা প্রমাণিত হওয়ার পর ফেরাউন ও তার সহযোগীরা তাকে জাদু বলে উড়িয়ে দেয়। ফেরাউন নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ খোদা (রব) বলে দাবি করে। সে বলে "اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى" আমি তোমাদের বড় রব। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট দাবি জানান বনূ ইসরাঈলকে মুক্তি দেওয়ার জন্য- তার সাথে মিশর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য; কিন্তু ফেরাউন তাঁর দাবি মেনে তো নিলই না; বরং দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে চলল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারী বনূ ইসরাঈলকে মিশর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। ফেরাউন দলবল নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করল। আল্লাহর কুদরতে হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈল নীল নদ পার হয়ে চলে গেলেন। পক্ষান্তরে তাদের পিছু ধাওয়া করতে যেয়ে ফেরাউন তার দলবলসহ নীল নদে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

তিন. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে একটি সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ" আর আমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে সুস্পষ্ট কিতাব প্রদান করেছি। যাতে সর্বপ্রকার দণ্ডবিধান ও অপরাপর আহকাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিধৃত হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)-কে যাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল তারা ছিল অত্যন্ত বক্র স্বভাবের। তারা মূসা (আ.)-এর রিসালাতকে মেনে নিতে আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। শিরক ও দুনিয়ার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ তাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় মন-মগজে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, তা হতে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা ছিল অতি দুরূহ কাজ। হযরত মূসা (আ.) দাওয়াতের জবাবে তারা নানা টাল-বাহানা ও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল। সত্যের পক্ষে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট দলিলাদি মোজেজা স্বচক্ষে দেখেও তারা সত্যের প্রতি এতটুকু আকৃষ্ট হয়নি; বরং জাদু বলে- সব মোজেজাকে প্রত্যাখ্যান করেছে- হযরত মূসা (আ.)-কে জাদুকরদের শিক্ষক হিসেবে অভিহিত করেছে। কাজেই তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য বলিষ্ঠ যুক্ত ও মোহনীয় প্রাঞ্জল ভাষায় সমৃদ্ধ একটি আসমানি কিতাবের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাতকে উক্ত গুণে গুণান্বিত করেই নাজিল করেছেন। এখানে "اَلْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ" বলে তাওরাতকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মূলত তাওরাত ছিল দীন-দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত একটি পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ মহাগ্রন্থ। তাওরাত সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ফরমান- "اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ" (নিশ্চয় আমি তাওরাত নাজিল করেছি; তাতে রয়েছে হেদায়েত ও আলো।) আর এ মহাগ্রন্থের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে সহজ-সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ" আর অমি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে সঠিক-সোজা পথের সন্ধান দিয়েছি- সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করেছি।

চার. আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী উম্মতের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর সুনাম ও সুখ্যাতি জারি রেখেছেন। হাজার হাজার বৎসর ধরে অগণিত মানুষ তাঁদের গুণ-কীর্তন করে আসছে- পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে তাঁদেরকে স্মরণ করছে। তাদের নামের সাথে পড়ছে- "عَلَيْهِ السَّلَامُ" তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে বলছে- "سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ" শান্তি বর্ষিত হোক হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-এর প্রতি। এত বড় নিয়ামত কয়জনের ভাগ্যে জুটে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার মুখলিস বান্দাগণকে তেমনটি প্রতিদান দিয়ে থাকি যেমনটি প্রতিদান দিয়েছি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.)-কে "اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ" পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে তাঁর মু'মিন বান্দা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মর্যাদা বুলন্দ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ"

পক্ষান্তরে ফেরাউন ও তার সহযোগীরা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাদেরকে যদিও বা মানুষ স্মরণে আনে, তবে তা ঘৃণা ও নিন্দার সাথে। ফেরাউনের আলোচনা করতে গেলে একজন প্রতাপশালী পাপী ও জালিমের বিভৎস চেহারাই আমাদের মনের মুকুরে ভেসে উঠে।

এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখের উপকারিতা : কুরআনে মাজীদে যেসব নবী-রাসূলের কাহিনী বিক্ষিপ্তাকারে হলেও মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– তাঁদের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) অন্যতম।

এখানে সূরা সাফ্‌ফাতে নবী-রাসূলগণের আলোচনায় তাঁকে তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এবং তাঁর ভাই হারুন ও বনূ ইসরাঈলের প্রতি কি কি অনুগ্রহ করেছেন তার বিবরণ পেশ করেছেন।

উক্ত আলোচনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মোখাতাব ও পাঠকদেরকে এটাই জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারূন (আ.) সত্যের উপর অটল থাকায়, তাঁদের কওম বনূ ইসরাঈল তাঁদের অনুগত থাকায় আমি তাদের উপর অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছি। তাদেরকে ফেরাউন ও কিবতীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করেছি। সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ লাভ করতে চাও, সারা বিশ্বে বিজয়ীর বেশে আত্মপ্রকাশ করতে চাও, তাহলে নবী মুহাম্মদের ﷺ আনুগত্য কর। আমার অশেষ রহমত তোমাদের উপর বর্ষিত হবে; তোমরা এক মহাবিজয়ী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে। নবী করীম ﷺ কুরাইশ নেতাদেরকে লক্ষ্য করে যথার্থ বলেছেন– "তোমরা ঈমান আনয়ন কর, পড়, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তাহলে সমস্ত আরব ও আজম তোমাদের পদতলে এসে যাবে।"

"وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ স্থলে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর আলোচনার ধারাবাহিকতায় চতুর্থ পর্যায়ে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর কাহিনী : কুরআনে মাজীদে মাত্র দুটি স্থানে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত সূরা আনআমে এবং দ্বিতীয়ত সূরা সাফ্‌ফাতের এ কয়টি আয়াতে। তবে সূরা আনআমে তার কোনো কাহিনীর উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর লিষ্টিতে তাঁকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। হ্যাঁ, এ স্থলে অতি সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের ঘটনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর বিস্তারিত আলোচনা নেই। নিশ্চয় হাদীসসমূহেও তাঁর অবস্থাদির বিশদ বর্ণনা নেই। এ জন্য তাঁর ব্যাপারে তাফসীরের কিতাবসমূহে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য ও বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হতে গৃহীত।

মুফাস্‌সিরে কেরামের একটি ক্ষুদ্র দলের মতে হযরত ইলইয়াস হযরত ইদরীস (আ.)-এর অপর নাম। তাঁরা একই ব্যক্তি। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত ইলইয়াস ও খাজের এক ব্যক্তি। কিন্তু মুহাক্কিকগণ উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কুরআন মাজীদে হযরত ইলইয়াস ও হযরত ইদরীস (আ.)-এর উল্লেখ এমন পৃথকভাবে করা হয়েছে যে, উভয়কে এক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করার কোনো অবকাশ নেই। কাজেই হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) তার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা দুজন পৃথক রাসূল। –[আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কখন এবং কোথায় হযরত ইলইয়াস (আ.) রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন? হযরত ইলইয়াস (আ.) কবে কোথায় ন
হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন– তা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ এ ব্যাপারে একম
যে, তিনি হযরত হিযকীল (আ.)-এর পরে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে বনূ ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এট
সময়ের কথা, যখন হযরত সোলায়মান (আ.)-এর স্থলাভিষিক্তগণের এক অপকর্মের কারণে বনূ ইসরাঈল দু' দলে বিভক্ত হ
গিয়েছিল। এক দলকে বলা হতো ইয়াহুদীয়াহ বা ইয়াহুদাহ। তাদের কেন্দ্র ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। অপর দলকে বলা হত
ইসরাঈল। তাদের রাজধানী ছিল সামেরাহ।

হযরত ইসমাঈল (আ.) জর্দানের জালআদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইসরাঈলীদের তৎকালীন বাদশাহের নাম বাইবে
'আখিয়াব' এবং আরবি ইতিহাস ও তাফসীরের কিতাবে 'আজব' অথবা 'আখব' উল্লেখ রয়েছে। তার স্ত্রী "বা'ল" একটি প্রতিম
[দেবী]-এর পূজা করত। সে মহিলাই ইসরাঈলে "বা'ল" নামে একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে সমস্ত বনূ ইসরাঈলকে প্রতিম
[মূর্তি] পূজায় লাগিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত ইলইয়াস (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তিনি যেন তথায় যে
তাদের তাওহীদের তালীম দেন। ইসরাঈলীদেরকে মূর্তিপূজা হতে বারণ করেন। –[ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর]

দাওয়াত ও গোত্রের সাথে সংঘর্ষ : হযরত ইলইয়াস (আ.) ইসরাঈলের বাদশাহ আখিয়াব এবং তার প্রজাদের 'বা'ল' নাম
মূর্তির পূজা হতে বারণ করত তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু' একজন ব্যতীত সকলেই তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যা
করল; বরং তারা উল্টা তাঁর উপর নির্যাতনের পাঁয়তারা করল। এমনকি বাদশাহ আখিয়াব ও তার স্ত্রী ইসাবেলা তাঁকে শহীদ করা
পরিকল্পনা করল। তিনি বহুদূরে একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং তথায় বসবাস করতে লাগলেন। অতঃপর বদদোয়
করলেন যে, ইসরাঈলীরা যেন দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। যাতে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করতে যেয়ে তিনি মোজেজা দেখাতে পারেন। আ
এতে গোত্রের লোকেরা ঈমান গ্রহণ করার সুযোগ পায়। সুতরাং ইসরাঈলীরা মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল।

অতঃপর হযরত ইলইয়াস (আ.) আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর নাফরমানি করার
কারণে এ আজাব নেমে এসেছে। তোমরা এখন ফিরে আসলে তা দূর হয়ে যাবে। আর এ সুযোগে আমার সত্যতাও যাচাই
করতে পারবে। তিনি তাদের নিকট প্রস্তাব দিলেন যে, তোমরা তো দাবি কর ইসরাঈলীদের মধ্যে তোমাদের বা'লের সাড়ে
চারশত নবী রয়েছে। তোমরা একদিন তাদের সকলকে হাজির কর। তারা বা'লের নামে কুরবানি পেশ করুন। আর আমি
আল্লাহর নামে কুরবানি পেশ করব। যার কুরবানিকে আসমান হতে আগুন নেমে এসে জ্বালিয়ে যাবে তার দীন সত্য বলে প্রমাণিত
হবে। সকলেই উক্ত প্রস্তাব খুশি মনে মেনে নিল।

কারমাল পাহাড়ের পাদদেশে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বা'লের মিথ্যা (ভণ্ড) নবীরা তাদের কুরবানি পেশ করল। তারা ভোর
হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বা'লের নিটক প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলইয়াস (আ.)
তাঁর কুরবানি পেশ করলেন। আসমান হতে আগুন নেমে এসে তাঁর কুরবানিকে জ্বালিয়ে গেল। এটা দেখে বহু লোক সেজদায়
পড়ে গেল। তাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হয়ে গেল। কিন্তু 'বা'ল'-এর ভণ্ড নবীরা তা মেনে নিল না। সুতরাং হযরত ইলইয়াস
(আ.)-এর নির্দেশে 'কাইশুন' নামক ময়দানে তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হলো।

এরপর মুষলধারে বৃষ্টি হলো। সম্পূর্ণ এলাকা পানিতে সয়লাব হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের স্ত্রী ইসাবেলার এতেও বোধ উদয়
হলো না। সে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর উপর ঈমান আনল না; বরং তাঁকে হত্যার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

এটা শুনে ইলইয়াস (আ.) সামেরাহ হতে আত্মগোপন করলেন। কিছু দিন পর তিনি বনূ ইসরাঈলের অপর ভূখণ্ড ইয়াহুদীয়াহতে
গিয়ে তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করলেন। কেননা ধীরে ধীরে "বা'ল" পূজা তথায়ও বিস্তার লাভ করেছিল। সেখানকার
বাদশাহ ইয়াহুরামও তাঁর কথা মানল না। অতঃপর সে হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংস হয়ে গেল। কয়েক
বৎসর পর তিনি পুনরায় ইসরাইলে চলে গেলেন। আখিয়াব ও তার ছেলে আখযিয়াহকে হেদায়েত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু
সে তার অপকর্মে পূর্ববৎ নিয়োজিত রইল। সুতরাং তাকে আল্লাহ তা'আলা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত করলেন এবং কঠিন
রোগ-ব্যাধিতে লিপ্ত করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে তার নিকট নিয়ে গেলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইলইয়াস (আ.) জীবিত না মৃত? হযরত ইলইয়াস (আ.) এখনও জীবিত আছেন না মৃত্যুবরণ করেছেন? এ ব্যাপারে আলিমগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

তাফসীরে মাযহারীতে আল্লামা বাগাবীর হাওলা দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইলইয়াস (আ.)-কে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় আকাশে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) ও ইবনে আসাকির ও হাকিম হতে এমন কিছু রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন যা দ্বারা তিনি জীবিত রয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কা'বুল আহবার (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, চারজন নবী এখনও জীবিত আছেন। দু'জন জমিনে তাঁরা হচ্ছেন– হযরত খাজের (আ.) ও হযরত ইলইয়াস (আ.)। আর দু'জন আসমানে। তাঁরা হলেন– হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইদরীস (আ.)। এমনকি কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খাজের (আ.) ও হযরত ইলইয়াস (আ.) প্রতি বৎসর রমজান মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোজা রাখেন। –[কুরতুবী]

কিন্তু হাফিজ ইবনে কাছীরের ন্যায় মুহাক্কিকগণ উপরিউক্তক্ত বর্ণনা সমূহের সত্যতা স্বীকার করেননি। এসব বর্ণনার ব্যাপারে তাদের মন্তব্য হলো– "وَهُوَ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِىْ لَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ بَلِ الظَّاهِرُ اَنَّ صِحَّتَهَا بَعِيْدَةٌ" তা ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে না সত্য বলা যায় আর না মিথ্যা; বরং তাদের বিশুদ্ধ হওয়া যে সুদূর পরাহত– তা (দিবালোকের ন্যায়) স্পষ্ট। –[আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া]

ইবনে কাছীর (র.) আরও বলেন, ইবনে আসাকির তো কতিপয় রেওয়ায়েত এমন ব্যক্তিদের নিকট হতে করেছেন যারা হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। কিন্তু তাদের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। হয়তো এ কারণে যে, তাদের সনদ দুর্বল। নতুবা এ জন্য যে, যাদের দিকে ঘটনাবলিকে নিসবত করা হয়েছে তারা অজ্ঞাত। –[আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া]

মোদ্দাকথা, হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর জীবিত থাকা কোনো বিশ্বস্ত ইসলামি বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ ব্যাপারে নিরাপদ পন্থা হলো নীরবতা অবলম্বন করা। আর ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -এর নিম্নোক্ত হাদীসখানার উপর আমল করতে হবে। "তোমরা তাদেরকে সত্যও বল না আবার মিথ্যাও বল না।" কেননা কুরআনে কারীমের তাফসীর, তা হতে শিক্ষা গ্রহণ এবং নসিহতের উদ্দেশ্যে তা (ইসরাঈলীয়াত) ব্যতীতও পূর্ণ হয়ে যায়।

"اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا" আয়াতের ব্যাখ্যা : بَعْل (বা'ল)-এর আভিধানিক অর্থ হলো– সরদার, মালিক ও মনিব। এটা স্বামীর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানে তা স্বামীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের সেমিটিক জাতি তাকে ইলাহ বা উপাস্যের অর্থে প্রয়োগ করত। তারা একটি বিশেষ দেবতার নামকরণও করেছিল 'বা'ল'। তৎকালীন লেবাননের ফেনিকি জাতির প্রধান দেবতার নাম ছিল 'বা'ল'। আর বা'লের স্ত্রী আস্তারাত ছিল তাদের সর্বপ্রধান দেবী।

'বা'ল' দ্বারা তারা মতান্তরে সূর্য অথবা সুচারতী গ্রহকে বুঝাত আর আস্তারাত বলে মতান্তরে চন্দ্র বা শুকতারাকে বুঝাত। যা হোক, তৎকালে বাবেল হতে মিশর পর্যন্ত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে 'বা'ল'-এর উপাসনা করা হতো। বিশেষত লেবানন, সিরিয়া, ফিলিস্তিন সর্বত্র মুশরিক জাতিসমূহ এ কাজে ব্যাপকহারে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে বনূ ইসরাঈল মিশর হতে ফিলিস্তিন ও জর্দান এসে বসবাস করতে শুরু করল। তাওরাতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা এ মুশরিক জাতির সাথে বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। তখন এ মূর্তি [বা'ল] পূজার রোগ তাদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করল। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফা ইউশা-ইবনে নূনের মৃত্যুর পর পরই বনূ ইসরাঈলের লোকদের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বা'লের পূজা বনূ ইসরাঈলের মধ্যে এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, তারা বা'লের উদ্দেশ্যে বলিদানের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করে নিয়েছিল। কিন্তু এক আল্লাহ প্রেমিকের তা বরদাশত হলো না। তিনি রাত্রি বেলায় গোপনে উক্ত বলিদান ক্ষেত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন। পরের দিন লোকেরা এক বিশাল সমাবেশ করল। তারা উক্ত খোদা প্রেমিককে হত্যা করার সংকল্প ব্যক্ত করল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পরবর্তী যুগে অবশ্য হযরত শামবীল, হযরত তালূত, হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) বনূ ইসরাঈলকে মূর্তি পূজার অভিশাপ হতে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। তাদের প্রচেষ্টায় বনূ ইসরাঈলের মূর্তি পূজার অবসান হয়। সর্বত্র পুনরায় একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর পর মূর্তি পূজার ফেতনা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বিশেষত উত্তর ফিলিস্তিনেই ইসরাইল রাষ্ট্র 'বা'ল' নামক দেবতার পূজায় সরগরম হয়ে উঠল।

"وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইলইয়াস (আ.) তাঁর গোত্রকে মূর্তি পূজার জন্য তিরস্কার করে বললেন– "তোমরা কি বা'ল মূর্তির উপাসনার পিছনে পড়ে এক আল্লাহর ইবাদতকে বর্জন করবে?"

এ স্থলে– "اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" -এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, [আল্লাহর পানাহ] অন্য কেউও স্রষ্টা কারিগর। অন্যান্য কারিগর [ও আবিষ্কারক] গণ তো শুধু বিভিন্ন অংশকে জোড়া লাগিয়ে একটি বস্তু তৈরি করে থাকে। তারা কোনো বস্তুকে অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করতে পারে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দানে স্বভাবগতভাবে সক্ষম। –[বয়ানুল কুরআন]

গায়রুল্লাহর দিকে সৃষ্টির নিসবত জায়েজ নেই : উল্লেখ্য যে, خَلَقَ -এর অর্থ হলো– সৃষ্টি করা। এর মর্মার্থ হলো– অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্ব দান করা। আর উক্ত ক্ষমতা স্বভাবগতভাবে থাকা। সুতরাং উক্ত গুণটি আল্লাহ তা'আলার সাথে খাস, অন্য কারো দিকে তার নিসবত করা জায়েজ নেই। সুতরাং আমাদের যুগে লেখকগণের লেখা, কবিদের কাব্য ও চিত্রশিল্পীদের চিত্রকর্মকে যে "সৃষ্টি" বলার প্রথা দেখা যায় তা মূলত সঠিক নয়। বেশি থেকে বেশি তাকে তাদের 'সাধনা' বলা যেতে পারে। অথবা, লেখা, কাব্য ও চিত্রকর্ম বলাই ভালো। –[মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٢٦. اَللّٰهُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ بِرَفْعِ الثَّلَاثَةِ عَلٰى اِضْمَارِ هُوَ وَبِنَصْبِهَا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ اَحْسَنَ .

১২৬. আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও প্রতিপালক। (اَللّٰهُ) ও উভয় رَبُّ তিনটিই রফা'বিশিষ্ট হবে هُوَ যমীরকে উহ্য মেনে। অপরদিকে اَحْسَنَ হতে বদল গণ্য করে তিনটিকেই নসব বিশিষ্ট পড়া যাবে।

١٢٧. فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ فِى النَّارِ .

১২৭. অথচ তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল অবিশ্বাস করেছিল। কাজেই তাদেরকে উপস্থিত একত্রিত করা হবে জাহান্নামে।

١٢٨. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ فَاِنَّهُمْ نَجَوْا مِنْهَا .

১২৮. আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ ব্যতীত। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে ঈমানদারগণ। কেননা তারা জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি পাবে।

١٢٩. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ثَنَاءً حَسَنًا .

১২৯. আর তার ব্যাপারে আমি পরবর্তীদের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছি উত্তম প্রশংসা।

١٣٠. سَلَامٌ مِنَّا عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ هُوَ اِلْيَاسُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَقِيْلَ هُوَ مَنْ اٰمَنَ مَعَهُ فَجُمِعُوْا مَعَهُ تَغْلِيْبًا كَقَوْلِهِمْ لِلْمُهَلَّبِ وَقَوْمِهِ اَلْمُهَلَّبُوْنَ وَعَلٰى قِرَاءَةِ اٰلِ يَاسِيْنَ بِالْمَدِّ اَىْ اَهْلَهُ الْمُرَادُ بِهِ اِلْيَاسُ اَيْضًا .

১৩০. আমার পক্ষ হতে ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক ইনি সেই ইলইয়াস– যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন– তিনি হলেন, যিনি তাঁর [পূর্বোক্ত ইলইয়াস-এর] উপর ঈমান আনয়ন করেছিলেন। সুতরাং তাগলীবের কায়দা অনুযায়ী তারা [সালাম প্রেরণাকারীগণ] তাঁর সাথে উক্ত ঈমানদারকে একত্রিত করেছে। যেমন– আরবের লোকেরা মুহাল্লাব ও তার কওমকে [একত্রে] মুহাল্লাবুন বলে থাকে। আর اٰلِ يَاسِيْنَ মদের সাথে [অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরের সাথে] আরেকটি কেরাত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর পরিবার-পরিজন। এটার দ্বারা হযরত ইলইয়াস (আ.)-কেও উদ্দেশ্য [অন্তর্ভুক্ত] করা হয়েছে।

١٣١. اِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ .

১৩১. নিশ্চয় আমি এভাবে যেভাবে তাঁকে প্রতিদান দিয়েছি মুখলিস বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

١٣٢. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ .

১৩২. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম।

١٣٣. وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .

১৩৩. আর নিশ্চয় হযরত লূত (আ.)ও অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

١٣٤. اُذْكُرْ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ .

১৩৪. স্মরণ করো যখন আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে নাজাত দিয়েছি।

١٣٥. اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَابِرِيْنَ الْبَاقِيْنَ فِى الْعَذَابِ .

১৩৫. একজন বুড়ি ব্যতীত সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশিষ্টজনদের সাথে শাস্তিতে নিপতিত হয়েছিল।

١٣٦. ثُمَّ دَمَّرْنَا اَهْلَكْنَا الْاٰخَرِيْنَ كُفَّارَ قَوْمِهِ .

১৩৬. অতঃপর আমি নিপাত করেছি ধ্বংস করেছি অন্যান্যদেরকে অর্থাৎ তাঁর কওমের কাফেরদেরকে।

١٣٧. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ اَىْ عَلٰى اٰثَارِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِىْ اَسْفَارِكُمْ مُصْبِحِيْنَ اَىْ وَقْتَ الصَّبَاحِ يَعْنِىْ بِالنَّهَارِ .

১৩৭. আর তোমরা তাদের নিকট দিয়ে পাড়ি জমিয়ে থাক অর্থাৎ ভ্রমণে গেলে তোমরা তাদের মনযিল ও নিদর্শনাদির পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে থাক। ভোরবেলায় অর্থাৎ ভোরের সময়ে তথা দিবাভাগে।

١٣٨. وَبِاللَّيْلِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مَا حَلَّ بِهِمْ فَتَعْتَبِرُوْنَ بِهٖ .

১৩৮. আর রাত্রিকালেও তথাপি তোমরা কি বুঝ না? হে মক্কাবাসীগণ! তাদের উপর [আজাব ও গজবের] কি [ঘটনা] ঘটে গিয়েছিল। সুতরাং তোমরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

"اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ" আয়াতে رَبّ ও اَللّٰهُ-এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী "اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ" -এর মধ্যস্থিত رَبّ ও اَللّٰهُ শব্দদ্বয়ের মধ্যে দু ধরনের ই'রাব হতে পারে–

এক. তারা مَرْفُوْعٌ হবে। ইবনে কাছীর, আবূ আমর, আবূ জা'ফর, শায়বা ও নাফে' প্রমুখগণ উক্ত তিনটি শব্দে রফা' দিয়ে পড়েছেন। রফা' হওয়ার দুটি দিক হতে পারে।

১. একটি اَللّٰهُ رَبُّكُمْ الخ স্বতন্ত্র বাক্য (جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ):

২. এটা একটি উহ্য মুবতাদা (مُبْتَدَأٌ) -এর خَبَرٌ আর সেই উহ্য মুবতাদাটি হলো هُوَ অর্থাৎ "هُوَ اللّٰهُ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ"

দুই. উক্ত তিনটি শব্দ مَنْصُوْبٌ হবে। হাসান ইবনে আবূ ইসহাক, রাবী ইবনে খায়যাম, ইবনে আহছাব, আ'মাশ, হামযা ও কিসায়ী প্রমুখ ক্বারীগণ উক্ত তিনটি শব্দের মধ্যে নসব দিয়ে পড়েছেন। তার আবার দু'টি দিক রয়েছে।

ক. আবূ উবায়েদ (র.) বলেছেন যে, উক্ত তিনটি শব্দই পূর্বোক্ত "اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" হতে نَعْت হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

খ. ইমাম নাহাস (র.) বলেছেন, উল্লিখিত তিনটি শব্দ পূর্বোক্ত "اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ" হতে بَدَل হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইলইয়াস (আ.) যখন তার সম্প্রদায়কে মূর্তি পূজা বর্জন করত আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানালেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আজাব ও গজবের ভয় দেখালেন তখন তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন (অবিশ্বাস) করল। ইরশাদ হচ্ছে– রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। আল্লাহর সত্য রাসূলকে মিথ্যুক বলার শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে। এর দ্বারা আখেরাতের আজাব ও উদ্দেশ্য হতে পারে এবং দুনিয়ার দুর্ভোগও বুঝানো যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইলইয়াস (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে বনূ ইসরাঈলের দু'টি রাষ্ট্র ইসরাঈল ও ইয়াহুদাহ উভয়ের শাসকবর্গ নিপাত গিয়েছিল।

"سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ" -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইলইয়াস (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে দোয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত লোকেরা তাঁদের জন্য শান্তির দোয়া করতে থাকবে। তাঁদের প্রশংসা ও গুণ-গান করতে থাকবে।

অত্র আয়াতের إِلْيَاسِيْنَ শব্দটির মধ্যে ক্বারীগণ হতে দু'টি ক্বেরাত বর্ণিত রয়েছে। ক্বেরাতের পার্থক্যের কারণে তার অর্থের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো।

১. জমহুর কারীগণের (র.) মতে, এটা إِلْيَاسِيْنَ হামযার নিচে যের لَامْ অক্ষরটি জযম যোগে يَاسِيْن -এর সাথে যুক্ত করে

২. হযরত নাফে, ইবনে আমির ও ইয়াকূব (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ آلْيَاسِيْنَ পড়েছেন। তারা آلِ শব্দটিকে يَاسِيْن -এর দিকে ইযাফত করেছেন। শেষোক্ত ক্বেরাত অনুযায়ী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. ইলইয়াস ইয়াসীনের বংশধর অর্থাৎ ইলইয়াস ইবনে ইয়াসীন।

দুই. ইয়াসীনের বংশধর মানে মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধর। [কেননা, নবী করীমের এক নাম হলো ইয়াসীন।]

তিন. ইয়াসীন কুরআনে কারীমের একটি নাম। সুতরাং "سَلَامٌ عَلَى اٰلْيَاسِيْنَ" -এর অর্থ হলো- "سَلَامُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ اٰمَنَ بِكِتَابِ اللّٰهِ الَّذِىْ هُوَ يَاسِيْنَ" অর্থাৎ আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক সেই লোকদের প্রতি যে আল্লাহর ইয়াসীন নামীয় কিতাব তথা কুরআনে হাকীমের উপর ঈমান আনয়ন করেছেন।

প্রথমোক্ত ক্বেরাত অনুযায়ী এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এক. ইলইয়াসীন– হযরত ইলইয়াস (আ.)-এর অপর নাম। আরবীয়রা সাধারণত আজমী (অনারব) শব্দের সাথে يا ও ن বৃদ্ধি করে পড়ে থাকে। যেমন– তারা سِيْنَا কে سِيْنِيْنَ পড়ে থাকে। সুতরাং اِلْيَاسْ -কে তারা اِلْيَاسِيْن পড়ে থাকে।

দুই. নাহুবিদ যুজাজ (র.) বলেছেন, مِيْكَالُ হতে যেমন مِيْكَائِيْل ও مِيْكَائِيْل পড়া হয়ে থাকে তদ্রূপ اِلْيَاسْ হতে اِلْيَاسِيْن পড়া হয়েছে।

তিন. নাহুবিদ ফাররা (র.) বলেছেন, اِلْيَاسِيْنَ এটা اِلْيَاسْ -এর বহুবচন। এর দ্বারা ইলইয়াস এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– مُهَلَّبْ ও তার গোত্রের লোকদেরকে একত্রে مُهَلَّبُوْنَ বলা হয়ে থাকে।

"وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা : قِصَّةُ لُوْطٍ (ع) - হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনী :** হযরত লূত (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর ঈমান এনে তিনি তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে হিজরত করে সিরিয়াও গিয়েছিলেন। মিশরেও তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। ফিলিস্তিনের সাদূম নামক এলাকায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে হেদায়েতের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি নবুয়ত লাভ করেছিলেন। এলাকাটি ছিল নানা অশ্লীল ও অপকর্মের কেন্দ্র। কোনো প্রকার ভালো ও প্রশংসনীয় কাজ তাদের মধ্যে ছিল না। তারা নিকৃষ্টতম অপকর্ম তথা সমকামে অভ্যস্ত ছিল। নারীদের পরিবর্তে ছেলেদের সাথে তারা যৌন সম্ভোগ করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের এহেন ঘৃণ্য কার্য-কলাপের ব্যাপারে ভর্ৎসনা ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন–

"أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ" ـ

অর্থাৎ 'তোমরা কি সেই জাতি নও যারা পুরুষের সাথে অপকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত হও এবং বংশধারা ছিন্ন কর (বা ডাকাতি কর) আর প্রকাশ্য মজলিসে দুষ্কর্মে মেতে উঠ।'

হযরত লূত (আ.) তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাদের অশ্লীল কার্যকলাপ বর্জন করত সত্য পথে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। হাজারোভাবে তাদের বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু তারা হযরত লূত (আ.)-এর দাওয়াত কবুল করেনি। সত্যের ডাকে সাড়া দেয়নি। মাত্র গুটি কতেক লোক ব্যতীত সকলেই তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীও ছিল বিরোধীদের দলভুক্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করার জন্য কয়েকজন ফেরেশতাসহ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। ফেরেশতাগণ বালকের আকৃতিতে আগমন করেছিলেন। পাষণ্ডরা তাদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হতে উদ্যত হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত লূত (আ.) ও ঈমানদারগণকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী যেহেতু মুশরিকা ছিল সেহেতু তাকে রেখে যেতে বললেন। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আল্লাহর হুকুমে সমগ্র লূত জনপদকে উপুড় করে ধ্বংস করে দিলেন। এ স্থলে সংক্ষিপ্তাকারে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখানে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখের উপকারিতা : এ স্থলে হযরত লূত (আ.)-এর কাহিনীর উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদেরকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন যে, তোমরা সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভ্রমণে যাওয়ার সময় সাদ্দুমের সেই এলাকা দিয়ে দিবা-রাত্রি যাতায়াত করে থাক যেখানে লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। কিন্তু তোমরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করছ না। সকাল ও সন্ধ্যার উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, সাধারণত এ সময়েই তারা উক্ত স্থান অতিক্রম করে থাকে। কাযী আবুস সাউদ (র.) বলেছেন যে, সাদ্দুমের উক্ত স্থানটি রাস্তার এমন পর্যায়ে অবস্থিত যেখান থেকে গমনকারীরা সকাল বেলায় রওয়ানা করে এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছে থাকে। -[তাফসীরে আবীস্ সাউদ]

"إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আজাব হতে নাজাত দিয়েছি। কিন্তু একজন বৃদ্ধাকে নাজাত দেইনি। সে পশ্চাৎ অবস্থানকারী তথা শাস্তি প্রাপ্তদের দলভুক্ত ছিল। এখানে সেই বৃদ্ধা কে? কেনই বা তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?

মুফাস্‌সিরগণ [এবং কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য] এ ব্যাপারে একমত যে, ঐ বুড়িটি স্বয়ং হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী। সে মুশরিকদের সহযোগী ছিল। উপরন্তু হযরত লূত (আ.)-এর সাথে হিজরত করতে রাজি হয়নি বিধায় আজাবে নিমজ্জিত হয়েছিল।

"إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : হযরত লূত (আ.)-এর গোত্র- যাদের নিকট তাকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের 'সাদ্দুম' নামক স্থানে বসবাস করত। তাদের ধ্বংসাবশেষ ও স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শনাদি যুগ-যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল। আরবের কুরাইশরা সিরিয়ায় সফরে যাওয়া-আসা করার সময় তা তাদের পথে পড়ত। তথা হতে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হতো, আর আগমনকারীরা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছত।

আল্লাহ তা'আলা এখানে কুরাইশদেরকে সতর্ক করে বলে দিয়েছেন যে, হে কুরাইশ জাতি! তোমরা সিরিয়া যাওয়া-আসার পথে একবারও ভেবে দেখেছ যে, হযরত লূত (আ.)-এর গোত্র সাদ্দুমবাসীদেরকে কেন আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর হযরত লূত (আ.) ও তার উপর যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকেই বা কেন নাজাত দিয়েছিলেন? তোমরা হযরত লূত (আ.)-এর জাতির ইতিহাস হতে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পার যে, যদি নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতায় তোমরা অনড় থাক তাহলে তোমরাও ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিপতিত হবে। ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। তোমরা গোটা জাতি-গোটা দেশ। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ﷺ ও তার অনুসারীদেরকে আল্লাহ পাক অবশ্যই হেফাজত করবেন, যদ্রূপ হযরত লূত (আ.) ও তাঁর অনুগামীদেরকে রক্ষা করেছিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣٩. وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ .

১৩৯. আর ইউনুস (আ.) রাসূলগণের একজন ছিলেন।

١٤٠. اِذْ اَبَقَ هَرَبَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ السَّفِيْنَةِ الْمَمْلُوْءَةِ حِيْنَ غَاضَبَ قَوْمَهُ لَمَّا لَمْ يَنْزِلْ بِهِمُ الْعَذَابُ الَّذِىْ وَعَدَهُمْ بِهِ فَرَكِبَ السَّفِيْنَةَ فَوَقَفَتْ فِىْ لُجَّةِ الْبَحْرِ فَقَالَ الْمَلَّاحُوْنَ هُنَا عَبْدٌ اَبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ تُظْهِرُهُ الْقُرْعَةُ .

১৪০. স্মরণ করো, যখন সে পলায়ন করেছিল পালিয়ে গিয়েছিল বোঝাইকৃত নৌকায় পরিপূর্ণ নৌকায় যখন তাঁর গোত্র তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কেননা সে তাদেরকে যে আজাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা আসেনি। সুতরাং সে নৌকায় আরোহণ করল। অতঃপর নৌকাটি সমুদ্রের মধ্যে আটকে পড়ল। তখন মাঝিরা বলল, এখানে একজন গোলাম রয়েছে যে, তার মনিব হতে পলায়ন করেছে। লটারির দ্বারা সে প্রকাশিত (সনাক্ত) হবে।

١٤١. فَسَاهَمَ قَارَعَ اَهْلَ السَّفِيْنَةِ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ الْمَغْلُوْبِيْنَ بِالْقُرْعَةِ فَاَلْقَوْهُ فِى الْبَحْرِ .

১৪১. অতঃপর লটারি দিল নৌকার আরোহীরা লটারি দিল। ফলে সে দোষী সাব্যস্ত হলো– লটারিতে পরাস্ত হলো। সুতরাং তারা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল।

١٤٢. فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ اِبْتَلَعَهُ وَهُوَ مُلِيْمٌ اَىْ اٰتٍ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ مِنْ ذِهَابِهِ اِلَى الْبَحْرِ وَرُكُوْبِهِ السَّفِيْنَةَ بِلَا اِذْنٍ مِنْ رَبِّهِ .

১৪২. অতঃপর তাকে মৎস গ্রাস করল– তাকে গলাধঃকরণ করল। আর সে ছিল তিরস্কৃত অর্থাৎ এমন কিছু করেছিল যাতে সে তিরস্কৃত হয়েছে। যেমন– স্বীয় প্রভুর অনুমতি ব্যতীত সমুদ্রে যাত্রা, নৌকায় আরোহণ করা।

١٤٣. فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ الذَّاكِرِيْنَ بِقَوْلِهِ كَثِيْرًا فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

১৪৩. সুতরাং যদি না তিনি আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনাকারী এবং গুণগান) পাঠকারী হতেন– স্বীয় বক্তব্য "لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ" [তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।] এর দ্বারা মাছের পেটে আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী না হতো।

١٤٤. لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ لَصَارَ بَطْنُ الْحُوْتِ قَبْرًا لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

১৪৪. তাহলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে অবস্থান করত। (অর্থাৎ) কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেট তার জন্য কবর হতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٤٥. فَنَبَذْنٰهُ اَلْقَيْنَاهُ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ بِالْعَرَآءِ بِوَجْهِ الْاَرْضِ اَىْ بِالسَّاحِلِ مِنْ يَوْمِهٖ اَوْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ اَوْ سَبْعَةِ اَيَّامٍ اَوْ عِشْرِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَهُوَ سَقِيْمٌ عَلِيْلٌ كَالْفَرْخِ الْمُمَعَّطِ.

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম –মাছের পেট হতে আমি তাকে ফেলে দিলাম। সমভূমিতে ভূমির উপর। অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সেই দিনই অথবা মতান্তরে তিন, সাত, বিশ কিংবা চল্লিশ দিন পর। আর তখন সে অসুস্থ ছিল– রুগ্ণ পালকহীন পাখির ছানার ন্যায়।

١٤٦. وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ وَهُوَ الْقَرْعُ تُظِلُّهٗ وَهِىَ بِسَاقٍ عَلٰى خِلَافِ الْعَادَةِ فِى الْقَرْعِ مُعْجِزَةً لَهٗ وَكَانَتْ تَاْتِيْهِ وَعْلَةٌ صَبَاحًا وَمَسَاءً يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا حَتّٰى قَوِىَ.

১৪৬. আর তার উপর লতা-পাতাযুক্ত বৃক্ষ সৃষ্টি করলাম। আর তা হলো লাউগাছের ঝাড়, যা তাকে ছায়া দিল। তা ছিল কাণ্ডযুক্ত, যা সাধারণত লাউগাছের হয় না (অস্বাভাবিক)। এটা তাঁর মোজেজা ছিল। আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নিকট একটি হরিণী আসত। সে তার দুধ পান করত। এভাবে সে হৃষ্টপুষ্ট [শক্তিশালী] হয়ে উঠল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সংশ্লিষ্ট কাহিনী : সূরা সাফ্‌ফাতে যে সকল নবীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বশেষে হযরত ইউনুস (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আম্বিয়া, নিসা, আন্‌আম, ইউনুস ও আলোচ্য সূরায় বিশেষভাবে তাঁর কাহিনীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে তাকে ذُو النُّوْنِ এবং صَاحِبُ الْحُوْتِ ও বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ আর স্মরণ কর যাননূনকে যখন সে দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং ধারণা করেছিল যে, আমি তাকে পাকড়াও করতে পারব না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– "فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ" (সুতরাং তোমার প্রভুর নির্দেশ আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছ ওয়ালার ন্যায় হয়ো না।)

হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্রের সামাজিক অবস্থা : হযরত ইউনুস (আ.) ছিলেন 'মোছেল' শহরের নিনুওয়া নামক স্থানের অধিবাসী। তাঁর জাতির লোকেরা ছিল মূর্তিপূজক। তাদের প্রধান মূর্তির নাম ছিল 'আশতার'। তাঁর জাতির লোকেরা ধনবান ও অত্যন্ত সম্পদশালী ছিল। তাদের ধন-সম্পদ বিত্ত-বৈভব ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য ছিল। মূলত ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যই তাদের মধ্যে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও অপরাধ প্রবণতার বিস্তার ঘটিয়েছিল। এর কারণেই তারা খোদাদ্রোহী ও বেপরোয়া হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ" অর্থাৎ 'যে কোনো শহরে আমি রাসূল (ভীতি প্রদর্শনকারী) পাঠিয়েছি তথাকার বিত্তবান ও প্রভাবশালীরা বলেছে– তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তাকে অস্বীকার করি।'

হযরত ইউনুস (আ.)-এর দাওয়াত : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ" আর হযরত ইউনুস (আ.) রাসূলগণের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করত নিনুওয়াবাসীদের হেদায়েতের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইউনুস (আ.) গোত্রের হেদায়েতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তিনি তাদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন। তাদেরকে মূর্তি পূজা হতে বারণ করলেন। তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। তাঁর ডাকে সাড়া দিল না। তাঁকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করল। তিনি তাদের শাস্তির ভয় দেখালেন। জাতির লোকদের প্রতি বিরক্ত ও নিরাশ হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার সময় জাতির লোকদের একটি সময়ে আজাব আসার কথা বলে গেলেন। গোত্রের লোকেরা আজাবের নিদর্শনাদি দেখে হযরত ইউনুস (আ.)-কে খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না। অবশেষে তারা আল্লাহর নিকট তওবা করল এবং কান্নাকাটি করতে শুরু করল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তাদের উপর আজাব নাজিল করলেন না। হযরত ইউনুস (আ.) যখন জানতে পারলেন যে, গোত্রের উপর আজাব নাজিল হয়নি তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন গোত্রের নিকট ফিরে গেলে এবার আর তাঁর রেহাই নেই। গোত্রের লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলবে। এমনকি তারা তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলতে পারে। সুতরাং তিনি অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। তিনি সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলেন। তথায় একটি জাহাজে আরোহণ করলেন। জাহাজটি ছিল আরোহীতে ঠাসা। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে জাহাজটি আটকে গেল। মাঝি-মাল্লারা বলল, এ জাহাজে মনিবের নিকট হতে পলায়ন করে আসা কোনো দাস রয়েছে। তার গুনাহের কারণে আমাদের জাহাজ আটকে গেছে। অতঃপর তারা লটারী দিল। লটারীতে হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম উঠল। লোকেরা তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দিল। একটি বৃহদাকারের মাছ তাঁকে গ্রাস করল এবং গিলে ফেলল। হযরত ইউনুস (আ.) অনুতপ্ত হলেন। তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কেন আল্লাহর অনুমতি না নিয়ে চলে আসলেন, তজ্জন্য নিজেকে তিরস্কার করতে লাগলেন। তিনি মাছের পেটে বার বার পড়তে লাগলেন– "لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ"

"হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার গুণ-গান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের একজন।" আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, হযরত ইউনুস (আ.)-এর উক্ত দোয়া আরশের নিচে গিয়ে পৌঁছল। ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আমাদের প্রভু! এক আশ্চর্য জনক স্থান হতে একটি দুর্বল শব্দ শোনা যাচ্ছে। তা কার আওয়াজ? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, এটা আমার বান্দা হযরত ইউনুস (আ.)-এর আওয়াজ– তার দোয়া। ফেরেশতাগণ পুনরায় আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করলেন, হে আমাদের রব! আপনি কি হযরত ইউনুস (আ.)-কে তার স্বাভাবিক অবস্থার সৎকর্মের বিনিময়ে তাঁকে এ মসিবত হতে উদ্ধার করবেন না? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয় আমি তাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করব। আল্লাহ তা'আলা মাছটিকে নির্দেশ দিলেন হযরত ইউনুস (আ.)-কে সমুদ্র উপকূলে উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষেপ করার জন্য। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মাছটি হযরত ইউনুস (আ.)-কে একটি উন্মুক্ত ময়দানে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– . "فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ" অর্থাৎ আমি হযরত ইউনুস (আ.)-এর ডাকে সাড়া দিয়েছি– তাঁর দোয়া কবুল করেছি। আর আমি তাকে দুঃশ্চিন্তা (বিপদ) হতে উদ্ধার করেছি। আমি ঈমানদারদের অনুরূপভাবে উদ্ধার করে থাকি।

হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে কত দিন ছিলেন এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যেদিন মাছ তাকে গ্রাস করেছিল সেদিনই তাকে উপকূলে উদগীরণ করেছে। কেউ বলেন তিন দিন, কারো মতে সাত দিন, কোনো কোনো মুফাসসির বলেন– বিশ দিন আবার এক দলের মতে চল্লিশ দিন তিনি মাছের পেটে ছিলেন।

মাছটি তাঁকে সমুদ্রের উপকূলে উন্মুক্ত ময়দানে উদ্‌গীরণ করল। আল্লাহ তা'আলা সঙ্গে সঙ্গে তথায় একটি লাউগাছ জন্মিয়ে দেন। লাউগাছটি ছিল সাধারণত নিয়মের বহির্ভূতভাবে কাণ্ড ও ডালপালা বিশিষ্ট। এটা হযরত ইউনুস (আ.)-এর মোজেজা স্বরূপ ছিল। একটি হরিণীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন। হরিণীটি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর নিকট আসত। তিনি তার দুধ পান করতেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলেন। অথচ যখন মাছটি তাঁকে উদগীরণ করেছিল তখন তিনি অতিশয় দুর্বল ছিলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছিল। শরীরের চামড়া নবজাতক পাখির ছানার ন্যায় নাজুক হয়ে পড়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্রের তওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন : হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্র তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। তিনি তাদের ঈমান হতে নিরাশ হয়ে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন। এমনকি কখন তাদের উপর আজাব আসবে তাও জানিয়ে দিলেন। অতঃপর এলাকা ছেড়ে পাশের এক জায়গায় অবস্থান করলেন। গোত্রের লোকজন সেই নির্দিষ্ট দিন আজাবের আ'লামত দেখতে পেল। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-কে খুঁজল, কিন্তু পেল না। তারা পরস্পরে পরামর্শ করল– কি করা যায়। বয়োবৃদ্ধগণ বললেন, হযরত ইউনুস (আ.) বলতো তার খোদা সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। সুতরাং চল আমরা হযরত ইউনুস (আ.)-এর খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সুতরাং সকলে মিলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা দোয়া করল– "إِنَّ ذُنُوبَنَا قَدْ عَظُمَتْ وَجَلَّتْ وَأَنْتَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَجَلُّ افْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ" ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করলেন। তাদের উপর হতে আজাব সরে গেল।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্রের শুভ পরিণতি : সমুদ্র হতে উত্থিত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পুনরায় তাওহীদ ও ইবাদতের দাওয়াত নিয়ে তাঁর জাতির নিকট গেলেন। এবার তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করল। সকলে খালিস তওবা করত আল্লাহ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হলেন। পরবর্তী সময়ে তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছিল। তাদের উপর আর কোনো আজাব আসেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ" সুতরাং তারা ঈমান এনেছিল। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি তাদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছিলাম।

"وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ" **আয়াতের বিশ্লেষণ :** এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হযরত ইউনুস (আ.)ও নবী (রাসূল) ছিলেন। যখন তিনি বোঝাইকৃত নৌকায় আরোহণ করে পালিয়ে গেছেন সে ক্ষণটি বিশেষভাবে স্মরণীয়

হযরত ইউনুস (আ.) কি পলায়নের পূর্বে নবী ছিলেন? মৎসের সেই স্মরণীয় ঘটনার পূর্বে হযরত ইউনুস (আ.) নবী ছিলেন কিনা? এ প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরগণ ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অতএব একদলের নিকট মৎসের ঘটনার পর তাঁকে নবী বানানো হয়েছে। তাঁদের মতে হযরত ইউনুস (আ.)-কে সে কালের বাদশাহ ও তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হেদায়েত করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। তিনি তাদেরকে আজাবের ভয় দেখালেন। অতঃপর আজাব আপতিত না হওয়ায় তিনি পালিয়ে যান এবং পথিমধ্যে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আর এ স্থলে لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ-এর অর্থ হলো তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার ইলমে (জ্ঞানমতো) নবী ছিলেন। যদিও জনসাধারণের সমক্ষে তাঁর নবুয়ত প্রকাশ পায়নি বা তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নবুয়তের দায়িত্ব তখনও গ্রহণ করেননি। আর তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ছেড়ে পলায়ন করেননি; বরং তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট হতে পলায়ন করেছিলেন।

অন্য দলের অভিমত হলো, হযরত ইউনুস (আ.) মৎসের ঘটনার পূর্বেই নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ পলায়ন করার পূর্বেই তিনি নবী ছিলেন। কুরআনে কারীমের প্রকাশ্য বচনভঙ্গি ও অধিকাংশ বর্ণনানুসারে এ অভিমতটি অগ্রগণ্য হওয়া প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তিনি নবী ছিলেন এবং নবুয়ত লাভের পরই মৎসের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ.) যখন বোঝাইকৃত নৌকার দিকে পলায়ন করেছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন।

হযরত ইউনুস (আ.) কেন বোঝাইকৃত নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন? মুফাস্‌সিরীনে কেরাম উক্ত পলায়নের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন–

১. হযরত ইউনুস (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা দাওয়াত গ্রহণ করল না। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর রিসালাতকেও অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে অবগত করলেন যে, উক্ত সম্প্রদায়ের উপর আজাব অবতীর্ণ করবেন। আর আজাব অবতীর্ণ করার জন্য একটি সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আজাব নাজিল হওয়ার পূর্বে হযরত ইউনুস (আ.) গোত্র হতে সরে পড়লেন; কিন্তু গোত্রের তওবার কারণে আজাব সরে যায় এ দিকে গোত্র তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে এ ভয়ে ঘটনার যথার্থ পর্যালোচনা না করেই তিনি পালিয়ে যান।

Free @ www.e-ilmweebly.com

২. হযরত ইউনুস (আ.) গোত্রকে আজাবের যেই ভয় দেখিয়েছেন তার প্রতিশ্রুতি মূলত আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া হয়নি; বরং তিনি নিজের পক্ষ হতে উক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন আজাব নাজিল করার জন্য কিন্তু তার কওমের তওবার কারণে দোয়ার কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। সুতরাং তিনি মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পালিয়ে যান।

إِبَاقٌ-এর অর্থ এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর শানে "أَبَقَ" শব্দ প্রয়োগের কারণ : أَبَقَ শব্দটি إِبَاقٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো- "কোনো গোলাম তার মনিবের নিকট হতে পালিয়ে যাওয়া।"

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-এর ব্যাপারে এ জন্য أَبَقَ শব্দটি ব্যবহার করেছেন যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। নবীগণ (আ.) আল্লাহর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। তাদের সাধারণ ভুল-ত্রুটিও আল্লাহ তা'আলার নিকট জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লামা আলূসী (র.) "إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ"-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন- أَبَقَ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো, মনিবের নিকট হতে পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আ.) যেহেতু আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত নিজ জাতির নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর সম্পর্কে এ শব্দটির প্রয়োগ যথার্থ হয়েছে।

এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নির্দিষ্ট সময়ে যখন আজাব আসল না তখন হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই চলে গেলেন। পরে তাঁর জাতির লোকেরা যখন তাকে পেল না তখন তারা বড়-ছোট সব লোক ও সব জন্তু-জানোয়ার নিয়ে বের হলো আজাব নাজিল হওয়ার বড় দেরি ছিল না। তারা আল্লাহর দরবারে কান্না-কাটি করল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

"فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইউনুস (আ.) নৌকায় উঠার পর সমুদ্রের মাঝে নৌকা আটকে গেল। মাঝিরা বলল, এ নৌকায় এমন কেউ রয়েছে যে, তার মনিবের নিকট হতে পালিয়ে এসেছে। অতঃপর তাকে সনাক্ত করার জন্য তারা লটারি দিল। "সুতরাং তিনি লটারিতে অংশ গ্রহণ করলেন এবং পরাভূত হলেন।"

উক্ত লটারি তখন দেওয়া হয়েছিল যখন নৌকা সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়েছিল। আর বোঝাই অধিক হওয়ার কারণে তা পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

শরিয়তে লটারির বিধান : শরিয়তের দৃষ্টিতে লটারির মাধ্যমে কারো অধিকার সাব্যস্ত করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা যায় না। উদাহরণত যদ্রূপ লটারির মাধ্যমে কাউকে চোর সাব্যস্ত করা যায় না। তদ্রূপ যদি দুজনের মধ্যে কোনো সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে মতভেদ হয় তাহলে লটারির মাধ্যমে তার ফয়সালা করা জায়েজ নেই। তবে যদি কোনো ব্যক্তিকে শরিয়ত কয়েকটি বস্তু হতে যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করার জন্য অনুমতি দেয়, তাহলে তাদের যে কোনো একটি গ্রহণ করার জন্য লটারী দেওয়া জায়েজ; বরং উক্ত পরিস্থিতিতে লটারী দেওয়া উত্তম। যেমন কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তা হলে সফরে যাওয়ার সময় তাদের যে কোনো একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জায়েজ কিন্তু এ ক্ষেত্রে লটারী দেওয়া উত্তম। তাহলে আর কেউ মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার সুযোগ পাবে না। নবী করীম ﷺ তাই করতেন।

مُدْحَضِيْنَ-এর তাফসীর "مَغْلُوْبِيْنَ" দ্বারা করার কারণ : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) যে নৌকায় উঠেছিলেন তা সম্পূর্ণ বোঝাই ছিল। উপরন্তু মাঝ দরিয়ায় যেয়ে তা ঝড়ের কবলে পড়ে। কর্তৃপক্ষ লটারীর মাধ্যমে আরোহীদের একজন সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। লটারী দেওয়া হলো, লটারীতে হযরত ইউনুস (আ.) পরাজিত হলেন। তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো।

এখানে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) اَلْمُدْحَضِيْنَ-এর তাফসীর করেছেন- "اَلْمَغْلُوْبِيْنَ" শব্দের দ্বারা। مُدْحَضِيْنَ শব্দটি اِدْحَاضٌ মাসদার হতে গঠিত হয়েছে। اِدْحَاضٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো- কাউকে অকৃতকার্য (ব্যর্থ) করে দেওয়া। এর মর্মার্থ হলো- লটারীতে তার নাম উঠল। তিনি নিজে নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তবে এর দ্বারা তার উপর আত্মহত্যার অপবাদ দেওয়া যাবে না। কেননা হয়তো উপকূল নিকটে ছিল এবং তিনি আশা করেছিলেন যে, সাতার কেটে তীরে চলে যেতে পারবেন। -[মা'আরিফুল কুরআন]

"فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : হযরত ইউনুস (আ.) সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার পর একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। তিনি তখন অনুতপ্ত হলেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে লেগে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– যদি হযরত হযরত ইউনুস (আ.) জিকিরে আত্মনিয়োগ না করতেন, তাহলে তথা হতে তার রেহাই পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না; বরং কেয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই অবস্থান করত।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত; বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে– উক্ত মাছের পেটকে হযরত ইউনুস (আ.)-এর কবর বানিয়ে দেওয়া হতো।

তাসবীহ ও ইস্তেগফারের দ্বারা মসিবত লাঘব হয় : আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, বিপদ-মসিবত লাঘবে তাসবীহ ও ইস্তেগফারে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে বারংবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করছিলেন– "لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ" [হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই। আমি আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের একজন।] এ কালিমা পাঠের বরকতে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা (বিপদ) হতে নাজাত দিলেন। আর তিনি মাছের পেট হতে সহীহ সালেম বের হয়ে আসলেন। এ জন্য বুজুর্গানে দীন হতে এ রীতি চলে এসেছে যে, তারা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে বিপদাপদের সময় উক্ত কালিমা সোয়া লক্ষ বার পড়ে থাকেন। এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা মসিবত দূর করে দেন।

আবূ দাউদ শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে যে দোয়া পড়েছেন (অর্থাৎ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) তা যে কোনো মুসলমান যে কোনো উদ্দেশ্যে পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করবেন। –[কুরতুবী, মা'আরিফ]

"فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ .... شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ" **আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– হযরত ইউনুস (আ.) যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং একটি খোলা ময়দানে মাছটি তাঁকে উদগীরণ করল। তখন হযরত ইউনুস (আ.) খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁর আশ্রয় ও ছায়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা লতা-পাতাযুক্ত একটি গাছ তথায় গজিয়ে দিলেন।

اَلْعَرَاءُ - বলে খোলা ময়দানকে যেখানে কোনো গাছ-পালা তরুলতা জন্মায় না। সেখানে আত্মগোপন করার অথবা আশ্রয় নেওয়ার কোনো জায়গা নেই। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছটি 'মোছেল' শহরের একটি বস্তির অদূরে একটি উন্মুক্ত ময়দানে উদ্গীরণ করেছিল।

কোনো কোনো বর্ণনা মতে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকার কারণে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শরীরের পশম পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না।

يَقْطِيْن এমন গাছকে বলা হয় যার কাণ্ড হয় না। হাদীসে এসেছে যে, এটা ছিল লাউগাছ। এটা গজানোর উদ্দেশ্য ছিল হযরত ইউনুস (আ.)-এর ছায়া পাওয়া। এখানে شَجَرَةً শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মোজেজা হিসেবে লাউগাছের কাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। অথবা, অন্য কোনো গাছের উপর লাউয়ের ঝাড় সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা ঝাড় ব্যতীত ছায়া পাওয়া মুশকিল ছিল।

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, লাউগাছটি দু'ভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-এর উপকারে এসেছিল। প্রথমত উন্মুক্ত ময়দানে তা তাঁকে ছায়াদান করেছিল। দ্বিতীয়ত তাঁর শরীরে যেন মাছি বসতে না পারে তারও ব্যবস্থা হয়েছিল এ লাউগাছটির মাধ্যমে। কেননা লাউ ঝাড়ে মাছি বসে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٤٧. وَاَرْسَلْنٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ كَقَبْلِهٖ اِلٰى قَوْمٍ بِنَيْنَوٰى مِنْ اَرْضِ الْمُوْصِلِ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ بَلْ يَزِيْدُوْنَ عِشْرِيْنَ اَوْ ثَلَاثِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا .

১৪৭. আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছিলাম – তৎপর যদ্রূপ পূর্বে পাঠিয়েছিলাম মোসেল শহরের নিনুওয়া নামক স্থানের একটি জাতির নিকট– একলক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট বিশ অথবা ত্রিশ কিংবা সত্তর হাজার।

١٤٨. فَاٰمَنُوْا عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ الْمَوْعُوْدِيْنَ بِهٖ فَمَتَّعْنٰهُمْ اَبْقَيْنَاهُمْ مُتَمَتِّعِيْنَ بِمَالَهُمْ اِلٰى حِيْنٍ تَنْقَضِىْ اٰجَالُهُمْ فِيْهِ .

১৪৮. সুতরাং তারা ঈমান গ্রহণ করেছিল। প্রতিশ্রুত আজাব স্বচক্ষে দেখার পর– সুতরাং আমি তাদেরকে সম্ভোগের সুযোগ করে দিলাম আমি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখলাম একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যেন তাতে তাদের নির্ধারিত সময় নিঃশেষ হয়ে যায়।

١٤٩. فَاسْتَفْتِهِمْ اِسْتَخْبِرْ كُفَّارَ مَكَّةَ تَوْبِيْخًا لَهُمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ بِزَعْمِهِمْ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ فَيَخْتَصُّوْنَ بِالْاَبْنَاءِ .

১৪৯. কাজেই আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি তিরস্কারের ভঙ্গিতে মক্কাবাসীদের নিকট জানতে চান– তোমাদের রবের জন্য কি কন্যা সন্তান রয়েছে কেননা তারা মনে করে (এবং বলে বেড়ায়) যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা– আর তাদের জন্য রয়েছে পুত্র সন্তান? কাজেই তারা শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে।

١٥٠. اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ خَلْقَنَا فَيَقُوْلُوْنَ ذٰلِكَ .

১৫০. অথবা, আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারী রূপে সৃষ্টি করেছি আর তারা স্বচক্ষে দেখেছে? আমার সৃষ্টিকরণ– যদ্দরুন তারা তা বলে বেড়াচ্ছে?

١٥١. اَلَآ اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ كِذْبِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ لا

১৫১. জেনে রেখো! তারা তাদের বানোয়াট তাদের মিথ্যা [ভাষণ] বলে বেড়ায়।

١٥٢. وَلَدَ اللّٰهُ لا بِقَوْلِهِمُ الْمَلٰئِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ فِيْهِ .

১৫২. যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন– তাদের এ বক্তব্যের মাধ্যমে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী এ ব্যাপারে।

١٥٣. اَصْطَفَى بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَاسْتُغْنِىَ بِهَا عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ فَحُذِفَتْ اَىْ اِخْتَارَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ .

১৫৩. তিনি কি বেছে নিয়েছেন? প্রশ্নবোধক হামযাটি যবর-যোগে। তার কারণে হামযায়ে অসলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কাজেই তাকে বিলোপ করা হয়েছে অর্থাৎ পছন্দ করেছেন– পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তানকে?

١٥٤. مَا لَكُمْ نف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ هٰذَا الْحُكْمَ الْفَاسِدَ .

১৫৪. তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিরূপ ফয়সালা কর? এরূপ অন্যায় ফয়সালা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٥٥. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الذَّالِ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ الْوَلَدِ .

১৫৫. তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? (تَذَكَّرُونَ -এর মধ্যে) تَاء -কে ذَال -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। [মূলত এটা ছিল تَتَذَكَّرُونَ -এ ব্যাপারে যে,] আল্লাহ তা'আলা সন্তানসন্ততি হতে পবিত্র।

١٥٦. أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ أَنَّ لِلّٰهِ وَلَدًا .

১৫৬. নাকি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে? প্রকাশ দলিল এ ব্যাপারে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার সন্তান সন্ততি রয়েছে।

١٥٧. فَأْتُوْا بِكِتَابِكُمُ التَّوْرَاةِ فَأَرُوْنِيْ ذٰلِكَ فِيْهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فِيْ قَوْلِكُمْ ذٰلِكَ .

১৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের কিতাবখানা পেশ করো অর্থাৎ তাওরাত আর তাতে আমাকে তা দেখিয়ে দাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক– তোমাদের উক্ত উক্তির মধ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَأَرْسَلْنَاهُ إِلٰى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অতঃপর পুনরায় আমি তাকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকজনের নিকট পাঠিয়েছি। আলোচ্য আয়াতের উপর বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে।

মাছের ঘটনার পর হযরত ইউনুস (আ.)-কে কাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কওমকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে একটি নৌকায় উঠার পর নৌকাটি ঝড়ের কবলে পড়ে এবং ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। লোকেরা তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দেয়। একটি মাছ তাকে গিলে ফেলে এবং পরে একটি উপকূল ভূমিতে ফেলে দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহে তথা হতে নাজাত পাওয়ার পর হযরত ইউনুস (আ.) পুনরায় দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য আদিষ্ট হন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, পুনরায় তাঁকে কোথায় পাঠানো হয়েছে? পূর্ববর্তী কওম তথা মোসেল শহরের নিনুওয়া এলাকায় না অন্য কোথাও? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. আল্লামা বাগাবী (র.) ও একদল মুফাস্সিরের মতে উল্লিখিত আয়াতে নিনুওয়ায় প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পর তাকে অন্য একটি জাতির নিকট পাঠানো হয়েছে? যাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষের কিছু বেশি।

২. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, পুনরায় (মাছের ঘটনার পর) হযরত ইউনুস (আ.)-কে পূর্বোক্ত নিনুওয়াবাসীদের নিকটই পাঠানো হয়েছিল। অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এ অভিমতই পোষণ করে থাকেন। কুরআনে কারীমের বচনভঙ্গি ও হাদীস এবং ঐতিহাসিক বর্ণনাদির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়ে থাকে। অবশ্য হযরত ইউনুস (আ.)-এর কাহিনীর শুরুতে তাঁর রিসালাতের উল্লেখ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল হওয়ার পরই মাছের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এখানে পুনরায় এ জন্য এর উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় তথায়ই প্রেরিত হয়েছেন। তবে এখানে এটাই বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁকে গুটি কতেক লোকের নিকট পাঠানো হয়নি; বরং তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক।

"إِلٰى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ" আয়াতে "أَوْ" কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? অধিকাংশ মুফাস্সিরগণ এখানে "أَوْ" শব্দটিকে "بَلْ" -এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.)ও তা-ই বলেছেন। হযরত মুকাতিল, ফাররা ও আবূ উবায়দা (র.) "أَوْ" শব্দটির অর্থ بَلْ বলে মনে করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, "اَوْ" শব্দটি এখানে "وَاوْ" -এর অর্থে হয়েছে।
- অন্য এক কেরাতে এসেছে- "قِيْلَ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" অর্থাৎ দর্শকগণ তাদেরকে এক লক্ষের বেশি মনে করেন কিন্তু কত বেশি মনে করে- সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।
- কেউ কেউ বলেছেন, বিশ হাজার।
- কারো কারো মতে, ত্রিশ হাজার।
- কেউ কেউ বলেছেন, সত্তর হাজার।

"اَوْ" শব্দটি সন্দেহের জন্য অথচ আল্লাহ তা'আলার শানে সন্দেহ ঠিক নয়। তথাপি আল্লাহ তা'আলা কিভাবে "اَوْ" বললেন?

অথবা, "وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" আয়াতে "اَوْ" শব্দটি দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ" অর্থাৎ আর আমি হযরত ইউনুস (আ.)-কে পাঠিয়েছিলাম একলক্ষ লোকের নিকট অথবা ততোধিক লোকের নিকট।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছুই জানেন, শুনেন, কোনো ব্যাপারেই তার সন্দেহ-সংশয় থাকার কথা নয় তথাপি আল্লাহ তা'আলা এখানে "اَوْ" শব্দ ব্যবহার করলেন কিভাবে?

এর জাওয়াবে মুফাস্সিরগণ বলেছেন- তা সাধারণ লোকদের হিসেবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ লোক যদি তাদেরকে দেখত তাহলে বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা তার কিছু বেশি।

আল্লামা থানবী (র.) বলেছেন- এখানে সন্দেহের প্রকাশ করার উদ্দেশ্যই নয়। বরং তাদেরকে এক লক্ষও বলা যায় এবং লক্ষাধিক বলা যায়। আর তা এভাবে যে, যদি ভগ্নাংশ হিসেবে করা না হয় তাহলে এক লক্ষ হবে। আর যদি ভগ্নাংশকে হিসেবে ধরা না হয় তাহলে লক্ষাধিক হবে।

"فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- হযরত ইউনুস (আ.)-কে পুনরায় নিনুওয়া পাঠানোর পর তথাকার লোকেরা ঈমান গ্রহণ করল। তারা খাঁটি অন্তরে তাওবা করত আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। একটি নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ মৃত্যু অবধি তিনি তাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখলেন। মোটকথা তাদেরকে ইহলৌকিক সমৃদ্ধি এবং পারলৌকিক শান্তি দান করলেন।

তবে কেউ কেউ বলেন, এখানে "اِلٰى حِيْنٍ" -এর অর্থ হলো যতদিন পর্যন্ত তারা কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়নি ততদিন পর্যন্ত তাঁদের উপর কোনো আজাব ও গজব আসেনি- তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিল।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাদিয়ানীদের দলিল পেশ এবং মুহাক্কিকীনের পক্ষ হতে এর জবাব : আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর গোত্র হতে আজাব সরে গিয়েছে। কেননা তাঁর কওম সময়মতো ঈমান গ্রহণ করেছিল।

অথচ ভণ্ডনবী গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তা হতে তার স্বপক্ষে অযৌক্তিক দলিল পেশ করেছিল। তা এই যে, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার বিরোধীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল যে, যদি তারা তার উপর ঈমান না আনে তাহলে আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, অমুক সময় তাদের উপর আজাব এসে পড়বে। কিন্তু এতে বিরোধীদের বিরোধিতা আরও প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। কিন্তু তাদের উপর আজাব আসল না। অতঃপর কাদিয়ানীরা ব্যর্থতার লাঞ্ছনা ঢাকা দেওয়ার জন্য বলতে লাগল যে, বিরোধীরা যেহেতু মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে এবং তওবা করেছে সেহেতু তাদের হতে আজাব সরে গেছে। যদ্রূপ হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওম হতে আজাব সরে গিয়েছিল।

Free@www.eilm.weebly.com

কিন্তু হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওম ঈমান আনার এবং রাসূলের আনুগত্য করার কারণে আজাব হতে রেহাই পেয়েছে। অথচ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিরোধীগণ না তার উপর ঈমান এনেছে আর না তার অনুসরণ করেছে। কাজেই উভয় ঘটনাকে এক করে দেখার কোনোরূপ অবকাশ নেই। বরং তার দ্বারা দলিল পেশ করা সম্পূর্ণ বাতিল।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে অত্র আয়াতগুলোর সম্পর্ক : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। এ আয়াতসমূহে তাওহীদকে প্রমাণ করা ও শিরককে বাতিল করার মূল আলোচনা শুরু করা হয়েছে। বিশেষ করে এখানে শিরকের একটি খাস প্রকারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের আকীদা ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা। আর জিনদের নেতাদের কন্যারা হলো ফেরেশতাদের মাতা। আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেছেন, কুরায়েশ ব্যতীত জুহায়নাহ, বনূ সালীমাহ, বনূ খোযায়াহ ও বনূ মালীহের লোকজনও উক্ত আকীদা পোষণ করত। -[কাবীর, মা'আরিফ]

'ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা' মুশরিকদের এ আকিদার সমালোচনা : মক্কার কাফেররা বিশেষত কুরাইশ, বনূ জুহায়নাহ, বনূ৫প্রিযি সালীমাহ, বনূ খোযায়াহ ও বনু মালীহের লোকেরা আকিদা পোষণ করত যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান। অত্র আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত আকিদার কঠোর সমালোচনা করেছেন। জোরালো ভাষায় ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তাদের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

প্রথমত তোমাদের উক্ত দাবি খোদ তোমাদের সামাজিক প্রচলন ও মূল্যবোধের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভুল। কেননা তোমরা নিজেরা কন্যাদেরকে লজ্জাকর মনে কর। এখন যাকে তোমরা নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে কর- যাকে নিজেরা ঘৃণা কর তাকে আল্লাহ তা'আলার জন্য কিভাবে সাব্যস্ত কর। তাছাড়া তোমরা যে দাবি কর ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান- এতদ্বিষয়ে তোমাদের নিকট কি প্রমাণ রয়েছে?

কোনো দাবি সাব্যস্ত করার জন্য তিন প্রকারের দলিল পেশ করা যেতে পারে।

এক. স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা।

দুই. নকলী (বর্ণনামূলক) দলিল। অর্থাৎ এমন কারো বক্তব্যের রেফারেন্স দেওয়া যাকে সকলে মান্য করে।

তিন. আকলী (যুক্তিভিত্তিক) দলিল।

আর এটা তো স্পষ্ট যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করতে দেখনি। তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় তোমরা তথায় উপস্থিত ছিলে না। সুতরাং তাদের কন্যা হওয়ার ব্যাপারে তোমরা প্রত্যক্ষদর্শী হতে পর না। এ দিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ" অর্থাৎ নাকি আমি ফেশেতাদেরকে কন্যা করে সৃষ্টি করার সময় তারা তা দেখেছে?

আর তোমাদের নিকট কোনো নকলী দলিলও নেই। কেননা তাদের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে যার সত্যবাদী হওয়া সর্বজনবিদিত। অথচ যারা উক্ত আকিদা পোষণ করে থাকে তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া সর্বজনবিদিত। কাজেই তাদের বক্তব্য দলিল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বুঝাতে চেয়েছেন- "اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ" [তারা তা মিথ্যা বলে বেড়ায়।]

তা ছাড়া আকলী দলিল বা যুক্তিও তোমাদের মতবাদকে সমর্থন করে না। কেননা খোদ তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র সন্তানের মোকাবিলায় কন্যা সন্তানের মর্যাদা কম। সুতরাং যে পবিত্র সত্তা (আল্লাহ তা'আলা) এর মর্যাদা সমস্ত বিশ্ব ভ্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বাধিক তিনি কি করে নগণ্য মর্যাদার বস্তুটিকে [অধিক মর্যাদার মোকাবিলায়] গ্রহণ করতে পারেন? আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন- اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ؛ الخ আল্লাহ তা'আলা কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন? ধিক তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর! কিভাবে তোমরা এরূপ রায় দিতে পারলে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখন শুধু তোমাদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি পথই অবশিষ্ট রয়েছে তাহলো তোমাদের নিকট কোনো আসমানি কিতাব এসেছে যাতে ওহীর মাধ্যমে তোমাদের উক্ত আকিদার তা'লীম দেওয়া হয়েছে। যদি এরূপ হয়ে থাকে তাহলে আমাকে দেখাও যে, তোমাদের সে কিতাব ও ওহী কোথায়? নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

"أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ . فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ" অথবা তোমাদের নিকট কি কোনো স্পষ্ট দলিল রয়েছে? সুতরাং যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমাদের আসামানি কিতাব খুলে দেখাও।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে দাবি করত তা সর্বাংশে মিথ্যা ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

হটধর্মীদেরকে পাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে জবাব দিতে হয় : আলোচ্য আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, হটধর্মীদেরকে ইলযামি জবাব দেওয়া উচিত। ইলযামি জবাব বলে বিরোধীদের কোনো দাবিকে খোদ তাদের অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বাতিল সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের অন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা মেনে নিয়েছি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপর দৃষ্টিভঙ্গিটিও ভুল হয়ে থাকে। শুধুমাত্র বিরোধীদেরকে বুঝানোর জন্য তা করা হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা বিরোধীদের আকিদাকে বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য খোদ তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়েছেন যে, কন্যা সন্তানের জন্য লজ্জাকর হয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলার নিকটও কন্যা সন্তানের জন্য লজ্জাকর। আর তার অর্থ এটাও নয় যে, তারা যদি ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান না বলে পুত্র সন্তান বলত, তাহলে তা সঠিক হতো। বরং এটা একটি ইলযামী জবাব। এর উদ্দেশ্য হলো খোদ তাদের ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে তাদের আকিদাকে খণ্ডন করা।

অন্যথা এ রকম আকিদার প্রকৃত জবাব হলো আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন, তার না কোনো সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন রয়েছে আর না সন্তান-সন্ততি হওয়া তাঁর উচ্চ মর্যাদার জন্য শোভনীয় হতে পারে।

Free@www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٥٨. وَجَعَلُوْا اَىِ الْمُشْرِكُوْنَ بَيْنَهُ تَعَالٰى وَبَيْنَ الْجِنَّةِ اَىِ الْمَلٰئِكَةِ لِاِجْتِنَانِهِمْ عَنِ الْاَبْصَارِ نَسَبًا ط بِقَوْلِهِمْ اَنَّهَا بَنَاتُ اللّٰهِ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ اَىْ قَائِلِىْ ذٰلِكَ لَمُحْضَرُوْنَ النَّارَ يُعَذَّبُوْنَ فِيْهَا .

১৫৮. আর তারা নির্ধারণ করেছে অর্থাৎ মুশরিকরা নির্ধারণ [করেছে] তার মাঝে অর্থাৎ আল্লাহর মাঝে এবং জিনদের মাঝে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাঝে, কেননা তারা দৃষ্টি হতে লুকিয়ে থাকে جِنٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো গোপন থাকা, লুকিয়ে থাকা। বংশের সম্পর্ক- কেননা তারা বলত ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। অথচ জিনরা জানে যে, নিঃসন্দেহে তাদেরকে অর্থাৎ তা যারা বলে- অবশ্যই উপস্থিত করা হবে জাহান্নামে তথায় তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে।

١٥٩. سُبْحٰنَ اللّٰهِ تَنْزِيْهًا لَهُ عَمَّا يَصِفُوْنَ بِاَنَّ لِلّٰهِ وَلَدًا .

১৫৯. আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ তার পবিত্রতা- তা হতে যা তারা বর্ণনা করে থাকে- যেমন (তারা বলে) আল্লাহর সন্তানসন্ততি রয়েছে।

١٦٠. اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَىْ فَاِنَّهُمْ يُنَزِّهُوْنَ اللّٰهَ عَمَّا يَصِفُهُ هٰؤُلَاءِ .

১৬০. আল্লাহর মুখলিস বান্দাগণ ব্যতীত অর্থাৎ ঈমানদারগণ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ রয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদারগণ ঐ সব কলঙ্ক হতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকেন যা মুশরিকরা বলে বেড়ায়।

١٦١. فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنَ الْاَصْنَامِ .

১৬১. নিশ্চয় তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা অর্থাৎ মূর্তিসমূহ।

١٦٢. مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى مَعْبُوْدِكُمْ وَعَلَيْهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِفٰتِنِيْنَ لا اَىْ اَحَدًا .

১৬২. তোমরা কেউই পার না তার নিকট হতে- তোমাদের মাবুদের নিকট হতে, আর عَلَيْهِ শব্দটি مُتَعَلِّقٌ হয়েছে আল্লাহর বাণী بِفٰتِنِيْنَ -এর সাথে [বিভ্রান্ত করে] ফিরিয়ে আনতে অর্থাৎ কাউকেও না।

١٦٣. اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ جِبْرَئِيْلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ .

১৬৩. শুধুমাত্র জাহান্নামে প্রবেশকারীদের ব্যতীত যা আল্লাহ তা'আলার জানা রয়েছে।

١٦٤. وَمَا مِنَّا مَعْشَرَ الْمَلٰئِكَةِ اَحَدٌ اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ لا فِى السَّمٰوٰتِ يَعْبُدُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى فِيْهِ لَا يَتَجَاوَزُهُ .

১৬৪. হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে বললেন- নেই আমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ) ফেরেশতাদের মধ্য হতে কেউ- তবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট জ্ঞাত স্থান রয়েছে- আকাশমণ্ডলে তথায় সে আল্লাহর ইবাদত করে। সে তা অতিক্রম করে যেতে পারে না।

١٦٥. وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ اَقْدَامَنَا فِى الصَّلٰوةِ .

১৬৫. আর নিশ্চয় আমরা সারিবদ্ধকারী আমাদের পা-গুলোকে নামাজের মধ্যে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٦٦. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ الْمُنَزِّهُوْنَ اللّٰهَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ.

১৬৬. আর নিঃসন্দেহে আমরা তাসবীহকারী– আল্লাহ তা'আলার জন্য যা অশোভনীয় তা হতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকারী।

١٦٧. وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ كَانُوْا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ لَيَقُوْلُوْنَ.

১৬৭. নিঃসন্দেহে ان ছাকীলাহ হতে খাফীফাহ করা হয়েছে– তাঁরা অর্থাৎ মক্কার কাফেররা বলে আসছে।

١٦٨. لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا كِتَابًا مِنَ الْأَوَّلِيْنَ أَيْ مِنْ كُتُبِ الْأُمَمِ الْمَاضِيِّيْنَ.

১৬৮. যদি আমাদের নিকট থাকত জিকির অর্থাৎ কিতাব পূর্ববর্তীদের হতে– অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কিতাবসমূহ হতে।

١٦٩. لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ الْعِبَادَةَ لَهٗ قَالَ تَعَالٰى.

১৬৯. তাহলে তো অবশ্যই আমরা আল্লাহর মুখলিস একনিষ্ঠ বান্দা হতাম (অর্থাৎ) আল্লাহর জন্য ইবাদতকে খালেস করতাম।

١٧٠. فَكَفَرُوْا بِهٖ أَيْ بِالْكِتَابِ الَّذِيْ جَاءَهُمْ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ الْأَشْرَفُ مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ كُفْرِهِمْ.

১৭০. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– অথচ তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল অর্থাৎ যে কিতাবখানা তাদের নিকট এসেছে। আর তা হলো কুরআনে হাকীম– যা সেসব কিতাব হতে উত্তম। সুতরাং অচিরেই তারা জানতে পারবে– তাদের কুফরির পরিণতি সম্পর্কে।

١٧١. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا بِالنَّصْرِ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ج وَهِيَ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ أَوْ هِيَ قَوْلُهٗ.

১৭১. আর পূর্ব হতে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে আমার বাক্য [প্রতিশ্রুতি] সাহায্যের ব্যাপারে আমার রাসূলগণের জন্য– আর তা হলো–আল্লাহর বাণী "لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيْ" [নিশ্চয় আমি এবং আমার রাসূলগণ বিজয়ী হবে।] অথবা, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী

١٧٢. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ.

১৭২. "إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ" নিঃসন্দেহে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, কুরাইশরা বলত যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান। হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ফেরেশতাগণ যদি আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান হয়ে থাকে তাহলে তাদের জননী কে? তারা উত্তর দিল যে, জিন সরদারগণের কন্যারা হলো তাদের জননী। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেছেন– "وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" অর্থাৎ জিনরা ভালো করেই জানে যে, উক্ত আকিদা পোষণকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

"وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ ...... الخ" আয়াতগুলোর শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেছেন- নবী করীম ﷺ -এর উপর উক্ত আয়াত এমন সময় নাজিল হয়েছে যখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা "سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى" -এর নিকট (মি'রাজের সময়) ছিলেন। এ সময় তাঁর সাথী হযরত জিব্রাঈল (আ.) কিছুটা পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি আমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছ? হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে বললেন, আমি আমার নির্ধারিত স্থান হতে একটুও সামনে অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা রাখি না। "وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ" আমাদের প্রত্যেকেরই আসমানে ইবাদতের এমন একটি স্থান রয়েছে যা সে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

অপরদিকে ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানগণ নামাজে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে জানত না। তারা কিছুটা এলোমেলো হয়ে দাঁড়াত। তাদেরকে তালীম দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের ইবাদতের অবস্থা (জিব্রাঈলের মুখে) তুলে ধরেছেন। وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ আর নিঃসন্দেহে আমরা নামাজ পড়ার সময় সারিবদ্ধ হয়ে থাকি।

"وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" আয়াতের ব্যাখ্যা : আর মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ স্পষ্ট স্থাপন করেছে। এর এক ব্যাখ্যা হচ্ছে- এখানে মক্কার মুশরিকদের এ ভ্রান্ত আকিদার সমালোচনা করা হয়েছে যে, জিনদের সর্দার কন্যাগণ ফেরেশতাগণের জননী। যেন [আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই] জিন সর্দারদের কন্যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। আর সে সম্পর্কের কারণেই ফেরেশতারা জন্মগ্রহণ করেছেন।

সুতরাং তাফসীরের এক বর্ণনায় এসেছে যে, যখন আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে দাবি করল তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাদের জননী কে? তারা উত্তরে বলল, তাদের জননী হলো জিন সর্দারদের কন্যা। -[ইবনে কাছীর]

কিন্তু এ স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে, উক্ত আয়াতে তো আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। অথচ দাম্পত্য সম্পর্ক তো বংশীয় সম্পর্ক নয়।

এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.) ও যাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত অপর একটি তাফসীরই এ স্থলে সমধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আর তা হচ্ছে- আরবের মুশরিকদের আকিদা এটাও ছিল যে, (মা'আযাল্লাহ) শয়তান আল্লাহর ভাই। আল্লাহ হলেন কল্যাণের স্রষ্টা। অপরদিকে শয়তান (ইবলিস) হলো অকল্যাণের স্রষ্টা।

এখানে তাদের উক্ত বাতিল আকিদাকে খণ্ডন করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর, কুরতুবী ও কাবীর]

"وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" আয়াতে اَلْجِنَّةُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? আলোচ্য আয়াতে اَلْجِنَّةُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং-

ক. একদল মুফাস্‌সির বলেছেন, এখানে اَلْجِنَّةُ -এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। جِنٌّ -এর আভিধানিক অর্থ হলো গোপন থাকা বা লুকিয়ে থাকা। যেহেতু ফেরেশতারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে সেহেতু তাদেরকে اَلْجِنَّةُ বলা যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং হযরত মুকাতিল (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে- মক্কার কুরাইশ ও অপরাপর কতিপয় গোত্র বলত যে, "ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান"। তাদের উক্ত আকিদাকে খণ্ডন করার জন্যই আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের উক্ত আকিদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খ. অপর একদল মুফাস্‌সিরের মতে, এখানে اَلْجِنَّةُ -এর দ্বারা জিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা বলত- ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, যদি ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা হন তাহলে তাদের জননী কে? তখন তারা জবাবে বলল, তাদের জননী হলো জিনদের সর্দারগণের কন্যাগণ। এটা হতে স্বভাবতই প্রমাণিত হয় যে, তারা দাবি করেছেন যে, জিন সর্দারদের কন্যাগণের সাথে আল্লাহ তা'আলার (মা'আযাল্লাহ) দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে ফেরেশতাগণ জন্মলাভ করেছে।

অত্র আয়াতে তাদের উক্ত আকিদার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম রাযী (র.) উল্লিখিত তাফসীরদ্বয়ের সমালোচনা করেছেন এবং নিম্নোক্তভাবে তাদের খণ্ডন করেছেন : প্রথমোক্ত তাফসীরটি এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে তাদের উক্ত আকিদা তথা "ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান"-কে খণ্ডন ও বাতিল করে দিয়েছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত- "وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" -কে তার উপর আতফ করেছেন। আর عَطْف -এর মধ্যে مَعْطُوْفٌ হবে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ব্যতীত অন্য কিছু। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াত ও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য এক ও অভিন্ন হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় তাফসীরটিও এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, এতে দাম্পত্য সম্পর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে نَسَبٌ-এর কথা। আর نَسَبٌ -এর অর্থ হলো বংশগত সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্ককে نَسَبٌ বলে না, বরং একে বলে مُصَاهَرَةٌ বা اِزْدِوَاجٌ।

ইমাম রাযী (র.)-এর মাযহাব : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, এখানে نَسَبٌ -এর দ্বারা বংশগত সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে, আর الْجِنَّة -এর দ্বারা জিনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হাসান বসরী (র.) ও যাহহাক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, আরবে মুশরিকরা এটাও বলত যে, ইবলিস (শয়তান) আল্লাহর ভাই (মা'আযাল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের স্রষ্টা আর ইবলিস হলো অকল্যাণের স্রষ্টা।

আলোচ্য আয়াতে প্রকৃতপক্ষে তাদের উক্ত আকিদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুহাক্কিকগণ ইমাম রাযী (র.)-এর এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

"وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত اَلْجِنَّةُ -এর ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায়ও পার্থক্য সূচিত হয়েছে। সুতরাং যারা اَلْجِنَّةُ -এর দ্বারা ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করেছেন তাদের মতে অত্র আয়াতের তাফসীর হলো- আর ফেরেশতাগণ ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, যারা উক্ত ভ্রান্ত-আকিদা পোষণ করে [যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা-সন্তান] তারা অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আর যারা اَلْجِنَّةُ -এর দ্বারা শয়তান বা ইবলিসকে বুঝিয়েছেন তাদের মাযহাব অনুযায়ী আয়াতখানার তাফসীর হচ্ছে- তোমরা তো জিনকে আল্লাহর সাথে শরিক করে রেখেছ তারা নিজেরাও ভালো করেই জানে যে, আখেরাতে তাদের হাশর হবে অত্যন্ত খারাপ। যেমন- ইবলিস সে তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছে। সুতরাং যে স্বয়ং জানে যে, তাকে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে তাকে খোদার সাথে শরিক করা নিজের বোকামি ছাড়া আর কি?

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য : উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফেরদের একটি ভ্রান্ত আকিদার অন্তঃসারশূন্যতা বর্ণনা করেছেন। শাণিত যুক্তির মাধ্যমে তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা শিরকের অক্টোপাশ ছিন্ন করে তাওহীদের পানে ধাবিত হতে পারে। তাদের মগজ ধোলাই হয়।

"وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ" আয়াতের মধ্যস্থিত اِنَّهُمْ -এর যমীরের মারজি' : আলোচ্য আয়াতে اِنَّهُمْ -এর هُمْ যমীরের মারজি'র ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে।

এক. উক্ত যমীরের مَرْجِعٌ হলো মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়। তখন আয়াতের অর্থ হবে-

اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا يَقُوْلُوْنَ فِى الْمَلٰئِكَةِ وَقَدْ عَلِمَتِ الْمَلٰئِكَةُ الْمُشْرِكِيْنَ فِىْ ذٰلِكَ كَاذِبُوْنَ وَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ - النَّارَ وَمُعَذَّبُوْنَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ মুশরিকরা ফেরেশতাগণের ব্যাপারে যা বলার বলছে। অথচ ফেরেশতাগণ ভালোভাবেই জানেন যে, উক্ত বক্তব্যে মুশরিকরা মিথ্যাবাদী। তজ্জন্য মুশরিকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আজাব দেওয়া হবে।

দুই. উক্ত هُمْ যমীরের মারজি' হলো اَلْجِنَّةُ [জিন] অর্থাৎ জিন [শয়তানরা] ভালো করেই জানে যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আজাব দেওয়া হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** মুশরিক সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তান-সন্ততির সেই সম্পর্ক স্থপন করে থাকে আল্লাহ তা'আলা তা হতে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। মূলত এটা ফেরেশতাগণের উক্তি আল্লাহ তা'আলা এখানে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার উপর যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তাকে খণ্ডন করা এবং ফেরেশতাদের মুখে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করা এর উদ্দেশ্য। কেননা মুশরিকরা তাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলেছে। সুতরাং আল্লাহর বক্তব্যের পর এখানে এ ব্যাপারে খোদ ফেরেশতাদের বক্তব্য অত্যন্ত সমীচীন হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা তো বলে ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা- কিন্তু এ ব্যাপারে দেখা যাক যে, খোদ ফেরেশতারা কি বলে? কেননা মুশরিকদের অপেক্ষা ফেরেশতারা তাদের নিজস্ব ব্যাপারে অধিক ওয়াকিফহাল থাকার কথা।

"إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার উপর বহু মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে। যেমন মক্কার কাফেররা বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। জিনদের সাথে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বংশগত সম্পর্ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন- কিন্তু আমার মুখলিস তথা ঈমানদার বান্দাগণের কথা ভিন্ন। তারা আমার সাথে কাউকে শরিক করে না। কাউকে আমার সন্তান-সন্ততি বলে দাবি করে না। কারো সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করে না। বরং উপরিউক্ত বিষয়াবলিকে তারা আমার জন্য অশোভনীয় ও অপ্রযোজ্য বলে ঘোষণা দেয়। আমার তাসবীহ পাঠ করে, আমার পূত-পবিত্রতা বর্ণনা কর। আমার প্রশংসা ও গুণগান করে।

"إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" **আয়াতের** مُسْتَثْنٰى مِنْهُ **কি?** এখানে إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ -এর মধ্যে إِلَّا হরফে ইস্তিছনা। আর "عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ" হলো مُسْتَثْنٰى কিন্তু তার مُسْتَثْنٰى مِنْهُ কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে-

১. কেউ কেউ বলেছেন, এটার مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো لَمُحْضَرُوْنَ অর্থাৎ "إِنَّهُمْ نَاجُوْنَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَلَا هُمْ يُحْضَرُوْنَ" অর্থাৎ মুখলিস বান্দাগণ জাহান্নামের আজাব হতে নাজাত পাবে; তাদেরকে জাহান্নামে হাজির করা হবে না।

২. কারো কারো মতে, এটা আল্লাহর বাণী- "وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا" হতে مُسْتَثْنٰى হয়েছে। অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করে। কিন্তু ঈমানদারগণ তা করে না।

৩. কেউ কেউ বলেছেন- এটা لَمُحْضَرُوْنَ হতে اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ হয়েছে। "فَإِنَّهُمْ يُنَزِّهُوْنَ اللّٰهَ عَمَّا يَصِفُهُ هٰؤُلَاءِ" এ মুশরিকরা আল্লাহর উপর যে অপবাদ দেয় ঈমানদারগণ তা হতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।

"وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوْمٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ" **আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে দাবি করে এবং সদা-সর্বদা খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত থাকে ফেরেশতাদের খোদাভীতি ও খোদাপ্রীতি এর উল্লেখ করে ধিক্কার দিয়েছেন। ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশের বাইরে এক কদমও নাড়াচাড়া করে না। এমনকি ইবাদত করার জন্য তাদেরকে যে স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাও তারা অতিক্রম করে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে- "مَا فِى السَّمٰوَاتِ مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ يُصَلِّىْ وَيُسَبِّحُ" আসমানের প্রতি বিঘত জায়গায় একেক জন ফেরেশতা নামাজ ও তাসবীহরত রয়েছেন।

তা ছাড়া ফেরেশতারা আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ করে থাকে অত্যন্ত শৃঙ্খলের সাথে এবং আদব ও মহব্বতের সাথে। শেষোক্ত আয়াতটি দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"وَلَقَدْ سَبَقَتْ ..... لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ" **আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা বলেন- পূর্ব হতেই আমার রাসূলগণের জন্য আমার বাক্য স্থির হয়ে রয়েছে। এখানে বাক্য দ্বারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতিকে বুঝানো হয়েছে। আর উক্ত বাক্যটি হয়তো আল্লাহর বাণী- "لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِىْ" (অবশ্যই আমি এবং আমার রাসূলগণ বিজয়ী হবে) অথবা, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে- "إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ" নিশ্চয় তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

রাসূলগণের বিজয়ী হওয়ার অর্থ : উক্ত আয়াতদ্বয়ের সারকথা হলো– এটা পূর্ব হতেই স্থির করে রাখা হয়েছে যে, আমার খাস বান্দাগণ অর্থাৎ পয়গাম্বরগণই বিজয়ী হবে। এর উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, বহু নবী-রাসূল তো দুনিয়াতে বিজয়ী হতে পারেননি; তাহলে উক্ত আয়াতদ্বয়ের কি অর্থ হবে?

এর উত্তর হচ্ছে– যেসব পয়গাম্বরের কাহিনী আমরা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি তাদের অধিকাংশের অবস্থা হলো তাঁদের কওম তাঁদের রেসালাত ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করত কঠিন আজাবে নিপতিত হয়েছে। অপরদিকে তাদেরকে এবং তাদের অনুসারীদেরকে আজাব হতে রেহাই দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু সংখ্যক নবী ও রাসূল এমনও অতিবাহিত হয়েছেন যে, পৃথিবীতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জাগতিক বিজয় অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু যুক্তি ও দলিল উপস্থাপনের দিক বিচারে সদাসর্বদা তাঁরাই বিজয়ী ছিলেন। আর আদর্শগত বিজয় সব সময় তাঁরাই লাভ করেছেন। হ্যাঁ, এ বিজয়ের জাগতিক নিদর্শন কোনো বিশেষ হিকমত যেমন পরীক্ষা করা ইত্যাদি এর কারণে আখেরাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত থানবী (র.)-এর উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন যে, যেমন কোনো নিকৃষ্ট ডাকাত-ছিনতাইকারী যদি কোনো বড় বাদশাহের সাথে রাস্তায় দুর্ব্যবহার করে তার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে বাদশাহ তার খোদা প্রদত্ত উচ্চ মন-মানসিকতার কারণে তাকে খোশামোদ-তোষামোদ করবে না; বরং বাদশাহ তার রাজধানীতে পৌঁছে উক্ত ডাকাতকে গ্রেফতার করত শাস্তি দিবে। সুতরাং এ সাময়িক বিজয়ের কারণে না ঐ ডাকাতকে বাদশাহ বলা যাবে আর না ঐ নেতা (বাদশাহ)-কে পরাজতি বলা যাবে। বরং প্রকৃত অবস্থার বিবেচনায় ডাকাতটি তার উক্ত সাময়িক বিজয় কালেও পরাজিত। আর বাদশাহ পরাজয়ের সময়ও বাদশাহ-ই বটে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অত্যন্ত সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– "إِنْ لَمْ يُنْصَرُوْا فِى الدُّنْيَا يُنْصَرُوْا فِى الْاٰخِرَةِ" অর্থাৎ তাঁর [নবী রাসূলগণ] দুনিয়াতে সাহায্য প্রাপ্ত তথা বিজয়ী না হলেও আখেরাতে যে বিজয়ী হবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু এটা মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে, এ বিজয়– চাই তা দুনিয়াতে হোক অথবা আখেরাতে হোক কোনো সম্প্রদায় শুধুমাত্র বংশের বৈশিষ্ট্যের কারণে অথবা দীনের সাথে নিছক নামের সম্পর্কের দ্বারা অর্জন করতে পারে না; বরং এটা কেবল তখনই লাভ করা সম্ভব যখন মানুষ নিজেকে আল্লাহর সেনাবাহিনীর একজন সদস্য বানিয়ে নিবে। যার অনিবার্য পরিণতি হবে জীবনের প্রতিটি শাখায় আল্লাহর আনুগত্যকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করা।

মোটকথা, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে তার গোটা জীবনে নাফ্স এবং শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যয় করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। আর তার বিজয় চাই জাগতিক হোক অথবা আদর্শিক, দুনিয়ায় হোক বা আখেরাতে– উক্ত শর্তের উপর মওকুফ থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٧٣. وَاِنَّ جُنْدَنَا اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ الْكُفَّارَ بِالْحُجَّةِ وَالنُّصْرَةِ عَلَيْهِمْ فِى الدُّنْيَا وَاِنْ لَمْ يَنْتَصِرْ بَعْضٌ مِنْهُمْ فِى الدُّنْيَا فَفِى الْاٰخِرَةِ ـ

১৭৩. আর নিশ্চয় আমার সেনাবাহিনী অর্থাৎ ঈমানদারগণ অবশ্যই তারাই বিজয়ী হবে– কাফেরদের উপর দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে এবং দুনিয়াতে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে। আর যদি তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ দুনিয়ায় বিজয়ী না হয়ে থাকে, তাহলে আখেরাতে বিজয়ী হবে।

١٧٤. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اَعْرِضْ عَنْ كُفَّارِ مَكَّةَ حَتّٰى حِيْنٍ تُؤْمَرُ فِيْهِ بِقِتَالِهِمْ ـ

১৭৪. সুতরাং আপনি তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে নিন। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের হতে মুখ ফিরিয়ে রাখুন– একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে সময় আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হবে সে সময় পর্যন্ত।

١٧٥. وَاَبْصِرْهُمْ اِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْعَذَابُ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ عَاقِبَةَ كُفْرِهِمْ فَقَالُوْا اِسْتِهْزَاءً مَتٰى نُزُوْلُ هٰذَا الْعَذَابِ ـ

১৭৫. আপনি তাদের প্রতি দেখুন– যখন তাদের উপর আজাব নাজিল হয়। শীঘ্রই তারাও দেখবে– তাদের কুফরির পরিণাম, তখন তারা বিদ্রূপ করে বলল– এ আজাব কবে নাজিল হবে?

١٧٦. قَالَ تَعَالٰى تَهْدِيْدًا لَّهُمْ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ـ

১৭৬. আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমক দিয়ে ইরশাদ করেন– আমার আজাব পাওয়ার জন্য এরা কি তাড়াহুড়া করছে?

١٧٧. فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ بِفِنَائِهِمْ قَالَ الْفَرَّاءُ الْعَرَبُ تَكْتَفِىْ بِذِكْرِ السَّاحَةِ عَنِ الْقَوْمِ فَسَاءَ بِئْسَ صَبَاحًا صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ وَفِيْهِ اِقَامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ ـ

১৭৭. যখন আজাব নাজিল হবে তাদের আঙিনায়– তাদের উঠানে– ফাররা নাহবী বলেছেন, আরবরা প্রাঙ্গণের উল্লেখ করে কওমকে বুঝিয়ে থাকে। তখন কতইনা মন্দ হবে– অকল্যাণকর ভোর হবে– তাদের [ভোর] যাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে– এখানে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য ইসম ব্যবহার করা হয়েছে।

١٧٨. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ـ

১৭৮. আর আপনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের হতে মুখ ফিরিয়ে রাখুন।

١٧٩. وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ كَرَّرَ تَاكِيْدًا لِتَهْدِيْدِهِمْ وَتَسْلِيَةٍ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১৭৯. আর আপনি দেখুন, শীঘ্রই তারাও দেখবে– তাদেরকে হুমকি দেওয়ার জন্য এবং নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এ বাক্যটি দু-বার উল্লেখ করা হয়েছে।

١٨٠. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ الْغَلَبَةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ بِاَنَّ لَهُ وَلَدًا ـ

১৮০. আপনার প্রভুর জন্য পবিত্রতা যিনি ক্ষমতার অধিকারী– বিজয়ের অধিকারী– যা তারা বর্ণনা করে তা হতে– এই যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তানসন্ততি রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٨١. وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ الْمُبَلِّغِيْنَ عَنِ اللّٰهِ التَّوْحِيْدَ وَالشَّرَائِعَ .

১৮১. আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি- যারা আল্লাহর পক্ষ হতে তাওহীদ ও আহকাম প্রচার করে থাকেন।

١٨٢. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى نَصْرِهِمْ وَهَلَاكِ الْكَافِرِيْنَ .

১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। রাসূলগণকে সাহায্য ও কাফেরদেরকে ধ্বংস করার জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

"فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ" আয়াতে نَزَلَ-এর বিভিন্ন কেরাত : অত্র আয়াতে نَزَلَ-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

এক. জমহুর কারীগণের মতে, نَزَلَ মাযী মা'রূফের সীগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

দুই. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, نُزِلَ মাযী মাজহুলের সীগাহ হবে।

"فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ" আয়াতের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : অত্র আয়াতের فَسَاءَ-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

এক. জমহুর ক্বারীগণের মতে, فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

দুই. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, فَبِئْسَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) سَاءَ-এর স্থলে بِئْسَ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ" আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, মক্কার কাফের ও মুশরিকরা নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলত, হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি আমাদেরকে যে আজাবের ভয় দেখিয়ে আসছ তা কখন আগমন করবে? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতখানা নাজিল করেন- "اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ" তারা কি আমার আজাব পাওয়ার জন্য খুব তাড়াহুড়া করছে? তাহলে অচিরেই তারা তা দেখতে পাবে। মূলত নবী করীম ﷺ কে উপহাস করেই অনুরূপ উক্তি করত। আজাবের সময় অবগত হওয়া মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

"وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- আর আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। এখানে جُنْدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বাহিনী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? আর তারা কিভাবে বিজয়ী হবে? তা বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।

"وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ" আয়াতে আল্লাহর বাহিনী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এখানে "جُنُوْدُ اللّٰهِ" বা আল্লাহর বাহিনী বলে ঈমানদারগণকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে কাফেরদের উপর বিজয়ী করবেন- এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

صَفْوَةُ التَّفَاسِيْرِ-এর মধ্যে আল্লামা মোহাম্মদ আলী সাবূনী (র.) লিখেছেন, এখানে আল্লাহর বাহিনী দ্বারা ঈমানদারগণকে বুঝানো হয়েছে। ঈমানদারগণই দুনিয়া ও আখেরাতে বিজয়ী হবেন। দুনিয়াতে তারা অকাট্য দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে বিজয়ী হবেন। আর আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে পার্থিব বিজয়ও লাভ করবেন। আর যদি তাদের সকলের ভাগ্যে দুনিয়ার পার্থিব বিজয় লাভ করা সম্ভব নাও হয়, তথাপি তারা আখেরাতে যে বিজয়ী হবেন তা অবধারিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুফাস্‌সিরগণ আরো উল্লেখ করেছেন যে, ঈমানদারগণের বিজয় সুনিশ্চিত। কোনো কোনো যুদ্ধে তাদের আকস্মিক পরাজ বিজয়ের পরিপন্থি নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য অথবা তাদের ভুল শুধরিয়ে দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে ত করে থাকেন। এর মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত থাকে।

শত্রু ও কাফেরদের বিরুদ্ধে ঈমানদারগণ বিজয়ী হওয়ার পদ্ধতি : ঈমানদারগণ যে, কাফেরদের উপর বিজয়ী হবেন– ত আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বহু স্থানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা কখনো কখনো দেখি খোদ রাসূলগণের ভাগ্যেও পার্থিব বিজয় জুটেনি। আর ঈমানদারগণ যে বহু স্থানে পরাজিত হয়েছেন এবং বর্তমানেও হচ্ছেন– তাও তে অস্বীকার করার জো নেই। এর জবাব কি? মুফাস্‌সিরগণ এর দু'টি জবাব দিয়েছেন।

এক. উক্ত বিজয় দ্বারা দলিল ও ও যুক্তিগত বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদারগণ দলিল-প্রমাণে ও যুক্তির দিক বিবেচনায় সদা-সর্বদা কাফেরদের উপর বিজয়ী থাকবেন। যদিও সদা-সর্বদা পার্থিব বিজয় তাদের লাভ না হোকনা কেন।

দুই. উক্ত বিজয়ের অর্থ ব্যাপক। তা দুনিয়ার বিজয়ও হতে পারে, আবার আখেরাতের বিজয়ও হতে পারে। সুতরাং যেসব রাসূল পার্থিব বিজয় লাভ করতে পারেননি। তারা পরকালীন বিজয় লাভ করবেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভ করার জন্য নামে মাত্র ঈমানদার হলে চলবে না; বরং প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। আল্লাহর প্রকৃত সৈনিক হতে হবে। আর আল্লাহর প্রকৃত সৈনিক তখনই হওয়া যায় যখন কোনো ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি শাখায় আল্লাহর আনুগত্যকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করে থাকে। মূলত এ গুণটির অভাবেই ঈমানদারদের জীবনে নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি। বর্তমান বিশ্বের দিকে দিকে ঈমানদারদের পরাজিত-লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবার একমাত্র কারণ এটাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রকৃত সৈনিক হিসেবে কবুল করুন– এ কামনই করি আজ কায়মনোবাক্যে।

"أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ মক্কার কাফেরদের নিকট দীনের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। তিনি কালিমার দাওয়াত নিয়ে তাদের ধর্ণা দিয়েছিলেন কিন্তু গুটিকতেক ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত তাঁর ডাকে কেউই সাড়া দেননি। বিশেষত প্রভাবশালী, পুঁজিপতিরা ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে উঠে পড়ল। তাঁরা নানাভাবে তাঁর দাওয়াতকে প্রতিহত করতে লাগল। নবী করীম ﷺ ও তাঁর নিরীহ অনুসারীদের উপর চালানো হয় নির্যাতনের স্টীম রোলার। শত নির্যাতনের মুখেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে ধৈর্যধারণ করার পরামর্শ দিলেন। জিহাদের হুকুম নাজিল না হওয়া পর্যন্ত কিছু দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, অচিরেই কাফেরদের উপর আজাব নেমে আসবে। হুযূর ﷺ তাদেরকে আজাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা তাঁকে পাত্তাই দিল না। বরং উপহাস করে বলল, মুহাম্মদ! সেই আজাব কবে আসবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে ইরশাদ করেন– তারা আমার আজাব পাওয়ার জন্য কি তাড়াহুড়া করছ? সুতরাং জেনে রেখ রাখ, তারা স্বচক্ষেই উক্ত আজাব দেখতে পাবে।

"فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ" : **আয়াতের ব্যাখ্যা :** সুতরাং যখন সেই আজাব তাদের আঙ্গিনায় এসে পড়বে তখন যাদেরকে পূর্ব হতে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের কতইনা মন্দ হবে।

سَاحَة -এর আভিধানিক অর্থ হলো– আঙ্গিনা। আরবিতে প্রবাদ আছে– "نَزَلَ بِسَاحَتِهٖ" (তার আঙ্গিনায় নাজিল হলো।) এর অর্থ হলো– কোনো বিপদ এসে পড়া। আর সকাল বেলার কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, আরবের শত্রুর হামলা সাধারণত সকাল (ভোর) বেলায় হতো।

নবী করীম ﷺ -এরও পবিত্র অভ্যাস ছিল যখন তিনি রাত্রি বেলায় শত্রু-কওমের নিকট পৌঁছতেন তখন সাথে সাথে আক্রমণ করতেন না; বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যখন খায়বরের দুর্গের উপর সকালবেলা আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ মহান, খায়বর বিরান হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আমরা যখন কোনো কওমের আঙিনায় অবতরণ করি তখন যাদেরকে পূর্ব হতে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের সেই ভোর কতই না মন্দ হয়ে থাকে।' –[মা'আরিফ]

"وَتَوَلَّ عَنْهُمْ ..... فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : কাফেরদের নির্যাতনের মুখে কিছু কাল ধৈর্যধারণ করার জন্য নবী করীম ﷺ -কে পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– হে হাবীব! আপনি জিহাদের হুকুম নাজিল না হওয়া পর্যন্ত কিছু কাল মক্কার কাফেরদের হতে মুখ ফিরিয়ে রাখুন। আর আপনি দেখতে থাকুন, শীঘ্রই তারাও দেখতে পাবে।

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে কিছু দিন সুযোগ দেওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ -কে পরামর্শ দিয়েছেন তাদের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাতে যেতে নিষেধ করেছেন। মূলত এর দ্বারা তাদের ঢিল দেওয়া উদ্দেশ্য– যাতে তাদের কুফরিতে আরও তারাক্কী করত কঠোর আজাবের উপযোগী হয়। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ফরমান– "أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا" কাফেরদেরকে খানিকটা সুযোগ দিন।

আলোচ্য আয়াতে حِيْنٍ -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

ক. একদল মুফাস্সিরের মতে– إِلَىٰ حِيْنٍ -এর অর্থ "إِلَىٰ يَوْمِ بَدْرٍ" অর্থাৎ বদরের দিবস পর্যন্ত আপনি মক্কার কাফেরদেরকে সুযোগ দিন।

খ. কেউ কেউ বলেছেন– "إِلَىٰ حِيْنٍ" দ্বারা فَتْحُ مَكَّةَ (মক্কা বিজয়কে) উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সুযোগ দিন।

গ. আরেক দল মুফাস্সিরের মতে– "إِلَىٰ حِيْنٍ" -এর অর্থ হলো– إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে রাখুন।

শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণের বিজয় ও কাফেদের উপর আল্লাহর আজাব নেমে আসার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-কে আশ্বাস প্রদান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নবীজী ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেন–

হে নবী! ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে মোড় নেয় তা আপনি দেখতে থাকুন। অতি শীঘ্রই তাদের উপর যে আজাব নেমে আসবে তা যদ্রূপ আপনি দেখতে পাবেন তদ্রূপ তারাও তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তাদের চোখের সামনেই আপনি বিজয়ী বেশে আত্মপ্রকাশ করবেন। আর তারা তাদের কুফরির শাস্তি তার ভয়াবহ পরিণতি হাড়ে হাড়ে টের পাবে। তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। দুনিয়ায় পরাজয়, লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। আর পরকালে রয়েছে সীমাহীন আজাব।

কিছুদিন যেতে না যেতেই আল্লাহ তা'আলার উক্ত ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। মাত্র অল্প কয়েক বৎসরের ব্যবধানে মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে শুধু মক্কার বাইরে কয়েকটি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী দেখিনি, রবং মহা বিজয়ীর বেশে সেই মক্কায়ও তাকে প্রবেশ করতে দেখেছে যেখান হতে একদিন তাকে দলবলসহ তারা তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের সমস্ত অহমিকা, অহঙ্কারবোধ মিথ্যা আস্ফালন সেই দিন ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল।

"سُبْحَانَ رَبِّكَ ..... رَبِّ الْعَالَمِيْنَ" **আয়াতত্রয়ের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফ্‌ফাতের ইতি টানা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সুন্দর সমাপ্তি বিশ্লেষণের জন্য একটি পুস্তক রচনা করা দরকার। সংক্ষিপ্ত কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা এ তিনটি আয়াতের মধ্যে সমস্ত সূরার বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

সূরাটির সূচনা হয়েছিল তাওহীদের আলোচনার মাধ্যমে। যার সারকথা হলো– মুশরিকরা আল্লাহর সম্পর্কে যা বলে থাকে– আল্লাহ তা'আলা সেসব হতে পাক-পবিত্র। সুতরাং প্রথম আয়াতটিতে সেই দীর্ঘ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরপর নবীগণের (আ.) কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিতীয় আয়াতে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তৎপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কাফেরদের আকিদা-সন্দেহ-সংশয় ও অভিযোগসমূহের অসারতা প্রমাণ করত বলে দেওয়া হয়েছে যে, পরিশেষে ঈমানদরগণই বিজয়ী হবেন। এ কথাগুলো যে কোনো লোক মনোযোগের সাথে পড়বে সে-ই পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা তার প্রশংসা ও গুণগান করতে বাধ্য হবে। সুতরাং সেই হামদ ও ছানার মাধ্যমেই সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তা ছাড়া উক্ত আয়াত কয়টিতে ইসলামের বুনিয়াদী আকিদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ ও রেসালাতকে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আখেরাতের আলোচনাও এসে গিয়েছে। আর এগুলো সাব্যস্ত করাই ছিল আলোচ্য সূরাটির মুখ্য উদ্দেশ্য সাথে সাথে এ তালীমও দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ঈমানদারের উচিত সে যেন তার প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি ভাষণ এবং প্রতিটি মজলিসকে আল্লাহর মহত্ত্ব ও হামদ-ছানার সাথে সমাপ্ত করে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ স্থলে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে কয়েকবার নামাজ শেষ করার পর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়তে শুনেছি।

"سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ الخ" এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে আল্লামা বাগাবীর (র.) হাওলায় হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে– তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাল্লাভর্তি ছওয়াব কামনা করে সে যেন প্রত্যেক মজলিসের পর এই আয়াত কয়টি পাঠ করে– "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ الخ" ইবনে আবী হাতিম (র.) হযরত শা'বীর (র.) মাধ্যমে উক্ত হাদীসখানা নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

উল্লিখিত আয়াত কয়টির মধ্যে নিহিত গূঢ়রহস্য : আলোচ্য আয়াত কয়টিতে আল্লাহ তা'আলা এমন তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যার জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মু'মিন তথা প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো–

১. **আল্লাহর পরিচয় :** প্রতিটি মানুষের উচিত স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলাকে চিনা তাঁর পরিচয় লাভ করা। এর জন্য তিনটি গুণ অর্জনের প্রয়োজন।

এক. আল্লাহর জন্য যেসব গুণাবলি শোভনীয় সেগুলো দ্বারা তাকে গুণান্বিত করা। আল্লাহ সর্বশক্তিমান– সর্বশক্তির আকর। সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও তার মুখাপেক্ষী কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন ইত্যাদি।

দুই. যেসব সিফাত তাঁর জন্য শোভনীয় নয় তাদের হতে তাকে পবিত্র জানা। সেসব সিফাত দ্বারা তাঁকে আখ্যায়িত না করা।

তিন. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক না করা। সত্তা সিফাত বা ইবাদত কোনো ব্যাপারেই কাউকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত না করা। رَبِّ الْعِزَّةِ কথাটি হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। اَلْعِزَّةِ -এর মধ্যস্থিত "اَل" টি اِسْتِغْرَاقْ -এর জন্য হয়েছে। এর অর্থ হলো, সকল ক্ষমতার উৎস হলেন, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। প্রথমোক্ত আয়াতে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ" আয়াতখানায় সত্যিই আল্লাহ তা'আলার এক নিখুঁত পরিচয় ফুটে উঠেছে।

২. **আত্ম পরিচয় :** মানুষ নিজে নিজেকে জানতে হবে। সে– কে? এ সৃষ্টিগত ও তার স্রষ্টার সাথে তার কি ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত– তা ভালো করে জেনে নেওয়া প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, মানুষ স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; বরং এর জন্য এমন এক সম্পূরকের প্রয়োজন যে তার এ অভাব-জ্ঞানের এ কাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করতে পারে। এমন এক পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন যে তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিবে। যে তাকে নির্ভুলভাবে বাতলিয়ে দিবে, যে তার নাফস বা আত্মা কি? তার প্রাপ্য কি? অন্যান্য সৃষ্টজীবের সাথে তার আচার-আচরণই বা কিরূপ হওয়া উচিত? বলাবাহুল্য যে, কেবলমাত্র একজন নবী বা রাসূলই এ দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করতে পারে। কেননা, ঐশী জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁর জ্ঞান যেমন নিখুঁত ও নির্ভুল তেমনটি পরিপূর্ণও বটে। তিনিই কেবল পথনির্দেশক ও অনুসরণযোগ্য হতে পারেন। দ্বিতীয় আয়াত– "وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ" -এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. **মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া :** একমাত্র ঐশীবাণী ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা জানার কোনো পথ নেই। মূলত মৃত্যুর পরবর্তী শান্তি লাভের জন্য এবং আজাব হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর রহমতের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশাকেই বড় করে দেখতে হবে। তৃতীয় আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– "وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ"

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ : সূরা সোয়াদ মক্কায় অবতীর্ণ

وَهِيَ سِتٌّ اَوْ ثَمَانٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً : [illegible]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. صٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ -

১. সোয়াদ আল্লাহ তা'আলাই তার মর্মার্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

٢. وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ اَىِ الْبَيَانِ اَوِ الشَّرَفِ وَجَوَابُ هٰذَا الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ اَىْ مَا الْاَمْرُ كَمَا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ تَعَدُّدِ الْاٰلِهَةِ -

২. শপথ উপদেশপূর্ণ বর্ণনাপূর্ণ ও মর্যাদাবান কুরআনের। শপথের জবাব উহ্য অর্থাৎ বিষয় এমন নয়, যেমন মক্কার কাফেরগণ অসংখ্য মাবুদের দাবি করে।

٣. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فِىْ عِزَّةٍ حَمِيَّةٍ وَّتَكَبُّرٍ عَنِ الْاِيْمَانِ وَّشِقَاقٍ خِلَافٍ وَّعَدَاوَةٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ كَمْ اَىْ كَثِيْرًا اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ اَىْ اُمَّةٍ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فَنَادَوْا حِيْنَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ بِهِمْ وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ اَىْ لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ فِرَارٍ وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ وَّالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ نَادَوْا اَىِ اسْتَغَاثُوْا وَالْحَالُ اَنْ لَا مَهْرَبَ وَلَا مَنْجٰى وَمَا اعْتَبَرَ بِهِمْ كُفَّارُ مَكَّةَ -

৩. বরং যারা কাফের মক্কার অবিশ্বাসীগণ তারা অহংকার ঈমানের বিপরীতে কুফরের সাথে অহংকার ও মুহাম্মদ ﷺ -এর শত্রুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত। তাদের আগে আমি কত অসংখ্য জনগোষ্ঠীকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছি। অতঃপর তারা তাদের উপর আজাব অবতরণের সময় আর্তনাদ করতে শুরু করেছে কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। অর্থাৎ সে সময় পলায়নের সময়ও ছিল না। لَاتَ -এর মধ্যে تَاء টি অতিরিক্ত এবং لَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ বাক্যটি نَادَوْا -এর যমীর থেকে حَالٌ অর্থাৎ তারা আর্তনাদ করেছে অথচ তাদের পলায়নের কোনো সুযোগ ছিলনা ও মুক্তির কোনো পথ ছিল না। মক্কার কাফেরগণ তাদের অবস্থা থেকে কোনো উপদেশ গ্রহণ করে না।

٤. وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ زِ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِهِمْ يُنْذِرُهُمْ وَيُخَوِّفُهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَ الْبَعْثِ وَهُوَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ج

৪. তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্কবাণী আগমন করেছেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল প্রেরিত হয়েছে যিনি তাদেরকে পুনরুত্থানের পরের জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। আর কাফেররা বলে, এ-তো এক মিথ্যাচারী জাদুকর। قَالَ الْكٰفِرُوْنَ -এর মধ্যে যমীরের স্থলে اِسْمِ ظَاهِرٌ রাখা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج حَيْثُ قَالَ لَهُمْ قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَىْ كَيْفَ يَسَعُ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ عَجِيْبٌ .

৫. সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যখন মহানবী ﷺ মক্কার কাফেরদের বললেন, তোমরা বল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তখন তারা পূর্বোল্লিখিত উক্তিটি বলল। অর্থাৎ পুরা বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের জন্যে এক মাবুদ কিভাবে যথেষ্ট?।

٦. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ مِنْ مَجْلِسِ اِجْتِمَاعِهِمْ عِنْدَ اَبِىْ طَالِبٍ وَسِمَاعِهِمْ فِيْهِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنِ امْشُوْا اَىْ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ ج اُثْبُتُوْا عَلٰى عِبَادَتِهَا اِنَّ هٰذَا الْمَذْكُوْرَ مِنَ التَّوْحِيْدِ لَشَىْءٌ يُرَادُ مِنَّا .

৬. মক্কার কাফেরদের সর্দার আবূ তালেবের মজলিসে মহানবী ﷺ -এর থেকে قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উক্তি শোনার পর। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি পরস্পর একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও ও তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই আমাদের কাছে তাওহীদের এ বক্তব্য বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

٧. مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج اَىْ مِلَّةِ عِيْسٰى اِنْ مَا هٰذَاۤ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ج كِذْبٌ .

৭. আমরা এ ধরনের কথা সাবেক ধর্মে হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মে শুনিনি, এটা মনগড়া ব্যাপার মিথ্যা বৈ নয়।

٨. ءَاُنْزِلَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكِهِ عَلَيْهِ عَلٰى مُحَمَّدٍ الذِّكْرُ الْقُرْاٰنُ مِنْ بَيْنِنَا ط وَلَيْسَ بِاَكْبَرِنَا وَلَا اَشْرَفِنَا اَىْ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ قَالَ تَعَالٰى بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ج وَحْيِىْ اَىِ الْقُرْاٰنِ حَيْثُ كَذَّبُوا الْجَائِىَ بِهٖ بَلْ لَّمَّا لَمْ يَذُوْقُوْا عَذَابِ وَلَوْ ذَاقُوْهُ لَصَدَّقُوا النَّبِىَّ ﷺ فِيْمَا جَاۤءَ بِهٖ وَلَا يَنْفَعُهُمُ التَّصْدِيْقُ حِيْنَئِذٍ .

৮. আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি উপদেশবাণী কুরআন অবতীর্ণ হলো? অথচ তিনি আমাদের চেয়ে বড়ও না, সম্মানীও না। অর্থাৎ তার প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। ءَاُنْزِلَ -এর উভয় হামযাকে তাহকীক বা দ্বিতীয় হামযাকে তাসহীল বা উভয় অবস্থায় উভয় হামযার মধ্যখানে আলীফ যুক্ত করে মোট চার প্রকার পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বস্তুতঃ তারা আমার উপদেশ আমার ঐশীবাণী কুরআন সম্পর্কে সন্দিহান। কেননা তারা ওহীর বাহককে অস্বীকার করেছে। বরং তারা আমার আজাব আস্বাদন করেনি। এবং যখন তারা আজাব আস্বাদন করবে নবী ﷺ -কে তার আনীত বিষয়ে বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখন তাদের সেই বিশ্বাস কোনো ফায়েদা দেবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْغَالِبِ الْوَهَّابِ مِنَ النُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا فَيُعْطُونَهَا مَنْ شَاءُوا.

৯. না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার নবুয়ত ইত্যাদির রহমতের কোনো ভাণ্ডার রয়েছে? অতঃপর তারা যাকে ইচ্ছা দান করে ও যাকে ইচ্ছা দান করে না।

١٠. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج إِنْ زَعَمُوا ذٰلِكَ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ الْمُوصِلَةِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَأْتُوا بِالْوَحْيِ فَيَخُصُّوا بِهِ مَنْ شَاءُوا وَ أَمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْإِنْكَارِ.

১০. না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? যদি তাদের বিশ্বাস এটা হয় তাহলে তাদের উচিত রশি ঝুলিয়ে আকাশে আরোহণ করা। অতঃপর ওহী নিয়ে এসে তাদের ইচ্ছানুযায়ী যাকে খুশি তাকে দান করা। أَمْ অব্যয়টি উভয়স্থানে هَمْزَة إِنْكَارِيْ -এর অর্থে।

١١. جُنْدٌ مَا أَيْ هُمْ جُنْدٌ حَقِيرٌ هُنَالِكَ أَيْ فِيْ تَكْذِيبِهِمْ لَكَ مَهْزُومٌ صِفَةُ جُنْدٍ مِنَ الْأَحْزَابِ صِفَةُ جُنْدٍ أَيْضًا أَيْ مِنْ جِنْسِ الْأَحْزَابِ الْمُتَحَزِّبِيْنَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ وَأُولٰئِكَ قَدْ قُهِرُوا وَأُهْلِكُوا فَكَذٰلِكَ يُهْلَكُ هٰؤُلَاءِ.

১১. এ ক্ষেত্রে অর্থাৎ তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে তারা পরাজিত এক নগণ্য বাহিনী مَهْزُوْم টি جُنْدٌ -এর সিফত جُنْدٌ ও مِنَ الْأَحْزَابِ -এর সিফত। অর্থাৎ এই বাহিনী ঐ বাহিনীর মধ্য থেকে যারা আপনার পূর্বে নবীদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে পরাজিত হয়েছে ও ধ্বংস হয়েছে। তেমনিভাবে তারা ধ্বংসও হবে।

١٢. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ تَانِيثُ قَوْمٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنٰى وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ كَانَ يَتِدُ لِكُلِّ مَنْ يَغْضَبُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ وَيَشُدُّ إِلَيْهَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَيُعَذِّبُهُ.

১২. তাদের পূর্বেও মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, قَوْم শব্দটি অর্থগতভাবে মুওয়ান্নাছ, আদ, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন, ফেরাউন যার প্রতি রাগ করত তাকে চারটি কীলক গেঁড়ে হাত পা বেঁধে শাস্তি দিতো। তাই তাকে ذُو الْأَوْتَادِ বলা হতো।

١٣. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ط أَيِ الْغَيْضَةِ وَهُمْ قَوْمُ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ أُولٰئِكَ الْأَحْزَابُ.

১৩. ছামুদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ অর্থাৎ বাগান ওয়ালা হযরত শুয়াইব (আ.)-এর গোত্র এরাই ছিল বহু বাহিনী।

Free @ www.eilm.weebly.com

١٤. اِنْ مَا كُلٌّ مِنَ الْاَحْزَابِ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ لِاَنَّهُمْ اِذَا كَذَّبُوْا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَدْ كَذَّبُوْا جَمِيْعَهُمْ لِاَنَّ دَعْوَتَهُمْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ دَعْوَةُ التَّوْحِيْدِ فَحَقَّ وَجَبَ عِقَابِ.

১৪. এদের প্রত্যেকেই পয়গাম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। কেননা যখন তারা একজন নবীকে অস্বীকার করল যেন তারা সব নবীকে অস্বীকার করলো। কেননা সব নবীরাই একই তাওহীদের দাওয়াত দিতো ফলে আমার আজাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ صٓ : এই সূরাকে সূরায়ে দাউদও বলা হয় (خَازِنْ) এতে পাঁচটি কেরাত রয়েছে–

১. জমহুরের নিকট سُكُوْن-এর সাথে অর্থাৎ صَادْ [সোয়াদ]

২. তানভীন ব্যতীত পেশসহ অর্থাৎ صَادُ [সোয়াদু]

৩. তানভীন ছাড়া যের যুক্ত অর্থাৎ صَادِ [সায়াদি]

৪. তানভীন বিহীন যবরযুক্ত صَادَ [সোয়াদা]

৫. তানভীনসহ যেরযুক্ত অর্থাৎ صَادٍ [সোয়াদিন]

তানভীন বিহীন পেশযুক্ত সুরতে উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰذِهٖ صَادُ-এই সুরতে صٓ সূরার নাম হবে। তা عَلَمِيَّتْ এবং تَانِيْثْ-এর কারণে غَيْر مُنْصَرِف হবে। যারা তানভীন বিহীন مَفْتُوْح পড়েছেন তা তিন সুরত হতে পারে।

১. تَخْفِيْفًا ফাতহার উপর মাবনী হবে। যেমন– اَيْنَ ও كَيْفَ

২. جَرّ تَقْدِيْرِىْ-এর সাথে উহ্য حَرْف قَسَمْ-এর কারণে।

৩. উহ্য ফে'লের কারণে نَصْب যুক্ত হবে অথবা উহ্য হরফে কসমের কারণে। (جَمَل مُلَخَّصًا)

قَوْلُهُ وَالْقُرْاٰنِ : এখানে وَاوْ টি হলো جَارَّه قَسَمِيَّةْ আর اَلْقُرْاٰنِ হলো مُقْسَمْ بِهٖ আর جَوَاب قَسَمْ-এর মধ্যে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ হলো جَوَاب قَسَمْ মূলে ছিল لَكُمْ اَهْلَكْنَا এরপর لَامْ কে فَصْل كَثِيْر-এর কারণে উহ্য করে দিয়েছেন। যেমন সূরায়ে শাম্‌স্ এ قَدْ اَفْلَحَ জওয়াবে কসম হতে لَامْ কে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

২. জওয়াবে কসম হলো اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ

৩. জওয়াবে কসম উহ্য রয়েছে আর তা হলো لَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ ইত্যাদি। ইবনে আতিয়া বলেছেন جَوَاب قَسَمْ হলো مَا الْاَمْرُ كَمَا تَزْعُمُوْنَ যা উহ্য রয়েছে। আল্লামা মহল্লী (র.) كَمَا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ تَعَدُّدِ الْاٰلِهِ কে جَوَاب قَسَمْ মেনেছে যা উহ্য রয়েছে। আর আল্লামা যামাখশরী (র.) اِنَّهٗ لَمُعْجِزٌ কে উহ্য মেনেছেন। আর শায়খ (র.) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ কে উহ্য মেনেছেন এবং বলেছেন যে, এটা يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ-এর নজির। (جَمَل مُلَخَّصًا)

قَوْلُهُ اَىْ كَثِيْرًا : এতে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, كَمْ টি হলো خَبَرِيَّةْ যা اَهْلَكْنَا-এর মাফঊল হয়েছে। আর مِنْ قَرْنٍ হলো তার تَمْيِيْز ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ : لَاتَ -এর تَا -এর রুসমূল খতের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ مَنْصُوْلًا লম্বার সুরতে লিখেছেন (ت) যেমনটি বিদ্যমান নুসখায় রয়েছে। আবার কেউ কেউ تَا কে حِيْنَ -এর সাথে মিলিয়ে লিখেছেন। অর্থাৎ لَا تَحِيْنُ مَنَاصٌ আর এই দ্বন্দ্বের ভিত্তি হলো وَقْف -এ উপর। কেউ কেউ ت -এর উপর ওয়াকফ করেন। তখন তারা (ت) কে লম্বা আকৃতিতে লিখেন। আবার কেউ কেউ لَا -এর উপর ওয়াকফ করেন।

قَوْلُهُ مَنَاصٍ : বাবে نَصَرَ হতে مَصْدَر مِيْمِىٌّ অর্থ পলায়ন করা। আশ্রয় নেওয়া। إِسْم ظَرْف ও হতে পারে। আশ্রয়স্থল, আশ্রয়ের জায়গা, পালানোর জায়গা। এর অর্থ হলো– لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ فِرَارٍ আর تَا হলো অতিরিক্ত। বাক্যটি نَادَوْا -এর فَاعِلٌ থেকে حَالٌ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো রাসূলগণের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ অনেক চিৎকার করবে কিন্তু তাদের কোনো পালানোর জায়গাও থাকবে না এবং মুক্তির জায়গাও থাকবে না। কিন্তু মক্কার কাফেররা তাদের সেই অবস্থা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি।

قَوْلُهُ اَىْ لَيْسَ الْحِيْنُ : এই ইবারত দ্বারা আল্লামা মহল্লী (র.) لَاتَ -এর ব্যাপারে খলীল এবং সীবওয়াইহ -এর পছন্দনীয় মাযহাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর তা হলো لَاتَ -এর মধ্যে لَا হলো لَيْسَ অর্থে। আর তার إِسْم এবং خَبَرْ উহ্য রয়েছে। আর সেই إِسْم এবং خَبَر হলো حِيْن শব্দটি। উহ্য ইবারত হলো لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ مَنَاصٍ প্রথম حِيْن হলো إِسْم আর দ্বিতীয়টি হলো خَبَرْ আর لَاتَ -এর ت টি نَفِىْ তাকিদের জন্য অতিরিক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ : অতিরিক্ত تَقْبِيْح -এর জন্য إِسْم ضَمِيْر -এর পরিবর্তে إِسْم ظَاهِرْ উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ قَالُوْا -এর পরিবর্তে قَالَ الْكَافِرُوْنَ বলেছেন।

قَوْلُهُ عُجَابٌ : বড় আশ্চর্য জিনিস, মুবালাগার সীগাহ অর্থাৎ এরূপ আশ্চর্য বস্তু যা يقين -এর অনুপোযুক্ত।

قَوْلُهُ اَنِ امْشُوْا : এতে اَنْ হলো تَفْسِيْرِيَّة যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ : এটা اِصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ -এর ইল্লত।

قَوْلُهُ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ : এটা اِعْرَاضْ مُقَدَّرْ থেকে হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো اِنْكَارُهُمْ لِلذِّكْرِ لَيْسَ عَنْ عِلْمٍ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِنْهُ

قَوْلُهُ بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ : অর্থাৎ عَذَابِىْ সংশয়ের কারণ কে বর্ণনা করার জন্য اِضْرَاب اِنْتِقَالِىْ হয়েছে অর্থাৎ তাদের সংশয়ের কারণ হলো এই যে, এই সকল লোকেরা এখনও আমার শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেনি ﷺ لَوْ ذَاقُوْا لَصَدَّقُوا النَّبِىَّ

قَوْلُهُ لَمَّا : لَمْ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে لَمَّا টা لَمْ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ : فَاء উহ্য শর্তের জবাবে হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) উহ্য ইবারত বের করে ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ اِنْ زَعَمُوْا ذٰلِكَ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ

قَوْلُهُ اَىْ هُمْ جُنْدٌ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جُنْدٌ হলো উহ্য মুবতাদা খবর এবং تَنْوِيْن টা تَقْلِيْل এবং تَحْقِيْر -এর জন্য হয়েছে। আর مَا টা قِلَّتْ তাকিদের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ هُنَالِكَ : এটা جُنْدٌ বা مَهْزُوْمٌ -এর ظَرْف হয়েছে। আর مَهْزُوْمٌ অর্থ– হলো مَغْلُوْب [পরাজিত] مَقْهُوْر [ক্রোধে নিপতিত] উদ্দেশ্য হলো কুরাইশ হলো রাসূল ﷺ বিরোধী একটি ছোট লাঞ্ছিত সম্প্রদায় যারা অচিরেই পরাজিত হবে।

قَوْلُهُ صِفَةُ جُنْدٍ اَيْضًا : এখানে جُنْدٌ -এর তিনটি সিফত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম সিফত হলো مَا আর দ্বিতীয় সিফত হলো مَهْزُوْمٌ আর তৃতীয় সিফত হলো مِنَ الْاَحْزَابِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ : এটা উল্লিখিত طَائِفَ হতে بَدْل হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُمْ الخ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর. প্রশ্ন হলো এই যে. اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ কেন বলেছেন অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তো শুধুমাত্র একজন রাসূলকেই মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে?

উত্তর. যেহেতু সকল নবী রাসূলের দীনের মূলনীতি ও দাওয়াত একই ছিল, কাজেই এক রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা সকল রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই নামান্তর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সোয়াদ প্রসঙ্গে :

সূরায়ে সোয়াদ মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত-৮৮, বাক্য ৭৩২, অক্ষর, ৩,০৬৬।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ -এর একখানি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে গুনাহ থেকে মুক্ত করবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

প্রথমত: পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে তাওহীদ ও রেসালাতের আলোচনার উপর। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং শানের বর্ণনা দ্বারা, যা প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালাত ও নবুয়তের দলিল।

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী সূরায় পূর্বকালের কয়েকজন সত্য সাধক নবী রাসূলগণের ঘটনা স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে এ সূরায়ও হযরত দাউদ (আ.) হযরত সোলায়মান (আ.) এবং হযরত আইউব (আ.)-এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: পূর্ববর্তী সূরার শেষে কাফেরদের একথার উদ্ধৃতি রয়েছে- لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ মক্কার কাফেররা বলতো যদি আমাদের নিকট কোনো উপদেশমূলক গ্রন্থ নাজিল হতো। তবে আমরা পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা খাঁটি বান্দা হতে পারতাম। তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এবং এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের শপথ যা উপদেশে পরিপূর্ণ।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ১০]

শানে নুযূল : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমি এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর পিতৃব্য আবূ তালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও। ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা শোনা ও হেফাজত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কুরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হলো। এতে আবূ জাহল, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করলো যে, আবূ তালিব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। তারা বলবে, আবূ তালিবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলো না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালিব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই যাতে সে আমাদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেবদেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র। তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোনো লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র এ কুরায়শ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কুরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেব না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে। আবূ তালিব বললেন, সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন, আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা বলতে চাই, যার দৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবূ জাহল বলে উঠল, বল, সেই কালেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কালেমা নয়, দশ কালেমা বলতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যস "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, আমরা কি সমস্ত দেবদেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার! এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেই সূরা সোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। −[ইবনে কাছীর]

صٓ অন্যান্য মোকাত্তায়াত' অক্ষরের ন্যায় এর অর্থও একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত রয়েছেন। অবশ্য তাফসীরকারগণ একথাও বলেছেন যে, صٓ অক্ষরটি আল্লাহ তা'আলার একটি পবিত্র নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন− صَمَدٌ অথবা صَادِقُ الْوَعْدِ থেকে صٓ নেওয়া হয়েছে। অথবা صَدَقَ مُحَمَّدٌ فِیْ كُلِّ مَا اَخْبَرَبِهٖ عَنِ اللّٰهِ.

তাফসীরকার যাহহ্যাক (র.) বলেছেন, صٓ ব্যবহৃত হয়েছে صَدَقَ اللّٰهُ অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সত্যই বলেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে যে, صٓ অর্থ হলো صَدَقَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য বলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, صٓ -এর পরের و অব্যয়টি শপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর জবাব এখানে উহ্য রয়েছে, আর তা হলো [হে রাসূল ﷺ!] আপনি অবশ্যই সত্যবাদী অথবা এই কুরআন অবশ্যই সত্য।

−[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৮০]

قَوْلُهٗ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِ : অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের শপথ, যা উপদেশে পরিপূর্ণ, যা জ্ঞানগর্ভ, মহা মূল্যবান গ্রন্থ। যার মহান শিক্ষাই তাঁর সত্যতার প্রমাণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন আকীদা ও বিশ্বাস, বিধি নিষেধ ঈমানদারের জন্যে শুভ পরিণতি, কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী এবং অতি মূল্যবান উপদেশে সমৃদ্ধ রয়েছে।

তাফসীরকার যাহহাক (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'জিকর' শব্দটি দ্বারা অতি উচ্চ মর্যাদা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ মহা মূল্যবান এবং সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন। যেসব কাফেররা পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিশ্বাস করে না এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল নবীয়ে কারীম ﷺ-এর রেসালতকে অস্বীকার করে, তারা এর কোনো ত্রুটির জন্য তা করে না: بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ অর্থাৎ বরং কাফেররা ঔদ্ধত্ব ও সত্য বিরোধিতায় লিপ্ত। অর্থাৎ তারা তাদের অহংকার করে বিদ্বেষের কারণেই পবিত্র কুরআনের সত্যতায় অবিশ্বাস করে এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে। যদি তাদের এ দম্ভ, অহমিকা, বিদ্বেষ ও সত্য বিরোধিতা থেকে তারা রেহাই পেতো, তবে পবিত্র কুরআনের সত্যতায় অবশ্যই বিশ্বাস করতো এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাতকেও অস্বীকার করতো না।

قَوْلُهٗ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ : এ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে এমনিভাবে বহু জাতি সত্যদ্রোহিতা এবং ঔদ্ধত্যের কারণে ধ্বংস হয়েছে। তারাও এভাবে নবী রাসূলগণের বিরোধিতা করেছিল, পরিণামে যখন তাদের উপর আজাব এসেছে, তখন তারা আর্ত চিৎকার করেছে, কিন্তু তা তাদের জন্যে উপকার হয়নি, তাদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। মক্কার কাফেররাও যদি এভাবে তাদের আত্মগরিমা এবং সত্য বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে তাদেরকেও অনুরূপ ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, তখন তাদের হাহাকার আর্তনাদও কোনো কাজে আসবে না।

قَوْلُهٗ وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ : [তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল] এতে উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ : -এর শাব্দিক অর্থ "কীলকওয়ালা ফেরাউন।" এর তাফসীরে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন, এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (র.)-এর তরজমা করেছেন "যার খুটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেন, সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত পায়ে কীলক এঁটে দিতো এবং তার উপরে সাপ বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন, সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলতো। কেউ কেউ আরো বলেন, এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। –[কুরতুবী]

أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ এটা مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (র.) এ অর্থ অনুযায়ীই তাফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায় ছিল আদ, সামূদ প্রমুখ। তাদের মোকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। তারাই যখন খোদায়ী আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে? –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ : তাদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ জাতি এবং পেরেকধারী ফেরাউনও রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। আর সামূদ জাতি, লূতের জাতি এবং আইকাবাসীও রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তারা ছিল বিরাট বিরাট বাহিনী। তাদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাই তাদের ব্যাপারে আমার আজাব সাব্যস্ত হয়েছে।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর : মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাদের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে ইতিপূর্বে যে সব জাতি অনুরূপ অন্যায়ের জন্যে কোপগ্রস্ত হয়েছিল, তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে পূর্বের ছয়টি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি; তারা হযরত নূহ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং তাঁর বিরোধিতা করেছিল, তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পৌছিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাদের নাফরমানি এতটুকু হ্রাস পায়নি, তাই প্রলয়ঙ্কারী বন্যা দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২. আদ জাতি, হযরত হূদ (আ.)-কে তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে, পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তীব্র বায়ু প্রবাহ দ্বারা ধ্বংস করেছেন।

৩. হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করা হয়। ফেরাউন ছিল ক্ষতার মোহে মত্ত। লক্ষ লক্ষ সৈন্যবাহিনী, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তার ঔদ্ধত্য এবং আত্মগরিমা বৃদ্ধি করেছিল। আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে সে মন্দ আচরণ করেছিল। সে সত্যকে তার সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিয়েছিল, পরিণামে শাস্তি আপতিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার দলবল সহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেছেন।

৪. সামূদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু সামূদ জাতি তাকে মানেনি, পরিণামে তাদেরকেও ধ্বংস করা হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি গর্জনই তাদের ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট ছিল।

৫. হযরত লূত (আ.)-এর জাতি সাদূম নামক এলাকার অধিবাসী ছিল। তারা ছিল অশ্লীল কর্মে লিপ্ত। হযরত লূত (আ.) তাদেরকে হেদায়েত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার নবীকে অস্বীকার করেছে, শাস্তি স্বরূপ তারা ধ্বংস হয়েছে।

৬. আইকাবাসী হযরত শুআয়েব (আ.)-এর জাতি, হযরত শুআয়েব (আ.) তার পথভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ হতভাগ্য জাতি আল্লাহ তা'আলার নবীর হেদায়েত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, পরিণামে তারাও ধ্বংস হয়েছে।

অতএব, যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরোধিতা করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত, যে কোনো সময় তাদের উপর শাস্তি আপতিত হতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৫. وَمَا يَنْظُرُ يَنْتَظِرُ هٰؤُلَاءِ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً هِىَ نَفْخَةُ الْقِيَامَةِ تَحُلُّ بِهِمُ الْعَذَابَ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا رُجُوْعٍ.

১৬. وَقَالُوْا لَمَّا نَزَلَ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ الخ رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا اَىْ كِتَابَ اَعْمَالِنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ قَالُوْا ذٰلِكَ اِسْتِهْزَاءً.

১৭. قَالَ تَعَالٰى اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ط اَىِ الْقُوَّةِ فِى الْعِبَادَةِ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَيَقُوْمُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَنَامُ ثُلُثَهٗ وَيَقُوْمُ سُدُسَهٗ اِنَّهٗ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ اِلٰى مَرْضَاتِ اللّٰهِ.

১৮. اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِتَسْبِيْحِهٖ بِالْعَشِىِّ وَقْتَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ وَالْاِشْرَاقِ لا وَقْتَ الصَّلٰوةِ الضُّحٰى وَهُوَ اَنْ تَشْرِقَ الشَّمْسُ وَيَتَنَاهٰى ضَوْءُهَا.

১৯. وَ سَخَّرْنَا الطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ط مَجْمُوْعَةً اِلَيْهِ تُسَبِّحُ مَعَهٗ كُلٌّ مِنَ الْجِبَالِ وَالطَّيْرِ لَّهٗ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ اِلَى الطَّاعَتِهٖ بِالتَّسْبِيْحِ.

অনুবাদ :

১৫. কেবল তারা মক্কার কাফেরগণ একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, এবং তা হলো কিয়ামতের ফুঁক যা তাদের উপর আজাব নাজিল করবে যাতে কোনো বিরতি থাকবে না। فَوَاقٍ শব্দটি فَاء তে যবর ও পেশ উভয়ভাবে পড়বে।

১৬. যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ الخ অবতীর্ণ হয় তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ আমলনামা হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। তারা এটা ঠাট্টা করে বলে।

১৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা যা বলে আপনি তাতে সবর করুন এবং স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যিনি ইবাদতের মধ্যে বড় শক্তিশালী ছিলেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন ও আরেক দিন ইফতার করতেন, অর্ধরাত্রি ইবাদত করতেন ও রাতের এক তৃতীয়াংশ নিদ্রা যেতেন এবং পুনরায় রাত্রির এক ষষ্টাংশ ইবাদত করতেন সে ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।

১৮. আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে সন্ধ্যায় ইশার নামাজের সময় ও সকাল চাশতের নামাজের সময় যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও তাপ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে পবিত্রতা ঘোষণা করতো।

১৯. আরো অনুগত করে দিয়েছি পক্ষীকুলকে যারা তার কাছে সমবেত হতো তার সাথে তাসবীহ পড়ার জন্যে সবাই পাহাড় ও পক্ষীকূল ছিল তাসবীহ পড়ার সাথে তার আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ج قَوَّيْنَاهُ بِالْحَرْسِ وَالْجُنُوْدِ وَكَانَ يَحْرُسُ مِحْرَابَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلٰثُوْنَ اَلْفَ رَجُلٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ النُّبُوَّةَ وَالْاِصَابَةَ فِي الْاُمُوْرِ وَفَصْلَ الْخِطَابِ الْبَيَانَ الشَّافِيَ فِيْ كُلِّ قَصْدٍ ـ ২০.

২০. আমি তার সাম্রাজ্যকে প্রহরী ও সৈন্যবাহিনী দ্বারা শক্তিশালী, সুদৃঢ় করেছিলাম। প্রতিরাত্রে প্রায় ত্রিশ হাজার প্রহরী তাঁর সিংহাসন প্রহরা দিত। এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা নবুয়ত ও সঠিক সিদ্ধান্তের বিচারশক্তি ফয়সালাকারী বাগ্মিতা ভাবার্থ প্রকাশে অসাধারণ বর্ণনা।

وَهَلْ مَعْنَى الْاِسْتِفْهَامِ هُنَا التَّعْجِيْبُ وَالتَّشْوِيْقُ اِلَى اِسْتِمَاعِ مَا بَعْدَهُ اَتٰكَ يَا مُحَمَّدُ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ مِحْرَابَ دَاوُدَ اَيْ مَسْجِدَهُ حَيْثُ مَنَعُوا الدُّخُوْلَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ لِشُغْلِهِ بِالْعِبَادَةِ اَيْ خَبَرُهُمْ وَقِصَّتُهُمْ ـ ২১.

২১. হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনার কাছে কি বাকবিতণ্ডাকারীদের সংবাদ পৌছেছে, هَلْ প্রশ্নবোধক অব্যয় এবং এটা এখানে বিস্ময় প্রকাশ করার জন্যে বা আগত ঘটনা শোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে যখন তারা দাউদ (আ.)-এর মিহরাব ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল, যখন তাদেরকে হযরত দাউদ (আ.)-এর ইবাদতে লিপ্ত থাকার কারণে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করা হয়। অর্থাৎ তাদের সংবাদ ও ঘটনা কি তোমার কাছে পৌছেছে?

اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ج نَحْنُ خَصْمَانِ قِيْلَ فَرِيْقَانِ لِيُطَابِقَ مَا قَبْلَهُ مِنْ ضَمِيْرِ الْجَمْعِ وَقِيْلَ اِثْنَانِ وَالضَّمِيْرُ بِمَعْنَاهُمَا وَالْخَصْمُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَاَكْثَرَ وَهُمَا مَلَكَانِ جَاءَا فِيْ صُوْرَةِ خَصْمَيْنِ وَقَعَ لَهُمَا مَا ذُكِرَ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ لِتَنْبِيْهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى مَا وَقَعَ مِنْهُ وَكَانَ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ اِمْرَأَةً وَطَلَبَ اِمْرَأَةَ شَخْصٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَتَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا ـ ২২.

২২. যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করলো তখন তিনি তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন, তারা বলল, ভয় করবেন না, আমরা বিবদমান দুটিপক্ষ, বর্ণিত আছে যে, خَصْمَانِ দ্বারা فَرِيْقَانِ তথা দুটি দল উদ্দেশ্য যাতে পূর্বের تَسَوَّرُوْا ফে'লের যমীরের সাথে মিলে। অনেকে বলেছেন যে, خَصْمَانِ দ্বিবচনের অর্থে এবং خَصْمٌ এক ও একাধিকের উপর বলা হয়। সে দুজন ফেরেশতা ছিল, যারা বিবদমান দুপক্ষ হিসেবে হযরত দাউদ (আ.) এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের ব্যাপারে কুরআনের উল্লিখিত ঘটনা নিছক সাজানো। যাতে এটা দ্বারা হযরত দাউদ (আ.) তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের উপর অবগত হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর নিরানব্বইজন স্ত্রী ছিল তবুও তিনি ঐ ব্যক্তির স্ত্রীকে প্রস্তাব দিলেন যার মাত্র একজন স্ত্রীই ছিল। অতঃপর তিনি তাকে বিবাহ করলেন ও সঙ্গম করলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ تَجُرْ وَاهْدِنَا اَرْشِدْنَا اِلٰى سَوَاۤءِ الصِّرَاطِ وَسَطِ الطَّرِيْقِ الصَّوَابِ.

একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি অতঃপর আমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না আমাদেরকে সরল পথ মধ্যম সরল পথ প্রদর্শন করুন।

٢٣. اِنَّ هٰذَاۤ اَخِىْ ـ اَىْ عَلٰى دِيْنِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً يُعَبِّرُ بِهَا عَنِ الْمَرْاَةِ وَلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ـ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا اِجْعَلْنِىْ كَافِلَهَا وَعَزَّنِىْ غَلَبَنِىْ فِى الْخِطَابِ اَىِ الْجِدَالِ وَاَقَرَّهُ الْاٰخَرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

২৩. ঘটনাটি শুনুন সে আমার ভাই ধর্মীয় ভাই তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে স্ত্রীকে দুম্বা বলে উল্লেখ করা হয়েছে আর আমার মাত্র একটি দুম্বা। এরপরও সে বলে এটিও আমাকে দিয়ে দাও আমাকে তার মালিক বানিয়ে দাও সে কথাবার্তায় অর্থাৎ বাকবিতণ্ডায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। আমার উপর বিজয়ী হয়েছে এবং অপর পক্ষও এটা স্বীকার করেছে।

٢٤. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ لِيَضُمَّهَا اِلٰى نِعَاجِهٖ ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ الشُّرَكَاۤءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ط مَا التَّاكِيْدُ الْقِلَّةُ فَقَالَ الْمَلَكَانِ صَاعِدَيْنِ فِىْ صُوْرَتِهِمَا اِلَى السَّمَاۤءِ قَضَى الرَّجُلُ عَلٰى نَفْسِهٖ فَتَنَبَّهَ دَاوٗدُ قَالَ قَالَ تَعَالٰى وَظَنَّ اَىْ اَيْقَنَ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ اَوْقَعْنَاهُ فِىْ فِتْنَةٍ اَىْ بَلِيَّةٍ بِمَحَبَّةِ تِلْكَ الْمَرْاَةِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا اَىْ سَاجِدًا وَّاَنَابَ.

২৪. দাউদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। مَا অব্যয়টি قَلِيْلٌ -এর তাকিদের জন্যে। অতএব ফেরেশতাদ্বয় তাদের নিজ আকৃতিতে আসমানের দিকে উঠতে উঠতে বললেন, বান্দা নিজের আমলের খেলাফ ফয়সালা দিলেন। অতঃপর হযরত দাউদ (আ.) অবগত হলেন ও বুঝলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, দাউদের খেয়াল হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি অর্থাৎ আমি তার অন্তরে যে মহিলার মহব্বত সৃষ্টি করে তাকে পরীক্ষা করছি অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলো।

٢٥. فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ط وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى اَىْ زِيَادَةُ خَيْرٍ فِى الدُّنْيَا وَحُسْنَ مَاٰبٍ مَرْجِعٍ فِى الْاٰخِرَةِ.

২৫. আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তবা অর্থাৎ দুনিয়াতে অধিক কল্যাণ ও আখেরাতে সুন্দর আবাসস্থল।

٢٦. يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ تُدَبِّرُ الْاَمْرَ النَّاسِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى اَىْ هَوَى النَّفْسِ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اَىْ عَنِ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلٰى تَوْحِيْدِهٖ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَىْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا بِنِسْيَانِهِمْ يَوْمَ الْحِسَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ تَرْكُهُمُ الْاِيْمَانَ وَلَوْ اَيْقَنُوْا بِيَوْمِ الْحِسَابِ لَاٰمَنُوْا فِى الدُّنْيَا .

২৬. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি যাতে মানুষের সমস্যাদির ফয়সালা কর অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা কর। এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। তা তোমাকে আল্লাহ তা'আলার পথ আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের দলিলাদি থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়। যার কারণে তারা ঈমান ত্যাগ করে। যদি তারা হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখতো তবে অবশ্যই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনতো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فَوَاقٍ : فَاء-এর فَتْحَة এবং ضَمَّة উভয়টি সহই পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ اَلرُّجُوْعُ তথা ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। এটা اِسْم فِعْل-এর বহুবচন اَفْوِقَةٌ ও اَفْوِقَةٌ - অর্থ মাঝের বিরতি। দুইবার দুগ্ধদোহনের মাঝের বিরতি। একবার দুগ্ধ দোহনের পরে বাচ্চাকে দুধ পান করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, বাচ্চা দুধ পান করার ফলে উলান পুনরায় দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। দুগ্ধ দোহনকারী বাচ্চাকে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় দুগ্ধ দোহন করে। এই মধ্যবর্তী বিরতির নাম হলো فَوَاقٍ [কামূস] এখানে উদ্দেশ্য سُكُوْن অবস্থান, অথবা رُجُوْع উদ্দেশ্য, যেমনটি আল্লামা মহল্লী (র.) উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের ফুৎকার কোনো বিরতি ছাড়াই تَسَلْسُلْ-এর সাথে হবে।

قَوْلُهٗ مَالَهَا : مَا হলো نَافِيَة আর لَهَا খবরে মুকাদ্দাম আর مِنْ হলো অতিরিক্ত فَوَاقٍ হলো শাব্দিকভাবে اِسْم مَجْرُوْر এটা مَا-এর اِسْم অথবা مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ হওয়ার কারণে محلا مرفوع হয়েছে। আর مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ টা صَيْحَة-এর সিফত হওয়ার কারণে نَصَب-এর মহলে হয়েছে।

قَوْلُهٗ ذَا الْاَيْدِ : এটা بَيْع-এর ওজনে اٰدَ يَئِيْدُ থেকে مَصْدَر مُفْرَدْ হয়েছে। اِذَا قَوِىَ وَاشْتَدَّ এটা يَدٌ-এর বহুবচন নয়। (صَاوِىْ)

قَوْلُهٗ اِنَّهٗ اَوَّابٌ : এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর দীনের মধ্যে শক্তিশালী হওয়ার ইল্লত।

قَوْلُهٗ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً : এটা اَلْجِبَال-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। কেউ কেউ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْع বলেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَوَّابٌ : لَهُ -এর مَرْجِعْ হযরত দাউদ (আ.)। যেমনটি মুফাসসির (র.)-এর ইবাদত দ্বারা বুঝা যায়। এই সুরতে উদ্দেশ্য হবে যে, পাহাড় এবং বিহঙ্গকুল তাসবীহ পাঠ করার ক্ষেত্রে হযরত দাউদ (আ.)-এর হুকুমের অনুগত ছিল। হযরত দাউদ (আ.)-এর তাসবীহ পাঠ করার কারণে। যখন হযরত দাউদ (আ.) তাদেরকে তাসবীহ পাঠ করার হুকুম করতেন তখন তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে তাসবীহ পাঠে লেগে যেতো। এই সুরতে اَوَّابٌ টা مُسَبِّحٌ -এর অর্থে হবে। দ্বিতীয় সুরত হলো এই যে, لَهُ -এর مَرْجِعْ আল্লাহ তা'আলাকে বলেছেন তখন সেই সুরতে উদ্দেশ্য হবে হযরত দাউদ (আ.) পাহাড় পর্বত ও বিহঙ্গকুল আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং তাসবীহ পাঠকারী। আল্লামা মহল্লী (র.)-এর ইবারত দ্বারা জানা যায় যে, এটা اَوَّابٌ -এর সেলাহ (جَمَلٌ) এটা হলো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفٌ পূর্বের مَضْمُوْن -এর তাকিদ এবং اِجْمَالٌ -এর تَفْصِيْل -এর জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بِالْحَرْسِ : حَاء -এর পেশ এবং رَاء তাশদীদযুক্ত فَتْحَة সহ حَارِسٌ -এর বহুবচন। আর উভয়টি فَتْحَة সহ خَدَمٌ যার অর্থ সেবক, চাকর -এর ওজনে।

قَوْلُهُ هَلْ اَتَاكَ : هَلْ হলো اِسْتِفْهَامِيَة تَعَجُّبِيَّة অর্থাৎ مُخَاطَبْ কে তাজ্জবে ফেলার জন্য ভবিষ্যৎ কথা শোনার আগ্রহ দেওয়ার জন্য। এটা এরূপ যখন কোনো আশ্চর্য সংবাদ শোনানো হয় তখন مخاطب কে متوجه করার জন্য বলে থাকে هَلْ تَعْلَمُ؟ এবং مَا وَقَعَ الْيَوْمَ؟ উর্দূ পরিভাষায় বলে کچھ معلوم এবং اج ایسا ہوگیا

قَوْلُهُ تَسَوَّرُوْا : এটা مَاضِىْ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ অর্থাৎ তারা দেয়াল টপকালো, তারা দেয়াল টপকিয়ে প্রবেশ করল। اِذْ تَسَوَّرُوْا উহ্য মুযাফের ظَرْف হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– هَلْ اَتَاكَ نَبَؤُ تَخَاصُمِ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوْا

قَوْلُهُ اِذْ دَخَلُوْا : এটা প্রথম اِذْ থেকে بَدَل হয়েছে এবং تَسَوَّرُوْا -এর بَدَل ও হতে পারে।

قَوْلُهُ خَبَرُهُمْ وَقِصَّتُهُمْ : এটা نَبَؤُ -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ قِيْلَ فَرِيْقَانِ لِيُطَابِقَ مَا قَبْلَهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো। تَسَوَّرُوْا বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার হয়েছে। এবং خَصْمَانِ -এর মধ্যে দ্বিবচনের। কাজেই উভয়ের ভিতর مُطَابَقَتْ নেই। অথচ উভয়ের মিসদাক একই। উত্তরের সার হলো এই যে, خَصْمَانِ দ্বারা فَرِيْقَانِ উদ্দেশ্য। এবং প্রত্যেক فَرِيْق কয়েকটি اَفْرَادْ সম্বলিত হয়। তখনই তাকে فَرِيْق বলে। কাজেই উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

অন্য জবাব এভাবেও দেওয়া হয়েছে যে, خَصْم টা মাসদারও একারণে এটা وَاحِدْ ـ تَثْنِيَة ـ جَمْع সকলের উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اِثْنَانِ وَالضَّمِيْرُ بِمَعْنَاهَا : উল্লিখিত প্রশ্নের এটা তৃতীয় জবাব। এর সারকথা হলো দেওয়াল টপকে আগমনকারী দুজনই ছিল তবে تَسَوَّرُوْا -এর বহুবচন দ্বারা مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ উদ্দেশ্য। যার اِطْلَاقْ দুয়ের উপরও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَقَعَ لَهُمَا مَا ذُكِرَ عَلٰى سَبِيْلِ الْفَرْضِ : এই ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন. দুজন ফেরেশতা উল্লিখিত মাসআলায় বাদী ও বিবাদী সেজে এসেছিল। তারা হযরত দাউদ (আ.)-এর আদালতে এমন একটি মোকদ্দমা পেশ করল যার শুরু থেকে কোনো অস্তিত্ব ছিল না, যা সরাসরি মিথ্যা ও গোনাহ ছিল। অথচ ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ তাদের থেকে গোনাহ প্রকাশ পেতে পারে না।

উত্তর. كِذْب এবং مَعْصِيَتْ সে সময় হবে যখন বাস্তবে কোনো ঘটনার সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হয়। এখানে তো সতর্ক করার জন্য একটি فَرْض صُوْرَتْ চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল। এখানে বাস্তবতার বিপরীত মিথ্যার কোনো প্রশ্নই ব্যতীত উঠতে পারে না। এটা এরূপ যে, শিক্ষকে বাচ্চাদেরকে বুঝানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলে থাকে। ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا এবং اِشْتَرٰى بَكْرٌ دَارًا অথচ এখানে প্রহারও নেই এবং বেচাকেনাও নেই। এখানেও হযরত দাউদ (আ.)-কে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল। কোনো ঘটনার বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاَقَرَّهٗ لِاٰخَرَ : এই ইবারত দ্বারা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো– হযরত দাউদ (আ.) বিবাদীও সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ব্যতীত কি করে একদিকে ফয়সালা দিয়ে দিলেন?

উত্তর. জবাবের সার হলো এরূপ মনে হয় যেন বিবাদী বাদীর দাবিকে মেনে নিয়েছিল। আর যখন বিবাদী বাদীর দাবিকে মেনে নেয় তখন সাক্ষীরও প্রয়োজন হয় না এবং বিবাদীর বর্ণনারও প্রয়োজন হয় না।

قَوْلُهُ قَلِيْلٌ مَّاهُمْ : قَلِيْلٌ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর هُمْ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ আর مَا হলো قِلَّتْ-এর তাকিদের জন্য, অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ زُلْفٰى : মর্যাদা, স্তর, زُلْفٰى টা قُرْبٰى-এর ওজনে মাসদার। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَاۤءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقٍ : তাফসীরকারগণ বলেছেন, هٰٓؤُلَاۤءِ দ্বারা মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের অন্যায় আচরণে একথা অনুভূত হয় যে, তারা হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় হুঙ্কারের অপেক্ষা করছে, এর পূর্বে তাদের মধ্যে চেতনা ফিরে আসবে না, সত্যকে গ্রহণ করতে তারা প্রস্তুত হবে না।

কিয়ামতের জন্যে যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, যখন এ বিশ্ব কারখানা ধ্বংসোন্মুখ হবে, তখনই তারা ঈমান আনবে, কিন্তু তখনকার ঈমান কোনো উপকারেই আসবে না, আর হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গার গর্জন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সে গর্জন হবে বিরামহীন। অথবা এর অর্থ হলো, তারা দুনিয়াতেই কোনো ভয়ঙ্কর গর্জনের অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আজাবের অপেক্ষা করছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে فَوَاقٍ শব্দটির অর্থ হলো অবকাশ।

আবূ ওবায়দা এবং ফাররাও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। একথার তাৎপর্য হলো, এ দুরাত্মা কাফেররা কিয়ামতের দিনের শাস্তি না দেখা পর্যন্ত সঠিক পথে আসবে না।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ : তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, সূরা আল হাক্কাহ -এর এ আয়াত– فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ অর্থাৎ আর যার ডান হাতে দেওয়া হবে তার আমলনামা। যখন নাজিল হয়, তখন মক্কার কাফেররা বিদ্রূপ করে বলেছিল, হে পরওয়ারদেগার! হিসাবের দিনের প্রয়োজন নেই, আমাদের আমলনামা এখানেই দিয়ে দাও। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে জান্নাতের কথা বলেছেন, তাতে আমাদের যে অংশ রয়েছে, তা এ পৃথিবীতেই আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হোক।

হযরত হাসান বসরী (র.), কাতাদা (র.), মুজাহিদ (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, পরকালীন জীবনে যে সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, তা আমাদেরকে দুনিয়াতেই দেওয়া হোক।

আর তাফসীরকার হযরত আতা (র.) বলেছেন, এ উক্তি করেছিল মক্কার কাফের নজর ইবনে হারেস। সে বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি এই নবী সত্য হয়, তবে আমদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর। –[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ৮৯]

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা তিনটি বিষয় অবিশ্বাস করতো, **এক.** তাওহীদ **দুই.** রেসালাত **তিন.** আখেরাত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, কাল কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার জীবনের যাবতীয় কর্মের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা দেওয়া হবে। যদি ঈমানদার ও নেককার হয় তবে ডান হাতে, আর বেঈমান ও পাপীষ্ঠ হলে বাম হাতে আমলনামা পাবে। তাই দূরাত্মা কাফেররা বিদ্রূপ করে বলেছিল, আমাদের আমলনামা দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হোক, আমরা দেখি তাতে কি রয়েছে। আর যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যারা ঈমানদার ও নেককার হবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং যারা বেঈমান ও বদকার হবে তাদের জন্যে রয়েছে দোজখের কঠিন শাস্তি। তখন কাফেররা বিদ্রূপ করে বলেছিল, কিয়ামতের দিন অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমাদের জান্নাতে যে অংশ রয়েছে, অথবা দোজখে যে শাস্তি রয়েছে তা এখানেই হিসাবের পূর্বেই দিয়ে দেওয়া হোক। কাফেরদের এ বিদ্রূপাত্মক এবং মূর্খতাপ্রসূত উক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পরবর্তী আয়াতে স্থান পেয়েছে- اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ হে রাসূল ! আপনি তাদের উক্তি সম্বন্ধে সবর অবলম্বন করুন এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা, সে ছিল শক্তিশালী এবং নিশ্চয়ই সে ছিলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি তন্ময় চিত্ত।

قَوْلُهُ اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ الخ : কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে অতীত পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। সে মতে আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গাম্বরের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ : [স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী]। প্রায় সমস্ত তাফসীরবিদই এর একই ধরনরে অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ.) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। اِنَّهٗ اَوَّابٌ [নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।] বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামাজ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোজা ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোজা রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনো পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন। -[ইবনে কাসীর]

ইবাদতের উপরিউক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোজা রাখলে মানুষ রোজার অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোজার কোনো কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু একদিন পর পর রোজা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এপদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

قَوْلُهُ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ : এ আয়াতে হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের ইবাদতে ও তাসবীহে শরিক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহ পাঠকে আল্লাহ তা'আলা এখানে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি নিয়ামত হলো কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহ পাঠে তার বিশেষ কি উপকার হতো?

এর এক উত্তর এই যে, এতে হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মোজেজা প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, মোজেজা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী (র.)-এর এক সূক্ষ্ম জবাবে বলেন, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহর ফলে জিকিরের এক বিশেষ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হতো। ফলে ইবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হতো। সঙ্ঘবদ্ধ জিকিরের আরো একটি উপকারিতা এই যে, এতে জিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সূফী বুজুর্গগণের মধ্যে জিকিরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে জিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ জিকির করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়। -[মাসায়েলে সুলূক]

চাশতের নামাজ : بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ জোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عَشِيّ বলা হয়। আর إِشْرَاق-এর অর্থ– সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতকে চাশতের নামাজ শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। চাশতের নামাজকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে ইশরাকও বলেন। পরবর্তীতে "সালাতে আওয়াবীন" নাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের জন্য এবং সালাতে ইশরাক নাম সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাকাত নফল নামাজের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশতের নামাজ দুই রাকাতে থেকে বার রাকাত পর্যন্ত যতো রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাজ নিয়মিত পড়ে, তার গুনাহ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করে দেবেন। –[কুরতুবী]

আলেমগণ বলেন : চাশতের নামাজে দুই থেকে বার পর্যন্ত যতো রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্য কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকাত হওয়াই শ্রেয়। কেননা চার রাকাত পড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও নিয়ম ছিল।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ : [আমি তাকে হিকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করেছি।] হিকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধিরূপী ধন দান করেছিলাম। কেউ কেউ হিকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুয়ত। فَصْلَ الْخِطَابِ-এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। হযরত দাউদ (আ.) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর اَمَّا بَعْدُ শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী (র.) যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থই একত্রিত থাকতে পারে।

قَوْلُهُ وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদতখানায় বিবদমান দুটি পক্ষ পাঠিয়ে কোনো এক বিষয়ে তাকে পরীক্ষা করেছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'আলাও তাকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আ.) সব ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা দিকে রুজু করতেন এবং কোনো সময় সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, হযরত দাউদ (আ.) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোনো কোনো অনুসন্ধানী ও সাবধানী তাফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গাম্বরের এসব ত্রুটি বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেননি। তাই আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কুরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেজ ইবনে কাছীরের মতো অনুসন্ধানী তাফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে اَبْهِمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলা বাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তীদের উক্তির আলোকে এ পরীক্ষা ও যাচাইর বিষয়টি নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে খ্যাত একটি রেওয়ায়েত এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর দৃষ্টি একবার তার সেনাধ্যক্ষ উরিয়ার পত্নীর উপর গড়ে গেলে তার মনে তাকে বিয়ে করার স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এক ভয়ানক বিপজ্জনক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে হযরত দাউদ (আ.) তার পত্নীকে বিয়ে করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরিউক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে মানবাকৃতিতে বাদী-বিবাদীরূপে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, যা ইহুদিদের প্রভাবাধীন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতটি বাইবেলের সামূয়েল কিতাবের একাদশ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত। পার্থক্য এতটুকু যে, বাইবেলে খোলাখুলি হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি উরিয়া পত্নীর সাথে বিয়ের পূর্বেই ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ তাফসীরী রেওয়ায়েতেসমূহে ব্যভিচারের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, কেউ এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েতটি দেখে এ থেকে ব্যভিচারের কাহিনী বাদ দিয়ে একে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর জুড়ে দিয়েছে। অথচ সামুয়েল কিতাবটিই মূলত ভিত্তিহীন। সুতরাং রেওয়ায়েতটি নিশ্চিতরূপেই মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ একে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফেজ ইবনে কাছীর (র.)-ই নয়, আল্লামা ইবনে জাওযী, কাযী আবূ সাঈদ, কাজী বায়যাভী, কাজী আয়ায, ইমাম রাযী, আল্লামা আবূ হাইয়্যান আন্দালুসী, খাযেন, যমখশরী, ইবনে হযম, আল্লামা খাফফাজী, আহমদ ইবনে নসর, আবূ তামাম, আল্লামা আলূসী (র.) প্রমুখ খ্যাতনামা তাফসীরবিদ রেওয়ায়েতটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) লিখেন–

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার বেশির ভাগই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। রাসূলে কারীম ﷺ থেকে এ সম্পর্কে অনুসরণীয় কোনো কিছু প্রমাণিত নেই। কেবল ইবনে আবী হাতেম এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদও বিশুদ্ধ নয়।

মোটকথা, অনেক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর থেকে উপরিউক্ত রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। এসব যুক্তি প্রমাণের কিছু বিবরণ ইমাম রাযীর তাফসীরে কাবীর এবং জাওযীর যাদুল মাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ.)-কে ন্যায়বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোনো সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে উল্টা শাস্তি দিতো। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গাম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

হযরত দাউদ (আ.) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। –[বয়ানুল কুরআন]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ.) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। হযরত দাউদ (আ.) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তার মতো সম্মানিত পয়গাম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না। এ কারণেই তিনি পরে হুঁশিয়ার হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কেউ কেউ বলেন, হযরত দাউদ (আ.) তার সময়সূচি যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তার গৃহের কোনো না কোনো ব্যক্তি ইবাদত, জিকির ও তাসবীহে মশগুল থাকতো। একদিন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোনো মুহূর্ত যায় না, যখন হযরত দাউদ (আ.)-এর পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, জিকির ও তাসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, দাউদ, এটা আমার দেওয়া তাওফীকের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নেই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির পর উপরিউক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তার সময়সূচি বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে মশগুল হয়ে পড়েন এবং তার পরিবারের অন্য কেউ তখন ইবাদত ও জিকিরে মশগুল ছিল না। এতে হযরত দাউদ (আ.) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকেমে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। -[আহকামুল কুরআন]

উপরিউক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকদ্দমাটি কাল্পনিক নয়- সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয় ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে ছিলেন যাতে হযরত দাউদ (আ.) নিজের ভুল বুঝতে পারেন।

সে মতে তাদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পত্নীকে বিয়ে করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তখন কাউকে 'তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও' এ কথাটি বলা দূষণীয় ছিল না। বরং তখন এধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। এর ভিত্তিতেই হযরত দাউদ (আ.) উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেন, ব্যাপারটি এই যে, উরিয়া কোনো এক মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। হযরত দাউদ (আ.)ও সে মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সুক্ষ্ম ভঙ্গিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের মাধ্যমে সতর্ক করেন। কাযী আবূ ইয়ালা এ ব্যাখ্যার প্রমাণস্বরূপ কুরআন পাকের وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ বাক্যটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাক্যটি প্রমাণ করে যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গামের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত দাউদ (আ.)ও তাকে বিয়ে করেননি। -[যাদুল মাসীর]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ শেষোক্ত ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোনো কোনো উক্তি থেকেও এ দুটি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যা। [রূহুল মা'আনী, তাফসীরে আবূ সাউদ, যাদুল মাসীর, তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি।] কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য নয়। তাই এতটুকু বিষয় তো মীমাংসিত যে, উরিয়াকে হত্যা করানোর যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত। কিন্তু আসল ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এগুলোর কোনো একটিকেও অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। সুতরাং হাফেজ ইবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্ঝঞ্ঝাট। তাই এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের অনুমান ও ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের কোনো কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অস্পষ্টতার মধ্যেও অবশ্যই কোনো রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং কেবল কুরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখা এবং বিশদ বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মগত উপকারিতা অর্জিত হয়। এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। এখন আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ : অর্থাৎ যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করলো। مِحْرَابٌ আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা কোনো গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কুরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারের মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে ছিল না।

-[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ فَفَزِعَ مِنْهُمْ : [হযরত দাউদ (আ.) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।] ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দুর্ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণত মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থি নয় : এ থেকে জানা গেল যে, কোনো ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীদের পরিপন্থি নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজে ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই মন্দ। কুরআন পাকে পয়গাম্বরগণের শানে বলা হয়েছে- وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।] অতঃপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আ.) ভীত হলেন কেন? জবাব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশঙ্কায় হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَوْف বলা হয়। দ্বিতীয়ত ভয় কোনো মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَشْيَةٌ বলা হয়। [মুফরাদাতে রাগিব] শেষোক্ত ভয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো জন্য হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গাম্বরগণ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিত : قَالُوا لَا تَخَفْ তারা বলল, আপনি ভীত হবেন না। আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং হযরত দাউদ (আ.) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়; বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিতো, কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) আসল ব্যাপার জানার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবত এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَلَا تُشْطِطْ [এবং অবিচার করবেন না।] আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যত ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমত প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতঃপর এসেই হযরত দাউদ (আ.)-এর মতো মহান পয়গাম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেওয়া। এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেননি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা উচিত : এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তার ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবি। বিশেষভাবে শাসক বিচারক ও মুফতিগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। -[রূহুল মা'আনী]

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ হযরত দাউদ (আ.) বললেন, সে তোমার দুম্বাকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে। এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ। ১. হযরত দাউদ (আ.) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন বিবাদীর বিবৃতি শুনেননি। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তার ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না। কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তার কাছে আদালতি মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই হযরত দাউদ (আ.) বিচারকের পদমর্যাদায় নয়, মুফতির পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতির কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয়; বরং প্রশ্ন মুতাবিক জবাব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান খয়রাত চাওয়া লুণ্ঠনের নামান্তর : এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.) কেবল এক ব্যক্তির দুম্বা দাবি করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যত কারো কাছে কোনো বস্তু প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুণ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছে এভাবে কোনো কিছু চায় যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, প্রার্থিত বস্তু দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তবে এভাবে উপঢৌকন চাওয়াও লুণ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায় সে ক্ষমতাসীন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের দরুন দিতে অস্বীকার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপঢৌকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠন হয়ে থাকে। যে চায় তার পক্ষে এভাবে অর্জিত বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরি, যারা মক্তব, মাদরাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদায় করে। একমাত্র সে চাঁদাই হালাল, যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুশিতে দান করে। যদি চাঁদা আদায়কারীরা তাদের ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা একযোগে আট দশ ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে চাঁদা আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে। রাসূলে কারীম ﷺ পরিষ্কার বলেন– لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ অর্থাৎ কোনো মুসলমান ব্যক্তির মাল তার মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়।

কাজ কারবারে শরিক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ অর্থাৎ শরিকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে। এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি কোনো কাজ-কারবারে শরিক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। কোনো সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামূলী ভেবে করে ফেলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গুনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

قَوْلُهُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ : অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ.)-এর ধারণা হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। মোকদ্দমায় বিবরণকে যদিও হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও উভয়পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্য বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করতো, তবে ফয়াসালার জন্য হযরত দাউদ (আ.)-এর কাছে আসার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারতো। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ সাধারণ ঘটনা। হযরত দাউদ (আ.)ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসলো এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে যায়।

قَوْلُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ : [অতঃপর তিনি তাঁর পরওয়াদিগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন।] এখানে 'রুকু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এতে এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রুকুর মাধ্যমে তেলাওয়াতে সেজদা আদায় হয় : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রয়োগ মনে করেন যে, নামাজে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে যদি রুকুতেই সেজদার নিয়ম করা হয়, তবে সেজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেজদার জন্য রুকু শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, রুকুও সেজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কতিপয় জরুরি মাসআলা স্মরণ রাখা দরকার।

১. নামাজের ফরজ রুকুর মাধ্যমে সেজদা তখনই আদায় হতে পারে, যখন সেজদার আয়াত নামাজে পাঠ করা হয়। নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করলে রুকুর মাধ্যমে সেজদা আদায় হয় না। কারণ রুকু কেবল নামাজেরই ইবাদত নামাজের বাইরে সিদ্ধ নয়। ২. রুকুর মধ্যে সেজদা তখন আদায় হবে, যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দু'তিন আয়াত তেলাওয়াত করার পরে রুকু করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তেলাওয়াত করার পরে রুকুতে গেলে সেজদা আদায় হবে না। ৩. তেলাওয়াতে সেজদা রুকুতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে রুকুতে যাওয়ার সময় সেজদার নিয়ত করতে হবে। নতুবা সেজদা আদায় হবে না। অবশ্য সেজদার যাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সিজদা আদায় হয়ে যাবে। ৪. তেলাওয়াতে সেজদা নামাজের ফরজ রুকুতে আদায় করার পরিবর্তে নামাজে আলাদা সেজদা করাই সর্বোত্তম। সেজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত তেলাওয়াত করার পর রুকুতে যেতে হবে। -[বাদায়ে]

قَوْلُهُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ : অর্থাৎ নিশ্চয়ই দাউদের জন্য আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ.) যে ভুলই করে থাকুন, তার ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকুর পর আল্লাহ তা'আলার সাথে তার সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.) বিচ্যুতি যাহোক না কেন, আল্লাহ তাা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে পারতেন; কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হলো? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে তার ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারো মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

قَوْلُهُ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً الخ : হযরত দাউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাজও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য শাসনকার্যের জন্য তাকে একটি বুনিয়াদী পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশনামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১. আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি।

২. সে মতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা।

৩. এ কর্তব্য পালনের জন্য নাফরমানি খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তা'আলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদন করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহ তা'আলার আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামি রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য : এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপার দিতে ও কলহ বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম। তাই সে শাসনকার্যের জন্য যে সব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্বযুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : সে মতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে এ ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় কোনো নির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি যা কোনো কালেই পরিবর্তিত হতে পারে না। যদি কোনো যুগের শাসকবর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা সম্ভব। কোনো যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গাম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারতো? তাই তাকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচারের বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মুমিনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল মুমিনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াত সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং পরকালে চিন্তা থাকবে, সেই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যতো উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল-খুশির দূরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্র পথ বের করে নেবে। খেয়াল খুশির উপস্থিতিতে কোনো উৎকৃষ্টতর আইন ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র : এখান থেকে আরো জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তিকে শাসক, বিচারক অথবা কোনো বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে আল্লাহভীতির পরিবর্তে খেয়াল খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোনো উচ্চপদের যোগ্য নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٧. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط اَىْ عَبَثًا ذٰلِكَ اَىْ خَلْقُ مَا ذُكِرَ لَا لِشَىْءٍ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَوَيْلٌ وَادٍ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ .

২৭. আমি আসমান জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনো কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা উল্লিখিত বস্তুসমূহ অযথা সৃষ্টি করা মক্কার কাফেরদের ধারণা। অতএব কাফেরদের জন্যে রয়েছে, দুর্ভোগ, জাহান্নাম।

٢٨. اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ .

২৮. আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব।

٢٩. نَزَلَ لَمَّا قَالَ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّا نُعْطٰى فِى الْاٰخِرَةِ مِثْلَ مَا تُعْطَوْنَ وَاَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ كِتٰبٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ هٰذَا اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اَصْلُهُ يَتَدَبَّرُوْا اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الدَّالِ اٰيٰتِهٖ يَنْظُرُوْا فِىْ مَعَانِيْهَا فَيُؤْمِنُوْا وَلِيَتَذَكَّرَ يَتَّعِظَ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ .

২৯. উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কার কাফেররা ঈমানদারদেরকে বলল, আমাদেরকে আখেরাতে তোমাদের সমতুল্য দেওয়া হবে। اَمْ অব্যয়টি هَمْزَة اِنْكَارِىْ-এর অর্থে। এটি একটি বরকতময় কিতাব, كِتَابٌ উহ্য মুবতাদা هٰذَا-এর খবর যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এর অর্থসমূহ অনুধাবন করে অতঃপর ঈমান আনে। يَدَّبَّرُوْا মূলত يَتَدَبَّرُوْا ছিল تَاء-কে دَال-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এবং বুদ্ধিমানগণ যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

٣٠. وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ط اِبْنَهُ نِعْمَ الْعَبْدُ ط اَىْ سُلَيْمَانُ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ فِى التَّسْبِيْحِ وَالذِّكْرِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ .

৩০. আমি দাউদকে সোলায়মান নামের সন্তান দান করেছি। সে সুলায়মান একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল সর্বাবস্থায় জিকির ও তাসবীহের প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।

٣١. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ الصّٰفِنٰتُ الْخَيْلُ جَمْعُ صَافِنَةٍ وَهِىَ الْقَائِمَةُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَاِقَامَةُ الْاُخْرٰى عَلٰى طَرَفِ الْحَافِرِ وَهِىَ مِنْ صَفَنَ يَصْفِنُ صُفُوْنًا الْجِيَادُ جَمْعُ جَوَادٍ وَهُوَ السَّابِقُ .

৩১. যখন তার সামনে অপরাহ্নে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হলো, صَافِنَاتٌ শব্দটি صَافِنَةٌ-এর বহুবচন অর্থ ঘোড়া অর্থাৎ ঐ ঘোড়া যা তিন পা ও চতুর্থ পায়ের খুরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। صَفَنَ . يَصْفِنُ . صُفُوْنًا থেকে নির্গত। اَلْجِيَادُ শব্দটি جَوَادٌ-এর বহুবচন, অর্থাৎ দ্রুত অগ্রগামী।

اَلْمَعْنٰى اِنَّهَا اِنِ اسْتُوْقِفَتْ سَكَنَتْ وَاِنْ رُكِضَتْ سَبَقَتْ وَكَانَتْ اَلْفُ فَرَسٍ عُرِضَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ اَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لِاِرَادَتِهِ الْجِهَادَ عَلَيْهَا لِعَدُوٍّ فَعِنْدَ بُلُوْغِ الْعَرْضِ تِسْعَمِائَةٍ مِنْهَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَاغْتَمَّ۔

যার ভাবার্থ হলো, যদি তাকে থামানো হয় থামে আর যদি চালানো হয় দ্রুত চলে। এক হাজার ঘোড়া ছিল যা জোহরের নামাজের পর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেওয়ার জন্য তার সম্মুখে পেশ করা হলো। যার মধ্যে নয়শ ঘোড়ার পরিদর্শন করতে করতে সূর্য ডুবে যায় অতঃপর তিনি আসরের নামাজ আদায় করতে পারেননি বিধায় তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন।

٣٢. فَقَالَ اِنِّىْٓ اَحْبَبْتُ اَىْ اَرَدْتُ حُبَّ الْخَيْرِ اَىِ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ج اَىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَوَارَتْ اَىِ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ اَىِ اسْتَتَرَتْ بِمَا يَحْجُبُهَا عَنِ الْاَبْصَارِ۔

৩২. তখন সে বলল, আমি তো পরওয়ারদেগারের স্মরণে অর্থাৎ আসরের নামাজ বিস্মৃত হয়ে সম্পদের অর্থাৎ ঘোড়ার মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। এমন কি সূর্য ডুবে গেছে। অর্থাৎ সূর্য এমন বস্তুর আড়াল হয়েছে যদ্দরুন মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

٣٣. رُدُّوْهَا عَلَىَّ ط اَىِ الْخَيْلَ الْمَعْرُوْضَةَ فَرَدُّوْهَا فَطَفِقَ مَسْحًا ۢبِالسَّيْفِ بِالسُّوْقِ جَمْعُ سَاقٍ وَالْاَعْنَاقِ اَىْ ذَبَحَهَا اَوْ قَطَعَ اَرْجُلَهَا تَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى حَيْثُ اِشْتَغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلٰوةِ وَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا فَعَوَّضَهُ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا وَاَسْرَعَ وَهِىَ الرِّيْحُ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ كَيْفَ شَاءَ۔

৩৩. এগুলোকে সম্মুখে পেশকৃত ঘোড়াসমূহ পুনরায় আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর তিনি তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। سُوْقٌ . سَاقٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য এগুলো জবাই করে দিলেন এবং এগুলোর পা কেটে দিলেন। কেননা এগুলোর কারণে তিনি নামাজ থেকে গাফেল হলেন এবং এগুলোর গোশত সদকা করে দিলেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময় আরো উৎকৃষ্ট ও তেজস্ব বস্তু অর্থাৎ বাতাসকে তার অনুগত করে দিয়েছেন। যা তার হুকুমে যেভাবে চাই প্রবাহিত হয়।

٣٤. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ اِبْتَلَيْنَاهُ بِسَلْبِ مُلْكِهٖ وَذٰلِكَ لِتَزَوُّجِهٖ بِاِمْرَاَةٍ هَوِيَهَا وَكَانَتْ تَعْبُدُ الصَّنَمَ فِىْ دَارِهٖ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهٖ وَكَانَ مُلْكُهٗ فِىْ خَاتَمِهٖ فَنَزَعَهٗ مَرَّةً عِنْدَ اِرَادَةِ الْخَلَاءِ وَوَضَعَهٗ عِنْدَ امْرَاَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالْاَمِيْنَةِ عَلٰى عَادَتِهٖ۔

৩৪. আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম আমি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেছি। এই পরীক্ষা তার প্রেমিকার সাথে বিবাহের উদ্দেশ্যে ছিল। মহিলাটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অজান্তে তার গৃহে মূর্তিপূজা করতো। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্ব তার আংটির নিয়ন্ত্রণে ছিল। একদা তিনি টয়লেটে প্রবেশের সময় তার পূর্বের অভ্যাসমতে আংটিখানা তার আমীনা নামক স্ত্রীর হাতে দিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَجَاءَهَا جِنِّيٌّ فِي صُوْرَةِ سُلَيْمَانَ فَاَخَذَهُ مِنْهَا وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا هُوَ ذٰلِكَ الْجِنِّيُّ وَهُوَ صَخْرٌ اَوْ غَيْرُهُ جَلَسَ عَلٰى كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ وَعَكَفَتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ وَغَيْرُهَا فَخَرَجَ سُلَيْمَانُ فِيْ غَيْرِ هَيْئَتِهٖ فَرَاٰهُ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ وَقَالَ لِلنَّاسِ اَنَا سُلَيْمَانُ فَاَنْكَرُوْهُ ثُمَّ اَنَابَ رَجَعَ سُلَيْمَانُ اِلٰى مُلْكِهٖ بَعْدَ اَيَّامٍ بِاَنْ وَصَلَ اِلَى الْخَاتَمِ فَلَبِسَهُ وَجَلَسَ عَلٰى كُرْسِيِّهٖ .

অতঃপর একজন জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আকৃতিতে এসে তার স্ত্রী থেকে আংটিখানা নিয়ে নিলেন। এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। এটা ছিল সেই জিন যিনি আংটি নিয়ে নিলেন। এবং সে সাখর বা অন্য কেউ। হযরত সোলায়মান (আ.)-এর চেয়ারে বসল এবং তার উপর পক্ষীসমূহ ছায়া দিল। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ.) তার নিজস্ব আকৃতির খেলাপ বের হলেন ও তার সিংহাসনে জিনকে দেখে লোকদেরকে বলতে লাগলেন যে, আমিই সোলায়মান কিন্তু লোকেরা তা চিনল না। অতঃপর সে রুজু হলো। তিনি কিছুদিন পর আংটি ফিরে পেলে পুনরায় তা পরিধান করে তার সিংহাসনে বসলেন।

٣٥. قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لَا يَكُوْنُ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ج اَيْ سِوَايَ نَحْوَ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَيْ سِوَى اللّٰهِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

৩৫. সোলায়মান দোয়া করলো হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। مِنْ بَعْدِيْ অর্থ سِوَايَ অর্থাৎ আমি ছাড়া যেমন فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ -এর মধ্যে بَعْدِ اللّٰهِ অর্থ- سِوَى اللّٰهِ নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।

٣٦. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً لَيِّنَةً حَيْثُ اَصَابَ اَرَادَ .

৩৬. তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হতো যেখানে সে পৌঁছাতে চাইতো।

٣٧. وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ يَبْنِي الْاَبْنِيَةَ الْعَجِيْبَةَ وَّغَوَّاصٍ فِي الْبَحْرِ لِيَسْتَخْرِجَ اللُّؤْلُؤَ .

৩৭. আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী আজীব প্রাসাদ নির্মাণ করা ও সাগরের ডুবুরী মুক্তা বের করার জন্যে।

٣٨. وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ مُقَرَّنِيْنَ مَشْدُوْدِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ الْقُيُوْدِ بِجَمْعِ اَيْدِيْهِمْ اِلٰى اَعْنَاقِهِمْ .

৩৮. এবং অন্য আরো অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকতো শৃঙ্খলে তাদের হাত কাধে একত্রিত করে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٣٩. وَقُلْنَا لَهُ هٰذَا اَعْطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَعْطِ مِنْهُ مَنْ شِئْتَ اَوْ اَمْسِكْ عَنِ الْاِعْطَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَىْ لَا حِسَابَ عَلَيْكَ فِىْ ذٰلِكَ ـ

৩৯. আমি তাকে বললাম এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব তুমি এগুলো যাকে ইচ্ছা দাও অথবা নিজে রেখে দাও। এর কোনো হিসেবে দিতে হবে না।

٤٠. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ ـ

৪০. নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি। অনুরূপ আয়াত পূর্বে বর্ণিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا : এটা كَلَام مُسْتَاْنِفٌ পূর্বের مَضْمُوْن -এর تَقْرِيْر এবং تَاكِيْد -এর জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ بَاطِلًا : এটা উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। অর্থাৎ خَلْقًا بَاطِلًا এটাও জায়েজ যে, خَلَقْنَا -এর যমীরে ফায়েল থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ مَا خَلَقْنَا مُبْطِلِيْنَ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ اَىْ خَلْقُ مَا ذُكِرَ لَا لِشَيْءٍ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কে নির্ধারণ করা অর্থাৎ আকাশ পাতালের অহেতুক সৃষ্টির ধারণা মক্কার কাফেরদের।

قَوْلُهُ كِتَابٌ : এটা هٰذَا উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰذَا كِتَابٌ

قَوْلُهُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ : এটা كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ مُبَارَكٌ : এটা উহ্য মুবতাদার দ্বিতীয় খবর। কেউ কেউ مُبَارَكٌ কে كِتَابٌ -এর সিফত বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা জমহুরের নিকট وَصْف غَيْر صَرِيْح কে- وَصْف صَرِيْح -এর উপর مُقَدَّم করা হয় না।

قَوْلُهُ لِيَدَّبَّرُوْا : এটা সম্পর্ক হয়েছে انزلناه -এর সাথে। প্রকাশ্য হলো এই যে, لِيَدَّبَّرُوْا -এর فَاعِلْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর এটা تَنَازُعُ الْفِعْلَانِ -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা لِيَدَّبَّرُوْا এবং لِيَتَذَكَّرَ উভয়টি اُولُوا الْاَلْبَابِ -কে স্বীয় ফায়েল বানাতে চায়। বসরীগণের মাযহাব অনুযায়ী দ্বিতীয় ফে'লকে আমলের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রথমটির জন্য যমীর নিয়ে এসেছেন।

قَوْلُهُ اَىْ سُلَيْمَانُ : এটা نِعْمَ -এর مَخْصُوْصُ بِالْمَدْحِ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ عُرِضَ : এটা উহ্য ফেলের ظَرْف হয়েছে উহ্য ইবারত হলো– اُذْكُرْ اِذْ عُرِضَ

قَوْلُهُ الْجِيَادُ : এটা جَوَادٌ -এর বহুবচন। বলা হয়েছে যে, جِيْد অর্থ হলো উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়াকে বলে। جَوَادٌ টা নর ও মাদী উভয়ের উপরই প্রয়োগ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ الْمَعْنٰى : অর্থাৎ صَافِنَاتُ الْجِيَادِ -এর অর্থ।

قَوْلُهُ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ : এটা حُبَّ الْخَيْرِ -এর اَحْبَبْتُ মَفْعُوْل بِهٖ আর اَحْبَبْتُ টা اٰثَرْتُ অর্থে হয়েছে। কেননা انبت -এর সেলাহ عَنْ আসে না। اَحْبَبْتُ হলো حُبَّ الْخَيْرِ -এর مَفْعُوْل مُطْلَقْ অতিরিক্ত অক্ষর ফেলে দিয়ে যেমন نَبَاتًا এবং عَنْ টা عَلٰى অর্থে হয়েছে এবং خَيْر অর্থ خَيْل হাদীসে এসেছে اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ অর্থাৎ ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ জড়িত, সম্ভবত এই মুনাসাবাতের কারণেই خَيْل কে خَيْر বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, যেহেতু خَيْل টা كَثِيْرُ الْمَنَافِعِ হয়ে থাকে, একারণেই তাকে خَيْر বলা হয়। (فَتْحُ الْقَدِيْرِ، شَوْكَانِىْ)

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَصَابَ اَيْ اَرَادَ : এখানে اَصَابَ টা اَرَادَ অর্থে হয়েছে। কেননা এখানে اَصَابَ টা فَعَلَ نِعْلَ الصَّوَابِ অর্থে হওয়া বৈধ নয়। আর اَصَابَ টা اَرَادَ অর্থে আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলা হয়- اَصَابَ الصَّوَابَ فَاَخْطَأَ الْجَوَابَ অর্থাৎ সঠিক উত্তরের ইচ্ছা করেছে কিন্তু উত্তর ভুল হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ مُقَرَّنِيْنَ : এটা اِسْمِ مَفْعُوْل এর جَمْع مُذَكَّرْ -এর সীগাহ এর وَاحِدْ হলো مُقَرَّنٌ বাবে تَفْعِيْل থেকে অর্থাৎ বাধা, বুনিত।

قَوْلُهُ الْاَصْفَادِ : এটা صَفَدٌ -এর বহুবচন অর্থ- বেড়ি, শিকল।

قَوْلُهُ زُلْفٰى : অর্থ- মর্যাদা, স্তর, নেকট্য। قُرْبٰى -এর মতো মাসদার ইমাম বগভী (র.) লিখেছেন زُلْفَةٌ ইসিম بِوَصْفِ مَصْدَرْ এতে مُذَكَّرْ . مُؤَنَّثْ . وَاحِدْ . تَثْنِيَة . جَمْع সবই একই রূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ الخ :

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা : আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষত পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলির মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি হঠকারিতাবশত কোনো বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোনো অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্য এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনার পূর্বে কাফেরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ অর্থাৎ তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা একথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অননুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শাস্তি দিতে বলেন, তিনি কি নিজে এই সৃষ্টজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবেন না? অবশ্যই সে ভালো মন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কিয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে, এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালোমন্দ সব মানুষ জীবন যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

قَوْلُهُ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... كَالْفُجَّارِ : অর্থাৎ আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব না পরহেজগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব? অর্থাৎ এমন কখনো হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলির ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা মুমিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তি প্রাপ্ত হবে। এ থেকে এ কথা ও বলা যায় না যে, ইসলামি রাষ্ট্রে কাফেরের পার্থিব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না; বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে। সে মতে ইসলামি রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) অশ্বরাজি পরিদর্শন এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামাজ পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশ্ব জবাই করে দেন। কেননা এগুলোর কারণেই আল্লাহ তা'আলার স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামাজ নফল হলে কোনো আপত্তির কারণ নেই। কেননা পয়গাম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরজ নামাজ হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাজা হতে পারে এতে কোনো গুনাহ হয় না। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তাফসীরটি কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.)-এর ন্যায় অনুসন্ধানী আলেমও এই তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ-এর এক উক্তি থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্তিটি নিম্নরূপ–

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِهٖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ قَالَ قَطَعَ سُوْقَهَا وَاَعْنَاقَهَا بِالسَّيْفِ .

আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা হুসায়মী (র.) মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেন–

"তাবারানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী হযরত সাঈদ ইবনে বশীর (রা.) রয়েছে যাকে শু'বা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

এ হাদীসের কারণে বর্ণিত তাফসীরটি খুব মজবুত। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গাম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু তাফসীরবিদগণ এর জবাবে বলেন যে, এ অশ্বরাজি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তার শরিয়তে গরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশ্ব কুরবানি করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহ তা'আলার নামে কুরবানি করেছেন-। গরু, ছাগল ও উট কুরবানি করলে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরো একটি তাফসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তাফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে জিহাদের জন্য তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনে নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেন, এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ এগুলো জিহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জিহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন, এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত করো। সে মতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

এই তাফসীর অনুযায়ী عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ বাক্যে عَنْ টি কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تَوَارَتْ-এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বুঝানো হয়েছে। এখানে مَسْحٌ-এর অর্থ কর্তন করা নয়; বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কুরআন পাকের ভাষাদৃষ্টে উভয় তাফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তাফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী : কেউ কেউ প্রথম তাফসীর অবলম্বন করে আরো বলেছেন যে, আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার পর হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অথবা ফেরেশতাদের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে رُدُّوْهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু আল্লামা আলুসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন– رُدُّوْهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বুঝানো হয়েছে; সূর্য নয়।

এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার নেই। বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কুরআন ও হাদীসের কোনো দলিল দ্বারা প্রামাণ্য নয়। –[রূহুল মা'আনী]

আল্লাহ তা'আলার স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদা বোধের দাবি : সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সময় আল্লাহ তা'আলার স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো মুবাহ [অনুমোদিত] কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েজ। সূফী বুজুর্গগণের পরিভাষায় একে 'গায়রত' বলা হয়।

–[বয়ানুল কুরআন]

কোনো সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হুজুরে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ জুহায়ম (রা.) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামাজ পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন চাদরটি আবূ জুহায়েম (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাজে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। –[আহকামুল কুরআন]

এমনিভাবে হযরত আবূ তালহা (রা.) একবার তার বাগানে নামাজরত অবস্থায় একটি পাখিকে দেখায় মশগুল হয়ে যান। ফলে নামাজের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ অহেতুক কোনো সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েজ নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয় এরূপ কোনো কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (র.) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসাবে তার বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শে'রানী (র.)-এর মতো অনুসন্ধানী সূফী বুজুর্গগণ তার এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেন নি। –[রূহুল মা'আনী]

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশুনা করা শাসনকর্তার উচিত : এ ঘটনা থেকে আরো জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশুনা করা উচিত। কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সুলায়মান (আ.) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদতে মশগুল থাকা ভুল : এ ঘটনা থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, এক ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলা বাহুল্য জিহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ ইবাদতের পরিবর্তে নামাজের জন্য নির্দিষ্ট। তাই হযরত সুলায়মান (আ.) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফিকহবিদগণ লিখেন, জুমার আজানের পর যেন ক্রয়বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েজ নয়, তেমনি জুমার নামাজের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোনো কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়। যদিও তা তেলাওয়াতে কুরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قوله ولقد فتنا سليمان والقينا الخ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আরো একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্প্রাণ দেহ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্প্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনের রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হলো, এসব বিবরণ কুরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোনো সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেজ ইবনে কাছীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কুরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে কোনোভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে আরো বেশি রুজু হয়েছিলেন। এতেই কুরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তারা এক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের রহস্য তার আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আংটি করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহ রূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর হযরত সুলায়মান (আ.) সে আংটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরো কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) এ ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন–

"আহলে কিতাবের একটি দল হযরত সুলায়মান (আ.)-কে পয়গাম্বর বলেই মানে না। বাহ্যত এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলা কিছুতেই জায়জ নয়।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আরো একটি ঘটনা সহহী বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই: একবার হযরত সুলায়মান (আ.) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তারা আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গাম্বরের এ ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করলেন না এবং তিনি তার দাবি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে দিলেন। ফলে সকল বিবির মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববিহীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন, সিংহাসনে নিষ্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তার সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে হযরত সুলায়মান (আ.) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ না বলার ফল। সে মতে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সাউদ, আল্লামা আলুসী (র.) প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ এ তাফসীরবিদও তদনুরূপ তাফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তাফসীর বলা যায় না। কারণ এ ঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতের মধ্যে কোথাও এরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (র.)-এর হাদীসটি কিতাবুল জিহাদ, কিতাবুল আম্বিয়া, কিতাবুল আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরীকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুত তাফসীরে সূরা সোয়াদের তাফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبْ لِي مُلْكًا আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোনো বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর নয়; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য পয়গাম্বরের যেমন অন্যান্য আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোনো আয়াতের তাফসীর হওয়া জরুরি নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তৃতীয় এক তাফসীরে ইমাম রাযী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এতো দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাকে সিংহাসনে বসানো হতো, তখন মনে হতো যেন একটি নিষ্প্রাণ দেহ সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন। কিন্তু এ তাফসীরও অনুমানভিত্তিক। কুরআন পাকের ভাষার সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোনো রেওয়ায়েতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্য আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন।

কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা কোনো বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মতো আল্লাহ তা'আলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُـهُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ : অর্থাৎ আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না। কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাদের মতে আমার পরে শব্দটির অর্থ 'আমাকে ছাড়া'। হযরত থানভী (র.) ও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালেও কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি।

কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোনো কোনো জিনকে বশীভূত করে দেয়। এটা তার পরিপন্থি নয়। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জিন বশীভূতকরণের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া : এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গাম্বরগণের কোনো দোয়া আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সুলায়মান (আ.) এ দোয়াটিও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এর পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর হযরত সুলায়মান (আ.) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবুলও করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদ লাভের কামনা-বাসনা হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্য রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ। -[রূহুল মা'আনী]

مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ [শৃঙ্খলিত অবস্থায়] জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করতো, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে হযরত সুলায়মান (আ.) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরি নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্য অন্য কোনো পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝার জন্য এখানে শিকল ব্যক্ত করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤١. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ اَىْ بِاَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ بِضُرٍّ وَعَذَابٍ اَلَمٍ وَ نَسَبَ ذٰلِكَ اِلَى الشَّيْطَانِ وَاِنْ كَانَتِ الْاَشْيَاءُ كُلُّهَا مِنَ اللّٰهِ تَاَدُّبًا مَعَهٗ تَعَالٰى وَقِيْلَ لَهٗ.

৪১. স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বললেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। اَنِّىْ মূলত بِاَنِّىْ ছিল। যদিও প্রত্যেক কিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয় কিন্তু এখানে আদব রক্ষার্থে যন্ত্রণা ও কষ্টকে শয়তানের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

٤٢. اُرْكُضْ اِضْرِبْ بِرِجْلِكَ ج الْاَرْضَ فَضَرَبَ فَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ فَقِيْلَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ اَىْ مَا يُغْتَسَلُ بِهٖ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاغْتَسَلَ وَشَرِبَ فَذَهَبَ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ كَانَ بِظَاهِرِهٖ وَبَاطِنِهٖ.

৪২. তাকে বলা হয়েছে যে, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। অতঃপর তিনি পা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে পানির ঝরণা নির্গত হয়। অতঃপর বলা হয় যে, এটা গোসল ও পান করার জন্যে শীতল পানি। অতঃপর হযরত আইয়ূব (আ.) এটা দ্বারা গোসল করলেন ও পান করলেন অতএব তাতে তার জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকার রোগ সুস্থ হয়।

٤٣. وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ اَىْ اَحْيَى اللّٰهُ لَهٗ مَنْ مَاتَ مِنْ اَوْلَادِهٖ وَرَزَقَهٗ مِثْلَهُمْ رَحْمَةً نِعْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى عِظَةً لِاُولِى الْاَلْبَابِ لِاَصْحَابِ الْعُقُوْلِ.

৪৩. আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মতো আরো অনেক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার মৃত সন্তানদেরকে জীবিত করে দিলেন ও তাদের মতো আরো অনেক দান করলেন। আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

٤٤. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا هُوَ حُزْمَةٌ مِنْ حَشِيْشٍ اَوْ قُضْبَانٍ فَاضْرِبْ بِّهٖ زَوْجَتَكَ وَقَدْ كَانَ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا مِائَةَ ضَرْبَةٍ لِاِبْطَائِهَا عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَا تَحْنَثْ ط بِتَرْكِ ضَرْبِهَا فَاَخَذَ مِائَةَ عُوْدٍ مِنَ الْاِذْخِرِ اَوْ غَيْرِهٖ فَضَرَبَهَا بِهٖ ضَرْبَةً وَاحِدَةً اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ ط اَيُّوْبُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ رَجَّاعٌ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

৪৪. তুমি তোমার হাতে এক মুঠো ঘাস ও তৃণলতা নাও এবং তদ্দ্বারা তোমার স্ত্রীকে আঘাত কর। একদিন স্ত্রী তার কাছে দেরিতে আসার কারণে তিনি শপথ করলেন যে, তিনি তাকে একশ বেত্রাঘাত করবেন এবং শপথ ভঙ্গ করো না। তুমি তাকে আঘাত না করে। অতঃপর তিনি ইজখির ইত্যাদির একশটি তৃণশলা নিলেন ও একবার বেত্রাঘাত করলেন নিশ্চয়ই আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। চমৎকার বান্দা আইয়ূব। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। আল্লাহ তা'আলার দিকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٥. وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ اَصْحَابَ الْقُوٰى فِى الْعِبَادَةِ وَالْاَبْصَارِ الْبَصَائِرِ فِى الدِّيْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ عَبْدَنَا وَاِبْرَاهِيْمَ بَيَانٌ لَهٗ وَمَا بَعْدَهٗ عَطْفٌ عَلٰى عَبْدَنَا ـ

৪৫. স্মরণ করুন, হাত ও চোখের অধিকারী ইবাদতে শক্তিশালী ও দীনের ব্যাপারে বিচক্ষণ আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা অন্য কেরাত মতে عَبْدَنَا এবং ইবরাহীম عَبْدَنَا-এর বর্ণনামূলক পদ ও এর পরবর্তী শব্দসমূহ عَبْدَنَا-এর উপর আতফ হয়েছে।

٤٦. اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ هِىَ ذِكْرَى الدَّارِ الْاٰخِرَةِ اَىْ ذِكْرُهَا وَالْعَمَلُ لَهَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ وَهِىَ لِلْبَيَانِ ـ

৪৬. আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের স্মরণ দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। অর্থাৎ আখেরাতের স্মরণ করা ও এটার জন্যে আমল করা। অন্য কেরাতে خَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ ইযাফতে বায়ানিয়্যাহর সাথে।

٤٧. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْمُخْتَارِيْنَ الْاَخْيَارِ جَمْعُ خَيِّرٍ بِالتَّشْدِيْدِ ـ

৪৭. আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত। اَخْيَارٌ ـ خَيِّرٌ [তাশদীদযুক্ত] এর বহুবচন।

٤٨. وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ هُوَ نَبِىٌّ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَذَا الْكِفْلِ ط اُخْتُلِفَ فِىْ نُبُوَّتِهٖ قِيْلَ كَفَلَ مِائَةَ نَبِىٍّ فَرُّوْا اِلَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ وَكُلٌّ اَىْ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَخْيَارِ جَمْعُ خَيِّرٍ بِالتَّثْقِيْلِ ـ

৪৮. স্মরণ করুন, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা তিনি নবী ছিলেন। এখানে اَلِفْ لَامْ অতিরিক্ত। ও যুলকিফলের কথা যুলকিফলের নবুয়তের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি শতাধিক নবীদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। যারা হত্যার ভয়ে পলায়ন করে তার কাছে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই গুণীজন। خَيِّرٌ اَخْيَارٌ [তাশদীদযুক্ত] বহুবচন।

٤٩. هٰذَا ذِكْرٌ ط لَهُمْ بِالثَّنَاءِ الْجَمِيْلِ هُنَا وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ الشَّامِلِيْنَ لَهُمْ لَحُسْنَ مَاٰبٍ مَرْجِعٍ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৪৯. এখানে তাদের আলাচনা এক মহৎ আলোচনা। তারা সহ খোদাভীরুদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে উত্তম ঠিকানা।

٥٠. جَنّٰتِ عَدْنٍ بَدَلٌ اَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لِحُسْنَ مَاٰبٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْاَبْوَابُ مِنْهَا ـ

৫০. তথা স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। جَنّٰتِ عَدْنٍ এটা حُسْنَ مَاٰبٍ থেকে عَطْفِ بَيَانٌ বা بَدَلٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥١. مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ـ

৫১. সেখানে তারা খাটের উপর হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফলমূল ও পানীয়।

٥٢. وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ حَابِسَاتِ الْعَيْنِ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ اَتْرَابٌ اَسْنَانُهُنَّ وَاحِدَةٌ وَّهُنَّ بَنَاتُ ثَلَاثٍ وَّثَلَاثِيْنَ سَنَةً جَمْعُ تَرِبٍ ـ

৫২. তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না অর্থাৎ তারা সবাই তেত্রিশ বছরের রমণী। اَتْرَابٌ টা تَرِبٌ-এর বহুবচন

٥٣. هٰذَا الْمَذْكُوْرُ مَا تُوْعَدُوْنَ بِالْغَيْبَةِ وَبِالْخِطَابِ اِلْتِفَاتًا لِيَوْمِ الْحِسَابِ اَىْ لِاَجْلِهٖ ـ

৫৩. উল্লিখিত এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্য। يُوْعَدُوْنَ গায়েব হিসেবে আর ইলতিফাত হিসেবে খিতাবের সীগাহ ব্যবহৃত।

٥٤. اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ اَىْ اِنْقِطَاعٍ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ رِزْقِنَا اَوْ خَبَرٌ ثَانٍ لِاَنَّ اَىْ دَائِمًا اَوْ دَائِمٌ ـ

৫৪. এটা আমার দেওয়া রিজিক যা শেষ হবে না। مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ বাক্যটি رِزْقُنَا থেকে حَالٌ বা اِنَّ থেকে দ্বিতীয় খবর অর্থাৎ حَالٌ হিসেবে دَائِمًا আর খবর হিসেবে دَائِمٌ।

٥٥. هٰذَا الْمَذْكُوْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ مستانف لَشَرَّ مَاٰبٍ ـ

৫৫. এটা উল্লিখিত নিয়ামতসমূহ ঈমানদারদের জন্যে এবং নিশ্চয়ই দুষ্টদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা। এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ তথা স্বতন্ত্র বাক্য।

٥٦. جَهَنَّمَ ج يَصْلَوْنَهَا ج يَدْخُلُوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ ـ

৫৬. তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব কত নিকৃষ্ট সেই আবাসস্থল।

٥٧. هٰذَا اَىِ الْعَذَابُ الْمَفْهُوْمُ مِمَّا بَعْدَهٗ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ اَىْ مَاءٌ حَارٌّ مُحْرِقٌ وَّغَسَّاقٌ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مَا يَسِيْلُ مِنْ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ ـ

৫৭. এই আজাব যা পরবর্তী থেকে বুঝা যায় উত্তপ্ত পানি গরম ফুটন্ত পানি ও পুঁজ غَسَّاقٌ সীনে তাশদীদ ও তাশদীদ বিহীন আহলে জাহান্নামের ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ অতএব তারা একে আস্বাদন করুক।

٥٨. وَاٰخَرُ بِالْجَمْعِ وَالْاِفْرَادِ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَىْ مِثْلُ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْحَمِيْمِ وَالْغَسَّاقِ اَزْوَاجٌ اَصْنَافٌ اَىْ عَذَابُهُمْ مِنْ اَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ وَيُقَالُ لَهُمْ عِنْدَ دُخُوْلِهِمُ النَّارَ بِاَتْبَاعِهِمْ ـ

৫৮. এই ধরনের উল্লিখিত উত্তপ্ত পানি ও পুঁজের ন্যায় আরো বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। অর্থাৎ তাদের আজাব ও শাস্তি বিভিন্ন প্রকারের। اٰخَرُ একবচন ও বহুবচন তথা اُخَرُ ـ اٰخَرُ উভয়ভাবে পড়া যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٩. هٰذَا فَوْجٌ جَمْعٌ مُقْتَحِمٌ دَاخِلٌ مَّعَكُمْ ج النَّارَ بِشِدَّةٍ فَيَقُوْلُ الْمَتْبُوْعُوْنَ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اَىْ لَاسَعَةَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ـ

৫৯. তারা তাদের অনুসারীদের ন্যায় জাহান্নামে প্রবেশের সময় তদেরকে বলা হবে যে, এটা এক দল যারা তোমাদের সাথে কঠিনভাবে জাহান্নামে প্রবেশকারী অতঃপর নেতারা বলবে তাদের জন্য অভিনন্দন নেই অর্থাৎ তাদের শাস্তি হালকা হবে না তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٦٠. قَالُوْا اَىِ الْاَتْبَاعُ بَلْ اَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ط اَنْكُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ اَىِ الْكُفْرَ لَنَا ج فَبِئْسَ الْقَرَارُ لَنَا وَلَكُمُ النَّارُ ـ

৬০. তারা অনুসারীরা বলবে, তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এর কুফরির সম্মুখীন করেছ। অতএব তোমাদের ও আমাদের জন্য জাহান্নাম কতই না ঘৃণ্য আবাসস্থল।

٦١. قَالُوْا اَيْضًا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا اَىْ مِثْلَ عَذَابِهِ عَلٰى كُفْرِهِ فِى النَّارِ ـ

৬১. তারা আরো বলবে হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। অর্থাৎ তাদের কুফরির শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন।

٦٢. وَقَالُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَهُمْ فِى النَّارِ مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ فِى الدُّنْيَا مِنَ الْاَشْرَارِ ـ

৬২. এবং তারা মক্কার কাফেররা জাহান্নামে থাকা অবস্থায় বলবে, আমাদের কি হলো যে, আমরা দুনিয়াতে যাদেরকে মন্দলোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না।

٦٣. اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا بِضَمِّ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا اَىْ كُنَّا نَسْخَرُ بِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْيَاءُ لِلنِّسْبَةِ اَىْ اَمَفْقُوْدُوْنَ هُمْ اَمْ زَاغَتْ مَالَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ فَلَمْ نَرَهُمْ وَهُمْ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَصُهَيْبٍ وَسَلْمَانَ ـ

৬৩. আমরা কি তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম سِخْرِيًّا সীনে পেশ ও যের এর সাথে অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করতাম এবং سِخْرِيًّا শব্দটির يَاء নিসবতী। অর্থাৎ তারা কি অনুপস্থিত। না আমাদের দৃষ্টি তাদের থেকে সরে পড়েছে। অর্থাৎ আমরা তাদেরকে দেখছি না এবং তারা হলো দরিদ্র মুসলমানগণ যেমন, আম্মার, বিলাল, সুহাইব ও সালমান (রা.) প্রমুখ।

٦٤. اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ وَاجِبٌ وُقُوْعُهُ وَهُوَ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ كَمَا تَقَدَّمَ ـ

৬৪. এটা অর্থাৎ জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যম্ভাবী। যেমন– পূর্বে বর্ণিত।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِنُصْبٍ : এ শব্দটির তিনটি কেরাত রয়েছে।

১. نُصْبٍ তথা نُوْنٌ এ পেশ ও صَادٌ সাকিন।

২. نَصْبٍ তথা نُون -এ যবর ও صَادْ সাকিন।

৩. نُصُبٍ তথা صَادْ ও نُوْن -এ পেশ। অর্থ– দুঃখ, কষ্ট, মসিবত।

اُذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ -এর আতফ عَطْفُ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ -এর ভিত্তিতে اُذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ -এর উপর হয়েছে।

প্রশ্ন. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনার সময় اُذْكُرْ না বলার কারণ কি?

উত্তর. হযরত দাউদ (আ.) এবং তার সন্তান হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মধ্যে যেহেতু كَمَال اِتِّصَالْ রয়েছে। মনে হয় যে উভয়টি একই ঘটনা। এ কারণে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনাকে اُذْكُرْ দ্বারা শুরু করেননি। এখানে اُذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ টা عَبْدَنَا থেকে بَدْل অথবা عَطْف بَيَانْ হয়েছে। আর اِذْ نَادٰى এটা اَيُّوْبَ থেকে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ : وَاوْ টি হলো আতেফা, উহ্যের উপর এর عَطْف হয়েছে। যে দিকে মুফাসসির (র.) فَاغْتَسَلْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ رَحْمَةً وَّذِكْرٰى : উভয়টি عَطْف -এর মাধ্যমে وَهَبْنَا -এ مَفْعُول لِاَجْلِهٖ হয়েছে।

قَوْلُهُ ضِغْثًا : এটা হলো حُزْمَةً حَشِيْش শুকনো ঘাসের আঁটি حُزْمَةً হলো আঁটি ফারসিতে বলে دَسْتَه

قَوْلُهُ بِخَالِصَةٍ : এটা উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে অর্থাৎ بِخَصْلَةٍ خَالِصَةٍ

قَوْلُهُ ذِكْرَى الدَّارِ : এটাকে মুফাসসির (র.) উহ্য هِيَ মুবতাদার খবর বলেছেন। এই সুরতে ذِكْرٰى টা مَحَلًّا مَرْفُوْع হবে। এক কেরাতে ذِكْرَى الدَّارِ কে خَالِصَة -এর- مُضَافْ اِلَيْهِ বলেছেন। اِضَافَة بَيَانِيَة হবে এই সুরতে ذِكْرٰى টা مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে।

قَوْلُهُ الْيَسَعَ : তিনি হলেন ইবনে আখতুব ইবনে আজূজ -এর ছেলে।

قَوْلُهُ مُفَتَّحَةً : এটা جَنّٰتِ عَدْنٍ টা حُسْنَ مَاٰبٍ হতে حَالْ হয়েছে। আর عَطْف بَيَانْ বা بَدْلْ হতে হয়েছে।

قَوْلُهُ مُتَّكِئِيْنَ : এটা لَهُمْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلْتِفَاتًا : অর্থাৎ تُوْعَدُوْنَ - (ت) -এর সাথে পড়া হলে غَيْبَتْ থেকে خِطَابْ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ হবে।

قَوْلُهُ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ : هٰذَا হলো মুবতাদা এবং حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ হলো مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْه মিলে মুবতাদার খবর হয়েছে। ইবারতে تَقْدِيْم ও تَاخِيْر হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- هٰذَا حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ فَلْيَذُوْقُوْهُ

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُمْ : قَائِل ফেরেশতা হবে। এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, هٰذَا فَوْجٌ টা كَلَام مُسْتَانِفْ

قَوْلُهُ بِاَتْبَاعِهِمْ : অর্থাৎ مَعَ اَتْبَاعِهِمْ

قَوْلُهُ بَلْ اَنْتُمْ : অর্থাৎ بَلْ اَنْتُمْ اَحَقُّ بِمَا قُلْتُمْ بِمَا لَنَا

قَوْلُهُ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ : এটা তাদের احقيت -এর ইল্লত হয়েছে।

قَوْلُهُ فِى النَّارِ : এটা হয়তো زِدْهُ -এর ظَرْف অথবা عَذَابًا -এর সিফত অর্থাৎ عَذَابًا كَائِنًا فِى النَّارِ

قَوْلُهُ وَهُمْ : هُمْ যমীরটি رِجَالًا -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ وَسَلْمًا : এই বাক্য যেহেতু কুফর ও পথভ্রষ্টতার ইমামরা দরিদ্র মুসলমানদের ব্যাপারে বলেছিল, কাজেই মুনাসিব মনে হতো سَلْمَان কে উহ্য করে দেওয়া। কেননা তিনি মদীনায় ঈমান এনেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ الخ : রাসূলে কারীম ﷺ -কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য এখানে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হয়েছে- مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ অর্থাৎ শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, হযরত আইয়ূব (আ.) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ হযরত আইয়ূব (আ.)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করলঃ আমাকে তার দেহ, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যদ্দ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল হযরত আইয়ূব (আ.)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেওয়া হলো। অতঃপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন, কুরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গাম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান হযরত আইয়ূব (আ.)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলেন, রুগ্ণাবস্থায় শয়তান হযরত আইয়ূব (আ.)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করতো। এতে তিনি আরো অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন।

হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগ কি ছিল? কুরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, হযরত আইয়ূব (আ.) কোনো গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনো বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোনো কোনো সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তার সর্বাঙ্গে ফোড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঘৃনাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তাফসীরবিদগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেননি। তারা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মতো কোনো রোগে পয়গাম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়ূব (আ.)-এর রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোনো সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরিউক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়। -[রূহুল মা'আনী, আহকামুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]

خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا [তুমি তোমার হাতে এক মুঠোর তৃণলতা লও। এ ঘটনার পটভূমি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এখানে এ ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম এই যে, এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে একশ বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরি করে নিয়ে তদ্দ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়ূব (আ.)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) লিখেছেন যে, এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে- ১. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্যে প্রস্থে লাগতে হবে এবং ২. এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত তাই। নতুবা হানাফী ফকীহগণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরিউক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। -[ফাতহুল কাদীর]

শরিয়তের দৃষ্টিতে কৌশল: দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোনো অসমীচীন অথবা মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরিয়তসম্মত কোনো কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ। বলা বাহুল্য হযরত আইয়ূব (আ.)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবি এই যে, তিনি তার স্ত্রীকে পূর্ণ একশ বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তার পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হযরত আইয়ূব (আ.)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েজ, যখন একে শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোনো হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূল প্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্য হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ নাজায়েজ। উদাহরণত জাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারো জাকাত ওয়াজিব হয় না। এরূপ কৌশল শরিয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয়তো জাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে। –[রূহুল মা'আনী]

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা : তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি কোনো অসমীচীন ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজিব না হতো, তবে হযরত আইয়ূব (আ.)-কে কৌশল শিখানো হতো না। এতদসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনো অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরিয়তের বিধান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা।

أُولِى الْأَيْدِى وَالْأَبْصَارِ-এর শাব্দিক অর্থ হলো তারা হস্ত ও দৃষ্টি বিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তারা তাদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকাল চিন্তা ও পয়গাম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ : ذِكْرَى الدَّارِ শাব্দিক অর্থ হলো গৃহের স্মরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। কোনো কোনো আল্লাহদ্রোহীদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তিসমূহকে ভোঁতা করে দেয়।

হযরত আল ইয়াসা (আ.) : وَالْيَسَعَ [আল ইয়াসা (আ.)-কে স্মরণ করুন।] হযরত আল ইয়াসা (আ.) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গাম্বর। কুরআন পাকে মাত্র দু জায়গায় তার উল্লেখ দেখা যায় এখানেও সূরা আন'আমে। কিন্তু কোথাও তার বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি; বরং পয়গাম্বরগণের তালিকায় তার নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ)-এর চাচাতো ভাই এবং তার নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর পর তাঁকেই নবুয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার নাম 'ইলশা ইবনে সাকেত' উল্লিখিত হয়েছে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ অর্থাৎ তাদের কাছে আনতয়না সমবয়স্কা রমণীগণ থাকবে। অর্থাৎ জান্নাতের হুরগণ থাকবে। 'সমবয়স্কা' এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্তা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে– সপত্নীসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। বলা বাহুল্য এটা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম : দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতূহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক ভালোবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٥. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلْكُفَّارِ مَكَّةَ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ مُخَوِّفٌ بِالنَّارِ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لِخَلْقِهِ .

৬৫. হে মুহাম্মদ ﷺ! বলুন, মক্কার কাফেরদেরকে আমি তো একজন জাহান্নামের সতর্ককারী মাত্র এবং মাখলুকের উপর পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।

٦٦. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهِ الْغَفَّارُ لِاَوْلِيَائِهِ .

৬৬. তিনি আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা। তিনি পরাক্রমশালী তার নির্দেশের প্রতি মার্জনাকারী তার বন্ধুদের প্রতি।

٦٧. قُلْ لَهُمْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ .

৬৭. আপনি তাদেরকে বলুন, এটি একটি মহাসংবাদ।

٦٨. اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ اَيِ الْقُرْاٰنَ الَّذِىْ اَنْبَاْتُكُمْ بِهِ وَجِئْتُكُمْ فِيْهِ بِمَا لَا يُعْلَمُ اِلَّا بِوَحْيٍ وَهُوَ قَوْلُهُ .

৬৮. তোমরা এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। অর্থাৎ কুরআন থেকে তোমাদের নিকট আমি যার সংবাদ দিয়েছি ও এতে তোমরা ওহী ছাড়া যা জানো না তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি। এবং উক্ত সংবাদটি হলো مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ .

٦٩. مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اَيِ الْمَلَائِكَةِ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ فِىْ شَاْنِ اٰدَمَ حِيْنَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً .

৬৯. ঊর্ধ্বজগৎ ফেরেশতাদের জগৎ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিল। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন যে, আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছি।

٧٠. اِنْ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ اِنَّمَا اَنَا اى انى نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ .

৭০. আমার কাছে এই ওহী আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

٧١. اُذْكُرْ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ هُوَ اٰدَمُ .

৭১. আপনি স্মরণ করুন যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করবো। তিনি হলেন হযরত আদম (আ.)।

٧٢. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ اَتْمَمْتُهُ وَنَفَخْتُ اَجْرَيْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَصَارَ حَيًّا وَاِضَافَةُ الرُّوْحِ اِلَيْهِ تَشْرِيْفٌ لِاٰدَمَ وَالرُّوْحُ جِسْمٌ لَطِيْفٌ يَحْيٰى بِهِ الْاِنْسَانُ بِنُفُوْذِهِ فِيْهِ فَقَعُوْا لَهُ سٰجِدِيْنَ سُجُوْدَ تَحِيَّةٍ بِالْاِنْحِنَاءِ .

৭২. যখন আমি তাকে সুষম করবো পরিপূর্ণ করবো এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব। অতঃপর সে জীবিত হবে। হযরত আদম (আ.)-এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলার দিকে রূহের নিসবত করা হয়। রূহ একটি অদৃশ্য বিষয় যার বদৌলতে মানুষ জীবিত হয়। তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ো। একটু ঝুঁকে অভিনন্দন মূলক সেজদা কর।

٧٣. فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ فِيْهِ تَاكِيْدَانِ -

৭৩. অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হলো এখানে كُلُّهُمْ ও اَجْمَعُوْنَ দ্বারা দুটি তাকীদ এসেছে

٧٤. اِلَّا اِبْلِيْسَ هُوَ اَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلٰئِكَةِ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

৭৪. কিন্তু ইবলীস জিনদের আদিপিতা সে ফেরেশতাদের মধ্যে থাকত। সে অহংকার করলো, আর সে আল্লাহ তা'আলার ইলমে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٧٥. قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط اَيْ تَوَلَّيْتُ خَلْقَهُ وَهٰذَا تَشْرِيْفٌ لِاٰدَمَ فَاِنَّ كُلَّ مَخْلُوْقٍ تَوَلَّى اللّٰهُ خَلْقَهُ اَسْتَكْبَرْتَ الْاٰنَ عَنِ السُّجُوْدِ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ فَتَكَبَّرْتَ عَنِ السُّجُوْدِ لِكَوْنِكَ مِنْهُمْ -

৭৫. আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? যাকে আমি নিজেই সৃষ্টি করেছি। এটা হযরত আদম (আ.)-এর সম্মানার্থে বলা হয়েছে নতুবা সকল মাখলুক আল্লাহ তা'আলা নিজেই সৃষ্টি করেন। তুমি অহংকার করলে এখন সেজদা থেকে। প্রশ্নবোধক অব্যয় ধমক দেওয়ার জন্য না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। অতএব তুমি অহংকারী হওয়ার কারণে সেজদা থেকে বিরত রয়েছ।

٧٦. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

৭৬. সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা।

٧٧. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا اَيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ مَطْرُوْدٌ -

৭৭. আল্লাহ তা'আলা বললেন, বের হয়ে যা, এখান থেকে অর্থাৎ জান্নাত বা আসমান থেকে কারণ তুমি অভিশপ্ত।

٧٨. وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْۤ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ -

৭৮. তোমার প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

٧٩. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ اَيِ النَّاسُ -

৭৯. সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আপনি আমাকে মানুষের পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।

٨٠. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۙ

৮০. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের থেকে।

٨١. اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وَقْتَ النَّفْخَةِ الْاُوْلٰى -

৮১. নির্দিষ্ট সময় সিঙ্গায় প্রথম ফুৎকারের দিবস পর্যন্ত।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٢. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

৮২. সে বলল, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপদগামী করে দেব।

٨٣. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

৮৩. তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার খাঁটি বান্দা ঈমানদার তাদেরকে ছাড়া।

٨٤. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ بِنَصْبِهِمَا وَرَفْعِ الْاَوْلٰى وَنَصْبِ الثَّانِى فَنَصْبُهُ بِالْفِعْلِ بَعْدَهُ وَنَصْبُ الْاَوَّلِ قِيْلَ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُوْرِ وَقِيْلَ عَلَى الْمَصْدَرِ اَىْ اُحِقُّ الْحَقَّ وَقِيْلَ عَلٰى نَزْعِ حَرْفِ الْقَسَمِ وَرَفْعِهِ عَلٰى اَنَّهُ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفُ الْخَبَرِ اَىْ فَالْحَقُّ مِنِّىْ وَقِيْلَ فَالْحَقُّ قَسَمِىْ وَجَوَابُ الْقَسَمِ ـ

৮৪. আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাই ঠিক। আর আমি সত্য বলছি اَلْحَقُّ উভয়টি নসবযুক্ত প্রথমটি পেশ ও দ্বিতীয়টি পরবর্তী ফে'ল দ্বারা নসব, প্রথমটি পূর্বের উল্লিখিত ফে'লের কারণে নসব অথবা মাসদার তথা مَفْعُول مُطْلَق হিসেবে নসব অর্থাৎ اُحِقُّ الْحَقُّ অথবা حَرْف قَسَمْ -এর বিলুপ্ত হওয়ার পর নসব অথবা উহ্য খবরের মুবতাদা হিসেবে পেশ অর্থাৎ اَلْحَقُّ مِنِّىْ ـ فَالْحَقُّ قَسَمِىْ এবং জবাবে কসম পরবর্তী বাক্য।

٨٥. لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ بِذُرِّيَّتِكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ مِنَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

৮৫. তোমার বংশধর ও মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

٨٦. قُلْ مَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ مِنْ اَجْرٍ جُعْلٍ وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ـ الْمُتَقَوِّلِيْنَ الْقُرْاٰنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِىْ ـ

৮৬. বলুন, আমি তোমাদের কাছে রেসালতের তাবলীগের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না, আর আমি লৌকিকতাকারী ও কুরআনকে নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথা নই।

٨٧. اِنْ هُوَ اَىْ مَا الْقُرْاٰنُ اِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ لِلْاِنْسِ وَالْجِنِّ الْعُقَلَاءِ دُوْنَ الْمَلٰئِكَةِ ـ

৮৭. এই কুরআন বিশ্ববাসীর ফেরেশতা ব্যতীত মানুষ ও জিন জাতি জন্যে এক উপদেশ মাত্র।

٨٨. وَلَتَعْلَمُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ نَبَاَهٗ خَبَرَ صِدْقِهِ بَعْدَ حِيْنٍ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَعَلِمَ بِمَعْنٰى عَرَفَ وَاللَّامُ قَبْلَهَا لَامُ قَسَمٍ مُقَدَّرٍ اَىْ وَاللّٰهِ ـ

৮৮. হে মক্কার কাফেরগণ! তোমরা কিছুকাল কিয়ামত দিবসের পর এর সংবাদ এর সত্যার খবর অবশ্যই জানতে পারবে। عَلِمَ অর্থ عَرَفَ এবং لَتَعْلَمُنَّ وَاللّٰهِ لَتَعْلَمُنَّ -এর লাম উহ্য কসমের অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَتَعْلَمُنَّ ـ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ : রাসূল ﷺ نَذِيْر [ভীতি প্রদর্শনকারী] ও এবং بَشِيْر [সুসংবাদ দাতা] ও। অথচ এখানে তার সিফত نَذِيْر-এ মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ কি?

এর উত্তর হলো এই যে, ঐ সময় مُخَاطَبْ যেহেতু মুশরিকরা তাদের কারণেই তাঁর نَذِيْر হওয়া। তাই এখানে তার সিফত نَذِيْر-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ-এর মধ্যে حَصْر اِضَافِىْ হয়েছে حَقِيْقِىْ অর্থাৎ اِنَّمَآ اَنَا এই مُنْذِرٌ لَا سَاحِرٌ وَلَا شَاعِرٌ وَلَا كَاهِنٌ وَغَيْرُ ذٰلِكَ. حَصْر দ্বারা এই সকল সিফত দ্বারা نَفِىْ করা উদ্দেশ্য। যাকে কাফেররা রাসূল ﷺ-এর জন্য প্রমাণিত করতে ছিল। اِنْذَار ব্যতীত সকল صِفَاتْ-এর নয়।

قَوْلُهُ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ : হতে قُلْ পর্যন্ত اَلْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পাঁচটি مَقُوْلَه এই مَقُوْلَه-এর صِفَتْ বর্ণনা করেছেন যার সবগুলো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর দালালত করে। ১. اَلْوَاحِدُ ২. اَلْقَهَّارُ ৩. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ৪. اَلْعَزِيْزُ ৫. اَلْغَفَّارُ

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ : قُلْ-এর تَكْرَارْ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য হয়েছে যে, مَامُوْر بِهٖ টা جَلِيْلُ الْقَدْرِ এবং عَظِيْمُ الشَّانِ বিষয়। এর দিকে اَمْرًا এবং اِئْتِمَارًا তাওয়াজ্জুহ জরুরি।

قَوْلُهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ : এটা هُوَ نَبَأٌ عَظِيْمٌ-এর মধ্যস্থ هُوَ-এর তাফসীর অর্থাৎ কুরআন আযীমুশ শান এবং كَثِيْرُ الْفَائِدَةِ খবর। যার আমি তোমাদেরকে খবর দিয়েছি। যার মধ্যে এমন খবর নিয়ে এসেছি যা ওহী ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। কাজেই এতে আমার রেসালতের দাবির সত্যায়ন রয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ (مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ الخ) : মুফাসসির (র.) هُوَ-এর মারজি' مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ الخ-কে বলেছেন।কিন্তু এটা ঠিক নয়। বরং اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً الخ-এর مَرْجِعْ হলো مَا অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে, مَا لَا يَعْلَمُ কে كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى-এর ভূমিকা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, ঐ খবর যার জ্ঞান ওহী ছাড়া সম্ভব নয় তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। যাতে আল্লাহ তা'আলা مَلَاِ اَعْلٰى তে ফেরেশতাদেরকে বলেছেন اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً আর তা উপর ফেরেশতাদের এই জবাব اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী يَا اِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ-এর জবাবে ইবলীসের اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ বলা উল্লিখিত কথাবার্তা এবং প্রশ্ন ও উত্তর সেই কথাবার্তা যা আকাশে আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাদের মধ্যে হয়েছিল। এই কথোপকথন ও مَلَاِ اَعْلٰى কথাবার্তার খবর দেওয়া ওহী ব্যতীত হতে পারে না, যা রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতার نَا قَابِلِ تَرْدِيْد-এর প্রমাণ। (صَاوِىْ . جَمَلْ . فَتْحُ الْقَدِيْرِ شَوْكَانِىْ)

قَوْلُهُ اَلْاٰنَ : এই শব্দ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্ন হলো مِنَ الْعَالِيْنَ অর্থ হলো مِنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ আর اِسْتَكْبَرْتَ-এর অর্থও হলো অহংকার করা। কাজেই تَكْرَارْ আবশ্যক হচ্ছে।

জবাবের সার হচ্ছে- اَتَرَكْتَ السُّجُوْدَ لِاِسْتِكْبَارِكَ الْحَادِثِ اَمْ اِسْتِكْبَارِكَ الْقَدِيْمِ الْمُسْتَمِرِّ উদ্দেশ্য এই যে, হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করা তোমার جِبِلِّىْ এবং قَدِيْم تَكَبُّرْ-এর কারণে হয়েছে অথবা تَكَبُّرْ حَادِثْ جَدِيْد-এর কারণে। কাজেই تَكْرَارْ হয়নি।

প্রশ্ন. رَجِيْم হলো مَطْرُوْد অর্থে যেমনটি শারেহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং সামনে বলেছেন اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ আর لَعْنَتْ-এর অর্থও طَرْد কাজেই এখানে تَكْرَارْ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর. رَجِيْم-এর অর্থ طَرْدٌ مِنَ الرَّحْمَةِ আর লুগাতের অর্থ طَرْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ السَّمَاءِ কাজেই تَكْرَارْ হয়নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ الْمُتَقَوِّلِيْنَ : এটা বাবে تَفَعُّلْ -এর تَقَوُّلْ মাসদার হতে অর্থ বানোয়াট কথা বলা, মিথ্যা কথার মাধ্যমে কাজ নেওয়া।

قَوْلُهُ دُوْنَ الْمَلَائِكَةِ : কুরআন সমগ্র আলমের জন্য উপদেশ। عَالَمْ -এর মধ্যে মানব, দানব ফেরেশতা সবই অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে دُوْنَ الْمَلَائِكَةِ বলে عَالَمْ থেকে مَلَائِكَة কে বের করে দিয়েছেন। কেননা কুরআনকে আলমবাসীর জন্য ذِكْر এবং নসিহত বলা হয়েছে। আর ذِكْر নসিহত ও تَخْوِيْف এটা মানব দানবের জন্য প্রযোজ্য তবে مَلَائِكَة -এর জন্য প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ عَلِمَ بِمَعْنَى عَرَفَ : মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য এই ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রশ্ন হলো عَلِمَ টা مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হয়ে থাকে। এখানে مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل হয়েছে। কেননা تَعْلَمُنَّ -এর শুধুমাত্র একটি মাফউলই রয়েছে। আর তা হলো نَبَأ ; জবাবের সার হলো عَلِمَ টা عَرَفَ অর্থে। আর وَلَتَعْلَمُنَّ -এর মধ্যকার لَامْ টি جَوَابْ قَسَمْ আর কসম হলো وَاللّٰهِ যা উহ্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, عَلِمَ টা مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাফউল হলো بَعْدَ حِيْنٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার সার-সংক্ষেপ : قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ এ সূরার আসল লক্ষ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবি খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলি দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে– ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের মতো আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। ২. এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষা লাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গাম্বরের রিসালাত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এরপর মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অঙ্কন করে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ কিয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহার আবার আসল দাবি অর্থাৎ রিসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مَاكَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلٰى إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ : অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতের কোনো জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল। অর্থাৎ আমার রিসালাতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিলেন– أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ অর্থাৎ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে اِخْتِصَامٌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ– ঝগড়া করা, অথবা বাকবিতণ্ডা করা। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোনো আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اِخْتِصَامٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোনো ছোট বড়কে কেনো প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত এ প্রশ্নোত্তরকে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ : অর্থাৎ যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের উপরিউক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ : এখানে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আমি নিজ হাতে তাকে সৃষ্টি করেছি। সকল তাফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে মানুষের ন্যায় আল্লাহ তা'আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হলো আল্লাহর কুদরত আরবি ভাষায় يد শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণত এক আয়াতে আছে بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অতএব আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহর কুদরত দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিষেভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ [আল্লাহর ঘর], হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীকে 'নাকাতুল্লাহ' [আল্লাহর উষ্ট্র], হযরত ঈসা (আ.)-কে কালেমাতুল্লাহ [আল্লাহর বাক্য] অথবা 'রূহুল্লাহ' [আল্লাহর রূহ] বলা হয়েছে। এখানেও হযরত আদম (আ.)-এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা : وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ অর্থাৎ আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী নই। উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুয়ত, রেসালাত ও জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করছি না; বরং আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এথেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সে মতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর একটি উক্তিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন–

"লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে اَللّٰهُ اَعْلَمُ [আল্লাহ ভালো জানেন] বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল সম্পর্কে বলেছেন– قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা যখন ইবলিসকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তখন সে বলল, এ সুযোগে আমি আদম সন্তানদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো। এরপর বলেছে, তবে হে আল্লাহ! যাদেরকে আপনি আপনার বন্দেগীর জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন, তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে পারবো না। আলোচ্য আয়াতে একথাই ইরশাদ করেছেন– اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তার বন্দেগীর জন্যে তৌফিক দান করেন, যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন, যারা আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট এবং একনিষ্ঠ বান্দা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, তাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবো না।

ইবলিসের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত : বর্ণিত আছে, একবার ইবলিস হযরত গাওসুল আজব শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (র.) -এর নিকট অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র আকৃতি ধারণ করে হাজির হয়ে বলে, হযরত! আমি একজন ফেরেশতা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন এ সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার বন্দেগীতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন, এখন আর আপনার কোনো গুনাহ নেই। যেহেতু নবী ব্যতীত কোনো মানুষ নিষ্পাপ নন, তাই হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) মনে করলেন এ হলো ইবসিল শয়তান, আমাকে প্রতারণার জন্যে হাজির হয়েছে। তাই তিনি পাঠ করলেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম" এ দোয়াটি ইবলীসের ক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্রের ন্যায় কার্যকর হয়।

এ দোয়া শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে ইবলিস পলায়নে বাধ্য হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধূর্ত ইবলিস পলায়নপর অবস্থাতেও হযরত শেখ জিলানী (র.)-কে পুনরায় ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করলো। তার গৃহ দ্বারের বাইরে গিয়ে সে পুনরায় বলে হযরত! আমি অনেক বুজুর্গকে এভাবে প্রতারণা করেছি, কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমি ব্যর্থ হলাম, কেননা আপনি অত্যন্ত বিজ্ঞ আলেম. আপনার ইলমের কারণেই আজ আমি ব্যর্থ হলাম। তখন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) উপলব্ধি করলেন, এটিও ইবলিস শয়তানের আরেকটি চাল, আমি যেন আমার ইলমের কারণে অহংকারী হই তাই সে চায়, তখন তিনি বললেন, হে মিথ্যাবাদী ইবলিস! আমার ইলমের কারণে নয়, বরং শুধু আল্লাহ তা'আলার রহমতেই তোর ধোকা থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি।

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.)-এর ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিখ্যাত তাফসীরকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর এক হাজার দলিল পেশ করতেন। একবার তিনি বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (র.)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষা নিলেন। হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (র.) তাকে বললেন, আপনাকে কিছুদিন আমার নিকট অবস্থান করতে হবে। ইমাম রাযী (র.) তা নিকট কিছুদিন অবস্থান করলেন। একদিন তিনি পীর ও মুর্শেদকে বললেন, হযরত! আমার ইলম চলে যাচ্ছে। আমি অনেক কথা ভুলে যাচ্ছি। তখন অক্লান্ত সাধনা এবং কঠোর পরিশ্রমের পর আমি এ ইলম হাসিল করেছিলাম। তখন হযরত নাজমুদ্দিন কোবরা (র.) বললেন, আপনার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর সবকিছু থেকে মুক্ত করতে হবে। শুধু এভাবেই আপনার দিলকে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ করা সম্ভব হবে। ইমাম রাযী (র.) বললেন, হযরত! সারা জীবনের কঠোর সাধনালব্ধ এই ইলম হারাতে আমার বড় কষ্ট হয়, আধ্যাত্মিক সাধনার এই মহান কাজ আপাততঃ মুলতবি থাকুক। কিছুদিন পরই ইমাম রাযী (র.)-এর মৃত্যুর মুহূর্ত ঘণিয়ে এলো। ইবলিস শয়তান তাকে প্রতারিত করতে উপস্থিত হলো। ইমাম রাযী (র.) আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর একে একে এক হাজার দলিল উপস্থাপন করলেন। ইবলিস শয়তান তাঁর পেশকৃত প্রত্যেকটি দলিল খণ্ডন করলো। তখন ইমাম রাযী (র.)-এর বেঈমান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। এই সংকটজনক অবস্থায় কাশফ হলো হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (রা.)-এর তিনি তখন অজু করেছিলেন। পানির পাত্রটি ইবলিস শয়তাতের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে ইমাম রাযী (র.)-কে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'বল, কোনো দলিল ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা এক, তার কোনো শরিক নেই, এর উপর আমার ঈমান রয়েছে, তোমাকে দলিল দেওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ইমাম রাযী (র.) যখন একথা বললেন, তখন ইবলিস শয়তানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এভাবে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় এবং পছন্দনীয় বান্দাগণ তার বিশেষ রহমতে ইবলিস শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কুরআনে একথাই ঘোষণা করেছে- قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ তবে এটি সত্য, আর আমি সত্য কথাই বলছি। অর্থাৎ আমার কথা সত্য, আর আমি সত্যই বলে থাকি। হে ইবলিস! তুই এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি দোজখকে পরিপূর্ণ করে দেবো।

এ ঘোষণা শ্রবণের পর বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা, প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তার পরিপূর্ণ অনুসারী হওয়া, ইবলিস শয়তানের অনুগামী না হওয়া।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেউ যদি ঈমান না আনে, তবে হে রাসূল! আপনার কর্তব্য হলো, সুস্পষ্ট ভাষায় একটি কথা ঘোষণা করা, আর তা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ. অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

অর্থাৎ আমি যে তোমাদেরকে সত্য গ্রহণের জন্য আহ্বান করছি অথবা তোমাদের নিকট পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, এতে আমার কোনো স্বার্থ নেই, আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিকও চাই না, আমি কোনো মিথ্যা কথার দাবিদারও নই। বরং আমি সত্য নবী আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে যে পথ নির্দেশ আসে তা আমি মানুষকে জানিয়ে দেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমাদেরকে বানানো কথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মাসরুক (র.) বলেছেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর খেদমতে হাজির ছিলাম, তিনি বলেছেন, যদি কেউ কোনো কথা জানে তবে তা যেন বলে দেয়, আর যদি না জানে তবে বলা উচিত আল্লাহ তা'আলা জানেন, এর বেশি নিজের তরফ থেকে কোনো কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়।

এ আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ অর্থাৎ এই কুরআন তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটি উপদেশ মাত্র যা আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ওহী স্বরূপ অবতীর্ণ হয়, আর আমি তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দেই, আর এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পবিত্র কুরআনের মহামূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করলে, তোমাদেরই উপকার হবে, এতেই রয়েছে তোমাদের জীবন সাধনার সার্থকতা, সার্বিক কল্যাণ। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে গ্রহণ কর, আমার অনুসরণ কর, এটিই সরল সঠিক পথ।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ এবং অচিরেই তোমরা এর ইতিবৃত্ত জানতে পারবে অর্থাৎ যদি তোমরা পবিত্র কুরআনের বাণী এবং আমার আহ্বানের সত্যতা উপলব্ধি করতে না পার তবে মনে রেখো, অদূর ভবিষ্যতে এর সত্যতা তোমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

প্রশ্ন হলো, কবে কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষ ইসলামের সত্যতা, পবিত্র কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করবে।

আর হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে এ সত্য উপলব্ধি করবে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুই কিয়ামত, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করবে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন সবই সত্য, আর হযরত হাসান বসরী (র.) এ ব্যাখ্যাই করেছেন। সুদ্দী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা বদরের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ বদরের দিন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর কথাই সত্য, কেননা আল্লাহ তা'আলা সেদিন সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্যপন্থিদেরকে বিজয় দান করেছেন এবং বাতিল-পন্থিদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৩৯-১৪০, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ. ৫৫]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আয-যুমার, মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (الْآيَةَ) فَمَدَنِيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ آيَةً.

তবে قُلْ يَا عِبَادِيَ ..... আয়াতটি ব্যতীত এটি মাদানী এবং সর্বমোট ৭৫ টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهُ الْعَزِيْزِ فِيْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمِ فِيْ صُنْعِهِ.

٢. إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلْنَا فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ مِنَ الشِّرْكِ أَيْ مُوَحِّدًا لَهُ.

٣. أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ط لَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ الْأَصْنَامَ أَوْلِيَاءَ م وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ قَالُوْا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ط قُرْبٰى مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى تَقْرِيْبًا إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ط مِنْ أَمْرِ الدِّيْنِ فَيُدْخِلُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ وَالْكَافِرِيْنَ النَّارَ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ فِيْ نِسْبَةِ الْوَلَدِ إِلَيْهِ كَفَّارٌ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ.

অনুবাদ :

১. কিতাব কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, তার রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তার কর্মে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে اَلْقُرْاٰنِ মুবতাদা ও مِنَ اللّٰهِ খবর।

২. হে মুহাম্মদ ﷺ ! আমি আপনার প্রতি ও কিতাব যথার্থরূপে নাজিল করেছি। অতএব আপনি শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে অর্থাৎ তাওহীদের বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করুন। بِالْحَقِّ টি اَنْزَلْنَا-এর সাথে সম্পর্কিত।

৩. জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর হকদার নয় যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে মূর্তিসমূহ উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে তারা মক্কার কাফেরগণ এবং তারা বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করে দেয়। زُلْفٰى শব্দটি تَقْرِيْبًا -এর অর্থে মাসদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় বিষয়ে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তাদের মধ্যে ও মুসলমানদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। অতএব মুসলমানদেরকে জান্নাতে ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী আল্লাহর দিকে সন্তানের নিসবত করে কাফেরকে যারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا كَمَا قَالُوْا اِتَّخَذَ
الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ
وَاتَّخَذَهُ وَلَدًا غَيْرَ مَنْ قَالُوْا مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ
بَنَاتُ اللّٰهِ وَعُزَيْرٌ بْنُ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحُ بْنُ
اللّٰهِ سُبْحٰنَهٗ ط تَنْزِيْهًا لَهٗ عَنِ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ
هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ لِخَلْقِهٖ ـ

৪. আল্লাহ তা'আলা যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, যেমন কাফেররা বলে রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন তবে তার সৃষ্টির মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতেন অর্থাৎ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতেন, তাদেরকে ব্যতীত যাদের ব্যাপারে কাফেররা বলে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা এবং হযরত উযাইর ও ঈসা আল্লাহর পুত্র। তিনি পবিত্র অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা গ্রহণ করা থেকে পবিত্র তিনি আল্লাহ এক, পরাক্রমশালী। তার সৃষ্টের প্রতি।

٥. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ج مُتَعَلِّقٌ
بِخَلَقَ يُكَوِّرُ يُدْخِلُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ
فَيَزِيْدُ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ يُدْخِلُهٗ عَلَى الَّيْلِ
فَيَزِيْدُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ
فِىْ فُلْكِهٖ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَلَا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهٖ الْمُنْتَقِمُ مِنْ
اَعْدَائِهٖ الْغَفَّارُ لِاَوْلِيَائِهٖ ـ

৫. তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। بِالْحَقِّ টি خَلَقَ -এর সাথে সম্পর্কিত। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন ফলে দিবস দীর্ঘ হয় এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন ফলে রাত্রি দীর্ঘ হয় এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই তার কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়কাল কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বিচরণ করে। জেনে রাখুন, তিনি তার নির্দেশে পরাক্রমশালী তার শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও তার বন্ধুদের প্রতি ক্ষমাশীল।

٦. خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ اَىْ اٰدَمَ ثُمَّ جَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ
الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالضَّاْنِ وَالْمَعْزِ ثَمٰنِيَةَ
اَزْوَاجٍ ط مِنْ كُلٍّ زَوْجَانِ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى كَمَا بُيِّنَ
فِىْ سُوْرَةِ الْاَنْعَامِ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ
اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ اَىْ نُطَفًا ثُمَّ
عَلَقًا ثُمَّ مُضَغًا فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ـ

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আদম (আ.) থেকে অতঃপর তা থেকে তার যুগল হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু অর্থাৎ উট, গাভী, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি। থেকে আট জোড়া অবতীর্ণ করেছেন। প্রত্যেকটির মধ্যে নর-নারী করে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। যেমন সূরায়ে আনআমে বর্ণিত তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক অর্থাৎ এক ফোটা বীর্য অতঃপর জমাট রক্ত অতঃপর এক টুকরো গোশত ত্রিবিধ অন্ধকারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

هِىَ ظُلْمَةُ الْبَطْنِ وَظُلْمَةُ الرَّحِمِ وَظُلْمَةُ الْمَشِيْمَةِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ اِلٰى عِبَادَةِ غَيْرِهِ -

অর্থাৎ পেট, রেহেম ও সন্তানের থলির অন্ধকার তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তারই তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। অতএব তোমরা তার ইবাদত থেকে ফিরে অন্যের ইবাদতে কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

٧. اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ قف وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ج وَاِنْ اَرَادَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ وَاِنْ تَشْكُرُوْا اللّٰهَ فَتُؤْمِنُوْا يَرْضَهُ بِسُكُوْنِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا مَعَ اَشْبَاعٍ وَدُوْنَهُ اَىِ الشُّكْرِ لَكُمْ ط وَلَا تَزِرُ نَفْسٌ وَّازِرَةٌ وِّزْرَ نَفْسٍ اُخْرٰى ط اَىْ لَا تَحْمِلُهُ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ -

৭. যদি তোমরা কুফরি কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে বেপরওয়া। তিনি তার বান্দাদের জন্য কুফরকে পছন্দ করেন না। যদিও তাদের অনেকে কুফরের ইচ্ছা করেছে। পক্ষান্তরে তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞ হও অতঃপর ঈমান আন তবে তিনি তোমাদের জন্য তা শুকর পছন্দ করেন। يَرْضَهُ -এর ه সর্বনামে সাকিন ও ইশবা -এর সাথে পেশ হবে। একের পাপের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত।

٨. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ اَىِ الْكَافِرَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ تَضَرَّعَ مُنِيْبًا رَاجِعًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً اَعْطَاهُ اِنْعَامًا مِّنْهُ نَسِىَ تَرَكَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا يَتَضَرَّعُ اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَهُوَ اللّٰهُ فَمَا فِى مَوْضِعِ مَنْ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا شُرَكَاءَ لِيُضِلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا عَنْ سَبِيْلِهِ دِيْنِ الْاِسْلَامِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ن بَقِيَّةَ اَجَلِكَ اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ -

৮. যখন মানুষকে কাফেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে অতঃপর তিনি যখন তাকে নিয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা ভুলে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায় مَنْ -এর স্থলে مَا হবে এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে, যাতে করে অপরকে আল্লাহ তা'আলার পথ ইসলাম ধর্ম থেকে বিভ্রান্ত করে। لِيُضِلَّ -এর ى -এর মধ্যে যবর ও পেশ উভয়টা পড়া যাবে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল তোমার অবশিষ্ট জিন্দেগী জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই পরিশেষে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।

٩. اَمَّنْ بِتَخْفِيْفِ الْمِيْمِ هُوَ قَانِتٌ قَائِمٌ
بِوَظَائِفِ الطَّاعَاتِ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاعَاتِهٖ
سَاجِدًا وَّ قَائِمًا فِي الصَّلٰوةِ يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ
اَيْ يَخَافُ عَذَابَهَا وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ جَنَّةَ رَبِّهٖ ط
كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِالْكُفْرِ اَوْ غَيْرِهٖ وَفِيْ قِرَاءَةٍ
اَمْ مَّنْ فَاَمْ بِمَعْنٰى بَلْ وَالْهَمْزَةُ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط
اَيْ لَا يَسْتَوِيَانِ كَمَا لَا يَسْتَوِي الْعَالِمُ
وَالْجَاهِلُ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ يَتَّعِظُ اُولُوا الْاَلْبَابِ
اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

৯. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের কর্মে লিপ্ত থেকে রুকু সেজদায় তথা নামাজে লিপ্ত থাকে, যে অবস্থায় সে পরকালের আজাব থেকে ভয় করে এবং তার পালনকর্তার রহমত জান্নাতের প্রত্যাশা করে। সে কি তার সমান যে কুফর ইত্যাদি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করে। اَمَّنْ-এর মীম তাশদীদ বিহীন এবং অন্য কেরাত মতে اَمْ مَنْ এবং اَمْ অর্থ بَلْ ও হামযা। বলুন, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ সমান হতে পারে না। যেমন আলেম ও জাহেল সমান হতে পারে না। নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

এই সূরারনাম সূরায়ে যুমার। زُمَرًا শব্দটি زُمْرَةٌ-এর বহুবচন, এর অর্থ জামাত। এই সূরাকে غُرَفٌ ও বলা হয়। এই দুই শব্দই যেহেতু এই সূরায় এসেছে তাই এটা اِسْمُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। زُمَرٌ শব্দটি وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا এবং وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং غُرَفٌ শব্দটি لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ-এর মধ্যে। يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ হতে তিন আয়াত পর্যন্ত মদনী। কেউ কেউ এখান থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত মদনী বলেছেন।

قَوْلُهُ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ : এটা উহ্য هُوَ মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। অর্থাৎ هُوَ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ এবং বলা হয়েছে যে, এটা মুবতাদা হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর جَارْ مَجْرُوْرٌ টা كَائِنٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে মুবতাদার খবরর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تَنْزِيْلٌ كَائِنٌ مِنَ اللّٰهِ

ফাররা ও কিসায়ী উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْبٌ ও বলেছেন। অর্থাৎ اِتَّبِعُوْا تَنْزِيْلَ الْكِتَابِ অথবা اِقْرَءُوْا تَنْزِيْلَ الْكِتَابِ এবং ফাররা اِغْرَاءٌ-এর ভিত্তিতেও نَصَبٌ বৈধ বলেছেন অর্থাৎ اَلْزِمُوْا تَنْزِيْلَ الْكِتَابِ (فَتْحُ الْقَدِيْرِ)

قَوْلُهُ مُخْلِصًا : এটা اَعْبُدُ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ زُلْفٰى : এটা يُقَرِّبُوْنَ-এর مَصْدَرٌ بِغَيْرِ لَفْظِهٖ হয়েছে। মূলে يُزْلِفُوْنَ زُلْفٰى ছিল اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا-এর মতো مَصْدَرٌ بِغَيْرِ لَفْظِهٖ হয়েছে।

قَوْلُهُ يُكَوِّرُ : এটা تَكْوِيْرٌ মাসদার হতে اَللَّفُّ . اَللَّيُّ তথা পেচানো, ভাজ করা অর্থে হয়েছে। বলা হয় كَارَ الْعِمَامَةَ عَلٰى رَأْسِهٖ وَكَوَّرَهَا মাথার পাগড়ি পেচিয়ে দেওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَهُ مِنْ بَعْضِهِمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার কুফরির উপর সন্তুষ্ট নন। যদিও কুফরের অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো إِرَادَةْ এবং مَشِيْئَتْ অস্তিত্বে আসতে পারে না। আর إِرَادَةْ-এর জন্য رِضَا আবশ্যক নয়। যেমন অকামনীয় কোনো কাজ করার মধ্যে إِرَادَةْ তো থাকে কিন্তু রেজামন্দি থাকে না।

قَوْلُهُ يَرْضَهُ : যমীরের مَرْجِعْ হলো شُكْر যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার শোকর কর তবে তিনি তোমাদের শোকরের কারণে খুশি হবেন। يَرْضَهُ মূলে ছিল يَرْضَاهُ শর্তের جَزَاءْ হওয়ার কারণে اَلِفْ পড়ে গেছে। يَرْضَهْ-এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে। اَلْاِشْبَاعُ [টেনে] সহ পেশ দিয়ে, اَلْاِشْبَاعُ বিহীন পেশ দিয়ে, هَاءْ-এর سُكُوْنْ-এর সাথে।

قَوْلُهُ أَيِ الشُّكْرُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো يَرْضَهْ-এর ضَمِيْر مَفْعُوْلِيْ-এর مَرْجِعْ নির্দিষ্ট করা। আর يَرْضَهْ-এর ফায়েল হলো اَللّٰهُ

قَوْلُهُ خَوَّلَهُ : এটা বাবে تَفْعِيْلْ-এর تَخْوِيْلْ মাসদার হতে مَاضِيْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। অর্থ- তাকে দান করেছেন, মালিক বানিয়েছেন। مِنْهُ-এর যমীর আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ تَرَكَ : نَسِيَ-এর তাফসীর تَرَكَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে نِسْيَانْ-এর لَازِمِيْ অর্থ উদ্দেশ্য। تَرَكَ টা مُؤَاخَذَةْ-এর জন্য আবশ্যক। আর এ কারণে لَازِمِيْ অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে যে, نِسْيَانْ-এর উপর نِسْيَانْ নেই। প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ

قَوْلُهُ مَا كَانَ يَدْعُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ : مَا-এর মধ্যে তিনটি সুরত বৈধ।

১. مَا টা مَوْصُوْلَةْ যা اَلَّذِيْ অর্থে আর اَلَّذِيْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ضَرٌّ [কষ্ট] অর্থাৎ نَسِيَ الضُّرَّ الَّذِيْ كَانَ يَدْعُوْ إِلَى كَشْفِهِ অর্থাৎ আমাদের উহার উপর পুরস্কার দেওয়া এবং তার কষ্ট দূর করার পর সে ঐ تَكَلُّفْ [কষ্ট] কে ভুলে গেছে, যার দূর করার দোয়া করতে ছিল।

২. مَا টা اَلَّذِيْ অর্থে, উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ نَسِيَ الَّذِيْ كَانَ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ তথা কষ্ট দূর হওয়ার পর ঐ সত্তাকে ভুলে গেছে যার থেকে কষ্ট দূর করার দোয়া করতে ছিল। কিন্তু এটা তাদের নিকট বৈধ যারা مَا-এর প্রয়োগ ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর জন্য জায়েজ মনে করেন।

৩. مَا টা হলো مَصْدَرِيَّةْ অর্থাৎ نَسِيَ كَوْنَهُ دَاعِيًا তথা মসিবত দূর হওয়ার পর সে এটাও ভুলে গেছে যে, আমি কোনো সময় দায়ী ছিলাম।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلُ : অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ تَخْوِيْلِ النِّعْمَةِ

قَوْلُهُ وَهُوَ اللّٰهُ : মুফাসসির (র.) এই ইবারত দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তার নিকট দ্বিতীয় সুরত পছন্দনীয়।

قَوْلُهُ قَانِتٌ : এটা قُنُوْتٌ মাসদার থেকে اِسْمُ فَاعِلْ অর্থ আনুগত্যের ওয়াযীফা আদায়কারী, বিনয়ী, অনুগত।

قَوْلُهُ إِنَاءُ : এটা اِنْيٌ-এর বহুবচন। অর্থ- সময়।

قَوْلُهُ أَمَّنْ : أَمْ টা مُتَّصِلَةْ ও হতে পারে তার مُقَابِلْ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَلْكَافِرُ خَيْرٌ أَمِ الَّذِيْ قَانِتٌ হামযাটা مَنْ مَوْصُوْلَةْ-এর উপর প্রবেশ করেছে। مِيْم কে مِيْم-এর মধ্যে اِدْغَامْ করে দেওয়া হয়েছে। অথবা أم টি مُنْقَطِعَةْ-এর উহ্য হবে بَلْ হামযার সাথে অর্থাৎ بَلْ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كَغَيْرِهِ এবং تَخْفِيْف-এর সাথেও পড়া হয়েছে। এই সুরতে হামযাটা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ হবে।

قَوْلُهُ كَمَنْ هُوَ عَاصٍ بِكُفْرِهِ وَغَيْرِهِ : এখান থেকে শারেহ (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ-এর مُعَادِلْ-কে বর্ণনা করা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে যুমার প্রসঙ্গে :

এ সূরায় ৮ রুকু, ৭৫ আয়াত রয়েছে। তিনটি আয়াত ব্যতীত অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। ঐ তিনটি আয়াত মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ১,১৯২টি বাক্য ও ৪০০০ অক্ষর রয়েছে। -[তানবীরুল মেকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃ. ৩৮৫]

নামকরণ :

সূরায়ে যুমারের আরো একটি নাম হলো 'সূরাতুল গোরাফ'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে, তবে হযরত হামযা (আ.)-এ হত্যাকারী ওয়াহশী সম্পর্কে যে তিনটি আয়াত রয়েছে, তা মদীনায়ে মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৩, পৃ. ২৩২]

এ সূরার ফজিলত :

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ প্রত্যেক রাত্রে সূরায়ে বাকারা এবং সূরায়ে যুমার তেলাওয়াত করতেন। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা, ২৩, পৃ. ৭৫]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী সূরার অধিকাংশ বিষয় প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর রেসালাত সম্পর্কীয় ছিল। আর এ সূরার অধিকাংশ বক্তব্য তৌহিদ সম্পর্কে রয়েছে। যারা তাওহীদে বিশ্বাস করে। তাদের জন্যে পুরস্কার এবং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবতার কলঙ্ক শিরক বা অংশীবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরার প্রথম আয়াতেও পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাজিল হওয়ার কথা ঘেষণা করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।

-[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.), খ. ৬, পৃ. ৫৮-৫৯]

قَوْلُهُ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ : دِيْن শব্দের অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খাঁটি করুন, যাতে শিকর, রিয়া ও নাম যশের নামগন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত অথবা কারো প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরিক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণস্বরূপ اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। -[কুরতুবী]

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমল গৃহীত হয় : কুরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমলের হিসাব গণণা দ্বারা নয় ওজন দ্বারা হয়ে থাকে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ এবং উল্লিখিত আয়াতসমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোনো ইবাদত ও আনুগত্য অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যে সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى : এ হলো আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরিকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখতো যে, আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সবকিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাদের আকার-আকৃতিতে মূর্তি বিগ্রহ তৈরি করলো অতঃপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, যাদের আকৃতিতে মূর্তি বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানতো যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোনো বুদ্ধি জ্ঞান, চেতনা চৈতন্য ও শক্তি বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের দরবারের মতোই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারো প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করতো, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারো জন্য সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শয়তানি, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব মূর্তি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতি অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোনো বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কুরআনি আয়াতের অর্থ তাই−

كَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى .

তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফেরদের চেয়ে উত্তম ছিল : বর্তমান যুগের বস্তুবাদি কাফেররা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্ন ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার মালিক। আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুফর ও অকৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সুখ ও আরামের নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম রয়েছে কিন্তু সুখ নেই। চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধিরও এতো আধিক্য যা পূর্বে কোনোকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আরামের নব নব পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফেরের জন্যই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ অন্ধ কৃতজ্ঞতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে বৈ কি। যে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করা অন্ধ কৃতজ্ঞতা নয় কি? در میان خانہ کہ گم کردیم صاحب خانہ را অর্থাৎ আমরা গৃহ্যভ্যন্তরে গৃহ স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।

قَوْلُهُ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا : যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন কল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান হতো তবে তা তার ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা জবরদস্তি সন্তান তার উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো, তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তার সৃষ্ট, অতএব তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ : تَكْوِيْر -এর অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। কুরআন পাক দিবরাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تَكْوِيْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যে যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল : كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কুরআন পাক অথবা যে কোনো আসমানি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোনো বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরজ। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়। কিন্তু কুরআন পাকের তথ্যাবলি অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরজ। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কুরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

قَوْلُهُ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ : আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিতে اَنْزَلَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাজিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোরও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কুরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে- وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে- وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ : এতে মানব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আল্লাহ তা'আলার কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ তা'আলার কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেন নি; বরং خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্য চুলের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা উপশিরা স্থাপন করা হয়। কিন্তু সাধারণত শিল্পীর মতো একাজ কোনো খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না; বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌঁছার পথ পায় না।

قَوْلُهُ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোনো উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোনো ক্ষতি হয় না। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না। -[ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رِضَاءٌ শব্দের অর্থ মহব্বত করা আপত্তি ব্যতিরেকে কোনো কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سَخَطٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোনো কিছুকে অপছন্দ করা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো কাজ অথবা কোনো মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভালো কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি

Free @ www.eilm.weebly.com

পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নদভী (র.) 'উসুল ও যাওয়াবেত' গ্রন্থে লিখেছেন-

مَذْهَبُ اَهْلِ الْحَقِّ الْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ وَاِثْبَاتُهُ وَاَنَّ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدْرِهِ وَهُوَ مُرِيْدٌ لَهَا كُلِّهَا وَيَكْرَهُ الْمَعَاصِيْ مَعَ اَنَّهُ تَعَالٰى مُرِيْدٌ لَهَا لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا جَلَّ وَعَلَا .

সত্যপন্থিদের মাযহাব তাকদীরে বিশ্বাস করা। আরো এই যে, ভালো-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও তাকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোনো উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনিই জানেন। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ اللَّيْلِ : এই বাক্যের পূর্বে কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরপর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে اَمَّنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তাফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ কাফেরকে বলা হবে- তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قَانِتٌ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন- قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাজে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোনো অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোনো বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থি নয়। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ : -এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়কেও اٰنَاءَ اللَّيْلِ বলেছেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ : এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারতো যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিশেষে আটকে আছি তো সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জবাব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোনো স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশে থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٠. قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ط اَىْ عَذَابَهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا بِالطَّاعَةِ حَسَنَةٌ ط وَهِىَ الْجَنَّةُ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ط فَهَاجِرُوْا اِلَيْهَا مِنْ بَيْنِ الْكُفَّارِ وَمُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرَاتِ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَمَا يُبْتَلَوْنَ بِهٖ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ مِكْيَالٍ وَلَا مِيْزَانٍ ـ

১০. বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে আজাবকে ভয় কর। অর্থাৎ তার অনুসরণ কর যারা এ দুনিয়াতে আনুগত্যের মাধ্যমে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য জান্নাত। আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব কাফেরদের থেকে ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে অন্য এলাকায় হিজরত কর। নিশ্চয়ই যারা আনুগত্যের উপর ও তাদের প্রতি নাজিলকৃত বিভিন্ন মসিবতের উপর সবরকারী তাদের পুরস্কার অগণিত। ওজন করা ব্যতীত।

١١. قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ مِنَ الشِّرْكِ ـ

১১. বলুন, আমি শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।

١٢. وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَىْ بِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ـ

১২. আরো আদিষ্ট হয়েছি যে, এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্যে।

١٣. قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

১৩. বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি।

١٤. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ مِنَ الشِّرْكِ ـ

১৪. বলুন, আমি শিরক থেকে মুক্ত থেকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করি।

١٥. فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ط غَيْرِهٖ فِيْهِ تَهْدِيْدٌ لَّهُمْ وَاِيْذَانٌ بِاَنَّهُ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِتَخْلِيْدِ الْاَنْفُسِ فِى النَّارِ وَبِعَدَمِ وُصُوْلِهِمْ اِلَى الْحُوْرِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِى الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنُوْا اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ ـ

১৫. অতএব তোমরা আমার পালনকর্তার পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। এটা তাদের প্রতি ধমকমূলক ও তারা যে আল্লাহর ইবাদত করে না তা ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নিজেদেরকে আজীবনের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ও জান্নাতে সজ্জিত হুরসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। যদি তারা ঈমান আনতো এসব নিয়ামত তারা অর্জন করতো জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٦. لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ طِبَاقٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ط مِنَ النَّارِ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ط اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَتَّقُوْهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ.

১৬. তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ঈমানদারদেরকে সতর্ক করেন যেন তারা ভয় করে। যার দিকে পরবর্তী বাক্য ইঙ্গিত করে হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর।

١٧. وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ الْاَوْثَانَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اَقْبَلُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج بِالْجَنَّةِ فَبَشِّرْ عِبَادِ.

১৭. যারা শয়তানি শক্তির মূর্তিসমূহের পূজা অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।

١٨. اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط وَهُوَ مَافِيْهِ فَلَاحُهُمْ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ اَصْحَابُ الْعُقُوْلِ.

১৮. যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম যাতে তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান জ্ঞানী।

١٩. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط اَىْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ تُخْرِجُ مَنْ فِى النَّارِ جَوَابُ الشَّرْطِ وَاُقِيْمَ فِيْهِ الظَّاهِرُ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ وَالْمَعْنٰى لَا تَقْدِرُ عَلٰى هِدَايَتِهٖ فَتُنْقِذُهٗ مِنَ النَّارِ.

১৯. যার জন্য শাস্তির বাণী অর্থাৎ কুরআনের বাণী নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? اَفَاَنْتَ الخ জওয়াবে শর্ত এবং এতে যমীরের স্থলে প্রকাশ্য ইসিম আনা হয়েছে এবং হামযা অস্বীকারের জন্য। আর আয়াতের অর্থ হলো, আপনি তাদের হেদায়েতের শক্তি রাখেন না যাতে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

٢٠. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِاَنْ اَطَاعُوْهُ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اَىْ مِنْ تَحْتِ الْغُرَفِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ وَعْدَ اللّٰهِ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ وَعْدَهٗ.

২০. কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, অর্থাৎ তার অনুসরণ করে তাদের জন্যে নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। অর্থাৎ উপর ও নিচের উভয় প্রাসাদের নিচে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। وَعْدَ اللّٰهِ উহ্য ফে'ল দ্বারা নসব বিশিষ্ট আল্লাহ তা'আল প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢١. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ اَدْخَلَهُ اَمْكِنَةَ نَبْعٍ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ ط يَيْبَسُ فَتَرٰهُ بَعْدَ الْخُضْرَةِ مَثَلًا مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ط فُتَاتًا اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرٰى تَذْكِيْرًا لِاُولِي الْاَلْبَابِ يَتَذَكَّرُوْنَ بِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلٰى وَحْدَانِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَقُدْرَتِهِ.

২১. তুমি কি দেখনি জাননা যে আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি জমিনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন। অতঃপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তোমরা তা সবুজ রঙের পর হলদে রঙের মতো দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে খড় কুঠায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানের জন্যে উপদেশ রয়েছে। যাতে তারা এটা থেকে নসিহত গ্রহণ করে। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও কুদরতের উপর প্রমাণ বহন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ : এটা تَقْوٰى -এর তাফসীর।

قَوْلُهُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا : এটা جُمْلَةٌ হয়ে خَبَرٌ مُقَدَّمٌ হয়েছে আর حَسَنَةٌ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

قَوْلُهُ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ : এটা মুবতাদা এবং খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ تَهْدِيْدٌ لَّهُمْ : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَاعْبُدُوْا টা اَمْرُ تَهْدِيْدٍ অর্থাৎ ধমকির জন্য হয়েছে طَلَبُ فِعْلٍ -এর জন্য নয়।

قَوْلُهُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ : لَهُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর مِنْ فَوْقِهِمْ হলো حَالٌ আর ظُلَلٌ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ

قَوْلُهُ طِبَاقٌ : অর্থাৎ قِطَعٌ كِبَارٌ তথা বড় বড় টুকরা। আগুনের বড় বড় স্ফুলিঙ্গের উপর ظُلَلٌ -এর প্রয়োগ বিদ্রূপাকারে হয়ে থাকে। অন্যথায় তো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে ছায়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ظُلَلٌ শব্দটি ظُلَّةٌ -এর বহুবচন অর্থ ছায়াদার।

قَوْلُهُ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ : প্রশ্ন. ছায়াদারের উপরে হওয়া বুঝে আসে, তবে ছায়াদারের নিচে হওয়া বুঝে আসে না।

উত্তর. এই সুরত এই হবে যে, যদি উপরের طَبَقَةٌ -এর জন্য فُرُشٌ হয় তবে নিচের তবকার জন্য ছায়াদার হবে। যেমন- বহুতল বিশিষ্ট ইমারতের মধ্যে ছাদ একদলের জন্য فُرُشٌ হয় এবং অন্য দলের জন্য ছাদ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ تَخْوِيْفٌ : অর্থাৎ تَخْوِيْفُ الْمُؤْمِنِيْنَ এখানে ذٰلِكَ -এর مَرْجِعٌ হলো ذِكْرُ اَحْوَالِ اَهْلِ النَّارِ

قَوْلُهُ الْاَوْثَانُ : طَاغُوْتٌ -এর কয়েকটি ব্যাখ্যার মধ্যে এটাও একটি। কেউ কেউ طَاغُوْتٌ দ্বারা শয়তান উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেউ কেউ প্রত্যেক সেই مَعْبُوْدٌ কে উদ্দেশ্য নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া যার উপাসনা করা হয়।

قَوْلُهُ اُقِيْمَ فِيْهِ الظَّاهِرُ مَقَامَ الْمُضْمَرِ : অর্থাৎ مَنْ فِى النَّارِ টা اِسْمُ ضَمِيْر-এর স্থানে রয়েছে। আর এরূপ বৃদ্ধি شَنَاعَتْ কে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। যাতে করে তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যথায় اَفَانْتَ تُنْقِذُ যথেষ্ট ছিল اَفَانْتَ-এর মধ্যে হামযাটি اِنْكَارٌ-এর জন্য হয়েছে। আর اَفَانْتَ হলো اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ-এর জবাব। হামযাকে পুনরায় আনা হয়েছে اِنْكَارٌ-এর তাকিদের জন্য।

قَوْلُهُ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ : জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে এই উক্তি সেই কথার মোকাবিলায় হয়েছে যা জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহর বাণী لَهُمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ

قَوْلُهُ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ : এর উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে, وَعَدَهُمُ اللّٰهُ وَعْدًا অর্থাৎ وَعْدًا-এর نَصَبْ দানকারী ফে'ল হলো وَعْدٌ উহ্য ফে'ল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ : بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থ সবরকারীদের ছওয়াব কোনো নির্ধারিত পরিমাণে নয় অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ بِغَيْرِ حِسَابٍ-এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারো কাছে কারো কোনো প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে দাবি ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের ছওয়াব পাবে।

হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ ছওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামাজ, হজ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর বালা-মসিবতে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোনো ওজন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত ছওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে, হায়! দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।

ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতে صَابِرِيْنَ-এর অর্থ নিয়েছেন যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صَابِرُوْنَ বলা হয়েছে। কুরতুবী (র.) বলেন, صَابِرٌ শব্দকে অন্য কোনো শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লিখিত হয়। যেমন বলা হয়- صَابِرٌ عَلٰى كَذَا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী।

قَوْلُهُ قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনে অত্যাচারিত উৎপীড়িত হয়ে সবর অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অগণিত ছওয়াব দান করবেন। আর তা করবেন আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের কারণে। এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল! আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন শুধু এক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে একনিষ্ঠভাবে তার বন্দেগী করি, তার বন্দেগীতে কোনো কিছুকে শরিক না করি, আর আমার প্রতি এ আদেশও হয়েছে যেন আমি সর্বপ্রথম মুসলমান হই।

শানে নুযূল : তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলল, আপনি কি কারণে আমাদের নিকট এই নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, আপনি কি দেখেননি আপনার পূর্ব পুরুষরা লাত, উজ্জা নামক মূর্তির পূজা করতো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- قُلْ اِنِّىْ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ـ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তার ইবাদত করার জন্যে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমাকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে, যেন আমি সর্বপ্রথম মুসলমান হই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতসমূহে দুটি আদেশের উল্লেখ রয়েছে– ১. মুসলমান হিসেবে শুধু এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করা এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করা। ২. আর দ্বিতীয় আদেশ হলো, নবী হিসেবে সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়া। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান করেন, আর তা তখনই সম্ভব, যখন সর্বপ্রথম তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ আয়াতে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের আদেশ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সে ইবাদত হতে হবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার শিরক থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাতে লোক দেখানোর তথা রিয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এতদ্ব্যতীত আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এর দ্বারা সমগ্র উম্মতকে সতর্ক করা হয়েছে। তৃতীয়ত প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি এ আদেশও হয়েছে যেন তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি, যাতে করে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ আমার আনুগত্যের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে। আর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগি এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য চাই সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার ভয়। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– قُلْ إِنِّيْٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলুন, যদি আমি আমার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করি, তবে আমি এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করি।

কেননা আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করে কেউ নাজাত পায় না, তাই আমি আল্লাহ তা'আলার কঠিন আজাবকে ভয় করি।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত তখন নাজিল হয়েছে, যখন কাফেরদের তরফ থেকে প্রিয়নবী ﷺ -কে তাঁর পিতা-পিতামহের ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। তখন তাদের কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ . فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ [হে রাসূল ﷺ !] আপনি বলুন, আমি এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করি, তার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ট রেখে। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্থলে যার ইচ্ছা তার বন্দেগি কর।

ইতিপূর্বে শুধু এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করার আদেশ হয়েছিল, আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, হে রাসূল ﷺ ! আপনি কাফেরদের একথা জানিয়ে দেন যে, আমি শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করি, আর কারো নয়। তোমরা যার ইচ্ছা তার পূজা কর, তবে এর শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন এবং যিনি আমাকে তাঁর নবী মনোনীত করেছেন এবং তোমাদের নিকট পথ প্রদর্শক, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি শুধু তারই বন্দেগি করি, একনিষ্ঠভাবে তার বন্দেগি করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ এবং পরিপূর্ণ সাফল্য। যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া না দাও, সত্য গ্রহণে ব্যর্থ হও সত্যকে বাধাগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাক, তবে তার পরিণতিতে যে আজাব আসবে, তা ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাক।

قَوْلُهٗ قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ : অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলুন, কিয়ামতের দিন যারা নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে আল্লাহ তা'আলার আজাব থেকে বাঁচাতে পারবেনা, তারাই হবে প্রকৃত সর্বহারা।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে এবং তার পরিবারবর্গের জন্যে জান্নাতে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যদি বান্দা ঈমানদার ও নেককার হয়, তবে সে জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থানই লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি বান্দা বেঈমান হয়, তবে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি অন্য কোনো মুমিনকে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, সেদিন সে হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদগ্রস্ত।

অন্য একখানা হাদীসে একথাও বর্ণিত আছে যে, ঐ ব্যক্তিকে দোজখের সে স্থানটিও দেখিয়ে দেওয়া হবে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে তার ঈমান ও নেক আমলের বরকতে নাজাত দিয়েছেন। এমনিভাবে যাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে তাকে জান্নাতে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দেওয়া হবে, যা সে বেঈমানী ও নাফরমানির কারণে হারিয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ : অর্থাৎ জেনে রাখ এটিই সুস্পষ্ট সর্বনাশ। দুনিয়াতে যদি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাময়িক কিন্তু আখেরাতের সুখ যেমন চিরস্থায়ী, তেমনি দুঃখও চিরস্থায়ী। যারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা চির দুঃখী হয়, এজন্যেই এক সাহাবী প্রিয়নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কে? তিনি ইরশাদ করেছেন, যে অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং আখেরাতের জন্যে অধিকতর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর আখেরাতের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যে সুস্পষ্ট সর্বনাশ এবং মহাবিপদ তার বিবরণ স্থান পেয়েছে পরবর্তী আয়াতে- لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ অর্থাৎ তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন এবং নিচেও থাকবে আগুনের আচ্ছাদন, এককথায় উপরে নিচে চতুর্দিক থেকে আগুন তাদেরকে ঘিরে রাখবে। দোজখের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারা ভোগ করতে থাকবে। ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই এ ভয়াবহ আজাব সম্পর্কে তার বান্দাদেরকে সাবধান করে বলেছেন- يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।' অর্থাৎ এমন কাজ থেকে বিরত থাক, যা আমার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এমন অপরাধ করো না, যার শাস্তি অনিবার্য। তোমরা যদি আমাকে ভয় করে জীবন যাপন কর, তবে আমার নাফরমানি তথা পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারবে, আর এভাবেই পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوْهَا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিক মূর্তিপূজক তথা অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই, যেখানে কাফেরদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় বা তাদের শাস্তির ঘোষণা থাকে, তার পাশাপাশি মু'মিনদের উদ্দেশ্যে পুরস্কারের ঘোষণাও স্থান পায়। তাই এ আয়াতে মু'মিনদের জন্যে পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে, ইরশাদ হয়েছে- وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ অর্থাৎ আর যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশ করে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, বর্ণিত আছে যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত জায়েদ ইবনে আমর (রা.) হযরত আবূ যর (রা.) এবং হযরত সালমান ফারসী (রা.) সম্পর্কে। অনেকের মতে এ আয়াত যেভাবে উপরোল্লিখিত সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত, ঠিক তেমনিভাবে সকল যুগের সেসব লোকও এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে আয়াতে উল্লিখিত গুণাবলি রয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সবকিছু থেকে যারা নিজেকে দূরে রাখে এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে যারা মশগুল থাকে, যারা শয়তানের অনুগামী হয় না, যারা শয়তানের পথ পরিহার করে চলে, যা উত্তম তা গ্রহণ করে, আর যা অন্যায় অনাচার তা বর্জন করে, তাদের ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বল, তাদেরও পরিণাম হবে শুভ, তারা আখেরাতে লাভ করবে উচ্চমর্যাদা।

–[তাফসীরে ইবনে কাছীর, পারা, ২৩, পৃ. ৮১]

আলোচ্য আয়াতের طَاغُوْت শব্দটি طُغْيَانٌ থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ হলো- চরম অবাধ্যতা। এজন্যেই শয়তানকে 'তাগুত' বলা হয়, কেননা সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, যারা শয়তানের পূজা পরিহার করে চলে, অথচ কেউ শয়তানের পূজা করে না, সেক্ষেত্রে এ কথার তাৎপর্য কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাব দিয়েছেন, যেহেতু ইবলিস শয়তানই মানুষকে মূর্তির পূজা করার দুর্বুদ্ধি যোগায়, আর এটিই হলো আল্লাহ তা'আলার চরম অবাধ্যতা, তাই 'তাগুত' শব্দটি দ্বারা ইবলিস শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ আর এ সুসংবাদ দুনিয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে এবং মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْ عِبَادِ .... وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ : অর্থাৎ অতএব [হে রাসূল!] আমার বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ সহকারে কথা শ্রবণ করে এবং যা উত্তম তা মেনে চলে। তারাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শানে নুযূল : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন একজন আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার সাতটি গোলাম রয়েছে, আমি একেক দ্বারে প্রবেশের জন্যে একটি গোলামকে আজাদ করে দিলাম। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ যারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে, এরপর পবিত্র কুরআনের হেদায়েত মেনে চলে, তাদের জন্যেই রয়েছে এ সুসংবাদ।

তাফসীরকার আতা (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবূ বকর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হযরত ওসমান (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.), হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.), হযরত জোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) সমবেত হয়ে তার নিকট আসলেন এবং তার মুসলমান হবার খবরের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি ঈমান এনেছি, তখন তারা সকলেও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে দুটি সুসংবাদ রয়েছে–

১. যারা আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েত নসীব করেন।

২. আর তারাই হলো বুদ্ধিমান, অতএব হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া এবং বুদ্ধিমান হওয়া এ দুটিই হলো সুসংবাদ।

হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের জন্যে প্রযোজ্য। এমনিভাবে বুদ্ধিমান হওয়ার সুসংবাদও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তাফসীরকার ইবনে জায়েদ (র.) বলেছে, এ দু'খানি আয়াত তিন ব্যক্তির সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। জাহেলিয়াতের যুগেও তারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা হলেন– ১. হযরত জায়েদ ইবনে আমের ইবনে নুফায়েল (রা.) অথবা সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) ২. হযরত আবূযার গিফারী (রা.) ৩. হযরত সালমান ফারসী (রা.)। আর আয়াতে যে উত্তম কথার উল্লেখ রয়েছে, তা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই।

তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে বিষয়কে উত্তম বলা হয়েছে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-নিষেধ যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ যারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে এবং তাতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে, তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত এবং তারাই বুদ্ধিমান।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পবিত্র কুরআনে জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অথবা ক্ষমা করার অনুমতি রয়েছে তবে ক্ষমা করাই উত্তম। আলোচ্য আয়াতে উত্তম কথা বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ .... وَاُولٰئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ : এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাছীর (র.) কর্তৃক গৃহীত উক্তি এই যে, এখানে قول অর্থ আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআন অথবা তৎসহ রাসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিল– يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَهُ কিন্তু এ স্থলে اَحْسَنَ শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কুরআন রাসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে আসেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারো কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশ তাদেরকে اُولُوا الْاَلْبَابِ তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কুরআনের মধ্যেই তাওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছে– خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا এতেও اَحْسَنُ বলে সমগ্র তাওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তেমিন قَوْلٌ অর্থ কুরআন এবং اِتِّبَاعُ اَحْسَنِ অর্থ সমগ্র কুরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ বলা হয়েছে। এই তাফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরো বলেন যে, কুরআন পাকেও অনেক حَسَنٌ [ভালো] ও اَحْسَنُ [উত্তম] শ্রেণির বিধান রয়েছে। উদাহরণত

প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েজ, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে– وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অনেক ব্যাপারে কুরআন মানুষকে বৈধ দুটি পন্থার যে কোনো একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে। যেমন– وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব লোক কুরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে। কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং حَسَنٌ ও اَحْسَنُ শ্রেণির দু'পন্থার মধ্য থেকে اَحْسَنُ -কে অবলম্বন করে।

অনেক তাফসীরবিদ এক্ষেত্রে قَوْل -এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথাবার্তা। এতে তাওহীদ, শিরক, কুফর ও ইসলাম, সত্য মিথ্যা ইত্যাদি সবরকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফের, মু'মিন সত্য মিথ্যা ও ভালো মন্দ নির্বিশেষে সব কথাই শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই করে, তাওহীদ ও শিরকের কথা শুনে তাওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দুটি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এক. هَدٰىهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। দুই. اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুত ভালোমন্দ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবূজর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা.) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। হযরত আবূ যর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা.) মুশরিক, ইহুদি খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ : يَنَابِيْعَ শব্দটি يَنْبُوْعٌ -এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নিয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তদ্দ্বারা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারতো। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাজিল করেই ক্ষান্ত হননি, একে সংরক্ষিত করার জন্যও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পানি তো ভূমির গর্ভে, চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পঁচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা আপনি নির্গত হয়। এরপর নদীনালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কুরআনে পাকে সূরায়ে মু'মিনুনের فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ : ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রঙ বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই مُخْتَلِفًا শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে حَالٌ [বর্তমানকাল বাচক] প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ : অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তদ্দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভুসি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলিল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চিনারও জানার উপায় হতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٢. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَاهْتَدٰى فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ط كَمَنْ طُبِعَ عَلٰى قَلْبِهٖ دَلَّ عَلٰى هٰذَا فَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ط اَىْ عَنْ قَبُوْلِ الْقُرْاٰنِ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ .

২২. আল্লাহ তা'আলার যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন অতঃপর সে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে তবে সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য দুর্ভোগ যাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার স্মরণে কুরআনের বাণী কবুল করা থেকে কঠোর। وَيْلٌ শব্দটি দুর্ভোগ অর্থবোধক শব্দ। وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ বাক্যটি উহ্য খবর এর উপর প্রমাণ বহন করে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।

٢٣. اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا بَدَلٌ مِّنْ اَحْسَنَ اَىْ قُرْاٰنًا مُّتَشَابِهًا اَىْ يُشْبِهُ بَعْضُهٗ بَعْضًا فِى النَّظْمِ وَغَيْرِهٖ مَّثَانِىَ ثُنِّىَ فِيْهِ الْوَعْدُ وَالْوَعِيْدُ وَغَيْرُهُمَا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ تَرْتَعِدُ عِنْدَ ذِكْرِ وَعِيْدِهٖ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ ج ثُمَّ تَلِيْنُ تَطْمَئِنُّ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ اَىْ عِنْدَ ذِكْرِ وَعْدِهٖ ذٰلِكَ اَىِ الْكِتَابُ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ .

২৩. আল্লাহ তা'আলা উত্তম বাণী তথা কিতাব অর্থাৎ কুরআন اَحْسَنَ টি كِتَابًا থেকে بَدَل নাজিল করেছেন। যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, এটার অনেক বাক্য শব্দ চয়ন ইত্যাদিতে অনেক বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য পুনরায় পুনরায় পঠিত। অর্থাৎ নিয়ামতের ওয়াদা ও আজাবের ধমকিসমূহ ইত্যাদি বার বার পঠিত এতে তাদের লোম কাটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর যখন তার ধমকির বর্ণনা তুলে ধরা হয় যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। অতঃপর তাদের চামড়া ও অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার স্মরণে বিনম্র হয়। যখন তার নিয়ামতের বর্ণনা হয় এই কিতাবই আল্লাহ তা'আলার পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে গোমরাহ করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

٢٤. اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ يَلْقٰى بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَىْ اَشَدَّهٗ بِاَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ مَغْلُوْلَةً يَدَاهُ اِلٰى عُنُقِهٖ كَمَنْ اٰمَنَ مِنْهُ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ اَىْ كُفَّارِ مَكَّةَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ اَىْ جَزَاءَهٗ .

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আজাব অর্থাৎ কঠিনতম আজাব ঠেকাবে অর্থাৎ যাকে তার হাতদ্বয় গর্দানের সাথে বেধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে নিরাপদে রয়েছে এরূপ জালেমদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফেরদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে তার স্বাদ পরিণাম আস্বাদন কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٥. كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ رُسُلَهُمْ فِيْ اِتْيَانِ الْعَذَابِ فَاَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ مِنْ جِهَةٍ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِمْ ۔

২৫. তাদের পূর্ববর্তীরাও আজাব আসার ব্যাপারে তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আজাব এমনভাবে আসল যা তারা কল্পনাও করতো না. অর্থাৎ তাদের অন্তরে এর ধারণাও হয়নি।

٢٦. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ الذُّلَّ وَالْهَوَانَ مِنَ الْمَسْخِ وَالْقَتْلِ وَغَيْرِهِمَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ م لَوْ كَانُوْا اَيِ الْمُكَذِّبُوْنَ يَعْلَمُوْنَ عَذَابَهَا مَا كَذَّبُوْا ۔

২৬. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পার্থিব জীবনে বিকৃতি, হত্যা ইত্যাদির দ্বারা অপমান লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর পরকালের আজাব হবে আরো গুরুতর যদি তারা মিথ্যাবাদীরা এটার আজাব জানতো : অস্বীকার করতো না।

٢٧. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا جَعَلْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ ۔

২৭. আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে। উপদেশ গ্রহণ করে।

٢٨. قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ اَيْ لَبْسٍ وَاخْتِلَافٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ الْكُفْرَ ۔

২৮. আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত অর্থাৎ ইখতেলাফ ও ইলতিবাস বিহীন, قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا টি حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ যাতে তারা কুফর থেকে বিরত থাকে।

٢٩. ضَرَبَ اللّٰهُ لِلْمُشْرِكِ وَالْمُوَحِّدِ مَثَلًا رَّجُلًا بَدَلٌ مِنْ مَثَلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ مُتَنَازِعُوْنَ سَيِّئَةٌ اَخْلَاقُهُمْ وَرَجُلًا سَلَمًا خَالِصًا لِرَجُلٍ ط هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ط تَمْيِيْزٌ اَيْ لَا يَسْتَوِي الْعَبْدُ لِجَمَاعَةٍ وَالْعَبْدُ لِوَاحِدٍ فَاِنَّ الْاَوَّلَ اِذَا طَلَبَ مِنْهُ كُلٌّ مِنْ مَالِكِيْهِ خِدْمَتَهُ فِيْ وَقْتٍ وَاحِدٍ تَحَيَّرَ مَنْ يَخْدِمُهُ مِنْهُمْ ۔

২৯. আল্লাহ মুশরিক ও ঈমানদার এর মধ্যে এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, যারা চরিত্রহীন পরস্পর ঝগড়া করে আরেক ব্যক্তির মালিক মাত্র একজন, তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? একাধিক মালিকানাধীন গোলাম ও একক মালিকানাধীন গোলামের মধ্যে সমান হতে পারে না। কেননা যদি একাধিক মালিক এক সাথে একজন গোলাম হতে খেদমত চায় তখন সেই গোলাম পেরেশান হয়ে পড়বে কার খেদমত করবে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَهٰذَا مَثَلٌ لِلْمُشْرِكِ وَالثَّانِي مَثَلٌ لِلْمُوَحِّدِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ط وَحْدَهُ بَلْ اَكْثَرُهُمْ اَهْلُ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ مَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ فَيُشْرِكُوْنَ .

এবং এটা মুশরিকদের উদাহরণ ও দ্বিতীয় গোলামটি ঈমানদারের উদাহরণ। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু তাদের মক্কাবাসীর অধিকাংশ জানে না। ঐ আজাবকে যেদিকে তারা ধাবিত হয়, ফলে তারা শিরক করে।

৩০. اِنَّكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ سَتَمُوْتُ وَيَمُوْتُوْنَ فَلَا شَمَاتَةَ بِالْمَوْتِ نَزَلَتْ لَمَّا اسْتَبْطَؤُوْا مَوْتَهُ ﷺ .

৩০. হে নবী ﷺ নিশ্চয়ই তোমারও মৃত্যু হবে তাদেরও মৃত্যু হবে। অতএব মৃত্যুতে খুশি প্রকাশ করার কোনো অর্থ নেই। যখন মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল, তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

৩১. ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ مِنَ الْمَظَالِمِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَخْتَصِمُوْنَ .

৩১. অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই হে লোক সকল! তোমাদের অধিকার সম্পর্কে তোমাদের পালনকর্তার সাথে কথা কাটাকাটি করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ : এটা كَلَام مُسْتَأْنِفٌ পূর্বে উল্লিখিত فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ -এর জন্য عِلَّتٌ -এর স্থানে হয়েছে। অর্থাৎ ذِكْرٰى কে اُولِى الْاَلْبَابِ -এর সাথে خَاصّ করার ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য হলো– আকাশ থেকে পানি বর্ষণের পর পানির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা কত কত আশ্চর্য ধরনের পরিবর্তন প্রকাশ করেন। তা দেখে জ্ঞানীদের ইসলামের জন্য شَرْحِ صَدْرٌ হয়ে যায়। আর এই شَرْحِ صَدْرٌ জ্ঞানীদের জন্য ذِكْر কবুল করার কারণ হয়। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ) اَفَمَنْ -এর হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىٌّ আর فَاء হলো عَاطِفَة আর مَعْطُوْف উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَكُلُّ النَّاسِ سَوَاءٌ আর مَنْ হলো مَوْصُوْلَه -এর পরবর্তী পূর্ণ জুমলা صِلَه হয়েছে। صِلَه স্বীয় مَوْصُوْل সহ মুবতাদা। তার خَبَرٌ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন كَمَنْ طَبَعَ عَلٰى قَلْبِه আর এই حَذْف -এর উপর فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ টা বুঝাচ্ছে। আর কেউ কেউ مَنْ কে شَرْطِيَة বলেছেন। আর পরবর্তী বাক্য তার جَزَاء হয়েছে।

قَوْلُهُ عَنْ ذِكْرِ قَبُوْلِ الْقُرْاٰنِ : এই ইবারত দ্বারা আল্লামা মহল্লী (র.) দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। প্রথম হলো عَنْ টি مِنْ অর্থে হয়েছে। আর এই বাক্যে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ -এর অর্থ হলো عَنْ قَبُوْلِ ذِكْرِ اللّٰهِ। আবার এটাও ঠিক আছে যে, مِنْ টা স্বীয় অবস্থায় হবে এবং تَعْلِيْل -এর জন্য হবে। অর্থাৎ–

قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ مِنْ اَجْلِ ذِكْرِ اللّٰهِ لِفَسَادِ قُلُوْبِهِمْ وَخُسْرَانِهَا

قَوْلُهُ مَثَانِىَ : এটা مَثْنٰى -এর বহুবচন। কিন্তু এটা مُفْرَدٌ -এরও সিফত হতে পারে। যেমন এখানে كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে। كِتَابٌ যদিও مُفْرَدٌ কিন্তু অনেক تَفَاصِيْل -এর جَامِعٌ হওয়ার কারণে একটি مَجْمُوْعَة -এর নাম। কাজেই এর সিফত বহুবচন নেওয়া যেতে পারে। এর নজির আরবের এই উক্তি– اَلْاِنْسَانُ عُرُوْقٌ وَعِظَامٌ وَاَعْصَابٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ عِنْدَ ذِكْرِ وَعِيْدِهِ : ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, عِنْدَ টা مِنْ অর্থে হয়েছে। تَقْشَعِرُّ অর্থ হলো- تَرْتَعِدُ وَتَضْطَرِبُ ফার্সিতে বলে لرزيدن তথা কাঁপা, কম্পন করা। মাসদার اِقْشِعْرَارٌ ফার্সিতে موئے برتن خاستن বলা হয় اِقْشَعَرَّ الشَّعْرُ অর্থাৎ قَامَ وَانْتَصَبَ مِنْ فَزَعٍ اَوْ بَرْدٍ তথা ভয় বা ঠাণ্ডার কারণে লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া, শিহরণ জাগা। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ تَرْمِيْمًا وَتَلْخِيْصًا) আল্লামা যামাখশারী বলেন, এটা মূলে ছিল اَلْقَشْعُ অর্থ- শুকিয়ে যাওয়া চামড়া. এটাকে رُبَاعِىْ বানানোর জন্য তার শেষে ر। বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে শব্দের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতাকে বুঝায়। (لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ)

قَوْلُهُ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ اَىْ عِنْدَ ذِكْرِ وَعْدِهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عِنْدَ টা اِلٰى অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : অর্থাৎ اَلْكِتَابُ الْمَوْصُوْفُ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُوْرَةِ

قَوْلُهُ هُدَى اللّٰهِ : অর্থাৎ سَبَبُ فِى الْهُدٰى অথবা মুবালাগার ভিত্তিতে زَيْدٌ عَدْلٌ-এর অন্তর্গত অর্থাৎ এই কিতাব এত পরিমাণ হেদায়েতের কারণ যে, মনে হয় সে নিজেই হেদায়েত।

قَوْلُهُ اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ وَيَلْقِىْ بِوَجْهِهِ سُوْءَ الْعَذَابِ : এক নোসখায় يَلْقِىْ-এর স্থানে يَقِىْ রয়েছে مَنْ মওসূলাহ স্বীয় সেলাহ সহ মিলে জুমলা হয়ে মুবতাদ। আর খবর উহ্য রয়েছে। যাকে আল্লামা মহল্লী (র.) كَمَنْ اٰمَنَ مِنْهُ বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো যে ব্যক্তি স্বীয় চেহারাকে আগুনের জন্য ঢাল বানায়, সে কি সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে যে, অগ্নি হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।

قَوْلُهُ قِيْلَ لِلظَّالِمِيْنَ : يَقِيْنِى الْوُقُوْعِ হওয়ার কারণে مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর আতফ হয়েছে يَتَّقِىْ-এর উপর। لِلظّٰلِمِيْنَ ইসমে জাহের اِسْم ضَمِيْر-এর স্থানে উহার সিফত ظُلْم কে বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। অন্যথা قِيْلَ لَهُمْ বলাই যথেষ্ট ছিল।

قَوْلُهُ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ : كُفَّار مَكَّة-এর স্থানে মুতলাক كُفَّارْ বলতো তবে অধিক মুনাসিব হতো। কেননা এই উক্তি মক্কার কাফেরদের সাথে নির্দিষ্ট নয়।

قَوْلُهُ اَىْ جَزَاءَهُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ذُوْقُوْا جَزَاءَ مَاكُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ

قَوْلُهُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ : لَوْ হলো شَرْطِيَّة আর كَانُوْا হলো فِعْل نَاقِصْ-এর যমীর হলো اِسْم আর يَعْلَمُوْنَ জুমলা হয়ে كَانَ-এর খবর। كَانَ তার اِسْم ও خَبَرْ মিলে شَرْط হয়েছে। জওয়াবে শর্ত উহ্য রয়েছে যাকে মুফাসসির (র.) مَا كَذَّبُوْا বের করে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর عَذَابَهَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, يَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا : لَقَدْ-এর মধ্যে উহ্য لَام قَسَمْ-এর জবাবের উপর প্রবেশ করেছে। আর ضَرَبْنَا অর্থ হলো- اَوْضَحْنَا এবং بَيَّنَّا

قَوْلُهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا : এটা هٰذَا الْقُرْاٰنِ-এর জন্য حَال مُؤَكِّدَه হয়েছে।

قَوْلُهُ مُتَشَاكِسُوْنَ : এটা اِسْم فَاعِلْ-এর جَمع مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। অর্থ হলো- ঝগড়াটে। شَكِسَ يَشْكُسُ বাবে كَرُمَ হতে মাসদার شَكَاسَةٌ অর্থ- দুশ্চরিত্র হওয়া। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, اَلتَّشَاكُسُ وَالتَّشَاخُسُ অর্থাৎ اَلْاِخْتِلَافُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا تَمْيِيْزًا : مَثَلًا টা تَمْيِيْز হয়েছে যা فَاعِلْ থেকে مَنْقُوْل হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَىْ لَا يَسْتَوِىْ مَثَلُهُمَا وَصِفَتُهُمَا -

قَوْلُهُ مَيِّتٌ : ইমাম ফররা (র.) বলেন, يَا টি তাশদীদসহ অর্থ এমন ব্যক্তি যে এখনো মৃত্যুবরণ করেনি তবে মৃত্যুর নিকটবর্তী। এবং مَيْتٌ তাশদীদবিহীন অর্থ মুরদাহ, মরা লাশ। কেউ কেউ বলেন, উভয়ের অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ : شَرَحَ-এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলি, আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা قَسَاوَتْ قَلْب কুরআনের يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا আয়াতে এবং এস্থলের لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ আয়াতে বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে আমরা شَرْح صَدْر তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! এর লক্ষণ কি? তিনি বললেন−

اَلْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالتَّجَافِىْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالتَّاَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ -

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান [অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল] থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা। −[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতটি اَفَمَنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোর প্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ : قَسَاوَةٌ শব্দের অর্থ কঠোরপ্রাণ হওয়া, কারো প্রতি দয়াদ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জিকির ও বিধানাবলি থেকে কোনো প্রভাব কবুল করে না।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِىَ : এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআনই اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ তথা উত্তম বাণী। حَدِيْث-এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কুরআনকে উত্তম বাণী বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কুরআন। অতঃপর কুরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে−

১. مُتَشَابِهًا-এর অর্থ কুরআনের বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. مَثَانِيَ এটা مَثْنٰى -এর বহুবচন। অর্থাৎ কুরআন একই বিষয়বস্তু বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

৩. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্যে ভীত, কুরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে।

৪. ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে কখনো আজাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনো রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহর স্মরণে নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হলে তাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠতো। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَفَمَنْ يَتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ : এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোনো কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পাকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আজাব সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা তাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –[নাউযুবিল্লাহ]

তাফসীরবিদ আতা ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত পা বেঁধে হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ : যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে مَيِّتٌ এবং যে অতীত কালে মরে গেছে তাকে مَيْتٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রুমিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকালের চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গাম্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আওতা বহির্ভূত নন, যাতে তার ইন্তেকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়। –[কুরতুবী]

হাশরের আদালতে মজলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে اِنَّكُمْ শব্দের মধ্যে মুমিন, কাফের, মুসলমান, জালেম ও মজলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ তা'আলা জালেমকে মজলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারো জিম্মায় কারো কোনো হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালেম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মজলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোনো সৎকর্ম না থাকলে মজলুমের গুনাহ, তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কি? তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকারে নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামাজ, রোজা ও হজ জাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারো অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল এসব মজলুম সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে তাদের জুলুমের প্রতিকার দাবি করবে। ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মজলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মজলুমের গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

তাবারানীতে বর্ণিত হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহ্বা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করতো। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাতো। অতঃপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যেসব লোকের সাথে তার কাজ কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারো প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না : তাফসীরে মাযহারীতে লিখিত আছে, মজলুমের হকের বিনিময়ে জালিমের আমল দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা সব জুলুমই কর্মগত গোনাহ, কুফর নয়। কর্মগত গোনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা। যদিও তা গুনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালেমের ঈমান ব্যতীত সব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকি থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না; বরং মাজলুমের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মাযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٢. فَمَنْ اَىْ لَا اَحَدُ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ بِالْقُرْاٰنِ اِذْ جَاۤءَهٗ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَاوٰى لِّلْكٰفِرِيْنَ بَلٰى .

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে শিরক ও সন্তানের অপবাদ দিয়ে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য তথা কুরআন আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হবে? তার চেয়ে কেউ অধিক জালেম নেই কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নাম নয় কি? হ্যাঁ, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।

٣٣. وَالَّذِىْ جَاۤءَ بِالصِّدْقِ هُوَ النَّبِىُّ ﷺ وَصَدَّقَ بِهٖ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَالَّذِىْ بِمَعْنَى الَّذِيْنَ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ الشِّرْكَ .

৩৩. যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে তিনি হলেন নবী করীম ﷺ এবং যারা সত্য মেনে নিয়েছে অর্থাৎ ঈমানদারগণ। اَلَّذِىْ একবচন اَلَّذِيْنَ বহুবচন অর্থে তারাই তো খোদাভীরু। শিরক থেকে মুক্ত।

٣٤. لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَاۤؤُ الْمُحْسِنِيْنَ لِاَنْفُسِهِمْ بِاِيْمَانِهِمْ .

৩৪. তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চইবে। এটা সৎকর্মীদের জন্যে তাদের ঈমানের পুরস্কার।

٣٥. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَءَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَسْوَأُ وَاَحْسَنُ بِمَعْنَى السَّيِّئِ وَالْحَسَنِ .

৩৫. যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহের মার্জনা করেন ও তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। اَسْوَأُ ـ اَحْسَنُ উভয় ইসমে তাফজীলের অর্থ حَسَنٌ ـ سَيِّئٌ সিফতের।

٣٦. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط اَىِ النَّبِىَّ ﷺ بَلٰى وَيُخَوِّفُوْنَكَ الْخِطَابُ لَهٗ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط اَىِ الْاَصْنَامِ اَنْ تَقْتُلَهٗ اَوْ تَخْبِلَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ .

৩৬. আল্লাহ তা'আলা কি তার বান্দা নবী ﷺ -এর পক্ষে যথেষ্ট নন। হ্যাঁ, অবশ্যই যথেষ্ট। অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য মূর্তিসমূহের ভয় দেখায়। অর্থাৎ মূর্তিসমূহ তাকে হত্যা করার ও উম্মাদ করে দেবে ইত্যাদি। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٧. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ غَالِبٍ عَلٰى اَمْرِهٖ ذِى انْتِقَامٍ مِنْ اَعْدَائِهٖ بَلٰى ـ

৩৭. আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা কি তার হুকুমের প্রতি পরাক্রমশালী ও তার শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

٣٨. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاَصْنَامَ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖ لَا اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ لَا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ فِيْهِمَا قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ يَثِقُ الْوَاثِقُوْنَ ـ

৩৮. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? لَئِنْ -এর লাম কসমের জন্য তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ! বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ তা'আলা আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন,তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, যে সমস্ত মূর্তিসমূহের পূজা কর তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? কখনো না। অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি তা আটকে দিতে পারবে? না, কখনো না অন্য কেরাত মতে مُمْسِكَاتُ ও كَاشِفَاتُ ইজাফতের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তারই উপর নির্ভর করে।

٣٩. قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ج عَلٰى حَالَتِىْ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ

৩৯. বলুন! হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় অবস্থায় কাজ কর। আমি আমার অবস্থায় কাজ করছি। সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।

٤٠. مَنْ مَوْصُوْلَةٌ مَفْعُوْلُ الْعِلْمِ يَاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ يَنْزِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ دَائِمٌ هُوَ عَذَابُ النَّارِ وَقَدْ اَخْزَاهُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ ـ

৪০. কারো কাছে অবমাননাকর আজাব ও চিরস্থায়ী শাস্তি জাহান্নামের আজাব নেমে আসে। আল্লাহ তাদেরকে বদর যুদ্ধে অপমানিত করেছেন। مَنْ ইসমে মাওসূল تَعْلَمُوْنَ -এর মাফঊল বিহী।

٤١. اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج مُتَعَلِّقٌ بِاَنْزَلَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ؕ اِهْتِدَاؤُهٗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ فَتَجْبُرُهُمْ عَلَى الْهُدٰى ـ

৪১. আমি আপনার প্রতি সত্যধর্মসহ কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে اَنْزَلَ ـ بِالْحَقِّ -এর সাথে সম্পর্কিত অতঃপর যে সৎ পথে আসে সে নিজের কল্যাণেই হেদায়েত গ্রহণ করে। আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন যে, তাদেরকে জোরপূর্বক হেদায়েত দান করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَمَنْ اَظْلَمُ اَىْ لَا اَحَدُ : এই তাফসীরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা যে, فَمَنْ اَظْلَمُ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ টা نَفِىْ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذَّبُوْا بِالصِّدْقِ : মুফাসসির (র.) صِدْق দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর কুরআন যা صَادِقْ মুবালাগা রূপে صِدْق বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَلٰى : মুফাসসির (র.) بَلٰى বৃদ্ধি করে সুন্নতের অনুসরণ করেছেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পাঠ করে সে যেন বলে بَلٰى কাজেই اَلَيْسَ كَذَا -এর তেলাওয়াতের সময় بَلٰى বলা সুন্নত।

-[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ اَلَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ : اَلَّذِىْ মাওসূলের দুটি সেলাহ রয়েছে। একটি হলো وَاحِدْ আর তা হলো وَجَاءَ بِالصِّدْقِ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ; আর অপরটি হলো جَمْع যা صَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُوْنَ তথা বহুবচন প্রথম সেলাহ -এর রেয়ায়েতে اَلَّذِىْ -কে مُفْرَدْ নেওয়া হয়েছে। আর অপর সেলাহ এই রেয়ায়েতেই اُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -এর মধ্যে جَمْع নেওয়া হয়েছে। اَلَّذِىْ যেহেতু اِسْمِ جِنْس কাজেই তাকে جَمْع ও وَاحِدْ উভয়েরই অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهُ اَسْوَءَ وَاَحْسَنَ : এটা اَلسَّيِّئُ وَالْحَسَنُ -এর অর্থে হয়েছে। এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. উল্লিখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সত্যায়নকারী মুমিনগণের অধিক নেককাজের পুরস্কার দিবেন, আর অতি জঘন্য মন্দ কর্মকে ক্ষমা করে দিবেন। এতে নেক আমল ও বদ আমলের উল্লেখ নেই। মুফাসসির (র.) উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধি করে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন যে, اِسْمِ تَفْضِيْل তার অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং اِسْمِ فَاعِلْ -এর অর্থে হয়েছে। কাজেই এখন ভালো এবং অধিক ভালো এমনিভাবে মন্দ এবং অতি জঘন্য মন্দ উভয় প্রকার আমল এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَخْبِلَهُ : এটা বাবে نَصَرَ -এর خَبْلًا মাসদার হতে নির্গত অর্থ হলো– জ্ঞানকে বিনষ্ট করে দেওয়া, পাগল বানানো। تَخْبِيْل ও এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ : এই উভয়টিই কেরাতে সাবআর অন্তর্ভুক্ত যদি اِضَافَتْ সহ পাঠ করে তবে كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ এবং مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ পড়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :

পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফের, তাওহীদপন্থি ও মুশরিকের মধ্যকার পার্থক্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, আর একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিরকের অমার্জনীয় পরিণতি অশান্তি-অকল্যাণ এককথায় সর্বনাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানব জীবনে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে জীবনকে সার্থক করতে হলে অবশ্যই মানুষকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ সত্য উদ্ভাসিত হবার পরও যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যেমন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে অপবাদ দেয়, [নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এমনিভাবে তাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হবে? যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। অর্থাৎ এ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় জালেম, অতএব কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি তারই হবে। وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاۤءَهٗ অর্থাৎ এবং তার নিকট সত্য আসার পর সে তা প্রত্যাখ্যান করে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য, কিন্তু এ হতভাগা কাফের মুশরিকরা এ সত্যকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কেও তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে। এর চেয়ে বড় কোনো অপরাধ হতে পারে না। তাই পৃথিবীতে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নয়।

قَوْلُهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ : অর্থাৎ কাফেরদের আবাসস্থল কি দোজখ নয়? অর্থাৎ এমন কাফেরদের স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই দোজখে হবে, আর তা তাদের অন্যায় অনাচারের কারণেই হবে।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে বিশেষ সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, হে রাসূল ﷺ ! কাফেররা যদিও আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং পদে পদে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার অপচেষ্টা করে, আপনি এজন্যে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও চিন্তা করবেন না। কেননা তাদের শাস্তির জন্য দোজখই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দোজখের স্থায়ী অধিবাসী করে দিয়েছেন, তারা কখনো দোজখের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্তার পাবে না।

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ جَاۤءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ - : অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী-পরহেজগার।

ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতি : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্যায়-অনাচার ও তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসারী মুমিনগণের ঈমানও নেক আমলের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ এবং তাঁর উম্মত ও পূর্বকালের সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের শুভ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, প্রিয়নবী ﷺ -এর সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট এ সত্য নিয়ে এসেছেন, পৃথিবীতে যারা তার অনুসরণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তাদের সম্পর্কেই সুসংবাদ হলো- اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ অর্থাৎ তারাই মোত্তাকী পরহেজগার। সুদ্দী (র.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন নিয়ে এসেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.), আর তার সত্যায়নকারী হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ । অতএব, আয়াতের অর্থ এই হবে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যে সত্য নিয়ে এসছেন, তা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম কবুল করেছেন।

কালবী এবং আবুল আলীয়া (র.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন আনয়নকারী হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সর্বপ্রথম তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

হযরত জুযাজ (র.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন আনয়নকারী হলেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আর তার প্রতি প্রথম ঈমান আনয়নকারী হলেন হযরত আলী (রা.)।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত কাতাদা (র.) এবং মুকাতিল (র.) বলেছেন, সত্যকে নিয়ে এসেছেন প্রিয়নবী ﷺ আর তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন মুমিনগণ।

হযরত আতা (র.) বলেছেন, সত্যকে আনয়নকারী ছিলেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আর যুগে যুগে যারা তাদের অনুসরণ করেছেন, তাদের সকলের উদ্দেশ্যই রয়েছে আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদ যে, তারা হলেন প্রকৃত মোত্তাকী-পরহেজগার।

–[তাফসীরে তাবারী খ. ২৪. পৃ. ৩; তাফসীরে মাযহারী. খ. ১০. পৃ. ১৭২-৭৩; তাফসীরে রুহুল মা'আনী. খ. ২৪. পৃ. ৩]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার হযরত মুজাহিদ (র.), কাতাদা (র.) হযরত রবী ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সত্য আনয়নকারী হলেন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হলেন, সেসব লোক যারা তার প্রতি ঈমান আনে। যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, উর্দূ পারা ২৪, পৃ. ৩ ; তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) খ. ৬. পৃ. ৮০]

قَوْلُهُ لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ : অর্থাৎ তাদের কাঙ্ক্ষিত সবকিছুই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, এটিই নেককারদের পুরস্কার।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্যে বিশেষ কোনো পুরস্কারের কথা না বলে জান্নাতবাসীগণের আনন্দ বৃদ্ধি করার নিমিত্তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীগণ যখন যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবেন, অনতিবিলম্বে তারা তা পাবেন। হাদীস শরীফে এ বিবরণ স্থান পেয়েছে যে ঐ বস্তুটি তিনি খাচ্ছেন। এমনিভাবে যখন কিছু পরিধান করার ইচ্ছা করবেন, তখন দেখবেন যে তার কাঙ্ক্ষিত পোষাক তিনি পরে আছেন। এটিই হলো নেককার মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার।

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তার নেককার বান্দাদেরকে উত্তম এবং উৎকৃষ্টতম পুরস্কার দান করবেন। শুধু তাই নয়; বরং তাদের জীবনের যাবতীয় গুনাহ এবং ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাদেরকে নিষ্কলঙ্ক করে তুলবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. অর্থাৎ তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের নেক আমলের জন্যে তাদেরকে ছওয়াব দান করবেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে মুমিন বান্দার কবীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন। কেননা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا অর্থাৎ তারা যে মন্দ কাজ করেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি মন্দ যা, আল্লাহ তা'আলা সে গুনাহও মাফ করবেন। যখন কবীরা গুনাহ মাফ করা হবে, তখন স্বাভাবিকভাবে সগীরাহ গুনাহও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন। আর তাদের নেক আমলের জন্যে উত্তম বিনিময় তথা ছওয়াব দান করবেন।

মুকাতিল (র.) বলেছেন, এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের নেক আমলসমূহের অশেষ ছওয়াব দান করবেন, তবে বদ আমলের কোনো শাস্তি দেবেন না; বরং সেগুলো ক্ষমা করবেন। এটি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৭৪]

قَوْلُهُ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ : কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জবাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কি তার বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সেজন্যেই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে কোনো বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কেরাত عِبَادَهُ বর্ণিত আছে। এ কেরাত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট।

শিক্ষা ও উপদেশ : وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কাফেরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপারে এই যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণি তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি অমান্য করবে, না অফিসার বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা পড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য গোনাহ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলির বিপক্ষে কোনো শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোনো উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরি ত্যাগ করা উচিত।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٢. اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَيَتَوَفَّى الَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ج اَىْ يَتَوَفَّاهَا وَقْتَ النَّوْمِ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَىْ وَقْتَ مَوْتِهَا وَالْمُرْسَلَةُ نَفْسُ التَّمْيِيْزِ تَبْقٰى بِدُوْنِهَا نَفْسُ الْحَيٰوةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَاٰيٰتٍ دَلَالَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى ذٰلِكَ قَادِرٌ عَلَى الْبَعْثِ وَقُرَيْشٌ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ ذٰلِكَ .

৪২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না তার প্রাণ হরণ করেন তার নিদ্রাকালে। অর্থাৎ তাকে নিদ্রার সময় রূহ কবজা করেন অতঃপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন তার রূহ হরণ করেন এবং অন্যান্যদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় তথা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ছেড়ে দেন। ছেড়ে দেওয়া রূহ নফসে তামীয যা ব্যতীত নফসে হায়াত বাকি থাকে পক্ষান্তরে এর বিপরীত সম্ভব নয় অর্থাৎ নফসে হায়াত ব্যতীত নফসে তামীয বাকি থাকে না। নিশ্চয়ই এতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। অতএব তারা জানবে নিশ্চয়ই এসমস্ত বিবষয়ের উপর শক্তিশালী সত্তা পুনরুত্থানের উপরও সামর্থ্য রাখে। কিন্তু কুরাইশরা এটা চিন্তা করে না।

٤٣. اَمْ بَلِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاَصْنَامِ اٰلِهَةً شُفَعَآءَ ط عِنْدَ اللّٰهِ بِزَعْمِهِمْ قُلْ لَهُمْ اَيَشْفَعُوْنَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا مِنَ الشَّفَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ اِنَّكُمْ تَعْبُدُوْنَهُمْ وَلَا غَيْرَ ذٰلِكَ لَا .

৪৩. বরং তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মূর্তিসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে ও তাদের বিশ্বাস মতে মূর্তিসমূহকে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে। আপনি তাদেরকে বলুন, তারা কি সুপারিশ করবে? যদিও তারা সুপারিশ ইত্যাদির এখতিয়ার রাখে না ও তারা বুঝে না তোমরা যে তাদের অর্চনা করছো এবং না অন্য কিছু বুঝে। তারা কিছুই বুঝে না।

٤٤. قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط اَىْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِهَا فَلَا يَشْفَعُ اَحَدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

৪৪. বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ তা'আলারই ক্ষমতাধীন, অর্থাৎ সুপারিশ আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। অতএব তার অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। আসমান ও জমিনে তারই সাম্রাজ্য অতঃপর তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

٤٥. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ اَىْ دُوْنَ اٰلِهَتِهِمْ اشْمَاَزَّتْ نَفَرَتْ وَانْقَبَضَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ج وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىِ الْاَصْنَامِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ .

৪৫. যখন তাদের অন্যান্য উপাস্য ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য উপাস্য মূর্তিসমূহের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٦. قُلِ اللّٰهُمَّ بِمَعْنٰى يَا اَللّٰهُ فَاطِرَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُبْدِعُهُمَا عٰلِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ مَا غَابَ وَمَا شُوْهِدَ اَنْتَ
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ اِهْدِنِيْ لِمَا
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ .

৪৬. বলুন, হে আল্লাহ! আসমান জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য অদৃশ্যের জ্ঞানী, يَا اَللّٰهُ টি اَللّٰهُمَّ -এর অর্থে আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন ঐ ধর্মীয় বিষয়ে যাতে তারা মতবিরোধ করতো। আপনি তাদের মতবিরোধ বিষয়ে আমাকে সঠিক পথের দিকে পথ প্রদর্শন করুন।

٤٧. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَبَدَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنَ
اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ يَظُنُّوْنَ .

৪৭. যদি জালেমদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকে তবে অবশ্যই তারা কিয়ামতের দিন সে সবকিছুই আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন শাস্তি যা তারা কল্পনাও করতো না।

٤٨. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ نَزَلَ
بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَيِ الْعَذَابَ .

৪৮. আর তাদের সামনে প্রকাশ পাবে, তাদের দুষ্কর্মসমূহ এবং যে আজাবের ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদেরকে ঘিরে নেবে।

٤٩. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ ضُرٌّ دَعَانَا ز
ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ اَعْطَيْنَاهُ نِعْمَةً اِنْعَامًا مِّنَّا
قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ط مِنَ اللّٰهِ
بِاَنِّىْ لَهٗ اَهْلٌ بَلْ هِىَ اَيِ الْقَوْلَةُ فِتْنَةٌ
بَلِيَّةٌ يُبْتَلٰى بِهَا الْعَبْدُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ التَّخْوِيْلَ اِسْتِدْرَاجٌ وَّامْتِحَانٌ .

৪৯. মানুষকে যখন দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে, এরপর যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে, এটা তো আমাকে এজন্যে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জানা মতে আমি এটার উপযুক্ত। বরং তাদের এ জাতীয় কথাবার্তা এক পরীক্ষা যা দ্বারা বান্দাদের পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। এই নিয়ামত দান তাদের জন্যে পরীক্ষা ও সুযোগ দেওয়া।

٥٠. قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْاُمَمِ
كَقَارُوْنَ وَقَوْمِهٖ الرَّاضِيْنَ بِهَا فَمَآ اَغْنٰى
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

৫০. তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণও যেমন, কারূন ও তার প্রতি অনুগত কওম তাই বলতো অতঃপর তাদের কৃতকর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥١ ৫১. فَأَصَابَهُمْ سَيِّأتُ مَا كَسَبُوْا ط اَيْ جَزَاؤُهَا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَاءِ اَيْ قُرَيْشٍ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّأتُ مَا كَسَبُوْا لا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ بِفَائِتِيْنَ عَذَابَنَا فَقُحِطُوْا سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ.

৫১. যে বিপদ তাদের কাছে এসেছে তা তাদের দুষ্কর্মের প্রতিদান। কুরাইশদের যারা পাপী তাদের প্রতিও তাদের দুষ্কর্মের প্রতিদান পৌছবে। তারা তাদের শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে না। অতএব তাদেরকে সাত বৎসর দূর্ভিক্ষ দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে অতঃপর তাদের কাছে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

٥٢ ৫২. اَوَلَمْ يَعْلَمُوْآ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِبْتِلَاءً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

৫২. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে চান রিজিক বৃদ্ধি করেন পরীক্ষামূলক ও যার জন্যে চান পরিমিত করে দেন। নিশ্চয়ই এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَتَوَفّٰى : এটা বাবে تَفَعُّلٌ হতে مُضَارِعٌ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ-এর সীগাহ, অর্থ– সে রূহ কবজ করে। يَقْبِضُ الْاَرْوَاحَ عِنْدَ حُضُوْرِ اٰجَالِهَا অর্থাৎ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ

قَوْلُهُ اَنْفُس : এটা نَفْسٌ-এর বহুবচন অর্থ– রূহ, জান। وَاوْ আর اَللّٰهُ হলো মুবতাদা يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ জুমলা হয়ে খবর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে হলো حِيْنَ مَوْتِهَا টা يَتَوَفّٰى-এর সাথে ظَرْف ; উদ্দেশ্য হলো حَرْف عَطْف আর اَلَّتِيْ لَمْ تَمُتْ হলো مَعْطُوْف - اَنْفُسَ-এর উপর فِيْ مَنَامِهَا হলো يَتَوَفّٰى-এর যে সকল নফসসমূহের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদেরকে শয়নের সময় কবজা করে নেয়। এই অর্থেই হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ

মৃত্যু এবং ঘুমে রূহ কবজা করা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য :

قَوْلُهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ : تَوَفّٰى শব্দের অর্থ হলো নেওয়া এবং কবজা করা। এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো এটা বলা যে, প্রাণীদের রূহ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলার تَصَرُّفٌ এবং তারই হুকুমের অধীন। তিনি যখন ইচ্ছা কবজা করেন। এই আল্লাহ তা'আলার تَصَرُّفٌ-এর একটি প্রকাশ্য নমুনা প্রতিটি প্রাণী নিয়মিত অবলোকন করে থাকে। নিদ্রার সময় তার রূহ এক হিসেবে কবজা হয়ে যায়। এরপর জাগ্রত হওয়ার সময় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সর্বশেষে এমন একটি সময় আসবে যে, একেবারেই কবজ হয়ে যাবে। কিয়ামতের পূর্বে আর ফিরে আসবে না।

মাযহারী গ্রন্থকারের তাহকীক : তিনি বলেন, রূহ কবজা করার উদ্দেশ্য হলো– শরীরের থেকে রূহের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। কখনো এই সম্পর্ক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়ভাবেই শেষ করে দেওয়া হয়। এর নাম হলো মৃত্যু। আর কখনো শুধুমাত্র প্রকাশ্য ছিন্ন করে দেওয়া হয় অপ্রকাশ্যভাবে বাকি থাকে। এর প্রতিক্রিয়াটা এই হয় যে, শুধুমাত্র অনুভূতি ও নড়াচড়ার ইচ্ছা যা জীবনের প্রকাশ্য নিদর্শন তা ছিন্ন করে দেয়। আর অপ্রকাশ্য সম্পর্ক বাকি থাকে। যার কারণে সে শ্বাস নেয় এবং জীবিত থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে تَوَفّى শব্দটি কবজ অর্থে عُمُوم مَجَازْ-এর ভিত্তিতে উভয় অর্থকে শামিল করে। মৃত্যু এবং নিদ্রা উভয়ের মধ্যে রূহ কবজের এই পার্থক্য যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি অনুপাতেও এ মতের সমর্থন হয়। তিনি বলেন, শয়নকালে রূহ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু একটি ঝলকের মাধ্যমে রূহের সম্পর্ক শরীরের সাথে অবশিষ্ট থাকে। যার ফলে সে জীবিত থাকে। এভাবে ঝলকের সম্পর্কের কারণে সে স্বপ্নে দেখে। এরপর এই স্বপ্ন যদি عَالَم مِثَالْ-এর দিকে تَوَجُّهْ-এর সময় দেখে তবে তা সত্য স্বপ্ন হয়ে থাকে। আর যদি শরীরের দিকে ফেরার সময় দেখে তবে এতে শয়তানি تَصَرُّفَاتْ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই স্বপ্ন رُؤْيَا صَادِقَه তথা সত্য স্বপ্ন হয় না। -[মা'আরিফ]

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.)-এর তাহকীক : শাহ সাহেব (র.) বলেন, নিদ্রায় প্রতিনিয়ত জান নিয়ে নেওয়া হয়। এরপর পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এটাই আখেরাতের নিশান। জানা গেল যে, নিদ্রায়ও জান নিয়ে নেওয়া হয়। যেমন মৃত্যুতে জান নিয়ে নেওয়া হয়। যদি নিদ্রায় জান নিয়ে আটকে রাখা হয় তবে সেটাই মৃত্যু। এই জান হলো সেটা যাকে হুশ বলে। আর এক জান হলো সেটা যার দ্বারা নিঃশ্বাস চলে এবং নড়াচড়া করে এবং খাদ্য হজম হয় এই দ্বিতীয় জান মৃত্যুর পূর্বে নিয়ে নেওয়া হয় না। -[তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ]

ইমাম বগভী হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন নিদ্রায় রূহ বের হয়ে যায়। কিন্তু شُعَاعْ [ঝলক] -এর মাধ্যমে এর বিশেষ সম্পর্ক শরীরের সাথে বিদ্যমান থাকে। যার দ্বারা হায়াত বাতিল হয় না। যেমন সূর্য লক্ষ কোটি মাইল দূরে থেকেও شُعَاعْ-এর মাধ্যমে জমিনকে গরম রাখে। এর দ্বারা প্রকাশ হয় যে, নিদ্রার সময়ও সেই বস্তুই বের হয় যা মৃত্যুর সময় বের হয়। তবে اِنْقِطَاعْ-এর সম্পর্ক সেরূপ হয় না যেরূপ মৃত্যুর মধ্যে হয়ে থাকে। -[তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ]

ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, প্রতিটি মানুষের দুটি نَفْس হয়। এক হলো সেই نَفْس تَمْيِيْز بِهٖ যা নিদ্রার সময় শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। যার কারণে فَهْم এবং اِدْرَاكْ বেকার হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় হলো نَفْس حَيَاتْ যখন এই نَفْس দূর হয়ে যায় তখন জীবন প্রদীপ নিভে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। নিদ্রায় মগ্ন ব্যক্তির বিপরীত। তার শ্বাস-প্রশ্বাস জারি থাকে। কুশায়রী বলেন, এতে দূরত্ব রয়েছে। কেননা আয়াত হতে যা বুঝা যায় তা হলো এই যে, উভয় সুরতেই نَفْس مَقْبُوْض হলো একই বস্তু। এ কারণেই বলেছেন, فَيُمْسِكُ الَّذِىْ قَضٰى عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى অর্থাৎ যার মৃত্যুর সময় এসে যায় তাকে আটকে রাখেন। অন্যথায় ছেড়ে দেন। প্রথম সুরতের নাম মৃত্যু। আর দ্বিতীয় সুরতের নাম নিদ্রা। (فَتْحُ الْقَدِيْر شَوْكَانِىْ مُلَخَّصًا)

দার্শনিকগণ এতে মতভেদ করেছেন যে, نَفْس এবং رُوْح উভয়টি কি একই বস্তু না পৃথক বস্তু। এ মাসআলার আলোচনা অতিদীর্ঘ। যার জন্য كُتُب طِبّ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা চাই। কেননা এটা চিকিৎসা বিদ্যার আলোচ্য বিষয়। রূহ এর ব্যাপারে যতগুলো نَظْرِيَاتْ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার সবগুলো ধারণা ও কল্পনা প্রসূত। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। সবচেয়ে বিশুদ্ধ কথা সেটাই যাকে পবিত্র কুরআন اَلرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ বলে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالْمُرْسَلَةُ نَفْسُ التَّمْيِيْزِ الخ : এর সার হলো نَفْس দু ধরনের- ১. نَفْس تَمْيِيْز ২. نَفْس حَيَاتْ ; نَفْس تَمْيِيْز ব্যতীত نَفْس حَيَاتْ অবশিষ্ট থাকতে পারে। তবে نَفْس حَيَاتْ টা نَفْس تَمْيِيْز ব্যতীত থাকতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম সন্তানের মধ্যে একটি হলো نَفْس আর অপরটি হলো رُوْح আর عَقْل এবং تَمْيِيْز-এর সম্পর্ক نَفْس-এর সাথে। আর নিঃশ্বাসের সম্পর্ক রূহের সাথে যখন মানুষ শুয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার نَفْس কে কব্জা করে ফেলেন। রূহকে কব্জা করেন না। এ জাতীয় উক্তি হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তাহকীকী কথা : বিশুদ্ধ কথা হলো মানুষের মধ্যে রূহ মূলত একটি। তবে তার اَوْصَافْ হিসেবে একাধিক। (حَاشِيَة جَلَالَيْن)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ أَوَ لَوْ كَانُوْا : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হামযাটি اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ এবং উহ্যের উপর প্রবেশ করেছে। উহ্য ইবারত হলো اَيَشْفَعُوْنَ যেমনটি মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। وَاوْ হলো حَالِيَة এবং لَوْ হলো اَىْ وَاِنْ شَرْطِيَّة আর এই বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে نَصْب -এর স্থানে হয়েছে। لَوْ -এর জবাব হলো উহ্য। উহ্য ইবারত হলো كَانُوْا بِهٰذِهِ الصِّفَةِ تَتَّخِذُوْنَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ.

قَوْلُهُ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا : মুফাসসির (র.) اَىْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِهَا فَلَا يَشْفَعُ اَحَدٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ বৃদ্ধি করে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন. لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো সুপারিশের অধিকার হবে না। এবং কেউ কারো সুপারিশ করবে না। অথচ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবীগণ, আলেমগণ, শহীদগণ ও অন্যান্যরা সুপারিশ করবেন।

উত্তর. উত্তরের সার হলো এই যে, যত প্রকার সুপারিশ হবে সেগুলো আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষেই হবে। কাজেই এই সুপারিশ ও আল্লাহ তা'আলার সাথে خَاصّ হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

قَوْلُهُ نِعْمَةً اِنْعَامًا : نِعْمَةً -এর তাফসীর اِنْعَامًا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ -এর مَرْجِعْ কে ঠিক করা যাতে করে যমীর এবং مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ হয়ে যায়। এটা সেই সুরতে হবে যে, مَا কে كَافَّة বলা হবে এবং مَا -কে مَوْصُوْلَة মানা হলে تَاوِيْل -এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ الْمَقُوْلَةُ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো هِىَ যমীর এবং তার مَرْجِعْ - قَوْل -এর মাঝে مُطَابَقَة স্থাপন করা। এ কারণেই قَوْل দ্বারা مَقُوْلَة উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর مَقُوْلَة দ্বারা উদ্দেশ্য এর এই যে, اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ আবার কেউ কেউ هِىَ -এর مَرْجِعْ কে نِعْمَةٌ বলেছেন অর্থাৎ بَلِ النِّعْمَةُ فِتْنَةٌ এই সুরতে تَاوِيْل -এর প্রয়োজন হবে না।

قَوْلُهُ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوْا اَىْ جَزَائُهَا : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা যে, سَيِّئَاتْ -এর مُضَافْ উহ্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন কল্পে তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি একথা ঘোষণা করা হয় যে, কিয়ামতের দিন পাপীষ্ঠ লোকদের পরিণতি তারা দেখতে পাবে। আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে, আর এটি এমন এক দৃশ্য যা প্রতিনিয়ত মানব জীবনে লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো মানুষের নিদ্রা যা মৃত্যু সদৃশ্য, এরপর জাগ্রত হওয়া হলো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা। এ অবস্থা প্রতিদিনই মানুষের জীবনে আসে অর্থাৎ নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যু এবং পুনর্জীবন লাভের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের প্রাণও [হরণ করেন] নিদ্রার সময়।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন, মানুষ যখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার রূহ দেহ থেকে নিজের কাছে নিয়ে যান, যখন নিদ্রার অবসান ঘটে তখন দেহে রূহ ফেরত দেন, নিদ্রিত অবস্থায় যার মৃত্যুর সময় হয়ে যায় তার প্রাণ ফেরত দেওয়া হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, মানুষ যখন নিদ্রিত হয় তখন তার রূহ সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যায় তবে দেহের সঙ্গে সঙ্গে রূহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় না; বরং কিছুটা সংযোগ অব্যাহত থাকে, ফলে দেহ এবং জীবন বিনষ্ট হয় না। এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। সূর্য নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর থেকে তা কিরণের সাহায্যে পৃথিবীতে স্বীয় প্রভাব বজায় রাখে। মানবাত্মা তার নিদ্রার সময় দেহ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও একটা সম্পর্ক বজায় রাখে, কিন্তু মৃত্যু হলে রূহের সাথে দেহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যেহেতু নিদ্রকালে দেহ ও রূহের এক প্রকার সম্পর্ক বজায় থাকে তাই ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে, এরপর যখন সে জাগ্রত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে রূহ দেহের মধ্যে ফিরে আসে।

হযরত সোলায়েম ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই, কিছু লোক নিদ্রিত অবস্থায় এমন কিছু দেখে যা সে কখনো কল্পনাও করেনি, যখন সে জাগ্রত হয় তখন ঐ বিষয়টি তার সম্মুখে এসে পড়ে। অর্থাৎ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। অথচ কোনো কোনো লোকের স্বপ্নের কোনো গুরুত্বই নেই। হযরত আলী (রা.) একথা শ্রবণ করে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। আমি আপনাকে এর কারণ বলছি। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন– اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রূহসমূহকে কবজ করিয়ে নেন, যখন রূহসমূহ আসমানে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যে থাকে। তখন তারা যা দেখে তাই সত্য স্বপ্ন হয়। আর রূহসমূহকে তাদের দেহের দিকে প্রেরণ করা হয়, তখন পথিমধ্যে শয়তানের মুখোমুখি হয়, শয়তান তাদেরকে কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা শুনিয়ে দেন তখন তা মিথ্যা স্বপ্নে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা.) এর একথা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন।

–[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৭৮; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ৮, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ৮৬-৮৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মানুষের মধ্যে দুটি জিনিস রয়েছে। একটি হলো বিবেক-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি, অপরটি হলো রূহ। মানুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন তার বিবেক বুদ্ধি এবং উপলব্ধি শক্তি থাকেনা, কিন্তু রূহ থেকে যায়, যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন রূহ বিদায় নেয়, দেহ তখন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মানুষের জীবন আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, যে কোনো সময় মানুষের জীবনে আল্লাহ তা'আলার হুকুম জারি হয়ে থাকে।

মানুষের মৃত্যু দু'প্রকার। একটি ক্ষুদ্র এবং সাময়িক, আরেকটি বৃহৎ এবং স্থায়ী। ক্ষুদ্র মৃত্যু হলো নিদ্রা, আর বৃহৎ মৃত্যু হলো যখন মানুষের দেহ থেকে তার রূহকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন তার জীবনের অবসান ঘটে চিরতরে। নিদ্রা বা ক্ষুদ্র মৃত্যু সম্পর্কে অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ তিনিই সে আল্লাহ তা'আলা যিনি রাত্রিবেলা তোমাদের প্রাণ হরণ করেন। আর দিনে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন, নিদ্রিত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, আর অপরগুলোকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত দেন। অর্থাৎ জাগ্রত হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং মৃত্যুর জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সে সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হয়।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নিদ্রিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তার বিছানায় যায়, তখন তার কর্তব্য হলো বিছানাকে ঝেড়ে নেওয়া। কেননা সে জানে না যে তার পরে তাতে কি হয়েছে। এরপর তার কর্তব্য হলো এ দোয়া পাঠ করা– بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ لَهٗ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ. অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তোমার পবিত্র নামের বরকতেই আমি শায়িত হই এবং তোমার নামের বরকতেই জাগ্রত হই। যদি তুমি আমার রূহকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কর, তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি আমার রূহকে তুমি ফেরত দেওয়া পছন্দ কর, তবে এভাবেই তার হেফাজত কর, যেভাবে তুমি তোমার নেককার বান্দাদের হেফাজত করে থাক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ পর্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ যখন রাতে বিছানায় যেতেন, তখন ডান কাত হয়ে শায়িত হতেন এবং ডান হাতকে তার গাল মোবারকের নীচে রেখে এ দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার জীবন ও মরণ তোমারই হাতে।

এরপর যখন তিনি জাগ্রত হতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার প্রাণ হরণের পর পুনরায় জীবন দান করেছেন. আর তারই নিকট কিয়ামতের দিন হাজির হতে হবে।

قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : অর্থাৎ নিশ্চয়ই এতে আল্লাহ তা'আলার কুদরত হিকমতের বহু নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা চিন্তা করে থাকে। অর্থাৎ যারা চিন্তা করতে অভ্যস্থ, তারা জীবন-মৃত্যু নিদ্রা এবং জাগরণে আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের অনেক জীবন্ত নিদর্শন দেখতে পায়। যিনি মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং যিনি প্রতিদিন মানুষকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও নিদ্রার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, আর যিনি মানুষকে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন, তথা মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর করেন, তার পক্ষে সমগ্র মানব জাতিকে কিয়ামতের দিন তার দরবারে হাজির করা আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। অতএব, প্রতিদিন জাগ্রত হয়ে আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত ও হিকমত উপলব্ধি করা এবং পুনরায় জীবন লাভ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে শোকর আদায় করা যেমন কর্তব্য, ঠিক তেমনিভাবে আরেকটি কর্তব্য হলো এ সত্য উপলব্ধি করা যে, অবশেষে আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অবশ্যই হাজির হতে হবে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে যেমন জীবন উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগির জন্যেও আমাদেরকে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করতে হবে। যারা চিন্তাশীল, যারা পরিণামদর্শী, তারা এ পর্যায়ের কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল হয় না।

قَوْلُهُ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ : অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? [হে রাসূল ﷺ!] আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি তারা কোনো প্রকার ক্ষমতা না রাখে বা কিছুই বুঝতে না পারে তবুও?

কাফের মুশরিকদের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তাদের ঠাকুর দেবতারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, এজন্যে তারা ঠাকুর দেবতাদের উপাসনা করে। কিন্তু তারা এ সত্য উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করবেন শুধু সে-ই সুপারিশ করতে পারে। আর মুশরিক বা তাদের ঠাকুর দেবতারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করার কোনো অনুমতি বা যোগ্যতা রাখে না। তাদের ঠাকুর দেবতাগুলো হলো জড় পদার্থ, অসহায়, নিরুপায়, সুপারিশ করার কোনো ক্ষমতাও তাদের নেই, তারা বিবেক বুদ্ধিহীন, কিছু বোঝেওনা আর কিছু করতেও সক্ষম নয়, অতএব তাদের সুপারিশ করার প্রশ্নই উঠে না। তাই ইরশাদ হয়েছে– قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا অর্থাৎ কারো নিকট সুপারিশ করার জন্যে সুপারিশকারীর যে গুণাবলির প্রয়োজন তা এ জড়পদার্থের তৈরি মূর্তিগুলোর নেই, অতএব সুপারিশ করার কোনো অধিকারও তাদের নেই। আর কাফের মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুধু যে অপ্রিয় তাই নয়;বরং অভিশপ্তও। তাই তাদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোরই নেই। এরপর ইরশাদ হয়েছে– قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ! আপনি বলুন, সকল সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই এখতিয়ারে আসমান জমিনের রাজত্ব একমাত্র তারই এরপর তোমাদেরকে তারই নিকট ফিরে যেতে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দেন, আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করার চাবিকাঠি শুধু তারই হাতে রয়েছে। অনুমতি ব্যতীত কেউ আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করতে পারে না, তিনি যে আসমান জমিনের মালিক, তিনি যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তার দরবারে অনুমতি ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। অতএব, যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, পাপীষ্ঠ তাদের পক্ষে কে সুপারিশ করবে, আর কাফেররা যাদেরকে মানে, তারা জড়পদার্থ, অক্ষম বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার অনুমতি মোতাবেকই সুপারিশ করা সম্ভব হবে, যেমন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ অর্থাৎ আমিই [কিয়ামতের দিন] সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হবো, আর আমার সুপারিশ সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে। আর যে কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের পক্ষে তিনি কি সুপারিশ করবেন? তা তো কখনো সম্ভব নয়। আর কাফেররা একথা যেন মনে রাখে যে, ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ অবশেষে তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফিরে যেতে হবে। তখনই হবে তোমাদের জীবনের যাবতীয় কর্মের বিচার যাদেরকে তোমরা সুপারিশকারী মনে কর, তারা দরবারে ইলাহীতে সুপারিশ করার যোগ্য নয়, আর যিনি সুপারিশ করবেন, তার সঙ্গে তোমরা কর শত্রুতা, অতএব তোমদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, তা উপলব্ধি কর।

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য :

قَوْلُهُ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا : -এর শাব্দিক অর্থ লওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যেহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্ত চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনো শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকি থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' -এর দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিস্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হতে যায়।

আলোচ্য আয়াতে تَوَفّٰى শব্দটি উপরিউক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরিউক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তা দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকি থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না। তিনি আরো বলেন, নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, আমি কুরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন– اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ : হযরত সুফিয়ান ছওরী (র.) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোকদেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্য সৎকর্ম করতো, এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করতো। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে এরূপ সৎকর্মের কোনো পুরস্কার ও ছওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। –[কুরতুবী]

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ : হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন, সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খটকা দেখা দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও। রূহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন– এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা উচিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٣. قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا بِكَسْرِ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا وَقُرِئَ بِضَمِّهَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط لِمَنْ تَابَ مِنَ الشِّرْكِ اَيْ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

৫৩. বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। لَا تَقْنَطُوْا -এর ن -এর মধ্যে যের, যবর ও পেশ তিনটি পড়া যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোনাহ মাফ করেন যারা শিরক থেকে তওবা করে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

٥٤. وَاَنِيْبُوْٓا اِرْجِعُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا اخلصوا العمل لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ بِمَنْعِهٖ اِنْ لَّمْ تَتُوْبُوْا.

৫৪. তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তোমাদের কাছে আজাব আসার পূর্বে আমলকে তার জন্যে খাঁটি কর। যদি তোমরা তওবা না কর অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

٥٥. وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ هُوَ الْقُرْاٰنُ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ قَبْلَ اِتْيَانِهٖ بِوَقْتِهٖ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ قَبْلَ.

৫৫. তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিষয় তথা কুরআনের অনুসরণ কর, তোমাদের কাছে অতর্কিত ও অজ্ঞাতসারে আজাব আসার পূর্বে। অর্থাৎ আজাব আসার পূর্বে তার সময়ের ব্যাপারে তোমাদের খবরও হবে না। অতএব তোমরা দ্রুত তওবা কর।

٥٦. اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى اَصْلُهٗ يَاحَسْرَتِيْ اَيْ نَدَامَتِيْ عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ اَيْ طَاعَتِهٖ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَيْ وَاِنِّيْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ لا بِدِيْنِهٖ وَكِتَابِهٖ.

৫৬. যাতে কেউ না বলে, হায়, হায় হায় আমার আফসোস! يَاحَسْرَتٰى -এর অর্থ يَا حَسْرَتِيْ অর্থাৎ আমার লজ্জা আমি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে অবহেলা করেছি। এবং আমি আল্লাহ তা'আলার ধর্ম ও কিতাবের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। اِنْ অব্যয়টি مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ ও এটা اِنِّيْ -এর অর্থে।

٥٧. اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ بِالطَّاعَةِ اَيْ فَاهْتَدَيْتُ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ عَذَابَهٗ.

৫৭. অথবা যাতে না বলে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে তার আনুগত্যের পথ প্রদর্শন করতেন তবে অবশ্যই আমি হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম ও তার আজাব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হতাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٨. اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً رَجْعَةً اِلَى الدُّنْيَا فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيُقَالُ لَهُ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ .

৫৮. অথবা আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি আমার জন্যে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার কোনো এক সুযোগ হতো, তবে আমি সৎকর্মশীল ঈমানদার হয়ে যাব।

٥٩. بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ سَبَبُ الْهِدَايَةِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ تَكَبَّرْتَ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهَا وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ .

৫৯. অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে বলা হবে যে, হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নিদর্শন কুরআন ও এটা হেদায়েতের কারণ এসেছিল অতঃপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে ও এটার প্রতি ঈমান আনা থেকে অহংকার করেছিলে। এবং তুমি কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে।

٦٠. وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى مَأْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ بَلٰى .

৬০. যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি শিরক ও সন্তানের অপবাদ দ্বারা মিথ্যা আরোপ করে কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। ঈমান থেকে অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? হ্যাঁ।

٦١. وَيُنَجِّى اللّٰهُ من جهنم الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الشِّرْكَ بِمَفَازَتِهِمْ اَىْ بِمَكَانِ فَوْزِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ بِاَنْ يَجْعَلُوْا فِيْهِ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

৬১. আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকতো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন সাফল্যের সাথে অর্থাৎ তারা জান্নাতের এমন সাফল্যের স্থানে অবস্থান করবে যাতে তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

٦٢. اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ مُتَصَرِّفٌ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ .

৬২. আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।

٦٣. لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَىْ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهِمَا مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهِمَا وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا الخ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ .

৬৩. আসমান জমিনের চাবি তারই নিকট। অর্থাৎ উভয়ের খনিসমূহের বৃষ্টি ও শষ্য ইত্যাদির চাবি তারই হাতে যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ বাক্যটির সম্পর্ক তথা আতফ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا -এর সাথে এবং উভয় বাক্যের মধ্যবর্তী আয়াতে اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ স্বতন্ত্র বাক্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَا عِبَادِىَ : এখানে দুটি কেরাত রয়েছে– ১. يَا. কে ফেলে দিয়ে دَالْ বর্ণে كَسْرَة দিয়ে অর্থাৎ يَا عِبَادِ
২. يَا. কে অবশিষ্ট রেখে يَا.-এর উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ يَا عِبَادِىَ

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ : اَسْرَفُوْا টা اِسْرَافٌ মাসদার হতে مَاضِىْ- এর جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– তারা বাড়াবাড়ি করল, সীমাতিক্রম করল। অর্থাৎ স্বীয় নফসের উপর গুনাহ এবং খেয়ানত করে বাড়াবাড়ি করল। এখানে اِسْرَاف দ্বারা اِسْرَافٌ فِى الْمَعْصِيَةِ উদ্দেশ্য। اِسْرَافٌ-এর অর্থ মুতলাক বাড়াবাড়ি করা। اَسْرَفَ اِسْرَاف مُقَيَّدٌ যেমন فِى الْمَالِ-এর মধ্যে مَجَازْ হিসেবে ব্যবহার হয়। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত বলেছে। তবে প্রথমটি অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন. اِسْرَاف-এর সেলাহ عَلٰى ব্যবহার হয় না?

উত্তর. اِسْرَاف যেহেতু খেয়ানতের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তাই اِسْرَافٌ-এর সেলাহ عَلٰى নেওয়া বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا تَقْنَطُوْا : এটা বাবে ضَرَبَ এবং نَصَرَ হতে বেশি ব্যবহার হয়। আর বাবে كَرُمَ হতে شَاذٌ বা কম ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ هُوَ الْقُرْاٰنُ : এটা اَحْسَنَ-এর তাফসীর। অর্থাৎ আসমানি কিতাবের মধ্যে কুরআন সর্বোত্তম।

قَوْلُهُ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ : এখানে اَنْ এবং যা তার অধীনে রয়েছে। مَفْعُول لِاَجْلِهٖ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। আল্লামা যমখশারী (র.)-এর উহ্য ইবারত كَرَاهَةً اَنْ تَقُوْلَ মেনেছেন। আর আবুল বাকা اَنْذَرْنَاكُمْ مَخَافَةً اَنْ تَقُوْلَ বলেছেন, আর মুফাসসির (র.) بَادِرُوْا উহ্য ফে'লের مَعْمُوْل বলেছেন। যেমনটি সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ بِالطَّاعَةِ : এক নোসখায় بِالطَّاقَةِ রয়েছে।

قَوْلُهُ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ : এই ইবারতে সেই কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে মতলক كِذْب উদ্দেশ্য নয়। বরং সেই كِذْب দ্বারা শিরক আবশ্যক হয় সেই كِذْب উদ্দেশ্য। তাই সামনে যেই وَعِيْد বর্ণনা করা হয়েছে তা মতলাক كِذْب-এর নয়; বরং সেই كِذْب যার কারণে كُفْر আবশ্যক হয়।

قَوْلُهُ مَقَالِيْدُ : এটা مِقْلِيْدٌ বা مِقْلَادٌ-এর বহুবচন। অর্থ– চাবি। এটা প্রতিটি বস্তুতে شِدَّتْ تَصَرُّفْ এবং تَمَكُّنْ হতে كِنَايَة হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে মুশরিকদের অন্যায় আচরণের বিবরণ ও তাদের শাস্তির ঘোষণা ছিল। এরপর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষণ পন্থায় প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছিল। এ আয়াতসমূহ শ্রবণের পর হয়তো কারো মনে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি হতে পারে, এর পাশাপাশি এ চিন্তাও হতে পারে যে, এত অন্যায়-অনাচারের পর কি আর আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়– قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا اَنْفُسِهِمْ.

শানে নুযূল : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কিছু মুশরিক যারা মানুষকে হত্যা করেছে, ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে, তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেছে আপনি যা কিছু বলেন তা অত্যন্ত ভালো, আর যে বিষয়ের প্রতি আপনি আহ্বান করেন, তা-ও নিসন্দেহে উত্তম, কিন্তু আমরা যে বড়ই পাপী, আমাদের পাপাচার মাফ হবে কি? তখন এ আয়াত এবং সূরায়ে ফোরকানের একটি আয়াত নাজিল হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে, মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাবারানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রিয়নবী ﷺ হযরত হামযা (রা.)-এর ঘাতক ওয়াহশীকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে লোক মারফত আহ্বান জানান, ওয়াহশী জবাব দেয় আমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কিভাবে দাওয়াত দিচ্ছেন, কেননা আপনি বলেছেন, যে শিরক করে, যে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, তাকে কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়- إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا অর্থাৎ কিন্তু যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। তখন ওয়াহশী বলল, এ শর্তটি অত্যন্ত কঠিন, যদি তা পূর্ণ করা আমার দ্বারা সম্ভব না হয় তবে অন্য কোনো পথ আছে কি? তখন নাজিল হয়- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করতেও পারেন। তখন ওয়াহশী বললো, মাফ করা না করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন, আমি তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলেও ক্ষমা না-ও পেতে পারি, এমন পরিস্থিতিতে আমার কি অবস্থা হবে? তখন আলোচ্য আয়াত- قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ নাজিল হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

এ আয়াত নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ ঘোষণা শুধু কি ওয়াহশীর জন্যে, না সকল মুসলমানের জন্য? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, সকল মুসলমানের জন্য।

হাকেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের পর বিপদগ্রস্ত হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইয়াশ ইবনে রবীয়া (রা.) এবং ওলীদ (রা.) ইবনে ওলীদ সহ এমন মুসলমানদের ব্যাপারে, যারা প্রথমে ঈমান এনেছিল, কিন্তু ঈমানের কারণে যখন দুঃখ দুর্দশা দেখা দেয় তখন তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে। আমরা বলতাম, আল্লাহ তা'আলা তাদের কোনো আমল কবুল করবেন না, ফরজও নয়, নফলও নয়, আর কোনোভাবেই তাদের তওবাও কবুল হবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) তার নিজের হাতে এ আয়াত লিখে ইয়াশ ইবনে রবীয়া এবং ওলীদ (রা.) সহ অন্যান্য লোকের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তারা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফে চলে আসেন। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত.আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ৯২; তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৮৫-৮৬;]

قَوْلُهٗ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরো কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[কুরতুবী]

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গুনাহ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে কারো নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এই আয়াতটি গুনাহগারদের জন্য কুরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ আয়াতই হলো সর্বাধিক আশার আয়াত।

قَوْلُهُ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ : এখানে উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কুরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাওরাত, ইঞ্জীল যাবূর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে আল কুরআন। −[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتٰى...... مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ : এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোনো বৃহত্তম অপরাধী, কাফের পাপাচারীরও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা বলে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হলো মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোনো উপকার হবে না।

কোনো কোনো কাফের ও পাপাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায় আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম। কেউ সেখানেও তাকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোনো কাজে আসবে না।

উপরিউক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আজাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দুটি বাসনা আজাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে− يَا حَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ। এরপর ওজর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ। এরপর আজাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলার মাগফিরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি− মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

قَوْلُهُ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا : আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করলে আমরা পরহেজগার হয়ে যেতাম, এখানে কাফেরদের এ উক্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা পুরোপুরিই হেদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্য বাধ্য করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোনো পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা ও নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, তজ্জন্য সে নিজেই দায়ী।

আল্লাহ তা'আলার দয়া মায়ার একটি দৃষ্টান্ত : হযরত আমের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, তার গায়ে চাদর এবং হাতে কোনো জিনিস ছিল, যা তিনি চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তিনি আরজ করলেন, আমি একটি বৃক্ষের নিচ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, সেখানে পাখির ছানার শব্দ শুনলাম, আমি সেগুলোকে ধরে আমার চাদরে রেখে দিলাম। এরই মধ্যে তাদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘোরফেরা করতে লাগলো, আমি তখন পাখির ছানাগুলোকে তার সম্মুখে রেখে দিলাম। মা পাখিটি এগিয়ে আসলে আমি সবগুলোকে আমার চাদরে

তুলে নিলাম, এখন এসবই আমার কাছে রয়েছে। হুজুর ﷺ আদেশ করলেন, এগুলোকে রেখে দাও, তখন দেখা গেল মা তার ছানাদের আকড়ে ধরে রেখেছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, মা পাখিটি তার বাচ্চাদের উপর কত মেহেরবান তা দেখে তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? শপথ সেই আল্লাহ তা'আলার যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, এই পাখিটি তার ছানাগুলোর উপর যত মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি মেহেরবান। এরপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, যাও যেখান থেকে এগুলো ধরে এনেছ সেখানে এগুলো রেখে দাও। নির্দেশ মোতাবেক ঐ ব্যক্তি সেগুলোকে নিয়ে চলে গেল। -[আবূ দাউদ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা এক জিহাদে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, পথে কিছু লোকের সাথে দেখা হলো। হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমাদের কি পরিচয়? তারা আরজ করলেন, আমরা মুসলমান। তাদের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও ছিল, সে রান্না করেছিল, তার সঙ্গে একটি শিশু সন্তানও ছিল। যখন অগ্নি বেশি করে জ্বলে উঠতো তখন সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে রাখতো, এরপর সে হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো, আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ ! তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরআন, আল্লাহ তা'আলা কি দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান নন? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন কেন নয়? এরপর সে বলল, মা তার সন্তানদের প্রতি যতটা দয়াবান আল্লাহ তা'আলা কি তার বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অধিকতর দয়াবান নন? [অবশ্যই] এরপর সে বলল, মা তার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে না। একথা শ্রবণ করে হুজুর ﷺ চিন্তিত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু তাকেই আজাব দেবেন যে অবাধ্য, যে বিদ্রোহী, আর যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে অস্বীকৃতি জানায়। -[ইবনে মাজাহ]

এ পর্যায়ে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যেসব মুমিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় তারা কি জান্নাতে যাবে? মুতাজেলা ফেরকা এ মত পোষণ করে, যে মু'মিন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় সে যদি তওবা না করে তবে চিরদিন দোজখে থাকবে। তাদের এ মত সঠিক নয়, তারা বিভ্রান্ত। আর মুরজিয়া ফেরকার মত হলো, গুনাহ ছোট হোক বা বড় যদি ঈমান সঠিক থাকে তবে মুমিনের আখেরাতে কোনো আজাবই হবে না। এমতটিও সঠিক নয়। কেননা এর দ্বারা সেসব আয়াত ও হাদীসসমূহ অস্বীকার করা হয় যাতে গুনাহের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত দুটি মতই ভ্রান্ত।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত : সঠিক মত হলো, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আর তা হলো, গুনাহের শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে গুনাহ মাফ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। গুনাহ মাফ হয় তওবার মাধ্যমে অথবা প্রিয়নবী ﷺ -এর শাফায়াতের মাধ্যমে কিংবা কোনো ওলী আল্লাহ তা'আলার সুপারিশ ক্রমে, অথবা শুধু আল্লাহ তা'আলার রহমতে। যদি আল্লাহ তা'আলা কোনো গুনাহগার মু'মিনকে আজাব দেওয়ার ইচ্ছাও করেন। তবে তা স্থায়ী আজাব হবে না; বরং সাময়িক হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য নেক আমলও করবে সে তার বিনিময় অবশ্যই দেখতে পাবে। আর ঈমান হলো সবচেয়ে বড় নেক আমল এবং সকল নেক আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে ঈমানের উপর, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার বরখেলাফ হওয়া সম্ভব নয়। আখেরাতে ছওয়াব প্রদানের স্থানই হলো জান্নাত। অতএব মুমিন মাত্রই জান্নাতে যাবে। আজাব ভোগ করার পর অথবা কোনো আজাব ব্যতীতই আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত নসিব করবেন। মুমিনের অবস্থা হলো এই, যদি তার দ্বারা একটি গুনাহ হয়ে যায় তবে সে মনে করে সে পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে, আর উপর থেকে পাহাড় আপতিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর কাফের তার গুনাহকে মনে করে একটি মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, একটি ইঙ্গিতেই তাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৯২-৯৩]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ : مَقَالِيْدُ শব্দটি مِقْلَادٌ অথবা مِقْلِيْدٌ-এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসিতে চাবিকে كَلِيْد বলা হয়। আরবি রূপান্তর করে প্রথমে একে اِقْلِيْد করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন مَقَالِيْد ব্যবহৃত হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

চাবি কারো হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ এই কালেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কালেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দান করেন। ইবনে জাওযী এ ধরনের রেওয়ায়েতকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফজিলত ধর্তব্য হতে পারে। -[রূহুল মা'আনী]

ইমাম ইবনে আবি হাতেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত একখানা হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও বর্ণনা করেছেন, যা আবূ ইয়ালা মুসনাদে সংকলন করেছেন, আর তাবারানী 'আদ দোয়া'য় এবং বায়হাকী 'আল আসমাউস সেফাত' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। হাদীসের বিবরণ এই যে, হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে [আলোচ্য আয়াত] لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, হে ওসমান! তোমার পূর্বে কেউ আমার নিকট এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করেনি। এ আয়াতের তাফসীর হলো একাধিক, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ [আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই] اَللّٰهُ اَكْبَرُ [আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ] سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ [পবিত্র আল্লাহ তা'আলা, সমস্ত প্রশংসা তারই] اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ [আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী] لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ [আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো কোনো শক্তি নেই] اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ [তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ] بِيَدِهِ الْخَيْرُ [সকল কল্যাণ তারই হাতে] يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ [তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন] وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ [আর তিনি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান]।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায়ও হযরত উসমান (রা.)-এর প্রশ্ন ও জবাবের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় একথাও রয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এ বাক্যগুলো দশবার করে পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছয়টি নিয়ামত দান করেন। যেমন-

১. ইবলিস ও তার দলবল থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে হেফাজত করবেন।

২. জান্নাতে তাকে অঢেল ছওয়াব দান করবেন।

৩. হুরগণ তার স্ত্রী হবে।

৪. তার গুনাহ মাফ করা হবে।

৫. সে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে থাকার তৌফিক পাবে।

৬. মৃত্যুর সময় তার নিকট বারজন ফেরেশতা আসবে এবং তাকে সুসংবাদ দান করবে এবং কবর থেকে হিসাবের স্থান পর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাকে নিয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন যখন সে ভীত হবে তখন তাকে ফেরেশতাগণ সান্ত্বনা প্রদান করবেন। তার হিসাব সহজ করা হবে। এরপর তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন অন্যরা থাকবে কঠিন বিপদের মুখোমুখি।

-[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ১৯৬-৯৭; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ২২; তাফসীরে আদদুররুল মানসুর, খ. ৫, পৃ. ৩৬৭]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٤. قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ غَيْرَ مَنْصُوْبٌ بِاَعْبُدُ الْمَعْمُوْلِ لِتَاْمُرُوْنِّىْ بِتَقْدِيْرِ اَنْ بِنُوْنٍ وَاحِدَةٍ وَبِنُوْنَيْنِ وَادْغَامٍ وَفَكٍّ .

৬৪. বলুন হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছো? غَيْرَ শব্দটি تَاْمُرُوْنِّىْ -এর মামূল اَعْبُدُ দ্বারা মানসূব হয়েছে। تَاْمُرُوْنِّىْ -এর মধ্যে ان উহ্য রয়েছে ও এতে একটি নূন বা দুটি নূন তথা تَاْمُرُوْنَنِىْ বা ইদগাম এর সাথে পড়বে।

٦٥. وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَاللّٰهِ لَئِنْ اَشْرَكْتَ يَا مُحَمَّدُ فَرْضًا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

৬৫. আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার কসম মেনে নিলাম যদি আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক স্থির করেন, হে মুহাম্মদ ﷺ তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।

٦٦. بَلِ اللّٰهَ وَحْدَهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ اِنْعَامَهُ عَلَيْكَ .

৬৬. বরং আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করুন এবং তোমায় প্রদত্ত তার নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।

٦٧. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ق مَا عَرَفُوْهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهٖ اَوْ مَا عَظَّمُوْهُ حَقَّ عَظْمَتِهٖ حِيْنَ اَشْرَكُوْا بِهٖ غَيْرَهُ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا حَالٌ اَىِ السَّبْعُ قَبْضَتُهٗ اَىْ مَقْبُوْضَةٌ لَهٗ فِىْ مِلْكِهٖ وَتَصَرُّفِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ مَجْمُوْعَاتٌ بِيَمِيْنِهٖ ط بِقُدْرَتِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ مَعَهٗ .

৬৭. তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থরূপে বুঝেনি। যখন তারা অন্যকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করে তখন তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থরূপে চিনেনি ও আল্লাহ তা'আলকে যথার্থ সম্মান দেয়নি। কিয়ামতের দিন গোটা সাত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে অর্থাৎ এর রাজত্ব তারই নিয়ন্ত্রণে ও তারই ইচ্ছায় এবং সব আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে তথা তার কুদরতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরিক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

٦٨. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى فَصَعِقَ مَاتَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ط مِنَ الْحُوْرِ وَالْوِلْدَانِ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ اَىْ جَمِيْعُ الْخَلَائِقِ الْمَوْتٰى قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ يَنْتَظِرُوْنَ مَا يَفْعَلُ بِهِمْ .

৬৮. শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই বেহুশ হয়ে যাবে মৃত্যুবরণ করবে তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ হুর, গিলমানসমূহ মৃত্যুবরণ করবে না অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে অতঃপর সমস্ত মৃতসমূহ দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে। তাদের সাথে কি ব্যবহার করা হচ্ছে।

٦٩. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ اَضَاءَتْ بِنُوْرِ رَبِّهَا حِيْنَ يَتَجَلّٰى لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ كِتَابُ الْاَعْمَالِ لِلْحِسَابِ وَجِيْٓئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاۤءِ اَىْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَاُمَّتِهٖ يَشْهَدُوْنَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاغِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اَىْ الْعَدْلِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ـ

৬৯. পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে। যখন তিনি বিচারের জন্যে সিংহাসনে আসীন হবেন প্রত্যেকের হিসেবের আমলনামা স্থাপন করা হবে। পয়গাম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও তার উম্মতগণ আনা হবে, যাতে তারা সাক্ষ্য দেয় প্রেরিত রাসূলদের দাওয়াত ও তাবলীগের উপর এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের উপর কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না।

٧٠. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ اَىْ جَزَاءَهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ فَلَا يَحْتَاجُ اِلٰى شَاهِدٍ ـ

৭০. প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত। অতএব এতে তিনি কোনো সাক্ষীর মুখাপেক্ষী নন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ : এটা মূলত اَتَاْمُرُوْنَنِىْ اَنْ اَعْبُدَ غَيْرَ اللّٰهِ ছিল اَعْبُدُ-এর মাফউল غَيْرَ اللّٰهِ কে اَعْبُدُ-এর আমেল تَاْمُرُوْنِّىْ-এর উপর مُقَدَّمْ করে দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে, এই সুরত দুর্বল। তবে দুর্বল বলাটা ঠিক নয়। কেননা اَنْ শব্দের মধ্যে নয়। কাজেই এর আমল বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয় সুরত হলো এই যে, غَيْرَ اللّٰهِ কে تَاْمُرُوْنِّىْ-এর মাধ্যমে مَنْصُوْبٌ মানা হবে। এবং اَعْبُدُ-কে তার থেকে بَدَلْ মানা হবে। উহ্য ইবারত হবে قُلْ اَفَتَاْمُرُوْنِّىْ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ এই তারকীব بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ-এর অন্তর্গত।

তৃতীয় সুরত غَيْرَ টা উহ্য ফে'লের কারণে মানসূব হয়েছে অর্থাৎ اَفَتَلْزِمُوْنِىْ غَيْرَ اللّٰهِ এই সুরতে এর مَا بَعْدَ তার জন্য مُفَسِّرْ হবে। এছাড়া আরো তারকীব হতে পারে।

قَوْلُهُ تَاْمُرُوْنِّىْ : এটা مُضَارِعْ-এর حَاضِرْ مُذَكَّرْ جَمْعْ-এর সীগাহ। অর্থ– তোমরা আমাকে নির্দেশ দিচ্ছো। ى হলো وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ-এর যমীর। আর نُوْنْ টা اِدْغَامْ-এ কারণে তাশদীদযুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ : لَامْ টি جَوَابُ قَسَمْ-এর জন্য হয়েছে অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَقَدْ আর قَدْ হলো হরফে তাহকীক। اُوْحِىَ হলো فِعْلْ مَجْهُوْلْ আর اِلَيْكَ হলো نَائِبْ فَاعِلْ-এর স্থলাভিষিক্ত। আর কেউ কেউ বলেন যে, পূর্বাপরের قَرِيْنَةْ-এর কারণে نَائِبْ فَاعِلْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اُوْحِىَ اِلَيْكَ التَّوْحِيْدُ

قَوْلُهُ فَرْضًا : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হলো নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাদের দ্বারা শিরক হতে পারে না। এরপরও لَئِنْ اَشْرَكْتَ কেন বলা হলো?

উত্তর. فَرْضْ مُحَالْ-এর ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কেউ কেউ এই উত্তর দিয়েছেন যে, যদিও রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মত। কিন্তু এখন এই প্রশ্ন হবে যে, যদি উম্মতই উদ্দেশ্য হয় তবে لَئِنْ اَشْرَكْتَ-এর পরিবর্তে لَئِنْ اَشْرَكْتُمْ বলা উচিত ছিল? এর উত্তর হলো এই যে, অর্থ হলো اُوْحِىَ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَئِنْ اَشْرَكْتَ الخ যেমন আরবে বলা হয়– كسانا الامير حلة অর্থাৎ كَسَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا حُلَّةً

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ আয়াতের শানে নুজুল : তেবরানী এবং ইবনে আবি হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে এসে প্রস্তাব দেয়, আপনি যদি রাজি থাকেন, আমরা আপনাকে এত ধন সম্পদ দেব যে, আপনি মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে যাবেন। অথবা মক্কার রাজত্ব আপনি গ্রহণ করবেন অথবা যে কোনো সুন্দরী স্ত্রী লোককে আপনি বিয়ে করতে চাইলে আমরা তার ব্যবস্থা করবো, তবে আমাদের একটি মাত্র শর্ত এই যে, আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলবেন না, তাদের সমালোচনা করবেন না। অথবা আপনি যদি পছন্দ করেন তবে এ ব্যবস্থাও হতে পারে যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের পূজা করবেন, আর এক বছর আমরা আপনার মাবুদের পূজা করবো। হুজুর ﷺ তখন তাদেরকে বললেন, যখন আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে জবাব আসবে তখন আমি তোমাদের এ কথার জবাব দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর অপেক্ষা করবো। তখন সূরা কাফিরুন এবং আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

বায়হাকী 'দালায়েলে' হযরত হাসান বসরী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিল, আপনি আপনার পিতা-পিতামহকে পথভ্রষ্ট বলেছেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (র.) তাফসীরকার মোকাতিল (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে বলেছিল আপনি আপনার পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে আসুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি বলুন, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে বলেছো?

যারা এ ধারণা করে যে প্রিয়নবী ﷺ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করবেন, তাদের ন্যায় বোকা বা মূর্খ আর কেউ হতে পারে না।

হে মুশরিকের দল! তোমরা কি একথা মনে কর যে, আমি স্বভাবধর্ম ইসলাম ছেড়ে দিয়ে মানবতার কলঙ্ক শিরক গ্রহণ করবো? যা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পরবর্তী আয়াতে শিরকের ভয়াবহ পরিণতির ঘোষণা করা হয়েছে– وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি নিশ্চয়ই ওহী নাজিল করা হয়েছে যে, 'হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক মেনে নাও, তবে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে, তোমার জীবন সাধনা হবে ব্যর্থ, আর তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ মুরতাদ হয়, তবে তার বিগত দিনের সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যায়, যেভাবে কোনো কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন কাফের অবস্থায় কৃত গুনাহসমূহ ইসলাম গ্রহণের কারণেই দূরীভূত হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোনো ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, আর এমন সময় মুসলমান হয়, যখন নামাজের সময় এখনো বাকি রয়েছে, তবে মুরতাদ হওয়ার পূর্বে যে নামাজ আদায় করেছিল, তা-ও বাতিল হয়ে যাবে। তাকে নতুন করে ঐ নামাজ আদায় করতে হবে। ঠিক এভাবে যদি কেউ হজ আদায় করলো, এরপর মুরতাদ হলো এরপর পুনরায় সে মুসলমান হলো, এমন অবস্থায় তাকে দ্বিতীয়বার ফরজ হজ আদায় করতে হবে। আর আলোচ্য আয়াতে একথাই ঘোষণা করা হয়েছে– لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ অথাৎ যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ অর্থাৎ বরং এক আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী কর, শুধু তারই সম্মুখে মাথা নত কর, শুধু তার কাছেই আশা কর এবং শুধু তার প্রতিই ভরসা কর আর আল্লাহ তা'আলার শুকরগুজার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও তথা তিনি যে অনন্ত অসীম নিয়ামত দান করে রেখেছেন, তার জন্যে সর্বদা শোকর আদায় করতে থাক।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রকৃত বান্দার কর্তব্য : এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত বান্দার দুটি কর্তব্য একান্ত পালনীয় ১. শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী করা, তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা তথা তার যাবতীয় বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। ২. আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত অগণিত নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করতে থাকা। যারা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত বান্দা তাদের মধ্যে এ দুটি গুণ অবশ্যই থাকবে।

قَوْلُهُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ...... وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ : আয়াতের শানে নুযূল : তিরমিযী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, একবার এক ইহুদি ধর্মযাজক প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয় এবং বলে 'হে আবুল কাসেম! আল্লাহ তা'আলা যখন আসমানসমূহকে এ আঙ্গুলের উপর আর জমিন সমূহকে এ আঙ্গুলের এবং সমুদ্রগুলোকে এ আঙ্গুলের উপর আর পাহাড়গুলোকে এ আঙ্গুলের উপর রাখবেন, তখন কি অবস্থা হবে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهِ : কিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ তা'আলার হাতের মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অপবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু مُتَشَابِهَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ তা'আলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ তা'আলা এগুলো থেকে পবিত্র। سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে' এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা : এ আয়াতের মর্মকথা হলো, আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য, সম্মান এবং মর্যাদা যতখানি করা উচিত ছিল, বান্দারা তা করেনি, আর কিয়ামতের দিন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার হাতের মুঠোয় থাকবে। আসমানগুলো আল্লাহ তা'আলার দক্ষিণ হাতে থাকবে, আর কাফেররা যে শিরক করে, তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য : ইমাম তাবারী (র.) এ কথাটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, যারা কাফের, তারা আল্লাহ তা'আলার সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষা করেনি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে আর একথা বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, তারা আল্লাহ তা'আলার সত্যিকার মর্যাদা উপলব্ধি করেছে। অতএব, যারা কাফের, মুশরিক, বেদ্বীন তারা আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি, তার অনন্ত অসীম মহিমা সম্পর্কে যদি তারা সঠিক ধারণা করতো, তবে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতো না, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হতো না। -[তাফসীরে তাবারী, খ. ২৪, পৃ. ১৭]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তাওহীদ বা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা প্রমাণিত হয় না। কেননা বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম হক হলো, তার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি কেউ তাওহীদে বিশ্বাস না করে তথা শিরক করে, তবে সে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। আল্লাহ তা'আলার শান হলো এই যে, কিয়ামতের দিন আসমান জমিন তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতখানি 'মুতাশাবিহাত' এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে একথা জানিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলার মহান মর্যাদা সম্পর্কে তার বান্দারা কিছুই জানেনা। আর আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আঁচ করা বান্দার পক্ষে সম্ভবই নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মানুষের সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরত, হেকমত, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে ধারণা করা এবং তার হক আদায় করা কখনো সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যতখানি জ্ঞান অর্জন করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য, তার ন্যূনতম সীমা হলো তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যারা তাওহীদ তথা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদেই বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য সম্মান করে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এবং বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এ বিশাল বিস্তৃত জমিনকে তার কুদরতি হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন। আর আসমানকে গুটিয়ে তার দক্ষিণ হস্তে নেবেন, এরপর ইরশাদ করবেন, আমিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ, জমিনের রাজা বাদশারা কোথায়?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আসমানগুলোকে গুটিয়ে ডান হাতে নিয়ে ইরশাদ করবেন, আজ কোথায় সেই শক্তিশালী লোকেরা? কোথায় অহংকারী লোকেরা? এরপর জমিনগুলোকে গুটিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে ইরশাদ করবেন, আমি-ই বাদশাহ, শক্তিশালী লোকেরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?

আবুশ শেখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিন আসমান জমিনকে আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতি হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন। এরপর ইরশাদ করবেন, আমি-ই আল্লাহ আমি-ই রহমান, আমি-ই বাদশাহ, আমি-ই সকল দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। আমি-ই নিরাপত্তা দানকারী, আমি-ই অভিভাবক, আমি-ই বিজয়ী, আমি-ই পরম শক্তিশালী, আমি-ই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, আমি-ই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি, যখন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আর আমি-ই পুনর্জীবন দান করেছি। আজ বাদশারা কোথায়? বড় বড় শক্তিশালী লোকেরা কোথায়?

ইবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইহুদিরা সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিসমূহকে গণনা করেছে। এরপর আসমান জমিন ও ফেরেশতাগণের সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করেছে। এরপর তারা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করেছে, তখন আলোচ্য আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ নাজিল হয়েছে।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, ইহুদিরা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং এমন সব কথা বলেছে, যার জ্ঞান তাদের ছিল না তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ইবনুল মুনজির রবী ইবনে আনাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! যখন কুরসীই এত বিরাট বিশাল এবং বিস্তৃত, তখন আরশের কি অবস্থা? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ নাজিল করেছেন।

قَوْلُهُ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ : অর্থাৎ তিনি পবিত্র এবং তিনি তাদের বর্ণিত শরিকদের বহু উর্ধ্বে। অর্থাৎ কাফের মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শিরকের যে কথা বলে, তা থেকে তিনি পবিত্র। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

قَوْلُهُ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : صَعِقَ -এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, এখানে প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে।

–[বয়ানুল কুরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : দুররে মানসূরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা– হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মিকাঈল (আ.), হযরত ইসরাফীল (আ.) এবং হযরত আজরাঈল (রা.) এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিঙ্গা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাছীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে হযরত আজরাঈল (আ.)-এর মৃত্যু হবে। সূরা নামলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صَعِقَ-এর পরিবর্তে فَزِعَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجِيْٓئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ : অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত পয়গাম্বরও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গাম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কুরআনে আছে مَعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ উম্মতে মুহাম্মদীও থাকবে। যেমন– এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন– কুরআনে বলা হয়েছে– وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ

قَوْلُهُ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا .... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ : অর্থাৎ আর পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে, নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا অর্থাৎ কিয়ামতের মাঠ তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মাঝে ফায়সালা করার জন্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন যেভাবে আসমানে সূর্যকে দেখতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার নূর দেখতেও কোনো সন্দেহ থাকবেনা।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَلْاَرْضُ শব্দ দ্বারা এ জমিনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, যাতে মানুষ এখন বসবাস করছে, বরং এটি হবে অন্য জমিন যাকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সমগ্র বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার জন্যে সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন সেখানে তার বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন ঐ জমিন তার নূরে আলোয় ঝলমল করে উঠবে। –[তাফসীরে কাবীর, খ. ২৭, পৃ. ১৯]

হযরত হাসান বসরী (র.) এবং সুদ্দী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের نُوْرِ رَبِّهَا শব্দটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেভাবে আলো আধারকে দূরীভূত করে দেয়, ঠিক তেমনিভাবে জুলুমের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেয় সুবিচারের আলো, এজন্যে সুবিচারকে 'নূর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটি হলো সেই নূর যা আল্লাহ তা'আলা সেদিনের জন্য সৃষ্টি করবেন, যেমন চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ২৯-৩০ ; তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ২০৩]

قَوْلُهُ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ : অর্থাৎ আর আমলনামা পেশ করা হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আমলনামা পেশ করা হবে।

বায়হাকী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– সকল আমলনামা আল্লাহ তা'আলার আরশের নিচে রয়েছে। যখন সময় হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে সমগ্র মানব জাতিকে এক ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা একটি বাতাস প্রেরণ করবেন, যা আমলননামাগুলোকে উড়িয়ে আনবে এবং মানুষের ডান বা বাম হাতে পৌছাবে। এ আমলনামায় যে কথাটি সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ থাকবে তা হলো– اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. অর্থাৎ পাঠ কর তোমার আমলনামা, তোমার হিসাবের জন্যে আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট।

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ وَجِاْئَ بِالنَّبِيِّنَ : অর্থাৎ নবীগণ ও স্বাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন, নবী রাসূলগণের সম্মুখেই মানুষের হিসাব নিকাশ হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন কোনো দিন যায় না, যেদিন সকাল-সন্ধ্যায় হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মুখে তার উম্মতকে হাজির না করা হয়। তিনি তাদের আকৃতিগুলো এবং আমলগুলো দেখে চিনতে পারেন। এজন্যে কিয়ামতের দিন মানুষের সম্পর্কে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একথাও বলেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ -এর উম্মত অন্য পয়গাম্বরগণের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা তাদের উম্মতগণকে আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী পৌঁছিয়েছিলেন।

তাফসীরকার হযরত আতা (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে সাক্ষীগণের উল্লেখ রয়েছে তারা হলেন আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ। আর কিয়ামতের ময়দানে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হবে, কারো প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না।

قَوْلُهُ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ : অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেওয়া হবে, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সবিশেষ অবগত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেই সবকিছু দেখেন, সবকিছু জানেন, কারো খবর দেওয়ার বা সাক্ষী রাখারও কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত আতা (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর জন্যে কোনো লেখক বা সাক্ষীর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। আমলনামা বা সাক্ষী কাফেরদের অপরাধ প্রমাণিত করার জন্যেই থাকবে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ২০৪]

কোনো কোনো তাফসীরকার এ পর্যায়ে বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলার আদালতে কারো ছওয়াব কম হওয়া অথবা শাস্তি বেশি হওয়া সম্ভবই নয়। কেননা তিনি মহাজ্ঞানী, সকলের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন কেউ নেই। কাজেই তিনি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দান করবেন, তাতে এতটুকু কম করা হবে না। -[তাফসীরে মাযহারী, পৃ. ৯৩৩]

এবং প্রত্যেকের সকল আমলের পূর্ণ এবং যোগ্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের ভালো-মন্দ আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোনো কিছুই তার নিকট গোপন নেই। পৃথিবীতে যে নেক আমল করে, তার পুরস্কার অবশ্যই সে পাবে, আর মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হবে, তবে যাকে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে ক্ষমা করেন, তা হবে মহান দাতার দান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧١. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعُنْفٍ اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ط جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا جَوَابُ اِذَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ الْقُرْاٰنَ وَغَيْرَهٗ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَىْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

৭১. কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে বিভিন্ন দলে কঠিনভাবে হাকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে। فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا বাক্যটি اِذَا-এর জবাব। এবং জাহান্নামের বন্দীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গাম্বর আসেনি? যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ কুরআন ইত্যাদি আবৃত্তি করতো এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করতো। তারা বলবে, হ্যাঁ কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির নির্দেশই তথা আল্লাহর বাণী لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الخ বাস্তবায়িত হয়েছে।

٧٢. قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى مَاْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ جَهَنَّمَ.

৭২. বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম।

٧٣. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِلُطْفٍ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا الْوَاوُ فِيْهِ لِلْحَالِ بِتَقْدِيْرِ قَدْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ حَالاً فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا وَجَوَابُ اِذَا مُقَدَّرٌ اَىْ دَخَلُوْهَا وَسَوْقُهُمْ وَفَتْحُ الْاَبْوَابِ قَبْلَ مَجِيْئِهِمْ تَكْرِمَةً لَهُمْ وَسَوْقُ الْكُفَّارِ وَفَتْحُ اَبْوَابِ جَهَنَّمَ عِنْدَ مَجِيْئِهِمْ لِيَبْقٰى حَرُّهَا اِلَيْهِمْ اِهَانَةً لَّهُمْ.

৭৩. যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত থাকা অবস্থায় এতে পৌছবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, وَفُتِحَتْ-এর وَاوْ অবস্থাবোধক অব্যয় এবং এতে قَدْ উহ্য রয়েছে তোমাদের প্রতি সালাম ও তোমরা সুখে থাক, طِبْتُمْ বাক্যটি حَالْ অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। خَالِدِيْنَ অবস্থাবোধক পদ। اِذَا-এর জবাব উহ্য অর্থাৎ دَخَلُوْهَا اِذَا এবং জান্নাতীদেরকে নিয়ে যাওয়া ও তারা যাওয়ার পূর্বে দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া সবই তাদের সম্মানার্থে। জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে হাকিয়ে নেওয়া ও তারা যাওয়ার পর দরজা খোলা যাতে জাহান্নামের গরম তেজ বাকি থাকে, সবই তাদের অপমানের জন্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٤. وَقَالُوْا عَطْفٌ عَلٰى دَخَلُوْهَا الْمُقَدَّرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ بِالْجَنَّةِ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ اَيْ اَرْضَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ نَنْزِلُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ج لِاَنَّهَا كُلَّهَا لَا يُخْتَارُ فِيْهَا مَكَانٌ عَلٰى مَكَانٍ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ الْجَنَّةُ ـ

৭৪. তারা বলবে قَالُوْا উহ্য دَخَلُوْهَا-এর উপর আতফ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদের প্রতি তার জান্নাতের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির তথা জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো। কেননা জান্নাতের কোনো অংশকে কোনো অংশের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না। আমলকারীদের পুরস্কার জান্নাত কতইনা চমৎকার।

٧٥. وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ حَالٌ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْهُ يُسَبِّحُوْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ حَآفِّيْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج مُلَابِسِيْنَ لِلْحَمْدِ اَيْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ بِالْحَقِّ اَيِ الْعَدْلِ فَيَدْخُلُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْجَنَّةَ وَالْكَافِرُوْنَ النَّارَ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خُتِمَ اِسْتِقْرَارُ الْفَرِيْقَيْنِ بِالْحَمْدِ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ ـ

৭৫. আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। اَلْمَلَائِكَةَ - حَآفِّيْنَ থেকে حَالٌ আর يُسَبِّحُوْنَ জুমলা হয়ে حَآفِّيْنَ-এর যমীর থেকে حَالٌ অর্থাৎ তারা বলে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ তাদের সবার মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে। অতএব ঈমানদারদেরকে জান্নাতে ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে স্থান দেওয়া হবে। এবং বলা হবে সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার। উভয় দলের তথা জান্নাতী ও জাহান্নামীর অবস্থান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার উপরই সমাপ্ত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعُنْفٍ : এখানে وَاوْ টি عَاطِفَةٌ-এর জন্য। আর سِيْقَ হলো فِعْل مَاضِىْ مَجْهُوْل আর اَلَّذِيْنَ হলো مَوْصُوْل এবং كَفَرُوْا হলো সেলাহ। এখন মওসূল ও সেলাহ মিলে سِيْقَ-এর نَائِبْ فَاعِلْ হয়েছে। اِلٰى جَهَنَّمَ টা سِيْقَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। زُمَرًا টা حَالْ হয়েছে زُمَرٌ শব্দটি زُمْرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– দল, জামাত।

قَوْلُهٗ بِعُنْفٍ : এটা বৃদ্ধি করা হয়েছে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে شِدَّتْ এবং سَخْتِىْ বর্ণনা করার জন্য। কেননা জাহান্নামীদের এটাই মুনাসিব অবস্থা।

قَوْلُهٗ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِلُطْفٍ : এখানে لُطْف বৃদ্ধি করা হয়েছে সম্মান ও ইজ্জত বর্ণনা করার জন্য।

প্রশ্ন. জাহান্নামী ও জান্নাতী উভয়ের জন্যই سِيْقَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। জাহান্নামীদেরকে জন্য অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে سَدَتْ ও سَخْتَى তথা কঠোরতার সাথে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া। আর জান্নাতীদের জন্য অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ইজ্জত ও সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া। শব্দ এক, সীগাহ এক, মাদ্দাহও এক। তদুপরি দু জায়গায় অর্থের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ কি?

উত্তর. জাহান্নামীদের জন্য سِيْقَ শব্দের ব্যবহার বিশুদ্ধ ও যুক্তিগ্রাহ্য। কেননা যখন তাদের জন্য শাস্তি ও আজাবের ফয়সালা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তাদের حَيْثِيَّتْ [পদমর্যাদা] এমন অপরাধীদের সাথে হবে যাকে বন্দী করার নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, এ জাতীয় বিদ্রোহী ও অপরাধীকে কঠোরতা ও দ্রুততার সাথে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে করে খুবই দ্রুত তাকে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য সে সকল লোকদের ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, যাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা দেওয়া হয়েছে তাদেরকে দ্রুততার সাথে নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন হতে পারে? তাদেরকে অনেক ইজ্জত ও সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া উচিত। এর উত্তর হলো– اَلَّذِيْنَ رَبَّهُمْ-এর পূর্বে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো مَرَاكِبُ এখন ইবারত এরূপ হবে سِيْقَ الْمَرَاكِبُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের বাহনকে দ্রুততার সাথে চালানো হবে যাতে তারা স্বীয় শান্তির নিবাসে খুবই দ্রুত পৌছে যায়। আর শব্দকে উহ্য মানার قَرِيْنَةْ হলো এই যে, জান্নাতীদেরকে পদব্রজেই নিয়ে যাওয়া হবে না। বরং কবর থেকে বের হতেই তাদের জন্য বাহন প্রস্তুত রাখা হবে। (جُمَلْ)

مَا اَجْمَلَ قَوْلُ الزَّمَخْشَرِيِّ فِيْ هٰذَا الصَّدَدِ قَالَ : فَاِنْ قُلْتَ كَيْفَ عُبِّرَ عَنِ الذَّهَابِ بِالْفَرِيْقَيْنِ جَمِيْعًا بِلَفْظِ السَّوْقِ؟ قُلْتُ : اَلْمُرَادُ بِسَوْقِ اَهْلِ النَّارِ طَرْدُهُمْ اِلَيْهَا بِالْهَوَانِ وَالْعُنْفِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْاُسَارٰى وَالْخَارِجِيْنَ عَلَى السُّلْطَانِ اِذَا سِيْقُوْا اِلٰى حَبْسٍ اَوْ قَتْلٍ وَالْمُرَادُ بِسَوْقِ اَهْلِ الْجَنَّةِ سَوْقُ مَرَاكِبِهِمْ لِاَنَّهُ لَا يُذْهَبُ بِهِمْ اِلَّا رَاكِبِيْنَ وَحَثُّهَا اِلٰى دَارِ الْكَرَامَةِ وَالرِّضْوَانِ كَمَا يُفْعَلُ بِمَنْ يُشَرَّفُ وَيُكْرَمُ مِنَ الْوَافِدِيْنَ عَلٰى بَعْضِ الْمُلُوْكِ فَشَتَّانَ بَيْنَ السَّوْقَيْنِ .

(اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْش)

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا : এখানে حَتّٰى টা اِبْتِدَائِيَّةْ আর جَاءُوْهَا হলো اِذَا শর্ত আর فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا জাযা جَزَاءْ সর্বসম্মতিক্রমে হয়েছে।

প্রশ্ন. এখানে وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا-এর মধ্যে وَاوْ নেওয়া হয়েছে এর পূর্বে وَاوْ নেওয়া হয়নি। এতে কি সূক্ষ্মতা রয়েছে?

উত্তর. এতে সূক্ষ্মতা হলো এই যে, জেলখানার দরজা সাধারণত বন্ধ থাকে। যখন কোনো অপরাধীকে আনা হয় তখন কিছু সময়ের জন্য খোলা হয়। এরপর সাথে সাথেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে আগমনকারীদের জন্য লাঞ্ছনা রয়েছে। কাজেই তার জন্য وَاوْ বিহীন হওয়াই যথোপযুক্ত হয়েছে। এটা মেহমানখানা ও বিচরণ গাহের দরজার বিপরীত। এর দরজা ববা ফটক আগন্তুকের অপেক্ষায় সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। আর এতে আগন্তুকদের সম্মানও রয়েছে। কাজেই وَاوْ সহ হওয়াই এর জন্য যথোপযুক্ত।

এখানে اِذَا-এর জবাবে তিন সূরত হতে পারে–

১. وَفُتِحَتْ হলো جَوَابْ شَرْط আর وَاوْ অতিরিক্ত। এটা কুফীগণ ও আখফাশের মতে।

২. جَوَابْ উহ্য রয়েছে। আল্লামা যমখশারী বলেন যে, خَالِدِيْنَ-এর পরে উহ্য মানা হবে। কেননা مُتَعَلِّقَاتْ شَرْط-এর পরে دَخَلُوْهَا (র.) মহল্লী আর মুবাররাদ سَعِدُوْا উহ্য মেনেছেন। আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ কে নেওয়া হয়। উহ্য ইবারত হবে اِطْمَأَنُّوْا উহ্য মেনেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, جَوَابْ হলো وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا অতিরিক্ত واو সহ।

قَوْلُهُ مُقَدَّرِيْنَ الْخُلُوْدَ فِيْهَا : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য যে, خَالِدِيْنَ টা فَادْخُلُوْا-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর حَالٌ ও ذُو الْحَالِ-এর জমানা এক হয়ে থাকে। অথচ এখানে উভয়ের জমানা এক হয়নি। কেননা دُخُوْلٌ-এর পরে خُلُوْدٌ হবে। সাথে সাথেই নয়।

এর জবাব দিয়েছেন যে, তাদের জন্য خُلُوْدٌ টা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এমতাবস্থায় যে, তাদের জন্য خُلُوْدٌ কে مُقَدَّرٌ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামতের দিনের অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী বিনিময় প্রদান করা হবে। এ আয়াত থেকে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, এরপর নেককার মুমিনদের অবস্থা বর্ণিত হবে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রত্যেকটি মানুষকে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেননা কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমলের হিসাব অবশ্যই হবে, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে কোনো কিছুই গোপন নেই, তিনি প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই নাফরমানদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং ঈমানদার ও নেককারগণকে পুরস্কৃত করা হবে। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে– وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ـ অর্থাৎ আর কাফেরদেরকে দলে দলে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন, এ আয়াতে সত্যদ্রোহী, দূরাত্মা ভাগ্যাহত কাফের মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, যখন বিচার শেষ হবে, তখন কাফেরদেরকে অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তখন অত্যন্ত পিপাসাগ্রস্ত হবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে তারা তখন মূক, বধির, অন্ধ থাকবে, তাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে দোজখ। যখন দোজখের অগ্নি অপেক্ষাকৃত কম হবে তখন তা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দু] পারা. ২৪, পৃ. ২০]

قَوْلُهُ زُمَرًا : অর্থাৎ দোজখীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে, যেমন কেউ অগ্নিপূজক, কেউ মূর্তিপূজক, কেউ নাস্তিক, কেউ মুনাফিক, কেউ মুরতাদ। এই প্রকারভেদের কারণে কিয়ামতের দিনও তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। আর প্রত্যেক প্রকার কাফেরের এক একটি দল হবে আর এভাবে প্রত্যেক দলকে হাঁকিয়ে দোজখে পৌছানো হবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا . অর্থাৎ কাফেরদের প্রত্যেক দল থেকে আমরা সেসব লোককে বেছে নেব যারা কুফরি ও নাফরমানিতে ছিল অত্যন্ত কঠোর।

এতে প্রমাণিত হয় যে, বড় বড় কাফেরদের এক দল হবে, আর ছোটদের ভিন্ন দল হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا فُتِحَتْ .... لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ـ : অর্থাৎ অবশেষে যখন তারা দোজখের নিকট উপস্থিত হবে, তখন তার প্রবেশ দ্বারা খুলে দেওয়া হবে এবং দোজখের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল আগমন করেননি? যারা তোমাদের সম্মুখে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং এদিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সাবধান করতেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দোজখের সাতটি প্রবেশ দ্বারই রুদ্ধ থাকবে, কাফেররা দোজখের কাছাকাছি হলে তাদের জন্যে তা খুলে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের লজ্জা এবং অনুতাপ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দোজখের রক্ষীরা তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে তাঁর প্রেরিত কোনো নবী রাসূল কি তোমাদের এদিন সম্পর্কে সাবধান করেননি?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে, দোজখের রক্ষীরা তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট তো আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে নবী রাসূল পৌঁছেছিলেন, তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম তোমাদেরকে শুনিয়েছিলেন তবুও কেন শিরক বর্জন করনি? কেননা আল্লাহ তা'আলার বিধানের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ তা'আলার বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে বিবেক বুদ্ধিই যথেষ্ট। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণকেও প্রেরণ করেছেন, আসমানি গ্রন্থসমূহ নাজিল করেছেন এবং সত্যকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন, এরপর শিরক ও কুফরের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার কোনো যুক্তি থাকে না।

قَوْلُهُ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ : অর্থাৎ তারা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই আগমন করেছিলেন নবী রাসূলগণ, কিন্তু আসলে কাফেরদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ তারা বলবে, পথ-প্রদর্শক নবী রাসূলগণ আগমন করেছিলেন। কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, আমরা তাদের কথা শুনেছি, মেনে চলিনি, তাই কাফেরদের ক্ষেত্রে আজাবের বিধান অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ : অর্থাৎ তাদেরকে হুকুম করা হবে, দোজখের দ্বারে প্রবেশ কর, চিরকাল তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে, কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। অর্থাৎ যখন কাফেররা দোজখের প্রবেশ দ্বারে হাজির হবে, তখন তাদের প্রতি নির্দেশ হবে, তোমরা দোজখে প্রবেশ কর। যারা অহংকারী, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ এবং তাদের ঠিকানা কত মন্দ।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে অহংকারীদের আবাসস্থল কত মন্দ। এর তাৎপর্য হলো, কুফরি ও নাফরমানির কারণেই দোজখের শাস্তি হবে আর কুফরি ও নাফরমানির কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, কুফরি করা হয়েছে তাদের অহংকারের কারণে। কেননা এই কাফেররা তাদের অন্তর্নিহিত দম্ভের কারণে নবী রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তাদের প্রতি ঈমান আনেনি, এজন্যে তাদেরকে অপমানিত অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়ার জীবনে দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশ করেছিলে, আল্লাহ তা'আলার বিধান অমান্য করেছিলে, তার প্রেরিত নবী রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলে, আর তারই পরিণতি স্বরূপ চিরদিন দোজখের আজাব ভোগ করতে থাক।

قَوْلُهُ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا .... فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ : অর্থাৎ আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে আসা হবে। যখন তারা বেহেশতের নিকট উপস্থিত হবে এবং বেহেশতের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বেহেশতের দ্বার রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, জান্নাতে প্রবেশ কর চিরদিনের জন্য।

পূর্ববর্তী আয়াতে কিয়ামতের দিন দোজখীদের যে অবস্থা হবে তা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতে বেহেশতবাসীগণের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যারা সেদিন ভাগ্যবান হবেন তাদেরও বহু দল হবে। আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে বিশেষভাবে নৈকট্য-ধন্য ভাগ্যবানদের দলকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জান্নাতের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছানো হবে, এরপর যাদের মরতবা অপেক্ষাকৃত কম তাদেরকে আনা হবে। নবীগণ এবং তাদের সাথীগণকে আনা হবে, সিদ্দিক এবং শহীদগণকে আনা হবে, ওলামায়ে কেরাম এবং তাদের সাথীগণকে আনা হবে। এভাবে একের পর এক জান্নাতী লোকদের দলকে পৌঁছানো হবে। জান্নাতের দ্বার প্রান্তে তারা অপেক্ষা করবেন। এ মর্মে যে, সর্বপ্রথম কাকে অনুমতি দেওয়া হয়?

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দ্বারে করাঘাত করবো।

মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি যখন জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করবো, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি কে? আমি বলবো, মুহাম্মদ ﷺ। তখন সে বলবে আমার প্রতি হুকুম হয়েছে আপনার আগমনের পূর্বে কারো জন্যে যেন আমি জান্নাতের দ্বার না খুলি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসে আরো রয়েছে, সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় হবে। তাদের থুথু, নাকের পানি, প্রস্রাব-পায়খানা কিছুই থাকবে না, তাদের খাবার ও পান পাত্র এবং অন্যান্য আসবাবপত্র স্বর্ণ রৌপ্যের হবে। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর। -[আল হাদীস]

অন্য একখানা হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, প্রথমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় চমকদার হবে।

একথা শ্রবণ করে হযরত উক্কাশা ইবনে মোহসেন (রা.) আরজি পেশ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর একজন আনসারী সাহাবী অনুরূপ দোয়া করার জন্য আরজি পেশ কররেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, উক্কাশা তোমার পূর্বে সুযোগ নিয়ে ফেলেছেন। এ সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার কথা আরো বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাতশত একসঙ্গে জান্নাতে যাবে। একজন আরেকজনের হাত ধরে রাখবে, সকলে একসঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় হবে।

ইবনে আবি শায়বায় রয়েছে, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালক এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। আর প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরো সত্তর হাজার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। তাদের নিকট থেকে কোনো হিসাব নেওয়া হবে না এবং তাদের কোনো শাস্তিও হবে না। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা. ২৪, পৃ. ২২]

মুসনাদে আহমদে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি তার ধন সম্পদের জোড়া আল্লাহ তা'আলার রাহে ব্যয় করে। [অর্থাৎ একই বস্তু দুটি দান করবে] তাকে জান্নাতের সকল দ্বার থেকে ডাকা হবে। জান্নাতের কয়েকটি দ্বার রয়েছে, নামাজিকে 'বাবুস সালাত' থেকে এবং দানবীর ব্যক্তিকে 'বাবুস সাদাকাত' থেকে মুজাহিদ ব্যক্তিকে 'বাবুল জিহাদ' থেকে আর রোজাদারদেরকে 'বাবুর রাইয়্যান' থেকে ডাকা হবে। একথা শ্রবণ করে হযরত আবূ বকর (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদিও প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দ্বার থেকে কাউকে ডাকা হোক, কিন্তু এমন কেউ কি থাকবে, যাকে প্রত্যেক দ্বার থেকে ডাকা হবে। তখন হুজুর ﷺ ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, [তা হবে] আর আমি আশা করি যে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ১০৭]

বুখারী শরীফ ও মুসলিমে সংকলিত আরেকখানি হাদীসে রয়েছে, জান্নাতের আটটি দ্বার থাকবে, তন্মধ্যে একটির নাম হলো 'বাবুর রাইয়্যান' তাতে শুধু রোজাদাররাই থাকবে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিকভাবে অজু করে পাঠ করবে, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" তার জন্যে বেহেশতের আটটি দ্বার খুলে যাবে, যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর, [উর্দু] পা. ২৪, পৃ. ২২]

হযরত আলী (রা.) বলেছেন, যখন জান্নাতীগণকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, জান্নাতের প্রবেশ দ্বারের কাছে তারা একটি বৃক্ষ দেখতে পাবে, যার নীচ থেকে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। একটি ঝর্ণায় মুমিন ব্যক্তি গোসল করবে, ফলে তার দেহের বহিঃভাগ পবিত্র হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় ঝর্ণার পানি সে পান করবে ফলে সে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ করবে। ফেরেশতাগণ জান্নাতের দ্বার প্রান্তে তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে বলবেন- سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, জান্নাতে প্রবেশ কর চিরদিনের জন্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত জুযাজ (র.) বলেছেন– طِبْتُمْ শব্দটির অর্থ হলো, তোমরা দুনিয়াতে শিরক এবং পাপাচার থেকে পবিত্র ছিলে, তাই এ পবিত্র স্থানেও তোমরা আনন্দিত থাক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তোমাদের এ স্থানটি পবিত্র।

قَوْلُهُ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ : অর্থাৎ অতএব তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। অর্থাৎ যেহেতু তোমরা শিরক, কুফর এবং যাবতীয় নাফরমানি থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছ, অতএব পবিত্রতম স্থান জান্নাতে প্রবেশ কর, আর জান্নাতে তোমাদের অবস্থান সাময়িক নয়; বরং চিরস্থায়ী হবে। অতএব, এ বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নাফরমানি ও পাপাচার থেকে পবিত্রতা অর্জনই জান্নাতে প্রবেশের চাবিকাঠি হবে।

এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তির উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যার মর্ম হলো, যেহেতু জান্নাত পবিত্র স্থান তাই জান্নাতবাসীগণের আবাসস্থল হিসেবে তা নির্বাচিত হয়েছে যেমন কাফেরদের কুফরি ও নাফরমানিতে অপবিত্রতার জন্যে তারা দোজখে অবস্থানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ : উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগবাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনুমতিও দেওয়া হবে। –[তাবারানী]

আবূ নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গাম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরূপ দেখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা শুনে কোনো জবাব দিলেন না। অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ.) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন– وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا . এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গাম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-মু'মিন [গাফির]

নামকরণের কারণ : উল্লিখিত সূরাটি اَلْمُؤْمِنُ [আল-মু'মিন] নামে প্রসিদ্ধ। তবে এর আর একটি প্রসিদ্ধ নামও রয়েছে। তা হলো غَافِرٌ (গাফির)। আলোচ্য সূরাটির আটাশ নম্বর আয়াত "وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ" [ফেরাউনের বংশধরদের মধ্য হতে এক ঈমানদার ব্যক্তি বলল]। উক্ত আয়াতস্থ مُؤْمِنٌ শব্দটির দ্বারাই আলোচ্য সূরাটির নাম اَلْمُؤْمِنُ বলে রাখা হয়েছে। তাইতো এটি এমন একটি সূরা যাতে ঐ বিশেষ ঈমানদারের আলোচনা স্থান পেয়েছে যে সত্যের ধ্বজাধারী ও বাতিলের আতঙ্কের রূপ ধারণ পূর্বক পর্বতসম সৎসাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তৎকালীন স্বঘোষিত প্রভু ফেরাউন [লা'নাতুল্লাহি আলাইহি]-এর সম্মুখে পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

অপরদিকে সূরাটির তৃতীয় আয়াত (اَلْاٰيَةُ) غَافِرِ الذَّنْبِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِخَلْقِهِ হতে غَافِرٌ শব্দ চয়নে নামকরণ করা হয়েছে غَافِرٌ বলে। এতে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা সে মহান সত্তা যিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করতঃ তাদের পাপ মার্জনা করেন।

এতদুভয় ব্যতীত এ সূরাটিকে سُوْرَةُ الطُّوْلِ - سُوْرَةُ الْحٰمٓ এবং ذَاتُ حٰمٓ ও বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কুরআনে হাকীমের সর্বমোট সাতটি সূরার প্রারম্ভে অনুরূপ حٰمٓ [হা-মীম] রয়েছে। এদেরকে একত্রে اَلْحَوَامِيْمُ বলা হয়।

সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) লেখেছেন, এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীরকার আতা ও ইকরামা (র.)ও এ মতই পোষণ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বায়হাকীর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সাতটি সূরা 'হা-মীম' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে এর প্রত্যেকটিই মক্কায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা যুমারের প্রারম্ভে ওহীর সত্যতা তথা পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা ছিল। আর সূরা যুমারের পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁর বান্দাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য এবং গুণাবলি পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, আর এ সূরাও মহান আল্লাহর এমনি গুণাবলির বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যেমন– তিনি عَزِيْزٌ [পরাক্রমশালী], তিনি عَلِيْمٌ [মহাজ্ঞানী], তিনি غَافِرِ الذَّنْبِ [গুনাহ মার্জনাকারী], তিনি قَابِلِ التَّوْبِ [তওবা কবুলকারী], তিনি شَدِيْدِ الْعِقَابِ [অবাধ্য বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি প্রদানকারী], তিনি অনন্ত অসীম ক্ষমতাবান, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, সমগ্র মানব জাতিকে পরিশেষে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটির বিষয়বস্তুর আলোকে বুঝা যায় যে, এটা ইসলামের ঊষালগ্নে অবতীর্ণ হয়। তাফসীর সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও যায়েদ (রা.) -এর অভিমত হলো, সূরাটি সূরা যুমার-এর পর পরই নাজিল হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা যুমার নাজিল হয়েছে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে। নাজিল হওয়ার বিন্যাস অনুযায়ী সূরাটি সূরাসমূহের ক্রমধারায় যথাস্থানে স্থাপিত রয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কালে মক্কার সামাজিক অবস্থা : সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও ভাবধারার বর্ণনায় তৎকালীন মক্কার সামাজিক অবস্থা অনেকটা ফুটে উঠে। মক্কার কাফের ও মুশরিকরা তখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর আনীত দীন ইসলামকে ঘিরে দু ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

১. মক্কার অধিবাসী। যারা ছোটবেলা হতেই মহানবী ﷺ-কে সত্যবাদী আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আজ তারাই হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে জাগতিক চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে নবী জন্মভূমি মক্কা তথা তার প্রত্যন্ত প্রান্তে বিশ্বনবীর আনীত দীনের ও তাঁর সার্বজনীন সংবিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সত্যতা চ্যালেঞ্জে বিতর্ক জুড়ে দেয়। শুরু করে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, নানান ধরনের অপ্রাসঙ্গিক উল্টা-পাল্টা প্রশ্নের উত্থাপন। নব নব ভিত্তিহীন অভিযোগের গণজাগরণে তখনকার আকাশ বাতাস ভারি ছিল। ইসলামের দাওয়াত, কুরআনের শিক্ষার এমনকি স্বয়ং নবী করীম ﷺ সম্পর্কে মানুষের মনে ক্রমাগত নানান সন্দেহ-সংশয়ের জাল বুনার গভীর ষড়যন্ত্রে ব্যাপ্ত ছিল গোটা বেদীন শক্তি। তা নিরসনে মহানবী ﷺ ও ঈমানদারগণ যেন শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েন। এরই ফল হলো নবীজির মদীনা হিজরত।

২. ইসলাম বিদ্বেষীরা মহানবী ﷺ -এর রক্ত পিপাসু হয়ে উঠে। নবী করীম ﷺ -কে শহীদ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। এহেন হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দৃঢ়সংকল্পে তারা ষড়যন্ত্রের ক্রমধারা অব্যাহত রাখে। একবার তা বাস্তবায়ন করার কল্পে পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। এ পরিসরে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম ﷺ হেরেম শরীফে নামাজেরত ছিলেন, এমন সময় উকবাহ ইবনে আবী মুয়ায়িত অগ্রসর হয়ে মহানবী ﷺ -এর গলায় একটি কাপড় পেঁচিয়ে তাঁকে পাকাতে ও টানতে লাগল। মূলত গলায় ফাঁস লাগিয়ে নবী করীম ﷺ -কে হত্যা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি সজোরে ধাক্কা মেরে উকবাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত উকবার সাথে ধস্তাধস্তির সময় বলছিলেন– "أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ" অর্থাৎ 'তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যে বলছেন আল্লাহ আমার প্রভু!'

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় তিনটি বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১. তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরিক নেই। এ তাওহীদের বর্ণনা কোথাও ইসতিদলালী তথা তা দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন এবং কোথাও কোথাও তার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনিভাবে কুফর হতে নিষেধাজ্ঞা, আবার কোথাও তাওহীদের ধারক-বাহকদের প্রশংসা আর সুসংবাদ।

২. বিবাদ সৃষ্টিকারী কাফের মুশরিকদেরকে ধমকি প্রদান। সত্যের ব্যাপারে এ বিবাদ সৃষ্টিকারীরা ব্যাপক। সুতরাং রাসূলকে অস্বীকারকারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠোর শাস্তির ধমকি দেওয়া হয়েছে।

৩. মক্কার কাফের মুশরিক কর্তৃক মহানবী ﷺ -কে নানান লাঞ্ছনা-প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, অপপ্রচার এমনকি জীবন নাশের ব্যর্থ পরকল্পনায় রাসূল ﷺ যখন বিচলিত এ দিকে মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবের এ অসহায়তাবোধকে দূরীকরণে এবং স্বীয় মিশন পরিচালনায় প্রত্যয়ী থাকার জন্য সান্ত্বনা দেন। তাই এ পরিসরে বর্ণনায় বিস্তারিত স্থান পায় হযরত মূসা (আ.) ও মারদূদ ফেরাউনের মধ্যকার ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয়ের বাণী শুনানো। সাথেই অতীতের পয়গাম্বরগণের প্রেরণ ও সমকালীন নির্যাতন ও বাধাবিপত্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ সূরার রৌনক।

উল্লেখ্য, সূরা মু'মিন হতে সূরা আহকাফ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাতটি সূরা حٰمٓ (হা-মীম) দ্বারা শুরু হয় অথচ এ সবগুলোর প্রারম্ভিক আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন আর হলো কুরআন আল্লাহর ওহী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরাটির সারসংক্ষেপ : পূর্বের আলোচনায় এসেছিল যে, আলোচ্য সূরাতে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে. অর্থাৎ ক. تَوْحِيْد তথা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে তাঁর প্রভুত্বে ও ইবাদতে কাউকে শরিক না মানা। খ. ইসলাম ও তার পয়গাম্বরের বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতির সংবাদ দান। গ. বিরুদ্ধবাদীদের হিংসা ও কার্যকলাপে বিচলিত না হতে আল্লাহ কর্তৃক তদীয় রাসূলকে সান্ত্বনা প্রদান ইত্যাদি। কুরআন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এগুলোর যথাস্থানে যথোপযোগী পরিসরে অত্যন্ত প্রাণবন্ত, প্রভাবশালী ও প্রশিক্ষণের ধারায় সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা প্রদত্ত হলো–

১. কাফেরদেরকে বলা হয়েছে আজ তোমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যে নৃশংস আচরণ করে আসছ ঠিক শত শত বৎসর পূর্বে ফেরাউন ও তার বাহিনী ক্ষমতার দম্ভে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুগামীদের সাথে অনুরূপ করতে চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদের জেনে রাখা চাই যে, ফেরাউন ও অনুগত বাহিনীর যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তোমাদেরকেও তার ভাগ্য বরণ করতে হবে।

২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে সান্ত্বনামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, জালিমদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের মোকাবিলায় তোমরা নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না এবং হিম্মতহারা হয়ো না। তোমাদের বুকে এ অটুট বিশ্বাস বেঁধে নাও যে, তোমরা যে মহান সত্তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সম্মুখ সফর করছ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে সকল শক্তি ও ক্ষমতা তুচ্ছ। তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার স্মরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর।

জালিম তথা তাগুতের হুঙ্কার, অত্যাচার ও ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলার বিপরীতে একটি অন্যতম অস্ত্র হলো– اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَ رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার ও তোমাদের রবের নিকট প্রত্যেক অহঙ্কারী হতে যে হিসাব-নিকাশের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে না।

একটি মন্তব্য : আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক ভরসা করতঃ সর্বপ্রকার ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে দীনের হিতে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে, পেয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। এ কালের ফেরাউনরাও সে অবস্থায় সম্মুখীন হবে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সে কালের ফেরাউনরা। সে সময়টা আসা পর্যন্ত অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীম-রোলার যতই বেগবান হয়ে আসুকনা কেন তার সবটাই অপূর্ব ধৈর্য সহকারে মোকাবিলা করে দীনের মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা উচিত।

৩. সত্য দীনের ব্যাপারে মক্কায় দিবারাত্র যে বিতর্ক চলছিল তা নিরসনকল্পে একদিকে যেমন দলিল ও যুক্তি দ্বারা তাওহীদ ও পরকালের বাস্তবতা প্রমাণ করে দেওয়া হলো। মক্কাবাসী কাফের মুশরিকরা কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ ব্যতীতই এ মহান সত্যনিষ্ঠ কথাগুলোর বিরুদ্ধে অযথাই কলহ-বিবাদে লিপ্ত তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হলো। বাইরে তারা দেখছিল যে, নবী করীম ﷺ -এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধেই তাদের মূল অভিযোগ-আপত্তি। এজন্যই তারা তা মেনে নিতে পারছিল না। বস্তুত তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বেই লিপ্ত ছিল। সুতরাং স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তোমাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত অহমিকা ও অহঙ্কারবোধই হলো বিশ্ব স্রষ্টার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নেতৃত্ব স্বীকার না করাও আনুগত্য না করার মূল কারণ। তোমাদের কাপুরুষিত ধারণা মতে হযরত মানুষেরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত মেনে ইসলামি দর্শনের উপর চললেই বুঝি তোমাদের নেতৃত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এজন্যই তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছ।

অতএব, কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো– তোমরা মুহাম্মদের বিরোধিতার ধ্বংসশীল প্রাচীর হতে বেরিয়ে তাঁর সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করো। তা না হয় দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদায়ক আজাব ও প্রবঞ্চনা তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ। সেদিন অতীতের সব ভুল স্মরণ পড়বে। দম্ভ আর গৌরবের কেল্লা মিসমার হয়ে যাবে। হাজারো আফসোস, অনুতাপ আর অনুনয়-বিনয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারবে না। পরন্তু তোমাদের সামনে তওবারও সুযোগ থাকবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরাটির বৈশিষ্ট্য ও ফজিলত :

১. বায়হাকী প্রিয়নবী ﷺ -এর একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, আলে হামীম (অর্থাৎ যে সমস্ত সূরা حٰمٓ [হা-মীম] শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে) সাতটি, আর দোজখের দরজাও সাতটি, ১. জাহান্নাম, ২. হুতামাহ, ৩. লামা, ৪. সাঈর, ৫. সাকার, ৬. হাবীয়াহ ও ৭. জাহীম। যারা এ হা-মীম বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করবে, এর প্রত্যেকটি দোজখের দরজা থেকে তাকে রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করবে। -[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী, ৬/১০৯]

২. আল্লামা বাগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক বস্তুরই মগজ থাকে, পবিত্র কুরআনের মগজ হলো হা-মীম বিশিষ্ট সূরাসমূহ।

৩. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, "اٰلُ حٰمٓ" কুরআন মাজীদের রেশমি বস্ত্র অর্থাৎ সৌন্দর্য। -[হাকিম]

৪. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লেখেছেন, 'হা-মীম' আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্যতম।

-[তাফসীরে ইবনে কাছীর, (উর্দু) পারা-২৪, পৃ- ২৫]

৫. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম, ইমাম কাতাদা (র.)ও একথাই বলেছেন।

-[তাফসীরে তাবারী, পারা-২৪, পৃষ্ঠা- ২৬]

৬. **বিপদ-আপদ হতে হেফাজত :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, দিনের শুরুতে যদি কেউ আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত [অর্থাৎ حٰمٓ হতে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত] তেলাওয়াত করে সে উক্ত দিবস সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্ত থাকবে। -[তিরমিযী, মুসনাদে বায়যাবী]

৭. **শত্রুর অনিষ্ট হতে হেফাজত :** হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবূ সুফরাহ (র.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। মহানবী ﷺ কোনো যুদ্ধে রাত্রিবেলা হেফাজতের জন্য বলেছেন- তোমাদের উপর যদি রাত্রে আক্রমণ করা হয়, তাহলে তোমরা حٰمٓ ..... لَا يُنْصَرُوْنَ পড়বে। এর সারকথা হলো حٰمٓ -এর সাথে এ দোয়া করবে যে, "আমাদের দুশমন সফল না হোক।" এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, حٰمٓ শত্রুর ত্রাস হতে নিরাপত্তা পাওয়ার সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে কাছীর]

চরিত্র সংশোধনে অত্র সূরার ভূমিকা : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) ইবনে আবূ হাতেম হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে সিরিয়ায় একজন প্রভাবশালী সুপুরুষ ছিলেন। কিছু দিন যাবৎ সে আসছিল না। হযরত ওমর (রা.) লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন তারা বলল, আমীরুল মু'মিনীন! তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন না। সে তো এখন মদ্যপানে ব্যস্ত রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) তাঁর লেখককে ডেকে নিম্নোক্ত ভাষায় একখানা পত্র লেখতে বললেন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذُو الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

অতঃপর উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, আপনারা দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন তার কলবকে ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল করেন। হযরত ওমর (রা.) একজন বাহকের মাধ্যমে উক্ত পত্রখানা পাঠালেন। আর বাহককে বলে দিলেন, সে যেন লোকটির হুঁশ ফিরে আসার পর তার হাতে পত্রখানা দেয়, অন্য কারো নিকট যেন তা সোপর্দ করে না আসে। হযরত ওমরের পত্র পেয়ে লোকটি তা বারংবার পাঠ করতে থাকে এবং ভাবল যে, এতে আমাকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে তো ক্ষমার পতিশ্রুতিও বিদ্যমান। অতঃপর কাঁদতে লাগল এবং মদ্যপান হতে ফিরে আসল। এমনি তওবা করল যে জীবনে সে আর মদ স্পর্শ করেনি।

سُوْرَةُ غَافِرٍ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-গাফির বা মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ الْآيَتَيْنِ خَمْسٌ وَثَمَانُوْنَ آيَةً

কিন্তু اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ আয়াতদ্বয় মাদানী, আয়াত সংখ্যা- ৮৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

১. হা-মীম। এটার উদ্দিষ্ট অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন।

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهٗ اَلْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ اَلْعَلِيْمِ بِخَلْقِهٖ ـ

২. এ কিতাবটি অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ) আল-কুরআন মুবতাদা আল্লাহর পক্ষ হতে মুবতাদার খবর যিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজ্যে সর্বজ্ঞাত নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে।

٣. غَافِرِ الذَّنْبِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَقَابِلِ التَّوْبِ لَهُمْ مَصْدَرٌ شَدِيْدِ الْعِقَابِ لِلْكَافِرِيْنَ اَىْ مُشَدِّدُهٗ ذِى الطَّوْلِ ط اَىِ الْاِنْعَامِ الْوَاسِعِ وَهُوَ مَوْصُوْفٌ عَلَى الدَّوَامِ بِكُلٍّ مِنْ هٰذِهِ الصِّفَاتِ فَاِضَافَةُ الْمُشْتَقِّ مِنْهَا لِلتَّعْرِيْفِ كَالْاَخِيْرَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ ـ

৩. গুনাহ মার্জনাকারী ঈমানদারদের এবং তওবা কবুলকারী তাদের জন্য [اَلتَّوْبِ শব্দটি] মাসদার। কঠিন শাস্তি প্রদানকারী কাফেরদের জন্য অর্থাৎ কাফেরদের শাস্তিকে কঠোরতা দানকারী। অনুগ্রহকারী অর্থাৎ ব্যাপক অনুগ্রহ প্রদানকারী। প্রোক্ত এসব গুণাবলির দ্বারা তিনি সদাসর্বদা গুণান্বিত। উক্ত সিফাতসমূহের মুশতাক তথা ইসমে ফায়িল-এর ইযাফত মা'রিফা বা নির্দিষ্ট করার জন্য, যেমনটি শেষোক্তটি (ذِى الطَّوْلِ) -এর ক্ষেত্রে হয়েছে। তিনি ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

٤. مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ لِلْمَعَاشِ سَالِمِيْنَ فَاِنَّ عَاقِبَتَهُمُ النَّارُ ـ

৪. আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে কেউই বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় না। আল-কুরআনের ব্যাপারে তবে কাফেররা মক্কাবাসীদের মধ্য হতে সুতরাং বিভিন্ন দেশে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। জীবিকা উপার্জনে আরাম-আয়েশে থাকা। কেননা তাদের পরিণাম হলো জাহান্নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْاَحْزَابُ كَعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمْ ص وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَأْخُذُوْهُ يَقْتُلُوْنَ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا يُزِيْلُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ قف بِالْعِقَابِ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ لَهُمْ اَيْ هُوَ وَاقِعٌ مَوْقِعَهُ.

৫৫. তাদের পূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিও রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল। এ ছাড়া অন্যান্য জাতিরাও যেমন– আদ, ছামূদ ও অপরাপর জাতিরা তাদের পরে। প্রত্যেক জাতিই তাদের রাসূলের ব্যাপারে ফন্দি এঁটেছিল তাঁকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য আর তারা অযথা-অকারণে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল যেন তারা হটায়ে দিতে পারে, বিদূরিত করতে পারে তা দ্বারা সত্যকে অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। সুতরাং আমার এ শাস্তি প্রদান কেমন হলো? তাদেরকে অর্থাৎ তা যথাস্থানেই পতিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

আয়াতাংশে غَافِرٌ . قَابِلٌ ও شَدِيْدٌ . قَابِلٌ -এর মহল্লে ই'রাব কি? জমহুর তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতাংশের শব্দত্রয় قَابِلٌ ও غَافِرٌ কে 'মাজরূর'-এর মহল হিসেবে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ তাদের মতানুসারে এগুলো مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ [মহল্লান মাজরূর]। তবে কিসের বিবেচনায় মাজরূর হবে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে–

১. নাহুশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম ফাররা (র.) বলেছেন–قَابِلِ التَّوْبِ - غَافِرِ الذَّنْبِ ও شَدِيْدِ الْعِقَابِ এরা পূর্ববর্তী اَللّٰهُ শব্দ -এর صِفَتٌ হিসেবে অবস্থান করছে। আর আল্লাহ শব্দটি যেহেতু এখানে مَجْرُوْرٌ বা যের বিশিষ্ট হয়েছে সেহেতু এরাও মাজরূর হবে।

২. ইমাম মু'আয (র.) বলেছেন, এখানে শব্দত্রয় غَافِرٌ - قَابِلٌ ও شَدِيْدٌ তৎপূর্ববর্তী اَللّٰهُ শব্দ হতে بَدَلٌ হওয়ার কারণে مَجْرُوْرٌ বা যের বিশিষ্ট হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, اَللّٰهُ শব্দ হতেও حَالٌ হওয়ার কারণে এগুলো مَنْصُوْبٌ তথা যবর বিশিষ্ট হবে।

"شَدِيْدُ الْعِقَابِ" ইযাফাতে লাফযিয়াহ। অথচ اِضَافَةٌ لَفْظِيَّةٌ মা'রিফার অন্তর্ভুক্ত নয়; সুতরাং এটা কিভাবে اَللّٰهُ শব্দের সিফাত হবে? অত্র আয়াতে شَدِيْدُ الْعِقَابِ টা ইযাফতে লাফযিয়াহ -এর শ্রেণিভুক্ত। এটা দ্বারা تَخْفِيْفٌ তথা হালকাকরণ হলেও تَعْرِيْفٌ বা নির্দিষ্টকরণ অর্জিত হয় না। কাজেই তা কিভাবে اَللّٰهُ শব্দটির সিফাত হতে পারে? কেননা اَللّٰهُ মা'রিফাহ আর মা'রিফার সিফাত মা'রেফাহ হওয়াই শর্ত। মুফাসসিরীনে কেরাম এটার নানানভাবে উত্তর প্রদান করেছেন–

ক. পূর্বেকার দুটি مَعْرِفَةٌ সিফাত তথা اَلْعَزِيْزُ ও اَلْعَلِيْمُ ইত্যাদি এর সাথে হওয়ার কারণে এটা نَكِرَةٌ হয়েও مَعْرِفَةٌ অর্থাৎ اَللّٰهُ শব্দের সিফাত হতে পেরেছে।

খ. এটা اَللّٰهُ এর সিফত নয়; বরং اَللّٰهُ হতে حَالٌ (অবস্থাজ্ঞাপক) হয়েছে। আর حَالٌ টা نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্টই হয়ে থাকে।

গ. অত্র শব্দটি নাকিরাহ হলেও যেহেতু এদের মধ্যে دَوَامٌ ও اِسْتِمْرَارٌ (সদা-সর্বদা)-এর অর্থ বিদ্যমান সেহেতু এটা মা'রিফার সিফাত হওয়া বৈধ হয়েছে।

ঘ. এটা সিফাত নয়; বরং اَللّٰهُ শব্দ হতে بَدَلٌ হয়েছে। কায়েদা রয়েছে–نَكِرَةٌ মা'রিফাহ হতে بَدَلٌ হতে পারে।

ঙ. আলোচ্য শব্দটির মধ্যে حَالٌ ও اِسْتِقْبَالٌ (বর্তমান ও ভবিষ্যতে)-এর অর্থ বিদ্যমান। তাই তা نَكِرَةٌ হয়েও مَعْرِفَةٌ হতে সিফাত হতে পেরেছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

"وَهُوَ مَوْصُوْفٌ عَلَى الدَّوَامِ" বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার কি বুঝাতে চেয়েছেন? উল্লিখিত বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকার একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আলোচ্য আয়াতে غَافِرْ . قَابِلْ ও شَدِيْد শব্দত্রয় مُشْتَقْ "ইসমে যাত" নয়। আর ইসমে মুশতাক مُضَافْ হলেও مَعْرِفَهْ হয় না। তাই এ শব্দত্রয়ও اِضَافَتْ -এর কারণে مَعْرِفَهْ হবে না। তাহলে কিভাবে এরা একটি مَعْرِفَهْ তথা اَللّٰه -এর সিফত হতে পারে? অথচ" مَعْرِفَه -এর صِفَتْ হওয়ার জন্য مَعْرِفَهْ হওয়া জরুরি।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, اَسْمَاءُ مُشْتَقَّهْ -এর মধ্যে دَوَامْ ও اِسْتِمْرَارْ তথা সদাসর্বদার অর্থ পওয়া গেলে তারা مَعْرِفَهْ-এর উপকারিতা দেয় অর্থাৎ মা'রিফা-এর صِفَتْ হওয়ার যোগ্যতা পেয়ে যায়। কাজেই বিজ্ঞ গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, আলোচিত গুণাবলি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সদাসর্বদা গুণান্বিত হওয়ার কারণে এরা اِسْمُ مُشْتَقْ হওয়া সত্ত্বেও مَعْرِفَهْ হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং اَللّٰهُ যা مَعْرِفَهْ তার সিফাত হওয়া বৈধ হয়েছে। সুতরাং সহজেই অনুধাবন হলো যে, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) স্বীয় বক্তব্য وَهُوَ مَوْصُوْفٌ عَلَى الدَّوَامِ بِكُلِّ مِنْ هٰذِهِ الصِّفَاتِ الخ দ্বারা উপরিউক্ত আলোচনার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

বিজ্ঞ মুফাসসির (র.) شَدِيْدِ الْعِقَابِ -এর তাফসীর مُشَدَّدُهْ দ্বারা কেন করলেন? বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জালালাইনের দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থকার আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) আলোচ্যাংশে شَدِيْدِ الْعِقَابِ -এর তাফসীর করেছেন مُشَدَّدُهْ এর দ্বারা। এর দ্বারা তিনি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি হলো شَدِيْد শব্দটি صِفَتْ مُشَبَّهْ আর সিফতে মুশাব্বাহ তার فَاعِلْ বা কর্তার দিকে اِضَافَتْ করা হলে তা اِضَافَتْ لَفْظِيَّهْ হয়ে থাকে, اِضَافَتْ لَفْظِيَّهْ দ্বারা مَعْرِفَهْ হয় না। এমনকি اِضَافَتْ ও دَوَامْ ও اِسْتِمْرَارْ-এর অর্থ প্রকাশ করলেও তা মা'রিফার صِفَتْ হতে পারে না। এর উত্তরে গ্রন্থকার বলেছেন, উল্লিখিত اِضَافَتْ টি اِضَافَتْ لَفْظِيَّهْ হিসেবে নয়; বরং ইযাফতে হাকীকিয়াহ। সুতরাং شَدِيْد শব্দটি এখানে صِفَتْ হিসেবে নয়; বরং ইসমে ফায়েল-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

"فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ" আয়াতাংশের শুরুতে فَاءْ অব্যয়টি কোন অর্থে ব্যবহৃত : আলোচ্য আয়াতাংশের প্রারম্ভে (فَلَا يَغْرُرْكَ الخ) فَاءْ বর্ণটি উহ্য শর্তের جَزَاءْ তথা শর্তের জবাব নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ ফা'টির নাম فَاءْ جَزَائِيَّهْ বাক্যটি হবে নিম্নরূপ- "وَاِذَا عَلِمْتَ اَنَّهُمْ كُفَّارٌ فَلَا تَحْزَنْ وَيَغْرُرْكَ اِمْهَالُهُمْ فَاِنَّهُمْ مَاخُوْذُوْنَ عَنْ قَرِيْبٍ" অর্থাৎ যখন তুমি অবগত হবে যে, তারা কাফের, তখন তুমি চিন্তিত হয়ো না এবং তাদেরকে ঢিল দেওয়াটা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ঠেলে দেয়। নিশ্চয়ই তাদেরকে অচিরেই পাকড়াও করা হবে। উক্ত আরবি গোটা অংশটা جَزَاءْ [জাযা] আর جَزَاءْ -এর শুরুতে فَاءْ এসে থাকে।

"فَكَيْفَ كَانَ عِقَابْ" -এর জবাব কি? : আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ইরশাদ "فَكَيْفَ كَانَ عِقَابْ" অর্থাৎ সুতরাং আমার আজাব কিরূপ ছিল? আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জবাব নিজে না দিয়ে পাঠক চিন্তাবিদের কাছে ছেড়ে দেন। এর জবাব লুপ্ত রয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এর জবাব হলো- كَانَ عَذَابِىْ شَدِيْدًا অর্থাৎ আমার আজাব অত্যন্ত কঠিন ছিল। আসলে এ ধরনের স্থানে পাঠক বা শ্রোতাদের মনোযোগ এ রহস্য উদঘাটনের জন্য বক্তা এরূপ অসম্পূর্ণ বলে থাকে। এটা ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি পাঠ।

حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ এ- حٰمٓ -এর বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : মুফাসসিরীনে কেরাম ও কারীগণ (র.) হতে অত্র حٰمٓ শব্দটিতে নানাবিধ কেরাত বর্ণিত আছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো-

১. জমহুর মুফাসসিরীন অপরাপর حُرُوْفْ مُقَطَّعَاتْ -এর ন্যায় এর মীম বর্ণটিতে সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

২. ইমাম ইবনে আবূ ইসহাক ও আবূ সাম্মাক (র.) দুটি সাকিন এক হওয়ার কারণে حٰمٓ -এর مِيْم -কে যের দিয়ে পড়েছেন। অথবা, তা উহ্য কসমের কারণে যেরবিশিষ্ট হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. ইমাম যাওহারী (র.) حٰمٓ -এর মীম অক্ষরটিতে পেশ দিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মতে এটা উহ্য مُبْتَدَأ -এর খবর অথবা তা মুবতাদা এবং এর পরবর্তী বাক্য تَنْزِيْلُ الْقُرْاٰنِ الخ উহ্য خَبَرْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হবে।

৪. ইমাম ঈসা ইবনে ওমর সাকাফী (র.) حٰمَ -কে مَنْصُوْبْ পড়েছেন। তাঁর মতে তা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل অথবা এটা فَتْحٌ (যবর)-এর উপর মাবনী হবে।

"فَلَا يَغْرُرْكَ" আয়াতাংশের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : উক্ত আয়াতাংশে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ فَلَا يَغْرُرْ -এর দুটি رَا -কে পৃথক পৃথক ইদগাম না করেই পড়েছেন। যেমন নাকি এখানে রয়েছে।

২. আর হযরত যায়েদ ইবনে আলী ও ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (র.) উক্ত শব্দের মধ্যে দুটি "ر" -কে ইদগাম করে পড়েছেন। সুতরাং তাঁদের মতের ভিত্তিতে শব্দটি এরূপ হবে- فَلَا يَغُرُّكَ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হা-মীম সম্পর্কিত শানে নুযূল : তাফসীর সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, حٰمٓ [হা-মীম] "ইসমে আ'যম" আর الٓرٰ - حٰمٓ এবং ن এগুলো اَلرَّحْمٰنُ -এর হরূফে মুকাত্তা'আত।

"مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ" **-এর শানে নুযূল :** সাহাবী হযরত আবূ মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াত مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ হারিছ ইবনে কায়েস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

মক্কার কুরাইশরা শীতকালে ইয়েমেনে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে বের হতো আর গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায়। বায়তুল্লাহর খাদিম হওয়ার সুবাদে গোটা আরবেই তারা বিশেষ মর্যাদা পেত। কাজেই তারা সফরে নিরাপদে নির্বিঘ্নে ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হতো। এ কারণেই তাদের সম্পদ ও নেতৃত্ব অটুট থাকত। হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর আনীত দীন ইসলামের ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব বহাল তবিয়তে থাকার কারণে তারা দম্ভ-অহমিকায় মেতে থাকত। তারা বলত আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট অপরাধী হিসেবে গণ্য হলে তিনি আমাদের এ ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিতেন।

এতে কিছু কিছু মুসলমানদের মাঝেও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। ঠিক তখনই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে তাদের সে সংশয় দূরীভূত করেন। আল্লাহ জাল্লাশানুহু এতে ইরশাদ করেন যে, তিনি বিশেষ হেকমত ও মাসলাহাতের কারণে কিছু দিন তাদেরকে অবকাশ প্রদান করেছেন। এতে মুসলমানদের বিচলিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। এ কারণে যে, শীঘ্রই বিরুদ্ধবাদীদের উপর আজাব নাজিল হবে। তারা দুনিয়ার ইতিহাসে ঘৃণিত অধ্যায় রচনা করবে। ওদিকে পরকালে জাহান্নামের অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করবে।

تَوْضِيْحُ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "حٰمٓ" :

হা-মীম-এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ : হা-মীম-এর অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণে হযরত মুফাসসিরীনে কেরামের নানান অভিমত পাওয়া যায়।

১. জমহুর তাফসীরকারগণ উক্ত حٰمٓ ও অপরাপর হুরূফে মুকাত্তা'আতের ব্যাপারে বলেন, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহই অবগত আছেন। তবে অনেকের মতে আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল ﷺ-কে এর অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। নতুবা আল্লাহ কর্তৃক কাউকে خِطَابٌ বা সম্বোধনে ব্যবহৃত অবোধগম্য শব্দ প্রয়োগ বৃথা প্রমাণিত হবে। মোদ্দকথা, তাঁদের মতে, এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা একমাত্র তাঁরই অবগত। জালালাইন গ্রন্থকার প্রখ্যাত তাফসীরকার শাইখুল ইসলাম আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) জমহুরের সাথেই রয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেছেন- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) 'হা-মীম' -এর তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন, (ক) এটি আল্লাহ তা'আলার ইসমে আ'যম। (খ) এটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (গ) 'আর রহমান' শব্দকে সংক্ষিপ্ত করে 'হা-মীম' বলা হয়েছে। অভিধান বিশেষজ্ঞ যুজাজও এ মতই পোষণ করতেন।

৩. প্রখ্যাত তাফসীরকার সাঈদ ইবনে জুবাইর এবং 'আতা খোরাসানী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামসমূহ হাকীম, হামীদ, হাইয়্যুন, হান্নান থেকে 'হা' গ্রহণ করা হয়েছে। আর মালিক, মাজীদ এবং মান্নান এ পবিত্র নামসমূহ হতে 'মীম' গ্রহণ করা হয়েছে, আর এভাবেই 'হা-মীম' হয়েছে।

৪. ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, حٰمٓ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের একটি এবং এটা তোমার রবের কোষাগারের চাবিকাঠি।

৫. হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, حٰمٓ কুরআনে কারীমের একটি নাম।

৬. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, এক বেদুইন নবী করীম ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন حٰمٓ কি? তা আমাদের ভাষায় আছে বলে আমরা জানি না। নবী করীম ﷺ জবাব দিলেন, তা আল্লাহ তা'আলার নামের সূচনা এবং কুরআনের সূরাসমূহের নামের ভূমিকা।

৭. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তা সূরার ভূমিকা।

৮. ইমাম কেসায়ী (র.) বলেছেন, হা-মীম অর্থ হলো যা কিছু হবার তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাঁর মতে, হা-মীম অর্থ হলো 'হুম্মা'। -[তাফসীরে মাযহারী-১০/২১০]

মূলত: এতসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরও তার প্রকৃত অর্থ অস্পষ্টতার বেষ্টনিতে আবদ্ধ থেকে যায়।

"تَنْزِيْلٌ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন কোনো মানব রচিত গ্রন্থ নয় তথা কুরআনে কারীম মুহাম্মদ ﷺ -এর মনগড়া কোনো সংলাপ নয়। হে কুরাইশ তথা মক্কাবাসীরা তোমাদের ধারণা মতে এটা মুহাম্মদের স্বরচিত কোনো গ্রন্থ হবে? না এমন কিছুই নয়। বরং এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সুব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করেছি। সমগ্র মানব ও জিন জাতির হেদায়েতের জন্যে। এতে কোনো সৃষ্টির হাত নেই। এর সব কিছুই মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলারই। এ জন্যই তিনি এটার হেফাজত করছেন, কালের আবর্তনে তাতে কোনো পরিবর্তন হয় না। এতে মহান প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানবজাতির জন্য সাম্রাজ্য পরিচালনার সকল নীতি নির্ধারণ করেছেন। কারো মনের বিরুদ্ধে কোনো ইতিবাচক নীতি বিধান বাধ সাধলেও এ গ্রন্থে প্রণীত শাশ্বত বিধান অটুট থাকবে।

যে আল্লাহর পক্ষ হতে এ মহাগ্রন্থ নাজিল হয়েছে সে সত্তা অসংখ্য গুণের আধার। স্থানের ও সময়ের প্রয়োজনে বিশেষিত গুণগুলো আলোকপাত করা হয়েছে। যার সূত্রপাত হয় اَلْعَزِيْزُ হতে।

اَلْعَزِيْزُ-এর বিশ্লেষণ : যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর পক্ষ হতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। عَزِيْزٌ (আযীয) এমন সত্তাকে বলে যিনি কিছু করতে চাইলে তাঁকে কোনো শক্তি প্রতিরোধ করতে পারে না। যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে অন্য কেউ কিছু করতে চাইলে তাতে তাঁর অনুমতি তথা তৌফিকের প্রয়োজন হয়। তাইতো তিনি পরাক্রমশালী। মোটকথা, তিনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। না পারে কেউ তাঁর সাথে লড়াই করে বিজয়ী হতে আর না পারে তাঁর পাকড়াও হতে পরিত্রাণ পেতে। নিশ্ছিদ্র ইস্পাত কঠিন সিন্দুকের ভেতরের খবর তিনি রাখেন। অথৈ সমুদ্রের গহীন জলরাশির তলদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বেখবর নন তো সপ্তাকাশের উর্ধ্বে তাঁর আরশ কুরসী, লৌহ-কলম। উষালগ্নেও তিনি সূর্যাস্তেও তিনি। সুতরাং তাঁর আদেশ ও আজ্ঞা অমান্য করে কেউ কামিয়াব হতে পারে না। পাবে না সে সফলতা তাঁর মহান রাসূলকে পরজিত করার পরিকল্পনায়। কেউ এমনটি করতে চাইলে তা তার একমাত্র নির্বুদ্ধিতা আর বোকামিরই পরিচায়ক হবে বৈ অন্য কিছু নয়। নিঃসন্দেহে তার বা তাদের এরূপ পরিকল্পনার গুড়েবালি মেখে হাওয়া ভেস্তে যাবে। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তাদের তাবত হীন ষড়যন্ত্র।

عَلِيْمٌ-এর বিশ্লেষণ : যিনি عَلِيْمٌ (আলীম) তথা মহাজ্ঞানী, যাঁর নিকট কোনো কিছু গোপন নেই। যিনি কোনো রূপ ধারণা প্রসূত অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কথা বলেন না। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর রয়েছে মহা প্রজ্ঞাময় নিখুঁত জ্ঞান। সুতরাং সৃষ্টি জগতের কল্পনাশক্তির আওতা বহির্ভূত জগতের যেসব তথ্যাবলি তিনি পরিবেশন করবেন কেবল সেটাই সংশয়াতীতভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে। এ পরিসরে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির প্রসারের এ যুগেও কোনো তথ্যবিদ শতভাগ নিষ্কলুষ তথ্যবহুল সমাধান দানে সামর্থ্য হতে পারেনি, পারছে না এবং পারবেও না। তাইতো তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বিশ্ব বিভ্রাটও তত বেশি ঘটছে।

অথচ মহান আল্লাহ জ্ঞাত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি কিসে, কোন সব নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ তাদের কল্যাণের জন্য অতীব জরুরি। তাঁর প্রতিটি শিক্ষাই অকাট্য যুক্তি ও নির্ভুল জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তাতে ভুল-ভ্রান্তির কোনোরূপ আশঙ্কা নাই। এছাড়া মানুষের তৎপরতা ও গতিবিধির কোনো কিছুই তাঁর অজান্তে থাকা অসম্ভব। তাইতো তিনি সবজান্তা। এভাবে মানুষের কাজকর্মের মূল উদ্বোধক যে নিয়ত, মনোভাব ও ইচ্ছা-বাসনা তাও তাঁর নিকট লুপ্ত কিছু নয়। অতএব মানুষের পক্ষে মহা দিব্যিদৃষ্টি সম্পন্ন আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিকে এড়িয়ে তাঁর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর হবে না।

"غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوْبِ وَشَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াত হতে শুরু করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু গুরুত্বপর্ণ সিফাত বা গুণাবলি তুলে ধরেছেন। অত্র আয়াত তারই ধারাবাহিকতা। আল্লাহ বলেন, তিনি "غافر الذنب قابل التوب" অর্থাৎ তিনি ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ মার্জনাকারী এবং তওবা কবুলকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ বাক্যগুলোর তাফসীরে বলেছেন, যে ব্যক্তি কালিমায়ে তাইয়্যিবা পাঠ করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এমনিভাবে কালিমায়ে তাইয়্যিবা বিশ্বাস স্থাপনকারীর তওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলার এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিশেষ কোনো যুগ নির্দিষ্ট নেই, যে বা যারা, যখন যেখানে যেভাবেই আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তওবা করে, সঠিক তওবা হলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। এটি মহান আল্লাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহান আল্লাহ গুনাহ মার্জনাকারী ও তওবা কবুলকারী। এর দ্বারা মানুষের মনে আশার আলো জ্বালানো হয়েছে, উৎসাহ দান করা হয়েছে। এস্থানে এসব বলার উদ্দেশ্য হলো, যেসব লোক তখনো পর্যন্ত আল্লাহ দ্রোহীতায় মগ্ন ছিল, তারা যেন নিরাশ হয়ে না যায়; বরং তারা তখনো আল্লাহদ্রোহীতা হয়ে বিরত থেকে সঠিক পথে আসলে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় পেতে পারে। এ আশা হৃদয়ে পোষণ করত যেন নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়।

তওবা এবং মাগফেরাতের মধ্যকার পার্থক্য : কোনো লোকর ধারণা 'মাগফেরাত' তথা গুনাহ মাফ করা এবং তওবা কবুল করা একই বস্তু, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা তা নয়; বরং দুটি বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তি মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও কৃত গুনাহের জন্য তওবা না করে আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে غَافِرِ الذَّنْبِ অর্থাৎ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার গুনাহসমূহের উপর পর্দা রেখে দেবেন। ঐ ব্যক্তির গুনাহসমূহ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখবেন। আর غَفْرٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থই হলো– পর্দায় ঢেকে রাখা, কোনো কিছু গোপন রাখা।

আসলে মাগফেরাতটা হলো ব্যাপক; অনেক সময় তওবা ব্যতীতই আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তি পাপকাজ করে আবার নেক কাজ করে। তার নেক কাজগুলোর কারণে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সে তওবা করার সময় পাক বা নাপাক অথবা তওবার কথা ভুলেই গেল। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির উপর বিপদ আপদ ও দুঃখ-কষ্ট এসে পড়লে তা দ্বারা তার গুনাহ মাফ হয় এবং তার মর্যাদা বেড়ে যায়। এ জন্যই গুনাহ ক্ষমা করার গুণকে তওবা কবুল করার গুণ হতে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তওবা কবুল হওয়ার জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে তিনটি জিনিস থাকা জরুরি : ১. গুনাহ পরিত্যাগ করা; ২. কৃত গুনাহ এবং নাফরমানির উপর অনুশোচনা করা এবং ৩. আগামীতে গুনাহ বা নাফরমানি না করার দৃঢ়প্রত্যয়সূচক আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। আর ইস্তিগফারের অর্থ হলো- গুনাহ করাকে অপছন্দ করে নিকৃষ্ট জেনে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং প্রথমে তওবা পরে ইস্তিগফার।

স্মরণ রাখতে হবে যে, কৃত অপরাধ নাফরমানির উপর তওবা ব্যতীত গুনাহ মাফ পাওয়ার সুযোগ এক্ষেত্রে মু'মিনদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর ঈমানদারদের মধ্য হতেও কেবল তাদেরই এ সৌভাগ্য হবে যাদের মন বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা অমান্যতার কুটিল হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। মোদ্দাকথা হলো যারা একান্ত বিনয়ী মনে, অনুশোচার সাথে একনিষ্ঠ আবেগে ঈমানের অবস্থায় তওবা করবে শুধু তাদেরই তওবা কবুল হবে। ফলত তওবাকারী হবে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- "اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ" অর্থাৎ গুনাহ হতে তওবাকারী এমন যেন তার কোনো গুনাহই নেই, সদ্য প্রসূত সন্তানের ন্যায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তওবা ছাড়া মাগফেরাতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন, না হয় করবেন না। অথচ তওবাকারী নিষ্পাপ হয়ে যায়।

কাফের মুশকিরদের তওবার স্বরূপ কি? কাফের মুশরিকদেব তওবার একটিই মাত্র পন্থা, তা হলো তাদের কৃত ভ্রষ্টতার উপর লজ্জিত হয়ে তথা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের বিরোধিতা হতে বিমুখ হয়ে আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত বা পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে খালেস মনে আল্লাহকে এক মনে এবং তাঁর রাসূলের আনীত সকল নীতি-বিধানকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে আসা। অবশ্যই তা হতে হবে "কালিমায়ে তাইয়্যিবা" لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করতে হবেই তবে তা তওবা বলে গণ্য হবে। আর মুক্তি পাবে সর্বপ্রকার অপরাধের বোঝায় চাপা পড়া হতে। পাবে আল্লাহর রেজামন্দি আর রাসূলের শাফাআত। কেননা ইরশাদ হচ্ছে- "اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা ব্যক্তির অতীতের সকল অপরাধ ধ্বংস করে দেয়। অতএব, কোনো ব্যক্তি খালেস মনে মুসলমান হওয়ার কোনো প্রকার নেক আমল করা ব্যতীত মারা গেলে সে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার জন্য ইসলাম গ্রহণই হলো সবচেয়ে বড় নেক আমল। আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে কালিমার সুধা পান করার তৌফিক দিন।

قَوْلُهٗ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ : شَدِيْدُ الْعِقَابِ বা কঠোর শাস্তিদাতা। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালাতকে অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত যেমন অনন্ত, অসীম ঠিক তেমনিভাবে তাঁর ক্ষমতা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা এ শব্দ দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, তিনি যদিও তাঁর ঈমানদার ও অনুগত বান্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান ও ক্ষমতাশীল পক্ষান্তরে নাফরমান, আল্লাহ দ্রোহী, রাসূল ও তাঁর আনীত দীন ইসলামে বিদ্বেষী কাফেরদের জন্য তিনি অতীব নিষ্ঠুর, কঠোর ও পরাক্রমশালী। অথচ এ সকলকে অবশেষে তাঁর দ্বারে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে এবং জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

অতএব, সময় থাকতে সতর্ক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ এবং জীবন থাকতেই মৃত্যু পরবর্তী আলমে বরযখের সে একাকিত্ব আপনজন মানব বন্ধু হতে বিচ্ছিন্ন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। এমনিভাবে দুনিয়ায় থাকতে আখেরাতের সহায়-সম্বল সংগ্রহ করা বাস্তববাদী মানুষের একান্ত করণীয়।

قَوْلُهٗ ذُو الطَّوْلِ -এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা বা অনুগ্রহকারী, এখানে উদ্দেশ্য অফুরন্ত নিয়ামতদাতা। কেউ কেউ এর অর্থ শাস্তি না দেওয়া অর্থ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহের বারি সকল মাখলূকাতের উপর প্রতি মুহূর্তে বর্ষিত হয়। সৃষ্ট জীব যা কিছু সুবিধা ভোগ করছে তা সব একমাত্র তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই লাভ করছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

চরিত্র সংশোধনে উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রভাব : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) তাঁর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এযীদ ইবনে আসিম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি বড় বীর পুরুষ ছিল। তাঁর বীরত্বের কারণে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। [লোকটি হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে বারবার যাতায়াত করত] কিছু দিন পর লোকটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে বলা হলো, লোকটি মন্দকাজে লিপ্ত হয়েছে, এমনকি মদ্যপায়ী হয়ে গেছে। তখন হযরত ওমর (রা.) তাকে নিম্নোক্তভাবে একটি পত্র পাঠালেন–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) إِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ . سَلَامٌ عَلَيْكَ فَإِنِّىْ اَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

অর্থাৎ "ওমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ হতে অমুকের পুত্র অমুকের নিকট। তোমাকে সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করছি। যিনি ব্যতীত সত্যিকার মাবুদ নেই। তিনি অপরাধ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, মহা অনুগ্রহের মালিক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।"

এরপর হযরত ওমর (রা.) ঐ ব্যক্তির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে দোয়া করেন এবং অন্যদেরকেও দোয়া করতে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে তওবা করার তৌফিক দান করেন আর তার সে তওবা কবুল ফরমান।

যথাসময়ে হযরত ওমর (রা.)-এর পত্র তার নিকট পৌছলে সে এভাবে চিঠিটি পাঠ করতে থাকে غَافِرِ الذَّنْبِ আল্লাহ তা'আলা আমাকে কথা দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন, قَابِلِ التَّوْبِ তিনি আমার তওবা কবুল করবেন, شَدِيْدِ الْعِقَابِ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে কেউ বাধা প্রদানে স্তব্ধ করতে পারবে না। আর পরিশেষে সকলকে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি পত্রটি বারংবার পাঠ করেন এবং ক্রন্দন করেন, অবশেষে তিনি তওবা করেন।

ঐ ব্যক্তির তওবা করার সংবাদ হযরত ওমর (রা.)-কে দেওয়া হলে তিনি বললেন, তোমরাও তাই কর অর্থাৎ তওবা কর, আর যখন দেখ কেউ সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে তখন তাকে সঠিক পথে রাখার চেষ্টা কর, তাকে বিনম্র ভাষায় বুঝাও; আর আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া কর, যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবা করার তৌফিক দান করেন এবং কোনো অবস্থাতেই তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।

কুরতুবী নামক তাফসীর গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইমাম কুরতুবী (র.) এ বিষয়ে অপর একটি ঘটনার উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তা এই যে, হযরত আবূ বকর ইবনে আইয়াশ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (র.)-এর দরবারে এসে আরজ করে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। এখন আমার তওবা করার কোনো পথ উন্মুক্ত আছে কি? তখন হযরত ওমর (রা.) "حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ ...... شَدِيْدُ الْعِقَابِ" তেলাওয়াত করলেন এবং তাকে পরামর্শ দিলেন, সৎকর্ম করতে থাক, আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।

দীনের রাহে আহ্বানকারীদের জন্য হেদায়েত : উল্লিখিত ঘটনায় দিনের পথে আহবানকারী ও সংস্কারকারীদের জন্য বিরাট শিক্ষা ও হেদায়েত বা নির্দেশন নিহিত রয়েছে। অতএব, যারা আল্লাহর পথ ভোলা দীশাহীন বান্দাদেরকে আল্লাহর তথা দীনের সহজ সরল পথে দিশা দেওয়ার জন্য নিয়োজিত থাকছেন, তাদের একান্ত কর্তব্য হবে তারা যেন ঐ বিপথগামী বান্দাদের জন্য দোয়া করার সাথে সাথে বাহ্যিক মিশন পরিচালনা করে। আর নম্রতার সাথে মানুষকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। কেননা দোয়া মানে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তি আর নম্রতা অবলম্বন মানে সু ও সদাচরণ দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করে নেওয়া। আর এ হৃদয় জয় করা যদি হয় আল্লাহর রহমতের সাহারায় তবে মানুষ দলে দলে ইসলামকে সুশীতল ও মর্যাদাশীল মহান ধর্ম মনে করে তাতে প্রবেশ করবে, কোনো সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে কঠোরতা ও রুষ্টতা আরোপের মাধ্যমে রাগান্বিত স্বরে তাবলীগের মিশন সচল রাখার চেষ্টা করাতে কোনো উপকার তো হবেই না; বরং শয়তান মরদূদের সাহায্য করা বুঝাবে। এতে তারা দীনের পরিধি হতে, মিশনের বৃত্ত হতে আরো দূরে বহুদূরে সরে যাবে।

"لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ" : আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতাংশে দু'টি বিষয় সুস্পষ্টভাবে তাঁর বান্দাদেরকে অবগত করিয়েছেন।

১. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই।

২. পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের পরে সবাইকে অবশ্যই বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর হাশর ময়দানে দুনিয়াস্থ কৃতকর্মের তথা পাপপুণ্যের হিসাব-নিকাশ হবে। অর্থাৎ পাপ-পুণ্যের রেজিস্টারকে দাঁড়িপাল্লায় তোলা হবে। তা হতে কেউ পরিত্রাণ পাওয়ার থাকবে না। মানুষ যখনি পরকালের উপর আস্থাশীল হবে তখন সে আল্লাহ তা'আলা ও তার মধ্যকার সম্পর্কের কথা অনুধাবন করতে পারবে। সে উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মাঝে আবিদ তথা উপাসনাকারী ও মাবুদ তথা উপাস্য-এর সম্পর্ক। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকে যখন এ চিন্তার উদ্রেক হবে তখনই সে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারবে। মানুষ বুঝতে পারবে, কি করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আর কোন কাজে অসন্তুষ্ট। অথচ মা'বুদ নির্ধারণে মানুষ চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত। এ পরিসরে সে নেহায়েতই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। তারা স্বহস্তে গড়া মূর্তিগুলোকে মা'বুদের মর্যাদায় পূজা অর্চনা করে। তারা নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায় তাদের উপাসনা করে থাকে। তারা বুঝেও না বুঝার ভান করে আছে। কেননা সে অবলা নির্জীব মাটির পুতুলগুলো তাদের না কোনো উপকার করতে পারে না ক্ষতি করতে পারে। তারা তাদের ভক্ত বেহুদাদের কি হেফাজত করতে পারে যারা নিজেরাই নিজেদের হেফাজতে অক্ষম। নির্বুদ্ধিতার সীমা ছাড়িয়ে গেল।

"مَا يُجَادِلُ فِىٓ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا" আয়াতের ব্যাখ্যা : مَعْنَى الْجِدَالِ বা جِدَالٌ-এর অর্থ : আয়াতস্থ يُجَادِلُ শব্দটি اَلْمُجَادَلَةُ ـ اَلْجِدَالُ ক্রিয়ামূল হতে সংগৃহীত। এর অর্থ হলো– ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া, কথার মারপ্যাঁচ দেওয়া। এখানে অর্থ হবে বিতর্ক করা, অহেতুক উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করা, পূর্বাপর সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কোনো একটি শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে তা হতে নানান প্রকারের খুঁটি-নাটি বের করে পর্বতসম সন্দেহ ও দোষক্রটি সৃষ্টি করা যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। কেনো কথার মূল উদ্দেশ্যের অবমূল্যায়ন করতঃ সম্পূর্ণ ভুল অর্থ গ্রহণ করা। মস্তিষ্কের বক্রতার কারণে আসল বিষয়টি না নিজে বুঝবে আর না বা অন্যদেরকে বুঝতে দেবে। তা নিয়ে শুধু শুধুই বির্তকে সময় কাটাবে। তার লক্ষ্যই হলো অহেতুক অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা।

আল্লাহর আয়াতে কাফেরদের বির্তক সৃষ্টির উদ্দেশ্য : মক্কার কাফেররা কুরআন মজিদের আয়াতকে ঘিরে অনর্থক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বির্তক সৃষ্টি করত। এহেন অহেতুক বিতর্ক ও মতবিরোধে কেবল তারাই জড়াতে পারে যাদের এ ঝগড়া-বিবাদের পিছনে অসদুদ্দেশ্য কাজ করে। সৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বিপরীতমত পোষণকারীর বিতর্কে জড়িত হওয়াটা আসল সত্যটা উদঘাটন করে অসত্যের কৃষ্ণ চেহারা হতে পর্দা উন্মোচন করার জন্য হয়ে থাকে। সে আলোচনার পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত ধারণা ও বিপরীত মতের মাঝে ব্যাবধান সৃষ্টি করে অবলোকন করতে চায় যে এতদুভয় ধারণার মধ্যে কোনটি নির্ভুল এবং নিরেট তা যাচাই বাছাইয়ের মধ্যে নিশ্চিত হতে চায়। সত্যের বিচারে এ ধরনের বিতর্ক প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়। পক্ষান্তরে যাদের মনের মনিকোঠায় অসৎ উদ্দেশ্যের বীজ ব্যাপৃত থাকে তারা কেবল প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই বিতর্কে জুড়ে যায়। বিপক্ষের বক্তব্যকে হাজারো সত্য মিথ্যার প্রলেপে জড়িয়ে বিকল করে দেওয়ার জন্যই তারা বিতর্কের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, মক্কার কাফেররা আল্লাহর আয়াত তথা কুরআনে কারীমের বিরুদ্ধে অনুরূপ বিবাদ বিতর্কে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তাদের সে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ষড়যন্ত্র কর্পূরের ন্যায় মহাশূন্যে মিশে যায়।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিতর্কের শ্রেণিবিভাগ : প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইমাম রাযী (র.) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করেছেন- اَلْجِدَالُ বা বিতর্ক দু প্রকার।

১. حَقٌّ তথা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বিতর্কে জড়িত হওয়া। এটার দায়িত্বভার নবী-রাসূলগণ (আ.) এবং তাঁদের অনুসারীদের স্কন্ধে বর্তায়। পবিত্র কুরআন মাজীদের আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন- وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ "হে রাসূল! আপনি বিরুদ্ধবাদীদের সাথে উত্তম পন্থায় তথা উত্তম কৌশল ও সঠিক যুক্তি পেশ করার মাধ্যমে বিতর্ক করুন।"

এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য বিরোধী পক্ষের সাথে প্রকৃষ্ট যুক্তির মাধ্যমে ও উত্তম উন্নত কৌশল অবলম্বনের দ্বারা বিতর্ক করা যেতে পারে। পরন্তু দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এরূপ বিতর্কে জড়িত হওয়া আম্বিয়া (আ.) -এর কর্মপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাতে সত্য উদ্ভাসিত হয়, আর বাতিল নিপাত যায়। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের গলায় বিজয়ের মাল্য সোভা পায়, আর পরাজিত তাগুতি শক্তি ভীতু সন্ত্রস্ত হয়ে ধ্বংসের করাল গ্রাসে পরিণত হয়। কুরআনের সাক্ষ্য মতে প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই তাঁর বিরোধীদের সঙ্গে তর্ক-বহসে লিপ্ত হতে হয়েছে। এ ব্যাপার হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি তার বিরোধীদের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাদের উক্তির প্রসঙ্গ টেনে মহান আল্লাহ বলেন- يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا হে নূহ! তুমি আমদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছ। এমনটি বিতর্কে তুমি আমাদের সাথে অতিরঞ্জিত করেছ।

২. বাতিল বা অসত্যকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে جِدَالٌ তথা বিতর্ক করা। কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূল ও সত্যের ধারক-বাহকগণ যখনই সত্যের আহবানে কল্যাণজনক ঘোষণাগুলো মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাতে ময়দানে অবতীর্ণ হতেন, তখনই এ তাগুতি শক্তি মিথ্যা ও শয়তানি চক্রের হোতারা তা প্রতিহত ও স্তব্ধ করার জন্য অনর্থক ও অনাহুত বিতর্কের সৃষ্টি করত। এ পরিসরে কুরআন ও হাদীসের নিম্নোক্ত মহান বাণীসমূহ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

১. مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا একমাত্র কাফের গোষ্ঠিরাই আল্লাহর আয়াতের বিপক্ষে অযথাই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে।

২. وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ আর তারা সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যা [অসত্য ও অনর্থক] -এ লিপ্ত হয়ে থাকে।

৩. مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ শুধুমাত্র নিছক বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তারা আপনার সম্মুখে উপমা পেশ করে থাকে।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করছেন-

১. لَا تُمَارُوْا فِى الْقُرْاٰنِ فَاِنَّ الْمِرَاءَ فِيْهِ كُفْرٌ তোমরা কুরআনের বিরুদ্ধে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ো না। কেননা কুরআনের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কুফরি।

২. اِنَّ جِدَالًا فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ কুরআনের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া কুফরির নামান্তর।

আল-কুরআনের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি ধ্বংসের নামান্তর : এ ব্যাপারে প্রিয়নবী ﷺ -এর কয়েকখানা হাদীস উল্লেখ করছি।

ক. প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একদা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে দুপুর বেলায় উপস্থিত হলেন। হুযূর ﷺ লক্ষ্য করলেন, দু' ব্যক্তি একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত, তখন তিনি আমাদের দিকে তশরিফ আনলেন, চেহারা মুবারকে তখন রাগের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি ইরশাদ করেন, তোমদের পূর্ববর্তী লোকেরা আসমানি কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধ করায় ধ্বংস হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. আমর ইবনে শোয়েবের পিতামহ থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ কিছু লোককে বিতর্কে লিপ্ত দেখে ইরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশের বিরোধিতায় অন্য অংশকে ব্যবহার করত অথচ পবিত্র কুরআনের একাংশ অপর অংশের সত্যায়ন ও সমর্থন করে। বিরোধ বা তার বিপরীতে অবস্থান করে না। অতএব, তোমরা আল্লাহর কালামের এক অংশকে আরেক অংশ দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান কর না. যদি তোমরা কিছু জান তবে বল. আর যদি না জান তবে যে জানে তার উপর দায়িত্ব অর্পণ কর।

গ. বায়হাকী শোআবুল ঈমানে, আবূ দাউদ ও হাকিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কুরআনে কারীমের ব্যাপারে ঝগড়া করা কুফর।

প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা বায়যাবী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে, এরপরও কুরআনে কারীমের ব্যাপারে বিতর্ক করার অর্থ হলো, সত্যকে বাতিলের মাধ্যমে দুর্বল করা আর যারা সত্যকে পরাজিত করে বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে না। এ জন্যই এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে- مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا "কাফের ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার আয়াতে কেউ ঝগড়া করে না।" আলোচ্য বিতর্ক বা ঝগড়া যাকে কুরআন ও হাদীস কুফর হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। কুরআনের আয়াতের সমালোচনা করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে বিতর্কের বান তোলা বা কুরআনের কোনো আয়াতেব এরূপ অর্থ বর্ণনা করা যা কুরআনের অন্য আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী অথবা সুন্নতের সুস্পষ্ট পরিপন্থি। এটা মূলত تَحْرِيْفُ قُرْاٰنْ তথা কুরআন বিকৃত করণের নামান্তর। কিন্তু কোনো অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বাক্যের তাহকীক অথবা مُشْكِلْ (অপ্রকাশ্য) বাক্যের সমাধান অনুসন্ধান করা কিংবা কোনো আয়াত হতে আহকাম ও মাসায়েল বের করার উদ্দেশ্যে গবেষণা করা উক্ত جِدَالْ -এর পর্যায়ে আসে না; বরং এতে বিরাট পুণ্য নিহিত রয়েছে। -[বায়যাবী, কুরতুবী]

আয়াতে কুফরের অর্থ : তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন যে. উক্ত আয়াতে কুফর দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

ক. সত্য দীন তথা তৌহীদকে অস্বীকার করা। এ অর্থের আলোকে আয়াতের অর্থ হবে- উক্ত কর্মনীতি কেবল তাদের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব যারা আল্লাহর সত্য দীনকে অস্বীকার করেছে। নবী করীম ﷺ -এর রিসালতকে অস্বীকার করেছে। আর যেসব কাফের দীনকে অস্বীকার করছে অথচ তাকে বুঝার জন্য সৎ উদ্দেশ্যে তা সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে। তাদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াত প্রযোজ্য নয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ সব স্বার্থান্বেষী বিবেকান্ধ লোক যারা তা প্রত্যাখ্যান করার পর বুঝার মননে নয়; বরং সমালোচনার হীন উদ্দেশ্যেই সমালোচনা লব্ধ গবেষণা করছে।

খ. আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতের নাফরমানি করা। এ অর্থের বিচারে আয়াতের মর্মার্থ এরূপ হবে- "আল্লাহর আয়াতসমূহের বিপরীতে অনুরূপ নীতি কেবল তারাই গ্রহণ করতে পরে যারা আল্লাহ তা'আলার মহা অনুগ্রহকে ভুলে গিয়েছে; আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত রাজির মধ্যেই যে তারা লালিত-পালিত হচ্ছে এ কথা তারা ভুলে বসেছে। যদি তাই না হতো তবে তারা কিরূপে আল্লাহর কালামের সরাসরি বিরোধিতায় আত্মনিয়োগ করতে পারে?

কাফেররা কিভাবে কুরআনে বিতর্কের উত্থাপন করে? অত্র আয়াতে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাপারে একমাত্র কাফেররাই অনর্থক বিতর্কের উত্থাপন করে।

বস্তুত: এর নেপথ্যে তাদের কোনো সৎ উদ্দেশ্য ছিল না, আর ছিল না সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার সামান্যতম আগ্রহ। ফলে কখনো তারা বলেছে بَلْ هُوَ شَاعِرٌ মুহাম্মদ হলো একজন কবি আর কুরআন তাঁর মহাকাব্য। (اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) আবার কখনো এ বলে অপপ্রচারে লিপ্ত হয় যে, মুহাম্মদ হলো একজন দক্ষ জাদুকর আর কুরআন তাঁর জাদুমন্ত্র। কখনো বা বলেছে, মুহাম্মদ একজন জ্যোতির্বিদ আর কুরআন তার জ্যোতির্বিদ্যা। তারা এও বলেছে بَلْ هُوَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ- কুরআন হলো, পূর্ববর্তী সম্প্রদায় বা জাতিসমূহের কিচ্ছা কাহিনী মাত্র।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা এ কুরআনের মাধ্যমেই তাদের অপবাদের মূলোৎপাটন করেন এভাবে مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ এটা কোনো কবির সনাতন কাব্য নয়, না কোনো পাগলের প্রলাপ, এটা কোনো জাদুকরের মন্ত্রও হতে পারে না, এটাতো মহা মর্যাদাবান পঠিত [ঐশী] গ্রন্থ।

"فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আয়াতের প্রথমাংশের ভাষ্য ছিল– আল্লাহ তা'আলার আয়াতের ব্যাপারে কেবলমাত্র তারাই অযাচিত বিতর্কে লিপ্ত হয় যারা ঈমানের উপর কুফরিকে প্রাধান্য দিয়েছে, কৃতজ্ঞতা পরিহার করে অকৃতজ্ঞকে স্বাগত জানিয়েছেন। আর এ অংশে বলা হলো– "হে রাসূল! দেশ বিদেশে কাফেরদের অবাদ বিচরণ আপনাকে যেন ভ্রমে না ফেলে" অর্থাৎ যারা কাফের যারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস রাখে না, তাঁর প্রেরিত রাসূল ﷺ কে মানে না, আনুগত্য করে না, তারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এমন কি অভিশপ্ত, অথচ তাদের জাগতিক উন্নতি অব্যাহত রয়েছে; তারা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করছে; আর্থিক উন্নতি অগ্রগতি লাভ করছে। যেমন– তখন মক্কার কাফেররা সিরিয়া এবং ইয়েমেনে ব্যবসার উদ্দেশ্য সফর করত। আর এ অবস্থা সকল যুগেই লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহর নাফরমানরা ঈমানদারদের তুলনায় অধিক সম্পদ ও শক্তি অর্জন করে থাকে, পক্ষান্তরে আল্লাহর আনুগত্যকারীরা, রাসূলের অনুসারীরা, সত্যের ধ্বজাধারীরা দারিদ্র পীড়িত অবস্থায় জীবন পরিচালনা করছে, রাতের পর দিন কাটাচ্ছে আহারে, অনাহারে আর অর্ধাহারে। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। "হে রাসূল! কাফেরদের দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমণ আপনাকে যেন ভ্রমে না ফেলে। কেননা অদূর ভবিষ্যতে তাদের শাস্তি অবধারিত। আর মু'মিনরা অফুরন্ত নিয়ামতে ধন্য হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা কাফেরদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটা অবকাশ মাত্র, তারা এ অবকাশের সুযোগ পাচ্ছে শুধু। এ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে গিয়ে যারা যত অধিক শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণে পাপাচারে জড়িয়ে পড়বে, তাদের শাস্তি ততই কঠোরতর হবে।

ইবনে আবূ হাতিম সুদ্দী (র.)-এর সূত্রে আবূ মালিক (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইবনে কায়েস সাহমী সম্পর্কে। কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে কারো যেন ভুল ধারণা না হয়, আল্লাহ তা'আলার অপ্রিয় ব্যক্তিরাই যে তাঁর নিয়ামত ভোগ করছে। প্রকৃত অবস্থা হলো, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের কয়েকটি দিনই তারা এ নিয়ামত ভোগ করছে। তারা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ হয়ে চিরকালের শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। আর মু'মিনগণ সামান্য কয়েকটি দিন বা আখেরাতের একদিনের তুলনায় কয়েক মিনিট মাত্র, কিন্তু তারা পরকালে অনন্তর জীবনের জন্য তারা অভাবনীয় নিয়ামত লাভে ধন্য হবে।

"كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ" **আয়াতাংশের ব্যাখ্যা :** প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা অত্র আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– হে নবী! মক্কার কাফেররা আপনার সাথে যে অন্যায় ও অশোভনীয় আচরণ করেছে তা নতুন কিছু নয়। ইতপূর্বে যে সকল নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের উম্মতেরা তাঁদের সঙ্গে অনুরূপ অন্যায় আচরণ করেছে, তাঁদের মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাঁদেরকে বন্দী করার এমনকি প্রাণনাশের অপপ্রচেষ্টা করেছে, কিন্তু পরিশেষে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং তাদের মূলোৎপাটন করেছেন। অতএব, লক্ষ্য করুন আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হওয়ার এবং তাঁর প্রেরিত নবীর বিরোধিতা করার পরিণত কত ভয়াবহ হয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আহযাব তথা দলসমূহ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? আলোচ্য আয়াতে اَلْاَحْزَابُ দ্বারা বিশেষ করে عَادٌ - ثَمُوْدُ ও اَيْكَةُ (আদ, ছামূদ ও আইকা) জাতিসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আর সাধারণভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঐ সব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে যেসব সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল। সূরায়ে রা'দে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ" .

অর্থাৎ 'তাদের পূর্বে [নবী রাসূলগণকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে হযরত নূহ, আ'দ, ফেরাগওয়ালা ফেরাউন ও ছামূদ (আ.)-এর জাতিসমূহ এবং হযরত লূত (আ.)-এর কওম ও আইকাহবাসীরাও [রাসূলগণকে] মিথ্যাবাদী বলেছিল। এরাই হলো আহযাব।'

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ-এর মহল্লে ই'রাব কি? অত্র আয়াতাংশে সর্বসম্মতভাবে মারফূ' -এর মহল্লে রয়েছে। অর্থাৎ ই'রাবের দিক থেকে এটা رَفْعٌ (রফা')-এর স্থলে রয়েছে। কিন্তু কোনো কারণে তা রফা-এর স্থলে হয়েছে– সে ব্যাপারে নাহুবিদ ও মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তা প্রদত্ত হলো–

১. জমহুরের মতে, এখানে تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ হলো মুবতাদা আর مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الخ হলো তার খবর। সুতরাং এটা মুবতাদা হওয়ার কারণে রফার স্থলে হয়েছে।

২. কারো কারো মতে, এটা মুবতাদা মাহযূফের খবর হওয়ার কারণে রফা'র স্থলে হয়েছে। যেমন– هٰذَا تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ

৩. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে حٰمٓ মুবতাদা এবং تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ এর خَبَرْ হওয়ার কারণে رَفْعٌ -এর মহলে হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে– "إِنَّ الْقُرْاٰنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَيْسَ مَنْقُوْلًا وَلَا مِمَّا يَجُوْزُ اَنْ يَكْذِبَهُ" অর্থাৎ আল-কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যেটা মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। এটা কারো বর্ণনা প্রসূত তথা মনগড়া নয়। আর এ গ্রন্থকে মিথ্যা আখ্যাদানও সঠিক হবে না।

অনুবাদ :

٦. وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اَىْ لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ بَدَلٌ مِنْ كَلِمَةٍ.

৬. আর তদ্রূপ সত্যে পরিণত হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী অর্থাৎ لَاَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ الخ (আমি জাহান্নাম পরিপূর্ণ করবো) কাফেরদের উপর এই যে, তারা জাহান্নামী হবে। এখানে " اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ " বাক্যটি كَلِمَةٌ হতে بَدَل হয়েছে।

٧. اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ مُبْتَدَأٌ وَمَنْ حَوْلَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ يُسَبِّحُوْنَ خَبَرُهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ مُلَابِسِيْنَ لِلْحَمْدِ اَىْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ تَعَالٰى بِبَصَائِرِهِمْ اَىْ يُصَدِّقُوْنَ بِوَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالٰى وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا اَىْ وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ كُلَّ شَىْءٍ وَعِلْمُكَ كُلَّ شَىْءٍ فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا مِنَ الشِّرْكِ وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ دِيْنَ الْاِسْلَامِ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ النَّارِ.

৭. যারা আরশ বহন করেন– এটা মুবতাদা এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্বে রয়েছেন এটা পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে তাসবীহ পাঠ করেন– এটা পূর্ববর্তী বাক্যের খবর তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে অর্থাৎ প্রশংসার সঙ্গে মিশ্রণ করে [তাসবীহ পাঠ করেন] অর্থাৎ তারা বলেন– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ আর তারা আল্লাহ তা'আলার উপব ঈমান রাখেন– তাদের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সত্যায়ন করেন। আর তারা ঈমানদারগণের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করেন। তারা বলেন– হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার করুণা এবং জ্ঞান সব কিছুতেই ব্যাপৃত রয়েছে। অর্থাৎ তোমার রহমত বা দয়া সমগ্র বস্তুকে ঘিরে রয়েছে এবং তোমার ইলমও প্রত্যেক বস্তুতে বিস্তৃত আছে। সুতরাং তুমি ক্ষমা করে দাও তাদেরকে যারা তওবা করেছে। শিরক হতে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে দীন ইসলামের আর তাদেরকে নাজাত দাও দোজখের আজাব হতে অর্থাৎ জাহান্নাম হতে।

٨. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ اِقَامَةٍ نِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ عَطْفٌ عَلٰى هُمْ فِىْ وَاَدْخِلْهُمْ اَوْ فِىْ وَعَدْتَّهُمْ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ.

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও বসবাসের জন্য যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ আর যারা সৎ এটা اَدْخِلْهُمْ অথবা وَعَدْتَّهُمْ-এর যমীর هُمْ-এর উপর আতফ হয়েছে। তাদের পিতামাতার মধ্য হতে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মধ্য হতে তাদেরকে তোমার জান্নাতে প্রবেশ করাও নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী তার কার্যে।

٩. وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ط اَىْ عَذَابَهَا وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৯. আর তুমি তাদেরকে অমঙ্গলজনক কাজ হতে রক্ষা করো অর্থাৎ অমঙ্গলজনক কর্মসমূহের শাস্তি হতে। আর তুমি যাকে অমঙ্গল হতে রক্ষা করবে সেদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তার উপর সত্যিই অনুগ্রহ করবে আর এটাই তো বিরাট সাফল্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

"وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ" আয়াতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী "وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ"-এর كَلِمَةُ শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত।

১. كَلِمَةُ অর্থাৎ একবচনের সাথে, এটা জমহুরের কেরাত :

২. كَلِمَاتُ বহুবচনের সাথে। ইমাম নাফে' ও ইবনে আমের শামী (র.) এরূপ পড়েছেন।

"وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ" আয়াতাংশের বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহ তা'আলার বাণী "وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ"-এর صَلَحَ-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. صَلَحَ শব্দটির ل বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হবে। এটাই জমহুরের মাযহাব।

২. صَلُحَ শব্দটির ل বর্ণে পেশ-যোগে পড়া হবে। ইবনে আবী আয়ালা এরূপ মত দিয়েছেন।

"اِنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" আয়াতের মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহ তা'আলার বাণী– كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ-এর শেষোক্ত اِنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ বাক্যটির مَحَلُّ الْاِعْرَابِ সম্পর্কে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে–

১. "اِنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" বাক্যটি পূর্ববর্তী كَلِمَةُ শব্দ হতে بَدَل (বাদল) হয়েছে। আর যেহেতু كَلِمَةُ শব্দটি حَقَّتْ-এর فَاعِلْ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হয়েছে, তাই উক্ত বাক্যটিও رَفْع তথা مَحَلًّا এটা مَرْفُوْعٌ হবে। কেননা بَدَل ও مُبْدَلٌ مِنْهُ-এর ই'রাব একই হয়ে থাকে।

২. "اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" বাক্যটি جُمْلَةٌ تَعْلِيْلِيَّةٌ তথা কারণ-নির্দেশক বাক্য হওয়ার কারণে এটা مَحَلًّا মাজরূর হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে "وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِاَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" আর তদ্রূপ কাফেরদের উপর আল্লাহর বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেননা তারা জাহান্নামি হয়েছে।

"وَمَنْ صَلَحَ"-এর মহল্লে ই'রাব : ফেরেশতারা ঈমানদারগণের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন–

"رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ ...... اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ".

এ জায়গায় "وَمَنْ صَلَحَ" আয়াতাংশটুকু وَاَدْخِلْهُمْ-এর هُمْ যমীরের উপর আতফ হওয়ার কারণে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে। কেননা, هُمْ যমীরটি اَدْخِلْ ফি'লের مَفْعُوْلٌ হওয়ার সুবাদে মানসূব। আর مَعْطُوْفٌ ও مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ-এর একই ই'রাব হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অত্র সূরার শুরু হতে মহান রাব্বুল আলামীন এক মহা সত্যকে বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আবহমান কাল হতে চলে আসছে। নবী-রাসূলগণ যেখানেই তাওহীদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার মিশন চালিয়েছেন, তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ছিলেন, সেখানেই তাঁরা বিরোধীদের চরম বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা তাওহীদের নিশানকে ভূলুণ্ঠিত করতে চেয়েছে। দীনের প্রদীপকে নির্বাপিত করে দেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, আর চেয়েছে সত্যের ধ্বনিকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিতে। মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত সকলেই সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখান করেছেন। উল্টো দাওয়াতকারী ও তার অনুসারীদের উপর চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। কিন্তু পরিণামে সত্যকে প্রত্যাখানকারী কাফেররা নিপাত গিয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ পরিসরে আলোচ্য আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। ১. যেভাবে দুনিয়াতে কাফেরদেরকে ধ্বংস করা একান্ত জরুরি ছিল ঠিক তেমনিভাবে আখেরাতে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া একান্ত জরুরি। ২. অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের কাফেরদের শাস্তি কার্যকর হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনার উম্মতের কাফেরদের শাস্তিও অবশ্যই হবে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-এর ব্যাখ্যায় লেখেছেন, যারা ইতপূর্বে নবী-রাসূলগণকে কষ্ট দিয়েছে, যেভাবে যথাসময়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনার উম্মতের যেসব লোক আপনার বিরোধিতা করে, তাদের প্রতিও কঠিন কঠোর আজাব আসন্ন, যদিও তারা অন্য নবীকে মান্য করে, কিন্তু যতক্ষণ আপনার নবুয়তের প্রতি ঈমান না আনে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সে ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় এবং তারা শাস্তিরযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত।

অতএব পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এ উম্মতের লোকদের একান্ত কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত নিয়মানুসারেই বান্দাদের পরিণতি নির্ধারিত হয়। অতীতে যেসব উম্মত আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের উপর চরম শাস্তি আপতিত হয়েছে। দুনিয়াতে যেমন তারা শাস্তি পেয়েছে আখেরাতের শাস্তিও তাদের জন্য অনিবার্য হয়েছে। যেভাবে অতীত কালের কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ আজো পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, ঠিক এভাবে এ উম্মতের কাফেরদের ব্যাপারেও ঐ শাস্তিই অবধারিত। কেননা তারা সকলে একই অপরাধে অপরাধী যা অমার্জনীয়।

আলোচ্য আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এবং তদীয় সাহাবী (রা.)-কে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, দীনের আওয়াজ বুলন্দ করতে গিয়ে তোমরা যে প্রবল বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হচ্ছ তাতে ঘাবড়িয়ে যাওয়ার কিছুই নেই, নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা এটা শুধু তোমাদের বেলায় নয়, বরং সমস্ত নবী রাসূলগণের বেলায় হয়েছে। সাময়িক ভাবে যদিও তোমরা নির্যাতিত হচ্ছ, তোমাদেরকে অসহায় ভাবছ, পরিণামে তোমরাই হবে চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী, পরিশেষে বিজয়ের মাল্য তোমাদের গলায়ই শোভা পাবে। পক্ষান্তরে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত ও পরাজিত তো হবেই পরকালেও জাহান্নামের আজাব হতে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ তাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে না।

'اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ .... وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ' : আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার দীন এবং তদীয় রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধবাদী কাফেদেরকে ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি কুরআনের মধ্য যে, কাফেরদের আলোচনার সাথে সাথে মু'মিনদের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। এমনিভাবে জাহান্নামের স্বরণের পাঠে জান্নাতের তথা জান্নাতবাসীদের কথা বলে থাকেন এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি। মূলত ঈমান-কুফর, জান্নাত-জাহান্নাম, মু'মিন-কাফের এগুলোর মধ্য হতে কোনো একটির আলোচনা করার ইচ্ছা করলেই প্রসঙ্গত বিপরীতটার আলোচনা না আনলে ব্যাপারটা খোলাসা হয় না।

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে কুফর, কাফের ও জাহান্নামের বয়ান ছিল সেহেতু আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের শুভ পরিণতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস করত তাঁর অনুসরণ করে তাদের মর্তবা এতই অধিক যে, আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী এবং আরশের চতুষ্পার্শ্বের ফেরেশতাগণ তাদের উপর মুগ্ধ হয়ে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়, ফলে তাদের কল্যাণে ও মুক্তিতে কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সে মু'মিন, মুত্তাকীদের চিরস্থায়ী নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত দান করার জন্যে দোয়া করেন, আবেদন নিবেদন করেন। যেমন একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের নির্দেশ দান করেন, তোমাদের নিজস্ব ইবাদত মুলতবি রাখ এবং রোজাদারদের দোয়ার সময় আমীন আমীন বলতে থাক। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতেও ঘোষণা হয়েছে 'وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ' [ফেরেশতাগণের প্রতি যে আদেশ হয় তাই তারা করেন।] এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, মু'মিনদের জন্য দোয়া করার আদেশ আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহর আরশ বহনকারী এবং তার চারিপার্শ্বের ফেরেশতাদের দোয়া অবশ্যই দরবারে এলাহীতে কবুল হবে, এ সৌভাগ্য একমাত্র নেককার মু'মিনদেরই।

Free @ www.eilm.weebly.com

এখানে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আয়াতে সাধারণ ফেরেশতাদের কথা না বলে আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ও তার চতুর্পার্শ্বের অবস্থানকারী বিশেষ ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তার রাজ্যের সাধারণ কর্মকর্তা দূরের কথা যারা তাঁর মহান আরশ ধারণকারী তাঁর বিশেষ করুণা ও সান্নিধ্য প্রাপ্ত সে সকল ফেরেশতারাও বিশেষভাবে তোমাদের ব্যাপারে আগ্রহী ও সহানুভূতি প্রদর্শনকারী।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আরশ বহনকারী ও আরশের চারিপার্শ্বের ফেরেশতাগণ নিজেরাও আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান রাখেন এবং জমিনে যে সকল ঈমানদারগণ রয়েছেন তাদের মাগফেরাত কামনা করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ঈমানের এ মহান শক্তিই সপ্তাকাশের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী মহীয়ান গরিয়ান ফেরেশতাকুলের সাথে ধূলির ধরার এ মৃত্তিকাময় মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে। হাদীসের ভাষায় كُلُّ مُؤْمِنٍ اِخْوَةٌ "সমগ্র মু'মিনরা পরস্পর ভাই" এ সুসম্পর্কের কারণেই আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য লাভে ধন্য ফেরেশতাকুলের মনে জমিনে বসবাস রত এ মানুষগুলোর ব্যাপারে এত উৎসাহ ও হিতকামনা। আল্লাহর দরবারে ঈমানদার মানুষের ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য আকুল আবেদন প্রমাণ করে যে, ঈমানী সম্পর্কটা কেমন গভীর হতে পারে।

ফেরেশতাকুল হতে একটি সন্দেহ নিরসন : ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁরা সৃষ্টিকর্তার নাফরমানি বুঝে না, তারা সর্বদা আল্লাহর আদশে পালনে ব্যাপৃত। আয়াতে বলা হয়েছে তারা ঈমান রাখে এর অর্থ এ সময় তাদের কুফরি করার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু তারা কুফরি ত্যাগ পূর্বক সেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ করেছেন; বরং এর অর্থ হলো তারা একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রভুত্বও সার্বভৌমত্বকে মান্য করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারো নিকট তারা মাথা নত করে না।

ঈমানদার মানুষগুলো যখন ঈমান গ্রহণ করে আল্লাহর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে মেনে নিল আর গায়রুল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করল তখন সত্তাগতভাবে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা যেন একই সমাজভুক্ত হয়ে পড়েছে। -[জুমাল]

আলোচ্য আয়াত হতে একটি সন্দেহ দূরীকরণ : উল্লিখিত আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করছেন। আর সিংহাসনে বসার জন্য কোনো আকৃতিধারী সত্তা হতে হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিরাকার। কেননা আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে ইরশাদ করেছেন- "اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ" তথা যারা আরশ বহন করে, সূরা اَلْحَاقَّةُ -এর ১৭নং আয়াতে আল্লাহ ফরমান "وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ" আর কিয়ামত দিবসে আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশ তাদের মাথার উপর বহন করবে।

উল্লিখিত আয়াতদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আরশ বহনকারী ফেরেশতারা আরশে অবস্থিত সব কিছুই বহন করে আছেন। বাতিলপন্থিদের দাবির স্বপক্ষে যদি আপাতত মেনে নেওয়া হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করে আছেন। আর আরশবহনকারী ফেরেশতারা আল্লাহকেও বহন করে আছেন। তা ছাড়া পরোক্ষভাবে এটাও বুঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার রক্ষণাবেক্ষণও করছেন। অতএব, রক্ষণাবেক্ষণকারী রক্ষণাবেক্ষণকৃতের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা আবিদ [ইবাদতকারী] আর ফেরেশতারা মা'বুদ হওয়া প্রমাণ পাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করছেন এটা মেনে নিলে দুটি বিষয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১. আল্লাহর আকারবিশিষ্ট হওয়া, ২. আল্লাহ ইবাদতকারী- এ দুটি উপলক্ষ ইসলামি আকিদার পরিপন্থি।

এর সমাধান হলো, আল্লাহ তা'আলা আরশে অবস্থান করছেন এরূপ ধারণা ঠিক নয়। এ পরিসরে আল্লাহর ইরশাদ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى [আর-রহমান তথা আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর স্থির রয়েছেন] এটা مُتَشَابِهَاتٌ (মুতাশাবিহাত) -এর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহই অব .ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান– فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ. অর্থাৎ সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা ও বক্রতা রয়েছে, তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অপব্যাখ্যা উপস্থাপনের মানসে কুরআনে কারীমের মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পিছু হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর অন্য কেউ এদের সঠিক অর্থ অবগত নয়। এসব ক্ষেত্রে অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও আধিপত্য ঐ আরশ এবং আরশের মাধ্যমে যার পরিচালনা করা হয়। তথা গোটা সৃষ্টিকুলের উপর আল্লাহর রাজত্ব বিদ্যমান বুঝাবে। কোনো কিছুই তাঁর আওতা বহির্ভূত নয়।

উক্ত আয়াতে দু ধরনের ফেরেশতার উল্লেখ রয়েছে : আল্লাহ তা'আলার একটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি হলো ফেরেশতা। তারা নূরের তৈরি। সৃষ্ট জাহানের নেজাম তথা কাজ-কর্ম পরিচালনার তাগিদে নিজস্ব বিশ্বস্ত বাহিনী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলার সমস্ত আদেশ তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে সম্পাদন করেন অতি সুচারুরূপে, যেভাবে আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ দু'শ্রেণির ফেরেশতার কথা উল্লেখ করেন।

১. আল্লাহ জাল্লা শানহুর আরশ বহনকারী ফেরেশতা। সূরা আল-হাক্কার আয়াতে এঁদের সংখ্যা আটজন উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর আরশকে তাদের মাথার উপর বহন করবেন। অত্র আয়াতে হয়তো তাদের কথাই বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতারা নিঃসন্দেহে অন্য সকল ফেরেশতা হতে সর্বাধিক সম্মানিত। তবে এটা এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, প্রধান ফেরেশতার সংখ্যা চার। হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আ.)।

   আল্লামা যমখশরী (র.) আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে এটি হাদীস উল্লেখ করেন যে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের পদযুগল জমিনের নিম্নদেশে অবস্থিত। আর তাদের মাথাসমূহ আরশ পর্যন্ত প্রসারিত। আল্লাহর ভীতিতে তারা তাদের মাথা কখনো উপরে উঠায় না।

   অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে সালাম করার জন্য অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন, অন্যান্য ফেরেশতাদের উপর তাদের অধিক মর্যাদাবান হওয়ার দরুন।

২. ঐ শ্রেণির ফেরেশতারা যারা আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করে আছে। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "مَنْ حَوْلَهُ" আর যারা তার চারিদিকে অবস্থান করছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র নাজিল হয়েছে–

وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"আর তুমি আরশের ফেরেশতাদেরকে ঘিরে থাকতে দেখবে। তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যথার্থ তথা সঠিক ফয়সালা করে দিয়েছেন। অনন্তর তাদেরকে বলা হবে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।"

আল্লামা যামাখশারী (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ আল-কাশ্শাফে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, আরশের চারিদিকে সত্তর হাজার সারি ফেরেশতা রয়েছে, তারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আরশের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে থাকে। তাদের পিছনে আরো সত্তর হাজার সারি ফেরেশতা রয়েছে। তারা নিজেদের স্কন্ধের উপর হাত রেখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও আল্লাহু আকবার ধ্বনি পাঠে আরশের চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করেন। তাদের পশ্চাতেও রয়েছে আরো 'সত্তর হাজার কাতার ফেরেশতা'। তারা সদা সর্বদা ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখে। তারা সকলেই বিভিন্ন তাসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকে।

মোদ্দাকথা, উল্লিখিত দু'শ্রেণির ফেরেশতারা বিশেষভাবে ঈমানদারগণের জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা ও সুপারিশ পেশ করে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে অতি মর্যাদাবান হওয়ার সুবাদে আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া ও সুপারিশ কবুল করে থাকেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের অবস্থা : আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতারা হলেন অতি মর্যাদাবান, নিষ্পাপ সৃষ্টি। এখন তাঁদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. আল্লামা আলুসী (র.) লেখেছেন, আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং তাঁদের চতুষ্পার্শ্বের অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে 'মুকাররিবীন' বলা হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা হলো চার জন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের টাখনুর নিচ হতে পায়ের তালু পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব। আর কোথাও বর্ণিত আছে– তাঁদের পা পাতালে রয়েছে, আর আসমান তাদের কোমর পর্যন্ত হয়। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করেন–

سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ .

এ ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিনীত অবস্থায় থাকেন, সর্বদা নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, কখনো উপরের দিকে তাকান না। সপ্তম আকাশে যারা রয়েছেন, তাদের থেকেও অধিকতর ভীত থাকেন আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ।

৩. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ফেরেশতা এবং আরশের মধ্য সত্তর হাজার নূরের পর্দা রয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.) হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি নিয়েছেন, প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে, আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতার কথা বর্ণনা করি, আর তা হলো তার কানের লতি থেকে বাহু পর্যন্ত সাতশত বছরের সমান দূরত্ব রয়েছে। –[আবূ দাউদ]

৪. ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেছেন, আরশের চারি পার্শ্বে ফেরেশতাদের সত্তর হাজার কাতার রয়েছে। একের পর এক কাতার দণ্ডায়মান। সকলেই মহান আরশের তওয়াফে রত রয়েছেন। তারা যখন একে অন্যের মুখোমুখি হয় তখন একজন বলেন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'আল্লাহু আকবার।' যখন প্রথম কাতারের ফেরেশতাগণের তকবীর পাঠের আওয়াজ পিছনের কাতারের ফেরেশতাগণ শ্রবণ করেন, তখন তারা (পিছনের কাতারে) উচ্চৈঃস্বরে বলেন,

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَجَلَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ أَنْتَ الْأَكْبَرُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ رَاجِعُوْنَ إِلَيْكَ .

ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকেন, তাদের হাত কাঁধের উপর থাকে, তাদের সত্তর হাজার কাতার রয়েছে, তাঁরা হাত বেঁধে দণ্ডায়মান রয়েছেন। বাম হাতের উপর ডান হাত রয়েছে, তাঁরা তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের দু'বাহুর মধ্যে তিনশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে। তাদের এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সত্তরটি পর্দা রয়েছে নূরের, সত্তরটি পর্দা রয়েছে সাদা মুক্তার, সত্তরটি পর্দা রয়েছে লালবর্ণের ইয়াকূত পাথরের। সত্তরটি পর্দা রয়েছে সবুজ জমরুদ পাথরের। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু জিনিস রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না।

উক্ত আয়াতে আরশ বহনকারী ও এর চার পাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে : আলোচ্য আয়াতে আরশবাহী ও তার চারি পাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করেন। গুণ তিনটির বর্ণনা নিম্নরূপ–

১. ফেশেতাদের ১ম গুণটি হলো– يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ তারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করেন। কুরআন মাজীদে ফেরেশতাদের ব্যাপারে এরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ অর্থাৎ 'আর আমরা তোমার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করি, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণকীর্তন করি।' অপর আয়াতে আছে– وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ 'আর তুমি দেখতে পাবে ফেরেশতারা আরশের চতুর্দিকে ঘিরে থেকে তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছে।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উল্লেখ্য, تَسْبِيْح (তাসবীহ) -এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার শানে শোভা পায় না এমন বিষয়াদি হতে তাঁকে পবিত্র মুক্ত ঘোষণা করা। আর حَمْد (হামদ)-এর অর্থ হলো– প্রশংসাও গুণকীর্তন করা, নিয়ামত তথা অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করা। মোদ্দাকথা, মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি যেসব অশোভনীয় বিষয়ের ইঙ্গিত করে সেগুলো হতে তিনি সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র। কোনো দোষত্রুটি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। অন্য দিকে সকল সৎ গুণাবলির আধার ও উৎস একমাত্র তিনিই। সুতরাং সমস্ত প্রশংসার একক পাপ্য তাঁর অন্য কেউ এতে ভাগীদার নেই।

২. ফেরেশতাদের দ্বিতীয় গুণটি হলো– "وَيُؤْمِنُوْنَ بِه" আর তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। মূলত জমিনে অবস্থিত মু'মিনদের সাথে তাদের সম্পর্ক গভীর হয় একমাত্র এ গুণটির ভিত্তিতে।

৩. তারা মু'মিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাদের জন্য সুপারিশ করে থাকেন। এর প্রতিই ইঙ্গিত করছে আল্লাহ তা'আলার বাণী– "وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا"

শহর ইবনে হাওশাব আরো বলেছেন, ফেরেশতাগণ মানুষের পাপাচার অবলোকন করেন, আর সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার নখদর্পণে রয়েছে কিন্তু আল্লাহ সুবহানুহু মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান করেন না বিধায় ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ক্ষমা ও ঔদার্যের প্রশংসা করেন।

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ ফেরেশতাগণ মু'মিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যদিও মানুষ ও ফেরেশতার মাঝে সৃষ্টিগত দিক হতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। তথাপি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্কও রয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন– اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

তাসবীহ পাঠের সাথে বিশেষিত করার পর ফেরেশতাদেরকে ঈমানের সাথে বিশেষিত করার কি ফায়দা থাকতে পারে? আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ও তার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের গুণাবলির বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমত বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করেন। এরপর দ্বিতীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। অথচ তাসবীহ পাঠকারী হওয়ার দ্বারাই তাদের ঈমানদার হওয়া বোধগম্য হয়। সুতরাং পুনরায় "وَيُؤْمِنُوْنَ بِه" বলার মধ্যে কি ফায়েদা থাকতে পারে?

হযরত মুফাস্‌সিরীনে কেরাম এর নানান জবাব দিয়েছেন–

ক. তাসবীহ পাঠ করার উল্লেখ করার পর ঈমানের উল্লেখ করার কারণ হলো, এ ঈমান তথা অন্তরের এ বিশ্বাসই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠে উদ্বুদ্ধ করে। তা না হয় তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করত না, আর না কোনো প্রকার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করত, নাইবা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো।

খ. তাসবীহ পাঠ করা হলো মৌলিক স্বীকারোক্তি যেটা মৌলিক আমল। অপরাদিকে ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস যেটা আত্মিক বিষয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তারা কেবল মৌখিকভাবে আমার গুণগান করছে তাই নয়; বরং তাদের অন্তরে আমার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে।

গ. যদিও প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠের দ্বারাই পরোক্ষভাবে ঈমানের সত্যায়ন হয়; তথাপি সুস্পষ্টভাবে তার উল্লেখ করার জন্য وَيُؤْمِنُوْنَ بِه বলা হয়েছে।

ফেরেশতা কি মানুষ হতে উত্তম? যেমন নাকি কেউ কেউ উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা দলিল পেশ করেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আরশ বহনকারী ও তার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ ঈমানদার বান্দাগণের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেন। উক্ত আয়াত দ্বারা কোনো কোনো মুফাসসিরীনে কেরাম মানুষ হতে ফেরেশতা উত্তম বলে দলিল পেশ করেন। তারা বলেন, ইরশাদ হয়েছে–ফেরেশতারা আল্লাহর প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করেন। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে ঈমানদারদের জন্য মাগফেরাতের সুপারিশ করেন। এটা হতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. ফেরেশতাদের নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন নাই। কেননা আয়াত পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন মনে না করে ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তাদের নিজেদের জন্যে যদি ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন থাকত তবে প্রথমত: তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত পরে ঈমানদারদের মাগফেরাত কামনা করত। আসলে এটাই হলো নিয়ম। কুরআনের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে এ পদ্ধতিতেই শিক্ষা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে- "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" অর্থাৎ 'অতএব, হে রাসূল! আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। অনন্তর আপনি আপনার ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর ঈমানদার নর-নারীদের গুনাহের জন্যও আল্লাহর দরবারে মাগফেরাত কামনা করুন।'

অপর এক হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- প্রথমে তোমার নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর অন্যান্যদের জন্য। সুতরাং ফেরেশতাদের নিজেদের জন্য যদি আদৌ ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হতো, তবে তারা প্রথমত নিজেদের জন্যই ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং পরবর্তীতে ঈমানদারদের জন্য মাগফেরাতের কামনা করত। এতে প্রতীয়মান হলো যে, তারা মাগফেরাতের মুখাপেক্ষী নয়। অথচ মানুষ ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী।

২. সাধারণত কেউ অন্যের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির নিকট কেবল তখনই ক্ষমার সুপারিশ করতে পারে, যখন সেই তৃতীয় ব্যক্তির নিকট দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা তার মর্যাদা বেশি হয়। আর দেখা যাচ্ছে এখানে ফেরেশতারা মানুষের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেছে।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা দু'টির বিচারে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতারা মানুষ অপেক্ষা উত্তম। তথা "اَلْمَلَكُ اَفْضَلُ مِنَ الْبَشَرِ"। উল্লেখ্য যে, যদিও আলোচ্য আয়াত দ্বারা কোনো কোনো মুফাসসির ফেরেশতাকুলকে মানুষ অপেক্ষা উত্তম প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তা জমহুরের মতের পরিপন্থি। বিশুদ্ধ মত হলো জমহুরের দৃষ্টিভঙ্গি, আর তা হলো- মানুষ "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা জীব। তাই তারা ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম প্রমাণ করা সঠিক নয়; তা এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

১. ফেরেশতাকুলের ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকার কারণে তারা মানুষ হতে শ্রেষ্ঠ এ ধারণা ও যুক্তি সঠিক নয়। কেননা মহান আল্লাহ তো তাদেরকে গুনাহ করার ক্ষমতাই প্রদান করেন নি। সুতরাং তারা গুনাহ করবে কি করে? আর গুনাহ নাফরমানি বা অপরাধই যখন নেই সে ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রশ্নই আসে না। অবশ্য যদি তাদেরকে গুনাহ করার ক্ষমতা প্রদান করার পর গুনাহ করা হতে বিরত থাকতে পারত, তাহলে সে পর্যায়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বে প্রস্তাব বাস্তবসম্মত হতো।

২. কখনো কখনো কর্মচারীরাও মনিবের নিকট মনিবের কোনো প্রিয়জনের অপরাধ মার্জনা করে দেওয়ার সুপারিশ করে থাকে। এর দ্বারা ঐ প্রিয়জন অপেক্ষা উক্ত কর্মচারীর অধিক মর্যাদাবান হওয়া প্রমাণিত হয় না।

অতএব কারণে উক্ত আয়াত দ্বারা ফেরেশতাদের মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের ভাবার্থ : মু'মিনদের জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দোয়া : পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে নেককার মু'মিনদের গুণাবলি এবং তাদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, আর সে নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য ধন্য, তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ যাঁরা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার হামদ পাঠে এবং তাঁর তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকেন, তাঁরা নেককার মু'মিনদের জন্য দোয়া করতে থাকেন, তাঁরা এ দোয়াও করেন যে, মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দোজখের আজাব হতে রক্ষা করেন। সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করত বলেন- "হে আমাদের রব! তোমার রহমত ও জ্ঞান সর্বত্র বিস্তৃত। তোমার বান্দাদের ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা, পদস্খলন ও অপরাধ কোনোটাই তোমার নিকট গোপন নয়। নিঃসন্দেহে সবই তোমার জানা রয়েছে। তোমার জ্ঞানের ন্যায় তোমার রহমত ও অনুগ্রহ সর্বব্যাপ্ত, সুপ্রশস্ত ও বিশাল। অতএব, তাদের অপরাধের কথা জেনেও তাদের প্রতি দয়া কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অথবা, এর ভাবার্থ এ হতে পার যে, হে আমাদের রব! তুমি তোমার সর্ব ব্যপ্তি জ্ঞানের দ্বারা যাদের ব্যাপারে জান যে, তারা সঠিক তওবা করেছে– সত্যিকার অর্থেই দীন ইসলামের অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি তোমার রহমতের বারি বর্ষণ কর– তাদের সকল অপরাধ মার্জনা কর দাও। জাহান্নামের আজাব হতে তাদেরকে নাজাত দাও।

ফেরেশতারা প্রথমে বলল- فَاغْفِرْ الخ [ক্ষমা করুন] এরপর বলল "وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ" তোমাদের জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করুন, অথচ মাগফেরাতের অর্থই হলো আজাব না দেওয়া এর কারণ কি? ঈমানদারদের জন্য দোয়া করার প্রারম্ভে ফেরেশতারা বলল "فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ" [সুতরাং যারা তওবা করেছে এবং তোমরা পথ তথা দীন ইসলামের আনুগত্য করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর ক্ষমা করে দেওয়ার অর্থই হলো আজাব হতে পরিত্রাণ দেওয়া, অথচ এর পরও "وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ" [আর তাদেরকে জাহান্নামের আজাব হতে হেফাজত করুন] বলার অর্থ কি?

মুফাসসিরীনে কেরাম এ প্রশ্নের তিনটি জবাব দিয়েছেন–

১. ফেরেশতাদের প্রথমোক্ত বাক্য – فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ এর জাহান্নামের আজাব হতে মুক্তিদানের বিষয়টি সরাসরি বোধগম্য হয় না; বরং পরোপক্ষভাবে বুঝা যায়। এ জন্য শেষোক্ত বাক্য "وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ" -এর দ্বারা সে প্রার্থনা সুস্পষ্টভাবে সরাসরি বুঝানো হয়েছে।

২. ঈমানদারদের প্রতি ফেরেশতাদের গভীর আগ্রহের কারণে এরূপ হয়েছে। কেননা কোনো ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির অন্তরে মায়ার উন্মেষ হলে সে যখন প্রকৃত প্রভু ও দয়াবান মা'বুদের খেদমতে কিছু বলার সুযোগ পায়, তখন সে কাকুতি-মিনতির সাথে এ কথাটি একবার বলে সান্ত্বনা ও আত্মতৃপ্তি পায় না। আরবি অলংকার শাস্ত্র তথা বালাগাত ও ফাসাহাতের এটাই কামনা। এসব ক্ষেত্রে স্বভাবতই বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ারই কথা।

৩. প্রথমোক্ত ও শোষোক্ত উভয় বাক্য যদিও এক ও অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে এতদসত্ত্বেও শেষোক্ত বাক্যটিকে প্রথমোক্ত বাক্যের তাকিদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যের জোর সমর্থনের জন্যে দ্বিতীয় বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

'رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ ...... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ' আয়াতের তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরেশতাগণের দোয়ার উল্লেখ রয়েছে যা তারা মু'মিনদের পক্ষে করেছে, এ আয়াতেও নেককার মু'মিনদের পক্ষে ফেরেশতাগণের আরা দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দান করেছ, তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ দান কর এবং তাঁদের পিতা-মাতা, পতী-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য হতে যারা (ঈমানদার অবস্থায়) নেক আমল করেছে, তাদেরকে [প্রবেশাধিকার দান কর]।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈমান ও নেক আমলের নিরিখেই প্রত্যেকটি মানুষকে বিচার করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করা হবে। মোটকথা, আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান হলো পূর্ব শর্ত। ঈমানের পরেই অন্যান্য কাজকর্মের স্থান। আর ইখলাসের ভিত্তিতেই জান্নাতে মর্তবার পার্থক্য হবে, আত্মীয়-স্বজন বা আপনজন কেউ এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মর্জি হলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনদের দ্বারাও উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে। যেমন এ আয়াতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ধন্য ফেরেশতাগণ নেককার মুসলমানদের পক্ষে দোয়া করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, শুধু তাই নয়; বরং তাদের পিতামাতা সহ সকল ঈমানদার আত্মীয়-স্বজনকেও জান্নাতে স্থান দেওয়ার জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করবেন। সূরায়ে তূরে এ মর্মে একখানি আয়াত রয়েছে– "وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ (الْاٰيَةَ)" অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততিরাও ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকেও তাদের সঙ্গে মিলিত করবো। অথচ এতে তাদের কর্মফল কিছু মাত্রও কম করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর (র.) বলেছেন, ঈমানদার যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্যরা কোথায়? উত্তর দেওয়া হবে যে, তাদের আমল কম হওয়ার কারণে তারা এ স্তরে পৌছতে পারে নি। ঈমানদার ব্যক্তি বলবে আমি যে আমল করেছি তা শুধু আমার জন্যই করি নি; বরং তাদের জন্যও করেছি। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করে দাও। –[ইবনে কাছীর]

জান্নাতীগণের আপনজনদেরকে একত্রিত করা হবে : আল্লামা বাগভি (র.) লিখেছেন, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বর্ণনা করেছেন, মু'মিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, আমার পিতা-মাতা কোথায়? আমার সন্তান-সন্ততিরা কোথায়? আমার স্ত্রী কোথায়? তখন ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, তারা আপনার ন্যায় আমল করেনি; [তাই এখানে পৌঁছতে পারেনি]। মু'মিন বলবে, আমি যে আমল করতাম তা তো আমার জন্যেও করতাম এবং তাদের জন্যেও করতাম। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হুকুম হবে, তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও অর্থাৎ জান্নাতী ব্যক্তির আপন জনদেরকেও যেন তার সাথে একত্রিত করা হয়, যাতে করে উভয় পক্ষের নয়ন মনের তৃপ্তি হয়, আর একত্রিত করার জন্যে উচ্চ পর্যায়ের জান্নাতীকে নিম্ন পর্যায়ে আনয়ন করা হবে না; বরং নিম্নস্তরের অবস্থানকারীদের মর্তবা উন্নীত করে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়ায় উচ্চ মর্যাদায় পৌছানো হবে, এরূপে তাদেরকে আপনজনদের সাথে একত্রিত করা হবে। এরপর সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত মুতরাফ ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, ফেরেশতাগণ মু'মিনদের কল্যাণ কামনা করেন, এ আয়াতেই এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাফসীরকারগণ বলেছেন, وَمَنْ صَلَحَ -এর অর্থ হলো আর যে ঈমান এনেছে। কেননা ঈমান ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। –[তাফসীরে মাযহারী]

প্রকাশ থাকে যে, وَمَنْ صَلَحَ -এর তাৎপর্য হলো, যার মধ্যে জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্যতা থাকবে একমাত্র সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ফেরেশতাগণের সুপারিশক্রমে জান্নাতে মু'মিনদের মর্তবা উন্নীত হবে। মু'মিনদের আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ সেসব লোকদের ব্যাপারেই উপকারী হবে যাদের মধ্যে ঈমান থাকবে। অতএব, বংশ মর্যাদা আখেরাতে উপকারী হবে না; বরং উপকারী হবে ঈমানী সম্পর্ক।

ঈমানদারদের সুপারিশ কি শুধু অপর ঈমানদারদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই হবে নাকি আজাব হতে মুক্তি দানের জন্যেও হবে? কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা হতে অবগত হওয়া যায় যে, আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনে কেরাম অন্যান্য ঈমানদারগণের জন্য সুপরিশ করবেন। কিছু সংখ্যক বাতিল ফেরকাহ ব্যতীত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিমত নেই। তা ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে তাদের মধ্যেও ঈমান বর্তমান থাকা আবশ্যক।

তবে এ বিষয়ে কিছুটা মতানৈক্য বিদ্যমান যে, সুপারিশ শুধু رَفْعُ دَرَجَاتٍ (মর্যাদা বৃদ্ধি)-এর জন্য হবে নাকি জাহান্নাম হতে মুক্তির ব্যাপারেও সুপারিশ করা হবে?

১. ইমাম কা'বী (র.)-এর মতে, ফেরেশতা ও অন্যান্যদের সুপারিশ দ্বারা শুধু মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, এর দ্বারা গুনাহগারদেরকে আজাব হতে মুক্তি দেওয়া হবে না। আল্লামা কা'বী (র.) দলিল স্বরূপ فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ পেশ করেছেন। কেননা এ আয়াতে ফেরেশতারা শুধু এ সব লোকদের জন্য সুপারিশ করেছেন, যারা শিরক হতে তওবা করত: ঈমান গ্রহণ করে। মু'মিন হয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলার পথ অবলম্বন করেছেন। আল্লাহর পথের পথিক তো তাকেই বলা হবে যে পাপ-পঙ্কিলতার রাহ অবলম্বন করে ইবাদতের পথ গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন– وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ [হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ঈমানদরগণকে আপনার প্রতিশ্রুত জান্নাতে প্রবেশ করান] এ সুপারিশও ফাসিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদেরকে জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করেন নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, নবী-রাসূলগণ, ফেরেশতাগণ ও অপরাপর সালেহীনের সুপারিশ কেবলমাত্র মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য হবে আজাব হতে মুক্তিদানের জন্য নয়।

২. জমহুর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, ফেরেশতা, আম্বিয়া (আ.) ও সালেহীনদের সুপারিশক্রমে অন্যান্য ঈমানদারগণের যে শুধু মর্যাদাই বৃদ্ধি তা নয়; বরং তাদেরকে আজাব হতে পরিত্রাণও দেওয়া হতে পারে কিংবা তাদের আজাবও শিথিল করা যেতে পারে। ইতঃপূর্বেই আমরা এর পক্ষে দলিল পেশ করেছি।

অত্র আয়াত দ্বারা ইমাম কা'বী (র.) কর্তৃক প্রমাণদানের জবাব :

ক. ইরশাদ হচ্ছে- وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর তারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আলোচ্যাংশে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا দ্বারা সমস্ত ঈমনাদারগণকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ফাসিক ও কবীরা গুনাহকারীরাও এর অধীনে আসবে। অতএব, তাদেরও সুপারিশ সাব্যস্ত হলো।

খ. আলোচ্য আয়াতে ক্ষমা করে দেওয়ার অর্থই হলো আজাব হতে মুক্তি দেওয়া। এছাড়া তারা এটাও বলেছে যে, وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ। অর্থাৎ 'আর আপনি তাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত দান করুন।' মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ক্ষমা করে দেওয়ার কি প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে তো ক্ষমা করে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

গ. ইমাম কা'বী (র.) وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ 'যারা তোমার পথের অনুসরণ করেছে-এর দ্বারা ফাসিককে খারিজ করতে চেয়েছেন তা ঠিক না; বরং জমহুর মুফাসসিরগণ এবং মুহাক্কিকগণ এখানে 'পথ'-এর দ্বারা দীনে ইসলামকে বুঝিয়েছেন। আর ফাসিক (প্রকাশ্যে গুনাহগার ঈমানদারগণ)ও যে দীনে ইসলামের অনুসারী তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং ফাসিক ঈমানদারগণও সুপারিশের আওতায় পড়বে।

'وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ .... اَلْفَوْزُ الْعَظِيْمُ' আয়াতের তাফসীর : আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী ফেরেশতারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করেন।

হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে শাস্তি থেকে [সর্ব প্রকার কষ্ট থেকে] রক্ষা করুন। কবর, হাশর, পুলসিরাত, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতির কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করুন। হে পরওয়ারদেগার! সেদিন [কিয়ামতের দিন] যাকে তুমি শাস্তি হতে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে, এটিই তো বিরাট সাফল্য।

এ স্থানে ফেরেশতাদের দোয়া আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়? আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অতি সান্নিধ্য প্রাপ্ত নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা মু'মিনদের হিতে যে দোয়া করেছেন তাতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে-

ফেরেশতাগণের এ দোয়া মু'মিনদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন জীবনের প্রতি মুহূর্ত সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজ হতে বিরত থাকে, কথা ও কাজে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সচেষ্ট হয়, মহানবী ﷺ -এর অনুসৃত পথে জীবন পরিচালনা করে এবং আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ লাভের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করে। এ আকাঙ্ক্ষাই জীবন সাধনায় সতর্কতা লাভে সহায়তা হবে। কেননা মানুষ যখন কোনো কিছুর লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তা পূরণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টাও করে, তাই আখেরাতের নিয়ামত লাভের আকাঙ্ক্ষার পাশা-পাশি তার জন্য সাধনা ও শ্রম অব্যাহত রাখবে। (হে আল্লাহ! আমাদরকে তৌফিক দিন) এখানে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এ পার্থিব জীবনে যত সাফল্যই অর্জিত হোক না কেন, তা প্রকৃত সাফল্য নয়; বরং প্রকৃত সাফল্য হলো আখেরাতের স্থায়ী জিন্দেগীর শান্তি, নাজাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক সাফল্য। কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াত মুসলমানদেরকে সে মহান সাফল্য অর্জন করার জন্যে অনুপ্রাণিত করে। কেননা দুনিয়ার জীবনের সাফল্য তা যে ক্ষেত্রেই হোকনা কেন, তা নিতান্তই সামান্য আর আখেরাতের সাফল্য স্থায়ী এবং উত্তম। ফেরেশতাগণের এ দোয়া থেকে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করার একটা ধারাও শিখতে পারি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম রাযী (র.) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেছেন, ফেরেশতাগণ সর্ব প্রথম মু'মিনদের জন্য এ দোয়া করেছেন- وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ [হে পরওয়ারদেগার! মু'মিনদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করো।] এরপর দোয়া করছেন, وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنٍ [হে পরওয়ারদেগার ! মু'মিনরদেরকে জান্নাত নসিব করো] এরপর আলোচ্য আয়াতে এ দোয়া করেছেন, হে পরওয়ারদেগার মু'মিনদেরকে বাতিল আকীদা এবং অপরাপর অন্যায় ও গর্হিত কাজ হতে রক্ষা কর। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ মু'মিনদেরকে বাতিল আকিদা, মন্দ পথ ও মন্দ মত হতে, মন্দ ও অপছন্দনীয় কাজ হতে রক্ষা কর। কেননা মন্দ কাজের আসন্ন পরিণতি মন্দই হয় যা পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্যকে স্তব্ধ ও ব্যর্থ করে দেয়।

اَلسَّيِّاٰتِ-এর অর্থ : سَيِّاٰتٌ (মন্দ ও অন্যায়) শব্দটি নিম্নোল্লেখিত তিনটি অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে-

১. বিপদ, আপদ, মসিবত ও কষ্ট তা এ দুনিয়ায় সম্মুখীন হোক, অথবা আলমে বরযখে হোক কিংবা কিয়ামত দিবসে হোক।

২. ভুল আকিদা-বিশ্বাস, মন্দ চরিত্র ও খারাপ আমল।

৩. পথভ্রষ্টতা ও মন্দ আমলের পরিণাম।

"يَوْمَئِذٍ" অর্থ কি এবং এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? يَوْمَئِذٍ শব্দটির শেষে ذ (যাল) বর্ণে যের-এর تَنْوِيْن দিয়ে। এখানে সে তানবীনের ধরনের ভিত্তিতে এর অর্থ হবে, তাই নিম্নে তার تَنْوِيْن-কে চিহ্নিত পূর্বক অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে-

ক. يَوْمَئِذٍ শব্দের শেষোক্ত ذَالْ-এর তানবীনটি একটি উহ্য বাক্যের পরিবর্তে (তার প্রমাণস্বরূপ)। যে বাক্যটিতে বের করতে হয় বাক্যের পূর্বেকার রীতির (অবস্থার) প্রেক্ষিতে। সুতরাং এখানে يَوْمَئِذٍ মূলে ছিল "يَوْمَ إِذْ تَدْخُلُ مَنْ تَشَاءُ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَشَاءُ النَّارَ الْمُسَبَّبَةَ عَنِ السَّيِّاٰتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ" অর্থাৎ হে আল্লাহ! সেদিন যাকে ইচ্ছা তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাও আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাও এ বদ-আকিদা, মন্দ আমলের কারণে। আর সেদিন হলো কিয়ামত দিবস।

খ. এদিকে সামীন গ্রন্থে রয়েছে- তানবীনটি একটি উহ্য বাক্যের পরিবর্তে কিন্তু বাক্যে এমন কোনো বাক্য নেই যার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে উক্ত তানবীন সে পরিবর্তিত বাক্যের বা কথার উহ্যতার প্রমাণবহ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ حِيْنَئِذٍ মূলে ছিল حِيْنَ إِذَا بَلَغَتِ الرُّوْحُ الْحُلْقُوْمَ এখানে পূর্বে اَلْحُلْقُوْمُ শব্দটি অতিবাহিত হওয়ার কারণে। সুতরাং উক্ত يَوْمَئِذٍ-এ কোনো একটি বাক্য উহ্য মানতেই হচ্ছে তা হলো "يَوْمَ إِذْ تُؤَاخَذُ بِهَا" "যে দিন তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।"

মোদ্দাকথা হলো, يَوْمَئِذٍ দ্বারা উদ্দেশ্য কেয়ামত দিবস কিন্তু তা উদ্দিষ্ট করণের পদ্ধতিটা ভিন্নতর হয়েছে। -[জুমাল]

কিয়ামত দিবসে سَيِّاٰتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্যাংশে কিয়ামত দিবসের মন্দ বা অমঙ্গল দ্বারা হাশরের ময়দানের কঠিন অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে সর্ব প্রকার সুখ-শান্তি হতে বঞ্চনা, হিসাব নিকাশ গ্রহণে কঠোরতা। আর সমগ্র জানতার সামনে জীবনের সমুদয় গোপন রহস্য উদঘাটিত হওয়ার অপমান বঞ্চনা। এতদ্ব্যতীত অপরাধীরা সেদিন সেখানে যেসব অপমান, কষ্ট ও কঠোরতার সম্মুখীন হবে তাও এটার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় দোয়া হলো বান্দা তার পালনকর্তাকে "ইয়া রাব্বী" বলে ডাকবে : আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণবাচক নাম হলো رب বান্দার দোয়ায় আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বান্দার "يَا رَبِّ" বলে আহবান করাকে সর্বাধিক পছন্দ করেন। হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাগণকে দোয়া করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এ গুণবাচক নামটি (يَا رَبِّ) ব্যবহার করতে দেখা যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা হলেন প্রতিপালক, তাঁর অপার নিয়ামত রাজি দ্বারা বান্দার লালনপালন করে থাকেন। এ বিচারে আল্লাহর দরবারে বান্দার পাওনা হলো ব্যাপক, বান্দার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানো, বান্দার চাহিদা মোতাবেক তাকে দান করা।

নিম্নে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও ফেরেশতাদের দোয়া সম্বলিত কতিপয় উদ্ধৃতি প্রদত্ত হলো-

১. আলোচ্যাংশে ফেরেশতাগণ দোয়ায় বলেছেন- "رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا الخ" "হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপ্ত।

Free @ www.e-ilmweebly.com

২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বাণী- "رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ" "হে আমাদের রব! অনন্তর আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত বানাও; আর আমাদের সন্তান-সন্ততি হতেও তোমার অনুগত জাতি বানিয়ে দাও।

৩. হযরত মূসা (আ.) বলেছেন- "رَبِّ إِنِّي بِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ"

৪. হযরত নূহ (আ.) বলেছেন- "رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا" "হে আমার পালনকর্তা! আমি দিবা-রাত্রি আমার জাতিকে সত্যের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছি।"

৫. হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছেন- رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ অর্থাৎ 'হে প্রভু! তুমি আমাকে বাদশাহী প্রদান করেছ।'

৬. নবী করীম ﷺ ও তাঁর উম্মতকে দোয়ার তালিম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا الخ হে আমাদের রব! আমার যদি বিচ্যুতি হয়ে যা কিংবা ভুলে যাই, তাহলে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। আমাদেরকেও দোয়ায় يَا رَبِّ বলে দোয়া করা উচিত।

দোয়ার সুন্নত পদ্ধতি : اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া হলো ইবাদতের মূলাংশ। সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত মাসনূন তরিকা বা নিয়ম অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। দোয়া করার মাসনূন তথা সুন্নত তরিকা হলো- পাক-পবিত্র মন, পোশাক-আশাক ও হালাল খাবার দোয়ার কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। এরপর দোয়া করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে হবে। কিবলামুখী হয়ে নামাজের তাশাহ্হুদের বসার নিয়মে বসবে। রাসূল ﷺ -এর উপর বেজোড় বার দরুদ শরীফ প্রেরণ করতে হবে। [দরূদ হলো পত্রের খামের উপরের টিকেটের ন্যায় টিকেট- মোহর না হলে পত্র প্রাপক পর্যন্ত পৌঁছায় না, তদ্রূপ রাসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণ ব্যতীত দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।] ইস্তেগফার করতে হবে। অতঃপর অতি কাতর স্বরে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে মোনাজাত আরম্ভ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দোয়ার প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে সূরায়ে ফাতিহায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইরশাদ হচ্ছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . اِيَّاكَ نَعْبُدُ الخ এখানে আল্লাহ তা'আলা প্রথমত তাঁর মহান সত্তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করত তাঁর কুদরতে এবং মানশায় সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে নিজ মনের আকুতি মেশানো আরজি পেশ করার শিক্ষা দেন।

আলোচ্য আয়াতে ফেরেশতারাও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেন। যে কারণে স্বীয় আরজি পেশ করার পূর্বেই তারা আল্লাহর গুণগান করেছে- "اَلَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ...." আল্লাহ তা'আলা ঐ মহান সত্তা যিনি আমাকে পানাহার করান, আমি অসুস্থ হলে আমাকে আরোগ্য দান করেন।

তৎপর তিনি আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করেন- "رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ" হে আমার প্রতিপালক! আমাকে বাদশাহী (হুকুমত) দান করুন আর আমাকে সৎ এবং দীনদার লোকদের দলভুক্ত করুন।"

এ ছাড়া বিবেকও এটাই বলে যে, কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করতে হলে প্রথমে তার মহত্ত্বকে স্বীকার করত তার নিকট আকুতি সহ বিনয় প্রকাশ করা আবশ্যক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٠. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ مِنْ قِبَلِ
الْمَلٰئِكَةِ وَهُمْ يَمْقُتُوْنَ اَنْفُسَهُمْ عِنْدَ
دُخُوْلِهِمُ النَّارَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اِيَّاكُمْ اَكْبَرُ مِنْ
مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ فِي الدُّنْيَا اِلَى
الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ .

১০. নিশ্চয়ই যারা কাফের তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলা হবে– ফেরেশতাদের পক্ষ হতে। তারা নিজেদের উপর নিজেরা ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকবে, জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। আর তারা ভর্ৎসনা করতে থাকবে। অবশ্যই আল্লাহর ক্রোধ অসন্তুষ্টি তোমাদের উপর তোমাদের নিজেদের উপর নিজেদের ক্রোধ অসন্তুষ্টি অপেক্ষা অনেক বড় বেশি। যখন তোমাদের আহ্বান করা হতো তোমাদের দুনিয়ার জীবনে ঈমানের প্রতি অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে।

١١. قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ اِمَاتَتَيْنِ
وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اِحْيَاءَتَيْنِ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا
نُطَفًا اَمْوَاتًا فَاُحْيُوْا ثُمَّ اُمِيْتُوْا ثُمَّ اُحْيُوْا
لِلْبَعْثِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا بِكُفْرِنَا
بِالْبَعْثِ فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِنَ النَّارِ وَالرُّجُوْعِ
اِلَى الدُّنْيَا لِنُطِيْعَ رَبَّنَا مِنْ سَبِيْلٍ
طَرِيْقٍ وَجَوَابُهُمْ لَا .

১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে দু-বার মৃত্যু দান করেছেন দুটি মৃত্যু দান করেছেন! আর আমাদেরকে দু বার জীবন দান করেছেন দু-বার জীবিত করেছেন। কেননা তারা (প্রথমত) শুক্রকীট অবস্থায় মৃত ছিল। অতঃপর তাদেরকে জীবন দান করা হলো, তারপর পুনঃ মৃত্যুদান করা হলো, আবার পুনরুত্থানের জন্যে জীবিত করা হলো। অতএব, আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করে নিলাম। অর্থাৎ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার অপরাধ। যাই হোক বের হওয়ার জাহান্নাম হতে এবং দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের যাতে আমরা আমাদের প্রভুর আনুগত্য করতে পারি। কোনো পথ আছে কি? অর্থাৎ কোনো উপায় বা মাধ্যম আছে কি? আর তাদের জবাব দেওয়া হবে–'না' কোনো পথ নাই।

١٢. ذٰلِكُمْ اَيِ الْعَذَابُ الَّذِيْ اَنْتُمْ فِيْهِ بِاَنَّهُ اَيْ
بِسَبَبِ اَنَّهُ فِي الدُّنْيَا اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ
كَفَرْتُمْ ج بِتَوْحِيْدِهِ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهِ يُجْعَلْ لَهُ
شَرِيْكٌ تُؤْمِنُوْا ط تُصَدِّقُوْا بِالْاِشْرَاكِ
فَالْحُكْمُ فِيْ تَعْذِيْبِكُمْ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ عَلٰى
خَلْقِهِ الْكَبِيْرِ الْعَظِيْمِ .

১২. তোমাদের এ অবস্থার কারণ অর্থাৎ যে আজাবে এখন তোমরা প্রবিষ্ট আছ তা এ কারণে যে, যখন দুনিয়ায় এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলাকে ডাকা হতো তোমরা অস্বীকার করতে আল্লাহর একত্ববাদকে। আর যদি তাঁর সাথে শরিক অংশীদার স্থাপন করা হতো তাঁর সাথে অংশীদার মানা হতো তবে তোমরা তার উপর বিশ্বাস করতে অর্থাৎ তোমরা অংশীদার সাব্যস্ত করাকে সত্যায়ন করতে। কিন্তু জেনে রেখো! চূড়ান্ত ফয়সালার বাগডোর তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে একমাত্র সে আল্লাহ তা'আলার জন্যে নির্দিষ্ট যিনি সুমহান মর্যাদার অধিকারী তাঁর স্বীয় মাখলুকের উপর বিরাট মহান।

١٣. هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهِ دَلَائِلَ تَوْحِيْدِهِ وَيُنَزِّلُ
لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ط بِالْمَطَرِ وَمَا يَتَذَكَّرُ
يَتَّعِظُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ يَرْجِعُ عَنِ الشِّرْكِ .

১৩. তিনি সে মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখিয়ে থাকেন, তাঁর একত্ববাদের প্রমাণাদি। আর তিনিই আকাশ হতে তোমাদের জীবিকার জন্যে পানি অবতারণ করেন, বৃষ্টির মাধ্যমে। আর সে-ই একমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে নসিহত কবুল করে যে রুজু করে শিরক হতে প্রত্যাবর্তন করে।

Free @ www.eilm.weebly.com

١٤. فَادْعُوا اللّٰهَ اعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مِنَ الشِّرْكِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ اِخْلَاصَكُمْ مِنْهُ .

১৪. অতএব, আল্লাহকে আহ্বান করো তাঁর ইবাদত করো আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে শিরক হতে বেঁচে যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে তোমাদের শিরক হতে মুক্ত হওয়াকে।

١٥. رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ اَىْ اَللّٰهُ عَظِيْمُ الصِّفَاتِ اَوْ رَافِعُ دَرَجَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْجَنَّةِ ذُو الْعَرْشِ ج خَالِقُهُ يُلْقِى الرُّوْحَ الْوَحْىَ مِنْ اَمْرِهٖ اَىْ قَوْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يُخَوِّفَ الْمُلْقٰى عَلَيْهِ النَّاسَ يَوْمَ التَّلَاقِ بِحَذْفِ الْيَاءِ وَاِثْبَاتِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِتَلَاقِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْعَابِدِ وَالْمَعْبُوْدِ وَالظَّالِمِ وَالْمَظْلُوْمِ فِيْهِ .

১৫. তিনি উচ্চমর্যাদার অধিকারী অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সুমহান গুণাবলির অধিকারী, অথবা জান্নাতে ঈমানদারদের মর্যাদা সমুন্নতকারী আরশের অধিপতি তার সৃষ্টিকর্তা তিনি অবতীর্ণ করে থাকেন অর্থাৎ ওহী তাঁর নির্দেশে অর্থাৎ তাঁর ভাষ্যে তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার উপরে ইচ্ছা করেন যাতে সে যার উপর অবতীর্ণ করেন ভীতি প্রদর্শন করতে পারে যার উপরে নাজিল হয়েছে সে যেন লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে সাক্ষাতের দিনে [কিয়ামত দিবসে]। اَلتَّلَاقِ শব্দটির শেষে ى সংযোগে এবং ى বাদে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। কেননা, সেদিন আসমান জমিনের অধিবাসী, ইবাদতগুজার [উপাসক], মাবুদ [উপাস্য] এবং জালিম ও মজলুমের সাথে সাক্ষাৎ হবে।

তাহকীক ও তারকীব

"اِثْنَتَيْنِ" শব্দটির মহল্লে ইরাব কি? : এখনে اِثْنَتَيْنِ শব্দটি اِمَاتَتَيْنِ-এর صِفَتْ হয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে اَمَتَّنَا-এর مَفْعُوْلٌ হওয়ার সুবাদে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে। পরবর্তী اِثْنَتَيْنِ-এরও একই অবস্থা।

"اِذْ تُدْعَوْنَ" -এর মহল্লে ই'রাব কি? "اِذْ تُدْعَوْنَ" আয়াতাংশটুকু مَحَلًّا মানসূব হবে নিম্নবর্ণিত কারণে– ১. উহ্য اُذْكُرْ فِعْل-এর مَفْعُوْلٌ হিসেবে। ২. ظَرْف হওয়ার কারণে। ৩. পূর্বোক্ত مَقْتْ-এর مَفْعُوْلٌ হিসাবে।

"ذٰلِكُمْ" শব্দটির মহল্লে ই'রাব কি? "ذٰلِكُمْ" শব্দটি মহল্লান مَرْفُوْعٌ হয়েছে নিম্নবর্ণিত কারণে– ১. এটা মুবতাদা এবং তার খবর উহ্য রয়েছে মূলে বাক্যটি হবে "ذٰلِكُمُ الْعَذَابُ الَّذِىْ اَنْتُمْ فِيْهِ بِذَالِكَ السَّبَبِ" অর্থাৎ তোমাদের উপর যেই আজাব নেমে এসেছে তা এ কারণেই এসেছে। ২. এটা একটি উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ "اَلْاَمْرُ ذٰلِكُمْ"

"اَلتَّلَاقِ" শব্দের বিভিন্ন কেরাত : "اَلتَّلَاقِ" শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে–

১. اَلتَّلَاقِ শব্দটির শেষে ى ব্যতীত, তাই জমহুরের কেরাত।

২. اَلتَّلَاقِىْ শব্দটির শেষে ى (مُتَكَلِّمْ) যুক্ত করে। তা ইবনে কাছীর (র.) ও ইয়াকূব (র.)-এর কেরাত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... فَتَكْفُرُوْنَ" **আয়াতের বিশ্লেষণ** : আলোচ্য আয়াতের একথাটি তখনকার জন্যে যখন কাফেররা দোজখে প্রবেশ করে নিজেদের উপর আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকবে এবং নিজেদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে আমরা কেন এত পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। তাদের মধ্যে আত্মসমালোচনার সৃষ্টি হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে শিরক, নাস্তিকতা, পরকালে অবিশ্বাস এবং গোটা জীবন নবী রাসূলগণের বিরোধিতায় ব্যয় করে তারা নিজেরা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করেছে। নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে এনেছে। তখন তারা ক্ষোভে-ব্যথায় নিজেদের অঙ্গুলি কামড়াতে থাকবে– নিজেদের উপর নিজেরই অভিশাপ ও লা'নত দিতে থাকবে। এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের ডেকে বলবে আজকে তো তোমরা নিজেরা নিজেদের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে, অথচ যখন তোমাদেরকে ঈমানের পথে ডাকা হতো আর তোমরা ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করতে– যার কারণে আজ তোমরা জাহান্নামী হয়েছ– তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আরো অধিক ক্রোধান্বিত হয়েছেন। কেননা তিনি অতি মহব্বত ও আদর করে তোমাদেরকে সৃষ্ট করেছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনাটা কিভাবে সহ্য করতে পারেন?

অতএব, সময় থাকতেই আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করা অর্থাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। দুনিয়ার জীবনে কেউ এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তার আখেরাতে দুঃখ প্রকাশ করা ব্যতীত আর কোনোই গত্যন্তর থাকবে না।

কিয়ামত দিবসে কাফেরদের নিজেদের উপর ক্রোধ প্রকাশের বিভিন্ন দিক : মুফাসসিরগণ দুনিয়ার জীবনে কৃত নাফরমানির উপর কিয়ামত দিবসে কাফেরদের নিজেদের উপর ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশের নানান দিক উল্লেখ করেছেন। তা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র.) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, কেয়ামত দিবসে কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবলিস বলবে, "وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ" তোমাদের উপর আমার তো কোনো কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরা যা করেছ তার জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী। সে সময় কাফেররা ক্রোধে ফেটে পড়বে। কিন্তু করার তো কিছুই থাকবে না।

২. সেদিন কাফেররা জান্নাত ও জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তখন তাদের মনে পড়বে যে, একদিন দুনিয়ায় তারা এ বাস্তব সত্যটিকে প্রগাঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং সে জন্য তারা নিজেদের উপর বিক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হবে।

৩. কিয়ামত দিবসে কাফেরদের নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে ভর্ৎসনার বিপরীতে ভর্ৎসনা করবে। তারা বলবে, তোমাদেরকে তো আমরা জবরদস্তি কুফরির দিকে আনয়ন করি নি; বরং তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের সহযোগিতা করে আসছিলে।

৪. কাফেররা নিজেদের উপর নিজেরা ক্ষোভ প্রকাশ করার অর্থ হলো, কাফের নেতৃবৃন্দের উপর তাদের অনুসারীরা বিক্ষুব্ধ হবে। কারণ সে কথিত নেতাদের অনুসরণ করেই তো তারা আজকের এই দিনে মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। জাহান্নামের অনন্ত কালের আজাবে গ্রেফতার হয়।

اَلْمَقْتُ [আল-মাক্ত]-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য :

১. কারখীতে রয়েছে– اَلْمَقْتُ অর্থ হলো– অতীব অবজ্ঞা, ঘৃণা ও শত্রুতা। আর তা আল্লাহ তা'আলার শানে অসম্ভব। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কারো অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান, ধমক ও তিরস্কার।

২. আবূ সউদে রয়েছে– اَلْمَقْتُ অর্থ হলো– অতীব আবজ্ঞা, ঘৃণা ও শত্রুতা। আর এখানে মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং তার সান্নিধ্যপূর্ণ অপরিহার্য অর্থ উদ্দেশ্য। তা হলো তাদের উপর নারাজ, অভিসম্পাত ও তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ" **আয়াতের বিভিন্ন অর্থ :** কাফেররা তাদের দুনিয়ার জীবনের নাফরমানির কারণে কিয়ামত দিবসে নিজেদের উপর বিক্ষুব্ধ হলে ফেরেশতারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে; তোমরা তোমাদের উপর যতটুকু ন ক্রোধান্বিত হয়েছ তদপেক্ষা অধিক ক্রোধান্বিত হয়েছেন মহান আল্লাহ তা'আলা। এ কথাটির দুটি অর্থ হতে পার।

ক. দুনিয়াতে যখন তোমাদেরকে ঈমান আনার জন্য বলা হতো আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তা অপেক্ষা অধিক ক্রোধান্বিত হতেন অদ্য তোমরা নিজেরা নিজেদের উপর যতটুকু ক্রোধান্বিত হয়েছে। এমতাবস্থায় اِذْ تُدْعَوْنَ الخ -এর اِذْ যরফের জন্য হবে।

খ. তোমরা আজ নিজেরা নিজেদের উপর যতটুকু বিক্ষুব্ধ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তদপেক্ষা হাজারো গুণ বেশি বিক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছেন তোমাদের উপর। কেননা তোমাদের কত বড় স্পর্ধা! যখন দুনিয়ায় তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি-আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানানো হতো তখন তোমরা চরম ঔদ্ধত্যের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করতে। উল্টো 'দায়ী ইলাল্লাহ'-আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে। এমতাবস্থায় اِذْ শব্দটি تَعْلِيْل -এর জন্য হবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হলো তার মধ্যে ক্রোধের ফলাফল প্রকাশিত হওয়া তথা তাদেরকে আজাব প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তা বাস্তবায়িত করা। মানুষ কারো উপর ক্রোধান্বিত হলে সাধারণত যা করে থাকে।

"قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا...... خُرُوْجٍ مِنْ سَبِيْلٍ" **আয়াতের বিশ্লেষণ :** পার্থিব জীবনের রং তামাশায় মগ্ন কাফের গোষ্ঠী কিয়ামত দিবসে ফেরেশতা কর্তৃক তিরস্কৃত হবে। তাঁরা তাদের জঘন্য কুফরির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তখন তারা তা [নাফরমানি] অকপটে স্বীকার করে নেবে আর দুনিয়ার পুনঃ প্রত্যাবর্তন করানোর ব্যাপারে আরজি পেশ করবে মহান স্রষ্টার দরবারে। তারা স্বকাতরে সবিনয় নিবেদন জানাবে এই বলে, হে প্রতিপালক! তুমি সর্বশক্তিমান মহা পরাক্রমশালী, আমরা আমাদের কৃত ভ্রান্তি অনুধাবনে সচেষ্ট, আমরা তো প্রণহীন ছিলাম, আমাদের দুনিয়ার আলো-ছায়ায় কোনো অস্তিত্বই বিদ্যমান ছিল না। তুমি আমাদেরকে দু'বার জীবন দান করেছ আর দু'বার দিয়েছ মৃত্যু। আমার পিতার বীর্যে শুক্রকীটাবস্থায় ছিলাম, মানব রূপ ছিল না তথা এটা মৃত্যুরই নামান্তর। আবার আপনি মৃত্যু প্রদান করলেন দীর্ঘ জীবন দান করার পর তার অবসান ঘটিয়েছেন। এমনিভাবে দু'বার জীবনও দান করেছেন। একবার দুনিয়ার জীবন আর দ্বিতীয়বার পরকালের জীবন। আমরা দুনিয়ার জীবনে অপরাধের বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেছি। তোমার বিধি-নিষেধ পালন করিনি; তোমার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছি। তোমার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করিনি। আমাদের স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই। আমরা চরম অন্যায় করেছি, নিজেদের প্রতিই মূলত আমরা জুলুম করেছি। যখন ইতোপূর্বে দু' দু' বার জীবন দান করেছ তখন আরেকবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনে আমাদেরকে বর্ধিত কর। তবে এবার আর ভুল হবে না। ভ্রমে ও হেয়ালিপনায় জীবন নাশ করব না। আমরা তোমার ও তোমার রাসূলের নির্দেশিত পথে নিজেদেরকে পরিচালনা করব।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে মোট চারটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তারা শুধু একটিতে তথা পরকালের জীবনকেই অস্বীকার করত। এতদসত্ত্বেও অপরাপর তিনটির উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে যে, তারা তাতে সন্দিহান ছিল। আর উক্ত স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য ছিল– আমরা এক্ষণে চতুর্থ প্রকার তথা পুনরুত্থান ও প্রথমোক্ত তিন প্রকারের ন্যায় সন্দেহাতীত বিশ্বাস করলাম। পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আমরা যে অপরাধ করেছি, তা স্বীকার করছি। অতএব, হে রব! এ পরিস্থিতিতে জাহান্নামের আজাব হতে পরিত্রাণ পেয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে কি? যাতে আমরা তোমার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে পারি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জীবন মৃত্যু দু দু-বার হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : আলোচ্য আয়াতে দু-বার জীবন ও দু-বার মৃত্যুর যে আলোচনা এসেছে সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পেশ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লেখেছেন, এ পর্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে এক জীবন এবং কিয়ামত দিবসে যখন পুনরুত্থান হবে তখন আরেকটি জীবন লাভ করবে। অতএব, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের অবস্থাকে একটি মৃত্যু বলা হয়েছে, আর দুনিয়ার নশ্বর দেহ ত্যাগ করে শেষ বিদায়ের অবস্থাকে অপর একটি মৃত্যু বলা হয়েছে। এভাবে দুটি জীবন ও দুটি মৃত্যু হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরায়ে বাকারায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

অর্থাৎ তোমরা কিভাবে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি কর অথচ তোমরা ছিলে মৃত [প্রাণহীন, নির্জীব], এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু মুখে পতিত করবেন (যখন জীবনের অন্তিম সময় আসবে) এরপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন [কিয়ামতের দিন], এরপর তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে।

"قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ" দ্বারা কবরের আজাব প্রমাণিত হয় : বিরুদ্ধবাদী তথা কাফেররা মৃত্যু পরবর্তী কবরের আজাব অস্বীকার করত, আজও এ মতাবলম্বী লোকের সংখ্যা অনেক, যারা হাশর, মীযান, কবরের আজাব ইত্যাদিকে অস্বীকার করে। অথচ তা দ্রুব সত্য। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফেরদের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন, যাতে তারা কিয়ামত দিবসে সে ভাষায় ও শব্দে আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করবে।

"হে আমাদের রব! তুমি আমাদের দু দু-বার মৃত্যুদান করেছ, তেমনি দান করেছ দু'-বার জীবন ......।

উক্ত আয়াত হতে কোনো কোনো মুফাসসির কবরের আজাব সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা এভাবে দলিল সাজিয়েছেন যে, কাফেররা আলোচ্য আয়াতে দুটি মৃত্যুর কথা বলেছে। আর উক্ত মৃত্যুর একটি দুনিয়াতে সংঘটিত হয়েছে। তাই কবরে তথা আলমে বরযখে তাদেরকে আরেকটি জীবন প্রদান করা হবে। তাতে আরেকটি মৃত্যু সংঘটিত হতে পারে। অতএব, বুঝা গেল কাফেরদেরকে কবরে পুনরুজ্জীবিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

এ ব্যাপারে মুহাক্কিকীনরা যা বলেন : তবে আলোচ্য আয়াতের পর্যালোচনায় মুহাক্কিকীন মুফাসসিরীনে কেরাম বক্তব্য পেশ করেন, এভাবে যদিও অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে কবরের আজাব প্রমাণিত হয়েছে, আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। পরন্তু অত্র আয়াত দ্বারা কবরের আজাব সাব্যস্ত করাটা অনর্থক প্রয়াস। কারণ তাদের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত মৃত্যুদ্বয়কে গ্রহণ করা হলে জীবনদান নিঃসন্দেহে তিনবার হবে যেটা অত্র আয়াতেরই পরের অংশের وَاَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ সম্পূর্ণ বিরোধী। সুতরাং তাদের এ বক্তব্য মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া এটাতো কাফেরদের উক্তি আল্লাহ তা'আলা উদ্ধৃতি পেশ করেছেন মাত্র। সুতরাং এটা কিভাবে শরিয়তের দলিল সাব্যস্ত হতে পারে?

দুনিয়াতে দ্বিতীয়বার আসার আবেদন টালবাহানা মাত্র : কাফেররা যদিও দুনিয়ার বুকে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণই অস্বীকার করে আসছিল, কিন্তু মৃত্যুর পর এ ব্যাপারটি তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেননা তাদেরকেও তো জীবন দান করা হবে। এ অবস্থা ও দৃশ্য দেখে তাদের ভুলগুলো সামনে ভেসে আসবে সত্য প্রমাণিত হয়ে। তাদের ভ্রান্তিগুলো স্বীকার করা ব্যতীত কোনো গত্যান্তরও থাকবে না। এটা তাদের ভাবনা, অথচ আফসোস হবে। কেননা প্রকাশ্যত আখেরাতের এ বেষ্টনি হতে বেরুবার কোনো রাস্তা খোলা নেই। তারা এও ধারণা করবে যে, এতো পরিবর্তন পরিবধনকারী মহান আল্লাহর জন্য কোনো অসম্ভব ও মুশকিল কিছু নয় যে, তিনি এতসব পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কৌশলে মহা বিজ্ঞ তার পক্ষে আরেকটি পরিবর্তন সৃষ্টি করা তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। যদি এমন হতো অর্থাৎ আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানো হতো তবে আমরা প্রচুর পরিমাণে নেক আমল করে হে আল্লাহ তোমার দরবারে ফিরে আসতাম। কিন্তু তাদের এ প্রস্তাবটিকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর একেশ্বর বাদের আহবানের প্রতি কর্ণপাতই করনি: বরং সর্বদা অস্বীকারই

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তোমাদের মজ্জাগত অভ্যাস ছিল। পক্ষান্তরে কোনো মিথ্যা (মাটির তৈরি) যে কোনো দেবতার নামের যে কোনো আহ্বানে যে কোনো সময় সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ কর নি। এতেই তোমাদের ভণ্ডামী এবং বদভ্যাসের অনুমান করা সম্ভব। এটা তোমাদের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হলো যে, যদি তোমাদেরকে সহস্রাবারও দুনিয়াতে পাঠানো হয় তবুও সে রকম আমল তথা নাফরমানি করে আসবে যেমনটি ইতোপূর্বে করে এসেছ। কেননা আমার প্রিয়বান্দা নবীকূল শিরোমনি তোমাদের নানানভাবে বুঝিয়ে ছিল তোমরা জানতে এ কুরআন সত্যবাণী, তোমাদের লোকেরাই বলেছিল "مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَشَرٍ" এটা কোনো মানবের ভাষা হতে পারে না, এটা তো একমাত্র মহান স্রষ্টারই কালাম। তথাপি তোমরা বুঝেও না বুঝার ভান করে দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে আর ছিল একমাত্র জাগতিক হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। সুতরাং এখন তোমদের ভ্রান্তসমূহের এটাই যোগ্য শাস্তি। সর্বোচ্চ আদালত হতে যে সিদ্ধান্ত জাহান্নামের রূপে তোমার জন্য নির্ধারিত তা ভোগ করতেই হবে। এর আপিল প্রত্যাখাত, মুক্তির যে কোনো আকুতি অগ্রাহ্য-অতিরঞ্জিত।

"ذٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ .... لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ" **আয়াতের বিশ্লেষণ :** দুনিয়ার জীবনের কৃত অপরাধের স্বীকার করত কাফেররা কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলাকে সম্বোধন করে বলবে– আপনি যেমন আমাদেরকে দু দু-বার জীবন মৃত্যু দান করেছেন, তেমনি যদি আরো একবার আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ প্রদান করতেন, তবে আমরা অতীতের ক্ষতিপূরণ পূর্বক অধিক নেকি অর্জন করে আপনার পবিত্র মহান দরবারে উপস্থিত হতাম।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাফেরদের এ অসময়োচিত অন্যায় আবেদনের জবাবে ঘোষণা করা হবে, কখনো তোমাদেরকে দোজখ থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা হবে না। কেননা এ শাস্তি তোমাদের অপকর্মেরই অনিবার্য পরিণাম। স্মরণ আছে কি? যখনই তেমাদেরকে পৃথিবীতে এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের প্রতি আহবান জানানো হতো তখন তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে। শত চেষ্টাতেও তোমাদেরকে সঠিক পথের উপর আনা সম্ভব হয়নি। সত্য বিরোধিতায় তোমরা ছিলে সদা তৎপর। নবী রাসূলগণকে, তাঁদের অনুসারীদেরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারেও তোমরা ছিলে খড়গহস্ত। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা তাতে অস্বীকৃততি জানাতে আর যখন কেউ শিরকের ন্যায় জঘন্য অপরাধের প্রতি ডাকত তখন তোমরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করতে। সত্যকে তোমরা সর্বদা পরিহার করে চলেছ এবং অসত্যকে সর্বক্ষণ সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে রেখেছ। এতএব, তোমাদের শাস্তি অবধারিত। তোমরা আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও, একবার নয় সহস্রবার পাঠালেও তোমরা পাপাচারেই লিপ্ত হবে, তাই দোজখের আজাব ভোগ করতে থাক এটিই তোমাদের প্রাপ্য।

আজ ফলাফল প্রাপ্তির দিন, কারো কোনো কথা নেই, কোনো কর্তৃত্ব নেই, কোনো কিছুতেই কোনো প্রকার অধিকার নেই। অদ্য ফয়সালা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। যাঁর প্রভুত্ব ও আধিপত্য তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নাওনি। অপর দিকে যাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্বের অংশীদার সাব্যস্ত করার জন্যে তোমরা দৃঢ়তা পোষণ করছিলে, আজ চূড়ান্ত ফয়সালার ব্যাপারে তাদের একবিন্দু অংশও নেই, সুতরাং আজ আল্লাহর সিদ্ধান্ত হুকুম। অনন্ত কালের জন্য তোমরা জাহান্নামের কারাগারে দণ্ডভোগ করতে থাক, তোমাদের মুক্তির আশা দুরাশা মাত্র। মহাপরাক্রমশালী মর্যাদাবান সুমহান আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তই আজ বলবৎ থাকবে। তাঁকে রুখতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই।

"هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ .... وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ" **আয়াতের বিশ্লেষণ :** উল্লিখিত আয়াত দুটিতে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় বিশেষ গুণাবলি ও নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়েছে, সেসব নিয়ামতের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে তা হতে উপদেশ গ্রহণ পূর্বক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত মানুষের জীবন ধারণের জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাটি কি আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের অন্যমত নিদর্শন নয়? কেননা আল্লাহ তা'আলাই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ফলে পৃথিবী সজীব হয়; ফল-ফসল উৎপন্ন হয়; আবহমান কাল থেকে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শন মানুষ দেখতে থাকে কিন্তু তবুও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না; তদুপরি তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করে না। অথচ যে সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার কথা মনে করে সেই উপদেশ গ্রহণ করে আর যে গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে বা যে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না সে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েই জীবন পরিচালনা করে এমন লোকের শাস্তি অনিবার্য।

Free @ www.eilm.weebly.com

সুতরাং আল্লাহর একত্ববাদের উপর যখন প্রমাণ বর্তমান রয়েছে তখন তোমরা একনিষ্ঠতার সাথে কায়মনে তাঁর ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরিক কর না। প্রকৃতপক্ষেই মুসলমান হয়ে যাও। কাফেরদের নিকট এটা অপছন্দনীয় হলেও তার পরোয়া করে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকলে কাফেরদের অসন্তুষ্ট কিছু যায় আসে না।

"وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا" **আয়াতাংশে রিজিকের দ্বারা উদ্দেশ্য :** মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত আয়াতাংশে রিজিক رِزْق -এর দ্বারা مَطَر তথা বৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা মানুষকে দুনিয়ায় যত প্রকারের রিজিক প্রদান করা হয় তার সবটাই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এটা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অসংখ্য নিদের্শনাবলি হতে একটি। এর দ্বারা লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, তোমরা শুধু এ একটি বস্তুর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, কুরআনে মাজীদে তোমাদের সামনে পৃথিবী সম্পর্কে যেই ধারণা পেশ করা হয়েছে তাই সত্য বিশ্ব-দর্শন। বৃষ্টি পাতের উক্ত ব্যবস্থা কেবল তখনই কার্যকর হওয়া সম্ভব যখন জমিন তার মধ্যস্থ প্রত্যেকটি জিনিস-পানি, বাতাস, সূর্য, গ্রীষ্ম, উত্তাপ ও শৈত্য সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা হবেন আল্লাহ পাক। আর এ ব্যবস্থা লক্ষ-কোটি বৎসর ধরে শুধু তখনই কার্যকর হয়ে থাকতে পারে ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলতে পারে যখন সেই চিরন্তন আল্লাহ পাক তাকে কার্যকর রাখেন। আর এ ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক অবশ্যই এক মহাবিজ্ঞানী ও দয়াবান প্রভুই হতে পারেন যিনি পৃথিবীতে মানুষ, জীব, জানোয়ার ও গাছ-পালা যখন সৃষ্ট করেছেন, সেই সবের প্রয়োজন পরিমাণ পানিও ঠিক তখনই বানিয়েছে এবং সেই পানিকে সুনিয়মিতভাবে যথাসময়ে জমিনের বুকে পৌঁছাবার ও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা করেছেন। এমতাবস্থায় এ সবকিছু চোখে অবলোকন করেও যে লোক আল্লাহকে অস্বীকার করে কিংবা তাঁর সাথে অপর কোনো সত্তাকে আল্লাহর কর্তৃত্বের ব্যাপারে শরিক করে সে নিঃসন্দেহে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পরকালের শাস্তি হতে কোনো মতেই সে নিস্তার পাবে না।

"وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ" **আয়াতাংশের দ্বারা উদ্দেশ্য :** আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি দেখিয়ে শুধু তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে– যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করার ইচ্ছা করে থাকে। কেননা আল্লাহর প্রতি রুজু করতে চাইলে তার মধ্যে একাগ্রতা, চিন্তা ও ধ্যানের আবির্ভাব হয়ে থাকে। যার পরিণামে সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার দীদার ও সন্তোষ অর্জিত হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ বিমুখ–যাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর গাফলতি কিংবা হিংসা-বিদ্বেষের পর্দা পড়ে রয়েছে তারা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তার চক্ষু দেখতে পাচ্ছে যে, বাতাস হচ্ছে– মেঘ জমাট বাঁধছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তার বিবেকচিন্তা করবে না যে, এ সব কেন হচ্ছে, কে করছে এবং এর ব্যাপারে আর কি করণীয় রয়েছে?

আল্লাহর জন্য দীনকে খালিস করার অর্থ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–"فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ" অর্থাৎ আল্লাহর জন্য দীনকে খালিস করত তাঁর ইবাদত কর। এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় দু'টি বিষয় লক্ষণীয়।

১. উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাবি জানানো হয়েছে।

২. এমন ইবাদত প্রত্যাশা করা হয়েছে যা দীনকে আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পরই সম্ভব।

আরবি ভাষার অভিধান গ্রন্থ পর্যলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, عِبَادَةٌ [ইবাদত]-এর দুটি অর্থ বিদ্যমান– ১. পূজ ও উপাসনা। ২. বিনয় ও নম্রতাপূর্ণ আনুগত্য, আন্তিক আগ্রহ, উৎসাহের সাথে আল্লাহর হুকুম পালন করা।

উপরিউক্ত আভিধানিক প্রামাণ্য ব্যাখ্যানুযায়ী এখানে শুধু আল্লাহ তা'আলার পূজা-উপাসনাই কামনা করা হয় নি; বরং তাঁর আদেশ-নিষেধ মনে-প্রাণে অনুসরণ করার জোর দাবি জানায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অপরদিকে دِين [দীন] শব্দটিও আরবি ভাষায় প্রধানত তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১. আনুগত্য, হুকুম পালন, গোলামী ও দাসত্ব।

২. সেসব আদব অভ্যাস ও নিয়ম-নীতি যেগুলো মানুষ পালন করে চলে।

৩. আধিপত্য, মালিকানা, প্রভুত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনা, হুকুম চালানো এবং অন্যদের উপর নিজেদের ফয়সালা কার্যকর করা।

উপরোল্লিখিত তিনটি অর্থের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, অত্র আয়াতে 'দীন' শব্দের অর্থ হলো এমন কর্মনীতি, পদ্ধতি ও আচরণ যেটা মানুষ কারো উচ্চতর কর্তৃত্ব মেনে ও কারো আনুগত্য কবুল করে।

আর দীনকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর বন্দেগি করার অর্থ হলো– আল্লাহর বন্দেগির সাথে অন্য কারো বন্দেগি জুড়ে দেবে না; উপাসনা একমাত্র তাঁরই হবে। তাঁরই দেখানো ও নির্দেশিত হেদায়েতের পথে জীবন চালাবে এবং তাঁরই বিধানাবলি ও আদেশ নিষেধ মান্য করবে।

"رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ...... لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ" আয়াতের বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনিই আরশের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার উপর ইচ্ছা করেন নিজের নির্দেশে ওহী নাজিল করে থাকেন। যেন সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করিয়ে দেয়।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কতিপয় মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, এখানে دَرَجَاتٌ-এর দ্বারা صِفَاتٌ-কে বুঝানো হয়েছে। অতএব, رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ-এর অর্থ হবে رَفِيعُ الصِّفَاتِ তথা তার সৎ গুণাবলি সর্বোচ্চ মর্যাদার। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) একে প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এখানে আরশের সুউচ্চ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আরশ বিস্তৃত। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বকে ঘর কল্পনা করা হলে আরশ হবে তার ছাদের ন্যায়। যেমন সূরায়ে মা'আরিজে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "مِنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ"

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) আরও বলেছেন যে, এ পঞ্চাশ সহস্র বছরের পরিমাণ হলো সে দূরত্ব যা সপ্তম আকাশ হতে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। জমহুর এ মতকেই গ্রহণ করেছে। কিছুসংখ্যক মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, আরশে আযীম হলো ইয়াকুত পাথরের তৈরি। এর পরিধি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব এবং এর উচ্চতা সপ্তম আকাশ হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্ব সম।

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ-এর অন্য অর্থ হলো رَافِعُ الدَّرَجَاتِ অর্থাৎ আল্লাহভীরু ঈমানদারদের মর্যাদা বুলন্দকারী। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–"نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ" আরো ইরশাদ হয়েছে– هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ইত্যাদি।

মোদ্দাকথা, সমস্ত সৃষ্টিলোকে আল্লাহ পাকের মর্যাদা সর্বোচ্চ। এ বিশ্বলোকে যা কিছু রয়েছে, তা ফেরেশতা হোক বা নবী ওলী কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টিই হোক না কেন, তা অন্য সব সৃষ্টির তুলনায় যতই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হোক না কেন– আল্লাহর সর্বোচ্চ মর্যাদার নিকটবর্তী হওয়ার কথা ধারণাও করা যেতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহ, শাসক, পরিচালক ও পৃথিবীর সিংহাসনের অধিকারী। এমন নয় যে, তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর কোথাও গিয়ে আরাম করছেন এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন; বরং তিনি সরাসরি এ বিশ্বলোকের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সুসম্পন্ন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই নন; বরং তার সার্বভৌম শাসক ও পরিচালকও একমাত্র তিনিই।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা নবুয়ত দান করে থাকেন। তার অনুগ্রহের ব্যাপারে কারো হাত নেই। অমুককে রূপ-লাবণ্য দেওয়া হয়েছে কেন বা অমুককে স্মরণ শক্তি বা বুদ্ধি মত্তা ও প্রতিভার অসাধারণ শক্তি কেন দেওয়া হয়েছে বলে, যেমন কেউ প্রশ্ন করতে পারে না, তদ্রূপ অমুককেই কেন নবুয়তের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে এটাও করতে পারে না। আমরা যাকে চেয়েছিলাম তাকে কেন নবী নিযুক্ত করা হয়নি, বলেও আপত্তি জানাবার অধিকার কারো নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মোলাকাতের দিনের তাৎপর্য : কিয়ামতের দিনকে মোলাকাতের দিন বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য হলো–

১. সেদিন হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ সন্তানের মোলাকাত হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বশেষ যে ভূমিষ্ঠ হবে, আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গে তারও মোলাকাত হবে।

২. হযরত কাতাদা (র.) বলছেন, সেদিন আসমান জমিনের অধিবাসীগণ একত্রিত হবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির জালিম ও মজলুমের মোলাকাত হবে। কিয়ামত দিবসে সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে সেখানে কেউ আত্মগোপন করে থাকতে পারবে না, এমনকি ছায়াও থাকবে না। সেদিন সকলেই আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে থাকবে। সেদিন মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, আজ রাজত্ব কার? কেউ এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার হিম্মত করবে না। কারো কিছুই বলার থাকবে না। সকল প্রাণ নিজ আত্মাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং জবাব দেবেন, لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আজ সর্বময় ক্ষমতা প্রবল প্রতাপান্বিত এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার।

৩. ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসকে 'মোলাকাতের দিন' এ জন্য বলা হয়েছে যে, সেদিন বান্দারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করে ধন্য হবে।

৪. হাকিম, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম, ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমগ্র সৃষ্টি জগতকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন; জিন, মানুষ, পক্ষীকুল সকলকেই একত্রিত করা হবে। এরপর সর্বনিম্ন আসমান ফেটে যাবে, এ আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে। তাদের সংখ্যা জিন ও মানুষ থেকে অধিকতর হবে।

উপরিউক্ত হাদীসের সুদীর্ঘ বর্ণনায় সাতটি আসমান ভেঙ্গে পড়া এবং প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীদের একের পর এক অবতরণ এবং অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার আত্মপ্রকাশ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলার আত্মপ্রকাশ করার অবস্থা কি হবে তা মানুষের বোধ শক্তির উর্ধ্বে। সেদিন কবরসমূহ থেকে মানুষ বের হয়ে আসবে তখন সকলেই সম্মুখে থাকবে, কোনো কিছুরই আড়াল থাকবে না।

"يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ" আয়াতাংশের রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্যাংশ "رُوْحٌ"-এর দ্বারা ওহীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, ওহীর মাধ্যমে কাফেরদের মৃত [ঈমানী] আত্মার মধ্যে রূহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণেই কাফেরদেরকে মৃত বলা হয়েছে আর ঈমানদারদেরকে বলা হয়েছে জীবিত। পয়গাম্বরদের প্রতি ওহী নাজিল হয়। তাঁদের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট ওহী পৌঁছায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٦. يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ ج خَارِجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ط لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط يَقُوْلُهُ تَعَالٰى وَيُجِيْبُ نَفْسَهُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اَىْ لِخَالِقِهِ .

১৬. সেদিন মানুষ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে তাদের কবর হতে বের হবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? আল্লাহ তা'আলা এটা বলবেন। আর নিজেই নিজের সে প্রশ্নের জবাব দেবেন। প্রবল প্রতাপান্বিত এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার অর্থাৎ এ দিবসেরই [মহাপরাক্রমশালী] সৃষ্টিকর্তার।

١٧. اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ يُحَاسِبُ جَمِيْعَ الْخَلْقِ فِىْ قَدْرِ نِصْفِ نَهَارٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذٰلِكَ .

১৭. অদ্য প্রত্যককে তার কর্মফল দেওয়া হবে, আজ কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম করা হবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, দুনিয়ার দিনের হিসেবে অর্ধ দিবসে তিনি সমগ্র সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করবেন।

١٨. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ اَزِفَ الرَّحِيْلُ قَرُبَ اِذِ الْقُلُوْبُ تَرْتَفِعُ خَوْفًا لَدَى عِنْدَ الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ط مُمْتَلِئِيْنَ غَمًّا حَالٌ مِنَ الْقُلُوْبِ عُوْمِلَتْ بِالْجَمْعِ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ مُعَامَلَةَ اَصْحَابِهَا مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ مُحِبٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ لَا مَفْهُوْمَ لِلْوَصْفِ اِذْ لَا شَفِيْعَ لَهُمْ اَصْلًا فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ اَوْلَهُ مَفْهُوْمٌ بِنَاءً عَلٰى زَعْمِهِمْ اَنَّ لَهُمْ شُفَعَاءَ اَىْ لَوْ شَفَعُوْا فَرْضًا لَمْ يُقْبَلُوْا .

১৮. [হে রাসূল আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সাবধান করে দিন, অর্থাৎ কিয়ামত দিবস, اَلْاٰزِفَةُ শব্দটি আরবদের উক্তি اَزِفَ الرَّحِيْلُ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। اَزِفَ অর্থ হলো قَرُبَ [নিকবর্তী হয়েছে] যখন প্রাণসমূহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে আসবে নিকট কাছে কণ্ঠনালীর এমতাবস্থায় তারা তা সংযত করতে থাকবে। চিন্তায় পরিপূর্ণ হবে। كَاظِمِيْنَ [কাযিমীনা] এটা قُلُوْب হতে حَال হয়েছে। অপরাপর جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ -এর ন্যায় এটাকে ى ও নূনের দ্বারা جَمْع [বহুবচন] করা হয়েছে। সীমালঙ্ঘনকারী জালিমদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। ভালোবাসাকারী প্রেমিক আর না কোনো সুপারিশকারী রয়েছে যার আদেশ পালন করা অবশ্যকর্তব্য। আলোচ্যাংশে মূলত وَصْف -এর কোনো অর্থ নেই। কেননা তার কোনো সুপারিশকারীই থাকবে না। যেমন– অন্য আয়াতে রয়েছে "فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ" অর্থাৎ তাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। অথবা, এর অর্থ হলো এ হিসেবে যে, তাদের ধারণা মতে তাদের জন্য সুপারিশকারী থাকবে। যদি ধরে নেওয়া হয় তাদের জন্য সুপারিশকারী থাকবে, তবে তাদের সে সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না।

١٩. يَعْلَمُ اَىِ اللّٰهُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ بِمُسَارَقَتِهَا النَّظَرَ اِلٰى مُحَرَّمٍ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ الْقُلُوْبُ .

১৯. তিনি অবগত অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন, চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতাকে নিষিদ্ধ হারাম বস্তুর দিকে [লোলুপ দৃষ্টিতে] তাকিয়ে তাকিয়ে তা চুরি করাকে [তিনি তাও অবগত] যেটা বক্ষদেশ লুকিয়ে গোপন রাখে। অন্তরসমূহ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْ دُوْنِهٖ وَهُمُ الْاَصْنَامُ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ط فَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ شُرَكَاءَ لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِهِمْ الْبَصِيْرُ بِاَفْعَالِهِمْ.

২০. আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে বিচার করবেন, আল্লাহ তা'আলার স্থলে তারা যাদের ডাকতে থাকে তথা ইবাদত করে অর্থাৎ মক্কার কাফেররা, يَدْعُوْنَ শব্দটি ى এবং تَاء উভয়ের সাথে পড়া যায় [অর্থাৎ يَدْعُوْنَ ও تَدْعُوْنَ] তাকে [আল্লাহকে] ব্যতীত আর তারা হলো দেব-দেবী, তারা কোনো প্রকার ফয়সালা করতে পারে না সুতরাং কিরূপে তারা আল্লাহ তা'আলার শরিক হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা তাদের বক্তব্যসমূহ সর্বদ্রষ্টা অধিক শ্রেতা তাদের কৃতকর্মসমূহে।

তাহকীক ও তারকীব

اِذِ الْقُلُوْبُ الخ আয়াতে كَاظِمِيْنَ-এর মহল্লে ই'রাব কি? এখানে "كَاظِمِيْنَ" শব্দটিতে দু ধরনের ই'রাব হতে পারে।

১. এটা مَحَلًّا মানসূব হবে। এ অবস্থায় দু সম্ভাবনা– ক. হয়তো এটা اَصْحَابُ الْقُلُوْبِ হতে حَالٌ হবে। এ পরিসরে আয়াতের অর্থ হয়- "اِذْ قُلُوْبُهُمْ لَدَى حَنَاجِرِهِمْ كَاظِمِيْنَ عَلَيْهَا" যখন তাদের অন্তরসমূহ কণ্ঠাগত হবে, অথচ তারা সেগুলোকে সংযত করতে ইচ্ছা করবে। খ. না হয় এটা অর্থাৎ كَاظِمِيْنَ টা اَلْقُلُوْبُ হতে حَالٌ হবে। তখন অর্থ হবে- اِذِ الْقُلُوْبُ كَاظِمِيْنَ عَلٰى غَمٍّ وَكَرْبٍ فِيْهَا مَعَ كَوْنِهَا الْحَنَاجِرِ অর্থাৎ 'যখন কণ্ঠাগত হওয়া সত্ত্বেও অন্তরসমূহ দুঃখে ও ক্ষোভে পরিপূর্ণ হয়ে পড়বে।'

২. এটা مَحَلًّا মারফূ' হবে। অর্থাৎ كَاظِمُوْنَ হবে। এমতাবস্থায় এটা اَلْقُلُوْبُ-এর খবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ" আয়াতের বিশ্লেষণ : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ পরিস্থিতির মাঝে মানুষের অবস্থার যৎসামান্য বিবরণ প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যককে নবুয়তের গুরুদায়িত্ব প্রদানের জন্যে নির্বাচিত করেছেন। যেন তারা মানুষদেরকে কিয়ামত তথা হাশরের দিবস সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করাতে পারেন। তাদেরকে সাবধান করে দিতে পারেন। সেদিন সমগ্র মানুষ আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হবে। তাদের ক্ষুদ্রতর কোনো বিষয়ও আল্লাহ পাকের নিকট গোপন থাকবে না।

আল্লাহর বাণী "هُمْ بَارِزُوْنَ" দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর পবিত্র বাণী "هُمْ بَارِزُوْنَ" -এর তাফসীরে হযরত মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.)-এর তাফসীরে বলেছেন– خَارِجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ অর্থাৎ হাশরের দিবসে লোকসকল তাদের কবরসমূহ হতে বের হয়ে আসবে।

২. মুফতি শফী (র.) লিখেছেন যে, "بَارِزُوْنَ" -এর ভাবার্থ হলো হাশরের ময়দান সম্পূর্ণ সমতল হবে। অথবা পাহাড়-পর্বত, প্রাসাদ অথবা বৃক্ষলতা কিছুই থাকবে না। সুতরাং তখন সৃষ্ট জীব সরাসরি গোচরীভূত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এর অর্থ হলো হাশরের ময়দানে সকল সৃষ্টির কৃতকর্ম ও যাবতীয় গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

৪. অথবা কেউ কেউ বলেছেন- এর অর্থ হলো হাশরের ময়দানে মানুষসমূহকে উলঙ্গ করে উঠানো হবে। সুতরাং হাদীস শরীফে রয়েছে "يُحْشَرُونَ عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا" অর্থাৎ লোকজনকে উলঙ্গ ও নগ্ন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে।

মোদ্দাকথা, হাশরের ময়দানে বান্দার সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আমল আল্লাহ তা'আলার নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়বে।

لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, হাশরের দিন কারো কোনো বিষয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট উহ্য থাকবে না। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কাফের ও পাপীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। তাদেরকে অবগত করালেন যে, তোমরা যত সঙ্গোপনেই গুন্নাহ কর না কেন তা হাশরের দিন যেদিন তোমাদের প্রতিটি কাজ-কর্মের কড়া-ক্রান্তি হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে বিন্দুমাত্র গোপন রাখতে পারবে না। দুনিয়ার বিচারক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে যেভাবে ফাঁকি সম্ভব হয় হাশরের ময়দানেও আল্লাহর চক্ষুকে অনুরূপ ফাঁকি দিতে পরবে বলে যারা ধারণা করে বসে রয়েছে, তারা চরম ভ্রান্তির মধ্যেই নিমজ্জিত রয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া তাঁর নিকট হতে কোনো কিছুকে গোপন রাখা মোটেই সম্ভবপর হবে না। অবশ্য দুনিয়াতেও সে তাঁর নিকট হতে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় তা নয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, দুনিয়াতে কাফের ও পাপাচারীদের অনেক কিছু আল্লাহ জেনেও না জানার ভাব দেখান। পরীক্ষার স্বার্থে তাদের সবকিছু প্রকাশ করে দেন না। কিন্তু পরকালে হাশরের ময়দানে তিনি সবকিছু ফাঁস করে দেবেন। সকল গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে দেবেন, যা দুনিয়োতে করেননি। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে এ একই কথার দিকে ইঙ্গিতবহ।

১. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ সেদিন সমস্ত গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করে দেওয়া হবে।

২. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ হাশরের দিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো গোপন বিষয়ই সেদিন গোপন থাকবে না।

৩. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا সেদিন তা নিজের উপর সংঘটিত সমস্ত অবস্থা প্রকাশ করে দেবে।

৪. "إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ" যেদিন কবরস্থ সব কিছু উত্থিত হবে এবং অন্তরস্থ সবকিছু প্রকাশিত হবে।

মোদ্দাকথা, হাশরের দিন মানুষের সকল গোপন তথ্য প্রকাশিত হবে এবং তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কঠোর প্রতিফল প্রদান করা হবে। হয় তা হবে জান্নাত রূপে না হয় 'জাহান্নাম'।

"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" আয়াতাংশের বিশ্লেষণ : হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত সৃষ্টিকুলকে লক্ষ্য করে দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করবেন- لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ অর্থাৎ আজকের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পরাক্রমতার প্রভাবে কেউই কিছু বলার সাহস পাবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজেই উত্তরে বলবেন "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" অদ্যকার সর্বময় কর্তৃত্ব ও রাজত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হলেন এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ। এতদ সম্পর্কিত দুটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে-

ক. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস আবূ দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, একজন ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করবে যে, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি সে সময় এসে গেছে, এ ঘোষণার আওয়াজ এতই সুদীর্ঘ হবে যে, জীবিত ও মৃত সকলেই তা শুনতে পারবে। আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে আগমন করবেন, তখন একজন ফেরেশতা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘোষণা করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. ইমাম কুরতুবী (র.) উল্লেখ করেন যে, আবূ ওয়ায়েল হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সকলকে একটি পরিষ্কার ময়দানে একত্রিত করা হবে যে জমিনে কেউ কোনো দিন কোনো পাপ করে নি। অতঃপর এক আহ্বানকারীকে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলা হবে- "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" তখন সমগ্র মু'মিন ও কাফের এক বাক্যে সমস্বরে বলে উঠবে-"لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" ঈমানদারগণ তাদের আকীদা অনুযায়ী আনন্দের সাথে তা বলবে। অপর দিকে কাফেররা নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বেদনাহত হয়ে তা স্বীকার করে নেবে।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য কতেক বর্ণনায় এসেছে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই জবাবে তা বলবেন।

সে যা-ই হোক আল্লাহ তা'আলা ভর্ৎসনার সুরে সেদিন উপরিউক্ত প্রশ্ন উথাপন করবেন। দুনিয়ায় তো এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক অনেক রয়েছে যারা নিজেদের একচ্ছত্র বাদশাহী ও স্বৈরতন্ত্রের শানাই বাজাতে থাকে। আর অনেক নির্বোধ লোকই তাদের বাদশাহী ও শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতেছে। কিন্তু এখন বল, মূলত বাদশাহী, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কার? সর্বময় ক্ষমতার উৎস ও মালিক কে? সত্যিকার পক্ষে কার হুকুম চলে? তা এমন একটা কথা, যা কেউ চেতনা সহকারে শুনতে পেলে সে যত বড় স্বৈরাচারী বাদশাহ ও নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের অধিকারী হোক না কেন তার কলিজা প্রকম্পিত হয়ে উঠবে এবং স্বৈরতন্ত্রের বাষ্প সবই তার মস্তিষ্ক হতে বের হয়ে পড়বে।

এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ্য। সামানী পরিবারের বাদশাহ নসর ইবনে আহমদ নিশাপুরে প্রবেশ করে। একটি দরবার বসাল। আর সিংহাসনে আরোহণ করে নির্দেশ দিল যে, দরবারের কার্যক্রম আরম্ভ হবে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। তার কথা শুনে এক বৃদ্ধ লোক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কুরআনের এ আয়াতসমূহ পাঠ করল। বৃদ্ধ তেলাওয়াত করতে করতে এ আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছলে নসর ইবনে আহমদ বাদশাহের উপর ভয় ও কম্পন আরম্ভ হয়ে গেল। সে প্রকম্পিত অবস্থায় সিংহাসন হতে নেমে আসল। রাজমুকুট মাথার উপর হতে নামিয়ে সিজদায় পড়ে গেল এবং বলল- "হে আল্লাহ! বাদশাহী একমাত্র তোমারই, আমার নয়"।

"لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الخ" আয়াতে প্রশ্নকারী ও উত্তর দাতা কে? উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরের দিন উপস্থিত জানতার উদ্দেশ্য প্রশ্ন পরিবেশন করা হবে এ মর্মে "অদ্যকার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব কার"। এর উত্তরে বলা হবে- "একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার। অথচ একথার উল্লেখ নেই যে, কে প্রশ্ন করবে আর কেই বা উত্তর দেবে। সুতরাং এতদ সম্পর্কিত মুফাসসিরীনের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

১. কিছু সংখ্যক মুফাসসিরীনে কেরাম (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ থেকেই হাশরের ময়দানে সমগ্র জনতার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত প্রশ্ন তুলবেন এবং নিজেই তার জবাব পেশ করবেন। কারণ সেদিন, সেক্ষণে আল্লাহ সুবহানুহুর প্রভাবে কেউ মুখ খোলার সাহস করবে না। শ্রদ্ধেয় ইমাম আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.)-এর এটাই অভিমত।

২. এক দল মুফাসসিরের মতে প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতা উভয়ই হবেন ফেরেশতা।

৩. অন্যরা বলেন, প্রশ্নকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আর উত্তর দেবেন হাশরের মাঠে উপস্থিত মানুষরা।

৪. আল্লাহর পক্ষ হতে একজন ঘোষণাকারী উল্লিখিত প্রশ্ন রাখবেন। আর তখনই সমগ্র মু'মিন ও কাফের জবাবে সমস্বরে বলে উঠবে "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" অদ্যকার রাজত্বের মালিক একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার।

হযরত হাসান বসরী (র.) সহ অধিকাংশ তাফসীরকারগণ প্রথমোক্ত মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রা.) এর নিম্নোক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন সমস্ত জমিনকে বাম হাতে এবং আসমানসমূহকে ডান হাতে ধারণ করে বলবেন "اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ" "আমিই বাদশাহ, সব কিছুর মালিক, প্রতাপশালী ও দাম্ভিকেরা আজ কোথায়?"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কখন বলা হবে "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" ? উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর কখন করা হবে– এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. একদল মুফাসসিরীনে কেরামের মতে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ যেমন– হযরত জিবরাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত ইসরাফীল এমনকি মালাকুল মউত হযরত আযরাঈল (আ.)ও ইন্তেকাল করবেন। আল্লাহ তা'আলার একক সত্তা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত প্রশ্ন রাখবেন–

এখানে প্রিয়নবী ﷺ -এর একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য, বায়হাকী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, যার মর্ম হলো, তিনজন ফেরেশতা বেহুঁশ হবে না তারা হলেন জিবরাঈল, মীকাঈল এবং আযরাঈল (আ.)। এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদিও তিনি সবই অবগত তবুও জিজ্ঞাসা করবেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা আর কে অবশিষ্ট আছে? মালাকুল মওত বলবেন, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র সত্তা এবং তোমার বান্দা জিবরাঈল, মীকাঈল ও মালাকুল মওত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, মিকাঈলের রূহ কবজ করে নাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, আর কে বাকি রয়েছে? মালাকুল মওত আরজ করবে, হে আল্লাহ তা'আলা! তোমার মহাপবিত্র সত্তা এবং তোমার বান্দা জিবরাঈল ও মালাকুল মওত : আদেশ হবে, জিবরাঈলের রূহ কবজ করে নাও। তখন উক্ত আদেশ কার্যকর হবে। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, এখন কে রয়েছে? তখন হযরত আযরাঈল (আ.) বলবেন, শুধু তোমার পবিত্র সত্তা এবং মালাকুল মওত। আদেশ হবে, তুমিও মৃতুবরণ কর, এবার মালাকুল মওতের মৃত্যু হবে। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা তখন ঘোষণা করবেন, আমিই সর্বপ্রথম সমগ্র মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছি, পুনরায় আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করব, আজ দম্ভকারী, জালিমরা কোথায়? আজ ক্ষমতা কার? কিন্তু তখন কেউই জবাব দেওয়ার মতো অবশিষ্ট থাকবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইরশাদ করবেন– لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজ ক্ষমতা) একমাত্র এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলারই, যিনি মহা পরাক্রমশালী। –[তাফসীরে মাযহারী : ১০/২২৫]

২. জুমহুর মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, কবর থেকে উঠে এসে মানুষদের হাশরের ময়দানে একত্রিত হওয়ার পর তথা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পর সমগ্র সৃষ্টি পুনরুজ্জীবিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা উপস্থিত সৃষ্টিকুলের সামনে প্রশ্ন রাখবেন। তাৎক্ষণিক অকপটে সমস্বরে উপস্থিত জনতা ঈমানদার ও কাফের নির্বিশেষে সকলেই জবাব দেবে "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" ঈমানদাররা তো আনন্দের সাথে এ জবাব দেবে। অপরদিকে কাফের বাধ্য নিরুপায় হয়ে দুঃখভারাক্রান্ত মনে, অসহনীয় জ্বালা ক্ষোভ বক্ষে ধারণ করে উক্ত জবাব দেবে। এ পরিসরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ مِثْلَ الْفِضَّةِ لَمْ يَعْصِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا . فَيُؤْمَرُ مُنَادٍ يُنَادِيْ "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" فَتَقُوْلُ الْعِبَادُ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافِرُهُمْ "لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ" فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ هٰذَا سُرُوْرًا وَتَلَذُّذًا وَيَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ غَمًّا وَانْقِيَادًا وَخُضُوْعًا .

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হাশরের ময়দান হবে রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও স্বচ্ছ। এর মধ্যে কেউই পাপাচারে লিপ্ত হয়নি। তখন এক ঘোষক ঘোষণা দিয়ে বলবে, আজকের দিনের কর্তৃত্ব কার? ঈমানদার ও কাফের সকলেই নির্বিশেষে বলে উঠবে মহাপরাক্রমশালী এক অদ্বিতীয় আল্লাহর। ঈমানদারগণ এটা আনন্দ উল্লাসের সাথে বলবেন আর কাফেররা ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে বাধ্য হয়ে বলবে। উক্ত দ্বিতীয় মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এর কারণ হলো–

ক. "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" -এর পূর্বে "يَوْمَ التَّلَاقِ" ও "يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ" উল্লেখ করা হয়েছে। "يَوْمَ التَّلَاقِ" অর্থ হলো– মোলাকাত ও একত্রিত হওয়ার দিবস আর "يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ" যেদিন মানুষ তাদের কবর হতে বের হয়ে আসবে তথা পুনরুত্থানের দিন। এ দুটি অবস্থা দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে সংঘটিত হবে। আর এসবের যেহেতু "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ" -এর উল্লেখ আনা হয়েছে, সেহেতু এ থেকে প্রকাশ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য প্রশ্নোত্তরের ঘটনা ও দ্বিতীয় ফুৎকার বা পুনরুত্থানের পর হাশরের ময়দানে উপস্থিত জনতার সামনে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. আল্লাহ তা'আলার কোনো কথা কাজ উদ্দেশ্যহীন হয় না; বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের পিছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। অতএব, তাঁর উল্লেখ্য প্রশ্নোত্তর কালে যদি কোনো শ্রোতাই না থাকবে তবে তা অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় খামখেয়ালিপূর্ণ বাক্য ব্যয় বলে মনে হবে। সুতরাং এ অভিমতই বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য। পরিশেষে এটাই সিদ্ধ কথা যে, দ্বিতীয় ফুৎকারের পর পুনরুত্থানের পরে উপরিউক্ত সুয়াল জবাব সংঘটিত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

"اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ" **আয়াতের তাফসীর :** ইতঃপূর্বে ইরশাদ ছিল, হাশরের মাঠে সর্বসময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানুহু। পরন্তু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েই যে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করবেন তা নয়; বরং প্রতিটি প্রাণকে শুধু তার কর্মের প্রতিদান দেবেন। ভালো কর্মের প্রতি দান ভালো তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তি। আর মন্দ ও অযাচিত কর্মের প্রতিদানও হবে মন্দ তথা ভয়াবহ পরিণতি।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ... : আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

ক. প্রত্যেককে তার কর্মফল ভোগ করতেই হবে : ইরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ "আজকের দিনে প্রত্যেককেই তার কর্মফল প্রদান করা হবে।" অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। সেদিন কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, হবে না কোনো অবিচার আর অনাচার। কারো নেক আমলের ছওয়াব কম করা হবে না, আর কারো পাপ কার্যের শাস্তি অধিক পরিমাণে দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা যেমন ওয়াদা করেছেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেককে তার কর্মের বিনিময় দেওয়া হবে। সেদিন ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় জুলুম সম্পূর্ণই অচিন্তনীয়।

মূলত ক্ষমতা নিঃসন্দেহে আজো আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে, তবে দুনিয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রদান করেছেন, মানুষ আল্লাহ তা'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করে, কিন্তু কিয়ামতের দিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতেই। ইরশাদ হচ্ছে وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ 'আর আমি বান্দাদের জন্যে আদৌ জালিম নই।' বস্তুত আল্লাহ তা'আলা অনন্ত-অসীম দয়াবান, তিনি পারম দয়ালু, তিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না, তিনি এটাও ঘোষণা করেছেন- "غَلَبَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ" অর্থাৎ 'আমার রহমত গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।'

খ. যে কোনো কাজের প্রতিফল অনিবার্য : মানুষ ভালো মন্দ যা কিছুই করবে অবশ্যই তাকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" সে যে ভালো কর্ম করবে তার কল্যাণ ভোগ করবে, আর যা কিছু মন্দ কর্ম করবে তার শাস্তিও ভোগ করবে। আরো ইরশাদ হচ্ছে-"فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ" অর্থাৎ কেউ সামান্যতম ভালো কাজ করলে তার প্রতিদান পাবে আর সামান্যতম মন্দ কাজ করলেও তার প্রতিফল পাবে।

মোদ্দাকথা হলো, 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এটাই এ বিষয়ে ইসলামের মূল নীতিমালা ও বিধান।

গ. মানুষের উপার্জনে সাব্যস্ত করা হয়েছে : মানুষ যদিও তার কাজকর্মের স্রষ্টা নয়। তথাপি সে তার كَاسِبٌ বা উপার্জনকারী। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বা বিশ্বাস। অন্যভাবে বলা যায়- কোনো কাজ করা ও না করার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। ভাল-মন্দ সব কাজেই মানুষ ইচ্ছা করলে তা করতে পারে আবার ইচ্ছা না হলে তা হতে বিরত থাকতে পারে। আর এর উপর বিচার করেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে কিংবা আজাব দেওয়া হবে। মোদ্দাকথা, كَسْبٌ -এর উপর ভিত্তি করেই মানুষের প্রতিফল নির্ধারণ করা হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ঘ. **মানুষের কর্মের প্রতিফল পাওয়ার উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত** : মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের প্রতিফল যদিও কম-বেশি বিভিন্নভাবে দুনিয়াতেও দেওয়া হয়ে থাকে তথাপি তার প্রকৃতি প্রতিফল প্রাপ্তির উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত। শুধুমাত্র আখেরাতেই মানুষ তার কর্মের পরিপূর্ণ ন্যায় সঙ্গত প্রতিফল পেতে পারে। দুনিয়ার এ স্বল্প পরিসরে মানুষের ভালো কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা সম্ভব নয়; যেমনি সম্ভব নয় মন্দ কার্মের যথোচিত শাস্তি প্রদান করা।

"**لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ**" **আয়াতাংশের তাফসীর** : ইরশাদ হচ্ছে, আজকের এ দিনে কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, যার যা প্রাপ্য সত্য ও ন্যায় সঙ্গতভাবে সে তাই পাবে। আবদ ইবনে হুমায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গুনাহ তিন প্রকার– ১. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে, ২. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না ও ৩. যে গুনাহ থেকে কোনো কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে। যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে তা হলো এমন গুনাহ যা করার পর বান্দা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা ইস্তেগফার করে। আর যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না তা হলো শিরক। আর যে গুনাহ এতটুকুও ছেড়ে দেওয়া হবে না তা হলো মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের জুলুম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথা বলার পর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিফল প্রদানের ব্যাপারে কয়েক প্রকারের জুলুম হতে পারে।

১. কেউ পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য ও অধিকারী হবে, কিন্তু তাকে তা দেওয়া হবে না।

২. যে লোক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে শাস্তি না দেওয়া।

৩. একজন শাস্তি পাওয়ার মতো নয়, তথাপি তাকে শাস্তি দেওয়া।

৪. কম মাত্রায় শস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে অধিক শাস্তি দেওয়া।

৫. একজন যতটা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তাকে তা অপেক্ষা অনেক কম দেওয়া।

৬. একজনের অপরাধে অন্য জনেকে দোষী সাব্যস্ত করা।

মোদ্দাকথা, এসবের কোনো জুলুমই আল্লাহ করবেন না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুম করা আমার উপর হারাম করেছি, আর তোমাদের উপরও জুলুম করা হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। আরো ইরশাদ করেছেন– হে আমার বান্দাগণ! এ হলো তোমাদের আমলসমূহ, আমি এ সবরের বিনিময় অবশ্যই দান করবো। অতএব, যে কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। আর যে এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু পায় সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

"**إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ**" **আয়াতাংশের তাফসীর** : ইরশাদ হচ্ছে– "اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ" "মানুষের নিকট তার হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত এবং বিমুখ। এমনিভাবে "مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ" অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করা এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা আমার নিকট এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করার মতোই। কেননা আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়ার সাথে সাথেই অনতি বিলম্বে তা কার্যকরী হয়।

আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুততার সাথে হিসাব গ্রহণকারী। হাদীস শরীফে এসেছে হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দিনের অর্ধ দিনের মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ সম্পাদন করে ফেলবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হিসাব গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলার এতটুকুও বিলম্ব হবে না। তিনি জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টজীবকে একই সময় রিজিক দান করেছেন এবং একজনকে রিজিক দান করার ব্যস্ততায় অপরকে রিজিক দিতে অপারগ হন না। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসকে যেমন একই সময়ে দেখতে পান, সকল শব্দ একই সময় শুনতে পান, ছোট-বড় সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনা একই সময় করে থাকেন। কোনো একটি জিনিস তার লক্ষ্যকে এমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না-যার ফলে তিনি অন্য জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য দিতে পারেন না। ঠিক তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব একই সময়ে গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে মামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও সেই জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হওয়ার কারণে বিচারকার্যে কোনোরূপ বিলম্ব হবে না। বিচারপতি সকল ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নিজেই অবহিত, মামলার প্রতিপক্ষ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত এবং ঘটনার স্পষ্ট সাক্ষ্য খুঁটি-নাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ অনতিবিলম্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়ে যাবে। কাজেই প্রতিটি মামলার ফয়সালাও মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা তো বিশাল কুদরতের অধিকারী যে, সমগ্র সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করতে তাঁর মুহূর্ত কালেরও প্রয়োজন হয় না।

"وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ" আয়াতাংশের তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা এখানে নবী করীমকে ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, কাফেরদের বিশেষভাবে এবং সকলকে সাধারণভাবে কিয়ামত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে- "হে হাবীব! আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন তথা কিয়ামতের দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দিন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মাজীদে বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের নিকট হতে বিন্দুমাত্র দূরে নয়। যে কোনো মুহূর্তেই কিয়ামত তাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে পারে।

কোথাও বলা হয়েছে- "اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنَ" কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- "اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ" "কিয়ামত নিকটবর্তী, আল্লাহ ব্যতীত তা হতে কেউ রক্ষাকারী নেই।"

মোদ্দাকথা, উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা লোকদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতকে দূরবর্তী মনে করে তারা নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে না পড়ে। সুতরাং আর এক মুহূর্তেও বিলম্ব না করে তারা যেন আত্মসংশোধন করে নেয়।

কেউ কেউ "يَوْمُ الْاٰزِفَةِ" -এর দ্বারা মৃত্যুর দিনকে বুঝিয়েছেন। কেননা "اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ" অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুবরণ করতেই তার কিয়ামত আরম্ভ হয়ে যায়। কাফেরদের এ বিশ্বাস ছিল তাদের বাতিল উপাসনা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে; কিন্তু তাদের একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাফেরদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোই থাকবে না। কাউকেই এর অনুমতি দেওয়া হবে না। অথচ অনুমতি ব্যতীত সেদিন কেউ কোনো কথা বলার সাহস পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, বিপদগ্রস্ত এবং ক্রন্দনরত থাকবে। যারা দুনিয়াতে নাফরমানি করে নিজেদের প্রতি চরম জুলুম করে তারা সেদিন সর্বাধিক অসহায় হবে। তাদের কোনো বন্ধুও থাকবে না এবং তাদের কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।

"مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ" আয়াতাংশ দ্বারা সুপারিশ সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে বাতিলপন্থিদের দলিল এবং তার খণ্ডন : উল্লিখিত আয়াতাংশ দ্বারা মু'তাযিলা ও অন্যান্য বাতিলপন্থিরা ধৃষ্টতা পোষণ করতঃ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হাশরের দিন জালিম তথা কাফের ও ফাসেক কারো জন্যই কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। আর থাকলেও তার সুপারিশ অগ্রাহ্য হবে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো যে সকল ঈমানদার তার বদ আমলের কারণে জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে, সে সকল গুনাহগার মু'মিনদের সুপারিশ কবুল করবেন । কুরআন হাদীসের বহু বাণী দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে। নিম্নে সে বাতিলপন্থিদের প্রামাণ্য এ দলিলের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করা হচ্ছে–

১. উক্ত আয়াতে ظَالِمِيْنَ দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে শিরক মহা জুলুম। আর মুশরিক ও কাফিরদের পক্ষে এ সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রকার দ্বিমত পোষণ করেনি। এর কারণ হলো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে ঈমানদার হওয়া পূর্বশর্ত।

২. আর ظَالِمِيْنَ দ্বারা যদি ঈমানদার ফাসেক উদ্দেশ্য হয়, তবে "لَا شَفِيْعٌ يُطَاعُ" -এর অর্থ হবে তাদের জন্য এমন কোনো সুপারিশকারী হবে না যার সুপারিশ মেনে নিতে আল্লাহ তা'আলা বাধ্য হবেন। ইচ্ছা সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন হবে। আয়াতে "سِيَاقْ سِبَاقْ" তথা পূর্বাপর অবস্থার আলোকে প্রথমোক্ত দলিলই অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।

"وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ" আয়াতের তাফসীর :

কোনো কিছুই আল্লাহ পাকের অজানা নয় : ইরশাদ হচ্ছে– 'তিনি (আল্লাহ তা'আলা) অবগত রয়েছেন মানুষের গোপন দৃষ্টি এবং তাদর অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে ভাবনার উদয় হয় তিনি তাও অবগত।'

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরীনে কেরাম চক্ষুর খেয়ানত বলতে এর চুরিকে বুঝিয়েছেন।

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যক্তি কারো বাড়িতে গমন করল অথবা অন্য কোথাও কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করল যা তার জন্যে হারাম, যাকে দেখল সে হয়তো তাকে দেখেনি আল্লাহ তা'আলা তা দেখেছেন, শুধু তাই নয়; বরং তখন তার মনে যে বাবনার উদয় হয় সে গোপন বিষয় সম্পর্কেও মহান আল্লাহ জ্ঞাত। মোটকথা পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞাত নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, চোখের চোর হলো সে ব্যক্তি যে বহু মানুষের সাথে বসা থাকা অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে যখন কোনো বেগানা [অপরিচিতা গায়রে মাহরাম] রমণী অতিবাহিত হয়, তখন অন্যদের অগোচরে এ মহিলার প্রতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, সে ব্যক্তি হলো চোখের চোর যে বেগানা মহিলার পতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি দেয়। আর লোকেরা তা দেখে নিলে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এমনিভাবে বরংবার করতে থাকে।

আল্লামা মুফতি শফী (র.) স্ব-প্রণীত মা'আরিফুল কুরআন নামক তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, চক্ষু বা দৃষ্টির খেয়ানতের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি লোকদের অগোচরে এমন কোনো বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তার জন্য হারাম। যেমন কোনো বেগনা মহিলার প্রতি কামভাবে দৃষ্টি দেওয়া। অতঃপর অন্য কাউকে দেখলে দৃষ্টি ফিরেয়ে নেওয়া। অথবা [আড় চোখে] এমনভাবে তাকাবে যে, কেউ দেখে তা বুঝতেই পারে না। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে ও দৃষ্টিতে এর কোনোটাই গাপন নয়।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব চরাচরের সব কিছুই জানেন, সবই তাঁর আয়ত্বে। উম্মে মা'বাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন প্রিয়নবী ﷺ -কে এ দোয়া করতে শুনেছি–

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خِيَانَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ.

'হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফেকী হতে পবিত্র রাখ এবং আমার আমলকে রিয়া (হিংসা) থেকে এবং আমার রসনাকে মিথ্যাবাদী থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত থেকে, কেননা তুমি চক্ষুগুলোর খেয়ানতও জ্ঞাত এবং অন্তরসমূহে যেসব ভাবনা গোপন থাকে তাও তুমি জ্ঞাত। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর–৫/৩৮৪]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ..... هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ" **আয়াতের তাফসীর :** আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসের একমাত্র ন্যায়পরায়ণ মহাপ্রজ্ঞাময় বিচারক হবেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর সত্তা ব্যতীত অন্য কারো কল্পনাও করা যায় না। কেননা সঠিক জ্ঞান না থাকলে সঠিক বিচার করা যায় না, আর ক্ষমতা না থাকলে সঠিক বিচারের বাস্তবায়নও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, কোনো কিছুই তাঁর অবিদিত নয়; আর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর বিচার কার্যকরী হতেও কোনো প্রকার বাধা থাকে না। তাই ইরশাদ হচ্ছে- وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ الخ আর আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে বিচার কার্য সমাধা করেন। কেননা তিনি মহা জ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আর এ জন্যেই তাঁর বিচার হয় সঠিক ও নির্ভুল, হিকমতপূর্ণ, তাৎপর্য মণ্ডিত। "আল্লাহ তা'আলার স্থলে কাফেররা যাদেরকে ডাকে তারা কোনো কিছুই ফয়সালা করতে পারে না।"

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার স্থলে যাদেরকে ডাকে যেমন- মূর্তি, শয়তান প্রভৃতিকে তারা ডাকে, তারা কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিতে পারে না। কেননা ফয়সালা করার শক্তিই তাদের মধ্যে নেই। সঠিক ফয়সালা করার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা তাদের নেই এবং ফয়সালা কার্যকর করতে যে শক্তির প্রয়োজন তাও তাদের মধ্যে নেই।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন তাই কারো চক্ষুর চুরিও তাঁর অগোচরে থাকে না। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সেসব লোকের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে এবং ডাকে। আর তাদের সমালোচনাও হয়েছে এ মর্মে যে, যারা কিছু দেখেও না, শোনেও না এমন জড় পদার্থকে কাফিররা উপাস্য মনে করে, এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।

সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করা এবং তাঁর স্থলে জড় পদার্থকে ঠাকুর দেবতা বানিয়ে তার সম্মুখে মাথা নত করা শুধু যে নির্বুদ্ধিতা তাই নয়; বরং মানবতার চরম অবমাননা এবং চূড়ান্ত অধঃপতন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢١. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط
كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَفِىْ قِرَاءَةٍ مِنْكُمْ
وَاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ مِنْ مَصَانِعَ وَقُصُوْرٍ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اَهْلَكَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ
لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ عَذَابِهِ ـ

২১. তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তো তার তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি দেখতে পেত। তারা শক্তিমত্তার দিক দিয়ে এদের হতে অধিক ছিল– এক কেরাতে مِنْهُمْ -এর স্থলে مِنْكُمْ রয়েছে এবং জমিনে নিদর্শনাদি স্থাপনের দিক দিয়ে যেমন শিল্প-কারখানা ও প্রাসাদসমূহ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করলেন তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন তাদের গুনাহের দরুন। আর তাদেরকে কেউ রক্ষাকারী ছিল না আল্লাহ হতে (অর্থাৎ) আল্লাহর আজাব হতে।

٢٢. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَكَفَرُوْا
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ـ

২২. তা এই যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ আগমন করতেন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ নিয়ে– অতঃপর তারা কুফরি করল [তারা অস্বীকার করল] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা।

٢٣. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ بُرْهَانٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ ـ

২৩. আর নিশ্চয় আমি মূসা (আ.)-কে আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে।

٢٤. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا هُوَ
سِحْرٌ كَذَّابٌ ـ

২৪. ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট– সুতরাং তারা বলল, সে জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

٢٥. فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ بِالصِّدْقِ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا اِسْتَبْقُوْا نِسَآءَهُمْ ط وَمَا
كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ هَلَاكٍ ـ

২৫. অনন্তর যখন সে হক সহ তাদের নিকট আগমন করল সত্য নিয়ে আমার পক্ষ হতে, তখন তারা বলল, মূসা (আ.)-এর উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করে দাও। আর জীবিত রাখো অবশিষ্ট রাখো তাদের কন্যা সন্তানদেরকে, তবে কাফেরদের ষড়যন্ত্র তো ব্যর্থ হবেই ধ্বংস [বিফল]।

٢٦. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى لِاَنَّهُمْ
كَانُوْا يَكُفُّوْنَهٗ عَنْ قَتْلِهٖ وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ط
لِيَمْنَعَهٗ مِنِّىْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ
مِنْ عِبَادَتِكُمْ اِيَّاىَ فَتَتَّبِعُوْنَهٗ ـ

২৬. আর ফেরআউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসা (আ.)-কে খুন করবো– কেননা লোকেরা তাকে মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হতে বারণ করত। সে যেন তার রবকে ডাকে আমার [আক্রমণ] হতে তাকে রক্ষা করার জন্য আমার ভয় হচ্ছে যে, সে তোমার দীনকে পরিবর্তন করে দেবে, তোমাদেরকে আমার ইবাদত হতে ফিরিয়ে নেবে। আর তোমরাও তার অনুসরণ করে বসবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

أَوْ أَنْ يَظْهَرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ وَفِى قِرَاءَةٍ أَوْ وَفِى أُخْرٰى بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَضَمِّ الدَّالِ.

অথবা, সে জমিনে ফেতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি করবে। হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে। এক কেরাতে و -এর পরিবর্তে أَوْ হয়েছে। আবার অপর এক কেরাতের يَظْهَرَ -এর ى ও ه -এর মধ্যে যবর রয়েছে এবং (الْفَسَادُ -এর) د -এর মধ্যে পেশ রয়েছে।

٢٧. وَقَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ وَقَدْ سَمِعَ ذٰلِكَ إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.

২৭. আর হযরত মূসা (আ.) বললেন – তার জাতিকে লক্ষ্য করে, তিনি ফেরাউনের ঐ কথা শুনেছিলেন। আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার রবের নিকট যিনি তোমাদেরও রব, প্রত্যেক অহঙ্কারীর (অনিষ্ট) হতে হিসাব-নিকাশের দিনের উপর যার বিশ্বাস নেই।

তাহকীক ও তারকীব

"أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا الخ" আয়াতাংশে মা'তূফ আলাইহি ও اِسْتِفْهَامْ-এর জবাব কি? উল্লিখিত আয়াতাংশে অর্থাৎ أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ -এর মধ্যে হামযাটি اِسْتِفْهَامْ -এর জন্য এসেছে এবং وَاوْ (ওয়াওটি) হরফে আতফ। তাই اِسْتِفْهَامْ -এর হামযাহ তার জবাব কামনা করে এবং হরফে আতফ তদপূর্বে مَعْطُوْف عَلَيْهِ হওয়াকে চায়। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে যে, اِسْتِفْهَامْ -এর জবাবটি কি এবং এখানে مَعْطُوْف عَلَيْهِ টা কি হতে পারে। যাহোক এখানে اِسْتِفْهَامْ -এর জবাব হলো "فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ" আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর পূর্বে উহ্য রয়েছে। বাক্যটি হবে এমন "أَقَعَدُوْا فِى الْبُيُوْتِ وَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ"

আয়াতে "كَيْفَ" -এর মহল্লে ই'রাব কি এবং كَيْفَ -এর جَوَابْ কি? আয়াতে কারীমা- "كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ الخ"؟ "كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ" -এর মধ্যে كَيْفَ পদটি كَانَ -এর خَبَرْ مُقَدَّمْ (হওয়ার কারণে মহল্লান মানসূব হয়েছে)। আর "عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ" হলো كَانَ -এর اِسْم. كَانَ তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হয়েছে। আর كَيْفَ -এর جَوَابْ হলো "كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا" -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبْ হয়েছে। يَنْظُرُوْا

"كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً" আয়াতে مِنْهُمْ -এর একাধিক কেরাত প্রসঙ্গে : অত্র আয়াতে مِنْهُمْ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. ইবনে আমের শামী (র.) এখানে مِنْكُمْ পড়েছেন।

২. জমহুর ক্বারীগণ এখানে مِنْهُمْ পড়েছেন।

"أَوْ أَنْ يَظْهَرَ" আয়াতাংশে বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী "أَوْ أَنْ يَظْهَرَ" -এর أَوْ -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত রয়েছে।

১. কূফার ক্বারীগণ ও ইয়াকূব (র.) أَوْ পড়েছেন।

২. অন্যান্য ক্বারীগণ أَوْ -এর স্থলে وَ দিয়ে পড়েছেন।

আবার "يَظْهَرَ" -এর মধ্যে দু ধরনের কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ يُظْهِرَ - ى -এর উপর পেশ এবং ه -এর নিচে যের যোগে (بَابُ اِفْعَالٌ) হতে পড়েছেন।

২. নাফে, ইবনে কাছীর ও আবূ আমর প্রমুখ ক্বারীগণ يَظْهَرَ . ى ও ه অক্ষরদ্বয়ের উপর যবর দিয়ে পড়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমোক্ত কেরাত অনুযায়ী اَلْفَسَادُ -এর د অক্ষরে পেশ হবে এবং শেষোক্ত কেরাত অনুযায়ী যবর হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : উল্লিখিত আয়াতসমূহের দ্বারা হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যকার সংশ্লিষ্ট কাহিনীর প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীর বর্ণনা আলোকপাত করা হলো–

হযরত মূসা (আ.) -এর জন্মগ্রহণকালে মিশরের বাদশা তথা ফেরাউন ছিল ওলীদ ইবনে মুস'আব। হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বে সে ফেরাউনের এক স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জ্যোতিষীরা বলে ছিল যে, বনূ ইসরাঈলে অচিরেই এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে আপনার সিংহাসনের পতন অনিবার্য। ফেরাউন তখন বনূ ইসরাঈলের যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। হত্যার ভয়ে জন্মের পর হযরত মূসা (আ.)-এর মা তাঁকে সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। সিন্দুক ফেরাউনের প্রাসাদের পার্শ্বে গিয়ে ভিড়ে। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া সিন্দুকটি তুলে নেন। নিঃসন্তান আসিয়ার অনুরোধে ফেরাউন শিশুটিকে লালনপালনের দায়িত্ব নেয়।

ফেরাউনের ঘরেই হযরত মূসা (আ.) ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করেন । এ সময়ে এক কিবতীকে হত্যা করতঃ ভয়ে তিনি মিসর ছেড়ে মাদইয়ান চলে যান। তথায় হযরত শোআয়েব (আ.)-এর ঘরে আশ্রয় পান। হযরত শোআয়েব (আ.)-এর এক কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। দীর্ঘ আট বৎসর তথায় অবস্থানের পর সস্ত্রীক মিসরের উদ্দেশ্যে গমন করেন। পথিমধ্যে তুর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করেন। তদীয় ভাই হারুনকেও নবুয়ত দান করতঃ তাঁর সহযোগী নির্ধারণ করা হয়।

মিসরে তখন প্রধানত দুটি সম্প্রদায় ছিল– কিবতী ও বনূ ইসরাঈল। ফেরাউন ছিল কিবতী বংশোদ্ভূত। স্বভাবতই সে রাষ্ট্রতন্ত্রে কিবতীদের প্রতি ছিল সদয় আর ইসরাঈলীদের প্রতি ছিল ভীষণ বিশ দাঁতের। মিশরে প্রত্যাবর্তন করে হযরত মূসা (আ.) ফেরাউন ও তার দলবলকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। তিনি নির্যাতিত বনূ ইসরাঈলদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার জোর দাবি জানান। ফেরাউন যে মুশরিক ছিল তাই নয়; বরং সে নিজেকে 'বড় মা'বুদ' হিসেবে দাবি করে।

ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। তাঁর নবুয়ত মেনে নেয়নি। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল যে, তুমি সত্য নবী হলে কোনো মোজেজা দেখাও। হযরত মূসা (আ.) লাঠিকে ছেড়ে দিলে তা বিশালকায় অজগর সর্প হয়ে যেত। তাঁর বগলকে মোজেজা হিসেবে পেশ করতেন যা হতে সূর্যের ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হতো। এ ঐশ্বরিক ও অলৌকিক কাণ্ড দেখে ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে জাদুকর আখ্যা দিল। অতঃপর তৎকালের সেরা সত্তর হাজার জাদুকরের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হলো। আল্লাহ প্রদত্ত মোজেজার মোকাবিলায় জাদুকররা পরাস্ত হয়ে সবাই ঈমান আনয়ন করল। কিন্তু ফেরাউন ও তার সহযোগীরা তথা মন্ত্রীপরিষদ ঈমান আনল না।

হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনীয়দের উপর নানা ধরনের আজাব নাজিল করেছেন। কোনো আজাব নাজিল হলেই তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ছুটে আসত। বলত যে, আপনি দোয়া করতঃ এ আজাবটি দূর করে দিলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো; কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার বরকতে আজাব সরে গেলে পুনরায় তারা কুফরির প্রতি ফিরে আসত।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউনীয়দের সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করল। ফেরাউন তার সভাসদগণের এক মজলিসে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ঘোষণা দিল। মজলিসে উপস্থিত এক সদস্য– যে গোপনে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষে ওকালতি করল এবং তাঁকে হত্যা করা হতে ফেরাউনকে নিবৃত্ত করল। আল্লাহর কঠোর আজাব সম্পর্কে ফেরাউনকে ভয় দেখাল। এদিকে হযরত মূসা (আ.)ও তাতে কিছুমাত্র ভীত হলেন না। তিনি তাঁর দাওয়াতি কাজে অটল রইলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অবশেষ আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার সমর্থকদের ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। গভীর রজনীতে হযরত মূসা (আ.)-কে বনূ ইসরাঈলদেরকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। হযরত মূসা (আ.) বনূ ইসরাঈলদের সঙ্গে করে শেষ রাত্রে মিসর হতে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। খবর পেয়ে ফেরাউন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈলের পিছু ধাওয়া করল। সামনে নীল-নদ, পেছনে ফেরাউনের বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী। বনূ ইসরাঈলের লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়ল। হযরত মূসা (আ.) তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। আল্লাহর আদেশে হযরত মূসা (আ.) নীল-নদে লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। সাথে সাথে বনূ ইসরাঈলের বারটি গোত্রের জন্য বারটি রাস্তা হয়ে গেল। সে রাস্তা দিয়ে বনূ ইসরাঈলের লোকেরা নদী পার হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে ফেরাউন সদলবলে নদী গর্ভের রাস্তায় পা বাড়াল। কিন্তু মাঝ দরিয়ায় যাওয়ার পর রাস্তাটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। ফেরাউন তার সুবিশাল বাহিনীসহ নদী বক্ষে নিমজ্জিত হলো। হযরত মূসা (আ.) বনূ ইসরাঈলকে নিয়ে শামের পথে যাত্রা করেন।

"اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফেরও মুশরিকদেরকে পূর্ববর্তী নবীদের কাওমসমূহের অবস্থা হতে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। তাদের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে খবরদার করেন। তাই মক্কার কাফেরদেরকে আসন্ন ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। রাসূলের উপর ঈমানের আহ্বান জানান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, মক্কাবাসী যখন প্রিয়নবী ﷺ-কে মিথ্যা জ্ঞান করে ও তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করে, তখন আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– এ কাফেররা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না? যদি তারা ভ্রমণ করত তবে দেখত যে, ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে বহু জাতির আগমন ঘটেছিল। পৃথিবীতে তারা অনেক কীর্তি রেখেছে যা তাদের স্মরণিকা হিসেবে আজো বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু যখন তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ উপস্থিত হন তখন তাঁরা তাঁদেরকে মিথ্যা জ্ঞান করে, আল্লাহ সুবহানুহুর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তাদেরকে, যেমন– আদ, ছামূদ এবং হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি প্রভৃতি। যদি মক্কাবাসী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে মিথ্যারোপ করে, তবে তারাও নিষ্কৃতি পাবে না। হে মক্কাবাসী! যদি তোমাদের বর্তমান আচরণ অব্যাহত থাকে, তবে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত এবং তোমাদের ধ্বংসও অনিবার্য। কেননা সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত এবং আল্লাহ তা'আলার নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহ তা'আলার কঠিন-কঠোর শাস্তি হতে কে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তাই তারা রক্ষা পায়নি; রক্ষা করলে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রক্ষা করতে পারতেন, যদি তারা তাঁর নিকট তওবা-ইস্তেগফার করে হাজির হতো, কিন্তু তারা তা করেনি এবং রক্ষাও পায়নি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা : অত্র আয়াত দুটিতে আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল ﷺ-কে অবগত করাচ্ছেন হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতি মিশনের বিরোধিতা ও মিথ্যারোপ করাটা। আর এর হোতা ছিল ফেরাউন, হামান ও কারূন। তাদের নিষ্ঠুরতার কথা তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনার বাণী শোনান। ইরশাদ হচ্ছে–

"আর নিশ্চয়ই আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন, হামান এবং কারূনের নিকট, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যারোপ করে, তারা বলে এতো এক জাদুকর, অত্যন্ত মিথ্যাবাদী।"

ইতঃপূর্বে ফেরাউন, হামান আর কারূনের নিকট হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তিনি অনেক মোজেজা এবং দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন; কিন্তু এত কিছুর পরও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের উপর নির্মম অত্যাচার করেছে। হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা এক বিস্ময়কর লাঠি প্রদান করেছিলেন, এমনিভাবে "يَدٌ بَيْضَاءُ" তথা চন্দ্রোজ্জ্বল হাত দান করেন। আরো বহু মোজেজা। এসব মোজেজা দেখে ঈমান আনা তো দূরে থাক; বরং তারা তাঁকে জাদুকর আর মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতএব, হে রাসূল! যদি মক্কার কাফেররা আপনাকে মিথ্যা জ্ঞান করে করুক এটা কোনো নতুন বিষয় নয়; বরং যারাই এ কাফের মুশরিকদেরকে সহজ সরল পথের দিকে আহ্বান করেছেন তাদের সকলকেই মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত যারাই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী রাসূলগণের সঙ্গে মন্দ আচরণ করেছে তারই ধ্বংস হয়েছে। যেমন ফেরাউন ও তার দলবল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, আর কারূনকে ভূ-গর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হয়।

সংক্ষেপে ফেরাউন, কারূন এবং হামানের পরিচিতি :

ফেরাউন : এটা মিসরের বাদশাহের উপাধি ছিল। আয়াতে বর্ণিত ফেরাউনের প্রকৃত নাম 'রাইয়্যান' (رَيَّانٌ)। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জমানার ফেরাউনের নাম ছিল 'ওলীদ'। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন নিজেকে দাম্ভিকতার বশে ও দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজের জাতিকে তথা কিবতী সম্প্রদায়; বরং গোটা মিসরে ঘোষণা করেছিল- "اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى" "আমি তোমাদের বড় প্রভু।" পরিশেষে সে সদলবলে নীল নদে ডুবে মারা যায়। বর্তমানে তার লাশ মিসরের পিরামিডে মমি অবস্থায় আছে।

হামান : হামানই সে ফেরাউনের মন্ত্রী ছিল এবং তার কেবিনেটের প্রধান ছিল।

কারূন : কারূন সে আমলের ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। এমনকি সে ব্যবসায়ীদের বাদশা ছিল। সে হযরত মূসা (আ.)-এর আহ্বানে জাকাত প্রদানের অস্বীকার করে, ফলে হযরত মূসা (আ.)-এর অভিশাপে ভুগর্ভস্থ হয়ে পড়ে। কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে থাকে : হযরত মূসা (আ.) যখন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সত্য দীন নিয়ে তাঁর জাতির নিকট উপস্থিত হন, তখন ফেরাউনের পরামর্শ দাতারা বলল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হোক আর তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হোক যেন মেয়েদেরকে পরিচারিকা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফেরাউন এ পন্থা হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পূর্বেও গ্রহণ করেছিল, যাতে করে হযরত মূসা (আ.)-কে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়। ফেরাউন তখন বনী ইসরাঈলদের নব্বই হাজার নবজাতককে হত্যা করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুম যখন হয় তখন তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে পয়দা করেন এবং তাঁর হেফাজত করেন। এমনকি জালিম ফেরাউনের বাড়িতে রেখেই তাঁর লালনপালন করেন। তখন ফেরাউনের চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। আর যখন হযরত মূসা (আ.) সত্য দীন নিয়ে আগমন করলেন তখন ফেরাউনের তরফ থেকে নতুন করে পুরানো কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো যে, বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা এবং কন্যাদেরকে জীবিত রাখা হোক। এবারের কর্মসূচির কয়েকটি লক্ষ্য হলো-

ক. বনী ইসরাঈলের জনসংখ্যা যাতে হ্রাস পায় এবং তারা কখনো বিদ্রোহী হতে সক্ষম না হয়, খ. এভাবে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যায়। গ. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেন এ ধারণা জন্মে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর কারণেই আমাদের যত দুঃখ-দুর্দশা, এ ধারণার কারণে বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করবে, ফলে হযরত মূসা (আ.) দুর্বল অসহায় হয়ে পড়বেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। ফেরাউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি ঘটে এবং হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীরা মিসরের রাজত্বের অধিকারী হন, তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ 'আর কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।'

এতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্য রয়েছে সান্ত্বনা, যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের চক্রান্তও নস্যাৎ হবে। কেননা কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েই থাকে।

-[তাফসীরে রুহুল মা'আনী-২৪/৬২]

'اٰيٰتٌ' ও 'حَقٌّ' -এর অর্থ এবং হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত মোজেজাসমূহ : اَلْاٰيَاتُ-এর বহু অর্থ হয়ে থাকে। যেমন- দলিল, চিহ্ন, নিদর্শন, মু'জিযা, কুরআনে মাজীদের আয়াত ইত্যাদি। এখানে নিদর্শনাদি ও মোজেজাকে বুঝানো হয়েছে। اَلْحَقُّ অর্থ- সত্য। এখানে তা দ্বারা সত্য দীন তথা তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে। এটা মূলত বাতিলের বিপরীত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত মোজেজাসমূহ : আল্লাহ তা'আলার একটি চিরাচরিত নীতি হলো তিনি কোনো কওমের নিকট নবী ও রাসূল পাঠানোর সময় তাকে এমন কতিপয় মোজেজা দান করেন যা উক্ত কওমের জন্য উপযোগী। তথা যে জাতি যে বিষয়ে সর্বাধিক পারদর্শী হয় সে কওমের নবীকে সে বিষয়ে ততোধিক পারদর্শী করে প্রেরণ করা হয়। যেহেতু হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে মিশরে জাদু বিদ্যা চরম উন্নতি লাভ করেছিল, সেহেতু হযরত মূসা (আ.)-কে এমন মোজেজা প্রদান করা হয়েছে যাতে তিনি সে যুগের সেরা জাদুকরদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি মোজেজা দান করেছেন। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিরণ দেওয়া হলো।

১. **লাঠি :** কথিত আছে এটা তিনি তাঁর শ্বশুর নবী হযরত শোআয়েব (আ.) হতে লাভ করেন। তাকে মাটিতে ফেলে দিলে আল্লাহর নির্দেশে তা বিশাল অজগর সাপে পরিণত হয়ে যেত। আবার হাত দিয়ে ধরলে পুনরায় লাঠি হয়ে যেত।

২. **উজ্জ্বল হাত :** তিনি যখন হাত উপরে উঠাতেন তখন বগল হতে আল্লাহর হুকুমে প্রখর আলো বিচ্ছুরিত হতো।

৩. **তুফান :** হযরত মূসা (আ.)-এর অভিশাপের কারণে সমগ্র মিসরে ভয়াবহ তুফানের সৃষ্টি হয়েছিল।

৪. **দুর্ভিক্ষ :** হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ার কারণে মিশরের উপর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল।

৫. **পঙ্গপাল :** সারা মিশরে পঙ্গপাল বিস্তার লাভ করে। তাদের সমস্ত ফসলাদি পঙ্গপালে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

৬. **বেঙে :** সারা মিসর বেঙে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। তাদের ঘর-বাড়ি এমনকি খাদ্য-দ্রব্যও বেঙে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

৭. **রক্ত :** মিসরীয়দের শরীর, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় সব কিছু রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিল। সর্বত্রই ছিল রক্তের বিরক্তি।

৮. **উকুন :** সমগ্র মিসর একবার উকুনে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের খাদ্য-দ্রব্যেও ছিল উকুন আর উকুন। উকুনের অত্যাচারে তারা অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল।

৯. **ফল-ফলাদির উৎপাদন কম :** হযরত মূসা (আ.)-এর বদদোয়ায় তাদের ফল-ফলাদির উৎপাদন কমে গেল।

প্রকাশ থাকে যে, যখনই কোনো আজাব দেখা দিত তখন মিসরীয়রা হযরত মূসা (আ.)-এর শরণাপন্ন হতো। হযরত মূসা (আ.)-কে বলত আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আজাবটা অপসারিত হয়, তাহলে আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করবো। কিন্তু আজাব সরে যাওয়ার পর পুনরায় তারা কুফরি করত; ঈমান আনত না।

"وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْ ..... وَلْيَدْعُ رَبَّهُ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ তোমরা আমাকে বাধা দিও না, আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। সে তার প্রতিপালককে ডাকুক, দেখি তার প্রতিপালক কি করতে পারে। মূসাকে আর এমন স্বাধীনতা দেওয়া যায় না, যদি এমন স্বাধীনতা সে ভোগ করতে থাকে তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, সে তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দেবে। এ ছাড়া তার অবাধ স্বাধীনতার কারণে সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএব, তাকে আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার সুযোগ দেওয়া যায় না।

ফেরাউনের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা দেখে এবং সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করে বেশ প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করলে তাঁর প্রতিপালক তাদের থেকে প্রতিরোধ গ্রহণ করতে পারেন বলে তারা ভয় করছিল।

আল্লামা বগভী (র.) লেখেছেন– ফেরাউন এ কথাটি এজন্য বলেছে যে, তার পরিষদবর্গের কিছু লোক হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছিল। কেননা তাদের ধারণা ছিল হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হবে। তারা ফেরাউনকে বলত, আপনি যদি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করেন তবে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা করতে অক্ষম এজন্যে তাকে হত্যা করেছেন। এতে জনমনে আপনার দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হতে কেউ ফেরাউনকে বারণ করে ছিল কি? উপরিউক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনকে কেউ হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ব্যাপারে বারণ করেছে, আসলে প্রকৃত ব্যাপারটি কি? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মাঝে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

১. একদল মুফাসসিরের মতে এ কথাটি বলে ফেরাউন এ ধারণা দিতে চাচ্ছিল যে, কিছু লোক তাকে বাধা দিয়েছে বলেই সে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করছে না। কেউ যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে সে কবে কোন দিন তাকে শেষ করে ফেলত।

২. অন্য একদল মুফাসসিরের মতে ফেরাউনের নিকটস্থ অনেকেই তাকে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করতে বাধা দিচ্ছিল। তার নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ হতে পারে।

ক. হযরত মূসা (আ.)-এর হত্যার জের ধরে ফেরাউনের ক্ষমতা খর্ব হতে পারে, যাতে তাদেরও অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে।

খ. তারা অন্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিল। যদিও নানাবিধ কারণে তা প্রকাশ করেছিল না।

গ. সভা-পরিষদগণ চেয়েছিলেন যে, ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর আমরা এ দিকে আমাদের সুবিধা বানিয়ে নেই।

ঘ. তাদের ধারণা ছিল হযরত মূসা (আ.) মূলত ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্য নয় এবং তিনি ফেরাউনের কোনো ক্ষতিও করতে পারবেন না।

মূলত আসল ব্যাপার হলো, হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা হতে ফেরাউনকে বাইরের কোনো শক্তিই বাধা দিয়ে রাখে নি; বরং তার মনের ভীতিই তাকে আল্লাহর রাসূলের গায়ে হাত দিতে বাধা প্রদান করেছে ও তাকে বিরত রেখেছে।

"اِنِّىٓ اَخَافُ .... فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ" আয়াতের ব্যাখ্যা শান্তি লাভের পন্থা : পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন স্বীয় মন্ত্রীসভায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার প্রস্তাব উপস্থান করেছে। আর আলোচ্য আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

ফেরআউন বলছে, যদি আমি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা না করি তবে তোমরা যে ধর্ম-বিশ্বাসে রয়েছ তাতে সে পরিবর্তন ঘটাবে। অথবা, সে পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করবে। নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষাকল্পে দেশ ও জাতির স্বার্থে তাকে হত্যা করা একান্ত জরুরি।

আল্লামা কান্ধলভী (র.) লেখেছেন, এটি বড়ই বিস্ময়কর বিষয় যে, বাতিলপন্থিরা আল্লাহর নবীর হেদায়েতকে 'ফ্যাসাদ' অশান্তি বলে আখ্যায়িত করেছে, অথচ আল্লাহর নবীর হেদায়েত মেনে চললে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে শান্তি লাভ করা যায়, শান্তি লাভের একমাত্র পন্থাই হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতঃ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, এটিই শান্তি লাভের পন্থা। কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট, যারা আদর্শচ্যুত, যারা দিশেহারা তারা শান্তির পথকেই অশান্তি বলে বেড়ায় আর এ অবস্থা শুধু সে যুগের ফেরাউনদের নয়; বরং সকল যুগের ফেরাউনদের এ একই চিন্তাধারা।

বস্তুত যুগে যুগে এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, যখনই এবং যারাই সত্যদীনকে বাধা দিয়েছে তা হয় তাদের অহঙ্কারের কারণে অথবা ক্ষমতা হারা হবার আশঙ্কায়। বদরের যুদ্ধের দিবসে রণাঙ্গনে উমাইয়া ইবনে খালফ আবূ জেহেলকে এ প্রশ্নটিই করেছিল যে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র নবুয়তের দাবিদার মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তোমার অন্তরের কথাটি কি? এখানে আমি ব্যতীত আর অন্য কেউ নেই, সুতরাং তুমি নির্দ্বিধায় তোমার অন্তরের কথাটি বলতে পার। তখন আবূ জেহেল বলেছিল, 'আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ ﷺ সত্য কথাই বলে', তখন উমাইয়া ইবনে খালফ বলল, 'তবে তা মেনে নিতে বাধা কোথায়?' আবূ জেহেল বলেছিল, যদি তাকে মেনে নেই তবে আমাদের নেতৃত্ব থাকে কোথায়? এ একই অবস্থাই হয়েছিল ফেরাউনের।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতে দীন বদলিয়ে দেওয়ার যে কথাটি বলা হয়েছিল তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা এ ভয়েই ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এখানে দীন অর্থ হলো রাষ্ট্রব্যবস্থা। ফেরাউনের এ উক্তির অর্থ হলো "اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ يُّغَيِّرَ سُلْطَانَكُمْ" আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ ব্যক্তি তোমাদের রাষ্ট্র প্রভুত্বকে পরিবর্তন করে দেবে। অন্য কথায় ফেরাউন ও তার পরিবারবর্গের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে মিসরে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি ও চলমান সমাজ ব্যবস্থাই ছিল সারা দেশের দীন। হযরত মূসা (আ.)-এর ইসলামি দাওয়াতে ফেরাউন এ দীনেরই পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছিল।

"وَقَالَ مُوْسٰى ..... بِيَوْمِ الْحِسَابِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনা করছে। আল্লাহর দীনের দায়ীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এ কথা হযরত মূসা (আ.) অবগত হন। পরিশেষে নির্ভীকচিত্তে দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা দেন, "যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে না এমন সব অহঙ্কারী লোক থেকে আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের পানাহ চাই।"

আলোচ্য বিষয়টিতে দুটি সমান সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। এদের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো কারণ পাওয়া ভার।

১. হযরত মূসা (আ.) হয়তো নিজেই তখন দরবারে উপস্থিত ছিলেন। ফেরাউন তাঁর উপস্থিতিতেই তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। আর তিনি তখনই ফেরাউন ও তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে প্রকাশ্যভাবে এ কথাগুলো বলেছেন।

২. হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতেই ফেরাউন তার সরকারের দায়িত্বশীলদের মজলিসে এ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল আর এ কথার খবর পরে তার কর্ণগোচর হয়েছিল। অতঃপর তিনি সঙ্গী-সাথী ও অনুসারীদের সমাবেশে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছেন।

উপরোল্লিখিত দুটি অবস্থার মধ্যে আসল ঘটনার সময় যে অবস্থাই থাকুক না কেন, হযরত মূসা (আ.)-এর কথাগুলো দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ফেরাউনের ভয় প্রদর্শনে তার মনে বিন্দুমাত্র শঙ্কা সঞ্চারিত হয়নি। তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে ফেরআউনের ধমকি তার মুখের উপরই নিক্ষেপ করলেন। কুরআনে মাজীদের যেখানে এ ঘটনা বিবৃত হয়েছে তা হতে স্বতঃই বুঝতে পারা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে এ জবাবই দেওয়া হয়েছিল, সেসব জালিমদেরকে যারা বিচার দিনে একবিন্দু ভয় না করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

উল্লিখিত আয়াতের শব্দাবলি হতে অর্জিত ফায়দা : হযরত মূসা (আ.) যখন অবগত হলেন যে, ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। তখন তিনি দ্ব্যর্থকণ্ঠে নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করলেন– "اِنِّیْ عُذْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ" "আমি প্রত্যেক ঐ অহঙ্কারী যে আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা তার নিকট হতে আমার প্রভুর পানাহ গ্রহণ করছি– যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক।"

হযরত মূসা (আ.) -এর এ উক্তির শব্দাবলিতে কতিপয় বিশেষ ফায়িদা নিহিত রয়েছে, নিম্নে আমরা সেগুলোর উপর আলোকপাত করছি।

১. আলোচ্যাংশে হযরত মূসা (আ.) এমন দাম্ভিক মানুষ হতে আল্লাহর পানাহ চেয়েছেন, যে বিচার দিনের উপর বিশ্বাস রাখে না। তা হতে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যেভাবে জিন শয়তান হতে পানাহ চেয়ে থাকি তেমনি মানুষ শয়তান হতেও আল্লাহর পানাহ চাওয়া প্রয়োজন।

২. হযরত মূসা (আ.) "بِرَبِّكُمْ" তোমাদেরও রব বলে তাদেরকে অবহিত করলেন যে, আমার ন্যায় তোমাদেরও উচিত তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাঁর উপর ভরসা করা।

৩. এখানে বক্তব্যে اِنِّیْ শব্দটি তাকিদের অর্থ বুঝায়। তা হতে আমরা শিখতে পরি যে, বিপদে অধীর না হয়ে; বরং জোরালো কণ্ঠে তাকে রুখে দাঁড়ানো উচিত। সুতরাং হযরত মূসা (আ.) কে তৎকালীন মহা শক্তিধর ফেরাউন হত্যার হুমকি দেওয়া স্বত্ত্বেও তার ভাষায় কোনোরূপ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৪. হযরত মূসা (আ.) "رَبِّ فِرْعَوْنَ" না বলে رَبِّكُمْ বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুধু ফেরাউনেরই রব নন; বরং সকলেরই রব।

৫. হযরত মূসা (আ.) সরাসরি ফেরাউনের অনিষ্ট হতে আশ্রয় না চেয়ে বলছেন-"مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ الخ" প্রত্যেক অহঙ্কারী মাতাল হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়েছেন। তা হতে বুঝা যায় যে, দোয়ার মধ্যে এরূপ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

৬. ফেরাউন বলেছিল, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও আমি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করব।' তার সাথে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিল "وَلْيَدْعُ رَبَّهُ" আর হযরত মূসা (আ.) যেন তার রবকে আহ্বান করে।

জবাবে হযরত মূসা (আ.) জানিয়ে দিলেন, আমি তো আমার রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। তবে জেনে রাখ, তিনি শুধু আমারই রব নন; বরং তোমাদেরও রব তিনিই। সুতরাং তিনি আজ যেভাবে তোমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছেন, ঠিক সেভাবে ইচ্ছা করলে তোমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতঃ আমাকেও রাজত্ব ও ক্ষমতা দান করতে পারবেন। প্রকৃতার্থে তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত কলকাঠি।

হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউনীয়রা যেসব কষ্ট দিয়েছে : বিগত আয়াত কটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) ও বনূ ইসরাঈলকে ফেরাউনীয়রা তিন ধরনের কষ্ট দিয়েছে।

১. হযরত মূসা (আ.) তাদের নিকট আগমন করার প্রথম পর্যায়েই ফেরাউনীয়রা তাকে মিথ্যাবাদী ও জাদুকর বলে আখ্যা দিল। তাই ইরশাদে বারী- "فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ"

২. তারা বনূ ইসরাঈল তথা হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করেছিল। আর কন্যা সন্তানদেরকে তাদের সেবা করার নিমিত্তে জীবন্ত রেখেছিল। ইরশাদ হচ্ছে- "قَالُوْا اقْتُلُوْآ اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ"

৩. তারা হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তারা হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার মাধ্যমে স্বীয় স্বৈরশাসনকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٨. وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ قِيْلَ هُوَ ابْنُ عَمِّهٖ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ اَىْ لِاَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ط وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ج اَىْ ضَرَرُ كَذِبِهٖ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ط بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ عَاجِلًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُشْرِكٌ كَذَّابٌ مُفْتَرٍ.

অনুবাদ :

২৮. আর ফেরআউনের সম্প্রদায়ের এক মু'মিন ব্যক্তি বলল, কথিত আছে তিনি ফেরাউনের চাচাত ভাই– নিজের ঈমানকে গোপন রেখে; তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, এখানে اَنْ শব্দটি لِاَنْ [কারণ বুঝানো]-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে বলে, আমার রব আল্লাহ অথচ সে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ এসেছে– অর্থাৎ প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ সহ তোমাদের প্রভুর নিকট হতে, আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যা তার উপরই পতিত হবে অর্থাৎ তার মিথ্যার ক্ষতি তাকেই বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তার একাংশ তোমাদের ভোগ করতে হবে অর্থাৎ যে আজাবের ভয় দেখাচ্ছে তার অংশবিশেষ শীঘ্রই এসে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘন- কারীকে হেদায়েত দান করেন না– মুশরিককে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে।

٢٩. يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ غٰلِبِيْنَ حَالٌ فِى الْاَرْضِ اَرْضِ مِصْرَ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَاْسِ اللّٰهِ عَذَابِهٖ اِنْ قَتَلْتُمْ اَوْلِيَاءَهٗ اِنْ جَآءَنَا ط اَىْ لَا نَاصِرَ لَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى اَىْ مَا اُشِيْرُ عَلَيْكُمْ اِلَّا بِمَا اُشِيْرُ بِهٖ عَلٰى نَفْسِىْ وَهُوَ قَتْلُ مُوْسٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ طَرِيْقَ الصَّوَابِ.

২৯. হে আমার জাতি! আজ তোমাদের রাজত্ব, তোমরা জয়ী– বিজয়ী এটা حَالٌ [হাল] হয়েছে জমিনে– মিশরের জমিনে সুতরাং কে আমাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করবে, আল্লাহর শাস্তি হতে, যদি তোমরা তাঁর বন্ধুদেরকে হত্যা কর যদি তা আমাদের উপর এসে পড়ে অর্থাৎ তখন আমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। ফেরাউন বলল, যা কিছু আমি বুঝছি তাই তোমাদের নিকট পেশ করছি। অর্থাৎ আমি নিজের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি; তোমাদেরকে শুধু সে পরামর্শই দিচ্ছি। আর তা হলো হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা। আর সে পথই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যা সত্য ও সঠিক। অর্থাৎ সঠিক পথ।

তাহকীক ও তারকীব

"مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ" কিসের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে? "وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ" এখানে مِنْ হরফে জারটি একটি উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। মূলত বাক্যটি এভাবে হবে "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ كَائِنٌ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ" -এর তারকীব নিম্নরূপ হবে قَالَ ফে'ল رَجُلٌ মাওসূফ مُؤْمِنٌ প্রথম সিফাত, كَائِنٌ শিবহে ফে'ল مِنْ হরফে জার اٰلِ فِرْعَوْنَ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। মওসূফ তার সিফাতদ্বয়ের সাথে মিলিত হয়ে فَاعِلٌ এখন قَالَ ফে'ল তার فَاعِلٌ মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হয়েছে।

"وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ" -এর মহল্লে ই'রাব কি? উল্লিখিত আয়াতাংশ "وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ" তৎপূর্ববর্তী رَجُلًا মাফঊল হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ এটা جُمْلَة حَالِيَة বা অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য।

"ظَاهِرِيْنَ" শব্দটির মহল্লে ইরাব কি? "ظَاهِرِيْنَ" শব্দটি لَكُمْ -এর যমীরে মাজরূর হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ ..... مِنْ رَبِّكُمْ" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : অভিশপ্ত ফেরাউন যে পরামর্শ সভায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার সংকল্প ব্যক্ত করেছিল, সে সভায় স্বীয় ঈমান গোপন করে উপস্থিত ছিল ফেরাউন গোত্রীয় এক মু'মিন কিবতী। সে ফেরাউন ও তার দলবলকে উপদেশ দিয়েছিল যে, তোমরা কি এমন লোককে হত্যা করতে চাও, যে বলে আমার প্রতিপালক কেবল এক আল্লাহ তা'আলা, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন। তাঁর তরফ থেকে সে অনেক মোজেজা অনেক দলিল প্রমাণসহ উপস্থিত হয়েছে। সে আল্লাহ তা'আলার রাসূল হওয়ার দাবি করে। স্বীয় নবুয়তের পক্ষে মোজেজাসমূহ দেখাচ্ছে। আর প্রমাণ পেশকারীর বিরোধিতা করা, আর এ বিরোধিতা এমন পর্যায়ের যে, তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হবে– এতএব, তা কোনো প্রকারেই বৈধতা পাবে না।

ফেরাউনের বংশের ঈমানদার ব্যক্তিটি কে? হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যকার সংঘাতের বর্ণনা করতে গিয়ে ফিরাউন ও তার অনুসারীদের সাথে এমন এক ব্যক্তির দীর্ঘ সংলাপের আলোচনা করা হয়েছে যে ফেরাউনের বংশের এবং তার পরামর্শ সভার পদস্থ সদস্য ছিল। আর হযরত মূসা (আ.)-এর মোজেজা দেখে ঈমান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কৌশলগত কারণে তখনো পর্যন্ত নিজের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। উপরিউক্ত সংলাপের সময় অনিবার্যভাবে তার ঈমানের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে।

মুফাসসিরীনে কেরামের মধ্য হতে মুকাতিল, সুদ্দী এবং হাসান প্রমুখগণ বলেছেন যে, এ ব্যক্তি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। এ ব্যক্তিই কিবতী হত্যার দায়ে যখন ফেরাউনের পরামর্শ সভায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছিল তখন দৌড়ে এসে হযরত মূসা (আ.)-কে সংবাদ পৌঁছিয়ে সাবধান করেন এবং শীঘ্রই মিশর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লেখেছেন, এ মু'মিন ব্যক্তি ছিল কিবতী, আর এ ব্যক্তি সম্পর্কেই 'সূরা কাসাসে' ইরশাদ হয়েছে– "وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَسْعٰى" 'আর শহরের শেষ প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল।' এখানে رَجُلٌ দ্বারা এলোককে বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যদি এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের হতো তবে ফেরাউন তার বক্তব্য শ্রবণ করে ধৈর্যের পরিচয় দিত না; বরং তার প্রতি জুলুম-অত্যাচার করত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, ফেরাউনের বংশে এ এক ব্যক্তিই ঈমানদার ছিল এবং ফেরাউনের স্ত্রী হযরত 'আসিয়া' দ্বিতীয় ঈমানদার ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি হলো সে যে হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবহিত করে ছিল। ফেরাউনের বংশে এ তিন জনই মু'মিন ছিলেন।

কোনো কোনো মুফাসসির উল্লেখ করেছেন যে, তার নাম হাবীবে নাজ্জার, কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়; বরং হাবীব হলো সে ব্যক্তির নাম যার আলোচনা সূরা ইয়াসীনে করা হয়েছে।

এ ব্যক্তির নামের ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরাম বহু মতামত পেশ করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, তার নাম ছিল খাবুর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলী ছিল, তার নাম ছিল জাকাইল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করতেন।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম شَمْعَانُ (শাম'আন)। সুহাইলী (র.) বলেছেন যে, এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত।

৪. কারো কারো মতে, তার নাম حِزْقِيْلُ ছিল, ইমাম ছা'লাবী (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ মতটিই বর্ণনা করেছেন। একখানা হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– বান্দাদের মধ্যে কতিপয় صِدِّيْقِيْنَ রয়েছেন। একজন হলেন হাবীবে নাজ্জার, যার উল্লেখ সূরা ইয়াসীনে রয়েছে। দ্বিতীয় হলো اٰلِ فِرْعَوْنَ [আলে ফিরআউন]-এর মু'মিন ব্যক্তি এবং তৃতীয়জন হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। আর আবূ বকর তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। –[কুরতুবী]

"يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ" হতে গৃহীত ফায়দা : আল্লাহর বাণী "يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ" হতে জানা যায় যে, কেউ যদি লোকদের সামনে স্বীয় ঈমান প্রকাশ না করে অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, তবে সে ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীসমূহ হতে এটা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতির প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখে স্বীকার করবে, ঈমানদার হতে পরবে না। অবশ্য মৌখিক স্বীকৃতির জন্য জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা তার ঈমান সম্পর্কে অবহিত হতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে মুসলিমের ন্যায় আচরণ করতে পারবে না।

নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার সময় কে কাফেরদেরকে বলেছিল اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ الخ ? হাদীস শরীফে এসেছে মক্কার কাফেররা যখন নবী করীম ﷺ -এর উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেছিল তখন হযরত আবূ বকর (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে অনুরূপ উক্তি করেছিলেন। সুতরাং তিনি বলেছিলেন– "اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ" "আল্লাহ আমার প্রভু" বলার কারণে তোমরা কি একজন লোকের প্রাণ নাশ করবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত ওরওয়াহ ইবনে জোবায়ের (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি আমাকে বলুন, মক্কার কাফেররা প্রিয় নবী ﷺ -এর সাথে সর্বাধিক মন্দ আচরণ কোনটি করেছিল? হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, একদা রাসূল ﷺ কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে সালাতে রত ছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে আবূ মুয়ীত রাসূল ﷺ -এর দিকে অগ্রসর হলো। সে রাসূল ﷺ -এর চাদরটি তাঁর গর্দান মোবারকে পেঁচিয়ে নিল এবং সজোরে টানতে লাগল এতে তাঁর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, ঠিক এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা.) আগমন করলেন এবং সজোরে ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে গর্দান ধরে হুজুর ﷺ -এর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলেন, "اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ" (তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করছ, যিনি বলেন, আমার প্রতিপালক এক আল্লাহ তা'আলাই।)

হযরত আলী ও আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত আলী (রা.) অনেক্ষণ ক্রন্দন করেন, তাঁর অশ্রুতে দাড়িগুলো ভিজে যায়। এরপর বললেন, আমি তোমাদেরকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ফেরাউনের বংশের ঐ ব্যক্তি উত্তম ছিল? না আবূ বকর? সব লোক নীরব ছিল। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, তোমরা জবাব কেন দিচ্ছ না? আল্লাহর শপথ! হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একটি ঘণ্টা ফেরাউনের বংশীয় মু'মিনের সারা জীবনের থেকে উত্তম কেননা, সে তো তার ঈমান গোপন রেখেছিল, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর ঈমানের কথা ঘোষণা করে ছিলেন।

–[তাফসীরে মাযহারী ১০/২২৩]

'وَقَدْ جَاۤءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ' আয়াতে بَيِّنٰتٌ -এর অর্থ : بَيِّنٰتٌ -এর দ্বারা এখানে তিনটি বিষয় বুঝানো হয়েছে।

১. এমন সব উজ্জ্বল দলিল ও প্রমাণ, যা হতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা পুরোপুরি নির্ভুল ও সত্য।

২. এমন সব সুস্পষ্ট চিহ্ন ও নিদর্শনাদি যা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত ও নিয়োগপ্রাপ্ত।

৩. জীবনের সমস্যা ও ব্যাপারাদি সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট হেদায়েত যা দেখে প্রত্যেক সুস্থ ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী মানুষ বুঝতে পারে যে, কোনো মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর মানুষ এরূপ পবিত্র শিক্ষা পেশ করতে পারে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا ..... كَذَّابٌ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ সমর্থনকারী ফেরাউন বংশীয় তথা কিবতী ঈমানদার লোকটি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন। সে বলেছে যে, হযরত মূসা (আ.) যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তা হলে তাতে তোমাদের ক্ষতি কি? তার মিথ্যার বোঝা সে নিজেই বহন করবে।

এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া স্বত্ত্বেও তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদী মনে কর তবে তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়াই তোমাদের উচিত হবে। কেননা সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি সত্যবাদীও হতে পারেন। তা হলে তাঁর উপর হস্তক্ষেপ করে তোমরা আল্লাহর আজাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা যদি তাকে মিথ্যাবাদীও মনে কর কবুও তাকে নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। কেননা তিনি যদি আল্লাহ তা'আলার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকেন, তা হলে আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাকে সামলাবেন। প্রায় এ ধরনের কথাই ফেরাউনকে লক্ষ্য করে ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আ.) বলেছেন–

"وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ" (اَلدُّخَانُ) "তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আনলে আমাকে আমার অবস্থায়ই ছেড়ে দাও।"

লক্ষ্যণীয় যে, ফেরাউনী সমাজের এ মুমিন ব্যক্তি কথার শুরুতেই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি তার ঈমান আনার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে নি; বরং শুরুতে সে এমনভাবে কথা বলছিল যে, মনে হচ্ছিল সেও ফেরাউনী আদর্শের একজন লোক এবং নিছক নিজ জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই সে এরূপ কথা বলছে। কিন্তু ফেরাউন ও তার দরবারী যখন কিছুতেই হেদায়েতের পথে ফিরে আসছিল না, তখন পরিশেষে সে তার ঈমানের গোপন রহস্য উন্মোচন করে দিল। তার বক্তব্যের পরবর্তী অংশে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে।

"اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ" নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হেদায়েতের কল্যাণ দান করেন না।

আলোচ্য ব্যাখ্যাংশ দুটি অর্থ বহন করছে–

১. তোমরা যদি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রাণ-প্রদীপ নির্বাপিত করতে উদ্যত হও এবং তাঁর উপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে নিজেদের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর। তা হলে মনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কখনই সাফল্যের পথ দেখাবেন না।

২. একই ব্যক্তির চরিত্রে ন্যায়বাদিতার ন্যায় ভালো গুণ এবং মিথ্যা কথা ও মিথ্যা অপবাদের ন্যায় খারাপ গুণ একত্রিত হতে পারে না। তোমরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছ যে, হযরত মূসা (আ.) এক অতীব পবিত্র চরিত্র ও পূর্ণ মাত্রায় মহান নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি। এরূপ অবস্থায় এক দিকে তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা নবুয়তের দাবি করার মতো মিথ্যুক হবেন, আর অপরদিকে আল্লাহ তাঁকে এত উচ্চমানের সুমহান চরিত্র বৈশিষ্ট্য দান করবেন, এমন কথা তোমাদের মন মগজে স্থান পেল কি ভাবে?

"وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهٗ" উক্তি হতে প্রতীয়মান হয় যে, তার মিথ্যার ক্ষতি শুধু তার সাথে সীমাবদ্ধ। অন্যের দিকে তা সংক্রামিত হবে না। এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? : হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে উক্ত মুমিন ব্যক্তিটি বলেছেন যে, "وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهٗ" যদি হযরত মূসা (আ.) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন তা হলে এর প্রতিফল তাকেই ভোগ করতে হবে। তা হতে বুঝা যায় যে, পাপীর পাপের প্রতিফল কেবল সে-ই ভোগ করে থাকে অন্যদের প্রতি তা প্রসারিত হয় না।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো উক্ত উক্তিটি আল্লাহর বাণী– "لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى" [কেউই কারো পাপের বোঝা বহন করবেনা] এর মতো। সুতরাং উক্তিটি যথাস্থানে ঠিকই আছে।

এর মর্মকথা হলো, হযরত মূসা (আ.) নবুয়তের দাবি করছেন, এ ব্যাপারে যদি তিনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, আর ব্যাপারটি এরূপ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নবী করে পাঠান নি অথচ তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে, আল্লাহ তাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন। তা হলে তার শাস্তি বিধান করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তোমরা তাকে সমর্থন না করলেও হতো। কেননা, সে এমন প্রতাপশালী নয় যে, তোমাদের উপর তা চাপিয়ে দিতে পারবে– আর না সে এরূপ কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাকে হত্যা করার জন্য তোমাদের এত ব্যতিবস্ত হওয়ার কি প্রয়োজন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

উক্ত মু'মিন ব্যক্তির يُصِبْكُمْ كُلُّ الَّذِيْ الخ না বলে يُصِبْكُمْ بَعْضُ الخ বলার কারণ কি? উক্ত মু'মিন ব্যক্তিটি ফেরাউন কর্তৃক হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনার কথা শুনে তার প্রতিবাদ করতে যেয়ে এক পর্যায়ে বলেছেন– আর হযরত মূসা (আ.) যদি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদীই হয়ে থাকেন তা হলে তিনি তোমাদের ব্যাপারে আজাবের যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার কিয়দংশ অবশ্যই এসে পড়বে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হযরত মূসা (আ.) যদি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন– আর মূলত তিনি সত্যবাদীই ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতিশ্রুত আজাবের আংশিক আসবে কেন? বরং পুরোটাই আসা উচিত। সুতরাং তিনি– "يُصِبْكُمْ كُلُّ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ" না বলে "يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ" বললেন কেন?

মুফাসসিরীনে কেরাম এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন :

১. আলোচ্যাংশে উক্ত মুমিন ব্যক্তির উক্তি– "يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ" -এর অর্থ হলো– হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের দাবি যদি সত্য হয় আর তোমরা তার বিরোধিতা করতে থাক তবে অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আজাব হতে নিষ্কৃতির কোনো পথই নেই। তবে মোদ্দাকথা, হযরত মূসা (আ.)-এর আনুগত্য না করে তাকে হত্যা করার পরিকল্পনাই যদি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় তা হলে আল্লাহর আজাব যে অনিবার্য হয়ে পড়বে তা বুঝিয়ে দেওয়াই আলোচ্য উক্তির মূল উদ্দেশ্য।

২. হযরত মূসা (আ.) ফেরাউন ও তার সমর্থক মুশরিকদেরকে দুপ্রকার আজাবের ভয় দেখিয়েছিলেন। এক প্রকার দুনিয়ার আজাব এবং অপর প্রকার হলো আখেরাতের আজাব। এখানে উক্ত মুমিন লোকটি بَعْضُ -এর দ্বারা প্রতিশ্রুত আজাবের আংশিক আজাব তথা দুনিয়ার আজাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) "مِنَ الْعَذَابِ عَاجِلًا" -এর দ্বারা এর তাফসীর করে এদিকেই ইশারা করেছেন। কেননা দুনিয়ার আজাবকে "اَلْعَذَابُ الْعَاجِلُ" এবং পরকালের আজাবকে "اَلْعَذَابُ الْاٰجِلُ" বলা হয়ে থাকে।

৩. আবূ ওবাইদ নাহুবিদ বলেছেন যে, بَعْضُ শব্দটি কোনো কোনো সময় كُلّ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– লবিদের নিম্নোক্ত শ্লোকটি بَعْضُ শব্দটিতে كُلّ -এর অর্থে হয়েছে–

تَرَّاكَ اَمْكِنَةٍ اِذَا لَمْ اَرْضَهَا * اَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النُّفُوْسِ حِمَامُهَا

"اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ ...... كَذَّابٌ" আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে অপ্রকাশ্য রাখার কারণ : উক্ত আয়াতাংশে মুমিন ব্যক্তিটি বলেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হেদায়েত করেন না। এখানে তিনি সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদী তা ইচ্ছাকৃতভাবেই সনাক্ত করেন নি।

এর কারণ হলো, মূলত এর দ্বারা তো তিনি ফেরাউনকেই বুঝিয়েছেন। অথচ বক্তব্যটি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, ফেরাউন ভেবেছে এর দ্বারা তিনি হযরত মূসা (আ.)-কেই বুঝিয়েছেন। আর প্রকাশ্যভাবে তখন ফেরাউনকে ঐরূপ বিশেষণে আখ্যায়িত করলে তিনি চিহ্নিত হয়ে যেতেন। কাজেই اِبْهَامْ তথা অপ্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করেছেন। মূলত ফেরাউনই সীমালঙ্ঘনকারী ও প্রভুত্বের দাবিতে মিথ্যাবাদী হওয়ার কারণে আল্লাহর হেদায়েত হতে বঞ্চিত রইল।

"قَالَ فِرْعَوْنُ .... سَبِيْلَ الرَّشَادِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশের তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন– "اَيْ مَا اُشِيْرُ عَلَيْكُمْ اِلَّا بِمَا اُشِيْرُ بِهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَهُوَ قَتْلُ مُوْسٰى" অর্থাৎ, সেই মু'মিন ব্যক্তিটির দীর্ঘ ভাষণের জবাবে ফেরাউন বলল, আমার নিজের জন্যে যা পরামর্শ তা তোমাদের জন্যও প্রযোজ্য। আর আমার পরামর্শ হলো হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা। আর তোমরা তো অবগত আছ, আমি তোমাদেরকে সদাসর্বদা সঠিক পথের নির্দেশনাই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ, আমার মতে, যেটা তোমাদের হিতে মঙ্গলজনক তাহলো প্রারম্ভিক অবস্থাতেই হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা যুক্তিযুক্ত।

ফেরাউনের উক্ত জবাব হতে অনুমান করা যায় যে, তার দরবারে এ প্রভাবশালী ও পদাধিকারী আন্তরিকভাবে মু'মিন হয়ে গিয়েছে। অথচ সে এখনো পর্যন্ত টেরই পায়নি। এ কারণে সে উক্ত ব্যক্তির কথা শুনে কোনোরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নি। অবশ্য সে এ কথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, তার অভিমত জেনে নেওয়ার পরও সে নিজের মত পরিবর্তনে সম্মত নয়।

٣٠. وَقَالَ الَّذِيٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ اَيْ يَوْمِ حِزْبٍ بَعْدَ حِزْبٍ.

٣١. مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ
مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِثْلَ بَدَلٌ مِنْ مِثْلِ قَبْلَهُ اَيْ
مِثْلَ جَزَاءِ عَادَةِ مَنْ كَفَرَ قَبْلَكُمْ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ فِي
الدُّنْيَا وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ.

٣٢. وَيٰقَوْمِ اِنِّيٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ
بِحَذْفِ الْيَاءِ وَاِثْبَاتِهَا اَيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
يَكْثُرُ فِيْهِ نِدَاءُ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ
النَّارِ بِالْعَكْسِ وَالنِّدَاءُ بِالسَّعَادَةِ لِاَهْلِهَا
وَالشَّقَاوَةِ لِاَهْلِهَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

٣٣. يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ج عَنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ
اِلَى النَّارِ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ مِنْ
عَاصِمٍ ج مَانِعٍ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.

٣٤. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ اَيْ قَبْلَ
مُوْسٰى وَهُوَ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ فِيْ قَوْلٍ
عُمِّرَ اِلٰى زَمَانِ مُوْسٰى اَوْ يُوْسُفُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ
يُوْسُفَ بْنِ يَعْقُوْبَ فِيْ قَوْلٍ بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ
الظَّاهِرَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ط
حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ.

অনুবাদ :

৩০. আর যে লোকটি ঈমান এনেছিল সে বলল, হে আমার জাতি! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আজাবের দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশঙ্কা করছি। অর্থাৎ এক জাতির দিনের পর আরেক জাতির দিন

৩১. নূহ, আদ, সামুদ জাতি এবং তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল; অত্র আয়াতের مِثْلَ শব্দটি পূর্বোক্ত আয়াতের مِثْلَ হতে بَدَل হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী কাফেরদেরকে দুনিয়াতে আজাব প্রদানের যে চিরাচরিত রীতি চলে এসেছে তার ন্যায়– আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর জুলুম করার ইচ্ছা পোষণ করেন না।

৩২. আর হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি কিয়ামত দিবসের। اَلتَّنَادِ -এর শেষে ى সহ এবং তা পরিহার করে উভয়ভাবে পড়া যায়। يَوْمَ التَّنَادِ -এর অর্থ– কিয়ামত দিবস। সেদিন জান্নাতিরা জাহান্নামিদেরকে এবং জাহান্নামিরা জান্নাতিকে খুব বেশি ডাকাডাকি করবে। সৌভাগ্যশালীদেরকে সৌভাগ্যের ব্যাপারে এবং দুর্ভাগাদেরকে দুর্ভাগা হিসেবে আহ্বান করা হবে ইত্যাদি।

৩৩. যেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে হিসাব, নিকাশের স্থান হতে জাহান্নামের দিকে। তোমাদের জন্য থাকবে না আল্লাহ হতে– অর্থাৎ আল্লাহর আজাব হতে কোনো রক্ষাকারী বিপদ প্রতিহতকারী। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে হেদায়েতকারী কেউ নেই।

৩৪. ইতঃপূর্বে তোমাদের নিকট হযরত ইউসুফ (আ.) এসেছিলেন– অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.)-এর পূর্বে। আর তিনি ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)। একদল মুফাসসিরদের মতে তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অথবা অন্য এক দলের মতে তিনি হলেন হযরত ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ.)। সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ– অর্থাৎ প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ নিয়ে– কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন তার ব্যাপারে তোমরা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করতে। অবশেষে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তখন তোমরা বললে– কোনো প্রমাণ ছাড়াই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ط اَىْ فَلَنْ تَزَالُوْا كَافِرِيْنَ بِيُوْسُفَ وَغَيْرِهٖ كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِضْلَالِكُمْ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُشْرِكٌ مُّرْتَابٌ شَاكٌّ فِيْمَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنٰتُ .

তাঁর পরে আল্লাহ আর কাউকে রাসূল করে পাঠাবেন না। অর্থাৎ সুতরাং তোমরা হযরত ইউসুফ (আ.) ও অন্যান্যদের সকলকেই অস্বীকার করতে থাকলে। এভাবে অর্থাৎ যেভাবে তোমাদেরকে গোমরাহ করেছেন আল্লাহ তা'আলা গোমরাহ করে থাকেন সীমালঙ্ঘনকারীকে মুশরিককে সন্দেহকারীকে সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে যে সন্দেহ পোষণ করে থাকে।

Free © www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ التَّنَادِ বাক্যাংশটির মহল্লে ইরাব কি? "يَوْمَ التَّنَادِ" বাক্যাংশটুকু দু'কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে-

১. এটা পূর্ববর্তী اَخَافُ ফেলের مَفْعُوْل فِيْهِ হয়েছে।

২. অথবা এটা পূর্ববর্তী اَخَافُ ফে'লের مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। মূল বাক্যটি হবে اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ - يَوْمِ التَّنَادِ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিনের আজাবের ভীতি প্রদর্শন করছি।

مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ আয়াতাংশটুকুর নাহবী তারকীব কি? আল্লাহর বাণী- "مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ عَاصِمٌ" -এর মূল রূপ হবে- لَيْسَ عَاصِمٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ثَابِتًا لَكُمْ সুতরাং لَيْسَ ফে'লে নাকেস। عَاصِمٌ ইসমে লাইসা "مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ" জার মাজরূর মিলে عَاصِمٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ আর "ثَابِتًا لَكُمْ" লাইস এর খবর, لَيْسَ তার ইসেম ও খবরের সাথে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে নাকেসাহ।

يَوْمَ التَّنَادِ বাক্যাংশের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গ : "يَوْمَ التَّنَادِ" -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), যাহ্হাক ও ইকরামাহ প্রমুখ ক্বারীগণ اَلتَّنَادِ -এর د অক্ষরে তাশদীদ যোগে পড়েছেন।

২. হযরত হাসান, ইয়াকূব, ইবনে কাসীর ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ اَلتَّنَادِ -এর শেষে ى অক্ষরকে বলবৎ রেখে يَوْمَ التَّنَادِ পড়েছেন।

৩. অন্যান্য ক্বারীগণ د কে তাখফীফ করতঃ এর শেষভাগ হতে ى -কে হযফ করে اَلتَّنَادِ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ الخ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ফেরাউনের পরামর্শ পরিষদের সদস্য সে মু'মিন ব্যক্তি আরো এগিয়ে বলল, হে জাতি! পৃথিবীতে সকল যুগেই দূত হত্যা করাকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হতো, তোমরা আল্লাহ সুবহানুহুর দূততে হত্যা করার পরিকল্পনা করছো এমতাবস্থায় তোমাদের পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুধাবন যোগ্য। যদি তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয় তবে তা হবে তোমাদের অন্যায় অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি আদ এবং ছামূদ জাতি এবং তোমাদের পর হযরত লূত (আ.)-এর জাতি পরিশেষে নমরুদরা আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করেছে তখনই তাদের প্রতি আজাব এসেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি জুলুম করেন নি। যদি কোনো অপরাধ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় অথবা কোনো জালিমকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় কিংবা কোনো ব্যক্তির নেক আমলের ছওয়াব কম দেওয়া হয় বা কোনো অপরাধীকে তার অপরাধের চেয়ে অধিক শাস্তি দেওয়া হয় তবে তাকে জুলুম বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা কোনো ভাবেই বান্দার প্রতি জুলুম করেন না।

اَلْاَحْزَابُ বহুবচনের শব্দ দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : মহান আল্লাহ ফেরাউনের পরামর্শ সভার ঈমানদার ব্যক্তির কথার উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন- "وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ" ঈমানদার ব্যক্তিটি বলল, আমি আশঙ্কা করছি যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় তোমাদের ভাগ্যেও দুর্দিন নেমে আসবে।

اَلْاَحْزَابُ শব্দটি حِزْبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ দল বা জাতি। জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন- "اَىْ يَوْمِ حِزْبٍ بَعْدَ حِزْبٍ" অর্থাৎ সেই দুর্দিন এক জাতির পর অন্য জাতির উপর আপতিত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে সেই দুর্দিন ঐ সকল জাতির উপর একদিনে আসেনি; বরং একেক সময় বিভিন্ন অঞ্চলে যুগের আবর্তনে সমকালীন জাতিসমূহের উপর এসেছে। "مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ" -এর দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

মোদ্দাকথা, اَلْاَحْزَابُ-এর দ্বারা বিভিন্ন নবী ও রাসূলগণের বিদ্রোহী জাতিসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

"وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ" দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায় কিসের উপর দলিল পেশ করেছেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ" অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানুহু বান্দাদের উপর জুলুম করার ইচ্ছা পোষণ করেন না। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর এমনকি তাঁর কোনো সৃষ্টির উপরই জুলুম করেন না।

মু'তাযিলার দলিল : যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর জুলুম করেন না সেহেতু তিনি বান্দাদের সকল কাজ-কর্মের স্রষ্টা হতে পারেন না। কেননা উদাহরণস্বরূপ কুফর ও অন্যান্য মন্দ কাজের স্রষ্টা যদি তিনি হন তা হলে সে জন্য বান্দাদেরকে শাস্তি দেওয়া জুলুম হবে। অথচ তিনি তো জুলুম করেন না। কাজেই তিনি সেগুলোর স্রষ্টা নন।

দ্বিতীয়তঃ সৎকর্মশীলদেরকে ছওয়াব প্রদান করা এবং দুষ্কর্মকারীদেরকে আজাব দেওয়া আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব। তিনি এটার ব্যতিক্রম করতে পারেন না। কেননা না হয় এটা ইনসাফের পরিপন্থি ও জুলুম হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তো জুলুম করেন না।

তারা আরো বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা যদিও জুলুম করেন না তথাপি তিনি জুলুম করার ক্ষমতা রাখেন। নতুবা তা বর্জনের কারণে তিনি প্রশংসার পাত্র হতে পারতেন না।

"وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : কেয়ামত দিবসে হিসাব-নিকাশের জন্যে প্রত্যেকটি মানুষের ডাক পড়বে, প্রত্যেককে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। ঈমান ও নেক আমল থাকলে পুরস্কার তথা চিরসুখ ও শান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভ হবে। পক্ষান্তরে ঈমান না থাকলে চিরশাস্তি ও চির দুঃখের কেন্দ্র দোজখ অবধারিত হবে। জান্নাতিরা! জান্নাতে প্রবেশের পর এবং দোজখীরা দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেককে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে বেহেশতের অধিবাসীরা তোমরা চিরদিন বেহেশতে থাকবে, কখনো বেহেশতের সুখ-শান্তি হতে তোমাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না, আর দোজখবাসীদেরকে বলা হবে, হে দোজখবাসীরা! তোমরা চিরদিন দোজখে থাকবে, তোমাদের মৃত্যু নেই এবং দোজখ থেকে কখনো ছাড়া পাবে না।

اَلتَّنَادُ-এর অর্থ এবং কেয়ামত দিবসকে "يَوْمَ التَّنَادِ" বলার কারণ : اَلتَّنَاد শব্দটি د অক্ষরটির উপরে জবর হবে। এটা اَلتَّنَادِىْ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বাবে تَفَاعُلٌ থেকে। "اَلتَّنَادِىْ" অর্থ হলো একে অপরকে আহ্বান করা। কেয়ামতের দিবসকে يَوْمَ التَّنَادِ বলার কারণ হলো, সেদিন বহু আহ্বান সংঘটিত হবে। আর তা হবে এক মহাদিবস। কেননা আহ্বান ও ডাকাডাকির অধিক তথা একে অপরকে অধিক পরিমাণে আহ্বান ও ডাকাডাকি করা ঘটনার গুরুত্বকে বুঝিয়ে থাকে।

সুতরাং সর্বপ্রথম শিঙ্গায় ফুৎকার হবে। যার দ্বারা মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ" অর্থাৎ, সেদিন নিকটস্থ স্থান হতে একজন ঘোষক ঘোষণা দেবে- সেদিন সকলেই যথার্থভাবে সেই হুংকারের বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সর্বশেষ আওয়াজ হবে হিসাব নিকাশের জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ" সেদিন আমি প্রতিটি মানুষকে তার ইমাম (নেতা)-এর সাথে ডাকব।

আবার জান্নাতিরা জাহান্নামিদেরকে এবং জাহান্নামিরা জান্নাতিদেরকে ডাকাডাকি করবে। সুতরাং সূরায়ে আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ الخ" আ'রাফবাসীগণ আহ্বান করবে। "وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ الخ" - জাহান্নামিগণ আহ্বান করবে। "وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ الخ" বেহেশতবাসীগণ আহ্বান করবে।

পরিশেষে মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে জবাই করার সময় একটি আওয়াজ হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- "يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ" "হে জান্নাতিরা চিরদিন জান্নাতে অবস্থান কর, আর মৃত্যু হবে না এবং হে জাহান্নামিরা চিরদিন জাহান্নামে পড়ে থাক, আর তোমাদের মৃত্যু হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে- "হে আল্লাহদ্রোহীরা তোমরা দণ্ডায়মান হও।" এর দ্বারা তাকদীর অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হবে। এর পর জান্নতিরা জাহান্নামিদেরকে এবং জাহান্নামিরা জান্নাতিদেরকে আর আ'রাফের অধিবাসীরা উভয় দলকে আহ্বান করে স্বীয় বক্তব্য পেশ করবে। এর প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী ও দুর্ভাগার নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করে তাদের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। যেমন- বলা হবে, অমুকের পুত্র অমুক সৌভাগ্যশালী ও কৃতকার্য হবে। এর পর আর দুর্ভাগ্য হওয়ার আশঙ্কা নেই। অমুকের পুত্র অমুক দুর্ভাগা ও অকৃতকার্য হয়েছে। এখন আর তার সৌভাগ্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। -[মাযহারী]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আমল ওজন করার পর সৌভাগ্য ও হতভাগ্য হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হবে।

-[মুসনাদে বায্যার ও বায়হাকী]

হযরত আবূ হাজ্জে আ'রাজ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি নিজে নিজেকে লক্ষ্য করে বলতেন, হে আ'রাজ কেয়ামতের দিন আহ্বান করে বলা হবে- হে অমুক প্রকারের গুনাহকারী দাঁড়াও তখন তুমি তাদের সাথে দাঁড়াবে। আবার ঘোষণা করা হবে, অমুক শ্রেণির গুনাহগার দাঁড়াও, তখন তুমি তাদের সাথে দাঁড়াবে। পুনরায় ঘোষণা করা হবে, অমুক প্রকারের গুনাহকারী দাঁড়াও, তখনা তুমি দাঁড়াবে। আর আমার তো মনে হয় প্রত্যেক প্রকারের গুনাহগারদের ই'লানের সময়ই তোমাকে তাদের সারিতে দাঁড়াতে হবে। কেননা, তুমি সব ধরনের অপরাধেই জড়িত হয়েছ। -[মুযহেরী]

অবশ্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) বলেছেন যে, এখানে "يَوْمَ التَّنَادِ" -এর দ্বারা সেই দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেদিন ফেরাউন ও তার সমর্থকদের উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হবে। অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন বিপদের দিন ঘনিভূত হবে যখন তোমরা সাহায্যের জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি করবে। কিন্তু তা কোনো কাজেই লাগবে না। লোহিত সাগরে ডুবার সময় ফেরাউন ও তদীয় জাতির এ পরিণতিই হয়েছিল।

হযরত ইসরাফীল (আ.) কতবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন? হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের জন্য তিনবার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে।

১. **نَفْخَةُ الْفَزَعِ তথা ভয়-ভীতির ফুৎকার :** এ ফুৎকারের কারণে সমস্ত মাখলূকাত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।

২. **نَفْخَةُ الصَّعْقِ বেহুঁশ হওয়ার ফুৎকার :** প্রথম ফুৎকার তথা نَفْخَةُ الْفَزَعِ বা ভয়-ভীতির ফুৎকারের পর তা দীর্ঘায়িত হয়ে نَفْخَةُ الصَّعْقِ -এর রূপ নেবে। এর কারণে সমগ্র জীব বেহুঁশ হয়ে পড়বে ও পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করবে।

৩. **نَفْخَةُ النَّشْرِ বা পুনর্জীবিত হওয়ার ফুৎকার :** এ ফুৎকারের কারণে সমগ্র জীবজগত তথা মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও প্রাণীকূল পুনর্জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের প্রতি ধাবিত হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

বর্ণিত হাদীসেও نَفْخَةُ الْفَزَعِ বা প্রথম ফুৎকারের সময় লোকদের এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ির, ছুটাছুটির বিষয়টি উল্লেখ করে বলা হয়েছে- "وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ اللّٰهُ يَوْمَ التَّنَادِ" আর এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতেও "يَوْمَ التَّنَادِ" -এর দ্বারা প্রথম ফুৎকারের কারণে লোকদের অস্থিরতা বশত এদিক সেদিক বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটির ব্যাপারটা বুঝানো হয়েছে।

"يَوْمَ تُوَلُّوْنَ ..... هَادٍ" **আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর :** ফেরাউনের সভাসদের সে মু'মিন সদস্য ব্যক্তিটি তাদেরকে কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন- হে আমার জাতি! ঐ দিনকে স্মরণ কর, যেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়নপর হবে, সেদিন আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা যাকে ভুলের মধ্যে রাখেন তার জন্যে কোনো পথ প্রদর্শক নেই।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিনকে ভয় কর যখন তোমরা দোজখের আজাব থেকে পলায়ন করবে, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, যখন শিঙ্গার ফুৎকার শ্রবণ করে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, এরপর পুনরায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হলে মানুষ সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে, আলোচ্য আয়াতে তখনকার কথাই বলা হয়েছে।

ইবনে জারীর, আবূ ইয়া'লা, বায়হাকী, আবুশ শেখ, আবদ ইবনে হোমায়েদ (র.) নিজ নিজ সংকলনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আ.)-কে প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার আদেশ দিয়ে বলবেন, শিঙ্গায় ফুঁক দাও, যাতে ভয়ভীতির সৃষ্টি হয়। নির্দেশ মোতাবেক হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন। আসমান জমিনের অধিবাসীগণ সে আওয়াজ শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তবে আল্লাহ তা'আলা যার সম্পর্কে ইচ্ছা করবেন তাকে (ভয়-ভীতি) হতে রক্ষা করবেন। হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ঐ ফুঁককে অব্যাহত রাখবেন, আওয়াজকে সুদীর্ঘ করবেন, মাঝখানে বিরতি দিয়ে দম নেবেন না। ফলে এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কথা তাদের মায়েরা ভুলে যাবে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের গর্ভপাত হয়ে যাবে, চরম আতঙ্কের কারণে শিশুদের চুল পর্যন্ত সাদা হয়ে যাবে। শয়তান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করবে, ঘোরপাক খাবে। পলায়নপর হয়ে যখন গোটা পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে পৌঁছবে তখন ফেরেশতাগণ তাদের চেহারায় প্রহার করে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেবেন। মানুষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে তখন পরস্পরের মধ্যে ডাকাডাকি হবে। আর এটিই হলো সেদিন যাকে আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ التَّنَادِ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেদিন মানুষ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়নপর হবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আজাব হতে কোনো অবস্থাতেই রেহাই পাবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং জাহ্হাক (র.) يَوْمَ التَّنَادِ শব্দটিতে د (দাল) এর উপর তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেছেন। এর অর্থ পলায়ন এবং ছড়িয়ে পড়ার দিন। যেভাবে উষ্ট্র তার মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করে ঠিক এভাবে মানুষ কেয়ামতের দিন পৃথিবীতে পলায়নপর হবে।

ইবনে জারীর এবং ইবনে মোবারক (র.) যাহ্হাক (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম (সর্বনিম্ন) আসমানকে ফেটে যাওয়ার আদেশ দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ আসমান ফেটে যাবে এবং তাতে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তার এক প্রান্তে থাকবেন। পুনরায় আল্লাহ তা'আলার হুকুম মোতাবেক তারা পৃথিবীতে অবতরণ করে দুনিয়াবাসীকে ঘেরাও করবেন। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সষ্ঠ এবং সপ্তম আসমানেরও একই অবস্থা হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আসমান ফেটে যাবে এবং ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। এরপর আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ তা'আলা রাব্বুল আলামীন নাজিল হবেন। দোজখ তাঁর বাম দিকে হবে এবং জান্নাত ডান দিকে। দোজখের ভয়াবহ অবস্থা দেখে জমিনের অধিবাসীরা পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু জমিনের যে প্রান্তেই পৌঁছবে, সেখানেই দেখবে ফেরেশতাগণের সাতটি কাতার বর্তমান রয়েছে তখন বাধ্য হয়ে লোকেরা যেখান থেকে পলায়ন করেছে সেখানেই ফিরে আসবে। আলোচ্য আয়াতে সে ভয়াবহ দিনের কথাই বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এতদ্ব্যতীত সূরায়ে ওয়াল ফাজরে এ সম্পর্কে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে– "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى" "এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন এবং ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবেন, সেদিন দোজখকে আনা হবে এবং সেদিন মানুষ (সত্য) উপলব্ধি করবে, কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে?"

এমনিভাবে সূরা আর রাহমানে সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা এভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে।

"يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ".

'হে জিন ও মানবজাতি! যদি তোমরা আসমান ও জমিনের সীমা অতিক্রম করতে পার তবে তা কর কিন্তু তোমরা তা কখনো করতে পারবে না শক্তি ব্যতীত, [আর সে শক্তি তোমাদের নেই]।

অর্থাৎ আমার পৃথিবীতে থেকে আমার যাবতীয় নিয়ামত ভোগ করে আমার অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ থাকার কোনো যুক্তি নেই। যদি তোমরা আমার দাওয়াত অমান্য করতেই চাও তবে আসমানে ও জমিনের এ চৌহদ্দি হতে বেরিয়ে যাও, আর তা কখনো তোমরা পারবে না।

"وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আয়াতের বক্তব্যটি হতে পারে হযরত মূসা (আ.)-এর অথবা সে মু'মিন ব্যক্তির বক্তব্যের শেষাংশ যেটা তার পূর্বেকার ভাষণের পরিপূরক। বলা হচ্ছে–

হে মিশরবাসী! ইতঃপূর্বে তোমাদের নিকট হযরত ইউসুফ (আ.) যখন প্রকাশ্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। তাঁর ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই স্বীকার কর যে, তিনি অতি পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি তদানীন্তন বাদশাহের স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে তোমাদেরকে ক্রমাগত সাত বৎসর কালীন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হতে মুক্তি দিয়েছেন, তোমাদের গোটা জাতিই একথা মাথা পেতে স্বীকার করে যে, তার শাসনামল অপেক্ষা অধিক সুবিচার, ইনসাফ ও মঙ্গলময় অবস্থা মিশরের ভাগ্যে আর কখনো সম্ভব হয়নি। আফসোস! তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যপূর্ণ গুণাবলি জেনে ও মেনে নেওয়ার পরও তোমরা তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর উপর ঈমান আনলে না। তার পরলোক গমনের কারণে সে তোমরাই বললে– ভালোই হলো, সকল ঝামেলা মিটে গেল, এখন আর কোনো রাসূল আসবে না, রাসূলদের উপদেশ বর্ষণে আর বিরক্ত হতে হবে না।

আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (র.) হযরত শাহ সাহেব (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মিশরবাসী হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যখন মিশরের শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন তারা বলে, হযরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন অত্যন্ত বরকতময় ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যতে এমন মোবারক সত্তা হয়তো আর কখনো আসবেন না। জীবদ্দশায় তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে আর এখন তাঁর জন্য আক্ষেপ করছে, অর্থাৎ যখন নিয়ামত তাদের কাছে ছিল তখন তারা তাঁর কদর করেনি। –[ফাওয়াদে ওসমানী, পৃ– ৬১০]

"وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ الخ" -এর মধ্যে يُوْسُفُ -এর দ্বারা কাউকে বুঝানো হয়েছে? উক্ত আয়াতে ইউসুফের দ্বারা কোন ইউসুফকে বুঝানো হয়েছে– এতদসম্পর্কিত দু'টি অভিমত পাওয়া যায়–

১. আল্লামা জামাখশরী (র.) বলেছেন যে, তিনি হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর ঔরষজাত পুত্র ইউসুফ নন; বরং তিনি হলেন ইউসুফ ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব। অথাৎ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রপৌত্র এবং ইউসুফ (আ.)-এর দৌহিত্র। তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে প্রায় বিশ বৎসর পর্যন্ত হেদায়েত করেছিলেন।

২. জমহুর মুফাসসিরের মতে উল্লিখিত ইউসুফ হলেন হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর ঔরষজাত পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)। সূরা ইউসুফে যার বিস্তারিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগের ফেরাউন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন এক না ভিন্ন ভিন্ন? হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগে যেই ফেরআউন মিশরে রাজত্ব করত সেই একই ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর যুগেও ছিল কি-না? এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং–

ক. জমহুরের মতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগের ফেরাউন ও হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউন একজন ছিল না; বরং হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে অপর এক ফেরাউন ছিল। ইতিহাস বলছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগের ফেরাউনের নাম ছিল ওলীদ ইবনে মুসআব (وَلِيْدُ بْنُ مُصْعَبٍ) অপরদিকে হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের ফেরাউনের নাম ছিল আর রাইয়ান (اَلرَّيَّانُ)। –[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٥. اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُعْجِزَاتِهٖ مُبْتَدَأٌ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ بُرْهَانٍ اَتٰهُمْ ط كَبُرَ جِدَالُهُمْ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِضْلَالِهِمْ يَطْبَعُ يَخْتِمُ اللّٰهُ بِالضَّلَالِ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ بِتَنْوِيْنِ قَلْبٍ وَدُوْنَهٗ وَمَتٰى تَكَبَّرَ الْقَلْبُ تَكَبَّرَ صَاحِبُهٗ وَبِالْعَكْسِ وَكُلٌّ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ لِعُمُوْمِ الضَّلَالِ جَمِيْعَ الْقَلْبِ لَا لِعُمُوْمِ الْقُلُوْبِ.

৩৫. যারা বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহর নিদর্শনাবলির ব্যাপারে- তাঁর মোজেজাসমূহের ব্যাপারে, এ আয়াতাংশ মুবতাদা। বিনা দলিল-প্রমাণে তাদের নিকট না থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত অপ্রিয় তাদের এই ঝগড়া, এটা মুবতাদার খবর- আল্লাহ তা'আলার নিকট (অপ্রিয়) এবং ঈমানদারদের নিকট ও তদ্রূপ অর্থাৎ যদ্রূপ এদেরকে গোমরাহ করেছেন মোহর করে দেন- মোহরাঙ্কিত করে দেন আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীর প্রত্যেকটি অহঙ্কারী উদ্ধত প্রকৃতির অন্তরে قَلْبِ শব্দটি তানভীন যোগে এবং তানভীন ব্যতীত উভয় ভাবেই পড়া যায়। আর যখন অন্তর অহঙ্কারী হয়ে পড়ে তখন অন্তর ওয়ালাও অহঙ্কারী হয়ে যায়। আবার অন্তর ওয়ালা [ব্যক্তি] যখন অহঙ্কারী হয়ে পড়ে তখন তার অন্তরও অহঙ্কারী হয়ে যায়। উভয় কেরাত অনুসারেই كُلِّ শব্দটি সমস্ত অন্তরে গোমরাহীর ব্যাপ্তি বুঝানোর জন্য হয়েছে। সবলোকের অন্তরই গোমরাহ এটা বুঝানোর জন্য হয়নি।

٣٦. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا بِنَاءً عَالِيًا لَّعَلِّىْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ.

৩৬. আর ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি কর সুউচ্চ প্রাসাদ সম্ভবতঃ আমি পথে পৌঁছে যেতে পারি।

٣٧. اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ طُرُقَهَا الْمُوْصِلَةَ اِلَيْهَا فَاَطَّلِعَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلٰى اَبْلُغُ وَبِالنَّصْبِ جَوَابًا لِابْنِ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ اَىْ مُوْسٰى كَاذِبًا ط فِىْ اَنَّ لَهٗ اِلٰهًا غَيْرِىْ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذٰلِكَ تَمْوِيْهًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ط طَرِيْقِ الْهُدٰى بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ خَسَارٍ.

৩৭. আসমানের পথে- অর্থাৎ ঐ পথসমূহে যেগুলো আসমানে পৌঁছে দেয়। অতঃপর তাকিয়ে দেখতে পারি اَطَّلِعَ শব্দটি اَبْلُغُ-এর উপর আত্ফ হয়ে মারফূ ও হতে পারে। আবার اِبْنِ নির্মাণ কর [এ আদেশাজ্ঞা] এর جَوَابٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ ও হতে পারে- হযরত মূসা (আ.)-এর মা'বুদের দিকে আর নিঃসন্দেহে আমি তাকে মনে করি- অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে মিথ্যাবাদী এ ব্যাপারে যে, আমি ব্যতীত ও [নাকি]তার [অন্য একজন] মাবুদ রয়েছে। ফেরাউন তার অনুসারীদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য এরূপ বলেছিল। আর এ ভাবেই ফেরাউনকে তার অপকর্মসমূহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দেখানো হলো এবং তাকে সঠিক-সরল পথ হতে বিরত রাখা হলো। (অর্থাৎ) হিদায়েতের পথ হতে [صُدَّ শব্দটির] ص অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট হতে পারে তেমনি পেশবিশিষ্টও হতে পারে। আর ফেরাউনের সমস্ত ষড়যন্ত্র (তার নিজের) ধ্বংসের আয়োজনেই ব্যয়িত হলো [تَبَابٌ-এর অর্থ] ক্ষতি বা ধ্বংস।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

"اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ" বাক্যাংশের মহল্লে ইরাব কি? : اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ الخ পূর্ববর্তী শব্দ مُسْرِفٌ হতে بَدْل হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع তথা مَرْفُوْع-এর মহল্লে রয়েছে।

তবে এখানে প্রশ্ন জাগে যে, مُسْرِفٌ হলো (একবচন) অথচ "اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ" হলো বহুবচন। সুতরাং একবচন হতে বহুবচন কিভাবে بَدْل হতে পারে?

এর জবাবে বলা হবে, مُسْرِفٌ শব্দটি যদিও শব্দের দিক বিবেচনায় একবচন কিন্তু এখানে অর্থের দৃষ্টিতে বহুবচন হয়েছে। অর্থাৎ مُسْرِف দ্বারা প্রত্যেক مُسْرِفٌ কেই বুঝানো হয়েছে। এ বিচারে তা হতে বহুবচনের শব্দ بَدْل হওয়া জায়েজ হয়েছে।

كَبُرَ ফে'লের ফায়েল কে? مَقْتًا মানসূব হওয়ার কারণ কি? : আল্লাহর বাণী- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ الخ -এর মধ্যে كَبُرَ -এর ফায়েল হলো পূর্বোক্ত আয়াতাংশের ভাবার্থ তথা "اَلْجِدَالُ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ" (বিনা প্রমাণে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া।)

আর مَقْتًا শব্দটি তামঈয হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। সুতরাং বাক্যটির মূলরূপ হবে- "كَبُرَ جِدَالُ الْمُشْرِكِيْنَ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ مَقْتًا"

"عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ" আয়াতে قَلْب-এর বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহর বাণী- "كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ الخ"-এর قَلْب শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. হযরত আমর ইবনে যাকওয়ান (রা.) قَلْب শব্দটিকে তানবীনের সাথে পড়েছেন। এ পরিস্থিতিতে جَبَّارٍ ও مُتَكَبِّرٍ শব্দদ্বয় قَلْب -এর সিফাত হবে। অর্থ হবে- "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দাম্ভিক ও আত্মাভিমানী অন্তরে গোমরাহীর মোহর মেরে দেন।"

বস্তুত উল্লিখিত কেরাতদ্বয়ের পার্থক্যের কারণে আয়াতের অর্থের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) লিখেছেন যে, কলবের অধিকারী তথা ব্যক্তি দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হলে অনিবার্যভাবে কলব ও দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হবে। আবার কলব অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হলে স্বভাবতঃই কলবের অধিকারী তার অনুসারী হয়ে পড়ে। কাজেই কলবের অধিকারী (ব্যক্তি) অহঙ্কারী হওয়া আর কলব অহঙ্কারী হওয়া একই কথা।

২. জমহুর ক্বারীগণ قَلْب শব্দটিকে তানবীন ব্যতীত যের যোগে পড়েছেন। অর্থাৎ এর পরে অথবা পূর্বে একটি শব্দ উহ্য মেনেছেন। তবে এমনিতে قَلْب কে مُتَكَبِّر -এর দিকে اِضَافَتْ করেছেন। মূলত বাক্যটি এরূপ হবে- "عَلٰى كُلِّ قَلْبٍ شَخْصٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ" অথবা "كُلِّ ذِيْ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ الخ" ইমাম জামাখশারী (র.) দ্বিতীয় তারকীবটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দাম্ভিক ও ঔদ্ধত্য ব্যক্তির অন্তরে গোমরাহীর মোহর অঙ্কন করে দেন।

فَاَطَّلِعَ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত : জালালাইন দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) উক্ত فَاَطَّلِعَ শব্দের মধ্যে দুটি কেরাতের উল্লেখ করেছেন-

১. فَاَطَّلِعُ শব্দটি اَبْلُغُ-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হবে।

২. فَاَطَّلِعَ শব্দটি اِبْنِ আমরের সীগাহ-এর জবাব হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। অর্থাৎ এখানে فَاَطَّلِعَ -এর فَا -এর পরে একটি اَنْ উহ্য থেকে اَطَّلِعَ কে نَصْب প্রদান করেছে। যেমন নিম্নের শ্লোকটি লক্ষ্যণীয়-

يَا نَاقُ سِيْرِيْ عَنَقًا فَسِيْحًا * اِلٰى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيْحَا -

এখানে "فَنَسْتَرِيْحَا" শব্দটি سِيْرِيْ শব্দের জবাব হওয়ার কারণে তার فَا -এর পরে একটি اَنْ উহ্য থেকে এর শেষাক্ষরে নসব প্রদান করেছে। -[জামাল]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْاَسْبَابُ - اَلصَّرْحُ - اَلْمَقْتُ শব্দাবলির অর্থ :

ক. আবূ সালেহ (র.) বলেছেন- "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ" -এর অর্থ হলো- "طُرُقَ السَّمٰوٰتِ" অর্থাৎ আসমানের পথসমূহ।

খ. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইমাম জুহরী (র.) এর মতে- "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ" -এর অর্থ হলো "اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ" অর্থাৎ আকাশমণ্ডলের দ্বারসমূহ। আগত শ্লোকটি লক্ষ্যণীয়- وَمَنْ هَابَ اَسْبَابَ الْمَنَايَا يَنَلْنَهُ * وَلَوْ رَامَ اَسْبَابَ السَّمَاءِ بِسُلَّمٍ سَلَّمَ এখানে "اَسْبَابَ السَّمَاءِ" -এর দ্বারা "اَبْوَابَ السَّمَاءِ" কে বুঝানো হয়েছে।

গ. কেউ কেউ বলেছেন- "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ" -এর অর্থ হলো সেসব উপাদান যা দ্বারা আসমান তৈরি করা হয়েছে।

اَلصَّرْحُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- اَلظَّهْرُ সুতরাং صَرْحُ الشَّيْءِ -এর অর্থ হবে ظَهْرُ الشَّيْءِ বা বস্তুর প্রকাশ্য অংশ। তবে পারিভাষিক অর্থে সামান্য মতানৈক্য বিদ্যমান।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এর আভিধানিক অর্থ হলো- রাজ প্রাসাদ।

খ. কারো কারো মতে, এর অর্থ হলো- সুউচ্চ ইমারত।

গ. একদল মত প্রকাশ করেছেন, এর অর্থ হলো- ঘরের ছাদ। তবে এখানে ইমারতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلْمَقْتُ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে-

ক. اَلْغَضَبُ তথা ক্রোধ বা ঘৃণা।

খ. নাফরমানি, পাপ।

গ. অপমানকর অবস্থা ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ ...... اٰمَنُوْا" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহর নিদর্শনাদির ব্যাপারে যারা বিবাদে লিপ্ত হয় তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বিচারে পথভ্রষ্ট করা হয় ঐ সকল লোকদেরকে যাদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিন ধরনের ত্রুটি বর্তমান থাকে।

১. তারা নিজেদের দুষ্কৃতিতে সীমালঙ্ঘন করে যায়। গুনাহের কাজগুলো তাদের এতই ভালো লাগতো যে, নীতি সংশোধনের কোনো দাওয়াত ও প্রচেষ্টাকেই কবুল করতে তারা আদৌ প্রস্তুত হতো না।

২. আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ সম্পর্কে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণার পরিবর্তে বাঁকা-বাক্য ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করতে চায়। অথচ এ বিতর্কের ভিত্তি কোনো বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন দলিল প্রমাণের উপর নয়; না কোনো আসমানি কিতাবের সনদের উপর; বরং প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত জিদ ও হঠকারিতাই হলো তার একমাত্র ভিত্তি।

৩. নবী-রাসূল সম্পর্কে তাদের আচরণ হবে শঙ্কা ও সন্দেহপূর্ণ। আল্লাহর নবী তাদের সামনে যত অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়েই আসুক না কেন তারা চিরাচরিত নিয়মেই তাঁদের নবুয়তে সংশয় পোষণ করে। আর আল্লাহর একত্ববাদ ও আখেরাত সম্বলিত যেসব তত্ত্ব ও তথ্য তাঁরা পেশ করে থাকেন তার প্রতি তারা সদা সন্দেহ প্রবণ হয়ে থাকে।

মূলত যখন মানব সমাজের কোনো অংশের লোকদের মধ্যে এ তিন প্রকারের দোষ-ত্রুটি সমবেত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গোমরাহীর গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করেন। সে স্তর হতে কোনো শক্তিই তাদেরকে উত্তোলন করে আনতে সক্ষম হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াত হতে গৃহীত মাসআলাসমূহ : আলোচ্য আয়াত হতে ইমাম রাযী (র.) তিনটি মাসআলা বের করেছেন-

১. যারা বিনা সনদে বিনা দলিলে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে ঝগড়া করে- আলোচ্য আয়াতে তাদের কুৎসা রচনা করা হয়েছে। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, দলিল-প্রমাণ বা সুস্পষ্ট সনদের ভিত্তিতে তর্ক-বিতর্ক করা উত্তম ও সত্য পন্থা। তাতে অন্ধ আনুগত্যের অবসান করা হয়।

২. আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো কোনো বান্দার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকেন; কিন্তু এ সিফাতটি আল্লাহ তা'আলার শানে ব্যাখ্যাবহ। যেমন- غَضَبْ - حَيَاء ও تَعَجُّبْ - (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

কোনো কোনো বান্দার প্রতি এ ঘৃণা যেমন আল্লাহর মাঝে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি তা সৃষ্টি হয়েছে ঈমানদার লোকদের মাঝে। -[কাবীর]

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ" "এভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।"

আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে আল্লামা কুরতুবী (র.) তাঁর সুবিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ কুরতুবীতে বলেছেন- ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন হযরত মূসা (আ.) ও ঈমানদার ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, তেমনি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহঙ্কারী ও স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন, ফলে সে আলোর পথ দেখতে পায় না, না সে সত্যকে গ্রহণ করে।

আয়াতে مُتَكَبِّرٍ ও جَبَّارٍ শব্দদ্বয় قَلْبِ -এর صِفَةٌ বা বিশেষণ হয়েছে। কারণ সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে قَلْبٌ বা অন্তর। অন্তর হতেই ভাল-মন্দ কর্মের উদ্ভব ঘটে। এ কারণেই নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

"اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ".

মানুষের দেহে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহই নষ্ট হয়ে যায়। খবরদার (তোমাদের জেনে রাখা দরকার) তা হলো কলব বা অন্তর। -[কুরতুবী]

মুফাস্সির আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন- যার অন্তরে অহঙ্কার ও স্বৈরতন্ত্রের বীজ রোপিত রয়েছে তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর অঙ্কিত করেন ফলে সে ন্যায় ও সত্যকে চিনে না, না অন্যায় ও অসত্যকে ঘৃণা করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ" "এভাবেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহঙ্কারী ও স্বৈরাচারীর অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।" হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, স্বৈরাচরীদের নিদর্শন হলো অন্যায়ভাবে হত্যা করা। -[ইবনে কাছীর]

"وَقَالَ فِرْعَوْنُ .... وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهُ كَاذِبًا" আয়াতের ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একজন মর্দে মু'মিনের উপদেশের উল্লেখ ছিল। এ উপদেশ ছিল অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। বুদ্ধিমান মাত্রেরই মনে এসব উপদেশ দাগ কাটে। ফেরাউন ঐ মর্দে মু'মিনের যুক্তিপূর্ণ কথার কোনো প্রকার জবাব প্রদানে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হয়, তাই সে অসহায় হয়ে পড়ে,তখন সে তার ফেরাউনী ভাব প্রকাশ করতঃ প্রধানমন্ত্রী হামানকে একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দেয়। আলোচ্য আয়াতে ফেরাউনের এ নির্দেশেরই উল্লেখ রয়েছে।

বিশ্লেষণ : উক্ত আয়াতে ফেরাউনের দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের বর্ণনা করা হয়েছে। ফেরাউন মন্ত্রী হামানকে বলেছে- আমার জন্য গগনস্পর্শী প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে করে আমি আকাশপথে ভ্রমণ করে আসমানের দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারি এবং মূসার প্রভুকে দেখতে পারি (اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ)। ফেরাউনের এ মন্তব্য দ্বারা তার মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হয়, সে এটাও জানে না যে, পৃথিবী থেকে আসমানের দূরত্ব কতখানি, এ ব্যাপারেও সে অজ্ঞাত যে, প্রাসাদ যত সুউচ্চই হোক না কেন, তার উপর আরোহণ করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। ফেরাউন এ-ও বলেছিল, অবশ্য আমি জানি মূসা মিথ্যাবাদী, আর সে যে সব কথা বলে তাও অসত্যের প্রলেপে বেষ্টিত। যেমন সে বলে, মহান আল্লাহ তাকে রাসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন, আমার মনে হয় এ কথাও অসত্য, শুধু তাই নয়; বরং তাঁর নবুয়তের দাবিই মিথ্যা, এতদ্ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক যে একজন বলে সে দাবি করে তার এ দাবিতেও সে মিথ্যাচারিতায় ভুগছে; আমিতো মনে করি না যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু আছে। -[নাউযুবিল্লাহে মিন যালিকা]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আত্ম বিস্মৃতিই ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হয় : মানুষ যখন কুকর্মে লিপ্ত হয় এবং অবশেষে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তার বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়, সে মন্দকেই উত্তম মনে করে, যা অশোভনীয়। ফেরাউনেরও এ একই অবস্থা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার সকল চক্রান্ত শুধু যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তা নয়; বরং তা তার ধ্বংসকেই নিশ্চিত করেছে এজন্যে কুরআনে মাজীদের অন্যত্র মু'মিনদের সতর্ক করে বলা হয়েছে–

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ .

"আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে বসেছে, পরিণামে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন, তারাই তো পাপাচারী।"

এ আত্মবিস্মৃতিই পথভ্রষ্টতার প্রথম সোপান, এরপর মানুষ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তখন সে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে তাই করতে পারে। প্রথমতঃ ভাল-মন্দের মাঝে সে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। এ অবস্থা কিছুদিন অব্যাহত থাকার পর সে মন্দকেই উত্তম মনে করে থাকে। এমনিভাবে অসত্যকে সত্য; অসুন্দরকে সুন্দর এবং যা অশোভনীয় তাকে শোভন মনে করে। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতাংশে ইরশাদ হয়েছে– "وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ"

অর্থাৎ, তার অন্যায় অনাচারের কারণে তাকে সরল পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তার যাবতীয় ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, পরিশেষে সে তার সমস্ত সৈন্য সামন্তসহ তাকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করা হয়।

এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি, সত্যদ্রোহীতা, সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সর্বদা ব্যর্থ-পরিণামই হয়। যখন কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি ধ্বংসের পথ বেছে নেয় আর সে পথকেই কল্যাণের পথ মনে করে, তাদের এ মনে করার কারণে অকল্যাণ কখনো কল্যাণে পরিণত হয় না; বরং তাদের জন্য তা সর্বনাশই ডেকে আনে।

আসমানে আরোহণ করার জন্য ফেরাউনের সেই আদিষ্ট ইমারত নির্মাণ করা হয়েছিল কিনা? ফেরাউন তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে এমন একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিল যার দ্বারা সে আসমানে আরোহণ করতঃ হযরত মূসা (আ.)-এর প্রভুকে তাকিয়ে দেখতে পারে। কিন্তু সত্যি-সত্যিই ফেরাউনের জন্য অনুরূপ কোনো ইমারত স্থাপন করা হয়েছিল কি-না এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

ক. একদল মুফাসসিরের মতে অনুরূপ সুউচ্চ একটি ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছেই তা ধ্বসে পড়ে।

মুহাক্কিকগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে উক্ত ইমারত ধ্বসে পড়ার জন্য আল্লাহর আজাব আসা আবশ্যক ছিল না; বরং যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হলো, প্রত্যেক ইমারতের উচ্চতাকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ভিত্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ ইমারত এমন উঁচুতে গিয়ে ধ্বসে পড়েছিল যখন আর সে ভিত্তি তাকে বরদাশত করতে পারছিল না। পরন্তু এতেও ফেরাউন ও হামানের নির্বুদ্ধিতাই প্রমাণিত হয়।

খ. একদল মুফাস্সিরের মতে ফেরাউনের জন্য উক্ত ইমারত নির্মাণ করা হয়নি। কেননা মূলতঃ ফেরাউন নিজেও জানত যে, এমন ইমারত তৈরি করা সম্ভব নয়– যা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সে শুধু তার অনুসারীদেরকে বোকা বানানোর জন্য এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই সে এটা বলেছে।

সুতরাং কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারাই সাব্যস্ত হয়না যে, ফেরাউনের নির্দেশিত অনুরূপ ইমারত তৈরি করা হয়েছিল।

হযরত মূসা (আ.) কি দাবি করেছিলেন যে, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন? মূলত হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট এমন দাবি করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশে রয়েছেন; বরং ফেরাউন নিজেই অনুরূপ একটি ধারণার বশীভূত হয়ে মন্ত্রী হামানের নিকট আসমানে উঠে হযরত মূসা (আ.)-এর রবকে তাকিয়ে দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল। আর হযরত মূসা

Free @ www.eilm.weebly.com

(আ.) তো আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করেছেন এবং তাদের উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে স্বীয় বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মূসা (আ.) যে সব বক্তব্য পেশ করেছেন তা হতে নিম্নে কতিপয় উদ্ধৃতি দেওয়া হলো–

১. "رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রব।

এটা সত্য যে, ফেরাউন আসমানে আল্লাহর সন্ধানে যেতে চেয়েছে– এ হতে দলিল উপস্থাপন করতঃ কতিপয় বাতিল পন্থিরা আল্লাহ তা'আলা আসমানে রয়েছেন এবং তথায় অবস্থান করতঃ পৃথিবী পরিচালনা করছেন বলে দাবি করে থাকে। অথচ হকপন্থি তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্মিলিত অভিমত হলো আল্লাহ তা'আলা নিরাকার, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান-বিরাজমান। তিনি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে গণ্ডিভূত নন। আর ফেরাউনের উক্ত বাতিল উক্তির দ্বারা কেবল বাতিলপন্থিরাই দলিল পেশ করতে পারে।

ফেরাউনের উপরিউক্ত উক্তি– "اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى" দ্বারা মুশাববেহীন ও অপরাপর বাতিল মতবাদীরা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করে থাকে–

ক. হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তি– "رَبُّ السَّمٰوٰتِ" হতে আল্লাহ আসমানে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

খ. ফেরাউন অবশ্যই হযরত মূসা (আ.) হতে অবগত লাভ করে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর খোদা আসমানে রয়েছেন।

গ. সাধারণত আস্তিকদের ধারণা হলো আল্লাহ তা'আলা আসমানে অবস্থান করেন। ফেরাউন ও এই একই আকিদায় বিশ্বাসী ছিল।

২. رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى – আমাদের রব তো তিনি যিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের জীবন-যাপনের দিক নির্দেশনা দান করেছেন। –[সূরায়ে তোয়া-হা]

৩. رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا (আমার রব তিনি) যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব, মাশরিক-মাগরিব ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুরও রব তিনি। –[সূরায়ে শু'আরা]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٨. وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ بِاِثْبَاتِ الْيَاءِ وَحَذْفِهَا اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ تَقَدَّمَ .

৩৮. আর ঈমানদার ব্যক্তিটি বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর। (اِتَّبِعُوْنِ-এর শেষে) ى বহাল রেখে এবং উহ্য রেখে দুভাবেই পড়া যায়। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেব। এটার তাফসীর পূর্বে করা হয়েছে।

٣٩. يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز تَمَتُّعٌ يَزُوْلُ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ .

৩৯. হে আমার জাতি! এ পার্থিব জীবন তো শুধু কিছুটা উপভোগের বস্তু মাত্র, অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতই হলো স্থায়ী আবাসস্থল।

٤٠. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْخَاءِ وَبِالْعَكْسِ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ رِزْقًا وَاسِعًا بِلَا تَبْعَةٍ .

৪০. যে কেউ মন্দ-গর্হিত কাজ করবে সে তার সমান প্রতিফল পাবে। আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঈমানদার অবস্থায় যে কেউ নেক আমল করবে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। يَدْخُلُوْنَ শব্দটির ى তে পেশ যোগে এবং خ টা যবর যোগে হবে। আবার এর বিপরীতে ى তে যবর দিয়ে এবং خ তে পেশ দিয়েও পড়া যেতে পারে। বেহেশতে তাদেরকে অগণিত রিজিক প্রদান করা হবে। বিপুল পরিমাণ রিজিক প্রদান করা হবে, কোনোরূপ কষ্ট ও পরিশ্রম ব্যতীত।

٤١. وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ .

৪১. আর হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে নাজাতের দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ দোজখের দিকে।

٤٢. تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَالِبِ عَلٰى اَمْرِهٖ الْغَفَّارِ لِمَنْ تَابَ .

৪২. তোমরা আমাকে আহ্বান করছো আমি যেন আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করি আর তাঁর সঙ্গে এমন কিছুকে শরিক করি যার ব্যাপারে কোনো জ্ঞান আমার নেই, অথচ আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি মহা পরাক্রমশালী– যিনি তাঁর সর্ব বিষয়ে বিজয়ী অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁর জন্য যে তওবা করে। তাঁর প্রতি রুজু করে।

٤٣. لَا جَرَمَ حَقًّا اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لِاَعْبُدَهٗ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا اَيْ اِسْتِجَابَةُ دَعْوَةٍ وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ مَرْجِعَنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ الْكٰفِرِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ .

৪৩. আর এ কথা নিশ্চিত যে, স্বতঃসিদ্ধ তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাকছো তার ইবাদত করার জন্য দুনিয়াতে কোথাও কোনো প্রয়োজনে সে আহুত হওয়ার যোগ্য নয়, অর্থাৎ কবুল হওয়ার মতো আর না আখেরাতে– আর আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল গন্তব্যস্থল– আল্লাহর দিকে। নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারীরা কাফেররা তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٤. فَسَتَذْكُرُونَ إِذَا عَايَنْتُمُ الْعَذَابَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ط وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ قَالَ ذٰلِكَ لِمَا تَوْعَدُوْهُ بِمُخَالَفَتِهِ دِيْنَهُمْ.

৪৪. অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে– যখন তোমরা স্বচক্ষে আজাব প্রত্যক্ষ করবে– আমি তোমাদেরকে যা বলছি। আর আমার কাজ আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি এ কথা তখন বলেন, যখন তাদের দীনের বিরোধিতা করার কারণে তারা তাকে ভীতি-প্রদর্শন করেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

"يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ" উক্তিটির প্রবক্তা এবং "اِتَّبِعُوْنِىْ"-এর মধ্যকার কেরাত : "يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ" উক্তিটি কার– এ ব্যাপারে হযরত মুফাস্সিরীনে কেরামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে এটা ফেরাউনের বংশীয় মুমিন ব্যক্তির উক্তি। আলোচনার ধারাবাহিকতার আলোকে এ মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

২. কেউ কেউ বলেছেন, এটা হযরত মূসা (আ.)-এর উক্তি। –[বায়যাবী, সাবী]

اِتَّبِعُوْنِىْ-এর মধ্যে দুটি কেরাত প্রসিদ্ধ–

১. ইবনে কাসীর, ইয়াকুব ও সাহল (র.) প্রমুখ ক্বারীগণের মতে– اِتَّبِعُوْنِىْ-এর ى অক্ষরটি বলবৎ রেখে।

২. اِتَّبِعُوْنِىْ-এর শেষাংশ হতে ى-কে বিলুপ্ত করে।

اَلرَّشَادِ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : اَلرَّشَادِ শব্দটির মধ্যে দু ধরনের কেরাত রয়েছে–

১. জমহুরের মতে– اَلرَّشَادِ শব্দের ش অক্ষরটি তাশদীদবিহীনভাবে পড়া।

২. হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ও ইমাম জামাখশরী (র.) প্রমুখ কারীগণ اَلرَّشَّادِ-এর ش অক্ষরটিকে তাশদীদ যুক্ত করে পড়েছেন।

"يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ اَهْدِكُمْ" আয়াতাংশে اَهْدِكُمْ-এর মহল্লে ইরাব : আল্লাহর বাণী– "يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِىْ اَهْدِكُمْ"-এর মধ্যে اَهْدِكُمْ শব্দটি اِتَّبِعُوْنِىْ আমর এর জবাব হওয়ার কারণে জযমের মহল্লে অর্থাৎ مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে। মূলত শব্দটি ছিল– "اَهْدِيْكُمْ" জযমের মহল্লে হওয়ার কারণে ى অক্ষরটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

جَرَمَ শব্দটির অর্থ কি? এর মহল্লে ইরাব কি? : "لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ"-এর মধ্যে لَا جَرَمَ শব্দটি فِعْل مَاضِىْ-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো حَقَّ এবং وَجَبَ অর্থাৎ এটা বাস্তব ও সতঃসিদ্ধ তথা আপনা-আপনিই সাব্যস্ত।

لَاجَرَمَ-এর ফায়েল হলো এটার পরবর্তী বাক্যের বিশ্লেষণ। অর্থাৎ–

"حَقَّ وَ وَجَبَ دَعْوَتُكُمْ لِىْ اِلٰى مَنْ لَا اِسْتِجَابَةَ لِدَعْوَتِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ" "তোমাদের দাওয়াত আমার জন্য এমন সত্তার দিকে সাব্যস্ত হয়েছে ইহ-পরকালের কোথাও যার দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

নাহুশাস্ত্র বিশারদ ফাররা (র.) বলেছেন যে, لَا جَرَمَ শব্দটি لَابُدَّ ও لَا مُحَالَةَ-এর ন্যায় একটি শব্দ; কিন্তু এটা বিকৃত হয়ে কসমের অর্থে হয়েছে এবং পরবর্তীতে حَقَّ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, جَرَمَ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– قَطْعٌ (কর্তন ও বিচ্ছিন্ন করা) সুতরাং لَا جَرَمَ-এর অর্থ হবে "لَا قَطْعَ" যা ভাবার্থে গিয়ে وَجَبَ-এর অর্থ প্রকাশ করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ ...... بِغَيْرِ حِسَابٍ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** ইত্যকার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন তার জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল- "وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ" "আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথই বাতলাচ্ছি।" তার জবাবে মু'মিন লোকটি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন- ফেরাউনের কথা মিথ্যা, তার প্রদর্শিত পথ সর্বনাশ ডেকে আনবে : বরং তোমরা আমার প্রদর্শিত পথে চল। আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে নিয়ে চলব, মুক্তির পথের সন্ধান দেব। ফেরাউনের পথে নয়: বরং আমার প্রদর্শিত পথেই তোমরা প্রকৃত সুপথ এবং সত্যিকার কল্যাণ লাভ করবে।

আলোচ্যাংশে سَبِيْلَ الرَّشَادِ -এর অর্থ হলো কল্যাণ ও ছওয়াবের পথ এবং এমন পথ যা কল্যাণ ও ছওয়াবের প্রতি পৌঁছায়। رَشَادٌ শব্দটি غَىٌّ -এর বিপরীত। সুতরাং এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরাউন ও তার সমর্থকরা যে পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হলো غَىٌّ বা ভ্রষ্ট ও বাতিল পথ।

তিনি আরো বললেন- "হে আমার জাতি! তোমরা এই নশ্বর জগতের মায়ায় ডুবে থেকো না। দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ, স্বাদ-আহলাদ দু'দিনের মাত্র। মৃত্যুর আক্রমণ এর উপর যবনিকা টেনে দেবে। পরলোকের জীবনই স্থায়ী জীবন। ইহলোকে থাকা অবস্থায় পরলোকের স্থায়ী বসবাসের উত্তম আয়োজন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় সেথায় চরম কষ্ট ভোগ করতে হবে।

স্মরণ রেখো, আখেরাতের সুখ-সুবিধায় আমলের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা বেশি। মন্দ এবং অসৎ কাজ করলে অবশ্যই তদনুরূপ শাস্তি এবং প্রতিফল দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে নর-নারী নির্বিশেষে যে কেউ নেককাজ করবে সে বেহেশতের স্থায়ী নিবাসে প্রবেশ করবে। সে অগণিত স্বর্গীয় আস্বাদন ভোগ করতে থাকবে।

আল্লাহর বাণী- "يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ" -এর দুটি অর্থ হতে পারে-

১. তাদেরকে এমন রিজিক দেওয়া হবে যা গুণে-মানে ও পরিমাপে উভয়দিক দিয়েই তাদের ধারণার বহির্ভূত হবে। কোনো দিন তাদের কল্পনায়ও আসে না যে, তাদের সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসিতার জন্য এরূপ জীবনোপকরণ প্রদান করবে।

২. জান্নাতিদেরকে অফুরন্ত রিজিক প্রদান করা হবে। এ দ্বারা তাদের জীবনোপকরণের প্রাচুর্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মোটকথা, খাওয়া-পরা ও ভোগ-বিলাসিতা চরম মাত্রায় পৌঁছবে।

يٰقَوْمِ مَالِىْٓ اَدْعُوْكُمْ ..... اَصْحٰبُ النَّارِ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : উক্ত মু'মিন ব্যক্তিটি তার কওম তথা ফেরাউন ও তার ভক্তদেরকে লক্ষ্য করে আরো বলল- হে আমার জাতি! এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তো তোমাদিগকে তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণের পথে আহবান করছি। অথচ তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে ডাকছ। আমি তোমাদিগকে আল্লাহর আজাব ও গজব হতে বাঁচাতে চেয়েছি অথচ তোমরা আমাকে সে দিকেই ঠেলে দিতে চাচ্ছ।

তোমরা তো আমাকে কুফর-শিরকে লিপ্ত হতে বলছ। আল্লাহকে অস্বীকার করতে বলছ; আমি যাকে জানিনা, যার বৈধতার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই তাকে আল্লাহর শরিক করতে এবং শিরক করতে তোমরা আমাকে প্রলুব্ধ করছ। এমনভাবে আল্লাহর রোষে ফেলে আমার সর্বনাশ করতে চাচ্ছ। অথচ আমি সর্বশক্তিমান মার্জনাপ্রিয় আল্লাহর প্রতি তোমাদেরকে ডাকছি। যাতে তোমরা তার রোষের কবল হতে মুক্তি পাও এবং তার অনন্ত ক্ষমা ও মার্জনা পাও, আমি সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

"لَا جَرَمَ اَنَّمَا ..... فِى الْاٰخِرَةِ" আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে :

১. তাদেরকে তো লোকেরা জবরদস্তি করে মাবুদ বানিয়েছে। নচেৎ তারা নিজেরা না এ দুনিয়ায় মাবুদ হওয়ার দাবি করে, না আখেরাতে তারা এ দাবি নিয়ে উঠবে যে, আমরাও তো মাবুদ ছিলাম, তোমরা আমাদেরকে মান্য করো নি কেন? তার কৈফিয়ত দাও।

২. তাদেরকে ডাকার মধ্যে না এ দুনিয়ায় কোনো ফায়িদা রয়েছে, না পরকালে এর বদৌলতে কোনো কল্যাণ লাভ করা যাবে। কেননা, এদের তো কোনো ক্ষমতা-ইখতিয়ার নেই। কাজেই তাদের ডাকলে কোনো ফল হবে না।

৩. "যাদের দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করছ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কোনো আহ্বান নেই"– এর অর্থ হলো, তাদের প্রভুত্ব মেনে নেওয়ার জন্য দুনিয়ার মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার অধিকার না দুনিয়ায় তাদের আছে, আর না আখেরাতে থাকবে।

আর আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার দিকেই ফিরতে হবে। সীমালঙ্ঘনকারী লোক জাহান্নামী হবে। অর্থাৎ এ দুনিয়ায় যারা বাড়াবাড়ি করে, সীমালঙ্ঘন করে তিনি তাদেরকে নিশ্চয় জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরূপ লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের আসল অধিবাসী।

আলোচ্যাংশে 'সীমালঙ্ঘন করার' অর্থ হলো– সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে মাবুদ মেনে নেয়; অথবা– নিজেই মাবুদ হয়ে বসে, খোদাদ্রোহী হয়ে দুনিয়ায় স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার আচরণ অবলম্বন করে এবং পরে নিজের সত্তার উপর, আল্লাহর সৃষ্ট জীব ও মানুষের উপর, এমনিভাবে দুনিয়ার যেসব জিনিসের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের সকলের উপর জুলুম ও নিপীড়ন চালায়, সে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও ইনসাফের সমস্ত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে বাইরে চলে যায়।

"فَسَتَذْكُرُونَ مَآ اَقُوْلُ .... بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ" আয়াতের ব্যাখ্যা : মু'মিন লোকটি স্বীয় জাতিকে লক্ষ্য করে বলল– "হে আমার জাতি! আজ তোমরা আমায় গুরুত্ব দিচ্ছ না, আমার কথা তোমাদের ভালো লাগছে না। কিন্তু মনে রেখ– অদূর ভবিষ্যতে এমনও একদিন আসবে যেদিন তোমরা তোমাদের কর্মফল ভোগ করবে। তখন কিন্তু আমার কথা তোমাদের স্মরণ হবে। বলবে– দুনিয়ায় একটি লোকও আমাদেরকে অদ্যকার দুর্গতি ও কঠিন আজাব হতে রক্ষা করার জন্য কতই না প্রয়াস-প্রচেষ্টা করেছিল। হায়– আমরা যদি তখন তার কথা শুনতাম-মানতাম, তবে আজ আমাদেরকে এ শাস্তি, জাহান্নামের এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না। তখনকার অনুতাপ কিন্তু কোনো কাজেই আসবে না।

আমি তোমাদেরকে বুঝালাম, আমার কর্তব্য পালন করলাম, এখন তোমরা জান আর তোমাদের কর্ম জানে। আমি কিন্তু আমার বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম। তোমরা আমার উপর নির্যাতন করতে উদ্যত হও তো তিনিই আমার মদদ করবেন, সাহায্য করবেন। সকলের কীর্তিকলাপ তাঁর সম্মুখে সুস্পষ্ট, কারো কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। অতএব, যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করতঃ সকল সমস্যা সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভক্ত মু'মিনের কর্তব্য।

উক্ত বাক্যাংশ হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ কথাগুলো বলার সময় সেই মু'মিন ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, এ সত্য ভাষণের পরিণামে ফেরাউনের গোটা রাষ্ট্র শক্তিই প্রবল বিক্রমে তার উপর লেলিহান শিখার মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে ও কঠিন শাস্তি দেবে। তাকে শুধু তার সম্মান ও পদমর্যাদা হতে বঞ্চিত করা হবে না। তার জীবন হতেও তাকে বরখাস্ত করা হবে। কিন্তু এ সব জেনে বুঝেও সে কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেই নিজের কর্তব্য পালন করল। এ কঠিন মুহূর্তে সে এরূপ করাকেই নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করেছিল।

মা'আরিফুল কুরআনের গ্রন্থকার মুফতি শফী (র.) লেখেন– ফেরাউন বংশীয় মু'মিন লোকটি হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে– তার কওমকে উদ্দেশ্য করে যেই ভাষণ দিয়েছিল– এটা সেই উপদেশমূলক ভাষণের শেষাংশ। সুতরাং তিনি কওমের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, আজ তো তোমরা আমার কথা শুনছ না– মানছনা। কিন্তু যখন আজাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করবে তখন তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে। কিন্তু তখন স্মরণ করলে কোনো কাজ হবে না। দীর্ঘ ভাষণের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন তার ঈমান প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন আশঙ্কাবোধ করলেন যে, তারা তাঁর উপর চড়াও হতে পারে, এ জন্য বললেন, আমি আমার বিষয়াদি ও কাজ-কর্ম আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম, তিনি তাঁর বান্দার হেফাজতকারী।

হযরত মুকাতেল (র.) বলেছেন যে, উক্ত মু'মিন লোকটি আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। লোকেরা যখন তার পিছু ধাওয়া করল তখন তিনি পালিয়ে পাহাড়ে চলে গেলেন। তারা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে নি।

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা বায়যাবী (র.) উল্লেখ করেছেন– উক্ত মুমিন ব্যক্তি ফেরাউনের বাহিনীর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার তাগিদে পালিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। তাঁকে পাকড়াও করার জন্য একদল লোককে ফেরাউন তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়। ফেরাউনের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী পাহাড়ে চড়ে তাঁকে দেখতে পান যে, তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন আর হিংস্র প্রাণীরা দলবদ্ধ হয়ে তাঁর চতুষ্পার্শে পাহারা দিচ্ছে। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে ফেরাউন ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সকলকে হত্যা করল।

Free @ www.al-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٥. فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا بِهٖ مِنَ الْقَتْلِ وَحَاقَ نَزَلَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ قَوْمِهٖ مَعَهٗ سُوْءُ الْعَذَابِ الْغَرَقُ ـ

৪৫. এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন অর্থাৎ তাকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র তারা রচনা করেছিল তা হতে আর আপতিত হলো ফেরাউনের দলের উপর ফেরাউনের লোকদের উপর যাদের মধ্যে ফেরাউন নিজেও ছিল। কষ্টদায়ক আজাব অর্থাৎ নিমজ্জন।

٤٦. ثُمَّ النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا يُحْرَقُوْنَ بِهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا صَبَاحًا وَمَسَاءً وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقَالُ اُدْخُلُوْآ يَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ اَمْرٌ لِلْمَلٰئِكَةِ اَشَدَّ الْعَذَابِ عَذَابَ جَهَنَّمَ ـ

৪৬. তারপর তাদেরকে উপস্থিত করা হবে অগ্নির সম্মুখে– তা দ্বারা তাদেরকে জ্বালানো হবে। সকাল-সন্ধ্যা– সকালে এবং সন্ধ্যায়– আর যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, বলা হবে– প্রবেশ কর হে ফেরাউনের দল! অন্য এক কেরাতে اَدْخِلُوْا -এর হামযাহ অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট এবং خ অক্ষরটি যের বিশিষ্ট। [خِ এ যের হওয়া অবস্থায় এটা ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ বুঝা যাবে– কঠোর আজাবে জাহান্নামের আজাবে।

٤٧. وَ اذْكُرْ اِذْ يَتَحَاجُّوْنَ يَتَخَاصَمُ الْكُفَّارُ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا جَمْعُ تَابِعٍ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ دَافِعُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا جُزْءًا مِّنَ النَّارِ ـ

৪৭. আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন তারা ঝগড়া করবে অর্থাৎ কাফেররা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবে– জাহান্নামে, তখন দুর্বলরা সবলদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম– تَبَعًا এটা تَابِعٌ -এর বহুবচন– সুতরাং তোমরা কি প্রতিহতকারী হবে– প্রতিরোধকারী হবে– আমাদের উপর হতে আংশিক সামান্য জাহান্নামের আজাব হতে?

٤٨. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَاَدْخَلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ وَالْكَافِرِيْنَ النَّارَ ـ

৪৮. সবলরা উত্তরে বলবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করেছেন। সুতরাং ঈমানদারদেরকে জান্নাতে আর কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন।

٤٩. وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا اَيْ قَدْرَ يَوْمٍ مِّنَ الْعَذَابِ ـ

৪৯. জাহান্নামীরা জাহান্নামের কর্মকর্তাদেরকে বলবে– "তোমরা তোমাদের প্রভুকে বল, যেন লাঘব করে দেয় আমাদের হতে একদিন অর্থাৎ এক দিনের সমপরিমাণ আজাব।

٥٠. قَالُوْٓا اَيِ الْخَزَنَةُ تَهَكُّمًا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ ـ

৫০. উত্তরে তারা বলবে অর্থাৎ জাহান্নামের কর্মকর্তারা তিরস্কার করে বলবে– তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ আগমন করেননি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ প্রকাশ্য মোজেজা সহ–

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالُوْا بَلٰى ط اَىْ فَكَفَرْنَا بِهِمْ قَالُوْا فَادْعُوْا ج اَنْتُمْ فَاِنَّا لَا نَشْفَعُ لِكَافِرٍ قَالَ تَعَالٰى وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ اِنْعِدَامٍ .

তারা বলবে হ্যাঁ! আগমন করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাদেরকে অস্বীকার করেছিলাম– কর্মকর্তাগণ বলবেন– তাহলে ডাক– তোমরা নিজেরাই। আমরা কোনো কাফেরের জন্য সুপারিশ করতে পারব না। আল্লাহ তা'আলা বলেন– কাফেরদের আহ্বান তো নিষ্ফল হবেই– বিফল।

৫১. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ جَمْعُ شَاهِدٍ وَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ لِلرُّسُلِ بِالْبَلَاغِ وَعَلَى الْكُفَّارِ بِالتَّكْذِيْبِ .

৫১. নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে সাহায্য করব আর ঈমানদারগণকে দুনিয়ার জীবনে এবং সে দিবসেও সাহায্য করব যে দিবসে স্বাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে– اَشْهَادُ শব্দটি شَاهِدٌ -এর বহুবচন। আর তারা হলেন ফেরেশতাগণ। যারা সাক্ষ্য দেবে যে, রাসূলগণ আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে লোকদের নিকট পৌঁছিয়েছেন। অথচ কাফেররা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে– তাদের রেসালতকে অস্বীকার করেছে।

৫২. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ عُذْرُهُمْ لَوْ اِعْتَذَرُوْا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اَىِ الْبُعْدُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ .

৫২. সে দিন কাজে আসবে না – لَا تَنْفَعُ শব্দটি ى যোগেও হতে পারে এবং تَا যোগেও হতে পারে জালিমদের ওজর– তথা অপারগতা প্রকাশ করা। যদি তারা ওজর পেশ করেও। আর তাদের জন্য লা'নত অর্থাৎ রহমত হতে বঞ্চনা– আর তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট নিবাস। আখেরাতে অর্থাৎ আখেরাতের কঠোর শাস্তি।

তাহকীক ও তারকীব

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا আয়াতাংশে اَلنَّارُ শব্দটির মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহর বাণী– "اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ الخ" -এর মধ্যস্থিত اَلنَّارُ -এর মহল্লে ইরাবের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ তিনটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. এটা رَفْع -এর মহল্লে হবে। এমতাবস্থায়–

ক. এটি উহ্য مُبْتَدَا -এর خَبَرْ হবে।

খ. এটা سُوْءُ الْعَذَابِ হতে بَدْل হবে।

গ. অথবা اَلنَّارُ মুবতাদা হবে। আর তার خَبَرْ হবে "يُعْرَضُوْنَ" -

২. اَلنَّارُ মহল্লান মানসূব হবে। এমতাবস্থায় এটা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হবে, যেই ফে'লের তাফসীর يُعْرَضُوْنَ ফে'লটি করে। অর্থাৎ, "يَصْلُوْنَ النَّارَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا" -

৩. اَلنَّارُ টা مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে। এমতাবস্থায় এটা عَذَابِ শব্দটি হতে بَدْل হবে। ইমাম ফাররা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا আয়াতাংশের "كُلٌّ" -এর মহল্লে ইরাব কি? : আল্লাহর বাণী– "اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا" -এর মধ্যে كُلٌّ শব্দটির মহল্লে ইরাবের ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

১. كُلٌّ শব্দটি خَبَرْ হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। ইমাম اَخْفَش এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. كُلٌّ শব্দটি اِنَّ -এর تَاكِيْد হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কেসায়ী, ফাররা ও ঈসা প্রমুখ নাহুবিদগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ الخ আয়াতাংশে اَدْخِلُوْا-এর একাধিক কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী- اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ-এর মধ্যস্থিত اَدْخِلُوْا-এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. اَدْخِلُوْا-এর হামযাহ যবরবিশিষ্ট এবং خ যের বিশিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় এটা بَاب اِفْعَالْ হতে আমরের সীগাহ হবে। এটা হামজা, কেসায়ী, নাফে ও হাফস (র.)-এর কেরাত।

২. অপরাপর কারীগণ اُدْخُلُوْا পড়েছেন। অর্থাৎ হামযা ও خ উভয় অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় এটা বাবে نَصَرَ হতে আমরে হাজেরের সীগাহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা : হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে ফেরাউন বংশীয় একজন মু'মিনের ঘটনা এসে পড়েছে। বিশ্বস্ত বর্ণনানুযায়ী তিনি ছিলেন ফেরাউনের রাজ দরবারের একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা, পরামর্শ পরিষদের সদস্য এবং ফেরাউনের চাচাত ভাই। শুরু থেকেই তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এক কিবতীকে হত্যা করার অপরাধে যখন এক সময় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য ফেরাউনের সভাসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তখন তিনিই শহরের উপকণ্ঠে দৌড়ে গিয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মিশর ত্যাগ করার জন্য তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) মিশর ত্যাগ করে মাদইয়ানে চলে যান। সেখানেই হযরত শোআয়েব (আ.)-এর সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ ঘটে। বলাবাহুল্য, তথায় তিনি নবুয়তের প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিলেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে ফেরাউনের সংঘাত যখন চরম আকার ধারণ করল এবং ফেরাউন বুঝল যে, ভয়-ভীতি ও প্রলোভন কোনোটাতেই হযরত মূসা (আ.)-কে দমানো যাচ্ছে না, কোনো কৌশলেই হযরত মূসা (আ.)-কে কাবু করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন সে রাজদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা আহ্বান করল। সভায় নিজের মত প্রকাশ করে ফেরাউন বলল যে, "হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাকে হত্যা করা না হলে সে গোটা সামাজিক কাঠামোকেই ওলট-পালট করে ছাড়বে।

মু'মিন লোকটি পূর্ব হতেই যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন তথাপি এতদিন পর্যন্ত তা গোপন রেখে ছিলেন। তিনি ফেরাউনের উপরিউক্ত প্রস্তাব শুনে আর বরদাশত করতে পারলেন না। তাৎক্ষণিক এর প্রতিবাদ করলেন। যদি সত্যিই তারা এটা করতে অগ্রসর হয় তাহলে এর পরিণাম যে মোটেই ভালো হবে না তাও তিনি বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস হতে শিক্ষাগ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিলেন। তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বললেন যে, নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করার কারণে নূহ, আদ, ছামূদ ইত্যাদি জাতিসমূহের উপর আল্লাহর আজাব ও গজব নেমে এসেছিল; ধরাপৃষ্ঠ হতে তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সময় থাকতে সাবধান হও, হযরত মূসা (আ.)-এর বিরোধিতা হতে ফিরে আস; তাঁকে মান্য করতে না পারো তো অন্তত হত্যা করার দুঃসাহস করিও না, অন্যথায় পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় একই ভয়াবহ পরিণাম তোমাদের জন্যও অপেক্ষমান। মনে রেখ হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলে শুধু যে রাষ্ট্র ক্ষমতাই তোমাদের হাত ছাড়া হবে তাই নয়; বরং তোমাদের গোটা জাতিই ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যাবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। কওমের লোকদের দীনের দাওয়াত দিলেন। ঈমান আনলে তাদের কি লাভ হবে এবং ঈমান হতে বিমুখ হয়ে থাকলে ইহকাল ও পরকালে তাদের কি ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে তাও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন- "اُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ" "আমি আমার সবকিছু আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম। বান্দারা সকলেই আল্লাহর নজরে রয়েছে।" আমি যা করলাম তাও তিনি দেখলেন আর এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তোমরা যা করবে তাও তিনি অবশ্যই দেখবেন।

তাঁকে হত্যা করার জন্য ফেরআউন তার লোকজনকে লেলিয়ে দিল। তিনি পালিয়ে পাহাড়ে আত্মগোপন করেন। ফেরাউনের বাহিনী তাঁকে পাকড়াও করার জন্য পাহাড় পর্যন্ত গেল। তারা দেখল যে, তিনি নামাজরত আর হিংস্র বন্য প্রাণীরা চতুর্দিক দল বেঁধে তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। তারা ভয়ে ফিরে আসল। কিন্তু ফেরাউন তাদের সকলকেই হত্যা করে ছাড়ল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার বাহিনীর হাত হতে সেই মু'মিন লোকটিকে রক্ষা করলেন। অপরদিকে ফেরাউন ও তার দলবলকে নীলনদে ডুবিয়ে মারলেন। নিম্নোক্ত আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে– فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَامَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ সুতরাং আল্লাহ ফেরাউন ও তার বাহিনীর ষড়যন্ত্র হতে তাকে হেফাজত করলেন। আর ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে নিকৃষ্ট আজাবে নিক্ষেপ করলেন।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ ...... الْعَذَابِ **আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ব্যক্তির নসিহতের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াতে আলমে বরজখ তথা মধ্যলোকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে অবস্থিত জগতের নামই আলমে বরজখ যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হোক কিংবা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হোক কিংবা অগ্নিতে দগ্ধ করা হোক। সংক্ষেপে আলমে বরজখের শাস্তিকে কবরের আজাব বলা হয়। কবরের আজাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যেভাবে নিদ্রা জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি একটি অবস্থার নাম, ঠিক তেমিনভাবে দুনিয়া এবং আখেরাতের মাঝামাঝি সময় যেখানে অতিবাহিত করতে হয় তা-ই হলো আলমে বরজখ বা মধ্যলোক। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ জীবনের অবসান ঘটে আর রুহ আলমে বরজখে চলে যায়। এতদসত্ত্বেও রুহের সঙ্গে দেহের একপ্রকার সম্পর্ক অব্যাহত থাকে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হয় এবং তিনটি প্রশ্ন করা হয়–

১. তোমার প্রতিপালক কে? ২. তোমার ধর্ম কি? ৩. নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করা হয়, ইনি কে?

মৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তবে প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেবে কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি কাফির হয় তবে জবাবে বলবে– হায় আক্ষেপ! আমি জানি না।

উল্লেখ্য, দুনিয়ার জীবন এবং কবরের জীবনে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ দেখে, শুনে, কথা বলে কিন্তু এ চক্ষু দিয়ে দেখে না এবং এ কর্ণ দিয়েও শ্রবণ করে না, নিদ্রিত হওয়ার কারণে এসব ইন্দ্রিয়ের শক্তি তখন অকেজো হয়ে থাকে, মৃত্যুর পর যখন মানুষ চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় এবং আলমে বরজখে পৌঁছে যায় তখন সে ঈমান ও কুফর তথা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও নাফরমানির প্রকৃত রূপ প্রকাশ্যে দেখতে পায়।

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি যখন কবরে মুনকির-নকীরের প্রশ্নের জবাব দিয়ে অবসর পায় তখন একটি অতি সুন্দর, আকর্ষণীয় আকৃতি দেখতে পায়, মু'মিন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। এমনিভাবে কাফের বা অপরাধী ব্যক্তিদের সম্মুখেও তাদের আমল দৃশ্যমান হয়ে হাজির হয় তবে সে দৃশ্য হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তখন তাকে জবাব দেওয়া হয়– আমি তোমার আমল। এটি হলো আলমে বরজখের প্রাথমিক অবস্থা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হয়, তবে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত বা দোজখে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। যদি সে ব্যক্তি মু'মিন হয় তবে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখে তার আনন্দ বৃদ্ধি পায়, আর যদি সে কাফের হয় তবে সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফেরাউন সম্প্রদায়ের রূহগুলো কৃষ্ণবর্ণের পাখির উদরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। দৈনিক দু'বার তাদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং তাদেরকে বলা হয়, এটিই হবে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উল্লিখিত আয়াত কবরের আজাবকে সাব্যস্ত করে : আল্লাহর বাণী- "اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا الخ" আলমে বরযখের তথা কবরে আজাব হওয়ার কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করছে। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাষায় আজাবের দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন, একটি হলো কম মাত্রার আজাব, কেয়ামত আগমনের পূর্বে ফেরাউন তার দলবলসহ এ আজাবে ভুগছে। এ আজাব দেখেই তারা ছটফট করছে ও হা-হুতাশ করছে এ বলে যে, এ দোজখেই শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে প্রবেশ করতে হবে। অতঃপর হাশরের ময়দানের হিসাব-নিকাশের পর তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট সেই আসল শাস্তিই দেওয়া হবে। অর্থাৎ সে দোজখেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, যার দৃশ্য তাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার সময় হতে আজ পর্যন্ত নিত্য দেখানো হচ্ছে এবং কেয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেখানো হবে।

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে-

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ . وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ . فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (بُخَارِىْ . مُسْلِمْ وَالْمُسْنَدُ لِاَحْمَدَ)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তাকে তার শেষ অবস্থানস্থল দেখানো হয়ে থাকে। যদি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতের অবস্থান স্থল দেখানো হয়, অপরদিকে জাহান্নামি হলে জাহান্নামের অবস্থানস্থল দেখানো হয়। তাকে বলা হয় এটা সেই স্থান, যেখানে আল্লাহ তোমাকে পুনর্জীবিত করার পর কেয়ামতের দিন তুমি যাবে। -[বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ]

তাফসীরে খাজেনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে নিম্নোক্ত হাদীসখানা বর্ণিত রয়েছে-

"اَرْوَاحُ اٰلِ فِرْعَوْنَ فِىْ اَجْوَافِ طُيُوْرٍ سُوْدٍ يُعْرَضُوْنَ عَلَى النَّارِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ تَغْدُوْ وَتَرُوْحُ اِلَى النَّارِ وَيُقَالُ يَا اٰلَ فِرْعَوْنَ . هٰذِهِ مَنَازِلُكُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ .

ফেরআউন ও তার সমর্থকদের পাপাত্মাসমূহকে কালো পাখির আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় দুবার জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আর জাহান্নামকে দেখিয়ে তাদেরকে বলা হয়- হে ফেরাউন ও তার অনুসারীরা! এটাই তোমাদের ঠিকানা, আবাসস্থল। কেয়ামতের পর এখানেই তোমরা প্রবিষ্ট হবে।

কাজেই অত্র আয়াতও উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কবরে কাফেরদের এমনকি গুনাহগার পাপী ঈমানদারদেরও আজাব হবে। আর এটাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাযহাব। অবশ্য মু'তাজিলাহ ও অন্যান্য বাতিলপন্থিরা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যকে উপেক্ষা করতঃ এর বিরোধিতা করে থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের মতামত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কবরের আজাব সম্পর্কিত একটি অভিযোগ ও এর জবাব : বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আয়েশা (রা.) মদীনায় এক ইহুদি রমণীকে কিছু দান করেছিলেন। রমণীটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য দোয়া করল যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে কবরের আজাব হতে মুক্তি দান করেন। ঘটনাটি নবী করীম ﷺ -এর কর্ণগোচর হলো। নবী করীম ﷺ কবরের আজাবের কথা অস্বীকার করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বললেন যে, আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, কবরের আজাব সত্য।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আলোচ্য আয়াত দ্বারা কবরের আজাব সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তা হলে নবী করীম ﷺ কবরের আজাব কিভাবে অস্বীকার করলেন? কেননা এ আয়াতখানা তো মক্কী জীবনে নাজিল হয়েছে আর উপরিউক্ত ঘটনাটি ঘটেছে মদনী যুগে।

মুফাস্সিরগণ উপরিউক্ত প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন :

১. এ আয়াতে শুধুমাত্র ফেরাউন ও তার অনুসারীদের আজাবের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য কাফেরদের কবরে আজাব হবে কি-না তা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এজন্য নবী করীম ﷺ প্রথমতঃ মনে করেছিলেন যে, অন্যান্য কাফেরদের কবরে আজাব হবে না। কিন্তু পরবর্তীতে ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, অপরাপর কাফেরদেরকেও কবরে আজাব দেওয়া হবে।

২. আলোচ্য আয়াতে তো কাফেরদের কবর আজাবের কথা বলা হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ ঈমানদারগণের কবরের আজাবকে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, ঈমানদার পাপীদেরও কবরের আজাব হবে তখন তা সকলকে জানিয়ে দিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে কাফেরদের নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক হবে- তার উল্লেখ করেছেন। দুনিয়াতে কাফেররা সাধারণতঃ দুই দলে বিভক্ত ছিল। নেতৃবৃন্দ ও অনুসারী বৃন্দ। প্রথমোক্ত প্রভাবশালী নিজেদের পার্থিব স্বার্থে শেষোক্ত দলকে ব্যবহার করেছে, তাদেরকে ফুসলিয়ে প্রলোভিত করে ভ্রান্ত পথে নিয়ে গিয়েছে। তাদেরকে সত্যপন্থিদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে।

জাহান্নামের কঠোর আজাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সেই দুর্বল অনুসারীরা নেতাদের নিকট ধরনা দেবে, তাদের মোড়ল মাতব্বর প্রধানদের বলবে- দুনিয়াতে তো আমরা তোমাদের কথায় উঠা-বসা করেছি। তোমাদেরই নির্দেশিত পথে চলেছি। আজ কি তোমরা আমাদের এ আগুনের অংশ বিশেষ বহন করবে, লাঘব করতে পারবে?

উত্তরে তাদের নেতারা বলবে- কি বলব বল- আমাদের সকলেরই পোড়া কপাল; আমাদেরকে আমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। কিছুতেই তা হতে অব্যাহতি নেই। আমাদের সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই জাহান্নামে রয়েছি। আল্লাহ যে আমাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। তার বিন্দুমাত্র এদিক সেদিক করার সাধ্য কারো নেই।

"وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ .... اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ" আয়াতদ্বয়ের বিস্তারিত তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা কাফের দোজখীদের জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য জান্নাতের প্রহরী ফেরেশতাদের কাছে আকুতি জানানোর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, ফেরেশতারা যেন তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করেন। ইরশাদ হচ্ছে-

কাফের নেতা-নেত্রীদের থেকে নিরাশ হওয়ার পর দোজখীরা দোজখের প্রহরীদের বলবে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ কর যেন তিনি অন্ততঃ একটি দিন আমাদের প্রতি আজাব লাঘব করেন। অর্থাৎ তারা বলতে চাইবে, এক দিবসের সময়ের সমান যদি আজাব মুলতবি রাখা হয় তবে তাও হবে আমাদের জন্যে বিরাট নিয়ামত।

আর দোজখীদের আলোচ্য ফরিয়াদের জবাবে ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ বৃথা, সময় শেষ হয়ে গেছে, এখন যত আর্তনাদই করোনা কেন তোমাদের জন্যে তা উপকারি হবে না, আমরা তোমাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারব না, আল্লাহ তা'আলার হুকুম তোমাদের শাস্তি বিধান করাই আমাদের কাজ। সুপারিশ বা অনুরোধ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। তোমাদের নিকট কি কোনো নবী-রাসূল আগমন করে নি? তাঁরা কি কোনো সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ মোজেজা প্রদর্শন করেন নি, তারা দোজখ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ প্রদর্শন করেননি? তখন দোজখীরা বলবে, হ্যাঁ! অবশ্যই তাঁরা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মান্য করিনি; বরং তাঁদের বিরোধিতা করেছি। ফেরেশতাগণ তখন বলবেন, তাহলে এখন আর আক্ষেপ-অনুশোচনা করে কি লাভ?

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, কাফেরদের দোয়া আখেরাতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ঈমান পূর্বশর্ত, আর ঈমান আনয়ন সম্ভব ছিল দুনিয়াতে, কিন্তু তারা তা করেনি।

তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষে সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন এজন্যে যে, যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার কারোই নেই।

اِنَّا لَنَنْصُرُ .... الْاَشْهَادُ আয়াতের ব্যাখ্যা : কাফেররা দোজখে একে অন্যকে দোষারোপ করবে, লা'নত দেবে, পূর্ববর্তী আয়াতে এ কথার উল্লেখ ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রেরিত নবীগণকে এবং মু'মিনদেরকে দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন এবং আখেরাতেও। আর এ কথাও ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর রাহে যত সমস্যা দেখা দেয় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তা সমাধা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতে ও রহমতে সকল বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করেন। নবী-রাসূলগণকেই নয়; বরং তাদেরকে যারা সাহায্য করেন, আল্লাহ তা'আলা সে মু'মিনদেরকেও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এজন্যই নবী-রাসূলগণ যত বাধা-বিপত্তিরই সম্মুখীন হন না কেন, অবশেষে তাঁরা সাফল্য লাভ করেন। আর সত্যদ্রোহীদেরকে আল্লাহ তা'আলা শুধু যে ব্যর্থ করেন তাই নয়; বরং তাদের প্রতি লা'নত করেন অর্থাৎ তাদেরকে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা যদি আম্বিয়া (আ.)-কে বিরোধীদের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ সাহায্যই করতেন না কোনো নবী শহীদ হতেন আর না কেউ দেশত্যাগ করতেন। যেমন– হযরত ইয়াহইয়া, জাকারিয়া এবং শোআয়েব (আ.)-কে বিরোধীরা শহীদ করেছে আর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ বিরোধীদের অত্যাচারে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) ইবনে জারীরের হাওলায় এর জবাব দিয়েছেন যে, এ আয়াতে সাহায্যের দ্বারা প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতখানার অর্থ হবে নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণ ও ঈমানদার বান্দাগণ-এর পক্ষে কাফেরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি। চাই তাদের উপস্থিতিতে তাদের নিজের হাতে অথবা তাদের মৃত্যুর পর। আর এটা সকল নবী রাসূলগণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং যেই সব জাতি নবী-রাসূলগণকে হত্যা করেছে তাঁদের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে তাদেরকে দুনিয়ায় কি ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে তা কারো অজানা নয়। হযরত ইয়াহিয়া, যাকারিয়া ও শোআয়েব (আ.)-এর হত্যাকারীরা তাদের শত্রুদের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন। নমরুদকে আল্লাহ তা'আলা কি মর্মান্তিকভাবেই না হত্যা করেছেন। নবী করীম ﷺ -এর উপর যারা নির্যাতন করেছিল তাদেরকে তো আল্লাহ তা'আলা খোদ মুসলমানদের দ্বারাই শায়েস্তা করিয়ে ছেড়েছেন। পরিশেষে নবী করীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীরাই বিজয়ী হয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা অধিকাংশ নবী রাসূলগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ দু'চারজন নবী-রাসূল ব্যতীত অধিকাংশ নবী-রাসূলগণই আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভে ধন্য হন।

"يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ" দ্বারা উদ্দেশ্য এবং এটাকে يَوْمُ الْاَشْهَادِ বলার কারণ : আলোচ্যাংশে "يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ" দ্বারা কেয়ামতের দিবসকে বুঝানো হয়েছে।

আর اَشْهَادٌ হলো شَاهِدٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ সাক্ষীগণ। যেহেতু কেয়ামতের দিবসে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হবে সেহেতু উক্ত দিবসকে يَوْمُ الْاَشْهَادِ বলা হয়েছে।

সেদিন ফেরেশতা, নবী রাসূলগণ ও ঈমানদারগণ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। ফেরেশতাগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে বলবেন যে, তাঁরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেছেন। আল্লাহর বাণী ও দীনের দাওয়াত তাদের কওমের নিকট পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু লোকেরা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) তাদের উম্মতগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন এবং ঈমানদারগণ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

"فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ شَهِيْدًا

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন– "وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ"

(১) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ (২) لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ :

আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার সমন্বয় : আলোচ্যাংশে প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'কেয়ামতের দিন জালিম তথা কাফেরদের ওজর পেশ করা তাদের কোনো উপকারে আসবে না।' আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে– কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে ওজর পেশ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। বাহ্যতঃ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়।

মুফাস্সির আল্লাম এর সমাধান পেশ করতে গিয়ে প্রথমোক্ত আয়াতটির তাবীল করেছেন। সুতরাং তারা এর অর্থ এভাবে করেছেন যে, "যদি কেয়ামতের দিন কাফেরদের ওজর পেশকরার সুযোগ দেওয়াও হয় তাহলেও সেই ওজর পেশ করা তাদের কোনো উপকারে আসবেনা।" কিন্তু মূলত তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগই দেওয়া হবে না। সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধিতার অবসান হলো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى اَلتَّوْرَاةَ وَالْمُعْجِزَاتِ وَاَوْرَثْنَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى الْكِتٰبَ التَّوْرَاةَ.

৫৩. আমি অবশ্যই হযরত মূসা (আ.)-কে হেদায়েত দান করেছি তাওরাত এবং মোজেজাসমূহ। আর বনু ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছি– হযরত মূসা (আ.)-এর পর আল-কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের।

٥٤. هُدًى هَادِيًا وَّ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ تَذْكِرَةً لِاَصْحَابِ الْعُقُوْلِ.

৫৪. হেদায়েত– পথপ্রদর্শক এবং উপদেশ বিবেকবানদের জন্য অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ।

٥٥. فَاصْبِرْ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِنَصْرِ اَوْلِيَائِهٖ حَقٌّ وَاَنْتَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ لِيُسْتَنَّ بِكَ وَسَبِّحْ صَلِّ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ هُوَ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ وَالْاِبْكَارِ الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ.

৫৫. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন– হে মুহাম্মদ ﷺ! নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গীকার তার বন্ধুদের সাহায্য করার ব্যাপারে সত্য আর– আপনি ও আপনার অনুসারীগণ আল্লাহর বন্ধুদের অন্তর্গত– আপনি আপনার ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন– যাতে লোকেরা আপনার অনুসরণে ইস্তেগফার করতে পারে। আর আপনি তাসবীহ পাঠ করুন (অর্থাৎ) নামাজ পড়ুন সম্পৃক্ত হয়ে আপনার রবের প্রশংসাসহ বিকালে– সূর্য ঢলে যাওয়ার পরবর্তী সময়কে عَشِيّ বলে এবং সকালে (অর্থাৎ) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে।

٥٦. اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيَاتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ بُرْهَانٍ اَتٰهُمْ لا اِنْ مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ تَكَبُّرٌ وَطَمَعٌ اَنْ يَعْلُوْا عَلَيْكَ وَمَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ط فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط مِنْ شَرِّهِمْ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِاَقْوَالِهِمْ الْبَصِيْرُ بِاَحْوَالِهِمْ.

৫৬. নিশ্চয় যারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে অর্থাৎ আল কুরআনের ব্যাপারে– দলিল ব্যতীত প্রমাণ ছাড়া তাদের নিকট অনুপস্থিত নেই তাদের অন্তরে তবে অহঙ্কার – দাম্ভিকতা এবং তোমার উপর বিজয়ী হওয়ার লোভ অথচ তারা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা– সুতরাং আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় পার্থনা করুন– তাদের অনিষ্ট হতে– নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা তাদের কথা-বার্তা এবং সর্বদ্রষ্টা তাদের অবস্থার।

٥٧. وَنَزَلَ فِيْ مُنْكِرِى الْبَعْثِ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِبْتِدَاءً اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ مَرَّةً ثَانِيَةً وَهِيَ الْاِعَادَةُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ اَيِ الْكُفَّارِ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ فَهُمْ كَالْاَعْمٰى وَمَنْ يَعْلَمُهٗ كَالْبَصِيْرِ.

৫৭. আর পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে– নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টি প্রথমবার মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বিরাট কাজ– দ্বিতীয়বার আর তা হলো পুনরায় জীবিত করন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ কাফেররা তা অবগত নয়। সুতরাং তারা অন্ধের ন্যায়। আর যারা এটা অবগত রয়েছে তারা হলো চক্ষুষ্মান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٨. وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ هُوَ الْمُحْسِنُ وَلَا الْمُسِيْٓئُ فِيْهِ زِيَادَةُ لَا قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ تَذَكُّرُهُمْ قَلِيْلٌ جِدًّا ـ

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না আর (সমান হতে পারে) না যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছে তারা– অর্থাৎ মুহসিন সৎকর্মশীল এবং দুষ্কৃতিকারী সমান হতে পারে না– এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত খুব কমই নসিহত কবুল করে থাকে– উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। تَتَذَكَّرُوْنَ শব্দটি ى -এর দ্বারা হতে পারে এবং ت যোগেও হতে পারে। অর্থাৎ তারা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

٥٩. اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ـ

৫৯. নিশ্চয় কেয়ামত আসন্ন, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, সংশয় নেই কিন্তু এ বিষয়টি অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না– কেয়ামত সম্পর্কে।

٦٠. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اَىْ اُعْبُدُوْنِىْ اُثِبْكُمْ بِقَرِيْنَةِ مَا بَعْدَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْخَاءِ وَبِالْعَكْسِ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ صَاغِرِيْنَ ـ

৬০. আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, শুধু আমাকেই তোমরা ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। অর্থাৎ তোমরা আমার ইবাদত কর। আমি তোমাদেরকে ছওয়াব প্রদান করব। এর পরবর্তী বাক্য দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদত হতে বিমুখ হয়। শীঘ্রই তারা প্রবেশ করবে– ى অক্ষরটি জবর বিশিষ্ট এবং خ অক্ষরটি পেশ বিশিষ্ট। আর এর বিপরীতে অর্থাৎ ى পেশ বিশিষ্ট এবং خ জবর বিশিষ্টও হতে পারে। জাহান্নামে অপমানিত অবস্থায়– লাঞ্ছিত হয়ে।

তাহকীক ও তারকীব

নাহবী তারকীবে "اَتٰهُمْ" শব্দটির মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহর পবিত্র বাণী- اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتٰهُمْ -এর মধ্যে "اَتٰهُمْ" শব্দটি سُلْطَانٍ শব্দের সিফাত হয়েছে। আর سُلْطَانٌ শব্দটি غَيْرِ -এর মুযাফ ইলাইহি হওয়ায় মাজরূর হয়েছে। সুতরাং "اَتٰهُمْ" ও জুমলা হয়ে بِتَاوِيْلِ مُفْرَدٍ পূর্ববর্তী سُلْطَانٌ -এর সিফাত হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে।

"لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" বাক্যাংশটুকুর তারকীবে মহল্লে ই'রাব কি? আল্লাহর বাণী- "لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" মুবতাদা, আর তৎপরবর্তী اَكْبَرُ الخ -এর خَبَرٌ সুতরাং مُبْتَدَا হওয়ার কারণে এটা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

"اَسْتَجِبْ" শব্দটির তারকীবে মহল্লে ইরাব কি? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ" "তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" এখানে اَسْتَجِبْ শব্দটি اُدْعُوْنِىْ আমরের [সীগার] জবাব হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْزُوْم হয়েছে।

سَيَدْخُلُوْنَ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী- "سَيَدْخُلُوْنَ" -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে

১. سَيَدْخُلُوْنَ -এর ى অক্ষরটি যবরযোগে এবং خ অক্ষরটি হবে পেশযোগে। অর্থাৎ এটা بَاب نَصَرَ হতে مُضَارِعْ مَعْرُوْف -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ হবে। অর্থ হবে- শীঘ্রই তারা প্রবেশ করবে।

২. سَيُدْخَلُوْنَ -এর ى অক্ষরটি পেশ যোগে এবং خ অক্ষরটি যবরযোগে হবে। এ পরিসরে এটা بَاب نَصَرَ হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ হবে। অর্থ হবে "শীঘ্রই তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ ..... بِاللّٰهِ আয়াতের শানে নুযূল : আল্লাহর বাণী- "اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ الخ" ইহুদিদের শানে নাজিল হয়েছে। সুতরাং আবুল আলীয়া বর্ণনা করেছেন যে, একবার কতিপয় ইহুদি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে অহেতুক দাজ্জাল সম্পর্কে তর্ক-বচসা জুড়ে দিল। তারা বলল যে, দাজ্জাল তাদের মধ্য হতেই আবির্ভূত হবে। তারা দাজ্জালের ব্যাপারটিকে খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থাপন করল। কোনোরূপ দলিল প্রমাণ ছাড়াই তারা দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনায় বাড়াবাড়ি করতে লাগল। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন- "اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ الخ" নিশ্চয় যারা বিনা প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার আয়াতের ব্যাপারে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে অহংকার পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে। তারা আপনার উপর বড়ত্ব জাহির করতে চায়। অথচ তাদের এ চাওয়া কোনো দিনও পূরণ হবে না। কোনো দিনও আপনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। তবে আপনি তাদের অনিষ্ট হতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন। কেননা তারা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে।

কা'বে আহবার (রা.) বলেছেন, এ আয়াত ইহুদিদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। ইহুদি অপর দিকে যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে, এবং এটাকে অসম্ভব মনে করেছে তাদের শানে অবতীর্ণ হয়েছে- "لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" অর্থাৎ তারা তো স্বচক্ষে দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এ বিশাল ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টি হতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা কোনো কঠিন কাজ নয়। সুতরাং যখন তিনি আসমান-জমিনের এ বিশালতা স্বত্ত্বেও সেটাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন, এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

'وَلَقَدْ اٰتَيْنَا ...... الْبَابِ' আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে হেদায়েত দান করেছিলেন কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেনি। তারা হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলায় সর্বশক্তি ব্যয় করেছে, লক্ষ লক্ষ সৈনিক নিয়ে ফেরাউন তাঁর মোকাবিলা করেছে, কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফেরাউন ও তার দলবল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে অথচ বনী ইসরাঈলরা যখন হযরত মূসা (আ.)-এর হেদায়েত মেনে চললো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাহায্য করলেন। তারা উন্নতি লাভ করল। এ দ্বারা এদিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 'হে মুহাম্মদ! আপনার সাথেও আমি এরূপ আচরণই করব। আপনাকে মক্কানগরী ও কুরাইশ গোত্রের নবুয়তের জন্যে দাঁড় করিয়েছি। অতঃপর আমি আপনাকে আপনার অবস্থার উপর অসহায় একাকিত্বে ছেড়ে রাখি নি। এ জালিমরা আপনার প্রতি যাচ্ছেতাই ব্যবহার করবে তার সুযোগ রাখি নি; বরং আমার স্বীয় সত্তাই আপনার পৃষ্ঠপোষক। আপনাকে পথ দেখিয়ে অবশ্যই চরম সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেব। মহান আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন- "আর আমি বনী ইসরাঈলকে তাওরাতের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। যা পথ-প্রদর্শক এবং বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে তাতে উপদেশ। গুণী-জ্ঞানী লোকেরা এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"

অর্থাৎ যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে অমান্যকারী লোকেরা, এ নিয়ামত ও বরকত হতে বঞ্চিত হয়েছে। আর তাঁর প্রতি আনুগত্য ঈমানদার বনূ ইসরাঈলদেরকে কিতাবের ধারক-বাহক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"فَاصْبِرْ ان .... وَالْاِبْكَارِ" আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন. এজন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনার সাফল্যকে প্রতিহত করার শক্তি কারোই হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে প্রিয় হাবীব! আপনি ধৈর্যধারণ করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন অবশেষে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবেই। আল্লাহ তা'আলা যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। এর বিপরীত কখনো হবে না। হে রাসূল! আপনার বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত। তাছাড়া আপনার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অনুগামী উম্মতদিগকেও দুনিয়া আখেরাতে অসাধারণ মর্যাদা দান করবেন। তবে শর্ত হলো– আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ এবং প্রসন্নতা লাভের জন্য তাদেরকে সব ধরনের পরিস্থিতিতে সবরের উন্নত আদর্শ পেশ করতে হবে। যত ঝড় আসুক না কেন তাদেরকে সত্যের উপর অবিচল থাকতে হবে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা নিবেদন, গুণ মহিমা কীর্তন এবং পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে।

মুসনাদে হিন্দ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) উল্লেখ করেছেন, নবী করীম ﷺ দিবা-রাত্রি শত শতবার ইস্তেগফার করতেন। প্রত্যেক মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি তার মর্যাদানুপাতে গুরুত্ব রাখে। সুতরাং সকলের পক্ষেই এ ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা অপরিহার্য।

কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এখানে যেই পূর্বাপর পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ -কে ইস্তেগফার করার জন্য বলা হয়েছে তা চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে "ذَنْبٌ" বা অপরাধ বলতে ধৈর্যহীনতার সেই অবস্থা ও ভাবধারাকে বুঝানো হয়েছে যা কঠিন বিরুদ্ধতার পরিবেশে, বিশেষ করে নিজের অনুসারীদের নিপীড়িত অবস্থা দেখে নবী করীম ﷺ -এর মনে জেগে উঠেছিল। তিনি মনে মনে আকস্মিক মোজেজা মতো কিছু একটা দেখিয়ে কাফের সমাজকে ঈমানদার বানাতে চেয়েছিলেন। কিংবা অপেক্ষমান ছিলেন, আল্লাহর পক্ষ হতে অনতিবিলম্বে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হোক যাতে বিরুদ্ধতার এ তুফান এসে যাবে। তাঁর মনের এ কামনা মূলত কোনো গুনাহের কাজ ছিল না। সে জন্য বিশেষ কোনো তওবা ইস্তেগফারের প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ কে আল্লাহ তা'আলা যেই উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছিলেন এবং সেই দিক বিবেচনায় রাসূল ﷺ -এর মন-মানসিকতা যতটা উন্নত হওয়ার কথা ছিল সে নিরিখে এই সামান্য ধৈর্যহীনতা ও তার মর্যাদার পক্ষে আল্লাহ তা'আলা হানিকর মনে করেছিলেন। এ কারণে বলা হয়েছে যে, আপনি যে দুর্বলতা দেখালেন সে জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং পাহাড়ের মতো অটল হয়ে নিজের নীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকুন। আপনার মতো উচ্চ মর্যাদার লোকদের জন্য এটাই শোভনীয়।

"وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الخ" অর্থাৎ এ হামদ ও তাসবীহ তথা প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনাই হলো এমন একটা উপায় যার দরুন আল্লাহর উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তারা আল্লাহর পথের যাবতীয় বাধা বিঘ্নসমূহের মোকাবিলা করার শক্তি লাভ করে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার দুটি অর্থ হতে পারে।

১. সব সময় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করতে থাকে।

২. উক্ত বিশেষ সময় সালাত আদায় করে।

দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে এ কথাটি দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর এ সূরাটি নাজিল হওয়ার কিছুকাল পরই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা আরবি ভাষায় عَشِيٌّ শব্দটি সূর্যের পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর হতে রাত্রের প্রাথমিক অংশ পর্যন্তকার সময়কে বলা হয়। আর এতে যোহর হতে ই'শা এ চার ওয়াক্ত সালাত শামিল রয়েছে। আর إِبْكَارٌ-এর দ্বারা পূর্বাকাশে আলো ফুটে উঠার পর হতে সূর্যোদয়কালীন সময়টিকে বুঝায়। এটা ফজরের সালাতের সময়।

Free @ www.eilm.weebly.com

নবী করীম ﷺ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অপরাধের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো কেন? : কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ এমনকি সকল নবীগণই নিষ্পাপ। তবুও এখানে কেন নবী করীম ﷺ কে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ" আপনি আপনার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন"? মুফাসসিরে কেরাম (র.) এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন।

১. এর দ্বারা ইজতেহাদী ভুল [গবেষণাগত ভুল] কে বুঝানো হয়েছে। যা মূলত কোনো অপরাধ নয় (বরং ছওয়াবেরই কারণ)। তথাপি নবীর শানের খেলাফ হওয়ার কারণে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

২. এখানে ذَنْب এর পর مُضَافٌ اِلَيْه তথা امة শব্দ মাহজুফ রয়েছে। অর্থাৎ "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ اُمَّتِكَ" আপনার উম্মতের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৩. এখানে ذَنْب -এর দ্বারা অপরাধ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হলো উত্তম পন্থা পরিহার করা। সুতরাং কোনো কোনো কাজে উত্তম পন্থা পরিহার করার কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. অপরাধের কারণ নয়; বরং উম্মতকে তা'লীম দেওয়ার জন্য নবী করীম ﷺ কে ইস্তেগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেন নবী করীম ﷺ -এর অনুকরণে তাঁর উম্মত ইস্তেগফার করার পদ্ধতি শিখে নিতে পারেন। আর বলাই বাহুল্য যে, উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া নবী করীম ﷺ -এর দায়িত্ব ছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ ..... الْبَصِيْرُ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- যারা আল্লাহর কথায় তর্ক করতে যায়, আল্লাহর তাওহীদ, আসমানি কিতাব, পয়গাম্বরদের মোজেজা এবং হেদায়েত প্রভৃতি সম্বন্ধে অযথা কলহ করে। অমূলক ও ভিত্তিহীন কথার অবতারণা করতঃ সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায়- তাদের হাতে যুক্তি প্রমাণ বলতে কিছুই নেই। উল্লিখিত বিষয়াদির সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। তবুও তারা বিরোধিতা করে। আসলে তাদের অহঙ্কারই এরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশে প্রলুব্ধ করে। তারা নিজেকে পয়গাম্বরের অপেক্ষা উচ্চ এবং উন্নত মনে করে, পয়গম্বরদের কথা মানতে তাদের সম্মুখে মাথা নত করতে তাদের অহংকার বাধে। তারা পয়গাম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা কমপক্ষে তাদের সমান এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন থাকতে চায়।

বলাবাহুল্য তাদের এ মনোবাঞ্ছা কস্মিনকালেও পূরণ হওয়ার নয়। কিছুতেই তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। তারা ভালো করেই জেনে রাখুক- একদা এই পয়গাম্বরের সম্মুখেই তাদের মাথা হেট করতে হবে। অন্যথায় চরম অপমান এবং দুর্ভোগ তাদের অদৃষ্টে অনিবার্য বলে জানবে।

দীন-ধর্ম এবং সত্যের এরূপ বিরুদ্ধাচারী শত্রুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর স্মরণ নেওয়া, সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনাই কাম্য এবং সর্বাপেক্ষা অমোঘ অস্ত্র। অতএব, এরূপ পরিস্থিতিতে নির্দেশিত এই অস্ত্র ব্যবহারে যেন ভুল না হয়।

এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল রয়েছেন; বরং তারা যা কিছু বলছে এবং যা কিছু করছে সবই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত রয়েছেন। সুতরাং তিনি সময় মতো তাদের বিহিত ব্যবস্থা করতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করবেন না।

আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে কাফেরদের বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ : কাফেরদের দলিল ও যুক্তি-প্রমাণহীন বিরোধিতা এবং তাদের অযৌক্তিক তর্ক-বিতর্কের আসল কারণ হলো, আল্লাহর আয়াতসমূহে যে সব মহাসত্য এবং মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর কথা তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে তা তাদের বোধগম্য হয় না বলেই তারা নিষ্ঠা সহকারে এটা বুঝার জন্য বুঝি এ সব তর্ক-বিতর্ক করছে; বরং এদের এরূপ আচরণের আসল কারণ হলো, তাদের বর্তমানে আরব দেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকৃত হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারাও এমন ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হবে যার মোকাবিলায় তারা নিজেদেরকে সর্দারী লাভের অধিকতর যোগ্য মনে করত। এটা তাদের আত্মাভিমানের দরুন তারা বরদাশত করতে রাজি ছিল না। এ জন্যই তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কোনো কথাই বলতে না দেওয়ার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে কাজ করতেছিল। আর এ উদ্দেশ্যে হীন ও লজ্জাকর কাজ-কর্ম করতে ও উপায় অবলম্বন করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করত না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ যাকে বড় বানিয়েছেন সে-ই বড় ও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে। আর এ ছোট লোকেরা নিজেদের বড়ত্ব কায়েম রাখার জন্য যেসব চেষ্টা করছে, তা সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। -[কুরতুবী]

পূর্বে আলোচ্য আয়াতে "اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ الخ" -এর শানে নুযূলে বলা হয়েছে জনৈক ইহুদি দাজ্জাল সম্পর্কে নবী ﷺ-এর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, সুতরাং এখানে হাদীসের বর্ণনানুসারে দাজ্জালের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

দাজ্জাল প্রসঙ্গ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিজে প্রিয়নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন, আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ঘটনার চেয়ে বড় আর কোনো ঘটনা ঘটবে না।

-[মুসলিম শরীফ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- এমন কোনো নবী ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মতকে মিথ্যুক, কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। খুব ভালো করে জেনে রাখ! দাজ্জাল কানা হবে (এক চক্ষু বিশিষ্ট) তোমাদের প্রতিপালক এমন নন। দাজ্জালের দু'চক্ষুর মধ্যখানে ك ف ر অর্থাৎ কাফের লেখা থাকবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি কথা বলবনা? প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে (কিছু না কিছু) বলেছেন। নিঃসন্দেহে সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে, তার সঙ্গে জান্নাতও থাকবে এবং দোজখও থাকবে, সে যাকে জান্নাত বলবে আসলে তাই হবে দোজখ। আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করি, যেমন নূহ (আ.) তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দাজ্জাল যখন বের হবে তখন তার সাথে পানিও থাকবে, অগ্নিও থাকবে। লোকেরা যে বস্তুকে পানি মনে করবে তা-ই হবে অগ্নি আর যে বস্তুকে অগ্নি মনে করবে তা-ই হবে সুশীতল মিষ্টি পানি। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দাজ্জালকে পায়, তার কর্তব্য হবে অগ্নির আকৃতিতে যা থাকবে তাতে ঝাঁপ দেওয়া, নিঃসন্দেহে তা হবে সুশীতল পবিত্র পানি।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণিত আরেকখানি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দাজ্জালের বাঁ দিকের চক্ষু থাকবে না, তার চুল হবে কোকড়ানো। তার সাথে জান্নাতও থাকবে এবং দোজখও। তার দোজখই প্রকৃত অবস্থায় হবে জান্নাত আর তার জান্নাত হবে আসলে দোজখ। -[মুসলিম শরীফ]

হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ -এর সম্মুখে দাজ্জালের আলোচনা হয়। তখন তিনি ইরশাদ করেন, যদি দাজ্জাল আমার জীবদ্দশায় বের হয়ে আসে তবে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলা করবো। যদি আমার জীবদ্দশায় সে না বের হয় তবে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার মোকাবিলায় দায়িত্ব পালন করবে। তার চক্ষু ফুলে থাকবে, আমি তাকে আবদুল ওজ্জাহ ইবনে কতনের ন্যায় দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে পায় সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করে তার প্রতি দম করে। এ আয়াত সমূহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে রক্ষাকবচ হবে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যস্থল থেকে বের হবে। ডানে বামে অনেক কিছু ধ্বংস করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অবিচল থেক। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! সে কতদিন জমিনে অবস্থান করবে? তিনি ইরশাদ করেন, চল্লিশ দিন, তবে তার একদিন এক বছরের সমান হবে। আর একদিন এক মাসের সমান হবে, আর একদিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর বাকি দিনগুলো স্বাভাবিকভাবে অন্য দিনগুলোর সমান হবে। আমরা আরজ করলাম যেদিন এক বছরের সমান হবে সেদিন কি আমাদের একদিনের নামাজ যথেষ্ট হবে। তিনি ইরশাদ করলেন: না; বরং তোমরা সময়ের হিসাব করে নেবে। প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। এভাবে এক বছরের সমান নামাজ তথা আঠারশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দাজ্জাল যখন বের হবে তখন একজন ঈমানদার ব্যক্তি সম্মুখের দিক থেকে তার দিকে আসবে, দাজ্জালের প্রহরী ঐ মু'মিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? মু'মিন বলবে, ঐ ব্যক্তির নিকট যেতে চাই যে বের হয়েছে। প্রহরী বলবে, আমাদের প্রভুর প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? মু'মিন বলবে, আমাদের প্রতিপালকের নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই। প্রহরী বলবে, এ ব্যক্তিকে হত্যা কর। তখন তাদের মধ্যে একজন বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কি এ আদেশ দেননি যে আমার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করবে না। একথা শ্রবণ করে ঐ প্রহরী মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না; বরং তাকে নিয়ে দাজ্জালের নিকট চলে যাবে। মু'মিন দাজ্জালকে দেখেই বলবে, হে লোক সকল! এই হলো সে দাজ্জাল যার সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন। তখন দাজ্জাল আদেশ দেবে, এ লোকটির মাথা ভেঙ্গে দাও। হুকুম মোতাবেক লোকেরা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং ঐ ব্যক্তির উদর এবং পৃষ্ঠদেশ চিরে ফেলবে। দাজ্জাল বলবে, তুমি এখনো আমার প্রতি ঈমান আনবেনা? মু'মিন বলবে, তুমি প্রতারক, তুমি মিথ্যাবাদী। দাজ্জাল আদেশ দেবে একে করাত দিয়ে চিরে ফেল। দজ্জালের লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে শরীরের মধ্যখান দিয়ে চিরে ফেলবে। এরপর দাজ্জাল তার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে বলবে, উঠ মু'মিন জীবিত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মু'মিন জীবিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, দাজ্জাল তখন বলবে, এখন তো তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে। মু'মিন বলবে, এখন তো তোমার সম্পর্কে আমার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে তুই-ই দাজ্জাল। এরপর মু'মিন বলবে, হে লোক সকল! শোন, আমার পর এ দাজ্জাল আর কারো সঙ্গে এ ব্যবহার করতে পারবে না। দাজ্জাল ঐ মু'মিন ব্যক্তিকে জবাই করতে চেষ্টা করবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার গর্দানকে তাম্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে দেবেন, ফলে ছুরি বা তলোয়ার কার্যকর হবে না। যখন দাজ্জাল সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে তখন সে আদেশ দেবে, তার হাত-পা বেঁধে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। লোকেরা মনে করবে, দাজ্জাল তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছে। বাস্তব অবস্থা এই যে, সে জান্নাতে থাকবে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সে সবচেয়ে বড় শহীদ বলে পরিগণিত হবে। –[মুসলিম শরীফ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: ইস্পাহান নামক স্থানে সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে, আর তারা খুব মূল্যবান চাদর পরিহিত থাকবে অর্থাৎ তাদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হবে। –[মুসলিম শরীফ]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দজ্জাল মদীনা শরীফে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে কিন্তু মদীনা শরীফে প্রবেশ তার জন্যে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এজন্যে মদীনা শরীফের নিকটস্থ কোনো মরুভূমিতে সে অবতরণ করবে। এক ব্যক্তি যে তখন অত্যন্ত উত্তম হবে, মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে তার নিকটে পৌঁছবে, দাজ্জাল বলবে, আমি যদি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে দ্বিতীয়বার জীবিত করে দেই তবুও কি তোমরা আমার কথায় সন্দেহ করবে? লোকেরা বলবে, আল্লাহর শপথ! আজ থেকে অধিক পরিমাণে তোর সম্পর্কে আমার জ্ঞান কখনো হয়নি। দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে কিন্তু ব্যর্থ হবে। –বুখারী, মুসলিম

হযরত আবূ বকর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দাজ্জালের কোনো প্রকার প্রভাব মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করবেনা। সেদিন মদীনা মনাওয়ারার সাতটি দ্বার হবে। প্রত্যেক দ্বারে দু'জন ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দাজ্জাল একটি প্রাচ্য দেশ থেকে যাকে খোরাসান বলা হয়, বের হবে, তার অনেক অনুসারী থাকবে। –[তিরমিযী]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার মুকুটধারী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি দাজ্জালের অনুসারী হবে। লোকেরা তার পেছনে পেছনে চলতে থাকবে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সেদিন সত্তর হাজার ইহুদি মুকুটধারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাজ্জালের অনুসারী হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী ﷺ আমার গৃহে তশরিফ আনয়ন করেন, সেখানে দাজ্জালের আলোচনা হয়, তিনি ইরশাদ করেন, দাজ্জালের সম্মুখে তিন বছর এমন আসবে যে এক বছর তো আসমান থেকে তিন ভাগের একভাগ বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে, আর জমিনের এক তৃতীয়াংশে ফসল উৎপন্ন হবে না। দ্বিতীয় বছর দু'তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং জমিনেও ফসল দু'তৃতীয়াংশ কম উৎপন্ন হবে। আর তৃতীয় বছর এক ফোটা বৃষ্টিও হবে না এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সমস্ত জীব-জন্তু মারা যাবে। দাজ্জালের তরফ থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ফেতনা হবে যে, সে একজন গ্রাম্য ব্যক্তির নিকট যাবে এবং বলবে, যদি আমি তোমার উটগুলো জীবিত করে দেই, এরপরও কি তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মানবে না? সে গ্রাম্য ব্যক্তিটি বলবে, কেন নয়? তখন দজ্জাল শয়তানদেরকে উষ্ট্রের আকৃতি দেবে। এক ব্যক্তির ভ্রাতা এবং পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, দাজ্জাল সে ব্যক্তিকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা এবং ভ্রাতাকে জীবিত করে দেই তবু কি তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মানবেনা? সে বলবে, কেন নয়? তখন দাজ্জাল শয়তানদেরকে তার পিতা এবং ভ্রাতার আকৃতি দিয়ে উপস্থিত করবে। এ কথা বলার পর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর নিজস্ব কোনো কাজে তশরিফ নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন, লোকদেরকে দেখলেন যে, তারা চিন্তিত, তখন তিনি ঘরের দরজার পাল্লা ধরে জিজ্ঞেস করলেন, হে আসমা! কি হয়েছে! আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি দাজ্জাল সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা শুনে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, যদি সে আমার জীবদ্দশায় আসে তবে আমি তার মোকাবিলা করবো। অন্যথায় প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নেগাহবান। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আটা তৈরি করি কিন্তু রুটি তৈরির আগেই ক্ষুধার্ত হয়ে যাই। এমন পরিস্থিতিতে সেদিন মু'মিনদের কী অবস্থা হবে? তখন ﷺ ইরশাদ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার নামের তসবীহ পাঠ মু'মিনদের জন্যে যথেষ্ট হবে, যেমন আসমানের অধিবাসীদের জন্যে যথেষ্ট হয়। [অর্থাৎ রুটি, পানির তখন প্রয়োজনই হবে না]। –[আহমদ ও বাগভী]

হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে এত বেশি জিজ্ঞেস করেছি যা আর কেউ করেনি। হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমি আরজ করলাম লোকেরা বলে, দাজ্জালের সঙ্গে রুটির পাহাড় এবং পানির সমুদ্র চলমান থাকবে। তিনি তখন ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলার জন্যে এ কাজটি আরো সহজ।

"لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ ...... لَا يَعْلَمُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আপাতঃ দৃষ্টিতে আসমান-জমিনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা শতগুণে বড় স্বীকার করতে হয়। সুতরাং যে সর্বশক্তিমান আসমান-জমিনের ন্যায় বিশাল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এ ক্ষুদ্রায়তন মানুষকে প্রথম বারে অথবা মৃত্যুর পরে পুনরায় সৃষ্টি করতে বাধা কোথায়? তাজ্জবের বিষয় এমন সুস্পষ্ট সত্যকেও অনেকে বুঝতে পারে না।

এখানে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যেসব মহা সত্য মেনে নেওয়ার জন্য তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত কথা, তা মেনে নেওয়াতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। আর তাকে অমান্য করা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম পরকাল সম্পর্কিত আকীদাকে পেশ করে তার স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা এ আকীদার কারণেই সর্বাপেক্ষা বেশি আশ্চর্যন্বিত হয়েছিল। তাকে তারা দুর্বোধ্য ও অনুধাবনের অতীত মনে করেছিল।

এ আয়াতখানা পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার দলিল : যেসব ইসলামি আকীদার সাথে তৎকালীন কাফের-মুশরিকদের লালিত আকীদার সংঘর্ষ বেঁধেছিল এটা তাদের অন্যতম। কাফেরদের ধারণা ছিল মৃত্যুর পর মানুষের পুনরায় জীবিত হয়ে উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যে সব লোক এ ধরনের কথা-বার্তা বলে প্রকৃতপক্ষে তারা অজ্ঞ ও মূর্খ। তাদের যদি বুদ্ধি থাকত তথা যেই বুদ্ধি আছে তা যদি কাজে লাগাত, তাহলে এ কথা বুঝতে পারা তাদের জন্য মোটেই কঠিন হতো না যে, যে মহান আল্লাহ এই বিরাট বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি মোটেই কঠিন কাজ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمٰى ..... مَا تَتَذَكَّرُوْنَ" **আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর :** যারা আখেরাতের সম্ভাব্যতা, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার বিষয় অনুধাবন করতে পারে না– তারা মূলতঃ অন্ধ, তাদের জ্ঞান চক্ষুর আলো হারিয়ে গেছে। অপর পক্ষে যারা তা বুঝতে সক্ষম তারা হলো চক্ষুষ্মান। সুতরাং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কোনোদিন এক সমান হতে পারে না। তদ্রূপ ঈমানদার এবং কাফেরও সমপর্যায়ের হতে পারে না। মূলতঃ কাফেররা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে।

মোদ্দাকথা, একজন অন্ধ, যে সরল পথটিও দেখতে পায় না, আর একজন দৃষ্টি সম্পন্ন লোক যে স্বচক্ষে সরল-সঠিক পথ দেখে চলে, উভয় কি কখনো সমান হতে পারে? কিংবা ঈমানদার সাধু সজ্জন এবং অসৎ প্রবৃত্তির কাফের কখনো এক হতে পারে? যদি তা না হয় তাহলে একান্ত ন্যায়বিচারের খাতিরেই একদা সকলকে পৃথক পৃথক শ্রেণিতে বিভক্ত করতঃ তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দান এবং প্রভেদ প্রকাশ করে দেওয়ার প্রয়োজন কোনো ন্যায়দর্শী বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই অস্বীকার করতে পারে না। বলাবাহুল্য এ অনিবার্য প্রয়োজনই কেয়ামতের এবং বিচারদিনের আয়োজনে বাধ্য করেছে।

"إِنَّ السَّاعَةَ ..... لَا يُؤْمِنُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, কেয়ামত অবশ্যই আসবে এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকজনই তা বিশ্বাস করে না।

আলোচ্য আয়াতখানা, কিয়ামতের সুস্পষ্ট দলিল। পূর্ববর্তী বাক্যে কেয়ামতের সম্ভাব্যতার উপর দলিল পেশ করা হয়েছিল। আর এ বাক্যে বলা হচ্ছে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

জ্ঞান, বিবেক ও ইনসাফের এটাই দাবি, পরকাল হতেই হবে। এটা না হওয়া বুদ্ধি-বিবেক ও ইনসাফের বিপরীত। মূলত যারা অন্ধভাবে জীবন-যাপন করে এবং নিজেদের খারাপ চরিত্র ও দুষ্কৃতিসমূহের দ্বারা আল্লাহর জমিনকে ফেতনা-ফ্যাসাদে ভরে দেয়। তারা তাদের এ অনাচারের কোনো খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে না, অপরদিকে দুনিয়ায় যারা চক্ষু খুলে চলাফেরা করে ও ঈমান এনে নেক আমল করে, তারা তাদের এ ভালো আচরণের কোনো ভাল ফল দেখা হতে বঞ্চিত থাকবে। কোনো বুদ্ধিমান মানুষই কি তা মেনে নিতে পারে? এটা তো সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের বিপরীত। সুতরাং এ কথাও মেনে নিতে হবে যে, পরকালে অস্বীকার করা সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফের বিপরীতই হবে। কেননা পরকাল না হওয়ার অর্থ ভালো-মন্দ সকল মানুষই মরে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। উভয় একইরূপ পরিণতির সম্মুখীন হবে। এতে কেবল জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইনসাফেরই বিরোধিতা হয় না, নৈতিক চরিত্রের ও মূল শিকড় কেটে যায়। কেননা ভালো ও মন্দ লোকের পরিণতি এক ও অভিন্ন হলে খারাপ চরিত্রের লোককেই বড় বুদ্ধিমান মেনে নিতে হয়। এ জন্য যে, সে মৃত্যুর পূর্বে সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নিয়েছে। অপরদিকে ভাল চরিত্রের লোককে বড়ই নির্বোধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। কেননা সে খামাখাই নিজের উপর নানাবিধ নৈতিক বাঁধন চাপিয়ে নিয়েছে এবং নিজেকে তার অধীনে পরিচালিত করে নিজের জীবনকে অহেতুক কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে।

"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ الخ" **আয়াতখানার ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন, তোমরা অন্যান্যদের কেন ডাকতে যাবে, তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো স্বতন্ত্র ক্ষমতা কিংবা আদৌ ক্ষমতাই যাদের নেই, তাদের ডেকে কি লাভ? তোমরা শুধু আমাকেই ডাকো। আমারই কাছে তোমাদের মিনতি জানাও, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব। তোমাদের মিনতি মঞ্জুর করব, আর তা করার ক্ষমতা একমাত্র আমারই রয়েছে।

আল্লাহর দরবারে মিনতি এবং প্রার্থনাও তাঁর বন্দেগী তথা উপাসনার অন্তর্গত। যারা অহংকারের বশে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী হতে বিমুখ থাকে, তাদের কল্যাণ নেই, মঙ্গল নেই, তারা চরম অপমানের সঙ্গে জাহান্নামের কারাগারে প্রবেশ করবে।

দোয়ার হাকীকত : دُعَاءٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো, আহ্বান করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কখনো আল্লাহ তা'আলার সাধারণ স্মরণকেও দোয়া বলা হয়ে থাকে। অত্র আয়াত উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে। কেননা এতে উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে দোয়া করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে তা কবুল হওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি যারা দোয়া করবে না তাদেরকে আজাবের ভয় দেখানো হয়েছে।

হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে নিম্নোক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ" অর্থাৎ ইবাদতই হলো দোয়া আর দলিল স্বরূপ তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– "إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ الخ" অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত বা দোয়া হতে বিমুখ হয় তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হযরত কাতাদাহ (র.) কা'বে আহবার (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী যুগে এ বৈশিষ্ট্য নবীগণ (আ.)-এর জন্য খাস ছিল। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য একে আম [ব্যাপক] করে দেওয়া হয়েছে।

দোয়া এবং ইবাদতের তাৎপর্য : মূলত: দোয়া এবং ইবাদতের মর্ম কাছাকাছি, পাশাপাশি। আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে কিছু চাওয়া হলো দোয়া, আর আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মিনতি প্রকাশ করা হলো ইবাদত। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনের জন্যে শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করা, অন্যকোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করাই হলো বন্দেগীর পরিপূর্ণ রূপ।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজনের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার দরবারে চায় এমনকি, যদি তাদের জুতোর ফিতাও ছিড়ে যায় তা-ও তারা আল্লাহর কাছেই চায়। –[তিরমিযী শরীফ]

আর হযরত সাবেত বুনানীর (র.) বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি তারা লবণও আল্লাহ তা'আলার নিকটই চায়।

হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– দোয়া ইবাদত, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে– "اَلْكَرَمُ هُوَ التَّقْوٰى وَالْحَسَبُ هُوَ الْاِيْمَانُ"

[পরহেজগারীই সম্মান, পরহেজগারী ব্যতীত কোনো সম্মান নেই, আর ঈমানই হলো বংশ, ঈমান ব্যতীত কোনো বংশ পরিচয় নেই।]

আলোচ্য হাদীসেরও এ অর্থই হতে পারে (১) দোয়াই ইবাদত (২) ইবাদতই দোয়া। হয়তো এর তাৎপর্য হলো দোয়া এবং ইবাদতের মর্মকথা একই, কেননা প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক এবাদতেই থাকে দোয়া। আর দোয়া ও ইবাদতের যোগ্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ নয়, যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ"

'আর আপনার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করো না।'

যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার নিকট চাওয়ার স্থলে আমার প্রশংসায় মশগুল থাকে তাকে আমি সে ব্যক্তির চেয়ে বেশি দান করি যে আমার নিকট চেয়ে থাকে।

তিরমিযী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, [আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন] যে ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত আমার জিকির এবং আমার নিকট চাওয়া থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে এমন দান করি, যেটা যারা চেয়ে থাকে তাদের চেয়ে উত্তম হয়।

এ পৃথিবীতে মানুষ নানা প্রয়োজনের জিঞ্জিরে আবদ্ধ, তাই মানুষকে সর্বদা নিজের প্রয়োজনের আয়োজনে ব্যস্ত থাকতে হয়, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় কিন্তু তার গৃহীত ব্যবস্থা সর্বদা যে সফল হবে এমনও নয়, তাই কোনো উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যা একান্ত জরুরি তা হলো, ঐ একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করা। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভরসা করার শিক্ষা দিয়েছেন, কেননা প্রকাশ্যে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার সাফল্য-অসাফল্য নর্ভর করে আল্লাহ তা'আলার মর্জির উপর। অতএব, কোনো কাজের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা-তদবির যেমন জরুরি, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করাও একান্ত জরুরি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দোয়ার ফজিলত ও মাহাত্ম্য : হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দোয়া হলো ইবাদতের মগজ। –[তিরমিযী শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর দান প্রাপ্তির জন্যে আরজি পেশ কর, কেননা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যেন তাঁর নিকট আরজি পেশ করা হয়। আর উত্তম ইবাদত হলো আল্লাহ তা'আলার দানের অপেক্ষা করা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চায় না আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর এজন্যই আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ –

"নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে তারা অপমানিত অবস্থায় দোজখে প্রবেশ করবে।"

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: দোয়া করার ব্যাপারে দুর্বলতার পরিচয় দিও না, কেননা দোয়ার বর্তমানে আল্লাহ তা'আলা কাউকে ধ্বংস করেন না। –[ইবনে হাব্বান ও হাকেম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– দোয়া হলো মু'মিনের হাতিয়ার, দীন ইসলামের খুঁটি, আসমান ও জমিনের নূর। –[হাকিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যার জন্যে দোয়ার দুয়ার খোলা হয়েছে তার জন্যে রহমতের দুয়ারও খুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে যা কিছু চাওয়া হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো, সর্বপ্রকার বালা-মসিবত থেকে নিরাপত্তার জন্যে আরজি পেশ করা। –[তিরমিযী]

দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে যার জন্যে দোয়ার দরজা খোলা হয়েছে তার জন্যে কবুলিয়তের দরজাও খোলা হয়েছে। –[ইবনে আবি শায়বা]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল, যখন বান্দা হাত তুলে তাঁর কাছে কিছু চায়, তখন বান্দাকে শূন্য হস্তে ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, বায়হাকী]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যদি কোনো মুসলমান এমন দোয়া করে যাতে গুনাহের কোনো কথা না থাকে এবং কোনো আত্মীয়তার হক্ব বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা না থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বস্তুর একটি অবশ্যই দান করেন।

১. তার দোয়া অনতিবিলম্বে কবুল করা হয়।

২. অথবা আখেরাতে তাকে দান করার জন্যে তার দোয়া সংরক্ষিত থাকে।

৩. তার কাম্য বস্তুর সমান কোনো বিপদ তার উপর থেকে দূর করে দেওয়া হয়।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! যদি আমরা অনেক দোয়া করি তবুও আমরা এর বিনিময় পাব? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক কিছু আছে, তিনি অবশ্যই দান করবেন। –[আহমদ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যদি দোয়াতে গুনাহ অথবা আত্মীয়তার হক্ব নষ্ট করার কোনো কথা না থাকে তবে বান্দার দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। তবে শর্ত হলো সে যদি দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া না করে। আরজ করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! এ পর্যায়ে তাড়াহুড়া করার তাৎপর্য কি? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, বন্দা বলতে থাকে, আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি (অর্থাৎ বার বার দোয়া করেছি) কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখি না। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়। (অর্থাৎ দোয়া অব্যাহত রাখা জরুরি, কখনো কাম্য বস্তুর জন্যে তাড়াহুড়া করা সমীচীন নয়। যখন আল্লাহ তা'আলার মর্জি হবে তখনই তিনি দান করবেন। –[মুসলিম শরীফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– দোয়া সেই বিপদাপদের ব্যাপারেও উপকারী হয় যা এখনও আপতিত হয়নি তবে ভবিষ্যতে হবে। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা সর্বদা দোয়া করতে থাক। –[তিরমিযী শরীফ]

ইমাম আহমদ (র.) হযরত মা'আজ ইবনে জাবাল এবং হযরত জাবের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করে আল্লাহ তা'আলা তার আরজি কবুল করেন, অথবা তার দোয়ার সমান কোনো বিপদ দূর করে দেন। অবশ্য এর জন্যে শর্ত রয়েছে, দোয়াতে যেন কোনো গুনাহের কথা না থাকে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্ট করারও কোনো কথা না থাকে। –[তিরমিযী]

যাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয় : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তিনটি দোয়া কবুল হয়, যে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ১. পিতার দোয়া (সন্তান-সন্ততির জন্যে), ২. মজলুমের দোয়া (জালেমের বিরুদ্ধে), ৩. মুসাফিরের দোয়া। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না।

১. রোজাদারের দোয়া, ইফতারের সময়।

২. ন্যায়বিচারক রাষ্ট্রনায়কের দোয়া।

৩. মজলুমের দোয়া। মজলুমের বদদোয়া মেঘমালার উপর উঠানো হয়, তার জন্যে আসমানের দুয়ার খুলে দেওয়া হয়। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমার ইজ্জতের শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো যদিও কিছু সময় পরে হোক। –[তিরমিযী]

হযরত আবূ দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: কোনো মুসলমান তার মুসলমানের ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে যে দোয়া করে তা কবুল হয়। যখন সে তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্যে দোয়া করে তখন তার নিকটবর্তী ফেরেশতা আমীন বলে অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলা যেন তাই করে দেন আর তোমার জন্যেও এমনটি যেন হয়।

–[মুসলিম শরীফ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন: কয়েকটি দোয়া কবুল হয়ে থাকে যেমন– ১. মজলুমের দোয়া প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত, ২. হাজীর দোয়া বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত, ৩. রুগ্ন ব্যক্তির দোয়া সুস্থ হওয়া পর্যন্ত, ৪. কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে। এরপর তিনি ইরশাদ করেছেন– সর্বাধিক শীঘ্র যে দোয়া কবুল হয় তা হলো, কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে অন্য মুসলমান ভাইয়ের দোয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: সর্বাধিক শীঘ্র যে দোয়া কবুল হয় তা হলো, কোনো অনুপস্থিত মুসলমান ভাইয়ের জন্যে দোয়া। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

দোয়া কবুল হওয়ার শর্তসমূহ :

১. পানাহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে হারাম বস্তুসমূহ পরিহার করা এক কথায় যাবতীয় বিষয়ে হারাম পন্থা পরিহার করা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: মানুষ সুদীর্ঘ সফর করে, তার চুল থাকে এলোমেলো, বালু মিশ্রিত, এমন অবস্থায় সে আসমানের দিকে হাত তুলে এবং বলে, হে পরওয়ারদেগার! হে পরওয়ারদেগার! কিন্তু তার খাবার হারাম পন্থায় অর্জিত, পোষাক পরিচ্ছদও হারাম পন্থায় রোজগার করা এবং তার প্রতিপালনও হয়েছে হারাম রোজগার দ্বারা। এমন অবস্থায় দোয়া কিভাবে কবুল হবে? –[মুসলিম শরীফ]

২. দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে আরেকটি শর্ত হলো, দোয়ার সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে মনকে হাজির করতে হবে অর্থাৎ দোয়া শুধু মৌখিক হবে না; বরং তা আন্তরিক হতে হবে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস বা একীন নিয়ে দোয়া কর, মনে রেখ গাফেল অন্তরের দোয়া আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। -[তিরমিযী শরীফ]

৩. কোনো ব্যাপারে দোয়া করতে হলে বিষয়টি সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দোয়া করে, সে যেন এভাবে না বলে, 'হে আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে মাফ করে দিও'; বরং সংকল্পের সুদৃঢ়তা বজায় রেখে পূর্ণ একীন নিয়ে এবং মনের আগ্রহ নিয়ে দোয়া করবে [অর্থাৎ এ বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন।] কেননা আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দান করেন তা তাঁর নিকট বড় কিছু হয় না। -[মুসলিম শরীফ]

দোয়ার আদব : হযরত ফোজালা ইবনে ওবায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী ﷺ মসজিদে অবস্থান করেছিলেন, এক ব্যক্তি আগমন করল এবং নামাজ আদায়ের পর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিও এবং আমার প্রতি রহম কর। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে নামাজি! তুমি (দোয়া করার ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করে ফেলেছ, যখন তুমি নামাজ আদায় করলে, এরপর বসে যাবে, এরপর আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির উল্লেখ করে তুমি তাঁর শানে হামদ পেশ করবে, এরপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে, এরপর তুমি দোয়া করবে। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুক্ষণ পর অন্য এক ব্যক্তি এসে নামাজ আদায় করল, নামাজ আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ পেশ করল, এরপর নবী করীম ﷺ -এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করল, তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার দোয়া কবুল করা হবে। -[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নামাজ আদায় করেছিলাম, যখন আমার নামাজের শেষ বৈঠক পূর্ণ করলাম, তখন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার শানে হামদ পেশ করলাম, এরপর নবী করীম ﷺ -এর প্রতি দরূদ পেশ করে দোয়া করলাম, তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন- তোমার যা ইচ্ছা দরবারে এলাহীতে চাও তোমাকে দান করা হবে।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, আসমান জমিনের মধ্যে দোয়াকে থামিয়ে রাখা হয় যতক্ষণ তুমি প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি দরূদ পাঠ না কর, দোয়ার কোনো অংশ উর্ধ্বে গমন করে না। -[তিরমিযী]

হযরত মালেক ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া কর তখন হাতকে ছেড়ে দোয়া করবে, হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে দোয়া করো না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তোমরা হাত খুলে দোয়া কর, হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে দোয়া করো না। আর দোয়া শেষ করে দু'হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নিও।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ দোয়াতে উভয় হাত উঠাতেন, যতক্ষণ মুখমণ্ডলে হাতগুলো ফিরে না নিতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হাত নিচে নামাতেন না। -[তিরমিযী শরীফ]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ অর্থপূর্ণ ভাষায় দোয়া করা পছন্দ করতেন, আর অন্য শব্দগুলো পরিহার করতেন। -[আবূ দাঊদ শরীফ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ দোয়ার সময় এতখানি হাত উঠাতেন যে দু'বগলের সাদা অংশ দেখা যেত।

সায়েব ইবনে এজিদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দোয়া করতেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে মুখমণ্ডল মুছে নিতেন।

হযরত ইকরামা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দোয়ার অবস্থা হলো এই, তোমরা দোয়ায় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলবে। -[আবূ দাঊদ শরীফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, (দোয়াতে) নির্দিষ্ট স্থানের উপর হাত তোলা বিদআত। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বক্ষ বরাবর হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন, তদূর্ধ্বে উত্তোলন করতেন না।

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ যদি কারো নাম উল্লেখ করতেন তবে তার জন্যে দোয়া করতেন। এ পর্যায়ে শুরুতে নিজের জন্যে দোয়া করতেন। -[তিরমিযী]

قَوْلُهُ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের প্রতি আমরা কুরবান হয়ে যাই যে, তিনি আমাদেরকে দোয়া করার হেদায়েত করেছেন এবং দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ জন্যে বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) নিজের দোয়ায় একথা বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি সেই পবিত্র সত্তা, যার দরবারে ঐ বান্দা প্রিয় যে অধিক পরিমাণে দোয়া করে। আর সে বান্দা অপ্রিয় যে দোয়া করে না অথচ মানুষের চরিত্র হলো এই যে, তার নিকট চাওয়া হলে সে অসন্তুষ্ট হয়।

হযরত কাব আহবার (রা.) বর্ণনা করেন, এ উম্মতকে তিনটি এমন জিনিস দান করা হয়েছে যা অন্য কোনো উম্মতকে ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার উম্মতের উপর সাক্ষী হিসেবে থাক, কিন্তু সমগ্র মানব জাতির উপর আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে সাক্ষী করেছেন। পূর্বকালের নবীগণকে বলা হতো যে, দীন ইসলামে কোনো সংকীর্ণতা নেই আর এ উম্মতকে বলা হয়েছে, তোমাদের ধর্মে কোনো ক্ষতিকর কিছু নেই। প্রত্যেক নবীকে বলা হতো, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাক কবুল করবো কিন্তু এ উম্মতকে বলা হয়েছে তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

আবূ ইয়া'লাতে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলেছেন যে, চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তন্মধ্যে একটি আমার জন্যে এবং একটি আপনার জন্যে, আর একটি আপনার এবং আমার মধ্যে। আর একটি হলো আপনার এবং অন্যান্য বন্দাদের মধ্যে। যে চরিত্রটি বিশেষ করে আমার জন্যে তা হলো শুধু আমারই বন্দেগী কর, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না। আর যা শুধু আপনার তা হলো, আপনার প্রত্যেক ভালো কাজের আমি পরিপূর্ণ বদলা দেব। আর যা আমার এবং আপনার মাঝে রয়েছে তা হলো আপনি দোয়া করবেন, আমি কবুল করবো। আর যে চরিত্রটি আপনার এবং আমার অন্যান্য বান্দাদের মধ্যে রয়েছে তা হলো, আপনি তাদের জন্যে তাই পছন্দ করবেন, যা নিজের জন্যে পছন্দ করেন। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন: দোয়া হলো ইবাদতের মূলকথা, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

মুসনাদে আহমদে আরেকখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেনা, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রাগান্বিত হন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা আনসারী (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর তরবারির খাপ থেকে একটি ছোট কাগজ বের হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, তুমি তোমার প্রতিপালকের রহমতের সময়গুলোর সন্ধান করতে থাক, হয়তো এমন সময় তুমি দোয়া করবে যখন তাঁর রহমত উপচে পড়বে। আর সে সুযোগে হয়তো তুমি এমন কল্যাণ লাভ করবে যার পর আর কখনো তোমার কোনো প্রকার আক্ষেপ থাকবে না।

উক্ত আয়াতখানা একটি হাদীসে কুদসীর বিরোধী, সুতরাং এর জবাব কি? অত্র আয়াত- "اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ الخ" -এর মধ্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করার জন্য বলা হয়েছে এবং যারা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করা হতে বিমুখ থাকে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।

অথচ হাদীসে কুদসীতে এসেছে- "مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِىَ السَّائِلِيْنَ" অর্থাৎ যে আমার নিকট প্রার্থনা করা হতে বিমুখ থেকে আমার স্মরণে মশগুল থাকে আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের হতে উত্তম বস্তু দান করি।

আপাতঃদৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াত ও উক্ত হাদীসখানা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মনে হয়। কিন্তু মূলত এদের মধ্যে কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। মুফাস্সিরগণ নিম্নোক্তভাবে আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার বাহ্যিক বিরোধ অবসানের চেষ্টা করেছেন :

১. উক্ত আয়াতে দোয়া দ্বারা মূলত ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং জালালাইনের মুফাসসির (র.) "اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ" -এর তাফসীরে বলেছেন- "اُعْبُدُوْنِىْ اُثِبْكُمْ" তোমরা আমার ইবাদত কর, আমি তোমাদের ছাওয়াব দান করব। অপরদিকে উল্লিখিত হাদীসে কুদসীতে যেই 'ذِكْر' বা স্মরণের কথা বলা হয়েছে তাও ইবাদত। অতএব, আয়াত ও হাদীসের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই।

২. আর যদি আয়াতে "اُدْعُوْنِىْ" -এর দ্বারা দোয়ার অর্থও গ্রহণ করা হয়, তাহলে বলা যেতে পারে যে, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা ওয়াজিব মনে হলেও মূলতঃ দোয়া করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব- এটাই ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত। তবে এ আয়াতে যে দোয়া পরিত্যাগকারী জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে নিজেকে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী মনে করে দাম্ভিকতার সাথে তাঁর নিকট দোয়া করা হতে বিরত থাকে। এটা কুফরের আলামত। এ কারণেই সে জাহান্নামী হবে।

মোটকথা, দোয়া- যা মোস্তাহাব- তা হতে আল্লাহর স্মরণে মশগুল ও বিভোর থাকা অবশ্যই উত্তম। কেননা আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণের মাধ্যমে মা'রিফাতে ইলাহী তথা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা যায়। তবে তা হলো বিশেষ স্তরের লোকদের জন্য যারা আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী- 'আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য তাদের জন্য। অন্যথায় আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করাই উত্তম। উদাহরণতঃ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করার পরিবর্তে তাঁর ধ্যানে তপস্যায় রত ছিলেন। কিন্তু এখন বিপদে আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকদের দোয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অহঙ্কারের ভয়াবহ পরিণতি : যারা অহঙ্কারের কারণে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে চরম অপমানিত অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের জন্যে কঠিন অপমানজনক শাস্তি অবধারিত। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ পর্যায়ে মুসনাদে আহমদে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন অহঙ্কারী লোকদেরকে পিপীলিকার মতো করে একত্রিত করা হবে। দোজখের "বালাওস" নামক কারাগারে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। জ্বলন্ত অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। অন্য দোজখীদের শরীরের পুঁজ, মল-মূত্র তাদেরকে ভক্ষণ করতে দেওয়া হবে। এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে, আমি রুমে কাফেরদের হাতে বন্দী ছিলাম। একদিন আমি একটি গায়েবী আওয়াজ শ্রবণ করলাম যা পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ার দিক থেকে ভেসে আসছিল।

'হে আল্লাহ! আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার মারেফাত হাসিল করা সত্ত্বেও অন্যদের কাছে আশা করে।'

'হে আল্লাহ! আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও অন্যের কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলে।'

একটু পর পুনরায় উচ্চারিত হয়, 'আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার মারেফাত হাসিল করা সত্ত্বেও অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এমন কাজ করে যাতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।' একথা শ্রবণ করে ঐ বুজুর্গ বলেন, আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করি, তুমি কে? জিন না মানুষ? জবাব আসে আমি মানুষ, তুমি সে সব দিক থেকে তোমার ধ্যান পরিবর্তন কর যা তোমার জন্যে উপকারি হবে না, আর এমন কাজে মশগুল হও যা তোমার কাজে আসবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦١. اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِسْنَادُ الْاِبْصَارِ اِلَيْهِ مَجَازِىٌّ لِاَنَّهُ مُبْصَرٌ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ اللّٰهَ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

৬১. তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রশান্তির জন্য রাত্রিকে সৃষ্টি করেছেন আর দিনকে উজ্জ্বল করেছেন। দিনের দিকে اِبْصَارْ -এর নিসবত রূপকার্থে করা হয়েছে কেননা, এটা (مُبْصَرٌ) দৃষ্টিদানকারী নয়; বরং এতে দৃষ্টিদান করা হয়- দেখা হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর অতিশয় অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষগুলো শুকরিয়া আদায় করে না – আল্লাহর, যদ্দরুন তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।

٦٢. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ م لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ فَكَيْفَ تُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ مَعَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ.

৬২. তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রভু– সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তবু তোমরা কোথা হতে ফিরে যাও? সুতরাং দলিল-প্রমাণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তোমরা কিভাবে ঈমান হতে বিমুখতা প্রদর্শন করছ।

٦٣. كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ اَىْ مِثْلَ اَفْكِ هٰؤُلَاءِ اُفِكَ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ مُعْجِزَاتِهٖ يَجْحَدُوْنَ.

৬৩. এমনিভাবে তারা ফিরে গিয়েছিল অর্থাৎ এদের ন্যায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল (ঈমান হতে) যারা আল্লাহর আয়াত তথা তাঁর মোজেজাসমূহকে অস্বীকার করত।

٦٤. اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً سَقْفًا وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

৬৪. তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে স্থিতি লাভের স্থান বানিয়েছেন এবং আসমানকে বানিয়েছেন গম্বুজ স্বরূপ– ছাদস্বরূপ যিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন। সুতরাং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। আর যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসসমূহের রিজিক দান করেছেন। সেই আল্লাহই তোমাদের রব। বিশ্বলোকের প্রভু সেই আল্লাহ অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা।

٦٥. هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ اُعْبُدُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط مِنَ الشِّرْكِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, কাজেই তাঁকেই আহ্বান করো– তাঁর ইবাদত করো। তাঁর জন্য দীনকে নির্ভেজাল করতঃ শিরক হতে বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

তাহকীক ও তারকীব

فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ আয়াতাংশে صُوَرْ শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী– فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ -এর صُوَرْ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. صِوَرْ -এর ص অক্ষরটি যেরযোগে হবে। এটা আবূ রাজীন ও আশহাব, আকীলী (র.)-এর কেরাত।

২. صُوَرْ -এর ص অক্ষরটি পেশযোগে হবে। এটা জমহুর ক্বারীগণের কেরাত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ ..... لَا يَشْكُرُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : অনন্ত অসীম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির আরাম এবং বিশ্রামের জন্যে, তার সুখ-শান্তির জন্যে রাতকে সৃষ্টি করেছেন, এমনিভাবে দিনকে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ দিনের আলোতে নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয় এবং জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিনের আলোতে সে চলাফেরা করতে পারে। সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কারণে স্বাভাবিকভাবেই সে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়, এ ক্লান্তি দূর করার জন্যে চাই একটু অখণ্ড বিশ্রাম, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা মানুষের সে বিশ্রাম এবং সুখ-শান্তির জন্যে সৃষ্টি করেছেন রাত। অতএব, মানব মনে আল্লাহ তা'আলার এসব দানের উপলব্ধি থাকা উচিত এবং আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে এসব নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– "اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ" 'নিশ্চয় মানুষ বড় জালিম, বড়ই অকৃতজ্ঞ।' তবে সবাই যে, জালিম এবং অকৃতজ্ঞ তা-ও নয়; বরং সামান্য সংখ্যক লোক আল্লাহ তা'আলার দরবারে শোকরগুজার থাকে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ 'আর অতি সামান্য সংখ্যক লোকই শোকরগুজার।'

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

১. এতে রাত্র ও দিনকে তাওহীদের দলিল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কেননা এর নিয়ামত আসা-যাওয়ায় প্রমাণ করে যে, পৃথিবী ও সূর্যের উপর একই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সংস্থাপিত। এ দুটি আবর্তন মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সে এক আল্লাহই এ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি পূর্ণ যৌক্তিকতা ও বিচক্ষণতার সাথে এ বিশ্ব ব্যবস্থাকে এমনভাবে বানিয়েছেন যে, তা তাঁর সৃষ্টি সব জীবের জন্যে কল্যাণকর হয়েছে।

২. এতে আল্লাহকে অস্বীকারকারী ও আল্লাহর সাথে শিরককারী মানুষকে দিনরাতের এ বিরাট নিয়ামত সম্পর্কে অনুভূতি দেওয়া হয়েছে। মানুষ এ নিয়ামত হতে কল্যাণ লাভ করেও দিনরাত তাঁর সাথে গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এটা যে কত বড় নাশুকরির ব্যাপার তা বুঝানো হয়েছে।

মানুষের কর্তব্য : মানুষের এ জীবন ও জীবনের যথার্সবস্ব আল্লাহ তা'আলারই দান। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার দরবারে সর্বক্ষণ শোকরগুজার থাকা, কিন্তু মানুষ আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত দান নিয়ে ব্যস্ত, মহান দাতা সম্পর্কে উদাসীন। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তা'আলার অকৃতজ্ঞ, এটিই মানুষের দুর্ভাগ্য। আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– . "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ" অর্থাৎ যদি তোমরা আমার শোকরগুজার হও, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো। পক্ষান্তরে যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে মনে রেখো, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়, আর নাফরমানি ও অকৃতজ্ঞতায় শাস্তি অবধারিত হয়। এতদ্ব্যতীত শুধু দান নিয়ে ব্যস্ত হওয়া এবং দাতাকে ভুলে যাওয়া অভদ্রতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোকরগুজারির তাৎপর্য হলো, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার দানের কথা উপলব্ধি করা এবং রসনা দ্বারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তিনি তাঁর দান ব্যবহারের জন্যে যে রীতি-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, কখনো এর বরখেলাফ না করা।

"ذٰلِكُمْ رَبُّكُمْ .... يَجْحَدُوْنَ" **আয়াতদ্বয়ের বিস্তারিত তাফসীর :** পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– দিবারাত্রির সৃষ্টি মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। যদি শুধু দিন বা শুধু রাত হতো তবে মানুষের কত অসুবিধা হতো তা ভাবতেও কষ্ট হয়। আর শুধু দিবারাত্রিই নয়; বরং মানুষের জীবন ও জীবনের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার দান। অতএব, শুধু এক আল্লাহ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তা'আলার বন্দেগি করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য, তাই এ আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

এই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, তিনিই ভাগ্য নিয়ন্তা, তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগি করো। এমন অবস্থায় তোমরা তাঁর ইবাদত না করে কোথায় চলে যাচ্ছ? তোমরা কিভাবে বিপথগামী হও? কিভাবে তাঁর সঙ্গে শরিক কর? যিনি তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি তোমাদের জীবনের যাবতীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন, যাঁর অফুরন্ত নিয়ামত তোমরা ভোগ করে চলেছ, এ সমস্ত নিয়ামতের দাবি হলো তোমরা শুধু এক আল্লাহ তা'আলারই বন্দেগি করবে, তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, কিন্তু তোমরা কিভাবে তাঁর নাফরমানি কর? কিভাবে তাঁর স্থলে অন্যকিছুকে উপাস্য মনে কর? মূলত যারা আল্লাহ তা'আলার কথাকে অস্বীকার করে তাদের নিজেদের হস্তে নির্মিত মূর্তির সম্মুখে তারা মাথা নত করে, যা কোনো কিছুকেই সৃষ্টি করে না; বরং নিজেই অন্যের (সৃষ্টির) সৃষ্টি; এমন অসহায় বস্তুর সম্মুখেও মানুষ মাথানত করে। এর চেয়ে লজ্জার, অপমানজনক এবং দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হতে পারে?

"اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ .... رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার এমন নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে যা সমগ্র মানব জাতি ভোগ করে এবং যে নিয়ামতসমূহ সকলেই দেখতে পায়, ফলে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা সহজ হয় তাই ইরশাদ হচ্ছে–

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বাসোপযোগী করেছেন, এটি মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। যদি মাটি কাঁদার ন্যায় নরম হতো অথবা পাথরের ন্যায় শক্ত হতো, তবে মানুষ তাতে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করতে সক্ষম হতো না।

বস্তুত জমিনকে আল্লাহ তা'আলা ফরাশের মতো বিছিয়ে রেখেছেন এবং পাহাড়গুলোকে তার উপর বসিয়ে দিয়েছেন যাতে করে জমিন স্থবির থাকে। কেননা জমিনের নিচে পানি রয়েছে, তরীর মতো সে নড়াচড়া করত। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির বাসোপযোগী করার লক্ষ্যে জমিনের উপর পাহাড় রেখে তাকে স্থির-নিশ্চল করে রেখেছেন, যেন মানুষ তার উপর আবাসস্থল নির্মাণ করতে পারে, চলাফেরা করতে পারে, বিশ্রাম করতে পারে, রাতের বেলা সুখ-নিদ্রায় বিভোর হতে পারে এবং দিবাভাগে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, শুধু তাই নয়; বরং হে মানব জাতি! উপরের দিকে তাকাও, লক্ষ্য কর কিভাবে আল্লাহ তা'আলা নীলাভ আকাশকে গম্বুজের ন্যায় তৈরি করে রেখেছেন, এর জন্যে কোনো খুঁটি ব্যবহার করা হয়নি, আল্লাহ তা'আলার কুদরতি হাতেই বিশাল বিস্তৃত আসমানকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন যাকে মানুষের জন্যে ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আর তাতেই তিনি রেখে দিয়েছেন দীপ্তিময় সূর্য, আলোকময় চন্দ্র এবং অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জও। আর ঐ আসমান থেকেই মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলা বারি বর্ষণ করেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমেই মেঘমালা আকাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে, যখন যেখানে নির্দেশ হয়, সেখানেই বারি বর্ষিত হয়। এসব কিছু মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামতসমূহের কয়েকটি মাত্র যা দেখে মানুষ এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনতে পারে এবং তাঁর প্রতি শোকরগুজার হতে পারে।

আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং অতি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কত সুন্দর, সুশৃঙ্খলভাবে সঠিক স্থানে স্থাপন করেছেন।

মানুষের সৃষ্টি-সৌন্দর্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– "لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ" 'নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে।'

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একথা বলে তালাক দিয়েছিল, যদি তুমি চন্দ্র থেকে সুন্দরী না হও, তবে তোমাকে তিন তালাক। তদানীন্তন কালের ওলামায়ে কেরাম এ মত প্রকাশ করলেন যে, একথা দ্বারা ঐ ব্যক্তির স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। কিন্তু সে জমানার সুবিখ্যাত আলিম ইমাম শাফিয়ী (র.) বললেন, না একথা দ্বারা তার স্ত্রী তালাক হয়নি। তিনি দলিল হিসেবে এ আয়াত পেশ করলেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে মানুষ যে চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর একথা প্রমাণিত হয়। অতএব, তার স্ত্রী তালাক হয়নি।

Free @ www.eilm.weebly.com

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তিনি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, আর এমন সুন্দর আকর্ষণীয় আকৃতি অন্য কোনো সৃষ্টিকে তিনি দান করেননি। এজন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মানুষের শোকরগুজার হওয়া কর্তব্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ ..." 'আর আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।' সমস্ত সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মানুষ হাত দিয়ে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে এবং এরপর মুখে পুরে দেয়। খাদ্য গ্রহণের জন্যে তার মাথা নত করতে হয় না, অথচ সমস্ত প্রাণীজগত তার মুখ দিয়েই খাদ্য গ্রহণ করে এবং এজন্যে মাথাকে নত করতেই হয় কিন্তু মানুষের বেলায় তা হয় না। এটি একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এ জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে শোকর আদায় করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারাতে ইরশাদ করেন- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ...... الخ হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের বন্দেগি কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও। হয়তো তোমরা পরহেজগারী অবলম্বন করবে। সেই প্রতিপালক, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্যে বিছানা এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন আর আসমান থেকে তিনি বারিবর্ষণ করেছেন। আর তা দ্বারা তিনি তোমাদের উপজীবিকা হিসেবে ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা এসব কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কোনো কিছুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করো না। তিনিই মহান আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রতিপালক, আর কত মহান বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা, সমগ্র সৃষ্টি জগতকে তিনিই লালন-পালন করেন, সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই, মাহাত্ম্য তাঁরই, সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই।

"هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ...... الْعٰلَمِيْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। প্রকৃত ও মূল জীবন তো তাঁরই। তিনি স্বজীবিত, নিজ শক্তি বলে চিরঞ্জীব। অনাদি, অনন্ত, অবিনশ্বর। তিনি ছাড়া অন্য সবের জীবন প্রদত্ত জিনিস, তা অস্থায়ী, মৃত্যুশীল ও ধ্বংসমুখী।

فَادْعُوْهُ الخ উপরে যে দাবি পেশ করা হয়েছে তার আলোকে এ সত্য কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে দীন শব্দের অর্থ হলো- এমন ধর্মনীতি, পদ্ধতি ও আচরণ যা মানুষ কারো উচ্চতর কর্তৃত্ব মেনে কারো আনুগত্য কবুল করে গ্রহণ করে।" আর দীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে তাঁর বন্দেগি করার অর্থ হলো- আল্লাহর বন্দেগির সাথে অপর কারো বন্দেগিকে শামিল করবে না; বরং উপাসনা একমাত্র তাঁরই করা হবে, ইবাদত শুধুমাত্র তাঁরই করতে হবে, তাঁরই হেদায়েত মেনে চলবে, তাঁরই বিধান ও আদেশ নিষেধ পালন করবে।"

আল্লাহ তা'আলার জন্য দীনকে খালেস করে তাঁদের বন্দেগি তোমাদেরকে করতে হবে। কেননা খালেস ও অবিমিশ্রিত বন্দেগি পাওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, অপর কেউ বন্দেগি পাওয়ার অধিকারী নয়, আল্লাহর সাথে তারও পূজা উপাসনা করা ও তার আইন মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো খালেছ ইবাদত করে, তবে সে নিতান্ত ভ্রমে নিপতিত। অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহর বন্দেগির সাথে অপরের বন্দেগি মিশায় তবে তাও সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ হবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো সেই হাদীস যা ইবনে মারদুইয়া ইয়াজিদুর রাক্কাশী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা নিজেদের ধন-সম্পদ এ উদ্দেশ্যে দান করি যেন আমাদের সুনাম-সুখ্যাতি হয়। তখন কি আমাদের কোনো ছওয়াব হবে? নবী করীম ﷺ বললেন না। লোকটি বলল, যদি আল্লাহর নিকট হতে ছওয়াব পাওয়া এবং দুনিয়ার সুখ্যাতি লাভ করা দুই-ই উদ্দেশ্য হয়? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন- "اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يَقْبَلُ اِلَّا مَنْ اَخْلَصَ لَهُ" আল্লাহ তা'আলা কোনো আমলই কবুল করেন না, যতক্ষণ না তা খালেসভাবে তাঁরই উদ্দেশ্যে হবে।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٦. قُلْ إِنِّىْ نُهِيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ دَلَائِلُ التَّوْحِيْدِ مِنْ رَّبِّىْ ز وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৬৬. হে রাসূল! আপনি বলুন! আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর [অর্থাৎ] তোমরা যাদের ইবাদত কর। আল্লাহ ব্যতীত। কেননা আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এসেছে– একত্ববাদের প্রমাণাদি– আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আর রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

٦٧. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ بِخَلْقِ أَبِيْكُمْ اٰدَمَ مِنْهُ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِيٍّ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ دَمٍ غَلِيْظٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا بِمَعْنٰى أَطْفَالًا ثُمَّ يُبْقِيْكُمْ لِتَبْلُغُوْآ أَشُدَّكُمْ تَكَامُلَ قُوَّتِكُمْ مِنَ الثَّلَاثِيْنَ سَنَةً إِلَى الْأَرْبَعِيْنَ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا بِضَمِّ الشِّيْنِ وَكَسْرِهَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ أَىْ قَبْلَ الْأَشُدِّ وَالشَّيْخُوْخَةِ فَعَلَ ذٰلِكَ بِكُمْ لِتَعِيْشُوْا وَلِتَبْلُغُوْآ أَجَلًا مُّسَمًّى وَقْتًا مَحْدُوْدًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ دَلَائِلَ التَّوْحِيْدِ فَتُؤْمِنُوْنَ.

৬৭. আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে তা হতে সৃষ্টি করার মাধ্যমে অতঃপর বীর্য হতে শুক্রকীট হতে এরপর রক্তপিণ্ড হতে জমাট রক্ত হতে তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকৃতিতে বের করেন– এখানে طِفْل (একবচনের) শব্দটি أَطْفَال (বহুবচন)-এর অর্থে হয়েছে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত রাখেন যাতে তোমরা পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যে পৌঁছতে পার। পরিপূর্ণ শক্তিতে উপনীত হতে পার। যা ত্রিশ হতে চল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে লাভ হয়ে থাকে। তারপর (তোমাদেরকে বৃদ্ধি দান করেন) যেন তোমরা বার্ধক্যে পৌঁছতে পার – এ স্থানে شُيُوْخًا শব্দটির শীন অক্ষরটি পেশবিশিষ্টও হতে পারে এবং যেরযোগেও হতে পারে। অবশ্য তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার পূর্বেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে– পূর্ণ শক্তিতে এবং বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বেই। তোমাদের সঙ্গে এরূপ করা হয়েছে যেন তোমরা সুখী জীবনযাপন করতে পার। আর এটা এজন্য যে, যাতে তোমরা (তোমাদের জন্য) নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত ওয়াক্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পার। আর যাতে তোমরা বুঝতে পার তাওহীদের প্রমাণাদির ফলে ঈমান গ্রহণ কর।

٦٨. هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ فَإِذَا قَضٰىٓ أَمْرًا أَرَادَ إِيْجَادَ شَىْءٍ فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا بِتَقْدِيْرِ أَنْ أَىْ يُوْجَدُ عَقِبَ الْإِرَادَةِ الَّتِىْ هِىَ مَعْنَى الْقَوْلِ الْمَذْكُوْرِ.

৬৮. তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং যখন তিনি কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (অর্থাৎ) কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন– তখন তিনি বলেন, হও, অমনি তা হয়ে যায়। فَيَكُوْنُ শব্দটির ن অক্ষরটি পেশবিশিষ্ট হবে। অথবা এর পূর্বে أَنْ উহ্য মেনে একে যবর যোগেও পড়া যাবে। অর্থাৎ ইচ্ছা করা মাত্রই হয়ে যায়। আর উল্লিখিত "كُنْ" -এর অর্থ হলো [মূলত] ইচ্ছা করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

"شُيُوْخًا" **শব্দের বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে :** আল্লাহ তা'আলার বাণী– "ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا" -এর মধ্যস্থিত شُيُوْخًا শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে–

১. জমহুর ক্বারীগণ শীন (ش) অক্ষরটির নিচে যের যোগে شِيُوْخًا পড়েছেন।

২. হজরত আবূ আমর ও নাফে প্রমুখ ক্বারীগণ "ش" -এর উপর পেশযোগে "شُيُوْخًا" পড়েছেন।

"فَيَكُوْنُ" **শব্দটির বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে :** আল্লাহর বাণী– "فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ" -এর "فَيَكُوْنُ" শব্দটির মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. জুমহুর ক্বারীগণ فَيَكُوْنُ -এর ن অক্ষরটিকে পেশযোগে পড়েছেন।

২. ইবনে আমের (র.) ن অক্ষরটিকে যবর যোগে فَيَكُوْنَ পড়েছেন। তারা فَا -এর পরে একটি اَنْ -কে উহ্য মেনে থাকেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ الخ" **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, শায়বা ইবনে রবীয়াহ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বললো, আপনি আপনার নতুন ধর্মের কথা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের বাপ-দাদার ধর্ম মেনে চলুন।' তখন এ আয়াত নাজিল হয়। –[তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড– ১০, পৃষ্ঠা– ৩৫৯]

তাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দেন যে, তোমরা যাদের পূজা কর, আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে আমাকে তাদের পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এসে গেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করার প্রশ্নই উঠেনা। আমার পক্ষে তাওহীদের সত্য মতবাদ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়, আমাকে শিরক থেকে দূরে থাকার এবং এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার তাবেদার বান্দা হয়ে জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই মানবতার উৎকর্ষ সাধন হয়।

পূর্বের সাথে "قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الخ" আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সামনে তাঁর কতিপয় গুণাবলির উল্লেখ করতঃ তাদেরকে খালেস ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং সারা জাহানের একমাত্র তিনিই প্রতিপালক তাও জানিয়ে দিয়েছেন।

আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যিনি রাব্বুল আলামীন, সারা জগতের পালনকর্তা, একমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে, তারই নিকট মাথানত করতে হবে। অন্য কারো ইবাদত করা চলবে না– অন্য কারো নিকট মাথানত করা যাবে না।

"قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ الخ" **আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর :** আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনি মক্কার মুশরিকদেরকে বলে দিন, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য নিদর্শনাদির উপস্থিতির পর তিনি ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত বন্দেগী করার প্রশ্নই উঠে না। এ কারণেই তা হতে দূরে থাকার এবং একমাত্র তারই অনুগত বান্দা ও তাবেদার হয়ে থাকার ও তদনুযায়ী জীবন-যাপন করার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও কোমল এবং সহজ সরল ভাষায় মুশরিক ও বিধর্মীদেরকে দেব-দেবীদের মোহ হতে সরিয়ে ঈমান ও একত্ববাদের দিকে আকৃষ্ট করা। অতএব, তাদের দেব-দেবীদের প্রত্যক্ষ কোনো সমালোচনা না করে পরোক্ষভাবে তাদের ইবাদতে নবী করীম ﷺ -এর অপারগতার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'তাওহীদের অকাট্য দলিলাদি আল্লাহর পক্ষ হতে আমার নিকট পৌঁছে যাওয়ার পর কিভাবে আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তথাকথিত মাবুদের ইবাদতে মশগুল হতে পারি? আমাকে তো তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তোমরা যাদের ইবাদত করছ আল্লাহকে বাদ দিয়ে, তাদের উপাসনার পক্ষে কি আদৌ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবে? পারবে কি সামান্যতম যুক্তিরও অবতারণা করতে?

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে "هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ الخ" আয়াতের যোগসূত্র : পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাবি করা হয়েছে, গায়রুল্লাহর ইবাদত হতে বারণ করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে তার দলিল পেশ করা হয়েছে। মানুষের জন্ম বৃত্তান্তের ধারাবাহিকতার ইতিহাস ভুলে ধরে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটা কার কাজ। কে তোমাদের আদি পিতা আদম (আ.)-কে এক মুষ্টি মাটি হতে সৃষ্টি করেছিল? কে-ইবা এক ফোঁটা নাপাক বীর্য হতে হৃষ্ট-পুষ্ট তুল-তুলে একটি শিশু সৃষ্টি করে? কে এই দুর্বল শিশুটির গায়ে সিংহসম শক্তির যোগান দিয়ে তাকে সুন্দর-সুঠাম করে তোলে? আবার কে এত শক্তিধর লোকটিকে সম্পূর্ণ হীনবল করে বার্ধক্যে পৌঁছিয়ে দেয়? এ সব প্রশ্নের একমাত্র জবাব আল্লাহ। এ সব আল্লাহর কুদরত। কাজেই ইবাদত পাওয়ার যোগ্যও হবেন কেবল তিনিই; অন্য কেউ নয়।

"هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ .... وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির আদি ইতিহাসও সৃষ্টিতত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাই ইরশাদ হচ্ছে–

তিনিই আল্লাহ তা'আলা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন, আর অন্য মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়। এজন্যে যে, মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করে, ঐ খাদ্য দ্বারা রক্ত তৈরি হয়, আর ঐ রক্তকে আল্লাহ তা'আলা শুক্রে পরিণত করেন, আর শুক্র বিন্দু থেকে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেন। সে শুক্র বিন্দুকে তিনি প্রথমে জমাট রক্ত, পরে গোশত, অস্থি এবং চর্মে পরিণত করেন, এরপর তাতে মানবাকৃতি দান করেন, একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে তাকে মাতৃগর্ভ থেকে শিশুরূপে বের করে আনেন। কুরআনে কারীমের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা কথাটিকে এভাবে ইরশাদ করেছেন–

"وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ" –

'আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বের করে এনেছেন তোমাদের মায়ের উদর থেকে, এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতেনা, আর আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং অন্তর, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।'

আর শৈশবের পরে আসে কৈশোর, এরপর ঐ কিশোরই যৌবনে পদার্পণ করে। সে পূর্ণ শক্তি অর্জন করে, কিন্তু সে শক্তি চিরদিন স্থায়ী হয় না, একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পরই একজন যুবক বার্ধক্যে উপনীত হয়। তার সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে, এরই মধ্যে কারো মৃত্যুও হয়ে যায়, আর কেউ বার্ধক্যের দুর্বলতা, অসুস্থতাসহ জীবনের গ্লানি টেনে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো এই, মানুষ তার জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার অগণিতদানে ধন্য, এর কোনটি মানুষ অস্বীকার করতে পারে? এর কোনো পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো কোনো ভূমিকা রয়েছে কি? অবশ্যই নেই, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করা বা তাঁর সাথে শিরক করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর এজন্যে কুরআনে কারীমে শিরককে জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়– اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "নিশ্চয় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।" দ্বিতীয়তঃ মানুষের সৃষ্টি, তার ক্রমবিকাশ, তার উন্নতি, পরিবৃদ্ধি সবই এক আল্লাহ তা'আলারই নিয়ন্ত্রণাধীন, এতে অন্য কারো তো দূরের কথা, মানুষের নিজেরও কোনো হাত নেই।

মানুষের একান্ত কর্তব্য : অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। মানুষের আনুগত্যের সর্বপ্রথম হকদারই হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা, তাই মানুষ মাত্রকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয় আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আর এটিই ইসলাম। ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করাই হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। এটিই হলো পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা, আলোচ্য আয়াতে এ মহান শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে মানব-সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের মাধ্যমে। আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে তার অস্তিত্বের কথা, জীবন ও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থার কথা, তার প্রতি আল্লাহ তা'আলা মহান দানের কথা, যাতে করে মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ অনুগত ও কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। কিভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাজিল করেছেন। অতএব, পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে এবং এর উপর কিভাবে মানুষ আমল করবে তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বনবী ﷺ। তাই তাঁকে অনুসরণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এটিই মানব জীবনের সাফল্য লাভের একমাত্র পথ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

মানব জীবনের স্তরসমূহ : ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কাবীরের অত্র আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, মানব জীবনে তিনটি স্তর রয়েছে–

১. اَلْمَرْحَلَةُ الطُّفُوْلَةُ **[শৈশবকাল]** : এটা ব্যক্তি জীবনের প্রথম পর্যায়। এ সময় সে দ্রুত বাড়তে থাকে।

২. مَرْحَلَةُ بُلُوْغِ الْاَشُدِّ **[যৌবনকাল]** : এ পর্যায়ে সে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে– পূর্ণ বয়সে পৌঁছে। এ সময়ে সে পরিপূর্ণরূপে বাড়তে থাকে। এ বয়সে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায় না। একেই কুরআনে মাজীদে "لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ" বলা হয়েছে।

৩. اَلْمَرْحَلَةُ الشَّيْخُوْخَةُ **[বৃদ্ধকাল]** : এ স্তরে দুর্বলতা ও ঘাটতি প্রকাশ পায়। কুরআনে মাজীদে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে– "ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا"।

তবে দার্শনিকগণ আরো দুটি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে–

৪. اَلْمَرْحَلَةُ الْجَنِيْنَةُ **[উন্মেষকাল]** : এটা শৈশবের পূর্বেকার অবস্থা।

৫. اَلْمَرْحَلَةُ الْبَرْزَخِيَّةُ **[বরযখকাল]** : এটা মৃত্যুর পরবর্তী কাল হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

"وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى" **আয়াতাংশে "اَجَلٌ" [নির্দিষ্ট সময়] দ্বারা উদ্দেশ্য :** আলোচ্য আয়াতে "اَجَلٌ مُسَمًّى" বা নির্দিষ্ট সময়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর সময়, না হয় সেই সময় যখন সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

প্রথম অর্থে এর তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করায়ে সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিয়ে যান। যা তিনি প্রত্যেকের প্রত্যাবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেই নির্দিষ্ট সময় আগমনের পূর্বে সারাটি দুনিয়া একত্রিত হয়ে কাউকেও মারতে চাইলে মারতে পারবে না অপরদিকে সেই নির্দিষ্ট সময় এসে গেলে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে কাউকে জীবিত রাখতে চাইলে তা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে তার তাৎপর্য হবে, এ বিশ্বজগত এজন্য রচনা করা হয় নি যে, তোমরা মরে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে; বরং জীবনের বিভিন্ন স্তর হতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এজন্যে অগ্রসর করে নিয়ে যান যেন তোমরা সকলেই নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সম্মুখে হাজির হতে পার।

"هُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ..... فَيَكُوْنُ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার অপরিসীম কুদরতের বর্ণনা করেন। ইরশাদ হচ্ছে–

মানুষের জীবন ও মরণ এক কথায় সব কিছুই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর জন্যে কোনো কিছুই কঠিন নয়। এমনকি, মানুষের জীবন ও মৃত্যু বা কোনো কিছুই করতে তাঁকে আদৌ কোনো বেগ পেতে হয় না। আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা হলো এমন, তিনি কোনো কিছু করার ইচ্ছা করলে শুধু বলেন, 'হও', সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। এতটুকু বিলম্ব হয় না, এটিই তাঁর মহান কুদরতের অন্যতম জীবন্ত নিদর্শন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যেভাবে পৃথিবীতে মানুষকে জীবন দেওয়া এবং মৃত্যুমুখে পতিত করা অত্যন্ত সহজ, ঠিক এমনিভাবে মৃত্যুর পর মানুষকে নব জীবন দান করা এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাজির করাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষে আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। অতএব কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এজন্যে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন– وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ।

'আর তোমরা সে আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট অবশেষে তোমরা একত্রিত হবে।'

হযরত মুফাসসিরীনে কেরাম অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনটি বিকল্প ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে ক্রমধারা পরিবর্তনের বিষয়টি উপরে ব্যক্ত করা হয়েছে তা না মানুষের কোনোরূপ দৈহিক বিকৃতি সাধিত হবে আর নাই বা মানুষ ক্ষত-বিক্ষত ও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে। কেননা এটা সংঘটনের জন্য আল্লাহ তা'আলার কোনো হাতিয়ার বা অস্ত্রের প্রয়োজন পড়বে না; বরং "হয়ে যাও", বলা মাত্রই তা সৃষ্টি হয়ে যায়।

২. মানুষের জীবন ও মৃত্যু দানের ব্যাপারে আল্লাহকে কোনো শ্রমই স্বীকার করতে হয় না; বরং "হয়ে যাও" বললেই তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির যেই ধীর গতির কথা কুরআনে মাজীদে ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে তা হলো দৈহিক সৃষ্টি। কিন্তু তাতে মুহূর্তকালের মধ্যেই রূহ ফুঁকিয়ে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। অর্থাৎ এর জীবন দান ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র। "জীবন লাভ কর" বলা মাত্রই তা জীবিত হয়ে যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. যদিও মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে একটি ধীরগতি ও ধারাবাহিক স্তর বিন্যাসের ব্যবস্থা রেখেছেন. যেমন নর-নারীর মিলনের ফলে নারীর গর্ভে নরের বীর্য পৌঁছে এবং তা অনেকগুলো স্তর পার হয়ে একটি (প্রাণ সম্পন্ন) শিশুর আকারে বের হয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এর ব্যতিক্রম করতঃ "كُنْ" (হয়ে যাও) বলার মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন– মাতা-পিতা ব্যতীত হযরত আদম (আ.)-কে এবং পিতা ছাড়া হযরত ঈসা (আ.)-কে সৃষ্টি করতঃ প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও তিনি সৃষ্টি করতে পারেন– তা জগতকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

মুফাসসির (র.) طِفْلً -এর ব্যাখ্যা اَطْفَالً -এর দ্বারা কেন করেছেন? "ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا" আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ করেছেন– بِمَعْنَى اَطْفَالًا অর্থাৎ এখানে طِفْل (একবচনের) শব্দটি اَطْفَالْ (বহুবচন)-এর অর্থে হয়েছে।

এর কারণ হচ্ছে– طِفْل তৎপূর্ববর্তী يُخْرِجُكُمْ -এর كُمْ যমীরে মাফঊল হতে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে এমতাবস্থায় বের করেন যে, তোমরা তখন শিশু। নাহুর নিয়ম অনুযায়ী حَالْ ও ذُوالْحَالِ -এর বচন একরূপ হতে হয়। অর্থাৎ ذُوالْحَالِ একবচন হলে حَالْ ও একবচন হতে হয়। আর ذُوالْحَالْ বহুবচন হলে حَالْও বহুবচন হতে হয়। সুতরাং এখানে যেহেতু ذُوالْحَالْ তথা كُمْ যমীরটি বহুবচন, সেহেতু حَالْ তথা طِفْل ও বহুবচন (اَطْفَالْ)-এর অর্থে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ তা'আলা اَطْفَالْ না বলে طِفْل বললেন কেন? এর জবাব এই যে, طِفْل শব্দটি মূলত স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ এবং একবচন ও বহুবচন সকলের জন্য সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে এটা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে মজীদের অন্যত্রও এটা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ফরমান– وَالطِّفْلُ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا আর সেই সকল শিশু যারা বালেগ হয় নি।

শৈশব ও যৌবনের মেয়াদ কতটুকু? মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, ভূমিষ্ট হওয়ার পর হতে ছয় বৎসর পর্যন্ত হলো শৈশব কাল।

আর ত্রিশ হতে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পরিপূর্ণ শক্তির সময় তথা এ সময়ে যৌবনের পূর্ণতা লাভ ঘটে। একেই কুরআন মাজীদে اَشُدَّ বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٩. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ط الْقُرْاٰنِ اَنّٰى كَيْفَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ الْاِيْمَانِ .

৬৯. তুমি কি তাদেরকে দেখছ না যারা বিতর্কে লিপ্ত হয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অর্থাৎ কুরআনে কারীম সম্পর্কে কোথায় কিভাবে– ফিরে যাচ্ছে– ঈমান হতে।

٧٠. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ن مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالْبَعْثِ وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ عُقُوْبَةَ تَكْذِيْبِهِمْ .

৭০. যারা অস্বীকার করে কিতাবকে (অর্থাৎ) আল-কুরআন এবং অস্বীকার করে তাকেও যা সহ আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি– যেমন– একত্ববাদ, পুনরুত্থান ইত্যাদি। আর তারা হলো মক্কার কাফেররা। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তি– পরিণতি।

٧١. اِذِ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اِذْ بِمَعْنٰى اِذَا وَالسَّلٰسِلُ ط عَطْفٌ عَلَى الْاَغْلٰلِ فَتَكُوْنُ فِى الْاَعْنَاقِ اَوْ مُبْتَدَاٌ خَبَرُهٗ مَحْذُوْفٌ اَىْ فِىْ اَرْجُلِهِمْ اَوْخَبَرُهٗ يُسْحَبُوْنَ اَىْ يُجَرُّوْنَ بِهَا .

৭১. যখন তাদের গলায়ও শিকল-বেড়ি পরানো হবে– এখানে اِذْ শব্দটি اِذَا -এর অর্থে হয়েছে। আর শৃঙ্খল اَلسَّلَاسِلُ শব্দটি اَغْلَال -এর উপর আতফ হয়েছে। সুতরাং (এমতাবস্থায়) শৃঙ্খল ও গলায় পরানো হবে। অথবা, اَلسَّلَاسِلُ মুবতাদা এর খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ "فِىْ اَرْجُلِهِمْ" [তাদের পায়ে বেড়ি হবে।] অথবা, এর خَبَرٌ হলো পরবর্তী يُسْحَبُوْنَ অর্থাৎ [বেড়ি পরিয়ে] তাদেরকে টেনে নেওয়া হবে।

٧٢. فِى الْحَمِيْمِ اَىْ جَهَنَّمَ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ يُوْقَدُوْنَ .

৭২. ফুটন্ত পানিতে অর্থাৎ জাহান্নামে অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে পোড়ানো হবে।

٧٣. ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ تَبْكِيْتًا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ .

৭৩. এরপর তাদেরকে বলা হবে তিরস্কার করে যাদেরকে তোমরা [আল্লাহর সাথে] শরিক করতে তারা কোথায়?

٧٤. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط مَعَهٗ وَهِىَ الْاَصْنَامُ قَالُوْا ضَلُّوْا غَابُوْا عَنَّا فَلَا نَرَاهُمْ بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ط اَنْكَرُوْا عِبَادَتَهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ اُحْضِرَتْ قَالَ تَعَالٰى اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَىْ وَقُوْدُهَا كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِضْلَالِ هٰؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِيْنَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ .

৭৪. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত [অর্থাৎ] আল্লাহর সাথে। আর তারা হলো দেব-দেবীর প্রতিমাসমূহ। তারা বলবে তারা তো হারিয়ে গেছে– অদৃশ্য হয়ে গেছে আমাদের হতে সুতরাং আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না; বরং ইতঃপূর্বে আমরা কাউকে ডাকতাম না– তারা প্রতিমাপূজার কথা অস্বীকার করবে। অতঃপর তাদেরকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা [অন্যত্র] ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা ইবাদত কর জাহান্নামের ইন্ধন হবে। অর্থাৎ জ্বালানি হবে। তদ্রূপ অর্থাৎ এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে পথভ্রষ্ট করার ন্যায় আল্লাহ কাফিরদেরকে বিপথগামী করে থাকেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

٧٥. وَيُقَالُ لَهُمْ اَيْضًا ذٰلِكُمُ الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مِنَ الْاِشْرَاكِ وَاِنْكَارِ الْبَعْثِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ تَتَوَسَّعُوْنَ فِى الْفَرَحِ .

৭৫. তাদেরকে লক্ষ্য করে আরো বলা হবে- তোমাদের তা অর্থাৎ শাস্তি এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-অহঙ্কার করতে- যেমন শিরক করতে, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে আর এ কারণে যে, তোমরা আনন্দে বাড়াবাড়ি করতে- আনন্দ-ফুর্তিতে ডুবে থাকতে।

٧٦. اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ج فَبِئْسَ مَثْوَى مَأْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ .

৭৬. তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর তথায় চিরদিন থাকবে। সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল! বাসস্থান অহঙ্কারীদের তথা কাফেরদের।

তাহকীক ও তারকীব

"اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا" বাক্যাংশটুকু তারকীবে কি হয়েছে? আল্লাহর বাণী- "اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا" বাক্যাংশটুকুর তারকীবে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে-

১. এটা (اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا) পূর্ববর্তী اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ -এর بَيَانٌ হয়েছে।

২. বা اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ -এর صِفَتْ হয়েছে।

৩. এটা পূর্ববর্তী اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ -এর اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ হতে بَدَلْ হয়েছে?

৪. কিংবা اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ হতে ذَمْ (হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ) হয়েছে।

৫. অথবা, একটি উহ্য مُبْتَدَأْ (যেমন هُمْ) -এর خَبَرْ হয়েছে।

৬. اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ হলো মুবতাদা আর "فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ" হলো তার خَبَرْ -

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমোক্ত পাঁচটি অবস্থায় "فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ" স্বতন্ত্র বাক্য হবে।

"اَلسَّلَاسِلُ" -এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী "اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ" -এর মধ্যস্থিত اَلسَّلَاسِلُ শব্দটির মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা.) আবূ যাওয়া (র.) প্রমুখগণ اَلسَّلَاسِلَ -এর ل অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়েছেন।

২. কতিপয় কারীগণ ل অক্ষরটিকে যেরযোগে اَلسَّلَاسِلِ পড়েছেন।

৩. জুমহুর ক্বারীগণ اَلسَّلَاسِلُ শব্দটির ل অক্ষরটি পেশ-যোগে পড়েছেন। এমতাবস্থায় এটাই اَلْاَغْلَالُ -এর উপর আতফ হবে। অথবা, মুবতাদা কিংবা খবর হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ .... أَنّٰى يُصْرَفُوْنَ" আয়াতের শানে নুযূল : জমহুর মুফাসসিরীনে কেরামের মতে আলোচ্য আয়াতখানা মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং ইবনে জায়েদ হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, উক্ত আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পরবর্তী আয়াত খানাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। কেননা তাতে ইরশাদ হয়েছে– "اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَابِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ"

"যারা আল-কিতাবকে অস্বীকার করেছে এবং আমি রাসূলগণকে যেই সব আকীদা-বিশ্বাস সহ প্রেরণ করেছি তাদেরকেও অস্বীকার করেছে।"

এটা হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তারা হলো মক্কার মুশরিকরা। কেননা তারাই তো সরাসরি কুরআন মাজীদকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রাসূলে কারীম ﷺ যেসব তথ্যাদি নিয়ে এসেছেন বিশেষ করে তাওহীদ ও পুনরুত্থানকে তারা তা সরাসরি অস্বীকার করেছে।

কতিপয় মুফাসসিরে কেরাম যেমন ইবনে সীরিন, আবূ কুবায়েল ও ওকবাহ ইবনে আমের প্রমুখগণ বলেছেন যে, উক্ত আয়াত কাদরিয়াদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

ইবনে সীরিন (র.) বলেছেন যে, এটা যদি কাদরিয়াদের ব্যাপারে নাজিল না হয়ে থাকে তা হলে তা কাদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে তা আমি জানি না।

ওকবাহ ইবনে আমির বলেছেন, আয়াতখানা কাদরিয়াহ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

আবূ কুবায়েল (র.) বলেছেন যে, কাদরিয়ারাই (কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে) ঈমানদারদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, কাদরিয়াহ একটি বাতিল গোমরাহ দল। তারা তাকদীরকে অস্বীকার করে থাকে। রাসূলে কারীম ﷺ তাদের নিন্দা করে গিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে গিয়েছেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ সুবহানুহু উল্লিখিত আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ কে লক্ষ্য করে কাফের-মুশরিকদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

"হে রাসূল! আপনি কি তাদের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না যারা আল্লাহর আয়াত তথা কুরআনে কারীমের সম্পর্কে মিছামিছি বিতর্কে লিপ্ত হয়। তারা ঈমান হতে বিমুখতা প্রদর্শন পূর্বক কোথায় চলে যাচ্ছে?"

অর্থাৎ উপরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পরও কি তোমরা এ লোকগুলোর ভুল দৃষ্টি ও ভুল আচরণের মূল উৎস কোথায় এবং কোথায় মাখিয়ে এরা গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে তা কি তোমরা বুঝতে পার না?

প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও আল্লাহর নবী রাসূলগণের উপস্থাপিত আদর্শ-নীতি ও শিক্ষাকে মেনে না নেওয়া এবং আল্লাহর আয়াতসমূহে গভীর মনোনিবেশ ও দায়িত্বানুভূতি সহকারে চিন্তা-বিবেচনা করার পরিবর্তে ঝগড়াটে মনোভাব নিয়ে তার মোকাবিলা করা– এটাই হলো তাদের গোমরাহ ও বিপথগামী হওয়ার মূল কারণ। এটাই তাদের সরল-সঠিক পথে ফিরে আসার সকল সম্ভাবনাকে খতম করে দিয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য : উল্লিখিত আয়াত ও তৎপরবর্তী কয়েকটি আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো, যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে ঝগড়া এবং অযথা তর্ক-বিতর্ক করে তাদেরকে আখেরাতের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া এবং এরূপ অপকর্মের দরুন তাদেরকে নিন্দা জ্ঞাপন করা।

"اِذِ الْاَغْلَالُ فِيْ .... يُسْجَرُوْنَ" আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা : কেয়ামত দিবসে কাফের ও মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে এবং তা তারা প্রত্যক্ষ করবে– তারা এ ভয়াবহ পরিণতি তখন দেখতে পাবে, যখন কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের গলদেশে শিকল বেড়ি থাকবে, তাদেরকে জন্তুর ন্যায় দোজখের দিকে টেনে নেওয়া হবে, কখনো ফুটন্ত পানিতে আবার কখনো জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেছেন, দোজখের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে তখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এ কাফেরদেরকে দোজখের অগ্নির ইন্ধন বানানো হবে।

মোটকথা, কাফেরদেরকে দোজখে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে, কখনো ফুটন্ত পানিতে, আবার কখনো জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যদি সীসা নির্মিত কোনো গোলা আসমান থেকে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়, যার দূরত্ব পাঁচশত মাইল, তবে সে গোলাটি রাত পর্যন্ত জমিনে পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করতে আনুমানিক দশ বারো ঘন্টার প্রয়োজন হবে)। কিন্তু যদি দোজখের ভেতরে কোনো গোলা নিক্ষেপ করা হয় তবে তার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে চল্লিশ বছরের প্রয়োজন হবে (অর্থাৎ, দোজখের গভীরতা আসমান জমিনের দূরত্ব থেকে অনেক বেশি)। –[তাফসীরে মাযহারী– ১০/২৬২]

হামীম কি জাহান্নামের অভ্যন্তরে না বাইরে? حَمِيْمٌ বলা হয় ফুটন্ত গরম পানিকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আয়াতে উল্লিখিত ফুটন্ত গরম পানির ঝর্ণা কোথায় থাকবে, জাহান্নামের ভিতরে না বাইরে? কুরআনে মাজীদের আয়াত হতে বাহ্যতঃ এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমত হামীমে (ফুটন্ত গরম পানিতে) নিক্ষেপ করা হবে। এর পর তাদেরকে জাহীম তথা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং তা হতে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, حَمِيْمٌ জাহান্নামের বাইরে কোথাও অবস্থিত। সূরায়ে সাফ্‌ফাতে বলা হয়েছে– "ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ" অর্থাৎ হামীমে পানি পান করানোর পর পুনরায় তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।

মোদ্দাকথা, যখন জাহান্নামীরা তৃষ্ণায় চটপট করতে থাকবে তখন তাদের সেই গরম পানির ঝর্ণার নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। পানি পান করানোর পর পুনরায় তাদেরকে জাহান্নামে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

অপরদিকে কতিপয় আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, حَمِيْمٌ জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত। যেমন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ"

"এই সেই জাহান্নাম, অপরাধী তথা কাফেররা যাকে অস্বীকার করে– কাফেররা সেই জাহান্নাম এবং হামীম (ফুটন্ত গরম পানির ঝর্ণা)-এর মাঝে প্রদক্ষিণ করবে।"

আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হামীম জাহান্নামের অভ্যন্তরেই কোথাও হবে। এতদসংক্রান্ত অন্য একটি আয়াত নিম্নরূপ– "خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ"

উক্ত আয়াত হতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হামীম জাহান্নামের ভেতরেই থাকবে।

পরস্পর বিরোধী আয়াতসমূহের মধ্যকার সমন্বয়ন সাধন : মুফাসসিরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন, চিন্তা করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, উপরিউক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্ব নেই। কেননা জাহান্নামের বহু তাবকাহ হবে। এদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি হবে। এদের এক স্তরের নাম হবে 'হামীম'। সুতরাং তা পৃথক একটি স্তর হওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামের অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। আবার পৃথক হওয়া স্বত্ত্বেও তা জাহান্নামের একটি স্তর হওয়ার কারণেও জাহান্নামের অন্তর্ভুক্তও বলা যেতে পারে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নামীদেরকে শিকল দ্বারা বেঁধে কখনো জাহীমে (অগ্নিকুণ্ডে) আবার কখনো হামীমে (ফুটন্ত গরম পানি)-এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা : জাহান্নামীদেরকে শাসিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে, যাদের পূজা করতে, ডাকতে, আজ তোমাদের সেই সমস্ত শরিক এবং ঠাকুর দেবতারা কোথায়? তাদেরকে ডাক, তারা যেন আসে, তোমাদের এ বিপদে তোমাদের সাহায্য করুক, মুক্তি দেক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাফেররা তখন অনুশোচনার সুরে বলবে হায়! আজ তারা আমাদের ছেড়ে গিয়েছে, তাদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। বলাবাহুল্য, কাফেররা হঠাৎ নিজ মুখে এক স্বীকারোক্তি করার পর সচেতন হবে এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা করে বলবে, কই আমরা তো কখনো কোনো শরিকই মানি নি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকি নি! আসলে দুনিয়াতেও কাফেরদের অবস্থা তথৈবচ ছিল। কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর রাসূলের সত্যতা স্বীকার করে ফেলে আবার তা অস্বীকার করে বসত। পরকালেও তদ্রূপ করবে। অবশ্য সেদিন জাহান্নামীদের সামনে তাদের উপাস্যদেরকেও হাজির করা হবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমাসমূহ জাহান্নামের জ্বালানি হবে।"

"ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ الخ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** تَفْرَحُونَ শব্দটি فَرِحَ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো খুশি হওয়া এবং আনন্দিত হওয়া। আর تَمْرَحُونَ শব্দটি مَرِحَ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো- "ধন-সম্পদের কারণে অহঙ্কারী ভাব নিয়ে অন্যদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা। مرح সর্বাবস্থায় হারাম এবং নিন্দনীয়। আর فَرِحَ অর্থাৎ আনন্দ উল্লাস অর্থাৎ সম্পদের গরিমায় আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে সুখ-সম্ভোগ করা এবং এতে আনন্দিত হওয়া হারাম ও নাজায়েজ। অত্র আয়াতে فَرِحَ -এর দ্বারা একেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- কারুনের কাহিনী বর্ণনাতেও এ অর্থে فَرِحَ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ" "বেশি খুশি হয়ো না [ধন-দৌলত ও প্রাচুর্যের আধিক্যের কারণে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়িও না], আল্লাহ তা'আলা এরূপ মাত্রাতিরিক্ত উপভোগকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"

আরেক ধরনের فَرِحَ (আনন্দ) হলো, দুনিয়ার নেয়ামত ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ তা'আলার দান মনে করে এদের উপর খুশি হওয়া ও আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েজ বরং মোস্তাহাব ও আদিষ্ট। কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে فَرِحَ -এর দ্বারা একেই বুঝানো হয়েছে। "فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا" অর্থাৎ এর উপর সন্তুষ্টচিত্তে খুশি হওয়া উচিত।

উল্লিখিত আয়াতে فَرِحَ -এর সাথে কোনোরূপ শর্তারোপ করা হয়নি। কিন্তু فَرِحَ -এর সাথে "بِغَيْرِ الْحَقِّ" (অন্যায়ভাবে) কথাটিকে শর্তারোপিত করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অবৈধ স্বাদ-আস্বাদন ও সুখ-সম্ভোগের উপর খুশি হওয়া হারাম অপরদিকে বৈধ সুখ-সম্ভোগের উপর খুশি হওয়া আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা ছওয়াব ও ইবাদত।

গ্রন্থকার (র.) স্বীয় বক্তব্য إِذْ অর্থাৎ إِذَا -এর দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন? মুহতারাম গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, "إِذِ الْأَغْلَالُ" -এর মধ্যে إِذْ শব্দটি إِذَا -এর অর্থে হয়েছে। বস্তুতঃ এর দ্বারা তিনি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্নটি হলো- আলোচ্য আয়াতে পরকালের কথা বলা হয়েছে- যা ভবিষ্যতে হবে। এর পূর্বে "فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ" "শীঘ্রই তারা জানবে- এর দ্বারাও এটাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু إذ শব্দটি সাধারণতঃ مَاضِىْ তথা অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অথচ إذَا শব্দটি ভবিষ্যৎ কালের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এখানে ভবিষ্যৎ কালের বিষয়ে আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও إذ কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

উক্ত প্রশ্নের জবাবে গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, এখানে إِذْ শব্দটি إِذَا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতীতকালে সংঘটিত বিষয়াদিতে যেমন আমাদের কোনো প্রকার সংশয় নেই তেমনি ভবিষ্যতের অনুষ্ঠিতব্য বিষয়াদির ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোনোরূপ সন্দেহ নেই। এ নিশ্চিত সত্য জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের বহু স্থানে অতীতকালে ব্যবহৃত বহু শব্দকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে ব্যবহাত করেছেন। এটা সে সব স্থানগুলোর একটি।

ذم -এর দ্বারা دُخُوْل -কে নির্দিষ্ট না করে مَثْوًى -কে নির্দিষ্ট করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ" অর্থাৎ অহঙ্কারী তথা কাফেরদের আবাসস্থল কতোইনা নিকৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এরূপ বলেন নি যে, "فَبِئْسَ مَدْخَلُ الْمُتَكَبِّرِيْنَ" "কাফেরদের প্রবেশ করা [বা প্রবেশস্থল] কতইনা নিকৃষ্ট। অর্থাৎ ذَم কে مَثْوًى দ্বারা বিশেষিত করেছেন مَدْخَلْ কে নয়। কারণ হলো مَثْوًى স্থায়ী, কিন্তু مَدْخَلْ স্থায়ী নয়। - وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৭৭. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِعَذَابِهِمْ حَقٌّ ج فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ فِيْهِ اِنِ الشَّرْطِيَّةُ مُدْغَمَةٌ وَمَا زَائِدَةٌ تُؤَكِّدُ مَعْنَى الشَّرْطِ اَوَّلَ الْفِعْلِ وَالنُّوْنُ تُؤَكِّدُ اٰخِرَهُ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ فِىْ حَيَاتِكَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ اَىْ فَذَاكَ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ فَنُعَذِّبُهُمْ اَشَدَّ الْعَذَابِ فَالْجَوَابُ الْمَذْكُوْرُ لِلْمَعْطُوْفِ فَقَطْ.

৭৮. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط رُوِىَ اَنَّهُ تَعَالٰى بَعَثَ ثَمَانِيَةَ اٰلَافِ نَبِيٍّ اَرْبَعَةُ اٰلَافٍ نَبِيٍّ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَاَرْبَعَةُ اٰلَافٍ نَبِيٍّ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ مِنْهُمْ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ج لِاَنَّهُمْ عَبِيْدٌ مَرْبُوْبُوْنَ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ بِنُزُوْلِ الْعَذَابِ عَلَى الْكُفَّارِ قُضِىَ بَيْنَ الرُّسُلِ وَمُكَذِّبِيْهَا بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ اَىْ ظَهَرَ الْقَضَاءُ وَالْخُسْرَانُ لِلنَّاسِ وَهُمْ خَاسِرُوْنَ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ.

অনুবাদ :

৭৭. অতএব হে রাসূল ﷺ ! আপনি সবর অবলম্বন করুন, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক-সত্য– তাদেরকে আজাব দেওয়ার ব্যাপারে– এখন হয়তো অবশ্যই আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো – এখানে اِنْ শর্তজ্ঞাপক -এর نْ -কে مَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর مَا হলো অতিরিক্ত। ফে'লের প্রথমে এসে এটা শর্তের অর্থের উপর তাগিদ দেয়। আর نْ ফে'লের শেষে হয়ে তাকিদের অর্থ প্রদান করে। এর কিয়দংশ যার প্রতিশ্রুতি আমি তাদের ব্যাপারে দিচ্ছি অর্থাৎ আজাব। আপনার জীবদ্দশায়। আর শর্তের জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَذَاكَ সুতরাং তা অর্থাৎ তবে তাই হবে। অথবা, আপনাকে মৃত্যু দান করবো– তাদেরকে আজাব দেওয়ার পূর্বেই। আর তখন তাদেরকে আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করানো হবে। তখন আমি তাদেরকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ করবো। কাজেই উল্লিখিত جَوَابٌ শুধু مَعْطُوْفٌ -এর জন্যই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ اِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ শুধু نَتَوَفَّيَنَّكَ -এর জবাব হয়েছে।

৭৮. হে রাসূল ﷺ ! আপনার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের মধ্য হতে কারো কারো কথা ঘটনা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো কথা কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিনি। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী পাঠিয়েছেন, চার হাজার বনূ ইসরাঈল হতে এবং বাকি চার হাজার অন্যান্য সমস্ত মানুষ হতে। আর কোনো রাসূলেরই এ ক্ষমতা ছিল না যে– তাদের মধ্য হতে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন উপস্থান করবে। কেননা তাঁরা আল্লাহর বান্দা এবং প্রতিপালিত। সুতরাং যখন আল্লাহর আদেশ আসবে কাফেরদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হওয়ার ব্যাপারে– তখন ফয়সালা করে দেওয়া হবে রাসূলগণ এবং তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথভাবে আর তখন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ তখন ফয়সালা এবং ক্ষতি প্রকাশিত হবে। অথচ তারা তৎপূর্বেও সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

"فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ" শব্দটির তাহকীক : فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ -এর মধ্যে ف হরফে আতফ। এর পর শর্তজ্ঞাপক إن রয়েছে। এর ن কে مَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। مَا শব্দটি হলো অতিরিক্ত এটা শর্তের অর্থকে তাকিদ করে।

نُرِيَنَّكَ -এর ك অক্ষরটি خِطَابٌ -এর জন্য হয়েছে। نُرِيَنَّ এটা بَابُ اِفْعَالٌ হতে جَمْعُ مُتَكَلِّمٌ -এর সীগাহ আর ن হলো نُونُ تَاكِيْد بَاثْقِيْلَهْ -

"مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا" আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : "مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا" এবং "مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ" বাক্যে مِنْهُمْ শব্দটি بَعْضٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। উভয় مِنْهُمْ -ই একটি উহ্য مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

'فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ الخ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেছেন– কাফেরদের অন্যায় অত্যাচারে আপনি সবর অবলম্বন করুন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অবশেষে বিজয় দান করবেন এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করবেন। এটি আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য, তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। 'আমি তাদেরকে যে সব কথা দিচ্ছি' অর্থাৎ তাদের যে শাস্তির কথা ঘোষণা করছি তার কোনোটি হয়তো আপনাকে দেখিয়ে দেব, যেমন বদরের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে এবং মক্কা বিজয়ে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের পরাজয় এবং অপমানজনক শাস্তি প্রিয়নবী ﷺ -কে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে– অথবা তাদের কোনো কোনো শাস্তি দেখার পূর্বেই আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করবো, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আখেরাতে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে আর তাদের আমার নিকট অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেব, এটি নির্ঘাত সত্য। শাস্তি থেকে তাদের রেহাই নেই, হয় আপনার জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করবে, অথবা যদি এরই মধ্যে আপনার ওফাত হয় তবে আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত।

কাফেরদের জন্য আজাবের প্রতীক্ষায় থাকা : আপাত দৃষ্টিতে "رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ" -এর শান বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো নির্দোষদেরকে যাদের উপর জুলুম করা হয়েছে– তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া সেহেতু অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান দয়া ও স্নেহের বিরোধী নয়। অপরাধী ও দুষ্কৃতিকারীকে শাস্তি দেওয়া কারো নিকটই দয়া ও মমতার পরিপন্থি নয়।

মোটকথা, নবী করীম ﷺ কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেসব লোক ঝগড়া-ঝাটির দ্বারা আপনার সাথে মোকাবিলা করে এবং নিকৃষ্ট ধরনের উপায় অবলম্বন করতঃ আপনাকে নীচ ও হীন করতে চায়, তাদের কথা-বার্তা ও কর্মতৎপরতার জন্য আপনি সবর প্রদর্শন করুন।

যারা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এ দুনিয়ায় আপনার জীবদ্দশায়ই শাস্তি দেব– এটা অত্যাবশ্যক নয়। এখানে কেউ শাস্তি পাক আর না-ই পাক আমার পাকড়াও হতে কেউই নিস্তার পেতে পারে না। মরে গিয়ে তো তাকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন সে স্বীয় কর্মফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভোগ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, যখন নবী করীম ﷺ মক্কার মুশরিক কর্তৃক নির্যাতন ও মিথ্যারোপের শিকার হয়েছিলেন তখন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতখানা নাজিল করেন। সুতরাং বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করুন। এতে আপনার উপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু তাতে বিচলিত হয়ে পড়লে চলবেনা; বরং ধৈর্যধারণ করতে হবে। এ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কাফেরদেরকে কিভাবে শায়েস্তা করবেন তা আল্লাহ তা'আলার ভালো করেই জানা আছে। তিনি সময় মতো সুচারুরূপেই তা সম্পাদন করবেন। সে ব্যাপারে আপনার চিন্তা করা লাগবে না। আপনি শুধু নির্দেশিত পন্থায় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে চলতে থাকুন। আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস রাখুন। পরিণামে বিজয় মাল্য আপনার গলায়ই শোভা পাবে। আর কাফেররা যে নিপাত যাবে- কুফর ও শিরকের কারণে কি ভয়াবহ পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তা শীঘ্রই তারা টের পাবে।

"وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ .... وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ" আয়াতের ব্যাখ্যা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন- হে রাসূল! আপনার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, নবী রাসূল প্রেরিত হওয়া নুতন কিছু নয়; বরং বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সরল-সঠিক পন্থা প্রদর্শনের নিমিত্তে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, তন্মধ্যে আপনি শুধু অন্যতম রাসূল নন; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাদের মধ্যে কারো কারো কথা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, আর কারো কারো কথা বর্ণনা করিনি। তাদের প্রত্যেকেই যে সত্য ছিলেন, একথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। তাই অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে- "لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهِ" "আমরা নবীগণের সত্যতার ব্যাপারে কোনো প্রকার পার্থক্য করিনা।" সকলকেই সত্য বলে জানি, তাঁরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রেরিত, এ কথার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি। এটিই প্রকৃত মু'মিনের কথা। এটিই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের এ উদার নীতিই তাকে বিশ্ব-জনীন জীবন বিধান রূপে পরিগণিত করেছে। পক্ষান্তরে, ইহুদিরা বনী ইসরাঈলী নবী ব্যতীত আর কাউকে মানে না, তদুপরি বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে তারা শত্রুতা রাখে। অপরপক্ষে, খ্রিস্টানরা নবুয়তের স্তর থেকে তাঁকে উন্নীত করে তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলে যা তাদের বলা উচিত নয়। ইসলাম যে পরিপূর্ণ, পূর্ণ পরিণত, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত একমাত্র জীবন বিধান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো এই যে, ইসলাম নবী-রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। পবিত্র কুরআনের চিরস্থায়ী ঘোষণা হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সমস্ত নবী রাসূলগণই সত্য, এ পর্যায়ে এটিই শেষ কথা।

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ. 'আল্লাহ তা'আলার হুকুম ব্যতীত কোনো নিদর্শন পেশ করার ক্ষমতা কোনো রাসূলেরই নেই।'

মোজেজা প্রসঙ্গে : মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বিশেষ বিশেষ মোজেজা প্রদর্শনের আবদার করতো। তারই জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ মোজেজা প্রদর্শন করা নবীর কাজ নয়, আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কোনো নবীই মোজেজা প্রদর্শন করতে পারে না। মোজেজা মূলত আল্লাহ তা'আলার কুদরত এবং ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, আর তা তাঁর অনুমতিক্রমে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্জি মোতাবেক যখন ইচ্ছা, যেখানেই ইচ্ছা, যে নবীর দ্বারা ইচ্ছা মোজেজা প্রকাশ করেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্যে নমরুদের তৈরি অগ্নিকুণ্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের মাঝে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলীদের জন্যে পথ তৈরি করে দেন। এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে করীম ﷺ -এর আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তাঁর দোয়ায় সপ্তম হিজরিতে খায়বরে অস্তমিত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং এছাড়া মে'রাজের ঘটনার ন্যায় বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এসব কিছুই এক আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, মর্জি এবং শক্তিতেই হয়।

অতএব, হে রাসূল! মক্কার কাফেররা আপনার নিকট যে মোজেজার আবদার করে তা যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কোনো হেকমতের কারণে প্রদান না করেন, তবে আপনি ব্যথিত এবং চিন্তিত হবেন না; বরং সবর অবলম্বন করুন। ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ .

'যখন আল্লাহ তা'আলার হুকুম হবে তখন ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা করা হবে, তখন এ বাতিলপন্থিরা সর্বস্বান্ত হবে।'

অর্থাৎ যখন কোনো জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির আদেশ হবে তখন সঠিকভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। কাফেরদের শাস্তি হবে, আর মু'মিনগণ লাভ করবে বিজয়। বাতিলপন্থি, মিথ্যাবাদী, সত্য-বিরোধী এবং সত্যদ্রোহীরা সেদিন হবে সর্বস্বান্ত।

মক্কার যে সব কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে, বিস্ময়কর মোজেজা সমূহ দেখেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং শত্রুতাবশতঃ নতুন নতুন মোজেজার আবদার করেছে তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রিয়নবী ﷺ -এর জন্যে রয়েছে এ সান্ত্বনা যে, অদূর ভবিষ্যতে এমনও সময় আসবে যখন অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির আদেশ হবে। তখন তারা নিঃশ্চিহ্ন হবে এবং সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সত্যের অনুসারীদের বিজয় লাভ হবে, যেমন বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন, এরপর অষ্টম হিজরিতে অনুষ্ঠিত মক্কা বিজয়ের দিনও আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক সাফল্য দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا" : ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে আরজ করেছি, নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি ইরশাদ করেছেন: এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। এরপর আরজ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা কত? তিনি ইরশাদ করেছেন: তিনশত তের। এ হাদীস ইবনে রাহবীয়া তাঁর মুসনাদে, ইবনে হাব্বান তাঁর গ্রন্থে এবং হাকেম মোস্তাদরাকে হযরত আবূ লুবাবার সূত্রে বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে রুহুল মা'আনী– ২৪/৮৮]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন যে, পবিত্র কুরআনে মোট সাতাশজন নবী রাসূলের নামোল্লেখ করা হয়েছে। মূলত নবী-রাসূলগণের সংখ্যার ইলম এক আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। যাঁদের উল্লেখ করা আল্লাহ তা'আলার মর্জি হয়েছে, কুরআনে কারীমে তিনি তাঁদের উল্লেখ করেছেন। এজন্যেই এ আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হয়েছে–

مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط

তবে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তাফসীরে জালালাইনে এ ব্যাপারে একটি বিরল বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। এতে রয়েছে নবীগণের মোট সংখ্যা আট হাজার। এঁদের মধ্যে চার হাজার বনূ ইসরাঈলের এবং অবশিষ্ট চার হাজার অন্যান্য মানুষ হতে নির্বাচিত হয়েছে। বায়যাবী ও কাশশাফে এ বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবীগণের সংখ্যা সংক্রান্ত হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)-এর বর্ণনাকেই মুফাসসির ও মুহাক্কিকগণ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧٩. اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ قِيْلَ الْاِبِلُ هُنَا خَاصَّةً وَالظَّاهِرُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ .

৭৯. আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু– কথিত আছে যে, এখানে নির্দিষ্টভাবে উটকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু গাভী ও ছাগল উদ্দেশ্য হওয়া প্রকাশ্য। যাতে তোমরা এদের কোনো কোনোটির উপর আরোহণ কর এবং কোনোটি ভক্ষণ কর।

٨٠. وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ مِنَ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالْوَبَرِ وَالصُّوْفِ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ هِيَ حَمْلُ الْاَثْقَالِ اِلَى الْبِلَادِ وَعَلَيْهَا فِي الْبَرِّ وَعَلَى الْفُلْكِ السُّفُنِ فِي الْبَحْرِ تُحْمَلُوْنَ .

৮০. আর তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার– দুগ্ধ, মাংস, পশম ও লোম ইত্যাদি। আর যাতে তাদের উপর সওয়ার হয়ে তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পার আর তা হলো শহর হতে শহরে বোঝা বহন করে নিয়ে যাওয়া। আর তাদের উপর স্থলে এবং নৌকায় সমুদ্রের মধ্যে নৌকায়। তোমাদের পরিবহন করা হয়।

٨١. وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهٖ تُنْكِرُوْنَ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ وَتَذْكِيْرُ اَيِّ اَشْهَرُ مِنْ تَانِيْثِهٖ .

৮১. আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কোন নিদর্শনকে– যা তাঁর একত্ববাদের উপর দলিল তোমরা অস্বীকার করবে? এখানে তাদেরকে তিরস্কার এবং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। اَيَّ শব্দটি এর স্ত্রীলিঙ্গ (اَيَّةَ) হতে প্রয়োগে অধিক প্রসিদ্ধ।

٨٢. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ مِنْ مَصَانِعَ وَقُصُوْرٍ فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

৮২. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? তারা তো এদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশি ছিল, এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অনেক বেশি চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে বহু শিল্প ও প্রাসাদ নিদর্শন স্বরূপ রেখে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল, শেষ পর্যন্ত তা তাদের কোন কাজে আসল?

٨٣. فَلَمَّا جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْمُعْجِزَاتِ الظَّاهِرَاتِ فَرِحُوْا اَيِ الْكُفَّارُ بِمَا عِنْدَهُمْ اَيِ الرُّسُلِ مِنَ الْعِلْمِ فَرَحَ اسْتِهْزَاءٍ وَضِحْكَ مُنْكِرِيْنَ لَهٗ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَيِ الْعَذَابُ .

৮৩. যখন তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ আসত প্রকাশ্য মোজেজাসমূহ সহ খুশি হলো অর্থাৎ কাফেররা যা তাদের নিকট ছিল অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট ইলম হতে ঠাট্টা ও তাচ্ছিল্যের আনন্দ এবং তাকে অস্বীকার করার ছলে [কৌতুকের হাসি] হাসত। অতঃপর পরিবেষ্টন করল অর্থাৎ পতিত হলো তাদের উপর যাকে নিয়ে তারা উপহাস করেছিল অর্থাৎ আজাব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٤. فَلَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا اَىْ شِدَّةَ عَذَابِنَا قَالُوْآ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ .

৮৪. সুতরাং যখন তারা আমার কঠোর শাস্তি প্রত্যক্ষ করল অর্থাৎ আমার শাস্তির কঠোরতা তারা বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম আর তাঁর সাথে যাদেরকে শরিক করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম।

٨٥. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا ط سُنَّتَ اللّٰهِ نَصَبَهٗ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ مِنْ لَفْظِهٖ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ج فِى الْاُمَمِ اَنْ لَّا يَنْفَعَهُمُ الْاِيْمَانُ وَقْتَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ تَبَيَّنَ خُسْرَانُهُمْ لِكُلِّ اَحَدٍ وَهُمْ خَاسِرُوْنَ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ قَبْلَ ذٰلِكَ .

৮৫. আমার আজাব প্রত্যক্ষ করার পর তাদের ঈমান কোনো উপকারে আসল না। আল্লাহর চিরন্তন নীতি এখানে سُنَّةً [সুন্নাত] শব্দটি তা হতে নির্গত একটি উহ্য فِعْل -এর কারণে مَصْدَرٌ [তথা مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ] হওয়ায় নসব বা যবরবিশিষ্ট হয়েছে। যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত রয়েছে, তা কোনো উপকারে আসেনি। আর তখন কাফেররাই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সকলের সামনে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রকাশিত হয়ে পড়ল। অবশ্য তৎপূর্বেও সর্বদা তারা ক্ষতিগ্রস্তই ছিল।

তাহকীক ও তারকীব

"فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ" : আয়াতাংশে দুটি مَا কোন অর্থে হয়েছে? "فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" -এর مَا শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে–

১. مَا শব্দটি এখানে نَافِيَة [না জ্ঞাপক] হবে। অর্থাৎ তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজেই আসল না।

২. এটা প্রশ্নবোধক হবে। অর্থ হবে তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজে আসল ?

আবার "مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" -এর ما ও দুটি অর্থে হতে পারে–

১. উক্ত مَا শব্দটি مَوْصُوْلَه হবে। এর অর্থ হবে– "اَلَّذِىْ كَانُوْا يَكْسِبُوْنَهٗ" অর্থাৎ তারা যা উপার্জন করত। ه যমীরকে হজফ করা হয়েছে।

২. উক্ত مَا মাসদারের অর্থবোধক হবে। আয়াতের অর্থ হবে– "مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ كَسْبُهُمْ" অর্থাৎ তাদের উপার্জন [করা] তাদের কোনো উপকারে আসে নি।

"سُنَّتَ اللّٰهِ" -এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী "سُنَّتَ اللّٰهِ" মহল্লান মানসূব হয়েছে। আর এটা মানসূব হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে–

১. এটা হতে গঠিত এর পূর্বে অবস্থিত একটি فِعْل -এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হওয়ার দরুন। বাক্যটি হবে– قَدْ سَنَّ سُنَّةَ اللّٰهِ الخ

২. এটা تَحْذِيْرٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। সুতরাং বাক্যটি হবে– "اِحْذَرُوْا يَا اَهْلَ مَكَّةَ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ" "হে মক্কাবাসীরা! অতীত জাতিসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার গৃহীত নীতিকে ভয় কর। প্রথমোক্ত মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ।"

Free @ www.eilm.weebly.com

"فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ" **আয়াতাংশে اَىَّ-এর মহল্লে ই'রাব** : আল্লাহর বাণী "فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ"-এর মধ্যে শব্দটি اَىَّ ফে'লের تُنْكِرُوْنَ مَفْعُوْلٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। اَىَّ প্রশ্নবোধক হওয়ার কারণে এটা বাক্যের শুরুতে হয়েছে এবং ফে'লের পূর্বে হওয়া জায়েজ হয়েছে। কেননা اِسْتِفْهَامٌ বা প্রশ্নবোধক শব্দের জন্য বাক্যের প্রারম্ভে হওয়া- (صَدَارَتُ كَلَامٍ) নির্ধারিত।

তবে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, اَىَّ না হয়ে যদি اَيُّهَا হতো, তাহলে এটা مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হতো।

"لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا" **আয়াতাংশে مِنْ-এর অর্থ** : আল্লাহর বাণী- "لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا"-এর মধ্যস্থিত مِنْ শব্দটি تَبْعِيْض (অংশ বিশেষ)-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ ঐ পশুদের একাংশের তথা কতিপয়ের উপর যেন তোমরা সওয়ার হতে পার।

"اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ الخ" **আয়াতাংশে হামযাহ-এর مَدْخُوْل কি?** আল্লাহর বাণী اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا الخ-এর মধ্যে হামযাহ-এর مَدْخُوْل উহ্য রয়েছে। আর তা হলো "عَجِزُوْا" মূলত বাক্যটি হলো, اَعَجِزُوْا فَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ الخ অর্থাৎ তারা কি অক্ষম হয়ে গেছে- যে কারণে তারা জমিনে ভ্রমণ করেনি।

"فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ" **আয়াতাংশের তারকীব কর** : আল্লাহর বাণী "فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ"-এর তারকীব নিম্নরূপ- ف হরফে আতফ لَمْ يَكُ ফে'লে নাকেসের اِيْمَانُهُمْ يَنْفَعُهُمْ বাক্য হয়ে لَمْ يَكُ ফে'লে নাকেসের خَبَرْ হয়েছে এবং اِيْمَانُهُمْ এর اِسْم হয়েছে। ফে'লে নাকেস এর ইসম ও ফে'লসহ জুমলায়ে ফে'লিয়ায়ে নাকেসাহ হয়েছে।

আল্লাহর বাণী "هُنَالِكَ"-এর মহল্লে ই'রাব : هُنَالِكَ শব্দটি ظَرْفُ مَكَانٍ তথা স্থানাধার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রূপকার্থে ظَرْفُ زَمَانٍ কালাধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ظَرْف হওয়ার কারণে এটা مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ ..... اَللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা** : ইরশাদ হচ্ছে, মানুষের উপকারেই আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ জন্তু, উট, ঘোড়া প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্য হতে মানুষ কোনো কোনো জন্তুর মাংস আহার করে, কোনো কোনোটির পৃষ্ঠে আরোহণ করে, তার পৃষ্ঠে বোঝা চাপিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। তাদের চামড়া, পশম এমন কি হাড়-গোড় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। স্থলে তাদের পীঠে এবং জলে নৌকার বুকে আরোহণ করে দূর-দূরান্তে যাত্রা করে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা কতভাবে তাঁর নিদর্শনাদি মানুষকে দেখিয়ে থাকেন, তবুও মানুষের দৃষ্টি চেতন পায় না, আল্লাহ তা'আলা আরো নিদর্শনাদি দেখাতে থাকবেন, দেখা যাক মানুষ তার কোন নিদর্শন কত অস্বীকার করতে পারে?

অত্র আয়াতের তাৎপর্য হলো, তোমরা যদি শুধু তামাশা দেখার জন্য ও চিন্তা-বিনোদনের জন্যই মোজেজা দেখার দাবি না করে থাক; বরং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদ ও পরকাল মেনে নেওয়ার জন্য যে দাওয়াত তোমাদেরকে দিতেছেন এটা সত্য কি-না তারই নিশ্চয়তা লাভ করতে চাও, তাহলে সে জন্য আল্লাহর এই নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট। যা দিবস-রজনী প্রতি মুহূর্ত তোমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতায় আসছে। প্রকৃত ব্যাপার বুঝাবার জন্য এ নিদর্শনরাজি বর্তমান থাকতে অন্য কোনো নিদর্শনের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কাফেরদের মোজেজার দাবির জবাবে বলা হয় তৃতীয় বক্তব্য। কুরআনে মাজিদের একাধিক স্থানে ইতঃপূর্বে এ জবাব উদ্ধৃত হবে।

বান্দার উপর আল্লাহর নিয়ামতরাজি তাঁর একত্ববাদের দলিল : পৃথিবীতে যেসব জন্তু ও পশু মানুষের খেদমত করছে, বিশেষ করে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট ও ঘোড়া এ সবকে সৃষ্টিকর্তা এমন পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন যে, এগুলো অনায়াসে মানুষের পালিত সেবক হতে পারছে। এটা দ্বারা মানুষের বহু প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে। তারা এতে সওয়ার হচ্ছে। তাদের দ্বারা ভার বহনের কাজ নিচ্ছে। চাষাবাদের কাজে এদের ব্যবহার করছে। তাদের দুধ বের করে পান করে এবং তা হতে দধি,

মাখন, ঘি, পনির, লাসসি, ও নানা প্রকারের হালুয়া মিঠাই তৈরি করছে। মানুষ তাদের গোশত ভক্ষণ করে, তাদের চর্বি ব্যবহার করছে, তাদের লোম, পশম, খাল, আতুড়ি, রক্ত ও গোবর প্রত্যেকটি জিনিসই মানুষের উপকারে আসে। এটা কি স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না যে, মানুষের সৃষ্টিকর্তা তাকে দুনিয়ায় পয়দা করার পূর্বেই তার এ অসংখ্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করার জন্যই এই পশুগুলোকে বিশেষ পরিকল্পনায় এসব গুণের আকার করে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেন এগুলোর দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারে।

এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর তিন চতুর্থাংশ পানি দ্বারা ভরে দিয়েছেন, কেবল অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ স্থলভাগ বানিয়েছেন। ভূ-পৃষ্ঠের এ স্থলভাগে মানব ছড়িয়ে পড়া ও তাদের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসায়ের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য পানি, নদী, সমুদ্র ও বাতাসের নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক যেন জাহাজ ও নৌকা চলাচল করতে পারে। জমিনের উপর এমন দরকারি দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি হওয়ারও প্রয়োজন ছিল যা ব্যবহার করে মানুষ জাহাজ চালাতে সক্ষম হতে পারে। এসব হতে এ কথাটি প্রমাণিত হয়না যে, একমাত্র সর্বশক্তিমান ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক দয়াময় সুবিজ্ঞ আল্লাহই মানুষ, জমিন, পানি, নদী-সাগর, বাতাস এবং পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী বানিয়েছেন। মানুষ যদি শুধু জাহাজ চলাচলের ব্যাপারটিই চিন্তা করে তবে তাতে তারকাসমূহের অবস্থিতি ও গ্রহের নিয়ামত আবর্তন হতে যে সাহায্য লাভ করা যায় তাও অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, কেবল জমিনই নয়, আসমানের সৃষ্টিকর্তাও সেই এক ও লা শরীক আল্লাহ।

সেই সাথে এ কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যে মহান সুবিজ্ঞ আল্লাহ এত অগণিত জিনিস ও দ্রব্যাদি মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য দান করেছেন এবং তার স্বার্থ সুবিধার্থে এ সব জিনিস সংগ্রহ করে দিয়েছেন তিনি এমন অন্ধ ও বধির হবেন যে, তিনি মানুষের নিকট হতে এ সবের কখনো হিসাব গ্রহণ করবেন না, কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ কি এটা চিন্তা করতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও তাওহীদের উপর দলিল পেশ করার প্রশ্ন রেখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তো তার নিদর্শনাদি তাওহীদের প্রমাণাদি তোমাদের সামনে পেশ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও পেশ করতে থাকবেন। সুতরাং তাদের কোনোটাকে অস্বীকার করতে পারবে? অর্থাৎ তাদের কোনোটিকেই তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না। এ সব নিদর্শনাবলি সুস্পষ্ট ও অকাট্য। তাদের অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার কোনোরূপ অবকাশ নেই।

"لِتَرْكَبُوْا وَلِتَبْلُغُوْا" ফে'লদ্বয়ে লামে তা'লীল দাখিল করা এবং অন্যান্য ফে'লে না করার ফায়দা : আল্লাহ তা'আলার বাণী اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الخ -এর মধ্যে "لِتَرْكَبُوْا" ও "لِتَبْلُغُوْا ফে'লদ্বয়ে লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য فِعْلٌ -এর মধ্যে লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়নি– এর ফায়দা কি?

এর ফায়িদা বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লামা যামাখশরী (র.) তাফসীরে কাশশাফে উল্লেখ করেছেন যে, হজের অনুষ্ঠানে এবং জিহাদে পশুর উপর সওয়ার হওয়া হয়তঃ ওয়াজিব, না হয় মোস্তাহাব। হজ ও জিহাদ উভয় দীনি প্রয়োজন ও কর্তব্য। এ জন্যই এদের ব্যাপারে লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে পানাহার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি মুবাহ বা জায়েজ। সেহেতু তাদের জন্য লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয় নি।

কুরআনে মাজীদের অন্যস্থানেও এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। সূরায়ে আনআমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–"وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের উপর আরোহণ করতে পার এবং তারা তোমাদের জন্য সৌন্দর্যবর্ধক হয়। এখানে لِتَرْكَبُوْا -এর উপর লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু زِيْنَةً -এর উপর লামে তা'লীল ব্যবহার করা হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা "فِى الْفُلْكِ" না বলে "عَلَى الْفُلْكِ" বলেছেন কেন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ" তথা ঐ পশুদের উপর এবং নৌকার উপর তোমাদেরকে সওয়ার করা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা فِى الْفُلْكِ না বলে عَلَى الْفُلْكِ বলেছেন কেন?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, নৌকায় উত্তোলিত দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যাপারে فِىْ ও عَلٰى দুটোই ব্যবহার করা চলে যেমন- "وَضَعَ فِى الْفُلْكِ" এবং "وَضَعَ عَلَى الْفُلْكِ" দুভাবে বলাই জায়েজ ও সহীহ। কিন্তু عَلٰى শব্দটি যেহেতু اِسْتِعْلَاء বা উচ্চ মর্যাদা-এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে, সেহেতু এখানে আল্লাহ তা'আলা "فِى الْفُلْكِ" -এর পরিবর্তে "عَلَى الْفُلْكِ" বলেছেন। কেননা উভয় প্রয়োগের মধ্যে এটা উত্তম।

"اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا ...... مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ" **আয়াতের তাফসীর :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করলে দেখতে পেত- অতীতে তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ঐশ্বর্য সম্পদের অধিকারী হয়েও বহু জাতি আল্লাহর আজাব হতে মুক্তি পায় নি। অতএব, তারা রেহাই পাবে কি করে।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত, বান্দার প্রতি তাঁর অসংখ্য অগণিত নিয়ামতরাজির উল্লেখ করেছেন। আর যারা সেগুলোর অস্বীকার করে কুফরির পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য উক্ত আয়াতে হুমকি ও ধমকি উচ্চারণ করা হয়েছে।

ইমাম রাযী (র.)-এর ফায়িদা উল্লেখ করতে যেয়ে লিখেছেন যে, একমাত্র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের লোভে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের মোহে পড়ে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে অনর্থক তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে থাকে। এ সকল পার্থিব সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাশায় হকের সামনে যারা মাথানত করতে প্রস্তুত নয়, তারা দুনিয়ার বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে দিল। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের এই কর্মকৌশল ও হীন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বাতিল ও ফাসেদ। কেননা দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। কেউই দুনিয়াতে চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে দেখলেই এর ভূরি ভূরি নজির পাওয়া যাবে যে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-এর সাথে হঠকারিতায় লিপ্ত হয়েছিল তাদের কি ভয়াবহ পরিণতিই না হয়েছিল। এর প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করা হয়েছে- "اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا الخ" অর্থাৎ কাফেররা কি জমিনে ভ্রমণ করে নি যে, তারা সেই লোকদের পরিণতি প্রত্যক্ষ করবে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়ে গিয়েছে? তাদের সংখ্যা তো মক্কার কাফেরদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। শক্তিমত্তার দিক দিয়েও তারা এদের অপেক্ষা ছিল অধিক। তারা জমিনে এই লোকদের অপেক্ষা অধিক চাকচিক্যময় ও জাঁকজমক পূর্ণ চিত্র-স্থাপত্যশিল্প ও প্রমোদমালা রেখে গিয়েছে। কিন্তু এসব কিছু তাদের কোনো কাজে আসে নি, আল্লাহর আজাব ও গজব হতে তাদের সংখ্যার আধিক্য, অধিক শক্তিমত্তা ও শিল্পকলা তাদেরকে নাজাত দিতে পারে নি।

সুতরাং পূর্ববর্তীদের ইতিহাস হতে শিক্ষাগ্রহণ করে মক্কার মুশরিক ও কাফেরদের উচিত আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে এদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাদের মেনে নেওয়া আর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাদের ইহ-পরকালীন কল্যাণ।

"فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ..... بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ" **আয়াতের ব্যাখ্যা :** ইরশাদ হচ্ছে যে, অতীত উম্মতদের কাছে যখন তাদের পয়গাম্বর আল্লাহর নির্দশনাদি নিয়ে আসতেন তখন তারা বলত এ সমস্ত নিদর্শনাদি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা যা জানি তাই যথেষ্ট, এ বলে তারা তাদের ভ্রান্ত প্রত্যয় আকীদা-বিশ্বাস এবং কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকত এবং এতে গর্ববোধ ও গর্ব প্রকাশ করত। তারা তাদের নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ভ্রান্ত প্রত্যয়ের তুলনায় পয়গম্বরদের শিক্ষা-দীক্ষাকে তুচ্ছ মনে করত। তাঁদের বিদ্রূপ করত। বলাবাহুল্য, তাদের এ ঠাট্টা-বিদ্রূপই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

"فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" অর্থাৎ সেই অপরিণামদর্শী এবং অস্বীকারকারীদের নিকট যখন আল্লাহর রাসূল তাওহীদ ও ঈমানের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল তখন তারা নিজেদের ইলমকে আম্বিয়ায়ে কেরামের ইলম হতে উত্তম মনে করে নবীগণের ইলমকে প্রত্যাখ্যান করতে লাগল। এ ইলম যার উপর কাফেররা খোশ ও মগ্ন ছিল এবং যার মোকাবিলায় নবী-রাসূলগণের ইলমকে প্রত্যাখ্যান করত- এটা হয়তঃ এ কারণে ছিল যে, তারা ছিল বদ্ধ মূর্খ, তারা অসত্য এবং বাতিলকে সত্য ও সহীহ মনে করে বসেছিল। যেমন- ইউনানী দর্শনে ইলাহ সম্পর্কীয় অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা এই ধরনের যার স্বপক্ষে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। এদেরকে বদ্ধ মূর্খতাই বলা চলে। তাদেরকে জ্ঞান নামে আখ্যায়িত করা জ্ঞানের কলঙ্ক ছাড়া আর কি?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অথবা, তাদের উক্ত ইলম দ্বারা পার্থিব বিদ্যাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কলা সম্পর্কীয় বিদ্যা। এতে বাস্তবিকই তারা অভিজ্ঞ ছিল। সূরায়ে রুমের একটি আয়াতে নিম্নোক্তভাবে তাদের এ ইলেমের উল্লেখ করা হয়েছে– "يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ" অর্থাৎ তারা দুনিয়ার পার্থিব জীবন এবং তাকে ভোগ করার ব্যাপারে তো কিছু জ্ঞান রাখে। কিন্তু আখেরাতে যেখানে তাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে, যেখানকার শান্তি ও অশান্তি স্থায়ী হবে, তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাস। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার এ পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর অর্থ হবে– তারা যেহেতু কেয়ামত এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে এবং আখেরাতের শাস্তি ও দুর্গতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও গাফেল সেহেতু তাদের এ পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর খুশি হয়ে এতে মগ্ন হয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের (আ.) ইলমের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেছে না।

এর তাফসীরে সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) তাফসীরে যিলালে বলেন– ঈমান ও আদর্শহীন জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো বিপর্যয়ের নামান্তর এটা মানুষকে গোমরাহ ও অন্ধ করে ছাড়ে। আদর্শবিহীন জড় জ্ঞান মানুষকে বিভ্রান্তির অতল তলে তলিয়ে দেয়। কেননা এ পার্থিব জ্ঞানের অধিকারী নিজেকে সত্যিকার জ্ঞানী মনে করে। সে মনে করে যে, সত্য ও ন্যায়ের হুকুমই দিতেছে অথচ এটা যে নিরেট অসত্য, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তা বুঝাবার ক্ষমতাটুকুও তার নেই। তার জ্ঞানের পরিসর যে একেবারেই সীমিত ও অপূর্ণ তা যদি সে বুঝার চেষ্টা করত তাহলে আর বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকত না এবং নবী-রাসূলগণের ঐশী জ্ঞানের মোকাবিলায় কখনো নিজেদের ইলমকে যথেষ্ট মনে করত না, নবী-রাসূলগণের জ্ঞানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার দুঃসাহস দেখাতো না।

সুতরাং তাদের নিজেদের ভ্রান্তিপূর্ণ ও অত্যন্ত সীমিত ও পরিমিত জ্ঞানকে নবীগণের ঐশীজ্ঞান যা পরিপূর্ণ ও নির্ভুল– তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা, প্রত্যাখ্যান করা তাদের জ্ঞানের অন্তরঃসারশূন্যতা ও তাদের অপরিণাম-দর্শীতাকেই প্রমাণ করে।

জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) একটি অভিনব তাফসীর করেছেন। তিনি বলেছেন– রাসূলগণ যখন প্রকাশ্য মোজেজাসহ তাদের নিকট আসল তখন তাদের উপস্থাপিত ইলমকে দেখে কাফেররা উপহাসের হাসি হাসল এবং তাকে অস্বীকার করল। সুতরাং তাঁর মতে عِنْدَهُمْ-এর هُمْ যমীরের مَرْجِعْ হলো রাসূলগণ। অথচ অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতে এই هُمْ যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফেররা।

عِنْدَهُمْ-এর যমীরে দুটি সম্ভাবনা এবং উভয় সম্ভাবনার আলোকে عِلْم-এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" অর্থাৎ "যখন তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসলেন তখন তারা তাদের নিজস্ব ইলম নিয়েই নিমগ্ন রইল।"

আলোচ্য আয়াতে عِنْدَهُمْ-এর যমীরের দুটি مَرْجِعْ হতে পারে–

১. উক্ত যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফেররা। এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত।

২. এর যমীরের مَرْجِعْ হলো রাসূলগণ।

প্রথমোক্ত অভিমত অনুযায়ী যদি মেনে নেওয়া হয় যে, عِنْدَهُمْ-এর যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফেররা– তাহলে এর অর্থ কি হবে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন–

এক. ইলম দ্বারা সেই ইলমকে বুঝানো হয়েছে যাকে কাফেররা প্রকৃত ইলম বলে মনে করত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে নিছক অনুমান ভিত্তিক বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন তারা বলত–

১. যুগই তো আমাদের ধ্বংস করে থাকে। (١) وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ.

২. আল্লাহ চাইলে না আমরা শিরক করতাম না আমাদের পূর্বপুরুষগণ। (٢) وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا اٰبَاؤُنَا.

৩. জরাজীর্ণ হওয়ার পর কে তাকে জীবিত করেন? (٣) مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৪. "আর যদি আমার রবের প্রতি আমাকে ফিরে যেতে হয় তাহলে আবশ্যই আমি দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম নেয়ামত লাভ করব।"

(৪) وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا .

মোটকথা, তারা এসব কল্পনা প্রসূত কথা-বার্তার দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করত এবং নবীগণের ইলেম তথা ঐশীবাণীকে প্রত্যাখ্যান করত। তাদের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– "كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" প্রত্যেকেই নিজেদের ইলম ও জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত।

দুই. এখানে ইলম দ্বারা দার্শনিকদের ইলমকে বুঝানো হয়েছে। তারা নবী-রাসূলগণের ইলমের মোকাবিলায় নিজেদের ইলমকে উত্তম মনে করত এবং রাসূলগণের ইলমকে প্রত্যাখ্যান করত ও তার বিরোধিতা করত। কথিত আছে যে, দার্শনিক সক্রেটিস কয়েকজন নবীর আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন। তাকে নবীগণের নিকট যাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, আমরা নিজেরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত। সুতরাং হেদায়েত লাভের জন্য আমাদের কারো নিকট যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

তিন. এটা দ্বারা পার্থিব জগতের বাস্তব ইলমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি সংক্রান্ত ইলম এ প্রকারের ইলমের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে রূমে ইরশাদ করেছেন–

"يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ" .

অর্থাৎ, তারা বৈষয়িক জগত ও তা হতে কল্যাণ লাভের বিষয়ে বাহ্যত কিছু জ্ঞান রাখে। অথচ পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ– একেবারেই উদাসীন, বিলকুল গাফেল। তাদের ইলমের বহর এতটুকুই।"

সুতরাং এর পর রাসূলগণ যখন তাদের নিকট এসে ঐশীবাণী উপস্থাপন করলেন তখন তারা নিজেদের ইলমকে যথেষ্ট মনে করল এবং রাসূল যেই ইলম তাদের নিকট পেশ করলেন তাকে অস্বীকার করল, প্রত্যাখ্যান করল।

আর যদি عِنْدَهُمْ -এর هُمْ এর مَرْجِعْ রাসূলগণ হন তাহলে আয়াতের অর্থ হবে– "রাসূলগণ যখন প্রকাশ্য মোজেজাসসহ কাফেরদের নিকট আসল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত ইলেম কাফেরদের নিকট পেশ করলেন তখন তারা উপহাস করে তা প্রত্যাখ্যান করল।" অত্র আয়াতের উক্ত তাফসীর– তখনই প্রযোজ্য হবে যখন فَرِحُوْا -এর যমীর-এর মারজি' (مَرْجِعْ) হবে কাফেররা। আর فَرِحُوْا -এর যমীরের مَرْجِعْ যদি রাসূলগণ হয় তাহলে অর্থ হবে– "যখন রাসূলগণ প্রকাশ্য মোজেজাসহ আগমন করলেন, [আর কাফেররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল] তখন রাসূলগণ স্বীয় ইলম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন, আর কাফেররা যে আজাবের ব্যাপারে উপহাস করল সেই আজাব তাদের উপর পতিত হলো।"

"فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ" উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা : আজাব এসে পড়ার পর তারা ঈমান গ্রহণ করল, কিন্তু এ সময় ঈমান গ্রহণ করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীস শরীফে এসেছে– "يَقْبَلُ اللّٰهُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ" অর্থাৎ মৃত্যুর কম্পন ও রূহ টেনে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন। কিন্তু যখন মৃত্যুর গরগরা আরম্ভ হয় তখনকার তওবা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা তখনকার ঈমান হলো اِضْطِرَارِيْ তথা অস্বাভাবিক বাধ্যগত ঈমান। অথচ বান্দাকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ঈমান গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে– যাকে "اِيْمَانْ اِخْتِيَارِيْ" বলে।

মোটকথা, আজাব আসার পূর্ব মুহূর্তে যখন আল্লাহর প্রতাপ এবং তাঁর আজাব তাদের চোখের সম্মুখে মূর্ত হয়ে উঠে, তখন তাদের চেতনা হয়, ভুল ভাঙ্গে, তাদের ঠাকুর দেবতা এবং শিরক যে ভুল, এ কথা বুঝতে পেরে তারা তখন ঈমান আনে এবং তওবা করে। অথচ সময় তখন পার হয়ে গেছে। আল্লাহর আজাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর ঈমান এবং তওবা কোনো কাজেই আসে না। কেননা দেখার পর তো আপনা-আপনিই, শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ সত্যকে বিশ্বাস করতে বাধ্য এ বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই, মর্যাদা নেই।

سُوْرَةُ فُصِّلَتْ مَكِّيَّةٌ : সূরা ফুসসিলাত [হা-মীম সাজদাহ] মক্কায় অবতীর্ণ

ثَلَاثٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً : ৫৩ আয়াত বিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. حٰمٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ۔

১. হা-মীম -এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٢. تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُبْتَدَأٌ ۔

২. এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এখানে تَنْزِيْلٌ মুবতাদা এবং পরবর্তী আয়াতের كِتٰبٌ-এর খবর।

٣. كِتٰبٌ خَبَرُهٗ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ بُيِّنَتْ بِالْاَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا مِنْ كِتَابٍ بِصِفَتِهٖ لِقَوْمٍ مُتَعَلِّقٌ بِفُصِّلَتْ يَّعْلَمُوْنَ يَفْهَمُوْنَ ذٰلِكَ وَهُمُ الْعَرَبُ ۔

৩. এটা এমন কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত অর্থাৎ এতে বিধানাবলি, ঘটনাবলি ও নসিহতসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত। কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। قُرْاٰنًا শব্দটি كِتٰبٌ থেকে তার সিফতসহ حَالٌ আর لِقَوْمٍ শব্দটি فُصِّلَتْ-এর সাথে সম্পর্কিত। জ্ঞানী লোকদের জন্যে যারা বুঝে এবং তারা হলো আরববাসী।

٤. بَشِيْرًا صِفَةُ قُرْاٰنًا وَّنَذِيْرًا ج فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ سَمَاعَ قَبُوْلٍ ۔

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। بَشِيْرًا শব্দটি قُرْاٰنٌ-এর সিফত অতঃপর তাদের অধিকাংশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা শুনে না কবুল করার জন্যে শুনে না।

٥. وَقَالُوْا لِلنَّبِيِّ قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ اَغْطِيَةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ ثِقْلٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ خِلَافٌ فِي الدِّيْنِ فَاعْمَلْ عَلٰى دِيْنِكَ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ عَلٰى دِيْنِنَا ۔

৫. এবং তারা মহানবী ﷺ-কে বলে, আমাদের অন্তরসমূহ আবরণে পর্দায় আবৃত যে বিষয়ের দিকে আপনি আমাদেরকে দাওয়াত দেন। এবং আমাদের কর্ণে আছে বোঝা অর্থাৎ আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনাদের মাঝে রয়েছে অন্তরাল। ধর্মের ভিন্নতা অতএব আপনি আপনার ধর্মের কাজ করুন, আমরা আমাদের ধর্মের কাজ করি।

٦. قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ بِالْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ط وَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۔

৬. বলুন, আমিও তোমাদের মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু একমাত্র মাবুদ। অতএব তার দিকে ঈমান ও আনুগত্যের সাথে নিবিষ্ট হও। এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। وَيْلٌ শব্দটি দুর্ভোগ মূলক শব্দ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ تَاكِيْدٌ كٰفِرُوْنَ.

৭. যারা জাকাত আদায় করে না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। هُمْ যমীর তাকিদের জন্যে।

٨. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ مَقْطُوْعٍ.

৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছেও সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَنْزِيْلٌ : মাসদার যা اِسْم مَفْعُوْل অর্থে হয়েছে, মুবতাদা, আর كِتَابٌ হলো খবর।

সংশয় : تَنْزِيْلٌ হলো نَكِرَه -এর মুবতাদা হওয়া কিভাবে বৈধ হতে পারে?

নিরসন : مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ হলো تَنْزِيْل -এর সিফত। যার কারণে تَخْصِيْص হয়ে মুবতাদা হওয়া সহীহ হয়ে গেছে। উহ্য ইবারত হবে اَلْمُنَزَّلُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَوْلُهُ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ : এটা كِتَابٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ حَالٌ مِنْ كِتَابٍ بِصِفَتِهِ : অর্থাৎ قُرْاٰنًا টা كِتَابٌ থেকে حَالٌ হয়েছে।

সংশয় : كِتَابٌ হলো نَكِرَه এটা ذُو الْحَالِ হতে পারে না। যেহেতু ذُو الْحَالِ -এর জন্য مَعْرِفَة হওয়া জরুরি।

নিরসন : فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ যেহেতু كِتَابٌ -এর সিফত। কাজেই كِتَابٌ -এর ذُو الْحَالِ হওয়া বৈধ হয়েছে حَالٌ مِنَ الْكِتَابِ بِصِفَتِهِ -এর এই উদ্দেশ্য; بِصِفَتِهِ -এর بَاء টি سَبَبِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ لِقَوْمٍ مُتَعَلِّقٌ بِفُصِّلَتْ : এটাও একটি সংশয়ের জবাব।

সংশয় : কুরআনের আয়াত তো সকলের জন্যই مُفَصَّلٌ এবং সুস্পষ্ট, এরপরও قَوْم عَاقِلٌ -এর সাথে কেন تَخْصِيْص করেছেন?

নিরসন : যদিও কুরআনি আয়াত فِىْ نَفْسِه সকলের জন্যই مُفَصَّلَة এবং সুস্পষ্ট। কিন্তু যেহেতু জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানগণই এর দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন তাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কে تَخْصِيْص করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بَشِيْرًا صِفَةُ قُرْاٰنًا : بَشِيْر হলো قُرْاٰن -এর সিফত উভয়টিই كِتَابٌ থেকে حَالٌ অথবা نَعْت হওয়া, আরবের تَخْصِيْص এই জন্য হয়েছে যে, আরবগণ কুরআনকে কোনো মাধ্যম ব্যতীত অনুধাবনকারী এবং প্রথম مُخَاطَبٌ অনারবের বিপরীত।

قَوْلُهُ قَالُوْا : এটা وَقْرٌ -এর প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করেছে। এর দ্বারা বধির উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كَافِرُوْنَ : এর আতফ হয়েছে لَا يُؤْتُوْنَ -এর উপর اَلَّذِيْنَ -এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে هُمْ যমীরে ফসলকে حَصْر -এর জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ تَاكِيْدٌ : এর এক অর্থ তো এটাই যে, দ্বিতীয় هُمْ টা প্রথম هُمْ -এর تَاكِيْد হয়েছে। এবং تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ তে রয়েছে যে, كَافِرُوْنَ টা مُشْرِكِيْنَ -এর تَاكِيْد হয়েছে। মনে হয় যেমন এটা এই প্রশ্নের জবাব যে, যখন তাদের صِفَتِ شِرْك কে বর্ণনা করে مُشْرِكِيْنَ বলে দিল তখন পুনরায় هُمْ كَافِرُوْنَ -এর কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তরের সার হলো كَافِرُوْنَ টা مُشْرِكِيْنَ -এর تَاكِيْد কাজেই অহেতুক হয়নি।

قَوْلُهُ مَمْنُوْن : এটা বাবে نَصَرَ -এর مَنَّ থেকে اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِد مُذَكَّر -এর সীগাহ। অর্থ– কম করা হলো, কর্তন করা হলো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা [ফুসসিলাত] হা-মীম আস সেজদা প্রসঙ্গে :

এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এতে ৬টি রুকু, ৫৪টি আয়াত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ : এ সূরার নাম সূরাতুল সেজদা, সূরা হা-মীম সেজদা, সূরাতুল মাসাবীহ এবং এ সূরাকে সূরা ফুসসিলাত'ও বলা হয়।

এ সূরার ফজিলত : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ প্রত্যেক রাত্রে এ সূরা এবং সূরা মুলক পাঠ না করে ঘুমাতেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আল মুমিন তাওহীদ, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন এবং কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। আর এ সূরায় প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি মৃত্যুর পর সে জীবন আসবে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়নে অনীহা প্রকাশ করে এবং তার বিরোধিতা করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

قَوْلُهُ حٰمٓ : হা-মীম এর অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবগত রয়েছেন। একে হরফে মোকাত্তাআত বলা হয়। এ সম্পর্কে সূরায়ে বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তিনটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। ১. এটি হলো আল্লাহ তা'আলার ইসমে আজম। ২. এটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ৩. হা-মীম আর রাহমানের সংক্ষিপ্ত রূপ। অভিধানবেত্তা জুযাজ (র.) এ মতই পোষণ করতেন। আর সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) এবং আতা খোরাসানী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম হাকীম, হামীদ হাইয়্যুন, হালীম, হান্নান থেকে 'হা' গ্রহণ করা হয়েছে আর আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম মালিক, মাজিদ এবং মান্নান থেকে মীম গ্রহণ করা হয়েছে তাই হা-মীম হয়েছে। -[তাফসীরে মাজেদী পৃ. ৯৩৫]

পারস্পরিক স্বাতন্ত্রের জন্যে 'আল হা-মীম, অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরো কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণ সূরা মুমিনের হামীমকে 'হা-মীম আল মুমিন এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা-মীম' আস-সিজদাহ অথবা হা-মীম ফুসসিলাতও বলা হয়। এ সূরার এ দুটি না সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কোরাইশ গোত্র, তাদের সামনে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে। তারা কুরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসংখ্য মোজেজা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জবাবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াত আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কুরআন আরবি ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কুরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ - تَفْصِيْل -এর আসল অর্থ বিষয়বস্তুকে পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কুরআন পাকের আয়াতসমূহে বিধানাবলি, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থিদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কুরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আজাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন পাকের আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারি হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কুরাইশরা এসব সত্ত্বেও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে কাফেরদের একটি প্রস্তাব : আলোচ্য সূরায় কুরাইশ কাফেরদেরকে প্রত্যাক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামি আন্দোলনেকে নস্যাৎ করার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর ন্যায় অসমসাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজন স্বীকৃতি কুরাইশ সরদার হযরত হামযা (রা.) মুসলমান হয়ে যান। ফলে কুরাইশ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেজ ইবনে কাছীর মুসনাদে বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূণ্য বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আসসীরাত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃতি করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এ স্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃতি করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, কুরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের কাছে কতাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধ প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা.) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, [ওতবার ডাক নাম] আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতাও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোনো একটি পছন্দ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন আপনি কি বলতে চান? আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধনসম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কুরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কুরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোনো কাজ করবো না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোনো জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব। সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা ফুসসিলাত তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করতে করতে যখন فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ পর্যন্ত পৌছলেন, তখন ওতবা তার মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদার আয়াতে পৌছে সিজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন, আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম! আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল খবর এই-

إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلًا وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ وَاللّٰهِ مَا هُوَ بِالسِّحْرِ وَلَا بِالشِّعْرِ وَلَا بِالْكَهَانَةِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَطِيعُونِي وَاجْعَلُوهَا لِي خَلُّوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ فَاعْتَزِلُوهُ فَوَاللّٰهِ لَيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ بِنَاءٌ فَإِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيتُمُوهُ بِغَيْرِكُمْ وَإِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهُ وَعِزُّكُمْ وَكُنْتُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِهِ .

অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায় তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবিলা ও তাকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। কেননা তার এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কুরাইশদের সহযোগিতা ব্যতীত তাকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব ও তার ইজ্জত হবে তোমাদেরই ইজ্জত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ : এক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। **এক.** আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পরি না। **দুই.** আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং **তিন.** আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কুরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কুরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আন'আমের আয়াতে আছে- وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহফেও রয়েছে।

এর জবাব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারগ, আমাদের অন্তরে আরবণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যে অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কুরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারগই সাব্যস্ত করেনি; বরং এর সারমর্ম যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বোঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়; বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। -[বয়ানুল কুরআন]

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গাম্বরসুলভ জবাব : কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির; বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মোকাবিলায় কোনো কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ তা'আলা নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ; পার্থক্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মোজেজা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী ছওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ তারা জাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর জাকাত ফরজ হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব ফরজ হওয়ার পূর্বেই কাফেরদের জাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে কাছীর এর জবাবে বলেন যে, আসলে জাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাজের সাথে ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুজ্জাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নিসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় জাকাত ফরজ ছিল না।

কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কি না : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকহবিদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধানাবলি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করুক। ঈমানের পরে ফরজ কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব তাদের উপরে যখন জাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জবাব এই যে, অনেক ফিকহবিদদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাদের মতে আয়াতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে জাকাত না দেওয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি। বরং তাদের জাকাত না দেওয়ার ভিত্তিগদতহ০ক ছিল কুফর এবং জাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মুমিন হলে জাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া।

-[বয়ানুল কুরআন]

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামি বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জবাবে বলেন যে, কুরাইশ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরিবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কুরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করতো। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ : مَمْنُوْنٍ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোনো সময় কোনো অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোনো ওজরবশত তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করতো, তার ওজর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে শরহুস সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রা.) থেকে এবং রাজীনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। -[মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩. قُلْ اَئِنَّكُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهَا بِوَجْهَيْهَا وَبَيْنَ الْاُوْلٰى لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ الْاَحَدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ط شُرَكَاءَ ذٰلِكَ رَبُّ مَالِكُ الْعٰلَمِيْنَ جَمْعُ عَالَمٍ وَهُوَ مَا سِوَى اللّٰهِ وَجُمِعَ لِاخْتِلَافِ اَنْوَاعِهٖ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ تَغْلِيْبًا لِلْعُقَلَاءِ .

৯. বলুন, তোমরা কি অস্বীকার কর সে সত্তাকে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে রবি ও সোমবারে এবং তার জন্যে সমকক্ষ শরিক স্থির কর? اَئِنَّكُمْ শব্দটির মধ্যে দ্বিতীয় হামযাকে তাহকীক ও তাসহীল এবং উভয় অবস্থার মধ্যে উভয় হামযার মধ্যে আলিফের সাথে পড়া যাবে। তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা মালিক عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ-এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সমস্ত কিছুকে আলম বলা হয়। عَالَمٌ বিভিন্ন প্রকৃতির ধরনের হওয়ার কারণে عَالَمِيْنَ বহুবচন আনা হয়েছে। জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞানহীন বস্তুর চেয়ে অধিক হওয়ার কারণে عَالَمِيْنَ কে ى ও ن দিয়ে বহুবচন করা হয়েছে।

١٠. وَجَعَلَ مُسْتَاْنِفٌ وَلَا يَجُوْزُ عَطْفُهٗ عَلٰى صِلَةِ الَّذِىْ لِلْفَاصِلِ الْاَجْنَبِىِّ فِيْهَا رَوَاسِىَ جِبَالًا ثَوَابِتَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا بِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ وَالزُّرُوْعِ وَالضُّرُوْعِ وَقَدَّرَ قَسَّمَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا لِلنَّاسِ وَالْبَهَائِمِ فِىْ تَمَامِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط اَىِ الْجَعْلُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهٗ فِىْ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَالْاَرْبِعَاءِ سَوَاءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ اَىْ اِسْتَوَتِ الْاَرْبَعَةُ اِسْتِوَاءً لَا تَزِيْدُ وَلَا تَنْقُصُ لِلسَّائِلِيْنَ عَنْ خَلْقِ الْاَرْضِ بِمَا فِيْهَا .

১০. তিনি পৃথিবীতে উপরিভাবে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। উক্ত বাক্যটি جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ তথা স্বাতন্ত্র্য বাক্য। এবং এটাকে পূর্বের اَلَّذِىْ ইসমে মাওসূলের সেলার উপর আতফ করা বৈধ হবে না। কেননা তাদের মধ্যখানে সম্পর্কবিহীন বাক্য দ্বারা পৃথক করা হয়েছে। তাতে কল্যাণ, বরকত রেখেছেন। অধিক পানি ও ফলমূল ও দুগ্ধজাত প্রাণী দিয়ে এবং তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। বণ্টন করেছেন, এতে বসবাসকারী মানুষ ও পশুপাখির জন্যে পূর্ণ চারদিনের মধ্যে। অর্থাৎ পর্বতমালা স্থাপন ও খাদ্যের ব্যবস্থা সবকিছু পূর্ণ চার দিনে সম্পন্ন করেছেন। এবং جَعْلِ جِبَالٍ-এর সাথে যা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ খাদ্যের ব্যবস্থা দুদিনে তথা মঙ্গল ও বুধববার করেছেন। পৃথিবী ও এটার বস্তুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের জন্যে। سَوَاءً শব্দটি مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ-এর মাসদার হিসেবে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ اِسْتَوَتِ الْاَرْبَعَةُ اِسْتِوَاءً তথা পূর্ণ চারদিন সমান ছিল এতে কোনো কম ও বেশি ছিল না।

١١. ثُمَّ اسْتَوٰى قَصَدَ اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ بُخَارٌ مُرْتَفِعٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا اِلٰى مُرَادِىْ مِنْكُمَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط فِىْ مَوْضِعِ الْحَالِ اَىْ طَائِعَتَيْنِ اَوْ مُكْرَهَتَيْنِ .

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, এবং এটা ছিল ধোঁয়া ঊর্ধ্বগামী ধূম্রকুঞ্জ অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস তোমাদের ব্যাপারে আমার হুকুম পালনের দিকে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। طَوْعًا ও كَرْهًا উভয়টি অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ অর্থাৎ طَائِعَيْنِ ও مُكْرَهَتَيْنِ-এর অর্থে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَتَا اَتَيْنَا بِمَنْ فِيْنَا طَائِعِيْنَ فِيْهِ تَغْلِيْبُ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ اَوْ نُزِلَتَا لِخِطَابِهِمَا مَنْزِلَتَهُ.

তারা বলল, আমরা আমাদের সাথে বস্তুসমূহ নিয়ে স্বেচ্ছায় আসলাম। এখানে জ্ঞানী পুংলিঙ্গের প্রাধান্য দিয়ে طَائِعِيْنَ শব্দটিকে ن ও ى দ্বারা বহুবচন আনা হয়েছে। এবং উভয়কে সম্বোধনের মধ্যে জ্ঞানীদের স্থলে রাখা হয়েছে।

১২. فَقَضٰهُنَّ اَلضَّمِيْرُ يَرْجِعُ اِلَى السَّمَاءِ لِاَنَّهَا فِىْ مَعْنَى الْجَمْعِ الْاٰئِلَةِ اِلَيْهِ اَىْ صَيَّرَهَا سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ الْخَمِيْسِ وَالْجُمُعَةِ فَرَغَ مِنْهَا فِىْ اٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْهُ وَفِيْهَا خُلِقَ اٰدَمُ وَلِذٰلِكَ لَمْ يَقُلْ هُنَا سَوَاءً وَوَافَقَ مَا هُنَا اٰيَاتُ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ط اَلَّذِىْ اُمِرَ بِهِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ بِنُجُوْمٍ وَحِفْظًا ط مَنْصُوْبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ اَىْ حَفِظْنَاهَا عَنِ اسْتِرَاقِ الشَّيَاطِيْنِ السَّمْعَ بِالشُّهُبِ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْعَلِيْمِ بِخَلْقِهِ.

১২. অতঃপর তিনি দুদিনে বৃহস্পতি ও শুক্রবার আকাশমণ্ডলীকে সপ্ত আকাশ করে দিলেন। জুমার দিনের শেষ প্রান্তে তিনি এটার সৃষ্টির সমাপ্ত করলেন। এবং এই দিনেই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন। তাই এখানে سَوَاءً তথা পূর্ণ দিন বলেননি। فَقَضَاهُنَّ-এর যমীর اَلسَّمَاء-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে, কেননা سَمَاء ভবিষ্যৎ হিসেবে বহুবচন অর্থাৎ আসমানকে সাত আসমান করে দিলেন। অতএব উক্ত আয়াতের মর্মার্থ 'আসমান জমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, আয়াতের সাথে মিল হয়েছে। এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। এতে অবস্থানকারীদের প্রতি আনুগত্য ও ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং আমি দুনিয়ার আসমানকে প্রদীপমালা তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। حِفْظًا শব্দটি উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ হিসেবে মানসূব হয়েছে অর্থাৎ حَفِظْنَاهَا حِفْظًا عَنِ اسْتِرَاقِ الشَّيْطَانِ السَّمْعَ بِالشُّهُبِ তথা আমি অগ্নি শিখা দ্বারা এটাকে সংরক্ষণ করেছি, যাতে শয়তান গোপনে চুরি করে কোনো প্রত্যাদেশ শুনতে না পারে। এটা পরাক্রমশালী, তার রাজত্বে সর্বজ্ঞ তার সৃষ্টজগত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাপনা।

১৩. فَاِنْ اَعْرَضُوْا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ عَنِ الْاِيْمَانِ بَعْدَ هٰذَا الْبَيَانِ فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ خَوَّفْتُكُمْ صٰعِقَةً مِثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ اَىْ عَذَابًا يُهْلِكُكُمْ مِثْلَ الَّذِىْ اَهْلَكَهُمْ.

১৩. অতঃপর তারা অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান থেকে এই বয়ানের পরও তবে আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলাম এই কঠোর আজাব সম্পর্কে আদ ও সামূদের আজাবের মতো। অর্থাৎ এমন আজাব যা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে যেমন তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٤. اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَىْ مُقْبِلِيْنَ عَلَيْهِمْ وَمُدْبِرِيْنَ عَنْهُمْ فَكَفَرُوْا كَمَا سَيَاْتِىْ وَالْاِهْلَاكُ فِىْ زَمَنِهٖ فَقَطْ اَنْ اَىْ بِاَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ عَلٰى زَعْمِكُمْ كٰفِرُوْنَ .

১৪. যখন তাদের নিকট সম্মুখ ও পিছন দিক থেকে রাসূলগণ এসেছিলেন অর্থাৎ ধারাবাহিকতার সাথে নবীগণ এসেছিলেন অতঃপর তারা অস্বীকার করেছে। যেমন সামনে বর্ণিত হবে। আজাব দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগেই তাদের ধ্বংস হওয়া ও এরপর নয়। এবং তারা বলতো যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না। তারা বলল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব আমরা তোমাদের ধারণা মতে তোমাদের রিসালাতের প্রতি পূর্ণ অস্বীকারকারী।

١٥. فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا لَمَّا خُوِّفُوْا بِالْعَذَابِ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ط اَىْ لَا اَحَدَ كَانَ وَاحِدُهُمْ يَقْلَعُ الصَّخْرَةَ الْعَظِيْمَةَ مِنَ الْجَبَلِ يَجْعَلُهَا حَيْثُ يَشَاءُ اَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا الْمُعْجِزَاتِ يَجْحَدُوْنَ .

১৫. আর আদ জাতি পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং তারা বলল, যখন তাদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করা হলো আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে? অর্থাৎ কেউ নেই। তাদের মধ্যে একা এক ব্যক্তি পাহাড় থেকে বড় পাথর বহন করে ইচ্ছাধীন যে কোনো স্থানে নিয়ে যেত। তারা কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর। অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলি মোজেজাসমূহ অস্বীকার করতো।

١٦. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا بَارِدَةً شَدِيْدَةَ الصَّوْتِ بِلَا مَطَرٍ فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُوْنِهَا مَشْئُوْمَاتٍ عَلَيْهِمْ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ الذُّلِّ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى اَشَدُّ وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ بِمَنْعِهٖ عَنْهُمْ .

১৬. অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝাঞ্ঝাবায়ু প্রচণ্ড শব্দ বিশিষ্ট ঠাণ্ডা বৃষ্টি বিহীন বায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে نَحِسَاتٍ শব্দটিকে ح বর্ণে যের ও সাকিন উভয়ভাবে পড়া যাবে। অর্থাৎ তাদের জন্য অশুভ দিন যেন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আজাব আস্বাদন করাই। আর পরকালের আজাব তো আরো লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা তাদের থেকে আজাবকে দূর করার জন্যে কোনো সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৭. وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ بَيَّنَّا لَهُمْ طَرِيْقَ الْهُدٰى فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى اِخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ الْمُهِيْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ـ

১৭. আর ছামূদ জাতি, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম তাদেরকে হেদায়েতের পথের বর্ণনা দিয়েছিলাম অতঃপর তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই কুফরিকে পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আজাবের বিপদ এসে ধৃত করলো।

১৮. وَنَجَّيْنَا مِنْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ اللّٰهَ ـ

১৮. এবং আমি এটা থেকে উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল ও আল্লাহকে ভয় করতো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَئِنَّكُمْ : এতে চারটি কেরাত রয়েছে। তবে মুফাসসির (র.)-এর ইবারত দ্বারা শুধুমাত্র দুটি কেরাত জানা যাচ্ছে। প্রথম হামযা তো সর্বদা مُحَقَّقْ হয়ে থাকে। অবশ্য দ্বিতীয় হামযাতে تَحْقِيْق এবং تَسْهِيْل উভয়ই জায়েজ। উভয় সুরতে উভয় হামযার মাঝে اَلِف বৃদ্ধি করে। এই দুই কেরাত হয়ে গেল। অথচ تَرْكُ اِدْخَالِ اَلِفٍ-এর সুরতে দুটি কেরাত আরো রয়েছে। এভাবে চার কেরাত হয়ে যায়। কাজেই মুফাসসির (র.) যদি وَتَرْكُهُ বৃদ্ধি করতেন তবে চারো কেরাতের দিকে ইঙ্গিত হয়ে যেত। আসল ইবারত এই হওয়া উচিত ছিল اِدْخَالُ اَلِفٍ وَتَرْكُهُ (اَىْ اِدْخَالُ) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْاُوْلٰى بِوَجْهَيْهَا

قَوْلُهُ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ : হামযাটা اِسْتِفْهَامِيَّة اِنْكَارِىْ হয়েছে اِنَّ এবং لَام تَاكِيْد-এর জন্য। হামযাটা صَدَارَتْ কে চাওয়ার কারণে مُقَدَّمْ করে দেওয়া হয়েছে। আর كُمْ হলো اِنَّ-এর اِسْم আর لَامْ টা تَاكِيْد-এর জন্য। আর تَكْفُرُوْنَ كَلَامْ টা জুমলা হয়ে اِنَّ-এর খবর হয়েছে। আর تَجْعَلُ-এর عَطْف হয়েছে تَكْفُرُوْنَ-এর উপর।

قَوْلُهُ لَهُ : এটা تَجْعَلُوْنَ-এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। আর اَنْدَادًا হলো প্রথম মাফউল ذٰلِكَ হলো মুবতাদা। আর اَلَّذِىْ হলো مُشَارٌ اِلَيْه স্বীয় صِلَة-এর সাথে مُتَّصِفْ হওয়ার সাথে [উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা।]

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ : এতে বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী وَاوْ টি عَاطِفَة-এর জন্য। এবং جَعَلَ-এর আতফ خَلَقَ-এর উপর হয়েছে। তবে আবুল বাকা ও অন্যান্যরা وَاوْ টা عَاطِفَة হওয়ার ব্যাপারে اِنْكَارٌ করেছেন। এবং وَاوْ-কে اِسْتِئْنَافِيَة মনে করে বাক্যকে مُسْتَانِفْ বলেছেন। অস্বীকারের কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, যদি جَعَلَ-এর আতফ خَلَقَ-এর করা হয় তবে اَلَّذِىْ মওসূলের অধীনে প্রবেশ করার কারণে সেলাহ এর অংশ হবে আর এটা জায়েজ নেই। কেননা يَجْعَلُوْنَ لَهُ الخ টা جُمْلَة مُعْتَرِضَة হয়েছে। আর সেলাহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে صِلَة-এর মধ্যে فَصْلٌ بِالْاَجْنَبِىْ জায়েজ নেই।

কেউ কেউ جَعَلَ-এর আতফ خَلَقَ-এর উপর জায়েজ বলেছেন। এবং আবুল বাকা এর অস্বীকারের এই উত্তর দিয়েছেন যে, এই দুই আতেফা জুমলার মাঝে আগত বাক্য مُعْتَرِضَة-এর সদৃশ। আর দুই مَعْطُوْف বাক্যের মাঝে جُمْلَة مُعْتَرِضَة অনেক স্থানেই পতিত হয়। কাজেই বিশুদ্ধ কথা হলো خَلَقَ-এর উপর جَعَلَ-এর আতফ হওয়ার উপর কোনো اِعْتِرَاضْ নেই। (اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فِي يَوْمَيْنِ : অর্থাৎ فِي مِقْدَارِ يَوْمَيْنِ কেননা يَوْم -এর অস্তিত্ব সূর্য উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সাথে হয়ে থাকে। আর সেই সময় সূর্যের অস্তিত্বই ছিল না। তবে يَوْم -এর অস্তিত্ব কিভাবে হচ্ছিল?

قَوْلُهُ جَمَعَ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ : ফায়েদা উল্লিখিত ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. عَالَمٌ হলো اِسْمِ جِنْس যার اِطْلَاق হয়ে থাকে مَاسِوَى اللّٰهِ -এর উপর। আর جَمْع -এর জন্য কমপক্ষে তিন اَفْرَادْ হওয়া জরুরি। অথচ عَالَمٌ মাত্র একটি।

উত্তর. عَالَمٌ -এর যেহেতু বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন– عَالَمِ جِنْ . عَالَمِ اِنْس . عَالَمِ اٰخِرَتْ . عَالَمِ دُنْيَا . عَالَمِ مَلَائِكَةِ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হিসেবে اَلْعَالَمِيْنَ কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ تَغْلِيْبًا لِلْعُقَلَاءِ : এই ইবারত দ্বারাও একটি সংশয়ের নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : عَالَمٌ হলো ذَوِي الْعُقُوْلِ এবং غَيْر ذُو الْعُقُوْل উভয়ের সমষ্টির নাম। আর عَالَمٌ -এর মধ্যে অধিকাংশই হলো غَيْر ذَوِي الْعُقُوْل কাজেই এর বহুবচন نُوْنْ এবং يَاء দ্বারা না হওয়া চাই। কেননা يَاء এবং نُوْنْ দ্বারা ذَوِي الْعُقُوْلِ -এর বহুবচন আসে।

নিরসন : عَالَمٌ -এর মধ্যে যদিও ذَوِي الْعُقُوْلِ -এর তুলনায় غَيْر ذَوِي الْعُقُوْلِ -এর সংখ্যার আধিক্য অনেক বেশি। কিন্তু জ্ঞান এমন এক মূল্যবান জওহার যা সকল সিফতের উপর প্রাধান্য পায়। আর ঐ সিফতের মোকাবিলায় সমস্ত সিফতই বেহুদা ও অর্থহীন। তাই ذَوِي الْعُقُوْل -এর স্বল্পতা সত্ত্বেও غَيْرُ ذَوِي الْعُقُوْلِ -এর উপর প্রাধান্য দিয়ে يَاء এবং نُوْن দ্বারা বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي تَمَامِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ : দুদিন সাবেক যাতে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে এবং দু'দিন لَاحِقْ যাতে জীবিকা নির্ধারণের উল্লেখ রয়েছে। এভাবে উভয়টি মিলে সর্বমোট চারদিন হলো। শুধু জীবিকা নির্ধারণই চারদিন নয়। কেননা সামনে سَبْع سَمٰوٰت সৃষ্টির আলোচনা আসছে। উহার সৃষ্টির সময়ও দুদিন বলা হয়েছে। যদি تَقْدِيْر اَقْوَاتْ তথা জীবিকা নির্ধারণের সময় চার দিন মেনে নেওয়া হয়। যেমন বাহ্যত বুঝা যায় তবে اَيَّام تَخْلِيْق -এর সামষ্টিক সংখ্যা আট হয়ে যাবে। অথচ সমগ্র সৃষ্টিতে ছয় দিনের সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

قَوْلُهُ سَوَاءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِيَّةِ : سَوَاءً টা اِسْتَوَتْ উহ্য ফে'লের مَصْدَرٌ بِلَفْظِهٖ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে এবং জুমলা হয়ে اَيَّامٌ -এর সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ لِلسَّائِلِيْنَ : এর সম্পর্ক হয়েছে سَوَاءً -এর সাথে অর্থাৎ مُسْتَوِيَةً لِلسَّائِلِيْنَ اَيْ جَوَابُ السَّائِلِيْنَ فِيْهَا কেউ কেউ لِلسَّائِلِيْنَ -এর সম্পর্ক উহ্যের সাথে করেছেন। উহ্য ইবারত হলো– (تَرْوِيْحُ الْاَرْوَاحِ) هٰذَا الْحَصْرُ لِلسَّائِلِيْنَ سَوَاءٌ لَا يَتَغَيَّرُ بِسَائِلٍ بِزِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ (صَاوِيْ)

قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ : প্রশ্ন. এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আসমানের সৃষ্টি পৃথিবীর সৃষ্টির পরে হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا দ্বারা এর বিপরীত বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্বে আকাশের সৃষ্টি হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী বিস্তৃত করা। অর্থাৎ পৃথিবীর মূল উপাদানের সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির পূর্বেই হয়েছে তবে জমিনের বিস্তৃতি পরে হয়েছে কাজেই কোনো দ্বন্দ্ব বাকি থাকে না।

قَوْلُهُ مُرَادِيْ : অর্থাৎ تَاثِيْرٌ فِي السَّمَاءِ وَتَاثِيْرٌ فِي الْاَرْضِ যা আমার উদ্দেশ্য তার تَعْمِيْل করো।

قَوْلُهُ طَائِعِيْنَ فِيْهِ تَغْلِيْبُ الْمُذَكَّرِ الْعَاقِلِ الخ : ফায়দা. এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সংশয় : اَرْض এবং سَمَاء টা لَا يَعْقِلُ হওয়ার কারণে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর হুকুমে হয়েছে। কাজেই طَائِعِينَ বলা উচিত ছিল।

নিরসন : اَرْض এবং سَمَاء যদিও مُؤَنَّثْ তবে এই উভয়টি ذَوِي الْعُقُوْلِ এবং غَيْر ذَوِي الْعُقُوْلِ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কাজেই ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ذَوِي الْعُقُوْلِ কে- غَيْر ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে جَمْع مُذَكَّرْ-এর বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَنَزَّلْنَا : এতে উল্লিখিত প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাব রয়েছে। এর সার হলো اِئْتِيَا বলে যখন জমিন ও আসমানকে مُخَاطَبْ বানানো হয়েছে। তখন যেন তাদেরকে ذَوِي الْعُقُوْلِ-এর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এ কারণেই এর বহুবচন وَاوْ এবং نُوْن দ্বারা নেওয়া হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর উক্তি اَوْ نَزَّلْنَا لِخِطَابِهِمَا مَنْزِلَتَهُ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই।

قَوْلُهُ لِاَنَّهَا فِيْ مَعْنَى الْجَمْعِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : فَقَضٰهُنَّ-এর যমীর اَلسَّمَاءُ-এর দিকে ফিরেছে যা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর হুকুমে হয়েছে। কাজেই তার চাহিদা ছিল فَقَضَاهَا বলা।

নিরসন : নিরসনের সার হলো سَمَاء টা قَضَاء এবং تَصْيِيْر-এর পরে যেহেতু সপ্তাকাশে পরিণত হওয়ার ছিল তাই مَا يَؤُوْلُ-এর ভিত্তিতে বহুবচন মেনে فَقَضٰهُنَّ কে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ الْاٰئِلَةُ اِلَيْهِ : এটা اَلْ يَؤُوْلُ হতে اِسْم فَاعِلْ-এর সীগাহ অর্থ— প্রত্যাবর্তনকারী।

قَوْلُهُ وَافَقَ : এটা فِعْل مَاضِيْ আর مَا هُنَا হলো তার فَاعِلْ আর اٰيَاتْ হলো وَافَقَ-এর মাফউল।

قَوْلُهُ اَمْرَهَا الَّذِيْ اُمِرَ بِهِ مَنْ فِيْهَا مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ : এখানে اَمْرَهَا মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মওসূফ আর مَنْ হলো اِسْم مَوْصُوْل الَّذِيْ আর اَمْرَ হলো فِعْل مَاضِيْ مَجْهُوْل আর بِهِ হলো اُمِرَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর مَنْ হলো نَائِب-এর اَمْرٌ মিলে صِلَة আর فِيْهَا হলো مَوْجُوْدٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে صِلَة হয়েছে। এখন مَوْصُوْل এবং مَوْصُوْلَة الطَّاعَةِ হয়েছে। ফে'ল তার مُتَعَلِّقْ এবং نَائِب فَاعِلْ কে নিয়ে مُبَيَّنْ হয়েছে। আর مِنْ হলো بَيَانِيَة আর فَاعِلْ وَالْعِبَادَةِ মাতৃফ আলাই ও মা'তৃফ মিলে مُبَيِّنْ হলো এখন مُبَيَّنْ ও مُبَيِّنْ মিলে اَلَّذِيْ-এর صِلَة হয়েছে। সেলাহ এবং মওসূল মিলে সিফত হয়েছে اَمْرَهَا-এর। এখন مَوْصُوْف এবং صِفَتْ মিলে اَوْحٰى-এর مَفْعُوْل بِهِ হয়েছে।

قَوْلُهُ شُهُبٌ : এটা شِهَابٌ-এর বহুবচন। অর্থ— অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উজ্জ্বল নক্ষত্র।

قَوْلُهُ اَنْ : اَنْ-এর মধ্যে তিনটি কারণ হতে পারে—

১. এটা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ-এর সুরতে ضَمِيْر شَانْ তার উহ্য اِسْم হবে অর্থাৎ اَنَّهُ لَا تَعْبُدُوْا

২. مَصْدَرِيَّةٌ نَاصِبٌ لِلْمُضَارِعِ . لَا نَاهِيَة

৩. এটা مُفَسِّرَةٌ কেননা مَجِيْئُ الرَّسُوْلِ টা قَوْل হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কেননা اَنْ مُفَسِّرَة-এর জন্য জরুরি হলো যে, তার পূর্বে قَوْل অথবা قَوْل-এর সমার্থবোধক অথবা قَوْل-এর উপর দালালতকারী কোনো শব্দ হওয়া। যদি مَجِيْئ رَسُوْل-এর দালালত قَوْل-এর উপর না মানা হয় তবে اَنْ تَفْسِيْرِيَّة মানা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا : এর عَطْف হয়েছে فَاسْتَكْبَرُوْا-এর উপর।

قَوْلُهُ صَرْصَرًا : صَرٌّ-এর অর্থ— তুষার, বরফ, শীতের প্রকোপ, লু-হাওয়ার গরম বাতাস, তপ্ত হাওয়া। আল্লামা খাযেন বাগদাদী (র.) লিখেন صَرٌّ-এর মধ্যে দুটি দিক রয়েছে—

১. অধিকাংশ মুফাসসির (র.) এবং ভাষাভাষীদের মতে صَرٌّ অর্থ অত্যধিক ঠান্ডা, কনকনে শীত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ (র.) এটাই বলেছেন।

২. গরম লু-হাওয়া যা ধ্বংসকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এরূপও একটি বর্ণনা রয়েছে। আহলে লোগাতের মধ্য থেকে ইবনে আম্বারী ও এ মতই পোষণ করেছেন। আল্লামা কাজী বায়যাবী (র.) বলেন, এ ব্যবহার ঠাণ্ডার জন্যই প্রচলিত। যেমন- صَرْصَرٌ এটা মূল মাসদার। যা صِفَتٌ হিসেবে ব্যবহার হয় (لُغَاتُ الْقُرْآنِ مُلَخَّصًا) মুফাসসির (র.) بَارِدَةٌ شَدِيْدَةُ الصَّوْتِ বলে উভয় অর্থকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ مَشْئُوْمٌ : এটা سَعِيْدٌ-এর বিপরীত অর্থ- হতভাগ্য, অমঙ্গল চিহ্নিত, জঘন্য, অকল্যাণ।

قَوْلُهُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى : اَخْزٰى মূলত مُعَذِّبٌ-এর সিফত عَذَابٌ-এর দিকে اِسْنَادِ مَجَازِيْ مُبَالَغَةً রূপে হয়েছে। কেননা আজাব হলো অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ, স্বয়ং অপমান নয়। سَبَبٌ বলে مُسَبَّبٌ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ بَيَّنَّا لَهُمْ طَرِيْقَ الْهُدٰى : এই বাক্যটি فَهَدَيْنَاهُمْ-এর তাফসীর। এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, এখানে هِدَايَةٌ দ্বারা اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ উদ্দেশ্য اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ مِنْهَا : অর্থাৎ مِنَ الصَّاعِقَةِ الَّتِىْ نَزَلَتْ بِثَمُوْدٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, এমন মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরিক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাকারার তৃতীয় রুকুতে এভাবে উল্লিখিত রয়েছে-

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ . هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ .

সূরা বাকারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেওয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোনটির পর কোনটি এবং কোন কোন দিনে সৃজিত হয়েছে : বয়ানুল কুরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কুরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোনটির পরে কোনটি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবত মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে **এক**. হা-মীম সিজদার আলোচ্য আয়াত, **দুই**. সূরা বাকারার উল্লিখিত আয়াত এবং **তিন**. সূরা নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত-

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاۤءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا .

বাহ্য দৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা সূরা বাকারা ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। -[বয়ানুল কুরআন, সূরা বাকারা]

Free @ www.eilm.weebly.com

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাই মাওলানা থানভী (র.) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরের উদ্ধৃতির ভাষা নিম্নরূপ-

فَسَوَّاهُنَّ فِى يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ثُمَّ دَحَى الْاَرْضَ وَدَحْيُهَا اَنْ اَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعٰى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالرِّمَادَ وَالْجَمَادَ وَالْاٰكَامَ مَا بَيْنَهُمَا فِى يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ـ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى دَحَاهَا ـ

ইবনে কাছীর ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ রেওয়ায়েতও উদ্ধৃতি করেছেন-

মদীনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে রোববার ও সোমবার, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চারদিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে। -[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীরের মতে হাদীসটি غَرِيْبٌ [অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে দুর্বলসূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টি কাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অর্থাৎ আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিশারদগণ উপরিউক্ত রেওয়ায়েটিকে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। -[ইবনে কাছীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাছীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

অথচ কুরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর ঘটনা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল- اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً -[মাযহারী]

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনোটিকেই কুরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কাছীর মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কুরআনের আয়াতকেই মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্র করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়ত জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চারদিন লেগেছে।

তৃতীয়ত জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলী সৃজনে দুদিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দুদিনের বর্ণনা নেই। বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চারদিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযি'আতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল কুরআনের বক্তব্য অবাস্তব নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এপর দুদিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদনদী, ঝরনা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সিজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে– وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ এতে তাফসীরবিদগণ একমত যে, এই চারদিন প্রথমোক্ত দুদিনসহ, পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কুরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ বলার পর যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হতো তবে মোট চারদিন আপনা আপনিই জানা যেত, কিন্তু কুরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হলো মোট চার দিন। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চারদিনন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। দুদিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের خَلَقَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا বাক্যের আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا : ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কুরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরি ছিল না; বরং ভূ-গর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীবজন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে مِنْ فَوْقِهَا বলে এই নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ : اَقْوَاتٌ শব্দটি قُوْتٌ-এর বহুবচন। অর্থ– রিজিক, রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। –[যাদুল মাসীর]

হযরত হাসান ও সুদ্দী (র.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিজিক ও রুজি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূখণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূখণ্ডের শিল্পজাতও দ্রব্য পোশাক-পরিচ্ছেদ বিভিন্নরূপে হয়েছে। কোনো ভূখণ্ডে গম, কোনো ভূখণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা কোথাও পাট, কোথাও সেব, কোথাও আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহহাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোনো ভূখণ্ডই অন্য ভূখণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতা মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোনো কোনো ভূখণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহাগুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীবজন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূগর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ বাক্যটি অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ -এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চারদিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোনো সময় চার থেকে কম ও কোনো সময় চার থেকে কিছু বেশিও হতে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, এ কাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِلسَّائِلِينَ -এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য এই গণনা। ইবনে জারীর ও দুররে মানসূরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চারদিনে হয়েছে। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

ইবনে যায়েদ প্রমুখ কোনো কোনো তাফসীরবিদ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا لِلسَّائِلِينَ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سَائِلِينَ -এর অর্থ নিয়েছেন প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سَائِلِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]

ইবনে কাছীর এ তাফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কুরআনে এ আয়াতের অনুরূপ– وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ অর্থাৎ তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

قَوْلُهُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ : কোনো কোনো তাফসীরবিদদের মতে আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেওয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়। বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তাফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোনো রূপক অর্থ নেই। বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা ও অনুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জবাব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তাফসীরে বাহরে মুহীতে এ তাফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তাফসীর উদ্ধৃত করে কারো কারো এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জবাব সেই ভূখণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জবাব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহর বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে 'বায়তুল মামূর' বলা হয়।

قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ : অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! যদি তবুও তারা [সত্য গ্রহণে] বিমুখ হয়, তবে আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে আদ ও ছামূদ জাতির আজাবের ন্যায় আজাব সম্পর্কে সতর্ক করছি।

আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নিয়ামত, কুদরত এবং অনন্ত করুণার নিদর্শনসমূহ দেখার পরও যদি মক্কার কাফেররা ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত না হয়, তবে হে রাসূল ﷺ ! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আদ এবং ছামূদ জাতি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে যেভাবে আজাব ভোগ করেছে এবং নিশ্চিহ্ন হয়েছে ঠিক তেমনি আজাব সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। আদ ও ছামূদ জাতি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেছিল, হযরত হূদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন আদ জাতির নিকট এমনিভাবে ছামূদ জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত সালেহ (আ.) কিন্তু আদ ও ছামূদ জাতি নবীগণের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার স্থলে তাদের বিরোধিতা করে, সত্যদ্রোহীতার অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। হে মক্কাবাসী! যদি তোমরাও আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি কর, তাঁর রাসূলের বিরোধিতা কর তবে কোপগ্রস্ত আদ ও ছামূদ জাতির ভয়াবহ পরিণতি তোমাদের হতে পারে।

قَوْلُهُ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ .... بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ : অর্থাৎ তাদের নিকট যখন তাদের সম্মুখ এবং পশ্চাত এক কথায় সবদিক থেকে নবী রাসূলগণ এ নির্দেশ নিয়ে আসেন যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করো না, তারা বলেছিল, যদি আমাদের প্রতিপালক এমন ইচ্ছা করতেন তবে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।

আলোচ্য আয়াতের مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ [সম্মুখ পশ্চাৎ থেকে] কথার তাৎপর্য হলো, নবী রাসূলগণ মানুষকে সত্য গ্রহণের আহ্বানের পাশাপাশি অতীতে যারা এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের যে শাস্তি হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে তথা আখেরাতে তাদের কি শাস্তি হবে তারও উল্লেখ করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো নবী রাসূলগণ তাদের অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে উত্তমভাবে তাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো, নবী-রাসূলগণ সর্বদিক থেকে তাদের নিকট আগমন করেছেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্য সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

قَوْلُهُ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ : অর্থাৎ কাফেররা বলল, যদি আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, মানুষ কি করে আল্লাহ তা'আলার রাসূল হবে? অতএব রেসালাতের দাবিকে আমরা সত্য মনে করি না এবং আপনাদের বর্ণিত বিষয়গুলোকে আমরা মানি না। এভাবে আদ ও ছামূদ জাতির দূরাত্মা কাফেররা হযরত হূদ (আ.) এবং হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, আপনারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, মানুষ হিসেবে সকলেই সমান, আপনাদেরকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করি না। এরপরই আদ ও সামূদ জাতির প্রতি আসমানি আজাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

হতভাগা আদ ও ছামূদ জাতির এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এ মর্মে যে, যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে না মান তবে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত।

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ -কে বিশেষ সান্ত্বনা এ মর্মে যে, হে রাসূল ﷺ ! মক্কার কাফেররা যদি আপনাকে অবিশ্বাস করে তবে তাতে দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই, কেননা ইতিপূর্বে যখনই কোনো নবী রাসূল এসেছেন তখনই কাফেররা তাদের সঙ্গে এমন আচরণই করেছে যা মক্কার কাফেররা আপনার সাথে করছে। আর আদ ও ছামূদ জাতি এমন ধ্বংসাত্মক আচরণ করেই ধ্বংস হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আদ জাতির অন্যায় অনাচার, দম্ভ-অহংকার এবং তাদের শাস্তির কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً : আর আদ জাতির ব্যাপার এই যে, তারা অযথা পৃথিবীতে বড়াই করতো এবং বলতো, আমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কে?

আদ জাতির লোকেরা দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল, তারা পাহাড়ের বড় বড় পাথরকে উঠিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতো, তাদের দৈহিক শক্তির দম্ভ ছিল অনেক বেশি, তারা বলতো আমাদের কোনো ভয় নেই, আমরা যে কোনো বিপদের মোকাবিলা করতে পারি, আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারে এমন কেউ নেই, কাজেই আমাদেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে কোনো লাভ হবে না। কারো কোনো আজাবের ভয়কে আমরা পরওয়া করি না। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ . অর্থাৎ তবে কি তারা লক্ষ্য করে না? নিশ্চয়ই যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, আর তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ তারা যখন নিজেকে শক্তিশালী বলে দাবি করে তখন এ সত্য ভুলে যায় যে, পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেকে শক্তি দান করেছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন।

মূলত, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতো, অর্থাৎ তারা মনে মনে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের সত্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও দম্ভ অহমিকার কারণে তা অস্বীকার করতো, তাদের এ হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপই তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

قَوْلُهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا : এটা صَاعِقَةً এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও ছামূদের صَاعِقَةً বলে বর্ণিত হয়েছে। صَاعِقَةً শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صَاعِقَة বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صَاعِقَة ছিল। একাই رِيح صَرْصَرْ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝাঞ্ঝাবায়ু যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। -[কুরতুবী]

যাহহাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হতো। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষদিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুত যে কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব এসেছে তা বুধবারেই এসেছে। -[কুরতুবী, মাযহারী]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

قَوْلُهُ فِىْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ : ইসলামের নীতি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোনো দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝাঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অশুভ হওয়া জরুরি হয় না।

-[মাযহারী, বয়ানুল কুরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٩. وَاذْكُرْ يَوْمَ يُحْشَرُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ الْمَفْتُوْحَةِ وَضَمِّ الشِّيْنِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَعْدَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ يُسَاقُوْنَ.

১৯. এবং আপনি স্মরণ করুন যেদিন আল্লাহ তা'আলার শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। يُحْشَرُ শব্দটির শুরুতে ى ও ن এবং ش বর্ণে পেশ এবং أَعْدَاءُ-এর মধ্যে ফাতহার সাথে পড়বে।

٢٠. حَتّٰى إِذَا مَا زَائِدَةٌ جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

২০. তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। إِذَامَا-এর مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত।

٢١. وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَا شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَيْ أَرَادَ نُطْقَهُ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ قِيْلَ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْجُلُوْدِ وَقِيْلَ هُوَ مِنْ كَلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَالَّذِيْ بَعْدَهُ وَمَوْقِعُهُ تَقْرِيْبُ مَا قَبْلَهُ بِأَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى إِنْشَائِكُمْ اِبْتِدَاءً وَإِعَادَتِكُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَحْيَاءً قَادِرٌ عَلٰى إِنْطَاقِ جُلُوْدِكُمْ وَأَعْضَائِكُمْ.

২১. তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কেন দিয়েছ? তারা বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুকে কথাবলার শক্তি দিয়েছেন। যাকে ইচ্ছা করেন বাকশক্তি দেওয়ার তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। বর্ণিত আছে যে, وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ উক্তিটি ত্বকসমূহের উক্তি বা আল্লাহ তা'আলার উক্তি যেমন, আগত বাণী وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ টি আল্লাহ তা'আলার উক্তি। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উদ্দেশ্য পূর্বের তার বাণী أَنْطَقَنَا اللّٰهُ কে প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে আল্লাহ মানুষকে কোনো নমুনা ছাড়া এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে পারেন তিনি তোমাদের ত্বকসমূহকে বাকশক্তি দানেও সক্ষম।

٢٢. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ عِنْدَ اِرْتِكَابِكُمُ الْفَوَاحِشَ مِنْ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ لِأَنَّكُمْ لَمْ تُوْقِنُوْا بِالْبَعْثِ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ عِنْدَ اِسْتِتَارِكُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ.

২২. তোমরা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সময় কোনো কিছু গোপন করতে না, এ ধরনের বর্শবর্তী হয়ে যে, তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না। কেননা তোমরা পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে না। তবে তোমরা ধারণা কর যে, তোমাদের গোপন করার সময় তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ তা'আলা জানেন না।

২৩. ذٰلِكُمْ مُبْتَدَأٌ ظَنُّكُمْ بَدَلٌ مِنْهُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ نَعْتُ الْبَدَلِ وَالْخَبَرُ اَرْدٰكُمْ اَىْ اَهْلَكَكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

২৩. তোমাদের এই ধারণাই যা তোমরা তোমাদের প্রভুর ব্যাপারে ধারণা কর, তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে اَلَّذِىْ ظَنَنْتُمْ - بَدَل ظَنُّكُمْ এটা থেকে ذٰلِكُمْ মুবতাদা بِرَبِّكُمْ টি بَدَل থেকে সিফত আর اَرْدٰكُمْ টি খবর। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।

২৪. فَاِنْ يَّصْبِرُوْا عَلَى الْعَذَابِ فَالنَّارُ مَثْوًى مَنْزِلٌ لَّهُمْ ط وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا يَطْلُبُوا الْعُتْبٰى اَىِ الرِّضٰى فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ الْمَرْضِيِّيْنَ .

২৪. অতঃপর যদি তারা সবর করে আজাবের উপর তবুও তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর যদি তারা সন্তুষ্টি কামনা করে ওজর পেশ করে তবে তাদের ওজর কবুল করা হবে না। তারা সন্তুষ্টি প্রাপ্তদের মধ্য থেকে নয়।

২৫. وَقَيَّضْنَا سَبَّبْنَا لَهُمْ قُرَنَاۤءَ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ بِقَوْلِهِمْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ وَهُوَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الْاٰيَةَ فِىْ جُمْلَةِ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ هَلَكَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ج اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ .

২৫. আমি তাদের জন্য কিছু সাথী শয়তানদের থেকে নির্ধারণ করে তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি, অতঃপর তারা তাদের সামনের ও পিছনের আমলসমূহ অর্থাৎ দুনিয়ার বিষয়াদি, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও আখেরাতের বিষয়াদি অর্থাৎ তাদের আক্বীদা কোনো হিসাব ও পুনরুত্থান নেই ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিতে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে দিয়েছিল। এবং সে সমস্ত লোকদের ব্যাপারেও আল্লাহ তা'আলার শাস্তির আদেশ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বাণী لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ الخ বাস্তবায়িত হলো, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نُحْشَرُ : এটা جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ نُوْن বর্ণে যবর এবং شِيْن বর্ণে পেশ দিয়ে। এই সুরতে اَعْدَاءَ -এর শেষ হামযাটি মাফঊল হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হবে। দ্বিতীয় কেরাত যেটাকে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে মুফাসসির (র.) ও شِيْن বর্ণটি যবর দিয়ে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। এই সুরতে اَعْدَاءُ -এর শেষ হামযাটি نَائِبِ فَاعِلْ হওয়ার কারণে مرفوع হবে।

قَوْلُهُ اِلَى النَّارِ : অর্থাৎ اِلٰى مَوْقِفِ الْحِسَابِ

قَوْلُهُ يُسَاقُوْنَ : আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) يُوْزَعُوْنَ -এর তাফসীর করেছেন يُحْبَسُ اَوَّلُهُمْ عَلٰى اٰخِرِهِمْ দ্বারা। তবে উভয়ের উদ্দেশ্য একই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يُوزَعُونَ : এটা وَزْعٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ مَجْهُوْل -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ তাদেরকে একত্রিত করা হবে। অর্থাৎ অগ্রগামীদেরকে আটকে রাখা হবে যাতে সকলে একত্রিত হয়ে চলে। এর দ্বারা كَثْرَتْ -এর দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَسْتَعْتِبُوْا : এটা بَاب اِسْتِفْعَالٌ -এর اِسْتِعْتَابٌ মাসদার হতে مُضَارِع مَجْزُوْم -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ। কাশশাফ গ্রন্থকারের তাফসীর বেশি সুস্পষ্ট। আল্লামা মহল্লী (র.) এটাকেই পছন্দ করেছেন অর্থাৎ যদি তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ভাজন হওয়ার কামনা করে। অর্থাৎ এখানে اِسْتِعْتَابٌ টা عَتْبٰى হতে গঠিত হয়েছে اِعْتَابٌ থেকে নয়। কেননা তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ভাজন হওয়ার কামনা অন্য কারো থেকে নয়। বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার থেকেই কামনা করেছেন।

قَوْلُهُ قَيَّضْنَا : অর্থাৎ هَيَّأْنَا এবং قَدَّرْنَا এটা مَاضِى مَعْرُوْف -এর جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। মাসদার تَقْيِيْضٌ বাবে تَفْعِيْل মূলবর্ণ قَيْضٌ আর قَيْضٌ অর্থ হলো ডিমের খোসা। যেহেতু ডিমের খোসা ডিমের সাথে লেগে থাকে এই مُنَاسَبَتْ -এর কারণে تَقْيِيْض -এর অর্থ হয়েছে সাথে লাগিয়ে দেওয়া, চাপিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهُ فِىْ أُمَمٍ : অর্থাৎ كَائِنِيْنَ এখানে فِىْ টা مَعَ অর্থেও হতে পারে। عَلَيْهِمْ -এর ضَمِير مَجْرُوْر হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ مَعَ جُمْلَةِ أُمَمٍ

قَوْلُهُ مِنْ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ : এটা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, يَشْهَدَ টা نَزْع خَافِضٌ -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর সেই خَافِضٌ হলো مِنْ কেননা تَسْتَتِرُوْنَ টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِه হয়নি।

قَوْلُهُ عِنْدَ اِسْتِتَارِكُمْ اَىْ مِنَ النَّاسِ : অর্থাৎ مَعَ عَدَمِ اِسْتِتَارِكُمْ مِنْ اَعْضَائِكُمْ এখানে اَعْضَاء থেকে اِسْتِتَارٌ -এর শুধুমাত্র একটি সুরতই রয়েছে যে, ঐ فِعْل কেই পরিত্যাগ করা হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ يَصْبِرُوْا : প্রশ্ন. যখন মুশরিকদের জন্য সর্বাবস্থায়ই خُلُوْدٌ فِى النَّارِ টা دَائِمِىْ এবং لَازِمِىْ তথা অত্যাবশ্যক। চাই সবর করুক বা না করুক, তদুপরি اَنْ يَصْبِرُوْا -এর সাথে مُقَيَّدٌ করার হেতু কি?

উত্তর. আয়াতে উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এই যে, فَاِنْ يَصْبِرُوْا اَوْ لَا يَصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ইলম এবং শুহরত -এর কারণে مُقَابِلْ কে حَذْف করে দেওয়া হয়েছে। কেননা যখন সবরের সুরতে ঠিকানা জাহান্নাম হবে তখন সবর না করার সুরতে তো بِطَرِيْقِ اَوْلٰى ই ঠিকানা জাহান্নাম হবে।

قَوْلُهُ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ اَىْ لِلْقُرَيْشِ : কাজেই فِىْ اُمَمٍ বলা বৈধ হয়ে গেল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ : এটা وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ الخ : আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোনো গোনাহ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত-পা দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়। বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোনো অপরাধ ও গোনাহ করার কোনো পথই

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তাওহীদ ও রেসালাত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন তার জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজকর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলা বাহুল্য, তোমাদের এই বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান : সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরজ করলাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি যা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে হে পরওয়ারদিগার, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোনো সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হবো না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. অর্থাৎ ভালো কথা তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে– بُعْدًا لَّكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ أُنَاضِلُ অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি তোমাদের সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। –[মাযহারী]

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোনো পুণ্যকাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে কখনো পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রি মানুষকে ডেকে একথা বলে। –[কুরতুবী]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ .... كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ - **আয়াতের শানে নুযূল :** বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কা'বা শরীফের নিকট সাকাফ গোত্রের দুইজন এবং কোরায়েশ গোত্রের একজন অথবা দুইজন কোরাইশী ও একজন সাকাফী একত্রিত হয়। এই তিনজনেরই পেট বেশ মোটা ছিল, তাতে চর্বি জমেছিল তবে বুদ্ধি কম ছিল। তাদের একজন বলল, তোমরা কি জান আল্লাহ তা'আলা আমাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা চিৎকার করে বললে শুনেন, আর চুপে চুপে বললে শুনেন না। আর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, যদি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বললে শুনেন তবে নিম্নস্বরে বললেও শুনবেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, সাকাফী লোকটি ছিল আবদ ইয়ালাইল। আর কুরাইশী দু'জন ছিল রবীয়া এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া। তাদের এ কথাবার্তার পরই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তোমরা কি চিন্তা করেছিলে? যে তোমাদের চক্ষু কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে বস্তুতঃ তা তোমরা তখন কল্পনাও করনি; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমরা এ ভুল ধারণা করতে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন না। এজন্যেই তোমরা নির্ভয়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে লিপ্ত ছিলে। আর তোমাদের এ ভুল ধারণাই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যদি তোমরা একথা বিশ্বাস করতে যে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন তবে তার নাফরমানি করার ধৃষ্টতা তোমরা দেখাতে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ : অর্থাৎ অতএব, তারা যদি সবর অবলম্বন করে তবুও দোজখই হবে তাদের ঠিকানা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পৃথিবীতে ধৈর্যধারণ করলে অনেক বিপদ দূর হয়ে যায়। বিখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিব কথাটিকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন?

رنج کا خوگر ہوا انسان تومٹ جاتا ہے رنج

مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گیں ۔

অর্থাৎ যদি বিপদাপদে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে তা দূরীভূত হয়ে যায়, আমার জীবনে এত কঠিন সমস্যা এসেছে যে সবই সহজ হয়ে গেছে।

যাহোক এ অবস্থা দুনিয়ার ব্যাপারে হতে পারে কিন্তু আখেরাতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যদি কাফেররা সবরও করে তবুও তাদের বিপদ কম হবে না, দোজখই থাকবে তাদের ঠিকানা, দোজখের শাস্তিও অব্যাহত থাকবে।

قَوْلُهُ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে এ শাস্তির কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ـ

আর এ নাফরমানদের জন্যে আমি কিছু এমন সহচর নির্ধারণ করেছি যারা তাদের চরম ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কীর্তিকলাপকে সুন্দর এবং শোভনীয় করে দেখাত। তারা তাদের যাবতীয় অসৎ কর্মকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করতো। আর ভবিষ্যতের প্রশ্নে তথা আখেরাতের ক্ষেত্রে ঐ সহচররা বলতো, জান্নাত, দোজখ, কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এসব কিছুই নেই, দুনিয়ার জীবনই সত্য, আর এজীবনকে যেভাবে পার ভোগ কর, দুনিয়া কখনো শেষ হবে না। এভাবে তাদেরকে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থাকার সুযোগ দিত তাদের ঘৃণ্য কীর্তিকলাপকে এ দুষ্ট সহচররা অত্যন্ত লোভনীয় মোহনীয় করে তুলত। পরিণামে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার একটি ঘোষণা বাস্তবায়িত হলো, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রথম দিন ইবলিস শয়তান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়- لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ অর্থাৎ আমি তোকে এবং তোর অনুসারীদেরকে দিয়ে দোজখকে পরিপূর্ণ করে দেব। আর এ শাস্তি নতুন কিছু নয়; বরং তাদের পূর্বে যারা পৃথিবীতে ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তা জিন হোক বা মানুষ তাদেরও এমন শাস্তি হয়েছিল। إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ـ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত।

অসৎ সংসর্গ বিষতুল্য :

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য-

১. অসৎ সংসর্গ মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়, মন্দ সাথী মানুষকে মন্দ কাজে আকৃষ্ট করে এবং ঐ মন্দ সংসর্গের কারণে ভালো মন্দ হয়ে যায়, পরিণামে তার জীবনে আসে ধ্বংস, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সে হয় সর্বস্বান্ত, অতএব অসৎ সংসর্গ বিষতুল্য, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে।

২. যখন মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাকে অন্যায় মনে করে না, বরং তাকে সুন্দর, শোভনীয় এবং যুক্তিপূর্ণ মনে করে। আর অন্যায় কাজের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের কাজটিই করে মন্দ সহচরেরা, আর এভাবেই মানুষের জীবনে ধ্বংস নেমে আসে, দুনিয়া-আখেরাত দু'জাহানে তার শাস্তি হয় অবধারিত।

৩. যেহেতু মন্দ কাজকে মন্দ মনে করা হয় না তাই তা বর্জন করার চিন্তাও করা হয় না, পরিণামে এমন লোকেরা কখনও ঘৃণ্য কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। সারা জীবন মন্দ কাজেই লিপ্ত থাকে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের হাশর তেমনই হবে যেমন তোমাদের মৃত্যু হবে, আর তোমাদের মৃত্যু তেমনই হবে যেমন তোমাদের জীবন হবে।"

অতএব, যার এ জীবন মন্দ হবে তার পরজীবনও মন্দ, অপমানজনক এবং বিপদজনক হবে [আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করুন।]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٦. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عِنْدَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ اِيْتُوْا بِاللَّغَطِ وَنَحْوِهٖ وَصِيْحُوْا فِيْ زَمَنِ قِرَاءَتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ فَيَسْكُتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ.

২৬. মহানবী ﷺ -এর কুরআন পড়ার সময় কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং হট্টগোল সৃষ্টি কর তার ﷺ পড়ার সময় শোর ও হট্টগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা বিজয়ী হও। অতঃপর তিনি কুরআন পড়া থেকে নিশ্চুপ হয়ে যাবেন।

٢٧. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اَيْ اَقْبَحَ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ.

২৭. আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন, আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আজাব আস্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও খারাপ কাজের প্রতিফল দেব। অর্থাৎ তাদের কর্মের মন্দ ফলাফল দেব।

٢٨. ذٰلِكَ اَيِ الْعَذَابُ الشَّدِيْدُ وَاَسْوَءُ الْجَزَاءِ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَاِبْدَالِهَا وَاوًا النَّارُ ج عَطْفُ بَيَانٍ لِلْجَزَاءِ الْمُخْبَرِ بِهٖ عَنْ ذٰلِكَ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ط اَيْ اِقَامَةٌ لَا اِنْتِقَالَ مِنْهَا جَزَآءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ يَجْحَدُوْنَ.

২৮. এটা অর্থাৎ কঠিন শাস্তি ও মন্দ পরিণাম আল্লাহ তা'আলার শত্রুদের শাস্তি, জাহান্নাম। جَزَاءُ শব্দটির দ্বিতীয় হামযাকে হামযা বা وَاوْ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়বে। اَلنَّارُ টি اَلْجَزَاءُ -এর আতফে বায়ান, এবং এটা ذٰلِكَ -এর খবর। তাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আজাব এটা থেকে তারা স্থানান্তরিত হবে না। এটা আমার আয়াতসমূহ কুরআন অস্বীকার করার প্রতিফল স্বরূপ। جَزَاءً শব্দটি উহ্য ফে'লের মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসূব।

٢٩. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي النَّارِ رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَيْ اِبْلِيْسَ وَقَابِيْلَ سَنَّا الْكُفْرَ وَالْقَتْلَ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا فِي النَّارِ لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ اَيْ اَشَدَّ عَذَابًا مِنَّا.

২৯. কাফেররা বলবে, জাহান্নামে হে আমাদের পালনকর্তা যেসব জিন ও মানুষ অর্থাৎ ইবলিশ শয়তান ও কাবিল, তারা উভয়ে কুফর ও হত্যার প্রথা চালু করেন আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, তাদেরকে আমরা জাহান্নামে পদদলিত করব। যাতে তারা আমাদের চেয়ে জাহান্নামে নিম্নস্তরে অবস্থান করে অধিক শাস্তিতে অপমানিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩০. إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا عَلَى التَّوْحِيْدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنْ أَيْ بِأَنْ لَا تَخَافُوْا مِنَ الْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا خَلَّفْتُمْ مِنْ أَهْلٍ وَلَدٍ فَنَحْنُ نَخْلُفُكُمْ فِيْهِ وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

৩০. নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা, অতঃপর তাওহীদ ও তাদের উপর ওয়াজিবকৃত হুকুম আহকামের উপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়, তাদের মৃত্যুর সময় এবং বলে তোমরা ভয় করো না মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থার ব্যাপারে ও চিন্তা করো না দুনিয়াতে তোমাদের রেখে যাওয়া সন্তান-সন্তুতিদের ব্যাপারে। কেননা এদের ব্যাপারে আমি তোমাদের খলীফা। এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।

৩১. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا أَيْ حَفِظْنٰكُمْ فِيْهَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ج أَيْ نَكُوْنُ مَعَكُمْ فِيْهَا حَتّٰى تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ تَطْلُبُوْنَ.

৩১. আমরা ইহকালে ও পরকালে তোমাদের বন্ধু অর্থাৎ দুনিয়াতে আমি তোমাদেরকে হেফাজত করব এবং পরকালে তোমাদের সাথে থাকব তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি কর, তোমরা চাও।

৩২. نُزُلًا رِزْقًا مُهَيَّأً مَنْصُوْبٌ بِجَعَلَ مُقَدَّرًا مِنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ أَيِ اللّٰهِ.

৩২. এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন। তৈরিকৃত রিজিক। نُزُلًا শব্দটি উহ্য جَعَلَ ফে'লের মাফউল হিসেবে মানসূব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ : এটা قَالَ -এর ظَرْف হয়েছে। অর্থাৎ قَالَ عِنْدَ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ

قَوْلُهُ وَالْغَوْا : اِلْغَوْا টি বাবে فَتَحَ ও سَمِعَ . نَصَرَ -এর সীগাহ। অর্থ– অহেতুক কথা বলা, বকবক করা। চেচামেচি করা।

قَوْلُهُ اللَّغَط : অর্থ– হৈ চৈ করা, অহেতুক কথা বলা। এটা لَغْوٌ -এর সমার্থক।

قَوْلُهُ أَيْ أَقْبَحَ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে একটি সংশয়ের নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেররা তাদের আমলের মতো প্রকারের জঘন্য প্রতিদান পাবে। যেমন সে সকল মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর সাথে উপহাস করেছিল পরকালে তাদেরকে জঘন্যতম ধরনের উপহাস করা হবে। অথচ উদ্দেশ্য এটা নয়।

নিরসন : বাক্যটি উহ্য মুযাফের সাথে রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَقْبَحَ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَلْعَذَابُ الشَّدِيْدُ الخ : এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ নির্ধারণ করা। আর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো فَلَنُذِيْقَنَّهُمْ এবং وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

ذٰلِكَ হলো মুবতাদা আর جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ তার খবর আর اَلنَّارُ হলো جَزَاءُ থেকে بَدَلٌ অথবা عَطْف بَيَانٌ এটাও হতে পারে যে, ذٰلِكَ الْاَمْرُ হলো উহ্য মুবতাদার খবর আর جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ হলো পূর্বের بَيَانٌ তবে প্রথমটি উত্তম।

প্রশ্ন. اَلنَّارُ কে جَزَاءُ থেকে بَدَلٌ বলা সহীহ নয়। কেননা بَدَلٌ সহীহ হওয়ার আলামত হলো যে, যদি بَدَلٌ কে مُبْدَلٌ مِنْهُ -এর স্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে অর্থ ঠিক থাকবে। অথচ এখানে এরূপ হয়নি, কেননা بَدَلٌ কে مُبْدَلٌ مِنْهُ -এর স্থানে রাখার পর উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, ذٰلِكَ النَّارُ اَعْدَاءُ, আর এটা সহীহ নয়। কাজেই مَرْجُوْح ই'রাব হতে راجح ই'রাবের দিকে ফিরে যাওয়া জরুরি। اَلنَّارُ কে هِيَ উহ্য মুবতাদার খবর বলা হবে অথবা اَلنَّارُ কে মুবতাদা বলা হবে। তার পরবর্তী অংশ অর্থাৎ وَلَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ কে উহার খবর বলা হবে।

প্রশ্ন. لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ -এর মধ্যে فِيْهَا -এর যমীরের مَرْجِعٌ হলো اَلنَّارُ আর نَارٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জাহান্নাম আর জাহান্নাম হলো دَارُ الْخُلْدِ -এর অর্থ হলো- فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ এখন مَوْصُوْفٌ بِصِفَةِ الْخُلْدِ -এর মধ্যে دَارُ الْخُلْدِ রয়েছে। আর এটা ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهٖ হয়েছে যা জায়েজ নেই।

উত্তর. বাক্যের মধ্যে تَجْرِيْد হয়েছে تَجْرِيْد বলা হয় কোনো اَمْر ذِيْ صِفَتْ থেকে তারই مُوَافِقٌ মুবালাগার ভিত্তিতে অন্য একটি اَمْر ذِيْ صِفَتْ -এর اِنْتِزَاعٌ করা। যেমনিভাবে এখানে اَلنَّارُ দ্বারা دَار اٰخِرَة -এর اِنْتِزَاعٌ করে তার নাম دَارُ الْخُلْدِ রেখে দিয়েছে। কাজেই এটা ঠিক আছে।

قَوْلُهُ جَزَاءً : এটা উহ্য ফে'লের মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ يُجْزَوْنَ جَزَاءً

قَوْلُهُ بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ : **প্রশ্ন.** بِاٰيٰتِنَا -এর মধ্যে بَاء টি কিরূপ?

উত্তর. হয়তো بَاء টি অতিরিক্ত। অথবা يَجْحَدُوْنَ টা يَكْفُرُوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। এই সুরতে بَاء টি تَعْدِيَة -এর জন্য হবে।

قَوْلُهُ فِي النَّارِ : এটা قَالَ -এর ফায়েল اَلَّذِيْنَ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ كَائِنِيْنَ فِي النَّارِ

قَوْلُهُ اَرِنَا : اَرِنَا এটা اَمْر -এর وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ نَا হলো جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর যমীর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلَّذِيْن আর হামযাটা تَعْدِيَةٌ اِلَى الْمَفْعُوْلِ الثَّانِيْ -এর জন্য হয়েছে যমীর হলো প্রথম مَفْعُوْل আর رُؤْيَة بَصَرِيَّة দ্বিতীয় মাফউল। اَرِنَا -এর মূল ছিল اَرْئِيْنَا অর্থাৎ صَيِّرْنَا رَائِيْنَ بِاَبْصَارِنَا - يَاء হরফে ইল্লত যা لَام كَلِمَة ফে'লটা হরফে ইল্লত উহ্য থাকার উপর مَبْنِيٌّ হওয়ার কারণে حَذْف হয়ে গেছে। দ্বিতীয় হামযা যা عَيْن كَلِمَة উহার كَسْرَة কে তার পূর্বের رَاء কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যা فَاء كَلِمَة এখন তার ওজন اَرِنَا হয়ে গেছে। বিদ্যমান হামযাটি শব্দের নয় বরং تَعْدِيَة -এর জন্য হয়েছে।

خَوْف এবং حُزْن -এর মধ্যকার পার্থক্য :

قَوْلُهُ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا : আগত ভবিষ্যত কষ্টের কারণে মানুষের যেই অবস্থা হয় তাকে خَوْف বলে। আর অতীতকালে কোনো উপকারী বস্তু ছুটে যাওয়ার কারণে যে অবস্থা হয় তাকে حُزْن বলা হয়।

قَوْلُهُ اَنْ اَيْ بِاَنْ : এখানে اَنْ হলো مَصْدَرِيَّة আর بَاء উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ قَائِلِيْنَ لَهُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا حُزْنٌ -

قَوْلُهُ اَبْشِرُوْا : এটা বাবে اِفْعَالٌ -এর اِبْشَارٌ মাসদার হতে اَمْر -এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। অর্থ- তোমাদের সুসংবাদ হোক।

قَوْلُهُ نَحْنُ اَوْلِيَاۤئُكُمْ : এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলার كَلَامٌ ও হতে পারে। আবার ফেরেশতাদের কথাও হতে পারে।

قَوْلُهُ نُزُلًا : এটা تَدَّعُوْنَ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে نُزُلٌ সেই খাবারকে বলা হয় যা মেহমানের জন্য যিয়াফতের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ : অর্থাৎ কাফেররা কুরআনের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। –[কুরতুবী]

নীরবতার সাথে কুরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব, হৈ-হুল্লোড় করা কাফেরদের অভ্যাস : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরো জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরাও তাদের কাজকর্মে এবং গ্রাহকরাও খানা-পিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যত এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা কাফেদের আলামত ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজকর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাফেরদের অপচেষ্টা ব্যর্থ : দূরাত্মা কাফেররা মানুষকে পবিত্র কুরআন থেকে দূরে রাখার এ অপচেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পবিত্র কুরআন স্ব-মহিমায় সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে, বিগত চৌদ্দশত বছরে পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষার প্রচার প্রসারে কখনো ভাটা পড়েনি, আধুনিক বিশ্বের চারশত ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন। হাফেজগণ তা কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন, কারীগণ তাদের সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন আবৃত্তি করে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত রাখছেন। অনুবাদকগণ অনুবাদ করে এবং তাফসীরকারগণ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা পেশ করে তার মর্মবাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, আর এ অবস্থা ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম, তার মহান বাণী, বিশ্ব মানবের নামে আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ পয়গাম, বিশ্ব কল্যাণের মূর্ত প্রতীক, যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন পবিত্র কুরআনও থাকবে।

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. অর্থাৎ অতএব, আমি এ কাফেরদেরকে কঠিন আজাব আস্বাদন করাব, আর নিশ্চয়ই আমি তাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের শাস্তি প্রদান করব।

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কুরআনের প্রচারে কাফেরদের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ অপকর্মের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন যে, কাফেরদেরকে তাদের অপরাধের জন্যে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের জঘন্যতম অন্যায়ের জন্যে কঠোরতর শাস্তি অপেক্ষা করছে।

ذٰلِكَ جَزَاۤءُ اَعْدَاۤءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَاۤءً ۢبِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ. অর্থাৎ এটি আল্লাহ তা'আলার দুশমনদের শাস্তি, দোজখ, সেখানে তাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল রয়েছে, অর্থাৎ তারা চিরদিন দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, কাফেররা পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় হট্টগোল করে, চিৎকার করে, তালি বাজিয়ে মানুষকে পবিত্র কুরআন শ্রবণে বাধা দিতো, এজন্য তাদের চিরস্থায়ী শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কর্তব্য : এ পর্যায়ে মুমিনদের কর্তব্য নির্দেশ করে ইরশাদ হয়েছে– وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. অর্থাৎ আর যখন পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।

অতএব, মুমিন মাত্রেরই কর্তব্য হলো, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় তার আদব রক্ষা করা তথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা যত্ন সহকারে এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভ করা যাবে।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে রেডিও টেলিভিশনের ন্যায় প্রচার মাধ্যমে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয়। এ পর্যায়ে মুমিন মাত্রেরই কর্তব্য হলো সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। যারা এ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে অন্য আয়াতে– فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ. অর্থাৎ হে রাসূল ﷺ ! আপনি সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা মনোযোগ সহকারে কুরআনে কারীম শ্রবণ করে এবং তার উত্তম কথাগুলো মেনে চলে, এরাই সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করেছেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ الخ : সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কুরআন, রেসালাত ও তাওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের সৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তাওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আজাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামেলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মুমিন ও কামেল তারাই যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল পুরোপুরিভাবে শরিয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবর এবং মন্দের জওয়াবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ : বলা হয়েছে– إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহ তা'আলাকে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে [এটা হলো মূল ঈমান] অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে [এটা হলো সৎকর্ম]। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। اِسْتِقَامَتْ শব্দের অর্থ বর্ণিত হয়েছে ঈমান ও তাওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তাফসীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত উসমান (রা.) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ করেছেন খাঁটি আমল করা। হযরত ওমর (রা.) বলেন اَلْاِسْتِقَامَةُ أَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَا تَرُوغَ رَوَغَانَ الثَّعَالِبِ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম اِسْتِقَامَةٌ –[মাযহারী]

তাই আলেমগণ বলেন, اِسْتِقَامَةٌ সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তাফসীরে কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ তা'আলার প্রতিপালনাধীন, তার রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন, যা শোনার পর অন্য কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাস করার প্রয়োজন থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ তুমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর, অতঃপর তাতে অবিচল থাক। –[মুসলিম]

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

একারণেই হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) اِسْتِقَامَةٌ -এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, ফরজ কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اِسْتِقَامَةٌ এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, اِسْتِقَامَةٌ -এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রা.) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে জারীর এই তাফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ : ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী ইবনে জাররাহ বলেন, তিন সময়ে হবে– প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, আমি তো বলি যে, মুমিনের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুস দেখা ও তাদের কথা শোনা উপরিউক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বানানী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম সিজদা তেলাওয়াত করত আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকতো, তারা এসে বলবে তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ : অর্থাৎ ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত যখন কোনো বড় লোকের মেহমান হয়। –[মাযহারী]

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে কোনো পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোনো কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। –[মাযহারী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ : অথাৎ এটি হলো অত্যন্ত ক্ষমা প্রিয় করুণাময় প্রভুর আপ্যায়ন।

বস্তুতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা, তার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া, এই নিয়ামত নজিরবিহীন। তাই হাদীসে শরীফে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়বান্দাদেরকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রদানের পর ইরশাদ করবেন হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আরো কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তখন জান্নাতবাসীগণ আরজ করবে, হে পরওয়ারদিগার! সবই তো তুমি দান করেছ, আর আমাদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এরপর ঘোষণা করা হবে– رِضَائِيْ অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি দান করলাম, এরপর আমি আর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আহমদ, নাসায়ী সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা সুয়ূতী (র.)। এ হাদীসে হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন- (اَلْحَدِيْثُ) مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার মোলাকাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার মোলাকাতকে পছন্দ করেন।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমরা সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি, তিনি ইরশাদ করলেন, বিষয়টি মৃত্যুকে অপছন্দ করা নয়; বরং যখন কোনো মুমিনের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সুসংবাদ দাতা ফেরেশতা তার নিকট আসে এবং তার জন্যে যেসব নিয়ামত রয়েছে তার সুসংবাদ দান করে। তখন ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়াকে সর্বাধিক পছন্দ করে, আর তাই আল্লাহ তা'আলাও তার উপস্থিতিকে পছন্দ করেন।

পক্ষান্তরে কোনো পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নিকট যখন মৃত্যু হাজির হয় তখন আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে ফেরেশতা এসে তার পরিণতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করে, এমন অবস্থায় সে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হওয়া অপছন্দ করে, তাই আল্লাহ তা'আলাও এমন ব্যক্তির উপস্থিতিকে অপছন্দ করেন।

জান্নাতীদের আপ্যায়ন : জান্নাতে নেককার মুমিনদের আপ্যায়নের যে অসাধারণ ব্যবস্থা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে হাদীস শরীফে। এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমতঃ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হবেন মেজবান, আর জান্নাতীগণ হবেন তার মেহমান, অতএব মেহমানদারীর যে শান হবে তা শুধু বর্ণনাতীতই নয়; বরং কল্পনাতীতও।

ইবনে আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা জান্নাতে যখনই কোনো পাখি দেখে তার গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা ভাজা গোশত হয়ে তোমাদের সম্মুখে এসে পড়বে।

হযরত আবূ উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, কোনো জান্নাতী ব্যক্তি যখনই পাখীর গোশত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তখনই উড়ন্ত পাখী তার দস্তরখানে আহার্য হিসেবে এসে পড়বে। কিন্তু সেখানে অগ্নিও থাকবে না ধোয়াও থাকবে না। জান্নাতীগণ সে পাখির গোশত পেট ভরে আহার করবে, এরপর পাখিটি পুনরায় উড়ে চলে যাবে। -[তাফসীরে মাযহারী, খ. ১০, পৃ. ২৮৮]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٣. وَمَنْ اَحْسَنُ اَىْ لَا اَحَدٌ مِنْ اَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৩৩. তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কার? যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দিকে মানুষকে আহ্বান করে ও সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন মুসলমান আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তার কথার চেয়ে কারো কথা উত্তম নয়।

٣٤. وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط فِىْ جُزْئِيَّاتِهِمَا لِاَنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِدْفَعْ اَىِ السَّيِّئَةَ بِالَّتِىْ اَىْ بِالْخَصْلَةِ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ كَالْغَضَبِ بِالصَّبْرِ وَالْجَهْلِ بِالْحِلْمِ وَالْاِسَاءَةِ بِالْعَفْوِ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ اَىْ فَيَصِيْرُ عَدُوُّكَ كَالصَّدِيْقِ الْقَرِيْبِ فِىْ مَحَبَّتِهِ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ فَالَّذِىْ مُبْتَدَأٌ وَكَاَنَّهُ الْخَبَرُ وَاِذَا ظَرْفٌ لِمَعْنَى التَّشْبِيْهِ ـ

৩৪. সব ভালো পরস্পর সমান নয় ও সব মন্দও তার সংখ্যার মধ্যে পরস্পর সমান নয়। কেননা এদের মধ্যে একে অপরের চেয়ে বড়। আপনি মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। যেমন ক্রোধকে ধৈর্য দ্বারা, মূর্খতাকে সহনশীলতার মাধ্যমে ও অত্যাচারকে ক্ষমার মাধ্যমে জবাব দিন। অতঃপর আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়। অতঃপর আপনার এই চরিত্রের কারণে, আপনার চরম শত্রু বন্ধু হিসেবে পরিণত হবে। এখানে اَلَّذِىْ মুবতাদা এবং كَاَنَّهُ খবর এবং اِذَا শব্দটি তাশবীহের অর্থ প্রদান করে কালবাচক পদ হয়েছে।

٣٥. وَمَا يُلَقّٰهَا اَىْ يُؤْتَى الْخَصْلَةَ الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ ثَوَابٍ عَظِيْمٍ ـ

৩৫. এ চরিত্র তারাই লাভ করে এই উত্তমটি তাদেরই দান করা হয় যারা সবর করে। এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।

٣٦. وَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ اَىْ اَنْ يَصْرِفَكَ عَنِ الْخَصْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَيْرِ صَارِفٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط جَوَابُ الشَّرْطِ وَجَوَابُ الْاَمْرِ مَحْذُوْفٌ اَىْ يَدْفَعُهُ عَنْكَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ لِلْقَوْلِ الْعَلِيْمُ بِالْفِعْلِ ـ

৩৬. اِمَّا শব্দটি শর্তজ্ঞাপক অব্যয় اِنْ ও অতিরিক্ত অব্যয় مَا দ্বারা যৌগিক এবং مَا কে اِنْ-এর সাথে ইদগাম করা হয়েছে। যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কোনো কুমন্ত্রণা অনুভব করেন। অর্থা যদি কোনো বিরতকারী আপনাকে কোনো সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তবে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট শরণাপন্ন হোন। فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ শর্তের জওয়াব এবং জওয়াবে আমর উহ্য অর্থাৎ يَدْفَعُهُ عَنْكَ অর্থাৎ যাতে আপনার কাছ থেকে এটা দূর হয়। নিশ্চয়ই তিনি কথাবার্তা সর্বশ্রোতা, কাজকর্মের প্রতি সর্বজ্ঞ।

Free @ www.eilm.weebly.com

۳۷. وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ ط لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اي الْاٰيٰتِ
الْاَرْبَعَ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۔

৩৭. তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, এবং আল্লাহ তা'আলাকে সেজদা কর যিনি এগুলো অর্থাৎ চার নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তারই ইবাদত কর।

۳۸. فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا عَنِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ
فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ اي الْمَلٰٓئِكَةُ
يُسَبِّحُوْنَ يُصَلُّوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ
لَا يَسْئَمُوْنَ لَا يَمَلُّوْنَ ۔

৩৮. অতঃপর তারা যদি এক আল্লাহ তা'আলার সেজদা থেকে অহংকার করে তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে অর্থাৎ ফেরেশতারা দিবারাত্রি তারই পবিত্রতা বর্ণনা করে তার সালাত আদায় করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

۳۹. وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً
يَابِسَةً لَا نَبَاتَ فِيْهَا فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَآءَ اهْتَزَّتْ تَحَرَّكَتْ وَرَبَتْ ط اِنْتَفَخَتْ
وَعَلَتْ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ط
اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

৩৯. তার আরেক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর শুকনা, কোনো ক্ষেতবিহীন পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন এতে পানি, বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন এটা তরতাজা হয়ে শস্য-শ্যামল, স্ফীত ও উথিত হয়। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর উপর সক্ষম।

٤٠. اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ مِنْ اَلْحَدَ وَلَحَدَ فِيْٓ
اٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ بِالتَّكْذِيْبِ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ط
فَنُجَازِيْهِمْ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ
يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ط اِنَّهٗ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ ۔

৪০. নিঃসন্দেহে যারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে কুরআনকে অস্বীকার করে বক্রতা অবলম্বন করে يُلْحِدُوْنَ ক্রিয়াটি لَحَدَ বা اَلْحَدَ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুড়ে পড়া। তারা আমার নিকট গোপন নয়। অতঃপর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। কিয়ামতের দিসবে যে ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে নিরাপদে থাকবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর। নিশ্চয় তিনি পর্যবেক্ষণকারী তোমরা যা কর। তাদের প্রতি ধমকমূলক এটা বলা হয়েছে।

٤١. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ الْقُرْاٰنِ لَمَّا
جَآءَهُمْ ج نُجَازِيْهِمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ لا مَنِيْعٌ ۔

৪১. নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট জিকির কুরআন আসার পরও অস্বীকার করে, আমরা তাদের প্রতিদান দেব নিশ্চয়ই এটা এক সম্মানিত বিরল গ্রন্থ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٢. لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ط اَيْ لَيْسَ قَبْلَهُ كِتَابٌ يُكَذِّبُهُ وَلَا بَعْدَهُ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ اَيِ اللّٰهِ الْمَحْمُوْدِ فِيْ اَمْرِهِ .

৪২. এতে কোনো বাতিল নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। অর্থাৎ তার আগে ও পরে এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা তাকে অস্বীকার করে। এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত তার কর্মসমূহে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

٤٣. مَا يُقَالُ لَكَ مِنَ التَّكْذِيْبِ اِلَّا مِثْلَ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ط اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ لِّلْكَافِرِيْنَ .

৪৩. আপনার ব্যাপারে তাই বলা হয় অস্বীকার মূলক যা বলা হতো পূর্ববর্তী রাসূলগণকে। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা ঈমানদারদের প্রতি ক্ষমাশীল ও কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি দাতা।

٤٤. وَلَوْ جَعَلْنٰهُ اَيِ الذِّكْرَ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا هَلَّا فُصِّلَتْ بُيِّنَتْ اٰيٰتُهُ ط حَتّٰى نَفْهَمَهَا ءَ اَقُرْاٰنٌ اَعْجَمِيٌّ وَّ نَبِيٌّ عَرَبِيٌّ ط اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ مِّنْهُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَقَلْبِهَا اَلِفًا بِاِشْبَاعٍ وَّدُوْنَهُ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ وَّشِفَاءٌ ط مِّنَ الْجَهْلِ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ ثِقَلٌ فَلَا يَسْمَعُوْنَهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ اَيْ هُمْ كَالْمُنَادٰى مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَفْهَمُ مَا يُنَادٰى بِهِ .

৪৪. আর যদি আমি একে অর্থাৎ এই কুরআনকে অনারব ভাষায় কুরআন করতাম, তখন তারা অবশ্যই বলতো, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়নি কেন? যাতে আমরা এটা বুঝতাম এটা কি ব্যাপার যে, কুরআন অনারব ভাষায় আর রাসূল আরবি ভাষী? এটা তাদের পক্ষ থেকে অস্বীকারমূলক প্রশ্ন। ءَاَعْجَمِيٌّ -এর মধ্যে দ্বিতীয় হামযাকে প্রথম হামযার সাথে বা আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে বা উভয় হামযার মধ্যখানে আলিফ যুক্ত করে বা আলিফবিহীন অর্থাৎ اِشْبَاعٌ বা اِشْبَاعٌ বিহীন পড়া যাবে। বলুন, এটা বিশ্ববাসীদের জন্য পথভ্রষ্টতা থেকে [হেদায়েত ও] অজ্ঞতার প্রতিকার। এবং যারা ঈমান গ্রহণ করেনি তাদের কানে রয়েছে বধিরত্ব বোঝা, ফলে তারা শুনে না এবং এটা তাদের কাছে অন্ধত্ব ফলে তারা এটা বুঝে না। এবং এ সমস্ত লোক যেন তাদেরকে দূরবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করা হয়। অর্থাৎ তারা দূর থেকে আহ্বানকৃত ব্যক্তির ন্যায়, তারা শুনে না ও বুঝে না যে, তাদেরকে কি বলা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ التَّوْرٰةَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط بِالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ كَالْقُرْاٰنِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاخِيْرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط فِى الدُّنْيَا فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَاِنَّهُمْ اَىِ الْمُكَذِّبِيْنَ بِهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ مُوْقِعُ الرِّيْبَةِ.

৪৫. আমি মূসাকে কিতাব তাওরাত দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতেও কুরআনের ন্যায় কেউ বিশ্বাস ও কেউ অস্বীকার করে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে মাখলুকের হিসাব-নিকাশ কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত বিলম্ব করার উপর পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে অবশ্যই তাদের মধ্যে দুনিয়াতে ফয়সালা হয়ে যেত। সে বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছে। এবং তারা কুরআনের অস্বীকার কারীগণ কুরআন সম্বন্ধে এক দ্বিধাপূর্ণ সন্দেহে লিপ্ত।

٤٦. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ عَمِلَ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا اَىْ فَضَرَرُ اِسَاءَتِهٖ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ اَىْ بِذِىْ ظُلْمٍ لِقَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের উপকারের জন্যেই সৎকর্ম করে আর যে অসৎকর্ম করে তা তার উপরই বর্তাবে অর্থাৎ সে অসৎ কর্মের অনিষ্টতা তার নিজেরই ক্ষতি করবেন। এবং আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নয়। অর্থাৎ জুলুমকারী নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا : مَنْ হলো اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ মুবতাদা। মুফাসসির (র.) لَا اَحَدَ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مَنْ টা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হয়েছে। اَحْسَنُ হলো খবর। قَوْلًا টা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। عَمِلَ صَالِحًا হলো جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ

قَوْلُهُ فِىْ جُزْئِيَّاتِهِمَا لِاَنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ : এই ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ এবং اَجْزَاءٌ জুযইয়্যাত جُزْئِيَّاتٌ-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। আর পার্থক্য বর্ণনা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَاسِيْس-এর মধ্যে এটা বলা যে, দ্বিতীয় لَا টা تَاسِيْس-এর জন্য হয়েছে تَاكِيْد-এর জন্য নয়। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, تَاسِيْس টা تَاكِيْد থেকে উত্তম। কেননা تَاكِيْد দ্বারা পূর্ববর্তী مَضْمُوْن-এর تَاكِيْد হয় যা কোনো নতুন ইলম নয়। আর تَاسِيْس দ্বারা নতুন ইলম, নতুন ফায়দা অর্জিত হয়। আর নতুন বিষয় জানা পুরনো বিষয়ের তাকিদের মোকাবিলায় সর্বাবস্থায়ই উত্তম।

جُزْئِيَّاتٌ এবং اَجْزَاءٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : কোনো বস্তুর اَعْضَاء এবং حِصَّه [অংশ] কে اَجْزَاء বলা হয়। اَجْزَاء হলো جُزْء-এর বহুবচন। যেমন خَالِد একটি বস্তু এটা অনেক اَجْزَاء দ্বারা مُرَكَّبٌ; যেমন তার হাত আছে, পা আছে, নাক আছে, কান আছে, চোখ আছে। মোটকথা খালেদ ভিতর এবং বাহির -এর অনেকগুলো اَجْزَاء-এর সমষ্টিতে গঠিত। اَجْزَاء-এর সাথে مُرَكَّبٌ হয়ে যে বস্তু তৈরি হয় তাকে جُزْئِىْ বলা হয়। আর অনেক جُزْئِيَّاتٌ মিলে যে সমষ্টি তৈরি হয় তাকে نَوْع বলা হয়। যেমন অনেক মানুষের اَفْرَادٌ-এর সমষ্টিকে نَوْع বলা হয়। এরই উপর কিয়াস করে حَسَنَة এবং سَيِّئَة কে বুঝে নিবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَوْع হলো একটি نَوْع আর سَيِّئَة হলো আরেকটি نَوْع ; প্রতিটি نَوْع-এর অধীনে অনেক أَفْرَادْ হয়ে থাকে। যাকে ঐ نَوْع -এর جُزْئِيَّاتْ বলা হয়। এ কারণেই حَسَنَة অর্থাৎ নেকীর অনেক أَفْرَادْ রয়েছে। যা পরস্পর একটি অপরটির হতে أَعْلٰى এবং أَدْنٰى হয়ে থাকে। যেমন ঈমান, শোকর, নামাজ, রোজা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মানুষের সহমর্মিতা, সুন্নতের পাবন্দী, মোস্তাহাবের উপর আমল, এগুলো সবই حَسَنَة অর্থাৎ নেক কর্মের أَفْرَادْ বা একক, আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত নেক কর্মগুলোর মধ্যে কোনোটি কোনোটি হতে উপরের স্তরের। যেমন ঈমান সবচেয়ে উপরের স্তরের। এরপর অন্যান্য ফরজসমূহ, এরপর ওয়াজিব, এরপর সুন্নত ও মোস্তাহাবসমূহ এরপর أَوْلٰى এবং أَفْضَلُ -এর নম্বর। হাদীস শরীফেও এই পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ . (مشكوة صـ١٢)

যেমনিভাবে নেক কাজের অনেক أَفْرَادْ এবং جُزْئِيَّاتْ রয়েছে, অনুরূপভাবে سَيِّئَة তথা মন্দকর্মেরও অনেক أَفْرَادْ রয়েছে। তন্মধ্যে কোনোটি কোনোটি অপেক্ষা أَعْلٰى এবং أَدْنٰى যেমন কুফর, শিরক, ফরজ কর্ম পরিত্যাগ করা, ছিনতাই, চুরি, এতিমের মাল ভক্ষণ, গালিগালাজ, বদ ধারণা, বদ নজর, রাস্তায় ময়লা আবর্জনা ফেলে রাখা, ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা, ডান হাতে নাক পরিষ্কার করা, ইস্তেঞ্জা করার সময় কেবলার দিকে إِسْتِقْبَالْ বা إِسْتِدْبَارْ করা। কাবার দিকে থুথু ফেলা, পা বিছিয়ে রাখা এই সবগুলোই মন্দকর্মের أَفْرَادْ বা একক। তবে মর্যাদাগত দিক থেকে সবগুলো সমান নয়। বরং পরস্পর একটি অপরটি থেকে أَعْلٰى এবং أَدْنٰى হয়েছে। একথা কেউ জানে না যে শিরক ও কুফর এর বিপরীতে কেবলার দিকে ফিরে বা পেছন দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা বা কেবলার দিকে থুথু ফেলা এবং পা বিছিয়ে রাখার কোনোই حَيْثِيَّتْ [অবস্থান] রাখে না।

উল্লিখিত আয়াতে لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ -এর মধ্যে যদি حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর সমতা না হওয়াকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় তবে দ্বিতীয় لَا কে শুধুমাত্র تَاكِيْد -এর জন্য মানা হবে। কেননা এখন আসল ইবারত এরূপ হবে যে, لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ এই ইবারত দ্বারা حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর মধ্যে عَدَم مُسَاوَاتْ বুঝা গেল। এখন যদি لَا বৃদ্ধি করে তবে তা দ্বারা عِلْم عَدَم مُسَاوَاتْ -এর تَاكِيْد হবে যা প্রথম থেকেই জানা গেছে। নতুন ইলম এবং নতুন ফায়দা নয়।

আর যদি لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর جُزْئِيَّاتْ -এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। তবে এটা একটা নতুন ইলম হবে। কেননা حَسَنَة এবং سَيِّئَة -এর মাঝের পার্থক্য তো প্রথম لَا দ্বারাই বুঝা গেছে। আর এখন দ্বিতীয় لَا দ্বারা حَسَنَاتْ এবং سَيِّئَاتْ -এর جُزْئِيَّاتْ -এর মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। এই সুরতে لَا টা تَاسِيْس -এর জন্য হবে تَاكِيْد -এর জন্য নয়। এই নতুন ফায়দা বর্ণনা করার জন্য মুফাসসির (র.) لَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ -এর তাফসীরে فِيْ جُزْئِيَّاتِهِمَا -এর বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ : জমহুরের নিকট إِنَّنِيْ টা দুটি نُوْن -এর সাথে হয়েছে। আর ইবনে আবি লায়লা একটি نُوْن -এর সাথে إِنِّيْ পড়েছেন। অর্থাৎ সে গর্ব বড়ত্ব ও অহঙ্কারের সাথে বলে যে, আমি মুসলমান।

قَوْلُهُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ : حَمِيْم অর্থ গরম পানি বলা হয় إِسْتَحَمَّ অর্থাৎ إِغْتَسَلَ بِالْحَمِيْمِ তথা গরম পানি দ্বারা গোসল করেছে। এখন মুতলাক গোসল করাকে إِسْتِحْمَامْ বলতে লাগলো। চাই গরম পানি দ্বারা হোক বা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা হোক। আবার حَمِيْم অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলা হয়।

قَوْلُهُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ : এটা إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ শর্তের جَوَابْ হয়েছে। আর فَاسْتَعِذْ আমরের জবাব উহ্য রয়েছে। যাকে আল্লামা মহল্লী (র.) يَدْفَعُهُ বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يَنْزَغَنَّكَ : এটা نَزْغٌ মসদার থেকে مُضَارِع بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ ك হলো মাফউলের যমীর অর্থ তোমার ওয়াসওয়াসা আসে।

قَوْلُهُ خَلَقَهُنَّ اَيِ الْاٰيَاتِ الْاَرْبَعَ : সংশয় : خَلَقَهُنَّ -এর জায়গায় خَلَقَهُمَا টা অধিক স্পষ্ট ছিল কেননা যাদের জন্য সেজদা তারা তো দুটিই অর্থাৎ চন্দ্রও সূর্য। কাজেই خَلَقَهُمَا হওয়া উচিত ছিল।

নিরসন : চন্দ্র সূর্য কে সেজদা করা নাজায়েজ হওয়া এবং তাদের মধ্যে মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা না থাকার ইল্লত হলো তাদের মাখলুক হওয়া। কেননা মাখলুক যতই বড়ত্বের অধিকারী হোক না কেন সে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না। خلقهن -এর মধ্যে বহুবচনের যমীর নিয়ে বলে দিয়েছেন যে, চন্দ্র ও সূর্য ও দিন রাতের মতো মাখলুক এবং সৃষ্টির প্রতিক্রিয়ার অধীন।

قَوْلُهُ وَمِنْ اٰيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ الخ : مِنْ اٰيَاتِهٖ হলো خَبَر مُقَدَّمْ এবং اَللَّيْلُ এবং اَلنَّهَارُ এবং যা তার উপর আতফ করা হয়েছে তা مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ الخ : এখানে مِنْ اٰيَاتِهٖ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর اَنَّ স্বীয় مَدْخُول সহ بَتَاوِيْل مَصْدَرْ হয়ে مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ

قَوْلُهُ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ -এর মধ্যে اَمْر টা تَخْيِيْر -এর জন্য নয়; বরং تَهْدِيْد তথা ধমকির জন্য হয়েছে। এর قَرِيْنَة হলো بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

قَوْلُهُ تُجَازِيْهِمْ : এটা উহ্য মানার উদ্দেশ্য হলো এটা বলা যে, اِنَّ -এর خَبَرْ উহ্য রয়েছে। আর اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হলো اِنَّ -এর اِسْم

قَوْلُهُ مَنِيْعٌ : منيع টা فَعِيْلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ -এর ওজনে হয়েছে। অর্থাৎ যেটা পরিবর্তন পরিবর্ধন গ্রহণ করা থেকে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ ءَاَعْجَمِيٌّ : এটা উহ্য مُبْتَدَأ -এর খবর। যাকে মুফাসসির (র.) قُرْاٰن বলে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَعْجَمِيٌّ : এর মধ্যে يَاء টা مُبَالَغَةٌ فِى الْوَصْفِ -এর জন্য হয়েছে। যেমন اَحْمَرِيٌّ -এর মধ্যে হয়েছে। كَلَام اَعْجَمِيٌّ ঐ كَلَام কে বলে যা বুঝে আসে না। ءَاَعْجَمِيٌّ -এর মধ্যে প্রথম হামযা হলো اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيٌّ দ্বিতীয় হামযার মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে যেদিকে আল্লামা মহল্লী (র.) بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ وَقَلْبِهَا اَلِفًا بِالْاَشْبَاعِ বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন প্রথম কেরাত তো সুস্পষ্ট যে, উভয় হামযাকে مُحَقَّقْ পড়া হবে। দ্বিতীয় কেরাত হলো এই যে, দ্বিতীয় হাযমাকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে اَشْبَاعٌ অর্থাৎ مَدْ طَوِيْل لَازِمْ -এর সাথে পড়বে। اَعْجَمِيٌّ আর وَدُوْنَهُ -এর শব্দ سَبَقَتْ قَلَمْ হয়েছে। এরপর دُوْنَهُ -এর সম্পর্ক قَلْب -এর সাথে হয়েছে। অর্থাৎ دُوْنَ قَلْبِ اَلِفٍ এই সুরতে এটা অন্য কেরাতের بَيَانٌ হবে। কেননা قَلْب -এর সুরতে مَدْ لَازِمْ তো রয়েছে এরপর بِدُوْنَ الْمَدِّ কিভাবে হতে পারে?

পাঁচটি কেরাত ধারাবাহিকভাবে এই যে, ১. উভয় হামযার মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় হামযাকে تَسْهِيْل করে পাঠ করা।

২. اَلْمَدُّ الطَّوِيْلُ সহকারে দ্বিতীয় হামযাকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করা।

৩. দুই হামযার মাঝে اَلِفْ বৃদ্ধি না করে দ্বিতীয় হামযাকে تَسْهِيْل করে পাঠ করা।

৪. এক হামযায়ে খবরিয়্যার সাথে اَعْجَمِيٌّ পড়া।

৫. اَلِفْ বৃদ্ধি না করে هَمْزَتَيْنِ مُحَقَّقَيْنِ রূপে পাঠ করা।

قَوْلُهُ عَمِلَ : عَمِلَ উহ্য ফে'ল মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, فَلِنَفْسِهٖ টা উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আবার এটাও সহীহ যে, لِنَفْسِهٖ টা উহ্য মুবতাদার খবর হবে। উহ্য ইবারত হবে فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ لِنَفْسِهٖ

قَوْلُهُ بِذِىْ ظُلْمٍ : এটা একটি সংশয়ের নিরসন।

সংশয় : আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ দ্বারা كَثْرَتْ ظُلْم -এর نَفِيْ হয় তবে نَفْس ظُلْم -এর نَفِيْ হয় না

নিরসন : ظَلَّامٌ টা صِيْغَةُ نِسْبَتْ এটা صِيْغَةُ مُبَالَغَة নয়। অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা مَنْسُوْب নন। যেমন- تَمَّارٌ এবং خَبَّازٌ -এর মধ্যে تَمَّارٌ খেজুর বিক্রেতাকে বলে। বেশি খেজুর বিক্রেতাকে নয়। এমনিভাবে خَبَّازٌ রুটি তৈরিকারীকে বলে। বেশি রুটি তৈরি কারীকে নয়। মুফাসসির (র.) بِذِيْ ظُلْم দ্বারা এই জওয়াবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ : এটা মুমিনের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনোভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে আমানতদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা সে মানুষকে নামাজের দিকে আহ্বান করে। একারণেই হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াজ্জিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَا اِلَى اللّٰهِ বাক্যের পর عَمِلَ صَالِحًا বলে আজান ইকামতের মধ্যস্থলে দু'রাকাত নামাজ বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আজান ও ইকামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। –[মাযহারী]

হাদীসে আজান ও আজানের জবাব দেওয়ার অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে আজান দেওয়া হয়। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ : এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার পথে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অর্থাৎ দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জবাবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মুকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। –[মাযহারী]

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জবাবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই তবে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। –[কুরতুবী]

আজানের ফজিলত ও মাহাত্ম্য : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে। –[বুখারী শরীফ]

হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুয়াজ্জিনের [আজানের] আওয়াজ যত দূর যাবে যত জিন, মানুষ বা জীব জন্তু তা শ্রবণ করবে, কিয়ামতের দিন সকলেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। –[বুখারী শরীফ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইমাম জিম্মাদার, মুয়াজ্জিন আমানতদার, হে আল্লাহ! ইমামদেরকে হেদায়েত কর, আর মুয়াজ্জিনদেরকে মাগফেরাত দান কর। –[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী]

Free@ www.eilm.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় সাত বছর যাবত আজান দেয়, তার জন্যে দোজখ থেকে নাজাতের ঘোষণা লিপিবদ্ধ করা হয়। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চ স্থানে থাকবে- ১. সেই গোলাম যে আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে এবং তার মনিবের দায়িত্বও পালন করে। ২. সেই ব্যক্তি যে মানুষের ইমামতি করে এবং লোকেরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। ৩. সে ব্যক্তি যে দিনে রাতে পাঁচবার আজান দেয়। -[তিরমিযী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বার বছর আজান দেয় তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়, প্রত্যেক আজানের জন্যে ৬০টি নেকি লিপিবদ্ধ হয়, আর ইকামতের জন্য ৩০টি নেকি লিপিবদ্ধ হয়।

-[ইবনে মাজাহ]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ পর্যায়ে হযরত ওমর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমি মুয়াজ্জিন হতাম তবে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো, আর সে অবস্থায় আমি রাত্রের নফল নামাজ এবং দিনের নফল রোজার জন্যেও এত ব্যাকুল হতাম না। আমি শুনেছি যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মুয়াজ্জিনদের মাগফেরাতের জন্যে তিনবার দোয়া করেছেন, আমি আরজ করেছি, হুজুর আমাদেরকে আপনি দোয়াতে স্মরণ করলেন না? অথচ আমরা আজান জারি করার জন্যে জিহাদ করে থাকি। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, কিন্তু হে ওমর! এমনও সময় আসবে যখন মুয়াজ্জিনের কাজটি নিতান্ত দরিদ্র এবং অনাথ লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়বে। শোন হে ওমর! যাদের গোশত এবং চর্ম দোজখের উপর হারাম মুয়াজ্জিনও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা ২৪, পৃষ্ঠা-৭৮]

এ আয়াতে সেসব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করে এবং যারা সৎকাজ করে আর একথা জানিয়ে দেয় যে, আমি একজন মুসলমান।

এ পর্যায়ে ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, এ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী যাঁরা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বন করেছেন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ। সেজন্যে কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ মত পোষণ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর যেহেতু মুয়াজ্জিনগণ মানুষকে নামাজের জন্যে আহ্বান করে থাকেন, সেজন্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এবং হযরত ইকরিমা (রা.) হযরত মুজাহিদ (র.) এবং কায়েস ইবনে আবি হাজেম বলেছেন, এ আয়াত মুয়াজ্জিনদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ মত পোষণ করেন, এ আয়াত সে সব লোকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে। এ মত পোষণ করেন হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত মুকাতেল (র.) এবং অন্যান্য অনেক তাফসীরকারগণ।

মূলতঃ মুয়াজ্জিনগণের ফজিলত ও মাহাত্ম্য সর্বত্র স্বীকৃত। হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যার কিছুটা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে শুধু মুয়াজ্জিন নয়, বরং যে কেউ মানুষকে আল্লাহ তা'আলার বন্দেগীর দিকে ডাকে, তার ফজিলতের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তিনি পীর মুর্শিদও হতে পারেন, দ্বীনি কিতাবের গ্রন্থকারও হতে পারেন, ওয়ায়েজ বা মোদাররেসও হতে পারেন, ন্যায়বিচারক, মুজাহিদও হতে পারেন, যদি কেউ মানুষকে ইসলামের দিকে আন্তরিকভাবে আহ্বান করে এবং নিজেও ইসলামি বিধি-বিধানের উপর আমল করে তবে সে-ই হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি, তার মরতবা হবে সর্বোচ্চ।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে আদদুররুল মানসুর, তাফসীরে মাজেদী]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, তাঁরাই হলেন আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁরাই হলেন সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং প্রিয়। তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং অন্যদেরকে আনুগত্যের জন্য আহ্বান করেছেন এবং সর্বদা নেক আমল করেছেন, নিজের মুসলমান হওয়ার কথা সর্বত্র ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে তাঁরাই হলেন আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত প্রতিনিধি। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর [উর্দু] পারা- ২৪, পৃ. ৭৮]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নবী রাসূলগণের দাওয়াত। এরপরের স্থান হলো ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতের, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- عُلَمَاءُ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ আলেমগণ হলো নবীগণের উত্তরাধিকারী। প্রিয়নবী ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন- عُلَمَاءُ أُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ আমার উম্মতের ওলামায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের নবীগণের ন্যায়।

যেহেতু আমাদের প্রিয়নবী ﷺ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তারপর অন্য কোনো নবী আগমনের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাঁর দীনের প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতের ওলামায়ে কেরামের প্রতি, তাই ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতি কর্মসূচিই হলো উত্তম। আর এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত বা আহ্বান করা হলো সর্বোত্তম কাজ আর যা সর্বোত্তম কাজ তা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য, অতএব মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা অবশ্য কর্তব্য।

-[তাফসীরে কাবীর, খ. ২৬, পৃ. ১২৫-২৬]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করার পাশাপাশি সৎকাজ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু ভালো কথা বললেই হবে না, বরং ভালো কাজও করতে হবে, যদি শুধু ভালো কথাই বলা হয়, সে অনুযায়ী কাজ না করা হয় তবে তাতে বরকত হয় না। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, পৃ. ৯২৮]

وَقَالَ إِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আর সে বলে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলার অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

কখনো কখনো বুঝা যায়, যদি ওয়াজ বয়ান ভালো হয় এবং নেক আমলও হতে থাকে তখন মানব অন্তরে তার কু-প্রবৃত্তির কারণে অহংকার সৃষ্টি হয়, সে নিজেকে অন্যদের থেকে বড় মনে করতে থাকে, তার ইলম, আমল এবং দাওয়াতি কর্মসূচির বড়াই করতে থাকে। ঐ ব্যক্তির মনের এ অবস্থা তার সমূহ ধ্বংসের কারণ হয়, এজন্যে আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে এই রোগের চিকিৎসা স্বরূপ বিনয় অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ডাকে এবং নিজেও সৎকাজ করে, সে একথা বলে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার অগণিত অনুগত গোলামদের অন্যতম, আল্লাহ তা'আলার অনুগত লোকদের সংখ্যা অগণিত, আমিও তাদের মধ্যে একজন। আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দান করেছেন বলেই আমি তার অনুগত হতে পেরেছি। এটি আমার কোনো গুণ নয়, তাঁরই তৌফিক, তাঁরই দয়া।

আয়াতের মর্মকথা : আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো তিনটি বিষয়-

১. মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা, সত্যের নির্দেশ দেওয়া এবং অসত্য থেকে বিরত রাখা অবশ্য কর্তব্য।

২. কিন্তু এ কর্তব্য পালনের পাশাপাশি নিজেও সৎকাজ করতে হবে। মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ভালো কাজ, কিন্তু যে পর্যন্ত নির্দেশ দাতা নিজে আমল না করে বরং শুধু অন্যকেই আহ্বান করে তার সে আহ্বান ফলপ্রসু হয় না।

৩. মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা তথা দাওয়াতি দায়িত্ব পালন করা এবং সর্বদা নেক আমল করার কারণে কখনো আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, কখনো মনে যেন দম্ভ অহংকার সৃষ্টি না হয়, নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় এবং ভালো মনে করা সমীচীন নয়; বরং বিনীতভাবে একথা প্রকাশ করা উচিত যে, আমিও আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের একজন।

বর্তমান যুগের মানুষের কর্তব্য : যেভাবে মক্কা মুয়াজ্জমায় কাফেররা ইসলামের বিরোধিতা করেছিল, আর এজন্যে তখন মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো অত্যন্ত বড় কাজ ছিল, বর্তমানে ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমান নামধারী, লোকেরাই ইসলামের বিরোধিতা করে। ইসলাম একটি পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান, জীবনের সকল অঙ্গন ও এর আওতাধীন রয়েছে, জীবনের কোনো স্তর বা কোনো দিক ইসলামের বাইরে নয়, যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনের কোনো দিককে ইসলামি বিধি-নিষেধের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বাইরে রাখতে চায় সে পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারে না। এজন্যেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগে কোনো কোনো লোককে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা ইসলামের বিধি-নিষেধ প্রয়োগের কথা স্বীকার করতে রাজি নন, মানব জীবনের এ অঙ্গনকে ইসলামের বিধি-নিষেধ থেকে দূরে রাখতে ইচ্ছুক। এতো হলো বিশ্বাসগত ব্যাপার, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ্বাস ঠিকই আছে, কিন্তু কার্যতঃ তার বাস্তবায়ন অনুপস্থিত। যেমন- সূদ, ঘুষ প্রভৃতি ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য এবং অবৈধ, কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সুদ এবং ঘুষের আদান-প্রদান অহরহ চলছে। এতদ্ব্যতীত, নারী সমাজের ব্যাপারে ইসলামের বিধি-নিষেধ সর্বজনবিধিত, তাদের পর্দায় রাখার ব্যাপারে কুরআনে কারীমের ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ এবং তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান কর আর প্রাচীন জাহেলিয়া যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না, তোমরা নামাজ কায়েম করবে, এবং জাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূলের অনুগত থাকবে।

বর্তমান যুগে এসব নির্দেশ অহরহ লঙ্ঘন করা হয়। ইসলামের এসব বিধান অমান্য করতে কারোই কোনো প্রকার ভয় হয় না, অথচ এর অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি এমন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। নারীকে বেপর্দা করে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হয়েছে এবং এতে করে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা দিয়েছে নৈতিক অবক্ষয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ব্যভিচারের সময় ব্যভিচারী, মদ্যপানের সময় মদ্যপায়ী এবং চুরি করার সময় চোর মুমিন থাকে না। মানুষ যখন এমনি অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে তখন তার ঈমান দূরে সরে পড়ে। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- গুপ্তস্থান ও রসনার পাপই মানুষকে সবচেয়ে বেশি দোজখের দিকে নিয়ে যাবে অর্থাৎ ব্যভিচার ও মিথ্যাবাদিতা মানুষের জন্যে কঠিন শাস্তির কারণ হবে।

হযরত মায়মূনা (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ উম্মত সর্বদা সুখে-শান্তিতে থাকবে, যতদিন তাদের মধ্যে অবৈধ সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধি না পাবে। কিন্তু অবৈধ সন্তান জন্মের হার বেড়ে যাবে তখন সমগ্র উম্মতের উপরই আজাব নাজিল হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। -[বুখারী শরীফ]

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে জনপদে সুদখোরী এবং ব্যভিচার প্রকাশ্যে হতে থাকে, তবে মনে করবে সে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহ তা'আলার গজবে পতিত করেছে। প্রিয়নবী ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন- مَتَىٰ يَفْشُو الزِّنَا يَكْثُرُ الْهَرْجُ অর্থাৎ যখন কোনো সমাজে ব্যভিচার বেড়ে যাবে তখন হত্যাকাণ্ডও বেড়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়ানত লাভ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় সৃষ্টি করে দেবেন। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার বেড়ে যাবে, তাতে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে। আর যে সম্প্রদায় ওজনে ফাঁকি দেবে তাদের রিজিক কমে যাবে। আর যারা সত্য বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে। আর যারা প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট করবে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দুশমনকে চড়াও করে দেবেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলার আজাবের যে সব কারণ ও উপকরণের কথা প্রিয়নবী ﷺ বলে গেছেন, তার কোনটি বর্তমান সমাজকে বিষাক্ত সর্পের ন্যায় দংশন করেনি? বর্তমান অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করা হলে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, প্রিয়নবী ﷺ যেন এ যুগের জন্যেই এসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

বস্তুতঃ বর্তমানে বর্বরতার যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে, একথা আদৌ অত্যুক্তি নয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে- فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ অতএব, যারা আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর যে কোনো বিপদ বা কঠিন শাস্তি আসতে পারে।

বর্তমান যুগে মুসলিম জাতির উপর যে দুর্গতি নেমে এসেছে, এটি সে বিপদই যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সতর্কবাণী করেছেন। অতএব, বর্বরতার যুগে মানুষকে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা যেমন উত্তম এবং অবশ্য কর্তব্য ছিল, ঠিক তেমনিভাবে আজো তা সর্বাধিক উত্তম ও অবশ্য কর্তব্য। প্রতিটি মুসলমানের বিশেষত ওলামায়ে কেরামের জন্যে এ কর্তব্য অবশ্য পালনীয়। আর এর ফজিলত ও মাহাত্ম বর্ণনাতীত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে সেজদা করা জায়েজ নয় : لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোনো নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই সেজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমা বলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, ইবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে।

ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোনো উম্মত ও শরিয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গাম্বরের শরিয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তার পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কুরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা সর্ববস্থায় হারাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ : এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবূ বকর আহকামুল কুরআনে লিখেন, হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) প্রথম আয়াত অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-এর শেষে সিজদা করতেন। ইমাম মালেক (র.) তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ لَا يَسْئَمُوْنَ-এর শেষে সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)ও তাই বলেছেন। এ কারণে মাসরূক, আবূ আব্দুর রহমান, ইবরাহীম নাখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহকামুল কুরআনে আরো বলা হয়েছে, হানাফী মাযহাবের আলেমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করাই সাবধানতার প্রতীক। কেননা আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

কুফরের বিশেষ প্রকার 'ইলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান : اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালাত ও তাওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করতো, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আজাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার ইলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اِلْحَادْ ও لَحْدٌ-এর আভিধানিক অর্থ এক দিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা কবরকেও একারণেই لَحْدٌ বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কুরআনি আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে ইলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাশ কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে ইলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে ইলহাদ হচ্ছে কুরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যত ঈমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কুরআন সুন্নত ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও ইলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, اَلْاِلْحَادُ هُوَ وَضْعُ الْكَلِمِ عَلٰى غَيْرِ مَوْضِعِهٖ। আয়াতের لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইতো। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কুরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কুরআনের বিধানাবলিকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী।

সারকথা এই যে, ইলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ মুখে কুরআন ও কুরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামি মূলনীতির পরিপন্থি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিতাবুল খেলাফে বলেন, كَذَالِكَ الزَّنَادِقَةُ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ وَقَدْ كَانُوْا يُظْهِرُوْنَ الْإِسْلَامَ। অর্থাৎ সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা ইলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম অর্থে এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলিকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান : আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরি বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয় যে, যে কোনো অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোনো ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্য করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করি। কিন্তু কুরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলেম ও ফিকহবিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরি বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল যেমন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়া, ফজরের দু'রাকাত ও জোহরের চার রাকাত ফরজ হওয়া, রমজানের রোজা ফরজ হওয়া, সুদ, মদ ও শুকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোনো ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে এমন কোনো অর্থ উদ্ভাবন করে যদ্দারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপে ও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা এটা প্রকৃত প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا عُلِمَ مَجِيْئُهُ بِهٖ ضَرُوْرَةً অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে নবী করীম ﷺ -এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্বল্যমানরূপে তার কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, অর্থাৎ আলেমগণ তো জানেনেই সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত ও জাজ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনোটিকে অস্বীকার করা।

অতএব যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

বর্তমান যুগে কুফর ও ইলহাদের ব্যাপকতা : বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানাবলি সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। নবশিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অজ্ঞ। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহবিহীন বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ও ইসলামি মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য ও জাজ্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরিয়তের সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলির পরিবর্তন করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরিউক্ত প্রসিদ্ধ নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না; বরং এতে অর্থ সংযোজন করি মাত্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত শাহ আব্দুল আজীজ (র.) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কুরআনের আয়াতে ইলহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। **এক.** যে অর্থ কুরআন-হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অকাট্য ইজমার পরিপন্থি, এটা নিঃসন্দেহে কুফর এবং **দুই.** যা কুরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্তু নিশ্চয়তার নিকটবর্তী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থি। এটা গোমরাহী ও পাপাচার [ফিসক] কুফর নয়। এ দুপ্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কুরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ ফিকহবিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় পুরস্কার ও ছওয়াবের কাজ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذكر বলে কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে ان الذين كفروا বাক্যটি পূর্ববর্তী إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ বাক্য থেকে بدل হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম এই যে, তারা যেহেতু আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না বিধায় আজাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

قَوْلُهُ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ : এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। হযরত কাতাদা ও সুদ্দী (র.) বলেন, আয়াতে باطل বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাদদিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনোদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোনো প্রকার শয়তানই কুরআন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কুরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবূ হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যই প্রয়োজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে হোক, যে কোনো বাতিল কুরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোনো বাতিলপন্থিদের সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও ইলহাদ করার সাধ্যও কারো নেই।

তাবারীর তাফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কুরআনে ইলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দুটিই। এক. খোলাখুলিভাবে কুরআন কোনো পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. বাহ্যত ঈমান দাবি করা কিন্তু গা-ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ বিয়োজনের মাধ্যমে কুরআনের অর্থে বিয়োজন সাধন করা। একে مِنْ خَلْفِهِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারো নেই, তেমনি এর অর্থ সত্তার বিকৃত করে বিধানাবলির পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো নেই। যখনই কোনো হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কুরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কুরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বুঝে। কুরআন চৌদ্দশ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষকে বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে বালক পর্যন্ত এবং আলেম থেকে জাহেল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বলে আল্লাহ তা'আলা কেবল কুরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ সম্ভারের হেফাজত করাও আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্ব। তনি আপন রাসূল ও তার প্রত্যক্ষ শাগরিদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কুরআনের অর্থ সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোনো বেদ্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলেম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। ফলে সে ব্যর্থও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি؛ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ বাক্যে لَهُ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে এবং কুরআন কেবল ভাষার নাম নয়। বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যত মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ -এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের হেফাজত করেছেন। ফলে কারো মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কুরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক আল্লাহ তা'আলার কাছে গোপন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

قَوْلُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ : আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে أَعْجَمْ বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবি নয়, তাকে আজমি বলা হবে যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুত أَعْجَمِيٌّ বলা হবে তাকেই যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবি ভাষা ব্যতীত অপর কোনো ভাষায় কুরআন নাজিল করতাম তবে কুরাইশরা অভিযোগ করতো যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতো, রাসূল তো আরবি আর কিতাব হলো কিনা অনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ : এখানে কুরআনের দুটি গুণ ব্যক্ত হয়েছে– **এক.** কুরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে, **দুই.** কুরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা লোভ-লালসা ইত্যাদি রোগ যে কুরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কুরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কুরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফল হয়।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে أَنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَرِيْبٍ অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে أَنْتَ تُنَادِيْ مِنْ بَعِيْدٍ অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। –[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কুরআনের নিদর্শনাবলি শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

اَلْجُزْءُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُوْنَ : পঁচিশতম পারা

Free @ www.e-ilmweebly.com

অনুবাদ :

٤٧. اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط مَتٰى تَكُوْنُ لَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَةٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا اَوْعِيَتِهَا جَمْعُ كِمٍ بِكَسْرِ الْكَافِ اِلَّا بِعِلْمِهٖ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِىْ قَالُوْٓا اٰذَنَّاكَ لا اَىْ اَعْلَمْنَاكَ الْاٰنَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ج اَىْ شَاهِدٍ بِاَنَّ لَكَ شَرِيْكًا .

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর দিকেই ফিরানো হয়। কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। সব ফলই আবরণ মুক্ত হয় অন্য কেরাতে ثَمَرَاتٌ রয়েছে এবং اَكْمَامٌ শব্দটি كِمٌّ -এর [كـ-এর মধ্যে যের দ্বারা এর] বহুবচন; আল্লাহর জ্ঞানেই। এবং কোনো নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না আল্লাহর ইলম ছাড়া। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরিকরা কোথায়? সেদিন তারা উত্তর দেবে যে, আমরা আপনাকে ঘোষণা দিয়েছি যে, আমরা আপনার নিকট জানিয়ে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। আমরা কেউ এটা স্বীকার করিনি যে, আপনার শরিক আছে।

٤٨. وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ قَبْلُ فِى الدُّنْيَا مِنَ الْاَصْنَامِ وَظَنُّوْا اَيْقَنُوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ مَهْرَبٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّفْىُ فِى الْمَوْضَعَيْنِ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ وَقِيْلَ جُمْلَةُ النَّفْىِ سُدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ .

৪৮. পূর্বে দুনিয়াতে তারা যে সমস্ত মূর্তিকে আহ্বান করত পূজা করত তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, বিশ্বাস করে নেবে যে, তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। আজাব থেকে পলায়নের কোনো স্থান নেই। আর حَرْفُ نَفْىٍ তথা না-বোধক অব্যয় পূর্বের দুই স্থানে অর্থাৎ ১. مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ২. مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْصٍ -এর মধ্যে আমল থেকে নিষ্ক্রিয় এবং না-বোধক বাক্যটি (جُمْلَةُ النَّفْىِ) পূর্বের اٰذَنَّا ফে'লের দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

٤٩. لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاۤءِ الْخَيْرِ ز اَىْ لَا يَزَالُ يَسْـَٔلُ رَبَّهُ الْمَالَ وَالصِّحَّةَ وَغَيْرَهُمَا وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ الْفَقْرُ وَالشِّدَّةُ فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَهٰذَا وَمَا بَعْدَهُ فِى الْكَافِرِيْنَ .

৪৯. মানুষ কল্যাণ কামনায় ক্লান্ত হয় না। অর্থাৎ মানুষ সর্বদা তার রবের নিকট সম্পদ, সুস্থতা ইত্যাদির উন্নতি কামনা করতে থাকে। আর যদি তাকে অমঙ্গল দারিদ্র ও কষ্ট মসিবত স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর রহমত থেকে এবং এরপর সে অকৃতজ্ঞশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٥٠. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ اَذَقْنٰهُ اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً غِنًى وَصِحَّةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ شِدَّةٍ وَبَلَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ اَيْ بِعَمَلِيْ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ج اَيِ الْجَنَّةُ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ز وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ شَدِيْدٍ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلَيْنِ لَامُ قَسَمٍ.

৫০. لَئِنْ -এর ل কসমের জন্যে আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ [ধনরত্ন, সুস্থতা আস্বাদন করাই, দুঃখ -দুর্দশা কষ্ট, মসিবত স্পর্শ করার পর, তখন সে বলে, এটা আমার প্রাপ্য অর্থাৎ আমার কর্মের বিনিময়ে এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই তবে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্যে কল্যাণ জান্নাত রয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত করব ও তাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব। পূর্বের দুই ফে'লের মধ্যে ل বর্ণটি কসমের জন্যে।

٥١. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ الْجِنْسِ اَعْرَضَ عَنِ الشُّكْرِ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ج ثَنّٰى عِطْفَهٗ مُتَبَخْتِرًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَقْدِيْمِ الْهَمْزَةِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ كَثِيْرٍ.

৫১. এবং আমি যখন মানুষের প্রতি اَلْاِنْسَانْ দ্বারা মানুষ জাতি উদ্দেশ্য অনুগ্রহ করি, তখন সে কৃতজ্ঞতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে অর্থাৎ অহংকার করে পার্শ্ব পরিবর্তন করে। نَاءَ ফে'লের মধ্যে ভিন্ন কেরাত মতে হামযাকে পূর্বে নিয়ে আসবে অর্থাৎ نَأَى পড়বে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে অধিক দোয়া কামনাকারী হয়।

٥٢. قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ اَيِ الْقُرْاٰنُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَيْ لَا اَحَدَ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ خِلَافٍ بَعِيْدٍ عَنِ الْحَقِّ اَوْقَعَ هٰذَا مَوْقِعَ مِنْكُمْ بَيَانًا لِحَالِهِمْ.

৫২. বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় যেমনটা মুহাম্মদ ﷺ বলেন। অতঃপর তোমরা একে অস্বীকার কর, তার চাইতে কে অধিক পথভ্রষ্ট যে সত্য থেকে দূরে থেকে কুরআনের বিরোধিতায় লিপ্ত? অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কেউ নেই। উক্ত আয়াতে বিরোধিতাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য مِنْكُمْ -এর স্থলে مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ বলা হয়েছে [অর্থাৎ مَنْ اَضَلُّ مِنْكُمْ না বলে مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ বলা হয়েছে। কেননা مَنْ اَضَلُّ مِنْكُمْ বলা দ্বারাই তাদের অবস্থা প্রকাশ হয় না।]

٥٣. سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنَ النَّيِّرَاتِ وَالنَّبَاتِ وَالْاَشْجَارِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مِنْ لَطِيْفِ الصَّنْعَةِ وَبَدِيْعِ الْحِكْمَةِ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ اَيِ الْقُرْاٰنُ الْحَقُّ ط

৫৩. শীঘ্রই আমি তাদেরকে দেখাব, আমার নিদর্শনাবলি দিগদিগন্তে আসমান ও জমিনের প্রান্তে এবং এই নিদর্শনসমূহ হলো তারকা-নক্ষত্র, তৃণলতা ও গাছপালা ইত্যাদি এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শন দেখিয়েছি নিপুণ কারিগরি ও জ্ঞান দানের মাধ্যমে ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمُنَزَّلُ مِنَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْعِقَابِ فَيُعَاقَبُوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ بِهٖ وَبِالْجَائِىْ بِهٖ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ فَاعِلُ يَكْفِ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ بَدَلٌ مِنْهُ اَىْ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ فِىْ صِدْقِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَا يَغِيْبُ عَنْهُ شَىْءٌ مَا ـ

পুনরুত্থান, হিসাব ও শাস্তি ইত্যাদির সত্যায়নে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব এ কুরআন ও এর বাহককে অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা। بِرَبِّكَ বাক্যটি اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ -এর ফায়েল এবং يَكْفِ টি رَبِّكَ থেকে بَدَلٌ অর্থাৎ আপনার সত্যায়নের ব্যাপারে তাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার রব থেকে ক্ষুদ্র কোনো বস্তুও লুক্কায়িত নয়।

৫৪. اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ شَكٍّ مِنْ لِقَآءِ رَبِّهِمْ ط لِاِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ اَلَا اِنَّهٗ تَعَالٰى بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ عِلْمًا وَقُدْرَةً فَيُجَازِيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ ـ

৫৪. জেনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের অবিশ্বাসের কারণে। শুনে রাখ, নিশ্চয় তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। ইলম ও কুদরত দ্বারা। অতএব তিনি তাদের কুফরির শাস্তি প্রদান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ لَا يَعْلَمُ غَيْرُهٗ : এর দ্বারা এই حَصْر -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা اِلَيْهِ يُرَدُّ -এর পূর্বে আনার দ্বারা বা مُقَدَّمْ করার দ্বারা বুঝা যায় অন্যথায় তো يُرَدُّ اِلَيْهِ হতো।

قَوْلُهٗ مَا تَخْرُجُ مِنْ اَكْمَامِهَا : مِنْ অব্যয়টি ফায়েলের উপর অতিরিক্ত হয়েছে। ثَمَرَةٌ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। আর উভয়টিই কেরাতে সাব'আর অন্তর্ভুক্ত। جِنْس -এর হিসেবে اَفْرَاد আর نَوْع -এর হিসেবে جَمْع হয়েছে। اَكْمَام শব্দটি كِمٌّ -এর বহুবচন। খেজুর ইত্যাদির খোসাকে كِمٌّ বলা হয়।

قَوْلُهٗ وَالنَّفْىُ فِى الْمَوْضَعَيْنِ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ : এখানে مَوْضَعَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اٰذَنَّاكَ مَا مِنَّا এবং وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ مِنْ شَهِيْدٍ উল্লিখিত উভয় স্থানেই نَفِى টা فِعْل -এর মধ্যে শাব্দিকভাবে আমল করার প্রতিবন্ধক, مَحَلًّا প্রতিবন্ধক নয়। আর সেই উভয় فِعْل হলো اٰذَنَّاكَ এবং ظَنُّوْا - اٰذَنَّاكَ টা اَعْلَمْنَاكَ -এর অর্থে হয়েছে কাজেই এটা اَفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর অন্তর্গত এবং ظَنُّوْا ও اَفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর অন্তর্গত। আর اَفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর মধ্যে تَعْلِيْق -এর অর্থ হলো শব্দের মধ্যে আমলকে রহিত করে দেওয়া– অর্থের মধ্যে নয়। আর এ আমল রহিতকরণ সে সময় হয়ে থাকে যখন এই ফে'লগুলো اِسْتِفْهَام , نَفِى বা اِبْتِدَاء লা -এর পূর্বে পতিত হয়। মুফাসসির (র.) اٰذَنَّاكَ -এর তাফসীর اَعْلَمْنَاكَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اٰذَنَّاكَ টা اَفْعَالُ قُلُوْبٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ الخ : মুফাসসির (র.) এখানে বলতে চাচ্ছেন যে, যদি উল্লিখিত فِعْل -গুলোকে مُتَعَلِّقٌ عَنِ الْعَمَلِ মানা না হয় তবে উভয় স্থানেই جُمْلَهْ مَنْفِيَهْ -কে দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত মানতে হবে। ظَنُّوْا -এর প্রথম মাফউল এবং দ্বিতীয় মাফউলের স্থলাভিষিক্ত এবং اٰذَنَّاكَ-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। اٰذَنَّاكَ -এর كَافْ ضَمِيْر হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهٗ مَحِيْصٍ : এটা حَيْص হতে ظَرْفُ مَكَانٍ হয়েছে। অর্থ হলো আশ্রয়স্থল। حَاصَ يَحِيْصُ حَيْصًا অর্থ اَلْفِرَارُ وَالْهَرَبُ তথা পলায়ন করা।

قَوْلُهٗ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ : এখানে ইযাফতটা اِضَافَةُ مَصْدَرٍ اِلَى الْمَفْعُوْلِ হয়েছে। আর جَارُ مَجْرُوْر মিলে يَسْاَمُ -এর مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ هٰذَا لِيْ : এতে لَامْ -টি اِسْتِحْقَاقْ -এর জন্য হয়েছে। মুফাসসির (র.) بِعَمَلِيْ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন :

قَوْلُهُ فَلَنُنَبِّئَنَّ : এটা বাবে تَفْعِيْل হতে مُضَارِعْ بَانُوْنْ تَاكِيْد ثَقِيْلَه হয়েছে। অর্থ– আমরা অবশ্যই সতর্ক করব অবশ্যই বলে দেব। উভয় ফে'লের মধ্যে لَامُ قَسَمْ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَنَاءَ : اَلِفْ -কে হামযার উপর مُقَدَّمْ করে অর্থাৎ نَا ، যা قَالَ -এর ওযনে হয়েছে। আর দ্বিতীয় কেরাত হলো نَأَ হামযাকে اَلِفْ -এর উপর مُقَدَّمْ করে যা رَمٰى -এর ওজনে হয়েছে।

قَوْلُهُ نَاٰى : এটা مَاضِىْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, মূলবর্ণ نَاٰى বাবে فَتَحَ অর্থ– দূর হয়ে গেল, চেহারা ফিরিয়ে নিল, পার্শ্ব খালি করল। যেহেতু আয়াতে مُتَعَدِّىْ بِالْبَاءِ হয়েছে তাই তার অনুবাদ হবে সে পার্শ্ব ফিরিয়ে নিল। কোনো কোনো কেরাতে نَاءَ بِجَانِبِهٖ এসেছে। এর মূলবর্ণ (نوء) বাবে نَصَرَ হতে অর্থ– অহংকারের সাথে পার্শ্ব ফিরিয়ে নিল।

قَوْلُهُ عِطْفَهُ : عِطْفٌ অর্থ– পার্শ্ব, কিনারা। বহুবচনে اَعْطَافٌ، عِطَافٌ، عُطُوْفٌ ; বলা হয় ثَنٰى عَنِّىْ عِطْفَهٗ অর্থাৎ সে আমার থেকে পার্শ্ব খালি করল।

قَوْلُهُ لَا اَحَدَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مَنْ اَضَلُّ -এর মধ্যে مَنْ টি اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ

قَوْلُهُ اَوْقَعَ هٰذَا : অর্থাৎ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ এটা اِعْرَاضْ -কারীদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য مِنْكُمْ -এর স্থানে পতিত হয়েছে। অন্যথায় مَنْ اَضَلُّ مِنْكُمْ বলাই যথেষ্ট ছিল। যেহেতু مِنْكُمْ দ্বারা তাদের অবস্থা বুঝা যায় না তাই مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ এনেছেন।

একটি সংশয় ও তার জবাব : قَوْلُهُ سَنُرِيْهِمْ -এর মধ্যে سِيْنْ টা فِعْل -কে ভবিষ্যতকালের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়। এতে বুঝায় যায় যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শনাবলি দেখাবেন। অথচ اٰيَاتْ قُدْرَتْ এখনও তো বিদ্যমান রয়েছে এবং দৃষ্টিগোচরও হচ্ছে।

উক্ত সংশয়ের জবাব হচ্ছে– বাক্যে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ– سَنُرِيْهِمْ عَوَاقِبَ اٰيَاتِنَا

قَوْلُهُ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ : হামযা উহ্য ইবারতের উপর প্রবেশ করেছে আর وَاوْ -টি হলো عَاطِفَهْ; উহ্য ইবারত হলো- اَتَحْزَنُ عَلٰى اِنْكَارِهِمْ وَمُعَارَضَتِهِمْ لَكَ وَلَمْ يَكْفِكَ رَبُّكَ এটা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ হয়েছে بَاءْ টা فَاعِلْ -এর উপর অতিরিক্ত হয়েছে مَفْعُوْلْ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ يَكْفِيْكَ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে তা সে তারই উপকারার্থে করে, আর যে মন্দ কাজ করে তার শোচনীয় পরিণতি কিয়ামতের দিন তাকেই ভোগ করতে হবে, তখন কেউ প্রশ্ন করল, কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিন কবে আসবে? তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ [কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে।]

অর্থাৎ কিয়ামত কবে হবে? কোন দিন হবে? কোন মুহূর্তে হবে, তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কারোই কোনো জ্ঞান নেই, যে যত বড় জ্ঞানী-গুণীই হোক না কেন, এ প্রশ্নের জবাবে শুধু বলবে, আমি জানি না। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ কিছুই জানে না। মক্কার কাফেররা প্রায়ই বিদ্রূপ করে এ প্রশ্ন করত, যে কিয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় দেখানো হয় সে কিয়ামত কবে আসবে? তারই উত্তরে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে, এ সম্পর্কে আর কেউ কিছু বলতে পারে না। –[তাফসীরে কাবীর, খ, ২৭, পৃ. ১৩৬]

قَوْلُهُ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِىْ قَالُوْا اٰذَنّٰكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ : যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করত না, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করত, তাদেরকে কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টজগতের সম্মুখে ভর্ৎসনা করে জিজ্ঞাসা করা হবে, দুনিয়ার জীবনে যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে, যাদের পূজা-অর্চনা করতে, তারা এখন কোথায়?

.মুশরিকরা তখন জবাবে বলবে, আমরা পূর্বেই আরজ করেছি, আমাদের মধ্যে কেউ আর এখন শিরকের কথা স্বীকার করে না, শিরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় না। অর্থাৎ মুশরিকরা যখন দোজখের আজাব স্বচক্ষে দেখবে, তখন শিরকের কথা অস্বীকার করবে। কোনো কোনো তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের 'শহীদ' শব্দটিকে 'শাহেদ' অর্থে গ্রহণ করে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আমাদের মাঝে শিরকে বিশ্বাস করে এমন লোক দেখতে পাই না, সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, শিরকের দাবিদার বা শিরকে বিশ্বাসী এখন আর কেউ নেই। কেননা সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে, প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হয়েছে, পরকালীন জীবনের হিসাব-নিকাশের কথা যারা দুনিয়াতে অস্বীকার করত তারা আজ হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হয়েছে, বাস্তবের কষাঘাত তাদেরকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করেছে, তাই সেদিন তারা বলবে, আমাদের মধ্যে শিরকে বিশ্বাসী কেউ নেই। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ১০, পৃ. ৩০০, তাফসীরে কাবীর খ. ২৭, পৃ. ১৩৬-৩৭]

قَوْلُهُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ : "তারা যাদের ডাকাত তারা উধাও হয়ে গেছে এবং তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছে যে তাদের নাজাত নেই।" কাফের মুশরিকরা আল্লাহ পাকের ইবাদতের স্থলে যাদের উপাসনা করত, যাদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দুর্দিনে তারা কাজে লাগবে, সে উপাস্যরা সেদিন উধাও হয়ে যাবে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে, আজ আল্লাহ পাকের আজাব থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নেই। কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে কথাটিকে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছে– وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْاَ اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا 'সেদিন পাপিষ্ঠরা দোজখকে দেখবে এবং একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করবে যে, তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, আর দোজখ থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই।' –[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু] পারা। ২৫, পৃ. ২]

قَوْلُهُ لَا يَسْئَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ الخ : "উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় কল্যাণের প্রার্থনা মানুষ কখনো ক্লান্তি বোধ করে না, আর যদি কোনো দুঃখ তাকে স্পর্শ করে তবে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে।"

মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি : এ আয়াতে মানুষের বিচিত্র প্রকৃতির একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ যখন একটু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে তখন তার লোভ বেড়ে যায়, সে অর্থসম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে এজন্যে প্রার্থনা করতে থাকে, এ পর্যায়ে কোনো সংকোচ বা ক্লান্তি বোধ করে না, সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হলেও তার "আরো চাই" ভাব কমে না, কোনো অবস্থাতেই সে পরিতৃপ্তি লাভ করে না, কিন্তু যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, কোনো দুঃখকষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে হতাশ হয়ে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে।

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতের اَلْاِنْسَانُ শব্দটি সম্পর্কে তাফসীরকার সুদ্দী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, কাফের, অকৃতজ্ঞ মানুষ, লোভ-লালসায় যার মন পরিপূর্ণ। আর ঐ স্থলে خَيْر শব্দটির অর্থ হলো ধনসম্পদ, স্বাস্থ্য এবং জাগতিক উন্নতি।

অতএব, আয়াতের মর্মকথা হলো যারা কাফের অকৃতজ্ঞ তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ পাওয়ার পরও তারা তুষ্ট হয় না। অথচ তাদেরকে কোনো প্রকার দুঃখ স্পর্শ করলেই তারা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিরাশ, ভগ্ন-চিত্র, দারুণ ক্ষোভ তাদেরকে পেয়ে বসে।

পক্ষান্তরে, মুমিনের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি আস্থাশীল, আল্লাহ পাকের রহমতের আশায় আশান্বিত মুমিন আল্লাহ পাকের প্রতি সে পূর্ণ ভরসা রাখে, মুমিন যদি নিয়ামত লাভ করে তবে সে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকরগুজার হয়, করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মনে ভরে উঠে, আর যদি কোনো দুঃখকষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে আশা করে যে, আল্লাহ পাক এজন্যে ছওয়াব দান করবেন, তাই সে সবর অবলম্বন করে। কিন্তু যারা তাওহীদে বিশ্বাসী নয়, যারা আখিরাতের জীবনকে অস্বীকার করে, তারা কখনো মানের শান্তি লাভ করে না, মনের শান্তি লাভ হয় মনের মালিক আল্লাহ পাকের স্মরণে, তাঁর আদেশ পালনে। এর কোনো বিকল্প নেই।

قَوْلُهُ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ : অর্থাৎ কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো নিয়ামত, ধনসম্পদ ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আরো দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরো বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.quranweebly.com

থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এ স্থলে عَرِيْض অর্থাৎ প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ বলেছেন। অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতিমিনতি, কান্নাকাটি ও বারবার বলা উত্তম। -[বুখারী ও মুসলিম] সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এ স্থলে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি; বরং তাদের এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

قَوْلُهُ سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ : অর্থাৎ আমি আমার কুদরত ও তাওহীদের নিদর্শনাবলি তাদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। اٰفَاقْ শব্দটি اُفُقْ -এর বহুবচন, অর্থ- দিগন্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহর অস্তিত্ব. তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরো নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার একেকটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সূক্ষ্ম ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিং লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরি হলে ইস্পাত নির্মিত স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তাভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যার জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যার কোনো সমকক্ষ হতে পারে না। (فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ : সূরা শূরা মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ الْاٰيٰتُ الْاَرْبَعُ ثَلٰثٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً

তবে قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ থেকে চার আয়াত ব্যতীত। এতে সর্বমোট ৫৩ আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ۚ

১. হা-মীম।

٢. عٓسٓقٓ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ.

২. আইন, সীন,কাফ এটার মর্মার্থ আল্লাহই ভালো জানেন।

٣. كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ ذٰلِكَ الْاِيْحَاءِ يُوْحِىْٓ اِلَيْكَ وَ اُوْحِىَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ فَاعِلُ الْاِيْحَاءِ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهٖ.

৩. এমনিভাবে অর্থাৎ এই ওহি অবতীর্ণ করার ন্যায় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহি প্রেরণ করেন, আল্লাহ হলেন اِيْحَاءٌ-এর فَاعِلٌ যে আল্লাহ পরাক্রমশীল তাঁর রাজত্বে ও প্রজ্ঞাময় তাঁর সৃষ্টিতে।

٤. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا وَهُوَ الْعَلِىُّ عَلٰى خَلْقِهِ الْعَظِيْمُ الْكَبِيْرُ.

৪. নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহর মালিকানা, সৃষ্টি ও দাস হিসাবে। এবং তিনি সমুন্নত তার মাখলুকের উপর ও মহান বড়।

٥. تَكَادُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ بِالنُّوْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ فَوْقِهِنَّ اَىْ تَنْشَقُّ كُلُّ وَاحِدَةٍ فَوْقَ الَّتِىْ تَلِيْهَا مِنْ عَظْمَتِهٖ تَعَالٰى وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اَىْ مُلَابِسِيْنَ لِلْحَمْدِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ط مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ لِاَوْلِيَآئِهٖ الرَّحِيْمُ بِهِمْ.

৫. আসমান উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, تَكَادُ শব্দটি ى বা ت দ্বারা উভয়রূপে পড়া যায়। يَتَفَطَّرْنَ শব্দটি ن-এর সাথে এবং অন্য কেরাত মতে ت দ্বারা এবং ط-এর মধ্যে তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে। تَتَفَطَّرْنَ অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে আসমানের উপরের স্তর ফেটে নিচে পড়ে যাবে। আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে অর্থাৎ তাসবীহ ও তাহমীদ উভয়টি একসাথে বর্ণনা করে سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলতে থাকে। এবং পৃথিবীতে অবস্থানরত ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, তাঁর বন্ধুদের প্রতি পরম করুণাময়। তাঁদের সাথে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦. وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَىِ الْاَصْنَامَ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ مُحْصٍ عَلَيْهِمْ لِيُجَازِيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ تُحَصِّلُ الْمَطْلُوْبَ مِنْهُمْ مَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ .

৬. যারা আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিসমূহকে অভিভাবক বানিয়েছে, আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। এবং আপনি তাদের জিম্মাদার নন। যে, তাদের কাছ থেকে লক্ষ্য অর্জন করবেন, বরং আপনার দায়িত্ব হলো দাওয়াত পৌঁছানো।

٧. وَكَذٰلِكَ مِثْلَ ذٰلِكَ الْاِيْحَاءِ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ تُخَوِّفَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ وَسَائِرَ النَّاسِ وَتُنْذِرَ النَّاسَ يَوْمَ الْجَمْعِ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُجْمَعُ فِيْهِ الْخَلْقُ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ ط فَرِيْقٌ مِنْهُمْ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ النَّارِ .

৭. আর এমনিভাবে এই প্রত্যাদেশের ন্যায় আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি, যাতে আপনি সতর্ক করেন ভয় দেখান মক্কা ও তার আশপাশের লোকদের অর্থাৎ মক্কাবাসী ও সকল লোকদের এবং লোকদেরকে সতর্ক করেন সমবেত হওয়ার দিনের ব্যাপারে অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের ব্যাপারে যেদিন সমস্ত সৃষ্টজীবকে একত্র করা হবে। যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মধ্যে একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

٨. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً اَىْ عَلٰى دِيْنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْاِسْلَامُ وَلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهِ ط وَالظّٰلِمُوْنَ الْكَافِرُوْنَ مَا لَهُمْ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ يَدْفَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ .

৮. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সবাইকে এক উম্মতে এক ধর্মের তথা ইসলামের অনুসারী পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন আর জালেমদের কাফেরদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। যে তাদের থেকে শাস্তি দূরীভূত করবে।

٩. اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَىِ الْاَصْنَامَ اَوْلِيَاءَ ج اَمْ مُنْقَطِعَةٌ بِمَعْنٰى بَلِ الَّتِىْ لِلْاِنْتِقَالِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ اَىْ لَيْسَ الْمُتَّخَذُوْنَ اَوْلِيَاءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ اَىِ النَّاصِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْفَاءُ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

৯. তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে মূর্তিসমূহকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে اَمْ অব্যয়টি بَلْ -এর অর্থ প্রদান করে, যা পরিবর্তিত হওয়ার অর্থে এবং হামযা অস্বীকার করার অর্থে আসে। অর্থাৎ তারা যাকে অভিভাবক স্থির করেছে তা বাস্তব অভিভাবক নয়; বরং আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক অর্থাৎ যিনি ঈমানদারকে সাহায্যকারী এবং فَاللّٰهُ -এর ف আতফের জন্যে। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حٰمٓ ـ عٓسٓقٓ : কতিপয় মুফাসসির বলেন, এটা সূরা শূরা -এরই অপর নাম, এ কারণেই এটাকে পৃথক পৃথক দুটি আয়াতরূপে গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, উভয়টি মিলে একটি নাম, কিন্তু অন্যান্য حٰمٓ সংবলিত সূরার সাথে مُمَاثَلَتْ ও مُوَافَقَتْ -এর জন্য পৃথক পৃথক লেখা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِثْلُ ذٰلِكَ الْإِيْحَاءِ : অর্থাৎ مِثْلُ مَا فِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ مِنَ الْمَعَانِيْ ; এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, كَذٰلِكَ -এর كاف টি مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হওয়ার কারণে نَصَبْ -এর স্থানে হয়েছে। অর্থাৎ- يُوْحِيْ اِيْحَاءً مِثْلَ ذٰلِكَ الْاِيْحَاءِ অর্থাৎ এ সূরার ওহি করার মতো আপনার প্রতি فِى الْوَقْتِ ওহি প্রেরণ করেন এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের নিকটও এভাবেই ওহি পাঠিয়েছেন।

প্রশ্ন. পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ওহি প্রেরণের কথা ব্যক্ত করার জন্য اَوْحٰى ফে'লে মাযী -এর সীগাহ ব্যবহার করা উচিত ছিল, مُضَارِعْ -এর সীগাহ يُوْحِيْ নয়।

উত্তর. مُضَارِعْ -এর সীগাহ অতীতের অবস্থা বর্ণনার ভিত্তিতে اِسْتِمْرَارُ وَحِيْ -কে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর مُضَارِعْ টা مَاضِيْ -এর অর্থে হয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) اَوْحٰى উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ : এখানে فَرِيْقٌ হলো মুবতাদা আর فِى الْجَنَّةِ হলো তার খবর।

প্রশ্ন. فَرِيْقٌ তো نَكِرَةٌ এটা কি করে مُبْتَدَأ হওয়া বৈধ হলো?

উত্তর. মুফাসসির (র.) مِنْهُمْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, فَرِيْقٌ মাওসূফের সিফাতটি উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- فَرِيْقٌ كَائِنٌ مِنْهُمْ فِى الْجَنَّةِ ; কাজেই এখন তার মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। আর فَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ -এর মধ্যেও এই তারকীবই হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা শূরা প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, চারটি আয়াত, মতান্তরে, সাতটি আয়াত ব্যতীত সকল আয়াতই মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এতে ৫ রুকূ', ৫৩ আয়াত, ৮৮৬ বাক্য এবং ৩, ৫৮৮ অক্ষর রয়েছে।

–[তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃ. ৪০৫]

সূরার নামকরণ : এ সূরাকে সূরা শূরা এবং এতদ্ব্যতীত সূরা হা-মীম আইন-সীন ক্বাফও বলা হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় সত্য-বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব এবং তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের প্রমাণ, পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার পর প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, "কাফেরদের নির্যাতনে ব্যথিত হবেন না।"

قَوْلُهُ حٰمٓ ـ عٓسٓقٓ : হামীম, আইন-সীন-ক্বাফ হলো হরফে মুকাত্তাআত। [এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।] ইবনে জারীর এ সূরার প্রথম অক্ষরগুলো সম্পর্কে একটি ঘটনা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঘটনাটি হচ্ছে-

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয়, তখন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট হামীম, আইন-সীন-ক্বাফ, এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্যে মাথা নিচু করে রাখলেন, এরপর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বারও একই প্রশ্ন করল, তিনি পুনরায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। সে তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করল, কিন্তু তিনি এর কোনো জবাব দিলেন না। তখন হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমি তোমাকে বলছি, আর আমি জানি তিনি জবাব দেওয়া কেন পছন্দ করছেন না, তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে, যাকে আব্দুল এলাহ বা আব্দুল্লাহ বলা হয়। সে প্রাচ্যের কোনো নদীর তীরে অবতরণ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করবে এবং সেখানে দুটি শহর আবাদ করবে, নদী দুটিকে ঐ শহর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। যখন আল্লাহ পাক তার পতনের ইচ্ছা করবেন এবং তারও সময় শেষ হয়ে আসবে, তখন ঐ দুটি শহরের একটির উপর আগুন জ্বলে উঠবে, আর ঐ শহরটিকে ভস্মীভূত করে দেবে। সেখানকার লোকেরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে, তাদের কাছে মনে হবে এখানে কিছুই ছিল না, অতি প্রত্যুষে সেখানে সকল সত্যদ্রোহী, অহংকারী লোকেরা একত্র হবে এবং তখনই আল্লাহ পাক তাদের সহ ঐ শহরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর এটিই হবে হা-মীম, আইন-সীন-ক্বাফের অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। 'আইন' অক্ষর দ্বারা আদল বা সুবিচারকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সীন অক্ষরটির তাৎপর্য হলে অদূর ভবিষ্যতে হবে, আর ক্বাফের তাৎপর্য হলো একটি ঘটনা ঘটবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবিষ্ট লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট এ অক্ষরগুলোর অর্থ শ্রবণ করেছ? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি শুনেছি। 'হা-মীম' আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। 'আইন' -এর তাৎপর্য হলো বদরের যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ-প্রদর্শনকারী কাফেররা আজাবের স্বাদ ভোগ করেছে। আর 'সীন' -এর তাৎপর্য হলো, জালেমরা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে। আর 'ক্বাফ' -এর তাৎপর্য তিনি বলতে পারেননি। তখন হযরত আবূ জর (রা.) দণ্ডায়মান হলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনিও সেভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, আর ক্বাফ -এর তাৎপর্য হলো, গজব আসন্ন যা তাদেরকে সর্বস্বান্ত করবে। -[তাফসীরে তাবারী খ. ২৫, পৃ. ৫; তাফসীরে দুররুল মনসূর খ. ৬, পৃ. ২৩, তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দু], পারা ২৫, পৃ. ৫]

মূলত হা-মীম আইন সীন ক্বাফ এবং এমনি অন্যান্য মুকাত্তাআত অক্ষরগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন, একথা বলাই উত্তম। -[তাফসীরে কবীর খ. ২৭, পৃ. ১৪১]

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ হে রাসূল! যেভাবে আপনার প্রতি এ জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ সূরা নাজিল করেছি এবং ইতঃপূর্বেও আপনার প্রতি অন্যান্য সূরা নাজিল করেছি, এভাবেই অতীতের নবী-রাসূলগণের নিকটও ওহি প্রেরিত হয়ে এসেছে। মানবজাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করা এবং তাঁদের নিকট ওহী নাজিল করা আল্লাহ পাকের চির শাশ্বত নিয়ম।

قَوْلُهُ يَتَفَطَّرْنَ : এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোনো বস্তুর উপর ভারী বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী, এটা অবান্তরও নয়। কেননা এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম দেহও বহুসংখ্যক একত্র হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى : اُمُّ الْقُرٰى -এর অর্থ সকল জনপদ এবং শহরের মূল ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররামা বুঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللّٰهِ اِلَيَّ وَلَوْلَا اَنِّيْ اُخْرِجْتُ مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ অর্থাৎ তুমি আমার কাছে আল্লাহর সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হতো, তবে আমি কখনো স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

قَوْلُهُ وَمَنْ حَوْلَهَا : অর্থাৎ মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশেপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম তথা সমগ্র বিশ্বও হতে পারে। তাফসীরে নূরুল কুরআনের ভাষায়- মক্কার চতুর্দিক বলতে সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ একমত। মক্কা মোয়াজ্জমা হলো পৃথিবীর নাভি অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে বা মধ্যস্থলে অবস্থিত। মক্কা মোয়াজ্জমা সারা পৃথিবীতে সর্বোত্তম স্থান। আর এ শহরের ফজিলতের জন্যে একথাই যথেষ্ট যে, কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলে এক লক্ষ নামাজের ছওয়াব হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রিয়নবী ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য : প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন আমাকে অন্যান্য সমস্ত নবীগণের উপর বিশেষভাবে পাঁচটি ফজিলত দান করা হয়েছে। যথা–

১. সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। [অন্যান্য নবীগণ বিশেষ কোনো এলাকার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। যেহেতু প্রিয়নবী ﷺ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন তাই আলোচ্য আয়াতে وَمَنْ حَوْلَهَا দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে]।

২. আমার উম্মতের জন্যে আমার শাফায়াতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে [অর্থাৎ প্রিয়নবী ﷺ -কে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের জন্যে শাফায়াত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে]।

৩. এক মাসের পথ সম্মুখের দিকে এবং এক মাসের পথ পেছনের দিকে দুশমনের অন্তরে আমার ভয় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এভাবে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে।

৪. সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্যে মসজিদে এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করে দেওয়া হয়েছে [অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ইবাদতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এর যে কোনো অংশ দ্বারা তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে]।

৫. আমার জন্যে মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্যেই হালাল করা হয়নি। وَمَنْ حَوْلَهَا শব্দটি দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের পরিধি ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের হেদায়েতের জন্যেই তিনি প্রেরিত।

দ্বিতীয়ত অন্যান্য নবীগণ যেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকাবাসীর হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁদের যুগের জন্যেই তারা নবী ছিলেন, অর্থাৎ যতদিন তাঁরা জীবিত ছিলেন, ততদিনই তাঁদের নবুয়ত ছিল। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ শুধু যে সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তাই নয়; বরং সর্বকালের জন্যে তিনি নবী এবং রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন। যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর যুগ থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই নবী, তিনিই রাসূল কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল, এটি তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٠. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ مَعَ الْكُفَّارِ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الدِّيْنِ وَغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ مَرْدُوْدٌ إِلَى اللّٰهِ ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ قُلْ لَهُمْ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ أَرْجِعُ .

١١. فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط مُبْدِعُهُمَا جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا حَيْثُ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ اٰدَمَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ج ذُكُوْرًا وَإِنَاثًا يَذْرَؤُكُمْ بِالْمُعْجَمَةِ يَخْلُقُكُمْ فِيْهِ ط فِي الْجَعْلِ الْمَذْكُوْرِ أَيْ يُكَثِّرُكُمْ بِسَبَبِهِ بِالتَّوَالُدِ وَالضَّمِيْرُ لِلْأَنَاسِيِّ وَالْأَنْعَامِ بِالتَّغْلِيْبِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج اَلْكَافُ زَائِدَةٌ لِأَنَّهُ تَعَالٰى لَا مِثْلَ لَهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِمَا يُقَالُ الْبَصِيْرُ بِمَا يُفْعَلُ .

١٢. لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج أَيْ مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِهِمَا مِنَ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهِمَا يَبْسُطُ الرِّزْقَ يُوَسِّعُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِمْتِحَانًا وَيَقْدِرُ ط يُضَيِّقُهُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِبْتِلَاءً إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

١٣. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوْحًا هُوَ أَوَّلُ أَنْبِيَاءِ الشَّرِيْعَةِ وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط

অনুবাদ :

১০. যে বিষয়ে অর্থাৎ ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে কাফেরদের সাথে তোমরা যা মতভেদ করেছ, তার ফয়সালা আল্লাহর নিকটই সমর্পিত। কিয়ামতের দিন তিনিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আপনি তাদেরকে বলুন, ইনি আল্লাহ! আমার পালনকর্তা, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই। প্রত্যাবর্তন করি।

১১. তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা কোনো নমুনা ছাড়াই সর্বপ্রথম আবিষ্কারক তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে যুগল সৃষ্টি করেছেন। তিনি হযরত আদম (আ.)-এর পাঁজরের হাড় থেকে হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে থেকে জোড়া নর-মাদি সৃষ্টি করেছেন। يَذْرَؤُكُمْ শব্দটি ذ দ্বারা, অর্থ يَخْلُقُكُمْ অর্থাৎ উল্লিখিত পদ্ধতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। كُمْ সর্বনাম মানুষ ও প্রাণী উভয়ের দিকে ফিরানো হয়েছে। কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয় كَمِثْلِهِ -এর ك অতিরিক্ত। কেননা আল্লাহর কোনো সদৃশ নেই। তিনি সর্ব শ্রবণকারী, যা বলা হয় পর্যবেক্ষণকারী যা করা হয়।

১২. আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে অর্থাৎ আসমান ও জমিন উভয়ের সঞ্চিত ধনের যেমন- বৃষ্টি ও ফসল ইত্যাদির চাবি তাঁর নিকট। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক বৃদ্ধি করেন পরীক্ষামূলক এবং যার জন্যে ইচ্ছা পরিমিত করেন পরীক্ষার জন্যে। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

১৩. তিনি তোমাদের জন্যে দীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন হযরত নূহ (আ.)-কে। হযরত নূহ (আ.) আহকামে শরিয়তের ব্যাপারে প্রথম নবী। এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.)-কে এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।

هٰذَا هُوَ الْمَشْرُوْعُ الْمُوْصٰى بِهٖ وَالْمُوْحٰى اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ كَبُرَ عَظُمَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط مِنَ التَّوْحِيْدِ اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ اِلَى التَّوْحِيْدِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ يُقْبِلُ عَلٰى طَاعَتِهٖ ـ

এবং তাদের প্রতি এই নির্দেশিত পথ ও মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি প্রেরিত ওহি হলো, তাওহীদ তথা একত্ববাদ। আপনি মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত জানান, তা তাদের নিকট দুঃসাধ্য বড় মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাওহীদের জন্যে মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাঁর আনুগত্যের অভিমুখী হয় তাকে হেদায়েত দান করেন।

١٤. وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اَىْ اَهْلُ الْاَدْيَانِ فِى الدِّيْنِ بِاَنْ وَحَّدَ بَعْضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَغْيًا مِنَ الْكَافِرِيْنَ بَيْنَهُمْ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ بِتَاخِيْرِ الْجَزَاءِ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط بِتَعْذِيْبِ الْكَافِرِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ مُرِيْبٍ مُوْقِعٍ فِى الرِّيْبَةِ ـ

১৪. আহলে দীন ধর্মের ব্যাপারে তখনই মতভেদ করেছে, অর্থাৎ কেউ ঈমান এনেছে এবং কেউ কুফরি করেছে যখন তাদের নিকট তাওহীদের জ্ঞান এসেছে, তাদের কাফেরদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের কারণে যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত শাস্তি বিলম্ব করার অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে কাফেরদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়ার ফয়সালা হয়ে যেত। আর যাদেরকে তাদের পরে কিতাব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাগণ তারাও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারে অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত হয়েছে।

١٥. فَلِذٰلِكَ التَّوْحِيْدِ فَادْعُ ج يَا مُحَمَّدُ النَّاسَ وَاسْتَقِمْ عَلَيْهِ كَمَآ اُمِرْتَ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ج فِىْ تَرْكِهٖ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ج وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ اَىْ بِاَنْ اَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ط فِى الْحُكْمِ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ط

১৫. সুতরাং হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি মানুষকে এই তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন এবং এর উপর অবিচল থাকুন যেমন আপনার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটা পরিত্যাগ করে আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন তোমাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط فَكُلٌّ يُجَازِى بِعَمَلِهِ لَا حُجَّةَ خُصُوْمَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط هٰذَا قَبْلَ أَنْ يُّؤْمَرَ بِالْجِهَادِ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ج فِى الْمَعَادِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ الْمَرْجِعُ.

আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। অতএব প্রত্যেককে তাদের কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। এই বিধান জিহাদের হুকুম আসার পূর্বের। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে ফয়সালার জন্যে আমাদের সবাইকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।

١٦. وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ نَبِيِّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهُ بِالْإِيْمَانِ لِظُهُوْرِ مُعْجِزَتِهِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ بَاطِلَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ.

১৬. যারা আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাঁর নবীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, নবীর মু'জিযাসমূহ প্রকাশ হওয়ার কারণে তা মেনে নেওয়ার পর এবং তারা হলো ইহুদি সম্প্রদায় তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার নিকট বাতিল। আর তাদের উপর আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

١٧. اَللّٰهُ الَّذِىْٓ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِأَنْزَلَ وَالْمِيْزَانَ ط الْعَدْلَ وَمَا يُدْرِيْكَ يُعْلِمُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ أَىْ إِتْيَانُهَا قَرِيْبٌ وَلَعَلَّ مُعَلِّقٌ لِلْفِعْلِ عَنِ الْعَمَلِ وَمَا بَعْدَهُ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ.

১৭. আল্লাহ তা'আলা সত্যসহ কিতাব কুরআন নাজিল করেছেন بِالْحَقِّ টি أَنْزَلَ -এর সাথে সম্পর্কিত। এবং তিনি মীযান ইনসাফ ও ন্যায়ের মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন। আপনি কি জানেন? সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন নিকটবর্তী। لَعَلَّ অব্যয়টি পূর্বের فِعْل অর্থাৎ يُدْرِىْ -এর আমলকে রহিতকারী অথবা لَعَلَّ -এর পরবর্তী বাক্য يُدْرِىْ -এর দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

١٨. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ج يَقُوْلُوْنَ مَتٰى تَأْتِىْ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهَا غَيْرُ اٰتِيَةٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ خَائِفُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهَا الْحَقُّ ط أَلَا إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ يُجَادِلُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ.

১৮. যারা তার প্রতি ঈমান আনে না তারা তাকে দ্রুত কামনা করে। তারা বলে, কিয়ামত কখন আসবে? এবং তারা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এবং যারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, এটা সত্য। জেনে রাখ, নিশ্চয় যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দূরবর্তী পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٩. اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ حَيْثُ لَمْ يُهْلِكْهُمْ جُوْعًا بِمَعَاصِيْهِمْ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ ج مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ عَلٰى مُرَادِهٖ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ عَلٰى اَمْرِهٖ.

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু চাই বান্দা নেককার হোক বা বদকার, তাই তিনি বান্দার পাপের কারণে তাদেরকে অনাহারে ধ্বংস করেন না। তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন এবং তিনি প্রবল তাঁর উদ্দেশ্যে ও পরাক্রমশালী তাঁর হুকুমে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ : উক্ত আয়াতে ذٰلِكُمْ অর্থাৎ ذٰلِكُمُ الْحَاكِمُ الْعَظِيْمُ الشَّانُ মুবতাদা ও এর পরবর্তী বাক্যসমূহ তার খবর। অর্থাৎ اَللّٰهُ প্রথম খবর, رَبِّىْ দ্বিতীয় খবর, তেমনিভাবে شَرَعَ لَكُمْ একাদশতম খবর। ذٰلِكُمْ -এর খবর এগারোটি যথাক্রমে, ১. اَللّٰهُ ২. رَبِّىْ ৩. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ৪. اِلَيْهِ اُنِيْبُ ৫. فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ ৬. جَعَلَ لَكُمْ ৭. لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ৮. هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ৯. لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ ১০. يَبْسُطُ الرِّزْقَ ১১. شَرَعَ لَكُمْ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ يَذْرَءُكُمْ : এটা বাবে فَتَحَ হতে مُضَارِعٌ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন, বৃদ্ধি করছেন।

قَوْلُهُ فِيْهِ : উল্লিখিত جَعَلَ হলো ضَمِيْر مَجْرُوْر -এর مَرْجِعْ অর্থাৎ فِىْ ذٰلِكَ الْخَلْقِ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ অর্থাৎ সৃষ্টির এই পদ্ধতি [تَوَالُدْ وَتَنَاسُلْ] -এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে প্রথম থেকে সৃষ্টি করে চলে আসছেন। অথবা فِيْهِ -এর যমীরের مَرْجِعْ মায়ের গর্ভাশয় বা رِحْم অথবা فِىْ টা بَاءٌ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের জোড়া বানানোর কারণের মাধ্যমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কেননা এই زَوْجِيَّتْ বা জোড়াই বংশ-বৃদ্ধির কারণ। -[ফাতহুল কাদীর, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ يَذْرَءُكُمْ : كُمْ যমীরের مَرْجِعْ মানুষই। জানোয়ারদেরকে كُمْ দ্বারা تَغْلِيْبًا অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অন্যথায় يَذْرَءُهَا হওয়া উচিত ছিল।

قَوْلُهُ الْكَافُ زَائِدَةٌ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন. আয়াতের প্রকাশ্য ভাব দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর সদৃশ রয়েছে। কেননা আয়াতের অনুবাদ হলো তার সদৃশ্যের কোনো সদৃশ নেই। অর্থাৎ مِثْلْ তো রয়েছে, তাঁর مِثْل -এর কোনো مِثْل নেই। অথচ তাঁর কোনো مِثْل -ই নেই। কেননা তিনি তো নিরাকার।

উত্তর. كَمِثْلِهٖ -এর মধ্যে অতিরিক্ত كَافْ টি শুধুমাত্র তাকিদের জন্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– لَيْسَ مِثْلَهٗ شَيْءٌ

قَوْلُهُ مَقَالِيْدُ : এটা مِقْلَادٌ বা مِقْلِيْد বা اِقْلِيْد -এর বহুবচন, অর্থ– চাবি।

قَوْلُهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا : এখানে شَرَعَ -টি سَنَّ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ جَعَلَ لَكُمْ طَرِيْقًا وَاضِحًا

قَوْلُهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ : এটা সেই اِجْمَالْ -এর বিস্তারিত বিবরণ যার উল্লেখ كَذٰلِكَ يُوْحِىْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ -এর মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে এবং لَكُمْ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ التَّوْحِيْدِ : **প্রশ্ন.** মুফাসসির (র.) مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ -এর তাফসীর مِنَ التَّوْحِيْدِ দ্বারা করেছেন, অথচ এতে সকল اُصُوْل এবং فُرُوْع অন্তর্ভুক্ত।

উত্তর. যেহেতু তাওহীদ হলো عِمَادُ الدِّيْنِ তথা দীনের স্তম্ভ এবং اُصُوْلُ الْاُصُوْل যা সকল اُصُوْل এবং فُرُوْع -কে অন্তর্ভুক্ত করে, এ কারণেই তার উপর اِكْتِفَاءٌ করেছেন।

قَوْلُهُ يَجْتَبِىْ : এটা اِجْتِبَاءٌ হতে নির্গত, এর অর্থ নির্বাচন করা ও বেছে নেওয়া। এ কারণেই তাওফীক দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ بَغْيًا : এটা اِسْتِثْنَاءٌ যা مَفْعُوْلٌ لَهٗ তাফাররাকূ تَفَرَّقُوْا ফে'লে মুছবাতের দ্বারা বুঝা যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لَفِيْ شَكٍّ مِنْهُ مُرِيْبٌ : অর্থাৎ অস্থিরকারী সংশয়, পেরেশানিতে জড়িতকারী সন্দেহ।
قَوْلُهُ رِيْبَةٌ : অর্থাৎ দুর্ভাবনা, বিরক্তি, পেরেশানি।
قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ : এটা হলো প্রথম মুবতাদা, আর حُجَّتُهُمْ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর دَاحِضَةٌ হলো দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। দ্বিতীয় মুবতাদা তার খবরকে নিয়ে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।
قَوْلُهُ اَيْ اِتْيَانُهَا : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।
প্রশ্ন. قَرِيْبٌ -কে কেন مُذَكَّر নেওয়া হয়েছে। অথচ সেটা سَاعَةٌ স্ত্রীলিঙ্গের সিফাত হয়েছে। কাজেই قَرِيْبَةٌ হওয়া উচিত ছিল।
উত্তর. বাক্যটিতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مَجِيْئُ السَّاعَةِ কাজেই قَرِيْبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَجِيْئ।
قَوْلُهُ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ : এখানে وَاوْ টি হলো عَاطِفَةٌ আর مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হলো মুবতাদা হয়েছে আর يُدْرِيْكَ বাক্য হয়ে তার খবর হয়েছে। مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক নিয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গাম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ পয়গাম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.) ও সর্বশেষ আমাদের রাসূল ﷺ এবং মাঝখানে পয়গাম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লিখিত রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়ত স্বীকার করত। কুরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর ভক্ত ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরে এ দুজন পয়গাম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আহযাবেও পয়গাম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচজন পয়গাম্বরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে- وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী ﷺ -এর নাম প্রথমে এবং হযরত নূহ (আ.)-এর নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া ﷺ যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন; কিন্তু নবুয়ত বণ্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টির ক্ষেত্রে সকল পয়গাম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে। -[ইবনে মাজাহ, দারেমী]

قَوْلُهُ اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ : এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যে দীন বা ধর্মমতে পয়গাম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরজ এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম : এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ এবং তাতের বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গাম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক বিশ্বাস যেমন তাওহীদ, রিসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত যেমন- নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধান মেনে চলা। এছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মতো অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশীধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গাম্বরগণের শরিয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কুরআনেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا অতএব পয়গাম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলিতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরো কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর। -[তাফসীরে মাযহারী]

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গাম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বুঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধহাত পরিমাণও দূরে সরে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পড়ে, সে ইসলামের বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরো বলেন, يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহর রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগলটি পালের পেছনে অথবা এদিকে-ওদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা, পৃথক না থাকা। -[তাফসীরে মাযহারী]

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গাম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تَفَرُّقْ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্য বিপজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় : শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোনো বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজাতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এ মতভেদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল থেকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত।

قَوْلُهُ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ : অর্থাৎ তাওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন মনে হয়। এর কারণ খেয়াল-খুশি ও শয়তানি শিক্ষার অনুসরণ এবং সরল পথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে- اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ অর্থাৎ সরলপথ প্রাপ্তির দু'টই উপায়। এক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরল পথের জন্য মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলেন। যেমন- পয়গাম্বর ও ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে- اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্য খাঁটিভাবে তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গাম্বর সম্পর্কে কুরআনে مُخْلَصٌ [অর্থাৎ মনোনীত] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে সত্যধর্মের হেদায়েত দান করেন। يَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ বাক্যের অর্থ তা-ই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব মুশরিকদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত কঠিন মনে হওয়ার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না।

قَوْلُهُ وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কুরাইশ কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রাসূলে কারীম ﷺ -এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গাম্বরগণের ধর্ম থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে সরল পথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ কাফেরদের কথা বলা হোক, উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রাসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ- اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ- اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) বলেন, দশটি বাক্য সংবলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নজির। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। যথা-

প্রথম বিধান- فَلِذٰلِكَ فَادْعُ অর্থাৎ যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার তাওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন।

দ্বিতীয় বিধান- وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদশে করা হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোনো দিকেই যেন কোনোরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- شَيَّبَتْنِىْ هُوْدٌ অর্থাৎ সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সুরা হূদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় বিধান وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরোয়া করবেন না।

চতুর্থ বিধান قُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করুন আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাজিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী।

পঞ্চম বিধান– اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের কোনো মকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে عَدْل -এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধিবিধান যেন তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি এরূপ নয় যে, কোনো বিধান মানব আর কোনোটি অমান্য করব। অথবা কোনোটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনোটির প্রতি করব না।

ষষ্ঠ বিধান– اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের সকলের পালনকর্তা।

সপ্তম বিধান– لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোনো লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে, আমার তাতে কোনো লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলিলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অষ্টম বিধান– لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাজে লাগাও, তবে তর্কবিতর্কের কোনো অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোনো বিতর্ক নেই।

নবম বিধান– اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন।

দশম বিধান– وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ : অভিধানে لَطِيْفٌ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর অনুবাদ করেছেন, 'দয়ালু' এবং মুকাতিল (র.) করেছেন, 'অনুগ্রহকারী'।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বান্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই ইমাম কুরতুবী (র.) لَطِيْفٌ শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ তা'আলার রিজিক সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহর রিজিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিজিক দেন। এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার রিজিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিজিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিজিক বণ্টনে তিনি ভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধনসম্পদের রিজিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারিফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিজিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, রিজিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পার স্বরূপ হলো, তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিজিক একযোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাজত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাজতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না। –[তাফসীরে মাযহারী]

একটি পরীক্ষিত আমল : মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী (র.) বলেন, হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ আয়াতটি নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিজিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরো বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٠. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ اَىْ كَسْبَهَا وَهُوَ الثَّوَابُ نَزِدْ لَهُ فِىْ حَرْثِهِ ج بِالتَّضْعِيْفِ فِيْهِ الْحَسَنَةُ اِلَى الْعَشَرَةِ وَاَكْثَرَ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا لا بِلَا تَضْعِيْفٍ مَا قُسِمَ لَهُ وَمَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ .

২০. যে ব্যক্তি নিজের আমল দ্বারা পরকালের ফসল তথা আখেরাতের কল্যাণ ও ছওয়াবের কামনা করে আমি তার জন্যে সেই ফসল দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেই। অর্থাৎ ছওয়াবের দশগুণ ও এর চাইতে অধিক পর্যন্ত বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার জীবনের ফসল কামনা করে, আমি তাকে এর কিছু অংশ অতিরিক্ত ব্যতীত তার জন্যে নির্ধারণ করা অংশই দান করি। সে সমস্ত লোকদের জন্যে পরকালে তার কোনো অংশই বাকি থাকবে না।

٢١. اَمْ بَلْ لَهُمْ لِكُفَّارِ مَكَّةَ شُرَكٰؤُا هُمْ شَيٰطِيْنُهُمْ شَرَعُوْا اَىْ الشُّرَكَاءُ لَهُمْ لِلْكُفَّارِ مِنَ الدِّيْنِ الْفَاسِدِ مَا لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ كَالشِّرْكِ وَاِنْكَارِ الْبَعْثِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ اَىْ الْقَضَاءِ السَّابِقِ بِاَنَّ الْجَزَاءَ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ط وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالتَّعْذِيْبِ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ .

২১. তাদের মক্কার কাফেরদের কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু শরিক দেবতা তাদের শয়তানসমূহ আছে, যারা অর্থাৎ শরিকসমূহ এদের কাফেরদের জন্যে এমন ফাসেদ বিধান-ধর্ম প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যেমন শিরকের বিধান, পুনরুত্থানের অস্বীকার ইত্যাদি। যদি কিয়ামতের দিনের সিদ্ধান্তকর একটি ঘোষণা না থাকত, অর্থাৎ পূর্বের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, প্রতিদান কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে তাহলে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। কাফেরদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দানের মাধ্যমে মুমিন ও তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় জালেমদের কাফেরদের জন্যে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

٢٢. تَرَى الظّٰلِمِيْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُشْفِقِيْنَ خَائِفِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا فِى الدُّنْيَا مِنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يُّجَازُوْا عَلَيْهَا وَهُوَ اَىْ الْجَزَاءُ عَلَيْهَا وَاقِعٌ بِهِمْ ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا مُحَالَةَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ج اَنْزَهِهَا بِالنِّسْبَةِ اِلٰى مَنْ دُوْنَهُمْ لَهُمْ مَا يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ .

২২. আপনি কিয়ামতের দিন জালেমদেরকে দেখতে পাবেন ভীতসন্ত্রস্ত দুনিয়াতে তাদের পাপকর্মসমূহের জন্যে। যার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। নিশ্চয় তাদের কর্মের শাস্তি কিয়ামতের দিন তাদের উপর পতিত হবেই। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারা জান্নাতের উদ্যানে অবস্থান করবে। জান্নাতের উদ্যানসমূহ অন্যের তুলনায় অধিক মনোরম তাদের জন্যে রয়েছে তাই যা তারা চাইবে তাদের পালনকর্তার নিকট। এটাই হচ্ছে আল্লাহর মহাঅনুগ্রহ।

Free © www.eilm.weebly.com

٢٣. ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ مِنَ الْبِشَارَةِ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا بِهٖ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط قُلْ لَآ اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَىْ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ط اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ اَىْ لٰكِنْ اَسْاَلُكُمْ اَنْ تَوَدُّوْا قَرَابَتِىَ الَّتِىْ هِىَ قَرَابَتُكُمْ اَيْضًا فَاِنَّ لَهٗ فِىْ كُلِّ بَطْنٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَرَابَةً وَمَنْ يَّقْتَرِفْ يَكْتَسِبْ حَسَنَةً طَاعَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ط بِتَضْعِيْفِهَا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِلذُّنُوْبِ شَكُوْرٌ لِلْقَلِيْلِ فَيُضَاعِفُهٗ.

২৩. এটাই হচ্ছে সেই নিয়ামত, আল্লাহ তা'আলা তার সেসব বান্দাদেরকে যার সুসংবাদ দেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। يُبَشِّرُ শব্দকে ش অক্ষরে তাশদীদ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপে পঠিত রয়েছে বলুন, আমি তোমাদের নিকট এর অর্থাৎ দাওয়াতে রিসালতের তথা দীন প্রচারের উপর কোনো পারিশ্রমিক চাই না কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ্য চাই। اِلَّا الْمَوَدَّةَ টি اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ কেবল আমি তোমাদের নিকট চাই যে, তোমরা আমার আত্মীয়তার হক আদায় কর যা তোমাদেরই আত্মীয়তার সৌহার্দ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরাইশ বংশের প্রত্যেক গোত্রেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। যে কেউ হাসানা পুণ্য কাজ করে আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেই। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, পাপসমূহ গুণগ্রাহী সামান্য নেক আমলের প্রতিও; অতএব তিনি তাতে বাড়িয়ে দেন।

٢٤. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ج بِنِسْبَةِ الْقُرْاٰنِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ يَرْبِطْ عَلٰى قَلْبِكَ ط بِالصَّبْرِ عَلٰى اَذَاهُمْ بِهٰذَا الْقَوْلِ وَغَيْرِهٖ وَقَدْ فَعَلَ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ الَّذِىْ قَالُوْهُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ يُثْبِتُهٗ بِكَلِمٰتِهٖ ط الْمُنَزَّلَةِ عَلٰى نَبِيِّهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِى الْقُلُوْبِ.

২৪. বরং তারা বলে যে, اَمْ অব্যয়টি بَلْ-এর অর্থে তিনি মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছেন, আল্লাহর দিকে কুরআনের নিসবত করে আল্লাহ তা'আলা চাইলে আপনার অন্তরে মোহর মেরে দিতে পারতেন তাদের এ জাতীয় মিথ্যা অভিযোগের উপর সবর ও ধৈর্য ধারণ ইত্যাদির মাধ্যমে এবং বস্তুত আল্লাহ তাই করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যাদাবিকে মিটিয়ে দেন এবং তার নবীর উপর নাজিলকৃত নিজ বাক্য দ্বারা ও ওহীর মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তর্নিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত।

٢٥. وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ مِنْهُمْ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ الْمُتَابِ عَنْهَا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ.

২৫. তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং তওবাকৃত পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তিনি তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কেও জানেন। يَفْعَلُوْنَ-কে ى ও ت উভয়ের সাথে পড়া যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٦. وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يُجِيْبُهُمْ إِلَى مَا يَسْأَلُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ـ

২৬. তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন যারা তার উপর ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা যা চায় তা কবুল করেন তিনি তাদের প্রতি নিজ অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন এবং কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

٢٧. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ جَمِيْعُهُمْ لَبَغَوْا جَمِيْعُهُمْ اَىْ طَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِالتَّخْفِيْفِ وَضِدِّهٖ مِنَ الْاَرْزَاقِ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ط فَيَبْسُطُهَا لِبَعْضِ عِبَادِهٖ دُوْنَ بَعْضٍ وَيَنْشَأُ عَنِ الْبَسْطِ الْبَغْيِ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ـ

২৭. যদি আল্লাহ তার সব বান্দাদের রিজিকে প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত ফ্যাসাদ সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাজিল করেন। يُنَزِّلُ ফে'লকে زَاء অক্ষরে তাশদীদ ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পড়া যাবে। অতএব তিনি তার অনেক বান্দাদেরকে অধিক রিজিক দান করেন এবং অনেককে অধিক রিজিক দেন না। আর রিজিকের প্রাচুর্যতা অহংকার সৃষ্টি করে। তিনি নিশ্চয় তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন।

٢٨. وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْمَطَرَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا يَئِسُوْا مِنْ نُزُوْلِهٖ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ط يَبْسُطُ مَطَرَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْمُحْسِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْحَمِيْدُ الْمَحْمُوْدُ عِنْدَهُمْ ـ

২৮. তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মানুষ বৃষ্টি থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন অর্থাৎ বৃষ্টি ছড়িয়ে দেন। এবং তিনিই হচ্ছেন মুমিনদের অভিভাবক অনুগ্রহকারী প্রশংসিত বান্দাদের নিকট।

٢٩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ خَلْقَ مَا بَثَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ط هِىَ مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ لِلْحَشْرِ اِذَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ فِى الضَّمِيْرِ تَغْلِيْبُ الْعَاقِلِ عَلٰى غَيْرِهٖ ـ

২৯. তাঁর এক নিদর্শন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব ছড়িয়ে দিয়েছেন এদের সৃষ্টি। دَابَّةٍ বলা হয় পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রাণীকে যেমন, মানুষ ইত্যাদি। তিনি যখন ইচ্ছা, এদের সবাইকে একত্র করতে সক্ষম। جَمْعِهِمْ-এর সর্বনাম هُمْ দ্বারা জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন সকল ধরনের প্রাণী উদ্দেশ্য; কিন্তু জ্ঞানসম্পন্ন অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়ে هُمْ আনা হয়েছে। যদি জ্ঞানহীনদের প্রাধান্য দিত তখন جَمْعِهَا আনা হতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ بِعَمَلِهِ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَه দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আমলকারীদের আমলের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আখিরাতের জন্য আমল করবে, তবে তার আমলে اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আর যার আমল শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য হবে, তাকেও দুনিয়া হতে কিছু অংশ যা তার ভাগ্যে রয়েছে তাকে দেওয়া হবে। তবে এ জাতীয় লোকেরা পরকালে কোনো কিছুই পাবে না।

قَوْلُهُ مَنْ : এটা اِسْم شَرْط যা মুবতাদা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে আর نَزِدْ لَهٗ হলো جَوَاب شَرْط

قَوْلُهُ هُوَ الثَّوَابُ : পরকালের জন্য আমলকে حَرْث তথা শস্যক্ষেত্রের সাথে তাশবীহ দিয়েছেন। আর حَرْث হলো مُشَبَّه এরপর مُشَبَّه بِه -কে উহ্য করে দিয়েছে, আর مُشَبَّه بِه -কে অবশিষ্ট রেখেছে। এটা اِسْتِعَارَه تَصْرِيْحِيَّة হয়েছে। حَرْث-এর মূল অর্থ হলো اِلْقَاءُ الْبَذْرِ فِى الْاَرْضِ রূপকভাবে উৎপন্ন শস্যকে حَرْث বলে দিয়েছেন। اِسْتِعَارَة -এর ভিত্তিতে ছওয়াব তথা আমলের প্রতিদানের উপরও প্রয়োগ করা হয়।

قَوْلُهُ الْحَسَنَةَ : এটা تَضْعِيْف -এর مَفْعُوْل بِه হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ : মুফাসসির (র.) اَمْ -কে بَلْ -এর অর্থে নিয়েছেন যা شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ الخ হতে اِنْتِقَالْ -এর জন্য হয়েছে। অন্যান্য মুফাসসিরগণ بَلْ এবং هَمْزَه -এর সাথে উহ্য মেনেছেন, যা تَوْبِيْخ -এর জন্য হয়েছে। আর ইমাম কুরতুবী (র.) اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ -কে اَلَهُمْ شُرَكَاءُ অর্থে নিয়েছেন। اَمْ-এর মধ্যে مِيْم টি হলো صِلَه আর هَمْزَه টা تَقْرِيْع -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ شَرَعُوْا : شَرَعُوْا -এর اِسْنَادْ টা مَجَازِىْ হয়েছে। شَيَاطِيْن -এর দিকে যেহেতু কাফেরদের গোমরাহির কারণ, কাজেই এটা مُسَبَّبْ -এর اِسْنَادْ সববের দিকে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْ يُجَازُوْا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- يَخَافُوْنَ مِنْ جَزَاءِ مَا كَسَبُوْا

قَوْلُهُ يُبَشِّرُ اللّٰهُ : এটা اَلْبِشَارَةُ হতে, شِيْن বর্ণটি তাশদীদসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপে পঠিত। তাশদীদবিহীন হওয়ার সুরতে اِبْشَارْ বাবে اِفْعَالْ হতে, আর তাশদীদযুক্ত হলে বাবে تَفْعِيْل থেকে।

قَوْلُهُ الْمَوَدَّةَ : এটা مَصْدَر مَنْصُوْب বাবে سَمِعَ অর্থ- বন্ধুত্ব, মহব্বত, বন্ধুত্ব করা।

قَوْلُهُ الْقُرْبٰى : এটা زُلْفٰى এবং بُشْرٰى -এর ওজনে اِسْم مَصْدَرْ অর্থ আত্মীয়তা, নৈকট্যতা। বাবে نَصَرَ হতে মাসদার- قَرَابَةٌ

قَوْلُهُ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى : এতে দুটি মত রয়েছে- ১. اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ হবে। কেননা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো اَجْرًا আর مُسْتَثْنٰى مِنْه টা مُسْتَثْنٰى -এর জিনস থেকে হয়নি। অর্থাৎ لَا اَسْئَلُكُمْ اَجْرًا قَطُّ .২ مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে অর্থাৎ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا هٰذَا وَهُوَ اَنْ تَوَدُّوْا اَهْلَ قَرَابَتِى الَّذِيْنَ هُمْ قَرَابَتُكُمْ

قَوْلُهُ فِى الْقُرْبٰى : এটা جَارْ এবং مَجْرُوْر মিলে مُتَعَلِّقْ হয়ে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ اٰبِتَةً فِى الْقُرْبٰى

قَوْلُهُ يَقْتَرِفْ : এর মূল হলো اَلْقَرْفُ অর্থাৎ اَلْكَسْبُ বলা হয়- فُلَانٌ يَقْرِفُ لِعِيَالِهٖ كَسْبًا [এর বাব হলো ضَرَبَ] এই আয়াতের مِصْدَاقْ নির্ধারণে কঠিন মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে উত্তম হলো যা মুজাহিদ এবং কাতাদা (র.) উল্লেখ করেছেন। যার সারকথা হলো এই যে, اِنَّكُمْ قَوْمِىْ وَاَحَقُّ مِنْ اَجَابَنِىْ وَاَطَاعَنِىْ فَاِذَا قَدْ اَبَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاحْفَظُوْا حَقَّ الْقُرْبٰى وَصِلُوْا رَحِمِىْ وَلَا تُؤْذُوْنِىْ অর্থাৎ তোমরা আমার সম্প্রদায়! যারা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে এবং আমার আনুগত্য গ্রহণ করেছে তাদের থেকে তোমরা অধিক হকদার। এখন যখন তোমরা তা অস্বীকার করে দিয়েছ অন্তত পক্ষে আমার আত্মীয়তার খেয়াল রাখ এবং আমার সাথে আত্মীয়তাসুলভ আচরণ কর এবং আমাকে কষ্ট দিয়ো না। -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ يُجِيْبُهُمْ : মুফাসসির (র.) يَسْتَجِيْبُ -এর তাফসীর يُجِيْبُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, سِيْن টা تَاكِيْد -এর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে। যেমন- اِسْتَعْظَمَ যা تَعَظَّمَ অর্থে হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْ لَّا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى : এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রিসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্য আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয়-বাৎসল্যের প্রয়োজন তো তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোনো পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলা বাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোনো শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নজির দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেন–

وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ اَنَّ سُيُوْفَهُمْ * بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

অর্থাৎ কোনো এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোনো দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্য এটা কোনো দোষ নয়; বরং নৈপুণ্য। জনৈক উর্দু কবি বলেন– مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সারকথা এই যে, আত্মীয়বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গাম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোনো বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তা'আলাই দেবেন। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের সেরা পয়গাম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, আমি এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পত্র লিখলে তিনি জবাবে লিখে পাঠালেন– اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ وَسَطَ النَّاسِ فِىْ قُرَيْشٍ لَيْسَ بَطْنٌ مِنْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا وَقَدْ وَلَدُوْهُ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلْ اِنِّىْ لَا اَسْئَلُكُمْ اَجْرًا عَلٰى مَا اَدْعُوْكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى تَوَدُّوْنِىْ لِقَرَابَتِىْ مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوْنِىْ بِهَا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাজত কর। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ আরো বর্ণনা করেন– يَا قَوْمِ اِذَا اَبَيْتُمْ اَنْ تُتَابِعُوْنِىْ فَاحْفَظُوْا قَرَابَتِىْ مِنْكُمْ وَلَا يَكُوْنُ غَيْرُكُمْ مِنَ الْعَرَبِ اَوْلٰى بِحِفْظِىْ وَنُصْرَتِىْ مِنْكُمْ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাজত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই আরো বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাজিল হলে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তানসন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই আল্লামা সুয়ূতী ও হাফেজ ইবনে হাজার (র.) প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এই রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তানসন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গাম্বরগণ বিশেষত সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তাফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত : উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোনো গুরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোনো হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশি হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যার যত নিকটবর্তী সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে জরুরি হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোনো সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও ছওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হলো। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলেমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন–

يَا رَاكِبًا قِفْ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مِنًى * وَاهْتِفْ بِسَاكِنِ خَيْفِهَا وَالنَّاهِضِ

سَحَرًا إِذَا فَاضَ الْحَجِيجُ إِلَى مِنًى * فَيْضًا كَمُ لْتَطَمِ الْفُرَاتُ الْفَائِضُ

إِنْ كَانَ رِفْضًا حُبُّ اٰلِ مُحَمَّدٍ * فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضِيٌّ

অর্থাৎ হে আশ্বারোহী, তুমি মুহাস্সাব উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যুষে যখন হাজীদের স্রোত ফোরাত নদীর উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর– যদি কেবল মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধররের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী থাকুক আমিও রাফেযী।

قَوْلُهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত, রিসালত ও কুরআনকে ভ্রান্ত আখ্যাদানকারী এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জবাব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গাম্বরের মু'জিযা ও জাদুকরের জাদু –এ দুই এর মধ্যে কোনোটিই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গাম্বরগণের নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু'জিযা দান করেন। এতে পয়গাম্বরের কোনো এখতিয়ার থাকে না।

Free @ www.eilm.weebly.com

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জাদুকরদের জাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু জাদু ও মু'জিযার মধ্যে এবং জাদুকর ও পয়গাম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবি করে, তার হাতে কোনো জাদুও সফল হতে দেন না, নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্তই তার জাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিযাও দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাজিল করেন।

কুরআন পাকও এক মুজেযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী করীম ﷺ -এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মু'জিযা উপরিউক্ত নীতি অনুযায়ী কোনো মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহি ও রিসালত সম্পর্কিত দাবি সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে ভ্রান্ত ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপ : তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরিয়তের পরিভাষায় কোনো গুনাহ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে- ১. বর্তমানে যে গুনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে। ২. অতীতের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। ৩. ভবিষ্যতে সে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো ফরজ কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাজা করতে হবে। গুনাহ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধনসম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোনো ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোনো হক হলে যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে অথবা কারো গিবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যই আল্লাহর ওয়াস্তে গুনাহ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গুনাহ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গুনাহ থেকে তওবা করাই শরিয়তের কাম্য। কিন্তু কোনো বিশেষ গুনাহ থেকে তওবা করলেও আহলে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গুনাহ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গুনাহ বহাল থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا الخ : পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুযূল : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করেছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ইবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ সন্দেহের জবাব উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থি হয়ে থাকে। কাজেই কোনো সময় কোনো মানুষের দোয়া বাহ্যত কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিজিক ও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। -[তাফসীরে কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় যারা কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) বলেন, আমরা যখন বনূ-কুরায়যা, বনূ-নুযায়ের ও বনূ কায়নুকার অগাধ ধনসম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর ইবনে হুরায়স (রা.) বলেন, সুফফায় অবস্থানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে রূহুল মাআনী]

দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ : আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিজিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ ধনসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারো মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি, কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বণ্টন করেছেন যে, কাউকে ধনসম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ তাঁর নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সম্যক জানেন কার জন্য কোন নিয়ামত উপযুক্ত এবং কোন নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারো কাছ থেকে কোনো নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরি নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হবো। কারণ এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তাভাবনা করে। আর আল্লাহ তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের পরিপন্থি নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোনো ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা-আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধনসম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য : এখানে খট্কা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জবাব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধনসম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণত বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। ফলে কোনোরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দুনিয়াতে ধনসম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো না কেন? এখন এ আপত্তি উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভালো ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হতো না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ থাকবে মন্দের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا : [মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।] ভূপৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহর সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে 'নিরাশ হওয়ার পর' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করাও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতিমিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহর কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তদবির থেকে নিরাশ হওয়া বুঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

قَوْلُهُ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابَّةٍ : অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دابة বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীবজন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্টবস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তুও হতে পারে, যা এখনো মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্ব-ব্যবস্থার উপযোগিতাবশত আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেননি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূপৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবই আল্লাহর তাওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারো কোনো কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٠. وَمَآ اَصَابَكُمْ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِّنْ
مُّصِيْبَةٍ بَلِيَّةٍ وَشِدَّةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ
اَىْ كَسَبْتُمْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَعُبِّرَ بِالْاَيْدِىْ
لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهَا وَيَعْفُوْا
عَنْ كَثِيْرٍ مِنْهَا فَلَا يُجَازِىْ عَلَيْهِ وَهُوَ
تَعَالٰى اَكْرَمُ مِنْ اَنْ يُثَنِّىَ الْجَزَاءَ فِى
الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا غَيْرُ الْمُذْنِبِيْنَ فَمَا يُصِيْبُهُمْ
فِى الدُّنْيَا لِرَفْعِ دَرَجَاتِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৩০. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ আপতিত হয়, এখানে ঈমানদারগণকে সম্বোধন করা হয়েছে তা তোমাদের কর্মেরই ফল। অর্থাৎ তোমাদের হাতের উপার্জন পাপের কারণে। উক্ত আয়াতে পাপসমূহকে হাতের উপার্জন বলা হয়েছে, কেননা অধিকাংশ পাপসমূহ হাত দ্বারা সংঘটিত হয়। এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। অর্থাৎ এর উপর শাস্তি দেওয়া হয় না। আল্লাহ তা'আলা বড়ই মেহেরবান, তিনি পরকালে কোনো অপকর্মের শাস্তি পুনরায় দেওয়া থেকে পবিত্র। আর নিরাপরাধ ঈমানদার দুনিয়াতে যেসব বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়, তা পরকালে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে হয়।

٣١. وَمَآ اَنْتُمْ يَا مُشْرِكِيْنَ بِمُعْجِزِيْنَ اللّٰهَ
هَرَبًا فِى الْاَرْضِ ج فَتَفُوْتُوْنَهُ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا
نَصِيْرٍ يَدْفَعُ عَذَابَهُ عَنْكُمْ .

৩১. হে মুশরিকগণ! তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহকে অক্ষম করতে পার না যাতে তোমরা তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাবে। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো কার্যনির্বাহী নেই, সাহায্যকারী নেই। যিনি তোমাদের থেকে তা দূর করে দিবেন।

٣٢. وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ السُّفُنِ فِى
الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ كَالْجِبَالِ فِى الْعِظَمِ .

৩২. আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে বাতাসের বেগে বেয়ে চলা পাহাড়সম জাহাজসমূহ পাহাড়ের ন্যায় বৃহৎ জাহাজ।

٣٣. اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ يَصِرْنَ
رَوَاكِدَ ثَوَابِتَ لَا تَجْرِىْ عَلٰى ظَهْرِهِ ط اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ هُوَ الْمُؤْمِنُ
يَصْبِرُ فِى الشِّدَّةِ وَيَشْكُرُ فِى الرَّخَاءِ .

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন, ফলে এসব জলযানসমূহ সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে। ফলে এসব সমুদ্রে চলবে না নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ ঈমানদারগণের জন্যে যারা কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে সুখের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

٣٤. اَوْ يُوْبِقْهُنَّ عَطْفٌ عَلٰى يُسْكِنْ اَىْ
يُغْرِقْهُنَّ بِعَصْفِ الرِّيْحِ بِاَهْلِهِنَّ بِمَا
كَسَبُوْا اَىْ اَهْلُهُنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ وَيَعْفُ
عَنْ كَثِيْرٍ لا مِنْهَا فَلَا يُغْرِقُ اَهْلَهُ .

৩৪. অথবা তিনি চাইলে তাদের কৃতকর্মের পাপসমূহের কারণে সেগুলোকে ধ্বংসও করে দিতে পারেন। يُوْبِقْ-এর আতফ يُسْكِنْ-এর উপর অর্থাৎ তিনি সে জাহাজগুলোকে তাদের যাত্রীসহ বাতাসের তীব্রগতি দ্বারা ডুবিয়ে দিতে পারেন। এবং তিনি অনেক পাপীদেরকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। ফলে তিনি জাহাজবাসীকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন না।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٣٥. وَيَعْلَمَ بِالرَّفْعِ مُسْتَانِفٌ وَبِالنَّصْبِ مَعْطُوْفٌ عَلٰى تَعْلِيْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ يُغْرِقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا ط مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْصٍ مَهْرَبٍ مِنَ الْعَذَابِ وَجُمْلَةُ النَّفْىِ سُدَّتْ مَسَدَّ مَفْعُوْلَىْ يَعْلَمُ اَوِ النَّفْىُ مُعَلِّقٌ عَنِ الْعَمَلِ .

৩৫. যারা আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের শাস্তি থেকে পলায়নের কোনো জায়গা নেই। مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيْصٍ না-বোধক বাক্যটি يَعْلَمَ ফে'লের দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত অথবা نَفْى টি يَعْلَمَ -কে আমল থেকে রহিত করে দিয়েছে। يَعْلَمَ পেশবিশিষ্ট অবস্থায় স্বতন্ত্র বাক্য ও নসববিশিষ্ট অবস্থায় উহ্য ফে'লের উপর আতফ অর্থাৎ يُغْرِقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمَ

٣٦. فَمَآ اُوْتِيْتُمْ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ شَىْءٍ مِنْ اَثَاثِ الدُّنْيَا فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا ثُمَّ يَزُوْلُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

৩৬. হে ঈমানদার ও অমুসলিমগণ বস্তুত তোমাদের দুনিয়ার ধনসম্পদ থেকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা এ দুনিয়ার কতিপয় অস্থায়ী ভোগের সামগ্রী মাত্র। এটার দ্বারা তোমরা দুনিয়াতে কিছুদিন ভোগ করবে অতঃপর তা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে পুণ্য থেকে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে।

٣٧. وَيُعْطَفُ عَلَيْهِ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ مُوْجِبَاتِ الْحُدُوْدِ مِنْ عَطْفِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ وَاِذَا مَا غَضِبُوْهُمْ يَغْفِرُوْنَ ج يَتَجَاوَزُوْنَ .

৩৭. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ বাক্যটি পূর্বের উপর আতফ যারা বড় গুনাহ ও অশ্লীল গুনাহ যেসব পাপ দণ্ড ওয়াজিব করে থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন তারা রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়। عَطْفُ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ -এর উপর كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ -এর আতফ اَلْفَوَاحِشَ

٣٨. وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ اَجَابُوْهُ اِلٰى مَا دَعَاهُمْ اِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالْعِبَادَةِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص اَدَامُوْهَا وَاَمْرُهُمْ الَّذِىْ يَبْدُوْ لَهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ يُشَاوِرُوْنَ فِيْهِ وَلَا يَعْجَلُوْنَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اَعْطَيْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ وَمَنْ ذُكِرَ صِنْفٌ .

৩৮. এবং যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে অর্থাৎ তাদের প্রতি দাওয়াতকৃত তাওহীদ ও ইবাদতের আদেশ কবুল করে এবং নামাজ কায়েম করে, সর্বদা নামাজ আদায় করে। পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে, অর্থাৎ যখন তাদের সম্মুখে কোনো কাজ উপস্থিত হয়, তখন তারা পরামর্শ করে ও দ্রুত করে না। এবং তারা খরচ করে আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর আনুগত্যে। এখানে উল্লিখিত গুণাবলি মুমিনদের একটি দলের।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٩. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ الظُّلْمُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ صِنْفٌ اَيْ يَنْتَقِمُوْنَ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ بِمِثْلِ ظُلْمِهِ كَمَا قَالَ تَعَالٰى :

৩৯. এবং যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে যখন তারা আক্রান্ত হয় জুলুমের শিকার হয়। মুমিনদের আরেক দল হলো, তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের উপর কৃত অত্যাচারের সমপরিমাণ যারা তাদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তাদের থেকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আগত আয়াতে বলেন– جَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

٤٠. وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج سُمِّيَتِ الثَّانِيَةُ سَيِّئَةً لِمُشَابَهَتِهَا لِلْاُوْلٰى فِي الصُّوْرَةِ وَهٰذَا ظَاهِرٌ فِيْمَا يُقْتَصُّ فِيْهِ مِنَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَاِذَا قَالَ لَهُ اَخْزَاكَ اللّٰهُ فَيُجِيْبُهُ اَخْزَاكَ اللّٰهُ فَمَنْ عَفَا عَنْ ظَالِمِهِ وَاَصْلَحَ الْوُدَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ط اَيْ اَنَّ اللّٰهَ يَاْجُرُهُ لَا مُحَالَةَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ اَيِ الْبَادِئِيْنَ بِالظُّلْمِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمْ عِقَابُهُ .

৪০. আর মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ মন্দই। এখানে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ প্রতিশোধকে سَيِّئَةً তথা মন্দ বলা হয়েছে, কেননা প্রকাশ্যে এটাও প্রথমটির ন্যায়। এটা ঐ জাতীয় প্রতিশোধের মধ্যে স্পষ্ট, যেখানে কিসাস নেওয়া হয়। আর অনেকে বলেছেন দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কেউ তোমাকে বলে, اَخْزَاكَ اللّٰهُ তথা আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করুন, তখন তুমিও তার জবাবে বলবে, اَخْزَاكَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকেও অপদস্থ করুন। কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় তার প্রতি জুলুমকারীকে এবং আপস করে অর্থাৎ তার প্রতি জুলুমকারীদের সাথে ভালোবাসা ও মহব্বতের সাথে আপস করে ক্ষমা করে দেয় তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রথম জুলুমকারীদের পছন্দ করেন না এবং তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হবে।

٤١. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اَيْ ظُلْمِ الظَّالِمِ اِيَّاهُ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ مُؤَاخَذَةٍ .

৪১. নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর অর্থাৎ জালিম তার উপর জুলুম করার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের উপর কোনো অভিযোগ ধরপাকড় নেই।

٤٢. اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط بِالْمَعَاصِيْ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ .

৪২. অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহের আচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٤٣. وَلَمَنْ صَبَرَ فَلَمْ يَنْتَصِرْ وَغَفَرَ تَجَاوَزَ اِنَّ ذٰلِكَ الصَّبْرَ وَالتَّجَاوُزَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ اَيْ مَعْزُوْمَاتِهَا بِمَعْنَى الْمَطْلُوْبَاتِ شَرْعًا .

৪৩. যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না এবং ক্ষমা করে দেয়, নিশ্চয় এটা ক্ষমা ও ধৈর্য হচ্ছে সাহসিকতার কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম অর্থাৎ সাহসিকতার কাজ অর্থাৎ শরিয়তসম্মত উত্তম কাজ।

Free @ www.e-ilmweebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ : এ ইবারতের উদ্দেশ্য হলো مَا اَصَابَكُمْ -এর সম্বোধন থেকে কাফেরদেরকে বের করা কেননা পৃথিবীতে কাফেরদের উপর যে বিপদাপদ পতিত হয় তা تَعْجِيْلُ بَعْضِ عَذَابٍ -এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ শাস্তি পরকালে হবে। আর পৃথিবীতে মুমিনগণের উপর যেই বিপদাপদ নিপতিত হয় এটা হয়তো গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে, অথবা মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ : এর মধ্যে مِنْ مُصِيْبَةٍ টা مَا -এর بَيَانٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ : যদি مَا اَصَابَكُمْ -এর মধ্যে مَا -কে شَرْطِيَّه মানা হয় তবে مَا اَصَابَكُمْ টা جَوَاب فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ হবে। আর যদি مَا -কে مَوْصُوْلَه বলা হয় তবে তা مُبْتَدَأْ مُتَضَمِّنْ بِمَعْنٰى شَرْطٍ হবে, আর شَرْط এটা মুবতাদার খবর হবে। আর যেহেতু مُبْتَدَأْ مُتَضَمِّنْ شَرْطٍ হয়েছে এজন্য তার খবরের উপর فَا، প্রবিষ্ট হয়েছে এক কেরাতে مَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ এটা فَا، ব্যতীত রয়েছে। ঐ সুরতে মুবতাদা খবরের তারকীবই উত্তম। এ সুরতে شَرْط وَجَزَا، বলে فَا، -কে উহ্য মানা شَاذ-

قَوْلُهُ اَىْ كَسَبْتُمْ مِنَ الذُّنُوْبِ : فَبِمَا كَسَبْتُمْ اَيْدِيْكُمْ -এর তাফসীর كَسَبْتُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, فِعْل -এর সম্পাদনকারী ذَاتْ হয়ে থাকে কিন্তু যেহেতু فِعْل -এর সম্পাদনের ক্ষেত্রে অধিক অংশ এবং দখল হাতের হয়ে থাকে এজন্য فِعْل -এর নিসবত রূপকভাবে হাতের দিকেই করা হয়ে থাকে।

ذُنُوْب দু প্রকার– ১. সেই গুনাহ যার শাস্তি পৃথিবীতেই আপদ-বিপদের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয়। ২. সেই গুনাহ যাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এরপর এ ব্যাপারে পৃথিবীতে কিংবা পরকালে কোনোরূপ ধরপাকড় করা হয় না যে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয় তার সংখ্যা, যাকে ধরপাকড় করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু اَكْرَمُ الْاَكْرَمِيْنَ তাই যে গুনাহের শাস্তি পৃথিবীতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার শাস্তি পুনরায় আর দেবেন না এবং যেগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে তারও শাস্তি পুনরায় প্রদান করা হবে না। হযরত আলী (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনের এ আয়াত খুবই আশাব্যঞ্জক।

قَوْلُهُ هُوَ تَعَالٰى اَكْرَمُ : وَيَعْفُوْ এর সম্পর্ক بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ -এর সাথে হয়েছে, কাজেই উচিত ছিল যে, এটাকে عَنْ كَثِيْرٍ -এর উপর مُقَدَّمْ করে فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ -এর সাথে মিলিয়ে নেওয়া।

قَوْلُهُ مُشْرِكِيْنَ : বর্তমান নুসখাতে يَا مُشْرِكِيْنَ রয়েছে। অথচ صَحِيْح হলো يَا مُشْرِكُوْنَ যেমনটি حَاشِيَةُ الْجَمَلِ -এর নুসখায় রয়েছে। কেননা মুনাদাটা رَفْع -এর উপর مَبْنِىْ হয়ে থাকে। কাজেই مَرْفُوْعٌ بِالْوَاوِ -এর সুরতে يَا مُشْرِكُوْنَ হওয়া উচিত।

قَوْلُهُ مُعْجِزِيْنَ : অর্থাৎ فَارِّيْنَ مِنْ عَذَابِهٖ

قَوْلُهُ الْجَوَار : رَسْمُ الْخَطِّ -এর হিসেবে يَا، -কে উহ্য করে। কেননা এটা অতিরিক্ত। جَوَارٍ শব্দটি جَارِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রবাহিত নৌকা, চলমান নৌকা।

একটি সংশয় ও তার জবাব : বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, الْجَوَارِ এটা السُّفُنِ -এর উহ্য مَوْصُوْف -এর সিফত হয়েছে। যেমনটি আল্লামা মহল্লী (র.) السُّفُنِ উহ্য মেনে উহ্য মাওসূফের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উহ্য ইবারত হলো– السُّفُنِ الْجَوَارِ কিন্তু এখানে السُّفُنِ মাওসূফকে উহ্য করা জায়েজ নয়। কেননা مَوْصُوْف -কে সে সময় পর্যন্ত উহ্য করা জায়েজ নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত صِفَتْ মওসূফের সাথে خَاصّ না হয়। এ কারণেই مَرَرْتُ بِمَاشٍ বৈধ নয়। কেননা مَاشٍ টা হলো صِفَت عَامّ কোনো مَوْصُوْف -এর সাথে خَاصّ নয়। তবে مَرَرْتُ بِكَاتِبٍ এবং مَرَرْتُ بِمُهَنْدِسٍ বলা যেতে পারে। অথচ مُهَنْدِسٌ এবং كَاتِبٌ -ও সিফাত; কিন্তু তাদের مَوْصُوْف উহ্য রয়েছে। কেননা এটা صِفَات خَاصَّه -এর অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত হলো اَلْجَرْىُ এটা اَلسُّفُنُ -এর সাথে خَاصّ নয়। কাজেই اَلسُّفُنُ -কে উহ্য করা জায়েজ না হওয়া উচিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ সংশয়ের জবাব এই যে, مَوْصُوْف উহ্য করা সে সময় হয় যখন صِفَتْ -এর উপর إِسْمِيَتْ প্রাধান্য না পায়। আর যখন إِسْمِيَتْ গালিব হয়ে যায়, তখন مَوْصُوْف -কে উহ্যকরণ বৈধ হয়ে যায়। যেমন- أَبْرَقُ এটা সিফত। অনেক বেশি উজ্জ্বল বস্তুকে أَبْرَقُ বলা হয়। কিন্তু এখন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর নাম হয়ে গেছে, যা উজ্জ্বল পদার্থ। কাজেই এখন তার مَوْصُوْف -কে উহ্য করা জায়েজ হবে। এমনিভাবে أَبْطَحُ -এর অর্থ হলো প্রশস্ত এবং (سنگریزه والا ہونا) প্রস্তরময় হওয়া। কিন্তু এখন তাতে إِسْمِيَتْ প্রাধান্য পাওয়ায় নির্দিষ্ট একটি উপত্যকার অর্থে হয়ে গেছে। কাজেই এর مَوْصُوْف -কে উহ্য করা জায়েজ রয়েছে। এমনিভাবে مُنَقّٰى -এর অর্থ হলো পরিষ্কারকৃত। এটা صِفَتْ কিন্তু এর উপর إِسْمِيَتْ প্রাধান্য লাভ করেছে। এর مَوْصُوْف হলো مُوَيْز পূর্ণ নাম مُوَيْز مُنَقّٰى যা সাধারণত ঔষধে ব্যবহার হয়। কিন্তু এখন তার مَوْصُوْف -কে উহ্য করে উহ্য مُنَقّٰى বলে। অথচ এর مَوْصُوْف -কে অধিকাংশ মানুষ জানেই না। অনুরূপভাবে اَلْجَوَارِ শব্দটি যা جَارِيَةٌ -এর বহুবচন, সিফাত হয়েছে। এর অর্থ হলো প্রবাহিত, চলন্ত। কিন্তু এখন তার উপর إِسْمِيَتْ প্রাধান্য লাভ করেছে। যার কারণে নৌকাকে جَارِيَة বলতে লাগল। কাজেই এর مَوْصُوْف -কে উহ্য করা যায়। যেমনটি মুফাসসির (র.) اَلسُّفُنُ উহ্য মেনে مَوْصُوْف -এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ يَظْلَلْنَ يَصِرْنَ : এটা ظَلَّ হতে مُضَارِعْ -এর جَمع مُؤَنَّث غَائِبْ -এর সীগাহ فِعْل نَاقِصْ অর্থ -তারা হয়ে যাবে। يَظْلَلْنَ -এর তাফসীর يَصِرْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে ظَلَّ টা মুতলাকান صَارَ -এর অর্থে হয়েছে। অন্যথায় ظَلَّ -এর মূল অর্থ হলো- দিনে কোনো কাজ হওয়ার সংবাদ দেওয়া। যেমন- بَاتَ -এর অর্থ হলো রাতে কোনো কাজ হওয়ার সংবাদ দেওয়া।

قَوْلُهُ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : এর তাফসীর وَهُوَ الْمُؤْمِنُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, যিনি উল্লিখিত দুটি সিফাতের বাহক তিনি পরিপূর্ণ মুমিন, মনে হয় যেন ঈমানের দুটি অংশ রয়েছে। একটি হলো صَبْر ; আর অপরটি شُكْر ; সবরের অর্থ হচ্ছে গুনাহের উপর সবর করা। আর شُكْر -এর অর্থ হলো ওয়াজিবসমূহকে আদায় করা।

قَوْلُهُ بِاَهْلِهِنَّ : بَاء টা مَعَ অর্থে হয়েছে অর্থাৎ যদি তিনি চান তবে নৌকাগুলোকে তার আরোহীসহ ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

قَوْلُهُ اَىْ اَهْلِهِنَّ : এটা كَسَبُوْا -এর وَاوْ -এর তাফসীর যার দ্বারা নৌকার আরোহীগণ উদ্দেশ্য, যা سَبَاقٌ দ্বারা বুঝা যায়। يُوْبِقْهُنَّ এটা إِيْبَاقٌ থেকে [বাবে إِفْعَالٌ] مُضَارِعْ -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। আর هُنَّ হলো মাফঊলের যমীর; অর্থ- তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে শেষ করে দিবেন।

قَوْلُهُ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْهَا : এটা عَفْوٌ মাসদার থেকে مُضَارِعْ -এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ যা مَجْزُوْم হয়েছে। জমহুর يَعْفُ -কে جَوَاب شَرْط -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَجْزُوْم পড়েছেন।

قَوْلُهُ مِنْهَا : অর্থাৎ اَلسُّفُنُ বা اَلذُّنُوْبُ অর্থাৎ কতিপয় নৌকাকে ডুবিয়ে দেন না, বা কতিপয় নৌকা আরোহীদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দেন।

قَوْلُهُ يَعْلَمَ : يَعْلَمَ -এর মধ্যে رَفْع এবং نَصْب উভয় কেরাতই রয়েছে। جُمْلَه مُسْتَانِفَه হওয়ার কারণে رَفْع হবে। অর্থাৎ هُوَ يَعْلَمُ আর نَصْب হবে ডুবে যাওয়ার ইল্লতের উপর আতফ হওয়ার কারণে, অর্থাৎ يُغْرِقُهُمْ لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ وَيَعْلَمَ অর্থাৎ তিনি যদি চান তবে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতেন যেন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন যাতে তারা জানে বা প্রকাশ করে যারা আমার আয়াতের ব্যাপারে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়।

قَوْلُهُ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ : এখানে مَا لَهُمْ হলো خَبَرْ مُقَدَّمْ আর مِنْ مَحِيْصٍ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ আর مِنْ টা অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ مُعَلَّقٌ عَنِ الْعَمَلِ : تَعْلِيْق এটা اَفْعَال قُلُوْب -এর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। تَعْلِيْق শাব্দিকভাবে আমল বাতিল করাকে বলে। تَعْلِيْق عَمَل -এর জন্য শর্ত হলো فِعْل قَلْب টা اِسْتِفْهَامْ বা نَفِىْ বা لَام اِبْتِدَاء -এর পূর্বে পতিত হওয়া। যেমন এখানে يَعْلَمَ হলো فِعْل قَلْب আর يَعْلَمَ টা দুই মাফঊলকে চায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَمَا اُوْتِيْتُمْ : এখানে مَا হলো شَرْطِيَّة আর اُوْتِيْتُمْ -এর দ্বিতীয় মাফউল صَدَارَتِ كَلَامْ -এর কারণে مُقَدَّمْ হয়েছে। اُوْتِيْتُمْ -এর مُخَاطَبْ -এর যমীর প্রথম মাফউল যা নায়েবে ফায়েল হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ شَيْئٍ : এটা مَا -এর বয়ান হয়েছে। কেননা এতে اِبْهَامْ বা অস্পষ্টতা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : এখানে জবাবে শর্তের উপর فَا. এসেছে। আর مَتَاعٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ فَهُوَ مَتَاعٌ

قَوْلُهُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ : এখানে مَا عِنْدَ اللّٰهِ টা মাওসূল সেলাহ মিলে মুবতাদ হয়েছে। আর خَيْرًا হলো তার খবর। আর لِلَّذِيْنَ الخ এটা اَبْقٰى -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ الخ : এর আতফ হয়েছে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর উপর। বাক্যটি لَامْ হরফে জারের অধীনে হওয়ার কারণে محلا مجرور হয়েছে।

قَوْلُهُ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ : এখানে كَبَائِرَ দ্বারা সর্বপ্রকার বড় গুনাহ উদ্দেশ্য, আর فَوَاحِشَ দ্বারা বিশেষ ধরনের বড় গুনাহ উদ্দেশ্য, যার উপর حُدُوْد এবং قِصَاص প্রয়োগ করা হয়।

قَوْلُهُ مِنْ عَطْفِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ : এটা দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে।

সংশয় : প্রত্যেক বড় গুনাহকেই তো كَبَائِرَ বলে, যার মধ্যে فَوَاحِشَ -ও অন্তর্ভুক্ত, এরপরও এটাকে পুনরায় উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল?

নিরসন : এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। এটা مَعْطُوْف -এর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়। এটাকে عَطْفُ بَعْضٍ عَلَى الْكُلِّ -ও বলা হয়। যেমন- حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -এর মধ্যে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ : এখানে مَا -টি অতিরিক্ত ফারসিতে বলা হয় چون بخشم مى آيند ايشان مى آمرزند অর্থাৎ যখন তিনি রাগান্বিত হন তখন তিনি ক্ষমা করে দেন। اِذَا টা يَغْفِرُوْنَ -এর ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। مَا হলো অতিরিক্ত এবং يَغْفِرُوْنَ হলো هُمْ -এর খবর। বাক্য হয়ে يَجْتَنِبُوْنَ -এর উপর مَعْطُوْف হয়েছে। যা اَلَّذِيْنَ -এর صِلَه হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ এ সুরতে جُمْلَه اِسْمِيَّه -এর আতফ جُمْلَه فِعْلِيَّه -এর উপর আবশ্যক হবে।

অন্য একটি তারকীব এভাবেও হতে পারে যে, هُمْ টা غَضِبُوْا -এর মধ্যস্থ যমীরের تَاكِيْد হয়েছে। এ সুরতে يَغْفِرُوْنَ জবাবে শর্ত হবে। আবুল বাকা (র.) বলেন, هُمْ মুবতাদা আর يَغْفِرُوْنَ তার খবর। এরপর বাক্য হয়ে জবাবে শর্ত হয়েছে। কিন্তু এটা صَحِيْح নয়। কেননা যদি اِذَا -এর জবাব হয় তবে فَا. হওয়া জরুরি। যেমন তুমি বলবে- اِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو يَنْطَلِقُ কিন্তু عَمْرٌو يَنْطَلِقُ বলা জায়েজ নয়। -[جَمَلْ]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا : এর আতফ পূর্বের الذين মাওসূলের উপর হয়েছে। মুফাসসির (র.) اِسْتَجَابُوْا -এর তাফসীর اَجَابُوْا দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اِسْتَجَابُوْا -এর মধ্যে سِيْن এবং تَا. অতিরিক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট নিয়ামতসমূহ সে সকল লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর হুকুমের উপর লাব্বাইক বলে থাকেন।

قَوْلُهُ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ : এখানে اَمْرُهُمْ মুরাক্কাবে ইযাফী হয়ে মুবতাদা شُوْرٰى হলো তার খবর بَيْنَهُمْ হলো তার ظَرْف

قَوْلُهُ شُوْرٰى : এটা شَاوَرْتُهٗ [বাবে مُفَاعَلَه]-এর মাসদার بُشْرٰى এবং ذِكْرٰى -এর ওযনে অর্থ পরামর্শ করা।
(فَتْحُ الْقَدِيْرِ : شَوْكَانِى، لُغَاتُ الْقُرْاٰن)

قَوْلُهُ وَيَبْغُوْنَ يَعْمَلُوْنَ : মুফাসসির (র.) يَبْغُوْنَ -এর তাফসীর يَعْمَلُوْنَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِغَيْرِ الْحَقِّ টা تَاسِيْس -এর জন্য হয়েছে, তাকিদের জন্য নয়। কেননা بَغْىٌ টা نَاحَقْ -ই হয়ে থাকে তার পরে بِغَيْرِ الْحَقِّ বলাটা পূর্বের বাক্যের তাকিদ হবে। আর যদি يَبْغُوْنَ কে- يَعْلَمُوْنَ -এর অর্থে নেওয়া হয় তবে بِغَيْرِ الْحَقِّ টা تَاسِيْس -এর জন্য হবে। আর تَاسِيْس টা تَاكِيْد হতে উত্তম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ : এটা عَزِيْمَةٌ হতে নির্গত যা রুখসতের বিপরীত। অর্থাৎ সবর ও ক্ষমা করা মোস্তাহাব। তবে সমতার ভিত্তিতে প্রতিশোধ নেওয়াও জায়েজ।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ : হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোনো কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোনো শিরা ধড়ফড় করে, অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গুনাহের কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গুনাহের শাস্তি দেন না; বরং যেসব গুনাহের শাস্তি দেন না, সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত আশরাফুল মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গুনাহের কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোনো গুনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গুনাহ হয়ে গেলে তা অন্য গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (র.) 'দাওয়ায়ে শফী' গ্রন্থে লিখেন, গুনাহের এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। পয়গাম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোনো গুনাহ হতে পারে না। তারা যদি কোনো কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী (র.) হযরত আলী (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী]

قَوْلُهُ فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্ম ও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গুনাহ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না; বরং গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। "আইন অনুযায়ী" বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গুনাহ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোনো আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত কর্ম ও গুণাবলি লক্ষ্য করুন–

প্রথম গুণ– عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না।

দ্বিতীয় গুণ– اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۤئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ যারা কবীরা গুনাহ হতে মহাপাপ বিশেষত অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে।

কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে সমস্ত গুনাহই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গুনাহকে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গুনাহ সাধারণ কবীরা গুনাহ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বুঝানের জন্য فَوَاحِشَ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন– ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয় সেগুলোকে فَوَاحِشَ তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা এগুলোর কু-প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানবসমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ– وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা সচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা কারো ভালোবাসা অথবা কারো প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারো প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমতো ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও সৎকর্মীদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ– اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ : اِسْتِجَابَةٌ-এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। সে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। এতে ইসলামের সকল ফরজ কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরজ কর্মসমূহের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরজ কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তাওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামাজ পড়ে।

পঞ্চম গুণ– وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিয়ত কোনো বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে اَمْرٌ শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা সাধারণের পরিভাষায় اَمْرٌ শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেনদেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে মূর্খতাযুগের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনেরা উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসনব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে ঢালাও এখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে। ইমাম জাসসাস (র.) আহকামুল কুরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শ সাপেক্ষে কাজে তাড়াহুড়া না কারার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা : খতীব বাগদাদী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোনো ব্যাপারের সম্মুখীন হই যাতে কুরআনের কোনো ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোনো ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন– اَجْمِعُوْا لَهُ الْعَابِدِيْنَ مِنْ اُمَّتِىْ وَاجْعَلُوْهُ بَيْنَكُمْ شُوْرٰى وَلَا تَقْضُوْهُ بِرَاْيٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ এর জন্যে আমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারো একক মতে ফয়সালা করো না।

এ রেওয়ায়েতের কোনো কোনো ভাষ্যে فُقَهَاء এবং عَابِدِيْن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ফিকহবিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দীন লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীস ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন– مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ اِلَّا هُدُوْا لِاَرْشَدِ اَمْرِهِمْ অর্থাৎ যখন কোনো সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

Free @ www.eelm.weebly.com

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূপৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভালো। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে, তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্য ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হবে অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে। -[তাফসীরে রূহুল মাআনী]

ষষ্ঠ গুণ– مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তারা আল্লাহপ্রদত্ত রিজিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরজ জাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাজের সাথে জাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাজের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজের জন্য মসজিদসমূহে দৈনিক পাঁচবার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়। -[তাফসীরে রূহুল মাআনী]

সপ্তম গুণ– وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ অর্থাৎ তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান-সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালঙ্ঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয় বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমালঙ্ঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। সীমালঙ্ঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে– وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারীরিক ক্ষতি কেউ করে, তুমি তার ঠিক ততটুকু ক্ষতিই কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণত কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্য তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না।

আয়াতে যদিও সমান-সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে– فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপস-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু-আয়াতে এরই আরো বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা : হযরত ইবরাহীম নাখায়ী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরো বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে। কাজী আবূ বকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী (র.) এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তাঁরা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দুটিই অবস্থাভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য দু-আয়াতে খাঁটি মুমিন ও সৎকর্মীদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না; বরং তখনো ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোনো সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٤. وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اَىْ اَحَدٍ يَلِىْ هِدَايَتَهٗ بَعْدَ اِضْلَالِ اللّٰهِ اِيَّاهُ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ اِلَى الدُّنْيَا مِّنْ سَبِيْلٍ ج طَرِيْقٍ ـ

৪৪. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্যে তিনি ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে গোমরাহ করার পর তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারবে না। পাপাচারীরা যখন আজাব পর্যবেক্ষণ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা আফসোসের সাথে বলবে, আজ এখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?

٤٥. وَتَرٰهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا اَىِ النَّارِ خٰشِعِيْنَ خَائِفِيْنَ مُتَوَاضِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهَا مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ط ضَعِيْفِ النَّظْرِ مُسَارَقَةً وَمِنْ اِبْتِدَائِيَةٌ اَوْ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِتَخْلِيْدِهِمْ فِى النَّارِ وَعَدَمِ وُصُوْلِهِمْ اِلَى الْحُوْرِ الْمُعَدَّةِ لَهُمْ فِى الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنُوْا وَالْمَوْصُوْلُ خَبَرُ اِنَّ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ دَائِمٍ هُوَ مِنْ مَقُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

৪৫. আপনি তাদেরকে দেখবেন, যখন তারা অপমানে অবনত হয়ে যাবে তারা অর্ধনির্মিলিত দৃষ্টিতে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকবে مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ-এর مِنْ অব্যয়টি اِبْتِدَاء বা ب -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুমিনগণ বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে সর্বদা জাহান্নামের আজাবে প্রবেশ করিয়ে এবং তাদের জন্যে প্রস্তুতকৃত হুরসমূহ থেকে বঞ্চিত করে। অর্থাৎ যদি তারা ঈমান আনত এ সমস্ত নিয়ামত তারা অর্জন করত। اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا টি صِلَه ও مَوْصُوْل মিলে اِنَّ -এর খবর। জেনে রাখ, নিশ্চয় জালেমরা কাফেররা স্থায়ী আজাবে থাকবে। এটা আল্লাহর উক্তি।

٤٦. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَىْ غَيْرِهٖ يَدْفَعُ عَذَابَهٗ عَنْهُمْ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ط طَرِيْقٍ اِلَى الْحَقِّ فِى الدُّنْيَا وَاِلَى الْجَنَّةِ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

৪৬. তাদের আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সাহায্যকারী থাকবে না, যারা তাদেরকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ তাদের থেকে আজাবকে দূর করবে আল্লাহ তা'আলা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে দুনিয়াতে সঠিক পথে পৌছার কোনো রাস্তা নেই। এবং পরকালেও জান্নাতে পৌছার কোনো রাস্তা নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٧. اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ اَجِيْبُوْهُ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْعِبَادَةِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ هُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ لَا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط اَىْ اَنَّهٗ اِذَا اَتٰى بِهٖ لَا يَرُدُّهٗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ تَلْجَئُوْنَ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ اِنْكَارٍ لِذُنُوْبِكُمْ.

৪৭. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে তাওহীদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের সাথে সাড়া দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিন কিয়ামতের দিন আসার পূর্বে. অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস আসার পর কেউ তা ফিরাতে পারবে না। সেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না । যেখানে তোমরা আশ্রয় নেবে। এবং তোমাদের জন্যে কোনো অস্বীকারকারী থাকবে না। যিনি তোমাদের পাপসমূহ অস্বীকার করবে।

٤٨. فَاِنْ اَعْرَضُوْا عَنِ الْاِجَابَةِ فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ط تَحْفَظُ اَعْمَالَهُمْ بِاَنْ تُوَافِقَ الْمَطْلُوْبَ مِنْهُمْ اِنْ مَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ط وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نِعْمَةً كَالْغِنٰى وَالصِّحَّةِ فَرِحَ بِهَا ج وَاِنْ تُصِبْهُمْ الضَّمِيْرُ لِلْاِنْسَانِ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ سَيِّئَةٌ بَلَاءٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اَىْ قَدَّمُوْهُ وَعَبَّرَ بِالْاَيْدِىْ لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهَا فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ لِلنِّعْمَةِ.

৪৮. যদি তারা তার ডাকে সাড়া দেওয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। যাতে আপনি তাদের আমলসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করেন। যেন তাদের আমলসমূহ তাদের থেকে প্রত্যাশিত আমলসমূহের ন্যায় হয়। আপনার দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া। এ হুকুম জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বের এবং আমি যখন মানুষকে আমার রহমত নিয়ামত যেমন– প্রাচুর্য ও সুস্থতা আস্বাদন করাই, তখন সে আনন্দিত হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোনো অনিষ্ট ঘটে তখন মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরি করে। تُصِبْهُمْ -এর هُمْ সর্বনাম মানবজাতির দিকে ফিরেছে। قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ -এর অর্থ قَدَّمُوْهُ অর্থাৎ তারা যা পেশ করে এবং এখানে তাদের হাতসমূহকে তাদের সাত্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে, কেননা মানুষের অধিকাংশ কাজসমূহ হাত দ্বারা সংঘটিত হয়।

٤٩. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنَ الْاَوْلَادِ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ لا

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে, তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন, যাকে চান তাকে কন্যাসন্তান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে পুত্রসন্তান দান করেন।

٥٠. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ اَىْ يَجْعَلُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط فَلَا يَلِدُ وَلَا يُوْلَدُ لَهٗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِمَا يَخْلُقُ قَدِيْرٌ عَلٰى مَا يَشَآءُ.

৫০. আবার যাকে চান তাকে পুত্র-কন্যা উভয়টাই দান করেন এবং যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন। অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সন্তান জন্মদানে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়ে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর সৃষ্টিজীব সম্পর্কে ক্ষমতাশীল তাঁর ইচ্ছার প্রতি।

Free @ www.eilm.weebly.com

٥١. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُّوْحِىَ اِلَيْهِ وَحْيًا فِى الْمَنَامِ اَوْ بِالْاِلْهَامِ اَوْ اِلَّا مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ بِاَنْ يُّسْمِعَهُ كَلَامَهُ وَلَا يَرَاهُ كَمَا وَقَعَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ اِلَّا اَنْ يُّرْسِلَ رَسُوْلًا مَلَكًا كَجِبْرَائِيْلَ فَيُوْحِىَ الرَّسُوْلُ اِلَى الْمُرْسَلِ اِلَيْهِ اَىْ يُكَلِّمَهُ بِاِذْنِهٖ اَىِ اللّٰهِ مَا يَشَاۤءُ ط اَللّٰهُ اِنَّهٗ عَلِىٌّ عَنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثِيْنَ حَكِيْمٌ فِىْ صُنْعِهٖ .

৫১. কোনো মানুষের জন্যেই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহির মাধ্যমে তার কাছে ওহি প্রেরণ করা হবে স্বপ্ন বা ইলহাম দ্বারা অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে, যেমন পর্দার অন্তরালে বান্দাকে তাঁর বাণী শুনানো হবে; কিন্তু তিনি তাকে দেখবেন না। যেমন- হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি এভাবে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে। অথবা তিনি কোনো দূত ফেরেশতা যেমন- হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতিতে দূত নির্দিষ্ট প্রাপকের নিকট ওহি পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ, পার্থিব সকল গুণাবলি থেকে প্রজ্ঞাময়, তাঁর কারিগরিতে।

٥٢. وَكَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِيْحَائِنَا اِلٰى غَيْرِكَ مِنَ الرُّسُلِ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ رُوْحًا هُوَ الْقُرْاٰنُ بِهٖ تَحْيَى الْقُلُوْبُ مِّنْ اَمْرِنَا ط اَلَّذِىْ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ تَعْرِفُ قَبْلَ الْوَحْىِ اِلَيْكَ مَا الْكِتٰبُ الْقُرْاٰنُ وَلَا الْاِيْمَانُ اَىْ شَرَائِعُهٗ وَمَعَالِمُهٗ وَالنَّفْىُ مُعَلِّقٌ لِلْفِعْلِ عَنِ الْعَمَلِ وَمَا بَعْدَهٗ سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُوْلَيْنِ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ اَىِ الرُّوْحَ اَوِ الْكِتٰبَ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِنَا ط وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْۤ تَدْعُوْ بِالْمُوْحٰى اِلَيْكَ اِلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنِ الْاِسْلَامِ .

৫২. এমনিভাবে অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! অন্যান্য রাসূলগণের মতো আমি আপনার নিকট আমার নির্দেশে রূহ অর্থাৎ কুরআন যা দ্বারা অন্তরসমূহ জীবিত হয় প্রেরণ করেছি। অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি যা ওহি প্রেরণ করেছি তা হলো কুরআন, যাতে মানুষের অন্তরসমূহ জিন্দা হয়। আপনি ওহি নাজিলের পূর্বে জানতেন না কিতাব কুরআন কি? এবং জনতেন না ঈমান কি? অর্থাৎ ইসলামের বিধিবিধান জানতেন না। اِسْتِفْهَامٌ তার পূর্বের উল্লিখিত ফে'লকে আমল থেকে রহিত করে দিয়েছে। বা তার পরবর্তী বাক্য দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত। কিন্তু আমি একে অর্থাৎ রূহ বা কিতাবকে করেছি নূর, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি আপনার কাছে প্রেরিত ওহির দ্বারা সরল পথ ইসলাম ধর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করেন।

٥٣. صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيْدًا اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ تَرْجِعُ .

৫৩. আল্লাহর পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই রাজত্ব, সৃষ্টি ও দাসত্ব সব হিসেবে শুনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব বিষয় পৌঁছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَحَدٍ يَلِيْ : এটা مِنْ وَلِيٍّ -এর তাফসীর। অর্থাৎ لَيْسَ لَهٗ وَلِيٌّ يَلِيْ هِدَايَتَهٗ بَعْدَ اِضْلَالِهٖ এ সুরতে مِنْ بَعْدِهٖ - যমীর اِضْلَالٌ -এর দিকে ফিরবে এবং এটাও সম্ভব যে, بَعْدِهٖ -এর যমীর আল্লাহর দিকে ফিরবে। আর بَعْدِ اللّٰهِ টা سِوَى اللّٰهِ অর্থে হবে। সেই সুরতে অনুবাদ হবে– আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো অভিভাবক থাকবে না।

قَوْلُهُ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ : এটা جُمْلَهْ حَالِيَهْ এবং رُؤْيَتْ দ্বারা رُؤْيَتْ بَصَرِيَهْ উদ্দেশ্য এবং এর مُخَاطَبْ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে رُؤْيَتْ -এর যোগ্যতা থাকবে।

قَوْلُهُ مَرَدٍّ : এটা رَدٌّ হতে ظَرْف زَمَان وَمَكَانْ অর্থ– ফিরিয়ে আনার সময় বা ফিরিয়ে আনার স্থান।

قَوْلُهُ عَلَيْهَا : প্রশ্ন. عَلَيْهَا -এর মধ্যে هَاء যমীরের مَرْجِعْ কি? যদি পূর্বে উল্লেখ না থাকে তবে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হচ্ছে। আর যদি পূর্বে উল্লিখিত اَلْعَذَابَ -এর দিকে ফিরে তবে যমীর এবং مَرْجِعْ -এর মধ্যে مُطَابَقَتْ হয় না। কেননা عَذَابَ হলো পুংলিঙ্গ এবং هَاء যমীর হলো স্ত্রীলিঙ্গ।

উত্তর. هَاء যমীরের مَرْجِعْ হলো نَارْ যেমনটি ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। اَلْعَذَابَ শব্দটি দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে, কাজেই কোনো বিপত্তি থাকে না। (جَمَلْ)

قَوْلُهُ تَرَاهُمْ : এখানে تَرٰى দ্বারা رُؤْيَتْ بَصَرِيْ উদ্দেশ্য। আর يُعْرَضُوْنَ এবং خَاشِعِيْنَ উভয়টি هُمْ যমীর থেকে جُمْلَهْ হয়ে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الذُّلِّ : এটা خَاشِعِيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الطَّرْفِ : طَرْف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চক্ষু। কেউ কেউ মাসদারী অর্থ তথা দেখা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। প্রথম অর্থই ব্যাখ্যাকারের ইবারতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। طَرْف خَفِىْ লজ্জাবনত দৃষ্টিকে বলা হয়। چشم نیم باز، چشم ضعیف، چشم بیمار এ সকল শব্দ দ্বারা প্রায় একই مَفْهُوْمْ আদায় করা হয়।

بمژگان سیاه کردی ہزاراں رخنہ درتیم * بیا کاز چشم بیمارت ہزاراں درد برد چینم

কবি লজ্জাবনত দৃষ্টিকে چشم بیمار দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন পাপীদেরকে দোজখের সামনাসামনি করা হবে তখন লজ্জা ও লাঞ্ছনার কারণে চোখসমূহ পরিপূর্ণরূপে খুলতে সক্ষম হবে না; বরং চোখের কিনারা দ্বারা আড় চোখে দেখবে।

قَوْلُهُ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهَا : এখানে اِلَيْهَا -এর যমীরও اَلْعَذَابَ হতে নির্গত مَفْهُوْمُ النَّارِ -এর দিকে ফিরবে। مِنْ طَرْفٍ -এর মধ্যে مِنْ টি اِبْتِدَائِيَّه অথবা بَاء অর্থে হয়েছে। بَاء অর্থে হওয়াটাই অধিক সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا : এটা اِنَّ -এর খবর আর اَلْخٰسِرِيْنَ হলো اِنَّ -এর اِسْم।

قَوْلُهُ بِتَخْلِيْدِهِمْ فِي النَّارِ وَعَدَمِ وُصُوْلِهِمْ اِلَى الْحُوْرِ : এখানে لَفْ نَشْر مُرَتَّبْ হয়েছে بِتَخْلِيْدِ -এর সম্পর্ক اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ -এর সাথে হয়েছে। আর عَدَمُ وُصُوْلِهِمْ -এর সম্পর্ক اَهْلِيْهِمْ -এর সাথে হয়েছে। আর পরিবারের সম্পর্কে ক্ষতির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেই হুর ও গিলমান তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এখন তারা তা থেকে বঞ্চিত হবে। আবার কেউ কেউ এ সম্ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন যে, اَهْل দ্বারা পৃথিবীর اَهْل বা পরিবার-পরিজন উদ্দেশ্য হবে। তাদের ব্যাপারে ক্ষতির সুরত এই হবে যে, তা জান্নাতে অন্যকে দিয়ে দেওয়া হবে। (حَاشِيَه جَلَالَيْن) মুফাসসির (র.) هُوَ مِنْ مَقُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَلَا اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِىْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ এটা আল্লাহ তা'আলার مَقُوْلَهْ বা উক্তি এবং মুমিনের উক্তির সত্যায়ন। আবার কেউ কেউ এই বাক্যকে মুমিনগণের কথার تَتِمَّه বলেছেন।

قَوْلُهُ لَا يَرُدُّهٗ : এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مِنَ اللّٰهِ এটা مَرَدٍّ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আবার يَاْتِىْ -এর সাথেও এর تَعَلُّقْ করা জায়েজ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اِنْكَارَ لِذُنُوْبِكُمْ : এ ইবারতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, نَكِيْر টা খেলাফে কিয়াস اَنْكَرَ -এর মাসদার হয়েছে। অর্থাৎ অপরাধীদের পক্ষে স্বীয় অপরাধকে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না। কেননা صَحِيْفَةُ اَعْمَالِ তথা আমলনামাতে তাদের কার্যবিবরণী সংরক্ষিত রয়েছে এবং অপরাধীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

قَوْلُهُ فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا : এ বাক্যটি শর্তের জবাব উহ্যের ইল্লত অর্থাৎ شَرْط হলো اِنْ اَعْرَضُوْا আর فَلَا تَحْزَنْ জবাবে শর্ত উহ্য রয়েছে- اِنَّا مَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا অর্থাৎ মুশরিকদের বিমুখ থাকার কারণে চিন্তিত হবেন না। কেননা আমি আপনাকে তাদের রক্ষক বানিয়ে প্রেরণ করিনি, আপনার দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করা। অর্থাৎ অহেতুক তাদের চিন্তায় পড়ে থাকবেন না যে, তাদের আমল তাদের থেকে প্রার্থিত আমল অনুপাতে হয় কিনা?

قَوْلُهُ الضَّمِيْرُ لِلْاِنْسَانِ بِاِعْتِبَارِ الْجِنْسِ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন. تُصِبْهُمْ -এর যমীর اِنْسَانٌ-এর দিকে ফিরেছে। এখন যমীর ও مَرْجِعْ -এর মধ্যে সামঞ্জস্য হয় না। কেননা যমীর হলো বহুবচন আর مَرْجِعْ হলো একবচন।

উত্তর. اِنْسَانٌ শব্দটি শব্দ হিসেবে যদিও একবচন; কিন্তু جِنْس হওয়ার ভিত্তিতে বহুবচন, কাজেই বহুবচনের যমীর নেওয়া বৈধ হয়েছে- এবং فَرِحَ -কে مُفْرَدْ নেওয়া হয়েছে اِنْسَانٌ -এর শব্দের হিসেবে।

قَوْلُهُ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ : এখানে اِسْمُ ضَمِيْر -এর স্থানে اِسْمُ ظَاهِرٌ নেওয়া হয়েছে। মূলে ছিল فَاِنَّهُ كَفُوْرٌ ইমাম কারখী (র.) বলেন, এ বাক্যটি جَوَابُ شَرْط ; কিন্তু বাস্তবতা হলো এই যে, এ جَوَابْ টা উহ্যের ইল্লত। উহ্য ইবারত হলো- وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ نَسِىَ النِّعْمَةَ رَأْسًا فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ জবাবে শর্ত উহ্য রয়েছে كَفُوْرٌ نَسِىَ النِّعْمَةَ رَأْسًا فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ জবাবে শর্তের ইল্লত।

قَوْلُهُ فَلَا يَلِدُ وَلَا يُوْلَدُ لَهُ : فَلَا يَلِدُ -এর সম্পর্ক اِمْرَأَةٌ -এর সাথে অর্থাৎ যদি বন্ধ্যা নারী হয় তবে لَا يَلِدُ বলা হবে। কিন্তু এ সুরত تَلِدُ তথা تَاءٌ -এর সাথে হওয়া উচিত। তবে বলা যায় যে, مِنْ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে مُذَكَّرٌ নেওয়া বৈধ। কোনো কোনো নুসখায় تَلِدُ -ও রয়েছে, যা অধিক সমীচীন। আর وَلَا يُوْلَدُ -এর সম্পর্ক ঐ সুরতের সাথে হবে যখন عَقْم তথা বন্ধ্যাত্ব পুরুষের সাথে হয়। আর মিসবাহগ্রন্থে রয়েছে যে, لَا يُوْلَدُ لَهُ উভয় সুরতেই বলা যায় عَقْم বা বন্ধ্যাত্ব চাই পুরুষের মধ্যে হোক বা নারীর মধ্যে হোক। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ وَلَا يَرَاهُ : এ ইবারতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখানে حِجَابٌ -এর لَازِمْ مَعْنٰى অর্থাৎ عَدَمُ رُؤْيَتْ উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহর জন্য পর্দা বা হেজাব অসম্ভব; বরং حِجَابٌ বান্দার সিফত।

قَوْلُهُ مَا الْكِتَابُ : مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হলো মুবতাদা আর اَلْكِتَابُ তার খবর। বাক্যটি উহ্য মুযাফের সাথে হয়েছে। অর্থাৎ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ جَوَابُ مَا الْكِتَابُ অর্থাৎ আপনি সেই প্রশ্নের জবাবও জানতেন না যে, কিতাব কি? -[جُمَلٌ]

قَوْلُهُ اَىْ شَرَائِعَهُ وَمَعَالِمَهُ : এ ইবারত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা।

প্রশ্ন. রাসূল ﷺ তো নবুয়তের পূর্বেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন এবং হেরাগুহায় শরিকহীন একক আল্লাহর ইবাদত করতেন। এরপরও তার সম্পর্কে "আপনি ঈমান সম্পর্কে অনবগত ছিলেন" বলার অর্থ বা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর. ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَحْكَامٌ ও শরিয়ত এবং এর বিস্তারিত বিবরণ। যে সম্পর্কে তিনি ওহি আসার পূর্বে অনবগত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মুমিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ বাক্যে তাদেরকে কিয়ামতের আজাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا বাক্যের মর্ম তাই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ : এখান থেকে اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানবসৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে– يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ অর্থাৎ মানবসৃষ্টিতে কারো ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি জ্ঞানেরও কোনো দখল নেই। পিতামাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র; কিন্তু সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোনো দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই কাউকে কন্যাসন্তান, কাউকে পুত্রসন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন; তার কোনো সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কন্যাসন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। –[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদিদের এক হঠকারিতামূলক দাবির জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগভী ও কুরতুবী (র.) প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা আপনি হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একথা সত্য নয় যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-ও সামনাসামনি কথা শুনেননি, বরং যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়াজ শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। যথা–

প্রথম উপায় : وَحْيًا অর্থাৎ কোনো বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারেও হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ اَلْقٰى فِىْ رَوْعِىْ বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গাম্বরগণের স্বপ্নও ওহি হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গাম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায় : اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার অন্তরাল থেকে কোনো কথা শোনা। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ তা'আলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করেননি। তাই رَبِّ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জবাব لَنْ تَرٰنِىْ বলে দেওয়া হয়।

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোনো বস্তু নয়, যা আল্লাহ তা'আলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোনো বস্তুই ঢাকতে পারে না; বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতি আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যত ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ তা'আলার সামনাসামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি মেরাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখোমুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরিউক্ত নীতির পরিপন্থি নয়। কেননা সে কথাবার্তা এ জগতে নয়, আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায় : أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রমুখ কোনো ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গাম্বরকে তার পাঠ করে শোনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কুরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরিউক্ত বিবরণে وَحْيٌ শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহর সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহির একটি প্রকার বলে গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহিও দুরকম। কখনো ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনো মানুষের আকৃতিতে।

قَوْلُهُ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ : এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারো সাথে হয়নি, হতে পারেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি যে ওহি প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এ নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহি প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনাসামনি কথা বলুন ইহুদিদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোনো মানুষ এমনকি কোনো রাসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ওহির মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলগণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার অর্থ এই যে, ঈমানের বিবরণ, ঈমানের শর্তাবলি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহির পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলেমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রাসূল ও নবী করেন, তাঁকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর সৃষ্টি করেন। তাঁর মন-মানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহি অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মুমিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চরিত্রে পরিণত হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় পয়গাম্বরগণের বিরোধিতা করে তাঁদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে; কিন্তু কোনো পয়গাম্বরকে বিরোধীরা এ দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুয়ত দাবির পূর্বে আমাদের মতোই প্রতিমা পূজা করতেন।

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ : সূরা যুখরুফ মক্কায় অবতীর্ণ

وَقِيْلَ اِلَّا وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا الْاٰيَةَ تِسْعٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً

এবং وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا ব্যতীত এতে সর্বমোট ৮৯ আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

1. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ . ١

১. হা-মীম আল্লাহ তা'আলাই এর মর্মার্থ সম্পর্কে অধিক অবগত।

2. وَالْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ الْمُبِيْنِ لا الْمُظْهِرِ طَرِيْقَ الْهُدٰى وَمَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الشَّرِيْعَةِ . ٢

২. শপথ ঐ কিতাবের কুরআনের যা হেদায়েতের রাস্তা ও শরিয়তের জরুরি বিধানাবলি সুস্পষ্টকারী।

3. اِنَّا جَعَلْنٰهُ اَوْجَدْنَا الْكِتَابَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا بِلُغَةِ الْعَرَبِ لَعَلَّكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ تَعْقِلُوْنَ تَفْهَمُوْنَ مَعَانِيَهٗ . ٣

৩. আমি একে এই কিতাবকে আরবি কুরআন আরবি ভাষার কুরআন করেছি, যাতে তোমরা হে মক্কাবাসী! বুঝ এর অর্থসমূহ বুঝ।

4. وَاِنَّهٗ مُثْبَتٌ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ اَصْلِ الْكِتَابِ اَىِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ لَدَيْنَا بَدَلٌ عِنْدَنَا لَعَلِيٌّ عَلَى الْكُتُبِ قَبْلَهٗ حَكِيْمٌ ط ذُوْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ . ٤

৪. নিশ্চয় এ কুরআন আমার কাছে লওহে মাহফূযে সমুন্নত পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উপর অটল অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। عِنْدَنَا টি لَدَيْنَا থেকে بَدَلٌ -

5. اَفَنَضْرِبُ نُمْسِكُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ صَفْحًا اِمْسَاكًا فَلَا تُؤْمَرُوْنَ وَلَا تُنْهَوْنَ لِاَجْلِ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ لا . ٥

৫. আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এই উপদেশনামা কুরআন প্রত্যাহার করে নেব যাতে তোমাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করা না হয়। শুধুমাত্র এ কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

6. وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ . ٦

৬. পূর্ববর্তী জাতিসমূহের নিকট আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি।

7. وَمَا كَانَ يَاْتِيْهِمْ اَتَاهُمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ كَاسْتِهْزَاءِ قَوْمِكَ بِكَ وَهٰذَا تَسْلِيَةٌ لَهٗ ﷺ . ٧

৭. এবং তাদের নিকট এমন কোনো নবী আসেনি যার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। যেমন আপনর গোত্র আপনার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। উক্ত বাক্যটি নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨. فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ مِنْ قَوْمِكَ بَطْشًا قُوَّةً وَمَضٰى سَبَقَ فِىْ اٰيَاتٍ مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ صِفَتُهُمْ فِى الْاِهْلَاكِ فَعَاقِبَةُ قَوْمِكَ كَذٰلِكَ

৮. সুতরাং যারা তাদের চেয়ে তোমার গোত্র থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্ববর্তীদের এই উদাহরণসমূহ বিভিন্ন আয়াতে অতীত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধ্বংসের মধ্যে তাদের অবস্থা বর্ণনা হয়েছে। অতএব আপনার সম্প্রদায়ের অবস্থাও তাই হবে।

٩. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى النُّوْنَاتِ وَوَاوُ الضَّمِيْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ اٰخِرُ جَوَابِهِمْ اَىِ اللّٰهُ ذُو الْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ زَادَ تَعَالٰى.

৯. তোমরা যদি ঐসব লোকদের জিজ্ঞাসা করো কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন لَئِنْ-এর ل শপথের জন্যে অবশ্যই তারা বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহই। لَيَقُوْلُنَّ আসলে لَيَقُوْلُوْنَنَ ছিল। পরস্পর কয়েকটি ن একত্র হওয়ার نُوْنُ الرَّفْعِ -কে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। অতঃপর দুটি সাকিন একত্র হওয়ার দরুন و -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

١٠. اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا فِرَاشًا كَالْمَهْدِ لِلصَّبِىِّ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا طُرُقًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ج اِلٰى مَقَاصِدِكُمْ فِىْ اَسْفَارِكُمْ.

১০. যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন যেমন শিশুর জন্যে দোলনাকে বানিয়েছেন এবং তাতে করেছেন তোমাদের জন্যে পথ যাতে তোমরা ভ্রমণে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছ যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলের পথ খুঁজে পাও। ذُو الْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ থেকে الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ পর্যন্ত মুশরিকদের কথার জবাব সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তবুও আল্লাহ তা'আলা اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ থেকে وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত বাড়িয়েছেন।

١١. وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ج اَىْ بِقَدْرِ حَاجَتِكُمْ اِلَيْهِ وَلَمْ يُنْزِلْهُ طُوْفَانًا فَاَنْشَرْنَا اَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ج كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ هٰذَا الْاِحْيَاءِ تُخْرَجُوْنَ مِنْ قُبُوْرِكُمْ اَحْيَاءً.

১১. যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমিত তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে এবং প্লাবন ও তুফানের আকৃতিতে প্রেরণ করেনি। অতঃপর তার সাহায্যে আমি মৃত ভূমিকে জীবিত করে তুলেছি। তেমনিভাবে অর্থাৎ এই জীবন দানের ন্যায় তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে তোমাদের কবর থেকে।

١٢. وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ الْاَصْنَافَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ السُّفُنِ وَالْاَنْعَامِ كَالْاِبِلِ مَا تَرْكَبُوْنَ حُذِفَ الْعَائِدُ اِخْتِصَارًا وَهُوَ مَجْرُوْرٌ فِى الْاَوَّلِ اَىْ فِيْهِ مَنْصُوْبٌ فِى الثَّانِىْ.

১২. এবং যিনি সবকিছুর যুগল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে যেমন উটকে তোমাদের যানবাহন রূপে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যাবর্তনকারী যমীরকে সংক্ষেপকরণের জন্যে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং প্রথম প্রত্যাবর্তনকারী যমীর (عَائِدْ اَوَّلْ) হলো মাজরুর অর্থাৎ مِنَ الْفُلْكِ -এর মধ্যে যমীর হলো فِيْهِ অর্থাৎ تَرْكَبُوْنَ فِيْهِ আর দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনকারী যমীর عَائِدْ ثَانِىْ হলো মানসূব অর্থাৎ الْاَنْعَامْ-এর মধ্যে যমীর হলো ه অর্থাৎ تَرْكَبُوْنَهُ -

١٣. لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ذَكَرَ الضَّمِيْرَ وَجَمَعَ الظَّهْرَ نَظْرًا لِلَفْظِ مَا وَمَعْنَاهَا ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ لا مُطِيْقِيْنَ .

১৩. যাতে তোমরা তার পিঠে আরোহণ করো স্থিরতার সাথে। এখানে- ظُهُوْرِهٖ-এর যমীরকে একবচন পুংলিঙ্গ আর ظُهُوْرُ -কে বহুবচন আনা হয়েছে مَا শব্দটির শাব্দিক ও অর্থগত উভয় দিকে লক্ষ্য করে। অতঃপর তোমরা যখন তার উপর ঠিকঠাকভাবে আরোহণ কর তোমাদের পালনকর্তার নিয়ামত স্মরণ করে বল, পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য এসব জিনিসকে অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা এদেরকে আয়ত্তে আনার উপর সক্ষম ছিলাম না।

١٤. وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ لَمُنْصَرِفُوْنَ .

১৪. আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

١٥. وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ط حَيْثُ قَالُوْا الْمَلٰئِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ لِاَنَّ الْوَلَدَ جُزْءُ الْوَالِدِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ اِنَّ الْاِنْسَانَ الْقَائِلَ ذٰلِكَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ط بَيِّنٌ ظَاهِرُ الْكُفْرِ .

১৫. এবং তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকেই কোনো কোনো বান্দাকে আল্লাহর অংশ বানিয়ে দিয়েছে। যেমন তারা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। কেননা সন্তান পিতারই অংশ আর ফেরেশতাগণ আল্লাহরই বান্দা। বাস্তবিক মানুষ এ জাতীয় উক্তিকারী স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ প্রকাশ্য কুফরকারী।

তাহকীক ও তারকীব

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ : زُخْرُفٌ অর্থ- গিলটি করা বস্তু, স্বর্ণের প্রলেপ, সজ্জিত, সৌন্দর্য, যখন زُخْرُفٌ-কে কথার সাথে ব্যবহার করা হয় তখন অর্থ হয়- মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি। ইরশাদ হচ্ছে- زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا অর্থাৎ সুসজ্জিত প্রতারণার কথাবার্তা।

قَوْلُهٗ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : এখানে وَاوْ টি হলো قَسَمِيَّةٌ جَارَّةٌ আর اَلْكِتَابُ الْمُبِيْنُ মাওসূফ সিফাত মিলে مَجْرُوْرٌ এখন جَارٌ ও مَجْرُوْرٌ মিলে اُقْسِمُ উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। ফে'ল তার فَاعِلٌ এবং مُتَعَلِّقٌ -কে নিয়ে قَسَمٌ হয়েছে। আর اِنَّا جَعَلْنَاهُ হলো جَوَابُ قَسَمٍ -

قَوْلُهٗ اَوْجَدْنَا الْكِتَابَ : মুফাসসির (র.) جَعَلْنَاهُ -এর তাফসীর اَوْجَدْنَا الْكِتَابَ দ্বারা করে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন. جَعَلَ টা কুরআনের مَجْعُوْلٌ হওয়াকে বুঝায় এবং مَجْعُوْلٌ মখলুক বা সৃষ্টজীব হয়ে থাকে। কাজেই এর দ্বারা কুরআনের مَخْلُوْقٌ হওয়া আবশ্যক হয়, যা হলো মু'তাযেলাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ আল্লাহ তা'আলা আলো ও আঁধারকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদার পরিপন্থি। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে كَلَامٌ نَفْسِيٌّ আল্লাহর সিফাত হওয়ার কারণে غَيْرُ قَدِيْمٍ এবং مَخْلُوْقٌ

উত্তর. জবাবের সারকথা হলো, جَعَلَ টা خَلَقَ -এর সাথে খাস নয়; বরং পবিত্র কুরআনেও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- بَعَثَ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী- وَجَعَلْنَا مَعَهٗ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا আর قَالَ টা جَعَلَ অর্থেও ব্যবহার

হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا অর্থাৎ মুশরিকরা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে কাউকে তাঁর অংশ বলেছে অথবা অংশ হওয়ার বিশ্বাস রেখেছে। আবার جَعَلَ টা صَيَّرَ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً অর্থাৎ আমি তাদের অন্তরে পর্দা ফেলে দিয়েছি। جَعَلْنَاهُ -এর তাফসীর اَوْجَدْنَاهُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, جَعَلَ টা مَفْعُوْل بِهٖ مُتَعَدِّىْ হয়েছে। আর তা হলো جَعَلْنَاهُ -এর মাফঊলের যমীর, যার مَرْجِعْ হলো كِتَابْ আর كِتَابًا عَرَبِيًّا মাওসূফ সিফাত মিলে جَعَلْنَاهُ -এর মাফঊলের যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। কতিপয় মুফাসসির جَعَلَ -কে صَيَّرَ -এর অর্থে নিয়ে, যমীরকে প্রথম মাফঊলে বিহী এবং قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا মওসূফ সিফত মিলে দ্বিতীয় মাফঊলে বিহী বলেছেন। তবে আল্লামা যমখশরী (র.) جَعَلَ -কে خَلَقَ অর্থে জায়েজ বলেছেন। আর এটা কুরআন مَخْلُوْقْ হওয়ার মু'তাযেলী বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

قَوْلُهُ وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتَابِ : এর আতফ جَوَابُ قَسَمْ -এর উপর হয়েছে। এভাবে এটা দ্বিতীয় جَوَابُ قَسَمْ আল্লামা মহল্লী (র.) مُثْبَتٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, فِىْٓ اُمِّ الْكِتَابِ এটা جَارْ ও مَجْرُوْرْ মিলে اِنَّ -এর খবর হয়েছে এবং لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ হলো اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর لَدَيْنَا টা فِىْٓ اُمِّ الْكِتَابِ হতে بَدْلْ হয়েছে। আর তা عِنْدَنَا অর্থে হয়েছে। আর اُمُّ الْكِتَابِ অর্থ হলো اَصْلُ الْكِتَابِ তথা লৌহে মাহফূয।

قَوْلُهُ اَفَنَضْرِبُ : উহ্য হামযার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর فَاءْ হলো عَاطِفَهْ উহ্য ইবারত হলো- اَنُهْمِلُكُمْ فَنَضْرِبُ الخ যা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ হয়েছে। যার দিকে মুফাসসির (র.) শেষে لَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তোমাদের কুরআন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে কুরআন অবতরণের ধারা স্থগিত করব না; কুরআনের ধারা চালু রেখে কুরআন অবতরণ পরিপূর্ণ করব। যাতে করে তোমাদের উপর দলিল পূর্ণ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ نُمْسِكُ : মুফাসসির (র.) نَضْرِبُ -এর তাফসীর نُمْسِكُ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, نَضْرِبُ -এর صَفْحًا টা مَفْعُوْل مُطْلَقْ হয়েছে এবং صَفْحًا টা اِمْسَاكًا -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ نُمْسِكُ اِمْسَاكًا

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ : নাফে (র.) اِنْ -কে شَرْطِيَّهْ বলে হামযাকে كَسْرَهْ -এর সাথে পড়েছেন।

প্রশ্ন. اِنْ شَرْطِيَّةْ টা غَيْرُ مُحَقَّقْ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়। অথচ মুশরিকদের শিরক مُحَقَّقْ ছিল। তাহলে এখানে কি করে اِنْ شَرْطِيَّهْ বলা বৈধ হবে?

উত্তর. اِنْ شَرْطِيَّةْ কখনো اَمْر مُحَقَّقْ -এর উপরও প্রবিষ্ট হয় مُخَاطَبْ -কে এই تَاثُّرْ দেওয়ার জন্য যে, مُتَكَلِّمْ -এর শর্ত পতিত হওয়ার বিশ্বাস নেই; বরং সে শর্ত وُقُوْعْ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, এটা প্রকাশ করার জন্য এ ধরনের ফে'লের প্রকাশ হওয়া জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান থেকে مُسْتَبْعَدْ বা অসম্ভব।

আর আল্লামা বাকূন (র.) اَنْ كُنْتُمْ হামযা فَتْحْ -এর সাথে পড়েছেন এবং لَامْ تَعْلِيْلِيَّةْ -কে উহ্য মেনেছেন। উহ্য ইবারত হলো- لِاَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ আমি কি এ কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় কুরআন অবতরণ বন্ধ করে দেব? অর্থাৎ আমি এরূপ করব না।

قَوْلُهُ كَمْ اَرْسَلْنَا : এখানে كَمْ টা হলো خَبَرِيَّةْ যা اَرْسَلْنَا -এর مَفْعُوْل مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَتَاهُمْ : এখানে يَاْتِيْهِمْ -এর তাফসীর اَتَاهُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُضَارِعْ টা مَاضِىْ -এর অর্থে হয়েছে, আশ্চর্য ধরনের সুরতে اِسْتِحْضَارْ -এর উপর বুঝানোর জন্য مَاضِىْ -কে مُضَارِعْ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ اَشَدَّ مِنْهُمْ : এটা উহ্য মাওসূফের সিফাত। আর مَوْصُوْفْ হলো اَهْلَكْنَا -এর مَفْعُوْلْ আর بَطْشًا হলো تَمْيِيْز উহ্য ইবারত হলো- اَهْلَكْنَا قَوْمًا اَشَدَّ مِنْ قَوْمِكَ مِنْ جِهَةِ الْبَطْشِ

قَوْلُهُ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ : এর মধ্যে وَاوْ হলো عَاطِفَهْ এবং قَسَمِيَّةْ আর اِنْ হলো شَرْطِيَّةْ আর لَيَقُوْلُنَّ হলো جَوَابْ قَسَمْ এবং جَوَابُ شَرْط উহ্য রয়েছে। جَوَابُ قَسَمْ টা جَوَابُ شَرْط -এর উপর দালালত করছে। قَسَمْ এবং شَرْط যখন একত্র হয়ে যায় তখন প্রথমটির جَوَابْ উল্লেখ হয়। এই প্রসিদ্ধ নীতির ভিত্তিতেই এখানে جَوَابُ قَسَمْ উল্লেখ রয়েছে এবং جَوَابُ شَرْط

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উহ্য রয়েছে। جَوَابُ شَرْط উহ্য হওয়ার দ্বিতীয় قَرِيْنَةُ এখানে এটাও যে, মুফাসসির (র.) لَيَقُوْلُنَّ -এর মধ্যে نُوْن পড়ে যাওয়ার ইল্লত একাধিক نُوْن -এর একত্র হওয়া বলেছেন। যদি لَيَقُوْلُنَّ টা جَوَابُ شَرْط হতো তাহলে মুফাসসির (র.) حُذِفَتِ النُّوْنُ لِلْجَازِمِ বলতেন।

قَوْلُهُ زَادَ تَعَالٰى الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ : মুফাসসির (র.)-এর زَادَ تَعَالٰى বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটা বর্ণনা করা যে, মুশরিকদের কথা اَلْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ -এর উপর শেষ হয়ে গেছে। اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ থেকে আল্লাহ তা'আলার কথা শুরু হচ্ছে। কেননা যদি এ বাক্যও মুশরিকদের হতো তবে তারা جَعَلَ لَنَا الْاَرْضَ مَهْدًا الخ বলত।

قَوْلُهُ الْاَصْنَافُ : এ শব্দ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْاَزْوَاجُ -এর অর্থ নির্ধারণ করা। কেননা এখানে اَزْوَاج শব্দটি তার প্রসিদ্ধ অর্থ তথা জোড়া অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং সাধারণ اَقْسَام এবং اَنْوَاع তথা প্রকারভেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَانْشَرْنَا : এতে اِلْتِفَاتْ غَائِبْ থেকে مُتَكَلِّمْ -এর দিকে হয়েছে।

قَوْلُهُ حَذْفُ الْعَائِدِ الخ : مَا تَرْكَبُوْنَ -এর مَا হলো اِسْمِ مَوْصُوْل আর تَرْكَبُوْنَ জুমলা হয়ে صِلَةْ : নীতিমালা হলো, যখন সেলাহ জুমলা হয় তখন তাতে একটি যমীর আবশ্যক হয়, যা مَوْصُوْل -এর দিকে ফিরে। এখানে তাকে اِخْتِصَارًا ফেলে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু مَا تَرْكَبُوْنَ -এর সম্পর্ক فُلْك এবং اَنْعَام উভয়ের সাথে হয়। এ কারণে যখন مَا تَرْكَبُوْنَ -এর تَعَلُّق বা সম্পর্ক فُلْك -এর সাথে হবে তখন عَائِدْ যা فِيْهِ উহ্য হবে। কেননা رَكِبْتُ فِى الْفُلْكِ বলা হয় ; رَكِبْتُ الْفُلْكَ বলা হয় না। আর যখন তার সম্পর্ক اَنْعَام -এর সাথে হবে তখন عَائِدْ মানসূব হবে। কেননা رَكِبْتُ الْاِبِلَ -এর ব্যবহার রয়েছে; رَكِبْتُ عَلَى الْاِبِلِ -এর ব্যবহার নেই।

قَوْلُهُ ذِكْرُ الضَّمِيْرِ : মুফাসসির (র.) ظُهُوْرِهِ -এর ব্যাপারে বলতে চাচ্ছেন ظهوره -এর মধ্যে ه যমীর مُذَكَّر এবং ظُهُوْر বহুবচন নিয়েছেন; ظُهُوْر শব্দটি ظَهْر -এর বহুবচন, অর্থ– পিঠ, চতুষ্পদ পশুর পিঠ। এর ه যমীর দ্বারাও اَنْعَام উদ্দেশ্য, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই; যখন উভয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য একই। মুফাসসির (র.) এর জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, এই পার্থক্য হয়েছে مَا শব্দটির শব্দ এবং অর্থের মধ্যে পার্থক্যের কারণে। مَا শব্দটি শাব্দিকভাবে مُفْرَدْ এ কারণে যমীরকে مُفْرَدْ مُذَكَّرْ নেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু অর্থগতভাবে বহুবচন, এ কারণে ظُهُوْر -কে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

সতর্কীকরণ : মুফাসসির (র.) যদি ذَكَرَ الضَّمِيْرَ -এর পরিবর্তে اَفْرَدَ الضَّمِيْرَ বলতেন, তবে বেশি উত্তম হতো। কেননা جَمْع -এর মোকাবিলায় مُفْرَدْ আসে مُذَكَّرْ নয়। যদি উভয় ক্ষেত্রে مَا -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হতো তবে عَلٰى ظُهُوْرِهَا হতো। আর যদি উভয় স্থানে শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা হতো তবে ظَهْرِهٖ হতো।

قَوْلُهُ مُقْرِنِيْنَ : অর্থাৎ مُطِيْقِيْنَ مَاخُوْذٌ مِنْ اَقْرَنَ الشَّيْئَ اِذَا اَطَاقَهُ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যুখরুফ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ, তবে হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী] এতে ৮৯ আয়াত, ৮৩৩ বাক্য এবং ৩,৪০০ অক্ষর রয়েছে।

ইবনে মরদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরা যুখরুফ মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে ওহির কথা বলা হয়েছে, আর ওহি কিভাবে নাজিল হতো তার বিবরণ স্থান পেয়েছে সূরার পরিসমাপ্তিতে। আলোচ্য সূরা শুরু করা হয়েছে ওহি তথা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা দ্বারা। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, এ সূরার প্রারম্ভে "পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ" ঘোষণা দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর যারা তাঁকে বা পবিত্র কুরআনকেও অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশ্যে রয়েছে সতর্কবাণী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আ'মালুল কুরআন : সূরা যুখরুফ লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধৌত করে পান করলে কফ কাশি দূরীভূত হয়।

–[তাফসীরে দুররুল নজম]

স্বপ্নের তাবির : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে সে সূরা যুখরুফ তেলাওয়াত করছে, তার অর্থ হবে ঐ ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সফল হবে, আর আখিরাতেও সে লাভ করবে উচ্চ মরতবা।

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। তবে হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ : এতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী দাবির দলিল হয়ে থাকে। এখানে কুরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজের সত্যতার দলিল। কুরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরিয়তের বিধিবিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ [নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?] এতে বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরি হয় না; বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় : اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ [আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়?] উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যতই সীমা অতিক্রম করো না কেন, আমি তোমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোনো দলের কাছে তাবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বেদীন অথবা পাপাচারী।

কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন-শাশ্বত : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা হলো কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং তা قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন ও শাশ্বত। কেননা কুরআন আল্লাহর কালাম ও বাণী আর আল্লাহর ন্যায় আল্লাহর বাণী কুরআনও قَدِيْمٌ ও চিরন্তন। কিন্তু বাতিলপন্থি মুতাযিলা সম্প্রদায় দল বলে, কুরআন মাখলুক ও সৃষ্ট। তারা দলিল দিতে গিয়ে বলে যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং কুরআনে বলেন– اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কুরআনকে বানিয়েছি আরবি ভাষায়। এতে তিনি কুরআনকে مَجْعُوْلٌ বলেছেন। আর مَجْعُوْلٌ একমাত্র مَخْلُوْقٌ হয়ে থাকে। আর সকল মাখলূক নতুন ও حَادِثٌ তাই কুরআনকে তারা حَادِثٌ বলে দাবি করে থাকে।

তাদের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, আল্লাহর কালাম বাস্তবিক ও প্রকৃতগত [نَفْسِىْ] হিসেবে ক্বাদীম ও চিরন্তন। অতএব আল্লাহর বাণীকে অন্যান্য শাব্দিক ও জাহেরী কথাবার্তার সাথে সমতুল্য করা যাবে না। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে جَعَلَ-এর অর্থ صَيَّرَ ও خَلَقَ-এর অর্থে নয়। অতএব তাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সঠিক নয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট حَضْرَمَوْتُ শহরের এক বাসিন্দা এসে বললেন, আপনি আমাকে বলুন, কুরআন আল্লাহর বাণীসমূহের একটি বাণী, নাকি আল্লাহর সৃষ্টের কোনো সৃষ্ট বা মাখলূক? তিনি (রা.) বলেন, এটা আল্লাহর বাণী এবং তুমি কি শোননি আল্লাহর বাণী– وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ؟ অতঃপর حَضْرَمَوْتِىْ লোকটি বললেন, আপনি কি আল্লাহর বাণী– اِنَّا جَعَلْنَا قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا-এর মধ্যে চিন্তা করেননি? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার উত্তরে বললেন, এখানে جَعَلْنَاهُ অর্থ كَتَبَهُ اللّٰهُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ অর্থাৎ আল্লাহ এটা লওহে মাহফূযে আরবিতে লিখেছেন। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ إِنَّهُ فِىْ أُمِّ الْكِتٰبِ : আলোচ্য আয়াতে أُمُّ الْكِتٰبِ অর্থ أَصْلُ الْكِتٰبِ অর্থাৎ যেখান থেকে সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি নাজিলকৃত কিতাবসমূহ গৃহীত হয়েছে সেখান থেকে এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ওয়াকিয়ায় এ কিতাবকেই كِتٰبٌ مَّكْنُوْنٌ তথা গোপন ও সুরক্ষিত কিতাব বলা হয়েছে এবং সূরা বুরূজে এটাকে লওহে মাহফূয হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন ফলক যার লেখা মুছে যেতে পারে না এবং যা সব রকম হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। কুরআন সম্পর্কে أُمُّ الْكِتٰبِ -এ লিপিবদ্ধ আছে এ কথা বলে একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলো এই যে, আল্লাহ যুগে যুগে যত কিতাব নাজিল করেছেন সব কিতাবেরই দাওয়াত ছিল একই আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি। সব কিতাবেই একই সত্যকে ন্যায় ও সত্য বলা হয়েছে, ভালো ও মন্দের একই মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে, নৈতিকতা ও সভ্যতার একই নীতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং এসব কিতাব যে দীন পেশ করেছে তা সবদিক দিয়ে একই দীন। আর তা হলো, আল্লাহর একত্ববাদ ও উলূহিয়্যাতের কথা প্রমাণ করা।

قَوْلُهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا : আলোচ্যে আয়াতে আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানার পরিবর্তে দোলানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা একটা শিশু যেভাবে তার দোলনার মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে মহাশূন্যে ভাসমান এই বিশাল গ্রহকে তোমাদের জন্যে তেমনি আরামের জায়গা বানিয়ে দিয়েছেন। এটি তার কক্ষের উপর প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে ঘুরছে এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬৬,৬০০ মাইল গতিতে ছুটে চলছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তোমাদের স্রষ্টা তাকে এতটা সুশান্ত বানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আরামে তার উপর ঘুমাও অথচ ঝাঁকুনি পর্যন্ত অনুভব করো না। তোমরা তার উপর বসবাস কর কিন্তু অনুভব পর্যন্ত করতে পার না যে এটি মহাশূন্যে ঝুলন্ত গ্রহ আর তোমরা তাতে পা উপরে ও মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলছ। তোমরা এর পিঠের উপরে আরামে ও নিরাপদে চলাফেরা করছ অথচ এ ধারণা পর্যন্ত তোমাদের নেই যে, তোমরা বন্দুকের গুলির চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়িতে আরোহণ করে আছ। উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ : [তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।] মানুষের যানবাহন দু প্রকার। যথা– ১. যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরি করে। ২. যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোনো দখল নেই। 'নৌকা, বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বুঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ তা'আলার মহাঅবদান। চতুষ্পদ জন্তুর যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে সাধারণ সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, মানুষ লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহর সৃষ্টি।

قَوْلُهُ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ : [এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর।] এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হলো সত্যিকার দাতা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহর দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্টজগতের নিয়ামতসমূহ মুমিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মুমিন আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু

সংবলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলাফেরার এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে, তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীন' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর কিতাব 'মোনাজাতে মকবুলে' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া : سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا [পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।] এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারির জন্তুর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারিতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে, অতঃপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ থেকে শুরু করে لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে। -[তাফসীরে কুরতুবী] আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে রওয়ানা হয়ে উপরিউক্ত দোয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ

এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বর্ণিত আছে- اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

-[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهٗ وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ : [আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব।] এটা যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তি দান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্র হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না।

قَوْلُهٗ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ : [নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিরে যাবে।] এ বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোনো সওয়ারি কাজে আসবে না।

قَوْلُهٗ وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا : [তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে আল্লাহর অংশ স্থির করেছে।] এখানে অংশ বলে সন্তান বুঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যাসন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান থাকলে সে আল্লাহ তা'আলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরি হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলা বাহুল্য যে, কোনো প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহর মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٦. اَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ وَ الْقَوْلُ مُقَدَّرٌ اَىْ تَقُوْلُوْنَ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ لِنَفْسِهِ وَاَصْفٰكُمْ اَخْلَصَكُمْ بِالْبَنِيْنَ اَللَّازِمُ مِنْ قَوْلِكُمُ السَّابِقِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُنْكَرِ .

১৬. আল্লাহ তা'আলা কি তার সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যাসন্তান বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র সন্তান? এ কথাটি তোমাদের পূর্বের কথা থেকে বুঝা যায়। اَمْ অব্যয়টি হামযায়ে ইনকার তথা অস্বীকারমূলক অর্থে ব্যবহৃত হামযার অর্থে এসেছে এবং কথাটি উহ্য অর্থাৎ اَتَقُوْلُوْنَ তথা তোমরা কি বল? এবং اَصْفَاكُمْ بِالْبَنِيْنَ -এর আতফ اَتَّخَذَ -এর উপর। বস্তুত এটা মুনকার তথা অশোভনীয়।

١٧. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا جَعَلَ لَهُ شَبَهًا بِنِسْبَةِ الْبَنَاتِ اِلَيْهِ لِاَنَّ الْوَلَدَ يُشْبِهُ الْوَالِدَ الْمَعْنٰى اِذَا اُخْبِرَ اَحَدُهُمْ بِالْبِنْتِ تُوَلَّدُ لَهُ ظَلَّ صَارَ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا مُتَغَيِّرًا تَغَيُّرَ مُغْتَمٍّ وَهُوَ كَظِيْمٌ مُمْتَلِئٌ غَمًّا فَكَيْفَ يُنْسَبُ الْبَنَاتُ اِلَيْهِ تَعَالٰى عَنْ ذٰلِكَ .

১৭. অথচ এসব লোকের অবস্থা এই যে, তারা রহমান তথা আল্লাহর জন্যে যে কন্যাসন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেওয়া হয়, কন্যাদেরকে তার দিকে নিসবত করে তাঁর شَبِيْه তথা সদৃশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা সন্তান পিতার অনুরূপ হয়। যার অর্থ হলো, যখন তাদের ঘরে কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো চিন্তাযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। তবুও সেই কন্যা সন্তানের নিসবত আল্লাহর দিকে কিভাবে করা হয়? আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র।

١٨. اَوْ هَمْزَةُ الْاِنْكَارِ وَ وَاوُ الْعَطْفِ لِجُمْلَةٍ اَىْ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَنْ يُنَشَّؤُا اَىْ يُرَبّٰى فِى الْحِلْيَةِ الزِّيْنَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ مُظْهِرُ الْحُجَّةِ لِضُعْفِهِ عَنْهَا بِالْاُنُوْثَةِ .

১৮. اَوْ -এর মধ্যে হামযা অস্বীকারমূলক অর্থ প্রদান করে এবং আতফের و জুমলার উপর আতফের জন্যে। অর্থাৎ তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর জন্যে বর্ণনা করে, যে অলঙ্কারে লালিতপালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম মহিলা হওয়ার কারণে তাদের দুর্বলতার দরুন দলিল প্রকাশ করতে অক্ষম।

١٩. وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ط اَشَهِدُوْا حَضَرُوْا خَلْقَهُمْ ط سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ بِاَنَّهُمْ اِنَاثٌ وَيُسْئَلُوْنَ عَنْهَا فِى الْاٰخِرَةِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْعِقَابُ .

১৯. তারা ফেরেশতাগণকে যারা আল্লাহর খাস বান্দা, তাদেরকে স্ত্রীলোক গণ্য করেছে। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? তাদের এ দাবি ফেরেশতাগণ স্ত্রীলোক ছিল লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কিয়ামতের দিন এবং এর উপর শাস্তি দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ط اَىْ الْمَلٰئِكَةَ فَعِبَادَتُنَا اِيَّاهُمْ بِمَشْيَتِهِ فَهُوَ رَاضٍ بِهَا قَالَ تَعَالٰى مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ الْمَقُوْلِ مِنَ الرِّضَا بِعِبَادَتِهَا مِنْ عِلْمٍ ن اِنْ مَا هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ط يَكْذِبُوْنَ فِيْهِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمُ الْعِقَابُ بِهِ.

২০. এবং তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন যে, আমরা তাদের অর্থাৎ ফেরেশতাদের ইবাদত না করি তাহলে আমরা তাদের পূজা করতাম না। অতএব আমরা তাদের পূজা করা আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তিনি এতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ বিষয়ে ফেরেশতাদের ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে তাদের উক্তির বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। মিথ্যা বলে। অতএব এর বিনিময়ে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

٢١. اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهِ الْقُرْاٰنِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ اَىْ لَمْ يَقَعْ ذٰلِكَ.

২১. আমি কি এর আগে কুরআনের আগে তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে পূজা করার অনুমোদন দেয়। অতঃপর তারা তা আঁকড়ে রেখেছে অর্থাৎ এমন হয়নি।

٢٢. بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ مِلَّةٍ وَاِنَّا مَاشُوْنَ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ بِهِمْ وَكَانُوْا يَعْبُدُوْنَ غَيْرَ اللّٰهِ.

২২. বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এক মাজহাবে এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি তাদের বদৌলতে হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করত।

٢٣. وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا مُتَنَعِّمُوْهَا مِثْلَ قَوْلِ قَوْمِكَ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ مِلَّةٍ وَاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ مُتَّبِعُوْنَ.

২৩. এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোনো জনপদে কোনো সতর্কবাণী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা সুখী ব্যক্তিগণ বলেছে, তোমার গোত্রের উক্তির ন্যায় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে একটি পন্থার অনুসরণ করতে দেখেছি এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি।

٢٤. قُلْ لَهُمْ اَ تَتَّبِعُوْنَ ذٰلِكَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ اَنْتَ وَمَنْ قَبْلَكَ كٰفِرُوْنَ.

২৪. হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যে পথে চলতে দেখেছ আমি যদি তোমাদের তার চেয়ে অধিক সঠিক রাস্তা বলে দেই তবুও কি তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের এ কথার অনুসরণ করবে। তারা বলত, তোমরা তুমি ও তোমার পূর্ববর্তীগণ যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ তা আমরা অস্বীকার করি।

٢٥. قَالَ تَعَالٰى تَخْوِيْفًا لَهُمْ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اَىْ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ لِلرُّسُلِ قَبْلَكَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

২৫. আল্লাহ তাদেরকে ভয় প্রদর্শনমূলকভাবে বলেন, অতঃপর আমি তাদের আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اللَّازِمُ مِنْ قَوْلِكُمُ السَّابِقِ : قَوْل سَابِق দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কার মুশরিকদের উক্তি- اَلْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللّٰهِ অর্থাৎ ফেরেশতাকে যখন আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করল, তখন এর দ্বারা একথা নিজে নিজেই আবশ্যক হয়ে গেল যে, ছেলে সন্তান তাদের জন্যই নির্দিষ্ট। কাজেই মক্কার মুশরিকদের উক্তি- وَاَصْفَاكُمْ بِالْبَنِيْنَ -এরও যা তাদের পূর্বের উক্তির জন্য আবশ্যক, مُنْكَرْ এবং مَذْمُوْم হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ بِمَا ضَرَبَ : مَا مَوْصُوْلَهْ দ্বারা بَنَاتْ উদ্দেশ্য ضَرَبَ অর্থ হলো جَعَلَ যেমনটি ব্যাখ্যাকার جَعَلَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। جَعَلَ-এর প্রথম মাফউল ، যমীর উহ্য রয়েছে। যা مَوْصُوْل-এর عَائِدْ ও অর্থাৎ ضَرَبَهُ আর مَثَلًا হলো দ্বিতীয় মাফউল, যা شِبْهًا অর্থে হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- جَعَلَ الْبَنَاتِ لَهُ شِبْهًا অর্থাৎ কন্যাদেরকে আল্লাহর দিকে নিসবত করে কন্যাদেরকে আল্লাহর সদৃশ করে দিল। কেননা সন্তান তো পিতার সদৃশ্যই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَوَ : এখানে হামযাটি اِنْكَار-এর জন্য হয়েছে। আর وَاوْ টি عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ-এর জন্য হয়েছে। يَجْعَلُهُ-এর মধ্যে بَاءْ টি لَامْ অর্থে রয়েছে। بِجُمْلَةٍ টা عَطْف-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর مَعْطُوْف উহ্য রয়েছে। আর তা হলো يَجْعَلُوْنَ আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও উহ্য রয়েছে আর তা হলো يَجْتَرِئُوْنَ উহ্য ইবারত হলো

اَيَجْتَرِئُوْنَ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَنْ يَنْشَأُ فِى الْحِلْيَةِ

قَوْلُهُ يُنَشَّؤُ : এটা বাবে تَفْعِيْل-এর تَنْشِئَةٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ অর্থ- সে লালনপালন পায়। এই অনুবাদ مَنْ-এর শব্দের হিসাব করার সুরতে। আর অর্থের হিসেবে অর্থ হবে- সে লালিত পালিত হয়।

قَوْلُهُ غَيْرُ مُبِيْنٍ مُظْهِرُ الْحُجَّةِ : مُبِيْن-এর তাফসীর مُظْهِرْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, مُبِيْن টা এখানে اِبَان মুতা'আদ্দী হতে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَجَعَلُوْا الْمَلَائِكَةَ : এখানে جَعَلَ টা قَالَ ও حَكَمْ অর্থে হয়েছে। বলা হয়- جَعَلْتُ زَيْدًا اَعْلَمَ النَّاسِ অর্থাৎ যায়েদের ব্যাপারে আমি اَعْلَمَ النَّاسِ-এর হুকুম লাগিয়েছি।

قَوْلُهُ لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ : شَاءَ-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ عَدَمَ عِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ مَا عَبَدْنَاهُمْ

قَوْلُهُ اِنَّا مَاشُوْنَ عَلَى اٰثَارِهِمْ : এখানে مَاشُوْنَ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, عَلٰى اٰثَارِهِمْ টা مَاشُوْنَ উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ এবং اٰثَارْ-এর خَبَرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ : অর্থাৎ اَلْاَمْرُ كَمَا ذُكِرَ অর্থাৎ নারীরা সাধারণত দলিল-প্রমাণে অক্ষম ও দুর্বল হয়ে থাকে مَا اَرْسَلْنَا হলো حَالِيَهْ টা وَاوْ এটা এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, হামযাটা উহ্য ফে'লের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। আর اَتَتَّبِعُوْنَ ; جُمْلَةٌ مُسْتَأْنِفَةٌ হয়েছে। অর্থাৎ اَتَقْتَدُوْنَ بِاٰبَائِكُمْ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى الخ اَىْ بِدِيْنٍ لَاَهْدٰى وَاَصْوَبُ مِمَّا وَجَدْتُمْ الخ ইসমে তাফযীলের ব্যবহার اِرْخَاءُ عِنَانٍ এবং مُخَاطَبْ-এর কথা বড় করার ভিত্তিতে হয়েছে। অন্যথায় তাদের দীন ও পদ্ধতিতে শুরু থেকেই হেদায়েত নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ : [যে অলংকার ও সাজসজ্জায় লালিতপালিত হয়] এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্য অলঙ্কার ব্যবহার এবং শরিয়তসম্মত সাজসজ্জা অবলম্বন করা জায়েজ। এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সারাদিনমান সাজসজ্জা ও প্রসাধনীতে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ : [এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।] উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোনো কোনো নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকে হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থি হবে না। কেননা অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ : অর্থাৎ যদি শিরক এত মন্দ কাজই হয় তবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিরক করার শক্তি কেন দিয়েছেন? তাঁর যদি মর্জি হতো তবে তিনি আমাদেরকে এমন গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কাফেররা ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলোক সাব্যস্ত করেছে, এরপর তাদের মূর্তি তৈরি করেছে এবং ঐ মূর্তিগুলোর পূজা করেছে, এতসব অন্যায়ের পর বলছে যে, যদি এটি অন্যায় হতো তবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারতেন। যেহেতু তিনি আমাদেরকে এসব থেকে দূরে রাখেননি এবং এসব গর্হিত কাজ করার শক্তি দিয়েছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আমাদের এহেন কর্মে রাজি আছেন।

তাদের এ ভিত্তিহীন উক্তির জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ অর্থাৎ 'মূলত এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞানই নেই, তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে।'

যারা মূর্খ, নির্বোধ তারাই এমন ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অসুন্দর উক্তি করতে পারে। কেননা মানুষকে যে দুনিয়াতে ভালোমন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার কারণ হলো এই যে, আখিরাতে তাদেরকে ভালো কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে এবং মন্দকাজের জন্যে শাস্তি দেওয়া হবে। যদি তাদের কর্মের স্বাধীনতা না থাকত এবং তারা যন্ত্রের ন্যায় কাজ করত, তবে ছওয়াব বা আজাবের প্রশ্নই উঠত না। তাই কাফেরদের এই উক্তি "শিরক যদি আল্লাহ পাকের এত অপছন্দনীয়ই হয় তাহলে কাফেরদের তার শক্তি কেন দিলেন?" –নিতান্তই মূর্খতাপ্রসূত। সত্যের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই।

যদি কাফেরদের এ খোঁড়া যুক্তি মেনে নেওয়া হয়, তবে পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অপ্রিয়, অপছন্দনীয় কোনো কাজেই থাকবে না, দুরাত্মা পাপিষ্ঠরা তাদের সকল অন্যায় আচরণের পক্ষে এ যুক্তিই পেশ করবে।

قَوْلُهُ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ : 'আমি কি তাদেরকে পবিত্র কুরআনের পূর্বে কোনো কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছে? অর্থাৎ কাফেরদের কুফর ও শিরকের পক্ষে তারা যে খোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করেছে, তা তো ধোপে টিকল না। এখন জিজ্ঞাসা করি, তাদের অপকর্মের পক্ষে আল্লাহ পাকের প্রেরিত কোনো কিতাব রয়েছে কি, যা তিনি পবিত্র কুরআন নাজিল করার পূর্বে তাদেরকে দান করেছেন? আর একথা সর্বজনবিদিত যে, সারা পৃথিবীতে খুঁজেও তারা এমন দলিল হাজির করতে পারবে না। কুরআনে করীমের একাধিক স্থানে কাফেরদেরকে শিরকের পক্ষে দলিল পেশ করার জন্যে বারংবার তাগিদ করা হয়েছে; কিন্তু তারা তা পেশ করতে সর্বদা অক্ষম রয়েছে। যে সব আসমানি গ্রন্থ ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুগে নাজিল হয়েছে, সেগুলোতেও তাদের পূজা অর্চনার পক্ষে কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণই এক্ষেত্রে তাদের একমাত্র সম্বল। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ 'বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পিতা-পিতামহকে একই পথে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমেই সঠিক পথ পাব'।

অর্থাৎ ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় তারা উপস্থিত ছিল না, একথা চির সত্য, দ্বিতীয়ত শিরক কুফরের পক্ষে তাদের নিকট কোনো কিতাব বা দলিল নেই, শুধু তাদের মূর্খ পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের কারণেই তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকে। আর যেহেতু তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণে বদ্ধপরিকর, তাই সত্যের আহ্বানে তারা সাড়া দেয় না, পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা তারা গ্রহণ করে না। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি তারা ঈমান আনে না বরং তাঁর বিরোধিতায় তারা তৎপর থাকে।

٢٦. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ اِنَّنِىْ بَرَاءٌ اَىْ بَرِئٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۙ

٢٧. اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ خَلَقَنِىْ فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ يُرْشِدُنِىْ لِدِيْنِهِ ـ

٢٨. وَجَعَلَهَا اَىْ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ الْمَفْهُوْمَةَ مِنْ قَوْلِهِ اِنَّنِىْ اِلَى سَيَهْدِيْنِ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهِ ذُرِّيَّتِهِ فَلَا يَزَالُ فِيْهِمْ مَنْ يُّوَحِّدُ اللّٰهَ لَعَلَّهُمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ يَرْجِعُوْنَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ اِلَى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَبِيْهِمْ ـ

٢٩. بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَاۤءِ الْمُشْرِكِيْنَ وَاٰبَاۤءَهُمْ وَلَمْ اُعَاجِلْهُمْ بِالْعُقُوْبَةِ حَتّٰى جَاۤءَهُمُ الْحَقُّ الْقُرْاٰنُ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ مُظْهِرٌ لَهُمُ الْاَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ وَهُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ ـ

٣٠. وَلَمَّا جَاۤءَهُمُ الْحَقُّ الْقُرْاٰنُ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ـ

٣١. وَقَالُوْا لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ مِنْ اَيَّةٍ مِّنْهُمَا عَظِيْمٍ اَىِ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ بِمَكَّةَ وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ الثَّقَفِىُّ بِالطَّائِفِ ـ

অনুবাদ :

২৬. এবং আপনি স্মরণ করুন, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের দাসত্ব করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ আমি এটা থেকে পবিত্র।

২৭. তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন তাঁরই ধর্মের দিকে।

২৮. তিনি এ কথাটি অর্থাৎ তার উক্তি اِنَّنِىْ بَرِئٌ থেকে سَيَهْدِيْنِ পর্যন্ত জ্ঞাত কালিমায়ে তাওহীদ কে তার পরবর্তী তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অক্ষয় বাণীরূপে রেখে গেছে, অতএব সর্বদা তাদের মধ্যে একত্ববাদের বিশ্বাসী বিদ্যমান থাকবে যাতে তারা মক্কাবাসীগণ বর্তমান তাদের ধর্ম থেকে তাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের দিকে ফিরে আসে।

২৯. বরং আমি এদেরকে ও এদের পূর্বপুরুষদেরকে মক্কার মুশরিকদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি। তাদের শাস্তির ব্যাপারে দ্রুত করিনি। অবশেষে তাদের নিকট সত্য কুরআন ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল তাদের নিকট আহকামে শরাইয়্যাহকে স্পষ্ট বর্ণনাকারী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ আগমন করেছেন।

৩০. যখন সত্য কুরআন তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা জাদু এবং আমরা একে অস্বীকারকারী।

৩১. তারা বলে, এই কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির উপর মক্কার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং তায়েফের উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীর উপর অবতীর্ণ হলো না?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

٣٢. اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط اَلنُّبُوَّةَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَجَعَلْنَا بَعْضَهُمْ غَنِيًّا وَبَعْضَهُمْ فَقِيْرًا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ بِالْغِنِيِّ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ اَلْغَنِيُّ بَعْضًا اَلْفَقِيْرُ سُخْرِيًّا ط مُسَخَّرًا فِى الْعَمَلِ لَهُ بِالْاُجْرَةِ وَالْيَاءُ لِلنَّسَبِ وَقُرِئَ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ اَيْ اَلْجَنَّةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ فِى الدُّنْيَا .

৩২. তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত নবুয়ত বণ্টন করে? আমি তাদের মধ্যে দুনিয়ার জীবন যাপনের উপায়-উপকরণ বণ্টন করে দিয়েছি। অতএব আমি তাদের মধ্যে কাউকে ধনী ও কাউকে ফকির করে দিয়েছি এবং এদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের উপর অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে ধনীরা অপরের গরীবদের সেবা গ্রহণ করতে পারে। ধনীরা গরিবদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাটাতে পারে। سُخْرِيًّا -এর মধ্যে ى নিসবতী এবং অন্য কেরাত মতে س -এর মধ্যে যের।] তারা যে সম্পদ দুনিয়াতে অর্জন করছে আপনার রবের রহমত অর্থাৎ জান্নাত তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

٣٣. وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً عَلَى الْكُفْرِ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ بَدَلٌ مِنْ لِمَنْ سُقُفًا بِفَتْحِ السِّيْنِ وَسُكُوْنِ الْقَافِ وَبِضَمِّهِمَا جَمْعًا مِنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ كَالدَّرَجِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ يَعْلُوْنَ اِلَى السَّطْحِ .

৩৩. সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী কুফরের উপর হয়ে যাওয়ার যদি আশঙ্কা না থাকত, তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহর সাথে কুফরি করে আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় উঠে, সেই সিঁড়ি বানিয়ে দিতাম রৌপ্য নির্মিত। لِبُيُوْتِهِمْ টি مِنْ থেকে بَدَلٌ এবং سُقُفًا -এর س এর ফাতাহ ও ق সাকিন বা উভয়টি পেশ -এর সাথে বহুবচন হিসেবে।

٣٤. وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا مِنْ فِضَّةٍ وَّ جَعَلْنَا لَهُمْ سُرُرًا مِنْ فِضَّةٍ جَمْعُ سَرِيْرٍ عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ .

৩৪. এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজাসমূহ দিতাম রৌপ্য নির্মিত এবং যে সিংহাসনের উপর তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে তা সবই রৌপ্য বানিয়ে দিতাম سُرُرٌ শব্দটি سَرِيْرٌ -এর বহুবচন।

٣٥. وَزُخْرُفًا ط ذَهَبًا الْمَعْنٰى لَوْلَا خَوْفُ الْكُفْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ اِعْطَاءِ الْكَافِرِ مَا ذُكِرَ لَاَعْطَيْنَاهُ ذٰلِكَ لِقِلَّةِ خَطَرِ الدُّنْيَا عِنْدَنَا وَعَدَمِ حَظِّهِ فِى الْاٰخِرَةِ فِى النَّعِيْمِ .

৩৫. এবং স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। যার ভাবার্থ হলো, উল্লিখিত বস্তুসমূহ কাফেরদের দেওয়ার দরুন মুমিনদের ব্যাপারে যদি কুফরির আশঙ্কা না থাকত, তবে এসব জিনিস আমি কাফেরদেরকে দিতাম, আমার নিকট দুনিয়ার সম্পদের কোনো মর্যাদা না থাকার কারণে ও কাফেরদের জন্যে আখিরাতের নিয়ামতের কোনো মর্যাদা না থাকার কারণে।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَا بِالتَّخْفِيْفِ فَمَا زَائِدَةٌ وَبِالتَّشْدِيْدِ بِمَعْنٰى إِلَّا فَإِنْ نَافِيَةٌ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط يَتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا ثُمَّ يَزُوْلُ وَالْاٰخِرَةُ الْجَنَّةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ .

এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র দুনিয়াতে উপভোগ করবে অতঃপর শেষ হয়ে যাবে لَمَا ও مُخَفَّفَةٌ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ অব্যয়টি إِنْ তাশদীদবিহীন এবং مَا যায়েদাহ এবং তাশদীদের সাথে إِلَّا-এর অর্থে, অতএব إِنْ নাফিয়াহ আর আখিরাত অর্থাৎ জান্নাত আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যেই, যারা ভয় করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَرَاءٌ : এটা মাসদার, অর্থ- অসন্তুষ্ট হওয়া, ঘৃণা করা মুফাসসির (র.) بَرِئٌ দ্বারা তাফসীর করে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَرِئٌ টি بَرَاءٌ শব্দের সিফত যা فَعِيْلٌ ওজনে হয়েছে অসন্তুষ্ট প্রকাশকারী মাসদার যখন সিফত হয় তখন وَاحِدٌ, تَثْنِيَةٌ, جَمْعٌ, مُذَكَّرٌ, مُؤَنَّثٌ সব একই ধরনের হয়।

قَوْلُهُ اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ : এতে তিনটি সুরত হতে পারে, যথা-

১. مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ لٰكِنَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ এটা সেই সুরতে হবে যে, সে শুধু মূর্তিদেরই উপাসনা করে।

২. مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ এই সুরতে হবে, যখন আল্লাহর সাথে মূর্তিদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে।

৩. اِلَّا টা صِفَتِىّ যা غَيْرُ অর্থে হবে, এটা যামাখশারী (র.)-এর অভিমত।

قَوْلُهُ جَعَلَهَا اَىْ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ الْمَفْهُوْمِ الخ : প্রশ্ন اَىْ كَلِمَةَ التَّوْحِيْدِ الخ বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্য হলো جَعَلَهَا-এর যমীরের مَرْجِعْ কি? যদি كَلِمَةٌ হয় তবে পূর্বে উল্লেখ নেই।

উত্তর. كَلِمَةٌ পূর্বে যদিও উল্লেখ নেই, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি- اِنِّىْ بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ থেকে বুঝা যায়।

قَوْلُهُ بَلْ هٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ : এখানে بَلْ হলো اِضْرَابْ اِنْتِقَالِىْ-এর জন্য। তাদের অনুসরণ না করার উপর ধমক রয়েছে। ইসমে ইশারার هٰؤُلَاءِ মুশারুন ইলাইহি مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো সে সকল মুশরিক, যারা নবী করীম ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ছিল।

حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ : এটা উহ্য غَايَتْ উহ্য ইবারত হলো- بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ فَاشْتَغَلُوْا بِذٰلِكَ التَّمَتُّعِ حَتّٰى جَاءَهُمُ الخ

قَوْلُهُ مَعَارِجُ : এটা مِعْرَجٌ মীম বর্ণে যের ও যবর উভয় হরকতসহ -এর বহুবচন। সিঁড়িকে مَعَارِجُ বলার কারণ হলো সিঁড়িতে লেংড়ার মতো আরোহণ করে থাকে। আর লেংড়াকে اِعْرَاجٌ বলে।

قَوْلُهُ سُرُرًا : এটা উহ্য ফে'লের মাফউল। যেমনটি মুফাসসির (র.) جَعَلْنَا উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। এর আতফ হয়েছে جَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ-এর উপর।

قَوْلُهُ زُخْرُفًا : এটা উহ্য جَعَلْنَا ফে'লের কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ جَعَلْنَا لَهُمْ مَعَ ذٰلِكَ زُخْرُفًا অথবা نَزْعِ خَافِضْ-এর কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে উহ্য ইবারত এই ছিল যে- اَبْوَابًا وَسُرُرًا مِنْ فِضَّةٍ وَمِنْ ذَهَبٍ এখানে مِنْ-কে ফেলে দেওয়ার কারণে زُخْرُفًا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ : اِنْ টা হলো نَافِيَةٌ আর كُلُّ ذٰلِكَ হলো মুবতাদা আর لَمَّا [তাশদীদসহ] اِلَّا অর্থে হয়েছে। مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তার খবর لَمَا-কে تَخْفِيْفٌ-এর সাথেও পড়া হয়েছে। সে সময় اِنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ مُهْمَلَه হবে। আর لَامٌ টা اِنْ مُخَفَّفَةٌ এবং نَافِيَةٌ-এর মাঝে পার্থক্যকারী হবে। আর مَا অতিরিক্ত।

قَوْلُهُ وَالْاٰخِرَةُ : এখানে وَاوْ টি حَالِيَةٌ আর اَلْاٰخِرَةُ হলো মুবতাদা عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ উভয়ের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোনো দলিল নেই। বলা বাহুল্য সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যার সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর, তিনি কেবল তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না; বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন– اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

এ থেকে আরো জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যানধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশঙ্কা তাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে না; বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরি হবে। সে মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং মুখে সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতাও ঘোষণা করেছেন।

قَوْلُهُ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ : [তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।] উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদী বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেননি; বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার অসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থি ছিল স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশেপাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরো জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তানসন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আ.) সম্পর্কেও কুরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধ ধর্মে কায়েম থাকার অসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোনো সাম্ভাব্য উপায়ে সন্তানসন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরি, তেমনি পয়গাম্বরগণের সুন্নতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যা স্থান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়েখ আব্দুল্লাহ ওয়াহহাব শা'রানী (র.) 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকারী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তাই এই যে, পিতা মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্য সযত্নে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয় হলো– এই সহজ পদ্ধতির প্রতি আজকাল ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতামাতাই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

قَوْلُهُ وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে এ কথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রাসূল কোনো মানুষ হতে পারেন। কুরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করছে যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ -কে কিরূপে রাসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতোই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কুরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হলো যে, কেবল মুহাম্মদ ﷺ -ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত যত পয়গাম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তখন তারা পাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোনো মানুষকেই নবুয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোনো বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হলো না কেন? মুহাম্মদ ﷺ তো কোনো প্রভাবশালী বা ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফী, হাবীব ইবনে আমর ছাকাফী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মুশরিকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা দুটি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জবাব উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জবাব এর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জবাবের সারমর্ম এই যে, এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই যে, আল্লাহ কাকে নবুয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুয়তের বণ্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের অভিমত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমাধা করেন তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুয়ত বণ্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্য নয় নবুয়ত বণ্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা– অস্তিত্বও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বণ্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজ-কারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বণ্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেননি; বরং এ কাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুয়ত বণ্টনের মতো মহান কাজ কিরূপে তোমাদরে হাত সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জবাব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরি।

قَوْلُهُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ الخ : জীবিকা বণ্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : আল্লাহ তা'আলা বলেন– نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবন ব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মেটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা জীবিকা বণ্টনের কাজ [সোশলিজমের ন্যায়] কোনো ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি? সেগুলো কিভাবে মেটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বণ্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্ব-ব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতো অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনাআপনিই এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষীতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানি-রপ্তানির' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রপ্তানির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রপ্তানীর তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানি ও রপ্তানির এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন বণ্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বণ্টনের কাজ কোনো মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন? এর মাধ্যমে জীবিকার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি প্রয়োজন জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরনের সামাজিক বিষয়াদি সাধারণত স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনিভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধানপ্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে সোর্পদ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণত দিন কাজের জন্য এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোনো চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি; বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনভাবে কে কাকে বিয়ে করবে? এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং এতে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারো মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণত কেউ জ্ঞান ও কারিগরির কোনো বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও

অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকার ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে। তাই ইরশাদ হচ্ছে– كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্র করে অপরের জন্য রিজিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বধীনতা দেয়নি; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও জাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূল্যোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনো ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

قَوْلُهُ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ : সামাজিক সাম্যের তাপর্য : وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আমি একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক এ অর্থে সামাজিক সাম্য কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন। আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি, তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টজীবের দায়িত্বে কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েজ ও নাজায়েজের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোনো কোনো জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোনো কোনোটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনোটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বরে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গাম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিধায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনো ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানী তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোনো যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতি যুগে [পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে] যে সাম্যের দাবি করে, তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত? এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কঠিন কাজ এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘণ্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এক তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরুদায়িত্বের সমান হতে পারে না। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল এক ঘণ্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরের আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বণ্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্য মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্য প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বণ্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোনো মাপকাঠি আছে কি, যা দ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানববুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানি ও রপ্তানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময়ে তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য এ কারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানি সমান হলে কেউ কারো কাজে আসত না। তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানি ও রপ্তানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে, তারা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমত হালাল-হারাম ও জায়েজ নাজায়েজের সুদূরপ্রসারী বিধিবিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়ত নৈতিক আচরণাবলি ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনো কোনো স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্য উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামি সাম্যের অর্থ : উল্লিখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ন্যায় ও সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যত কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান। এ বিষয়ের কোনো অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সসম্মানে ও সহজে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অর্জন করবে, আর গরিব বেচারা তার অধিকার অর্জনের জন্য দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরিবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেন- وَاللّٰهِ مَا عِنْدِىْ أَقْوٰى مِنَ الضَّعِيْفِ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ لَهٗ وَلَا عِنْدِىْ اَضْعَفُ مِنَ الْقَوِىِّ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামি সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধনসম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারি প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি এবং ইজারাদারি ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া জাকাত, ওশর, খারাজ, ভরণপোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এতসবের পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তানসন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়।

ধন-দৌলতের প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় : কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোনো বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গাম্বর করা হলো কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জবাব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্য কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধনদৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা ধনদৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحُ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে মশার একটি ডানার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্যও কোনো শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুয়তের জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা আত্যাবশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ ﷺ -এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٦. وَمَنْ يَّعْشُ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ الْقُرْاٰنِ نُقَيِّضْ نُسَبِّبْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ لَا يُفَارِقُهٗ .

৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের কুরআনের স্মরণ থেকে গাফেল থাকে বিরত থাকে আমি তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, নিয়োজিত করে দেই যে তার বন্ধু হয়ে যায়। সে তার থেকে পৃথক হয় না।

٣٧. وَاِنَّهُمْ اَيِ الشَّيٰطِيْنَ لَيَصُدُّوْنَهُمْ اَيِ الْعَاشِيْنَ عَنِ السَّبِيْلِ طَرِيْقِ الْهُدٰى وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ فِى الْجَمْعِ رِعَايَةَ مَعْنٰى مَنْ .

৩৭. এবং শয়তানরাই এসব গাফেল মানুষকে হেদায়েতের রাস্তা থেকে বাধা দান করে এবং তারা মনে করে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে। مُهْتَدُوْنَ -কে বহুবচন এনেছে مَنْ -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে।

٣٨. حَتّٰى اِذَا جَاءَنَا الْعَاشِىْ بِقَرِيْنِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ لَهٗ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ اَىْ مِثْلَ بُعْدِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ اَنْتَ لِىْ .

৩৮. অবশেষে যখন সে গাফেল ব্যক্তি তার বন্ধুসহ কিয়ামতের দিন আমার নিকট আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে "হায়, যদি আমার ও তোমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান হতো" অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে যত দূরত্ব সে পরিমাণ দূরত্ব হতো। يا অব্যয়টি সতর্ক করার অর্থে। কত জঘন্যতম সাথী সে। অর্থাৎ তুমি আমার জন্যে কতই জঘন্যতম সাথি।

٣٩. قَالَ تَعَالٰى وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ اَيِ الْعَاشِيْنَ تَمَنِّيْكُمْ وَنَدَمُكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَىْ تَبَيَّنَ لَكُمْ ظُلْمُكُمْ بِالْاِشْرَاكِ فِى الدُّنْيَا اَنَّكُمْ مَعَ قُرَنَائِكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ عِلَّةٌ بِتَقْدِيْرِ اللَّامِ لِعَدَمِ النَّفْعِ وَاِذْ بَدَلٌ مِنَ الْيَوْمِ .

৩৯. আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে গাফেলরা! আজ তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না, তোমাদের আফসোস ও আরজু তোমরা যখন জুলুম করেছো। অর্থাৎ দুনিয়াতে শিরকের মাধ্যমে তোমাদের জুলুম যখন প্রকাশ হয়েছে নিশ্চয় তোমরা তোমাদের বন্ধুসহ আজাবে সমানভাবে শরিক থাকবে। এটা উহ্য ل -এর সাথে উপকার না হওয়ার কারণ বুঝাচ্ছে এবং اِذْ -টি اَلْيَوْم থেকে بَدَل -

٤٠. اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ اَىْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

৪০. আপনি কি বধিরদের শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? অর্থাৎ তারা ঈমান গ্রহণ করবে না।

٤١. فَاِمَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اِنِ الشَّرْطِيَّةِ فِىْ مَا الزَّائِدَةِ نَذْهَبَنَّ بِكَ بِاَنْ نُّمِيْتَكَ قَبْلَ تَعْذِيْبِهِمْ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ .

৪১. অতঃপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তাদেরকে আজাব দেওয়ার পূর্বে আপনার মৃত্যু দান করি তবুও আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেব আখিরাতে। اِمَّا শব্দটি اِنْ شَرْطِيَّة ও مَا যায়েদাহ দ্বারা যৌগিক। ن -কে م -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٢. اَوْ نُرِيَنَّكَ فِىْ حَيٰوتِكَ الَّذِىْ وَعَدْنَاهُمْ بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ عَلٰى عَذَابِهِمْ مُقْتَدِرُوْنَ قَادِرُوْنَ.

৪২. অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে আপনার জীবদ্দশায় দেখিয়ে দেই, তবুও তাদেরকে আজাব দেওয়ার উপর তাদের প্রতি আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

٤٣. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ج اَىِ الْقُرْاٰنُ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

৪৩. অতএব আপনার প্রতি যে ওহি কুরআন নাজিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথে রয়েছেন।

٤٤. وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّشَرَفٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ج لِنُزُوْلِهٖ بِلُغَتِهِمْ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهٖ.

৪৪. এ কিতাব আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে অনেক বড় একটি মর্যাদা এটা তাদরে ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার দরুন এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন এটার হক আদায়ের ব্যাপারে।

٤٥. وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اَىْ غَيْرِهٖ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ قِيْلَ هُوَ عَلٰى ظَاهِرِهٖ بِاَنْ جُمِعَ لَهُ الرُّسُلُ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ اُمَمُ مَنْ اَىْ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ وَلَمْ يَسْاَلْ عَلٰى وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ لِاَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْاَمْرِ بِالسُّؤَالِ التَّقْرِيْرُ لِمُشْرِكِىْ قُرَيْشٍ اِنَّهٗ لَمْ يَاْتِ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَا كِتَابٌ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ.

৪৫. আপনার পূর্বে যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের জন্যে আমি কি কোনো উপাস্য স্থির করেছিলাম? বর্ণিত আছে যে, এটা তার প্রকাশ্য অর্থ মতো। অর্থাৎ মি'রাজের রাত্রে সকল নবীকে একত্র করা হয়েছে। অন্য বর্ণনা মতে, এখানে উদ্দেশ্য দুই আহলে কিতাব থেকে কোনো এক উম্মত। উভয় বর্ণনার কোনো মত অনুযায়ী তিনি [নবী করীম ﷺ] প্রশ্ন করেননি। কেননা জিজ্ঞাসা করার হুকুম থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশ মুশরিকদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়া যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো কিতাব ও রাসূল আসেননি, যিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনার আদেশ দেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَعْشُ : دَعَا يَدْعُوْ -এর মতো عَشَا، يَعْشُوْ، عَشْيًا، عَشْوًا বাবে نَصَرَ থেকে مَاضِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ বিরত থাকা, বিমুখ থাকা مَنْ يَّعْشُ অর্থ– যে বিমুখ থাকবে।

قَوْلُهٗ نُقَيِّضْ : এটা جَوَابْ شَرْط আর يَعْشُ হলো فِعْل شَرْط যা مَجْزُوْمْ হওয়ার কারণে শেষের وَاوْ পড়ে গেছে। আর ضَمَّه টা তা বুঝাচ্ছে। আর مَنْ হলো حَرف شَرْط আর نُقَيِّضْ টা বাবে تَفْعِيْل হতে مُضَارِعْ -এর جَمع مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ। অর্থ– আমরা مُقَدَّرْ করে দিচ্ছি, কারণ বানিয়ে দিচ্ছি।

قَوْلُهٗ اِنَّهُمْ : এখানে هُمْ -এর مَرْجِعْ হলো শয়তান। শয়তান যেহেতু جِنْس এজন্য যমীরকে বহুবচন আনা হয়েছে। আর যেখানে যমীরকে مُفْرَدْ নেওয়া হয়ে সেখানে شَيْطَانْ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে নেওয়া হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ : এটা جُمْلَه حَالِيَه হয়েছে। مَنْ -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এই তিন স্থানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। -[صَاوِىْ]

قَوْلُهُ بِقَرِيْنَةٍ : অর্থাৎ مَعَ قَرِيْنَةٍ

قَوْلُهُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ : يَا টা تَنْبِيْه -এর জন্যও হতে পারে যেমনটি ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিতও করেছেন। আবার يَا টা نِدَائِيَه -ও হতে পারে مُنَادٰى উহ্য হবে। অর্থাৎ يَا قَرِيْنُ ، لَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ الخ

قَوْلُهُ تَمَنِّيْكُمْ وَنَدَمُكُمْ : এটা يَنْفَعُكُمْ হয়ে جُمْلَه مَعْطُوْفَه -এর فَاعِلْ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبَيَّنَ لَكُمْ ظُلْمُكُمْ : এ ইবারত দ্বারা একটি সংশয়ের নিরসন করা হয়েছে।

সংশয় : ظُلْم তথা কুফর ও শিরক পৃথিবীতে হয়েছে। কেননা إِذْ টা مَاضِىْ -এর জন্য ظَرْف আর اَلْيَوْمَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিয়ামতের দিন যা إِذْ থেকে بَدَل হয়েছে; কাজেই مَاضِىْ কিভাবে حَالْ থেকে بَدَل হতে পারে?

নিরসন : تَبَيَّنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ظُلْم -এর প্রকাশ আর এটা কিয়ামতের দিনই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ : **আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ :** আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ অর্থাৎ কুরআন ও ওহি থেকে জেনেশুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -[কুরতুবী]

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ শয়তান অথবা জিন-শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎ কর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে খুব ভালো কাজ করছে। -[কুরতুবী]

এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মতো লেগেই থাকে। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ : এ আয়াতের দুরকম তাফসীর হতে পারে- ১. যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমার থেকে দূরে থাকত! কেননা, তখন তোমরা সবাই আজাবে শরিক থাকবে। এমতাবস্থায় إِنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ -এর অর্থ হবে لِأَنَّكُمْ

২. দ্বিতীয় সম্ভাব্য তাফসীর এই যে, সেখানে পৌছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আজাবে শরিক হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরিক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয়; কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারো দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আজাবে শরিক হওয়া কোনো উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় إِنَّكُمْ হবে يَنْفَعُ ক্রিয়ার কর্তা।

قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ : **সুখ্যাতিও ধর্মে পছন্দনীয় :** ইরশাদ হচ্ছে- وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ [এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু।] ذِكْر -এর অর্থ এখানে সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এই দোয়া করেছিলেন- وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ -[তাফসীরে কাবীর] কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের বদৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং এতে পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারো কারো মতে কুরাইশ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনর পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا : [আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গাম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।] এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেওয়া হলো? কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর জবাবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা যদি মু'জিযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। যেমতে মি'রাজ রজনীতে সকল পয়গাম্বরের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গাম্বরগণের ইমামত শেষে তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গাম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। যেমতে বনী ইসরাঈলের পয়গাম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তাওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হলো।

বর্তমান তওরাতে আছে যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউ নেই। -[এস্তেছনা ৩৫-৪]

শোন হে ইসরাঈল! খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা। -[এস্তেছন ৪-৬]

হযরত আশিইয়া (রা.)-এর সহীফায় আছে-

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোনো খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদাওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই । -[ইয়াহিয়া ৬-৫: ৪৫]

হযরত ঈসা (আ.)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে "হে ইসরাঈল, শোন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদাওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালোবাস।

-[মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬]

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন, এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহকে এবং ঈসা মসীহকে যাকে তুমি প্রেরণ করেছ চিনবে -[ইউহান্না ৩-১৭]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَآ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ أَيِ الْقِبْطِ فَقَالَ إِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ সহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের কিবতীদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর তিনি বলেছিলেন, আমি বিশ্বপালনকর্তার রাসূল।

٤٧. فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَا الدَّالَّةِ عَلٰى رِسَالَتِهٖ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ۔

৪৭. অতঃপর তিনি যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ যা তাঁর রিসালতের উপর দলিল বহন করে উপস্থাপন করলেন, তখন তারা বিদ্রূপ করতে লাগল

٤٨. وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيَاتِ الْعَذَابِ كَالطُّوْفَانِ وَهُوَ مَاءٌ دَخَلَ بُيُوْتَهُمْ وَوَصَلَ إِلٰى حُلُوْقِ الْجَالِسِيْنَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَالْجَرَادُ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ز قَرِيْنَتِهَا الَّتِىْ قَبْلَهَا وَأَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ عَنْ كُفْرِهِمْ ۔

৪৮. আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, আজাবের নিদর্শনসমূহ থেকে যেমন– তুফান ও জলোচ্ছ্বাস। এমন পানির সয়লাব যা তাদের ঘরে প্রবেশ করে ও তাদের গলা পরিমাণ পানি বৃদ্ধি পায়; সাতদিন পর্যন্ত পানি স্থির থাকে এবং পঙ্গপালের উপদ্রব ইত্যাদি। তাই হতো তুলনামূলক বৃহৎ পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা। আমি তাদেরকে আজাবের মধ্যে লিপ্ত করলাম যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে বিরত থাকে। তাদের কুফর থেকে বিরত থাকে।

٤٩. وَقَالُوْا لِمُوْسٰى لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ أَيِ الْعَالِمُ الْكَامِلُ لِأَنَّ السِّحْرَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ عَظِيْمٌ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج مِنْ كَشْفِ الْعَذَابِ عَنَّا إِنْ اٰمَنَّا إِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ أَيْ مُؤْمِنُوْنَ ۔

৪৯. যখন তারা আজাব দেখত তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলত, হে জাদুকর বড় জ্ঞানী, কেননা তাদের নিকট জাদুই বড় জ্ঞান। তুমি আমাদের জন্যে তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয়ে প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন। অর্থাৎ যদি আমরা ঈমান গ্রহণ করি আমাদের থেকে আজাব দূর করার ওয়াদা আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বনকারী অর্থাৎ ঈমান গ্রহণকারী।

٥٠. فَلَمَّا كَشَفْنَا بِدُعَاءِ مُوْسٰى عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ وَيُصِرُّوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ ۔

৫০. অতএব যখন আমি হযরত মূসার দোয়ায় তাদের থেকে আজাব সরিয়ে দিতাম, তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করত ও তাদের কুফরির উপর বহাল থাকত।

٥١. وَنَادٰى فِرْعَوْنُ افْتِخَارًا فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ أَيْ مِنَ النِّيْلِ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج أَيْ تَحْتَ قُصُوْرِىْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ط عَظَمَتِىْ ۔

৫১. ফেরাউন গর্বের স্বরে তার সম্প্রদায়কে ঘোষণা করলো হে আমার জনগণ! আমি কি মিশরের অধিপতি নই? এবং এই নদীগুলো যেমন নীলনদ কি আমার অধীনে আমার দালানের নীচে প্রবাহিত হচ্ছে না? তোমরা কি তা আমার বড়ত্ব দেখতে পাচ্ছ না।?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫২. أَمْ تُبْصِرُونَ وَحِينَئِذٍ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا أَيْ مُوسٰى الَّذِيْ هُوَ مَهِينٌ ضَعِيفٌ حَقِيرٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ يُظْهِرُ كَلَامَهُ لِلُثْغَةٍ بِالْجَمْرَةِ الَّتِيْ تَنَاوَلَهَا فِيْ صِغَرِهِ .

৫২. তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ, অতএব আমি শ্রেষ্ঠ এই মূসা থেকে, যে হীন ও নগণ্য দুর্বল, তুচ্ছ। এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে না। বাল্যকালে তাঁর মুখে যে তোতলামি সৃষ্টি হয় তার কারণে।

৫৩. فَلَوْلَا هَلَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ جَمْعُ أَسْوِرَةٍ كَأَغْرِبَةٍ جَمْعُ سِوَارٍ كَعَادَتِهِمْ فِيمَا يُسَوِّدُونَهُ أَنْ يُلْبِسُوهُ أَسْوِرَةَ ذَهَبٍ وَيُطَوِّقُوهُ طَوْقَ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ مُتَتَابِعِينَ يَشْهَدُونَ بِصِدْقِهِ .

৫৩. তার কাছে কেন স্বর্ণের বালা পাঠানো হলো না? যদি তিনি তাঁর নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হন। أَسَاوِرُ শব্দটি أَسْوِرَةٌ -এর বহুবচন। যেমন أَسْوِرَةٌ শব্দটি سِوَارٌ -এর বহুবচন। যেমন তাদের রীতি ছিল যে, যাকে তারা নেতা নির্বাচিত করত তাকে তারা স্বর্ণের বালা ও হার ইত্যাদি পরিধান করাত। অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে? যারা একের পর এক তার সত্যবাদিতার উপর সাক্ষ্য প্রদান করে।

৫৪. فَاسْتَخَفَّ اسْتَفَزَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ فِيمَا يُرِيدُ مِنْ تَكْذِيبِ مُوسٰى إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ .

৫৪. অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল যা সে তাদের নিকট কামনা করল অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করা। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

৫৫. فَلَمَّا آسَفُونَا أَغْضَبُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِينَ .

৫৫. অতঃপর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করলাম।

৫৬. فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا جَمْعُ سَالِفٍ كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ أَيْ سَابِقِينَ عِبْرَةً وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ بَعْدَهُمْ يَتَمَثَّلُونَ بِحَالِهِمْ فَلَا يُقْدِمُونَ عَلٰى مِثْلِ أَفْعَالِهِمْ .

৫৬. অতঃপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীতলোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্যে। سَلَفٌ টি سَالِفٌ -এর বহুবচন যেমন- خَدَمٌ টি خَادِمٌ -এর বহুবচন। পরবর্তীলোক যেন তাদের ন্যায় কর্মের অনুসরণ না করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَقَالَ إِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এ কাহিনী বর্ণনায় সংক্ষিপ্ততার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সূরা ত্বা-হা এবং সূরা কাসাসে বিস্তারিতভাবে এ ঘটনার বিবরণ রয়েছে, আয়াতের অর্থ হলো এই–

فَقَالَ إِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لِتُؤْمِنَ بِهٖ وَتُرْسِلَ مَعِيَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ .

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاٰيٰتِنَا : فَا টা হলো আতেফা এর مُقَدَّرٌ -এর উপর আতফ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهٗ يَنْكُثُوْنَ : এটা বাবে نَصَرَ -এর نَكْثٌ মাসদার হতে مُضَارِعٌ -এর جَمع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ- ভাঙতে থাকে, ভেঙে দেওয়া।

قَوْلُهٗ سَلَفًا : মুফাসসির (র.) سَالِفٌ -এর বহুবচন বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, سَلَفًا মাসদার নয় যে, ব্যাখ্যার / তাবীলের প্রয়োজন পড়বে; বরং سَلَفًا এটা سَالِفٌ -এর বহুবচন, যেমন خَدَمٌ এটা خَادِمٌ -এর বহুবচন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا الخ : হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা পূর্বে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তরিতভাবে সূরা আ'রাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফেররা তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোনো নতুন বিষয় নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিশর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি মূসা (আ.) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোনো কাজে আসল না; বরং সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হলো, তেমনি মক্কার কাফেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে না।

قَوْلُهٗ وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ : [এবং সে কথার শক্তি রাখে না] যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখের তোতলামি দূর করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বাবস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে "কথা বলার শক্তি" বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বুঝানো যেতে পারে। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা হযরত মূসা (আ.) দলিল-প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা- জওয়াব করে দিয়েছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ : এর দু-রকম অনুবাদ হতে পারে- ১. ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল। (طَلَبَ مِنْهُمُ الْخِفَّةَ فِىْ مُطَاوَعَتِهٖ) ২. সে তার সম্প্রদায়কে বেকুব পেল। (وَجَدَهُمْ خَفِيْفَةَ اَحْلَامِهِمْ)
-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا : এটা اَسَفٌ থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ- অনুতপ্ত। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো- "অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল।" অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণত এভাবে করা হয়- যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ তা'আলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে- তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।
-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٧. وَلَمَّا ضُرِبَ جُعِلَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا حِيْنَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ رَضِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ اٰلِهَتُنَا مَعَ عِيْسٰى لِاَنَّهُ عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِذَا قَوْمُكَ الْمُشْرِكُوْنَ مِنْهُ مِنَ الْمَثَلِ يَصِدُّوْنَ يَضِجُّوْنَ فَرَحًا بِمَا سَمِعُوْهُ.

৫৭. এবং যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হলো, অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অবতীর্ণ হয় তখন মুশরিকরা বলতে লাগল, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আমাদের মাবুদও ঈসা (আ.)-এর সাথে জাহান্নামে হবে। কেননা আল্লাহ ব্যতীত তাঁরও উপাসনা করা হতো। তখনই আপনার সম্প্রদায় মুশরিকগণ এই দৃষ্টান্ত শুনে হট্টগোল শুরু করে দিল। অর্থাৎ তারা যা শুনেছে তাতে তারা হৈচৈ শুরু করে দিল।

٥٨. وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ط اَيْ عِيْسٰى فَنَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ اٰلِهَتُنَا مَعَهُ مَا ضَرَبُوْهُ اَيِ الْمَثَلَ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ط خُصُوْمَةً بِالْبَاطِلِ لِعِلْمِهِمْ اَنَّ مَا لِغَيْرِ الْعَاقِلِ فَلَا يَتَنَاوَلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ج شَدِيْدُ الْخُصُوْمَةِ.

৫৮. এবং তারা বলল, আমাদের উপাস্যরা উৎকৃষ্ট নাকি সে? অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)। আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আমাদের মাবুদ জাহান্নামে ঈসার সাথে থাকবে। তারা আপনার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির জন্য এ উদাহরণ পেশ করেছে। অনর্থক দলিলবিহীন বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ কথা বলে। নতুবা তারা অবগত যে, مَا শব্দটি জ্ঞানহীন প্রাণীর জন্যে আসে অতএব আল্লাহর বাণী اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ-এর মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) শামিল নয়। বস্তুত তারা হলো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায় অধিক বিতর্ককারী।

٥٩. اِنْ هُوَ مَا عِيْسٰى اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ وَجَعَلْنٰهُ لِوُجُوْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَبٍ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ط اَيْ كَالْمَثَلِ لِغَرَابَتِهٖ يُسْتَدَلُّ بِهٖ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى مَا يَشَاءُ.

৫৯. তিনি ঈসা আমার বান্দা ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। আমি তাকে নবুয়তের নিয়ামত দান করেছিলাম এবং তাকে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলদের জন্য আমার অসীম ক্ষমতার একটি নমুনা বানিয়েছি। অর্থাৎ অলৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায় আশ্চর্য পদ্ধতিতে তার জন্মলাভ দ্বারা আল্লাহর কুদরতের দলিল পেশ করা যায়, যারা চায় তাদের জন্য।

٦٠. وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ بَدَلَكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ بِاَنْ نُّهْلِكَكُمْ.

৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে তোমাদের পরিবর্তে ফেরেশতা সৃষ্টি করে দিতে পারি যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অর্থাৎ এভাবে যে, তোমাদেরকে ধ্বংস করে।

٦١. وَاِنَّهُ اَىْ عِيْسٰى لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ تَعْلَمُ بِنُزُوْلِهٖ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِلْجَزْمِ وَوَاوُ الضَّمِيْرِ لِاِلْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ تَشُكُّنَّ فِيْهَا وَ قُلْ لَهُمْ اتَّبِعُوْنِ ط عَلَى التَّوْحِيْدِ هٰذَا الَّذِىْ اٰمُرُكُمْ بِهٖ صِرَاطٌ طَرِيْقٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

৬১. নিশ্চয় তিনি অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে কিয়ামতের ইলম অর্জন হবে। অতএব সে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করো না। تَمْتَرُنَّ -এর নূনে ই'রাবী জযম দানকারী অব্যয় لا -এর কারণে আর وَاوْ যমীর দুই সাকিন একত্র হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। تَمْتَرُنَّ অর্থ تَشُكُّنَّ তথা সন্দেহ করা এবং আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা আমার অনুসরণ কর তাওহীদের উপর। এটাই আমি তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিচ্ছি সরল-সোজা পথ।

٦٢. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ يَصْرِفَنَّكُمْ عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ الشَّيْطٰنُ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ.

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে তা থেকে আল্লাহর দীন থেকে বিরত না রাখে। নিশ্চয় সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন শত্রুতার ক্ষেত্রে।

٦٣. وَلَمَّا جَاۤءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالشَّرَائِعِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ بِالنُّبُوَّةِ وَشَرَائِعِ الْاِنْجِيْلِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ج مِنْ اَحْكَامِ التَّوْرٰىةِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَغَيْرِهٖ فَبَيَّنَ لَهُمْ اَمْرَ الدِّيْنِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

৬৩. হযরত ঈসা (আ.) যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ মু'জিযা ও আহকামে শরিয়ত নিয়ে আগমন করে বললেন, আমি তোমাদের কাছে হিকমত নিয়ে নবুয়ত ও ইঞ্জিলের হুকুম নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যেসব বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করছ যেমন– তাওরাতের ধর্মীয় হুকুম আহকাম ইত্যাদি। তার কিছু বিষয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করব। অতঃপর তিনি তাদের কাছে দীনের আহকাম বর্ণনা করেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

٦٤. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ طَرِيْقٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের রব। তাঁরই ইবাদত কর। এটা সরল-সোজা পথ।

٦٥. فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ج فِىْ عِيْسٰى اَهُوَ اللّٰهُ اَوِ ابْنُ اللّٰهِ اَوْ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ فَوَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا كَفَرُوْا بِمَا قَالُوْهُ فِىْ عِيْسٰى مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ.

৬৫. অতএব বিভিন্ন দল-গোষ্ঠী পরস্পর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে মতপার্থক্য করল। কেউ বলেছে, তিনি খোদা। কেউ বলেছে, তিনি খোদার পুত্র। আবার কেউ বলেছে, তিনি তিন খোদার একজন। অতএব যারা জুলুম কুফরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক দিনের আজাব। তারা ঈসার ব্যাপারে। وَيْلٌ শব্দটি শাস্তিমূলক শব্দ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٦. هَلْ يَنْظُرُونَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَىْ مَا يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَدَلٌ مِنَ السَّاعَةِ بَغْتَةً فَجْأَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ بِوَقْتِ مَجِيْئِهَا قَبْلَهُ.

৬৬. এখন এসব লোক অর্থাৎ মক্কার কাফেররা কি শুধু এ জন্যই অপেক্ষমাণ যে অকস্মাৎ তাদের উপর কিয়ামত এসে যাবে। اَلسَّاعَةَ টি تَاْتِيَهُمْ থেকে بَدَلٌ এবং তারা কিয়ামত আসার পূর্বে টেরও পাবে না।

٦٧. اَلْاَخِلَّاءُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِى الدُّنْيَا يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ الْمُتَحَابِّيْنَ فِى اللّٰهِ عَلٰى طَاعَتِهِ فَاِنَّهُمْ اَصْدِقَاءُ.

৬৭. সেদিন কিয়ামদের দিন সব বন্ধুরাই দুনিয়াতে পাপের মধ্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীগণ একে অপরের শত্রু হবে, يَوْمَئِذٍ -এর সম্পর্ক بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ -এর সাথে তবে আল্লাহভীরুগণ নয়। যারা আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর আনুগত্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। তারা কিয়ামতের দিন একে অপরের সাথে শত্রুতা রাখবে না; বরং তারা পরস্পর বন্ধুই থাকবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ : অর্থাৎ شُبِّهَ ابْنُ مَرْيَمَ لِاَصْنَامٍ মুফাসসির (র.) ضُرِبَ -এর তাফসীর جُعِلَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, ضُرِبَ টা جُعِلَ অর্থে مُتَعَدِّىْ بَدُوْ مَفْعُوْل হয়েছে। প্রথম মাফউল হলো اِبْنُ مَرْيَمَ যা نَائِبِ فَاعِلْ হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাফউল হলো مَثَلًا আর اِذَا হলো مُفَاجَاتِيَه আর قَوْمُكَ হলো مُبْتَدَأ আর مِنْهُ টা يَصُدُّوْنَ -এর مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর يَصُدُّوْنَ টা বাক্য হয়ে خَبَرٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَصُدُّوْنَ : صَادٌ বর্ণে যের সহ এটা বাবে ضَرَبَ হতে مُضَارِعٌ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ, অর্থ– সে চেঁচামেচি করে, শোরগোল করে –[اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ] খুশিতে হৈ-হুল্লোড় করে। –[لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ] আবার কেউ কেউ يَصُدُّوْنَ -এর صَادٌ বর্ণে পেশ দিয়ে পড়েছেন, সে সময় এটা صُدُوْدٌ হতে নির্গত হবে। অর্থ হবে– সে বিরত থাকে, মুখ ফিরিয়ে রাখে।

قَوْلُهُ اِلَّا جَدَلًا : এটা مَا ضَرَبُوْا -এর مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ اللّٰهُ : এটা খ্রিস্টানদের ইয়াকুবিয়া সম্প্রদায়ের উক্তি বা মতাদর্শ।

اَوْ اِبْنُ اللّٰهِ : এটা খ্রিস্টানদের مَرْقُوْسِيَه সম্প্রদায়ের মতাদর্শ।

اَوْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ : এটা খ্রিস্টনাদের তৃতীয় গোত্র مَلْكَانِيَه সম্প্রদায়ের মতাদর্শ। –[جَمَل]

قَوْلُهُ الْاَخِلَّاءُ : এটা خَلِيْلٌ -এর বহুবচন, অর্থ– বন্ধু।

قَوْلُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ : যদি اَلْاَخِلَّاءُ -কে مَعْصِيَةٌ -এর সাথে مُقَيَّدْ করা হয় যেমনটি মুফাসসির (র.) করেছেন, তখন اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ টা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হবে। কেননা আল্লাহভীরুগণের বন্ধুত্ব গুনাহের কারণে হয় না। এ সুরতে مُسْتَثْنٰى টা جِنْس -এর مُسْتَثْنٰى থেকে হবে না। আবার কেউ কেউ اَخِلَّاءُ থেকে مُطْلَقًا বন্ধু উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এই সুরতে আল্লাহভীরুগণও مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে, ফলে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ বলা হবে।

قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ : অর্থাৎ يَوْمَئِذٍ -এর সম্পর্ক عَدُوٌّ -এর সাথে হয়েছে। কেননা يَوْمَئِذٍ টা عَدُوٌّ -এর ظَرْف مُقَدَّمْ হয়েছে।

প্রশ্ন. عَدُوٌّ টা صِيْغَه صِفَتْ হওয়ার কারণে عَامِلِ ضَعِيْف ; এটা সেই সময় আমল করে যখন তার مَعْمُوْل তারতীবের সাথে তথা তার পরে আসে অথচ এখানে يَوْمَئِذٍ যা عَدُوٌّ -এর ظَرْف হয়েছে তা مُقَدَّمْ হয়েছে। কাজেই عَدُوٌّ টা عَامِلْ ضَعِيْف হওয়ার কারণে يَوْمَئِذٍ -এর মধ্যে আমল করবে না।

উত্তর. ظُرُوْف -এর মধ্যে যেহেতু وَسْعَتْ বা প্রশস্ততা রয়েছে. তাই مُقَدَّمْ হওয়া সত্ত্বেও عَامِلِ ضَعِيْف - ও আমল করতে পারে।

সংশয় : ظَرْف টা مُقَدَّمْ হওয়া ব্যতীতও عَمَلْ এবং مَعْمُوْل -এর মধ্যে مُبْتَدَأ ثَانِي তথা بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ -এর দ্বারা فَصْل রয়েছে।

নিরসন : মুবতাদা -এর فَصْل ও আমলের জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ : এসব আয়াতের শানে নুযূলে তাফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে. একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন– يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا خَيْرَ فِي أَحَدٍ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ হে কুরাইশগণ! আল্লাহ ব্যতীত যারাই ইবাদত করা হয় তার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। কুরাইশরা বলল. খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে. তিনি আল্লাহ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে. কুরআন পাকের إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ [তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে।] আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আব্দুল্লাহ ইবনুযযিবা'রা [যে তখনো কাফের ছিল] বলল. আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জবাব রয়েছে। তা এই যে. খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে এবং ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.)-এর পূজা করে। অতএব তাঁরা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরিক কুরাইশরা খুবই আনন্দিত হলো। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন। –[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরিকরা মিছামিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খ্রিস্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর পূজা করে, এমনভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জবাবে আল্লাহ তা'আলা এমন আয়াত নাজিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জবাব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট। কেননা যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহর কোনো আদেশ বলে করেনি এবং হযরত ঈসা (আ.)-এরও বাসনা ছিল না, কুরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কুরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খ্রিস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন? প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জবাব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই, তারা হয়তো নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী। কিন্তু নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন– শয়তান, ফেরাউন, নমরূদ প্রমুখ। হযরত ঈসা (আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তিনি কোনো পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রিস্টানরা তাঁর কোনো নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না; বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম. যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রিস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতের পরিপন্থি ছিল। তিনি সর্বদা তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা, ইবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে কাফেরদের আরো একটি আপত্তির জবাব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)] তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জবাব সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থি ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ : এটা খ্রিস্টানদের সে বিভ্রান্তির জবাবে, যার ভিত্তিতে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয় কেননা হযরত আদমকে পিতামাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নযীর এ পর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

قَوْلُهُ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ : [এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।] এর দু-রকম তাফসীর করা হয়েছে। প্রথম তাফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আ.) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলিল যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় আকাশ থেকে অবতরণ কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ : [এবং যাতে আমি তোমাদের কোনো কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।] বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোনো কোনো বিধিবিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ.) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। 'কোনো কোনো' বলার কারণ এই যে, কোনো কোনো বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেননি। -[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

প্রকৃত বন্ধুত্ব তা-ই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয় : الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ [আল্লাহভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।] এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেজ ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফের বন্ধু। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হলো। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল, ইয়া আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। অতএব, হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জবাবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে পুরস্কার ও ছওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশি। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ একত্র হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দকাজে উৎসাহ দিত এবং ভালোকাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনো আপনার কাছে হাজির হবো না। অতএব, হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে হেদায়েত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুর মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ একত্র হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সংজ্ঞা বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। যে দুজন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফজিলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহর ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার উস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহভক্তদের প্রতি এবং মুসলিম বিশ্বের সকল মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

Free@www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦٨. وَيُقَالُ لَهُمْ يٰعِبَادِى لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ج

৬৮. এবং তাদেরকে বলা হবে হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আজ কোনো ভয় নেই এবং কোনো দুঃখও তোমাদের স্পর্শ করবে না।

٦٩. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا نَعْتٌ لِعِبَادِى بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ج

৬৯. যারা আমার আয়াতসমূহ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তারা ছিল মুসলমান। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا টি عِبَادِى-এর সিফত।

٧٠. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ مُبْتَدَأٌ وَاَزْوَاجُكُمْ زَوْجَاتُكُمْ تُحْبَرُوْنَ تُسَرُّوْنَ وَتُكْرَمُوْنَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ .

৭০. তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ জান্নাতে প্রবেশ কর সানন্দে اَنْتُمْ মুবতাদা تُحْبَرُوْنَ খবর।

٧١. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ بِقِصَاعٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج جَمْعُ كُوْبٍ وَهُوَ اِنَاءٌ لَا عُرْوَةَ لَهُ لِيَشْرَبَ الشَّارِبُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ تَلَذُّذًا وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج نَظَرًا وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ج

৭১. তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পেয়ালাসমূহ اَكْوَابٍ শব্দটি كُوْبٌ-এর বহুবচন। كُوْبٌ এমন পাত্র যেখানে লোটা বা বদনার ন্যায় হাতল ও নালা থাকে না, যাতে পানকারী যেদিক দিয়ে ইচ্ছা পানি পান করতে পারে। আর সেখানে রয়েছে মনে যা চায় এবং দৃষ্টি পরিতৃপ্তকারী জিনিসমূহ। আর তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে।

٧٢. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

৭২. পৃথিবীতে তোমরা যেসব কাজ করেছো তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছ।

٧٣. لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا اَىْ بَعْضُهَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا يُؤْكَلُ يُخْلَفُ بَدَلَهُ .

৭৩. তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে, তা থেকে তোমরা আহার করবে। যা খাওয়া হবে, ত্বরিত তার পরিবর্তে আরেকটি উৎপন্ন হবে।

٧٤. اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা, তারা তো চিরদিন জাহান্নামের আজাব ভোগ করবে।

٧٥. لَا يُفَتَّرُ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ج سَاكِتُوْنَ سُكُوْتَ يَاْسٍ .

৭৫. তাদের আজাব কখনো কম করা হবে না এবং তারা সেখানে নিরাশ অবস্থায় নীরব পড়ে থাকবে।

٧٦. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ .

৭৬. আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুমকারী।

٧٧. وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ هُوَ خَازِنُ النَّارِ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ط لِيُمِتْنَا قَالَ بَعْدَ اَلْفِ سَنَةٍ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ مُقِيْمُوْنَ فِى الْعَذَابِ دَائِمًا .

৭৭. তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালেক! জাহান্নামের প্রহরী তোমার পালনকর্তা যেন আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন আমাদেরকে মৃত্যু দেন এক হাজার বৎসর পর সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। আজাবে সর্বদা অবস্থান করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٨. قَالَ تَعَالٰى لَقَدْ جِئْنٰكُمْ اَىْ اَهْلَ مَكَّةَ بِالْحَقِّ عَلٰى لِسَانِ الرَّسُوْلِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ـ

৭৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের মক্কাবাসীদের নিকট ন্যায় ও সত্য রাসূলগণের ভাষায় পৌছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্ম অপছন্দকারী।

٧٩. اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَحْكَمُوْا اَمْرًا فِىْ كَيْدِ مُحَمَّدِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ مُحْكِمُوْنَ كَيْدَنَا فِىْ اِهْلَاكِهِمْ ـ

৭৯. তারা মক্কার কাফেররা কি কোনো পদক্ষেপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষতি সাধনের জন্যে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে? তাহলে আমিও তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি।

٨٠. اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰهُمْ مَا يُسِرُّوْنَ اِلٰى غَيْرِهِمْ وَمَا يُجْهِرُوْنَ بِهٖ بَيْنَهُمْ بَلٰى نَسْمَعُ ذٰلِكَ وَرُسُلُنَا الْحَفَظَةُ لَدَيْهِمْ عِنْدَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ذٰلِكَ ـ

৮০. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ অর্থাৎ যেসব কথা তারা গোপনে বলে ও যেসব কথা তারা পরস্পর প্রকাশ্যে বলে শুনি না? হ্যাঁ আমি এগুলো শুনি এবং ফেরেশতাগণ তাদের কাছে থেকেই তা লিপিবদ্ধ করেন।

٨١. قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ق فَرْضًا فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ لِلْوَلَدِ لٰكِنْ ثَبَتَ اَنْ لَا وَلَدَ لَهٗ تَعَالٰى فَانْتَفَتْ عِبَادَتُهٗ ـ

৮১. বলুন, মেনে নিলাম যদি দয়াময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত, তবে আমি সর্বপ্রথম তাঁর সন্তানের ইবাদতকারী। কিন্তু প্রমাণ হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো সন্তান নেই। অতএব তার ইবাদতও করা হয় না।

٨٢. سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكُرْسِىِّ عَمَّا يَصِفُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ الْكِذْبِ بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ اِلَيْهِ ـ

৮২. তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। তারা সন্তানের নিসবত দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা বলে।

٨٣. فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا فِىْ بَاطِلِهِمْ وَيَلْعَبُوْا فِىْ دُنْيَاهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ فِيْهِ الْعَذَابَ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ـ

৮৩. অতএব আপনি তাদেরকে বাতিল ধ্যান-ধারণা ও ক্রীড়া-কৌতুকে তাদের দুনিয়াতে ডুবে থাকতে দিন অতএব তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করানো হবে তাদের ঐদিন যার আজাব সম্পর্কে ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। এবং এটা কিয়ামতের দিন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٤. وَهُوَ الَّذِي هُوَ فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِسْقَاطِ الْأُوْلٰى وَتَسْهِيلِهَا كَالْيَاءِ أَيْ مَعْبُودٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ط وَكُلٌّ مِنَ الظَّرْفَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ فِي تَدْبِيرِ خَلْقِهِ الْعَلِيمُ بِمَصَالِحِهِمْ .

৮৪. তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে। اَلسَّمَاءِ إِلٰهٌ -এর মধ্যে দুই হামযা বহাল রেখে এবং প্রথম হামযা বিলুপ্ত করে দ্বিতীয় হামযা তাসহীল ى -এর ন্যায় অর্থাৎ উপাস্য এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। উভয় ظَرْف -এর প্রত্যেকটি পরবর্তী إِلٰهٌ -এর সাথে সম্পর্কিত এবং তিনি প্রজ্ঞাময় তাঁর সৃষ্টির পরিকল্পনায়। সর্বজ্ঞ তাদের কল্যাণ সম্পর্কে।

٨٥. وَتَبٰرَكَ تَعَظَّمَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج مَتٰى تَقُومُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ .

৮৫. অনেক উচ্চ ও সম্মানিত সেই মহান সত্তা, যাঁর মুঠিতে জমিন ও আসমানসমূহ এবং জমিন আসমানে যা কিছু আছে তার প্রতিটি জিনিসের বাদশাহী এবং তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান কখন তা সংঘটিত হবে? এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। تُرْجَعُونَ ফে'লটি ى ও ت উভয়রূপে সাথে পড়া বৈধ।

٨٦. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَعْبُدُونَ أَيِ الْكُفَّارُ مِنْ دُونِهِ أَيِ اللّٰهِ الشَّفَاعَةَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ أَيْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ مَا شَهِدُوا بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَهُمْ عِيسٰى وَعُزَيْرٌ وَالْمَلٰئِكَةُ فَإِنَّهُمْ يَشْفَعُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ .

৮৬. তিনি আল্লাহ ব্যতীত তারা মক্কার কাফেররা যাদের পূজা করে তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং যা তারা মুখে স্বীকার করে অন্তরে বিশ্বাস করে এবং এরা ঈসা, উযাইর এবং ফেরেশতাগণ। অতএব তারা মুমিনদের সুপারিশ করবে।

٨٧. وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ حُذِفَ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ وَوَاوُ الضَّمِيرِ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ يُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৮৭. যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্য বলবে আল্লাহ। لَئِنْ -এর ل শপথের জন্যে, لَيَقُولُنَّ -এর نُون إِعْرَابِي ও واو যমীর বিলোপ করা হয়েছে। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? আল্লাহর ইবাদত থেকে কোথায় ফিরে যাচ্ছে?

٨٨. وَقِيلِهِ أَيْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ أَيْ وَقَالَ يٰرَبِّ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ م

৮৮. এবং তাঁর হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তির কসম, হে আমার পালনকর্তা নিশ্চয় এই সম্প্রদায় বিশ্বাস স্থাপন করে না। قِيلِهِ উহ্য ফে'লের মাসদার তথা مَفْعُول مُطْلَق হিসেবে مَنْصُوب হবে অর্থাৎ قَالَ قِيلَهُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٩. قَالَ تَعَالَى فَاصْفَحْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ط مِنْكُمْ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يُؤْمَرَ بِقِتَالِهِمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ تَهْدِيْدٌ لَهُمْ .

৮৯. অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন তোমাদের প্রতি সালাম। এবং এটা জিহাদের নির্দেশের পূর্বের হুকুম তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। তাদের প্রতি ধমকমূলক এ রকম বলা হয়েছে تَعْلَمُوْنَ টি ت ও ى উভয়ভাবে পড়া বৈধ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَا عِبَادِ : মূলে ছিল يَا عِبَادِىْ অর্থ– হে আমার বান্দাগণ! عِبَادِ টা উহ্য يَاءِ مُتَكَلِّمْ -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর এটা উহ্য مُصْحَفْ اِمَامْ -এর رِعَايَتْ -এর কারণে। এই ইযাফত تَشْرِيْف -এর জন্য হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলার কাউকেও নিজের বলে দেওয়া অনেক বড় ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপার। আর এতে বান্দার চিত্তাকর্ষণও হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يَا عِبَادِىْ : এর يَاء -এর মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে। يَاء উহ্য করে, يَاء -কে সাকিন করে। يَاء -কে যবর দিয়ে। এ আয়াতে نِدَا চারটি বিষয়ের উপর সংবলিত। যথা– ১. نَفِى خَوْف ২. نَفِى حُزْن ৩. জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার বিধান. ৪ খুশির সুসংবাদ تُحْبَرُوْنَ -এর মধ্যে।

قَوْلُهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ : رَفْع এবং জমহুরের তিন কেরাত। خَوْف হলো মুবতাদা। خَوْف নাকেরাটা نَفِىْ -এর অধীনে হওয়ার কারণে মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। আর عَلَيْكُمْ হলো মুবতাদার খবর হলো يَوْمَ ظَرْف যা উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ تُحْبَرُوْنَ : অর্থাৎ تُسَرُّوْنَ ; تُحْبَرُوْنَ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর حَبْرٌ হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل -এর جَمْع مُذَكَّرْحَاضِرْ -এর সীগাহ। অর্থ তোমাদের সম্মান করা হবে। তোমাদের খুশি করা হবে। এমন খুশি যার প্রভাব চেহারায় ফুটে উঠবে। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, تُحْبَرُوْنَ অর্থ হলো– تُكْرَمُوْنَ اِكْرَامًا مَا يُبَالِغُ فِيْهِ

قَوْلُهُ بِصِحَافٍ : এটা صَحْفَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– থালা, বাসন, গামলা, এত বড় বাসন, যাতে একসাথে পাঁচ ব্যক্তি আহার করতে পারে। কিসায়ী (র.) বলেন যে, সবচেয়ে বড় বাসন হলো جَفْنَةٌ এরপর اَلْقَصْعَةُ যাতে দশজন মানুষ পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পারে। এরপর اَلْمَكِيْلَةُ যাতে দুজন বা তিনজন পরিতৃপ্তি সহকারে খেতে পারে।

[لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِىِّ]–

قَوْلُهُ اَكْوَابٌ : এটা كُوْبٌ -এর বহুবচন। এমন লোটাকে বলে যাতে হাতল এবং নলা থাকে না।

قَوْلُهُ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا : এখানে تِلْكَ হলো মুবতাদা اَلْجَنَّةُ মাওসূফ اَلَّتِىْ হলো مَوْصُوْل আর اُوْرِثْتُمُوْهَا সেলাহ, মওসূল ও সেলাহ মিলে জুমলা হয়ে اَلْجَنَّةُ -এর সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর হয়েছে মুবতাদার।

প্রশ্ন. اُوْرِثْتُمُوْهَا -এর সামঞ্জস্যের চাহিদা ছিল تِلْكُمُوا الْجَنَّةُ বলা। অর্থাৎ تِلْكَ -কে বহুবচন নেওয়া।

উত্তর. تِلْكَ -কে جَمْع নেওয়ার পরিবর্তে مُفْرَدْ নেওয়ার মধ্যে হিকমত হচ্ছে। تِلْكُمُوْ বহুবচন নেওয়ার ক্ষেত্রে জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন সম্মিলিতভাবে হতো। আর مُفْرَدْ নেওয়ার সুরতে প্রত্যেক জান্নাতিকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যা খুবই ইজ্জত ও সম্মানের ব্যাপার।

قَوْلُهُ لَا يُفَتَّرُ : এটা বাবে تَفْعِيْل -এর تَفْتِيْرٌ মাসদার হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْل مَنْفِىْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– কম করা হবে না, হালকা করা হবে না।

قَوْلُهُ نَادَوْا يَا مٰلِكُ : এটা مُحَقَّقُ الْوُقُوْعِ হওয়ার কারণে مَاضِىْ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ : এটা আল্লাহ তা'আলার كَلَامٌ -ও হতে পারে। এতে মক্কার মুশরিকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং মুশরিকদের জাহান্নামে অবস্থানের ইল্লত। আল্লামা মহল্লী (র.)-এর নিকট এটাই অগ্রগণ্য। আবার এটা জাহান্নামের দারোগা মালেক ফেরেশতার উক্তি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ সুরতে সম্বোধন ব্যাপকভাবে জাহান্নামবাসীদেরকে হবে। আর عِلَّتٌ -এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

قَوْلُهُ اَبْرَمُوْا : এটা মাসদার اِبْرَامٌ হতে مَاضِىْ -এর جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ -এর সীগাহ। অর্থ– তারা সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করল।

قَوْلُهُ الْعَرْشِ الْكُرْسِىِّ : মুফাসসির (র.)-এর عَرْش -এর তাফসীর كُرْسِىِّ দ্বারা না করাই উচিত ছিল। কেননা এটা জ্ঞাত ও নির্দিষ্ট বা সর্বজনবিদিত যে, আরশ এবং কুরসি উভয়টি পৃথক পৃথক বস্তু।

قَوْلُهُ يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ : এর তাফসীর يَوْمَ الْقِيَامَةِ -এর পরিবর্তে يَوْمَ الْمَوْتِ দ্বারা করা হলে অধিক ভালো হতো। কেননা মুশরিকদের خَوْضٌ فِى الْبَاطِلِ এবং لَعِبٌ فِى الدُّنْيَا -এর চূড়ান্ত ফয়সালা মৃত্যুর উপর হয়ে যায় কিয়ামতের দিনে নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الظَّرْفَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ : ظَرْفَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فِى السَّمَاءِ এবং فِى الْاَرْضِ এবং مَا بَعْدَ দ্বারা উদ্দেশ্য উভয় স্থানে اِلٰهٌ যা مَأْلُوْهٌ তথা মাবুদ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ : অর্থাৎ يَدْعُوْنَهُمْ -هُمْ হলো উহ্য মাফউল।

قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ الخ : এখানে اَلَّذِيْنَ টা يَمْلِكُ -এর ফায়েল, যদি اَلَّذِيْنَ দ্বারা মুতলাকভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ উদ্দেশ্য হয় তবে সেই সুরতে اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ টা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে। যেমনটি মুফাসসির (র.)-এর ইবারতের চাহিদা। অথবা اَلَّذِيْنَ দ্বারা বিশেষভাবে اَصْنَامٌ উদ্দেশ্য। তখন সেই সুরতে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হবে।

قَوْلُهُ اَىِ الْكُفَّارُ : এখানে اَلْكُفَّارُ টা يَدْعُوْنَ -এর وَاوٌ -এর তাফসীর হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَحَدٍ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে اَلشَّفَاعَةَ -এর মাফউল উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : এখানে যমীরটা অর্থের হিসেবে مَنْ -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ : এখানে لَامٌ قَسَمٌ হয়েছে لَيَقُوْلُنَّ টা جَوَابٌ قَسَمٌ হয়েছে এবং নিয়ম অনুপাতে جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। কেননা قَسَمٌ এবং شَرْط যখন একত্র হয়ে যায় তখন প্রথমটির جَوَابٌ উল্লিখিত হয় এবং দ্বিতীয়টির جَوَابٌ উহ্য থাকে।

قَوْلُهُ وَقِيْلِهِ اَىْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ﷺ : এটা মুযাফ এবং مُضَافٌ اِلَيْهِ উভয়ের তাফসীর অর্থাৎ قِيْلَ টা قَوْل অর্থে হয়েছে। আর مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর যমীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ।

قَوْلُهُ نَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ : এখানে قِيْلَ টা قَالَ -এর মাসদারের মধ্য হতে একটি মাসদার। অর্থাৎ قِيْلِهِ টা قَالَ উহ্য ফে'লের মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ يَا رَبِّ : মুফাসসির (র.)-এর قَالَ يَارَبِّ -এর স্থলে قَالَ قِيْلَهُ يَا رَبِّ বলাটা অধিক স্পষ্ট ছিল।

–[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ سَلَامٌ : এটা سَلَامٌ مُتَارِكَتٌ [বিচ্ছেদের সালাম] যেমনটি বক্তা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অন্যথায় عَلَيْكُمْ হতো। সালামে তাহিয়্যাহ নয়। আর سَلَامٌ হলো মুবতাদা মাহযূফের খবর। উহ্য ইবারত হলো– اَمْرِىْ سَلَامٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ : আলোচ্য আয়াতে اَزْوَاجٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা স্ত্রীকে বুঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে আবার সহপাঠি ও বন্ধুদের বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এজন্য যে, তার মধ্যে যেন এই উভয় অর্থ শামিল হয়। ঈমানদারদের ঈমানদার স্ত্রীরা এবং তাদের মুমিন বন্ধুরাও জান্নাতে তাদের সাথে থাকবে।

قَوْلُهُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ : [যদি দয়াময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদত করতাম।] এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোনো পর্যায়ে সম্ভব; বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোনো শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলিল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাবাদীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েজ ও সমীচীন যে, তোমার দাবি সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

قَوْلُهُ وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ : এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গজব নাজিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান রয়েছে তা ব্যক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' ও 'শফীউল মুযনিবীন' রূপে প্রেরিত রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রাসূল ﷺ -এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলি কষ্ট পেয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তাফসীর অনুযায়ী وَقِيْلِهٖ -এর এক আয়াত পূর্বে اَلسَّاعَةَ শব্দের উপর مَعْطُوْف হয়েছে। এ আয়াতের আরো কয়েকটি তাফসীর করা হয়েছে। উদাহরণত وَاوْ অক্ষরটি কসমের অর্থ বুঝায় এবং اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ কসমের জবাব। এসব তাফসীর রূহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

قَوْلُهُ وَقُلْ سَلَامٌ : পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলিল ও আপত্তির জবাব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জবাব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। "সালাম বলুন" -এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোনো অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়; বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, "আমার পক্ষ থেকে সালাম" অথবা "তোমাকে সালাম করি।" এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা অথবা سَلَامٌ বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ : সূরা দুখান মক্কায় অবতীর্ণ

وَقِيْلَ إِلَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ الْآيَةَ وَهِيَ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ أَوْ تِسْعٌ وَخَمْسُوْنَ آيَةً

তবে অনেকে বলেছেন إِلَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا আয়াতটি ব্যতীত

এতে মোট ৫৬, ৫৭ বা ৫৯ আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ ـ

১. হা-মীম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٢. وَالْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ الْمُبِيْنِ لا الْمُظْهِرِ لِلْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ ـ

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। কুরআনের হালালকে হারাম থেকে স্পষ্টকারী।

٣. إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَزَلَ فِيْهَا مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ مُخَوِّفِيْنَ بِهٖ ـ

৩. নিশ্চয় আমি একে নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে, এটা লাইলাতুল ক্বদর বা শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত। এতে উম্মুল কিতাব সপ্ত আসমানে অবস্থিত লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হয়। নিশ্চয় আমি সর্তকারী। অর্থাৎ এটা দ্বারা ভয় প্রদর্শনকারী।

٤. فِيْهَا أَيْ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ يُفْرَقُ يُفْصَلُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ لا مُحْكَمٍ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ وَغَيْرِهِمَا الَّتِيْ تَكُوْنُ فِي السَّنَةِ إِلٰى مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ـ

৪. এ রাতে অর্থাৎ লাইলাতুল ক্বদরে বা শাবানের ১৫ তারিখের রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় যথা রিজিক, মৃত্যু ইত্যাদি যা চলতি বৎসর থেকে আগামী বৎসরের সেই রাত পর্যন্ত হবে ফয়সালা স্থিরীকৃত হয়।

٥. أَمْرًا فَرْقًا مِّنْ عِنْدِنَا ط إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ الرُّسُلَ مُحَمَّدًا أَوْ مَنْ قَبْلَهٗ ـ

৫. তা স্থিরীকৃত হয় আমারই আদেশক্রমে। আমিই প্রেরণকারী, রাসূলদেরকে, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পূর্ববর্তীদেরকে।

٦. رَحْمَةً رَأْفَةً بِالْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّكَ ط إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ لِأَقْوَالِهِمْ الْعَلِيْمُ بِأَفْعَالِهِمْ ـ

৬. রহমত স্বরূপ যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে তাদের উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, তাদের কথাবার্তা– সর্বজ্ঞ তাদের কর্মসমূহ সমূহ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۢ بِرَفْعِ رَبُّ خَبَرٌ ثَالِثٌ وَبِجَرِّهِ بَدَلٌ مِنْ رَّبِّكَ اِنْ كُنْتُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مُوْقِنِيْنَ بِاَنَّهُ تَعَالٰى رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَيْقِنُوْا بِاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُهُ .

৭. তিনি আসমানসমূহ, জমিন ও এদের উভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তার সবকিছুর পালনকর্তা। رَبِّ শব্দটি رَفْع-এর সাথে هُوَ-এর তৃতীয় খবর অথবা جَر টি رَبِّ-এর অবস্থায় مِنْ رَّبِّكَ থেকে بَدَل হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা ঈমানদার হও এ কথার উপর যে, তিনিই আসমান ও জমিনের পালনকর্তা, তাহলে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর নিশ্চয় মুহাম্মদ তাঁর রাসূল।

٨. لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ .

৮. তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের পালনকর্তা।

٩. بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِنَ الْبَعْثِ يَلْعَبُوْنَ اِسْتِهْزَاءً بِكَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ .

৯. এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে পুনরুত্থানের ব্যাপারে ক্রীড়া-হাসি তামাশা করে চলেছে। হে মুহাম্মদ ﷺ আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। অতএব তিনি তাদের প্রতি বদদোয়া করে বলেন– اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ الخ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দুর্ভিক্ষের ন্যায় তাদের উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দিয়ে।

١٠. قَالَ تَعَالٰى فَارْتَقِبْ لَهُمْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ فَاَجْدَبَتِ الْاَرْضُ وَاشْتَدَّ بِهِمُ الْجُوْعُ اِلٰى اَنْ رَاَوْا مِنْ شِدَّتِهِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ .

১০. আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতএব আপনি তাদের ব্যাপারে সেদিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে। অতএব, দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে এবং মক্কাবাসী অধিক ক্ষুধার্ত হবে। তারা অধিক ক্ষুধার কারণে আসমান ও জমিনের মধ্যখানে ধোয়ার ন্যায় দেখতে থাকবে।

١١. يَّغْشَى النَّاسَ ط فَقَالُوْا هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

১১. তা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর তারা বলবে এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

١٢. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ مُصَدِّقُوْنَ بِنَبِيِّكَ .

১২. হে আমাদের মালিক! আমাদের কাছ থেকে এই আজাব সরিয়ে নাও, নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী। আপনার নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী।

١٣. قَالَ تَعَالٰى اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى اَيْ لَا يَنْفَعُهُمُ الْاِيْمَانُ عِنْدَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ لا بَيِّنُ الرِّسَالَةِ .

১৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তাদের উপদেশ গ্রহণ করারই সুযোগ কোথায়? অর্থাৎ আজাব আসার সময় ঈমান আনয়ন কোনো উপকারে আসে না। অথচ তাদের নিকট স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল স্পষ্ট রিসালতের অধিকারী রাসূল এসেছিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٤. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ اَىْ يُعَلِّمُهُ الْقُرْاٰنَ بَشَرٌ مَّجْنُوْنٌ ۔

১৪. অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো শিখানো কথা বলে, অর্থাৎ কোনো মানুষ তাকে কুরআন শিখায় উন্মাদ।

١٥. اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ اَىِ الْجُوْعِ عَنْكُمْ زَمَنًا قَلِيْلًا فَكُشِفَ عَنْهُمْ اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ ۚ اِلٰى كُفْرِكُمْ فَعَادُوْا اِلَيْهِ ۔

১৫. আমি এই আজাব কিছুটা সরিয়ে দেই অর্থাৎ তোমাদের থেকে ক্ষুধার আজাব কিছু দিনের জন্যে দূর করে দেই অতএব, তাদের থেকে ক্ষুধার কষ্ট সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ তাদের পূর্বের কুফরির দিকে ফিরে যাবে অতঃপর তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরেছে।

١٦. اُذْكُرْ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ج هُوَ يَوْمُ بَدْرٍ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ مِنْهُمْ وَالْبَطْشُ الْاَخْذُ بِقُوَّةٍ ۔

১৬. আপনি উল্লেখ করুন সেদিনের কথা যেদিন আমি কঠোরভাবে এদের পাকড়াও করব, এটা বদরের দিন নিশ্চয় আমি এদের কাছ থেকে সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণকারী اَلْبَطْشُ বলা হয় কঠোরভাবে পাকড়াও করাকে।

١٧. وَلَقَدْ فَتَنَّا بَلَوْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ مَعَهُ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ هُوَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرِيْمٌ لا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ۔

১৭. এবং তাদের পূর্বে আমি ফেরাউনের সম্প্রদায়কে ফেরাউনসহ পরীক্ষা করেছি এবং তাদের কাছেও আল্লাহর একজন সম্মানিত রাসূল হযরত মূসা (আ.) আগমন করেছিলেন।

١٨. اَنْ اَىْ بِاَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ مَا اَدْعُوْكُمْ اِلَيْهِ مِنَ الْاِيْمَانِ اَىْ اَظْهِرُوْا اِيْمَانَكُمْ بِالطَّاعَةِ لِىْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ ط اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ عَلٰى مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ ۔

১৮. এ মর্মে যে, হে আল্লাহর বান্দাগণ! যে ঈমানের দিকে আমি আহ্বান করছি তা কবুল কর। অর্থাৎ আমার আনুগত্যে ঈমানকে প্রকাশ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রাসূল। যা দ্বারা আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে তদ্বিষয়ে।

١٩. وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا تَتَجَبَّرُوْا عَلَى اللّٰهِ ط بِتَرْكِ طَاعَتِهٖ اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ بُرْهَانٍ مُّبِيْنٍ ج بَيِّنٍ عَلٰى رِسَالَتِىْ فَتَوَعَّدُوْهُ بِالرَّجْمِ ۔

১৯. আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করো না তাঁর আনুগত্য ছেড়ে নাফরমানি করে আমি তোমাদের কাছে নিজের রিসালতের উপর প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি। কিন্তু তারা তাকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করার ধমকি দিয়েছে।

٢٠. فَقَالَ وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ بِالْحِجَارَةِ ۔

২০. অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা যাতে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে না পার সে জন্যে আমি আমার মালিক ও তোমাদের মালিকের কাছে পানাহ চেয়ে নিয়েছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢١. وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ تُصَدِّقُوْنِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ فَاتْرُكُوْا اِذًاي فَلَمْ يَتْرُكُوْهُ

২১. এবং যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন না কর, তাহলে আমার কাছ থেকে তোমরা দূরে থাক। অর্থাৎ আমাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক; কিন্তু তারা তা থেকে ফিরে আসেনি।

٢٢. فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنْ اَيْ بِاَنْ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ مُشْرِكُوْنَ.

২২. অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন যে, এরা অপরাধী সম্প্রদায় শিরককারী।

٢٣. فَقَالَ تَعَالٰى فَاَسْرِ بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَوَصْلِهَا بِعِبَادِيْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ لا يَتْبَعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ.

২৩. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি আমার বান্দা বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে রাতেই বের হয়ে পড়, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। ফেরাউন ও তার গোত্র তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। اَسْرِ সীগাহটিতে هَمْزَه وَصْلِيْ বা هَمْزَه قَطْعِيْ উভয় ধরনের পড়া যাবে।

٢٤. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ اِذَا قَطَعْتَهٗ اَنْتَ وَاَصْحَابُكَ رَهْوًا ط سَاكِنًا مُتَفَرِّجًا حَتّٰى يَدْخُلَهُ الْقِبْطُ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ فَاطْمَاَنَّ بِذٰلِكَ فَاُغْرِقُوْا.

২৪. যখন তুমি ও তোমার সাথিগণ সাগর পার হবে তখন তুমি সাগরকে শান্ত খোলা থাকতে দাও। অতঃপর কিবতীরা এতে প্রবেশ করবে। নিঃসন্দেহে ওরা নিমজ্জিত বাহিনী। উক্ত বাণীতে তিনি শান্ত হয়েছেন, অতএব তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে।

٢٥. كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَّعُيُوْنٍ لا تَجْرِيْ.

২৫. তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনা যা প্রবাহিত।

٢٦. وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ لا مَجْلِسٍ حَسَنٍ.

২৬. ও কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ সুরম্য স্থান।

٢٧. وَّنَعْمَةٍ مُتْعَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ لا نَاعِمِيْنَ.

২৭. আরো কত নিয়ামত সামগ্রী যাতে তারা নিমগ্ন থাকত। এসব কিছুই তারা সাথে নিতে পারেনি; বরং তারা চলে যাওয়ার পর এসবই বিরান হয়ে পড়ে রইল।

٢٨. كَذٰلِكَ قف خَبَرُ مُبْتَدَاٍ اَيِ الْاَمْرُ وَاَوْرَثْنٰهَا اي اموالهم قَوْمًا اٰخَرِيْنَ اَيْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ.

২৮. এমনিই হয়েছিল كَذٰلِكَ শব্দটি উহ্য اَلْاَمْرُ মুবতাদার খবর। এবং আমি আরেক জাতিকে বনী ইসরাঈলকে এসব কিছুর তাদের সম্পদসমূহের উত্তরাধিকারী করেছিলাম।

٢٩. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَبْكِيْ عَلَيْهِمْ بِمَوْتِهِمْ مُصَلَّاهُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَمَصْعَدُ عَمَلِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ مُؤَخَّرِيْنَ لِلتَّوْبَةِ.

২৯. তাদের অবস্থায় উপর ক্রন্দন করেনি আকাশ ও পৃথিবী, কিন্তু ঈমানদারগণের মৃত্যুর পর তাদের নামাজের স্থান তাদের মৃত্যুর উপর ক্রন্দন করে এবং আকাশে তাদের নেক আমল যাওয়ার রাস্তাও ক্রন্দন করে। আর তারা অবকাশপ্রাপ্ত নয়। তাদেরকে তওবার জন্যে কোনো অবকাশ দেওয়া হয়নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ : এখানে وَاو টা قَسَمِيَّه আর اَلْكِتَاب হলো مُقْسَمٌ بِهٖ আর اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ হলো جَوَاب قَسَمْ

قَوْلُهٗ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ : এটা جَوَاب قَسَمْ -এর ইল্লত। কেউ কেউ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ -কে جَوَاب قَسَمْ বলেছেন। আর اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ -কে قَسَمْ এবং جَوَاب قَسَمْ -এর মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَة বলেছেন, তবে প্রথমটিই উত্তম।

قَوْلُهٗ فِيْهَا يُفْرَقُ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হয়েছে। আর فِيْهَا টা يُفْرَقُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ অথবা لَيْلَةٍ -এর সিফাত, আর মাঝে اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ হলো جُمْلَه مُعْتَرِضَة -

قَوْلُهٗ فَرْقًا : মুফাসসির (র.) اَمْرًا -এর তাফসীর فَرْقًا দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, اَمْرًا টা يُفْرَقُ -এর مَفْعُوْل مُطْلَق بِغَيْرِ لَفْظِهٖ হওয়ার কারণ مَنْصُوْب হয়েছে যেমন قُمْتُ وُقُوْفًا এবং قَعَدْتُ جُلُوْسًا এবং اَنْزَلْنَاهُ -এর যমীরে ফালে থেকে حَالْ হওয়াও বৈধ রয়েছে। উহ্য ইবারত হবে- اَنْزَلْنَاهُ حَالَ كَوْنِنَا اٰمِرِيْنَ অথবা اَنْزَلْنَاهُ -এর مَفْعُوْل হতেও حَالْ হতে পারে। উহ্য ইবারত হবে- اَنْزَلْنَاهُ حَالَ كَوْنِهٖ مَامُوْرًا بِهٖ এবং مَفْعُوْل لَهٗ হওয়াও বৈধ রয়েছে। এর عَامِلْ হবে اَنْزَلْنَا উহ্য ইবারত হবে- اَنْزَلْنَاهُ لِاَمْرِ الْخَلْقِ -[صَاوِىْ]

قَوْلُهٗ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ : এতে পাঁচটি সুরত রয়েছে-

১. مَفْعُوْل لَهٗ হবে এবং তার আমেল হবে হয়তো اَنْزَلْنَا অথবা اَمْرًا অথবা يُفْرَقُ অথবা مُنْذِرِيْنَ

২. رَحْمَةً টা উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَق হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ رَحِمْنَا رَحْمَةً

৩. رَحْمَةً টা اَلْمُرْسِلِيْنَ -এর মাফউল হবে।

৪. مُرْسِلِيْنَ -এর যমীর থেকে حَالْ হবে অর্থাৎ ذَوِىْ رَحْمَةٍ

৫. اَمْرًا থেকে بَدَلْ হবে।

قَوْلُهٗ فَايْقَنُوْا : ব্যাখ্যাকার (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ -এর جَوَاب شَرْط উহ্য রয়েছে। আর جُمْلَه شَرْطِيَّة টা খবরসমূহের মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَه হয়েছে। কেননা لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যটি اِنَّ -এর চতুর্থ খবর হয়েছে।

-[اِعْرَابُ الْقُرْاٰنِ]

قَوْلُهٗ دُخَانٍ : ধোঁয়া, বহুবচনে اَدْخِنَةٌ ; আয়াতে যেই ধোঁয়ার উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, এই ধোঁয়া নবুয়তকালে প্রকাশ পেয়েছে। হযরত আলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এটা কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে প্রকাশ পাবে। হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) প্রথম উক্তিটি গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهٗ اَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ : এখানে اَنْ টি مُفَسِّرْ -ও হতে পারে। কেননা مَجِيْئُ الرَّسُوْلِ টা قَول رَسُوْل -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে جَاءَ الرَّسُوْلُ অর্থ قَالَ الرَّسُوْلُ আর اَنْ টা مَصْدَرِيَه হওয়াও বৈধ। এ সুরতে اَنْ টা তার مَدْخُوْل সহ نَزْعِ خَافِض -এর কারণে মাসদারের তাবীল হয়ে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ بِاَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ আর جَارّ ও مَجْرُوْر টা جَاءَهُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে এটাও বৈধ যে, এটা اَنْ مُخَفَّفَةٌ عَنِ الثَّقِيْلَةِ হয়েছে। এর যমীরে শান উহ্য রয়েছে। আর اَدُّوْا اِلَىَّ বাক্য হয়ে তার খবর হয়েছে।

عِبَادَ اللّٰهِ মুনাদা মুযাফ, হরফে নেদা উহ্য রয়েছে। عِبَادَ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে قِبْط ; আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন যে, عِبَادَ اللّٰهِ টা اَدُّوْا اِلَىَّ -এর مَفْعُوْل بِهٖ হবে। আর তারা হলো বনী ইসরাঈল। আর اَدُّوْا اِلَىَّ অর্থের ক্ষেত্রে اَرْسِلُوْهُمْ مَعِىَ অর্থে হবে। এর تائيد বা সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, সূরা শু'আরাতে এসেছে- اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ আল্লামা মহল্লী (র.) اَدُّوْا -এর তাফসীর مَا اَدْعُوْكُمْ اِلَيْهِ مِنَ الْاِيْمَانِ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ হলো مَصْدَرِيَّة আর اَدَاءٌ অর্থ হলো قَبُوْلُ اِلَىَّ الدَّعْوَةِ কিন্তু এটা তাদের নিকট যারা اَمْر -এর উপর اَنْ مَصْدَرِيَّة হওয়া বৈধ বলে থাকেন। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهٗ عِبَادَ اللّٰهِ : ব্যাখ্যাকার مَا اَدْعُوْكُمْ বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَدُّوْا -এর মাফউল উহ্য রয়েছে عِبَادَ اللّٰهِ হলো مُنَادٰى আর حَرْف نِدَا يَا উহ্য রয়েছে। আর عِبَادَ اللّٰهِ দ্বারা قِبْط উদ্দেশ্য, অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন যে, عِبَادَ اللّٰهِ টা اَدُّوْا -এর মাফউল। উদ্দেশ্য হলো বনী ইসরাঈল অর্থাৎ اَرْسِلُوْا مَعِىَ بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ

قَوْلُهُ اُتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا : এটা رَهَا يَرْهُوْ -এর মাসদার, অর্থ– অবস্থান করা, থামা, বসতি গ্রহণ করা। কেউ কেউ রাস্তার প্রশস্ততা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। ইমাম বুখারী (র.) সূরা حٰمٓ -এর তাফসীরে বলেন رَهْوًا অর্থ শুকনো রাস্তা। উদ্দেশ্য হলো এই যে, সমুদ্রকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ো না; বরং সেই সময় পর্যন্ত এই অবস্থায়ই ছেড়ে দাও যে, ফেরাউনের সর্বশেষ সৈন্যটিও তাতে প্রবেশ করে ফেলে। আবদ ইবনে হুমাইদ অন্য পদ্ধতিতে মুজাহিদ (র.) থেকে رَهْوًا-এর অর্থ مُنْفَرِجًا বলেছেন যার অর্থ প্রশস্ত ও বিস্তৃত। আল্লামা মহল্লী (র.) رَهْوًا -এর তাফসীর سَاكِنًا مُنْفَرِجًا দ্বারা করে رَهْوًا -এর উভয় অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَيِ الْاَمْرُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে كَذٰلِكَ الْاَمْرُ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা দুখান প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় ৩ রুকূ' ৫৯ আয়াত রয়েছে। এ সূরার বাক্য সংখ্যা ৩৪৬ এবং এতে অক্ষর হলো ১, ৪৩১ টি।

এ সূরার ফজিলত : ইবনে মারদুবিয়া হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জুমা রাতে অথবা জুমার দিনে সূরা আদদুখান তেলাওয়াত করে, আল্লাহ পাক তার জন্যে জান্নাতে একটি মহল তৈরি করেন।

বায়হাকী অন্য একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে হামিম আদ দুখান এবং সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে সকালে সে এমন অবস্থায় জাগ্রত হবে যে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী এবং বায়হাকী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা হামিম আদ দুখান রাত্রিকালে তেলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে।

–[তাফসীরে রূহুল মাআনী– খ. ২৫, পৃ. ১১০ তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ২৭ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (র.)- খ. -৬, পৃ. ২৮৯]

এ সূরার আমল : ইমাম তিরমীযী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সূরা দুখান, সূরা গাফের এবং আয়াতুল কুরসী সন্ধ্যাকালে পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তার হেফাজত করা হবে। দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এতটুকু সংযোজিত হয়েছে, যে উপরিউক্ত আমল করবে, সে কোনো প্রকার মন্দ কিছু দেখাবে না। –[ইতকান]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর যারা কুরআনে কারীমের সত্যতায় বিশ্বাস করেনি, এমন অপরাধীর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে, আর একথাও ঘোষণাও করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এক বরকতময় রজনীতে।

قَوْلُهُ حٰمٓ. وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিষয়ে গুণ বর্ণিত হয়েছে। كِتَابٌ مُّبِيْنٌ [সুস্পষ্ট কিতাব] বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাত্রিতে নাজিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফিল মানুষকে সতর্ক করা।

قَوْلُهُ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে শবে কদর বুঝানো হয়েছে, যা রমজান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাজিল হয়। সূরা কদরে اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক শবে-কদরে নাজিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে কদরকেই বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাজিল করেছেন, তা সবই রমজান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাজিল হয়েছে। হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ রমজানের প্রথম তারিখে, তাওরাত ছয় তারিখে, যাবূর বারো তারিখে, ইঞ্জিল আঠারো তারিখে এবং কুরআন পাক চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

কুরআন শবে কদরে নাজিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লাওহে মাহফূয থেকে সমগ্র কুরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাজিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নাজিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কুরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে কদরে দুনিয়ার আকাশে নাজিল করা হতো।

–[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত ইকরিমা (র.) প্রমুখ কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতরণ কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থি। إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ এবং شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ -এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কুরআন শবে বরাতে নাজিল হয়েছে। তবে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে শা'বানের পনেরো তারিখকে শবে বরাত অথবা 'লায়লাতুন্নিসফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এখানে উল্লিখিত গুণও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ -এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ কুরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিজিক দেওয়া হবে। মাহদভী (র.) বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাত্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলি তাদের কাছে অর্পণ করা হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিজিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কুরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআন অবতরণ যে রমজান মাসে হয়েছে, তা কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত কোনো কোনো রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর (র.) অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরাবী (র.) শবে বরাতের ফজিলত স্বীকার করেন না। তবে কোনো কোনো মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফজিলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهُ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ধোঁয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। **প্রথম উক্তি** এই যে, এটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত যা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে। এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রা (রা.) ও হাসান বসরী (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। **দ্বিতীয় উক্তি** এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদদোয়ার ফলে মক্কাবাসীদের উপর আপতিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃতজন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধুম্র দৃষ্টিগোচর হতো। এ উক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের। **তৃতীয় উক্তি** এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধূলিকণাকে ধুম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আব্দুর রহমান আ'রাজ প্রমুখের। –[কুরতুবী]

প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ–

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা ইবনে উসাইদ বলেন, একবার রাসূল ﷺ উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না। যথা– ১. পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ২. দুখান তথা ধুম্র ৩.

Free @www.eilm.weebly.com

দাব্বা ৪. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ৫. হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ৬. দাজ্জালের আবির্ভাব ৭. পূর্বে ভূমিধস ৮. পশ্চিমে ভূমিধস ৯. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস ১০. আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রি যাপন করতে আসবে অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নি থেমে যাবে। –[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

আবূ মালেক আশ'আরী বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি– ১. ধূম্র. যা মুমিনকে কেবল একপ্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্র পথে বের হতে থাকবে। ২. দাব্বা [ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানেয়ার] এবং ৩. দাজ্জাল। ইবনে কাসীর (র.) এমনি ধরনের আরো কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন–

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْرِ الْاُمَّةِ وَتَرْجَمَانِ الْقُرْاٰنِ وَهٰكَذَا قَوْلُ مَنْ وَافَقَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مَعَ الْاَحَادِيْثِ الْمَرْفُوْعَةِ مِنَ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَغَيْرِهِمَا الَّتِىْ اَوْرَدُوْهَا مِمَّا فِيْهِ مُقْنِعٌ وَدَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلٰى اَنَّ الدُّخَانَ مِنَ الْاٰيَاتِ الْمُنْتَظَرَةِ مَعَ اَنَّهُ ظَاهِرُ الْقُرْاٰنِ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاۤءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ وَعَلٰى مَا فَسَّرَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّمَا هُوَ خَيَالٌ رَاَوْهُ فِىْ اَعْيُنِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْجُوْعِ وَالْجُهْدِ وَهٰكَذَا قَوْلُهُ تَعَالٰى يَغْشَى النَّاسَ اَىْ يَتَغَشَّاهُمْ وَيَعُمُّهُمْ وَلَوْ كَانَ اَمْرًا خَيَالِيًّا يَخُصُّ اَهْلَ مَكَّةَ لِمُشْرِكِيْنَ لِمَا قِيْلَ فِيْهِ يَغْشَى النَّاسَ .

কুরআনের শ্রেষ্ঠ তাফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই. তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, 'দুখান' বা ধূম্র কিয়ামতের ভবিষৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীরে উল্লিখিত ধূম্র একটি কাল্পনিক ধূম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্য 'মানুষকে ঘিরে নেবে' কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা এই কাল্পনিক ধূম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يَغْشَى النَّاسَ থেকে বোঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।

হযরত আব্দুল্লাহ হযরত মাসউদ (রা.)-এর উক্তির রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী প্রভৃতি কিতাবে হযরত মসরূকের বাচনিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদের প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েজ ওয়াজ করেছেন। তিনি يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاۤءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতঃপর নিজেই বললেন, এক ধূম্র, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনেদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মসরূক বলেন, ওয়ায়েজের এ কথা শুনে আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন, ব্যস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী ﷺ -কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আমার সেবাকর্মের কোনো বিনিময় চাই না এবং আমি কোনো কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলেম হবে, সে যা জানে না, তা পরিষ্কার বলে দেবে, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলাই জানেন। নিজে কোনো কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শোনাই। কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরিকেই আঁকড়ে রইল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! এদের উপর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে পতিত হলো। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হতো না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মতো দেখত। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاۤءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন! নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলে বৃষ্টি হলো। তখন اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ আয়াত নাজিল হলো। অর্থাৎ আমি কিছুদিনের জন্য তোমাদের থেকে আজাব প্রত্যাহার করে

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নিচ্ছি, কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে যাবে। বাস্তবে তা-ই হলো, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ আয়াতটি নাজিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদর যুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরো বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম। -[ইবনে কাসীর]

দুখান অর্থ- মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ- সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে- وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ : চাঁদ অর্থ- চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া যা اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ- বদর যুদ্ধে কুরাইশ-কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থ- فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়। যথা- ১. আকাশে ধূম্র দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে। ২. মুশরিকরা আজাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। ৩. তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বেঈমানী করবে। ৪. তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ ত'আলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্য কিছুদিনের জন্য আজাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং ৫. আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারটি মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়ার এবং তা দূর হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তাফসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কুরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তাফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না; বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে কাসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ইবনে মাসউদের তাফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে কাসীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীরে বাহ্যত খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ অথচ কিয়ামতে কাফেরদের থেকে কোনো সময় আজাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছুদিনের জন্য আজাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আজাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরিই করতে থাকবে। কুরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অন্য এক আয়াতে আছে- وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ

২. দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كَشْف عَذَابْ -এর মানে যদিও আজাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আজাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে; কিন্তু কিছুদিন আমি তা পিছিয়ে দেব। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে إِنَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ বলা হয়েছে। অথচ তাদের আজাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আজাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল একেই كَشْف عَذَابْ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কিয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোনো খটকা দেখা দেয় না এবং এ তাফসীর অনুযায়ী نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى -এর অর্থ হবে কিয়ামত দিবসের পাকড়াও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীরে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে, এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরি হয় না যে, কিয়ামতের দিন আরো প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কুরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এরপর তাদের উপর যে কোনো আজাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

هُمَا دُخَانَانِ مَضٰى وَاحِدٌ وَالَّذِيْ بَقِيَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا بِالزُّكْمَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَشُقُّ مَسَامِعَهُ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِنْدَ ذٰلِكَ الرِّيْحَ الْجُنُوْبَ مِنَ الْيَمَنِ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ

অর্থাৎ ধূম্র দুটি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে [অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়]। আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়েমেনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়েতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কুরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তাফসীরের কোনো বৈপরীত্য থাকে না।

قَوْلُهُ وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ : [তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।] رجم শব্দের অর্থ- প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ- কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা ফেরাউনের সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

قَوْلُهُ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا : [সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।] হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না। যাতে ফেরাউন শুষ্ক ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ : [আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।] সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিশরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তাফসীরে এর জবাবও দেওয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ [অতঃপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।] উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোনো সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোনো সৎকর্ম আকাশেও পৌছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোনো সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দুটি দ্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। এক দ্বার দিয়ে তার রিজিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পৌছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

হযরত শোরায়াহ ইবনে ওবাইদ (রা.)-এর বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য কোনো ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোনো কাফেরের জন্য ক্রন্দন করে না। -[ইবনে জারীর]

হযরত আলী (রা.)-ও সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর]

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য ছিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতপ্ত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েত দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জবাব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে- اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ ; আধুনিক বিজ্ঞানও ক্রমান্বয়ে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরি নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٠. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ قَتْلِ الْاَبْنَاءِ وَاسْتِخْدَامِ النِّسَاءِ .

৩০. আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি অর্থাৎ ছেলে সন্তানকে হত্যা করা ও মেয়ে সন্তানদেরকে খাদেমা বানানো ইত্যাদি থেকে উদ্ধার করেছি।

٣١. مِنْ فِرْعَوْنَ ط قِيْلَ بَدَلٌ مِنَ الْعَذَابِ بِتَقْدِيْرِ مُضَافٍ اَيْ عَذَابِ وَقِيْلَ حَالٌ مِنَ الْعَذَابِ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِيْنَ .

৩১. যা ফেরাউনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি করা হতো مِنْ فِرْعَوْنَ টি উহ্য مُضَافٌ সহ عَذَابٌ থেকে بَدَلٌ অর্থাৎ مِنْ عَذَابِ فِرْعَوْنَ এবং অনেকে বলেন, এটা عَذَابٌ থেকে حَالٌ নিশ্চয় ফেরাউন ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

٣٢. وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ اَيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى عِلْمٍ مِّنَّا بِحَالِهِمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ اَيْ عَالِمِيْ زَمَانِهِمْ اَيِ الْعُقَلَاءِ .

৩২. আমি তাদেরকে অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদেরকে তাদের অবস্থার উপর আমার অবগত হওয়ার দরুন বিশ্বাবাসীদের উপর তাদের যুগের সকল জ্ঞানীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

٣٣. وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ فَلْقِ الْبَحْرِ وَالْمَنِّ وَالسَّلْوٰى وَغَيْرِهَا .

৩৩. এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলি দিয়েছিলাম যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। [প্রকাশ্য নিয়ামত যেমন, সাগর চিরে রাস্তা হয়ে যাওয়া ও মান্না-সালওয়া ইত্যাদি।

٣٤. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ اَيْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَيَقُوْلُوْنَ .

৩৪. এই লোকেরা মক্কার কাফেররা বলেই থাকে–

٣٥. اِنْ هِيَ مَا الْمَوْتَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا الْحَيٰوةُ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى اَيْ وَهُمْ نُطَفٌ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ بِمَبْعُوْثِيْنَ اَحْيَاءً بَعْدَ الثَّانِيَةِ .

৩৫. এটিই হচ্ছে আমাদের প্রথম মৃত্যু অর্থাৎ নুতফা থাকা অবস্থায়। এমন কোনো মৃত্যু নেই যার পরে পুনরুত্থান হবে। এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার পর।

٣٦. فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَا اَحْيَاءً اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اَنَّا نُبْعَثُ بَعْدَ مَوْتِنَا اَيْ نُحْيَا .

৩৬. যদি তোমরা সত্যবাদী হও, এ দাবিতে যে, আমরা আমাদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবো তবে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে জীবিত নিয়ে এসো!

٣٧. قَالَ تَعَالٰى اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ هُوَ نَبِيٌّ اَوْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط مِنَ الْاُمَمِ اَهْلَكْنٰهُمْ ز لِكُفْرِهِمْ وَالْمَعْنٰى لَيْسُوْا اَقْوٰى مِنْهُمْ فَاُهْلِكُوْا اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ .

৩৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন, ওরা শ্রেষ্ঠ, নাকি তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ? তুব্বা একজন নবী ছিলেন বা সৎকর্মী পুরুষ ছিলেন। আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের কুফরির কারণে। এর অর্থ হলো তারা ওদের চেয়ে শক্তিশালী নয় অতঃপর তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।। নিশ্চয় ওরা ছিল অপরাধী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٨. وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ بِخَلْقِ ذٰلِكَ حَالٌ .

৩৮. আমি আসমানসমূহ, জমিন এবং এদের উভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সবকিছু খেল-তামাশার ছলে সৃষ্টি করিনি। لٰعِبِيْنَ শব্দ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ

٣٩. مَا خَلَقْنٰهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ اَىْ مُحِقِّيْنَ فِىْ ذٰلِكَ لِيُسْتَدَلَّ بِهٖ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَّتِنَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ لَا يَعْلَمُوْنَ .

৩৯. আমি এগুলোকে যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি অর্থাৎ আমি এগুলোর সৃষ্টিতে প্রজ্ঞাবান। যাতে এগুলো আমার কুদরত ইত্যাদির উপর দলিল হয় কিন্তু তাদের মক্কার কাফেরদের অধিকাংশই বোঝে না।

٤٠. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ اللّٰهُ فِيْهِ بَيْنَ الْعِبَادِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ لا لِلْعَذَابِ الدَّائِمِ .

৪০. নিশ্চয় ফয়সালার দিন কিয়ামতের দিন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন তাদের সবারই নির্ধারিত সময় চিরস্থায়ী আজাবের জন্যে।

٤١. يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى بِقَرَابَةٍ اَوْ صَدَاقَةٍ اَىْ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الْعَذَابِ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ لا يُمْنَعُوْنَ مِنْهُ وَيَوْمَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمِ الْفَصْلِ .

৪১. সেদিন কোনো বন্ধুই কোনো বন্ধুর উপকারে আসবে না অর্থাৎ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা তাদের কোনো আজাব দূর করতে পারবে না। এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। শাস্তি থেকে বিরত রাখতে পারবে না। يَوْمَ শব্দ পূর্বের يَوْمَ الْفَصْلِ থেকে بَدَل।

٤٢. اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ط وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَاِنَّهٗ يَشْفَعُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بِاِذْنِ اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ فِىْ اِنْتِقَامِهٖ مِنَ الْكُفَّارِ الرَّحِيْمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ .

৪২. তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তারা ছাড়া এবং তারা হলেন ঈমানদারগণ। কেননা তারা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ একে অপরের জন্যে সুপারিশ করবে। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী কাফেরদের প্রতি শাস্তি দেওয়ার উপর দয়াময় ঈমানদারদের প্রতি।

তাহকীক ও তারকীব

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ; এর দ্বারা রাসূল ﷺ -এর সান্ত্বনা উদ্দেশ্য। لَقَدْ -এর মধ্যে لَامْ টি উহ্য قَسَمْ -এর جَوَابْ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ فِرْعَوْنَ : এটি حَرْفِ جَارْ -এর পুনরাবৃত্তির সাথে مِنَ الْعَذَابِ হতে بَدَلْ হয়েছে এবং صَادِرًا বা كَائِنًا বা وَاقِعًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে عَذَابِ থেকে حَالْ -ও হতে পারে। অর্থাৎ صَادِرًا مِنْ فِرْعَوْنَ

قَوْلُهُ كَانَ : كَانَ -এর اِسْم যা هُوَ উহ্য রয়েছে এবং عَالِيًا হলো তার খবর। আর مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ টা كَانَ -এর দ্বিতীয় খবর।

قَوْلُهُ اَىْ عَالِمِىْ زَمَانِهِمْ اَىِ الْعُقَلَاءِ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ মূলত একটি সংশয়ের নিরসন করা, যা اِخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

সংশয় : এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বিশ্বের সমগ্র জ্ঞানী-গুণীদের উপর বনী ইসরাঈলদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অথচ প্রকাশ্য নস كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নিরসন : বনী ইসরাঈলদের তৎকালীন যুগের জ্ঞানীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল জ্ঞানী-গুণীদের উপর নয়। মুফাসসির (র.) عَلَى الْعٰلَمِيْنَ-এর তাফসীর اَلْعُقَلَاءُ দ্বারা করার পরিবর্তে اَلثَّقَلَيْنِ দ্বারা করলে বেশি ভালো হতো। কেননা عُقَلَاءُ-এর মধ্যে দানব ও ফেরেশতা সকলেই অন্তর্ভুক্ত। অথচ বনী ইসরাঈলগণ ফেরেশতা থেকে উত্তম নয়।

قَوْلُهُ مِنَ الْاٰيَاتِ : এটা اَلْمُبِيْنُ-এর বয়ান مُقَدَّمٌ হয়েছে فَوَاصِلُ-এর رِعَايَتْ-এর কারণে مُقَدَّمٌ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ : এটা بَلَاءٌ-এর তাফসীর; بَلَاءٌ-এর মূল অর্থ হলো পরীক্ষা ও যাচাই বাছাইকরণ। আর যেহেতু নিয়ামত রহমত, স্বাচ্ছন্দ্য, কঠোরতো, কষ্ট, খারাপ অবস্থা, ভালো অবস্থা উভয় সুরতেই হয়ে থাকে এ কারণেই মুফাসসির (র.) بَلَاءٌ-এর অনুবাদ نِعْمَتٌ দ্বারা করেছেন। -[صَاوِىْ]

قَوْلُهُ الْمَنَّ : এটা اِسْم; অর্থ- একজাতীয় শিশিরের খামির। তীহ উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত বনী ইসরাঈলীদের খাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যহ গাছের পাতায় তা জমিয়ে দিতেন।

قَوْلُهُ سَلْوٰى : এটা একটি ছোট পাখি, যাকে بٹیر বলা হয়। কামূস গ্রন্থে এর একবচন سَلْوَاةٌ লিখা হয়েছে। صِحَاحٌ-এ আখফাশ হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এর একবচন শোনা যায়নি। এরূপ জানা যায় যে, এর একবচন ও বহুবচন একই রূপের হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ هٰؤُلَاءِ : এটা নিকটবর্তীর জন্য اِسْمِ اِشَارَهْ। কাফেরদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার জন্য اِسْمِ اِشَارَهْ قَرِيْب-এর ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُه قَوْم تُبَّع : এটা تُبَّع حِمْيَرِى; তার কুনিয়ত হলো আবূ কুরাইব, তার নাম সা'আদ। আনসারী বনী হীরা তার দিকেই নিসবতকৃত حِيْرَةٌ কূফার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ : এর আতফ হয়েছে قَوْمِ تُبَّعْ-এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ : [আমি বনী ইসরাঈলকে জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।] এতে উম্মতে মুহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরি হয় না। কেননা এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বুঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কুরআনে হযরত মারইয়ামকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোনো বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلٰى عِلْمٍ [জেনেশুনে] -এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

قَوْلُهُ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ : [আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলি দিয়েছি, যাতে প্রকৃষ্ট পুরস্কার ছিল।] এখানে লাঠি, দীপ্তময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মু'জিযা বুঝানো হয়েছে। بلاء শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। যথা- পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর। -[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَأْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : [তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।] এই আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট বিধায় কুরআন পাক এর কোনো জবাব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করো বোঝা যায়?

-[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা : اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ [তারা শৌর্যবীর্যে শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায়?] কুরআনে দু-জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে। এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে কোনো বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এরা কোন জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়; বরং এটা ইয়েমেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়েমেনের পশ্চিমাংশকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই تُبَّعٌ শব্দের বহুবচন تَبَابِعَة ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবেয়ায়ে-ইয়েমেন' বলা হয়। এখানে কোন সম্রাট বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাসীর (র.)-এর বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাট বুঝানো হয়েছে, যার নাম আসআদ আবূ কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব। যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদিনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদিনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদিনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদিনার দুজন ইহুদি আলেম তাকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না। কারণ এটা শেষ পয়গাম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদি আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়েমেন প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য তখন ইহুদি ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়। সূরা সাবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে : শুধু তুব্বা উল্লিখিত হয়নি। হযরত সহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- لَا تَسُبُّوْا تُبَّعًا فَاِنَّهٗ قَدْ اَسْلَمَ তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, تُبَّعٌ -কে খারাপ বলো না, সে ভালো মানুষ ছিল। রাসূল ﷺ তার ব্যাপারে বলেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে, আমি জানি না তুব্বা নবী ছিলেন কিনা? তুব্বা দারে আবী আইয়ূব রাসূল ﷺ -এর জন্য বানিয়ে ছিলেন এবং অসিয়তনামাতে লিখেছিলেন যে, শেষ নবী যখন আগমন করবেন তখন এই ঘর ও আমার বার্তা তার সম্মুখে পেশ করবে। কাজেই সেই বার্তা/ চিঠি হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) রাসূল ﷺ -এর নিকট পৌছে দেন। সেই চিঠিতে এই কবিতাও লিখিত ছিল যে,

شَهِدْتُ عَلٰى اَحْمَدَ اَنَّهٗ * رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ بَارِى النَّسَمِ
فَلَوْ مُدَّ عُمُرِىْ اِلٰى عُمُرِهٖ * كُنْتُ وَزِيْرًا لَهٗ وَابْنَ عَمٍّ

ইবনে ইসহাকের মতে চিঠির বিষয়বস্তু এরূপ ছিল-

اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكَ وَاَنَا عَلٰى دِيْنِكَ وَسُنَّتِكَ وَاٰمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَاٰمَنْتُ بِكُلِّ مَا جَاءَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَدْرَكْتُكَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَاِنْ لَمْ اُدْرِكْكَ فَاشْفَعْ لِىْ ... وَاَنَا عَلٰى مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ اَبِيْكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ خَتَمَ الْكِتَابَ وَنَقَشَ عَلَيْهِ. لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَكَتَبَ عُنْوَانَهٗ اِلٰى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نَبِىِّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تُبَّعٍ اَوَّلٍ. -(لُغَاتُ الْقُرْاٰنِ لِلدَّرْوِيْشِىْ)

قَوْلُهٗ مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ : [আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।] উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যেবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উর্দঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান না থাকলে সৃষ্টির সকল কাণ্ডকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহর মাহাত্ম্যের পরিপন্থি। চতুর্থত সৃষ্টিজগৎ চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٣. إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ هِيَ مِنْ أَخْبَثِ الشَّجَرِ الْمُرِّ بِتِهَامَةَ يُنْبِتُهَا اللّٰهُ فِي الْجَحِيْمِ .

৪৩. নিশ্চয় জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ, এটা অধিক তিক্ত নিকৃষ্ট একটি গাছ যা তিহামা অঞ্চলে জন্মে। আল্লাহ তা'আলা এটা জাহান্নামে উৎপন্ন করবেন।

٤٤. طَعَامُ الْأَثِيْمِ ۚ أَيْ أَبِيْ جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ ذَوِي الْإِثْمِ الْكَثِيْرِ .

৪৪. পাপীর অর্থাৎ আবূ জাহল ও অধিক পাপের অধিকারী তার সঙ্গীদের খাদ্য হবে।

٤٥. كَالْمُهْلِ ۚ أَيْ كَدُرْدِيِّ الزَّيْتِ الْأَسْوَدِ خَبَرٌ ثَانٍ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۙ بِالْفَوْقَانِيَّةِ خَبَرٌ ثَالِثٌ وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ حَالٌ مِنَ الْمُهْلِ .

৪৫. গলিত তামার মতো অর্থাৎ কালো আলকাতরার ন্যায় পেটের ভিতরে ফুটতে থাকবে। كَالْمُهْلِ দ্বিতীয় খবর। تَغْلِيْ শব্দটি تَاء -এর সাথে তৃতীয় খবর এবং يَغْلِيْ শব্দটি ى -এর সাথে اَلْمُهْلِ থেকে حَالْ -

٤٦. كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ الْمَاءِ الشَّدِيْدِ الْحَرَارَةِ .

৪৬. যেমন ফুটে প্রচণ্ড গরম পানি।

٤٧. خُذُوْهُ يُقَالُ لِلزَّبَانِيَةِ خُذُوا الْأَثِيْمَ فَاعْتِلُوْهُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَضَمِّهَا جُرُّوْهُ بِغِلْظَةٍ وَشِدَّةٍ إِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ۙ وَسَطِ النَّارِ .

৪৭. এবং জাহান্নামে নিযুক্ত ফেরেশতাদের বলা হবে একে ধর অর্থাৎ পাপিষ্ঠদের ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। فَاعْتِلُوْهُ -এর ت যের বা পেশযোগে অর্থাৎ তাকে শক্ত ও কঠিনভাবে টেনে নিয়ে যাও।

٤٨. ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۙ أَيْ مِنَ الْحَمِيْمِ الَّذِيْ لَا يُفَارِقُهُ الْعَذَابُ فَهُوَ أَبْلَغُ مِمَّا فِيْ آيَةِ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ .

৪৮. অতঃপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির আজাব। অর্থাৎ এমন গরম পানি যা থেকে আজাব পৃথক হয় না। এই অর্থ অধিক সুন্দর ঐ অর্থ থেকে, যা يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ الخ আয়াত থেকে নেওয়া হয়।

٤٩. وَيُقَالُ لَهُ ذُقْ ۚ أَيِ الْعَذَابَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ بِزَعْمِكَ وَقَوْلِكَ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا أَعَزُّ وَأَكْرَمُ مِنِّيْ .

৪৯. এবং বলা হবে যে, তুমি স্বাদ গ্রহণ কর অর্থাৎ আজাবের নিশ্চয় তোমার ধারণায় তুমিতো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। তোমার দাবি, কথা, মক্কার দুই পাহাড়ের মধ্যখানে আমার চেয়ে বড় সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত কেউ নেই।

٥٠. وَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هٰذَا الَّذِيْ تَرَوْنَ مِنَ الْعَذَابِ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ فِيْهِ تَشُكُّوْنَ .

৫০. এবং তাদেরকে বলা হবে যে, নিশ্চয় এই শাস্তি যা তোমরা দেখছ ঐ শাস্তি যা সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫১. إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ مَجْلِسٍ اَمِيْنٍ يُؤْمَنُ فِيْهِ الْخَوْفُ .

৫১. নিশ্চয় পরহেজগার লোকেরা নিরাপদ শান্তির জায়গায় থাকবে যাতে ভয় ইত্যাদি থেকে নিরাপদ হয়।

৫২. فِيْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَعُيُوْنٍ لا

৫২. মনোরম উদ্যান ও নির্ঝরণীসমূহে।

৫৩. يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ اَىْ مَا رَقَّ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَمَا غَلُظَ مِنْهُ مُتَقٰبِلِيْنَ لا حَالٌ اَىْ لَا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى قَفَا بَعْضٍ لِدَوَرَانِ الْاَسِرَّةِ بِهِمْ .

৫৩. তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমি বস্ত্র, সামনাসামনি হয়ে বসবে। مُتَقَابِلِيْنَ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ অর্থাৎ তাদের আসনস্থল গোলাকার হওয়ার দরুন কেউ কারো পিঠ দেখবে না।

৫৪. كَذٰلِكَ نف يُقَدَّرُ قَبْلَهُ الْاَمْرُ وَزَوَّجْنٰهُمْ مِنَ التَّزْوِيْجِ اَوْ قَرَنَّاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ بِنِسَاءٍ بِيْضٍ وَاسِعَاتِ الْاَعْيُنِ حِسَانِهَا .

৫৪. এরূপই হবে كَذٰلِكَ -এর পূর্বে اَلْاَمْرُ উহ্য রয়েছে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব।

৫৫. يَدْعُوْنَ يَطْلُبُوْنَ الْخَدَمَ فِيْهَا اَىِ الْجَنَّةِ اَنْ يَاْتُوْا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مِنْهَا اٰمِنِيْنَ لا مِنْ اِنْقِطَاعِهَا وَمُضَرَّتِهَا وَمِنْ كُلِّ مُخَوِّفٍ حَالٌ .

৫৫. তারা সেখানে জান্নাতে খাদেমদেরকে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে তা শেষ হয়ে যাওয়া, তার ক্ষতি ইত্যাদির আশঙ্কা হতে মুক্ত থেকে শান্ত মনে। اٰمِنِيْنَ টি يَدْعُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ -

৫৬. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج اَىِ الَّتِىْ فِى الدُّنْيَا بَعْدَ حَيٰوتِهِمْ فِيْهَا قَالَ بَعْضُهُمْ اِلَّا بِمَعْنٰى بَعْدَ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ .

৫৬. তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত অর্থাৎ প্রথম মৃত্যু যা দুনিয়াতে তাদের হায়াতের পর দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেছেন, اِلَّا শব্দটি بَعْدَ -এর অর্থে। এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করেন।

৫৭. فَضْلًا مَصْدَرٌ بِمَعْنٰى تَفَضُّلًا مَنْصُوْبٌ بِتَفَضَّلَ مُقَدَّرًا مِنْ رَّبِّكَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

৫৭. তোমার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহাসাফল্য। فَضْلًا মাসদার; অর্থাৎ تَفَضُّلٌ এবং উহ্য تَفَضَّلَ দ্বারা মানসূব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ سَهَّلْنَا الْقُرْاٰنَ بِلِسَانِكَ بِلُغَتِكَ لِتَفْهَمَهُ الْعَرَبُ مِنْكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يَتَّعِظُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ لٰكِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ . ٥٨

৫৮. আমি আপনার ভাষায় এটাকে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। যাতে আরববাসী আপনার কাছে এটা শুনে বুঝে। যাতে তারা স্মরণ রাখে। নসিহত কবুল করে ঈমান গ্রহণ করে। কিন্তু তারা তবুও ঈমান আনেনি।

فَارْتَقِبْ اِنْتَظِرْ اِهْلَاكَهُمْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ هَلَاكَكَ وَهٰذَا قَبْلَ نُزُوْلِ الْاَمْرِ بِجِهَادِهِمْ . ٥٩

৫৯. অতএব আপনি অপেক্ষা করুন তাদের ধ্বংসের এবং তারাও অপেক্ষা করছে। তোমার ধ্বংসের। এ হুকুম জিহাদের নির্দেশ আসার পূর্বের।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ : এখানে شَجَرَتَ শব্দটি تَاءِ مَجْرُوْرَةٌ- تَانে -এর সাথে হয়েছে। কুরআনের অন্যান্য স্থানে تَاءِ مُدَوَّرَةٌ -এর সাথে এসেছে وَقْف -এর অবস্থায় ، এবং تَا، উভয়টি পড়া হয়েছে।

قَوْلُهُ زَقُّوْمِ : এটা একটি জংলী উদ্ভিদ, চামেলির মতো তাতে ফুল আসে। এটা জাহান্নামিদের খাদ্য, উর্দুতে تهوہر এবং হিন্দিতে ناگ پهن বলা হয়। এর স্বাদ তিক্ত বিস্বাদ।

مُجَرَّبُ نُسْخَه [পরীক্ষিত ঔষধ] : زَقُّوْم এমন গাছকেও বলা হয় যার ফল খেজুরের মতো হয়। এর তৈল পাকস্থলীর ঠাণ্ডা বায়ু নিঃসরণে খুবই উপকারী। কাঁশি রোগের জন্য বিস্ময়কর ফলপ্রদ। জোড়াসমূহের ব্যথা, সায়্যাটিকা, গেঁটে বাত এবং কাটিদেশে আটক বায়ু নিঃসরণে দ্রুত ক্রিয়াশীল ও খুবই উপকারী।

সেবন বিধি : প্রতিদিন সাত দিরহাম পরিমাণ তিন দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। এই ঔষধ দ্বারা বিকলাঙ্গ এবং মাজুরগণও আল্লাহর ইচ্ছায় ভালো হয়ে যায়।

قَوْلُهُ تِهَامَةٍ : মক্কা মোয়াজ্জমা ও হিজাজের দক্ষিণ এলাকাকে নিসবতের জন্য তেহামা বলা হয়। এর বহুবচনে تِهَامِيُّوْنَ ، تِهَامُوْنَ আসে।

قَوْلُهُ كَالْمُهْلِ : অর্থ– গলিত ধাতু। دردى অর্থ– গাদ। তলানি তৈল ইত্যাদির গাদ, কালো তেল, তারকুল।

قَوْلُهُ طَعَامُ الْاَثِيْمِ : এটা اِنَّ -এর প্রথম খবর আর كَالْمُهْلِ হলো দ্বিতীয় খবর। تَغْلِىْ শব্দটি تَا، সহ তৃতীয় খবর। আর يَا، -এর সাথে হলে اَلْمُهْلِ থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ : এতে يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ -এর তুলনায় অধিক মুবালাগা হয়েছে। প্রথম আয়াতে শাস্তিকে মাথার উপর প্রবাহিত করার হুকুম হয়েছে। মনে হয় যেন পানি এতই গরম যে, তা নিজেই শাস্তি হয়ে গেছে। কাজেই এখন তা হতে حَرَارَتْ বা উষ্ণতা পৃথক হবে না। কেননা حَرَارَتْ টা এখন صِفَتْ থাকেনি; বরং নিজেই মাওসূফ হয়ে গেছে। এতে অধিক মুবালাগা রয়েছে এটা বলা থেকে যে, তার উপর গরম পানি ঢেলে দাও। এখানে পানি মাওসূফ আর গরম হলো তার সিফাত। আর সিফাতটা মাওসূফ হতে পৃথক হতে পারে।

قَوْلُهُ قَرَنَّاهُمْ : এটা সেই সন্দেহের জবাব যে, زَوَّجْنَا টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهِ হয়েছে; অথচ এখানে তার সেলাহ بِحُوْرٍ عِيْنٍ -এর بَا، জবাব হলো এই যে, زَوَّجْنَا হলো قَرَنَّا অর্থে, কাজেই তার সেলাহ بَا، নেওয়া বৈধ রয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কুরআন পাকে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

قَوْلُهُ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ : যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা সাফফাতে কিছু জরুরি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نُزُلٌ বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضِيَافَةٌ অথবা مَأْدُبَةٌ বলা হয়। কুরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে জাহান্নামে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল। কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরো লাঞ্ছিত করার জন্য ও কষ্টদানের জন্য জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে। −[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ : এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি। যথা− ১. উত্তম বাসগৃহ ২. উত্তম পোশাক ৩. আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী ৪. সুস্বাদু খাদ্য ৫. এসব নিয়ামতের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং ৬. দুঃখকষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতিদের জন্যে প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের প্রধান গুণ।

قَوْلُهُ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ : এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমিবস্ত্র।

قَوْلُهُ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ : تَزْوِيْج -এর অর্থ কাউকে অন্যের যুগল করে দেওয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতি পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথানিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না; কিন্তু সম্মানার্থে এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতি পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসাবে দেওয়া হবে। এর জন্য দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোনো মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামিদের জন্যও। কিন্তু সেটা তাদের জন্য অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্য তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতিরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনো ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরো বৃদ্ধি করে দেবে।

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা জাছিয়া মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا الْاٰيَةَ وَهِىَ سِتٌّ اَوْ سَبْعٌ وَّثَلَاثُوْنَ اٰيَةً

তবে قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا ব্যতীত এতে মোট ৩৬ বা ৩৭ আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ :

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .

১. হা-মিম এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهٗ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهٖ الْحَكِيْمِ فِىْ صُنْعِهٖ .

২. কিতাব কুরআন এর অবতরণ পরাক্রান্ত, তাঁর রাজত্বে প্রজ্ঞাময় তাঁর কর্মে আল্লাহর পক্ষ থেকে। تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ মুবতাদা مِنَ اللّٰهِ খবর।

٣. اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَىْ فِىْ خَلْقِهِمَا لَاٰيٰتٍ دَالَّةٍ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ وَوَحْدَانِيَّتِهٖ تَعَالٰى لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ط

৩. নিশ্চয় নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে অর্থাৎ এ দুয়ের সৃষ্টির মধ্যে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে। যা আল্লাহর কুদরত ও একত্ববাদের উপর প্রমাণ বহন করে।

٤. وَفِىْ خَلْقِكُمْ اَىْ خَلْقِ كُلٍّ مِّنْكُمْ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْغَةٍ اِلٰى اَنْ صَارَ اِنْسَانًا وَ خَلْقِ مَا يَبُثُّ يُفَرِّقُ فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ هِىَ مَا يَدُبُّ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ .

৪. আর তোমাদের সৃষ্টিতে অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেককে বীর্য থেকে অতঃপর জমাট রক্ত অতঃপর এক টুকরো মাংস থেকে পরিপূর্ণ একজন মানুষরূপে সৃষ্টি করাতে এবং পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীবজন্তু সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলি রয়েছে কিয়ামতের উপর বিশ্বাসীদের জন্য। دَابَّةٍ বলা হয় যা ভূমিতে বিচরণ করে। যেমন– মানুষ ইত্যাদি।

٥. وَ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَهَابِهِمَا وَمَجِيْئِهِمَا وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ رِّزْقٍ مَطَرٍ لِاَنَّهٗ سَبَبُ الرِّزْقِ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ تَقْلِيْبِهَا مَرَّةً جَنُوْبًا وَمَرَّةً شِمَالًا وَبَارِدَةً وَحَارَّةً اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ الدَّلِيْلَ فَيُؤْمِنُوْنَ .

৫. আর দিবারাত্রির পরিবর্তনে অর্থাৎ দিবারাত্রির আগমন ও গমনে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিজিক বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বৃষ্টিকে রিজিক বলা হয়েছে। কেননা এটা রিজিকের কারণ। অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে কখনো উত্তর দিকে ও কখনো দক্ষিণে, কখনো ঠাণ্ডা ও কখনো গরম নিদর্শনাবলি রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্যে যারা দলিল-প্রমাণাদি বুঝে অতঃপর ঈমান আনে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦. تِلْكَ الْاٰيٰتُ الْمَذْكُوْرَةُ اٰيٰتُ اللّٰهِ حُجَجُهُ الدَّالَّةُ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهٖ نَتْلُوْهَا نَقُصُّهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ج مُتَعَلِّقٌ بِنَتْلُوْ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ اَىْ حَدِيْثِهٖ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ وَاٰيٰتِهٖ حُجَجِهٖ يُؤْمِنُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ اَىْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالتَّاءِ.

৬. এগুলো উল্লিখিত নিদর্শনাবলি আল্লাহর আয়াত অর্থাৎ আল্লাহর ঐ দলিলসমূহ যা তাঁর একত্ববাদের উপর প্রমাণ বহন করে। যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। بِالْحَقِّ -এর সম্পর্ক نَتْلُوْ -এর সাথে। অতএব, আল্লাহর বাণী অর্থাৎ কুরআন ও তাঁর আয়াতের পর তারা মক্কার কাফেররা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? অর্থাৎ ঈমান আনবে না। এবং অন্য কেরাত মতে يُؤْمِنُوْنَ -টা تَاء -এর সাথে تُؤْمِنُوْنَ -

٧. وَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ كَذَّابٍ اَثِيْمٍ لا كَثِيْرِ الْاِثْمِ.

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর অধিক পাপকারীর জন্যে। وَيْلٌ আজাব সংক্রান্ত শব্দ।

٨. يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ عَلٰى كُفْرِهٖ مُسْتَكْبِرًا مُتَكَبِّرًا عَنِ الْاِيْمَانِ كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ.

৮. সে আল্লাহর আয়াতসমূহ কুরআন যা তার সামনে তেলাওয়াত করা হয় শুনে। অতঃপর ঈমান থেকে অহংকারবশত ফিরে কুফরির উপর অবিচল থাকে, যেন সে আয়াতসমূহ শুনেনি। অতএব তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন!

٩. وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا اَىِ الْقُرْاٰنِ شَيْئَا نِ اتَّخَذَهَا هُزُوًا ط اَىْ مَهْزُوًّا بِهَا اُولٰئِكَ اَىِ الْاَفَّاكُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ط ذُوْ اِهَانَةٍ.

৯. যখন সে আমার কুরআনের কোনো আয়াত অবগত হয়, তখন তাকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করে। এদের অর্থাৎ ঠাট্টাকারীদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। مُهِيْنٌ অর্থ- ذُوْ اِهَانَةٍ

١٠. مِنْ وَّرَائِهِمْ اَىْ اَمَامِهِمْ لِاَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا جَهَنَّمُ ج وَلَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا مِنَ الْمَالِ وَالْفِعَالِ شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاَصْنَامِ اَوْلِيَاءَ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

১০. তাদের পিছনে অর্থাৎ সামনে, কেননা তারা তো দুনিয়াতে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে সম্পদ ও আমল থেকে তা তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মূর্তিসমূহকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারা কোনো কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

١١. هٰذَا اَىِ الْقُرْاٰنُ هُدًى ج مِنَ الضَّلَالَةِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ حَظٌّ مِّنْ رِّجْزٍ اَىْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ مُّوْجِعٍ.

১১. এটা অর্থাৎ কুরআন সৎপথ প্রদর্শনকারী গোমরাহি থেকে আর যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ : এটা হলো মুবতাদা আর مِنَ اللّٰهِ টা كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে তার খবর হয়েছে। আর الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ এ উভয়টি اَللّٰهِ -এর সিফত হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন। আবার এটাও হতে পারে যে, تَنْزِيلُ الْكِتَابِ এটা هٰذَا উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে । আর مِنَ اللّٰهِ টা تَنْزِيلُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَاٰيَاتٍ : اٰيَاتٍ টা اِنَّ -এর اِسْمٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। এটা সর্বসম্মতিতে كَسْرَه -এর সাথে পঠিত। তবে আগত আয়াত اٰيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُوْنَ এবং لَاٰيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ এতে رَفْعٌ এবং نَصْبٌ উভয়টিই বৈধ রয়েছে। رَفْعٌ এজন্য যে مَعْطُوْفٌ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আর فِىْ خَلْقِكُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর نَصْبٌ এজন্য যে, اٰيَاتٌ টা প্রথম اٰيَاتٌ -এর উপর হয়েছে, যা اِنَّ -এর اِسْمٌ আর فِىْ خَلْقِكُمْ টা فِى السَّمٰوَاتِ -এর উপর যা اِنَّ -এর খবর হয়েছে। এতে একটি عَامِلٌ -এর দু'টি مَعْمُوْلٌ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে, যা সর্বসম্মতিতে জায়েজ। -[صَاوِىْ]

قَوْلُهُ وَخَلْقِ مَا يَبُثُّ : ব্যাখ্যাকার خَلْقٌ মুযাফ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এর عَطْفٌ হয়েছে خَلْقِكُمْ -এর উপর। আবার مَا يَبُثُّ -এর আতফ خَلْقِكُمْ -এর كُمْ যমীরের উপর হওয়াও বৈধ রয়েছে। তবে এটা তাদের নিকটই জায়েজ যারা যমীরে মাজরূর এর উপর হরফে জরের পুরাবৃত্তি ব্যতীত عَطْفٌ জায়েজ বলে থাকেন।

قَوْلُهُ وَفِى اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ : এখানে فِىْ -কে স্পষ্ট করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এখানে فِىْ উহ্য রয়েছে। যেমন– قِرَاءَةٌ شَاذَّةٌ দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। -[صَاوِىْ]

قَوْلُهُ تِلْكَ اٰيَاتُ : এটা মুবতাদা ও খবর আর نَتْلُوْهَا টা حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُوْنَ : দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ -এর মধ্যে هَمْزَه টা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْلٌ : এটা শাস্তি এবং জাহান্নামের উপত্যকা উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ كَاَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا : كَاَنْ টা মূলে كَاَنَّ ছিল। مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ যমীরে শান উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كَاَنَّهٗ বাক্যটি হয়তো مُسْتَانِفَه হবে বা حَالٌ হবে। -[صَاوِىْ]

قَوْلُهُ اِتَّخَذَهَا هُزُوًا : প্রশ্ন. اِتَّخَذَهَا -এর যমীর شَيْئًا -এর দিকে ফিরেছে যা مُذَكَّرٌ কাজেই তার প্রতি مُؤَنَّثٌ -এর যমীর ফিরানো সহীহ নয়।

উত্তর. অর্থের হিসেবে مُؤَنَّثٌ -এর যমীর ফিরানো বৈধ। কেননা شَيْئًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اٰيَاتٌ -

দ্বিতীয় জবাব : اٰيَاتِنَا -এর দিকে ফিরানোও বৈধ রয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ اَمَامِهِمْ : এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَرَاءِ টা اَمَامٌ এবং خَلْقٌ উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা জাসিয়াহ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : একটি আয়াত ব্যতীত এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ, ৬৪৪ বাক্য ও ২৬০০ অক্ষর রয়েছে। সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে– قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ আয়াতখানি শুধু মদিনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হলো বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তাওহীদ, রিসালত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলিলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদীনদের খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরার নামকরণ : এ সূরাকে 'সূরাতুশ শরীয়া'ও বলা হয়। ইবনে মারদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা জাসিয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদুবিয়াহ হযরত জোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরাতুশ শরিয়া মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সূরাকে 'সূরাতুশ শরিয়া'ও বলা হয়।

–[তাফসীরে দুররুল মানসূর, খ. ৬, পৃ. ৩৮]

সূরা জাসিয়ার আমল : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সূরা জাসিয়া' লিপিবদ্ধ করে যদি তার দেহে বেঁধে রাখা হয়, তবে সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নবজাত শিশু হেফাজতে থাকে।

স্বপ্নের তাবির : যে ব্যক্তি এ সূরাকে স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে, তার মধ্যে দুনিয়া-ত্যাগী ভাব সৃষ্টি হবে এবং সে পরহেজগার হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে এমন গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে যা মানবজীবনের সাফল্যের কারণ হয়। এরপর একথা ঘোষণা করা হয় যে, কুরআনে কারীমকে আরবি ভাষায় সহজ করে নাজিল করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, এরপরও যদি কেউ হেদায়েত কবুল না করে তবে তা সে ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ প্রেক্ষিতেই সূরা জাসিয়ার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সৃষ্টিজগতে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে ঈমান আনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ : এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তাওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্বান পাঠকবর্গ ইমাম রাযীর তাফসীরে কাবীরে দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তাওহীদের দলিল। এ বিশ্বাস কোনো না কোনো দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মুমিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী। কারণ সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই পয়দা হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপারে বিবেককে কষ্ট দেওয়া পছন্দ করে না, তাদের জন্য হাজারো দলিল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

قَوْلُهُ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ : [মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য ভীষণ দুর্ভোগ।] কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোনো রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ সম্পর্কে এবং কোনো রেওয়ায়েত থেকে আবূ জাহল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়। –[কুরতুবী]

আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। শব্দ ব্যক্ত করেছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ একজন হোক অথবা তিনজন।

قَوْلُهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ : وَرَاءَ শব্দটি আরবিতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশি এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। যারা পেছনে অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবনযাপন করছে, এর পেছনে অর্থাৎ পরে জাহান্নাম আসছে। –[তাফসীরে কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٢. اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ السُّفُنُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ بِاِذْنِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا تَطْلُبُوْا بِالتِّجَارَةِ مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

১২. তিনি আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে তাতে জাহাজ চলাচল করে এবং যাতে তোমরা ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

١٣. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ مِنْ شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَنَجْمٍ وَمَاءٍ وَغَيْرِهٖ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَشَجَرٍ وَنَبَاتٍ وَاَنْهَارٍ وَغَيْرِهَا اَىْ خَلَقَ ذٰلِكَ لِمَنَافِعِكُمْ جَمِيْعًا تَاكِيْدٌ مِنْهُ ط حَالٌ اَىْ سَخَّرَهَا كَائِنَةً مِنْهُ تَعَالٰى اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ فِيْهَا فَيُؤْمِنُوْنَ ـ

১৩. এবং তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যা আছে নভোমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র, তারকা ও পানি ইত্যাদি থেকে ও যা আছে ভূমণ্ডলে জীবপ্রাণী, গাছপালা ও নদীনালা থেকে। অর্থাৎ এসব কিছুই তাদের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সবই তার পক্ষ থেকে جَمِيْعًا তাকীদ, مِنْهُ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ অর্থাৎ এই অধীনস্থ করে দেওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে এমন গোত্রের জন্যে যারা চিন্তা করে অতঃপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।

١٤. قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ يَخَافُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ وَقَائِعَهٗ اَىْ اِغْفِرُوْا لِلْكُفَّارِ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الْاَذٰى لَكُمْ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِجِهَادِهِمْ لِيَجْزِىَ اَىِ اللّٰهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنَ الْغُفْرِ لِلْكُفَّارِ اَذَاهُمْ ـ

১৪. আপনি ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন ক্ষমা করে দেয় তাদেরকে, যারা আল্লাহর দিনসমূহের অবস্থা থেকে ভয় করে না। অর্থাৎ তোমরা ক্ষমা করে দাও কাফেরদেরকে, তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কষ্টসমূহ এবং এই নির্দেশ জিহাদের হুকুম আসার পূর্বে। যাতে আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পুরাপুরি বিনিময় দিতে পারেন। কাফেরদেরকে তাদের ক্ষমার বিনিময়ে।

١٥. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ج عَمِلَ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ز اَسَاءَ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ تَصِيْرُوْنَ فَيُجَازِى الْمُصْلِحَ وَالْمُسِىْءَ ـ

১৫. যে সৎকাজ করছে, সে নিজের কল্যাণার্থেই তা করছে আর যে অসৎকাজ করছে তা তার উপরই বর্তাবে। তোমাদের সবাইকে স্বীয় মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে অতএব সৎকর্মপরায়ণ ও অসৎ ব্যক্তিদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٦. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ التَّوْرٰىةَ وَالْحُكْمَ بِهٖ بَيْنَ النَّاسِ وَالنُّبُوَّةَ لِمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ مِنْهُمْ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ الْحَلَالَاتِ كَالْمَنِّ وَالسَّلْوٰى وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ج عَالَمِىْ زَمَانِهِمُ الْعُقَلَاءِ ۔

১৬. আমি বনী ইসরাঈলদের কিতাব, তাওরাত রাজত্ব জনগণের উপর রাজত্ব ও নবুয়ত তাদের মধ্যে মূসা ও হারূনকে দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন রিজিক হালাল রিজিক যেমন– মান্না ও সালওয়া ইত্যাদি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বিশ্বজাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্বও দান করেছিলাম তাদের সময়কালের জ্ঞানীদের উপর।

١٧. وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ج اَمْرِ الدِّيْنِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَبَعْثِهٖ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا فِىْ بَعْثَتِهٖ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اَىْ لِبَغْىٍ حَدَثَ بَيْنَهُمْ حَسَدًا لَهٗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۔

১৭. আমি আরো দিয়েছিলাম তাদেরকে দীন সংক্রান্ত বিষয়াবলি অর্থাৎ হালাল, হারাম ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাবের উপর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। অতঃপর তারা জ্ঞান লাভ করার পর শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাবের উপর মতভেদ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ তাদের মতভেদের কারণ শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি হিংসা ও জেদ হিসেবে। নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমার প্রভু তাদের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা দুনিয়ায় মতবিরোধ করেছে।

١٨. ثُمَّ جَعَلْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى شَرِيْعَةٍ طَرِيْقَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ اَمْرِ الدِّيْنِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ فِىْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ ۔

১৮. অতঃপর হে মুহাম্মদ ﷺ আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ পদ্ধতির উপর রেখেছি। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন ও সেসব লোকদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবেন না, যারা কিছুই জানে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার পরিণাম সম্পর্কে।

١٩. اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا يَدْفَعُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهٖ شَيْـًٔا ط وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۗءُ بَعْضٍ ج وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

১৯. এরা আপনার থেকে আল্লাহর কোনো আজাব কখনো সরাতে পারবে না। নিশ্চয় জালিমগণ কাফেররা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ পরহেজগার তথা ঈমানদারগণের বন্ধু।

٢٠. هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ مَعَالِمُ يَتَبَصَّرُوْنَ بِهَا فِى الْاَحْكَامِ وَالْحُدُوْدِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ .

২০. এই কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার এটা দ্বারা তারা আহকাম ও দণ্ডবিধির হুকুম শিক্ষা করে; এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে হেদায়েত ও রহমত।

٢١. اَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا اكْتَسَبُوا السَّيِّاٰتِ الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِىَ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَآءً خَبَرٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط مُبْتَدَأٌ وَمَعْطُوْفٌ وَالْجُمْلَةُ بَدَلٌ مِنَ الْكَافِ وَالضَّمِيْرَانِ لِلْكُفَّارِ الْمَعْنٰى اَحَسِبُوْا اَنْ نَّجْعَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ فِىْ خَيْرٍ كَالْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ فِىْ رَغَدٍ مِنَ الْعَيْشِ مُسَاوٍ لِعَيْشِهِمْ فِى الدُّنْيَا حَيْثُ قَالُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ لَئِنْ بُعِثْنَا لَنُعْطٰى مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَ مَا تُعْطَوْنَ قَالَ تَعَالٰى عَلٰى وَفْقِ اِنْكَارِهِ بِالْهَمْزَةِ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ اَىْ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ فَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ عَلٰى خِلَافِ عَيْشِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْمُؤْمِنُوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ فِى الثَّوَابِ بِعَمَلِهِمُ الصَّالِحَاتِ فِى الدُّنْيَا مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ اَىْ بِئْسَ حُكْمًا حُكْمُهُمْ هٰذَا .

২১. যারা অপকর্ম করেছে কুফর ও পাপাচারের মাধ্যমে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মতো করে দেব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? اَمْ অস্বীকারমূলক হামযা তথা هَمْزَةُ اِنْكَارٍ -এর অর্থে। سَوَآءٌ খবরে মুকাদ্দম এবং مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ মুবতাদা হয়ে مَعْطُوْفٌ এবং পূরো জুমলাটি ك থেকে بَدَلٌ এবং مَحْيَاهُمْ-مَمَاتُهُمْ উভয়ের যমীর কাফেরের দিকে ফিরবে। আয়াতের অর্থ হলো, এ কাফের সম্প্রদায় কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে আখিরাতে ঈমানদারদের মতো সুখে রাখব অর্থাৎ সুখ-শান্তির জীবনে তারা মুমিনদের সমান হবে! কেননা তারা দুনিয়াতে মুমিনদেরকে বলেছিল যে, যদি আবার জীবিত করে আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়, তাহলে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখা হবে যেমন তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَمْزَهٌ কে اِنْكَارِىْ মানার ক্ষেত্রে তাদের ফয়সালা, দাবি কতইনা মন্দ। অর্থাৎ বাস্তব এমন নয়, বরং তারা পরকালে আজাবে লিপ্ত থাকবে দুনিয়াতে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিপরীতে এবং ঈমানদারগণ দুনিয়াতে তাদের কৃত সৎআমল যেমন- নামাজ, জাকাত ও রোজা ইত্যাদির পরিবর্তে আখিরাতে ছওয়াব ও সুখপ্রাপ্ত হবে। مَا يَحْكُمُوْنَهُ -এর মধ্যে مَا টি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ : এখানে وَاوْ টি হলো عَاطِفَهْ পূর্বের বাক্যের উপর এ বাক্যের আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ جَمِيْعًا : এটা مَا থেকে حَالْ হয়েছে এবং مِنْهُ টা سَخَّرَهَا -এর هَا যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ سَخَّرَهَا كَائِنَةً مِنْهُ تَعَالىٰ আল্লামা মহল্লী (র.) جَمِيْعًا -কে مَا مَوْصُوْلَهْ -এর তাকিদ বলেছেন, যা سَخَّرَهَا -এর মাফউল সম্ভবত এটা আল্লামা মহল্লী (র.)-এর وَهَمْ হয়েছে। যদি جَمِيْعًا টা مَا مَوْصُوْلَهْ -এর তাকিদ হতো তবে جَمِيْعَهُ বলা হতো সম্ভবত আল্লামা মহল্লী (র.) এ ক্ষেত্রে ইবনে মালেকের অনুসরণ করেছেন। তিনি ব্যতীত جَمِيْعًا -এর মাধ্যমে তাকিদ কম ব্যবহার হয়েছে। কাজেই কুরআনকে এর উপর مَحْمُوْلْ করা উত্তম নয়।

قَوْلُهُ مِنْهُ : এটা حَالْ হয়েছে অর্থাৎ سَخَّرَهَا كَائِنَةً مِنْهُ تَعَالىٰ

قَوْلُهُ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : উল্লিখিত বাক্যটি ক্ষমা করার ইল্লত। আর قَوْمًا দ্বারা قَوْمٌ مُؤْمِنٌ উদ্দেশ্য। আর مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্ষমা করার আমল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে কষ্ট দেওয়াকে ক্ষমা করে দেওয়ার হুকুম করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী মুমিনদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। এই বিধান জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল।

আয়াতের অন্য অর্থ : قَوْمًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফের সম্প্রদায় আর مَا كَسَبُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের অনুচিত ও গর্হিত কার্যাবলি, যা মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার সুরতে করতেছিল। আর جَزَاءْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাস্তি। উদ্দেশ্য এই যে, হে মুমিনগণ! তোমরা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করো না, আমিই তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। প্রথমটি অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا : قُلْ -এর مَقُوْلَهْ তথা اِغْفِرُوْا টি اَمْرْ তথা جَوَابْ يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ -এর দালালত করার কারণে উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- قُلْ لَهُمْ اِغْفِرُوْا يَغْفِرُوْا আর لِيَجْزِىَ উহ্য اَمْرْ তথা اِغْفِرُوْا -এর ইল্লত। আল্লামা মহল্লী (র.) مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -এর তাফসীর مِنَ الْغَفْرِ لِكُفَّارٍ اِذَا هُمْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ الْكِتَابَ : বনী ইসরাঈলের কিতাব হলো তিনটি। যথা- যাবূর, তাওরাত, ইঞ্জিল। কিন্তু যেহেতু এগুলোর মধ্যে তাওরাত হলো মূল যা অন্য কিতাবের দ্বারা যথেষ্ট করে। এ কারণেই এখানে তাওরাতের উপর নির্ভর করেছেন।

قَوْلُهُ الْعُقَلَاءُ : যদি মুফাসসির (র.) اَلْعُقَلَاءُ -এর পরিবর্তে اَلثَّقَلَيْنِ বলতেন, তবে ভালো ও যথোপযুক্ত হতো। কেননা اَلْعُقَلَاءُ -এর মধ্যে ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। অথচ ফেরেশতাগণ আসমানি কিতাবের مُكَلَّفْ নন। তাফসীরে বায়যাভীর ইবারত হলো- وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ حَيْثُ اٰتَيْنَاهُمْ مَا لَمْ نُؤْتِهِ اَحَدًا غَيْرَهُمْ ; কাযী বায়যাভীর উক্তি- حَيْثُ اٰتَيْنَاهُمْ الخ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, عَالَمِىْ زَمَانِهِمْ -এরও প্রয়োজন নেই। কেননা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল كُلِّىْ فَضِيْلَتْ -এর মধ্যে خُصُوْصِيَّتْ বর্ণনা করা, যা বাস্তবে অন্যদের অর্জিত ছিল না। আর جُزْئِىْ فَضِيْلَتْ দ্বারা فَضَائِلْ প্রমাণিত হয় না। যেমন- বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবীর আগমন ঘটা, সমুদ্র বিদীর্ণ করে রাস্তা করে দেওয়া, তাদের শত্রু ফেরাউনের নিমজ্জিত হওয়া, মান্না সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া, একটি পাথর হতে বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত হওয়া। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রতিদানের হিসেবে ফজিলত উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَبِعْثِهِ مُحَمَّدٍ : এর আতফ اَلَّذِيْنَ -এর উপর অর্থাৎ اَمْرِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ

قَوْلُهُ نَبْغِىْ حَدَثَ : এতে দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম হলো بَغْيًا টা মতবিরোধের ইল্লত। আর দ্বিতীয় হলো বনী ইসরাঈলের মাঝে মতবিরোধের কারণ তাদের পরস্পর হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ : প্রশ্ন. هٰذَا মুবতাদা যা একবচন, আর بَصَائِرُ হলো বহুবচন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই উত্তর. هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসংখ্য আয়াত ও বিভিন্ন প্রমাণাদি কেননা অর্থের দিক থেকে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللّٰهِ : এর সম্পর্কে لَا تَتَّبِعُوْنَ -এর সাথে।

قَوْلُهُ مَعَالِمُ : এটা مَعْلَمٌ-এর বহুবচন। ঐ চিহ্নকে বলা হয়, যার দ্বারা রাস্তার দিকনির্দেশনা জানা যায়। অর্থাৎ আয়াতসমূহ আহকামের প্রতি দিকনির্দেশনা করে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ : এটা حَسِبَ -এর ফায়েল আর أَنْ نَجْعَلَهُمْ الخ বাক্যটি حَسِبَ -এর দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ سَوَاءٌ : سَوَاءٌ টা رَفْع -এর সাথে مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ মুবতাদার خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর ইমাম কেসায়ী (র.) سَوَآءً -কে كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-এর যমীরে মাজরুর থেকে حَالٌ হওয়ার ভিত্তিতে নসবের সাথে পড়েছেন। অথবা এ কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে যে, এটা حَسِبَ তৃতীয় মাফউল। আবার কেউ কেউ نَجْعَلَهُمْ-এর মাফউল হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ : এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أَمْ حَسِبَ -এর হামযাটা اِسْتِفْهَامُ اِنْكَارٍ -এর জন্য হয়েছে। এটা উচিত ছিল যে, মুফাসসির (র.) لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ -কে سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -এর উপর مُقَدَّمٌ করতেন। কেননা এ বাক্যটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ............وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ : কুরআন পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খোঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে অধিক খনিজ সম্পদ এবং ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قَوْلُهُ قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ : [আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহর সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।] এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরিক হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর (রা.) -এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসাছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আব্দুল্লাহ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ বাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটাতাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত ওমর (রা.) এ বিষয়টি অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আব্দুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। -[তাফসীরে কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

সনদ খোঁজাখুঁজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ প্রমাণিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাজিল হয়েছিল, অতঃপর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ

Free@www.e-ilm.weebly.com

ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় পুনরায় একই আয়াত নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার [বারবার অবতরণ] বলা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতে اَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারাদি। اَيَّامٌ শব্দটি ঘটনাবলি ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবিতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনাযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরিকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহর ব্যাপারাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আজাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাটো ধরাপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ-কারবারের ছোটখাটো বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব একে রহিত বলা ঠিক নয়, বিশেষত এর শানে নযূল যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয় তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْكِتٰبَ الخ : আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ : এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দুটি বিষয় জানা যায়। যথা– ১. বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমর্থন এবং ২. তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোনো ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। –[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন]

পূর্ববর্তী উম্মতদের শরিয়তের বিধান আমাদের জন্য : ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ [এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরিকার উপর রেখেছি।] এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন– তাওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধিবিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যেই এক ও অভিন্ন। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গাম্বরের শরিয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই "ধর্মের এক বিশেষ তরিকা" বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরিয়ত মুহাম্মদীর বিধানাবলিই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের একপ্রকার এই যে, কুরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়। আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কুরআন পাক অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের কোনো বিধান প্রশংসাছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরিয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এ বিধান শরিয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসেবেই অবশ্যই পালনীয় হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

২২. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِخَلَقَ لِيَدُلَّ عَلٰى قُدْرَتِهٖ وَوَحْدَانِيَّتِهٖ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ مِنَ الْمَعَاصِىْ وَالطَّاعَاتِ فَلَا يُسَاوِىْ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

২২. আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছেন, بِالْحَقِّ টি خَلَقَ -এর সাথে সম্পর্কিত যাতে এটা তাঁর কুদরত ও একত্ববাদের উপর প্রমাণ বহন করে। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের চাই পাপকাজ হোক বা সৎকাজ ইত্যাদির যথাযথ বিনিময় পায়। অতএব কাফের মুমিনের সমান হয় না। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

২৩. اَفَرَءَيْتَ اَخْبِرْنِىْ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ مَا يَهْوَاهُ مِنْ حَجَرٍ بَعْدَ حَجَرٍ يَرَاهُ اَحْسَنَ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ مِنْهُ تَعَالٰى اَىْ عَالِمًا بِاَنَّهٗ مِنْ اَهْلِ الضَّلَالَةِ قَبْلَ خَلْقِهٖ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ فَلَمْ يَسْمَعِ الْهُدٰى وَلَمْ يَعْقِلْهُ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ط ظُلْمَةً فَلَمْ يُبْصِرِ الْهُدٰى وَيُقَدَّرُ هُنَا الْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ لِرَاَيْتَ اَىْ اَيَهْتَدِىْ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ط اَىْ بَعْدَ اِضْلَالِهٖ اِيَّاهُ اَىْ لَا يَهْتَدِىْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ تَتَّعِظُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ اِحْدَى التَّائَيْنِ فِى الذَّالِ.

২৩. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, তার প্রতি যে নিজের খেয়াল-খুশিকে নিজের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে? অর্থাৎ যে পাথরকে একের পর এক পছন্দ করে তাকেই মাবুদ বানিয়ে নেয়। আল্লাহ তাকে জেনেশুনে পথভ্রষ্ট করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ জানে যে, সে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন অতএব সে হেদায়তের বাণী শুনে না ও বুঝে না। এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা অন্ধকার। ফলে সে হেদায়ত দেখে না। এখানে رَاَيْتَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل অর্থাৎ اَيَهْتَدِىْ উহ্য। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? অর্থাৎ আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করার পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে অর্থাৎ কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করবে না। তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না। উপদেশ গ্রহণ কর না। تَذَكَّرُوْنَ -এর একটি ت -কে ذ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

২৪. وَقَالُوْا اَىْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ مَا هِىَ اَىِ الْحَيٰوةُ اِلَّا حَيَاتُنَا الَّتِىْ فِى الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰى اَىْ يَمُوْتُ بَعْضٌ وَيَحْيٰى بَعْضٌ بِاَنْ يُّوْلَدُوْا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ ع اَىْ مُرُوْرُ الزَّمَانِ قَالَ تَعَالٰى وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ الْمَقُوْلِ مِنْ عِلْمٍ ع اِنْ مَا هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ.

২৪. তারা কিয়ামত অস্বীকারকারীরা বলে, আমাদের এই পার্থিব দুনিয়া ছাড়া আর কোনো জীবনই নেই, আমরা মরি ও বাঁচি অর্থাৎ কেউ মৃত্যুবরণ করে আর জন্মের মাধ্যমে জীবিত হয়। এবং আমাদেরকে কিছুই ধ্বংস করে না কিন্তু দহর অর্থাৎ কালের আবর্তনই আমাদের যা কিছু ধ্বংস করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের নিকট এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٥. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا مِنَ الْقُرْاٰنِ الدَّالَّةِ عَلٰى قُدْرَتِنَا عَلَى الْبَعْثِ بَيِّنٰتٍ وَّاضِحَاتٍ حَالٌ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَا اَحْيَاءً اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اَنَّا نُبْعَثُ .

২৫. তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ কুরআন যা পুনরুত্থানের উপর আল্লাহর কুদরতের প্রতি দলিল বহন করে পাঠ করা হয়। بَيِّنٰتٌ অবস্থাবোধক পদ তথা حَالٌ তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত নিয়ে এসো। নিশ্চয় আমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে

٢٦. قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ حِيْنَ كُنْتُمْ نُطَفًا ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اَحْيَاءً اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ وَهُمُ الْقَائِلُوْنَ مَا ذُكِرَ لَا يَعْلَمُوْنَ .

২৬. আপনি বলুন আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জীবন দান করেন যখন তোমরা বীর্য ছিলে। অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ উল্লিখিত বক্তাগণ তা বোঝে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ اَخْبِرْنِىْ : এতে سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা رُؤْيَتْ হলো سَبَبْ اِخْبَارْ কাজেই رُؤْيَتْ হলো سَبَبْ আর اِخْبَارْ হলো তার مُسَبَّبْ এবং এটা مَجَازْ হিসেবে اِطْلَاقْ হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامْ টা اَمْرْ -এর অর্থে হয়েছে এবং جَامِعْ طَلَبْ হয়েছে। কেননা اَمْرْ এবং اِسْتِفْهَامْ উভয়টা طَلَبْ -এর মধ্যে مُشْتَرِكْ -

قَوْلُهُ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ : এখানে عَلٰى عِلْمٍ টা اَضَلَّهُ -এর ফায়েল اَللّٰهُ হতেও حَالْ হতে পারে এবং ، যমীরে মাফউল থেকেও حَالْ হতে পারে। মুফাসসির (র.) ফায়েল থেকে حَالْ বলে এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় عِلْم اَزَلِىْ -এর কারণে তার গোমরাহ হওয়াকে জানার কারণে তাকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন।

আর যারা عَلٰى عِلْمٍ -কে اَضَلَّهُ -এর যমীর থেকে حَالْ বলেছেন তাদের নিকট উদ্দেশ্য হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বুঝা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ اَضَلَّهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْحَقِّ এতে কঠোর তিরস্কার রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ الْمَقُوْلِ : ذٰلِكَ الْمَقُوْلُ দ্বারা আল্লাহকে অস্বীকারকারীদের উক্তি- وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের নিকট তাদের এই কথার কোনোই দলিল নেই। আকলী দলিলও নেই, নকলী দলিলও নেই; বরং তারা অনুমান-নির্ভর কথা বলে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য : উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভালো বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না; বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অঢেল ধনসম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথম

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে আল্লাহদ্রোহী ও খেয়ালখুশির অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরিয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব যদি ইজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোনো চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবনযাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধনসম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকুরি ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না, তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভালো, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই। যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও, কিন্তু দুনিয়াতে এর কোনো প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব সাধুতা ও অসাধুতা পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেওয়া হোক? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভালো ও মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে- وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভালো ও মন্দের প্রতিদান এ দুনিয়াতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

قَوْلُهٗ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ : [অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে-। বলা বাহুল্য, কোনো কাফেরও তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় খোদা অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কুরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কারো আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েজ নাজায়েজের পরওয়া করে না, আল্লাহ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে খেয়াল-খুশির অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশিই তার উপাস্য। জনৈক সাধক কবি নিম্নোক্ত কবিতায় এ বিষয়টিই বর্ণনা করেছেন-

سودہ گشت از سجدہ راہ بتان پیشانیم * چند بر خود تہمت دین مسلمانی نہم

এতে খেয়াল-খুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি খেয়াল-খুশিকে স্বীয় ইমাম ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে খেয়াল-খুশিই যেন তার প্রতিমা। হযরত আবূ ওমামা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়াল-খুশি। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তিই পাপাচারী, যে তার মনকে খেয়াল-খুশির পেছনে ছেড়ে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দেয় এবং তারপরেও আল্লাহর কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আব্দুল্লাহ তস্তরী (র.) বলেন, তোমাদের খেয়াল-খুশি তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়াল-খুশির বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক।

-[তাফসীরে কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ : دَهْرٌ শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি। কখনো দীর্ঘ সময়কালকে دَهْرٌ বলা হয়। কাফেররা দলিলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণের অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ কোনো খোদায়ী আদেশ নয়; বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় : কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগৎ ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছুকে তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই সহীহ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা দহর দ্বারা যে শক্তিকে ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ তা'আলারই। তাই দহরকে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহাকালকে গালি দিয়ো না, কেননা প্রকৃতপক্ষে মহাকাল আল্লাহই। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহর শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোনো কিছু নয়। এতে জরুরি হয় না যে, দহর আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম হবে। কেননা হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে দহর বলা হয়েছে।

অনুবাদ :

٢٧. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْدَلُ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ الْكَافِرُوْنَ اَىْ يَظْهَرُ خُسْرَانُهُمْ بِاَنْ يَّصِيْرُوْا اِلَى النَّارِ.

২৭. আকাশমণ্ডলী ও জমিনের যাবতীয় রাজত্ব আল্লাহ তা'আলার জন্যে যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থিরা অর্থাৎ কাফেরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে. يَوْمَئِذٍ টি يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ থেকে بَدَل অর্থাৎ সেদিন তাদের লোকসান প্রকাশ হবে তাদের জাহান্নামে প্রবেশের মধ্য দিয়ে।

٢٨. وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ اَىْ اَهْلَ دِيْنٍ جَاثِيَةً قف عَلَى الرُّكَبِ اَوْ مُجْتَمِعَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا ط كِتَابِ اَعْمَالِهَا وَيُقَالُ لَهُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاءَهُ.

২৮. আপনি প্রত্যেক উম্মতকে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের দেখবেন নতজানু অবস্থায় বা একত্র অবস্থায়। পড়ে থাকবে, প্রত্যেক উম্মতকে তাদের কর্মসমূহের আমলনামা দেখতে বলা হবে। আর তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা কিছু করতে আজ তোমাদের তার প্রতিফল দেওয়া হবে।

٢٩. هٰذَا كِتٰبُنَا دِيْوَانُ الْحَفَظَةِ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ نُثْبِتُ وَنَحْفَظُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

২৯. এই হচ্ছে আমার কিতাব সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের বিবরণী যা তোমাদের সম্পর্কে সত্য বলবে, তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ সংরক্ষণ করতাম।

٣٠. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط جَنَّتِهٖ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ الظَّاهِرُ.

৩০. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে জান্নাতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য।

٣١. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قف فَيُقَالُ لَهُمْ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ الْقُرْاٰنُ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ تَكَبَّرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ كَافِرِيْنَ.

৩১. অপরদিকে যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে বলা হবে তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ কুরআন পঠিত হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। নাফরমান জাতি।

٣٢. وَاِذَا قِيْلَ لَكُمْ اَيُّهَا الْكُفَّارُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِالْبَعْثِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ لَا رَيْبَ شَكَّ فِيْهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ لا اِنْ مَا نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا قَالَ الْمُبَرِّدُ اَصْلُهُ اِنْ نَحْنُ اِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ اَنَّهَا اٰتِيَةٌ.

৩২. হে কাফেররা যখন তোমাদেরকে বলা হতো, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সত্য এবং কিয়ামতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই اَلسَّاعَةُ টি نَصْبٌ ও رَفْعٌ উভয়ভাবে পড়া যাবে তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কিয়ামত কি? আমরা কেবল কিছু ধারণাই করতে পারি। মুবাররাদ বলেন- مَا نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا মূলত اِنْ نَحْنُ اِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا ছিল। এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই যে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٣. وَبَدَا لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ سَيِّاٰتُ مَا
عَمِلُوْا فِي الدُّنْيَا اَيْ جَزَاؤُهَا وَحَاقَ نَزَلَ
بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ اَيِ الْعَذَابُ ـ

৩৩. কিয়ামতের দিন তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে তাদের মন্দকর্মগুলো যা তারা দুনিয়াতে করেছে অর্থাৎ এটার প্রতিদান পাবে এবং যে আজাব নিয়ে তারা হাসিঠাট্টা করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে।

٣٤. وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ نَتْرُكُكُمْ فِي
النَّارِ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ز اَيْ
تَرَكْتُمُ الْعَمَلَ لِلِقَائِهٖ وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا
لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ مَانِعِيْنَ مِنْهَا ـ

৩৪. বলা হবে, আজ তোমাদেরকে ভুলে যাব তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। যেভাবে তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে অর্থাৎ এ দিনের সাক্ষাতের জন্যে কোনো আমল করনি। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই আজাবকে বাধা দানকারী নেই।

٣٥. ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ الْقُرْاٰنَ
هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج حَتّٰى
قُلْتُمْ لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ فَالْيَوْمَ لَا
يُخْرَجُوْنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ
مِنْهَا مِنَ النَّارِ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ اَيْ لَا
يُطْلَبُ مِنْهُمْ اَنْ يُّرْضُوْا رَبَّهُمْ بِالتَّوْبَةِ
وَالطَّاعَةِ لِاَنَّهَا لَا تَنْفَعُ يَوْمَئِذٍ

৩৫. এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে কুরআনকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। ফলে তোমরা বলতে যে, কোনো পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ নেই সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না يُخْرَجُوْنَ-কে مَعْرُوْف ও مَجْهُوْل উভয়ভাবে পড়া যায়। ও তাদের কোনো ওজর আপত্তি কবুল করা হবে না। অর্থাৎ তাদেরকে এ সুযোগ দেওয়া হবে না যে, তারা তওবা ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করে নেবে। কেননা ঐদিন এটা কোনো উপকারে আসবে না।

٣٦. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ الْوَصْفُ بِالْجَمِيْلِ عَلٰى
وَفَاءِ وَعْدِهٖ فِي الْمُكَذِّبِيْنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ
وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ خَالِقِ مَا ذُكِرَ
وَالْعَالَمُ مَا سِوَى اللّٰهِ وَجُمِعَ لِاخْتِلَافِ
اَنْوَاعِهٖ وَرَبِّ بَدَلٌ ـ

৩৬. অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যে উত্তম প্রশংসা তার জন্যে তিনি মিথ্যুকদের ব্যাপারে তার ওয়াদা পূরণ করার কারণে। যিনি আসমানসমূহের মালিক, যিনি জমিনের মালিক, তিনি মালিক সারা জাহানের তিনি উল্লিখিত সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকেই عَالَمْ বলা হয় এবং عَالَمْ-এর বিভিন্ন প্রকারকে শামিল করার জন্যে عٰلَمِيْنَ বহুবচন আনা হয়েছে। আর رَبِّ শব্দটি আল্লাহ থেকে بَدَلْ -

٣٧. وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ الْعَظَمَةُ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط حَالٌ اَيْ كَائِنَةً فِيْهِمَا وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تَقَدَّمَ ـ

৩৭. আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সমস্ত গৌরব ও মাহাত্ম্য তাঁর জন্যেই। فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অবস্থাবোধ পদ তথা حَالْ অর্থাৎ তিনি আসমান ও জমিনে হওয়াটা সর্বাবস্থায় তাঁর জন্যে গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটার ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ : এটা يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ হতে بَدَل হয়েছে تَاكِيْد-এর জন্য। আর يَوْمَ تَقُوْمُ টা يَخْسَرُ-এর ظَرْف হয়েছে। আর يَوْمَئِذٍ-এর মধ্যে تَنْوِيْن টা مُضَافٌ اِلَيْهِ-এর পরিবর্ত হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اِذَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ

قَوْلُهُ اَيْ يَظْهَرُ خُسْرَانُهُمْ : এটা হলো সেই উহ্য প্রশ্নের জবাব যে, বাতিলপন্থিদের ক্ষতিগ্রস্ততা তো عِلْمِ اَزَلْ-তে নির্দিষ্ট এবং আবশ্যক. তাহলে পুনরায় ঐ দিনের ক্ষতিগ্রস্ততার কি উদ্দেশ্য হতে পারে?

উত্তর. বাতিলপন্থিদের ক্ষতিগ্রস্ততা যদিও رُوْزِ اَزَلْ থেকেই নির্দিষ্ট কিন্তু তার প্রকাশ সেদিন হবে যখন তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

قَوْلُهُ جَاثِيَةً : এটা جُثُوٌّ বা جَثْوٌ হতে وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ। অর্থ– রানের উপর উপবেশনকারী। এখানে جَاثِيَةٌ টা বহুবচনের স্থানে ব্যবহার হয়েছে। যেমন- جَمَاعَةٌ - قَائِمَةٌ

قَوْلُهُ نَسْتَنْسِخُ : এটা বাবে اِسْتِفْعَالٌ-এর اَلْاِسْتِنْسَاخُ মাসদার হতে মুযারে-এর جَمْعُ مُتَكَلِّمْ-এর সীগাহ; অর্থ- আমরা সংরক্ষণ করি। বাবে فَتَحَ হতে نَسْخًا মাসদার অর্থ দূর করা, বদলে দেওয়া, রহিত করা লেখা, নকল করা।

قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ وَالنَّصَبِ : অর্থাৎ اَلسَّاعَةُ-এর উপর رَفْع-এবং نَصَبْ উভয় বৈধ। মুবতাদা হওয়ার কারণে رَفْع হবে। لَا رَيْبَ فِيْهَا বাক্য হয়ে মুবতাদার খবর। আর اِنَّ-এর اِسْم-এর উপর আতফ হওয়ার কারণে نَصَبْ হবে।

قَوْلُهُ قَالَ الْمُبَرِّدُ اَصْلُهُ اِنْ نَحْنُ اِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا : **প্রশ্ন.** ظَنًّا মাসদার تَاكِيْد-এর জন্য হয়েছে। আর যেই মাসদার تَاكِيْد-এর জন্য হয় সেটা اِسْتِثْنَاءْ مُفَرَّغْ হতে পারে না। অথচ এখানে ظَنًّا মাসদারটা اِسْتِثْنَاءْ مُفَرَّغْ হয়েছে। কেননা এর দ্বারা একই জিনিসের اِثْبَاتْ এবং তারই نَفِيْ করা আবশ্যক হচ্ছে; যা জায়েজ নয়। এটা এরূপ যেমন কেউ বলল- مَا ضَرَبْتُ اِلَّا ضَرْبَتُ আর এটা اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ হওয়ার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ।

উত্তর. মুফাসসির (র.) نَحْنُ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন যার কারণে مُسْتَثْنٰى مِنْهُ টা مُسْتَثْنٰى-এর مُغَائِرْ হয়ে গেছে। এজন্য اِلَّا نَظُنُّ ظَنًّا (مَوْرِدْ) টি نَفِيْ-এর مَوْرِدْ [মিসদাক] উহ্য রয়েছে। আর তা হলো نَحْنُ এবং اِثْبَاتْ-এর মিসদাক نَفِيْ যদিও مُؤَخَّرْ হয়েছে কিন্তু তাকদীরীভাবে مُقَدَّمْ হয়েছে। আয়াত থেকে সেই حَصْر বুঝা যাচ্ছে। নিজের জন্য ظَنْ-এর اِثْبَاتْ এবং ظَنْ ব্যতীত অন্যগুলোর نَفِيْ হয়েছে। আর সমষ্টিগতভাবে مَاعَدَا-এর মধ্যে يَقِيْن-ও রয়েছে- এবং يَقِيْن-এরই نَفِيْ করা উদ্দেশ্য। কিন্তু মুতলাকান مَاعَدَا الظَّنِّ-এর نَفِيْ টা يَقِيْن-এর نَفِيْ-এর মধ্যে মুবালাগা করার জন্য হয়েছে। আর এ কারণেই যে, মুশরিকরা স্বীয় উক্তি مَا نَظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ দ্বারা -এর তাকিদ করেছেন।

قَوْلُهُ جَزَاءُ هَا : উহ্য মুযাফ দ্বারা ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, ظُهُوْرِ سَيِّئَاتْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ظُهُوْرِ جَزَاءِ سَيِّئَاتْ আর نِسْيَانْ-এর তাফসীর تَرْك দ্বারা করে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, نِسْيَانْ দ্বারা لَازِمْ অর্থ উদ্দেশ্য। কেননা মানুষের থেকে نِسْيَانْ তথা ভুল করার অপরাধকে মার্জনা করে দেওয়া হয়েছে। আর نِسْيَانْ টা আল্লাহর জন্য مُحَالٌ আর تَرْك টা نِسْيَانْ-এর জন্য আবশ্যক।

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمْ : অর্থাৎ ذٰلِكَ الْعَذَابُ الْعَظِيْمُ بِسَبَبِ اَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا আর ذٰلِكَ-এর مَرْجِعْ হলো عَذَابْ আর بِاَنَّكُمْ-এর মধ্যে بَاءْ হলো سَبَبِيَّةْ-এর জন্য।

قَوْلُهُ لَا يُسْتَعْتَبُوْنَ : اِسْتِعْتَابٌ যা বাবে اِسْتِفْعَالٌ-এর মাসদার তা হতে এটা مُضَارِعْ-এর جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনাই করা হবে না। কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন যে, তাদের ওজর কবুল করা হবে না। আল্লামা মহল্লী (র.) প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : এটা اَلْكِبْرِيَاءُ থেকে حَالٌ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً : جِثُوٌّ -এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كُلَّ اُمَّةٍ [প্রত্যেক দল] শব্দ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে, কোনো কোনো আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গাম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গাম্বর ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই এতে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসীকে বুঝানো হয়েছে। كُلٌّ শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جَاثِيَةً -এর অর্থ করেছেন নামাজে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোনো খটকা থাকে না। কেননা এটা আদবের বসা, ভয়ের নয়।

قَوْلُهُ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌঁছে যাবে। তাকে বলা হবে- اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا .... وَمَا لَكُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ : 'আর তাদেরকে বলা হবে, যেভাবে তোমরা এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনিভাবে আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব। আর তোমাদের আবাসস্থল হলো দোজখ এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'

কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা : অর্থাৎ কাফের মুশরেকদেরকে সেদিন বলা হবে, দুনিয়ার জীবনে কিয়ামতের দিনের কথা বললে তোমরা তার প্রতি বিদ্রূপ করতে, এমনকি তোমরা কখনো একথা স্মরণ করনি যে, অবশেষে তোমাদেরকে একদিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে, জীবনের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে তোমরা কিয়ামতের দিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলে। যেভাবে সেদিন তোমরা এ সত্যকে ভুলে গিয়েছিলে, ঠিক তেমনিভাবে আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে থাকব, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারীও নেই যে, তোমাদেরকে দোজখের শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়ার জন্যে সাহায্য করতে পারে।

এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করবেন, "আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে সন্তানসন্ততি দান করিনি? আমি কি তোমাদের জন্যে উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতিকে অনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাদের জন্যে তোমাদের বাড়ি-ঘরে আরাম-আয়েশে জীবনযাপনের সুযোগ দান করিনি?" তখন বান্দারা আরজ করবে, "অবশ্যই হে পরওয়ারদেগার! ঐ সমস্ত কিছু তোমার নিয়ামতই ছিল, যা আমরা ভোগ করেছি।" এরপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন, যেভাবে দুনিয়াতে তোমরা আমাকে ভুলে গিয়েছিল, আজ আমি তোমাদেরকে সেভাবে ভুলে থাকব। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দু), পারা ২৫, পৃ. ৬৮]

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ .... وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে যে, তাদের আবাসস্থল হবে দোজখ, আর এ আয়াতে তাদেরকে এ শাস্তি প্রদানের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে-

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ কাফেরদেরকে দোজখের শাস্তি এজন্যে দেওয়া হবে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের প্রতি বিদ্রূপ করেছিল এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল, তারা ভেবেছিল, দুনিয়ার জীবন চিরদিন ভোগ করবে, কখনো তাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির করা হবে না; কিন্তু অতি অল্প সময়ের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মধ্যেই মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের সে জীবনের অবসান ঘটেছে এবং আখিরাতের এ জীবনে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, আর তা হলো দোজখের শাস্তি। আর এ শাস্তি থেকে তারা কখনো রেহাই পাবে না এবং তওবা করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হবে না।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের কোনো সুযোগ থাকবে না। কেননা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ নির্ভর করছে ঈমান ও নেক আমলের উপর, আর মৃত্যুর মাধ্যমে আমলের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই তখন আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার কোনো পথ খোলা থাকবে না।

قَوْلُهُ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : অতএব, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আসমান জমিনের প্রতিপালক, আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু লাভ করেছে অস্তিত্ব, তাঁরই আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আর তিনিই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক। অতএব, সমস্ত প্রশংসা শুধু এক আল্লাহ পাকের জন্যেই। বান্দা মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর বন্দেগিতে মশগুল থাকা।

قَوْلُهُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাজত্ব আসমান-জমিনে, একমাত্র তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। অহংকার শুধু তাঁরই সাজে, আর কারো নয় এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সর্বত্র বিরাজমান, তিনিই মহাজ্ঞানী, তিনি প্রজ্ঞাময়, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। অতএব, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আহকাফ, মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (اَلْاٰيَة) وَاِلَّا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (اَلْاٰيَة)
وَاِلَّا وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ الثَّلَاثُ اٰيَاتٍ وَهِىَ اَرْبَعٌ اَوْ خَمْسٌ وَثَلٰثُوْنَ اٰيَةً
قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ এবং فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ এবং ও
وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ এই তিনটি আয়াত ব্যতীত। এতে ৩৪ বা ৩৫টি আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. حٰمٓ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ .

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ الْقُرْاٰنِ مُبْتَدَأٌ مِنَ اللّٰهِ خَبَرُهٗ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمِ فِىْ صُنْعِهٖ

٣. مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا خَلْقًا بِالْحَقِّ لِيَدُلَّ عَلٰى قُدْرَتِنَا وَوَحْدَانِيَّتِنَا وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِلٰى فَنَائِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا خُوِّفُوْا بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ مُعْرِضُوْنَ .

٤. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِىْ مَّا تَدْعُوْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاَصْنَامِ مَفْعُوْلٌ اَوَّلُ اَرُوْنِىْ اَخْبِرُوْنِىْ تَاكِيْدٌ مَاذَا خَلَقُوْا مَفْعُوْلٌ ثَانٍ مِنَ الْاَرْضِ بَيَانٌ ما اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ مُشَارَكَةٌ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ مَعَ اللّٰهِ وَاَمْ بِمَعْنٰى هَمْزَةِ الْاِنْكَارِ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مُّنَزَّلٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ الْقُرْاٰنِ اَوْ اَثٰرَةٍ بَقِيَّةٍ مِّنْ عِلْمٍ يُؤْثَرُ عَنِ الْاَوَّلِيْنَ بِصِحَّةِ دَعْوَاكُمْ فِىْ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ اَنَّهَا تُقَرِّبُكُمْ اِلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِىْ دَعْوَاكُمْ .

অনুবাদ :

১. হা-মীম আল্লাহ তা'আলাই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

২. এই কিতাব আল কুরআন অবতীর্ণ এই বাক্যটি মুবতাদা আল্লাহর নিকট হতে مِنَ اللّٰهِ হলো তার খবর পরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে প্রজ্ঞায় তাঁর কাজ-কর্মে।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলার মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তা বিনাশ হয়ে যাওয়া পর্যন্তের জন্য, যাতে তা আমার ক্ষমতা ও একত্ববাদকে বুঝাতে পারে। কিন্তু কাফেররা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪. আপনি বলুন, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে জানিয়ে দাও। তোমরা যাদেরকে ডাক উপাসনা কর আল্লাহর পরিবর্তে অর্থাৎ মূর্তিদেরকে। এটা প্রথম মাফঊল। আমাকে দেখাও আমাকে জানিয়ে দাও, এটা তাকিদ হয়েছে। এরা কি সৃষ্টি করেছে এটা দ্বিতীয় মাফঊল পৃথিবীতে এটা مَا -এর বয়ান। অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? আল্লাহর সাথে। আর এখানে اَمْ টা অস্বীকারমূলক হামযার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর পূর্ববর্তী কোনো কিতাব আসমান থেকে অবতারিত কুরআনের পূর্বে। অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা, যা তোমাদের মূর্তিপূজার দাবির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আসলাফ তথা পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে যে, মূর্তিপূজা তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তোমাদের দাবিতে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. وَمَنْ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَيْ لَا اَحَدٌ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا يَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَيْ غَيْرِهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ الْاَصْنَامُ لَا يُجِيْبُوْنَ عَابِدِيْهِمْ اِلٰى شَيْءٍ يَسْأَلُوْنَهٗ اَبَدًا وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ عِبَادَتِهِمْ غٰفِلُوْنَ لِاَنَّهُمْ جَمَادٌ لَا يَعْقِلُوْنَ.

৫. কে সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত এখানে مَنْ টি ইস্তেফহাম যা نَفِىْ -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ কেউ নেই। যারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে উপাসনা করে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দিবে না আর এরা হলো মূর্তিসমূহ, এরা তাদের উপাসকদের কোনো প্রার্থনার কখনোই কোনোরূপ সাড়া দিবে না। তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। কেননা এগুলো হলো জড় পদার্থ তারা কোনো কিছুই অনুধাবন করে না।

٦. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا اَيِ الْاَصْنَامُ لَهُمْ لِعَابِدِيْهِمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ بِعِبَادَةِ عَابِدِيْهِمْ كٰفِرِيْنَ جَاحِدِيْنَ.

৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ঐগুলো হবে অর্থাৎ মূর্তিগুলো তাদের তাদের উপাসকদের শত্রু এবং ঐগুলো আদের ইবাদত তাদের উপাসকদের উপাসনা অস্বীকার করবে।

٧. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اَيْ اَهْلِ مَكَّةَ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ بَيِّنٰتٍ ظَاهِرَاتٍ حَالٌ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ لِلْحَقِّ اَيِ الْقُرْاٰنِ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ. بَيِّنٌ ظَاهِرٌ

৭. যখন তাদের নিকট অর্থাৎ মক্কাবাসীদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আল কুরআন আবৃত্তি করা হয় بَيِّنٰتٍ টা حَالٌ হয়েছে এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় অর্থাৎ কুরআন তখন কাফেররা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

٨. اَمْ بِمَعْنٰى بَلْ وَهَمْزَةُ الْاِنْكَارِ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط اَيِ الْقُرْاٰنَ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَرْضًا فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهٖ شَيْئًا ط اَيْ لَا تَقْدِرُوْنَ عَلٰى دَفْعِهٖ عَنِّيْ اِذَا عَذَّبَنِيَ اللّٰهُ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ط تَقُوْلُوْنَ فِي الْقُرْاٰنِ كَفٰى بِهٖ تَعَالٰى شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ط وَهُوَ الْغَفُوْرُ لِمَنْ تَابَ الرَّحِيْمُ بِهٖ فَلَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوْبَةِ.

৮. তবে কি তারা বলে যে, তিনি এটা অর্থাৎ কুরআন উদ্ভাবন করেছেন। আপনি বলুন, আমি যদি এটা উদ্ভাবন করে থাকি ধরে নাও/ মনে কর। তবে তো তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহ যখন আমাকে শাস্তি দিবেন তখন তোমরা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত রয়েছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। কুরআন সম্পর্কে তোমরা যা বলছ সে ব্যাপারে। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল যে তওবা করে তার জন্য। পরম দয়ালু। এ কারণেই তিনি তোমাদের শাস্তিকে ত্বরান্বিত করছেন না।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٩. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا بَدِيْعًا مِّنَ الرُّسُلِ اَيْ اَوَّلَ مُرْسَلٍ قَدْ سَبَقَ مِثْلِيْ قَبْلِيْ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَكَيْفَ تُكَذِّبُوْنَنِيْ وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ط فِي الدُّنْيَا اُخْرَجُ مِنْ بَلَدِيْ اَمْ اُقْتَلُ كَمَا فُعِلَ بِالْاَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ اَوْ تُرْمَوْنَ بِالْحِجَارَةِ اَمْ يُخْسَفُ بِكُمْ كَالْمُكَذِّبِيْنَ قَبْلَكُمْ اِنْ مَا اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ اَيِ الْقُرْاٰنَ وَلَا اَبْتَدِعُ مِنْ عِنْدِيْ شَيْئًا وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ.

৯. বলুন, আমি কোনো নতুন রাসূল নই, অর্থাৎ আমিই তো প্রথম রাসূল নই। আমার পূর্বেও তো অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তবে তোমরা কোন ভিত্তির উপর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ। আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে? পৃথিবীতে আমি কি আমার নগরী হতে বহিষ্কৃত হবো নাকি আমি নিহত হবো? যেমনটি আমার পূর্বের নবীগণের সাথে করা হয়েছে। নাকি তোমাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা হবে, না মাটিতে দাবিয়ে দেওয়া হবে তোমাদের পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের ন্যায়। আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয় তারই অনুসরণ করি। আর আমার পক্ষ থেকে কোনো কিছুই উদ্ভাবন করি না। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

١٠. قُلْ اَرَاَيْتُمْ اَخْبِرُوْنِيْ مَاذَا حَالُكُمْ اِنْ كَانَ اَيِ الْقُرْاٰنُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ عَلٰى مِثْلِهٖ اَيْ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَاٰمَنَ الشَّاهِدُ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ط تَكَبَّرْتُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ بِمَا عَطَفَ عَلَيْهِ اَلَسْتُمْ ظَالِمِيْنَ دَلَّ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

১০. আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের অবস্থা কিরূপ? যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ আল কুরআন আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর এটা جُمْلَة حَالِيَة বা অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য। অথচ বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষ্য দিয়েছে তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে অর্থাৎ এ ব্যাপারে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করল। আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে ঈমান হতে অহঙ্কার করলে। আর جَوَاب شَرْط তার উপর عَطْف সহকারে اَلَسْتُمْ ظَالِمِيْنَ যার উপর اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ বুঝাচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ জালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَحْقَافٌ : এটা حِقْفٌ -এর বহুবচন। বালুর লম্বা ও উঁচু টিলাকে حِقْفٌ বলে। اَحْقَافٌ নামে ইয়েমেনের একটি উপত্যকাও রয়েছে, আদ সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল 'আহকাফ'। এটা হাযরামাউতের উত্তরে এভাবে অবস্থিত, যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি বলা হয়। পূর্বকালে হাযরামাউত ও নজরানের মধ্যবর্তী স্থানে আদে ইরম অর্থাৎ আদে উলার প্রসিদ্ধ গোত্রের বসবাস ছিল। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের নাফরমানির কারণে সাইমুম বা ধূলো ঝড়ের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব নাজ্জার কাসাসুল আম্বিয়ার ৭১নং পৃষ্ঠায় হাযরামাউত অধিবাসী আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ওমর ইবনে ইয়াহইয়া আলাভীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, সে একটি দলের সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাচীন আবাসের খোঁজে হাযরামাউতের উত্তরাঞ্চলীয় ময়দানে অবস্থান করেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর টিলাসমূহের কারুকার্যের মধ্যে মর্মর পাথরের কিছু পাত্র পাওয়া যায়, যাতে ধ্বংস স্তূপের মাঝেও কিছু খোদাইকৃত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো পূজির স্বল্পতার কারণে এর গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। -[লুগাতুল কুরআন]

জ্ঞাতব্য : ১৯৯২ সালে খনন কাজের সময় আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষের প্রকাশ পেয়েছে যা ছবিতে স্পষ্টই ফুটে উঠেছে।

قَوْلُهُ اِلَّا بِالْحَقِّ : بِالْحَقِّ -এর পূর্বে خَلْقًا উহ্য মেনে মুফাসসির (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِالْحَقِّ টা مُتَلَبِّسًا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে خَلْقًا উহ্য মাসদারের সিফত হয়েছে। মূল ইবারত এরূপ হবে- اِلَّا خَلْقًا مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

قَوْلُهُ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى : এখানে وَاوْ টি হলো عَاطِفَة অর্থাৎ اَجَلٍ -এর আতফ اَلْحَقِّ -এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ- بِحَقٍّ وَبِاَجَلٍ مُّسَمًّى তথা আমি আকাশ ও পাতালকে সত্যসহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ এগুলো ধ্বংস হওয়ার একটি নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। আর তা হলো কিয়ামতের দিন। আর বাক্যের মধ্যে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وَاِلَّا بِتَعْيِيْنِ اَجَلٍ مُّسَمًّى

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا : মওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা। আর مُعْرِضُوْنَ হলো তার খবর। আর عَمَّا اُنْذِرُوْا টা مُعْرِضُوْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। مَا হলো اِسْم مَوْصُوْل আর مُعْرِضُوْنَ বাক্য হয়ে সেলাই আর عَائِدٌ উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) بِه উহ্য মেনে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ عَمَّا اُنْذِرُوْا : عَمَّا -এর মধ্যে مَا টা مَوْصُوْل এবং مَصْدَرِيَّة উভয়ই হতে পারে। মওসূলা হওয়ার সুরতে উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- عَنْ عَذَابِ الَّذِيْ اُنْذِرُوْهُ مُعْرِضُوْنَ

قَوْلُهُ قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : ব্যাখ্যাকারের মতে اَرَاَيْتُمْ -এর অর্থ- اَخْبِرُوْنِيْ ; আর تَدْعُوْنَ অর্থ- تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ مَا تَدْعُوْنَ مِنَ الْاَصْنَامِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَخْبِرُوْنِيْ এটা اَرَاَيْتُمْ -এর প্রথম মাফউল এবং مَاذَا خَلَقُوْا বাক্য হয়ে মাফউলে ছানীর স্থলাভিষিক্ত। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, اَرُوْنِيْ এটা اَرَاَيْتُمْ -এর তাকিদ এবং অর্থের দিক হতে اَخْبِرُوْنِيْ -এর অর্থে। এ অবস্থায় এটা تَنَازُعُ الْفِعْلَيْنِ -এর অন্তর্গত হবে। কেননা اَرَاَيْتُمْ এবং اَرُوْنِيْ উভয়টিই দ্বিতীয় মাফউলকে চায়। উভয়টিরই প্রথম মাফউল রয়েছে- مَا تَعْبُدُوْنَ হলো اَرَاَيْتُمْ -এর প্রথম মাফউল। এবং اَرُوْنِيْ -এর মধ্যে نِيْ হলো اَرُوْنِيْ -এর প্রথম মাফউল। আর مَاذَا خَلَقُوْا হলো تَنَازُع فِيْه উভয় ফে'লটিই তাকে নিজের مَفْعُوْل বানাতে চায়। বসরী নাহবীদের মতে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দিয়ে প্রথম মাফউলকে উহ্য মানা হবে।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا : এটা بِكِتَابٍ -এর সিফত যা সাধারণত مُنَزَّلٌ হোক অথবা غَيْر مُنَزَّلٌ হোক অর্থাৎ اِئْتُوْنِيْ -কে مُنَزَّلٌ -কে خَاصّ অর্থাৎ بِكِتَابٍ كَائِنٍ مِّنْ قَبْلِ কিন্তু মুফাসসির (র.) اَبُو الْبَقَاءِ -এর অনুসরণে مِنْ قَبْلِ -এর مُتَعَلِّقٌ উহ্য মেনেছেন। তবে مُطْلَقٌ রাখাটাই অধিক উত্তম। অর্থাৎ- كَائِنٌ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا

قَوْلُهُ اَثَارَةٍ بَقِيَّةٍ : بَقِيَّة -কে অর্থ বর্ণনার জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। اَثَارَةٌ শব্দটি غَوَايَةٌ এবং ضَلَالَةٌ -এর ওজনে মাসদার। এটা আরবদের উক্তি سَمِنَتِ النَّاقَةُ عَلٰى اَثَارَةٍ مِنْ لَحْمٍ اَىْ عَلٰى بَقِيَّةٍ مِنْهُ হতে مُشْتَقّ ; আবার কেউ কেউ اَثَارَة -এর অর্থ رِوَايَة এবং عَلَامَة -ও বর্ণনা করেছেন। মোটকথা হলো اَثَارَة -এর মধ্যে তিনটি মতামত রয়েছে। যথা-

১. اَلْاَثَارَة অর্থ- بَقِيَّة -এটা اَثَرَتِ الشَّيْءُ اِثَارَةً হতে مُشْتَقّ -
২. اَلْاَثَارَة এটা اَلْاَثَرُ হতে অর্থাৎ اَلرِّوَايَةُ وَالنَّقْلُ
৩. اَلْاَثَرُ হতে অর্থ اَلْعَلَامَةُ

এর দ্বারা সেই জ্ঞান উদ্দেশ্য যা পূর্ববর্তীদের থেকে سِيْنَة بِسِيْنَه বর্ণিত হয়ে এসেছে।

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا : এটা كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে بِكِتَابٍ -এর সিফত হয়েছে। আর بِكِتَابٍ এটা اِئْتُوْنِيْ -এর مُتَعَلِّقٌ আর اَثَارَه টা كِتَابٍ -এর উপর مَعْطُوْف হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ : এটা হলো شَرْط -এর جَزَاء যা فَأْتُوْنِيْ উহ্য আছে। আর صَادِقِيْنَ টা كُنْتُمْ -এর খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ الخ : এটা نَكِرَه مَوْصُوْفَه -ও হতে পারে। পরবর্তী বাক্য তার সিফত হবে। মূল ইবারত এরূপ হবে যে مَنْ اَضَلُّ مِنْ شَخْصٍ يَعْبُدُ شَيْئًا لَا يُجِيْبُهُ এবং مَوْصُوْلَه -ও হতে পারে। এ সুরতে পরবর্তী বাক্য তার صِلَه হবে। মূল ইবারত এরূপ হবে যে, مَنْ اَضَلُّ مِنْ شَخْصٍ يَعْبُدُ الشَّيْئَ الَّذِيْ لَا يُجِيْبُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ

قَوْلُهُ مَنْ لَا يُجِيْبُ لَهُ : এটা বাক্য হয়ে يَدْعُوْ -এর مَفْعُوْل بِه হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ : এটা لَا يُجِيْبُ -এর غَايَتْ যার দ্বারা বাহ্যত জানা যায় যে, কিয়ামতের পর اِسْتِجَابَة হবে। এভাবে যে, غَايَتْ টা مُغَيًّا -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়; বরং এখানে غَايَتْ বর্ণনার দ্বারা تَابِيْد উদ্দেশ্য। আর غَايَتْ টা مُغَيًّا -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ جَمَادٌ لَا يَعْقِلُوْنَ : এখানে غَافِلُوْنَ -এর তাফসীর لِاَنَّهُمْ جَمَادٌ الخ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, غَفْلَتْ দ্বারা عَدَم فَهْم উদ্দেশ্য عَدَم تَوَجُّهْ উদ্দেশ্য নয়। وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ -এর মধ্যে প্রথম هُمْ যমীর মূর্তির দিকে। আর দ্বিতীয় هُمْ মূর্তিপূজারীদের দিকে ফিরেছে। مَنْ -এর প্রতি লক্ষ্য করে উভয় যমীরকে বহুবচন নেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকরা মনে করত যে, মূর্তিরা অনুধাবন করতে পারে।

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এটা وَضْعُ الْاِسْمِ مَوْضِعَ الضَّمِيْرِ -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা قَالُوْا বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মক্কাবাসীদের কুফরি সিফতকে বর্ণনা করার জন্য اِسْم ظَاهِرْ -কে اِسْم ضَمِيْر -এর স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ لَمَّا جَاءَهُمْ : এটা قَالَ -এর ظَرْف হয়েছে। আর هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ হলো مَقُوْلَه -

قَوْلُهُ تُفِيْضُوْنَ : এটা اِفَاضَةٌ মাসদার হতে جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ -এর সীগাহ। এটা যখন পানি, অশ্রু ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন এটার অর্থ হয়- বয়ে যাওয়া, প্রবাহিত হওয়া। কিন্তু এটা যখন কথা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যবহার হয় তখন অর্থ হয়- কথাবার্তার মধ্যে খুবই চিন্তাভাবনা করে কথা বলা ও শ্রবণ করা এবং টিপ্পনী কাটা। এখানে টিপ্পনী কাটা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بِدْعًا بَدِيْعًا : بِدْعًا এটা মাসদারও হতে পারে। তবে এই সুরতে মুযাফ উহ্য থাকবে। অর্থাৎ ذَا بِدْعٍ আবার এটাও হতে পারে যে, بِدْعًا টা بَدِيْعًا অর্থে হয়েছে সীগায়ে সিফত। যেমন- خَفٌّ যা خَفِيْفٌ অর্থে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَمَا اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ : প্রথম مَا টি نَافِيَه আর দ্বিতীয় مَا টি اِسْتِفْهَامِيَّة আর তার পরবর্তী অংশ তার খবর এই مَا টা اَدْرِيْ -কে আমল করা থেকে বিরত রেখেছে। এর পরবর্তী অংশ দুই মাফউলের স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ مَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ : এটা প্রকৃত حَصْر নয় যে, এই প্রশ্ন করা যাবে যে, তিনি بَشِيْر ও ; তদুপরি نَذِيْر -এর মধ্যে حَصْر কিভাবে হলো। উত্তর হলো- এটা حَصْر اِضَافِيْ হয়েছে। অর্থাৎ আমার ভয় দেখানো ও সতর্ক করা আল্লাহরই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আবার নিজের পক্ষ থেকে কিছুই নয়। যেমনটি আপনাদের ধারণা।

قَوْلُهُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ : اَرَاَيْتُمْ বাক্যটি قَوْل -এর مَقُوْل হয়েছে اَرَاَيْتُمْ -এর উভয় মাফউলই উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হবে- اَخْبِرُوْنِيْ مَاذَا حَالُكُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ শর্ত এবং তার উপর مَعْطُوْف হওয়ার জবাব উহ্য রয়েছে। আল্লামা মহল্লী (র.) اَلَسْتُمْ ظَالِمِيْنَ উহ্য মেনে যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন উল্লিখিত জবাবে শর্তের উহ্য মানা আল্লামা যমখশারী (র.)-এর ভাষ্য মতে। কিন্তু আবূ হাইয়ান এটাকে বাতিল করে বলেন যে, যদি যমখশরীর বর্ণিত উহ্যকরণ মেনে নেওয়া হয় তবে তো فَاء আনয়ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, যখন جُمْلَه اِسْمِيَّة টা جَوَاب شَرْط হয় তখন তাতে فَاء আনা আবশ্যক হয়ে থাকে। এ কারণেই অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম فَقَدْ ظَلَمْتُمْ 'জবাবে শর্ত' উহ্য মেনেছেন। -[ইরাবুল কুরআন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহকাফ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আহকাফ মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় ৪ রুকূ, ৩৫ আয়াত, ৬৪৪টি বাক্য এবং ২,৬০০ অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ : 'আহকাফ' ইয়েমেনের অন্তর্গত একটি স্থানের নাম, যেখানে আদ জাতির বসবাস ছিল। 'আহকাফ' শব্দটি 'হকফ' -এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ হলো বালুর স্তূপ। আলোচ্য সূরায় আদ জাতির নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে, যেন পৃথিবীর অন্যত্র অবস্থানকারী নাফরমানদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয়। এজন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আহকাফ'।

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় :

১. প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রমাণিত করা, কেননা যতক্ষণ তাঁকে আল্লাহ পাকের নবী হিসেবে কেউ মেনে নেবে না, ততক্ষণ পবিত্র কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করবে না। এজন্যে সর্বপ্রথম এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, তাই ইরশাদ হয়েছে- تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ অর্থাৎ সর্বশক্তিমান, বিজ্ঞানময় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে [হে রাসূল!] আপনার প্রতি মহান গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের নিকট থেকে প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি কিতাব নাজিল হওয়াই তাঁর রিসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২. স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রমাণ। ইরশাদ হচ্ছে- مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ পাকই আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা তিনি এক, অদ্বিতীয়, আর তিনিই উপাস্য, কেননা পৃথিবীর কোনো কিছুই আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, আল্লাহ পাকই তাঁর "কুন" আদেশ দ্বারা সবকিছুকে যথাযথভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করাই হলো বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য। -[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃ. ৪২৩]

এ সূরার আমল : সূরা আহকাফ লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে জিন ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার মৃত্যুর সময় মালাকুল মওত হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে তার নিকট আসবেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে কিয়ামতের দিনের সত্যতার ঘাষণা রয়েছে। আর এ সূরার সূচনাতেই পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং কেয়ামতের আলোচনা রয়েছে। কুরআনে কারীমে এ দুটি বিষয়ের আলোচনা প্রায়শ কাছাকাছিই থাকে, আর এটি উভয় সূরার যোগসূত্র। -[বয়ানুল কুরআন পৃ. ৯৬৭]

قَوْلُهُ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ : এসব আয়াতে মুশরিকদের দাবি বাতিল করার জন্য তাদের দাবির সপক্ষে দলিল চাওয়া হয়েছে। কেননা সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত কানো দাবি গ্রহণীয় হয় না। দলিলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের দাবির পক্ষে কোনো প্রকার দলিল নেই। তাই এহেন দলিলবিহীন দাবিতে অটল থাকা নিরেট পথভ্রষ্টতা। আয়াতে দলিলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. যুক্তিভিত্তিক দলিল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছে- اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمَاوَاتِ

২. ইতিহাসভিত্তিক দলিল। বলাবাহুল্য, আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলিলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যেমন- তাওরাত, ইঞ্জীল, কুরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূলগণের উক্তি। এ দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে- اِيْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ তোমাদের মূর্তিপূজার কোনো দলিল থাকলে কোনো ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তিপূজার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ রাসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে, اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অর্থাৎ কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রাসূলগণের পরম্পরাগত কোনো উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পথভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

اَثَارَةٍ : শব্দটি شَجَاعَةٌ ও سَمَاحَةٌ -এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ- উদ্ধৃত করা, রেওয়ায়েত করা। এ কারণে ইকরিমা ও মুতাকিল (র.) এর তাফসীরে 'পয়গাম্বরগণ থেকে রেওয়ায়েত' বলেছেন। -[কুরতুবী]

সারকথা এই যে, দু'রকম দলিল গ্রহণযোগ্য- কোনো পয়গাম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গাম্বরের উক্তি। আয়াতে اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরো কিছু তাফসীর করেছেন, যা কুরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَمَا أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ : এ আয়াতে إِنْ أَتَّبِعُ বাক্যটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তাফসীরবিদ যাহহাক (র.) এ আয়াতের যে তাফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উম্মতের মুমিন ও কাফেরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক– তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে– تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কুরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ তা'আলার মতো নই এবং এসব জ্ঞানে স্বেচ্ছাধীনও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেওয়া হয়, আমি ততটুকই বর্ণনা করি।

তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, যতদিন আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যায়েদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের খুঁটিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোনো উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জানলেও নবুয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব : এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়; বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন, যা অন্য কোনো পয়গাম্বরকে দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্থিব অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে 'আমি জানি না' বলা হয়েছে– পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা পারলৌকিক বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, মুমিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ .... عُلَمَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ : এ আয়াতের এবং সূরা শু'আরার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও কুরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিতাব সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্যও কি এই মূর্খদের জন্য যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার নবুয়ত দাবিকে ভ্রান্ত এবং কুরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জবাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবি করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরি, যাতে জনসাধারণ প্রতারিত না হয়। এ জবাবই যথেষ্ট; কিন্তু তোমরা যদি না মান, তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবি যদি সত্য হয় এবং কুরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করে যাও, তবে তোমাদের পরণতি কি হবে, বিশেষত যখন তোমাদের বনী ইসরাঈলেরই কোনো মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেও মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জিদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোনো বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদি আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামসহ যত ইহুদি ও খ্রিস্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাজিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক প্রমুখ তাফসীরবিদ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থি। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَيْ فِيْ حَقِّهِمْ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ط وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا اَيِ الْقَائِلُوْنَ بِهٖ اَيْ بِالْقُرْاٰنِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اَيِ الْقُرْاٰنُ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ـ

১১. মুমিনদের সম্পর্কে কাফেররা বলে অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে যদি এটা ঈমান ভালো হতো, তবে তারা এর দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারত না। আর যখন তারা এর দ্বারা অর্থাৎ কুরআন দ্বারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়নি অর্থাৎ এর প্রবক্তারা তখন তারা অবশ্য বলবে, এটা তো অর্থাৎ আল-কুরআন এক পুরাতন মিথ্যা।

١٢. وَمِنْ قَبْلِهٖ اَيِ الْقُرْاٰنِ كِتٰبُ مُوْسٰى اَيِ التَّوْرٰىةِ اِمَامًا وَّرَحْمَةً ط لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِهٖ حَالَانِ وَهٰذَا اَيِ الْقُرْاٰنُ كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِلْكُتُبِ قَبْلَهٗ لِّسَانًا عَرَبِيًّا حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِيْ مُصَدِّقٌ لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ق مُشْرِكِيْ مَكَّةَ وَ هُوَ بُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

১২. এর পূর্বে ছিল কুরআনের পূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর কিতাব অর্থাৎ তাওরাত আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ মুমিনদের জন্য। اِمَامًا এবং رَحْمَةً উভয়টি كَائِنٌ مِنْ كِتَابِ مُوْسٰى থেকে حَالٌ হয়েছে, আর এটা কুরআন সত্যায়নকারী কিতাব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের আরবি ভাষায় এটা مُصَدِّقٌ-এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। যেন এটা জালিমদেরকে সতর্ক করে অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদেরকে এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় মুমিনদেরকে।

١٣. اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّاعَةِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ج

১৩. যারা বলে আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ। অতঃপর অবিচল থাকে আনুগত্যের উপর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

١٤. اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج حَالٌ جَزَآءً مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ اَيْ يُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

১৪. তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এখান خَالِدِيْنَ শব্দটি حَالٌ হয়েছে। তারা যা করত তার পুরস্কারস্বরূপ এখানে جَزَاءً শব্দটি স্বীয় ফে'ল উহ্য থাকার মাধ্যমে মাসদারের ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ يُجْزَوْنَ جَزَاءً

١٥. وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَفِيْ قِرَاءَةٍ اِحْسَانًا اَيْ اَمَرْنَاهُ اَنْ يُّحْسِنَ اِلَيْهِمَا فَنُصِبَ اِحْسَانًا عَلَى الْمَصْدَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَمِثْلِهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط اَيْ عَلٰى مَشَقَّةٍ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ من الرضاع ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط

১৫. আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। অন্য কেরাতে اِحْسَانًا রয়েছে। অর্থাৎ আমি তাকে তাদের প্রতি বিনয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। আর اِحْسَانًا টা ফে'ল উহ্য থাকার কারণে মাসদারের ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। حُسْنًا টি অনুরূপই। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ করতেও তার স্তন্য ছাড়াতে ত্রিশ মাস।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سِتَّةُ اَشْهُرٍ اَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَالْبَاقِىْ اَكْثَرُ
مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَقِيْلَ اِنْ حُمِلَتْ بِهٖ سِتَّةً
اَوْ تِسْعَةً اَرْضَعَتْهُ الْبَاقِىْ حَتّٰى غَايَةً
لِجُمْلَةٍ مُقَدَّرَةٍ اَىْ وَعَاشَ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ
هُوَ كَمَالُ قُوَّتِهٖ وَعَقْلِهٖ وَرَأْيِهٖ اَقَلُّهٗ ثَلَاثٌ
وَّثَلٰثُوْنَ سَنَةً وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اَىْ تَمَامَهَا
وَهُوَ اَكْثَرُ الْاَشُدِّ قَالَ رَبِّ اِلٰى اٰخِرِهٖ نَزَلَ فِىْ
اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ لَمَّا بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً
بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ مَبْعَثِ النَّبِىِّ ﷺ اٰمَنَ بِهٖ
ثُمَّ اٰمَنَ اَبَوَاهُ ثُمَّ ابْنُهٗ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَابْنُ عَبْدِ
الرَّحْمٰنِ اَبُوْ عَتِيْقٍ اَوْزِعْنِىْٓ اَلْهِمْنِىْ اَنْ
اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ
وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَهِىَ التَّوْحِيْدُ وَاَنْ اَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضٰىهُ فَاَعْتَقَ تِسْعَةً مِّنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ فِى اللّٰهِ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ
ذُرِّيَّتِىْ فَكُلُّهُمْ مُؤْمِنُوْنَ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ
وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

ছয় মাস হলো গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময় আর দুই বছর বা চব্বিশ মাস হলো দুগ্ধ ছাড়ানোর সর্বোচ্চ সময়। বলা হয়েছে যে, যদি বাচ্চা ছয় মাস বা নয় মাস গর্ভে থাকে তবে অবশিষ্ট সময় তাকে দুগ্ধ পান করানো হবে। ক্রমে যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় حَتّٰى টা উহ্য বাক্যের غَايَة অর্থাৎ وَعَاشَ حَتّٰى আর اَشُدّ অর্থ হলো– তার শক্তি, জ্ঞান ও মতামতে পূর্ণতায় পৌঁছে যাওয়া। এর সর্বনিম্ন সময় হলো তেত্রিশ বছর এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় অর্থাৎ পূর্ণ চল্লিশ বৎসর। আর এটা হলো পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার সর্বোচ্চ সময়। তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। রাসূল ﷺ প্রেরিত হওয়ার দু'বৎসর পর যখন তাঁর বয়স চল্লিশে উপনীত হলো তখন তিনি রাসূল ﷺ -এর উপর ঈমান আনলেন, এরপর তার পিতামাতা ঈমান আনলেন, অতঃপর তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান এবং নাতি আবূ আতীক ঈমান আনলেন। তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও আমাকে ইলহাম কর। যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য আর তা হলো তাওহীদ তথা একত্ববাদের নিয়ামত। এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তিনি এমন নয়জন মুমিন কৃতদাস মুক্ত করেছেন যাদেরকে আল্লাহর পথে নির্যাতন করা হচ্ছিল। আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর সুতরাং তাঁরা সকলেই ঈমান এনেছিলেন। আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

١٦. اُولٰٓئِكَ اَىْ قَائِلُوْا هٰذَا الْقَوْلِ اَبُوْ بَكْرٍ
وَغَيْرُهٗ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ
بِمَعْنٰى حَسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ
سَيِّاٰتِهِمْ فِىْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ط حَالٌ اَىْ
كَائِنِيْنَ فِىْ جُمْلَتِهِمْ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ
كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَعَدَ
اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ .

১৬. আমি এদেরই এ উক্তির প্রবক্তা হযরত আবূ বকর (রা.) ও অন্যান্যদের সুকীর্তিগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলো ক্ষমা করি, তাঁরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। فِىْ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ এটা حَالٌ হয়েছে অর্থাৎ كَائِنٌ مِنْ جُمْلَةِ اَهْلِ الْجَنَّةِ এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য। সেই প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে রয়েছে وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ

Free @ www.e-ilmweebly.com

١٧. وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْإِفْرَادِ أُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ أُفٍّ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا بِمَعْنَى مَصْدَرٍ اَىْ نَتْنًا وَقُبْحًا لَّكُمَآ اَتَضْجَرُ مِنْكُمَا اَتَعِدَانِنِىْٓ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِدْغَامِ اَنْ اُخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ الْاُمَمُ مِنْ قَبْلِىْ ج وَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْقُبُوْرِ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ يَسْأَلَانِهِ الْغَوْثَ بِرُجُوْعِهِ وَيَقُوْلَانِ اِنْ لَمْ تَرْجِعْ وَيْلَكَ اَىْ هَلَاكَكَ بِمَعْنَى هَلَكْتَ اٰمِنْ ق بِالْبَعْثِ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ بِهِ حَقٌّ ج فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اَىِ الْقَوْلُ بِالْبَعْثِ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكَاذِيْبُهُمْ .

১৭. আর এমন লোক রয়েছে যে তার মাতাপিতাকে বলে অন্য এক কেরাতে اِفْرَادٌ বা এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য। আফসোস তোমাদের জন্য اُفٍّ -এর فَاء টি যের ও যবর উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। মাসদারের অর্থে অর্থাৎ তোমাদের জন্য দুর্গন্ধ ও মন্দতা, আমি তোমাদের থেকে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছি। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, অন্য কেরাতে ইদগামের সাথে اَتَعِدَانِّىْ রয়েছে। আমি পুনরুত্থিত হবো কবর থেকে যদিও আমার পূর্বে বহুপুরুষ গত হয়েছে উম্মত গত হয়েছে। অথচ তাদেরকে কবর থেকে বের করা হয়নি। তখন তার মাতাপিতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে অর্থাৎ তার ঈমানের দিকে ফিরে আসার দোয়া করেন এবং বলেন, যদি তুমি ফিরে না আস। দুর্ভোগ তোমার জন্য অর্থাৎ هَلَاكَكَ অর্থাৎ هَلَكْتَ ঈমান নিয়ে এসো/বিশ্বাস স্থাপন কর পুনরুত্থানের উপর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে এটা তো অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কিত কথা অতীতকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাদের মিথ্যা উপাখ্যান।

١٨. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ بِالْعَذَابِ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ .

১৮. এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে শাস্তির ব্যাপারে। এদের পূর্বে জিন ও মানব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মতো। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

١٩. وَلِكُلٍّ مِنْ جِنْسِ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ دَرَجٰتٌ فَدَرَجَاتُ الْمُؤْمِنِ فِى الْجَنَّةِ عَالِيَةٌ وَدَرَجَاتُ الْكَافِرِ فِى النَّارِ سَافِلَةٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ج اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْكَافِرُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِىْ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَىِ اللّٰهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ اَعْمَالَهُمْ اَىْ جَزَاءَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا يُنْقَصُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيُزَادُ لِلْكُفَّارِ .

১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা মুমিন ও কাফেরদের মধ্য থেকে। সুতরাং মুমিনের মর্যাদা হলো সুউচ্চ জান্নাত। আর কাফেরের মর্যাদা হলো সর্বনিম্ন জাহান্নাম। তার কর্মানুযায়ী অর্থাৎ মুমিন যারা আনুগত্যের কাজ করেছেন এবং কাফের যারা অবাধ্যতার কাজ করেছেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন। অর্থাৎ তার প্রতিদান। لِيُوَفِّيَهُمْ এটা অন্য কেরাতে نُوْن যোগে لِنُوَفِّيَهُمْ -ও পঠিত রয়েছে। এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। বিন্দুমাত্রও যে, মুমিনদের পুণ্যকর্ম হ্রাস করা হবে আর কাফেরদের পাপের বোঝা বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২০. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط بِاَنْ تُكْشَفَ لَهُمْ يُقَالُ لَهُمْ اَذْهَبْتُمْ بِهَمْزَةٍ وَبِهَمْزَتَيْنِ وَبِهَمْزَةٍ وَمُدَّةٍ وَبِهِمَا وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ طَيِّبٰتِكُمْ بِاشْتِغَالِكُمْ بِلَذَّاتِكُمْ فِيْ حَيٰوتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ تَمَتَّعْتُمْ بِهَا ج فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ اَيِ الْهَوَانِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ تَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ بِهٖ وَتُعَذَّبُوْنَ بِهَا .

২০. যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে এভাবে যে, তাদের সম্মুখে জাহান্নামের পর্দা খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তোমরা তো তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছ। তোমরা এগুলোর স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে। اَذْهَبْتُمْ শব্দটি এক হামযাসহ ও দুই হামযাসহ এবং একই হামযা ও মদসহ এবং উভয়ভাবে এবং দ্বিতীয়টিকে تَسْهِيْل করে পঠিত রয়েছে। এবং সেগুলো উপভোগও করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেওয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি هُوْن টি هَوَان অর্থে হয়েছে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী। জাহান্নামের মাধ্যমে তোমাদেরকে তারই শাস্তি দেওয়া হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا : لَوْ টা হরফে শর্ত خَيْر এটা جُمْلَه হয়ে شَرْط আর مَا سَبَقُوْنَا এটা جُمْلَة হয়ে جَزَاء শর্ত ও জাযা মিলে قَالَ -এর مَقُوْلَه হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ : اِذْ -এর আমেল উহ্য রয়েছে অর্থাৎ ظَهَرَ عِنَادُهُمْ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ এখানে اِذْ -এর মধ্যে فَسَيَقُوْلُوْنَ -এর আমেল হওয়া দুই কারণে বৈধ নয়।

প্রথমত উভয়টির কাল ভিন্ন ভিন্ন। اِذْ টা مَاضِىْ -এর জন্য আর فَسَيَقُوْلُوْنَ হলো مُسْتَقْبِلْ -এর জন্য।

দ্বিতীয়ত فَاء টা তার مَا بَعْد -কে مَا قَبْل -এর জন্য প্রতিবন্ধক।

قَوْلُهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتَابُ مُوْسٰى : مِنْ قَبْلِهٖ টা كَائِنٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে خَبَرِ مُقَدَّمْ হয়েছে। আর كِتَابُ مُوْسٰى হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ এ বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ اِمَامًا وَّرَحْمَةً : উভয় خَبَرِ مُقَدَّمْ -এর মধ্যে كَائِنٌ -এর যমীর থেকে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর আবূ ওবাইদ এটাকে جَعَلْنَاهُ উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب বলেছেন। -[ফতহুল কাদীর; আল্লামা শাওকানী (র.)]

قَوْلُهُ لِسَانًا عَرَبِيًّا : এটা مَوْصُوْف এবং صِفَتْ মিলে مُصَدِّقٌ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। আর مُصَدِّقٌ -এর যমীর كِتَابٌ -এর দিকে ফিরেছে। لِيُنْذِرَ হলো مُصَدِّقٌ -এর মুতা'আল্লিক।

قَوْلُهُ اَىْ عَلٰى مَشَقَّةٍ : এ ইবারতের মাধ্যমে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, كُرْهًا টা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। মূলত ছিল عَلٰى كُرْهٍ। আবার কেউ কেউ حَالْ হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب বলেছেন। অর্থাৎ ذَاتَ كُرْهٍ আবার কেউ কেউ উহ্য মাসদারের সিফত হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب বলেছেন। অর্থাৎ حَمْلًا كُرْهًا

قوله ثلثون شهرا : এই বাক্যে কিছু জিনিস উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- مُدَّةُ حَمْلِهٖ وَفِصَالِهٖ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ : এটা كَائِنِيْنَ উহ্যের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে عَنْهُمْ -এর যমীর থেকে حَالْ হয়েছে। যেমনটি ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন এবং এরূপই যেমন আরবীয়দের উক্তি- أَكْرَمَنِى الْأَمِيْرُ فِى أَصْحَابِهِ অর্থাৎ فِى جُمْلَتِهِمْ আবার কেউ কেউ فِى কে مَعَ অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ مَعَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ আবার অন্যান্যরা এটাকে উহ্য মুবতাদার খবর বলেছেন। অর্থাৎ- هُمْ فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ

قَوْلُهُ وَعْدَ الصِّدْقِ : وَعْدًا টা উহ্য ফে'লের মাসদার হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ- وَعَدَهُمُ اللّٰهُ وَعْدَ الصِّدْقِ

قَوْلُهُ وَفِى قِرَاءَةٍ بِالْإِفْرَادِ : অর্থাৎ হিশামের কেরাতে لِوَالِدَيْهِ -এর পরিবর্তে لِوَالِدِهِ রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো جِنْس وَالِدْ যা বহুবচনের অর্থে।

قَوْلُهُ أُفٍّ : أُفٍّ শব্দটি যেরযুক্ত তানভীনসহ ও তানভীনবিহীন এবং তানভীনবিহীন যবর দ্বারা। আর أَفَّ. يَؤُفُّ. أَفًّا হতে মাসদার অর্থ- قُبْحًا এবং نَتْنًا ; ইমাম কারখী (র.) বলেন, এটা يَؤُفُّ. أَفَّ -এর মাসদার যা تَبًّا ও قُبْحًا অর্থে। أُفٍّ -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

১. মাসদার ২. اِسْم صَوْت ৩. اِسْم فِعْل এই তিনটির মধ্য হতে মুফাসসির (র.) দুটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। بِمَعْنَى مَصْدَرْ দ্বারা প্রথমটির দিকে এবং أَتَضَجَّرُ দ্বারা দ্বিতীয়টির দিকে। মনে হয় যেন মুফাসসির (র.) এটা বলতেছেন যে, উভয় তাফসীরই বৈধ। যাবতীয় ময়লা আবর্জনাকে أُفٍّ বলে। যেমন কর্তিত নখ ইত্যাদি। আর এ হিসেবেই কোনো জিনিসের প্রতি ঘৃণা বুঝাতে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ফতহুল কাদীরে কাজী শাওকানী (র.) সূরা ইসরার ব্যাখ্যায় আসমায়ী-এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, أُفٍّ হলো কানের ময়লা, আর تُفٌّ হলো নখের ময়লা। কোনো জিনিসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য أُفٍّ বলা হয়। সুতরাং এ অর্থেই এর অধিক ব্যবহার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তুতেই আরবগণ এটাকে ব্যবহার করতে লাগল।

ছালাব থেকে ইবনে আরাবী (র.) বর্ণনা করেন যে, أُفٍّ যা أُفُفٌ -এর মূল এর অর্থ অন্তর ছোট হওয়া, সঙ্কীর্ণ হওয়া। আল্লামা যুজাজ (র.)-এর অর্থ দুর্গন্ধ বলেছেন। -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ هَلَاكَكَ : এখানে وَيْلَكَ -এর তাফসীর هَلَاكَكَ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, وَيْلَكَ তার সমজাতীয় উহ্য ফে'ল হতে مَنْصُوْب হয়েছে, আর তা হলো هَلَكَ কেননা وَيْلٌ -এর ফে'ল ব্যবহার হয় না। আর অর্থের ক্ষেত্রে ধ্বংসের অর্থ দেয়। যা আপাতদৃষ্টে বদদোয়া। কিন্তু এটা দ্বারা বদদোয়া উদ্দেশ্য হয় না; বরং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ও ঈমানের দিকে লালায়িত করা উদ্দেশ্য হয়। প্রকৃত ধ্বংস উদ্দেশ্য নয়। যেমন- মা স্বীয় সন্তানকে বলে যে, তুই মর, এমন করিস না। وَيْلَكَ -এর ফার্সী অর্থ হলো وے برتر অর্থাৎ তোমার উপর আফসোস!

قَوْلُهُ دَرَجَاتٌ : বাক্যের মধ্যে تَغْلِيْب হয়েছে। অন্যথায় জাহান্নামের دَرَكَاتٌ -কে دَرَجَاتٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ يَوْمَ يُعْرَضُ : এখানে يَوْمَ টা উহ্য ফে'ল يُقَالُ لَهُمْ থেকে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ أَذْهَبْتُمْ : অধিকাংশের নিকট এটা একটি হামযার সাথে পঠিত। অর্থাৎ هَمْزَه اِسْتِفْهَامْ ব্যতীত। এবং উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং এক হামযা এবং মদের সাথে। আর এটা হিশামের অভিমত এবং দুই হামযার সাথে হবে তবে দ্বিতীয় হামযায় মদবিহীন تَسْهِيْل হবে। এটা ইবনে কাছীরের অভিমত।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ : এটা تَسْتَكْبِرُوْنَ -এর সিফতে কাশেফাহ। কেননা, অহঙ্কার তো অন্যায়ই হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখার যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তার কোনো যুক্তিপূর্ণ উত্তর খুঁজে না পেয়ে কাফের মুশরিকরা বলল, পবিত্র কুরআন বা দীন ইসলাম যদি উত্তম কিছু হতো, তবে সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা কি পেছনে পড়ে থাকতো আর দারিদ্র্যপীড়িত, বিপদগ্রস্ত লোকেরাই এ ধর্ম গ্রহণে অগ্রবর্তী হতো? এমন তো হতে পারে না।

শানে নুযূল : ইবনে জারীর (র.) তাফসীরকার কাতাদা (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েকজন মুশরিক বলেছিল, আমরা সমাজে সম্মানের অধিকারী, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের চেয়ে আমরা ভালো অবস্থায় রয়েছি, যদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হতো, তবে আমরাই তাদের পূর্বে তা গ্রহণ করতাম, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনুল মুনজির আওন ইবনে আবি শাদ্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা.)-এর রানীন নাম্নী একটি বাঁদি ছিল, সে তাঁর মুসলমান হওয়ার পূর্বে ঈমান এনেছিল। হযরত ওমর (রা.) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতেন। তখন কাফেররা বলতো, যদি ইসলাম কোনো উত্তম বস্তু হতো, তবে রানীন নাম্নী বাঁদি আমাদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করতে পারতো না। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে সা'দ (র.) যাহ্হাক এবং হাসান বসরী (র.) সূত্রে এ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا إِفْكٌ قَدِيْمٌ : কাফেরদের এ উক্তির মূল কারণ হলো, তারা হেদায়েতের সৌভাগ্য লাভ করেনি, এটি তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা হেদায়েত থেকে মাহরুম হয়েছে। আর এজন্যেই তারা কুরআনে কারীমকে পুরাতন মিথ্যা বলেছে, অর্থাৎ পূর্বকালে যেভাবে মিথ্যা দাবি করা হতো, এটিও তেমনি মিথ্যা দাবি।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, ইসলামের অগ্রযাত্রা দেখে আরবের কাফের এবং ইহুদিরা সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বলতে থাকলো, যদি ইসলাম ধর্ম সত্য হতো, তবে সকলের আগে আমরাই তা গ্রহণ করতাম। আর যেহেতু আমরা এ ধর্ম গ্রহণ করিনি, এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এতে কোনো কল্যাণ নেই। [নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক]

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ : অহংকার ও গর্ব ও মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালোমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেই বোকা। কাফেরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হতো, তবে সর্বাগ্রে তা আমাদের পছন্দনীয় হতো। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য!

قَوْلُهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوْسٰى إِمَامًا وَرَحْمَةً : এ আয়াত থেকে প্রথমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অভিনব রাসূল এবং কুরআন কোনো অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে; বরং এর আগে হযরত মূসা (আ.) রাসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তাওরাত নাজিল হয়েছিল। ইহুদি ও খ্রিস্টান কাফেররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়ত এতে شَهِدَ شَاهِدٌ বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা হযরত মূসা (আ.) ও তাওরাত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালিমদের জন্য শাস্তিবাণী এবং মুমিনদের জন্য সাফল্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য প্রথম দু'আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম আয়াত অর্থাৎ- إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। رَبُّنَا اللّٰهُ বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং إِسْتِقَامَةٌ শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানে অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। إِسْتِقَامَةٌ-এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সিজদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোনো দুঃখ-কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী চার আয়াতে মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতামাতার অনুগ্রহ, সন্তানের জন্য শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌঁছার পর মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কুরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবাযত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহর তাওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরতুবীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক প্রকার সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা মানুষ তাদের পিতামাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং কেউ সদ্ব্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুষ্টয়ের আসল বিষয়বস্তু হলো পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তাফসীরে মাযহারীতে وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ বাক্যে إِنْسَانٌ -এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, হযরত আবূ বকর (রা.)। বলাবাহুল্য কুরআনের কোনো আয়াত অবতরণর কারণ কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত আবূ বকর (রা.) হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লিখিত বিশেষ গুণাবলি তাঁরই গুণাবলি হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবূ বকর (রা.) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলি হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুন–

قَوْلُهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا : وَصِيَّةٌ শব্দের অর্থ তাকিদপূর্ণ নির্দেশ এবং إِحْسَانٌ -এর অর্থ সদ্ব্যবহার। এতে সেবাযত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا : كُرْهٌ শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা মানুষ কোনো কারণবশত সহ্য করে থাকে এবং كَرْهٌ -এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই إِكْرَاهٌ শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকিদ। অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতার অপেক্ষা বেশি : আয়াতের শুরুতে পিতামাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরি। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্য লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তানের উপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন– صِلْ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ অর্থাৎ মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

قَوْلُهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا : এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রা.) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব স্তন্যদানের দু'বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান গনী (রা.)-এর খেলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা সাধারণ নিয়ম ছিল নয়; বরং সাধারণ নিয়ম হচ্ছে– সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া। হযরত আলী (রা.) এ সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। –[কুরতুবী]

এ কারণেই সমস্ত আলেম একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে কুরআন এ সম্পর্কে কোনো ফায়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয়মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্ন রূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোনো কোনো নারীর দুধই হয় না এবং কারো কারো দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা উক্ত মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের ব্যাপারে ফিকহবিদদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। ইমাম মালেক থেকে চার বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর ইত্যাদি বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে চার বছর। –[মাযহারী]

স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কালের সাথে স্তন্যদান হারাম হওয়ার বিধানও সম্পৃক্ত। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে এই সময়কাল দু'বছর। একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আড়াই বছর পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করা যায়। এর অর্থ এই যে, শিশু দুর্বল হলে, স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য গ্রহণ না করলে অতিরিক্ত ছ'মাস স্তন্যদানের অনুমতি রয়েছে। কারণ এ বিষয়ে সবাই একমত যে, স্তন্যদানের দু'বছরের সময়কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুকে পান করানো হারাম।

قَوْلُهُ حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً : أَشُدَّ-এর শাব্দিক অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। সূরা আন'আমে এর তফসীর করা হয়েছে 'প্রাপ্তবয়স' বলে। এ আয়াতেও কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন। অতঃপর بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً -কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে, بَلَغَ أَشُدَّهُ ও بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর حَتّٰى إِذَا بَلَغَ বলার অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্তিশালী হলো এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে স্রষ্টা ও পালনকর্তার অভিমুখী হওয়ার তাওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে লাগল–

رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দীয় সৎকর্ম করি, আমার সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এটা কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকবে। এ কারণেই তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এরূপ করে। কুরতুবীতে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের দলিল। সে রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) সে সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ أَشُدَّهُ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়ত দান করলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গল, তখন তিনি উল্লিখিত দোয়া করলেন। আয়াতে بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ দোয়াও কবুল করেন এবং নয়জন মুসলমান ও কাফেরের হাতে নির্যাতিত গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করার তাওফীক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দোয়া وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ কবুল হয়। বস্তুত তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবূ বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তারা সবাই রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্র সংসর্গও লাভ করেন। তফসীরে রূহুল মা'আনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবূ কুহাফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতামাতার প্রতি নিয়ামত দেওয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হলো? জবাব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোনো প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া।
–[রূহুল মা'আনী]

এই তাফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবূ বকরের বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল-চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গুনাহ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত উসমান (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌঁছালে সে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার তওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌঁছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌঁছালে আল্লাহ তা'আলা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দকর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত অতীত গুনাহ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে أَسِيْرُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ লিখে দেন। অর্থাৎ সে পৃথিবীতে আল্লাহর কয়েদী। –[ইবনে কাসীর] বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মুমিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরিয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে আল্লাহভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّـئَاتِهِمْ : অর্থাৎ উপরিউক্ত গুণে গুণান্বিত মুমিন-মুসলমানের সৎকর্মসমূহ কবুল করে নেওয়া হয় এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেব বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আরো কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন–

كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِمْ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِيْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ قَالَ وَاللّٰهِ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا.

অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাঁদের কথা আল্লাহ তা'আলা أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ الخ আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর কসম! উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। –[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا : পূর্বের আয়াতসমূহে মাতাপিতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আজাব ও শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, যে পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটূক্তি করে। বিশেষত পিতামাতা যখন তাকে ইসলাম ও সৎকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, যে কোনো লোক পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) মারওয়ানের এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোনো সহীহ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বর্ণিত নেই।

قَوْلُهُ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا : অর্থাৎ কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা কিছু ভালো কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেওয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোনো প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদেরকে যেসব সৎকাজ ঈমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়, পরকালে সেগুলো মূল্যহীন। কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাফেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহানুভূতি, সততা ইত্যাদি সৎকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধনসম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা : আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাফেরদের উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মুআয (রা.)-কে ইয়েমেন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে অল্প রিজিক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান। –[মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢١. وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ط هُوَ هُوْدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذْ اِلٰى اٰخِرِهٖ بَدْلُ اِشْتِمَالٍ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ خَوَّفَهُمْ بِالْاَحْقَافِ وَادٍ بِالْيَمَنِ بِهٖ مَنَازِلُهُمْ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مَضَتِ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ اَىْ مِنْ قَبْلِ هُوْدٍ وَمِنْ بَعْدِهٖ اِلٰى اَقْوَامِهِمْ اَنْ اَىْ بِاَنْ قَالَ لَا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط وَجُمْلَةُ وَقَدْ خَلَتْ مُعْتَرِضَةٌ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنْ عَبَدْتُمْ غَيْرَ اللّٰهِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

২১. স্মরণ করুন, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা তিনি হলেন হযরত হূদ (আ.) তিনি তাঁর আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে এই বলে সতর্ক করেছিলেন اِذْ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত اَخَا عَادٍ হতে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। আহকাফ ইয়েমেনের একটি উপত্যকা, সেখানেই তাদের ঘরবাড়ি ও বসবাস ছিল সতর্ককারীগণ এসেছিলেন রাসূলগণ তাঁর পূর্বে এবং পরেও অর্থাৎ হযরত হূদ (আ.)-এর পদার্পণের পূর্বে এবং পরেও স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে। এভাবে যে, তারা বললেন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। وَقَدْ خَلَتْ বাক্যটি جُمْلَهْ مُعْتَرِضَةٌ যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর। আমি তো তোমাদের জন্য মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।

٢٢. قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ج لِتَصْرِفَنَا عَنْ عِبَادَتِهَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ مِنَ الْعَذَابِ عَلٰى عِبَادَتِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فِىْٓ اَنَّهٗ يَاْتِيْنَا.

২২. তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা-অর্চনা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তাদের উপাসনা হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে তবে তুমি যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর তাদের উপাসনার ফলে যে শাস্তি আসবে তা যদি তুমি সত্যবাদী হও। তা আমাদের নিকট আনয়নে।

٢٣. قَالَ هُوْدٌ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ز هُوَ الَّذِىْ يَعْلَمُ مَتٰى يَاْتِيْكُمُ الْعَذَابُ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ ط اِلَيْكُمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ بِاسْتِعْجَالِكُمُ الْعَذَابَ.

২৩. তিনি হযরত হূদ (আ.) বললেন এর জ্ঞান তো কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। তিনি জানেন শাস্তি কখন আসবে আমি যা নিয়ে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি কেবল তা-ই তোমাদের নিকট প্রচার করি। আমি দেখছি তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়। শাস্তি দ্রুত কামনা করার ক্ষেত্রে।

٢٤. فَلَمَّا رَاَوْهُ اَىْ مَا هُوَ الْعَذَابُ عَارِضًا سَحَابًا عَرَضَ فِىْ اُفُقِ السَّمَاءِ مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ط اَىْ مُمْطِرٌ اِيَّانَا قَالَ تَعَالٰى بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ط مِنَ الْعَذَابِ رِيْحٌ بَدْلٌ مِنْ مَا فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا مُؤْلِمٌ.

২৪. অতঃপর যখন তারা দেখল শাস্তিকে মেঘ আকারে যা আকাশের দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে, তখন বলতে লাগল, তা তো মেঘ। আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে অর্থাৎ আমাদের উপর বর্ষিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, বরং এটাই তো তা যা তোমরা ত্বরান্বিত করছ, শাস্তি হতে এক ঝড় এটা مَا থেকে بَدْل হয়েছে এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٥. تُدَمِّرُ تُهْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ بِأَمْرِ رَبِّهَا بِإِرَادَتِهِ أَيْ كُلَّ شَيْءٍ أَرَادَ إِهْلَاكَهُ بِهَا فَأَهْلَكَتْ رِجَالَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَصِغَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ طَارَتْ بِذٰلِكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَزَّقَتْهُ وَبَقِيَ هُوْدٌ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ فَأَصْبَحُوا لَا يُرٰى إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ط كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَاهُمْ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ غَيْرَهُمْ .

২৫. এটা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিবে যার উপর দিয়ে এটা অতিক্রম করে যাবে, তার প্রতিপালকের নির্দেশে অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুকে ধ্বংস করে দিবে যাকে ঐ শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। কাজেই এ শাস্তির ঝড় তাদের আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা ও ছোট বড় সকলকে এবং তাদের ধন-সম্পদকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এভাবে যে, ঐ সকল বস্তুকে আকাশ ও পাতালের মাঝামাঝি নিয়ে উড়ে গেল। আর সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। এদিকে হযরত হূদ (আ.) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীজনেরা নিরাপদ থাকল। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতি ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবেই যেমনিভাবে আমি তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছি আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। অন্যান্যদেরকে।

٢٦. وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا فِي الَّذِيْ إِنْ نَافِيَةٌ أَوْ زَائِدَةٌ مَكَّنّٰكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ فِيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْمَالِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا بِمَعْنٰى أَسْمَاعًا وَّأَبْصَارًا وَّأَفْئِدَةً ز قُلُوْبًا فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ أَيْ شَيْئًا مِنَ الْإِغْنَاءِ وَمِنْ زَائِدَةٌ إِذْ مَعْمُوْلَةٌ لِأَغْنٰى وَأُشْرِبَتْ مَعْنَى التَّعْلِيْلِ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ حُجَجِهِ الْبَيِّنَةِ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ أَيِ الْعَذَابَ .

২৬. আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম শক্তি ও সম্পদ থেকে তোমাদেরকে তা দেইনি হে মক্কাবাসীরা! এখানে إِنْ مَكَّنّٰكُمْ-এর إِنْ টি نَافِيَه বা অতিরিক্ত। আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ سَمْعٌ শব্দটি أَسْمَاعٌ অর্থে। চক্ষু ও হৃদয় অন্তকরণ কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোনো কাজে আসেনি। অর্থাৎ কোনো কাজেই আসেনি। এখানে مِنْ টি অতিরিক্ত আর إِذْ টা হলো أَغْنٰى-এর مَعْمُوْل এবং এটা تَعْلِيْل-এর অর্থ সম্বলিত। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। সুস্পষ্ট প্রমাণাদিকে। এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হলো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَخَا عَادٍ : আদ হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। যার বংশসূত্র তিন পুরুষের মাধ্যমে হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। পরবর্তীতে তার বংশসূত্রও আদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যারা হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের পর সর্বপ্রথম আরব সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দানকারী সম্প্রদায় ছিল, আদ যদি ব্যক্তি অর্থে হয় তবে مُنْصَرِفٌ হবে। আর যদি সম্প্রদায় অর্থে হয় তবে غَيْر مُنْصَرِفٌ হবে। -[লুগাতুল কুরআন]

আর এখানে اَخٌ তথা ভাই দ্বারা বংশীয় ভ্রাতৃত্ব উদ্দেশ্য, ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন উদ্দেশ্য নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِالْأَحْقَافِ : এটা حِقْفٌ -এর বহুবচন; অর্থ- বালু উঁচু ও লম্বা টিলা। اَحْقَافٌ -কে বাহ্য দৃষ্টিতে اَنْذَرَ -এর সেলাহ মনে হলেও বাস্তবে তা নয়; বরং এটা عَادٌ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِمْ مُقِيْمِيْنَ بِالْأَحْقَافِ আর اَنْذَرَ -এর সেলাহ তো لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ যেমনটি সামনে আসছে। -[জুমাল]

بِاَنْ দ্বারা ব্যাখ্যাকার ইঙ্গিত করেছেন যে, اَنْ মাসদারিয়া বা مُخَفَّفَه আর بَاء হলো تَصْوِيْرِيَّة অর্থাৎ অতিক্রমকারীর صُوْرَتْ حَالْ অথবা كَيْفِيَّة বর্ণনা করার জন্য এসেছে অর্থাৎ সেই নবী ও রাসূলগণ এমন অবস্থায় চলে গেছেন যে, তাঁরা স্বীয় সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শনকারী ছিলেন।

قَوْلُهُ تَافِكَنَا : বাবে ضَرَبَ ও سَمِعَ হতে মাসদার اِفْكٌ অর্থ- মিথ্যা বলা। তবে যখন এর সেলাহ عَنْ ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় বিদ্রোহ করা, ফিরে যাওয়া। চাই এটা বিশ্বাসগতভাবে হোক বা আমলগত হোক।

قَوْلُهُ مَا هُوَ الْعَذَابُ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- এদিকে ইঙ্গিত করা যে, رَاَوْهُ -এর যমীর ঐ مَا -এর দিকে ফিরেছে, যা مَا تَعِدُنَا -এর মধ্যে রয়েছে। আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন, رَاَوْهُ -এর যমীর مُبْهَمٌ -এর দিকে করাও জায়েজ। যার অস্পষ্টতাকে عَارِضًا থেকে দূর করা হয়েছে। চাই তা تَمْيِيْز হওয়ার কারণে হোক বা حال হওয়ার কারণেই হোক। তিনি আরো বলেছেন যে, এই اِعْرَابٌ অধিক বিশুদ্ধ। কেননা তাতে অস্পষ্টতার পরে বয়ান এসেছে।

প্রশ্ন : مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ এটা عَارِضًا -এর সিফত। অথচ عَارِضًا যা مَوْصُوْف সেটা نَكِرَه হয়েছে। আর مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ইযাফতের কারণে مَعْرِفَه হয়েছে। অনুরূপভাবে مُمْطِرُنَا ও عَارِضًا -এর সিফত হয়েছে অথচ مُمْطِرُنَا ইযাফতের কারণে مَعْرِفَه হয়েছে। আর عَارِضًا হলো نَكِرَه পক্ষান্তরে সিফত ও মওসূফের মধ্যে تَطَابُقٌ শর্ত।

উত্তর : উভয় স্থানে صِفَتْ -এর মধ্যে اِضَافَتْ لَفْظِيَّة তথা শাব্দিক ইযাফত হয়েছে যা مَعْرِفَه -এর ফায়দা দেয় না। কাজেই সেগুলো صِفَتْ হওয়াতে কোনো দোষ নেই। ব্যাখ্যাকার (র.) مُمْطِرُ اِيَّانَا উহ্য মেনে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ فَاَهْلَكَتْ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فَاَصْبَحُوْا -এর আতফকে বৈধ করা।

قَوْلُهُ اَوْ زَائِدَةٌ (فِيْمَا فِيْهِ) : কেননা مَا কে অতিরিক্ত মেনে নেওয়ার সুরতে অর্থ হবে- আমি তাদেরকে সেরূপ ক্ষমতা দিয়েছি, যেরূপ তোমাদেরকে শক্তি দিয়েছি। এতে আদ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা مُشَبَّه এবং কুরাইশদের ক্ষমতা مُشَبَّهٌ بِهٖ আর مُشَبَّهٌ بِهٖ টা مُشَبَّه থেকে শক্তিশালী হয়ে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরাইশদের শক্তি ও ক্ষমতা আদ সম্প্রদায়ের শক্তি ও ক্ষমতা থেকে বেশি দেওয়া হয়েছিল। এর দ্বারা কুরাইশদের বড়ত্ব বুঝা যায়। যা উদ্দেশ্যের বিপরীত। কাজেই ব্যাখ্যাকারের اَوْ زَائِدَةٌ বলাটা অতিরিক্ত মনে হয়। -[জুমাল]

قَوْلُهُ وَاُشْرِبَتْ مَعْنَى التَّعْلِيْلِ : আল্লামা যমখশারী (র.) বলেন- اِذْ ظَرْفِيَّه এটা تَعْلِيْل -এর স্থলাভিষিক্ত। আর اُشْرِبَتْ হলো غُلِبَتْ অর্থে। বলা হয়- اُشْرِبَ الْاَبْيَضُ حُمْرَةً، وَاُشْرِبَ فِىْ قَلْبِهِمْ اَىْ غُلِبَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ الخ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক** : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু মক্কাবাসী পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার কারণে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনেনি; বরং তাদের সত্যদ্রোহিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্যাতনও বেড়ে যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ 'আর যেদিন কাফেরদেরকে দোজখের নিকট উপস্থিত করা হবে'। এ আয়াতে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এতেও তাদের গাফলত এবং ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটেনি, তারা মনে করতো যে, তারা সমৃদ্ধশালী, তাদের ধন-সম্পদের কারণে কখনো তাদের সুখ-শান্তির অভাব হবে না।

তাই আলোচ্য আয়াতে সমৃদ্ধশালী আদ জাতির কথা বলা হয়েছে। তারাও ছিল প্রচুর অর্থ-সম্পদের অধিকারী, তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত হুদ (আ.)। তিনি তাদেরকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আদ জাতি হযরত হুদ (আ.)-এর উপদেশে কর্ণপাত না করার কারণে আল্লাহ পাকের আজাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে, আসমানি গজব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ـ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ـ

অর্থাৎ 'আর স্মরণ কর আদ জাতির ভাইকে, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীগণ এসেছিলেন। তিনি তাঁর আহকাফবাসী জাতিকে সতর্ক করেছিল একথা বলে যে, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।'

প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা : এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– হে রাসূল! যদি আজ আপনার জাতি আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে থাকে, তবে তা নতুন কিছু নয়। ইতিপূর্বে অন্যান্য নবী রাসূলগণকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে এ মর্মে যে, আপনি আদ জাতির কথা স্মরণ করুন, আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন; তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তাওহীদে বিশ্বাস কর, শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর।

কিন্তু আদ জাতি হযরত হুদ (আ.)-এর এ সতর্কবাণীকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলল, আমরা উপলব্ধি করছি যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করাই তোমার উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ـ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ "তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করার জন্যেই এসেছ? যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে ভয়ের কথা বলছো, তা আনয়ন কর।"

এভাবে আদ জাতি তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আ.)-এর হেদায়েতকে অমান্য করেছে, সত্যের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু এর পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। আদ জাতি কোপগ্রস্ত হয়েছে, আল্লাহ পাকের আজাব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী : আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার পাশাপাশি কাফেরদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী-রাসূলের বিরোধিতার পরিণাম সর্বদা ভয়াবহ হয়েছে। আদ ও সামুদ জাতির ঘটনাবলি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে কখনো আল্লাহ পাক কোনো দল, গোষ্ঠী বা জাতিকে ক্ষমা দান করেন, সমৃদ্ধশালী করেন, কিন্তু যখন তাদের ঔদ্ধত্য, নাফরমানি, জুলুম-অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে গজব নেমে আসে, পরিণামে তারা ধ্বংস হয়। পবিত্র কুরআন তাই এ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করে মানবজাতিকে সতর্ক করেছে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁর অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে।

আহকাফের পরিচিতি : আলোচ্য আয়াতে এ সূরার নাম 'আহকাফ' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, সূরার শুরুতে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি (র.) লিখেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'আহকাফ' নামক স্থানটি আম্মান এবং মোহরা নামক স্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। তফসীরকার হযরত মোকাতেল (র.) বলেছেন, আদ জাতি ইয়েমেনের হাজরামাউত এলাকার 'মোহরা' নামক স্থানে বসবাস করতো। হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, বর্ণিত আছে– আদ জাতি ছিল ইয়েমেনের একটি গোত্র, তারা সমুদ্রের তীরে বালুময় স্থানে বাস করতো। এ স্থানটিকে "ইয়াশজার" বলা হতো।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) লিখেছেন, আদ জাতি ইয়ামামা বাহরাইন প্রভৃতি এলাকার নিকটস্থ বিরাট শূন্য প্রান্তরে বসবাস করতো। এ এলাকাকেই তখন 'আহকাফ' বলা হতো। বর্তমানে এটি অনাবাদী থাকলেও তখন আদ জাতির বাসস্থান হওয়ার কারণে তা ছিল প্রাণবন্ত। –[ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃ. ৬৫৪]

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) ইবনে যায়েদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, যা ইকরিমার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আহকাফ পাহাড় এবং গর্তকে বলা হয়। এসব স্থানেই আদ জাতির আবাস ছিল। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাজরামাউতে একটি মরুভূমির নাম আহকাফ।" –[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৬, পৃ. ৩৫০]

আল্লামা আলুসী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, সিরিয়াতে একটি পাহাড়ের নাম আহকাফ। হযরত ইবনে ইসহাক বলেছেন, আদ জাতি আম্মান এবং হাজরামাউতের মাঝামাঝি স্থানে বাস করতো। আর ইবনে আতিয়া (র.) বলেছেন, আদ জাতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো তারা ইয়েমেনে বাস করতো।

আল্লামা মাজেদী (র.) লিখেছেন, আহকাফ এর শাব্দিক অর্থ বালুর স্তূপ; আহকাফ নামক স্থানটি জর্ডানের আম্মান থেকে পূর্ব পশ্চিমে ইয়েমেন পর্যন্ত, আর উত্তর দক্ষিণে নজদ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত। সম্পূর্ণ এলাকাটি ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এর পশ্চিমাংশে বালুর বর্ণ লাল, আর এ এলাকাকেই 'আহকাফ' বলা হয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত হুদ (আ.)-এর পূর্বেও এ এলাকাবাসীর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সতর্ককারী পৌঁছেছেন, তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوٓا إِلاَّ اللّٰهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .

অর্থাৎ তাঁর পূর্বে এবং পরেও বিভিন্ন যুগে সতর্ককারী এসেছিলেন এবং তাঁরা সতর্ক করে একথা বলেছিলেন, তোমরা এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো বন্দেগী করো না, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে এক মহা দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

বস্তুত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে আল্লাহ পাকের নবী রাসূলগণ এভাবেই মানুষকে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন, যারা ভাগ্যবান, তারা সতর্কতা অবলম্বন করে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে গেছে, পক্ষান্তরে যারা হতভাগ্য, তারা নবী-রাসূলগণের হেদায়েত মানেনি, পরিণামে তাদের শাস্তি হয়েছে অবধারিত।

قَوْلُهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا : বর্ণিত আছে যে, আদ জাতি অনেক দিন থেকে অনাবৃষ্টির কারণে কষ্টে ছিল। হঠাৎ একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল, তারা মেঘ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তারা মনে করল বৃষ্টিপাত হবে, তারা ফসল ঘরে তুলবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকাশে মেঘমালার আকৃতিতে যা দেখা গিয়েছিল, তা মেঘ ছিল না; বরং আল্লাহ পারেক আজাব ছিল, আর তা ঘূর্ণিঝড়ের আকৃতি ধারণ করলো এবং দুর্ধর্ষ আদ জাতির উপর আপতিত হলো। তাই পরবর্তী আয়াতাংশে ইরশাদ হয়েছে- بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ . رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ, [তোমরা যা দেখেছ তা বৃষ্টি নয়;] বরং তা সে শাস্তিই, যা তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছ। এতেই রয়েছে ঝড়, যা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বহনকারী।

অর্থাৎ হযরত হুদ (আ.)-এর নিকট আদ জাতি যে শাস্তির জন্যে তাড়াহুড়ো করছিল, সে শাস্তিই তাদের উপর আপতিত হলো।

قَوْلُهُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا : তার প্রতিপালক তথা আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে সে সব কিছুকে উপড়ে ফেলবে, এরপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বাড়ি-ঘড় ব্যতীত আর কিছুই রইল না, তাদের সব কিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। তাদের পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফসল এক কথায় সবকিছু আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে গেল। হযরত হুদ (আ.) এবং তাঁর অনুসারীগণ ব্যতীত কেউ রক্ষা পেল না। শুধু তাদের হারানো দিনের সাক্ষী হিসেবে বাড়ি-ঘরের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেল। তাই ইরশাদ হয়েছে- فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ অর্থাৎ, তাদের বাড়ি-ঘর ব্যতীত আর কিছুই রইল না।

বর্ণিত আছে যে, আদ জাতি তাদের আজাবের কথা তখন উপলব্ধি করল, যখন তারা দেখল, বাতাস সবকিছু উড়িয়ে নিচ্ছে, এমনকি তাদের উটগুলোকে পৃষ্ঠের বোঝাসহ আসমান-জমিনের মধ্যখানে নিয়ে যাচ্ছে। এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে তারা পালিয়ে স্ব-স্ব গৃহে প্রবেশ করলো, দ্বার-রুদ্ধ করে দিল, কিন্তু প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে তাদের ঘরের দরজা ভেঙ্গে গেল এবং তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে অন্যত্র নিক্ষেপ করলো।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, তাদের লাশগুলো মরুভূমির উপর পড়েছিল, আল্লাহ পাক বালুর ঝড় প্রেরণ করলেন এবং আদ জাতির লোকদের মৃত লাশগুলো বালুর নীচে চাপা পড়ল। এ ঘূর্ণিঝড় আট দিন সাত রাত অব্যাহত ছিল, এরপর ঝড় তাদেকে সমুদ্রে ফেলে দিল।

সাধারণত বাতাস একটি পরিমাণ মোতাবেক চলে, কিন্তু সেদিন আল্লাহ পাকের গজবি বাতাস কত দ্রুত প্রবাহিত হয়েছিল তা বর্ণনাতীত। আর এভাবে দুর্ধর্ষ,আকাশ-চুম্বি ইমারত নির্মাণকারী, শক্তিধর, আদ জাতির নাম-নিশানও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেল। পরবর্তী আয়াতে তাই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ . অর্থাৎ "এভাবেই আমি পাপিষ্ঠ জাতিগুলোকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"

এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যেভাবে আদ জাতির প্রতি আজাব আপতিত হয়েছে, সে অবস্থা তোমাদেরও হতে পারে।

আল্লামা বগভী (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! লোকেরা মেঘমালা দেখে খুশি হয়, বৃষ্টিপাতের আশা করে, কিন্তু আপনি মেঘমালা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং আপনার চেহারা মোবারকে দুশ্চিন্তার আলামত লক্ষ্য করা যায়। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, হে আয়েশা! আমার আশঙ্কা হয় যে, হয়তো ঐ মেঘমালায় আল্লাহ পাকের আজাব রয়েছে। [পূর্বকালে] একটি জাতির উপর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এসেছিল, কিন্তু প্রথমে মেঘমালা দেখে তারা উপলব্ধি করেছিল, এ মেঘমালা থেকে আমাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হবে [কিন্তু ঐ মেঘমালাই তাদের জন্যে আজাব বহন করে এনেছিল।]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ যখন দেখতেন যে, তীব্র গতিতে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তিনি এভাবে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই বাতাস থেকে এবং যা এর মধ্যে আছে তা থেকে কল্যাণ কামনা করি এবং এই বাতাস যা বহন করে এনেছে তা থেকেও কল্যাণ কামনা করি। আর আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অকল্যাণ থেকে এবং যা কিছু এই বাতাস বহন করে এনেছে তার অকল্যাণ থেকে। প্রিয়নবী ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, সাধারণত যা দেখলে মানুষ বৃষ্টিপাতের

Free@ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

আশা করে; কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ -এর অবস্থা এই ছিল যে, মেঘমালা দেখেই তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেত। এ অবস্থায় তিনি একবার বাইরে যেতেন আবার ভেতরে আসতেন। যখন বৃষ্টি শুরু হতো, তখন তাঁর চেহারা মোবারকের দুশ্চিন্তার ছাপ দূরীভূত হতো।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি এ অবস্থাটা উপলব্ধি করে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, হে আয়েশা! সম্ভবত এ মেঘমালা সেরকমই, যেমন আদ জাতি মেঘ দেখে বলেছিল, এর দ্বারা আমরা বৃষ্টি পাব।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বৃষ্টি দেখে এভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তোমার রহমত কামনা করি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছেন, "হে আয়েশা! আমি কি করে নিশ্চিত হব! কারণ একটি জাতিকে এ বাতাস দ্বারাই ধ্বংস করা হয়েছে।"

আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ যখনই আকাশে মেঘ দেখতেন, তখনই নিজের কাজ ছেড়ে সেদিকে মনোনিবেশ করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই এর অকল্যাণ থেকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ যখনই তুফান দেখতেন, তখনই দু' জানু একত্র করে বলতেন, 'হে আল্লাহ! এ তুফানকে রহমতে রূপান্তরিত কর, একে আজাবে পরিণত করো না।'

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন তিনি তাঁর সব কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাজ হলেও। এরপর এ দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এর অকল্যাণ থেকে।

পূর্ববর্তী আয়াতে শক্তিধর আদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে সাধারণত সকল যুগের কাফের মুশরিক বিশেষত মক্কার কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ

অর্থাৎ "আর আমি আদ জাতিসহ অন্যান্য জাতিকে যে ক্ষমতা দান করেছিলাম তা তোমাদেরকে দান করিনি।" তাদেরকে ধনবল, জনবল, বাহুবল তোমাদের চেয়ে শতগুণ বেশি প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এবং নাফরমান হয় এবং তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আ.)-কে মিথ্যাজ্ঞান করে, তখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়। আর সে শাস্তির কারণে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের শক্তি-সামর্থ্য কোনো কাজে আসেনি, তাদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব তোমরা তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ। কেননা পূর্বকালের অবাধ্য জাতিগুলোর ন্যায় তোমরাও আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের বিরোধিতা করছো এবং আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করছো, তোমাদের এ দৌরাত্ম্যের পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে তা ভেবে দেখ।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً : 'আর আমি তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দান করেছিলাম।' অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহান বাণী শ্রবণের জন্যে তাদেরকে শ্রবণ শক্তি দান করেছিলাম, যেন তা দ্বারা তারা উপদেশ গ্রহণ করে, এমনিভাবে আল্লাহ পাকের কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখার জন্যে তাদেরকে দান করেছিলাম নয়ন যুগল, যেন তারা সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার প্রতি ঈমানে আনে, এমনিভাবে সত্যকে উপলব্ধি করার জন্যে এবং আল্লাহ পাকের মারেফাত হাসিল করার জন্যে তাদের দান করেছিলাম অন্তর যেন তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখে তারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে।

কিন্তু এসব উপকরণ দ্বারা এ হতভাগ্যরা সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারেনি, এসব নিয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তারা এর দ্বারা আল্লাহ পাকের নাফরমানিই করেছে, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَىْءٍ অর্থাৎ, কিন্তু কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের কোনো কাজেই আসেনি'। কেননা তারা এ সমস্ত নিয়ামতের অপব্যবহার করেছে।'

قَوْلُهُ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ : এজন্যে যে, সত্য গ্রহণের যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর বিধানসমূহকে অমান্য করেছে, এমনকি যখন তাদেরকে আল্লাহর নবী তাদের অপকর্মের পরিণতিতে আজাবের ভয় প্রদর্শন করেন, তখন তারা ঐ আজাবকে বিদ্রূপ করে। তারা বলে, যদি কোনো আজাব এসে আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে তবে তা আসুক এখনই, বিলম্ব কিসের? অবশেষে সেই আজাব তাদের উপর আপতিত হলো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করল। তাই পরবর্তী বাক্যাংশে ইরশাদ হয়েছে– وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ. অর্থাৎ, আর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।' অর্থাৎ সে আজাবই তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করল। এভাবে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ জাতিকে তাদের চরম অন্যায় অনাচারের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আয়াতের প্রতি বিদ্রূপ করার অর্থ হলো তারা বলেছিল, "এখনই আসুক সে আজাব"।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٧. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى اَىْ اَهْلَهَا كَثَمُوْدَ وَعَادٍ وَقَوْمِ لُوْطٍ وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ كَرَّرْنَا الْحُجَجَ الْبَيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

২৭. আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ: অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে। যেমন– সামূদ, আদ এবং লূত সম্প্রদায়কে। আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলি বিবৃত করেছিলাম অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহকে বারবার বর্ণনা করেছিলাম। যাতে তারা ফিরে আসে।

٢٨. فَلَوْلَا هَلَّا نَصَرَهُمْ بِدَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَىْ غَيْرِهٖ قُرْبَانًا مُتَقَرَّبًا بِهِمْ اِلَى اللّٰهِ اٰلِهَةً ط مَعَهٗ وَهُمُ الْاَصْنَامُ وَمَفْعُوْلُ اِتَّخَذُوْا الْاَوَّلُ ضَمِيْرٌ مَحْذُوْفٌ يَعُوْدُ اِلَى الْمَوْصُوْلِ اَىْ هُمْ وَقُرْبَانًا الثَّانِىْ وَاٰلِهَةً بَدَلٌ مِنْهُ بَلْ ضَلُّوْا غَابُوْا عَنْهُمْ ج عِنْدَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَ ذٰلِكَ اَىْ اِتِّخَاذُهُمُ الْاَصْنَامَ اٰلِهَةً قُرْبَانًا اِفْكُهُمْ كِذْبُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ يَكْذِبُوْنَ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ اَوْ مَوْصُوْلَةٌ وَالْعَائِدُ مَحْذُوْفٌ اَىْ فِيْهِ .

২৮. তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? তাদের থেকে শাস্তি দূরীভূত করে। আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিল, নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। আর তারা হলো প্রতিমাগুলো। اِتَّخَذُوْا -এর মাফউল হলো উহ্য যমীর যা مَوْصُوْل -এর দিকে ফিরেছে। আর তা হচ্ছে– هُمْ আর قُرْبَانًا হলো দ্বিতীয় মাফউল এবং اٰلِهَةً শব্দটি তা থেকে بَدَل হয়েছে। বস্তুত তাদের ইলাহগুলো তাদের নিকট হতে অন্তর্নিহিত হয়ে পড়লো শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় এরূপই অর্থাৎ আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্য প্রতিমাগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করা। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম। এখানে مَا টা হলো মাসদারিয়া অথবা মাওসূলা এবং عَائِد উহ্য রয়েছে তথা فِيْهِ

٢٩. وَ اذْكُرْ اِذْ صَرَفْنَآ اَمَلْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ جِنَّ نَصِيْبِيْنَ الْيَمَنِ اَوْ جِنَّ نِيْنَوٰى وَكَانُوْا سَبْعَةً اَوْ تِسْعَةً وَكَانَ ﷺ بِبَطْنِ نَخْلٍ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ الْفَجْرَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ج فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَىْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَنْصِتُوْا ج اَصْغُوْا لِاِسْتِمَاعِهٖ فَلَمَّا قُضِىَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهٖ وَلَّوْا رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ مُخَوِّفِيْنَ قَوْمَهُمْ بِالْعَذَابِ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا وَكَانُوْا يَهُوْدًا .

২৯. এবং স্মরণ করুন আমি আপনার প্রতি ফিরিয়েছিলাম আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে সে জিন ছিল نَصِيْبِيْنَ يَمَنْ অথবা নীনাওয়ার অধিবাসী ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন বা নয়জন। তখন নবী করীম ﷺ বাতনে নাখলা নামক স্থানে সাহাবায়ে কেরামসহ সালাতুল ফজর আদায় করছিলেন। এ ঘটনাটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন। যারা কুরআন পাঠ শুনতেছিল, যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলো, তারা বলল অর্থাৎ তাদের কেউ কেউ বলল, তোমরা চুপ করে শ্রবণ কর কান লাগিয়ে শোন। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তিনি তাঁর কেরাত পাঠ হতে অবসর হলেন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। অর্থাৎ তাদের সম্প্রদায়কে শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর তারা ছিল ইহুদি।

٣٠. قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا هُوَ الْقُرْاٰنُ اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَيْ تَقَدَّمَهُ كَالتَّوْرٰىةِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ الْاِسْلَامِ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ اِلٰى طَرِيْقِهِ .

৩০. তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায় আমরা এমন কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি আর তা হলো কুরআন যা অবতীর্ণ হয়েছে হযরত মূসা (আ.)-এর পরে তা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে অর্থাৎ যা তার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছিল যেমন- তাওরাত এবং পরিচালিত করে সত্য ইসলাম ও সরল পথের দিকে।

٣١. يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْاِيْمَانِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ اللّٰهُ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ اَيْ بَعْضَهَا لِاَنَّ مِنْهَا الْمَظَالِمَ وَلَا تُغْفَرُ اِلَّا بِرِضٰى اَرْبَابِهَا وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ مُّؤْلِمٍ .

৩১. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ ঈমানের দিকে যে আহ্বান করেছেন তাতে সাড়া দাও। এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন অর্থাৎ তার কতিপয় পাপ ক্ষমা করবেন। কেননা এর মধ্যে অত্যাচার-নির্যাতন তথা বান্দার হকও রয়েছে যা বান্দার সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না। এবং তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

٣٢. وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ اَيْ لَا يُعْجِزُ اللّٰهَ بِالْهَرَبِ مِنْهُ فَيَفُوْتُهُ وَلَيْسَ لَهُ لِمَنْ لَا يُجِبْ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَيِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءُ ط اَنْصَارٌ يَدْفَعُوْنَ عَنْهُ الْعَذَابَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُجِيْبُوْا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ ظَاهِرٍ .

৩২. আর কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না। অর্থাৎ পালিয়ে গিয়ে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং তাঁর পাকড়াও থেকেও বাঁচতে পারবে না। এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের যারা তার ডাকে সাড়া না দিবে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। যে তার থেকে শাস্তি বিদূরিত করবে। তারাই যারা আহ্বানে সাড়া দেয়নি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

٣٣. اَوَلَمْ يَرَوْا يَعْلَمُوْا اَيْ مُنْكِرُو الْبَعْثِ اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ بِقٰدِرٍ خَبَرُ اَنَّ وَزِيْدَتِ الْبَاءُ فِيْهِ لِاَنَّ الْكَلَامَ فِيْ قُوَّةِ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ط بَلٰٓى هُوَ قَادِرٌ عَلٰى اِحْيَاءِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

৩৩. তারা কি অনুধাবন করে না জানে না! পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীরা যে, আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি তা থেকে অক্ষম হননি। তিনি সক্ষম এটা اَنَّ-এর খবর এবং এতে بَاء অতিরিক্ত আনা হয়েছে। বাক্যটি اَلَيْسَ اللّٰهُ بِقَادِرٍ-এর শক্তিতে পৌঁছার কারণে। মৃতের জীবন দান করতেও। বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٤. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ط
بِاَنْ يُعَذَّبُوْا بِهَا يُقَالُ لَهُمْ اَلَيْسَ هٰذَا
التَّعْذِيْبُ بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط
قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ.

৩৪. যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে এভাবে যে, তাদেরকে অগ্নির শাস্তি প্রদান করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে এটা কি সত্য নয়? শাস্তি। তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, এটা সত্য! তখন তাদেরকে বলা হবে শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

٣٥. فَاصْبِرْ عَلٰى اَذٰى قَوْمِكَ كَمَا صَبَرَ
اُولُوا الْعَزْمِ ذَوُوالثُّبَاتِ وَالصَّبْرِ عَلَى
الشَّدَائِدِ مِنَ الرُّسُلِ قَبْلَكَ فَتَكُوْنَ ذَا
عَزْمٍ وَمِنْ لِلْبَيَانِ فَكُلُّهُمْ ذُوْو عَزْمٍ وَقِيْلَ
لِلتَّبْعِيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ اٰدَمُ لِقَوْلِهٖ
تَعَالٰى وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا وَلَا يُوْنُسُ
لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ
وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ط لِقَوْمِكَ نُزُوْلَ
الْعَذَابِ بِهِمْ قِيْلَ كَاَنَّهٗ ضَجِرَ مِنْهُمْ
فَاَحَبَّ نُزُوْلَ الْعَذَابِ بِهِمْ فَاُمِرَ بِالصَّبْرِ
وَتَرْكِ الْاِسْتِعْجَالِ لِلْعَذَابِ فَاِنَّهٗ نَازِلٌ
بِهِمْ لَا مُحَالَةَ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا
يُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ فِى الْاٰخِرَةِ لِطُوْلِهٖ
لَمْ يَلْبَثُوْٓا فِى الدُّنْيَا فِىْ ظَنِّهِمْ اِلَّا
سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلٰغٌ تَبْلِيْغٌ
مِّنَ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَهَلْ اَىْ لَا يُهْلَكُ عِنْدَ
رُؤْيَةِ الْعَذَابِ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ اَىِ
الْكَافِرُوْنَ.

৩৫. অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার সম্প্রদায়ের কষ্টের উপর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুদৃঢ় ও মসিবতে ধৈর্যধারণকারী, রাসূলগণ। আপনার পূর্বে। তবে আপনিও أُولُو الْعَزْمِ তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর مِنْ টা بَيَانِيَّه হবে। এ সুরতে প্রত্যেকেই أُولُو الْعَزْمِ -এর অন্তর্ভুক্ত হবেন। বলা হয়েছে যে, مِنْ টা تَبْعِيْضِيَّة তখন হযরত আদম (আ.) এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا -এর কারণে এবং হযরত ইউনুস (আ.) ও অন্তর্ভুক্ত হবেন না, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ -এর কারণে। আর আপনি এদের জন্য ত্বরা করবেন না আপনার সম্প্রদায়ের জন্য। তাদের উপর শাস্তি আরোপিত হওয়ার ব্যাপারে। বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ তাদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন, যার কারণে তিনি তাদের উপর শাস্তি কামনা করেছিলেন। এ কারণেই তাঁকে ধৈর্যধারণ করার ও শাস্তি কামনার ক্ষেত্রে ত্বরা না করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। কেননা শাস্তিতো তাদের উপর নিশ্চিতভাবে অবতীর্ণ হবেই। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে পরকালের শাস্তির ব্যাপারে, তার সুদীর্ঘতার কারণে সেদিন তাদের মনে হবে তারা যেন পৃথিবীতে দিবসের এক দণ্ডের বেশি অবস্থান করেনি। পৃথিবীতে তাদের ধারণা মতে, এই কুরআন এক ঘোষণা তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে তাবলীগ বা প্রচার। সুতরাং শাস্তি প্রত্যক্ষ করার সময় পাপাচারী সম্প্রদায়কেই ধ্বংস করা হবে। অর্থাৎ কাফেরদেরকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ -এর দ্বারা মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। لَامْ টা উহ্য قَسَمْ -এর জবাবের উপর এসেছে। مِنَ الْقُرٰى এটা مَا -এর بَيَانٌ আর اَهْلَهَا বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উহ্য مُضَافٌ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা।

قَوْلُهُ لَوْلَا : لَوْلَا -এর তাফসীর هَلَّا দ্বারা এটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, لَوْلَا টা تَحْضِيْضِيَّة বা উৎসাহব্যাঞ্জক আর এর দ্বারা تَوْبِيْخ তথা ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا : اَلَّذِيْنَ হলো اِسْم مَوْصُوْل আর اِتَّخَذُوْا এটা جُمْلَه হয়ে صِلَه এখন সেলাহ ও মাওসূল মিলে نَصَرَ -এর ফায়েল। আর اِتَّخَذُوْا -এর প্রথম মাফউল هُمْ উহ্য রয়েছে আর দ্বিতীয় মাফউল হলো قُرْبَانًا। আর اٰلِهَةً টা قُرْبَانًا হতে بَدَل হয়েছে। যেমনটি মুফাসসির (র.) বর্ণনা করেছেন। قُرْبَانًا বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার। আর এটাও হতে পারে যে, اٰلِهَةً হলো اِتَّخَذُوْا -এর দ্বিতীয় মাফউল। আর قُرْبَانًا টা حَال অথবা مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে।

قَوْلُهُ ضَلُّوْا اَىِ الْاَصْنَام : আবার কেউ কেউ ضَلُّوْا -এর ফা'য়েল কাফেরদেরকে বলেছেন। অর্থাৎ উপাসকরা উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবে এবং তাদের থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। [প্রথমটি উত্তম] –[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُه نَفَرًا : এর অর্থ হলো– জামাত, দখল, যা তিন হতে অধিক এবং দশ থেকে কম। বহুবচনে اَنْفَارٌ -

قَوْلُهُ مِنَ الْجِنِّ : এটা نَفَرًا -এর প্রথম সিফত, আর يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ হলো দ্বিতীয় সিফত।

قَوْلُهُ حَضَرُوْهُ : যমীরের مَرْجِعْ কুরআন এবং নবী উভয়ই হতে পারে।

قَوْلُهُ فَلَمَّا قُضِىَ : জমহুর ওলামায়ে কেরাম এটাকে مَجْهُوْل পড়েছেন। আর হাবীব ইবনে ওবাইদ এটাকে مَعْرُوْف পড়েছেন مَجْهُوْل -এর সুরতে حَضَرُوْهُ -এর যমীর কুরআনের দিকে ফিরবে, আর مَعْرُوْف -এর সুরতে মহানবী ﷺ -এর দিকে ফিরবে। –[ফাতহুল কাদীর : আল্লামা শাওকানী]

قَوْلُهُ مُنْذِرِيْنَ : এটা مُقَدَّرَه حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدِّرِيْنَ الْاِنْذَارَ আর نَصِيْبِيْن হলো ইয়েমেনের একটি গ্রাম। نِيْنَوٰى -এর প্রথম نُوْن টি যেরযুক্ত এবং পরবর্তী يَاء সাকিন এবং দ্বিতীয় نُوْن -এ যবর ও পেশ উভয়ই হতে পারে। আর শেষে اَلِف مَقْصُوْرَة হবে।

قَوْلُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ : মুফাসসির (র.) এই ঘটনাকে نَخْل -এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এতে تَسَامُحْ তথা বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি রয়েছে। কেননা যেখানে জিনদের কুরআন শ্রবণের ঘটনা ঘটেছিল সেটা بَطْن نَخْلَه ছিল। এটাকে نَخْلَه -ও বলা হতো। এ জায়গাটা মক্কা হতে তায়েফের পথে একরাতের দূরত্বে অবস্থিত। যেখানে রসূল ﷺ সালাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন আর এ জায়গাটা মদীনা হতে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত। –[জুমাল]

قَوْلُهُ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ : এখানে জিনদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে। আর اَوَلَمْ يَرَوْا থেকে আল্লাহর কালাম শুরু হয়েছে।

قَوْلُه وَزِيْدَتِ الْبَاءُ فِيْهِ لِاَنَّ الْكَلَامَ الخ : আল্লামা মহল্লী (র.) এই ইবারত বৃদ্ধি করে একটি প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো– بَاء টা নেতিবাচক বাক্যের পরে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। আর যা তার অধীনে থাকে তা হ্যাঁ-বাচক হয়ে থাকে। কাজেই بِقَادِرٍ -এর মধ্যে بَاء আনাটা ঠিক হয়নি।

উত্তরের সারকথা হলো– نَفِىْ টা আয়াতের শুরুতে اَلَمْ يَرَوْا -এর মধ্যে হয়েছে এবং এর পরে যা কিছু তার পরে রয়েছে তাও نَفِىْ -এর অধীনে রয়েছে। মনে হয় যেন বাক্যটি اَلَيْسَ بِقَادِرٍ -এর শক্তিতে হয়েছে। কাজেই بَاء প্রবিষ্ট করা জায়েজ। এ কারণেই তার উত্তর আল্লাহর বাণী– بَلٰى اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এর মধ্যে بَلٰى দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এটা এ কথার নিদর্শন যে, বাক্যটি শক্তিতে نَفِىْ -এর মতো হয়েছে। কেননা بَلٰى দ্বারা مَنْفِىْ বাক্যের জবাব প্রদান করা হয়।

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُمْ : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) يُقَالُ لَهُمْ উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَوْمَ টা উহ্য يُقَالُ ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। আর يَوْمَ يُعْرَضُ হতে اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ পর্যন্ত বাক্যটি يُقَالُ -এর مَقُوْلَه হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَرَبِّنَا : এখানে وَاوْ টা تَسْمِيَه তাকিদের জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ ذُو الثَّبَاتِ : এটা أُولُوا الْعَزْمِ -এর তাফসীর। এর অর্থ হলো উঁচু হিম্মত, সুদৃঢ় পদ। যদি مِنْ -কে بَيَانِيَّة ধরা হয় তবে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম أُولُوا الْعَزْمِ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। তবে কেউ কেউ مِنْ -কে تَبْعِيْضِيَّه বলেছেন। এ সুরতে কয়েকজন আম্বিয়ায়ে কেরামকে أُولُوالْعَزْمِ থেকে مُسْتَثْنٰى করা হয়েছে। যেদিকে মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ فَاصْبِرْ : এটা جَوَاب شَرْط আর فاء হলো جزائية শর্ত উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ– إِذَا كَانَ أَمْرُ الْكُفَّارِ مَا ذُكِرَ فَاصْبِرْ عَلٰى أَذَاهُمْ

قَوْلُهُ يَوْمَ يَرَوْنَ : এটা لَمْ يَلْبَثُوْا -এর ظَرْف হয়েছে। আর لِطُوْلِهٖ টা لَمْ يَلْبَثُوْا -এর تَعْلِيْل যা مُقَدَّمْ হয়েছে।

قَوْلُهُ هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلَاغٌ : এখানে هٰذَا الْقُرْاٰنُ উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بَلَاغٌ টা উহ্য মুবতাদার খবর। আর بَلَاغٌ হলো اِسْمٌ لِلتَّبْلِيْغِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : এ আয়াতেও পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পাকের অবাধ্য জাতিগুলোকে ধ্বংস করার কথা ইরশাদ হয়েছে– হে মক্কাবাসী! তোমাদের আশপাশের অনেক জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের শিরক কুফর ও নাফরমানির কারণে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন مَا حَوْلَكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের আশ-পাশের" কথাটির অর্থ হলো, মক্কার অদূরেই সামুদ জাতি, আদ জাতি এবং হযরত লূত (আ.)-এর জাতি বাস করতো। আল্লাহ পাক বারে বারে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এসব জাতি সৎপথে ফিরে আসেনি; তাই তাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন। আদ জাতিকে ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে, সামুদ জাতিকে ভূমিকম্পের মাধ্যমে এবং হযরত লূত (আ.)-এর জাতি সদুমবাসীকে প্রথমে পাথর বর্ষণ করে এবং পরে জমিনকে উল্টিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। মক্কার চারপার্শ্বের এসব ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণই ছিল মক্কাবাসীর একান্ত কর্তব্য।

আদ জাতি ছিল আহকাফে, তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল সামুদ জাতি, তোমরা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকালে তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো দেখতে পাও। অতএব, তাদের ঘটনা থেকেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তোমাদের রয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً : 'তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে নিজেদের উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল তারা কেন [বিপদ মুহূর্তে] তাদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের পূজারীদের থেকে উধাও হয়ে গেল। বস্তুত এটিই ছিল তাদের নিজেদের মনগড়া মিথ্যা, আর তারা যা রচনা করতো, এটি তাই।'

অনেক কাফের তাদের হাতের বানানো প্রতিমার পূজা করে বলতো, এরা আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং তাদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে পারবো। তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, মহাবিপদের সময় তোমাদের ঐসব উপাস্যরা কোথায় ছিল, তোমাদের মহাবিপদের দিনে কেন তারা সাহায্য করতে আসল না?

বস্তুত যারা একথা মনে করে যে ঠাকুর দেবতাদের পূজা অর্চনা তাদের জন্যে উপকারী হবে, তাদের এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নিছক মনগড়া এবং ভ্রান্ত ধারণা, এ সম্পর্কে আদৌ সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ الخ : **শানে নুযূল :** ইবনে আবি শায়বা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী ﷺ 'বতনে নাখলা' নামক স্থানে কুরআনে কারীম পাঠ করছিলেন, তখন কয়েকজন জিন উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তারা পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে নীচে অবতরণ করলো এবং একে অন্যকে বলল, নীরবে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে থাক। এ জিনদের সংখ্যা ছিল নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল রাজবাআ। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

রাসূল ﷺ -এর দরবারে জিনের উপস্থিতি : মক্কার কাফেরদেরকে শোনানোর জন্য পূর্বেকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশি, কিন্তু কুরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জিনদের চেয়ে বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না! জিনদের কুরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সে মতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হতো। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে সচেষ্ট হলো এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনসুন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হিজাযেও পৌঁছাল। সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর 'ওকায' বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মতো বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহু লোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হতো এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাজে কুরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌঁছাল। তারা কুরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌঁছে পরস্পর বলতে লাগল, চুপ করে কুরআন শোন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্ত কার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কুরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। –[ইবনুল মুনযির]

আরো এক রেওয়ায়েতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরো তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়। –[রূহুল মা'আনী]

অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বারবার আগমন করেছে।

খাফফাযী (র.) বলেন, সবগুলো হাদীস একত্র করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয়বার সংঘটিত হয়েছে। –[বয়ানুল কুরআন]

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরিউক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى : "মূসার পরে" বলার কারণে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর পর হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি যে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইঞ্জিলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদি হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইঞ্জিলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইঞ্জীল অধিকাংশ বিধি-বিধানে তাওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কুরআন তাওরাতের মতো একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরিয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কুরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

قَوْلُهُ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ : مِنْ অব্যয়টি আসলে "কোনো কোনো"-এর অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেওয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোনো কোনো গুনাহ মাফ হবে। অর্থাৎ আল্লাহর হক মাফ হবে– বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ مِنْ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

Free@ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জিনেরা জান্নাতে যাবে না : তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, জিনেরা তাদের ঈমান ও নেক আমলের কারণে দোজখের আজাব থেকে রেহাই পাবে; কিন্তু জান্নাতে যেতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জিন মুমিন হলেও জান্নাতে যেতে পারবে না। কেননা তারা ইবলিসের বংশধর। আর ইবলিসের বংশধররা জান্নাতে যেতে পারবেন না, তবে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন, জিন যদি ঈমানদার হয়, তবে তাকে ঈমানদার মানুষের ন্যায় বিবেচনা করা হবে। −[তাফসীরে ইবনে কাসীর [উর্দূ] পারা. ২৬, পৃ. ২৬]

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءُ أُولٰئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ : অর্থাৎ যে আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাকে আল্লাহর আজাব থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সে কোনো সাহায্যকারীও পাবে না।

যারা আল্লাহ পাকের রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাঁর কথা মানবে না, তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে; কেননা হেদায়েত শুধু আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল ﷺ -এর অনুসরণেই রয়েছে। তাঁর আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। আর একথা সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ প্রসঙ্গে : আলোচ্য আয়াতে কোনো কোনো রাসূলকে 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞ' বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীই ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পৃথিবীতে এমন কোনো নবীর আবির্ভাব হয়নি, যাঁর মধ্যে এ গুণটি ছিল না। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত ইউনুস (আ.) ব্যতীত সমস্ত নবী রাসূলগণই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রত্যাদেশের অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া করেছিলেন, তাই প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন− وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ "[হে রাসূল!] আপনি ইউনুস (আ.)-এর ন্যায় হবেন না।", অর্থাৎ তাঁর ন্যায় তাড়াহুড়া করবেন না।"

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী রাসূলগণের উল্লেখ সূরা আন'আমে রয়েছে। তাঁদের সংখ্যা হলো আঠার। তাঁরা হলেন. হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকূব (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত আইয়ূব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত হারূন (আ.), হযরত জাকারিয়া (আ.), হযরত ইয়াহইয়া (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত আলয়াসা (আ.), হযরত লূত (আ.) ও আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এ সমস্ত নবী-রাসূলগণের উল্লেখ করার পর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন− أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"এরাই সেসব লোক যাঁদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন। অতএব, তাঁদেরই অনুসরণ কর।"

তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, أُولُوا الْعَزْمِ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবী-রাসূলগণ হলেন তাঁরা, যাঁদেরকে জেহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মোকাতিল (র.) বলেছেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী হলেন ছয়জন। ১. হযরত নূহ (আ.), তিনি তাঁর জাতির অকথ্য নির্যাতনে সবর অবলম্বন করেছেন। ২. হযরত ইব্রাহীম (আ.), নমরূদ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, তিনি তাতে সবর করেছিলেন। ৩. হযরত ইসহাক (আ.), তিনি জবেহ করার ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। মোকাতিল (র.)-এর মতে, হযরত ইসহাক (আ.)-ই ছিলেন জবীহুল্লাহ, ইসমাঈল (আ.) নন [অথচ এ কথাটি অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতের পরিপন্থি, তাঁদের মতে জবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। ৪. হযরত ইয়াকূব (আ.), তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে যাওয়ার এবং নিজের অন্ধ হওয়ার ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। ৫. হযরত ইউসুফ (আ.), তিনি অরণ্যের কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর এবং কারাগারে অবস্থানের ব্যাপারে সবর অবলম্বন করেছেন। ৬. হযরত আইয়ূব (আ.), তিনি কুষ্ঠ রোগের কারণে চরম কষ্ট ভোগ করেছেন এবং সবর অবলম্বন করেছেন। হযরত জাবের (রা.) বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি "উলুল আজম" রাসূলের সংখ্যা হলো ৩১৩ জন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.)-এর মত হলো যাঁদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁরাই হলেন 'উলুল আজম' নবী-রাসূল। −[আদ্ দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ৫০]

Free @ www.eilm.weebly.com

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উলুল আজম বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী রাসূল ছিলেন পাঁচজন; যাঁদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন শরিয়ত দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন, হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ । আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদের কথা বিশেষভাবে নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন– وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

এমনিভাবে এ পাঁচজন নবীর উল্লেখ অন্য আয়াতেও রয়েছে–

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى .

যাহোক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, যেহেতু এই পাঁচজন নবীর উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে, তাই তাঁরাই হলেন اُولُوا الْعَزْمِ 'উলুল আজম' বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন ছয়জন। হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ । উপরোল্লিখিত আয়াতে হযরত আদম (আ.) ব্যতীত আর পাঁচজনের উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন শরিয়তের বাহক ছিলেন। তাঁদের পরে যাঁরা নবী হয়েছেন তাঁরাও এঁদেরই শরিয়তের অনুসারী ছিলেন। আর হযরত আদম (আ.) সর্বাগ্রে আগমন করেছেন। তাঁকে প্রদত্ত শরিয়তের উপরই তিনি আমল করেছেন।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, তাফসীরকার মাসরুক (র.) বলেছেন, আমাকে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্যে দুনিয়ার প্রতি সামান্য আকর্ষণও সমীচীন নয়। হে আয়েশা! আল্লাহ পাক 'উলুল আজম' ব্যক্তিদের জন্যে দুনিয়ার কষ্টের উপর সবর করা এবং লোভনীয় মোহনীয় বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করাকে পছন্দ করেছেন, আমার প্রতিও সে আদেশই হয়েছে যা অন্যান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণের প্রতিও হয়েছিল, আল্লাহ পাক আমার জন্যে তাই পছন্দ করেছেন, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করছেন। فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ . "[হে রাসূল!] আপনি সবর করুন যেভাবে অন্যান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীগণ সবর অবলম্বন করেছেন।"

তাই আমিও তাঁদের ন্যায় সবর অবলম্বন করবো, যেমনটি তাঁরা করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, সে দৃশ্যটি আমার চোখের সামনে রয়েছে যখন প্রিয়নবী ﷺ একজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, যাঁকে তার সম্প্রদায় প্রহার করতে করতে রক্তাপ্লুত করে ফেলেছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে মাফ করে দাও, এরা জানে না। এ ঘটনা স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এরই যা তায়েফ নামক স্থানে ঘটেছিল; কিন্তু তিনি নিজেকে গোপন করে এভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ১০, পৃ. ৪৬৫ - ৪৬৬]

জিনদের মধ্য হতে কোনো রাসূল নেই : আল্লাহ তা'আলা জিনদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল প্রেরণ করেছেন কিনা? এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, জিনদের মধ্য থেকে কোনো রাসূল নেই। রাসূল ﷺ -কে মানব ও দানব উভয়ের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقِتَالِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা কিতাল [মুহাম্মদ] মদিনায় অবতীর্ণ

إِلَّا وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ (اَلْاٰيَةَ) أَوْ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ أَوْ تِسْعٌ وَثَلٰثُوْنَ اٰيَةً

তবে وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত ৩৮/৩৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَصَدُّوْا غَيْرَهُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيِ الْاِيْمَانِ اَضَلَّ اَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ كَاِطْعَامِ الطَّعَامِ وَصِلَةِ الْاَرْحَامِ فَلَا يَرَوْنَ لَهَا فِي الْاٰخِرَةِ ثَوَابًا وَيُجْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ فَضْلِهِ تَعَالٰى .

১. যারা যেসব মক্কাবাসী কুফরি করে ও অপরকে আল্লাহর পথ অর্থাৎ ঈমান হতে নিবৃত্ত করে, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। যেমন খাদ্য খাওয়ানো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা। তারা পরকালে এর কোনো ছওয়াব / প্রতিদান পাবে না। আল্লাহর অনুগ্রহে তাদেরকে পৃথিবীতেই এর প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে।

২. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَيِ الْاَنْصَارُ وَغَيْرُهُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَيِ الْقُرْاٰنُ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ غفر لهم سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ اَيْ حَالَهُمْ فَلَا يَعْصُوْنَهُ .

২. যারা ঈমান আনে, অর্থাৎ আনসারগণ ও অন্যান্যরা সৎকর্ম করে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন তাতে বিশ্বাস করে। আর তা-ই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দকর্মগুলো বিদূরিত করবেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন ফলে তারা তাঁর নাফরমানি করবে না।

৩. ذٰلِكَ اَيْ اِضْلَالُ الْاَعْمَالِ وَتَكْفِيْرُ السَّيِّئَاتِ بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ الشَّيْطَانَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ الْقُرْاٰنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ط كَذٰلِكَ اَيْ مِثْلَ ذٰلِكَ الْبَيَانِ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ يُبَيِّنُ اَحْوَالَهُمْ اَيْ فَالْكَافِرُ يُحْبَطُ عَمَلُهُ وَالْمُؤْمِنُ يُغْفَرُ زَلَلُهُ .

৩. এটা এজন্য যে, অর্থাৎ কর্মকে ব্যর্থ করে দেওয়া ও পাপ মোচন করা এ কারণে যে, যারা কুফরি করে তারা মিথ্যার শয়তানের অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের কুরআনের অনুসরণ করে, এভাবেই অর্থাৎ এই বর্ণনার মতো আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। তাদের অবস্থা বর্ণনা করেন। সুতরাং কাফেরের কর্মকে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে। আর মুমিনের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط مَصْدَرٌ بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ اَىْ فَاضْرِبُوْا رِقَابَهُمْ اَىْ اُقْتُلُوْهُمْ وَعَبَّرَ بِضَرْبِ الرِّقَابِ لِاَنَّ الْغَالِبَ فِى الْقَتْلِ اَنْ يَكُوْنَ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ حَتّٰى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ اَىْ اَكْثَرْتُمْ فِيْهِمُ الْقَتْلَ فَشُدُّوا اَىْ فَاَمْسِكُوْا عَنْهُمْ وَاَسِرُوْهُمْ وَشُدُّوا الْوَثَاقَ مَا يُوْثَقُ بِهِ الْاَسْرٰى فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ مَصْدَرٌ بَدَلٌ مِنَ اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ اَىْ تَمُنُّوْنَ عَلَيْهِمْ بِاِطْلَاقِهِمْ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ وَاِمَّا فِدَاۤءً اَىْ تُفَادُوْنَهُمْ بِمَالٍ اَوْ اَسْرٰى مُسْلِمِيْنَ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَىْ اَهْلُهَا اَوْزَارَهَا تف اَثْقَالَهَا مِنَ السِّلَاحِ وَغَيْرِهٖ بِاَنْ يُسْلِمَ الْكُفَّارُ اَوْ يَدْخُلُوْا فِى الْعَهْدِ وَهٰذِهٖ غَايَةٌ لِلْقَتْلِ وَالْاَسْرِ ذٰلِكَ ط خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مُقَدَّرٍ اَىِ الْاَمْرُ فِيْهِمْ مَا ذُكِرَ وَلَوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلٰكِنْ اَمَرَكُمْ بِهٖ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط مِنْهُمْ فِى الْقِتَالِ فَيَصِيْرُ مَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمِنْهُمْ اِلَى النَّارِ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا وَفِىْ قِرَاءَةٍ قَاتَلُوْا الْاٰيَةَ نَزَلَتْ يَوْمَ اُحُدٍ وَقَدْ فَشَا فِى الْمُسْلِمِيْنَ الْقَتْلُ وَالْجِرَاحَاتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ يُحْبِطَ اَعْمَالَهُمْ .

৪. অতএব, যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর। ضَرْبَ শব্দটি মাসদার ফে'ল শব্দ দ্বারা স্বীয় ফে'লের পরিবর্তে অর্থাৎ فَاضْرِبُوْا رِقَابَهُمْ অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা কর। আর হত্যাকে গর্দানের দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হলো এই যে, সাধারণত গর্দানে আঘাত করার দ্বারা সহজ উপায়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তাদের অধিক হারে হত্যা করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে এবং তাদেরকে বন্দী করে ফেলবে। اَلْوَثَاقَ এমন বস্তুকে বলা হয় যার দ্বারা বন্দীদেরকে বাঁধা হয়। রশি ইত্যাদি। অতঃপর হয় অনুকম্পা مَنًّا শব্দটি স্বীয় ফে'লের মাসদার স্বীয় ফে'লের পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ তোমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে তাদেরকে কোনো বিনিময় ব্যতিরেকে ছেড়ে দিয়ে। নয় মুক্তিপণ অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে ধন-সম্পদ কিংবা মুসলিম বন্দির বিনিময়ে ছেড়ে দিবে। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ যুদ্ধ এদের অস্ত্র নামিয়ে ফেলে যাতে করে কাফেররা মুসলমান হয়ে যায় বা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আর এটা হলো হত্যা ও বন্দী করার চূড়ান্তসীমা। এটাই বিধান এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ اَلْاَمْرُ ذٰلِكَ তথা তাদের ব্যাপারে বিধান এটাই। এটা এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন হত্যা ব্যতিরেকেই কিন্তু তোমাদের হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। সুতরাং যে তোমাদের মধ্য থেকে নিহত হবে সে জান্নাতে চলে যাবে আর যে ব্যক্তি তাদের থেকে নিহত হবে সে জাহান্নামে আশ্রয় নিবে। যারা নিহত হয়/মৃত্যুবরণ করে অপর কেরাতে রয়েছে قَاتَلُوْا এ আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হয়েছে যখন মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নিহত ও আহত হওয়া ছড়িয়ে পড়েছিল। আল্লাহর পথে তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. سَيَهْدِيْهِمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلٰى مَا يَنْفَعُهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ حَالَهُمْ فِيْهِمَا وَمَا فِى الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يُقْتَلْ وَاُدْرِجُوْا فِىْ قُتِلُوْا تَغْلِيْبًا .

৫. তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন পৃথিবীতে এবং পরকালে এমন জিনিসের যা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে হেদায়েত ও সংশোধন ইত্যাদি তার জন্য যে শহীদ হয়নি। আর যারা নিহত হয়নি তাদেরকে تَغْلِيْبًا নিহতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

٦. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا بَيَّنَهَا لَهُمْ فَيَهْتَدُوْنَ اِلٰى مَسَاكِنِهِمْ مِنْهَا وَاَزْوَاجِهِمْ وَخَدَمِهِمْ مِنْ غَيْرِ اِسْتِدْلَالٍ .

৬. তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে। যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং তারা জান্নাতে স্বীয় বাসস্থানের দিকে, স্বীয় পুণ্যবতী রমণীদের দিকে এবং স্বীয় সেবকদের দিকে কোনো নির্দেশনা ব্যতিরেকেই পৌঁছে যাবে।

٧. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ اَىْ دِيْنَهُ وَرَسُوْلَهُ يَنْصُرْكُمْ عَلٰى عَدُوِّكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ يُثَبِّتْكُمْ فِى الْمُعْتَرَكِ .

৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর অর্থাৎ তাঁর দীনকে ও তাঁর রাসূলকে তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের সুদৃঢ় করবেন।

٨. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَعَسُوْا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَتَعْسًا لَهُمْ اَىْ هَلَاكًا وَخَيْبَةً مِنَ اللّٰهِ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ عَطْفٌ عَلٰى تَعَسُوْا .

৮. যারা কুফরি করেছে এটা مُبْتَدَأٌ তার খবর হলো تَعَسُوْا যা উহ্য রয়েছে। আর فَتَعْسًا لَهُمْ ঐ উহ্য খবরকে বুঝাচ্ছে। তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। ধ্বংস ও আল্লাহর পক্ষ হতে হতাশা ও লাঞ্ছনা। এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। এটা تَعَسُوْا -এর উপর আতফ হয়েছে।

٩. ذٰلِكَ اَىِ التَّعْسُ وَالْاِضْلَالُ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى التَّكَالِيْفِ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

৯. এটা এই ধ্বংস ও কর্ম ব্যর্থ হওয়া এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন বিধান সম্বলিত কুরআন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

١٠. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَهْلَكَ اَنْفُسَهُمْ وَاَوْلَادَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا اَمْثَالُ عَاقِبَةِ مَنْ قَبْلِهِمْ .

১০. তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন অর্থাৎ তাদেরকে, তাদের সন্তানাদেরকে এবং তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকদের শাস্তির ন্যায় শাস্তি।

١١. ذٰلِكَ اَىْ نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَهْرُ الْكَافِرِيْنَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى وَلِىُّ وَنَاصِرُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ .

১১. এটা অর্থাৎ মুমিনদেরকে সাহায্য করা এবং কাফেরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়া এজন্য যে, আল্লাহতো মুমিনদের অভিভাবক ওলী ও সাহায্যকারী এবং কাফেরদের তো কোনো অভিভাবক নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

এ সূরার নাম সূরা কিতাল। পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের তারতীব অনুযায়ী এটা ৪৭নং সূরা। এই নামটি অত্র সূরার ২০ নং আয়াতের وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা ছাড়াও এ সূরার আরো দুটি নাম রয়েছে- ১. সূরা মুহাম্মদ ২. সূরা আল্লাযীনা কাফারূ।

قَوْلُهُ صَدُّوْا : এটা لَازِمٌ এবং مُتَعَدِّيْ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ নিজেই বিরত থাকা এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখা। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরাইশ কাফেররা।

قَوْلُهُ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ : এর অর্থ হলো- اَبْطَلَهَا وَجَعَلَهَا ضَائِعَةً তথা আমলকে বাতিল, বিনষ্ট ও ব্যর্থ করে দেওয়া।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ : এখানে عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -এর আতফ اٰمَنُوْا -এর উপর করা হয়েছে। এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَمَلٌ صَالِحٌ মূল ঈমানের অংশ নয়। কেননা আতফ مُغَايَرَتْ [বিপরীত বস্তুকে] চায়। কাজেই عَمَلٌ صَالِحٌ বা সৎ কাজ ঈমানের পূর্ণতার জন্য শর্তের পর্যায়ে যা আশায়েরাদের অভিমত।

قَوْلُهُ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ : এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَعْطُوْفٌ -এর গুরুত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা এবং এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের পর তাঁর উপর ও তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন এর উপর ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত পূর্ণ ঈমানদার হবে না। অর্থাৎ কেউ যদি তাওহীদ, তাওহীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, দীনের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে, তবে তার ঈমান আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এটা হলো মুবতাদা, আর كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ হলো তার খবর। আর وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ হলো উভয়ের মাঝে একটি جُمْلَه مُعْتَرِضَه

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : এটা হলো মুবতাদা আর بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ হলো মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ : এটা হলো ظَرْف অর্থাৎ اِذَا لَقِيْتُمْ -এর আমেল উহ্য রয়েছে এবং ضَرْبَ الرِّقَابِ -ও ঠিক সেই আমেলই। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে, فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ وَقْتَ مُلَاقَاتِكُمُ الْعَدُوَّ

قَوْلُهُ فَضَرْبَ الرِّقَابِ : এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ضَرْبَ মাসদারটা তার থেকে গঠিত فِعْلِ اَمْر তথা اِضْرِبُوْا -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কেননা মূলত ছিল فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا ফে'লকে ফেলে দিয়ে মাসদারকে مَفْعُوْل -এর দিকে ইযাফত করে ফে'লের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে সংক্ষেপ করার সাথে সাথে تَاكِيْد -ও হয়েছে।

قَوْلُهُ اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ : অর্থাৎ যখন তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে হত্যা করেছ। اَثْخَنْتُمُوْا এটা اِثْخَانٌ মাসদার হতে مَاضِيْ -এর جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ। আর هُمْ যমীর হলো جَمْع مُذَكَّر غَائِب অর্থাৎ اَكْثَرْتُمْ فِيْهِمُ الْقَتْلَ আর مِصْبَاح গ্রন্থে রয়েছে, اَثْخَنَ فِي الْاَرْضِ অর্থ হলো- سَارَ اِلَى الْعَدُوِّ

قَوْلُهُ الْوَثَاقَ : এর وَاوْ বর্ণ যের ও যবর উভয় হরকতসহ পঠিত রয়েছে। অর্থ হলো- مَا يُوْثَقُ بِهٖ অর্থাৎ যা দ্বারা বাঁধা হয় যেমন রশি ইত্যাদি। এর বহুবচন হলো وُثُقٌ যেমন عِنَاقٌ -এর বহুবচন عُنُقٌ -

قَوْلُهُ وَهٰذِهٖ غَايَةٌ لِلْقَتْلِ وَالْاَسْرِ : অর্থাৎ শত্রুপক্ষ যখন যুদ্ধের হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করে এবং শত্রুদের শক্তি একেবারেই খর্ব হয়ে যায় তখন হত্যা ও বন্দীকরণ স্থগিত করে দাও।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا : এটা হলো মুবতাদা আর فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ হলো মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ : এটা হলো اَمْرٌ بِالْقِتَالِ -এর ইল্লত তথা জিহাদের নির্দেশদানের কারণ।

قَوْلُهُ وَمَا فِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُقْتَلُ وَاُدْرِجُوْا فِيْ قُتِلُوْا تَغْلِيْبًا : এটার মাধ্যমে একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো- আল্লাহর বাণী- وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ -এর তাফসীর حَالُهُمْ فِيْهَا اَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দ্বারা করা হয়েছে। هُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিবর্গ। একথা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে اِصْلَاحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে সকল বস্তু যা পৃথিবীতে কল্যাণকর হয়। যেমন- সৎ আমল, ইখলাস, হেদায়েত। কিন্তু এ জাতীয় اِصْلَاحٌ -এর অবস্থাতো তাদের জন্যই হতে পারে, যারা নিহত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় اِعْتِرَاضٌ টা قُتِلُوْا কেরাতে হবে। আর যদি قَاتَلُوْا হয় তবে এই প্রশ্ন উঠবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জবাবের সারনির্যাস হলো– এখানে قُتِلُوْا দ্বারা সে সকল মুজাহিদগণ উদ্দেশ্য যরা নিহত হননি। তবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। قَاتَلُوْا কেরাতের দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। হত্যাকারীদেরকে تَغْلِيْبًا নিহতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন আয়াতের উদ্দেশ্য এটা হবে যে, যেই মুজাহিদগণ জীবিত রয়েছেন আল্লাহ পৃথিবীতে তাদের অবস্থার اِصْلَاحٌ করবেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছেন, তাদের অবস্থার اِصْلَاحٌ বা সংশোধন জান্নাতে করবেন।

قَوْلُهُ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ : এর তাফসীর يُثَبِّتْكُمْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, جُزْء বলে كُلّ তথা ذَاتْ - উদ্দেশ্য। ذَاتْ -কে اَقْدَامْ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হলো– সুদৃঢ় থাকা এবং কম্পিত হওয়ার প্রভাব প্রথমে পায়ের উপরই প্রকাশ পায়।

قَوْلُهُ اَلْمُعْتَرِكِ : এর দ্বারা রণাঙ্গন উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : ذَالِكَ হলো মুবতাদা আর بِاَنَّ اللّٰهَ হলো তার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা মুহাম্মদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এই সূরা মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ, এতে ৪ রুকূ' ও ৩৮ আয়াত রয়েছে।

নামকরণ : এই সূরাকে 'সূরা কিতাল'-ও বলা হয়। কেননা, এতে জিহাদের বিবরণ রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, একটি আয়াত ব্যতীত সম্পূর্ণ সূরাটিই মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। আর সে আয়াতটি হলো– وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً.....فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

প্রিয়নবী ﷺ হিজরতের সফরে যখন মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, তখন বারংবার মক্কা নগরীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহ পাকের দরবারে তুমি প্রিয় শহর, আর আমার নিকটও তুমি অত্যন্ত প্রিয় শহর, যদি মক্কাবাসী আমাকে বাধ্য না করতো তবে আমি কখনো এই শহর থেকে হিজরত করতাম না।" তখন আলোচ্য আয়াতখানি নাজিল হয়।

যেহেতু আয়াতখানি হিজতের সফরে মক্কার অদূরে মদীনা মোনাওয়ারায় পৌঁছার পূর্বে নাজিল হয়, তাই এ আয়াতকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কায় অবতীর্ণ বলেছেন, সূরার অবশিষ্ট সকল আয়াতই মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

যেহেতু এ আয়াতখানি হিজরতে সফরে মক্কার অদূরে মদীনা মোনাওয়রায় পৌঁছার পূর্বে নাজিল হয়, তাই এ আয়াতকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কায় অবতীর্ণ বলেছেন, সূরার অবশিষ্ট সকল আয়াতই মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর নাফরমানি করে, যারা পাপিষ্ঠ, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এ কথার উপর কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, কুফরি ও নাফরমানি সত্ত্বেও যারা গরিব দুঃখীকে সাহায্য করে, দুর্গত মানবতার সেবায় এগিয়ে যায়, তারাও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? এরই জবাবে আল্লাহ পাক সূরার প্রথম আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ

অর্থাৎ যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকেও মানে না, তদুপরি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, তাদের যাবতীয় সৎ কাজ বরবাদ হয়ে যায়; কেননা, ঈমান ও ইখলাস ব্যতীত আল্লাহ পাকের দরবারে কোনো নেক আমলই কবুল হয় না।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর দুশমন, তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে, প্রিয়নবী ﷺ -এর সত্য-সাধনায় বাধা দেয়, তাদের যাবতীয় সৎকাজ ব্যর্থ। এরপর জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি কখন আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। এরপর মক্কার কাফেরদের ধ্বংসের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে মদীনা মোনাওয়ারায় মুনাফিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সূরার পরিসমাপ্তিতে মুসলিম জাতিকে আল্লাহর রাহে জিহাদের আহ্বান জানানো হয়েছে। কেননা জিহাদের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি পৃথিবীতে বিজয় এবং সাফল্য লাভ করতে পারে।

সূরার আমল : যে ব্যক্তি এ সূরা লিপিবদ্ধ করে আবে জমজম দ্বারা ধৌত করে পান করে, সে মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয় হয়। আর যে ঐ পানি দ্বারা গোসল করে, সে অনেক রোগ থেকে বিশেষত চর্ম রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তার নিকট হযরত আজরাঈল (আ.) অতি উত্তম আকৃতি ধারণ করে আসবেন এবং তার হাশর হবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে।

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে– فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ

অর্থাৎ পাপিষ্ঠরাই ধ্বংস হবে। এ কথার উপর এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, যারা নিরন্নকে খাবার দেয়, যারা আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়, সেলায়ে রেহমী করে তাদের সকল সৎকাজই বিনষ্ট হয়ে যাবে? অথচ কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ
"যে সামান্যতম সৎকাজও করবে সে তার শুভ পরিণতি অবশ্যই দেখতে পাবে।"
এ প্রশ্নের জবাবই আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে–
اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ যারা অস্বীকার করেছে প্রিয়নবী ﷺ -এর নবুয়তকে এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতাকে, শুধু তাই নয়; বরং তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রেখেছে আল্লাহ পাক তাদের সকল আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন। কেননা কোনো সৎকাজ আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত হলো ঈমান। যেহেতু তারা কাফের ও বিদ্রোহী এবং জনসাধারণকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে বিরত রাখার জন্যে তারা সর্বদা অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো, তাই তাদের কোনো সৎকর্মই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।
যে কর্মের উদ্দেশ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা না হয়, তা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে দুনিয়াতে তাদের এসব কল্যাণকর কাজের জন্যে সুনাম হতে পারে।
তাফসীরকার যাহহাক (র.) আলোচ্য আয়াতে اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ বাক্যটির অর্থ করেছেন এভাবে– আল্লাহ পাক কাফেরদের গোপন চক্রান্তগুলোকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে, তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে বানচাল করেছেন। মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার এটিই অনিবার্য শাস্তি।
ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর দুটি অর্থ হতে পারে। ১. তারা নিজেদেরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। ২. অথবা এর অর্থ হলো তারা অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বিরত রাখে।

বস্তুত অমুসলিমরা যেসব কাজকে সৎকাজ এবং মানবতার জন্যে কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, কিয়ামতের দিন সে কাজগুলোর কোনোটিরই গুরুত্ব হবে না, ঈমান ব্যতীত কোনো সৎকাজই যে গ্রহণযোগ্য হয় না, সেদিন তারা এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।
তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কারো সৎকাজ ব্যর্থ হওয়ার জন্যে তথা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার জন্য তার কুফরি ও নাফরমানিই যথেষ্ট; অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে বাধা দান এর শর্ত নয়, তবে মক্কার কাফেরদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা শুধু কুফরি ও নাফরমানিতেই যে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা মানুষকে ঈমান আনয়নেও বাধা দিত এবং কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত থাকতে প্ররোচিত করতো।
তাবারানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সময় মাগরিবের নামাজে এ সূরার প্রথম আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন।
قَوْلُهٗ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ : যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষনবী মুহাম্মদ ﷺ -এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।
قَوْلُهٗ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ : بَالٌ শব্দটি কখনো অবস্থার অর্থে এবং কখনো অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভালো করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা– ১. যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। ২. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কৃপাবশত তাদেরকে কোনো রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যত খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন– আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলার আজাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল– যদি এই আজাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরিফুল কুরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সারকথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরো উত্তমরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হাসান, আতা (র.), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখ ফিকহবিদ ইমামের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদের কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এ আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্ত করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ .

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েজ নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে য, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের অনুরূপ অর্থাৎ মুক্ত করা জায়েজ বলে তাফসীরে মাযহারী বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলেমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে এই মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেন– কুদূরী ও হিদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযম থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রেওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রেওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র.) 'মা'আনিউল আসারে' এটাকেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিকহবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনো একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনো হত্যা করা হয়েছে, কখনো গোলাম করা হয়েছে, কখনো মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনো মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া– এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কোনো আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাফেররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনোটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদি করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন অথবা কোনোরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী (র.) লিখেন–

وَهٰذَا الْقَوْلُ يُرْوٰى مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَاَبِيْ عُبَيْدٍ وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ مَذْهَبًا عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْمَشْهُوْرُ مَا قَدَّمْنَاهُ .

অর্থাৎ মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ওবায়েদ (র.)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব এর বিপক্ষে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা : উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধ বন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিকহবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপার কোনো মতভেদ নেই। এক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েজ। এমতাবস্থায় কুরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাযী (র.) তাফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েজ নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। -[তাফসীরে কবীর খ. ৭, পৃ. ৫০৮]

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানতে যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এ স্থলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এ স্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমুহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কুরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হতো। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পর কুরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম ভক্ত সাহাবায়ে কেরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির স্বরূপ ও প্রাণ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক ব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তা ও লিবান তদীয় 'আরবের তমদ্দুন' গ্রন্থে লিখেন-

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকান ঐতিহ্য পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন মিসকীনদের চিত্র ভেসে উঠে, যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনোরূপ দেহে আটকে রাখার জন্যও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কিনা।"...... কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃস্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

-[ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরা মা'আরিফুল কুরআন থেকে উদ্ধৃত। খ. ৪, পৃ. ১৭৯]

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চেয়ে উত্তম কোনো পথ থাকে না। কেননা, দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থায়ই সম্ভবপর- হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, কিংবা যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোনো কোনো বন্দী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে তাকে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে যাবে। এখন দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে- হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মতো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবাধিকারের পুরোপুরি দেখাশোনা করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষত দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রতিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরো সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন-

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ.

অর্থাৎ তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কারেজ ভার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহায্য করে। –[বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ]

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সে মতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মনিবদেরকে وَأَنْكِحُوا الْأَيَامٰى مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমন কি তারা স্বাধীন ও মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে প্রাণের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য, যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কুরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশনাবলি এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা.) বলেন, দু'জাহানের নেতা হযরত রাসূলে মাকবুল ﷺ -এর পবিত্র মুখে যে বাক্যাবলি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই– اَلصَّلٰوةَ اَلصَّلٰوةَ اِتَّقُوا اللّٰهَ فِيْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। –[আবূ দাউদ]

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এরপর এই নামেমাত্র দাসত্বকেও পর্যায়ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্য দাসদেরকে মুক্ত করার ফজিলত কুরআন ও হাদীসে ভুরি ভুরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্যকোনো সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিকহের বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্য বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোজার কাফফারা, জিহারের কাফফারা ও কসমের কাফফারার মধ্যে দাসমুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া। –[মুসলিম] সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল তাঁর অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। 'আন্নাজমুল ওয়াহহাজ'-এর গ্রন্থকার কোনো কোনো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন–

হযরত আয়েশা (রা.)– ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রা.)– ১০০, হযরত উসমান গণী (রা.)– ২০, হযরত আব্বাস (রা.)– ৭০, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)– ১০০০, হযরত যুলকা'লা হিমইয়ারী (রা.)– ৮০০০ [মাত্র এক দিনে], হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ৩০,০০০।

–[ফতহুল আল্লামা, টীকা বুলুগুল মারাম : নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত খ. ২, পৃ. ২৩২]

এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, অন্য আরো হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোটকথা ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বুঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোনো চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোনো বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য : وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা, জিহাদকে আসমানী আজাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও আল্লাহদ্রোহিদার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও জমিনের আজাব দ্বারা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আজাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আজাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথমত এই যে, ব্যাপক আজাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহর ধর্মের হিফাজতকারীদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তওফীক হয়ে যায়। জিহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফেরের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহর নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ : সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফর ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন; অর্থাৎ তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোনো ছওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাঁদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গুনাহ করলেও সেই গুনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না; বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এতে শহীদের দু'টি নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। ১. আল্লাহ তাকে হেদায়েত করবেন। ২. তার সমস্ত অবস্থা ভালো করে দেবেন। অবস্থা বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এভাবে যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের ছওয়াবের অধিকারী হবে। আখিরাতে এভাবে যে, সে কবরের আজাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার জিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ তা'আলা হকদারকে তাঁর প্রতি রাজী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। -[মাযহারী]

শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে মকসূদ' অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন; যেমন কুরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌছে একথা বলবে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا

قَوْلُهُ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ : এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নিয়ামত তথা হুর এবং গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চেয়েও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা হবে। -[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার স্ত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

قَوْلُهُ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا : এখানে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আজাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

قَوْلُهُ وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ : مَوْلٰى শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ- অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বুঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কুরআনর অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ এতে আল্লাহ তা'আলাকে কাফেরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ তা'আলা সবারই মালিক। মুমিন-কাফের কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٢. إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ اَيْ لَيْسَ لَهُمْ هِمَّةٌ اِلَّا بُطُوْنُهُمْ وَفُرُوْجُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُوْنَ اِلَى الْاٰخِرَةِ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ . مَنْزِلٌ وَمَقَامٌ وَمَصِيْرٌ .

১২. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরি করে তারা ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে পৃথিবীতে এবং জন্তু-জানোয়ারের মতো উদর পূর্তি করে। অর্থাৎ তাদের পেট ও যৌনাঙ্গের কামনা বাসনা ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা আখিরাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না। আর জাহান্নামই তাদের নিবাস। অর্থাৎ বাড়ি, অবস্থানস্থল ও প্রত্যাবর্তনস্থল।

١٣. وَكَاَيِّنْ وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اُرِيْدَ بِهَا اَهْلُهَا هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ مَكَّةَ اَيْ اَهْلِهَا الَّتِيْ اَخْرَجَتْكَ ج رُوْعِيَ لَفْظُ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهُمْ رُوْعِيَ مَعْنٰى قَرْيَةٍ الْاُوْلٰى فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ . مِنْ اِهْلَاكِنَا .

১৩. আরো কত শক্তিশালী জনপদ ছিল এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জনপদের অধিবাসীরা আপনার জনপদ হতে মক্কা তথা তার অধিবাসীদের থেকে। যে জনপদ হতে আপনাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা اَخْرَجَتْكَ এর মধ্যে قَرْيَة শব্দের রেয়ায়েত করা হয়েছে, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি প্রথম قَرْيَة -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। এবং তাদেরকে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। আমার ধ্বংস হতে।

١٤. اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا وَهُمْ كُفَّارُ مَكَّةَ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ . فِيْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ اَيْ لَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا .

১৪. যে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আর তারা হলো মুমিনগণ। সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলো শোভন প্রতীয়মান হয়। ফলে সে তাকে উত্তম মনে করে আর তারা হলো মক্কার কাফেররা। এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে? মূর্তিগুলোর উপাসনা করে অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাঝে কোনো মিল নেই।

١٥. مَثَلُ اَيْ صِفَةُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط الْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَ دَاخِلِيْهَا مُبْتَدَاٌ خَبَرُهٗ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ كَضَارِبٍ وَحَذِرٍ اَيْ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ بِخِلَافِ مَاءِ الدُّنْيَا فَيَتَغَيَّرُ لِعَارِضٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ج بِخِلَافِ لَبَنِ الدُّنْيَا لِخُرُوْجِهٖ مِنَ الضُّرُوْعِ .

১৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত যা তাতে প্রবেশকারীদের মধ্যে মুশতারিক এটা মুবতাদা আর তার খবর হচ্ছে তাতে আছে নির্মল পানির নহর اٰسِنٍ শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত। যেমন ضَارِبٍ এবং حَذِرٍ অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল। পৃথিবীর পানির বিপরীত কেননা তা যে কোনো কারণেই পরিবর্তন হয়ে যায়। আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় পৃথিবীর দুধের বিপরীত তা স্তন থেকে বের হওয়ার কারণে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لَذِيْذَةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا فَاِنَّهَا كَرِيْهَةٌ عِنْدَ الشُّرْبِ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط بِخِلَافِ عَسَلِ الدُّنْيَا فَاِنَّهُ لِخُرُوْجِهِ مِنْ بُطُوْنِ النَّحْلِ يُخَالِطُهُ الشَّمْعُ وَغَيْرُهُ وَلَهُمْ فِيْهَا اَصْنَافٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط فَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ مَعَ اِحْسَانِهِ اِلَيْهِمْ بِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ سَيِّدِ الْعَبِيْدِ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَعَ اِحْسَانِهِ اِلَيْهِمْ سَاخِطًا عَلَيْهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ خَبَرُ مُبْتَدَاٍ مُقَدَّرٍ اَىْ اَمَنْ هُوَ فِىْ هٰذَا النَّعِيْمِ وَسُقُوْا مَاۤءً حَمِيْمًا اَىْ شَدِيْدَ الْحَرَارَةِ فَقَطَّعَ اَمْعَاۤءَهُمْ اَىْ مَصَارِيْنَهُمْ فَخَرَجَتْ مِنْ اَدْبَارِهِمْ وَهُوَ جَمْعُ مِعًا بِالْقَصْرِ وَاَلِفُهُ عِوَضٌ عَنْ يَاءٍ لِقَوْلِهِمْ مِعْيَانِ.

আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর পৃথিবীর মদের বিপরীত। কেননা তা পানকালে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। আর আছে পরিশোধিত মধুর নহর। পৃথিবীর মধুর বিপরীত। কেননা এটা মধু মক্ষিকার পেট হতে বের হওয়ার কারণে তাতে চর্বি ইত্যাদির সংমিশ্রণ থাকে। এবং সেখায় তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল আর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা তাদের প্রতি উল্লিখিত অনুগ্রহ করার পরও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। পৃথিবীর দাসদের সর্দারদের বিপরীত। কেননা পৃথিবীর মনিবরা অনুগ্রহ করার সাথে সাথে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হন। মুত্তাকীগণ কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ اَمَنْ هُوَ فِىْ هٰذَا النَّعِيْمِ -এর খবর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ নিয়ামতের মধ্যে হবে সে কি ঐ ব্যক্তির মতো হবে, যে সর্বদা আগুনে থাকবে। এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি। অর্থাৎ খুবই গরম যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে। অর্থাৎ নাড়িভুঁড়ি তাদের পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আর اَمْعَاۤءً শব্দটি مِعًا [মদবিহীন] -এর বহুবচন ; এর আলিফটি يَاء -এর পরিবর্তে এসেছে। দ্বিবচনে مَعْيَانِ যা তাদের উক্তিকে সমর্থন করে।

١٦. وَمِنْهُمْ اَىِ الْكُفَّارُ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ج فِىْ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ لِعُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ اِسْتِهْزَاءً وَسُخْرِيَّةً مَاذَا قَالَ اٰنِفًا نف بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ اَىِ السَّاعَةَ اَىْ لَا نَرْجِعُ اِلَيْهِ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ بِالْكُفْرِ وَاتَّبَعُوْۤا اَهْوَاۤءَهُمْ فِى النِّفَاقِ.

১৬. তাদের মধ্যে কতেক অর্থাৎ কাফেরদের আপনার কথা শ্রবণ করে জুমার খুতবায়, আর তারা হলো মুনাফিকরা। অতঃপর আপনার নিকট হতে বের হয়ে যায়, যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত তাদেরকে বলে বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরাম কে ঠাট্টা-বিদ্রূপের স্বরে বলে তন্মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত। এই মাত্র তিনি কি বললেন? اٰنِفًا শব্দটি মদসহ ও মদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত। অর্থ– সময় এখনই আমরা সেদিকে মনোযোগ দেই না। এদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন কুফরের মাধ্যমে এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে। নেফাকের ক্ষেত্রে।

Free @ www.eilm.weebly.com

١٧. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ زَادَهُمُ اللّٰهُ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اَلْهَمَهُمْ مَا يَتَّقُونَ بِهِ النَّارَ.

১৭. যারা সৎ পথ অবলম্বন করে তারাই হলো মুমিন সম্প্রদায়। আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে মুত্তাকী হওয়ার শক্তিদান করেন। অর্থাৎ এমন জিনিসের ইলহাম/শক্তিদান করেন যার মাধ্যমে সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকে।

١٨. فَهَلْ يَنْظُرُونَ مَا يَنْتَظِرُونَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ السَّاعَةِ اَيْ لَيْسَ الْاَمْرُ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ج فَجْأَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا ج عَلَامَاتُهَا مِنْهَا بِعْثَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ وَالدُّخَانُ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ ذِكْرٰهُمْ تَذَكُّرُهُمْ اَيْ لَا تَنْفَعُهُمْ.

১৮. তারা মক্কার কাফেররা কি কেবল এ জন্যই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে تَأْتِيَهُمْ টা اَلسَّاعَةَ হতে بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বাস করার কোনো সুরত অবশিষ্ট থাকল না; কিন্তু এটা যে, তাদের নিকট অকস্মাৎ কিয়ামত এসে যাবে। কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। অর্থাৎ তার নিদর্শনগুলো। তন্মধ্য হতে মহনবী ﷺ -এর ধরায় প্রেরিত হওয়া, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া এবং ধোঁয়া নির্গত হওয়া। কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে! অর্থাৎ উপদেশ তাদেরকে উপকৃত করবে না।

١٩. فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَيْ دُمْ يَا مُحَمَّدُ عَلٰى عِلْمِكَ بِذٰلِكَ النَّافِعِ فِي الْقِيَامَةِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ لِاَجْلِهِ قِيلَ لَهُ ذٰلِكَ مَعَ عِصْمَتِهِ لِتَسْتَنَّ بِهِ اُمَّتُهُ وَقَدْ فَعَلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط فِيهِ اِكْرَامٌ لَهُمْ بِاَمْرِ نَبِيِّهِمْ بِالْاِسْتِغْفَارِ لَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ مُنْصَرَفَكُمْ لِاشْتِغَالِكُمْ بِالنَّهَارِ وَمَثْوٰىكُمْ مَاْوَاكُمْ اِلٰى مَضَاجِعِكُمْ بِاللَّيْلِ اَيْ هُوَ عَالِمٌ بِجَمِيعِ اَحْوَالِكُمْ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا فَاحْذَرُوهُ وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِهِمْ.

১৯. সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সেই জ্ঞানের উপর অবিচল থাকুন যা কিয়ামতের দিন কল্যাণকর ও উপকারী হবে। এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। রাসূল ﷺ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। যাতে করে তাঁর উম্মতেরা তাঁর অনুসরণ করতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর এ নির্দেশ পালনও করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ ১০০ বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। [ইস্তিগফার পড়ি] এবং মুমিন নর নারীদের নির্দেশ দেওয়ার মধ্যে উম্মতের সম্মান নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবগত আছেন তোমাদের গতিবিধি সম্পর্কে দিনের বেলায় তোমাদের কাজ-কর্মের জন্য। এবং তোমাদের অবস্থান সম্বন্ধে। রাতে তোমাদের শয়নস্থল সম্পর্কে। অর্থাৎ তিনি তোমাদের সকল অবস্থান সম্পর্কে অবগত। এর মধ্যে হতে কোনো জিনিসই গোপন নয়। কাজেই তাঁকে ভয় করতে থাকো। আর এই সম্বোধন মুমিন ও গায়রে মুমিন সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَثْوًى : এটা ظَرْف مَكَان অর্থ– ঠিকানা, দীর্ঘ দিন অবস্থান করার জায়গা।

قَوْلُهُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ : এটা মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَه مُسْتَانِفَه

قَوْلُهُ كَايِّنْ : এটা كَافْ এবং اَيٌّ দ্বারা গঠিত/ মুরাক্কাব হয়েছে। كَمْ خَبَرِيَّة এর অর্থে হয়েছে। মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ هِيَ اَشَدُّ الخ : প্রথম قَرْيَة প্রতি লক্ষ্য করে اَخْرَجَتْكَ-এর যমীর مُؤَنَّثْ আনা হয়েছে। আর اَهْلَكْنَا هُمْ-এর যমীরের মধ্যে দ্বিতীয় قَرْيَة-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ قَرْيَة দ্বারা اَهْل قَرْيَة উদ্দেশ্য নেওয়ার কারণে যমীরকে مُذَكَّرْ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَخْرَجَتْكَ : প্রথম قَرْيَة প্রতি লক্ষ্য করে اَخْرَجَتْكَ-এর যমীর مُؤَنَّثْ আনা হয়েছে। اَهْلَكْنَاهُمْ-এর যমীরের মধ্যে দ্বিতীয় قَرْيَة-এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ قَرْيَة দ্বারা اَهْل قَرْيَة উদ্দেশ্য নেওয়ার কারণে যমীরকে مُذَكَّرْ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمُشْتَرِكَةُ : অর্থাৎ খোদাভীরুদের সাথে যে জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তাতে সকল মুমিনগণের অংশীদারিত্ব রয়েছে। কেননা প্রত্যেক মুমিনই শিরক থেকে বেঁচে থাকে। তবে পরিপূর্ণ মুত্তাকীর জন্য জান্নাতের উচ্চস্তর রয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْجَنَّةِ الَّتِيْ : এটা হলো মুবতাদা, আর فِيْهَا اَنْهَارٌ হলো তার খবর।

প্রশ্ন : এখানে خَبَرْটা হলো জুমলা। আর যখন জুমলা খবর হয় তখন তাতে একটি عَائِدْ আবশ্যক হয়। আর এখানে কোনো عَائِدْ নেই।

উত্তর : যখন خَبَر عَيْن মুবতাদা হয় তখন عَائِدْ আবশ্যক হয় না। আর এখানে এরূপই হয়েছে।

قَوْلُهُ اٰسِنٍ : এটা বাবে ضَرَبَ ও سَمِعَ হতে মাসদার اَسِنًا অর্থ– পানি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাওয়া।

قَوْلُهُ لَذِيْذَةٍ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাসদার اِسْم فَاعِلْ অর্থে হয়েছে। আর اِسْنَاد مَجَازِيْ হয়েছে যেমন زَيْدٌ عَدْلٌ-এর মধ্যে, অর্থাৎ জান্নাতের শরাব এতই সুস্বাদু যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুস্বাদুতে পরিপূর্ণ। এটাকে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে এটাও বলা যেতে পারে যে, مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ-এর মধ্যে মাসদারের حَمْل সত্তা বা ذَاتْ-এর উপর হয়েছে যা বৈধ নয়, এর উত্তর হলো এই যে, এই حَمْل টা زَيْدٌ عَدْلٌ-এর মতো মুবালাগার ভিত্তিতে হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُمْ فِيْهَا : لَهُمْ এটা كَائِنٌ বা مَوْجُوْدٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে خَبَر مُقَدَّمْ হয়েছে। আর উহ্যের সাথে فِيْهَا مُتَعَلِّقْ হয়েছে। এবং مُبْتَدَأ مَحْذُوْف যেমন মুফাসসির (র.) اَصْنَافْ উহ্য মেনে উহ্য মুবতাদার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَهُوَ رَاضٍ عَنْهُمْ : এই বাক্যটি বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা–

প্রশ্ন : আল্লাহর বাণী– وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ দ্বারা জানা যায় যে, যেমনিভাবে জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতীগণ বিভিন্ন ধরনের ফলমূল প্রাপ্ত হবেন অনুরূপভাবে ক্ষমাও জান্নাতে প্রাপ্ত হবেন, অথচ ক্ষমা জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই হওয়া উচিত।

উত্তর : ক্ষমা দ্বারা এখানে সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য, যা জান্নাতে অর্জিত হবে।

قَوْلُهُ مَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর, মুফাসসির (র.) স্বীয় উক্তি– اَمَّنْ هُوَ فِيْ هٰذَا النَّعِيْمِ দ্বারা উহ্য মুবতাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَمْعَاءَ : এর অর্থ হলো নাড়িভুঁড়ি এটা مِعًا-এর বহুবচন, এর শেষের اَلِفْ টি يَا، হতে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। কেননা তার একবচন হলো مِعًى এবং দ্বিবচন হলো مَعْيَانِ যা একথার প্রতি প্রমাণ বহন করেছে। مِعًا-এর اَلِفْ টি يَا، হতে পবির্তিত।

قَوْلُهُ مَصَارِيْنَ : এটা مَصِيْرٌ-এর جَمْعُ الْجَمْعِ বা বহুবচনের বহুবচন, অর্থাৎ مَصِيْرٌ-এর বহুবচন হলো مُصْرَانٌ আর مُصْرَان-এর বহুবচন হলো مَصَارِيْنُ-এর অর্থ হলো নাড়িভুড়ি, অন্ত্রসমূহ। ফারসিতে এটাকে روده বলা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ : অর্থাৎ এর দিকে মনোনিবেশ করা হয় না, তা ভ্রুক্ষেপ করার যোগ্য নয়। বিশুদ্ধ নুসখায় نَرْجِعُ তথা جَمْع مُتَكَلِّمْ -এর সীগার সাথে রয়েছে। অর্থাৎ আমরা তার কথার প্রতি মনোনিবেশ করি না, তোমরা বল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এখন কি বলেছেন? -[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শাওকানী]

قَوْلُهُ فَأَنّٰى لَهُمْ : এটা হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর ذِكْرَاهُمْ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ আর إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ হলো جُمْلَه مُعْتَرِضَه আর إِذَا -এর জবাবটা উহ্য রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ইবারত হলো- إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ فَكَيْفَ يَتَذَكَّرُوْنَ

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ : এটা হলো মুবতাদা, আর اَلَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا : এটা হলো মুবতাদা زَادَهُمْ হলো তার খবর।

قَوْلُهُ أَشْرَاطُهَا : এটা شَرْطٌ -এর বহুবচন [رَا বর্ণে যবর] অর্থ- আলামত, নিদর্শন, চিহ্ন।

قَوْلُهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ : অর্থাৎ যখন মুমিনগণের সৌভাগ্য ও কাফেরদের হতভাগ্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল, তবে আপনি আগামীতেও স্বীয় عِلْمٌ بِالْوَحْدَانِيَّةِ -এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকুন।

قَوْلُهُ اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ : অর্থাৎ اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ لِيَعْصِمَكَ অথবা اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اَنْ يَقَعَ مِنْكَ الذَّنْبُ আর কেউ কেউ বলেন, সম্বোধন তার জন্য; কিন্তু উদ্দেশ্য হলো তাঁর উম্মতগণ। এই শেষ ব্যাখ্যাটা আগত অংশ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ অস্বীকার করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিন ও কাফেরদের দুনিয়ার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে উভয়ের আখিরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ.

অর্থাৎ যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতে আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি এবং তাঁর মহান বাণী পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে জীবন যাপন করে এবং ঈমান মোতাবেক সৎ কাজ করে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন বেহেশতে বাস করার তাওফীক দান করবেন, যাতে রয়েছে মনোরম উদ্যান, যার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত রয়েছে এবং যাতে রয়েছে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত, যা কেউ পৃথিবীতে দেখেনি, যার কথাও শ্রবণ করেনি এবং পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করেনি।

পক্ষান্তরে যারা কাফের, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত, যারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পানাহার করে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি তাদের লোভ সীমাহীন, যিনি রিজিক দাতা, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁর ব্যাপারে তাদের গাফলত অপরিসীম, কখনো তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, আর এ সত্যও উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত তারা অহরহ ভোগ করছে এবং তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও তারা চিন্তিত হয় না।

قَوْلُهُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ : এদেরই আবাস্থল হলো দোজখ। কেননা তারা সারা জীবন কখনো চিরস্থায়ী জীবনের তথা আখিরাতের কথা চিন্তাও করেনি; জন্তুর ন্যায় পানাহারই ছিল তাদের কাম্য, দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধিই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। এমনি অবস্থায় তাদের পরিণতি কত শোচনীয় হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর সে পরিণতিই হলো দোজখের কঠোর কঠিন শাস্তি। এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

قَوْلُهُ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً.........فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ : এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে রাসূল! মক্কাবাসী আপনার প্রতি এবং আপনার সাহাবায়ে কেরামের প্রতি চরম জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণেই আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করতে হয়েছে; কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অনেক জনপদের অধিবাসীকে আমি তাদের নাফরমানির কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তখন কেউ তাদের সাহায্যকারী ছিল না। অতএব মক্কার কাফেরদের ভয় করা উচিত, যে কোনো সময় তাদের ভরাডুবি ঘটতে পারে।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ......... وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَاۤءَهُمْ : মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতে মুমিন ও কাফেরের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। মুমিন আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত দলিল-প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রিয়নবী ﷺ -এর হেদায়েতের আলোকে জীবন যাপন করে; মুমিনের অভিভাবক সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক, তিনিই তার সাহায্যকারী এবং মুমিন মাত্রই আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখে। পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়। কখনো এ বিষয়ে সচেতন হয় না যে, কে তাঁকে দান করেছেন এ জীবন এবং জীবনের যথাসর্বস্ব।

বস্তুত কাফেররা দাতাকে বিস্মৃত হয়, অথচ তাঁর দান নিয়ে ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে, তদুপরি সর্বদা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতায় তথা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, ঐ পাপাচার তাদের নিকট বড়ই মধুর, মনোমুগ্ধকর এবং শোভনীয় মনে হয় , অথচ তার পরিণাম হয় ভয়াবহ।

কাফেরদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই, তারা তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশী মোতাবেক জীবন যাপন করে, ভাল-মন্দের পার্থক্য করে না, মন যা চায় তাই করে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি লালন-পালন করেছেন, যাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামত অহরহ আমরা ভোগ করে থাকি। কাফেররা তার কোনো ইচ্ছা ও মর্জির প্রতি লক্ষ্য রাখে না।

আধুনিককালে মানুষের জীবনধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনা বাস্তব রূপে লক্ষ্য করা যায়। মরমী কবি তাই বলেছেন- کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے * مومن کی یہ پہچان کہ گم ہیں اس میں آفاق

"কাফেরের পরিচয় হলো এই যে, সে পৃথিবীতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে, আর মুমিনের পরিচয় হলো এই যে, পৃথিবী তারই মাঝে হারিয়ে যায়"।

قَوْلُهُ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاۤءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ الخ : দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোনো কোনো সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে তাকে। তবে কোনো কোনো উপকারের কারণে পান করা হয়। যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া হয় এবং খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয় যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত- একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে- لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধু মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নজির পৃথিবীতে নেই।

জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে দোয়া করা চাই : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট আরজি পেশ কর, তখন অবশ্যই জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে আরজি পেশ করবে, কেননা এটি সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চে তার স্থান। আর জান্নাতুল ফেরদাউস থেকেই নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। আর তার উপরই আল্লাহ পাকের আরশ রয়েছে। তাবারানীতে রয়েছে, হযরত লাকীত ইবনে আমের যখন একটি প্রতিনিধি দলে এসেছিলেন, তখন প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তিনি জানতে চাইলেন, জান্নাতে কি কি রয়েছে? প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, পরিচ্ছন্ন মধুর নহর, পবিত্র সুরার নহর, এমন সুরা, যাতে নেশা নেই। দুধের নহর, যে দুধের স্বাদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে এবং স্বচ্ছ পানির নহর, যার পানি কখনো বিকৃত হয় না। -[তাফসীরে ইবনে কাসীর (উর্দু), পারা. ২৬, পৃ. ৩৫]

قَوْلُهُ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, দুনিয়াতে এমন কোনো ফল নেই, যা জান্নাতে নেই মিষ্ট হোক বা টক। -[ইবনে আবি হাতেম, ইবনুল মুনযির]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, জান্নাতে যে ফল রয়েছে, দুনিয়াতে শুধু তার নামই আছে [জান্নাতী ফলের স্বাদ এবং এর বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার ফলে নেই। -[ইবনে জারীর, ইবনে আবি হাতেম]

হযরত ছাওবান (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জান্নাতী ব্যক্তি যখনই বৃক্ষ থেকে ফল ছিড়বে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্থলে আরেকটি ফল গাছে সংযুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ : এই সমস্ত নিয়ামতের উপর বাড়তি নিয়ামত হলো আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদেরকে মাফ করে দেবেন। জান্নাতবাসীগণ তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবেন। এরপর কখনো আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। দুনিয়ার মুনিবরা কখনো কর্মচারীদের উপর সন্তুষ্ট হয়, আবার কখনো থাকে অসন্তুষ্ট; কিন্তু আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হবেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ : জান্নাতবাসীগণের জন্যে সংরক্ষিত নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করার পর আলোচ্য আয়াতাংশে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এই ভাগ্যবান লোকেরা কি সে ভাগ্যাহত লোকদের ন্যায় হবে? যারা চিরদিন দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে; যাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়িকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে। জান্নাতীগণ কখনো দোজখীদের ন্যায় হবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– لَا يَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ "দোজখীরা এবং জান্নাতবাসীগণ কখনো এক সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীগণই হবে সফলকাম, কিন্তু দোজখীরা হবে ব্যর্থ এবং বিপদগ্রস্ত"।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ .... عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথমত মুমিনদের জন্যে জান্নাতে সংরক্ষিত নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

শানে নুযূল : ইবনুল মুনজির ইবনে জোরায়েজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট মুমিন এবং মুনাফিক সকলেই একত্র হতো, তিনি যা ইরশাদ করতেন, মুমিনগণ মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতেন এবং স্মরণ রাখতেন। পক্ষান্তরে, মুনাফিকরা শ্রবণ করতো ঠিকই, কিন্তু স্মরণ রাখতো না। যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবার থেকে তারা বের হয়ে আসত, তখন তারা মুমিনগণকে জিজ্ঞাসা করতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এখন কী বলছিলেন? তখন এ আয়াত নাজিল হয়। ইরশাদ হয়েছে– وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا

অর্থাৎ এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মজলিসে উপস্থিত হয়, প্রকাশ্যে মনে হয় যে তারা তাঁর কথা মনযোগ সহকারেই শ্রবণ করে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আদৌ তাঁর কথায় মন দেয় না, মজলিস থেকে বের হওয়ার পরই তারা সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞসা করে, এই মাত্র তিনি কী বলেছিলেন? এর দ্বারা তারা হয়তো বোঝাতে চায়, আমরা তাঁর মজলিসে হাজির হলেও তাঁর কথা মনেযোগ সহকারে শ্রবণ করি না, অর্থাৎ তাঁর কথায় আমরা খুব একটা গুরুত্ব দেই না। মুনাফিকদের এ ধৃষ্টতার কারণেই আল্লাহ পাক তাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ.

"এরাই সে সব লোক, আল্লাহ পাক যাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। এরাই তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলছে। এ আয়াতে মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্যের বিবরণ রয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হওয়া সত্ত্বেও তারা মনযোগ সহকারে তাঁর কথা শ্রবণ করতো না এবং তাঁর হেদায়েত মেনে নিত না। কেননা তারা ছিল নির্বোধ এবং হতভাগা।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰيهُمْ : অর্থাৎ আর যারা সঠিক পথে রয়েছে, আল্লাহ পাক তাদের সুবুদ্ধি ও হেদায়েত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের তাওফীক দান করেন।" তারা হেদায়েতের উপর অটল অবিচল থাকে, তাই তাদের সততা, সত্যবাদিতাসহ যাবতীয় গুণাবলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বদা তাদের সম্মুখে হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত হতে থাকে। মুমিনদের প্রতি এটি হয় আল্লাহ পাকের মহান দান যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক আমল করার তাওফীক লাভ করে। অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক তাদেরকে দোজখ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ-নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) আলোচ্য বাক্যাংশের অর্থ বলেছেন যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের পরহেজগারীর ছওয়াব দান করবেন। –[তাফসীরে মাযহারী খ. ১০, পৃ. ১৮১]

قَوْلُهُ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا الخ : اَشْرَاطٌ শব্দের অর্থ– আলামত, লক্ষণ। খাতামুন্নাবীয়্যিন ﷺ-এর আবির্ভাবই কিয়ামতের প্রাথমিক লক্ষণ। কেননা খতমে-নবুয়তও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মুজেযাকে কুরআনে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কুরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছেন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের আলামত– জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে; এমন কি পঞ্চাশ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষ করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। –[বুখারী, মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে [অর্থাৎ হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে] জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, [অর্থাৎ তা আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে] ইলমে-দীন পার্থিব স্বার্থের জন্য অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে, হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গানবাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে। বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্য পান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো: একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে যাওয়ার আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলোর একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

قَوْلُهُ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : "আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।" বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন মুসলমানও একথা জানে, পয়গাম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে কেউ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, তুমি কি কুরআনের এই বাণী শ্রবণ করিনি– فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ; এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র রয়েছে– اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আরো বলা হয়েছে– سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে– وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ এরপর বলা হয়েছে فَاحْذَرُوْهُمْ এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ ইস্তিগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গাম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গাম্বরগণ গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থান বিশেষ ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরিয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গুনাহ নয়; বরং এই ভুলেরও ছওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গাম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে ذَنْبٌ তথা গুনাহ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়। যেমন সূরা আবাসায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গুনাহ ছিল না: বরং এরও এক ছওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিত সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গুনাহ বোঝানো যেতে পারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা বেশি পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর এবং ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা কর। ইবলীস বলে, আমি মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে [যেমন সাধারণ বিদ'আতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই]। এতে করে তাদের তওবা করারও তাওফীক হয় না।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ : مُتَقَلَّبَ -এর শাব্দিক অর্থ হলো– ওলটপালট হওয়া এবং مَثْوٰى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তাফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। ১. যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং ২. যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোনো কোনো গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোনো কোনো গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ী আবাসকে مُتَقَلَّبَ শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ী আবাসকে مَثْوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا طَلَبًا لِلْجِهَادِ لَوْلَا هَلَّا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ج فِيْهَا ذِكْرُ الْجِهَادِ فَإِذَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَىْ لَمْ يَنْسَخْ مِنْهَا شَيْءٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ اَىْ طَلَبُهُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَىْ شَكٌّ وَهُمُ الْمُنَافِقُوْنَ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ط خَوْفًا مِنْهُ وَكَرَاهِيَةً لَهُ اَىْ فَهُمْ يَخَافُوْنَ مِنَ الْقِتَالِ وَيَكْرَهُوْنَهُ فَأَوْلٰى لَهُمْ ج مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ .

অনুবাদ :

২০ মুমিনগণ বলে, জিহাদ কামনা করে একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? যাতে জিহাদ অনুমোদনের উল্লেখ থাকবে। অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় যার থেকে কোনো কিছু রহিত হয়নি। এবং তাতে যুদ্ধের কোনো নির্দেশ থাকে। অর্থাৎ জিহাদের কামনা উল্লেখ থাকে আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে অর্থাৎ সন্দেহ রয়েছে, আর তারা হলো মুনাফিকরা। তারা মৃত্যু ভয়ে বিহবল মানুষের মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে। মৃত্যু থেকে ভীত হয়ে এবং এটাকে অপছন্দ করে। অর্থাৎ তারা জিহাদকে ভয় করে এবং সেটাকে অপছন্দ করে। শোচনীয় পরিণাম তাদের জন্য। এটা হলো মুবতাদা। তার খবর হলো [পরবর্তী বাক্যের] طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ

٢١. طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ تف اَىْ حسن لك فَإِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ تف اَىْ فَرَضَ الْقِتَالُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ فِى الْاِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَجُمْلَةُ لَوْ جَوَابُ اِذَا .

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য তাদের জন্য উত্তম ছিল। অর্থাৎ তাদের জন্য আপনার আনুগত্য স্বীকার করা ও আপনার সাথে ভালো কথা বলা উত্তম ছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে অর্থাৎ জিহাদ ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত। ঈমান এবং আনুগত্যের ব্যাপারে। তবে তাদের জন্য এটা অবশ্যই মঙ্গলজনক হতো। لَوْ صَدَقُوْا বাক্যটি اِذَا -এর جَوَابٌ হয়েছে।

٢٢. فَهَلْ عَسَيْتُمْ بِكَسْرِ السِّيْنِ وَفَتْحِهَا وَفِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ اِلَى الْخِطَابِ اَىْ لَعَلَّكُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَعْرَضْتُمْ عَنِ الْاِيْمَانِ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ اَىْ تَعُوْدُوْا اِلٰى اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْبَغْيِ وَالْقَتْلِ .

২২. তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা عَسَيْتُمْ -এর سِيْن বর্ণটি যবর ও যের উভয়ভাবেই পঠিত। এতে غَائِبٌ হতে حَاضِرٌ -এর দিকে اِلْتِفَاتٌ করা হয়েছে। আর عَسَيْتُمْ অর্থ হলো لَعَلَّكُمْ অর্থাৎ ঈমান থেকে ফিরে যেতে। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। অর্থাৎ তোমরা জাহিলী যুগের কর্মকাণ্ড তথা হত্যা ও লুণ্ঠনে ফিরে যেতে।

٢٣. اُولٰٓئِكَ اَىِ الْمُفْسِدُوْنَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ عَنْ اِسْتِمَاعِ الْحَقِّ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ عَنْ طَرِيْقِ الْهِدَايَةِ .

২৩. এদেরকেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকেই আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন, আর করেন বধির সত্য শ্রবণ করা থেকে। ও দৃষ্টিশক্তিহীন হেদায়েতের পথ থেকে।

٢٤. اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَيَعْرِفُوْنَ الْحَقَّ اَمْ بَلْ عَلٰى قُلُوْبٍ لَهُمْ اَقْفَالُهَا فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ .

২৪. তবে কি এরা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? ফলে তারা হককে জানত। নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ফলে তারা তা অনুধাবন করতে পারে না।

٢٥. اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا بِالنِّفَاقِ عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لا الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ زَيَّنَ لَهُمْ ط وَاُمْلِيْ لَهُمْ . بِضَمِّ اَوَّلِهِ وَبِفَتْحِهِ وَاللَّامِ وَالْمُمْلِي الشَّيْطَانَ بِاِرَادَتِهِ تَعَالٰى فَهُوَ الْمُضِلُّ لَهُمْ .

২৫. যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে নিফাকের দ্বারা শয়তান তাদের কর্মকে শোভন করে দেখায় এবং এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। أُمْلِي বর্ণের হামযাটি পেশ ও যবরের সাথে পঠিত রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা সাপেক্ষে মিথ্যা আশাদানকারী হচ্ছে শয়তান, আর সে তো মানুষকে পথভ্রষ্টকারী।

٢٦. ذٰلِكَ اَيْ اِضْلَالُهُمْ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ اَيْ لِلْمُشْرِكِيْنَ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ج اَمْرِ الْمُعَاوَنَةِ عَلٰى عَدَاوَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَثْبِيْطِ النَّاسِ عَنِ الْجِهَادِ مَعَهُ قَالُوْا ذٰلِكَ سِرًّا فَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ . بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ سِرٍّ وَبِكَسْرِهَا مَصْدَرٌ .

২৬. এটা অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে। অর্থাৎ মুশরিকদেরকে আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। অর্থাৎ নবীর বিরোধিতায় তোমাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে এবং মানুষকে মহানবী ﷺ -এর সাথে জিহাদে গমন করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে। এ কথা মুনাফিকরা গোপনভাবে বলেছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করে দিলেন আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। أَسْرَارٌ শব্দটির হামযাটি যবরযুক্ত হলে এটা سِرٌّ -এর বহুবচন হবে। আর যদি হামযাটি যেরযুক্ত হয় তবে তা মাসদার হবে।

٢٧. فَكَيْفَ حَالُهُمْ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ حَالٌ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ . ظُهُوْرَهُمْ بِمَقَامِعَ مِنْ حَدِيْدٍ .

২৭. তখন কেমন হবে তাদের অবস্থা/ দশা। যখন ফেরেশতাগণ আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবেন এটা (يَضْرِبُوْنَ) حَالٌ হবে اَلْمَلٰٓئِكَةُ হতে তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে তাদের পিঠে লোহার হাতুড়ি দিয়ে।

٢٨. ذٰلِكَ اَيِ التَّوَفِّيْ عَلَى الْحَالَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ اَيِ الْعَمَلَ بِمَا يَرْضِيْهِ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ .

২৮. এটা অর্থাৎ উল্লিখিত সুরতে প্রাণ সংহার করা এই জন্য যে, তারা অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে অর্থাৎ ঐ আমল দ্বারা যা তাকে সন্তুষ্টকারী। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَاَوْلٰى لَهُمْ : لَامْ টা يَاء -এর অর্থে অর্থাৎ- اِنْ كَانَ الْاَوْلٰى بِهِمْ طَاعَةُ اللّٰهِ وَطَاعَةُ رَسُوْلِهٖ অর্থাৎ দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও মুনাফিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে আনুগত্য করাই শ্রেয় ছিল। এটা হযরত আতা (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবার কেউ কেউ اَوْلٰى -কে وَيْلٌ থেকে مُشْتَقٌّ মেনেছেন, এর অর্থ হলো ধ্বংস ও বিনাশ সাধন, তখন এ বাক্যটি দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও মুনাফিকদের জন্য বদদোয়া ও ধমকি স্বরূপ হবে এবং اَوْلٰى لَهُمْ -এর উপর ওয়াকফ হবে। এরপর নতুন বাক্য আরম্ভ হবে। (طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوْفٌ خَيْرٌ لَكُمْ) অর্থাৎ তাদের জন্য আনুগত্য ও উত্তম কথা বলাই ভালো। মুফাসসির (র.) প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَاَوْلٰى لَهُمْ : এর মধ্যে তিনটি তারকীব হতে পারে। যথা-

১. اَوْلٰى হলো মুবতাদা لَهُمْ তার مُتَعَلِّقٌ আর لَامْ টা يَاء অর্থে طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوْفٌ হলো তার খবর। মুফাসসির (র.) এ তারকীবই পছন্দ করেছেন।

২. اَوْلٰى لَهُمْ হলো উহ্য মুবতাদার খবর, উহ্য ইবারত এরূপ হবে এরূপ- اَلْهَلَاكُ اَوْلٰى لَهُمْ اَىْ اَقْرَبُ لَهُمْ وَاَحَقُّ لَهُمْ

৩. اَوْلٰى হলো মুবতাদা, আর لَهُمْ তার খবর, উহ্য ইবারত হলো فَالْهَلَاكُ لَهُمْ ; এটাকে আবুল বাকা (র.) পছন্দ করেছেন। -[ই'রাবুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ : অর্থাৎ যখন اَمْر তথা জিহাদের পাক্কা ইরাদা করে ফেলল। এখানে اِسْنَاد مَجَازِىْ হয়েছে। কেননা عَزَمَ হলো صَاحِب عَزَمْ -এর কর্ম ; اَمْر -এর কর্ম নয়।

قَوْلُهُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ : কতিপয় আলেমের অভিমত হলো لَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ তার জবাবসহ اِذَا -এর জওয়াব হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, اِذَا -এর জবাব হলো كَرِهُوْا যা উহ্য রয়েছে। আর فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ -কে শর্ত এবং لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ কে তার جَزَاء বলেছেন।

قَوْلُهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ : عَسَيْتُمْ হলো اَفْعَال رَجَاء বা اَفْعَال مُقَارَبَة -এর অন্তর্গত ফে'লে মাযী। অর্থাৎ তোমাদের থেকে দূরে নয় যে, তোমরা এতে অধিক ধমক দেওয়ার জন্য غَائِبْ থেকে حَاضِرْ -এর দিকে اِلْتِفَاتْ করা হয়েছে। হযরত কাতাদা (র.) تَوَلَّيْتُمْ -এর অর্থ اِعْتِرَاضٌ عَنِ الطَّاعَةِ তথা আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া করেছেন। মুফাসসির (র.)-ও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। আর হযরত কালবী (র.) تَوَلَّيْتُمْ -এর অর্থ করেছেন اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَمْرَ الْاُمَّةِ অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে উম্মতের কর্মের জিম্মাদার বানিয়ে দেওয়া হয় তবে তোমরা রাজ্যে অত্যাচার-নির্যাতনের মাধ্যমে বিচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ফেলবে।

قَوْلُهُ اَقْفَالُهَا : اَقْفَالٌ শব্দটি قُفْلٌ -এর বহুবচন। اَقْفَالٌ -কে قُلُوْب -এর দিকে সম্বন্ধ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে قُفْلٌ দ্বারা প্রচলিত তালা উদ্দেশ্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের অদৃশ্য তালা উদ্দেশ্য যা قُلُوْب -এর জন্য সমীচীন হবে। যেমন তাওফীক বা সামর্থ্য দূরীভূত হয়ে যাওয়া, চিন্তা-ভাবনার যোগ্যত নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। মুফাসসির (র.) فَلَا يَفْهَمُوْنَهُ দ্বারা এই অদৃশ্য তালা অর্থাৎ বুঝার যোগ্যতা হরণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اُمْلِىْ : এতে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. হামযাতে পেশ এবং لَامْ -এ যের يَاء তে যবর অর্থাৎ اُمْلِىَ মাযী মাজহুল অর্থাৎ তাদেরকে ঢিল দেওয়া হয়েছে।

২. অপর কেরাতে يَاء সাকিনের সাথে مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ তথা اُمْلِىْ অর্থাৎ তাদেরকে আমি অবকাশ দিব।

اُمْلِىْ لَهُمْ অর্থ- তাদেরকে আমি দীর্ঘাশা দিব। সে সময় এর فَاعِلْ হবে শয়তান। আর তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি এবং ঢিল দিয়েছি- এই সুরতে فَاعِلْ হবেন আল্লাহ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ الْمُمْلِي الشَّيْطَانُ بِإِرَادَتِهِ تَعَالَى : এ ইবারতের দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন. অবকাশ দেওয়া আল্লাহর কাজ, কাজেই শয়তানের দিকে এর নিসবত করা তো ঠিক নয়।

উত্তর. ঢিল -এর অবকাশ দেওয়া তো বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর কাজ। কিন্তু إِسْنَادْ مَجَازِىْ হিসেবে শয়তানের দিকে এর নিসবত করে দেওয়া হয়েছে। কেননা তার ওয়াসওয়াসার মাধ্যমেই এটা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ ذَالِكَ : ذَالِكَ হলো মুবতাদা আর بِأَنَّهُمْ قَالُوْا হলো তার খবর। আর بَا টা হলো سَبَبِيَّةْ

قَوْلُهُ قَالُوْا : قَالُوْا -এর فَاعِلْ হলো মুনাফিকরা আর كَرِهُوْا -এর فَاعِلْ হলো ইহুদি। মনে হয় যেন এই কথাবার্তা বলা ও শ্রবণ করা মুনাফিক ও ইহুদিদের মাঝে হয়েছে; মুশরিক ও মুনাফিকের মাঝে হয়নি। যেমনটি আল্লামা মহল্লী (র.) পছন্দ করেছেন। এটা سَبْقَتْ قَلَمْ বা লিখনীর পদস্খলন করা হবে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ فَاِذَا اُنْزِلَتْ الخ : মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে মুসলমানগণ যখন অতিষ্ঠ এবং তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে, তখন তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, যদি পবিত্র কুরআনের এমন কোনো সূরা নাজিল হতো, যাতে জিহাদের আদেশ থাকত, তাহলে কাফেরদের মোকাবেলা করার একটা ব্যবস্থা হতো, কিন্তু যখন এমন সূরা নাজিল হলো, যাতে জিহাদের আদেশ রয়েছে, তখন মুনাফিকরা মহাবিপদে পড়ল। মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে যে অবস্থা হয় ঠিক সে অবস্থা দেখা দিল। তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শঙ্কিত চিত্তে তারা প্রিয়নবী ﷺ -এর দিকে তাকাতে লাগল, জিহাদের কথা শ্রবণ করে তাদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে গেল এবং চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাদের বিপদ আসন্ন, তাদের পক্ষে যা উচিত ছিল, তা হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা এবং কার্যক্ষেত্রে সে আনুগত্যের প্রমাণ উপস্থাপন করা। যদি তাদের কথায় তারা সত্যবাদী হতো তবে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হতো, অর্থাৎ যদি তারা জিহাদে অংশ নিত, তবে তা তাদের জন্যে ভালো হতো।

অথবা এর অর্থ হলো, যদি তারা তাদের ঈমানের ব্যাপারে আন্তরিক হতো এবং আল্লাহর রাসূলের অনুসরণেও তারা আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসত, তবে তা তাদের জন্যে অতি উত্তম হতো। কেননা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণেই মুসলিম জাতির সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। -[তাফসীরে কবীর খ. ২৮, পৃ. ৬৩]

قَوْلُهُ سُوْرَةٌ مُحْكَمَةٌ : مُحْكَمَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কুরআনের প্রত্যেক সূরাই مُحْكَمَةٌ কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় مُحْكَمٌ শব্দটি مَنْسُوْخٌ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে 'মুহকামাহ' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদা (র.) বলেন, যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জিহাদের বিধানাবলি বিধৃত হয়েছে। সেগুলো সব 'মুহকামাহ' তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জিহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মুহকামাহ শব্দ যুক্ত করে জিহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ اَوْلٰى لَهُمْ : আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ অর্থাৎ তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ : আভিধানিক দিক দিয়ে تولى শব্দের দুটি অর্থ সম্ভবপর। যথা- ১. মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও ২. কোনো দলের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তাফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবূ হাইয়ান (র.) তাফসীরে বাহরে মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরিয়তের বিধানাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও [জিহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত] তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হতো। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা দূর করার জন্যে জিহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যত রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জিহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রূহুল মা'আনী ও কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلَّى শব্দের অর্থ 'রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভ করা' নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ তোমরা দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাগিদ : اَرْحَامٌ শব্দটি رِحْمٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رِحْمٌ শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, اَرْحَامٌ ও ذَوِى الْاَرْحَامِ শব্দ কোন কোন আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য খুবই তাগিদ করেছে। বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও অন্য দুজন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরিউক্ত হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কুরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা যেসব গুনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোনো গুনাহ নেই। -[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আয়ু বৃদ্ধি ও রুজি-রোজগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ হাদীসসমূহে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ বুখারীতে আছে–

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِىْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِىْ إِذَا قُطِعَتْ رِحْمُهٗ وَصَلَهَا .

অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপর পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهٗ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ : "যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।" অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারূকে আযম (রা.) এই আয়াতদৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে মালিকানাধীন বাঁদির গর্ভ থেকে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে , যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদি বিক্রয় করা হারাম। -[হাকেম]

কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা : হযরত ইমাম আহমদ (র.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সে ব্যক্তির প্রতি কেন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন?

তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন, এজিদের চাইতে অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আর কে হবে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি? কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরূপে জানা না যায়। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণ সহ অভিসম্পাত করা জায়েজ; যেমন মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, দুষ্কৃতিকারীর প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত ইত্যাদি।

-[রূহুল মা'আনী খ. ২৬, পৃ. ৭২]

قَوْلُهٗ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا : অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে طَبْعٌ ও خَتْمٌ অর্থাৎ মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোরও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গুনাহে লিপ্ত থাকে। [নাউযুবিল্লাহ মিনহু]

قَوْلُهٗ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ : এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। যথা–

১. تَسْوِيْلٌ ; এর অর্থ সুশোভিত করা অর্থাৎ মন্দ বিষয় অথবা মন্দকর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া।

২. اِمْلَاءٌ ; এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দ কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٩. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ـ يُظْهِرُ اَحْقَادَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ـ

২৯. যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ কখনো তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেন না। নবী করীম ﷺ ও মুমিনদের ব্যাপারে তাদের শত্রুতাকে প্রকাশ করে দিবেন না।

٣٠. وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ عَرَّفْنَاكَهُمْ وَكُرِّرَتِ اللَّامُ فِيْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ط عَلَامَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اَلْوَاوُ لِقَسَمٍ مَحْذُوْفٍ وَمَا بَعْدَهَا جَوَابُهُ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ اَيْ مَعْنَاهُ اِذَا تَكَلَّمُوْا عِنْدَكَ بِاَنْ يُّعَرِّضُوْا بِمَا فِيْهِ تَهْجِيْنُ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ـ

৩০. আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের পরিচয় দিতাম। তাদের সকলের ব্যাপারে আপনাকে জানিয়ে দিতাম। আর فَلَعَرَفْتَهُمْ -এর মধ্যে لَامْ -কে تَكْرَارْ আনা হয়েছে। ফলে আপনি তাদেরকে লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনে ফেলতে পারতেন। আপনি অবশ্যই তাদেরকে চিনতে পারবেন وَاوْ টা উহ্য কসমের জন্য। তার পরবর্তী অংশ হলো جَوَابْ قَسَمْ কথার ভঙ্গিতে অর্থাৎ যখন তারা আপনার সাথে কথা বলে তখন এমনভাবে কটাক্ষ পাত করে যাতে মুসলমানদের ব্যাপারে ঘৃণা হয়। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

٣١. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نَخْتَبِرَنَّكُمْ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ حَتّٰى نَعْلَمَ عِلْمَ ظُهُوْرٍ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ وَنَبْلُوَ نُظْهِرَ اَخْبَارَكُمْ ـ مِنْ طَاعَتِكُمْ وَعِصْيَانِكُمْ فِي الْجِهَادِ وَغَيْرِهٖ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلٰثَةِ ـ

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যাচাই বাছাই করব জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে। যতক্ষণ না আমি জেনে নেই অর্থাৎ প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল কে? জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে পরীক্ষা করি জিহাদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কে আনুগত্যশীল আর কে নাফরমান। উপরিউক্ত তিনটি ফে'লই يَاءْ এবং نُوْنْ দ্বারা উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে।

٣٢. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَرِيْقِ الْحَقِّ وَشَاقُّوا الرَّسُوْلَ خَالَفُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى هُوَ مَعْنٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ـ يُبْطِلُهَا مِنْ صَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَرَوْنَ لَهَا فِي الْاٰخِرَةِ ثَوَابًا نَزَلَتْ فِي الْمُطْعِمِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ اَوْ فِيْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ ـ

৩২. যারা কুফরি করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে সত্য পথ থেকে এবং রাসূলের বিরোধিতা করে নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর سَبِيْلُ اللّٰهِ -এর অর্থ এটাই। তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তাদের দান সদকা ইত্যাদিকে নিষ্ফল করে দিবেন। ফলে তারা পরকালে এর কোনো প্রতিদান প্রাপ্ত হবে না। আলোচ্য আয়াতটি আসহাবে বদর অথবা বনূ কুরায়যা এবং বনূ নযীরকে অন্ন দানকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٣. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ . بِالْمَعَاصِىْ مَثَلًا .

৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করো না। অবাধ্যাচরণের মাধ্যমে। যেমন–

٣٤. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ طَرِيْقِهٖ وَهُوَ الْهُدٰى ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ . نَزَلَتْ فِىْ اَصْحَابِ الْقَلِيْبِ .

৩৪. যারা কুফরি করে ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে আর তা হলো হেদায়েতের পথ। অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। এ আয়াত কূপবাসীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

٣٥. فَلَا تَهِنُوْا تَضْعُفُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ ق بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكَسْرِهَا اَىِ الصُّلْحِ مَعَ الْكُفَّارِ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ق حُذِفَ مِنْهُ وَاوُ لَامِ الْفِعْلِ الْاَغْلَبُوْنَ الْقَاهِرُوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ يَنْقُصَكُمْ اَعْمَالَكُمْ . اَىْ ثَوَابَهَا .

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না। اَلسَّلْم শব্দটি سِيْن বর্ণে যের ও যবর উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ যখন তোমরা কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তখন সন্ধির প্রস্তাব করো না। তোমরাই প্রবল اَعْلَوْنَ -এর لَامْ কালিমার وَاوْ -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরাই বিজয়ী ও প্রভাবশালী থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছে অর্থাৎ তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা। তিনি কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না কমিয়ে দিবেন না তোমাদের কর্মফল প্রতিদান/ ছওয়াব।

٣٦. اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اَىِ الْاِشْتِغَالُ فِيْهَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوا اللّٰهَ وَذٰلِكَ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ جَمِيْعَهَا بَلِ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ فِيْهَا .

৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল অর্থাৎ এতে ব্যাপৃত থাকা ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহকে ভয় কর। এটাই হলো পরকালের কাজ। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না তবে তন্মধ্য হতে জাকাতের ফরজ পরিমাণ চান।

٣٧. اِنْ يَّسْئَلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ يُبَالِغْ فِىْ طَلَبِهَا تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ الْبُخْلُ اَضْغَانَكُمْ لِدِيْنِ الْاِسْلَامِ .

৩৭. তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে ও তজ্জন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে অর্থাৎ তার চাওয়ার মধ্যে মুবালগা করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তখন তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন এবং কার্পণ্য দীন ইসলামের জন্য তোমাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দিবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩৮. هَاَنْتُمْ يَا هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا فُرِضَ عَلَيْكُمْ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ ج وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ط يُقَالُ بَخِلَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ عَنْ نَفَقَتِكُمْ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ج اِلَيْهِ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَتِهٖ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اَيْ يَجْعَلُهُمْ بَدَلَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ . فِي التَّوَلِّيْ عَنْ طَاعَتِهٖ بَلْ مُطِيْعِيْنَ لَهٗ عَزَّ وَجَلَّ .

৩৮. দেখ, তোমরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে যা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে। তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে, যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য নিজেদেরই প্রতি। বলা হয় بَخِلَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ আল্লাহ অভাবমুক্ত তোমাদের ব্যয় করা থেকে এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত তাঁর প্রতি। যদি তোমরা বিমুখ হও তাঁর আনুগত্য করা হতে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অর্থাৎ তাদেরকে করবেন তোমাদের পরিবর্তে তারা তোমাদের মতো হবে না আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া থেকে, বরং তারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ الخ : এখানে اَمْ টি হলো مُنْقَطِعَةٌ অর্থাৎ بَلْ اَحَسِبَ الْمُنَافِقُوْنَ, আর اَلَّذِيْنَ এটা স্বীয় সেলাহ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَوْجُوْدٌ এর সাথে মিলে حَسِبَ এর فَاعِلٌ আর اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ টা حَسِبَ-এর দুই মফউলের স্থলাভিষিক্ত। আর اِنْ টা مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُثَقَّلَةِ যমীরে শান হলো তার উহ্য اِسْمٌ অর্থাৎ اِنَّهٗ ; এর পরবর্তী অংশ জুমলা হয়ে اِنْ-এর خَبَرٌ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَضْغَانَهُمْ : এটা ضِغْنٌ-এর বহুবচন; অর্থ- ঈর্ষা, ঘৃণা, গোপন শত্রুতা।

قَوْلُهٗ لَاَرَيْنَاكَهُمْ : এখানে رُؤْيَتٌ দ্বারা رُؤْيَتٌ بَصَرِيٌّ উদ্দেশ্য। এ কারণেই مُتَعَدِّيْ بِدُوْ مَفْعُوْلٌ হয়েছে। আর যদি رُؤْيَتٌ قَلْبِيٌّ উদ্দেশ্য হতো তবে তিন মাফউলের দ্বারা مُتَعَدِّيْ হতো كَهُمْ হলো اَرَيْنَا-এর দুই মাফউল। -[ই'রাবুল কুরআন] আবার কেউ কেউ رُؤْيَتٌ দ্বারা رُؤْيَةٌ عِلْمِيَّةٌ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মুফাসসির (র.) اَرَيْنَا-এর তাফসীর عَرَّفْنَا দ্বারা করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর مَعْرِفَتٌ দ্বারা এমন مَعْرِفَتٌ উদ্দেশ্য যা চাক্ষুষ দেখার মতো হয়।

قَوْلُهٗ لَاَرَيْنَاكَهُمْ : এটা হলো لَوْ-এর জবাব। আর فَلَعَرَفْتَهُمْ -এর জওয়াব لَوْ-এর উপর আতফ হয়েছে। لام টা তাকিদের জন্য তাকরার/ পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। আর فا হলো عَاطِفَةٌ।

قَوْلُهٗ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ : উহ্য لَامِ قَسَمْ-এর জবাবের উপর প্রবিষ্ট হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَحْنِ الْقَوْلِ : উল্লিখিত لَحْنٌ-এর দুটি অর্থ রয়েছে। যথা-

১. خَطَأٌ فِى الْاِعْرَابِ তথা ই'রাবের ক্ষেত্রে ভুল হওয়া।

২. خَطَأٌ فِى الْكَلَامِ তথা বাক্যের মধ্যে ভুল হওয়া। لَحْنٌ فِى الْكَلَامِ -এর মানে হলো বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ সম্মান বুঝায় এবং অপ্রকাশ্য অর্থ নীচুতা ও হীনতা বুঝায়, আর বক্তা অপ্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকে। অথবা বাক্যকে এমনভাবে উচ্চারণ/উদ্দেশ্য করা যে, তাতে তার অর্থে পরিবর্তন এসে যায় এবং সম্মানের স্থলে দুর্নাম হয়ে যায়। যেমন- মুনাফিকরা রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করতে গিয়ে رَاعِنَا-এর স্থলে رَاعِيْنَا বলত। رَاعِنَا-এর অর্থ হলো আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন! আর رَاعِيْنَا -এর অর্থ হলো- আমাদের রাখাল। অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর স্থলে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বলত, অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হোক, ধ্বংস হোক!

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ فِي الْاَفْعَالِ الثَّلَاثِ : এই তিনটি فِعْل হলো ১. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ২. نَعْلَمَ ৩. نَبْلُوَ এই فِعْل -ত্রয়ের মধ্যে وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ ও جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ রূপ উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়।

قَوْلُهُ شَاقُّوْا : এটা مَاضِىْ -এর جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ অর্থাৎ তারা বিরোধিতা করেছে। এটা مُشَاقَّةْ এবং شِقَاقٌ থেকে مُشْتَقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ سَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ : حَبْطُ عَمَلٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরকালে তাদের আমলকে নিঃশেষ করে দেওয়া। আর আমল দ্বারা সেই আমল উদ্দেশ্য যাকে পরিভাষায় আমল মনে করা হয়। যেমন- আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন, গরিব, মিসকিন ও মুসাফিরকে সাহায্য করা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ اُنْزِلَتْ فِي الْمُطْعِمِيْنَ : এখানে مُطْعِمِيْنَ দ্বারা সে সকল মুশরিকরা উদ্দেশ্য, যারা বদর যুদ্ধের সময় কাফের সৈন্যদের খানাপিনা তথা ব্যয়ভার নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করেছিল।

قَوْلُهُ اَصْحَابُ الْقَلِيْبِ : বদর প্রান্তরের একটি কূপের নাম হলো قَلِيْبٌ; যেখানে রাসূল ﷺ নিহত মুশরিকদের লাশ ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ فَلَا تَهِنُوْا : অর্থাৎ তোমরা হিম্মতহারা হয়ো না, দুর্বল হয়ো না। فَا টা جَوَابُ شَرْطٍ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে। শর্তটা উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে اِذَا تَبَيَّنَ لَكُمْ بِالدَّلَالَةِ الْقَطْعِيَّةِ عِزَّ الْاِسْلَامِ وَذَلَّ الْكُفْرِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَا تَهِنُوْا

قَوْلُهُ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ : এখানে وَاوْ হলো حَالِيَهْ বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ وَاَنْتُمْ غَالِبُوْنَ بِالسَّيْفِ وَالْحُجَّةِ اٰخِرَ الْاَمْرِ ; اَعْلَوْنَ মূলত اَعْلَوُوْنَ ছিল। প্রথম وَاوْ টি كَلِمَةْ হলো لَامْ আর দ্বিতীয়টি হলো বহুবচনের وَاوْ প্রথম وَاوْ টি مُتَحَرِّكْ এবং তার পূর্বের বর্ণে যবর হওয়ার কারণে -وَاوْ -কে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এরপর দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে اَلِفْ পড়ে গেছে। ফলে اَعْلَوْنَ হয়েছে। অর্থ হলো اَغْلَبُوْنَ الْقَاهِرُوْنَ ; অন্য নোসখায় قَاهِرُوْنَ -এর স্থলে اَلظَّاهِرُوْنَ উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ : এটা جُمْلَهْ حَالِيَهْ হয়েছে।

قَوْلُهُ يَتِرَ : এটা বাবে ضَرَبَ থেকে مُضَارِعْ -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ হলো-হ্রাস করা, কম করা।

قَوْلُهُ فَيُحْفِكُمْ : এটা اِحْفَاءٌ থেকে অর্থ হলো কোনো ব্যাপারে মুবালাগা করা, মূলসহ উপড়ে ফেলা। এটা থেকেই اِحْفَاءُ الشَّارِبِ তথা গোঁফকে ভালোভাবে পরিষ্কার করা। এখানে প্রার্থনার ক্ষেত্রে মুবালাগা করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ هَا اَنْتُمْ : এখানে هَا হলো حَرْفُ تَنْبِيْهٍ আর اَنْتُمْ হলো মুবতাদা। আর هٰؤُلَاءِ হলো মুনাদা। হরফে নেদা উহ্য। যাকে মুফাসসির (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন। تَدْعَوْنَ হলো خَبَرْ ; جُمْلَةْ نِدَائِيَّةْ মুবতাদা এবং খবরের মাঝে جُمْلَهْ مُعْتَرِضَهْ

قَوْلُهُ يُقَالُ بَخِلَ عَلَيْهِ وَعَنْهُ : এ ইবারতের মাধ্যমে এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, بَخِلَ যদি شُحٌّ তথা লোভ-লালসার অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তবে তা عَلٰى -এর মাধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়ে থাকে। আর যখন اَمْسَكَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে তখন এটা عَنْ দ্বারা مُتَعَدِّىْ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ : اَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ- গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত এবং বাহ্যত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত; কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আলিমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন না? ইবনে কাসীর (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়া-কর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যা দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাআতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ : অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যা দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে لَوْ অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম;

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশত আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন। -[ইবনে কাসীর]

হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোনো বিষয় গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভালো হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোনো কোনো হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হয়েছিল। মুসনাদে আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক খুতবায় ছত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ : আল্লাহ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনা ভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। -[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদি বনী কোরায়যা ও বনী নাজীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশ-কাফরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন লোক সমগ্র কুরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

قَوْلُهُ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ : এখানে 'কর্ম বিনষ্ট' করার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না: বরং ব্যর্থ করে দেবেন। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন- সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে; গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ لَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ : কুরআন পাক এ স্থলে حَبْطٌ -এর পরিবর্তে اِبْطَالٌ উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حَبْطٌ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোনো আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোনো কোনো সৎকর্মের জন্য অন্য সৎকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণত প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম-যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না! কুরআন পাকে বলা হয়েছে- وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ; অন্যত্র বলা হয়েছে- اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ; অতএব যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খায়রাত সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে- لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى অর্থাৎ অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরিবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা-খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরিবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎকর্মসমূহকে গুনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ (র.) বলেন- بِالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ মুকাতিল (র.) প্রমুখ বলেন- بِالْمَنِّ কেননা আহলে সুন্নত দলের ঐকমত্যে কুফর ও শিরক ছাড়া কোনো কবীরা গুনাহও এমন নেই, যা মুমিনদের সৎকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণত কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাজি ও রোজাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামাজ রোজা বাতিল হয়ে গেছে, এগুলোর কাজা কর। অতএব, সেসব গুনাহ দ্বারাই সৎকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত। যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করাটা প্রত্যেক সৎকর্ম কবুল হওয়ার জন্য শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎকর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গুনাহের ক্ষেত্রেই শর্ত হবে যার আমলে গুনাহের প্রাধান্য থাকবে, তার অল্প সৎকর্মেও আজাব থেকে রক্ষা করার মতো বরকত থাকবে না: বরং সে নিয়মানুযায়ী গুনাহের শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিমাণে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগ করার পর মুক্তি পাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোনো সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত নফল নামাজ অথবা রোজা শুরু করে বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং নাজায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তিনি বলেন, যে সৎকর্ম প্রথমে ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না; কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম পূর্ণ করা আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে ফরজ হয়ে যাবে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গুনাহগার হবে এবং তা কাজা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে গুনাহগারও হবে না এবং তা কাজাও করতে হবে না। কারণ প্রথমে যখন এই আমল ফরজ অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও তা ফরজ ও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরজ, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ : এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর ছওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

قَوْلُهُ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ : এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির আহবান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থাৎ কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েজ, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوْا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোনো বিরোধ নেই। কারণ وَاِنْ جَنَحُوْا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়; বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

قَوْلُهُ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোনো কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব কষ্ট করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়।

قَوْلُهُ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا : সংসার-আসক্তিই মানুষের জন্য জিহাদে বাধা দানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিয়ো না।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ : আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কুরআনেই জাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাগিদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন لَا يَسْئَلْكُمْ -এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোনো উপকারের জন্য চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এই আয়াতেও يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা ছওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত- مَا اُرِيْدُ مِنْكُمْ مِنْ رِزْقٍ অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোনো জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, لَا يَسْئَلْكُمْ বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উক্তি।

-[কুরতুবী]

Free @ www.eilm.weebly.com

পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে– اِنْ يَّسْئَلْكُمْ فَيُحْفِكُمْ ; يُحْفِ শব্দটি اِحْفَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– বাড়াবাড়ি করা এবং কোনো কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হতো। এমন কি, তা আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে لَا يَسْئَلْكُمْ বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فَيُحْفِكُمْ সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি জাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরজ কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কোনো উপকার নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এসব ফরজ কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশত অল্প পরিমাণ অংশই ফরজ করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। জাকাত হলো মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ অথবা ২০ ভাগের একভাগ এবং ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাননি। সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তা স্বভাবতই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

قَوْلُهُ يُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ : اَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ– গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এ স্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বভাবতই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয় ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরজ করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করছো। শেষ আয়াতে এ কথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে– تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ অর্থাৎ তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে– وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ এতে করে সে পরকালের ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরজ তরক করা শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা।

قَوْلُهُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদে আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলি পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকি রাখতে চাইব, ততদিন সত্য ধর্মের হেফাজত এবং বিধানাবলি পালন করার জন্য অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলির প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন, এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তাঁরা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তাঁরা আমাদের মতো শরিয়তের বিধানাবলির প্রতি বিমুখ হবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর উরুতে হাত মেরে বললেন, সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত। [যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না] তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্য ধর্ম হাসিল করত এবং তা মেনে চলত। –[তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী]

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য-সন্তান। কোনো দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন। –[তাফসীরে মাযহারীর প্রান্ত-টীকা]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْفَتْحِ : সূরা ফাত্হ

সূরার নামকরণের কারণ : কুরআন মাজিদের ৪৮ নং সূরার নাম হলো সূরা ফাত্হ। فَتْحٌ [ফাত্হ] শব্দের অর্থ হলো উন্মুক্ত করা ও বিজয়। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি] এর মধ্যস্থ "فَتْحًا" [ফাতহান] অর্থ- বিজয়। আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্য সুস্পষ্ট বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদেরকে এ বিজয় দান করেছেন। উক্ত সূরায় বিরাট অংশ জুড়ে হুদায়বিয়ার সন্ধির উপর আলোকপাত করেছেন। যেহেতু এ আলোচনার মধ্যে اَلْفَتْحُ [বিজয়] শব্দটি রয়েছে সেহেতু সূরাটির নামকরণ اَلْفَتْحُ দ্বারা করা হয়েছে। যদিও সূরাটির অংশ বিশেষ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে, তথাপি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির জন্য এটা যথার্থ শিরোনাম হওয়ার দাবিদার।

সূরাটির ফজিলত ও আমল : আলোচ্য সূরাটির বহু ফজিলত রয়েছে, তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো−

১. হুদায়বিয়া নামক স্থানে মহানবী ﷺ মক্কার কুরাইশ কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হলে হযরত সুহাইল ইবনে আমরের মধ্যস্থতায় সন্ধি করত মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে আলোচ্য সূরা ফাত্হ অবতীর্ণ হয়। সূরাটি রজনীতে নাজিল হয়। প্রভাতে মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন−
   অদ্যকার রজনীতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে− أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا [যা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সকলবস্তু হতে উত্তম ও পছন্দনীয়।] আর তা হলো− "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।]
২. তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধের সময় এ সূরাটি লিখে নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখলে নিরাপদে থাকা যায় এবং বিজয় সহজসাধ্য হয়।
৩. নৌকায় আরোহণ করার সময় এ সূরা তেলাওয়াতে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ হয়ে থাকে।
৪. রমজান শরীফের চাঁদ দেখার সময় তিনবার এ সূরাটি তেলাওয়াত করলে গোটা বছর যাবত রুজি-রোজগার সুপ্রশস্ত ও সুপ্রসন্ন হয়ে থাকে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা ফাতহ পাঠ করতে দেখে, আল্লাহ পাক তাকে আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করবেন। দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান করবেন।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপ্তির পর নবী করীম ﷺ হযরত সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, পথিমধ্যে রজনীকালে সূরাটি নাজিল হয়। সূরাটির প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হুদায়বিয়ার সন্ধির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

হিজরি ষষ্ঠ সনের যুলকাদ মাসে রাসূল ﷺ স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, তিনি ওমরা পালন করছেন। স্বপ্নের বিষয়টি শ্রবণ করে সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনার্থে অধীর হয়ে উঠলেন। সুতরাং প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীদের সঙ্গে করে ওমরা ব্রত পালনার্থে নবী করীম ﷺ মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহানবী ﷺ অবগত হলেন যে, মক্কার কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশে বাধা দান করবে, কাজেই নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে করে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে অবস্থান করলেন। মক্কার মুশরিকদেরকে ব্যাপারটি বুঝানো পূর্বক তাদের সাথে সমঝোতা করার জন্য নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে মক্কায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনি বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন।

এরপর কুরাইশদের পক্ষ হতে একাধিক দূত এসেও ব্যাপারটির সূরাহা করতে পারেনি। সমস্যা জিইয়ে থাকল। পরিশেষে সুহাইল ইবনে আমরের মাধ্যমে সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু সন্ধির অধিকাংশ শর্তাবলিই বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীতে ছিল। বাহ্যত মনে হচ্ছিল নবী করীম ﷺ অনেকটা নতি স্বীকার করেই মুশরিকদের সাথে এক অসম চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

সাহাবায়ে কেরাম− যাঁরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করার জন্য স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুলহুলাইফার বাবলা গাছের নিচে নবী করীম ﷺ -এর হাতে হাত রেখে বায়'আত করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষোভে অভিমানে জ্বলছিলেন। এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করা অপেক্ষা যুলহুলাইফার ময়দানে জীবন বিসর্জন দেওয়া যেন তাদের নিকট শ্রেয় মনে হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.-এর ন্যায় দু একজন তেজস্বী ও প্রতিভাবান সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর সাথে এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এতে যে, কি হিকমত লুক্কায়িত ছিল, বাহ্যিক পরাজয়ের অভ্যন্তরে যে এক মহাবিজয় নিহিত ছিল, তা আল্লাহ ও তদীয়

রাসূল ﷺ -এরই ভালো জানা ছিল। কাজেই সাহাবীগণের সকল মান-অভিমানকে উপেক্ষা করে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর ইঙ্গিতে অনুরূপ শর্তাবলি মেনে নিয়েই সন্ধি করতে সম্মত হলেন।

সে বছর আর ওমরা পালন করা সম্ভব হলো না। সন্ধির শর্তানুযায়ী নবী করীম ﷺ যুলহুলাইফাতেই সাহাবীগণসহ ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন। হাদীর পশুগুলোকে সেখানেই জবাই করেন। ক্ষোভে-অভিমানে হতাশ মর্মাহত সাহাবীদেরকে নিয়ে তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'কুরাউল গাইম' নামক এলাকার আসফান নামক স্থানে রজনীকালে আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণ নাজিল হয়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন– "অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা আমার উপর নাজিল হয়েছে যেটা সূর্য যাতে উদিত হয়েছে, তা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। অতঃপর তিনি সূরাটি তেলাওয়াত করে সাহাবীগণকে শুনালেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "আমার উপর অদ্য রজনীতে এমন একটি সূরা নাজিল হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু হতে প্রিয়।" এরপর তিনি সূরা ফাত্হ -এর শুরু হতে পড়া আরম্ভ করলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি : আলোচ্য সূরাটি যে মহান ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছিল তা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। হিজরি ষষ্ঠ সনে মক্কার অদূরে নবী করীম ﷺ ও কাফেরদের মধ্যে এ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ মহান ঐতিহাসিক সন্ধির শর্তাবলি যদিও অসম ছিল এবং আপাতঃদৃষ্টিতে কুরাইশদেরই পক্ষে তথাপি মূলত এর দ্বারাই মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

মহানবী ﷺ ও মুহাজির সাহাবীগণ (রা.) মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আসার পর দেখতে না দেখতে প্রায় ছয়টি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁরা এমনকি আনসারী সাহাবীগণও মক্কায় বায়তুল্লাহর জিয়ারতে গমন করতে পারেননি। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসে মহানবী ﷺ স্বপ্নযোগে দেখলেন যে, তিনি সাহাবীগণসহ মক্কা মুয়াজ্জামায় গিয়ে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করেছেন। নবীর স্বপ্ন ওহী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর এ স্বপ্নও নিছক কোনো স্বপ্ন ছিল না বরং এটা ছিল ওহীর নামান্তর। মূলত আল্লাহ তা'আলারই ইঙ্গিত।

প্রিয়নবী ﷺ -এর পক্ষে এ ইঙ্গিত বাস্তবায়িত করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছিল না। কুরাইশ মুশরিকরা দীর্ঘ ছয়টি বৎসর যাবৎ মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘরের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তারা মুসলমানদেরকে হজ বা ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় যেতে দেয়নি। এখানে তারা স্বয়ং রাসূলে করীম ﷺ -কে সাহাবীদের দলবলসহ মক্কা শরীফে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে, তা কি করে আশা করা যেতে পারে? ওমরার নিয়ত করে এবং ইহরাম বেঁধে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সহকারে বের হওয়া তো যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ারই নামান্তর ছিল। আর নিতান্ত নিরস্ত্র অবস্থায় যাওয়া তো নিজের ও সঙ্গী-সাথীদের প্রাণের জন্য কঠিন বিপদ টেনে আনা ছাড়া অন্য কোনো পরিণতি হতে পারে বলে মনে করা যায় না। এহেন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার এ ইঙ্গিত কি করে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হতে পারে তা কারো বোধগম্য হচ্ছিল না।

কিন্তু পয়গাম্বরের পদ ছিল অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাঁকে যে নির্দেশই দেবেন, কোনো রূপ দ্বিধা-সংকোচ ব্যতীতই তা যথার্থরূপে পালন করাই তাঁর একান্ত কর্তব্য। এ কারণে নবী করীম ﷺ নিঃসঙ্কোচে অকপটে তাঁর স্বপ্নের বিবরণ তাঁর সাহাবীগণকে শুনালেন এবং সফরে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। আশে-পাশের গোত্রসমূহেও সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিলেন– "ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছি যারাই আমাদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করবে, তারা যেন আমাদের কাফেলায় শামিল হয়ে যায়।" এতে যাদের দৃষ্টি বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নিবদ্ধ ছিল তারা স্পষ্ট মনে করে নিল যে, এ লোকগুলো তো অযথাই মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই রাসূলে করীম ﷺ -এর সঙ্গী হতে প্রস্তুত ছিল না। অপরদিকে আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের ﷺ প্রতি যাদের সত্যিকার ঈমান ডানা পেতে ছিল তারা এ যাত্রার পরিণতি কি হবে? তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হলো না। এটা আল্লাহর সংকেত এবং তাঁরই রাসূল ﷺ এ সংকেত কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এটাই ছিল তাদের সান্ত্বনা লাভের একমাত্র অবলম্বন। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গী হতে তাদেরকে বাধা দিতে পারে এমন কিছু ছিল না।

চৌদ্দশত সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ -এর নেতৃত্বে এ কঠিন শঙ্কাময় বিপদ সংকুল সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসের শুরুতে এ কাফেলা মদীনা হতে যাত্রা করল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে সকলেই ওমরার ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানি করার উদ্দেশ্যে সত্তরটি উট সঙ্গে নিলেন। উটগুলোর গলায় شِعَارُ قُرْبَانِيْ তথা "কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট জন্তু" হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ রশি বেঁধে দেওয়া হলো। জিনিসপত্রের মধ্যে এক একখানি তরবারিও সঙ্গে নেওয়া হলো। এটা কোনো বেআইনী কাজ ছিল না; বরং তখনকার সময় আরবের প্রচলিত নিয়মে বায়তুল্লাহ জিয়ারতকারীদের জন্য এটার পুরোপুরি অনুমতি ছিল। এটা ছাড়া অন্য কোনো সমরাস্ত্র সঙ্গে নেওয়া হয়নি। অতঃপর এ কাফেলা 'লাব্বাইকা' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা শুরু করল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের ও যে রূপের সম্পর্ক ছিল, তা আরবের প্রতিটি লোকই জানত। বিগত বৎসরই পঞ্চম হিজরি সনের শাওয়াল মাসে– আরবের সমগ্র গোত্র-সম্প্রদায়গুলো সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার উপর আক্রমণ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে 'আহজাব' যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণে নবী করীম ﷺ যখন জনতার এতবড় একটি কাফেলা নিয়ে তাঁদের সকলেরই রক্ত-পিপাসু দুশমনদের ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন এ আশ্চর্য ধরনের অভিযাত্রার দিকে আরবের সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। অবশ্য লোকেরা এটাও লক্ষ্য করল যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য নয়; বরং হারাম মাসে ইহরাম বেঁধে কুরবানির উট সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নবী করীম ﷺ -এর এ অগ্রযাত্রায় কুরাইশরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। জুলকাদ মাস ছিল হারাম মাসসমূহের একটি। যুগ যুগ ধরে আরবের লোকেরা এ মাসগুলোকে হজ ও জিয়ারত করার জন্য সংরক্ষিত এবং অত্যন্ত সম্মানিত মাস মনে করে আসছে। এ মাসসমূহে যে কোনো কাফেলাই ইহরাম বেঁধে হজ বা ওমরাহ পালন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, এর প্রতিরোধ করার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোনো গোত্রের সাথে কোনো কাফেলার লোকদের প্রাণের দুশমনী থাকলেও আরবের সর্বসমর্থিত বিধান অনুযায়ী তার এলাকা দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করতে বাধা দান করতে পারে না। এ কারণে কুরাইশ বংশের লোকেরা বিশেষ দুর্ভাবনার শিকার হলো। তারা মনে করল, মদীনার এ কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে না দিলে সমগ্র আরব জুড়ে সে জন্য কঠিন প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। আরবের প্রত্যেকটি লোকই এ কাজটি অন্যায় ও নিগৃহীত বলে আখ্যায়িত করবে। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ মনে করতে শুরু করবে– আমরা বুঝি আল্লাহর ঘরের একচ্ছত্র মালিক হতে চাচ্ছি। প্রত্যেক গোত্রই চিন্তা করবে– ভবিষ্যতে কোনো গোত্রকে হজ ও ওমরা পালন করতে দেওয়া না দেওয়া বুঝি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমরা যার উপর বিরাগভাজন হবো, তাকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে তেমনি বাধা প্রদান করব, যেমন– আজ এ জিয়ারত ইচ্ছুক লোকদেরকে বাধা দিচ্ছি। এটা তো একটি বড় ভ্রান্ত পদক্ষেপ হবে। সমস্ত আরব জনতা আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ হয়ে পড়বে। কিন্তু আমরা যদি মুহাম্মদকে এতবড় একটা কাফেলা সমভিব্যাহারে বিনা বাধায় আমাদের শহরে প্রবেশ করার সুযোগ দেই তা হলে সারা দেশে আমাদের আর কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং আধিপত্য অবশিষ্ট থাকবে না। লোকেরা মনে করবে, আমরা মুহাম্মদের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। মূলত এটা ছিল কুরাইশদের জন্য মস্তবড় সমস্যা। তারা এতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের জাহেলিয়াতের আত্মসম্মানবোধ ও বিদ্বেষই বিজয়ী হয়ে পড়ল। তারা নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, কোনোক্রমেই এ কাফেলাকে তারা তাদের শহরে প্রবেশ করতে দেবে না।

নবী করীম ﷺ বনূ কা'আবের এক ব্যক্তিকে পূর্বেই সংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। কুরাইশদের মনোভাব, ইচ্ছা, তৎপরতা ও গতিবিধি সম্পর্কে জেনে রাসূলে কারীম ﷺ -কে আগাম অবহিত করানোই ছিল তাঁর দায়িত্ব। নবী করীম ﷺ যখন উসফান, [মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান, মদীনা হতে উটের গাড়িতে দু' দিনের পথ] পৌঁছলেন, তখন সেই লোকটি এসে সংবাদ দিল যে, কুরাইশদের লোকেরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে [মক্কার বাইরে উসফানের পথে] 'যী তাওয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেছে। আর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে সৈন্যে সুসজ্জিত দুই শত উটের গাড়িসহ [উসফান হতে মক্কার দিকে আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত] 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানের দিকে আগে ভাগে পাঠিয়ে দিয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর অগ্রযাত্রা রোধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাফেলার সাথে গায়ে পড়ে তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদেরকে উত্তেজিত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর যুদ্ধ সংঘটিত হলে যেন সারা দেশে রটিয়ে দেওয়া যায় যে, এ লোকেরা আসলেই লড়াই করার উদ্দেশ্যে এসেছিল। যদিও ওমরা করার বাহানা করেছিল। ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মূলত তারা ইহরাম বেঁধে রেখেছিল।

প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে নবী করীম ﷺ সফরের পথ পরিবর্তন করে দিলেন। সাহাবীগণসহ তিনি অত্যন্ত বন্ধুর দূরতিক্রম্য পথ পাড়ি দিয়ে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। এ স্থানটি হারামের বিস্তীর্ণ এলাকার সীমান্তে অবস্থিত।

এ স্থানে বনূ খুজাআ গোত্রের সরদার বুদায়েল ইবনে ওরকাহ তাঁর গোত্রের কয়েকজন সঙ্গীসহ নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনি এসেছেন? নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। বায়তুল্লাহর জিয়ারত ও তার তওয়াফ করাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য। তারা এ কথাগুলো কুরাইশ সর্দারদের নিকট পৌঁছে দিল এবং হারাম শরীফের জিয়ারত করতে ইচ্ছুক এ কাফেলাকে বাধা না দেওয়ার জন্য তাদেরকে পরামর্শ দিল। কিন্তু কুরাইশ সর্দাররা তাদের একগুঁয়েমী জিদ ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজি হলো না। তারা কুরাইশদের মিত্র গোত্র সমষ্টি আহবীশ সর্দার হুলাইছ ইবনে আলকামাহকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট

Free @ www.elmweebly.com

পাঠাল; যাতে সে নবী করীম ﷺ -কে মদীনায় ফিরে যেতে প্রস্তুত করে। কুরাইশ সর্দারদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ তার কথা না মানলে সে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং অতঃপর আহবীশের সমস্ত শক্তি আমাদের পথে নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হবে। কিন্তু হুলাইস যখন এসে প্রত্যক্ষ করল যে, সমস্ত কাফেলা ও কাফেলার সব লোকই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, কুরবানির জন্তুগুলোর গলায় চিহ্ন ব্যবহৃত রয়েছে এবং সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার জন্যই এসেছে, তখন সে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কোনো প্রকার বাক্য ব্যয় ব্যতীতই মক্কায় ফিরে গেল। কুরাইশ সর্দারদের নিকট স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল– এই লোকেরা বায়তুল্লাহর মাহাত্ম্য মেনেই তার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছে। তোমরা যদি তাদেরকে বাধা দাও তাহলে আহবীশ এ কার্যে তোমাদের কোনোই সহযোগিতা করবে না। তোমরা কা'বার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য পদদলিত করবে, আর সেই কাজে আমরা তোমাদের সাহায্য করব– এই উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের মিত্র হইনি।

তারপর কুরাইশদের পক্ষ হতে দূত হিসেবে ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ সাকাফী আসল। সে নিজস্বভাবে বিভিন্ন কথা বুঝিয়ে নবী করীম ﷺ -কে মক্কায় প্রবেশ করার ইচ্ছা হতে বিরত থাকার জন্য প্রস্তুত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, আমরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। তিনি বললেন, আমরা তো আল্লাহর ঘরের মাহাত্ম্য মেনে নিয়ে একটি দ্বীনি কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। উরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে বললেন, আমি কায়সার, কেসরা ও নাজাসীর দরবারেও গিয়েছি। কিন্তু খোদার শপথ! আমি মুহাম্মদের ﷺ সাথী-সঙ্গীদেরকে তাঁর জন্য যতখানি উৎসর্গকৃত দেখতে পেয়েছি, এমন দৃশ্য কোনো বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখতে পাইনি। এ লোকগুলোর অবস্থা এমন যে, মুহাম্মদ ﷺ অজু করেন, আর তার অনুসারীরা পানির একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেন না, তাঁরা সবই নিজেদের দেহে ও কাপড়ে মেখে নেন। এরূপ অবস্থায় তোমরা তোমাদের প্রতিপক্ষকে ভালো করে অনুধাবন করে নাও।

দূতদের পরস্পর আসা-যাওয়া এবং মতবিনিময়ের এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। এ সময়ে কুরাইশরা চুপে চুপে নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে সাহাবীগণকে উত্তেজিত করে তুলত। কোনো না কোনোভাবে এমন কোনো কাজ করতে তাদেরকে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকে, যাতে লড়াই বাধানোর পরিস্থিতি ঘটে। তারা এ ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা বহাল রাখে; কিন্তু প্রতিবারই সাহাবীগণের ধৈর্য এবং নবী করীম ﷺ -এর বুদ্ধিমত্তা, কৌশল তাদের সমস্ত কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিল। একবার তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক রাত্রিবেলায় এসে মুসলমানদের তাবুর উপর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করল। সাহাবীগণ তাদেরকে গ্রেফতার করে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত করলেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। অন্য এক সময় 'তানয়ীম' [মক্কার হারাম সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থান] দিক হতে আশি জন লোক এসে ঠিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসল। তারাও সাহাবীগণের হাতে বন্দী হলো। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদেরকেও মুক্ত করে দিলেন। কুরাইশদের সব কয়টি ষড়যন্ত্রই এভাবে ভেস্তে গেল।

অবশেষে নবী করীম ﷺ স্বয়ং হযরত ওসমান (রা.)-কে দূত বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ সর্দারদেরকে বলে দিলেন যে, আমি যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসিনি। জিয়ারত ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে কুরবানির জন্তুসহ এসেছি। আমরা তওয়াফ ও কুরবানি সম্পাদন করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে সম্মত হলো না। উপরন্তু তারা হযরত ওসমান (রা.)-কে আটক করে রাখল।

এ সময় মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন। তিনি প্রত্যাবর্তন না করায় মুসলমানরা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন। বস্তুত এটা ছিল একটি কঠিন সংকটময় মুহূর্ত। অধিক সহ্য করার এবং চুপচাপ বসে থাকার সময় ছিল না। [মক্কায় প্রবেশ করার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর]। এর জন্য শক্তি প্রয়োগ প্রার্থিত ছিল না। কিন্তু বিষয়টি যখন দূত হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছে তখন মুসলিম জনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এ জন্য নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত সাহাবীদের একত্র করে তাঁদের নিকট হতে এ কথার উপর বায়'আত গ্রহণ করলেন যে, "অতঃপর আমরা এ স্থান হতে মৃত্যু পর্যন্তও পশ্চাদপদ হবো না। অবস্থার নাজুকতা লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, এটা কোনো নগণ্য ধরনের বায়'আত ছিল না। মুসলমান ছিল মাত্র চৌদ্দশত জন, সঙ্গে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম বা অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই ছিল না। এ সময় তারা নিজেদের আবাসস্থল হতে আড়াইশত মাইল দূরে মক্কার উপকণ্ঠে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে শত্রুপক্ষ পূর্ণ শক্তিকে তাঁদের উপর অতি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। আর আশ-পাশ হতে নিজেদের মিত্র ও সমর্থক গোত্রসমূহকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলতেও কোনো অসুবিধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও মাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া সমস্ত কাফেলা-ই নবী করীম ﷺ -এর হাতে মরতে প্রস্তুত থাকার জন্য বায়'আত গ্রহণ করতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হলো না। তাঁদের ঈমানী নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং আল্লাহর পথে আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকার অধিক স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ এটা

Free @ www.eelm.weebly.com

অপেক্ষা আর কি হতে পারে? বস্তুত এ বায়'আত 'বাইয়াতে রেদওয়ান' তথা আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আত্মদানমূলক শপথ ও অঙ্গীকার নামে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তা চিরদিনই ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পরবর্তীতে জানা গেল যে, হযরত ওসমান (রা.)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ ভুল ছিল। তিনি নিজেই স্ব-শরীরে ফিরে আসলেন। এদিকে কুরাইশদের পক্ষ হতে সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সন্ধির ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতেই দেওয়া হবে না– এরূপ জিদ ও একগুঁয়েমী মনোভাব তারা পরিত্যাগ করেছিল। অবশ্য নিজেদের নাক উঁচু রাখার জন্য তারা বারংবার শুধু বলতে লাগল, আপনি এ বৎসর ফিরে যান। আগামী বৎসর আসতে পারেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে সন্ধি চুক্তি স্থাপিত হলো–

১. দশ বৎসর যাবৎ উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার তৎপরতা চালাবে না।
২. এ সময়ের মধ্যে কুরাইশদের কোনো ব্যক্তি নেতার অনুমতি ব্যতীত পালিয়ে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। অপরদিকে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্য হতে কেউ কুরাইশদের নিকট পালিয়ে চলে গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
৩. আরবের গোত্রসমূহ উপরিউক্ত পক্ষদ্বয়ের যে কোনো একটির সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে।
৪. মুহাম্মদ ﷺ এ বৎসর ফিরে যাবেন এবং আগামী বৎসর ওমরা পালন করার উদ্দেশ্যে আগমন করে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। তবে অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে মাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে আসতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো যুদ্ধ-সরঞ্জাম সঙ্গে আনতে পারবেন না। এ তিন দিনের জন্য মক্কাবাসীরা তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে। যেন কোনোরূপ সংঘাত হওয়ার আশংকা না থাকে। কিন্তু তারা এখান হতে ফিরে যাওয়ার সময় কোনো এক ব্যক্তিকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবেন না।

যে সময় এ সন্ধি চুক্তির শর্তসমূহ ঠিক করা হচ্ছিল, তখন মুসলমানদের সমগ্র বাহিনী উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। যে সব কল্যাণকর দিকের উপর দৃষ্টি রেখে নবী করীম ﷺ এ শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন, অন্য কারো দৃষ্টি সেই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ ছিল না। ফলে এই সন্ধির পরিণতিতে যে মহান কল্যাণ সাধিত হতে যাচ্ছিল, তা কেউই অনুধাবন করতে পারছিলেন না। কাফের কুরাইশগণ এ শর্তসমূহকে নিজেদের সাফল্য মনে করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল– আমরা দুর্বল দেখে এই অপমানকর শর্তসমূহ মেনে নেব কেন? হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ন্যায় একজন সুক্ষ্মদর্শী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন জননেতার অবস্থাও সীমাহীন উদ্বেগজনক ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, ইসলাম কবুল করার পর আমার দিলে কখনো কোনো রূপ সংশয় মাথাচাড়া দেয়নি। কিন্তু এ সময় আমিও তা হতে রক্ষা পেলাম না। তিনি অস্থির হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, নবী করীম ﷺ কি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? তারা কি মুশরিক নয়? তা হলে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অপমান ও লাঞ্ছনা মাথা পেতে নেব কেন? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হে ওমর! তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কখনো তাঁকে বিপথগামী করবেন না। এটা শুনে তিনি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঠিক এ প্রশ্নগুলো করলেন। তিনিও তাঁকে ঠিক সেই জবাবই দিলেন– যা দিয়েছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)।

আলোচ্য সন্ধি চুক্তির দুটি বিষয় লোকদের মনে সর্বাধিক ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছিল। এর একটি হলো দুই নম্বর শর্ত। লোকদের মতে এটা সুস্পষ্টরূপে সমতা ভঙ্গকারী শর্ত। মক্কা হতে পালিয়ে আসা লোককে যদি আমরা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হই তা হলে মদীনা হতে পালিয়ে আসা লোককে তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন? নবী করীম ﷺ এ বিষয়ে বললেন, আমাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে তাদের নিকট চলে যাবে, তারা কি আমাদের কোন কাজে আসবে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের হতে দূরে রাখুন, এতেই তো মঙ্গল। আর তাদের নিকট হতে যারা পালিয়ে আমাদের নিকট আসবে, আমরা যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেই তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের মুক্তি ও নিষ্কৃতির বিকল্প কোনো পথ সৃষ্টি করে দেবেন।

তা ছাড়া চতুর্থ শর্তটিও লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। মুসলমানরা মনে করতেছিলেন যে, এই শর্তটি মেনে নেওয়ার অর্থ হলো আমরা সমস্ত আরবদের সম্মুখে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। এতদ্ব্যতীত আরো একটি প্রশ্ন তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমরা মক্কায় তওয়াফ করছি। অথচ বাস্তবে আমরা তওয়াফ না করে ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী করীম ﷺ লোকদেরকে বুঝালেন, এ বৎসরই তওয়াফ করা হবে। স্বপ্নে তা তো স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি। সন্ধির শর্তানুযায়ী এ বৎসর না হলেও আগামী বৎসর তো ইনশাআল্লাহ তওয়াফ করা হবেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ সময় একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনাটি বলা যেতে পারে আগুনে ঘৃত ঢালার কাজ করছে। সন্ধির চুক্তি পত্র লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল, এ মুহূর্তেই সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জন্দল যিনি ইতোপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিল– কোনো না কোনোক্রমে পালিয়ে এসে নবী করীম ﷺ -এর ক্যাম্পে শামিল হয়ে গেছেন। তাঁর পায়ে বেড়ী লাগানো ছিল, তাঁর সমগ্র দেহের উপর অত্যাচার নির্যাতনের স্পষ্ট চিহ্ন অংকিত ছিল। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট ফরিয়াদ করলেন, "আমাকে এ অন্যায়-অকারণ বন্দীদশা হতে মুক্তি দান করুন!" এ মর্মান্তিক অবস্থা সহ্য করে নেওয়া উপস্থিত জনতার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর বলল, সন্ধিপত্র লেখা সম্পূর্ণ না হলেও এর শর্তাবলি আমাদের পরস্পরে মাঝে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং শর্তানুযায়ী আমার এ পুত্রকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিতে আপনি বাধ্য। নবী করীম ﷺ তার যুক্তি মেনে নিলেন। আবু জান্দালকে এ জালিমদের নিকটই সোপর্দ করা হলো।

সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমবেত সাহাবীগণকে বললেন, এখনই কুরবানি করে মাথা মুণ্ডন করে ফেল এবং ইহরাম খুলে ফেল। কিন্তু একজনও নিজ স্থান হতে নড়লেন না। নবী করীম ﷺ পরপর তিনবার এ নির্দেশ প্রদান করলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ সময় যে দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও অন্তর্জ্বালার সুগভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, তাতে একজন লোকের পক্ষেও স্বীয় স্থান হতে এতটুকু নড়াচড়া করাও সম্ভবপর হলো না। অথচ নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে কোনো কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন আর তারা তা পালন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয়ে উঠেননি, এমনটি রাসূলে করীম ﷺ -এর সমগ্র রিসালতের জীবনে এটাই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘটনা। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরূপ বিস্ময়কর ঘটনার আর কখনো উদ্রেক হয়নি। এতদ দর্শনে নবী করীম ﷺ খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি তাঁর ক্যাম্পে পৌছে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর নিকট তাঁর এ দুঃখ ও ক্ষোভের কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) নিবেদন করলেন, আপনি নিজে গিয়ে চুপ চাপ আপনার উটটি জবাই করে ফেলুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে আপনার মাথা মুণ্ডন করে ফেলুন। এর পর সাহাবীগণ নিজেরাই অগ্রসর হয়ে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাঁরা বুঝে নেবে যে, যা কিছু ফয়সালা হয়ে গেছে তা আর পবিরর্তিত হওয়ার মতো নয়। কার্যত হলোও তা-ই। রাসূলে কারীম ﷺ -এর আমল দেখে লোকেরা কুরবানি করল এবং মাথা মুণ্ডন করল, চুল কর্তন করাল এবং ইহরাম ভেঙ্গে ফেলল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের হৃদয় যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল, হতাশা ও দুঃখ-ক্ষোভে তাদের কলিজাটা যেন ফেটে গিয়েছিল।

অতঃপর এ কাফেলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা ও অপমান-লাঞ্ছনার চূড়ান্ত প্রতীক মনে করে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল তখন মক্কা হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত যাজনান নামক স্থানে [মতান্তরে কুরাউল গাইম নামক স্থানে] এ সূরাটি নাজিল হলো। এতে মুসলমান জনতাকে বলা হয়েছে যে, তোমরা এ সন্ধিকে নিজের পরাজয় মনে করলেও আসলে এটাই তোমাদের মহাবিজয়। এ সূরা নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সমস্ত মুসলিম জনতাকে একত্র করেন এবং বললেন, আজ আমার উপর এমন একটা জিনিস অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার নিকট সমগ্র দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সবকিছুর তুলনায় অধিক মূল্যবান। এরপর তিনি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেন এবং বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে তা শুনালেন। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে তিনিই সর্বাধিক দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।

ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলার এ মহাবাণী শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীতে অল্পকালের মধ্যেই যখন এ সন্ধির কল্যাণ এক একটা করে প্রকাশ হতে শুরু করল তখন এ সন্ধি যে বাস্তবিকই ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এক মহা বিজয় ছিল তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। এ সন্ধির কতিপয় কল্যাণকর বিষয়গুলো নিম্নে উদ্ধৃত হলো–

১. এ সন্ধির ফলে আরবদেশে সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের অবস্থিতিকে যথারীতি স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের মর্যাদা এরূপ ছিল যে, আরবদের দৃষ্টিতে তারা ছিলেন কুরাইশ ও আরবের অন্যান্য গোত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি দল বা গোষ্ঠী মাত্র। তারা এদেরকে তাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বহির্ভূত মনে করত। অথচ সেই কুরাইশরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে সন্ধি চুক্তি করে ইসলামি রাষ্ট্র অধিকৃত অঞ্চলের উপর এর স্বাধীন সার্বভৌমত্ব কর্তৃত্ব মেনে নিল। আরবদের অন্যান্য গোত্রসমূহের জন্য এ দুটি রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে যে কোনো একটির সাথে ইচ্ছা, মিত্রতার সন্ধি চুক্তি করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

২. মুসলমানদের জন্য আল্লাহর ঘর জিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে কুরাইশরা যেন আপনা আপনি এটাও স্বীকার করে নিল যে, ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত কোনো ব্যবস্থার নাম নয়। তখনও পর্যন্ত যদিও তারা এটাই মনে করে আসছিল; বরং তা আরবে অবস্থিত ও প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে একটি এবং অন্যান্য ধর্মপরায়ণদের ন্যায় হজ ও ওমরা অনুষ্ঠানাদি পালন করার অধিকার মুসলমানদেরও রয়েছে। কুরাইশদের এ যাবতকালীন মিথ্যা প্রচারণার ফলে আরববাসীদের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ জেগে উঠেছিল এ সন্ধি চুক্তির ফলে তা হ্রাসপ্রাপ্ত হলো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. কুরাইশদের পক্ষ হতে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর নবী করীম ﷺ ইসলাম অধিকৃত ও প্রভাবাধীন অঞ্চলে ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ইসলামি আইন-বিধান চালু করে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে মুসলমান সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্যাদায় উন্নীত করার অবাধ সুযোগ লাভ করেন। বস্তুত এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি বড় নিয়ামত। সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে এ নিয়ামত সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করে নিলাম।

৪. সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার চুক্তি হওয়ায় মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা লাভ করলেন। এর ফলে তাঁরা আরবের সর্বাধিক ও সর্বাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করত অবাধে ইসলাম প্রচার করার সুযোগ পেলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে উনিশ বৎসরে যত সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এর পর মাত্র দু বৎসরে তার অনেক বেশি সংখ্যক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গী ছিলেন মাত্র চৌদ্দশত জন মুসলমান। আর এর মাত্র দুই বৎসর পরই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী করীম ﷺ যখন মক্কার উপর চড়াও হলেন, তখন দশ হাজার লোক তাঁর অনুগত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল।

৫. কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র দক্ষিণ দিক [মক্কা] হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা লাভ করল। এতে বড় একটি ফায়দা সাধিত হলো যে, মুসলিমগণ উত্তর আরব ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী গোত্রগুলোকে অতি সহজেই অধীন করে নিতে সক্ষম হলো। হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মাত্র তিনটি মাসই অতিবাহিত হয়েছিল। এর মধ্যেই ইহুদিদের শক্তিকেন্দ্র খায়বর জয় হয়ে গেল। অতঃপর ফাদাক, ওয়াদীউল কুরা, তাইমা ও তাবুকের ইহুদি জনবসতিসমূহ ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে এসে গেল। এ ছাড়া মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদি ও কুরাইশদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল তারাও একে একে মুসলমানদের অধীনতা পাশে বন্দী হয়ে গেল। এভাবেই হুদায়বিয়ার সন্ধি মাত্র দুটি বৎসরের মধ্যেই সমগ্র আরবের শক্তির ভারসাম্য এমনভাবে বদলিয়ে দিল যে, কুরাইশ ও মুশরিকদের শক্তি চাপা পড়ে গেল এবং ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় অবধারিত হয়ে পড়ল।

মূলত মুসলমানরা যে সন্ধিকে নিজেদের ব্যর্থতা এবং অপমানজনক মনে করত এবং কুরাইশরা নিজেদের চরম সাফল্য ও সম্মান মনে করত তার বিপুল কল্যাণময় অবদানসমূহ উল্লিখিতভাবে ছিল। উক্ত সন্ধিতে যে বিষয়টি সর্বাধিক দুঃসহ ও বেদনাদায়ক ছিল এবং যেটাকে কুরাইশরা স্বীয় মর্যাদা ও বিজয়ের হেতু বলে ধারণা পোষণ করত তাহলো মক্কা হতে প্রাণে বেঁচে মদীনায় পলায়নকারী লোকদেরকে কুরাইশদের হাতে সোপর্দ করার এবং মক্কায় যাওয়া লোকদেরকে ফিরিয়ে না দেওয়ার শর্ত।

কিন্তু মূলত বিষয়টি ছিল– মানুষ ভাবে একটা, আর হয় তার বিপরীতটার মতো অর্থাৎ স্বল্পকালের মধ্যেই এ অসম শর্তটি কুরাইশদের সম্পূর্ণ স্বার্থবিরোধী প্রমাণিত হলো। সন্ধির অল্প কিছুদিন পরই মক্কা হতে আবূ বসীর নামক একজন মুসলমান কুরাইশদের বন্দীশালা হতে মুক্ত হয়ে পালিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। নবী করীম ﷺ সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁকে কুরাইশদের হাতে তুলে দিলেন। হযরত আবূ বসীর (রা.)-কে মক্কায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য যেসব লোক এসেছিল মক্কায় যাওয়ার পথে তিনি তাদের একজনকে হত্যাপূর্বক পালিয়ে লোহিত সাগরের মরু অঞ্চলে গিয়ে গোপন আস্তানা গাড়লেন। তাঁর অবস্থানস্থলের পাশ দিয়ে কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়া যাতায়াত করত। পরবর্তীতে যে কোনো মুসলামনই কুরাইশদের ছোবল হতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হতো সে-ই হযরত আবূ বাসীরের আস্তানায় গিয়ে ভিড়ত। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা সত্তরে গিয়ে পৌঁছল। তাঁরা সুযোগমতো কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করতে শুরু করেন। তাঁরা যেহেতু মদীনার ইসলামি সরকার হতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন সেহেতু নবী করীম ﷺ -এর উপর এর দায়-দায়িত্ব বর্তালো না। এ বিপদের মোকাবিলা করতে না পেরে পরিশেষে কুরাইশরা নিজেরাই নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ শর্তটি বাতিলের অনুরোধ জানাল। অবশেষে হযরত আবূ বাসীর (রা.) এবং তাঁর সহযোগীরা দস্যুবৃত্তি পরিহার করে মদীনায় চলে আসলেন। এরূপেই এ অসম চুক্তির চির অবসান হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً

সূরা ফাতহ মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত : ২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ قَضَيْنَا بِفَتْحِ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا
الْمُسْتَقْبَلِ عَنْوَةً بِجِهَادِكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا
بَيِّنًا ظَاهِرًا ـ

১. নিশ্চয় আমি [হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে] আপনাকে বিজয় দান করেছি। আমি আপনার জন্যে মক্কা বিজয় এবং অন্যান্য বিজয়ের সিদ্ধান্ত করে রেখেছি যা আপনি ভবিষ্যতে আপনার জিহাদের সাধনা ও ক্লেশের মাধ্যমে সৃষ্টি করবেন। সুস্পষ্ট বিজয় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য [বিজয়]।

٢. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ بِجِهَادِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ
وَمَا تَاَخَّرَ مِنْهُ لِتَرْغَبَ اُمَّتُكَ فِى الْجِهَادِ
وَهُوَ مُؤَوَّلٌ لِعِصْمَةِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ بِالدَّلِيْلِ الْعَقْلِيِّ الْقَاطِعِ مِنَ الذُّنُوْبِ
وَاللَّامُ لِلْعِلَّةِ الْغَائِيَّةِ فَمَدْخُوْلُهَا مُسَبَّبٌ لَا
سَبَبٌ وَيُتِمَّ بِالْفَتْحِ الْمَذْكُوْرِ نِعْمَتَهٗ اِنْعَامَهٗ
عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ بِهٖ صِرَاطًا طَرِيْقًا مُّسْتَقِيْمًا
يُثَبِّتَكَ عَلَيْهِ وَهُوَ دِيْنُ الْاِسْلَامِ ـ

২. [হে রাসূল!] আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন আপনার জিহাদের মাধ্যমে আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন যাতে করে আপনি আপনার উম্মতকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া অকাট্য আকলী দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সেহেতু অত্র আয়াতের তাবীল [সমাধানমূলক ব্যাখ্যা] করা হবে। ل বর্ণটি এখানে [আয়াতে] হুকুমের উদ্দেশ্যে তার কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা مُسَبَّبٌ -এর উপর দাখিল হয়েছে ; سَبَبٌ -এর উপর নয়। এবং তিনি পূর্ণ করে দেন। উল্লিখিত বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর নিয়ামত– তাঁর নিয়ামত প্রদান– আপনার প্রতি এবং আপনাকে দেখাতে পারেন তা দ্বারা এমন পথ– রাস্তা, যেটা সহজ-সরল অর্থাৎ তার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে। আর তা হলো দীন ইসলাম।

٣. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ بِهٖ نَصْرًا عَزِيْزًا ـ نَصْرًا ذَا عِزٍّ
لَا ذُلَّ مَعَهٗ ـ

৩. আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করতে চান তা দ্বারা– পূর্ণ শক্তিতে সাহায্য– সম্মানসমৃদ্ধ সাহায্য যাতে সামান্যতম অপমান নেই [লাঞ্ছনা নেই]।

٤. هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ الطُّمَانِيْنَةَ فِىْ
قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ
اِيْمَانِهِمْ ط بِشَرَائِعِ الدِّيْنِ كُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدَةٌ
مِنْهَا اٰمَنُوْا بِهَا وَمِنْهَا الْجِهَادُ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط فَلَوْ اَرَادَ نَصْرَ دِيْنِهٖ بِغَيْرِكُمْ
لَفَعَلَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِىْ
صُنْعِهٖ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

৪. তিনিই সাকীনা দান করেছেন– প্রশান্তি মুমিনদের অন্তরে যেন তাদের ঈমানের সঙ্গে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়, দীনের বিধানাবলি সম্পর্কে। তা এভাবে যে, যখনই কোনো বিধান নাজিল হয়েছে তখনই তাঁরা তার প্রতি ঈমান এনেছেন। আর ঐসব বিধান সমষ্টির অন্যতম হলো জিহাদ। ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ তা'আলার জন্যই সুতরাং তিনি তোমাদের ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা তাঁর দীনকে সাহায্য করার ইচ্ছা করলে তা তিনি অবশ্যই করতে পারেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী– তাঁর সৃষ্টিকলায় প্রজ্ঞাময়– তাঁর শিল্পকার্যে, অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এসব গুণে গুণান্বিত থাকেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا : এর মধ্যে فَتَحْنَا -এর তাফসীর قَضَيْنَا দ্বারা করার উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের অপনোদন করা।

সংশয় : فَتْح বা বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মক্কা বিজয় আর মক্কা বিজয় সর্বসম্মাতিক্রমে ৮ম হিজরিতে হয়েছে। আর এই সূরা হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ضَجْنَانْ যা মক্কা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরত্বে অথবা কারো মতে كُرَاعُ الْغَمِيْمِ নামক স্থানে ৬ষ্ঠ হিজরিতে অবতীর্ণ হয়েছে, এখন সংশয় হলো যে, ৮ম হিজরিতে সংঘটিতব্য ঘটনাকে ৬ষ্ঠ হিজরিতে إِنَّا فَتَحْنَا তথা মাযীর সীগাহ দ্বারা কেন ব্যক্ত করা হলো?

নিরসন : মুফাসসিরগণ এই সংশয়ের তিনটি জবাব দিয়েছেন। যথা–

১. প্রথম জবাব তো সেটাই যার দিকে আল্লামা মহল্লী (র.) فَتَحْنَا -এর তাফসীর قَضَيْنَا দ্বারা করে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই জবাবের সার হলো فَتْح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো قَضَا فِى الْاَزَلِ তথা আলমে আযলের ফয়সালা অর্থাৎ حَكَمْنَا فِى الْاَزَلِ আর قَضَا فِى الْاَزَلِ নিঃসন্দেহে হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বেই হয়েছে। অর্থাৎ ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের ফয়সালা আলমে আযলে হয়েছিল, এই সুরতে অতীতকালীন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হাকীকী হবে।

২. দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে মক্কা বিজয় হওয়াটা সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে মাযীর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা যা ঘটা সুনিশ্চিত হয় তাকে মাযীর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এই সুরতে মাযীর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করাটা মাযাযী হবে এবং এটা وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ -এর অনুরূপ হলো।

৩. তৃতীয় জবাব হলো মূলত হুদায়বিয়ার সন্ধিই হলো বিজয়। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধিই মক্কা বিজয় ও অন্যান্য বিজয়ের কারণ হয়েছিল। মহানবী ﷺ -ও হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই فَتْحٌ مُبِيْنٌ বা সুস্পষ্ট বিজয় বলেছেন।

كُرَاعُ الْغَمِيْمِ নামক স্থানে যখন এই সূরা অবতীর্ণ হলো তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে তেলাওয়াত করে শুনালেন, সে সময় হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এটাও কি فَتْحٌ مُبِيْنٌ ? নবী করীম ﷺ বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, এটাই فَتْحٌ مُبِيْنٌ ; এ সূরতেও মাযীর শব্দ দ্বারা এটা ব্যক্ত করা হাকীকী হবে।

قَوْلُهُ عَنْوَةً : এর অর্থ হলো জোর জবরদস্তি করে নিয়ে নেওয়া, তরবারির মাধ্যমে অর্জন করা। এভাবে মক্কা বিজয় হয়েছে বলে ইমাম আযম (র.) ও ইমাম মালেক (র.) অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, সন্ধির মাধ্যমে মক্কা বিজয় হয়েছে।

قَوْلُهُ بَيِّنًا : مُبِيْنًا -এর তাফসীর بَيِّنًا দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, مُبِيْن এটা اَبَانَ থেকে لَازِمْ অর্থে হয়েছে مُتَعَدِّىْ অর্থে নয়।

قَوْلُهُ فِى الْمُسْتَقْبِلِ : এটা বিজয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কোনো কোনো নুসখায় فِىْ ব্যতীত রয়েছে; তখন اَلْمُسْتَقْبِلُ টা بِفَتْحٍ -এর সিফত হবে।

قَوْلُهُ بِجِهَادِكَ : এর সম্পর্ক فَتْحُ مَكَّةَ -এর সাথে। এ বাক্য বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : فَتْحُ مَكَّةَ আল্লাহ তা'আলার কর্ম, কেননা إِنَّا فَتَحْنَا -এর মধ্যে فَتْح -এর সম্পর্ক বা নিসবত আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে করেছেন, আর مَغْفِرَتْ -এর সম্পর্ক রাসূল ﷺ -এর পবিত্র সত্তার সাথে করা হয়েছে। এর অর্থ হলো মক্কা বিজয় যা আল্লাহ তা'আলার কর্ম এটা রাসূল ﷺ -এর مَغْفِرَتْ -এর ইল্লত, আর এটা ঠিক নয়। কেননা একজনের কর্ম অন্যের জন্য ইল্লত হতে পারে না। কাজেই মক্কা বিজয়ের উপর রাসূল ﷺ -এর مَغْفِرَتْ হওয়াটা সঠিক নয়। এ প্রশ্নের সমাধানকল্পেই মুফাসসির (র.) بِجِهَادِكَ বৃদ্ধি করেছেন।

উত্তর : উত্তরের সার হলো بِجِهَادِكَ -এর সম্পর্ক মক্কা বিজয়ের সাথে। অর্থ হলো– মক্কা বিজয় তো আল্লাহ দিয়েছেন; কিন্তু এর প্রকাশ্য কারণ ও মাধ্যম হলো আপনার জিহাদ করা। এ পদ্ধতিতে স্বয়ং তার ফে'ল তার মাগফেরাতের ইল্লত হলো. আল্লাহ তা'আলার নয়। আর এটা বৈধ। কাজেই এখন কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

Free @ www.eelm.weebly.com

قَوْلُهُ هُوَ مُؤَوَّلٌ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের সমাধান। প্রশ্ন হলো নবীগণ মাসুম তথা নিষ্পাপ হয়ে থাকেন, এরপর রাসূল ﷺ -এর মাগফেরাত তথা গুনাহসমূহ ক্ষমা করার কি অর্থ হতে পারে?

উত্তর : উত্তর হলো এতে ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে–

১. প্রথমত এই সম্বোধন যদিও রাসূল ﷺ -কে করা হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উম্মতে মুহাম্মাদী। যাতে করে তারা জিহাদে আগ্রহী হয়।

২. দ্বিতীয় ذُنُوبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ নীতির ভিত্তিতে خِلَافُ أَوْلٰى অতি উত্তমের বিপরীত। আর خِلَافُ أَوْلٰى বিষয়াবলি নবীর থেকে প্রকাশ পেতে পারে, আর এটা عِصْمَتُ أَنْبِيَاءُ -এর বিপরীত নয়।

৩. তৃতীয়ত অথবা مَغْفِرَتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পর্দা। অর্থ হলো আপনার এবং আপনার থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার মাঝে পর্দা দ্বারা আবরণ দিয়ে দিব যাতে করে আপনার থেকে গুনাহ প্রকাশ না পেতে পারে।

قَوْلُهُ لِتَرْغَبَ أُمَّتُكَ : এটা জিহাদের উপর মাগফেরাত مُرَتَّبٌ হওয়ার ইল্লত। অর্থাৎ জিহাদের উপর মাগফেরাত مرتب হওয়ার কারণে আপনার উম্মত জিহাদের উপর আগ্রাহান্বিত হবে।

قَوْلُهُ وَاللَّامُ لِلْعِلَّةِ الْغَائِيَةِ : لِيَغْفِرَ -এর لَامٌ টি عِلَّتْ غَايَةٌ ইল্লতে بَاعِثَةٌ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার কোনো কাজই مُعَلَّلٌ بِالْأَغْرَاضِ হতে পারে না, অর্থাৎ কোনো কিছু তাকে কোনো কাজে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করতে পারে না। অবশ্য উল্লিখিত لَامٌ টা عِلَّتْ غَائِيَةٌ -এর জন্য হতে পারে। অর্থাৎ কাজের ফলাফলের জন্য। যখন বলে اِشْتَرَيْتُ الْقَلَمَ لِأَكْتُبَ [আমি লেখার জন্য কলম ক্রয় করেছি] লেখাটা ক্রয়ের غَايَتْ বা শেষ সীমা। কাজেই لَامٌ -এর مَدْخُوْلٌ অর্থাৎ মাগফেরাতটা مُسَبَّبٌ ; সবব নয়। سَبَبٌ হলো বিজয়, আর مُسَبَّبٌ হলো মাগফেরাত। مَغْفِرَتٌ সবব নয়, আর মক্কা বিজয় হলো مُسَبَّبٌ অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে মক্কা বিজয় ক্ষমা পাওয়ার কারণ; মাগফেরাত মক্কা বিজয়ের سَبَبٌ নয়।

قَوْلُهُ وَيُتِمَّ : এর আতফ হলো يَغْفِرُ -এর উপর এবং لَامٌ -এর অধীনে।

قَوْلُهُ يُثَبِّتَكَ : এটার বৃদ্ধিকরণ দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া উদ্দেশ্য। প্রশ্ন হলো তিনি তো সূচনালগ্ন থেকেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন। এরপরও তাঁর সম্পর্কে وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا বলার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : জবাবের মূলকথা হলো হেদায়েত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হেদায়েতের উপর স্থায়িত্ব লাভ করা।

قَوْلُهُ ذَاعِزٍّ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্ন হলো عَزِيْزٌ এটা مَنْصُوْرٌ -এর সিফত ; نَصَرَ -এর নয়। এ আর এখানে نَصَرَ -এর সিফত হয়েছে।

উত্তর : উত্তরের সারহলো عَزِيْزٌ এটা فَعِيْلٌ -এর ওজনে । আর فَعِيْلٌ -এর ওযনটা নিসবত বর্ণনা করার জন্যও আসে। যেমন فَسَّقْتُهُ [আমি তাকে ফিসকের দিকে নিসবত করেছি বা আমি তাকে ফাসেক বলেছি।] এমনিভাবে এখানেও عَزِيْزٌ অর্থ হলে ذُوْ عِزٍّ আর ذُوْ عِزٍّ এটা مَنْصُوْرٌ -ই হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা ছিল, জিহাদের প্রেক্ষিতে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, প্রসঙ্গক্রমে তারও উল্লেখ করা হয়েছে, অবশেষে তাদের ব্যর্থতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে। প্রকৃত মুমিনদের গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে মুমিনদের ইখলাস, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগাত্য এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি মহব্বত, অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রভৃতি গুণাবলির কারণে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে যে সুস্পষ্ট এবং মহান বিজয় দান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন এ সূরা নিয়ে অবতরণ করেন, তখন তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বিজয়ের জন্য মোবারকবাদ জানান। আর প্রিয়নবী ﷺ -এরপর উপস্থিত মুসলমানগণকে বিজয়ের সুসংবাদের জন্যে মোবারকবাদ দান করেন।

যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে মক্কার অদূরে অবস্থিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়, আল্লাহ তা'আলা এ শান্তি চুক্তিকেই 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন। আর এ সূরায় সে ঐতিহাসিক মহান বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে. তাই এর নামকরণ করা হয়েছে– 'সূরাতুল ফাত্‌হ'। 'ফাত্‌হ' শব্দের অর্থই হলো বিজয়।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; যদিও মক্কা বিজয় হয় এ ঘটনার দু'বছর পর, কিন্তু কাফেরদের সঙ্গে যে শান্তি-চুক্তি হয়েছিল, তা-ই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছে। আর এজন্যেই আলোচ্য সূরায় হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি যে মহব্বত এবং আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর রাহে প্রাণপণ জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছেন, তজ্জন্যে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির কথাও ঘোষণা করেছেন এ সূরায়।

উপরোল্লিখিত ৪টি আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদা (র.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) তাঁদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সমাপন করার পর মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন তখন "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا" হতে "فَوْزًا عَظِيْمًا" পর্যন্ত নাজিল হয়েছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসম চুক্তিতে সম্মত হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাহাবীগণ যথেষ্ট মান-অভিমান ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ হুদায়বিয়াতেই ইহরাম ভেঙ্গেছিলেন এবং কুরবানি করেছিলেন। তথাপি তাদের অন্তর্জ্বালা এতটুকু প্রশমিত হয়নি। সুতরাং আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে একত্র করে শুনিয়ে দিলেন– যাতে তারা মানসিক শান্তি লাভ করল– তাদের অন্তরের ক্ষোভ ও দুঃখ মুছে গেল।

হযরত মুকাতিল ইবনে সুলায়মান (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহর বাণী– "وَمَا أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ" নাজিল হলো তখন মুনাফিক ও মুশরিকরা খুব আনন্দিত হলো। তারা কটূক্তি করে বলতে শুরু করল, যে লোক তার নিজের এবং তার সাহাবীদের ব্যাপারে কি আচরণ করা হবে, তার কোনো হদীস দিতে পারে না, আমরা কিভাবে তার অনুসরণ করতে পারি? এ সময় নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا الخ

–[ফাতহুল কাদীর, কুরতবী]

হযরত আতা (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন আয়াতে কারীমা– "وَمَا أَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ" [হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলুন! আমি জানি না আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। আর তোমাদের সাথেই বা কিরূপ আচরণ করা হবে।] নাজিল হওয়ার পর ইহুদিরা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণকে ভর্ৎসনা করে বলেছিল, যে নিজের সম্পর্কে পর্যন্ত কিছু জানে না, আমরা কিভাবে তার আনুগত্য করতে পারি? এতে নবী করীম ﷺ যারপর নাই দুঃখিত হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা হুদায়বিয়ার কাহিনী : আলোচ্য আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা হলো– 'সোলহে হুদায়বিয়াহ' বা হুদায়বিয়ার সন্ধি। সূরার আলোচনার প্রারম্ভে উক্ত ঘটনার মোটামুটি আলোচনা করেছি। এখানে উল্লিখিত আয়াতসমূহের মর্মার্থ অনুধানার্থে পুনরায় বিস্তারিতভাবে তা উল্লেখ করা হলো।

নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় হিজরতের পর দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর মক্কার মুশরিকদের বিরোধিতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় সাহাবীরা মক্কায় সফর করতে পারেননি। ফলে বায়তুল্লাহর জিয়ারতে তাঁরা ধন্য হতে পারেননি প্রায় অর্ধ যুগ পর্যন্ত। মনে বড় ব্যাকুলতা, মুসলমান হয়েও আল্লাহর গৃহের জিয়ারত নসিব হচ্ছে না।

হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রিয়নবী ﷺ স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পবিত্র কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা মারওয়্যার মধ্যে "সাঈ" করছেন, অর্থাৎ তিনি ওমরাহ পালন করছেন। অবশ্য স্বপ্নে দিন তারিখের কোনো উল্লেখ ছিল না। এর কিছুদিন পরই তিনি চৌদ্দশ' সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন। মক্কাবাসী এ সংবাদ পেয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে তারা মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না। যদিও পৃথিবীর কোনো মানুষকে তারা হজ ও ওমরাহ পালনে বাধা দিত না এবং এটাও তারা স্বীকার করত যে, হজ ও ওমরার ব্যাপারে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের যে বিদ্বেষ ছিল, তার কারণেই তারা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির রজব মাস মোতাবেক মার্চ, ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে এ সফর করেন। তখন মুশরিকদের হাতেই ছিল মক্কা শরীফের নিয়ন্ত্রণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম আহমদ বুখারী, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবু দাউদ এবং নাসায়ী (র.) প্রমুখ ইমাম জুহরী (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হুদায়বিয়া রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল সম্পন্ন করেছেন এবং চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করেছেন, এরপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে সঙ্গে নিয়েছেন, উম্মে মানীয় আসমা বিনতে আমর, উম্মে আম্মারা আশহালীয়া প্রমুখও সঙ্গে ছিলেন। মুহাজির ও আনসারগণ এবং অন্যান্য আরব গোত্রেরও কিছু লোক তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি ওমরা করছেন, সেজন্যে মুসলমানদের বিজয় সম্পর্কে কারো মনেই কোনো সন্দেহ ছিল না, তবে সাহাবায়ে কেরামের নিকট তরবারি ব্যতীত অন্যকোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না আর তা-ও খাপে ভরা ছিল। হুজুর ﷺ কুরবানির জন্যে কিছু পশু পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরিতে সোমবার দিন তিনি মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হন, দ্বি-প্রহরে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে পৌঁছে জোহরের নামাজ আদায় করেন। কুরবানির জন্যে সত্তরটি উট নির্দিষ্ট ছিল, মুসলমানদের সঙ্গে দু'টি অশ্বও ছিল। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হযরত বশির ইবনে সুফিয়ান (রা.) নামক সাহাবীকে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে পূর্বেই প্রেরণ করেছিলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশরকে বিশ জন অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়ে অগ্রবর্তী দল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, এ দলের অধিনায়ক ছিলেন সা'দ ইবনে জায়েদ আশহালী (রা.)। হুজুর ﷺ এরপর দু' রাকাআত নামাজ আদায় করেন এবং 'যুলহোলায়ফার' মসজিদের সম্মুখ থেকে তিনি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করেন, তখন তিনি ওমরার ইহরাম বেঁধেছেন, যেন কারো মনে এ আশঙ্কা না থাকে যে, তিনি যুদ্ধের জন্যে মক্কা শরীফ গমন করছেন; বরং সকলেই উপলব্ধি করতে পারে যে, কাবা শরীফের জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই তিনি এ সফর করছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" পাঠ করেন, তাঁর ইহরাম দেখে হযরত উম্মে সালামা (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও ইহরাম বাঁধেন। অবশ্য কিছু সংখ্য সাহাবায়ে কেরাম 'জুহফা' নামক স্থানে ইহরাম বেঁধেছেন। হুজুর ﷺ 'বয়দা' নামক স্থান দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন।

পথিমধ্যে বনূ বকর, মোজায়না এবং জুহায়না নামক গোত্রের আবাসস্থল ছিল। তিনি তাদেরকেও ওমরার সফরে রওয়ানা হওয়ার আহ্বান জানান, কিন্তু তারা নিজেদের আর্থিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল এবং একে অন্যকে তারা বলল, মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে এমন লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে বলছিলেন, যারা অস্ত্র-শস্ত্র এবং যানবাহনের দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ তাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হবেন, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাথীগণ আর কখনো ফিরে আসবেন না, এরা বড় অসহায়, তাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রও নেই।

রাসূলে কারীম ﷺ যখন 'জুহফা' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করার আদেশ প্রদান করেন, এরপর তিনি লোকদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদের অগ্রবর্তী হতে চাই, আর তোমাদের জন্যে দু'টি জিনিস রেখে যাব– ১. আল্লাহর কিতা। ২. আল্লাহর নবীর আদর্শ, যদি তোমরা এ দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাক, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।"

এদিকে মক্কার কাফেররা যখন এ সংবাদ পেল যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ রওয়ানা হয়েছেন, তখন তারা একত্র হয়ে পরামর্শ করল এবং বলল, "মুহাম্মদ ﷺ ওমরার জন্যে সৈন্যবাহিনীসহ আমাদের নিকট আসতে চান, আরবের লোকেরা শুনবে, মুহাম্মদ ﷺ এক প্রকার জবরদস্তি আমাদের এখানে এসে গেছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধাবস্থা রয়েছে, এতে সকলেই আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে আঁচ করতে পারবে, আমরা তা হতে দেব না।" এরপর দু'শ অশ্বারোহীকে তারা হুজুর ﷺ -এর মোকাবিলার জন্যে "কোরাউল গমীম" নামক স্থানে প্রেরণ করল, এদের অধিনায়ক ছিল খালেদ ইবনে ওয়ালিদ [তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি], খালেদ আরবের আরো কয়েকটি গোত্রের লোকজন নিয়ে রওয়ানা হয় এবং বনূ সাকীফ গোত্রের লোকেরাও তার সঙ্গে যোগ দেয়। এভাবে সকলে 'বালদাহ' নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান নেয়, তারা একত্রিত হয়ে রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করে, আর এ-ও স্থির করে যে, কোনো অবস্থাতেই তাঁকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না। গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে তারা দশ ব্যক্তিকে পাহাড়ের উপর মোতায়েন করে, তাদের একজন আরেকজনকে উচ্চৈঃস্বরে বলতো, "মুহাম্মদ ﷺ এখন অমুক কাজ করছেন", আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে একথা বলতো, এভাবে কুরাইশরা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশর ইবনে সুফিয়ানকে গোয়েন্দা কর্মে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 'গাদীরুল আশতাত' নামক স্থানে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে আরজ করেন, "আপনার রওয়ানা হওয়ার কথা কুরাইশরা জেনে ফেলেছে, তারা এখন 'জীতুওয়া' নামক স্থানে অবস্থান করছে, আর সকলে শপথ করে এ সংকল্প করেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনো মক্কা শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না, আর এ উদ্দেশ্যেই খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে পূর্বেই 'কোরাউল গামীমে' প্রেরণ করেছে। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ "অত্যন্ত আক্ষেপ হয় কুরাইশের অবস্থা দেখে, যুদ্ধ যেন তাদেরকে পেয়ে বসেছে, আমাকে যদি আরবদের ব্যাপারে তারা কোনো প্রকার বাধা না দিত, তবে তাদের কী ক্ষতি হতো! যদি আরবরা আমার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতো, তবে তাদের উদ্দেশ্যই সফল হতো, আর যদি

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করেন, তবে তারা আমাদের দলে প্রবেশ করতো এবং আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতো। যদি তারা এমন না-ও করতো, অর্থাৎ মুসলমানদের দলে প্রবেশ না করতো, তবে শক্তি থাকলে তারা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, কুরাইশদের ধারণা কি? আল্লাহর শপথ! আমি দীন ইসলামের জন্যে তাদের সাথে সর্বদা জিহাদ করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।" এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের মাঝে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন এবং ইরশাদ করলেনঃ হে মুসলমানগণ! আমাকে পরামর্শ দাও, তোমাদের কী অভিমত? আমি কি এদের সন্তান-সন্ততির দিকে দৃষ্টিপাত করবো এবং তাদেরকে ধরে ফেলবো? অথবা নীরব হয়ে বসে থাকবো, যদি তারা আমাদের মোকাবিলায় আসে, তবে কিছু লোকের জীবনাবসান ঘটবে, অর্থাৎ তাদের একদল নিহত হবে, অথবা তোমাদের যদি এ মত হয় যে, আমরা কাবা শরীফের জিয়ারতের জন্যেই এসেছি, যদি কেউ আমাদেরকে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সঙ্গে লড়াই করবো। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কাবা শরীফের উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হয়েছেন, কারো সঙ্গে যুদ্ধ করা আপনার অভিপ্রেত ছিল না, অতএব আমরা কাবা শরীফের দিকে যেতে থাকি, যদি পথিমধ্যে কেউ আমাদেরকে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। উসায়েদ ইবনে হোজায়ের (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এ মত সমর্থন করলেন।

নবী করীম ﷺ প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীসহ ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, মক্কার লোকেরা তাঁদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করবে। কাজেই তিনি সাধারণ পরিচিত পথ পরিহার করত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে মক্কার অদূরে 'যুলহুলায়ফা' নামক স্থানে গিয়ে পৌছলেন। তথায় তাঁর উষ্ট্রী বসে পড়ল। তিনি সেখানেই সাহাবায়ে কেরামসহ অবস্থান নিলেন।

কুরাইশদের পক্ষ হতে বিভিন্ন গোত্রের কতিপয় নেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট কথাবার্তা বলার জন্য আসল। তাদের মধ্যে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকাহ খোজায়ী, হুলাইস ইবনে আলকামাহ ও ওরওয়া ইবনে মাসঊদ সাকাফী অন্যতম। মুহাম্মদ ﷺ -কে মদীনায় ফিরে যেতে প্রস্তুত করানোই ছিল তাদেরকে পাঠানোর লক্ষ্য। নবী করীম ﷺ তাদেরকে বলে দিলেন যে, আমরা যুদ্ধবিগ্রহ করার জন্য আসিনি। বায়তুল্লাহর জিয়ারত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দূতগণ কুরাইশদেরকে মুসলমানদের সদুদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাদের দাবিতে অটল রইল– তারা কিছুতেই মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে দেবে না, মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।

এবার নবী করীম ﷺ তাঁর পক্ষ হতে হযরত ওসমান (রা.)-কে দূত হিসেবে মক্কার নেতাদের নিকট পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণ যে শুধু বায়তুল্লাহর জিয়ারত তথা ওমরা পালন করার জন্যই এসেছেন তা মক্কার মুশরিক নেতাদেরকে জানিয়ে দেওয়া।

এ দিকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মক্কার মুশরিকরা হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে। এটা শুনে মুসলমানগণ অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। নবী করীম ﷺ সমস্ত সাহাবীগণকে একত্র করে বিষয়টি জানালেন এবং তাদের নিকট হতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করলেন। নবী করীম ﷺ -এর হাতে হাত রেখে সাহাবীগণ ওয়াদা করলেন, জীবনের বিনিময়ে হলেও তাঁরা ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। একেই বলা হয় 'বাইয়াতে রিদওয়ান'।

এ দিকে মুশরিকরা দু' দু' বার মুসলমানদের উপর গোপনে অতর্কিত হামলা করে। একবার চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের এক দল মুশরিক রাত্রিবেলায় মুসলমানদের তাঁবুর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলে তারা মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গেল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দেন। পুনরায় আশিজন মুশরিক একদিন ভোরে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়; কিন্তু তারাও মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে যায়। নবী করীম ﷺ তাদেরকেও মুক্ত করে দিলেন। পরবর্তীতে সংবাদ আসল যে, হযরত ওসমান (রা.) জীবিত আছেন এবং মুশরিকরা তাঁকে ছেড়ে দিল।

পরিশেষে কুরাইশরা সুহাইল ইবনে আমরকে সন্ধির ইচ্ছায় নবী করীম ﷺ -এর নিকট পাঠাল। সুহাইল ইবনে আমর নবী করীম ﷺ -এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) সন্ধির চুক্তিপত্র লেখা আরম্ভ করলেন। প্রথমেই লেখা হলো– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কিন্তু সুহাইল এতে আপত্তি জানাল। তার কথানুযায়ী লেখা হলো– بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ তারপর হযরত আলী (রা.) লিখলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর এতেও প্রতিবাদ জানাল। সে বলল, আমরা যদি মুহাম্মদ ﷺ -কে আল্লাহর রাসূলই মানব তা হলে তার সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব কিসের? বরং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র' পরিবর্তে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিখতে হবে। নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.)-কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ -এর পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লেখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। হযরত উসাইদ ইবনে হুজায়ের (রা.) ও সাদ

Free@www.e-ilmweebly.com

ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর ন্যায় রাসূল প্রেমিক সাহাবীগণও এতে প্রবলভাবে আপত্তি জানালেন। নবী করীম ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এটা যেমন সত্য আমি যে আব্দুল্লাহর পুত্র তাও তেমন সত্য। অতঃপর তিনি নিজেই মুহাম্মাদু রাসূলুল্লাহ মুছে তদস্থলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া এবং লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন–

هٰذَا مَا قَضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو اَهْلَهَا عَلٰى وَضْعِ الْحَرْبِ عَنِ النَّاسِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَاْمَنُ فِيْهِ النَّاسُ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ -

অর্থাৎ, এ চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ও সুহাইল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করেছেন। এ সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ :

১. দশ বছর যাবৎ এ চুক্তি বলবৎ থাকবে। এর মধ্যে কেউ কারো উপর আক্রমণ করবে না, একের জীবন ও সম্পদ অপরের নিকট নিরাপত্তা লাভ করবে।
২. মক্কা হতে কেউ পালিয়ে মদীনায় চলে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে।
৩. মদীনা হতে পালিয়ে কেউ মক্কা গেলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।
৪. মুসলমানগণ এবারের মতো ওমরা পালন না করে ফিরে যাবে। আগামী বছর তারা ওমরা পালনে আসবে। আর তখন শুধু তিন দিনের জন্য তারা মক্কায় অবস্থান করবে। এ সময় মক্কার লোকজন বাইরে অবস্থান করবে।
৫. আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহ মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্য হতে যে-কোনো দলের সাথে জোটবদ্ধ হতে পারবে।

শান্তির প্রত্যাশায় এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার কারণে নবী করীম ﷺ চাপিয়ে দেওয়া উক্ত শর্তাবলি মেনে নিয়েই সন্ধি করতে সম্মত হলেন। কিন্তু সাহাবীগণ এতে অতিশয় মর্মাহত হলেন। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নবী করীম ﷺ যখন সাহাবীদেরকে 'যুলহুলাইফা'তেই ইহরাম ভেঙ্গে ফেলার এবং হাদীর জন্তুর কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন তখন মনের ক্ষোভে সাহাবীগণ হুজুরের ﷺ কথায় সাড়া দিলেন না। হযরত উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শে নবী করীম ﷺ নিজের ইহরাম ভেঙ্গে ফেললেন। তা দেখে সাহাবীগণও নবী করীম ﷺ -এর অনুসরণ করলেন।

অতঃপর সাহাবীগণসহ মহানবী ﷺ মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাত্হ নাজিল করত বিষাদ বেদনায় মর্মাহত মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করেন এবং এ সন্ধির গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।

قَوْلُهُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ...... وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ بِهِ نَصْرًا عَزِيْزًا : আয়াতের বিশদ তাফসীর : হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই হুদায়বিয়ার সন্ধির উপর মন্তব্য পেশ করত আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন– হে নবী! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে এক সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। মক্কা বিজয় ও অপরাপর জিহাদের ব্যাপারে আমি আপনার বিজয়ের ফয়সালা করে রেখেছি। যাতে এ জিহাদের অসিলায় আমি আপনার পূর্বাপর ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারি। আপনাকে বিজয়ের নিয়ামতে ধন্য করতে পারি এবং সহজ-সঠিক পথ তথা দীন ইসলামের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারি।

হুদায়বিয়ার সন্ধি বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরাজয় ও লাঞ্ছনাকর সন্ধি বলে প্রতীয়মান হয়। সন্ধির শর্তাবলির দিকে দৃষ্টি দিলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় এর সবটাই কাফের-মুশরিকদের পক্ষে গিয়েছে। সুতরাং হযরত ওমর (রা.) ও অপরাপর বহু সাহাবী সন্ধির শর্তাবলির বাহ্যিক দিক দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছেন। তাদের যুক্তি হলো এতটা আত্মসমর্পিত হয়ে সন্ধি করার কি প্রয়োজন ছিল? তরবারীর মাধ্যমে ফয়সালা করা হয়নি কেন? কিন্তু নবী করীম ﷺ পয়গাম্বরী দূরদৃষ্টি সন্ধির সেই শুভ ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ ছিল যা অন্যদের চোখে ধরা পড়েনি। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর অন্তরকে বিপদাপদ সহ্য করার উপযোগী ও সকল প্রকার বিরূপ প্রতিকূল পরিবেশকে মেনে নেওয়ার যোগ্য করে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার উপর অসম্ভব রকম তাওয়াক্কুলপূর্ণ অবস্থা এবং দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষীতা নেহায়েত অপছন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাকেও স্বাগতম জানানোর দুর্লভ মন-মানসিকতা তার মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন।

এজন্যই তো সেদিন তিনি বলেছিলেন, কুরাইশরা আজ শান্তির বিনিময়ে আমার নিকট যা চাইবে আমি তা তাদেরকে দেব। সুতরাং শান্তির বিনিময়ে সেদিন মুশরিকরা যত অবাঞ্ছিত শর্তই জুড়ে দিয়েছে নবী করীম ﷺ পূর্ণ ধৈর্যের সাথে তা বরণ করে নিয়েছেন এবং সাহাবীগণকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এটাকে "فَتْحٌ مُّبِيْنٌ" তথা **'সুস্পষ্ট বিজয়'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? হুজুর ﷺ জবাব দিলেন. অবশ্যই এটা আমাদের জন্য এক [অবশ্যম্ভাবী] মহাবিজয়।

"إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا" আয়াতে فَتْحٌ مُّبِينٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : উক্ত আয়াতে فَتْحٌ مُّبِينٌ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যথা–

১. উক্ত বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।
২. হুদায়বিয়ার সন্ধি।
৩. অন্যান্য মতবাদের উপর ইসলামি জীবন ব্যবস্থার বিজয়।
৪. এটা দ্বারা অন্যান্য জাতির উপর মুসলমানদের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।
৫. হুদায়বিয়ার পরবর্তী সকল বিজয়।
৬. এটা দ্বারা রোম বিজয় উদ্দেশ্য।
৭. এটা দ্বারা খায়বর বিজয় উদ্দেশ্য।

ইমাম রাযী (র.)-সহ অধিকাংশ মুফাসসিরগণ দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা সর্বসম্মতভাবে অত্র আয়াতখানা হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে হুদায়বিয়ার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আর বাহ্যত হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় বলা যদিও একটু বেমানান মনে হয় তথাপি গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটাকে বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

হযরত মাজমা ইবনে হারেসিয়া আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হুদায়বিয়া থেকে 'কোরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে দেখি, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। অনেক লোক তাঁর চার পার্শ্বে সমবেত, তিনি তখন এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন। একজন সাহাবী আরজ করলেন, এটিই কি বিজয়? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন, শপথ সেই আল্লাহ তা'আলার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে এটিই হলো সুস্পষ্ট বিজয়।

হযরত আবূ বকর (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ইসলামে হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোনো বিজয় হয়নি। আল্লামা বগভী (র.) হযরত বারা (রা.)-এর সূত্রেও এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি কিরূপে সুস্পষ্ট বিজয় হতে পারে? : অত্র সূরার 'ঐতিহাসিক পটভূমি' এর আলোচনায় এ ব্যাপারে আমরা বিশদ আলোকপাত করেছি। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হলো–

হুদায়বিয়ায় "জিহাদের বায়'আত" গ্রহণ এবং মুশরিকদের সাথে যতসামান্য বুঝা-পড়া ও সাহাবীগণের ঐক্য রাসূল ﷺ -এর প্রতি তাদের আনুগত্য ও সাহসী ভূমিকা প্রদর্শনে মুশরিক কুরাইশরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির জন্য ঝুঁকে পড়েছিল। নবী করীম ﷺ -এর নিশ্চিন্ত ও অবিচল মনোভাব, দশ বৎসরের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি নির্বিঘ্নে মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়– যা মহাবিজয়ের ভিত্তি রচনা করেছিল। এ সন্ধির মাধ্যমেই দুশমনদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং নবী করীম ﷺ -এর মহত্ত্বের প্রভাব তাদের অন্তরে দাগ কেটেছিল– যার ফলশ্রুতিতে দুই বৎসরের মধ্যে মক্কা মোয়াজ্জমা বিজয় হয়েছিল।

সুতরাং মুসলমান ও অমুসলমানদের পারস্পরিক মেলামেশা ও অকপট সংমিশ্রণের ফলে আপনা আপনি ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সময় এতবেশি লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে যা পূর্বে দেখা যায়নি। এটা ছিল অন্তরের বিজয়– আর প্রকৃত বিজয় তো এটাই।

মক্কা মোয়াজ্জমা সদা-সর্বদার জন্য দারুল ইসলাম হয়ে গেছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীগণের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মাত্র দেড় হাজার অথচ কেবল দুই বছরের মাথায় মক্কা বিজয়ের সময় তাঁদের সংখ্যা দশ হাজারে দাঁড়াল। অপরদিকে খায়বর বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের দ্বিতীয় প্রাণকেন্দ্র মদীনা আরো সুদৃঢ় হয়।

মোটকথা, উক্ত সন্ধি এভাবে সমস্ত বিজয়ের বুনিয়াদ ও সোনালী অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। আর এ ধারায় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জগতের বরকতময় বিজয়ের যেই দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে– এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا" আয়াতের তাফসীরে উক্ত বিজয়কে হুদায়বিয়ার সন্ধি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অথবা কথাটিকে এভাবে বলা যায়, 'ফাত্‌হ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো বন্ধ জিনিসকে উন্মুক্ত করা বা কোনো বাধাকে অপসারিত করা, কাফেরদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছানোর পথে যে বাধা ছিল, তা হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অপসারিত হয়েছে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'ফাত্‌হ' -এর অর্থ হলো, চূড়ান্ত ফয়সালা করা। এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, আমি চূড়ান্ত ফয়সালা দিয়েছি যে, [হে রাসূল!] আপনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করবেন।

হযরত জাবের (রা.) বলেছেন– আমরা হুদায়বিয়ার বিজয় ব্যতীত মক্কা বিজয়ের কল্পনাই করতাম না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ফাররা (রা.) বলেছেন– তোমরা মক্কা বিজয়কেই চূড়ান্ত বিজয় ধরে নিয়েছ। বাস্তবিকই মক্কা বিজয় একটি বিজয়ই ছিল, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত বাইয়াতে রেদওয়ানকে বিজয় মনে করি।

ইমাম শা'বী (র.) লিখেছেন, এটি হুদায়বিয়ার সন্ধিই ছিল, যা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর পূর্বাপর সকল ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়েছে। এমনিভাবে এ হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণেই খায়বর বিজয় সম্ভব হয়েছে, এরপর মুসলমানদের বিজয়ের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

ইমাম জুহরী (র.) বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় কোনো বিজয় হয়নি। কেননা এ সন্ধির কারণেই মুশরিকরা মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে। মুসলমানদের সাথে কথা বলার এবং ইসলামি আচরণ লক্ষ্য করার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে তিন বছরের মধ্যে বহু মুশরিক মুসলমান হয়েছে।

তাফসীরকার যাহ্হাক (র.) বলেছেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি যুদ্ধ ব্যতীতই সুস্পষ্ট বিজয়ে পরিণত হয়েছে। মূলত এ সন্ধিই বিজয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত।

এখানে একথাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সপ্তম হিজরিতে মুসলমানগণকে আল্লাহ তা'আলা খায়বরের বিজয় দান করেন, আর হুদায়বিয়ার সন্ধি মোতাবেক সপ্তম হিজরিতে জিলকদ মাসে হুজুর ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ওমরা করেন এবং নিরাপদে, নির্বিঘ্নে মদীনা মোনাওয়ারা প্রত্যাবর্তন করেন। মক্কার কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে, তাই অষ্টম হিজরির রমজান মাসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ দশ হাজার স.হাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মক্কাভিমুখে অভিযান করেন। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে এ অভিযানে বিজয় লাভের সৌভাগ্য প্রদান করেন।

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত নিয়ামতসমূহ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে চারটি মহা নিয়ামত দানের উল্লেখ করেছেন–

১. হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, তাই তাঁর এ উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে সারা জীবনে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে বা ভবিষ্যতে হয় তবে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবীগণ নিষ্পাপ, নিষ্কলংক, কিন্তু মানুষ হিসেবে যদি কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েও থাকে, তার জন্যে আল্লাহ পাক পূর্বাহ্নেই ক্ষমা ঘোষণা করলেন যে, আপনার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হলো, দুনিয়া বা আখিরাতে কখনো এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

হাদীস শরীফে রয়েছে, কিয়ামতের দিবসের ভয়াবহ অবস্থায় যখন মানুষ আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর নিকট সুপারিশের জন্যে হাজির হবে, তখন তিনি তাঁর দ্বারা যে ভুল হয়েছিল, তা স্মরণ করত আল্লাহ তা'আলার দরবারে সুপারিশ করতে অপারগতা পেশ করবেন। তিনি বলবেন– لَسْتُ لَهَا অর্থাৎ "আজকের এ কঠিন দিনে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সুপারিশ করার যোগ্য আমি নই"। এমনিভাবে অন্যান্য নবী রাসূলগণের নিকটও মানুষ যাবে, তাঁরাও একই জবাব দেবেন। অবশেষে মানুষ এ আবেদন নিয়ে হাজির হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট, তিনি প্রথমত সুপারিশ করার ব্যাপারে নিজের অপারগতা পেশ করবেন, এরপর পরামর্শ দেবেন যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট হাজির হও, তিনি এমন মহান ব্যক্তি, যাঁর পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে। এর বিবরণ বুখারী শরীফে এভাবে রয়েছে–

"وَلٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" -

"অর্থাৎ বরং তোমরা সকলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট গমন কর, তিনি আল্লাহর তা'আলার এমন বান্দা, যাঁর পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি মহান আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।" –[বুখারী শরীফ, পৃ. ১১০৮]

হযরত ঈসা (আ.)-এর এ পরামর্শের তাৎপর্য হলো, কিয়ামতের এ কঠিন দিনে শাফাআত করার যোগ্য একমাত্র ব্যক্তি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ । কেননা তিনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁর আগের এবং পরের সমস্ত ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে কোনো বিষয়ে তাঁর জবাবদিহী করার কিছুই নেই। তাই তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে সমগ্র মানবজাতির জন্যে আজ সুপারিশ করতে পারবেন। এজন্যেই প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَ اَوَّلُ مُشَفَّعٍ

"[কিয়ামতের দিন] আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশ করবো এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে।]"

এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন প্রিয়নবী ﷺ -ই হবেন সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি, আর আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়েরই সুসংবাদ রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে "সীরাতুল মুস্তাকীম" বা সরল-সঠিক পথ দান করবেন। এতে কোনো

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অস্পষ্টতা নেই, ভুল-ভ্রান্তির কোনো আশঙ্কা নেই। যে পথে চললে মানুষ জীবনকে সার্থক সুন্দর এবং সফলকাম করতে পারে, সে জীবন বিধানই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করবেন।

'আর [হে রাসূল!] আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পূর্ণ শক্তিকে সাহায্য করতে চান'। ফলে আপনার বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত হবে এবং দলে দলে লোক আপনার প্রতি ঈমান আনবে, আর এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ .... إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

অর্থাৎ "যখন আসবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং বিজয় আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, এখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী।"

বস্তুত পবিত্র কুরআনের এ ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল, প্রিয়নবী ﷺ -এর যুগে অর্থাৎ বিদায় হজের মুহূর্তে তিনি এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেছিলেন, অথচ যখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করেন, তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। এর মাত্র আট বছর পর দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে তিনি মক্কা বিজয় করেছিলেন, আর মাত্র দু'বছর পর ঐতিহাসিক আরাফার ময়দানে বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন। অতএব দশ বছরের ব্যবধানে অতি অল্প সংখ্যক থেকে একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হয়েছিলেন, যা সম্ভব হয় আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের বরকতে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরই খায়বর এবং মক্কা বিজয় হলো, এরপর হুনাইন এবং তায়েফও মুসলমানদের করতলগত হয়। পরবর্তীতে হেজাজ, নাজদ, ইয়েমেন এক কথায় সমগ্র আরবে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। এর পাশাপাশি রাসূলে কারীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তদানীন্তন পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। পারস্য রাজ, রোমক সম্রাট এবং মিশরের রাজা মোকাওকাসসহ অনেকের কাছে প্রিয়নবী ﷺ -এর পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রিয়নবী ﷺ -এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইরান, সিরিয়া, ইরাক, মিশরসহ অন্যান্য বহু দেশ মুসলমানদের আয়ত্তাধীন হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের এক বিরাট অংশে ইসলামি হুকুমত কায়েম করার তাওফীক দান করেন। এটিও ছিল আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত পরিপূর্ণ করার, তাঁর সাহায্য করার এবং সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

বিজয় কিভাবে মাগফিরাতের সবব হতে পারে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لِيَغْفِرَ اللّٰهُ الخ অর্থাৎ বিজয় এ জন্য দান করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করতে পারেন। এখানে বিজয়কে মাগফিরাতের সবব বা কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিজয় কিভাবে মাগরিফাতের সবব হতে পারে। এর জবাবে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটিই সহজ ও সঠিক।

কোনো কোনো মুফাসসির উল্লেখ করেছেন এর সহজ ব্যাখ্যা হলো, বিজয় হলো মানুষের ইসলাম গ্রহণের সবব। আর এটা ছওয়াবের আধিক্য এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণ [সবব]। এদিকে এটা হলো মাগফিরাতের কারণ। আর কারণের কারণও কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এভাবে বিজয় মাগফিরাতের সবব বা কারণ হয়েছে।

ইমাম রাযী (র.) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

১. এর মাধ্যমে লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, নবী করীম ﷺ -এর কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা করে দেওয়া হলো– তিনি সম্পূর্ণ মাসুম-নিষ্পাপ।

২. মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বায়তুল্লাহর হজ করা সম্ভব হয়েছে। আর হজ হলো মাগফিরাতের সবব। হজ করতে গিয়ে নবী করীম ﷺ নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ হজকে তুমি কবুল করে নাও, এ প্রচেষ্টাকে তুমি গ্রহণ করে নাও এবং এর দ্বারা গুনাহ মাফ করে দাও।

৩. মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে বায়তুল্লাহকে মূর্তিপূজার অপবিত্রতা হতে হেফাজত করা হয়েছে আর তা মানুষের গুনাহ হতে পবিত্র হওয়ার কারণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তো কোনো গুনাহ নেই, সুতরাং তাঁর গুনাহ মাফের কি অর্থ হতে পারে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু এটা তো জানা কথা যে, নবী করীম ﷺ ছিলেন নিষ্পাপ, তাঁর কোনো গুনাহ ছিল না। সুতরাং তাঁর গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার কি অর্থ হতে পারে?

মুফাসসিরগণ এর একাধিক জবাব দিয়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো–

১. এ স্থলে কোনো ব্যাপারে উত্তম পন্থা পরিহার করাকে গুনাহ বলা হয়েছে।

২. এখানে গুনাহ দ্বারা মুমিনদের গুনাহ উদ্দেশ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. গুনাহের দ্বারা সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কেননা ক্ষেত্রবিশেষে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) হতে সগীরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে। "حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ" অর্থাৎ সাধারণ সৎলোকদের পুণ্য আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে পাপ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৪. কেউ কেউ বলেছেন- পূর্বের গুনাহ দ্বারা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর বিচ্যুতি এবং পরবর্তী গুনাহ দ্বারা উম্মতের গুনাহ উদ্দেশ্য।

৫. অথবা এখানে মাগফিরাতের অর্থ হলো নবী করীম ﷺ -এর নিষ্পাপ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া।

৬. এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো, مَغْفِرَتْ -এর অর্থ হলো পর্দা [অন্তরায়] অর্থাৎ গুনাহ ও বান্দার মাঝখানে অন্তরায় [বাধা] সৃষ্টি করে দেওয়া। অথবা, গুনাহ ও শাস্তির মধ্যে পর্দা [অন্তরায়] সৃষ্টি করে দেওয়া। প্রথমোক্ত অর্থটি আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) -এর জন্য প্রযোজ্য এবং শেষোক্ত অর্থটি ঈমানদারগণ ও অলিগণের জন্য প্রযোজ্য। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

উল্লিখিত আয়াত নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নাজিল হয়েছে। আর মক্কা বিজয় হয়েছে ৮ম হিজরিতে সুতরাং মাজীর সীগাহ্ ব্যবহার করত কিভাবে এ বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হতে পারে? :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" "[হে নবী!] আমি নিশ্চয় আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

কেউ কেউ বলেছেন- এখানে "فَتْحٌ مُّبِيْنٌ" -এর দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ আয়াতখানা নাজিল হয়েছে নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি সমাপনান্তে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তনের পথে ষষ্ঠ হিজরির জিলকাদ মাসে। আর মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম হিজরির রমজান মাসে। সুতরাং যদি আয়াতে উল্লিখিত বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হয় তা হলে "فَتَحْنَا" মাজীর সীগাহ ব্যবহার করা হলো কিভাবে?

মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন-

১. এ স্থলে مَاضِىْ -এর সীগাহ مُضَارِعْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. এখানে فَتَحْنَا [আমি বিজয় দান করেছি] এর অর্থ হলো, আমি আদিকালে আপনার জন্য মক্কা বিজয়ের ফয়সালা করে রেখেছি। (قَضَيْنَا لَكَ بِفَتْحِ مَكَّةَ يَوْمَ الْاَزَلِ)

৩. অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা সন্দেহাতীত হওয়ার কারণে দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য ভবিষ্যতের বিষয়াবলিকে অতীতকালজ্ঞাপক সীগাহর মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। এ বিষয়টিও তন্মধ্যে একটি। অর্থাৎ আপনি যে মক্কা বিজয় লাভ করবেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেন তা আপনার জন্য বিজয় হয়ে গিয়েছে।

মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে নাকি সন্ধির মাধ্যমে? : পবিত্র মক্কা নগরী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে না সন্ধির মাধ্যমে এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষী ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ বিচারে-

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও একদল মনীষীর মতে মক্কা মোয়াজ্জমাহ যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজিত হয়েছে। তাদের দলিল-

১. আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন- "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" [নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি]। আর فَتْحٌ বা বিজয় শব্দের ব্যবহার তখনই প্রযোজ্য হয় যখন যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজয় লাভ হয়ে থাকে।

২. নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যারাই বাধা দিতে আসবে তাদেরকে হত্যা করবে। সুতরাং মক্কার নিম্ন এলাকায় প্রবেশকালে বাধার সম্মুখীন হয়ে তিনি বহু মুশরিককে হত্যা করেছেন।

৩. ইতিহাস হতে জানা যায় যে, মক্কা বিজয়ের সময় ইকরিমা ইবনে আবী জাহলের নেতৃত্বে কয়েকজন মুশরিক যুবক মুসলমানদেরকে বাধা দান করেছে এবং অসতর্কভাবে ঘোরাফেরাকারী দুজন মুসলমানকে তারা হত্যাও করেছিল।

৪. ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই যে, মক্কা বিজয়ের সময় মক্কাবাসীদের সাথে নবী করীম ﷺ -এর কোনো প্রকার সন্ধি ও সমঝোতা হয়েছিল।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও একদল মনীষীর মতে, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজয় হয়নি; বরং সন্ধি ও সমঝোতার মাধ্যমে তা মুসলমানদের দখলে এসেছে। তাঁদের দলিল হলো নিম্নরূপ-

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ الخ আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা, যিনি মুশরিকদের হাতকে তোমাদের হতে বিরত রেখেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের হতে বিরত রেখেছেন। অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে আক্রমণ করতে পারনি।

২. মক্কা বিজয়ের পর মুশরিকদের বন্দী করা হয়নি।

৩. মক্কার মুশরিকদের সম্পদ গনিমত হিসেবে গণ্য করা হয়নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উপরোল্লিখিত মতদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় : উপরিউক্ত পরস্পর বিরোধী মতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, মক্কার আংশিক যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক বিজয় হয়েছে এবং অপরাংশ সন্ধির মাধ্যমে অধিকৃত হয়েছে। সুতরাং 'বুআইতীত' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত খালেদ (রা.) মক্কার নিম্নভাগ যুদ্ধের মাধ্যমে জোরপূর্বক দখল করেছেন। অপরদিকে মক্কার উপরিভাগ সন্ধির মাধ্যমে জয় করে নিয়েছেন। আর এ সময় নবী করীম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে উপরিউক্ত বক্তব্যকেই অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হয়।

قَوْلُهُ وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ; এর দুটি অর্থ হতে পারে-

১. আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রবল পরাক্রান্ত সাহায্য দান করেন।

২. অর্থের দৃষ্টিতে বাক্যটির তাৎপর্য হলো, এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে এমন সাহায্য করলেন, যার দরুন তাঁর দুশমনরা অক্ষম ও দুর্বল হয়ে যাবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দৃষ্টান্তহীন সাহায্য দান করেন। এ অর্থের দৃষ্টিতে এর তাৎপর্য হলো, যে জিনিস বাহ্যত একটি সন্ধিচুক্তি মাত্র- আর তাও যথেষ্ট নতি স্বীকার করে গ্রহণ করা একটি সন্ধিপত্র, তাই এক সময় এটি চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হবে। কাউকে সাহায্য-সহযোগিতা দানের জন্য এমন আশ্চর্যজনক পন্থা খুব কম লোকই গ্রহণ করেছে।

একটি দ্বন্দ্বের নিরসন : এখানে একটি প্রশ্ন হলো, عَزِيْز শব্দটি مَنْصُوْر -এর সিফাত হয়ে থাকে, এটা نَصْر -এর وَصْف হয় না। কিন্তু এখানে কিভাবে نَصْرًا عَزِيْزًا বলা হলো?

এর জবাবে এই যে, فَعِيْل -এর وَزْن নিসবত [সম্পর্ক] বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং نَصْرًا عَزِيْزًا -এর অর্থ হলো, এমন সাহায্য যা عِزَّتْ -এর দিকে সম্পর্কিত হবে ذِلَّتْ -এর দিকে সম্পর্কিত হবে না।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ .... اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ : ইরশাদ হচ্ছে- সেই আল্লাহ ঈমানদারগণের অন্তরসমূহে প্রশান্তি নাজিল করেছেন। যাতে তাদের পূর্বেকার ঈমানের সাথে আরো ঈমান সংযুক্ত হয়। তাদের ঈমানী শক্তি বেড়ে যায়।

سَكِيْنَةٌ -এর অর্থ এবং হুদায়বিয়ায় ঈমানদারগণের উপর এর প্রভাব : আলোচ্য আয়াতে سَكِيْنَةٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দুটি প্রভাব রয়েছে-

১. জেহাদের বায়'আত গ্রহণ করার সময় জিহাদের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। পরবর্তী আয়াত- "فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ" -এর মধ্যে এর উল্লেখ করা হয়েছে।

২. কাফেরদের অনর্থক জিদ সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ অসম চুক্তিতে লিপ্ত হওয়ার পরও সাহাবীগণের শান্ত থাকা। পরবর্তী আয়াত- "فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ" -এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যেহেতু প্রথমত জিহাদের জন্য অগ্রসর হওয়া এবং পরে জিহাদ হতে বিরত থাকা নবী করীম ﷺ -এর সন্তুষ্টিতেই হয়েছে- সেহেতু এতে নবী করীম ﷺ -এর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। আর তাঁর প্রতিটি আনুগত্যেই ঈমানের নূর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, কাজেই এতেও সাহাবীগণের ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে।

আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের এমন কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো তাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তিনি মুসলমানদের অন্তরে এক প্রকার প্রশান্তি নাজিল করেন, ফলে প্রিয়নবী ﷺ -এর নির্দেশ পালনে তাঁরা সম্পূর্ণ অবিচল থাকেন এবং এভাবে আল্লাহর রাহে জান-মালের কুরবানি পেশ করার সুযোগ লাভ করেন।

যেহেতু বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো কাফেরদের অনুকূলে মনে হচ্ছিল, মুসলমানদের ধারণা হয়েছিল যে, এটি দুর্বলের সন্ধি, কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ -এর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল এসবের পরিণামের প্রতি, তাই তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সবর অবলম্বনের এবং সংযত থাকার উপদেশ দিলেন। তখন মুসলমানদের মনে শান্তি এবং সান্ত্বনার ভাব সৃষ্টি হলো। প্রিয়নবী ﷺ -এর কথায় হযরত ওমর (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের উত্তেজনা প্রশমিত হলো, প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি তাদের এ নজিরবিহীন আনুগত্য তাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হলো। কেননা প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুকরণের বরকতে মুমিনের কলবে নূর সৃষ্টি হয়, তার কলব নূরানী হয়, ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাহাবায়ে কেরামের মন আহত ছিল,

তখন এ সূরার প্রথম আয়াত নাজিল হলো, আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করলেন, আর হুজুর ﷺ তখন বললেন, এ পৃথিবীর সবকিছু থেকে আমার নিকট এ আয়াতসমূহ অধিক প্রিয়।

প্রিয়নবী ﷺ এ আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেন, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! এটিই কি বিজয়? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় إِنَّا فَتَحْنَا থেকে فَوْزًا عَظِيمًا পর্যন্ত নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে سَكِينَةً শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের কারণে মানব মনে এক প্রকার শান্তি এবং সান্ত্বনা আসে, সে সান্ত্বনাকেই এ আয়াতে سَكِينَةً বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুসলমানদের পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা এবং একীন পূর্বেই ছিল, এ ঘটনার কারণে তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। আর এ ঘটনায় এমন নতুন কিছু বিষয় যোগ হয়েছে, যা ঈমান ও একীনের মাত্রাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকারক যাহ্হাক (র.)।

ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ কি? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ অর্থাৎ যেন তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান যুক্ত হয়, বৃদ্ধি পায়। মুফাস্সিরগণ এর তাফসীর করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا "بِشَرَائِعِ الدِّيْنِ مَعَ إِيمَانِهِمْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ" অর্থাৎ যাতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর যে ঈমান রয়েছে তার সাথে দীনের বিধি-বিধানের ঈমান যুক্ত হয়ে যায়। ইসলামি বিধানাবলি যেহেতু পর্যায়ক্রমে ক্রমশ নাজিল হয়েছে, সেহেতু নতুন আহকামের প্রতি ঈমান আনয়নের দ্বারা ঈমানের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে। সুতরাং مُؤْمَنٌ بِهٖ তথা যার উপরে ঈমান গ্রহণ করা হয় তার হিসেবে ঈমানের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হওয়া উদ্দেশ্য। এটাকে আশায়েরাও স্বীকার করে। মূল ঈমানের মধ্যে প্রবৃদ্ধি হয় না। যেমন- মাতুরীদীয়াগণ বলেন- اَلْإِيمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ অর্থাৎ মূল ঈমানে ক্রম-বৃদ্ধি সাধিত হয় না।

আর কালবী (র.) বলেছেন, ঈমান বৃদ্ধির একটি ঘটনা হুদায়বিয়াতে ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে প্রেরণ করেছেন তাওহীদের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের জন্যে এবং মানুষকে তাওহীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, যখন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে তথা ঈমান এনেছে, তখন নামাজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে জাকাত, রোজা, হজ এবং এরপর জিহাদ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে দীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। প্রতিদিন ওহীর মাধ্যমে নতুন নতুন বিধান আসত, লোকেরা তা মেনে নিত, এভাবে তাদের ঈমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতো।

এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী- "لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ" -এর মর্মার্থ। অর্থাৎ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে তারা দীনের বিধানাবলির প্রতিও ঈমান এনেছেন। যখনই কোনো বিধান নাজিল হয়েছে তখনই তার উপর ঈমান এনেছেন। এভাবেই তাঁদের ঈমান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, তাদের ঈমান বৃদ্ধিকরণের অর্থ হলো আল্লাহ-ভীতির সাথে আরো আল্লাহভীতি যুক্ত করা।

কেউ কেউ বলেছেন, ঈমান বৃদ্ধির অর্থ হলো, ঈমানের নূর বা আলো বৃদ্ধি পাওয়া। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى أَعْلَمُ

قَوْلُهٗ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ .... عَلِيْمًا حَكِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- আর আসমান জমিনের সৈন্যবাহিনী আল্লাহ তা'আলারই, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

এ কথার তাৎপর্য হলো, কেউ যেন একথা মনে না করে যে, মুসলমানগণের দুর্বলতার কারণেই হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আসমান জমিনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী আল্লাহ পাকেরই, তাই কোনো প্রকার দুর্বলতার কারণে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়নি; বরং হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল হিকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ, বিশেষ হিকমতের কারণেই আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাঁর কোনো ফেরেশতাকে প্রেরণ করে নিজেই মক্কাবাসীকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর হিকমতের কারণে মুমিনদেরকে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন, যেন মুমিনগণ জিহাদের ছওয়াব লাভ করতে পারেন এবং কাফেরদেরকেও হঠাৎ ধ্বংস না করে ঈমান আনয়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥. لِيُدْخِلَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ اَمَرَ بِالْجِهَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا .

৫. যাতে তিনি প্রবেশ করাতে পারেন – [لِيَدْخُلَ শব্দটি] উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। [অর্থাৎ اَمَرَ بِالْجِهَادِ لِيَدْخُلَ الخ আল্লাহ তা'আলা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে প্রবেশ করাতে পারেন] ঈমানদার নর-নারীদেরকে এমন জান্নাতে যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আর যেন তাদের পাপরাশি মোচন করে দিতে পারেন। এটা আল্লাহ তা'আলার কাছে মহা সাফল্য।

٦. وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فِى الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ ظَنُّوْا اَنَّهُ لَا يَنْصُرُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ج بِالذُّلِّ وَالْعَذَابِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ اَبْعَدَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا مَرْجِعًا .

৬. আর যেন শাস্তি দিতে পারেন মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষদেরকে, যারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করে। اَلسَّوْءُ শব্দটির সীন অক্ষরটি তিন স্থানেই যবর এবং পেশ উভয়ভাবে পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ তারা ধারণা করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে এবং ঈমানদারগণকে সাহায্য করবেন না। বস্তুত তাদের উপরই অমঙ্গল চক্র [নিপতিত হবে] লাঞ্ছনা এবং শাস্তির। আর আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর এবং আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন তাদেরকে স্বীয় রহমত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল– প্রত্যাবর্তনস্থল।

٧. وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا فِىْ مُلْكِهٖ حَكِيْمًا . فِىْ صُنْعِهٖ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

৭. আকাশমণ্ডল ও জমিনের সমস্ত বাহিনী আল্লাহর [করায়ত্তে]। আর আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে মহাকৌশলী তাঁর কার্যে সর্বদাই তিনি এ সকল গুণ ধারণ করে আছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الخ" "যাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নর-নারীগণকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন।"

অত্র আয়াতে "لِيَدْخُلَ" এর لَامْ -এর مُتَعَلِّقٌ সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিম্নে কতিপয় মতামত উল্লেখ করা হলো–

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, لِيُدْخِلَ -এর লামটি একটি উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ আর মূল ইবারত হলো- "أَمَرَ بِالْجِهَادِ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ" আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত দ্বারা জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাতে করে তিনি এর [মহান আমলের] বিনিময়ে ঈমানদার নারী-পুরুষদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। তিনি এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, لِيَغْفِرَ اللّٰهُ الخ -এর ন্যায় এটাও বিজয়ের কারণ; কিন্তু যেহেতু দু'টি حَرْفُ جَارٍّ একটি عَامِلْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হওয়া আপত্তিজনক, সেহেতু তিনি উহ্য فِعْل -এর সাথে এটাকে مُتَعَلِّقْ মেনেছেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন- إِنَّا فَتَحْنَا -এর সাথে لِيَزْدَادُوْا টা مُتَعَلِّقْ হওয়ার পর لِيُدْخِلَ ও- إِنَّا فَتَحْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন- لِيُدْخِلَ -এর لَامْ -এর বর্ণটি উহ্য فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। মূলত ইবারতটি এমন হবে- "يَبْتَلِيْ بِتِلْكَ الْجُنُوْدِ مَنْ يَّشَاءُ لِيُدْخِلَ الخ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে বাহিনী দ্বারা যাকে ইচ্ছা পরীক্ষা করেন। যাতে করে ঈমানদার নর-নারীগণকে জান্নাতে পাঠাতে পারেন।

৪. কিছু সংখ্যক মুফাসসিরের মতে, إِنَّا فَتَحْنَا -এর সাথে لِيَزْدَادُوْا টা مُتَعَلِّقْ হওয়ার পর তার সাথে لِيُدْخِلَ ও مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

৫. কারো কারো মতে, لِيُدْخِلَ শব্দটি يَنْصُرَكَ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

উল্লেখ্য- উক্ত صُوَرَتْ -সমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত সূরতই উত্তম যেটা জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন- عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ মুনাফিক ও মুশরিকদের উপরই অকল্যাণ হয়।

دَائِرَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো- এমন রেখা যা একটি কেন্দ্রকে পরিবেষ্টন করে থাকে [বৃত্ত]। অতঃপর এমন বিপদ ও মসিবতের অর্থে তা ব্যবহার হতে লাগল যা বিপদগ্রস্তকে চতুর্দিক হতে ঘিরে ফেলে। অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিক মুসলমানদের উপর যে বিপদ আপতিত হওয়ার আশা করেছিল তা শেষ পর্যন্ত তাদের উপর এসে পড়ল। -[কামালাইন]

আয়াতে سَوْءٌ -এর বিভিন্ন কেরাত এবং তদনুযায়ী তার অর্থগত পার্থক্য : আল্লাহ তা'আলার বাণী - "عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ" -এর মধ্যস্থিত سَوْءٌ -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. سُوْءٌ -এর সীন অক্ষরটি পেশ বিশিষ্ট হবে। এটা আবূ আমর এবং ইবনে কাছীরের ক্বেরাত। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে আজাব, পরাজয় এবং মন্দ।

২. سَوْءٌ -এর সীন অক্ষরটি যবরযোগে হবে। এটা অধিকাংশ ক্বারীগণের কেরাত।

এ অবস্থায় এর অর্থ হবে- নিন্দা ও তিরস্কার। আল্লামা জামাখশরী (র.) বলেছেন যে, প্রথমোক্ত অবস্থায় এর অর্থ হবে ধ্বংস। আর শেষোক্ত অবস্থায় এর অর্থ হবে অত্যন্ত অপছন্দনীয় কথাবার্তা।

এর কেরাত উল্লেখ করতে গিয়ে জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, "بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا فِى الْمَوَاضِعِ الثَّلٰثَةِ" অর্থাৎ তিন স্থানেই সীন অক্ষরটি যবর এবং পেশ উভয়যোগে পড়া জায়েজ হবে। এখানে 'তিন স্থান' এর দ্বারা তিনি বস্তুত নিম্নোক্ত তিনটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ১. ظَنَّ السَّوْءِ ২. دَائِرَةُ السَّوْءِ ৩. ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ -

মুহাক্কিকগণ (র.) বলেছেন, এদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় অবস্থায় সাতজন ক্বারী সর্বসম্মতভাবে سَوْءٌ শব্দটির সীন অক্ষরটিকে যবরযোগে পড়েছেন। কাজেই উক্ত দুই অবস্থায় আর পেশের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্যে যে কিছুটা শিথিলতা হয়ে গেছে তা স্পষ্ট।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ : শানে নুযূল : একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا" পড়ে শুনালে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী করীম ﷺ -কে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পুরস্কার তো আপনার জন্য অমাদের জন্য কি? তখন নাজিল হলো- لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الخ -

এখানে ঈমানের প্রবৃদ্ধির ফলাফলকে ভিন্ন ভঙ্গিমায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবে ঈমানদারগণকে সম্মানের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং মন্দ ও দুর্বলতা হতে তাদেরকে পুতঃপবিত্রকরণ উদ্দেশ্য। হাদীস শরীফে এসেছে হুদায়বিয়ায় জিহাদের বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী কেউই জাহান্নামী হবে না।

قَوْلُهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الخ : আল্লাহ তা'আলা এজন্য জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন যাতে এর বদৌলতে মুসলিম নর-নারীগণকে জান্নাতের স্থায়ী শান্তি ও সুখ দান করতে পারেন, তাদের সমস্ত পাপ ও দুঃখ মোচন করে দিতে পারেন। আর আল্লাহর নিকট ঈমানদারগণের এ প্রাপ্তি মহা সফলতা হিসেবে চিহ্নিত ও বিবেচিত।

আয়াতে ঈমানদার মহিলাগণের উল্লেখের কারণ : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদের জন্য শুভ প্রতিফলের কথা সাধারণত [নারী ও পুরুষের জন্য] সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করে থাকেন। পুরুষ ও মহিলাদের প্রাপ্য শুভফলের কথা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু গুটিকতেক স্থানে বিশেষ কারণে মুসলিম নর-নারীর শুভ ফলের উল্লেখ পৃথক পৃথকভাবে করা হয়েছে। এ স্থানটি সেগুলোর মধ্যে একটি। অথচ যেই হুদায়বিয়াকে কেন্দ্র করে এ শুভসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে সে হুদায়বিয়ার ঘটনায় মুসলিম রমণীগণ উপস্থিত ছিলেন না। এর বিশেষত্ব ও কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ বলেছেন-

প্রথমত মর্যাদা ও শুভফল প্রাপ্তি নির্ভর করে আনুগত্যের উপর। চাই তা হুদায়বিয়ার ব্যাপারে হোক কিংবা অন্য কোনো ব্যাপারে হোক- আর এর মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত উক্ত ব্যাপকতার মধ্যে মহিলাদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে। তারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ফজিলতের কথা শ্রবণ করত মনঃক্ষুণ্ন হবে না।

যা হোক ফজিলত যখন আনুগত্যের কারণে শিরধার্য হয়ে থাকে তখন নারীরা তাদের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পালন করত শুভ সংবাদ ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে। কেননা নারী পুরুষ কারো পরিশ্রমই বৃথা যায় না।

তাছাড়া হাদীস শরীফে রয়েছে, উক্ত হুদায়বিয়ার সফরে হযরত উম্মে সালামা (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সফর-সঙ্গিনী ছিলেন। আর অন্তরের দিক দিয়ে তো সকল মুসলিম মহিলাই মুসলামনদের সাথে ছিল।

এতদ্ব্যতীত মুসলিম মহিলাগণ নিজেদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতাকে এ বিপদসংকুল যাত্রা হতে বিরত রাখা এবং কান্নাকাটি ও বিলাপ করে তাদের সাহস-হিম্মতকে ভেঙ্গে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের সাহস বৃদ্ধি করেছিলেন। তারা সেই লোকদের ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান ইত্যাদি সংরক্ষণ করে তাদেরকে নিশ্চিত করে রেখেছিলেন। তাঁরা কাফের ও মুনাফিকদের আক্রমণের আশঙ্কা অনুধাবন করেও মদীনার ঘর-বাড়িতে বসে রয়েছিলেন। সুতরাং এ জন্যই ঘরে বসে থেকেও তাঁরা জিহাদের শুভফল লাভে তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে শরিক হয়েছেন।

সুতরাং এ সন্দেহ নিরসন হয়ে গেল যে, ঈমানদার রমণীগণ ঘরে বসে থেকেও জিহাদের মর্যাদা লাভ করবেন কিনা?

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে ঈমানদারদের পাপ মোচন হয়ে থাকে; কিন্তু এখানে পরে উল্লেখ করা হয়েছে কেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার নর-নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন- যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবহমান, তথায় তারা চিরকাল থাকবেন। আর যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপরাশি মোচন [মার্জনা] করে দিতে পারেন।

এ আয়াত হতে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর তাদের দোষ-ত্রুটি, পাপরাশি বিমোচন করে দিবেন। অথচ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পূর্বেই তাদের পাপের পঙ্কিলতা হতে পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। অন্যান্য স্পষ্ট আয়াত ও হাদীস দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ বৈপরীত্ব কিভাবে নিরসন করা যেতে পারে?

এর জবাবে মুফাস্সিরগণের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

Free@www.e-ilm.weebly.com

১. আলোচ্য আয়াতে وَاوْ সাধারণ একত্রিকরণের অর্থে হয়েছে তারতীব তথা ক্রমধারার জন্য হয়নি। সুতরাং এর অর্থও হবে প্রথমত তাদের পাপ মোচন করে দেওয়া হবে এবং পরে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

২. এখানে ঈমানদারগণকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো মুখ্য বিষয়। আর তাদের পাপ মোচন করে দেওয়া হলো গৌণ ও পরোক্ষ বিষয়। এ জন্যই জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পাপ মোচনের বিষয়কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। তারতীবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

৩. এখানে "تَكْفِيْرُ سَيِّئَاتٌ"-এর অর্থ হলো জান্নাতীগণকে সম্মান ও ইজ্জতের পোশাক পরানো। আর তা জান্নাতের প্রবেশের পরই হবে।

৪. এর অর্থ হলো জান্নাতীগণ হতে মানবীয় দোষ-ত্রুটি দূর করে তাদেরকে ফেরেশতার গুণে গুণান্বিত করা। আর তা জান্নাতে প্রবেশ করানোর পরই করা হবে।

قَوْلُهُ وَكَانَ ذَالِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণের জান্নাতে প্রবেশ এবং তাদের গুনাহ মাফের উল্লেখ করতঃ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা বিরাট সাফল্যও চূড়ান্ত বিজয়।

জান্নাতে প্রবেশকে "فَوْزًا عَظِيْمًا" তথা মহাবিজয় আখ্যায়িত করায় সেই আনাড়ী, সুফী ও মাস্তান দরবেশদের মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে যারা জান্নাত তলবকারীদেরকে নিকৃষ্ট মনে করে থাকে। কেননা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটা মহাসাফল্য সেহেতু বাস্তবিক পক্ষেই এটা মহা সফলতা। যারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সফলতা অর্জনকারী তারাই সত্যিকারভাবে সফলকাম। আর হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ঈমানদারগণ যা লাভ করেছিলেন তা দর্শনে সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং নবী করীম ﷺ -কে দেওয়া নিয়ামতরাজির কথা শুনে ঈমানদারগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন এটা তো আপনাকে প্রদান করা হয়েছে, আমাদের জন্য কি রয়েছে? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মু'মিনগণের জান্নাতবাসী হওয়া এবং তাদের গুনাহের পঙ্কিলতা বিমোচন হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে– আর বলা হয়েছে, এটা সাধারণ কোনো জিনিস নয়– এটা হলো এক বিরাট পাওনা ও মহাসফলতা।

قَوْلُهُ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ .... مَصِيْرًا : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিক নর-নারীদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি ও ভয়াবহ পরিণতির বিষয় উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

আর আল্লাহ তা'আলা [এজন্য জিহাদের হুকুম নাজিল করেছেন] যাতে তিনি মুনাফিক ও মুশরিক নর-নারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। এ মুনাফিক ও মুশরিকরা আল্লাহর ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে। এ কু-ধারণার কারণে তাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হবে। আজাব ভোগ করতে হবে। তাদের উপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ ও অভিশাপ। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত রেখেছেন, কতইনা নিকৃষ্ট স্থান এ জাহান্নাম– যেথায় তারা চিরকাল থাকবে।

ইতঃপূর্বে ঈমানদারদের নিয়ামতরাজির উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে মুনাফিক ও মুশরিকদের শাস্তি ও দুর্গতির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশংসাস্থলে হওয়ার কারণে ঈমানদারদের উপর ইতঃপূর্বে সাকীনাহ বা প্রশান্তি নাজিল হওয়ার যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তা তাদের জন্যই নির্ধারিত হবে। কাজেই মুনাফিক ও মুশরিকরা যে এটা হতে বঞ্চিত হতো, তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

সুতরাং উক্ত হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে একদিকে যেমন– ইসলামের শিকড় মজবুত হয়েছে এবং ইসলামি বিজয়সমূহের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি অপরদিকে এর দরুন কাফের ও মুনাফিকদের উপর বিপদাপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে এবং তাদের শাস্তি অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছে।

বর্ণিত আছে যে, মুমিনগণ যখন হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন, তখন মুনাফিক ও মুশরিকরা মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করতে লাগলো এবং আল্লাহ তা'আলার শানে অত্যন্ত মন্দ ধারণা পোষণ করল, যেমন তারা বলতে শুরু করল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করবেন না। কোনো কোনো মুনাফিক বলল, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা শরীফে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন না। অথবা মন্দ ধারণার অর্থ হলো, তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য অনেক কিছুকে শরিক মনে করতো।

সুতরাং মদীনা হতে যাত্রা করার সময় নবী ﷺ -এর সাথে একমাত্র জাদ্দ ইবনে কায়েস ব্যতীত অন্য কোনো মুনাফিক ছিল না। অন্যরা সকলেই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়েছিল। তাদের ধারণা ছিল যুদ্ধ তো অবশ্যই হবে এবং মুসলিমরা কোনোমতেই জীবিত সহীহ সালামতে ফিরে আসতে পারবে না। আর বাহ্যিকভাবে দেখতে গেলে অবস্থা অনেকটা এরূপই

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ছিল। কেননা মুসলমানরা স্বীয় দেশ মদীনা হতে দূরে ছিল। যুদ্ধাস্ত্র ছিল তাদের হাতে অতি নগণ্য। অপরদিকে মুশরিকরা ছিল তাদের নিজেদের দেশে। তাছাড়া শুধু যে কুরাইশরা তাদের বিরুদ্ধে ছিল তা নয়; বরং গোটা মক্কাই ছিল তাদের প্রতিপক্ষ দুশমন। এমতাবস্থায় মুনাফিকরা ভাবল যে, কেন নিজেদেরকে তারা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে যাবে?

অপরদিকে কাফেররা ভাবল যদিও বাহ্যত মুসলমানরা ওমরা পালন করতে আসছে; কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হলো ওমরার ছলনায় মক্কা দখল করে নেওয়া। মুনাফিক ও মুশরিকদের এ ছিল কুধারণা। আয়াতে কারীমায় ظَنَّ السَّوْءِ -এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুনাফিক ও কাফেররা ধারণা করেছিল যে, মুসলমানদের উপর বিপদ আসন্ন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, বিপদ মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং মুনাফিক ও কাফিরদের উপরই বিপদ ও ধ্বংসের ঘূর্ণি-চক্র আপতিত হবে, আর তা তাদের মুনাফেকী এবং নাফরমানিরই শাস্তি, শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার গজবও তাদের উপর পড়বে এবং আল্লাহ পাকের লা'নতও রয়েছে তাদের প্রতি। আর আখিরাতে হবে তাদের প্রতি কঠিন ও কঠোর শাস্তি, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে দোজখ তৈরি করে রেখেছেন, আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাসস্থল।

আর যেহেতু কুফরির কারণেই তাদেরকে এ শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সেহেতু মহিলাদেরকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাফের ও মুনাফিক মহিলারাও যেহেতু তাদের পুরুষদের সহযোগী ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল সেহেতু তাদেরকেও আজাবের উপযোগী সাব্যস্ত করা যথার্থ হয়েছে।

যা হোক কাফের ও মুনাফিকরা কোনো মতেই তাদের প্রাপ্য শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিতে চাইলে কে আছে যে, তা হতে রক্ষা করতে পারে?

আলোচ্য আয়াতে মুনাফিক ও কাফেরদের জন্যে চারটি শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যথা–

১. তাদের উপর বিপদাপদের ঘূর্ণিচক্র আপতিত হবে, কখনো এর থেকে তারা রেহাই পাবে না।
২. তাদের প্রতি আল্লাহর তা'আলার গজব অবধারিত।
৩. তারা হবে অভিশপ্ত, রহমত থেকে বঞ্চিত, কোপগ্রস্ত। এ পর্যন্ত দুনিয়ার শাস্তির কথা বলা হয়েছে, এরপর আখেরাতের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
৪. আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে দোজখ তৈরি করে রেখেছেন; আর তা অত্যন্ত মন্দ আবাসস্থল।

অবশ্য তিনি প্রাজ্ঞ ও কৌশলীও বটে। সুতরাং এটা তাঁর কৌশলের পরিপন্থি যে, মুহূর্তেই সকল কাফেরকে ধ্বংস করে দেবেন। তবে কিছুদিন পর কাফেররা নিহত ও বন্দী হয়েছে। আর মুনাফিকরা জীবনভর আফসোস ও হতাশায় ভুগেছিল। কেননা ইসলাম ও মুসলমানগণ দিন দিন শক্তিশালী হয়েছিল। পক্ষান্তরে কাফেররা হয়েছিল হীন-দীন। এটা ছিল ইহকালীন শাস্তি। আর পরকালের যন্ত্রণাদায়ক আজাবের কথা তো আলাদা।

মুনাফিকদেরকে মুশরিকদের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন– "وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ الخ" অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা সেসব মুনাফিক নর-নারী এবং মুশরিক নর-নারীকে শাস্তি প্রদান করতে চান, যারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে।"

আলোচ্যাংশের ন্যায় কুরআনে মাজীদের বহু স্থানে মুশরিকদের পূর্বে মুনাফিকদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুফাসসিরীনে কেরাম উল্লেখ করেন যে, আজাবের ঘোষণার ক্ষেত্রে মুশরিকদের পূর্বে মুনাফিকদের উল্লেখ রয়েছে। কেননা মুশরিকদেরকে সকলেই ইসলামের দুশমন জানে, ইসলামের প্রতি তাদের দুশমনী প্রকাশ্য; কিন্তু মুনাফিকদের কুফরি ও নাফরমানি তারা কখনো প্রকাশ করে না, সর্বদা তারা নিজেদের অবস্থা গোপন রেখে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে।

দ্বিতীয়ত মুনাফিক হলো ইবলিস শয়তানের ন্যায়, ইবলিস যখন মানুষকে প্রতারণা দেওয়ার জন্যে আসে, তখন সে আদৌ একথা প্রকাশ করে না যে, আমি তোমার শত্রু; বরং সে বন্ধু বেশেই আসে, এমনিভাবে মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুমিন বলে দাবি করতো, প্রকাশ্যে তাদেরকে ইসলামের শত্রু মনে করাও কঠিন ছিল, তারা ঈমানদার না হয়েও ঈমানের দাবিদার ছিল। সুতরাং তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা তো দূরের কথা; বরং তাদেরকে পরম বন্ধু ভেবে মুসলমানরা যে তাদের নিকট সকল গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবে এটাই তো স্বাভাবিক। এ জন্যেই তারা মুসলমানদের অধিক ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। অতএব, তাদের আজাবও হবে কাফের মুশরিকদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ "নিশ্চয় মুনাফিকদের স্থান হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।"

মুশরিক ও মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার কিরূপ ধারণা করত? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "اَلظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ।" অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে কিরূপ কু-ধারণা পোষণ করে? এর জবাবে মুফাসসিরগণের অভিমত নিম্নরূপ-

১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন- "ظَنُّوْا اَنَّهٗ لَا يَنْصُرُ مُحَمَّدًا ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ" অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিকরা ধারণা পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও ঈমানদারগণের সাহায্য করবেন না।

২. ইমাম শাওকানী (র.) বলেছেন- মুনাফিক ও মুশরিকরা ধারণা করেছিল যে, নবী করীম ﷺ এবং মুমিনগণ পরাজিত হবেন। ইসলামি আদর্শের উপর কুফর বিজয়ী হবে।

৩. ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেছেন, মুনাফিক ও মুশরিকদের ধারণা ছিল আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখতে পান না এবং তিনি তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত নন। ইরশাদ হচ্ছে- "وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ" "বরং তোমরা ধারণা করে বসে আছো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অধিকাংশ কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত নন।"

৪. কারো কারো মতে মুশরিকরা ধারণা করত যে, প্রতিমা ও দেব-দেবীদের সাথে আল্লাহ তা'আলার যোগসাজশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "اِنْ هِىَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ" অর্থাৎ তোমরা যা ধারণা করেছ তা মোটেই ঠিক নয়; বরং তোমাদের এ প্রতিমাগুলো হলো কিছু নাম মাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা নির্ধারণ করেছ।

৫. কেউ কেউ বলেছেন- কাফেরদের কু-ধারণা ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং মুমিনগণ ওমরা পালনের অজুহাতে মক্কা দখলের ষড়যন্ত্র করছে। আর মুনাফিকদের ধারণা ছিল, মুসলমানগণ হুদায়বিয়া হতে নিরাপদে জীবিত ফিরে আসবে না। আল্লাহ পাক মুনাফিকদের এ অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে অন্যত্র ইরশাদ করেন- بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا "বরং তোমরা [মুনাফিকরা] ধারণা করে বসে আছ যে, রাসূল ﷺ ও ঈমানদারগণ কখনো তাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে আসবে না।"

৬. মুনাফিক ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, নবী করীম ﷺ ও মুমিনদেরকে মক্কায় ওমরা পালন করার জন্য প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তারা অপমানিত হয়েছে এবং চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

মোটকথা, মুশরিক ও মুনাফিকরা বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনা ও ধারণার বশবর্তী ছিল। আর তাদের উক্ত ধারণা সর্বমূলেই যে খারাপ ও বিশ্রী তা বলাই বাহুল্য। ইরশাদ হচ্ছে- اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ অর্থাৎ তারা শুধু ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করে [বাস্তবের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই।]

"وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ الخ" **আয়াতটি পুনরুল্লেখের কারণ :** এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا। অর্থাৎ "আসমান-জমিনের সকল বাহিনী আল্লাহ তা'আলার করায়ত্বে। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী ও মহাকৌশলী।

উক্ত সূরার প্রারম্ভে ইতঃপূর্বেও প্রায় হু-বহু এরূপ একটি আয়াত রয়েছে। আয়াতদ্বয় শাব্দিকভাবে প্রায় এক ও অভিন্ন হলেও এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে তফাৎ রয়েছে।

সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদেরকে সু-সংবাদ দেওয়া। অপরদিকে শেষোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, কাফিরদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দুঃসংবাদ প্রদান করা। এজন্যই শেষোক্ত আয়াতে حَكِيْمًا -এর সাথে عَزِيْزًا -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ **আয়াতে** جُنُوْدٌ **-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? :** আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল বাহিনী আল্লাহর অধীনে।

এখানে جُنُوْدٌ বাহিনী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরামের বক্তব্য নিম্নরূপ-

১. এটা দ্বারা আল্লাহ পাকের অসীম শক্তিমত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. এখানে جُنُوْدٌ তথা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনী দ্বারা এতদুভয়ের মধ্যকার ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে।

৩. আকাশের ফেরেশতাগণ এবং জমিনের জীব-জন্তু ও জিনদেরকে বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨. إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى أُمَّتِكَ فِى الْقِيٰمَةِ وَمُبَشِّرًا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا - مُنْذِرًا مُخَوِّفًا فِيْهَا مَنْ عَمِلَ سُوْءٍ بِالنَّارِ .

৮. নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে আপনার উম্মতের জন্য কিয়ামতের দিন এবং তাদের জন্য সুসংবাদদাতা হিসেবে দুনিয়াতে তাদের জন্য জান্নাতের এবং ভীতি প্রদর্শনকারী দুনিয়ায় অপকর্মকারীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী।

٩. لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيْهِ وَفِى الثَّلٰثَةِ بَعْدَهُ وَتُعَزِّرُوْهُ يَنْصُرُوْهُ وَقُرِئَ بِزَايَيْنِ مَعَ الْفَوْقَانِيَّةِ وَتُوَقِّرُوْهُ ط تُعَظِّمُوْهُ وَضَمِيْرُهُمَا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُسَبِّحُوْهُ أَيِ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا - بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ .

৯. যাতে তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে পার। لِتُؤْمِنُوْا শব্দটি এখানে এবং এরপর তিনটি স্থানে ى ও تَا উভয়ের সাথে পড়া যায় এবং তাঁকে সহযোগিতা করতে পার। তারা তাকে সাহায্য করতে পারে। আর وَتُعَزِّرُوْهُ শব্দটির ز অক্ষরটি تَا সহ দুটি ز -এর সাথে (تُعَزِّزُوْهُ) -ও পঠিত হয়েছে। আর যাতে তোমরা তাকে সম্মান করতে পার ইজ্জত করতে পার। هُمَا যমীরটি আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর যেন তাঁর তাসবীহ [পবিত্রতা] পাঠ করতে পার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ সকাল এবং বিকাল সকাল-সন্ধ্যা।

١٠. إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ بِالْحُدَيْبِيَةِ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط هُوَ نَحْوُ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ج الَّتِىْ بَايَعُوْا بِهَا النَّبِىَّ ﷺ أَىْ هُوَ تَعَالٰى مُطَّلِعٌ عَلٰى مُبَايَعَتِهِمْ فَيُجَازِيْهِمْ عَلَيْهَا فَمَنْ نَّكَثَ نَقَضَ الْبَيْعَةَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ يَرْجِعُ وَبَالُ نَقْضِهٖ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ أَجْرًا عَظِيْمًا .

১০. [হে হাবীব!] নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে অর্থাৎ হুদায়বিয়ায় বায়'আতে রিদওয়ান [মূলত] তারা [যেন] আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে। [ঐ আয়াতের ন্যায়] যেমন [আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন] যে আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে সে [পরিণামে] আল্লাহরই আনুগত্য করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর যেই হাত দ্বারা তারা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের বায়'আত সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে তার প্রতিদান দেবেন– পুরস্কৃত করবেন। অতঃপর যে ভঙ্গ করবে অর্থাৎ বায়'আত ভঙ্গ করবে– সুতরাং সে অবশ্যই ভঙ্গ করবে অর্থাৎ তার বায়'আত ভঙ্গের অশুভ ফল প্রত্যাবর্তন করবে। তার নিজের প্রতি। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি যে পূরণ করবে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করবেন ى এবং ن -এর সাথে– মহাবিনিময়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِتُؤْمِنُوا وَتُعَزِّرُوْهُ الخ : উল্লিখিত আয়াতে لِتُؤْمِنُوْ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ لِتُؤْمِنُوْا কে ت -এর সাথে جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -এর সীগাহ হিসেবে পড়েছেন। অর্থাৎ যাতে তোমরা ঈমান আন।

২. ইবনে কাসীর (র.), আবূ আমর ও ইবনে মুহাইমিন (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ পড়েছেন– لِيُؤْمِنُوْا . ى সহ جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ হিসেবে। অর্থাৎ যাতে তারা ঈমান আনে।

এতদ পরবর্তী তিনটি শব্দ যথাক্রমে وَيُعَزِّرُوْهُ - وَيُوَقِّرُوْهُ ও وَيُسَبِّحُوْهُ -এর মধ্যেও অনুরূপ দুটি কেরাত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَتُعَزِّرُوْهُ : تُعَزِّرُوْهُ শব্দটির শেষে ضَمِيْر টি হলো ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِل আর تُعَزِّرُوْا শব্দটি تَعْزِيْر হতে নির্গত। নেহায়া গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, تَعْزِر -এর মূল অর্থ হলো বিরত রাখা, প্রতিহত করা। এটা সাহায্যের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেননা কেউ যদি কারো সাহায্য করে সে যেন তার দুশমনদেরকে প্রতিহত করে। সুতরাং تَعْزِيْر শব্দটি تَادِيْب তথা আদব শিক্ষাদান এর অর্থেও হয়ে থাকে।

শরিয়তের পরিভাষায় تَعْزِيْر এমন শাস্তিকে বলে যেটা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। তবে কোনো কেরাতে تُعَزِّرُوْهُ -এর স্থানে تُعَزِّزُوْهُ (تَعْزِيْز) হতে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا অর্থাৎ আর যেন তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।

بُكْرَةً -এর অর্থ হলো সকাল এবং اَصِيْل -এর অর্থ সন্ধ্যা। তবে এখানে মুফাস্‌সিরগণ "সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করা" -এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যথা–

১. কেউ কেউ বলেছেন– بُكْرَةً -এর দ্বারা সকালের নামাজ [ফজর] এবং اَصِيْل -এর দ্বারা অবশিষ্ট চার ওয়াক্ত নামাজ যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজকে বুঝানো হয়েছে।

২. অথবা, এর অর্থ হলো সকাল-সন্ধ্যা سُبْحَانَ اللّٰهِ ও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর তাসবীহ পাঠ কর।

قَوْلُهُ فَسَنُؤْتِيْهِ : আল্লাহর বাণী– "فَسَنُؤْتِيْهِ" -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণের মতে, فَسَنُؤْتِيْهِ - ن -এর সাথে جَمْعُ مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ হবে। অর্থাৎ– আমি তাকে শীঘ্রই দান করব।

২. কুফার ক্বারীগণ এবং আবূ আমর (রা.)-এর মতে– فَسَيُؤْتِيْهِ . ى -এর সাথে وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ হবে। অর্থাৎ আল্লাহ শীঘ্রই তাকে দান করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ ..... وَاَصِيْلًا : পূর্ববর্তী আয়াতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করার পর চারটি এমন নিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। আর এ আয়াতে এমন নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, যা প্রিয়নবী ﷺ -এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে দান করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, হে নবী! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির কাছে সাক্ষী রূপে এবং মুমিনদের জন্য সুসংবাদদাতা হিসেবে, আর কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হিসেবে, যাতে করে তোমরা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে তোমরা সাহায্য কর এবং তাঁকে সম্মান কর, তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা উপলব্ধি কর। আর এ সত্যও উপলব্ধি কর যে, তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও নেক আমলের শুভ পরিণতির সুসংবাদ দান করা এবং যারা ঈমান আনে না, নেক আমল করে না, তাদেরকে সতর্ক করা। আর তোমরা যেন সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের মহিমা বর্ণনা কর তথা তসবীহ পাঠ কর।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, প্রিয়নবী ﷺ দুনিয়াতেই ঈমান ও নেক আমলের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন, আর কাফেরদেরকে দুনিয়াতেই তিনি ভীতি প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু সাক্ষ্য প্রদানের যে দায়িত্ব তাঁর প্রতি রয়েছে তা তিনি পালন করবেন কিয়ামতের কঠিন দিনে, সেদিন উম্মতের আমল সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আর প্রিয়নবী ﷺ -কে সাহায্য করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের সাহায্য করা, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং তা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা।

Free@ www.e-ilmweebly.com

হাদীস শরীফে এসেছে যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবীর উম্মতেরা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করবে, তাদের নিকট কোনো নবী রাসূল আসেননি– কেউই তো আমাদের নিকট আপনার বার্তা পৌঁছে দেয়নি। কেউই আমাদেরকে সতর্ক করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-কে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তাঁরা আল্লাহর পয়গাম কেন লোকদেরকে পৌঁছান নি। নবীগণ (আ.) বলবেন, আমরা আপনার পয়গাম যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছি এবং তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি। কিন্তু তারা তো আমাদের কথা শোনেনি– আমাদের আনুগত্য করেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা নবীগণের নিকট জানতে চাইবেন যে, তাঁদের দাবির পক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ আছে কিনা? তখন তাঁরা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতগণকে সাক্ষী মানবেন। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ সাক্ষ্য দেবেন যে, নবীগণ তাদের কওমের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন; কিন্তু কওমের লোকেরাই তাদের দাওয়াত গ্রহণ করেনি। অন্যান্য নবীগণের কওমের লোকেরা এর প্রতিবাদ করে বলবে, উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ তো আমাদের বহু পরে দুনিয়ায় আগমন করেছে, তারা এটা কি করে জানল? উত্তরে উম্মতে মুহাম্মদী বলবেন যে, আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ -এর মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতের বক্তব্যকে সত্যায়িত করবেন এবং তাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন।

আলোচ্য আয়াতের تُعَزِّرُوْهُ -এর সর্বনাম দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং আরো কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, এ বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা সাহায্য করা বা তা'যীম করা রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যাপারেই হতে পারে। অবশ্য কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ সর্বনামগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ উভয়ই উদ্দেশ্য হতে পারেন। যদি আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করা হয় তবে সম্মান করা এবং সাহায্য করার তাৎপর্য হবে দীন ইসলামের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা। আর যদি প্রিয়নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করা হয় তবে এর অর্থ হবে, তাঁর মহান আদর্শের বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করা। আর আল্লামা জমখশরী (র.) লিখেছেন, সকল সর্বনাম দ্বারাই আল্লাহ তা'আলাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তাফসীরকারগণ একথাও বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার মহিমা বর্ণনা করার তাৎপর্য হলো, সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার জিকিরে তন্ময় থাকা। কোনো কোনো তাফসীরকার এ কথাও বলেছেন, সকাল-সন্ধ্যা তসবীহ পাঠ করার তাৎপর্য হলো, নামাজ আদায় করা।

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ : বাইয়াতের তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে যে বাইয়াতের কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ হলো বিশেষ অঙ্গীকার। ইসলাম বা জিহাদ সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ কোনো কোনো সময় সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাইয়াত গ্রহণ করতেন এ মর্মে যে, আমরা প্রাণপণ জিহাদ করবো, কখনো কোনো অবস্থাতেই দুশমনের মোকাবিলা তথা রণাঙ্গন থেকে পিছপা হবো না।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে যে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ -এর দস্তে মোবারকের উপর হাত রেখে তাঁরা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, দুশমনের বিরুদ্ধে তাঁরা আমরণ জিহাদ করবেন। সাহাবায়ে কেরামের এ বাইয়াত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, [হে রাসূল!] মুমিনগণ আপনার হাতে হাত রেখে যে অঙ্গীকার করেছিল, প্রকৃতপক্ষে সে অঙ্গীকার তারা আমার সঙ্গেই করেছে। কেননা সে অঙ্গীকার ছিল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রকাশের লক্ষ্যেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

[যে রাসূলের অনুগত হয়, সে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।]

এর দ্বারা প্রিয়নবী ﷺ -এর উচ্চতম মর্যাদা প্রমাণিত হয় যে, যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর কথা মেনে চলে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই কথা মানে, এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কী হতে পারে।

দ্বিতীয়ত বায়'আতের এ প্রথা রাসূল ﷺ-এর অনুসরণেই আজ অব্যাহত রয়েছে। বুজুর্গানে দীনের নিকট যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মসংশোধনের জন্যে হাজির হয়, তাঁরা তাদেরকে এ মর্মে বাইয়াত করেন যে, তারা কখনো আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করবে না, শরিয়ত বিরোধী কাজে অংশ নেবে না।

হুদায়বিয়ায় সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী ﷺ -এর দস্তে মোবারকে হাত রেখে যে বাইয়াত করেছিলেন, তা ইতিহাসে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলে অভিহিত। এ বাইয়াতকে শুধু যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সাথে বাইয়াত বলে আখ্যা দিয়েছেন তাই নয়; বরং পরবর্তী আয়াতাংশে একথাও বলেছেন– يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা সেদিন জিহাদের বাইয়াত করেছিলেন, তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারের যে ওয়াদা করেছেন, তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

يَدُ اللّٰهِ বা আল্লাহর হাত দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : আল্লাহ তা'আলার 'হাত' বলে তাঁর এমনি একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে যা বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত।

তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে يَدُ اللّٰهِ [আল্লাহ তা'আলার হাত] দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েতের নিয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা সেদিন প্রিয়নবী ﷺ -এর হাতে হাত রেখে জিহাদের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হেদায়েতের নিয়ামত দান করেছেন।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ১. يَدُ اللّٰهِ কথাটির অর্থ হলো نِعْمَتُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত তাদের প্রতি রয়েছে। ২. نُصْرَتُ অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের জন্যে রয়েছে। ৩. এর অর্থ হলো, غَلَبَتْ অর্থাৎ যারা সেদিন প্রিয়নবী ﷺ -এর হাতে বাইয়াত করেছেন সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, দীন ইসলামকে বিজয়ী করতে, আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। -[তাফসীরে কাবীর খ. ২৮, পৃ. ৮৭]

ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করেছে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট বাইয়াত করেছে, তথা আল্লাহ তা'আলার নিকট জিহাদের অঙ্গীকার করেছে। হাদীস শরীফে রয়েছে, হজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এ পাথরটিকে দাঁড় করাবেন, তার দু'টি চক্ষু থাকবে, যা দ্বারা সে দেখবে, আর তার রসনা থাকবে, যা দ্বারা সে কথা বলবে, হজরে আসওয়াদকে যে চুম্বন করেছে, তার পক্ষে সে সাক্ষ্য দেবে। আর ঐ চুম্বনকারী মূলত আল্লাহ তা'আলার নিকট অঙ্গীকারকারী বিবেচিত হবে। এরপর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আলোচ্য আয়াতখানা তেলাওয়াত করেন।

اَلْبَيْعَةُ-এর অর্থ : بَيْعَتْ -এর আভিধানিক অর্থ হলো বিক্রয় করা। আর পরিভাষায় এমন চুক্তিকে বাইয়াত বলে যা মানুষ নিজের উপর ঈমানের আনুগত্য করার জন্য করে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হুদায়বিয়ায় নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিহাদের বাইয়াত করেছিলেন।

اَلْبَيْعَةُ-এর প্রকারভেদ : বাইয়াত দুই প্রকার। যথা-

১. بَيْعَتْ جِهَادْ **[বাইয়াতে জিহাদ] :** বিশেষ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রয়োজনে আমীর বা ইমাম জিহাদের উপর বাইয়াত গ্রহণ করেন।

২. কোনো ভাল কাজের উপর বাইয়াত (بَيْعَتْ سُلُوْكْ) সহীহ মুসলিমে এতদসংক্রান্ত বর্ণনায় "وَعَلَى الْخَيْرِ" শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। মাশায়েখে তরীকত এর بَيْعَتْ اِحْسَانْ -ও এর অন্তর্গত। সূরায়ে মুমতাহানার দ্বিতীয় রুকুর আয়াতসমূহের মধ্যেও এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার বায়'আতকে বায়'আতে রিদওয়ান বলার কারণ : হুদায়বিয়ায় সংঘটিত বায়'আতকে বায়'আতে রিদওয়ান (بَيْعَةُ الرِّضْوَانْ) বলার দুটি কারণ মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. এতদ্‌সংক্রান্ত আল্লাহর বাণী- لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ الخ আল্লাহর রেজামন্দি ও সন্তোষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে বাইয়াতে রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির বাইয়াত।

২. উক্ত বাইয়াত যেহেতু আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু এর নাম হয়েছে- بَيْعَةُ الرِّضْوَانْ -

বাইয়াতের সময় ইমামের হাতের উপর হাত রাখা জরুরি কিনা? : আল্লাহর বাণী- يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -এর দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, বাইয়াতের সময় ইমামের হাতের উপর হাত রাখা আবশ্যক। কিন্তু আসলে তা নয়; বরং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং কারো মাধ্যমেও বাইয়াত গ্রহণ করা যেতে পারে; বরং শায়েখের [ইমামের] নির্দেশনা অনুযায়ী চলাই হলো প্রকৃত বাইয়াত। আনুষ্ঠানিক বাইয়াত জরুরি নয়। অবশ্য বাইয়াতের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেও কিছুটা ফায়েদা রয়েছে- এতে বাইয়াত গ্রহণকারীর উপর ইমামের একটি বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে প্রচলিত বাইয়াতের স্থান : বর্তমানে আমাদের দেশে পীর-মাশায়েখ যে বাইয়াত গ্রহণ করে থাকেন ক্ষেত্র বিশেষে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এর জন্য খাঁটি তথা শরিয়তের অনুসারী পীর দেখে নিতে হবে। এক শ্রেণির শরিয়ত বিরোধী ভণ্ডপীর বাইয়াতের নামে লোকদেরকে নিজের স্বার্থের অসিলা বানিয়ে নেওয়ার এবং মানুষের দীন-ধর্মকে বরবাদ করার যে ফন্দি তৈরি করে রেখেছে সে ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন থাকা দরকার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বাইয়াতে রেদওয়ান কিসের উপর নেওয়া হয়েছিল? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ الخ "অর্থাৎ [হে হাবীব!] যারা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন........।"

অত্র আয়াত দ্বারা সে বাইয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা হুদায়বিয়ায় নবী করীম ﷺ কথিত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জিহাদের উপর সাহাবীগণ (রা.) হতে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত সালামা ইবনে আকওয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ায় সাহাবীগণ (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট بَيْعَتْ عَلَى الْمَوْتِ তথা মৃত্যু কবুল করার উপর বাইয়াত করেছিলেন।

ইবনে ওমর, মা'কাল ইবনে ইয়াসের ও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ায় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ কথার উপর বাইয়াত হয়েছেন যে, তাঁরা যুদ্ধের ময়দান হতে পশ্চাদপসারণ করবেন না, পালিয়ে যাবেন না।

মোদ্দাকথা, নবী করীম ﷺ-এর হাতে হাত রেখে সেই দিন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বজ্র কঠিন শপথ গ্রহণ করেছেন– অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন যে, মুশরিকদের হতে হযরত ওসমান (রা) হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাবেন না। প্রয়োজনে জীবন দেবেন তবুও পিছ পা হবেন না।

বাইয়াতে রিদওয়ানের ঘটনা : হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে নবী করীম ﷺ তাঁর বিশ্বস্ত একজন সাহাবীকে কুরাইশদের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন– যাতে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরাসরি তাদেরকে জানানো যায় এবং তাদের মতামতও জানা যায়।

সুতরাং এ জন্য প্রথমত তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশরা আমার জীবন নাশ করার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কেননা আমি তাদের কেমন দুশমন তা তারা ভালো করেই অবহিত রয়েছে। তাছাড়া আমার সম্প্রদায় বনূ আদী ইবনে কা'আবের কেউই বর্তমানে মক্কায় নেই। কাজেই তারা যদি আক্রমণ করেই বসে তা হলে কেউ আমার পক্ষে কথা বলার মতো থাকবে না; বরং আমি আপনাকে এমন একজনের কথা বলব যে, কুরাইশদের নিকট আমার অপেক্ষা অধিক সম্মানী ও প্রিয়। তিনি হলেন হযরত ওসমান (রা.)। নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে ডাকলেন এবং তাঁকে আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতাগণের নিকট পাঠালেন, যাতে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ শুধু বায়তুল্লাহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই এসেছেন– এতদভিন্ন তাদের অন্য কোনো ইচ্ছা নেই।

হযরত ওসমান (রা.) মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। পথে আহ্বান ইবনে সাঈদ ইবনে আস তাঁর সঙ্গী হলেন। হযরত ওসমান (রা.) কুরাইশদেরকে নবী করীম ﷺ -এর বার্তা পৌঁছে দিলেন। আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য নেতারা হযরত ওসমান (রা.)-কে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে পার। তিনি উত্তর দিলেন, নবী করীম ﷺ তওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তওয়াফ করতে পারি না। অতঃপর সংবাদ ছড়িয়ে গেল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে।

নবী করীম ﷺ যখন সংবাদ পেলেন যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে, তখন তিনি ইরশাদ করলেন– যে, হযরত ওসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি এ স্থান ত্যাগ করবেন না। এরপর তিনি সাহাবীগণকে ডেকে একটি বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। একেই বাইয়াতে রিদওয়ান বলে। জাবদ ইবনে কায়েস মুনাফিক ব্যতীত উপস্থিত সকলেই নবী করীম ﷺ -এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হয়েছেন। নবী করীম ﷺ তাঁর একটি হাত অপর হাতের উপর রেখে বললেন, তা ওসমানের বাইয়াত। এটা হতে হযরত ওসমান (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয়। নবী করীম ﷺ তাঁকে কত বেশি স্নেহ করতেন, এ ঘটনা হতে তার কিছুটা অনুমান করা যায়।

বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ সেদিন মৃত্যুর উপর বাইয়াত করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা মরতে প্রস্তুত। মোটকথা, তাঁরা হযরত ওসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। জীবনের রক্তবিন্দু দিয়ে তারা লড়ে যাবেন। অবশ্য পরে সংবাদ আসল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে বলে যে খবর ইতোপূর্বে পাওয়া গেছে তা মোটেই সঠিক নয়। হযরত ওসমান (রা.) জীবিত আছেন। অতঃপর কুরাইশরা তাঁকে ছেড়ে দিলে তিনি হুদায়বিয়ায় এসে নবী করীম ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন।

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণের উক্ত বায়'আতে তাঁদের দৃঢ় মনোবলের প্রশংসা করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন "অর্থাৎ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর" অথচ আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র : এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো হাত নেই। তিনি তো হাত পা ইত্যাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন, আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর? মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন–

১. গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, "আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর"-এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের বায়'আত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন এবং তাদেরকে এর পূর্ণ বিনিময় ছওয়াব দান করবেন।

২. আল্লামা জমখশরী (র.) বলেছেন– يَدُ اللّٰهِ -এর দ্বারা تَخْيِيْل -এর ভিত্তিতে يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ -এর তাকিদ নেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের (রা.)-এর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াটা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হওয়ার শামিল।

৩. ইমাম ছাক্বাফী (র.) বলেছেন, এখানে اللّٰه শব্দটিকে "اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ" হিসেবে বিক্রয়কারীর সাথে তাশবীহ [উপমা] দেওয়া হয়েছে। আর يَدٌ শব্দটি اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيْلِيَّةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উক্ত বাক্যটি রূপকভাবে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা যা ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

৫. কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ পাকের হাত রয়েছে, তবে এটা সৃষ্টির হাতের মতো নয়; বরং যেরূপ হাত হওয়া আল্লাহর জন্য শোভনীয় সেরূপ হাতই তাঁর রয়েছে। এর প্রকৃত রূপ আমাদের জানা নেই। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

৬. "وَحْدَةُ الْوُجُوْدِ" একক সত্তার প্রবক্তা একদল [বাতিলপন্থি] সুফী এটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।

প্রশ্ন : এই পুরস্কারের অঙ্গীকার বায়'আতে রিদওয়ানের সাহাবীদের জন্য নির্দিষ্ট নাকি ব্যাপক?

উত্তর : যাদের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তারা তো প্রথম ও بِالذَّاتِ মিসদাক। অন্যান্যরা যারা তাকে গ্রহণ করেছেন তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে بِالتَّبْعِ মিসদাক। আর বায়'আতে রিদওয়ানের সাহাবীরা নিশ্চিতভাবে ঐ দৌলত পেয়ে গেছেন। তবে অন্যান্যদের ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কেননা ধর্তব্য তো হয় عُمُوْمِ سَبَبْ -এর; خُصُوْص مَوْرِدْ -এর নয়।

সংশয় : সামনের আয়াতে اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -এর মধ্যে تَحْتَ الشَّجَرَةِ -এর কয়েদ রয়েছে। কাজেই عُمُوْم তো বাকি থাকবে না।

উত্তর : تَحْتَ الشَّجَرَةِ -এর কয়েদ -এর رِضَا এবং قُبُوْل -এর মধ্যে সাধারণভাবে দখল নেই, শুধুমাত্র একটি ঘটনার বর্ণনা। যদি ঐ গাছের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকত, তবে সকল বায়'আত সেই গাছের নিচেই অনুষ্ঠিত হতো এবং হযরত ওমর (রা.)-ও সেটা কর্তন করতেন না।

ফায়েদা : খলিফাগণ ও আউলিয়ায়ে কেরামের বাইয়াত এটার উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, তবে খেলাফতের বাইয়াত মাসনূন ও مُتَوَارِثْ আর সূফীগণের বয়াত مُتَضَمِّنْ বিস্তারিত জানার জন্য خُلَاصَةُ التَّفَاسِيْرِ দেখুন।

মাসআলা : বাইয়াত সুন্নত। ওয়াজিবও নয়, আবার বিদআতও নয়। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) قَوْلُ الْجَمِيْلِ -এর মধ্যে এরূপই বলেছেন।

মাসআলা : বায়'আত একটি অঙ্গীকার যা মুখে স্বীকার করা ও লিখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু মোসাফাহা করা সুন্নত।

মাসআলা : মহিলাদেরকে মুসাফাহা করার মাধ্যমে বাইয়াত করা জায়েজ নয়, বুখারীতে বর্ণিত রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে মৌখিক বাইয়াত করতেন, বায়'আতের উদ্দেশ্যে কখনো তিনি নারীদের হাত স্পর্শ করেননি।

মাসআলা : বায়'আতকৃতা নারী যদি ছোট ও মাহরামও হয় তবুও তার সাথে মুসাফাহা পরিত্যাগ করাই উত্তম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ اَىِ الَّذِيْنَ خَلَّفَهُمُ اللّٰهُ عَنْ صُحْبَتِكَ لَمَّا طَلَبْتَهُمْ لِيَخْرُجُوْا مَعَكَ اِلٰى مَكَّةَ خَوْفًا مِنْ تَعَرُّضِ قُرَيْشٍ لَكَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ اِذَا رَجَعْتَ مِنْهَا شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا عَنِ الْخُرُوْجِ مَعَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ج اللّٰهَ مِنْ تَرْكِ الْخُرُوْجِ مَعَكَ قَالَ تَعَالٰى مُكَذِّبًا لَهُمْ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ اَىْ مِنْ طَلَبِ الْاِسْتِغْفَارِ وَمَا قَبْلَهُ مَا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط فَهُمْ كَاذِبُوْنَ فِىْ اِعْتِذَارِهِمْ قُلْ فَمَنْ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَىْ لَا اَحَدَ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا بِفَتْحِ الضَّادِ وَضَمِّهَا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

১১. অচিরেই আপনাকে বলবে যারা পিছনে রয়ে গেছে তারা বেদুইনদের মধ্য হতে [অর্থাৎ যারা] মদীনার আশে-পাশে রয়েছে, অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আপনার সঙ্গলাভ হতে পিছনে রেখেছেন, হুদায়বিয়ার বৎসর আপনি যখন তাদেরকে আপনার সাথে মক্কার দিকে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এ আশঙ্কায় যে, কুরাইশরা আপনার পথ অবরোধ করতে পারে। আপনি যখন তাদের নিকট ফিরে যাবেন মক্কা হতে– আমাদেরকে বিরত রেখেছে আমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ আপনার সাথে বের হওয়া থেকে সুতরাং আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহর নিকট আমরা আপনার সাথে বের হতে না পারার দরুন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ইরশাদ করছেন, তারা তাদের মুখে [এমন কথা] বলে– ক্ষমা প্রার্থনা ও পূর্ববর্তী বক্তব্য– যা তাদের অন্তরে নেই। –সুতরাং তাদের এ ওজর [অপারগতা] পেশ করার ব্যাপারে তারা অভ্যাসগতই মিথ্যাবাদী। হে নবী! আপনি বলুন, তাহলে কে আছে এখানে اِسْتِفْهَام [প্রশ্নবোধক] نَفِىْ [নেতিবাচক] অর্থে হয়েছে অর্থাৎ কেউই নেই যে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে? যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষতি করতে চান। এখানে ضَرٌّ শব্দটি ض অক্ষরে যবরও হতে পারে এবং পেশও হতে পারে অথবা তিনি তোমাদের মঙ্গল করতে চান; বরং তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই এ গুণে গুণান্বিত।

١٢. بَلْ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ غَرْضٍ اِلٰى اٰخَرَ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِىْ قُلُوْبِكُمْ اَىْ اَنَّهُمْ يَسْتَاصِلُوْنَ بِالْقَتْلِ فَلَا يَرْجِعُوْنَ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ز هٰذَا وَغَيْرِهٖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ـ جَمْعُ بَائِرٍ اَىْ هَالِكِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ بِهٰذَا الظَّنِّ ـ

১২. বস্তুত بَلْ শব্দটি উভয় স্থানে এক উদ্দেশ্য হতে অন্য উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তোমরা তো ধারণা করে বসেছিলে যে, রাসূল ﷺ ও ঈমানদারগণ কখনো তাঁদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসবে না। আর তোমাদের অন্তরে তাকে আকর্ষণীয় চমৎকার করে দেখানো হয়েছে– অর্থাৎ তারা নিহত হয়ে নির্মূল হয়ে যাবে। কাজেই তারা ফিরে আসবে না। আর তোমরা মন্দ-ধারণা পোষণ করেছিলে– এটাও অন্যান্য ধারণা– তোমরা একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। بُوْرٌ শব্দটি بَائِرٌ-এর বহুবচন। অর্থাৎ এ কু-ধারণার কারণে তোমরা আল্লাহর নিকট ধ্বংসশীল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٣. وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ـ نَارًا شَدِيْدَةً ـ

১৩. আর যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনবে না, আমি সেই কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি- জ্বলন্ত আগুন। প্রচণ্ড অগ্নি।

١٤. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِمَا ذُكِرَ ـ

১৪. ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা আজাব দেন। আর আল্লাহ তা'আলা তো অতি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। অর্থাৎ সর্বদাই তিনি এসব গুণে গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ ; এর তাফসীরে মুফাসসির (র.) বলেছেন- حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ অর্থাৎ মদীনার আশে-পাশে বসবাসকারী বেদুইনরা।

মুফাসসিরগণ এর মহল্লে ই'রাব সম্পর্কে দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন-

১. এটা পূর্ববর্তী اَلْاَعْرَابُ হতে صِفَتْ হওয়ার কারণে মহল্লান مَجْرُوْر হবে। অর্থাৎ مِنَ الْاَعْرَابِ الْمُقِيْمِيْنَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ [মদীনার আশে-পাশে বসবাসকারী] বেদুইনরা।

২. حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী اَلْاَعْرَابُ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে মানসূব (مَنْصُوْب) হবে।

قَوْلُهٗ اِذَا رَجَعْتَ مِنْهَا : বিজ্ঞ মুফাসসিরের বক্তব্য "اِذَا رَجَعْتَ مِنْهَا" তারকীবের দৃষ্টিকোণ হতে شَرْطٌ مُؤَخَّرٌ [পরে উল্লিখিত শর্ত] হয়েছে। আর আল্লাহর বাণী- سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ الخ তার جَزَاءٌ مُقَدَّمٌ [পূর্বে উল্লিখিত জাযা হয়েছে।] অথবা, এটা বাক্য হয়ে سَيَقُوْلُ لَكَ الخ -এর ظَرْف তথা مَفْعُوْل فِيْهِ হয়েছে।

قَوْلُهٗ ضَرًّا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত ضَرًّ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত বিদ্যমান -

১. ضَرًّ শব্দটির ض অক্ষরটি যবরযোগে। এমতাবস্থায় এটা মাসদার হবে। অর্থ হবে- অনিষ্ট সাধন করা। এটা জমহুরের কেরাত।

২. ضُرًّ শব্দটির ض অক্ষরটি পেশযোগে পঠিত হবে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে- اَمْرًا يَضُرُّكُمْ এমন বিষয় যা তোমাদের ক্ষতিসাধন করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- পরাজয়। এটা হামযাহ ও কেসায়ী প্রমুখ ক্বারীগণের কেরাত। কেউ কেউ বলেছেন, উভয় অবস্থায় একই অর্থ হবে। যেমন- اَلضَّرُّ এ অর্থে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ الخ : **শানেনুযূল :** বর্ণিত আছে যে, মদীনার আশে-পাশে গিফার, মুজুনীয়াহ, জুহাইনাহ, আসলাম, আশজা ও ওয়ায়েল ইত্যাদি বেদুইন গোত্রসমূহ বসবাস করত। নবী করীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে যখন মক্কায় ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন তাদেরকেও যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা এ ভয়ে নবী করীম ﷺ-এর সাথে ওমরা পালনের জন্য বের হলো না যে, কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পথ অবরোধ করে বসবে এবং মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেবে।

পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ সাহাবীগণসহ সম্পূর্ণ নিরাপদে ফিরে আসলে তারা বহু ওজর-আপত্তি করতে শুরু করল। তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তেগফার করার জন্যে নবী করীম ﷺ -কে অনুরোধ জানাল।

Free @ www.eilm.weebly.com

সুতরাং তারা যে এগুলো বলবে, তা তারা মদীনা ফিরে যাওয়ার পূর্বেই হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে এ আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলা নাজিল করে নবী করীম ﷺ -কে আগাম জানিয়ে দিয়েছেন। আর এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের এসব ওজর-আপত্তি অনর্থক ও বেমানান। মূলত কুরাইশদের ভয়েই তারা ওমরাহ পালন করতে যায়নি এবং নবী করীম ﷺ -এর সাথে শরিকও হয়নি।

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ .... خَيْرًا : অর্থাৎ [হে রাসূল!] যেসব আরব গ্রামবাসী পেছনে রয়ে গিয়েছিল, তারা অচিরেই আপনাকে বলবে, আমাদের ধন-সম্পদ এবং পরিবারবর্গ আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব, অমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তারা মুখে যা বলে তাদের অন্তরে তা নেই।

আরবের যেসব গোত্র রাসূল ﷺ -এর আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে হুদায়বিয়ার সফরে যায়নি, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা এখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট নিজেদের অপারগতা পেশ করবে যে, আর্থিক কাজে ব্যস্ততা এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি দায়িত্ব পালনে মশগুল থাকার কারণেই আমরা ওমরার এ সফরে শরিক হতে পারিনি।

মূলত যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রিয়নবী ﷺ -এর সফর-সঙ্গী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে দুর্বলচিত্ত বেদুইন ব্যক্তিরা ভয়ে এ সফর থেকে বিরতও থাকে। তাদের ধারণা ছিল, এ সফরে যুদ্ধ হবে, আর এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় অনিবার্য, তাদের এমন ধারণার কারণেই তারা এ সফরে অংশ নেয়নি, এখন যখন প্রিয়নবী ﷺ নিরাপদে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন তারা কি কি ওজর-আপত্তি তুলে ধরবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী ﷺ -কে পূর্বেই এ আয়াতের মাধ্যমে অবহিত করেছেন।

মুখাল্লাফুন [পশ্চাদপদ অবলম্বনকারী] কারা? তারা কি ওজর পেশ করেছিল? : ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারাহ হতে যাত্রা করার সময় নবী করীম ﷺ অত্যন্ত সতর্কতা ও প্রস্তুতির সাথে সাহাবীগণ (রা.)-কে সঙ্গে নিয়েছিলেন। কেননা, তখনই তিনি সংঘর্ষ বাধার আশংকাবোধ করেছিলেন। এটা দেখে কতিপয় সরলপ্রাণ বেদুইন যাদের অন্তরে তখনো ঈমান দৃঢ়তা লাভ করেনি। তারা পরস্পরে বলতে লাগল যে, দেখ এ যাত্রাকারী মুসলমানগণ কোনো মতেই জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই লোকদের গোপন তথ্য উন্মোচন করে নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁকে সাবধান করে দিলেন। জানিয়ে দিলেন যে, তারা হুদায়বিয়ায় তাদের অনুপস্থিতির ব্যাপারে অহেতুক মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করবে। তারা বলবে, হুজুর, ঘর-বাড়ি ও পরিবার পরিজনদের ধান্ধায় আমরা সময় করে উঠতে পারিনি। আমাদের ঘর-সংসার দেখা-শুনা করার মতো কেউ ছিল না। এ জন্য আমরা ওমরা পালনে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। য হোক, এতে আমাদের গোস্তাখী হয়ে গিয়েছে। আমরা তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

অথচ বলার সময় তারা নিজেরা জানত যে, তারা যা বলছে তা সর্বাংশে মিথ্যা। আর ইস্তেগফারের দরখাস্তও ছিল নিছক অভিনয় মাত্র– সত্যিকারভাবে আন্তরিকতার সাথে ছিল না। কেননা, তারা মূলত এটাকে গুনাহই মনে করে না, কাজেই অন্তরের সাথে লজ্জিত হবে কিভাবে? আর এমতাবস্থায় তওবা কবুল হওয়ার বিষয় তো নিতান্ত হাস্যকর।

মুখাল্লাফুনের ওজর পেশের মোকাবিলায় নবী করীম ﷺ -এর জবাব : ইরশাদ হচ্ছে– হে হাবীব! আপনি মুনাফিকদের ওজর পেশের জবাবে বলুন যে, মঙ্গল-অমঙ্গল সবই আল্লাহ তা'আলার হাতে– তার সামনে কারো কোনো ক্ষমতা চলে না। সুতরাং তোমাদের মতো বাজে-নীচু লোক রাসূলের সাথী হওয়া তিনি পছন্দ করেননি। আর এখন আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও তাঁর পছন্দনীয় নয়। কেননা তোমাদের মিথ্যার পর্দা ফাঁস হয়ে পড়েছে। তোমরা নিজেদের দোষেই হুদায়বিয়ার বরকতও মর্যাদা হতে বঞ্চিত রইলে।

মুখাল্লাফুনের ওজর গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ : মুখাল্লাফুন তথা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ হতে বিমুখতা প্রদর্শনকারীরা তাদের ধন-সম্পদ ও সংসারের ঝামেলায় যে ওজর পেশ করেছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ঘর-সংসার ও মালামালের মঙ্গলামঙ্গল তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তেই রয়েছে। তিনি চাইলে ঘরের মধ্যে অমঙ্গল হতে পারে, আর তিনি ইচ্ছা করলে ঘরের বাইরেও ক্ষতিমুক্ত রাখতে পারে। তাছাড়া আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তোষ এর মোকাবিলায় ঐসব বস্তুর ব্যাপারে চিন্তা করা কিভাবে ঈমানদারের আলামত হতে পারে। তারা প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহকে ভুলিয়ে ফেলতে চেয়েছে। যেন তারা চেয়েছে যে, দুনিয়াও হাতে থাকুক এবং আল্লাহও সন্তুষ্ট থাকুন। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের সবকিছুর খবর রাখেন। ওমরায় শরিক না হওয়ার যে কারণ তোমরা বর্ণনা করেছ তা যে, মূলত কোনো ব্যাপারই ছিল না; বরং এর কারণ যে অন্যত্র নিহিত রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই অবগত আছেন। তোমরা তো ধারণা করে বসেছিলে যে, নবী করীম ﷺ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এবং মুসলিমগণ সহীহ সালামতে ফিরে আসবেন না। আর তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল এটাই। উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা ভেবেছিলে যে, আল্লাহর রাসূলের সাথে না যাওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অথচ এটা তোমাদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক।

মুনাফিকদের উপরিউক্ত ওজর গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর কয়েকটি দিক রয়েছে। যথা–

১. তারা বলেছে আমাদের হাতে সময় ছিল না।

২. আমরা সফরে অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম।

৩. আমাদের ধারণা ছিল যে, আপনি আমাদের জন্য ইস্তেগফার করলে এ গুনাহের কাফফারাহ হয়ে যাবে।

অথচ বাস্তবিক অবস্থা তা ছিল না। প্রথমোক্ত দুটি ওজর তো সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল। আর তৃতীয় ধারণাটি এ জন্য বাতিল হবে যে, তারা নবুয়তের উপর আস্থাশীল ছিল না। উপরন্তু ইস্তেগফারের আবেদনেও তারা একনিষ্ঠ ছিল না।

যাহোক, তাদের ওজরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। প্রথমত যদি তাদের ওজর সত্যও হতো তা হলে অকাট্য নির্দেশের মোকাবিলায় তা ছিল অনর্থক। কেননা উক্ত ওজর বাস্তবিক পক্ষে তাদের ভাগ্যকে খণ্ডন করতে পারত না। তথা শরিয়ত যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করেছে বাস্তব ওজরকে রুখসতের যোগ্য সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে শরিয়ত ওজরের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি; বরং অকাট্যভাবে নির্দেশ দিয়েছে– যেমন এ ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে প্রকৃত ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত তাদের উক্ত ওজর সত্য ও বাস্তব ছিল না; বরং নিছক কাল্পনিক ও মনগড়া ছিল এবং এক ধরনের প্রতারণা ছিল, সুতরাং তা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

কোনো কোনো তাফসীর হতে জানা যায় যে, উক্ত মুনাফিকদের মধ্য হতে এক দল তওবা করত প্রকৃতপক্ষে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

হুদায়বিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করেনি, এখানে তাদের উল্লেখের কারণ : কুরআনে মাজীদের ভাষা ও বর্ণনা গভীর মনোনিবেশের সাথে দেখলে লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের পাশাপাশি কাফেরদের, মুখলিসদের [নিষ্ঠাবান] পাশাপাশি মুনাফিকদের এবং জান্নাতীদের পাশাপাশি জাহান্নামীদের উল্লেখ করেছেন। কেননা, "تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا" অর্থাৎ বিপরীত বস্তুর উল্লেখের মাধ্যমে যে কোনো বস্তু স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

সুতরাং ইতোপূর্বে যেসব মুখলিস ঈমানদারগণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমের আকর্ষণে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন, জীবনের মায়া তুচ্ছ করে বাইয়াতে রিদওয়ানে শরিক হয়েছেন এবং আল্লাহ ও রাসূলের সন্তোষ অর্জনের জন্য নিজের প্রাণকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি– তাদের আলোচনা করা হয়েছে, প্রশংসা করা হয়েছে, তারা যে আল্লাহ পাকের দরবারে মকবুল ও মর্যাদার পাত্র হয়েছেন তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এরপর এখানে যারা হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেননি– কোনোরূপ যুক্তিযুক্ত ওজন না থাকা সত্ত্বেও রাসূলে কারীম ﷺ -এর ডাকে সাড়া দেয়নি তাদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ লোকগুলো হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ না করে, শুধু যে হুদায়বিয়ার বরকত-রহমত ও মর্যাদাপ্রাপ্তি হতেই বঞ্চিত হয়েছে তা নয়; বরং তা হতে বিরত থেকে তারা মুসলমান ও নবী করীম ﷺ -এর সম্পর্কে কুধারণা, বদ আকীদা পোষণ করেছে, তাঁদের ধ্বংস ও নিপাত কামনা করেছে এবং নবী করীম ﷺ মদীনায় ফেরার পর তাঁর নিকট মিথ্যা ও বানোয়াট ওজর-আপত্তি পেশ করেছে– সে কারণে তারা মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। কাজেই অন্যান্য মুনাফিকদের ন্যায় তাদেরও স্থায়ী নিবাস হবে জাহান্নামের গভীরতম স্থানে।

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ ...... رَحِيْمًا : ইরশাদ হচ্ছে, ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব ও সমস্ত কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকের। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। আর যাকে চান শাস্তি দান করেন। আল্লাহ পাক অতিশয় ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান।

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, যারা হুদায়বিয়ায় শরিক হয়নি এবং নবী করীম ﷺ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর নিকট অনর্থক ওজর-আপত্তি পেশ করেছে, তারা নবী করীম ﷺ -এর নিকট তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার– ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছিল। এর জবাবে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আসমান-জমিনের সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর কব্জায় রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন আর যাকে ইচ্ছা আজাব দিতে পারেন। আমি তাঁর মতের বিরুদ্ধে কি করতে পারি? হ্যাঁ! তিনি দয়া করলে তোমাদের ক্ষমা করেও দিতে পারেন। কেননা তাঁর ক্রোধের উপর সর্বদাই দয়া ও রহমত বিজয়ী রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٥. سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ الْمَذْكُوْرُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ هِىَ مَغَانِمُ خَيْبَرَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا اُتْرُكُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ج لِنَاْخُذَ مِنْهَا يُرِيْدُوْنَ بِذٰلِكَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ط وَفِىْ قِرَاءَةٍ كَلِمَ بِكَسْرِ اللَّامِ اَىْ مَوَاعِيْدَهٗ بِغَنَائِمِ خَيْبَرَ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ خَاصَّةً قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ج اَىْ قَبْلَ عَوْدِنَا فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ط اَنْ نُّصِيْبَ مَعَكُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ فَقُلْتُمْ ذٰلِكَ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ اِلَّا قَلِيْلًا - مِنْهُمْ -

১৫. যারা [হুদায়বিয়া হতে] পেছনে রয়ে গেছে তারা শীঘ্রই বলবে অর্থাৎ উল্লিখিত মুনাফিকরা যখন তোমরা গনিমতের দিকে যাবে– তাহলো খায়বরের গনিমত– তা নেওয়ার জন্য আমাদের কে অবকাশ দাও সুযোগ করে দাও যাতে আমরা তোমাদের অনুগামী হতে পারি যাতে গনিমতের মালের অংশ গ্রহণ করতে পারি। তারা চায় তা দ্বারা আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করে দিতে এক কেরাতে [كَلٰمَ -এর স্থলে] كَلِمَ লাম অক্ষরটির যেরযোগে এসেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে খায়বরের গনিমত-এর ওয়াদা নির্ধারিত হওয়া। হে হাবীব! আপনি বলে দিন, তোমরা কখনো আমাদের অনুগামী হতে পারবে না। এরূপ আল্লাহ তা'আলা ইতোপূর্বে বলেছেন অর্থাৎ [হুদায়বিয়া হতে] আমাদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই। সুতরাং শীঘ্রই তারা বলবে; বরং তোমরা আমাদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করছ। এ কারণে যে, আমরা তোমাদের সাথে গনিমতের মালে শরিক হয়ে যাব। এজন্যই তোমরা এরূপ বলেছ। বস্তুত তারা বুঝে না দীন তবে গুটি কতেক– তাদের মধ্য হতে [দীনি স্মরণ রাখে]।

١٦. قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ الْمَذْكُوْرِيْنَ اِخْتِبَارًا سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ اَصْحَابِ بَاْسٍ شَدِيْدٍ قِيْلَ هُمْ بَنُوْ حَنِيْفَةَ اَصْحَابُ الْيَمَامَةِ وَقِيْلَ فَارِسُ وَالرُّوْمُ تُقَاتِلُوْنَهُمْ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ هِىَ الْمَدْعُوْ اِلَيْهَا فِى الْمَعْنٰى اَوْهُمْ يُسْلِمُوْنَ ج فَلَا تُقَاتِلُوْنَ فَاِنْ تُطِيْعُوْا اِلٰى قِتَالِهِمْ يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا -

১৬. [হে হাবীব!] আপনি বলুন, যেই সকল বেদুইন [হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ হতে] পশ্চাতে রয়েছে উল্লিখিত [মুনাফিক]-দেরকে পরীক্ষার নিমিত্তে শীঘ্রই তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে এমন এক জাতির দিকে যারা প্রবল শক্তিধর– কেউ কেউ বলেছেন, তারা হলো ইয়ামামার অধিবাসী বনূ হানীফা। আর কারো কারো মতে তারা হলো পারস্য ও রোমবাসীগণ। তাদের সাথে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করবে এটা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ প্রকৃত পক্ষে এ [লড়াইয়ের] দিকেই তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে– যতক্ষণ না তারা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তখন তোমরা আর তাদের সঙ্গে লড়াই করবে না। সুতরাং যদি তোমরা এটা মেনে নাও তাদের সাথে লড়াই করার ব্যাপারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও যেমনটি নিয়েছিলে ইতোপূর্বে তাহলে তোমাদেরকে দেওয়া হবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব ব্যথাদায়ক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٧. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ط فِيْ تَرْكِ الْجِهَادِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ عَذَابًا اَلِيْمًا.

১৭. অন্ধ, পঙ্গু এবং রুগণ ব্যক্তির জন্য কোনো অপরাধ নেই জিহাদ পরিহার করার ব্যাপারে। আর যে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য করে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রবেশ করাবেন يُدْخِلْهُ শব্দটি ى ও ن উভয়ের সাথে পড়া জায়েজ হবে। এমন জান্নাতে যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবহমান। অপরদিকে যে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ তাকে [আজাব] দেবেন এখানে يُعَذِّبْهُ শব্দটি ى ও ن উভয়ের সাথে হবে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يُبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ এখানে كَلٰمَ শব্দটিতে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ ل -এর উপর যবর দিয়ে এর পরে একটি আলিফ বাড়িয়ে كَلَامْ পড়েছেন।

২. হামযাহ ও কেসায়ী (র.) প্রমুখ কারীগণ ل -এর নিচে যেরযোগে كَلِمْ পড়েছেন।

প্রথমোক্ত কেরাতে শব্দটি একবচন এবং শেষোক্ত কেরাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا الخ : অত্র আয়াতের প্রথমোক্ত بَلْ তথা بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا -এর দ্বারা হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণকারী গোত্রসমূহের মুসলমানদের বক্তব্য- لَنْ تَتَّبِعُوْنَا [তোমরা কখনো আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না]-কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আর শেষোক্ত بَلْ তথা بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا দ্বারা মুনাফিকরা মুসলমানদের উপর যে অপবাদ দিয়েছে- তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُعَذِّبْهُ وَيُدْخِلْهُ : يُدْخِلْهُ ও يُعَذِّبْهُ শব্দদ্বয়ের মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ ى যোগে يُدْخِلْهُ ও يُعَذِّبْهُ পড়েছেন। অর্থাৎ- صِيْغَةُ وَاحِدٍ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ

২. হযরত নাফে' ও ইবনে ওমর (রা.) এ শব্দদ্বয়ে ى -এর পরিবর্তে ن যোগে نُدْخِلْهُ ও نُعَذِّبْهُ তথা جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ -এর صِيْغَةٌ দ্বারা পড়েছেন।

قَوْلُهُ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا : لَنْ -এর দ্বারা যদিও সাধারণত ভবিষ্যতের সদা-সর্বদার জন্য নফী বুঝিয়ে থাকে তথাপি এখানে সর্বদার জন্য নফী উদ্দেশ্য নয়; বরং এই لَنْ সাময়িক নফী বুঝানোর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ তা শুধু খায়বরের যুদ্ধের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং আল্লামা আলুসী (র.) بَحْر নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুদায়বিয়ায় যারা অংশ গ্রহণ করেনি তাদের মধ্যে মুজনিয়াহ ও জুহাইনাহ গোত্রদ্বয় খায়বরের পর কতিপয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে- সেই যুদ্ধসমূহে খোদ নবী করীম ﷺ -ও উপস্থিত ছিলেন।

তাছাড়া হযরত ওমর ফারূক (রা.) তাঁর খেলাফতের যুগে ঐ বেদুইন গোত্রগুলোকে বিভিন্ন জিহাদে শরিক করেছিলেন। সুতরাং এসব ঘটনাপ্রবাহ হতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে لَنْ -এর مُطْلَقْ تَابِيْد [সর্বদা] -কে বুঝানো হয়নি।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ الخ : শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরিতে ওমরা পালনের সফরে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তাঁর সাথে শরিক হওয়ার জন্য। কিন্তু মদীনার আশপাশের কতিপয় বেদুইন গোত্র যারা নতুন মুসলমান হয়েছিল এবং যাদের ঈমান অত্যন্ত দুর্বল ছিল তারা ধারণা করল যে, কুরাইশরা অবশ্যই মুসলমানদের গতিরোধ করে বসবে এবং এমন সংঘর্ষ বাধবে যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যাবে– তারা আর কখনো মদীনায় ফিরে আসতে পারবে না। এ ধারণার বশীভূত হয়ে তারা নবী করীম ﷺ ও ঈমানদারগণের সাথে ওমরায় অংশগ্রহণ করল না। হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করত জানিয়ে দিলেন যে, হে হাবীব! আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন তখন সেই মুনাফিক বেদুইন গোত্রগুলো আপনার নিকট এসে অনর্থক ওজর-আপত্তি পেশ করবে এবং আপনাকে তাদের পক্ষ হতে ইস্তেগফার করার জন্য অনুরোধ করবে। আপনি তাদের কথা আদৌ বিশ্বাস করবেন না এবং তাদের ওজর কবুল করবেন না।

আরো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতি শীঘ্রই একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে সেই যুদ্ধে শুধু তারাই অংশগ্রহণ করবে, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে। আর কেবল তারাই সেই যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালিক হবে।

আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে আরো জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যখন হুদায়বিয়ার সঙ্গীদেরকে নিয়ে খায়বরের যুদ্ধে রওয়ানা করবেন তখন সেই বেদুইন মুনাফিক গোত্রসমূহ তারা হুদায়বিয়ায় শরিক হয়নি, তারা আপনার সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুরোধ করবে। আপনি কিন্তু তাদের সেই অনুরোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে বলে দেবেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ প্রেরণ করেছেন এটা রদবদল করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই।

قَوْلُهُ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ ..... إِلَّا قَلِيْلًا : নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ার বৎসর ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাত্রার সময় মুসলমানদেরকে তাঁর সাথে ওমরায় শরিক হতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু মদীনার আশে-পাশে অবস্থিত কয়েকটি বেদুইন গোত্র, যেমন– গেফার, জুহাইনাহ, আসলাম প্রভৃতি ওমরায় অংশ গ্রহণ করেনি। তাদের ধারণা ছিল মুসলমানরা মক্কায় প্রবেশ করতে গেলে কুরাইশদের সাথে তাদের বিপুল সংঘাতে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ অনেকটা হতাশ চিত্তে ব্যথিত মনে অথচ নিরাপদে হুদায়বিয়া হতে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এমন সময় পথিমধ্যে এ সূরাটি নাজিল হয়। এতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তাদেরকে আশার বাণী শুনানো হয়। মদীনায় ফিরে গেলে উপরিউক্ত মুনাফিকরা কি কি বলবে, তাও নবী করীম ﷺ -কে আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এ সূরায় হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণকে যেসব সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে একটি ছিল– হুদায়বিয়াহ হতে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর প্রথম যে যুদ্ধটি হবে তাতে শুধু হুদায়বিয়ায় বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণই অংশগ্রহণ করবেন এবং এটা হতে পাওয়া গনিমতের মাল শুধু তারাই ভোগ করবেন। অন্য কেউ না উক্ত যুদ্ধে শরিক হতে পারবে আর না তার গনিমতের অংশ পাবে। কিন্তু মুনাফিকরা যদিও মৃত্যুর আশঙ্কায় হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেনি। তথাপি গনিমতের মালের লোভে তারা আসন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আরজু করবে। আপনি কিন্তু তাদের সেই আবেদন-নিবেদনে এতটুকুও কর্ণপাত করবেন না। ইরশাদ হচ্ছে–

হে হাবীব! আপনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর যখন খায়বরের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন, যুদ্ধে যাত্রা করবেন, তখন হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণকারী সেই মুনাফিকরা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দাও। আর এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর দেওয়া ঘোষণাকে পাল্টিয়ে দিতে চায়।

হে হাবীব! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা কোনোক্রমেই আমাদের সাথে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। আমাদের প্রভু পূর্বেই তা বলে দিয়েছেন। কিন্তু তারা বলবে, তোমরা হিংসার বংশবর্তী হয়েই আমাদেরকে গনিমত হতে বঞ্চিত করার জন্যই এরূপ বলছ। মূলত তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকেরই দীনি জ্ঞান রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে كَلَامَ اللّٰهِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ তারা আল্লাহর তা'আলার ঘোষণাকে পাল্টিয়ে দিতে চায়। এখানে كَلَامَ اللّٰهِ বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং–

১. জমহুর মুফাসসিরগণের মতে– كَلَامَ اللّٰهِ বা আল্লাহর বাণী দ্বারা হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণকে দেওয়া আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো, খায়বরের যুদ্ধ ও তার গনিমতের অংশীদার একমাত্র হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারীগণই হবে।

২. অথবা, এর দ্বারা খায়বরের যুদ্ধ হতে মুনাফিকদের বিরত রাখা সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ঘোষণাকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে– "كَلَامَ اللّٰهِ" -এর দ্বারা এখানে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ না করে তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের প্রাপ্য হয়েছে। কিন্তু খায়বরে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সাথে শামিল হয়ে তারা আল্লাহর গজবকে পাল্টিয়ে রহমতের অধিকারী হতে চাইছে।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, অত্র আয়াতে "كَلَامَ اللّٰهِ" -এর দ্বারা মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আগাম বক্তব্য ও ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়াহ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, খায়বরের যুদ্ধে যাত্রাকালে মুনাফিকরা এরূপ বলবে।

৫. ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন যে, অত্র আয়াতে– "كَلَامَ اللّٰهِ" -এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীকে বুঝানো হয়েছে– فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا

অর্থাৎ হে হাবীব! তারা আপনার সাথে যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা কখনো আমার সাথে যুদ্ধের জন্য বের হতে পারবে না এবং আমার সাথে কখনো শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবে না। কিন্তু শেষোক্ত মতটি মুহাক্কীকগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এ আয়াতখানি তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতখানা এর তিন বৎসর পূর্বে নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهٗ كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে এরূপই বলেছেন। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. আমরা মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা এরূপ বলবে– খায়বরে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন-নিবেদন করবে। আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে।

২. আমরা মদীনায় ফিরে আসার পূর্বেই হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, খায়বরের যুদ্ধে তোমরা আমাদের সাথে শরিক হতে পারবে না।

৩. ইতোপূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা খায়বরে যাওয়ার আবেদন করলে আমরা যেন "لَنْ تَتَّبِعُوْنَا" [কখনো তোমরা আমাদের সাথী হতে পারবে না] বলে দেই।

৪. মুফতী শফী (র.) বলেছেন যে, كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ -এর দ্বারা وَحْيٌ غَيْرُ مَتْلُوٍّ তথা হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهٗ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا : ইরশাদ হচ্ছে হে হাবীব! মুনাফিকরা যখন খায়বরে যাওয়ার জন্য আবদার করবে তখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশ হলো, তোমরা আমাদের সাথে শরিক হতে পারবে না, তখন তারা বলবে, আল্লাহ তা'আলা তো নিষেধ করেনি; বরং তোমরা চাচ্ছ যে, গনিমতের মাল সম্পূর্ণটার মালিক যেন তোমরা হতে পার। অন্য কেউ যেন এতে অংশীদার না হয়। মূলত তারা ছিল একেবারেই নিরেট বোকা ও অন্ধ! মুসলমানগণ কিরূপ দুনিয়াত্যাগী ও লালসাহীন, তারা যদি একবার চোখ খুলে তা দেখার চেষ্টা করত তা হলে কখনো এরূপ অযাচিত ও জঘন্য মন্তব্য করতে পারত না। ত্যাগ-তিতিক্ষাই যাদের জীবনের একমাত্র ব্রত তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ স্থান পাবে কি করে? আর নবী করীম ﷺ -এর ব্যাপারেও বা কি করে এ ধারণা পোষণ করা যেতে পারে যে, তিনি হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

লোভ-লালসার শিকার হয়ে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে বসেছেন? [নাউযুবিল্লাহ] একমাত্র মুনাফিকরাই যে পারে আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল ﷺ ও প্রিয় সাহাবীগণ (রা.)-এর ব্যাপারে এরূপ জঘন্য ও ঘৃণ্য মন্তব্য করত, তা বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না।

قَوْلُهُ قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ ..... عَذَابًا اَلِيْمًا : ইরশাদ হচ্ছে- হে হাবীব! যেই বেদুইন মুনাফিক গোত্রসমূহ হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেনি, তারা যখন খায়বরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আবেদন জানাবে তখন তা প্রত্যাখ্যান করত আপনি এর বিকল্প প্রস্তাব পেশ করবেন এবং বলবেন, শীঘ্রই এক পরাক্রমশালী জাতির সাথে লড়াই করার জন্য তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়। যদি তোমরা এ ব্যাপারে আনুগত্য কর এবং লড়াই কর, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন- আর যদি পূর্বের ন্যায় পশ্চাদপসরণ কর তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দান করবেন।

قَوْلُهُ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ : আলোচ্য আয়াতে قَوْمٌ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. ইমাম যাহ্হাক (র.) ও এক দলের মতে। এখানে قَوْمٌ দ্বারা বনূ সাকীফকে বুঝানো হয়েছে।
২. ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর মতে এখানে قَوْمٌ -এর দ্বারা পারস্যবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
৩. কা'বে আহবার (র.)-এর মতে قَوْمٌ -এর দ্বারা অত্র আয়াতে রোমবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে।
৪. আতা ও হাসান (র.) প্রমুখগণের মতে এখানে قَوْمٌ -এর দ্বারা পারস্য ও রোমবাসী উভয়দেরকে বুঝানো হয়েছে।
৫. মুজাহিদ (র.) ও একদল মনীষীর মতে তারা হলো মূর্তি ও প্রতিমাপূজারী তথা পৌত্তলিক।
৬. কারো কারো মতে এর দ্বারা খায়বরের পরবর্তী যুদ্ধসমূহ উদ্দেশ্য।
৭. কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে قَوْمٌ -এর দ্বারা মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের কওম বনূ হানীফাকে বুঝানো হয়েছে- যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হযরত আবূ বকর (রা.) সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। যার পরিণতিতে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসায়লামা নিহত হয় এবং বনু হানীফার লোকেরা পরাজিত হয়। হযরত জুবায়ের (রা.) এ মত পোষণ করেন।
৮. কেউ কেউ বলেছেন- এখানে قَوْمٌ -এর দ্বারা ঐসব লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং হযরত আবূ বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাদেরকে তওবা করতে বাধ্য করেছিলেন।
৯. কারো কারো মতে এখানে قَوْمٌ -এর দ্বারা হাওয়াজিন গোত্রের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইকরিমা (রা.) এ মত পোষণ করেন।

মূলতঃ অত্র আয়াতে قَوْمٌ -এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে- তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এটা দ্বারা মুনাফিকদেরকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য তা নিশ্চিত করেই বলা চলে। যদি তাদের মধ্যে ঈমানী নূর থাকে তা হলে যুদ্ধের পরিণতির কথা না ভেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ পাওয়া মাত্র বিরোধীরা যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ الخ : শানে নুযূল : অত্র আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা-

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াতখানা নাজিল হলো- وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ আর যদি তোমরা ইতোপূর্বে যেমনিভাবে হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণ করেছ তেমনি এ যুদ্ধ হতেও পশ্চাদপসরণ কর তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাবে নিক্ষেপ করবেন"- তখন অন্ধ, পঙ্গু ও রুগ্‌ণ লোকজন যারা যুদ্ধ করতে অক্ষম তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং নবী করীম ﷺ -এর নিকট আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ। তখন উপরিউক্ত আয়াতখানা নাজিল করত তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় এবং যুদ্ধের হুকুম হতে তাদেরকে বহির্ভূত রাখা হয়।

২. ইতোপূর্বে যারা হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেনি, আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরায় তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন; তাদের উপর আজাব ও গজবের কথা ঘোষণা করেছেন। এতে অন্ধ, পঙ্গু ও অক্ষম লোকজন– যারা ওমরায় ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম ছিল তারা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল করত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা দান করেন।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ الخ : **প্রতিবন্ধীদের উপর জিহাদ ফরজ নয় :** আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, যখন পূর্ববর্তী আয়াত নাজিল হয় এবং তাতে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার জন্যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়, তখন অন্ধ, খোঁড়া লোকেরা আরজ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমাদের সম্পর্কে কি আদেশ? তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ ....

অর্থাৎ যারা অন্ধত্বের কারণে বা পঙ্গু হওয়ার দরুণ জিহাদে যেতে অক্ষম হয়, এ ব্যাপারে তাদের কোনো গুনাহ নেই। তাদের জন্যে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার অনুমতি রয়েছে।

এর পাশাপাশি যারা সাময়িকভাবে রুগ্ণ হয়, তাদের রোগের কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম না হলেও তাদেরও গুনাহ হয় না, অবশ্য রোগ যেমন সাময়িক, এর অনুমতিও সাময়িক, অর্থাৎ যখন তারা আরোগ্য লাভ করবে, তখন পুনরায় তাদের প্রতি জিহাদের দায়িত্ব বর্তাবে।

তাবারানী (র.) হযরত জায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর আদেশক্রমে [পবিত্র কুরআনের আয়াত] লিখছিলাম, কলম আমার কানের মধ্যে রাখা ছিল, যখন জিহাদের আদেশ হলো, ঠিক তখন একজন অন্ধ ব্যক্তি হাজির হলো এবং আরজ করলো, আমি তো অন্ধ, আমার সম্পর্কে কি আদেশ? ঐ মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত "لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ" নাজিল হলো, তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– যারা জিহাদে অংশ গ্রহণে অক্ষম হয়, তাদের প্রতি এ দায়িত্ব নেই। –[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ৮০-৮১]

আল্লামা আলুসী (র.) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদিও প্রতিবন্ধীদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু যদি তারা কোনোভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তবে তাদের জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তিনি কাদেসিয়ার জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। তিনি এ জিহাদে ইসলামের পতাকাবাহী ছিলেন। –[রূহুল মা'আনী খ. ২৬, পৃ. ১০৫]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٨. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ بِالْحُدَيْبِيَةِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ هِيَ سَمُرَةٌ وَهُمْ اَلْفٌ وَّثَلْثُمِائَةٍ اَوْ اَكْثَرُ ثُمَّ بَايَعَهُمْ عَلٰى اَنْ يُنَاجِزُوْا قُرَيْشًا وَاَنْ لَّا يَفِرُّوْا عَلَى الْمَوْتِ فَعَلِمَ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْوَفَاءِ وَالصِّدْقِ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا . هُوَ فَتْحُ خَيْبَرَ بَعْدَ اِنْصِرَافِهٖ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ .

১৮. আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারগণের উপর যখন তারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন– হুদায়বিয়ায় বৃক্ষের নিচে এটা হলো বাবলা গাছ। আর তাদের সংখ্যা হলো এক হাজার তিন শত কিংবা ততোধিক। তথায় নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে এ কথার উপর বায়'আত করিয়েছেন যে, তারা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করবেন এবং মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে যাবেন না। সুতরাং তাঁদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহ তা'আলা জেনে নিলেন অর্থাৎ ওয়াদা পূর্ণ করা এবং সত্যবাদিতা। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর সাকীনা [প্রশান্তি] নাজিল করলেন এবং অচিরেই তাদেরকে একটি বিজয় দান করলেন। আর তা হলো হুদায়বিয়া হতে নবী করীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তনের পর খায়বরের বিজয়।

١٩. وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط مِنْ خَيْبَرَ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

১৯. আর বিরাট অংকের গনিমতের মাল তারা আহরণ করবে খায়বর হতে। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী মহাকৌশলী। অর্থাৎ সর্বদাই তিনি উক্ত গুণে গুণান্বিত।

٢٠. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا مِنَ الْفُتُوْحَاتِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ غَنِيْمَةَ خَيْبَرَ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج فِيْ عِيَالِكُمْ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَهَمَّتْ بِهِمُ الْيَهُوْدُ فَقَذَفَ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلِتَكُوْنَ اَيِ الْمُعَجَّلَةُ عَطْفٌ عَلٰى مُقَدَّرٍ اَيْ لِتَشْكُرُوْهُ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ نَصْرِهِمْ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا . اَيْ طَرِيْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَتَفْوِيْضِ الْاَمْرِ اِلَيْهِ تَعَالٰى .

২০. আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মালের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যেটা তোমরা আহরণ করবে– বিজয়সমূহ হতে অনন্তর অনতিবিলম্বেই তোমাদেরকে দান করেছেন এটা খায়বরের গনিমত। আর লোকদের [আক্রমণের] হাতকে তোমাদের হতে বিরত রেখেছেন অর্থাৎ তোমাদের পরিবার পরিজনকে [হেফজাত করেছেন] যখন তোমরা যুদ্ধে বের হয়েছিলে এবং ইহুদিরা তোমাদের পরিবারবর্গের উপর আক্রমণের সংকল্প করেছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আর যাতে হয় তা– অর্থাৎ অবিলম্বে প্রাপ্ত গনিমত এটা উহ্য বাক্যের উপর আতফ হয়েছে– আর তা হলো لِتَشْكُرُوْهُ [যাতে তোমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পার।] ঈমানদারগণের জন্য নিদর্শন তাদের সাহায্যের ব্যাপারে আর যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখাতে পারেন সরল-সঠিক পথ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করার এবং সকল বিষয় তাঁর উপর সোপর্দ করার পদ্ধতি।

٢١. وَأُخْرَى صِفَةُ مَغَانِمَ مُقَدَّرٍ مُبْتَدَأً لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا هِيَ مِنْ فَارِسَ وَالرُّوْمِ قَدْ أَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ط عَلِمَ أَنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ـ اَيْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ ـ

২১. আর অন্য এটা উহ্য مَغَانِمُ শব্দের সিফাত (صِفَتْ) হয়েছে আর তা হলো مُبْتَدَأ যা এখনো তোমাদের হাতে আসেনি তা হলো রোম ও পারস্য হতে প্রাপ্য গনিমত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, শীঘ্রই এটা তোমাদের হস্তগত হবে। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বদা উক্ত গুণে গুণান্বিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ : এখানে يُبَايِعُوْنَكَ টা إِذْ رَضِيَ ফে'লের কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা إِذْ টা অতীতকালের জন্য ظَرْف -এর পর সর্বদাই جُمْلَة হয়ে থাকে। অতীতকালের অবস্থার বর্ণনার ভিত্তিতে বাইয়াতের সুরতকে উপস্থিত করার জন্য مُضَارِعْ -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর تَحْتَ টা يُبَايِعُوْنَكَ -এর ظَرْف হয়েছে।

قَوْلُهُ سَمُر : এটা رَجُل -এর ওযনে বাবলা গাছ/ বাবুল বৃক্ষ। কেউ কেউ বলেন, ঝাউ গাছকে سَمُر বলা হয়।

قَوْلُهُ أَنْ لَا يَفِرُّوْا عَلَى الْمَوْتِ : কোনো নুসখায় রয়েছে مِنَ الْمَوْتِ উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, মৃত্যু থেকে পলায়নের রাস্তা গ্রহণ করবে না। মুফাসসির (র.) مِنْ -এর পরিবর্তে عَلٰى এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এক রেওয়ায়েতে এটাও রয়েছে যে, বায়'আত মৃত্যুর উপর হয়েছিল। আর অন্য বর্ণনাতে রয়েছে যে, বায়'আত সুদৃঢ় থাকা ও পলায়ন না করার উপর হয়েছিল।

قَوْلُهُ فَعَلِمَ : এখানে عَلِمَ -এর আতফ হয়েছে إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ -এর উপর। এখন এ প্রশ্ন রয়ে গেল যে, মাতূফ হলো مُضَارِعْ আর مَعْطُوْف عَلَيْه হলো مَاضِيْ

এর জবাব হলো إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ টা مَاضِيْ -এর অর্থে। যেমনটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَنْزَلَ : এর আতফ رَضِيَ -এর উপর হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً : এর আতফ হয়েছে فَتْحًا قَرِيْبًا -এর উপর।

قَوْلُهُ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ : যেহেতু এটা অনুদান ও অনুগ্রহের স্থান, তাই উত্তম রূপে সম্বোধনের জন্য গায়েব থেকে খেতাবের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা আহলে হুদায়বিয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنَ الْفُتُوْحَاتِ : মুফাসসির (র) مِنَ الْفُتُوْحَاتِ বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এই আতফ مُغَايَرَتْ -এর জন্য। অর্থ হলো প্রথম مَغَانِمَ كَثِيْرَةً যা مَعْطُوْف عَلَيْه -এর দ্বারা খায়বরের গনিমত উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় গনিমত যা مَعْطُوْف -এর দ্বারা খায়বর ব্যতীত অন্যান্য গণিমত উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ غَنِيْمَةَ خَيْبَرَ : যদি এ আয়াত খায়বর বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়; যেমনটি সুস্পষ্ট, তবে পূর্ণ সূরাটা হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে অবতীর্ণ হয়নি। আর যদি এটি খায়বর বিজয়ের পূর্বে অবতীর্ণ হয় তবে এটা অদৃশ্য সংবাদের অন্তর্গত হবে। আর ফে'লে মাযী দ্বারা ব্যক্তকরণ বিষয়টি সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে হবে। এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, পূর্ণ সূরা হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'আসফানে'র নিকটবর্তী 'কুরাউল গাইম' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছিল।

قَوْلُهُ فِيْ عِيَالِكُمْ اَيْ عَنْ عِيَالِكُمْ : এটা عَنْ عِيَالِكُمْ হতে পরিবর্তিত। এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَوْلُهُ اُخْرٰى : আয়াত– "وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا" -এর মধ্যস্থিত اُخْرٰى -এর মহল্লে ই'রাব -এর ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যথা–

Free @ www.e-ilmweebly.com

১. এটা (أُخْرٰى) রফার মহল্লে হবে। এমতাবস্থায় এর দুটি অবস্থা হবে। যথা–

ক. এটা (أُخْرٰى) মুবতাদা এবং "لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا" তার صِفَتْ আর "قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا" তার - خَبَرٌ

খ. অথবা এটা উহ্য মুবতাদার خَبَرٌ

২. এটা مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হবে। মূল ইবারত হবে– وَعَدَكُمْ اُخْرٰى অথবা فِعْلٌ مُضْمَرٌ عَلٰى شَرْطِ التَّفْسِيْرِ হিসেবে মানসূব হবে। ইবারত হবে– وَقَضَى اللّٰهُ اُخْرٰى الخ

৩. اُخْرٰى মাজরূর হবে। এমতাবস্থায় এর পূর্বে رُبَّ মাহযূফ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ : শানে নুযূল : হুদায়বিয়ায় মুসলমানগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট মৃত্যুর উপর যে বায়'আত করেছিলেন এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অত্র বাইয়াতের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ–

নবী করীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির জুলকাআদ মাসে প্রায় দেড় সহস্র সাহাবীগণসহ ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাঁকে বাধা প্রদান করবে– মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাই সাধারণ পথ ত্যাগ করত পার্বত্য পথ পাড়ি দিয়ে সাহাবীগণসহ তিনি হুদায়বিয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হলেন এবং তথায় অবস্থান করলেন। কুরাইশদের পক্ষ হতে বুদায়েল বিন ওয়ারাকা, ওরওয়াহ ইবনে মাসউদ এবং আরো কয়েকজন দূত পর পর নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল। নবী করীম ﷺ তাদের মারফত কুরাইশদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আমরা শুধু ওমরা পালনের উদ্দেশ্যেই এসেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা মক্কা দখলের কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই। কিন্তু কুরাইশরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল– তাদের একই কথা আমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাথীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেব না।

রাসূল ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন মক্কায় প্রেরণের জন্য। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং হযরত ওসমান (রা.)-কে পাঠানোর পরামর্শ দিলেন। হযরত ওসমান (রা.) কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট নবী করীম ﷺ -এর বার্তা পৌঁছে দিলেন। তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের সাথে হাদীর পশুও রয়েছে– সেগুলোকে ওমরা পরবর্তী কুরবানির উদ্দেশ্যে তাঁরা নিয়ে এসেছেন। কুরাইশরা তা মানতে রাজি হলো না। তারা বলল, ইচ্ছা হয় তুমি নিজেই বায়তুল্লার তওয়াফ করে যেতে পার। কিন্তু হযরত ওসমান (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ব্যতীত আমি ওমরা পালন করতে পারি না– বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারি না। কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে আটক করে রাখল।

এ দিকে মুসলমানদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে শহীদ করে ফেলেছে। এতদশ্রবণে নবী করীম ﷺ -ও মর্মাহত হলেন। তিনি সাহাবীগণকে ডাকলেন। সমবেত সাহাবীগণ একটি বাবলা গাছের নিচে নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করলেন যে, আমরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করব– হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করব এবং মৃত্যুর ভয়ে ময়দান ত্যাগ করব না। এটাই ইতিহাসে "بَيْعَتِ رِضْوَانْ" হিসেবে খ্যাত।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচ্য আয়াত কয়টি নাজিল হয়েছে। এতে বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণের ফজিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় আমরা কথাবার্তা ও আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ হতে এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, اَلْبَيْعَةَ - اَلْبَيْعَةَ অর্থাৎ বায়'আত গ্রহণ করুন– বায়'আত। ইতোমধ্যে হযরত জিবরাইল (আ.) অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন আমরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট দৌড়ে গেলাম। দেখলাম যে, তিনি একটি বৃক্ষের নিচে রয়েছেন। তখন আমরা তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম। এটাকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন– لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব বেদুঈনদের কথা বলা হয়েছে, যারা হুদায়বিয়ার অভিযানে শরিক হয়নি এবং এজন্যে ভিত্তিহীন ওজর-আপত্তি পেশ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আর আলোচ্য আয়াতে খাঁটি মুমিনদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা হুদায়বিয়ায় একটি বৃক্ষতলে রাসূলে কারীম ﷺ -এর হস্ত মোবারকে এ মর্মে বায়'আত করেছিলেন যে, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও রাসূলে কারীম ﷺ -কে সাহায্য করতে থাকবেন এবং ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করবেন। আলোচ্য আয়াতে এমন ত্যাগী, নিবেদিত প্রাণ মুমিনগণের প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

যে বৃক্ষের নিচে বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল : হুদায়বিয়ায় যে গাছের নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান হয়েছে, আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) তার নাম উল্লেখ করেছেন সামুরাহ্ বা বাবলা গাছ। বিভিন্ন বর্ণনা হতে উক্ত বৃক্ষটির নাম বাবলাই পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের দ্বিমত পরিলক্ষিত হয় না।

তবে যেই গাছটির নিচে বাইআতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল পরবর্তীতে তার কি পরিণতি হয়েছে– এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও মুফাসসিরীনে ইজামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তা নিম্নরূপ–

১. আল্লাহর পক্ষ হতে পরবর্তী সময়ে উক্ত গাছটি মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং 'তাবাকাতে ইবনে সা'আদে' হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বাই'আতে রেদওয়ানের পর কয়েক বৎসর ধরে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উক্ত গাছটির খোঁজ করেছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাকে খুঁজে বের করতে পারেননি। কাজেই গাছটি যে ঠিক কোনটি ছিল এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

   তাবাকাত ইবনে সা'আদ এবং বুখারী-মুসলিমে হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) হতে সহীহ্ সনদে বর্ণিত রয়েছে– তিনি বলেছেন যে, তাঁর পিতা হযরত মুসাইয়্যাব (রা.) বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন। তিনি আমাকে বলেছেন বাইয়াতের পরের বৎসর যখন আমরা ওমরাতুল ক্বাজা পালনের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করলাম তখন তা আমাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বহু অন্বেষণ করেও আমরা তার সন্ধান পাইনি।

   হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র) হতে এও বর্ণিত আছে যে, একবার হজের যাত্রাপথে তিনি কতিপয় লোককে হুদায়বিয়ায় একটি গাছের নিচে নামাজ পড়তে দেখলেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা এখানে নামাজ পড়ছ কেন? তারা বলল, এটা সেই গাছ যার নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা.) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, রাসূল ﷺ -এর সাহাবীগণ যারা উক্ত বাইয়াতে শরিক ছিলেন তাঁরা বলেছেন, পরবর্তী বৎসর তাঁরা বহু খুঁজেও সে গাছটি শনাক্ত করতে পারেননি। অথচ তোমরা তাকে শনাক্ত করতে পেরেছ। সুতরাং বুঝা যায় যে, তোমরা সাহাবীগণ (রা.) হতেও এতদসম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখ।

২. উক্ত বৃক্ষটি যার নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছে– তা পরবর্তীতেও পরিচিত ছিল। লোকজন এটাকে চিনত এবং বরকতের উদ্দেশ্যে তার নিচে নামাজ পড়ত।

৩. একদল আলেমের মতে উক্ত বৃক্ষটিকে কেটে ফেলা হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা পরবর্তীতে উক্ত বৃক্ষের নিচে নামাজ পড়া শুরু করেছিল। বিষয়টি হযরত ওমর (রা.)-এর নজরে পড়লে তিনি লোকদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং বৃক্ষটি কেটে ফেললেন।

তাফসীরে ইবনে জারীরে উল্লেখ আছে যে, হযরত ওমর (রা.) তার খেলাফতের আমলে হুদায়বিয়ার নিকট দিয়ে একবার অতিক্রম করেছিলেন। তখন তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, যে গাছটির নিচে বাইআত সংঘটিত হয়েছিল তা কোথায়? এতে একেকজন একেকটি দেখিয়েছিল। তখন তিনি তাদেরকে তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করলেন।

উক্ত বৃক্ষটি কেন কাটা হয়েছিল? অথবা কেন ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল? : নবী করীম ﷺ যে গাছটির নিচে বাইয়াতে রিদওয়ান গ্রহণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা কেটে দেওয়া হয়েছে অথবা মানুষের অন্তর হতে তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) সেটাকে কর্তন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তিনি দেখেন, লোকেরা তার নিচে ভীড় জমাচ্ছে– নামাজ পড়ছে এবং তাকে অসিলাহ বানিয়ে মঙ্গল কামনা করছে– তখন তিনি তা কাটার জন্য নির্দেশ দিলেন। কেননা কোনো বৃক্ষ মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ এর কারণ হতে পারে না। আর এর দ্বারা মানুষ ধীরে ধীরে শিরকের দিকে ধাবিত হতে পারে। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু উক্ত গাছটির নিচে একটি উত্তম কার্য সম্পাদিত হয়েছে এবং লোকেরা তাকে কল্যাণদাতা মনে করে অন্ধ আনুগত্যে মেতে উঠতে পারে এবং বাড়াবাড়ি করে ফেতনার সৃষ্টি করতে পারে সেহেতু মানুষের মন হতে এটাকে বিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছে বা গোপন করে ফেলা হয়েছে।

রাফেজী ও তাদের অনুসারীদের আকীদা খণ্ডন : لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন এবং তাঁদের ভুল-ত্রুটি মার্জনা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ সকল সাহাবী এমন কি অপরাপর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাহাবীগণকেও দোষারোপ করা, তাঁদের সমালোচনা করা, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা কোনোক্রমেই ঠিক হবে না। যেমনটি রাফেজী সম্প্রদায় করে থাকে। রাফেজীরা হযরত আবূ বকর, ওমর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণের উপর কুফর ও নিফাকের অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে। [নাউজুবিল্লাহ]

অথচ হুদায়বিয়ার এ ভয়াবহ মুহূর্তে আল্লাহর দীনের জন্য মৃত্যুবরণ ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাঁদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানে একনিষ্ঠ-আন্তরিক এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্যে আত্মদানের ভাবধারায় পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চতর মানে উন্নীত ছিল। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে অনুরূপ সনদ প্রাপ্তির পর কেউ যদি তাঁদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে অথবা তাঁদের প্রতি রূঢ় ও খারাপ ভাষা ব্যবহার করে কিংবা বিষোদগার সৃষ্টির অপপ্রয়াস করে তখন তা খোদ আল্লাহ তা'আলার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর হবে।

অবশ্য কেউ ধারণা পোষণ করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁদের সন্তুষ্টির সনদ করেছিলেন তখন তাঁরা নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু পরে আল্লাহদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। আর এরূপ ধারণা হবে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এক কঠিন ভ্রমে নিমজ্জিত হওয়া। কেননা এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে যে, তাদের ধারণা হলো যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে অত্র আয়াত নাজিল করেছিলেন তখন তিনি তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মূলত লোকেরা সাহাবীগণের ব্যাপারে অপবাদে জড়িয়ে পড়বে অমূলক ও ভিত্তিহীন ধারণায় লিপ্ত হবে বলেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমের বিভিন্ন স্থানে অকাট্যভাবে সাহাবীগণের সততা, সাধুতা ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন, তাঁদের চরিত্রকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সত্যায়িত করেছেন।

হুদায়বিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যার ব্যাপারে মতবিরোধ : নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় কতজন সাহাবী অংশ গ্রহণ করেছেন এবং কতজন বাইয়াতে রিদওয়ানে শরিক হয়েছেন? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. সাহাবী হযরত ইবনে আবী আওফা (রা.) হতে তাঁদের সংখ্যা [১৩০০] এক হাজার তিনশত জন বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং ইমাম মুসলিম ও বুখারী (র.) তাঁর সনদে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন–

عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رض) قَالَ اِنَّهٗ ﷺ بَعَثَ عُثْمَانَ اِلٰى قُرَيْشٍ لِلصُّلْحِ فَاحْتَبَسَهٗ قُرَيْشٌ فَبَلَغَ النَّبِىَّ اَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا نَبْرَحُ حَتّٰى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ وَدَعَاهُمْ اِلَى الْبَيْعَةِ فَبَايَعُوْا وَهُمْ اَلْفٌ وَّثَلٰثُ مِاَةٍ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আবী আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কুরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তখন কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা.)-কে বন্দী করে রাখল। নবী করীম ﷺ -এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ বলেন, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা ফিরে যাবো না। অতঃপর নবী করীম ﷺ সাহাবীগণকে বায়'আত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। সেই সময় সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত জন।

৩. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত অথবা ততোধিক।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার পাঁচশত।

৫. বুখারী শরীফে হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত।

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে কেউ কেউ বলেছেন যে, মদীনা হতে বের হওয়ার সময় তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত। পথে লোকসংখ্যা বেড়ে ক্রমান্বয়ে চৌদ্দশত ও পনেরশতে পৌঁছেছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক আজাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার তিনশত জন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক গোলামের সংখ্যা ছিল এক শত, তাছাড়া অপ্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা ছিল একশত। মোট সংখ্যা এক হাজার পাঁচ শত জন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهٗ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا অর্থাৎ সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে এক নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতে 'নিকটবর্তী বিজয়' দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর দ্বারা খায়বরের বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। খায়বরের যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল লাভ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, উক্ত গনিমতের মাল শুধুমাত্র যারা হুদায়বিয়ায় শরিক হয়েছে তারাই লাভ করবে এবং তারাই শুধু খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, নবী করীম ﷺ ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে হুদায়বিয়ায় গমন করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখন হুদায়বিয়া হতে ফিরে এসেছেন এবং কতদিন মদীনায় অবস্থানের পর খায়বরে অভিযান পরিচালনা করেছেন? এ ব্যাপারে মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী তিনি জিলহজ মাসে মদীনায় ফিরে আসেন এবং সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে খায়বর গমন করেন, আর সফর মাসে তা বিজয় হয়। ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কারো কারো মতে, হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম ﷺ বিশ দিন মদীনায় অবস্থান করত খায়বরে অভিযান পরিচালনা করেন।

কেউ কেউ বলেছেন, হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিন মদীনায় অবস্থান করত নবী করীম ﷺ খায়বরে অভিযান পরিচালনা করেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রতিশ্রুত সেই বিজয়ের কথা অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. উক্ত বিজয় যে অবশ্যই ঘটবে এবং এর সংগঠনের ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয়ের অবকাশ নেই তা বুঝাবার জন্যই অতীতকাল-জ্ঞাপক সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. সূরা فَتْح -এর সম্পূর্ণ অংশ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে নাজিল হয়নি; বরং তার কিছু অংশ খায়বরের বিজয়ের পর নাজিল হয়েছে। সুতরাং খায়বরের বিজয় সংক্রান্ত এই আয়াতগুলো শেষোক্ত অংশভুক্ত।

খায়বর কখন বিজিত হয় : নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর দশ দিন মতান্তরে বিশ দিন মদীনায় অবস্থান করত সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে খায়বর আক্রমণ করলেন। আল্লাহ তা'আলার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নবী করীম ﷺ -এর সাথে উক্ত যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁরাই অংশগ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁর সাথে হুদায়বিয়ায় শরিক ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণসহ রাত্রি বেলায় খায়বরে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর দিনের বেলায় তাদের উপর আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। খায়বর ছিল প্রভাবশালী ইহুদিদের বসতি। তাদের ছিল বহু দুর্ভেদ্য সুরক্ষিত দুর্গ। প্রথমত নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু তারা পুরোপুরি সফলতা অর্জন করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে ইহুদিদের সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক সুরক্ষিত কামুস দুর্গ বিজিত হয়।

নিশ্চিত পরাজয় অনুধাবন করতে পেরে অন্যান্য দুর্গের অধিবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়, নবী করীম ﷺ তা গ্রহণ করেন। তাদের থেকে নগদ যে সম্পদ লাভ হয় তা মুজাহিদীনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। তাদের ভূমি এ শর্তে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যে, এর অর্ধেক ফসল তারা মুসলমানদেরকে দেবে। এই যুদ্ধে ১৫ জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন এবং ৯৩ জন ইহুদি নিহত হয়েছে।

বাইআতে রিদওয়ানে কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এতদসংক্রান্ত পরস্পর বিরোধী বর্ণনাসমূহের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা যায়? : নবী করীম ﷺ হুদায়বিয়ায় সাহাবীগণ হতে কিসের উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন? এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মুসলিম (র.) হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– بَايَعْنَا عَلٰى اَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ। অর্থাৎ সেদিন আমরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বাইআত গ্রহণ করেছিলাম যে, আমরা যুদ্ধের ময়দান হতে পশ্চাদপসরণ করব না। আমরা মৃত্যুর উপর বায়'আত গ্রহণ করিনি।

২. অথচ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া' (রা.) হতে এর বিপরীত নিম্নোক্ত বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে–

"عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلٰى اَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ"

অর্থাৎ হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবি উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি সালমাহ ইবনে আকওয়া' (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনারা হুদায়বিয়ার দিন নবী করীম ﷺ -এর হাতে কিসের উপর বায়'আত করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মৃত্যুর উপর।

সুতরাং উপরিউক্ত হাদীস দু'খানা হতে পরস্পর বিরোধী দুটি বক্তব্য সাব্যস্ত হয়েছে। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস হতে সাব্যস্ত হয়, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন না করার উপর তাঁরা বায়'আত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে হযরত সালাম ইবনে আকওয়া (রা.)-এর হাদীস হতে প্রমাণিত হয়, মৃত্যুর উপর বায়'আত হয়েছিল।

বর্ণনাদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় : উপরিউক্ত পরস্পর বিরোধী হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে অত্র হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধিতা বা বৈপরীত্ব নেই। কেননা বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি যুদ্ধ হতে পশ্চাদপসরণ করব না। আর কেউ কেউ এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা মৃত্যুকে বাজি রেখে যুদ্ধ করব– অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করলেও আমরা যুদ্ধে পিছ পা হবো না।

আসলে হুদায়বিয়ায় তো সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করলেও হুদায়বিয়া হতে পশ্চাদপসরণ করবেন না। সম্পূর্ণ বক্তব্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে যারা অংশ বিশেষ শুনেছেন তারা তাই বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে যারা পুরোপুরি বক্তব্য শুনেছেন তাঁরা তদনুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ .... مُسْتَقِيْمًا : হুদায়বিয়ার সন্ধির ধারাবাহিকতায় নাজিলকৃত অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী বিজয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মূলত অত্র আয়াতখানা এ কথারই ইঙ্গিতবহ যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য পরাজয়ের গ্লানি তো নয়ই; বরং তা ভবিষ্যতের হাজারো বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ গনিমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– যা তোমরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিজয় হতে অর্জন করবে। আর এখন নগদ তোমাদেরকে খায়বরের বিজয় দান করা হলো। আর লোকদের আক্রমণ হতে তোমাদেরকে হেফাজত করা হয়েছে। তোমরা বের হয়ে যাওয়ার পর যখন ইহুদিরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে দিয়েছেন।

আর এ নগদ পাওনার উপর যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর এবং আল্লাহ যে ঈমানদারদেরকে সাহায্য করে থাকেন তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন থেকে যায়। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা যাতে তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাতে পারেন। আল্লাহর উপর যেন তোমরা তাওয়াক্কুল ও ভরসা করতে শিখ এবং নিজের সব বিষয় আল্লাহর উপর সমর্পণ করতে অভ্যস্ত হও।

আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর বাণী– "وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ" [আর লোকদের হাত তথা হামলা হতে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেফাজত করেছেন] -এর মধ্যে اَلنَّاسُ দ্বারা মদীনার ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। মুসলমানগণ হুদায়বিয়ার দিকে বের হয়ে যাওয়ার পর ইহুদিরা এ মনস্থ করেছিল যে, তারা মুসলমানদের পরিবার-পরিজনের উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন, ফলে তারা আর আক্রমণ করার সাহস পেল না।

কারো কারো মতে মুশরিকদের একটি গুপ্ত ঘাতকদল এ জন্য হুদায়বিয়ায় এসে পৌঁছল যে, সুযোগ বুঝে তারা নবী করীম ﷺ -কে শহীদ করে দেবে। তারা কিছুটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছিল। এমনকি একজন মুসলমানকে শহীদও করে ফেলেছিল। সাহাবীগণ তাদেরকে বন্দী বানিয়ে নবী করীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করলেন; কিন্তু দয়ার সাগর মহানবী ﷺ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আরেক দল মুশরিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর অতর্কিতে হামলা করে বসল। কিন্তু মুসলমানগণ তাদেরকে বন্দী করে নবী করীম ﷺ -এর নিকট নিয়ে আসলেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অপরদিকে এটাও আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত যে, উক্ত সময় কোনো শত্রুশক্তিও মদীনার উপর আক্রমণ করার সাহস পায়নি। অথচ চৌদ্দশত যোদ্ধা বাইরে চলে যাওয়ার পর মদীনা প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং ইহুদি, মুনাফিক ও মুশরিকরা এ মুহূর্তে সুযোগ গ্রহণ করতে পারত। সহজেই তারা অরক্ষিত মদীনা দখল করে নিতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়-ভীতি ঢেলে দিয়েছেন– সে কারণে তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।

قَوْلُهُ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا ..... شَيْءٍ قَدِيرًا : খায়বরের পরও আরো বহু বিজয় ও গনিমত যে মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করছে– এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

তোমাদের জন্য আরো বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল রয়েছে– যা এখনো তোমাদের হস্তগত হয়নি। রোম, পারস্য ও অন্যান্য রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে তোমরা তা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলার নিশ্চিত জানা রয়েছে যে, তা তোমরা লাভ করবেই। আর আল্লাহ পাক তো সর্বশক্তিমান– তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। জয়-পরাজয়ের মালিক তিনি। যাকে ইচ্ছা জয়ের মাল্যে ভূষিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জিত করেন।

"আর এটা ভিন্ন অন্যান্য গনিমত যা তোমাদের হস্তগত হয়নি"-এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا" আর এটা ছাড়া আরো বহু গনিমত রয়েছে যা এখনো তোমাদের হস্তগত হয়নি– অচিরেই তোমরা তার মালিক হবে।" এটার দ্বারা কোন গনিমত উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে নিম্নোক্ত মতপার্থক্য রয়েছে–

১. জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন, আলোচ্য আয়াতে উক্ত গনিমতের মাল দ্বারা রোম ও পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে অর্জিতব্য গনিমতের মালকে বুঝানো হয়েছে।

২. ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান, মুকাতিল, ইবনে আবী লাইলা (র.) প্রমুখ মনীষীগণের মতে এর দ্বারা মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়সমূহকে বুঝানো হয়েছে।

৬. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এটা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিজয়সমূহকে বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, এটা দ্বারা হুনায়েনের বিজয় উদ্দেশ্য।

৪. হযরত কাতাদা ও হাসান (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. ইবনে জায়েদ ইবনে ইসহাক, যাহহাক (র.) প্রমুখ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী এর দ্বারা খায়বরের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।

মোদ্দাকথা, বাইয়াতে রিদওয়ানের নগদ প্রতিদান খায়বর বিজয়ের মাধ্যমে পাওয়া গেল। আর মক্কা বিজয় যদিও তাৎক্ষণিকভাবে হয়নি, তথাপি তা বাইয়াতে রিদওয়ানের বরকতেই পরবর্তীতে অর্জিত হয়েছে। বলা যায় মুসলমানদের পরবর্তী পর্যায়ের হাজারো বিজয়ের সোনালী সূচনা রচিত হয়েছিল এ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমেই।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٢. وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْحُدَيْبِيَةِ لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا يَحْرُسُهُمْ وَّلَا نَصِيْرًا .

২২. আর যদি কাফেররা লড়াই করে তোমাদের সাথে হুদায়বিয়ায়– তাহলে অবশ্যই তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তারা কোনো মুরব্বি [বন্ধু] – ও পাবে না– যে তাদেরকে রক্ষা করবে আর না কোনো সাহায্যকারী পাবে।

٢٣. سُنَّةَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ مِنْ هَزِيْمَةِ الْكَافِرِيْنَ وَنَصْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ سَنَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ سُنَّةَ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا مِنْهُ .

২৩. আল্লাহর [চিরন্তন] নীতি হলো– এখানে سُنَّةَ শব্দটি مَصْدَرٌ এটা তার পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবার্থ তথা কাফেরদের পরাজয় ও ঈমানদারদের সাহায্য করার জন্যে তাকিদ প্রদানকারী হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে নীতি হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন– যে, তিনি কাফেরদেরকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করবেন এবং ঈমানদারকে বিজয় দান করবেন। যা পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তুমি আল্লাহ তা'আলার এ নীতিতে কোনোরূপ রদবদল ও পরিবর্তন দেখবে না। তা হতে।

٢٤. وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط فَاِنَّ ثَمَانِيْنَ مِنْهُمْ طَافُوْا بِعَسْكَرِكُمْ لِيُصِيْبُوْا مِنْكُمْ فَاُخِذُوْا وَاُتِىَ بِهِمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَفَا عَنْهُمْ وَخَلّٰى سَبِيْلَهُمْ فَكَانَ ذٰلِكَ سَبَبَ الصُّلْحِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا . بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ .

২৪. তিনি সেই পবিত্র সত্তা যিনি তাদের হাতকে তোমাদের হতে বিরত রেখেছেন এবং তোমাদের হাতকে তাদের হতে বিরত রেখেছেন মক্কার উপত্যকায়– হুদায়বিয়ায় তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর– সুতরাং তাদের আশিজন তোমাদের বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্য সুযোগ খুঁজে ফিরছিল। তখন তাদেরকে বন্দী করা হলো এবং রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্ত করে দিলেন। আর এটাই সন্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ তা'আলা দেখেন। এখানে تَعْمَلُوْنَ শব্দটি تَا ও ى উভয়ের সাথে পড়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই উক্ত গুণে গুণান্বিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سُنَّةَ اللّٰهِ : سُنَّةَ اللّٰهِ নসবের মহল্লে হয়েছে। এর পূর্বে একটি فِعْل উহ্য থেকে এটাকে নসব প্রদান করেছে। মূল ইবারত হবে– سَنَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ سُنَّةً

قَوْلُهُ تَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ; অত্র আয়াতে يَعْمَلُوْنَ শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ تَعْمَلُوْنَ – ت যোগে جَمْع مُذَكَّر حَاضِر -এর সীগাহ দ্বারা পড়েছেন।

২. আবূ আমর (র.) يَعْمَلُوْنَ – ى যোগে جَمْع مُذَكَّر غَائِب -এর সীগাহ হিসেবে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ ..... عَلَيْهِمْ : **শানে নুযূল** : অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে তা হতে কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করা হলো–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল মুজানী (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমরা যখন হুদায়বিয়ায় ঐ বৃক্ষের নিচে অবস্থান করলাম যার উল্লেখ কুরআনে করা হয়েছে– এমতাবস্থায় আশিজন মুশরিক যুবক আমাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল– তারা অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে অভিশাপ দিলে আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করে দেন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কারো সাথে চুক্তি করে এসেছ? নাকি কেউ তোমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ দান করেছে? তারা তা অস্বীকার করল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্তি দিয়ে দিলেন।

২. হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশ মুশরিকদের আশি জনের একটি দল মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য অস্ত্র–শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তানঈম পাহাড়ের উপর দিয়ে এসেছিল। সাহাবীগণ তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসল এবং নবী করীম ﷺ তাদেরকে জীবন্ত ছেড়ে দিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত আয়াতটি নাাজিল হয়েছিল।

৩. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে সত্তর অথবা আশিজন কুরাইশ কাফের মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য তানঈম পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে এসেছিল। সাহাবীগণ (রা.) তাদের সকলকে বন্দী করে নবী করীম ﷺ -এর নিকট হাজির করলেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তি দিলেন না; বরং তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

৪. কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, একবার কতিপয় মুশরিক ফজরের সময় মুসলমানদের উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বসল। সাহাবীগণ পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির করলেন। কিন্তু দয়াল নবী ﷺ তাদেরকে শাস্তি দিলেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং মুক্তি দিয়ে দিলেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ ..... وَلَا نَصِيْرًا : হুদায়বিয়ায় নবী করীম ﷺ বাহ্যত কিছুটা নতজানু হয়ে মক্কার কুরাইশ কাফেরদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। এতে সাহাবীগণ যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু এ সন্ধির মধ্যে মুসলমানদের জন্য এক সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত ছিল তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি। সুতরাং হুদায়বিয়াহ হতে বেদনাবিধুর ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরার পথে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতখানা নাজিল করে উক্ত সন্ধির নেপথ্য রহস্য সাহাবীগণকে বুঝিয়ে দিলেন এবং তাঁদের হতাশ অন্তরে সান্ত্বনার বারি বর্ষণ করলেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

আল্লাহ তা'আলা এ জন্য হুদায়বিয়ায় তাঁর নবীকে সংঘর্ষের অনুমতি দেননি যে, যুদ্ধ বাধলে মুসলমানরা পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হতো; বরং এর পেছনে ভিন্ন রহস্য নিহিত ছিল। আর তা হলো, আপাতত রক্তক্ষয় ও সংঘর্ষ এড়িয়ে কুরাইশদেরকে রাজনৈতিক ও আদর্শিক দিক হতে পরাস্ত করা। মুশরিকদের উপর মুসলমানদের নৈতিক ও আদর্শিক বিজয় প্রতিষ্ঠা করা। যাতে সামরিক দিক দিয়ে তারা আপনা আপনিই দুর্বল হয়ে পড়ে। আর বস্তুত হয়েছিলও তাই।

বস্তুত হুদায়বিয়ায় যদি মুশরিকরা তোমাদের মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত এবং তাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ বেধেই যেত, তাহলে নিঃসন্দেহে মুশরিকরা পরাজিত হতো। কেউ অভিভাবক হয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতো না।

মূলত কাফেরদেরকে পরাজিত করা এবং ঈমানদারগণকে বিজয় দান করাই আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি। কখনো তাঁর এ নীতির বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে হকেরই বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আর বাতিলকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নিতে হয় চিরবিদায়।

قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ ..... بَصِيْرًا : আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা যিনি হুদায়বিয়ায় মুশরিকদেরকে তোমাদের উপর আক্রমণ করা হতে বিরত রেখেছেন। অথচ তোমরা তো তাদেরকে বশ করেই বসেছিলে। আর আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদের সকল কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষ করেই থাকেন। সুতরাং তিনি তোমাদের হুদায়বিয়ায় কৃত কার্যকলাপও ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নবী করীম ﷺ প্রায় দেড় হাজার সাহাবীসহ হুদায়বিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মক্কায় বায়তুল্লাহর জিয়ারত তথা ওমরা পালন করাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু কুরাইশরা তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে সম্মত হলো না। তারা প্রতিজ্ঞা করল যে, কোনোক্রমেই তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না।

বাহ্যত মুসলমানগণ খারাপ পরিস্থিতিতে ছিলেন। কেননা তারা তো ওমরার ইহরাম বেঁধে প্রায় নিরস্ত্রভাবে তথায় গিয়েছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য মাত্র একখানা তরবারি ছাড়া তাদের নিকট অস্ত্র বলতে আর কিছুই ছিল না। তাছাড়া তাঁরা কেন্দ্র তথা মদীনা হতে বহু দূরে ছিলেন। অথচ মক্কা ছিল অতি নিকটে। কুরাইশরা ছিল অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত। এতদ্ব্যতীত আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের সমর্থনও তাদের পক্ষে ছিল। কাজেই যেকোনোভাবে তারা যুদ্ধ বেঁধে দিতে চেয়েছিল। মুসলমানদেরকে সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়ে দেওয়ার জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশে সাহাবীগণ চরম ধৈর্য প্রদর্শনপূর্বক সংঘর্ষ এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সুতরাং একবার কতিপয় মুশরিক মুসলমানদের ভেতরে ঢুকে পড়ে গোলযোগের চেষ্টা করল। মুসলমানগণ সুকৌশলে তাদেরকে বন্দী করে ফেললেন। আবার একদা ফজরের সময় একদল মুশরিক অকস্মাৎ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে বসল। সাহাবীগণ তাদেরকেও কয়েদ করতে সক্ষম হলেন। নবী করীম ﷺ উদারতা প্রদর্শন করত সকলকে মুক্ত করে দিলেন।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই হুদায়বিয়ায় মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সামগ্রিক কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবে যুদ্ধ হলে মুসলমানরাই বিজয়ী হতেন। তথাপি পূর্বাপর ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সেদিন যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মুসলমানগণ যা লাভ করতে পারত সন্ধির মাধ্যমে তদপেক্ষা বহুগুণ বেশি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِيْ كَفَّ ..... بِبَطْنِ مَكَّ : আল্লাহর বাণী- "هُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ .... بِبَطْنِ مَكَّةَ" -এর মধ্যে بَطْنِ مَكَّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, بَطْن -এর দ্বারা হুদায়বিয়াকে এবং مَكَّةَ -এর দ্বারা হেরেম শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। بَطْن অর্থ পেট, অন্তর্নিহিত যেহেতু হুদায়বিয়া হেরেম শরীফের অন্তর্ভুক্ত সে কারণে তাকে بَطْنِ مَكَّةَ বলা যথার্থ হয়েছে। অথবা হুদায়বিয়াকে এ জন্য بَطْنِ مَكَّةَ বলা হয়েছে যে, এটা হেরেম শরীফের সংলগ্ন এলাকা।

قَوْلُهُ سُنَّةَ اللّٰـ : আল্লাহ তা'আলা বাণী- "سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ" -এর মধ্যকার سُنَّةَ اللّٰهِ দ্বারা কি বুঝিয়েছেন- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

১. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে سُنَّةَ اللّٰهِ -এর দ্বারা নবী-রাসূলগণের বিজয়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন- অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ "আমিও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হবো।"

২. سُنَّةَ اللّٰهِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে পরিণামে হকপন্থিদেরই বিজয় অবধারিত। এ শর্তে যে, হক পন্থিগণ সামগ্রিকভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

৩. অথবা سُنَّةَ اللّٰهِ -এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অভ্যাসকে বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

٢٥. هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَىْ عَنِ الْوُصُوْلِ اِلَيْهِ وَالْهَدْىَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى كُمْ مَعْكُوْفًا مَحْبُوْسًا حَالٌ اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ط اَىْ مَكَانَهُ الَّذِىْ يُنْحَرُ فِيْهِ عَادَةً وَهُوَ الْحَرَمُ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ مَوْجُوْدُوْنَ بِمَكَّةَ مَعَ الْكُفَّارِ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ بِصِفَةِ الْاِيْمَانِ اَنْ تَطَئُوْهُمْ اَىْ تَقْتُلُوْهُمْ مَعَ الْكُفَّارِ لَوْ اُذِنَ لَكُمْ فِى الْفَتْحِ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ مِنْ هُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ اَىْ اِثْمٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج مِنْكُمْ بِهٖ وَضَمَائِرُ الْغَيْبَةِ لِلصِّنْفَيْنِ بِتَغْلِيْبِ الذُّكُوْرِ وَجَوَابُ لَوْلَا مَحْذُوْفٌ اَىْ لَاُذِنَ لَكُمْ فِى الْفَتْحِ لٰكِنْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيْهِ حِيْنَئِذٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ج كَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ لَوْ تَزَيَّلُوْا تَمَيَّزُوْا عَنِ الْكُفَّارِ لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ حِيْنَئِذٍ بِاَنْ نَاْذَنَ لَكُمْ فِىْ فَتْحِهَا عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا.

অনুবাদ :

২৫. তারা তো সেই লোক যারা কুফরি করেছে এবং তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে বিরত রেখেছে অর্থাৎ সেথায় পৌঁছা হতে এবং হাদী [কুরবানির জন্তু] এটা كُمْ জমীরের উপর আত্‌ফ হয়েছে। যাকে বারণ করা হয়েছে। বাধা প্রদান করা হয়েছে। এটা حَالٌ (مَعْكُوْفًا) হয়েছে। তার যথাস্থানে পৌঁছা হতে অর্থাৎ ঐ স্থানে পৌঁছা হতে যেথায় সাধারণত তাকে জবাই করা হয়। আর তা হলো হেরেম শরীফ। এটা بَدَلُ اِشْتِمَالٍ হয়েছে। আর যদি কিছু ঈমানদার নর-নারী না হতো, মক্কায় কাফেরদের সাথে অবস্থিত যাদের সম্পর্কে তোমাদের জানা নেই ঈমানদার হিসেবে যে তোমরা তাদেরকে পদদলিত করবে অর্থাৎ কাফেরদের সাথে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে– যদি তোমাদেরকে বিজয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। এটা هُمْ হতে بَدَلُ اِشْتِمَالٍ হয়েছে। ফলে তাদের কারণে তোমাদের উপর গুনাহ আরোপিত হতো। مَعَرَّةٌ অর্থ পাপ। অজানাবশত তোমাদের সম্পর্কে তা [না জানা থাকার কারণে] আর নামবাচক (هُمْ) সর্বনাম নর ও নারী উভয়ের জন্য হয়েছে– নরকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। لَوْلَا -এর জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তা হলে অবশ্যই তোমাদেরকে বিজয়ের অনুমতি দেওয়া হতো। কিন্তু এমতাবস্থায় এ জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি যে, যাতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে প্রবেশ করাতে পারেন যেমন উল্লিখিত ঈমানদারগণকে [প্রবেশ করিয়েছেন।] যদি তারা দূরে সরে যেত কাফেরদের দল হতে পৃথক হয়ে যেত তাহলে তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে অবশ্যই আমি শাস্তি দিতাম। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্য হতে যারা কাফের। তখন আমি তোমাদেরকে মক্কা বিজয়ের অনুমতি দিতাম। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পীড়াদায়ক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ...... وَالْهَدْيَ : আল্লাহর বাণী- "هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ" -এর মধ্যস্থিত اَلْهَدْيَ শব্দটির মধ্যে একাধিক কেরাত বিদ্যমান। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

১. জমহুর ক্বারীগণের মতে هَ -এর উপর জবর এবং د জযম ও ى -এর মধ্যে জবর হবে। অর্থাৎ- اَلْهَدْيَ -

২. আবূ আসেম ও ওমর (র.) প্রমুখগণের মতে د যেরযোগে এবং ى তাশদীদযোগে اَلْهَدِيَّ হবে।

৩. اِبْنُ خَالِدِيَه -এর তিনটি لُغَتْ বর্ণনা করেছেন- ক. اَلْهَدْيَ খ. اَلْهَدِيَّ ও গ. اَلْهُدَىٰ -[কামালাইন]

اَلْهَدْيَ শব্দটির কেরাতের ন্যায় মহল্লে ইরাবের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন-

১. জমহুর ওলামায়ে কেরাম (র.)-এর মতে اَلْهَدْيَ শব্দটি মানসূব হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা- ক. পূর্ববর্তী صَدُّوْكُمْ -এর كُمْ যমীরের উপর আতফ হবে। খ. অথবা, مَفْعُوْل مَعَهُ হবে।

২. কেউ কেউ এটাকে مَرْفُوْع পড়েছেন। এ হিসেবে যে, এটা فِعْل مُقَدَّر مَجْهُوْل -এর نَائِب فَاعِلْ হয়েছে। ইবারত হবে এরূপ- وَصُدَّ الْهَدْيُ

৩. এক বর্ণনায় আবূ আমর এটাকে مَجْرُوْر পড়েছেন। এমতাবস্থায় তা اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -এর উপর আত্‌ফ হবে।

قَوْلُهُ مَحِلَّهُ : مَحِلَّهُ -এর মহল্লে ইরাবের ব্যাপারে দুটি اِحْتِمَالْ রয়েছে।

১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা اَلْهَدْيَ হতে بَدَل اِشْتِمَالْ হবে।

২. অথবা এর হরফে জার হজফ বা উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। মূলত ইবারত হবে- عَنْ اَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ আর جَارّ ও مَجْرُوْر মিলিত হয়ে صَدُّوْا অথবা مَعْكُوْفًا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ الخ : শানে নুযূল : হুদায়বিয়ার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় মক্কায় এমন কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন সঙ্গত কারণে হিজরত করে মদীনায় আসতে পারেননি। তাছাড়া এমন বহু লোকও ছিল যারা পরবর্তীতে ঈমান আনবে বলে আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। আর তখন যুদ্ধ বেঁধে গেলে তাদের নিহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাঁদের শানে উক্ত আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

হযরত আবূ জুমআ জুনযুব ইবনে সাবআহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন- আমি দিনের প্রথমাংশে কাফের অবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। অথচ দিনের শেষাংশে মুসলমান অবস্থায় তাঁর পক্ষ থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আমরা তিনজন পুরুষ ও সাতজন মহিলা এই দলভুক্ত ছিলাম। আমাদের শানেই আয়াতে কারীমা- وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ الخ নাজিল হয়েছে। -[তাবারানী, লুবাব]

قَوْلُهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ .... بِغَيْرِ عِلْمٍ : হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের অনুমতি না দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- তোমাদেরকে হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ করা এবং মক্কা বিজয় করার অনুমতি না দেওয়ার কারণ হলো তখন মক্কায় কাফেরদের সাথে এমন বহু ঈমানদার নর-নারী রয়ে গেছে যাদের ঈমানদার হওয়া তোমাদের জ্ঞাত ছিল না। আর সে অজ্ঞতার কারণে কাফেরদের সাথে তোমরা তাদেরকেও হত্যা করতে এবং পাপী সাব্যস্ত হতে।

মুসলমানগণ যে, আন্তরিকতার সাথে দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং নবী করীম ﷺ -এর আনুগত্যে অটল ছিলেন তা আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। আর কাফেরদের অহেতুক বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবহিত। এ অবস্থায় করণীয় ছিল মুসলমানদের মাধ্যমে কাফেরদেরকে শায়েস্তা করা; কিন্তু এক সুদূরপ্রসারী কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে তা বাস্তবায়িত করা হয়নি। উক্ত কল্যাণের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। যথা-

যখন হুদায়বিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন মক্কায় এমন কিছু ঈমানদার নর-নারী ছিলেন যারা নিজেদের ঈমান লুকিয়ে রেখেছিলেন অথবা নিজেদের অসহায়ত্বের দরুন হিজরত করে মদীনায় যেতে অপারগ ছিলেন বিধায় মুশরিকদের কর্তৃক নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়েছিলেন। কাজেই এমতাবস্থায় যুদ্ধ বাঁধলে কাফের মুশরিকদের সাথে উক্ত ঈমানদারগণও নিহত হতেন। এতে মুসলমানদের মধ্যে অনুশোচনা ও পরিতাপের সৃষ্টি হতো এবং কাফেররা অপবাদ দেওয়ার সুযোগ পেত যে, মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের দীনি ভাইদেরকে হত্যা করেছে। সুতরাং মহান আল্লাহ উক্ত ঈমানদারগণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। অপরদিকে মুসলমানদেরকেও কলঙ্ক, দুর্নাম এবং অনুশোচনার হাত হতে হেফাজত করেছেন। আর এ কারণেই যুদ্ধ অনুমোদন করেননি।

২. আল্লাহ তা'আলা বিপুল রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে মক্কা বিজয় কামনা করেননি; বরং সামরিক দিকের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও আদর্শিক দিক দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। সুতরাং হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলামের আদর্শবাদ যখন জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ল তখন মূর্তিপূজার নিগূঢ় বন্ধন ছিন্ন করে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। যদ্দরুন মাত্র দেড় বৎসরের ব্যবধানে প্রায় বিনা রক্তপাতে মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করে নিলেন।

قَوْلُهُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الخ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, যদি মক্কায় অবস্থিত মুসলমানগণ কাফেরদের হতে পৃথক হয়ে যেতো, যদি তাদেরকে কাফেরদের হতে পৃথক করা সম্ভব হতো এবং কাফেরদেরকে আক্রমণ করলে তাদের নিহত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করতাম এবং তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু যেহেতু তখন যুদ্ধ সংঘটিত হলে কাফেরদের সাথে মক্কায় অবস্থিত ঈমানদারগণকে অজ্ঞাতসারে নিহত হতে হবে এজন্যই আমি যুদ্ধের অনুমতি দান করিনি।

কাফেরদের সাথে যদি ঈমানদারগণ মিশে থাকে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ হবে কিনা? : আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের সাথে যদি মুসলিমগণ মিশ্রিত থাকে অমুসলিমদের উপর হামলা করলে মুসলিমগণও হামলার শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলে এহেন পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের উপর হামলা করা জায়েজ নেই।

সুতরাং আবূ যায়েদ (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে কাসেম (র.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যদি মুশরিকদের কোনো ক্যাম্পে তাদের কর্তৃক অধিকৃত কিছু মুসলমানও তাদের সাথে থাকে তাহলে কি ঐ ক্যাম্প জ্বালিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে? ইবনে কাসেম (র.) বললেন, ইমাম মালেক (র.)-কেও ঠিক এই প্রশ্নটি করা হয়েছিল- 'আমরা কি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব" এমতাবস্থায় যে, তাদের ক্যাম্পে মুসলমান বন্দীও রয়েছে? ইমাম মালেক (র.) উত্তরে বলেছেন, এটা করা জায়েজ হবে না। কেননা মক্কাবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ যদি ঈমানদারগণ কাফেরদের হতে পৃথক হয়ে যেত তাহলে আমি কাফেরদেরকে অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আজাব প্রদান করতাম।

সুতরাং উপরিউক্ত অবস্থায় যদি কেউ ঐ ক্যাম্পে আক্রমণ করে এবং কোনো মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা হলে তাকে দিয়ত ও কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। অবশ্য আক্রমণকারীর যদি পূর্ব হতে জানা থাকে যে, উক্ত ক্যাম্পে মুসলমান রয়েছে তা হলেই কেবল উপরিউক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি উক্ত ক্যাম্পে মুসলমান আছে কিনা- তা জানা না থাকে এবং এমতাবস্থায় আক্রমণ করে তাহলে দিয়ত ও কাফ্ফারা কিছুই আদায় করতে হবে না। তাছাড়া মুসলিমগণ তো তখনই কাফেরদের ক্যাম্পে আক্রমণ পরিচালনা করে থাকে যখন নিশ্চিত হয় যে, তথায় কোনো মুসলমান নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

٢٦. اِذْ جَعَلَ مُتَعَلِّقٌ بِعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاعِلٌ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْاَنَفَةَ مِنَ الشَّئِ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ بَدَلٌ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَهِىَ صَدُّهُمُ النَّبِىَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى اَنْ يَعُوْدُوْا مِنْ قَابِلٍ وَلَمْ يَلْحَقْهُمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ مَا لَحِقَ الْكُفَّارَ حَتّٰى يُقَاتِلُوْهُمْ وَاَلْزَمَهُمْ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَلِمَةَ التَّقْوٰى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاُضِيْفَتْ اِلَى التَّقْوٰى لِاَنَّهَا سَبَبُهَا وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْكُفَّارِ وَاَهْلَهَا ط عَطْفُ تَفْسِيْرِىٌّ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَئٍ عَلِيْمًا . اَىْ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِذٰلِكَ وَمِنْ مَعْلُوْمِهِ تَعَالٰى اَنَّهُمْ اَهْلُهَا .

অনুবাদ :

২৬. যখন ভরে নিয়েছিল– এটা عَذَّبْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ কাফেররা– এটা فَاعِلٌ তাদের অন্তরে অহমিকা অহঙ্কার জাহিলিয়াতের অহমিকা এটা (حَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ) পূর্ববর্তী اَلْحَمِيَّةَ হতে بَدَلٌ হয়েছে। আর তা হলো তাদের পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাজিল করলেন। সুতরাং তাঁরা এ মর্মে মুশরিকদের সাথে সন্ধিতে সম্মত হলেন যে, পরবর্তী বৎসর তাঁরা [ওমরা করার জন্য] পুনরায় আসবেন। আর কাফেরদের ন্যায় তাঁরা অহমিকায় লিপ্ত হননি। নতুবা তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন। আর তাদের উপর অপরিহার্য [অত্যাবশ্যক] করে দিলেন– অর্থাৎ ঈমানদারদের তাকওয়ার কালিমা তথা "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ"; এখানে كَلِمَةَ -কে এ জন্য তাকওয়ার দিকে সম্বোধন করা হয়েছে, কেননা তাকওয়ার কারণেই মানুষ তা পাঠ করে থাকে। বস্তুত তারাই ছিল এর অধিক হকদার– উক্ত কালিমার, কাফেরদের তুলনায়। আর [তারাই ছিল] এর যোগ্য পাত্র– এটা আত্ফে তাফসীর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞাত অর্থাৎ তিনি সর্বদাই উক্ত গুণে গুণান্বিত। আর আল্লাহ তা'আলার এটাও জানা রয়েছে যে, তারাই এ কালিমার উপযুক্ত পাত্র।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ এখানে اِذْ শব্দটি ظَرْف বা مَفْعُوْل فِيْهِ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে।

এখানে اِذْ -এর মধ্যে যে فِعْل টি আমল করেছে তাকে উহ্য ধরা হবে অথবা তা উল্লেখ রয়েছে বলে গণ্য হবে।

সুতরাং যদি এর মধ্যে আমলকারী فِعْل উল্লেখ আছে বলে ধরা হয়, তাহলে তার দুটি অবস্থা হবে। যথা–

১. এর মধ্যে আমলকারী فِعْل হলো صَدُّوْا ; মূলত বাক্যটি এরূপ হবে– وَصَدُّوْكُمْ حِيْنَ جَعَلُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الخ অর্থাৎ তারা তোমাদেরকে তখন বারণ করেছে যখন তাদের অন্তরে অন্ধ অহমিকা স্থান করে নিয়েছিল।

২. অথবা إِذْ-এর উপর আমলকারী فِعْل হলো- لَعَذَّبْنَا ; মূল ইবারত হবে- لَعَذَّبْنَاهُمْ حِيْنَ جَعَلُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الخ অর্থাৎ যখন তারা তাদের অন্তরে অন্ধ অহমিকা ও মিথ্যা আভিজাত্যকে স্থান দিয়েছিল তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

অপর দিকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, إِذْ-এর মধ্যে আমলকারী فِعْل উহ্য রয়েছে তাহলেও এর দুটি অবস্থা হবে। যথা-

১. একটি হলো, إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ অর্থাৎ যখন কাফেররা তাদের অন্তরে অন্ধ আভিজাত্যবোধ ও ঘৃণ্য অহমিকাকে স্থান দিয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে হেফাজত করেছেন।

২. দ্বিতীয়টি হলো- أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ অর্থাৎ কাফেররা যখন মিথ্যা অহংকার ও দাম্ভিকতায় মেতে উঠেছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর ইহসান করেছেন এবং তোমাদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দিয়েছেন।

قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ : এর আতফ উহ্যের উপর হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো এরূপ- فَضَاقَتْ صُدُوْرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاشْتَدَّ الْكَرْبُ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ

قَوْلُهُ لِأَنَّهَا سَبَبُهَا : এতে উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। كَلِمَةُ التَّقْوٰى অর্থাৎ سَبَبُ التَّقْوٰى-এর ইযাফত أَدْنٰى مُنَاسَبَتْ-এর কারণে হয়েছে। আবার কেউ কেউ تَقْوٰى-এর পূর্বে أَهْل উহ্য মেনেছেন অর্থাৎ كَلِمَةُ أَهْلِ التَّقْوٰى তথা আল্লাহ তা'আলা বদরবাসীদের জন্য খোদাভীরু লোকদের কথা পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهُ أَهْلَهَا : এটা أَحَقَّ بِهَا-এর عَطْف تَفْسِيْرِىْ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... الْجَاهِلِيَّةِ : আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, হুদায়বিয়ার দিন কাফের কুরাইশরা জাহিলিয়াতের অন্ধ অহমিকায় মেতে উঠেছিল। অত্র আয়াতে মুসলিমগণ এ বৎসর ওমরা পালন করতে পারবে না; বরং আগামী বৎসর এসে বিশেষ ব্যবস্থায় ওমরা পালন করতে হবে, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর পরিবর্তে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-এর পরিবর্তে مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ লিখতে হবে, কোনো মুশরিক মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে; কিন্তু কোনো মুসলমান দীন ত্যাগ করে মক্কায় আসলে তাকে মদীনায় ফেরত দেওয়া হবে না- ইত্যকার শর্তারোপ জাহিলিয়াতের ঘৃণ্য অহমিকা ও মিথ্যা দম্ভ ছাড়া আর কি? হুদায়বিয়ায় কুরাইশ কাফেররা যে ঔদ্ধত্য ও অহমিকা দেখিয়েছিল তা কোনো আদর্শের জন্য ছিল না; বরং তা ছিল হিংসা-বিদ্বেষ ও বর্বরতামূলক। এটা কোনো ন্যায়নীতির জন্য ছিল না; বরং তা ছিল তাদের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের অমূলক আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। এ বিদ্বেষের কারণেই তারা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণের (রা.) বিরোধিতায় গর্জে উঠে। এ জন্যই তারা নবী করীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বায়তুল্লাহ জিয়ারতের জন্য মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল। কুরবানির পশুগুলোকে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে জবাই করতে দেয়নি।

মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে এ ভাবনাই তাদের জন্য বড় বাধ সাজিয়েছিল যে, লোকেরা বলবে কুরাইশরা মুসলমানদের ভয়ে তাদের নিকট নত হয়ে তাদেরকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। তারা ভেবেছে যে, এমনটি করতে দিলে আরবের অন্যান্য গোত্রেরসমূহের নিকট তারা মুখ দেখাতে পারবে না। তাদের ইজ্জত রক্ষা হবে না। কিন্তু কাউকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত করতে দিলে কুরাইশ মুশরিকদের আভিজাত্যে আঁচড় লাগবে, তাদের সম্ভ্রমে আঘাত লাগবে- এটা জাহিলিয়াতের জিদ ও দাম্ভিকতা বৈ আর কি হতে পারে?

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা দাম্ভিকতার কথা তুলে ধরেছেন এবং এর নিন্দা করেছেন। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণকে বর্বরতামূলক জিদ হতে রেহাই দিয়েছেন। তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেছেন, তাদের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন। সন্ধির শর্তাবলি মুসলমানদের ইচ্ছার সম্পূর্ণরূপে পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে তাঁরা শেষ পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى الخ : অত্র আয়াতে "كَلِمَةَ التَّقْوٰى" -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- তাকওয়ার কালেমা হলো- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ নিম্নে বর্ণিত হাদীসখানা এর প্রমাণ-

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهٖ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১. ইবনে জারীর (র.)-ও হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করে উল্লেখ করেছেন যে, كَلِمَةُ التَّقْوٰى -এর দ্বারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -কে বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তাকওয়ার কালেমা হলো ইখলাস।

৪. হযরত আতা (র.)-এর মতে তাকওয়ার কালেমা হলো-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

৫. হযরত আলী (রা.) বলেছেন- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তাকওয়ার কালেমা হলো- شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

৭. কারো কারো মতে এখানে- كَلِمَةُ التَّقْوٰى বলতে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -কে বুঝানো হয়েছে।

৮. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) বলেছেন- তাকওয়ার কালেমা দ্বারা- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهٖ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৯. হযরত ওবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে مَرْفُوْعًا বর্ণিত আছে- তাকওয়ার কালেমা দ্বারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ উদ্দেশ্য।

প্রকাশ থাকে যে, كَلِمَةُ التَّقْوٰى -এর মধ্যে أَدْنٰى تَلَبُّسْ তথা সামান্যতম সম্পর্কের দরুন ইজাফত হয়েছে। অবশ্য تَقْوٰى -এর দ্বারা যদি أَهْلِ تَقْوٰى উদ্দেশ্য হয় তা হলে إِضَافَتْ حَقِيْقِيَّةْ হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٧. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ج رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ خُرُوْجِهِ اَنَّهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ اٰمِنِيْنَ وَيُحَلِّقُوْنَ وَيُقَصِّرُوْنَ فَاَخْبَرَ بِذٰلِكَ اَصْحَابَهُ فَفَرِحُوْا فَلَمَّا خَرَجُوْا مَعَهُ وَصَدَّهُمُ الْكُفَّارُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَجَعُوْا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ وَرَابَ بَعْضُ الْمُنَافِقِيْنَ نَزَلَتْ وَقَوْلُهُ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِصَدَقَ اَوْ حَالٌ مِنَ الرُّؤْيَا وَمَا بَعْدَهَا تَفْسِيْرٌ لَهَا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ لِلتَّبَرُّكِ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ اَىْ جَمِيْعَ شُعُوْرِهَا وَمُقَصِّرِيْنَ اَىْ بَعْضَ شُعُوْرِهَا وَهُمَا حَالَانِ مُقَدَّرَتَانِ لَا تَخَافُوْنَ ط اَبَدًا فَعَلِمَ فِى الصُّلْحِ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا مِنَ الصَّلَاحِ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ اَىِ الدُّخُوْلِ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ هُوَ فَتْحُ خَيْبَرَ وَتَحَقَّقَتِ الرُّؤْيَا فِى الْعَامِ الْقَابِلِ ـ

২৭. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -এর স্বপ্নকে যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। হুদায়বিয়ার বৎসর [মদীনা হতে] বের হওয়ার পূর্বে নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি ও তাঁর সাথীগণ– নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করেছেন– এবং তাঁরা মাথার চুল মুণ্ডাচ্ছেন এবং চুল ছোট করছেন। সুতরাং তিনি তাঁর সাহাবীগণকে তা অবগত করালেন। সাহাবী এতদশ্রবণে অত্যন্ত খুশি হলেন। অতঃপর যখন তাঁরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে বের হলেন এবং হুদায়বিয়ায় কাফেররা তাঁদেরকে বাধা প্রদান করল, তখন তাঁরা ফিরে আসলেন। এতে তাঁরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। আর কিছু মুনাফিক [নবী করীম ﷺ -এর স্বপ্নের ব্যাপারে] সংশয় পোষণ করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়। আর আল্লাহর বাণী– بِالْحَقِّ [শব্দটি] صَدَقَ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অথবা, এটা رُؤْيَا হতে حَالٌ হয়েছে। এর পরবর্তী বাক্য এর জন্য তাফসীর [ব্যাখ্যা] হয়েছে। যদি আল্লাহ তা'আলা চান তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। এখানে اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ টি বরকতের জন্য হয়েছে। নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডানো অবস্থায় অর্থাৎ মাথার সমস্ত চুল এবং চুল কর্তন করা অবস্থায় অর্থাৎ মাথার আংশিক চুল। আর এ শব্দদ্বয় حَالٌ مُقَدَّرٌ হয়েছে। তোমরা ভীত হবে না। কখনো সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অবগত হয়েছেন সন্ধির ব্যাপারে যেটা তোমরা জানতে না তার সুফল ও কল্যাণ কাজেই তিনি দান করেছেন তোমাদেরকে তা ব্যতীত– অর্থাৎ প্রবেশ ব্যতীত নিকটবর্তী বিজয়– তা হলো খায়বরের বিজয়। আর রাসূল ﷺ -এর স্বপ্ন পরবর্তী বৎসর বাস্তবায়িত হয়েছে।

٢٨. هُوَ الَّذِىْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ اَىْ دِيْنَ الْحَقِّ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ط عَلٰى جَمِيْعِ بَاقِى الْاَدْيَانِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ اَنَّكَ مُرْسَلٌ بِمَا ذُكِرَ ـ

২৮. আল্লাহ সেই পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর রাসূল ﷺ -কে হেদায়েত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। বিজয়ী করার জন্য তাকে– অর্থাৎ অকাট্য সত্য দীনকে সমস্ত দীনের উপর অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত দীনের উপর। আর সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এ ব্যাপারে যে, নিঃসন্দেহে আপনি উল্লিখিত বিষয়াদিসহ প্রেরিত হয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا : আল্লাহ তা'আলার বাণী– "فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا" -এর মধ্যে فَتْحٌ قَرِيْبٌ বা নিকটবর্তী বিজয় দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে আলেমগণ হতে বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. এটার দ্বারা খায়বর বিজয় উদ্দেশ্য। এটাই প্রসিদ্ধ মত।

২. এটার দ্বারা মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে।

৩. এটার দ্বারা হুদায়বিয়া পরবর্তী সকল বিজয় উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ : আল্লাহর বাণী– لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ -এর মধ্যে بِالْحَقِّ -এর মুতা'আল্লাক -এর ব্যাপারে বিভিন্ন সম্ভাবনা বিদ্যমান। যথা–

ক. بِالْحَقِّ পূর্ববর্তী صَدَقَ ফেলের সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

খ. بِالْحَقِّ একটি উহ্য شِبْه فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ– صَدَقَ مُتَلَبِّسًا بِالْحَقِّ

গ. بِالْحَقِّ একটি উহ্য شِبْه فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে যা اَلرُّؤْيَا হতে حَالٌ হয়েছে। اَلرُّؤْيَا مُتَلَبِّسَةً بِالْحَقِّ অর্থাৎ রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা এমতাবস্থায় উক্ত স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তা যথাযথ ছিল।

ঘ. بِالْحَقِّ একটি উহ্য فِعْل অর্থাৎ اُقْسِمُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হবে। এমতাবস্থায় এটা কসম হবে। আর لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الخ হবে তার জবাব। এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه তথা স্বতন্ত্র বাক্য হবে এবং اَلرُّؤْيَا -এর মধ্যে وَقْف করতে হবে।

قَوْلُهُ اٰمِنِيْنَ : اٰمِنِيْنَ শব্দটি পূর্ববর্তী لَتَدْخُلُنَّ ফে'লের যমীর اَنْتُمْ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। اٰمِنِيْنَ فِيْ حَالِ الدُّخُوْلِ لَا تَخَافُوْنَ عَدُوَّكُمْ অর্থাৎ তোমরা মাসজিদুল হারামে সম্পূর্ণ নিরাপদে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের শত্রুকে এতটুকুও ভয় করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ .... بِالْحَقِّ : বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হুদায়বিয়ায় গমনের পূর্বে নবী করীম ﷺ স্বপ্নযোগে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং তথায় সাহাবীগণসহ হলক ও কসর করেছেন।

কিন্তু পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ যখন হুদায়বিয়ায় কুরাইশ কাফেরদের সাথে সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন এবং সে বৎসরের জন্য মক্কায় প্রবেশ স্থগিত রেখে হুদায়বিয়ায় ইহরাম ভেঙ্গে ফেললেন ও কুরবানির পশুগুলো তথায় জবাই করে ফেললেন, তখন সাহাবীগণ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্বপ্নের সত্যতা কোথায়? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতখানা নাজিল করেন। –[লুবাব]

ইবনে কাছীর (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ষষ্ঠ হিজরির জুলকা'দাহ মাসে নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি সাহাবীগণ (রা.)-সহ মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেছেন। মদীনা হতে রওয়ানার পূর্বে তিনি সাহাবীগণকে তা অবগতও করেছিলেন। সাহাবীগণের ধারণা ছিল নবী করীম ﷺ এ বৎসর অবশ্যই ওমরা পালন করবেন। কিন্তু যখন হুদায়বিয়ায় এ মর্মে সন্ধি স্থাপিত হলো যে, মুসলমানগণ এ বৎসর ওমরা পালন করতে পারবে না; বরং আগামী বৎসর বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তারা কাজা ওমরা পালন করবে। তখন বহু সাহাবী দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। এমন কি হযরত ওমর (রা.) অকপটে নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদেরকে বলেননি যে, আমরা বায়তুল্লাহে যাবো এবং এর তওয়াফ করব? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তবে আমি কি তোমাকে বলেছি যে, তুমি এ বৎসরই যাবে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, না। নবী করীম ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, তুমি অবশ্যই বায়তুল্লাহে যাবে এবং এর তওয়াফ করবে। হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কেও অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি তদ্রূপ উত্তর দিয়েছেন, যেমনটি দিয়েছিলেন নবী করীম ﷺ। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উক্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে দূরীভূত করে আলোচ্য আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

আল্লাহ তা'আলা কেন ইনশাআল্লাহ বলেছেন- অথচ তিনি নিজেই তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ চান অবশ্যই তোমরা নিরাপদে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, আলোচ্যাংশে তো আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঈমানদারগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে নিরাপদে-নির্বিঘ্নে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেবেন। সুতরাং এতে আবার ইনশাআল্লাহ বলার কি আছে? এটাকে তাঁর ইচ্ছার সাথে শর্তারোপিত করার কি অর্থ হতে পারে?

মুফাসসিরীনে কেরাম এটার তাৎপর্য উল্লেখ করতে যেয়ে লিখেছেন। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এটার দ্বারা একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো- মক্কার মুশরিকরা হুদায়বিয়ার দিন নিজেদের পেশি শক্তি প্রদর্শন করেছিল। গায়ের জোরে তারা মুসলমানদের উপর এক অসম চুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিল। তারা ধরে নিয়েছিল যে, তারা যা চাইবে তাই হবে। আসলে ব্যাপার তা নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যা চাইবেন তাই হবে। আর তিনি যা চাইবেন না তা কস্মিনকালেও হবে না, হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করবেন কেউই তা রুখতে পারবে না। মূলত হুদায়বিয়ার বৎসর মুসলমানগণের মক্কা বিজয়ের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেননি, বিধায় তা হয়নি। যদি ইচ্ছা করতেন তা হলে মুসলমানগণ অবশ্যই মক্কা বিজয় করতে পারত। আল্লাহ ইচ্ছা করলে কাফেরদের সমস্ত দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করাতে পারতেন।

মোটকথা, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সবকিছুই তাঁর মহান সত্তার ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

ওমরাতুল কাজার ঘটনা অথবা لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الخ আয়াতের বাস্তবরূপ : হুদায়বিয়ার সন্ধির মর্মানুযায়ী নবী করীম ﷺ পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ সপ্তম হিজরিতে ওমরা পালন করার জন্য সাহাবীগণ (রা.) সহ মক্কায় গেলেন। একেই ওমরাতুল কাজা বলে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী এ ওমরায় ঐসব সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর সাথে ছিলেন যাদেরকে হুদায়বিয়ায় বাধা দেওয়া হয়েছিল। মক্কাবাসীরা নবী করীম ﷺ -এর আগমনের সংবাদ শুনে মাসজিদুল হারাম হতে বের হয়ে দারুন-নদওয়ায় এসে একত্র হলো- নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ (রা.)-কে দেখার জন্য। তারা পরপর বলাবলি করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথীগণ খুবই জীর্ণ-শীর্ণও ভুখা-নাংগা অবস্থায় আছে। নবী করীম ﷺ এটা শুনলেন। মাসজিদুল হারামে প্রবেশের পর চাদরের ভেতর হতে ডান কাঁধ বের করলেন, যেটা তওয়াফের নির্ধারিত নিয়ম। অতঃপর ইরশাদ করলেন, আজ যারা এ মুশরিকদেরকে তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করবে তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এর পর সাহাবীগণ (রা.) সম্মিলিতভাবে দৌড়িয়ে তিন বার তওয়াফ করলেন। রুকনে ইয়ামানী এবং হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন।

ওমরাতুল কাজায় নবী করীম ﷺ যুলহুলায়ফায় এসে ইহরাম বেঁধেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুরবানির পশুও ছিল। মুসলমানগণ তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের সাথে মক্কায় প্রবেশের সময় শুধুমাত্র খাপে ঢাকা একটি তরবারি ছিল। সতর্কতার খাতিরে মদীনা হতে রওয়ানার সময় কিছু তীর-বল্লমও সাথে ছিল; কিন্তু সেগুলো আজুজ নামক স্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

এ ওমরাতুল কাজার সময় নবী করীম ﷺ ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছেন। হযরত মায়মূনা (রা.) তাঁর বোন উম্মে ফজল (রা.)-কে তাঁর বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার প্রদান করেছিলেন। উম্মে ফজল (রা.) ছিলেন হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী। তিনি হযরত মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ প্রদানের উক্ত অধিকার হযরত আব্বাস (রা.)-কে দিয়েছিলেন। আর হযরত আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সাথে তাঁকে বিবাহ দিয়েছিলেন।

কাফেরদের নেতারা এ সময় মক্কা হতে বের হয়ে পড়ল। কেননা এ দৃশ্য তাদের জন্য অসহনীয় ছিল। অন্যান্য মক্কাবাসীরা মক্কায় অবস্থান করত নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ (রা.)-এর ওমরা পালনের দৃশ্য অবলোকন করল। নবী করীম ﷺ কুরবানির পশুগুলোকে 'জী-তুয়া' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর উটে আরোহণ করলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) উটের লাগাম ধরে তাকে চালাচ্ছিলেন। আর এভাবে নবী করীম ﷺ -এর স্বপ্ন সত্য হলো, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাপূর্ণ হলো।

Free @ www.eilm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিন মক্কায় অবস্থান করলেন। তৃতীয় দিন কুরাইশরা হুয়াইতাব ইবনে আব্দুল উজ্জাহর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলকে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পাঠালেন। তারা কুরাইশদের পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন যে, এখন আপনার মুদ্দত তথা সন্ধিস্থিত নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে আপনি চলে যান। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের কোনোরূপ অসুবিধা হবে না। আমরা এখানে বিবাহ করে ভোজের আয়োজন করব। তোমাদেরকেও দাওয়াত দেওয়া হবে। কুরাইশরা বলল, তোমাদের দাওয়াতের প্রয়োজন নেই আমাদের। এর পর সাহাবীগণসহ নবী করীম ﷺ মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হযরত মায়মুনা (রা.)-এর তত্ত্বাবধানের ভার আবূ রাফে' (রা.)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি হযরত মায়মুনা (রা.) -সহ সারেফ (سَرِفْ) নামক স্থানে নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তথায় তাঁর সাথে নবী করীম ﷺ বাসর উদ্‌যাপন করলেন। জিলহাজ মাসে মদীনায় এসে পৌছলেন। –[সীরাতে ইবনে হিশাম]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ الخ এ صَدَقَ -এর অর্থ কি? ভবিষ্যতের ঘটনাকে অতীতকাল জ্ঞাপক সীগাহ দ্বারাই প্রকাশের হেতু কি? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا অর্থাৎ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন।"

صَدَقَ-এর অর্থ : صَدَقَ **শব্দটি** كَذَبَ -এর বিপরীত। এমন সংবাদ ও ভাষণ যার সাথে বাস্তবতার মিল রয়েছে তাকে صَدَقَ বা সত্য বলা হয়। পক্ষান্তরে যে সংবাদ ও ভাষণের সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নাই তাকে বলে كَذَبَ বা মিথ্যা।

নবী করীম ﷺ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি সাহাবীগণসহ মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেছেন। বস্তুত নবীগণের স্বপ্ন হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর এ স্বপ্নও ওহী ছিল। নবী করীম ﷺ -কে স্বপ্নে প্রতারণা করার ক্ষমতা শয়তানকে দেওয়া হয়নি। অবশ্য যে বৎসর তিনি তা স্বপ্নে দেখেছিলেন সে বৎসর তা বাস্তবায়িত হয়নি; বরং তা বাস্তব রূপ লাভ করতে আরো একটি বৎসর লেগে গিয়েছিল। সুতরাং সপ্তম হিজরির জুলকা'দাহ মাসে ওমরাতুল কাজায় তা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

হজ ও ওমরায় হলক এবং কসরের হুকুম কি? এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম? : حَلْق [হলক] -এর অর্থ হলো মাথা মুণ্ডানো এবং قَصْر [কসর] -এর অর্থ হলো মাথার চুল কর্তন করা। হজ ও ওমরার মধ্যে মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল কর্তন করা ওয়াজিব।

ওমরা ও হজের সমাপ্তি পর্যায়ে হলক বা কসর করা হয়ে থাকে। হলক বা কসর না করা পর্যন্ত হজ ও ওমরার কাজের নিয়ত হতে মুক্ত হওয়া যায় না। হজ বা ওমরা পালনকারীকে যাবতীয় কার্যাদি শেষ করত হলক বা কসর করে ইহরামের কাপড় খুলতে হয়।

হজ ও ওমরা পালনকারীর জন্য হলক বা কসর যেকোনো একটি করলেই চলবে। তবে এতদুভয়ের মধ্যে হলকই হলো উত্তম, কেননা হাদীস শরীফে এসেছে নবী করীম ﷺ হলককারীর জন্য তিন বার দোয়া করেছেন এবং কসরকারীর জন্য দোয়া করেছেন মাত্র একবার।

সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন– হুদায়বিয়ার দিন কেউ কেউ হলক করল, আবার কেউ কেউ কসর করল। নবী করীম ﷺ বলেন– আল্লাহ তা'আলা হলককারীদের উপর রহম করুন! সাহাবীগণ (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কসরকারীগণ! তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা হলক ও কসরকারী উভয়ের উপর অনুগ্রহ করুন!

কাজেই উপরিউক্ত হাদীস হতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, হলক করা কসর অপেক্ষা উত্তম।

২৯. كَمَا قَالَ تَعَالٰى مُحَمَّدٌ مُبْتَدَأٌ رَسُوْلُ
اللّٰهِ خَبَرُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَىْ اَصْحَابُهُ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ اَشِدَّاءُ غِلَاظٌ
عَلَى الْكُفَّارِ لَا يَرْحَمُوْنَهُمْ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ خَبَرٌ ثَانٍ اَىْ مُتَعَاطِفُوْنَ
مُتَوَادُّوْنَ كَالْوَالِدِ مَعَ الْوَلَدِ تَرٰهُمْ
تُبْصِرُهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا حَالَانِ يَبْتَغُوْنَ
مُسْتَانِفٌ يَطْلُبُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ
وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ عَلَامَتُهُمْ مُبْتَدَأٌ
فِىْ وُجُوْهِهِمْ خَبَرُهُ وَهِىَ نُوْرٌ وَبَيَاضٌ
يُعْرَفُوْنَ بِهِ فِى الْاٰخِرَةِ اَنَّهُمْ سَجَدُوْا
فِى الدُّنْيَا مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط مُتَعَلِّقٌ
بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ الْخَبَرُ اَىْ كَائِنَةً وَاُعْرِبَ
حَالًا مِنْ ضَمِيْرِهِ الْمُنْتَقِلِ اِلَى الْخَبَرِ
ذٰلِكَ اَىِ الْوَصْفُ الْمَذْكُوْرُ مَثَلُهُمْ
صِفَتُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ج مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ
وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهُ بِسُكُوْنِ الطَّاءِ
وَفَتْحِهَا فَرَاخَهُ فَاٰزَرَهُ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ
قَوَّاهُ وَاَعَانَهُ فَاسْتَغْلَظَ غَلُظَ فَاسْتَوٰى
قَوِىَ وَاسْتَقَامَ عَلٰى سُوْقِهِ اُصُوْلِهِ
جَمْعُ سَاقٍ .

অনুবাদ :

২৯. যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– মুহাম্মদ এটা মুবতাদা আল্লাহর রাসূল এটা তার খবর এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অর্থাৎ তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ এটাও মুবতাদা। এর খবর হলো– অতি কঠোর পাষাণ হৃদয়ের কাফেরদের প্রতি তারা কাফেরদের উপর দয়া করেন না। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিশীল দয়ালু এটা দ্বিতীয় খবর। পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতাপূর্ণ বন্ধু ভাবাপন্ন। যেমন পিতা সন্তানের প্রতি হয়ে থাকেন। তুমি তাদেরকে দেখবে– অবলোকন করবে তাদেরকে রুকু ও সিজদারত– এতদুভয় حَالْ হয়েছে। তারা কামনা করে এটা স্বতন্ত্র বাক্য, তালাশ করে আল্লাহর করুণা এবং সন্তোষ, তাদের চিহ্ন তাদের আলামত– এটা মুবতাদা। তাদের চেহারায় বিদ্যমান, এটা তার খবর। আর তা হলো আলো ও শুভ্রতা যা দ্বারা আখিরাতে তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে যে, তারা পৃথিবীতে [থাকাকালে] সিজদা করেছে। সিজদার চিহ্ন– খবর [অর্থাৎ فِىْ وُجُوْهِهِمْ] যার সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে এটাও ঠিক তার সাথেই مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর তা হলো كَائِنَةً এর মধ্যে حَالْ -এর ই'রাব দেওয়া হয়েছে; সেই যমীরের দরুন, যা খবরের দিকে রুজু করেছে। তা অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলি [তাদের এমন] গুণাবলি সিফাত যার উল্লেখ রয়েছে তাওরাতে– এটা মুবতাদা ও খবর এবং তাদের এমন গুণাবলি যার উল্লেখ রয়েছে ইঞ্জীলে এটাও মুবতাদা এবং খবর। এমন একটি কৃষি ক্ষেতের ন্যায় যে তার অঙ্কুর বের করে। شَطْأَ শব্দটির ط অক্ষরটি জযম ও যবরযোগে উভয়ভাবে পড়া যায়। অর্থাৎ তার অঙ্কুর। অতঃপর এটাকে দৃঢ় করছে। اٰزَرَ শব্দটি মদসহ ও মদ ছাড়া দুভাবেই পড়া যায়। এটাকে সুদৃঢ় করেছে। ফলে এটা হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছে। মোটা ও তরতাজা হয়েছে। অতঃপর তা সোজা হয়েছে– শক্তিশালী হয়েছে এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের কাণ্ডের উপর তার মূলের উপর– سُوْقٌ শব্দটি سَاقٌ -এর বহুবচন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ اَىْ زُرَّاعَهُ لِحُسْنِهِ مِثْلُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِذٰلِكَ لِاَنَّهُمْ بَدَؤُوْا فِىْ قِلَّةٍ وَضُعْفٍ فَكَثُرُوْا وَقَوُوْا عَلٰى اَحْسَنِ الْوُجُوْهِ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ط مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ اَىْ شَبَّهُوْا بِذٰلِكَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ اَىِ الصَّحَابَةِ لِبَيَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتَّبْعِيْضِ لِاَنَّ كُلَّهُمْ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُوْرَةِ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا. اَلْجَنَّةَ وَهُمَا لِمَنْ بَعْدَهُمْ اَيْضًا فِىْ اٰيَاتٍ.

অনুবাদ : কৃষকদেরকে তা মুগ্ধ করে দেয়। অর্থাৎ তার সৌন্দর্য দর্শনে কৃষক অভিভূত ও খুশি হয়ে পড়ে। এর দ্বারা সাহাবীগণের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কেননা তাঁদের যাত্রা শুরু হয় সংখ্যার স্বল্পতা ও দুর্বলতা নিয়ে। অতঃপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং তাঁরা অত্যন্ত চমৎকার শক্তিমত্তার অধিকারী হলেন। যাতে তাঁদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন এটা একটি উহ্য فِعْل -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে, পূর্ববর্তী বাক্যের দ্বারা তা বোধগম্য হয় অর্থাৎ তাদেরকে সেটার সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে তাদের মধ্য হতে অর্থাৎ সাহাবীগণ (রা.), এখানে مِنْ জাতীয়তা বর্ণনার জন্য হয়েছে- অংশবিশেষ বুঝানোর জন্য হয়নি। কেননা তাদের সকলের মধ্যেই উক্ত গুণ বিদ্যমান। মাগফিরাত ও মহা বিনিময়ের অর্থাৎ জান্নাত। সাহাবীগণের পরবর্তী লোকদের জন্যও মাগফিরাত ও জান্নাত রয়েছে- যা অন্যান্য আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ : আল্লাহর বাণী- "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ الخ" -এর মধ্যে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। আর তা নিম্নোক্ত তিনটি দিকের বিবেচনায় مَرْفُوْع হতে পারে-

১. مُحَمَّدٌ মুবতাদা এবং رَسُوْلُ اللّٰهِ তার خَبَرٌ এমতাবস্থায় এটা هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ -এর তাকিদ হবে।

২. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এটা একটি مُبْتَدَأ مَحْذُوْف -এর خَبَرٌ ; মূল বাক্যটি হবে- هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ سَبَقَ ذِكْرُهُ الخ অর্থাৎ তিনিই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ যার আলোচনা ইতোপূর্বে "اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ" -এর মধ্যে করা হয়েছে।

৩. مُحَمَّدٌ মুবতাদা আর رَسُوْلُ اللّٰهِ হবে عَطْف بَيَان এখানে مَدْح টা رَسُوْلُ اللّٰهِ -এর জন্য হবে, تَمْيِيْز -এর জন্য হবে না।

قَوْلُهُ سِيْمَاهُمْ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ সিজদার কারণে তাদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন বিদ্যমান।

এখানে سيماهم -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন-

১. এর দ্বারা সেই আলো উদ্দেশ্য যা দ্বারা কিয়ামতের দিন ঈমানদার ও নামাজি হিসেবে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ইমাম তাবারানী (র.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে مَرْفُوْعًا বর্ণনা করেছেন যে, سِيْمَاهُمُ النُّوْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তাদের মুখায়বের নিদর্শন বলতে কিয়ামত দিবসের আলোকে বুঝানো হয়েছে।

২. এর দ্বারা সিজদার দীর্ঘতার কারণে নামাজির শরীরে সিজদার স্থানসমূহে যেই চিহ্ন পড়ে থাকে তাকে বুঝানো হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে- مَنْ كَثُرَ صَلٰوتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রিবেলা অধিকহারে নামাজ পড়ে দিনের বেলায় তার চেহারা উদ্ভাসিত দেখা যায়।

৩. শহর ইবনে হাওশাব (র.) বলেছেন, [পরকালে] সিজদার চিহ্নসমূহ পূর্ণিমার রাত্রির চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে।

৪. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এর দ্বারা خُضُوْع এবং خُشُوْع উদ্দেশ্য।

৫. সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর মতে এর দ্বারা সিজদার মাটি যা কপালে লেগে থাকে, তাকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ : এখানে مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ-এর مِنْ-এর একটি উহ্য شِبْه فِعْل তথা كَائِنَةً-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ الخ : আল্লাহর বাণী– ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ-এর মধ্যে ذٰلِكَ টা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। কেননা মুবতাদা এবং পরবর্তী বাক্য এর خَبَرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَشِدَّاءُ : আল্লাহর বাণী– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاءُ عَلَى الخ-এর মধ্যস্থ اشداء-এর মধ্যে একাধিক কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণের মতে اَشِدَّاءُ-এর হামযাহ অক্ষরটি مَرْفُوْع হবে।

২. হযরত হাসান (রা.)-এর মতে اَشِدَّاءَ-এর হামযা অক্ষরটির উপর نَصْب হবে।

قَوْلُهُ شَطْأَهٗ : আল্লাহর বাণী–كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهٗ-এর মধ্যস্থিত شَطْأَهٗ-এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কেরাতসমূহ বিদ্যমান–

১. জমহুর ক্বারীগণ "ط" অক্ষরটির উপর সাকিন দিয়ে شَطْأَهٗ পড়েছেন।

২. জুহরী ও ইবনে আবু ইসহাক হামযা বাদ দিয়ে شَطَهٗ পড়েছেন।

৩. ইবনে কাসীর (র.) ও জাকওয়ান (র.)-এর উপর জবর দিয়ে شَطَأَهٗ পড়েছেন।

৪. আনাস, নসর ইবনে আসেম ও ইয়াহইয়া ইবনে আদাব (র.) এটাকে عَصَاهٗ-এর অনুরূপ شَطَاهٗ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : পূর্বেই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত ওসমান (রা.)-কে মক্কার মুশরিকদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া যে, মুসলমানগণ শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও ওমরা পালনের জন্য এসেছে। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু হঠাৎ সংবাদ আসল, কুরাইশ মুশরিকরা হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে। এতে নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ খুবই মর্মাহত হলেন। রাসূলে করীম ﷺ একটি বাবলা গাছের তলদেশে সাহাবীগণ (রা.) হতে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করবেন এবং কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ হতে পশ্চাদপসরণ করবেন না। মোটকথা, তারা হযরত উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যার সংবাদ সত্য ছিল না। মুশরিকরা তাঁকে বন্দী করেছিল মাত্র। অতঃপর তিনি সশরীরে ফিরে আসলেন।

এ দিকে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সুহাইল ইবনে আমর নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল। সে অনেকগুলো অসম শর্ত মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিল। নবী করীম ﷺ শান্তির খাতিরে সবকিছু অকপটে মেনে নিলেন। সন্ধি চুক্তি লিখার সময় হযরত আলী (রা.) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখলে তাদের পক্ষ হতে ঘোর আপত্তি উঠল। তারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর পরিবর্তে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ লিখতে বাধ্য করল। এমন কি চুক্তিপত্রে বিসমিল্লাহ লিখাও তারা বরদাশত করল না। সন্ধির সমুদয় শর্তাবলি এমন ছিল যে, তা মুসলমানগণের পক্ষে মেনে নেওয়া ছিল অত্যন্ত অকার্যকর। যাদের সাথে যুদ্ধ করে জীবন দিতে সাহাবীগণ একটু পূর্বে নবী করীম ﷺ -এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের সাথে অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে সাহাবীগণের (রা.)-এর অন্তর মোটেই সায় দিচ্ছিল না। হযরত ওমর (রা.)ও ক্ষোভে দুঃখে নবী করীম ﷺ -কে প্রশ্ন করেই বসলেন যে, আপনি যে আল্লাহর রাসূল এটা কি সত্য নয়? আমরা যে হকের উপর রয়েছি তা কি ঠিক নয়? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, সবই সত্য। হযরত ওমর (রা.) পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন, তা হলে নতজানু হয়ে সন্ধি করার কি হেতু থাকতে পারে? কিন্তু এত কিছুর পরও সন্ধির অন্তর্নিহিত কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করে শান্তি ও সমঝোতার খাতিরে নবী করীম ﷺ তা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অত্র আয়াতটি নাজিল করে দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যথা–

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. অত্র আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে সান্ত্বনা দান করত তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্য রাসূল হিসেবে আগমন করেছেন তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান করা হয়েছে। মুসলমানদের উপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে একটি অপমানজনক সন্ধি যে তাদের চাপিয়ে দেওয়া হয়নি; বরং আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণের উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট রয়েছেন এবং উক্ত সন্ধির মধ্যে বিশেষ হিকমত নিহিত রয়েছে– তা জানিয়ে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা।

২. মুশরিকরা যে, নবী করীম ﷺ -কে রাসূল বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে অত্র আয়াতে তা খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে রাসূল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করেছেন তখন মুশরিকরা কি বলল না বলল, কুরাইশরা তাকে রাসূল হিসেবে স্বীকার করল কি করল না তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না। কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বে তিনি রাসূল হিসেবেই পরিচিত থাকবেন। এমন কি পরকালেও তাকে রাসূল হিসেবেই সম্বোধন করা হবে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এর দ্বারা একদিকে মুশরিকদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে এবং অপরদিকে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ : সমগ্র কুরআনে শেষ নবী ﷺ -এর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে সাধারণত গুণাবলি ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ আহবানের স্থলে يَا اَيُّهَا - يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ يَآاَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُزَّمِّلُ ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর গয়গাম্বরকে নাম সহকারে আহবান করা হয়েছে : যেমন – يَا عِيْسٰى – يَا مُوْسٰى - يَا اِبْرَاهِيْمُ সমগ্র কুরআনে মাত্র চার জায়গায় তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রা.) যখন তাঁর নাম 'মুহাম্মদুর-রাসূলুল্লাহ' লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাফেররা এটা মিটিয়ে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লিপিবদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ কুরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ : এখান থেকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি বর্ণিত হচ্ছে। যদিও এতে সর্বপ্রথম হুদায়বিয়া ও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি : এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালত ও তাঁর দীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহীত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা, অন্তরগত বিশ্বাস ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাদের এতটুকু পদস্খলন হয়নি; বরং তারা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর দুনিয়াতে আর কোনো নবী রাসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্য কুরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কুরআনও তাঁদের গুণাবলি ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাফেরদের মোকাবিলায় বজ্র-কঠোর সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্য বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অংশীদার করার আহবান জানায়। কুরআন সাহাবায়ে কেরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালোবাসা অথবা হিংসাপরায়ণতা কোনো কিছুই নিজের জন্য নয়, বরং সব আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্য হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে আছে– مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার ভালোবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, "সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের মোকাবিলায় কঠোর ছিলেন এ কথার অর্থ এই যে. এ স্থলে আত্মীয়তা. বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক এ কাজে অন্তরায় হয় না. পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কুরআনের ফয়সালা এই যে– لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ .... اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ যেসব কাফের মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যত যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেন না। রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্যা ঘটনা এমন পাওয়া যায়, যেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফেরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমন কি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থি কোনো কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণত রুকু-সিজদা ও নামাজে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামাজ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামাজ তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামাজ ও সিজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে 'সিজদার চিহ্ন' বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সিজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাজের ফলে উপরিউক্ত চিহ্ন খুব বেশি ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রেওয়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- مَنْ كَثُرَ صَلٰوتُهٗ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهٗ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাতে বেশি নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকাজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ নামাজিদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ : উপরে সাহাবায়ে কেরামের সিজদা ও নামাজের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তই তাওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলে তাঁদের আরো একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোনো কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সুচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরো মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনিভাবে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্য সংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত মাত্র তিনজন মুসলমান ছিলেন। আর তাঁরা হলেন- পুরুষদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.), নারীদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমন কি, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

১. مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ -এ পাঠবিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তাওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর فِى الْاِنْجِيْلِ -এ পাঠবিরতি না করা তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেই চারাগাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্ত কাণ্ড বিশিষ্ট হয়ে যায়।

২. فِى التَّوْرٰىةِ -এ পাঠবিরতি না করা, বরং فِى الْاِنْجِيْلِ -এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে মুখমণ্ডলের নূরের সাব্যস্ত করা।

৩. فِى التَّوْرٰىةِ এ বাক্য না করা এবং فِى الْاِنْجِيْلِ -এও শেষ না করা। অতঃপর ذٰلِكَ -কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। বর্তমান যুগে তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কুরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোনো নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তাওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জীল আছে। ইমাম বগভী (র.) বলেন, ইঞ্জীলে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারাগাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। -[মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জীলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে–
খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্য একটি অগ্নিদীপ্ত শরিয়ত ছিল। তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালোবাসেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। –[তাওরাত : বাবে ইস্তেরা]

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে 'খলীলুল্লাহ' শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত থাকবে বলে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ -এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। 'ইজহারুল হক' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভী (র.) খ্রিস্টান মতবাদের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য ফিন্ডার নামক পাদ্রীর জবাবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জীলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে বললে, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মতো, যাকে কেউ ক্ষেত বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সবজির চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী এসে বাসা বাঁধে। –[ইঞ্জীল: মাত্তা]

ইঞ্জীল মরকাসের ভাষা কুরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে, সে বলল, আল্লাহর রাজত্ব এমন, যেমন কোনো ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অঙ্কুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বুঝি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরি দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা কাটায় সময় এসে গেছে। –[ইযহারুল হক খ. ৩, ৩১০ পৃ.] আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে। তা তাওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

قَوْلُهُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিকতা দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হযরত আবূ ওরওয়া যুবায়রী (র.) বলেন, একবার আমরা ইমাম মালেক (র.)-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোনো একজন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালেক (র.) উপরিউক্ত আয়াতটি পূর্ণ তেলাওয়াত করে যখন لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন, যার অন্তরে কোনো একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে। –[কুরতুবী]

ইমাম মালেক (র.) একথা বলেননি যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সেও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফেরদের কাজের অনুরূপ হবে।

قَوْلُهُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا : مِنْهُمْ -এর مِنْ অব্যয়টি এখানে সবার মতে বর্ণনামূলক। অর্থ এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সৎকর্ম করতেন। দ্বিতীয়ত তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক مِنْ -এর ব্যবহার কুরআনে প্রচুর যেমন– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ; এখানে مِنَ الْأَوْثَانِ বলে رِجْس -এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে مِنْهُمْ বলে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ স্থলে مِنْ -কে 'কত' এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যাঁরা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের পরিষ্কার পরিপন্থি। কেননা যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বায়'আতে রিদওয়ানে শরিক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট। তাঁদের সবার প্রতি পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করে বলেছেন–
لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

সন্তুষ্টির এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ঈমান ও সৎকর্মের উপর কায়েম থাকেন। কারণ আল্লাহ আলিম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি কারো সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ঈমান থেকে কোনো-না-কোনো সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আব্দুল বার (র.) ইস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত

উদ্ধৃত করে লিখেন- وَمَنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ اَبَدًا অর্থাৎ আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনো অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যই যখন মুখ্যত এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারো কারো বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই আদিল ও সিকাহ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনীয় এবং তাঁদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা গুনাহ : কুরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে আরো অনেক আয়াতে এই উল্লিখিত হয়েছে- لَقَدْ رَضِيَ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এবং اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا

এ ছাড়া আরো অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে। যেমন-

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ.

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ তাঁদের সবাইকে আল্লাহ 'হুসনা' তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আম্বিয়ায় 'হুসনা' সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰۤئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই হুসনার ফয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সমময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরো এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলো না। কেননা ঈমানী শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে,] তাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না এমন কি অর্ধ মুদেরও না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম, যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি। -[বুখারী]

হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্যে থেকে নিম্নোক্ত চারজনকে আমার জন্য পছন্দ করেছেন আবূ বকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)। -[বাযযার]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে-

اَللّٰهَ اللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ.

অর্থাৎ আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালোবাসে, সে আমার ভালোবাসার কারণে তাঁদের ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ আজাবে আক্রান্ত করবেন। -[তিরমিযী]

এ সম্পর্কে আয়াত ও হাদীস অনেক। আর সব সাহাবীই যে আদিল ও সিকাহ এ সম্পর্কে সমগ্র উম্মত একমত।

সূরা হুজুরাত

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নাম হলো– হুজুরাত। হুজুরাত শব্দের অর্থ– ঘরের চার দেয়াল। এ সূরার চতুর্থ নম্বর আয়াতটি হতে সূরার নামটি চয়ন করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে– إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঘরের চার দেয়ালের পিছন হতে ডাকাডাকি করে। আয়াতে উল্লিখিত حُجُرَاتٌ [হুজুরাত] শব্দটিকে পূর্ণ সূরার নাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় এ সূরাতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ [অর্থাৎ অংশ বিশেষের দ্বারা পূর্ণ বস্তুর নামকরণ করা] -এর নীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়। ইবনে মরদিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সূরা হুজুরাত মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়। ইবনে মরদিয়া হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা.) হতেও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

এ সূরায় ১৮ টি আয়াত ৩৪৩ টি বাক্য এবং ১৪৭৬ টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার ফজিলত ও আমল : যদি কেউ সূরা হুজুরাত লিপিবদ্ধ করে গৃহের দেয়ালে লাগিয়ে রাখে তবে সে গৃহে জিন-ভূত আসবে না।

যদি এ সূরা লিখে তা ধৌত করে কোনো দুগ্ধবতী মাকে পান করানো হয়, তবে তার দুধ বৃদ্ধি পায়। আর যদি সে অন্তঃসত্ত্বা হয় তবে তার গর্ভস্থ সন্তান নিরাপদ থাকে। এ সূরাটি কেউ স্বপ্নযোগে তেলাওয়াত করতে দেখলে সে মানুষের প্রিয় পাত্র হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : পূর্ববর্তী সূরায় হুদায়বিয়ার সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, খায়বরের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের সাথে জিহাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিজয় বহন করে এনেছে। এরপর সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত এবং গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মুমিনগণকে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর উচ্চতম শান এবং মর্যাদা রক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম রাসূল ﷺ-এর দরবারে কথাবার্তা বলার নিয়ম-নীতির শিক্ষা এতে রয়েছে। এরপর এ সূরায় মুসলমানদের পরস্পরের প্রীতি বন্ধন এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার পথ ও পন্থা শেখানো হয়েছে। পরস্পরের মধুর সম্পর্ক রক্ষা করার সঠিক ও বাস্তব পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। তদুপরি বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের এবং মানবতার মান উন্নয়নের নিয়ম-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মনকে আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বনের জন্যে যাচাই করে নিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সান্নিধ্য লাভের কারণে তাঁরা আত্মসংশোধনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : আলোচ্য সূরাটি বিভিন্ন সময় ও অবস্থায় নাজিলকৃত আইন-বিধান ও খোদায়ী হেদায়েতের সমন্বয় ও সমষ্টি। মূল বিষয়বস্তুর আলোকে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এ জন্যই সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন-বিধান ও হেদায়েতকে একটি সূরায় একত্র করে দেওয়া হয়েছে। সূরার আলোচিত বিষয়াদি দেখলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা হতেও তা জানা যায়।

হাদীসের বর্ণনা হতে একথাও জানা যায় যে, উক্ত আইন বিধানের অধিকাংশই মদীনা শরীফে নবী করীম ﷺ -এর জীবনের শেষের দিকে নাজিল হয়েছে। উদাহরণত চতুর্থ আয়াত সম্পর্কে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এটা বনূ তামীম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। উক্ত গোত্রের প্রতিনিধিগণ মদীনায় এসে নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের হুজরা শরীফের পিছন হতে নবী করীম ﷺ -এর নাম ধরে ডাকাডাকি করেছিল। সমস্ত সীরাতগ্রন্থেও প্রতিনিধি আগমনের সময় নবম হিজরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তদ্রূপ একাধিক হাদীস হতে জানা যায় যে, ষষ্ঠ আয়াতটি অলীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ তাঁকে বনূ মুস্তালিক হতে জাকাত আদায়ের জন্য পাঠালে উক্ত ঘটনাটি ঘটে। অথচ অলীদ ইবনে উকবা সর্বসম্মতভাবে মক্কা বিজয়কালে মুসলমান হয়েছেন। কাজেই সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় যে মহানবী ﷺ -এর জীবনের শেষ দিক তা স্পষ্টভাবেই বলা যায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরার আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্য : উক্ত সূরা হুজুরাতের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মুসলমানদেরকে ঈমানদার উপযোগী আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেওয়া। প্রথমোক্ত পাঁচটি আয়াতে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো শুনা খবর বিশ্বাস করে নেওয়া এবং এর উপর নির্ভর ও ভিত্তি করে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি, দল অথবা জাতির বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ পাওয়া গেলে, প্রথমত ভেবে দেখতে হবে যে, সংবাদটির সূত্র নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কিনা? বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে না হলে সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান ও তদন্ত চালিয়ে জানার চেষ্টা করতে হবে যে, মূল সংবাদটি সত্য কিনা? এরপর মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোনো সময় ঘটনাক্রমে পরস্পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তখন মুসলমান জনগণের পক্ষে কিরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর মুসলিম জনগণকে সেসব অন্যায় ও অনুচিত কাজ-কর্ম হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে ভাঙ্গন, বিপর্যয় ও অশান্তির সৃষ্টি করে, যার দরুন পারস্পরিক সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে যায়। বাস্তবিক পক্ষেই পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, গালাগালি করা, একে অপরকে মন্দ নামে ডাকা, অন্যের ব্যাপারে অন্তরে মন্দ ধারণা পোষণ করা, অন্যদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদি তন্ন তন্ন করে জানার চেষ্টা করা, অপরের গিবত করা– এগুলো মন্দ কাজ। এগুলোর দ্বারা সমাজে অশান্তির বীজ বপন করে থাকে। এগুলোই স্বভাবতই খারাপ ও পাপ কাজ। আল্লাহ তা'আলা পৃথক পৃথকভাবে নাম ধরে এদেরকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

বংশীয় ও গোত্রীয় যেসব বৈষম্য ও পার্থক্য মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের সৃষ্টি করে, মানুষে মানুষে হানাহানি ও মারা-মারির সূত্রপাত করে, তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। বস্তুত বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশ পরিবারের নিজেদের মর্যাদা ও অভিজাত্য নিয়ে গৌরব অহংকার করা এবং অন্যদেরকে নিজেদের অপেক্ষা নীচ জ্ঞান করা, আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা- এগুলোই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে দুনিয়া ও মানব সমাজের জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে পড়ার প্রধান কারণ। একটি সংক্ষিপ্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মূল উৎপাটন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে যে, সমস্ত মানুষ একই মূল হতে উৎসারিত, একই বংশ হতে উদ্ভূত। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও শ্রেণিতে তাদের বিভক্ত হয়ে পড়া কেবল পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। এগুলো অহঙ্কার ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উপকরণ নয়। হ্যাঁ, একজন মানুষের উপর অপর একজন মানুষের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র নৈতিক মর্যাদার কারণেই স্বীকৃত হতে পারে। নৈতিক মান ব্যতীত মর্যাদা ও প্রাধান্যের অন্য কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। এটাই ভালো-মন্দ এবং উত্তম-অধমের একমাত্র মাপকাঠি।

পরিশেষে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে মেনে নেওয়া, কার্যত অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করা এবং খালেসভাবে আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল অকাতরে সঁপে দেওয়াই হলো প্রকৃত ঈমান। যে লোক উপরিউক্ত রীতি ও আচরণ অবলম্বন করবে সে-ই হবে প্রকৃত ঈমানদার। কিন্তু যারা শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং দিল দিয়ে সত্যকে মেনে নেয় না, উপরন্তু হাব-ভাবে এমনটি বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম কবুল করে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছে। দুনিয়ার সামাজিকতার মাপকাঠিতে এ লোকেরা মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারে। সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মতো আচরণ করা যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তারা মুমিনরূপে গণ হতে পারে না– প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়; জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

পূর্বোক্ত সূরার সাথে আলোচ্য সূরার সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরা ফাত্‌হ-এর মধ্যে জিহাদের মাধ্যমে পৃথিবীকে সংশোধন ও সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। আর অত্র সূরা হুজুরাতে সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত সূরায় আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণের (রা.) ফজিলত ও মর্যাদার উল্লেখ করেছেন। আর এ সূরাতে নবী করীম ﷺ ও ঈমানদারগণের পারস্পরিক অধিকার এবং আচরণের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের পরস্পরের আচার-আচরণের গাইড লাইন দেওয়া হয়েছে। কাজেই পূর্বোক্ত সূরার সাথে অত্র সূরাটির যোগসূত্র ও সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা হুজুরাত, মদীনায় অবতীর্ণ

ثَمَانِيْ عَشَرَةَ اٰيَةً : আয়াত সংখ্যা : ১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ اَيْ لَا تَتَقَدَّمُوْا بِقَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ الْمُبَلِّغِ عَنْهُ اَيْ بِغَيْرِ اِذْنِهِمَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ لِقَوْلِكُمْ عَلِيْمٌ ـ بِفِعْلِكُمْ نَزَلَتْ فِيْ مُجَادَلَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ تَامِيْرِ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ اَوِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ مَعْبَدٍ ـ

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অগ্রগামী হয়ো না– এখানে لَا تُقَدِّمُوْا সীগাহটি قَدَّمَ (بَاب تَفْعِيْل) হতে গৃহীত। এটা تَقَدَّمَ (তথা تَفَعُّل)-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ لَا تَتَقَدَّمُوْا بِقَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ -কোনো কথা বা কাজে অগ্রণী হয়ো না– আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অগ্রে–যিনি আল্লাহর পয়গাম প্রচারক। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ -এর অনুমতি ব্যতীত। আর আল্লাহকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী তোমাদের বক্তব্য এবং জানেন তোমাদের কাজকর্ম। এ আয়াতখানা হযরত ওমর (রা.) ও আবূ বকর (রা.)-এর সম্পর্কে নাজিল হয়, যখন তাঁরা খোদ নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে আকরা ইবনে হাবিছ এবং কা'কা' ইবনে মা'বাদকে আমীর নিয়োগের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন [অর্থাৎ উক্ত দু'জনের মধ্য হতে কে আমীর হবে– এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ও কথা কাটাকাটি হয়েছিল।]

٢. وَنَزَلَ فِيْمَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ اِذَا نَطَقْتُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اِذَا نَطَقَ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ اِذَا نَاجَيْتُمُوْهُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ بَلْ دُوْنَ ذٰلِكَ اِجْلَالًا لَهٗ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ اَيْ خَشْيَةَ ذٰلِكَ بِالرَّفْعِ وَالْجَهْرِ الْمَذْكُوْرَيْنِ ـ

২. আর যারা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেছে তাদের শানে নাজিল হয়েছে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের স্বর বুলন্দ করো না যখন তোমরা কথা বল নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজের উপর– যখন তিনি কথা বলেন। আর তোমরা তাঁর সাথে তদ্রূপ বড় গলায় কথা বলো না যখন তাঁর সাথে আলাপ আলোচনা কর যদ্রূপ তোমরা পরস্পরে কথা বলার সময় করে থাক, বরং তার সম্মানার্থে তদপেক্ষা নিচু গলায় বলবে। কেননা [অন্যথা] তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের আমলসমূহ [সৎকর্মসমূহ] বরবাদ-নিষ্ফল হয়ে যাবে অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে ও উঁচু গলায় কথা বললে– যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে– এ আশঙ্কা রয়েছে যে, তোমাদের আমলসমূহ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣. وَنَزَلَ فِيْمَنْ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ كَاَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ اِخْتَبَرَ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ط اَيْ لِتَظْهَرَ مِنْهُمْ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ اَلْجَنَّةُ.

৩. হযরত আবূ বকর (রা.) ও ওমর (রা.) এবং তদ্রূপ অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.) যারা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে নিচু স্বরে কথা বলতেন তাদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে নিশ্চয় যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে নিচু স্বরে কথা বলে তারা এমন লোক, পরীক্ষা করেছেন আল্লাহ তা'আলা– যাচাই করেছেন তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য– অর্থাৎ যেন তাদের হতে তাকওয়া প্রকাশিত হয়। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা বিনিময় [অর্থাৎ] জান্নাত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تُقَدِّمُوْا : আল্লাহর বাণী– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ الخ -এর মধ্যস্থিত لَا تُقَدِّمُوْا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ تَقْدِيْمٌ (بَاب تَفْعِيْل) হতে "لَا تُقَدِّمُوْا" -এর মীম-এর উপর পেশ ও د -এর মধ্যে যেরযোগে পড়েছেন।

২. যাহ্হাক ও ইয়াকূব হাযরামী (র.) প্রমুখ ক্বারীগণ تَقَدَّمَ (بَاب تَفَعُّلْ) হতে "لَا تَقَدَّمُوْا" পড়েছেন।

قَوْلُهُ (رحـ) مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ : জালালাইনের গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) لَا تُقَدِّمُوْا -এর তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন–

مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنٰى تَقَدَّمَ ; এর ভাবার্থ এই যে, لَا تُقَدِّمُوْا এটা بَاب تَفْعِيْل থেকে صِيْغَه جَمْع مُذَكَّر حَاضِر তথা تَقْدِيْم মাসদার হতে নির্গত হয়েছে [যা হতে مَاضِيْ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ হলো قَدَّمَ] তবে এখানে উল্লেখ্য যে, بَاب تَفْعِيْل সাধারণত مُتَعَدِّيْ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে بَاب تَفْعِيْل টি بَاب تَفَعُّلْ -এর অর্থে [قَدَّمَ টি تَقَدَّمَ -এর অর্থে এবং তদনুযায়ী] لَا تُقَدِّمُوْا শব্দটি لَا تَتَقَدَّمُوْا -এর অর্থে হয়েছে। আর তা مُتَعَدِّيْ না হয়ে لَازِمْ হয়েছে। সোজা কথা হলো, এখানে لَا تُقَدِّمُوْا বাবে তাফয়ীল হতে হওয়া সত্ত্বেও لَازِمْ হয়েছে। কেননা مُتَعَدِّيْ হলে এর অর্থ হতো– " তোমরা অগ্রগামী করো না" যা এ ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। আর لَازِمْ হওয়ার কারণে এর অর্থ হয়েছে– " তোমরা অগ্রগামী হয়ো না" এখানে এটাই প্রযোজ্য।

সুতরাং মুফাস্সির (র.)-এর তাফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন– "لَا تَتَقَدَّمُوْا بِقَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ" অর্থাৎ কোনো কথা বা কাজে তোমরা নবী করীম ﷺ হতে অগ্রগামী হয়ে যেয়ো না।

قَوْلُهُ اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى : অত্র আয়াতাংশে اِمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى -এর মধ্যস্থিত لَامْ অক্ষরটির অর্থের ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

১. لِلتَّقْوٰى -এর لَامْ অক্ষরটি كَائِنَة -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে قُلُوْب -এর صِفَتْ হয়েছে।

২. অথবা, لِلتَّقْوٰى -এর لَامْ অক্ষরটি عِلَّةْ বর্ণনা করার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ খোদাভীতির কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছেন।

Free @ www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ ؟ : اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ বাক্যটি لَا تَرْفَعُوْا অথবা لَا تَجْهَرُوْا হতে مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ -এর মধ্যে আমল করার ব্যাপারে لَا تَرْفَعُوْا এবং لَا تَجْهَرُوْا -এর মধ্যে تَنَازُعْ রয়েছে। সুতরাং বসরীগণের মতে দ্বিতীয় فِعْل -এর مَفْعُوْل لَهٗ হবে। পক্ষান্তরে কূফীগণের মতে প্রথমোক্ত فِعْل -এর مَفْعُوْل لَهٗ হবে। তবে প্রথমোক্ত মাযহাব অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ؟ : আল্লাহর বাণী- وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ পূর্ববর্তী বাক্য اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ হতে حَال হওয়ার দরুন مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ : **শানে নুযূল** : আলোচ্য আয়াত- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا الخ -এর শানে নুযূল-এর ব্যাপারে একাধিক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা অত্র আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখ করেছেন এবং জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন- তা এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ তামীম এবং কতিপয় লোক একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের মধ্য হতে কাকে আমীর নিয়োগ করা হবে এ ব্যাপারে হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। হযরত আবূ বকর (রা.) কা'কা' ইবনে মা'বাদকে আমীর নিয়োগের প্রস্তাব করলেন। পক্ষান্তরে হযরত ওমর (রা.) আকরা ইবনে হাবিসকে আমীর নিয়োগের জন্য পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও। এতে তাদের মধ্যে কিছুটা তর্ক-বচসা হলো, যাতে উভয়ের স্বর উচ্চ হয়ে পড়ল। একে কেন্দ্র করে আলোচ্য আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. হযরত শা'বী (র.) জাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ঈদুল আযহার নামাজের পূর্বে কুরবানি করার ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর নামাজ হতে অবসর হওয়ার পূর্বেই কুরবানি করে ফেলেছিল। এখানে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে যে, তোমরা নবী করীম ﷺ কুরবানি করার পূর্বে কুরবানি করো না। এমন কি যারা নবী করীম ﷺ -এর কুরবানির পূর্বে কুরবানি করেছিল তাঁদের কুরবানি পুনরায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. হযরত মাসরূক (র.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, অত্র আয়াতখানা يَوْمُ الشَّكِّ [সন্দেহের দিবস]-এর রোজার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। উক্ত দিন রোজা রাখা হতে সাহাবীগণকে বারণ করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর পূর্বে রোজা না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ খায়বর গমন করার সময় মদীনা শরীফে একজন লোককে খলীফা নিয়োগ করে যেতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) অন্য এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৫. হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, কিছু লোক বলাবলি করেছিল যে, নবী করীম ﷺ -এর পূর্বে যদি আমাদের রোজা রাখার হুকুম সম্বলিত কোনো আয়াত নাজিল হতো! তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ চল্লিশজন সাহাবীকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য বনী আমিরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনজন সাহাবী পিছনে পড়ে যায়। বনূ আমির ঐ তিনজন ব্যতীত বাকি সকলকে শহীদ করে ফেলে। উক্ত তিনজন সাহাবী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথে তাঁদের সাথে বনূ সুলাইমের দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বনূ সুলাইম অপেক্ষা বনূ আমির সম্মানী ও অভিজাত হওয়ার কারণে তারা নিজেদেরকে বনূ আমিরের লোক হিসেবে পরিচয় দিল। সাহাবীত্রয় তাদের উভয়কে হত্যা করে ফেললেন।

বনূ সুলাইমের লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর নিকট তাদের লোককে হত্যা করার বিচার দাবি করল। কেননা তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে দিয়াত আদায় করে দিলেন। উক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

৭. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, অত্র আয়াতখানা মূলত ব্যাপক যেকোনো কথা বা কাজে নবী করীম ﷺ -এর উপর অগ্রণী না হওয়ার ব্যাপারে এটি নাজিল হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৮: ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ যদিও সহীহ তথাপি অত্র আয়াতের প্রকৃত শানে নুযূল আল্লাহ পাকেরই ভালো জানা রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, কোনো বিশেষ কারণ ব্যতীতই অত্র আয়াত নাজিল হয়েছে। মোটকথা, আয়াতখানার শানে নুযূল যাই হোক না কেন, এর হুকুম ব্যাপক। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর হতে কথা ও কাজে যে কেউ অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা করবে তার জন্যই এর হুকুম প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا الخ : **শানে নুযূল** : রাসূল ﷺ -এর সাথে কথা বলার সময় কতিপয় লোক নিজেদের পরস্পরের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলত, আর তাদের ব্যাপারে এ আয়াত খানা অবতীর্ণ হয়; কারো কারো মতে এ আয়াত হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যকার বিতর্কের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। যেটা পূর্ববর্তী আয়াতের শানে নুযূলে আলোচিত হয়েছে।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ الخ : **শানে নুযূল** : অত্র আয়াত- إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ الخ -এর শানে নুযূল-এর ব্যাপারেও একাধিক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলোর উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) জন্মগতভাবে উচ্চৈঃস্বরের অধিকারী ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, আয়াত- لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الخ নাজিল হওয়ার পর তিনি রাস্তায় বসে কাঁদতে শুরু করলেন। আসিম ইবনে আদী ইবনে আজালান (রা.) পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় সাবিত (রা.)-কে ক্রন্দনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমার আওয়াজ জন্মগতভাবে উঁচু। কাজেই আমার মনে হয় আয়াত- لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الخ আমার ব্যাপারেই নাজিল হয়েছে। আসিম (রা.) এ ব্যাপারটি নবী করীম ﷺ -কে জানালেন। নবী করীম ﷺ সাবিত (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি কি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করতে চাও না, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করা কি তোমার কাম্য নয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে কি তুমি রাজি নও? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাজি, আর কখনো নবী করীম ﷺ -এর সাথে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলব না। তখন তাঁর শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, আয়াত لَا تَرْفَعُوْا الخ নাজিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা.) কসম করে আরজ করলেন যে, তিনি কখনো উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেছেন- আয়াত لَا تَرْفَعُوْا الخ নাজিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) এত নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন যে, পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতো। তখন অত্র আয়াত নাজিল হয়।

মোটকথা, এর উদ্দেশ্য এই যে, কথাবার্তায় নবী করীম ﷺ -এর সাথে আদব রক্ষা করে চল। আওয়াজ একেবারে উঁচু করো না, যা বেয়াদবীর পর্যায়ে পড়ে। আবার এত নিচুও করো না, যাতে কথা বুঝতে কষ্ট হয়; বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর।

قَوْلُهُ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ الخ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নবী করীম ﷺ -এর সাথে আদব ও আচার-আচরণের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। কথাবার্তা ও চাল-চলনে কিভাবে আদব রক্ষা করতে হবে, তার সাথে আদব বজায় রাখলে কি লাভ হবে এবং না রাখলে কি ক্ষতি হবে- এতদ্ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, যে বিষয়ে আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ -এর হতে হুকুম পাওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে, এর ফয়সালা নবী করীম ﷺ -এর উপর অগ্রণী হয়ে নিজের পক্ষ হতে করে নিয়ো না; বরং আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। সুতরাং নবী করীম ﷺ যখন কিছু ইরশাদ করেন তা কান দিয়ে নীরবে শ্রবণ কর। তাঁর ইরশাদের পূর্বেই নিজের পক্ষ হতে কিছু বলে ফেলার দুঃসাহস করো না। তাঁর তরফ হতে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নির্দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে তা গ্রহণ কর এবং তদনুযায়ী আমল কর। স্বীয় ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে তার ইচ্ছা ও নির্দেশের উপর প্রাধান্য দিয়ো না; বরং স্বীয় চিন্তা-চেতনা ও কামনা-বাসনাকে শরিয়তের অনুগত করে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশেষ করীনা [লক্ষণ] অথবা স্পষ্টভাবে কথা বলার অনুমতি পাওয়া যায় কথা বলবে না, বরং অপেক্ষা করতে থাকবে। অনুমতি ও অপেক্ষা ছাড়া কথা বলতে গেলে রাসূলের ﷺ ইচ্ছার বিরোধী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মোটকথা, কোনো কিছুর বৈধতা শরিয়তের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে। চাই তা কাতয়ী قَطْعِىْ হোক অথবা যান্নী ظَنِّىْ হোক। আর যেমনিভাবে পয়গাম্বরের অনুপস্থিতিতে প্রথমত نَصّ -কে অনুসরণ করতে হয় এবং نَصّ -এর মধ্যে গবেষণা করতে হয় তেমনটি নবী করীম ﷺ -এর উপস্থিতিতে প্রথমত نَصّ -এর অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর করীনার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। প্রত্যেক ব্যাপারে এ একই হুকুম প্রযোজ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাজেই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চল। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ -এর সত্যিকার আনুগত্য ও তা'জীম কেবল তখনই সম্ভবপর হতে পারে যখন অন্তরে খোদাভীতি থাকবে। অন্তরে যদি আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকে, তাহলে বাহ্যত ইসলামের দাবিদার হওয়ার জন্য বারংবার মুখে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নাম নিবে এবং বাহ্যিকভাবে তাঁদের আহকামকেও সামনে রাখবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একে নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ ও স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করবে। সুতরাং জেনে রাখা উচিত যে, যা মুখে রয়েছে তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই শুনেন এবং যা অন্তরে রয়েছে তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। কাজেই তাঁকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। অতএব তাঁকে ভয় করা উচিত।

আয়াতের উদ্দেশ্য : আরবের কতিপয় গোত্রের লোকদের নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে কতিপয় অসৌজন্য ও অভদ্রোচিত আচরণ ছিল। তা ছাড়া তারা লোকদেরকে মন্দ উপাধি দানেও ছিল পটু। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তথা গোটা উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -কে উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতামূলক আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অত্র আয়াত নাজিল করেছেন। যাতে তারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে ভদ্রতামূলক আচরণ করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর সাথে সবচেয়ে উত্তম আচরণ হলো নিজের মতামতের উপর তাঁর মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। নবী করীম ﷺ হযরত মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তুমি কিসের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করবে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন মাজীদ অনুযায়ী। নবী করীম ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো হুকুম তুমি খুঁজে না পাও, তাহলে কি করবে? তিনি উত্তর দিলেন, তাহলে সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী হুকুম দিব। নবী করীম ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সুন্নাতে রাসূল ﷺ -এর মধ্যেও কোনো হুকুম খুঁজে না পাও, তাহলে কি করবে? তিনি বললেন, এমতাবস্থায় আমি ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করব।

মোটকথা, অত্র আয়াত নাজিল করত আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, সর্বব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর মতামতকে নিজের মতামতের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। নবী করীম ﷺ -এর মতামত ও কথাবার্তার ব্যাপারে বিতর্কের সৃষ্টি করা যাবে না। তাঁর কথা ও কাজকে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে মাথা পেতে নিতে হবে। রাসূলের কারীম ﷺ -এর নিঃশর্ত আনুগত্যই কেবল ইহ্-পরকালের সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

দীনি নেতা তথা আলেমগণের সাথেও উক্ত আদব জরুরি : কোনো কোনো মুফাস্সির (র.) বলেছেন, দ্বীনি ইমাম ও আলেমগণের ব্যাপারে আয়াতে উল্লিখিত আদব বজায় রাখা জরুরি। কেননা দীনি নেতৃবৃন্দ হলেন নবী করীম ﷺ -এর প্রতিনিধিগণ। আর আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরসূরি। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

একদিন নবী করীম ﷺ হযরত আবুদ্ দারদা (রা.)-কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অগ্রে চলতে দেখে তাঁকে সাবধান করে বললেন, তুমি কি এমন এক ব্যক্তির অগ্রে চলতে চাও যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নবী করীম ﷺ আরও ইরশাদ করলেন, দুনিয়ায় এমন কোনো ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি, যে নবী-রাসূলগণের পর হযরত আবূ বকর (রা.) হতে শ্রেষ্ঠ। মোটকথা হযরত আবূ বকর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর পর সকল মানুষ হতে উত্তম।

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ .... لَا تَشْعُرُوْنَ : অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথাবার্তার আদব-কায়দার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- "হে মুমিনগণ! তোমরা নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলো না। আর নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলার সময় পরস্পরের ন্যায় বলো না। কেননা এরূপ করলে তোমাদের নেক আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না।

উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলার অর্থ হচ্ছে- নবী করীম ﷺ -এর দরবারে পরস্পরে কথা বলার সময় যেন নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা তোমাদের আওয়াজ উচ্চ না হয়। আর খোদ নবী করীম ﷺ -এর সাথেও যদি কথা বল তাহলে তাঁর অপেক্ষা নিচু স্বরে বলবে।

মোটকথা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে শোরগোল করো না। আর নিজেরা পরস্পরে যে পদ্ধতিতে বেপরোয়াভাবে হাসি-তামাশার সাথে কথা বল, নবী করীম ﷺ -এর সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা আদবের খেলাফ ও গোস্তাখী হিসেবে গণ্য হবে। নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করার সময় অত্যন্ত নম্রভাবে তা'জীমের সাথে আদব-কায়দা ও ভদ্রতার সাথে করবে।

এ আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি যদিও নবী করীম ﷺ -এর মজলিসের জন্য বলা হয়েছে; কিন্তু এটা কেবল সে যুগের লোকদের জন্য সীমিত নয়; বরং সর্বকালের লোকদের জন্যই তা প্রযোজ্য।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম ﷺ -এর রওজা শরীফের সামনে উচ্চৈঃস্বরে সালাম-কালাম করা হারাম। কেননা জীবিত অবস্থায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভদ্রোচিত আচরণ করা যদ্রূপ ফরজ তদ্রূপ তাঁর ইন্তেকালের পরও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ফরজ।

নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আদবের অবস্থা : লক্ষণীয় যে, একজন ভদ্র ছেলে তার পিতার সাথে, একজন যোগ্য ছাত্র তার উস্তাদের সাথে, একজন মুখলিস মুরীদ তার মুর্শিদের সাথে এবং একজন সিপাহী তার কমাণ্ডারের সাথে কিভাবে কথাবার্তা বলে। অথচ পয়গাম্বর (আ.)-এর মর্তবা তো এদের অপেক্ষা কত বেশি। কাজেই নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথাবার্তা বলায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি; যাতে কোনোরূপ বেয়াদবি না হয় এবং তিনি ব্যথা না পান। নবী করীম ﷺ নাখোশ হয়ে গেলে ঈমান আর থাকে কোথায়! এতে সমস্ত আমল বরবাদ হওয়ার এবং সকল মেহনত ব্যর্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

নাফরমানি [গুনাহ]-এর দরুন নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যায় কিনা? : কুফর এবং শিরক এর কারণে তো সকল নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়– এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু গুনাহ ও অপরাধের কারণে নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায় কিনা? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

খাওয়ারিজ এবং মু'তাযিলীগণ তাঁদের মূলনীতি অনুযায়ী বলে থাকেন যে, ফিস্‌ক ও গুনাহের দ্বারাও যেহেতু ঈমান হতে খারিজ [বাহির] হয়ে যায় সেহেতু গুনাহের কারণে নেক আমলও বরবাদ হয়ে যাবে।

আয়াত أَنْ تَحْبَطَ الخ বাহ্যত খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলীগণের পক্ষে যায়। আর এটা তাঁদের দলিল। কিন্তু জমহুর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত শুধু গুনাহকে আমল বরবাদকারী হিসেবে গণ্য করেন না।

আহলুস্‌-সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তার খণ্ডন : অত্র আয়াত أَنْ تَحْبَطَ الخ -এর দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তারা তো গুনাহকে আমল বরবাদকারী হিসেবে গণ্য করেন না। অথচ অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা উঁচু আওয়াজে কথা বলাকে আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা তো গুনাহ।

আহলুস-সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে এর বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। যথা–

* উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নবী করীম ﷺ -এর কষ্ট পাওয়ার কারণ। আর নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া হলো কুফর। কাজেই [কুফর হওয়ার কারণে]-এর দ্বারাও আমল বরবাদ হয়ে যাবে।
* কখনো কখনো উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলায় বেয়াদবি হয়ে যায়। আর কেউ কারো অনুগত হলে তার সাথে আদব রক্ষা করা জরুরি হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম করলে নেতা অন্তরে ব্যথাবোধ করে। আর সাধারণ গুনাহ যদিও আমল বরবাদকারী হয় না, তথাপি নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া খাসভাবে এমন কঠিন পাপ যার কারণে আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটা عَامٌ -এর একটি খাস একক। এর হুকুমও খাস।

হ্যাঁ, কোনো কোনো সময় যখন মন-মেজাজ ভালো থাকে তখন আর তা [উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা] অপছন্দনীয় হয় না এবং তখন তা কষ্টের কারণও হয় না। কাজেই এমতাবস্থায় এর কারণে আমল বরবাদ হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। কিন্তু যে নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলবে তাঁর পক্ষে তো জানা সম্ভব নয় যে, নবী করীম ﷺ কোন অবস্থায় রয়েছেন– প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ﷺ -এর মানসিক অবস্থা তখন কোন পর্যায়ে রয়েছে। কাজেই অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ জালালী মেজাজে থাকার কারণে উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথনের দরুন কথকের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। অথচ তার কোনো খবরই থাকবে না। হয়তো সে এ মনে করে উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে থাকবে যে, নবী করীম ﷺ -এর কষ্ট হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে হুযূর ﷺ -এর কষ্ট হচ্ছে এবং তার আমলও বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে টেরও পাচ্ছে না। আল্লাহর বাণী– لَا تَشْعُرُوْنَ -এর দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ সকল দিকের বিবেচনা করত সাধারণভাবে সকল প্রকার উচ্চৈঃস্বর হতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা যদিও কোনো কোনো প্রকারের উচ্চৈঃস্বরের কারণে নেক আমল বিনষ্ট হয় তথাপি এটা নির্দিষ্ট করা অসম্ভব। কাজেই সব সময় সর্বপ্রকার উচ্চ আওয়াজ হতে নিষেধ করেছে। সুতরাং যে কোনো সময় নবী করীম ﷺ -এর সাথে বড় গলায় কথা বলা হতে বিরত থাকা উচিত।

মোদ্দাকথা– তোমরা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ করা হতে বিরত থাকবে। কেননা এতে নবী করীম ﷺ -এর মনে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর তা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে পারে যে, তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে। কারণ বেয়াদবি এবং গোস্তাখীর দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া যদিও নিছক গুনাহই বটে, কিন্তু যেহেতু এটা নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; আর নবী করীম ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া আল্লাহ তা'আলার একেবারেই অপছন্দনীয় যা কোনো কোনো সময় ইচ্ছাকৃত কুফরির নিকটবর্তী নিয়ে যায়। আর কুফর তো সর্বসম্মতভাবে আমলকে বরবাদ করে ফেলে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে কোনো গুনাহ সরাসরি আমল বরবাদকারীও সাব্যস্ত হয় না। অথচ আহলে-সুন্নত গুনাহ সরাসরি আমল বরবাদকারী হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তা ছাড়া উক্ত গুনাহটি অন্যান্য গুনাহ অপেক্ষা জঘন্য হওয়াও সাব্যস্ত হয়েছে। যাহোক, আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াবে যে, তোমরা হুযূর ﷺ -এর সম্মুখে অথবা খোদ হুযূর ﷺ-এর সাথে উচ্চৈঃস্বরে এবং বেপরোয়াভাবে কথাবার্তা বলো না। কেননা এতে তোমাদের আমল বরবাদ ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এভাবে যে, এর দরুন নবী করীম ﷺ অন্তরে ব্যথা পাবেন। আর তা তোমাদের লাঞ্ছনার কারণ হবে– যা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছানোর দরুন আমলকে বরবাদ করে দিবে। তোমাদের এ কথোপকথন পদ্ধতিই যে, তোমাদের আমলকে বরবাদ করে দিয়েছে তা তোমরা টেরও পাবে না। আর তোমাদের বেপরোয়া মনোভাবই হবে তোমাদের চরম দুর্দশা ও দুর্ভোগের জন্য একান্তভাবে দায়ী।

এখানে نِدَاء -কে পুনঃ উল্লেখের ফায়দা কি? : আল্লাহ তা'আলা প্রথমোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا الخ দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় ইরশাদ করেছেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا অর্থাৎ উভয় আয়াতে ঈমানদারদেরকে আহ্বান করত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। মুফাস্‌সিরগণ এর কয়েকটি ফায়দা-এর উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার উল্লেখ করা হলো–

১. ঈমানদারগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অত্যধিক মমত্ববোধ ও কল্যাণকামিতার কারণে বারবার ঈমানদারগণকে খেতাব করেছেন। সাধারণত দেখা যায় যে, কেউ কাউকে অধিক মায়া-মহব্বত করলে তাকে বারংবার সম্বোধন করে। যেমন হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে বারবার يَا بُنَيَّ বলে খেতাব করেছেন।
২. نداء -কে পুনরায় উল্লেখের এক ফায়দা এও হতে পারে যে, পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া যে, দ্বিতীয়বারে তাদেরকে লক্ষ্য করেই কথা বলা হয়েছে প্রথমবারে যাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল। যাতে এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ না পায় যে, প্রথমে যাদের আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আলোচনা করা হয়নি; বরং অন্যদের কথা বলা হয়েছে।
৩. এর আরো একটি ফায়দা এই যে, উক্ত আয়াতদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন নয়; বরং এতদুভয়ের পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য রয়েছে। সুতরাং এদের দ্বিতীয়টি প্রথমটির তাকিদ নয়; বরং প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত।
৪. বারংবার ঈমানদারগণের সিফাত দ্বারা আহ্বান করত বস্তুত তাদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঈমানের গুণে গুণান্বিত হওয়া যে, একটি সুমহান ব্যাপার তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। বাস্তবিকই সত্যিকার ঈমানের অধিকারী হওয়া হতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর কি হতে পারে?

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপর অত্র আয়াতের প্রভাব : যখনই কোনো আয়াত নাজিল হতো সাথে সাথে সাহাবীগণ (রা.) তার উপর আমল করার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে যেতেন। তদনুযায়ী স্বীয় চরিত্রকে শোধরিয়ে নেওয়ার জন্য সাহাবীগণ (রা.)-এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় অনুরূপ এক পরিবর্তন। নিম্নে এতদ্‌সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো–

১. উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট নিবেদন করলেন যে, অদ্য হতে আমি আপনার সাথে চুপি চুপি কথা বলব।
২. অত্র আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হতো।
৩. মুহাম্মদ ইবনে সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, অত্র আয়াত– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا الخ নাজিল হওয়ার পর সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) রাস্তায় বসে কাঁদতে ছিলেন। এ সময় আসিম ইবনে আদী ইবনে আজালান তাঁর পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এ আয়াতখানা আমার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। কেননা জন্মগতভাবেই আমার আওয়াজ বিকট। আসিম (রা.) বিষয়টি নবী করীম ﷺ -এর নিকট উত্থাপন করলেন। নবী করীম ﷺ সাবিতকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কি রাজি নও যে, তুমি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন-যাপন করবে, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে? উত্তরে সাবিত (রা.) আরজ করলেন, আমি রাজি আছি। কখনও আমি আমার আওয়াজকে নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজের উপর উচ্চ করব না।

অত্র আয়াতে مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه বাহ্যত এক ও অভিন্ন হওয়ার পরও عَطْف -এর দ্বারা কিভাবে পার্থক্য সূচিত হলো? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ الخ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্বরকে নবী করীম ﷺ -এর স্বরের অপেক্ষা উচ্চ করো না, আর তাদের সাথে এমন প্রকাশ্য আওয়াজে কথা বলো না, যদ্রূপ তোমাদের পরস্পরে বলে থাক।

Free @ www.eelm.weebly.com

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এখানে مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه এক ও অভিন্ন। কেননা উভয় স্থলেই নবী করীম ﷺ -এর স্বরের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা প্রথমোক্ত অংশের তথা- "لَا تَرْفَعُوْٓا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ"-এর অর্থ হলো নবী করীম ﷺ যখন কথা বলতে থাকবেন আর তখন তোমরাও কারো সাথে [তাঁর সম্মুখে] কথাবার্তায় লিপ্ত হও সেই সময় তোমাদের কথাবার্তার আওয়াজ যেন নবী করীম ﷺ -এর আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ না হয়ে যায়।

আর দ্বিতীয়াংশ তথা "وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ" -এর অর্থ হলো- 'যখন তোমরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা-বার্তা বলবে তখন তদ্রূপ উচ্চ আওয়াজে বলবে না, যদ্রূপ তোমরা পরস্পরে বলে থাক; বরং তদপেক্ষা নিচু আওয়াজে বলবে'। সুতরাং উভয় বাক্যের অর্থগত পার্থক্য সাব্যস্ত হলো। আর عَطْف -এর জন্য এতটুকু পার্থক্যই যথেষ্ট।

قَوْلُهٗ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ .... وَأَجْرٌ عَظِيْمٌ الْجَنَّةُ : পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণকে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সামনে অথবা তার সাথে কথা বলার সময় উচ্চ আওয়াজে কথা বলার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর অত্র আয়াতে যারা নবী করীম ﷺ -এর সাথে নিচু গলায় আদবের সাথে কথা বলে তাদের প্রশংসা করেছেন। এর প্রতি ঈমানদারগণকে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- "যারা নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে নিচু আওয়াজে আদব, তা'জীম ও নত-নম্রভাবে কথাবার্তা বলে তারা এমন লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা খুব ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছেন, তাদেরকে খালেস ও পূতঃপবিত্র করে নিয়েছেন।

বস্তুত ইসলামের মহা নিদর্শনাবলি চারটি। যথা- ১. কুরআনে কারীম ২. নবী করীম ﷺ ৩. বায়তুল্লাহ ও ৪. নামাজ। এগুলোর প্রতি তারাই সম্মান প্রদর্শন করবে, যাদের অন্তরে খোদাভীতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলো অন্তরে আল্লাহ ভীতির বহিঃপ্রকাশ। এতে বুঝা যায় যে, হুযূর ﷺ -এর আওয়াজ হতে আওয়াজ উচ্চ হওয়া যখন বেয়াদবি তখন তাঁর আহকাম ও ফরমানাদি শ্রবণ করার পর এর বিরুদ্ধে কথা বলা কিরূপ জঘন্য অপরাধ হবে তা অনুমেয়। মোটকথা, পূর্ণমাত্রায় তাক্ওয়ার দাবি হলো মুসলমানকে অনুত্তম কথাবার্তা হতে বিরত থাকতে হবে।

তিরমিযী শরীফের একটি মারফূ' হাদীস নিম্নরূপ-

لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهٖ حَذَرًا لِمَا بِهٖ بَأْسٌ.

অর্থাৎ বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকী খোদাভীরু হতে পারবে না, যতক্ষণ না দূষণীয় বিষয়াদি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য [কিছু কিছু] নির্দোষ বিষয়কে পরিহার করে চলবে।

সুতরাং উচ্চৈঃস্বরে এবং বেপরোয়াভাবে কথা বলা কখনো অপরাধজনক হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো হয় না। এক্ষণে যদি সব ধরনের উচ্চ আওয়াজই পরিহার করে বলে, তাহলে অপরাধের পর্যায়ে পড়ার কোনোরূপ শঙ্কাই থাকে না। কাজেই পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া অর্জিত হবে।

পরিশেষে উক্ত আমলের পারলৌকিক লাভ ও পুরস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা এই যে, উপরিউক্ত ইখলাস ও সত্য উপলব্ধির কারণে আখিরাতে তাঁর জীবনে [পূর্বেকৃত] পাপরাশি ক্ষমা হয়ে যাবে এবং মহা প্রতিদান লাভ করবে।

অত্র আয়াতে "امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى" বাক্যের তাফসীরে ইমাম রাযী (র.) বলেন,

* তাকওয়ার গুণটি জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকে যাচাই করে নিয়েছেন।

* তাদের অন্তরসমূহ যে তাকওয়ার জন্য মনোনীত, তা আল্লাহ তা'আলা জেনে নিয়েছেন।

* তাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ তা'আলা নিখুঁতভাবে তাক্ওয়ার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন।

মোটকথা, রাসূল ﷺ -এর প্রতি আদব প্রদর্শন ও তাক্ওয়া [খোদাভীতি] পরস্পরে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। যাদের অন্তরে যত বেশি খোদাভীতি রয়েছে তারা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি ততবেশি আদব প্রদর্শন করবে, তাঁকে ভালোবাসবে, তাঁর অনুগত থাকবে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে খোদাভীতির বালাই নেই তারা যে, নবী করীম ﷺ -এর প্রতি শুধু অশ্রদ্ধাই পোষণ করবে তাই নয়, বরং তাকে অপমানিত করতেও কুণ্ঠিত হবে না। নবী করীম ﷺ -এর সাথে বেয়াদবি করা অন্তরে খোদাভীতির অনুপস্থিতিকেই প্রমাণিত করে, যা মূলত অন্তর্নিহিত কুফরিরই লক্ষণ।

Free@www.e-ilm.weebly.com

٤. وَنَزَلَ فِىْ قَوْمٍ جَاؤُوْا وَقْتَ الظَّهِيْرَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِىْ مَنْزِلِهٖ فَنَادَوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ حُجُرَاتِ نِسَائِهٖ ﷺ جَمْعُ حُجْرَةٍ وَهِىَ مَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَرْضِ بِحَائِطٍ وَنَحْوِهٖ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَادٰى خَلْفَ حُجْرَةٍ لِاَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوْهُ فِىْ اَيِّهَا مُنَادَاةَ الْاَعْرَابِ بِغِلْظَةٍ وَجَفَاءٍ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ . فِيْمَا فَعَلُوْهُ مَحَلَّكَ الرَّفِيْعَ وَمَا يُنَاسِبُهٗ مِنَ التَّعْظِيْمِ .

অনুবাদ :

৪. একবার একদল লোক জোহরের সময় নবী করীম ﷺ -এর নিকট আগমন করেছিল, তখন তিনি তাঁর হুজরা শরীফে ছিলেন। তারা নবী করীম ﷺ -কে ডাকাডাকি আরম্ভ করল। তাদের ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাজিল হয়েছে। নিশ্চয় যারা হুজরাসমূহের পিছন হতে আপনাকে ডাকাডাকি করে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণীগণের হুজরার পিছন হতে; حُجُرَاتٌ শব্দটি حُجْرَةٌ -এর বহুবচন। حُجْرَةٌ 'হুজরা' বলে জমিনের সেই অংশকে বুঝায়, যা দেয়াল ইত্যাদি দ্বারা সংরক্ষিত [পরিবেষ্টিত] করা হয়। তাদের প্রত্যেকে একেকটি হুজরার পিছন হতে ডাকছিল। গ্রাম্য আরবদের ন্যায় কর্কশ ও কঠোর আওয়াজে ডাকাডাকি করছিল। কেননা তাদের জানা ছিল না যে, নবী করীম ﷺ কোনটিতে রয়েছেন। তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ-অবুঝ তারা আপনার শানে যা করেছে সে ব্যাপারে এবং আপনার উচ্চ মর্যাদা ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে।

٥. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا اَنَّهُمْ فِىْ مَحَلِّ رَفْعٍ بِالْاِبْتِدَاءِ وَقِيْلَ فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ ثَبَتَ . حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . لِمَنْ تَابَ مِنْهُمْ وَنَزَلَ فِى الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى بَنِى الْمُصْطَلَقِ مُصَدِّقًا فَخَافَهُمْ لِتَرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَرَجَعَ وَقَالَ اِنَّهُمْ مَنَعُوا الصَّدَقَةَ وَهَمُّوْا بِقَتْلِهٖ فَهَمَّ النَّبِيُّ ﷺ بِغَزْوِهِمْ فَجَاءُوْا مُنْكِرِيْنَ مَا قَالَهٗ عَنْهُمْ .

৫. যদি তারা সবর করত এখানে اَنَّهُمْ রফার মহল্লে হয়েছে, শুরুতে হওয়ার দরুন। কারো কারো মতে এটি একটি উহ্য فِعْل -এর فَاعِل হয়েছে। অর্থাৎ ثَبَتَ اَنَّهُمْ الخ আপনি তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত, তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম তথা কল্যাণকর হতো, আর আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করে তাদের জন্য। ওলীদ ইব্‌নে উকবা-এর ব্যাপারে এ আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। [ঘটনা হচ্ছে] নবী করীম ﷺ তাঁকে সদকা উসূলের জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে বনূ মুস্তালিকের সাথে তাঁর শত্রুতা থাকার কারণে তিনি তাদেরকে ভয় পেলেন। ফিরে এসে নবী করীম ﷺ -কে জানালেন যে, তারা সদকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করেছে। তদুপরি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে। নবী করীম ﷺ তাদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু বনূ মুস্তালিকের লোকেরা এসে তাদের ব্যাপারে ওলীদ ইবনে উকবা (রা.) যা বলেছেন, তা অস্বীকার করল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ خَبَرٍ فَتَبَيَّنُوْٓا صِدْقَهٗ مِنْ كِذْبِهٖ وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَتَثَبَّتُوْا مِنَ الثُّبَاتِ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا مَفْعُوْلٌ لَهٗ اَيْ خَشْيَةَ ذٰلِكَ بِجَهَالَةٍ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ اَيْ جَاهِلِيْنَ فَتُصْبِحُوْا فَتَصِيْرُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ مِنَ الْخَطَاِ بِالْقَوْمِ نٰدِمِيْنَ . وَاَرْسَلَ اِلَيْهِمْ ﷺ بَعْدَ عَوْدِهِمْ اِلٰى بِلَادِهِمْ خَالِدًا فَلَمْ يَرَ فِيْهِمْ اِلَّا الطَّاعَةَ وَالْخَيْرَ فَاَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِذٰلِكَ .

৬. হে মুমিনগণ! যদি তোমাদের নিকট আগমন করে কোনো ফাসিক কোনো খবরসহ সংবাদ নিয়ে তাহলে তোমরা তাকে যাচাই করে দেখবে অর্থাৎ এর সত্যকে মিথ্যা হতে প্রভেদ করে দেখবে। অন্য এক কেরাতে فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থানে فَتَثَبَّتُوْا রয়েছে যা ثُبَاتٌ হতে নির্গত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা একে সপ্রমাণিত করবে। যেন এমন না হয় যে, তোমরা কোনো কওমের ক্ষতি সাধন করে বসবে (اَنْ تُصِيْبُوْا) এটা مَفْعُوْل لَهٗ হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কায়। অজ্ঞাতসারে এটা فَاعِلٌ হতে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ جَهَالَةٍ শব্দটি جَاهِلِيْنَ [এর অর্থে হয়েছে।] অতঃপর তোমরা হবে হয়ে পড়বে তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে উক্ত কওমের সাথে তোমরা যে ভুল করেছ [সে ব্যাপারে] লজ্জিত। অতঃপর তারা তাদের এলাকায় ফিরে যাওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাদের নিকট হযরত খালিদ (রা.)-কে পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে আনুগত্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। সুতরাং তিনি নবী করীম ﷺ-কে তা জানালেন।

٧. وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ط فَلَا تَقُوْلُوا الْبَاطِلَ فَاِنَّ اللّٰهَ يُخْبِرُهٗ بِالْحَالِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ الَّذِيْ تُخْبِرُوْنَ بِهٖ عَلٰى خِلَافِ الْوَاقِعِ فَيُرَتِّبُ عَلٰى ذٰلِكَ مُقْتَضَاهُ لَعَنِتُّمْ لَاَثِمْتُمْ دُوْنَهٗ اِثْمَ التَّسَبُّبِ اِلَى الْمُرَتَّبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ حَسَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ط اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى دُوْنَ اللَّفْظِ لِاَنَّ مَنْ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ الخ غَايَرَتْ صِفَتُهٗ صِفَةَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهٗ اُولٰٓئِكَ هُمْ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْخِطَابِ الرّٰشِدُوْنَ لا الثَّابِتُوْنَ عَلٰى دِيْنِهِمْ .

৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ রয়েছেন কাজেই তোমরা অনর্থক কথাবার্তা বলো না। এরূপ করলে আল্লাহ পাক তৎক্ষণাৎ নবী করীম ﷺ -কে তা অবহিত করে দিবেন। বহুবিদ বিষয়ে যদি নবী করীম ﷺ তোমাদের অনুসরণ করতেন [তোমাদের কথা ধরতেন] যেসব অবাস্তব সংবাদ তোমরা তাঁকে পৌঁছাও যদি তদনুযায়ী তিনি আমল করে বসেন তাহলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরা গুনাহগার হবে। হুযূর ﷺ কিন্তু নির্দোষ থাকবেন। কেননা উক্ত কর্মের কারণ তোমরাই [কাজেই দায়ীও হবে তোমরা]। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে তুলেছেন এবং একে পরিশোভিত করেছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন এটাকে তোমাদের অন্তরে। আর অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন তোমাদের কাছে কুফর, ফিসক ও নাফরমানিকে – এটা [পূর্ববর্তী বাক্য হতে] অর্থের দিক বিবেচনায় اِسْتِدْرَاكٌ হয়েছে ; শব্দের দিক দিয়ে নয়। কেননা, যার নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে ..... তার অবস্থা পূর্বোল্লিখিতদের অবস্থা হতে ভিন্নতর হবে। এরাই হলো এখানে خِطَابٌ হতে (غَائِبٌ) -এর দিকে اِلْتِفَاتٌ করা হয়েছে। সঠিক পথপ্রাপ্ত তাদের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

٨. فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ اَىْ اَفْضَلَ وَنِعْمَةً ط مِنْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِهِمْ حَكِيْمٌ . فِىْ اِنْعَامِهِ عَلَيْهِمْ .

৮. আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ فَضْلًا এটা মাসদার। একটি উহ্য فِعْل তথা اَفْضَلَ -এর [مَفْعُوْل হওয়ার] কারণে مَنْصُوْب হয়েছে এবং অনুদান তাঁর পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন তাদেরকে এবং তিনি মহাপ্রকৌশলী তাদেরকে অনুদান প্রদানের ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْحُجُرَاتِ : প্রকাশ থাকে যে, اَلْحُجُرَاتُ শব্দটি حُجْرَةٌ -এর বহুবচন। যেমন- اَلظُّلُمَاتُ ও اَلْغُرُفَاتُ শব্দদ্বয় যথাক্রমে ظُلْمَةٌ ও غُرْفَةٌ -এর বহুবচন।

কেউ কেউ বলেছেন- حُجُرَاتٌ হলো حُجَرٌ -এর বহুবচন। আর حُجَرٌ হলো حُجْرَةٌ -এর বহুবচন। এমতাবস্থায় এটা বহুবচনের বহুবচন (جَمْعُ الْجَمْعِ) হবে।

اَلْحُجْرَةُ -এর অর্থ হলো- اَلْحُجْرَةُ هِىَ مَا يُحْجَرُ مِنَ الْاَرْضِ بِحَائِطٍ اَوْ نَحْوِهِ অর্থাৎ জমিনের নির্দিষ্ট অংশ যার চতুর্দিকে দেয়াল ইত্যাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়ে থাকে।

اَلْحُجُرَاتُ শব্দের মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : اَلْحُجُرَاتُ শব্দের মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. জমহুর ক্বারীগণ اَلْحُجُرَاتُ -এর ج অক্ষরকে পেশ যোগে اَلْحُجُرَاتُ পড়েছেন।

২. ইবনে আবী উবলা (র.) ج অক্ষরকে সাকিন যোগে اَلْحُجْرَاتُ পড়েছেন।

৩. আবূ জা'ফর কা'কা' ও শায়বা প্রমুখ ج অক্ষরকে যবর যোগে اَلْحُجَرَاتُ পড়েছেন।

قَوْلُهُ فَتَبَيَّنُوْا : فَتَبَيَّنُوْا -এর মধ্যে দু'টি ক্বেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণের মতে فَتَبَيَّنُوْا যা মূল কুরআনে রয়েছে।

২. হামযাহ ও কিসায়ী (র.) পড়েছেন- فَتَثَبَّتُوْا [ثُبَاتٌ হতে]।

قَوْلُهُ اَنْ تُصِيْبُوْا : اَنْ تُصِيْبُوْا এর মধ্যে দু' প্রকারের ইরাব হতে পারে। যথা-

১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা اَنْ تَبَيَّنُوْا -এর مَفْعُوْل لَهٗ হবে।

২. অথবা, এটা একটি উহ্য مُضَاف -এর مُضَاف اِلَيْه হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে।

قَوْلُهُ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ : আল্লাহর বাণী- لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ -এর মধ্যে দু' ধরনের ই'রাবের সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। এমতাবস্থায় এটা পূর্বোক্ত বাক্যে বর্ণিত فِيْكُمْ -এর যমীর হতে حَال হবে।

২. অথবা, এটা مَحَلًّا مَرْفُوْع হবে। তখন এটা একটি প্রশ্নের জবাব হবে এবং স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবে পরিগণিত হবে। প্রশ্নটি হলো- لَوْ اَطَاعَكُمُ الرَّسُوْلُ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَمَا يَحْدُثُ؟ [নবী করীম ﷺ যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করতেন তাহলে কি হতো?]

قَوْلُهُ نِعْمَةً وَّ فَضْلًا : আল্লাহর বাণী- "فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً" -এর মধ্যস্থিত فَضْلًا ও نِعْمَةً মহল্লান مَنْصُوْب হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা-

১. এগুলো একটি উহ্য فِعْل -এর مَصْدَرٌ (তথা مَفْعُوْل مُطْلَقٌ) হবে। অর্থাৎ- اَفْضَلَ اللّٰهُ فَضْلًا وَاَنْعَمَ نِعْمَةً

২. অথবা, حَبَّبَ ফে'লের مَفْعُوْل لَهٗ হবে।

৩. কিংবা مَفْعُوْل بِهٖ হবে।

نِعْمَةٌ ও فَضْل -এর মধ্যকার পার্থক্য : فَضْل -এর অর্থ হলো ঐ মঙ্গল, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে; কিন্তু তিনি এর মুখাপেক্ষী নন।

পক্ষান্তরে نِعْمَةٌ -এর অর্থ হলো যা আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার নিকট পৌছে এবং বান্দা এর মুখাপেক্ষী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ : শানে নুযূল : অত্র আয়াতদ্বয় বনূ তামীমের একটি প্রতিনিধি দলের শানে নাজিল হয়েছিল। তারা দুপুরে মদীনায় এসেছিল। তাদের মধ্যে আকরা ইবনে হাবিস ও উয়াইনা ইবনে হিসনও ছিলেন। নবী করীম ﷺ তখন দুপুরের কায়লুলাহ [খাওয়ার পর বিশ্রাম] করছিলেন। তারা নবী করীম ﷺ -এর বের হওয়ার অপেক্ষা করল না; বরং উম্মুহাতুল মু'মিনীনের হুজরা শরীফসমূহের পিছন দিক হতে নবী করীম ﷺ-এর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করল। তাদের ভাষা ছিল মাধুর্যহীন, আচরণ ছিল অসৌজন্যমূলক। নবী করীম ﷺ জাগ্রত হয়ে বাহিরে তাশরীফ আনয়ন করলেন। যেহেতু তারা অসময়ে তড়িঘড়ি করে ডাকাডাকি করছিল এবং নবী করীম ﷺ -কে বিরক্ত করেছিল সেহেতু অত্র আয়াতদ্বয় নাজিল করত তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে সকলকেই অবহিত করা হয়েছে যে, এরূপ আচরণ নবী করীম ﷺ -এর মনঃকষ্টের কারণ হয়ে থাকে এবং পরিণামে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টিকে অপরিহার্য করে। –[জালালাইন, লুবাব, কুরতুবী]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ الخ : শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত উম্মে সালামা (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ হতে এবং তাবারানী ও আহমদ (র.) হারিছ ইবনে আবিল হারিছ খুযায়ী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, অত্র আয়াতখানা ওলীদ ইবনে উকবা (রা.)-এর শানে নাজিল হয়েছে।

নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবা (রা.)-কে বনূ মুস্তালিকের নিকট জাকাত উসূল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে ওলীদের সাথে বনূ মুস্তালিকের শত্রুতা ছিল। ওলীদকে দেখে তারা সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসল। কিন্তু ওলীদ মনে করলেন যে, পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে আসলেন। নবী করীম ﷺ -কে জানালেন যে, বনূ মুস্তালিকের লোকেরা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে; বরং তারা আমাকে হত্যা করবার জন্য উদ্যত হয়েছে। নবী করীম ﷺ এটা শুনে তাদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করলেন।

অতঃপর বনূ মুস্তালিকের একটি দল নবী করীম ﷺ -এর নিকট আগমন করল। তারা আরজ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জাকাত প্রদানে প্রস্তুত ছিলাম এবং আপনার পক্ষ হতে এক ব্যক্তির আগমনে আমরা খুশিও হয়েছিলাম। তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা দিতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি রাস্তা হতে ফিরে চলে এসেছেন। আমরা তো এতে শঙ্কাবোধ করলাম যে, আল্লাহ ও রাসূল ﷺ আমাদের উপর নারাজ হয়ে পড়লেন নাকি?

তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার পর কোনো সংবাদ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অতঃপর নবী করীম ﷺ হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে বনূ মুস্তালিকের নিকট পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে কোনোরূপ বিদ্রোহী মনোভাব পেলেন না; বরং তাদেরকে সম্পূর্ণ অনুগত পেলেন এবং নবী করীম ﷺ -কে তা অবহিত করালেন।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : নবী করীম ﷺ -এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণকারীদেরকে অজ্ঞ আখ্যায়িত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

হে হাবীব! যারা আপনাকে হুজরাসমূহের পিছন দিক হতে ডাকাডাকি করে তাঁদের অধিকাংশই অজ্ঞ ও অবুঝ। এরূপ তাড়াহুড়া না করে তারা যদি আপনি তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করত, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তারা তাদের কৃতকর্ম হতে তওবা করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানি করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

মুসলিমদের উন্নতি নবী করীম ﷺ -এর মহব্বত ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর নির্ভরশীল : আলোচ্য আয়াত ও এর প্রেক্ষাপট হতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ -এর ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উপর মুসলিম জাতির তারাক্কী ও উন্নতি নির্ভরশীল।

বনূ তামীমের লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসল। নবী করীম ﷺ হুজরা শরীফে অবস্থান করছিলেন। তারা হুজরার বাইরে দাঁড়িয়ে নবী করীম ﷺ -কে ডাকাডাকি করতে লাগল। এটা ছিল এক ধরনের বেয়াদবি, অজ্ঞতা ও অসৌজন্যতা। নিজেদের সরলতা ও কারণে তারা মহানবী ﷺ -এর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা কি জানত যে, তখন তাঁদের উপর হয়তো ওহী নাজিল হচ্ছিল, অথবা তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশগুল ছিলেন। সময়সূচি ও সময়ানুবর্তিতা না থাকলে তো কোনো সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষেও দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ নবী করীম ﷺ তো মুসলমানদের যাবতীয় পার্থিব ও দীনি দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

তা ছাড়া নবী করীম ﷺ -এর সাথে আদবের বিষয়টিও ছিল লক্ষণীয়। তাদের উচিত ছিল কারো মাধ্যমে নবী করীম ﷺ -কে সংবাদটি পৌঁছে দেওয়া এবং নবী করীম ﷺ বের হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। তিনি বের হয়ে আসার পর তাঁর সাথে আলোচনায় বসা উচিত ছিল। এই ছিল উত্তম ও সৌজন্যমূলক পন্থা। এতদ্‌সত্ত্বেও অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে ঘটনাক্রমে যা ঘটে গেছে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মেহেরবানিতে তা ক্ষমা করে দিবেন।

যাতে স্বীয় ভুলের উপর অনুতপ্তবোধ করত ভবিষ্যতে যেন এরূপ পন্থা অবলম্বন না করে। নবী করীম ﷺ -এর মহব্বত ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এর উপরই মুসলিম জাতির উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। আর এটাই এমন ঈমানী সম্পর্ক, যার উপর ইসলামি ভ্রাতৃত্বের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ আদবের চাহিদা : এখানে إِلَيْهِمْ -এর মধ্যে এ রহস্য নিহিত রয়েছে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না নবী করীম ﷺ তোমাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে না আসেন। কিন্তু যদি তিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন অথবা বের হয়ে আসার পর অন্য কোনো কার্যে মশগুল হয়ে যান তাহলেও অপেক্ষা করতে হবে। কেননা এটা তো خُرُوجٌ إِلَيْهِمْ [তাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া] নয়। এটা হলো ধৈর্যের চরম অবস্থা। মোটকথা, নবী করীম ﷺ তোমাদের দিকে আকৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আদবের সাথে অপেক্ষা করতে থাক। আর তোমরা যদি বুঝতে পার যে, নবী করীম ﷺ তোমাদের কথা শ্রবণ করার জন্য বের হয়ে এসেছেন তাহলে তোমরা কথা বলতে পার।

নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও নবী করীম ﷺ -এর হাদীস পড়া এবং শুনার সময় এবং তাঁর রওজা শরীফে হাজির হওয়ার সময় তাঁর আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এমন কি খুলাফা, ওলামা ও দীনি নেতৃবৃন্দের সাথেও পর্যায়ক্রমে আদব রক্ষা করে চলতে হবে। অবশ্য নবী করীম ﷺ ও পরবর্তীগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে।

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ .... نٰدِمِيْنَ : আলোচ্য আয়াতে যে কোনো সংবাদ যাচাই-বাচাই করে গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। অন্যথা কি অশুভ পরিণাম হতে পারে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট কোনো ফাসিক কোনো সংবাদ নিয়ে আসলে তা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করে দেখবে যে, তা সত্য কি মিথ্যা। কেননা এমনও আশঙ্কা রয়েছে যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমের উপর আক্রমণ করে বসবে এবং পরিণামে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা : অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ আয়াতখানা ওলীদ ইবনে উকবা ইবনে আবূ মুয়ীত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তার ব্যাপারে ঘটনা হলো, বনূ মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা যখন মুসলমান হলো, তখন নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবাকে তাদের নিকট হতে জাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদের এলাকায় গিয়ে কোনো কারণে ভয় পেলেন, অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শয়তান তাকে প্ররোচিত করল। তাই তিনি গোত্রের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই মদীনা ফিরে গেলেন এবং নবী করীম ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, লোকেরা জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। অপর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তারা মুরতাদ হয়ে গেছে এবং জাকাত দিতে অস্বীকার করেছে, আর তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। নবী করীম ﷺ এ সংবাদ শুনতে পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি তাদের মস্তক চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে একটি সশস্ত্র বাহিনী পাঠাবার সংকল্প করলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে তিনি ঐ বাহিনী পাঠিয়েও দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, এ সময় বনূ মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে যিরার নিজেই একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং নিবেদন করলেন যে, আল্লাহর নামের শপথ, আমরা ওলীদকে দেখিওনি, জাকাত দিতে অস্বীকার করা তো দূরের কথা। আর তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করার তো কোনো প্রশ্নই উঠে না। আমরা যে ঈমান এনেছি তার উপরই অবিচল রয়েছি। জাকাত দিতে আমরা আদৌ অস্বীকার করিনি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোনো খবর নিয়ে আসে, তবে তার সত্যতা যাচাই করে নাও"। -[ইবনে কাছীর]

ভিত্তিহীন সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করা অনেক অকল্যাণের কারণ : নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবাকে বনূ মুস্তালিক গোত্রের নিকট হতে জাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। জাহিলি যুগ হতে ওলীদ এবং বনূ মুস্তালিক গোত্রের মধ্যে কিছুটা তিক্ততা ছিল। ওলীদের আগমনের কথা শুনে তারা সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসল, কিন্তু ওলীদ এটা দেখে বুঝে নিল যে, তারা তাকে হত্যা করতে আসছে। এ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ওলীদ ফিরে আসল এবং নিজের ধারণা মোতাবেক নবী করীম ﷺ-কে রিপোর্ট করল যে, বনূ মুস্তালিক মুরতাদ হয়ে গেছে এবং আমাকে হত্যা করতে সংকল্প করেছে। অতঃপর নবী করীম ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে এ সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য পাঠালেন এবং বললেন যে, ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে দেখবে মূল ব্যাপারটি কি? অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তারা ফিরে এসে সঠিক খবর জানাল যে, বনূ মুস্তালিক মুসলমান অবস্থায় আছে, তারা জাকাত দিতে প্রস্তুত। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে তারা নিজেরাই এসে নবীকে ঘটনাটি জানিয়ে দিয়েছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

মোটকথা ঘটনাটি ছিল এমন যে, একটি ভিত্তিহীন সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করে নেওয়ার দরুন একটি বিরাট ভুল সংঘটিত হতে যাচ্ছিল। একটি ভুল সংবাদের দরুন দু'টি বন্ধু দলের মাঝে চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশংকা দেখা দিয়েছিল। সম্ভাব্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ সবাইকে তা হতে রক্ষা করলেন। এ কারণেই ভিত্তিহীন সংবাদের উপর নির্ভর করা সকল ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার কারণ। -[কামালাইন, ফতূহাতে ইলাহিয়া, কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

খবরের সত্যতা যাচাই কখন জরুরি : এটা একটি স্বতন্ত্র আলোচনা যে, সংবাদের সত্যতা যাচাই করা কখন ওয়াজিব, কখন জায়েজ এবং কখন নিষিদ্ধ? এ ব্যাপারে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে-

১. যে ক্ষেত্রে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করলে কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব। যেমন বাদশাহ [খলিফা] যদি কারো মুরতাদ হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করেন, তাহলে তার জন্য উক্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই করা ওয়াজিব। যদি সংবাদ সত্য হয়, তাহলে মুরতাদকে তওবা করার জন্য বলবে। আর তওবা করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করবার নির্দেশ দান করবে।

অথবা, বাদশাহ যদি জানতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি অমুককে হত্যা করতে চায়, তাহলে যেহেতু প্রজাদের হেফাজত ও নিরাপত্তা বিধান করা ওয়াজিব সেহেতু তার সত্যতা যাচাই করা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ওয়াজিব।

২. যে ক্ষেত্রে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করলে কোনো ওয়াজিবে ব্যাঘাত হয় না এবং যার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার কোনো ক্ষতিও হবে না, তাহলে সংবাদের সত্যতা যাচাই করা জায়েজ; ওয়াজিব নয়। যেমন- কেউ শুনল যে, অমুক ব্যক্তি তাকে প্রহার করবে।

৩. আর যদি অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, যাচাই করলে নিজের ক্ষতি তো প্রতিহত করা যাবে না, কিন্তু অন্যের তা অপছন্দনীয় হবে তাহলে সংবাদের সত্যতা যাচাই করা হারাম হবে। যেমন- কেউ শ্রবণ করল যে, অমুক ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহলে এর যাচাই করলে নিজের কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু যাচাই করতে গেলে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হবে, কাজেই এমতাবস্থায় সংবাদের সত্যতা যাচাই করা হারাম হবে।

অত্র আয়াত হতে উদ্ভাবিত দু'টি মাসআলা : আলোচ্য আয়াতের আলোকে দু'টি শরয়ী মাসআলা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. অত্র আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ফাসিক পাপাচারীর সংবাদ গ্রহণ করা এবং এর উপর ভিত্তি করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া জায়েজ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সত্যতা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

তা ছাড়া সংবাদ পাওয়া মাত্র তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তও নেওয়া উচিত হবে না। فَتَبَيَّنُوْا -এর স্থলে فَتَثَبَّتُوْا কেরাতটি এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ সংবাদ পাওয়ার পর যাচাই-বাছাই করে দৃঢ় ও ধীরচিত্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

উল্লেখ্য যে, ফাসিকের সংবাদ যদ্রূপ গ্রহণযোগ্য নয় তদ্রূপ তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাক্ষ্য এমন একটি সংবাদ যাকে শপথ দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়। কাজেই ফাসিকের সংবাদ ও সাক্ষ্য কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফাসিকের সংবাদ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে ফাসিকের সংবাদ বা সাক্ষাৎ গ্রহণ করলে কারো ক্ষতির কোনোরূপ আশঙ্কা থাকে না, সেসব ক্ষেত্রে তার সংবাদ ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা আয়াতে কারীমায় ফাসিকের সংবাদ গ্রহণ না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে- اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ অর্থাৎ তাদের সংবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতীত গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদের অজ্ঞাতে কোনো কওমের ক্ষতি সাধন করে বসার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং কোনো ফাসিক এসে যদি বলে যে, 'অমুক ব্যক্তি আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ এ বস্তুটি দান করেছেন'। তাহলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা উক্ত সংবাদ গ্রহণ করলে এবং হাদিয়া কবুল করলে তাতে কারো কোনোরূপ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। -[মা'আরিফুল কুরআন]

২. আলোচ্য আয়াত হতে গৃহীত [উদ্ভাবিত] দ্বিতীয় শরয়ী মাসআলাটি হলো خَبَرِ وَاحِدْ একজনের সংবাদ [শর্তসাপেক্ষে] গ্রহণযোগ্য এবং শরিয়তের দলিল হওয়ার উপযোগী।

কেননা ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, নবী করীম ﷺ ওলীদ ইবনে উকবা (রা.) কর্তৃক প্রদত্ত বনূ মুস্তালিক সম্পর্কিত সংবাদের যথার্থতা যাচাই করে দেখার জন্য এবং তাঁর নিকট রিপোর্ট পেশ করার জন্য হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.)-কে পাঠিয়েছিলেন। খালিদ ইবনে ওলীদ (রা.) তদন্ত করার পর যেই রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন, নবী করীম ﷺ উক্ত সংবাদ গ্রহণও করেছিলেন।

সুতরাং তা হতে خَبَرِ وَاحِدْ দলিল [ও তা গ্রহণযোগ্য] হওয়া প্রমাণিত হলো। -[তাফসীরে কবীর]

قَوْلُهُ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا : এ অংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. কূফাবাসীদের নিকট এর অর্থ হবে- لِئَلَّا تُصِيْبُوْا قَوْمًا

২. আর বসরাবাসীদের মতে এর অর্থ হবে- خَشْيَةَ اَنْ تُصِيْبُوْا -[তাফসীরে কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কুফর, ফিসক এবং ইসয়ানের মধ্যকার পার্থক্য : উল্লেখ্য যে, কুফর, ফিসক এবং ইসয়ান– এ তিনটি শব্দই اِيْمَان كَامِل তথা পূর্ণ ঈমানের বিপরীত। কারণ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। যার কোনো একটির অনুপস্থিতিতে পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কুফর, ফিসক এবং ইসয়ান এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ঈমানী গুণের বিপরীত। কারণ পূর্ণ মুমিন হতে হলে প্রথমত تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ তথা অন্তরের বিশ্বাস-এর প্রয়োজন। আর এটা কুফর এবং تَكْذِيْب -এর বিপরীত। দ্বিতীয়ত اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ -এর প্রয়োজন। আর এটা এটা ফিসক এবং كِذْب -এর বিপরীত। তৃতীয়ত عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ -এর প্রয়োজন। আর এটা عِصْيَان বা مَعْصِيَة -এর বিপরীত।

অথবা কুফরের অর্থ হচ্ছে শিরক। আর اَلْفُسُوْقُ -এর অর্থ হচ্ছে خُرُوْجٌ عَنِ الطَّاعَةِ বা আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া। অথবা কুফরের সম্পর্ক হবে কালামের সাথে আর مَعْصِيَة অর্থ হলো– আমল পরিত্যাগ করা। অথবা কুফ্‌রের অর্থ হচ্ছে– প্রকাশ্য পাপ, আর فُسُوْق -এর অর্থ হলো– কবীরা গুনাহ, আর مَعْصِيَة -এর অর্থ হলো– সগীরা গুনাহ।

সারকথা হলো, পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে হলে ব্যক্তির বিশ্বাস, আমল ও কথায় ছোট বা বড় কোনো গুনাহই থাকতে পারবে না। সকল গুনাহই তার নিকট অপছন্দনীয় হবে।

قَوْلُهُ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ الخ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, রাসূল ﷺ-এর বর্তমানে তোমরা যদি লাগামহীন কথাবার্তা বল, তাহলে রাসূলে কারীম ﷺ -কে তা অবহিত করে দেওয়া হবে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে নবী করীম ﷺ বর্তমান রয়েছেন। তোমরা যদি অবাস্তব কোনো সংবাদ তাঁকে প্রদান কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা ফাঁস করে দিবেন এবং তাঁকে বাস্তব ঘটনা অবহিত করিয়ে দিবেন। তোমরা তাঁকে যেসব অবাস্তব সংবাদ প্রদান কর, এর অধিকাংশ অনুযায়ী যদি তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তাহলে পরিণামে তোমরা কষ্ট পেতে। এর জন্য তিনি দায়ী হতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তোমাদেরকে প্রিয় বান্দা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন, ঈমানকে তোমাদের নিকট প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে একে সুশোভিত করে দিয়েছেন; পক্ষান্তরে কুফর, ফিস্‌ক ও নাফরমানিকে তোমাদের নিকট অপ্রিয় করে দিয়েছেন; সেহেতু তোমাদেরকে মিথ্যা সংবাদের ভয়াবহ পরিণতি হতে মেহেরবানি করে হেফাজত করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য : নবী করীম ﷺ মুসলমানদের মাঝে থাকা বস্তুত একটি বিরাট নিয়ামত। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ الخ সুতরাং তোমরা এর মর্যাদা প্রদান কর। ইহ্‌-পারলৌকিক কোনো বিষয়ে তোমরা তাঁর বিরোধিতা করো না। এরূপ ধারণা করে বস না যে, পার্থিব বিষয়াদিতে নবী করীম ﷺ আমাদের অনুসরণ করবেন। তাছাড়া তিনি তোমাদের কোনো সংবাদ বা মতামত অনুযায়ী যদি আমল না করেন, তাহলে এতে বিরক্ত হয়ো না। কেননা হক বা সত্য কারো ইচ্ছা বা মতামতের অনুসারী নয়। এরূপ হলে তো আসমান-জমিনের এ কারখানা কবেই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেত।

যাহোক, নবী করীম ﷺ যদি লোকজনের কথা মেনে নিতে থাকতেন, তাহলে তোমরা বিপদে পড়ে যেতে। কিন্তু আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি অনুগ্রহ করে ঈমানদারগণের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, ফিসক ও গুনাহ্‌কে অপ্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। যদ্দরুন তাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ কাম্য রয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ -এর রেজামন্দি হাসিলের জন্য তাঁরা যে কোনো ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। যথায় নবী করীম ﷺ উপস্থিত রয়েছেন তথায় অন্য কারো ইচ্ছা ও মতামতের কিভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে?

এমন কি পার্থিব বিষয়াদিতেও নবী করী ﷺ -এর আনুগত্য জরুরি। তাঁর নিঃশর্ত আনুগত্য ব্যতীত ঈমান কামিল হতে পারে না। সুতরাং ঈমানদারগণ সাথে সাথেই নবী করীম ﷺ -এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন এবং নিজেদের ঈমানকে পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়েছেন। আজ যদিও নবী করীম ﷺ আমাদের মাঝে নেই তথাপি তাঁর শিক্ষা, ওয়ারিশ ও প্রতিনিধি আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

কার কি যোগ্যতা রয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই অবগত আছেন। তিনি স্বীয় হিকমতের আলোকে যে যা পেতে পারে তাকে তা দান করে থাকেন। তার প্রতিটি বিধানেই হিকমত রয়েছে– মুসলিম মনীষীগণ ও অল্পবিস্তর তা অবগত রয়েছেন।

قَوْلُهُ اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى : গ্রন্থকার (র.) স্বীয় বক্তব্য– اِسْتِدْرَاكٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নটি এই যে, لٰكِنَّ -এর পূর্বাপরের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এর সম্পর্ক হয়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্বের বাক্য ও পরের বাক্য পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। অথচ এখানে তা দেখা যায় না, এর কারণ কি?

জবাবের সারকথা এই যে, যদিও শাব্দিকভাবে এখানে বৈপরীত্ব ও বিরোধ দেখা যায় না, কিন্তু অর্থগতভাবে বৈপরীত্ব বিদ্যমান। কেননা উপরোল্লিখিত গুণের অধিকারীগণ পূর্বোল্লিখিতদের হতে ভিন্ন ধরনের। পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার যারা তাদের অবস্থা পূর্বে উল্লিখিতদের হতে আলাদা। তারা সব কথায় কান দেয় না। সুতরাং পূর্বাপরের মধ্যে বৈপরীত্ব সাব্যস্ত হয়ে গেল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ قَضِيَّةٍ هِيَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا وَمَرَّ عَلٰى ابْنِ اُبَيٍّ فَبَالَ الْحِمَارُ فَسَدَّ ابْنُ اُبَيٍّ اَنْفَهُ فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ وَاللّٰهِ لَبَوْلُ حِمَارِهٖ اَطْيَبُ رِيْحًا مِنْ مِسْكِكَ فَكَانَ بَيْنَ قَوْمَيْهِمَا ضَرْبٌ بِالْاَيْدِيْ وَالنِّعَالِ وَالسُّعَفِ اقْتَتَلُوْا جُمِعَ نَظَرًا اِلَى الْمَعْنٰى لِاَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ جَمَاعَةٌ وَقُرِئَ اقْتَتَلَتَا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج ثُنِّيَ نَظَرًا اِلَى اللَّفْظِ فَاِنْ بَغَتْ تَعَدَّتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ تَرْجِعَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ج اَلْحَقِّ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ بِالْاِنْصَافِ وَاَقْسِطُوْا ط اِعْدِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ .

١٠. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فِي الدِّيْنِ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ج اِذَا تَنَازَعَا وَقُرِئَ اِخْوَتِكُمْ بِالْفَوْقَانِيَّةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي الْاِصْلَاحِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

অনুবাদ :

৯. আর ঈমানদারদের মধ্যে যদি দু'টি দল– অত্র আয়াতখানা একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। তা এই যে, নবী করীম ﷺ একবার গাধায় সওয়ার হলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট দিয়ে যেতে লাগলেন। এমতাবস্থায় গাধাটি প্রস্রাব করল। এতদ দর্শনে ইবনে উবাই নাক বন্ধ করে ফেলল। তখন হযরত ইবনে রাওয়াহা (রা.) বললেন, [হে ইবনে উবাই!] তোমার মেশক হতে তাঁর গাধার প্রস্রাব অধিক সুগন্ধিযুক্ত। এতে উভয় গোত্র হাত, জুতা ও গাছের ডালের দ্বারা মারামারি শুরু করে দেয়। [طَائِفَةٌ -এর] অর্থের দিক বিবেচনায় [اِقْتَتَلُوْا ক্রিয়াকে] বহুবচন নেওয়া হয়েছে। কেননা প্রতিটি طَائِفَةٌ -ই একেকটি দল। অন্য এক কেরাতে اِقْتَتَلَتَا রয়েছে, তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে সমঝোতা করে দাও। শব্দের দিক বিচারে দ্বিবচন নেওয়া হয়েছে। সুতরাং [এরপরও] যদি বাড়াবাড়ি করে সীমালঙ্ঘন করে তাদের মধ্য হতে একটি দল অন্য দলের উপর, তাহলে বাড়াবাড়িকারী দলের সাথে লড়াই কর। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ফিরে আসে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহর নির্দেশ [তথা বিধান]-এর দিকে [অর্থাৎ] সত্যের দিকে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তাহলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ইনসাফের সাথে এবং তোমরা ন্যায়বিচার করবে ইনসাফ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীগণকে ভালোবাসেন।

১০. নিশ্চয় ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই দীনি ভাই। কাজেই তোমাদের ভাইগণের মধ্যে সমঝোতা করে দাও যখন তারা পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। اَخَوَيْكُمْ -এর স্থলে এক কেরাতে اِخْوَتِكُمْ [تَا] -এর সাথে রয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর। সমঝোতা স্থাপনের ব্যাপারে। যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِقْتَتَلُوْا : اِقْتَتَلُوْا শব্দের মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ বহুবচনের সীগাহ দ্বারা اِقْتَتَلُوْا পড়েছেন। কেননা طَائِفَتَانِ শব্দগতভাবে বহুবচন।

২. ক্বারী ইবনে আবী উবলা (র.) পড়েছেন– اِقْتَتَلَتَا কেননা طَائِفَتَانِ তাছনিয়া মুয়ান্নাছ।

৩. যায়েদ ইবনে আলী ও উবাইদ ইবনে উমায়ের প্রমুখ ক্বারীগণ পড়েছেন– اِقْتَتَلَا ; তারা طَائِفَتَانِ -কে فَرِيْقَانِ হিসেবে গণ্য করেছেন।

قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا : আল্লাহর বাণী– فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -এর যমীরের مَرْجِعْ হলো طَائِفَتَانِ - [طَائِفَتَانِ -এর] শব্দের দিক বিবেচনায় একে দ্বিবচনের নেওয়া হয়েছে [যদিও পূর্বে اِقْتَتَلُوْا -এর মধ্যে বহুবচনের যমীর নেওয়া হয়েছিল অর্থের দিকে লক্ষ্য করে।]

قَوْلُهُ أَخَوَيْكُمْ : আল্লাহর বাণী– "فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" -এর মধ্যস্থিত أَخَوَيْكُمْ -এর মধ্যে তিন প্রকারের কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ أَخَوَيْكُمْ [দ্বিবচনের সীগাহ] পড়েছেন।

২. যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হাসান (রা.), হাম্মাদ ইবনে সালিমা (র.) ও ইবনে সীরীন (র.) প্রমুখ إِخْوَانِكُمْ পড়েছেন।

৩. আবূ আমর (র.) নসর ইবনে আসিম (র.), আবু আলিয়া (র.) ও ইয়াকূব (র.) প্রমুখ إِخْوَتِكُمْ পড়েছেন।

بَيْنَهُمَا -এর যমীর কিভাবে তাছনিয়া বা দ্বিবচন নেওয়া হলো, অথচ নিকটবর্তী مَرْجِعْ বহুবচন হয়েছে : আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -তে বর্ণিত بَيْنَهُمَا -এর যমীর কিভাবে تَثْنِيَة নেওয়া ঠিক হয়েছে, অথচ তার নিকটবর্তী مَرْجِعْ . اِقْتَتَلُوْا শব্দটি جَمْع -এর শব্দ?

মূল কথা হলো, بَيْنَهُمَا -এর যমীরটির مَرْجِعْ হলো طَائِفَتَانِ ; সুতরাং طَائِفَتَانِ শব্দের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে بَيْنَهُمَا -এর যমীরটি تَثْنِيَة নেওয়া হয়েছে। –[জালালাইন]

কিভাবে اِقْتَتَلُوْا -এর যমীরটি جَمْع নেওয়া হয়েছে অথচ তার مَرْجِعْ দ্বিবচন : اِقْتَتَلُوْا শব্দটি অর্থের দৃষ্টিতে জমা নেওয়া হয়েছে, যদিও সঙ্গতভাবে তা تَثْنِيَة হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা প্রতিটি طَائِفَة হলো একটি দল যাতে অনেক লোক আছে। সুতরাং অর্থের দৃষ্টিতে جَمْع নেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হক, আদব এবং তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সাধারণ দলগত ও ব্যক্তিগত রীতিনীতি এবং পরস্পরিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে। অপরকে কষ্ট প্রদান থেকে বিরত থাকাই আলোচ্য আয়াতগুলোর মূল প্রতিপাদ্য।

শানে নুযূল : এসব আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদ মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোনো একটি ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দেখে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরিক করে দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জিহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোনো ইমাম, আমির সরদার অথবা বাদশাহ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয় পক্ষকে উপদেশ দিয়ে যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সম্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারো বিরোধিতা এবং কারো পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না। –[বয়ানুল কুরআন]

মাসায়েল : মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। হয়তো বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে না কিংবা এক দল শাসনাধীন হবে কিংবা উভয় দল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। এটা ওয়াজিব। যদি ইসলামি সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয় পক্ষের সাথে বিদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জুলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদিল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফিকহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে গোলাম অথবা বাঁদি করা হবে না এবং তাদের ধনসম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধনসম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যার্পণ করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে- فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ যদি বিদ্রোহী দল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে শুধু যুদ্ধ-বিরতিই যথেষ্ট হবে না; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোনো পক্ষের মনো বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কুরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনসাফের তাকিদ করেছে। -[বয়ানুল কুরআন]

মাস'আলা : যদি মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোনো সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরিয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যাদ্দারা খোদ ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম জুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের জুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত। -[মাযহারী]

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হালাল। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েজ হবে না। -[মাযহারী]

এই বিধান তখন, যখন এক দলের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদিল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদিল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোনো প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে। যেমন জামাল ও সিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ : ইমাম আবু বকর ইবনে আরাবী (রা.) বলেন, এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোনো শরিয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গে-জামাল ও সিফফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে-

কোনো সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েজ নয়। কারণ তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বদা উত্তম পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহা (রা.) সম্পর্কে বলেছেন- إِنَّ طَلْحَةَ شَهِيْدٌ يَمْشِىْ عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ অর্থাৎ তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখন হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে হযরত তালহা (রা.)-এর জন্য বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ ও নাফরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনিভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্য শাহাদাতের মর্তবা অর্জিত হতো না। কারণ শাহাদাত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরি।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যুবায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়া তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়র (রা.) এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গুনাহগার ছিলেন না। এরূপ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুবায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্বসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়েম রেখেছেন এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসিক সাব্যস্ত করা এবং তাঁদের ফজিলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয় সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি জবাবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন– تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জবাবে অন্য একজন বুজুর্গ বলেন এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেননি। এখন আমি আমার জিহ্বাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোনো এক পক্ষকে কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন, আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার বাদানুবাদ হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলির অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুয়তের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যায়নি। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ঘটনাবলির ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বসরী (র.) সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সে ব্যাপারে আমরা নীরব থাকব।

হযরত মুহাসেবী (র.) বলেন, আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নীরব থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোনো পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১১. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ الْاٰيَةُ نَزَلَتْ فِيْ وَفْدِ تَمِيْمٍ حِيْنَ سَخِرُوْا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ كَعَمَّارٍ وَصُهَيْبٍ وَالسُّخْرِيَةُ الْاِزْدِرَاءُ وَالْاِحْتِقَارُ قَوْمٌ اَيْ رِجَالٌ مِنْكُمْ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَا نِسَآءٌ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ لَا تَعِيْبُوْا فَتُعَابُوْا اَيْ لَا يُعِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ لَا يَدْعُوْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلَقَبٍ يَكْرَهُهُ وَمِنْهُ يَا فَاسِقُ يَا كَافِرُ بِئْسَ الْاِسْمُ اَيِ الْمَذْكُوْرُ مِنَ السُّخْرِيَةِ وَاللَّمْزِ وَالتَّنَابُزِ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج بَدَلٌ مِنَ الْاِسْمِ لِاِفَادَةِ اَنَّهُ فِسْقٌ لِتَكَرُّرِهِ عَادَةً وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ مِنْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

১২. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ اَيْ مُؤْثِمٌ وَهُوَ كَثِيْرٌ كَظَنِّ السُّوْءِ بِاَهْلِ الْخَيْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهُمْ كَثِيْرٌ بِخِلَافِهِ بِالْفُسَّاقِ مِنْهُمْ فَلَا اِثْمَ فِيْهِ فِيْ نَحْوِ مَا يَظْهَرُ مِنْهُمْ وَلَا تَجَسَّسُوْا حُذِفَ مِنْهُ اِحْدَى التَّائَيْنِ لَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَعَائِبَهُمْ بِالْبَحْثِ عَنْهَا.

অনুবাদ :

১১. হে মুমিনগণ! কেউ যেন উপহাস না করে– তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল হযরত আম্মার (রা.) ও সুহায়েব (রা.) ইত্যাকার দরিদ্র মুসলমানদের সাথে বিদ্রূপ করেছিল। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। আর سُخْرِيَةٌ এমন হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুককে বলে যা দ্বারা অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং কষ্ট দেওয়া হয়। কোনো কওম তোমাদের মধ্য হতে এক দল অন্য কওম [দল]-এর সাথে [কেননা] হয়তো উপহাসকৃতরা উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে– আল্লাহর নিকট আর যেন উপহাস না করে নারীগণ তোমাদের মধ্য হতে অপর নারীগণের সাথে [কেননা] হয়তো উপহাসকৃতা নারীগণ উপহাস-কারিণীগণের অপেক্ষা উত্তম হবে। আর তোমাদের নিজেদের [ভাইয়ের] প্রতি দোষারোপ করো না অর্থাৎ তুমি তোমার অন্য ভাইয়ের প্রতি দোষারোপ করো না, তাহলে তোমার প্রতিও দোষারোপ করা হবে। অর্থাৎ তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না। আর পরস্পরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না– একে অপরকে এমন উপাধিতে ডেকো না যা সেই [আহুত ব্যক্তি] অপছন্দ করে। যেমন হে ফাসিক! হে কাফের ইত্যাদি। কতইনা মন্দ নাম; বিদ্রূপ, দোষারোপ, মন্দ নামে ডাকা ইত্যাদি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিস্‌কের নামকরণ ঈমান গ্রহণের পর اَلْفُسُوْقُ শব্দটি اَلْاِسْمُ হতে بَدَلٌ হয়েছে। এটা বুঝানোর জন্য যে, তা ফিস্‌ক। কেননা بَدَلٌ সাধারণত বারংবার হয়। আর যে তওবা করবে না তা হতে– তারাই জালিম।

১২. হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অধিক ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাক। নিঃসন্দেহে কতিপয় ধারণা গুনাহ অর্থাৎ গুনাহের দিকে ধাবিতকারী। আর এর সংখ্যা অনেক। যেমন ভালো-সৎ ঈমানদারগণের ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করা– যারা সংখ্যায় অনেক। ফাসিক মুসলমানদের ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা– এটার বিপরীত। কেননা এটা যদি তাদের বাহ্যিক অবস্থা মাফিক হয় তাহলে তাতে গুনাহ হবে না। আর কারো ছিদ্রান্বেষণ করো না। এর দু'টি تَ -এর একটিকে হযফ করা হয়েছে। [অর্থাৎ] মুসলমানদের গোপন বিষয়াদি ও দোষ-ত্রুটি উদঘাটনের পিছনে লেগে যেয়ো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط لَا يَذْكُرْهُ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ لَا يَحِسُّ بِهِ لَا فَكَرِهْتُمُوهُ ط اَيْ فَاغْتِيَابُهُ فِيْ حَيَاتِهِ كَاَكْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْكُمُ الثَّانِيْ فَكَرِهْتُمُوهُ فَاكْرَهُوا الْاَوَّلَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اَيْ عِقَابَهُ فِي الْاِغْتِيَابِ بِاَنْ تَتُوبُوا مِنْهُ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ قَابِلُ تَوْبَةِ التَّائِبِيْنَ رَحِيْمٌ بِهِمْ .

একে অপরের গিবত করো না– অন্যের এমন কিছু উল্লেখ কর না যা সে অপছন্দ করে– যদিও এটা তার মধ্যে বিদ্যমান। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? مَيْتًا শব্দটির ى অক্ষরটি তাশ্‌দীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয়ভাবে পড়া যায়। [অর্থাৎ] যার মধ্যে অনুভূতি নেই। [জবাব হবে] না। সুতরাং তোমরা একে অপছন্দ কর। অর্থাৎ জীবদ্দশায় তার গিবত করা মৃতাবস্থায় তার গোশ্‌ত খাওয়ার সমতুল্য। আর তোমাদের নিকট দ্বিতীয়টি পেশ করার পর তোমরা একে ঘৃণা করেছ। সুতরাং প্রথমোক্তটিকেও ঘৃণা কর [এবং পরিহার কর]। আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ গিবত করার ব্যাপারে তাঁর শাস্তিকে ভয় কর। এভাবে যে, গিবত হতে তোমরা তওবা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী। তওবাকারীদের তওবা কবুলকারী অতিশয় দয়ালু তওবাকারীদের প্রতি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْفُسُوْقُ : আল্লাহর বাণী– بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ -এর মধ্যস্থিত اَلْفُسُوْقُ শব্দটি اَلْاِسْمُ হতে بَدَلٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে। কেননা, اَلْاِسْمُ শব্দটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ আর بَدَلٌ ও مُبْدَلٌ -এর ই'রাব এক হয়ে থাকে।

قوله وَلَا تَجَسَّسُوْا : আল্লাহর বাণী– وَلَا تَجَسَّسُوْا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ ج -এর সাথে وَلَا تَجَسَّسُوْا পড়েছেন।

২. হাসান, আবূ রেজা ও ইবনে সীরীন প্রমুখ ক্বারীগণ ج -এর পরিবর্তে ح দ্বারা وَلَا تَحَسَّسُوْا পড়েছেন।

قَوْلُهُ مَيْتًا : আল্লাহর বাণী– "اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا" -এর মধ্যস্থিত مَيْتًا শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কেননা, এটা لَحْم অথবা اَخِيْهِ হতে حَال হয়েছে।

مَيْتًا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ ى -এর উপর সাকিনযোগে مَيْتًا পড়েছেন।

২. হযরত নাফে (র.) ى -এর উপর তাশ্‌দীদযোগে مَيِّتًا পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ الخ : শানে নুযূল : অত্র আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। যথা–

১. হযরত যাহ্‌হাক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে কতিপয়ের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মধ্যে হযরত আম্মার (রা.), সোহাইব (রা.), খাব্বাব (রা.), ফোহায়রা (রা.), বেলাল (রা.), সালমান (রা.) ও সালিম (রা.) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। বনূ তামীমের লোকেরা তাদেরকে উপহাস করল। তাদের ব্যাপারে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

২. তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতখানা হযরত সাবিত ইবনে কায়েস ইব্‌নে শামআস (রা.)-এর শানে নাজিল হয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হযরত সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) কানে কম শুনতেন। এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সাধারণত নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে তাঁকে সামনের কাতারে বসার জন্য সুযোগ করে দিতেন।

একদিন হযরত সাবিত (রা.) নামাজের পর নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে হাজির হয়ে দেখতে পান যে, আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সাহাবীগণ (রা.) সারিবদ্ধ হয়ে আলোচনা শুনছিলেন। হযরত সাবিত (রা.) সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য বলতে লাগলেন- تَفَسَّحُوْا تَفَسَّحُوْا সকলেই তাঁকে সামনে যাওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর প্রায় সম্মুখে পৌঁছলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে আর সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হলো না। হযরত সাবিত (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কে? উপস্থিত লোকজন তার নাম প্রকাশ করে দিল। হযরত সাবিত (রা.) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বললেন, অমুক মহিলার পুত্র নাকি? জাহেলিয়াতের যুগে তাকে উক্ত নামে ডাকা হতো। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। হযরত সাবিত (রা.)-এর কথায় সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয় এবং এ ধরনের আচরণ হতে বিরত থাকার জন্য সাহাবীগণ (রা.)-কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

৩. অপর এক বর্ণনা এসেছে যে, ইকরিমা ইবনে আবী জাহল (রা.) মুসলমান হওয়ার পর মদীনায় আগমন করলেন। লোকজন তাকে বিদ্রূপ করল এবং বলল যে, اِبْنُ فِرْعَوْنَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ -এ উম্মতের ফিরাউনের ছেলে'। হযরত ইকরিমা (রা.) নবী করীম ﷺ -কে তা অবগত করালেন। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়। অনুরূপ আচরণ পরিহার করার জন্য সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ : শানে নুযূল : অত্র আয়াতের শানে নুযূলের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

১. কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, অত্র আয়াতখানা হযরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (রা.)-এর শানে নাজিল হয়েছে। তিনি ছিলেন ইহুদি রমণী। খায়বরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে মুসলিমদের হাতে আসার পর নবী করীম ﷺ তাকে আজাদ করেন এবং বিবাহ করেন। মদীনার অন্যান্য মহিলারা তাঁকে يَهُوْدِيَّةٌ بِنْتُ يَهُوْدِيَّةٍ (ইহুদির কন্যা ইহুদি) বলে তিরস্কার করত। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি বলনি যে, আমার পিতা হলেন হারূন (আ.), আমার চাচা হলেন মূসা (আ.) এবং আমার স্বামী হলেন মুহাম্মদ ﷺ ? তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিনীগণ (রা.) হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে বেঁটে ও খাটো বলে তিরস্কার করত। তাঁদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

৩. হযরত আয়েশা (রা.) হযরত উম্মে সালামা (রা.)-কে তিরস্কার করেছিলেন। তিনি উম্মে সালামা (রা.)-এর দিকে ইশারা করে বলেছিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মে সালামা (রা.) তো বেঁটে ও খাটো। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

قَوْلُهُ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ : শানে নুযূল : وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ আয়াতাংশের শানে নুযূলের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা-

১. বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁর সাথে কোনো এক বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) রাগন্বিত হয়ে তাকে বললেন, হে ইহুদির বাচ্চা! তখন নবী করীম ﷺ হযরত আবূ যর (রা.)-কে বললেন, হে আবূ যর! তুমি কি ঐ স্থানে লাল কালো দেখতে পাও না? তাক্‌ওয়ার দৃষ্টিতে তুমি তার অপেক্ষা উত্তম নও।

২. হাসান ও মুজাহিদ (র.) বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পরও কোনো কোনো ব্যক্তিকে কুফরির দিকে নিসবত করা হতো। যেমন- বলা হতো, হে ইহুদি! হে খ্রিস্টান! ইত্যাদি। তাদেরকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا : শানে নুযূল : আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا -এর শানে নুযূল হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে।

দু জন সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে নবী করীম ﷺ -এর নিকট তরকারির জন্য পাঠালেন। হযরত উসামা (রা.) খাওয়ার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তরকারি প্রদানে অস্বীকার করলেন। হযরত সালমান (রা.) প্রেরণকারী সাহাবীদ্বয়কে বিষয়টি অবহিত করালেন। তারা শুনে তিরস্কার করে বলল, হযরত সালমান (রা.)-কে যদি পানি ভর্তি কূপেও পাঠানো হয় তাহলে তার পানি শুষ্ক হয়ে যাবে।

উক্ত সাহাবীদ্বয় নবী করীম ﷺ -এর নিকট গেলেন। তাদের দেখে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, বাহ্ তোমাদের মুখে গোশ্‌তের লালিমা কিভাবে চমকাচ্ছে। তারা বললেন, আমরা তো গোশ্‌ত খাইনি। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা গিবত করেছ। তাদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

আয়াতগুলোর পূর্বাপর সম্পর্ক : ইতোপূর্বে মুসলমানদের পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিবাদ প্রতিরোধ করার কৌশলের উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ঘটনাক্রমে তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়ে গেলে তা কিভাবে নিরসন করতে হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারস্পরিক বিরোধ সম্পূর্ণ মেটানোও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত তা যেন ব্যাপক আকার ধারণ না করে তার চেষ্টা করতে হবে। কেননা দু' ব্যক্তি বা দু' দলের মধ্যে যদি ঘটনাক্রমে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন পরস্পরে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-কৌতুক করে থাকে, যা মতবিরোধের আগুনে ইন্ধন যোগিয়ে থাকে। অথচ যাকে সে উপহাস করছে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা যে, উপহাসকারীর অপেক্ষা বহু গুণে বেশি তা তার জানাও নেই। আর এভাবে মতবিরোধ ও তিক্ততা এত প্রকট আকার ধারণ করে যে, তা সংশোধনের আর কোনো পথই খোলা থাকে না।

قَوْلُهُ يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ ...... خَيْرًا مِّنْهُنَّ : এখানে আল্লাহ তা'আলা একজন ঈমানদারকে অন্য ঈমানদারের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে পুরুষগণ যেন অপর পুরুষদের এবং নারীগণ যেন অপর নারীদের বিদ্রূপ না করে। কেননা হয়তো আল্লাহর নিকট বিদ্রূপকারীদের অপেক্ষা বিদ্রূপকৃতগণ অধিকতর সম্মানী ও উত্তম হতে পারে, যা তাদের জানা নেই।

কোনো দল যেন অন্য দলের সাথে কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়ের সাথে উপহাস না করে। سُخْرِيَة এমন হাসি ও বিদ্রূপকে বলে যা দ্বারা অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং তার অন্তরে ব্যথা দান করা হয়। কিন্তু কারো অন্তরকে খুশি করার জন্য যে হাসি-তামাশা করা হয় তাকে কৌতুক বলে। এটা জায়েজ বরং নবী করীম ﷺ হতে সাব্যস্ত রয়েছে।

قَوْم এবং نِسَاء -এর শব্দের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু সমষ্টিগতভাবে বিদ্রূপ করা নাজায়েজ; বরং পুরুষ ও নারীদের জাতি বুঝানোই এটার উদ্দেশ্য, চাই তাদের সংখ্যা এক হোক অথবা একাধিক হোক। যদ্রূপ নারীদের সাথে নারীদের এবং পুরুষদের সাথে পুরুষদের বিদ্রূপ করা হারাম তদ্রূপ নারীদের সাথে পুরুষদের এবং পুরুষদের সাথে নারীদের বিদ্রূপ করাও হারাম। অধিকতর উপহাস সমজাতীয়ের সাথে হওয়ার কারণেই সম্ভবত কুরআন মাজীদে তাখসীস করা হয়েছে। অথবা, এর উদ্দেশ্য এই যে, সমজাতীয়ের সাথে যখন উপহাস করা জায়েজ নেই তখন অসমজাতীয়ের সাথে কোনোক্রমেই জায়েজ হবে না। কেননা এতে উপহাস ছাড়াও এক ধরনের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা নিহিত রয়েছে– যা ততোধিক নিন্দনীয়। আর যে কোনো লোক যতই হীন হোক তার শেষ পরিণতি যদি ঈমানের সাথে হয় অর্থাৎ ঈমানের সাথে যদি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাহলে আল্লাহর নিকট অবশ্যই সে মর্যাদাবান হবে। অপরদিকে বাহ্যিক সম্মানী ব্যক্তির মৃত্যু যদি ঈমানের সাথে না হয় তাহলে তার মতো দীনহীন আর কে হতে পারে? কাজেই বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সাবধান থাকা উচিত। عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا -এর দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ যে মুখের কথার দ্বারাই হয়ে থাকে এমন নয়। কারো নকল বেশ ধারণ বা প্রতিকৃতি কিংবা পুত্তলিকা বানানো, কারো প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক ইঙ্গিত করা, কারো কথা, কাজ বা আকার-আকৃতি কিংবা পোশাকের উপর হাসি-ঠাট্টা বিদ্রূপ করা অথবা তার কোনো দোষ-ত্রুটির দিকে লোকদের দৃষ্টি এমনভাবে আকৃষ্ট করা– যেন তারা তজ্জন্য বিদ্রূপের হাসি হাসে, এসব কিছুই অপমানকর ঠাট্টা-বিদ্রূপের পর্যায়ে পড়ে। মোটকথা, এমন যে কোনো ধরনের বিদ্রূপ হতে এখানে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

সহীহ হাদীসে আছে, অহঙ্কার ও উপহাস সত্যের পরিপন্থি। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। কেননা এমনও হতে পারে যে, উপহাসকারী অপেক্ষা উপহাসকৃত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট মান ও মর্যাদায় অনেক বড় ও অধিক প্রিয়।

মহিলারা قَوْم -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের কথা পুনরায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো কেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ কোনো দল যেন অন্য দলের সাথে বিদ্রূপ না করে। এখানে قَوْم -এর মধ্যে মহিলারাও শামিল রয়েছে। তথাপি পুনরায় وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ বলে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে কেন?

মুফাস্‌সিরগণ এর জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, যদিও সাধারণত قَوْم বলতে আমরা পুরুষ ও নারী উভয়ের সমষ্টিকে বুঝিয়ে থাকি, তথাপি মূলত قَوْم বিশেষত পুরুষদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা তারাই মহিলাদের জন্য قَوَّامٌ [শৃঙ্খলা বিধানকারী] হয়ে থাকে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْم শব্দটি প্রকৃতপক্ষে قَائِمٌ -এর বহুবচন। যেমন- صَائِمٌ ও زَائِرٌ -এর বহুবচন صَوْمٌ ও زَوْرٌ হয়ে থাকে। সুতরাং মহিলারা যদি قَوْم -এর মধ্যে শামিল হতো, তাহলে وَلَا نِسَاءٌ الخ বলার প্রয়োজন হতো না। এ ব্যাপারে কবি যুহাইরের নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য- وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ أَخَالُ أَدْرِي * أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءٌ

অত্র শ্লোকে قَوْم -এর বিপরীতে نِسَاء -কে ব্যবহার করা হয়েছে।

অবশ্য قَوْم عَادٍ এবং قَوْم ثَمُوْد ইত্যাদিতে পুরুষদের অধীনে (تَبَعًا) নারীদেরকে শামিল করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ -এর তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন- لَا تَعِيْبُوْا فَتُعَابُوْا أَيْ لَا يَعِيْبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا অর্থাৎ তোমরা অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না, তাহলে তোমাদের প্রতিও দোষারোপ করা হবে। অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করা হতে বিরত থাকো।

কামালাইনের গ্রন্থকার (র.) লিখেছেন, এর দ্বারা অপরের প্রতি দোষারোপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর أَنْفُسَكُمْ এ জন্য বলা হয়েছে যে, অন্যের দোষচর্চা করা পরিণামে নিজের দোষচর্চা করারই শামিল। কেননা সমস্ত মুসলমান একটি আত্মার ন্যায়। অথবা, এ জন্য যে, যে অন্যের দোষ বর্ণনা করবে তার দোষও বর্ণনা করা হবে। কাজেই অন্যের দোষ বর্ণনা করার পরিণামে নিজের প্রতিই দোষারোপ করা হয়।

তাফসীরে কবীর প্রণেতা [ইমাম রাযী (র.)] এটার তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা-

১. কোনো মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে গালমন্দ বা তিরস্কার করা, তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো ও তার প্রচার প্রসার করার অর্থ হলো নিজেকে তিরস্কার ও গালমন্দ করা। কেননা দু'জনই একটি দেহের মতো।

২. একজন যদি অপরজনকে গালমন্দ করে, তাহলে অপরজন প্রতিশোধ হিসেবে তাকে গালমন্দ করবে। কাজেই কাউকে গালা-গালি করার অর্থ হলো নিজেকে গালাগালি করা।

৩. অপরকে গালমন্দ করলে [সে যদি এর যোগ্য না হয়, তাহলে] উক্ত গালমন্দের অশুভ পরিণাম গালমন্দকারীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং এটা যেন নিজেকেই গালমন্দ করা হলো।

قَوْلُهُ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ : ইরশাদ হয়েছে- وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ তোমরা নিন্দনীয় [মন্দ] উপাধিতে কাউকে ডেকো না, কাউকে মন্দ উপনাম [খেতাব বা উপাধি] প্রদান করো না।

জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন- لَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلَقَبٍ يَكْرَهُهُ وَمِنْهُ يَا فَاسِقُ الخ অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে এমন উপাধিতে ডেকো না, যা সে অপছন্দ করে। যেমন- কাউকে হে ফাসিক! অথবা, হে কাফির! বলে সম্বোধন করা।

কামালাইন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, نَبْزٌ -এর অর্থ হলো, যে কোনো ধরনের উপাধি। কিন্তু পরিভাষায় মন্দ উপাধিকে نَبْز বলে।

কামূস অভিধান গ্রন্থে আছে- تَنَابُزٌ -এর অর্থ হলো, কাউকে তার উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন- اَلتَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ -এর অর্থ হলো, কেউ কোনো পাপ বা অপরাধ করে তওবা করার পরও তাকে সেদিকে নিসবত [সম্পর্কিত] করে ডাকা। যেমন- কেউ মদ পান করা হতে তওবা করার পরেও তাকে মদ্যপায়ী বলা। যে কোনো অপরাধ হতে তওবা করার পর তওবাকারীকে পূর্বে কৃত অপরাধের জন্য লজ্জা দেওয়া জায়েজ নেই।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যদি কেউ কাউকে এমন গুনাহের কারণে লজ্জা দেয় যা হতে সে তওবা করেছে, তাহলে লজ্জাদাতাকে উক্ত গুনাহে লিপ্ত করে ইহ-পরকালে অপমানিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, যে সকল উপনাম বা উপাধি বাহ্যত মন্দ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নিন্দনীয় নয়, তা উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এগুলো তাদের পরিচিতির মাধ্যম। এদের মাধ্যমে সহজেই তাদের পরিচয় লাভ করা যায়। এ জন্যই মুহাদ্দিসগণ أَسْمَاءُ الرِّجَالِ -এর মধ্যে سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ [নির্বোধ সুলায়মান] ইত্যাকার পরিচিতিমূলক শব্দাবলিকে জায়েজ রেখেছেন। যেমন- আবূ হুরায়রাহ (রা.)-কে উক্ত [বিড়ালের পিতা বা বিড়ালওয়ালা] নামে ডাকা হয়েছে। হাদীসে এ নামেই তিনি পরিচিত।

ভালো উপাধিতে সম্বোধন করা সুন্নত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এক ঈমানদারের উপর অপর ঈমানদারের যেসব অধিকার রয়েছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- সে তার ঈমানদার ভাইকে অধিক পছন্দনীয় ও সুন্দর নাম ও পদবী সহকারে ডাকবে। আরবে এরূপ নামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। নবী করীম ﷺ নিজেও তা পছন্দ করতেন। তিনি বিশেষ বিশেষ সাহাবীকে বিশেষ বিশেষ পদবীতে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সিদ্দীক ও আতীক, ওমর (রা.)-কে ফারূক, হামযা (রা.)-কে আসাদুল্লাহ ও খালিদ (রা.) -কে সাইফুল্লাহ উপাধি দান করেছিলেন। সাহাবীগণের পরবর্তী যুগেও এর রেওয়াজ চলে এসেছে। বর্তমানেও তা জায়েজ; বরং সুন্নত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী নাম খুবই খারাপ ও নিকৃষ্ট।

কাউকে মন্দ নামে ডাকলে নিজেই গুনাহগার হতে হয়। যাকে মন্দ নামে ডাকল সে মন্দ হোক বা না হোক, তার ক্ষতি হোক বা না হোক. কিন্তু যে উক্ত উপাধি [বা নাম] প্রদান করল সে সমাজে অসভ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। ভেবে দেখ যে, মুমিন-এর উত্তম উপাধি পাওয়ার পর এরূপ নাম কিরূপ অশোভনীয় হবে।

অথবা, এর মর্মার্থ এ যে, যখন একজন লোক ঈমান গ্রহণ করেছে, মুসলমান হয়ে গেছে, তখন তাকে মুসলমান হওয়ার পূর্বেকার বিষয়াদির দ্বারা তিরস্কার করা অথবা তখনকার নিকৃষ্ট উপাধিতে আখ্যায়িত করা অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ইত্যাকার নামে আখ্যায়িত করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ।

অথবা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ে কিংবা যদি কোনো গুনাহ হতে তওবা করে থাকে তাহলে তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য এর পুনরুল্লেখ করা অনুচিত হবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এর মর্মার্থ এই যে, ঈমান গ্রহণের পর তোমরা পূর্ববর্তী এ সকল অপকর্মের কারণে তাদেরকে ফাসিক- ফাজির বলে ডেকো না। এরূপ করা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম কাজ।

'তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন' গ্রন্থে সাইয়েদ কুতুব (র.) বলেছেন যে, ঈমান গ্রহণ করার পর কাউকে বিদ্রূপ করা এবং গালাগালি করা, মন্দ উপাধিতে সম্বোধন করা নিঃসন্দেহে ফাসিকী কাজ। এটা এমন একটি অপকর্ম যা ঈমান হতে দূরে সরিয়ে দেয়। বারংবার এরূপ আচরণ করা জুলুম। আর জুলুম শিরকের নামান্তর। সুতরাং এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-, যারা উক্ত আচরণ হতে তওবা করবে না তারা জালিম।

قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا ...... إِثْمٌ : ইরশাদ হচ্ছে- হে ঈমানদারগণ! অধিক অধিক ধারণা করা হতে বিরত থাক। নিঃসন্দেহে কতিপয় ধারণা গুনাহের দিকে ধাবিত করে।

পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টিতে কু-ধারণার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা একদল অন্য দলের [এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির] ব্যাপারে এমন ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝিতে নিপতিত হয় যে,] ভালো ধারণার কোনো রাস্তাই আর খোলা থাকে না। বিরোধীদের যে কোনো কথাকেই বিপরীত অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বিরোধীদের কথা ভালো ব্যাখ্যার যদি হাজারো অবকাশ থাকে- অপরদিকে মন্দ ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে একটি, তাহলেও মন্দ দিকটাই তার নজরে বিরাট হয়ে দেখা দিবে। আর এ মন্দ দিকটাকেই সে সন্দেহাতীত ও নিশ্চিত বলে ধরে নিবে। এর অজুহাতেই তার উপর দোষারোপ করত তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুরু করবে।

ধারণার শ্রেণিবিভাগ এবং সেগুলোর হুকুম : ধারণার বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং সেগুলোর হুকুমও বিভিন্ন। নিম্নে তাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো-

১. **ওয়াজিব :** এ প্রকারের ظَنّ বা ধারণা ওয়াজিব। যেমন ফিকহী ধারণা। যেসব বিষয়াদিতে কোনো نَصّ নেই, সেগুলোর ধারণা [তথা ইজতিহাদ-গবেষণা] করা। অথবা, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সু-ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব।

২. **জায়েজ :** এরূপ ধারণা পোষণ করা জায়েজ। যেমন- জীবনাচরণের ব্যাপারে ধারণা করা। উদাহরণত কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে ফিসক তথা অপকর্ম করে, যেমন- মদ পান করে বা বেশ্যালয়ে গমন করে। এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করা জায়েজ। কিন্তু কোনো প্রমাণ ব্যতীত নিশ্চিত হওয়া ঠিক হবে না। অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃত কু-ধারণা করাও গুনাহ নয়- যতক্ষণ পর্যন্ত না তদনুযায়ী আমল করবে। অবশ্যই যথাসম্ভব একে প্রতিহত করতে হবে।

৩. **হারাম :** যেমন- খোদায়ী এবং নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহাতীত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ধারণা করে বসা অথবা আকায়েদ ও ফিকহী মাসআলায় কিতয়ী [অকাট্য] বিষয়ের বিপরীত মত পোষণ করা। অথবা, কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ফিসকের আলামত বর্তমান না থাকে; বরং নেককার [সৎ] হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায় তথাপি তার ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম।

উপরিউক্ত প্রকারত্রয়ের মধ্যে যেহেতু সবগুলো হারাম নয়, বরং শুধু তৃতীয়টি হারাম সেহেতু كُلًّا না বলে كَثِيْرًا বলা হয়েছে আর উক্ত كَثِيْر [আধিক্য] -এর দ্বারা মূল আধিক্যকে বুঝানো হয়েছে। আপেক্ষিক আধিক্য উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এর একক অন্যান্যের তুলনায় অধিক হওয়া জরুরি নয়। অবশ্য সর্বসাধারণ এবং তাদের স্বাভাবিক অবস্থার দিকে যদি তাকানো হয়, তাহলে প্রথমোক্ত দু' প্রকারের তুলনায় এর আধিক্য প্রমাণিত হবে। কেননা অধিকাংশ লোক এ হারাম ধারণায়ই লিপ্ত রয়েছে। بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ -এর মর্মার্থ এটিই।

অবশ্য কু-ধারণার ব্যাপারে যে একটি প্রবাদ রয়েছে- "اَلْحَزْمُ سُوْءُ الظَّنِّ" -এর মর্মার্থ হচ্ছে- সন্দিগ্ধ ব্যক্তির ব্যাপারে নিজে সতর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ যার ব্যাপারে কু-ধারণা [সন্দেহ] রয়েছে তার সাথে তদনুযায়ী আমল না করা। অর্থাৎ তাকে হেয় প্রতিপন্ন বা লাঞ্ছিত করবে না অথবা তার কোনোরূপ ক্ষতি সাধন করবে না। অবশ্য খোদ ধারণাকারী নিজের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। তার আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ সতর্ক থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَا تَجَسَّسُوْا : ইরশাদ হচ্ছে- " তোমরা অন্যদের ছিদ্রান্বেষণ করো না।"

جَسّ -এর আভিধানিক অর্থ হলো "جَسٌّ بِالْيَدِ" অর্থাৎ হাত দ্বারা স্পর্শ করত কোনো বস্তুকে উপলব্ধি করা। পরিভাষায় গোপনে ছদ্মবেশে কারো কথাবার্তা শ্রবণ করাকে تَجَسُّسٌ বলে। এটা হারাম। তবে কারো দ্বারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা নিজের কিংবা কোনো মুসলমানের হেফাজতের জন্য تَجَسُّسٌ হারাম নয়।

আয়াতের মর্মার্থ হলো, লোকদের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য খুঁজে বেড়িয়ো না। একজন অপরজনের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়িয়ো না। অন্যদের অবস্থাবলি ও কাজ-কর্মের ব্যাপারে দোষ ধরার লক্ষ্যে ওঁৎ পেতে থেকো না। এরূপ কাজ খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হোক, বা কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে করা হোক, অথবা নিছক নিজের কৌতুকপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে করা হোক- সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। অন্যদের অস্পষ্ট ও গোপন কাজ-কর্ম খুঁজে খুঁজে বেড়ানো এবং আবরণের ঐ ধারে কি আছে তা দেখার জন্য চেষ্টা করা, কারো দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা কতটুকু রয়েছে তা নিরূপণ করার জন্য চেষ্টা করা একজন ঈমানদারের কাজ হতে পারে না। অন্যের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, তাদের পারস্পরিক কথাবার্তা কান দিয়ে শুনা, প্রতিবেশির ঘরে কান পাতা ও চোখ পাতা, কারো দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারাদি আড়ি পেতে শোনা ও জানার চেষ্টা করা আদপেই চরিত্রহীনতার কাজ। এগুলোর কারণে সমাজে সমূহ বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, অশান্তি নেমে আসে।

ছিদ্রান্বেষণ হতে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ : আল্লাহর বাণী- وَلَا تَجَسَّسُوْا [তোমরা একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ করো না] -এর মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে উক্ত আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। নিম্নে কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করা হলো-

১. عَنْ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ إِنْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ" فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ (رض) : كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى - (أَبُوْ دَاوُدَ)

২. عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْأَمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ - (أَبُوْ دَاوُدَ)

৩. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) فَقِيْلَ هٰذَا فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ لٰكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهٖ .

৪. وَعَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِهٖ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهٖ (أَبُوْ دَاوُدَ)

قَوْلُهُ وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا .... فَكَرِهْتُمُوْهُ : ইরশাদ হচ্ছে- [হে ঈমানদারগণ!] তোমরা একে অপরের গিবত [পরনিন্দা] করো না। তোমরা দীনি ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার এমন কিছু উল্লেখ কর না যা সে অপছন্দ করে। যদিও এটা তার মধ্যে থাকুক না কেন। আপন মুসলমান ভাইয়ের গিবত করা এমন খারাপ কাজ- যেন কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত ঠোকরিয়ে ভক্ষণ করল। কোনো মানুষ কি এটা পছন্দ করবে? সুতরাং বুঝে নাও যে, গিবত এটা হতেও নিন্দনীয় ও খারাপ কাজ। কারো গোশ্‌ত ঠোকরিয়ে ভক্ষণ করলে হয়তো সে শারীরিক কষ্ট অনুভব করবে। কিন্তু কারো ইজ্জত, আব্রু হানি করলে সে সীমাহীন মনোযাতনা ভোগ করবে।

মূলত একটি উপমার মাধ্যমে এখানে গিবতের কদর্যতা তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে পর পর কয়েকটি মুবালাগাহ (مُبَالَغَه) রয়েছে। প্রথমত إِسْتِفْهَامٌ [প্রশ্নবোধক] -কে ইতিবাচক অর্থে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিষয়কে প্রিয় রূপে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয়ত أَحَدُكُمْ -এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্যরা এটা পছন্দ করে না। চতুর্থত সাধারণ মানুষের পরিবর্তে ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চমত ভাইয়ের গোশ্‌তও মৃত অবস্থায় ভক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) এর তাফসীরে বলেছেন- تَكْرَهُ إِنْ وَجَدْتَ جِيْفَةً أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا كَذَالِكَ فَاكْرَهْ لَحْمَ أَخِيْكَ وَهُوَ حَيٌّ অর্থাৎ তোমার ভাইকে মৃত অবস্থায় পেলে তার গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে তুমি তো অপছন্দ কর; সুতরাং জীবদ্দশায়ও তার গোশ্‌ত খেতে [তথা গিবত করতে] অপছন্দ কর।

মুজাহিদ (র.) বলেছেন, যখন বলা হলো- أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا؟ [তোমাদের কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে কি পছন্দ করবে?] তখন যেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পক্ষ হতে জবাব দেওয়া হলো- لَا [না]; অতঃপর বলে দেওয়া হলো, তোমরা তাকে যদ্রূপ অপছন্দ কর তদ্রূপ তার মন্দ কার্যের আলোচনা হতে বিরত থাক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাজী বায়যাভী (র.) বলেছেন– إِنْ صَحَّ ذَالِكَ وَعُرِضَ هٰذَا عَلَيْكُمْ فَقَدْ كَرِهْتُمُوْهُ তোমাদের মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া অছন্দনীয় হওয়া যদি সহীহ হয়, তাহলে তোমাদের নিকট গিবত পেশ করা হলে তোমরা একে অবশ্যই অপছন্দ করবে এবং পরিহার করবে। উক্ত فَا -কে فَصِيْحَه বলে, এটা উহ্য শর্তের জবাবের মধ্যে হয়ে থাকে। উক্ত উপমায় ইজ্জত-আব্রুকে গোশতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। একে اِسْتِعَارَه تَمْثِيْلِيَّه বলে।

জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তবে তা কি গিবত হবে? হুযূর ﷺ ইরশাদ করলেন– إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ অর্থাৎ "তুমি যা বলবে তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে এটা গিবত হবে। আর যদি তোমার কথিত বিষয়টি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিবে"। [অর্থাৎ এটা মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে।]

মোটকথা, কারো দোষ– যা তার মধ্যে রয়েছে তা [পিছনে তার অবর্তমানে] বর্ণনা করাকে গিবত বলে। পক্ষান্তরে যেই দোষ তার মধ্যে নেই তা রটানোকে বলে بُهْتَانٌ বা মিথ্যা অপবাদ।

গিবত সম্পর্কীয় বিবিধ মাসআলা :

১. যে গিবতের কারণে অধিক কষ্ট হয় তা কবীরা গুনাহ।
২. যে গিবতের দরুন কষ্ট কম হয়, যেমন– জায়গা বা সওয়ারির গিবত বর্ণনা করা– এটা সগীরা গুনাহ।
৩. গিবত প্রতিহত করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গিবত শ্রবণ করা গিবত করার শামিল।
৪. গিবতের কারণে আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের হক বিনষ্ট হয় বিধায় তওবা করতে হবে এবং যার হক নষ্ট করেছে তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।
৫. শিশু, পাগল ও জিম্মির গিবত করাও নিষেধ এবং হারাম।
৬. কাফের হারবীর গিবত করা মাকরূহ।
৭. মুখের দ্বারা যদ্রূপ গিবত হয়ে থাকে তদ্রূপ কাজের দ্বারাও গিবত হতে পারে। যেমন– কোনো খঞ্জের ন্যায় চলে তাকে উত্যক্ত করা ও হেয় প্রতিপন্ন করা।
৮. গিবতকারী যদি ক্ষমা চায় তাহলে যার গিবত করেছে তার জন্য মোস্তাহাব হলো ক্ষমা করে দেওয়া।

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে গিবত জায়েজ :

১. জালিমের বিরুদ্ধে এমন কারো নিকট অভিযোগ করা, যে তার জুলুমকে রুখতে সক্ষম।
২. বিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট রোগীর অবস্থা বর্ণনা করা।
৩. ফতোয়ার প্রয়োজনে মুফতির নিকট প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দেওয়া।
৪. মুহাদ্দিসগণ হাদীসের হেফাজতের জন্য বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করা।
৫. মুসলমানকে পার্থিব বা দীনি কোনো ক্ষতি হতে হেফাজত করার জন্য কারো অবস্থা তার নিকট উল্লেখ করা।
৬. পরামর্শ গ্রহণের জন্য কারো অবস্থা প্রকাশ করা।
৭. যে নিজের দোষ নিজেই বলে বেড়ায় তার গিবত করা।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, গিবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াতখানা "عَامٌّ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ" -এর অন্তর্ভুক্ত।

গিবত সম্পর্কে চারটি হাদীস :

١. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِيْبَةُ هِيَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ . قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ . وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ .

٢. عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ لِيْ مُعَاوِيَةُ (رض) يَعْنِيْ ابْنَ قُرَّةَ لَوْ مَرَّ بِكَ رَجُلٌ اَقْطَعُ فَقُلْتَ هٰذَا اَقْطَعُ كَانَ غِيْبَةً - قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِاَبِيْ اِسْحَاقَ فَقَالَ . صَدَقَ .

٣. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ قَلْبَهٗ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ .

٤. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَاَوْا فِيْ قِيَامِهٖ عَجْزًا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا اَعْجَزَ فُلَانًا ؟ فَقَالَ اَكَلْتُمْ لَحْمَ اَخِيْكُمْ وَاغْتَبْتُمُوْهُ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى اٰدَمَ وَحَوَّاءَ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا جَمْعُ شَعْبٍ بِفَتْحِ الشِّيْنِ وَهُوَ اَعْلٰى طَبَقَاتِ النَّسَبِ وَّقَبَآئِلَ هِيَ دُوْنَ الشُّعُوْبِ وَبَعْدَهَا الْعَمَائِرُ ثُمَّ الْبُطُوْنُ ثُمَّ الْاَفْخَاذُ ثُمَّ الْفَصَائِلُ اٰخِرُهَا مِثَالُهُ خُزَيْمَةُ شَعْبٌ كِنَانَةُ قَبِيْلَةٌ قُرَيْشٌ عِمَارَةٌ بِكَسْرِ الْعَيْنِ قُصَيٌّ بَطْنٌ هَاشِمٌ فَخْذٌ الْعَبَّاسُ فَصِيْلَةٌ لِتَعَارَفُوْا ط حُذِفَ مِنْهُ اِحْدَى التَّائَيْنِ اَيْ لِيَعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لَا لِتَفَاخَرُوْا بِعُلُوِّ النَّسَبِ وَاِنَّمَا الْفَخْرُ بِالتَّقْوٰى اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِكُمْ خَبِيْرٌ. بِبَوَاطِنِكُمْ.

১৩. হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে [অর্থাৎ] আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) হতে। অতঃপর তোমাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি বিভিন্ন জাতিতে [শাখায়] شُعُوْبٌ শব্দটি شَعْبٌ -এর বহুবচন। شَعْبٌ -এর শীন অক্ষরটি যবরযোগে হবে। আর شَعْبٌ বলা হয় বংশের সর্বোচ্চ তাবকাহ [স্তর বা সিঁড়ি]-কে এবং বিভিন্ন গোত্রকে কাবীলা বলা হয় شَعْبٌ -এর নীচের স্তরকে। এর পরবর্তী স্তর হলো اَلْعَمَائِرُ তারপর بَطْنٌ ; এরপর فَخْذٌ অতঃপর সর্বশেষ স্তর হলো اَلْفَصَائِلُ যেমন- خُزَيْمَةُ হলো شَعْبٌ আর كِنَانَةُ হলো قَبِيْلَةٌ কুরাইশ হলো عِمَارَةٌ [এটার ع অক্ষরটি যের বিশিষ্ট।] কুসাই হলো بَطْنٌ হাশিম হলো فَخْذٌ এবং আব্বাস فَصِيْلَه যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। تَعَارَفُوْا হতে একটি تَ -কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার [একদল অপর দলের পরিচয় লাভ করতে পার]। উচ্চ বংশের দ্বারা অহঙ্কার করার জন্য এরূপ করা হয়নি। আর গৌরব একমাত্র তাকওয়ার দ্বারাই করা যেতে পারে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন তোমাদেরকে সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন তোমাদের গোপন তথ্য সম্পর্কে।

١٤. قَالَتِ الْاَعْرَابُ نَفَرٌ مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ اٰمَنَّا ط صَدَّقْنَا بِقُلُوْبِنَا قُلْ لَهُمْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا اَيْ اِنْقَدْنَا ظَاهِرًا وَلَمَّا اَيْ لَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط اِلَى الْاٰنِ لٰكِنَّهُ يُتَوَقَّعُ مِنْكُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ بِالْاِيْمَانِ وَغَيْرِهٖ لَا يَالِتْكُمْ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهٖ وَبِاِبْدَالِهٖ اَلِفًا لَا يَنْقُصُكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ اَيْ مِنْ ثَوَابِهَا شَيْئًا ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ رَّحِيْمٌ بِهِمْ.

১৪. বেদুইনরা বলে- বনূ আসাদের কতিপয় লোক- আমরা ঈমান এনেছি আমরা অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি [অন্তরের সাথে সত্যায়িত করেছি] আপনি বলুন তাদেরকে তোমরা ঈমান গ্রহণ করনি; বরং তোমরা বল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেছি। অথচ প্রবেশ করেনি ঈমান তাদের অন্তরে [এখানে لَمَّا শব্দটি لَمْ -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।] তখন পর্যন্ত। কিন্তু তোমাদের পক্ষ হতে এর আশা করা যায়। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর আনুগত্য কর- ঈমান ও অন্যান্য ব্যাপারে- তাহলে হ্রাস করা হবে না [لَا يَلِتْكُمْ শব্দটি] হামযাসহ, হামযা ব্যতীত বা হামযাকে আলীফের দ্বারা পরিবর্তন করত [বিভিন্নভাবে] পড়া যায়। অর্থাৎ লাঘব করা হবে না। তোমাদের আমলসমূহ অর্থাৎ তার ছওয়াব কিছুমাত্র। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ঈমানদারগণের জন্য, অতিশয় দয়ালু তাদের প্রতি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِتَعَارَفُوْا : আল্লাহর বাণী- لِتَعَارَفُوْا -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ একটি ت হযফ করে لِتَعَارَفُوْا পড়েছেন।

২. কুম্বিল (র.) একটি ت কে অপরটির মধ্যে ইদগাম করে لِتَّعَارَفُوْا পড়েছেন।

৩. আ'মাশ (র.) দু'টি ت -কে বলবৎ রেখে لِتَتَعَارَفُوْا পড়েছেন।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পড়েছেন- لِتَعْرِفُوْا -

قَوْلُهُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ : আল্লাহর বাণী- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ -এর মধ্যস্থিত إِنَّ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ হামযার নিচে যেরযোগে إِنَّ পড়েছেন।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) হামযার উপর যবরযোগে أَنَّ পড়েছেন।

قَوْلُهُ يَلِتْكُمْ : আল্লাহর বাণী- يَلِتْكُمْ -এর মধ্যে দু' প্রকারের কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ হামযাহ ব্যতীত يَلِتْكُمْ পড়েছেন।

২. আবূ আমর ও আবূ হাতিম প্রমুখ ক্বারীগণ হামযা সহ يَأْلِتْكُمْ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ .... مِنْ ذَكَرٍ الخ : শানে নুযূল : আল্লাহর বাণী- يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ الخ -এর শানে নুযূলের ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

১. আবূ দাউদ (র.) ইমাম যুহরী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, অত্র আয়াতখানা আবুল হিন্দ-এর শানে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ বনূ বায়াজাহকে বলেছেন যে, তোমরা আবুল হিন্দের সাথে তোমাদের একটি কন্যাকে বিবাহ করিয়ে দাও। তারা বলল, আমরা আমাদের কন্যাকে কিভাবে একজন দাসের সাথে বিবাহ দিতে পারি? তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

২. ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে বায়তুল্লাহর ছাদে উঠে আজান দিতে বললেন। ইত্তাব ইব্‌নে আসীদ বলল, আল্লাহর শুকরিয়া যে, আজকের এ দৃশ্য দেখার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা আমার পিতাকে তুলে নিয়েছেন। অর্থাৎ মৃত্যুদান করেছেন। হারিছ ইবনে হিশাম মন্তব্য করল যে, মুহাম্মদ ﷺ বুঝি আজান দেওয়ার জন্য এ কালো কাকটি ব্যতীত অন্য কাউকে পেলেন না। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا الخ : শানে নুযূল : ইব্‌নে জারীর (র.) মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বনূ আসাদের কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর নিকট সদ্‌কার মাল প্রার্থনা করল এবং তারা বুঝাতে চাইল যে, তারা ঈমান এনে রাসূল ﷺ -এর প্রতি ইহ্‌সান করেছে। তখন তাদের শানে অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ .... عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ : ইরশাদ হচ্ছে- হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে একজন নর তথা আদম (আ.) ও একজন নারী তথা হাওয়া (আ.) হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদের পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার্থে তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক খোদাভীরু ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান। তোমাদের ভিতর বাহির সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ভালভাবে জানা আছে।

অহঙ্কারের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গিবত পরস্পর দোষারোপ ও তিরস্কারের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর দরুনই মানুষ নিজেকে সম্মানী এবং অন্যাকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বড়-ছোট, মর্যাদাবান ও হীন হওয়া বংশলতা ও অভিজাত্যের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং যে ব্যক্তি যত বেশি ভদ্র ও খোদাভীরু হবে সে আল্লাহ পাকের নিকট তত বেশি সম্মানী ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বংশের হাকীকত এই যে, সমস্ত মানুষ একজন নর ও একজন নারী তথা আদম ও হাওয়া (আ.) হতে সৃষ্টি হয়েছে। শেখ, সাইয়েদ, মোগল, পাঠান, সিদ্দিকী, ফারুকী, ওসমানী, আনসারী ইত্যাদি সকলের বংশধারাই এক মাতা-পিতা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এ সকল বংশলতা ও ভ্রাতৃত্ব আল্লাহ তা'আলা শুধু পরিচিতির জন্য নির্ধারণ করেছেন।

অবশ্য আল্লাহ তা'আলা কাউকে যদি কোনো উচ্চ বংশে পয়দা করে থাকেন, তাহলে এটা তার জন্য একটি খোদাপ্রদত্ত সৌভাগ্য ও নিয়ামত। যেমন জন্মগতভাবে কারো আওয়াজ শ্রুতিমধুর এবং চেহারা সুদর্শন হয়ে থাকে, যা অবশ্যই তার একটি ভালো দিক। কিন্তু এটা তার জন্য অহঙ্কারের বিষয় হতে পারে না। একে মর্যাদা ও গৌরবের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এর কারণে অন্যদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। হ্যাঁ, এটার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিনা চেষ্টা ও পরিশ্রমে বংশীয় মর্যাদা দান করেছেন। আর অহঙ্কার পরিহার করাও শুকরিয়ারই দাবি। আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামতকে বদ অভ্যাস ও দুষ্কর্মের দ্বারা কলুষিত করা যাবে না।

মোটকথা, মর্যাদা, সম্মান ও ফজিলতের প্রকৃত মানদণ্ড বংশ নয়, এর মাপকাঠি হলো তাক্ওয়া [খোদাভীতি] ও সৎকর্ম। প্রথমটি বিনা পরিশ্রমে প্রাপ্ত খোদাপ্রদত্ত এবং শেষোক্তটি পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনযোগ্য।

আর তাকওয়ার সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। আল্লাহই ভালো জানেন যে, যে ব্যক্তি বাহ্যত মুত্তাকী বলে মনে হয় বাস্তবিক পক্ষে সে কেমন? আর ভবিষ্যতেই বা তার কি পরিণতি হবে?

বংশগত পার্থক্য পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য হয়ে থাকে। আর উক্ত পরিচয়ের পিছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। যেমন–

* একই নামের দু' ব্যক্তি হলে বংশের মাধ্যমে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।
* দূরবর্তী ও নিকটবর্তী আত্মীয়দের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত আত্মীয়তার নিরিখে তাদের শরয়ী অধিকার দেওয়া যায়।
* এর দ্বারা আসাবাদের নিকট হওয়া حَاجِبْ ও مَحْجُوْب দূর হওয়া অবগত হয়েও নির্ধারণ করা যায়।
* স্বীয় বংশের পরিচয় পাওয়ার পর অন্য বংশের দিকে নিজেকে সম্পর্কিত করবে না।

মোটকথা, ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতা, স্বভাব ও চরিত্রের ব্যবধান, শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞানের পার্থক্য পরস্পর সংঘর্ষ ও সংঘাতের জন্য নয়; বরং এটা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতা ও উন্নতির সোপানে পৌঁছার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট রং, জাতীয়তা, ভাষা, মাতৃভূমি এবং এ জাতীয় সকল ঐতিহ্যের কোনো মূল্য নেই। সেখানে শুধুমাত্র একটি বিষয়ের মূল্য রয়েছে– মাত্র একটি কারণেই তাকে সম্মান দেওয়া হবে। তা হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। যে যত বেশি খোদাভীরু হবে, আল্লাহর দরবারে সে তত বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

অত্র আয়াত হতে তিনটি মূলনীতি সাব্যস্ত হয় : আলোচ্য আয়াত– يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم الخ হতে তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. সকল মানুষের মূল উৎস এক ও অভিন্ন। একজন পুরুষ ও একজন নারী তথা আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) হতে সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যত মানুষ রয়েছে তাদের আদি পিতা ও আদি মাতা এক। মূলত মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ। কাজেই আল্লাহপ্রদত্ত জীবন বিধানই সকলকে অনুসরণ করা উচিত।

২. মূল উৎসের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনের তাগিদেই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন। ভাষা, বর্ণ ও আকৃতি-প্রকৃতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে এ জন্য পার্থক্য করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা পরস্পরে পরিচিত হতে পারে। এ জন্য তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি যে, এটাকে কেন্দ্র করে তারা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে এবং রক্তপাত করবে– শ্রেণি সংগ্রামে মেতে উঠবে। পারস্পরিক পার্থক্য তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বাধা হওয়ার জন্য তা করা হয়নি; বরং উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক হিসেবেই তা করা হয়েছে।

৩. তাকওয়া ও নৈতিক চরিত্রই হবে উত্তম ও অধমের মাপকাঠি ও মানদণ্ড। ভাষা, বর্ণ, বংশগত কৌলিন্য, দেশ, আকৃতি ইত্যাদি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হতে পারে না। কেবল বিশেষ কোনো বংশের, বর্ণের ও দেশের বলেই কেউই বিশেষ মর্যাদার দাবি করতে পারে না। এগুলো নিছক খোদাপ্রদত্ত; এতে মানুষের কোনো দখল বা কৃতিত্ব নেই। একমাত্র তাকওয়া ও নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা যেতে পারে। যে যত বেশি খোদাভীরু হবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা তত বেশি হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি এটাই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অত্র আয়াতদ্বয়ে বাহ্যত বৈপরীত্ব মনে হয়- কিভাবে এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা যেতে পারে? : প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন- [হে ঈমানদারগণ!] যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট ইসলামকে প্রকাশ করে তাকে বল না যে, তুমি ঈমানদার নও।

এর কারণ হচ্ছে- ঈমান হলো অন্তরের ব্যাপার। কারো অন্তরের কথা মানুষের জানা থাকার কথা নয়। সুতরাং বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করার পর তাকে ঈমানদারই ধরে নিতে হবে-মুনাফিক বলা যাবে না। বাকি তার অন্তরে কি রয়েছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। সে অনুযায়ী ফয়সালা করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার। সুতরাং সে ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মানুষের নেই। এ জন্যই বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা তোমাদের নিকট ইসলাম প্রকাশ করে- বাহ্যিক আনুগত্য জাহির করে, তাদের ঈমানের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করো না।

আর অত্র আয়াতে বলা হয়েছে- [হে হাবীব!] কতিপয় বেদুঈন লোক দাবি করে থাকে যে, তারা ঈমান এনেছে। আপনি তাদেরকে বলুন যে, তোমরা তো ঈমান গ্রহণ করনি; বরং তোমরা এতটুকু দাবি করতে পার যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ অর্থাৎ বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেছ।

এর কারণ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরের খবর জানেন। সুতরাং তাদের অন্তরে যে, ঈমান নেই, তারা যে শুধু বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেছে- আল্লাহ তা'আলার তা জানা থাকার কারণে তিনি নবী করীম ﷺ -কে তা জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ জন্যই নবী করীম ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য করে অনুরূপ মন্তব্য করা জায়েজ হয়েছে।

মোটকথা, প্রথমোক্ত আয়াতে যেহেতু মানুষের তা জানা নেই সেহেতু তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। আর শেষোক্ত আয়াতে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জানা রয়েছে সেহেতু তিনি নবী করীম ﷺ -কে তা জানিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধিতা নেই।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন। কিন্তু অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এদু'টি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। সুতরাং এর সমাধান কি? : إِيْمَانٌ ও إِسْلَامٌ -এর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে আলেমগণ বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। আমরা এর বিশদ আলোচনায় না গিয়ে সারকথা পেশ করবার চেষ্টা করব।

إِيْمَانٌ ও إِسْلَامٌ -এর মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে মূলনীতি হলো "إِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَإِذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا" অর্থাৎ একই ক্ষেত্রে যখন উভয় শব্দ একত্র হবে তখন এরা পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হবে। এমতাবস্থায় إِيْمَانٌ আভ্যন্তরীণ আনুগত্য এবং إِسْلَامٌ বাহ্যিক আনুগত্যের অর্থে হবে। অপরদিকে যদি কোনো ক্ষেত্রে শুধু ঈমান বা শুধু ইসলাম শব্দের প্রয়োগ করা হয় তাহলে উভয়টি একই অর্থে হবে। এমতাবস্থায় যে কোনো একটি দ্বারাই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকারের আনুগত্যের সমষ্টিকে বুঝাবে।

অত্র আয়াতে যেহেতু إِيْمَانٌ ও إِسْلَامٌ উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে সেহেতু এরা পৃথক পৃথক অর্থে হয়েছে। সুতরাং إِيْمَانٌ দ্বারা আভ্যন্তরীণ আনুগত্য ও إِسْلَامٌ দ্বারা বাহ্যিক আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ : شُعُوْبٌ শব্দটি شَعْبٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড় পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে شَعْبٌ এবং ক্ষুদ্রতম অংশ عَشِيْرَةٌ বলা হয়। আবূ রওয়াফ বলেন, অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে شَعْبٌ বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে তাদেরকে قَبَائِلَ বলা হয়। أَسْبَاطٌ শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য হচ্ছে পারস্পরিক পরিচয় : কুরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও শনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণত এক নামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্য ব্যবহার কর; গর্বের জন্য নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٥. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَىِ الصَّادِقُوْنَ فِىْ اِيْمَانِهِمْ كَمَا صُرِّحَ بِهِ بَعْدُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا لَمْ يَشُكُّوْا فِى الْاِيْمَانِ وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِجِهَادِهِمْ يَظْهَرُ صِدْقُ اِيْمَانِهِمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ . فِىْ اِيْمَانِهِمْ لَا مَنْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَلَمْ يُوْجَدْ مِنْهُمْ غَيْرُ الْاِسْلَامِ .

অনুবাদ :

১৫. তারাই শুধু ঈমানদার– স্বীয় ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী। যেমন– পরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– যারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর সংশয় পোষণ করেনি ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েনি এবং আল্লাহর পথে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে জিহাদের মাধ্যমেই তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ পায়। তারাই হলো সত্যবাদী তাদের ঈমানের ব্যাপারে। তারা নয় যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তাদের হতে ইসলাম তথা বাহ্যিক আনুগত্য ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

١٦. قُلْ لَهُمْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ط مُضَعَّفُ عَلِمَ بِمَعْنٰى شَعَرَ اَىْ اَتُشْعِرُوْنَهُ بِمَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ فِىْ قَوْلِكُمْ اٰمَنَّا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

১৬. আপনি বলুন, তাদেরকে তোমরা কি তোমাদের দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে অবগত করাচ্ছ? تُعَلِّمُوْنَ শব্দটি عَلِمَ -এর مُضَعَّفْ অর্থাৎ شَعَرَ অর্থাৎ তোমরা اٰمَنَّا [আমরা ঈমান এনেছি] বলে তোমাদের [বর্তমান] অবস্থা সম্পর্কে কি আল্লাহ তা'আলাকে অবহিত করাতে চাচ্ছ? অথচ আকাশমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু সবই আল্লাহ তা'আলা অবগত রয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তো প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারেই সম্পূর্ণ জ্ঞাত রয়েছেন।

١٧. يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ط مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ اَسْلَمَ بَعْدَ قِتَالٍ مِنْهُمْ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ ج مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ الْبَاءِ وَيُقَدَّرُ قَبْلَ اَنْ فِى الْمَوْضِعَيْنِ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . فِىْ قَوْلِكُمْ اٰمَنَّا .

১৭. এই লোকেরা আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। যুদ্ধ ব্যতীত পক্ষান্তরে তাদের মধ্য হতে অন্যান্যরা যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন তোমরা ইসলাম গ্রহণের অনুগ্রহ আমার উপর রেখ না। اِسْلَامَكُمْ শব্দটি مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অর্থাৎ যেরদাতা আমিল بَا -কে হযফ করত তদস্থলে যবর দেওয়া হয়েছে। উভয় স্থলে اَنْ -এর পূর্বে بَا -কে উহ্য গণ্য করা হবে। বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তোমাদের বক্তব্য اٰمَنَّا [আমরা ঈমান এনেছি] -এর ব্যাপারে।

١٨. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اَىْ مَا غَابَ فِيْهِمَا وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُ .

১৮. আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়াদি জানেন অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে যা অদৃশ্য রয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম ভালোভাবেই প্রত্যক্ষ করেন। يَعْمَلُوْنَ শব্দটি تَا ও يَا উভয়ের সাথে হতে পারে। অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মের কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا : ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا আয়াতাংশে ثُمَّ শব্দের উল্লেখ হওয়ার তাৎপর্য হলো, ঈমানদার লোকেরা যখন ঈমান এনেছে তখন তো তাদের অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ ছিলই না, ভবিষ্যতেও তাদের অন্তরে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তাদের ঈমান গ্রহণের সময় এবং ভবিষ্যতেও কোনোরূপ সন্দেহ না থাকার প্রতি ثُمَّ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আয়াতাংশে ثُمَّ -এর দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী- "ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا" -এর মধ্যস্থিত ثُمَّ -এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা ঈমান গ্রহণের সময় তাদের মধ্যে তো কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয় থাকেইনি এমন কি পরেও কোনোরূপ সন্দেহ দেখা দেয় না। তাদের ঈমান সর্বদাই সংশয় ও সন্দেহমুক্ত থাকে।

قَوْلُهُ اَتُعَلِّمُوْنَ : আল্লাহর বাণী- اَتُعَلِّمُوْنَ -এর মধ্যে تَعْلِيْمٌ [শব্দটি] إِعْلَامٌ -এর অর্থে হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ শিক্ষা দেওয়া নয়; বরং অবহিত করা। এ জন্য بَا -এর সাহায্যে مَفْعُوْل ثَانِىْ -এর দিকে مُتَعَدِّىْ করা হয়েছে। একে যদি شَعْر -এর অর্থে ধরা হয়, তাহলে مُتَعَدِّىْ بِيَكْ مَفْعُوْل হবে। আর যদি اَشْعَرَ -এর অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে مُتَعَدِّىْ بِدُوْ مَفْعُوْل হবে।

تُعَلِّمُوْنَ-এর বিভিন্ন কেরাত প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী- تُعَلِّمُوْنَ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর কারীগণ (র.) تا -এর সাথে تُعَلِّمُوْنَ পড়েছেন।
২. ইবনে কাছীর (র.) ى -এর সাথে يُعَلِّمُوْنَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ اِسْلَامَكُمْ : আল্লাহর বাণী- "لَا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ" -এর মধ্যস্থিত اِسْلَامَكُمْ مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। অর্থাৎ মূলে ছিল بِاِسْلَامِكُمْ - بَاء হরফে জারকে হযফ করত যেরের স্থলে যবর দেওয়া হয়েছে। একে নাহুবিদগণের পরিভাষায় "مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ" বলে।

قَوْلُهُ اَنْ هَدَاكُمْ : আল্লাহর বাণী- اَنْ هَدَاكُمْ -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. জমহুর ক্বারীগণ اَنْ هَدَاكُمْ -এর হামযার উপর যবরযোগে পড়েছেন।
২. ক্বারী আসিম (র.) (اَنْ -এর) হামযার নিচে যেরযোগে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا الخ : **শানে নুযূল** : يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا الخ -এর শানে নুযূলের ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তাদের উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, বনূ আসাদের কতিপয় লোক নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোনো রূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম কবুল করেছি। আমরা আপনার পক্ষ হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আপনার বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্র হাতে তুলে নেইনি।
   নবী করীম ﷺ মন্তব্য করলেন, তাদের বোধশক্তি কম। শয়তান তাদের মুখ দিয়ে কথা বলছে। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়। -[ইবনে কাছীর]
২. মুহাম্মদ ইবনে কা'আব আল-কুরাজী (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন- নবম হিজরিতে বনূ আসাদের দশ জন লোক নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ তখন সাহাবীগণসহ মসজিদে নববীতে ছিলেন। তারা আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট সদিচ্ছায় এসেছি। আমাদের নিকট কোনো দাওয়াতী দল পাঠানো হয়নি। তাছাড়া আমাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের হতেও আমরা নিরাপদ। তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতখানা নাজিল করেন।

قَوْلُهُ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ... ... اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ : কারো ইসলাম গ্রহণ যে নবী করীম ﷺ -এর উপর তাঁর অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার উপর আল্লাহ তা'আলারই একটি বিরাট অনুগ্রহ, তার আলোচনা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- হে হাবীব! তারা ইসলাম কবুল করেছে বলে আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে চাচ্ছে। কেননা, অন্যান্যদের ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা ইসলাম কবুল করেনি। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিও না- এ জন্য যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ, বরং তোমরা যদি সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে বুঝতে হবে যে, ঈমানের প্রতি হিদায়েত দান করত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

ইসলাম কবুল করা ইসলামের প্রতি অনুগ্রহ নয় : কতেক বেদুঈন ও গ্রাম্যলোক এসে নবী করীম ﷺ -এর নিকট আরজ করল, দেখুন, আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতীতই ইসলাম গ্রহণ করেছি। এর জবাব পরে দেওয়া হয়েছে। এতে এ সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তারা তো اٰمَنَّا বলেছে; اَسْلَمْنَا বলেনি।

এর উত্তর এই যে, তারা যদি اَسْلَمْنَا বলত, তাহলে সন্দেহের অবকাশ ছিল। যাহোক, তাদের ঈমানকে ইসলাম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর তারা ছিল এর দাবিদার। এ জন্য اَسْلَمُوْا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তারা স্বীয় বাহ্যিক আনুগত্যকে যাকে বস্তুত ইসলাম বলাই সমুচিত ছিল– ঈমান বলেছে এবং আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছে। هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ -এর দ্বারা এ সন্দেহ করা ঠিক হবে না যে, তাদের ঈমানকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এখানে একে ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেন তাদের উক্তির উল্লেখ করা হয়েছে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -এর দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমাদের ঈমানের দাবিকে মেনেও নিয়ে হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ মাত্র। –[বয়ানুল কুরআন, ফাওয়ায়েদে ওসমানী]

নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকারের সারকথা : সূরার সূচনা হয়েছিল নবী করীম ﷺ -এর আদবের আলোচনা প্রসঙ্গে। আর সম্পূর্ণ সূরাটিই যেন সেই আদবের তাফসীল বা ব্যাখ্যা। পৃথক পৃথকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ছয়টি আদব নবী করীম ﷺ -এর ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে–

১. لَا تُقَدِّمُوْا ২. لَا تَرْفَعُوْا ৩. لَا تَجْهَرُوْا ৪. لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا ৫. اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌ الخ ও ৬. وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ الخ

অন্যদিকে আটটি হুকুম [আদব] মুসলমানদের পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। আর একটি আদব এমন রয়েছে যা উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ সূরায় মোট পনেরটি আহকাম বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা ঈমান ও একীন যখন অন্তরে দৃঢ়তা ও মজবুতী লাভ করে এবং শিকল গেঁড়ে বসে, তখন গিবত, অপরের দোষ খুঁজে বেড়ানো ইত্যাদি আপনি আপনিই দূরীভূত হয়ে যায়। কোনো লোক যদি এসব অপরাধ ও নিকৃষ্ট কাজে জড়িত থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এখনো তার ঈমান দৃঢ়তা ও পূর্ণাঙ্গ লাভ করেনি।

হাদীস শরীফে এসেছে– يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يَفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ – "হে ঐসব লোক, যারা মুখে ঈমান এনেছে; কিন্তু অন্তর পর্যন্ত ঈমান পৌছেনি। তোমরা মুসলমানদের গিবত করো না এবং তাদের গোপন তথ্যাদি খুঁজে বেড়াইও না।"

ইসলাম ও ঈমানের সম্পর্ক : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا অর্থাৎ "তাদেরকে বলে দাও, তোমরা ঈমান আননি; বরং বল যে, আমরা অনুগত হয়েছি"।

এ আয়াত থেকে বাহ্যত প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য আছে। কিন্তু এ আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বুঝানো হয়েছে– পারিভাষিক অর্থ বুঝানো হয়নি। এ কারণে আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ঈমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা!

শরিয়তের পরিভাষায় অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আল্লাহর একত্ব ও রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালাতকে সত্য জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্মে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরিয়তে অন্তরের বিশ্বাসের ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো গুরুত্ব হয় না, যতক্ষণ এর প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ-কর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালেমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্মের নাম হলেও শরিয়তে এর গুরুত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হবে। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে এটা নিফাক হবে। এভাবে ইসলাম ও ঈমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজ-কর্ম পর্যন্ত পৌছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান ছাড়া ইসলাম এবং ইসলাম ছাড়া ঈমান হতে পারে না। যেমন আগুন ও ধুয়া। একটি অপরটির জন্য জরুরি। ইসলামি বিধানে এটা অসম্ভব যে, একজন মুমিন হবে; কিন্তু মুসলমান হবে না, আর মুসলমান হবে মুমিন হবে না।

মোটকথা, ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য আছে। শরিয়তের বিধানে ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই; বরং একটি অপরটির জন্য জরুরি ও সম্পূরক। –[মা'আরিফুল কুরআন]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

সূরা ক্বাফ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির প্রথম অক্ষর হলো– ق আর এর দ্বারাই এ সূরার নাম সূরা ক্বাফ রাখা হয়েছে। এখানে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ -এর নীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় করা হয়েছে। আর ق টি حُرُوْفِ مُقَطَّعَاتْ -এর অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

এ সূরাটি পবিত্র নগরী মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে তিনটি রুকূ', ৪৫টি আয়াত, ৩৯৫ টি বাক্য এবং ১৪৯০ টি অক্ষর রয়েছে। –[তানভীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস]

ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরা ক্বাফ মক্কা মুয়ায্যমায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সূরার আলোচ্য বিষয় : সূরা ক্বাফে অধিকাংশ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার ফজিলত : হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর গৃহের সন্নিকটেই আমার গৃহ ছিল। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূল ﷺ -এর রুটি পাকানোর চুল্লিও ছিল অভিন্ন, তিনি প্রতি শুক্রবার জুমার খুতবায় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি আমার মুখস্থ হয়ে যায়। –[মুসলিম, কুরতুবী]

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূল ﷺ উভয় ঈদের নামাজে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন– قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ এবং اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। সূরাটি বেশ বড়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও নামাজ হালকা করতেন। –[কুরতুবী]

মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ এ সূরাটি ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে তেলাওয়াত করতেন।

ইবনে মাজাহ, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সূরাটি ঈদের নামাজেও তেলাওয়াত করতেন।

আবুল আ'লা থেকে বর্ণিত ইবনে মরদবিয়া সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল ﷺ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা সূরা ক্বাফ শিক্ষা কর।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সূরার গুরুত্ব এবং বরকত অনেক বেশি। –[রূহুল মা'আনী খ. ২৬, পৃ. ১৭০]

এ সূরার আমল : বর্ণিত আছে যে গৃহে সূরা ক্বাফ পাঠ করা হয়, সে গৃহে সর্বদা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকে।

এ সূরার শুরু থেকে كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানিতে ধৌত করে পান করলে দাঁতের এবং পেটের ব্যথা দূর হয়। আর যে শিশুর দাঁত উঠে না তাকে ঐ পানি পান করানো হলে সহজে দাঁত উঠে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করছে, সে এমন ইলম অর্জন করবে যা মানুষের জন্য উপকারী হবে এবং সে কল্যাণকর কাজে শরিক হওয়ার তাওফীক পাবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় : এ সূরাটি ঠিক কখন নাজিল হয়েছিল তা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায়নি। তবে সূরাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় যে, এর নাজিল হওয়ার সময় নবুয়তের তৃতীয় বর্ষ হতে শুরু করে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে। এটা মাক্কী জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। সূরাটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এটা নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে নাজিল হয়েছে। তখন কাফেরদের বিরোধিতা ও শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। অবশ্য প্রকাশ্য নির্যাতন তখনো শুরু হয়নি।

সূরার মূল বক্তব্য : এ সূরায় বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়, হিসাব-নিকাশের কথা, জান্নাতের ছওয়াব এবং দোজখের আজাব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে এবং পরিশেষে জান্নাতের জন্য অনুপ্রাণিত করে দোজখের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পবিত্র কুরআনের যে সূরাসমূহকে 'মুফাসসাল' বলা হয়, তন্মধ্যে এটি সর্বপ্রথম সূরা।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট শুনে শুনেই এ সূরা কণ্ঠস্থ করেছি। কেননা তিনি প্রত্যেক জুমার খুতবার সময় এ সূরাটি পাঠ করতেন। সকল বড় বড় মজলিসে তিনি এ সূরা পাঠ করতেন। যেমন ঈদের দিনেও তিনি এ সূরা পাঠ করতেন, কেননা এ সূরায় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত এমনকি জান্নাত ও দোজখের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ দুই ঈদের নামাজে এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। উম্মে হিশাম নামের এক মহিলা নবী করীম ﷺ -এর প্রতিবেশীনী ছিলেন। তিনি বলেন, জুমার খুতবাসমূহে আমি নবী করীম ﷺ -এর মুখে এ সূরাটি প্রায় শুনতে পেতাম। এভাবে শুনতে শুনতেই এটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য বর্ণনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ নামাজেও এ সূরাটি প্রায় পাঠ করতেন। এটা হতে সাব্যস্ত হয় যে, সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সে জন্য তিনি বেশি বেশি পাঠের মাধ্যমে এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সূরাটি গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে অতি সহজেই এই গুরুত্বের কারণ অনুধাবন করা যায়। সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হচ্ছে পরকাল। নবী করীম ﷺ মক্কা শরীফে যখন তাঁর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের সূচনা করলেন, তখন তাঁর যে কথাটা শুনে লোকেরা বেশি স্তম্ভিত হয়েছিল তা হলো মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থিত হওয়া এবং যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব দেওয়া। লোকেরা বলত, এটা সম্পূর্ণ নতুন কথা। এটাকে কোনো বিবেক-বুদ্ধি মেনে নিতে পারে না। আমাদের দেহের বিন্দু যখন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন এ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত দেহাংশ হাজার হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় একত্র হয়ে আমাদের এ দেহাবয়ব সম্পূর্ণ নতুনভাবে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াব- এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? এর জবাব স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ ভাষণটি নাজিল হয়েছে। এ সূরাতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে পরকালের সম্ভাব্যতা এবং এটা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অপরদিকে লোকদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, স্তম্ভিত হও বা এটাকে বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে কর অথবা এটাকে মিথ্যা মনে করে উড়িয়ে দাও, তাতে প্রকৃত সত্য কখনো পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য হলো- তোমাদের দেহের একেকটি অণু মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় বটে; কিন্তু তা কি অবস্থায় পড়ে আছে তা আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানেন। এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও মাটির সাথে মিলে-মিশে যাওয়া অণু পুনরায় একত্র করে তোমাদের দেহাবয়বকে আবার দাঁড় করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটু ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, তোমাকে এখানে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, বাধা-বন্ধনহীন ও লাগাম ছাড়া করে দেওয়া হয়েছে এবং কারো নিকট তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। এটা নিছক ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত আল্লাহ নিজে সরাসরিভাবে তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন। শুধু তাই নয়; তোমাদের মনে আবর্তনশীল চিন্তা-কল্পনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তাঁর নিয়োজিত ফেরেশতাগণও তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছায়ার মতো থেকে তোমাদের প্রত্যেকটি গতিবিধি রেকর্ড ও সংরক্ষণ করছেন। যখন সময় হবে তখন একটি ডাকে ঠিক তেমনিভাবে তোমরা সকলে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যেমন করে বৃষ্টির এক পশলা পড়তেই মাটির বুক বিদীর্ণ করে উদ্ভিদের অংকুর মাথা তুলে দাঁড়ায়। বর্তমানে এ দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির উপর যে আবরণ পড়ে আছে তা সম্পূর্ণ দূরীভূত হবে, তোমাদের জ্ঞানের আলো দিবালোকের মতোই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং আজ যেই মহাসত্যকে তোমরা মেনে নিতে পারছ না বলে অস্বীকার করছ, তখন তোমরা নিজেদের চোখেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন তোমরা তাও জানতে পারবে যে, দুনিয়ায় তোমরা কিছুমাত্র দায়িত্বহীন ও শৃগাল কুকুরের ন্যায় বাধামুক্ত ছিলে না। বাস্তবিকই তোমরা দায়িত্বশীল ছিলে। তোমাদের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কর্মফল ভালো বা মন্দ, পুরস্কার-শাস্তি, আজাব ও ছওয়াব, জান্নাত ও দোজখ ইত্যাদিকে আজ তোমরা বিস্ময় উদ্দীপক গল্প কাহিনী বলে মনে করছ; কিন্তু সেদিন এসব তোমাদের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হয়ে মহাসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সত্যের সাথে শত্রুতা পোষণের শাস্তি স্বরূপ তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে যাকে তোমরা অবাস্তব ও অবোধগম্য বলে মনে করছ। অপরদিকে মহান আল্লাহকে ভয় করে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী লোকেরা তোমাদের চোখের সামনে সে জান্নাতেই প্রবেশ করবে যার কথা শুনে আজ তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ।

মাক্কী সূরাসমূহে সাধারণত তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ সূরায় আখিরাত সম্পর্কেই সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

সূরাটির যোগসূত্র : পূর্বোক্ত সূরা হুজুরাতের শেষ আয়াত হলো- وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ [আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম প্রত্যক্ষ করছেন] এর দ্বারা আমলের জাযা বা প্রতিদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল। আর এ সূরা ক্বাফ-এর সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই রয়েছে কিয়ামত ও আমলের প্রতিদানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা।

Free@www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ : সূরা ক্বাফ, মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ (الْاٰيَةُ) فَمَدَنِيَّةٌ خَمْسٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً

তবে وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ الخ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত : ৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. ১. قٓ تف اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ج الْكَرِيْمِ مَا اٰمَنَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ

অনুবাদ :

১. ق ক্বাফ এর দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন। সম্মানিত কুরআন মর্যাদাপূর্ণ [কুরআন] -এর শপথ। মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান আনেনি।

২. بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يُنْذِرُهُمْ يُخَوِّفُهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَ الْبَعْثِ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا الْاِنْذَارُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ ج

২. বরং তারা বিস্মিত হয়েছে এ জন্য যে, তাদের মধ্য হতেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেছেন। তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন রাসূল হয়ে আগমন করেছেন যিনি তাদেরকে পুনরুত্থানের পর জাহান্নামে [যাওয়া]-এর ভয় প্রদর্শন করেন। সুতরাং কাফেররা বলল, তা [ভয় প্রদর্শন] আশ্চর্য বিষয়।

৩. ءَاِذَا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ج نَرْجِعُ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ - فِيْ غَايَةِ الْبُعْدِ -

৩. তবে কি ءَاِذَا -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে, দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে, এতদুভয় অবস্থায় উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পড়া যায়। আমরা যখন মৃত্যুবরণ করব এবং মাটিতে পরিণত হব তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে? ঐ প্রত্যাবর্তন [পুনরুত্থান] সুদূর পরাহত। একেবারেই দূরবর্তী [অসম্ভব]।

৪. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ تَأْكُلُ مِنْهُمْ ج وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ فِيْهِ جَمِيْعُ الْاَشْيَاءِ الْمُقَدَّرَةِ -

৪. আমি ভালোভাবেই অবগত আছি যা জমিন হ্রাস করে তাদের হতে যা গ্রাস করে– আর আমার নিকট রয়েছে একটি সংরক্ষিত কিতাব এটা হলো লাওহে মাহফূয; সংঘটিতব্য সবকিছু এতে [লিপিবদ্ধ] রয়েছে।

৫. بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ بِالْقُرْاٰنِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْ شَاْنِ النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ فِيْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ - مُضْطَرِبٍ قَالُوْا مَرَّةً سَاحِرٌ وَسِحْرٌ وَمَرَّةً شَاعِرٌ وَشِعْرٌ وَمَرَّةً كَاهِنٌ وَكَهَانَةٌ -

৫. বরং তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে সত্যকে কুরআনকে। যখন এটা তাদের কাছে আসল তখন তারা নবী করীম ﷺ ও কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে পড়ল অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ল। সুতরাং কখনো বলল, জাদুকর ও জাদু। আবার কখনো বলল, কবি ও কাব্য। আর কখনো বলল, জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদ্যা।

Free @ www.eilm.weebly.com

٦. اَفَلَمْ يَنْظُرُوْآ بِعُيُوْنِهِمْ مُعْتَبِرِيْنَ بِعُقُوْلِهِمْ حِيْنَ اَنْكَرُوا الْبَعْثَ اِلَى السَّمَاءِ كَائِنَةً فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا بِلَا عَمَدٍ وَ زَيَّنّٰهَا بِالْكَوَاكِبِ وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ شُقُوْقٍ تُعِيْبُهَا .

৬. তারা কি দেখেনি তাদের চক্ষু দিয়ে বা বিবেকের দ্বারা উপলব্ধি করে– যখন তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে আকাশের দিকে যা রয়েছে তাদের উর্ধ্বে। কিভাবে আমি এটাকে সৃষ্টি করেছি ছাদবিহীনভাবে এবং আমি একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি তারকারাজির দ্বারা। আর এটার মধ্যে কোনোরূপ ছিদ্র [খুঁত] নেই এমন কোনো ফাটল নেই, যা এটাকে দোষযুক্ত করতে পারে।

٧. وَالْاَرْضَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى مَوْضِعِ اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ مَدَدْنٰهَا دَحَوْنَاهَا عَلٰى وَجْهِ الْمَاءِ وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ جِبَالًا تُثَبِّتُهَا وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ صِنْفٍ بَهِيْجٍ . يَبْهَجُ بِهٖ لِحُسْنِهٖ .

৭. আর জমিনের দিকে এটা اِلَى السَّمَاءِ -এর মহল্লের উপর আতফ হয়েছে। কিভাবে আমি একে বিস্তৃত করেছি পানির উপর বিছিয়ে দিয়েছি আর স্থাপন করেছি এটার মধ্যে পর্বতরাজি– পাহাড়সমূহ যা তাকে স্থিতিশীল রেখেছে। আর আমি গজিয়ে দিয়েছি এটার মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের শ্রেণির সতেজ উদ্ভিদ সুন্দর ও সতেজ হওয়ার কারণে যা দেখলে মন খুশি হয়ে যায়।

٨. تَبْصِرَةً مَفْعُوْلٌ لَهٗ اَيْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ تَبْصِيْرًا مِنَّا وَّ ذِكْرٰى تَذْكِيْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ . رَجَّاعٍ عَلٰى طَاعَتِنَا .

৮. জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচনকারী এটা مَفْعُوْلٌ لَهٗ হয়েছে; অর্থাৎ আমি তা এ জন্য করেছি যে, তা আমার পক্ষ হতে জ্ঞান চক্ষু খুলে দিবে এবং শিক্ষাপ্রদ নসিহত স্বরূপ। প্রত্যেক এমন বান্দার জন্য যে প্রত্যাবর্তনকারী আমার আনুগত্যের প্রতি রুজুকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ قٓ : সূরার প্রথমে উল্লিখিত قٓ -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ ف -এর উপর সাকিনসহ قَافْ পড়েছেন।

২. হাসান ইবনে আবী ইসহাক ও নসর ইবনে আসিম প্রমুখ ক্বারীগণ ف -এর যেরযোগে قَافِ পড়েছেন।

৩. হারূন ও মুহাম্মদ ইবনে সুমাইকাহ প্রমুখ ক্বারীগণ ف -এর উপর পেশযোগে قَافُ পড়েছেন। কেননা তা মাবনীর হরকত।

৪. ঈসা সাকাফী (র.) ف -এর উপর যবর দিয়ে قَافَ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ وَالْقُرْاٰنِ : আল্লাহর বাণী– وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ -এর মধ্যস্থিত وَاوْ টি কসম বা শপথের জন্য হয়েছে। اَلْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ হলো তার مُقْسَمٌ بِهٖ হয়েছে। কিন্তু এখানে جَوَابِ قَسَمٍ কি? এ ব্যাপারে আলেমগণ বিভিন্ন ইবারতের উল্লেখ করেছেন; নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো–

* مَا اٰمَنَ كُفَّارُ مَكَّةَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ অর্থাৎ মক্কার কাফেররা মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি।

* اِنَّ الرَّجْعَ لَكَائِنٌ অর্থাৎ পুনরুত্থান অবশ্যই হবে।

* اِنَّكَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি ভয় প্রদর্শনকারী।

* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ الخ অর্থাৎ যে কোনো শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হোক না কেন, তার জন্য আমার নিকট চির উপস্থিত একজন সংরক্ষক মওজুদ রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

* قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُ অর্থাৎ তাদের দেহের যে অংশ জমিন গ্রাস করবে, তা আমার জানা রয়েছে।
* لَتُبْعَثُنَّ অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।
* بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَ هُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ অর্থাৎ বরং তারা তো এ জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, তাদের নিকট একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসেছে।
* اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُنْذِرَ بِهِ النَّاسَ অর্থাৎ আমি আপনার উপর এ জন্য কুরআন নাজিল করেছি যে, তা দ্বারা আপনি লোকদেরকে ভয় দেখাবেন।
* بَلْ عَجِبُوْا অর্থাৎ বরং তারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَئِذَا مِتْنَا : مِتْنَا -এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা–

১. اَئِذَا -এর উভয় হামযাকে বহাল রেখে।

২. اَئِذَا -এর দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে।

৩. উভয় হামযাকে বহাল রেখে মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে।

৪. দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে।

৫. একটি হামযাকে বিলোপ করে।

اَئِذَا الخ -এর অর্থ : আল্লাহর বাণী– اَئِذَا مِتْنَا الخ মূলত মুশরিকদের উক্তি, যা তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন মাত্র। এখানে প্রশ্নটি তারা অস্বীকৃতির জন্য করেছে। এর অর্থ হলো– لَا نَرْجِعُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَ كَوْنِنَا تُرَابًا وَبَعْدَ اَكْلِنَا الْاَرْضُ অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর পর, আমি মাটিতে মিশে যাওয়ার পর এবং জমিন আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলার পর আমরা পুনরায় উত্থিত হব না।

আলোচ্য আয়াতাংশে ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ কি? : আল্লাহর বাণী– ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ -এর মধ্যে ذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হলো– نَرْجِعُ اِلَى اللّٰهِ بِالْبَعْثِ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ অর্থাৎ আমরা পুনরুত্থানের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ফিরে যাব। তাতো সুদূর পরাহত মনে হয়।

قَوْلُهُ لَمَّا جَاءَهُمْ : আল্লাহ তা'আলার বাণী– بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ -এর মধ্যস্থিত لَمَّا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

১. জমহুর ক্বারীগণ ل -এর উপর যবর ও م -এর উপর তাশদীদসহ যবর দিয়ে لَمَّا পড়েছেন।

২. ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (র.) ل -এর নিচে যেরযোগে এবং م -কে তাখফীফ করে لِمَ পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضَ : আল্লাহর বাণী– وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا -এর মধ্যস্থিত اَلْاَرْضَ শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। এর দু'টি কারণ হতে পারে। যথা–

১. وَالْاَرْضَ শব্দটি عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ মানসূব হয়েছে। মূলত ছিল وَمَدَدْنَا الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا الخ

২. অথবা, তা اِلَى السَّمَاءِ -এর মহল্লের উপর আতফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা اَفَلَمْ اِلَى السَّمَاءِ মূলত يَنْظُرُوْا -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ ذِكْرٰى وَ تَبْصِرَةً : আল্লাহর বাণী– تَبْصِرَةً ও ذِكْرٰى -এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। যথা–

১. تَبْصِرَةً ও ذِكْرٰى শব্দদ্বয় مَفْعُوْل لَهُ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে– فَعَلْنَا ذٰلِكَ تَبْصِيْرًا مِنَّا وَ ذِكْرٰى অর্থাৎ আমার পক্ষ হতে চক্ষু উন্মোচনকারী ও উপদেশ হওয়ার জন্য আমি আকাশ ও জমিনকে কৌশলপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছি।

অথবা, একটি উহ্য مَصْدَر -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। যার মূলে ছিল– بَصَّرْنَا هُمْ تَبْصِرَةً وَ ذَكَّرْنَا هُمْ ذِكْرٰى

২. تَبْصِرَةً ও ذِكْرٰى একটি উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। মূল ইবারত হবে– هِيَ تَبْصِرَةٌ وَ ذِكْرٰى

قَوْلُهُ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا : আল্লাহর বাণী– كَيْفَ بَنَيْنٰهَا মাফউল তথা اَلسَّمَاءِ হতে حَال হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। مخاطب -কে স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ الخ : শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ মক্কার লোকদের নিকট যেসব বিষয়াদি পেশ করেছেন তন্মধ্যে তাওহীদের ন্যায় পুনরুত্থানের বিষয়টিও তাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। তাওহীদের কথা শুনে যেমন তারা বলত যে, হাজার হাজার খোদা যখন দুনিয়াটাকে সামাল দিতে পারছে না, তখন এক খোদা কি করে তা পারবে? (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) তেমনটি পুনরুত্থানের ব্যাপারে তারা বলত যে, আমরা মৃত্যুবরণ করে যখন মাটির সাথে মিশে যাব, তখন আমাদেরকে কিভাবে জীবিত করা হবে– এটা কি করে সম্ভবপর হতে পারে? তাদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে নিরসন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাজিল করেন।

قَوْلُهُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ : ق এটা আরবি বর্ণমালার একটি। কুরআনের আয়াতসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. مُحْكَمٌ ২. مُتَشَابِهٌ –আবার مُتَشَابِهٌ -কেও ভাগ করা হয়েছে দু'ভাগে। এক. যার অভিধানিক অর্থ জানা আছে কিন্তু পারিভাষিক অর্থ অজ্ঞাত। দুই. যার আভিধানিক ও পারিভাষিক কোনো অর্থই জানা নেই। قٓ বর্ণটি শেষোক্ত শ্রেণিভুক্ত। সূরার প্রথমে ব্যবহৃত এ অজ্ঞাত অর্থবোধক বর্ণগুলোকে حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ -ও বলা হয়।

এ জন্যই জালালাইনের গ্রন্থকার আ'ল্লামা মহল্লী (র.) এর তাফসীরে লিখেছেন– اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ ق (ইত্যাদি)-এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা তিনিই ভালো জানেন।

অবশ্যই মুহাক্কিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এটার অর্থ জানতেন। অন্যথায় সম্বোধন অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবে সাধারণ ঈমানদারগণের এটার অর্থ জানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং তাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে।

তবে কতিপয় মুফাস্‌সিরে কেরাম (র.) ধারণার উপর ভিত্তি করে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

"ق" -এর ব্যাখ্যায় আলেমগণের বিভিন্ন মতামত : "ق" -এর তাফসীরে আলেমগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো–

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ق আল্লাহর নামসমূহের একটি।
* ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনায় যাহ্‌হাক ও ইকরিমা (র.) উল্লেখ করেছেন যে, ক্বাফ ভূপৃষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত এক বিশাল সবুজ পাহাড়ের নাম।
* শা'বী (র.) বলেছেন, ق হলো সূরার ভূমিকা।
* ইনতাকী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা مُقَرَّبُوْنَ [আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভকারী বান্দাগণকে] বুঝানো হয়েছে।
* আবূ বকর আররাফ (র.) বলেছেন, এটার অর্থ হলো– قِفْ عِنْدَ اَمْرِنَا وَنَهْيِنَا وَلَا تَعْدُّ هُمَا অর্থাৎ আমার আদেশ ও নিষেধের কাছে থেমে যাও– এদের সীমা ডিঙিয়ে যেয়ো না।
* ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, ق হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত চারটি নামের প্রথমাংশ– قَادِرٌ . قَرِيْبٌ . قَاضٍ ও قَابِضٌ
* যুজাজ (র.) বলেছেন– ق এর অর্থ হলো– قَاضِىُ الْاَمْرِ অর্থাৎ [যে কোনো] বিষয়ের ফয়সালাকারী।
* হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, এটা কুরআন মাজীদের একটি নাম।
* হযরত ওহ্‌হাব (র.) বর্ণনা করেছেন, একবার যুলকারনাইন (আ.) ভ্রমণে বের হয়ে একটি বিশাল পাহাড়ে গিয়ে পৌছলেন। ঐ পাহাড়ের নিচে বহু ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন পাহাড়! জবাব আসল, আমি কোহে ক্বাফ তথা ক্বাফ পাহাড়। তোমার আশে-পাশে এরা কি? জবাব আসল, এই ক্ষুদ্র পাহাড়সমূহ আমার শাখা-প্রশাখা। এমন কোনো দেশ নেই যেখানে আমার শাখা নেই। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো শহরে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন আমাকে নির্দেশ দেন, আমি আমার ঐ শাখা নাড়া-চাড়া করলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। হযরত যুলকারনাইন (আ.) উক্ত পাহাড়কে বললেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বলে দাও! জবাব আসল, "আমাদের রব অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ; তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ : 'আর শপথ কুরআনে মাজীদের'। কুরআনের মর্যাদা তো বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না। এটা আগমন করেই পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবসমূহকে মানসূখ [রহিত] করে দিয়েছে। এটা তার ই'জাযী শক্তি ও অসীম রহস্যের দ্বারা সারা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। কুরআনে কারীম স্বয়ং এর সাক্ষী যে, এতে কেউই হাত দেওয়ার সুযোগ পায়নি– কোনোরূপ খুঁত বের করতে পারেনি। কিন্তু তথাপিও মুশ্‌রিকরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। এর কারণ এই ছিল না যে, তাদের নিকট এর বিরুদ্ধে কোনো দলিল প্রমাণ মওজুদ ছিল; বরং শুধু তাদের নিজেদের অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও অহমিকার কারণেই তারা কুরআনে কারীম ও নবী করীম ﷺ -কে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি।

'আল-মাজীদ' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. উচ্চ মর্যাদাবান মহামহিমান্বিত, শ্রদ্ধেয়, মহামান্য, ইজ্জত ও সম্মানের অধিকারী।

২ দানশীল, অনুগ্রহকারী, বিপুল দাতা, অশেষ কল্যাণ বিধানকারী। এটা আল-কুরআনের সিফাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর উপরিউক্ত দু'টি অর্থই গ্রহণযোগ্য।

কুরআন এই দিকের বিবেচনায় মহান যে, দুনিয়ার কোনো গ্রন্থ তার মোকাবেলায় পেশ করা যেতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যিক মানের দিক দিয়েও তার অলৌকিকত্ব আশ্চর্যজনক ও নজীরবিহীন, শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তার মুজেযা অতুলনীয়। তা যখন নাজিল হয়েছিল তখনও মানুষ এর মতো বাণী রচনা করে পেশ করতে পারেনি এবং এর পরবর্তী সময় তথা আজ পর্যন্তও কেউ এর সমতুল্য বাণী রচনায় সক্ষম হয়নি, আর কিয়ামত পর্যন্তও হবে না। তার কোনো একটি বাণী কালের কোনো পর্যায়েই বিন্দুমাত্রও ভুল প্রমাণিত হয়নি, আর না কোনো দিন হবে। বাতিল না সম্মুখ দিক হতে তাকে মোকাবিলা করতে পারে, না পিছন দিক হতে আক্রমণ করে তাকে পরাস্ত করতে পারে। মানুষ এর নিকট যতবেশি হেদায়েত লাভ করতে চেষ্টা করবে এটা তাদেরকে ততবেশি হিদায়েত দান করবে। মানুষ তার যতবেশি অনুসরণ করবে এটা হতে ইহ ও পরকালীন কল্যাণ ততবেশি লাভ হবে। তার কল্যাণ ও মঙ্গলের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কোনো একটি পর্যায়েও মানুষ তার প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও তার উপর নির্ভরশীলতা হতে মুক্ত হতে পারে না। এর মঙ্গল ও কল্যাণ কোথায়ও এবং কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না এবং যেতেও পারে না।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-ও প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন– اَلْقُرْاٰنُ الْمَجِيْدُ-এর অর্থ হলো অশেষ কল্যাণ বিধায়ক ও মহামহিমান্বিত কুরআন। যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ অর্থাৎ বাতিল না এর সম্মুখে দিক হতে আসতে পারে, আর না পিছনের দিক হতে। মহাপ্রকৌশলী ও বহুল প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ হতে এটা নাজিল হয়েছে। মোটকথা আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল হওয়ার কারণেই এটা সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নির্ভুল হওয়ার দাবিদার হতে পেরেছে।

قَوْلُهُ فِيْ اَمْرٍ مَرِيْجٍ : مَرِيْجٍ শব্দ مَرَجَ হতে গৃহীত। এর অর্থ– স্থিরতা। اَمْر শব্দের সাথে مَرَجَ -এর সম্পর্ক রূপকভাবে হয়েছে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে সমস্যা বিজড়িত ব্যক্তিকে مَرِيْجٌ বলা হয়ে থাকে, সমস্যাকে নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতে, مَرِيْجٌ শব্দের অর্থ– বিশৃঙ্খলাকারী ও দুষ্ট। হযরত কাতাদা ও যাহহাক (র.) প্রমুখ বলেছেন এর অর্থ মিশ্র ও জটিল। অর্থাৎ কাফিররা এক নীতির উপর স্থির থাকে না। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলে ফ্যাসাদ ও জটিলতা সৃষ্টি করে।

قَوْلُهُ بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاۤءَهُمْ .... شَيْءٌ عَجِيْبٌ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে মক্কার কাফেররা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান না আনয়নের কারণ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

মক্কার মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -এর উপর যেসব কারণে ঈমান আনয়ন করেনি। যে বিষয়সমূহকে তারা ঈমান গ্রহণ না করার অজুহাত হিসেবে পেশ করেছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো পুনরুত্থানের বিষয়টি। সুতরাং একে তারা আশ্চর্যজনক মনে করেছে যে, তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজন ব্যক্তি ভয়-প্রদর্শনকরী হিসাবে তাদের নিকট আগমন করেছেন। যিনি তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তদানুযায়ী আমল না করলে মৃত্যুর পর তাদেরকে পরকালে পুনঃ জীবিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কাজেই কাফেররা বলেই ফেলল যে, এরূপ ভীতি প্রদর্শন তো অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"بَلْ عَجِبُوْا الخ" আয়াতে مُتَعَجَّبٌ مِنْه এবং تَعَجُّبٌ -এর কারণ : بَلْ عَجِبُوْا -এর مُتَعَجَّبٌ مِنْه হলো "اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ"; কাফেরদের ধারণা ছিল তাদেরকে সাবধানকারী তাদের মধ্য হতে একজন হতে পারে না। তাদেরই এক ব্যক্তি তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে রাসূল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, তা তাদের নিকট অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। আর যদি তাদের মধ্য হতেই হবে, তাহলেও সে ব্যক্তি তো মুহাম্মদ ﷺ হতে পারেন না। তাদের মধ্য হতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কোনো একজনের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হলে তাও একটা কথা ছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল এই যে, এ মহান দায়িত্বের জন্য হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে নির্বাচন করা হলো কেন? সুতরাং তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলেছিল- لَوْلَا اُنْزِلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ অর্থাৎ এ দু'টি জনপদ [মক্কা ও তায়েফের]-এর মধ্য হতে একজন মহান ব্যক্তির উপর [আবূ জাহল অথবা ওয়ারাকা ইবনে মাসউদ সাকাফীর উপর] এ কুরআন নাজিল হলো না কেন?

তাদের আশ্চর্যান্বিত হওয়ার আরো কারণ ছিল পরকাল বিষয়ক নবী করীম ﷺ -এর বক্তব্য। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, হাশর-নশর হওয়া, জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলো তাদেরকে বিস্মিত করত এবং তাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হতো।

بَلْ عَجِبُوْا -এর মধ্যে بَلْ কোন অর্থে হয়েছে? : আল্লাহর বাণী- بَلْ عَجِبُوْا -এর মধ্যে بَلْ শব্দটি উহ্য جَوَاب قَسَم হতে اِضْرَاب হয়েছে। আর তাদের বিস্ময় প্রকাশ তাদের নির্বুদ্ধিতার দরুন করা হয়েছে। অন্যথা মূলত এবং নিখুঁত বিবেকের দৃষ্টিতে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর আগমন মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়; বরং তাদের আগমন না করাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

আর উক্ত বাক্য- بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ الخ -এর মধ্যে مَضْرُوْب عَنْه উহ্য রয়েছে। মূল বাক্যটি হলো- لَمْ يَقْتَنِعُوْا بِالشَّكِّ فِى الرِّسَالَةِ وَالْحَشْرِ بَلْ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ অর্থাৎ তারা শুধু রিসালত ও হাশরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং এজন্যও তারা আশ্চর্যবোধ করেছে যে, তাদের নিকট তাদের নিজেদের মধ্য হতেই একজনকে ভয় প্রদর্শনকারী [রাসূল] হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

قَوْلُهُ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ .... وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ : কাফেররা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করত। তারা বলত যে, আমরা মৃত্যুবরণ করত মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় কি আমাদেরকে জীবিত করা হবে? এটাতো আমাদের নিকট সুদূর পরাহত ও অসম্ভব বলেই মনে হয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্ত ভ্রান্ত ধারণাকে নিরসন করত পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- জমিন তাদের দেহাংশের কি পরিমাণ গ্রাস করে তা আমার ভালো করেই জানা রয়েছে। আর আমার নিকট একটি সংরক্ষণকারী কিতাব রয়েছে। তারা যে, পুনরুত্থানকে সুদূর পরাহত মনে করছে তা ঠিক নয়। কেননা সুদূর পরাহত হওয়া হয়তো যাকে পুনরুত্থিত করা হবে, তার হিসাবে হবে অথবা পুনরুত্থানকারীর দিক বিবেচনায় হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় এ জন্য অসম্ভব হবে না যে, তার মধ্যে তো জীবন ধারণের যোগ্যতা বিদ্যমান- যা বাস্তবে রয়েছে। আর শেষোক্ত দিকের বিচারেও তা অসম্ভব হতে পারে না। কেননা দেহের সমস্ত অংশের মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার জানা-শুনা রয়েছে। তাদেরকে পুনরায় একত্র করত জীবনদানের ক্ষমতাও তাঁর রয়েছে।

মোটকথা, মানুষ সর্বাংশে মাটিতে মিশে যায় না; বরং তার জীবন তো সহীহ-সালামত থেকেই যায়। মাটিতে যদি মিশে তা শুধু দেহই তো মিশে থাকে। এর অংশসমূহ পরিবর্তিত হয়ে যে আকার ধারণ করে তা আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন। আর তা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাধীনই থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা একে একত্র করে জীবন্ত করে দিবেন। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার ইলমও হলো قَدِيْم [অনাদি] পূর্ব হতেই সবকিছু তিনি লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিভাবে মানুষের পুনরুত্থান হবে তাও তথায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখনো তাঁর নিকট অত্র কিতাব সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ইলমে কাদীম না বুঝলে এটুকু বুঝে নাও যে, উক্ত দপ্তরে সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে।

كِتَابٌ حَفِيْظٌ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলার বাণী- كِتَابٌ حَفِيْظٌ -এর দ্বারা লাওহে মাহফূজ (اَللَّوْحُ مَحْفُوْظٌ) -কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর মধ্যে সংঘটিত ও সংঘটিতব্য সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে। মূলত এটা একটি উপমা। অর্থাৎ যেমন কারো কাছে এমন একটি কিতাব থাকে যার মধ্যে সবকিছু লিপিবদ্ধ থাকে তেমনটি আল্লাহ তা'আলার ইলমেও সবকিছু সংরক্ষিত রয়েছে। লাওহে মাহফূযকে মানুষের দেমাগ [মগজ]-এর সাথে তুলনা করা যায়। ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও এতে জ্ঞানের কত ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে। আর লাওহে মাহফূয হলো সাদা মুক্তার ন্যায়, যা সপ্তম আকাশে হাওয়ার সাথে ঝুলে রয়েছে। এর ব্যাসার্ধ আসমান-জমিনের সমতুল্য। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ .... فِىْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে মক্কার কাফেরদের কুরআন ও নবী করীম ﷺ -কে অস্বীকার করার মূল কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- বস্তুত কাফেররা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যখন তা আমাদের নিকট আগমন করেছে। সুতরাং তারা দোদুল্যমানতা ও সংশয়ে ভুগছে। কুরআন ও নবী করীম ﷺ -এর সত্যতার ব্যাপারে তাদের মনে সংশয় ও সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কখনো তারা বলছে যে, কুরআন জাদু এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ জাদুকর! কখনো বলছে, কুরআন কাব্য এবং মুহাম্মদ ﷺ কবি। আবার কখনো বা বলছে কুরআন জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং মুহাম্মদ ﷺ জ্যোতিষী।

কাফেররা শুধু আশ্চর্যবোধের বহিঃপ্রকাশই করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা পরিষ্কার ভাষায় কুরআন মাজীদ ও নবী করীম ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এমনকি পরকাল-পুনরুত্থান সকল সত্যকেই তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আর যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য জিদ ধরে বসে তাদের সামনে শত যুক্তি পেশ করলেও তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবেই।

বস্তুত উপরে কুরআন মাজীদের শপথ করা হয়েছে এ কথাটি বলার জন্য যে, মক্কার কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত মেনে নিতে কোনো যুক্তিসঙ্গত ও বিবেক-বুদ্ধিসম্মত কারণে অস্বীকৃতি জানায়নি; বরং এর ভিত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও বিবেক বিরোধী। কেননা, তারা এ বলে নবী করীম ﷺ -এর নবুয়তকে অস্বীকার করেছিল যে, তাদের জাতির মধ্য হতে তাদের নিজেদের মতোই একজন লোককে আল্লাহ তা'আলা সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। এতেই তারা বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের কল্যাণের কথা বিবেচনা না করে তাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করার ব্যবস্থা না করতেন অথবা, তাদেরকে সতর্ক করার জন্য কোনো অতি মানবকে পাঠাতেন, তাহলে তা-ই তাদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় হতো। কাজেই নবী করীম ﷺ -কে অস্বীকার করার জন্য একে অজুহাত হিসেবে পেশ করা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সুস্থ বিবেকের দাবি হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে সাবধানকারীর আগমন হওয়া মানুষের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। আর উক্ত সতর্ককারী যে তাদের স্বজাতীয়, তাদের নিজেদের মতোই একজন এটাও তাদের নিকট কম আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু সুস্থ বিবেকের দাবি হলো, উক্ত ব্যক্তি তাদেরই একজন হওয়া।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, যাকে এ দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন, সে মুহাম্মদ ﷺ -ই কিনা? আর এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য অন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের তো প্রয়োজন পড়ে না। কুরআন মাজীদে তিনি যা উপস্থাপন করেছেন তার সত্যতা প্রমাণের জন্য এটাই সর্বদিক দিয়ে যথেষ্ট।

কাজেই প্রমাণিত হলো যে, পূর্বোক্ত আয়াতে এ কথাটি বলার জন্যই কুরআনের শপথ করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্যই আল্লাহর রাসূল। কাফেররা অকারণেই কোনো প্রমাণ ছাড়াই তাঁর রিসালতের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করছে। কুরআনের সিফাত 'মাজীদ' দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاۤءِ .... زَوْجٍ بَهِيْجٍ : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যে, পুনরুত্থানে সক্ষম তা বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টির প্রতি তাকানোর জন্য এবং এগুলোর ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

এ লোকেরা যখন পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তখন তারা কি একবারও তাকায়নি- একবারও আকাশের দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখেনি, কিভাবে আমি তাদের উর্ধ্বে তাকে ছাদবিহীনভাবে বানিয়েছি। তারকারাজির দ্বারা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি। আর তাতে দূষণীয় কোনো ফাটলও নেই। এত বিশাল আকাশকে ছাদ ব্যতীত কিভাবে আমি মজবুতভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। হাজারো লাখো তারকার আগমনে ঝিকিমিকিতে কি এক অপূর্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা হয় তথায় রাত্রি বেলায়। হাজারো-লাখো বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও না এতে ফাটল ধরেছে, না কোনো দিক ভেঙ্গে পড়েছে আর না তা বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। তারা কি চিন্তা করে দেখেছে, তা কোন কারিগরের কাজ, কোন শিল্পীর শিল্পকর্ম?

আর কি তারা জমিনের দিকে তাকিয়ে দেখেনি? এ বিশাল ভুখণ্ডকে কিভাবে আমি পানির উপর বিছিয়ে দিয়েছি। এর উপর পর্বতরাজিকে স্থাপন করে সুদৃঢ় করে দিয়েছি। সুদৃশ্যময় রকমারি উদ্ভিদ দ্বারা এর উপরিভাগকে করে দিয়েছি সুশোভিত। রিজিকের ভাণ্ডারসমূহ আর অগণিত সম্পদরাজি তা হতে উদগীরণ করা হচ্ছে- যা কোনো দিন নিঃশেষ হবে না।

نَظَر -এর অর্থ : এখানে نَظَر -এর অর্থ হলো অন্তরের দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করা। অর্থাৎ অন্তঃচক্ষু দ্বারা তা দেখা যে, যে মহান আল্লাহ আকাশের ন্যায় বিশাল বস্তুকে এবং জমিনের ন্যায় বিস্তৃর্ণ জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই পুনরুত্থানে সক্ষম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا كَثِيْرَ الْبَرَكَةِ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَحَبَّ الزَّرْعِ الْحَصِيْدِ ـ الْمَحْصُوْدِ ـ

৯. আর আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি বরকতপূর্ণ পানি অতি বরকতময়। অতঃপর উৎপন্ন করি তার দ্বারা বাগিচাসমূহ বাগানসমূহ এবং শস্য ফসল পরিপক্ক কর্তনযোগ্য।

١٠. وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ طِوَالًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ مُتَرَاكِبٌ بَعْضُهٗ فَوْقَ بَعْضٍ ـ

১০. এবং উন্নত উচ্চ খেজুর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি সুদীর্ঘ। তা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ হয়েছে। যার ছড়াগুলো স্তরে স্তরে সজ্জিত একটির উপর একটি [স্তরে স্তরে] ধরে থাকে।

١١. رِزْقًا لِّلْعِبَادِ مَفْعُوْلٌ لَهٗ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ط يَسْتَوِىْ فِيْهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلُ هٰذَا الْاِحْيَاءِ الْخُرُوْجُ مِنَ الْقُبُوْرِ فَكَيْفَ تُنْكِرُوْنَهٗ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُمْ نَظَرُوْا وَعَلِمُوْا مَا ذُكِرَ ـ

১১. বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ (رِزْقًا) তা مَفْعُوْلٌ لَهٗ হয়েছে। আর আমি জীবিত করেছি তার দ্বারা একটি মৃত শহরকে (مَيْتًا) -এর মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ সমান [অর্থাৎ তা এতদুভয়ের জন্য সমভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে]। তেমনিভাবে অর্থাৎ এ জীবিতকরণের ন্যায় হবে বহির্গমন কবরসমূহ হতে। সুতরাং তোমরা কিভাবে তাকে অস্বীকার করতে পার? এখানে প্রশ্নবোধক [বাক্য] تَقْرِيْر [ইতিবাচক] -এর জন্য হয়েছে। এর অর্থ হবে– তারা অবশ্যই দেখেছে এবং জেনেছে যা উল্লেখ করা হয়েছে।

١٢. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ تَانِيْثُ الْفِعْلِ لِمَعْنٰى قَوْمٍ وَاَصْحٰبُ الرَّسِّ هِىَ بِئْرٌ كَانُوْا مُقِيْمِيْنَ عَلَيْهَا بِمَوَاشِيْهِمْ يَعْبُدُوْنَ الْاَصْنَامَ وَنَبِيُّهُمْ قِيْلَ حَنْظَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ وَقِيْلَ غَيْرُهٗ وَثَمُوْدُ قَوْمُ صَالِحٍ ـ

১২. তাদের পূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে নূহ (আ.)-এর কওম – قَوْم -এর অর্থের দিকে লক্ষ্য করে فِعْل -কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে। এবং 'রাস'-এর অধিবাসীরা 'রাস' একটি কূপের নাম। তারা তাদের চতুষ্পদ জন্তুসহ তথায় বসবাস করত। তারা মূর্তিপূজারী ছিল। কারো কারো মতে, তাদের নবী ছিলেন হানযালা ইবনে সাফওয়ান। কেউ কেউ অন্যজনের নামোল্লেখ করেছেন। আর ছামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর কওম।

١٣. وَعَادٌ قَوْمُ هُوْدٍ وَفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ـ

১৩. আর আদ হযরত হুদ (আ.)-এর কওম এবং ফিরআউন ও লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়।

١٤. وَاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ اَىِ الْغَيْضَةِ قَوْمُ شُعَيْبٍ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ط هُوَ مَلِكٌ كَانَ بِالْيَمَنِ اَسْلَمَ وَدَعَا قَوْمَهٗ اِلَى الْاِسْلَامِ فَكَذَّبُوْهُ كُلٌّ مِّنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ كَذَّبَ الرُّسُلَ كَقُرَيْشٍ فَحَقَّ وَعِيْدِ وَجَبَ نُزُوْلُ الْعَذَابِ عَلَى الْجَمِيْعِ فَلَا يَضِيْقُ صَدْرُكَ مِنْ كُفْرِ قُرَيْشٍ بِكَ ـ

১৪. আর আইকা ওয়ালারা (اَيْكَةٌ) -এর অর্থ হলো ক্রোধ। তারা হলো হযরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম। আর 'তুব্বা' এর কওম তুব্বা ইয়েমেনের একজন বাদশাহ ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কওমকে ইসলাম কবুল করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু কওমের লোকেরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে [তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে] উল্লিখিত সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কুরাইশদের ন্যায়। সুতরাং আমাদের ভয় সত্যে পরিণত হলো। পূর্বোক্ত সকলের উপরই আজাব নাজিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই কুরাইশদের কুফরির কারণে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না– সংকীর্ণ হৃদয় হয়ে পড়বেন না।

١٥. اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط اَىْ لَمْ نَعْىَ بِهِ فَلَا نَعْيٰى بِالْاِعَادَةِ بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ شَكٍّ مِنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ . وَهُوَ الْبَعْثُ .

১৫. প্রথমবারের সৃষ্টিকার্যে আমি কি অক্ষম ছিলাম? অর্থাৎ এতে আমি অপরাগ হইনি। সুতরাং পুনরায় সৃষ্টি করতেও আমি অক্ষম হব না; বরং তারা পড়ে রয়েছে সন্দেহের মধ্যে সংশয়ের মধ্যে একটি নবতর সৃষ্টির ব্যাপারে আর তা হলো পুনরুত্থান।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَاسِقَاتٍ : আল্লাহর বাণী وَالنَّخْلَ بَسِقَتٍ-এর মধ্যে بَسِقَتٍ শব্দটি اَلنَّخْل হতে حَالْ مُقَدَّرَهْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب-এর মহল্লে ই'রাব হয়েছে। আর حَالْ مُقَدَّرَهْ এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা জন্মের সময় লম্বা হয়ে জন্মায় না, বরং ক্রমান্বয়ে লম্বা হয়ে থাকে। আর اَلنَّخْل-কে এ জন্য একবচন নেওয়া হয়েছে যে, তা অত্যন্ত লম্বা এবং উপকারী। সুতরাং হাদীস শরীফে اَلنَّخْل-কে মুসলমানগণের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ رِزْقًا : আল্লাহর বাণী– رِزْقًا শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْبْ হয়েছে। مَنْصُوْبْ হওয়ার কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা–

* এটা حَالْ হওয়ার দরুন مَنْصُوْبْ হয়েছে অর্থাৎ– مَرْزُوْقًا لِلْعِبَادِ
* اِنْبَاتٌ-এর অর্থ হয়ে مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ হিসেবে অর্থাৎ– اَنْبَتْنَا اِنْبَاتًا
* এটা مَفْعُوْلْ لَهُ হয়েছে। অর্থাৎ– اَنْبَتْنَا .... لِرِزْقِ الْعِبَادِ

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ : এ আয়াতটির কোনো মহল্লে ই'রাব নেই। এটা جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ যা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য এসেছে। অথবা এ কথা বর্ণনা করার জন্য এসছে যে, পুনরুত্থানের সময় তাদের কবর হতে বের হওয়ার ব্যাপারটি মৃত মাটি হতে জীবন্ত বস্তু সৃষ্টি করার মতোই। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ نَزَّلْنَا : আল্লাহর বাণী– وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ-এর نَزَّلْنَا-এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. জমহুর ক্বারীগণ بَابْ تَفْعِيْلْ তথা تَنْزِيْلْ হতে نَزَّلْنَا পড়েছেন।
২. কেউ কেউ اِنْزَالْ হতে اَنْزَلْنَا পড়েছেন।

قَوْلُهُ مَيْتًا : আল্লাহর বাণী· بَلْدَةً مَّيْتًا শব্দটির মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারগণ ى -এর মধ্যে সাকিন দিয়ে مَيْتًا পড়েছেন।
২. ক্বারী জাফর ও খালেক (র.) প্রমুখ ى -এর উপর তাশদীদযোগে مَيِّتًا পড়েছেন।

قَوْلُهُ اَفَعَيِيْنَا : اَفَعَيِيْنَا শব্দের দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–

১. জমহুর ক্বারীগণ اَفَعَيِيْنَا-এর প্রথম ى -এর নিচে যের ও দ্বিতীয় ى -এর উপর সাকিনযোগে পড়েছেন।
২. ইবনে আবী ইবলা প্রথম ى -এর উপর তাশদীদযোগে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ...... كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ : আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বান্দার রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকেন এখানে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে যে, আমি [আল্লাহই] তো আকাশ হতে বরকতপূর্ণ পানি নাজিল করে থাকি, আর এর দ্বারা জমিনে বাগ-বাগিচা ও ফসলের সমাহার সৃষ্টি করি। আর সৃষ্টি করি সুউচ্চ ও উন্নত খেজুর বৃক্ষরাজি যার মধ্যে থোঁকায় থোঁকায় ছড়ার গুচ্ছ স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে থাকে। আমার বান্দাদের রিজিকের ব্যবস্থা করার জন্যই তো আমি এরূপ করি।

আমি আর এ পানি দ্বারা সঞ্জীবিত করি মৃত প্রায় শুষ্কভূমিকে। আমি মৃত্যুর পর লোকদেরকে এভাবে পুনর্জীবিত করব।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের পরিচয় দিয়েছেন, পুনরুত্থানের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন। দলিল পেশ করেছেন এভাবে যে, যেই আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবী গোলকটিকে জীবন্ত সৃষ্টিকুলের অবস্থান ও বসবাস গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন– যিনি পৃথিবীর নিষ্প্রাণ মাটিকে উর্ধ্বলোকের প্রাণহীন পানির সাথে মিশিয়ে এত উচ্চ মানের ক্রমবর্ধমান জীবন সৃষ্টি করেছেন। যাকে তোমরা তোমাদের ক্ষেতখামার ও বাগ-বাগিচায় শ্যামল শোভামণ্ডিত ও চাকচিক্যময় হয়ে ভেসে উঠতে দেখতে পাও; যিনি এ উদ্ভিদকে মানুষ ও জীব-জন্তুর তথা সকল প্রাণীর জন্য খাদ্যের উপকরণ বানিয়ে দিয়েছেন: সে পবিত্র সত্তা সম্বন্ধে যদি ধারণা করা হয় যে, মৃত্যুর পর তিনি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না, তাহলে তা নিছক নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

তোমরা তো নিজেরাই দেখতে পাও যে, একটি বিশাল অঞ্চল সম্পূর্ণ নির্জীব ও শুষ্ক অবস্থায় পড়ে থাকে। বৃষ্টির একটি ফোঁটা নিপতিত হওয়া মাত্রই তার অভ্যন্তর হতে সহসা জীবনের ফল্গুধারা ফুটে উঠে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত মৃতবৎ পড়ে থাকা শিকড়গুলো তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত হয়ে উঠে এবং নানা ধরনের ভূগর্ভস্থ পোকা-মাকড় মাটির তলদেশ হতে বের হয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দেয়। তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা আল্লাহর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। আর তা তো তোমরা তোমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। এর সত্যতাকে তোমরা কোনোমতেই অস্বীকার করতে পার না। কাজেই পুনরুত্থানকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পার?

নূহ (আ.), ছামূদ ও অপরাপর জাতিসমূহের কথা এখানে উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা এখানে হযরত নূহ (আ.), ছামূদ ও অপরাপর কয়েকটি জাতির ইতিহাস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেন তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো? মুফাস্‌সিরগণ (র.) তার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. এ সকল জাতির লোকেরাও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল– যদ্রূপ মক্কার কাফের মুশরিকরা নবী করীম ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, পুনরুত্থানকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং দেখা গেল রাসূল (আ.)-এর সাথে আচরণে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে। সুতরাং এখানে মক্কার কাফেরদেরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতের ঐ সকল জাতিসমূহ রাসূলগণকে অস্বীকার করা ও পুনরুত্থানকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন– দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও শাস্তি তো তারা ভোগ করেছেই আখেরাতেও তাদের জন্য কঠিন ও চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষা করছে। কাজেই মক্কার কাফেররাও যদি নবী করীম ﷺ -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হতে ফিরে না আসে, তাহলে তাদেরকেও উক্ত অতীত জাতিসমূহের ভাগ্য বরণ করতে হবে। তাদের জন্য আল্লাহর আজাব অবধারিত ও অনিবার্য হয়ে পড়বে। দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই যে, একে রুখতে পারে– এর গতিরোধ করতে পারে।

২. অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলির উল্লেখ করার দ্বিতীয় কারণ হলো– নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া। বাস্তবিক পক্ষেই মক্কার কাফের মুশরিকদের সীমাহীন নির্যাতন, সমালোচনা, কটূক্তি, তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান ও দাওয়াতের গতিরোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে পড়া নবী করীম ﷺ -কে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তিনি স্বভাবতই মনভাঙ্গা ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাবছেন যে, না জানি তাঁর দাওয়াতে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে– হয়তো যেভাবে দাওয়াত দেওয়ার দরকার ছিল, আমি সেভাবে দাওয়াত পৌঁছাতে পারছি না। সুতরাং অতীত জাতিসমূহের ঘটনার উল্লেখ করত নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আপনার বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়োগ করায় আপনার হতাশ মর্মাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনি হকের উপর সঠিক পথ ও পদ্ধতির উপরই রয়েছেন। তা কেনো নতুন বিষয় নয়। চিরদিন এ রূপই হয়ে এসেছে। আপনার পূর্বেও আমি যাদেরকে রাসূল করে বিভিন্ন জাতির নিকট পাঠিয়েছি, তাদের সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সুতরাং আপনাকেও যে আপনার জাতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং আপনার দাওয়াতী কাজে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলবে, তা স্বাভাবিক। তাতে না বিস্ময়ের কিছু আছে আর না হতাশ ও মর্মাহত হওয়ার কোনো কারণ আছে।

'আসহাবুর রাস' কারা? : পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এবং তাদের আল্লাহদ্রোহিতার উল্লেখ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের কয়েকটি স্থানে أَصْحَابُ الرَّسِّ -এর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো স্থানেই তাদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়নি। তাই তাদের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ–

* জালালাইন প্রণেতা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, 'রাস' ছিল একটি কূপের নাম। তারা উক্ত কূপের আশে-পাশে বসবাস করত। তারা ছিল প্রতিমাপূজারী। কথিত আছে যে, তাদের নবী ছিলেন হানযালা ইবনে সাফওয়ান (আ.)।
* কারো কারো মতে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতের লোক ছিল।
* কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা ছিল হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি।
* কেউ কেউ বলেছেন, তারা ছিল উখদূদের অধিবাসী।
* কারো কারো মতে, তারা হলো হযরত সালেহ (আ.)-এর ঐ চার সহস্র অনুসারী যারা আজাব হতে নাজাত পেয়েছিল।

যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরকারের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আজাব নাজিল হয়, তখন তাদের মধ্যে থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আজাব থেকে নিরাপদ থাকে। আজাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরামাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ (আ.)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ (আ.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম حَضْرَمَوْتُ [হাযারা-মাউত অর্থাৎ মৃত্যু হাজির হলো] হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্য মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হেদায়তের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন পয়গাম্বর প্রেরণ করেন। তারা

Free @ www.e-ilmweebly.com

তাকে হত্যা করে। ফলে আজাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই উল্লিখিত হয়েছে- وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ অর্থাৎ তাদের অকেজো কুয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

قَوْلُهُ ثَمُوْدُ : হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত। তাদের কাহিনী কুরআনে বারবার উল্লিখিত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَادٌ : বিশাল বপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হুদ (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানি করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝনঝার আজাবে সব ফানা হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِخْوَانُ لُوْطٍ : হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ : ঘন জঙ্গল ও বনকে اَيْكَة বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শুয়াইব (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবাধ্যতা করে এবং আজাবে পতিত হয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

قوله قوم تبع : ইয়েমেনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তুব্বা। সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এখানে কওমে ফিরআউন না বলে ফিরআউন বললেন কেন? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ অর্থাৎ ইতঃপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে [নবীগণকে] হযরত নূহ (আ.)-এর কওম, আসহাবে রাস, ছামূদ, আদ, ফিরআউন ও লূত (আ.)-এর জাতি।

লক্ষণীয় যে, এখানে অন্যান্যদের ব্যাপারে জাতির নাম নেওয়া হয়েছে; কিন্তু ফিরআউনের শুধু নাম নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ قَوْمُ فِرْعَوْنَ না বলে শুধু فِرْعَوْنَ বলা হয়েছে। এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা-

১. অন্যান্য যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা নিজেরা দোষী ছিলেন না। যেমন হযরত নূহ (আ.), হযরত লূত (আ.), হযরত তুব্বা (আ.) ; বরং অপরাধী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ছিল তাদের জাতি। অথচ ফিরআউন নিজেই ছিল অপরাধী। এ জন্যই قَوْمُ نُوْحٍ বলা হয়েছে; কিন্তু قَوْمُ فِرْعَوْنَ বলা হয়নি।

২. যদিও হযরত মূসা (আ.)-কে ফিরআউন ও তার জাতি তথা কিবতীরা উভয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তথাপি এ ব্যাপারে ফিরআউনের ভূমিকাই ছিল মুখ্য এবং তাদের উপর ফিরআউনের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ, এ জন্যই শুধু فِرْعَوْنَ বলা হয়েছে ; قَوْمُ فِرْعَوْنَ বলা হয়নি।

৩. মিশরে বনূ ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে যে কিবতীরা ফিরআউনকে সহযোগিতা করেছিল ফিরআউন মূলত সে কিবতীদের বংশীয় লোক ছিল না।

قَوْلُهُ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ .... مِنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ : আল্লাহ তা'আলা এখানে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার দলিল পেশ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- 'আমি কি প্রথমবার এদেরকে সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়েছিলাম? অর্থাৎ না, আমি তো প্রথমবার তাদেরকে সৃষ্টি করতে অপারগ হইনি। সুতরাং এটাই তো প্রমাণ করে যে, পুনরায় আমি তাদেরকে জীবিত করতে অসমর্থ হব না। কেননা যে কোনো বস্তুকে প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হতে কঠিন। সুতরাং প্রথমবার সৃষ্টিকারী তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন।

বস্তুত পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীরা অনর্থকই সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। নতুন করে সৃষ্টি তথা পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ও সংশয়ের ঘোর কাটছে না। আর এ সংশয়ই তাদেরকে কুফরির দিকে তাড়িত করছে।

"وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ" ও "وَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ الخ" আয়াতদ্বয়ের মধ্যকার পার্থক্য : প্রথমোক্ত আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে- وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ আর আমি জমিনে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্যময় উদ্ভিদ গজিয়েছি।

শেষোক্ত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ অর্থাৎ আর পানি দ্বারা আমি জমিনের কর্তনযোগ্য [পরিপক্ক] শস্যদানা গজিয়েছি।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়কে বাহ্যত এক ও অভিন্ন মনে হয়। দ্বিতীয়টিকে যেন প্রথমটির পুনরাবৃত্তি বলেই মনে হয়। তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে- প্রথম আয়াতটিতে উদ্ভিদকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে উদ্ভিদকে রিজিকের পরিবেশক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী- حَبَّ الْحَصِيْدِ -এর মধ্যে তো اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ আবশ্যক হয়ে পড়ে, এর সমাধান কি? : আল্লাহর বাণী- "حَبَّ الْحَصِيْدِ" -এর মধ্যে اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ ওয়াজিব হয়ে পড়ে; এ জন্য-

* اَلْحَصِيْدُ -এর পূর্বে اَلزَّرْعُ শব্দকে উহ্য ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ اَلْحَصِيْدُ উহ্য اَلزَّرْعُ -এর সিফাত হয়েছে। مَوْصُوْفٌ -কে বিলোপ করে সিফাতকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

* অথবা, اَلْحَصِيْدُ অর্থাৎ কর্তনযোগ্য ফসল। এমতাবস্থায় উভয়ের অর্থের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে। সুতরাং اِضَافَةُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ সাব্যস্ত হবে না। যেমন- حَقُّ الْيَقِيْنِ ـ حَبْلُ الْوَرِيْدِ ও دَارُ الْاٰخِرَةِ ইত্যাদি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٦. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ حَالٌ بِتَقْدِيْرِ نَحْنُ مَا مَصْدَرِيَّةٌ تُوَسْوِسُ تُحَدِّثُ بِهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ اَوْ لِلتَّعْدِيَةِ وَالضَّمِيْرُ لِلْاِنْسَانِ نَفْسُهُ ج وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ بِالْعِلْمِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ . اَلْاِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَالْوَرِيْدَانِ عِرْقَانِ لِصَفْحَتَى الْعُنُقِ ..

১৬. আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে এবং আমি জানি একটি উহ্য نَحْنُ সহ এটা (نَعْلَمُ) حَالٌ হয়েছে। যা কিছু مَا শব্দটি مَصْدَرِيَّةٌ কুমন্ত্রণা দেয় যে কুপ্ররোচনা প্রদান করে بِهِ -এর بَاءٌ অতিরিক্ত অথবা তা (فِعْلٌ -কে) مُتَعَدِّىْ করার জন্য হয়েছে। আর যমীরটি اَلْاِنْسَانُ -এর দিকে ফিরেছে। তার নাফস প্রবৃত্তি এবং আমি তার অধিকতর নিকটবর্তী জানার দিক দিয়ে ঘাড়ের রগ হতে (حَبْلُ الْوَرِيْدِ) -এর মধ্যে ইযাফত بَيَانٌ -এর জন্য হয়েছে। গ্রীবাস্থিত দু'টি প্রধান রগকে وَرِيْدَانِ বলে।

١٧. اِذْ نَاصِبَهُ اُذْكُرْ مُقَدَّرًا يَتَلَقَّى يَأْخُذُ وَيُثْبِتُ الْمُتَلَقِّيَانِ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِالْاِنْسَانِ مَا يَعْمَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ مِنْهُ قَعِيْدٌ . اَىْ قَاعِدَانِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا قَبْلَهُ .

১৭. যখন একটি উহ্য اُذْكُرْ ক্রিয়া এটাকে নসব দানকারী লিপিবদ্ধ করে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে দু'জন সংগ্রহকারী-লিপিবদ্ধকারী মানুষের জন্য নিযুক্ত দুজন ফেরেশতা সে যা করে তার ডানে ও বামে উপবিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ, قَاعِدَانِ] قَعِيْدٌ একবচন, তবে দ্বিবচনের অর্থে হয়েছে। আর] قَعِيْدٌ শব্দটি مُبْتَدَأٌ এটার খবর তার পূর্বে রয়েছে।

١٨. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ حَافِظٌ عَتِيْدٌ . حَاضِرٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى الْمُثَنَّى .

১৮. সে যে কোনো কথাই বলে তার নিকটে রয়েছে প্রহরী হেফাজতকারী উপস্থিত হাজির قَعِيْدٌ ও عَتِيْدٌ উভয় শব্দ দ্বিবচনের অর্থে হয়েছে।

١٩. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ غَمْرَتُهُ وَشِدَّتُهُ بِالْحَقِّ ط مِنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ حَتّٰى يَرَاهُ الْمُنْكِرُ لَهَا عِيَانًا وَهُوَ نَفْسُ الشِّدَّةِ ذٰلِكَ اَىِ الْمَوْتُ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ . تَهْرُبُ وَتَفْزَعُ .

১৯. আর আসবে মৃত্যুযন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কষ্ট সত্য নিয়ে আখিরাতের বিষয়াদি এমনকি এটাকে অস্বীকারকারী স্বচক্ষে তা দেখে নিবে। আর তা হলো স্বয়ং কঠোরতা তা অর্থাৎ মৃত্যু যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে তুমি পলায়ন করতে ও ভয় করতে।

٢٠. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ط لِلْبَعْثِ ذٰلِكَ اَىْ يَوْمُ النَّفْخِ يَوْمُ الْوَعِيْدِ . لِلْكُفَّارِ بِالْعَذَابِ .

২০. আর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে পুনরুত্থানের জন্য তা অর্থাৎ শিঙ্গার ফুঁৎকারের দিন প্রতিশ্রুতির দিবস কাফেরদের জন্য আজাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এ দিনে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২১. وَجَاءَتْ فِيهِ كُلُّ نَفْسٍ اِلَى الْمَحْشَرِ مَعَهَا سَائِقٌ مَلَكٌ يَسُوقُهَا اِلَيْهِ وَشَهِيدٌ - يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا وَهُوَ الْاَيْدِىْ وَالْاَرْجُلُ وَغَيْرُهَا وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ -

২১. আর উপস্থিত হবে এ দিনে প্রত্যেক ব্যক্তি হাশরের ময়দানের দিকে তার সাথে থাকবে একজন পরিচালক একজন ফেরেশতা, যে তাকে তাড়িয়ে হাশরের দিকে নিয়ে যাবে এবং একজন স্বাক্ষী –যে তার কার্যাবলি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তা হলো তার হাত, পা ইত্যাদি।

২২. لَقَدْ كُنْتَ فِى الدُّنْيَا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا النَّازِلُ بِكَ الْيَوْمَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ اَزَلْنَا غَفْلَتَكَ بِمَا تُشَاهِدُهُ الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ حَادٌّ تُدْرِكُ بِهِ مَا اَنْكَرْتَهُ فِى الدُّنْيَا -

২২. আর কাফেরদেরকে বলা হবে অবশ্যই ছিলে তুমি পৃথিবীতে উদাসীনতায় লিপ্ত তা হতে [যে অবস্থা] যা তোমার উপর আজ আপতিত হয়েছে। সুতরাং আমি তোমার হতে তোমার পর্দাকে উন্মোচন করে দিলাম। আমি তোমার উদাসীনতাকে দূর করে দিয়েছি যা তুমি আজ চাক্ষুষ দেখলে তার মাধ্যমে। সুতরাং তোমার দৃষ্টি আজ খুবই তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তার দ্বারা তুমি উপলব্ধি করছ, যা তুমি দুনিয়ায় অস্বীকার করেছিলে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَعْلَمُ : আল্লাহর বাণী– وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ -এর মধ্যে نَعْلَمُ - حَالٌ হয়েছে। কাজেই তা مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। مُضَارِعْ مُثْبَتْ যদি حَالٌ হয়, তা হতে ضَمِيْرٌ -ই যথেষ্ট হয়ে থাকে وَاوْ -এর প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যদি وَاوْ -এর সাথে হয়, তাহলে তাকে جُمْلَه اِسْمِيَّة বানাতে হয়। আর এ জন্যই মুফাসসির [জালালাইন গ্রন্থকার (র.)] এখানে نَعْلَمُ -এর পূর্বে نَحْنُ উহ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। –[কামালাইন]

قَوْلُهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ : আল্লাহর বাণী– مَا تُوَسْوِسُ -এর মধ্যে مَا -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. উক্ত مَا . مَصْدَرْ -এর অর্থে হবে।

২. উক্ত مَا টি مَوْصُوْل -এর অর্থে হবে।

আল্লাহর বাণী– مَا تُوَسْوِسُ بِهِ -এর মধ্যে "ب" কয়েকটি অর্থে হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যথা–

১. উক্ত "ب" অতিরিক্ত হবে। অর্থাৎ এখানে এর বিশেষ কোনো অর্থ নেই। শুধু বাক্যের শোভাবর্ধনের জন্য নেওয়া হয়েছে।

২. অথবা, تَعْدِيَه -এর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ فِعل -কে مُتَعَدِّىْ করার জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ قَعِيْدٌ : মূলত ছিল– "عَنِ الْيَمِيْنِ قَعِيْدٌ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ" প্রথম قَعِيْد -কে বিলোপ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় قَعِيْدٌ শব্দটি قَاعِدٌ -এর অর্থে হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে قَعِيْدٌ শব্দটি مُقَاعِد -এর অর্থে হয়েছে। যেমন, جَلِيْسٌ শব্দটি مُجَالِسٌ -এর অর্থে হয়ে থাকে।

জাওহারী, আখফাশ ও ফাররা (র.) প্রমুখ নাহুবিদগণ বলেছেন– فَعِيْلٌ ও فَعُوْلٌ -এর ওজনে قَعِيْدٌ ও قَعُوْدٌ [এবং অন্যান্য শব্দাবলি] সমভাবে এক-দ্বি ও বহুবচনের জন্য হয়ে থাকে।

জালালাইনের গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, এখানে قَعِيْدٌ শব্দটি قَاعِدَانِ -এর অর্থে হয়েছে।

আর قَعِيْد এমন উপবেশনকারী [সঙ্গী]-কে বলে যে সর্বদা সঙ্গে থাকে– কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং কিরামুন-কাতিবুন ফেরেশতাগণও সর্বদা মানুষের সাথে থাকে। তবে স্ত্রীসহবাস [যৌন মিলন], প্রস্রাব-পায়খানার ও জানাবতের অবস্থায় যদিও দূরে সরে যায় তথাপি আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে যে, মানুষ কি করছে।

قَعِيْد-এর মহল্লে ই'রাব : অত্র আয়াতে قَعِيْد শব্দটি مُبْتَدَأ مُؤَخَّر হওয়ার কারণ مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ এটার খবরে মুকাদ্দাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ ...... حَبْلِ الْوَرِيْدِ : ইতঃপূর্বে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছিল। এখন হতে পুনরুত্থান কিভাবে সংঘটিত হবে তার সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে। আর যেহেতু প্রতিদান ও প্রতিফল প্রদানকারীর ইলম ও কুদরতের উপর নির্ভরশীল সেহেতু প্রথম হতে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে–

মানুষকে আমি আল্লাহই সৃষ্টি করেছি। আর তার অন্তরে কি প্ররোচনার সৃষ্টি হয়, তার অন্তরের অন্তঃস্থলে কি সব জল্পনা-কল্পনা চলে তা আমি ভালভাবেই অবগত রয়েছি। আমি তার গ্রীবার শাহরগ হতেও অধিকতর নিকটে অবস্থান করি। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতিটি কাজ ও কথা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এমনকি তার অন্তরের গভীরে যেই কুমন্ত্রণা ও কল্পনার বুদবুদ ভেসে উঠে তাও তাঁর গোচরীভূত রয়েছে। মানুষ তার নিজের সম্পর্কে যা জানে তারও অধিক জানা রয়েছে আল্লাহ তা'আলার।

وَرِيْد-এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ" আর আমি তার শাহরগ গ্রীবার শিরা হতেও অধিকতর নিকটবর্তী।

وَرِيْد অর্থ– প্রত্যেক প্রাণীর এমন শিরা যার মাধ্যমে গোটা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। তা কেটে দিলে প্রাণী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। একে দু' ভাগে ভাগ করা যায়।

১. তা কলিজা হতে উদ্ভূত হয়ে সারা শরীরে খাঁটি রক্ত পৌঁছিয়ে দেয়। তাকেই মূলত وَرِيْد বলে।

২. তা হৃদপিণ্ড হতে উদগত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম কণা সারা দেহে বিস্তৃত করে দেয়। এ প্রকার সূক্ষ্ম কণাকে রূহ বলে। প্রথম প্রকারের শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকারের শিরা সরু হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত وَرِيْد-এর দ্বারা উভয় প্রকারের শিরাকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা উভয় প্রকারের শিরা দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রক্ত সঞ্চালিত হয়ে থাকে। উল্লিখিত দু'টি অর্থের যে কোনো একটিই গ্রহণ করা হোক না কেন সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন তার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা মানুষের সবকিছু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

قَوْلُهُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ : আল্লাহর বাণী وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ-এর মধ্যে قَرَابَتْ-এর দ্বারা কোন ধরনের قَرَابَتْ [সংলগ্নতা]-কে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, এর দ্বারা قَرَابَةً بِالْعِلْمِ অর্থাৎ জ্ঞানগত নৈকট্যকে বুঝানো হয়েছে; স্থানগত নৈকট্যকে বুঝানো হয়নি।

* সুফিয়ায়ে কেরাম (র.)-এর মতে, এখানে জ্ঞানগত নৈকট্যের সাথে স্থানগত এক বিশেষ নৈকট্যকেও বুঝানো হয়েছে। যার অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও সঠিক অবস্থা আমাদের জানা নেই। যেমন কুরআন মাজীদের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

১. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ সিজদা কর এবং আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও।

২. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

সহীহ হাদীসে আছে–

১. মানুষ সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়।

২. হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য [সান্নিধ্য] লাভ করে।

* উপরিউক্ত দুই মতের মাঝামাঝি অবস্থান করে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) তৃতীয় একটি অভিমত পেশ করেছেন। তাঁর মতে আয়াতে বর্ণিত نَحْنُ-এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বুঝানো হয়নি; বরং ফেরেশতাকুলকে বুঝানো হয়েছে ফেরেশতাগণ সর্বদা মানুষের সাথে থাকেন এবং তারা মানুষের নিজের অপেক্ষাও তাদেরকে ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত রয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উপরিউক্ত তিনটি অভিমতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটিই সমধিক গ্রহণযোগ্য। এর দ্বারা আল্লাহ যে, মানুষের ব্যাপারে মানুষের চাইতেও অধিক জ্ঞাত রয়েছেন, তাই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞানের দিক বিচারে মানুষের রূহ ও নফস হতেও তাদের অধিক নিকটবর্তী। মানুষ নিজের সম্পর্কে ততটুকু জানে না, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে জানেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইলম হলো حُضُوْرِىْ পক্ষান্তরে মানুষের ইলেম হলো حُصُوْلِىْ

قَوْلُهُ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ .... رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ : ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। মানুষের সকল কাজকর্ম যদিও আল্লাহ তা'আলার ইলমে সংরক্ষিত রয়েছে তথাপি একটি দপ্তরে আমলের হেফাজতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– 'স্মরণ কর সেই সময়কে যখন মানুষের ডানে ও বামে উপবিষ্ট দু'জন সংরক্ষণকারী ফেরেশতা যাদেরকে মানুষের কার্যাবলি সংরক্ষণ করার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তারা মানুষের কাজ-কর্ম সংগ্রহ করে এবং সংরক্ষণ করে। মানুষ যে কোনো কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য একজন সংরক্ষণকারী-সমুপস্থিত থাকে।'

এক বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণকে قَعِيْدٌ বা উপবিষ্ট বলা তাদের কোনো কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে সহীহ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যখন বসে তখন তারাও বসে। মানুষ চলতে থাকলে একজন ফেরেশতা সম্মুখে এবং অন্যজন পিছনে চলতে থাকে। মানুষ শয়ন করলে একজন মাথার দিকে এবং অন্যজন পায়ের দিকে থাকে। অবশ্য পায়খানা-প্রস্রাব এবং স্ত্রী সহবাসের সময় তারা পৃথক হয়ে দূরে অবস্থান করে। তবে দূরে থেকেও আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ জ্ঞানের দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, 'মানুষ' কি কি করেছে। মানুষ কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করলে তাও তারা লিপিবদ্ধ করে।

ফেরেশতা কি সবকিছু লিখে, নাকি শুধু যাতে ছওয়াব ও শাস্তি রয়েছে তাই লিখে ? : আল্লাহ তা'আলা কতিপয় ফেরেশতাকে মানুষের কাজ-কর্ম রেকর্ড করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তারা কি মানুষের সব কাজ-কর্মই সংরক্ষণ করে, নাকি শুধু যে সকল কাজে ছওয়াব বা আজাব রয়েছে শুধু সেগুলো সংরক্ষণ করে? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরাগণ (র.) হতে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. হযরত হাসান (র.), কাতাদা (র.) ও একদল মুফাসসিরে কেরামের মতে ফেরেশতারা মানুষের প্রত্যেকটি কাজ-কর্মই সংরক্ষণ করে থাকে চাই এর সাথে ছওয়াব বা আজাব জড়িত থাকুক বা না থাকুক। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন– তারা শুধু সে সকল কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তা লিপিবদ্ধ করে যার সাথে ছওয়াব অথবা আজাব জড়িত রয়েছে।

উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) একটি হাদীসের উল্লেখ করত উপরিউক্ত মাযহাবদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। হাদীসখানা হলো, হযরত আলী ইবনে আবী তালহা (র.) বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতাগণ কর্তৃক প্রথমত প্রতিটি কথাই রেকর্ড করা হয়ে থাকে– তাতে কোনো পাপ বা ছওয়াব থাকুক বা না থাকুক; কিন্তু সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রেকর্ডকৃত বিষয়গুলো পুনঃবিবেচনা করা হয়। সুতরাং যা ছওয়াব অথবা আজাবের সাথে জড়িত তা রেকর্ড করত অবশিষ্টগুলো মুছে দেওয়া হয়। কুরআন মাজীদের অপর একটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান মুছে দেন এবং যা চান বলবৎ রাখেন। আর তাঁর নিকটই রয়েছে মূল কিতাব লিপি।

কথাবার্তায় সতর্কতা অবলম্বন জরুরি : ইমাম আহমদ (র.) হযরত বেলাল ইবনে হারিস মুযানী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– মানুষ মাঝে মাঝে কোনো ভালো কথা বলে যাতে আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে যান। অথচ সে সাধারণ মনে করে কথাটি বলে এবং ধারণাও করতে পারে না যে, এর ছওয়াব এত প্রচুর ও ব্যাপক যে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্থায়ী সন্তুষ্টি লিখে দেন। অপর পক্ষে মানুষ সাধারণ মনে করে কোনো মন্দ কথা বলে ফেলে। সে অনুমানও করতে পারে না যে, এর শাস্তি কত মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী, যার দরুন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য স্থায়ী অসন্তুষ্টি লিখে দেন।

হযরত আলকামা (রা.) এ হাদীসখানা উল্লেখ করার পর বলেছেন যে, এ হাদীস আমাকে অনেক কথা মুখে উচ্চারণ করা হতে বিরত রেখেছে। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আলোচ্য আয়াতের আলোকে হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নসিহত : হযরত হাসান বসরী (র.) আল্লাহর বাণী– اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ -এর আলোকে নসিহত করে বলেছেন, হে আদম সন্তান! তোমার জন্য আমলনামা স্থাপন করা হয়েছে এবং দু জন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়েছে। একজন রয়েছে তোমার ডান দিকে এবং অপরজন রয়েছে বাম দিকে। ডান দিকে নিযুক্ত ফেরেশতা তোমার ভালো কাজ লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকে নিযুক্ত ফেরেশতা মন্দ কাজ রেকর্ড করে। সুতরাং এ সত্যকে সামনে রেখে তোমার মনে যা চায় তাই কর; ভালো-মন্দ কম বেশি, যা তোমার ইচ্ছা করে। তোমার মৃত্যুর পর এ আমলনামা বন্ধ করে তোমার গ্রীবায় রেখে দেওয়া হবে। কবরে এটা তোমার সাথেই থাকবে। পুনরুত্থানের দিন যখন তুমি কবর হতে বের হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে, তখন তোমার আমলনামা অনুযায়ীই তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا . اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا .

অর্থাৎ আর আমি প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তার গ্রীবার সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কিয়ামতের দিবস সে একটি আমলনামা তার সামনে খোলা অবস্থায় পাবে। [তাকে বলা হবে-] তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'

হাসান বসরী (র.) বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি বড়ই ন্যায় ও সুবিচার করেছেন যিনি তোমাকেই তোমার কাজ-কর্মের হিসাবকারী নির্ধারণ করেছেন।

ফেরেশতারা কিভাবে মানুষের কাজ-কর্ম রেকর্ড করেন? : অত্র আয়াত এবং অনুরূপ অপরাপর আয়াতসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণ কর্তৃক মানুষের ভালো-মন্দ সকল কাজ-কর্ম রেকর্ড করে থাকেন। বহু হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে এ রেকর্ড করা হয় তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আমাদের সাধারণ জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা তা বুঝে আসে না। সুতরাং এর ব্যাপারে আল্লাহর সেই বক্তব্য যথাযথভাবে বিশ্বাস করাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর অবস্থা নিয়ে ঘাটাঘাটি করা এবং এর খুঁটি-নাটি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য বর্তমান যুগে সচিত্র ঘটনা বা অনুষ্ঠান রেকর্ড ধারণকারী ও চিত্রহীন বক্তব্য রেকর্ড ধারণকারী এমন কিছু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা কল্পনাও করতে পারেননি। শরিয়তের উক্ত বিষয়াবলি বুঝতে এ সকল আধুনিক আবিষ্কার আমাদেরকে যথেষ্ট রূপে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করেছে।

মোটকথা, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যতটুকু জানিয়ে দিয়েছেন ততটুকু বিশ্বাস করতে হবে। এর অবস্থা ও ধরন জানার কোনো প্রয়োজন নেই। তা শুধু আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ...... مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ : ইতঃপূর্বে মানুষের আমল রেকর্ড করার কথা বলা হয়েছে। এরপর মূল উদ্দেশ্য কিয়ামতের আলোচনা শুরু হয়েছে। সুতরাং সর্বপ্রথম কিয়ামতের ভূমিকা তথা মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, মানুষ মৃত্যুকে ভুলে বসে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিয়ামতকে অস্বীকার করে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– আর মৃত্যুযাতনা সত্যসহ আসবে। তখন আখিরাতের বহু বিষয় যা তোমরা অস্বীকার করতে তা তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে পড়বে। আর তা হবে সে মৃত্যু যা হতে তোমরা পলায়ন করতে, যাকে তোমরা ভয় করতে।

মৃত্যু যন্ত্রণা এসে পৌঁছলে সমস্ত সত্য মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে চাক্ষুষ ধরা দিবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ যেসব সংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন, তার সত্যতা সে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। ফাসিকরা তো দুনিয়ার মহব্বতের দরুন মৃত্যুকে ভয় করে থাকে। আর মুত্তাকীগণ স্বভাবগত কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য কখনো যদি এ স্বভাবজাত ভয়ের উপর শওক ও জযবাহ প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে ভিন্ন কথা।

মোটকথা, মানুষ মৃত্যুকে পরিহার করে চলার শত চেষ্টা করেছে, তা হতে পলায়নের জন্য প্রচেষ্টার ত্রুটি করেনি; কিন্তু তথাপি বিধাতার অমোঘ বিধান অনুযায়ী তা এসেই পড়েছে।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ আয়াতাংশে بِالْحَقِّ -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ অর্থাৎ আর মৃত্যু যাতনা সত্যসহ উপস্থিতি হবে। উক্ত আয়াতে اَلْحَقُّ -এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ (র.) হতে একাধিক قَوْل [অভিমত] পাওয়া যায়। যথা–

১. কেউ কেউ বলেছেন– اَلْحَقُّ -এর দ্বারা اَمْرُ الْاٰخِرَةِ তথা আখিরাতের বিষয়, যা দুনিয়ায় থাকাকালীন নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে বলেছেন। সে সময় মানুষ চাক্ষুষ তা দেখতে পাবে।

২. اَلْحَقُّ -এর দ্বারা কারো কারো মতে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুযাতনা পরিশেষে মৃত্যুকে নিয়ে উপস্থিত হবে এমতাবস্থায় ب - تَعْدِيَة এর জন্য হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. কেউ কেউ বলেছেন, اَلْحَقُّ -এর দ্বারা দীনে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, 'সাকরাতুল মাওত' তথা মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর মানুষ দীনে ইসলামকে কবুল করবে। কিন্তু তখন তা কোনো কাজে আসবে না।

৪. কেউ কেউ বলেছেন– এখানে اَلْحَقُّ -এর দ্বারা আমলের প্রতিদানকে বুঝানো হয়েছে।

৫. কারো কারো মতে, اَلْحَقُّ -এর দ্বারা حَقِيْقَةُ الْاَمْرِ তথা প্রকৃত অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ .... سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ : ইতঃপূর্বে মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– আর পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। সেদিন কাফেরদেরকে দেওয়া আজাবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে আর সাথে একজন পরিচালক থাকবে যে তাকে পরিচালনা করে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে। আর একজন সাক্ষী থাকবে, যে তার আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় سَائِقٌ [পরিচালক] ও شَهِيْدٌ [সাক্ষী]-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. জালালাইন গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, سَائِقٌ -এর দ্বারা ঐ ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যে মানুষকে পরিচালিত করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাবে। আর شَهِيْدٌ -এর দ্বারা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বুঝানো হয়েছে, সেগুলো হাশরের ময়দানে মানুষের আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে।
   এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত। আল্লামা ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও যাহহাক (র.) হতে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন– سَائِقٌ ও شَهِيْدٌ -এর দ্বারা আমলের লেখক ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু سَائِقٌ ও شَهِيْدٌ দ্বারা নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে বুঝানো হয়নি; বরং যার পুণ্য বেশি তার সাক্ষী হবে পুণ্যের লেখক এবং পরিচালক হবে পাপের লেখক। পক্ষান্তরে যার পাপ বেশি হবে তার সাক্ষী হবে পাপের লেখক এবং তার পরিচালক হবে পুণ্যের লেখক।

قَوْلُهُ لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا .... حَدِيْدٌ : কিয়ামতের দিবসে মানুষকে লক্ষ্য করে যা বলা হবে তা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– আজ তুমি যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছ দুনিয়ায় তো তুমি এ ব্যাপারে উদাসীন ও অসতর্ক ছিলে। তুমি অদ্য স্বচক্ষে যা দেখলে এ অবস্থা অবলোকন করলে তা দ্বারা আমি তোমার উদাসীনতার পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছি। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ও তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়েছে। দুনিয়ায় তুমি অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে যা উড়িয়ে দিয়েছিলে বা অস্বীকার করেছিলে তা আজ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ এবং হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছ।

দুনিয়ার আনন্দে পড়ে তো আজকের দিনকে ভুলে বসেছিলে। তোমার চোখের সামনে ছিল কু-প্রবৃত্তির চাকচিক্যের হাতছানি। পয়গাম্বর (আ.) যা বুঝাচ্ছেন তা বুঝতে না বুঝার চেষ্টাও করতে না। তোমার চোখের সামনে অন্ধকারের যে কালো ছায়া-পর্দা পড়েছিল তা সরে গিয়ে তোমার দৃষ্টিকে অত্যন্ত তেজোদীপ্ত ও প্রখর করে দেওয়া হয়েছে। আজ দেখে নাও যে, নবী-রাসূলগণ (আ.) যা বলতেন– বুঝাতেন, তা সত্য ছিল কিনা?

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ الخ আয়াতে مُخَاطَبْ কে? : অত্র আয়াত لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ -এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে– এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ–

১. জালালাইন গ্রন্থকার (র.) বলেছেন– অত্র আয়াতে কাফেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা কাফের দুনিয়াতে আখিরাতকে অস্বীকার করত। এটাই জমহুর মুফাস্‌সিরগণের অভিমত।

২. যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন যে, এখানে لَقَدْ كُنْتَ الخ -এর দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ প্রথমে কুরআনে কারীম হতে উদাসীন বে-খবর ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা তাঁকে অবহিত করেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশভঙ্গি (سِيَاقٌ) এ মতের পরিপন্থি।

৩. আল্লামা ইবনে জারীর ও ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন– অত্র আয়াতে ঈমানদার-কাফের, ফাসিক-মুত্তাকী নির্বিশেষে সকলকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটির মর্মার্থ হচ্ছে– দুনিয়ায় সকল মানুষের অবস্থা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখার মতো। আর আখেরাতে জেগে থাকার মতো। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষু বন্ধ হয়ে থাকে এবং কিছুই দেখতে পায় না, তদ্রূপ আখিরাতের বিষয়াবলিও দুনিয়ায় থেকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু দুনিয়ার জাগতিক চক্ষু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই প্রকৃত জাগরণ শুরু হয়ে যায়। তখন আখিরাতের সমস্ত বিষয় সামনে এসে পড়ে। এ জন্যই কেউ কউ মন্তব্য করেছেন– اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا অর্থাৎ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, মৃত্যুর পরই মূলত সে জেগে উঠবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٣. وَقَالَ قَرِيْنُهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ هٰذَا مَا اَيِ الَّذِيْ لَدَيَّ عَتِيْدٌ حَاضِرٌ .

২৩. আর তার সাক্ষী বলবে তার সাথে নিযুক্ত ফেরেশতা এটা যা অর্থাৎ যা [এখানে مَا শব্দটি اَلَّذِيْ -এর অর্থে হয়েছে।] আমার নিকট উপস্থিত হাজির।

٢٤. فَيُقَالُ لِمَالِكٍ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ اَيْ اَلْقِ اَلْقِ اَوِ اَلْقِيَنْ وَبِهِ قَرَأَ الْحَسَنُ فَاُبْدِلَتِ النُّوْنُ اَلِفًا كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ . مُعَانِدٌ لِلْحَقِّ .

২৪. অতঃপর মালিক [দোজখের দারোগা]-কে বলা হবে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর اَلْقِيَا শব্দটি اَلْقِ - اَلْقِ -এর অর্থে হয়েছে। অথবা, তা اَلْقِيَنْ -এর অর্থে হয়েছে। হযরত হাসান (র.) اَلْقِيَا -এর পরিবর্তে اَلْقِيَنْ পড়েছেন। অতঃপর ن -কে اَلِفْ -এর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রত্যেক ঔদ্ধত কাফেরকে সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী।

٢٥. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ كَالزَّكٰوةِ مُعْتَدٍ ظَالِمٍ مُّرِيْبٍ . شَاكٍّ فِيْ دِيْنِهِ .

২৫. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ভালোকার্যে যেমন জাকাত সীমালঙ্ঘনকারী অত্যাচারী সন্দেহকারী স্বীয় দীনের ব্যাপারে সন্দিহান।

٢٦. الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ مُبْتَدَأٌ ضُمِّنَ مَعْنَى الشَّرْطِ خَبَرُهُ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ . تَفْسِيْرُهُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ .

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ সাব্যস্ত করেছিল। এটা মুবতাদা। এটার মধ্যে শর্তের অর্থ নিহিত রয়েছে। এর খবর হলো– সুতরাং তাকে কঠোর আজাবে নিক্ষেপ কর– এটার ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার মতো।

٢٧. قَالَ قَرِيْنُهُ الشَّيْطَانُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ اَضْلَلْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ . فَدَعَوْتُهُ فَاسْتَجَابَ لِيْ وَقَالَ هُوَ اَطْغَانِيْ بِدُعَائِهِ لِيْ .

২৭. তার সাথী বলবে [অর্থাৎ] শয়তান বলবে– হে আমার প্রভু! আমি তো তাকে গোমরাহ করিনি বিপথগামী করিনি তাকে বরং নিজেই সে সুদূর গোমরাহীর মধ্যে পড়েছিল ফলে আমি তো শুধু তাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। আর সে আমার ডাকে সাড়া প্রদান করেছে। আর কাফের বলবে শয়তান তার আহ্বানের মাধ্যমে আমাকে বিপথগামী করেছে।

٢٨. قَالَ تَعَالٰى لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ اَيْ مَا يَنْفَعُ الْخِصَامُ هُنَا وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْوَعِيْدِ . بِالْعَذَابِ فِي الْاٰخِرَةِ لَوْ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلَابُدَّ مِنْهُ .

২৮. আল্লাহ তা'আলা বলবেন আমার সম্মুখে তোমরা ঝগড়া করো না অর্থাৎ এখানে ঝগড়া-বিবাদ করলে কোনো ফায়দা হবে না। আমি তো পূর্বেই পেশ করেছিলাম তোমাদের নিকট পৃথিবীতে সতর্কবাণী আখিরাতের আজাব সম্পর্কে যদি তোমরা ঈমান গ্রহণ না কর তাহলে তা তোমাদের জন্য অনিবার্য হবে।

٢٩. مَا يُبَدَّلُ يُغَيَّرُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فِيْ ذٰلِكَ وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ فَاُعَذِّبُهُمْ بِغَيْرِ جُرْمٍ وَظَلَّامٌ بِمَعْنٰى ذِيْ ظُلْمٍ لِقَوْلِهِ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ وَلَا مَفْهُوْمَ لَهُ .

২৯. কোনোরূপ রদ-বদল করা হয় না পরিবর্তন করা হয় না কথা আমার নিকট উক্ত ব্যাপারে আর আমি বান্দাদের উপর বিন্দুমাত্র অবিচারকারী নই যে, বিনা অপরাধে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করব। ظَلَّامٌ শব্দটি এখানে ذِيْ ظُلْمٍ [অবিচারকারী] -এর অর্থে হয়েছে। কেননা অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে। "لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ" [আজ কোনোরূপ অবিচার হবে না] এখানে মোবালাগা (مُبَالَغَة) -এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ : আল্লাহর বাণী– هٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيْدٌ -এর কয়েক প্রকারের তারকীব হতে পারে। যথা–

১. هٰذَا মুবতাদা مَا নাকেরায়ে মাওসূফাহ عَتِيْدٌ হলো এর সিফাত। لَدَىَّ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহে মিলে عَتِيْدٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। عَتِيْدٌ তার مُتَعَلِّقٌ ও মওসূফের সাথে মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

২. مَا নাকেরায়ে মাওসূফাহ, لَدَىَّ হলো এর প্রথম সিফাত এবং عَتِيْدٌ হলো এর দ্বিতীয় সিফাত। আর مَا -এর সিফাতদ্বয়ের সাথে যুক্ত হয়ে খবর হলো هٰذَا মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিল جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

৩. هٰذَا মুবতাদা, مَا ইসমে মওসূল, لَدَىَّ সেলাহ, مَوْصُوْلْ ও صِلَهْ মিলে মুবতাদা, عَتِيْدٌ হলো এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়ে পুনরায় هٰذَا -এর খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

৪. هٰذَا হলো مُبْدَلْ مِنْهُ আর مَا হলো بَدْل ; بَدْل ও مُبْدَلْ مِنْهُ মিলে মুবতাদা عَتِيْدٌ শব্দটি لَدَىَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

৫. هٰذَا মুবতাদা, مَا لَدَىَّ -এর খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে। عَتِيْدٌ উহ্য মুবতাদা هُوَ -এর খবর হয়েছে। অর্থাৎ هُوَ মুবতাদা ও عَتِيْدٌ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

৬. هٰذَا মুবতাদা مَا لَدَىَّ প্রথম খবর এবং عَتِيْدٌ দ্বিতীয় খবর , মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

৭. هٰذَا মুবতাদা, مَا لَدَىَّ হলো مُبْدَلْ مِنْهُ এবং عَتِيْدٌ বদল। بَدْل ও مُبْدَلْ مِنْهُ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَهْ اِسْمِيَّهْ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْقِيَا : আল্লাহর বাণী– اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ -এর মধ্যস্থিত اَلْقِيَا শব্দটিকে মুফাস্‌সিরগণ (র.) বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ [তাহকীক] করেছেন।

১. اَلْقِيَا শব্দটি মূলত ছিল اَلْقِ اَلْقِ দ্বিতীয় فِعْل -কে বিলোপ করত। এর فَاعِلْ তথা ضَمِيْر -কে فِعْل -এর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম فِعْل -কে দ্বিবচন আনা হয়েছে। ফলে اَلْقِيَا হয়ে গেছে। এতে اَلْقِيَا ফে'লটির ضَمِيْر তথা فَاعِلْ টি দ্বিবচন হয়েছে।

২. অথবা, তা মূলে اَلْقِيَنْ ছিল। নূন অক্ষরকে اَلِفْ -এর দ্বারা পরিবর্তন করায় اَلْقِيَا হয়ে গিয়েছে। -[জালালাইন]

৩. অথবা, মূলতই তা দ্বিবচনের সীগাহ। এখানে প্রকৃতপক্ষে سَائِقٌ ও شَهِيْدٌ ফেরেশতাদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ الَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ : আল্লাহর বাণী– اَلَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ -এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ (র.)-এর বিভিন্ন قَوْل রয়েছে। যথা–

১. উক্ত আয়াতাংশটুকু মুবতাদা হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে, আর فَاَلْقِيَاهُ الخ এর খবর হয়েছে।

২. অথবা, তা كُلّ হতে بَدْل হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

৩. অথবা, كَفَّار হতে بَدْل হওয়ার দরুন مَحَلًّا مَجْرُوْرٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ : আল্লাহর বাণী– وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ -এর মধ্যে ظَلَّامٌ শব্দটি মূলত مُبَالَغَهْ -এর সীগাহ। এর মূল অর্থ হলো অত্যধিক জুলুমকারী, অত্যধিক জালিম। কিন্তু এখানে مُبَالَغَهْ -এর অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা এখানে ذِىْ ظُلْمٍ [জুলুমওয়ালা, জালিম]-এর অর্থে হয়েছে। যেমন– لَبَّانٌ শব্দটি ذُوْ لَبَنٍ -এর অর্থে হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতখানার অর্থ হবে আমি বান্দাদের উপর [মোটেই] জুলুমকারী নই।

অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে مُبَالَغَهْ فِى النَّفْىِ জুলুম না করার ব্যাপারে আতিশয্য বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিন্দুমাত্রও অবিচারী নন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيْدٌ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– মানুষের সঙ্গী কিয়ামতের দিন বলবে, হে প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়ায় যার সঙ্গী হিসাবে নিয়োজিত করা হয়েছিল এই সে ব্যক্তি, অদ্য আপনার দরবারে উপস্থিত, আপনি তার ফয়সালা করুন!

Free @ www.eilm.weebly.com

এখানে সঙ্গী দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? : আলোচ্য আয়াত وَقَالَ قَرِيْنُهُ الخ -এর মধ্যে قَرِيْن তথা সঙ্গী দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে– ঐ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম বগভী (র.) ও কতিপয় মুফাস্সিরে কেরামের (র.) মতে এখানে قَرِيْن দ্বারা এ সঙ্গী ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যে পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ধ্বনি হওয়ার পর মানুষকে তাড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিয়ে যাবে এবং আমলনামার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। জালালাইনের মুসান্নিফ আল্লামা মহল্লী (র.)-ও এ মতকে সমর্থন করেছেন।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.) ও কতিপয় মুফাস্সিরের মতে অত্র আয়াতে قَرِيْن দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াত قَالَ قَرِيْنُهُ مَا اَطْغَيْتُهُ -এর দ্বারাও এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং সে বলবে, অপরাধী উপস্থিত হয়েছে– যাকে আমি বিভ্রান্ত করে দোজখের জন্য প্রস্তুত করে নিয়ে আসছি। আমি তো তাকে শুধুমাত্র আহ্বান জানিয়েছিলাম; কিন্তু গোমরাহ তো সে নিজেই হয়েছে। স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সে বিপথগামী হয়েছে এবং কুফরিকে গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামী কাফেরদের কতিপয় অপকর্মের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– এ জাহান্নামী কাফেররা দুনিয়ায় সৎকার্যে বাধা দান করত, সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করত এবং দীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করত।

مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ অর্থ– خَيْر -এর পথে বাধাদানকারী। এখানে মুফাসসিরগণ (র.) خَيْر -এর দু'টি তাফসীর উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. خَيْر -এর অর্থ– ধন-সম্পদ। এ অর্থের বিবেচনায় আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে– সে না নিজে ধান-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করত, না অন্যদেরকে দান করতে দিত। সে নিজেও জাকাত প্রদান করত না এবং অন্যদেরকেও জাকাত আদায়ে বাধা দান করত।

২. خَيْر -এর অপর অর্থ হলো 'কল্যাণ'– যাতে ঈমানও শামিল রয়েছে। এর আলোকে আয়াতখানার তাৎপর্য হচ্ছে– সে নিজেও ঈমান আনয়ন করেনি, অপরাপর কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করেনি এবং অন্যদেরকে ঈমান আনয়নে ও কল্যাণকর কার্যাদি পালনে বাধা প্রদান করেছে। সে ভালো কাজের কোনো উদ্যোগকেই সহ্য করত না।

কেউ কেউ বলেছেন– مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ কথাটি অলীদ ইবনে মুগীরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা সে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেনি; উপরন্তু তার গোত্রের লোকদেরকেও ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করেছে।

مُعْتَدٍ অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী। مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ -এর উপরিউক্ত অর্থদ্বয়ের আলোকে مُعْتَدٍ শব্দটিরও দ্বিবিধ অর্থ হবে–

১. مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ -এর অর্থ যদি জাকাত ও ধন-সম্পদ প্রদানে অস্বীকারকারী হয়, তাহলে مُعْتَدٍ -এর অর্থ হবে– ওয়াজিব কাজ বর্জনের মাধ্যমে সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ তার ধন-সম্পদের লোভ এতটুকু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, সে সুদ গ্রহণ ও চুরি করার মাধ্যমে হারাম বস্তু গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

২. আর مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ অর্থ যদি ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, তাহলে مُعْتَدٍ -এর অর্থ হবে– সে যে শুধু ঈমান গ্রহণে অস্বীকার করেছে তাই নয়; বরং তার ঔদ্ধত্য এতটুকু সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে, যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের উপর নির্যাতনের স্টীম-রোলার চালিয়েছে– ঈমানদারগণকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করে ছেড়েছে– মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে উঠে পড়ে লেগেছে।

مُرِيْب অর্থ– সংশয়কারী। এখানে এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা– ১. সংশয়কারী এবং ২. অন্যের অন্তরে সংশয় সৃষ্টিকারী। দীনের ব্যাপারে একদিকে তারা নিজেরা ছিল সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত, অপরদিকে তারা অন্যদের অন্তরেও সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টির অপপ্রয়াস পেত। তাদের নিকট আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, রিসালত, ওহী তথা দীনের সব বিষয়াদিই ছিল সংশয়পূর্ণ। নবী-রাসূলগণ যা বলতেন কিছুই তাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হতো না। তাদের আশ-পাশে পরিচিতজন যারা ছিল তাদের সকলের মধ্যেই এসব ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টির জন্য তারা চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করত না। সর্বদা তাদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপনের চেষ্টা চালিয়ে যেত।

তদুপরি পূর্বোক্ত আয়াতে كَفَّارٍ عَنِيْدٍ বলে বিশেষত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তার ধারণার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর এখানে নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথী-সঙ্গীগণের উপর তারা নির্যাতন করেছে, তাঁদেরকে দীন হতে ফিরিয়ে আনার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। পরকাল, কিয়ামত ও হাশর-নশরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে।

যেসব অপরাধ মানুষকে জাহান্নামী করে : কুরআন মাজীদে যে অপরাধসমূহকে জাহান্নামী হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে– তন্মধ্যে নিম্নোক্ত অপরাধগুলো উল্লেখযোগ্য–

১. اَلْكُفْرُ بِالْحَقِّ তথা সত্যকে অস্বীকার করা। সত্যকে গ্রহণ না করা।

২. كُفْرَانُ النِّعْمَةِ وَعَدَمِ الشُّكْرِ بِهَا তথা নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করা, শুকরিয়া আদায় না করা।

৩. وَالْحِقْدُ وَالْعَدُوُّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ তথা ঈমানদারগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণ।

৪. مَنَّاعٌ لِطَرِيْقِ الْخَيْرِ وَالْفَلَاحِ তথা ভালো ও কল্যাণের পথে বাধা দেওয়া।

৫. اَلتَّعَدِّىْ فِى الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ তথা কথা ও কাজে সীমালঙ্ঘন করা।

৬. اَلظُّلْمُ عَلَى النَّاسِ তথা মানুষের উপর জুলুম করা।

৭. اَلشَّكُّ فِىْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ তথা দীনের মূলনীতির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা।

৮. اِيْقَاعُ الشُّبْهَةِ فِىْ قُلُوْبِ النَّاسِ তথা লোকদের অন্তরে [দীনের ব্যাপারে] সংশয় সৃষ্টি করে দেওয়া।

৯. اَلشِّرْكُ فِى الْعِبَادَةِ তথা ইবাদতে শিরক করা।

১০. عَدَمُ تَأْدِيَةِ حُقُوْقِ اللّٰهِ وَحُقُوْقِ الْعِبَادِ তথা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার অধিকার আদায় না করা।

قَوْلُهُ قَالَ قَرِيْنُهُ مَا اَطْغَيْتُهُ ...... ضَلَالٍ بَعِيْدٍ : কিয়ামতের দীন যখন জাহান্নামীকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির করা হবে তখন তার সঙ্গী শয়তান আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করবে– হে আমার রব! আসলে আমি তো তাকে বিপথগামী করিনি; বরং সুদূর গোমরাহীতে সে নিজেই নিমজ্জিত ছিল।

এ বলে শয়তান তার অপরাধকে হালকা করতে চাবে যে, আমি তো তার উপর কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি করিনি। আমি শুধুমাত্র তাকে আহ্বান জানিয়েছিলাম। এ হতভাগা নিজেই গোমরাহ হয়ে নাজাত ও কামিয়াবীর পথ হতে দূরে সরে গিয়েছে। অপরদিকে কাফের লোকটি আরজ করবে যে, হে আল্লাহ! শয়তান আমাকে তার আহ্বানের মাধ্যমে বিপথগামী ও গোমরাহ করেছে।

কারো কারো মতে; এখানে ভাষণের প্রেক্ষিত ও বাচনভঙ্গীই বলে দেয় যে, এখানে قَرِيْن দ্বারা সে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে উক্ত ব্যক্তির সাথে নিয়েজিত থাকত। আল্লাহর আদালতে উক্ত ব্যক্তি যে, শয়তানের সাথে তর্ক-বচসায় লিপ্ত হয়েছে তাও স্পষ্ট। লোকটির আরজি হলো, এ শয়তান আমার পিছনে লেগেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে আমাকে পথহারা করেই ছেড়েছে। কাজেই সে-ই শাস্তিরযোগ্য। অপরদিকে শয়তানের আরজি হলো, হে রব! তার উপর তো মূলত আমার কোনোরূপ কর্তৃত্ব ছিল না, আমি মাত্র তাকে ডেকেছিলাম। যদি সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীতে লিপ্ত না হতো তাহলে তো আমার কিছুই করার ছিল না। সে তো ইচ্ছাকৃতভাবেই গোমরাহী ও আল্লাহদ্রোহিতার পথে এসেছে। সে নবী-রাসূলগণের কোনো কথাতেই কর্ণপাত করেনি। আর আমি গোমরাহীর প্রতি তার মধ্যে যে-ই মোহর সঞ্চার করে দিয়েছিলাম, তারই পিচ্ছিল পথ ধরে সে বিপথগামী হয়ে পড়েছিল। সে সরল সঠিক পথ হতে দূরে বহু দূরে সরে গিয়েছিল।

قَوْلُهُ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ .... اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ : কাফের ও তার সঙ্গী শয়তান হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার দরবারে যখন পরস্পরকে দোষারোপ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন– আমার সম্মুখে তোমরা এখানে অনর্থক তর্ক-বচসা করো না। বাক-বিতণ্ডা করলে এখানে কোনোরূপ ফায়েদা হবে না। পূর্ব হতেই দুনিয়ায় তোমাদেরকে ভালো-মন্দ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি কুফরি করবে-চাই কারোও কু-প্ররোচনায় পড়ে হোক অথবা আপনা-আপনি হোক তাকে জাহান্নামী হতে হবে। জাহান্নামের আজাব হতে নিস্তার লাভের কোনো পথই তার জন্য খোলা থাকবে না। কাফেরদেরকে কোনোক্রমেই ক্ষমা করা হবে না। আর শয়তানকে তো ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠে না। আমার এখানে কোনোরূপ জুলুম ও অবিচার হবে না। যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ইনসাফ ও হিকমতের আলোকেই নেওয়া হবে। আমার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সব হবে, কারো অনুরোধে তার একবিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন হবে না।

ظَلَّامٌ শব্দের অর্থ ও তার তাৎপর্য : ظَلَّامٌ শব্দের মূল অর্থ হলো অনেক বড় জালিম। এর তাৎপর্য এ নয় যে, আমি আমার বান্দাদের জন্য জালিম তো বটেই, তবে বহু বড় জালিম নই; বরং এ কথার তাৎপর্য হলো, আমি যদি সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী হয়ে নিজেরই লালিত-পালিত সৃষ্টির উপর জুলুম করি, তাহলে আমি কার্যত বহু বড় জালিম হয়ে যাব। এ কারণে আমি আমার বান্দাদের উপর আদৌ কোনো জুলুম করি না। তবে আমি তোমাদেরকে যে শাস্তি দিচ্ছি এটা ঠিক সেই শাস্তি যার জন্য তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে যোগ্য বানিয়ে নিয়েছ। তোমরা যতটা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তার এক রত্তি পরিমাণ বেশি শাস্তি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না। আমার বিচারালয় নিরপেক্ষ আদালত। যে লোক প্রকৃতই শাস্তি পাবার যোগ্য নয়; তাকে সে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না এবং কেউ তা পেতেও পারে না। যার এ শাস্তি পাওয়ার উপযোগিতা অকাট্য ও সংশয়-সন্দেহ বিমুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়নি, সে শাস্তি তাকে কক্ষনো দেওয়া হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٠. يَوْمَ نَاصِبُهُ ظَلَّامٍ نَقُوْلُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ اِسْتِفْهَامُ تَحْقِيْقٍ لِوَعْدِهِ بِمَلْئِهَا وَتَقُوْلُ بِصُوْرَةِ الْاِسْتِفْهَامِ كَالسُّؤَالِ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ. اَيْ فِيَّ لَا اَسَعُ غَيْرَ مَا امْتَلَأْتُ بِهِ اَيْ قَدِ امْتَلَأْتُ.

৩০. সেদিন তার নসবদাতা হলো ظَلَّامٌ আমি বলব نَقُوْلُ শব্দটি ي ও ن উভয়ের সাথে হতে পারে। [অর্থাৎ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ ও وَاحِدْ مُذَكَّرْ দু'ভাবেই পড়া যায়] জাহান্নামকে, তুমি কি পুরামাত্রায় ভর্তি হয়ে গেছ? জাহান্নামকে পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য এ প্রশ্ন করা হবে। আর জাহান্নাম বলবে প্রশ্নাকারে জানতে চাইবে আরো কিছু বাকি আছে নাকি? অর্থাৎ যা কিছু ভর্তি করা হয়েছে তদপেক্ষা অধিক ধারণের ক্ষমতা আমার মধ্যে নেই। অর্থাৎ আমি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছি।

٣١. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قُرِّبَتْ لِلْمُتَّقِيْنَ مَكَانًا غَيْرَ بَعِيْدٍ مِنْهُمْ فَيَرَوْنَهَا.

৩১. আর জান্নাতকে নিকটে নিয়ে আসা হবে নিকটবর্তী করা হবে মুত্তাকীগণের স্থানের দিক দিয়ে অদূরে তাঁদের হতে। সুতরাং তারা তা দেখতে পাবে।

٣٢. وَيُقَالُ لَهُمْ هٰذَا الْمَرْئِيُّ مَا يُوْعَدُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا وَيُبْدَلُ مِنْ لِلْمُتَّقِيْنَ قَوْلُهُ لِكُلِّ اَوَّابٍ رَجَّاعٍ اِلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ حَفِيْظٍ. حَافِظٍ لِحُدُوْدِهِ.

৩২. আর তাদেরকে বলা হবে এটা যা দৃশ্যমান যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল – يُوْعَدُوْنَ শব্দটি تَ ও ي উভয়যোগে পড়া যায়। [অর্থাৎ তা جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ -ও হতে পারে এবং جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ -ও হতে পারে। এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল] দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্যের দিকে রুজুকারীর জন্য। আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ হেফাজতকারী সংরক্ষণকারী -এর জন্য।

٣٣. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ خَافَهُ وَلَمْ يَرَهُ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ مُقْبِلٍ عَلٰى طَاعَتِهِ.

৩৩. যে দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করত তাকে ভয় করেছে অথচ তাকে দেখেনি এবং আসক্ত অন্তরসহ উপস্থিত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য অভিমুখী অন্তরসহ।

٣٤. وَيُقَالُ لِلْمُتَّقِيْنَ اَيْضًا ن اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ط اَيْ سَالِمِيْنَ مِنْ كُلِّ مَخُوْفٍ اَوْ مَعَ سَلَامٍ اَوْ سَلِّمُوْا وَادْخُلُوْا ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ حَصَلَ فِيْهِ الدُّخُوْلُ يَوْمُ الْخُلُوْدِ الدَّوَامِ فِي الْجَنَّةِ.

৩৪. মুত্তাকীগণকে আরো বলা হবে– জান্নাতে প্রবেশ কর সালাম সহকারে সকল ভয়-ভীতি হতে নিরাপদে অর্থাৎ প্রশান্তি সহকারে অথবা সালাম দাও এবং প্রবেশ কর এটা [অর্থাৎ] যে দিন জান্নাতে প্রবেশ করার ভাগ্য অর্জিত হলো অনন্তকালের দিন [অর্থাৎ] জান্নাতে তোমরা চিরদিন থাকবে।

٣٥. لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا دَائِمًا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ زِيَادَةٌ عَلٰى مَا عَمِلُوْا وَطَلَبُوْا.

৩৫. তথায় তারা যা চাইবে, তাই পাবে চিরকাল আর আমার নিকট অতিরিক্ত রয়েছে তারা যা আমল করেছে বা কামনা করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٦. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ اَىْ اَهْلَكْنَا قَبْلَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قُرُوْنًا اُمَمًا كَثِيْرَةً مِنَ الْكُفَّارِ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا قُوَّةً فَنَقَّبُوْا فَتَّشُوْا فِى الْبِلَادِ ط هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ. لَهُمْ اَوْ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَوْتِ فَلَمْ يَجِدُوْا.

৩৬. তাদের পূর্বে বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি অর্থাৎ কুরাইশ কাফেরদের পূর্বে [যুগে যুগে] বহু কাফের জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। শক্তির অধিকারী ছিল। তারা ভ্রমণ করে ফিরত অনুসন্ধান করে ফিরত শহরে শহরে কোনো আশ্রয়স্থল পাওয়া গিয়েছিল কি? তাদের জন্য অথবা অন্যদের জন্য মৃত্যু হতে আত্মরক্ষার। না, তারা পায়নি।

٣٧. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَذِكْرٰى لَعِظَةً لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ عَقْلٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ اِسْتَمَعَ الْوَعْظَ وَهُوَ شَهِيْدٌ. حَاضِرٌ بِالْقَلْبِ.

৩৭. আর নিশ্চয় তাতে উল্লিখিত বিষয়ে অবশ্যই নসিহত রয়েছে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার অন্তর রয়েছে আকল রয়েছে। অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়োজিত রেখেছে মনোযোগের সাথে উপদেশ শ্রবণ করেছে এমতাবস্থায় যে, সে উপস্থিত নিবিষ্ট চিত্তে উপস্থিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَقُوْلُ : আল্লাহর বাণী نَقُوْلُ-এর মধ্যে বিভিন্ন কেরাত রয়েছে। যথা–
১. জমহুর কারীগণ جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ-এর সীগাহ হিসেবে نَقُوْلُ পড়েছেন।
২. নাফে' ও আবূ বকর প্রমুখ ক্বারীগণ পড়েছেন يَقُوْلُ অর্থাৎ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ দ্বারা।
৩. হযরত হাসান (র.) পড়েছেন– اَقُوْلُ ، (وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ)
৪. ক্বারী আ'মাশ (র.) পড়েছেন– يُقَالُ (وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ مَجْهُوْل)

قَوْلُهُ يُوْعَدُوْنَ : আল্লাহর বাণী– يُوْعَدُوْنَ-এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে। যথা–
১. জমহুর ক্বারীগণ تُوْعَدُوْنَ (ت-এর সাথে) جَمْعُ مُذَكَّرْ حَاضِرْ হিসেবে পড়েছেন।
২. হযরত ইবনে কাছীর (র.) পড়েছেন– يُوْعَدُوْنَ (جَمْعُ مُذَكَّرْ غَائِبْ)

قَوْلُهُ غَيْرَ بَعِيْدٍ : আল্লাহর বাণী– غَيْرَ بَعِيْدٍ-এর মধ্যস্থিত غَيْرَ শব্দটি مَنْصُوْبْ হয়েছে। এর مَنْصُوْبْ হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যথা–
* এখানে غَيْرَ শব্দটি ظَرْف হিসেবে مَنْصُوْبْ হয়েছে।
* অথবা, حَالْ হওয়ার কারণে তা مَنْصُوْبْ হয়েছে।
* অথবা, مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ-এর সিফত হওয়ার দরুন مَنْصُوْبْ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ : আল্লাহর বাণী– لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে। لِكُلِّ اَوَّابٍ الخ পূর্ববর্তী لِلْمُتَّقِيْنَ হতে بَدَل হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْرْ হয়েছে। অথবা لِكُلِّ اَوَّابٍ الخ পূর্ববর্তী هٰذَا-এর খবর হয়ে مَحَلًّا مَرْفُوْعْ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ : আল্লাহর বাণী –وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ-এর মধ্যে بِالْغَيْبِ শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْبْ হয়েছে। কেননা–
* হয়তো তা مَفْعُوْلْ হতে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ– خَافَ الرَّحْمٰنَ حَالَ كَوْنِهِ غَائِبًا অর্থাৎ আল্লাহকে না দেখে ভয় করেছে।
* অথবা, فَاعِلْ হতে حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ– خَافَ اللّٰهَ تَعَالٰى حَالَ كَوْنِهِ غَائِبًا عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে সে আল্লাহকে ভয় করেছে।

قَوْلُهُ اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ : আল্লাহর বাণী- اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ-এর মধ্যস্থিত بِسَلَامٍ শব্দটির মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। যথা-

১. بِسَلَامٍ শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা مَفْعُوْل হতে হাল হবে। অথবা, اُدْخُلُوْا-এর যমীর হতে হাল হবে।

২. এটা مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে। এমতাবস্থায় بَا শব্দটি مَعَ-এর অর্থে হবে।

قَوْلُهُ مَحِيْصٍ : আল্লাহর বাণী- وَهُوَ شَهِيْدٌ-এর মধ্যে مَحِيْصٍ শব্দটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে। কেননা তা খবর হয়েছে। আর "مِنْ" অব্যয়টি এখানে অতিরিক্ত। هَلْ নাবোধক প্রশ্নের জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ شَهِيْدٌ : আল্লাহর বাণী- وَهُوَ شَهِيْدٌ বাক্যটি جُمْلَهْ حَالِيَهْ [অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য] হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ .... مِنْ مَزِيْدٍ : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দোজখের কি অবস্থা হবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন- আমি কিয়ামতের দিন দোজখকে লক্ষ্য করে বলব- তুমি কি পূর্ণমাত্রায় ভর্তি হয়ে গেছ? তখন জাহান্নাম জবাবে বলবে- هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟ অর্থাৎ আরো অতিরিক্ত [বাকি] আছে নাকি? দোজখের এ জবাবের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. হে রব! আর কোনো দোজখী আছে নাকি, থাকলে দাও। আমার উদর ভর্তি হয়নি। বর্ণিত আছে যে, দোজখ এত বিশাল হবে যে, দোজখীদের দ্বারা এর উদর পূর্ণ হবে না। সে রাগে-ক্ষোভে ফোঁস ফোঁস করতে থাকবে এবং আরো দোজখী চাইবে। আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলে তা হালকা করতে চাবেন। তার জবাব পাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কদম দোজখের উপর রাখবেন তখন দোজখ দেবে যাবে, সংকীর্ণ হয়ে পড়বে এবং ব্যস! ব্যস!! [যথেষ্ট হয়েছে] বলতে থাকবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

২. هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ؟-এর অন্য অর্থ হচ্ছে- জাহান্নাম বলবে যে, আরো অধিক আছে নাকি? অর্থাৎ আমার মধ্যে তো আর অধিক ধারণ ক্ষমতা নেই। আমার সম্পূর্ণ উদর কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে। জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) এ মতই সমর্থন করেছেন। সুতরাং অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ অর্থাৎ "অবশ্যই আমি জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করব।" সুতরাং আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে কিনা? তা জাহান্নাম হতে জানার জন্য এবং তার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এরূপ জিজ্ঞাসা করবেন।

قَوْلُهُ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ : ইতঃপূর্বে জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে- এখানে জান্নাত ও জান্নাতীগণের অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতকে মুত্তাকীগণের নিকট নিয়ে আসা হবে। আর দৃশ্যমান সে জান্নাতকে লক্ষ্য করে মুত্তাকীদেরকে সম্বোধন করত বলা হবে যে, এটা সেই জান্নাত দুনিয়ায় থাকাকালীন এমন সব লোকের জন্য যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি বেশি বেশি রুজুকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ রক্ষাকারী তথা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাবলি পালনকারী ছিল। কাজেই আজ তারাই এর হকদার হবে, তারা এতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য লাভ করবে। চিরদিন তারা এ জান্নাতের সুখ-সম্ভোগে মত্ত থাকবে, কখনো তা তাদের হতে ছিনিয়ে নেওয়া হবে না।

এখানে اَوَّابٌ-এর অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের মতামত : আলোচ্য اَوَّابٌ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যথা-

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আতা (র.) প্রমুখ বলেছেন, এখানে اَوَّابٌ-এর দ্বারা তাসবীহ পাঠকারীকে বুঝানো হয়েছে।
* হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) শা'বী (র.) ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখের মতে اَوَّابٌ এমন লোককে বলে, যে নির্জনে নিজের গুনাহ খাতা স্মরণ করে এবং তা হতে তওবা করে ও আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।
* হযরত কাসেম (র.) বলেছেন- اَوَّابٌ হলেন এমন ব্যক্তি যে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকেন।
* হযরত আবূ বকর আবরাক (র.) বলেছেন- যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করে তাকে اَوَّابٌ বলে।
* হযরত হাকাম ইবনে কুতাইবা (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি একাকী নির্জনে আল্লাহ তা'আলার জিকির করে, তাকে اَوَّابٌ বলে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

* হযরত যাহহাক (র.) ও একদল আলেমের মতে যে ব্যক্তি গুনাহ্ করা মাত্রই আল্লাহর দিকে রুজু করে– কখনো কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তওবা করতে মোটেই বিলম্ব করে না, তাকে اَوَّابٌ বলে।
* হযরত উবাইদ ইবনে উমায়ের (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসার পূর্বে এবং মজলিস হতে উঠার পর ইস্তেগফার করে, তাকে اَوَّابٌ বলে।

হাদীস শরীফে আছে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি মজলিস হতে উঠার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা ঐ মজলিসে কৃত তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি পূত-পবিত্র, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি। তোমার দিকে রুজু করছি।"

অত্র আয়াতে حَفِيْظٌ-এর অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের অভিমত : আলোচ্য আয়াতে حَفِيْظٌ-এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে–
* ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধের হেফাজতকারীকে حَفِيْظٌ বলে।
* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে, গুনাহ হতে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি এটাকে [আল্লাহর বিধি-নিষেধকে] হেফজ [স্মরণ] করে রাখে তাকে حَفِيْظٌ বলে।
* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আল্লাহ তা'আলার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে, তাকে বলে حَفِيْظٌ বলে।
* হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপদেশকে কবুল করে এবং তার সংরক্ষণ করে তাকে حَفِيْظٌ বলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথমভাগে চার রাকাত ইশরাকের নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে সে-ই হলো اَوَّابٌ ও حَفِيْظٌ -

قَوْلُهُ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ .... مُنِيْبٍ : এখানে জান্নাতীগণের কতিপয় গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে– তারাই জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করবে, যারা দয়াময় আল্লাহকে ভয় করেছে– অথচ কখনো তাকে দেখেনি। আর তারা আল্লাহর প্রতি আসক্ত– আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী অন্তঃকরণসহ তার দরবারে হাজির হয়েছে। আজকের দিনের সকল কল্যাণ ও সাফল্য একমাত্র তাদের জন্যই রয়েছে।

জালালাইন গ্রন্থকার (র.) خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ-এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন– خَافَهُ وَلَمْ يَرَاهُ অর্থাৎ সে আল্লাহকে দেখেনি। তথাপি তাকে ভয় করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাকে না সে দেখেছে আর না ইন্দ্রিয় দ্বারা তাকে উপলব্ধি করেছে। তা সত্ত্বেও তাঁকে ভয় করেছে– তার নাফরমানি করেনি। যদিও আল্লাহ তা'আলাকে দেখেনি। তথাপি আল্লাহর ভয়ে সদা সে তার নাফরমানি হতে বিরত থাকত। অবশ্যই আল্লাহকে রহমান দয়াময় হিসেবে জানত বলে তাঁর রহমত ও মাগফেরাতের আশাও করত। এ জন্যই হাদীসে আছে– اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ অর্থাৎ আশা ও ভয়ের মাঝামাঝি হলো ঈমান।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-এর তাফসীরে লিখেছেন যে, خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ-এর অর্থ হলো, নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা। এমন স্থানে যেখানে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ তাকে দেখতে পায় না, সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে গুনাহের কার্য হতে বিরত থাকেন। হাদীস শরীফে আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত প্রকারের লোককে আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবেন। তন্মধ্যে এক প্রকার হলো– رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে। আর তখন [আল্লাহর ভয়ে] তার দু' চোখ বেয়ে অশ্রু পড়তে থাকে। আয়াতের অপরাংশ হলো وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ অর্থাৎ আর সে আল্লাহর প্রতি আসক্ত অন্তর সহকারে উপস্থিত হয়েছে। مُنِيْبٌ শব্দটি اِنَابَةٌ হতে গৃহীত। এর অর্থ হলো– রুজু করা, প্রত্যাবর্তন করা। জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন– رَجَّاعٌ اِلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী, যে সমস্ত আনুগত্যকে প্রত্যাখ্যান করত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে কবুল করেছে।

কারো করো মতে, قَلْبٌ مُنِيْبٌ বলতে এমন একটি অন্তরকে বুঝানো হয়েছে যা সর্বদিক হতে ফিরে এক আল্লাহর দিকেই ঘুরে যায়। জীবনভর যত প্রতিকূল অবস্থার সাথে তাকে সংগ্রাম করতে হোক না কেন, সে অন্তর সর্বাবস্থায়ই সেদিকে ঘুরে যায় এবং বারবার তাই করে। এরূপ অন্তরকেই 'আল্লাহ-আসক্ত অন্তর' বলা যায়।

আবূ বকর আররাক (র.) বলেছেন, قَلْبٌ مُنِيْبٌ-এর নিদর্শন হলো; আল্লাহ তা'আলার উপলব্ধিকে সদা-সর্বদা চিন্তা-চেতনায় জাগ্রত রাখে। সকল প্রকার কু-প্রবৃত্তিকে পরিহার করত আল্লাহ তা'আলার সামনে অবনত মস্তকে হাজির থাকে। আর এরূপ কাল্বের অধিকারীর জন্যই রয়েছে জান্নাতের ওয়াদা।

কাফের ও ঈমানদার একই স্থানে হওয়া সত্ত্বেও মুত্তাকীনকে খাস করার অর্থ : স্থান হিসেবে ঈমানদার এবং কাফের উভয়ই

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সমান। সে হিসেবে জান্নাত কাফেরদেরও নিকটে হতে পারে। অথচ আয়াতে বলা হয়েছে যে, জান্নাত মুত্তাকীন লোকদের নিকটবর্তী হবে। এ বিশিষ্টতার ফায়দা বা তাৎপর্য কি?

আল্লাহর বাণী- أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ -এর অর্থ হলো- জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে। আয়াতে বর্ণিত নৈকট্যের অর্থ যদি স্থানগত নৈকট্য হতো, তাহলে উপরিউক্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করা যুক্তি সঙ্গত হতো। কিন্তু এটা শুধুমাত্র ঈমানদার লোকদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে। মূলত জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের দূরত্ব দূর করে দেওয়া হবে। এ কথাটি বুঝার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে, দু'জন লোক যদি একটি ঘরে থাকে, যার নিকটে আরো একটি ঘর রয়েছে যা ঐ দু'জনের একজনের জন্য অতি নিকটে, আর অপরজনের জন্য তুলনামূলকভাবে কিছুটা দূরে। ধরুন যে দু'জনের মধ্যে একজনের উভয় পা কাটা অন্যজনের উভয় পা ভালো সে দৌড়াতেও সক্ষম। তারা উভয়ে যদি ঐ ঘরটির দিকে হাত বাড়িয়ে কিছু নিতে চায় তাহলে যার পা নেই তার জন্য ঐ ঘর নিকটে হয়েও অতিদূরে। অনুরূপ জান্নাত জাহান্নামীদের অতি নিকটে হয়েও দূরে। কেননা তাদের সৎকর্ম ও নেক আমল না থাকার কারণে তারা পঙ্গু। উপরন্তু ঈমানদার লোকেরা নেক আমলের মাধ্যমে তার নিকট পৌঁছতে পারবে তা তাদের নিকটেই মনে হবে। কেননা নেক আমলের কারণে তারা পঙ্গু নয়। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[তাফসীরে কাবীর]

জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করার অর্থ কি? : আল্লাহর বাণী وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ الخ -এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাতকে মুত্তাকীগণের নিকটবর্তী করা হবে। মুফাস্‌সিরগণ (র.) এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যথা-

* জান্নাতকে তার মূল স্থান হতে স্থানান্তর করত কিয়ামতের ময়দানে হাজির করা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা তো সর্বশক্তিমান- তাঁর জন্য এটা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। এমতাবস্থায় اُدْخُلُوْهَا الخ -এর অর্থ এই নয় যে, এখনই চলে যাও; বরং এর দ্বারা ওয়াদা ও সুসংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য।
* হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতীদেরকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে- هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ الخ অর্থাৎ এ সেই জান্নাত, দুনিয়ায় তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।
* কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে জান্নাতকে নিকটবর্তী করা মূলত উদ্দেশ্য নয়; বরং এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জান্নাতীগণের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে দিবেন। জান্নাতবাসীরা জান্নাতকে অতি নিকটে দেখতে পাবে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের উচ্চ মর্যদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, উপরে জান্নাত-জাহান্নাম এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের যে অবস্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ঐ লোকের জন্য নসিহত ও উপদেশ রয়েছে যে মনোযেগের সাথে তা শ্রবণ করে এবং নিবিষ্ট চিত্তে তা উপলব্ধি করে।

জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) شَهِيْدٌ -এর তাফসীরে বলেছেন- حَاضِرٌ بِالْقَلْبِ অর্থাৎ অন্তরকে হাজির করে শ্রবণ করে।

কামালাইন গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেছেন যে, حُضُوْرِ قَلْب -এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যথা-

* সাধারণ স্তর হলো, পাঠ করার সময় আদেশাবলি ও নিষেধাবলির ধ্যান করবে।
* এর বিশেষ স্তর হলো, মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির রয়েছি। তিনিই নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এখানে জান্নাতীগণের যেসব গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে : আলোচ্য আয়াত কয়টিতে জান্নাতীগণের নিম্নোক্ত গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে-

* اَلتَّقْوٰى لِلّٰهِ تَعَالٰى তথা আল্লাহর ভয় থাকা।
* اَلرُّجُوْعُ وَالتَّوْبَةُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى তথা আল্লাহর দিকে রুজু করা ও তওবা করা।
* حَافِظٌ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী তথা আল্লাহর আদেশাবলি ও নিষেধাবলি মান্যকারী হওয়া।
* صَاحِبُ الْقَلْبِ الْمُنِيْبِ তথা আল্লাহর প্রতি আসক্ত অন্তঃকরণের অধিকারী হওয়া।
* اَلْاِعْتِقَادُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّهٗ رَحْمٰنٌ তথা আল্লাহ তা'আলা যে দয়াময়- এ আকিদা পোষণকারীহওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٨. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ق اَوَّلُهَا الْاَحَدُ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ تَعَبٍ نَزَلَ رَدًّا عَلَى الْيَهُوْدِ فِيْ قَوْلِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ اِسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبْتِ وَانْتِفَاءُ التَّعَبِ عَنْهُ لِتَنَزُّهِهٖ تَعَالٰى عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ وَلِعَدَمِ الْمُجَانَسَةِ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ غَيْرِهٖ اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

٣٩. فَاصْبِرْ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ التَّشْبِيْهِ وَالتَّكْذِيْبِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ صَلِّ حَامِدًا قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اَىْ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ج اَىْ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

٤٠. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اَىْ صَلِّ الْعِشَائَيْنِ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ دُبُرٍ وَبِكَسْرِهَا مَصْدَرُ اَدْبَرَ اَىْ صَلِّ النَّوَافِلَ الْمَسْنُوْنَةَ عَقِبَ الْفَرَائِضِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ حَقِيْقَةُ التَّسْبِيْحِ فِيْ هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ مُلَابِسًا لِلْحَمْدِ .

অনুবাদ :

৩৮. আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি আকাশমণ্ডল ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুকে [মাত্র] ছয় দিনে প্রথমদিন ছিল রবিবার এবং শেষ দিবস ছিল শুক্রবার। আর আমাকে স্পর্শ করেনি কোনো প্রকার ক্লান্তি অবসাদ। ইহুদিদের বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য অত্র আয়াতখানা নাজিল হয়েছে। তারা বলত, আল্লাহ তা'আলা শনিবারে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা হতে ক্লান্তি ও কষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টের গুণাগুণ হতে পবিত্র। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও অনান্যদের মধ্যে কোনোরূপ সাদৃশ্য নেই; বরং আল্লাহ তা'আলা যখন কিছু করতে চান তখন তাকে বলেন, হয়ে যাও! আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা হয়ে যায়।

৩৯. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এখানে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। তার উপর তারা যা বলে অর্থাৎ ইহুদি ও অন্যান্যরা। যেমন– তারা আল্লাহর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে। আর আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন আল্লাহর প্রশংসাসহ সালাত কায়েম করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে অর্থাৎ ফজরের সালাত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ জোহর ও আসরের সালাত।

৪০. আর রাত্রির একাংশে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার সালাত কায়েম করুন আর সিজদাসমূহ তথা সালাতসমূহের পরেও اِدْبَارٌ শব্দটির হামযাটি হয়তো যবর বিশিষ্ট হবে তখন তা دُبُرٌ -এর বহুবচন হবে। অথবা এর হামযাটি যের বিশিষ্ট হবে। এমতাবস্থায় তা اَدْبَرَ -এর মাসদার হবে। অর্থাৎ ফরজসমূহের পর প্রচলিত নফল নামাজসমূহ আদায় কর। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে উক্ত সময়গুলোতে প্রকৃত তাসবীহ পাঠের কথা বলা হয়েছে, যা হামদের সাথে মিশ্রিত হয়।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤١. وَاسْتَمِعْ يَا مُخَاطَبُ مَقُوْلِى يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ هُوَ اِسْرَافِيْلُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ج مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اَقْرَبُ مَوْضِعٍ مِنَ الْاَرْضِ اِلَى السَّمَاءِ يَقُوْلُ اَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ وَالْاَوْصَالُ الْمُتَقَطِّعَةُ وَاللُّحُوْمُ الْمُتَمَزِّقَةُ وَالشُّعُوْرُ الْمُتَفَرِّقَةُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُنَّ اَنْ تَجْتَمِعْنَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ.

৪১. আর মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর হে আমার বক্তব্যের শ্রোতা! যে দিবসে আহ্বানকারী আহ্বান করবে তিনি হলেন হযরত ইসরাফীল (আ.) নিকটবর্তী স্থান হতে আকাশ হতে। আর তা হলো, বায়তুল মাকদিসের পাথর- যা আকাশের সর্বাধিক নিকটবর্তী ভূমি। তিনি [ইসরাফীল (আ.)] বলবেন, হে পুরাতন হাড়সমূহ! হে ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিসমূহ! হে দীর্ণ-বিদীর্ণ মাংসসমূহ, বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন ফয়সালার জন্য একত্র হও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لُغُوْبٍ : وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ আয়াতে বর্ণিত لُغُوْبٌ শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ لُغُوْبٌ শব্দের ل অক্ষরের উপর পেশ দিয়ে لُغُوْبٌ পড়েছেন। হযরত আলী, তালহা, ইয়াকুব (রা.) প্রমুখ لَغُوْبٌ শব্দের ل অক্ষরের উপর ফাতহা দিয়ে لَغُوْبٌ পড়েছেন। لَغْوٌ এবং لُغُوْبٌ উভয় কেরাতেই لُغُوْبٌ শব্দটি মাসদার হবে এবং এদের অর্থও একই।

قَوْلُهُ اِدْبَارٌ : وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ আয়াতে বর্ণিত اِدْبَارٌ শব্দে দু'টি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ دُبُرٌ -এর বহুবচন হিসেবে اِدْبَارٌ শব্দের হামযার উপর ফাতহা দিয়ে اَدْبَارٌ পড়েছেন। হযরত নাফে', ইবনে কাছীর ও হামযা (রা.) প্রথম اِدْبَارٌ শব্দের হামযার নিচে কাসরা দিয়ে اِدْبَارٌ শব্দটিকে মাসদার হিসেবে اِدْبَارٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ : وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ বাক্যটি হয়তো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হবে, যার কোনো مَحَلٌّ مِنَ الْاِعْرَابِ হবে না। নতুবা وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْبٍ বাক্যটি وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ কালামে বর্ণিত خَلَقْنَا -এর نَحْنُ যমীর হতে حَالٌ হয়েছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ الخ : শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতখানা ইহুদিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে এসে আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল।

নবী করীম ﷺ উত্তরে তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা রবি ও সোমবার জমিন সৃষ্টি করেছেন। মঙ্গলবারে পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন। বুধবারে গাছ-পালা, পানি ও বৃক্ষ-লতা সৃষ্ট করেছেন। বৃহস্পতিবার আসমান সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবারে তরকারাজি, সূর্য-চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবারে তিনটি ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ঘণ্টায় আযল, দ্বিতীয় ঘণ্টায় কল্যাণকর বিষয়াদির বিপদাপদ ও তৃতীয় ঘণ্টায় আদমকে সৃষ্টি করেছেন। আদমকে জান্নাতে থাকতে দিয়েছেন এবং ইবলীসকে নির্দেশ দিয়েছেন আদমকে সিজদা করার জন্য। আর শেষ মুহূর্তে আদমকে জান্নাত হতে বের করে নিয়ে আসলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইহুদিরা জিজ্ঞাসা করল যে, তারপর কি হলো? নবীজী ﷺ বললেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা আরশে বসলেন। তারা বলল, তোমার কথা তো অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। তারা বলল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এতে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তখন অত্র আয়াতখানা নাজিল হয় এবং তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়।

قَوْلُهُ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ : এ আয়াত দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

১. ইহুদিদের ধারণা যে, "আল্লাহ আকাশ পাতাল সবকিছু সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি আরশে বসে বিশ্রাম নেন।" এটাকে খণ্ডন করার জন্য যে, এ সকল বিষয় সৃষ্টি করার ফলে আল্লাহ ক্লান্ত হননি। কোনো ধরনের ক্লান্তিই তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

২. মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলি হতে যে আল্লাহ তা'আলা পূত-পবিত্র তার ঘোষণা দেওয়ার নিমিত্তে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা ও মানুষকে এক জাতীয় ধারণা না করার জন্য। মানুষ যেমন কোনো কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা মোটেও ক্লান্ত হন না, তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যখন কোনো বস্তু সৃষ্টির মনস্থ করেন তখন كُنْ বলার সাথে সাথেই তা হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الخ : আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করত ইরশাদ করেন– "হে হাবীব! আপনি আপনার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রির একাংশেও তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন!"

জমহুর মুফাস্সিরগণ বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ -এর দ্বারা ফজরের নামাজের দিকে ইশারা করা হয়েছে এবং قَبْلَ الْغُرُوْبِ -এর দ্বারা জোহর ও আসরের নামাজের দিকে আর وَمِنَ اللَّيْلِ الخ -এর দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর আল্লাহর বাণী– اِدْبَارَ السُّجُوْدِ -এর দ্বারা ফরজ নামাজসমূহের পর নফল নামাজ আদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা নামাজের পরে যে তাসবীহ পাঠ করা হয় তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَاِدْبَارَ السُّجُوْدِ দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ السُّجُوْدِ অর্থাৎ আর রাত্রিকালে আবার তাসবীহ কর, আর সিজদায় অবনত হওয়া থেকে অবসর গ্রহণের পরও।

উপরিউক্ত আয়াতের শেষার্ধে বলা হয়েছে যে, সিজদায় অবনত হওয়া থেকে অবসর গ্রহণের পরও আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ কর। সিজদায় অবনত হওয়া দ্বারা ফরজ নামাজের কথা বুঝানো হয়েছে; কিন্তু এটা হতে অবসর গ্রহণের পরে আবার কি ধরনের তাসবীহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, এ সম্পর্কে তাফসীরকার ও মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন ধরনের মতামত বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সিজদা (سُجُوْدٌ) দ্বারা এখানে ফরজ নামাজ বুঝানো হয়েছে এবং اِدْبَارَ বলে সে নফল তাসবীহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফজিলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা এসেছে। কেউ কউ বলেছেন, উক্ত আয়াতে যেভাবে اِدْبَارَ السُّجُوْدِ। -এর উল্লেখ করা হয়েছে এটা হতে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা ফরজ নামাজের পর নফল নামাজসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যেমন নবী করীম ﷺ এটা আদায় করে থাকতেন। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস প্রমুখ সাহাবী (রা.) এবং মুজাহিদ, আওযায়ী (র.) প্রমুখ বলেছেন, اِدْبَارَ السُّجُوْدِ দ্বারা মাগরিবের পরে দু' রাকাত সুন্নত নামাজকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম মাযহারী (র.)-এর মতে, ফরজ নামাজের পর যেসব সুন্নত নামাজ পড়ার কথা সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, اِدْبَارَ السُّجُوْدِ। দ্বারা সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে।

নামাজের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জিত হয়ে থাকে : ইসলাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি। যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণের এ দীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূলের আগমন ঘটবে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

না। কিন্তু প্রশ্ন হলো– তাহলে নবীর মৃত্যুর পর যে সব মানুষ দুনিয়াতে আসবেন তাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করার দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত।' আমরা এর জবাবে বলব, এ দায়িত্ব সাধারণভাবে সব ঈমানদার লোক এবং বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামের উপরই অর্পিত হয়েছে। দাওয়াতের এ মহান ও পবিত্র দায়িত্ব পালন করা সহজ কথা নয়। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ; কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এ পথ কুরবানি ও আত্মোৎসর্গের পথ। যাঁরাই এ দায়িত্ব পালন করতে এসেছিলেন ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তাঁরা অত্যন্ত বিপদ সংকুল ও প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তাই এ পথে চলার জন্য প্রয়োজন ঈমানী ও আত্মিক শক্তি, যে শক্তি ছাড়া এ পথে চলা মোটেও সম্ভব নয়। এ শক্তি ও সামর্থ্য কিভাবে কোন পদ্ধতিতে এবং কিসের ভিত্তিতে অর্জন করা সম্ভব হবে? তা আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন।

সত্য দীনের দাওয়াত দেওয়ার পথে যতই মর্মবিদারী ও প্রাণান্তকর অবস্থা দেখা দিক, চেষ্টা-প্রচেষ্টার যে ফলই লাভ হতে দেখা যাক, তা সত্ত্বেও পূর্ণ ও দৃঢ় সংকল্প সহকারে সারাটি জীবন ধরে পরম সত্যের বাণী প্রচার ও বিশ্বকে পরম কল্যাণের দিকে ডাকার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা এ উপায়েই অর্জিত হতে পারে, যার কথা এ কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে। আল্লাহর হামদ ও তাঁর তাসবীহ বলে এখানে বুঝানো হয়েছে নামাজ। এ ছাড়া কুরআনে যেখানেই হামদ ও তাসবীহকে বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তার অর্থ হচ্ছে– নামাজ। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ এবং নফল নামাজ ও তাসবীহ-তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট শক্তি ও সামর্থ্যের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহর দীনের পথে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য এর মাধ্যমে অর্জিত হবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ অর্থাৎ "আর শোন, যেদিন ঘোষণাদানকারী [প্রত্যেক ব্যক্তির] নিকটস্থ স্থান হতেই ডাক দেবে।"

অর্থাৎ তোমার নিকট কিয়ামতের অবস্থাবলি হতে যা অবতীর্ণ হচ্ছে তুমি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। যেদিন আহবানকারী হযরত ইসরাফীল (আ.) অথবা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আহবান যেদিন শুনতে পাবে। কেউ কেউ বলেছেন, এ আহবান হলো সাধারণ আহবান, অথবা শব্দ অথবা বিকট আওয়াজ যা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আওয়াজ হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ইসরাফীল (আ.) ফুঁ দেবেন, আর জিবরাঈল হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকদেরকে আহবান করবেন এবং বলবেন, আল্লাহর দরবারে হিসাব দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি এসো! এ কথার ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, আহ্বানের কাজটি হাশরের ময়দানে সংঘটিত হবে।

মুকাতিল (র.) বলেছেন, ইসরাফীলই হাশরের ময়দানে আহ্বান করবেন এবং তাদের অতি নিকটবর্তী স্থান হতে বলবেন, যাতে তাদের প্রত্যেকের নিকট তাঁর আহবান পৌছে। বলবেন, "হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট হিসেব দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো!" হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে আহবান করবেন। হযরত কালবী (র.) বলেছেন, কেননা তা জমিন হতে আসমানের নিকটবর্তী স্থান অর্থাৎ বার মাইলের দূরত্ব। কা'ব বলেছেন, তা জমিন হতে মাত্র ১৮ মাইল দূরে। –[ফাতহুল কাদীর]

হযরত জাবির (রা.)-ও বলেছেন, এ আহবানকারী ফেরেশতা স্বয়ং হযরত ইসরাফীল ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নয়। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরায় দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্বের মৃতদেরকে এ বলে সম্বোধন করবেন, "হে পঁচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শোন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হিসেবের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।" –[মাযহারী]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, আয়াতে দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা দ্বারা নিম্ন জগতকে পুনর্জীবিত করা হবে। এর নিকটবর্তী স্থানের অর্থ হচ্ছে– তখন এ আওয়াজটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে যেন মনে হবে কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, আওয়াজটি এমনভাবে শোনা যাবে যেন কেউ আমাদের কাছেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেছেন, নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরা, এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক হতে এর দূরত্ব সমান। –[কুরতুবী]

মোটকথা, যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর এ আওয়াজ শুনতে পাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٢. يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ قَبْلَهُ يَسْمَعُوْنَ اَىْ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ط بِالْبَعْثِ وَهِىَ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ اِسْرَافِيْلَ وَيَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ قَبْلَ نِدَائِهِ اَوْ بَعْدَهُ ذٰلِكَ اَىْ يَوْمَ النِّدَاءِ وَالسَّمَاعِ يَوْمُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْقُبُوْرِ نَاصِبُ يَوْمَ يُنَادِىْ مُقَدَّرٌ اَىْ يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ تَكْذِيْبِهِمْ.

٤٣. اِنَّا نَحْنُ نُحْىٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ.

٤٤. يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ قَبْلَهُ وَمَا بَيْنَهُمَا اِعْتِرَاضٌ تَشَقَّقُ بِتَخْفِيْفِ الشِّيْنِ وَتَشْدِيْدِهَا بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الْاَصْلِ فِيْهَا الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ط جَمْعُ سَرِيْعٍ حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ اَىْ فَيَخْرُجُوْنَ مُسْرِعِيْنَ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ فِيْهِ فَصْلٌ بَيْنَ الْمَوْصُوْفِ وَالصِّفَةِ بِمُتَعَلِّقِهَا لِلْاِخْتِصَاصِ وَهُوَ لَا يَضُرُّ وَ ذٰلِكَ اِشَارَةٌ اِلٰى مَعْنَى الْحَشْرِ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْهُ وَهُوَ الْاِحْيَاءُ بَعْدَ الْفَنَاءِ وَالْجَمْعُ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ.

٤٥. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اَىْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ تف تُجْبِرُهُمْ عَلَى الْاِيْمَانِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ.

অনুবাদ :

৪২. যে দিবস এটা পূর্বোক্ত يَوْمَ হতে بَدَل হয়েছে। তারা শ্রবণ করবে অর্থাৎ সমস্ত মাখলুক সত্যের বিকট ধ্বনি পুনরুত্থানের [বিকট ধ্বনি] তা হবে ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার। এ ফুৎকার তার ঘোষণা [যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে] -এর পূর্বেও হতে পারে এবং পরেও হতে পারে। তা –অর্থাৎ ঘোষণা দেওয়া ও আওয়াজ শ্রবণ করার দিবস বাহির হওয়ার দিবস কবরসমূহ হতে يَوْمَ يُنَادِىْ -এর নসবদাতা [আমিল] উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম [প্রতিফল] জানতে পারবে। [যে দিন]।

৪৩. নিশ্চয় আমি জীবন দানকারী এবং মৃত্যুদানকারী আর আমারই দিকে সকলকে ফিরে আসতে হবে।

৪৪. যে দিন এটা পূর্ববর্তী يَوْمَ হতে بَدَل হয়েছে। উভয়ের মধ্যবর্তী বাক্য জুমলায়ে মু'তারিযা হয়েছে বিদীর্ণ হবে تَشَقَّقُ -এর শীন অক্ষরটি তাশদীদবিহীন এবং তাশদীদসহ উভয়ভাবে পড়া যাবে। তাশদীদসহ হলে মূলত এতে দ্বিতীয় تَ -কে শীনের মধ্যে ইদগাম করা হবে। জমিন, তা হতে দ্রুত বের হয়ে আসবে তারা سِرَاعًا শব্দটি سَرِيْع -এর বহুবচন। এটা উহ্য فِعْل -এর যমীর হতে حَال হয়েছে। অর্থাৎ তখন তারা দৌড়ে দ্রুতবেগে বের হতে থাকবে। তাই হবে হাশর, যা আমার জন্য অতি সহজ হবে। এখানে সিফাতের مُتَعَلِّق -এর দ্বারা মাওসূফ সিফাতের মধ্যে ব্যবধান করা হয়েছে اِخْتِصَاص -এর উদ্দেশ্যে। আর এরূপ ব্যবধান ক্ষতিকর নয়। ذٰلِكَ -এর দ্বারা হাশরের অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার সংবাদ অবহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত করা এবং হিসাব-নিকাশ ও আল্লাহর সমীপে পেশ করার জন্য একত্র করা।

৪৫. আমি জানি তারা যা বলে–অর্থাৎ কুরাইশ কাফেররা। আর আপনি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নন যে, তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবেন। এটা জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার কথা। সুতরাং আপনি কুরআনের মাধ্যমে তাকে উপদেশ দান করুন, যে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে। আর তারা হলেন মুমিনগণ।

Free@ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ الخ : আল্লাহর বাণী– يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ الخ -এর মধ্যে يَوْمَ শব্দটি পূর্ববর্তী يَوْمَ يُنَادِى হতে بَدَل হয়েছে। আর যেহেতু يَوْمَ يُنَادِى একটি উহ্য فِعْل -এর কারণে مَنْصُوْب হয়েছে, সেহেতু উক্ত يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ ও مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে। মূলত ছিল– يَعْلَمُوْنَ عَاقِبَةَ تَكْذِيْبِهِمْ يَوْمَ يُنَادِى .... يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ

قَوْلُهُ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ : আয়াতাংশে اَلْحَقّ শব্দটি কোন অর্থ হয়েছে? : আলোচ্য আয়াতে بِالْحَقِّ শব্দটি يَقِيْن [নিশ্চয়তা] -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন তারা যখন হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গার ফুৎকার সন্দেহাতীতভাবে শ্রবণ করবে।

قَوْلُهُ سِرَاعًا : আল্লাহর বাণী– يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا আয়াতে سِرَاعًا শব্দটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা, তা একটি উহ্য فِعْل হতে حَال হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে– فَيَخْرُجُوْنَ مُسْرِعِيْنَ অর্থাৎ ফলে তারা দৌড়ে বের হয়ে আসবে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ حَشْرٌ الخ : আল্লাহর বাণী– "ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ" -এর দ্বারা حَشْرٌ -এর অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ– اَلْاِحْيَاءُ بَعْدَ الْفَنَاءِ وَالْجَمْعُ لِلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত করা এবং হিসাব-নিকাশ ও আল্লাহর সম্মুখে পেশ করার জন্য তাদেরকে একত্র করা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ : শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইহুদিদের একটি দল নবী কারীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন– হে রাসূল! আমাদেরকে যদি আখিরাত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতেন তাহলে ভালো হতো। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ কুরআনের সাহায্যেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দাও, যারা আমাদের সতর্কতাকে ভয় করে। –[লুবাব]

قَوْلُهُ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ অর্থাৎ "যেদিন সমস্ত মানুষ হাশরের দিনের ধ্বনি যথাযথ শুনতে থাকবে; তা ভূগর্ভ হতে মৃতদের আত্মপ্রকাশ লাভের দিন হবে।"

এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে– সব মানুষই মহাসত্যের ব্যাপার সংক্রান্ত ডাক শুনতে পাবে। দ্বিতীয় হলো, হাশরের ধ্বনি সবাই ঠিক ঠিক ভাবেই শুনতে পাবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তাৎপর্য এ হবে যে, লোকেরা সে মহাসত্য সংক্রান্ত আহ্বানকে নিজেদের কানে শুনতে পাবে, তারা যা দুনিয়ায় মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, যা অমান্য ও অস্বীকার করার জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, আর যে বিপর্যয়ের আগাম সংবাদদাতা নবী-রাসূলগণকে তারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত। দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে তাৎপর্য এই হবে যে, তারা সন্দেহাতীতভাবে ও বস্তুতই হাশরের এ ধ্বনি শুনতে পারবে; তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে, এটা কিছুমাত্র বিভ্রান্তি বা ভুল বুঝার ব্যাপার নয়, এটা বাস্তবিকই হাশরেরই ধ্বনি। তাদেরকে যে হাশরের কথা বলা হয়েছিল তাই উপস্থিত হয়েছে এবং তারই ধ্বনি এখন উত্থিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে একবিন্দু সন্দেহই থাকবে না।

قَوْلُهُ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– [হে নবী!] যেসব কথাবার্তা এ লোকেরা রচনা করে, সেগুলোকে আমরা ভালো করেই জানি।'

রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য এ বাক্যটিতে সান্ত্বনাও রয়েছে, আর রয়েছে ধমক ও হুমকি কাফেরদের জন্য। নবী কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার সম্পর্কে এরা যেসব কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে, আপনি তার কিছুমাত্র পরোয়া করবেন না। আমি সবকিছুই শুনছি, তাদের সাথে বুঝাপড়া করা আমার কাজ। কাফেরদেরকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে, আমার নবীর বিষয়ে তোমরা যেসব উক্তি করছ তার জন্য তোমাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হবে। প্রত্যেকটি কথা আমি নিজেই শুনছি, তোমাদেরকেই তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আমার জ্ঞান আপনার ব্যাপারে মুশরিকদের কথা পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এটা যেন আপনাকে অস্থির করে না তোলে। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا যখন পৃথিবী দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে; আর লোকেরা তার ভেতর হতে বের হয়ে দ্রুততার সাথে চলে যেতে থাকবে।

হাদীসের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়াতে থাকবে। সেখানে বায়তুল মুকাদ্দাসের সখরায় হযরত ইসরাফীল (আ.) সবাইকে আহবান করবেন।

মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেছেন- مِنْ هٰهُنَا اِلٰى هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ এখান থেকে সেখান পর্যন্ত তোমরা উত্থিত হবে, কেউ সওয়ার হয়ে, আবার কেউ পায়ে হেঁটে এবং কেউ উপুড় হয়ে কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে কুরআন মাজীদের মাধ্যমে ঐসব লোকদেরকে নসিহত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার আজাবের ধমকি-হুমকিকে ভয় করে। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- হে হাবীব! আপনি কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে নসিহত করুন- উপদেশ দান করুন, যারা আল্লাহর আজাবের হুমকিকে ভয় করে। অর্থাৎ আপনি ঈমানদারগণকে কুরআন মাজীদের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করুন।

কুরআনের মাধ্যমে নবী করীম ﷺ দু'ভাবে উপদেশ দান করেছেন। যথা-

১. কুরআনের বাণী শুনিয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিয়েছেন।

২. কুরআন অনুযায়ী নিজে আমল করত লোকদেরকে দেখিয়েছেন।

যদিও কুরআনের উপদেশ ঈমানদার ও কাফের নির্বিশেষে সকলের জন্যই তথাপি যেহেতু তা হতে ঈমানদারগণই উপকৃত হয়ে থাকে, সেহেতু তাদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) অত্র আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَا بَارُّ يَا رَحِيْمُ অর্থাৎ হে আল্লাহ! যারা তোমার ধমকিকে ভয় করে এবং তোমার প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশা করে তুমি আমাকে তাদের দলভুক্ত কর। হে অনুগ্রহকারী! হে দয়াময়!

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ وَالذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ : সূরা যারিয়াত, মক্কায় অবতীর্ণ

سِتُّوْنَ اٰيَةً : আয়াত : ৬০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. وَالذّٰرِيٰتِ الرِّيَاحِ تَذْرُوا التُّرَابَ وَغَيْرَهُ ذَرْوًا مَصْدَرٌ وَيُقَالُ تَذْرِيْهِ ذَرْيًا تَهُبُّ بِهِ.

অনুবাদ :

১. শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার, যে বাতাস ধূলাবালি ইত্যাদিকে এলোমেলো করে দেয়। ذَرْوًا শব্দটি মাসদার। বলা হয়– تَذْرِيْهِ ذَرْيًا অর্থাৎ বাতাস ধূলা উড়ায়।

২. فَالْحٰمِلٰتِ السُّحُبِ تَحْمِلُ الْمَاءَ وِقْرًا ثِقْلًا مَفْعُوْلُ الْحَامِلَاتِ.

২. শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের। যে মেঘ পানি বহন করে। وِقْرًا শব্দটি اَلْحَامِلَاتِ -এর মাফউল।

৩. فَالْجٰرِيٰتِ السُّفُنِ تَجْرِيْ عَلٰى وَجْهِ الْمَاءِ يُسْرًا بِسُهُوْلَةٍ مَصْدَرٌ فِيْ مَوْضِعِ الْحَالِ اَيْ مُيَسَّرَةً.

৩. শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের, যে নৌকা পানি বুক চিড়ে চলাচল করে, সহজতার সাথে। يُسْرًا শব্দটি মাসদার حَالْ -এর স্থান অর্থাৎ এমতবস্থায় যে, তা ধেয়ে চলে/ দ্রুত চলে।

৪. فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا الْمَلٰئِكَةِ تُقَسِّمُ الْاَرْزَاقَ وَالْاَمْطَارَ وَغَيْرَهَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ.

৪. শপথ বণ্টনকারী ফেরেশতাগণের অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ বান্দাদের রিজিক ও শহরে বৃষ্টি বণ্টন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত।

৫. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ مَا مَصْدَرِيَّةٌ اَيْ اِنَّ وَعْدَهُمْ بِالْبَعْثِ وَغَيْرِهِ لَصَادِقٌ. لَوَعْدٌ صَادِقٌ.

৫. তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এখানে مَا টা مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ পুনরুত্থান ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের অঙ্গীকার অবশ্যই সত্য সত্য অঙ্গীকার।

৬. وَاِنَّ الدِّيْنَ الْجَزَاءَ بَعْدَ الْحِسَابِ لَوَاقِعٌ لَا مُحَالَةَ.

৬. আর কর্মফল দিবস হিসাব নিকাশের পর আমলের প্রতিদান দেওয়া অবশ্যম্ভাবী।

৭. وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْحُبُكِ جَمْعُ حَبِيْكَةٍ كَطَرِيْقَةٍ وَطُرُقٍ اَيْ صَاحِبَةِ الطُّرُقِ فِي الْخِلْقَةِ كَالطُّرُقِ فِي الرَّمْلِ.

৭. শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের حُبُكٌ শব্দটি حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। যেমন طُرُقٌ শব্দটি طَرِيْقَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ সেই আকাশ সৃষ্টিগতভাবেই রাস্তা বিশিষ্ট। যেমন বালুর মধ্যে রাস্তা হয়ে থাকে।

৮. اِنَّكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ فِيْ شَاْنِ النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ قِيْلَ شَاعِرٌ سَاحِرٌ كَاهِنٌ شِعْرٌ سِحْرٌ كَهَانَةٌ.

৮. তোমরা তো হে মক্কাবাসী! হুজুর ﷺ ও কুরআনের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কবি, জাদুকর ও জ্যোতিষী আর কুরআন সম্পর্কে বলা হয় এটা কবিতা, জাদু ও জ্যোতির্বিদ্যা।

Free @ www.e-ilmweebly.com

٩. يُؤْفَكُ يُصْرَفُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْقُرْاٰنِ اَىْ عَنِ الْاِيْمَانِ بِهٖ مَنْ اُفِكَ ط صُرِفَ عَنِ الْهِدَايَةِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৯. সে ব্যক্তিই তা পরিত্যাগ করে নবী করীম ﷺ ও কুরআনকে অর্থাৎ এ বিষয়ে ঈমান আনয়ন করতে যে সত্যভ্রষ্ট যাকে আল্লাহর ইলমে হেদায়েত হতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

١٠. قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ لُعِنَ الْكَذَّابُوْنَ اَصْحَابُ الْقَوْلِ الْمُخْتَلِفِ .

১০. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা বিভিন্ন উক্তিকারী মিথ্যাবাদীরা অভিশপ্ত ও লানতপ্রাপ্ত হোক।

١١. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ جَهْلٍ يَغْمُرُهُمْ سَاهُوْنَ لا غَافِلُوْنَ عَنْ اَمْرِ الْاٰخِرَةِ .

১১. যারা অজ্ঞ যাদেরকে অজ্ঞতা ডুবিয়ে রেখেছেন ও উদাসীন অর্থাৎ আখিরাতের কর্মের ব্যাপারে গাফিল।

١٢. يَسْئَلُوْنَ النَّبِيَّ اِسْتِهْزَاءً اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ اَىْ مَتٰى مَجِيْئُهٗ .

১২. তারা জিজ্ঞাসা করে নবী কারীম ﷺ -কে বিদ্রূপের স্বরে কর্মফল দিবস কবে হবে? অর্থাৎ সেটা কখন আসবে?

١٣. وَجَوَابُهُمْ يَجِيْئُ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ اَىْ يُعَذَّبُوْنَ فِيْهَا .

১৩. তাদের জবাব হলো– কর্মফল দিবস সেদিন আসবে, যেদিন যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে অগ্নিতে। অর্থাৎ তাতে শাস্তি প্রদান করা হবে।

١٤. وَيُقَالُ لَهُمْ حِيْنَ التَّعْذِيْبِ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ط تَعْذِيْبَكُمْ هٰذَا الْعَذَابُ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ فِى الدُّنْيَا اِسْتِهْزَاءً .

১৪. তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার সময় বলা হবে– তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। পৃথিবীতে উপহাসছলে বিদ্রূপ করে।

١٥. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَّعُيُوْنٍ لا تَجْرِىْ فِيْهَا .

১৫. সেদিন নিশ্চয় মুত্তাকীগণ থাকবেন প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। যে প্রসবণ তাতে প্রবাহিত হবে।

١٦. اٰخِذِيْنَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ فِىْ خَبَرِ اِنَّ . مَآ اٰتٰـهُمْ اَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ ط مِنَ الثَّوَابِ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ اَىْ دُخُوْلِهِمُ الْجَنَّةَ مُحْسِنِيْنَ . فِى الدُّنْيَا .

১৬. উপভোগ করবে তা এটা خَبَرُ اِنَّ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন পুণ্য হতে। কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ অর্থাৎ তাদের জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে পৃথিবীতে

١٧. كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ . يَنَامُوْنَ وَمَا زَائِدَةٌ وَيَهْجَعُوْنَ خَبَرُ كَانَ وَقَلِيْلًا ظَرْفٌ اَىْ يَنَامُوْنَ فِىْ زَمَنٍ يَسِيْرٍ مِنَ اللَّيْلِ وَيُصَلُّوْنَ اَكْثَرَهٗ .

১৭. তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতেন নিদ্রায়। এখানে يَهْجَعُوْنَ টা يَنَامُوْنَ অর্থে, আর مَا হলো অতিরিক্ত। আর يَهْجَعُوْنَ হলো كَانَ -এর খবর আর قَلِيْلًا হলো ظَرْفٌ অর্থাৎ রাতের স্বল্প অংশই শয়ন করতেন এবং অধিকাংশ অংশে নামাজ পড়তেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

١٨. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا.

১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তারা বলতেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا [হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করুন!]

١٩. وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. اَلَّذِىْ لَا يَسْاَلُ لِتَعَفُّفِهٖ.

১৯. তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক। مَحْرُوْمٌ হলো সে ব্যক্তি যে প্রার্থনা থেকে পবিত্র থাকার লক্ষ্য প্রার্থনা করে না। [যার ফলে সে বঞ্চিত থেকে যেত।]

٢٠. وَفِى الْاَرْضِ مِنَ الْجِبَالِ وَالْبِحَارِ وَالْاَشْجَارِ وَالثِّمَارِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا. اٰيٰتٌ دَلَالَاتٌ عَلٰى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَوَحْدَانِيَّتِهٖ لِلْمُوْقِنِيْنَ لا

২০. ধরিত্রীতে রয়েছে পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, ফল-ফলাদি তরুলতা ইত্যাদিতে রয়েছে নিদর্শন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও তাঁর ক্ষমতায় দিক নির্দেশনা। নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।

٢١. وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ ط اٰيَاتٌ اَيْضًا مِنْ مَبْدَاِ خَلْقِكُمْ اِلٰى مُنْتَهَاهُ وَمَا فِىْ تَرْكِيْبِ خَلْقِكُمْ مِنَ الْعَجَائِبِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ذٰلِكَ فَتَسْتَدِلُّوْنَ بِهٖ عَلٰى صَانِعِهٖ وَقُدْرَتِهٖ.

২১. এবং তোমাদের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে, তোমাদের সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্যজনক বস্তু রয়েছে। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? ফলে তোমরা তা দ্বারা তার সৃষ্টি ও ক্ষমতার উপর প্রমাণ পেশ করে থাকো।

٢٢. وَفِى السَّمَاۤءِ رِزْقُكُمْ اَىِ الْمَطَرُ الْمُسَبَّبُ عَنْهُ النَّبَاتُ الَّذِىْ هُوَ رِزْقٌ وَمَا تُوْعَدُوْنَ مِنَ الْمَاٰبِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ اَىْ مَكْتُوْبٌ ذٰلِكَ فِى السَّمَاۤءِ.

২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক অর্থাৎ বৃষ্টি যা উদ্ভিদ গজানোর কারণ যাতে রয়েছে তোমাদের জীবিকা। ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু প্রত্যাবর্তন, পুণ্য ও শাস্তি হতে অর্থাৎ এগুলো আকাশে লিখিত রয়েছে।

٢٣. فَوَرَبِّ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ اَىْ مَا تُوْعَدُوْنَ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ. بِرَفْعِ مِثْلُ صِفَةً وَمَا مَزِيْدَةٌ وَبِفَتْحِ اللَّامِ مُرَكَّبَةٌ مَعَ مَا الْمَعْنٰى مِثْلَ نُطْقِكُمْ فِىْ حَقِيْقَتِهٖ اَىْ وَمَعْلُوْمِيَّتِهٖ عِنْدَكُمْ ضَرُوْرَةَ صُدُوْرِهٖ عَنْكُمْ.

২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! এই সকল অর্থাৎ যার অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হয়েছে অবশ্যই তোমাদের বাক স্ফূর্তির মতোই সত্য। مِثْل শব্দটি رَفْع -এর সাথে (حَقٌّ)-এর সিফত এবং مَا টা হলো অতিরিক্ত এবং (مِثْل)-এর لَامْ যবরের সাথে مَا -এর সাথে مُرَكَّبْ আর অর্থ এই- তোমাদের সাথে যার অঙ্গীকার করা হয় তা বাস্তবায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে এরূপই যেমন তোমাদের কথাবার্তা বলা সত্য। অর্থাৎ যেভাবে তোমাদের নিকট তোমাদের কথাবার্তা জ্ঞাত হওয়াটা সুনিশ্চিত ও ইয়াকীনী, এই কথাবার্তা তোমাদের থেকে চাক্ষুষ প্রকাশ হওয়ার কারণে। [এভাবে তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারও সত্য।]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالذَّارِيَاتِ : এখানে وَاوْ টি হলো قَسَمِيَّةْ আর ذَارِيَاتٌ এটা ذَرِيَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– যা উড়িয়ে দেয়, এলোমেলো করে দেয়। এর মওসূফ اَلرِّيَاحُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَلرِّيَاحُ الذَّارِيَاتُ [এলোমেলোকারী বায়ু] এটা ذَرٰى يَذْرُوْ ذَرْوًا অথবা ذَرٰى يَذْرِىْ ذَرْيً হতে নির্গত যা مُعْتَلْ لَامْ وَاوِىْ বা يَائِىٌّ আর اَلذَّرِيَاتُ হলো مُقْسَمٌ بِهٖ

قَوْلُهُ ذَرٰى يَذْرِىْ ذَرْيًا : এর দ্বারা এটা مُعْتَلْ لَامْ يَائِىْ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ تَهُبُّ بِهٖ : এটা অর্থ বর্ণনা করার জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বায়ু এটাকে উড়িয়ে দেয়। এলোমেলো করে দেয়।

قَوْلُهُ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ : আল্লামা মহল্লী (র.) مَا -কে مَصْدَرِيَّةْ বলেছেন, অর্থাৎ وَعْدْ হয়েছে। উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে– اِنَّ وَعْدَكُمْ لَوَعْدٌ صَادِقٌ

قَوْلُهُ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ : হলো مَعْطُوْفْ عَلَيْهِ আর اِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ হলো مَعْطُوْفْ এখন মা'তূফ আলাইহি এবং মা'তূফ মিলে جُمْلَةْ হয়ে جَوَابُ قَسَمٍ হয়েছে। আবার এখানে اِنَّمَا -এর مَا -কে مَوْصُوْلَةْ -ও বলা যেতে পারে। আর تُوْعَدُوْنَ এটা বাক্য হয়ে সেলাহ আর عائد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ بِهٖ আর সব মিলে جُمْلَةْ হয়ে ان -এর اِسْمٌ আর لَصَادِقٌ হলো اِنَّ -এর খবর। আর اِنَّ হলো হরফে মুশাবাহ বিল ফে'ল।

قَوْلُهُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ : এখানে وَاوْ টি قَسَمِيَّةْ جَارَّةْ অর্থ اُقْسِمُ আর اَلسَّمَاءُ হলো মওসূফ اَلْحُبُكُ হলো সিফত। সিফত ও মওসূফ মিলে جُمْلَةْ হয়ে جَوَابُ قَسَمٍ

قَوْلُهُ حُبُكٌ : এটা حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। যেমন طُرُقٌ টা طَرِيْقَةٌ -এর বহুবচরন। অর্থ রাস্তা, পানির তরঙ্গ, বাতাসের কারণে বালুতে পতিত চিহ্ন। আবার কেউ কেউ حُبُكٌ -কে حِبَاكٌ -এর বহুবচন বলেছেন। যেমন مُثُلٌ এটা مِثَالٌ -এর বহুবচন, حَبِيْكَةٌ এবং حِبَاكٌ তারকারাজির পথ অতিক্রম করাকেও বলা হয়। –[ই'রাবুল কুরআন, লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ فِى الْخِلْقَةِ كَالطُّرُقِ فِى الرَّمْلِ : এই ইবারত বৃদ্ধির উপকারিতা হলো এই যে, আকাশের পথ গুলো خِيَالِىْ এবং مَعْنَوِىْ নয়; বরং তা مَحْسُوْسِىْ এবং مَوْجُوْدٌ فِى الْخَارِجِ হয়ে থাকে। যদিও বহু দূরে অবস্থানের কারণে চোখে দেখা যায় না।

قَوْلُهُ يُؤْفَكُ عَنْهُ : এটা اُفُكٌ মাসদার হতে মুযারে মাজহূলের وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ, অর্থ– ফিরানো হয়, বিপথগামী করা হয়, প্ররোচিত করা হয়।

قَوْلُهُ صُرِفَ عَنِ الْهِدَايَةِ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى : এই ইবারত বৃদ্ধি করণ দ্বারা উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের সমাধান করা–

প্রশ্ন : يُؤْفَكُ مَنْ اُفِكَ দ্বারা বুঝা যায় যে, যে পথভ্রষ্ট তাকে পথভ্রষ্ট করা হবে। আর এটা تَحْصِيْلِ حَاصِلْ কে আবশ্যক করে, কেননা যে বিপথগামী তাকে বিপথগামী করার কোনো অর্থ হয় না।

উত্তর : যে আল্লাহর عِلْمِ اَزَلِىْ -তে বিপথগামী, তাকে বাস্তবে ও প্রকাশ্যে বিপথগামী করা হবে।

বালাগাত : **قَوْلُهُ قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ** : قُتِلَ -এর হাকীকী অর্থ হলো হত্যা করা; কিন্তু এখানে اِسْتِعَارَةْ -এর ভিত্তিতে অভিসম্পাত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এভাবে যে, مَفْقُوْدُ السَّعَادَةِ -কে مَفْقُوْدُ الْحَيَاتِ -এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এটা اِسْتِعَارَةْ بِالْكِنَايَةْ হয়েছে।

مَفْقُوْدُ السَّعَادَةِ হলো مُشَبَّهْ আর مَفْقُوْدُ الْحَيَاةِ হলো مُشَبَّهْ بِهٖ ; মুশাব্বাহ বিহী যদিও উহ্য কিন্তু لَوَازِمْ - مُشَبَّهْ بِهٖ -এর মধ্য থেকে হত্যাকে مُشَبَّهْ -এর জন্য প্রমাণিত করে দিয়েছে। এটা اِسْتِعَارَةْ تَخْيِيْلِيَّةْ হয়েছে قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ এটা قُتِلَ الْكَذَّابُوْنَ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ বদ দোয়ার অর্থে। خَرَّاصُوْنَ অর্থ– অনুমান কারী, মিথ্যা বকওয়াজ কারী। এটা خَرَّاصٌ -এর বহুবচন, خَرْصٌ হতে মুবালাগার সীগাহ।

قَوْلُهُ غَمْرَةٌ : غَمْرَةٌ অর্থ– গভীর পানি যার তলদেশ দেখা যায় না। এখানে জ্ঞান বেষ্টনকারী অজ্ঞতা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ : এখানে اَيَّانَ হলো খবরে মুকাদ্দাম আর يَوْمُ الدِّيْنِ হলো মুবতাদা মুয়াখখার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مَتٰى مَجِيْئُهُ : এটা اَيَّانَ -এর তাফসীর مَجِيْئُهُ উহ্য মুযাফের দিকে ইঙ্গিত করেছে। আর উহ্য মুযাফ নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে।

প্রশ্ন : اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ এটা মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন। আর يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ হলো প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টিই زَمَانٌ আর زَمَانٌ -এর উত্তর زَمَانٌ দ্বারা দেওয়া যায় না। زَمَانٌ -এর উত্তর حَدَثٌ দ্বারা হয়। মুফাসসির (র.) এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যই مَجِيْئُهُ উহ্য মেনেছেন। যাতে করে زَمَانٌ -এর জবাব اَخْبَارٌ بِالزَّمَانِ দ্বারা হয়ে যায়।

প্রশ্ন : اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ -এর মধ্যে সময়ের নির্ধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, আর উত্তর হলো يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ যা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, যা ঠিক হয়নি।

উত্তর : মক্কার মুশরিকদের প্রশ্ন যেহেতু জানা ও বুঝার জন্য ছিল না, বরং তা ছিল উপহাসছলে ও বিদ্রূপাত্মক। এ কারণেই প্রকৃত জবাবের পরিবর্তে صُوْرَةً জবাব দিয়েছেন, যাতে প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে সমতার সৃষ্টির হয়। يَوْمَ শব্দটি يَجِيْئُ উহ্য থাকার কারণে নসবযুক্ত হয়েছে। هُمْ হলো মুবতাদা আর يُفْتَنُوْنَ হলো খবর, আর عَلٰى টা فِىْ অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন : يُفْتَنُوْنَ -এর সেলাহ عَلٰى কেন আনা হলো?

উত্তর : يُفْتَنُوْنَ যেহেতু يُعْرَضُوْنَ -এর অর্থের অধীন তাই يُفْتَنُوْنَ -এর সেলাহ عَلٰى আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَجْرِىْ فِيْهَا : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা সেই প্রশ্নে উত্তর দেওয়া উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর বাণী– اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَعُيُوْنٍ দ্বারা জানা যায় যে, মুত্তাকীগণ ঝরনায় থাকবেন। অথচ ঝরনায় হওয়ার বা থাকার কোনোই অর্থ হয় না। মুফাসসির (র.) تَجْرِىْ فِيْهِ বলে এরই উত্তর দিয়েছেন। উত্তরের সার হলো মুত্তাকীগণ এমন বাগানে অবস্থা করবেন যাতে প্রবহমান ঝরনা থাকবে।

قَوْلُهُ اٰخِذِيْنَ : এটা اِنَّ -এর উহ্য খবরের যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– كَائِنُوْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ حَالَ كَوْنِهِمْ اٰخِذِيْنَ مَا اٰتَاهُمْ رَبُّهُمْ

قَوْلُهُ مِنَ الثَّوَابِ : এটা مَا -এর বয়ান يَهْجَعُوْنَ এটা هُجُوْعٌ হতে রাতের নিদ্রা যাওয়াকে বলা হয়।

قَوْلُهُ وَبِالْاَسْحَارِ : এটা يَسْتَغْفِرُوْنَ -এর مُتَعَلِّقٌ এবং بَاءٌ টা فِىْ অর্থে اَلْاَسْحَارِ এটা سَحَرٌ -এর বহুবচন। রাতের শেষ ষষ্ঠাংশকে বলা হয়। আর يَسْتَغْفِرُوْنَ -এর عَطْفٌ হয়েছে يَهْجَعُوْنَ -এর উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যারিয়াত প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা যারিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সূরায় তিনটি রুকু, ষাট আয়াত, ৩৬০টি বাক্য ১২৮৭ টি অক্ষর রয়েছে।

এ সূরার আমল : রুগ্ন ব্যক্তির নিকট এ সূরা পাঠ করলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, তার সকল বন্ধু তার অনুগত থাকবে এবং তার রিজিক বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা ক্বাফে হাশরের কথা বলা হয়েছে এবং দলিল দ্বারা হাশরের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও হাশর, তাওহীদ এবং নবুয়তের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সূরা ক্বাফের পরিসমাপ্তিতে হাশরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেই শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমাদেরকে যে হাশরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই ঘটবে।

সূরা যারিয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গী : সূরা ক্বাফে হাশরের সত্যতার দলিল প্রমাণ উপস্থাপনা করা হয়েছে, কিন্তু সমাজে এমন কিছু লোক থাকে, যারা দলিল প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তা করে না। তাদেরকে যে পন্থায় বোঝানো হলে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। সেই পন্থাই আলোচ্য সূরার অবলম্বন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরব জাতির মধ্যে অনেক দোষ থাকলেও একটি বিরাট গুণ ছিল, তার মিথ্যাবাদিতাকে অপছন্দ করতো, বিশেষত শপথ করে মিথ্যা বলাকে তারা ভীষণ অন্যায় মনে করতো। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যে শপথ করে মিথ্যা বলে, সে ধ্বংস হয়ে যায়, এজন্যে কোনো ব্যক্তি যদি শপথ করে কোনো কথা বলতো, তবে তার সত্যতায় তারা পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূলত এ কারণেই আলোচ্য সূরার শুরুতে কয়েকটি জিনিসের শপথ করে কিয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এমন বস্তুসমূহের শপথ করা হয়েছে, যা কিয়ামতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সূরা যারিয়াতেও পূর্বেকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশির ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কিয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং ছওয়াব ও আজাব সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কিয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। যথা– ১. اَلذَّارِيَاتُ ذَرْوًا ২. اَلْحَامِلَاتُ وِقْرًا ৩. اَلْجَارِيَاتُ يُسْرًا এবং ৪. اَلْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا

আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে অগ্রাহ্য একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.) ও আলী মোর্তাযা (রা.)-এর উক্তিতে এই বস্তু চতুষ্টয়ের তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে–

ذَارِيَاتٌ বলে ধূলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। حَامِلَاتِ وِقْرًا -এর শাব্দিক অর্থ– বোঝাবাহী। অর্থাৎ যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جَارِيَاتٌ يُسْرًا বলে পানিতে সচ্ছল গতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। مُقَسِّمَاتِ اَمْرًا -এর অর্থ– সেই সব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিজিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বণ্টন করে। –[ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে মনসুর]

قَوْلُهُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ : حُبُكٌ শব্দটি حَبِيْكَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ– কাপড় বয়নে উদ্ভূত পাড়। এটা পথসদৃশ হয় বলে পথকেও حُبُكٌ বলা হয়। অনেক তাফসীরবিদের মতে এ স্থলে এই অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পথবিশিষ্ট আকাশের কসম। পথ বলে এখানে ফেরেশতাদের যাতায়াতের পথ এবং তারকা ও নক্ষত্রের কক্ষপথ উভয়ই বোঝানো যেতে পারে।

বয়নে উদ্ভূত পাড় কাপড়ের শোভা ও সৌন্দর্যও হয়ে থাকে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে حُبُكٌ -এর অর্থ নিয়েছেন শোভা ও সৌন্দর্য। আয়াতের অর্থ এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের কসম। যে বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য এখানে কসম খাওয়া হয়েছে, তা এই– اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ; বাহ্যত এতে মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ উক্তি করত এবং কখনো উম্মাদ, কখনো জাদুকর, কখনো কবি ইত্যাদি বাজে পদবী সংযুক্ত করত। মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এখানে সম্বোধন করার সম্ভাবনাও আছে। তখন 'বিভিন্ন রূপ উক্তির' অর্থ হবে এই যে, তাদের মধ্যে কেউ তো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁকে সত্যবাদী মনে করে এবং কেউ অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচারণ করে। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ : اُفْكٌ -এর শাব্দিক অর্থ– মুখ ফেরানো। عَنْهُ-এর সর্বনামে দু'টি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা আছে। যথা–

১. এই সর্বনাম দ্বারা কুরআন ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন ও রাসূল থেকে সেই হতভাগাই মুখ ফেরায়, যার জন্য বঞ্চনা অবধারিত হয়ে গেছে।

২. এই সর্বনাম দ্বারা قَوْلٌ مُّخْتَلِفٌ [বিভিন্ন উক্তি] বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের বিভিন্ন রূপ ও পারস্পরিক বিরোধী উক্তির কারণে সেই ব্যক্তিই কুরআন ও রাসূল থেকে মুখ ফেরায়, যে কেবল হতভাগ্য ও বঞ্চিত।

قَوْلُهُ قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ : خَرَّاصٌ -এর অর্থ অনুমানকারী এবং অনুমানভিত্তিক উক্তিকারী। এখানে সেই কাফের ও অবিশ্বাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা কোনো প্রমাণ ও কারণ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করত। কাজেই এর অনুবাদে 'মিথ্যাবাদীর দল' বললেও অযৌক্তিক হবে না। এই বাক্যে তাদের জন্য অভিশাপের অর্থে বদদোয়া রয়েছে। –[মাযহারী]

কাফেরদের আলোচনার পর কয়েক আয়াতেই মুমিন ও পরহেজগারদের আলোচনা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ كَانُوْا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ : ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ও তার বিবরণ : يَهْجَعُوْنَ শব্দটি هُجُوْعٌ থেকে উদ্ভূত এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া। এখানে রাত্রি অতিবাহিত করে, কম নিদ্রা যায় এবং অধিক জাগ্রত থাকে। ইবনে জারীর এই তাফসীর করেছেন। হযরত হাসান বসরী (র) থেকে তাই বর্ণিত আছে যে, পরহেজগারগণ রাত্রিতে জাগরণ ও ইবাদতের ক্লেশ স্বীকার করে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কাতাদা, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এখানে مَا শব্দটি 'না'-বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অল্প অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অল্প অংশ নামাজ ইত্যাদি ইবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোনো অংশে ইবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রা.)-এর মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ জাফর বাকের (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার নামাজের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।

-[ইবনে কাসীর]

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর বর্ণনামতে আহনাফ ইবনে কায়সের উক্তি এই যে- আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আমার চাইতে অনেক উচ্চে, উর্ধ্বে ও স্বতন্ত্র। আমার ক্রিয়াকর্ম তাদের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে না। কারণ তারা রাত্রিতে কম নিদ্রা যায় এবং ইবাদত বেশি করে। এরপর আমি আমার ক্রিয়াকর্ম জাহান্নামবাসীদের ক্রিয়াকর্মের সাথে তুলনা করে দেখলাম যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে। আল্লাহর রহমতে আমি এগুলো থেকে মুক্ত। তাই তুলনা করার সময় আমার ক্রিয়াকর্ম জান্নাতবাসীদের সীমা পর্যন্তও পৌঁছে না এবং আল্লাহর রহমতে জাহান্নামবাসীদের সাথেও খাপ খায় না। অতএব, জানা গেল ক্রিয়াকর্মের দিক দিয়ে আমার মর্তবা তাই, যা কুরআন পাক নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছে-

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا অর্থাৎ যারা ভালোমন্দ ক্রিয়াকর্ম মিশ্রিত করে রেখেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে কমপক্ষে এই সীমার মধ্যে থাকে।

আব্দুর রহামান ইবনে যায়েদ (রা.) বনী তামীমের জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলল, হে আবূ উসামা, আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদের জন্য যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন [অর্থাৎ كَانُوْا قَلِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ], আমরা নিজেদের মধ্যে তা পাই না। কারণ আমরা রাত্রি বেলায় খুব কম জাগ্রত থাকি ও ইবাদত করি। আমার পিতা এর জবাবে বললেন-

طُوْبٰى لِمَنْ رَقَدَ اِذَا نَعَسَ وَاتَّقَى اللّٰهَ اِذَا اسْتَيْقَظَ অর্থাৎ তার জন্য সুসংবাদ, যে নিদ্রা আসলে নিদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু যখন জাগ্রত থাকে, তখন তাকওয়া অবলম্বন করে অর্থাৎ শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করে না। -[ইবনে কাসীর]

উদ্দেশ্য এই যে, কেবল রাত্রিবেলায় অধিক জাগ্রত থাকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় না: বরং যে ব্যক্তি নিদ্রা যেতে বাধ্য হয় এবং রাত্রিতে অধিক জাগ্রত থাকে না, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, সেও ধন্যবাদের পাত্র।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

অর্থাৎ লোক সকল! তোমরা মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম কর এবং রাত্রিবেলায় তখন নামাজ পড়, যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। এভাবে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

-[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ : রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার বরকত ও ফজীলত : অর্থাৎ মুমিন পরহেজগারগণ রাত্রির শেষ প্রহরে গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে। اَسْحَارٌ শব্দটি سَحْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠ প্রহর। এই প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করার ফজিলত অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ; সহীহ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন [কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না]। তিনি ঘোষণা করেন, কোনো তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করবে? কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করব? -[ইবনে কাসীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনার আয়াতে সেই সব পরহেজগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় ক্ষমা প্রার্থনা করার বাহ্যত কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ গুনাহের কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করে?
জবাব এই যে, তাঁরা আল্লাহ তা'আলার আধ্যাত্ম্য জ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য সম্পর্কে সত্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের ইবাদতকে আল্লাহর মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ত্রুটি ও অবহেলার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ : **সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ :** سَائِلْ বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুত্তাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্বীয় অভাব কারো কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের খোঁজখবর নেয়।
বলা বাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুত্তাকীগণ কেবল দৈহিক ইবাদত তথা নামাজ ও রাত্রি জাগরণ করেই ক্ষান্ত হন না; বরং আর্থিক ইবাদতেও অগ্রণী ভূমিকা নেন। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজেদের অভাব কাউকে জানান না। কিন্তু কুরআন পাক এই আর্থিক ইবাদত وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ তারা যেসব ফকির ও মিসকিনকে দান করে, তাদের কাছে নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধনসম্পদে এই ফকিরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেওয়া কোনো অনুগ্রহ হতে পারে না; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত লাভ করার সুখ রয়েছে।
বিশ্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলি রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَفِى الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে [পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে]। অতঃপর মুমিন পরহেজগারদের অবস্থা, গুণাবলি ও উচু মর্তবা বর্ণনা করা। এখন আবার কাফের ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়া নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব এই বাক্যের সম্পর্ক পূর্বোল্লিখিত اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কুরআন ও রাসূলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।
তাফসীরে মাযহারীতে একেও মুমিন-মুত্তাকীদেরই গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مُوْقِنِيْنَ-এর অর্থ আগের مُتَّقِيْنَ -ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহর নিদর্শনাবলিতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। যেমন–
অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগবাগিচাই দেখুন এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ এক-একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র রয়েছে। এমনিভাবে ভূ-পৃষ্ঠের নদীনালা, কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূপৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিগুহা রয়েছে। মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

قَوْلُهُ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ : এ স্থলে নিদর্শনাবলির বর্ণনায় আকাশ ও শূন্যজগতের সৃষ্ট বস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চেয়েও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তি সত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-পৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহর কুদরতের এক-একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে

কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে একফোঁটা মানবীয় বীর্য বিভিন্ন ভূখণ্ডের খাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সূক্ষ্ম উপাদানের নির্যাস হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্য একটি জমাট রক্ত তৈরি হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরি করা হয়। এবং অস্থিকে মাংস পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিষ্প্রাণ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়াার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুখী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিকে বিভিন্ন রূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইঞ্চির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও মেযাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ পাকেরই কুদরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়, স্বয়ং তার অস্তিত্বের মধ্যেই দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তেমন বেশি জ্ঞান-বুদ্ধির দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ : অর্থাৎ আকাশে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তাফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ 'লওহে মাহফুযে' লিপিবদ্ধ থাকা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মানুষের রিজিক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার নির্ধারিত রিজিক থেকে বেঁচে থাকার ও পলায়ন করার ও চেষ্টা করে তবে রিজিক তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড় দেবে। মানুষ মৃত্যুর কবল থেকে যেমন আত্মরক্ষা করতে পারে না, তেমনি রিজিক থেকেও পলায়ন সম্ভবপর নয়। -[কুরতুবী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে রিজিক অর্থ বৃষ্টি অর্থ হলো- বৃষ্টি এবং আকাশ বলে শূন্যজগৎসহ উর্ধ্বজগৎ বোঝানো হয়েছে। ফলে মেঘমালা থেকে বর্ষিত বৃষ্টিকেও আকাশের বস্তু বলা যায়। مَا تُوْعَدُوْنَ বলে জান্নাত ও তার নিয়ামতরাজি বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَآ اَنْتُمْ تَنْطِقُوْنَ : অর্থাৎ তোমরা যেমন নিজেদের কথাবর্তা বলার মাধ্যমে কোনো সন্দেহ কর না, কিয়ামতের আগমনও তেমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত; এতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আস্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, উপরিউক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির কারণ ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে সুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে; কিন্তু বাকশক্তিতে কখনো কোনো ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٤. هَلْ أَتٰىكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ وَهُمْ مَلٰئِكَةٌ إِثْنَا عَشَرَ أَوْ عَشَرَةٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ جِبْرِيْلُ ـ

২৪. আপনার নিকট এসেছে কি? নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত তারা হলেন ১২ জন বা ১০ জন বা তিনজন ফেরেশতা, তাদের মধ্যে হযরত জিবরীল (আ.)-ও ছিলেন।

٢٥. إِذْ ظَرْفٌ لِحَدِيْثِ ضَيْفِ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط أَيْ هٰذَا اللَّفْظَ قَالَ سَلٰمٌ ج أَيْ هٰذَا اللَّفْظُ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ لَا نَعْرِفُهُمْ قَالَ ذٰلِكَ فِيْ نَفْسِهِ وَهُمْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ أَيْ هٰؤُلَاءِ ـ

২৫. যখন إِذْ টা حَدِيْثُ ضَيْفِ -এর ظَرْف হয়েছে তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। অর্থাৎ এই 'সালাম' শব্দটি। উত্তরে তিনি বললেন, 'সালাম' অর্থাৎ এই শব্দটি। এরা তো অপরিচিত লোক। আমি তাদেরকে চিনি না। তিনি [হযরত ইবরাহীম (আ.)] এটা মনে মনে বললেন, এটা হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰؤُلَاءِ

٢٦. فَرَاغَ مَالَ إِلٰى أَهْلِهِ سِرًّا فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ وَفِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ أَيْ مَشْوِيٍّ ـ

২৬. অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) গোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা নিয়ে আসলেন। সূরা হূদে রয়েছে— بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ তথা ভূনা গো-বৎস নিয়ে এলেন।

٢٧. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ ـ عَرَضَ عَلَيْهِمُ الْأَكْلَ فَلَمْ يُجِيْبُوْا ـ

২৭. ও তাদের সামনে রাখলেন এবং বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? তিনি তাদের সম্মুখে খাবার উপস্থাপন করলেন; কিন্তু তারা এতে সাড়া দিল না।

٢٨. فَأَوْجَسَ أَضْمَرَ فِيْ نَفْسِهِ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ذِيْ عِلْمٍ كَثِيْرٍ هُوَ إِسْحَاقُ كَمَا ذُكِرَ فِيْ سُوْرَةِ هُوْدٍ ـ

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হলো অর্থাৎ স্বীয় হৃদয়ের গহীনে ভয় অনুভব করলেন। তারা বললেন, ভীত হবেন না আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত। এবং তারা তাঁকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। অনেক জ্ঞানের অধিকারী পুত্রের। তিনি হলেন হযরত ইসহাক (আ.) যেমনটি সূরা হূদে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٩. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ سَارَةُ فِيْ صَرَّةٍ صَيْحَةٍ حَالٌ أَيْ جَاءَتْ صَائِحَةً فَصَكَّتْ وَجْهَهَا لَطَمَتْهُ وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ لَمْ تَلِدْ قَطُّ وَعُمْرُهَا تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ سَنَةً وَعُمْرُ إِبْرَاهِيْمَ مِائَةُ سَنَةٍ أَوْ عُمْرُهُ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً وَعُمْرُهَا تِسْعُوْنَ سَنَةً ـ

২৯. তখন তাঁর স্ত্রী আসল হযরত সারা (আ.) চিৎকার করতে করতে فِيْ صَرَّةٍ এটা حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ চিৎকার রত অবস্থায় আসল। এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে? যে কখনো সন্তান প্রসব করেনি, আর তাঁর বয়স হয়েছে ৯৯ বছর। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স একশত বৎসর। অথবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ১২০ বছর আর তাঁর স্ত্রীর বয়স ৯০ বছর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٠. قَالُوْا كَذٰلِكَ اَیْ مِثْلَ قَوْلِنَا فِی الْبُشَارَةِ قَالَ رَبُّكِ ط اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِیْمُ فِیْ صُنْعِهٖ الْعَلِیْمُ بِخَلْقِهٖ.

৩০ তারা বললেন, এরূপই অর্থাৎ আমাদের সুসংবাদের মতোই আপনার প্রতিপালক বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময় স্বীয় কর্মে সর্বজ্ঞ স্বীয় সৃষ্টির ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ هَلْ اَتٰكَ حَدِیْثُ ضَیْفِ اِبْرَاهِیْمَ : এখানে هَلْ টা আগ্রহ দেওয়া হৃদয়ের আকর্ষণ সৃষ্টির করা ও এই ঘটনার মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য এসেছে। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, এখানে هَلْ টা قَدْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন- আল্লাহর বাণী- هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ -এর মধ্যে هَلْ টা قَدْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খেদমতে মেহমান হিসেবে আগত ফেরেশতার সংখ্যা তিনের অধিক ছিল, যা ضُیُوْف তথা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। অথচ এখানে ضَیْف তথা এক বচনের শব্দ উল্লেখ কর্‌রার কারণ কি?

উত্তর : ضَیْف হলো মাসদার। আর মাসদার এক বচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয় এবং এটা تَثْنِیَةٌ ও جَمْعٌ হয় না। কাজেই কোনো প্রশ্ন থাকে না।

قَوْلُهٗ اِذْ دَخَلُوْا : কেউ কেউ বলেন, اِذْ دَخَلُوْا টা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের ظَرْف আর সেটাই তাতে নসব দিয়েছে। আবার কেউ কেউ حَدِیْث-কে عَامِل মেনেছেন। অর্থাৎ- هَلْ اَتَاكَ حَدِیْثُهُمُ الْوَاقِعُ فِیْ وَقْتِ دُخُوْلِهِمْ عَلَیْهِ

আবার কেউ কেউ اَلْمُكْرَمِیْنَ-কে نَاصِبْ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) আগত মেহমানদেরকে সম্মান করেছিলেন।

قَوْلُهٗ فَقَالُوْا سَلَامًا : এখানে سَلَامًا হলো مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ-এর নসব দানকারী ফে'ল سَلَّمْتُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ نُسَلِّمُ عَلَیْكُمْ سَلَامًا অথবা سَلَّمْتُ سَلَامًا মাসদার যা ফে'লের প্রতিনিধিত্ব করছে; এজন্যই তার ফে'লকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ سَلَامٌ : হযরত ইবরাহীম (আ.) উত্তরে বললেন سَلَامٌ ; এখানে سَلَامٌ টা نَكِرَهْ হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া বৈধ হয়েছে। কেননা ثُبَات এবং دَوَام-এর উপর বুঝানোর জন্য رَفْع-এর দিকে পরিবর্তন করেছে। যাতে করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সালাম মেহমানদের সালাম থেকে উত্তম হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ فَاَوْجَسَ : তিনি পেলেন, অনুভব করলেন, এটা اِیْجَاسٌ থেকে مَاضِیْ-এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ। اِیْجَاسٌ এর অর্থ হলো অন্তরে অনুভব করা। হৃদয়ে গোপন বা অস্পষ্ট আওয়াজ আসা। -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهٗ اَضْمَرَ فِیْ نَفْسِهٖ : শুধুমাত্র অর্থ বর্ণনার জন্যই এটাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ صَرَّةٌ : কঠিন চেচামেচিকে صَرَّةٌ বলা হয়। صَرِیْرُ الْبَابِ অর্থ- দরজার আওয়াজ। صَرِیْرُ الْقَلَمِ অর্থ- কলমের দ্বারা লেখার খশখশানি আওয়াজ।

اَقْبَلَتْ صَائِحَةً অর্থ হলো- جَاءَتْ صَائِحَةً অর্থাৎ চিৎকার করতে করতে আসল।

আবার কেউ কেউ اَقْبَلَتْ-এর অনুবাদ করেছেন اَخَذَتْ দ্বারা। অর্থাৎ হযরত সারা (আ.) চিৎকার করা আরম্ভ করেছিলেন। এটা اَقْبَلَتْ شَتَمَنِیْ-এর মধ্যে থেকে। অর্থাৎ তুমি আমাকে গালি দেওয়া আরম্ভ করে দিলে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا : হযরত সারা (আ.) এই বার্ধক্যজনিত অবস্থায় সন্তানের সুসংবাদ শুনে অতিশয় আশ্চার্যান্বিত হয়ে স্বীয় মুখ ঢেকে ফেললেন قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيْمٌ অর্থ হলো- اَنَا عَجُوزٌ عَقِيْمٌ فَكَيْفَ اَلِدُ আমি তো অতিশয় বন্ধ্যা বৃদ্ধা আমি কিভাবে সন্তান জন্ম দিব?

قَوْلُهُ كَذَالِكَ : এটা উহ্য মাসদারের সিফত হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অর্থাৎ- قَالَ قَوْلاً مِثْلَ ذَالِكَ الَّذِىْ قُلْنَا অর্থাৎ তিনি এরূপই বলেছেন, যেরূপ আমরা বললাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মেহমানগণের ঘটনা : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট মানব রূপ ধারণ করে কয়েকজন ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করলেন এবং একটি বাছুর ভাজা করিয়ে তাদের সম্মুখে পরিবেশন করলেন। কিন্তু এত সুস্বাদু খাদ্য মেহনদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তারা নিষ্ক্রীয় ছিলেন। খাবারের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না। অবস্থা দেখে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন, মেহমানগণ যদিও মানব রূপ ধারণ করছেন, প্রকৃত অবস্থায় তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা।

ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ দিলেন যে, তিনি এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তান লাভ করেবেন । অদূরেই তাঁর স্ত্রীর দন্ডায়মান ছিলেন। তিনি এ সুসংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কেননা তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধা, তার জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন, এটি আমাদের কথা নয়; বরং পরাক্রমশালী, মহান আল্লাহ পাকের ঘোষণা। তাই এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই, কেননা আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ফেরেশতাগণ যে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ.

অর্থাৎ "[হে রাসূল!] ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের ঘটনা আপনার নিকট পৌঁছেছে কি"?

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, মেহমান তথা ফেরেশতাগণের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রা.) এবং আতা (র.) বলেছেন, ফেরেশতাগণের সংখ্যা ছিল তিনজন। আর তাঁরা হরেন- হযরত জিবরাঈল (আ.) মিকাঈল (আ.) এবং ইস্রাফীল (আ.)।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (র.) বলেছেন, ফেরেশতাগণের সংখ্যা ছিল আটজন, হযরত জিবরাইল (আ.) সহ আরো সাতজন।

যাহহাক (র.) বলেছেন, তাঁরা ছিলেন নয় জন, মোকাতিল (র.) বলেছেন, বার জন ফেরেশতা ছিলেন।

সুদ্দী (র.)-এর মতে, তাঁরা ছিলেন ১১ জন। তারা অল্প বয়স্ক ছেলেদের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন। তাদের চেহারা ছিল অত্যন্ত জ্যোতির্ময়। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের পরিচয় পাওয়ার পূর্বেই মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছেন। এটি নবী-রাসূলগণের তরিকা। হযরত রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার কর্তব্য হলো মেহমানের আপ্যায়ন করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হুজুর ﷺ -এর নিকট আরজ করল, ইসলামে কোন কাজটি উত্তম, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, খাবার খাওয়ানো এবং সালাম দেওয়া পরিচিত হোক কিংবা অপরিচিত।

আলোচ্য আয়াতে مُكْرَمِيْنَ শব্দটির অর্থ হলো সম্মানিত, কেননা তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা আর ফেরেশতাগণ নিঃসন্দেহে সম্মানিত। আলোচ্য আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্ত্বনার জন্য অতীত যুগের কয়েকজন পয়গাম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَقَالُوْا سَلَامًا ـ قَالَ سَلَامٌ : ফেরেশতাগণ বলেছিল سَلَامًا ; হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাবে বললেন- سَلَامٌ ; কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শান্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কুরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জবাব সালামকারীর ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও! হযরত ইবরামীম (আ.)-এর এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

قَوْلُهُ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ : مُنْكَرٌ শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামের গুনাহের কাজও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গুনাহকেও مُنْكَرٌ বলে দেওয়া হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন, এরা তো অপরিচিত লোক। এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

قَوْلُهُ رَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ : رَاغَ শব্দটি رَوْغٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- গোপনে চলে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্য এভাবে গৃহে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা এ কাজে বাধা দিত।

মেহমানদারির উত্তম রীতিনীতি : আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এই আয়াতে মেহমানদারির কতিপয় উত্তম রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। **প্রথমত** এই যে, তিনি প্রথমে মেহমানদেরকে আহার্য আনার কথা জিজ্ঞাসা করেননি; বরং চুপিসারে গৃহে চলে গেলেন। অতঃপর অতিথি আপ্যায়নের জন্য তাঁর কাছে যে উত্তম বস্তু অর্থাৎ গোবৎস ছিল, তাই জবাই করলেন এবং ভাজা করে নিয়ে এলেন। **দ্বিতীয়ত,** আনার পর তা খাওয়ার জন্য মেহমানদেরকে ডাকলেন না। বরং তারা যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এনে সামনে রেখে দিলেন। **তৃতীয়ত,** আহার্য বস্তু পেশ করার সময় কথাবার্তার ভঙ্গিতে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি ছিল না; বরং বলেছেন- اَلَا تَاْكُلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি খাবে না। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, খাওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও আমার খাতিরে কিছু খাও।

قَوْلُهُ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ : অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) তাদের না খাওয়ার কারণে তাদের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্রসমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোনো মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশঙ্কা করা হতো। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা-জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়িতে কিছু খেত, তার ক্ষতি সাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশঙ্কার কারণ ছিল।

قَوْلُهُ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ : صَرَّة-এর অর্থ হলো অসাধারণ আওয়াজ। কলসের শব্দকে صَرِيْرٌ বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ প্রথমত আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জবাবে ফেরেশতাগণ বললেন- كَذٰلِكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজটি এমনিভাবে হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আ.) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স একশ বছর ছিল। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৩১. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ شَأْنُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ .

৩১. হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিশেষ কাজ কি?

৩২. قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ لا كَافِرِيْنَ اَيْ قَوْمِ لُوْطٍ .

৩২. তারা বললেন, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। কাফের সম্প্রদায়ের প্রতি অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের প্রতি।

৩৩. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ لا مَطْبُوْخٍ بِالنَّارِ .

৩৩. তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা, আগুনে পোড়ানো।

৩৪. مُّسَوَّمَةً مُعَلَّمَةً عَلَيْهَا اِسْمُ مَنْ يَرْمِيْ بِهَا عِنْدَ رَبِّكَ ظَرْفٌ لَهَا لِلْمُسْرِفِيْنَ بِاِتْيَانِهِمُ الذُّكُوْرَ مَعَ كُفْرِهِمْ .

৩৪. যা চিহ্নিত অর্থাৎ যে কঙ্কর দ্বারা যাকে ধ্বংস করা হবে তাতে তার তার নাম লিপিবদ্ধ করা ছিল। আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে عِنْدَ رَبِّكَ এটা مُسَوَّمَةً -এর জন্য ظَرْف হয়েছে সীমালজ্ঞনকারীদের জন্য তাদের কুফরির সাথে সাথে পুরুষের সাথে উপগত হওয়ার কারণে।

৩৫. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا اَيْ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ج لِاِهْلَاكِ الْكَافِرِيْنَ .

৩৫. সেথায় অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের জনপদে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম কাফেরদেরকে বিনাশ সাধন করার জন্য।

৩৬. فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ج وَهُمْ لُوْطٌ وَابْنَتَاهُ وُصِفُوْا بِالْاِيْمَانِ وَالْاِسْلَامِ اَيْ هُمْ مُصَدِّقُوْنَ بِقُلُوْبِهِمْ عَامِلُوْنَ بِجَوَارِحِهِمِ الطَّاعَاتِ .

৩৬. আর সেথায় আমি একটি পরিবার ব্যতীত কোনো আত্মসমর্পণকারী পাইনি। আর তারা হলো হযরত লূত (আ.) ও তাঁর দু কন্যার সন্তানগণ। পরিবারবর্গের ঈমান এবং ইসলামের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা স্বীয় হৃদয়ের গহীন থেকে সত্যায়নকারী এবং স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আনুগত্যের উপর আমলকারী।

৩৭. وَتَرَكْنَا فِيْهَآ بَعْدَ اِهْلَاكِ الْكَافِرِيْنَ اٰيَةً عَلَامَةً عَلٰى اِهْلَاكِهِمْ لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ط فَلَا يَفْعَلُوْنَ مِثْلَ فِعْلِهِمْ .

৩৭. আমি তাতে রেখেছি কাফেদেরকে ধ্বংস করার পর একটি নিদর্শন তাদের ধ্বংসের উপর একটি চিহ্ন যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে তাদের জন্য। যেন তারা তাদের মতো অপকর্ম না করে।

Free @ www.eilm.weebly.com

৩৮. وَفِي مُوسَى مَعْطُوفٌ عَلَى فِيهَا الْمَعْنَى وَجَعَلْنَا فِي قِصَّةِ مُوسَى آيَةً إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ مُتَلَبِّسًا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ . بِحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ .

৩৮. এবং নিদর্শন রেখেছি হযরত মূসা (আ.)-এর বৃত্তান্তে এর আতফ হলো فِيهَا-এর উপর অর্থ হলো আমি হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতেও নিদর্শন রেখেছি যখন আমি তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।

৩৯. فَتَوَلَّى أَعْرَضَ عَنِ الْإِيمَانِ بِرُكْنِهِ مَعَ جُنُودِهِ لِأَنَّهُمْ لَهُ كَالرُّكْنِ وَقَالَ لِمُوسَى هُوَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ .

৩৯. তখন সে মুখ ফিরিয়ে নিল ঈমান থেকে ক্ষমতার দম্ভে তার সৈন্য সামন্তসহ কেননা তারা তার জন্য স্তম্ভের মতো ছিল। এবং হযরত মূসা (আ.)-কে বলল যে, তিনি হয় এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।

৪০. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ طَرَحْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ الْبَحْرِ فَغَرِقُوا وَهُوَ أَيْ فِرْعَوْنُ مُلِيمٌ آتٍ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ مِنْ تَكْذِيبِ الرُّسُلِ وَدَعْوَى الرُّبُوبِيَّةِ .

৪০ সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম ফলে ডুবে মরল সেতো ছিল অর্থাৎ ফেরাউন তিরস্কারযোগ্য অর্থাৎ এরূপ কর্ম সম্পাদনকারী ছিল যার কারণে তাকে তিরস্কার করা যায়, আর তা ছিল রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ও রব তথা প্রতিপালক হওয়ার দাবি করা।

৪১. وَفِي إِهْلَاكِ عَادٍ آيَةٌ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ج هِيَ الَّتِي لَا خَيْرَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تَحْمِلُ الْمَطَرَ وَلَا تُلْقِحُ الشَّجَرَ وَهِيَ الدَّبُورُ .

৪১. এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের' ধ্বংসের ঘটনায় নিদর্শন রয়েছে। যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু; যাতে কোনোরূপ কল্যাণ ছিল না। কেননা তা বৃষ্টিকে বহন করেনি এবং বৃক্ষে ফলও উৎপাদন করেনি আর তা ছিল পশ্চিমা বায়ু।

৪২. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ كَالْبَالِي الْمُتَفَتِّتِ .

৪২. এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল মানুষ অথবা সম্পদ তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলাম। পঁচা, বাসি ও পুরানো হাড়ের ন্যায় টুকরো টুকরো করে দিত

৪৩. وَفِي إِهْلَاكِ ثَمُودَ آيَةٌ إِذْ قِيلَ لَهُمْ بَعْدَ عَقْرِ النَّاقَةِ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ أَيْ إِلَى انْقِضَاءِ آجَالِكُمْ كَمَا فِي آيَةٍ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .

৪৩. আরো নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে তাদের ধ্বংসের মধ্যে যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল উটকে বিনাশ করার পর স্বল্পকাল ভোগ করে দাও অর্থাৎ স্বীয় জীবনের সময়/হায়াত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। যেমন এ আয়াতে এসেছে– تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বাড়িঘরে তিন দিন উপভোগ করে নাও!

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٤. فَعَتَوْا تَكَبَّرُوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ اَىْ عَنْ اِمْتِثَالِهِ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بَعْدَ مُضِىِّ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ اَىِ الصَّيْحَةُ الْمُهْلِكَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اَىْ بِالنَّهَارِ.

৪৪. কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ মেনে নিতে অহঙ্কার প্রদর্শন করল ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর; অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক বজ্রাঘাত। এবং তারা তা দেখাতে ছিল। অর্থাৎ দিনের বেলায়।

٤٥. فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ اَىْ مَا قَدَرُوْا عَلَى النُّهُوْضِ حِيْنَ نُزُوْلِ الْعَذَابِ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ عَلٰى مَنْ اَهْلَكَهُمْ.

৪৫. তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণের সময় তারা দাঁড়াতেও সক্ষম হয়নি। এবং তা প্রতিরোধ ও করতে পারল না। তাদের ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে।

٤٦. وَقَوْمَ نُوْحٍ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلٰى ثَمُوْدَ اَىْ وَفِىْ اِهْلَاكِهِمْ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اٰيَةٌ وَبِالنَّصْبِ اَىْ وَاَهْلَكْنَا قَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اَىْ قَبْلَ اِهْلَاكِ هٰؤُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ.

৪৬. আমি ধ্বংস করেছিলাম নূহ সম্প্রদায়কে قَوْمَ نُوْحٍ -এর مِيْم বর্ণে যের সহকারে ثَمُوْدَ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে অর্থাৎ তাদেরকে আকাশের ও পৃথিবীর পানি দ্বারা ধ্বংস করার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। এবং مِيْم বর্ণে যবর সহকারে অর্থাৎ আমি নূহ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। এদের পূর্বে অর্থাৎ উল্লিখিত মিথ্যাবাদীদেরকে ধ্বংস করার পূর্বে তারা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ : এটা একটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه যা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তরের জন্য এসেছে। মনে হয় যেন এরূপ বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) ফেরেশতাদের সঙ্গে কথাবার্তার পর কি বললেন? উত্তর দেওয়া হলো– قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ

قَوْلُهُ خَطْبُكُمْ : خَطْبٌ অর্থ হলো শান, কাহিনী, মহান বিষয় এবং গুরুত্ব পূর্ণ কাজ।

قَوْلُهُ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ مَطْبُوْخٍ بِالنَّارِ : حِجَارَةً এটা حَجَرٌ -এর বহুবচন।

প্রশ্ন : مِنْ طِيْنٍ বৃদ্ধিকরণ দ্বারা লাভ কি হয়েছে।

উত্তর: এই বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِحْتِمَال مَجَازِىْ -কে প্রতিহত করা। কেননা কোনো কোনো সময় حِجَارَةٌ এবং حَجَرٌ শিলাখণ্ডকেও বলা হয়। حِجَارَة -এর মাজাযী অর্থ উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে লূত সম্প্রদায়কে শিলা খণ্ড দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। বিষয়টি এরূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ এতে يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ -কে বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَجَازٌ -এর সম্ভাবনাকে বিদূরিত করা। কেননা কোনো কোনো সময় দ্রুত ধাবমান ব্যক্তিকেও مَجَازًا তথা অপ্রকৃতরূপে طَائِرٌ বলে দেওয়া হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রশ্ন : মুসান্নেফ (র.)-এর مَطْبُوخٌ بِالنَّارِ -এর বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : এটা একটা সংশয়ের অপনোদন যে, حِجَارَة মাটির হয় না তথাপিও এখানে মাটির পাথর কেনা বলা হলো? এখানে حِجَارَةً مِنْ طِيْنٍ দ্বারা আগুনে পোড়ানো মাটি উদ্দেশ্য। যা শক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পাথরের মতো হয়ে থাকে। এটাকে سِجِّيْل বলা হয়। এটা মূলত سنگ گل -এর আরবিকৃত। যাকে কঙ্কর বলা হয়।

قَوْلُهُ مُسَوَّمَةً : এর অর্থ হলো مُعَلَّمَةً অর্থাৎ চিহ্নিত, مُسَوَّمَةً এটা হয়তো حِجَارَةً -এর সিফত হওয়ায় مَنْصُوْب হয়েছে অথবা حِجَارَة থেকে حَال হওয়ায় مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ عِنْدَ رَبِّكَ : এটা مُسَوَّمَةً -এর ظَرْف হয়েছে অর্থাৎ- مُعَلَّمَةً عِنْدَهُ

قَوْلُهُ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا : এখানে থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণীর সূচনা হচ্ছে পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ফেরেশতাদের কথোপকথন ছিল।

প্রশ্ন : فِيْهَا -এর যমীরের مَرْجِعْ হলো লূত সম্প্রদায়ের জনপদ অথচ পূর্বে কোথাও লূত সম্প্রদায়ের জনপদের উল্লেখ নেই। এতে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর : যেহেতু লূত সম্প্রদায়ের জনপদ প্রসিদ্ধ ও مَعْهُوْدٌ فِى الذِّهْنِ ছিল, তাই যমীর নেওয়া সঠিক হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِىْ مُوْسٰى : এর আতফ হলো فِيْهَا -এর উপর এবং تَرَكْنَا -এর অধীনে। যেমনটি মুফাসসির (র.) جَعَلْنَا فِىْ قِصَّةِ مُوْسٰى اٰيَةً বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি বিচক্ষণদের জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রেখে দিয়েছি।

قَوْلُهُ مَعَ جُنُوْدِه : এটা বৃদ্ধি করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, بِرُكْنِهٖ -এর মধ্যে بَاء টা مَعَ অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ : اَوْ টা وَاوْ অর্থেও হতে পারে। আর এটাই বেশি ভালো মনে হয়। কেননা সে হযরত মূসা (আ.) কে এই উভয় উপাধিতেই স্মরণ করত। পবিত্র কুরআনের এক স্থানে ফেরাউনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে- هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ [এতো দক্ষ জাদুকর] অন্যত্র ফেরাউনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে- اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, اَوْ টা وَاوْ অর্থে হয়েছে।

অথবা اَوْ তার নিজ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্প্রদায়কে সংশয় ও অস্পষ্টতার মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়া।

قَوْلُهُ وَجُنُوْدَهُ : এটাও ঠিক আছে যে, اَخَذْنَاهُ -এর মাফউলের যমীরের উপর আতফ হয়েছে এবং এটা مَفْعُوْل مَعَهٗ হয়েছে আর এটাই প্রকাশ্য।

قَوْلُهُ عَقِيْمٌ : عَقِيْم বলা হয় বন্ধ্যা নারীকে اَلرِّيْحَ الْعَقِيْمَ বলা হয় অকল্যাণকর বায়ুকে যা ক্ষতিকর হয়ে থাকে, যা বৃক্ষে ফল জন্মায় না এবং বৃষ্টিও বহন করে আনে না।

অধিকাংশ মুফাসসিরের ধারণা মতে এই বায়ু ছিল পশ্চিমা বায়ু। হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন- نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ আবার কেউ কেউ দক্ষিণা বায়ুও উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

قَوْلُهُ لَا تُلْقِحُ : এটা اِلْقَاحٌ থেকে নির্গত। অর্থ হলো, গর্ভবতী করা। আর বাবে سَمِعَ হতে لَقِحًا অর্থ হলো- গর্ভবতী হওয়া।

قَوْلُهُ الصَّعِقَةُ : صَاعِقَه আকাশের বিজলীকেও বলা হয় এবং চেচামেচি করে চিৎকার করাকেও বলা হয়। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য, যাতে করে তা অন্য আয়াত অর্থাৎ اِنَّ عَذَابَهُمُ الصَّيْحَةُ -এর বিপরীত না হয়।

قَوْلُهُ عَلٰى مَنْ اَهْلَكَهُمْ : এটা وَمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ -এর তাফসীর। অর্থাৎ সে তার ধ্বংসকারীর উপর বিজয়ী হতে পারেনি। অথবা তার থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেনি। তবে এই অর্থ ঠিক নয়। কেননা, কেউ আল্লাহর থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে না এবং বিজয় লাভ করতেও সক্ষম নয়। আল্লামা মহল্লী (র.) যদি عَلٰى مَنْ اَهْلَكَهُمْ -এর পরিবর্তে وَمَا كَانُوْا دَافِعِيْنَ عَنْ اَنْفُسِهِمُ الْعَذَابَ বলতেন, তবে উত্তম হতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ : **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ইরাক থেকে সিরিয়ায় হিজরত করছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ.) তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। হযরত লূত (আ.) সদুম, আমুরা প্রভৃতি জনপদের জন্যে নবী মনোনীত হয়েছিলেন। এ জনপদগুলো বর্তমানে জর্দানের অন্তর্ভুক্ত। জর্দানের বিখ্যাত 'মৃত সাগরের' উপকূলেই ছিল এ জনপদগুলোর অবস্থান।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর তাঁবুর দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় কয়েকজন আগন্তুক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। মেহমানদারি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাই আগন্তুকদের পরিচয় লাভের পূর্বেই তিনি তাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁরা খাদ্য গ্রহণে কোনো প্রকার আগ্রহ বোধ করলেন না, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত এবং ভীত হলেন। মানবরূপী এ আগন্তুকগণ তখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্যে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই, আমরা আল্লাহ পাকের প্রেরিত ফেরেশতা, আমরা আপনাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করছি। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের সঙ্গে যে বাক্যালাপ করছিলেন, তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে, ইরশাদ হয়েছে- قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম বলেন, হে ফেরেশতাগণ! তবে তোমাদের উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছ?

ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশ্নের জবাব দিলেন এভাবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ অর্থাৎ "তারা বলেন, আমরা এক পাপিষ্ঠ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি"।

অর্থাৎ হযরত লূত (আ.)-এর জাতির প্রতি, যারা শুধু জঘন্য নিন্দনীয় কুকর্মেই লিপ্ত হয়নি; বরং এতদ্ব্যতীত তারা ছিল ডাকাত, লুটেরা, অশ্লীল কুকর্মে লিপ্ত, চরম নির্লজ্জ আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত লূত (আ.)-কে প্রেরণ করছিলেন; কিন্তু তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে এবং বলেছে, আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আজাব নিয়ে আসুন। এমন অবস্থায় হযরত লূত (আ.) দরবারে ইলাহীতে দোয়া করলেন এভাবে, "হে আমার পরওয়ারদেরগার! আমাকে এ জালেমদের জুলুম থেকে হেফাজত কর, এ জঘন্য চরিত্রহীন লোকদের মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য কর এবং আমাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান কর"।

আল্লাহ পাক হযরত লূত (আ.)-এর দোয়া কবুল করলেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করলেন। পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ অর্থাৎ যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করাই হলো আমাদের কাজ।

حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ হলো কংকর এবং সেই জমাট মাটি, যা পাথরে রূপান্তরিত হয়, এমন প্রস্তর বর্ষণ করে তাদের শাস্তি বিধানই হলো আমাদের কর্মসূচি।

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতে পারলেন যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহর ফেরেশতা। অতএব তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোন অভিযানে আগমন করেছেন? তারা হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আজাব নাজিল করার কথা বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয় মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা হবে।

قَوْلُهُ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ : অর্থাৎ কংকরগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ চিহ্নযুক্ত হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্য কংকরটি প্রেরিত হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে লূতের আজাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) গোটা জনপদকে উপরে তুলে উল্টিয়ে দেন। এটা প্রস্তর বর্ষণের পরিপন্থি নয়। প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কওমে লূতের পর হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়, ফিরাউন প্রমুখ সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন মূসা (আ.) সত্যের পয়গাম দেন তখন বলা হয়েছে فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.)-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও পরিরষদবর্গের উপর ভরসা করে। رُكْن-এর শাব্দিক অর্থ- শক্তি। হযরত লূত (আ.)-এর বাক্যে اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এরপর আদ সম্প্রদায়, সামূদ এবং পরিশেষে কওমে নূহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত : হযরত লূত (আ.)-এর জাতির এ ধ্বংসলীলা, তাদের এ শোচনীয় পরিণতি অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে নিঃসন্দেহে একটি শিক্ষাণীয় দৃষ্টান্ত। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, যারা এ পৃথিবীতে অন্যায়, অশ্লীল অমানবিক কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এমনকি এসব ক্ষেত্রে নবীর নিকাত্মীয় হওয়াও আল্লাহ পাকের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হয় না।

قَوْلُهُ وَفِىْ مُوْسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ : যেভাবে হযরত লূত (আ.)-এর জাতির ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায়ও পরবর্তী কালের মানুষের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ তথা বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাঁর হাতের লাঠিটি বিরাটকায় অজগরে পরিণত হতো, যখন হযরত মূসা (আ.) তাকে স্বহস্তে স্পর্শ করতেন, তখন তা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হতো। কিন্তু এসব মুজেযা দেখেও ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানালো, ক্ষমতার দম্ভ তার ঈমান আনয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

قَوْلُهُ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ : হযরত মূসা (আ.)-এর বিস্ময়কর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে সে তাঁকে জাদুকর বলেছে, আর যেহেতু ক্ষমতার দম্ভে সে আত্মহারা হয়েছিল এবং দুনিয়ার লোভে মোহে মুগ্ধ-মত্ত হয়ে সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল, তাই তাওহীদের আহবানে সাড়া দিতে সে ব্যর্থ হয়েছে এবং হযরত মূসা (আ.)-কে পাগল বলেছে। অথচ ক্ষমতার দম্ভে সে নিজেই হয়ে পড়েছিল নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। কেননা তার কথাতেই রয়েছে স্ববিরোধিতা এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হযরত মূসা (আ.)-কে সে পাগল এবং জাদুকর বলেছে। যদি তিনি পাগল হন তবে জাদুকর কি করে হলেন? কেননা যারা জাদুকর, তারা হয় অত্যন্ত চতুর, আর যদি তিনি পাগল হন, তবে তাঁকে জাদুকর বলা যায় না। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফেরাউনের কোনো কথাই সত্য নয়।

قَوْلُهُ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُمْ مُلِيْمٌ : যেহেতু ফেরাউন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীর সাড়া দেয়নি, তাওহীদে বিশ্বাস করেনি এবং হযরত মূসা (আ.)-এর মুজেযাসমূহকে জাদু বলে আখ্যা দিয়েছে, তাই আল্লাহ পাক তার শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, তাকে তার দলবলসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করেছেন, আর হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসরণের বরকতে বনী ইসরাঈল নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করল।

قَوْلُهُ وَهُوَ مُلِيْمٌ : অর্থাৎ কুফর ও নাফরমানি, দম্ভ ও অহমিকা এবং সত্যের সঙ্গে শত্রুতা পোষণের দোষে ফেরাউন ছিল অভিযুক্ত এবং তিরস্কারের যোগ্য। আর এজন্যেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন– وَفِىْ مُوْسَى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ আর হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায়ও রয়েছে উপদেশ, যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করি।

ঈমানী শক্তির বিজয় অবশ্যম্ভাবী : প্রকাশ্য দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা হলো, ফেরাউন অত্যন্ত শক্তিধর, দাম্ভিক ও জালেম নৃপতি ছিল। পক্ষান্তরে, হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট প্রকাশ্যে কোনো শক্তিই ছিল না, কিন্তু তাঁর নিকট ছিল সত্য, এ সত্যের দাওয়াত নিয়েই তিনি এসেছিলেন ফেরাউনের কাছে, তিনি আল্লাহ পাকের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ছিলেন ঈমানী ও রূহানী শক্তির অধিকারী, আর ফেরাউন ছিল জাগতিক শক্তির অধিকারী। জাগতিক শক্তি কখনো রূহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তির মোকাবিলা করতে পারে না। যেমন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং লোহিত সাগরে তার সমাধি ঘটেছে।

ঠিক এমনিভাবে নমরুদ জাগতিক শক্তির অধিকারী হয়েও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রুহানী শক্তির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তদ্রূপ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে সকল জাগতিক শক্তি যুক্তফ্রন্ট করে বারংবার মোকাবিলা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে কা'বা শরীফের ভেতর প্রবেশ করে পাঠ করেছিলেন পবিত্র কুরআনের এ আয়াতখানি– وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"[হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেওয়ারই যোগ্য"।

পূর্ববর্তী আয়াতে কওমে লূত এবং ফেরাউনের পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এ ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। আল্লাহ পাক অবাধ্য কাফেরদের ধ্বংসকে দুনিয়ার মানুষের জন্যে নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন, যাতে করে মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আর একই উদ্দেশ্যে এ আয়াত থেকে আদ, সামুদ এবং নূহ জাতির শোচনীয়

Free @ www.eilm.weebly.com

পরিণতির কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে- وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ অর্থাৎ 'আর আদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে নিদর্শন, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম কল্যাণশূন্য বায়ু'।

اَلرِّيْحَ الْعَقِيْمَ অর্থাৎ এমন বায়ু যাতে কোনো কল্যাণ থাকে না। সাধারণত বায়ু হয় বৃষ্টির বাহন, কিন্তু আদ জাতির নিকট প্রেরিত বায়ুতে ছিল না বৃষ্টি, এতে ছিল শুধু ধ্বংস। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ .

'যে কোনো জিনিসের উপরই ঐ বায়ু প্রবাহিত হয়েছে, তাকেই সম্পূর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছেড়েছে.।

আল্লাহ পাকের নাফরমানি এবং সত্যদ্রোহিতার অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ আদ জাতির ধ্বংস নেমে আসে, ঝড় এবং ঘূর্ণিবাতে দুরাত্মা কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়, আর এ আজাব আসে তাদের কৃতকর্মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ। এতে রয়েছে পৃথিবীর অন্য মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়।

قَوْلُهُ وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ : যেভাবে কওমে লূত, কওমে ফেরাউন এবং কওমে আদ -এর ধ্বংসলীলায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এ পর্যায়ে সামূদ জাতির ঘটনায়ও রয়েছে মানবজাতির জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়। ইরশাদ হয়েছে- وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ

অর্থাৎ সামূদ জাতিকে ধ্বংস করার ব্যাপারেও আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ পাক পাহাড় থেকে তাদের জন্যে একটি উষ্ট্রী বের করে দিয়েছেন, আর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেউ যেন উষ্ট্রীটির ক্ষতিসাধন না করে। কিন্তু দুরাত্মা কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত সালেহ (আ.)-এর শত বাধা সত্ত্বেও ঐ উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে। তখন হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের গৃহে তোমরা তিনদিন যাবত আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ .

কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করলো। হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনলো না, তিনদিন পর্যন্ত তাদের ঐ অবস্থায় রেখে দেওয়া হলো, এরপর আল্লাহ পাকের আজাব আপতিত হলো এবং তা স্বচক্ষে তারা দেখছিল, আর তাদের গৃহেই তাদেরকে ধ্বংস করা হলো।

قَوْلُهُ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ : সামূদ জাতিকে হেদায়েত করার জন্যে আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী হযরত সালেহ (আ.) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেনি, তাই তাদের প্রতি আজাব নাজিল হলো, আর তা এত আকস্মিকভাবে আপতিত হলো যে, আজাব নাজিল হওয়ার পর তারা পলায়নের কোনো অবকাশ পায়নি, এমনকি তারা পলায়নের জন্যে দাঁড়াতেও পারেনি। আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই তারা করতে পারেনি। হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আরো কিছু দিন ভোগ করে নাও, এটি ছিল তাদের প্রতি তাঁর সতর্কবাণী।

ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, এই ভোগের সময় ছিল মাত্র তিন দিন। এরপরই তারা কোপগ্রস্ত হয়। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের আদেশ কার্যকর হয় এবং তারা তাদের নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

-[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬, পৃ. ১২৭]

قَوْلُهُ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ : "আর ইতিপূর্বে আমি নূহের জাতিকেও ধ্বংস করেছি, নিশ্চয় তারা ছিল অবাধ্য জাতি।" অর্থাৎ কওমে লূত, ফেরাউন, আদ এবং সামূদ জাতির পূর্বে হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিকেও তাদের অন্যায় অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা তারা ছিল অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। ইতিপূর্বে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٧. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ بِقُوَّةٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ لَهُمْ قَادِرُوْنَ يُقَالُ اٰدَ الرَّجُلُ يَئِيْدُ قَوِيَ وَاَوْسَعَ الرَّجُلُ صَارَ ذَا سَعَةٍ وَقُدْرَةٍ.

৪৭. আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। অর্থাৎ আমি এতে সক্ষম। বলা হয়- اٰدَ الرَّجُلُ يَئِيْدُ [মানুষ শক্তিশালী হয়ে গেছে] আরো বলা হয়- اَوْسَعَ الرَّجُلُ [মানুষ সুপ্রশস্ত ও ক্ষমতাবান হয়ে গেছে।]

٤٨. وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا مَهَّدْنَاهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ نَحْنُ.

৪৮. আর ভূমি আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী।

٤٩. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ صِنْفَيْنِ كَالذَّكَرِ وَ الْاُنْثٰى وَالسَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالسَّهْلِ وَالْجَبَلِ وَالصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَالْحُلْوِ وَالْحَامِضِ وَالنُّوْرِ وَالظُّلْمَةِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. بِحَذْفِ اَحَدِ التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ فَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ خَالِقَ الْاَزْوَاجِ فَرْدٌ فَتَعْبُدُوْنَهُ.

৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু مِنْ كُلِّ شَيْءٍ এটা পরবর্তী خَلَقْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় দুই প্রকারে যেমন পুরুষ ও নারী, আসমান ও জমিন সূর্য ও চন্দ্র, সমতল ভূমি ও পাহাড়, গ্রীষ্ম ও শীত, মিষ্টি ও টক এবং আলো ও অন্ধকার। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে দু'টি تَاء থেকে একটি تَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যাতে তোমরা জানতে পার যে, জোড়ার সৃষ্টিকর্তা একজন, তিনি বেজোড় কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

٥٠. فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ط اَيْ اِلٰى ثَوَابِهِ مِنْ عِقَابِهِ بِاَنْ تُطِيْعُوْهُ وَلَا تَعْصُوْهُ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْاِنْذَارِ.

৫০. [হে নবী! আপনি তাদেরকে বলুন!] অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও অর্থাৎ তাঁর শাস্তি থেকে তার ছওয়াবের দিকে এভাবে যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য করবে নাফরমানি করবে না আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

٥١. وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ط اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. يُقَدَّرُ قَبْلَ فَفِرُّوْا قُلْ لَهُمْ.

৫১. তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো ইলাহ স্থির করিও না। আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী। [৫০ নং আয়াতে] فَفِرُّوْا -এর পূর্বে قُلْ لَهُمْ উহ্য মানা হবে।

٥٢. كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا هُوَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ اَيْ مِثْلَ تَكْذِيْبِهِمْ لَكَ بِقَوْلِهِمْ اِنَّكَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ تَكْذِيْبُ الْاُمَمِ قَبْلَهُمْ رُسُلَهُمْ بِقَوْلِهِمْ ذٰلِكَ.

৫২. এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তারা তাকে বলেছে, "তুমিতো এক জাদুকর, না হয় এক উন্মাদ। অর্থাৎ যেমনি এ সকল লোকেরা তাদের উক্তি- اِنَّكَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ -এর মাধ্যমে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, এমনি এই উক্তির মাধ্যমেই এদের পূর্ববর্তী উম্মতেরাও স্বীয় রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٣. اَتَوَاصَوْا كُلُّهُمْ بِهِ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ج جَمَعَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْقَوْلِ طُغْيَانُهُمْ .

৫৩. এরা কি প্রত্যেকেই একে অপরকে এ উপদেশই দিয়ে এসেছে? ইস্তেফহামটা نَفِيْ -এর অর্থে। বস্তুত তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তাদের অবাধ্যতা তাদেরকে একথার উপর একত্র করে দিয়েছে।

٥٤. فَتَوَلَّ اَعْرِضْ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ لِاَنَّكَ بَلَّغْتَهُمُ الرِّسَالَةَ .

৫৪. অতএব, আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করুন, এতে আপনি অভিযুক্ত হবেন না। কেননা আপনি তো তাদের নিকট রিসালতের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

٥٥. وَذَكِّرْ عِظْ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ عَلِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهُ يُؤْمِنُ .

৫৫. আপনি উপদেশ দিতে থাকুন কুরআনের মাধ্যমে কারণ উপদেশ মুমিনদেরই উপকারে আসে যার ব্যাপারে আল্লাহর ইলম রয়েছে যে, সে ঈমান আনয়ন করবে।

٥٦. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ وَلَا يُنَافِيْ ذٰلِكَ عَدَمَ عِبَادَةِ الْكَافِرِيْنَ لِاَنَّ الْغَايَةَ لَا يَلْزَمُ وُجُوْدُهَا كَمَا فِيْ قَوْلِكَ بَرَيْتُ هٰذَا الْقَلَمَ لِاَكْتُبَ بِهِ فَاِنَّكَ قَدْ لَا تَكْتُبُ بِهِ .

৫৬. আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আর এটা কাফেরদের ইবাদত না করার অন্তরায় নয়। কেননা غَايَتْ -এর অস্তিত্বে আসা আবশ্যক নয়। যেমন তুমি বল যে, আমি লিখার জন্য কলম বানিয়েছি, আবার কখনো এরূপও হয় যে, তুমি সেই কলম দ্বারা লিখনা।

٥٧. مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ لِيْ وَلِاَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُوْنِ وَلَا اَنْفُسَهُمْ وَلَا غَيْرَهُمْ .

৫৭. আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না নিজের জন্য, না তাদের জন্য। আর না তাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য। এবং এটাও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। না তাদের জন্য আর না অন্যদের জন্য।

٥٨. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ الشَّدِيْدُ .

৫৮. আল্লাহই তো রিজিক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।

٥٩. فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ بِالْكُفْرِ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ ذَنُوْبًا نَصِيْبًا مِنَ الْعَذَابِ مِثْلَ ذَنُوْبِ نَصِيْبِ اَصْحٰبِهِمُ الْهَالِكِيْنَ قَبْلَهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ بِالْعَذَابِ اِنْ اَخَّرْتُهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

৫৯. জালিমদের প্রাপ্য তা-ই মক্কা ও অন্যান্য এলাকার যারা কুফরির মাধ্যমে নিজের প্রতি জুলুম করেছেন, তাদের জন্য শাস্তির অংশ সেই পরিমাণ। যা অতীতে তাদের সমতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। তাদের পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্তরা। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে। যদি আমি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেই।

٦٠. فَوَيْلٌ شدة عذاب لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ فِيْ يَوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ - اَيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

৬০. দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি কাফেরদের জন্য তাদের সেই দিনের যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا : জমহুর وَالسَّمَاءَ এবং وَالْاَرْضَ -এর উপর اِشْتِغَالٌ -এর ভিত্তিতে নসব দিয়ে পড়েছেন। উহ্য ইবারত হলো– وَفَرَشْنَا الْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا এবং وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا ; আবুস সাম্মাক এবং ইবনে মাকসান উভয় স্থানে মুবতাদা হওয়ার কারণে মা'রূফ পড়েছেন। এই উভয়টির পরবর্তী অংশ তার খবর। প্রথমটি তথা نَصْب দিয়ে পড়া উত্তম। جُمْلَه فِعْلِيَّه -এর আতফ جُمْلَه فِعْلِيَّه -এর উপর হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ وَاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ : ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই বাক্যটি حَال مُؤَكِّدَه হয়েছে, কেননা শারেহ এ কথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, مُوْسِعُوْنَ -এটা قَادِرُوْنَ -এর অর্থে। কাজেই مُوْسِعُوْنَ টা اَوْسَعَ লাজেম থেকে হবে। আর এটা এরূপ যেমন বলা যায়– اَوْرَقَ الشَّجَرُ অর্থাৎ صَارَ ذَا وَرَقٍ ; যখন একথা বুঝে এসে গেল যে, لَمُوْسِعُوْنَ ব্যাখ্যাকারের ভাষ্যমতে লাজেম, তখন জালালাইনের যে সকল নোসখায় لَمُوْسِعُوْنَ এর পরে لَهَا রয়েছে– সেটা বিশুদ্ধ নয়। অবশ্য যারা لَمُوْسِعُوْنَ -কে مُتَعَدِّىْ বলেছেন তাদের নিকট لَهَا থাকাটা বিশুদ্ধ হবে। এই সুরতে لَمُوْسِعُوْنَ টা حَال مُؤَسِّسَه হবে যেটা একটি নতুন ফায়দা দিবে।

قَوْلُهُ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ : প্রশ্ন : زَوْجَيْنِ তথা জোড়ার সাতটি উপমা কেন দিলেন? অথচ একটি দিলেও হতো।
উত্তর : অনেক উপমা দিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জোড়-বেজোড়ের যে বিষয়টি রয়েছে এটা مَحْسُوْسَاتْ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যাতে করে আরশ, কুরসি, লওহে মাহফূয, কলমকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন না করা হয়।

قَوْلُهُ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْىِ : উদ্দেশ্য হলো এই যে, পূর্বের এবং পরের সকল নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে একই রূপ এবং একই কথার উপরেই সকলে একত্র হয়েছে; একে অপরকে অছিয়ত বা উপদেশ করেনি। কেননা সময় ও কাল ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কাজেই পরস্পর একে অপরকে নবীগণের বিরোধিতা করার ব্যাপারে অসিয়ত করা সম্ভব নয়; বরং মূল কারণ ও ইল্লত হলো মুশতারাক। আর তা হলো অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ, বিরোধিতা, জিদ হিংসা ও আত্মম্ভরিতা, যা উভয় দলের মধ্যেই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْغَايَةَ لَا يَلْزَمُ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা ব্যাখ্যাকারের উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের নিরসন করা যে, لِيَعْبُدُوْنِ -এর মধ্যে لَامْ টি عِلَّت بَاعِثَه -এর জন্য। অর্থাৎ মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও কারণ হলো ইবাদত। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কর্ম مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলার কোনো কর্মই مُعَلَّلٌ بِالْاَغْرَاضِ হয় না।
এর উত্তর দিয়েছেন যে, لِيَعْبُدُوْنِ -এর মধ্যে لَامْ টা عَاقِبَتْ এবং صَيْرُوْرَتْ এর জন্য যাকে عِلَّت غَائِبَة ও বলা হয়, عِلَّت بَاعِثَه নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيْ ذَالِكَ عَدَمَ عِبَادَةِ الْكَافِرِيْنَ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া।
প্রশ্ন : জিন ও ইনসান সৃষ্টির عِلَّت غَائِيَه হচ্ছে ইবাদত। তাই প্রতিটি মানুষের ইবাদত করা উচিত। অথচ আমরা দেখেছি যে, কাফেররা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করে না?
উত্তর : غَايَة -এর পতিত হওয়া আবশ্যক হয় না। যেমন একটি কলম বানানো হয় লেখার জন্য। কিন্তু কোনো কোনো সময় তা দ্বারা লিখা হয় না। অথচ কলম বানানোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো লিখা। দ্বিতীয়ত উত্তর কেউ কেউ এটা দিয়েছেন যে, এখানে عِبَادٌ দ্বারা মুমিন বান্দাগণ উদ্দেশ্য, এটা تَعْمِيْمٌ بَعْدَ التَّخْصِيْصِ -এর অন্তর্ভুক্ত। আর মুমিনগণ ঈমান অনুপাতে ইবাদত করে থাকেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ لِأَنْفُسِهِمْ : এ বাক্য বৃদ্ধির দ্বারা একটি সংশয় নিরসন করা উদ্দেশ্য।

সংশয় : সাধারণত পৃথিবীর সর্দার ও দাসদের মালিকগণের এই অভ্যাস ও রীতি হয়ে থাকে যে, দাস ক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকে নিজের জন্য ও দাসদের জন্য জীবিকা উপার্জন করানো। তবে আল্লাহরও কি বান্দা সৃষ্টি করা দ্বারা এই উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা?

নিরসন : সাধারণ মালিকদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার এই অভ্যাস নেই এবং এর প্রয়োজনও নেই; বরং তিনি নিজেই তো স্বীয় বান্দাদেরকে জীবিকা দান করে থাকেন।

قَوْلُهُ ذَنُوْبًا : ذَنُوْبًا শব্দের ذَال বর্ণটি যবরযুক্ত। ذَنْبٌ -এর বহুবচন। বড় বালতিকে ذَنُوْبٌ বলা হয়। পরিভাষা ও প্রচলিত অর্থে অংশ ও পালাকে ذَنُوْبٌ বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং তা অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় শক্তির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে কিয়ামত ও কিয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যেসব বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এ ছাড়া আয়াতসমূহে তাওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রিসালতে বিশ্বাস স্থাপনের তাকিদ রয়েছে।

قَوْلُهُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ : اَيْد শব্দের অর্থ– শক্তি ও সামর্থ্য। এ স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ তাফসীরই করেছেন।

قَوْلُهُ فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গুনাহ থেকে ছুটে পালাও। আবূ বকর ওয়াররাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (র.) বলেন, প্রবৃত্তি ও শয়তান মানুষকে গুনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা এগুলো থেকে দূরে থেকে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ : পূর্ববর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের দিকেই পলায়ন কর, অর্থাৎ সব কিছু ছেড়ে এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁর নৈকট্য ধন্য হও, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে যত্নবান হও, এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হও, এক আল্লাহ পাকের প্রতি-ই ভরসা কর, আল্লাহ পাকের রহমতের-ই আশা কর, শুধু আল্লাহ পাককেই ভয় কর। তিনি তোমার মালিক, তিনিই তোমার খালেক বা স্রষ্টা। অতএব, তুমি সকল সম্পর্কচ্ছেদ করে শুধু এক আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক করতে প্রয়াসী হও।

আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ অর্থাৎ "আর তোমরা আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোনো কোনো মাবুদকে স্বীকার করো না।"

অর্থাৎ যদি তুমি সবকিছু থেকে পলায়ন করে নিজেকে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির রাখতে না পার, তবে অন্তত তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করো না, অন্য কোনো কিছুকে মাবুদ বা উপাস্য বলে মনে করো না। উপাস্য একজনই, তথা একমাত্র আল্লাহ পাকই মাবুদ বা উপাস্য, ইবাদতের যোগ্য শুধু তিনিই, আর কেউ নয়। অতএব আল্লাহ পাক ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, প্রিয় কেউ নেই আর আল্লাহ পাক ব্যতীত মকসুদও কেউ নেই, কেননা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই মর্দে মুমিনের সকল সাধনা। অতএব এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত হও।

قَوْلُهُ اِنِّىْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ : অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত প্রকাশ্য সতর্ককারী, অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর সম্মুখে মাথা নত করো না। এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর, শিরকসহ যাবতীয় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে সচেষ্টা হও।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ .... اَوْ مَجْنُوْنٌ : **প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা :** এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে নবী! এত সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি কাফেররা ঈমান না আনে, তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন বর্জন না করে, তবে আপনি তাতে দুঃখিত হবেন না। কেননা ইতিপূর্বে যখনই কোনো জাতির নিকট কোনো নব- রাসূল আগমন করেছেন, তখনই তাঁদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে এবং তাঁদেরকে জাদুকর

এবং পাগল বলা হয়েছে। এ কাফেরদের অন্যায় আচরণ দেখলে মনে হয়, যেন পূর্বের কাফেররা এদেরকে এ অন্যায় কাজের জন্যে অসিয়ত করেছে এবং পূর্বকালের লোকেরা এ যুগের কাফেদেরকে আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী ﷺ -এর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে- أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ অর্থাৎ "তবে কি তারা একে অন্যকে এই অসিয়ত করেই মরেছে? বস্তুত তারা এক সীমালজ্ঞনকারী জাতি।" আলোচ্য আয়াতের শুরুতে كذالك কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, হে রাসূল! আপনার উম্মতের কাফেরদের যে অবস্থা রয়েছে, অনুরূপ অবস্থাই ছিল পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মতদের। তারাও এমনিভাবেই নবী রাসূলগণের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে, তবে কি পূর্ববর্তী কাফেররা এ যুগের কাফেরদেরকে নবী-রাসূলগণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের অসিয়ত করে গেছে? কেননা সকল যুগের কাফেরদের একই আচরণ পরিলক্ষিত হয়।

যেহেতু এদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক, তাই পরস্পরকে অসিয়ত করার প্রশ্নই উঠে না; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা এক সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তাদের স্বভাব এবং প্রকৃতি একই, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যদ্রোহিতার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান আছে; কিন্তু আচরণে কোনো অমিল নেই। এজন্যে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ-কে কাফেরদের অন্যায় আচরণে সবর অবলম্বনের তাগিদ দিয়ে ইরশাদ করেছেন- فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ "[হে নবী!] কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি সবর অবলম্বন করুন, যেমন সবর অবলম্বন করেছেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রাসূলগণ"।

قَوْلُهُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ : অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি যখন এই কাফেরদেরকে বারংবার ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহবান করেছেন, কিন্তু আপনার আহবানে তারা সাড়া দেয়নি, তাদের শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রেখেছে, তাই তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাই শ্রেয়। আর এ কারণেই এ ব্যাপারে আপনার প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। তাই আপনাকে কাফেরদেরর জন্য চিন্তিত হতে হবে না। আর আপনি তাদেরকে সাবধান করেননি এবং নাজাতের পথ প্রদর্শন করেননি- এ অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে কেউ আনতে পারবে না। তাই তাদের আচরণে ভ্রুক্ষেপ না করে আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

ইবনে জারীর, ইবনে হাতিম, ইবনে রাহবীয়া, ইবনে হাইসাম, ইবনে কুলাইব, মুজাহিদ (রা.)-এর সূত্রে হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন এ আয়াত فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ [হে রাসূল! আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, আর এতে আপনার প্রতি কোনো অভিযোগও হবে না] নাজিল হয়, তখন আমাদের প্রত্যেকের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আজাব আসবে এবং সকলকে ধ্বংস করা হবে। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী ﷺ -কে মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার আদেশ দিয়েছেন। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ নাজিল হয়, তখন আমরা সকলে আনন্দিত এবং নিশ্চিন্ত হই।

ইবনে জারীর লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (র.) বলেছেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে, যখন فَتَوَلَّ عَنْهُمْ নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরামের নিকট তা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয়, কেননা তাঁরা মনে করেছেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ হলো এবং আজাব আপতিত হওয়া অবধারিত, এরপর আল্লাহ পাক নাজিল করলেন- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ [হে রাসূল! আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, নিশ্চয় আপনার উপদেশ মুমিনদের জন্যে উপকারী হবে]

অর্থাৎ যার মধ্যে ঈমান আনয়নের যোগ্যতা রয়েছে, তার জন্য আপনার উপদেশ উপকারী হবে, যদিও কাফেররা আপনার উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে প্রস্তুত না হয়।

অথবা এর অর্থ হলো; হে রাসূল! আপনি তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন, আপনার উপদেশ নিঃসন্দেহে মুমিনদের জন্যে উপকারী হবে। তাদের মন এর দ্বারা আলোকিত হবে।

এ আয়াত নাজিল হবার পর মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন। -[তাফসীরে তাবারী খ. ২৭, পৃ. ৭]

قَوْلُهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ : **জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য** : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে ইরশাদ করেন- অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এখানে বাহ্য দৃষ্টিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। যথা-

১. যাকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যুক্তিগতভাবে অসম্ভব, অপ্রাকৃত। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের বিপরীত কোনো কাজ করা অসম্ভব।

২. আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব সৃষ্টিকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাদের সৃষ্টিতে ইবাদত ব্যতীত আরো অনেক উপকারিতা ও রহস্য বিদ্যমান আছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এই বিষয়বস্তু শুধু মুমিনদের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি মুমিন জিন ও মুমিন মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। বলা বাহুল্য, যারা মুমিন তারা কমবেশি ইবাদত করে থাকে। যাহ্হাক, সুফিয়ান (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এই উক্তি করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই আয়াতের এক কেরাতে مُؤْمِنِيْنَ শব্দও উল্লেখ করা হয়েছে এবং আয়াত এভাবে পাঠ করা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

এই কেরাত থেকে উপরিউক্ত তাফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে জবরদস্তিমূলক ইচ্ছা বোঝানো হয়নি, যার বিপরীত হওয়া অসম্ভব; বরং আইনগত ইচ্ছা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি তাদেরকে কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে ইবাদত করার আদেশ দিই। আল্লাহর আদেশকে মানুষের ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত রাখা হয়েছে। তাই আদেশের বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহ সবাইকে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সাথে সাথে ইচ্ছা অনিচ্ছার ক্ষমতাও দিয়েছেন। তাই কোনো কোনো লোক আল্লাহপ্রদত্ত ইচ্ছা যথার্থ ব্যয় করে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে এবং কেউ এই ইচ্ছার অসদ্ব্যবহার করে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই উক্তি ইমাম বগভী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে এর সরল তাফসীর এই বর্ণিত হয়েছে যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার সময় তাদের মধ্যে ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রাখা হয়েছে। সে মতে প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে এই প্রতিভা প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান থাকে। এরপর কেউ এই প্রতিভাকে সঠিক পথে ব্যয় করে কৃতকার্য হয় এবং কেউ একে গুনাহ ও কুপ্রবৃত্তিতে বিনষ্ট করে দেয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ .

অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তান প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে প্রকৃতি থেকে সরিয়ে নিয়ে ইহুদি অথবা অগ্নিপূজারীতে পরিণত করে। 'প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ' করার অর্থ অধিকাংশ আলেমের মতে ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করা। অতএব, এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে ইসলাম ও ঈমানের যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রাখা হয়েছে। এরপর তার পিতামাতা এই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে কুফরের পথে পরিচালিত করে। এই হাদীসের অনুরূপ আলোচ্য আয়াতেরও এরূপ অর্থ হতে পারে যে, প্রত্যেক জিন ও মানবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব এই বর্ণিত হয়েছে যে, ইবাদতের জন্য কাউকে সৃষ্টি করাটা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থি নয়।

قَوْلُهُ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ : অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোনো উপকার চাই না যে, তারা রিজিক সৃষ্টি করবে আমার জন্য অথবা নিজেদের জন্য অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টজীবের জন্য। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা যত বড় লোকই হোক না কেন কেউ যদি কোনো গোলাম ক্রয় করে এবং তার পেছনে অর্থকড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাবে এবং রুজী-রোজগার করে মালিকের হাতে সমর্পণ করবে। আল্লাহ তা'আলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পশ্চাতে আমার কোনো উপকার উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ ذَنُوْبًا : এই শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذَنُوْبٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেওয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালার কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহর আজাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আজাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে, অর্থাৎ কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আজাব আসে না কেন? এর জবাব এই যে, আজাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এসে যাবে। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা তূর, মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً : আয়াত : ৪৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالطُّوْرِ لا اَيِ الْجَبَلِ الَّذِىْ كَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مُوْسٰى -

১. শপথ তূর পর্বতের অর্থাৎ যেই পাহাড়ে চড়ে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করেছেন।

٢. وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ لا

২. এবং শপথ ঐ কিতাবের, যা লিখিত আছে।

٣. فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ لا اَيِ التَّوْرٰىةِ اَوِ الْقُرْاٰنِ -

৩. উন্মুক্ত পত্রে। অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআনে।

٤. وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ لا هُوَ فِى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ اَوِ السَّادِسَةِ اَوِ السَّابِعَةِ بِحَيَالِ الْكَعْبَةِ يَزُوْرُهُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ بِالطَّوَافِ وَالصَّلٰوةِ لَا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ اَبَدًا -

৪. শপথ বায়তুল মা'মূরের; এটা হলো তৃতীয় আকাশে অথবা ষষ্ঠ আকাশে অথবা সপ্তম আকাশে কাবা শরীফের সোজা উপরে অবস্থিত, প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা তাতে নামাজ ও তওয়াফের জন্য এর জিয়ারত করে থাকে। তারা আর কখনো তাতে ফিরে আসার সুযোগ পায় না।

٥. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ لا اَيِ السَّمَاءِ -

৫. শপথ সমুন্নত ছাদের অর্থাৎ আকাশের।

٦. وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ لا اَيِ الْمَمْلُوْءِ -

৬. শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের অর্থাৎ পরিপূর্ণ/টইটুম্বুর

٧. اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ لا لَنَازِلٌ بِمُسْتَحِقِّهِ -

৭. আপনার প্রতিপালকের শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের উপর অবশ্যই অবতীর্ণ হবে।

٨. مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ لا عَنْهُ -

৮. এর নিবারণকারী কেউ নেই। এর থেকে।

٩. يَّوْمَ مَعْمُوْلٌ لِّوَاقِعٌ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا لا تَتَحَرَّكُ وَتَدُوْرُ

৯. যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে নড়াচড়া করবে এবং চক্কর দিবে। يَوْمَ টা لَوَاقِعٌ -এর مَعْمُوْلٌ

١٠. وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ط تَصِيْرُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا وَذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

১০. এবং পর্বত চলবে দ্রুত উড়তে উড়তে ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। আর এটা হবে কিয়ামতের দিন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١. فَوَيْلٌ شِدَّةُ عَذَابٍ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ لا لِلرُّسُلِ.

১১. দুর্ভোগ কঠিন শাস্তি সেদিন অস্বীকারকারীদের রাসূলগণকে।

١٢. الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ بَاطِلٍ يَّلْعَبُوْنَ ـ اَىْ يَتَشَاغَلُوْنَ بِكُفْرِهِمْ.

১২. যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকবে অর্থাৎ তাদের কুফরিতে ব্যতিব্যস্ত থাকবে।

١٣. يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ط يُدْفَعُوْنَ بِعُنْفٍ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ تَمُوْرُ.

১৩. সেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে। কঠোরভাবে ধাক্কা দেওয়া হবে। এটা يَوْمَ تَمُوْرُ থেকে بَدَلْ হয়েছে।

١٤. وَيُقَالُ لَهُمْ تَبْكِيْتًا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ.

১৪. এবং তাদেরকে নিরুত্তর করার জন্য বলা হবে- এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

١٥. اَفَسِحْرٌ هٰذَآ الْعَذَابُ الَّذِىْ تَرَوْنَ كَمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ فِى الْوَحْيِ هٰذَا سِحْرٌ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ.

১৫. এটা কি জাদু? এটা কি জাদু যা তোমরা দেখতেছ যেমনিভাবে তোমরা ওহীর ব্যাপারে বলতে যে, এটা জাদু। নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

١٦. اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا عَلَيْهَا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ج صَبْرُكُمْ وَجَزْعُكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ط لِاَنَّ صَبْرَكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَىْ جَزَاءَهُ.

১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা তাতে ধৈর্যধারণ কর অথবা ধৈর্য ধারণ না কর তোমাদের ধৈর্যধারণ করা এবং না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান কেননা তোমাদের ধৈর্য তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এর পরিণাম।

١٧. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ.

১৭. মুত্তাকীরা তো থাকবে জান্নাতে ও আরাম-আয়েশে।

١٨. فٰكِهِيْنَ مُتَلَذِّذِيْنَ بِمَآ مَصْدَرِيَّةٌ اٰتٰهُمْ اَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ ج وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ عَطْفٌ عَلٰى اٰتَاهُمْ اَىْ بِاِتْيَانِهِمْ وَوِقَايَتِهِمْ.

১৮. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে স্বাদ গ্রহণ করবে। এখানে بِمَا -এর مَا টি مَائے مَصْدَرِيَّة এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের আজাব হতে وَوَقَاهُمْ এটা اٰتَاهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে দেওয়া থেকে এবং সংরক্ষণ করা থেকে।

١٩. وَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا حَالٌ اَىْ مُهَنَّئِيْنَ بِمَا الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

১৯. এবং তাদেরকে বলা হবে- তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর هَنِيْٓـًٔا শব্দটি حَالٌ হয়েছে। অর্থ হলো مُهَنَّئِيْنَ ; তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ। بِمَا-এর بَاء টি سَبَبِيَّة

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. مُتَّكِئِيْنَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ الْمُسْتَكِنِّ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فِيْ جَنّٰتٍ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ج بَعْضُهَا اِلٰى جَنْبِ بَعْضٍ وَزَوَّجْنٰهُمْ عَطْفٌ عَلٰى فِيْ جَنَّاتٍ اَيْ قَرَنَّاهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ عِظَامِ الْاَعْيُنِ حِسَانِهَا .

২০. তারা হেলান দিয়ে বসবে مُتَّكِئِيْنَ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার বাণী– فِيْ جَنّٰتٍ -এর উহ্য যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে শ্রেণিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে তার একটির পাশে আরেকটি আমি তাদের মিলন ঘটাব এটা فِيْ جَنّٰتٍ -এর উপর عَطْفٌ হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে সংযুক্ত করব, মিলাবো। আয়াতলোচনা হুরের সাথে

٢١. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُبْتَدَأٌ وَاتَّبَعَتْهُمْ مَعْطُوْفٌ عَلٰى اٰمَنُوْا ذُرِّيَّتُهُمْ الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ بِاِيْمَانٍ مِنَ الْكِبَارِ وَمِنَ الْاٰبَاءِ فِي الصِّغَارِ وَالْخَبَرُ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ط الْمَذْكُوْرِيْنَ فِي الْجَنَّةِ فَيَكُوْنُوْنَ فِيْ دَرَجَتِهِمْ وَاِنْ لَمْ يَعْمَلُوْا بِعَمَلِهِمْ تَكْرِمَةً لِلْاٰبَاءِ بِاجْتِمَاعِ الْاَوْلَادِ اِلَيْهِمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا نَقَصْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ زَائِدَةٌ شَيْءٍ ط يُزَادُ فِيْ عَمَلِ الْاَوْلَادِ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ رَهِيْنٌ مَرْهُوْنٌ يُؤَاخَذُ بِالشَّرِّ وَيُجَازٰى بِالْخَيْرِ .

২১. এবং যারা ঈমান আনে এটা মুবতাদা আর তাদের অনুগামী হয় এটা اٰمَنُوْا -এর উপর مَعْطُوْفٌ তাদের সন্তান-সন্ততি ছোট ও বড় [অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক] ঈমানে প্রাপ্তবয়স্কদেরকে তাদের ঈমানের কারণে আর অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে তাদের পিতা-মাতা ঈমানের কারণে। আর খবর হলো তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে উল্লিখিতদেরকে জান্নাতে। ফলে তারাও তাদের মর্যাদায় পৌঁছে যাবে, যদিও তারা তাদের পিতাগণের অনুরূপ আমল করেননি। তাদের পিতাগণের সম্মানার্থে তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে একত্র করব এবং যে পরিমাণ প্রতিদান তাদের সন্তানদের ব্যাপারে বৃদ্ধি করা হয়েছে [তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না] اَلَتْنٰهُمْ -এর لَامٌ বর্ণে যবর ও যের উভয়ই পারে। অর্থ হলো হ্রাস করব না, কমাবো না। আর مِنْ شَيْءٍ -এর مِنْ টি হলো অতিরিক্ত। প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর কৃতকর্মের জন্য দায়ী অর্থাৎ মন্দ আমলের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে এবং ভালো আমলের কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। رَهِيْنٌ শব্দটি مَرْهُوْنٌ অর্থে হবে।

٢٢. وَاَمْدَدْنٰهُمْ زِدْنَاهُمْ فِيْ وَقْتٍ بَعْدَ وَقْتٍ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ وَاِنْ لَمْ يُصَرِّحُوْا بِطَلَبِهٖ .

২২. আমি তাদেরকে দিব তাদেরকে বৃদ্ধি করে দিব প্রতি মুহূর্তে ফলমূল এবং গোশত যা তারা পছন্দ করে যদিও তারা সুস্পষ্টভাবে প্রার্থনা না করে।

٢٣. يَتَنَازَعُوْنَ يَتَعَاطَوْنَ بَيْنَهُمْ فِيْهَا اَيِ الْجَنَّةِ كَاْسًا خَمْرًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا اَيْ بِسَبَبِ شُرْبِهَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَاْثِيْمٌ بِهٖ يَلْحَقُهُمْ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا .

২৩. তারা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করবে সেথায় জান্নাতে পানপাত্র শরাব যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না অর্থাৎ শরাব পান করার কারণে না কোনো অহেতুক কথাবার্তা বলবে এবং পাপকর্মেও লিপ্ত হবে না যা শরাব পান করার কারণে ঘটে থাকে/মিলিত হয়ে থাকে পৃথিবীর শরাবের বিপরীত

Free@www.e-ilm.weebly.com

٢٤. وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ لِلْخِدْمَةِ غِلْمَانٌ اَرِقَّاءُ لَهُمْ كَاَنَّهُمْ حُسْنًا وَنَظَافَةً لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ مَصُوْنٌ فِى الصَّدَفِ لِاَنَّهُ فِيْهَا اَحْسَنُ مِنْهُ فِى غَيْرِهَا.

২৪. তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোররা সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। কেননা যে মুক্তা ঝিনুকের মধ্যে থাকে, তা যে মুক্তা ঝিনুকের মধ্যে থাকে না সেটা অপেক্ষা বহু উত্তম।

٢٥. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَمَّا كَانُوْا عَلَيْهِ وَمَا وَصَلُوْا اِلَيْهِ تَلَذُّذًا وَاعْتِرَافًا بِالنِّعْمَةِ.

২৫. তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করবে অর্থাৎ তারা পরস্পর একে অপরের থেকে সে সকল কর্ম সম্পর্কে জেনে নিবে যা তারা পৃথিবীতে করতেন এবং সে সম্পর্কেও যা তারা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই সবকিছু স্বাদ গ্রহণ ও নিয়ামত প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি স্বরূপ হবে।

٢٦. قَالُوْٓا اِيْمَاءً اِلٰى عِلَّةِ الْوُصُوْلِ. اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْٓ اَهْلِنَا فِى الدُّنْيَا مُشْفِقِيْنَ خَائِفِيْنَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ.

২৬. এবং তারা বলবেন প্রাপ্তির কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে পৃথিবীতে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম আল্লাহর আজাবের ব্যাপারে ভীত শঙ্কিত ছিলাম।

٢٧. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا بِالْمَغْفِرَةِ وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ اَيِ النَّارِ لِدُخُوْلِهَا فِى الْمَسَامِ.

২৭. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ আগুন থেকে। জাহান্নামের আগুনকে এ কারণে سَمُوْم বলা হয় যে, সেই আগুন লোমকূপের মধ্যেও ঢুকে যায়।

٢٨. وَقَالُوْا اِيْمَاءً اَيْضًا. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ اَىْ فِى الدُّنْيَا نَدْعُوْهُ اَىْ نَعْبُدُهُ مُوَحِّدِيْنَ اِنَّهُ بِالْكَسْرِ اِسْتِئْنَافًا وَاِنْ كَانَ تَعْلِيْلًا مَعْنًى وَبِالْفَتْحِ تَعْلِيْلًا لَفْظًا هُوَ الْبَرُّ الْمُحْسِنُ الصَّادِقُ فِىْ وَعْدِهِ الرَّحِيْمُ الْعَظِيْمُ الرَّحْمَةِ.

২৮. এবং তারা ইঙ্গিতের ভঙ্গিতে এটাও বলবে যে, আমরা পূর্বেও পৃথিবীতে আল্লাহকে আহবান করতাম অর্থাৎ একত্ববাদের স্বীকৃতি দানপূর্বক তাঁর ইবাদত করতাম। তিনি তো اِنَّهُ-এর হামযা যের সহকারে جُمْلَه مُسْتَانِفَه হিসেবে যদিও তা تَعْلِيْل অর্থে হয়েছে। আর যবরসহ শাব্দিকভাবে تَعْلِيْل হওয়ার কারণে। কৃপাময় اَلْبَرُّ বলা হয় এমন দয়া প্রদর্শনকারী দাতাকে যিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণে সত্যবাদী। পরম দয়ালু অতিশয় অনুগ্রহকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالطُّوْرِ : আরবি ভাষায় পাহাড়কে طُوْر বলা হয়। কতিপয় আরবি ভাষাভাষী এটা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, প্রত্যেক সুজলা সুফলা পাহাড়কেই طُوْر বলা হয়। যখন তাতে اَلِفْ وَلَامْ প্রবেশ করে তখন সিনাই উপত্যকার একটি সুনির্দিষ্ট পর্বত উদ্দেশ্য হয়। আর এটা সেই পর্বত যা মিশর ও মাদায়েনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপরেই হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহর তাজাল্লী প্রদান করা হয়েছিল এবং এই পর্বত শৃঙ্গেই হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছিলেন।

قَوْلُهُ فِي رِقٍّ مَنْشُوْرٍ : رِقٍّ শব্দের অর্থ হলো কাগজ, পাতা, চামড়ার পাতলা আবরণ, বহুবচনে رُقُوْقٌ এটা رَا. বর্ণে যবরসহ অধিক ব্যবহৃত। আর رَا. বর্ণে যের দিয়ে তা খুব কমই ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ الْمَسْجُوْرِ : এটা ইসমে মাফউলের وَاحِدْ مُذَكَّرْ -এর সীগাহ অর্থ পরিপূর্ণ, টইটম্বুর। এটা ভীষণ গরম অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাবে نَصَرَ হতে سُجُوْرًا মাসদার। অর্থ– গরম করা, পরিপূর্ণ হওয়া।

قَوْلُهُ يُدَعُّوْنَ : دَعٌّ হতে মুযারে মাজহুলের جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– তাদের ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে নেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَمُوْرُ : এটা বাবে نَصَرَ থেকে, মাসদার– مَوْرًا অর্থ– ফেটে যাওয়া, কাঁপা, ভয় করা, থরথর করা

قَوْلُهُ بِمَا : এখানে مَا টা হলো مَصْدَرِيَّةٌ

প্রশ্ন : এটা مَانے مَصْدَرِيَّہ এ কথা কেন বলা হলো?

উত্তর: مَانے مَصْدَرِيَّہ বলার কারণ হলো যদি مَا -কে مَوْصُوْلَہ ধরে নেওয়া হয় তবে مَعْطُوْف -এর মধ্যে অর্থাৎ وَوَقَاهُمْ -এর عَائِدْ থেকে খালি হওয়া অত্যাবশ্যক হয়। কেননা فِعْل তার মাফউল هُمْ -কে নিয়ে নিয়েছে। আর عَائِدْ - বিহীন صِلَہ রয়ে গেল। অথচ صِلَہ যখন জুমলা হয় তখন عَائِدْ থাকা জরুরি। আবার বৈধ যে, اَنَّهٗ টা مَوْصُوْلَہ হবে আর وَوَقَاهُمْ এটা جُمْلَہ مُسْتَانِفَہ হবে। তবে অর্থের হিসেবে نَدْعُوْهُ -এর عِلَّتْ হবে। অর্থ হবে– আমরা তাঁর ইবাদত এ জন্য করতাম যে, তিনি অনুগ্রহকারী দয়ালু। আর যদি اَنَّهٗ -এর হামযাকে যবর দিয়ে পড়া হয় তবে তা نَدْعُوْهُ -এর শাব্দিক عِلَّتْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা তূর প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা তূর মক্কায় অবতীর্ণ, এতে ৪৮ আয়াত, ৩১২ বাক্য ও ১৫০০ টি অক্ষর রয়েছে। ইবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা তূর মক্কায় নাজিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বিবরণ রয়েছে।

হযরত জোবায়ের ইবনে মুতম (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, তা আমি নিজেই শ্রবণ করেছি, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পাঠ করেছেন।

–[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬. পৃ. ১২৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর, (উর্দু) পারা ২৭ পৃ. ৭]

স্বপ্নের তা'বীর : যদি কোনো ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, তবে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, কিছুদিন পর ঐ সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হবে. অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি কা'বা শরীফের নিকটে বসবাস করবে।

এ সূরার আমল : যদি কোনো বন্দী ব্যক্তি সর্বদা এ সূরা পাঠ করে, তবে অতি সত্বর রেহাই পাবে। এমনভিাবে, যদি কোনো ভ্রমণরত ব্যক্তি সর্বদা এ সূরা পাঠ করতে থাকে, তবে সে সফরে নিরাপদ থাকবে।

নামকরণ : এ সূরার বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তূর পর্বতের শপথ দ্বারা, এজন্যে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা তূর।

মূল বক্তব্য : এ সূরায় বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। যথা– ১. পরকালীন জীবনের সত্যতা। ২. সত্যদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী। ৩. পরকালীন জীবনের সত্য-সাধকদের জন্যে পুরস্কারের শুভ সংবাদ। এর পাশাপাশি রয়েছে তাওহীদ ও রিসালতের আলোচনা এবং কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার উল্লেখ। সূরার শুরুতেই পাঁচটি বস্তুর শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে; পরকালীন জীবনে পাপিষ্ঠদের শাস্তি অনিবার্য, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এ কথার সাক্ষী যে, প্রত্যেকটি মানুষকে অবশেষে তার কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে, মানবজাতিকে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এ সূরার শুরুতেই আল্লাহ পাকের অবাধ্য কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالطُّوْرِ : হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তূর বলে মাদায়েনে অবস্থিত তূরে সিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জান্নাতের চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তূর একটি। –[কুরতুবী]

তূরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরিউক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রমের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরজ।

Free@www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ : رَقٌّ শব্দের আসল অর্থ লেখার জন্য কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত 'কিতাব' বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে কুরআনে পাক বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ : আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল মা'মূর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বায়তুল মা'মূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের পালা আসে। −[ইবনে কাসীর]

সপ্তম আকাশে বসাবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মা'মূর। এ কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে পৌঁছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বায়তুল মা'মূরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। −[ইবনে কাসীর]

বায়তুল মা'মূরের অবস্থান : বায়তুল মা'মূর অর্থ− 'আবাদ ঘর'। এর দ্বারা কা'বা শরীফ এবং কা'বা শরীফের সরাসরি ঊর্ধ্বেই ফেরেশতাদের ইবাদতের জন্যে বায়তুল মা'মূর রয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনুল মুনজির, ইবনে মরদবিয়া হাকেম এবং বায়হাকী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, বাতুল মা'মূর রয়েছে সপ্তম আসমানে, প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বায়তুল মা'মূরে হাজির হয়, তারা আর কোনো দিন ফিরে আসে না। অর্থাৎ প্রতিদিনই নতুন সত্তর হাজার ফেরেশতা সেখানে ইবাদতে মশগুল থাকে। এ অবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। −[তাফসীরে দুররুল মানসূর, খ. ৬. পৃ. ১২৯]

আল্লামা বগভী (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, ফেরেশতারা বায়তুল মা'মূরের তওয়াফ করে এবং তার ভেতরে নামাজ আদায় করে, এরপর আর কখনো আসে না। সর্বক্ষণ ফেরেশতারা সেখানে ছড়িয়ে থাকে।

আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, বায়তুল মা'মুর বলে এ স্থলে কা'বা শরীফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা হজ, ওমরা পালনকারী, এতেকাফকারীদের দ্বারা কা'বা শরীফ সর্বক্ষণ আবাদ থাকে।

অথবা বায়তুল মা'মুর শব্দটি দ্বারা মুমিনের অন্তরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাকের মারেফাত এবং ইখলাস দ্বারা মুমিনের অন্তর পরিপূর্ণ থাকে।

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, বায়তুল মা'মুর কি? তিনি বললেন, তা আসমানে রয়েছে কা'বা শরীফের ঠিক উপরে। যেভাবে জমিনের কা'বা সম্মানিত স্থান, ঠিক তেমনি বায়তুল মা'মূরও আসমানের সম্মানিত স্থান, প্রতিদিন তাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামাজ আদায় করে। যে ফেরেশতা আজ এ দায়িত্ব পালন করল, কিয়ামত পর্যন্ত সে আর কখনো এ সুযোগ পাবে না, কেননা ফেরেশতাদের সংখ্যা অত্যধিক।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে জান? তারা জবাব দিলেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূলই জানেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করলেন, তা হলো আসমানি কা'বা, জমিনী কা'বার ঠিক উপরেই অবস্থিত, যদি তা নীচে পড়ে, তবে কা'বা শরীফের উপরই পড়বে। তাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামাজ আদায় করে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আসবে না। −[তাফসীরে ইবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-২৭, পৃ. ৯]

قَوْلُهُ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ : اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ মানে উঁচু ছাদ, এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা−

১. নীলাভ আকাশ যা পৃথিবীর উপর কোনো খুঁটি ব্যতীতই আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে স্থাপিত হয়েছে।

২. বেহেশতের উপরে আরশে এলাহী স্থাপিত রয়েছে, তার প্রতিও ইঙ্গিত করা হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ : مَسْجُوْرٍ শব্দটি سَجْرٌ থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করা। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছে− وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তাফসীরই হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, আলী, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ওবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। −[ইবনে কাসীর]

হযরত আলী (রা.)-কে জনৈক ইহুদি প্রশ্ন করল : জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন, সমুদ্রেই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে অভিজ্ঞ ইহুদি এই উত্তর সমর্থন করল। −[কুরতুবী]

হযরত কাতাদা (র.) প্রমুখ مَسْجُوْرٍ -এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জারীর (র.) এই অর্থই পছন্দ করেছেন। −[ইবনে কাসীর]

সমুদ্রগুলো দোজখে পরিণত হবে : মুহাম্মদ ইবনে কা'ব এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, পৃথিবীর সাগর মহাসাগরগুলোকে অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সাগর-মহাসাগরগুলোকে অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত করবেন, এর পরিণতিতে দোজখের অগ্নি আরো বৃদ্ধি পাবে।

বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, জিহাদ, হজ এবং ওমরা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি যেন সমুদ্রের সফর না করে, কেননা সমুদ্রের নীচে অগ্নি রয়েছে, অথবা তিনি বলেছেন, অগ্নির নীচে সমুদ্র রয়েছে। হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সমুদ্র হলো দোজখ।

আবুশ শেখ এবং বায়হাকী (র.) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আমি অমুক ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর সত্যবাদী কোনো ইহুদিকে দেখিনি, সে আমাকে বলেছিল, আল্লাহ পাকের বিরাট অগ্নিকুণ্ড হলো সমুদ্র। অর্থাৎ সমুদ্রগুলো অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হবে। যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ পাক চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জকে একত্র করবেন অর্থাৎ এগুলোকে সাগর-মহাসাগরে নিক্ষেপ করবেন। এভাবে সকল সাগর-মহাসাগর দোজখে পরিণত হবে।

কালবী (র.) বলেছেন, 'মাসজূর' অর্থ হলো পরিপূর্ণ, আর হাসান, কাতাদা এবং আবুল আলীয়া (র.) বলেছেন, 'মাসজূর' অর্থ হলো শুষ্ক, অর্থাৎ সমুদ্রের পানি শুষ্ক হয়ে যাবে। আর রবী ইবনে আনাস (র.) বলেছেন, তখন সমুদ্রের মিঠা পানি এবং লবণাক্ত পানি একাকার হয়ে যাবে, আর এ অবস্থাকেই 'মাসজূর' বলা হয়েছে। আলী ইবনে বদর বলেছেন, সাগর-মহাসাগর-গুলোকে 'বাহরে মাসজূর' এজন্যে বলা হয়েছে যে, তার পানি পান করা যায় না, আর তা দ্বারা কৃষিকাজও হয় না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, বাহরে মাসজূর বলা হয় বাহরে মা'কুফকে, অর্থাৎ যে পানিকে স্থবির করে রাখা হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, এমন কোনো রাত হয় না, যে রাতে সাগরগুলো তিনবার আল্লাহ পাকের দরবারে ছড়িয়ে পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করে না। আর তা এ মর্মে যে অনুমতি হলে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নিমজ্জিত করে দেই। কিন্তু আল্লাহ পাক এমন কাজ করা থেকে সমুদ্রগুলোকে বিরত রাখেন, আর তাদের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘনের অনুমতি দেন না।

–[তাফসীরে ইবনে কাসীর, (উর্দু) পারা ২৭, পৃ. ৯ মা'আরিফুল কুরআন, আল্লামা : ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৭, পৃ. ৩৭]

যাহহাক (র.) হযরত আলী (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বাহরে মাসজূর হলো মহান আরশের নীচে স্থাপিত একটি সাগর, সাত আসমান সাত জমিনের মধ্যে যতখানি দূরত্ব রয়েছে, এ সমুদ্রের গভীরতা ততখানি। এ সমুদ্রকে 'বাহরে হায়াওয়ান' বলা হয়। যখন হযরত ইস্রাফীল (আ.) প্রথম শিংগায় ফুঁক দেবেন, তখন ৪০ দিন সকালে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর ঐ সমুদ্র থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে, যে কারণে লোকেরা নিজ নিজ কবর থেকে বের হয়ে আসবে।

তাফসীরকার মোকাতিল (র.)-ও এ মত পোষণ করতেন।

قَوْلُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ : আপনার পালনকর্তার আজাব অবশ্যম্ভাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রা.) সূরা তূর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না। –[ইবনে কাসীর]

হযরত জুবায়ের ইবনে মুতঈম (রা.) বলেন, মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে মদীনা পৌছেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মাগরিবের নামাজে সূরা তূর পাঠ করেছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হলো যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন, এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আজাবে আক্রান্ত হয়ে যাব। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا : অভিধানে অস্থির নড়াচড়াকে مَوْرٌ বলা হয়, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে. কিয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ .... ذُرِّيَّتُهُمْ :

ঈমান থাকলে বুযুর্গদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব।" হযরত আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান সন্ততিকেও তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়, যাতে বুযুর্গদের চক্ষু শীতল হয়। –[মাযহারী]

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাই তারা জান্নাতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরজ করবে, হে পরওয়ারদিগার! দুনিয়াতে নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য আমল করে ছিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে– তাদেরকে জান্নাতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক! –[ইবনে কাসীর]

ইবনে কাসীর এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন: এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সৎকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। অপরদিকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতামাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে আহমদে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো নেক বান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে পরওয়ারদিগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেওয়া হলো? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তরে বলা হবে– তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করেছে। এটা তারই ফল।

قَوْلُهُ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ : اِيْلَاتٌ ও اَلَتَ -এর শাব্দিক অর্থ হলো হ্রাস করা। –[কুরতুবী] আয়াতের অর্থ এই সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুযুর্গ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুযুর্গদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে; বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাদেরকে পিতৃপুরুষদের সমান করে দেবেন।

قَوْلُهُ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ : অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্য দায়ী হবে; অপরের গুনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে নেক কর্মের বেলায় সৎকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেওয়া কথা আছে। কিন্তু গুনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গুনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না। –[ইবনে কাসীর]

মাস ব্যাপী হযরত ওমর (রা.)-এর অসুস্থতা : হাফেজ ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) এক রাতে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে বের হলেন। এক ব্যক্তি তার গৃহে তাহাজ্জুদের নামাজে সূরা তূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করছিল, হযরত ওমর (রা.) যখন এ আয়াত اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ শ্রবণ করলেন, তখন একটি চিৎকার দিলেন এবং বললেন, শপথ! কাবা শরীফের প্রতিপালকের, মনে হয় কোমর ভেঙ্গে গেছে। এরপর তিনি ঐ গৃহের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। অনেকক্ষণ পর যখন তিনি প্রকৃতস্থ হলেন, তখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ আয়াতের ভয়াবহতার প্রতিক্রিয়া তাঁর অন্তরে এত বেশি হয়েছিল যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এভাবে সুদীর্ঘ এক মাস যাবত তিনি অসুস্থ রইলেন। অনেক লোক তাঁকে দেখতে আসত, কিন্তু তারা জানত না তাঁর কী রোগ হয়েছে?

শপথের তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে পাঁচটি বিরাট বিস্ময়কর, গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির শপথ করে ঘোষণা করেছেন যে, আখিরাতে বেঈমান, নাফরমানদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। সেই পাঁচটি সৃষ্টি হচ্ছে– ১. কোহে তূর ২. কিতাবে মাসতুর ৩. বায়তুল মা'মূর, ৪. সাকফে মারফূ' ৫. বাহরে মাসজূর। এসব সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করার পর এ সত্যে বিশ্বাস করতে কোনো বুদ্ধিমান মানুষেরই বিলম্ব হয় না যে, যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে সমগ্র মানবজাতির পুনরুত্থান এবং কিয়ামত অনুষ্ঠান আদৌ কোনো কঠিন কাজ নয়। আর কিয়ামত কায়েম হবে ঈমানদার ও নেককারদের পুরস্কার এবং বেঈমান ও নাফরমানদের শাস্তি ঘোষণার জন্যে। কিয়ামতের দিনই প্রত্যেকটি মানুষকে তার সারা জীবনের কৃতকর্মের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা বা শ্বেতপত্র দেওয়া হবে। ঈমানদার ও নেককার হলে ডান হাতে এবং বেঈমান ও বদকার হলে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৯. فَذَكِّرْ دُمْ عَلٰى تَذْكِيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَرْجِعْ عَنْهُ لِقَوْلِهِمْ لَكَ كَاهِنٌ مَجْنُوْنٌ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اَىْ بِاِنْعَامِهِ عَلَيْكَ بِكَاهِنٍ خَبَرُ مَا وَلَا مَجْنُوْنٍ ط مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ ـ

৩০. اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ هُوَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ـ حَوَادِثُ الدَّهْرِ فَيَهْلِكُ كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّعَرَاءِ ـ

৩১. قُلْ تَرَبَّصُوْا هَلَاكِىْ فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ـ هَلَاكَكُمْ فَعُذِّبُوْا بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ وَالتَّرَبُّصُ الْاِنْتِظَارُ ـ

৩২. اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ عُقُوْلُهُمْ بِهٰذَا اَىْ قَوْلُهُمْ لَهُ سَاحِرٌ كَاهِنٌ شَاعِرٌ مَجْنُوْنٌ اَىْ لَا تَاْمُرُهُمْ بِذٰلِكَ اَمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ج بِعِنَادِهِمْ ـ

৩৩. اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ ج اِخْتَلَقَ الْقُرْاٰنَ لَمْ يَخْتَلِقْهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُوْنَ اِسْتِكْبَارًا فَاِنْ قَالُوْا اِخْتَلَقَهُ ـ

৩৪. فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مُخْتَلَقٍ مِّثْلِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ فِىْ قَوْلِهِمْ ـ

৩৫. اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَىْ خَالِقٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ط اَنْفُسَهُمْ وَلَا يُعْقَلُ مَخْلُوْقٌ بِدُوْنِ خَالِقٍ وَلَا مَعْدُوْمٌ يَخْلُقُ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ خَالِقٍ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ فَلِمَ لَا يُوَحِّدُوْنَهُ وَيُؤْمِنُوْنَ بِرَسُوْلِهِ وَكِتَابِهِ ـ

অনুবাদ :

২৯. অতএব আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন অর্থাৎ আপনি সর্বদা মুশরিকদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন। তারা আপনাকে গণকও উম্মাদ বলার কারণে আপনি তাদেরকে বুঝানো থেকে ফিরে আসবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে অর্থাৎ আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহের কারণে গণক নন এটা مَا -এর খবর এবং উন্মাদও নন এটা হলো بِكَاهِنٍ -এর উপর মা'তূফ।

৩০. তারা কি বলতে চায় যে, তিনি একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। যে যুগের পরিক্রমায় অন্যান্য কবিদের ন্যায় তিনিও ধ্বংস হয়ে যাবেন।

৩১. আপনি বলুন, তোমরা প্রতীক্ষা কর আমার ধ্বংসের আমি তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। তোমাদের বিনাশের। সুতরাং বদরের ময়দানে তাদেরকে তরবারির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর اَلتَّرَبُّصُ অর্থ হলো اَلْاِنْتِظَارُ তথা প্রতীক্ষা করা।

৩২. তবে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে? অর্থাৎ তাঁকে তাদের জাদুকর। গণক, কবি ও উন্মাদ বলা। অর্থাৎ তাদেরকে এরূপ শিক্ষা/নির্দেশ দেয় না। না, তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? তাদের অবাধ্যতার কারণে।

৩৩. তারা কি বলে, এই কুরআন তাঁর নিজের রচনা? অর্থাৎ নিজে নিজেই কুরআন রচনা করে ফেলেছেন। বরং তারা অবিশ্বাসী অহঙ্কারবশত যদি তারা বলে যে, এই কুরআন তিনি নিজেই রচনা করেছেন।

৩৪. তবে এর সদৃশ কোনো রচনা উপস্থিত করুন। তারা যদি সত্যবাদী হয় তাদের কথায়।

৩৫. তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে। না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নিজেদের। একথা আকলের বিপরীত যে, কোনো সৃষ্টির অস্তিত্ব স্রষ্টাবিহীন হবে, আর একথাও বুঝে আসে না যে, অস্তিত্বহীন, বস্তু কাউকে সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এটা প্রমাণিত হলো যে, নিশ্চিতভাবে তার কোনো না কোনো স্রষ্টা রয়েছে। আর তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ তবে কেন তারা তাঁর একত্ববাদকে স্বীকার করছে না এবং তাঁর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি ও তাঁর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে না।

٣٦. اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَقْدِرُ عَلٰى خَلْقِهِمَا اِلَّا اللّٰهُ الْخَالِقُ فَلِمَ لَا يَعْبُدُوْنَهُ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ط وَاِلَّا لَاٰمَنُوْا بِنَبِيِّهٖ .

৩৬. নাকি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ এতদুভয় সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় কাজেই তারা কেন তাঁর ইবাদত করবে না? বরং তারা তো অবিশ্বাসী অন্যথায় অবশ্যই তারা তাঁর নবীর প্রতি ঈমান আনত।

٣٧. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِهِمَا فَيَخُصُّوْا مَنْ شَاؤُوْا بِمَا شَاؤُوْا اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ . الْمُتَسَلِّطُوْنَ الْجَبَّارُوْنَ وَفِعْلُهُ صَيْطَرَ وَمِثْلُهُ بَيْطَرَ وَبَيْقَرَ .

৩৭. আপনার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে? নবুয়ত, রিজিক ইত্যাদির যে, তারা যাকে চাবে এবং যা চাবে তা দিয়ে তাকে বিশোষিত করবে। না, তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? প্রাধান্য বিস্তারকারী বিচারক। এর فِعْل হলো صَيْطَر এবং এর মতো হলো بَيْطَرَ এবং بَيْقَرَ [بَيْطَرَ এটা بَيْطَارٌ থেকে পশুর চিকিৎসককে বলে। আর بَيْقَرَ অর্থ হলো شَقَّ، اَفْسَدَ এবং اَهْلَكَ

٣٨. اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ مَرْقٰى اِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ اَىْ عَلَيْهِ كَلَامَ الْمَلٰٓئِكَةِ حَتّٰى يُمْكِنُهُمْ مُنَازَعَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِزَعْمِهِمْ اِنِ ادَّعَوْا ذٰلِكَ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ اَىْ مُدَّعِى الْاِسْتِمَاعِ عَلَيْهِ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ . بِحُجَّةٍ بَيِّنَةٍ وَاضِحَةٍ .

৩৮. নাকি তাদের নিকট সিঁড়ি আছে আকাশে আরোহণ করার যন্ত্র যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে থাকে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণের কথাবার্তা, যার ফলে তাদের জন্য নবী করীম ﷺ -এর সাথে এ সকল চিন্তাধারার ব্যাপারে মুনাযারা/ তর্ক-বিতর্ক করা সম্ভব হয়ে গেছে। যদি তারা এ দাবি করে থাকে। থাকলে তাদের সেই শ্রোতা উপস্থিত করুক অর্থাৎ শ্রবণ করার দাবিদার উপস্থিত করুক সুস্পষ্ট প্রমাণসহ।

٣٩. وَلِشِبْهِ هٰذَا الزَّعْمِ بِزَعْمِهِمْ اَنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ قَالَ تَعَالٰى اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ اَىْ بِزَعْمِكُمْ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا زَعَمُوْهُ .

৩৯. আর এই ধারণা তাদের ঐ ধারণার সদৃশ হওয়ার কারণে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা আল্লাহ তা'আলা বলেন– তবে কি কন্যা সন্তানগণ তাঁর জন্য অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মতে। এবং পুত্র সন্তানগণ তোমাদের জন্য। তোমরা যে ধারণা পোষণ কর তা হতে আল্লাহ বহু উর্ধ্বে।

٤٠. اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا عَلٰى مَا جِئْتَهُمْ بِهٖ مِنَ الدِّيْنِ فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ غُرْمٍ لَكَ مُّثْقَلُوْنَ ط فَلَا يُسْلِمُوْنَ .

৪০. তবে আপনি কি তাদের থেকে কোনো প্রতিদান চান আপনি যে দীন নিয়ে আগমন করেছেন এর বিনিময়ে যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে যার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে না।

٤١. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ اَىْ عِلْمُهُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ط ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْكِنُهُمْ مُنَازَعَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْبَعْثِ وَاَمْرِ الْاٰخِرَةِ بِزَعْمِهِمْ .

৪১. নাকি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান আছে যে, তারা এ বিষয় কিছু লিখে? যার ফলে তাদের পক্ষে মহানবী ﷺ -এর সাথে তাদের ধারণা মতে পুনরুত্থান এবং পরকালীন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয়ে গেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٢. اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ط بِكَ لِيُهْلِكُوْكَ فِيْ دَارِ النَّدْوَةِ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ط اَلْمَغْلُوْبُوْنَ الْمُهْلَكُوْنَ فَحَفِظَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ ثُمَّ اَهْلَكَهُمْ بِبَدْرٍ.

৪২. অথবা তারা কি কোনো ষড়যন্ত্র করতে চায়? আপনার সাথে দারুন নদওয়াতে আপনাকে বিনাশ করার জন্য পরিণামে কাফেররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। তারাই পরাজিত। তারাই ধ্বংসশীল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে তাদের থেকে রক্ষা করেছেন। তাদেরকে বদর ময়দানে ধ্বংস করেছে।

٤٣. اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . بِهٖ مِنَ الْاٰلِهَةِ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِاَمْ فِيْ مَوَاضِعِهَا لِلتَّقْبِيْحِ وَالتَّوْبِيْخِ.

৪৩. নাকি আল্লাহ ব্যতীত তাদের অন্যকোনো ইলাহ আছে? তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র! সকল স্থানে اَمْ -এর সাথে اِسْتِفْهَامْ আনাটা تَقْبِيْحْ তথা মন্দত্ব বর্ণনা করা ও تَوْبِيْخْ তথা ধমকির জন্য এসেছে।

٤٤. وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا بَعْضًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا عَلَيْهِمْ كَمَا قَالُوْا فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اَيْ تَعْذِيْبًا لَهُمْ يَقُوْلُوْا هٰذَا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ . مُتَرَاكِبٌ نَرْتَوِيْ بِهٖ وَلَا يُؤْمِنُوْا .

৪৪. তারা আকাশের কোনো খণ্ড তাদের উপর ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে যেমনটি তারা বলেছিল যে, আকাশের কোনো খণ্ড আমাদের উপরে ফেলে দাও অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। তারা বলবে, এটাতো এক পুঞ্জিভূত মেঘ। অর্থাৎ জমাকৃত বৃষ্টি। যার দ্বারা আমরা পরিতৃপ্ত হবো এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

٤٥. فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ لا يَمُوْتُوْنَ .

৪৫. আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তারা বজ্রাঘাতে হতচেতন হবে। মৃত্যুবরণ করবে।

٤٦. يَوْمَ لَا يُغْنِيْ بَدَلٌ مِنْ يَوْمِهِمْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ط يُمْنَعُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْاٰخِرَةِ.

৪৬. সেদিন কোনো কাজে আসবে না এটা يَوْمَهُمْ থেকে بَدَلْ হয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্র এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। পরকালে তাদের থেকে শাস্তি প্রতিহত করা হবে না।

٤٧. وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِكُفْرِهِمْ عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ اَيْ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ مَوْتِهِمْ فَعُذِّبُوْا بِالْجُوْعِ وَالْقَحْطِ سَبْعَ سِنِيْنَ وَبِالْقَتْلِ يَوْمَ بَدْرٍ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ . اَنَّ الْعَذَابَ يَنْزِلُ بِهِمْ .

৪৭. এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে, জালেমদের জন্য তাদের কুফরির কারণে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের মৃত্যুর পূর্বে। সুতরাং তাদেরকে সাত বছর পর্যন্ত ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং বদরের দিন হত্যার মাধ্যমে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না যে, তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤٨. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ بِإِمْهَالِهِمْ وَلَا يَضِيقُ صَدْرُكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بِمَرْأَى مِنَّا نَرَاكَ وَنَحْفَظُكَ وَسَبِّحْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِ رَبِّكَ أَيْ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ حِينَ تَقُومُ. مِنْ مَنَامِكَ أَوْ مِنْ مَجْلِسِكَ.

৪৮. আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় তাদেরকে অবকাশ দিয়ে এবং আপনার হৃদয় যেন সংকীর্ণ না হয়. আপনি আমার চক্ষুর সামনেই রয়েছেন অর্থাৎ আপনি আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছেন, আমি আপনাকে দেখছি এবং আপনার হেফাজত ও সংরক্ষণ করছি। আপনি আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন অর্থাৎ আপনি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ বলুন যখন আপনি শয্যা ত্যাগ করবেন।

٤٩. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ حَقِيْقَةً أَيْضًا وَإِدْبَارَ النُّجُوْمِ مَصْدَرٌ أَيْ عَقْبَ غُرُوْبِهَا سَبِّحْهُ أَيْضًا أَوْ صَلِّ فِي الْأَوَّلِ الْعِشَائَيْنِ وَفِي الثَّانِيْ سُنَّةَ الْفَجْرِ وَقِيْلَ الصُّبْحَ.

৪৯. এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন রাত্রিকালেও প্রকৃতভাবে ও তারকার অস্তগমনের পর। إِدْبَارَ হলো মাসদার। অর্থাৎ তারকারাজি অস্তমিত হওয়ার পর তাসবীহ পাঠ করুন। প্রথমটি দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামাজ পড়া উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা ফজরের সুন্নত উদ্দেশ্য এটাও বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয়টি দ্বারা ফজরের নামাজ উদ্দেশ্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ دُمْ عَلٰى تَذْكِيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ : فَذَكِّرْ-এর তাফসীর دُمْ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, اَثْبِتْ টা ذَكِّرْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ, যেভাবে আপনি এখনো পর্যন্ত তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন অনুরূপভাবে আগামীতেও আপনি তাদেরকে অনবরত উপদেশ দিতে থাকুন। তাদের কথার কারণে বিফল মনোরথ হয়ে উপদেশ দান বন্ধ করে দূরে চলে যাবেন না।

قَوْلُهٗ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ : এর অর্থ হলো بِفَضْلِ رَبِّكَ

قَوْلُهٗ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ : এখানে بَاء টা হলো قَسَم-এর জন্য نِعْمَةِ رَبِّكَ হলো مُقْسَمْ بِهٖ যা مَا-এর ইসম اَنْتَ আর খবর كَاهِنٍ-এর মাঝে পতিত হয়েছে। উহ্য ইবাতর হলো– مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ গণক (كَاهِنٌ) এমন ব্যক্তিকে বলে যে, দাবি করে যে, আমি প্রত্যাদেশ ব্যতীত অদৃশ্যের সংবাদ সম্বন্ধে অবগত। আবার কেউ কেউ বলেন যে, بِنِعْمَةِ-এর মধ্যে بَاء-টি হলো سَبَبِيَّة এবং নেতিবাচক বাক্যের مَضْمُوْن-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থ হলো اِنْتَفٰى عَنْكَ الْكَهَانَةُ وَالْجُنُوْنُ بِسَبَبِ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহর রহমতে আপনার থেকে গণকের কর্ম ও উন্মাদনাকে রহিত করা হয়েছে। –[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শওকানী]

قَوْلُهٗ اَمْ بَلْ يَقُوْلُوْنَ : এ আয়াতগুলোতে اَمْ টি ১৫টি জায়গায় এসেছে। প্রতিটি স্থানেই এর উহ্য রূপ بَلْ এবং হামযার সাথে রয়েছে। اِسْتِفْهَامْ-এর হামযা অস্বীকার ও ধমকের জন্য হয়েছে। কাজেই মুফাসসির (র.)-এর জন্য উচিত ছিল যে, প্রত্যেক স্থানেই بَلْ এবং হামযাকে উহ্য মানা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَرَبَّصُوا : এখানে أَمْر টা تَهْدِيْد -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ اَحْلَامُهُمْ : এটি حُلْم [.حَا বর্ণে পেশ] حِلْم [.حَا বর্ণে যের]-এর বহুবচন حُلُم [.حَا বর্ণে পেশ , এবং বহুবচন حُلْم [.حَا বর্ণে পেশ] অর্থ হলো স্বপ্ন। আর حِلْم [.حَا বর্ণে যের] অর্থ সহনশীল, ধৈর্যশীল। যেহেতু সহনশীলতা জ্ঞানের কারণে হয়ে থাকে حِلْم অর্থ জ্ঞান ব্যবহৃত হয়। মনে হয় যেমন এখানে مُسَبَّبْ বলে سَبَبْ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ لَمْ يَخْتَلِقَهُ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامْ -এর হামযাটা অস্বীকারমূলক।

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالُوْا اِخْتَلَقَهُ : এটা উহ্য মেনে এদিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ এটা উহ্য শর্তের جَزَاء হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِشِبْهِ هٰذَا الزَّعْمِ بِزَعْمِهِمْ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ : এই ইবারতে বৃদ্ধির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ের অপনোদন করা। সংশয় হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ -এর সাথে এর পূর্বের কোনো সম্পর্ক জানা যায় না।

সন্দেহের উত্তর : উত্তরের সারমর্ম হলো পূর্বের আয়াতে মুশরিকদের এ ধারণাকে বর্ণনা করেছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কুরআন রচনা করে মানুষের নিকট পেশ করছেন। তাদের এ ধারণা বাতিল ও অসার। দ্বিতীয় আয়াতে মুশরিকদের এ বাতিল ধারণার উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। উভয় ধারণাই ফাসেদ এবং বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে মুশতারাক। আর এটাই হলো وَجْهِ اِشْتِرَاكْ উভয় আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক ও مُنَاسَبَتْ প্রমাণিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ غُرْمٌ : مَغْرَمٌ -এর তাফসীর غُرْمٌ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, مَغْرَمٌ -এর مِيْم টি مَصْدَرِ مِيْمِيْ

قَوْلُهُ فِيْ دَارِ النَّدْوَةِ : মুফাসসির (র.)-এর জন্য উচিত ছিল دَارُ النَّدْوَةِ শব্দটি উহ্য করে দেওয়া। কেননা দারুন নদওয়াতে মুশরিকরা সমবেত হয়েছিল রাসূল ﷺ -এর হিজরতকালে। যাতে রাসূল ﷺ -কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল আর এই সূরা হলো মাক্কী যা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। কাজেই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকে নদওয়ার সাথে আবদ্ধ করা কঠিন কাজ। এরই উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, দারুন নদওয়ার قَيْد -কে উহ্য রাখাই ভালো হতো। কেননা রাসূল ﷺ প্রেরিত হওয়ার থেকেই তো চক্রান্তের ধারা অব্যাহত ছিল।

قَوْلُهُ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا : এই আয়াত হযরত শুয়াইব (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমনটি সূরা শু'আরাতে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসসির (র.)-এর সূরা বনী ইসরাঈলে কুরাইশদের সম্পর্কে অবতারিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত ছিল। আর সেই আয়াতটি হলো أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا

قَوْلُهُ فَذَرْهُمْ : এটা شَرْط مُقَدَّمْ -এর جَزَاء উহ্য শর্ত হলো এই যে– إِذَا بَلَغُوْا فِي الْعِنَادِ إِلٰى هٰذَا فَذَرْهُمْ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُوْنٍ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দু'দল লোকের উল্লেখ রয়েছে, এক দল যারা সত্যদ্রোহী, যারা অশান্তি প্রিয়, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত তাদের সম্পর্কে সূরার প্রারম্ভে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদের শাস্তি অনিবার্য, এরপর ঈমানদার ও নেককারদের শুভ পরিণতি জান্নাতের ঘোষণার পর জান্নাতের অসংখ্য নিয়ামতের কিছু উল্লেখ রয়েছে।

আর এ আয়াতে প্রিয়নবী ﷺ -কে এ মর্মে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেররা তাঁকে উন্মাদ ও গণক বলতো আর আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, হে রাসূল! আল্লাহ পাকের দয়ায় আপনি কাফেরদের অপপ্রচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, আপনি নিষ্কলংক, আপনি পাগলও নন, গণকও নন। আপনার সত্যিকার পরিচয় হলো, আপনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী, আর শুধু নবীও নন, বরং সর্বশেষও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। অতএব, কাফেরদের এসব অন্যায় আপত্তিকর মন্তব্যে কিছুই যায় আসে না। নবী হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো মানুষকে উপদেশ দান করা, এ দায়িত্ব আপনি যথারীতি পালন করতে থাকুন, হতভাগা কাফেরদের অন্যায় আচরণে আপনি সবর অবলম্বন করুন, আপনি তো আমার সাহায্য লাভে ধন্য, কাফেররা যাই বলুক, তাতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই।

قَوْلُهُ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ : এ আয়াতেও প্রিয়নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্যে ইরশাদ হয়েছে' হে রাসূল! কাফেররা যে আপনার কথায় কর্ণপাত করে না, তার কারণ কি এই যে, তারা আপনাকে একজন কবি মনে করে। কালের গর্ভে অনেক কবিই হারিয়ে গেছে তাদের ধারণা হলো, আপনিও এভাবে হারিয়ে যাবেন, তারা সে দিনেরই অপেক্ষায় আছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ : [হে রাসূল!] আপনি তাদেরকে বলুন তোমরা আমার মৃত্যুর অপেক্ষা করছো তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি, দেখি তোমাদের কী পরিণতি হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তোমাদের সম্পর্কে কি আদেশ দান করেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী (র.) লিখেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা আমার পরিণতি দেখার অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষা করছি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর। আর তা হলো, আমার শুভ পরিণতি হলো পরম সাফল্য আর তোমাদের শোচনীয় পরিণতি হলো চরম ব্যর্থতা এবং কঠিন শাস্তি।

–[তাফসীরে বয়ানুল কুরআন পৃ. ১০১০]

قَوْلُهُ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -কে কখনো গণক, কখনো পাগল বলতো, আর কখনো তাঁকে কবিও বলা হতো। আর আলোচ্য আয়াতে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এ মর্মে যে, মক্কার কুরাইশদেরকে মানুষ বুদ্ধিমান মনে করে, কিন্তু তাদের বুদ্ধির দৌড় কি এতখানি যে, আল্লাহর প্রিয়নবী ﷺ -কে তারা গণক, পাগল বা কবি মনে করে? তাদের বিবেক বুদ্ধি কি তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ওহী নাজিল হয়, আর কবি যে কল্পনার জাল বিস্তার করে এবং মাতাল যে প্রলাপ বকে, এর মধ্যে তারা কি কোনো পার্থক্যই করতে পারে না? তারা কি এতই নির্বোধ, প্রকৃতপক্ষে, তারা সবই বোঝে, তবে তারা জ্ঞানপাপী তাদের স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে দৌরাত্ম্য এবং সত্যদ্রোহিতা, আর সেই স্বভাবগত দৌরাত্ম্যের কারণেই তারা সত্যকে গ্রহণ করে না। তাই ইরশাদ হয়েছে– أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ অর্থাৎ 'তাদের বিচার বুদ্ধি কি তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়? অথবা তারা এক সীমা লঙ্ঘনকারী জাতি'।

অর্থাৎ কুরাইশ সর্দারদেরকে তো বুদ্ধিমান মনে করা হয়, কিন্তু তাদের বুদ্ধি কি তাদেরকে এ আদেশই দেয় যে, একই ব্যক্তিকে তারা একবার গণক বলে, আবার জাদুকর বলে, কখনো কবি বলে, আবার কখনো উন্মাদ বলে, অথচ যে জাদুকর সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আর যে উন্মাদ তার বুদ্ধিই নেই, তাদের এসব স্ববিরোধী কথাবার্তায় একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারাই নির্বোধ, অথবা সত্যদ্রোহিতা এবং ইসলামের শত্রুতায় তারা সীমালঙ্ঘন করছে পবিত্র কুরআন এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর সত্যতার দলিল প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত এবং অনস্বীকার্য।

قَوْلُهُ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ .... إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ : অর্থাৎ এ কাফেররা কি একথা বলতে চায় যে, পবিত্র কুরআনকে হযরত রাসূলে করীম ﷺ নিজেই রচনা করে এনেছেন এবং আল্লাহ পাকের কালাম বলে প্রচার করেছেন? তারা কি এ ধারণা করে যে, পবিত্র কুরআনের ন্যায় মহান গ্রন্থ কোনো মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব? যদি তাদের এ ধারণাই হয়, তবে পবিত্র কুরআনের অনুরূপ কোনো বাণী তারা রচনা করে নিয়ে আসুক। অথচ তা কখনো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। মানব দানব সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও পবিত্র কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। তাদেরকে বারে বারে আহবান জানানো সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মূলত এ কাফেরদের মন পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় না এবং এ কাফেররা জেনে শুনেই এসব কথা বলছে।

قَوْلُهُ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ :অর্থাৎ তারা যে, আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং আল্লাহ পাকের বাণীকে মানে না, এর কারণ কি? তারা কি ভেবেছে যে, তাদের উপর কারো কোনো শক্তি নেই? তারা কি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছে, কে তাদের স্রষ্টা? নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? এই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কি তাদেরই সৃষ্টি? অথবা আল্লাহ পাকের নিয়ামতের ভাণ্ডারের আধিপত্য কি তারা লাভ করেছে? প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টিজগতের একমাত্র মালিক, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনি রিজিকদাতা, তিনি ভাগ্য-নিয়ন্তা, তাঁর হাতেই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা, এসব কথা কাফেররা খুব ভালোভাবেই জানে। কিন্তু তাদের হিংসা, শত্রুতা, মানবতা বিরোধী আচরণ, এ কথার প্রমাণ যে, তাদের পাপপ্রবণ মন তাদেরকে সত্য গ্রহণে বিরত রাখে, ফলে তারা বুঝে শুনেই সত্যদ্রোহিতায় লিপ্ত থাকে।

قَوْلُهُ أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ : কাফের মুশরিকরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করে না, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালাতেও তারা ঈমান আনে না, আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কুরআনের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই, অথচ বিশাল বিস্তৃত আসমান জমিন স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি নৈপুণ্যের অপূর্ব জীবন্ত নিদর্শন। এসব নিদর্শন দেখেও কি তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না? নাকি তারা একথা মনে করে যে, তারা এসব সৃষ্টি করেছে? তারা যে সৃষ্টি করেনি, একথা তারা ভালোভাবেই জানে। অতএব, আল্লাহ পাকই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই হলো বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সম্পদ ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব কি তাদের হাতেই রয়েছে? যে তারা যাকে ইচ্ছা তাকে নবুয়ত দিয়ে দিতে পারে।

অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের জ্ঞান-ভাণ্ডারের উপর কি তাদের আধিপত্য রয়েছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা তাকে ইলম এবং হিকমত দান করতে পারে? এবং তারা জানতে পারে কে নবুয়তের যোগ্য আর কে ইলম এবং হিকমতের উত্তরাধিকারী হতে পারে? অথবা সবকিছুর উপর কি তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে? তথা তারা আল্লাহ পাকের সম্পদের ভাণ্ডারের রক্ষী নিযুক্ত হয়েছে? এসব কিছুই নয়, অতএব তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনা, যদি তারা এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তবে দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাকাই তাদের কাজ।

قَوْلُهُ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا : শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সূরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ আমার হেফাজতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরোয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে- وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাজত করবেন।

এরপর আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ অর্থাৎ আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থান করা। ইবনে জারীর (র.) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে বক্তি রাত্রে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তা-ই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

এরপর যদি সে অজু করে নামাজ পড়ে, তবে তার নামাজ কবুল করা হবে। -[ইবনে কাসীর]

মজলিসের কাফফারা : মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন: 'যখন দণ্ডায়মান হন' -এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.) বলেন, তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তাসবীহ ও তাহমীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোনো সৎকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোনো পাপকাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভালোমন্দ কথাবার্তা হয়, সে যদি মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা এই মজলিসে যেসব গুনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -[তিরমিযী, ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ الخ : অর্থাৎ রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরিব ও ইশার নামাজ এবং সাধারণ তাসবীহ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ অর্থাৎ তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামাজ ও তখনকার তাসবীহ পাঠ বোঝানো হয়েছে। -[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরা নাজম

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম শব্দটি হচ্ছে وَالنَّجْمِ এখানে "وَ" বর্ণটি কসমের জন্য, আর اَلنَّجْمُ অর্থ হলো– তারকা নক্ষত্র, যা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। আর এ শব্দটির বিবেচনায়ই এ সূরাকে اَلنَّجْمُ বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ নামকরণের সাথে সূরার বিষয়বস্তুর বিন্দুমাত্র মিল নেই, শুধুমাত্র আলামত বা নিদর্শন হিসেবেই এ শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। শুধুমাত্র একটি আয়াত যা হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সাবহা সম্পর্কে অবতীর্ণ তা মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। এটি পবিত্র কুরআনের ৫৩ নং সূরা। আয়াত সংখ্যা ৬২, রুকূ' সংখ্যা ৩টি, বাক্য সংখ্যা ৩০০টি। এর অক্ষর রয়েছে ১৪০৫ টি।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় তাওহীদের প্রমাণ এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে এ নশ্বর জগতের অবসান ও কিয়ামত অনুষ্ঠানের যে প্রমাণ রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালতের প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ -এর প্রত্যেকটি কথা যে সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় তা ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মোবারক জবান থেকে যা বের হয় তা শুধু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহী। এ কথার ঘোষণাও রয়েছে এ সূরায়। –[নূরুল কুরআন খ. ২৭, পৃ. ৬৩]

সূরার বৈশিষ্ট্য : সূরা নাজম এমন প্রথম সূরা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ঘোষণা করেন। –[কুরতুবী]

এ সূরাতেই সর্বপ্রথম সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াতের সিজদা আদায় করেন। মুসলমান এবং কাফের সবাই এ সিজদায় শরিক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাফের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সিজদায় অবনত হয় কেবল এক অহঙ্কারী ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে সে সিজদা করেনি। কিন্তু সে একমুষ্ঠি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল, ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি সেই ব্যক্তিকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। –[ইবনে কাছীর]

সূরার আলোচ্য বিষয় : এ সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মুশরিকদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে– أَوَّلُ سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ فِيْهَا سُوْرَةُ النَّجْمِ সিজদার আয়াত রয়েছে এমন সূরার মধ্যে সূরা নাজমই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতেই এ হাদীসের যেসব অংশ ও টুকরা আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ, আবূ ইসহাক ও যুহাইর ইবনে মুআবিয়ার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা হতে জানা যায় যে, এটা কুরআন মাজীদের এমন একটা সূরা যা নবী করীম ﷺ কুরাইশদের একটা সাধারণ সভায় [আর ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনানুযায়ী হেরেম শরীফে] সর্বপ্রথম পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সভায় কাফের ও মুমিন উভয় শ্রেণির লোকই উপস্থিত ছিল। শেষের দিকে তিনি যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করলেন, তখন উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সঙ্গে সিজদা করল। মুশরিকদের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত যারা সকলের অপেক্ষা বেশি বিরোধী ছিল সেজদা না করে পারল না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র একজন উমাইয়া ইবনে খালফ্কে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে নিল এবং বলল, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। উত্তরকালে আমার এ চক্ষুদ্বয় এ দৃশ্যও দেখতে পেয়েছে যে, লোকটি কুফরি অবস্থায়ই নিহত হলো।

এ ঘটনার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হচ্ছেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবূ অদায়া। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের দেওয়া বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ যখন সূরা নাজম পাঠপূর্বক সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সমস্ত জনতাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় চলে গেল, তখন আমি সিজদা করলাম না। বর্তমানে তার ক্ষতিপূরণ আমি এভাবে করি যে, এ সূরাটি পাঠকালে আমি কখনোই সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইবনে সা'আদ বলেছেন, ইতঃপূর্বে নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামের একটি ছোট দল আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেছিলেন। এ বৎসরই রমজান মাসে রাসূলে কারীম ﷺ কুরাইশদের সাধারণ সম্মেলনে সূরা নাজম তেলাওয়াত করলেন এবং মুমিন ও কাফের সকলেই তাঁর সাথে সেজদায় পড়ে গেল। আবিসিনিয়ায় হিজরত করে যাওয়া লোকদের নিকট এ খবর পৌঁছল ভিন্ন একরূপ নিয়ে। তাতে বলা হলো যে, মক্কার কাফেররা সব মুসলমান হয়ে গেছে। এরূপ সংবাদ পেয়ে হিজরতকারীদের মধ্যে কিছুলোক নবুয়তের ৫ম বর্ষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু তাঁরা এখানে এসে দেখতে পেলেন, জুলুমের চাকা পূর্বানুরূপই সবকিছু নিষ্পিষ্ট করে চলছে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা পুনরায় হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান। এ প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, এ সূরাটি নবুয়তের ৫ম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিল।

সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি : নাজিল হওয়ার সময়কাল সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হতে যে অবস্থার মধ্যে এ সূরাটি নাজিল হয়েছিল তা জানা যায় যে, নবুয়ত লাভের পর দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ কেবলমাত্র অপ্রকাশ্য মজলিসে ও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আল্লাহর কালাম শুনিয়ে শুনিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানাতেছিলেন। এ দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে কোনো সাধারণ জনসমাবেশে কুরআন মাজীদ পড়ে শুনাবার কোনো সুযোগই তাঁর হয়নি। কাফেরদের কঠিন প্রতিরোধই ছিল তাঁর পথের প্রতিবন্ধক। রাসূলে কারীম ﷺ -এর ব্যক্তিত্বে তাঁর তাবলীগী কার্যাবলি ও তৎপরতায় কি তীব্র আকর্ষণ ছিল এবং কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহে কি সাংঘাতিক রকমের প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা সবিশেষ অবহিত ছিল। এ কারণেই তারা নিজেরাও এ কালাম না শুনবার এবং অন্যরাও যাতে শুনতে না পারে সেজন্য চেষ্টা ও যত্নের কোনো ত্রুটি করত না। রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে নানা প্রকারে ভুল ধারণা প্রচার করে কেবলমাত্র নিজেদের মিথ্যা প্রচারণার বলে তাঁর এ দীনি মিশনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে এক দিকে তারা নানা স্থানে এ কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, 'মুহাম্মদ ﷺ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং এক্ষণে অন্য লোকদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে।' অপরদিকে তিনি যেখানেই কুরআন শুনানোর চেষ্টা করতেন, সেখানে হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকে কি কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে তা জানতে না পারে, এরূপ করার মূলে তাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

এরূপ অবস্থায় একদিন রাসূলে কারীম ﷺ হেরেম শরীফের মধ্যে আকস্মিকভাবে ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এখানে কুরাইশ বংশের লোকদের একটা বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মুখে ভাষণটি বিঘোষিত হয়, আর তা-ই আমাদের সামনে রয়েছে সূরা নাজম রূপে। এরূপ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তিনি যখন এটা শুনাতে শুরু করলেন, তখন তাঁর বিপরীত চিৎকার ও কোলাহল করার কোনো হুঁশ-ই বিরুদ্ধবাদীদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী করীম ﷺ যখন সিজদায় পড়ে গেলেন, তখন তারাও সিজদায় পড়ে গেল। এটা ছিল তাদের একটা বড় দুর্বলতা, এ দুর্বলতা যখন তারা দেখে ফেলল, তখন তারা বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়ল। সাধারণ লোকেরাও তাদের এ বলে ভর্ৎসনা করতে লাগল যে, যে কালাম শুনতে তারা অন্য লোকদেরকে নিষেধ করে বেড়াচ্ছে অথচ তারা নিজেরাই সেই কালাম শুধু যে মনোযোগ সহকারে শুনছে তাই নয়; বরং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে তারা সিজদাও করেছে। লোকদের এ ভর্ৎসনা হতে বাঁচার জন্য তখন তারা একটা মিথ্যা কথাও বলতে শুরু করল। তারা বলতে লাগল, দেখুন, আমরা তো শুনতে পাচ্ছিলাম যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى পড়ার পর যেন পড়ছেন– تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى 'এ উচ্চ সম্মানিত দেবী। আর তাদের শাফাআত পাওয়ার খুবই আশা করা যায়।' এ কারণে আমরা মনে করেছিলাম, মুহাম্মদ আমাদের আকিদা-বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে। এ কারণেই আমরা তাঁর সঙ্গে একত্র হয়ে সিজদা করতে কোনো দোষ মনে করিনি।

অথচ তারা যে বাক্য কয়টি শুনতে পেয়েছে বলে দাবি করেছে, এই গোটা সূরার পূর্বাপর প্রেক্ষিতের সাথে তার বিন্দুমাত্রও সামঞ্জস্য আছে এবং তাতে এ বাক্য কয়টিও পড়া হয়ে থাকতে পারে– এরূপ কথা কেবলমাত্র পাগলরাই চিন্তা করতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : মক্কার কাফেররা কুরআন মাজীদ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে যে আচরণ অবলম্বন করে আছে, তা যে একান্ত ভুল সেই কথা জানিয়ে দেওয়া ও আমাদের এসব বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়াই এ ভাষণের মূল বিষয়বস্তু।

কথা আরম্ভ করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মদ ﷺ কোনো বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন, তোমরা যেমনটা তাঁর সম্পর্কে রটিয়ে বেড়াচ্ছ। ইসলামের এ শিক্ষা ও দাওয়াত তিনি নিজের কল্পনা হতেও বানিয়ে নেননি– যেমনটি তোমরা মনে করে নিয়েছ; বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন, তা একান্তই ওহী বৈ কিছুই নয়, যা তাঁর প্রতি নাজিল করা হয়। তোমাদের সামনে তিনি যে মহাসত্য বর্ণনা করেন তা তাঁর নিজের ধারণা অনুমান কল্পনায় রচিত নয়। তার সবই তাঁর নিজ চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখা মহাসত্য বিশেষ। এ জ্ঞান তাঁকে যে ফেরেশতার মাধ্যমে দেওয়া হয়, তাঁকে তিনি নিজে দেখতে পেয়েছেন। আল্লাহর বিরাট মহান নিদর্শনাবলি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে ও সরাসরি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজের কল্পনাবশে কোনো কথা বলেন না, যা বলেন নিজের চোখে প্রত্যক্ষভাবে দেখে তবে বলেন। কোনো অন্ধ ব্যক্তি যদি দৃষ্টিমান ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে– এমন জিনিস নিয়ে, যা সে নিজে দেখতে পায় না, তাহলে যে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এখানে তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

এরপর ক্রমান্বয়ে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে– **প্রথমত** শ্রোতাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ কর তা নিছক ধারণা, অনুমান ও মনগড়াভাবে স্থির করে নেওয়া কতকগুলো কথার উপরই তার ভিত্তি সংস্থাপিত। তোমরা লাত-মানাত ও উয্যার ন্যায় কতিপয় দেবীকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছ, অথচ প্রকৃত 'ইলাহ' হওয়ার ব্যাপারে এগুলোর একবিন্দুও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাগণকে মনে করে বসেছ আল্লাহর কন্যা-সন্তান, অথচ তোমরা নিজেরা কন্যা-সন্তানকে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে কর। তোমরা নিজেরা ধরে নিয়েছ যে, তোমাদের এসব মা'বুদ আল্লাহ তা'আলা দ্বারা তোমাদের কাজ উদ্ধার করিয়ে দিতে পারে। অথচ আসল ব্যাপার হলো, তারা তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহর নিকটবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণও একত্র হয়ে আল্লাহ দ্বারা কোনো কথা মানিয়ে নিতে পারে না। তোমরা এ ধরনের যেসব আকিদা বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছ এর মধ্যে কোনো একটিও কোনোরূপ নির্ভুল জ্ঞান কিংবা প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নয়।

দ্বিতীয়ত লোকদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলাই সমগ্র বিশ্বলোকের একচ্ছত্র মালিক ও নিরঙ্কুশ অধিকর্তা। যে লোক তাঁর দেখানো পথের অনুসারী সেই সত্যানুসারী। যে লোক তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক নয়, সে-ই পথভ্রষ্ট।

তৃতীয়ত কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার শত শত বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফাসমূহে সত্য দীনের যে কয়টি মৌলিক বিষয় বিবৃত হয়েছে তা এ সূরার মাধ্যমে লোকদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে।

এ সূরার আমল : যে ব্যক্তি সূরা নাজম হরিণের চামড়ায় লিখে হাতে বেঁধে রাখবে, সে বিজয়ী হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ : সূরা নাজম, মক্কায় অবতীর্ণ

ثِنْتَانِ وَسِتُّوْنَ اٰيَةً : আয়াত : ৬২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. وَالنَّجْمِ اَلثُّرَيَّا إِذَا هَوٰى لا غَابَ .

٢. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَنْ طَرِيْقِ الْهِدَايَةِ وَمَا غَوٰى ج مَا لَابَسَ الْغَيَّ وَهُوَ جَهْلٌ مِنْ اِعْتِقَادٍ فَاسِدٍ .

٣. وَمَا يَنْطِقُ بِمَا يَاتِيْكُمْ بِهِ عَنِ الْهَوٰى ط هَوٰى نَفْسِهِ .

٤. اِنْ مَا هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى لا اِلَيْهِ .

٥. عَلَّمَهُ اِيَّاهُ مَلَكٌ شَدِيْدُ الْقُوٰى لا

٦. ذُوْ مِرَّةٍ ط قُوَّةٍ وَشِدَّةٍ اَوْ مَنْظَرٍ حَسَنٍ اَىْ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاسْتَوٰى لا اِسْتَقَرَّ .

٧. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ط اُفُقِ الشَّمْسِ اَىْ عِنْدَ مَطْلَعِهَا عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ بِحِرَاءَ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ سَالَهُ اَنْ يُرِيَهُ نَفْسَهُ عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا فَوَاعَدَهُ بِحِرَاءَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ صُوْرَةِ الْاٰدَمِيِّيْنَ .

অনুবাদ :

১. নক্ষত্রের কসম সুরাইয়া তারকা, যখন তা অস্তমিত হয় গোপন হয় বা ডুবে যায়।

২. তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট হননি– অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ হেদায়েতের সরল পথ হতে বিচ্যুত হননি এবং বিপদগামীও হননি। অর্থাৎ তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হননি। [غَوٰى যেটা اَلْغَوَايَةُ হতে নির্গত হয়েছে] তার অর্থ হলো কুসংস্কারমূলক অন্ধ বিশ্বাস।

৩. তিনি বলেন না ঐ সম্পর্কে যেটা তিনি তোমাদের নিকট নিয়ে আসেন [কুরআন বা ওহী সংক্রান্ত বিষয়াদি] কুপ্রবৃত্তি অনুসারে অর্থাৎ স্বীয় মনের প্রবৃত্তি অনুসরণে।

৪. এটা [কুরআন] তো ওহী ব্যতীত অন্য কিছু নয় যা প্রত্যাদেশ হয় তাঁর প্রতি।

৫. তাকে শিক্ষা দান করেন এমন এক ফেরেশতা যিনি প্রবল শক্তিশালী।

৬. [যে ফেরেশতা] প্রজ্ঞাসম্পন্ন শক্তি ও দৃঢ়তা সম্পন্ন অথবা আকৃতিতে অপরূপ সুন্দর অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) অতঃপর সে স্বীয় আকৃতিতে স্থির হয়েছিল। স্থির হয়ে দাঁড়াল।

৭. তখন সে উর্ধ্বদিগন্তে সূর্যের দিকে তথা সূর্য উদিত হওয়ার স্থলে তার মূল আকৃতিতে, নবী করীম ﷺ তাকে হেরা গুহা হতে দেখেছেন যে, পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দিগন্ত আবৃত হয়ে গিয়েছে। যা দেখা মাত্রই তিনি [নবীজী ﷺ] বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছেন। বস্তুত নবী করীম ﷺ তাকে তার সেই মূল আকৃতিতে প্রকাশ হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যেই আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যা তিনি হেরাগুহায় হওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) মনুষ্য আকৃতিতে প্রকাশ হয়েছেন।

٨. ثُمَّ دَنٰى قَرُبَ مِنْهُ فَتَدَلّٰى ۙ زَادَ فِى الْقُرْبِ .

৮. তারপর সে নিকটবর্তী হলো অর্থাৎ সে ফেরেশতা তার [মুহাম্মদ ﷺ -এর] নিকটবর্তী হলো। এরপর আরো নিকটবর্তী হলো অর্থাৎ অতি নিকটবর্তী হলো।

٩. فَكَانَ مِنْهُ قَابَ قَدْرَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ج مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى اَفَاقَ وَسَكَنَ رَوْعُهٗ .

৯. ফলে রইল তাদের মাঝের ব্যবধান– সমপরিমাণ দুই ধনুকের পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা কম অর্থাৎ দুই ধনুক অপেক্ষা [কম] ইতোমধ্যে নবী করীম ﷺ -এর হুঁশ ফিরে আসে এবং তিনি স্থির হলেন।

١٠. فَاَوْحٰى تَعَالٰى اِلٰى عَبْدِهٖ جِبْرَئِيْلَ مَا اَوْحٰى . جِبْرَئِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُذْكَرِ الْمُوْحٰى تَفْخِيْمًا لِشَاْنِهٖ .

১০. তখন ওহী করলেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি অর্থাৎ জিবরাঈল– [পরবর্তীতে] যেটার ওহী করল জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর প্রতি। বিশেষ গুরুত্বারোপের উদ্দেশ্যে ওহীর বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়নি।

١١. مَا كَذَبَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَنْكَرَ الْفُؤَادُ فُؤَادُ النَّبِيِّ مَا رَاٰى . بِبَصَرِهٖ مِنْ صُوْرَةِ جِبْرَئِيْلَ .

১১. মিথ্যারোপ করেননি– كَذَبَ পদটি তাখফীফ তথা তাশদীদ ব্যতীত শুধু যবর দিয়ে এবং তাশদীদসহ উভয়ভাবেই হতে পারে। আর তাশদীদ-এর সূরতে অর্থ হবে অস্বীকার। অন্তঃকরণ– নবী করীম ﷺ -এর অন্তর, যা সে দেখেছে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর যে আকৃতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

١٢. اَفَتُمَارُوْنَهٗ تُجَادِلُوْنَهٗ وَتَغْلِبُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى . خِطَابٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ الْمُنْكِرِيْنَ رُؤْيَةَ النَّبِيِّ لِجِبْرَئِيْلَ (ع) .

১২. তোমরা কি তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? তাকে পরাভূত করার জন্যে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ ঐ বিষয়ের উপর যা সে দেখেছে [এ আয়াতে] ঐ সকল মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ কর্তৃক জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার ব্যাপারটি অস্বীকার করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَالنَّجْمِ : এখানে وَاوْ টা হলো قَسَمِيَّة আর اَلنَّجْمُ অর্থ হলো তারকা। বহুবচনে نُجُوْمٌ এবং اَنْجُمٌ আসে। এটা اِسْمِ جِنْس-এর উপর اِسْمِيَّتْ প্রাধান্য লাভ করেছে। যখন মুতলাকভাবে বলা হয় তখন 'সূরাইয়া' তারকা উদ্দেশ্য হয়। এখানে اَلنَّجْمُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এতে কয়েকটি মতামত রয়েছে। যথা–

১. এক দলের অভিমত হলো তারকা জিনস উদ্দেশ্য।

২. আল্লাম সুদ্দী (র.) বলেন, যুহরা তারকা উদ্দেশ্য। আরবের এক সম্প্রদায় এর পূজা-অর্চনা করত।

৩. সুরাইয়া তারকা উদ্দেশ্য। মুফাসসির (র.) এটাই গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ ও অন্যান্যরাও এটাকে উদ্দেশ্য করেছেন।

৪. কেউ কেউ বলেছেন। এর দ্বারা বেলদার ঘাম উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহর বাণী وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ -এর মধ্যে আল্লামা আখফাশ (র.) এটাই গ্রহণ করেছেন।

৫. কারো কারো মতে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য।

৬. কেউ কেউ কুরআন উদ্দেশ্য করেছেন, তা نَجْمًا نَجْمًا বা কিছু কিছু করে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। মুজাহিদ , ফররা ও অন্যান্যের এ অভিমত রয়েছে। এ ছাড়া ও আরো অনেক মতামত রয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতামত হলো- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরাইয়া তারকা। –[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শওকানী]

সুরাইয়া সাতটি তারকার সমষ্টিগত নাম। তন্মধ্যে ছয়টি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। আর একটি অস্পষ্ট। কেউ কেউ বলেন ৭টি তারকার সমষ্টিকে সুরাইয়া বলা হয়। লোকেরা সুরাইয়া দ্বারা স্বীয় দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করে থাকে। 'শিফা' গ্রন্থে কাজী আয়াজ (র.) লিখেছেন যে, রাসূল ﷺ সুরাইয়ার এগারোটি তারকা দেখতে পেতেন, মুজাহিদ থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اِذَا هَوٰى : এর অর্থ হলো سَقَطَ এবং غَابَ

قَوْلُهُ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى : এটা عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ -এর অন্তর্গত। ضَلَالَةٌ প্রত্যেক ধরনের ভ্রষ্টতাকে বলা হয় চাই তা বিশ্বাসগত ভ্রষ্টতা হোক বা আমলগত হোক। আর বিশ্বাসগত ভ্রষ্টতাকে غَوَايَةٌ বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন ضَلَالٌ বলা হয় জ্ঞানগত ভ্রষ্টতাকে। আর আমলগত ভ্রষ্টতাকে غَوَايَةٌ বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, উভয়টি مُتَرَادِفٌ তথা সমার্থবোধক।

قَوْلُهُ عَنِ الْهَوٰى : اَلْهَوٰى এটা ইসমে মাসদার। অর্থ– মনের অবৈধ কামনা। عَنِ الْهَوٰى এটা مَا يَنْطِقُ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর কোনো কথাই স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণে হয় না।

قَوْلُهُ اِنْ هُوَ : এখানে هُوَ -এর মারজি হলো نُطْقٌ যা يَنْطِقُ -এর مَفْهُوْم

قَوْلُهُ يُوْحٰى : এটা وَحْيٌ -এর সিফত مَجَازٌ -এর সম্ভাবনা কে শেষ করার জন্য এসেছে। (صَاوِيْ)

قَوْلُهُ عَلَّمَهُ اِيَّاهُ : ضَمِيْر مَنْصُوْب مُتَّصِل রাসূল ﷺ -এর দিকে ফিরেছে এবং প্রথম মাফঊল এবং দ্বিতীয় ضَمِيْر مَنْصُوْب مُنْفَصِل যাকে মুফাসসির (র.) ঊহ্য মেনেছেন তা হলো দ্বিতীয় মাফঊল। আর তা وَحْيٌ -এর দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى : এটা উহ্য মাওসূফের সিফত যার প্রতি মুফাসসির (র.) مَلَكٌ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন উদ্দেশ্য হলো হযরত জিবরীল (আ.)।

قَوْلُهُ ذُوْ مِرَّةٍ : مِرَّةٍ শব্দের অর্থ হলো বাতেনী শক্তি। যেমন দৃঢ়তা, দ্রুত পট পরিবর্তন। আবার কেউ কেউ مِرَّةٍ দ্বারা ইলম এবং কেউ কেউ সৌন্দর্য উদ্দেশ্য নিয়েছেন। مَنْظَرٌ حَسَنٌ বলে এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং شَدِيْدُ الْقُوٰى হলো প্রকাশ্য শক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ.)-কে জাহেরী ও বাতেনী শক্তি পরিপূর্ণভাবে দান করেছিলেন।

قَوْلُهُ فَاسْتَوٰى : এটা عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى -এর উপর عَطْف হয়েছে

قَوْلُهُ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى : এটা جُمْلَه حَالِيَه হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَدَلّٰى : এটা تَدَلّٰى থেকে মাযী-এর وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থ– সে অবতীর্ণ হলো, সে নিকটবর্তী হলো, সে লটকে আসল, এটা دَلَّيْتُ الدَّلْوَ فِى الْبِئْرِ হতে নির্গত। আমি কূপে বালতি ঝুলিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন : নিকটবর্তী হওয়া অবতরণের পরে হয়। কাজেই নিকটবর্তী হলো এরপর অবতরণ করল– এটা অনুচিত মনে হচ্ছে।

উত্তর : মুফাসসির (র.) এই সংশয় নিরসনের জন্যই زَادَ فِى الْقُرْبِ বাক্যটি বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.) নিকটবর্তী হলেন, এরপর আরো নিকটবর্তী হলেন।

আবার কেউ কেউ সংশয়ের এভাবে নিরসন করেছেন যে, বাক্যের মধ্যে পূর্বাপর হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– ثُمَّ تَدَلّٰى فَدَنٰى অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.) অবতরণ করলন এবং নিকটবর্তী হলেন।

قَوْلُهُ قَابَ قَوْسَيْنِ : اَلْقَادُ وَالْقِيْدُ এবং اَلْقَابُ وَالْقِيْبُ অর্থ– পরিমাণ। আরবে মাপার ও অনুমান করার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্য হতে একটি হলো قَوْس বা ধনুক দ্বারা মাপা। এটা ছাড়াও আরবগণ নিম্নোক্ত বস্তুসমূহ দ্বারা মাপ নিরূপণ করত رُمْح [বর্শা] سَوْط [কোড়া, চাবুক] ذِرَاعٌ الْبَاعِ الْخُطْوَة [পা] اَلشِّبْرُ [বিঘত] فَتْرٌ [শাহাদত আঙ্গুল ও আংটির মধ্যখানের অংশ اَلْاِصْبَعُ [আঙ্গুল]। অর্থাৎ হযরত জিবরীল (আ.) রাসূল ﷺ -এর এতই নিকটবর্তী হলেন যে, শুধুমাত্র দুই ধনুক পরিমাণ দূরত্ব বাকি থাকল। কেউ বলেন, قَابَ এতটুকু দূরত্বকে বলা হয় যা ধনুকের হাতল ও কিনারার মাঝে হয়ে থাকে। এবং দুই ধনুকে দুটি قَابَ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَوْ اَدْنٰى : এখানে اَوْ টা بَلْ অর্থে হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– اَوْ يَزِيْدُوْنَ -এর মধ্যে اَوْ টা بَلْ অর্থে হয়েছে, আর যদি اَوْ তার আসলের উপর হয় তবে সংশয় দ্রষ্টার হিসেবে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ حَتّٰى اَفَاقَ : এটা উহ্যের غَايَتْ উহ্য ইবারত হলো ضَمَّهُ اِلَيْهِ حَتّٰى اَفَاقَ

قَوْلُهُ مَاكَذَبَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ : উভয়টিই কেরাতে সাব'আর অন্তর্ভুক্ত। তাশদীদের সুরতে অর্থ হবে- আপনার দৃষ্টি যা অবলোকন করেছে হৃদয় তার সত্যায়ন করেছেন। আর تَخْفِيْف -এর সুরতে অর্থে হবে যা কিছু আপনার দৃষ্টি দেখেছে হৃদয় তাতে সংশয় পোষণ করেনি। (صَاوِىْ)

قَوْلُهُ مِنْ صُوْرَةِ جِبْرَئِيْلَ : এটা مَا -এর বয়ান হয়েছে।

قَوْلُهُ وَتَغْلِبُوْنَهُ : تُمَارُوْنَهُ -এর অন্য তাফসীর تَغْلِبُوْنَهُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, تُمَارُوْنَهُ টা تَغْلِبُوْنَهُ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। যার কারণে تُمَارُوْنَهُ -এর সেলাহ عَلٰى নেওয়া বৈধ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরা ছিল সূরা তূর। এতে একত্ববাদ, নবুয়ত, পুনরুত্থান এবং প্রতিদানের বিষয় আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা নাজমেও উল্লিখিত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং উভয় সূরার মধ্যকার যোগসূত্র স্পষ্ট।

اَلنَّجْمُ -এর অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরীনদের অভিমত : اَلنَّجْمُ শব্দের অর্থে মুফাসসিরীনদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ- কৃত্তিকা সপ্ত নক্ষত্র বা সুরাইয়া। ইবনে জারীর ও যামাখশারী (র.) এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা আরবি ভাষায় যখন শুধু اَلنَّجْمُ শব্দটি বাহ্যত হয়, তখন সাধারণত তার অর্থ হয় কৃত্তিকা সপ্ত নক্ষত্র সমষ্টি। সুদ্দী বলেন, এটার অর্থ- শুক্রগ্রহ বা যোহরা তারা। আর আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ আবূ ওবাইদা বলেন, এখানে اَلنَّجْمُ শব্দটি বলে নক্ষত্রপুঞ্জও বুঝানো হয়েছে। এ দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো যখন সকাল হলো এবং সকল নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হলো। স্থান ও ক্ষেত্রের দৃষ্টিতে এ শেষ অর্থটিই অগ্রাধিকার যোগ্য। মুজাহিদ হতে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এর অর্থ হলো আকাশের তারকারাজি। তিনি এটাও বলেন, এর অর্থ- "نُجُوْمُ الْقُرْاٰنِ" আর আখফাশ নাহবীর মতে اَلنَّجْمُ অর্থ হচ্ছে- মাটিতে বিস্তৃত ডালাবিহীন তরুলতা। -[কুরতুবী, জালালাইন]

وَالنَّجْمِ উক্তি দ্বারা শপথ করার রহস্য : আলোচ্য স্থানে "وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى" দ্বারা অস্ত যাওয়া নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে। এ শপথ করার মূলে বিশেষ তাৎপর্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে। রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্ররাজি যখন নীল আকাশে ঝকঝক করতে থাকে, তখন অন্ধকারের মধ্যে তারকারাজির সেই ঝাপসা আলোকে চারপার্শ্বের জিনিসপত্র স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না। তখন বিভিন্ন জিনিসের অস্পষ্ট আকার-আকৃতি দেখে সেই সব সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার শিকার হওয়া কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। যেমন অন্ধকারে খানিকটা দূরত্ব হতে দণ্ডায়মান একটা বৃক্ষ দেখে সেটাকে ভূত মনে করা যেতেই পারে। বালুর স্তূপের মধ্য হতে কোনো পাথর খণ্ড উঁচু হয়ে থাকতে দেখে মনে হতে পারে যে, কোনো বিরাট জন্তু বসে আছে। কিন্তু তারকাসমূহ যখন অস্তমিত হয় এবং সকাল বেলায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তখন প্রত্যেকটি জিনিস তার স্বীয় রূপ ও আকার-আকৃতি নিয়ে প্রতিটি মানুষের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তখন কোনো জিনিসের সঠিকরূপ ও আকার-আকৃতির ব্যাপারে কোনো দ্বিধাবোধ বা সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হয় না। তোমাদের মাঝে বসবাসকারী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপারটিও ঠিক এরূপ। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিসত্তা কিছুমাত্র অন্ধকারে নিপতিত নয়। তা প্রভাত আলোকের মতোই উজ্জ্বল ও সর্বজনবিদিত। তোমরা নিশ্চিত জান, তোমাদের এ সঙ্গী এক অতীব শান্তশিষ্ট প্রকৃতির এবং বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন, কুরাইশ বংশের লোকদের এমন ভুল ধারণা কি করে সৃষ্টি হতে পারে? তিনি যে অতীব সদিচ্ছাপরায়ণ ও সত্যপন্থি মানুষ, তাও ভালো করেই তোমাদের জানা রয়েছে। তিনি জেনে বুঝে কেবল নিজেই বাঁকাপথ অবলম্বন করেছেন তাই নয়, অন্য লোকদেরকেও এ বাঁকাপথে চলার আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েছেন, এমন কিছু মনে করা ঠিক হবে না।

ضَلَالَتْ ও غَوَايَةٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য : অনেকের মতে ضَلَالَتْ এবং غَوَايَةٌ -এর অর্থের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই। তবে তাদের মতে উভয় শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তা হলো ضَلَالَتْ -টা هِدَايَتْ -এর বিপরীতে ব্যবহার হয়। আর غَوَايَةٌ শব্দটি رُشْد শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا -

এবং قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ এতদ্ব্যতীত ضَلَالَتْ শব্দটি غَوَايَتْ শব্দের তুলনায় অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

কারো কারো মতে, ضَلَالَتْ অর্থ- জেনে বুঝে ভুল পথে চলা। আর غَوَايَةٌ অর্থ না জেনে ভুল পথে চলা। অনেকের মতে ضَلَالَتْ অর্থ- সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া, আর غَوَايَتْ অর্থ- ভুল পথে অতিক্রম করা। কারো কারো মতে, ضَلَالَتْ শব্দের সম্পর্ক قَوْل -এর সাথে আর غَوَايَتْ শব্দের সম্পর্ক فِعْل -এর সাথে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তোমাদের নবী বা রাসূল না বলে তোমাদের সাথী বলার কারণ : এখানে মহানবী ﷺ -এর নাম বা নবী কিংবা রাসূল শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে "তোমাদের সাথী" বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ বাইরে থেকে আগত কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন যার সত্যবাদিতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে; বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সাথী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। তার জীবনের কোনো দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুয়ত দাবি করায় সেই তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করেছ। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনো মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাকে অভিযুক্ত করছ। -[মা'আরিফুল কুরআন খ. ৮, পৃ. ১৮৬]

عَنْ طَرِيْقِ الْهِدَايَةِ দ্বারা মুফাসসির কোন দিকে ইশারা করেছেন : মুফাস্‌সির (র.) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ -এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন- مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَنْ طَرِيْقِ الْهِدَايَةِ مَا ضَلَّ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ضَلَالَةٌ -এর অর্থ হচ্ছে- اَلْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ আর غَوَايَةٌ -এর অর্থ হচ্ছে- مَعْصِيَةٌ অর্থাৎ তিনি শব্দ দু'টির মধ্যকার পার্থক্য ও ব্যবধানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

আবার একথাও বলা যেতে পারে যে, ضَلَالَةٌ শব্দের সম্পর্ক সাধারণত قَوْل -এর সাথে হয়ে থাকে আর غَوَايَةٌ -এর সম্পর্ক সাধারণত فِعْل -এর সাথে হয়ে থাকে। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ وَمَا يَنْطِقُ ..... عَلٰى مَا يَرٰى : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরি করে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেন না। এর কোনো সম্ভাবনাই নেই; বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বুখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। যথা-

১. যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কুরআন।

২. যার কেবল অর্থ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ। এরপর হাদীসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনো তা কোনো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনো কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এ নীতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানাবলি বের করেন। এ ইজতিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তথা পয়গাম্বরকুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তাঁরা ইজতিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজতাহিদ আলেম ইজতিহাদে ভুল করলে তাঁরা তার উপর কায়েম থাকতে পারেন। তাঁদের এ ভুলও আল্লাহর কাছে কেবল ক্ষমার্হই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্য তাঁর কিঞ্চিৎ ছওয়াবেরও অধিকারী হন।

এ বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সব কথাই যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরি হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কিছু বলেন না। অথচ সহীহ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বুঝা যায় যে, প্রথমে নির্দেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজতিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জবাব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনো সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদ করে বিধানবলি বের করেন। এ ইজতিহাদে ভুল হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহীতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহর কালাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনোরূপ ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকতে পারে না।

এ আয়াতসমূহের তাফসীরে তাফসীরবিদদের মতভেদ : এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। যথা-

১. হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তাফসীরের সারমর্ম হলো, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ এবং আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, اِسْتَوٰى এবং دَنٰى فَتَدَلّٰى এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার বিশেষণ ও কর্ম। তাফসীরে মাযহারীতে এ তাফসীর অবলম্বিত হয়েছে।

২. অন্য অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এ তাফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নাজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নাজম। বাহ্যত মি'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি বিতর্কের নয়। আসল কারণ হচ্ছে– হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব হাদীসের যে তাফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লিখিত আছে। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য এরূপ–

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلَيْسَ اللّٰهُ يَقُوْلُ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى فَقَالَتْ اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرَائِيْلُ لَمْ يَرَهُ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ خُلِقَ عَلَيْهَا اِلَّا مَرَّتَيْنِ رَاٰهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ سَادًّا اَعْظَمُ خَلْقِهٖ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -

শা'বী হযরত মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন– মাসরূক বলেন এবং আমি একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম [এবং আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল।] মাসরূক বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, অর্থাৎ বলেছেন– وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ - وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আ.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। [আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ হলো] তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তাঁর দেহাকৃতি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। –[ইবনে কাসীর]

সহীহ মুসলিমেও এ রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে মরদুবিয়াহ (র.) থেকে এ রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভাষা এরূপ।

اَنَا اَوَّلُ مَنْ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ لَا اِنَّمَا رَاَيْتُ جِبْرَائِيْلَ مُنْهَبِطًا .

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেন, না; বরং আমি জিবরাঈলকে নিচে অবতরণ করতে দেখেছি।
–[ফাতহুল বারী খ. ৮, পৃ. ৪৯৩]

সহীহ বুখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবূ যার গিফারী (রা.)-কে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেন– فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى তিনি জবাবে বললেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈলকে ছয়শ বাহুবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জারীর (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ما كذب الفواد ما راى আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ রেখেছিল।

আল্লামা ইবনে কাসীরের বক্তব্য : ইবনে কাসীর (র.) স্বীয় তাফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, সূরা নাজমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'দেখা' ও 'নিকটবর্তী হওয়া' বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবূ যার গিফারী, আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবীর এ উক্তি। তাই ইবনে কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেন, আয়াতসমূহে উল্লিখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজের রাত্রিতে সিদরাতুল-মুন্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারের দেখা নবুয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক জমানায় হয়েছিল। তখন হযরত জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদারুন উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) দৃষ্টির অন্তরাল থেকে আওয়াজ দিতেন– হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনি আল্লাহর সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এ আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। তখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) মক্কার উন্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শ বাহু ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন, এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌঁছান। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হযরত জিবরাঈলের মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সারকথা হলো, আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে, উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর তাই, যা উপরে বর্ণনা করা হলো। এ প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল– কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকট আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন। দ্বিতীয়বার দেখার বিষয় وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে মি'রাজের রাত্রিতে এ দেখা হয়। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এই তাফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-ও এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম, সূরা নাজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং হযরত জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম নববী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থেও এ তাফসীর অবলম্বন করেছেন।

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ ইজতিহাদ করেননি, অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। কেননা তিনি যুদ্ধে ইজতিহাদ করেছেন– এর উত্তর কি?

উত্তর : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى আয়াত হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম ﷺ ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো কথা বলেননি, কিন্তু এটা প্রকৃত ব্যাপারের বিপরীত কথা। কেননা তিনি তো অনেক যুদ্ধে ইজতিহাদের ভিত্তিতে অনেক রকম ইরশাদ করেছেন। দ্বিতীয়ত তিনি অনেক বস্তুকে হারাম-অবৈধ করেছেন– যেসব বস্তুর হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট দলিল ও প্রমাণ কুরআনে কারীমে নেই। সুতরাং তিনি যে নিজের প্রবৃত্তি হতে কোনো কথা বলেন না, এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো, নবী করীম ﷺ -এর ইজতিহাদও ওহীর অন্তর্ভুক্ত। ওহী একটি قَاعِدَة كُلِّيَة তথা ব্যাপক ভিত্তিক নীতি যার অনেক جُزْئِيَاتٌ [শাখা-প্রশাখা] রয়েছে। নবী করীম ﷺ ঐসব جُزْئِيَاتٌ -এর ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব নবীর ইজতিহাদ وَحْى خَفِىٌّ তথা বিলুপ্ত ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

এ ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তরে এটাও বলা যেতে পারে যে, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এ কথাটি তো পুরাপুরি প্রযোজ্য; এতদ্ব্যতীত তিনি যেসব কথাবার্তা বলতেন তা তিনটি পর্যায়ে পড়ত, এর বাইরে কোনো কথাই পড়ে না।

১. নবী করীম ﷺ দীনের দাওয়াত সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতেন অথবা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন অথবা কুরআনেরই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়নের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে ওয়াজ-নসিহত করতেন, লোকদেরকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এ সব পর্যায়ে বলা সব কথাবার্তা ওহীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত এসব ব্যাপারে তিনি হলেন কুরআনের সহকারী ব্যাখ্যাদাতা। যদিও এটা ওহীর প্রতিশব্দ নয়, কিন্তু এটা ওহী হতে পাওয়া জ্ঞানেরই ফলশ্রুতি, তাঁরই উপর ভিত্তিশীল এসব কথা ও কুরআনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, কুরআনের শব্দ, ভাষা ও অর্থ সবকিছুই আল্লাহর নিকট হতে আসা। আর অন্যান্য সব বিষয়ের মূল ভাবধারা, বক্তব্য ও বিষয়াদি আল্লাহরই শেখানো, এগুলোকে তিনি নিজের ভাষায় প্রকাশ করতেন। এ পার্থক্যের ভিত্তিতে কুরআনকে 'ওহীয়ে জলী' (وَحْى جَلِىٌّ) এবং তাঁর অন্যান্য যাবতীয় কথাবার্তাকে 'ওহীয়ে খফী' (وَحْى خَفِىٌّ) বলা হয়।

২. দ্বিতীয় প্রকারের কথাবার্তা তিনি বলতেন আল্লাহর কালিমার প্রচার-প্রসার ও প্রচেষ্টা পর্যায়ে। আল্লাহর দীন কায়েম করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া প্রসঙ্গে। এ ক্ষেত্রে তিনি অনেক সময় সঙ্গী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এটা আমার নিজের কথা, অনেক সময় ইজতিহাদের ভিত্তিতে তিনি কথা বলেছেন। অতঃপর তার বিপরীত হেদায়েত [নির্দেশনা] নাজিল হয়েছে। এসব কথা ছাড়া অন্যান্য সব কথাই 'ওহীয়ে খফী' (وَحْى خَفِىٌّ) রূপে গণ্য।

৩. তৃতীয় ধরনের কথাবার্তা তিনি বলতেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। নবুয়তের কর্তব্য পালনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক ছিল না, যা তিনি নবী হওয়ার পূর্বে বলেছেন এবং পরেও বলেছেন। এসব কথাবার্তার ব্যাপারে কাফেরদের কোনো আপত্তিও ছিল না। সুতরাং এটা ওহীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর সেসব কথা সম্পর্কে "আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন"– এমন মনে করার কোনোই কারণ নেই।

'عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى' দ্বারা কোন কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী– عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয়ের ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের দুটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতে মি'রাজের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর নিকট হতে নবী করীম ﷺ -এর শিক্ষালাভ, আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্যলাভের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য ব্যাখ্যানুযায়ী شَدِيْدُ الْقُوٰى দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. জালালাইন গ্রন্থকার আল্লামা মহল্লী (র.) সহ অনেক তাফসীরকারের মতে আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তার মূল আকৃতিতে দেখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর আয়াতে কারীমায় বর্ণিত شَدِيْدُ الْقُوٰى এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর গুণ। আর এ ব্যাখ্যার পক্ষে প্রমাণও রয়েছে। কেননা, সূরার আয়াতসমূহ নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নাজিলকৃত। তাছাড়া নবী করীম ﷺ হতে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়াতে এ সকল আয়াতের তাফসীরে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার কথারই উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ ذُوْ مِرَّةٍ : হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা (রা.) এর অর্থ বলেছেন- সৌন্দর্যমণ্ডিত, ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জায়েদ ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ- শক্তিমান। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) বলেন এর অর্থ- প্রজ্ঞা ও কলা-কৌশল। হাদীস শরীফে বর্ণিত- لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِيْ مِرَّةٍ বাক্যে ذِيْ مِرَّةٍ -এর অর্থ হলো- সুস্থ-সবল ও পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন।

এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- বুদ্ধিবৃত্তি ও দৈহিক শক্তি উভয় দিক দিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর যাবতীয় শক্তি সামর্থ্য পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রয়েছে।

قَوْلُهُ اُفُقٌ : اُفُقٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- দিগন্ত। আর দিগন্ত বলে আকাশের পূর্ব কোণকে বুঝানো হয়। সূর্য যেখান থেকে উদিত হয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে দেয়।

قَوْلُهُ اِسْتَوٰى : "ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى" আয়াতে বর্ণিত اِسْتَوٰى শব্দের অর্থ হচ্ছে- اِسْتَقَرَّ হযরত জিবরীল (আ.) তাঁর প্রকৃত রূপ ও আকার আকৃতির উপর প্রকাশিত হয়েছেন। যেরূপ আকৃতি নিয়ে তিনি ওহী নিয়ে আসতেন সে আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেননি। উল্লেখ্য যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকালে ওহীর আকার ধারণ করতেন।

প্রকৃতরূপ ও আকার-আকৃতি নিয়ে আগমনের কারণ হচ্ছে রাসূল ﷺ হযরত জিবরীল (আ.)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন যখন [জিবরীল] উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিলেন তিনি। যা জুড়ে তিনি বসেছিলেন তা সূর্যের দিগন্ত ছিল।

বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত কোনো নবীই হযরত জিবরীল (আ.)-কে তাঁর মূল-অবয়বে দু'বার দেখেননি। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ তাঁকে দু'বার তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন। একবার পৃথিবীতে আর একবার আকাশে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى : মহান রাব্বুল আলামীন বলেন- فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ এমন কি দু' ধনুকের সমান কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম দূরত্ব থেকে গেল। অর্থাৎ আকাশের উচ্চতর পূর্ব দিগন্ত হতে হযরত জিবরীল (আ.) আত্মপ্রকাশ করার পর মহানবী ﷺ -এর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। তিনি অগ্রসর হতে হতে তাঁর উপর এসে শূন্যলোকে ঝুলে থাকলেন। এরপর তিনি মহানবী ﷺ -এর দিকে ঝুঁকলেন এবং এতোই সন্নিকটে অবস্থান করলেন যে, তাদের উভয়ের মাঝে মাত্র দু'টি ধনুকের সমপরিমাণ কিংবা তা থেকেও কম দূরত্ব ব্যবধান থাকল। মুফাসসিরগণ قَابَ قَوْسَيْنِ -এর অর্থ সাধারণত দু'ধনুক সমান পরিমাণ অর্থ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা.) হাত দ্বারা قَوْس শব্দটির অর্থ ব্যক্ত করেছেন। তারা قَابَ قَوْسَيْنِ -এর অর্থ করেছেন তখন তাদের উভয়ের মাঝে মাত্র দু'হাতের দূরত্ব ছিল। -[ইবনে কাসীর]

হাশিয়ায়ে জালালাইনে আছে قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থ ধনুকের তানা ও ধরার কবজের মধ্যকার ব্যবধান। ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সুতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَابَ বলা হয়ে থাকে। এখানে দু'টি ধনুক (قَوْسَيْنِ) -এর মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ হলো আরব জাতির লোকদের একটি প্রচলিত অভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে সাধারণ শ্রোতাদেরকে মূল বক্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। জাহিলি যুগে আরব জাতির লোকদের দু'জনের মধ্যে শান্তি-চুক্তি ও মিত্রতা স্থাপন করতে ইচ্ছা করলে উভয়ই নিজ নিজ ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সুতা প্রতিপক্ষের দিকে রাখত এবং নিজ নিজ ধনুক এক সাথে মিলিয়ে শান্তি-চুক্তি ও মিত্রতার শপথ করত। অতঃপর উভয় পক্ষই একত্রে তীর নিক্ষেপ করত। আল্লাহ তা'আলা এখানে এ উদাহরণ পেশ করে জিবরাঈল (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ -এর অতীব নিকটবর্তী হওয়ার কথা বুঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর এত বেশি নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যবর্তী ব্যবধান দু'ধনুক পরিমাণ তথা এর চেয়ে কম ছিল। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

এ নৈকট্যের মাধ্যমে এ সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায় যে, নবী করীম ﷺ -কে এসব কথা শয়তান শুনিয়েছে। কেননা কাফের ও মুশরিকদের মাঝে কেউ কেউ উপরিউক্ত বিশ্বাসও করত। اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ

আল্লাহ তা'আলা তো সন্দেহ হতে পবিত্র; সুতরাং তিনি সন্দেহ প্রকাশক শব্দ اَوْ ব্যবহার করলেন কেন? : বক্তা যদি নিজের উপস্থাপিত বক্তব্যে সন্দিহান হয়ে থাকেন তা হলে তিনি সন্দেহজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এখানে মূল বক্তা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা যিনি সন্দেহ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি কেন স্বীয় বক্তব্যে সন্দেহজ্ঞাপক শব্দ اَوْ ব্যবহার করেছেন?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এর জবাব হলো– فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى আয়াতে أَوْ শব্দটি সন্দেহের কারণে ব্যবহৃত হয়নি; বরং أَوْ শব্দটি এখানে অতীব নৈকট্যের অর্থ বুঝার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -এর এত বেশি নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে, দু'জনের দূরত্বের পরিমাণ দু'ধনুকের অধিক ছিল না; বরং তাঁদের উভয়ের অবস্থান দু'ধনুক পরিমাণ দূরত্বের চেয়েও কম দূরত্বে ছিল। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

قَوْلُهُ فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى ; উক্ত আয়াতের দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। যথা– ১. তিনি ওহী পাঠালেন তাঁর বান্দার প্রতি যা কিছু ওহী পাঠালেন। ২. এরূপ তিনি ওহী পাঠালেন নিজ বান্দার প্রতি যা কিছু ওহী করলেন।

প্রথম অনুবাদের দৃষ্টিতে আয়াতের বক্তব্য হয়, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর বান্দার প্রতি ওহী দিলেন, তাঁর ওহী দেওয়ার যা কিছু ছিল। আর দ্বিতীয় অনুবাদে আয়াতের তাৎপর্য হবে। আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর বান্দার নিকট ওহী নাজিল করলেন যা কিছু তাঁর ওহী করার ছিল। তাফসীরকারগণ এ উভয় প্রকার অর্থই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আয়াতের পূর্বাপরের আলোকে বুঝা যায় প্রথম অর্থই সঠিক ও সঙ্গতিপূর্ণ। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى দৃষ্টি যা কিছু দেখেছে তাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। অর্থাৎ দিবালোকে, পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত অবস্থায় ও খোলা চোখে নবী করীম ﷺ -এর এই যে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হলো, তাতে তাঁর মনে এ কথা জাগ্রত হয়নি যে, এটা দৃষ্টির ভ্রম কিংবা তিনি কোনো জিন বা শয়তান দেখতে পেয়েছেন বা জাগ্রত অবস্থায় তিনি কোনো স্বপ্ন দেখছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁর চক্ষু যা কিছু দেখেছিল,. তাঁর অন্তর তা যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিল। তাঁর উপলব্ধি ছিল প্রত্যক্ষ দর্শন ও পর্যবেক্ষণের হুবহু অনুরূপ, তিনি যাকে দেখছিলেন তিনি প্রকৃতই জিবরাঈল (আ.) কিনা এবং তিনি যে ওহী দিয়েছিলেন তা প্রকৃতই আল্লাহর ওহী কিনা? এ বিষয়ে তাঁর হৃদয়-মনে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগেনি। –[তাফসীরে কাবীর, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

أَوْحٰى ফে'লের ফা'য়েল : أَوْحٰى ফে'লের ফা'য়েল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন– أَوْحٰى ফে'লের ফায়েল হলো হযরত জিবরাঈল (আ.)। আর কারো কারো মতে, أَوْحٰى ফে'লের ফা'য়েল স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।

প্রথমোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হবে فَأَوْحٰى جِبْرَائِيْلُ إِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ مَا أَوْحٰى আর দ্বিতীয় অভিমতের বিচারে আয়াতের অর্থ হবে– فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى عَبْدِهٖ مُحَمَّدٍ

উপরিউক্ত আলোচনার দৃষ্টিতে أَوْحٰى جِبْرِيْلُ إِلٰى عَبْدِهٖ তথা জিবরাঈল 'তাঁর নিজের বান্দার দিকে ওহী করলেন– এটা কখনো হতে পারে না। এ কারণে অবশ্যই তার অর্থ হবে– আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি ওহী করলেন। কিংবা আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে নিজের বান্দার প্রতি ওহী করলেন।

আলোচ্য আয়াতে اَلْمُوْحٰى بِهٖ [যে সম্পর্কে ওহী করা হলো] -এর উল্লেখ নেই। কারণ এখানে ওহী অবতীর্ণ করার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পরিচিতি পেশ করা। যেন নবী করীম ﷺ ও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে যে, জিবরাঈল ওহী নিয়ে এসে থাকেন; শয়তান বা জিন নয়। তবে আরবি অলংকারশাস্ত্রের কায়দা অনুসারে বুঝা যায় যে, اَلْمُوْحٰى بِهٖ উল্লেখ না করা অর্থাৎ তাকে مُبْهَمْ রাখার উদ্দেশ্য হলো ওহীর মর্যাদা বর্ণনা করা। –[ফাতহুল কাদীর]

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى আয়াতে প্রত্যক্ষকারী কে? : مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى আয়াতে বর্ণিত رَأٰى ফে'লের ফায়েল কে বা কি কিংবা প্রত্যক্ষকারী কে? এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. رَأٰى ফে'লের ফায়েল হলো اَلْفُؤَادُ অর্থাৎ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْفُؤَادُ অন্তর যা কিছু দেখল, তাতে সে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি।

২. رَأٰى ফে'লের ফায়েল হলো اَلْبَصَرُ অর্থাৎ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى الْبَصَرُ দৃষ্টি যা কিছু দেখল, অন্তর তাতে সংমিশ্রণ করে নি।

৩. رَأٰى ফে'লের ফা'য়েল হলো مُحَمَّدٌ ﷺ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু দেখলেন তাঁর অন্তর তাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। –[তাফসীরে কাবীর]

আলোচ্য আয়াতস্থিত مَا رَأٰى বাক্যে اَلْمَرْئِىْ তথা প্রত্যক্ষিত বস্তুর নির্ণয় : مَا رَأٰى বাক্যে যে দেখার কথা বলা হয়েছে, তা কাকে বা কি জিনিস দেখার কথা বলা হয়েছে, তাতে মতভেদ রয়েছে।

১. হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখার কথা বলা হয়েছে।

২. এখানে আল্লাহ তথা সৃষ্টিকর্তার আশ্চর্যজনক নিদর্শনাবলি দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

৩. এখানে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার কথা বলা হয়েছে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. وَلَقَدْ رَاٰهُ عَلٰى صُوْرَتِهٖ نَزْلَةً مَرَّةً اُخْرٰى ۙ

১৩. তিনি ফেরেশতাকে তাঁর নিজ আকৃতিতে অন্য একবারও দেখেছেন।

١٤. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى . لَمَّا اُسْرِىَ بِهٖ فِى السَّمٰوٰتِ وَهِىَ شَجَرَةُ نَبْقٍ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ لَا يَتَجَاوَزُهَا اَحَدٌ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَغَيْرِهِمْ .

১৪. সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। যখন নবী করীম ﷺ মি'রাজের রাত্রে আসমানে গিয়েছেন। سِدْرَة হলো আরশের ডান পার্শ্বে বরই গাছের সীমা, ফেরেশতা প্রমুখ কেউই তা অতিক্রম করতে পারে না।

١٥. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ط تَاْوِىْ اِلَيْهَا الْمَلٰئِكَةُ وَاَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ اَوِ الْمُتَّقِيْنَ .

১৫. তার নিকট জান্নাতুল মা'ওয়াও রয়েছে যেখানে ফেরেশতা শহীদ ও মুত্তাকীগণের রূহসমূহের ঠিকানা।

١٦. اِذْ حِيْنَ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ مِنْ طَيْرٍ وَغَيْرِهٖ وَاِذْ مَعْمُوْلَةٌ لِرَاٰهُ .

১৬. যখন সিদরাতুল মুন্তাহাকে ঢেকে রেখেছিল যা ঢেকে রেখেছিল– পাখী ইত্যাদি। এখানে اِذْ পদটি رَاٰهُ-এর مَفْعُوْل তথা مَعْمُوْل

١٧. مَا زَاغَ الْبَصَرُ مِنَ النَّبِىِّ وَمَا طَغٰى . اَىْ مَا مَالَ بَصَرُهٗ عَنْ مَرْئِيهِ الْمَقْصُوْدِ لَهٗ وَلَا جَاوَزَهٗ تِلْكَ اللَّيْلَةَ .

১৭. দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি এবং অতিক্রমও করেনি অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর দৃষ্টি লক্ষ্যস্থল হতে অপসারিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য অতিক্রম করেনি সেই রাতে।

١٨. لَقَدْ رَاٰى فِيْهَا مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى . اَىِ الْعِظَامَ اَىْ بَعْضَهَا فَرَاٰى مِنْ عَجَائِبِ الْمَلَكُوْتِ رَفْرَفًا خُضْرًا سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ وَجِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهٗ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ .

১৮. তিনি সেই রাতে তাঁর প্রভুর বড় বড় আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছেন। অর্থাৎ কোনো কোনো বড় নিদর্শন। যেমন আশ্চর্যজনক সৃষ্টির মধ্যে সবুজ রফরফ দেখেছেন যা সমগ্র নভোমণ্ডলকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছিল এবং তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখেছিলেন যার ছয়শত ডানা ছিল।

١٩. اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۙ

১৯. আচ্ছা আপনি কি লাত এবং ওজ্জা সম্পর্কে ভেবে দেখেছেন?

٢٠. وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الَّتَيْنِ قَبْلَهَا الْاُخْرٰى صِفَةُ ذَمٍّ لِلثَّالِثَةِ وَهِىَ اَصْنَامٌ مِنْ حِجَارَةٍ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَعْبُدُوْنَهَا وَيَزْعُمُوْنَ اَنَّهَا تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ .

২০. এবং তৃতীয় মানাত -এর অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন? যা পূর্বোক্ত দুটি ব্যতীত অপর একটি। اُخْرٰى এটা ثَالِثَةً -এর দুর্নামসূচক বিশেষণ। আর এগুলো হলো পাথর দ্বারা নির্মিত প্রতিমা, মুশরিকরা যাদের পূজা করেছিল এবং তারা বুঝত যে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَمَفْعُولُ اَرَأَيْتُمُ الْاَوَّلُ اللَّاتُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَالثَّانِي مَحْذُوفٌ وَالْمَعْنَى اَخْبِرُونِي اَلِهٰذِهِ الْاَصْنَامِ قُدْرَةٌ عَلَى شَيْءٍ مَا فَتَعْبُدُونَهَا دُونَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقَادِرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَلَمَّا زَعَمُوا اَيْضًا اَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللّٰهِ مَعَ كَرَاهَتِهِمُ الْبَنَاتِ نَزَلَ .

افرأيتم -এর প্রথম مفعول হলো লাত এবং তার উপর যাদের আত্‌ফ করা হয়েছে এবং এর দ্বিতীয় مفعول উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ আমাকে অবহিত কর যে, এ প্রতিমাগুলোর কোনো বিষয়ের উপর কোনো ক্ষমতা আছে কিনা? যার প্রেক্ষিতে তোমরা পূর্বোল্লিখিত বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে তাদের পূজা করতে। আর তারা আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান আছে বলে ধারণা করত, বস্তুত তারা নিজেরা কন্যা সন্তান অপছন্দ করত। তাই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২১. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى .

২১. তোমাদের জন্য ছেলে আর আল্লাহর জন্য মেয়ে- এরূপ হওয়া।

২২. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى . جَائِرَةٌ مِنْ ضَازَهُ يَضِيْزُهُ اِذْ ظَلَمَهُ وَجَارَ عَلَيْهِ .

২২.. এটা তো বড় অসঙ্গত বণ্টন। ضِيْزٰى শব্দটি ضَازَ - يَضِيْزُ হতে নিষ্পন্ন। অর্থ- অত্যাচার করল।

২৩. اِنْ هِيَ مَا الْمَذْكُورَاتُ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا اَيْ سَمَّيْتُمْ بِهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ اَصْنَامًا تَعْبُدُونَهَا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا اَيْ بِعِبَادَتِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ اِنْ مَا يَتَّبِعُونَ فِي عِبَادَتِهَا اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ج مِمَّا زَيَّنَهُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مِنْ اَنَّهَا تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى ط عَلٰى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْبُرْهَانِ الْقَاطِعِ فَلَمْ يَرْجِعُوا عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ .

২৩. উল্লিখিত বিষয়গুলো কতগুলো নাম মাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ রেখেছে। প্রতিমারূপে তোমরা এগুলোর পূজা কর। আল্লাহ তা'আলা এদের ইবাদত করার জন্যে কোনো প্রমাণ নাজিল করেননি। তারা এ সকল প্রতিমার পূজা-অর্চনা করার ব্যাপারে শুধু ভিত্তিহীন ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যা শয়তান ও তাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছে যে, তারা আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের নিকট হেদায়েত এসেছে, নবী করীম ﷺ -এর ভাষায় অকাট্য প্রামাণাদিসহ। তবুও তারা তাদের পূর্বাবস্থা হতে ফিরে আসেনি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْمَأْوٰى : এটা মাসদার এবং اِسْم ظَرْف অর্থ দাঁড়ানো, থাকা, অবস্থান গ্রহণ করা, বসবাসের স্থান, ঠিকানা। বাবে ضَرَبَ ; যদি আর সেলাহ اِلٰى আসে তাহলে অর্থ হবে আশ্রয় নেওয়া। যদি সেলাহ لَامْ আসে তবে অর্থ হবে মেহেরবানি করা। যেমন- اَوٰى لَهُ অর্থ হলো- তার উপর মেহেরববানি করল, অনুগ্রহ করল।

قَوْلُهُ لَقَدْ رَاٰى : এখানে لَامْ টা جَوَاب قَسَمْ -এর উপর হয়েছে এর قَسَمْ হলো উহ্য اُقْسِمُ

قَوْلُهُ مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى : مِنْ টা হলো تَبْعِيْضِيَّة এবং رَاٰى -এর মাফউল যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন আর كُبْرٰى হলো اٰيَات -এর সিফত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রশ্ন : اَلْاٰيَات হলো মওসূফ যা বহুবচন আর كُبْرٰى হলো সিফত একবচন কাজেই মওসূফ ও সিফাতের মধ্যে তো সামঞ্জস্য হলো না।

উত্তর : اَلْاٰيَات হলো এমন বহুবচন যে, তার সিফত وَاحِدْ مُؤَنَّثْ নেওয়া বৈধ রয়েছে। এছাড়া মওসূফ ও সিফতের মধ্যে দূরত্বের কারণে তার আরো অতিরিক্ত সৌন্দর্যতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। -[জুমাল]

এর মধ্যে অন্য আরেকটি তারকীব এরূপও হতে পারে- اَلْكُبْرٰى হলো رَاٰى-এর মাফউলে বিহী, আর مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهٖ হলো حَالْ مُقَدَّمْ উহ্য ইবারত হবে- لَقَدْ رَاٰى الْاٰيَاتِ الْكُبْرٰى حَالَ كَوْنِهَا مِنْ جُمْلَةِ اٰيَاتِ رَبِّهٖ

قَوْلُهُ رَفْرَفًا : এর অর্থ হলো গালিচা, কার্পেট। رَفْرَفًا خُضْرًا সবুজ গালিচা, সবুজ কার্পেট, সুজলা সুফলা বাগান, এর একবচন হলো رَفْرَفَةٌ -[লুগাতুল কুরআন]

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى : এখানে اِسْتِفْهَامْ টা ধমকের জন্য এসেছে لَاتَ সেই ভূতের নাম যাকে কা'বা শরীফে স্থাপন করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এই ভূত তায়েফে ছিল, আর এটা বনূ ছাকীফের দেবতা ছিল। এর তাহকীক করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন যে, এটা لَتُّ السَّوِيْقَ হতে নির্গত। لَاتَ হলো اِسْم فَاعِلْ-এর সীগাহ, অর্থ- খামির তৈরিকারী, সংমিশ্রণকারী। এক ব্যক্তি যে হাজ্জাজকে ছাতু গুলিয়ে পান করাতো। কালবী (র.) বলেন, তার আসল প্রকৃত নাম সরমা ইবনে গমাম ছিল। যখন সে মৃত্যু বরণ করে তখন যে পাথরের উপর বসে সে ছাতু গোলাতো এবং পান করাতো সেই পাথরে একটি বড় ভূতের আকৃতি একে রেখে দিল। পরবর্তীতে লোকেরা এর পূজা শুরু করে দেয়, এটা সেই লাত।

قَوْلُهُ عُزّٰى : এটা اَعَزُّ-এর مُؤَنَّثْ এটা গাতফান গোত্রের ভূতের নাম। কেউ কেউ বলেন যে, এটা একটা বাবলা গাছ ছিল। মহানবী ﷺ হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)-কে প্রেরণ করে তা কেটে ফেলেন। যখন তিনি তা কেটে ফেললেন তখন তা হতে একটি পেত্নী মাথার চুল এলোমেলো করে মাথায় হাত রেখে উচ্চৈঃস্বরে কটুবাক্য ব্যবহার করতে বেরিয়ে আসল। হযরত খালেদ (রা.) তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। হযরত খালেদ (রা.) তার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-কে জানালে তিনি বললেন, এটাই হলো উজ্জা।

قَوْلُهُ مَنَاةَ : এটা একটি পাথর ছিল, যেটা হুযাইল এবং খোযায়াদের দেবতা ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এটা বনূ ছাকীফের দেবতা ছিল। এটা مَنٰى يَمْنٰى থেকে নির্গত, অর্থ হলো প্রবাহিত করা। যেহেতু তার সমীপে অসংখ্য পশু জবাই হতো যে কারণে অনেক রক্ত প্রবাহিত হতো। এ কারণেই এর নাম مَنَاة রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاُخْرٰى : এটা ثَالِثَة-এর صِفَتْ ذَمّ অর্থাৎ মর্যাদার দৃষ্টিকোণ হতে তৃতীয় নম্বরে।

প্রশ্ন : যখন ثَالِثَة বলে দিল তখন তার اُخْرٰى হওয়াটা নিজে নিজেই বুঝা গেল। এরপর اُخْرٰى বলার কি প্রয়োজন?

উত্তর : اَلْاُخْرٰى হলো صِفَتْ ذَمّ কেননা উদ্দেশ্য হলো মর্যাদায় পেছনে। উল্লেখ ও গণনার মধ্যে নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاُوْلٰهُمْ অর্থাৎ ضُعَفَائُهُمْ لِرُؤَسَائِهِمْ

قَوْلُهُ الثَّانِيْ مَحْذُوْفٌ : اَللَّاتَ তার মা'তূফগুলোর সাথে মিলে اَرَاَيْتُمْ بِمَعْنٰى اَخْبِرُوْنِيْ-এর প্রথম মাফউল, আর اَلِهٰذِهِ الْاَصْنَامِ الخ এটা جُمْلَه اِسْتِفْهَامِيَّة হয়ে দ্বিতীয় মাফউল।

قَوْلُهُ تِلْكَ : تِلْكَ-এর مُشَارٌ اِلَيْهِ হলো قِسْمَةٌ যা তার পূর্বের جُمْلَةِ اِسْتِفْهَامِيَّة-এর মাফহুম।

قَوْلُهُ ضِيْزٰى : এটা ضَيْزٌ থেকে নির্গত, অর্থ হলো জুলুম; يَاء-এর কারণে ضَاد-এর যেরকে পেশ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমনটি بِيْضٌ-এর মধ্যে করা হয়েছে। কেননা فِعْلٰى-এর ওযন সিফতের জন্য ব্যবহার হয় না।

প্রশ্ন : মুফাসসির (র.) سَمَّيْتُمُوْهَا-এর তাফসীর سَمَّيْتُمْ بِهَا দ্বারা কেন করলেন?

উত্তর : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের সমাধান করা, প্রশ্নটি হলো اَسْمَاء-এর নাম রাখা যায় না যেমনটি سَمَّيْتُمُوْهَا হতে বুঝা যায়; বরং مُسَمّٰى-এর নাম রাখা হয়।

উত্তরের সারমর্ম হলো বাক্যের মধ্যে حَذْف ; রয়েছে। মূল বাক্য ছিল- سَمَّيْتُمْ بِهَا-এর মাফউল উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَصْنَامًا যেমনটি মুসান্নিফ (র.) প্রকাশ করে দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَللَّاتَ : اَللَّاتَ শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। যথা–

১. অধিকাংশ কারীগণ اَللَّاتَ শব্দের ت অক্ষরে তাখফীফ করে اَللَّاتَ পড়েছেন। বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তা'আলার জাতি নাম 'আল্লাহ' হতে গৃহীত। কেউ কেউ বলেছেন, اَللَّاتَ শব্দটি لَاتَ - يَلِيْتُ হতে সংগৃহীত। সুতরাং اَللَّاتَ শব্দের শেষাংশে ت অক্ষরটি মৌলিক ও আসল। কেউ কেউ বলেছেন, এটা অতিরিক্ত, তার আসল হলো لَوَى - يَلْوِى কেননা মুশরিকরা এর প্রতি নিজেদের মাথা নত করে এর তাওয়াফ করত। এখানে প্রণিধান যোগ্য যে, اَللَّاتَ শব্দের উপর ت না ধরে وَقْف করা হবে। অধিকাংশ কারীগণ বলেছেন ت অক্ষর ধরে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। কাসায়ী (র.) বলেছেন (ه) ধরে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। ফাররা ও অন্যান্যকারীরা বলেছেন, মূল কুরআনের অনুসরণ করার প্রয়োজনে اَللَّاتَ শব্দে ت অক্ষর ধরে ওয়াক্‌ফ করাই উত্তম।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইবনে জুবাইর, মনসূর ইবনে মু'তারিম, আবূ সালেহ, আবূ জাওজা, ও হামীদ (র.) প্রমুখ اَللَّاتَ শব্দের ت অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে اَللَّاتَّ পড়েছেন। ইবনে কাসীর (র.) হতে এ কেরাতই বর্ণিত হয়েছে।

–[ফাতহুল কাদীর, কাশশাফ]

قَوْلُهُ مَنَاةَ : مَنَوْءَةَ শব্দেও দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ কারীগণ مَنَاةَ শব্দে বর্ণিত اَلِف অক্ষর দ্বারা مَنَاةَ পড়েছেন। এরা الف অক্ষরকে হামজা (أ) বানিয়ে পড়েননি। কিন্তু ইবনে কাসীর, ইবনে মুহায়সিন, মুজাহিদ ও সালামী হামীদ, مَنَاةَ শব্দে বর্ণিত আলিফ (ا) অক্ষরের স্থলে হামযা বসিয়ে তার উপর মদ দিয়ে مَنَوْءَةَ পড়েছেন।

অধিকাংশ কারীগণ মূল কুরআনের অনুসরণ করত مَنَاةَ শব্দের ة অক্ষরের উপর ت বলবৎ রেখে ওয়াক্‌ফ করার কথা বলেছেন। ইবনে কাসীর ও ইবনে মুহায়সিন, ه ধরে ওয়াক্‌ফ করার কথা বলেছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ ضِيْزٰى : ضِيْزٰى শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ কারীগণ ضِيْزٰى শব্দের ى [প্রথম] অক্ষরে সাকিন দিয়ে কোনো হামজা ব্যতীতই ضِيْزٰى পড়েছেন। ইবনে কাসীর (র.) একটি সাকিনযুক্ত হামজাযোগ করে ضِئْزٰى পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَتَّبِعُوْنَ : يَتَّبِعُوْنَ শব্দে দুটি কেরাত বর্ণিত আছে। অধিকাংশ কারীগণ يَتَّبِعُوْنَ-কে جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ-এর শব্দ হিসেবে পড়েছেন। যা মূল কুরআনের শব্দ। তবে ইবনে ওমর, আইয়ূব ও ইবনে সামাইকা শব্দটিকে تَتَّبِعُوْنَ তথা مُضَارِعْ-এর جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ হিসেবে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى : শানে নুযূল : মক্কার কাফেররা লাত, মানাত ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করত। তায়েফবাসী ছাকীফ সম্প্রদায়ের লোকেরা লাত নামক প্রতিমার পূজা করত। কুরাইশ বংশের লোকেরা ওজ্জার পূজা করত। আর হেলাল সম্প্রদায়ের লোকেরা মানাত প্রতিমার পূজা করত। তারা এ সকল দেব-দেবীকে ফেরেশতাদের মর্যাদা দিত এবং এদেরকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা বলে আখ্যায়িত করত। তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল দেব-দেবী তাদের জন্য পরকালে সুপারিশ করবে ও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও হতে রক্ষা করবে। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অবাস্তব জল্পনা-কল্পনা ও দেব-দেবীর ভিত্তিহীন ইবাদতের ধারণা খণ্ডন করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, এ সকল কল্পনা-জল্পনা ও প্রতিমা পূজার কোনো গুরুত্ব নেই।

قَوْلُهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى : এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে নবী করীম ﷺ-এর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার। এ সাক্ষাৎকারে তিনি নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে স্বীয় প্রকৃত আকার-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বলা হয়েছে, এ সাক্ষাৎকারের স্থান হলো সিদরাতুল মুন্তাহা। সে সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতুল মাওয়া তার নিকটেই অবস্থিত। سِدْرَةٌ [সিদরাতুন] আরবি ভাষায় বরই বা কুল গাছকে বলা হয়। আর مُنْتَهٰى শব্দের অর্থ সর্বশেষ বিন্দু। سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى শব্দের অর্থ হলো সেই বরই গাছটি যা সর্বশেষ বিন্দুতে অবস্থিত। আল্লামা আলূসী তাঁর রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলেছেন– اِلَيْهَا يَنْتَهِىْ عِلْمُ كُلِّ عَالِمٍ وَمَا وَرَاءَهَا لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ এখানেই সর্বজগতের জ্ঞান নিঃশেষ ও পরিসমাপ্ত। এর পরে যা কিছু রয়েছে সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ কিছুই জানে না।

ইবনে জারীর (র.) তাঁর তাফসীরগ্রন্থে এবং ইবনে আসীর (র.) তাঁর اَلنِّهَايَةُ কিতাবে প্রায় এই একই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বস্তু জগতের সর্বশেষ সীমা-বিন্দুতে অবস্থিত সে বরই গাছটি কিরূপ এবং তার প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থা কি? তা জানা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার। মূলত এটা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট এ বিশ্বলোকের এমন সব রহস্যময় ব্যাপারভুক্ত, যে পর্যন্ত আমাদের বোধশক্তি পৌঁছতে পারে না।

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى এবং اٰيٰةُ الْكُبْرٰى -এর দ্বারা উদ্দেশ্যের বর্ণনা ও তার সাথে সম্পৃক্ত ঘটনা : سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى আরশের ডান পার্শ্বে বেহেশত সীমান্তে একটি বরই বৃক্ষ। তাকে 'সিদরাতুল মুন্তাহা' বলার কারণ হলো, কোনো ফেরেশতা এবং কোনো সৃষ্টিই ঐ সীমান্ত অতিক্রম করার শক্তি রাখে না। একমাত্র নবী করীম ﷺ ব্যতীত কেউই ঐ সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ সে এলাকা আল্লাহর নূরে জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। যা কোনো সৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। আর ঐ গাছের পাদদেশে আরশের নির্দেশাবলি ও রহমতের জ্যোতি অবতারিত হয়। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, ঐ গাছের একটি পাতা হাতির কানের মতো বড়-চৌড়া এবং ফলগুলো মটকার মতো বৃহদাকার। এক মটকার পরিমাণ হলো ঐ পাত্র যাতে পাত্রে সাড়ে নয় কলসি পানি ধরে।

اٰيٰةُ الْكُبْرٰى দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা জগতের বিস্ময়কর নিদর্শনাবলি ও ঐ রফরফ যেটাকে রাসূল ﷺ দেখে ছিলেন, যা সমগ্র আসমানকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ছয়শত ডানার সাথে দেখতে পেয়েছিলেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) اٰيٰتِ الْكُبْرٰى -এর তাফসীর بَعْضَهَا ও اَلْعِظَمَ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেন যে, এখানে مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْض -এর জন্য যা رَاٰى ক্রিয়াপদের কর্মপদ। আর اَلْكُبْرٰى শব্দটি اٰيٰتِ -এর صِفَتْ; তার অর্থ হলো, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি অসীম হওয়াতে তা গণনাকরণ অসম্ভব। আর সবগুলোর দর্শনও সম্ভবপর নয়। কাজেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মহান নিদর্শনাবলি ও আশ্চর্য-অদ্ভুত কুদরতের কিয়দাংশ অবলোকন করেছিলেন।

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى ও اٰيٰتُ الْكُبْرٰى -এর দ্বারা মি'রাজের ঘটনা উপলব্ধি হয়। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রা.) হতে এবং হাকিম (র.) 'মুসতাদরীক' এর মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হযরত উম্মে হানীর গৃহে শায়িত ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাত্রিকালে তাঁর নিকট গমন করে তাঁকে জাগ্রত করলেন এবং কাবাঘরের পার্শ্বে নিয়ে জমজমের পানি দ্বারা তাঁর সীনা মুবারক খুলে ধৌত করলেন। অতঃপর 'বোরাকে' আরোহণ করিয়ে তাঁকে সিরিয়ার বায়তুল মুকাদ্দিস নামক পবিত্র ঘরে নিয়ে হাজির করলেন এবং ঐ খুঁটির সাথে 'বোরাক' কে বাঁধলেন। বোরাক হলো আরোহণের একটি বেহেশতী প্রাণী এবং যা গাধার চেয়ে কিয়দ ছোট; খচ্চর হতে খানিক বড়, ধবধবে সাদা। উপরন্তু তিনি তথায় অবতরণ করে বায়তুল মুকাদ্দিসে প্রবেশ করলেন। আল্লাহর হুকুমে তথায় সকল আম্বিয়া আওলিয়াদের রূহ ও ফেরেশতার বিশাল জামায়াত সমবেত হলেন। তিনি ইমামতি করে দু' রাক'আত নামাজ পড়ালেন; যাতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব সকল আম্বিয়া ও মুরসালীনসহ সর্বস্তরের সৃষ্টির উপর পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর সকলের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করে বের হলেন। হযরত জিবরাঈল বেহেশতী তশতরীতে নবী করীম ﷺ -এর জন্য এক পাত্রে দুধ ও এক পাত্র মদ আনয়ন করলেন। নবী করীম ﷺ দুধ গ্রহণ করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, আপনি আপনার ফিতরাতই গ্রহণ করেছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে নিয়ে আকাশপথে গমন করলেন। বোরাকে আরোহণ করে নবী করীম ﷺ জিবরাঈলের সাথে চললেন। প্রত্যেক আসমানে গিয়ে জিবরাঈল ডাক দিলে আসমানের দ্বার খোলা হয় চতুর্দিক থেকে আসমানবাসীরা তাঁকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতে থাকেন। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ.) দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আ.)-এর সাথে, পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে, সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন। প্রত্যেকেই তাঁকে আপনজন হিসেবে স্বাগতম জানিয়ে এগিয়ে নেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) মসজিদে বায়তুল মা'মুরের মধ্যে একটি খুঁটির সাথে টেক দিয়ে বসে আছেন। ঐ মসজিদে প্রত্যহ ৭০ হাজার ফেরেশতা নামাজ পড়ে থাকে। যে জামাত চলে যায়, তারা আর কিয়ামত পর্যন্ত ফিরবে না। এভাবে সিলসিলা চালু রয়েছে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে নিয়ে সিরদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছলেন, সেখানে সবুজ রফরফ আগমন করল। নবী করীম ﷺ তাতে আরোহণ করলেন, রফরফ নবী করীম ﷺ -কে নিয়ে আরশে পৌঁছায় এবং নবী করীম ﷺ -এর সাথে আল্লাহর সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। তিনি উম্মতের পক্ষ হতে উম্মতের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সকল ইবাদত আল্লাহর দরবারে হাদিয়া স্বরূপ পৌঁছান এবং আল্লাহ তা'আলা নবীকে সালাম পাঠ করলে নবী করীম ﷺ সকল মুমিন উম্মতের পক্ষ হতে সালাম গ্রহণ করেন এবং আরশবাহী ফেরেশতাগণ "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ" বলে সাক্ষ্য প্রদান করেন। উপরন্তু সেখানে যা কথাবার্তা হওয়ার তা হলো যার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ আয়াতে– "فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى" দ্বারা এবং উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে ফিরে আসেন। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, আপনার উম্মতের পক্ষে এ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা সম্ভব নয়। অতএব আল্লাহর নিকট গিয়ে আরো কমিয়ে আসুন। কাজেই নবী করীম ﷺ বারবার গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচ ওয়াক্ত করে কমিয়ে সবশেষে পাঁচ ওয়াক্তেই নিয়ে ফিরলেন। আর সেই রাত্রে তিনি বেহেশত-দোজখও প্রত্যক্ষ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় জমিনের ফিরেন। সময়ের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, যাওয়ার কালে বন্ধ করা তালা দেখে গিয়েছেন, আবার এসে ঝুলন্ত পেলেন। মাছের একটি কান কাটতে যেটুকু সময় লাগে ঐ সময়ও লাগেনি। ভোরে যখন মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন মক্কার কাফেররা উপহাস করতে থাকে। তারা প্রমাণ স্বরূপ বায়তুল মুকাদ্দাসের নমুনা জানতে চাইলে তিনি তাও বর্ণনা করেন। যাতে অনেকে ঈমান আনল আর অনেকেই গোমরাহ হলো। সর্বপ্রথম তা বিশ্বাস করেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান : এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, জান্নাত এখনো বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এটাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কিয়ামতের পর সৃজিত হবে না; বরং এখনো এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এ আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নিচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কুরআনের কোনো আয়াতে অথবা হাদীসের কোনো রেওয়ায়াতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা তূরের আয়াত "وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ" থেকে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোনো ভারি ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন এ আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নি রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপুলায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্য আবিষ্কার করেছে। যে দল এ কাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর একটি প্রস্তরাবরণ রয়েছে, যাতে কোনো মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এ বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তরাবরণের অস্তিত্ব স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভূগর্ভকে কোনো প্রস্তরাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোনো সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এ প্রস্তরাবরণের নিচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

قَوْلُهُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى : عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى আয়াতে سِدْرَةٌ শব্দটি اَلْمُنْتَهٰى শব্দের প্রতি মুযাফ হয়েছে। এ ইযাফত কোন প্রকার ইযাফত? এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মতভেদ রয়েছে–

১. এটা إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلٰى مَكَانِهٖ স্থানের দিকে বস্তুর ইযাফত। যেমন বলা হয়ে থাকে–

(١) أَشْجَارُ الْجَنَّةِ لَا تَيْبَسُ وَلَا تَخْلُوْا مِنَ الثِّمَارِ –

(٢) أَشْجَارُ بَلْدَةِ كَذَا لَا تَطُوْلُ مِنَ الْبَرْدِ

এ প্রকার ইযাফতের মুন্তাহা এমন একটি স্থান যার নিকট কোনো ফেরেশতা পৌঁছতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন, কোনো রূহও ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারে না।

২. এটা إِضَافَةُ الْمَحَلِّ إِلَى الْمَحَلِّ فِيْهِ স্থানের অবস্থার প্রতি স্থানের ইযাফত। যেমন বলা হয়ে থাকে– وَمَحَلُّ السَّوَادِ – كِتَابُ الْفِقْهِ এমতাবস্থায় মুন্তাহা সিদরার নিকট। অর্থাৎ– سِدْرَةٌ عِنْدَ مُنْتَهَى الْعُلُوْمِ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. এটা إِضَافَةُ الْمِلْكِ إِلَى مَالِكِهِ মালিকের প্রতি মালিকানার ইযাফত। যেমন বলা হয়ে থাকে– دَارُ زَيْدٍ وَاَشْجَارُ عُمَرَ এমতাবস্থায় اَلْمُنْتَهٰى اِلَيْهِ হলো তা, যার মূলে আছে سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى اِلَيْهِ এখানে اَلْمُنْتَهٰى اِلَيْهِ হলো আল্লাহ তা'আলা। এ ইযাফত দ্বারা سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى -এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى : এখানে اَفَرَاَيْتُمْ -এর শুরুর হামযাটি ইনকারের জন্য এসেছে। এর মাধ্যমে মুশরিকদের মূর্তিপূজার ভর্ৎসনা ও ঘৃণা করা উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্বে আল্লাহর ইবাদতের উপর অকাট্য প্রমাণাদির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং তার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। সারকথা হলো– আল্লাহ ছাড়া যদিও অন্য কারো মর্যাদা ও মহত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং যদিও তার স্থান সুউচ্চ হয়, তবুও আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের তুলনায় তার মর্যাদা বহুগুণে নীচে। মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে কারো তুলনা করা যাবে না এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহই ইবাদতের উপযোগী। হে অংশীদারবাদী মুশরিকরা! তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যার উপাসনা করছ, আল্লাহর দরবারে তা তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না। –[সাবী, হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ جَنَّةُ الْمَاْوٰى : জান্নাতুল মাওয়া শব্দের অর্থ হলো সেই জান্নাত যা অবস্থানের স্থান হতে পারে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন– এটা সে জান্নাত যা পরকালে ঈমান ও তাকওয়া সম্পন্ন লোকদেরকে দেওয়া হবে। এ আয়াতে দলিল হিসেবে পেশ করে তিনি এটাও বলেছেন যে, এ জান্নাত আকাশ মণ্ডলে রয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন– এটা সে জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহ সংরক্ষিত হয়। এটা সেই জান্নাত নয় যা পরকালে পাওয়া যাবে। হযরত ইবনে আব্বাসও এ কথাই বলেছেন। তিনি আরো খানিকটা বাড়িয়ে বলেছেন যে, পরকালে ঈমানদার লোকদেরকে যে জান্নাত দেওয়া হবে তা আকাশ মণ্ডলে নয়। তার স্থান হলো এ পৃথিবী।

قَوْلُهُ اللّٰتَ؟ : লাত কাবাগৃহে অবস্থিত একটি দেবীর নাম। কারো মতে, লাত তায়েফে বনূ সাকীফের দেবী। মূলত লাত এক ব্যক্তির নাম ছিল, যে একটি পাথরের নিকট বসত এবং হাজিদেরকে আহার করাত। তার মৃত্যুর পর পাথরটি লাত নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। আর লোকেরা তখন হতে পাথরটি পূজা করত।

اَللّٰتَ শব্দের অর্থে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে اَللّٰتَ শব্দটি اَللّٰهُ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ। এটাকে اَللّٰهَةُ হতে اَللّٰتَ করা হয়েছে। আল্লামা যমখশারী (র.) বলেছেন– اَللّٰتَ এটা لَوٰى - يَلْوِىْ হতে গৃহীত, অর্থ– ঘোরা ও কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া। যেহেতু মুশরিকীনরা তার দিকে ফিরত ও তার সম্মুখে ঝুঁকে পড়ত। তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করত, এজন্য তাকে লাত বলা হতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, শব্দটির উচ্চারণ হলো لَتَّ লাত্তা। অর্থ– লেপন।

قَوْلُهُ الْعُزّٰى : اَلْعُزّٰى শব্দটি اَلْاَعَزُّ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এটা একটি দেবীর নাম। কারো করো মতে– اَلْعُزّٰى শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক নাম اَلْعَزِيْزُ হতে গৃহীত। বর্ণিত আছে যে, তা একটি বৃক্ষ, যার পূজা করা হতো।

اَلْعُزّٰى শব্দের অর্থ সম্মানিত, এটা ছিল কুরাইশ বংশের লোকদের বিশেষ দেবী এবং তার অবস্থান বা আস্তানা ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাখলা' উপত্যকার 'হুবাজ' নামক স্থানে। বনূ হাশেম গোত্রের মিত্র বনূ শাইবান গোত্রের লোকেরা ছিল তার পূজারী। কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তার জিয়ারত করত। তার জন্য মানত করত। পূজার অর্ঘ্য পেশ করত এবং তার উদ্দেশ্যে বলিদান করত। কা'বাঘরের ন্যায় তার দিকে কুরবানির জন্তু নিয়ে যাওয়া হতো। আর অন্যান্য মূর্তিও দেব-দেবীর তুলনায় অনেক বেশি সম্মান ও মর্যাদা তাকে দেখানো হতো। সীরাতে ইবনে হিশামে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন আবূ উহাইহা মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলো, আবূ লাহাব তখন তাকে দেখতে গেল। আবূ লাহাব উহায়হাকে ক্রন্দনরত পেয়ে জিজ্ঞাসিল– হে আবূ উহাইহা! তুমি কেন কাঁদছ? তুমি কি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ভয় পাচ্ছ? ভয় পেয়ে লাভ কি? জন্ম যেহেতু নিয়েছ, মৃত্যুকে তো আলিঙ্গন করতেই হবে। আবূ উহাইহা বলল, আমি মরার ভয়ে কাঁদার লোক নই; আমি তো এজন্য কাঁদছি যে, আমার তিরোধানের পর ওজ্জার পূজা অর্চনা কিভাবে চলবে! আবূ লাহাব বলল, তোমার জীবিতাবস্থায় যেরূপে তার পূজা চলছে, তোমার মৃত্যুর পরও সেভাবেই চলবে। আবূ উহায়হা একথা শুনে বলল, আমি নিশ্চিত হলাম। এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব।

Free @ www.e-ilmweebly.com

'মানাত' পরিচিতি : মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত 'কুদাইদ' নামক স্থানে মানাত নামক দেবতা অবস্থিত। কারো কারো মতে এটা মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত একটি ঘর ছিল। বনু কা'ব এর পূজা করত। কারো মতে, এটা হুজাইল ও খুজয়া গোত্রের দেবতা ছিল। মক্কাবাসীরাও এর পূজা করত। কারো কারো মতে লাত, উজ্জা ও মানাত পাথর দ্বারা নির্মিত দেবতা যা কা'বা গৃহের ভেতরে অবস্থিত ছিল। মুশরিকীনরা সেগুলোর পূজা করত এবং মানতের জন্তু এদের নামে উৎসর্গ করত। হজের মৌসুমে হাজীগণ মানাতের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে 'লাব্বাইক! লাব্বাইক!' উচ্চারণ করত।

قَوْلُهُ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى অর্থাৎ "তোমাদের জন্য কি পুত্র সন্তান আর কন্যাগুলো আল্লাহর জন্য। এটাতো হলো বড় প্রতারণাপূর্ণ বন্টন।" বলা হচ্ছে, মক্কার মুশরিকরা বলত- মূর্তি ও প্রতিমা এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান। অথচ তাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তির কন্যাসন্তান জন্ম নিত তখন সে তা অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণ ও বণ্টনকে অপছন্দ করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে এর মাধ্যমে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, এ দেবীগণকে তোমরা আল্লাহর কন্যা বানিয়ে নিয়েছ। আর এ হাস্যকর আকীদা রচনা করার সময় তোমরা এতটুকু কথাও চিন্তা-বিবেচনা করলে না যে, নিজেদের জন্য তোমরা কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জাকর মনে কর, অথচ আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে ধরে নিয়ে তাঁর জন্যই কন্যাসন্তান সাব্যস্ত কর, এটা অপেক্ষা অবিচারমূলক আচরণ আর কি হতে পারে?

ধারণার প্রকার ও তার বিধান : ظَنّ শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা-

১. অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। মুশরিকরা এ প্রকার ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত ছিল।

২. এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত ব্যবহৃত হয়। 'একীন' তথা দৃঢ় বিশ্বাস সেই বাস্তব সম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ থাকে না। যেমন কুরআনে কারীম ও হাদীসে মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীত ظَنّ তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়ে থাকে যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয় ; বরং দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এ দলিল অকাট্য নয়- যাতে অন্য কোনো সম্ভাবনা না থাকে। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত জ্ঞান ও বিধান। প্রথম প্রকারের জ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি-বিধানকে يَقِيْنِيَاتٌ তথা 'দৃঢ় বিশ্বাস প্রসূত বিধানাবলি' এবং দ্বিতীয় প্রকার ইসলামি বিধান বা শরিয়তের বিধানে গ্রহণযোগ্য। এর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এ ধারণাপ্রসূত বিধানাবলি অনুসারে আমল করা ওয়াজিব। সকলেই এ বিষয়ে একমত। যে ধারণাকে আলোচ্য আয়াতে নাকচ করা হয়েছে তা হচ্ছে ভিত্তিহীন ও অমূলক কল্পনা। -[মা'আরিফুল কুরআন]

আয়াতসমূহে উল্লিখিত মুশরিকদের পথভ্রষ্টতার দু'টি কারণ : আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের পথভ্রষ্ট ও বিপদগামী হওয়া তথা তাদের গোমরাহীর দু'টি মৌলিক কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, কোনো জিনিসকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের অংশ ও দীন বানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রকৃত ও নির্ভুল জ্ঞানের প্রয়োজন। এ কথা তারা মোটেই অনুভব করে না। তারা নিছক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতেই একটা কথা মনে করে নেয় এবং তার উপর এমন দৃঢ় ঈমান স্থাপন করে যেন তাই প্রকৃত ও চূড়ান্ত সত্য। কুরআন তাদের এ প্রকার ধারণা ও অনুমানের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন- "إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ" অর্থাৎ "লোকেরা [মুশরিকরা] নিছক ধারণা ও অনুমানের অনুসরণ করছে"। দ্বিতীয় হলো, তারা মূলত তাদের নফসের কামনা-বাসনা ও লালসার অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে। তাদের মন চায়, এমন এক মা'বুদ যদি তাদের হতো, যে তাদের যাবতীয় বৈষয়িক কাজকর্ম তো করে দেবেই, সে-ই সঙ্গে পরকাল যদি কখনো হয়ও তবে সেখানেও সে তাদেরকে ক্ষমা পাইয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেবে; কিন্তু হালাল-হারামের বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেবে না। নৈতিকতার চরিত্রে তাদেরকে বাধবে না। এ কারণে তারা রাসূলদের উপস্থাপিত জীবনাদর্শ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। নিজেদের হাতে গড়া দেব-দেবীগুলোর পূজা মনগড়াভাবে গ্রহণ করা তাদের মনঃপূত।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٤. اَمْ لِلْاِنْسَانِ اَىْ لِكُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَمَنّٰى ز مِنْ اَنَّ الْاَصْنَامَ تَشْفَعُ لَهُمْ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ .

২৪. মানুষ কি তা পায় যা সে কামনা করে যে, প্রতিমাসমূহ তাদের জন্য সুপারিশ করবে। ব্যাপারটি এমন নয়।

٢٥. فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى . اَىِ الدُّنْيَا فَلَا يَقَعُ فِيْهِمَا اِلَّا مَا يُرِيْدُهٗ تَعَالٰى .

২৫. মূলত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই জন্য। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না।

٢٦. وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ اَىْ كَثِيْرٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لَهُمْ فِيْهَا لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَرْضٰى . عَنْهُ لِقَوْلِهٖ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَمَعْلُوْمٌ اَنَّهَا لَا تُوْجَدُ مِنْهُمْ اِلَّا بَعْدَ الْاِذْنِ فِيْهَا مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ .

২৬. আকাশমণ্ডলীতে অনেক ফেরেশতা রয়েছে এবং তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি সম্মানের অধিকারী। এতদসত্ত্বেও তাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুমতি দানের পর তাদেরকে যে বিষয়ে যাকে ইচ্ছা স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হতে এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট হন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى অর্থাৎ যার উপর তিনি সন্তুষ্ট সে ভিন্ন আর কেউই সুপারিশ করতে পারবে না। আর এটাও জানা কথা যে, সুপারিশকারীগণ তখনই সুপারিশ করবেন যখন তারা সুপারিশ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হন। যেমন আয়াতে আছে– مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ [অর্থাৎ কে আছে যে তার সম্মুখে অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে।]

٢٧. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى . حَيْثُ قَالُوْا هُمْ بَنَاتُ اللّٰهِ .

২৭. নিশ্চয় যারা পরকালের ব্যাপারে অবিশ্বাসী, তারাই ফেরেশতাগণকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। যেমন– তারা বলে থাকে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার কন্যা।

٢٨. وَمَا لَهُمْ بِهٖ بِهٰذَا الْقَوْلِ مِنْ عِلْمٍ ط اِنْ مَا يَتَّبِعُوْنَ فِيْهِ اِلَّا الظَّنَّ ج الَّذِىْ تَخَيَّلُوْهُ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ج اَىْ عَنِ الْعِلْمِ فِيْمَا الْمَطْلُوْبُ فِيْهِ الْعِلْمُ .

২৮. বস্তুত এ উক্তির ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে যা তারা ধারণা করে। অথচ সত্যের ব্যাপারে ধারণার কোনো গুরুত্ব নেই। অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যে বিষয়ে জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

٢٩. فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا اَىِ الْقُرْاٰنِ وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ط وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِالْجِهَادِ .

২৯. সুতরাং তাদের থেকে বিমুখ হোন যারা আমার স্মরণ হতে বিরত হয়েছে। স্মরণ তথা কুরআন। আর যে পার্থিব জীবন ছাড়া আর কিছু কামনা করে না। এ বিধান জিহাদ সংক্রান্ত আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٠. ذٰلِكَ اَىْ طَلَبُ الدُّنْيَا مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ط اَىْ نِهَايَةُ عِلْمِهِمْ اَنْ اٰثَرُوا الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى . اَىْ عَالِمٌ بِهِمَا فَيُجَازِيْهِمَا .

৩০. এটা তথা পার্থিব কামনা তাদের জ্ঞানের প্রান্তসীমা। অর্থাৎ তাদের জ্ঞানের শেষপ্রান্ত। যে জন্য তারা পরকালের উপর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, যে তার পথ হতে বিপথগামী হয়েছে এবং তিনিই সে ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত যে হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি উভয় সম্পর্কেই সম্যক জ্ঞাত এবং তাদের উভয়কেই প্রতিফল দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَمْ مِنْ مَلَكٍ : এখানে كَمْ টা হলো كَمْ خَبَرِيَّة আধিক্যতা বর্ণনা করার জন্য, যদিও এটা مُفْرَدٌ হয়। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে বহুবচন। কাজেই এটা لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ-এর অনুযায়ী হয়েছে। আর كَمْ مِنْ مَلَكٍ হলো মুবতাদা আর لَا تُغْنِى হলো তার খবর। উভয়টিই مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا اَكْرَمَهُمْ : এটা تَعَجُّبِيَّه ফেরেশতাগণের সংখ্যাধিক্য বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَعْلُوْمٌ اَنَّهَا لَا تُوْجَدُ مِنْهُمْ اِلَّا بَعْدَ الْاِذْنِ فِيْهَا : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণে একটি উদ্দেশ্য হলো সংশয় নিরসন করা যে, لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের সুপারিশ তো থাকবে; কিন্তু তা কোনো উপকারে আসবে না, অথচ ব্যাপার হলো যে, তাদের কোনো সুপারিশই থাকবে না।

মুফাসসির (র.) উল্লিখিত ইবরাতের মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছেন যে, عَدَمُ اِغْنَاءِ شَفَاعَتٍ এটা عَدَم شَفَاعَتْ-এর অর্থে। এর দ্বারা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো এটাও বর্ণনা করা যে, শাফায়াতের জন্য দুটো কথা জরুরি। প্রথমত যার জন্য সুপারিশ করা হয় আল্লাহ তার সুপারিশে সন্তুষ্টও এ কথা لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا الخ-এর থেকে বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত সুপারিশকারীর অনুমতিও থাকতে হবে। এটা مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ দ্বারা বুঝা যায়। যখন এই উভয় বিষয়টি একত্র হবে তখনই সুপারিশ হবে; অন্যথায় নয়।

قَوْلُهُ اَىْ عَنِ الْعِلْمِ : এ ইবারত দ্বারা মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন যে, مِنْ টা عَنْ অর্থে আর حَقّ টা عِلْم অর্থে হয়েছে।

مَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ-এর মহল্লে ইরাব : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন– وَمَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে কতইনা সম্মানিত। এখানে وَمَا اَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ বাক্যটি جُمْلَة تَعَجُّبِيَّة আশ্চর্যবোধক বাক্য, যা ফেরেশতাদের অধিক সম্মান বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে ফেরেশতাদের কতই না সম্মান ও মর্যাদা– এতদসত্ত্বেও তাদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। [হ্যাঁ, তবে যদি কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তিনি সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক : পূর্বোল্লিখিত আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দরবারে মুশরিকদের পূজনীয় দেবতার কোনো কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব নেই। বস্তুত সবকিছুর অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং কাউকেও আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা জায়েজ নয়। মুশরিকরা দাবি করত যে, আমরা তো কাউকেও আল্লাহর সাথে শরিক করি না, আমরা শুধু বলে থাকি যে, মূর্তিগুলো শুধু আমাদের জন্য সুপারিশকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াত অবতীর্ণ করে মুশরিকদেরকে জানিয়ে দিলেন যে এ সকল মূর্তি তোমাদের জন্য কিভাবে সুপারিশ করবে? বস্তুত এদের সুপারিশ করার কোনো অধিকার নেই। কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত কারো পক্ষে সুপারিশ করা আদৌ সম্ভব নয়।

يَشَآءُ-এর পর يَرْضٰى বলার হিকমত : আল্লাহ তা'আলার يَشَآءُ-এরপর يَرْضٰى শব্দটি বলার ফায়দা হলো মূলকথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা যদি শুধু يَشَآءُ বলতেন, তাহলে শ্রোতার মনে مَشِيَّةٌ-এর ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যেত। এ কারণে يَرْضٰى বলেছেন। যাতে সে জানতে ও বুঝতে পারে যে, مَشِيَّةٌ শুধু ঈমানদারদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। তথা আল্লাহ ইচ্ছা করলে শুধু ঈমানদার লোকদের মধ্য হতেই কাউকে সুপারিশের সুযোগ দেবেন।

মুশরিকরা কেন ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলিঙ্গে ডাকত : কুরআনে কারীমে রয়েছে- إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثٰى। অর্থাৎ মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে স্ত্রীলিঙ্গে ডাকত। তারা তাদের এ মন্তব্যের পেছনে দুটি যুক্তি প্রদর্শন করত। যথা-

১. কুরআনে কারীমে مَلٰٓئِكَةٌ শব্দের শেষে ة স্ত্রীলিঙ্গের অক্ষর রয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, ফেরেশতারা নারী জাতি এবং আল্লাহর কন্যা।

২. কুরআনে কারীমে আছে- فَسَجَدَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাদের সঙ্গে فِعْل مُؤَنَّث ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাগণ স্ত্রী জাতি।

বস্তুত তাদের এ জ্ঞান নেই যে, مَلٰٓئِكَةٌ শব্দের শেষাংশে ة টি تَاىْ تَانِيْث নয়; বরং তা تَاء مُبَالَغَه তাদের দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর হলো, فَاعِلْ যখন جَمْع تَكْسِيْر مُظْهَرْ হয়। তখন فِعْل-কে مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّثْ উভয় নেওয়া জায়েজ। সুতরাং তাদের দাবি ভিত্তিহীন ও অমূলক।

আকাশের কেউ তো সুপারিশ করতে পারবে না, তবুও كَمْ مِنْ مَلَكٍ বলার কারণ কি? : দেব-দেবীদের প্রতি লক্ষ্য করে মুশরিকরা বলত, এরা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। এ আয়াত দ্বারা তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করণই উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, ফেরেশতাগণের মাঝে একজন ফেরেশতার সুপারিশ কবুল করা হবে না। তখন অত্র আয়াতের মূল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হতো না। আর এ জন্যই كَمْ অর্থাৎ اَلْكَثِيْرُ বলা হয়েছে مَا مِنْهُمْ اَحَدٌ يَمْلِكُ الشَّفَاعَةَ। বলা হয়নি। কারণ এতে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। -[তাফসীরে কাবীর]

কিভাবে বলা যাবে যে, মুশরিকরা আখিরাত বিশ্বাস করে না : অথচ তারা বলে- هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ 'এসব দেব-দেবী আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য শুধু সুপারিশ করবে।' এ কারণেই আমরা তাদের পূজা করি। তাদের এ কথা হতে বাহ্যত বুঝা যায় তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে নতুবা তারা কেন বলল, 'আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে।' আল্লাহর দরবার বা তাঁর নিকট সুপারিশ মানেই আখিরাতকে বিশ্বাস করা। এমতাবস্থায় তাদেরকে আখিরাতের অবিশ্বাসী কিভাবে বলা যেতে পারে?

এ প্রশ্নের দু'টি জবাব হতে পারে। একটি হলো, তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করত; কিন্তু বিশ্বাস অনুপাতে তারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করত না। তাদের এহেন আচরণকেই আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস নেই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়টি হলো, তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করত ঠিকই; কিন্তু সেখানে একত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে হিসাব বা কৈফিয়ত দেওয়াটাকেই বিশ্বাস করত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আয়াত দ্বারা আরবের মুশরিকরা উদ্দেশ্য। তারা هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ বলত ঠিকই; কিন্তু এ কথার মাধ্যমে তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করেছে- এমন নয়। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো ঐসব মূর্তিদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করে নেওয়া। কেননা আখিরাত সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো "وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ اٰتِيَةً" অর্থাৎ আমরা কিয়ামতের আগমনের কথা কল্পনাও করি না।

Free @ www.e-ilmweebly.com

এছাড়া এ প্রশ্নের জবাব এও হতে পারে যে, তারা নবী-রাসূলগণের বর্ণনা বা চাহিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী আখিরাতকে স্বীকার করত না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কখনো তো ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে বলা যাবে যে ধারণা মূলত কোনো কাজেই আসে না : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا" 'আর ধারণা দৃঢ় প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো উপকারেই আসে না।' অথচ ধারণা-অনুমান কোনো কোনো সময় কাজে আসে। যা আমরা নবী করীম ﷺ -এর জীবনাদর্শ হতে জানতে পারি। তিনি কোনো কোনো জিহাদের ময়দানে ধারণার ভিত্তিতে অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে বাস্তবে কাজ করে সফলও হয়েছিলেন। তবে এখানে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, ধারণা-অনুমান কোনো কাজই দিতে পারে না এটা কোন ব্যাপারে বলা হয়েছে? তা জেনে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। এ আয়াতে যে ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ধারণা-অনুমান তাতে কেনো কাজেই আসবে না, তা হলো "اَلْاُمُوْرُ الْاِعْتِقَادِيَّةُ" অর্থাৎ যেসব কর্ম ও হুকুম আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত, যেমন তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাত ঐসব ব্যাপারে ধারণা-অনুমান কোনো কাজে আসে না। এমনিভাবে শরিয়তের অন্যান্য মৌলিক হুকুম আহকাম নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে নয়। তবে যেসব আহকামের সম্পর্ক সমাজের সাথে সম্পর্কিত ঐসব স্থানে ক্ষেত্র বিশেষ ধারণা-অনুমান কাজে আসতে পারে। এ প্রকারের ধারণা-অনুমানকে তো ইসলাম অস্বীকার করে না। اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ-এ আয়াত হতেও এ প্রকার ধারণা ও অনুমান বাদ পড়বে, যা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আল্লাহ কুরআনের তিনটি স্থানে 'ধারণা-অনুমান' করতে নিষেধ করেছেন, তার তাৎপর্য কি? : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের তিনটি স্থানে ظَنّ বা ধারণা হতে তার বান্দাদেরকে নিষেধ করেছেন। আর ঐসব স্থানে (تَسْمِيَة) নাম ও (دُعَاء) দোয়ার পরেই এটা নিষেধ করেছেন। দু'টি স্থান এ সূরায় আর একটি স্থান সূরা হুজুরাতে।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اِنْ هِىَ اِلَّا اَسْمَاۤءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

২. আরো ইরশাদ করেন- اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا-

৩. অপর আয়াতটি হচ্ছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

এ সকল আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, শরিয়তের বিভিন্ন রুকনের হেফাজত করার চেয়ে ব্যক্তির মুখ ও জিহ্বা হেফাজত করা উত্তম। মিথ্যা বলাটা হাত-পায়ের বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং তার দ্বারা ছোট খাটো গুনাহ করার চেয়ে অধিক পাপ ও নিকৃষ্টকর্ম। কারণ উক্ত তিনটি স্থানেই বস্তুকে নিজস্ব স্থান হতে হটিয়ে মিথ্যা আচরণের সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে।

১. তারা প্রথম স্থানে এমন সকল বস্তুর প্রশংসা করেছে, যাদের প্রশংসা করা অন্যায় এবং তা মিথ্যা। কারণ তারা প্রশংসা প্রাপ্তির উপযুক্ত নয়। যথা- লাত, উজ্জা ও মানাতের তারা প্রশংসা করেছে, অথচ বাস্তবিকপক্ষে তারা প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত ও যোগ্য নয়।

২. তারা দ্বিতীয় স্থানে ফেরেশতাগণের কুৎসা করেছে অথচ তাঁরা কুৎসা পাওয়ার মতো নন। তাঁরা হলেন নূরের তৈরি আল্লাহর একনিষ্ঠ উপাসক বান্দা। তাঁরা নরও নন আবার নারীও নন। অথচ মুশরিকরা তাঁদেরকে নারী ধারণা করে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে। [নাউজুবিল্লাহ]

৩. তারা তৃতীয় স্থানে এমন সব ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে কুৎসা রচনা করেছে যে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই এবং ছিলও না। এটা সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এজন্যই অযথা ধারণা সঠিক নয়। -[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى الخ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- "অতএব হে নবী! যে লোক আমার স্মরণ হতে বিমুখ হয় এবং দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন ছাড়া যার লক্ষ্য অন্য কিছু নয়, তাকে তারই অবস্থার উপর ছেড়ে দাও।"

অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির পেছনে লেগে থেকে এবং তাকে প্রকৃত কথা বুঝাবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করো না। কেননা এরূপ ব্যক্তি এমন কোনো দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত হবে না, যার ভিত্তি আল্লাহকে স্বীকার করা ও আনুগত্য করার উপর স্থাপিত যা দুনিয়ার বৈষয়িক স্বার্থ ও সুখ-সুবিধার উর্ধ্বস্থিত কোনো উচ্চতর লক্ষ্য এবং মূল্যমানের দিকে মানুষকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আহ্বান জানায় এবং যাতে পরকালীন চিরন্তন ও শাশ্বত সাফল্যকেই চরম ও পরম লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এ ধরনের বস্তুবাদী ও আল্লাহ-বিমুখ ব্যক্তিকে দীনের পথে নিয়ে আসার জন্য শ্রম-মেহনত করার পরিবর্তে সেই লোকদের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়, যারা আল্লাহর জিকির শোনার জন্য প্রস্তুত ও উন্মুখ এবং যারা দুনিয়া-প্রীতি ও বৈষয়িকতার কঠিন রোগে আক্রান্ত নয়। -[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

কুরআনে কারীম পরকাল ও কিয়ামত অবিশ্বাসীদের এ অবস্থা বর্ণনা করেছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হলো, পাশ্চাত্যের কুশিক্ষা এবং তা অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা-সাধনা আর পার্থিব জগতের প্রতি আমাদের লোভ-লালসা ও ধ্যান-ধারণা আমাদের মুসলিম জাতির লোকদেরকে পরকাল অবিশ্বাসীদের মতোই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সব জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি, কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এহেন অবস্থার ব্যক্তিদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেন। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ

بِهٖ যমীরের مَرْجِعٌ কোনটি হবে? : وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ আয়াতে বর্ণিত بِهٖ যমীরের مَرْجِعٌ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। যথা-

১. যমখশারী (র.) বলেছেন- بِهٖ যমীরটি মুশরিকদের কাণ্ডজ্ঞানহীন অমূলক কথা-বার্তার দিকে ফিরেছে অর্থাৎ- اِنَّهٗ عَائِدٌ اِلٰى مَا كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ

২. اِنَّهٗ عَائِدٌ اِلٰى مَا تَقَدَّمَ فِى الْاٰيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ عِلْمٍ এটা পরবর্তী আয়াতে যে ইলম বা জ্ঞানের কথা এসেছে ঐ জ্ঞান বা ইলমের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ مَا لَهُمْ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ فَيُشْرِكُوْنَ 'আল্লাহ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই বলেই তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরিক করত।

অপর এক কেরাতে بِهٖ মুযাক্কারের যমীরের স্থলে মুয়ান্নেসের যমীর هَا অর্থাৎ بِهَا পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় এ هَا যমীরের مَرْجِعٌ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। যথা-

১. যমীরটি আখেরাতের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ- مَا لَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ مِنْ عِلْمٍ

২. এটা তাসমিয়ার দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ- مَا لَهُمْ بِالتَّسْمِيَةِ مِنْ عِلْمٍ

৩. এটা ফেরেশতাদের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ- مَا لَهُمْ بِالْمَلَائِكَةِ مِنْ عِلْمٍ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣١. وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط اَىْ هُوَ مَالِكٌ لِذٰلِكَ وَمِنْهُ الضَّالُّ وَالْمُهْتَدِىْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا مِنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهٖ وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالتَّوْحِيْدِ وَغَيْرِهٖ مِنَ الطَّاعَاتِ بِالْحُسْنٰى ج اَىِ الْجَنَّةِ وَبَيَّنَ الْمُحْسِنِيْنَ بِقَوْلِهٖ .

৩১. আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহ তা'আলার জন্য। অর্থাৎ তিনি এ সবগুলোর অধিকারী। আর তন্মধ্যে পথভ্রান্ত ও সুপথগামীও রয়েছে। যাকে ইচ্ছা তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথগামী করেন। যাতে তিনি মন্দ কাজে লিপ্তদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী প্রতিফল দিতে পারেন, অর্থাৎ শিরক ইত্যাদির। আর তাওহীদ ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে যারা সৎকর্মশীল তাদের প্রতিদান দেন উত্তম পুরস্কারের মাধ্যমে অর্থাৎ বেহেশত।

٣٢. اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط هُوَ صِغَارُ الذُّنُوْبِ كَالنَّظْرَةِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسَةِ فَهُوَ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنٰى لٰكِنَّ اللَّمَمَ تَغْفِرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ط بِذٰلِكَ وَبِقَبُوْلِ التَّوْبَةِ وَنَزَلَ فِيْمَنْ كَانَ يَقُوْلُ صَلَاتُنَا صِيَامُنَا حَجُّنَا هُوَ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ اَىْ خَلَقَ اَبَاكُمْ اٰدَمَ مِنَ التُّرَابِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ جمع جنين فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ج فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ط لَا تَمْدَحُوْهَا اَىْ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِعْجَابِ اَمَّا عَلٰى سَبِيْلِ الْاِعْتِرَافِ بِالنِّعْمَةِ فَحَسَنٌ هُوَ اَعْلَمُ اَىْ عَالِمٌ بِمَنِ اتَّقٰى .

৩২. সৎকর্মশীলদের পরিচয় হচ্ছে– যারা ছোট অপরাধ ব্যতীত গুরুতর পাপ ও অপরাধ এবং অশ্লীলতা হতে বিরত থাকে। لَمَمٌ অর্থ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ, যেমন– কুদৃষ্টি করা, চুম্বন ও স্পর্শ করা। قَوْلُهُ اِلَّا اللَّمَمَ এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ ; অর্থ হলো বড় গুনাহ হতে বিরত থাকা দ্বারাই ছোট গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক প্রশস্ত ও অপরিসীম ক্ষমার অধিকারী, বর্ণিত প্রক্রিয়ায় ও তওবা কবুল করার মাধ্যমে। পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যারা আমার নামাজ, আমার রোজা, আমার হজ বলে দাবি প্রকাশ করে। তিনি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত, যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-কে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। যখন তোমরা তোমাদের মায়ের উদরে ভ্রূণরূপে অবস্থান করতেছিলে। اَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِيْنٌ -এর বহুবচন। অতএব তোমরা আত্ম প্রশংসা করো না। অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের প্রশংসা করো না অহংকারমূলকভাবে, হ্যাঁ, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতার্থে হলে তা দোষণীয় নয়। তিনিই মুত্তাকীগণ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَمِنْهُ الضَّالُّ وَالْمُهْتَدِيْ الخ : এ ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উপকারিতা হলো একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব প্রদান করা।

প্রশ্ন হলো আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুর মালিকানা আল্লাহর জন্য بِالذَّاتِ প্রমাণিত রয়েছে। আর যা بِالذَّاتِ প্রমাণিত হয় তা مَعْلُوْلٌ بِالْعِلَّةِ হয় না। অথচ এখানে مِلْكُ سَمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -কে- لِيَجْزِىَ الَّذِيْ الخ -এর عِلَّتْ বলা হয়েছে।

উত্তরের সারকথা হলো لِيَجْزِىَ টা اِضْلَالٌ [ভ্রষ্টতা] ও হেদায়েতের تَعْلِيْلٌ যা مِلْكُ سَمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِمَا -এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই উহ্য ইবারত এরূপ হবে- يُضِلُّ وَيَهْدِىْ لِيَجْزِىَ এটা হওয়াও বৈধ যে, لَامٌ টা عَاقِبَتْ -এর জন্য হবে। অর্থ হবে- সকল কিছু এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সৃষ্টির মধ্যে ভালোও থাকবে এবং মন্দও থাকবে অর্থাৎ নেককারগণও থাকবে এবং বদকাররা ও থাকবে। নেককারদেরকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে এবং বদকারদেরকে মন্দ প্রতিফল দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ الخ : এটা اَلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا থেকে بَدَلٌ হয়েছে অথবা عَطْفُ بَيَانٌ হয়েছে অথবা نَعْتٌ হয়েছে অথবা اَعْنِىْ উহ্য ফে'লের মাফউল হয়েছে অথবা উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। অর্থাৎ- هُمُ الَّذِيْنَ

قَوْلُهُ اللَّمَمَ : অর্থাৎ ছোট গুনাহ। لَمَمٌ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কম, অল্প, ছোট হওয়া। এর থেকেই তার ব্যবহার রয়েছে اَلَمَّ بِالْمَكَانِ অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কিছু সময় অবস্থান করল, اَلَمَّ بِالطَّعَامِ অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ খেয়েছে। এমনিভাবে কোনো জিনিসকে শুধুমাত্র স্পর্শ করা অথবা তার নিকটবর্তী হওয়া অথবা কোনো কাজ একবার দু'বার করা, তার উপর সর্বদা না করা। না থাকা। অথবা শুধুমাত্র অন্তরে খেয়াল কর এই সকল সুরতকেই لَمَمٌ বলা হয়। -[ফতহুল কাদীর : আল্লামা শওকানী]

এই مَفْهُوْم এবং ব্যবহারের কারণেই তার অর্থ ছোট গুনাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো বড় গুনাহের সূচনাতে লিপ্ত হওয়া; কিন্তু বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অথবা একবার বা দুবার কোনো গুনাহ করে ফেলা। এরপর সর্বদার জন্য তাকে পরিত্যাগ করা। অথবা কোনো গুনাহের খেয়াল হৃদয়ে আসা। কিন্তু কর্যত তার নিকটবর্তী না হওয়া। এই সবগুলোই ছোট গুনাহ যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার কারণে ক্ষমা করে দিবেন।

قَوْلُهُ اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ : অর্থাৎ اِلَّا اللَّمَمَ টা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ অর্থাৎ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি কবীরার অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ : শানে নুযূল : হযরত সাবিত ইবনে হারিছ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন ইহুদিদের কোনো ছোট শিশু মৃত্যুবরণ করত তখন তারা বলত, এটা صِدِّيْقٌ সত্যবাদী। নবী করীম ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, ইহুদিরা মিথ্যা বলেছে। প্রকৃত কথা হলো, প্রত্যেক শিশুকে আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন, হয় সে নেককার হবে অথবা গুনাহগার। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণিত হয়েছে। -[লুবাব, কুরতুবী]

قَوْلُهُ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى : শানে নুযূল : কালবী ও মুকাতিল (র.) বলেছেন- কিছু সংখ্যক লোক আমলে সালিহ তথা নেক আমল করত, অতঃপর বলত, আমাদের নামাজ, আমাদের সিয়াম, আমাদের হজ ও আমাদের জিহাদ [আমল সম্পর্কে তাদের এ প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল গর্ব করা] তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। -[খাযিন]

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ ...... اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى : اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনকারী সৎকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গুনাহ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে لَمَمٌ শব্দের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যতিক্রমের সারমর্ম হচ্ছে যে, ছোটখাটো গুনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সৎকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না। لَمَمٌ শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে দু'রকম উক্তি বর্ণিত আছে। যথা-

১. এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ ছোটখাটো গুনাহ। সূরা নিসার আয়াতে একে سَيِّئَاتٌ বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ এ উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ইবনে কাসীর (র.) বর্ণনা করেছেন।

২. এর অর্থ সেসব গুনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা থেকে তওবা করত চিরতরে বর্জন করা হয়। এ উক্তিও আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোনো সৎলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গুনাহ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সেও সৎকর্মী ও মুত্তাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না। সূরা আলে ইমরানের এক আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত এই-

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ, তারাও মুত্তাকীদের তালিকাভুক্ত, যাদের দ্বারা কোনো অশ্লীলকার্য ও কবীরা গুনাহ হয়ে যায় অথবা গুনাহ করে নিজের উপর জুলুম করে বসলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করে ও গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যাতীত কে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা কৃত গুনাহের উপর অটল থাকে না। অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সগীরা তথা ছোটখাটো গুনাহ বারবার করা হলে এবং অভ্যাস করে নিলে তা কবীরা হয়ে যায়। তাই তাফসীরের সার-সংক্ষেপে لَمَّمٌ -এর তাফসীরে এমন গুনাহের কথা বলা হয়েছে, যা বারবার করা হয় না।

قَوْلُهٗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ : এখানে اَجِنَّةٌ শব্দটি جَنِيْنٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত ভ্রূণ। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোনো জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলে। আয়াতে মানুষের অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোনো ভালো ও সৎকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরি করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনিই গতিশীল করেছেন। অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তাওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সৎকর্মী, মুত্তাকী ও পরহেজগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্য গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভালোমন্দ সবকিছু সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভালো হবে কি মন্দ হবে, তা এখনো জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে এ কথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ তোমরা নিজেদের পবিত্রতা দাবি করো না। কারণ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহভীতির উপর নির্ভরশীল; বাহ্যিক কাজকর্মের উপর নয়। আল্লাহভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম ও অবিচল থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবূ সালামা (রা.)-এর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন 'বাররা', যার অর্থ সৎকর্মপরায়ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য "فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ" আয়াত তেলাওয়াত করে এ নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ এতে সৎ হওয়ার দাবি রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়। -[ইবনে কাসীর]

ইমাম আহমদ (র.) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন, তুমি যদি কারো প্রশংসা করতে চাও, তবে একথা বলে কর যে, আমার জানা মতে এ ব্যক্তি সৎ, আল্লাহভীরু। সে আল্লাহর কাছেও পাক-পবিত্র কিনা, তা আমি জানি না।

اَللَّمَمُ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতের اَللَّمَمُ শব্দটির ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। যথা-

১. কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করা, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত না করা।

২. যত সগীরা গুনাহ রয়েছে, সবই اَللَّمَمُ -এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. যে সগীরা গুনাহ বারে বারে করা হয় না, এতে অভ্যস্ত হয় না, এমন সগীরা গুনাহকেও اَللَّمَمُ বলা হয়। কেননা সগীরা গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা আর সগীরা গুনাহ থাকে না; বরং কবীরা হয়ে যায়।

৪. তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, এর দু'টি পন্থা রয়েছে।

ক. এমন গুনাহ, আল্লাহ দুনিয়াতে যার শাস্তির কথা ঘোষণা করেননি, এমন কি আখিরাতেও কি শাস্তি হবে তার কোনো ঘোষণা নেই, এটি اَللَّمَمُ -এর অন্তর্ভুক্ত।

খ. যদি কোনো গুনাহ মুসলমানদের দ্বারা হয়ে যায়, এরপর সে ঐ গুনাহ থেকে তওবা করে ফেলে, তখন তা اَللَّمَمُ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

كَبَائِرُ ও فَوَاحِشُ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত :

১. যে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্যভাবে জাহান্নামের ধমক দিয়েছেন তা হলো كَبَائِرُ আর যেই গুনাহের কারণে দুনিয়ায় গুনাহকারীর উপর শাস্তি আবশ্যক হয় তাকে فَوَاحِشُ বলে।

২. যেই গুনাহকে হালাল মনে করলে গুনাহগার কাফের হবে তাকে كَبَائِرُ বলে। আর যেই গুনাহকে হালাল মনে করলে গুনাহগার কাফের হবে না তাকে فَوَاحِشُ বলে।

৩. যে গুনাহের কর্তা তওবা ব্যতীত ক্ষমা পাবে না তাকে كَبَائِرُ বলে। আর যার কর্তা তওবা ব্যতীত ক্ষমা পাবে তাকে فَوَاحِشُ বলে।

اَلْكَبَائِرُ শব্দের কেরাতের বর্ণনা : اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ আয়াতে বর্ণিত كبائر শব্দের দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-

১. অধিকাংশ কারীদের মতে كَبَائِرُ তথা বহুবচনের শব্দে পড়া হবে।

২. হযরত হামযা, কেসায়ী, আ'মাশ (র.) প্রমুখের মতে كَبِيْرُ তথা একবচন পড়া হবে।

قَوْلُهٗ لِيَجْزِىَ -এর সম্পর্ক কার সাথে? : لِيَجْزِىَ শব্দটি ضَلَّ এবং اِهْتَدٰى শব্দের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। মূল ইবারত হলো- هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ اَوِ اهْتَدٰى لِيَجْزِىَ الْمُضِلَّ مِنَ الْمُكَلَّفِيْنَ اَوِ الْمُهْتَدِيْنَ مِنْهُمْ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٣. اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ۙ عَنِ الْاِيْمَانِ اَىْ اِرْتَدَّ لَمَّا عُيِّرَ بِهٖ وَقَالَ اِنِّىْ خَشِيْتُ عِقَابَ اللّٰهِ فَضَمِنَ لَهُ الْمُعَيِّرُ اَنْ يَّحْمِلَ عَنْهُ عَذَابَ اللّٰهِ اِنْ رَجَعَ اِلٰى شِرْكِهٖ وَاَعْطَاهُ مِنْ مَالِهٖ كَذَا فَرَجَعَ.

৩৩. আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে ঈমান আনয়ন হতে বিমুখ হয়েছে। অর্থাৎ সে ঈমান ত্যাগ করল তখন তাকে ঈমান আনয়নের কারণে তাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তখন সে বলল, আমি আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করি। লজ্জাদাতা বলল, যদি সে শিরকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তবে তার উপর আপতিত শাস্তি বহন করার দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে, আর তার সম্পদ হতে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেবে। ফলে সে শিরকে ফিরে আসল।

٣٤. وَاَعْطٰى قَلِيْلًا مِنَ الْمَالِ الْمُسَمّٰى وَاَكْدٰى. مَنَعَ الْبَاقِىَ مَاخُوْذٌ مِنَ الْكُدْيَةِ وَهِىَ اَرْضٌ صُلْبَةٌ كَالصَّخْرَةِ تَمْنَعُ حَافِرَ الْبِئْرِ اِذَا وَصَلَ اِلَيْهَا مِنَ الْحَفْرِ.

৩৪. অথচ সে কম দিল, প্রতিশ্রুত মাল হতে বিরত থাকল। আর অবশিষ্ট মাল দেওয়া হতে। اَكْدٰى শব্দটি كُدْيَةٌ হতে নিষ্পন্ন। আর তাহলো পাথরতুল্য শক্ত মাটি। যখন কোনো ব্যক্তি সেই মাটিতে কূপ খনন করতে চায় তখন সেই মাটি তাকে কূপ খনন হতে বাধা প্রদান করে।

٣٥. اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى. يَعْلَمُ مِنْ جُمْلَتِهٖ اِنَّ غَيْرَهٗ يَتَحَمَّلُ عَنْهُ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ لَا وَهُوَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ اَوْ غَيْرُهٗ وَجُمْلَةُ اَعِنْدَهٗ الْمَفْعُوْلُ الثَّانِىْ لِرَاَيْتَ بِمَعْنٰى اَخْبِرْنِىْ.

৩৫. তার নিকট কি عِلْمِ غَيْب [অদৃশ্যের জ্ঞান] আছে যে, সে দেখবে অর্থাৎ জানতে পারবে। তন্মধ্য হতে একটি হলো, অপর কেউ তার পরকালীন আজাব বহন করবে না, কখনো না। সে ব্যক্তিটি হলো ওলীদ ইবনে মুগীরা বা অন্য কেউ। আর اَعِنْدَهٗ বাক্যটি যা رَاَيْتَ -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل ও তা اخبرنى অর্থে ব্যবহৃত।

٣٦. اَمْ بَلْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ۙ اسفار التورية او صحف قبلها.

৩৬. নাকি তাকে অবগত করা হয়নি। সে সম্পর্কে যা মূসা (আ.)-এর কিতাবে রয়েছে। তাওরাতের অধ্যায়সমূহে বা তৎপূর্ববর্তী সহীফাসমূহে।

٣٧. وَ صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى ۙ تَمَّمَ مَا اُمِرَ بِهٖ نَحْوُ وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ.

৩৭. আর ইব্রাহীম (আ.)-এর সহিফায় যিনি পুরোপুরিভাবে পালন করেছেন পূর্ণ করেছেন– যে বিষয়ে তাকে আদেশ করা হয়েছে। যেমন– وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ

٣٨. وَبَيَانُ مَا اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى. اِلٰى اٰخِرِهٖ وَاَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَىْ اَنَّهٗ لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ ذَنْبَ غَيْرِهَا.

৩৮. পূর্বোক্ত مَا -এর বিবরণ এই যে, কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না [শেষ পর্যন্ত] আর قَوْلُهٗ اَلَّا تَزِرُ -এর اَنْ টি مُثَقَّلَة অর্থাৎ اَنْ -এর নূন তাশদীদ বিশিষ্ট হতে اَنْ مُخَفَّفَة নূন সাকিন বিশিষ্ট হয়েছে। তথা কোনো ব্যক্তি অন্য কারো পাপ বহন করবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٩. وَأَنْ أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى . مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ سَعْيِ غَيْرِهِ الْخَيْرَ شَيْءٌ .

৩৯. আর এই যে, ان হরফটি মূলত انه ছিল। মানুষ তাই অর্জন করে যা সে চেষ্টা করে। সফলতার বিষয়ে সুতরাং অন্যের সাফল্যের চেষ্টা হতে সে কিছুই লাভ করতে পারবে না।

٤٠. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى . أَيْ يُبْصِرُهُ فِي الْآخِرَةِ .

৪০. আর এই যে, তার চেষ্টা তাকে অচিরেই দেখানো হবে। অর্থাৎ তার শ্রমের ফল সে পরকালে পাবে।

٤١. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفٰى . الْأَكْمَلَ يُقَالُ جَزَيْتُهُ سَعْيَهُ وَبِسَعْيِهِ .

৪১. অতঃপর তাকে যথার্থ প্রতিদান প্রদান করা হবে পরিপূর্ণরূপে। যেমন বলা হয়– [যেমন কর্ম তেমন ফল]।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ أَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى : এখানে হামযা টা اِسْتِفْهَام تَقْرِيْر -এর জন্য এসেছে।

قَوْلُهُ رَأَيْتَ : এটা اخبرني -এর অর্থে হয়েছে। اَلَّذِيْ ইসমে মাওসূল তার সেলাহ -এর সাথে মিলে প্রথম মাফঊল হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَاَكْدٰى : এটা تَوَلّٰى -এর উপর আতফ হয়েছে। আর قَلِيْلًا -কে মাসদারের সিফত অর্থাৎ اَعْطٰى اِعْطَاءً قَلِيْلًا আবার قليلا -কে মাফঊলে বিহী বলাও বৈধ।

قَوْلُهُ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ : এখানে اِسْتِفْهَامْ-এর হামযাটি অস্বীকারমূলক এবং বাক্যটি জুমলা হয়ে رَاَيْتَ -এর দ্বিতীয় মাফঊল।

قَوْلُهُ تَوَلّٰى : এর অর্থ হলো اَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ অর্থাৎ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করল এরপর মুরতাদ হয়ে গেল। অধিকাংশের অভিমত হলো এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং আয়াত তাঁর সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ : اَعْطٰى -এর উহ্য যমীর تَوَلّٰى -এর উহ্য فَاعِلْ -এর দিকে। আর ه যমীরে বারেয এটা ضَمِنَ -এর فَاعِلْ -এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ জিম্মাদার اَلَّذِىْ تَوَلّٰى -এর উপর দুটি বিষয় আবশ্যক করেছে। একটি তো হলো তাওহীদকে পরিত্যাগ করে শিরকের দিকে ফিরে এলো। দ্বিতীয় হলো ضَمَان -এর পরিবর্তে সম্পদের একটি বিশেষ পরিমাণ তাকে দিয়ে দিল। আর ضَامِنْ নিজের উপর শুধুমাত্র একটি জিনিস আবশ্যক করল। আর তা হলো পরকালে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষার জিম্মাদারী।

قَوْلُهُ تَمَّمَ مَا اُمِرَبِهِ : হযরত ইবরাহীম (আ.) উক্ত বিধানাবলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করেছেন যে, বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উদাহরণত সন্তান জবাই করা, অগ্নিতে নিপতিত হওয়া, দেশ ত্যাগ ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ..... الخ : শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

১. বর্ণিত আছে কোনো এক লোক ঈমান আনার পর, তার জনৈক বন্ধু তাকে তিরস্কার করে বলল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করেছ? জবাবে সে বলল, আমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করি। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তার বন্ধু তাকে বলল, আমাকে কিছু ধন-সম্পদ দাও তার বিনিময়ে তোমার আজাব আমি বহন করে নেব এবং তুমি আজাব হতে মুক্তি পাবে। অতঃপর সে তাকে কিছু অর্থ দিল; কিন্তু বন্ধু তাকে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো অর্থ চাইলে সে সামান্য ইতস্তত করে কিছু অর্থ দিয়ে দিল। সবশেষে সে বন্ধু বাকি অর্থের জন্য একটি সাক্ষ্যযুক্ত দলিল লিখে দিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। –[জালালাইন, কামালাইন]

২. হযরত মুজাহিদ, ইবনে যায়েদ ও মুকাতিল (র.) বলেছেন, উপরিউক্ত আয়াতগুলো ওলীদ ইবনে মুগীরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি নবী করীম ﷺ -এর দীনের আনুগত্য করেছিলেন, তখন কোনো এক মুশরিক তাকে তিরস্কার করল এবং বলল, কেন তুমি পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছ এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট বলে গণ্য করেছ এবং ধারণা করে নিয়েছ যে, তারা সবাই জাহান্নামী? জবাবে সে বলল, আমি আল্লাহর আজাবকে ভয় করছি। তখন সে তার গুনাহের বোঝা বহন করে নেবে বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দিল এ শর্তে যে, সে যদি তাকে কিছু মাল প্রদান করে এবং শিরকের কাজে ফিরে আসে তাহলে সে তার আজাবের বোঝা বহন করবে। অতঃপর সে তার প্রতিশ্রুত বিষয়ের কিয়দাংশ তাকে দান করল আর অবশিষ্ট অংশ আটকে দিল, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

মুকাতিল (র.) আরো বলেছেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা কুরআনে কারীমের প্রশংসা করল, অতঃপর তা হতে ফিরে গেল। তখন وَأَعْطٰى قَلِيْلًا আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), সুদ্দী, কালবী ও মুসাইয়্যাব ইবনে শুরাইক (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি হযরত ওসমান (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.) সদকা-খয়রাত করতেন। তখন তাঁর দুধ ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ সারাহ বলল, হে ওসমান! তুমি এটা কি করছ? তোমার তো কোনো সম্পদই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আমার অনেক গুনাহ আছে, আর আমি যা করছি এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিই চাচ্ছি এবং তাঁর ক্ষমার প্রত্যাশা করছি। তখন আবদুল্লাহ তাঁকে বলল, তুমি আমাকে তোমার উট দান কর, আর আমি তোমার সব গুনাহের দায়িত্ব গ্রহণ করব। তখন তিনি তাকে তা দান করলেন এবং তার উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন, আর সদকা-খয়রাতের ব্যাপার কিছুটা বন্ধ করে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা أَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى وَأَعْطٰى قَلِيْلًا وَّأَكْدٰى আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। অবশেষে হযরত ওসমান (রা.) পূর্বের তুলনায় আরো বেশি বেশি দান-খয়রাত করতে লাগলেন। -[কুরতুবী]

মৃত্যুর পর উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা : এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য-

আবূ নু'আঈম হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার রূহ কবজ করে নেন, তখন দু'জন ফেরেশতা তাকে নিয়ে আসমানে হাজির হয় এবং আরজ করে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে এ মুমিনের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলে, এখন তুমি তাকে ডেকে নিয়েছো, তাই আমাদের এখন অনুমতি দান কর, আমরা যেন জমিনে অবস্থান করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, জমিন আমার বান্দাদের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাই তোমরা উভয়ে এ বান্দার কবরে অবস্থান কর, আর আমার তসবীহ তাহলীল এবং তাকবীর পাঠে কিয়ামত পর্যন্ত মশগুল থাক, আর এ মুমিন বান্দার জন্যে তার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করতে থাক।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি পথ খোলা থাকে। যথা- ১. সদকায়ে জারিয়া। ২. যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি যদি কোনো দ্বীনি কিতাব রচনা করে যায় এবং মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়। ৩. যদি মৃত ব্যক্তির নেককার সন্তান তার জন্য দোয়া করে। মৃত ব্যক্তি এ তিনটি পন্থায় উপকৃত হতে পারে।

ইমাম আহমদ (র.) লিখেছেন, যদিও সদকায়ে জারিয়া এবং উপকারী ইলম মানুষের নিজের আমলের ফলশ্রুতি; কিন্তু নেককার সন্তানের দোয়ায় তার কোনো মেহনত থাকে না, এতদসত্ত্বেও এর দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

তাবারানী (র.) হযরত আবূ হুরায়রাহ এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর নেককার বান্দাদের মর্তবা বুলন্দ করবেন। বান্দা আরজ করবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! কিভাবে আমার মর্তবা বুলন্দ হলো? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, তোমার পুত্র তোমার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করেছে, এজন্য তোমার মর্তবা বুলন্দ হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কবরের ভেতর মানুষের এমন অবস্থা হয়, যেমন কোনো ডুবন্ত ব্যক্তির অবস্থা, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি তথা আপনজনদের কাছে সে আশা করে এবং অপেক্ষা করে তাদের দোয়ার জন্যে, যদি কেউ তার জন্যে দোয়া করে, তবে সে দোয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু থেকে তার নিকট প্রিয় হয়। পৃথিবীর অধিবাসীদের দোয়ার কারণে কবরবাসীদেরকে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের সমান ছওয়াব দান করেন। মৃতদের জন্যে জীবিতদের এ হাদিয়া হয় ইস্তেগফার। -[বায়হাকী]

তাবারানী (র.) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের প্রতি দয়া করা হয়েছে, আমার উম্মত গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে এবং বেগুনাহ হয়ে কবর থেকে বের হবে। মুমিনগণ তার জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করবে, ফলে সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে দোজখ থেকে বের হবে।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেছেন, জীবিতদের দোয়ায় মৃতদের উপকার হয়। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়- وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ "আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে মাগফিরাত দান কর, আর আমাদের সেই ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।"

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন, তিনি কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার ধারণা হলো, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তবে তিনি কিছু দান খয়রাত করতেন, আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি তবে কি তিনি ছওয়াব পাবেন? রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর মায়ের ইন্তেকাল হলো। তিনি হুজুর ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার মাতার ইন্তেকাল হয়েছে, আমি উপস্থিত ছিলাম না, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে দান খয়রাত করি তা কি তাঁর নিকট পৌঁছবে? রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। সাদ (রা.) আরজ করলেন, তবে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি যে, আমার বাগানটি আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে খয়রাত করলাম। -[বুখারী]

ইমাম আহমদ (র.) লিখেছেন, হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছে, এখন তাঁর জন্যে কোন জিনিসের খয়রাত সবচেয়ে উত্তম? হুজুর ﷺ ইরশাদ করলেন, পানি। একথা শ্রবণ করে হযরত সা'আদ (রা.) একটি কূপ খনন করালেন এবং বললেন, এটি সা'আদের মায়ের জন্যে। তাবারানী (র.) এ হাদীস হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে সংকলন করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি নফল খয়রাত করে তবে সে যেন তার পিতা মাতার পক্ষ থেকে করে। এর ছওয়াব তার পিতা-মাতা পাবে। আর তার নিজের ছওয়াবেও কম করা হবে না।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে বাড়িতে কারো মৃত্যু হয়, এরপর সে মৃত ব্যক্তির জন্যে দান খয়রাত করা হয়, তবে হযরত জিবরাঈল (আ.) নূরের একটি পাত্রে সেই দান নিয়ে মৃত ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বলেন, হে কবরের অধিবাসী! তোমার বাড়ির লোকেরা তোমার জন্য এ তোহফা প্রেরণ করেছেন, তুমি তা গ্রহণ কর। এভাবে সে মৃত ব্যক্তি তোহফা গ্রহণ করে এবং আনন্দিত হয়। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী কবরের অধিবাসীর জন্যে কোনো কিছু প্রেরিত না হওয়ার কারণে সে চিন্তিত হয়। -[তাবারানী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার পিতা-মাতার জন্যে দোজখ থেকে নাজাত লিপিবদ্ধ করে দেন, তাদের জন্য হজ পরিপূর্ণ হয়, আর যে হজ করলো তার ছওয়াবও কম করা হয় না।

আবূ আব্দুল্লাহ সাকাফী (র.) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আরজ করলাম, যার পিতা-মাতা হজ করতে পারেনি, সে যদি তাদের জন্যে হজ করে তবে কি হুকুম? নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তার পিতা-মাতা আজাদ হয়ে যাবে, আর আসমানে তাদের রূহগুলোকে সুসংবাদ দেওয়া হবে এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে নেকী লিপিবদ্ধ হবে।

হযরত আকাবা ইবনে আমের (রা.) বর্ণনা করেন, একজন স্ত্রীলোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমার মা ইন্তেকাল করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করতে পারি? রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন, তুমি বল যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকতো, আর তুমি তা তোমার মায়ের পক্ষ হতে আদায় করতে তবে কি তা আদায় হয়ে যেতো? স্ত্রীলোকটি আরজ করলো, জি হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন রাসূল ﷺ তাকে তার মায়ের পক্ষ থেকে হজ করতে আদেশ দিলেন। -[তাবারানী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মৃত লোকের পক্ষ থেকে হজ করবে, সে এত ছওয়াবই পাবে যা মৃত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা তাকাছুর পাঠ করে বলে যে, এ সূরাসমূহের ছওয়াব এ কবরস্থানের সকল নারী পুরুষকে বখশিশ করলাম, তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবরস্থানের সকলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কবরস্থান অতিক্রম করে এবং এগারো বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এবং কবরস্থানের মৃতদের তা বখশিশ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা ঐ কবরস্থানের সকলের সংখ্যা মোতাবেক তাকে ছওয়াব দান করবেন।

قَوْلُهُ اَكْدٰى : শব্দটি كُدْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে اَكْدٰى -এর অর্থ এই যে, প্রথম কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে নুযূলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তপর পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তাফসীর হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদা (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। -[ইবনে কাসীর]

Free@www.e-ilmweebly.com

قَوْلُهُ اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى : শানে নুযুলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোনো এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আজাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলা বাহুল্য, এটা নিরেট প্রতারণা। তার কাছে কোনো অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে নুযূলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে। এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তৎস্থলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং এই ধারণাও সঠিক নয়। কেননা কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যা ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তার বিকল্প দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিজিকদাতা। চিন্তা করলে দেখা যায়, কুরআনের এই বাণীর সত্যতা, কেবল টাকা-পয়সার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষ দুনিয়াতে যে কোনো শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার দেহে তার বিকল্প সৃষ্টি করতে থাকেন। নতুবা মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি ইস্পাত নির্মিতও হতো, তবু ষাট-সত্তর বছর ব্যবহার করার দরুন তা ক্ষয় হয়ে যেত। পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতটুকু ক্ষয় হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ন্যায় তার বিকল্প ভিতর থেকেই সৃষ্টি করে দেন। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারেও তদ্রূপ। মানুষ ব্যয় করতে থাকে আর তার বিকল্প আসতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিলাল (রা.)-কে বলেন– اَنْفِقْ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اِقْلَالًا বিলাল, আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক এবং আশঙ্কা করো না যে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তোমাকে নিঃস্ব করে দেবেন। –[ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى : এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وفى বলা হয়েছে। وفاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ গুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিঞ্চিৎ বিবরণ : উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। وَفّٰى শব্দের এই তাফসীর ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখের মতে।

কোনো কোনো হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য وَفّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরিউক্ত তাফসীরের পরিপন্থি নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ আল্লাহর বিধানাবলি প্রতিপালন এবং আল্লাহর আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রিসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণত আবূ ওসামা (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে বললেন, তুমি কি জান এর মর্মার্থ কি? হযরত আবূ ওসামা (রা.) আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অর্থ এই যে– وَفّٰى عَمَلَ يَوْمِهِ بِاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ অর্থাৎ তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন যে, দিনের শুরুতে [ইশরাকের] চার রাকাত নামাজ পড়ে নেন। –[ইবনে কাসীর]

তিরমিযীতে আবূ যর (রা.) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اِبْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ.

অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত নামাজ পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।

হযরত মুয়াজ ইবনে আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে اَلَّذِىْ وَفّٰى খেতাব কেন দিলেন? কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন–

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

–[ইবনে কাসীর]

হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষা : কুরআন পাক পূর্ববর্তী কোনো পয়গাম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই হয় যে, এই উম্মতের জন্যও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোনো আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পরবর্তী আঠারো আয়াতে সেই সব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো হযরত

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দু'টি। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। অবশিষ্ট শিক্ষা উপদেশ ও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই- اَنْ لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى এবং وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ; এখানে وِزْرٌ শব্দের আসল অর্থ হলো বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাপ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরণ করার ক্ষমতাও কারো হবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ অর্থাৎ কোনো শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দাংশও বহন করার সাধ্য কারো হবে না।

একের গুনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না : এই আয়াতের শানে নুযূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কিয়ামতে কোনো আজাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করবে তাকে বাঁচিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর দরবারে একের গুনাহে অপরকে পাকড়াও করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন অবৈধ বিলাপ ও ক্রন্দন করলে তাদের এই কর্মের কারণে মৃতের আজাব হয়। এটা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে নিজেও মৃতের জন্য বিলাপ ও আহাজারিতে অভ্যস্ত হয়। অথবা সে তার ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর যেন বিলাপ ও ক্রন্দনের ব্যবস্থা করা হয়। -[মাযহারী] এমতাবস্থায় তার আজাব তার নিজের কারণে হয়, অন্যের কর্মের কারণে নয়।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে- وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى -এর সারমর্ম এই যে, অপরের আজাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারো নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরজ নামাজ আদায় করতে পারে না এবং ফরজ রোজা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরজ নামাজ ও রোজা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ঈমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়।

আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীরে কোনো আইনগত খটকা ও সন্দেহ নেই। কেননা হজ ও জাকাতের প্রশ্নে বেশির বেশি এই সন্দেহ হতে পারে যে, প্রয়োজন দেখা দিলে আইনগত এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে বদলী হজ করতে পারে অথবা অপরের জাকাত তার অনুমতিক্রমে দিতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই সন্দেহ ঠিক নয়। কারণ কাউকে নিজের স্থলে বদলী হজের জন্য প্রেরণ করা এবং তার ব্যয়ভারে নিজে বহন করা অথবা কাউকে নিজের পক্ষ থেকে জাকাত আদায় করার আদেশ দেওয়াও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তির নিজের কাজ ও চেষ্টারই অংশ বিশেষ। তাই এটা আয়াতের পরিপন্থি নয়।

'ঈসালে ছওয়াব' তথা মৃতকে ছওয়াব পৌঁছানো : উপরে আয়াতের অর্থ এই জানা গেল যে, এক বক্তি অপরের ফরজ ঈমান, ফরজ নামাজ ও ফরজ রোজা আদায় করে তাকে ফরজ থেকে অব্যাহতি দিতে পারে না। এতে জরুরি হয় না যে, এক ব্যক্তির দোয়া ও দান-খায়রাতের ছওয়াব অপর ব্যক্তি পেতে পারে। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং আলেমগণের সর্বসম্মত ব্যাপার। -[ইবনে কাসীর]

কেবল কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব অপরকে দান করাও পৌঁছানো জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.) মতভেদ করেন। তাঁর মতে এটা জায়েজ নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাপক অর্থদৃষ্টে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশ ইমাম ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দোয়া ও দান-খয়রাতের ছওয়াব যেমন অপরকে পৌঁছানো যায়, তেমনি কুরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক নফল ইবাদতের ছওয়াব অপরকে পৌঁছানো জায়েজ। এরূপ ছওয়াব পৌঁছালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তা পাবে। কুরতুবী (র.) বলেন, অনেক হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, মুমিন ব্যক্তি অপরের সৎকর্মের ছওয়াব পায়। তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে এসব হাদীস বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার বরাত দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হলো, এগুলো অন্যান্য পয়গাম্বরের শরিয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের এই মূর্খতাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হতো। তাঁদের শরিয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করছিল।

قَوْلُهُ وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى : অর্থাৎ কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে শামিল আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ কেবল দৃশ্যত কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের খাঁটি নিয়ত থাকা জরুরি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٢. وَاَنَّ بِالْفَتْحِ عَطْفًا وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ اِسْتِيْنَافًا وَكَذَا مَا بَعْدَهَا فَلَا يَكُوْنُ مَضْمُوْنُ الْجُمَلِ فِي الصُّحُفِ عَلَى الثَّانِيْ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ـ الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيْرُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُجَازِيْهِمْ ـ

৪২. আর এই যে اَنَّ হরফটির প্রথমাক্ষর যবরের সাথে পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হিসেবে। আর مُسْتَانِفَه [স্বতন্ত্র] বাক্য হিসেবে যেরের সাথে। এর পরবর্তী আয়াতে اَنَّ -এর ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে দ্বিতীয় তারকীব অনুযায়ী جُمْلَه مُسْتَانِفَه হলে সহীফার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। সবকিছুর সমাপ্তি আপনার প্রতিপালকের দিকে। মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবেন।

٤٣. وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ مَنْ شَاءَ اَفْرَحَهٗ وَاَبْكٰى لا مَنْ شَاءَ اَحْزَنَهٗ ـ

৪৩. তিনি যাকে ইচ্ছা হাসান খুশি করেন। আর যাকে ইচ্ছা কাঁদান চিন্তিত করেন।

٤٤. وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ فِي الدُّنْيَا وَاَحْيٰى لا لِلْبَعْثِ ـ

৪৪. তিনিই দুনিয়ায় মৃত্যু দান করেন এবং পুনরুত্থানের জন্য জীবিত করেন।

٤٥. وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ

৪৫. আর তিনি নারী ও পুরুষ দুই শ্রেণিকে সৃষ্টি করেন।

٤٦. مِنْ نُّطْفَةٍ مَنِيٍّ اِذَا تُمْنٰى ص تُصَبُّ فِي الرَّحِمِ ـ

৪৬. শুক্রবিন্দু ধাতু হতে, যখন তা জরায়ুতে পৌঁছে।

٤٧. وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ الْاُخْرٰى الْخَلْقَةَ الْاُخْرٰى لِلْبَعْثِ بَعْدَ الْخَلْقَةِ الْاُوْلٰى ـ

৪৭. আর এই যে, তাঁরই দায়িত্বে প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা পুনরুত্থানের জন্য। نَشْاَةً শব্দটি مَدّ [মদ] ও قَصْر [কসর] উভয়রূপে পড়া যাবে।

٤٨. وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى النَّاسَ بِالْكِفَايَةِ بِالْاَمْوَالِ وَاَقْنٰى اَعْطَى الْمَالَ الْمُتَّخَذَ قِنْيَةً ـ

৪৮. আর তিনিই মানুষকে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ দানের মাধ্যমে স্বনির্ভর করেন। সম্পদ দান করেন, যা সে সঞ্চয় করেছে।

٤٩. وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى لا هِيَ كَوْكَبٌ خَلْفَ الْجَوْزَاءِ كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ـ

৪৯. আর তিনি শে'রা নক্ষত্রের মালিক। এটা جَوْزَاء নক্ষত্রের পেছনের একটি নক্ষত্র। জাহিলিয়া যুগে তার ইবাদত করা হতো।

٥٠. وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَانِ الْاُوْلٰى لا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِاِدْغَامِ التَّنْوِيْنِ فِي اللَّامِ وَضَمِّهَا بِلَا هَمْزَةٍ هِيَ قَوْمُ هُوْدٍ وَالْاُخْرٰى قَوْمُ صَالِحٍ ـ

৫০. আর তিনিই প্রথম আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন। এক কেরাত মোতাবেক عَادً শব্দের তানভীনকে اَلْاُوْلٰى-এর لَامْ অক্ষরের সাথে اِدْغَامْ করা হয়েছে এবং لَامْ -এর উপর পেশ দিয়ে হামযা ব্যতীত পড়া হয়েছে। প্রথম আদ বলতে হুদ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় হলো সালেহ (আ.)- এর সম্প্রদায়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

٥١. وَثَمُوْدَ بِالصَّرْفِ اِسْمٌ لِلْاَبِ وَبِلَا صَرْفٍ اِسْمٌ لِلْقَبِيْلَةِ وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى عَادٍ فَمَآ اَبْقٰى مِنْهُمْ اَحَدًا .

৫১. আর তিনিই ছামুদ সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছেন। উল্লেখ্য যে ثَمُوْدَ শব্দটি যদি مُنْصَرِف রূপে পড়া হয় তবে তা দ্বারা গোত্রের আদি পিতা উদ্দেশ্য হবে। যদি غَيْر مُنْصَرِف রূপে পড়া হয় তবে ছামুদ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য হবে। আর এটা عَادٌ -এর উপর عَطْف হবে। মোটকথা তিনি তাদের কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি।

٥٢. وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اَىْ قَبْلَ عَادٍ وَثَمُوْدَ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى مِنْ عَادٍ وَثَمُوْدٍ لِطُوْلِ لُبْثِ نُوْحٍ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا وَهُمْ مَعَ عَدَمِ اِيْمَانِهِمْ بِهٖ يُؤْذُوْنَهُ وَيَضْرِبُوْنَهُ .

৫২. আর নূহের সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করেছি। আদ ও ছামুদ সম্প্রদায়ের পূর্বে। নিশ্চয় তারাই ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য। হযরত নূহ (আ.) আদ ও ছামুদ জাতির মাঝে দীর্ঘ ৯৫০ বৎসরকাল অবস্থান করেন। তারা তাকে অমান্য করত এবং সাথে সাথে কষ্ট দিত ও প্রহার করত।

٥٣. وَالْمُؤْتَفِكَةَ وَهِىَ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ اَهْوٰى . اَسْقَطَهَا بَعْدَ رَفْعِهَا اِلَى السَّمَاءِ مَقْلُوْبَةً اِلَى الْاَرْضِ بِاَمْرِهٖ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِذٰلِكَ .

৫৩. আর উৎপাটিত আবাসভূমিকে তথা হযরত লূত (আ.)-এর জনপদকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলাম। সেটাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে উল্টিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশে জমিনে নিক্ষেপ করেছিলেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِالْفَتْحِ عَطْفًا وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ اِسْتِيْنَافًا : অর্থাৎ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى -এর মধ্যকার اِنَّ-এর মধ্যে দুটো সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমটি হলো– اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى -এর উপর আতফ করা হবে এবং اِنَّ -কে مَنْصُوْب পড়া হবে। এ সূরতে فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى পর্যন্ত مَا -এর বয়ান হবে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ مَضْمُوْن টা صُحُفِ مُوْسٰى এবং صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ হবে। আর اِنَّ -কে যের দিয়ে পাঠ করা হয় তবে وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى হতে শেষ পর্যন্ত جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হবে এবং শেষ পর্যন্ত مَضْمُوْن টা صُحُفِ مُوْسٰى ও صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ হবে না, বরং শুধুমাত্র প্রথম তিনটি তথা ১. اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ২. اِنَّ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ৩. وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى-এর مَضْمُوْن টা صُحُف اِبْرَاهِيْمَ এবং مُوْسٰى হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا مَا بَعْدَهَا : এখানে مَا بَعْدَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى হতে নিয়ে وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পর্যন্ত।

বি. দ্র. بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى -এর مَا-এর বয়ানে ১১ স্থানে اِنَّ এসেছে এটা সেই সুরতে হবে যখন اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى -এর আতফ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ الخ -এর উপর হবে, তখন اَنَّ -কে مَفْتُوْح পড়া হবে, অন্যথায় শুধুমাত্র প্রথম তিন জায়গায় مَفْتُوْح হবে। আর বাকি আট জায়গায় مَكْسُوْر হবে।

قَوْلُهُ وَاَقْنٰى : এটা اِقْنَاءٌ মাসদার থেকে মাযীর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। অর্থাৎ তিনি একত্র করলেন। অর্থাৎ اَعْطَى الْمَالَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ الَّذِىْ اِتَّخَذَ قِنْيَةً : قِنْيَةٌ এমন সম্পদকে বলা হয় যাকে সঞ্চয় করা হয় এবং ব্যয় করার ইচ্ছা থাকেনা, আরবি ভাষাভাষীগণ ও মুফাসসিরগণ اَقْنٰى -এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) اَقْنٰى -এর অর্থ করেছেন- اَرْضٰى তথা সন্তুষ্ট করে দিলেন, ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে এর অর্থ করেছেন- قَنَعَ তথা নিশ্চিন্ত করে দিল।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু তাকে দেওয়া হয় তাই হলো اَقْنٰى

আবূ উবাইদ ও অন্যান্যদের মতে اَقْنٰى শব্দটি قِنْيَةٌ হতে নির্গত যার অর্থ হলো সংরক্ষিত ও অবশিষ্ট মাল। যেমন, ঘর জমি, বাগান ইত্যাদি।

ইবনে যায়েদ, ইবনে কায়সান এবং আখফাশ اَقْنٰى -এর অর্থ اَفْقَرَ করেছেন। অর্থাৎ সে দরিদ্র বানালো। ইবনে জারীর (র.) এই অর্থই উদ্দেশ্য করেছেন এবং اِفْعَالٌ -এর হামযাকে سَلْبِ مَاخَذْ -এর জন্য নিয়েছেন। যেমন اَشْكٰى -এর سَلْبِ شِكَايَتْ অর্থে। পূর্বাপর আলোচনা প্রেক্ষিতেও এই অর্থ অধিক উপযোগী মনে হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়ের আলোচনা আসছে। অর্থ হলো- তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেছেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র বানিয়েছেন।

قَوْلُهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى : شِعْرٰى হলো আকাশের উজ্জ্বলতম তারকা। এটাকে كَلْبِ اَكْبَرْ -ও বলা হয়। এছাড়াও আরো বিভিন্ন নাম রয়েছে। ইংরেজিতে বলা হয় Dog Star আরবে এর পূজা করা হতো। কুরাইশ বংশীয় বনূ খুযাআ বিশেষভাবে এই তারকার পূজা করত। বলা হয় যে, এটা সূর্য থেকে ২৩ গুণ বেশি আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু তার দূরত্ব আট আলোকবর্ষ হতেও অধিক দূরে হওয়ার কারণে সূর্য হতে ছোট এবং অনুজ্জ্বল দেখা যায়। আলোর গতি বেগ প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ মাইল। এর পূজা সর্বপ্রথম আরম্ভ করেছিল কুরাইশ বংশীয় সর্দার আবূ কাবশা। আবূ কাবশা রাসূল ﷺ-এর মাতৃকুলের দিক দিয়ে جَدِّ اَعْلٰى ; এ কারণেই কুরাইশগণ তাঁকে ইবনে আবী কাবশা বলত। এই সম্পর্কের কারণে যখন রাসূল ﷺ আরবে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন তখন লোকেরা তাকে ইবনে আবী কাবশা বলা আরম্ভ করে দিল। অর্থাৎ আবূ কাবশা স্বীয় যুগে যেভাবে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে তারকা পূজা শুরু করে দেয়, অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ -ও মূর্তিপূজা পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদতের সূচনা করেন। এটা প্রচণ্ড গরমের সময় জাওযা নক্ষত্রের পর উদিত হয়। এটাকে شِعْرٰى يَمَانِىْ -ও বলা হয়। এর বিপরীতে একটি شِعْرٰى شَامِىْ -ও রয়েছে। সেটা আলোকোজ্জ্বল তারকার অন্তর্ভুক্ত। এটাকে كَلْبِ اَصْغَرْ বলা হয়।

قَوْلُهُ الْمُؤْتَفِكَةُ : এটা বাবে اِفْتِعَالٌ -এর اِئْتِفَاكٌ মাসদার হতে اِسْمِ فَاعِلْ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ ,বহুবচনে اَلْمُؤْتَفِكَاتُ অর্থ- উল্টে ফেলা জনপদ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের জনপদ। যা বর্তমানের মৃত সাগরের পাড়ে বিদ্যমান ছিল; যাদের সবচেয়ে বড় শহর ছিল 'সান্দূম' বা 'সাদূম'। হযরত লূত (আ.)-এর নির্দেশ অমান্যকরণ, অত্যাচার নির্যাতন ও লাওয়াতাত তথা সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে নাস্তনাবুদ করে দিয়েছিলেন।

اِنَّ অব্যয়ে **আরোপিত দুটি কেরাত** : "قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى : -এর ان -এর মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। اِنَّ শব্দটি পূর্বোক্ত اِنَّ শব্দের উপর مَعْطُوْف হিসেবে অধিকাংশ ক্বারীগণ فَتْحَة -এর সাথে পড়েছেন। কারো মতে وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى। বাক্যটিকে جُمْلَة مُسْتَانِفَة ধরে اِنَّ শব্দে كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَاَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى : ... وَاَنْ لَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ আয়াতটি بِمَا হতে বদল হিসেবে مَحَلاً مَجْرُوْر হয়েছে। অথবা, তা একটি উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ হিসেবে مَحَلاً مَرْفُوْعْ হয়েছে, অর্থাৎ- ذَالِكَ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ অথবা তা একটি উহ্য فِعْل -এর مَفْعُوْل হিসেবে مَحَلاً مَنْصُوْب -ও হতে পারে।

عَادًا الْاُوْلٰى **শব্দে বর্ণিত কেরাতদ্বয়** : عَادًا الْاُوْلٰى শব্দে দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। হযরত নাফে ও আবূ আমর عَادًا শব্দের তানভীনকে اَلْاُوْلٰى শব্দের لَامْ অক্ষরে ইদগাম করে এবং لَامْ অক্ষরে পেশ দিয়ে কোনো হামযা ছাড়াই পড়েছেন। আর অধিকাংশ কারীগণ عَادًا শব্দের তানভীনকে لَامْ -এর মধ্যে ইদগাম করে হামযা বলবৎ রেখে عَادًا الْاُوْلٰى পড়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের নিকটই পৌঁছতে হবে। আসলে দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই করুক না কেন, দুনিয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং তার আনন্দ ভোগ করার জন্য যা কিছুই নির্মাণ ও তৈরি করুক না কেন তাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছতে হবে। এটাই মানুষের শেষ লক্ষ্য ও শেষ গন্তব্যস্থল। এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না। তার রবের দরবার ছাড়া অন্য কোথাও মাথা গোজার সুযোগ থাকবে না। আল্লাহর দরবারে তার স্থান জান্নাত কিংবা জাহান্নাম হবে। এ মহাসত্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্মে সত্যিকার পরিবর্তন আনতে পারে। বস্তুত পক্ষে কারো চিন্তাশক্তিতে যদি এ অনুভূতির উদ্রেক হয় যে, তার শেষ পরিণতি আল্লাহর নিকট যা হতে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না, তখন তার কর্মপন্থা ও কর্মধারা ঐ সত্যের ভিত্তিতেই সূচিত হবে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে থাকবে। জীবনের সূচনা হতেই তার হৃদয় সর্বদাই তাঁর সাথে সম্পর্কিত থাকবে। -[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

قَوْلُهُ وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى : আল্লামা কুরতুবী (র.) আল্লাহর আয়াত- "وَاَنَّهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى" -এর তাফসীরে কয়েকটি রেওয়ায়েত ব্যক্ত করেন। যথা-

হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর শপথ নবী করীম ﷺ কখনো বলেননি যে, কোনো লোকের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে কবরে আজাব দেওয়া হয়েছে; বরং তিনি বলেছেন, কাফের ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তার আজাব বৃদ্ধি করে দেন। আর তিনি হাসিয়েছেন ও কাঁদিয়েছেন আর একজনের বোঝা অপরজন বহন করবে না।

হযরত আয়েশা (রা.) অপর এক রেওয়ায়েতে বলেছেন, নবী করীম ﷺ একদল সাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় তারা হাসছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বলেছেন যে, اَنَّهُ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى অর্থাৎ তিনিই হাসিয়েছেন ও কাঁদিয়েছেন।

হযরত আতা (র.) বলেন, তিনিই আনন্দ দান করেছেন এবং কাঁদিয়েছেন। কেননা আনন্দ হাসি আনে আর চিন্তায় কান্না আনে।

হযরত হাসান (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে জান্নাতে হাসিয়েছেন। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে কাঁদিয়েছেন। কারো অভিমত হচ্ছে- যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা আনন্দ দিয়ে দুনিয়াতে হাসিয়েছেন। আর যাকে ইচ্ছা চিন্তা দিয়ে কাঁদিয়েছেন।

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোকদেরকে অনুগ্রহ দ্বারা হাসিয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার অনুগত। আর ঐ সকল লোকদের কাঁদিয়েছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য।

মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযীর মতে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে আখিরাতে হাসিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তাদেরকে কাঁদিয়েছেন।

যাহহাক (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে গাছপালা ও বৃক্ষ দ্বারা মাটিকে হাসিয়েছেন এবং বৃষ্টির দ্বারা কাঁদিয়েছেন।
হযরত যুন্নূন (র.) বলেন, মহান রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদের হৃদয়কে হাসিয়েছেন এবং কাফেরদের হৃদয়কে কাঁদিয়েছেন।

قوله وانه امات واحيى : এ আয়াতের উদ্দেশ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা জীবন ও মৃত্যুর উৎসসমূহ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

কারো কারো মতে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করে রেখেছেন। এর সমর্থনে তারা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও উপস্থাপন করেছেন, তা হলো- اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ যিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন। ইবনে বাহার (র.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ কাফেরকে কুফর দ্বারা মৃত্যু দান করেছেন আর মুমিনকে ঈমানের মাধ্যমে জীবন দান করেছেন।

কারো কারো মতে, এর অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা আমাদের বাপ দাদাদের মৃত বানিয়েছেন আর সন্তানদেরকে জীবন দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, মানুষের শুক্রধাতুকে মৃত বানিয়েছেন, আর তা হতে নবজাত শিশুকে জীবন দিয়েছেন।

কারো মতে, এখানে জীবন দ্বারা উর্বরতা বুঝানো হয়েছে। আর মৃত্যু দ্বারা অনুর্বরতা বুঝানো হয়েছে। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

عَادًا الْأُوْلٰى -এর মর্মার্থ এবং তাদের ধ্বংসের কারণ : عَادًا الْأُوْلٰى 'প্রথম আদ' বলতে বুঝায় প্রাচীনতম আদ জাতি, যাদের প্রতি হযরত হূদ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। হযরত হূদ (আ.)-কে অমান্য ও অগ্রাহ্য করার প্রতিফলরূপে এ জাতিটি যখন আজাবে নিমজ্জিত হলো, তখন কেবলমাত্র সে লোকেরাই রক্ষা পেয়েছিল যারা নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। তাদেরই পরবর্তী বংশধরদেরকে عَادٌ اُخْرٰى দ্বিতীয় আদ বলা হয়।

আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তারা কুরআনে কারীম ও ইতিহাসে প্রথম আদ (عَادٌ اُوْلٰى) ও দ্বিতীয় আদ (عَادٌ اُخْرٰى) নামে পরিচিত। হযরত হূদ (আ.) তাদের নিকট নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

আদ জাতির লোকেরা হযরত হূদ (আ.)-কে নবী হিসেবে মেনে নেয়নি এবং তাঁর অবাধ্য ছিল। এ কারণে তারা رِيْحٌ صَرْصَرٌ ঝঞ্ঝাবায়ুর আজাব দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির লোকদের পরে আদ সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম আজাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। -[মাযহারী]

ছামূদ সম্প্রদায়ও তাদের একটি শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যারা তাঁর অবাধ্য হয়েছিল, বজ্রনিনাদের ফলে তাদের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে পড়লে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। -[মা'আরিফুল কুরআন]

হযরত ইবনে ইসহাক (র.) বলেছেন, আদ সম্প্রদায় দু'টির প্রথম সম্প্রদায় হযরত হূদ (আ.)-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করার কারণে উত্তপ্ত ঝঞ্ঝা প্রবাহে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আদের দ্বিতীয় সম্প্রদায় বজ্রনিনাদে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা হযরত সালেহ (আ.)-এর দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম আদ হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের প্রপৌত্রের নাম ছিল এবং তার পরবর্তী বংশধর হলো দ্বিতীয় আদের সম্প্রদায়। -[হাশিয়াতুল জামাল]

বায়যাভী (র.) বলেছেন হযরত নূহ (আ.)-এর পর যে সম্প্রদায় সর্বপ্রথম আল্লাহর আজাবে ধ্বংস হয়েছিল এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। -[বায়যাভী]

কারো মতে হূদ (আ.)-এর জাতির লোকেরা প্রথম আদ, আর ইরাম সম্প্রদায়ের লোকেরা দ্বিতীয় আদ নামে পরিচিত।

প্রধান তাফসীরকারদের অধিকাংশের মতে, এখানে আদ সম্প্রদায় জাতির লোকদের পরিচয় উদ্দেশ্য নয়, তাদের একের পর এক ধ্বংসের বিবরণ দেওয়াই উদ্দেশ্য। -[হাশিয়াতুল জামাল]

قَوْلُهٗ وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى : غِنَاءٌ শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং اِغْنَاءٌ শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। اَقْنٰى শব্দটি قُنْيَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ- সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন; যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

قَوْلُهٗ وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى : شِعْرٰى একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোনো কোনো সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই: যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি।

قَوْلُهٗ وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَنِ الْاُوْلٰى وَثَمُوْدَ فَمَا اَبْقٰى : 'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দুর্ধর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হূদ (আ.)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আজাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কওমে নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আজাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। -[মাযহারী]

সামূদ সম্প্রদায়ও তাদের অপর শাখা। তাদের প্রতি হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়। যারা অবাধ্যতা করে, ফলে তাদের প্রতি বজ্রনিনাদের আজাব আসে। ফলে তাদের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

قَوْلُهٗ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى : مُؤْتَفِكَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ- সংলগ্ন। এখানে কয়েকটি জনপদ ও শহর একত্রে সংলগ্ন ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। অবাধ্যতা ও নির্লজ্জতার শাস্তিস্বরূপ হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের জনপদসমূহ উল্টে দেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٤. فَغَشّٰهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا غَشّٰى ج اَبْهَمَ تَهْوِيْلاً وَفِيْ هُوْدٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ .

৫৪. তখন এর পর প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। যা ব্যাপারটির বিভীষিকা প্রকাশার্থে তার বিবরণ প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে। আর সূরা হুদ-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে- فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ

٥٥. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ بِاَنْعُمِهِ الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ تَتَمَارٰى . تَشُكُّكُ اَيُّهَا الْاِنْسَانُ اَوْ تُكَذِّبُ .

৫৫. হে মানুষ! অতঃপর তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে তার একত্ব ও কুদরতের সাক্ষ্য বহনকারী অনুগ্রহরাজির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। অথবা অস্বীকার করবে।

٥٦. هٰذَا مُحَمَّدٌ ﷺ نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى . مِنْ جِنْسِهِمْ اَيْ رَسُوْلٌ كَالرُّسُلِ قَبْلَهُ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ كَمَا اُرْسِلُوْا اِلٰى اَقْوَامِهِمْ .

৫৬. ইনি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ পূর্ববর্তী ভয় প্রদর্শন-কারীদের মধ্যে একজন, তাঁদেরই জাতীয়। অর্থাৎ পূর্ববর্তী রাসূলগণের ন্যায় একজন রাসূল। তাঁকে তোমাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন- পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

٥٧. اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ج قَرُبَتِ الْقِيَامَةُ .

৫৭. কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। মহাপ্রলয়ের দিন নিকটবর্তী হয়েছে।

٥٨. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نَفْسٌ كَاشِفَةٌ ط اَيْ لَا يَكْشِفُهَا وَيُظْهِرُهَا اِلَّا هُوَ كَقَوْلِهِ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ .

৫৮. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউই তা ব্যক্তকারী নয়। অর্থাৎ তিনি ভিন্ন আর কেউ তা ব্যক্ত ও প্রকাশ করতে পারবে না। যেমন- لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউ তা নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ ঘটাবে না। এখানে এটাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

٥٩. اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَيِ الْقُرْاٰنِ تَعْجَبُوْنَ لا تَكْذِيْبًا .

৫৯. তোমরা কি এ বাণী সম্পর্কে তথা কুরআন সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করছ। অসত্যারোপের উদ্দেশ্যে।

٦٠. وَتَضْحَكُوْنَ اِسْتِهْزَاءً وَلَا تَبْكُوْنَ لا لِسِمَاعِ وَعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ .

৬০. এবং হাসি-ঠাট্টা করছ, বিদ্রূপার্থে, আর কাঁদছ না এর প্রতিশ্রুতি ও হুমকীব্যঞ্জক আয়াতসমূহ শ্রবণ করে।

٦١. وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ . لَاهُوْنَ غَافِلُوْنَ عَمَّا يُطْلَبُ مِنْكُمْ .

৬১. আর তোমরা চরম উদাসীন তোমাদের নিকট যা চাওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কে অসতর্ক ও উদাসীন।

٦٢. فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَاعْبُدُوْا . وَلَا تَسْجُدُوْا لِلْاَصْنَامِ وَلَا تَعْبُدُوْهَا .

৬২. তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর উপাসনা কর, প্রতিমাকে সিজদা করো না এবং তাদের উপাসনা করো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَفِىْ هُوْدٍ فَجَعَلْنَا : এভাবে বলাটা বিশুদ্ধ ছিল যে- وَفِىْ هُوْدٍ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا অথবা পুনরায় وَفِى الْحَجَرِ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا বলা।

قَوْلُهُ تَشُكُّ : تَتَمَارٰى-এর তাফসীর تَشُكُّ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, تَفَاعُلْ টা تَعَدُّدْ فِى الْفَاعِلِ হতে মুক্ত।

قَوْلُهُ نَفْس : মুফাসসির (র.) نَفْس উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, كَاشِفَةٌ শব্দটি উহ্য মওসূফের সিফত হয়েছে।

قَوْلُهُ سَامِدُوْنَ : اَلسَّمُوْدُ اللَّهْوُ (ن) وَقِيْلَ الْاِعْرَاضُ وَقِيْلَ الْاِسْتِكْبَارُ وَقِيْلَ هُوَ الْغِنَاءُ

قَوْلُهُ مَا غَشّٰى : مَا غَشّٰى উক্তিটি তার পূর্বের تَغَشّٰى ফে'লের مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْبُ الْمَحَلِّ বা فَاعِلْ হিসেবে مَرْفُوْعُ الْمَحَلِّ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ : وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ আয়াতের দু'টি মহল্লে ইরাব হতে পারে। যথা-

১. وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ হলো جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ যা দ্বারা নির্বোধ মানুষ সম্পর্কে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং এর কোনো মহল্লে ইরাব নেই। এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব।

২. এছাড়া وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ বাক্যটি حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ- اَلنَّفْىُ عَنْكُمُ الْبُكَاءُ فِىْ حَالِ كَوْنِكُمْ سَامِدِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের নির্বোধ হওয়া অবস্থায় তোমাদের থেকে ক্রন্দন চলে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَغَشَّاهَا مَا غَشّٰى : অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে নিল জনপদগুলোকে উল্টে দেওয়ার পর। তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। এ পর্যন্ত হযরত মূসা (আ.) ও ইবরাহীম (আ.)-এর কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণিত শিক্ষা সমাপ্ত হলো।

قَوْلُهُ فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى : শব্দের অর্থ বিবাদ ও বিরোধিতা করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে প্রত্যেক মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত এবং হযরত মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফায় বর্ণিত আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর শিক্ষার সত্যতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও আজাবের ঘটনাবলি শুনে বিরোধিতা বর্জন করার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা আল্লাহ তা'আলার একটা নিয়ামত। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার কোনো কোনো নিয়ামত সম্পর্কে বিবাদ ও বিরোধিতা করতে থাকবে!

قَوْلُهُ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى : هٰذَا শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা কুরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনিও অথবা এই কুরআনও পূর্ববর্তী পয়গাম্বর অথবা কিতাবসমূহের ন্যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারীরূপে প্রেরিত। ইনি সকল পথ এবং দীন ও দুনিয়ার সাফল্য সম্বলিত নির্দেশাবলি নিয়ে আগমন করেছেন এবং বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান।

قَوْلُهُ اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ : অর্থাৎ নিকটে আগমনকারী বস্তু নিকটে এসে গেছে। আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর গতিরোধ করতে পারবে না। এখানে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের বয়সের দিক দিয়ে কিয়ামত নিকটে এসে গেছে। কারণ উম্মতে মুহাম্মাদী বিশ্বের সর্বশেষ ও কিয়ামতের নিকটবর্তী উম্মত।

قَوْلُهُ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ : هٰذَا الْحَدِيْثِ বলে কুরআন বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, কুরআন স্বয়ং একটি মুজেযা। এটা তোমাদের সামনে এসে গেছে। এ জন্যও কি তোমরা আশ্চর্যবোধ করছ, উপহাসের ছলে হাস্য করছ এবং গুনাহ ও ক্রটির কারণে ক্রন্দন করছ না?

قَوْلُهُ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ : سُمُوْدٌ-এর আভিধানিক অর্থ গাফিলতি ও নিশ্চিন্ততা। এর অপর অর্থ হলো গান-বাজনা করা এ স্থলে এই অর্থও হতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا : অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ চিন্তাশীল মানুষকে শিক্ষা ও উপদেশের সবক দেয়। এসব আয়াতের দাবি এই যে, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে বিনয় ও নম্রতা সহকারে নত হও এবং সিজদা কর ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নাজমের এই আয়াত পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদা করলেন এবং তাঁর সাথে সব মসুলমান, মুশরিক, জিন ও মানব সিজদা করল। বুখারী ও মুসলিমের অপর এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সূরা নাজম পাঠ করে তেলাওয়াতে সিজদা আদায় করলে তাঁর সাথে উপস্থিত সকল মুমিন ও মুশরিক সিজদা করল, একজন কুরাইশী বৃদ্ধ ব্যতীত। সে একমুষ্ঠি মাটি তুলে নিয়ে কপালে স্পর্শ করে বলল, আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনার পর আমি বৃদ্ধকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, তখন যেসব মুশরিক মজলিসে উপস্থিত ছিল, আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তারাও সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য কুফরের কারণে তখন এই সিজদার কোনো ছওয়াব ছিল না। কিন্তু এই সিজদার প্রভাবে পরবর্তীকালে তাদের সবারই ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করার তাওফীক হয়ে যায়। যে বৃদ্ধ সিজদা থেকে বিরত ছিল, একমাত্র সে-ই কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে সূরা নাজম আদ্যোপান্ত পাঠ করেন; কিন্তু তিনি সিজদা করেননি। এই হাদীসদৃষ্টে এটা বলা জরুরি হয় না যে, সিজদা ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কেননা এতে সম্ভাবনা আছে যে, তখন তাঁর অজু ছিল না অথবা সিজদার পরিপন্থি অন্য কোনো ওজর বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিক সিজদা জরুরি হয় না, পরেও করা যায়।

মাসআলা : ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী (র.) ও অধিকাংশ আহলে ইলমের নিকট এ আয়াত পাঠে সিজদা করা আবশ্যক। ইমাম মালেক (র.) যদিও এ আয়াত পাঠান্তে সিজদা করতেন [যেমনটি কাজী ইবনুল আরাবী (র.) আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন] কিন্তু তাঁর মাসলাক এই ছিল যে, এখানে সিজদা করা আবশ্যক নয়। তাঁর মতের পক্ষে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর এ রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আমি রাসূল ﷺ -এর সম্মুখে সূরা নাজম পাঠ করেছি; কিন্তু তিনি সিজদা করেননি। –[বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

কিন্তু এই হাদীস সিজদা আবশ্যক হওয়াকে লাজেম করে না। কেননা এর দ্বারা সর্বোচ্চ এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ সেই সময় সিজদা করেননি। কিন্তু পরেও সিজদা করেননি এটা প্রমাণিত হয় না। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূল ﷺ পরবর্তীতে সিজদা করেছেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য রেওয়ায়েত সুস্পষ্ট রয়েছে যে, এ আয়াতে তিনি আবশ্যকরূপে সিজদা করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং মুত্তালিব ইবনে আবী ওবায়দা'আ (রা.)-এর مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ রেওয়ায়েত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ যখন প্রথমবার হরমে এই সূরা পাঠ করেছেন তখন তিনি সিজদা করেছেন। তার সাথে মুসলমান ও মুশরিক সকলেই সিজদা করেছে। –[বুখারী, আহমদ ও নাসায়ী]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ নামাজে সূরা নাজম পাঠ করে দীর্ঘ সময় সিজদায় থেকেছেন। –[বায়হাকী, ইবনে মরদবিয়া]

সুবরাতুল জুহানী (র.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) ফজরের নামাজে সূরা নাজম পাঠ করে সিজদা করেছেন এবং এরপর উঠে সূরা যিলযাল পড়ে রুকূতে গিয়েছেন। –[সাঈদ ইবনে মানসূর]

ফায়েদা : সর্বপ্রথম যে সূরায় সিজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় সেটা হলো সূরা নাজম। –[বুখারী]

মাসআলা : এ আয়াতের উপর সিজদা ওয়াজিব।

মাসআলা : যার উপর সিজদা করবে, তাতে নত হওয়া ব্যতীত উহাকে উচুতে উঠানো বৈধ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা কামার, মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ الْاٰيَةَ وَهِىَ خَمْسٌ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً

তবে سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ আয়াতখানা ব্যতীত, এতে ৫৫টি আয়াত রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قَرُبَتِ الْقِيَامَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . اِنْفَلَقَ فَلْقَتَيْنِ عَلٰى اَبِىْ قُبَيْسٍ وَقُعَيْقَعَانَ اٰيَةً لَهٗ ﷺ وَقَدْ سُئِلَهَا فَقَالَ اشْهَدُوْا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

অনুবাদ :

১. কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ দু'টুকরো হয়ে গেছে। এক টুকরা 'আবী কুবাইস' পাহাড়ে আরেক টুকরা 'কু'য়াইকিআন' পাহাড়ে। রাসূল ﷺ -এর মুজেযা স্বরূপ। যখন রাসূল ﷺ থেকে মুজেযা কামনা করা হয়েছিল তখন তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো। –[বুখারী ও মুসলিম]

২. وَاِنْ يَّرَوْا اَىْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ اٰيَةً مُعْجِزَةً لَهٗ ﷺ كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ . قَوِىٌّ مِنَ الْمِرَّةِ الْقُوَّةِ اَوْ دَائِمٌ .

২. তারা অর্থাৎ মক্কার কুরাইশরা কোনো নিদর্শন দেখলে রাসূল ﷺ -এর কোনো মুজেযা যেমন চন্দ্র বিদীর্ণ করা। মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটাতো চিরাচরিত জাদু। مِرَّةٌ অর্থ– اَلْقُوَّةُ বা دَائِمٌ

৩. وَكَذَّبُوا النَّبِىَّ ﷺ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاۤءَهُمْ فِى الْبَاطِلِ وَكُلُّ اَمْرٍ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مُسْتَقِرٌّ . بِاَهْلِهٖ فِى الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ .

৩. তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। নবী করীম ﷺ -কে এবং নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে বাতিল বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাপারই ভালো হোক বা মন্দ হোক লক্ষ্যে পৌঁছাবে তার হকদারসহ জান্নাতে বা জাহান্নামে।

৪. وَلَقَدْ جَاۤءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاۤءِ اَخْبَارُ هَلَاكِ الْاُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ رُسُلَهُمْ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ . لَهُمْ اِسْمُ مَصْدَرٍ اَوْ اِسْمُ مَكَانٍ وَالدَّالُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الْاِفْتِعَالِ وَازْجَرْتُهٗ وَزَجَرْتُهٗ نَهَيْتُهٗ بِغِلْظَةٍ وَمَا مَوْصُوْلَةٌ اَوْ مَوْصُوْفَةٌ .

৪. তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ তাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতির ধ্বংসের সংবাদ। যাতে আছে সাবধান বাণী তাদের জন্য। مُزْدَجَرٌ শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرٍ কিংবা اِسْمُ مَكَانٍ আর مُزْدَجَرٌ -এর دَالٌ -টি اِفْتِعَالٌ -এর تَاءٌ হতে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। আর اِزْدَجَرْتُهٗ এবং زَجَرْتُهٗ -এর অর্থ হলো– আমি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি। আর مَا টা مَوْصُوْفَةٌ অথবা مَوْصُوْلَةٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. حِكْمَةٌ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوْفٍ اَوْ بَدَلٌ مِنْ مَا اَوْ مِنْ مُزْدَجَرٌ بَالِغَةٌ تَامَّةٌ فَمَا تُغْنِ تَنْفَعُ فِيْهِمُ النُّذُرُ جَمْعُ نَذِيْرٍ بِمَعْنَى مُنْذِرٍ اَيِ الْاُمُوْرُ الْمُنْذِرَةُ لَهُمْ وَمَا لِلنَّفْيِ اَوْ لِلْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيْ وَهِيَ عَلَى الثَّانِيْ مَفْعُوْلٌ مُقَدَّمٌ.

৫. এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান এটা উহ্য মুবতাদার খবর কিংবা مَا বা مُزْدَجَرٌ হতে بَدَلٌ হয়েছে। তবে এই সতর্কবাণী তাদের কোনো উপকারে আসেনি। اَلنَّذِيْر نُذُرٌ শব্দটি -এর বহুবচন অর্থ- مُنْذِرٌ অর্থাৎ তাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী বিষয়সমূহ। আর مَا টা হয়তো نَفِيْ -এর জন্য অথবা اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِيْ -এর জন্য। দ্বিতীয় সুরতে এটি تُغْنِيْ -এর মাফউলে মুকাদ্দাম হবে।

٦. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ط هُوَ فَائِدَةُ مَا قَبْلَهُ وَبِهِ تَمَّ الْكَلَامُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ هُوَ اِسْرَافِيْلُ وَنَاصِبُ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ بَعْدُ اِلٰى شَيْءٍ نُكُرٍ بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُوْنِهَا اَيْ مُنْكَرٍ تُنْكِرُهُ النُّفُوْسُ لِشِدَّتِهِ وَهُوَ الْحِسَابُ.

৬. অতএব আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এটা পূর্ববর্তী বাক্যের ফায়েদা এবং এর দ্বারাই বাক্যটি পূর্ণ হয়ে গেছে। যেদিন আহবানকারী আহবান করবেন তিনি হলেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। আর يَوْم -এর نَاصِبْ হলো পরবর্তী يَخْرُجُوْنَ ফে'লটি এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে। نُكُرٌ শব্দটির كَافْ বর্ণের পেশ ও সাকিন উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ অপছন্দনীয় বস্তু। যাকে তার কঠোরতার কারণে নফস অপছন্দ করবে। আর সেটা হলো হিসাবের দিন।

٧. خُشِعًا ذَلِيْلًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ خُشَّعًا بِضَمِّ الْخَاءِ وَفَتْحِ الشِّيْنِ مُشَدَّدَةً اَبْصَارُهُمْ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَخْرُجُوْنَ اَيِ النَّاسُ مِنَ الْاَجْدَاثِ الْقُبُوْرِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. لَا يَدْرُوْنَ اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْحَيْرَةِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَخْرُجُوْنَ.

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে خَاشِعًا অর্থ- লাঞ্ছিত, অপদস্ত। অন্য কেরাতে রয়েছে خُشَّعًا তথা خَاءْ বর্ণে পেশ شِيْن বর্ণে তাশদীদসহ যবর। আর خُشَّعًا টা يَخْرُجُوْنَ -এর ضَمِيْر فَاعِلْ থেকে حَالٌ হয়েছে, সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে অর্থাৎ মানুষেরা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়। ভয় এবং পেরেশানীর কারণে সেদিন তারা বুঝাতে পারবে না যে, কোথায় চলছে? আর এই বাক্যটি يَخْرُجُوْنَ -এর فَاعِلْ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

٨. كَذَا قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ اَيْ مُسْرِعِيْنَ مَادِّيْ اَعْنَاقِهِمْ اِلَى الدَّاعِ ط يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ مِنْهُمْ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. اَيْ صَعْبٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ كَمَا فِي الْمُدَّثِّرِ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

৮. এমনিভাবে আল্লাহর বাণী- مُهْطِعِيْنَ তারা ভীত-বিহবল হয়ে আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে অর্থাৎ দ্রুত ঘাড় উঠিয়ে আসবে। কাফেররা বলবে তাদের মধ্য থেকে কঠিন এই দিন অর্থাৎ খুবই কঠিন হবে কাফেরদের উপর যেমন সূরা মুদ্দাচ্ছির -এর মধ্যে রয়েছে- يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَبْلَ قُرَيْشٍ قَوْمُ نُوحٍ تَانِيْثُ الْفِعْلِ لِمَعْنَى قَوْمٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا نُوحًا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ اَىْ اِنْتَهَرُوْهُ بِالسَّبِّ وَغَيْرِهِ.

৯. এদের পূর্বে কুরাইশদের পূর্বে অস্বীকার করেছিল নূহের সম্প্রদায়ও ফে'লকে স্ত্রীলিঙ্গ আনা হয়েছে قَوْم -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। তারা অস্বীকার করেছিল আমার বান্দাকে হযরত নূহ (আ.)-কে আর বলেছিল, এতো এক পাগল, আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁরা তাকে বকাবাজি ইত্যাদির মাধ্যমে শাসিয়েছিল।

١٠. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّىْ بِالْفَتْحِ اَىْ بِاَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ.

১০. তখন তিনি তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিলেন اَنِّىْ শব্দটির হামযা যবর বিশিষ্ট অর্থাৎ بِاَنِّىْ আমি তো অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।

١١. فَفَتَحْنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ مُنْصَبٍّ اِنْصِبَابًا شَدِيْدًا.

১১. ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম فَفَتَحْنَا শব্দটির تَاء বর্ণে تَخْفِيْف ও تَشْدِيْد উভয়রূপেই পঠিত রয়েছে। আকাশের দ্বারা প্রবল বারি বর্ষণে।

١٢. وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا تَنْبَعُ فَالْتَقَى الْمَاءُ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ عَلٰى اَمْرٍ حَالٍ قَدْ قُدِرَ ج بِهِ فِى الْاَزَلِ وَهُوَ هَلَاكُهُمْ غَرَقًا.

১২. এবং মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ তখন পৃথিবীতে নালা/ঝরনা উপচে পড়ল। অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো আকাশ ও পাতালের পানি এক পরিকল্পনা অনুসারে আয়লে আর সে অবস্থা হলো তাদের ডুবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

١٣. وَحَمَلْنٰهُ اَىْ نُوْحًا عَلٰى سَفِيْنَةٍ ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ. وَهِىَ مَا تُشَدُّ بِهِ الْاَلْوَاحُ مِنَ الْمَسَامِيْرِ وَغَيْرِهَا وَاحِدُهَا دِسَارٌ كَكِتَابٍ.

১৩. তখন আরোহণ করালাম হযরত নূহ (আ.)-কে কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে। دُسُرٌ এমন বস্তুকে বলা হয় যার মাধ্যমে কাঠগুলোকে মিলানো হয়। যেমন– কীলক, পেরেক, তারকাটা। এর একবচন হলো دِسَارٌ যেমন كِتَابٌ -এর বহুবচন হয় كُتُبٌ

١٤. تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ج بِمَرْاٰى مِنَّا اَىْ مَحْفُوْظَةً بِحِفْظِنَا جَزَآءً مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ اُغْرِقُوْا اِنْتِصَارًا لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَهِىَ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُرِئَ كَفَرَ بِنَاءً لِلْفَاعِلِ اَىْ اُغْرِقُوْا عِقَابًا لَهُمْ.

১৪. যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; আমার দৃষ্টির সম্মুখে অর্থাৎ আমার হেফাজতে। এটা পুরস্কার جَزَاءً শব্দটি উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ اُغْرِقُوْا اِنْتِصَارًا তার জন্য যিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন আর তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.)। كُفِرَ শব্দটি كَفَرَ তথা مَعْرُوْف রূপেও পঠিত আছে فَاعِل হওয়ার ভিত্তিতে। অর্থাৎ তাদের নাফমানির কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٥. وَلَقَدْ تَرَكْنٰهَا اَىْ اَبْقَيْنَا هٰذِهِ الْفِعْلَةَ اٰيَةً لِمَنْ يَّعْتَبِرُ بِهَا اَىْ شَاعَ خَبَرُهَا وَاسْتَمَرَّ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ . مُعْتَبِرٍ مُتَّعِظٍ بِهَا وَاَصْلُهُ مُذْتَكِرٍ اُبْدِلَتِ التَّاءُ دَالًا مُهْمَلَةً وَكَذَا الْمُعْجَمَةُ وَاُدْغِمَتْ فِيْهَا .

১৫. আমি একে রেখে দিয়েছি অর্থাৎ এ কর্মকে অবশিষ্ট রেখেছি এক নিদর্শন রূপে ঐ ব্যক্তির জন্য যে ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়। অর্থাৎ সেই ঘটনা প্রচার হয়ে গেছে এবং অবশিষ্ট রয়েছে গেছে। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী। مُدَّكِرٌ আসলে ছিল مُذْتَكِرٌ এখানে تَاءْ -কে دَالْ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে এরপর ذَالْ -কে دَالْ -এ রূপান্তরিত করে دَالْ কে دَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করে দিয়েছেন।

١٦. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ اَىْ اِنْذَارِىْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ وَكَيْفَ خَبَرُ كَانَ وَهِىَ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ وَالْمَعْنٰى حَمْلُ الْمُخَاطَبِيْنَ عَلَى الْاِقْرَارِ بِوُقُوْعِ عَذَابِهٖ تَعَالٰى بِالْمُكَذِّبِيْنَ بِنُوْحٍ مَوْقِعَهُ .

১৬. কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী نُذُرٌ অর্থ হলো اِنْذَارِىْ এটা اِسْتِفْهَامْ تَقْرِيْرِىْ আর كَيْفَ হলো كَانَ -এর খবর। আর كَيْفَ অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর আয়াতের অর্থ হলো সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে হযরত নূহ (আ.)-এর মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীদের উপর শাস্তি পতিত হওয়ার স্বীকারোক্তির উপর অবহিত করতেছে যে, শাস্তি যথাস্থানে পতিত হয়েছে।

١٧. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ اَوْ هَيَّاْنَاهُ لِلتَّذَكُّرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ . مُتَّعِظٍ بِهٖ وَحَافِظٍ لَهُ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ اِحْفَظُوْهُ وَاتَّعِظُوْا وَ لَيْسَ يُحْفَظُ مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ غَيْرُهُ .

১৭. কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি। উপদেশ গ্রহণের জন্য; আমি একে সহজ করে দিয়েছি মুখস্থ করে সংরক্ষণ করার জন্য অথবা আমি একে প্রস্তুত করেছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণকারী এবং একে হিফজকারী উদ্দেশ্য। এখানে اِسْتِفْهَامْ টা اَمْرٌ -এর অর্থে। অর্থাৎ একে হিফজ করো এবং এর থেকে উপদেশ অর্জন কর। আর কুরআন ব্যতীত আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্য হতে অন্য কোনো কিতাব মৌখিকভাবে মুখস্থ করা হয় না।

١٨. كَذَّبَتْ عَادٌ نَبِيَّهُمْ هُوْدًا فَعُذِّبُوْا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ . اَىْ اِنْذَارِىْ لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ اَىْ وَقَعَ مَوْقِعَهُ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهٖ .

১৮. আদ সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের নবী হযরত হূদ (আ.)-কে। ফলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। ফলে কিরূপ ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। অর্থাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমার তাদেরকে ভয় দেখানো কিরূপ ছিল? অর্থাৎ জায়গা মতোই পতিত হয়েছে। আর তাকে স্বীয় উক্তি- اِنَّا اَرْسَلْنَا দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

١٩. اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا اَىْ شَدِيْدَةَ الصَّوْتِ فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ شُؤْمٍ مُّسْتَمِرٍّ لا دَائِمِ الشُّؤْمِ اَوْ قَوِيَّهُ وَكَانَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ اٰخِرَ الشَّهْرِ .

১৯. তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অর্থাৎ ভীষণ গর্জনকারী নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে ধারাবাহিক অকল্যাণ বা শক্তিশালী অকল্যাণ। আর তা ছিল মাসের শেষ বুধবার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২০. تَنْزِعُ النَّاسَ تَقْلَعُهُمْ مِنْ حُفَرِ الْاَرْضِ الْمُنْدَسِّيْنَ فِيْهَا وَتَصْرَعُهُمْ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ فَتَدُقُّ رِقَابَهُمْ فَتَبِيْنُ الرَّأْسُ عَنِ الْجَسَدِ كَاَنَّهُمْ وَحَالُهُمْ مَا ذُكِرَ اَعْجَازُ اُصُوْلُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ . مُنْقَلِعٍ سَاقِطٍ عَلَى الْاَرْضِ وَشُبِّهُوْا بِالنَّخْلِ لِطُوْلِهِمْ وَذُكِّرَ هُنَا وَاُنِّثَ فِى الْحَاقَّةِ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ مُرَاعَاةً لِلْفَوَاصِلِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ .

২০. মানুষকে তা উৎখাত করেছিল তাদের মাথার কুঞ্চন ভূপাতিত করা হচ্ছিল, তাদের ঘাড় কেটে দেওয়া হচ্ছিল। যার কারণে তাদের মস্তক শরীর হতে পৃথক হয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ তাদের উল্লিখিত অবস্থা এরূপ ছিল যে, যেন তারা উন্মূলিত খর্জুরকাণ্ডের ন্যায়। তাদের দেহ দৈর্ঘ্যাকৃতির হওয়ার কারণে তাদেরকে খেজুর গাছের দেহের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এখানে نَخْلٍ -কে পুংলিঙ্গ আর সূরা হাক্কাহ -এর মধ্যে উভয় স্থানে فَوَاصِلْ -এর কারণে نَخْلٌ خَاوِيَةٌ স্ত্রীলিঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

২১. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ .

২১. কি কঠোর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

২২. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

২২. কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَرُبَتِ الْقِيَامَةُ : এখানে اِقْتَرَبَ -এর তাফসীর قَرُبَ দিয়ে করে ইঙ্গিত করেছেন যে, مَزِيْد টা مُجَرَّدْ -এর অর্থে হয়েছে। যেমন اِقْتَدَرْ শব্দটি قَدَر -এর অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন : مُجَرَّدْ -কে مَزِيْد দ্বারা কেন ব্যক্ত করলেন?

উত্তর : قَرُبَ -এর অর্থের মধ্যে مُبَالَغَةٌ প্রকাশ করার জন্য, কেননা অতিরিক্ত বর্ণ অতিরিক্তি অর্থকে বুঝায়।

قَوْلُهُ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ : তৃতীয় এবং চৌদ্দ তারিখের রাতের মাঝের চাঁদকে قَمَرٌ বলা হয়। এর পূর্বের চাঁদকে هِلَالٌ এবং চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে بَدْرٌ বলা হয়।

قَمَرٌ হলো আমাদের نِظَامِ شَمْسِىْ -এর নিকটতম গ্রহ। পূর্ববর্তী তাহকীক [তত্ত্বানুসন্ধান] অনুসারে পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব হলো দু'লাখ চল্লিশ হাজার মাইল। কিন্তু নতুন তাহকীক অনুযায়ী পৃথিবী হতে চাঁদের দূরত্ব হলো দুই লাখ ছাব্বিশ হাজার নয়শত সত্তর দশমিক নয় মাইল। এর পূর্বে এত বিশুদ্ধ পরিমাপ আর কখনো করা হয়নি।

قَوْلُهُ قَوِىٌّ اَوْ دَائِمٌ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُسْتَمِرٌّ -এর অর্থ বর্ণনা করা। মুফাসসির (র.) مُسْتَمِرٌّ -এর দুটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হলো শক্তিশালী অর্থে। এ সুরতে مُسْتَمِرٌّ টা مِرَّةٌ হতে নির্গত হবে। কেননা مِرَّةٌ -এর অর্থ হলো শক্তি। যখন বিষয়টি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়, তখন বলা হয় اِسْتَمَرَّ الشَّيْئُ অর্থাৎ বিষয়টি শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হলো। আয়াতের অর্থ হলো– এটা খুবই শক্তিশালী জাদু।

দ্বিতীয় হলো مُسْتَمِرٌّ অর্থ– সর্বদা। তখন এটা اِسْتِمْرَارٌ হতে নির্গত হবে। যার অর্থ হলো সর্বদা বা পূর্ব থেকেই চলে আসছে, অর্থ হলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ রাতদিন তথা প্রতিনিয়ত জাদুকরের ধারা চালিয়ে রেখেছেন। উল্লিখিত দুটি অর্থ ছাড়াও مُسْتَمِرٌّ -এর আরো দুটি অর্থ রয়েছে যেগুলোকে মুফাসসির (র.) পছন্দ করেছেন। সেগুলো হলো–

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. অতিক্রমকারী, অতিবাহিত, অতিক্রান্ত, ধ্বংসশীল। অস্তিত্বহীন। এ সূরতে এটা مَارٌّ যা ذَاهِبٌ অর্থে তা হতে নির্গত তখন আয়াতের অর্থ হবে– যেভাবে অন্যান্য জাদু চলে গেছে এভাবে সেও চলে যাবে। তার প্রভাবও বেশিদিন স্থায়ী হবে না।

২. বিস্বাদ, অমনোপুত, তিক্ত। এ সুরতে مُسْتَمِرٌّ -টি مُرٌّ হতে নির্গত হবে যার অর্থ– তিক্ত, বিস্বাদ। তখন আয়াতের অর্থ হবে– যেভাবে তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না, অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর কথাও মুজেযা আমাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না।

প্রশ্ন : كَذَّبُوْا -এর আতফ يُعْرِضُوْا -এর উপর হয়েছে مَعْطُوْف عَلَيْهِ হলো مُضَارِع আর মা'তূফ হলো مَاضِى এতে কি রহস্য রয়েছে?

উত্তর : এতে রহস্য হচ্ছে এই যে, مَاضِى -এর সীগাহ এনে ইঙ্গিত করেছেন যে, মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করাটা তাদের পুরাতন অভ্যাস, নতুন কোনো অভ্যাস নয়।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ : এর মধ্যে مِنْ -টি হলো تَبْعِيْضِيَّةٌ উদ্দেশ্য হলো উম্মতের সেই সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ مُزْدَجَرٌ : এর মধ্যে مِيْمٌ -টি হলো مَصْدَرٌ مِيْمِىٌّ যা اِزْدِجَارٌ অর্থে। আবার اِسْمُ مَكَانٍ -ও হতে পারে। অর্থাৎ তাদের কাছে এমন খবর এসেছে যা اِزْدِجَارٌ -এর স্থানে। مِنَ الْاَنْبَاءِ এটা حَالٌ হওয়ার কারণে نَصَبٌ -এর স্থানে হয়েছে এবং مَا হলো ذُو الْحَال আর مَا টা مَوْصُوْلَةٌ এবং مَوْصُوْفَةٌ উভয়ই হতে পারে। আর উভয় সুরতেই مَا টা جَاءَ ফে'লের فَاعِلٌ হয়েছে আর فِىْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ এবং বাক্যটি مَا -এর صِلَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَا تُغْنِى النُّذُرُ : এখানে مَا টা اِسْتِفْهَامِيَّةٌ এবং نَافِيَةٌ উভয়টি হতে পারে। اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হওয়ার সুরতে تُغْنِىْ -এর মাফউলে মুকাদ্দাম হবে– اَىَّ شَيْءٍ تُغْنِى النُّذُرُ

قَوْلُهُ خَبَرُ مُبْتَدَأ مَحْذُوْف : অর্থাৎ– هُوَ حِكْمَةٌ

قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ : এটা اِهْطَاعٌ মাসদার হতে اِسْمُ فَاعِلٌ -এর সীগাহ এবং يَخْرُجُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থ হলো– ঘাড় উঁচু করে দ্রুত চলা।

قَوْلُهُ يَقُوْلُ الْكَافِرُ : এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ; এই সুরতে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব হবে। কিয়ামতের দিনের কঠোরতা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনা থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, ঐ সময় কাফেরদের কি হবে?

উত্তর দিয়েছেন যে, তারা বলবে, এই দিন বড় কঠিন হবে। আবার কেউ কেউ يَخْرُجُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সেই সুরতে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, جُمْلَةٌ যখন حَالٌ হয় তখন তাতে একটি رَابِطٌ থাকা জরুরি অথচ এখানে তো কোনো رَابِطٌ নেই।

উত্তর : মুফাসসির (র.) مِنْهُمْ উহ্য মেনে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَانِيْثُ الْفِعْلِ لِمَعْنَى قَوْمٍ : এ ইবারত দ্বারা নিম্নোক্ত উহ্য প্রশ্নের জবাব দান উদ্দেশ্য–

প্রশ্ন : প্রশ্ন হলো এই যে, قَوْمٌ যা পুংলিঙ্গ كَذَّبَتْ -এর ফায়েল। তাই দেখা যাচ্ছে যে, فِعْلٌ এবং فَاعِلٌ -এর মধ্যে সমতা নেই। কেননা ফে'ল হলো مُؤَنَّثٌ আর فَاعِلٌ হলো مُذَكَّرٌ

উত্তর : قَوْمٌ শব্দটি অর্থের হিসেবে مُؤَنَّثٌ অর্থাৎ اُمَّةٌ অর্থে এটা অধিক সংখ্যককে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে مُؤَنَّثٌ مَعْنَوِىْ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا : عُيُوْنًا শব্দটি تَمْيِيْز হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে যা মাফউল হতে পরিবর্তিত। উহ্য ইবারত হলো এরূপ যে– فَجَّرْنَا عُيُوْنَ الْاَرْضِ ; আবার কেউ কেউ فَاعِلٌ থেকে পরিবর্তিত বলেছেন। উহ্য ইবাতর হলো এরূপ যে– اِنْفَجَرَتْ عُيُوْنُ الْاَرْضِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কামার প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : সূরা কামার মক্কায় অবতীর্ণ, এতে ৫৫ আয়াত, ৩৪২ বাক্য এবং ১, ৪০৩টি অক্ষর রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ সূরার ফজিলত : আল্লামা সুয়ূতী (র.) এ মর্মে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা কামার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় সে হাজির হবে যে, তার চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। -[তাফসীরে দুররুল মানসুর খ. ৬ পৃ. ১৪৭]

বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফেতর নামাজে সূরা ক্বাফ এবং সূরা কামার পাঠ করতেন।

এ সূরার আমল : সূরা কামারকে জুমার দিন নামাজের পূর্বে লিপিবদ্ধ করে পাগড়ির ভেতর রাখা হলে ঐ ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি পায়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে থাকবে, সে জাদুসহ সকল বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

মূল বক্তব্য : এ সূরার প্রারম্ভেই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি বিশেষ মুজেযার উল্লেখ রয়েছে, যা হুজুর ﷺ -এর নবুয়তের দলিল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এ সূরায় কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ সূরায় তাওহীদ এবং রিসালতের দলিল প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, ঈমান ও নেক আমলের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি নাফরমানির শাস্তি সম্পর্কেও সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এমনভাবে এ সূরায় মানুষের পুনর্জীবনের কথাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে কুরআন কারীমকে সহজ করা হয়েছে। পূর্বকালে যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করেছে, তাদের কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে? তা-ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন- আদ জাতি, সামুদ জাতি, হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউনের দলবল প্রভৃতিকে তাদের নাফরমানির শাস্তি স্বরূপ যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তার উল্লেখ এ সূরায় রয়েছে।

শানে নুযূল : মক্কার কাফেররা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বলল, যদি আপনি সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের নবী হন, তবে তার প্রমাণ উপস্থাপন করুন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি প্রমাণ দেখতে চাও? তখন কাফেররা বলল, যদি আপনি এ চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। কাফেরদের শর্তারোপের কারণে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন এবং তাঁর দোয়া কবুল হলো।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা : আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। মক্কার কাফেররা স্বচক্ষে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। চন্দ্রের অর্ধেক সাফা নামক পাহাড়ের উপর চলে গেল। বাকি অর্ধেক চলে গেল কু'আইকিয়ান নামক পাহাড়ের দিকে। তখন প্রিয়নবী ﷺ মক্কাবাসীকে সম্বোধন করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দেখে নাও। এই বিরাট এবং বিশেষ মর্যাদার উল্লেখ রয়েছে এ সূরার প্রারম্ভে, আর এটিই প্রিয়নবী ﷺ নবুয়তের অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়তের দলিল প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সূরার পরিসমাপ্তি পথভ্রষ্ট লোকদের বঞ্চিত এবং ধ্বংস হওয়ার কথা ঘোষণার পাশাপাশি ঈমানদার, মুত্তাকী পরহেজগারদের শুভ-পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মক্কার অধিবাসীরা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ মর্মে আর্জি পেশ করল যে, আপনার কোনো মুজেযা প্রদর্শন করুন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে দিলেন। হেরা পর্বতের এক দিকে একখণ্ড, আর অন্য দিকে আরেক খণ্ড। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মক্কাতে দেখেছি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরতের পূর্বে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত রয়েছে। এদৃশ্য দেখে কাফেররা বলল চন্দ্রের উপর জাদু করা হয়েছে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়- اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

আল্লামা বগভী (র.) বুখারী শরীফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। একখণ্ড পাহাড়ের উপর, আর একখণ্ড পাহাড়ের নিচে চলে যায়।

কিন্তু এমন প্রকাশ্য মুজেযা দেখেও মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনেনি। ঈমান আনা তো দূরের কথা; বরং তারা একথাও বলেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জাদু করেছেন। অথবা চাঁদকে জাদু করেছেন। অথচ এ চন্দ্র বিদারণের ঘটনাটি কিয়ামতের সম্ভাবনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এমন একদিন আসবে, যেদিন এই বিশ্ব বিদীর্ণ হয়ে যাবে, চন্দ্র বিদারণের এই ঘটনা দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরা নাজম اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার একটি দলিল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মোজেযা আলোচিত হয়েছে। কেননা কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেন, আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির

ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরো কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুজেযা হিসেবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মুজেযাটি আরো এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহর কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজেযা : মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তাঁর রিসালতের স্বপক্ষে কোনো নিদর্শন চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসেবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজেযা প্রকাশ করেন। এই মুজেযার প্রমাণ কুরআন পাকের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও জুবায়ের ইবনে মুতঈম, ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ কথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মুজেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (র.) ও ইবনে কাসীর (র.) এই মুজেযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মুজেযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক খণ্ড পূর্বাদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরায় হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত সবাইকে বললেন, দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মুজেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্র হয়ে গেল। কোনো চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মুজেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল মুহাম্মদ ﷺ সারা বিশ্বের মানুষকে জাদু করতে পারবেন না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরক তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মুজেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। –[বয়ানুল কুরআন]

এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত তাফসীরে ইবনে কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন–

إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّيْنِ حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا .

অর্থাৎ মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নবুয়তের কোনো নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে ফেল। –[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন–

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِقَّيْنِ حَتّٰى نَظَرُوْا اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْهَدُوْا .

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে জারীর (রা.)-ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে–

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِنٰى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَاَخَذَتْ فِرْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْهَدُوْا اِشْهَدُوْا .

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং এক খণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাক্ষ্য দাও! সাক্ষ্য দাও!

আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ حَتّٰى صَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ اَهْلُ مَكَّةَ هٰذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ ابْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ انْظُرُوْا السُّفَّارَ فَاِنْ كَانُوْا رَاَوْا مَا رَاَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ . وَاِنْ كَانُوْا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ فَسُئِلَ السُّفَّارُ قَالَ وَقَدِمُوْا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَقَالُوْا رَأَيْنَا .

অর্থাৎ মক্কায় [অবস্থানকালে] চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কুরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে জাদু করেছেন। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবি সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বিদেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থা দেখেছে বলে স্বীকার করে। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব : গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জবাব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবি মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোনো যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলা বাহুল্য, মুজেযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাসবিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মুজেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোনো কোনো দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোনো কোনো দেশে শেষ রাত্রি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকবে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোনো প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোনো দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোনো খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে-ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মালাবাবের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

قَوْلُهُ وَإِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ : مُسْتَمِرٌّ শব্দের প্রচলিত অর্থ– দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবি ভাষায় কোনো সময়ে مَرَّ ও اِسْتَمَرَّ চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তাফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদা (র.) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এইযে, এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مُسْتَمِرٌّ শব্দের এক অর্থ হচ্ছে– শক্ত ও কঠোর। আবুল আলীয়া ও যাহ্হাক (রা.) এই তাফসীরই করেছেন। অর্থাৎ এটা বড় শক্ত জাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও শক্ত জাদু বলে নিজেরদেরকে প্রবোধ দিল।

قَوْلُهُ وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ : اِسْتِقْرَارٌ-এর শাব্দিক অর্থ– স্থির হওয়া। অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে, জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مُهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ : اَلْاِهْطَاعُ-এর শাব্দিক অর্থ– মাথা তোলা। আয়াতের অর্থ এই যে, আহবানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যের মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোনো কোনো স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

قَوْلُهُ مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ : وَازْدُجِرَ-এর শাব্দিক অর্থ– হুমকি প্রদর্শন করা। উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রিসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আ.)-কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল, যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমাইদ (র.) মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথেঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন। এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন! তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জবাব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

قَوْلُهُ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ : অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

قَوْلُهُ ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ : اَلْوَاحٌ শব্দটি لَوْحٌ-এর বহুবচন। অর্থ– কাঠের তক্তা। دُسُرٌ শব্দটি دِسَارٌ-এর বহুবচন। অর্থ– পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। এখানে উদ্দেশ্য হলো নৌকা।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ : ذِكْر-এর অর্থ দ্বিবিধ ১. মুখস্থ করা। ২. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোনো ঐশীগ্রন্থ এরূপ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জীল ও যাবূর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজীকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক বালিকারাও সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের যবরের পার্থক্য হয় না। চৌদ্দশ বছর ধরে প্রতি স্তরে, প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেজের বুকে আল্লাহর কিতাব কুরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ ছাড়া কুরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলি চয়ন করার জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়নি : আলোচ্য আয়াতে يَسَّرْنَا-এর সাথে لِلذِّكْرِ সংযুক্ত করে আরো বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা পর্যন্ত কুরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহিল, ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরি হয় না যে, কুরআন পাক থেকে বিধানাবলি চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলা বাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোনো কোনো মুসলমান উপরিউক্ত আয়াতকে সম্বল করে কুরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলি চয়ন করতে চায়। উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুঠে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ : **আদ জাতির ঘটনা :** অর্থাৎ আদ জাতির নিকট হযরত হুদ (আ.)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা তাঁর হেদায়েত মেনে নেয়নি। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন; কিন্তু তারা তাতেও সতর্ক হলো না। এরপর কেমন হয়েছিল তাদের প্রতি আমার আজাব?

আদ জাতির ধ্বংসের এ ঘটনা নিঃসন্দেহে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়। পরবর্তী আয়াতে আদ জাতির প্রতি আপতিত আজাবের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ : বর্ণিত আছে যে, দুর্ধর্ষ আদ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে যে, ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করা হয়, তা অব্যাহত থাকে সাত রাত আট দিন পর্যন্ত; ক্ষণিকের জন্যেও এতে কোনো বিরাম দেওয়া হয়নি। অবাধ্য আদ জাতির জীবনে এ দিনগুলো ছিল অত্যন্ত অশুভ। কেননা এ অবাধ্য জাতির সমুচিত শাস্তিস্বরূপ এ ভয়াবহ ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে।

مُسْتَمِرٍّ শব্দটির অর্থ হলো, ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু ততদিন অব্যাহত ছিল, যতদিন আদ জাতির একটি মানুষও জীবিত ছিল। অথবা এর অর্থ হলো, সে আজাবের দিনগুলো এত অশুভ ছিল যে, আবাল বৃদ্ধ বণিতা কাউকে রেহাই দেয়নি; এ বায়ু সকলকে ধ্বংস করেছে।

অথবা এর অর্থ হলো, চরম দুঃখজনক এবং চরম কষ্টদায়ক শাস্তি। আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আদ জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে যেদিন ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হয়, সেদিন ছিল বুধবার এবং মাসের শেষ তারিখ।

قَوْلُهُ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ : অর্থাৎ যেভাবে প্রবল বায়ু খেজুর বৃক্ষকে শেকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে, সেভাবে গজবী ঝঞ্ঝা বায়ু অবাধ্য আদ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের গৃহ থেকে বের করে আছড়ে ফেলে, তাদের ঘাড় ভেঙ্গে যায়। আল্লামা বায়যাভী (র.) লিখেছেন, সে সংকটময় মুহূর্তে কোনো কোনো লোক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল; কিন্তু গজবী ঝঞ্ঝা বায়ু তাদেরকে সেখান থেকে বের করে ধ্বংস্তূপে পরিণত করে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আপতিত গজবী বায়ু আদ জাতির লোকদেরকে তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারা ছিল শক্তিশালী দেহের অধিকারী। কিন্তু ধ্বংসের পর মনে হলো উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে ধরাশায়ী হয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ : তাফসীরকারগণ লিখেছেন, আজাবের ভয়াবহতা প্রকাশ করার লক্ষ্যেই এ কথাটি বার বার বলা হয়েছে, যেভাবে তারা দুনিয়াতে তাদের অন্যায় অনাচার ও অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করেছে, ঠিক তেমনিভাবে আখিরাতেও তারা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٣. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ جَمْعُ نَذِيْرٍ بِمَعْنٰى
مُنْذِرٍ اَيْ بِالْاُمُوْرِ الَّتِيْ اَنْذَرَهُمْ بِهَا
نَبِيُّهُمْ صَالِحٌ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ وَيَتَّبِعُوْهُ.

২৩. ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করেছিল نُذُرٌ শব্দটি نَذِيْرٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুর যার মাধ্যমে তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন, যদিও তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তার অনুসরণ করেনি।

٢٤. فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مَنْصُوْبٌ عَلَى الْاِشْتِغَالِ
مِنَّا وَاحِدًا صِفَتَانِ لِبَشَرًا نَتَّبِعُهٗٓ مُفَسِّرٌ
لِلْفِعْلِ النَّاصِبِ لَهٗ وَالْاِسْتِفْهَامُ بِمَعْنٰى
النَّفْيِ الْمَعْنٰى كَيْفَ نَتَّبِعُهٗ وَنَحْنُ
جَمَاعَةٌ كَثِيْرَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَّا وَلَيْسَ
بِمَلَكٍ اَيْ لَا نَتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا اَيْ اِنِ اتَّبَعْنَاهُ
لَفِيْ ضَلٰلٍ ذَهَابٍ عَنِ الصَّوَابِ وَّسُعُرٍ جُنُوْنٍ.

২৪. তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরন করব اَبَشَرًا শব্দটি اُضْمِرَ مَا -এর কায়দার ভিত্তিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। আর مِنَّا এবং وَاحِدًا উভয়টি بَشَرًا -এর সিফত হয়েছে। আর نَتَّبِعُهٗ এটা بَشَرًا -এর فِعْل نَاصِبٌ -এর مُفَسِّرٌ আর اِسْتِفْهَامٌ টা نَفِيْ -এর অর্থে। অর্থ হলো আমরা তাঁর অনুসরণ কেন করব? আমরা তো এক বিশাল জামাত। আর সে তো আমাদেরই একজন এবং ফেরেশতাও নয়। অর্থাৎ আমরা তাঁর অনুসরণ করব না। যদি আমরা তাঁর অনুসরণ করি তবে তো আমরা ভ্রষ্টতায় ও উম্মত্ততায় পতিত হবো। অর্থাৎ সঠিক রাস্তা হতে ছিটকে পড়ব।

٢٥. اَءُلْقِيَ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ
الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ
وَتَرْكِهِ الذِّكْرُ الْوَحْيُ عَلَيْهِ مِنْ ۢ بَيْنِنَا اَيْ
لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ بَلْ هُوَ كَذَّابٌ فِيْ قَوْلِهٖ اِنَّهٗ
اُوْحِيَ اِلَيْهِ مَا ذَكَرَهٗ اَشِرٌ مُتَكَبِّرٌ بَطِرٌ.

২৫. আমাদের মধ্যে কি তাঁরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? অর্থাৎ তার দিকে ওহী প্রেরণ করা হয়নি। اَءُلْقِيَ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে এবং দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে এবং উভয় সুরতে উভয়ের মধ্যে اَلِفْ বৃদ্ধি করে এবং اَلِفْ বৃদ্ধি না করে পড়া বৈধ রয়েছে। সে তো একজন মিথ্যাবাদী তাঁর এ উক্তির/ দাবির ক্ষেত্রে যে, যা কিছু তিনি বর্ণনা করেছেন তা তাঁর উপর ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। দাম্ভিক। অর্থাৎ অহঙ্কারী।

٢٦. قَالَ تَعَالٰى سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا اَيْ فِي الْاٰخِرَةِ
مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ . وَهُوَ هُمْ بِاَنْ يُعَذَّبُوْا
عَلٰى تَكْذِيْبِهِمْ لِنَبِيِّهِمْ صَالِحٍ.

২৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন– আগামীকল্য তারা জানবে অর্থাৎ পরকালে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক অথচ মিথ্যাবাদী তারা নিজেরাই কেননা তাদেরকে তাদের নবী হযরত সালেহ (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।

٢٧. اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ مُخْرِجُوْهَا مِنَ
الْهَضْبَةِ الصَّخْرَةِ كَمَا سَاَلُوْا فِتْنَةً
مِحْنَةً لَّهُمْ لِنَخْتَبِرَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ يَا
صَالِحُ اَيِ انْتَظِرْ مَا هُمْ صَانِعُوْنَ وَمَا
يُصْنَعُ بِهِمْ وَاصْطَبِرْ ز اَلطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ
تَاءِ الْاِفْتِعَالِ اَيِ اصْبِرْ عَلٰى اَذَاهُمْ.

২৭. আমি পাঠিয়েছি একটি উষ্ট্রী তাদের চাহিদা অনুপাতে পাথর হতে। তাদের পরীক্ষার জন্য যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর হে সালিহ! অর্থাৎ তারা কি করে? এবং তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়? এবং ধৈর্যশীল হও اِصْطَبِرْ শব্দটির طَاءٌ বর্ণটি বাবে اِفْتِعَالٌ -এর تَاءٌ হতে পরিবর্তন হয়ে এসেছে। অর্থাৎ তুমি তাদের কষ্টদানের উপর ধৈর্য্যধারণ কর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٨. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ مَقْسُوْمٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاقَةِ فَيَوْمٌ لَهُمْ وَيَوْمٌ لَهَا كُلُّ شِرْبٍ نَصِيْبٍ مِنَ الْمَاءِ مُحْتَضَرٌ - يَحْضُرُهُ الْقَوْمُ يَوْمَهُمْ وَالنَّاقَةُ يَوْمَهَا فَتَمَادَوْا عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ مَلُّوْهُ فَهَمُّوْا بِقَتْلِ النَّاقَةِ -

২৮. তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত তাদের মাঝে ও উষ্ট্রীর মাঝে। একদিন তাদের জন্য আর একদিন উষ্ট্রীর জন্য। এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পালার দিন উপস্থিত হবে এবং উষ্ট্রী তার জন্য নির্ধারিত দিন উপস্থিত হবে। সে সকল লোক এ অবস্থার উপর দীর্ঘকাল অটল থাকল। অতঃপর বিরক্ত হয়ে গেল। তখন তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করার সঙ্কল্প করল।

٢٩. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ قُدَارًا لِيَقْتُلَهَا فَتَعَاطٰى تَنَاوَلَ السَّيْفَ فَعَقَرَ - بِهِ النَّاقَةَ اَىْ قَتَلَهَا مُوَافَقَةً لَهُمْ -

২৯. অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গী কুদার কে আহ্বান করল উষ্ট্রীকে হত্যার জন্য। সে তাকে ধরে অর্থাৎ তরবারি হাতে নিয়ে [উষ্ট্রীর কুঁজে আঘাত করল] অর্থাৎ তাদের পরামর্শ মতে হত্যা করল।

٣٠. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ - اَىْ اِنْذَارِىْ لَهُمْ بِالْعَذَابِ قَبْلَ نُزُوْلِهِ اَىْ وَقَعَ مَوْقِعَهُ وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ -

৩০. কিরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী অর্থাৎ আমার তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার পূর্বে শাস্তি থেকে ভয় দেখানো। অর্থাৎ তা সঠিক স্থানেই পতিত হয়েছে। আর সেই শাস্তিকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বাণী إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً الخ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

٣١. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ هُوَ الَّذِىْ يَجْعَلُ لِغَنَمِهِ حَظِيْرَةً مِنْ يَابِسِ الشَّجَرِ وَالشَّوْكِ يَحْفَظُهُنَّ فِيْهَا مِنَ الذِّئَابِ وَالسِّبَاعِ وَمَا سَقَطَ مِنْ ذٰلِكَ فَدَاسَتْهُ هُوَ الْهَشِيْمُ -

৩১. আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়ার প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। مُحْتَظِر এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে স্বীয় বকরির সংরক্ষণের জন্য শুকনো ঘাস, কাঁটা ইত্যাদি দ্বারা খোঁয়াড় বানায়, তাতে সে বকরিগুলোকে বাঘ-ভল্লুক থেকে রক্ষা করে। আর ঐ ঘাস থেকে যখন কিছু পড়ে যায় তখন বকরিগুলো তাকে দলিত মথিত করে ফেলে, এটাকেই هَشِيْم বলা হয়।

٣٢. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ -

৩২. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

٣٣. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ اَىْ بِالْاُمُوْرِ الْمُنْذِرَةِ لَهُمْ عَلٰى لِسَانِهِ -

৩৩. লূত সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল সতর্ককারীদেরকে, অর্থাৎ সেই বিষয়গুলোকে যার মাধ্যমে হযরত লূত (আ.)-এর ভাষায় তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٤. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا رِيْحًا تَرْمِيْهِمْ بِالْحَصْبَاءِ وَهِيَ صِغَارُ الْحِجَارَةِ الْوَاحِدَةِ دُوْنَ مِلْءِ الْكَفِّ فَهَلَكُوْا إِلَّا آلَ لُوْطٍ ط وَهُمْ ابْنَتَاهُ مَعَهُ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ . مِنَ الْأَسْحَارِ أَيْ وَقْتَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَوْ أُرِيْدَ مِنْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لَمُنِعَ الصَّرْفُ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ مَعْدُوْلٌ عَنِ السَّحَرِ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي الْمَعْرِفَةِ بِأَلْ وَهَلْ أُرْسِلَ الْحَاصِبُ عَلَى آلِ لُوْطٍ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَعُبِّرَ عَنِ الْاِسْتِثْنَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَعَلَى الثَّانِيْ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْجِنْسِ تَسَمُّحًا .

৩৪. আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা অর্থাৎ এমন বায়ু যা তাদের উপর কংকর বর্ষণ করত। আর তা ছিল ছোট ছোট কংকর। এক মুষ্ঠি সমানও না। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয় আর হযরত লূত (আ.)-এর পরিবারের সাথে তাঁর দু'কন্যাও ছিল। তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রের শেষাংশে অর্থাৎ অনির্দিষ্ট দিনের প্রাতঃকালে। যদি নির্দিষ্ট দিনের সকাল উদ্দেশ্য হয় তবে غَيْرُ مُنْصَرِفٌ হবে। কেননা এটা مَعْرِفَةٌ এবং اَلسَّحَرْ থেকে পরিবর্তিত। কেননা তার হক হলো مَعْرِفَةٌ -এর মধ্যে اَلِفْ এবং لَامْ -এর সাথে ব্যবহার হবে। তবে লূত পরিবারের উপর পাথর বর্ষণকারী বায়ু প্রেরিত হয়েছে কিনা? এ বিষয়ে দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম সুরতে অর্থাৎ তা প্রেরণের সুরতে এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلْ হবে, আর দ্বিতীয় সুরতে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ হবে। যদি مُسْتَثْنٰى টা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর جِنْس থেকে হয় تَسْمَحُ হিসেবে।

٣٥. نِعْمَةً مَصْدَرٌ أَيْ إِنْعَامًا مِنْ عِنْدِنَا ط كَذٰلِكَ أَيْ مِثْلُ ذٰلِكَ الْجَزَاءِ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ . أَنْعَمْنَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَوْ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَرُسُلِهِ وَأَطَاعَهُمْ .

৩৫. আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ نِعْمَةً শব্দটি মাসদার اِنْعَامًا অর্থে। আমি এভাবেই অর্থাৎ এই জিনিসের মতো আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি, যারা কৃতজ্ঞ। এ অবস্থায় যে, সে মুমিন হবে অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে।

٣٦. وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ خَوَّفَهُمْ لُوْطٌ بَطْشَتَنَا أَخْذَتَنَا إِيَّاهُمْ بِالْعَذَابِ فَتَمَارَوْا تَجَادَلُوْا وَكَذَّبُوْا بِالنُّذُرِ بِإِنْذَارِهِ .

৩৬. তাদেরকে সতর্ক করেছিল হযরত লূত (আ.) তাদেরকে ভয় দেখিয়েছিলেন আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে শাস্তি দ্বারা তাদেরকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। ঝগড়া করল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

٣٧. وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ أَيْ سَأَلُوْهُ أَنْ يُّخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ أَتَوْهُ فِيْ صُوْرَةِ الْأَضْيَافِ لِيَخْبُثُوْا بِهِمْ وَكَانُوْا مَلَائِكَةً .

৩৭. তারা হযরত লূত (আ.)-এর নিকট হতে তাঁর মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করল অর্থাৎ তাঁর থেকে এটা প্রার্থনা করল যে, তাদের মাঝে ও আগত মেহমানগণের মাঝে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতা না রাখে, যাতে তারা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে। আর তারা ছিলেন ফেরেশতা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ أَعْمَيْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا بِلَا شَقٍّ كَبَاقِي الْوَجْهِ بِأَنْ صَفَقَهَا جِبْرَئِيلُ بِجَنَاحِهِ فذوقوا فقلنا لهم ذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ أَيْ إِنْذَارِي وَتَخْوِيفِي أَيْ ثَمْرَتَهُ وَفَائِدَتَهُ ـ

তখন আমি তাদের দৃষ্টি লোপ করে দিলাম অর্থাৎ তাদেরকে অন্ধ করে দিলাম এবং চোখকে চোখের গর্ত ছাড়া চেহারার অনুরূপ করে দিলাম এভাবে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) স্বীয় পাখা দ্বারা তাদের চোখে আঘাত করেন। এবং আমি বললাম আস্বাদন কর আমি তাদেরকে বললাম তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম। অর্থাৎ আমার শাস্তি ও ভয় দেখানোর পরিণাম ফল।

৩৮. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً وَقْتَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ـ دَائِمٌ مُتَّصِلٌ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ ـ

৩৮. প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল। প্রাতঃকালে অনির্দিষ্ট দিনের। পরকালের শাস্তির সাথে মিলিতকারী শাস্তি।

৩৯. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ـ

৩৯. এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।

৪০. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ـ

৪০. আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بِالْأُمُوْرِ الَّتِىْ اَنْذَرَهُمْ بِهَا : এখানে مُنْذِرٌ -এর তাফসীর اَلْاُمُوْرُ الْمُنْذِرُ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে مُنْذِرٌ দ্বারা নবীগণ উদ্দেশ্য নন; বরং উদ্দেশ্য হলো সে সকল কাজ, যার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে: দ্বিতীয় এমন একটি সুরতও হতে পারে যে, نُذُرٌ এটা نَذِيْرٌ অর্থ رُسُلٌ -এর বহুবচন। আর نُذُرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূল। আর نَذِيْرٌ -এর পরিবর্তে نذر বহুবচনের সীগাহ আনার মাঝে এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, এক রাসূলকে অস্বীকার করার অর্থ হলো সকল রাসূলকে অস্বীকার করা।

قَوْلُهُ مَنْصُوْبٌ عَلَى الْاِشْتِغَالِ : অর্থাৎ بَشَرًا শব্দটি مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ -এর নীতিতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- اَنَتَّبِعُ بَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ; এখানে نَتَّبِعُهُ হলো নসবদানকারী উহ্য ফে'লের মুফাসসির।

قَوْلُهُ جُنُوْنٌ : এখানে سُعُرٌ -এর তাফসীর جُنُوْنٌ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, سُعُرٌ হলো مُفْرَدٌ তথা একবচন; বহুবচন নয়। এর অর্থ হলো স্বল্প জ্ঞান/ অপরিপক্ক জ্ঞান। বলা হয়- نَاقَةٌ مَسْعُوْرَةٌ তথা পাগলের মতো বিচরণকারী উষ্ট্রী। سُعُرٌ শব্দটি نَارٌ অর্থে ব্যবহৃত سُعُرٌ -এর বহুবচনও হতে পারে।

قَوْلُهُ فِتْنَةً : এটা مُرْسِلُوْا -এর مَفْعُوْلٌ لَهٗ অর্থাৎ আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি শক্ত পাথর হতে উষ্ট্রী বের করে আনব।

قَوْلُهُ وَبَيْنَ النَّاقَةِ : এটা বৃদ্ধি করণ দ্বারা মুফাসসির (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো ঐ সংশয়ের নিরসন করা যা আল্লাহর বাণী- اَلْمَاءُ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ দ্বারা জানা যায় যে, পানির পালা বণ্টন হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল, অথচ পানির বণ্টন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন উষ্ট্রীও সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। এ সংশয় নিরসনের জন্যই وَبَيْنَ النَّاقَةِ বৃদ্ধি করেছেন।

قَوْلُهُ مُوَافَقَةً لَهُمْ : ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই আয়াত ও সূরা শু'আরা-এর আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। কেননা সূরা শু'আরাতে বিষয়টি فَعَقَرُوْهَا বহুবচনের সীগাহ দ্বারা এসেছে। আর এখানে فَعَقَرَ তথা একবচনের সীগার সাথে এসেছে। এখানে تَطْبِيْقٌ এভাবে হয়েছে সরাসরি হত্যাকারী তো কুদার একাই ছিল। তবে হত্যার পরামর্শে সকলেই শরিক ছিল। এ কারণেই এখানে সরাসরি হত্যাকারীর দিকেই হত্যার সম্পর্ক স্থাপন করেছে। আর সূরা শু'আরাতে পরামর্শে অংশগ্রহণকারী সকলকে শরিক করে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ هَشِيْم : এটা صِفَتْ مُشَبَّهْ -এর সীগাহ এবং ইসমে মাফউল مَشْهُوْم অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ– টুকরো কুটরো কৃত, দলিত মথিত।

قَوْلُهُ مِنَ الْاَسْحَار : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سِحْر টা نَكِرَهْ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকালে।

قَوْلُهُ وَلَوْ اُرِيْدَ مِنْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ لِمَنْعِ مِنَ الصَّرْفِ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো بِسَحَرٍ শব্দটি مُنْصَرِفْ কেননা এটা نَكِرَهْ মানার সুরতে مَنْعُ صَرْف -এর সববসমূহ হতে একটি سَبَبْ তথা عَدْل পাওয়া যায়। কেননা سِحْر টা اَلسَّحَر হতে مَعْدُوْل হয়ে এসেছে। আর যদি তা দ্বারা নির্দিষ্ট দিনের প্রাতঃকাল উদ্দেশ্য করা হয় তাতে عَلَمِيَّتْ -ও পাওয়া যাবে। এই সুরতে তাতে দুই সবব তথা عَدْل এবং عَلَمِيَّتْ পাওয়া যাওয়ার কারণে তা غَيْرُ مُنْصَرِف হবে।

قَوْلُهُ تَسَمُّحًا : এক নোসখায় تَسَامُحًا রয়েছে। উদ্দেশ্য হলো– اِلَّا اٰلَ لُوْط -কে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِع স্বীকৃতি দেওয়া ছাড় দেওয়ারই নামান্তর। অন্যথায় এর কোনোই সুরত নেই। কেননা اٰلُ لُوْط ও قَوْم বা সম্প্রদায়েরই একটি অংশ। যার কারণে এটা مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এটা مُسْتَثْنٰى مُتَّصِل হবে। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেটাকে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِع বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ نِعْمَةً مَصْدَرٌ : অর্থাৎ نِعْمَةً টা نَجَّيْنَا -এর مَفْعُوْل مُطْلَق হয়েছে, যা بِغَيْرِ لَفْظِهِ তাকিদের জন্য হয়েছে কেননা نَجَّيْنَا টা اَنْعَمْنَا -এর অর্থে হয়েছে এবং نَجَّيْنَا -এর مَفْعُوْل لَهُ -ও হতে পারে এবং উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَق بِلَفْظِهِ -ও হতে পারে। অর্থাৎ– اَنْعَمْنَا نِعْمَةً

قَوْلُهُ تَجَادَلُوْا وَكَذَّبُوْا : এটা فَتَمَارَوْا -এর তাফসীর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি সংশয়ে অপনোদন করা। সংশয় হলো تَمَارَوْا -এর صِلَهْ তো بَاءْ আসে না। অথচ এখানে সেলাহ بَاءْ এসেছে।

উত্তর : জবাবের সার হলো যে, تَمَارَوْا টা تَجَادَلُوْا এবং كَذَّبُوْا -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার কারণে بَاءْ -এর দ্বারা এর সেলাহ নেওয়া বৈধ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ .... اِنَّا اِذًا لَفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ : সামূদ জাতির ঘটনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আদ জাতির শিক্ষণীয় ঘটনার বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত থেকে সামূদ জাতির ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সামূদ জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অবাধ্য সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর রিসালতকে অস্বীকার করে। তাঁর বিরোধিতা করার কোনো যুক্তি তাদের নিকট ছিল না। তাই তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই একজন লোকের কথা মেনে চলবো? তাঁর নির্দেশেই উঠাবসা করবো? এমন তো হতে পারে না। এমন কাজ করলে আমরা পথভ্রষ্ট এবং পাগল বলে বিবেচিত হবো।

سُعُرٌ শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয়বার فِىْ ضَلَالٍ وَّسُعُرٌ বাক্যাংশে। এখানে سُعُرٌ -এর অর্থ– জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ববর্তী আয়াত ছিল সামূদ জাতির অবাধ্যতার বিবরণ। এ আয়াতেও তাদের নাফরমানি এবং ধৃষ্টতার উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে– اَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا

সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-কে কটাক্ষ করে বলে, আমাদের মধ্যে কি নবুয়তের যোগ্য একমাত্র তিনিই ছিলেন, যত প্রত্যাদেশ, উপদেশ তাঁর নিকটই অবতীর্ণ হচ্ছে ; অথচ আমাদের মধ্যেও ওহী লাভের যোগ্য অনেক লোকই রয়েছে, তবে কি আমরা কোনো কাজেরই নই? মূলত তাঁর নবুয়তের দাবি সত্য নয়।

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّابٌ اَشِرٌ : সে বড়াই করে বেড়ায়। নবুয়তের দাবি করে সে আমাদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হতে চায়। এভাবে সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর প্রতি নৈতিক দুর্বলতার অপবাদ দেয়।

قَوْلُهُ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ : এ আগামীকাল কথাটির অর্থ হলো, যেদিন তাদের উপর আজাব নাজিল হবে, সেদিন তারা জানতে পারবে– কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক? আর তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, এর অর্থ কিয়ামতের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিনই তারা জানতে পারবে যে, কে মিথ্যাবাদী, কে দাম্ভিক?

আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো মৃত্যুর পরই জানতে পারবে– কে মিথ্যাবাদী, কে দাম্ভিক?

قَوْلُهُ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ : সামূদ জাতি হযরত সালেহ (আ.)-এর নিকট তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ মুজেযা প্রদর্শনের দাবি উত্থাপন করল এবং তারাই প্রস্তাব করল, এ পাথরের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গাভীন লাল বর্ণের উষ্ট্রী বের করে আনুন, তাহলে আমরা আপনার নবুয়তের সত্যতা বিশ্বাস করবো। তখন আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আ.)-কে বললেন- إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি উষ্ট্রী প্রেরণ করছি, তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে। অতএব, তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং দেখ তারা [ঐ উষ্ট্রীর সাথে] কী করে? তাদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে থাক, আর তারা তোমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে, এর উপর সবর অবলম্বন কর। আল্লাহ পাকের আদেশ না আসা পর্যন্ত তাদের প্রতি আজাব তরান্বিত করার কথা বলো না।

-[তাফসীরে আল বাহরুল মুহীত খ. ৮, পৃ. ১৮১]

قَوْلُهُ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ : অর্থাৎ পানি বণ্টন করা হয়েছে, একদিন সামূদ জাতির জন্যে, আরেক দিন হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীর জন্যে। মুজাহিদ (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রী পানি পান করে চলে গেলে সামুদ জাতির লোকেরা আসবে এবং তাদের উষ্ট্রী পানি পান করবে। কিন্তু এ হতভাগা সামূদ জাতি ঐ উষ্ট্রীর জন্যে একদিন নির্দিষ্ট হবে- তা সইতে পারেনি। তারা হিংসা-ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠে এবং তাদের এক সাথী উষ্ট্রীটির শরীরের একটি অংশ কেটে ফেলে। তাই এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে- فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ অর্থাৎ এরপর তারা তাদের এক সাথীকে আহবান করলো, সে তাকে ধরে হত্যা করলো।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ ব্যক্তির নাম ছিল কাদার ইবনে সালেফ। -[ইবনে কাসীর [উর্দূ] পারা- ২৭ পৃ. ৪৬]

উল্লেখ যে, এ ঘটনার পর সামুদ জাতি আল্লাহ পাকের আজাবে পতিত হলো।

قَوْلُهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ : বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) তখন এত জোরে গর্জন করেন যে, সামূদ জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির কলিজা ফেটে যায়, তারা দলিত মথিত কাঁটাবনের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন এ ঘটনার উল্লেখ করেছে এভাবে- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ "নিশ্চয় আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করি একটি গুরুগর্জন, পরিণামে তারা দলিত মথিত কাঁটাবনের ন্যায় রয়ে যায়।"

অর্থাৎ ক্ষণিকের মধ্যেই তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি হুংকারই যথেষ্ট ছিল। كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ -এর ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, مُحْتَظِر সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে তার বকরির হেফাজতের জন্যে বৃক্ষ, ডালা এবং কাঁটা একত্র করে, যাতে করে হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে তার বকরির হেফাজত করতে পারে। সে বৃক্ষ-শাখা এবং কাঁটা দ্বারা যে দেয়াল তৈরি করে, তার কোনো অংশ যদি ভেঙ্গে পড়ে আর বকরিরা সেগুলো দলিত মথিত করে তবে সেগুলোকে هَشِيم বলে।

যাহোক, সামূদ জাতি আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করেছিল, আল্লাহ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তাই তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। তাদের ঘটনা পৃথিবীর অন্য মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

লূত সম্প্রদায়ের ঘটনা : ইতিপূর্বে আদ এবং সামূদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ আয়াত থেকে হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনার বর্ণনা শুরু হয়েছে। তারাও তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত নবীকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তিনি তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত হওয়ার জন্যে আহবান করেছেন এবং আখিরাতের আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তারা হযরত লূত (আ.)-কে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, আর একজন নবীকে অস্বীকার করা দুনিয়ার সকল নবী রাসূলগণকে অস্বীকার করার নামান্তর, তাই তাদেরকেও আল্লাহ পাকের আজাব পাকড়াও করেছে।

قَوْلُهُ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতে লূত-সম্প্রদায়ের নাফরমানির কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের উপর প্রস্তরবাহী প্রচণ্ড ঝড়, তবে লূত পরিবারের উপর নয়, তাদেরকে আমি শেষ রাতে রক্ষা করেছিলাম।

হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায় অত্যন্ত মন্দ ও অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ছিল। হযরত লূত (আ.) তাদের হেদায়েতের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় অন্যায় অনাচারে লিপ্ত থাকে, তাঁর রিসালতকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের অবাধ্যতা ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন তাদের প্রতি আজাবের সিদ্ধান্ত হয়, হযরত লূত (আ.)-এর নিকট আল্লাহর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পাকের পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের আগমন হয়, তাঁরা সকলেই অল্পবয়সী বালকদের আকৃতি ধারণ করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাদের সঙ্গেই ছিলেন। লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর মেহমানদেরকে ছিনিয়ে নিতে চায়, তিনি গৃহের দ্বার বন্ধ করে দেন; কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়। হযরত লূত (আ.) অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আত্মপ্রকাশ করলেন এবং হযরত লূত (আ.)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই, তারা আমাদের নিকট আসতে পারবে না। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর একটি ডানা দিয়ে তাদের প্রতি আঘাত করলেন। পরিণামে তৎক্ষণাত লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্ধ হয়ে গেল। তারা ঘরের ভেতর ঘোরাফেরা করতে শুরু করলো। বের হওয়ার পথ পেল না। অবশেষে হযরত লূত (আ.) অন্ধ অবস্থায় এ ঘৃণ্য চরিত্র বিশিষ্ট লোকদেরকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। এরপর শুরু হলো সামগ্রিকভাবে তাদের প্রতি আসমানি গজব। প্রথমে প্রস্তরবাহী ঝড় প্রবাহিত হতে লাগল এবং ঐ ঝড়ের সময় দুরাত্মা কাফেরদের প্রতি প্রস্তর বর্ষিত হলো। প্রত্যেকটি প্রস্তরের মধ্যে সে ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যার প্রতি ঐ প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল। অবশ্য এ আজাব শুরু করার পূর্বে আল্লাহ পাক দয়া করে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর পরিবারের লোকদেরকে [তাঁর স্ত্রী ব্যতীত] আজাবের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে বের করে নিলেন। এটি ছিল তাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ নিয়ামত।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ : আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। নবী রাসূলগণ মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং মন্দ পথ বর্জন করার তাগিদ করেছেন, অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন। কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো, সতর্ক হওয়া এবং মন্দ কাজ পরিহার করা। কিন্তু লূত সম্প্রদায় সতর্ক হওয়ার স্থলে আরো বেশি অবাধ্য হলো এবং হযরত লুত (আ.)-এর নিকট যে ফেরেশতাগণ মানবাকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন তাঁদেরকে তারা অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে চাইল। পরিণামে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাদেরকে অন্ধ করে দেন।

قَوْلُهُ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ : مُرَاوَدَةْ শব্দের অর্থ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য হযরত লূত (আ.)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। হযরত লূত (আ.) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। হযরত লুত (আ.) বিব্রত বোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা কামার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল-বিমুখ কাফেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আজাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য পাঁচটি বিশ্ববিশ্রুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গাম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি এবং ইহকালেও নানা আজাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহর আজাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে লূত ও কওমে ফিরাউন– এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহর আজাব আগমনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষ কুরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে– فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرْ অর্থাৎ এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির উপর যখন আল্লাহর আজাব নেমে এলো, তখন দেখ, তারা কিভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল! এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ আল্লাহর এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কুরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কুরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেরদের ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহস 'আদ, সামূদ ও ফিরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশি নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে!

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤١. وَلَقَدْ جَاءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ مَعَهُ النُّذُرُ ج الْاِنْذَارُ عَلٰى لِسَانِ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا .

৪১. ফেরাউন সম্প্রদায়ের নিকট এসেছিল ফেরাউনসহ তার জাতির নিকট সতর্ককারী হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-এর জবানিতে, তবে তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

٤٢. بَلْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا اَىِ التِّسْعِ الَّتِىْ اُوْتِيْهَا مُوْسٰى فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ اَخْذَ عَزِيْزٍ قَوِيٍّ مُّقْتَدِرٍ قَادِرٍ لَا يُعْجِزُهٗ شَيْءٌ .

৪২. বরং তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল অর্থাৎ নয়টি নিদর্শন, যা হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম সুকঠিন শাস্তি দ্বারা পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে প্রবল ক্ষমতাধর কোনো কিছুই তাকে ব্যর্থ ও অক্ষম করতে পারে না।

٤٣. اَكُفَّارُكُمْ يَا قُرَيْشُ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰئِكُمْ الْمَذْكُوْرِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ فَلَمْ يُعَذَّبُوْا اَمْ لَكُمْ يَا كُفَّارَ قُرَيْشٍ بَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ فِى الزُّبُرِ ج اَلْكُتُبِ وَالْاِسْتِفْهَامُ فِى الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى النَّفْيِ اَىْ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذٰلِكَ .

৪৩. হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উল্লিখিত নূহ সম্প্রদায় হতে ফেরাউন পর্যন্ত যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না নাকি তোমাদের রয়েছে হে কুরাইশ সম্প্রদায় অব্যাহতির কোনো সনদ শাস্তি হতে পূর্ববর্তী কিতাবে? এখানে উভয় স্থানেই اِسْتِفْهَامْ টা نَفِىْ -এর অর্থে রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এরূপ নয়।

٤٤. اَمْ يَقُوْلُوْنَ اَىْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ نَحْنُ جَمِيْعٌ اَىْ جَمْعٌ مُّنْتَصِرٌ عَلٰى مُحَمَّدٍ .

৪৪. এরা কি বলে, কুরাইশ কাফেররা আমরা এক সঙ্ঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর।

٤٥. وَلَمَّا قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ اِنَّا جَمْعٌ مُّنْتَصِرٌ نَزَلَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ . فَهُزِمُوْا بِبَدْرٍ وَنُصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ .

৪৫. বদরের দিন যখন আবূ জাহল বলল, আমরা সুনিশ্চিত ভাবে বিজয় অর্জনকারী দল, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। সুতরাং বদরের ময়দানে তারা পরাজিত হলো এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের উপর বিজয় লাভ করলেন।

٤٦. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بِالْعَذَابِ وَالسَّاعَةُ اَىْ عَذَابُهَا اَدْهٰى اَعْظَمُ بَلِيَّةً وَاَمَرُّ . اَشَدُّ مَرَارَةً مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا .

৪৬. অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিতকাল। এবং কিয়ামত অর্থাৎ তার শাস্তি কঠিনতর ভয়ানক মসিবতের এবং তিক্ততর হবে মারাত্মক তিক্ত পৃথিবীর শাস্তির তুলনায়।

٤٧. اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ هَلَاكٍ بِالْقَتْلِ فِى الدُّنْيَا وَسُعُرٍ نَارٍ مُسَعَّرَةٍ بِالتَّشْدِيْدِ اَىْ مُهَيَّجَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ .

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্ত পৃথিবীতে হত্যার মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত। ও বিকারগ্রস্ত। প্রজ্বলিত অগ্নিতে। مُسَعَّرَةٍ শব্দটির عَيْن বর্ণে তাশদীদসহ অর্থাৎ পরকালে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিপতিত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٨. يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ـ اِصَابَةَ جَهَنَّمَ لَكُمْ ـ

৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে অর্থাৎ পরকালে, তখন তাদেরকে বলা হবে- জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। তোমাদের জাহান্নামে প্রবেশের কারণে।

٤٩. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ـ بِتَقْدِيْرٍ حَالٌ مِنْ كُلَّ اَىْ مُقَدَّرًا وَ قُرِئَ كُلُّ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خَلَقْنَاهُ ـ

৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে كُلَّ شَيْءٍ -এর নসব দানকারী ফে'ল হলো উহ্য ঐ ফে'ল, যার তাফসীর করতেছে خَلَقْنٰهُ ; আর بِقَدَرٍ এটা كُلَّ شَيْءٍ থেকে حَالٌ হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدَّرًا আবার كُلّ -কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে مَرْفُوْع -ও পড়া হয়েছে। এর খবর হলো خَلَقْنَاهُ

٥٠. وَمَا اَمْرُنَا لِشَيْءٍ نُرِيْدُ وُجُوْدَهُ اِلَّا اَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ـ فِى السُّرْعَةِ وَهِىَ كُنْ فَيُوْجَدُ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

৫০ আমার আদেশ তো আমি যে বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করি একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মতো। দ্রুততার ক্ষেত্রে। আর সেই হুকুম হলো كُنْ [হও] শব্দটি। তখন সে বস্তুটি অস্তিত্বে এসে যায়। আর সেই হুকুম তখনই হবে যখন তিনি কোনো বস্তুর জন্য كُنْ বলার ইচ্ছা করেন, ফলে তখন তা হয়ে যায়।

٥١. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ اَشْبَاهَكُمْ فِى الْكُفْرِ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى الْاَمْرِ اَىْ اُذْكُرُوْا وَ اتَّعِظُوْا ـ

৫১. আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মতো দলগুলোকে অর্থাৎ কুফরির ক্ষেত্রে তোমাদের সদৃশ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য হতে। অতএব তা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? এখানে اِسْتِفْهَامٌ -টি اَمْر অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণ করো।

٥٢. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ اَىِ الْعِبَادُ مَكْتُوْبٌ فِى الزُّبُرِ ـ كُتُبِ الْحَفَظَةِ ـ

৫২. তাদের সকল কার্যকলাপ আছে অর্থাৎ বান্দারা যে কাজ করে তা লিখিত আছে আমলনামায় সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের কিতাবে।

٥٣. وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مِنَ الذَّنْبِ اَوِ الْعَمَلِ مُسْتَطَرٌ مُكْتَتَبٌ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ ـ

৫৩. আছে ছোট বড় সবকিছুই গুনাহ অথবা কাজ লিপিবদ্ধ। লওহে মাহফূযে।

٥٤. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَنَهَرٍ ۙ اُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ وَقُرِئَ بِضَمِّ النُّوْنِ وَالْهَاءِ جَمْعًا كَاَسَدٍ وَاُسُدٍ اَلْمَعْنٰى اَنَّهُمْ يَشْرَبُوْنَ مِنْ اَنْهَارِهَا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالْعَسَلَ وَالْخَمْرَ ـ

৫৪. মুত্তাকীগণ থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে নহর দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য। نَهَرٌ শব্দটিকে বহুবচনের ভিত্তিতে نُوْن এবং هَاء বর্ণে পেশ দিয়েও পঠিত রয়েছে। যেমনটা اَسَدٌ এবং اُسُدٌ -এর মধ্যে হয়েছে। অর্থ হলো তারা পানি, দুধ, মধু ও শরাবের নহর থেকে পান করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٥. فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ مَجْلِسِ حَقٍّ لَا لَغْوَ فِيْهِ وَلَا تَأْثِيْمَ وَارِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ وَقُرِئَ مَقَاعِدِ الْمَعْنٰى اَنَّهُمْ فِىْ مَجَالِسَ مِنَ الْجَنَّاتِ سَالِمَةٍ مِنَ اللَّغْوِ وَالتَّاْثِيْمِ بِخِلَافِ مَجَالِسِ الدُّنْيَا فَقَلَّ اَنْ تَسْلَمَ مِنْ ذٰلِكَ وَاُعْرِبَ هٰذَا خَبَرًا ثَانِيًا وَبَدَلًا وَهُوَ صَادِقٌ بِبَدَلِ الْبَعْضِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ مَلِيْكٍ مِثَالُ مُبَالَغَةٍ اَىْ عَزِيْزِ الْمُلْكِ وَاسِعِهِ مُقْتَدِرٍ ـ قَادِرٍ لَا يُعْجِزُهُ شَئٌ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَ اِشَارَةٌ اِلَى الرُّتْبَةِ وَالْقُدْرَةِ مِنْ فَضْلِهِ تَعَالٰى ـ

৫৫. উত্তম স্থানে/যোগ্য আসনে অর্থাৎ সত্য মজলিসে, সেথায় থাকবে না কোনো অহেতুক কথাবার্তা এবং গুনাহের কার্যক্রম। আর مَقْعَد দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং তা مَقَاعِد [বহুবচনের সাথেও] পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে এমন মজলিসে হবে যা অহেতুক কথাবার্তা ও গুনাহের কার্যক্রম হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। পৃথিবীর মজলিস বা আসরের বিপরীত যা অহেতুক কথাবার্তা ও গুনাহের কার্যক্রম হতে খুব কমই মুক্ত থাকে। مَقْعَدُ صِدْقٍ -কে اِنَّ-এর দ্বিতীয় খবর হওয়ার ভিত্তিতে ই'রাব দেওয়া হয়েছে এবং جَنّٰتٍ হতে بَدَل -এর ভিত্তিতেও। আর সেটা بَدَلُ الْبَعْضِ ইত্যাদির উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে অর্থাৎ মুবালাগার ভিত্তিতে উদাহরণ টানা হয়েছে বাস্তবিক নিকটে হওয়া উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ তিনি প্রবল ক্ষমতাধর, কোনো বস্তুই তাঁকে অক্ষম ও অপারগ করতে পারে না। আর তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা। এখানে عِنْدَ দ্বারা মর্যাদাগত নৈকট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর قُدْرَت [قُرْبَة] আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ থেকে হবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْاِنْذَارُ : মুসান্নিফ (র.) نُذُرٌ-এর তাফসীর اَلْاِنْذَارُ দ্বারা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, نُذُرٌ শব্দটি মাসদার, অর্থ– ভয় দেখানো, ভীতি প্রদর্শনকারী চিহ্নসমূহ। এখানে نُذُرٌ টা نَذِيْر অর্থেও হতে পারে। অর্থ– ভীতি প্রদর্শনকারী। اَلْاٰيَاتُ التِّسْعُ হলো– ১. লাঠি ২. শুভ্র হাত ৩. দুর্ভিক্ষ ৪. اَلطَّمْسُ বা আকৃতি বিকৃতকরণ ৫. তুফান ৬. পঙ্গপাল ৭. উকুন ৮. ব্যাঙ ও ৯. রক্ত।

قَوْلُهُ خَيْرٌ مِنْ اُولٰئِكُمْ : অর্থাৎ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্বেকার কাফের সম্প্রদায়ের চেয়েও তোমরা শক্তি ও কঠোরতায় প্রবল কিনা?

قَوْلُهُ اَدْهٰى : এটা دَاهِيَةٌ হতে اِسْمُ تَفْضِيْلٍ -এর সীগাহ, অর্থ হলো কঠিন মসিবত যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হয় না।

قَوْلُهُ سُعُرٍ : অর্থাৎ– نَارٌ مُسَعَّرَةٌ তথা প্রজ্বলিত অগ্নি।

قَوْلُهُ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ : এটা উহ্য ফে'লের ظَرْف হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– وَيُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الخ আবার এটা سُعُرٌ -এরও ظَرْف হতে পারে।

قَوْلُهُ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ : এখানে كُلَّ শব্দটি নসব সহকারে مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ -এর নীতি অনুসারে জমহুরের কেরাত। আর এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কেননা كُلُّ পেশ দিয়ে পড়া হলে ভ্রান্ত বিশ্বাসের দিকে ধারণার জন্ম দিবে। আর তা হলো এই যে, كُلٌّ -কে মুবতাদা বলা হবে এবং خَلَقْنَاهُ টা জুমলা হয়ে شَئٍ -এর সিফত হবে এবং بِقَدَرٍ হবে তার খবর। অর্থ হবে– প্রত্যেক ঐ জিনিস যাকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন পরিমাপ মতো, এর দ্বারা ধারণা হয় যে, কিছু জিনিস এরূপও রয়েছে যে, যা আল্লাহর সৃষ্টি নয়। অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি ও পরিমিত। নসবের সুরতে অর্থ হবে– আমি প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।

সারকথা : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ -এর মধ্যে দুটি اِحْتِمَالْ রয়েছে। যথা- ১. رَفْع ২. نَصَبْ ; এরপর رَفْع -এর সুরতে আবার দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি বিশুদ্ধ ও অপরটি ফাসেদ। যদি خَلَقْنٰهُ কে كُلَّ -এর খবর বানিয়ে দেওয়া হয় তবে এটা বিশুদ্ধ হবে। অর্থ হবে- প্রতিটি জিনিসই আমি পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি। এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতাদর্শ। তবে رَفْع -এর সুরতে অন্য আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে যেটা ফাসেদ। আর সেটা হলো خَلَقْنٰهُ টা شَيْءٍ -এর সিফত আর بِقَدَرٍ এটা كُلّ -এর খবর হবে। এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে ফাসেদ। এর অর্থ হচ্ছে- প্রত্যেক ঐ জিনিস যা আমি সৃষ্টি করেছি, তা পরিমিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কিছু জিনিস এমনও রয়েছে, যা غَيْرُ اللّٰهِ -এর সৃষ্টিকৃত। আর সেটা পরিমিত নয়। এটা মুতাযেলাদের মাযহাব। তবে كُلّ -কে نَصَبْ পড়ার সুরতে ফাসেদ অর্থের সম্ভাবনাই থাকে না। আর نَصَبْ -এর সুরতটা এরূপ হবে যে, هَلْ টা উহ্য ফে'লের মাফউল হবে যার তাফসীর পরবর্তী ফে'ল (خَلَقْنٰهُ) করতেছে। তাকে بَابُ اِشْتِغَالْ এবং مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ -এর কায়দা বলে। এর بِقَدَرٍ টা بِتَقْدِيْرٍ -এর অর্থে এবং এটা ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ এই সুরতে خَلَقْنٰهُ -কে كُلَّ شَيْءٍ -এর সিফত বানানোর সম্ভাবনা নেই যে, ফাসেদ অর্থের ধারণা হবে। কেননা صِفَتْ টা মওসূফের আমেল হয় না। আর যা عَامِلْ হয় না, তা আমেলের তাফসীরও হয় না।

قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ : এখানে পূর্বের বিপরীত كُلّ -এর উপর رَفْع সুনির্দিষ্ট। কেননা নসবের সুরতে অর্থ বিনষ্ট হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা যদি كُلّ -এর উপর নসব পড়া হয় তাহলে উহ্য ইবারত হবে- فَعَلُوْا كُلَّ شَيْءٍ فِى الزُّبُرِ অর্থাৎ তারা সব জিনিসকেই লওহে মাহফূযে ঢুকিয়েছে। অথচ লওহে মাহফূযে ঢুকানোর কাজ আল্লাহর সৃষ্টির নয়। এছাড়া আমলকারীদের কর্ম ব্যতীত লওহে মাহফূযে আরো অনেক বস্তু রয়েছে যার সাথে আমলকারীগণের কোনোই সম্পর্ক নেই। আর رَفْع -এর কেরাতের সুরতে অর্থ হবে- তারা যে আমলই করে তা লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত।

قَوْلُهُ اُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ : এখানে نَهَر যদিও একবচন কিন্তু جَنّٰتٌ যেহেতু বহুবচন এ কারণে جَنّٰتٌ -এর মুনাসাবাতে جِنْسٌ উদ্দেশ্য, যাতে করে তাতে বহুবচনের অর্থের ধর্তব্য হয়ে যায়। فَوَاصِلْ -এর রেয়ায়েতে একবচন নেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো কেরাতে نُهُر বহুবচনের সাথেও পঠিত রয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ اَىْ مَقَامٍ حَسَنٍ : এর মধ্যে মওসূফের ইযাফত সিফতের দিকে হয়েছে। فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ -এর মধ্যে দু'টি তারকীব হতে পারে। যথা- ১. এটা اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর আর فِىْ جَنّٰتٍ হলো প্রথম খবর। ২. جَنّٰتٌ থেকে بَدَلُ الْبَعْضِ কেননা مَقْعَدِ صِدْقٍ টা جَنّٰتٌ -এরই কিছু অংশ।

قوله وغيره : এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ টা بَدَلُ الْاِشْتِمَالِ -ও হতে পারে। কেননা جَنّٰتٌ টা مَقْعَدِ صِدْقٍ -এর উপর সম্বলিত হওয়াকে শামিল করে।

قَوْلُهُ عِنْدَ مَلِيْكٍ : যদি مَقْعَدِ صِدْقٍ -কে بَدَل বলা হয় তবে عِنْدَ مَلِيْكٍ টা اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর হবে, আর যদি مَقْعَدِ صِدْقٍ -কে اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর বলা হয়। তবে عِنْدَ مَلِيْكٍ টা اِنَّ -এর তৃতীয় খবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَقَدْ جَاءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ : ফেরাউন ও তার দলবলের ঘটনা : আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার দলবলের হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের তথা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করল, তাঁর আনিত আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল। আলোচ্য আয়াতের اٰيٰتٌ শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি যে নয়টি বিধান জারি করা হয়েছিল, তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত রাসূলে করীম ﷺ -এর দরবারে সেসব বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, তা হলো- ১. কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করো না। ২. চুরি করো না। ৩. ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ো না। ৪. যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ, তাকে হত্যা করো না। ৫. কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে বিচারকের নিকট নিয়ে যেও না। ৬. জাদু করো না। ৭. সুদ গ্রহণ করো না। ৮. কোনো চরিত্রবতী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দিও না। ৯. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করো না। আর ইহুদিদের জন্যে একটি বিশেষ হুকুম ছিল- শনিবার দিনের সম্মান রক্ষা কর, সেদিন দুনিয়ার কাজ করো না।

Free @ www.eilm.weebly.com

যে, দু'জন ইহুদি হযরত রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এ কথাটি জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা উভয়ে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর কদম মুবারক চুম্বন করলো এবং বলল, আপনি আল্লাহ পাকের সত্য নবী। হুজুর ﷺ তখন ইরশাদ করলেন, তবে আমার অনুসরণ থেকে কে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে? তারা বলল, আমরা যদি আপনার অনুসারী হই, তবে ইহুদিরা আমাদের মেরে ফেলবে।

قَوْلُهُ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُولٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِى الزُّبُرِ : এ আয়াতে সে যুগের মুসলমানদেরকে এ মর্মে সম্বোধন করা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত আদ, সামূদ, লূত এবং ফেরাউন জাতির নাফরমানি ও তাদের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, পূর্বের কাফেরদের এ ভয়াবহ পরিণতি দেখার পরও হে মুসলমানগণ! তোমাদের এ যুগের কাফেররা, বিশেষত মক্কাবাসী কুরাইশরা আল্লাহ পাকের নাফরমানিতে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি অতীত কালের কাফেরদের তুলনায় উত্তম যে, আল্লাহ আজাব থেকে তারা রেহাই পেয়ে যাবে? এমন তো নয়; বরং যে কেউ এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করবে, তার শাস্তি অবধারিত।

قَوْلُهُ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ : অর্থাৎ হে মক্কার কাফেররা! তবে কি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহে মুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হও, তাঁর রাসূলকে অস্বীকার কর তবে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না? এমন মুক্তিপত্রও তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি।

قَوْلُهُ اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ : অথবা তারা কি একথা বলে যে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? আমরা সর্বদা সংরক্ষিত থাকব, কেউ আমাদের প্রতি বিজয়ী হওয়ার কথা চিন্তাও করবে না। এমনও তো নয়; অবশেষে তোমাদের প্রতি শাস্তি আপতিত হবে এবং তোমাদের পরাজয় ও ধ্বংস অনিবার্য।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, اَكُفَّارُكُمْ বলে এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে মক্কাবাসীর প্রতি, আর সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানগণকে, আর اُولٰئِكُمْ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে হযরত নূহ (আ.), হুদ (আ.) ও লূত (আ.) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের জাতিসমূহের প্রতি ও ফেরাউনের দলবলের প্রতি এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, হে মুসলমানগণ! তোমাদের যুগের কাফেররা কি উল্লিখিত কাফেরদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী? বেশি সম্পদশালী? বা সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে পূর্বেকার কাফেরদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন? এমন তো নয়; বরং এ যুগের কাফেররা পূর্বযুগের কাফেরদের ন্যায়ই, অথবা তাদের চেয়েও অধিক মন্দ। অতএব, পূর্বকালের কাফেরদের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তাদের অবস্থাও সেরূপ শোচনীয় হবে– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অতীতের অনেক পথভ্রষ্ট জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে তারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রাসূলগণের বিরোধিতা করেছে এবং কিভাবে তারা কোপগ্রস্ত হয়েছে, তার বিবরণের পর মক্কাবাসীকে তাদের অবস্থা মূল্যায়ন করার আহ্বান করা হয়েছে এ মর্মে যে, তোমরা কি পূর্বের কাফেরদের চেয়ে উত্তম? যে অপরাধে তাদের শাস্তি হয়েছে, সে অপরাধে তোমরা অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কি শাস্তি হবে না? অথবা তোমাদের জন্যে কি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মুক্তিপত্র প্রদান করা হয়েছে? অথবা তোমরা কি এমন অপরাজেয় শক্তিশালী দল যে, তোমাদের শাস্তির কোনো ব্যবস্থা করা যাবে না?

আর এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ অর্থাৎ অচিরেই এ দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে।

প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা : এতে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, মক্কার কাফেররা যত দৌরাত্ম্যই প্রদর্শন করুক না কেন, অচিরেই তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করতে হবে। তারা পরাজিত হয়ে রণাঙ্গন থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে, তখন তাদের প্রকৃত অবস্থা তারা দেখতে পাবে। দ্বিতীয় হিজরিতে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে এবং পঞ্চম হিজরিতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধে পবিত্র কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

–[তাফসীরে আল বাহরুল মুহীত খ. ৮, পৃ. ১৮৩]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ : অর্থাৎ বদর এবং খন্দকে কাফেরদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং যে অপমান ও লাঞ্ছনা তারা ভোগ করেছে, এটিই শেষ নয়; বরং তাদের আসল শাস্তি হবে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে, যেদিন বড়ই বিপদজনক এবং কঠিনতর। দুনিয়াতে তারা যে শাস্তি পেয়েছে, আখিরাতের আজাবের তুলনায় তা কোনো শাস্তিই নয়, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের কঠিন শাস্তির ভূমিকা স্বরূপ, আখিরাতের শাস্তি বর্ণনাতীত।

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ : অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা কাফের মুশরিক, যারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা পথহারা দিশেহারা– তারা সত্য থেকে দূরে তাই তাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর আখিরাতে দোজখের শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা কাফের, মুশরিক তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকারগ্রস্ত, তারা এমন অন্যায় কাজে লিপ্ত যার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ, তারা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল, আখিরাত সম্পর্কে বে-খবর, অথচ ভয়াবহ পরিণতি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ৯৩]

তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ "সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে– দোজখের শাস্তির স্বাদ উপভোগ কর"। অর্থাৎ যারা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালতকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন উপুর করে দোজখের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা মর্মে মর্মে অনুভব করবে যে, দুনিয়ার জীবনে তারা ছিল অপরাধী, সেই অপরাধেরই শাস্তি তারা ভোগ করবে।

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَلْمُجْرِمِيْنَ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার সকল কাফেরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ইতিপূর্বে اَكُفَّارُكُمْ বলে শুধু মক্কার কাফেরদরেকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ : শানে নুযূল : মুসলিম শরীফ এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মুশরিক ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে ঝগড়া করার নিমিত্তে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট হাজির হয়, তখন اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ থেকে بِقَدَرٍ পর্যন্ত নাজিল হয়।

–[তাফসীরে মাযহারী খ. ১১, পৃ. ২০৮, রূহুল মা'আনী খ. ২৭. পৃ. ৯৪]

قَوْلُهُ قَدْرًا : শব্দের আভিধানিক অর্থ– পরিমাপ করা, কোনো বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরি করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণির বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোটবড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরি করেছেন। আঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরি করেননি; দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরিয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি আল্লাহর তাকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ কোনো কোনো হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, কুরাইশ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টিলাভ করে, তা এই আদিকালীন তাকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টিলাভ করে।

তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কফের। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে, তারা ফাসিক। আহমদ, আবূ দাউদ ও তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক মজূসী [অগ্নিপূজারী কাফের] থাকে। আমার উম্মতের মজূসী তারা, যারা তাকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে তাদের কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না।

–[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَمَآ اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ .... فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ : অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমাদের ন্যায় অনেক কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছেন, কেউ তাতে বাধা দিতে পারেনি, এসব কথা শুনেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? আর আল্লাহ পাকের কাজ তো চোখের পলকের ন্যায় ক্ষণিকের মধ্যেই হয়ে যায়, তাঁর ইচ্ছা হলেই তা বাস্তবায়িত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ উক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কিয়ামত আসবে চোখের পলকের ন্যায়। -[কালবী]

قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ : কিরামুন কাতেবীন নামক দু'জন ফেরেশতা প্রত্যেকটি মানুষের ডান এবং বাম কাঁধে কর্তব্যরত রয়েছেন। প্রত্যেকটি মানুষের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখা হচ্ছে, আর তাই আমলনামা হিসেবে কিয়ামতের দিন প্রত্যেককে দেওয়া হবে এবং সে আমলনামার ভিত্তিতেই পুরস্কার বা শাস্তি হবে। ছোট-বড় যাবতীয় কীর্তিকলাপই আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে এবং সকল বিবরণই সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রয়েছে, যথাসময়ে তা পেশ করা হবে। প্রত্যেকটি মানুষের হাতে তার আমলনামা দিয়ে বলা হবে- اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ "তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর! আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে যথেষ্ট"।

قَوْلُهُ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ - فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের মুশরিক এবং তাকদীরে অবিশ্বাসী লোকদের কীর্তিকলাপ এবং তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে নেককার পরহেজগার বান্দাগণের শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা এ জীবনে জীবনের মালিক আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে, তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন করে, তাঁর প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসরণ করে জীবনকে আল্লাহ পাকের নিয়ামত এবং আমানত মনে করে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়, তারা বেহেশতের বাগানে সম্মান এবং মর্যাদার আসনে অবস্থান করবে, আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে, মনের আনন্দে সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন, ন্যায়বিচার কায়েমকারী নেককার লোকেরা আল্লাহ পাকের নিকট নূরের মিম্বরে আসীন হবে। তারা সেসব লোক, যারা নিজেদের পরিবারবর্গের মধ্যে, আর যা কিছু তাদের কাছে রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ পাকের হুকুমের বরখেলাফ কিছু করে না; বরং তারা সুবিচার কায়েম করে এবং সুবিচারের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ করে। -[মুসলিম শরীফ]

তাফসীরকারগণ বলেছেন, مَقْعَدِ صِدْقٍ [সত্যবাদিতার স্থান] কথাটির তাৎপর্য হলো, এমন স্থান যেখানে কোনো গুনাহ বা অহেতুক কথা হবে না, এর দ্বারা জান্নাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (র.) লিখেছেন, ইমাম জাফর সাদেক (র.) বলেছেন, আল্লাহ পাক 'মাকাম' শব্দের গুণ বর্ণনা করেন صِدْقٍ শব্দ দ্বারা। এর তাৎপর্য হলো, যারা সত্যবাদী, তারাই সেখানে আসন পাবেন।

-[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ৯৬, মাযহারী খ. ১, পৃ. ২১০]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরা রাহমান

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরার শুরুতে বর্ণিত আর-রাহমান শব্দটিকেই গোটা সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আর-রাহমান অর্থ– পরম করুণাময়। এ সূরার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পরম করুণাময় আল্লাহর গুণ পরিচয়ের বাহ্যিক প্রকাশ, প্রতিফল ও নিদর্শনাদির উল্লেখ রয়েছে। এ সূরার অপর একটি নাম হলো 'উরূসুল কুরআন'। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– প্রত্যেকটি জিনিসের একটি সৌন্দর্য রয়েছে। আর এ সৌন্দর্যের কারণে সে জিনিসটি দুলহানের ন্যায় হয়, আর কুরআনে কারীমের সৌন্দর্য হলো সূরা আর-রাহমান।

সূরা রাহমানের আয়াত সংখ্যা– ৭৬/৭৮, বাক্য সংখ্যা ৩৫১, আর অক্ষর হলো ১৬৩৬টি।

সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : আল্লামা আলূসী (র.) তাঁর প্রণীত তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ মত পোষণ করেন যে, সূরা রাহমান মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে মরদবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের এবং হযরত আয়শা (রা.)-এর মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ইবনুন নুহাস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীরকার মুকাতিল (র.) এ মতই পোষণ করতেন। –[রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ৯৬]

নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ এ সূরাটি মক্কী হওয়ার প্রমাণ বহন করে–

* হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেছেন, রাসূল ﷺ-কে আমি হারাম শরীফে কা'বা ঘরের সেদিকে ফিরে নামাজ পড়তে দেখেছি, যেখানে হাজরে আসওয়াদ অবস্থিত। যখন "فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়নি, এটা সেই সময়ের কথা। এ নামাজে মুশরিকরা রাসূল ﷺ -এর মুখে "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" শব্দগুলো শুনেছিল। এ হতে জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি মহানবী ﷺ প্রকাশ্য দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করার পূর্বে অর্থাৎ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[মুসনাদে আহমদ]

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, একদা মহানবী ﷺ সূরা রাহমান নিজে তেলাওয়াত করলেন কিংবা তাঁর সম্মুখে এ সূরাটি তেলওয়াত করা হলো। এরপর তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জিনেরা আল্লাহর এ প্রশ্নের যেরূপ জবাব দিয়েছিল তোমাদের নিকট হতে সেরকম জবাব শুনতে পাই না কেন? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসিলেন, জিনদের জবাব কিরূপ ছিল? তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি যখন "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" আয়াত পাঠ করতাম তখন তারা "لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ" অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রভুর [আল্লাহর] কোনো একটি নিয়ামতকেও অস্বীকার করি না। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা আহকাফে মহানবী ﷺ -এর পবিত্র জবানে জিনদের কুরআন শ্রবণের যে ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তখন রাসূল ﷺ নামাজে সূরা রাহমান তেলাওয়াত করেছিলেন। এটা নবুয়তের দশম বছরের ঘটনা। রাসূল ﷺ তখন তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনকালে 'নাখলা' নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এটা হতে জানা যায় যে, সূরা হিজর ও সূরা আহকাফের পূর্বে সূরা রাহমান অবতীর্ণ হয়েছিল। –[তাফসীরে তাবারী]

* হযরত উরওয়া ইবনে জুবাইর হতে ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম একদা পরস্পর বলাবলি করলেন যে, কখনো কুরাইশরা কাউকে প্রকাশ্যে বা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ করতে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে তাদেরকে একবার আল্লাহর এ কালাম শুনিয়ে দেবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এটা এমন লোকের করা উচিত যার বংশ ও পরিবার প্রবল শক্তিশালী। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আল্লাহই হেফাজতকারী। এরপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) দ্বি-প্রহরে মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সূরা রাহমান পাঠ করা শুরু করে দিলেন। এ কারণে কুরাইশরা তাঁর উপর অত্যাচার চালাতে লাগল। কিন্তু হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তাদেরকে শুনিয়েই যেতে থাকলেন।

এ সকল বর্ণনা হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা কামারে নবুয়তের সত্যতার দলিল হিসেবে প্রিয়নবী ﷺ -এর মুজেযার উল্লেখ রয়েছে। এরপর অতীতের বিভিন্ন জাতির নাফরমানির উল্লেখ করে তাদের উপর যেসব আজাব এসেছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য সূরায় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে আল্লাহর অনন্ত অসীম নিয়ামতের বর্ণনা রয়েছে।

এ সূরার বৈশিষ্ট্য : সূরা রাহমান আপন বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় সমুজ্জ্বল। এ সূরার ভাব ও ভাষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়গ্রাহী। এ সূরার মিষ্টি মধুর শব্দ চয়ন এবং আশাব্যঞ্জক ভাব মানুষ মাত্রকে আকৃষ্ট করে, আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের আশীষে মানুষ আশান্বিত হয়। মানব মন কৃতজ্ঞ হয়। এ সূরাটি ছন্দের মাধুর্য, সুর লহরী এবং ভাষার অলংকারে মুগ্ধ হয়ে পৌত্তলিকরা পর্যন্ত সৎকাজে অনুপ্রাণিত হতো।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সঙ্কলন করেছেন। মহানবী ﷺ একদা সাহাবীগণের মজলিসে আগমন করে এ সূরার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। সাহাবায়ে কেরাম নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করতে থাকেন। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, হে লোক সকল! আমি এ সূরা জিনদেরকে শুনিয়েছি। আমি যখন এ আয়াত "فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ" তেলাওয়াত করেছি। তখন জিনেরা এ বলে জবাব দিয়েছে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করি না, তোমারই জন্য রয়েছে সকল প্রশংসা। কিন্তু তোমরা এ সূরা শ্রবণ করে নীরব রইলে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরা নামাজ ব্যতীত অন্য সময় যদি তেলাওয়াত বা শ্রবণ করা হয় তবে সুন্নত হলো উল্লিখিত আয়াতের পর জবাব প্রদান করা। আর নামাজের অবস্থায় জবাব দেওয়া যাবে না তবে বিষয়টি চিন্তায় আনতে পারে।

সূরার বিষয়বস্তু : সূরা রাহমানে মানুষ ও জিনদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা, অপরিসীমতা, তাঁর সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁর মোকাবিলায় এদের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব এবং তাঁর নিকট এদের জবাবদিহী করার চেতনা ও অনুভূতি জাগিয়ে মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি করার অতীব সাংঘাতিক পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। জিনদেরও মানুষের ন্যায় ইচ্ছা-ক্ষমতা ও এখতিয়ার রয়েছে। জিনদের মধ্যেও মানুষের মতো আল্লাহর অনুগত ও বিদ্রোহী রয়েছে। মহানবী ﷺ -এর আনীত কুরআনের দাওয়াত মানব-দানব উভয়ের জন্যেই উপস্থাপিত হয়েছে- এ কথাটিকে এ সূরাটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে।

সূরার মূল বক্তব্য :

* আল্লাহর রহমতের দাবি হচ্ছে- কুরআনে কারীম মানুষের হেদায়েতের জন্য এসেছে।
* এক আল্লাহ ছাড়া বিশ্বলোকের সকল ব্যবস্থাপনায় অন্য কারো প্রভুত্ব চলছে না।
* এ বিশ্বলোকের গোটা ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ভারসাম্যের সাথে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনোক্রমেই এ ভারসাম্যকে ক্ষুণ্ন করা যাবে না।
* মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরত ও বিস্ময়কর কার্যকলাপের কথা বলার সাথে মানব ও দানবরা আল্লাহর যেসব নিয়ামত ভোগ করছে, তার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।
* মানব ও দানবকে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে এক আল্লাহ ছাড়া চিরন্তন ও শাশ্বত আর কোনো সত্তা নেই।
* মানুষ ও জিন জাতিকে যাবতীয় কর্মের হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। এ থেকে নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই। এটা কিয়ামতের দিন অনুষ্ঠিত হবে।
* এ সূরায় পৃথিবীর নাফরমান জিন ও ইনসানের মর্মান্তিক পরিণতির কথা বলা হয়েছে।
* পৃথিবীতে মানব ও দানবের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে, পরকালকে ভয় পেয়েছে তাদেরকে প্রদেয় নিয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি : অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এ সূরাটি রাসূল ﷺ -এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর অপার করুণা বলেই জগতের সর্ববৃহৎ বস্তু হতে শুরু করে অতি ক্ষুদ্র বস্তু পর্যন্ত সবকিছু সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তাই আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর নাম স্মরণ করে চলতেন। রাসূল ﷺ ও আল্লাহর এ পবিত্র নাম "আর রাহমান" সর্বদা উচ্চারণ করতেন। এটা শুনে মক্কার প্রকৃতি বিশিষ্ট সত্যবিমুখরা অবাক হতো ও বিস্ময়বোধ করত এবং অবজ্ঞা সহকারে বলত 'রাহমান' আবার কে? তাঁকে তো আমরা জানি না। এ সূরা তাদের মূর্খতাসুলভ প্রশ্নের উত্তরে অবতীর্ণ হয়।

এ সূরার ফজিলত : পবিত্র কুরআনের মধ্যে সূরা রাহমান একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। বান্দার প্রতি আল্লাহর কি অশেষ দান রয়েছে? এ সূরায় বার বার সে কথাই আলোকপাত করা হয়েছে। এ সূরার আমল রুজি-রোজগারের জন্য বিশেষ ফলদায়ক। নির্দোষ ব্যক্তি মামলায় পড়লে, শত্রুকে বাধ্য করতে হলে, কারো চোখে অসুখ হলে, প্লীহারোগে আক্রান্ত হলে এ সূরা পাঠ করে রোগীর প্লীহার উপর ফুঁক দেবে। আর যে ব্যক্তি এ সূরা নিয়মিত পাঠ করবে, তার চেহারা কিয়ামতের দিন চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সর্বদা এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তির মন প্রফুল্ল থাকবে। তাকে দুশ্চিন্তা অস্থির করে তুলতে পারবে না। তার যে কোনো দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। যে ব্যক্তি সূরা রাহমান এগারো বার পাঠ করবে আল্লাহর রহমতে তার সকল নেক উদ্দেশ্য হাছিল হবে।

সূরা অবতীর্ণ হওয়ার কারণ : যখন "قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ الخ" আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন মক্কার কাফেরদের মধ্যে আবূ জাহেল, ওয়ালীদ, ওতবা, শায়বা প্রমুখ বলতে লাগল, রহমান কে? আমরা তো তা জানি না, তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে দয়াময় আল্লাহ তা'আলার অনেক গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে; তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কথা এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করা হলো।

বস্তুত মানুষের প্রতি আল্লাহর দানের কোনো সীমা নেই, শেষও নেই। মানুষের অস্তিত্ব, জীবন, যৌবন, জীবনের যাবতীয় উপকরণ- এক কথায় সবকিছুই আল্লাহর মহাদান। এ অসীম দানের মধ্যে আলোচ্য সূরায় মাত্র কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের পরওয়ার দিগারের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ : সূরা রাহমান, মক্কায় অবতীর্ণ

اِلَّا يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْاٰيَةَ فَمَدَنِيَّةٌ وَهِىَ سِتٌّ اَوْ ثَمَانٍ وَ سَبْعُوْنَ اٰيَةً

তবে اِلَّا يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ আর তাতে ৭৬/৭৮টি আয়াত রয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلرَّحْمٰنُ لا

১. 'আর-রাহমান' [পরম দয়ালু আল্লাহ]।

٢. عَلَّمَ مَنْ شَاءَ الْقُرْاٰنَ ط

২. শিক্ষা দিয়েছেন যাকে ইচ্ছা কুরআন।

٣. خَلَقَ الْاِنْسَانَ لا اَىِ الْجِنْسَ.

৩. তিনিই মানব [জাতি] - কে সৃষ্টি করেছেন।

٤. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ النُّطْقَ.

৪. তিনি তাকে কথা বলা বা ভাব প্রকাশ করা শিখিয়েছেন।

٥. اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ لا بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ.

৫. চন্দ্র ও সূর্য হিসেবের সাথে [নিয়ন্ত্রিত] রয়েছে অর্থাৎ গণনায় চলাচল করে।

٦. وَالنَّجْمُ مَا لَا سَاقَ لَهُ مِنَ النَّبَاتِ وَالشَّجَرُ مَا لَهُ سَاقٌ يَسْجُدَانِ. يَخْضَعَانِ بِمَا يُرَادُ مِنْهُمَا.

৬. আর তৃণলতা কাণ্ডবিহীন উদ্ভিদ আর বৃক্ষ তথা কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ উভয়ই আল্লাহর সিজদায় [অবনত] রয়েছে এদের নিকট হতে যা কামনা করা হয়, সে হুকুমের সম্মুখে এরা অনুগত থাকে।

٧. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ لا اَثْبَتَ الْعَدْلَ.

৭. আর তিনি আসমানকে সু-উচ্চ করেছেন এবং তিনিই ভূ-পৃষ্ঠে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

٨. اَلَّا تَطْغَوْا اَىْ لِاَجَلِ اَنْ لَّا تَجُوْرُوْا فِى الْمِيْزَانِ مَا يُوْزَنُ بِهِ.

৮. যেন তোমরা পরিমাপে [কম-বেশির ক্ষেত্রে] সীমালঙ্ঘন না কর। পরিমাপযোগ্য বস্তুতে।

٩. وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ بِالْعَدْلِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ تَنْقُصُوا الْمَوْزُوْنَ.

৯. আর ন্যায়পরায়ণতার সাথে ওজন প্রতিষ্ঠিত কর, [ন্যায়সঙ্গতভাবে] আর পরিমাপে কম করো না ওজনকৃত পণ্যে কম করো না।

١٠. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا اَثْبَتَهَا لِلْاَنَامِ لا لِلْخَلْقِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَغَيْرِهِمْ.

১০. আর তিনিই জমিনকে সৃষ্টজীবের জন্য স্থাপন করেছেন [প্রতিষ্ঠা করেছেন] মানব, জিন ইত্যাদি সকল সৃষ্টির জন্য।

١١. فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اَوْعِيَةُ طَلْعِهَا .

১১. তাতে ফল এবং খোসাযুক্ত খেজুর বৃক্ষ রয়েছে। [গুচ্ছের বাইরের আবরণ, এটা দ্বারা নুতন ফল বুঝিয়েছেন।]

١٢. وَالْحَبُّ كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ ذُوا الْعَصْفِ التِّبْنِ وَالرَّيْحَانُ ج الْوَرَقُ اَوِ الْمَشْمُوْمُ .

১২. আর তুষযুক্ত শস্যদানা যেমন– গম, যব ইত্যাদি তৃণ বিশিষ্ট ও সুগন্ধ পুষ্প রয়েছে– [যেমন পাতা ও নানাবিধ শাক সব্জী।]

١٣. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ نِعَمِ رَبِّكُمَا يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسُ وَالْجِنُّ تُكَذِّبٰنِ . ذُكِرَتْ اِحْدٰى وَّثَلٰثِيْنَ مَرَّةً وَالْاِسْتِفْهَامُ فِيْهَا لِلتَّقْرِيْرِ لِمَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ حَتّٰى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا لِيْ اَرٰىكُمْ سُكُوْتًا لَلْجِنُّ كَانُوْا اَحْسَنَ مِنْكُمْ رَدًّا مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ مِنْ مَرَّةٍ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ اِلَّا قَالُوْا وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ .

১৩. অতএব, হে জিন ও মানবজাতি! [এত অফুরন্ত নিয়ামত দেওয়া সত্ত্বেও] তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? অত্র সূরায় এ আয়াতটি একত্রিশবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর اِسْتِفْهَامْ [প্রশ্নবোধকটি] এখানে تَقْرِيْر বা সাব্যস্তকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাকেম (র.) হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার আমাদেরকে সূরা 'রাহমান' শেষ পর্যন্ত পড়ে শুনান। অতঃপর বললেন, তোমরা নীরব কেন? তোমাদের অপেক্ষা জিন জাতিই উৎকৃষ্ট। যেহেতু যতবারই আমি তাদের সম্মুখে "فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ" পাঠ করেছি, তদুত্তরে প্রত্যেকবারই তারা বলেছে– "لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ" [হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোনো নিয়ামতই অস্বীকার করি না; বরং আমরা আপনার প্রশংসাই বর্ণনা করি।]

١٤. خَلَقَ الْاِنْسَانَ اٰدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِيْنٍ يَابِسٍ يُسْمَعُ لَهٗ صَلْصَلَةٌ اَيْ صَوْتٌ اِذَا نُقِرَ كَالْفَخَّارِ لا وَهُوَ مَا طُبِخَ مِنَ الطِّيْنِ .

১৪. আল্লাহ মানুষকে তথা আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক মৃত্তিকা হতে, বিশুদ্ধ মাটি যাতে আঘাত করলে ঠন ঠন শব্দ বেজে উঠে, পোড়ামাটির মতো। আর ফাখখার হলো সেই মাটি, যা আগুনে পোড়ানো হয়।

١٥. وَخَلَقَ الْجَآنَّ اَبَا الْجِنِّ وَهُوَ اِبْلِيْسُ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ج هُوَ لَهَبُهَا الْخَالِصُ مِنَ الدُّخَانِ .

১৫. এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন জিন জাতির পিতাকে আর সে হলো ইবলিস। নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এমন বিশুদ্ধ অগ্নিশিখা, যা ধোঁয়ামুক্ত।

١٦. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

১৬. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা উভয়ে স্বীয় পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٧. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ مَشْرِقِ الشِّتَاءِ وَمَشْرِقِ الصَّيْفِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ج كَذٰلِكَ .

১৭. তিনি উভয় উদয়াস্থল শীত ও গ্রীষ্মের এবং অনুরূপ উভয় অস্তাচল শীত ও গ্রীষ্মের পালনকর্তা।

١٨. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

১৮. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে।

١٩. مَرَجَ اَرْسَلَ الْبَحْرَيْنِ الْعَذْبَ وَالْمِلْحَ يَلْتَقِيٰنِ لا فِيْ رَأْيِ الْعَيْنِ .

১৯. তিনি সম্মিলিত করেন প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র মিষ্ট ও লোনা, যারা পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে বাহ্যিক দৃষ্টিতে।

٢٠. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ حَاجِزٌ مِنْ قُدْرَتِهٖ تَعَالٰى لَا يَبْغِيٰنِ لَا يَبْغِىْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ فَيَخْتَلِطَ بِهٖ .

২০. এতদুভয়ের মধ্যে একটি অন্তরায় রয়েছে আল্লাহর কুদরতের প্রতিবন্ধক যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মিশ্রিত হয়ে পড়বে না। অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে সংমিশ্রণ হতে পারে না।

٢١. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

২১. অতএব [হে জিন ও মানুষ!] তোমরা স্বীয় রবের কোন কোন্ নিয়ামত অস্বীকার রকবে?

٢٢. يَخْرُجُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُوْلِ وَالْفَاعِلِ مِنْهُمَا مِنْ مَجْمُوْعِهِمَا الصَّادِقِ بِاَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمِلْحُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ج خَرَزٌ اَحْمَرُ اَوْ صِغَارُ اللُّؤْلُؤِ .

২২. বের হয়ে থাকে (يَخْرُجُ) ক্রিয়াপদটিকে ফায়েল [কর্তৃবাচ্য] ও মাফঊল [কর্মবাচক] উভয় প্রকার ক্রিয়াপদ রূপে পাঠ করা যায়। উভয় সমুদ্র হতে অর্থাৎ উভয়ের সমষ্টি হতে, যা লবণাক্ত সমুদ্রের উপর আরোপিত হয়ে থাকে মুক্তা ও প্রবাল লালমুক্তা অথবা ছোট ছোট মতি।

٢٣. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

২৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা স্বীয় পালনকর্তার কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে।

٢٤. وَلَهُ الْجَوَارِ السُّفُنُ الْمُنْشَاٰتُ الْمُحْدَثَاتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ج كَالْجِبَالِ عِظَمًا وَارْتِفَاعًا .

২৪. আর তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে জাহাজসমূহ যা [বিচরণশীল] চলাচলকারী সমুদ্রের মধ্যে পর্বত সদৃশ উচ্চতা ও বিশালতায় পাহাড়ের ন্যায়।

٢٥. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

২৫. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ السَّمَاءُ : اَلسَّمَاءُ শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ- اَلسَّمَاءُ শব্দের (ء) হামযা অক্ষরের উপর اِشْتِغَال -এর ভিত্তিতে نَصَب দিয়ে পড়েছেন। আর আবূ সাম্মাক مُبْتَدَأ -এর ভিত্তিতে اَلسَّمَاءُ শব্দের হামযাকে رَفَع দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ لَا تُخْسِرُوْا : لَا تُخْسِرُوْا শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ لَا تُخْسِرُوْا শব্দটি بَابُ اِفْعَال হতে নির্গত হওয়ার কারণে তার (ت) অক্ষরের উপর ضَمَّة এবং (س) অক্ষরের নিচে كَسْرَة দিয়ে "وَلَا تُخْسِرُوْا" পড়ে থাকেন। বেলাল ইবনে আবূ বুরজা প্রমুখ ক্বারীগণ ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ হতে গৃহীত হওয়ার ভিত্তিতে উক্ত শব্দের ت ও س অক্ষরদ্বয়ের উপর فَتْحَة দিয়ে পড়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اَلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ : اَلْحَبُّ - ذُوالْعَصْفِ - وَالرَّيْحَانُ শব্দগুলো فَاكِهَةٌ শব্দের উপর مَعْطُوْف ধরে তাদের শেষ অক্ষরসমূহের উপর ضَمَّة দিয়ে পড়েছেন। আর ইবনে আমের প্রমুখ ক্বারীগণ اَلْحَبُّ - ذُوالْعَصْفُ শব্দ দুটি نَصَبْ দিয়ে পড়েছেন। কারণ শব্দদ্বয় اَلْاَرْض -এর مَعْطُوْف হয়েছে। হামযা ও কাসায়ী (র.) وَالرَّيْحَانُ শব্দের নিচে كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন। এখানে প্রথম কেরাতটি গ্রহণযোগ্য ও উত্তম।

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ : اَلرَّحْمٰنُ শব্দটির তারকীব নিয়ে তাফসীরকারদের নিম্নোক্ত মতদ্বন্দ্ব রয়েছে–

* কেউ কেউ বলেন– اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি মুবতাদা মাহযূফের খবর হবে। মূল বাক্যটি হবে– اَللّٰهُ اَلرَّحْمٰنُ
* কোনো মুফাসসির বলেন– اَلرَّحْمٰنُ হলো মুবতাদা। আর পরবর্তী আয়াত عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ হলো খবর।
* কারো কারো মতে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি মুবতাদা আর তার খবর মাহযূফ বা উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য হবে– اَلرَّحْمٰنُ رَبُّنَا
* কতিপয় তাফসীরকারকের মতে এখানে اَلرَّحْمٰنُ -এর পূর্বে একটি هُوَ উহ্য আছে যা মুবতাদা হবে। আর اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ মিলে তার খবর হবে।

উল্লেখ্য যে, প্রথম দু'টি তারকীবের ভিত্তিতে اَلرَّحْمٰنُ একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। আর শেষোক্ত তারকীবের ভিত্তিতে اَلرَّحْمٰنُ টি পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়।

قَوْلُهُ اَلسَّمَاءُ وَالْاَرْضُ : اَلسَّمَاءُ এবং اَلْاَرْضُ শব্দ দুটি مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ হিসেবে মহল্লান মানসূব হয়েছে। যার আমেল وُجُوْبًا قِيَاسًا উহ্য রয়েছে। কাজেই শব্দ দুটি তাদের আমেলসহ পৃথক পৃথক বাক্য। আর رَفَعَهَا এবং وَضَعَهَا হলো পৃথক বাক্য।

অথবা এ শব্দ দু'টি اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ -এর উপর عَطْف হওয়ার কারণে মহল্লান মারফূ' হয়েছে।

قَوْلُهُ رَبُّ : "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ" -এর رَبُّ শব্দটির মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. মশহুর এবং মুতাওয়াতির কেরাত হচ্ছে رَبُّ শব্দের ب -এর উপর পেশ দিয়ে পড়া।

২. ইবনে আবূ আইলার মতে رَبِّ শব্দের ب -এর নিচে কাসরা দিয়ে পড়া হবে।

قَوْلُهُ يَخْرُجُ : يَخْرُجُ শব্দটির মধ্যেও নিম্নোক্ত দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. মশহুর কেরাত হলো– يَخْرُجُ -এর يَاءٌ -এর উপর যবর এবং رَاءٌ হবে পেশযুক্ত।

২. নাফে এবং আবূ আমরের মতে يُخْرَجُ -এর يَاءٌ -এর উপর পেশ এবং رَاءٌ যবরযুক্ত হবে।

قَوْلُهُ الْمُنْشَئٰتُ : এখানে দু'টি কেরাত রয়েছে–

১. অধিকাংশ কারীদের মতে اَلْمُنْشَئٰتُ -এর ش -এর উপর যবর দ্বারা হবে। আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।

২. হযরত হামযা ও আবূ বকরের মতে اَلْمُنْشِئٰتُ -এর ش -এর নিচে কাসরা হবে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ : উল্লেখ্য যে, رَبُّ শব্দটির মহল্লে ই'রাব কেরাতের ভিত্তিতে হয়েছে। সকল কারীগণ رَبُّ শব্দের ب -কে পেশ দিয়ে পড়েছেন। এখানে رَبُّ শব্দটি নিম্নোক্ত তিনটি কারণে মারফূ' হয়েছে–

১. رَبُّ শব্দটি মুবতাদা। এর খবর হচ্ছে– مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ আর "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" বাক্যটি জুমলায়ে মুস্তানাফা।

২. رَبُّ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর। মূল বাক্য হবে– هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

৩. رَبُّ الْمَشْرِقِ বাক্যটি خَلَقَ الْاِنْسَانَ -এর خَلَقَ ফে'লের যমীর হতে بدل হয়েছে। এ তিন কারণে رَبُّ শব্দটি مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

তবে ইবনে আবী আইলা رَبِّ -এর ب টি কাসরা দিয়ে পড়েছেন। কারণ এটি لِرَبِّكُمَا হতে বদল অথবা بَيَانٌ হওয়ায় মাজরূর হয়েছে।

قَوْلُهُ يَلْتَقِيَانِ : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ আয়াতে يَلْتَقِيَانِ ফে'লটি তার ফায়েলের সাথে মিলিত হয়ে اَلْبَحْرَيْنِ হতে حَالٌ হয়েছে। এটা حَالٌ مُقَارِنَةٌ -এর কাছাকাছি। এটা ছাড়া يَلْتَقِيَانِ টা اَلْبَحْرَيْنِ হতে حَالٌ مُقَارِنَةٌ হওয়াও বৈধ।

قَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ : এ বাক্যটি জুমলায়ে মুস্তানাফাহ হতে পারে এবং حَالٌ -ও হতে পারে। তাছাড়া وَبَيْنَهُمَا যরফটি নিজেই حَالٌ হতে পারে। আর بَرْزَخٌ হলো উক্ত ظَرْف -এর ফায়েল। এটি অধিক যুক্তিসঙ্গত মত।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ যদি جُمْلَة حَالِيَة বা حَال হয়ে থাকে তবে তার ذُوالْحَالِ কোনটি হবে? এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা–

১. اَلْبَحْرَيْنِ হলো এর ذُوالْحَالِ

২. يَلْتَقِيَانِ ফে'লের ফায়েল বা তাতে উহ্য هُمَا যমীর ذُوالْحَالِ হবে।

قَوْلُهُ لَا يَبْغِيَانِ : এখানে لَا يَبْغِيَانِ টি اَلْبَحْرَيْنِ হতে দ্বিতীয় حَالْ হয়েছে। يَلْتَقِيَانِ হলো প্রথম। আর দ্বিতীয় حَالْ টি حَالْ مُعَلَّلَة -এর পর্যায়ভুক্ত হবে। অর্থাৎ বাক্যটি لِئَلَّا يَبْغِيَانِ হওয়া উচিত। কারো কারো মতে মূল বাক্যটি لِئَلَّا يَبْغِيَانِ ছিল এরপর اَنْ এর সাথে حَرْف عِلَّت -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে لَا يَبْغِيَانِ হয়ে فِعْل مَرْفُوْع হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ : **শানে নুযূল** : এ আয়াতটি মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সূরা ফুরকানের আয়াত "وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا" [অর্থাৎ "তাদেরকে যখন বলা হয় রহমানকে সিজদা কর, তখন তারা মূর্খতা ও বিরোধিতাবশত বলে রহমান কি জিনিস? আমরা কি তাঁকেই সিজদা করব? যাকে সিজদা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বলবে এবং এতে তাদের ঘৃণা আরো বেড়ে যায়।"] যখন অবতীর্ণ হয়, তখন মক্কার কাফেররা ঘৃণা ভরে বলে, আমরা রহমান বলতে ইয়ামামার রহমানকে বুঝি। হে মুহাম্মদ ﷺ! যে রহমানের সম্মুখে তুমি আমাদেরকে সিজদা করার আহ্বান করছ, তার সামনে আমরা মাথা নত করতে পারব না। আর ইয়ামামার রহমান ছাড়া আমাদের অনেক ইলাহ রয়েছে, যাদের সামনে আমরা মস্তক অবনত করি। এ আয়াতটি তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয়েছে।

অথবা মক্কার কাফের মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল যে, ইয়ামামা প্রদেশের 'মুসায়লামাতুল কায্যাব' নামে একজন মানুষ যিনি রহমান বা দয়ালু নামে পরিচিত। তিনি মুহাম্মদ ﷺ -কে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন। আলোচ্য আয়াতটি তাদের বক্তব্যের জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে।

অথবা, اَلرَّحْمٰنُ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলারই গুণবাচক নাম। এ সম্পর্কে মক্কার কাফেরদেরকে অবগত করিয়ে দেওয়া। কেননা রহমান শব্দটির প্রচলন তাদের মধ্যে কম ছিল। বস্তুত ইসলামি শিক্ষার প্রতি তাদের এতই ঘৃণা ছিল যে, ইসলামি শব্দগুলোর প্রতিও তারা ঘৃণাপোষণ করত। কুরআনে এ শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হওয়ায় তারা শব্দটির বিরোধী হয়েছে। এ কারণে এ আয়াতটির মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী ﷺ পবিত্র কুরআনের রচয়িতা নন; বরং শিক্ষাদাতা। মহান রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন এর রচয়িতা, যাঁর বিশেষ গুণ হলো রহমান বা পরম দয়ালু। এ কুরআনুল কারীমের শিক্ষা তিনিই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ -কে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ : আল্লাহর বাণী– "اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ" অর্থাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ তিনিই মুহাম্মদ ﷺ -কে এই কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনের শিক্ষা দেওয়ার মর্মার্থ কুরআনের মাধ্যমে মানবজাতির জীবন-যাপনের সঠিক হেদায়েত সম্পর্কিত পরিপূর্ণ জীবন-বিধান শিক্ষা দেওয়া। যা অন্যান্য আসমানি গ্রন্থে পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়নি। ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যা দুনিয়ার সকল মানবের হেদোয়েতের জন্য নবী করীম ﷺ নিয়ে এসেছিলেন। এখানে কুরআনে কারীমের শিক্ষা দেওয়ার অর্থ তার উপস্থাপিত জীবনাদর্শ বিশদভাবে শিক্ষা দেওয়া।

قَوْلُهُ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ : আল্লাহ তা'আলার বাণী– "اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ" -এর মধ্যে خَلَقَ الْاِنْسَانَ -এর আগে عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ -এর উল্লেখ করেছেন। অথচ বাহ্যত تَعْلِيْمُ الْقُرْاٰنِ -এর উল্লেখ خَلَقَ الْاِنْسَانَ -এর পরে হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জানেন। কারণ তিনিই সকল জ্ঞান ও কৌশলের আধার। তবে আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ এখানে একটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন; তা এই যে, মানবজাতি সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআনে কারীমের শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষকে যে সংবিধান অনুসরণ করতে হবে তা হলো আল-কুরআন। আল-কুরআনের শিক্ষাই হবে মানবজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এর বিপরীত পথ অনুসরণ করলে বিপথগামী ও অভিশপ্ত হবে। আল্লাহ তাকে কঠিন আজাব প্রদান করবেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা خَلَقَ الْاِنْسَانَ -এর উল্লেখ করার পূর্বে عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ -এর আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ : আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি নিয়ামত হলো– "তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন"। যার ফলে মানুষ সহস্র প্রকারে উপকৃত হয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহ মানুষের খালেক বা সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁরই দায়িত্ব হলো নিজের সৃষ্টিকুলের হেদায়েত করা। এ কারণেই আল্লাহর নিকট হতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া একদিকে যেমন তাঁর পরম দয়াশীলতার অনিবার্য দাবি, তেমনি তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ারও অপরিহার্য

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দাবি কুরআন অবতরণ; সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টির বিবিধ ব্যবস্থা ও কর্মপথ নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব আল্লাহর পক্ষ হতে মানবজাতির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া সাধারণ ব্যাপার। কুরআন শিক্ষা পাওয়ার পর মানুষ কিভাবে চলবে, এ তত্ত্ব কুরআনের একটি মূল আলোচ্য বিষয়। এ কথাটি কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন– এক আয়াতে বলেছেন– "وَاِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى" "অর্থাৎ পথ-প্রদর্শন ও কর্মপদ্ধতি বলে দেওয়া আমার কর্তব্য"। অপর স্থানে বলেছেন– "وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ" অর্থাৎ সরল সঠিক পথ বলে দেওয়া আল্লাহরই দায়িত্ব।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ আয়াতে বর্ণিত بَيَانٌ -এর মর্মকথা : তাফসীরকারগণ بَيَانٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন– بَيَانٌ -এর অর্থ ভাষা অথবা সকল বস্তুর নাম, এ ক্ষেত্রে আয়াতে اِنْسَانٌ দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেন– اِنْسَانٌ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য আর بَيَانٌ দ্বারা হারাম হতে হালালের বর্ণনা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হারাম হতে হালাল বস্তুকে পার্থক্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বিপথ হতে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন– بَيَانٌ অর্থ ভালো ও মন্দের বর্ণনা। অর্থাৎ আল্লাহ ভালো ও মন্দের বর্ণনা দিয়েছেন, তবে بَيَانٌ -এর উত্তম অর্থ হলো, প্রত্যেক জাতি যেই ভাষায় কথা বলে থাকে, তাদেরকে ঐ ভাষা শিক্ষা দেওয়া আর اِنْسَانٌ দ্বারা সকল মানুষই উদ্দেশ্য। তখন আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাদের নিজ নিজ ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন; যেই ভাষায় তারা কথা বলে থাকে। –[ফাতহুল কাদীর]

কেউ কেউ বলেন– بَيَانٌ অর্থ– মনের ভাব ও আবেগ প্রকাশ করা। অর্থাৎ কথা বলা, নিজের বক্তব্য ও মনের ভাবধারা প্রকাশ করা। মনের ভাব প্রকাশ করা বা কথা বলা মানবজাতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টি হতে পৃথক সত্তার অধিকারী প্রমাণ করে। অনুরূপভাবে মানুষের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে একটি নৈতিক চেতনা ও বোধ স্বাভাবিকভাবেই রেখে দিয়েছেন। এর দরুনই মানুষ পাপ-পুণ্য; হক-বাতিল, জুলুম-ইনসাফ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে।

قَوْلُهُ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ : সূর্য এবং চন্দ্র হিসেবের সাথে চলছে এবং হিসেবের অনুসরণে চলা বাধ্য। কারণ, মানুষ এ পৃথিবীর দিবা-রাত্রি, ফসল ও মৌসুমের হিসাব তথা বিশ্বজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এ দুটি গ্রহে গতি ও কিরণ রশ্মির ভিত্তিতে করছে এবং দুটি গ্রহের চলাচল ও পরিভ্রমণের আলোকে চলছে। এদের গতির উপর শীত গ্রীষ্ম এবং বার মাসের গণনা তথা মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এদের মাধ্যমেই দিবা-রাত্রির পার্থক্য এবং ঋতু পরিবর্তন নির্ধারিত হয়ে থাকে। সূর্যের উদয়-অস্ত ও বিভিন্ন কক্ষপথ অতিক্রম করে যাওয়ার যেই নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তাতে এক বিন্দু পরিবর্তন ও ব্যতিক্রম হয়নি। পরিভ্রমণের ফলে চন্দ্র ও সূর্যের ক্ষয় হয়নি। এরা সৃষ্টির প্রথম হতে কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় নিজেদের দায়িত্ব আদায় করে যেতে থাকবে। এটা আল্লাহর প্রভুত্বের নীতি।

আল্লাহর সৃষ্টি ও মানব আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– মানব আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে ভাঙ্গাগড়া এক অপরিহার্য নিয়ম, মেশিন যতই শক্ত হোক না কেন, কিছুদিন চলার পর তা মেরামত করা এবং কক্ষপথে কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর মেরামত করার সময় তা অকেজো হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রবর্তিত বস্তুর কোনো সময় মেরামতের প্রয়োজন হয় না এবং এদের অব্যাহত গতিধারার কোনো পার্থক্যও হয় না। এটাই আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম ও মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য। এ জন্য গ্রহ দুটি মানুষের জন্য নিয়ামত বটে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

বিজ্ঞান ও আল্লাহর বিধানের মধ্যে পার্থক্য : আল্লাহ তা'আলা বলেন– "وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ" অর্থাৎ "চন্দ্র ও সূর্য একটা হিসেবের অনুসরণে বাধ্য।" আলোচ্য আয়াতের মূলবক্তব্য হচ্ছে– এ পৃথিবীতে সময়, দিন, তারিখ ফসল ও মৌসুমের হিসাব তথা বিশ্বজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এ দুটি গ্রহের গতি ও কিরণরশ্মির ভিত্তিতে চলছে। পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা এ দুটি গ্রহের চলাচল ও পরিভ্রমণের আলোকে চলছে। মানব জীবনের সকল কাজকর্ম এদের উপরই নির্ভর করে। দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন, মাস ও বছর এদের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সূর্যের উদয়-অস্ত ও বিভিন্ন কক্ষপথ অতিক্রম করে যাওয়ার যে নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত হয় না; এটা এমন অটল বিধান যা লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে কোনোরূপ ব্যতিক্রম হয়নি। এতো পরিভ্রমণের ফলে চন্দ্র ও সূর্যের কোনোই ক্ষয় হয়নি। সৃষ্টির শুরু হতে অদ্যাবধি এরা নিজ নিজ কর্ম যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছে এবং এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এরা নিজেদের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যেতে থাকবে। কখনো এগুলোর কোনোরূপ মেরামতের প্রয়োজন হবে না। এটাই আল্লাহর ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মানব আবিষ্কৃত বস্তু হতে এটা সম্পূর্ণ আলাদা। –[মা'আরিফুল কুরআন]

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ বলা হয়। প্রতিটি মানুষকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার হতবুদ্ধি করে রেখেছে। তবে আল্লাহর সৃষ্টি ও মানব আবিষ্কৃত বস্তুর মধ্যে এ বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মানুষের আবিষ্কৃত বস্তু যতোই মজবুত হোক না কেন কিছু দিন সার্ভিস দেওয়ার পর তাতে মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর মেরামত করার সময় তা অকেজো হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এ ধরনের কোনোই খুঁত নেই এবং থাকবেও না। এটাই আল্লাহর বিধান ও মানুষের অর্জিত বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِحُسْبَانٍ -এর তাফসীরে بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর তাফসীর بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ দ্বারা করেছেন। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, بِحُسْبَانٍ শব্দটি مُفْرَدٌ বা একক যা এখানে حِسَابٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেরূপভাবে كُفْرَانٌ - رُجْحَانٌ ইত্যাদি মুফরাদের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা ব্যতীত حُسْبَانٌ শব্দটি حِسَابٌ শব্দের বহুবচনও হতে পারে। যথা– شِهَابٌ শব্দের বহুবচন হলো– شُهْبَانٌ এবং رَغِيْفٌ শব্দের বহুবচন হলো رُغْفَانٌ মাস ও মৌসুমের দিক বিবেচনা করে চাঁদ ও সূর্য উভয়েই নিজ নিজ কক্ষপথে এর নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের সাথে স্তরসমূহ ও রাশিগুলো অতিক্রম করতে থাকে। এ কথার প্রতি ইমাম মহল্লী (র.) بِحِسَابٍ يَجْرِيَانِ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ : আয়াতে اَلنَّجْمُ শব্দটির দ্বারা এখানে শ্যামলা বা তৃণলতা উদ্দেশ্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এখানে نَجْمٌ শব্দ দ্বারা তৃণলতা এবং যে গাছের কাণ্ড হয় না, এমন গাছ বুঝানো হয়েছে। কেননা এ শব্দটির পর اَلشَّجَرُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর شَجَرٌ বলা হয় কাণ্ডযুক্ত বৃক্ষরাজিকে। কাজেই এখানে نَجْمٌ দ্বারা কাণ্ডবিহীন বৃক্ষ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নভোমণ্ডলের নক্ষত্ররাজি ও ভূমণ্ডলের বৃক্ষরাজি প্রণিপাত করছে। এতদুভয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার যা উদ্দেশ্য, তারা তাই সমাধা করে আসছে। আর এ অর্থের প্রতি يَسْجُدَانِ শব্দটিও পূর্ববর্তী আয়াত ..... اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ইঙ্গিত পোষণ করে। পক্ষান্তরে এখানে কাণ্ডবিহীন গাছ উদ্দেশ্য হওয়া অধিক শোভনীয়; যাতে আয়াতের পূর্বাপর সামঞ্জস্যতা, পারস্পরিক সংযোগ এবং সাম্যতা রক্ষা পায়। হাফেজ ইবনে কাসীর (র.)-এর মতটিও যথার্থ বলে মনে হয়। তিনি বলেন, ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয়ের বিচারে দ্বিতীয় অর্থ তথা আকাশমণ্ডলের তারকা-নক্ষত্র অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কেননা এ শব্দটির প্রচলিত ও সর্বজন জ্ঞাত অর্থ এটাই। আর সূর্য ও চন্দ্রের পর নক্ষত্ররাজির উল্লেখ খুব স্বাভাবিক, সামঞ্জস্যতা সহকারেই হয়েছে বলতে হবে। সূরা হজ্জেও নক্ষত্রসমূহ ও গাছপালার সিজদায় অবনত হওয়ার কথা বলা হয়েছে– وَاللّٰهُ اَعْلَمُ –[ইবনে কাসীর]

অতএব আয়াতের মর্মার্থ হবে– "নভোমণ্ডলের তারকাপুঞ্জ আর পৃথিবী বক্ষের বৃক্ষরাজি সবকিছুই মহান আল্লাহর অনুগত, তাঁর নিকট বিনীত ও তাঁর আইন-বিধান পালনকারী।"

'সিজদার' প্রকৃত অর্থ হলো– 'মাটির উপর মুখমণ্ডল রেখে সম্মান প্রদর্শন করা, কিন্তু এখানে রূপক অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা তারকাপুঞ্জ ও গাছপালা কোনো নড়াচড়া বা মস্তক অবনত না করে নিজ নিজ স্থানে স্থির থেকে আল্লাহর সিজদায় রয়েছে। অতএব আয়াতে 'সিজদা' রূপকভাবে বলা হয়েছে। এটা ছাড়াও সূরা হজ্জে রয়েছে–

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ .... وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ –

অর্থাৎ "তুমি কি এটা দেখ না? আল্লাহর সমীপে সকলেই মস্তক অবনত করছে, যা কিছু আসমানসমূহ ও জমিনে আছে এবং সূর্য ও চন্দ্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলী ও পর্বতমালা এবং বৃক্ষরাজি, আর সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু এবং মানুষের মধ্যকার বহু লোকও।" কাজেই এখানে 'সিজদার' উদ্দেশ্যগত অর্থ "আনুগত্য প্রকাশ করা" গ্রহণ করা হয়েছে। সকল বস্তু স্বীয় অবস্থা অনুযায়ী আনুগত্য প্রকাশ করে। সৃষ্টি জগতের এ বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সিজদা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

–[তাফসীরে কবীর, বয়ানুল কুরআন]

اَلْمِيْزَانُ শব্দটি তিনবার বলার তাৎপর্য : اَلْمِيْزَانُ শব্দটি তিনটি আয়াতে তিনবার ধারাবাহিক উল্লেখ করার তাৎপর্য হচ্ছে– প্রথম আয়াতে اَلْمِيْزَانُ শব্দের অর্থ– দাঁড়ি-পাল্লা। কেননা 'মীজান' তথা দাঁড়ি-পাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায়বিচার। তাফসীরকারগণ এখানে মীজানের অর্থ করেছেন 'সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা'। আর 'মীজান' প্রতিষ্ঠিত করেছেন -এর অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলাও বিশ্বলোকের এ সমগ্র ব্যবস্থাটিকে পরম সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আর দ্বিতীয় আয়াতে اَلْمِيْزَانُ শব্দে مَعْنَى الْمَصْدَرِ অর্থাৎ اَلْوَزْنُ উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে– 'আল্লাহ মীজান বা মাপযন্ত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাতে তোমরা ওজনে কম-বেশি করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও; যা পরস্পর বিরোধের কারণ হবে। অথবা اَلْعَدْلُ ইনসাফ বা ন্যায়বিচার উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলা মাপযন্ত্র নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা ন্যায় বিচারে কম-বেশি করে জুলুম করতে না পার। অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজ নিজ অধিকার প্রদান করতে পার।

আর তৃতীয় আয়াতে– اَلْمِيْزَانُ অর্থ হলো اَلْمَوْزُوْنُ তথা ওজনকৃত বস্তু। এমতাবস্থায় তিন আয়াতের অর্থ হবে– 'আল্লাহ মাপযন্ত্র নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে ওজনে কমবেশি করে জুলুম না করতে পার। ইনসাফ সহকারে মীজান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনকৃত বস্তুকে কম করিও না। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, "اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ" আয়াতে اَلْمِيْزَانُ শব্দের স্থলে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلَا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ এটাই। الْوَزْنَ শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন না? উত্তরে বলতে পারি যে, اَلْوَزْنَ শব্দটি مُتَعَدِّىْ সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে যে, "অন্যের কিছু ওজন করার সময় যেন কম ওজন না কর।" এমতাবস্থায় এর বিপরীত অর্থ হবে নিজের বেলায় কম ওজন করতে পারবে– এটা কখনো হতে পারে না। কেননা ইসলাম একমাত্র শোষণমুক্ত ইনসাফ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। এটা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদানের আদেশ দিয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে اَلْمِيْزَانَ শব্দটি ব্যবহার হওয়ার কারণে নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, অন্যকেও ক্ষতির দিকে ঠেলে দেবে না।

قَوْلُهُ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ : আল্লাহর বাণী– "وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ" অর্থাৎ পৃথিবীকে "আনাম" এর জন্য বানিয়েছেন। আয়াতে বর্ণিত اَلْاَنَامُ শব্দের অর্থ সমস্ত সৃষ্টিকুল। তাতে মানুষ ও অন্যান্য সমস্ত জীব-জন্তু, জীবন্ত সৃষ্টি শামিল রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– اَلْاَنَامُ বলতে এমন সব জিনিস বুঝায় যাতে প্রাণ আছে। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, সমস্ত সৃষ্টিকুল। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, সমস্ত জীবন্ত সত্তাই اَلْاَنَامُ -এর অন্তর্ভুক্ত। হাসান বসরী (র.) বলেন, মানুষ জিন উভয়ই তার অন্তর্ভুক্ত। যাহহাক (র.) বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই اَنَامٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

এখানে আয়াতটির বক্তব্য হলো, আল্লাহ পৃথিবীকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, এটা বিচিত্র ধরনের জীব-জন্তু ও জীবন্ত সৃষ্টির জন্য বসবাস করার ও জীবন-যাপন করার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু পৃথিবী নিজ ক্ষমতা বলে ও স্ব-ইচ্ছাক্রমে এরূপ হয়ে যায়নি, সৃষ্টিকর্তা এটাকে এরূপ বানিয়েছেন বলেই এরূপ হয়েছে। তিনি স্বীয় সৃষ্টি-কৌশলের দরুনই এটাকে এমনভাবে সংস্থাপিত করেছেন এবং এতে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যার ফলে এখানে জীবন্ত সৃষ্টির বসবাস ও জীবন-যাপন সম্ভবপর হয়েছে।

قَوْلُهُ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ الخ : **আয়াতে ফলের কথা আগে বর্ণনা করার হিকমত :** আল্লাহ তা'আলার বাণী– "فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ" দুটি আয়াতে আল্লাহ প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য ও সুস্বাদু ফলের আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি প্রধান খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সু-স্বাদু ফলের আলোচনা করেছেন।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এটার হিকমত হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা প্রথমত ছোটখাটো বস্তুর উল্লেখ করে পরবর্তীতে বড় বড় বস্তুর আলোচনা করেছেন। এটা একটি সৌন্দর্যময় সংযোজন। আরবি পরিভাষায় একে "بَابُ الْاِبْتِدَاءِ بِالْاَدْنٰى وَالْاِرْتِفَاعِ بِالْاَعْلٰى" বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের চাহিদার ক্ষেত্র খেজুরের চেয়ে নিম্নস্তরের। আর খেজুর দানার চেয়ে নিম্নস্তরের বলেই আল্লাহ প্রথমত ফল অতঃপর খেজুর এবং সর্বশেষ দানার উল্লেখ করেছেন। –[তাফসীরে কবীর]

আয়াতদ্বয়ের শব্দসমূহের অর্থ : আয়াতে اَلْاَكْمَامُ শব্দটি বহুবচন। তার একবচনে كُمٌّ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– গিলাফ বা খোসা। আর অভিধানে গম, সরিষা ইত্যাদির ভূষিকে اَلْعَصْفُ বলা হয়। এখানে ذُوالْعَصْفِ -এর অর্থ তৃণলতা বা ঘাস উদ্দেশ্য। আল্লামা বায়যাভী (র.)-এর মতানুসারে اَلْعَصْفُ হলো শুকনো ঘাসের চূর্ণপাতা এবং اَلرَّيْحَانُ -এর অর্থ– সুগন্ধি। আল্লাহ তা'আলা মাটি হতে উৎপন্ন বৃক্ষ হতে হরেক রকমের সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো সময় اَلرَّيْحَانُ শব্দটি রিজিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বলা হয়– "خَرَجْتُ لِطَلَبِ رَيْحَانِ اللّٰهِ" আমি বের হলাম আল্লাহর রিজিক অন্বেষণে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) اَلرَّيْحَانُ শব্দের তাফসীরে এ অর্থই করেছেন। –[মা'আরিফুল কুরআন]

فَاكِهَةٌ শব্দটি নাকেরা ও اَلنَّخْلُ শব্দ মা'রিফা হওয়ার রহস্য : "فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ" আয়াতে فَاكِهَةٌ -কে নাকেরা এবং اَلنَّخْلُ -কে মা'রিফা নেওয়ার রহস্য সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ–

* اَلنَّخْلُ বা খেজুর গরম প্রধান দেশে অধিক ফলন দেয় এবং তা কোনো কোনো মানুষের প্রধান খাদ্যরূপে বিবেচিত হয়। মহানবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময় শুধু খেজুরের উপরেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর প্রতিটি যুগ ও সময়ে মানুষ প্রধান খাদ্যের জন্য মুখাপেক্ষী। আর এ কারণে তা সবার নিকট পরিচিত থাকে। তাই اَلنَّخْلُ -কে মা'রেফা আনা হয়েছে। আর ফল-ফলাদি সর্বদা সর্বত্র পাওয়া যায় না। তাই তা মানুষের নিকট অপরিচিত বিধায় فَاكِهَةٌ -কে নাকেরা নেওয়া হয়েছে।
* اَلنَّخْلُ বা খেজুর এককভাবে আল্লাহর এক মহা নিয়ামত যার সাথে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে فَاكِهَةٌ সুস্বাদু খাবার, যা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেগুলো গণনা করা কঠিন। এ কারণে اَلنَّخْلُ -কে মারেফা এবং فَاكِهَةٌ -কে নাকেরা নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ : فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতে اٰلَاۤء শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে– নিয়ামত, দান, অবদান ইত্যাদি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) হতে এটাই বর্ণিত হয়েছে। আর এ অর্থটি যথার্থ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে মহানবী ﷺ -এর এ বাণী– পবিত্র কুরআনে বারবার ব্যবহৃত এ প্রশ্নের জবাবে জিনেরা বলত– "لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ" অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তোমার নেয়ামতসমূহের কোনো একটিকেও আমরা মিথ্যারোপ করি না। কাজেই সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। এটা ছাড়াও اٰلَاۤء শব্দটির আরো দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. কুদরত বা কুদরতের পূর্ণতা। ইবনে যায়েদ (র.) বলেন– فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا -এর অর্থ فَبِأَيِّ قُدْرَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ "আল্লাহর কোন কুদরতটিকে......." ইবনে জারীরের মতেও اٰلَاۤء শব্দটির এরূপ অর্থ হবে। –[তাবারী]
ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ আয়াতসমূহ নিয়ামত বর্ণনার জন্য নয় এবং এর দ্বারা কুদরত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

২. সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য, উত্তম পছন্দসই গুণাবলি পরিপূর্ণতা ও বাড়তি গুণাবলি। এ অর্থ মুফাসসিরগণ গ্রহণ করেননি।

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : এ আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তি সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। যথা–

১. মানুষ ও জিনকে এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে–
ক. আনাম জিন ও মানুষের নাম। আল আনাম শব্দের দ্বারা যে জাতিকে বুঝানো হয়েছে তার প্রতি যমীরে খেতাব ফিরবে।
খ. 'আনাম' মানুষের নাম আর তাতে শামিল থাকবে জিন। কাজেই যমীরটি اَلْمَنْوِىُّ -এর প্রতি ফিরবে।
গ. মুখাতাব কে বা কারা তা নিয়তে আছে, শব্দে নেই।

২. এ আয়াতে মানুষের মধ্যকার নারী ও পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং খেতাবের যমীর তাদের উভয়ের দিকে ফিরবে।

৩. উপরিউক্ত আয়াতকে কোনো কোনো কেরাতে "فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تُكَذِّبُ" পড়া হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা শুধু মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে।

৪. উক্ত আয়াতে সব প্রাণীকেই মূলত সম্বোধন করা হয়েছে; কিন্তু শব্দে মাত্র দু'জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. তাকযীব অর্থাৎ মিথ্যারোপ করা কখনো শুধু অন্তর আবার কখনো শুধু মুখের দ্বারা হয়ে থাকে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা অন্তর ও মুখকে সম্বোধন করে تُكَذِّبَانِ বলেছেন।

৬. মুকাযযিব বা মিথ্যা আরোপকারী দু'ধরনের। যথা– ১. নবীকে মিথ্যা আরোপকারী এবং ২. কুরআনের মিথ্যারোপকারী। এ দু'ধরনের মিথ্যাবাদীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

৭. মুকাযযিব কখনো কার্যের দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে, আবার কখনো মিথ্যার নীতি তার অন্তরে গ্রথিত থাকে। এ দু'ধরনের মিথ্যারোপকারীকে সম্বোধন করা হয়েছে।
মূলকথা হলো উপরোল্লিখিত আলোচনাগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত। তবে আয়াতে শুধুমাত্র জিন ও মানুষকে সম্বোধন করেই কথা বলা হয়েছে। –[তাফসীরে কাবীর]

فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ আয়াতটির পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা "فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ" আয়াতটি এ সূরায় একত্রিশবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এর প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো করে জানেন।

তবে তাফসীরকারদের এ বিষয়ে মূল বক্তব্য হচ্ছে– দু'টি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটির বার বার উল্লেখ করেছেন। একটি হলো তাঁর নিয়ামত ও অবদানসমূহের ধারণা শ্রোতাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আর অপরটি হলো তাঁর নিয়ামত ও অবদান সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। –[ফতূহাতে ইলাহিয়া, খাযিন]

গণনা করে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ শেষ করা যায় না। যদি কুরআনে কারীমে তার গণনা করা হতো তাহলে বিশাল গ্রন্থে রূপায়িত হতো। অথচ তাঁর নিয়ামতের স্মরণ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা এ কারণে এ সূরায় তাঁর কতগুলো নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন এবং তার পরপরই প্রশ্ন করেছেন– فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে"? যেমন অনুগ্রহকারী অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যখন সে অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়– তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, তোমাকে আমিই তো বিত্তবান বানিয়েছি? তুমি কি বস্ত্রহীন ছিলে না, তোমাকে আমিই তো বস্ত্র পরিধান করিয়েছি? তা তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে? তুমি কি সহায়হীন ছিলে না, আমিই তো তোমাকে সহায়তা দিয়েছি? আমার এ অবদানের কথা তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে? আরবি ভাষায় এ জাতীয় অনেক প্রথা প্রচলিত আছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদের উপর প্রমাণ হিসেবে মানুষ সৃষ্টির কথা এবং তাদের বাকশক্তি দানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রতি দানকৃত নিয়ামতসমূহ যেমন আসমান ও পৃথিবী আর চন্দ্র-সূর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি জিন ও মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন- فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অসত্য মনে করবে?।

-[ফতুহাতে ইলাহিয়া, খাযিন]

অথবা এ আয়াত দ্বারা জিন ও মানুষের মধ্য হতে যারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার করে এবং তা ভোগ করেও শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাদের এহেন কার্যকলাপ ও নীতির তিরস্কার করা হয়েছে। -[ফতুহাতে ইলাহিয়া]

সারকথা হলো- আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষ ও জিনকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই উপরিউক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

কুরআন মাজিদে মানুষ সৃষ্টির উপাদান :

১. كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ (اٰلِ عِمْرَانَ - ٥٩)

২. بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ (اَلسَّجْدَةُ - ٧)

৩. اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ (اَلصّٰفّٰتُ - ١١)

৪. اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (ص ٧٢-٧١)

৫. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً (اَلنِّسَآءُ - ١٠)

৬. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ (اَلسَّجْدَةُ - ٥-٨)

৭. فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ (اَلْحَجُّ - ٥)

প্রকৃত পক্ষে উল্লিখিত আয়াতসমূহে মানুষ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার ধারাবাহিক বিন্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মাটিরও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়গুলোতে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে মানুষ সৃষ্টির উপাদান বর্ণনা করা হয়েছে। -[জালালাইন]

জিন সৃষ্টির উপাদান : আল্লাহর বাণী- "وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ" অর্থাৎ জিনদেরকে আগুনের শিখা হতে সৃষ্টি করেছেন। আয়াতে "نَارٌ" শব্দ কাঠ বা কয়লা জ্বালিয়ে যে আগুন হয় তা নয়; বরং এক বিশেষ ধরনের আগুন বুঝানো হয়েছে। আর مَارِجٌ অর্থ শুধু আগুনের স্ফুলিঙ্গ যার সাথে ধোঁয়া নেই। এর তাৎপর্য হলো, প্রথম জিনকে নিছক আগুনের স্ফুলিঙ্গ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে তারই সন্তানাদির সাহায্যে তার বংশধারা চলেছে। এ প্রথম জিন, সমগ্র জিন-জাতির জন্য আদি জিন। যেমন- হযরত আদম (আ.) সমগ্র মানবজাতির জন্য আদি মানব। জীবন্ত মানুষ হওয়ার পর তিনিও তাঁর বংশোদ্ভূত মানুষের মাটির অংশ হতে সৃষ্টি করা সত্ত্বেও দেহের কোনো সরাসরি সাদৃশ্য সেই মাটির সাথে থাকল না।

পূর্ণাঙ্গ দেহ মাটির অংশ হতে গঠিত হলেও এখন অস্থি, চর্ম, মাংস ও রক্তের রূপ ধারণ করেছে। আর এতে প্রাণের সঞ্চার হওয়ার পর সেই মাটির স্তুপটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম জিনিস হয়ে গেছে। জিনদের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। তাদের মূলসত্তা এক অগ্নিময় সত্তা; নিছক অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নয়। তারা বিশেষ ধরনের বস্তুগত দেহসত্তাসম্পন্ন।

মানুষকে মাটির দিকে এবং জিনকে আগুনের দিকে সম্বোধন কেন করা হলো : মানব ও জিন সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে- মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস। তথাপিও পবিত্র কুরআনে মানবসৃষ্টির উপাদান মাটি এবং জিন সৃষ্টির উপাদান আগুন কেন বলা হলো?

এর উত্তরে তাফসীরে জালালাইনের গ্রন্থকার বলেন যে, মানুষ ও জিন সৃষ্টির মূল উপাদান যদিও মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস; কিন্তু মানুষের সৃষ্টিতে মাটির ব্যবহার অধিক হওয়ায় মানুষের সৃষ্টিকে মাটির দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর জিনদের সৃষ্টিতে আগুনের সর্বাধিক ব্যবহার হওয়ায় জিনের সৃষ্টিকে আগুনের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

مَشْرِقَيْنِ ও مَغْرِبَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَشْرِقَيْنِ ও مَغْرِبَيْنِ শব্দদ্বয় দ্বারা শীত ও গ্রীষ্মকালীন উদয়াচল ও অস্তাচল উদ্দেশ্য। কারণ শীতকালে সূর্য যে স্থান হতে উদিত হয় এবং যে স্থানে অস্ত যায়, গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্তের স্থান তাতে থাকে না। গ্রীষ্মকালে সূর্য প্রায় মাথার উপর দিয়ে যায়। কিন্তু শীতকালে তা দক্ষিণ আকাশে একটু সরে যায়। ২১ শে মার্চ তারিখে সূর্য ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয়। তার পর হতে ক্রমশঃ ২১ শে সেপ্টেম্বর পুনরায় ঠিক পূর্বদিকে উদিত হয়। এর পর ২২ শে

ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে উদিত হয়। ২২ শে ডিসেম্বরের পর সূর্য আবার উত্তরদিকে সরে উদিত হয়ে থাকে। আর ঠিক অস্তমিত হওয়ার ব্যাপারটিও অনুরূপ। আর এই এক সময় এক এক স্থানে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলকে পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় কোথাও مَشْرِقَيْنِ ও مَغْرِبَيْنِ আবার কোথাও مَشَارِقُ এবং مَغَارِبُ হয়েছে। অতএব مَشْرِقَيْنِ ও مَغْرِبَيْنِ দ্বারা مُنْفَصِلَيْنِ ও مُوْسِمَيْنِ উদ্দেশ্য এবং ঋতুর এই পরিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। আর পূর্বাপর সকল আয়াতে যেহেতু দুই দুটি নিয়ামত তথা বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করা হয়েছে, তাদের সাথে نَظْم ও سِلْسِلَة সঠিক রাখার জন্য এ আয়াতের শ্রুতিমাধুর্যের জন্য এখানেও مَشْرِقٌ -এর স্থলে مَشْرِقَيْنِ এবং مَغْرِبٌ -এর স্থলে مَغْرِبَيْنِ বলা হয়েছে। অন্যথা مَشْرِقٌ একটি এবং مَغْرِبٌ -ও একটি।

قَوْلُهُ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ অর্থাৎ দুটি সমুদ্রকে আল্লাহ তা'আলা স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করেছেন, যেগুলো পাশাপাশি অবস্থান করছে। কারো মতে يَلْتَقِيَانِ সমুদ্র দুটির দুপার্শ্ব দিয়ে মিলিত হওয়ার কারণে বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- بَحْرَيْنِ দ্বারা আসমান ও জমিনের দুটি সমুদ্রকে বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, পারস্য ও রোমের সমুদ্রকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন- بَحْرَيْنِ দ্বারা মিঠা ও লোনা এই দুই সমুদ্র উদ্দেশ্য। আয়াতে যে দুটি সমুদ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের পরস্পর মিশ্রিত না হওয়ার কথা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। এটা আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলার এ অপার শক্তি বা কুদরত প্রকাশ করার জন্যই বলা হয়েছে- "بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ" অর্থাৎ উভয় সমুদ্রের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা তাদেরকে মিশ্রিত হতে দেয় না। সারকথা হলো লবণাক্ত এবং মিঠাস্রোতে সম্মিলিত হলেও আল্লাহর অপার কুদরতে উভয় পৃথক পৃথক থাকে।

قَوْلُهُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ : আল্লাহর বাণী- "يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ" অর্থাৎ দুই সমুদ্র সংক্রান্ত অপর নিয়ামত এই যে, এতদুভয়ের মধ্য হতে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়ে থাকে। মুক্তা এবং প্রবাল রত্নের উপকারিতা এবং নিয়ামত হওয়া প্রকাশ্য ব্যাপার। আর যারা লবণাক্ত সমুদ্র হতে তাদের আবির্ভাব হওয়া নির্দিষ্ট বলে মত প্রকাশ করেন তাদের নিকট অর্থ এই হবে যে, উক্ত দুটি সমুদ্রের সমষ্টি হতে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়ে থাকে। কেননা উক্ত সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়ে এক হয়ে গিয়েছে। -[বয়ানুল কুরআন]

আয়াতে উল্লিখিত لُؤْلُؤٌ ছোট ছোট মুক্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আর مَرْجَانٌ বলতে ছোট বড় সব ধরনের মুক্তাকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন- لُؤْلُؤٌ হলো বড় বড় মুক্তা আর مَرْجَانٌ হলো ছোট ছোট মুক্তা। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- مَرْجَانٌ হলো লাল পাথর। মুক্তা ও প্রবাল রত্ন বের হওয়ার জন্য লোনা এবং মিঠা সমুদ্রের সঙ্গম শর্ত নয়; বরং বিভিন্ন স্থান হতে মুক্তা ও প্রবালরত্ন বের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এটাও একটি। এটা ছাড়া আরেকটি অভিনব গুণ হচ্ছে এখানে লোনা এবং মিঠা পানির সমুদ্রও একসঙ্গে মিলিত রয়েছে। মিঠা পানি বিশিষ্ট সমুদ্রের প্রবাহিত হয়ে পানি লোনা সমুদ্রে পতিত হলে তা হতে মুক্তা বের করে নেওয়া যায়। এজন্য লোনা সমুদ্রকে মুক্তার উৎস বলা হয়। আয়াতে উভয় প্রকার সমুদ্র হতে মুক্তা বের হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুক্তা ভারত ও পারস্য উপসাগরে জন্মে আর মারজান বৃক্ষের ন্যায় সমুদ্রে অংকুরিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ : আল্লাহ বলেন, আরো একটি নিয়ামত এই যে, আল্লাহর আয়ত্তে ও ইচ্ছায় রয়েছে জাহাজসমূহ যা দৃষ্টিপথে সমুদ্রের মধ্যে পর্বতমালার ন্যায় সুউচ্চ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উল্লিখিত কথার মর্মার্থ এই যে, নৌকা, স্টীমার ইত্যাদি যদিও মানুষের তৈরি, সমুদ্রের বুক চিরে যদিও মানুষ তা পরিচালনা করে, তবুও ভুল বুঝতে নেই। মানুষ, মানুষের এই সৃষ্টি বুদ্ধি, পরিচালনার ক্ষমতা, সাগর এবং সাগরের পানি ইত্যাদি সমস্তই আল্লাহর তৈরি, আল্লাহর দান। অতএব সমুদ্রগর্ভের মণিমুক্তা, সমুদ্রের উপরের যানবাহন সকলই যে, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর দান, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। اَلْجَوَارُ জাহাজের নাম কিংবা তার গুণ বিশেষ, তা সাগরে চলে বেড়ায় এবং এ উদ্দেশ্যেই তাকে নির্মাণ করা হয়েছে। এজন্য তাকে جَارِيَةٌ বলা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٦. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا أَيِ الْأَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ فَانٍ ۙ هَالِكٌ وَعُبِّرَ بِمَنْ تَغْلِيبًا لِلْعُقَلَاءِ.

২৬. যত কিছু আছে অর্থাৎ প্রাণীর মধ্য হতে ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত ধ্বংসশীল। নশ্বর। "مَنْ" টি বিবেকবানদের প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

٢٧. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذَاتُهُ ذُو الْجَلَالِ الْعَظَمَةِ وَالْإِكْرَامِ ۚ لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنْعُمِهِ عَلَيْهِمْ.

২৭. আর আপনার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে যিনি মহিমাময় মহত্ত্বের অধিকারী এবং দয়ারও অধিকারী ঈমানদারদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত দ্বারা দয়া করে থাকেন।

٢٨. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

২৮. [সুতরাং হে জিন ও মানবজাতি! এত অফুরন্ত ও মহান নিয়ামত সত্ত্বেও] তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٢٩. يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَيْ بِنُطْقٍ أَوْ حَالٍ مَا يَحْتَاجُوْنَ إِلَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالرِّزْقِ وَالْمَغْفِرَةِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَقْتٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ أَمْرٍ يُظْهِرُهُ فِي الْعَالَمِ عَلَى وَفْقِ مَا قَدَّرَهُ فِي الْأَزَلِ مِنْ إِحْيَاءٍ وَإِمَاتَةٍ وَإِعْزَازٍ وَإِذْلَالٍ وَإِغْنَاءٍ وَإِعْدَامٍ وَإِجَابَةِ دَاعٍ وَإِعْطَاءِ سَائِلٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

২৯. আকাশসমূহ এবং জমিনের অধিবাসীগণ সকলেই তাঁর সমীপে প্রার্থী হয়। অর্থাৎ প্রকাশ্য কথা বা অবস্থার দ্বারা ইবাদতের উপর সামর্থ্য রিজিক ও মাগফেরাত ইত্যাদি যা কিছুর প্রতি তারা মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক সময় কোনো না কোনো কাজে রত পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয় তা সৃষ্টির প্রারম্ভে স্থিরীকৃত আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে থাকে, আর তা হলো জীবিত করা, মৃত্যু দেওয়া, সম্মানিত করা, অপমানিত করা, ধনী করা, নির্ধন করা, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করা এবং সাহায্যপ্রার্থীকে দান করা ইত্যাদি পার্থিব দয়া।

٣٠. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

৩০. অতএব [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٣١. سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنَقْصِدُ لِحِسَابِكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ.

৩১. অচিরেই আমি তোমাদের জন্য অবসর লাভ করব শীঘ্রই তোমাদের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার প্রতি মনোযোগ দেব। হে জিন ও মানব সম্প্রদায়!

٣٢. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

৩২. সুতরাং [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٣٣. يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا تَخْرُجُوْا مِنْ أَقْطَارِ نَوَاحِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا ۗ أَمْرُ تَعْجِيْزٍ لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ بِقُوَّةٍ وَلَا قُوَّةَ لَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ.

৩৩. হে জিন ও মানবের দল! যদি তোমরা সামর্থবান হও যে, তোমরা অতিক্রম করবে বের হয়ে যাবে সীমা হতে প্রান্ত হতে আসমান ও জমিনের তবে, তোমরা বের হয়ে যাও। এ আদেশ تَعْجِيْز তথা অক্ষম করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। [কিন্তু] সামর্থ্য ব্যতীত অতিক্রম করতে কিংবা বের করতে পারবে না শক্তির সাহায্যে। আর তোমাদের এটা করার কোনো শক্তি নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٤. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -

৩৪. অতএব, [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে?

٣٥. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ هُوَ لَهَبُهَا الْخَالِصُ مِنَ الدُّخَانِ اَوْ مَعَهٗ وَنُحَاسٌ اَىْ دُخَانٌ لَا لَهَبَ فِيْهِ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ج تَمْتَنِعَانِ مِنْ ذٰلِكَ بَلْ يَسُوْقُكُمْ اِلَى الْمَحْشَرِ -

৩৫. তোমাদের উভয় জাতির উপর অগ্নিশিখা প্রেরিত হবে, ধোঁয়াযুক্ত অগ্নিশিখা এবং ধূম্র অর্থাৎ শিখাহীন ধোঁয়া, তখন তোমরা তা অপসারণ করতে পারবে না তা প্রতিহত বা প্রতিরোধ করতে পারবে না; বরং তা তোমাদেরকে হাশরের মাঠের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

٣٦. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -

৩৬. অতএব [হে জিন ও মানবজাতি!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ -এর মধ্যে هَا সর্বনামটির মারজি' হলো مَنْ আর مَنْ যা اِسْم مَوْصُوْل তা দ্বারা اَلْاَرْض তথা ভূ-পৃষ্ঠের সকল বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ كُلُّ مَنْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সকল প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাবে। اَلْاَرْض শব্দটি مُؤَنَّثْ سِمَاعِىْ এ কারণে তার যমীরটি مؤنث হয়েছে।

قَوْلُهٗ سَنَفْرُغُ لَكُمْ : আ'মাশ ও ইবরাহীম سَنَفْرُغُ শব্দের ن অক্ষরের স্থলে ى অক্ষর ধরে তার উপর ضَمَّة এবং ر অক্ষরের উপর فَتْحَة দিয়ে سَيُفْرَغُ পড়েছেন। ইবনে শিহাব سَنَفْرَغُ শব্দের ن ও ر অক্ষরে فَتْحَة দিয়ে سَنَفْرَغُ পড়েছেন। কেসায়ী (র.) বলেছেন– এটা বনূ তামীম গোত্রের ভাষা। আবূ আমের سَنَفْرُغُ শব্দের ن অক্ষরের পরিবর্তে ى ধরে তাও ر অক্ষরের উপর فَتْحَة দিয়ে পড়েছেন سَيَفْرَغُ শব্দটি হামযা ও কেসায়ী (র.) ى দ্বারা পড়েছেন। অন্যান্য সকল ক্বারীগণ سَنَفْرُغُ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ اَيُّهَا : اَيُّهَ শব্দের ه অক্ষরে ضَمَّة দিয়ে উবাই اَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ পড়েছেন। আর অন্যান্য সব ক্বারীগণ اَيُّهَ শব্দের ه অক্ষরে فَتْحَة দিয়ে اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ পড়েছেন।

قَوْلُهٗ كُلَّ يَوْمٍ : كُلَّ يَوْمٍ অংশটি مُضَاف اِلَيْه ও مُضَاف মিলে পূর্ববর্তী يَسْئَلُهٗ -এর ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب ; আর এখানে يَوْم দ্বারা দিন উদ্দেশ্য নয়, বরং সময়কে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ : يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ অংশটি جُمْلَهْ مُسْتَانِفَهْ ; যার কোনো مَحَلِّ اِعْرَاب নেই। অথবা مِنْ وَجْهٍ হাল হয়েছে। তার মধ্যে عَامِل হবে يَبْقٰى ক্রিয়াপদ। مَسْئُوْلًا مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আকাশ ও জমিনের অধিবাসীদের হতে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় তিনি বিরাজমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ الخ : আর ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত প্রাণী অবস্থিত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর একমাত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।" যিনি মহত্ত্ব এবং দয়ার অধিকারী। যেহেতু উভয় জাতি তথা জিন ও মানবজাতিকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য। কারণ তারা পৃথিবীর অধিবাসী, সেহেতু ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কেবল পৃথিবীবাসীর উল্লেখ হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দুটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি তাঁর ব্যক্তিগত গুণ এবং অপরটি অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মহৎ হয়েও নিজের বান্দার প্রতি অনুগ্রহ এবং দয়া করে থাকেন। যেহেতু বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণ, যা পারলৌকিক নিয়ামতও বটে, সুতরাং অন্যান্য নিয়ামতের ন্যায় এ নিয়ামতটির অনুগ্রহও

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রদর্শন করেছেন। আয়াতে جَلَالْ গুণ দ্বারা সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস করা এবং কাফেরদের শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে وَعِيْد বা সাবধান করা হয়েছে। আর اِكْرَام গুণ দ্বারা ঈমানদার লোকদেরকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

আর আয়াতে বর্ণিত "وَجْهُ رَبِّكَ" -এর তাৎপর্য এই যে, নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে মানব ও জিন জাতিকে অবহিত করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত করার অর্থ হলো উভয় জাতিকে প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং এই প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ رَبّ শব্দের সাথেই সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং তিনি وَجْهُ رَبِّكَ বলেছেন। আর যেখানে ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা উদ্দেশ্য, সেখানে وَجْهُ اللّٰه বলা হয়েছেন। আর وَجْه শব্দটি مُتَشَابِهَاتْ -এর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম প্রকার এরূপ যে, তার আভিধানিক অর্থ জানা থাকা সত্ত্বেও যার মর্মার্থ আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। এ জাতীয় مُتَشَابِهَاتْ -এর ব্যাখ্যায় যা কিছু বলা হয়েছে তা শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। তাই এ শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন– مَا يَلِيْقُ بِشَانِهٖ অর্থাৎ وَجْه এমন সত্তা যা আল্লাহর শানে প্রযোজ্য। কারো মতে-এর অর্থ جِهَةٌ আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহর জাত ও সত্তা। উল্লেখ যে, এই অর্থটিই প্রসিদ্ধ।

قَوْلُهُ يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে আসমান ও জমিনের যেখানেই যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আল্লাহর মুহতাজ, আল্লাহর কাছেই সকলের আবেদন-নিবেদন এবং বিনীত প্রার্থনা। তবে কিসের জন্য প্রার্থনা করে? তার উল্লেখ নেই।

আল্লামা রাযী (র.) বলেন, তাদের বিনীত প্রার্থনা দুটি বিষয়ে হতে পারে। যথা– ১. আসমান ও জমিনে যা কিছুই আছে প্রত্যেকেই আল্লাহর নিকট নিজের জন্য শক্তি-ক্ষমতা ও তাওফীক কামনার মাধ্যমে দোয়া করে থাকে। তারা আল্লাহর রহমত এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে যেই শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন তার জন্য আল্লাহর দরবারে তাওফীক প্রার্থনা করে। ২. আসমান ও জমিনের প্রত্যেকেই আল্লাহর নিকট ইলম প্রত্যাশা করে প্রার্থনা করে। তিনি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। তিনি ছাড়া কেউই অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না, আর জগদ্বাসীদের নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনাও প্রকাশ্য ব্যাপার, আর আসমানে বসবাসকারীদের যদিও পানাহারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু রহমত এবং অনুগ্রহের প্রয়োজন তো অবশ্যই রয়েছে।

قَوْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ : এর অর্থ হলো, আসমান-জমিনের সবকিছুরই প্রার্থনা আল্লাহর নিকট প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। মর্মার্থ এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তু বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহর নিকট নিজেদের আবেদন-নিবেদন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আবেদন পেশ করা ও তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। তাই كُلَّ يَوْم -এর সাথে هُوَ فِيْ شَاْنٍ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সব সময়ই আল্লাহর স্বতন্ত্র কাজ, নিত্যনতুন সাজ, কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, কেউ জন্মেছে, কেউ পীড়িত হয়েছে, কেউ আরোগ্য লাভ করেছে, কেউ উন্নতি করছে, আবার কারো পতন হচ্ছে। আল্লাহর নির্দেশেই এ সব ঘটছে। তাই তিনি নিত্যনতুনরূপে, নব নব সাজে বিরাজ করছেন।

এর অর্থ এই নয় যে, কার্য করা তাঁর সত্তার অপরিহার্য কর্ম উদ্দেশ্য। অন্যথায় অস্থায়ী কার্যাবলির স্থায়ী হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে; বরং মর্মকথা হলো, যত প্রকারের কার্যকলাপ পৃথিবীতে হচ্ছে, সমস্তই আল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে। কাজেই এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ বলার আরো একটি উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদের কথা প্রত্যাখ্যান করা। তারা বলতো, আল্লাহ শনিবার কোনো কাজ-কর্ম করেন না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) আয়াতে يَوْمٌ বলতে সময়কে বুঝানো হয়েছে; এর অর্থ দিবস নয়। শব্দটি شَاْنٌ -এর জন্য ظَرْف হয়েছে।

قَوْلُهُ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلٰنِ : অর্থাৎ হে জিন ও মানব! আমি তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণের নিমিত্তে শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করব। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগত লোকদেরকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি এবং অবাধ্যদেরকে সতর্ক করেছেন। سَنَفْرُغُ শব্দটি এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) سَنَفْرُغُ শব্দের তাফসীরে "سَنَقْصِدُ لِحِسَابِكُمْ" [অর্থাৎ শীঘ্রই আমি তোমাদের কাজ-কর্মের হিসাব নেওয়ার ইচ্ছা রাখি] বলেছেন। এটা দৃঢ় ইচ্ছা এবং পূর্ণ মনোযোগের অভিব্যক্তি। বস্তুত আল্লাহর সকল ইচ্ছাই পূর্ণ ইচ্ছা হয়ে থাকে। এখানে প্রকৃত অবসর গ্রহণের অর্থ এজন্য নেওয়া যেতে পারে না যে, তৎপূর্বে এমন লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়, যা অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া হতে বিরত রাখে, অথচ তা আল্লাহর শানের খেলাফ। আর ইমাম কুরতুবী (র.) এর অর্থ করেছেন, শীঘ্রই তোমাদের কৃতকর্ম যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে প্রতিফল দেওয়ার ইচ্ছা রাখি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জিন ও মানুষকে ثَقَلَيْنِ বলার কারণ : ثِقْلٌ শব্দের অর্থ বোঝা। যেহেতু জিন ও ইনসান জীবন-মরণ, সভ্যতা ও অসভ্যতার দিক হতে ভূ-পৃষ্ঠে বোঝা স্বরূপ। সেহেতু এদেরকে ثَقَلَيْنِ বা দুটি বোঝা বলা হয়েছে। আর সকল বস্তু যার পরিমাণ আছে এবং সেই পরিমাণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তা-ই ثِقْلٌ বা বোঝা। ইমাম জাফর সাদেক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এরা পাপের বোঝা বহন করে বলে এদেরকে ثَقَلَيْنِ বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে– إِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ

قَوْلُهُ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ الخ : আসমান-জমিনে সর্বত্রই একমাত্র আল্লাহর একাধিপত্য; নিখিলের কেউই তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়। জিন ও মানুষ যদি মনে করে, আসমান-জমিনের কোনো গোপন পথে আল্লাহর রাজত্বের বাইরে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তবে তা ভুল, প্রথমত যাবে কোথায়? আল্লাহর ক্ষমতাধীন নয় এমন কোনো জায়গা কি কোথাও আছে? যাবেই বা কেমন করে বিনা সনদে, বিনা পরোয়ানায়, বিনা পাসপোর্টে কি কেউ রাষ্ট্রের বাইরে যেতে পারে? অতএব আল্লাহর কাছ থেকে কি তারা তাঁর রাষ্ট্রের বাইরে যাবার সনদ বা পাসপোর্ট লাভ করেছে: বলাবাহুল্য এই পাসপোর্ট লাভ যেমন সম্ভব নয়, তেমিন কোথাও পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষাও সম্ভব নয়, অতএব সাবধান হয়ে যাও।

قَوْلُهُ اَمْرُ تَعْجِيْزٍ : মুফাসসির (র.)-এর উক্তি اَمْر تَعْجِيْز -এর অর্থ হলো, আল্লাহর রাজত্ব ছেড়ে যেতে মাখলুকের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা প্রকাশের ও প্রমাণের জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন যে, যদি চাও আল্লাহর রাজত্ব ছেড়ে চলে যাও! কিন্তু এটা সম্ভব নয়। এমন কি মরণ পর্যন্ত চেষ্টা-সাধনা করলেও তা হবে না। কেউ কেউ বলেন, এ কথাটি তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে।

এ আয়াতে اَلْاِنْس-এর পূর্বে اَلْجِنّ উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– মানুষ অপেক্ষা জিন জাতি পালিয়ে যাওয়ার অধিক ক্ষমতা রাখে। তারা আকাশে উড়তে পারে। তাই মানবজাতির পূর্বেই জিন জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ الخ : شُوَاظٌ বলা হয় ধোঁয়াবিহীন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে। আর نُحَاسٌ বলা হয় অগ্নিবিহীন ধুম্রকুণ্ডকে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামীদেরকে দুই প্রকারের আজাব দেওয়া হবে। কোথাও ধুম্রবিহীন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধুম্রকুণ্ড দ্বারা আজাব দেওয়া হবে।

অত্র আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা ধরে কোনো কোনো তাফসীরকার এরূপ অর্থ করেছেন, হে জিন ও মানুষ! তোমাদের আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য নেই। যদি তোমরা এ ধরনের কর্ম করার প্রচেষ্টা চালাও, তাহলে তোমরা যে দিকেই পালাতে যাবে, সেই দিকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুণ্ড তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করা হবে এবং তা তোমাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। যার মোকাবিলাও তোমরা করতে পারবে না। এ বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া যেহেতু হেদায়েতের কারণ, সেহেতু এটা একটি মহান নিয়ামত।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٧. فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ انْفَرَجَتْ أَبْوَابًا لِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ فَكَانَتْ وَرْدَةً أَيْ مِثْلَهَا مُحَمَّرَةً كَالدِّهَانِ كَالْأَدِيْمِ الْأَحْمَرِ عَلٰى خِلَافِ الْعَهْدِ بِهَا وَجَوَابُ إِذَا فَمَا أَعْظَمَ الْهَوْلَ .

৩৭. অনন্তর যখন আসমান বিদীর্ণ হবে ফেরেশতাগণের অবতরণের জন্য দরজা উন্মুক্ত হবে। তখন তা লালবর্ণ ধারণ করবে। গোলাপের ন্যায় যেন তা রক্ত তেলের ন্যায়। লাল চামড়ার ন্যায়, যা আসল অবস্থার বিপরীত হবে। আর إِذَا -এর جَوَابٌ হলো فَمَا أَعْظَمَ الْهَوْلَ অর্থাৎ বৃহৎ আকার ধারণ করবে।

٣٨. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৩৮. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٣٩. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ . عَنْ ذَنْبِهِ وَيُسْئَلُوْنَ فِيْ وَقْتٍ اٰخَرَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَالْجَانُّ هُنَا وَفِيْمَا سَيَأْتِيْ بِمَعْنَى الْجِنِّيِّ وَالْإِنْسُ فِيْهِمَا بِمَعْنَى الْإِنْسِيِّ .

৩৯. অনন্তর সেই দিন কোনো মানুষকেও তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না এবং কোনো জিনকেও না। এ দিন ছাড়া অন্য সময়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং "فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ" [অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় আমি তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করব।] এখানে এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে اَلْجَانُّ শব্দটি জিন অর্থে ও اَلْإِنْسُ শব্দটি মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٤٠. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৪০. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٤١. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ أَيْ سَوَادِ الْوُجُوْهِ وَزُرْقَةِ الْعُيُوْنِ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدَامِ ج

৪১. অপরাধীদের তাদের আকৃতি দ্বারা চিনা যাবে। অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ চেহারা ও নীলবর্ণের চক্ষুযুগল দ্বারা । অনন্তর তাদের মাথার চুল ও পা-সমূহে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

٤٢. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ . أَيْ تُضَمُّ نَاصِيَةُ كُلٍّ مِّنْهُمَا إِلٰى قَدَمَيْهِ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ وَيُلْقٰى فِي النَّارِ .

৪২. অতএব [হে জিন ও মানব!] তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে? অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের মাথার ঝুঁটি এবং পা পেছন দিক হতে অথবা সম্মুখ দিক হতে একত্র করে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

٤٣. وَيُقَالُ لَهُمْ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ .

৪৩. এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে– এটাই সেই জাহান্নাম যদ্বিষয়ে অপরাধীরা অসত্য আরোপ করত।

٤٤. يَطُوْفُوْنَ يَسْعَوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ مَاءٍ حَارٍّ اٰنٍ ج شَدِيْدِ الْحَرَارَةِ يُسْقَوْنَهُ إِذَا اسْتَغَاثُوْا مِنْ حَرِّ النَّارِ وَهُوَ مَنْقُوْصٌ كَقَاضٍ .

৪৪. তারা ছুটাছুটি করবে দৌড়াদৌড়ি করবে জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যস্থলে যা অত্যন্ত উত্তপ্ত। আগুনের তাপ সহ্য করতে না পেরে তারা যখন পানি প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে। اٰنٍ শব্দটি এ স্থানে قَاضٍ -এর ন্যায় مَنْقُوْص

٤٥. فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৪৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ : لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ আয়াতে উল্লিখিত ، যমীরের مَرْجِعْ উহ্য রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত اِنْس এবং جِنْ উক্ত যমীরের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ- يَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ الْمُجْرِمُ عَنْ ذَنْبِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

قَوْلُهُ اِذَا انْشَقَّتِ : اِذَا انْشَقَّتْ -এর জবাবটি উহ্য রয়েছে। মূলবাক্যটি হবে- "اِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَمَا اَعْظَمَ الْهَوْلَ" অথবা এরূপ হবে- "اِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتِ الْحَالُ عَسِيْرًا جِدًّا" -পরবর্তী বাক্যটি তথা "فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" হলো তার ব্যাখ্যা।

قَوْلُهُ كَالدِّهَانِ : كَالدِّهَانِ শব্দটির তিনটি অবস্থা হতে পারে। যথা-

১. كَالدِّهَانِ হলো দ্বিতীয় খবর।

২. এটা وَرْدَةً -এর সিফত।

৩. এটা كَانَتْ -এর حَالْ -ও হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, دِهَانٌ শব্দটি دُهْنٌ শব্দের جَمْعٌ বা বহুবচন। যেমন- قِرَاطٌ শব্দটি قُرْطٌ -এর বহুবচন এবং رِمَاحٌ শব্দটি رُمْحٌ -এর বহুবচন। এ অভিমতই পোষণ করেছেন হযরত যাহ্হাক ও মুজাহিদ (র.)। তখন আয়াতের অর্থ হবে- "يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ" -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" অর্থাৎ "যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে।"

এ কালামটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। অর্থাৎ অতঃপর কি হবে তখন, যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে? এটা কিয়ামতের দিনের কথা। আকাশমণ্ডল দীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে নভোমণ্ডলের বন্ধন ঢিলা হয়ে যাওয়া, নভোমণ্ডলের গ্রহ-উপগ্রহের ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া এবং উর্ধ্বলোকের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। আকাশমণ্ডল তখন লাল চামড়ার মতো রক্তিম বর্ণ হয়ে যাবে এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে- সে মহা হুলস্থুলের সময় যে ব্যক্তি পৃথিবী হতে আকাশমণ্ডলের দিকে তাকাবে, সে স্পষ্ট অনুভব করবে, সমস্ত উর্ধ্বজগতে যেন আগুন ধরে গিয়েছে।

অর্থাৎ আজ তোমরা কিয়ামতকে অসম্ভব ব্যাপার সাব্যস্ত করছ। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ঘটাতে অক্ষম। কিন্তু যখন সে সমস্ত ঘটনাই নিজেদের চোখে সংঘটিত হতে দেখবে, যার সংবাদ আজ তোমাদের দেওয়া হচ্ছে তখন তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ কুদরতকে অস্বীকার করবে?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ -এর অর্থ : ইতঃপূর্বে আল্লাহ পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ অর্থাৎ "প্রত্যেকটি জিনিস যা এ পৃথিবীতে রয়েছে ধ্বংসশীল।"

এখানে তিনি নভোমণ্ডলে বসবাসকারীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন- "فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ" নভোমণ্ডল যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং ফেরেশতাদের অবতীর্ণ হবার জন্য তা অনেক দরজায় রূপান্তরিত হবে তখন অবস্থা কি হবে?

কথিত আছে যে, এ বাক্যাংশের মর্মার্থ হলো নভোমণ্ডলের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করা। কেননা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে বসবাসকারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এখন এখানে নভোমণ্ডল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। কারো মতে এ আয়াতাংশ দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা তা দ্বারা ধূম্রকুণ্ড ও ধূম্রবিহীন আগুন নিক্ষেপ করার চেয়ে ভয়াবহ একটি বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো নভোমণ্ডলের দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া। -[খাযিন]

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ আয়াতের তাশবীহের ব্যাখ্যা : আয়াতে উল্লিখিত তাশবীহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উল্লিখিত আয়াতে اَلسَّمَاءُ হলো مُشَبَّهٌ - وَرْدَةً كَالدِّهَانِ হলো مُشَبَّهٌ بِهٖ - كَ হলো حَرْفُ التَّشْبِيْهِ এবং لَوْن ও دِهَانٌ হলো وَجْهُ التَّشْبِيْهِ ; وَرْدَةٌ অর্থ- রক্তিম বর্ণ। আর دِهَانٌ অর্থ- তেলের গাদ বা লাল চামড়া। অতএব তাশবীহের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে- اِذَا انْفَجَرَتِ السَّمَاءُ فَصَارَتْ كَلَوْنِ الْوَرْدِ الْاَحْمَرِ اَوِ الْمُهْلِ اَوِ الْاَدِيْمِ الْاَحْمَرِ

অর্থাৎ, যখন নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন তা রক্তিম বর্ণ অথবা তেলের গাঁদের মতো বা লাল চামড়ার মতো হয়ে যাবে।
-[তাফসীরে কাবীর, জালালাইন, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

"فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ" ও "فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ" আয়াত দু'টির সামঞ্জস্য : "فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ" আয়াতটি প্রমাণ করে যে, কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ ও জিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। পক্ষান্তরে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সব মানুষ ও জিনকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

বাহ্যত যদিও আয়াত দু'টির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ও গরমিল দেখা যাচ্ছে; কিন্তু মূলত তাদের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা নেই। কেননা আখিরাতের অনেকগুলো স্তর ও স্থান রয়েছে। হতে পারে এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে, সে সময়ে যে স্থানে মানুষ ও জিন অবস্থান করবে, সেখানে তাদেরকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। অতএব "فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ" আয়াতের সাথে এ আয়াতের কোনো গরমিল নেই। এছাড়া এ প্রশ্নের আরো একটি জবাব হতে পারে- তা হলো এই যে, আখিরাতে তাদেরকে কোনো প্রশ্নই করার প্রয়োজন নেই। কেননা অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে। অতএব, উল্লিখিত দু'টি আয়াতের মধ্যে কোনো গরমিল নেই। -[তাফসীরে কাবীর, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

قَوْلُهٗ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهٖ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ অর্থাৎ সেদিন কোনো মানুষ ও কোনো জিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হবে না।

এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি হলো এই যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক অমুক গুনাহ করেছ কিনা? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা এবং আল্লাহ তা'আলার আদিজ্ঞানে (اَلْعِلْمُ الْاَزَلِيُّ) পূর্ব হতেই বিদ্যমান রয়েছে; বরং তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে কেন তোমরা অমুক অমুক গুনাহ করেছ? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরূপ তাফসীর করেছেন। মুজাহিদ (র.) বলেছেন, অপরাধীদের শাস্তি দানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে এ কথা জিজ্ঞেস করবে না যে, তোমরা এ গুনাহ করেছ কি না? তাদেরকে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজনই হবে না। কেননা প্রত্যেক গুনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এ চিহ্ন দেখে তাদেরকে কপালের চুল ও পা ধরে হ্যাঁচড়িয়ে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। পরবর্তী "يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ" আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। উপরিউক্ত দু'টি তাফসীরের সারমর্ম হচ্ছে- হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এ ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গুনাহ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। আল্লাহর আদিজ্ঞান বা তাদের নিজেদের চিহ্নের ভিত্তিতেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, এটা ঐ সময়ের কথা যখন একবার তাদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর তারা অস্বীকার করবে তখন কসম করবে। উপরিউক্ত তিনটি তাফসীর কাছাকাছি, তাতে কোনো বিরোধ নেই। -[ইবনে কাসীর]

سِيْمَا শব্দের মর্মার্থ, কিয়ামতের দিনে অপরাধীদের নিদর্শন : سِيْمَا শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, আলামত। হযরত হাসান (র.) বলেছেন, বিমর্ষ ম্লান মুখাবয়ব ও ভীত-সন্ত্রস্ত চক্ষুদ্বয়। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

কিয়ামতের দিন একটি বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সব মানুষ একত্র হবে। সেখানে কে অপরাধী এবং কে নিরপরাধী তা কোনো মানুষ বা জিনকে জিজ্ঞেস করা হবে না। অপরাধীদের বিমর্ষ-ম্লান মুখাবয়ব, তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত চক্ষুদ্বয়, তাদের ঘাবড়ে যাওয়া আকার-আকৃতি এবং তাদের সর্বাঙ্গ হতে প্রবহমান ঘর্ম-ই অপরাধীদের পরিচয় দিয়ে দেবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) سِيْمَا শব্দের যে অর্থ করেছেন, এর আলোকে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন অপরাধীদের চিহ্ন হবে মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুনীলাভ। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ণ হবে। এ চিহ্নের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

অনুবাদ :

٤٦. وَلِمَنْ خَافَ أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لِمَجْمُوعِهِمْ مَقَامَ رَبِّهِ قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْحِسَابِ فَتَرَكَ مَعْصِيَتَهُ جَنَّتٰنِ ـ

৪৬. আর যে ব্যক্তি ভয় করতে থাকে অর্থাৎ তাদের উভয়ের জন্য অথবা তাদের সকলের জন্য নিজ প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে হিসাব-নিকাশের উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং গুনাহ পরিত্যাগ করে তার জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।

٤٧. فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ

৪৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٤٨. ذَوَاتَا تَثْنِيَةُ ذَوَاتٍ عَلَى الْأَصْلِ وَلَامُهَا تَاءٌ أَفْنَانٍ ج أَغْصَانٍ جَمْعُ فَنَنٍ كَطَلَلٍ ـ

৪৮. এতদুভয়ে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। ذَوَاتَا শব্দটি এখানে ذَوَاتٌ শব্দের দ্বিবচন। মূলের ভিত্তিতে তার লাম বর্ণ تَاءٌ বর্ণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। أَفْنَانٍ অর্থ- أَغْصَانٍ ; এটা فَنَنٌ -এর বহুবচন। যেমন طَلَلٌ -এর বহুবচন أَطْلَالٌ।

٤٩. فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ

৪৯. অতএব, তোমরা স্বীয় রবের কোন অনুগ্রহ কে অস্বীকার করবে?

٥٠. فِيهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ج

৫০. উভয় বেহেশতে দুটি প্রবহমান প্রস্রবণ রয়েছে।

٥١. فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

৫১. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٥٢. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فٰكِهَةٍ فِي الدُّنْيَا أَوْ كُلِّ مَا يُتَفَكَّهُ بِهِ زَوْجٰنِ ج نَوْعَانِ رَطْبٌ وَيَابِسٌ وَالْمُرُّ مِنْهُمَا فِي الدُّنْيَا كَالْحَنْظَلِ حُلْوٌ ـ

৫২. উভয় বেহেশতে রয়েছে সকল প্রকার ফল যা পৃথিবীতে পাওয়া যেত। অথবা, রুচিসম্মত ও মজাদার জিনিসসমূহ। তাজা ও শুষ্ক দুই দুই প্রকার ফল হবে। পৃথিবীতে যা টক ও বিস্বাদ ফল যেমন মাকাল তাও সেখানে মিষ্টি মধুর হবে।

٥٣. فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ

৫৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٥٤. مُتَّكِئِينَ حَالٌ عَامِلُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ يَتَنَعَّمُونَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ط مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ وَالظَّهَائِرُ مِنَ السُّنْدُسِ ـ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ ثَمَرُهُمَا دَانٍ ـ قَرِيبٌ يَنَالُهُ الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ ـ

৫৪. তারা এমন বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে এটা حَالٌ তার عَامِلٌ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ "يَتَنَعَّمُونَ" [সুখ উপভোগ করবে।] রেশমী বসনাবৃত শয্যাসমূহের উপর অবস্থান করবে। মোটা রেশম দ্বারা গদি, আর তার উপরের চাদর চিকন রেশমের দ্বারা প্রস্তুত হবে। উভয় বেহেশতের ফল এতদুভয়ের ফল তাদের নিকটবর্তী হবে। এরূপ নিকটবর্তী হবে যে, তা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত ব্যক্তি লাভ করবে।

٥٥. فَبِأَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ـ

৫৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٦. فِيْهِنَّ فِى الْجَنَّتَيْنِ وَمَا اشْتَمَلَتَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَلَالِيّ وَالْقُصُوْرِ قَصِرَاتُ الطَّرْفِ الْعَيْنِ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ الْمُتَّكِئِيْنَ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ يَفْتَضُّهُنَّ وَهُنَّ مِنَ الْحُوْرِ اَوْ مِنْ نِّسَاءِ الدُّنْيَا الْمُنْشَاتِ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

৫৬. তন্মধ্যে উভয় বেহেশতে ও তন্মধ্যস্থিত সৌধরাজি ও অট্টালিকাসমূহে বহু আনত দৃষ্টিসম্পন্নাগণ থাকবে যাদের নয়নযুগল কেবলমাত্র স্বীয় স্বামীদের প্রতি নিবন্ধ থাকবে। মানব ও জিন জাতির মধ্য হতে যারা শয্যায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট আছে। যাদেরকে স্পর্শ করেনি– স্বামী-স্ত্রী সংঘটিত কোনো ব্যবহার তাদের সাথে হয়নি। এরা জান্নাতের হুর অথবা, পৃথিবীর রমণীগণের মতো নূতনভাবে পয়দা করা হবে। ইতঃপূর্বে কোনো মানব অথবা কোন জিন।

٥٧. فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

৫৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فُرُشٍ : অধিকাংশ কারীগণ فُرُشٍ শব্দের ر ও ف অক্ষরদ্বয়ের উপর পেশ দিয়ে فُرُشٍ পড়েছেন। আবূ হায়ওয়া ف অক্ষরের উপর পেশ ও ر অক্ষর সাকিন করে فُرْشٍ পড়েছেন।

قَوْلُهُ جَنٰى : جَنٰى শব্দে দু'টি কেরাআত রয়েছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ جَنٰى শব্দের ج অক্ষরের উপর জবর দিয়ে جَنٰى পড়েছেন। ঈসা ইবনে ওমর ج অক্ষরের নিচে যের দিয়ে جِنٰى পড়েছেন।

قَوْلُهُ ذَوَاتَا اَفْنَانٍ وَ جَنَّتَانِ : جَنَّتٰنِ শব্দটি মুবতাদা মুআখখার এবং مَوْصُوْف আর لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ কালামটি খবরে মুকাদ্দাম। এখন ذَوَاتَا اَفْنَانٍ শব্দ দুটি مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْهِ মিলে جَنَّتٰنِ -এর সিফাত হয়েছে।

قَوْلُهُ مُتَّكِئِيْنَ : مُتَّكِئِيْنَ পদটি একটি উহ্য ফে'লের যমীর হতে حَالٌ হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। মূল বাক্যটি ছিল– يَتَنَعَّمُوْنَ مُتَّكِئِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ নিয়ামত ভোগ করবে হেলান দেওয়া অবস্থায়।

عَلٰى فُرُشٍ কিসের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে? : عَلٰى فُرُشٍ শব্দ দুটি جَارٌ ও مَجْرُوْرٌ মিলে একটি উহ্য ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। যার মূলে ছিল يَتَنَعَّمُوْنَ عَلٰى فُرُشٍ অথবা تَفَكَّهُوْنَ عَلٰى فُرُشٍ

قَوْلُهُ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ : وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ কালামের جَنَا الْجَنَّتَيْنِ শব্দ দুটি مُضَافْ ও مُضَافْ اِلَيْهِ মিলে مُبْتَدَأ হয়েছে। আর دَانٍ হলো তার خَبَرْ

قَوْلُهُ فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ : فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ আয়াতের বর্ণিত هُنَّ যমীরটির مَرْجِعْ হলো جَنَّتٰنِ ও اَنْعُمُهَا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ الخ : শানে নুযূল : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ الخ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা–

১. হযরত আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আবূ বকর (রা.) কিয়ামতের দিন, হিসাব-নিকাশ, মীজান, জাহান্নাম ও জান্নাত সম্বন্ধে আলোচনা করে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে বলেছেন, হায়! আমি যদি এ তৃণলতা বা ঘাসের মধ্যকার একটি ঘাস হতাম, তাহলে কোনো জন্তু এসে আমাকে খেয়ে ফেলত, আমার জন্য এটা কতোইনা ভাল হতো! কিন্তু আফসোস! আমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তখন উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে আল্লাহভীরু লোকদের ক্ষমা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে–

২. ইবনে আবূ হাতেম (র.) ইবনে শাওযিব হতে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

Free @ www.eelm.weebly.com

৩. হযরত আতিয়া ইবনে কায়েস (রা.) বলেছেন, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তির শানে অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি বলেছিলেন– সম্ভবত আমি আল্লাহকে চিনি এবং আমি বিপথগামী। অতএব আমাকে আগুনে পুড়ে ফেলে দাও। রাবী বলেছেন, এ কথার পর লোকটি একরাত একদিন পর্যন্ত মাগফেরাত কামনা করে আল্লাহর নিকট তওবা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর তওবা কবুল করেছেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। –[ইবনে কাসীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (র.) প্রমুখ বলেছেন, আয়াতটি সর্বসাধারণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। নির্দিষ্ট করে এটা কারো শানে অবতীর্ণ হয়নি। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে এর যোগসূত্র : পূর্বোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের অবস্থা, ভয়াবহ পরিণতি এবং তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বলেছেন। অতঃপর এখানে তিনি সৎ ও মুত্তাকী লোকদের অবস্থা এবং তাদের জন্য তৈরি জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। –[কুরতুবী]

মুফতী শফী (র.) বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার লোকদের উত্তম প্রতিফল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দু'উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দু'উদ্যান এবং তাতে জান্নাতীদের জন্য যা পরিবেশন করা হবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ অর্থাৎ আর আল্লাহর সম্মুখে পেশ হবার ভয় পোষণ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই দু'খানি বাগান রয়েছে।'

অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন যে, مَقَامَ رَبِّهٖ দ্বারা কিয়ামতের দিন মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে হিসেবের জন্য হাজির হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। –[ইবনে কাসীর]

এর অর্থ হচ্ছে– দুনিয়াতে যে লোক নিজের চিন্তা ও কল্পনায় এ বিশ্বাস করে যে, একদিন আমাকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে সকল কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। আর আল্লাহ সৎকর্মের জন্য ভালো প্রতিদান তথা জান্নাত আর অসৎকর্মের জন্য খারাপ প্রতিদান তথা জাহান্নাম দিবেন। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই দু'টি বাগান রয়েছে। যে ব্যক্তি সদা সর্বদা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে হিসাব দেওয়ার চিন্তা করে সে কখনো পাপকার্জে জড়িত হতে পারে না। ফলে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন]

ইমাম কুরতুবীসহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন– مَقَامَ رَبِّهٖ -এর অর্থ হচ্ছে– আমাদের প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই আল্লাহ জানেন ও দেখেন। তাঁরই দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ। আল্লাহর উপর এ বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় ও পাপকর্ম হতে রক্ষা করে এবং দূরে রাখে। ফলে সে সৎকর্ম করতে পারে। আর এ কারণেই তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

উল্লেখ্য যে, মানব ও দানব হতে যে কেউ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা স্মরণ করে গুনাহ হতে মুক্ত থাকবে সে নিঃসন্দেহে বেহেশত লাভ করবে।

قَوْلُهُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا اَوْ لِمَجْمُوْعِهِمْ : জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ" আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন– "لِكُلٍّ مِّنْهُمَا اَوْ لِمَجْمُوْعِهِمْ جَنَّتَانِ" অর্থাৎ তাদের [জিন ও মানুষ] প্রত্যেকের জন্য অথবা সকলের জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে। এর একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা–

১. একটি জান্নাত আল্লাহভীরু ও মুত্তাকী মানুষের জন্য হবে। আর অপরটি পরহেযগার জিনদের জন্য হবে।
২. মানব ও জিন উভয়ের মধ্যে যারা আল্লাহভীরু তাদের সহীহ ও নির্ভুল আকীদা বিশ্বাসের জন্য এক জান্নাত। আর তাদের সৎকর্মের জন্য আরেক জান্নাত হবে।
৩. তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আত্মিক ও আরেকটি দৈহিক জান্নাত দেওয়া হবে।
৪. মানব ও দানবকে ইবাদতের সুফল স্বরূপ একটি জান্নাত দেওয়া হবে আর পাপ হতে বেঁচে থাকার কারণে আরেকটি জান্নাত দেওয়া হবে।
৫. মানব ও দানব তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ একটি জান্নাত লাভ করবেন আর আরেকটি পাবেন আল্লাহর অতিরিক্ত অনুদান হিসেবে।

কারো কারো মতে দুটি জান্নাতের একটি হচ্ছে– আল্লাহভীরু লোকদের তৈরিকৃত আর অপরটি হচ্ছে– ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত। অথবা কারো কারো মতে একটি জান্নাত তার নিজের জন্য প্রদান করা হবে আর অপরটি তার স্ত্রীদের জন্য প্রদান করা হবে। কারো মতে একটি জান্নাত হবে তার অবস্থানের জন্য আর অপরটি তার বিনোদনের জন্য। কারো মতে একটি জান্নাত হলো বেহেশতের উচ্চশ্রেণির লোকদের জন্য আর অপরটি নিম্নশ্রেণির লোকদের জন্য। আবার কারো মতে দুটি জান্নাত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– এক জান্নাত হতে অপর জান্নাতে স্থানান্তরিত হয়ে অধিক আরাম উপভোগ করা।

মুকাতিল (র.) বলেন, এক জান্নাত আদনান, আর অপর জান্নাত নাঈম হবে। আর মুহাম্মদ বিন আলী তিরমিযী (র.) বলেন, এক জান্নাত আল্লাহভীতির বিনিময়ে আর এক জান্নাত রিপুর তাড়না পরিত্যাগ করার কারণে প্রদত্ত হবে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফরজসমূহ সম্পন্ন করার কারণে এক জান্নাত ও নফলসমূহের কারণে একটি জান্নাত প্রদত্ত হবে।

আয়াতে প্রথমে দুটি বাগান এবং পরে আরো দুটি বাগানের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত দুটি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য প্রাপ্ত খাস বান্দাগণের জন্য। আর শেষোক্ত দুটি সাধারণ মুমিনের জন্য।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত জান্নাতদ্বয়ের অধিকারী কারা? : "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ" এবং "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ" আয়াতে উল্লিখিত উদ্যানে কারা প্রবেশ করবে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ইতোপূর্বে "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ" আয়াতের অর্থের শিরোনামে প্রথমোক্ত দুটি উদ্যান বা জান্নাতে যারা প্রবেশ করবে তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের কথা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা আল্লাহর ভয়ে গুনাহ ও পাপ কাজ হতে দূরে থাকবে, তারা ঐ দুটি উদ্যানের অধিবাসী হবে।

কিন্তু শেষোক্ত দুটি উদ্যানের অধিবাসী কে বা কারা হবে তা আল্লাহ তা'আলা আয়াতে নির্দিষ্ট করে বলেননি। তবে এ কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ দুটি উদ্যান প্রথমোক্ত দু উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ" পূর্বোক্ত দুটি উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরো দুটি উদ্যান রয়েছে। এটা হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ উদ্যানদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ ঈমানদার লোকেরা যারা নৈকট্যশীলদের (مُقَرَّبِيْنَ) তুলনায় কিছুটা নিম্ন মর্যাদার।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদ্বয়ের তাফসীর প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ আরো অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরিউক্ত তাফসীরই অগ্রগণ্য বলে ধারণা করা যায়। –[মা'আরিফুল কুরআন]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ "وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ" এবং "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ"-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন– "جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلْمُقَرَّبِيْنَ وَجَنَّتَانِ مِنْ وَرِقٍ لِاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ" অর্থাৎ স্বর্ণ নির্মিত দুটি উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্য, আর রৌপ্য নির্মিত দুটি উদ্যান সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার লোকদের জন্য। –[ইবনে কাসীর, দুররে মানসূর]

এছাড়া দুররে মানসূরে হযরত বারা ইবনে আজিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে– "اَلْعَيْنَانِ اللَّتَانِ تَجْرِيَانِ خَيْرٌ مِنَ النَّضَّاخَتَيْنِ" প্রথমোক্ত দুটি উদ্যানের দুটি প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تَجْرِيَانِ তথা প্রবহমান বলা হয়েছে, তা শেষোক্ত দুটি উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে نَضَّاخَتَانِ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে প্রবহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) –[ইবনে কাসীর, ফতূহাতে ইলাহিয়া, দুররে মানসূর]

قَوْلُهُ ذَوَاتَا اَفْنَانٍ : ذَوَاتَانِ শব্দটিতে দুটি লোগাত আছে– ১. ذَوَاتَا শব্দটি মূল শব্দের দিক হতে ذَاتٌ-এর দ্বিবচন। ২. আর অপর লোগাত হলো ذُوَتَةٌ যার عَيْنِ كَلِمَةٌ হলো وَاوْ এবং لَامْ كَلِمَةٌ হলো ى এটা ذُوْ-এর تَانِيْث যার দ্বিবচন ذَوَاتَا ব্যবহার হয়। গ্রন্থকার প্রথমোক্ত শব্দের প্রতি নিজের মত প্রকাশ করেন।

আর اَفْنَانٌ শব্দের অর্থ হলো اَغْصَانٌ শব্দটি فَنَنٌ-এর বহুবচন। যেমনিভাবে غُصْنٌ-এর বহুবচন اَغْصَانٌ এবং ظِلٌّ-এর বহুবচন اَظْلَالٌ ; সম্ভবত এর মৌলিক অর্থ ডালসমূহই উদ্দেশ্য। অথবা, এটা বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতরাজির সমষ্টি হতে রূপক অর্থে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ জান্নাত দুটি ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এগুলো ছাড়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও হবে।

قَوْلُهُ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ" দুটি বাগানে দুটি ঝর্ণা সদা প্রবহমান।' এ কালামটি প্রথমোক্ত দুটি জান্নাতের– দ্বিতীয় বিশেষণ বা সিফাত। তাতে জান্নাতদ্বয়ের দ্বিতীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দুটি উদ্যানের প্রত্যেকটির নিম্নে দিয়ে একটি করে ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে। এ কথা সবারই জানা আছে যে, উদ্যান ও জান্নাতের নিম্নে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে তা দেখতে কতোই না সৌন্দর্যময়। কতোই না মধুর সে দৃশ্য। আজকের দুনিয়ায় যারা আরাম ও ভোগ বিলাসে সর্বদা ব্যস্ত রয়েছে, তাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা জলটঙ্গী তৈরি করে তথায় গ্রীষ্মকালে বসবাস করে। কিন্তু আখিরাতের এ জান্নাত ও উদ্যান কোনো একটি মৌসুমের জন্য সীমিত নয় সর্বদাই তার বিলাস ভবন থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ : আলোচ্য আয়াতটি জান্নাতদ্বয়ের তৃতীয় বিশ্লেষণ, আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে।

১. উভয় বাগানের ফলসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ও অভিনব হবে। এক বাগানে গেলে এক ধরনের ফল অন্য বাগানে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরনের ফল দৃষ্টিগোচর হবে।

২. বাগান দুটির একটিতে সুপরিচিত ফল হবে যদিও স্বাদে-গন্ধে স্বতন্ত্র ধরনের হবে। অন্য বাগানের ফলগুলো হবে অভিনব, যা কখনো কল্পনা করেনি।

জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, উভয় জান্নাতে সকল রকম ফল রয়েছে, যা দুনিয়াতেও পরিচিত অথবা উভয় জান্নাতে সকল প্রকার রুচিপূর্ণ বস্তুসমূহ রয়েছে। ঐ সকল ফল ও মজাদার বস্তুসমূহ দুপ্রকারের হবে– তাজা ও শুষ্ক। দুনিয়াতে যা তিক্ত ছিল, যেমন– حَنْظَلٌ বা মাকাল, তাও তথায় সুমিষ্ট হবে। –[জালালাইন]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে–

مَا فِى الدُّنْيَا شَجَرَةٌ حُلْوَةٌ وَلَا مُرَّةٌ اِلَّا وَهِىَ فِى الْجَنَّةِ حَتَّى الْحَنْظَلِ اِلَّا اَنَّهُ حُلْوٌ -

অর্থাৎ, পৃথিবীর মিষ্ট ও তিক্ত সকল প্রকারের গাছ এমন কি حَنْظَلٌ বা মাকালও জান্নাতে সুমিষ্ট হবে।

–[হাশিয়ায়ে জালালাইন, কামালাইন, ফতুহাতে ইলাহিয়া]

কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহর এ উক্তি দ্বারা পরবর্তী আয়াতে উল্লিখিত দুটি জান্নাতের উপর এখানে উল্লিখিত জান্নাত দুটির ফজিলত ও মহত্ত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কেননা এখানে দুটি জান্নাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে একই ফলের দুপ্রকার স্বাদ ও মজার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে যে জান্নাতদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে একটি ফলে দুধরনের স্বাদের কথা বর্ণনা করা হয়নি। –[ফতুহাতে ইলাহিয়া]

قَوْلُهُ جَنَّةُ الْاٰخِرَةِ مُخَالِفَةٌ لِجَنَّةِ الدُّنْيَا : পরকালীন উদ্যান দুনিয়ার উদ্যান হতে ভিন্নতর : আল্লামা রাযী (র.) বলেন, আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য আখিরাতে যে জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন তা তিনটি কারণে পৃথিবীর উদ্যান হতে ভিন্নতর। যথা–

১. সাধারণ পৃথিবীর গাছ-গাছালি ও তরুলতার ফল ফলাদি তার উপরিভাগে হয়ে থাকে। ফলে মানুষ ইচ্ছে করলেই তা হতে যে কোনো সময় উপকৃত হতে পারে না। অনেক সময় তা গাছ থেকে ছিড়ে নিতে পারে না। পক্ষান্তরে পরকালে যারা জান্নাতী হবেন তারা কোনো কিছুর প্রয়োজনবোধ করলে অমনিতেই তা তার নিকট হাজির হয়ে যাবে।

২. মানুষ পৃথিবীতে ফল-ফলাদি সংগ্রহ ও আহরণের জন্য চেষ্টা করে থাকে এবং নানা কৌশলের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করে থাকে, পক্ষান্তরে পরকালে তা নিজেই জান্নাতীদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পড়বে। এজন্য জান্নাতবাসীদের কোনোরূপ কষ্ট পোহাতে হবে না।

৩. যখন মানুষ পৃথিবীতে কোনো একটি গাছের ফলের নিকট পৌঁছবে তখন অপর গাছের ফল হতে দূরবর্তী হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে পরকালে প্রতিটি গাছের ফল একই সময় একই স্থানে তার নিকট উপস্থিত থাকবে। –[তাফসীরে কাবীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পরকালে জান্নাতের গাছগুলো এতোই নিচে নেমে আসবে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ তা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে। সে দাঁড়ানো থাকুক বা বসা থাকুক বা হেলান দিয়ে থাকুক।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতের ফল সংগ্রহের জন্য হস্ত প্রসারিত করবে, তখন দূরত্ব ও কাঁটা তাকে বঞ্চিত করবে না। আল্লাহ এ বিষয়টিকেই "وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ" আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ : جَنَى শব্দটি زَبَرْ সহযোগে اِسْمُ مَقْصُوْرٍ; অর্থ– ফল জন্ম হওয়া বা ফল লাভ হওয়া কিংবা ফল গুটিয়ে নেওয়া। جَنَى ক্রিয়াপদটি কর্ম পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনিভাবে قَبْضٌ শব্দটি مَقْبُوْضٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ মুবতাদা ও খবর হয়েছে। دَانٍ শব্দটি মূলে ছিল دَانِوٌ যেমন– غَازٍ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلٍ তা'লীল হয়ে غَازٍ হয়েছে। অনুরূপভাবে دَانِوٌ শব্দ তা'লীল হয়ে دان হয়েছে।

আল্লাহর দোস্ত মুমিনগণ বেহেশত হতে ফলসমূহ গুটিয়ে নেবে। ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ইচ্ছা করলে শুয়ে শুয়ে অথবা বসে বসে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, দূরত্ব ও কাঁটার কারণে তাদের হাত ফলগাছসমূহ হতে ফিরে আসবে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, তিন কারণে দুনিয়ার জান্নাত হতে আখিরাতের জান্নাত ভিন্নতর। যথা–

১. দুনিয়ার ফল গাছের মাথা স্বাভাবিকভাবে মানুষের থেকে দূরে হয়। কিন্তু বেহেশতের মধ্যে এলায়িত ব্যক্তির সন্নিকট করে ফল দেওয়া হবে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

২. দুনিয়ার মানুষকে ফল পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয় এবং গাছ নাড়াতে হয়; কিন্তু আখিরাতে ফল তার কাছেই এসে যাবে এবং ফল নিয়ে খাদেমগণ তার চারদিকে চক্কর দেবে।

৩. দুনিয়াতে মানুষ এক গাছের ফলের নিকট গেলে অন্য গাছের ফল তার থেকে দূরে থাকে; কিন্তু আখিরাতে একই সময়ে সব ধরনের ফল তার নিকটে এসে যাবে।

قَوْلُهُ فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ : قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ শব্দটি তাহকীকের জন্য اِسْمُ فَاعِلٍ-কে তার মানসূবের উদ্দেশ্যে ইজাফত করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে قَصَرَ طَرْفَهُ عَلٰى كَذَا বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হওয়ার কারণে তার مُتَعَلِّقٌ হজফ করা হয়েছে। তাহলে عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ অর্থ হলো- বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দরী তরুণীর, যারা তাদের স্বামীদের চারদিকে অবস্থিত থাকবে। অথবা, এর অর্থ হলো তাদের সৌন্দর্যের কারণে রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হয়ে তাদের স্বামীগণ তারা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। তারা এমন কুমারী হবে যাদের সাথে ইতঃপূর্বে কারো সাথে সঙ্গম হয়নি এবং তাদের সতীচ্ছেদ তথা যোনীপথ এমন সংকীর্ণ হবে নাযার দরুন দুনিয়াতে প্রথম সহবাসে কষ্ট হয়। এরা হবে হয়ত বেহেশতের হুর অথবা নব তৈরি রমণী। মুক্তার ন্যায় চকচকে দেহ হবে তাদের। মোটকথা, দর্শকদের দৃষ্টি হরণ করবে তাদের রূপ লাবণ্য।

নারীদের সৌন্দর্যের পূর্বে তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য : এখানে আল্লাহ তা'আলা নারীদের রূপ ও সৌন্দর্যের আলোচনা করার পূর্বে তাদের লজ্জাশীলতা, পবিত্রতা ও সতীত্বের বিবরণ দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে- নারীদের আসল বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য নির্লজ্জ ও উচ্ছৃঙ্খল না হওয়া। নারীর লজ্জাশীলতা ও চরিত্রবতী হওয়াই আসল ও প্রকৃত ভূষণ। তাদের দৃষ্টি সলজ্জভাবে অবনত হওয়াই শোভনীয়। সুন্দরী নারীরা পৃথিবীতে ক্লাবঘর ও প্রেক্ষাগৃহে সহ-সম্মেলনে বিপুলভাবে ভীড় জমিয়ে থাকে। আর সারা দুনিয়ায় বাছাই করা সুন্দরীদের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় একত্র করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র কুরুচি সম্পন্ন ও চরিত্রহীন লোকেরাই তাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। যে রূপ ও সৌন্দর্য যে কোনো কামনা ও পঙ্কিল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, আমন্ত্রণ জানায় এবং যে কোনো ক্রোড়ে ঢলে পড়তে প্রস্তুত হয়, সে রূপ ও যৌবনে সুরুচি ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিই কিছুমাত্র উদ্দীপনাবোধ করতে পারে না।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে জান্নাতী লোকদের জন্য যে পবিত্র আত্মা ও দেহবিশিষ্ট ললনাদের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এটা প্রথমোক্ত জান্নাতদ্বয়ের চতুর্থ সিফাত ও বিশেষণ। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

قَوْلُهُ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ" অর্থাৎ কোনো মানুষ বা জিন তাদের এ জান্নাতী লোকদের পূর্বে স্পর্শও করেনি।

طَمْثٌ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একটি অর্থ হায়েজের রক্ত। যে নারীর হায়েজ হয় তাকে طَامِثٌ বলা হয়ে থাকে। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকে طَمْثٌ বলা হয়। এখানে শেষোক্ত অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব طَمْثٌ শব্দের শেষ অর্থের আলোকে আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোনো মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোনো জিন স্পর্শ করেনি।

২. দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে জান্নাতে এরূপ অঘটন সংঘটিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। -[মা'আরিফুল কুরআন]

এ কথাটির আসল অর্থ হলো নেককার মানুষের ন্যায় নেককার জিনেরাও জান্নাতে প্রবেশে করবে। সেখানে জিন ও মানুষ উভয় জাতিরই মহিলা হবে। সবই লজ্জাশীল ও অস্পর্শিতপূর্ব হবে। কোনো জিন স্ত্রীলোক তার জান্নাতী জিন স্বামীর পূর্বে অপর কোনো জিন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না, কোনো মানুষ পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃতা হবে না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ)

এসব রমণী যাদেরকে কেউই স্পর্শ করেনি- তারা কে বা কারা? সে সম্পর্কে তাফসীরকারদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তারা হলো اَلْحُوْرُ الْعِيْنُ তথা জান্নাতের হুর। কেননা তাদেরকে জান্নাতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব স্বামীদের পূর্বে কেউই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। কারো মতে, তারা হলো نِسَاءُ الدُّنْيَا দুনিয়ার নারীগণ যাদের এমন পবিত্র চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের সৃষ্টি হতে কেউই তাদের স্পর্শ করতে পারে নি। কারো মতে তারা হলো ঐসব রমণী যারা কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতএব তাদেরকে কেউই স্পর্শ করতে পারেনি। -[খাযিন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥٨. كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ صَفَاءً وَالْمَرْجَانُ ج اَىِ اللُّؤْلُؤُ بَيَاضًا .

৫৮. তারা যেন ইয়াকুত পরিচ্ছন্নতায় ও প্রবাল রত্নমুক্তা সাদাবর্ণে।

٥٩. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৫৯. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٠. هَلْ مَا جَزَاۤءُ الْاِحْسَانِ بِالطَّاعَةِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ج بِالنَّعِيْمِ .

৬০. তবে কি هَلْ টি مَا অর্থে ব্যবহৃত ইহসানের [উত্তম কাজের] প্রতিদান আনুগত্যের ইহসান ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে? বেহেশত দান করা।

٦١. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬১. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٢. وَمِنْ دُوْنِهِمَا اَىِ الْجَنَّتَيْنِ الْمَذْكُوْرَتَيْنِ جَنَّتٰنِ ج اَيْضًا لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ .

৬২. আর সেই দুটি ব্যতীত অর্থাৎ উল্লিখিত জান্নাত দুটি ব্যতীত আরো দুটি বেহেশত রয়েছে আরো যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।

٦٣. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٤. مُدْهَاۤمَّتٰنِ ج سَوْدَاوَانِ مِنْ شِدَّةِ خُضْرَتِهِمَا .

৬৪. সেই উদ্যান দুটি গাঢ় সবুজ বর্ণের ঘনসবুজ হওয়ার কারণে শ্যামল বর্ণ ধারণকারী।

٦٥. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٦. فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ . فَوَّارَتَانِ بِالْمَاۤءِ لَا يَنْقَطِعَانِ .

৬৬. সেই উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে দুটি ঝর্ণা উথলিত হতে থাকবে পানির ফোয়ারা অবিরাম প্রবাহিত হবে।

٦٧. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ج

৬৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٦٨. فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ج هُمَا مِنْهَا وَقِيْلَ مِنْ غَيْرِهَا .

৬৮. সেই উদ্যান দুটিতে নানাবিধ ফল এবং খেজুর ও আনার থাকবে, খেজুর ও আনার ফলের মধ্য হতে হবে। মতান্তরে এ দুটি তা ব্যতীত হবে।

٦٩. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৬৯. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٠. فِيْهِنَّ اَىِ الْجَنَّتَيْنِ وَقُصُوْرِهِمَا خَيْرَاتٌ اَخْلَاقًا حِسَانٌ ج وُجُوْهًا

৭০. সেগুলোতে রয়েছে অর্থাৎ বেহেশত দুটিও তার সৌধরাজিতে উত্তম স্বভাবসম্পন্না রূপসীগণ আকৃতি বিচারে।

٧١. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

৭১. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

Free @ www.e-ilmweebly.com

٧٢. حُوْرٌ شَدِيْدَاتُ سَوَادِ الْعُيُوْنِ وَبَيَاضِهَا مَقْصُوْرٰتٌ مَسْتُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ ج مِنْ دُرٍّ مُجَوَّفٍ مُضَافَةٌ اِلَى الْقُصُوْرِ شَبِيْهَةً بِالْخُدُوْرِ.

৭২. এই হুরগণ যাদের চোখের মণি নির্মল সাদা ও প্রগাঢ় কাল হবে সুরক্ষিতা হবে পর্দায় অবস্থানকারিণী খীমাসমূহের মধ্যে যা ফাঁকা মুক্তার দ্বারা নির্মিত হবে। আর এ সকল খীমা হুরগণের জন্য পর্দাতুল্য হবে।

٧٣. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

৭৩. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٤. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ قَبْلَ اَزْوَاجِهِنَّ وَلَا جَآنٌّ ج

৭৪. এদের স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ তার পূর্বে অর্থাৎ তাদের স্বামীগণের পূর্বে আর না কোনো জিন।

٧٥. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

৭৫. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٦. مُتَّكِئِيْنَ اَىْ اَزْوَاجُهُنَّ وَاِعْرَابُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ جَمْعُ رَفْرَفَةٍ اَىْ بُسُطٍ اَوْ وَسَائِدَ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ج جَمْعُ عَبْقَرِيَّةٍ اَىْ طَنَافِسَ.

৭৬. এরা হেলান দিয়ে বসবে অর্থাৎ তাদের স্বামীগণ, তার পূর্বে উল্লিখিত اِعْرَابْ -এর অনুরূপ। সবুজ নকশীদার رَفْرَفْ শব্দটি رَفْرَفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থাৎ শয্যা অথবা তাকিয়া ও অতিসুন্দর গালিচার উপর عَبْقَرِيٍّ শব্দটি عَبْقَرِيَّةٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ গালিচা।

٧٧. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

৭৭. অতএব, [হে জিন ও মানব!] তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

٧٨. تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ. تَقَدَّمَ وَلَفْظُ اِسْمٍ زَائِدٌ.

৭৮. আপনার প্রতিপালকের নাম বড় বরকতপূর্ণ, যিনি মর্যাদাবান ও দয়ালু। এরূপ আয়াত পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। আর اِسْمٌ শব্দটি অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَيْرَاتٌ : অধিকাংশ ক্বারীগণ خَيْرَاتٌ শব্দটির ى অক্ষরের উপর সাকিন দিয়ে خَيْرَاتٌ পড়েছেন এবং অন্যান্য ক্বারীগণ ى অক্ষরের উপর তাশদীদ দিয়ে خَيِّرَاتٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ رَفْرَف : অধিকাংশ ক্বারীগণ একবচন হিসেবে رَفْرَفٌ পড়েছেন। আর হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) প্রমুখ বহুবচন হিসেবে رَفَارِفٌ পড়েছেন।

قَوْلُهُ عَبْقَرِيٍّ : অধিকাংশ ক্বারীগণ عَبْقَرِيٍّ শব্দটি একবচনের ভিত্তিতে পড়েছেন আর হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বহুবচনের ভিত্তিতে عَبَاقَرِيٌّ পড়েছেন। কেউ কেউ عَبَاقِرُ -ও পড়েছেন।

قَوْلُهُ خُضْر : অধিকাংশ ক্বারীগণ خُضْرٌ শব্দের خ অক্ষরে ضَمَّةٌ আর ض সাকিন করে পড়েছেন। কেউ কেউ خ ও ض অক্ষরের উপর ضَمَّةٌ দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ ذِىْ : অধিকাংশ ক্বারীগণ ذِى الْجَلَالِ শব্দটি رَبِّكَ -এর صِفَةٌ হিসেবে ذِى الْجَلَالِ পড়েছেন। ইবনে আমের (র.) ذُوالْجَلَالِ শব্দটিকে اِسْمٌ -এর صِفَةٌ ধরে ذُوالْجَلَالِ পড়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ : এ আয়াতটির দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে– এটা قَاصِرَاتٌ -এর সিফাত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– এটা قَاصِرَاتٌ হতে 'হাল' হয়েছে।

يَاقُوتٌ অর্থ হচ্ছে– এমন উত্তম হীরা যাকে আগুন পুড়ে ফেলতে পারে না। আর مَرْجَانٌ অর্থ হচ্ছে– মুক্তা। يَاقُوتٌ বা হীরা সাধারণত লাল বর্ণের হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহ জান্নাতী রমণীদেরকে ইয়াকুত পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে– তারা এমন শ্বেতবর্ণের হবে, যা লাল মিশ্রিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা রংয়ের রাজা হলদে মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের নয়। এর উত্তর হচ্ছে– জান্নাতী রমণীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ভিত্তিতে হীরার সাথে তুলনা করা হয়েছে, রংয়ের ভিত্তিতে নয়।

مَرْجَانٌ অর্থ হলো– মুক্তা। মুক্তা সাদা ও লাল উভয় বর্ণেরই হতে পারে। তাফসীরে খাযিনে রয়েছে, ছোট ছোট মুক্তাকে مَرْجَانٌ বলা হয়, যা খুব বেশি সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। এখানে আল্লাহ জান্নাতী রমণীদের দৈহিক রূপ ও সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ ধরনের উপমা দ্বারা তাদের মর্যাদা বাড়ানোই উদ্দেশ্য।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা এখানে জান্নাতী নারীদের দৈহিক রূপ ও সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জান্নাতী নারীগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় يَاقُوتٌ হীরা পাথরের ন্যায়। আর রংয়ের দিক দিয়ে তারা ছোট ছোট মুক্তার মতো শ্বেত রংয়ের হবে [যা হালকা হলুদ রং দ্বারা মিশ্রিত]। –[তাফসীরে খাযিন, কাবীর]

জান্নাতী নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনাকারী হাদীসসমূহের কয়েকটি : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ" তারা এমনই সুন্দরী রূপসী, যেমন হীরা ও মুক্তা। এ আয়াতে জান্নাতী নারীদের রূপ ও সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীরকার যেসব হাদীসের উল্লেখ করেছেন– তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوَرُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রথম যে জামাত জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারার আকৃতি হবে পূর্ণিমা রজনীর উজ্জ্বল চন্দ্রের মতো।

٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يُرٰى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِيْنَ حُلَّةً حَتّٰى يُرٰى مُخُّهَا -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– জান্নাতী নারীদের একজন যদি বের হয়ে আসে তা হলে সত্তর জোড়া কাপড়ের উপর দিয়ে তার উজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হবে এমন কি তার মূল দেহ দেখা যাবে।

٣. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنٍ اِنَّ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَتَلْبَسُ سَبْعِيْنَ حُلَّةً فَيُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذٰلِكَ كَمَا يُرٰى الشَّرَابُ الْاَحْمَرُ فِى الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ .

হযরত আমর ইবনে মায়মূন (রা.) বলেছেন, ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরেরা সত্তর জোড়া কাপড় পরিধান করলেও তার বাইরে থেকে তাদের শরীরের আসল পরিগঠন এমনভাবে দেখা যাবে যেমন রক্তিম রংয়ের শরবত সাদা গ্লাসে দেখা যায়।

٤. وَقَالَ الْحَسَنُ هُنَّ فِىْ صَفَاءِ الْيَاقُوْتِ وَبَيَاضِ الْمَرْجَانِ -

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, জান্নাতী হূরেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় হীরা পাথরের ন্যায়, আর রংয়ের দিক দিয়ে তারা হলুদ রং বিশিষ্ট ছোট ছোট সাদা মুক্তার ন্যায়।

قَوْلُهُ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ অর্থাৎ শুভ কাজের বিনিময় শুভ কাজ ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদেরকে শুভ প্রতিফল প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মূল আয়াতে اِحْسَانٌ শব্দটি দুবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমোক্ত اِحْسَانٌ ও শেষোক্ত اِحْسَانٌ -এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) প্রথমোক্ত اِحْسَانٌ -এর অর্থ طَاعَةٌ - আনুগত্য এবং শেষোক্ত اِحْسَانٌ -এর অর্থ نَعِيْمٌ জান্নাত করেছেন। –[জালালাইন]

Free@ www.eilm.weebly.com

ইমাম রাযী (র.) উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেছেন, এর তাফসীরে অনেক কথার উল্লেখ রয়েছে, এমন কি এটা সম্পর্কে এ কথাও বলা হয়েছে যে, কুরআনে এমন তিনটি আয়াত আছে, যার প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীরে একশত কথা বর্ণিত হয়েছে। আয়াত তিনটি হলো– ১. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ - ২. وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا - ৩. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এ আয়াতের তাফসীরে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখানে তার মধ্য হতে প্রসিদ্ধ ও অতি নিকটবর্তী কতগুলো নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো–

১. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতিফল জান্নাত ছাড়া আর কি হতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" একনিষ্ঠ বিশ্বাসের সাথে বলল, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।

২. পৃথিবীর ইহসানের প্রতিফল আখিরাতে ইহসান হবে।

৩. যে মহান সত্তা প্রচুর নিয়ামত ও অনুগ্রহের দ্বারা তোমাদের দুনিয়াতে অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের জন্য পরকালে নাঈম নামক জান্নাতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তার প্রতি তোমাদের ইহসান ইবাদত ও তাকওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ তিনটি কথার মূল বিষয় হচ্ছে– যে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করে, তার প্রতি অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করাই উচিত। –[তাফসীরে কাবীর]

হযরত ইকরিমা (রা.) বলেন– "هَلْ جَزَاءُ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِلَّا الْجَنَّةُ" অর্থাৎ যে বলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কি হতে পারে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– "مَا جَزَاءُ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَعَمِلَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ إِلَّا الْجَنَّةُ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ বিনে কোনো উপাস্য নেই স্বীকার করল এবং রাসূল ﷺ-এর আনীত জীবনাদর্শের ভিত্তিতে আমল করল, তার প্রতিফল হলো জান্নাত। –[কুরতুবী, খাযিন]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ "هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ" আয়াত পাঠ করে বলেন, তোমরা জান কি! তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ভালো জানেন। এরপর মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেছেন, যার প্রতি আমি তাওহীদের নিয়ামত বর্ষণ করেছি, তার প্রতিফল নিশ্চিতরূপে জান্নাত হবে। –[কুরতুবী, খাযিন, ইবনে কাসীর]

قَوْلُهُ "وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ" : এ আয়াতে دُوْنَ শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতানুসারে এর অর্থ হচ্ছে– কোনো উঁচু জিনিসের অপেক্ষা নিচু হওয়া।

২. তার দ্বিতীয় অর্থ কোনো উত্তম ও উৎকৃষ্ট অধিক মর্যাদাবান জিনিসের তুলনায় হীন ও সামান্য হওয়া। এটা ইবনে যায়েদের উক্তি। –[কুরতুবী, ইবনে কাসীর]

৩. তার তৃতীয় অর্থ কোনো জিনিস তা ব্যতিরেকে অন্যটি হওয়া।

–[তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থের উল্লেখ করা হয়েছে।]

অর্থের এ বিভিন্নতার কারণে আয়াতটির মোটামুটি অর্থ এ হতে পারে যে, জান্নাতী লোকদের পূর্ববর্তী দুটি বাগান ছাড়াও আরো দুটি বাগান বা জান্নাত দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে যে, এ দুটি বাগান উপরে বলা দুটি বাগানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদা ও কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাগান দুটি হয় উচ্চ স্থানে হবে, আর এ দুটি তার তুলনায় নিম্নস্থানে অবস্থিত হবে। অথবা পূর্ববর্তী বাগান দুটি অতীব উচ্চ মান-মর্যাদার হবে। তার তুলনায় এ দুটি কম মানের, কম গুরুত্বের হবে। প্রথম সম্ভাবনা গ্রহণ করা হলে তার অর্থ হবে এ দুটি অতিরিক্ত বাগানও সেই জান্নাতী লোকদেরকেই আলাদাভাবে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা গ্রহণ করা হলে এর অর্থ হবে, প্রথম বাগান দুটি আল্লাহর অতীব নিকটবর্তী লোকদের জন্য, আর দুটি বাগান ডানপন্থি তথা أَصْحَابُ الْيَمِيْنِ -এর জন্য। এ দ্বিতীয় অর্থটির গ্রহণ যোগ্যতা অধিক মনে হয়। কেননা সূরা ওয়াকি'আয় নেককার লোকদেরকে দুটিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ভাগের লোক হবে 'সাবিকীন' তথা পূর্ববর্তী লোকগণ। তাদেরকেই 'মুকাররাবীন' -ও বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হলো 'আসহাবুল-ইয়ামীন' ডানপন্থিগণ। তাদের 'আসহাবুল-মাইমানা' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। আর এ দুশ্রেণির লোকদের জন্য দু জান্নাতের পরিচিতিও আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হয়েছে। –[ফতূহাতে ইলাহিয়া]

উপরন্তু এ সম্ভাবনার সমর্থনে রয়েছে সেই হাদীস, যা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে তাঁর পুত্র আবূ বকর বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– দুটি জান্নাত সাবিকীন বা মুকাররাবীনের জন্য হবে। তাদের তৈজসপত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী সবই স্বর্ণের হবে। আর দুটি জান্নাত পরবর্তী লোকদের বা ডানপন্থিদের জন্য হবে। তাদের প্রত্যেকটি জিনিস রৌপ্যের হবে। –[ফাতহুল বারী, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

Free @ www.eilm.weebly.com

পরবর্তী জান্নাতদ্বয়ের গুণাগুণ : ইতঃপূর্বে আল্লাহ তা'আলা প্রথম দুটি জান্নাত ও তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তাতে যাঁরা বসবাস করবেন তাঁদের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। এখানে وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ আয়াতে তিনি অপর দুটি জান্নাত ও তার অধিবাসী এবং এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি ধারাবাহিক কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী দুটি জান্নাতের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

১. তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় দান প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে– مُدْهَآمَّتٰنِ ; مُدْهَامَّةٌ শব্দের অর্থ– এমন ঘন-গাঢ় সবুজ, যা চরম মাত্রার সতেজতার কারণে প্রায় কাল দেখা যায়। এটা সবুজ-শ্যামল বাগানের বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রথমোক্ত উদ্যানদ্বয়ের ক্ষেত্রে এ বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ বলে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছিল তা দ্বারা এ গুণটিও শামিল রয়েছে।

   মোটকথা, এ দুটি বাগান ঘন-সন্নিবেশিত সবুজ-শ্যামল ও সতেজ হবে।

২. জান্নাতদ্বয়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ দুটি বাগানে দুধারা ঝর্ণার মতো উৎক্ষিপ্তমান অর্থাৎ তাদের নিচে দিয়ে দুটি ঝর্ণাধারা সর্বদাই প্রবহমান আছে। নিঃসন্দেহে এটা বাগানদ্বয়ের অন্যতম গুণ ও বৈশিষ্ট্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ বৈশিষ্ট্য ও গুণের কারণে তারা সর্বদাই জান্নাতীদের জন্য কল্যাণ ও বরকত বহন করে আনতে পারবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, ঝর্ণা দুটি মিশক ও কর্পুর নিয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর প্রবাহিত হতে থাকবে। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, ঝর্ণা দুটি মিশক ও আম্বর জান্নাতীদের ঘরে ঘরে বৃষ্টির ফোঁটার মতো টাপুর টুপুর বর্ষণ করতে থাকবে।

৩. জান্নাতদ্বয়ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো "فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ" অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে। অর্থাৎ জান্নাত দুটি খাদ্য-দ্রব্য ও ফল-মূল দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে; যাদের ভাণ্ডার কোনো দিন খালি পড়ে থাকবে না।

৪. জান্নাতদ্বয়ের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো "فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ" অর্থাৎ এসব নিয়ামতের মধ্যেই থাকবে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীগণ।

   অর্থাৎ উভয় জান্নাতে উপরে বর্ণিত নিয়ামতসমূহ এবং জান্নাতীদের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য-সামগ্রী তাদের জন্য সর্বদা নিয়োজিত তো অবশ্যই থাকবে, তবে তাদের সুন্দর ও মধুময় জীবন যাপন ও দৈহিক কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য নিয়োজিত থাকবে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা স্ত্রীগণ।

৫. জান্নাতদ্বয়ের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো "حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ" অর্থাৎ জান্নাতীদের জন্য তাঁবুর মধ্যে সুরক্ষিত হূরগণও হবেন। এখানে তাঁবুসমূহ বলে সম্ভবত সে ধরনের তাঁবুসমূহ বুঝানো হয়েছে যা বড় বড় রাজা-বাদশাহদের জন্য প্রমোদ ও বিহার কেন্দ্রসমূহ তৈরি করানো হয়। এ সকল কথার তাৎপর্য হচ্ছে– জান্নাতী লোকদের স্ত্রীগণ তাদের সাথে তাদের প্রাসাদোপম বাসভবনসমূহে বসবাস করতে থাকবে। আর তাদের ভ্রমণকেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন স্থানে তাঁবু খাটানো থাকবে। আর তাতে হুরগণ তাদের জন্য আনন্দ ও স্বাদের সামগ্রী পরিবেশন করবেন।

৬. উভয় জান্নাতের ৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– সবুজ গালিচা এবং সুন্দর সুরঞ্জিত শয্যায় তারা এলায়িতভাবে অবস্থান করবে। এ কথার দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, জান্নাতের অধিবাসীগণ খুবই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে, আমোদ আহলাদে হাসি-খুশি, স্বাদ ও মজা উপভোগ করবে। এর নিগূঢ় কথা হচ্ছে- এ স্বাদ উপভোগ করার প্রকৃত স্থান হলো জান্নাত যা এ সকল সাজ-সরঞ্জামে পরিপূর্ণ হবে। –[খাযিন]

আয়াতে হুরদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : জান্নাতের নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন– فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ অর্থাৎ, এ সকল নিয়ামতের মধ্যে সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শনা রমণীগণও থাকবে। এখানে স্ত্রীদের আলোচনার পর হুরদের কথা উল্লেখ করে এটা বুঝানো হয়েছে যে, তারা স্ত্রীদের থেকে আলাদা ধরনের মহিলা হবে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা ও এ ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসিলাম, হে রাসূল ﷺ! পৃথিবীর নারীগণ উত্তম না হুরগণ! জবাবে মহানবী ﷺ বললেন– পৃথিবীর নারীগণ হুরদের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আমি বললাম, এর কারণ কি! রাসূল ﷺ বললেন, পৃথিবীতে নারীগণ নামাজ-রোজাসহ অন্যান্য অনেক ইবাদত বন্দেগী করেছে।

–[ইবনে কাসীর, তাবারানী, খাজিন]

অপর এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, যদি জান্নাতী মহিলাদের থেকে কোনো একজন পৃথিবীতে প্রকাশ পেত তবে আকাশ-পাতাল ও এর মধ্যবর্তী সকল স্থান আলোকিত হয়ে পড়ত এবং তার সুগন্ধিতে সমগ্র দুনিয়া বিমোহিত হয়ে যেত।

Free@www.e-ilm.weebly.com

তাফসীরকার তাঁর هُمَا مِنْهَا কথা দ্বারা যার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ "দুটি বাগানে বিপুল পরিমাণ ফল, খেজুর ও আনার থাকবে।" এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন- هُمَا مِنْهَا অর্থাৎ খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা দ্বারা তিনি ফিকহের একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে কেউ যদি শপথ করে যে, আমি ফল খাব না, অতঃপর যদি খেজুর ও আনার খায় তা হলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্যরা বলেছেন, ঐ ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা অধিকাংশ ফিকহবিদদের নিকট খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ যদি এই বলে শপথ করে যে, আমি ফল খাব না, অতঃপর সে খেজুর ও আনার খায় তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় আর তা হলো এই যে, খেজুর ও আনার যদি ফলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা হলে অন্যান্য ফল থেকে খেজুর ও আনারকে আলাদা করে উল্লেখ করা হলো কেন? এ প্রশ্নের জবাব হলো- অন্যান্য ফলের মধ্য হতে তাকে আলাদা করে বলার উদ্দেশ্য হলো এ দুটি ফলের অধিক গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, এ দুটি ফল তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে, তাদেরকে আলাদা করে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তারা ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ফল শুধু খাদ্য ও পানীয়ের জন্য হয়ে থাকে, কিন্তু আনার দ্বারা ঔষধও তৈরি করা হয়। সুতরাং তা শুধুমাত্র ফল নয়। আর উসূলের কায়দা হলো- مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ -এর তুলনায় مَعْطُوْفٌ -এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু বিদ্যমান থাকলে তা عَطْفٌ করা যায় না। সুতরাং কেউ যদি শপথ করে যে, 'আমি গোশত খাব না' তখন মাছ তার আওতায় পড়ে না। কেননা গোশত ও মাছের মধ্যে পার্থক্য বেশি আছে।

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মূলকথা হলো খেজুর ও আনার ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণে তাদেরকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব কেউ যদি ফল না খাওয়ার শপথ করে অতঃপর খেজুর ও আনার খায়, তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[কামালাইন, জালালাইন, তাফসীরে কাবীর, খাযিন]

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ **আয়াত দ্বারা যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে** : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ অর্থাৎ "বড়ই বরকতশালী মহান, মহা সম্মানিত, মাহাত্ম্যপূর্ণ আল্লাহর নাম।" সূরার মাঝামাঝিতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ" "প্রত্যেকটি জিনিস যা এ পৃথিবীতে রয়েছে ধ্বংসশীল এবং কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহর মহান সত্তা-ই অবশিষ্ট থাকবে।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষে উপরিউক্ত বলিষ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন কথা দ্বারা তিনি এ সত্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, দুনিয়ায় মানুষকে যে নিয়ামতসমূহ দান করা হয়েছিল তা অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে, মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং এসব নিয়ামতের যিনি একমাত্র দাতা, তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উচিত এবং প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাসবীহ পাঠের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। নবী করীম ﷺ সর্বদাই নামাজের পর তাসবীহ পাঠ করতেন। হাদীসে আছে-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهٖ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ নামাজ শেষ করার পর তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার নিকট শান্তির প্রত্যাশা করি। বড়ই বরকতশালী তুমি! হে মহীয়ান! মহা সম্মানিত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ নামাজের সালাম শেষ করার পর নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করা পর্যন্ত বসতেন- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -[খাযিন, ফতূহাতে ইলাহিয়া]

মোটকথা, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ দুনিয়ার নিয়ামতসমূহের মূল দাতার তাসবীহ পাঠ করার জন্য আহ্বান করেছেন। কেননা সবকিছুই ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবেন মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ -[তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন]

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা ওয়াকি'আ, মক্কায় অবতীর্ণ

إِلَّا أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْآيَةَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ الْآيَةَ وَهِيَ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ أَوْ تِسْعٌ وَ تِسْعُوْنَ آيَةً

তবে أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ এবং ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ব্যতীত; এতে ৯৬/৯৭/৯৯টি আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لا قَامَتِ الْقِيَامَةُ .

১. যখন কিয়ামত ঘটবে, অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হবে।

٢. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ـ نَفْسٌ تُكَذِّبُ بِأَنْ تَنْفِيَهَا كَمَا نَفَتْهَا فِي الدُّنْيَا .

২. এর সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না যে, তাকে অস্বীকার করবে যেমনিভাবে পৃথিবীতে তাকে অস্বীকার করেছিল।

٣. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ لا هِيَ مُظْهِرَةٌ لِخَفْضِ أَقْوَامٍ بِدُخُوْلِهِمُ النَّارَ وَلِرَفْعِ أٰخَرِيْنَ بِدُخُوْلِهِمُ الْجَنَّةَ .

৩. এটা কাউকে করবে নীচ, কাউকে করবে সমুন্নত; তা সম্প্রদায়সমূহের নীচুতাকে প্রকাশ করে দিবে তাদের জাহান্নামে প্রবেশের কারণে এবং অপর সম্প্রদায়ের উচ্চতাকে প্রকাশ করে দিবে তাদের জান্নাতে প্রবেশের কারণে।

٤. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا لا حُرِّكَتْ حَرَكَةً شَدِيْدَةً .

৪. যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে অর্থাৎ প্রচণ্ডভাবে নড়াচড়া করবে।

٥. وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا لا فُتِّتَتْ .

৫. এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে।

٦. فَكَانَتْ هَبَاءً غُبَارًا مُّنْبَثًّا لا مُنْتَشِرًا وَإِذَا الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِنَ الْأُوْلٰى .

৬. ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়; দ্বিতীয় إِذَا টা প্রথম إِذَا হতে بَدَلٌ হবে।

٧. وَّكُنْتُمْ فِي الْقِيٰمَةِ أَزْوَاجًا أَصْنَافًا ثَلٰثَةً .

৭. তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণিতে।

٨. فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ لا وَهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ـ تَعْظِيْمٌ لِشَأْنِهِمْ بِدُخُوْلِهِمُ الْجَنَّةَ .

৮. ডান দিকের দল তারা সে সকল লোক হবেন যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে। فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলো মুবতাদা। আর مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলো তার খবর। কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! তারা জান্নাতে প্রবেশ করার কারণে। এটা তাদের মহান মর্যাদার বিবরণ।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٩. وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ الشِّمَالِ بِاَنْ يُّؤْتٰى كُلٌّ مِنْهُمْ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ط تَحْقِيْرٌ لِشَانِهِمْ بِدُخُوْلِهِمُ النَّارَ .

৯. এবং বাম দিকের দল এভাবে যে, প্রত্যেকের আমল তাদের বাম হাতে প্রদান করা হবে কত হতভাগা বাম দিকের দল তারা দোজখে প্রবেশ করার কারণে, এটা তাদের নিকৃষ্ট অবস্থার বর্ণনা।

١٠. وَالسّٰبِقُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ مُبْتَدَأٌ السّٰبِقُوْنَ ۙ تَاكِيْدٌ لِتَعْظِيْمِ شَانِهِمْ وَالْخَبَرُ .

১০. আর অগ্রবর্তীগণই তো কল্যাণের প্রতি, আর তারা হলেন নবীগণ। এটা মুবতাদা। অগ্রবর্তী তাদের উচ্চ মর্যাদার জন্য তাকীদ এবং খবর।

١١. اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ج

১১. তারাই তো নৈকট্যপ্রাপ্ত।

١٢. فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ .

১২. নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানে।

١٣. ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ مُبْتَدَأٌ اَىْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ .

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে মুবতাদা অর্থাৎ অতীত উম্মতগণের মধ্য হতে এক বড় দল।

١٤. وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ط مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُمُ السّٰبِقُوْنَ مِنَ الْاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَهٰذِهِ الْاُمَّةُ وَالْخَبَرُ .

১৪. অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর উম্মতের মধ্য হতে। আর তারা হলো অগ্রবর্তী পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য হতে এবং এই উম্মতের মধ্য হতে এবং এটা খবর।

١٥. عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ مَنْسُوْجَةٍ بِقُضْبَانِ الذَّهَبِ وَالْجَوَاهِرِ .

১৫. স্বর্ণখচিত আসনে অর্থাৎ স্বর্ণ ও মুক্তার তার দিয়ে নির্মিত।

١٦. مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ حَالَانِ مِنَ الضَّمِيْرِ فِي الْخَبَرِ .

১৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। খবরের যমীর থেকে উভয়টি حَالٌ হয়েছে।

١٧. يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ اَىْ عَلٰى شَكْلِ الْاَوْلَادِ لَا يَهْرَمُوْنَ .

১৭. তাদের সেবায় ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা অর্থাৎ তারা বাচ্চাদের আকৃতিতে হবে; বৃদ্ধ হবে না।

١٨. بِاَكْوَابٍ اَقْدَاحٍ لَا عُرٰى لَهَا وَّاَبَارِيْقَ ۙ لَهَا عُرًى وَخَرَاطِيْمُ وَكَاْسٍ اِنَاءِ شُرْبِ الْخَمْرِ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ اَىْ خَمْرٍ جَارِيَةٍ مِنْ مَنْبَعٍ لَا يَنْقَطِعُ اَبَدًا .

১৮. পানপাত্র যাতে হাতল থাকবে না কুঁজা যাতে হাতল ও নলা থাকবে ও পেয়ালা নিয়ে মদপান করার পাত্র প্রস্রবণনিঃসৃত সুরাপূর্ণ অর্থাৎ শরাবের এমন প্রবাহিত প্রস্রবণ যা কখনো নিঃশেষ হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٩. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ . بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا مِنْ نَزَفِ الشَّارِبِ وَاَنْزَفَ اَيْ لَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْهَا صُدَاعٌ وَلَا ذَهَابُ عَقْلٍ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا .

১৯. সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞানহারাও হবে না يُنْزِفُونَ শব্দের زَا বর্ণে যবর ও যের উভয়রূপেই পঠিত। এটা نَزَفَ الشَّارِبُ وَاَنْزَفَ হতে নির্গত। অর্থাৎ এতে তাদের মাথা ব্যথাও হবে না এবং তাদের জ্ঞানও বিলুপ্ত হবে না। পৃথিবীর শরাব এর বিপরীত। কেননা তাতে জ্ঞান লোপ পায়।

٢٠. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ لا

২০. আর তাদের পছন্দ মতো ফলমূল,

٢١. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ لا

২১. এবং তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশত নিয়ে।

٢٢. وَلَهُمْ لِلْاِسْتِمْتَاعِ وَحُوْرٌ نِسَاءٌ شَدِيْدَاتُ سَوَادِ الْعُيُوْنِ وَبَيَاضِهَا عِيْنٌ ضِخَامُ الْعُيُوْنِ كُسِرَتْ عَيْنُهُ بَدَلَ ضَمِّهَا الْمُجَانَسَةِ الْيَاءِ وَمُفْرَدُهُ عَيْنَاءُ كَحَمْرَاءَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِجَرِّ حُوْرٍ عِيْنٍ .

২২. এবং থাকবে তাদের উপভোগের জন্য হূর অর্থাৎ এমন নারী যাদের চোখের কালো অংশ/চোখের রাজা খুবই কালো হবে এবং চোখের সাদা অংশ খুবই সাদা হবে। আয়তলোচনা বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট। عِيْنٌ শব্দের মধ্যে عَيْنٌ -কে يَاء -এর সাদৃশ্যের কারণে যের দেওয়া হয়েছে। এর একবচন হলো عَيْنَاءُ যেমন حُمْرٌ -এর একবচন হলো حَمْرَاءُ রয়েছে। অপর এক কেরাতে حُوْرٍ عِيْنٍ টি جَرّ -এর সাথে রয়েছে।

٢٣. كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ج الْمَصُوْنِ .

২৩. সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।

٢٤. جَزَاءً مَفْعُوْلٌ لَهُ اَوْ مَصْدَرٌ وَالْعَامِلُ مُقَدَّرٌ اَيْ جَعَلْنَا لَهُمْ مَا ذُكِرَ لِلْجَزَاءِ اَوْ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

২৪. তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ। جَزَاءً এটা مَفْعُول لَهُ অথবা মাসদার এবং عَامِلٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ جَعَلْنَا لَهُمْ مَا ذُكِرَ لِلْجَزَاءِ অথবা جَزَيْنَاهُمْ

٢٥. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا فِي الْجَنَّةِ لَغْوًا فَاحِشًا مِنَ الْكَلَامِ وَلَا تَاْثِيْمًا لا مَا يُؤْثِمُ .

২৫. তারা শুনবে না সেথায় জান্নাতে অসার অথবা পাপবাক্য।

٢٦. اِلَّا لٰكِنْ قِيْلًا قَوْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا بَدَلٌ مِنْ قِيْلًا فَاِنَّهُمْ يَسْمَعُوْنَهُ .

২৬. সালাম আর সালামবাণী ব্যতীত। এটা قِيْلًا হতে بَدَلٌ হয়েছে। কেননা তারা তা শুনতে পাবে।

٢٧. وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ لا مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ لا

২৭. আর ডানদিকের দল, কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল!

٢٨. فِيْ سِدْرٍ شَجَرِ النَّبَقِ مَخْضُوْدٍ لا شَوْكَ فِيْهِ .

২৮. তারা থাকবে এমন উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুল-বৃক্ষ, سِدْرٌ অর্থ- কুলবৃক্ষ।

٢٩. وَطَلْحٍ شَجَرِ الْمَوْزِ مَنْضُوْدٍ لا بِالْحَمْلِ مِنْ اَسْفَلِهِ اِلٰى اَعْلَاهُ .

২৯. কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ طَلْحٌ অর্থ কলাগাছ, যা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ভরপুর/বোঝাই করা থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٠. وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ لا دَائِمٍ .

৩০. সম্প্রসারিত ছায়া স্থায়ী।

٣١. وَمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ لا جَارٍ دَائِمًا .

৩১. সদা প্রবহমান পানি সর্বদা প্রবাহিত।

٣٢. وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لا

৩২. প্রচুর ফলমূল।

٣٣. لَّا مَقْطُوْعَةٍ فِيْ زَمَنٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ لا بِثَمَنٍ .

৩৩. যা শেষ হবে না কোনো কালে এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। মূল্য পরিশোধের জন্য।

٣٤. وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ط عَلَى السُّرُرِ .

৩৪. আর সমুচ্চ শয্যাসমূহ খাটসমূহের উপর।

٣٥. اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً لا اَيِ الْحُوْرَ الْعِيْنَ مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ .

৩৫. তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। অর্থাৎ ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূরদেরকে, যাদেরকে প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যতিত সৃষ্টি করা হয়েছে।

٣٦. فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا لا عَذَارٰى كُلَّمَا اَتَاهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ وَجَدُوْهُنَّ عَذَارٰى وَلَا وَجَعَ .

৩৬. তাদেরকে করেছি কুমারী যখনই তাদের স্বামীগণ তাদের নিকট আসবে তাদেরকে কুমারীই পাবে এবং কোনো কষ্টও হবে না।

٣٧. عُرُبًا بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُوْنِهَا جَمْعُ عَرُوْبٍ وَهِيَ الْمُتَحَبِّبَةُ اِلٰى زَوْجِهَا عِشْقًا لَهُ اَتْرَابًا لا جَمْعُ تِرْبٍ اَيْ مُسْتَوِيَاتٍ فِي السِّنِّ .

৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়স্কা عُرُبًا শব্দটির رَاء বর্ণটি পেশ ও সাকিন উভয়রূপেই পঠিত। এটি عَرُوْبٌ -এর বহুবচন, عَرُوْبٌ বলা হয় এমন নারীকে যে প্রেমাসক্তের মতো তার স্বামীকে ভালোবাসে। اَتْرَابٌ শব্দটি تِرْبٌ -এর বহুবচন; অর্থ– সমবয়স্কা নারী।

٣٨. لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ صِلَةٌ اَنْشَانَا هُنَّ اَوْ جَعَلْنَاهُنَّ .

৩৮. ডানদিকের লোকদের জন্য। لِاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ এটা جَعَلْنَاهُنَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অথবা اَنْشَانَاهُنَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ; অর্থাৎ এই জিনিসগুলো ডানদিকের লোকদেরকে জন্য হবে।

তারকীব ও তাহকীক

قَوْلُهُ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : وَاقِعَه হলো কিয়ামতের বিভিন্ন নামের মধ্য হতে একটি নাম, কিয়ামত নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হওয়ার কারণে একে وَاقِعَه বলা হয়।

قَوْلُهُ اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : -এর اِذَا -এর মধ্যে অনেকগুলো দিক রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এই–

اِذَا টা ظَرْف مَحْض -এর জন্য হবে। অর্থাৎ তাতে শর্তের অর্থ নেই। আর তার عَامِل হলো لَيْسَ আর তার অর্থটা نَفِيْ -এর উপর مُتَضَمِّن হওয়ার কারণে যেন এমন বলা হলো যে, اِنْتَفَى التَّكْذِيْبُ وَقْتَ وُقُوْعِهَا

অথবা شَرْطِيَّه হবে এবং তার جَوَاب টা উহ্য হবে। উহ্য ইবারত হবে– اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ كَانَ كَيْتَ وَكَيْتَ আর এটা তার মধ্যে عَامِل হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا : এখানে لَامْ টা فِيْ অর্থে হয়েছে। মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো لَيْسَ نَفْسٌ كَاذِبَةٌ تُوْجَدُ فِيْ وَقْتِ وُقُوْعِهَا -এখানে كَاذِبَة -এর মওসূফ نَفْس উহ্য রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ : এটা هِيَ উহ্য মুবতাদার খবর। যেমনটি মুফাসসির (র.) هِيَ বৃদ্ধি করে ইঙ্গিত করেছেন। مُظْهِرَةٌ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, خَفْض এবং رَفْع ইলমে আযালীর হিসেবে উহ্য রয়েছে। কিয়ামত সেটাকে প্রকাশ করে দিবে।

قَوْلُهُ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ : এই إِذَا টা হয়তো প্রথম إِذَا হতে بَدَل হবে যেমনটি মুফাসসির (র.) পছন্দ করেছেন। অথবা দ্বিতীয় إِذَا টি প্রথম إِذَا -এর تَاكِيد হবে অথবা এটা شَرْطِيَّة হবে এবং তার عَامِل উহ্য হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, তার পরের فِعْل (رُجَّتْ) আমেল হবে।

قَوْلُهُ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ : এখানে أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ হলো প্রথম মুবতাদা, مَا اِسْتِفْهَامِيَّة হলো দ্বিতীয় মুবতাদা, أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ জুমলা হয়ে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। দ্বিতীয় মুবতাদা স্বীয় খবরের সাথে মিলে প্রথম মুবতাদার খবর।

প্রশ্ন : খবর যদি জুমলা হয় তখন তাতে একটি عَائِد থাকা জরুরি; কিন্তু এখানে عَائِد নেই কেন?

উত্তর : اِسْم ظَاهِر টা যমীরের স্থলাভিষিক্ত। তাই عَائِد -এর প্রয়োজন নেই। বাক্যেরও এই তারকীব হবে। مَا যদিও বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য আসে; কিন্তু কখনো কখনো তার মাধ্যমে সিফত ও হালত সম্পর্কে প্রশ্ন করাও উদ্দেশ্য হয়। যেমন– তুমি বললে مَا زَيْدٌ ? তখন বলা হবে عَالِمٌ অথবা طَبِيْبٌ

قَوْلُهُ ثُلَّةٌ : এটার ثَاء বর্ণে পেশ দিয়ে অর্থ হলো– মানুষের বড় দল। আর ثَاء বর্ণে فَتْح হলে অর্থ হবে– বকরির পাল।

قَوْلُهُ مَوْضُوْنَةٍ : اَلْوَضْنُ অর্থ হলো نَضْدُ الدِّرْعِ বা বর্ম পরিধান করা। এখানে সাধারণভাবে বুনানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلٰى سُرُرٍ مَوْضُوْنَةٍ : এটা ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ مُسْتَقِرِّيْنَ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে মুবতাদার খবর। আর مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ এই উভয়টি مُسْتَقِرِّيْنَ -এর যমীর থেকে حَال হয়েছে।

قَوْلُهُ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ : এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হয়েছে। আবার এটা مُقَرَّبُوْنَ থেকে حَال হয়েছে। অর্থ হলো–
يَدُوْرُ حَوْلَهُمْ لِلْخِدْمَةِ غِلْمَانٌ لَا يَهْرَمُوْنَ وَلَا يَتَغَيَّرُوْنَ .

قَوْلُهُ لَا يَهْرَمُوْنَ : এটা مُخَلَّدُوْنَ -এর তাফসীর

قَوْلُهُ اَبَارِيْقَ : এটা اِبْرِيْقٌ -এর বহুবচন, অর্থ– পানপাত্র; এটা بَرِيْقٌ থেকে নির্গত। এই পাত্রগুলো যেহেতু খুবই উজ্জ্বল হবে এ কারণে এটাকে اِبْرِيْقٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ عِيْنٌ : এটা মুবতাদা, এর খবর উহ্য রয়েছে। মুফাসসির (র.) তার উক্তি– لَهُمْ لِلْاِسْتِمْتَاعِ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ مَخْضُوْضٍ : এটা خَضَدَ الشَّجَرَ خَضْدًا থেকে নির্গত। বাবে ضَرَبَ থেকে, অর্থ হলো কণ্টক ভেঙ্গে ফেলা।

قَوْلُهُ بِثَمَنٍ : যদি মুফাসসির (র.) بِشَيْءٍ বলতেন, তবে উত্তম হতো। কেননা শুধুমাত্র মূল্য ও দামের কারণেই নয়; বরং কোনো কারণেই জান্নাতীগণকে নিষেধ করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ওয়াকি'আ প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। –[বায়হাকী]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে মরদবিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।
–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২৭ পৃ. ১২৮]

এ সূরার আয়াত সংখ্যা - ৯৬, বাক্য ৮৭৮ আর অক্ষর হলো ১৯০৩ টি।

নামকরণ : ওয়াকি'আহ্ কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে অন্যতম। যেহেতু এ সূরায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই ঘটবে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার অনন্ত অসীম শক্তি এ অপূর্ব মহিমার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। এতে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষ মাত্রকে তার সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

জীবনের ন্যায় মৃত্যু সত্য, আর মৃত্যুর ন্যায় হাশরের ময়দানে পুনরুত্থানও সত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতে কামেলার প্রতি প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করলে কিয়ামতের দিনের মহাবিচারের ঘটনার প্রতি বিশ্বাস করা আদৌ কঠিন নয়।

এতদ্ব্যতীত এ সূরায় বেহেশতের সৌন্দর্য এবং প্রাচুর্যের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই মনোমুগ্ধকর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ **সূরার ফজিলত :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা সূরা ওয়াকি'আ পাঠ কর এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকেও তা শেখাও, এটি হলো 'সূরাতুল গিনা'।

হযরত আনাস (রা.) থেকে এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে। –[ইবনে আসাকের, দায়লামী]

সূরা ওয়াকি'আর আমল :

১. তাফসীরে হক্কানীতে আছে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন এটি প্রাচুর্যের সূরা। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে কখনো দারিদ্র ও অভাবে পতিত হবে না। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী খ. ২৭, পৃ. ১২৮]

২. যদি কেউ নিজের আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা এবং রিজিকের প্রাচুর্য কামনা করে, তবে তাকে এক শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার রাত্রে মাগরিবের নামাজের পর ২৫ বার এ সূরা পাঠ করতে হবে এবং ইশার নামাজের পর ২১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। তারপর প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর এবং মাগরিবের নামাজের পর ১বার এ সূরা পাঠ করতে হবে। এ আমলের বরকতে এর পাঠক শীঘ্রই প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হবে।

৩. এ সূরা লিখে তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে রাখলে সকল প্রকার বালা-মসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং প্রচুর রিজিকপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আসন্ন সন্তানপ্রসবা নারীর সঙ্গে এ সূরা বেঁধে দিলে অতি সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। যদি কোনো ব্যক্তি একই মজলিসে একচল্লিশবার সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করে, তবে তার আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া হবে।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করছে, তবে তার রিজিক বৃদ্ধি করা হবে এবং আসমানি জমিনী বালা-মসিবত থেকে তার হেফাজত করা হবে।

সূরা ওয়াকি'আর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব: অন্তিম রোগশয্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন : ইবনে কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনী (রা.) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

হযরত ওসমান গনী(রা.) বলেন– مَا تَشْتَكِيْ অর্থাৎ আপনার অসুখটা কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– ذُنُوْبِيْ অর্থাৎ আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।
হযরত ওসমান গণী (রা.) বলেন– مَا تَشْتَهِيْ অর্থাৎ আপনার বাসনা কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– رَحْمَةَ رَبِّيْ অর্থাৎ আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।
হযরত ওসমান গনী (রা.) বলেন– আমি আপনার জন্য কোনো চিকিৎসক ডাকব কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– اَلطَّبِيْبُ اَمْرَضَنِيْ। অর্থাৎ চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।
হযরত ওসমান গণী (রা.) বলেন– আমি আপনার জন্য সরকারি বায়তুলমাল থেকে কোনো উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا -এর কোনো প্রয়োজন নেই।

হযরত ওসমান গণী (রা.) বলেন, উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আপনি তো চিন্তা করেছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ করি না। কারণ আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকি'আ পাঠ করবে, সে কখনো উপবাস করবে না। ইবনে কাসীর (র.) এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা রাহমানের শুরুতে আল্লাহ পাকের কুদরত, হিকমত এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা রয়েছে, এরপর এ ক্ষণস্থায়ী জগতের উল্লেখ করে কিয়ামত কায়েম হওয়ার মাধ্যমে এ জগতের ধ্বংসের ঘোষণা রয়েছে। আর এ সূরার প্রারম্ভেই কিয়ামত কায়েম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা রহমানে আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান জানানো হয়েছে। আর এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা রাহমানে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহতার উল্লেখ করে সে কঠিন দিনের জন্যে আখিরাতের সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে। এ সূরায় একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামত এমনি এক মহাসত্য, যাকে অস্বীকার করা যায় না, যাকে মিথ্যাজ্ঞান করা যায় না, যাকে প্রতিরোধ করা যায় না। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন একদল লোক সম্মানিত হবে, আরেক দল লোক অপমানিত হবে। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে চিরশান্তি লাভ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না এবং তাঁর বিধান অমান্য করে, তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর। ইরশাদ হয়েছে- إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ . خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ . অর্থাৎ যখন কিয়ামত ঘটবে, যার সংঘটনে এতটুকু মিথ্যা নেই, যা কিছু লোককে করবে অবনত আর কিছু লোককে করবে সমুন্নত।

সূরা রাহমানের সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ

আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, কখন প্রকাশিত হবে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা?

قَوْلُهُ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : ইবনে কাসীর (র.) বলেন, ওয়াকি'আ কিয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা এর বাস্তবতায় কোনোরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ : كَاذِبَةٌ শব্দটি عَاقِبَةٌ -এর ন্যায় একটি ধাতু। অর্থ এই যে, কিয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

قَوْلُهُ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এই বাক্যের তাফসীর এই যে, কিয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিঃস্ব ধনবান আর ধনবান নিঃস্ব হয়ে যায়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً : **হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে :** ইবনে কাসীর (র.) বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডান পার্শ্বে থাকবে। তারা হযরত আদম (আ.)-এর ডান পার্শ্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাত দেওয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরেশের বামদিকে একত্র হবে। তারা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পার্শ্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেওয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আরশাধিপতির সামনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

قَوْلُهُ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ : ইমাম আহমদ (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা জান কি, কিয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবুল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে, যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ (র.) বলেন, سَابِقِيْنَ তথা অগ্রবর্তীগণ বলে পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে সিরীন (র.)-এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছে তারা অগ্রবর্তীগণ। হযরত হাসান ও কাতাদা (র.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী দল হবে। কারো কারো মতে, যারা সবার আগে মসজিদে গমন করে, তারাই অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাসীর (র.) বলেন, এসব উক্তি স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ দুনিয়াতে যারা সৎ কাজে অন্যের চাইতে অগ্রে, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ : ثلة শব্দের অর্থ- দল। আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে, বড় দল। -[রূহুল মা'আনী]

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা : আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বিভাগ উল্লিখিত হয়েছে নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় ثُلَّةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে। এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে তাফসীরবিদগণ দু'রকম উক্তি করেছেন। যথা-

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী। মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ এই তাফসীর করেছেন। হযরত জাবের (রা.) -এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তাফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাদীসে বলা হয়েছে, যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ নাজিল হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) বিস্ময় সহকারের আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশি এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাজিল হয়নি। এক বছর পরে যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন–

إِسْمَعْ يَا عُمَرُ مَا قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ أَلَا وَإِنَّ مِنْ آدَمَ إِلَىَّ ثُلَّةٌ وَأُمَّتِيْ ثُلَّةٌ

অর্থাৎ শোন হে ওমর! আল্লাহ নাজিল করেছেন যে, পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমার পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত হবে অপর বড় দল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ আয়াতখানি নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম ব্যথিত হন যে, আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কম সংখ্যক হবো। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ আয়াতখানি নাজিল হয়। তখন রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, আমি আশা করি যে, তোমরা [অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদী] জান্নাতে সমগ্র উম্মতের মুকাবিলায় এক-চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকি অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে। –[ইবনে কাসীর]

এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা প্রথম আয়াত قَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ তাদের বর্ণনায় নয়; বরং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জবাবে 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম ও হযরত ওমর (রা.) দুঃখিত হওয়ার কারণে এরূপ হতে পারে হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার, সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জান্নাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় যখন ثُلَّة [বড় দল] শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলো, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গাম্বরই রয়েছেন বিপুল সংখ্যক। কাজেই তাঁদের মোকাবিলায় উম্মতে মুহাম্মাদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

২. তাফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে 'কুরূনে উলা' তথা সাহাবী, তাবেয়ী প্রমুখের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর, আবূ হাইয়ান, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, মাযহারী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর (র.) বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি কুরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে, উম্মতে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত : যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরো বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে, এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। তাই এ কথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তীগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ এবং পরবর্তীগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) হযরত হাসান বসরী (র.)-এর উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, পূর্ববর্তীগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে সাধারণ মুমিন তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিন! অন্য এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তীগণের তাফসীর প্রসঙ্গে এ কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ– مَنْ مَضٰى مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ পূর্ববর্তীগণ হচ্ছে এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন, আলেমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ হোক। –[ইবনে কাসীর]

রূহুল মা'আনীতে দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থনে হযরত আবূ বকরা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস করা হয়েছে।

عَنْ اَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى قَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ قَالَ هُمْ جَمِيْعًا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ .

"একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে" আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির তাফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেন, তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তাফসীর অনুযায়ী শুরুতে وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্রয় উম্মতে মুহাম্মাদী হবে। -[রূহুল মা'আনী]

তাফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কুরআন পাক থেকে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মাদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কোনো উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারাই হয়ে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে- এটা সুদূরপরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই-

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এবং لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

এক হাদীসে বলা হয়েছে- اَنْتُمْ تَتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ اٰخِرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে- এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললাম, নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন وَالَّذِىْ نَفْسُ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে সত্তার করায়ত্ত্ব আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতের অর্ধেক হবে। -[বুখারী, মাযহারী]

اَهْلُ الْجَنَّةِ مِاَةٌ وَعِشْرُوْنَ صَفًّا ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ

অর্থাৎ জান্নাতীগণ মোট একশ' বিশ কাতারে থাকবে। তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্যে থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরিক হবে।

উপরিউক্ত রেওয়ায়েতসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জান্নাতীদের পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়ায়েতে দুই-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়েই থাকে।

قَوْلُهٗ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করে যে, مَوْضُوْنَةٍ -এর অর্থ হলো- স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

قَوْلُهٗ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ : অর্থাৎ এই কিশোররা সর্বদা কিশোরই থাকবে। তাদের মধ্যে বয়সের কোনো তারতম্য দেখা দেবে না। হুরদের ন্যায় এই কিশোরগণও জান্নাতেই পয়দা হবে এবং তারা জান্নাতীদের খিদমতগার হবে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একজন জান্নাতীর কাছে হাজারো খাদেম থাকবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهٗ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ : اَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ -এর বহুবচন। অর্থ- গ্লাসের ন্যায় পানপত্র। اَبَارِيْقُ শব্দটি اِبْرِيْقٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ- কুজা। كَاْسٌ -এর অর্থ সুরা পানের পিয়ালা। مَعِيْنٌ -এর উদ্দেশ্য এই যে, এই একটি ঝরনা থেকে আনা হবে।

قَوْلُهٗ لَا يُصَدَّعُوْنَ : এটা صَدْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- মাথাব্যথা। দুনিয়ার সুরা অধিক মাত্রায় পান করলে মাথাব্যথা ও মাথাচক্র দেখা দেয়। জান্নাতের সুরা এই সুরার উপসর্গ থেকে পবিত্র হবে।

قَوْلُهٗ لَا يُنْزِفُوْنَ : نَزْفٌ -এর আসল অর্থ- কূপের সম্পূর্ণ পানি উত্তোলন করা। এখানে نَزْفٌ -এর অর্থ হলো- জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা।

قَوْلُهٗ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ : অর্থাৎ রুচিসম্মত পাখীর গোশত। হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখীর গোশত খেতে চাইবে, তখন সেভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। -[মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاَصْحَابُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ : মুমিন, মুত্তাকী ও ওলীগণই প্রকৃতপক্ষে 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা ডান পার্শ্বস্থ লোক। পাপী মুসলমানগণও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেউ তো নিছক আল্লাহ তা'আলার কৃপায়, কেউ কোনো নবী ও ওলীর সুপারিশের পর এবং কেউ আজাব ভোগ করবে, কিন্তু পাপ পরিমাণে আজাব ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে 'আসহাবুল ইয়ামীনের' অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ পাপী মুমিনের জন্য জাহান্নামের অগ্নি প্রকৃতপক্ষে আজাব নয়, বরং আবর্জনা থেকে পবিত্র হওয়ার একটি কৌশল মাত্র। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ : জান্নাতের অবদানসমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। তন্মধ্যে কুরআন পাক মানুষের বোধগম্য ও পছন্দসই বস্তু সমস্ত উল্লেখ করেছে। আরবরা সেসব চিত্ত বিনোদন ও ফলমূলকে পছন্দ করত, এখানে তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। سِدْر -এর অর্থ বদরিকা বৃক্ষ مَخْضُوْد -এর অর্থ যার কাঁটা কেটে ফেলা হয়েছে এবং ফলভারে বৃক্ষ নুয়ে পড়েছে। জান্নাতের বদরিকা দুনিয়ার বদরিকার ন্যায় হবে না; বরং এগুলো আকৃতিতে অনেক বড় এবং স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় হবে। طَلْح -এর অর্থ কলা مَنْضُوْد -এর অর্থ কাঁদি কাঁদি। ظِلٌّ مَّمْدُوْدٌ -এর অর্থ আছে অশ্বে আরোহণ করে শত শত বছরেও তা অতিক্রম করা যাবে না। مَاءٌ مَّسْكُوْبٌ -এর অর্থ- মাটির প্রবাহিত পানি।

قَوْلُهُ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ : প্রচুর ফল। অর্থাৎ ফলের সংখ্যাও বেশি হবে এবং এর প্রকারও অনেক হবে। لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মৌসুম শেষ হয়ে গেলে ফলও শেষ হয়ে যায়। কোনো ফল গ্রীষ্মকালে হয় এবং মৌসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোনো ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে; কোনো মৌসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনিভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিঁড়তে নিষেধ করে; কিন্তু জান্নাতের ফল ছিঁড়তে কোনো বাধা থাকবে না।

قَوْلُهُ وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ : فُرُشٌ শব্দটি فِرَاشٌ -এর বহুবচন। অর্থ- বিছানা, ফরাশ। উচ্চ স্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জান্নাতের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয় এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়ত স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারো কারো মতে, এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে- اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ পরবর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী নারীদের আলোচনাও এরই ইঙ্গিত। -[মাযহারী] এই অর্থ অনুযায়ী مَرْفُوْعَة -এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

قَوْلُهُ اِنَّا اَنْشَاْنَا هُنَّ اِنْشَاءً : اَنْشَاء শব্দের অর্থ- সৃষ্টি করা। هُنَّ সর্বনাম দ্বারা জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে فراش -এর অর্থ জান্নাতে বিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জান্নাতের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জান্নাতী হুরদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জান্নাতেই প্রজনন ক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভঙ্গি এই যে, যারা দুনিযাতে কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল, জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী-যুবতী ও লাবণ্যময়ী করে দেওয়া হবে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে বৃদ্ধা, শ্বেত কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, ষোড়শী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহে আগমন করলেন! তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি আরজ করলাম, সে আমার খালা সম্পর্ক হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাস্যচ্ছলে বললেন- لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ অর্থাৎ জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ন হয়ে গেল! কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উক্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধরা যখন জান্নাতে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরিউক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ اَبْكَارًا : এটা بِكْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ عُرُبًا : এটা عَرُوْبَة -এর বহুবচন। অর্থ- স্বামী-সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

قَوْلُهُ اَتْرَابًا : এটা تِرْبٌ -এর বহুবচন। অর্থ- সমবয়স্ক। জান্নাতে পুরুষ ও নারী সব এক বয়সের হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে। -[মাযহারী]

অনুবাদ :

٣٩. وَهُمْ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ لا

৩৯. তাদের অনেক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্যে হতে,

٤٠. وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأٰخِرِيْنَ ط

৪০. এবং অনেক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।

٤١. وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ لا مَآ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ط

৪১. আর বামদিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল!

٤٢. فِيْ سَمُوْمٍ رِيْحٍ حَارَّةٍ مِنَ النَّارِ تَنْفُذُ فِي الْمَسَامِ وَحَمِيْمٍ لا مَاءٍ شَدِيْدِ الْحَرَارَةِ .

৪২. তারা থাকবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে سَمُوْم বলা হয় অগ্নি উত্তপ্ত বায়ুকে, যা লোমকূপ ভেদ করে চামড়ার ভিতরে ঢুকে যাবে।

٤٣. وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لا دُخَانٍ شَدِيْدِ السَّوَادِ .

৪৩. কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রের ছায়ায়, يَحْمُوْم -এর ধোঁয়াকে বলা হয় যা খুবই কালো হবে।

٤٤. لَا بَارِدٍ كَغَيْرِهِ مِنَ الظِّلَالِ وَلَا كَرِيْمٍ حَسَنِ الْمَنْظَرِ .

৪৪. যা শীতল নয় যেমন অন্যান্য ছায়া শীতল হয়ে থাকে এবং আরামদায়কও নয়। অর্থাৎ উপভোগ্য দৃশ্যও নয়।

٤٥. إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ فِي الدُّنْيَا مُتْرَفِيْنَ ج مُنَعَّمِيْنَ لَا يَتْعَبُوْنَ فِي الطَّاعَةِ .

৪৫. ইতিপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল পৃথিবীতে ভোগ বিলাসে পুণ্যের জন্য কষ্ট সহ্য করত না।

٤٦. وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الذَّنْبِ الْعَظِيْمِ ج أَيِ الشِّرْكِ .

৪৬. তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে অর্থাৎ শিরকে।

٤٧. وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ لا فِي الْهَمْزَتَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ التَّحْقِيْقُ وَتَسْهِيْلُ الثَّانِيَةِ وَإِدْخَالُ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ .

৪৭. আর তারা বলত, মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি উত্থিত হবো আমরা? أَئِذَا এবং أَئِنَّا -এর মধ্যে উভয় স্থানে উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয় হামযাকে تَسْهِيْل করে এবং উভয় সুরতে উভয় হামযার মাঝে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত রয়েছে।

٤٨. أَوَ اٰبَآؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ . بِفَتْحِ الْوَاوِ لِلْعَطْفِ وَالْهَمْزَةُ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَهُوَ فِيْ ذٰلِكَ وَفِيْمَا قَبْلَهُ لِلْاِسْتِبْعَادِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْوَاوِ عَطْفًا بِأَوْ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ مَحَلُّ إِنَّ وَاسْمِهَا .

৪৮. এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? এখানে أَوَ -এর وَاو টি যবরের সাথে আতফের জন্য এবং হামযাটা اِسْتِفْهَام -এর জন্য এবং এই اِسْتِفْهَام এখানে ও এর পূর্বে اِسْتِبْعَاد -এর জন্য। অপর এক কেরাতে وَاو টি সাকিন সহকারে أَوْ দ্বারা আতফ করে। আর إِنَّ ও তার ইসিমের مَحَلّ হলো মা'তুফ আলাইহি।

٤٩. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْأٰخِرِيْنَ لا

৪৯. বলুন, অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥٠. لَمَجْمُوعُونَ لا إِلَى مِيقَاتِ لِوَقْتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ اَيْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ .

৫০. সকলকে একত্র করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

٥١. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لا

৫১. অতঃপর হে বিভ্রান্তকারী অস্বীকারকারীরা!

٥٢. لَاٰكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّومٍ بَيَانٌ لِلشَّجَرِ .

৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে مِنْ زَقُّوْمٍ -এটা شَجَرَة -এর বয়ান হয়েছে।

٥٣. فَمَالِئُونَ مِنْهَا مِنَ الشَّجَرِ الْبُطُونَ .

৫৩. এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে অর্থাৎ ঐ বৃক্ষ থেকে।

٥٤. فَشٰرِبُونَ عَلَيْهِ اَيِ الزَّقُّوْمِ الْمَاْكُوْلِ مِنَ الْحَمِيمِ ج

৫৪. পরে তোমরা পান করবে তার উপর ভক্ষিত যাক্কুমের উপর অত্যুষ্ণ পানি।

٥٥. فَشٰرِبُونَ شُرْبَ بِفَتْحِ الشِّيْنِ وَضَمِّهَا مَصْدَرٌ الْهِيمِ ط اَلْاِبِلِ الْعِطَاشِ جَمْعُ هَيْمَانَ لِلذَّكَرِ وَهَيْمٰى لِلْاُنْثٰى كَعَطْشَانَ وَعَطْشٰى .

৫৫. আর পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। شُرْب শব্দটির شِيْن বর্ণে যবর ও পেশ উভয় হরকতই হতে পারে। এটা মাসদার। আর اَلْهِيْمِ তৃষ্ণার্ত উটকে বলা হয়। এটা هَيْمَانَ -এর বহুবচন, এর স্ত্রীলিঙ্গ হলো هَيْمٰى অর্থ তৃষ্ণার্ত উটনী। যেমন- عَطْشَانَ এবং عَطْشٰى

٥٦. هٰذَا نُزُلُهُمْ مَا اُعِدَّ لَهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ط يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

৫৬. এটাই হবে তাদের জন্য আপ্যায়ন। যা তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কিয়ামতের দিন।

٥٧. نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ اَوْجَدْنَاكُمْ عَنْ عَدَمٍ فَلَوْلَا هَلَّا تُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ اِذِا الْقَادِرُ عَلَى الْاِنْشَاءِ قَادِرٌ عَلَى الْاِعَادَةِ .

৫৭. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছি। তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না? পুনরুত্থানে। যিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি পুনরায় উঠাতেও সক্ষম।

٥٨. اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ط تُرِيْقُوْنَ الْمَنِيَّ فِيْ اَرْحَامِ النِّسَاءِ .

৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে যে বীর্য তোমরা স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে পৌছে দাও।

٥٩. ءَاَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهِ فِي الْمَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ تَخْلُقُوْنَهٗ اَيِ الْمَنِيَّ بَشَرًا اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ .

৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি কর অর্থাৎ বীর্য হতে মানুষ নাকি আমি সৃষ্টি করি? ءَاَنْتُمْ -এর মধ্যে উভয় হামযাকে বহাল রেখে, দ্বিতীয় হামযাকে اَلِف দ্বারা পরিবর্তন করে এবং তাকে تَسْهِيْل [সহজিকরণ] করে, সহজকৃত এবং, দ্বিতীয় হামযার মাঝে اَلِف বৃদ্ধি করে এবং এটাকে পরিত্যাগ করে চারো স্থানে পঠিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦٠. نَحْنُ قَدَّرْنَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ لا بِعَاجِزِيْنَ .

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করেছি। قَدَّرْنَا শব্দটির دَالْ বর্ণে তাশদীসহ ও তাশদীদবিহীন উভয়রূপেই পঠিত রয়ছে। এবং আমি অক্ষম নই।

٦١. عَلٰى عَنْ اَنْ نُّبَدِّلَ نَجْعَلَ اَمْثَالَكُمْ مَكَانَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ نَخْلُقَكُمْ فِىْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ مِنَ الصُّوَرِ كَالْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ .

৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতিতে সৃষ্টি করতে, যা তোমরা জান না। আকৃতিসমূহ হতে। যেমন– বানর ও শূকরের আকৃতিতে।

٦٢. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ .

৬২. তোমরা তো অবগত হয়েছে প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে اَلنَّشْاَةَ শব্দটি অন্য এক কেরাতে شِيْن বর্ণে سُكُوْن -এর সাথে এসেছে। তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? এখানে تَذَكَّرُوْنَ -এর মধ্যে দ্বিতীয় تَاء -কে ذَالْ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

٦٣. اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ط تُثِيْرُوْنَ الْاَرْضَ وَتُلْقُوْنَ الْبَذْرَ فِيْهَا .

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্বন্ধে চিন্তা করেছ কি? যে জমি চষে তাতে বীজ বপন কর।

٦٤. ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗ تُنْبِتُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ .

৬৪. তোমরা কি তাতে অঙ্কুরিত কর, নাকি আমি অঙ্কুরিত করি?

٦٥. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا نَبَاتًا يَابِسًا لَا حَبَّ فِيْهِ فَظَلْتُمْ اَصْلُهٗ ظَلِلْتُمْ بِكَسْرِ اللَّامِ فَحُذِفَتْ تَخْفِيْفًا اَىْ اَقَمْتُمْ نَهَارًا تَفَكَّهُوْنَ حُذِفَتْ مِنْهُ اِحْدَى التَّاءَيْنِ فِى الْاَصْلِ تَعْجَبُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ وَتَقُوْلُوْنَ .

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। অর্থাৎ শুষ্ক ঘাসে, ফলে তাকে একটি শস্যদানা ও উৎপাদিত হবে না। তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা। فَظَلْتُمْ মূলত ছিল ظَلِلْتُمْ তথা لَامْ বর্ণটি যেরযুক্ত সহজীকরণের জন্য তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সারা দিন পেরেশান হয়ে যাও। আর تَفَكَّهُوْنَ -এর মধ্যে মূলত একটি تَاء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আশ্চর্যের মধ্যে থেকে যাও এবং বলতে থাক।

٦٦. اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ لا نَفَقَةَ زَرْعِنَا .

৬৬. আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের বীজ বপনের খরচের।

٦٧. بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ مَمْنُوْعُوْنَ رِزْقَنَا .

৬৭. বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। আমাদের জীবিকা হতে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

٦٨. اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ط

৬৮. তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ?

٦٩. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ السَّحَابِ جَمْعُ مُزْنَةٍ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ .

৬৯. তোমরা কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আন, নাকি আমি তা বর্ষণ করি। مُزْنٌ শব্দটি مُزْنَةٌ -এর বহুবচন, অর্থ– মেঘ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧٠. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَا اُجَاجًا مِلْحًا لَا يُمْكِنُ شُرْبُهُ فَلَوْلَا فَهَلَّا تَشْكُرُوْنَ.

৭০. আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। ফলে তা পান করার অনুপুযুক্ত হয়ে পড়বে। /পান করা অসম্ভবপর হয়ে পড়বে। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?

٧١. اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ. تُخْرِجُوْنَ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ.

৭১. তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি? অর্থাৎ যা তোমরা সবুজ বৃক্ষ হতে বের কর।

٧٢. ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ كَالْمَرْخِ وَالْعَفَارِ وَالْكَلْخِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ.

৭২. তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, যেমন غَفَار، مَرْخ ও كَلْخ নাকি আমি সৃষ্টি করি?

٧٣. نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً لِنَارِ جَهَنَّمَ وَمَتَاعًا بُلْغَةً لِّلْمُقْوِيْنَ. لِلْمُسَافِرِيْنَ مِنْ اَقْوَى الْقَوْمِ اَىْ صَارُوْا بِالْقَوِىِّ بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ اَىِ الْقَفْرِ وَهُوَ مَفَازَةٌ لَا نَبَاتَ فِيْهَا وَلَا مَاءَ.

৭৩. আমি একে করেছি নিদর্শন জাহান্নামের আগুনের জন্য স্মারক এবং মরুচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। مُقْوِيْنَ শব্দটি اَقْوَى الْقَوْمِ হতে নির্গত। অর্থাৎ মরুভূমিতে পৌঁছে গেছে। اَلْقِوٰى শব্দটির قَاف বর্ণে যের এবং يَاء টি মদ সহকারে অর্থাৎ قَفْر তথা মরুভূমি/শূন্য প্রান্তর। এরূপ শূন্য প্রান্তর যাতে পানি ও তরুলতা কিছুই নেই।

٧٤. فَسَبِّحْ نَزِّهْ بِاسْمِ زَائِدٌ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ اَىِ اللّٰهِ.

৭৪. সুতরাং আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। অর্থাৎ আল্লাহর। আর আয়াতে اِسْم শব্দটি অতিরিক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هُمْ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ : এটা উহ্য মুবতাদার খবর। যেমনটি মুফাসসির (র.) ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ سَمُوْم : এর অর্থ লু হাওয়া, গরম বাষ্প, বিষের মতো প্রতিক্রিয়াশীল প্রচণ্ড গরম বায়ু। এটা مُؤَنَّث سَمَاعِىْ বহুবচনে سَمَائِمُ; এটাকে এ কারণে سَمُوْم বলা হয় যে, এটা শারীরে লোমকূপের মাধ্যমে চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করে। এর থেকে اَلسُّمُّ অর্থ- বিষ নির্গত হওয়া। কেননা বিষও চামড়ার ভিতর প্রবেশ করে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ : এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের ইল্লত হওয়ার কারণে تَعْلِيْل হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বামপন্থিরা এ জন্য শাস্তির উপযুক্ত হবে যে, তার স্বী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে লিপ্ত ও মত্ত হওয়ার সাথে সাথে সবচেয়ে বড় গোনাহ শিরক ও কুফরিতেও অটল ছিল এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে ছিল।

قَوْلُهُ اِدْخَالُ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ : মুফাসসির (র.) এখানে وَتَرْكِهِ-এর বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। যাতে চারটি কেরাত হয়ে যায়। মুফাসসির (র.)-এর কেরাত দ্বারা শুধুমাত্র দুটি কেরাতই বুঝে আসে।

قَوْلُهُ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ مَحَلُّ اِسْمِ اِنَّ وَاِسْمِهَا : এখানে اِنَّ وَاِسْمِهَا-এর মধ্যে وَاو টা مَعَ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ-এর আতফ اِنَّ-এর مَحَلّ উপর তার اِسْم সহ হয়েছে। এ কারণেই اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ টা مَرْفُوْع হয়েছে। এটা সেই সুরতে হবে যখন اِنَّ-এর খবর لَمَبْعُوْثُوْنَ-এর উপর অগ্রগামী মানা হবে, উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- اِنَّا وَاٰبَاؤُنَا لَمَبْعُوْثُوْنَ অন্যথায় لَمَبْعُوْثُوْنَ-এর ضَمِيْر مَرْفُوْع مُسْتَتِرْ-এর উপর আতফ হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রশ্ন : ضَمِيْر مَرْفُوْع مُسْتَتِر مُتَّصِل -এর উপর আতফ করতে হলে ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِل দ্বারা تَاكِيْد নেওয়া জরুরি, যা এখানে বিদ্যমান নেই। উহ্য ইবারত لَمَبْعُوْثُوْنَ হওয়া উচিত ছিল।

উত্তর : যখন مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه -এর মাঝে পার্থক্য না থাকে তখন ضَمِيْر مُنْفَصِل দ্বারা تَاكِيْد নেওয়া জরুরি। অন্যথায় নয়। এখানে أَوَ اٰبَاؤُنَا -এর মধ্যে هَمْزَه اِسْتِفْهَام দ্বারা পার্থক্য বিদ্যমান।

قَوْلُهُ لِوَقْتٍ اَىْ فِىْ وَقْتٍ : مِيْقَاتٌ টা وَقْتٌ অর্থে হয়েছে। আর لَام টা فِىْ অর্থে হয়েছে।

প্রশ্ন : لَمَجْمُوْعُوْنَ -এর সেলাহ فِىْ আসে, اِلٰى নয়। অথচ এখানে اِلٰى আনা হয়েছে।

উত্তর : لَمَجْمُوْعُوْنَ এটা لَمَسُوْقُوْنَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে এর সেলাহ اِلٰى আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا : এখানে مِنْهَا -এর যমীর شَجَر -এর দিকে ফিরেছে اِسْم جِنْس হওয়ার কারণে। কেননা اِسْم جِنْس -এর মধ্যে مُذَكَّر ও مُؤَنَّث উভয়টি হওয়ারই অবকাশ রয়েছে।

قَوْلُهُ الْهِيْمِ : ভীষণ তৃষ্ণার্ত উটকে اَلْهِيْم বলা হয় আর اِسْتِسْقَاء রোগকে هُيَام বলা হয়। যাতে খুব বেশি তৃষ্ণা অনুভূত হয়। এমন কি অধিক পানি পান করার পরও পরিতৃপ্ত হয় না, এই ব্যাধিকে জলান্ধরও বলা হয়। মুফাসসির (র.)-এর বলার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো هِيْم শব্দটি هَيْمَان [যা পুং লিঙ্গ] এবং هَيْمٰى [যা স্ত্রী লিঙ্গ উভয়েরই বহুবচন। মুফাসসির (র.)-এর هِيْم কে هَيْمَان -এর বহুবচন লেখাটা লেখার ভ্রান্তি মাত্র। এটা বলাও বৈধ যে, এটা اَهْيَم -এর বহুবচন। কেননা هِيْم টা মূলত هُيْم ছিল [هَاء বর্ণটি পেশ সহকারে] حُمْر -এর ওযনে هَاء এর পেশকে يَاء -এর অনুসরণে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং فُعْل হলো اَفْعَل -এর বহুবচন, যেমন حُمْر টা اَحْمَر -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا :

প্রশ্ন : لَوْ -এর জবাবে لَام নেওয়া আবশ্যক হয়। কাজেই لَجَعَلْنَاهُ হওয়া উচিত ছিল। তা না করে কি কারণে لَام -কে ফেলে দেওয়া হলো?

উত্তর : এখানে لَام تَاكِيْد -এর প্রয়োজন নেই। কেননা মেঘের মালিকানা এবং পানি লবণাক্তকরণ কোনো মানুষের শক্তিতে নেই। এ কাজের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। ক্ষেত ও ভূমি এর বিপরীত। তাতে মালিকানা সম্প্রসারিত। এ কারণেই পূর্বে لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا -এর মধ্যে لَام تَاكِيْد নেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ : ثُلَّةٌ শব্দের অর্থ এবং اَوَّلِيْن ও اٰخِرِيْن -এর তাফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি اولين তথা পূর্ববর্তীগণ বলে হযরত আদম (আ.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং اٰخِرِيْن তথা পরবর্তীগণ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা মুমিন মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গাম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া ثُلَّةٌ শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, তারা পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশি হবে।

পক্ষান্তরে যদি পূর্ববর্তীগণ এই উম্মতের মধ্যে থেকেই হয়, তবে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মত শেষের দিকেও অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের থেকে বঞ্চিত থাকবে না; যদিও শেষ যুগে এরূপ লোকের সংখ্যা কম হবে। সাধারণ মুমিন মুত্তাকী ও ওলী তো এই উম্মতের শুরু ও শেষভাগে বিপুল সংখ্যক থাকবে এবং তাদের কোনো যুগ 'আসহাবুল ইয়ামীন' থেকে খালি থাকবে না, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের একটি দল সদাসর্বদা সত্যের উপর কায়েম থাকবে। হাজারো বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যেও তারা সৎ পথ প্রদর্শনের কাজ অব্যাহত রাখবে। কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না কিয়ামত পর্যন্ত এই দল স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ডানদিকের লোকদের জন্যে জান্নাতে যেসব নিয়ামত রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে, আর এ আয়াত থেকে যারা ভাগ্যাহত, বদনসীব, যারা কাফের, মুশরিক ও পাপিষ্ঠ, যারা বামদিকের দলে থাকবে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ . فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ . وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ . অর্থাৎ আর বামদিকের দল, কত ভাগ্যাহত বাম দিকের লোকেরা। তারা থাকবে উত্তপ্ত বাতাস এবং ফুটন্ত পানিতে। তারা থাকবে ধোঁয়াচ্ছন্ন ছায়ার। যা ঠাণ্ডাও হবে না এবং আরামদায়কও হবে না। তাদের সুখও থাকবে না, শান্তিও থাকবে না, আর থাকবে না তাদের মান সম্মান। অপমান এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হবে তাদের জীবন-সাথী। দুঃখ-দুর্দশায় বিপদাপদে তারা থাকবে জর্জরিত, এর কারণ এই যে, তারা দুনিয়ার জীবনে ছিল আনন্দ উল্লাসে মত্ত, অন্যায় অনাচারে লিপ্ত, কুফারি ও নাফরমানিতে ব্যস্ত, আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ, দম্ভ ও অহংকার ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য, তারা ছিল আত্মবিস্মৃত, তারা বিস্মৃত হয়েছিল তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে, শিরক ও কুফরকে তারা কল্যাণের পথ মনে করেছিল, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে তারা জিদ বজায় রেখেছিল। তাই ইরশাদ হয়েছে– اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ . وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ .

ইতিপূর্বে তারা [অর্থাৎ দুনিয়াতে] ভোগ বিলাসে মত্ত থাকত, এবং তারা গুরুতর পাপকার্যে লিপ্ত থাকতে জিদ করতো। اَلْحِنْثِ الْعَظِيْمِ। অর্থাৎ অত্যন্ত বড় অপরাধ যেমন শিরক। ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, এটি হলো জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করা। কেননা কাফেররা মিথ্যা শপথ করে বলতো যে, তাদের পুনর্জীবন দেওয়া হবে না, তাদের পুনরুত্থান হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اَلْحِنْثِ الْعَظِيْمِ শব্দটি দ্বারা কুফর ও শিরককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে শিরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি মাফ করতেও পারেন"। বস্তুত কাফেররা শুধু যে দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাসে মত্ত এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা আখিরাতও বিশ্বাস করতো না। তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করতো এবং বিদ্রূপ করে বলতো, আমরা যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবো, চিরতরে মাটির সঙ্গে মিশে যাব, এরপর কি আবার জীবিত হবো? তা কি করে সম্ভব? তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ ভ্রান্ত মতের জবাবে ইরশাদ করেছেন–

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ .... اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ .

অর্থাৎ '[হে রাসূল!] আপনি ঘোষণা করুন, পূর্ববর্তীরা এবং পরবর্তীরা সকলকে এক নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হবে। এরপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা' [তোমাদের ভয়াবহ পরিণতির জন্যে তথা দোজখের শাস্তির জন্যে অপেক্ষা কর]।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন যে, হে রাসূল! আপনি জানিয়ে দিন যে, তোমাদের সকলকে অবশেষে একদিন তথা কিয়ামতের দিন একত্র করা হবে, তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে।

হযরত রাসূলে করীম ﷺ কিয়ামতের কঠিন দিন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন দোজখ থেকে একটি গর্দান বের হবে, তার দু'টি কানও থাকবে, এর দ্বারা সে দেখবে, শুনবে। তার একটি রসনা থাকবে তা দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলবে, আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তিন প্রকার লোকের উপর– ১. প্রত্যেক অবাধ্য এবং একগুঁয়ে লোকের উপর। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে শরিক করে অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে এবং ৩. যে ছবি প্রস্তুত করে। তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সংকলিত হয়েছে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন কিয়ামতের দিন এমন এক দোজখী ব্যক্তিকে একবার দোজখে ডুবিয়ে আনা হবে, যে দুনিয়ার জীবনে সর্বাধিক ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভোগ বিলাস করছো? কখনো কি তুমি সুখ শান্তি ভোগ করার সুযোগ পেয়েছো? তখন সে বলবে, আল্লাহ পাকের শপথ! কখনো না [অর্থাৎ অল্পক্ষণ দোজখের কঠোর শাস্তি দেখার পর অবস্থা এমন হবে যে, সে ব্যক্তি

সারা জীবনের ভোগ বিলাসকে এক মুহূর্তে ভুলে যাবে।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন এমন একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাতে ডুবিয়ে আনা হবে যে, দুনিয়াতে সর্বাধিক কষ্টে ছিল, এরপর তাকে জিজ্ঞাস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ কষ্ট দেখেছো? সে বলবে, আল্লাহ পাকের শপথ! আমি কখনো কোনো রকম দুঃখ কষ্ট দেখিনি [অর্থাৎ ক্ষণিকের জন্যে জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করার পর সে দুনিয়ার জীবনের সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবে।]

মূলত আলোচ্য আয়াতসমূহে দোজখের কঠিন শাস্তির কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে দোজখের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে মানুষ পরিণামদর্শী হয়, এবং পরকালীন জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا অর্থাৎ "তারা দোজখে গরম পানি এবং পুঁজ ব্যতীত কোনো পানীয়ের স্বাদে গ্রহণ করবে না"।

আরো ইরশাদ হয়েছে– يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ অর্থাৎ "তাদের মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে, পরিণামে তাদের উদরের সবকিছু এবং চামড়াসমূহ গলে বের হয়ে যাবে"।

এমনি আরো বহু আয়াতে দোজখের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে [আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন]।

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাশরের মানুষের তিন প্রকার এবং তাদের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পথভ্রষ্ট মানুষকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, যারা মূলত কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরুজ্জীবনেই বিশ্বাসী নয়। অথবা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। উদ্দেশ্য মানুষেরই সেই উদাসীনতা ও মূর্খতার মুখোশ উন্মোচন করা, যে তাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত করে রেখেছে! এর ব্যাখ্যা এই যে, এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে অথবা হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে, এগুলোকে সৃষ্টি করা, স্থায়ী রাখা এবং মানুষের বিভিন্ন উপকারে নিয়োজিত করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের লীলা। যদি কারণাদির যবনিকা মাঝখানে না থাকে এবং মানুষ এসব বস্তুর সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে, তবে সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার করেছেন। তাই এখানে যা কিছু অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে, সবকিছু কারণাদির অন্তরালে বিকাশ লাভ করে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও রহস্যের বলে কারণাদি ও ঘটনাবলির মধ্যে এমন এক অটুট যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন যে, কারণ অস্তিত্ব লাভ করার সাথে সাথে ঘটনা অস্তিত্ব লাভ করে। কারণ ও ঘটনা যেন একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাহ্যদর্শী মানুষ কারণাদির এই বেড়াজালে আটকে যায় এবং সৃষ্টকর্মকে কারণাদির সাথেই সম্বন্ধযুক্ত মনে করতে থাকে। যবনিকার অন্তরাল থেকে যে আসল শক্তি কারণ ও ঘটনাবলিকে সক্রিয় করে, তার দিকে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি যায় না।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা প্রথম খোদ মানবসৃষ্টির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, এরপর মানবীয় প্রয়োজনাদি সৃষ্টির মুখোশ উন্মোচিত করেছেন। মানুষকে সম্বোধন করে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন এবং এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সঠিক উত্তরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কেননা তিনি প্রশ্নের মধ্যেই কারণাদির দুর্বলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথম আয়াত একটি দাবি করে এবং পরবর্তী আয়াতগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। সর্বপ্রথম স্বয়ং মানবসৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। কারণ, গাফিল মানুষ প্রত্যহ দেখে যে, পুরুষ ও নারীর যৌন মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয়। এরপর তা জননীর গর্ভাশয়ে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নয় মাস পর একটি পরিপূর্ণ মানবরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়। এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টি এতেই নিবদ্ধ থেকে যায় যে, পুরুষ ও নারীর পরস্পরিক মিলনই মানবসৃষ্টির প্রকৃত কারণ। তাই প্রশ্ন করা হয়েছে– أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

অর্থাৎ হে মানব! একটু ভেবে দেখ, সন্তান জন্মলাভ করার মধ্যে তোমার হাত এতটুকুই তো যে, তুমি এক ফোঁটা বীর্য বিশেষ স্থানে পৌছিয়ে দিয়েছ। এরপর তোমার জানা আছে কি যে, বীর্যের উপর স্তরে স্তরে কি কি পরিবর্তন আসে? কি কি ভাবে এতে অস্থি ও রক্ত মাংস সৃষ্টি হয়? এই ক্ষুদে জগতের অস্তিত্বের মধ্যে খাদ্য আহরণ করার, রক্ত তৈরি করার ও জীবাত্মা সৃষ্টি করার কেমন যন্ত্রপাতি কি কি ভাবে স্থাপন করা হয় এবং শ্রবণ, দর্শন, কথন, আস্বাদন ও অনুধাবন শক্তি নিহিত করা হয়, যার ফলে

Free @ www.e-ilmweebly.com

একটি মানুষের অস্তিত্ব একটি চলমান কারখানাতে পরিণত হয়? পিতাও কোনো খবর রাখে না এবং যে জননীর উদরে এসব হচ্ছে, সেও কিছু জানে না। জ্ঞান-বুদ্ধি বলে কোনো বস্তু দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বুঝে না যে, কোনো স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপনা আপনি তৈরি হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরি হলো, কিভাবে হলো? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যে উদর, গর্ভাশয় ও ভ্রূণের উপরস্থ ঝিল্লি এই তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরি করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ [সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ মহান] বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এর পরের আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব! তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মঠ মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজ-কারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাক। এটাও জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্য কোনো জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞানবুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার।

مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ -এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি। ইরশাদ হচ্ছে- وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর তোমরা মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোনো জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তন হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আজাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড় পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেওয়া যেতে পারে।

قَوْلُهُ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ : খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানবসৃষ্টির গুঢ় তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে, তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অঙ্কুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জবাব নেই যে, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অঙ্কুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হেফাজতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্যে থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরি করেছে বলে দাবিও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, মণের মণ মাটির স্তূপে পতিত বীজের মধ্যে থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরি করল? জবাব এটাই যে, সেই পরম প্রভু, অপার শক্তিধর আল্লাহ তা'আলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, সেগুলো সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ : مُقْوِيْنَ শব্দটি اِقْوَاءٌ থেকে এবং اِقْوَاءٌ শব্দটিকে قَوَاءٌ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো- মরু। কাজেই قَوِيٌّ শব্দের অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে, যে প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমারই শক্তি সার্থ্যের ফসল।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : এর অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে; এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧٥. فَلَآ اُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۙ بِمَسَاقِطِهَا لِغُرُوْبِهَا ـ

৭৫. আমি শপথ করছি এখানে لَا টা অতিরিক্ত নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের সেগুলো অস্তমিত হওয়ার।

٧٦. وَاِنَّهٗ اَىِ الْقَسَمُ بِهَا لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۙ اَىْ لَوْ كُنْتُمْ مِنْ ذَوِى الْعِلْمِ لَعَلِمْتُمْ عِظَمَ هٰذَا الْقَسَمِ ـ

৭৬. অবশ্যই এটা এদের শপথ এক মহা শপথ যদি তোমরা জানতে অর্থাৎ যদি তোমরা জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে এই শপথের মহত্ত্ব জেনে নিবে।

٧٧. اِنَّهٗ اَىِ الْمَتْلُوُّ عَلَيْكُمْ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۙ

৭৭. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ যা তোমাদের নিকট পঠিত হচ্ছে সম্মানিত কুরআন।

٧٨. فِىْ كِتٰبٍ مَكْتُوْبٍ مَّكْنُوْنٍ ۙ مَصُوْنٍ وَهُوَ الْمُصْحَفُ ـ

৭৮. যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে আর তা হলো মাসহাফ।

٧٩. لَا يَمَسُّهٗٓ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْىِ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ؕ اَىِ الَّذِيْنَ طَهَّرُوْا اَنْفُسَهُمْ مِنَ الْاَحْدَاثِ ـ

৭৯. যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। لَا يَمَسُّهٗ এটা খবর نَهْى অর্থে। অর্থাৎ যারা নিজেদের কে অপবিত্রতা হতে পবিত্র করে নিয়েছেন।

٨٠. تَنْزِيْلٌ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

৮০. এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।

٨١. اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ الْقُرْاٰنِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ مُتَهَاوِنُوْنَ مُكَذِّبُوْنَ ـ

৮১. তবুও কি তোমরা এই বাণীকে কুরআনকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে? গুরুত্ব না দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে।

٨٢. وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ مِنَ الْمَطَرِ اَىْ شُكْرَهٗ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ـ بِسُقْيَا اللّٰهِ حَيْثُ قُلْتُمْ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ـ

৮২. এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ অর্থাৎ আল্লাহর পরিতৃপ্ত করাকে مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا বলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ? অর্থাৎ অমুক তারকা উদিত হওয়ার কারণে বৃষ্টি হয়েছে।

٨٣. فَلَوْلَا فَهَلَّا اِذَا بَلَغَتِ الرُّوْحُ وَقْتَ النَّزْعِ الْحُلْقُوْمَ ۙ وَهُوَ مَجْرَى الطَّعَامِ ـ

৮৩. পরন্তু কেন নয়– প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় সুতরাং যখন রূহ বের হওয়ার সময় খাদ্যনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

٨٤. وَاَنْتُمْ يَا حَاضِرِى الْمَيِّتِ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ اِلَيْهِ ـ

৮৪. এবং তোমরা হে মৃতের নিকট উপস্থিত লোকেরা! তখন তাকিয়ে থাকো তার দিকে।

٨٥. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ بِالْعِلْمِ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ مِنَ الْبَصِيْرَةِ اَىْ لَا تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ـ

৮৫. আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর জ্ঞানের দিক থেকে। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না تُبْصِرُوْنَ টা بَصِيْرَةٌ হতে নির্গত। অর্থাৎ আমার বিদ্যমানতার জ্ঞান তোমাদের হয় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨٦. فَلَوْلَا فَهَلَّا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ. مُجْزِيِّيْنَ بِاَنْ تُبْعَثُوْا اَىْ غَيْرَ مَبْعُوْثِيْنَ بِزَعْمِكُمْ.

৮৬. তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও। অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী তোমাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে না।

٨٧. تَرْجِعُوْنَهَا تُرَدُّوْنَ الرُّوْحَ اِلَى الْجَسَدِ بَعْدَ بُلُوْغِ الْحُلْقُوْمِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. فِيْمَا زَعَمْتُمْ فَلَوْلَا الثَّانِيَةُ تَاكِيْدٌ لِلْاُوْلٰى وَاِذَا ظَرْفٌ لِتَرْجِعُوْنَ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ الشَّرْطَانِ وَالْمَعْنٰى هَلَّا تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ نَفَيْتُمُ الْبَعْثَ صَادِقِيْنَ فِىْ نَفْيِهِ اَىْ لِيَنْتَفِىَ عَنْ مَحَلِّهَا الْمَوْتَ.

৮৭. তবে তোমরা তা ফিরাও না কেন? অর্থাৎ রূহ কণ্ঠাগত হওয়ার পর তোমরা একে শরীরের দিকে ফিরিয়ে দাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তোমাদের ধারণা মতে। দ্বিতীয় لَوْلَا টি প্রথম لَوْلَا -এর تَاكِيْد আর بَلَغَتْ اِذَا -এর মধ্যে اِذَا টা تَرْجِعُوْنَ -এর ظَرْف হয়েছে। আর تَرْجِعُوْنَ -এর সাথে দুটি শর্ত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ তোমরা যদি পুনরুত্থান না হওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তবে তাকে কেন ফিরিয়ে নাও না? যাতে করে মৃত্যুটা نَفْس -এর মহল হতে مُنْتَفِىْ হয়ে যাবে।

٨٨. فَاَمَّا اِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ.

৮৮. যদি সে মৃত ব্যক্তি নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়।

٨٩. فَرَوْحٌ اَىْ فَلَهُ اِسْتِرَاحَةٌ وَّرَيْحَانٌ لا رِزْقٌ حَسَنٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ وَهَلِ الْجَوَابُ لِاَمَّا اَوْ لِاِنْ اَوْ لَهُمَا اَقْوَالٌ.

৮৯. তবে তার জন্য রয়েছে আরাম ও উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখ উদ্যান, فَرَوْحٌ এটা হয়তো اَمَّا -এর জবাব হবে অথবা اِنْ -এর জবাব হবে অথবা উভয়ের জবাব হবে। এতে কয়েকটি [তিনটি] মত রয়েছে।

٩٠. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ من اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ.

৯০. আর যদি সে ডান দিকের একজন হয়।

٩١. فَسَلٰمٌ لَّكَ اَىْ لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ مِنْ جِهَةِ اَنَّهُ مِنْهُمْ.

৯১. তবে তাকে বলা হবে, তোমার প্রতি শান্তি অর্থাৎ তার জন্য শাস্তি হতে নিষ্কৃতির শান্তি, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! কেননা সে আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্গত।

٩٢. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ لا

৯২. কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়।

٩٣. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ لا

৯৩. তবে রয়েছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা।

٩٤. وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ.

৯৪. এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

٩٥. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ج مِنْ اِضَافَةِ الْمَوْصُوْفِ اِلٰى صِفَتِهِ.

৯৫. এটা তো ধ্রুব সত্য। এটা مَوْصُوْف তার সিফতের দিকে ইযাফতের অন্তর্গত।

٩٦. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ. تَقَدَّمَ

৯৬. অতএব আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ : জমহুর মুফাসসিরগণের মতে لَا টা تَاكِيْد -এর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে। فَاُقْسِمُ অর্থে যেমন- لَا وَاللّٰهِ

কেউ কেউ এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, لَا টা সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণাকে نَفِيْ করার জন্য। আর مَنْفِيْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো কাফেরদের বাক্য এবং এটা لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُ অর্থে। ইমাম ফাররা বলেন যে, এই لَا টা نَفِيْ -এর জন্য এবং এটা لَيْسَ الْاَمْرُ كَمَا تَقُوْلُوْنَ অর্থে হয়েছে। কেউ কেউ এটাকে দুর্বল বলেছেন।

قَوْلُهُ مَوَاقِعُ : এটা مَوْقِعٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ হলো তারকা অস্তমিত হওয়ার স্থান বা সময়।

কেউ কেউ مَوْقِعٌ দ্বারা তারকার মঞ্জিলসমূহ উদ্দেশ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ এর দ্বারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কেননা কুরআনে কারীমও রাসূল ﷺ -এর উপর ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ : لَا اُقْسِمُ হলো কসম আর اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ হলো জওয়াবে কসম। আর لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ হলো কসম ও জওয়াবে কসমের মাঝে جُمْلَه مُعْتَرِضَه আর جُمْلَه مُعْتَرِضَه -এর মধ্যেও সিফত ও মাওসূফের মধ্যে جُمْلَه مُعْتَرِضَه রয়েছে আর তা হলো لَوْ تَعْلَمُوْنَ

قَوْلُهُ لَعَلِمْتُمْ عَظَمَ هٰذَا الْقَسَمِ : এ বাক্য বৃদ্ধিকরণ দ্বারা মুফাসসির (রা.) -এর জবাব উহ্য থাকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُصْحَفُ : কেউ কেউ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ দ্বারা লওহে মাহফূজ উদ্দেশ্য করেছেন। এই সূরতে لَا يَمَسُّهٗ -এর অর্থ হবে- لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ اِلَّا الْمَلٰئِكَةُ الْمُطَهَّرُوْنَ এই সুরতে পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা নাজায়েজ হওয়ার দলিল হবে না।

قَوْلُهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- لَا يَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ এটা বাস্তবতার বিপরীত। কেননা অনেক লোকেরা পবিত্রতা ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করে। আর কুরআন তো বাস্তবতার বিপরীত কোনো খবর পরিবেশন করে না।

উত্তর : এখানে খবরটা نَهِيْ -এর অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ مُنَزَّلٌ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, تَنْزِيْلٌ মাসদারটা مُنَزَّلٌ ইসমে মাফঊল অর্থে হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ : এখানে اِسْتِفْهَامٌ টা ধমকির জন্য এসেছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য এটা সমীচীন নয়।

قَوْلُهُ مُدْهِنُوْنَ : مُدْهِنُوْنَ শব্দটি اِدْهَانٌ হতে اِدْهَانٌ ও تَدْهِيْنٌ -এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে তৈল লাগিয়ে মসৃণ ও নরম করা। এর থেকেই مُدَاهَنَتْ فِى الدِّيْنِ দ্বীনের ব্যাপারে খোশামোদ পছন্দ করা। এর লাযেমী অর্থ নেফাকও আসে। যে জিনিসের উপর তৈল লাগিয়ে নরম ও মসৃণ করা হয়, তার ভিতরটা বাহিরের বিপরীত হয়ে থাকে। উপরে নরম ও মসৃণ মনে হলেও ভিতরে তার বিপরীত হয়ে থাকে। নেফাকের মধ্যেও এরূপই হয়ে থাকে। এখানে সাধারণত কুফর উদ্দেশ্য। কুরআনকে স্বাভাবিক ও সাধারণ মনে করা ও গুরুত্ব না দেওয়াও اِدْهَانٌ -এর মিসদাক।

قَوْلُهُ مِنَ الْمَطَرِ : এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রিজিক দ্বারা রিজিকের কারণ উদ্দেশ্য। اَىْ شُكْرَهٗ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, ইবারতে মুযাফ উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত হলো- تَكْفُرُوْنَ شُكْرَ الْمَطَرِ তথা আল্লাহর না-শোকরি করা তোমরা নিজেদের ব্যস্ততা ও খাদ্য বানিয়ে নিয়েছ। এমন কি আল্লাহপ্রদত্ত বৃষ্টিকেও তোমরা কোনো কোনো তারকার উদিত হওয়া ও অস্ত যাওয়ার সাথে সম্পর্কিত করে থাকো।

قَوْلُهُ بِسَقْيَا اللّٰهِ : এটা মাসদার ; স্বীয় فَاعِلٌ -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। মূলে ছিল- سَقَى اللّٰهُ

قَوْلُهُ اِذَا ظَرْفٌ لِتَرْجِعُوْنَ : اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ এটা تَرْجِعُوْنَ -এর ظَرْف مُقَدَّمٌ হয়েছে। تَرْجِعُوْنَ -এর সাথে দুটি শর্ত সংশ্লিষ্ট, একটি হলো اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ এবং অপরটি হলো اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ সংশ্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হলো সেটা উভয়টি جَزَاء হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ফায়েদা : বাক্যের মধ্যে قَلْب হয়েছে। বাক্যটির অর্থ হলো- هَلَّا تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ نَفَيْتُمُ الْبَعْثَ صَادِقِيْنَ فِيْ نَفْيِهِ

قَوْلُهُ فَلَهُ رَوْحٌ : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, رَوْحٌ হলো মুবতাদা আর فَلَهُ হলো খবরে মুকাদ্দাম।

قَوْلُهُ هَلِ الْجَوَابُ لِاَمَّا اَوْ لِاِنْ اَوْ لَهُمَا : فَرَوْحٌ الخ হলো জওয়াব। এতে তিনটি মতামত রয়েছে । যথা- ১. اَمَّا -এর জওয়াব। ২. اِنْ -এর জওয়াব ৩. উভয়টিরই জওয়াব। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত হলো فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ الخ হলো اَمَّا -এর জওয়াব। আর اِنْ -এর জওয়াবটা উহ্য রয়েছে। কেননা اِنْ -এর জওয়াবটা বেশি বেশি উহ্য থাকে।

قَوْلُهُ اَىْ لَهُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعَذَابِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, سَلَامٌ টা سَلَامَتٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ اَنَّهُ مِنْهُمْ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ -এর মধ্যে مِنْ টা تَعْلِيْلِيَّةٌ অর্থাৎ- مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ مِنْهُمْ

قَوْلُهُ فَنُزُلٌ : এটা মুবতাদা, তার খবর لَهُ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- لَهُ نُزُلٌ

قَوْلُهُ تَقَدَّمَ : অর্থাৎ سَبِّحْ এটা نَزِّهْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং اِسْمِ শব্দটি অতিরিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কিয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

قَوْلُهُ فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ : قَسَم -এর শুরুতে অতিরিক্ত لا পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয়- لَا وَاللّٰهِ ; মূর্খতা যুগের কসমে لَا وَاَبِيْكَ সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে لا সম্বোধিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমার ধারণা ঠিক নয়: বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। مَوَاقِعُ শব্দটি مَوْقِعٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল অথবা অস্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে, যেমন সূরা নাজমেও وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অস্ত যাওয়ার সময় দিগন্তে নক্ষত্রের কর্ম সমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় এবং তার চিহ্নের অবসান প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ اِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ : যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কুরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কুরআন কারো রচিত অথবা শয়তান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। [নাউযুবিল্লাহ]

قَوْلُهُ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ : অর্থাৎ গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে মাহফূয বোঝানো হয়েছে لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তাফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। যথা-

১. ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ 'লওহে মাহফূযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَا يَمَسُّهٗٓ -এর সর্বনাম দ্বারা লওহে মাহফূযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ লওহে মাহফূযকে পাক পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ 'পাক পবিত্র লোকগণ' এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে মাহফূয পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম। এছাড়া مَسّ শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেওয়া যায় না: বরং مَسّ তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে। অর্থাৎ লওহে মাহফূযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা লওহে মাহফূজকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্টজীবের কাজ নয়। -[কুরতুবী]

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত 'সম্মানিত' শব্দটি কুরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বোঝানো হবে। তখন কুরআনের অর্থ হবে– সেই কপি, যাতে কুরআন লিখিত আছে এবং مَسّ শব্দটি হাতে সম্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (র.) বলেন, আমি এই আয়াতের যত তাফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তাফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসা-এর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মর্ম– فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ -এর বিশেষণ নয়, বরং কুরআনের বিশেষণ।

২. দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مُطَهَّرُوْنَ তথা 'পাক পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রা.) এই উক্তি করেছেন। –[কুরতুবী, ইবনে কাসীর] ইমাম মালেক (র.)-ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন। –[কুরতুবী]

কিছু সংখ্যক তাফসীরবিদ বলেন, কুরআনের অর্থ হলো– কুরআনের লিখিত কপি এবং مُطَهَّرُوْنَ -এর অর্থ হলো– এমন লোক, যারা 'হদসে আসগর' ও 'হদসে আকবর থেকে পবিত্র। বে-অজু অবস্থাকে 'হদসে আসগর' বলা হয়। অজু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েজ ও নেফাসের অবস্থাকে 'হদসে আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করা জরুরি। এই তাফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (র.) থেকে বর্ণিত আছে। –[রূহুল মা'আনী]

এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কুরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েজ নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে– বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বে-অজু না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তাফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তাফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কুরআন পাঠরত অবস্থায় পেয়ে কুরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নী আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কুরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করে পাতাগুলো হাত নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তাফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তাফসীরের সমর্থনে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা.) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন। তাই অনেক তাফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্য এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই–

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একখানি পত্র ইমাম মালেক (র.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপ আছে– لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ অর্থাৎ অপবিত্র ব্যক্তি যেন কুরআনকে স্পর্শ না করে। –[ইবনে কাসীর]

রূহুল মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মুসনাদে আব্দুর রাযযাক, ইবনে আবী দাউদ ও ইবনুল মুনজির থেকেও বর্ণিত আছে। তাবারানী ও ইবনে মরদুবিয়াহ বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ –[রূহুল মা'আনী]।

قَوْلُهُ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ : مُدْهِنُوْنَ শব্দটি اِدْهَانٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ– তৈল মালিশ করা। তৈল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কুরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ .... تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছেঞ

১. কুরআন আল্লাহর কালাম। এতে কোনো শয়তান ও জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য।

২ কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে নত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার কাফেরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবি যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা আপনোদনের জন্য আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরণোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় তার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকট থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্তে, এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হেফাজত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে, যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে, আল্লাহর নাগালের বাইরে চলে গেছে, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহর নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক!

قَوْلُهُ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আসহাবুল ইয়ামীন' তথা সাধারণ মুমিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি 'আসহাবুশ শিমাল' তথা কাফের ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে- إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ; অর্থাৎ উল্লিখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : সূরার উপসংহারে রাসূলে কারীম ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাজের ভেতরে ও বাইরের সব তাসবীহ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাজকেও মাঝে মাঝে তাসবীহ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাজের প্রতি গুরুত্ব দানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

Free@www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা হাদীদ, মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً : আয়াত : ২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج اَىْ نَزَّهَهُ كُلُّ شَىْءٍ فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ وَجِىْءَ بِمَا دُوْنَ مَنْ تَغْلِيْبًا لِلْاَكْثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ . فِىْ صُنْعِهٖ .

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুই তার পবিত্রতা বর্ণনা করে। لِلّٰهِ -এর لام -টি অতিরিক্ত। আর مَنْ -এর পরিবর্তে مَا -কে ব্যবহার করেছেন অধিকাংশকে প্রাধান্য দেওয়া হিসেবে। তিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজত্বে প্রজ্ঞাময় স্বীয় কর্মে।

٢. لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يُحْيِىْ بِالْاِنْشَاءِ وَيُمِيْتُ ج بَعْدَهٗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন সৃষ্টি করে এবং এরপর মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

٣. هُوَ الْاَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ بِلَا بِدَايَةٍ وَالْاٰخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَىْءٍ بِلَا نِهَايَةٍ وَالظَّاهِرُ بِالْاَدِلَّةِ عَلَيْهِ وَالْبَاطِنُ عَنْ اِدْرَاكِ الْحَوَاسِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ .

৩. তিনিই আদি, কোনো সূচনা ছাড়া সর্ববিষয়ের পূর্বে তিনিই অন্ত; তিনি অন্তহীনভাবে সর্ববিষয়ের পর থাকবেন তিনিই ব্যক্ত এর উপর প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে ও তিনিই গুপ্ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা থেকে। এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

٤. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَوَّلُهَا الْاَحَدُ وَاٰخِرُهَا الْجُمُعَةُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط الْكُرْسِىِّ اسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهٖ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ يَدْخُلُ فِى الْاَرْضِ كَالْمَطَرِ وَالْاَمْوَاتِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ . وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كَالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ وَمَا يَعْرُجُ يَصْعَدُ فِيْهَا ط كَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهٖ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

৪. তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর দিন অনুযায়ী। তার প্রথম দিন ছিল রবিবার এবং শেষ দিন ছিল জুমাবার/শুক্রবার। অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন অর্থাৎ কুরসির উপর তার শান অনুপাতে সমাসীন হয়েছে। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে যেমন বৃষ্টির পানি এবং মৃতব্যক্তি ও যা কিছু তা হতে বের হয়ে যায়। যেমন তরুলতা, ঘাস ও খনিজ দ্রব্য। এবং আকাশ হতে যা কিছু নেমে আসে যেমন রহমত ও শাস্তি এবং আকাশে যা উত্থিত হয় যেমন সৎ আমল ও বদ আমল। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন জ্ঞানের হিসেবে। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ الْمَوْجُوْدَاتُ جَمِيْعُهَا .

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। বিদ্যমান সবকিছুই।

٦. يُوْلِجُ الَّيْلَ يُدْخِلُ فِى النَّهَارِ فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ اللَّيْلَ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ط فَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ النَّهَارَ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاَسْرَارِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ .

৬. তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে ফলে তা বেড়ে যায় এবং রাত ছোট হয়ে যায় এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে ফলে তা বেড়ে যায় এবং দিন ছোট হয়ে যায়। তিনি তো অন্তর্যামী অর্থাৎ হৃদয়ে যে গোপন রহস্য ও বিশ্বাস লুকিয়ে আছে তা তিনি ভালো করেই জানেন।

٧. اٰمِنُوْا دُوْمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط مِنْ مَالِ مَنْ تَقَدَّمَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهِ مَنْ بَعْدَكُمْ نَزَلَ فِىْ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَهِىَ غَزْوَةُ تَبُوْكٍ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا اِشَارَةٌ اِلٰى عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ .

৭. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন অর্থাৎ ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাক এবং ব্যয় কর আল্লাহর পথে আল্লাহ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে সে সকল মানুষের মালের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং তাতে তোমাদের পরবর্তীগণকে তোমাদের প্রতিনিধি বানাবেন। এ আয়াত গাযওয়াতুল উসরায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর তা হলো তাবূক যুদ্ধ। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে হযরত উসমান (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার।

٨. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ خِطَابٌ لِلْكُفَّارِ اَىْ لَا مَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ج وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَنَصْبِ مَا بَعْدَهُ مِيْثَاقَكُمْ عَلَيْهِ . اَىْ اَخَذَهُ اللّٰهُ فِىْ عَالَمِ الذَّرِّ حِيْنَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اَىْ مُرِيْدِيْنَ الْاِيْمَانَ بِهٖ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ .

৮. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহতে ঈমান আন না? কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কোনো বস্তুই তোমাদের অন্তরায় নেই। অথচ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনতে আহবান করতেছেন এবং আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। اَخَذَ শব্দটি হামযার পেশ ও خَاء বর্ণে যেরসহ এবং উভয়টি যবরসহ এবং তার পরে যবরসহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের থেকে আলমে আযলে যখন তিনি নিজেই নিজেকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর মাধ্যমে সাক্ষী বানিয়েছিলেন তখন সকলেই বলেছিল- بَلٰى [হ্যাঁ] যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। অর্থাৎ যদি এর উপর ঈমান আনতে চাও তবে দ্রুত করো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৯. هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ اِلَى النُّوْرِ ط الْاِيْمَانِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ فِىْ اِخْرَاجِكُمْ مِنَ الْكُفْرِ اِلَى الْاِيْمَانِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

৯. তিনিই তাঁর বান্দার উপর সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন কুরআনের আয়াত তোমাদেরকে কুফরির অন্ধকার হতে ঈমানের আলোতে আনার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি কুফর হতে ঈমানের আলোতে বের করে আনার ক্ষেত্রে করুণাময়, পরম দয়ালু।

১০. وَمَا لَكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اَلَّا فِيْهِ اِدْغَامُ نُوْنِ اَنْ فِىْ لَامِ لَا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط بِمَا فِيْهِمَا فَيَصِلُ اِلَيْهِ اَمْوَالُكُمْ مِنْ غَيْرِ اَجْرِ الْاِنْفَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اَنْفَقْتُمْ فَتُؤْجَرُوْنَ لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ لِمَكَّةَ وَقٰتَلَ ط اُولٰۤئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۭ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ط وَكُلًّا مِّنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأً وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط اَلْجَنَّةَ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ ـ

১০. তোমরা কেন তোমাদের ঈমানের পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? اَلَّا -এর اَنْ -এর نُوْنْ -টি لَا -এর মধ্যে ইদগাম তথা প্রবিষ্ট হয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তাতে যা কিছু রয়েছে তা সহ তোমাদের সম্পদ ব্যয়ের বিনিময় ব্যতীতই তাঁর নিকট পৌঁছে যাবে। তবে যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার বিপরীত। এর উপর তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। كُلًّا শব্দটি এক কেরাতে رَفْع সহ রয়েছে তখন তা মুবতাদা হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। ফলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিদান দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

প্রশ্ন : سَبَّحَ لِلّٰهِ -এর মধ্যে سَبَّحَ -কে لَ -এর সাথে مُتَعَدِّىْ নেওয়া হয়েছে। অথচ سَبَّحَ টা مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর : لَامْ টা تَاكِيْد -এর জন্য অতিরিক্ত হয়েছে। যেমন نَصَحْتُ لَهٗ এবং شَكَرْتُ لَهٗ অথবা تَعْلِيْل -এর জন্য। মুফাসসির (র.) سَبَّحَ لِلّٰهِ -এর তাফসীর نَزَّهَهٗ দ্বারা করে এবং فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ বৃদ্ধি করে এই প্রশ্নেরই সমাধান করেছেন।

قَوْلُهٗ بِاِنْشَاءِ : এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, يُحْيِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য জীবিত ছেড়ে দেওয়া নয়। যেমন নমরূদ কাউকে হত্যা করত এবং কাউকে জীবিত ছেড়ে দিত। নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বিতর্ক করে বলেছিল- اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ এবং দু'জন মানুষ [বন্দী] -কে ডেকে একজনকে হত্যা করল এবং একজনকে ছেড়ে দিল এবং বলল- اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ কাউকে হত্যা না করা এটা জীবিত করা নয়; বরং يُحْيِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- اِنْشَاءُ حَيَاتٍ

قَوْلُهُ الْكُرْسِىِّ : আরশ-এর তাফসীর اَلْكُرْسِىِّ দ্বারা না করে তার অবস্থার উপর রেখে দেওয়াই যথাযথ ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اِسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ : এটা পূর্ববর্তীগণের তাফসীর পরবর্তীগণ قَهْر এবং غَلَبَه দ্বারা এর তাফসীর করেছেন।

قَوْلُهُ وَالسَّيِّئَةُ : اَلسَّيِّئَةُ শব্দটি ফেলে দেওয়াই উত্তম/ ভালো ছিল। কেননা كَلِمَاتُ طَيِّبَاتُ -ই আকাশে উঠে যায়; كَلِمَاتُ سَيِّئَاتُ নয়।

قَوْلُهُ دُوْمُوْا عَلَى الْاِيْمَانِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন : এখানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই اٰمِنُوْا বলার কারণে تَحْصِيْلُ حَاصِلٍ আবশ্যক হচ্ছে।

উত্তর : اٰمِنُوْا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানের উপর সর্বদা সুদৃঢ় থাকা, যা মুমিনদের থেকেই কামনীয়।

قَوْلُهُ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ : এটা لَا تُؤْمِنُوْنَ -এর যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ : এটা يَدْعُوْكُمْ -এর كُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اَىْ مُرِيْدِيْنَ الْاِيْمَانَ : এই ইবারত দ্বারাও একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন : প্রথম বলেছেন– مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ; যার চাহিদা হলো সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ মুমিন নয়। এরপর বললেন– اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ যার দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্বোধিতগণ মুমিন।

উত্তর : উত্তরের সারকথা হলো তোমরা আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর ঈমান নিয়ে আসো, যদি তোমরা হযরত মূসা (আ.) -এর উপর বিশ্বাসী হও। কেননা তাদের শরিয়তের চাহিদা ও এটা যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

قَوْلُهُ فَبَادِرُوْا اِلَيْهِ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, جَوَابُ شَرْطٍ উহ্য রয়েছে আর তা হলো– فَبَادِرُوْا الخ

قَوْلُهُ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلُ : এটা لَا يَسْتَوِىْ -এর ফায়েল। আর اِسْتَوٰى দুটি জিনিসের কমে হয় না, বুঝা গেল যে, তার مُقَابِلْ টা সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে উহ্য করে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো– مَنْ اَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ

قَوْلُهُ كُلًّا : এটা وَعَدَ اللّٰهُ -এর মাফউলে মুকাদ্দাম, তবে ইবনে আমের كُلٌّ -কে মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে رَفْع পড়েছেন। আর তার পরের অংশ হলো খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হাদীদ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মদীনা মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ২৯, এতে ৫৪৪টি বাক্য ও ২৪৭৬ টি অক্ষর রয়েছে।

বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা হাদীদ মদীনা মুনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে দুররুল মানসূর খ. ৬ পৃ. ১৮৮]

অবশ্য কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা নাজিল হয়েছে মঙ্গলবার দিন। এ সূরায় লৌহের সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক লৌহ সৃষ্টি করেছেন মঙ্গলবারে, আর হাদীদ অর্থ– লৌহ। তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা হাদীদ'।

বর্ণিত আছে যে, এই মঙ্গলবার দিন হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র কাবীল হাবিলকে হত্যা করেছিল।

মূল বক্তব্য : এ সূরায় ইসলামি শরিয়তের বুনিয়াদী বিধি-নিষেধ এবং মৌলিক আকীদা তথা তাওহীদ সম্পর্কে হেদায়েত রয়েছে, চরিত্র মাধুর্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ সূরায়। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, দীন দুনিয়ার সঠিক কল্যাণ লাভের জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আত্মসংশোধনে ব্রতী হওয়া, চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করা। এ সূরার মূল বক্তব্যকে তিনটি বিষয়ে বিভক্ত করা যায়। যথা–

১. বিশ্বজগৎ এক আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি, তিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সব কিছুর একমাত্র মালিক। সব কিছুই রয়েছে তাঁর কর্তৃত্বাধীন, তাঁর কর্তৃত্বে কোনো কিছুই শরীক নেই।

২. সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, আল্লাহ পাকের দীনকে কায়েম করার জন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আত্মত্যাগের পরিচয় দেওয়া।

৩. দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়, এর দ্বারা মানুষের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহে ব্যয় করাই কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এবং গুণাবলির বর্ণনা দ্বারা এ সূরা শুরু করা হয়েছে এবং একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে এবং সৃষ্টিমাত্রই আল্লাহ পাকের কুদরত হিকমত এবং তাঁর একত্ববাদের সাক্ষী হয়ে আছে। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি এমন আদি, যার পূর্বে কিছুই নেই, আর তিনি এমন শেষ, যার পরে আর কিছুই নেই। তিনি এমন প্রকাশ যে, তাঁর কুদরত ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সর্বত্র, তিনি এমন গুপ্ত যে, মানব দৃষ্টি এমনকি অন্তর্দৃষ্টিরও তিনি উর্ধ্বে।

সূরার পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলগণের প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন।

এ সূরার ফজিলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে কোনো প্রকার ওয়াসওয়াসা উপলব্ধি করে, তবে সে যেন [এ সূরার নিম্নোক্ত] আয়াতখানি পাঠ করে–
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –[আবূ দাউদ শরীফ, ইতকান]

এ সূরার আমল : সূরা হাদীদকে লিপিবদ্ধ করে সঙ্গে রাখলে তীর এবং তরবারি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

জ্বর এবং ফোঁড়ার ব্যাপারেও এ সূরার আমল উপকারী হয়।

স্বপ্নের তা'বীর : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা হাদীদ পাঠ করছে, তবে সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে আখিরাতের আলোচনা ছিল। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে তাওহীদের কথা দিয়ে তাওহীদের প্রতি ঈমানের উপরই আখিরাতের সাফল্য নির্ভরশীল, তাই দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর।

অথবা উভয় সূরার সম্পর্ককে এভাবেও বর্ণনা করা যায়। পূর্ববর্তী সূরার শেষ কথা ছিল, "হে রাসূল ! আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করুন"! আর এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে, "আসমান জমিনের সবকিছু আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে রত রয়েছে।"

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য : যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مُسَبِّحَاتٌ তথা 'তাসবীহযুক্ত সূরা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমু'আ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত–

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমু'আ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও জিকির অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়। –[মাযহারী]

শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতিকার : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কোনো সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানি কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। –[ইবনে কাসীর]

এই আয়াতের তাফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দশটির অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই, সবগুলোরই অবকাশ আছে। 'আউয়াল' শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট: অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। যথা– ১. যা বাস্তবেই ধ্বংসশীল। যেমন– পার্থিব ধন-দৌলত ইত্যাদি। ২. যা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোজখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভালো-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম গাযালী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার মারেফত সবার শেষে হয় না এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনজিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহর মারেফত। –[রূহুল মা'আনী]

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোনো বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তি সামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

স্বীয় সত্তার স্বরূপের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা 'বাতেন' তথা অপ্রকাশমান। জ্ঞান-বুদ্ধি ও কল্পনা ও তাঁর স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ : অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোনো কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

قَوْلُهُ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ : এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্র করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা এ কথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কুরআন পাকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى বলে এই আঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এই অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে–

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ . قَالُوْا اَقْرَرْنَا . قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ .

قَوْلُهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ : অর্থাৎ যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, এ কথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মু'মিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে "তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপ সঙ্গত হতে পারে?

জবাব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এই– مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রাসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যম হতে পারে।

قَوْلُهُ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : مِيْرَاثٌ অভিধানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيْرَاثٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে সে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশত কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বোতভাবে আল্লাহরই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহর নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহর পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন একদিন আমরা একটি ছাগল জবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বন্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্য রাখলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বণ্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে। আমি আরজ করলাম শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন, গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্য থেকে যাবে। যে হাতটি নিজে খাওয়ার জন্য রেখেছ, পরকালে এর কোনো প্রতিদান পাবে না। কেননা এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেওয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোনো সময় ব্যয় করলে পাওয়া যাবে; কিন্তু ঈমান আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশত ছওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে–

لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ .

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

১. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে।

২. যারা মক্কা বিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণির লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় এক শ্রেণি অপর শ্রেণি থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণি অপেক্ষা বেশি।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্য : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা– ১. যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২. যারা মক্কা বিজয়ের পর এ কাজে শরিক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশি।

মক্কা বিজয়কে উভয় শ্রেণির মর্যাদা নিরূপণের মাপকাঠি করার এক বড় রহস্য তো এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের টিকে থাকো ও বিলীন হয়ে যাওয়া, ইসলামের প্রসার লাভ ও বিলোপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে একই রূপ ছিল। যারা হুশিয়ার ও চালাক, তারা এমন কোনো দলে অথবা আন্দোলনে যোগদান করে না, যার পরাজিত হওয়ার অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সামনে থাকে। তারা পরিণামের অপেক্ষায় থাকে। যখন সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে তখনই তারা তড়িঘড়ি করে তাতে যোগদান করে। কিছুসংখ্যক লোক আন্দোলনকে সত্য ও ন্যায়ানুগ বিশ্বাস করলেও বিপক্ষ দলের নির্যাতনের ভয়ে ও নিজেদের দুর্বলতার কারণে তাতে যোগদান করতে সাহসী হয় না। অপরপক্ষে যারা অসম সাহসী ও দৃঢ়চেতা, তারা কোনো মতবাদ ও বিশ্বাসকে সত্য এবং বিশুদ্ধ মনে করলে জয় ও পরাজয় এবং দলের সংখ্যাস্বল্পতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না; বরং তারা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা মুসলমান হয়েছিল, তাদের সামনে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা, শক্তিহীনতা ও মুশরিকদের নির্যাতনের এক জাজ্বল্যমান ইতিহাস ছিল। বিশেষত ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করা জীবনের ঝুঁকি নেওয়া এবং বাস্তুভিটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর ছিল। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাহায্য এবং ইসলামের সেবায় জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছে তাদের ঈমানী শক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা চলে কি?

আস্তে আস্তে পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে সমগ্র আরবের উপর ইসলামি পতাকা উড্ডীন হয়। তখন পবিত্র কুরআনের ভাষায় দলে দলে লোকজন এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে– يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ; কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং তাদেরকে কল্যাণ তথা ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে একথা বলে দিয়েছে যে, তাদের মর্যাদা পূর্ববর্তীদের সমান হতে পারে না। কারণ তারা অসম সাহসিকতা ও ঈমানী শক্তির বিরোধিতা ও নির্যাতন আশঙ্কার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছে এবং বিপদ মুহূর্তে ইসলামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারকথা এই যে, সাহসিকতা ও ঈমানি শক্তি পরিমাপ করার জন্য মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির ব্যবধান একটি মাপকাঠির মর্যাদা রাখে। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই উভয় শ্রেণি সমান হতে পারে না।

সকল সাহাবীর জন্য মাগফিরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য : উল্লিখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে– وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ পরস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ অর্থাৎ জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে কেরামের সেই শ্রেণিদ্বয়ের জন্য, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কুরআনি ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

ইবনে হাযম (র.) বলেন, এর সাথে সূরা আম্বিয়ার অপর একটি আয়াতকে মিলাও, যাতে বলা হয়েছে–

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى أُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ . لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ .

অর্থাৎ যাদের জন্য আমি পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিয়েছি, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। জাহান্নামের কষ্টদায়ক আওয়াজও তাদের কানে পৌঁছবে না। সেখানে তাদের মন যা চাইবে, তারা চিরকাল তা ভোগ করবে।

আলোচ্য আয়াতে كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলা হয়েছে এবং সূরা আম্বিয়ার এই আয়াতে যাদের জন্য কল্যাণের ওয়াদা করা হয়েছে, তাদের জাহান্নাম থেকে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, কুরআন পাক এই নিশ্চয়তা দেয় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ যদি সারা জীবনে কোনো গুনাহ করেও ফেলেন, তবে তিনি তার উপর কায়েম থাকবেন না, তওবা করে নেবেন। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ, সাহায্য, ধর্মের মহান সেবামূলক কার্যক্রম এবং তাঁর অসংখ্য পুণ্যের খাতিরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন। গুনাহ মাফ হয়ে পূত-পবিত্র হওয়া অথবা পার্থিব বিপদাপদ ও সর্বোচ্চ কোনো কষ্টের মাধ্যমে গুনাহের কাফফারা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু ঘটবে না।

কতক হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর মৃত্যুর পর আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই আজাব পরকাল ও জাহান্নামের আজাব নয়; বরং বরযখ তথা কবর জগতের আজাব। এটা অসম্ভব নয় যে, কোনো সাহাবী কোনো গুনাহ করে ঘটনাচক্রে তওবা ব্যতীতই মৃত্যুবরণ করলে তাকে কবর-জগতের আজাব দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হবে, যাতে পরকালের আজাব ভোগ করতে না হয়।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়; ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় : সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তারা রাসূল ﷺ -এর উম্মতের মাঝখানে আল্লাহর তৈরি সেতু, তাদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা পৌঁছার কোনো পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাসগ্রন্থের সত্য-মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয়; বরং কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোনো পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোনো কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গুনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না; বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা দ্বারা তাঁরা একটি ছওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোনো গুনাহ হয়েই যায়, তবে প্রথমত তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবিলায় শূন্যের কোটায় থাকে। দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন অসাধারণ আল্লাহভীরু। সামান্য গুনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গুনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গুনাহের কাফফারা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফিরাতই নয়, رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি অনুযায়ী তা অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

আজকাল ইতিহাসের সত্য-মিথ্যা ও গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য বর্ণনার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোক সাহাবায়ে কেরামকে দোষারোপের শিকারে পরিণত করছে। প্রথমত যেসব বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁরা এসব লিখেছেন, সেগুলোর ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্বল। যদিও কোনো পর্যায়ে তাদের সেসব ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মেনেও নেওয়া যায়, তবে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার মোকাবিলায় তার কোনো মর্যাদা নেই। কেননা কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম সবাই ক্ষমাযোগ্য।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সমগ্র উম্মতের সর্বসম্মত বিশ্বাস : সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, অন্তরে ভালোবাসা পোষণ করার এবং তাঁদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা ওয়াজিব। তাদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে নীরব থাকা এবং যে কোনো এক পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত না করা জরুরি। আকাঈদের সকল কিতাবে এই সর্বসম্মত বিশ্বাসের বর্ণনা আছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ بِاِنْفَاقِ مَالِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا بِاَنْ يُّنْفِقَهُ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَيُضٰعِفَهُ لَهٗ وَفِيْ قِرَاءَةٍ فَيُضَعِّفَهُ بِالتَّشْدِيْدِ مِنْ عَشْرٍ اِلٰى اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ مِائَةٍ كَمَا ذُكِرَ فِي الْبَقَرَةِ وَلَهٗ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ اَجْرٌ كَرِيْمٌ مُقْتَرِنٌ بِهٖ رِضًى وَاِقْبَالٌ .

১১. কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দিবে? স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে উত্তম ঋণ এভাবে যে, একমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যয় করবে। তাহলে তিনি বহুগুণে একে বৃদ্ধি করে দিবেন তার জন্য। অন্য কেরাতে فَيُضَعِّفَهُ শব্দটির عَيْن বর্ণে তাশদীদসহ রয়েছে দশ হতে সাত শতের অধিক। যেমনটি সূরা বাকারায় বর্ণিত রয়েছে। এই বৃদ্ধির সাথে এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। অর্থাৎ এই প্রতিদানের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং কবুলিয়ত বা গ্রহণযোগ্যতা।

١٢. اُذْكُرْ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اَمَامَهُمْ وَ يَكُوْنُ بِاَيْمَانِهِمْ وَيُقَالُ لَهُمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ اَيْ دُخُوْلُهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

১২. সেদিনের কথা স্মরণ করুন যেদিন আপনি দেখবেন মুমিন নর-নারীদেরকে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে তাদের সম্মুখভাগে সামনে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হবে। তাদেরকে বলা হবে– আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের অর্থাৎ তাতে প্রবেশের যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।

١٣. يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا اَبْصِرُوْنَا وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الظَّاءِ اَيْ اَمْهِلُوْنَا نَقْتَبِسْ نَاْخُذِ الْقَبَسَ وَالْاِضَاءَةَ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ لَهُمْ اِسْتِهْزَاءً بِهِمْ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَرَجَعُوْا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِسُوْرٍ قِيْلَ هُوَ سُوْرُ الْاَعْرَافِ لَهٗ بَابٌ ط بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَظَاهِرُهٗ مِنْ جِهَةِ الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ط

১৩. যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম আমাদের দিকে দেখ। অপর এক কেরাতে اَنْظِرُوْنَا -এর হামযাতে যবর এবং ظَاءٌ বর্ণে যের দিয়ে পঠিত রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা কর/আমাদেরকে অবকাশ দাও। যাতে আমরা গ্রহণ করতে স্ফুলিঙ্গ ও আলো গ্রহণ করতে পারি। তোমাদের জ্যোতির কিছু। বলা হবে– তাদেরকে উপহাসের স্বরে তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। তখন তারা ফিরে যাবে অতঃপর তাদের মাঝে স্থাপিত হবে তাদের এবং মুমিনদের মাঝে একটি প্রাচীর; বলা হয়েছে যে, সেটা হলো আ'রাফের প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত মুমিনগণের দিকে এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের দিকে থাকবে শাস্তি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٤. يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط عَلَى الطَّاعَةِ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِالنِّفَاقِ وَتَرَبَّصْتُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ الدَّوَائِرَ وَارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِيْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ الْاَطْمَاعُ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ الْمَوْتُ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ الشَّيْطَانُ.

১৪. মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না আনুগত্যের ক্ষেত্রে তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ নেফাক তথা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে মুমিনগণের উপর বিপদাপদের। সন্দেহ পোষণ করেছিলে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অবশেষে আল্লাহর হুকুম আসল অর্থাৎ মৃত্যু আর মহা প্রতারক শয়তান তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।

١٥. فَالْيَوْمَ لَا تُؤْخَذُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مَاْوٰكُمُ النَّارُ ط هِيَ مَوْلٰكُمْ ط اَوْلٰى بِكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِيَ.

১৫. আজ তোমাদের নিকট হতে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না يُؤْخَذُ শব্দটি يَاءْ এবং تَا যোগে অর্থাৎ يُؤْخَذُ এবং تُؤْخَذُ উভয়রূপেই পঠিত। এবং যারা কুফরি করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য তোমাদের জন্য উত্তম কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

١٦. اَلَمْ يَاْنِ يَحِنْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا نَزَلَتْ فِيْ شَاْنِ الصَّحَابَةِ لَمَّا اَكْثَرُوا الْمِزَاحَ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنَ الْحَقِّ الْقُرْاٰنِ وَلَا يَكُوْنُوْا مَعْطُوْفٌ عَلٰى تَخْشَعَ كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ الزَّمَنُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اَنْبِيَائِهِمْ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط لَمْ تَلِنْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

১৬. যারা ঈমান এনেছে, তাদের সময় কি আসেনি? এই আয়াত সাহাবায়ে কেরামের শানে অবতীর্ণ হয়েছে যখন তারা হাসি তামাশায় মেতে উঠলেন হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? وَمَا نَزَلَ শব্দটি زَاءْ তাশদীদবিহীন ও তাশদীদসহ উভয় রূপেই পঠিত রয়েছে এবং তারা যেন না হয় এটা تَخْشَعَ -এর উপর আতফ হয়েছে। পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো। তারা হলো ইহুদি ও খ্রিস্টান বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাদের ও তাদের নবীগণের মাঝে যাদের অন্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল আল্লাহর স্মরণের জন্য নরম থাকল না। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

١٧. اِعْلَمُوْا خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط بِالنَّبَاتِ فَكَذٰلِكَ يَفْعَلُ بِقُلُوْبِكُمْ بِرَدِّهَا اِلَى الْخُشُوْعِ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ الدَّالَّةَ عَلٰى قُدْرَتِنَا بِهٰذَا وَغَيْرِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

১৭. তোমরা জেনে রাখ! উল্লিখিত মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে আল্লাহ ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তরুলতার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে তোমাদের অন্তকরণের সাথেও এরূপই করবেন তাকে خُشُوْعٌ -এর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে। আমি নিদর্শনগুলো বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যা প্রত্যেক পদ্ধতিতে আমার কুদরত ও ক্ষমতাকে বুঝায়। যাতে তোমরা বুঝতে পার।

Free @ www.eilm.weebly.com

১৮. إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ مِنَ التَّصَدُّقِ أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الصَّادِ أَيِ الَّذِيْنَ تَصَدَّقُوْا وَالْمُصَّدِّقٰتِ اللَّاتِيْ تَصَدَّقْنَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِتَخْفِيْفِ الصَّادِ فِيْهِمَا مِنَ التَّصْدِيْقِ الْإِيْمَانِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا رَاجِعٌ إِلَى الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ بِالتَّغْلِيْبِ وَعَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الْاِسْمِ فِيْ صِلَةِ اَلْ لِأَنَّهُ فِيْهَا حَلَّ مَحَلَّ الْفِعْلِ وَذِكْرُ الْقَرْضِ بِوَصْفِهِ بَعْدَ التَّصَدُّقِ تَقْيِيْدٌ لَهُ يُضٰعَفُ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُضَعَّفُ بِالتَّشْدِيْدِ أَيْ قَرْضُهُمْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ.

১৮. দানশীল পুরুষগণ এটা تَصَدُّقٌ হতে নির্গত تَاءٌ -কে صَادٌ -এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা সদকা করছে দানশীল নারীগণ যারা সদকা করেছে। এক কেরাতে اَلْمُصَدِّقَاتُ শব্দের صَادٌ বর্ণে তাশদীদবিহীন রয়েছে যা تَصْدِيْقٌ হতে নির্গত এবং উদ্দেশ্য হলো ঈমান। এবং যারা উত্তম দান করে এটা تَغْلِيْبًا স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের দিকে ফিরেছে। এবং فِعْلٌ -এর আতফ এই اِسْمٌ -এর উপর যা اَلْ -এর সেলাহ্-এ এসেছে এজন্য জায়েজ যে, এখানে اِسْمٌ টা فِعْلٌ -এর অর্থে হয়েছে। আর দানের উল্লেখের পরে ঋণকে তার সিফাতের সাথে উল্লেখ করা تَصَدُّقٌ বা দানকে مُقَيَّدٌ করার জন্য। তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশি يُضٰعَفُ শব্দটি অন্য কেরাতে يُضَعَّفُ তথা عَيْنٌ বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত রয়েছে, অর্থাৎ তাদের ঋণকে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ الْمُبَالِغُوْنَ فِي التَّصْدِيْقِ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط عَلَى الْمُكَذِّبِيْنَ مِنَ الْأُمَمِ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الدَّالَّةِ عَلٰى وَحْدَانِيَّتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ النَّارِ.

১৯. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সিদ্দীক অর্থাৎ تَصْدِيْقٌ -এর ক্ষেত্রে মুবালাগাকারী ও শহীদ পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপন্নকারী জাতির উপর। তদের জন্য রয়েছে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরি করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে যা আমার একত্ববাদের উপর প্রমাণবহ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী অর্থাৎ অগ্নিবাসী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : এখানে কয়েকটি তারকীব হতে পারে। যথা-

১. مَنْ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হলো মুবতাদা ذَا হলো তার খবর। اَلَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ হলো তার بَدَلٌ বা সিফত।

২. مَنْ ذَا হলো মুবতাদা আর اَلَّذِيْ হলো তার খবর।

৩. ذَا হলো মুবতাদা আর اَلَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ মওসুল সেলাহ মিলে সিফত। আর مَنْ হলো খবর। এতে اِسْتِفْهَامٌ -এর অর্থ থাকার কারণে مُقَدَّمٌ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَيُضٰعِفُ : এখানে فَاءٌ -এর পরে اَنْ উহ্য থাকার মাধ্যমে جَوَابُ اِسْتِفْهَامٍ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। اِسْتِئْنَافٌ অথবা يُقْرِضُ -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ -ও হতে পারে।

قَوْلُهُ رِضًا وَاِقْبَالٌ : এখানে مَعْطُوْفٌ عَلَيْهِ এবং مَعْطُوْفٌ মিলে مُقْتَرِنٌ -এর ফায়েল হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ اُذْكُرْ : মুফাসসির (র.) اُذْكُرْ উহ্য মেনে ইঙ্গিত করেছেন যে, يَوْمَ টা উহ্য ফে'লের যরফ হয়েছে। অর্থাৎ সেই দিনকে স্মরণ কর। আবার এটাও হতে পারে যে, اَجْرٌ كَرِيْمٌ -এর ظَرْف হবে। তৃতীয় আরেকটি সুরত এটাও হতে পারে যে, এটা يَسْعٰى -এর ظَرْف হবে অর্থাৎ তুমি দেখতে পাবে যে, সেদিন মুমিন নর-নারীর জ্যোতি তাদের সম্মুখে দৌড়াতে থাকবে.

قَوْلُهُ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ : এটা جُمْلَه حَالِيَه হয়েছে। তবে এই সুরতে يَسْعٰى -কে يَوْم -এর عَامِل বলা যাবে না।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنُ : يَكُوْنُ -কে উহ্য মেনে এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে যে, وَبِاَيْمَانِهِمْ টা يَسْعٰى -এর অধীনে হয়েছে। অর্থ হবে যে, জ্যোতি তাদের ডান দিকে তাদের থেকে দূরে থাকবে। কেননা اِيْمَانٌ দ্বারা সকল দিকই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ دُخُوْلُهَا : এটাকে উহ্য মেনে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, جَنّٰتٌ উহ্য মুযাফের সাথে হয়েছে بُشْرٰكُمْ মুবতাদার খবর উহ্য ইবারত এরূপ হবে যে- بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ

قَوْلُهُ ذٰلِكَ : অর্থাৎ- دُخُوْلُ الْجَنَّةِ

قَوْلُهُ يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ : এটা يَوْمَ تَرٰى থেকে بَدَلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ : এখানে بَابٌ টা জুমলা হয়ে نُوْر -এর প্রথম সিফত। আর اَلرَّحْمَةُ بَاطِنُهُ فِيْهِ হলো দ্বিতীয় সিফত।

قَوْلُهُ الْغَرُوْرُ : غَرُوْرٌ শব্দটি غَيْن বর্ণে যবর হলে অর্থ হবে শয়তান, যেমনটি মুফাসসির (র.) বলেছেন, আর যদি غَيْن বর্ণে পেশ হয় তবে شُذُوْذًا ওজনে মাসদার। অর্থ হবে- اِغْتِرَاءٌ بِالْبَاطِلِ তথা বাতিলের মাধ্যমে ধোঁকা খাওয়া।

قَوْلُهُ مَاْوٰكُمُ النَّارُ : এখানে مَاْوٰكُمْ হলো خَبَرٌ مُقَدَّمٌ আর اَلنَّارُ হলো مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ আবার এর উল্টোও হতে পারে তা জায়েজ।

قَوْلُهُ هِيَ مَوْلٰكُمْ : مَوْلٰى টা মাসদারও হতে পারে অর্থাৎ ذَاتُ وَلَايَتِكُمْ তথা وَلَايَتِكُمْ অথবা مَكَانٌ অর্থে হবে অর্থাৎ مَكَانُ وَلَايَتِكُمْ অথবা اَوْلٰى অর্থেও হতে পারে যেমন هُوَ مَوْلَاهُ অর্থাৎ اَوْلٰى بِهٖ আর যদি مَوْلٰى শব্দটি وَلِيٌّ হতে নির্গত হয় তবে নিকটবর্তী অর্থে হবে। অর্থাৎ আগুন তোমাদের নিকটে। هِيَ مَوْلٰى অর্থ হবে- هِيَ نَاصِرُكُمْ অর্থাৎ সেই আগুন তোমাদের সাহায্যকারী। এটা বিদ্রূপাত্মক।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : জমহুরের নিকট يَأْنِ শব্দটি হামযা সাকিন ও نُوْن যেরযুক্ত। رَمٰى যা اِنّٰى -يَانِيْ -এর ওজনে মুযারে -এর وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ। يَاءٌ টা শুরুতে حَرْف جَازِمْ আসার কারণে পড়ে গেছে। -يَرْمِيْ

قَوْلُهُ رَاجِعٌ اِلَى الذُّكُوْرِ وَالْاِنَاثِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে, وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ صِلَةٌ -এর আতফ হয়েছে দুই ইসিম অর্থাৎ اَلْمُصَّدِّقِيْنَ এবং اَلْمُصَّدِّقَاتِ -এর উপর। শুধুমাত্র প্রথমটির উপর মানার সুরতে পরিপূর্ণ হয়ে আতফহীন হওয়া আবশ্যক হবে, যা বৈধ নয়।

প্রশ্ন : اَقْرَضُوا اللّٰهَ -এর আতফ اَلْمُصَّدِّقِيْنَ -এর উপর হয়েছে যা ইসিম, কাজেই ফে'লের আতফ ইসিমের উপর হওয়া আবশ্যক হচ্ছে যা বৈধ নয়।

উত্তর : যে اِسْم -এর উপর اَلَّذِيْ অর্থে ব্যবহৃত اَلِفْ . لَامْ আসে, সেই اِسْم টা ফে'লের হুকুমে হয়ে যায়। কাজেই এখানে عَطْف বৈধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَذِكْرُ الْقَرْضِ بِوَصْفِهِ : এই ইবারত বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

প্রশ্ন : اَلْمُصَّدِّقِيْنَ [صَاد বর্ণে তাশদীদসহ] সদকা দানকারী। এরপর বললেন- وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا -এর অর্থও সদকা করা। কাজেই اَلْمُصَّدِّقِيْنَ -কে উল্লেখের পরে وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا উল্লেখের কি প্রয়োজন ছিল, এটা তো تَكْرَارٌ হয়ে গেল।

উত্তর : জবাবের সার হলো এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সদকাকে উত্তম সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ সদকা ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে হতে হবে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য। কাজেই تَكْرَارٌ টা অহেতুক হয়নি।

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ : এখানে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হলো মুবতাদা اُولٰٓئِكَ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর هُمْ -কে তৃতীয় মুবতাদা বলাও বৈধ। আর اَلصِّدِّيْقُوْنَ হলো তার খবর, মুবতাদা ও খবর মিলে দ্বিতীয় মুবতাদার খবর হলো। এরপর দ্বিতীয় মুবতাদা তার খবরসহ মিলে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।

আবার هُمْ -কে ضَمِيْر فَصْل বলাও বৈধ। আর اُولٰٓئِكَ এবং তার খবর মিলে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে আল্লাহ পাককে ঋণ দেওয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجْرٌ كَرِيْمٌ .

অর্থাৎ কে আছে যে, আল্লাহ পাককে ঋণ দেবে উত্তম রূপে [খাঁটি অন্তরে], তাহলে তিনি বৃদ্ধি করবেন তার ছওয়াব, অধিকন্তু তার জন্যে রয়েছে বিরাট পুরস্কার।

আল্লাহর রাহে দান করার মাহাত্ম্য : আল্লাহ পাককে ঋণ দেওয়ার যে কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে ব্যয় করা। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো নিজের স্ত্রী-পুত্র ওপরিবারের জন্যে ব্যয় করা।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) লিখেছেন, এ পর্যায়ে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো জিহাদে আল্লাহর রাহে দান করা এবং জিহাদের পর নিজেরাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করা, এতদ্ব্যতীত এর বিনিময়ে আখিরাতে লাভ হবে বিরাট মর্যাদা।

ইমাম রাযী (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে সাহায্যে করার, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার এবং দারিদ্র্যপীড়িত মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

দ্বিতীয়ত আল্লাহর রাহে ব্যয় করাকে 'করজ' বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো আল্লাহ পাক এর বিনিময়ে জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটি যেন করজের ন্যায়ই একটি সৎকাজ।

তাফসীরকারগণের মতে, এর দ্বারা সেসব খাতে ব্যয় করা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাতে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য। আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, যেসব নফল আর্থিক ইবাদত রয়েছে, এর দ্বারা সেগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

যাহোক, আয়াতের মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর রাহে দান করা, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যয় করাই আল্লাহ পাককে করজ দেওয়া। যে এভাবে আল্লাহর রাহে দান করবে, আল্লাহ পাক তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করবেন এবং অধিকন্তু জান্নাতে সে বিরাট পুরস্কার লাভ করবে।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবূ দাহদাহ আনসারী (রা.) হুজুর ﷺ -এর দরবারে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের নিকট করজ চেয়েছেন? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন। তখন তিনি বললেন, দয়া করে আপনার হাতকে বাড়িয়ে দিন। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর মোবারক হাত বাড়িয়ে দিলেন। হযরত দাহদাহ (রা.) হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর দস্তে মোবারকে হাত রেখে বললেন, আমার অমুক বাগান, যাতে ছয়শত খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, আমি তা আমার প্রতিপালককে দিয়ে দিয়েছি। তাঁর পরিবারবর্গ ঐ বাগানেই ছিল। তিনি ঐ বাগানের দরজায় এসে স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বললেন, আমি এ বাগান আল্লাহ পাকের দরবারে দিয়ে দিয়েছি, অতএব তোমরা বের হয়ে চলে এসো! এরপর বললেন, সন্তানদেরকেও নিয়ে এসো! তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আপনি অনেক লাভজনক ব্যবসা করেছেন। তাঁর স্ত্রী শিশু সন্তানদেরকে নিয়ে জরুরি মালপত্রসহ বের হয়ে আসলেন। তখন হযরত রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, জান্নাতের বাগান এবং জান্নাতের ফলের গাছ, যার শাখা প্রশাখা হবে ইয়াকূত এবং মুক্তার, আল্লাহ পাক আবূ দাহদাহকে দান করেছেন। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী খ. ৭, পৃ. ১২৬]

তাফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহর রাহে দান করাকে 'করজ' শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করার মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, আল্লাহর রাহে দান করার বিনিময় অবশ্যই আদায় করা হবে, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর এর বদলে আল্লাহ পাক অনেক মূল্যবান পুরস্কার দান করবেন। মূল পুঁজি থেকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা তার চেয়েও বেশি দান করা হবে।

قَوْلُهُ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ : অর্থাৎ "সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করছে।"

'সেদিন' বলে কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেওয়ার ব্যাপারটি পুল সিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি নাতিদীর্ঘ। এতে আছে যে, হযরত আবূ উমামা (রা.) একদিন দামেশকে এক জানাযায় শরিক হোন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেওয়া হলো–

Free@ www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মঞ্জিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মঞ্জিলে আল্লাহ তা'আলার নিদের্শে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেওয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেওয়া হবে। অপর এক মঞ্জিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেওয়া হবে। ফলে কারো নূর পর্বতসম, কারো খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারো মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে তাও আবার কখনো জ্বলে উঠবে এবং কখনো নিভে যাবে। -[ইবনে কাসীর]

অতঃপর হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, মুনাফিক ও কাফেদেরকে নূর দেওয়া হবে না। কুরআন পাক এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করেছে-

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ـ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

তিনি আরো বলেন, মুমিনদেরকে যে নূর দেওয়া হবে, তা দুনিয়ার নূরের মতো হবে না। দুনিয়ার নূর দ্বারা তো আশেপাশের লোকেরাও আলো লাভ করতে পারে। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চোখের জ্যোতি দ্বারা দেখতে পারে না, তেমনি মুমিনের নূর দ্বারা কোনো কাফের ব্যক্তি উপকৃত হতে পারবে না। -[ইবনে কাসীর]

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.)-এর এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, যে মঞ্জিলে গভীর অন্ধকারের পর নূর বণ্টন করা হবে, সেই মঞ্জিল থেকেই কাফের মুনাফিকরা নূর থেকে বঞ্চিত হবে, তারা কোনো প্রকার নূর পাবেই না।

কিন্তু তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পুলসিরাতের নিকটে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিনকে নূর দান করবেন এবং প্রত্যেক মুনাফিককেও। কিন্তু পুলসিরাতে পৌঁছা মাত্রই মুনাফিকদের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে। -[ইবনে কাসীর]

এ থেকে জানা গেল যে, মুনাফিকদেরকে প্রথমে নূর দেওয়া হবে। কিন্তু পুল সিরাতে পৌঁছার পর তা বিলীন হয়ে যাবে। বাস্তবে যা-ই হোক, মুনাফিকরা তখন মুমিনগণকে অনুরোধ করবে একটু এসো, আমরাও তেমাদের নূর দ্বারা একটু উপকৃত হই। কারণ দুনিয়াতেও নামাজ, জাকাত, হজ, জিহাদ ইত্যাদি কাজে আমরা তোমাদের অংশীদার ছিলাম। তাদের এই অনুরোধের নেতিবাচক জবাব দেওয়া হবে, যা পরে বর্ণিত হবে। প্রথমে মুনাফিকদেরকেও মুসলমানদের ন্যায় নূর দেওয়া এবং পরে তা ছিনিয়ে নেওয়াই তাদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ তারা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টাই লেগে থাকত। কাজেই কিয়ামতে তাদের সাথে তদ্রূপ ব্যবহারই করা হবে। তাদের সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে- يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তাদেরকে ধোঁকা দেন। ইমাম বগভী (র.) বলেন, এই ধোঁকার অর্থ তাই যে, প্রথমে তাদেরকে নূর দেওয়া হবে, এরপর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এ সময়ে মুমিনগণও তাদের নূর বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবে। তাই তারা শেষ পর্যন্ত নূর বহাল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। নিম্নোক্ত আয়াতে এর উল্লেখ আছে-

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا ـ

মুসলিম, আহমদ ও দারা কুতনীতে বর্ণিত হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসেও বলা হয়েছে, প্রথমে মুমিন ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়কে নূর দেওয়া হবে, এরপর পুলসিরাতে পৌঁছে মুনাফিকদের নূর বিলীন হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যেসব মুনাফিক ছিল, তারাই আসল মুনাফিক। তারা প্রথম থেকেই কাফেরদের ন্যায় নূর পাবে না; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরও এই উম্মতে মুনাফিক হবে। তবে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তাদেরকে 'মুনাফিক' নাম দেওয়া যাবে না। অকাট্য ওহী ব্যতীত কাউকে মুনাফিক বলার অধিকার উম্মতের কারো নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন কার অন্তরে ঈমান আছে এবং কার অন্তরে নেই; অতএব আল্লাহর জ্ঞানে যারা মুনাফিক হবে, তাদেরকে প্রথমে নূর দিয়ে পরে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

এই উম্মতে এ ধরনের মুনাফিক তারা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআন ও হাদীসের অর্থ বিকৃত করে। [নাউযুবিল্লাহ মিনহু]

হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার কি কি কারণে হবে : তাফসীরে মাযহারীতে এ স্থলে হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকরের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো-

১. আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে এবং ইবনে মাজাহ বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা অন্ধকার রাত্রে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। এই বিষয়বস্তুরই রেওয়ায়েত হযরত সাহল ইবনে সা'আদ, যায়েদ ইবনে হারেসা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবূ উমামা, আবুদ্দারদা, আবূ সাঈদ, আবূ মূসা, আবূ হুরায়রা, আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।

২. মুসনাদে আহমদ ও তাবারানী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَ بُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورًا وَ لَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাজ যথাসময়ে ও যথানিয়মে আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই নামাজ তার জন্য নূর, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি যথাসময়ে ও যথানিয়মে নামাজ আদায় করে না, তার জন্য নূর প্রমাণ ও মুক্তির কারণ কিছুই হবে না। সে কারূন, হামান ও ফেরাউনের সাথে থাকবে।

৩. তাবারানী বর্ণিত হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য মক্কা মোকাররামা পর্যন্ত বিস্তৃত নূর হবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হবে।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন সেই আয়াত তার জন্য নূর হবে। –[মুসনাদে আহমদ]

৫. দায়লামী সংকলিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার প্রতি দরূদ পাঠ পুলসিরাতে নূরের কারণ হবে।

৬. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার হজের বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, হজ ও ওমরার ইহরাম খোলার জন্য যে মাথা মুণ্ডন করা হয়, তাতে মাটিতে পতিত কেশ কিয়ামতরে দিন নূর হবে। –[তাবারানী]

৭. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মিনায় কংকর নিক্ষেপ কিয়ামতের দিন নূর হবে। –[মুসনাদে বাযযার]

৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, মুসলমান অবস্থায় যার মাথার চুল সাদা হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সেই চুল তার জন্য নূর হবে। –[তিরমিযী]

قَوْلُهُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُوْنَ......... انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ : অর্থাৎ যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা মুমিনদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের নূর দ্বারা উপকৃত হই। তাদেরকে বলা হবে, ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا যেখানে নূর বণ্টন হয়েছিল, সেখানে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর। এ কথা মুমিনগণ বলবে অথবা ফেরেশতাগণ জওয়াব দেবে।

قَوْلُهُ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ : অর্থাৎ মুমিন অথবা ফেরেশতাগণের জওয়াব শুনে মুনাফিকবরা সে স্থানে ফিরে গিয়ে কিছুই পাবে না। আবার এদিকে আসবে, কিন্তু তখন তারা মুমিনগণের কাছে পৌছতে পারবে না। তাদের ও মুমিনগণের মাঝখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে। এর অভ্যন্তরভাবে মুমিনদের জায়গায় থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে মুনাফিকদের জায়গায় থাকবে আজাব।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ الْحَقِّ : অর্থাৎ মুমিনদের জন্য কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির এবং যে সত্য নাজিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

قَوْلُهُ خُشُوْعِ قَلْبٍ : এর অর্থ– অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। –[ইবনে কাসীর] কুরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ হলো– এর বিধান তথা আদেশ-নিষেধ পুরোপুরি পালন করার জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোনো অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। –[রূহুল মা'আনী]

এটা মুমিনদের জন্য হুঁশিয়ারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মুমিনের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাজিল করবে। –[ইবনে কাসীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম আ'মাশ বলেন, মদীনায় পৌছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোনো কোনো সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উপরিউক্ত রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে, এই হুঁশিয়ারি সংকেত কুরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাজিল হয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়। মোটকথা, এই হুঁশিয়ারির সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্য তাৎপর থাকার শিক্ষা দেওয়া এবং এখাত ব্যক্ত করা যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎ কর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওসের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা.উঠিয়ে নেওয় হবে। -[ইবনে কাসীর]

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? ইরশাদ হচ্ছে- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاۤءُ : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদা ও আমর ইবনে মায়মূন (রা.) বলেন, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দীক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আজেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- আমার উম্মতের সব কিছুতেই কিছু সংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন كُلُّكُمْ صِدِّيْقٌ وَشَهِيْدٌ অর্থাৎ আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আবূ হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জবাবে বললেনঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করুন- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاۤءُ

কিন্তু কুরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণিকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই-

اُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ .

এই আয়াতে পয়গাম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণি বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে যথা- সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ। বাহ্যত এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি। নতুবা প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণির লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণ-গরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোনো না কোনো দিক দেয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রূহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামিল ও ইবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অনবধান ও খেয়াল খুশিতে মগ্ন, তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَللَّعَّانُوْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَاۤءَ অর্থাৎ যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রা.) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কাউকে অপরের ইজ্জতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আরজ করল, আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইজ্জতের উপর হামলা চালাবে- এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের উম্মতের মোকাবিলায় সাক্ষ্য দেবে। -[রূহুল মা'আনী]

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোনো মুমিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম সকলেই পয়গাম্বরসুলভ গুণ-গরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছে, সেই পয়গাম্বরসুলভ গুণ-গরিমায় নিমজ্জিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ تَزَيُّنٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ط اَىِ الْاِشْتِغَالُ فِيْهَا وَاَمَّا الطَّاعَاتُ وَمَا يُعِيْنُ عَلَيْهَا فَمِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ كَمَثَلِ اَىْ هِىَ فِىْ اِعْجَابِهَا لَكُمْ وَاضْمِحْلَالِهَا كَمَثَلِ غَيْثٍ مَطَرٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ الزُّرَّاعَ نَبَاتُهُ النَّاشِئُ عَنْهُ ثُمَّ يَهِيْجُ يَيْبَسُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط فُتَاتًا يَضْمَحِلُّ بِالرِّيَاحِ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لِمَنْ اٰثَرَ عَلَيْهَا الدُّنْيَا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط لِمَنْ لَمْ يُؤْثِرْ عَلَيْهَا الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَا التَّمَتُّعُ فِيْهَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ .

অনুবাদ :

২০. তোমরা জেনে রেখো! পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহমিকা, ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। অর্থাৎ তাতে ব্যাপৃত হয়ে যাওয়া, কিন্তু আনুগত্য এবং যে জিনিস তার সাহায্যকারী হয় [যেমন তওবা] তা পরকালীন কর্মের অন্তর্গত। তার উপমা অর্থাৎ ঐ সকল জিনিসের উপমা তোমার জন্য আশ্চর্যজনক হওয়ার মধ্যে এবং বিলুপ্ত হওয়ার মধ্যে বৃষ্টি যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে তা থেকে উৎপন্ন তরুলতা অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয়। অতঃপর বাতাসের মাধ্যমে নিস্তানাবুদ হয়ে যায়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি সে ব্যক্তির জন্য যে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে। এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। সে ব্যক্তির জন্য যে আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়নি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।

٢١. سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَوْ وُصِلَتْ اِحْدٰىهُمَا بِالْاُخْرٰى وَالْعَرْضُ السَّعَةُ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মতো। যদি একটিকে অপরটির সাথে মিলানো হয়, আর عَرْض দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রশস্ততা। যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

٢٢. مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ بِالْجَدْبِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ كَالْمَرَضِ وَفَقْدِ الْوَلَدِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ يَعْنِى اللَّوْحَ الْمَحْفُوْظَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا نَخْلُقَهَا وَيُقَالُ فِى النِّعْمَةِ كَذٰلِكَ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ لا

২২. যে বিপর্যয় আসে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যেমন- রোগ-বালাই এবং সন্তানের তিরোধানে তা লিপিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ লওহে মাহফূযে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই এবং নিয়ামতের ক্ষেত্রেও এরূপই বলা হবে। যেমনটি মসিবতের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٣. لِكَيْلَا كَيْ نَاصِبَةٌ لِلْفِعْلِ بِمَعْنٰى اَنْ اَيْ
اَخْبَرَ بِذٰلِكَ تَعَالٰى لِئَلَّا تَاْسَوْا تَحْزَنُوْا
عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا فَرَحَ بَطَرٍ بَلْ
فَرَحَ شُكْرٍ عَلَى النِّعْمَةِ بِمَآ اٰتٰىكُمْ ط
بِالْمَدِّ اَعْطَاكُمْ وَبِالْقَصْرِ جَاءَكُمْ مِنْهُ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ مُتَكَبِّرٍ بِمَا
اُوْتِيَ فَخُوْرٍ لا بِهٖ عَلَى النَّاسِ .

২৩. এটা এজন্য যে, لِكَيْلَا -এর মধ্যে كَيْ টা হলো ফে'লের নসব দানকারী اَنْ -এর অর্থে, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার সংবাদ দিয়েছেন তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন বিমর্ষ না হও এবং হর্ষোৎফুল্ল না হও সে নিয়ামতের উপর যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, গর্ব-অহঙ্কারের ভিত্তিতে যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য اٰتَاكُمْ শব্দটির হামযাটি মদ সহকারে হলে অর্থ হবে- اَعْطَاكُمْ এবং মদবিহীন হলে অর্থ হবে- جَاءَكُمْ مِنْهُ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না উদ্ধত তিনি যা দিয়েছেন তার বিনিময়ে অহংকারীকে তার নিয়ামতের কারণে মানুষের উপর।

٢٤. الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ
وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ط بِهٖ لَهُمْ وَعِيْدٌ
شَدِيْدٌ وَمَنْ يَتَوَلَّ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فَاِنَّ
اللّٰهَ هُوَ ضَمِيْرُ فَصْلٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِسُقُوْطِهٖ
الْغَنِيُّ عَنْ غَيْرِهٖ الْحَمِيْدُ لِاَوْلِيَائِهٖ .

২৪. যারা কার্পণ্য করে নিজেদের উপর আবশ্যকীয় বিষয়ে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় তাদের জন্য কঠোর ধমকি রয়েছে। যে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের উপর আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ হতে সে জেনে রাখুক আল্লাহ তো هُوَ হলো ضَمِيْر فَصْل আবার এক কেরাতে هُوَ উল্লেখ নেই। অভাবমুক্ত অন্যের থেকে প্রশংসার্হ। তার বন্ধুদের জন্য।

٢٥. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا الْمَلٰئِكَةَ اِلَى الْاَنْبِيَاءِ
بِالْبَيِّنٰتِ بِالْحُجَجِ الْقَوَاطِعِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتٰبَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ وَالْمِيْزَانَ الْعَدْلَ
لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ
اَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْمَعَادِنِ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ يُقَاتَلُ
بِهٖ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ
مَعْطُوْفٌ عَلٰى لِيَقُوْمَ النَّاسُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ بِاَنْ
يَّنْصُرَ دِيْنَهٗ بِاٰلَاتِ الْحَرْبِ مِنَ الْحَدِيْدِ وَغَيْرِهٖ
وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط حَالٌ مِنْ هَاءِ يَنْصُرُهٗ اَيْ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَائِبًا عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا .
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَنْصُرُوْنَهٗ وَلَا يُبْصِرُوْنَهٗ اِنَّ
اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ . لَا حَاجَةَ لَهٗ اِلَى النُّصْرَةِ
لٰكِنَّهَا تَنْفَعُ مَنْ يَاْتِيْ بِهَا .

২৫. নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি ফেরেশতাগণকে নবীগণের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ অকাট্য দলিলাদি সহকারে এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি দিয়েছি লৌহ আমি তা বের করেছি খনি হতে যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এর মাধ্যমে যুদ্ধ করা হয় ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে। لِيَعْلَمَ -এর আতফ لِيَقُوْمَ النَّاسُ -এর উপর হয়েছে; কে সাহায্য করে অর্থাৎ কে তাঁর দীনকে লৌহ নির্মিত অস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যক্ষ না করেও بِالْغَيْبِ এটা يَنْصُرُهٗ -এর ة থেকে حَال হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে তাদের থেকে অদৃশ্য থেকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারা তাঁর সাহায্য করে অথচ তাকে দেখে না। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তবে যে সাহায্য করবে, তারই উপকার হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَىِ الْاِشْتِغَالُ فِيْهَا : এতে এ কথার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধন-সম্পদও সন্তান-সন্ততি মূলত খারাপ জিনিস নয়, তবে এতে ডুবে যাওয়া ও গভীরভাবে মনোনিবেশ করা অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ اَىْ هِىَ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, فِىْ اِعْجَابِهَا টা هِىَ উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ الزُّرَّاعُ : এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, كُفَّارٌ শব্দটি كَافِرٌ অর্থ– কৃষক -এর বহুবচন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন– اَلْكُفَّارُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلزُّرَّاعُ বা কৃষক। আজহারী (র.) বলেন, আরবে কৃষককে كَافِرٌ বলা হয়। কেননা সে বীজকে মাটিতে ঢেকে দেয়। অর্থাৎ يَكْفُرُ অর্থ হলো يَسْتُرُ

قَوْلُهُ مَا التَّمَتُّعُ فِيْهَا : এটা বৃদ্ধিকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইঙ্গিত করা যে, مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا উহ্য মুযাফের সাথে মুবতাদা। যাতে করে مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -এর حَمْل টা حَيٰوةُ الدُّنْيَا -এর উপর হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْعِرْضُ السَّعَةُ : এটা একটি প্রশ্নের জবাবে এসেছে। প্রশ্ন হলো জান্নাতের عَرْض তথা প্রস্থের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু দৈর্ঘ্যের বিবরণ প্রদান করা হয়নি কেন?

উত্তর : উত্তরের সার হলো- এখানে عَرْض দ্বারা প্রস্থ উদ্দেশ্য নয়, যা লম্বার বিপরীত; বরং মুতলক প্রশস্ততা উদ্দেশ্য যাতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ فِى النِّعْمَةِ كَذَالِكَ : যেমনিভাবে জান ও মালের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ হতে বালা মসিবত আসে অনুরূপভাবে নিয়ামত ও শান্তিও তাঁর নির্দেশ ও নির্ধারণেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ مِنْهُ : অর্থাৎ– مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

قَوْلُهُ لَهُ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ : এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ اَلخ হলো মুবতাদা। আর তার খবর لَهُمْ وَعِيْدٌ شَدِيْدٌ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ : এখানে مَنْ হলো شَرْطِيَّةٌ ; এর জবাব উহ্য রয়েছে। আর তা হলো– فَالْوَبَالُ عَلَيْهِ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের জন্য পরকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আজাবে আক্রান্ত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিক ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই : প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজসজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

قَوْلُهُ لَعِبٌ وَلَهْوٌ : لَعِبٌ শব্দের অর্থ– এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। আর لَهْو হলো এমন খেলাধুলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময় ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোনো উপকার অর্জিত হয়ে যায়। যেমন বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজনবিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ -এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْو শুরু হয়, এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সম-সাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙ্গিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলাধূলাকে জীবনের সম্পদ ও সর্ববৃহৎ ধন মনে করে। কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায় যেমন বয়স্কদের ধনসম্পদ, কুঠি, বাংলো ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পরে তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থ হীন বস্তু। যৌবনে সাজসজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মঞ্জিল। এ মঞ্জিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁকজমক ও পদের জন্য গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর তথা বরযখ ও কিয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কুরআন পাক উল্লিখিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে– كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ; غَيْث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كُفَّارٌ শব্দটি মু'মিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোনে কোনো তাফসীরবিদ كُفَّارٌ শব্দটিকে প্রসিদ্ধ অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ-শ্যামল ফসল দেখে কেবল কাফেররাই আনন্দিত হয় না, বরং মুসলমানরাও হয়। জবাব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মুমিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ তা'আলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এ সুন্দর ফসল আল্লাহর কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে "কাফের আনন্দিত হয়" বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ-শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীত বর্ণ হয়, এর পরে সম্পূর্ণ খড়কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ : অর্থাৎ পরকালে মানুষ এ দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এখানে প্রথমে আজাব উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রথম আয়াতে উল্লিখিত দুনিয়া নিয়ে মাতাল ও উদ্ধত হওয়ার পরিণামও কঠোর আজাব । কঠোর আজাবের বিপরীতে দুটি বিষয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টি উল্লেখ করা হয়েছে। ইঙ্গিত আছে যে, পাপ মার্জনা করা একটি নিয়ামত, যার পরিণতিতে মানুষ আজাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পরকালে এতটুকুই হয় না; বরং আজাব থেকে বাঁচার পর মানুষ জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত দ্বারাও ভূষিত হয়। এটা রিদওয়ান তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে– وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ অর্থাৎ এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আজাব ও ছওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশি করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে–

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ .

Free@www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোনো ভরসা নেই। অতএব সৎ কাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোনো রোগ অথবা ওজর তোমার সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌঁছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎ কাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রা.) তাঁর উপদশাবলিতে বলেন, তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং তা হতে সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, জিহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্য অগ্রসর হও। হযরত আনাস (রা.) বলেন, জামাতের নামাজে প্রথম তাকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। –[রূহুল মা'আনী]

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আলে ইমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سَمٰوٰتٌ বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ বোঝানো হয়েছে; অর্থ এই অর্থ এই যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্র করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশি হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ, ঐ পৃথিবীর আকাশ এবং পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতেও বেশি। عَرْض শব্দটি কোনো সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতি বোঝা যায়।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নিয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্য যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত তো লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামতরাজির মূল্য হওয়া দূরের কথা। অতএব, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বুখারী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারব না; আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারব। –[মাযহারী]

قَوْلُهُ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ الخ : দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফিল করে দেয়। যথা– ১. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। ২. বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে–

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে, বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুযে জগৎসৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্য ঘাটতি, ধনসম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ لِكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ : আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তা'আলা লওহে মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভালোমন্দ অবস্থা নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফিল হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও ছওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও ছওয়াব হাসিল করতে হবে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ : পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধনসম্পদের কারণে উদ্ধত ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– والله لا يحب كل مختال فخور অর্থাৎ আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নিয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা করা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ .... بَأْسٌ شَدِيْدٌ :

ঐশী কিতাব ও পয়গাম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা : بَيِّنَاتٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য বিধানাবলিও হতে পারে এবং এর উদ্দেশ্য মুজেযা এবং রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে। –[ইবনে কাসীর] পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাজিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যত শেষোক্ত তাফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ بَيِّنَاتٌ বলে মুজেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলির জন্য কিতাব নাজিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মিজান' নাজিল করারও উল্লেখ আছে। মিজানের আসল অর্থ– পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্য নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও মিজান -এর অর্থে শামিল আছে। যেমন– আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদি পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মিজানের বেলায়ও নাজিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাজিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গাম্বরগণ পর্যন্ত পৌছা সুবিদিত। কিন্তু মিজান নাজির করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মিজান নাজিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলি নাজিল করা। কুরতুবী (র.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাজিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজির বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ– اَنْزَلْنَا الْكِتٰبَ وَوَضَعْنَا الْمِيْزَانَ অর্থাৎ আমি কিতাব নাজিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা রহমানের وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে مِيْزَانٌ শব্দের সাথে وَضَعَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাজিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যে ওজন করে দায়দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মিজানের পর লৌহ নাজিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাজিল করার মানে সৃষ্টি করা। কুরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাজিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাজিল হয় না; বরং পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাজিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহু পূর্বেই লওহে মাহফূযে লিখিত ছিল এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। –[রূহুল মা'আনী]

আয়াতে লৌহ নাজিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– ১. এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে আল্লাহর বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। ২. এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গাম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা পয়গাম্বরগণও আসমানি কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোনো প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া বলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিতাব ও মীজানকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছে। কিতাব থেকে দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীজান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনার অংশ নির্ধারিত হয়। এ বস্তুদ্বয় নাজিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। অন্যথায় এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত পক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্য নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্য বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

قَوْلُهُ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ : রূহুল মা'আনীতে আছে, এখানে وَاوْ অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ لِيَنْفَعَهُمْ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবেও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ জেনে নেন, কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্য জিহাদ করে? আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٦. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ يَعْنِى الْكُتُبَ الْاَرْبَعَةَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَالزَّبُوْرَ وَالْفُرْقَانَ فَاِنَّهَا فِيْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَاهِيْمَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ج وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ .

অনুবাদ :

২৬. আমি হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুয়ত ও কিতাব। অর্থাৎ চারটি কিতাব তথা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন, এই সবগুলোই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তানাদির মধ্যে এসেছে। কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

٢٧. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةً هِىَ رَفْضُ النِّسَاءِ وَاتِّخَاذُ الصَّوَامِعِ نِ ابْتَدَعُوْهَا مِنْ قِبَلِ اَنْفُسِهِمْ مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ مَا اَمَرْنَاهُمْ بِهَا اِلَّا لٰكِنْ فَعَلُوْهَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ مَرْضَاةِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ج اِذْ تَرَكَهَا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ وَكَفَرُوْا بِدِيْنِ عِيْسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَدَخَلُوْا فِىْ دِيْنِ مُلْكِهِمْ وَبَقِىَ عَلٰى دِيْنِ عِيْسٰى كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاٰمَنُوْا بِنَبِيِّنَا فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ .

২৭. অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তাঁর অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ। আর তা হলো নারীকে পরিত্যাগ করে গীর্জাকে আকড়ে ধরা এটা তো তারা নিজেরাই নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রত্যাবর্তন করেছিল। আমি তাদেরকে এই বিধান দেইনি। অর্থাৎ আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিনি, অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি যখন তাদের অধিকাংশই তা পরিত্যাগ করল, এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর আনীত ধর্মের অস্বীকারকারী হয়ে গেল এবং স্বীয় রাজন্যবর্গের ধর্মের অনুসারী হয়ে গেল। তাদের অনেকে হযরত ঈসা (আ.) ধর্মের উপর সুদৃঢ় রইলো। অতঃপর আমাদের নবী করীম ﷺ -এর উপর ঈমান আনয়ন করল। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।

٢٨. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِعِيْسٰى اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى عِيْسٰى يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ نَصِيْبَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ لِاِيْمَانِكُمْ بِالنَّبِيَّيْنِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ عَلَى الصِّرَاطِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

২৮. হে মুমিনগণ! হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন তাঁর অনুগ্রহে নবীগণের [দু'নবীর]। উপর বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে তিনি তোমাদেরকে দিনে আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে। পুলসিরাতের উপর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٩. لِئَلَّا يَعْلَمَ اَىْ اَعْلَمَكُمْ بِذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ التَّوْرٰىةِ الَّذِيْنَ لَمْ يُؤْمِنُوْا بِمُحَمَّدٍ ﷺ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا ضَمِيْرُ الشَّاْنِ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ خِلَافَ مَا فِىْ زَعْمِهِمْ اَنَّهُمْ اَحِبَّاءُ اللّٰهِ وَاَهْلُ رِضْوَانِهٖ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ يُعْطِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط فَاٰتَى الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللّٰهُ ذُوا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

২৯. এটা এ জন্য যে, যাতে জানতে পারে অর্থাৎ তোমাদেরকে এর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন কিতাবীগণ অর্থাৎ তাওরাতের অধিকারীগণ, যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। اَنْ টা হলো تَخْفِيْف থেকে تَقِيْلَة কৃত। এর اِسْم হলো ضَمِيْر شَانْ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোনো অধিকার নেই। তাদের ধারণার বিপরীত যে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং সন্তুষ্টভাজন, অনুগ্রহ আল্লাহরই এখতিয়ারে, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করে থাকেন কিতাবীদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করেছেন যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرَاهِيْمَ : এখানে وَاوْ -টি হলো عَاطِفَةٌ আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ হলো لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا আর لَامْ টি হলো جَوَابُ قَسَمْ -এর জন্য। আর قَسَمْ তথা اُقْسِمُ শব্দটি উহ্য রয়েছে। اِعْتِنَاءْ এবং تَعْظِيْم -এর বৃদ্ধির জন্য قَسَمْ -কে تَكْرَارْ আনা হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.) বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : উভয় নবী বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– সকল নবীগণ তাদেরই বংশধর। হযরত নূহ (আ.) হলেন আবুছ ছানী বা দ্বিতীয় পিতা। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) হলেন– আরব, রূম ও বনী ইসরাঈলের পিতা।

قَوْلُهُ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا : এটা অগ্রবর্তী দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে হয়েছে। আর اَلنُّبُوَّةَ হলো প্রথম মাফউল।

قَوْلُهُ الْكِتَابُ : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, اَلْكِتَابُ -এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টা جِنْس -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَرَهْبَانِيَّةً : অধিকাংশের মতে رَهْبَانِيَّةً শব্দটি اِشْتِغَالْ -এর নিয়ম অনুপাতে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– اِبْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّةَ اِبْتَدَعُوْهَا আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা رَاْفَةً -এর উপর আতফ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ বলা হয়েছে আর اِبْتَدَعُوْهَا হলো رَهْبَانِيَّةً -এর সিফত।

قَوْلُهُ لٰكِنْ فَعَلُوْهَا : اِلَّا -এর তাফসীর لٰكِنْ দ্বারা করে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটা مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعٌ হয়েছে এবং এটাকে مُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ -ও বলা হয়েছে। উহ্য ইবারত হলো– مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِشَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا لِاِبْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللّٰهِ এই সুরতে عُمُوْمُ اَحْوَالْ থেকে اِسْتِثْنَاءْ হবে। আর كَتَبَ অর্থ হলো قَضٰى

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ رَهْبَانِيَّةً : رَهْبَانِيَّةً -এর অর্থ হলো ইবাদত ও মুজাহাদার ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করা এবং জন-কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে একাকীত্ব গ্রহণ করা رَهْبَانِيَّةً শব্দটি رَاءٌ বর্ণে পেশ দিয়েও পঠিত রয়েছে, তখন এটা رُهْبَانٌ -এর দিকে নিসবত হবে যা رَاهِبٌ -এর বহুবচন। যেমন رُكْبَانٌ টা رَاكِبٌ -এর বহুবচন।

قَوْلُهُ اَىْ اَعْلَمُكُمْ بِذَالِكَ لِيَعْلَمَ : এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, لِئَلَّا -এর মধ্যে لَامْ টা অতিরিক্ত যা تَاكِيْد -এর জন্য হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : اَللّٰهُ হলো মুবতাদা, আর ذُوالْفَضْلِ হলো তার খবর। আর اَلْعَظِيْمِ হলো اَلْفَضْلِ -এর সিফত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গাম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মিজান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গাম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ.)-এর এবং পরে পয়গাম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গাম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ নূহ (আ.)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গাম্বর প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর। আর যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার সবই ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গাম্বরগণের পরম্পরকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا অর্থাৎ এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গাম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গাম্বর হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম উল্লেখ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর শরিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً অর্থাৎ যারা হযরত ঈসা (আ.) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رَأْفَةً ও رَحْمَتْ শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন- رَأْفَةً -এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কারো প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। যথা-

১. সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেওয়া। একে رَأْفَةً বলা হয়।
২. কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رَحْمَتْ বলা হয়। মোটকথা رَأْفَةً -এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رَحْمَتْ -এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رَأْفَةً -কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رَأْفَةً ও رَحْمَتْ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাতহ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ; কিন্তু এর আগে সাহাবায়ে কেরামের আরো একটি বিশেষ গুণ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ -ও বর্ণিত হয়েছে : অর্থাৎ তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোনো স্থানই সেখানে ছিল না।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا : সন্ন্যাসবাদের অর্থ ও জরুরি ব্যাখ্যা : رَهْبَانِيَّةٌ শব্দটি رُهْبَانٌ -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। رُهْبَان ও رَاهِبٌ -এর অর্থ- যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আ.)-এর পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণি ইঞ্জীলের বিধানাবলির প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছু সংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাদেরকে হত্যা করা হলো। যে কয়জন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবিলার শক্তি তাঁদের নেই; কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাদের ধর্মও বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্য জরুরি করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিয়ে করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোনো জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দেবেন, যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাই তাঁরা رَاهِبٌ অথবা رُهْبَانٌ তথা 'সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত হতো এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رَهْبَانِيَّتْ তথা 'সন্ন্যাসবাদ' নামে খ্যাতি লাভ করল।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারগ হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাজতের জন্য ছিল। তাই এটা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোনো বিষয়কে আল্লাহর জন্য নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেওয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণত মানত আসলে কারো উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোনো ব্যক্তি নিজে কোনো বস্তুকে মানত করে নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরিয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করলে গুনাহ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নজর-নিয়াজ আসতে থাকে। তাদের চারপাশে মানুষের ভীড় জমে উঠে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেওয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল; আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমতো পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলত নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর (র.) বর্ণিত এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আজাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়। সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মোকাবিলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মোকাবিলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবিলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে সাথে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরিয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরি করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরি করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কুরআন গোটা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্ন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরি করে নিয়েছিল, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا [তা যথাযথভাবে পালন করেনি]।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, اِبْتَدَعُوْا শব্দটি بِدْعَتْ থেকে উদ্ভূত হলেও এ স্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ'আত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে– كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা।

কুরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন– وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً .

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোনো কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رَهْبَانِيَّةً শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رَهْبَانِيَّةً শব্দের আগে اِبْتَدَعُوْا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী (র.) তাই বলেছেন। কিন্তু উপরিউক্ত তাফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কুরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনোরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্ন্যাসবাদ যথাযথভাবে পালন করেনি। এটাও اِبْتِدَاعٌ শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কুরআন স্বয়ং এর বিরূপ সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদ'আতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদ'আতের অপরাধে অপরাধী হতো, তবে তাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়; বরং পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হতো।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ : বিশুদ্ধ কথা এই যে, رَهْبَانِيَّةٌ শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। যথা–

১. কোনো অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি। কুরআন পাকের يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوْا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর বিধানালি পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

২ অনুমোদিত কাজ-কর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত হারাম সাব্যস্ত করে না; কিন্তু কোনো পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোনো রোগব্যাধির আশঙ্কা করে কোনো অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন যেমন– পরিণামে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণত মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে কিংবা কোনো কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোনো কোনো বৈধ কাজ বর্জন করে তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সুফী বুজুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ এটা দ্বারা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসবাদ নয়; বরং তাকওয়া যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই ছওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে- لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাজতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজে অপরাধী হয়েছে।

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ : এই আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কুরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বেলায় 'আহলে-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতেই এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রিস্টানদের জন্য اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্ভবত এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবি। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরিউক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও ছওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক ছওয়াব হযরত মূসা (আ.) অথবা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরিয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় ছওয়াব শেষনবী ﷺ -এর উপর ঈমান ও তাঁর শরিয়ত পালন করার। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোনো ইবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরিয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সৎকর্ম বহাল করে দেওয়া হয়। ফলে সে দুই ছওয়াবের অধিকারী হয়।

قَوْلُهُ لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ : এখানে لَا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত বিধানাবলি এজন্য বর্ণনা করা হলো, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ তা'আলার কৃপা লাভে সক্ষম হবে না; বরং যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহর কৃপা লাভে সমর্থ হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْجُزْءُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُوْنَ : অষ্টাবিংশতিতম [২৮তম] পারা

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ : সূরা আল-মুজাদালাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ কথা স্বীকৃত যে, تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ সে হিসেবে অত্র সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত تُجَادِلُكَ শব্দ হতে গ্রহণ করে এর নামকরণ করা হয়েছে মুজাদালাহ বা মুজাদিলাহ। مُجَادَلَةٌ-এর অর্থ হলো– বাদানুবাদকারী বা বিতর্ককারী নারী। কেননা, এ সূরার প্রথমেই এমন একজন মহিলার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে যে নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে নিজ স্বামীর যিহার [اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ তুমি আমার মায়ের পিঠের ন্যায়] সংক্রান্ত মামলা দায়ের করেছিল এবং বারবার এমন দাবি উত্থাপন করছিল যে, আপনি এমন কোনো উপায় ও ব্যবস্থা করে দিন যার ফলে তার ও তার সন্তানদের জীবন নিশ্চিত ধ্বংস হতে রক্ষা পেতে পারে। তার এরূপ পৌনঃপুনিক কথাকে মহান আল্লাহ মুজাদালাহ বলেছেন। যার ফলে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে মুজাদালাহ। এতে ৩টি রুকূ'; '২২টি আয়াত, ৪৭৩ টি বাক্য এবং ১৯৯২ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : মুজাদালার এ ঘটনা কবে ও কখন সংঘটিত হয়েছে হাদীসের কোনো বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য মূল সূরার বিষয়বস্তুতে এ বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তার উপর ভিত্তি করে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এ ঘটনা আহযাব যুদ্ধের [৫ম হিজরির শাওয়াল মাসের] পরে সংঘটিত হয়েছিল। সূরা আহযাবে 'মুখে ডাকা পুত্র প্রকৃত পুত্র নয়' এ কথা বলার পর শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল– وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰتِىْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ "তোমরা তোমাদের যেসব স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' কর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।' কিন্তু 'যিহার' করা যে কি রকমের পাপ বা অপবাদ তা সেখানে কিছুই বলা হয়নি; এ ধরনের কাজ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি সে সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়নি; কিন্তু আলোচ্য সূরায় যিহার সংক্রান্ত সমস্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তা হতে জানা গেল যে, সূরা আহযাবে বলা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত কথারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী সময়ে এ সূরায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরার শুরুতে ১ নম্বর হতে ৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যিহার সংক্রান্ত শরিয়তের বিধি-বধান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
২. ৭ নম্বর আয়াত হতে ১০ নম্বর আয়াত পর্যন্ত 'তানাজী' অর্থাৎ গোপন কান-পরামর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইহুদি ও মুনাফিকরা মু'মিনদের কষ্ট দেওয়ার জন্য এ কান-পরামর্শে লিপ্ত হতো। এখানে কান-পরামর্শের হুকুম ও তার পরিণাম সম্বন্ধে মু'মিনদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। পরে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনার বাণীও শুনানো হয়েছে এ কথা বলে যে, মুনাফিক ও ইহুদিদের এরূপ আচরণে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। পরে ইহুদিদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
৩. ১১ নম্বর আয়াত হতে ১৩ নম্বর আয়াত পর্যন্ত মুসলিম জনগণকে বৈঠক ও মজলিসের সভ্যতা সংক্রান্ত আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিখানো হয়েছে। বিশেষত নবী করীম ﷺ-এর মজলিসে কি রকম আদব-কায়দা মেনে চলতে হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
৪. ১৪ নম্বর আয়াত হতে সূরার শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের লোকদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সে মানদণ্ডের কথা, যার ভিত্তিতে দীন ইসলামের প্রকৃত নিষ্ঠাবান লোক কে, তা যাঁচাই করা হয়। অর্থাৎ সেই হুব্বু ফিল্লাহ ও বুগযু ফিল্লাহ'র হাকীকত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্য যা নিতান্তই প্রয়োজন। –[সাফওয়া ও যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উল্লেখ রয়েছে। আর অত্র সূরায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -এর মাধ্যমে এমন হেদায়েতনামা প্রেরণ করেন যার দ্বারা মানব জীবনের কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং শরিয়তের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা হয়। তাই ইরশাদ হয়েছে– قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا

মূলত প্রাক-ইসলামি যুগে যদি কোনো মানুষ তার স্ত্রীকে মা বলে বসত তবে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত এবং তাদের উভয়ের মিলনের পথ চিররুদ্ধ হয়ে যেত। –[নূরুল কোরআন]

সূরার আমল : এ সূরা কোনো রুগ্ণ ব্যক্তির নিকট পাঠ করলে সে নিদ্রিত হয়ে পড়ে। আর যদি কেউ এ সূরা লিপিবদ্ধ করে খাদ্যদ্রব্যে রাখে, তবে খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ থাকে। কারো জ্বর হলে আসরের নামাজের পর এ সূরা তিনবার পাঠ করে দম করলে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তার জ্বর ভালো হয়ে যায়। –[নূরুল কোরআন]

সূরার [স্বপ্নের] তা'বীর : যদি কোনো ব্যক্তি সূরা মুজাদালাহ স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে– যদি সে আলিম হয় তবে তার শত্রু পরাজিত হয়, আর যদি যে আলিম না হয় তবে দুশমনের বিজয়ী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল মুজাদালাহ মদীনায় অবতীর্ণ

اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২২ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ تُرَاجِعُكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ فِىْ زَوْجِهَا الْمُظَاهِرُ مِنْهَا وَكَانَ قَالَ لَهَا اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ وَقَدْ سَاَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَجَابَهَا بِاَنَّهَا حُرِمَتْ عَلَيْهِ عَلٰى مَا هُوَ الْمَعْهُوْدُ عِنْدَهُمْ مِنْ اَنَّ الظِّهَارَ مُوْجِبُ فِرْقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ وَهِىَ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَهُوَ اَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَحْدَتَهَا وَفَاقَتَهَا وَصِبْيَةً صِغَارًا اِنْ ضَمَّتْهُمْ اِلَيْهِ ضَاعُوْا اَوْ اِلَيْهَا جَاعُوْا وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا تَرَاجُعَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ عَالِمٌ .

১. অবশ্যই শুনেছেন আল্লাহ সেই মহিলাটির কথা যে মহিলা বাদ প্রতিবাদ করছিল আপনার সাথে কথা কাটাকাটি করছিল আপনার সাথে হে নবী স্বীয় স্বামীর সম্পর্কে যে তার সাথে যিহার করার মুহূর্তে তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল (اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ) তুমি আমার উপর আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়। তখন উক্ত মহিলা রাসূল ﷺ -কে সে প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ কথা বলে জবাব প্রদান করেছিলেন যে, উক্ত মহিলা তার উপর হারাম হয়ে গেছে; যেমনিভাবে তাদের মধ্যে এ প্রথা চলে আসছিল যে, যিহার করার দ্বারা স্ত্রীগণ স্বামী হতে চির বিচ্ছেদ বা চিরতরে হারাম হয়ে যায়। আর ঐ মহিলাটির নাম ছিল খাওলা বিনতে ছা'লাবা, আর উক্ত যিহারকারী পুরুষটির নাম ছিল আওস ইবনে সামেত (রা.) আর সে মহিলাটি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছিল, তার একাকিত্বতা, অনাহারিত্বতা, ছোট ছোট সন্তানদের ব্যাপারে যে, যদি তাদেরকে স্বামীর নিকট রেখে যায় তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি তার (খাওলার) নিকট থাকে তাহলে ক্ষুধার্ত থাকবে, আর আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথা শ্রবণ করছিলেন আপনাদের বাদানুবাদ। অবশ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শ্রবণকারী সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা বিজ্ঞ।

তাহকীকও তারকীব

قَوْلُهُ وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ : বাক্যটি تُجَادِلُكَ-এর উপর আতফ। এখানে এক جُمْلَة -কে অন্য جُمْلَه -এর উপর আতফ করা হয়েছে। এ جُمْلَه-এর কোনো ই'রাব নেই, কারণ এ جُمْلَه টি اَلَّتِىْ -এর صِلَه।

কোনো কোনো মুফাসসির وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ বাক্যটিকে حَالْ বলাও বৈধ মনে করেন। অর্থাৎ সে নিজের অবস্থার অভিযোগ করে আল্লাহর কাছে তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে। তখন مُبْتَدَأْ উহ্য মানতে হবে, অর্থাৎ وَهِىَ تَشْتَكِىْ কারণ যখন বিশুদ্ধ আরবিতে مُضَارِعْ-এর সাথে وَاوْ মিলিত হয় তখন সেখানে مُبْتَدَأْ উহ্য মানা হয় বাক্যটিকে اِسْمِيَّة করার জন্য।

قَوْلُهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ : قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ -এর দাল-কে إِظْهَارْ করে পঠিত হয়েছে। আবূ আমর হামযা, কাসায়ী دَالْ -কে سِيْن -এর মধ্যে إِدْغَامْ করে قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ পড়েছেন। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا : জমহুর تُجَادِلُكَ পড়েছেন। অর্থাৎ তোমার সাথে বাদানুবাদ করেছে। কোনো কোনো কেরাতে تحاورك পঠিত হয়েছে অর্থাৎ সে তোমার সাথে কথোপকথন করেছে। –[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ الخ আয়াতের শানে নুযূল :

১. বুখারী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, কত পবিত্র সত্তার অধিকারী সেই আল্লাহ তা'আলা, যিনি সমগ্র বিশ্বের কথা শ্রবণ করেন। ঐ স্ত্রীলোকটি যখন এ ঝগড়া নিয়ে এসেছিল। সে আমার কক্ষেই বসেছিল এবং এ কথা বলছিল তখন আমি আমার ঘরের এক কোণে বসা ছিলাম কিন্তু আমি তার সব কথা শুনতে পারিনি; অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সপ্ত আসমানের উপরে বসে তার কথা শ্রবণ করেছিলেন। সে যখন বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করি। তখন অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ.) আলোচ্য আয়াতগুলো নিয়ে হাজির হলেন। –[মাযহারী, বুখারী, তাবারী]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জাহিলিয়া যুগে যখন কোনো লোক নিজের স্ত্রীকে اَنْتَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ [তুমি আমার উপর আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশের ন্যায়] এ কথাটি বলত তখন সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেত। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে লোক নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলেন, তিনি হলেন আউস। অতঃপর লজ্জিত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, রাসূল ﷺ -এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। যখন সে [স্ত্রী] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল। তখনই এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। –[দুররে মানছূর, বায়হাকী]

৩. খাউলা বিনতে ছা'লাবা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার স্বামী আউস ইবনে সামেত আমার সাথে যিহার করেছিলেন, তখন আমি রাসূল ﷺ -এর কাছে গিয়েছিলাম অভিযোগ করার জন্য। তখন তিনি [রাসূল ﷺ] আমার সাথে সে ব্যাপারে কথোপকথন করছিলেন এবং বলছিলেন, আল্লাহকে ভয় করো, আউস তোমার চাচাতো ভাই।

আমি চলে আসার পূর্বেই কুরআনের আয়াত قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا হতে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا - পর্যন্ত অবতীর্ণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে একজন দাস আযাদ করতে হবে। উত্তরে আমি বললাম, সে দাস আযাদ করতে পারবে না। তখন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখতে হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সে বৃদ্ধ লোক, তার রোজা রাখার শক্তি নেই। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। আমি বললাম, সদকা করার মতো তার কাছে কিছুই নেই। তখন তিনি বললেন, আমি তাকে এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে আরও এক আরক খেজুর দিয়ে সাহায্য করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এ এহসান করে ভালো করলে। যাও সেগুলো দিয়ে তার পক্ষ থেকে ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াও এবং তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে যাও। অপর এক বর্ণনায় ষাট সা' বলা হয়েছে।

–[রাওয়ায়েউল বয়ান, আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ]

৪. বর্ণিত আছে যে, আউস ইবনে সামেত একদিন তাঁর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবাকে নামাজরত অবস্থায় দেখলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন, আর আউস স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। যখন সে নামাজের সালাম ফিরাল তখন স্বামী তাকে কামনা করলেন। স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দিলে তিনি রাগন্বিত হলেন এবং তার সাথে যিহার করলেন, তখন সে [স্ত্রী] রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসল এবং বলল, আউস আমাকে যখন বিবাহ করেছিল তখন আমি যুবতী ও কামনীয় ছিলাম, যখন আমার বয়স বাড়ল এবং সন্তানাদির সংখ্যা বাড়ল তখন সে আমাকে তার মায়ের মতো করল। আমার কিছু ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে, সে বাচ্চাদেরকে তার সাথে সম্পৃক্ত করলে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে, আর আমার সাথে দিলে অভুক্ত থাকবে। এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে ফয়সালা দেওয়ার মতো কিছু নেই। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ তাকে বলেছেন, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেতো তালাক দেয়নি, সে আমার সন্তানদের পিতা এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার জন্য

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

হারাম হয়ে গেছে। তখন সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে আমার ক্ষুধা ও দুঃখের অভিযোগ করছি। রাসূল যতই তাকে বলছিলেন যে, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছে, ততই সে ক্রন্দন করছিল আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। যখন সে এ রকম অবস্থায় ছিল তখন রাসূল ﷺ -এর মুখমণ্ডল পরিবর্তন হয়ে গেল এবং কুরআনের এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্বামীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, তুমি কি গোলাম আযাদ করতে পারবে? সে উত্তরে বলল, না, আল্লাহর কসম! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে রোজা রাখতে পারবে কি? সে উত্তর দিল, না, আল্লাহর কসম! আমি দৈনিক একবার দু'বার খেতে না পারলে আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় এবং মনে হতে থাকে যে আমার মৃত্যু আসবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার দান করতে পারবে কি? সে উত্তর দিল, না, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আপনি আমাকে সদকা দিয়ে সাহায্য করলে পারবো। তখন রাসূল তাকে পনের সা' খাদ্য দান করলেন এবং আউসও নিজের পক্ষ হতে সমপরিমাণ দিয়ে ষাটজন মিসকিনকে খাবার দান করলেন। -[কাবীর, খাযেন, ইবনু কাছীর]

قَوْلُهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ : قَدْ এখানে আশা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং বাদানুবাদকারী মহিলা উভয়ই আশা করেছিল যে, আল্লাহ মহিলার তর্ক-বিতর্ক এবং অভিযোগ শুনুক এবং এ সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধান অবতীর্ণ করুক। -[কাশ্‌শাফ, রুহুল মা'আনী, রাওয়ায়েউল বায়ান]

سَمِعَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা সে মহিলার কথা শ্রবণ করেছেন, এ বাক্যের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কেবল শুনেছেন বা জানিয়েছেন এ অর্থ নয়। -[কাশ্‌শাফ, রুহুল মা'আনী, রাওয়ায়েউল বায়ান]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ মহিলাটির দু'টি কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। একটি হলো, تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا -এর মধ্যে তার বাদানুবাদ। বাদানুবাদটি ছিল এ রকম, যতবারই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলছিলেন যে, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ, সে প্রতিবারই তদুত্তরে বলছিল, আল্লাহর কসম সে আমাকে তালাক দেয়নি।

তার দ্বিতীয় কথাটি হলো আল্লাহর দরবারে তার অভিযোগ। আর সে অভিযোগটি হলো তার এ উক্তি যে, আল্লাহর কাছে আমার দুঃখ আর ক্ষুধার কথা জানিয়ে অভিযোগ করছি, আরও বলছি যে, আমার কয়েকটি ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ : يَسْمَعُ শব্দটি مُضَارِعٌ-এর হওয়ার কারণে নতুনত্ব বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথোপকথন চলেছে। আল্লাহর শুনাও অব্যাহতভাবে চলছে।

تَحَاوُرَكُمَا 'তোমাদের কথোপকথন' এখানে রাসূল ﷺ -এর সাথে স্ত্রীলোকটিকেও একই সাথে সম্বোধন করে তাকে সম্মানিত করা হয়েছে।

আর দুই জায়গায় আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ মু'মিনদের অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি তরবিয়াত দানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। -[কাবীর]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এভাবে এ পবিত্র সূরা আরম্ভ করে আল্লাহ তা'আলা একদল মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ স্ত্রীলোকটির সাহায্যে ছিলেন তদ্রূপ তাদের সঙ্গেও আছেন, তাদের যে কোনো ছোট বড় সমস্যাবলির সমাধান দানের জন্য। তিনি তাদের দৈনন্দিন সমস্যাবলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাদের স্বাভাবিক সমস্যায় সাড়া দেন।

হযরত খাওলা (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.) ব্যবহার : হযরত আবূ ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেন। হযরত ওমর (রা.) একবার তাঁর খেলাফতের আমলে কিছু সংখ্যক লোক সাথে নিয়ে কোথাও গমন করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন মহিলা তাকে ডাক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) আহ্বানকারী সেই মহিলার নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে দাঁড়িয়ে তার কথা মনযোগের সাথে শ্রবণ করতে লাগলেন। এরপর সেই মহিলা যা চাইলেন তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি একজন বৃদ্ধার কথায় থেমে গেলেন এবং আপনার জন্য এত লোক অপেক্ষা করতে বাধ্য হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি তাকে চেন? এ মহিলা কে? ইতিহাসে সেই মহীয়সী নারী খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা.) যাঁর অভিযোগ মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে শ্রবণ করেছেন। যদি আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা নয় সারারাত তিনি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সাথে কথা বলতেন, তবে আমি তাঁর খেদমতে সর্বক্ষণ হাজির থাকতাম, তবে শুধু এটুকু যে নামাজের সময় নামাজ আদায় করে নিতাম- এরপর তাঁর কথা শ্রবণ করতাম। -[ইবনে কাছীর, রুহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢. اَلَّذِيْنَ يَظَّهَّرُوْنَ اَصْلُهُ يَتَظَهَّرُوْنَ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِى الظَّاءِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِاَلِفٍ بَيْنَ الظَّاءِ وَالْهَاءِ الْخَفِيْفَةِ وَفِىْ اُخْرٰى كَيُقَاتِلُوْنَ وَالْمَوْضِعُ الثَّانِىْ كَذٰلِكَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ ط اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا الّٰئِىْ بِهَمْزَةٍ وَيَاءٍ وَبِلَا يَاءٍ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ بِالظِّهَارِ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ط كَذِبًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ لِلْمُظَاهِرِ بِالْكَفَّارَةِ .

২. যারা যিহার করে يَظَّهَّرُوْنَ শব্দটি মূলত يَتَظَهَّرُوْنَ ছিল تَا -কে ظَا -এর মধ্যে اِدْغَامٌ করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে ظَا ও هَا -এর মধ্যখানে একটি আলিফ সহকারে يُظَاهِرُوْنَ পঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও শব্দটি একই রূপে বিভিন্ন কেরাতে পঠিত হয়েছে। তোমাদের মধ্য হতে তাদের স্ত্রীগণের সাথে। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো তারাই যারা اَلّٰئِىْ শব্দটি هَمْزَةٌ ও يَا সহকারে এবং يَا ব্যতীত উভয়রূপে পঠিত হয়েছে। তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা তো যিহার করার মাধ্যমে বলে থাকে অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথা মিথ্যা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল যিহারকারীকে কাফ্ফারা আদায় সাপেক্ষে।

٣. وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا اَىْ فِيْهِ بِاَنْ يُخَالِفُوْهُ بِاِمْسَاكِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا الَّذِىْ هُوَ خِلَافُ مَقْصُوْدِ الظِّهَارِ مِنْ وَصْفِ الْمَرْأَةِ بِالتَّحْرِيْمِ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ اَىْ اِعْتَاقُهَا عَلَيْهِ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط بِالْوَطْئِ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

৩. আর যারা আপন স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে, অতঃপর প্রত্যাহার করতে চায় তাদের বক্তব্য, অর্থাৎ জিহার সংক্রান্ত বিষয়ে। এ মর্মে যে, যিহার কার্যের ব্যতিক্রমধর্মী মনোবাঞ্ছা করতে চায়, আর যিহারকৃত স্ত্রীকে পুনরায় বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ [বা বহাল] রাখতে চায় যা যিহারের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি হয়, অর্থাৎ স্ত্রীকে হারাম বলে ঘোষণা করা, তবে একটি দাসমুক্ত করে দেওয়া, অর্থাৎ কৃতদাস আজাদ করে দেওয়া তার কর্তব্য হবে। তারা পরস্পর মিলনের পূর্বে সহবাসের মাধ্যমে। উল্লিখিত বাণীর সাহায্যে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অতি ভালোভাবে অবগত আছেন।

٤. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ط فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ اَىِ الصِّيَامَ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ط عَلَيْهِ اَىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ ذٰلِكَ اَىِ التَّخْفِيْفُ فِى الْكَفَّارَةِ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط وَتِلْكَ اَىِ الْاَحْكَامُ الْمَذْكُوْرَةُ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ بِهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ .

৪. অনন্তর যে ব্যক্তি গোলাম না পায় তবে রোজা রাখবে দু'মাস অনবরত পরস্পর মিলামিশার পূর্বে। আর যে ব্যক্তি এটাতেও সক্ষমতা না রাখে অর্থাৎ অবিরাম দু'মাস রোজা পালনে তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খাবার দান করা তার কর্তব্য অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। এতে مُطْلَقٌ -কে مُقَيَّدٌ -এর উপর স্থাপন করা হয়েছে। শহরে প্রচলিত প্রধান খাদ্য হতে ১ মুদ্দ সমপরিমাণ খাদ্য করে প্রত্যেক মিসকিনকে দিয়ে দিতে হবে। উক্ত নির্দেশ এ জন্য যে, অর্থাৎ কাফফারাহ -এর সহজতম ব্যবস্থা যাতে তোমরা বিশ্বাস আনয়ন কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর। আর এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত বিধানসমূহ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, আর কাফিরগণের জন্য এ সকল বিধি-বিধান অস্বীকার করার কারণে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, পীড়াদায়ক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ .... فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : ইসমে মাউসূল প্রথম মুবতাদা فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ দ্বিতীয় مُبْتَدَأ এ দ্বিতীয় مُبْتَدَأ-এর খবর উহ্য। অর্থাৎ فَعَلَيْهِمْ অথবা فَكَفَّارَتُهُمْ-কে এখানে উহ্য মানা হয়েছে। দ্বিতীয় مُبْتَدَأ আর خَبَرْ মিলে جُمْلَه হয়ে প্রথম مُبْتَدَأ-এর খবর হয়েছে। এ جُمْلَه তে فَاء প্রবেশ করেছে مُبْتَدَأ তে শর্তের অর্থ লুকিয়ে থাকার কারণে।

قَوْلُهُ لِمَا قَالُوْا : ইবনুল আম্বারী বলেছেন, لِمَا-এর جَارْ আর مَجْرُوْر উভয়টি نَصَب-এর স্থানে, কারণ তা يَعُوْدُوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। এখানে مَا মাসদারিয়া, যার تَقْدِيْر হবে يَعُوْدُوْنَ لِقَوْلِهِمْ এ মাসদারটি مَفْعُوْل-এর স্থানে হওয়ার কারণে মানসূব। -[রাওয়ায়ে', ই'রাবুল কোরআন]

قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ : ذٰلِكَ - مُبْتَدَأ-এর খবর উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ذٰلِكَ وَاقِعٌ - ذٰلِكَ ইসমে ইশারাটি مَحَلًّا مَنْصُوْب ও হতে পারে, তখন تَقْدِيْر হবে فَعَلْنَا ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا।

قَوْلُهُ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ : হাফস ও আসেম يُظْهِرُوْنَ অর্থাৎ يَاء তে ضَمَّة এবং هَا তে كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন। নাফে', ইবনু কাছীর ও আমর يَظَّهَّرُوْنَ অর্থাৎ ظَاء ও هَا তে তাশদীদ দিয়ে اَلِف-কে حَذْف করে এবং يَاء-কে فَتْح দিয়ে পড়েছেন।

হামযা, কেসায়ী এবং হালাফ يَظَّاهَرُوْنَ অর্থাৎ يَاء তে فَتْح এবং ظَاء তে তাশদীদ ও اَلِف বৃদ্ধি করে পড়েছেন। হাসান, কাতাদাহ يَظَّهَرُوْنَ অর্থাৎ يَاء তে فَتْح এবং هَاء তে তাশদীদ ও كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ ...... وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের স্ত্রীগণ মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছেন, তারা অসম ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী ক্ষমাশীল।

يُظَاهِرُوْنَ শব্দটি ظِهَارٌ হতে উদ্ভূত হয়েছে। স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার এক বিশেষ পদ্ধতিকে ظِهَارٌ বলা হয়। আর তা হলো স্বামী স্ত্রীকে বলবে اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ [তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় হারাম।] এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য কিন্তু রূপক ভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে। -[কুরতুবী, মা'আরেফুল কোরআন]

জাহিলিয়া যুগে আরবরা এভাবে স্ত্রীকে তালাক দিত বলে বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখ আছে, কিন্তু আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, জাহিলিয়া যুগে কোনো লোক স্ত্রীর সাথে রাগ করে বলে দিত اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ তার দ্বারা স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যেত। এভাবে হারাম অবস্থায় বাকি থাকত। হালাল হবার কোনো বিধান ছিল না, যার ফলে তাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। সে স্ত্রীলোকটিকে তালাকপ্রাপ্তাও মনে করা হতো না। তালাকপ্রাপ্তা গণ্য হলে তার জন্য অন্য পথ খুঁজে নেওয়া সম্ভব হতো। তা ছিল নারী সমাজের উপর স্বামীদের এক প্রকার জুলুম, যা জাহিলিয়া যুগের নারী সমাজকে সহ্য করতে হয়েছে। -[যিলাল]

ইসলাম একে হারাম ঘোষণা করেছে এবং তা সংঘটিত হলে সমাধানের ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ এ আয়াতে জাহিলিয়া যুগের সে সামাজিক সমস্যার সমাধান দান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যিহার নকল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, স্ত্রী কখনো মাতা নয়, যাতে মাতার ন্যায় হারাম হতে পারে। মাতাতো সেই নারী যিনি জন্ম দিয়েছেন। স্ত্রী কেবল একটা কথা দ্বারা মাতায় পরিণত হতে পারে না। সুতরাং এ কথাটি একটা বাস্তবতা বিবর্জিত নিন্দিত কথা। -[কাবীর]

স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা নিন্দনীয় হওয়ার কারণ : যিহারকারী স্ত্রীকে মা বলেনি, কেবল মায়ের সাথে তুলনা করছে মাত্র, কিভাবে তা নিন্দিত ও মিথ্যা হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এ কথাটি মিথ্যা এ কারণে যে, اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ কথাটি خَبَرْ, না হয় اِنْشَاء। খবর হলে মিথ্যা এ কারণে যে, স্ত্রী হালাল আর মাতা হারাম। হালাল মহিলাকে হারাম মহিলার সাথে তাশবীহ দান বা তুলনা করা মিথ্যা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আর যদি ইনশা হয়ে থাকে তবুও মিথ্যা, কারণ তখন অর্থ হবে ইসলামি শরিয়ত স্ত্রীকে হারাম করার উপায় হিসেবে এ বাক্যটিকে গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামি শরিয়ত এভাবে স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার অনুমতি দেয়নি। সুতরাং এ হুকুম দান করার জন্য এ বাক্যকে ইনশা হিসেবে গ্রহণ করাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। -[রাওয়ায়েউল বায়ান, কাবীর]

যিহার কি তালাকের ন্যায় বৈধ না হারাম? : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাহিলিয়া যুগে যিহারকে তালাক মনে করা হতো। এর দ্বারা স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যেত বটে কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা হতো না। কারণ এতে স্ত্রীকে চির হারাম মায়ের সাথে তুলনা করা হয়।

ইসলামে এ যিহার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا অর্থাৎ তারা নিন্দিত ও মিথ্যা কথা বলে, এ কথার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যিহারকে হারাম ঘোষণা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ যিহারকে কবীরা গুনাহ বলে দাবি করেছেন। সুতরাং যে লোক যিহার করল সে লোক মিথ্যাবাদী ও শরিয়ত বিরোধী।

ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতে যিহার হারাম। অতএব, যিহার করা বৈধ নয়। যিহার তালাক হতে ভিন্ন, কারণ যিহার অবৈধ আর তালাক বৈধ। এরপরও যে লোক যিহার করবে সে লোক হারামের মুরতাকিব বলে সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, রাওয়ায়েউল বায়ান]

যিহারের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ : ظِهَارٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার তা ظَهْرٌ হতে উদ্ভূত। আরবি ভাষায় এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- পিঠের সাথে পিঠের মোকাবিলা করা, রাগান্বিত করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা, এক কাপড়ের উপর অন্য কাপড় পরিধান করা ইত্যাদি। -[লিসানুল আরব, রূহুল মা'আনী, আহকাম]

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ফকীহগণ যিহারের দুই রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন-

১. জমহুর বলেছেন, যিহার হলো স্ত্রীকে "তুমি আমার কাছে আমার মায়ের সমতুল্য" এমন কথা বলা, যেমন আরবরা বলত- اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ.

২. আহনাফ, আওযায়ী, ছাওরী এক বর্ণনায় এবং শাফেয়ী ও যায়েদ ইবনে আলী তার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, যিহার হলো, 'স্ত্রীকে হারাম করার উদ্দেশ্যে চির দিনের জন্য হারাম এমন কোনো মুহরিমা মহিলার সাথে তাকে তুলনা করা'। -[ফিকহুস সুন্নাহ]

حَقِيْقَةُ الظِّهَارِ تَشْبِيْهُ ظَهْرٍ حَلَالٍ بِظَهْرٍ مُحَرَّمٍ فَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهٖ اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ فَهُوَ ظِهَارٌ بِاِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ.

যিহারকারীগণকে আল্লাহ তা'আলা مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ কেন বলেছেন? : আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, যিহারকারী স্বীয় স্ত্রীকে আপন মায়ের সাথে তুলনা করেছে মাত্র, মা বলেনি, তথাপিও তা নিন্দিত করা কিভাবে হতে পারে?

এটার জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ কথাটি মিথ্যা হওয়ার কারণ এই যে, তা খবরও হয়, অথবা ইনশাও হয়।

খবর হলে মিথ্যা হওয়ার কারণ এই যে, হালাল স্ত্রীকে হারাম মাতার সাথে তুলনা করা অশুদ্ধ। সুতরাং তা মিথ্যা। ইনশা হলে মিথ্যা হওয়ার কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এ বাক্য দ্বারা মাতার সাথে তুলনা করার অনুমতি প্রদান করেনি এবং এ বাক্য ব্যবহারের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সুতরাং তা মিথ্যা এ জন্য مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ বলা হয়েছে।

অথবা, مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ বলার কারণ হলো, শরিয়ত অথবা عَقْل অথবা طَبِيْعَت-এর বিবেচনায় তা নিন্দিত কথা। তাই আল্লাহ তা'আলা مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ বলেছেন। -[কাবীর, আবীছউদ, রাওয়ায়েউল বয়ান]

প্রশ্ন: প্রকাশ্য আয়াতের দ্বারা প্রকাশিত হয় যে, কেবল জন্মদানকারিণীই মাতা অথচ অন্য আয়াতে এটার ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। তোমাদের ধাত্রী, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মাতা তা কিভাবে হতে পারে?

উত্তর. আয়াতের সরাসরি বর্ণনায় যা প্রকাশ পায় তাই কেবল আয়াতের উদ্দেশ্য নয়; বরং আয়াতের রূপক অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে স্ত্রীগণকে মাতার সাথে তুলনার দ্বারা তারা মাতা হয় না; যাতে তারা মাতার ন্যায় হারাম হওয়াও আবশ্যক হয় না। আর শরিয়তে ইসলামও স্ত্রীদেরকে হারাম করার জন্য এ নির্দেশ দেয়নি; অথবা শব্দ দ্বারা হারাম হওয়ার জন্য শব্দটিকে سَبَبْ হিসেবে নির্ধারিত করেনি। সুতরাং যেহেতু এ শব্দটি سَبَب حُرْمَةْ-এর জন্য নির্ধারিত করেনি; তা এর জন্য ব্যবহার করাও মিথ্যাবাদী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অন্য দিকে অপরাপর আয়াতে যেভাবে وَاُمَّهَاتُكُمُ الَّتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ اَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهَاتُهُمْ বলা হয়েছে তা দ্বারা জন্মদানকারিণী মা -এর কথা বুঝানো হয়নি; বরং তা দ্বারা চির مُحَرَّمَاتْ -এর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন আয়াতের অর্থে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যিহার করার জন্য জন্মদানকারিণী মায়ের সাথে তাশবীহ দেওয়া আবশ্যক নয়। চিরতরে বিবাহ করা হারাম এমন যে কোনো পর্যায়ের মহিলাদের সাথে তাশবীহ দিয়ে যিহার করলেই হয়ে যাবে।

مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর হেজাজের অধিবাসীদের ভাষানুপাতে اُمَّهَاتِهِمْ-এর تَا-এ কাসরা দিয়ে পড়েছেন। আর মুফায্যল আসেম হতে বর্ণনা করে اُمَّهَاتُهُمْ-এর تَا-এ পেশ দিয়ে পড়েছেন। ইবনু মাসউদ بِاُمَّهَاتِهِمْ অর্থাৎ بَا বৃদ্ধি করে পড়েছেন। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, বাহরুল মুহীত, রাওয়ায়েউল বায়ান]

পূর্বাপর যোগসূত্র : উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল, স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করার জন্য যিহার করা হারাম। স্বামী যদি স্ত্রীর বিচ্ছেদ চায়, তাহলে বৈধ পন্থা হলো তালাক দেওয়া। যিহারকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ স্ত্রীকে মাতা বলা একটা অসার ও মিথ্যা কথা।

এখানে এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, যদি কোনো মূর্খ ও অর্বচীন ব্যক্তি যিহার করে বসে, তবে এ বাক্যের কারণে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। তবে স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তার থাকবে না; বরং স্ত্রীকে ভোগ করতে চাইলে তাকে পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা আদায় করা ব্যতীত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। এ কাফ্ফারা হলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা, যা ডিঙানো হারাম। যারা এ বিধান লঙ্ঘন করবে পরকালে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ "وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ .... لِمَا قَالُوْا" : হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) يَعُوْدُوْنَ শব্দের তাফসীর করেছেন يَنْدَمُوْنَ শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ যিহার করার পর তারা অনুতপ্ত হয়ে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে চায়। -[মা'আরেফুল কোরআন]

মুজাহিদ, তাউস, ছাওরী এবং ওসমান বিত্তী বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ-এর অর্থ হলো, ইসলামে জাহিলিয়া যুগের যিহারের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা। তাঁদের মতে এ আয়াতের অর্থ হবে, জাহিলিয়া যুগে যেসব লোকদের অভ্যাস ছিল স্ত্রীর সাথে যিহার করা, ইসলাম গ্রহণের পর এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেছিল, অতঃপর যারা যিহার করবে তাদেরকে গোলাম আজাদ করতে হবে। সুতরাং তাদের মতে ইসলামে যিহার প্রথা ফিরিয়ে আনার কারণে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

আবুল আলীয়া ও আহলে যাহির বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ-এর অর্থ হলো, পুনর্বার যিহারের শব্দাবলি উচ্চারণ করা। অতএব, তাঁদের মতে যিহারের শব্দ একবার উচ্চারণ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করলেই কাফফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ-এর অর্থ হলো اَلْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ তথা সহবাস করার ইচ্ছা করা। সুতরাং যিহারের কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না, সহবাসের ইরাদা করলেই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম মালিক (র.) হতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো, اَلْعَزْمُ عَلَى الْاِمْسَاكِ অর্থাৎ জিহার করার পর স্ত্রীকে পুনর্বার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চাওয়া। সুতরাং স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দিতে চাওয়াই হলো কাফ্ফারার কারণ। অপর এক বর্ণনায় সহবাস আর স্ত্রী হিসেবে রেখে দেওয়ার ইচ্ছা উভয়কে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا-এর অর্থ হলো- اَىْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَغْشٰى كَفَّهُ الْغِشْيَانِ অর্থাৎ যখন মিলিত হতে ইচ্ছা করবে তখনই কাফ্ফারা আদায় করবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর দীর্ঘ দিন তালাক না দিয়ে স্ত্রী হিসেবে আবদ্ধ রাখাই হলো ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ-এর অর্থ, সুতরাং যিহারের পর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তালাক না দিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, আহমদ ও শাফেয়ী (র.)-এর মতামত কাছাকাছি, কারণ সহবাসের ইচ্ছা স্ত্রীকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেওয়ার ইচ্ছা, মিলিত হওয়ার ইচ্ছা ও যিহারের পর তালাক না দেওয়ার অর্থই হলো- যে স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে সে স্ত্রীর সাথে পুনর্বার জীবন-যাপনের ইচ্ছা পোষণ করা। সুতরাং لِمَا قَالُوْا-এর لَامْ-এর অর্থ হলো اِلٰى অর্থাৎ তারা নিজেদের উপর যা হারাম করে দিয়েছিল, সহবাসের ইচ্ছা দ্বারা তা প্রত্যাহার করল।

ইমাম ফাররা বলেছেন, لِمَا قَالُوْا-এর অর্থ হলো عَمَّا قَالُوْا অর্থাৎ যা বলেছিল তা হতে ফিরে আসে।

ইসলামে যিহারের হুকুম : ইসলামে যিহারের হুকুম হলো, যিহার করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং স্ত্রীর সাথে যিহার করার জন্য অগ্রসর হওয়া কোনো মুসলমানের জন্য কখনো বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِىْ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ .

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতএব, যিহার করা হারাম, বরং শাফেয়ী ফকীহগণ বলেছেন, যিহার করা কবীরা গুনাহ। যে ব্যক্তি যিহার করতে অগ্রসর হবে সে লোককে মিথ্যুক ও শরিয়ত বিরোধী মনে করা হবে এবং তার উপর এ কর্মকাণ্ডের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কারণ সে যা বলেছে তা মিথ্যা বলেছে। -[রাওয়ায়েউল বায়ান, ফিকহুস সুন্নাহ]

যিহার করার ফলে কি কি হারাম হয়? : স্ত্রীর সাথে যিহার করার ফলে দু'টি কাজ হারাম হয়ে যায়-

১. যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস এবং অন্যান্য যৌনক্রীড়া হারাম হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছে,- فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا

২. পুনর্বার স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে কাফফারা ওয়াজিব হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-
وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا .....
সহবাসের সাথে অন্যান্যভাবে উপভোগও হারাম হয়ে যায়, যথা- চুম্বন, আলিঙ্গন, স্পর্শ, মর্দন ইত্যাদি। তা মালিকী, হানাফী এবং হাম্বলীদের অভিমত।

ইমাম ছাওরীর এক বর্ণনায় ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, কেবল সহবাসই হারাম হয়, কারণ مَسٌّ বলতে সহবাস বুঝানো হয়েছে। -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ : এ অংশের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেছেন, যারা নিজ-স্ত্রীর সাথে যিহার করল অতঃপর সেই যিহার হতে প্রত্যাবর্তনের ইরাদা করল তাদেরকে কাফ্ফারা হিসেবে একজন দাস বা দাসী আজাদ করতে হবে। অতঃপর ইমামগণের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে মতান্তর হয়েছে যে, সেই দাস বা দাসী কি মু'মিন হতে হবে, না মু'মিন ও কাফির যে কোনো একটি আজাদ করলেই চলবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, এ দাসকে অবশ্যই মু'মিন হতে হবে নতুবা কাফ্ফারা আদায় হবে না। কারণ-

১. কতলের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে উম্মতে মুসলিমার ইজমা হয়েছে যে, অবশ্যই মু'মিন দাস আজাদ করতে হবে, কারণ সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ অর্থাৎ মু'মিন দাস আজাদ করতে হবে। আলোচ্য আয়াতটি, مُطْلَقٌ (শর্তহীন) হলেও পূর্বোক্ত مُقَيَّدٌ (শর্তসাপেক্ষ) আয়াতের উপর প্রয়োগ করতে হবে।

২. আজাদী হলো এক রকমের পুরস্কার, সুতরাং সেই আজাদীর সাথে ঈমানের শর্ত লাগানোর মানে হলো সেই পুরস্কার আল্লাহর বন্ধুদেরকে দান করা, আর কাফিরদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করা। এক্ষেত্রে ঈমানের শর্ত জুড়ে না দেওয়ার অর্থ হবে- আল্লাহর দুশমনদের জন্য সেই পুরস্কার ও নিয়ামত উপভোগ করতে পারার পথ খুলে রাখা। সুতরাং ঈমানের শর্ত জুড়ে দেওয়া অপরিহার্য। -[কাবীর]

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, যে কোনো দাস নারী হোক বা পুরুষ হোক, মু'মিন বা কাফির আজাদ করলেই চলবে। এক্ষেত্রে ঈমানের শর্ত জুড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ-

১. ঈমান শর্ত হলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কতলের কাফ্ফারায় যেমন জুড়ে দিয়েছেন তেমনিই জুড়ে দিতেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেখানে مُطْلَقٌ রেখেছেন সেখানে مُطْلَقٌ আর যেখানে مُقَيَّدٌ করেছেন সেস্থানে مُقَيَّدٌ রাখতে হবে।

২. হানাফীরা আরো বলেছেন, এখানে ঈমানের শর্তারোপ করার অর্থ হলো زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ যা প্রকৃতপক্ষে مَنْعٌ বা রহিতকরণ। এ রহিতকরণ অবশ্যই কুরআন বা خَبَرِ مَشْهُوْر দ্বারা হতে হবে। উল্লেখ্য এ ক্ষেত্রে দুটার একটাও নাই।

-[কাবীর, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম]

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا : অর্থাৎ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বেই কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। اَنْ يَّتَمَاسَّا -এর তাফসীরে ইমামদের মতান্তর রয়েছে। জমহুর ফিক্হবিদগণ [মালিকী, হানাফী ও হাম্বলী] বলেছেন اَنْ يَّتَمَاسَّا -এর অর্থ হলো সহবাস এবং সহবাসের পূর্বের যাবতীয় যৌনকেলী, যেমন- চুম্বন, মুয়ানাকা ইত্যাদি।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক মতে এবং ইমাম ছাওরী (র.) বলেছেন, এ বাক্যের অর্থ হলো, সহবাস। সুতরাং কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস ছাড়া অন্যান্য কামক্রীড়া বৈধ। জমহুর তাদের স্বপক্ষে দলিল দিয়ে বলেছেন-

১. اَنْ يَّتَمَاسَّا -এর مَسٌّ শব্দ যে কোনো রকমের স্পর্শ বুঝায়। অতএব, যে কোনো রকমের যৌনোপভোগ হারাম।

২. যে মায়ের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করার কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে, সে মায়ের সঙ্গে যে কোনো ধরনের কামক্রীড়া যেমনি হারাম ঠিক তেমনি যিহারকৃত স্ত্রীর সঙ্গেও যাবতীয় কামক্রীড়া হারাম।

৩. যে লোকটি নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিল সে লোকটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, مِنْ قَبْلِ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন না করা পর্যন্ত তার (স্ত্রীর) কাছে যেয়ো না।

উপরিউক্ত কারণগুলোর কারণে যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে যাবতীয় কামক্রীড়া হারাম।

–[রাওয়ায়েউল বায়ান, আয়াতুল আহকাম]

কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্পর্শ করলে কাফ্ফারা কি বৃদ্ধি পাবে? : এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রা.) বলেছেন যে, যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে সহবাস করলে গুনাহগার হবে এবং আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে। সাথে সাথে সময় চলে যাওয়ার কারণে কাফ্ফারাও পতিত হয়ে যাবে।

জমহুর বলেছেন, এ কারণে সে গুনাহগার হবে, তাকে আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে এবং কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীকে পৃথক করে রাখতে হবে।–(রাওয়ায়েউল বায়ান)

মুজাহিদ বলেছেন, তাকে দু'টো কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় মাযহাব হচ্ছে জমহুরের মাযহাব। কারণ এক হাদীসে আছে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হলো যে, তিনি [যিহারকারী] কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছেন, তখনও রাসূল ﷺ তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে বলেছেন। –[জামেউল ফাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড]

قَوْلُهُ تَعَالَى ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ .... خَبِيْرٌ :

ذٰلِكُمْ ইসমে ইশারা দ্বারা যিহারের কাফ্ফারা সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ বিধান লোকদেরকে যিহার থেকে বিরত রাখার নিমিত্তে উপদেশ দানের জন্য অথবা তোমাদের নিজেদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমরা যা কিছু কর তা সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো আমলই গোপন নেই। যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্ত আমলের খবর রাখেন তোমাদের উচিত তাঁর দেওয়া বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ الخ :

এ আয়াতে যারা দাস মুক্ত করতে অপারগ তাদেরকে ক্রমাগতভাবে দু' মাস রোজা রাখতে বলা হচ্ছে। এ দু' মাসের মধ্যে একদিনও বিনা ওজরে রোজা না রাখলে তাকে আবার প্রথম হতে আরম্ভ করে ষাটটি পূর্ণ করতে হবে। আর যদি সফর বা রোগের কারণে রোজা রাখতে না পারে, তাহলে ইমাম শাফেয়ী, মালিক, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, হাসান বসরী, শা'বী ইত্যাদির মতে বাকি রোজা পূর্ণ করলেই চলবে, প্রথম হতে আবার আরম্ভ করার প্রয়োজন হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তাকে পুনরায় প্রথম হতে আরম্ভ করে ষাটটি পূর্ণ করতে হবে। তা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি মত। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا : এ বাক্যের তাফসীর উপরে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তুএখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো, যে লোক যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে ক্রমাগত দু' মাস রোজা রাখার সময়ের মধ্যে সহবাস বা যৌনাবেদন সৃষ্টিকারী কোনো কার্য করল, তাকে কি করতে হবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুহাম্মদ আলী 'তাফসীরু আয়াতিল আহকাম' -এ লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ, মালিক ও আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ মতে বলেছেন যে, তাকে আবার প্রথম হতে রোজা পূর্ণ করতে হবে। কারণ অত্র আয়াতে দু' মাস ক্রমাগতভাবে রোজা রাখতে বলা হয়েছে– একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে।

ইমাম আবূ ইউসুফ, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) -এর অপর এক মত হচ্ছে, লোকটিকে প্রথম হতে রোজা পূর্ণ করতে হবে না। কেবল বাকি রোজা রাখলেই চলবে। কারণ এ সহবাস দ্বারা রোজার কোনো ক্ষতি হয়নি। সুতরাং দু' মাসের ক্রমাগত রোজার মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি। মনে রাখতে হবে ক্রমাগতের শর্তের মধ্যে সহবাসহীন হতে হবে তেমন কোনো শর্ত নেই।

–[আয়াতুল আহকাম]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا : অর্থাৎ যার পক্ষে ক্রমাগতভাবে ষাটটি রোজা রাখা সম্ভব হবে না, তবে সে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। বিভিন্ন কারণে রোজা রাখা সম্ভব না হতে পারে, যেমন– রোগের কারণে বা বার্ধক্যের কারণে অথবা অত্যন্ত কষ্টের কারণে কারো পক্ষে ষাটটি রোজা ক্রমাগতভাবে রাখা সম্ভব না হলে তাকে ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য দান করতে হবে।

এ আয়াতে একজন মিসকিনকে কতটুকু খাদ্য দান করতে হবে বা ক্রমাগত দান করতে হবে কিনা তা উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু কয়েকটি হাদীসে অর্ধ সা' গম বা এক সা' যব অথবা খেজুর দান করতে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। সে কারণেই হানাফী ইমামগণ অর্ধ সা' বা এক সা' উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে আদায় করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.) -এর মতে এক মুদ্দ দান করতে হবে। ক্রমাগত দান করতে হবে কি-না এ প্রশ্নের উত্তরে জমহুর বলেছেন, যে কোনোভাবেই দান করা চলবে। ক্রমাগতভাবে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। –[আয়াতুল আহকাম]

খাদ্য দানের ক্ষেত্রেও কি স্পর্শ করার পূর্বে দান করা শর্ত? : আল্লাহ তা'আলা যিহারের কাফ্ফারা আলোচনা প্রসঙ্গে দাস আযাদ এবং রোজার ক্ষেত্রে স্পর্শ করার পূর্বে কাফ্ফারা আদায় করার শর্ত আরোপ করেছেন; কিন্তু মিসকিনদেরকে খাদ্য দানের ক্ষেত্রে শর্তহীন রেখেছেন। সুতরাং তা হতে বুঝা যায় যে, খাদ্য দানের পূর্বে অথবা, খাদ্য দানের মধ্যে সহবাস করলে গুনাহগার হবে না। শেখ আলী ছায়েহ বলেছেন, কোনো কোনো লোক তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত বলে দাবি করেছেন; কিন্তু তা ভুল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর আসল অভিমত হলো, খাদ্য দানের পূর্বে বা খাদ্য দানের সময় সহবাস করলে গুনাহগার হবে। তবে তাকে পুনর্বার খাদ্য দান করতে হবে না। তা-ই জমহুর ফকীহদের অভিমত। –[আহকামুল কুরআন আলী ছায়েহ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ : ذٰلِكَ ইসমে ইশারা দ্বারা কাফ্ফারা সহজকরণ বা উপরিউক্ত সংক্রান্ত বিধানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফ্ফারা সংক্রান্ত এ বিধান এ জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো এবং তোমাদের জন্য যা বিধান হিসেবে দান করেছেন তা মেনে চলো। আর জাহিলিয়া যুগে তোমরা যা করতে তা পরিত্যাগ করো।

قَوْلُهُ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : تِلْكَ দ্বারা উল্লিখিত কাফ্ফারার বিধান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উল্লিখিত বিধান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং এ সীমানা লঙ্ঘন করো না। এসব সীমা লঙ্ঘনকারী কাফিরদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। এ আয়াতে এসব বিধান লঙ্ঘনকারীকে কাফির বলা হয়েছে ভয় প্রদর্শন ও কঠোর হুঁশিয়ারির নিমিত্তে।

কোন কার্য দ্বারা যিহার ভঙ্গ হবে? : এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে মূলত ইতঃপূর্বে হয়ে গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْىِٔ সহবাসের ইচ্ছা দ্বারা যিহার ভঙ্গ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী, কাতাদাহ (র.) -এর মতও তাই।

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْاِمْسَاكِ بِنُقْصَانٍ يُمْكِنُ مُفَارَقَتُهَا فِيْهِ অর্থাৎ এমন সময় পর্যন্ত স্ত্রীকে আটক করে রাখার ইচ্ছা করা যে সময়ের ভিতর স্ত্রী পৃথক থাকতে পারে। (তাফসীরে মাদারেক ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে يَحْصُلُ بِاسْتِبَاحَةِ اِسْتِمْتَاعِهَا (–সাবী) তাফসীরে যামানে এ মতে বর্ণিত হয়েছে যে,

يَحْصُلُ نَقْضُ الظِّهَارِ بِاِمْسَاكِهَا زَمَانًا يَقَعُ الْفُرْقَةُ وَفِى التَّفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ بِمُجَرَّدِ اِمْسَاكِهَا بِطَرِيْقِ الزَّوْجِ عَقِيْبَ الظِّهَارِ زَمَانًا يُمْكِنُهُ مُفَارَقَتُهَا فِيْهِ.

مَسّ অর্থ কি? তার পদ্ধতি কি? مَسّ-এর অর্থ সম্পর্কে কি মতভেদ রয়েছে? : উক্ত আয়াতে مَسّ -এর অর্থ হচ্ছে– ছোঁয়া, স্পর্শ করা, অঙ্গের সাথে অঙ্গ লাগানো ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, مَسّ-এর অর্থ وَطْى বা সহবাস করা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন [তাফসীরে মাদারিকে বর্ণিত–]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمُمَاسَّةُ الْاِسْتِمْتَاعُ بِهَا مِنْ جِمَاعٍ اَوْ لَمْسٍ اَوْ نَظْرٍ اِلٰى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَفِىْ رُوْحِ الْبَيَانِ عَلٰى قَوْلِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا اَىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّسْتَمْتِعَ كُلٌّ مِنَ الْمُظَاهِرِ وَالْمُظَاهَرِ مِنْهَا بِالْاٰخَرِ جِمَاعًا وَتَقْبِيْلًا وَلَمْسًا وَنَظْرًا اِلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ.

অর্থাৎ তাফসীরে মাদারেকের বর্ণনা মতে مَسّ-এর অর্থ স্ত্রী হতে সহবাস, স্পর্শ, অথবা তার লজ্জাস্থানের প্রতি লক্ষ্য করার দ্বারা স্বাদ উপভোগ করাকে مَسّ বলা হয়।

আর তাফসীরে রূহুল বয়ানের বর্ণনা মতে قَوْلُهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا-এর ব্যাখ্যা অংশে বলা হয়েছে مَسّ এর অর্থ– যিহারকারী ও যিহারকারিণী পরস্পর পরস্পর হতে সহবাস, চুম্বন, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছোঁয়া অথবা স্ত্রীর যৌনাঙ্গের প্রতি খাহেশের সাথে লক্ষ্য করা ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধ ভোগ করাকে مَسّ বলা হয়েছে। কেননা اَلْمَسُّ শব্দটি উক্ত সকল প্রক্রিয়াকে শামিল করে।

মিসকিনকে কিভাবে খাবার খাওয়াবে? : ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (র.)-এর মতানুসারে এক মুদ্দ পরিমাণ খাদ্য প্রতি মিসকিনকে দিলেই চলবে। কিন্তু কয়েকটি হাদীসের বর্ণনা সাপেক্ষে ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী ইমামগণের মতে অর্ধ সা' গম বা এক সা' যব অথবা খেজুর প্রতি মিসকিনকে দিলেই চলবে। জমহুরের মতে যদি একই দিন ষাট মিসকিন খাইয়ে দেওয়া হয় অথবা একজন করে ৬০ দিন ষাটজনকে খাইয়ে দেওয়া হয়, অথবা প্রতিদিন ১ জনকে ১ দিনের সমান খাদ্য দেওয়া হয় তাহলেও চলবে। (كَمَا فِىْ اٰيَةِ الْاَحْكَامِ)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে একই ব্যক্তিকে একই দিন ৬০ দিনের সমান খাদ্য দিয়ে দিলে জায়েজ হবে না। শাফেয়ীগণের মতে তাও শুদ্ধ হবে, যেভাবে কাপড় দেওয়া জায়েজ হবে। হানাফীগণের যুক্তি এই যে, اِطْعَامٌ শব্দের অর্থ– খাদ্য খাইয়ে দেওয়া। সুতরাং একজন মিসকিনকে ৬০ দিনের খাদ্য একত্রে খাওয়ানো কোনো মতেই সম্ভব নয়। তাই ৬০ দিনে ১ জনকে খাওয়ালে তা শুদ্ধ হবে। –[শরহে বেকায়াহ্ ও হেদায়া]

নেশাগ্রস্ত লোকের যিহার বর্তিত হবে কি? : নেশাগ্রস্ত হয়ে যিহার করলে অধিকাংশ ফিক্‌হবিদগণ ও চার ইমামের মতে তার যিহার কার্যকার হবে; কিন্তু নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি নেশা সম্বন্ধে জেনে-শুনে নেশাপানকারী হতে হবে এবং এমন ব্যক্তির তালাকও বর্তিত হবে। এর কারণ এই যে, সে নিজেই ইচ্ছাকৃত বেহুঁশ হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.)-এর মতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেওয়া যিহার ও তালাক ধর্তব্য নয়। রোগ অথবা পিপাসিত অবস্থায় নেশা ও মধ্যপান করার পর মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতেও তালাক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক মতেও তালাক হবে না।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, যেমন নেশা দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত হয় বটে তবে কি বলে অথবা কি করে তা সঠিকভাবে বলতে পারে তখন তার যিহার বর্তিত হবে না। অন্যথায় বর্তিত হবে।

মুসলিম ও জিম্মিদের যিহারে হুকুম কি? : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে কেবলমাত্র মুসলমানদের যিহার ধর্তব্য হতে পারে, জিম্মিদের জন্য এতদ সম্পর্কীয় কোনো বিষয় গণ্য হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বলেছেন–اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ অর্থাৎ আয়াতে মাত্র মুসলমানদেরকেই লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায় উক্ত বিষয়ে সম্বোধিত হবে না।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) -এর মতে মুসলমান ও জিম্মি উভয়ই যিহারের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, জিম্মিদের জন্য সাওম কার্যকর হবে না, বাকি দুই প্রকারের কাফ্‌ফারা তাদের দেওয়া আবশ্যক হবে।

যদি কয়েকবার যিহার করে তার হুকুম কি? : যদি কোনো স্ত্রীলোককে একই মজলিসে বা একাধিক মজলিসে একাধিকবার যিহার করা হয়; তবে প্রত্যেকবারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। তবে যিহারকারী যদি এ কথা বলে যে, আমার নিয়ত ছিল একবার যিহার করা; কিন্তু কথাটিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার জন্য একাধিকবার বলেছি এমতাবস্থায় একবার কাফ্‌ফারা আদায়ই যথেষ্ট হবে। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥. إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ يُخَالِفُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ كُبِتُوْا أُذِلُّوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِيْ مُخَالَفَتِهِمْ رُسُلَهُمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ط دَالَّةً عَلٰى صِدْقِ الرَّسُوْلِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ بِالْاٰيَاتِ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ إِهَانَةٍ.

৫. যারা বিরুদ্ধাচরণ করে বিরোধিতা করে আল্লাহ তা'আলা ও তার প্রেরিত রাসূলের, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে লাঞ্ছিত করা হবে। যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীগণকে তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলগণের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে। আর আমি স্পষ্ট নিদর্শনাবলি অবতীর্ণ করছি যা রাসূলের সত্যতার সাক্ষ্য বহনকারী। আর অস্বীকারকারীদের জন্য নিদর্শনাবলিতে রয়েছে অপমানকর শাস্তি হীন অপদস্থকারী।

٦. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط أَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

৬. সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে অবহিত করা হবে তদ্বিষয়ে যা তারা আমল করেছে। আল্লাহ তৎসমুদয়ই সংরক্ষণ করেছেন, যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় সম্যক দ্রষ্টা।

٧. أَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ بِعِلْمِهِ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

৭. তুমি কি দেখনি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই অবগত আছেন তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থজন হিসেবে বিরাজ করেন না। তাঁর অবহিতির মাধ্যমে। আর না পাঁচজনের মধ্যে, যাতে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না। তারা এতদপেক্ষা কম অথবা অধিক হোক, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিবেন, যা তারা আমল করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

٨. أَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ز هُمُ الْيَهُوْدُ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ مِنْ تَنَاجِيْهِمْ أَيْ تَحَدُّثِهِمْ سِرًّا نَاظِرِيْنَ إِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لِيُوْقِعُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرِّيْبَةَ.

৮. তুমি কি দেখ না তাকাও না তাদের প্রতি যাদেরকে গোপন পরামর্শ হতে বারণ করা হয়েছে। অতঃপর তারা তাই পুনরাবৃত্তি করে যা হতে তাদেরকে বারণ করা হয়েছে এবং তারা গোপন পরামর্শ করে পাপাচারিতা, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যচারিতা সম্পর্কে এরা হলো ইহুদি সম্প্রদায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এরূপ শলা-পরামর্শ করতে নিষেধ করেছেন, যা তারা মুসলমানদেরকে দেখিয়ে করত। এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তাতে মুসলমানগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُهُمْ اَلسَّامُ عَلَيْكَ اَيِ الْمَوْتُ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا هَلَّا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُوْلُ ط مِنَ التَّحِيَّةِ وَاِنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ اِنْ كَانَ نَبِيًّا حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِيَ.

তারা যখন আপনার নিকট আগমন করে, তখন তারা আপনাকে অভিবাদন করে হে রাসূল! এমন বাক্য দ্বারা, যা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি তা হলো তাদের কথিত اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ আস-সামু আলাইকুম। অর্থাৎ মৃত্যু আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তজ্জন্য কেন لَوْلَا শব্দটি هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত আল্লাহ আমাদেরক শাস্তি দেন না। এভাবে অভিবাদন করার কারণে। যদি সত্যই তিনি নবী হতেন, কাজেই বুঝা গেল তিনি নবী নন। তাদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত শাস্তি। যেথায় তারা নিক্ষিপ্ত হবে। বস্তুত তা নিকৃষ্টতম নিবাস তা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا يَكُوْنُ : সাধারণের কেরাত হলো يَكُوْنُ অর্থাৎ يَاء সহকারে। نَجْوٰى শব্দটি مُؤَنَّثْ হলেও يَكُوْنُ এবং نَجْوٰى-এর মধ্যে مِنْ থাকার কারণে يَكُوْنُ ক্রিয়াটা مُذَكَّرْ পঠিত হয়েছে। আবূ জা'ফর ইবনে কা'কা, আ'রাজ, আবূ হাইওয়া ও ঈসা مَا تَكُوْنُ অর্থাৎ تَاء সহকারে পড়েছেন।

وَلَا اَكْثَرَ শব্দে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জহমহুর اَكْثَرَ অর্থাৎ ثَاء এবং رَاء তে যবর দিয়ে পড়েছেন, আর যুহ্‌রী এবং ইকরামা اَكْبَرَ অর্থাৎ بَاء দ্বারা পড়েছেন।

قَوْلُهُ وَيَتَنَاجَوْنَ : হামযা, খালাফ, রুয়াইছ يَنْتَجُوْنَ অর্থাৎ يَفْتَعِلُوْنَ -এর ওজনে পড়েছেন। এ কেরাতকে আবদুল্লাহ এবং তাঁর সাথীগণ গ্রহণ করেছেন। অন্যারা وَيَتَنَاجَوْنَ অর্থাৎ يَتَفَاعَلُوْنَ -এর ওজনে পড়েছেন। আবূ ওবাইদ এবং আবূ হাতেম এ কেরাতকেই গ্রহণ করেছেন। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ : যাহহাক, মুজাহিদ এবং হোমাইদ وَمَعْصِيَاتِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ اَلِفْ সহকারে جَمْع পড়েছেন। আর জমহুর مَعْصِيَةِ অর্থাৎ مُفْرَدْ পড়েছেন। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "ثَلَاثَةٍ" : ফাররা'র মতে ثَلَاثَةٍ - نَجْوٰى- এর صِفَتْ হওয়ার কারণে অথবা نَجْوٰى-এর মুযাফ ইলাইহ হওয়ার কারণে مَكْسُوْر [যেরবিশিষ্ট] হবে। তবে কোনো فِعْل উহ্য মেনে مَفْتُوْح পড়লেও বৈধ হবে। ثَلَاثَةٌ -এর نَجْوٰى-এ স্থানের بَدَلْ হিসেবে رَفْع দেওয়াও বৈধ। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ خَمْسَةٍ : خَمْسَةً মানসূব। কারণ خَمْسَةً এখানে উহ্য ক্রিয়া يَدْعُوْنَ -এর فَاعِلْ - هُمْ হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب অর্থাৎ وَلَا يَتَنَجَوْنَ حَالَ كَوْنِهِمْ خَمْسَةً –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَلَا اَكْثَرَ : وَلَا اَكْثَرَ শব্দটি نَجْوٰى শব্দের উপর عَطْف করে مَكْسُوْر পাঠ হয়েছে। আবার অনেকেই مَحَلِّ نَجْو -এর উপর عَطْف করে مَرْفُوْع পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে যিহারের কাফ্‌ফারার আদেশ প্রদানের পাশাপাশি এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ সব হলো আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা, মু'মিন মাত্রই কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার বিধান মান্য করা। আর যারা তাঁর বিধান অমান্য করে তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে তাদের ভয়াবহ পরণতির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ ..... شَيْءٍ شَهِيْدٌ : পূর্ব বর্ণিত আয়াতে ইসলামের আহকামসমূহের অনুসরণ করার প্রতি তাকিদ ছিল। এ আয়াতসমূহে আল্লাহর নাফরমানদের শাস্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর ও সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্মের বিরোধিতা করে থাকে একদিন না একদিন অবশ্যই এমন বেইজ্জতী তাদেরকে ভোগ করতেই হবে যা বর্ণনা করার মতো নয়। এহেন বেআদবি করার কারণে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণও এভাবে অপমানজনক অবস্থায় জগত হতে চিরতরে নিধন হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে কতইনা সুন্দরভাবে ভালোমন্দের জ্ঞান দান করেছি। আমার একত্ববাদ ও রাসূলগণের রিসালাত দ্বারা তাদেরকে ভূষিত করেছি, তথাপিও তারা অসৎ পথ হতে ফিরে আসেনি; বরং নিজ নিজ নাফরমানির পথে অটল রয়েছে। তাই এ সকল দুরাচার কাফিরদের জন্য আমি অকল্যাণকর ও নিকৃষ্ট শাস্তি সাজিয়ে রেখেছি।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, যেদিন তাদের প্রত্যেককে কবর হতে পুনরুত্থান করে ময়দানে হাশরে একত্র করবো, অতঃপর তাদের এ সমস্ত নাফরমানির কার্যকলাপ সম্মুখে তুলে ধরবো, তখন তারা কি উত্তর দিবে? আমি তো তাদের সকল কৃতকর্ম তাদের আমলনামায় কিরামান-কাতেবীন দ্বারা লিখিয়ে রেখেছি। তারা সে সময় বুঝতে পারবে। তাদের ধারণা ছিল হয়তো আমি সব ভুলে গেছি। আসলে সকল বিষয়ই আমার নিকট রক্ষিত রয়েছে। তারা নিজের সকল কৃতকর্ম ভুলে গেছে। আল্লাহ তা'আলা ভুলতে পারেন না।

কারণ তিনি সর্ব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিকারী সর্বক্ষণে ও সর্বস্থানেই আল্লাহ উপস্থিত থাকেন। আর আল্লাহর সমীপে সব কিছু আয়নার ন্যায় উজ্জ্বল ও ভাসমান, যা অতীতে ঘটেছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে। সুতরাং এ আয়াত দু'টি দ্বারা আল্লাহ গাফেল ও অচেতন লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তারা সব কিছু ভুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ হলো, তারা সর্বদা ফিসক ও ফুজুরীর কাজ করতে থাকে, আর সেই কাজগুলো অচেতন অবস্থায় করতে থাকে। সকল নাফরমানির কার্যেই আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তির সুব্যবস্থা রয়েছে। কারণ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ আল্লাহ নাফরমানদেরকে ভালোবাসেন না। আর নাফরমানদের থেকে সর্বদা আল্লাহ বিমুখ হয়ে থাকেন। قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ –[মা'আরিফ, তাফসীরে আশরাফী]

قَوْلُهٗ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا (اَلْاٰيَةَ) : এ আয়াতের দু'টি অর্থ করা হয়েছে। **এক.** সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকেই [কাউকে বাদ না দিয়ে] পুনরুত্থিত করবেন। **দুই.** সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন। অর্থাৎ একই অবস্থায় সকলকে একত্রে উত্থিত করা হবে। অতঃপর তাদেরকে তাদের আমল সম্বন্ধে অবহিত করা হবে। তখন তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত আমলের হিসাব রেখেছেন। অথচ তারা নিজেরা সেসব আমল হতে অনেক কিছুই তুচ্ছ মনে করে ভুলে গেছে; কিন্তু আল্লাহ ভুলতে পারেন না। কারণ তিনি সর্বদ্রষ্টা, কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে থাকতে পারে না। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ كُبِتُوْا : كُبِتُوْا শব্দকে مُضَارِعْ ব্যবহার না করে مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ হলো– بِاِعْتِبَارِ مَا يَؤُوْلُ অথবা تَحَقُّقُ وُقُوْعٌ তথা ভবিষ্যতে যা বাস্তবায়ন লাভ করা আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী তা مُضَارِعْ-এর صِيْغَة দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এরূপ বহু ব্যবহার রয়েছে। যেমন– اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এসেছে তথা শাস্তি আসা অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব অবাধ্য লোকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। যারা পরকালকে ভুলে থাকে। আর অত্র আয়াতে রয়েছে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ। এ পর্যায়ে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নেই। মানুষ যত গোপনেই কোনো কাজ করুন না কেন এবং যত পরামর্শই করুন না কেন। সবই আল্লাহ তা'আলা দেখেন এবং শোনেন। –[নূরুল কোরআন]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের শানে নুযূল : উপরিউক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কয়েকটি ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. ওয়াহেদী বলেছেন, মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, মুনাফিক এবং ইহুদিরা একে অপরের সাথে কানাকানি করত। তারা মু'মিনদেরকে বুঝাত যে, তাদের ক্ষতি করার জন্য এ কানাকানি করা হচ্ছে। এ অবস্থাদৃষ্টে মু'মিনগণ পেরেশান হতো। ইহুদি এবং মুনাফিকদের এ জাতীয় কর্মকাণ্ড যখন বৃদ্ধি পেল, তখন মু'মিনগণ রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলেন। তখন রাসূল ﷺ মু'মিনদের সামনে কানাকানি না করতে নির্দেশ দিলেন; কিন্তু তারা তা শুনল না। আবার কানাকানি করতে আরম্ভ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টি অবতীর্ণ করলেন। –[আসবাবুন নুযূল]

২. মুকাতিল বলেছেন, রাসূল ﷺ এবং ইহুদিদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল; কিন্তু যখন তাদের পার্শ্ব দিয়ে কোনো মুসলমান চলত তখন তারা একে অপরের সাথে কানাকানি আরম্ভ করত, যাতে ঐ মু'মিন অকল্যাণের ভয় করে। এ অবস্থাদৃষ্টে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কানাকানি করতে নিষেধ করলেন; কিন্তু তারা এ নিষেধাজ্ঞা শুনল না। তখন এ আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হলো। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. ইবনে যাইদ বলেছেন, কোনো কোনো লোক রাসূল ﷺ -এর কাছে এসে নানা সমস্যার সমাধান চাইত এবং তাঁর সাথে কান পরামর্শ করত। তখন যুদ্ধ চলছিল। তা দেখে লোকেরা মনে করত যে, সে কোনো যুদ্ধ সম্বন্ধে বা বালা-মসিবত সম্বন্ধে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। এ কারণে তারা ভয় পেত। –[ফাতহুল কাদীর]

وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ আয়াতের শানে নুযূল : এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

১. হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন– একদা রাসূল ﷺ -এর নিকট কয়েকজন ইহুদি আসল। তখন তারা রাসূল ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলল– اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ (অর্থাৎ আবুল কাসেম তোমার মৃত্যু হোক) তখন হযরত আয়শা (রা.) বললেন, وَعَلَيْكُمُ السَّامُ অর্থাৎ 'এবং তোমাদেরও মৃত্যু হোক।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা আল্লাহ অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন না যে তারা বলছে اَلسَّامُ عَلَيْكَ 'তোমার মৃত্যু হোক'। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যে وَعَلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপরও বলছি, তা কি শুনতে পাওনি? তখন আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

–[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন মুনাফিকগণ রাসূল ﷺ -কে সালাম করত তখন তারা বলত 'আসসামু আলাইকা', অর্থাৎ 'তোমার মৃত্যু বা ধ্বংস আসুক। –[ইবনে কাছীর]

وَيَقُولُونَ ...... الْمَصِيرُ আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে কাছীর তার স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইমাম আহমদ (র.) -এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, ইহুদিগণ উল্লিখিত নিয়মে নবী করীম ﷺ -কে সালাম প্রদর্শন করে চুপে চুপে বলতে থাকত যে, لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ তখন মহান আল্লাহ وَيَقُولُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ ...... الْمَصِيرُ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। –[মা'আরেফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ .... وَمَا فِي الْاَرْضِ (الْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুই অবগত আছেন, তিন ব্যক্তির মনে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থজন হিসেবে বিরাজ করেন না। আর না পাঁচজনের মধ্যে যাতে তিনি ষষ্ঠজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না ...... অর্থাৎ হে জ্ঞানী শ্রোতা! তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা মহাবিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণু সম্পর্কে অবহিত। আসমান-জমিনের কোনো বস্তুই তাঁর কাছে গোপন নয়। গোপন এবং প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জানা। লোকেরা গোপনে যেসব কানপরামর্শ করে তা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সাথেই স্বজ্ঞানে উপস্থিত আছেন, তাদের অবস্থা ও আমল সম্বন্ধে তিনি অবহিত, তাদের অন্তরে যেসব ভাবনা-চিন্তার উদয় হয় সেসব সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত। বান্দার কোনো বিষয়ই তাঁর কাছে গোপন থাকে না। তিনি কিয়ামত দিবসে– তা ভালো হোক বা মন্দ হোক যেসব আমল করছে তা সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন এবং প্রতিদান দিবেন। –[সাফওয়া]

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত ইলম-এর আলোচনা দ্বারা আরম্ভ করেছেন, এ উক্তির মাধ্যমে اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ এবং এ আয়াত শেষও করেছেন ইলম -এর আলোচনার মাধ্যমে এ উক্তি দ্বারা اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ এ কথা বুঝবার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলার ইলম جُزْئِيَّاتٌ এবং كُلِّيَّاتٌ সব কিছুকে শামিল করে আছে। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। –[সাফওয়া]

ثَلَاثَة এবং خَمْسَة সংখ্যা দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : এ সংখ্যা দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার অনেক কারণ মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন–

১. সাধারণত কানাকানি তিনজন বা পাঁচজনের মধ্যেই হয়ে থাকে। এ কারণেই এ দু'টি সংখ্যার উল্লেখ করেছেন।

২. অথবা যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তার কোনোটি কানাকানিকারীর সংখ্যা ছিল তিনজন, আর কোনো কোনোটিতে সংখ্যা ছিল পাঁচজন, সে কারণেই বিশেষত এ দু'টি সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

৩. এ সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কামালে রহমতের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ যখন তিনজন লোক একত্রিত হয়, আর তাদের মধ্যে দু'জন কানাকানি আর গোপন পরামর্শে লেগে যায় তখন তৃতীয় ব্যক্তিটি একাকী থেকে যায়; এ অবস্থায় তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, اَنَا جَلِيْسُكَ وَاَنِيْسُكَ অর্থাৎ "আমি তোমার সাথে বসেছি এবং তোমার মনোতুষ্টির জন্য উপস্থিত রয়েছি।" ঠিক তেমনি যখন পাঁচজন একত্রিত হয় আর দু'জন দু'জন কানাকানি করতে থাকে, তখন পঞ্চমজন একাকী থেকে যায়; কিন্তু যখন চারজন একত্রিত হয় তখন কেউ একাকী থাকে না। সুতরাং এখানে এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, যে লোক সৃষ্টিজগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে একাকী রাখেন না। –[কাবীর]

৪. তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত এ ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে বেজোড় সংখ্যাই পছন্দনীয়। -[মা'আরেফুল কোরআন]

৫. বেজোড় সংখ্যা জোড় সংখ্যার চেয়ে উত্তম। কারণ আল্লাহ তা'আলা বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। এখানে বেজোড় সংখ্যার উল্লেখ করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, যে কোনো বিষয়ে তার প্রতি গুরুত্বদান অপরিহার্য।

৬. যে কোনো পরামর্শে অন্তত পক্ষে তিনজন থাকা উচিত, কারণ দু'জনের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তখন তৃতীয়জন ফয়সালাকারী হিসেবে যেন থাকতে পারেন। এভাবে যে কোনো পরামর্শে দলাদলি হয়ে গেলে তখন সেখানে একজন অতিরিক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন সে ফয়সালা করতে পারে। -[কাবীর]

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- إِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَا تَتَنَاجٰى رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى يَخْتَلِطُوْا الخ অর্থাৎ যেখানে তোমরা তিনজন একত্র হবে তখন তৃতীয়জনকে ছেড়ে দু'জনে চুপে চুপে কিছু বলবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ব্যক্তি এসে না পৌঁছে, কারণ এতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির অন্তরে ব্যথা জাগবে এবং তোমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিবে। অথবা তৃতীয় ব্যক্তি এমন কুধারণা করতে পারবে, তোমরা দু'জন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনা করছ, তাই চুপেচুপে তোমরা দু'জনে বলছ। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ : আল্লামা ইবনে কাছীর বলেছেন, অনেকেই এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবি করেছেন যে, এ আয়াতে اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে তাদের সাথে থাকেন বলে বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, আল্লাহর জ্ঞান সাথে থাকা। এ অর্থ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর শ্রবণ, আল্লাহর জ্ঞানের সাথে তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখছে। আল্লাহর সৃষ্টি তাদেরকে অবলোকন করছে। তাঁর সৃষ্টির কোনো বিষয় তাঁর কাছে গোপন নেই। তিনি সব কিছু সম্বন্ধে অবহিত। -[ইবনে কাছীর]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টি, শ্রবণ ও জ্ঞান-এর দিক দিয়ে সর্বাবস্থায় তাদেরকে সাথে রয়েছেন। তাদের কথা শুনেন জানেন এবং দেখেন। -[মা'আরেফুল কোরআন]

এ কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে আরশের উপর সমাসীন থাকা কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রমাণিত। কুরআনে বলা হয়েছে اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى "রাহমান আরশের উপর সমাসীন" এ আয়াতের ব্যাখ্যা চাওয়া হলে ইমাম মালিক (র.) উত্তরে বলেছেন, 'ইস্তাওয়ার অর্থ জ্ঞাত, কিভাবে তা অজ্ঞাত এবং তা সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত'। -[ফাতহুল বারী]

আবূ মুতী বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ঐ লোক সম্বন্ধে বলেছেন যে লোক বলেন যে, আমার রব আসমানে আছেন না জমিনে আছেন তা আমি জানি না, সে লোক কুফরি করেছে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى আর তাঁর আরশ সাত আসমানের উপর রয়েছেন।

আমি বললাম [আবূ মুতী] যা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন আছেন, তবে জানি না আরশ আসমানে না জমিনে? তখন তিনি বললেন, যে এ কথা বলে সে লোক কাফির। কারণ সে আরশ আসমানে হওয়াকে অস্বীকার করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইল্লিয়্যীনে রয়েছেন। তিনি উপর থেকেই ডাকেন, নিচে থেকে নয়।

-[আল-ফাতওয়া, আল-হামভিয়া, আল-কুবরা-২৮]

হাদীস শরীফে রূহ কবজ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন- حَتّٰى يَنْتَهِىْ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ الَّتِىْ فِيْهَا اللّٰهُ রূহকে নিয়ে যাওয়া হয় সে আসমান পর্যন্ত যেখানে আল্লাহ রয়েছেন।

-[মুসনাদে আহমদ]

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ .... لِمَا نُهُوْا عَنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি কি লক্ষ্য করেননি? ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যাদেরকে গোপনীয়ভাবে ইশারা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপরও গোপনে তারা ইশারায় কাজ হতে বিরত হয় না।

মুনাফিক সম্প্রদায় হুযূর ﷺ-এর মজলিসে আগমন করত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে ব্যথা জাগাবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসূলের বিপক্ষীয় সমালোচনা গোপনে করত। আল্লাহ তাদের নিকৃষ্ট ধারণাসমূহ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করে দিলেন।

উক্ত আয়াতে কানাঘুষাকারী লোকগণ সম্বন্ধে মুফাসসিরগণ মতানৈক্য করেছেন। কেউ বলেন মুনাফিকগণকেই আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ একদল কাফিরদের কথা বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম রাযী (র.) ইহুদিদের কথাই বর্ণনা করেছেন। কারণ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى দ্বারা যাদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাদেরকে লক্ষ্য করেই وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ বলেছেন। আর হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইহুদিগণ যখন হযরতের সমীপে আগমন করত। তখন সালাম শব্দের পরিবর্তে আসসাম শব্দ ব্যবহার করত, যার অর্থ মৃত্যু এবং প্রত্যুত্তরে হুযূর ﷺ তাদেরকে وَعَلَيْكُمْ বলে উত্তর দিতেন। ঘটনা চক্রে একদিন তারা এভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর সম্মুখে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ বললে হযরত আয়েশা (রা.) প্রতি উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَةُ اللّٰهِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ বলে উত্তর দিলেন। এরই অর্থ হলো– وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ সুতরাং আয়াতে ইহুদিগণই উদ্দেশ্য। –[কাবীর]

আর আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্যান্য নবীগণকে যে সকল শব্দ দ্বারা সালাম বাণী প্রেরণ করা হয়েছিল সেগুলো হলো سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ...... سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

قَوْلُهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ : আয়াতের এ অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এবং তারা গোপন পরামর্শ করে পাপাচারিতা, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যাচারিতা সম্পর্কে।'

অর্থাৎ তারা পরস্পর এমন সব কথা বলে থাকে যাতে রয়েছে পাপাচারিতা, সীমালঙ্ঘন ও রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচারিতা। কারণ তাদের কথাবার্তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও ধোঁকাবাজি সম্বন্ধে হয়ে থাকে। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা যখন তোমার নিকট আগমন করে তখন তারা তোমাকে অভিবাদন করে এমন বাক্য দ্বারা যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি।"

তাফসীরকারগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, ইহুদিরাই এ কাজ করত। তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আসত তখন রাসূলকে অভিবাদনের স্বরে বলত اَلسَّامُ عَلَيْكَ অর্থাৎ 'তোমার মৃত্যু হোক।' তারা উচ্চারণটা এভাবে করত যে, সাধারণ লোকের কাছে বাহ্যত তা সালামই শুনাত; কিন্তু তারা মূলত এ বাক্য দ্বারা মৃত্যুই কামনা করত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জবাবে বলতেন, عَلَيْكُمْ কোনো কোনো বর্ণনায় وَعَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'এবং তোমাদের উপরও' তাই হোক, যারা তোমরা আমার জন্য কামনা করেছ। –[কাবীর, কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, একজন ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণের কাছে আসল এবং বলল, আসসামু আলাইকুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, তোমরা জান কি এ লোক কি বলেছে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে এমন বলেছে, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। তখন সে লোকটাকে নিয়ে আসা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি আস্‌সামু আলাইকুম বলেছ? তখন সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে) বললেন, যখন আহলে কিতাবগণ তোমাদেরকে সালাম দিবে তখন তোমরা তার জবাবে বলবে, তোমাদের উপর তাই হোক যা তোমরা বলেছ। তখনই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন আয়াতটি। وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ –[কুরতুবী]

জিম্মিদের সালামের জবাব দানের নিয়ম : ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মুসলমানদের সালামের মতো জিম্মিদের সালামের জবাবদান ওয়াজিব কিনা, সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, শা'বী, কাতাদা ওয়াজিব বলে মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক ও ইবনে ওয়াহাব (র.) বলেছেন, ওয়াজিব নয়। তবে কেউ জবাব দিতে চাইলে সে জবাবে কেবল وَعَلَيْكَ বলবে। আবার কেউ কেউ اَلسَّلَامُ অর্থাৎ سِيْن -এ যের দিয়ে জবাব দিতে বলেছেন। অর্থাৎ তোমার উপর পাহাড় পড়ুক। ইমাম মালিক (র.)-এর মত মেনে চলা এ ক্ষেত্রে উত্তম, কারণ পবিত্র হাদীসে [উপরউক্ত] তার স্বীকৃতি রয়েছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيَقُوْلُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তজ্জন্য আল্লাহ কেন আমাদেরকে শাস্তি দেন না?" অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ ও যদি নবী হতেন তাহলে আমরা যা বলি তার জন্য আমাদেরকে আজাব দিতেন। তিনি সত্য নবী হলে আমাদেরকে আজাব দেওয়া হচ্ছে না কেন? বলা হয়েছে– তারা আশ্চর্য হয়ে বলত, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের অভিবাদনের জবাব দিয়ে বলেন, তোমাদেরও মৃত্যু হোক। তিনি যদি নবী হতেন তাহলে তাঁর দোয়া আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে কবুল হতো এবং আমরা মরে যেতাম। তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ অর্থাৎ "তাদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত শাস্তি।" পরকালে জাহান্নামে গিয়ে তারা এ কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করবে। আর সে জাহান্নাম হলো فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ নিকৃষ্টতম নিবাস। –[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

৯. হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা গোপনে পরামর্শ করবে তখন তোমরা গোপন পরামর্শ করো না পাপ কার্যে, সীমালজ্ঘনতায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অবাধ্যতা সম্পর্কীয়। আর গোপন পরামর্শ করো পুণ্য কার্যে ও আল্লাহভীতি সংক্রান্ত বিষয়ে, আর সেই আল্লাহকে ভয় করবে যার সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

١٠. اِنَّمَا النَّجْوٰى بِالْاِثْمِ وَنَحْوِهٖ مِنَ الشَّيْطٰنِ بِغُرُوْرِهٖ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ هُوَ بِضَارِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط اَىْ اِرَادَتِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

১০. ইত্যাকার কানাঘুষা পাপাচার ইত্যাদি বিষয় শয়তানের পক্ষ হতে হয়ে থাকে, তার প্রবঞ্চনায় হয়ে থাকে। মুসলমানদেরকে মনঃক্ষুণ্ণতায় ফেলতে পারে, বস্তুত সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত তাদের কোনোই ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়। অর্থাৎ আল্লাহর অনুমোদন ব্যতীত, আর আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভরশীল হওয়া উচিত মু'মিনগণের।

١١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا تَوَسَّعُوْا فِى الْمَجْلِسِ مَجْلِسِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوِ الذِّكْرِ حَتّٰى يَجْلِسَ مَنْ جَاءَكُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج فِى الْجَنَّةِ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا قُوْمُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَيْرَاتِ فَانْشُزُوْا وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الشِّيْنِ فِيْهِمَا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ بِالطَّاعَةِ فِىْ ذٰلِكَ وَيَرْفَعُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط فِى الْجَنَّةِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

১১. হে ঈমানদারগণ যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও প্রসারিত করো মজলিসে নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে, অথবা জিকিরের মজলিসে। যাতে পরবর্তী আগমনকারীগণ বসতে পারে। অপর এক কেরাতে مَجْلِسْ শব্দটি বহুবচনের সাথে مَجَالِسْ পঠিত হয়েছে। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন বেহেশতে আর যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, উঠে যাও নামাজের জন্য বা অন্যবিধ ভালো কাজের জন্য দাঁড়াও। তখন তোমরা উঠে যাও فَانْشُزُوْا শব্দটি অপর এক কেরাতে شِيْن -এর উপর পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন, যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছেন এ আদেশ পালনে আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে। আর মর্যাদায় সুমুন্নত করবেন তাদেরকে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তদ্বিষয়ে সম্যক অবহিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ : জমহুরের কেরাত হলো تَفَسَّحَ فِى الْمَجْلِسِ অর্থাৎ একবচনে। অসসুলামী, যার ইবনে হোবাইশ, আসেম تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ পড়েছেন। অর্থাৎ বহুবচন পড়েছেন। কাতাদাহ, হাসান, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ ও ঈসা ইবনে আমর تَفَسَّحُوْا-এর স্থানে تَفَاسَحُوْا পড়েছেন। —[কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

فَانْشُزُوا أُنْشُزُوا তে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : أُنْشُزُوا ও فَانْشُزُوا শব্দ দু'টির দু'টি কেরাত রয়েছে। নাফে, ইবনে ওমর ও আসেম أُنْشُزُوا ও فَانْشُزُوا অর্থাৎ شِيْن এ ضَمَّة দিয়ে পড়েছেন। অন্যরা উভয় স্থানে شِيْن -এর নিচে كَسْرَة দিয়ে اُنْشِزُوا ও فَانْشِزُوا পড়েছেন। তবে উভয় কেরাতের অর্থ হবে এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ উঠ। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ ইহুদি ও মুনাফিকদের ইসলাম বিরোধী কুপরামর্শের উল্লেখ ছিল। আর এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন প্রসঙ্গে কানাকানি ও গোপন পরামর্শ না করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর যদি কোনো পরামর্শ করতে হয় তবে তা যেন সৎকাজের জন্যই করা হয়।

উক্ত আয়াতের শানে নুযূল : উক্ত দু'টি আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মুনাফিক গোষ্ঠীর নীতি এই যে, সর্বদা তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন ও লোকসান পৌঁছানোর মানসে লেগেই থাকত। আর মুমিনগণের অনিষ্ট সাধনের পন্থা খুঁজে বেড়াত, বিশেষত তারা সর্বদা এ কল্পনায় ব্যস্ত থাকত যে, কোনো প্রসঙ্গে তথা কোনো বিশষ ভূমিকা পালন করলে মুসলমানগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সতীর্থ বর্জন করতে বাধ্য হবে এবং তারা নির্দেশ লঙ্ঘন করবে। তাদের এ সকল বিষয়ের কানাকানির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতগুলো নাজিল করে তাদের সকল গুপ্ত রহস্য উদঘাটন করে দিলেন।

قَوْلُهُ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ...... وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর তখন তোমরা পাপাচারিতা, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে গোপন পরামর্শ করো না।" অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের মধ্যে গোপন কথা বলবে তখন এমন কোনো কথা বলবে না যাতে পাপাচারিতা রয়েছে। যেমন মন্দ ও অশ্লীল কথা বলা বা অন্যের উপর অযথা সীমালঙ্ঘন করা অথবা রাসূলের বিরুদ্ধাচারিতা বা নাফরমানি করা। -[সাফওয়া]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন যে, 'স্পষ্টতই একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যেসব লোকের মন-মানসিকতা এখনো ইসলামি সংগঠনের প্রকৃতিতে পূর্ণভাবে গঠিত হয়নি; কোনো সমস্যা দেখা দিলে সে ব্যাপারে তারা আলোচনা, পরামর্শ করার জন্য তাদের নেতাদের হতে দূরে একত্রিত হতো। যা ইসলামি জামায়াতের এবং ইসলামি সংগঠনের নীতি-প্রকৃতির বিরোধী ও পরিপন্থি। সংগঠনের কাম্য হলো সমগ্র চিন্তা-ভাবনা এবং প্রস্তাবনা প্রথমেই নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করা এবং জামায়াতের মধ্যে পার্শ্ব বা উপদলের বিলোপ ঘটানো। এ কথাও স্পষ্ট যে, এসব উপদলের মধ্যে এমন অনেক কিছুই আলোচনা হতো যা ভাঙ্গন সৃষ্টির পথ খুলে দিত এবং ইসলামি দলের ক্ষতি করত। যদিও গোপন পরামর্শকারীদের অন্তরে ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু চলমান সমস্যার ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করাই হতো কোনো কোনো সময় ক্ষতির কারণ এবং আনুগত্যের পরিপন্থি।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্যে তাদের সে গুণাবলির উল্লেখ করেছেন, যা তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ .... اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ -এর তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কল্যাণ ও তাকওয়া বিষয়ে তোমরা পরামর্শ করো। আর তোমরা সে আল্লাহকে ভয় কর যার নিকট তোমরা সমাবিষ্ট হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন এবং তাঁর নিষেধ হতে বিরত থেকে মহান আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদের সকলকেই তার আমলের প্রতিদান দিবেন। -[সাফওয়া]

এ আয়াতে মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তখন অর্থ হবে, 'হে বাহ্যত ঈমানদারগণ, অথবা হে এমন সব লোকেরা যারা নিজেদেরকে ঈমানদার মনে করে থাক।'

আবার কেউ কেউ এ আয়াতে ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন, তখন অর্থ হবে, 'হে ঐ লোকেরা যারা হযরত মূসার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছ।'-তবে প্রথমোক্ত মত অর্থাৎ মু'মিনগণ উদ্দেশ্য হওয়াই উত্তম।

অতঃপর মুসলিম জামায়াত হতে পৃথক হয়ে কানাকানি, গোপন পরামর্শ না করবার জন্য তাদেরকে বলতে গিয়ে বলেছেন, মুসলিম জামায়াত হতে আলাদা হয়ে কানাকানি ও গোপন পরামর্শ করতে দেখলে মুসলমানদের অন্তর অশান্তি ও চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে এবং তার ফলে মুসলিম সমাজে অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর এ কাজটিই করার জন্য শয়তান তৎপরতা চালিয়ে যায়।

قَوْلُهُ اِنَّمَا النَّجْوٰى ...... فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, গোপন পরামর্শতো শয়তানের দ্বারা হয়ে থাকে- তাদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য যারা ঈমান আনয়ন করেছে। আর সক্ষম নয় তাদের কোনোই ক্ষতি সাধনে আল্লাহর অনুমোদন ব্যতিরেকে। আর আল্লাহর উপর নির্ভর করাই মু'মিনগণের কর্তব্য।

অর্থাৎ শয়তান মানুষদেরকে সে গোপন পরামর্শের দিকে প্ররোচিত করে যা মু'মিনদের দুশ্চিন্তা ও ভীতির কারণ হয়। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا এ অংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক.** গোপন পরামর্শ মু'মিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। **দুই.** শয়তান মু'মিনদের আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং মু'মিনদেরক উচিত কেবল আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখা। কারণ, যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সে কখনো ব্যর্থ হয় না। তার প্রচেষ্টা বাতিল হয় না। -[কাবীর]

হাদীস শরীফে- যেসব অবস্থায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, বিশ্বাস নড়বড়ে হতে পারে-সেসব অবস্থায় গোপন পরামর্শ না করতে বলা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, যেখানে তোমরা তিনজন একত্রিত হবে সেখানে দু'জন তৃতীয়জনকে ছেড়ে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরো লোক না আসবে। কারণ এতে সে লোক মনঃক্ষুণ্ন হবে।

এটাই হলো ইসলামের আদব এবং শিক্ষা। এ আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে। তবে যেখানে গোপনীয়তা রক্ষা করার মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বা কারো দোষ গোপন করা হবে সে ক্ষেত্রে গোপনে পরামর্শ করার মধ্যে কোনো দোষ বা বাধা নেই। -[যিলাল]

تَنَاجِي-এর হুকুম : যদি কোথাও মজলিসে তিনজন থাকে তখন সে সময় একজনকে পৃথক রেখে দু' জনকে কানাকানি করতে নিষেধ করে হুযূর ﷺ একটি হাদীস বর্ণনা করেন-

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ صَاحِبِهِمَا فَاِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ. (بُخَارِىْ ، مُسْلِمْ ، تِرْمِذِىْ)

কুরতুবী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি সাধারণত সর্ব অবস্থা ও সর্ব কালকে শামিল করেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.), ইমাম মালিক (র.) এবং জমহুর মুহাদ্দেসীনগণের মতে কোনো ফরজ কার্যে, ওয়াজিব ও মানদূব বা মোস্তাহাব কার্যেও যদি কানাঘুষা হয় তথাপিও সে ক্ষেত্রে মনে ব্যথা জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। আবার কেউ কেউ বলেন, উক্ত নির্দেশটি ইসলামের প্রথম যুগের জন্য ছিল, সে যুগে মুনাফিকগণ এ অবস্থায় কানাকানি করত। যখন ইসলামের প্রসারতা আসল তখন উক্ত অবস্থা দূরীভূত হয়ে গেল।

আর কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে উক্ত অবস্থা সফর কালে অথবা এমন স্থানে ঘটত যেখানে পরস্পর নিরাপত্তার অভাব ছিল।

قَوْلُهُ فَلَا تَتَنَاجَوْا : فَلَا تَتَنَاجَوْا-এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : فَلَاتَتَنَاجَوْا হলো সাধারণ কেরাত। তবে ইয়াহইয়া ইবনে ওচ্ছাব, আসেম ও রুয়াইছ فَلَا تَنَّاجَوْا পড়েছেন।

পূর্বের সাথে সম্পর্ক : পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন যা তাদের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদেরকে এমন সব কাজের নির্দেশ দান করেছেন যা তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও মহব্বত বৃদ্ধি করবে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করবে। -[সাফওয়া]

এ আয়াতের শানে নুযূল : অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

১. মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন সুফফায় ছিলেন। স্থানটি ছিল অপ্রশস্ত। রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসারী এবং মুহাজির সাহাবীদেরকে সম্মান করতেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কিছু সাহাবী সেখানে উপস্থিত হলেন। মজলিস আগে থেকে পরিপূর্ণ ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের জন্য জায়গা করে দিবেন এবং আশায় তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। এ অবস্থা দৃষ্টে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দাঁড়িয়ে থাকার কারণ বুঝতে পারলেন। এটা রাসূলের কাছে কষ্টকর ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বদরে অনুপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজনকে বললেন, অমুক অমুক উঠ। যতজন দাঁড়িয়ে ছিল ততজনকে উঠিয়ে দিলেন। যাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হলো তাদের মনঃক্ষুণ্ন হলো এবং তাদের মুখমণ্ডলে মনঃক্ষুণ্নের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলো। এ কারণেই মুনাফিকরা সমালোচনা করতে লাগল এবং বলতে লাগল তাদের ব্যাপারে ইনসাফ করা হয়নি। একদল লোক আগেই নিজেদের স্থান নিয়ে নিল এবং তারা [রাসূলের] কাছে বসতে চাইল; কিন্তু তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে যারা পরে আসল তাদেকে বসানো হলো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। -[কাবীর]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ আয়াত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে সাম্মাহ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন লোকেরা মজলিসে বসে পড়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে যেতে চাইলেন, কারণ তাঁর শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় দূর হতে তিনি শুনতে পেতেন না। তখন কোনো কোনো লোক তাঁর জন্য জায়গা প্রশস্ত করলে তিনি কাছে চলে গেলেন। তা কারো অপছন্দ হলো, যার ফলে উভয়ের মধ্যে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হলো এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর কথা শুনার জন্যই তিনি কাছে যেতে চান; কিন্তু অমুক লোক তার জন্য জায়গা ছেড়ে দেন না। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। -[কাবীর]

৩. ইবনে জারীর হযরত কাতাদাহ (র.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, লোকেরা নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতেন। আর সে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে অনেক লোক আসা যাওয়া করতেন। তাদের সম্পর্কে অত্র আয়াত নাজিল হয়েছে, কেননা হুযূর ﷺ-এর কাছে বসার আকাঙ্ক্ষা সকলেই করতেন, সকলেই আশা করতেন তাঁর বাণী শ্রবণ করতে এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতে। -[নূরুল কোরআন]

৪. আল্লামা বাগাবী (র.) ইকরামা এবং যাহ্হাক (র.) -এর সূত্রে লিখেছেন যে, আজান হওয়ার সাথে সাথে কিছু লোক নামাজের জন্য উঠতে দেরি করত, তখন وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا আয়াত নাজিল হয় তথা নামাজের জন্য যখন আজান হবে তখন উঠে দাঁড়াও। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ .... يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও মজলিসে তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করো, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন।" এ আয়াতে মুসলমানদেরকে মজলিসের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে- إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ অর্থাৎ 'যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও মজলিসের, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও।' এখানে যে মজলিসের কথা আছে সে মজলিস সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। হযরত কাতাদা, যাহ্হাক ও মুজাহিদ বলেছেন, লোকেরা রাসূল ﷺ-এর মজলিসের কাছে বসার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো, তখন তাদেকে অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত হাসান, ইয়াযীদ ইবনে আবূ হোবাইব (র.) বলেছেন, এখানে মজলিস মানে যুদ্ধের মজলিস। কারণ সাহাবীগণ যখন যুদ্ধের কাতারে অংশ গ্রহণ করতেন তখন শাহাদত লাভের আশায় প্রথম কাতারে ঠাসাঠাসি করতেন, একজন আরেকজনকে জায়গা প্রশস্ত করে দিতেন না। এ কারণেই তাদেরকে জায়গা প্রশস্ত করে দিতে বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এখানে মজলিস মানে জিকির ও ওয়াজের মাহফিল। শানে নুযূল হতে বুঝা যায় মজলিস মানে জুমার খুতবার মজলিস।

কুরতুবী বলেছেন, এ আয়াতের বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, যেসব মজলিসে মুসলমানগণ কল্যাণ এবং ছওয়াবের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় সেসব মজলিস এ আয়াতের শামিল। যে লোক আগে এসেছেন সে লোকই নিকটতম স্থনে বসার হকদার। তবে সে তার মুসলমান ভাইদের জন্য যতটুকু সম্ভব জায়গা প্রশস্ত করে দিবে। কারণ হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো লোক অপর কোনো লোককে তার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে সে স্থানে বসবে না; কিন্তু তোমরা একে অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করবে এবং খালি করে দিবে। -[বুখারী, মুসলিম, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন।' আল্লাহ কি প্রশস্ত করবেন তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। অতএব, রিজিক, কবর, জান্নাত, বক্ষ, জায়গা ইত্যাদি যেসব ক্ষেত্রে বান্দা প্রশস্ততা কামনা করে সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ত করতে পারেন। -[কাবীর]

এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, আয়াত হতে বুঝা যাচ্ছে যে, যেসব লোক আল্লাহর বান্দাদের জন্য আরাম এবং কল্যাণের পথ খুলে দিবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ প্রশস্ত করে দিবেন। কোনো জ্ঞানী লোকের জন্য এ আয়াতকে মজলিসের প্রশস্ততায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়; বরং আয়াতের অর্থ হলো মুসলমানদের কল্যাণ করা এবং তাদেরকে অন্তরে প্রশান্তি প্রদান করা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করবে।" -[কাবীর]

আয়াতে মজলিস দ্বারা কি উদ্দেশ্য? : আয়াত দ্বারা কোন মজলিস উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

হযরত, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদাহ (র.) বলেন, লোকজন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে গিয়ে তাঁর দেহ মুবারক-এর নিকটে বসতে চেষ্টা করত এমনকি তা নিয়ে প্রতিযোগিতাও চলত। তখন তাদেরকে একে অপরের জন্য সভামঞ্চে জায়গা প্রসার করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আবূ হোবাইব, ইয়াযীদ, হাসান (র.) বলেন, এ আয়াতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মজলিস উদ্দেশ্য। কারণ, হুযূর ﷺ-এর সাথীবৃন্দের অভ্যাস ছিল যখন যুদ্ধের ডাক আসত তখন মজলিস উপস্থিত হতো এবং সাহাবীগণ শাহাদত লাভের ইচ্ছায় মজলিসের প্রথম কাতারে থাকার জন্য ঠাসাঠাসি করতেন এবং একে অপরকে স্থান দিতে ইচ্ছুক হতেন না। তাই তাদেরকে জায়গা প্রশস্ত করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

আল্লামা জালাল উদ্দীন (র.) বলেন এখানে জিকির ও নামাজের মজলিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো জুমার নামাজের মজলিস।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত কুতুব রহমান (র.)-এর মতে উক্ত আয়াতে সাধারণ মজলিস উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুসলমানগণের যাবতীয় ধর্মীয় ও জাগতিক সর্ব প্রকার মজলিসকেই বুঝানো হয়েছে; সুতরাং যে অগ্রে আসবে সে পরবর্তী আগন্তুককে স্থান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে সরে যাবে। তাতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

মসনদে আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত- لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا (ابن كثير) অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার স্থান হতে উঠিয়ে দিয়ে সে যেন তথায় না বসে যায়; বরং তোমরা মজলিসের স্থান প্রসার করে দাও। -[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতেও আর একটি বর্ণনা রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন-

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ . لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

উক্ত হাদীসদ্বয় হতে প্রমাণিত হয় যে, বসা ব্যক্তিকে নিজ জায়গা হতে অন্য কেউ উঠানো জায়েজ নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ এভাবে করতে হবে যে, মজলিসের কর্তা অথবা পরিচালনাকারী যদি কাউকেও স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় তখন মজলিসের সম্মানার্থে তার সাথে বাড়াবাড়ি না করে নম্রতা ভদ্রতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে এবং কর্তার নির্দেশ পালন করতে হবে। কেননা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মজলিসের হিতার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয় আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করলে তখন হয়তো নাড়াচাড়া করতে হবে।

অথবা, কোনো গুপ্ত বিষয়ে মজলিসের বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলোচনার প্রয়োজন হলে নড়াচড়া করা ব্যতীত তা সমাধান করা সম্ভব নাও হতে পারে, এমতাবস্থায় উঠে জায়গা প্রসার করতে হবে। তবে সর্ব ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে, মজলিস পরিচালক অথবা কর্তার কর্তৃত্বের সময় নড়াচড়াকারী ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। অন্যথায় তা নাজায়েজ হবে।

اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا বক্তব্যের উদ্দেশ্য : এ বাক্যের তিনটি অর্থ হতে পারে- ১. প্রবেশকারীদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে যখন তোমাদেরকে উঠতে বলা হয় তখন উঠে যাও। ২. যখন তোমাদেরকে বলা হয় রাসূলের সম্মুখ হতে উঠে যাও, কথা দীর্ঘায়িত করো না তখন উঠে যাও। ৩. যখন তোমাদেরকে নামাজ, জিহাদ ও সমাজকল্যাণের কাজে এগিয়ে আসতে বলা হয় এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলা হয় তখন তার জন্য তোমরা অগ্রসর হও ও প্রস্তুতি গ্রহণ করো এবং তাতে অলসতা করো না। হযরত হযরত যাহহাক, ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, একদল লোক নামাজ পড়তে অলসতা করতে থাকে তখন তাদেরকে আজানের সাথে সাথে নামাজ আদায় করতে এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ .... الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করবেন যারা তোমাদের মধ্য হতে ঈমান আনয়ন করেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

অর্থাৎ যারা রাসূল ﷺ-এর কথা মেনে ঈমানের পরিচয় দেয় এবং যারা মু'মিনদের মধ্যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে ছওয়াব বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আলিমদের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, হে লোক সকল এ আয়াতের তাৎপর্য বুঝে নাও। জ্ঞানার্জনের প্রতি তোমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে মু'মিন আলিম সে মু'মিনকে- যে মু'মিন আলিম নয় তার উপর মর্যাদা দান করা হয়েছে।

কুরতুবী এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কাছে মর্যাদার মানদণ্ড হলো ইলম ও ঈমান, মজলিসের মধ্যে বসা নয়। -[সাফওয়া, কুরতুবী]

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আলিমদের উচ্চ মর্তবার যে ঘোষণা রয়েছে তার কারণ এই যে, আলিমদের ইলম দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়। তাদের অনুসরণ করে অন্যরা নেক আমল করে। কিন্তু যে মু'মিন আলিম নয়; তার দ্বারা এমন কাজ অকল্পনীয়। -[কাবীর]

تَفْسِيْرُ قَوْلِهٖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ : যারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ মেনে চলে, তাদের জন্য রয়েছে এতে সুসংবাদ। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের নেক আমলের ছওয়াব দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করে। তাদের জন্য রয়েছে এতে সতর্কবাণী। কেননা তাদের অবাধ্যতার কারণে তিনি তাদের শাস্তি বিধানও করতে পারেন। -[মাযহারী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

অনুবাদ :

١٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ اَرَدْتُّمْ مُنَاجَاتَهٗ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ قَبْلَهَا صَدَقَةً ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ط لِذُنُوْبِكُمْ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَا تَتَصَدَّقُوْنَ بِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ لِمُنَاجَاتِكُمْ رَّحِيْمٌ بِكُمْ يَعْنِيْ فَلَا عَلَيْكُمْ فِي الْمُنَاجَاتِ مِنْ غَيْرِ صَدَقَةٍ ثُمَّ نُسِخَ ذٰلِكَ بِقَوْلِهٖ .

১২. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে চুপিসারে কথা বলবে তাঁর সাথে গোপন আলোচনার ইচ্ছা করবে। তবে তোমাদের গোপন কথার পূর্বে সদকাকে অগ্রবর্তী করবে তৎপূর্বে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পরিশোধক তোমাদের পাপের জন্য। অনন্তর তোমরা যদি অক্ষম হও যা দ্বারা সদকা করবে তাতে তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল তোমাদের গোপন আলোচনার জন্য পরম দয়ালু তোমাদের প্রতি। অর্থাৎ তবে গোপন আলোচনার জন্য তোমাদের উপর সদকা ব্যতীত আর কিছু কর্তব্য নেই। অতঃপর পরবর্তী আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে।

١٣. ءَاَشْفَقْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَاِبْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَيْ اَخِفْتُمْ مِّنْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ ط لِلْفَقْرِ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا الصَّدَقَةَ وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ رَجَعَ بِكُمْ عَنْهَا فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اَيْ دُوْمُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

১৩. তোমরা কি কষ্টকর মনে কর এ শব্দটি উভয় হামযা বহাল রেখে, দ্বিতীয়টিকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত করে, দ্বিতীয় হামযাটিকে আলিফসহ, আলিফ ব্যতীত সহজ করে পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ তোমরা কি ভয় পাও? চুপিচুপি কথা বলার পূর্বে সদকা পেশ করার বাপারে দারিদ্র্যের কারণে। অনন্তর যখন তোমরা আদায় করতে পারলে না সদকা আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এ বিধান প্রত্যাহার করত সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো অর্থাৎ এ সকল বিধানের পাবন্দী করো। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٤. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا هُمُ الْمُنَافِقُوْنَ قَوْمًا هُمُ الْيَهُوْدُ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ اَيِ الْمُنَافِقُوْنَ مِّنْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا مِنْهُمْ مِنَ الْيَهُوْدِ بَلْ هُمْ مُذَبْذَبُوْنَ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ اَيْ قَوْلِهِمْ اِنَّهُمْ مُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُمْ كَاذِبُوْنَ فِيْهِ .

১৪. আপনি কি লক্ষ্য করেননি? তাকাননি? সে সমস্ত লোকদের প্রতি যারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে। তারা হলো মুনাফিক এমন সম্প্রদায়ের সাথে যারা ইহুদি সম্প্রদায়। ক্রোধান্বিত হয়েছেন আল্লাহ তাদের উপর, তারা নয় অর্থাৎ মুনাফিক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্য হতে অর্থাৎ ঈমানদারগণ হতে, আর নয় তাদের মধ্য হতেও অর্থাৎ ইহুদি সম্প্রদায় হতে; বরং তারা দোদুল্যমান। আর তারা শপথ করে বসে মিথ্যার উপর অর্থাৎ তাদের উক্তি এমন যে, অবশ্যই তারা মু'মিন, অথচ তারা জানে যে, অবশ্যই তারা তাদের এ উক্তিতে মিথ্যাবাদী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٥. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ط اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِيْ .

১৫. ব্যবস্থা করে রেখেছেন আল্লাহ তাদের জন্য শাস্তি কঠিনভাবে অবশ্যই যা তারা করছিল তা অত্যন্ত নিকৃষ্টতম। গুনাহের কার্য হতে।

١٦. اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً سِتْرًا عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ فَصَدُّوْا بِهَا الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَيِ الْجِهَادِ فِيْهِمْ بِقَتْلِهِمْ وَاَخْذِ اَمْوَالِهِمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ذُوْ اِهَانَةٍ

১৬. তারা বানিয়ে রেখেছে তাদের শপথ শব্দগুলোকে ঢাল স্বরূপ। তাদের নিজেদের জীবন ও সম্পদসমূহের রক্ষার্থে, অতঃপর বিরত রাখে, তা দ্বারা ঈমানদারগণকে আল্লাহর পথ হতে, তাদের বিপক্ষে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের দ্বারা, অতএব, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। লজ্জাজনক।

١٧. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ شَيْئًا ط مِنَ الْاِغْنَاءِ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

১৭. কখনো তাদের কোনো কাজে আসবে না তাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ হতে আল্লাহর শাস্তি হতে সামান্যতমও যে কোনো প্রকার উপকার, তারাই দোজখী, তারা তথায় চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ : مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ এ جُمْلَه টি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلَّ نَصْب -এর স্থানে অবস্থিত। অথবা এ جُمْلَه টিকে جُمْلَة مُسْتَانِفَة বলতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِب : এ বাক্যটি تَوَلَّوْا قَوْمًا -এর উপর عَطْف হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : وهم يعلمون বাক্যটি حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب অর্থাৎ অবস্থা এই যে, তারা যে মিথ্যা ও বাতিল কসম করছে, সে সম্পর্কে তারা অবহিত।

قَوْلُهُ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ : জমহুর اَيْمَانَهُمْ অর্থাৎ أ তে فَتْح দিয়ে يَمِيْن-এর جَمْع করে পড়েছেন। তবে হাসান ও আবুল আলীয়া اِيْمَانَهُمْ অর্থাৎ أ তে كَسْرَة দিয়ে পড়েছেন। তখন অর্থ হবে- তারা তাদের বাহ্যত ঈমানকে তাদের হত্যার মোকাবিলায় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। সুতরাং হত্যার ভয়ে তাদের জবান ঈমান এনেছে; কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনয়ন করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : মুনাফিকরা রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে নিজেদেরকে তাঁর একান্ত আপন এবং অতি অন্তরঙ্গ বলে প্রকাশ করার অসৎ উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ -এর সাথে পরামর্শ করত। তাঁর কানে কানে কথা বলার চেষ্টা করত। তারা যে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট এ কথা প্রকাশ করতেই তারা এমন তৎপরতা দেখাত। এভাবে হযরত নবী করীম ﷺ-এর অনেক কাজের ক্ষতি হতো। অনেক লোক তাঁর দরবার থেকে বঞ্চিত হতো, ফলে মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করে রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে কোনো পরামর্শ করার পূর্বে আল্লাহর রাহে দান-সদকা করার আদেশ দেওয়া হলো। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... نَجْوٰىكُمْ صَدَقَتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা রাসূলের সাথে চুপিসারে কথা বলবে তবে তোমাদের গোপন কথার পূর্বে সদকাকে অগ্রবর্তী করবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ নির্দেশের কারণ ছিল তাই যে, মুসলমানরা আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুব বেশি প্রশ্ন করতে লাগলেন, যার ফলে রাসূলের কষ্ট হচ্ছিল। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের এ বোঝা হালকা করার নিমিত্তে এ নির্দেশ প্রদান করলেন। -[ইবনে জারীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, এ নির্দেশের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। ফকির-মিসকিনদের লাভের ব্যবস্থা, মুনাফিক ও মুখলেসের মধ্যে এবং দুনিয়া পূজারী ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থীর মধ্যে পার্থক্যকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটাই তোমাদের জন্য উত্তম ও পরিশোধক।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চুপিসারে আলোচনা করার পূর্বে সদকা দান তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে অতি উত্তম কাজ। কারণ তাতে আল্লাহর নির্দেশ পালন রয়েছে, যা গুনাহ মাফ হওয়ার কারণ। তবে 'এ নির্দেশ পালন তোমাদের জন্য উত্তম ও পরিশোধক' এ কথা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ নির্দেশ পালন করা মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কারণ ওয়াজিব হলে উত্তম ও পরিশোধক না বলে শাস্তির কথা বলা হতো। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا .... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অনন্তর তোমরা যদি অক্ষম হও তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ দান করার মতো কিছু তোমাদের কাছে না থাকলে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি এ নির্দেশ জারি করেছেন সক্ষমদের উদ্দেশ্যে মোস্তাহাব হিসেবে। সুতরাং সদকাবিহীন চুপিসারে অসামর্থ্যরা কথা বলতে পারবে। -[সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ -এর তাফসীর : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, উক্ত বর্ণিত পন্থাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা। অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে গোপনে আলোচনা করতে হলে পূর্বশর্ত হিসেবে তোমরা তাঁর নিকট সদকা পেশ করতে হবে। এতে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও রাসূলে কারীম ﷺ-এর অনুসরণ রয়েছে। -সাবী]

মুফাসসির (র.) বলেন, উক্ত নির্দেশ পালনের দ্বারা গুনাহসমূহ (সগীরাহ) মাফ হয়ে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَلصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ অর্থাৎ সদকা দ্বারা আল্লাহ গোসসা ও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। উক্ত আয়াত দ্বারা সদকা ফরজ বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না; বরং ইঙ্গিত স্বরূপ বুঝা যায় তা মোস্তাহাব হবে। ফরজ বা ওয়াজিব যদি হতো তবে তা লঙ্ঘনের কারণে শাস্তির কথা উল্লেখ থাকত।

قَوْلُهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, যারা চুপিসারে কথা বলতে চায় অথচ সদকা পেশ করতে অক্ষম হয়ে রয়েছে। তাদের জন্য বিনা সদকা-এর মাধ্যমেও (বিশেষ প্রয়োজনে) কথা বললে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করবেন, অথবা তৎপরবর্তী আয়াত দ্বারাও বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। -[সাবী]

কানাঘুষার পূর্বে সদকা দানের নির্দেশ কত দিন বহাল ছিল? : চুপে চুপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলার পূর্বে সদকা প্রদানের নির্দেশের সময়সীমা সম্বন্ধে বিভিন্ন মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, মাত্র এক দিনের চেয়েও স্বল্প সময় উক্ত নির্দেশ বহাল ছিল।

হযরত মুতাকিল ইবনে ইয়াহইয়া (র.) বলেন, উক্ত নির্দেশ দশ দিন পর্যন্ত বহাল ছিল, অতঃপর মানসূখ হয়ে গেছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের বর্ণনা মতে দশদিনের মেয়াদটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

قَوْلُهُ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا .... صَدَقٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা কি কষ্টকর মনে কর চুপিচুপি কথা বলার আগে সদকা পেশ করার ব্যাপারে। এখানে মু'মিনদেরকে নরম ও দয়ার্দ্র ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চুপিচুপি কথা বলার পূর্বে সদকা করলে দরিদ্র হবে বলে ভয় কর? তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিজিক দান করবেন। তিনি ধনী, আসমান-জমিনের ধনের ভাণ্ডার তাঁর হাতেই রয়েছে। -[সাফওয়া]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য সহজ করবার নিমিত্তে এ হুকুম রহিত করে বলেন,

فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

অর্থাৎ অনন্তর যখন তোমরা আদায় করতে পারলে না সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো।

অর্থাৎ যখন তোমরা সদকা আদায় করতে পারলে না তখন তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ রাসূলের সাথে চুপিসারে সদকা না দিয়ে কথা বলবার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে মনে রাখবে যে, তোমাদের উপর ফরজকৃত নামাজ ও যাকাত তোমাদেরকে অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এই হুকুম নিজ বান্দাদের বোঝা হালকা করবার নিমিত্তে রহিত করেছেন। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, একদিনের একাংশ কেবল এ বিধান প্রবর্তিত করা হয়েছিল অতঃপর রহিত করা হয়েছে। -[সাফওয়া]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উক্ত আয়াতের উপর হযরত আলী (রা.)-এর আমল : মুজাহিদ (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর সাথে কথা বলার পূর্ব দান-খয়রাত করার হুকুম যখন নাজিল হলো তখন হযরত আলী (রা.) ব্যতীত আর কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে পারে না। একমাত্র হযরত আলী (রা.) এক দিনার দান করে কিছু কথা বলেছেন। এরপর আলোচ্য আয়াতের হুকুম মানসূখ হয় এবং সাধারণভাবে কথা বলার অনুমতি হয়। এ জন্য হযরত আলী (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে– যার উপর আমার পূর্বে কেউ আমল করেনি এবং পরেও কেউ আমল করতে পারবে না। আর তা হলো আলোচ্য আয়াত। –[নূরুল কোরআন]

পূর্বাপর যোগসূত্র : এখান হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন যারা আল্লাহর শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা অন্য যে কোনো প্রকার কাফেরের সাথে কোনো মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েজ নয়। কেননা মু'মিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর মহব্বত। কাফের আল্লাহর দুশমন। যার অন্তরে কারো প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব রয়েছে তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণে কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে; কিন্তু এ সব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথেই সম্পর্কিত।

কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার-সহানুভূতি-শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে শামিল নয়। সুতরাং তা কাফেরদের সাথেও করা যাবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ..... وَهُمْ يَعْلَمُونَ-এর শানে নুযূল : এর শানে নুযূল সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. বর্ণিত আছে যে, কিছু সংখ্যক মুনাফিক গুপ্তভাবে ইহুদিগণের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল এবং মুসলমানদের মজলিসে বসে তাদের আলোচনার রহস্য ও গুপ্ত বিষয়াদি ইহুদিগণের নিকট গিয়ে বলে দিত। যাদি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণের কেউ তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করত তখন তারা ঈমান জাহির করত ও এ সম্পর্কে মিথ্যাভাবে হাজার বার শপথ করত ও কুটিলতা করত না। আর বলত আমরা তো তোমাদের মতোই মুসলমান। সুতরাং আল্লাহ তাদের প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[মাদারেক]

২. অন্যান্য রেওয়ায়াত মোতাবেক বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, আবদুল্লাহ ইবনে নাবতাল ও তার সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের সাথে বসাছিলেন। হঠাৎ হুযূর ﷺ বললেন, এখন তোমাদের নিকট এক নিষ্ঠুর ও শয়তান ব্যক্তি আসবে। তার কিছুক্ষণ পর 'নাবতাল' আসল। সে ছিল দেহাবয়ব বেঁটে ও গোধুম বর্ণ, হানফাশ্রুমণ্ডিত নীলাভ চক্ষু বিশিষ্ট। তাকে হুযূর ﷺ প্রশ্ন করলেন যে, তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন? তখন সে এবং তার সঙ্গীগণ মিথ্যা শপথ করে বলল, আমরা এটা বলিনি; আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদের প্রসঙ্গে মিথ্যা শপথ করার ব্যাপারটি ভেঙ্গে সত্যতা প্রকাশ করে দিলেন। –[তাফসীর কাবীর, কুরতুবী]

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ ...... خَٰلِدُونَ -এর শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (রা.) বলেন, মুনাফিকগণ মনে করে কিয়ামত দিবসে সে কেবল মুক্তি পাবে। এ কথা সত্য হলে আমরাই হতভাগ্য হবো, যদি কিয়ামত সত্যই সংঘটিত হয়। আল্লাহর কসম করে আমরা বলছি যে, কিয়ামতের দিবসে কেবল আমরাই আমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা মুক্তি পাবো আর অন্য কেউই নয়। তাদের এ বলাবলির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতখানি অবতীর্ণ করেন। –[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ أَلَمْ تَرَ .... اللّٰهُ عَلَيْهِمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আপনি কি তাদের দেখেননি? যারা বন্ধুত্ব করে সে সম্প্রদায়ের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রুষ্ট হয়েছেন।'

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ বলেছেন, মুনাফিকরা ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। তারা মুসলমানদের বিভিন্ন খবর ইহুদিদের কাছে সরবরাহ করত। ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, মুনাফিকরা ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করত। ইহুদিরাই হলো সে সম্প্রদায় যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা রুষ্ট হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ "ইহুদিরা হলো সে সম্প্রদায় যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন এবং যাদের উপর রুষ্ট হয়েছেন।" মুনাফিকরা ইহুদিদের কাছে মু'মিনদের খবরা-খবর সরবরাহ করত। –[কাবীর]

قَوْلُهُ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা নয় তোমাদের দলভুক্ত এবং না তাদের দলভুক্ত।" অর্থাৎ এ সমস্ত মুনাফিকগণ না মু'মিনদের দলভুক্ত আর না ইহুদিদের দলভুক্ত। বরঞ্চ তারা দোদুল্যমান অবস্থায়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অপর এক আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলেছেন- مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ শা'বী বলেছেন, তারা না নিষ্ঠাবান মু'মিনদের দলভুক্ত আর না নিষ্ঠাবান কাফিরদের দলভুক্ত। কোনো দলের সাথেই তাদের ভালো সম্পর্ক নেই।

قَوْلُهُ وَيَحْلِفُوْنَ ...... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তারা মিথ্যা শপথ করে অথচ তারা নিজেরাও জানে", অর্থাৎ তারা যে আল্লাহর নামে শপথ করেছে তা যে মিথ্যা তা তাদের জানা, তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে।

এ মিথ্যার অর্থ কি? : এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বলেছেন, হয়তো বা তারা এ কথা বলে মিথ্যা শপথ করত যে তারা মু'মিন। অথবা তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ﷺ -কে গালি দিত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। যখন তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা এ রকম করেছ, তখন তারা তাদের প্রাণের ভয়ে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে বলত যে, আমরা এমন বলিনি–করিনি। এ হলো সে মিথ্যা যা সম্বন্ধে তারা শপথ করত। –[কাবীর]

قَوْلُهُ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ ...... مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সুকঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে তা অতিশয় মন্দ।" এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, কোনো কোনো মুহাক্কিক আলিমের মতে সুকঠিন শাস্তির মানে কবরের আজাব। তবে আল্লামা ছাবূনী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিফাকের কারণে তাদের জন্য জাহান্নামের নিম্নতম স্থানে অতীব কষ্টকর ও কঠোর আজাব প্রস্তুত রেখেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন- اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

قَوْلُهُ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ ...... سَبِيْلِ اللّٰهِ الْاٰيَة : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাঁরা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, এভাবে তারা নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে, অনন্তর তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।" এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে জিন্নি বলেছেন, এখানে উহ্য রয়েছে অর্থাৎ-

اَىْ اِتَّخَذُوْا اِظْهَارَ اِيْمَانِهِمْ جُنَّةً عَنْ ظُهُوْرِ نِفَاقِهِمْ وَكَيْدِهِمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ তারা তাদের নিফাক ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হওয়ার পথে তাদের প্রকাশ্য শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অথবা, আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুসলমানগণ যেন তাদেরকে হত্যা করতে না পারে সে জন্য তারা তাদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। যখনই তাদের প্রাণের ভয় দূর হয় তখন তারা ইসলামকে নিষিদ্ধ করে ও মানুষের অন্তরে ইসলাম সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে।

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। ইমাম রাযী (র.) বলেন, পরকালে তাদের অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا -এর কবরের শাস্তির কথা বলেছিলাম, আর এখানে পরকালের শাস্তির কথা বলছি, যাতে تَكْرَارْ না হয়। আবার কোনো কোনো লোক উভয় স্থানে আজাবের অর্থ পরকালের আজাব বলে দাবি করেছেন। তখন তা হবে কুরআনের এ আয়াতের মতো যাতে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ.

আল্লামা কুরতুবী বলেন, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে হত্যা এবং আজাব দ্বারা উভয় স্থানে অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকরা তাদের মিথ্যা শপথকে তাদের ধন-সম্পত্তি ও আত্মরক্ষার ঢাল এবং অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করছে। মুসলমানদের ছদ্মবেশে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করত অন্যান্যদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধাও প্রদান করছে বটে। কিন্তু তাদের এ দু-মুখো অভিনয় কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে তাদের কোনো কাজেই আসবে না। তাদের বিষয়-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তখন তাদের কিছু মাত্রও উপকার করতেও পারবে না; বরং চিরকালই দোজখে অবস্থান করতে হবে। তথা হতে কখনো বের হওয়া সক্ষম হবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ শাস্তি হলো কবরের আজাব। এর কারণ এই যে, মুনাফিকরা মুখে ঈমানের দাবিদার ছিল। প্রকাশ্যে তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করলেও তাদের অন্তর ছিল কাফেরদের সাথে। তাদের বন্ধুত্ব ছিল আল্লাহ তা'আলার গজবে পতিত, চির অভিশপ্ত ইহুদি জাতির সাথে। অথচ মুসলমানদের নিকট তারা শপথ করে বলত, আমরা তো মুসলমান। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

১৮. اُذْكُرْ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ اَنَّهُمْ مُؤْمِنُوْنَ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ط مِنْ نَفْعِ حَلْفِهِمْ فِى الْاٰخِرَةِ كَالدُّنْيَا اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ـ

১৮. স্মরণ করুন যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে। তখন তারা তাঁর নিকট শপথ করবে যে, তারা মু'মিন। যেমন তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করে যে, তারা উপকৃত হবে তাদের শপথের দ্বারা ইহজগতের ন্যায় উপকৃত হবে। সাবধান! এরাই তো মিথ্যাবাদী।

১৯. اِسْتَحْوَذَ اِسْتَوْلٰى عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ بِطَاعَتِهِمْ لَهٗ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰۤئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَتْبَاعُهٗ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

১৯. তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে প্রাধান্য সৃষ্টি করেছে শয়তান তারা শয়তানের আনুগত্য করার ফলে ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দল তার অনুসারী। সাবধান! শয়ানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

২০. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ يُخَالِفُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰۤئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ الْمَغْلُوْبِيْنَ ـ

২০. নিশ্চয় যারা বিরুদ্ধাচরণ করে বিরোধিতা করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের। তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে পরাজিতগণের।

২১. كَتَبَ اللّٰهُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اَوْ قَضٰى لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ ط بِالْحُجَّةِ اَوِ السَّيْفِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ـ

২১. আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন লাওহে মাহফূযে অথবা সিদ্ধান্ত করেছেন। অবশ্যই বিজয়ী হবো আমি এবং আমার রাসূল দলিল প্রমাণ দ্বারা অথবা তরবারি দ্বারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী।

২২. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ يُصَادِقُوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْآ اَيِ الْمُحَادُّوْنَ اٰبَآءَهُمْ اَيِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ بَلْ يَقْصِدُوْنَهُمْ بِالسُّوْءِ وَيُقَاتِلُوْنَهُمْ عَلَى الْاِيْمَانِ كَمَا وَقَعَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (رض) ـ

২২. তুমি পাবে না এমন কোনো সম্প্রদায় যারা আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাতে বিশ্বাসী যে, তারা বন্ধু মনে করে ভালোবাসে তাদের যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। যদিও তারা বিরুদ্ধাচারীগণ তাদের পিতা অর্থাৎ মু'মিনদের। অথবা তাদের পুত্র বা তাদের ভ্রাতা কিংবা তাদের গোত্র বরং তারা ঈমানের আলোকে তাদের ধ্বংস কামনা করে এবং তাদের হত্যা করতে বদ্ধপরিকর থাকে। যেমন সাহাবায়ে কেরামের অনেকে এরূপ করে দেখিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَا يُوَادُّونَهُمْ كَتَبَ أَثْبَتَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ بِنُورٍ مِّنْهُ ط تَعَالَىٰ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهِ وَرَضُوا عَنْهُ ط بِثَوَابِهِ أُولَـٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ط يَتَّبِعُونَ أَمْرَهُ وَيَجْتَنِبُونَ نَهْيَهُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْفَائِزُونَ.

অনুবাদ : তারাই যারা তাদের ভালোবাসে না, সে সকল লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা সুদৃঢ় করেছেন স্থিতিশীল করেছেন ঈমানকে এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন রূহের দ্বারা জ্যোতি দ্বারা তাঁর পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা। আর তিনি তাদেরকে প্রবিষ্ট করবেন বেহেশতে, যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁর আনুগত্যের কারণে। আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তাঁর পক্ষ হতে প্রদত্ত প্রতিদানে। এরাই আল্লাহর দল। তারা তাঁর আদেশ মান্য করে এবং তাঁর নিষেধ হতে বেঁচে থাকে। জেনে রেখো! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে কৃতকার্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ .... هُمُ الْكَاذِبُونَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে। তখন তারা তাঁর নিকট শপথ করবে, যেমন তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করে যে, তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী।" অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের জন্য কেয়ামত দিবসে যখন মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থিত করবেন তখন তারা দুনিয়াতে তোমাদের সামনেও যেমন মিথ্যা শপথ করে তেমনি আল্লাহর সামনেও মিথ্যা শপথ করে বলবে وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমরা মুশরিক ছিলাম না।" আর তারা মনে করবে যেমনি দুনিয়াতে মিথ্যা শপথ দ্বারা তাদের প্রাণ রক্ষা করেছে তেমনি আখেরাতেও আল্লাহর আজাব ও শাস্তি হতে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

আবূ হাইয়ান বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে, এ মুনাফিকরা কিভাবে মনে করল যে, তাদের কুফরি عَلَّامُ الْغُيُوبِ আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে। তারা কিভাবে আল্লাহ তা'লাকে মু'মিনদের মতো ভাবতে পারল যে, মু'মিনগণ যেমন তাদের কুফরি আর নিফাক সম্বন্ধে অনবহিত আল্লাহ তা'আলাও তেমনি অনবহিত। মোদ্দাকথা হলো তারা মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই দুনিয়াতে যেমন তাদের মুখ হতে মিথ্যা বের হয়ে পড়ে তেমনি আখেরাতেও তাদের মুখ হতে মিথ্যা বের হয়ে পড়বে। তারা এত বড় মিথ্যাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলার সামনে পর্যন্ত মিথ্যা বলতে সাহস করবে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ .... فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে শয়তান। ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল, সাবধান! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ শয়তান কুপ্ররোচণা দিয়ে দুনিয়ায় তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। মুফাজ্জেল বলেছেন, তাদেরকে আবেষ্টিত করে রেখেছে। فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ অর্থাৎ ফলে তাদেরকে আল্লাহর জিকির [স্মরণ] ভুলিয়ে দিয়েছেন। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, যিকরুল্লাহ মানে আল্লাহর আনুগত্যকরণ সম্বলিত নির্দেশাবলি। কথিত আছে [এখানে] আল্লাহর নাফরমানি না করার জন্য দেওয়া হুঁশিয়ারী। أُولَـٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ তারা শয়তানের দল, মানে শয়তানের অনুগত ও সহচর। সাবধান! শয়াতনের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তারা শয়তানের আনুগত্য করে জান্নাত হারিয়েছে এবং নিজেদের জন্য চিরতরে দোজখের আজাবকে আবশ্যক করে নিয়েছে। সুতরাং তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ ..... فِي الْأَذَلِّينَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে।

এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সাবূনী বলেছেন, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারাই আল্লাহর রহমত হতে দূরে থাকার কারণে লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে। -[সাফওয়া]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, উপরে শয়তানের দলকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে। এখানে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ। এ বিরুদ্ধাচরণের ফলে তারা সর্বযুগের সর্বস্থানে অধিক লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সেহেতু আল্লাহর বিরোধীরা সীমাহীন লাঞ্ছনার ভাগী হবে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ كَتَبَ اللّٰهُ .... قَوِيٌّ عَزِيْزٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন, অবশ্যই বিজয়ী হব আমি এবং আমার রাসূল ﷺ। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

মুনাফিকগণ মনে করত যে ইহুদিরা একটা বিরাট শক্তি। সে জন্য তারা ইহুদিদের কাছে এসে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করত। নানান বিষয়ে তাদের পরামর্শ চাইত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিরাশ করে এখানে ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহর দুশমনদের জন্য আল্লাহ পরাজয় ও বিপর্যয় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং নিজের ও নিজের রাসূলের জন্য বিজয় সুনিশ্চিত করেছেন। –[যিলাল]

কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিজয়ী হবেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিজয়ী হওয়ার কোন কোন পদ্ধতি রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। আল্লামা সাইয়্যেদ কুতুব বলেন ঈমান ও তাওহীদ শিরক ও কুফরির উপর বিজয় লাভ করেছে। আর এ দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থায়ী হয়েছে। শিরক ও পৌত্তলিকতার বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও মানুষ ঈমান গ্রহণ করেছে। আর দৈনন্দিন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ ইসলামের দাওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর শিরক ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করেছে।

আর বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে বা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এ সত্যের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা হলেও দেখা যায় যে, তারা বিশ্বাস করে তাদের ধর্ম মূলত বাতিল এবং তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। হয়তো বিশেষ কোনো স্বার্থে তারা ঈমান গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করছে। সম্ভবত ঈমানকে পুনরুজ্জিবীত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাদেরকে একটু ঢিল দিয়ে রেখেছেন এবং সময় মতো ঈমানের বাস্তবায়ন দেখা যাবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, দলিল-প্রমাণ, যুক্তি, তরবারি ও শক্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী হবেন। কারো মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের সম্মুখে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা জয়ী হবেন। কোনো মুফাসসিরের মতে এ মতটি অগ্রাহ্য। কারণ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, মক্কা, খায়বর ও তায়েফ বিজয় হওয়ার পর মুসলমানরা বলাবলি করতে লাগল যে, আশা করি রোম ও পারস্য মুসলমানদের করতলগত হবে। এটা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালূল মুনাফিক বলতে লাগল, তোমরা কিভাবে এত বড় আশা করছ। অথচ রোম ও পারস্য অধিপতিগণ অনেক সৈনিকের অধিকারী ও তোমাদের অপেক্ষা অনেক সাহসী। আল্লাহর শপথ, তোমাদের এহেন ধারণা বস্তবায়ন হবে না। তখনই উক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলের এ বিজয় কেবল যুক্তিগত নয়; বরং বস্তুগত ও বৈষয়িক। –[কুরতুবী, ইবনে কাছীর, কাবীর]

(لَا تَجِدُ قَوْمًا (الْاٰيَة আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ : এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার কয়েকটি কারণ বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াত আবূ ওবাইদা ইবনুল জাররাহা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি উহুদ ময়দানে যুদ্ধের সময় নিজের পিতাকে হত্যা করলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা জাররাহ বারবার তাকে হত্যা করতে চাচ্ছিল, কিন্তু তিনি পিতাকে এড়িয়েই যাচ্ছিলেন। জাররাহ যখন বারবার তাকে আক্রমণ করছিলেন, তখন এক পর্যায়ে তিনিও আক্রমণ করে নিজের পিতাকে হত্যা করে ফেললেন। –[কুরতুবী]

২. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে এ আয়াতটি হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়া সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের জন্য মনস্থ করলেন এবং তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, তখন পরিকল্পনার কথা কয়েকজন বিশেষ সাহাবী ছাড়া বাকি সাহাবীদের কাছে গোপন রাখা হলো। হযরত আবু বালতায়া (রা.) এ পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে মক্কার কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার কাছে চিঠি দিলেন। এরপর যথাসময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে হযরত আবু বালতায়ার এ চিঠি সম্বন্ধে অবহিত করলেন। এ ঘটনার পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো। –[কুরতুবী]

৩. সুদ্দী বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সম্বন্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে বসেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করলে তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি পান করার পর যে পানি বাকি রয়েছে তা আমাকে দিন, আমার বাবাকে পান করাব। হয়তো আল্লাহ এ পানির বরকতে তার অন্তরকে পাক করে দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকি পানি তাঁকে দিলেন। তিনি সে পানি নিয়ে আসলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক) বলল, এটা কি? তিনি উত্তরে বললেন, তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পান করা পানির বাকি পানি। এ পানি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি, হয়তো আল্লাহ এ পানির বরকতে আপনার অন্তরকে পবিত্র করে দিবেন। তখন তাঁকে তাঁর পিতা বলল, তোমার মায়ের প্রস্রাব নিয়ে আস, তা এ পানির চেয়ে অধিক পবিত্র। তখন তিনি (আবদুল্লাহ) রাগান্বিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আমার পিতাকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন, বরঞ্চ তুমি তার সাথে নম্রতা ও ভদ্রতার ব্যবহার করবে। –[কুরতুবী]

৪. ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি শুনেছি যে, আবূ কুহাফা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালি-গালাজ করেছিল, তখন তার সন্তান আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাকে এমন এক ধাক্কা দিলেন যার ফলে তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যান, অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ঘটনা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সত্যিই কি তা করেছ, আর কখনো এ রকম করবে না। -[কুরতুবী]
৫. বর্ণিত আছে যে, হযরত মাসআব ইবনে উমাইর (রা.) বদরের যুদ্ধে তার ভাই আবদ ইবনে উমাইরকে হত্যা করে ফেলেন, আর এ দিকে ইঙ্গিত করেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়।
৬. বদরের যুদ্ধে হযরত ওমর (রা.), হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত ওবায়দা ইবনে হারিছ (রা.) তাঁদের নিজ নিজ নিকটাত্মীয়দের হত্যা করেছিলেন বিধায় অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[কামালাইন]

প্রথমে পিতা, তারপর পুত্র, তারপর ভ্রাতা, অতঃপর গোত্র দ্বারা আরম্ভ করার কারণ : তাফসীরে বাহরুল মুহীতে বলা হয়েছে যে, প্রথমে পিতার কথা বলা হয়েছে, কারণ তাদের আনুগত্য পুত্রদের উপর অপরিহার্য। তারপর পুত্রের কথা বলা হয়েছে, কারণ তাদের মুহব্বত অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। অতঃপর ভ্রাতার কথা বলা হয়েছে, কারণ ভ্রাতাদের দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতঃপর গোত্রের কথা বলা হয়েছে, কারণ গোত্র দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়, দুশমনদের উপর বিজয়ী হওয়া যায়। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'সেই সকল লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন।" এখান হতেই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের গণনা আরম্ভ করেছেন। একটি নিয়ামত হলো আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ নিয়ামত দান করেছেন, তখন কিভাবে তাদের অন্তরে আল্লাহর শত্রুদের মহব্বত থাকতে পারে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন রূহের দ্বারা তার পক্ষ হতে।" এখানে দ্বিতীয় নিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। তা হলো তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে রূহ দান করে শক্তিশালী করা হয়েছে। এখানে রূহ অর্থ কি?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, রূহের অর্থ হলো দুশমনদের উপর মু'মিনদের বিজয়। এ বিজয়কে রূহ বলা হয়েছে এ কারণে যে, বিজয়ের মাধ্যমেই মু'মিনদের জীবনে প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল।-(কাবীর, সাফওয়া)

সুদ্দীর মতে, এখানে مِنْهُ -এর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হলো ঈমান। অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের রূহ দান করে শক্তিশালী করা হয়েছে। যেমন, কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا এখানে রূহ মানে অন্তরের নূর।

রাবী ইবনে আনাস বলেন, রূহের অর্থ হলো কুরআন ও কুরআনের হুজ্জত।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, জিবরাঈল।

আবার কেউ 'ঈমান'ও বলেছেন, আর কেউ 'রহমত' বলেছেন। এসব দ্বারা যে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

قَوْلُهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ .... وَخٰلِدِيْنَ فِيْهَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তিনি তাদেরকে প্রবিষ্ট করাবেন বেহেশতে যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করবে।" হলো সে তৃতীয় নিয়ামত যা মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করবেন। অর্থাৎ আখিরাতে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

قَوْلُهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।" এটা হলো মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত চতুর্থ নিয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল কবুল করে নিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর তারা আল্লাহ প্রদত্ত ছওয়াব পেয়েছে, অতএব তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, এ আয়াতে এক অতি গোপন بديع রয়েছে। আর তা হলো, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আত্মীয় প্রতিবেশী ত্যাগ করল তখন তার প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হলেন এবং তাদেরকে চিরস্থায়ী নিয়ামত ও বিরাট সফলতা দান করত সন্তুষ্ট করলেন।

قَوْلُهُ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : উক্ত অংশে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে একটি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে حِزْبَ اللّٰهِ বা আল্লাহর সেনাদল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর আল্লাহ বলেন, তোমরা জেনে রাখবে যে, সর্বদা আল্লাহর দলই সফলতা অর্জন করবে। তাদের কাজ হলো এরা আল্লাহর নির্দেশিত কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে সৎকর্মে সহায়তা করবে। অসৎকর্মে নিষেধ করবে। প্রয়োজনে আল্লাহর শত্রুদেরকে হত্যা করবে। যদিও তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ছেলে সন্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন। আর আল্লাহর কার্য করতে সক্ষম হওয়ার চেয়ে বড় সফলতা আর কিছুই নয়। -[ফাতহুল কাদীর]

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা গোটা মানবকুলকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ হলো আল্লাহর দল অর্থাৎ حِزْبَ اللّٰهِ আর ইতি পূর্বে অপর ভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হিযবুল্লাহ বা আল্লাহর দল সর্বদা জয়ী থাকবে। আর হিযবুশ শয়তান বা শয়তানের দল সদা পরাভূত থাকবে ও সর্বশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

كَمَا قَالَ تَعَالٰى اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ . وَقَالَ اَيْضًا اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْحَشْرِ : সূরা আল-হাশর

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ -এর হাশর শব্দটির নামে সূরার নামকরণ করা হয়েছে, অর্থাৎ এটা এমন সূরা যাতে اَلْحَشْرُ শব্দটি রয়েছে।

এ সূরার অপর নাম হলো সূরা বনূ নাযীর। হযরত ইবনে যোবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -কে বললাম, এটি সূরা হাশর। তিনি বললেন একে সূরা বনূ নাযীর বলো, কেননা এ সূরায় মদীনা শরীফ থেকে বনূ নাযীর গোত্রের বহিষ্কারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অত্র সূরায় ৪টি রুকূ', ২৪টি আয়াত, ৭৪৬টি বাক্য ও ১৭১২টি অক্ষর রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

সূরা নাজিল হওয়ার সময়কাল : সহীহ বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কাছে সূরা হাশর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এটা বনূ নাযীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা আনফাল। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইরের অপর একটি বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর এ কথা উদ্ধৃত হয়েছে- قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ অর্থাৎ সূরা হাশর না বলে সূরা নাযীর বলো। মুজাহিদ, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মনীষীগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা হলো, এ সূরায় যে আহলে কিতাবী লোকদের বহিষ্কার করার কথা উল্লেখ হয়েছে তা বনূ নাযীর সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে রুমান, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বক্তব্য হলো, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এ গোটা সূরাটিই বনূ নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, বনূ নাযীরের এ যুদ্ধটি কবে সংঘটিত হয়েছে? ইমাম যুহরী এ প্রসঙ্গে উরওয়া ইবনে জুবাইরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের ছয়মাস পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু ইবনে সায়াদ, ইবনে হিশাম ও বালাযূরীর বর্ণনায় তা চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আর তাই ঠিক। কেননা, সব বর্ণনাই এ ব্যাপারে একমত যে, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনার পর তা ঘটেছিল। আর বীরে মাউনার ঘটনা যে বদর যুদ্ধের পরই সংঘটিত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক ভিত্তিতেই প্রমাণিত। -[যিলাল]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদের অপমানজনক শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় ইহুদি ও মুনাফিকদের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে সর্বদা চক্রান্তে লিপ্ত থাকত।

ইমাম বুখারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধের বিবরণ নাজিল হয়েছে, আর সূরা হাশরে বনূ নাযীর গোত্রের বিবরণ নাজিল হয়েছে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, বনূ নাযীরকে মদীনা মোনাওয়ারা থেকে তখন বহিষ্কার করা হয়, যখন নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধ শেষে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন, আর বনূ কোরায়যার ঘটনা ঘটে আহযাবের যুদ্ধের পর; দু'টি ঘটনার মধ্যে দু'বছরের ব্যবধান ছিল। -[নুরুল কোরআন]

সূরাটির বিশেষত্ব : মুফাসসিরগণ বলেন, যদি কারো শরীরের কোনো একটি অঙ্গ ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন অজু করে বিসমিল্লাহ -এর সাথে উক্ত সূরার শেষাংশে বর্ণিত আয়াত (لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا (الْآيَة পড়ে ব্যথাস্থানে ফুঁক দিয়ে দেয়, তাহলে উক্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হয়ে যাবে।

আর যদি সূরা হাশর -এর শেষ আয়াত অথবা পূর্ণ সূরাটি মৃতব্যক্তির মাথার পার্শ্বে বসে কিংবা মৃতদের উদ্দেশ্যে পাঠ করে ছওয়াব বখশিশ করে দেওয়া হয়, তাহলে মৃতগণ কবরের আজাব হতে রক্ষা পাবেন।

Free © www.e-ilm.weebly.com

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. সূরাহ আল-হাশর -এর বিষয়বস্তু কয়েকটি রয়েছে। তন্মধ্যে সূরার প্রথমাংশে আল্লাহর গুণাবলি ও কাফির বনূ নাযীর গোত্রের মদীনা হতে নির্বাসনের বিশেষ ঘটনার পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণের বর্ণনাও রয়েছে। বনূ নাযীর গোত্র পক্ষান্তরে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ছিল। তারা তাদের সময়কালে ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের তুলনায় কম ছিল না। অপর দিকে তাদের যুদ্ধ হাতিয়ার অজস্র পরিমাণ ছিল। তাদের বাসস্থান মদীনার ভূমিতে শত শত বছর পূর্ব থেকেই ছিল এবং তারা অত্যন্ত সুকঠিন ও দৃঢ় দুর্গের পত্তন করেছিল। তাদের হীন ধারণা মতে তাদেরকে কোনো শক্তি পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না। এতদসত্ত্বেও সর্বশেষ তাদের পরাজয় ঘটল এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মুসলিম সেনাবাহিনী জয়ী হলেন। শত শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এতে এ কথাটিই প্রকাশ পেয়েছে যে, যখনই যে জাতি আল্লাহর শক্তির মোকাবিলায় নামবে তখনই তারা চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২. দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ ৫ম আয়াতে বর্ণিত বাণী দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কীয় আইনের ধারার ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধ ও সামরিক সৈনিক কর্তৃক কোনো এলাকায় শত্রুদের মোকাবিলায় (শত্রু এলাকায়) পরিচালিত ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপসমূহ ইসলামিক আইন বহির্ভূত কার্যকলাপ তথা কুরআনে নিষিদ্ধ "ফাসাদ ফিল আরদ" -এর অন্তর্ভুক্ত কাজ নয়।

৩. তৃতীয়াংশে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ হতে ১০ম আয়াতে ইসলামিক জিহাদ ও মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত অঞ্চল বা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আপোষ মীমাংসার ফলে অর্থ সম্পদসমূহ বিলি-বন্টনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৪. চতুর্থাংশে উক্ত বনূ নাযীর গোত্রের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধকালীন মুনাফিকগণের আচার-আচরণ ও কু-প্রবৃত্তির আলোচনা করা হয়েছে।

৫. পঞ্চমাংশে (শেষাংশে) আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে উপদেশবাণী, ঈমানের মূল উপকরণ এবং ঈমানদার ও বেঈমানের মাঝে পার্থক্য, আর ঈমানের গুরুত্বসহ আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনার প্রকাশ করা হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ইরবাছ ইবনে সারিয়াহ (রা.) হতে একটি হাদীস রয়েছে, তাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বদা রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে মুসাব্বাহাত (অর্থাৎ এসব সূরাগুলো যেগুলোর পূর্বে سَبَّحَ يُسَبِّحُ سُبْحَانَ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে) পড়তেন। আর বলতেন উক্ত সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত হতেও উত্তম। তন্মধ্যে সূরা-হাশর একটি। কেউ কেউ মতানৈক্যে বলেন, তার উত্তম আয়াতটি হলো- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى الخ উক্ত বর্ণিত হাদীসটি হলো-

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ اَنْ يَرْقُدَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ اٰيَةٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

অনুরূপভাবে তিরমিযী শরীফে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে প্রতিদিন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠান্তে সূরা হাশর -এর শেষ তিন আয়াত هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ .... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ পাঠ করে থাকে, তখন তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন ৭০,০০০ [সত্তর হাজার] ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যারা সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া প্রার্থনা করতে থাকে। যদি উক্ত দিবসে সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি সন্ধ্যাবেলায় পড়ে থাকে, তাহলেও সারা রাত তাকে উক্ত গুণে ভূষিত করা হবে। -[মাযহারী ও ইতকান]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল হাশর মদীনায় অবতীর্ণ

أَرْبَعٌ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২৪ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج اَىْ نَزَّهَهُ فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ وَفِى الْاِتْيَانِ بِمَا تَغْلِيْبٌ لِلْاَكْثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ مُلْكِهِ وَصُنْعِهِ.

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতা ব্যক্ত করে। ل হরফটি অতিরিক্ত আর অপ্রাণী-বাচক বস্তুর জন্য ব্যবহৃত অব্যয়, مَا ব্যবহার দ্বারা সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় তাঁর রাজত্ব ও কর্মকাণ্ডে।

٢. هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ هُمْ بَنُو النَّضِيْرِ مِنَ الْيَهُوْدِ مِنْ دِيَارِهِمْ مَسَاكِنِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط هُوَ حَشْرُهُمْ اِلَى الشَّامِ وَاٰخِرُهُ اَنْ جَلَاهُمْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فِىْ خِلَافَتِهِ اِلٰى خَيْبَرَ مَا ظَنَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ خَبَرُ اَنَّ حُصُوْنُهُمْ فَاعِلُهُ بِهِ تَمَّ الْخَبَرُ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ اَمْرُهُ وَعَذَابُهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِمْ مِّنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

২. তিনিই আহলে কিতাবগণের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে বহিষ্কৃত করেছেন তারা বনূ নাযীর গোত্রীয় ইহুদিগণ। তাদের আবাসভূমি হতে মদীনাস্থিত তাদের ঘর-বাড়ি হতে প্রথম সমাবেশেই এ বহিষ্কার শাম দেশে হয়েছিল। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে খায়বর প্রান্তরে নির্বাসিত করেন। তোমরা কল্পনাও করনি হে মু'মিনগণ! যে, তারা নির্বাসিত হবে। আর তারা কল্পনা করেছিল যে, তাদের রক্ষাকারী হবে তা اَنَّ এর খবর তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ এ শব্দটি তার فَاعِل যার মাধ্যমে খবর পূর্ণত্ব লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা হতে তাঁর শাস্তি হতে। কিন্তু তাদের নিকট পৌছল আল্লাহ তাঁর আদেশ ও শাস্তি এমন স্থান হতে, যা তারা কল্পনাও করেনি তাদের অন্তরে ধারণাও জাগেনি, মুসলমানদের পক্ষ হতে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَقَذَفَ اَلْقٰى فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا الْخَوْفَ بِقَتْلِ سَيِّدِهِمْ كَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ يُخْرِبُوْنَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ مِنْ اَخْرَبَ بُيُوْتَهُمْ لِيَنْقُلُوْا مَا اسْتَحْسَنُوْهُ مِنْهَا مِنْ خَشَبٍ وَغَيْرِهٖ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ق فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ .

তা সঞ্চার করল উদ্রেক ঘটাল তাদের অন্তরে ত্রাস ও ভীতি اَلرُّعْبَ শব্দটি عَيْن হরফটিতে সাকিন ও পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। ত্রাস, তাদের দলপতি কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার মধ্য দিয়ে। তারা ধ্বংস করে ফেলল শব্দটি তাশদীদ যোগে تَخْرِيْب হতে এবং তাখফীফের সাথে اَخْرَبَ হতে নিষ্পন্ন হিসাবে পঠিত হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি কাষ্ঠ ইত্যাদির মধ্য হতে তারা যা ভালো মনে করেছে তা সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। তাদের স্বহস্তে ও মু'মিনগণের হাতে। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ : مَانِعَتُهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ আর حُصُوْنُهُمْ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّرْ এ جُمْلَه টি আবার اَنَّهُمْ - مُبْتَدَأ -এর خَبَرٌ আবার مَانِعَتُهُمْ -কে اَنَّهُمْ -এর خَبَرٌ ও বলা যেতে পারে। তখন حُصُوْنُهُمْ -কে اَنَّهُمْ -এর فَاعِلْ বলতে হবে। এ দ্বিতীয় তারকীবকে আবূ হাইয়্যান অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে প্রথম তারকীবটাই উত্তম।−(ফাতহুল কাদীর)

قَوْلُهُ الرُّعْبَ : اَلرُّعْبَ শব্দটিকে দু'টি পদ্ধতিতে পাঠ করা হয়ে থাকে− ১. অধিকাংশ কারীগণের মতে عَيْن كَلِمَه -কে সাকিন করে পড়তে হয়। যথা− اَلرُّعْبَ ২. অথবা, ইবনে আমের ও আলী (রা.) -এর মতে, তাকে (عَيْن كَلِمَه) পেশ প্রদান করে, যথা− اَلرُّعُبَ পড়া হয়।

قَوْلُهُ يُخْرِبُوْنَ : يُخْرِبُوْنَ শব্দে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : সাধারণের কেরাত হলো يُخْرِبُوْنَ অর্থাৎ تَخْفِيْف করে, যা اَخْرَبَ হতে উদ্গত। আস্‌সুলামী, হাসান, নসর ইবনে আসেম, আবুল আলীয়া, কাতাদাহ ও আবূ আমর يُخَرِّبُوْنَ অর্থাৎ تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন, যা تَخْرِيْب হতে উদ্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঐতিহাসিক পটভূমি : উহুদ যুদ্ধের পর আহযাব যুদ্ধ বা খন্দক যুদ্ধের পূর্বে মদীনা হতে বনূ নাযীরকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সাহাবীদের বড় বড় দশজনকে নিয়ে যাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর, ওমর ও আলী (রা.)ও ছিলেন− বনূ নাযীরের মহল্লায় গিয়েছিলেন, দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্ত বিনিময় আদায়করণের জন্য তাদেরকেও শরিক হওয়ার আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে, তাদের সাথে পূর্বের চুক্তির শর্তানুযায়ী। সেখানে তারা নবী করীম ﷺ -কে মন-ভুলানো কথাবার্তায় মশগুল করে রাখল এবং ভিতরে ভিতরে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে লেগে গেল। ষড়যন্ত্রটি ছিল এরূপ যে, যে বাড়ির দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে নবী করীম ﷺ আসন গ্রহণ করেছিলেন এক ব্যক্তি তার ছাদ হতে তাঁর উপর একটি বড় ভারি পাথর ঠেলে ফেলার ব্যবস্থা করল; কিন্তু সে তার কুকীর্তি শুরু করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সতর্ক করে দিলেন ও সমস্ত ব্যাপার তাঁর নিকট স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি সহসা সেখান হতে উঠে পড়লেন ও মদীনায় চলে গেলেন।

মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে বনূ নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হতে নির্দেশ দিলেন। তাদের এ ষড়যন্ত্র আর ওয়াদা ভঙ্গের কারণে, যা পূর্বেই তাদের সাথে হয়েছিল। নবী করীম ﷺ অনতিবিলম্বে তাদের প্রতি চূড়ান্ত নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন, তোমাদের বিশ্বাস ভঙ্গমূলক ষড়যন্ত্রের কথা আমি জানতে পেরেছি। কাজেই দশ দিনের মধ্যেই তোমরা মদীনা ত্যাগ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করে চলে যাও। এ সময়ের পরেও যদি তোমরা এখানে থাক, তাহলে তোমাদের বস্তিতে যাকেই পাওয়া যাবে তাকেই হত্যা করা হবে। অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে সংবাদ পাঠাল–দুই হাজার লোক দিয়ে আমি তোমাদের সাহায্য করবো এবং বনূ কুরাইযা ও বনূ গাতফানও তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে– তোমরা দৃঢ় হয়ে থাক, নিজেদের স্থান কিছুতেই ত্যাগ করবে না। এ মিথ্যা আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করে তারা নবী করীম ﷺ-এর চূড়ান্ত নির্দেশের জবাবে বলে পাঠাল– আমরা এখান হতে চলে যাব না, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। এরপর চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে নবী করীম ﷺ তাদেরকে অবরুদ্ধ করলেন। মাত্র কয়েক দিন পর্যন্ত অবরোধ চলার পর [কোনো কোনো বর্ণনা মতে ছয় দিন আর কোনোটির মতে পনেরো দিন] তারা মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হলো এ শর্তের ভিত্তিতে যে, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর যা কিছুই তারা নিজেদের উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবে, তা নিয়ে যাবে। এভাবেই তাদের অধিকার হতে মদীনার ভূমিকে মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে গেল। অবশিষ্টরা সিরিয়া ও খাইবারের দিকে চলে গেল। –[যিলাল]

قَوْلُهُ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى ..... الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন– জলে-স্থলে, আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীর উপরে এবং অন্তরীক্ষে অবিস্থত আল্লাহর যে সকল সৃষ্টিকুল [মানব-দানব..... সর্বপ্রকার জীব ও নির্জীব] রয়েছে সব কিছুই নিজ ভাষায় তাঁর তাসবীহ এবং অপরিসীম ক্ষমতা আর মহাজ্ঞানের জয়গান গাচ্ছে। আর তাসবীহ পাঠ করছে এবং তিনিই বিজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ (الْاٰيَةَ). আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করে না, এমন কোনো কিছুই সৃষ্টিকূলে নেই। কিন্তু [হে মানব!] তোমরা তাদের সে তাসবীহগুলো বুঝতে পার না।

এ আয়াতটির তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন– আল্লাহ তা'আলা এ খবর দিয়েছেন যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে, সম্মান করে ও একত্ববাদের বাণী ঘোষণা করে।

কতিপয় গ্রন্থে বর্ণনা রয়েছে যে, ইহুদি বনূ নাযীর গোত্রের বহিষ্করণ সম্পর্কে পর্যালোচনা আরম্ভ করার প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতটিকে ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এ সত্য তথ্যটি মুসলমানদেরকে উপলব্ধি করে দেওয়ার জন্য যে. কাফির বনূ নযীরদের সঙ্গে মুসলমানদের যে ঘটনা ঘটেছিল তা মুসলমানদের ক্ষমতাবলে ও বাহুবলে হয়নি; বরং তা মহান আল্লাহর বিশেষ কুদরতের কীর্তি ও ফলাফল মাত্র।

قَوْلُهُ تَعَالٰى هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– "প্রজ্ঞাময় আল্লাহই আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের বনূ নাযীর গোত্রীয় কাফেরদেরকে তাদের বাসস্থান (মদীনা ভূমি) হতে শাম বা সিরিয়া দেশের প্রতি প্রথম সমাবেশে বহিষ্কৃত করে দেন।' তাদের দ্বিতীয় সমাবেশে হযরত ওমর ফারুক (রা.) তার খিলাফত আমলে তাদেরকে শাম হতে এবং পূর্ণ আরব উপদ্বীপ হতে খায়বর -এর প্রতি বহিষ্কৃত করে দেন, ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন– হে মু'মিনগণ! ইহুদিদের কাফির সম্প্রদায় তাদের বাসস্থান ত্যাগ করবে বলে তোমাদের সামান্যতম ধারণাও জন্মেনি। আর কাফির সম্প্রদায় এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বসেছিল যে, আল্লাহর গজব ও শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষাকারী দুর্ভেদ্য দুর্গই যথেষ্ট। (বলা বাহুল্য) বনূ নাযীরের সুশক্ত কেল্লা, অজেয় দুর্গ ও প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম হেতু বিনা যুদ্ধে এত সহজে নিরস্ত্র, নিরবলম্বন মুসলমানগণ জয় করতে পারবে বলে তোমরা মুসলমানরা ধারণা করতে পারনি; অনুরূপভাবে বনূ নাযীরের ইহুদিগণও ভাবতে পারেনি যে, নিরীহ মুসলমানরা তো দূরের কথা বরং কোনো শক্তিই তাদের দুর্জয় কেল্লা জয় করারও তাদের উপর আক্রমণ করার দুঃসাহস করতে পারবে? এমন দুঃসাহসিক অভিযান, অতর্কিত আক্রমণ এবং শোচনীয় পরাজয় তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু আল্লাহর নির্দিষ্ট হুকুম যখন আসল তখন এমনই হলো, মুসলমানদের হাতেই এমনভাবে তাদের সর্বনাশ ঘটল, তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করত তবে তাদেরকে এমনভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হতো না। আর আল্লাহ রাব্বুল আলমীন তাদের দলপতি কা'ব ইবনে আশরাফ নামক প্রসিদ্ধ ইসলামের শত্রুকে আল্লাহর ইশারায় মুসলমানদের হস্তে অপ্রত্যাশিত হত্যার দ্বারা তাদের অন্তরে বিশেষ ভীতির সঞ্চার ঘটিয়ে দিলেন। এ ভয় উপচিয়ে মুসলমানদের হস্তে তারা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। আর লোভ লালসায়, ক্ষোভে উত্তেজনায় তাদের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পদ যাতে মুসলমানদের ভাগ্যে না জুটতে পারে তজ্জন্য তারা নিজেরা পোড়ামাটি নীতি অবলম্ব করে দেশত্যাগ করার মুহূর্তে নিজেদের হস্তে ও মুসলমানদের হস্তে নিজেদের ঘরবাড়ি বিনষ্ট ও

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিধ্বংস করে যায়। যা পূর্ব হতেই মুসলমানদের হাতে ধ্বংসের পথে পৌঁছতে থাকে, তা পুনরায় নিজেরাই ধ্বংসের ষোলকলা পরিপূর্ণ করে তোলে। বনূ নাযীর গোত্রীয় কাফেরদের বহিষ্কারের ঘটনা আলোকপাতের পর ঈমানদার মুসলমানদেরকে উপদেশ বাণীর ইঙ্গিত দিয়ে বলেন– হে মু'মিন মুসলমান জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ! তোমরা উল্লিখিত ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করে নাও।

বনূ নাযীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বনূ নাযীর গোত্রটি ইহুদি জাতিরই একটি অংশ। তারা হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধর ছিল। তাদের পূর্ব-পুরুষগণ তাওরাতের আলিম ছিলেন। তাওরাতে শেষনবী ﷺ-এর আকৃতি-প্রকৃতি এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ এমনকি এ কথারও বর্ণনা ছিল যে, তিনি মক্কা শরীফ হতে ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করবেন। এ গোত্র শেষনবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকবে এ প্রত্যাশায় সিরিয়া হতে স্থানান্তরিত হয়ে মদীনায় এসে বসবাস করতে থাকে। তাদের তৎকালীন লোকদের মধ্যে কিছু আলিম ছিলেন। যাঁরা নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর তাঁর নিদর্শনাদি দেখে তাঁকে চিনে ফেললেন। কিন্তু তাদের কল্পনা ছিল যে, শেষনবী ﷺ হযরত হারুন (আ.) -এর বংশধরদের মধ্য হতে হবে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী ইসরাঈল হতে না হয়ে বনী ইসমাঈল থেকে হয়েছে দেখে তারা হিংসায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। এ হিংসাকে কেন্দ্র করে তাদের ঈমান গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তারা মনে মনে তাঁকে শেষনবী বলে জানত এবং মানত।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের অভাবিত পূর্ণ বিজয়, তাদের এ প্রত্যয়কে আরো জোরদার করে তুলল। পরিশেষে উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় এবং কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম শাহাদত বরণ করেন। তখন তারা মক্কার কাফিরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করে দেয়।

রাসূলে কারীম ﷺ মদীনা শরীফে উপনীত হয়েই মদীনার আশে-পাশের ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে এমন একটি সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। সন্ধি পত্রে আরো বহুবিধ শর্ত ছিল। চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়েরই একটি হলো বনূ নাযীর। তারা মদীনার দুই মাইল দূরে বসবাস করত। সেখানে তাদের শক্তিশালী দুর্গ এবং বহু যোদ্ধা ছিল। উহুদের যুদ্ধ পর্যন্ত এ সকল গোত্র প্রকাশ্যভাবে কৃত সন্ধির প্রতি আনুগত্য ছিল। পরবর্তীতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বাসঘাতকতার প্রারম্ভ এ থেকে যে, ওহুদ যুদ্ধের পর ইহুদির গোত্রপতি কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা নিয়ে মক্কায় গমন করে। তারা মক্কার কাফিরদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

চুক্তির প্রাক্কালে কা'ব ইবনে আশরাফ এবং কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান তাদের স্ব-স্ব দল নিয়ে কা'বা ঘরের পর্দা ধরে শপথ করল যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একে অন্যের সাহায্য করবে।

উল্লিখিত চুক্তি সম্পাদন করে কা'ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে আসলে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -কে তার নিফাক সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এতে হুযূর ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ জারি করেন এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) এ বদবখতকে হত্যা করেন।

এর পরবর্তীতে বনু নাযীরের বিভিন্ন বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবহিত হতে থাকেন। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে ওহী নিয়ে আগমন করেন এবং তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে বিদ্যমান চুক্তির শর্তানুসারে একটি রক্তপণের চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গমন করলে তারা হুযূর ﷺ-কে দেওয়ালের উপর হতে পাথর নিক্ষেপে হত্যার সিদ্ধান্ত করেছিল।

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দশ দিনের সময় দিয়ে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ জারি করেন। তাদের একাংশ খায়বরে এবং অন্যরা সিরিয়া গিয়ে বসবাস আরম্ভ করে। হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফত আমলে এদেরকে খায়বর ত্যাগে বাধ্য করলেন।

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ-এর অর্থ : لِأَوَّلِ-এর لَامٌ - أَخْرَجَ ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। এ লামকে লামে তাওকীত অর্থাৎ সময় বুঝাবার লাম বলা হয়। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا عِنْدَ أَوَّلِ الْحَشْرِ অর্থাৎ যারা কুফরি করেছে তাদেরকে প্রথম হাশরের সময় বহিষ্কৃত করেন। حَشْر শব্দের অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনগণকে একত্রি করা। কিংবা বিক্ষিপ্ত জনতাকে একত্রিত করে বের করা। বনূ নাযীরের এ একত্রিতকরণকে কেন প্রথম হাশর বলা হলো? এ প্রশ্নের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যায়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (র.) এবং অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেছেন, তা ছিল আহলে কিতাবদেরকে প্রথমবারের মতো একত্রিত করণ। অর্থাৎ এ বারই প্রথমবারের মতো তাদেরকে একত্রিত করা হয়েছে এবং আরব উপদ্বীপ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর পূর্বে তারা এ রকম লাঞ্ছনার শিকার আর কখনো হয়নি। কারণ ইতঃপূর্বে তারা ইজ্জত এবং সম্মানের অধিকারী ছিল।

২. মদীনা হতে তাদেরকে বহিষ্কারকরণকে আল্লাহ তা'আলা হাশর আখ্যা দিয়েছেন। একে প্রথম হাশর এ জন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষকে কিয়ামতের দিন শাম রাজ্যের দিকে নিয়ে গিয়ে একত্রিত করা হবে তথায় তাদের হাশর হবে।

৩. এটা ছিল তাদের জন্য প্রথম হাশর। তাদের দ্বিতীয় হাশর হলো খায়বার হতে তাদেরকে হযরত ওমরের সিরিয়ায় নির্বাসিতকরণ।

৪. এ বাক্যের অর্থ হলো তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রথমবারই মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে তাদেরকে নির্বাসিত করল। কারণ, এ বারই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে প্রথম যুদ্ধ করলেন।

৫. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, তা প্রথম হাশর। দ্বিতীয় হাশর হবে এক আগুন মানুষদেরকে প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যের দিকে নিয়ে গিয়ে একত্রিত করবে, তারা যেথায় রাত যাপন করবে সেখানে সে আগুন রাত যাপন করবে। তারা যেখানে থাকবে আগুন সেখানেই থাকবে। -[কাবীর]

হাশর মোট কয়বার হয়েছিল : হাশর মোট কয়বার হয়েছিল এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ছা'বী গ্রন্থে এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে,

اِعْلَمْ اَنَّ الْحَشْرَ اَرْبَعٌ (١) فَالْاَوَّلُ اِجْلَاءُ بَنِى النَّضِيْرِ (٢) ثُمَّ بَعْدَهٗ اِجْلَاءُ اَهْلِ خَيْبَرَ (٣) ثُمَّ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قَعْرِ عَدْنَانَ تَسُوْقُ النَّاسَ (٤) ثُمَّ فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَشْرُ جَمِيْعِ الْخَلَائِقِ .

বনূ নাযীরের জন্য কয়টি হাশর নির্দিষ্ট? : বনি নাযীরের প্রথম হাশর হলো মদীনা হতে বিতাড়িত হওয়া, আর দ্বিতীয় হাশর হলো খাইবার হতে শামের পথে হযরত ওমর (রা.) দ্বারা পরে বিতাড়িত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, শেষ হাশর হলো সমগ্র মানবজাতির ময়দানে মাহশারে একত্রিত হওয়া। সুতরাং এ দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তাদের তিনটি হাশর হলে তৃতীয় হাশর হবে কিয়ামত দিবসের হাশর। -[ফাতহুল কাদীর]

হাশরের ময়দান কোথায় হবে? : আলোচ্য আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, হাশরের ময়দান হবে সিরিয়াতে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সিরিয়ার মাটিতেই সকলকে একত্রিত করবেন। যে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে, সে যেন এ আয়াত পাঠ করে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا : উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, বনূ নাযীর গোত্র শত শত বছর পূর্ব থেকেই তাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করছিল। মদীনার বাইরে তাদের গোত্রীয় লোক ব্যতীত অন্য কোনো বংশীয় লোক তাদের সাথে বসবাস করতে তারা দিত না। তারা নিজস্ব জনপদকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে রেখেছিল। ঘরবাড়িগুলো তাদের গুহার আকারে নির্মিত ছিল। আর উপজাতিদের নীতিমালায় তাদের বসতি ছিল। লোকসংখ্যাও মুসলমানদের তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না। মূল মদীনাবাসী বহুসংখ্যক লোক তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছিল। এ সব কারণে তারা সশস্ত্র মোকাবিলা না করেই কেবলমাত্র আবরোধের চাপেই দিশেহারা হয়ে বস্তুভিটা পরিত্যাগ করে আবাহমান কালের জন্য চলে যেত হবে, এমন আশা মুসলমানরাও করেন নি। অপর পক্ষে ইহুদিগণও ধারণা করেছিল যে, যত বড় শক্তিই আসুক না কেন, কিছুই তাদেরকে টলাতে কখনও ক্ষমতাবান হবে না। যদিও তাদের গৌরব ও স্পর্ধার সর্বদিক ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তথাপিও স্বল্প আক্রমণে ও স্বল্প দিনে তাদেরকে কিছুই করতে পারবে না। আর তাদের সুরক্ষিত কিল্লাগুলো অতি সহজে বিজয় করার ধারণা আসাও সাধারণ বিবেকের বহির্ভূত। তথাপিও আল্লাহ তাদেরকে (ইহুদি বনূ নাযীরকে) মতান্তরে মাত্র ৬ দিন, অথবা ১৫ দিন, অথবা ২১ দিন, অথবা ১০ দিনের অবরুদ্ধে মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِنَ اللّٰهِ : অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায় (ইহুদি বনূ নাযীর) তাদের সু-কঠিন দুর্গের উপর এত আস্থাবান ছিল যে, তাদের দুর্গই তাদেরকে আল্লাহর সর্বপ্রকার শাস্তি হতে মুক্ত রাখবে। অথবা, গায়েব হতে কোনো শক্তিই তাদের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

উক্ত আয়াতের মর্মবাণীর উপর একটি প্রশ্ন জাগতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রশ্নটি হলো, ইহুদি জাতি নিশ্চিত জানত যে, তাদের এ যুদ্ধ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহর সাথেই, তথাপিও তারা এ কথা কিভাবে বুঝতে সক্ষম হলো যে, তারা আল্লাহর সর্ব প্রকার কঠিন শাস্তি থেকে মুক্ত থাকবে?

এর উত্তরে বলা যায় যে, ইহুদি জাতি বিশ্ব জগতে বেশ চিহ্নিত বর্বর ও অসভ্য জাতি হিসেবে পরিগণিত। কেননা তারা অতীতকাল হতেই বহু নবী ও রাসূল এবং বুজুর্গকে নির্দোষে হত্যা করেছিল। এমনকি তারা উক্ত কার্যে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত উক্ত হত্যাকাণ্ডের উপর পরিতাপ বাণীও বর্ণনা করেনি। এর যুক্তি স্বরূপ 'দি হলি স্ক্রিপার জুইস পাবলিকেশন্স সোসাইটি অব আমেরিকা ১৯৫৪ সালে জন্ম বৃত্তান্ত অধ্যায় ২৫-২১ 'স্তোত্র' নামক গ্রন্থে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই-

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষ হযরত ইয়াকূব (আ.) একদা আল্লাহর সাথে পূর্ণ একটি রাত্র মল্লযুদ্ধ করে পরাজিত হননি। অতঃপর সকালবেলা আল্লাহ তা'আলা বললেন- এখন আমাকে যেতে দাও। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন, আমি তোমাকে যেতে দিব না। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রশ্ন করলেন তোমার নাম কি? উত্তরে বললেন, ইয়াকূব। অতঃপর আল্লাহ বললেন, ভবিষ্যৎকালে তোমার নাম ইয়াকূব-এর পরিবর্তে ইসরাঈল হবে।

এ ঘটনা হয় হতে প্রতীয়মান যে, যাদের পূর্ব পুরুষ আল্লাহ সম্বন্ধে জেনে বুঝে বিপক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, তাঁর বংশধররাও তো অনুরূপ করা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং তারা আল্লাহর বিরোধী হয়েও আল্লাহ কর্তৃক সুকঠিন শাস্তিসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়ার সাধনায় বসে থাকা স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ فَاَتَاهُمْ .... لَمْ يَحْتَسِبُوْا : এ বাক্যের দু'টি অর্থ করা হয়েছে-

১. আল্লাহর নির্দেশ তাদের উপর এমন দিক হতে আসল যেদিক হতে আসতে পারে বলে তারা কল্পনাও করে নি। আর তা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে বহিষ্কার করতে নির্দেশ দিয়েছেন, এ রকম কিছু তারা কখনো কল্পনা ও ধারণা করেনি। আর কেউ কেউ বলেছেন, তা হলো, তাদের নেতা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা। কারণ তার হত্যা তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল।

২. বলা হয়েছে اَتَاهُمْ এবং لَمْ يَحْتَسِبُوْا শব্দদ্বয়ের ضَمِيْر -এর মারজা হলো মু'মিনগণ, অর্থাৎ মু'মিনদের উপর আল্লাহর সাহায্য আসল এমন দিক হতে যেদিক হতে সাহায্য আসতে পারে বলে তাঁরা ধারণা করেনি।

আমাদের মতে প্রথম অর্থটাই এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ এ বাক্যের আলোকে। কারণ বনূ নাযীরের অন্তরেই ভীতির সঞ্চার করা হয়েছিল- মু'মিনদের অন্তরে নয়।

৩. এ বাক্যের তৃতীয় আরও একটি অর্থ হতে পারে আর তা হলো এই যে, বনূ নযীর বাইরের দিক হতে কোনো সেনাবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করবে এ রকম ধারণা করত; কিন্তু তাদের উপর এমন দিক হতে আক্রমণ আসল যেদিক হতে আক্রমণ আসার কল্পনাও তারা করতে পারেনি। সেদিকটি হলো অন্তর ও মনের দিক। অর্থাৎ ভিতর হতে তাদের সাহস, হিম্মত ও প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিলেন, যার ফলে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও দুর্গ কাজে আসল না। -[যিলাল]

قَوْلُهُ فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ : এ বাক্যের অর্থ হলো, 'তাদের উপর আল্লাহ আসল'। এ বাহ্যিক অর্থ জমহূরের মতে এখানে সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ স্বয়ং আরশের উপর আছেন, সেখান হতে এসে তিনি তাদের উপর আক্রমণ করেছেন এ অর্থ হতে পারে না। সুতরাং এ বাক্যটির অর্থ করা হয়েছে اَىْ اَتَاهُمْ اَمْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহর নির্দেশ আসল, অথবা اَتَاهُمْ بَأْسُ اللّٰهِ وَعَذَابُهٗ অর্থাৎ তাদের উপর আল্লাহর মার এবং আজাব আসল। -[সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يُخْرِبُوْنَ ...... الْمُؤْمِنِيْنَ (الاية) : অর্থাৎ "তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের ঘরবাড়ি তাদের স্বহস্তে ও মু'মিনগণের হাতে। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

অর্থাৎ দুই দিক হতে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়েছিল। বাইরের দিক হতে মুসলমানরা অবরোধ করে তাদের দুর্গসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগলেন। আর ভিতর হতে তারা নিজেরাই প্রথমে মুসলমানদের পথরোধ করার জন্য নানাস্থানে পাথর ও গাছ দ্বারা প্রতিবন্ধক দাঁড় করলো। এ কাজের জন্য তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি চূর্ণবিচূর্ণ করে ধ্বংসস্তূপের সৃষ্টি করল। পরে তারা যখন নিশ্চিত বুঝতে পারল যে, তাদেরকে এখান হতে বহিষ্কৃত হতেই হবে তখন তাদের বড় সাধের ও বড় আশায় নির্মিত ঘরবাড়ি তারা নিজেদের হাতেই ধ্বংস করতে আরম্ভ করল, যেন সেগুলো মুসলমানদের কোনো কাজে না লাগে। অতঃপর তারা নবী

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

করীম ﷺ -এর সাথে এই মর্মে সন্ধি করল যে, আমাদেরকে প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হোক এবং অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যা কিছু আমরা বহন করে নিয়ে যেতে পারি তা নিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করা হোক। এ চুক্তি অনুযায়ী তারা চলে যাবার কালে তাদের ঘরবাড়ির দরসা জানালা ও খুটিগুলো পর্যন্ত উৎপাটিত করে নিয়ে গেল। এমনকি অনেকে তো তাদের ঘরের ছাদের কাষ্ঠগুলো উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। -[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুসলমানগণ যখন ইহুদিদের বাড়ি ঘর দখল করতেন তখন তা ভেঙ্গে দিতেন যাতে করে যুদ্ধ ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়; আর ইহুদিরা একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে আরেকটি ঘরে প্রবেশ করত এবং মুসলমানদের উপর পাথর বর্ষণ করত। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ : আল্লাহ তা'আলা এখানে আহলে কিতাব বনূ নাযীদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কৃত করার ঘটনার বর্ণনা দানের পর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, হে দৃষ্টিমান [মু'মিন] ব্যক্তিরা [এ ঘটনা হতে তোমরা] শিক্ষা গ্রহণ করো।

এ ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণের অনেকগুলো দিক রয়েছে।

১. এ ইহুদিরা আল্লাহকে স্বীকার করত, আল্লাহর কিতাব, নবী-রাসূল ও পরকালকে তারা মানত; এ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, তারা সেকালের মুসলমান ছিল; কিন্তু তারাই যখন দীন-ধর্ম ও নৈতিক চরিত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিছক লালসা পরিপূরণ এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে সত্যে স্পষ্ট বিরোধিতা করতে শুরু করল এবং নিজেদের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনো দায়িত্বই বোধ করল না, তখন এরই ফলে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ দৃষ্টি তাদের দিক হতে ফিরে গেল, নতুবা তাদের সাথে আল্লাহর যে কোনোরূপ শত্রুতা নেই- থাকতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। এদিক দিয়ে এ ইহুদিদের পরিণতি হতে স্বয়ং মুসলমানদেরকেই উপদেশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। তারাও যেন নিজেদেরকে ইহুদিদের ন্যায় আল্লাহর আদরের বান্দা মনে করে না বসে, আল্লাহর শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে শামিল হয়ে থাকলে স্বতঃই তাদের জন্য আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ-সাহায্য বর্ষিত হতে থাকবে এরূপ অমূলক ধারণা যেন তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে না বসে। দীন ও নৈতিক চরিত্রের দায়িত্ব পালন করা তাদের জন্য জরুরি নয়-এমন অহমিকতা যেন তাদের মন-মগজকে কলুষিত করতে না পারে।

২. যেসব লোক জেনে বুঝে দীনের বিরোধিতা করে তাদের ধন-দৌলত, শক্তি সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণই তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও হতে রক্ষা করবে- যারা মনে মনে এ আস্থা পোষণ করে, দুনিয়ার এসব লোককে জরুরি শিক্ষা দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য।

৩. বনূ নাযীর তাদের সহায়-সম্পত্তি ও দৃঢ় দুর্গের উপর পুরোপুরী আস্থাশীল ছিল, তারা তাদের জনবলের উপরও নির্ভর করেছিল। এ সবের উপর নির্ভর করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তারা আল্লাহর উপর আস্থা রাখেনি। যার ফলে তাদের এ দুরাবস্থা। অতএব মুসলমানগণ যেন পুরোপুরি আল্লাহর উপর আস্থাশীল থাকে এ শিক্ষা দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

৪. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এ ইহুদিরা কুফরি, নবুয়ত অস্বীকার, ধোঁকাবাজিকরণের ফলে এ বিপদে পড়েছে এবং মদীনা হতে নির্বাসিত হয়েছে। সুতরাং মুসলমানরাও যেন মনে রাখে যে, নবুয়তের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ, ইসলামের প্রতি অমনোযোগিতা ও ধোঁকাবাজি বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। -[কাবীর]

এ আয়াত কিয়াস হুজ্জত হওয়ার প্রমাণ : ওলামায়ে কেরাম فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِى الْاَبْصَارِ দ্বারা কিয়াস হুজ্জত হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কেননা কোনো বস্তুকে তার সমপর্যায়ের বস্তুর প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া অথবা কোনো বস্তুকে অন্যের সাথে তুলনা করাকে اِعْتِبَارٌ বলা হয়। যেন বলা হয়েছে যে, قِيْسُوْا الشَّئَ عَلٰى نَظِيْرِهٖ 'হে জ্ঞানীগণ, তোমরা বস্তুকে সমপর্যায়ের বস্তুর সাথে তুলনা করো, কিয়াস করো।' এ কিয়াস (পূর্বেকার উম্মতের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল সে) শাস্তির উপর (বর্তমান) শাস্তির কিয়াসও হতে পারে অথবা শরিয়তের মূল বিষয়ের উপর শাখার (فُرُوْعٌ) কিয়াসও হতে পারে। মোদ্দাকথা, উক্ত আয়াত দ্বারা উসূলবিদগণ কিয়াসের উপর মযবুত দলিল পেশ করেছেন। -[নূরুল আনওয়ার]

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ قَضٰى عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ الْخُرُوجَ مِنَ الْوَطَنِ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ط بِالْقَتْلِ وَالسَّبْيِ كَمَا فُعِلَ بِقُرَيْظَةَ مِنَ الْيَهُوْدِ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ.

৩. আর যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে অবধারিত না করতেন সিদ্ধান্ত না করতেন নির্বাসিত হওয়া স্বদেশ হতে বিতাড়িত হওয়া তবে তাদেরকে দুনিয়ায় অন্য শাস্তি প্রদান করতেন হত্যা ও বন্দী হওয়ার মাধ্যমে, যেমন বনূ কুরায়যা গোত্রীয় ইহুদিদের বেলায় তাই করা হয়েছিল। আর তাদের জন্য আখেরাতে দোজখের শাস্তি রয়েছে

٤. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا خَالَفُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ج وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ لَهُ

৪. এটা এ জন্য যে, তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছে বিরোধিতা করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী তাকে।

٥. مَا قَطَعْتُمْ يَا مُسْلِمِيْنَ مِّنْ لِّيْنَةٍ نَخْلَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ أَيْ خَيَّرَكُمْ فِيْ ذٰلِكَ وَلِيُخْزِيَ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ الْفٰسِقِيْنَ الْيَهُوْدَ فِيْ اِعْتِرَاضِهِمْ بِأَنَّ قَطْعَ الشَّجَرِ الْمُثْمِرِ فَسَادٌ.

৫. তোমরা যে কর্তন করেছ হে মুসলমানগণ! খেজুর বৃক্ষগুলি খেজুর বৃক্ষ। কিংবা সেগুলোকে কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছ, তাও আল্লাহরই অনুমতিক্রমে আল্লাহ তোমাদেরকে এ বিষয়ে ইচ্ছাধিকার দান করেছেন। আর লাঞ্ছিত করার জন্য কর্তনের অনুমতি দান পূর্বক পাপাচারীদেরকে ইহুদিদেরকে। তাদের এ সমালোচনার জবাবে যে ফলন্ত বৃক্ষ কর্তন করা পাপ।

٦. وَمَا أَفَاءَ رَدَّ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ أَسْرَعْتُمْ يَا مُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِ مِنْ زَائِدَةٌ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ إِبِلٍ أَيْ لَمْ تُقَاسُوْا فِيْهِ مَشَقَّةً وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فَلَا حَقَّ لَكُمْ فِيْهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْاٰيَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ عَلٰى مَا كَانَ يُقَسِّمُهُ مِنْ أَنَّ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ خُمُسَ الْخُمُسِ وَلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاقِيْ يَفْعَلُ فِيْهِ مَا يَشَاءُ فَأَعْطٰى مِنْهُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَثَلَاثَةً مِنَ الْأَنْصَارِ لِفَقْرِهِمْ.

৬. আর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের নিকট হতে যে 'ফাই' দিয়েছেন প্রত্যর্পণ করেছেন তার জন্য তোমরা দৌড়াওনি হাঁকাওনি, হে মুসলমানগণ অশ্ব কিংবা সওয়ারি উষ্ট্র مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত। অর্থাৎ তোমরা এ ব্যাপারে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করনি। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান সুতরাং তাতে তোমাদের কোনো অধিকার নেই; বরং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের জন্য নির্দিষ্ট, যাদের আলোচনা অন্য আয়াতে আসছে। অর্থাৎ চার শ্রেণির লোক, যাদের প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যে তিনি এক-পঞ্চমাংশের মধ্য হতে এক-পঞ্চমাংশ বিতরণ করতেন। অবশিষ্ট তাঁরই জন্য থেকে যেত। তা দ্বারা তিনি যা ইচ্ছা করতেন। যেমন, তার একাংশ মুহাজির ও আনসারগণের মধ্য হতে তিনজনকে তাদের দারিদ্র্যের কারণে প্রদান করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَا قَطَعْتُمْ : مَا قَطَعْتُمْ -এর مَا - مَحَلْ نَصَبْ এ অবস্থিত হয়েছে قَطَعْتُمْ ক্রিয়া مَفْعُوْل হওয়ার কারণে, যেন বলা হয়েছে اَىُّ شَئٍ قَطَعْتُمْ –[কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَوْمًا عَلٰى اُصُوْلِهَا পড়েছেন, আ'মাশ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَوْمًا عَلٰى اُصُوْلِهَا পড়েছেন। অর্থাৎ তোমরা কর্তন করনি। কেউ কেউ قَوْمًاءُ عَلٰى اُصُوْلِهَا পড়েছেন। আবার কেউ কেউ قَائِمًا عَلٰى اَصْلِهِ পড়েছেন। অর্থাৎ ضَمِيْر-কে مُذَكَّرْ করে পড়েছেন, তখন সে ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ হলো لَفْظْ مَا আর পূর্বের কেরাতসমূহে ضَمِيْر ব্যবহারকরণ যথার্থ হয়েছে।–(কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর)

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّشَاقِ اللّٰهَ : হযরত তালহা ইবনে মুছাররেফ ও মুহাম্মদ ইবনে ছামছিকা وَمَنْ يُّشَاقِقْ অর্থাৎ আরো একটা ق অতিরিক্ত করে পড়েছেন। তবে বাকি ক্বারীগণ একটি ق -কে অন্য ق -এর মধ্যে اِدْغَامْ করে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(الاية) مَا قَطَعْتُمْ আয়াতের শানে নুযূল : বনূ নাযীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে বনূ নাযীরকে তাদের নিজ বাড়িতেই অবরোধ করে রাখলেন এবং তাদের খেজুর বাগান কেটে ফেলতে ও জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। উদ্দেশ্য তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা। তখন তারা বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! তুমিতো নিজেকে নবী বলে দাবি করা, ফিতনা ফ্যাসাদ অপছন্দ কর এবং তা বলে বেড়াও। এখন তুমি গাছ কাটতে ও জ্বালিয়ে দিতে কিভাবে নির্দেশ দিলে? তখন আল্লাহ তা'আলা مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ.... আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন এবং তাতে বলে দিলেন যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছিল। –[কাবীর, সাফওয়া]

قَوْلُهُ وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ .... فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে অবধারিত না করতেন নির্বাসিত হওয়া তবে তাদেকে দুনিয়ায় অন্য শাস্তি প্রদান করতেন। আর তাদের জন্য আখেরাতে দোজখের শাস্তি রয়েছে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বহিষ্কারকরণকে অবধারিত না করলে যা সন্ধির মাধ্যমে হয়েছে, তাহলে তাদেরকে দুনিয়ায় অন্য শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হতো। সন্ধি করে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করার পরিবর্তে তারা যদি লড়াই করত, তাহলে তারা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাদের পুরুষরা নিহত হতো, তাদের স্ত্রীলোক এবং শিশু-সন্তানদেরকে ক্রীতদাস বানানো হতো। যেমন–ইতঃপূর্বে বানূ কুরায়যার সাথে করা হয়েছে। –[সাফওয়া] আর আখেরাতে জাহান্নামের আজাব তো রয়েছেই। তারা তাদের বাড়িঘর হতে সন্ধি করে নির্বাসিত হয়ে দুনিয়াতে প্রাণে বেঁচে গেলেও আখেরাতে দোজখের শাস্তি হতে কোনো ভাবেই রক্ষা পাবে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহর আজাবের যোগ্য হয়েছে; সুতরাং তা তাদেরকে যে কোনোভাবে অবশ্যই পেতে হবে। –[রুহুল মা'আনী, যিলাল]

قَوْلُهُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا .... شَدِيْدُ الْعِقَابِ : তাদেরকে দুনিয়াতে বাড়িঘর হতে বহিষ্কৃতকরণ আর তাদের জন্য আখিরাতে দোজখের শাস্তি নির্ধারিতকরণ এ কারণে যে, তারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর প্রবল বিরোধিতা করেছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরোধিতা করে, আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

আহলে কিতাবগণের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তাদেরকে পরিণামে যে আজাব ও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে ঠিক তেমনি যেসব লোক সর্বযুগে সর্বস্থানে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদরেকেও তেমনি পরিণাম ভোগ করতে হবে। –[যিলাল]

جَلَاءٌ এবং اِخْرَاجٌ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য : جَلَاءٌ এবং اِخْرَاجٌ শব্দ দু'টির অর্থ বহিষ্কার-উচ্ছেদ হলেও উভয়ের মধ্যে দু' ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ১. جَلَاءٌ হলো আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে বহিষ্কৃত হওয়া, আর اِخْرَاجٌ কখনো আত্মীয়-স্বজন ব্যতিরেকে নির্বাসিত হওয়াকে বলা হয়। ২. جَلَاءٌ গোটা একটা সম্প্রদায়, দল বা জামাতের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর اِخْرَاجٌ গোটা দলের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি এক ব্যক্তির বহিষ্কারের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন গাছগুলো কাটতে ও জ্বালিয়ে দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন? : এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, বনূ নাযীর গোত্রের বসতির চতুষ্পার্শ্বে খেজুর বাগান ছিল, সে বাগানের কিছু গাছ অবরোধ নিষ্কণ্টক ও সার্থক করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেটে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন– قَطَعُوْا مِنْهَا مَا كَانَ مَوْضَعُهَا لِلْقِتَالِ মুসলমানরা বনূ নাযীরের কেবল সে গাছপালাই কেটেছেন যা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল। –[কাবীর, তাফসীরে নীশাপুরী]

কয়টি গাছ কাটা হয়েছিল? : হযরত কাতাদাহ এবং যাহহাক (র.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম বনূ নাযীরের কেবল একটি গাছ কেটেছিলেন এবং সেগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মুসলমানরা কেবল একটি গাছ কেটেছিলেন এবং ঐ গাছটিকেই কেবল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

বর্তমানেও শত্রুদের গাছপালা বাড়ি-ঘর ধ্বংসের বিধান : বর্তমানেও ধর্মযুদ্ধ চলাকালে কাফের মুশরিকদের ঘর-বাড়ি অথবা, খেত-খামার ধ্বংস করার বৈধতা প্রসঙ্গে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে কাফিরদের ঘর-দরজা, খেত-খামার, ঘর-বাড়ি ও গাছ-পালা ইত্যাদি সব কিছুই প্রয়োজনে ধ্বংস করা ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিধন করা বৈধ। তাঁর দলিল উক্ত আয়াত এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرَّقَ জুমহুরে মুহাদ্দেসীন-এর অভিমতও এটাই।

আল্লামা শাইখ ইবনুল হুমাম (র.) বলেন– যদি কাফেরদেরকে পরাজয় বরণ করানোর জন্য হত্যাকাণ্ড, গাছপালা ও সম্পদ পোড়ানো এবং ঘর-বাড়ি ইত্যাদি ধ্বংস করা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ জায়েজ হবে, অন্যথায় তা মাকরূহ হবে। لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّ الْحَاجَةِ وَمَا أُبِيْحَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ (মেরকাত ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৫৬, আশয়াতুল লুময়াত ৩য় খণ্ড ৪০৯ পৃ.) কারো মতে মদীনার খেজুর বৃক্ষ ১২০ প্রকারের ছিল। (تَنْظِيْم ج/٣) তবে যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকলে শত্রুপক্ষের অপদস্থের জন্য যে কোনো ব্যবস্থা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ : উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য ও অর্থ এই–আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে কাফির বনূ নাযীর গোত্রীয় লোকদের সহায়-সম্পদ ও গাছপালা কেটে পুড়িয়ে নিধন করার অনুমতি এ জন্য প্রদান করেছেন, যেন কাফিরদের গাত্রদাহ হয়। এখানে ফাসিক বলতে ইহুদিগণকে বুঝানো হয়েছে। ইহুদিগণেরই চোখের সম্মুখে তাদের সাধের বাগ-বাগিচাসমূহ নষ্ট হচ্ছে। অথচ তারা কিছুই করতে পারছে না, দেখে তারা অন্তরে অত্যন্ত ক্ষোভ ও অপমান বোধ করবে। আর যা অকর্তিত অবস্থায় অবশিষ্ট থেকে যাবে তা ভবিষ্যতে মুসলমানদের ভোগে আসাব ভেবে তারা মনের জ্বালায় পুড়ে মরতে থাকবে। কাফেরদের উপর মুসলমানদের এহেন আচরণকে আল্লাহ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ বলে বর্ণনা করেছেন।

আর মুসলমানগণের কেউ কেউ গাছ না কাটার পক্ষে ছিলেন, কারণ তারা ভাবনা করলেন যে, উক্ত বৃক্ষগুলো পরবর্তীতে মুসলমান গণই ভোগ করবে, সুতরাং কেটে নষ্ট করার যুক্তি নেই। তবে বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর ও ইয়াযীদ ইবনে রূমান এর বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, যারা বৃক্ষরাজি কেটেছেন, তারা সত্যই নবী করীম ﷺ-এর মতে ও নির্দেশেই কেটেছেন। অপর দিকে প্রথমেই কিছুসংখ্যক সাহাবী মহানবী ﷺ-এর নির্দেশের আওয়াজ কর্ণগোচর না হওয়ায় বৃক্ষ কর্তনের কার্য বৈধ ও অবৈধতার লক্ষ্যে মতান্তর হয়ে গেল। সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলা আয়াত مَا قَطَعْتُمْ নাজিল করে কর্তন কার্য বৈধতার ঘোষণা দিয়েছেন। –[ইবনে জারীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটিও এ মত প্রকাশ করেছে এবং তাতে আরও বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এ মর্মে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে কেউ বৃক্ষ কেটেছে, আর কেউ বিরত রয়েছে, এখন কাদের কার্য যথার্থ হয়েছে, তাই রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করলেন। –[নাসায়ী]

ফকীহগণের মধ্যে যারা প্রথমোক্ত বর্ণনাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন যে, তা নবী করীম ﷺ-এর ইজতিহাদ ছিল। উত্তরকালে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করে তাঁর প্রতি সমর্থন করলেন। [ইংরেজিতে তাকে Ratification বলা হয়] এতে বুঝা যায়, যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ ছিল না, সে সকল ক্ষেত্রে নবী ﷺ ইজতিহাদ করতেন।

যে সকল ফকীহ দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা উক্ত দ্বিতীয় বর্ণনার আলোকে যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে, মুসলমানদের দুই দল দু'টি পন্থায় অগ্রসর হয়েছেন। তবে তা নিজ ইজতেহাদের ভিত্তিতেই করেছেন। আল্লাহ পরবর্তীতে সকলকেই সমর্থন করে আয়াত নাজিল করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لِيْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে لِيْنَةٌ দ্বারা কোন প্রকার খেজুর গাছ উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তত্ত্ব জ্ঞানীর মতে সর্বপ্রকার খেজুর বৃক্ষকেই لِيْنَةٌ বলা হয়, তবে তাতে আজওয়া অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কথা বলেছেন, ইকরামা এবং কাতাদাহ (র.)। ইবনে আব্বাস (রা.)ও এ মত পোষণ করেছেন।

২. ইমাম যুহরী (র.) বলেছেন, আজওয়া এবং বরনিয়া নামক খেজুর ব্যতীত অন্যান্য সকল খেজুর বৃক্ষকে لِيْنَةٌ বলা হয়।

৩. হযরত মুজাহেদ (র.) এবং আতীয়া (র.) বলেছেন, সকল খেজুর বৃক্ষকেই লীনাহ বলা হয়।

৪. হযরত সুফিয়ান (র.) বলেছেন, সর্বপ্রকার উত্তম খেজুরের বৃক্ষকেই লীনাহ বলা হয়।

৫. হযরত মোকাতেল (র.) বলেছেন, এক প্রকার বিশেষ খেজুরের বৃক্ষকে لِيْنَةٌ বলা হয়। এ খেজুরগুলোর বর্ণ হলুদ হয়; আর তা এত পরিচ্ছন্ন হয় যে, বাইরে থেকেও ভেতরের দানা পর্যন্ত দেখা যায়। আরবরা এ ধরনের খেজুরকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। -[নূরুল কোরআন]

এ আয়াত হতে প্রাপ্ত শরিয়তের বিধান :

১. রাসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নির্দেশ। এ আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, পোড়ানো ও অক্ষত ছেড়ে দেওয়া উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছানুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কুরআনের কোনো আয়াতে এ দু' কাজের মধ্য থেকে কোনো কাজের আদেশ উল্লেখ নেই, সাহাবায়ে কেরাম যা করেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন, তা আল্লাহরই আদেশ বলে গণ্য হবে। এ আদেশ পালন করা কুরআনের আদেশ পালন করার মতো ফরজ।
-[মা'আরেফুল কোরআন]

২. যেসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ থাকত না, তাতে নবী করীম ﷺ ইজতিহাদ করতেন। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ইজতিহাদের ভিত্তিতেই বৃক্ষ কর্তন করতে ও পোড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরকালে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাজিল করে তার সমর্থন করলেন।

৩. হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.)-এর বর্ণনা হলো, মুসলমানরা নিজেদের সিদ্ধান্তে এ কাজ করেছিলেন অর্থাৎ গাছ কেটেছিলেন। এ কাজ করা উচিত কিনা পরে তা নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। কতিপয় সাহাবী তাকে বৈধ বলেছেন, কতিপয় নিষেধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে উভয় মতের লোকদের কাজকে যথার্থ বলে ঘোষণা করলেন।

এ বর্ণনা হতে একদল ফকীহ ইস্তেম্বাত করে বলেছেন, বিশেষজ্ঞগণ সমুদ্দেশ্যে ইজতেহাদ করে যদি ভিন্ন ভিন্ন মত গ্রহণ করেন, তাহলে তাদের মত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর শরিয়তের দৃষ্টিতে তা সবই বরহক সত্য হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনোটিকে গুনাহ বলা যাবে না। -[মা'আরেফুল কুরআন, কুরতুবী]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে বনূ নাযীর গোত্রের প্রাণ ও আত্মসম্মানের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণনা ছিল। উক্ত আয়াতে তাদের সম্পদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, বনূ নাযীর যখন ঘর-বাড়ি ছেড়ে মদীন মুনাওয়ারার উপকণ্ঠ হতে চলে যায়, তখন যেভাবে খায়বারের মালে গনিমত মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে বনূ নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করার কথা কোনো কোনো সাহাবী চিন্তা করেছিলেন। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে তাদের সে ধ্যান-ধারণা দূর করে দেন। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ : اَفَاءَ শব্দটি فَيْءٌ থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ- প্রত্যার্পণ করা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, "তাদের হতে যা কিছু আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ করেছেন।" এটা হতে বুঝা যায় যে, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং এ ধন-সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে তাঁরই ইচ্ছা ও বিধান অনুযায়ী ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে হবে। এরূপ ব্যবহার কেবল আল্লাহর মু'মিন বান্দারাই সঠিকভাবে করতে পারে, অন্যরা পারে না। এ কারণেই যেসব ধন-সম্পদ কাফেরদের হাত হতে মুক্ত হয়ে মু'মিনদের দখলে আসবে তার প্রকৃত অবস্থা ও মর্যাদা এই যে, সেগুলোর প্রকৃত মালিকই সেগুলোর আত্মসাৎকারীদের হাত হতে মুক্ত করে স্বীয় অনুগত বান্দাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাকে اَفَاءَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَيْءٌ [ফাই]-এর সংজ্ঞা : কাফেরদের হাত হতে যেসব ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যুদ্ধবিহীন মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই হলো 'ফাই' তার বিপরীত রয়েছে গনিমত।

غَنِيْمَةٌ -এর সংজ্ঞা : কাফেরদের হাত হতে যেসব ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি মুসলমানদের হাতে যুদ্ধের বিনিময়ে চলে আসে তাকে গনিমত বলা হয়। এ উভয় প্রকার ধন-সম্পদের মধ্যে পার্থক্য করে বলা হয়েছে فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ "তোমরা তার জন্য ঘোড়া ও উষ্ট্র কর্মে নিয়োজিত করনি।" ঘোড়া ও উষ্ট্র কর্মে নিয়োজিত করার অর্থ যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যক্রম। সুতরাং এ ধন-সম্পদ গনিমতের মাল নয়, তা ফাইয়ের মাল। গনিমত সম্বন্ধে সূরা আনফালে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে مَآ اَفَاءَ। مِنْهُمْ -এর مَرْجِع হলো اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ 'আহলে কিতাবের কাফিরগণ অর্থাৎ বনূ নাযীর। (فَلَا شَيْءَ مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رُسُلِهِ مِنْهُمْ হবে تَقْرِيْر যার مُبْتَدَأ এ ; مُبْتَدَأ টা فَا -এর اللّٰهُ -এর خَبَر উহ্য রাখা হয়েছে। যার لَكُمْ فِيْهِ)

অর্থাৎ যে ধন-সম্পদ আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন বনূ নাযীর হতে, তাতে তোমাদের কোনো হক নেই, এরপর তাদের হক না থাকার কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'কারণ সে মালগুলো এমন নয় যার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়িয়েছ।'

গনিমত ও ফাই -এর মধ্যে পার্থক্য :

اَلْفَيْءُ -এর পরিচিতি : কাফেরগণের মাল-সম্পদ যদি যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত অর্জিত হয়, তখন তাকে 'ফাই' বলা হয়। [তাফসীরে সাবী, হিদায়া] যথা– বনূ নাযীর গোত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি।

اَلْغَنِيْمَةُ -এর পরিচিতি : আর শত্রু পক্ষের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ অথবা সংঘর্ষের মাধ্যমে শত্রুদেরকে ধাওয়া করার পর তাদের হতে যে সম্পদ পাওয়া যায়, তাকে গনিমত বলা হয়। ইমাম আবূ ওবাইদ বলেন–

مَا يُنَلْ مِنْ اَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهُوَ الْغَنِيْمَةُ - وَمَا يُنَلْ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا تَضَعُ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا وَيَصِيْرُ الدَّارُ دَارُ الْاِسْلَامِ فَهُوَ فَيْءٌ يَكُوْنُ النَّاسُ عَامًا وَلَا خُمُسَ فِيْهِ .

মূল কথা, গনিমতের মাল হিসেবে পরিগণিত হতে হলে কাফের ও মুসলমান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ফাই-এর মালের জন্য যুদ্ধ শর্ত নয়।

* শরিয়ত বিশারদ অথবা ফকীহগণের মতে–
গণিমত সে অস্থাবর সম্পত্তি যা সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা কালে শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্ত হতে পাওয়া যায়।
এ ছাড়া শত্রুদের ভূমি, ঘর-বাড়ি এবং অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সবগুলো 'ফাই' বলে গণ্য হবে।

وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ -এর মধ্যে هُمْ ضَمِيْر -এর প্রত্যাবর্তন স্থল কি? : উক্ত আয়াতে বর্ণিত هُمْ ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ ইহুদি বনূ নাযীর -এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ উক্ত ضَمِيْر -এর পূর্ববর্তী বর্ণনায় ইহুদি বনূ নাযীর -এর সাথে সংঘর্ষ হওয়ার আলোচনা রয়েছে। আর তাদের থেকেই 'ফাই' অর্জন করার ঘোষণা রয়েছে এবং আলোচনা তাদেরকে নিয়েই চলেছে। সুতরাং هُمْ ضَمِيْر -এর ইঙ্গিত তারাই। –(তাফসীরে কাবীর)

فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ -এর মধ্যে "ه" ضَمِيْر এর مَرْجِعْ কি? : উক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ عَلَيْهِ -এর ("ه" ضَمِيْر) মুসলমান ও কাফির বনূ নাযীর গোত্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিল, সে সংঘর্ষের প্রতি ইঙ্গিতবহ। আর মুসলমানগণ কর্তৃক লব্ধ সম্পত্তিকেই বুঝানো এখানে মূল উদ্দেশ্য। কারণ, কিছু সংখ্যক লোক সে লব্ধ সম্পত্তি নিয়েই সমালোচনা করছিল। তখনই আল্লাহ ضَمِيْر) ("ه" দ্বারা তার প্রতি ইশারা করে উক্ত বিষয় সম্পর্কে বলে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ .... مَنْ يَّشَاءُ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।" অর্থাৎ এ মালগুলো 'ফাই' হলেও আল্লাহ এগুলোকে স্বীয় রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। কারণ সে মালগুলো তোমাদের যুদ্ধের বিনিময়ে প্রাপ্ত নয়; বরং শত্রুদের অন্তরে ভয় প্রবিষ্ট করিয়ে অর্জন করা হয়েছে। এটা অর্জনের জন্য লোকদেরকে সফর করতে হয়নি। ঘোড়াও উট দৌড়াতে হয়নি। লোকেরা বনূ নাযীরের অবরোধে যতটুকু উদ্যোগ আয়োজন করেছে তা অতি নগণ্য, আল্লাহ তাদের অন্তরে যে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন তার সাথে তুলনা করা যায় না। এ কারণেই 'ফাই' নির্দিষ্ট হয়েছে রাসূলের জন্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى كَالصَّفْرَاءِ وَ وَادِى الْقُرٰى وَيَنْبُعَ فَلِلّٰهِ يَأْمُرُ فِيْهِ بِمَا يَشَاءُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِىْ صَاحِبِ الْقُرْبٰى قَرَابَةِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِىْ الْمُطَّلِبِ وَالْيَتٰمٰى اَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ هَلَكَتْ اٰبَاؤُهُمْ وَهُمْ فُقَرَاءُ وَالْمَسٰكِيْنِ ذَوِى الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ الْمُنْقَطِعِ فِىْ سَفَرِهٖ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَىْ يَسْتَحِقُّهُ النَّبِىُّ وَالْاَرْبَعَةُ عَلٰى مَا كَانَ يُقَسِّمُهُ مِنْ اَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الْاَرْبَعَةِ خُمُسَ الْخُمُسِ وَلَهُ الْبَاقِىْ كَىْ لَا كَىْ بِمَعْنَى اللَّامِ وَاَنْ مُقَدَّرَةٌ بَعْدَهَا يَكُوْنَ الْفَىْءُ عِلَّةُ الْقِسْمَةِ كَذٰلِكَ دُوْلَةً مُتَدَاوِلًا بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط وَمَاۤ اٰتٰكُمْ اَعْطَاكُمُ الرَّسُوْلُ مِنَ الْفَىْءِ وَغَيْرِهٖ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

৭. আল্লাহ তা'আলা এ জনপদবাসীগণ হতে তাঁর রাসূলকে যা দান করেছেন যেমন– সাফরা, ওয়াদীউল কোরা ও ইয়ানবু' নামক জনপদবাসীগণ হতে। তবে তা আল্লাহর জন্য তৎসম্পর্কে তিনি যা ইচ্ছা আদেশ করেন। এবং রাসূল ও রাসূলের স্বজনগণের জন্য বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব গোত্রীয় রাসূলের স্বজনগণের জন্য আর অনাথদের জন্য মুসলমানদের সে সকল সন্তান যাদের পিতা মারা গেছে এবং তারা দরিদ্র মিসকিনদের জন্য মুসলমানদের মধ্য হতে অভাবীগণের জন্য। এবং পথিকগণের জন্য যে মুসলমান মুসাফির তার সঙ্গীগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উক্ত চার শ্রেণির লোক 'ফাই' -এর হকদার হবে। যাদের প্রত্যেক শ্রেণির মধ্যে তিনি তার পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশ বিতরণ করতেন। আর অবশিষ্ট তাঁর জন্য রাখতেন। যেন كَىْ শব্দটি لَامْ অর্থে ব্যবহৃত এবং তারপর اَنْ উহ্য রয়েছে। না–হয় উক্ত 'ফাই' এরূপে বণ্টনের কারণ। আয়ত্তাধীন তোমাদের মধ্যকার ধনশালীগণের মধ্যে। আর যা তোমাদেরকে দান করেন বখশিশ করেন রাসূল 'ফাই' ইত্যাদি হতে তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী।

٨. لِلْفُقَرَاءِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ اَعْجَبُوْا الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ فِىْ اِيْمَانِهِمْ .

৮. অভাবগ্রস্তদের জন্য শব্দটি উহ্য ক্রিয়া اَعْجَبُوْا -এর সাথে সম্পর্কিত সে মুহাজিরগণের যারা স্বগৃহ ও সম্পদ হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাই সত্যবাদী তাদের ঈমানে।

٩. وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ الْمَدِيْنَةَ وَالْاِيْمَانَ اَيْ اَلِفُوْهُ وَهُمُ الْاَنْصَارُ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً حَسَدًا مِّمَّآ اُوْتُوْا اَيْ اٰتَى النَّبِيُّ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْ اَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهٖ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط حَاجَةٌ اِلٰى مَا يُؤْثِرُوْنَ بِهٖ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ حِرْصَهَا عَلَى الْمَالِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

৯. আর যারা বসবাস করেছে নগরীতে মদীনায় এবং ঈমান আনয়ন করেছে অর্থাৎ ঈমানকে ভালোবেসেছে। তারা হলো আনসারগণ। এদের পূর্বে তাদের নিকট যারা হিজরত করে এসেছে, তাদেরকে ভালোবাসে এবং তাদের অন্তরে কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না। হিংসা তাতে যা মুহাজিরদেরকে প্রদত্ত হয়েছে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অংশ হতে বনূ নাযীর গোত্রীয় ইহুদিদের সম্পদের মধ্য হতে যা মুহাজিরদেরকে দান করেছেন এবং তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করে, যদিও তাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ততা রয়েছে যে জিনিসটি ত্যাগ করত প্রাধান্য দিয়েছে তৎপ্রতি নিজেদের প্রয়োজন থাকে। আর যে ব্যক্তি তার আন্তরিক কার্পণ্য হতে রক্ষা পেয়েছে সম্পদের প্রতি মোহাসক্তি হতে। তারাই সফলকাম।

١٠. وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا حِقْدًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

১০. আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে মুহাজির ও আনসারগণের পর, কিয়ামত পর্যন্ত। তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রণী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করো এবং আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। শত্রুতা ঈমানদারগণের প্রতি। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি দয়াবান ও পরম দয়ালু।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً : জমহুর (يَكُوْنَ) অর্থাৎ ي সহকারে আর دُوْلَةً-কে যবর সহকারে পড়েছেন। অর্থাৎ كَيْلَا يَكُوْنَ - يَكُوْنَ دُوْلَةً ক্রিয়ার فَاعِلْ-কে উহ্য করে دُوْلَةً-কে مَفْعُوْل হিসাবে পড়েছেন। আবূ জা'ফর, আ'রাজ, হিশাম, আবূ হাইয়ান تَكُوْنَ অর্থাৎ تَا সহকারে আর دُوْلَةٌ-কে مَرْفُوْع পড়েছেন। অর্থাৎ تَكُوْنَ-এর كَانَ-কে তাম্মা হিসাবে دُوْلَةٌ-কে فَاعِلْ করে পড়েছেন, তখন উহ্য ইবারত হবে এ রকম– اَيْ كَيْلَا تَقَعَ اَوْ تُوْجَدَ دُوْلَةٌ ।

জমহুর دُوْلَةٌ-এর دَالْ পেশ সহকারে পড়েছেন। তবে আবূ হাইয়ান ও আস্সুলামী যবর সহকারে পড়েছেন। ঈসা ইবনে ওমর, ইউনুস ও আশজায়ী বলেছেন, উভয়ভাবেই পড়া যায়। উভয়ের অর্থ কিন্তু এক ও অভিন্ন। কেউ কেউ ভিন্ন অর্থও করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَقَوْلُهُ وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ : وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ বাক্যটি يَبْتَغُوْنَ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে, উভয় বাক্যটি حَالْ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। প্রথম বাক্য হলো حَالْ مُقَارِنَة আর দ্বিতীয় বাক্য হলো حَالْ مُقَدَّرَة অর্থাৎ এখানে نَاوِيْنَ শব্দটি উহ্য রয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটি حَالْ مُقَارِنَة ও হতে পারে, কারণ এভাবে তাদের বহিষ্কৃত হওয়াটা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সাহায্যার্থে হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ : জমহুর يُوْقَ শব্দটিকে وَاوْ-এ سَاكِنْ দিয়ে এবং ق-এ تَخْفِيْف করে পড়েছেন। হযরত ইবনে ওমর (র.) ও আবূ হাইয়ান (র.) وَاوْ-এ فَتْح দিয়ে এবং ق-এ تَشْدِيْد দিয়ে পড়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য 'ফাই' -এর সম্পদ অর্জনের বিষয় আলোচনা করেছেন, আর অত্র আয়াতে 'ফাইয়ের' বিধান এবং এর অংশ বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মুফাসসিরগণ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ নাযীর হতে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ কেবল মুহাজিরদেরকে দিয়েছিলেন, কারণ তখন তারা গরিব ছিলেন। (কোনো কোনো বর্ণনায় আছে তিনজন গরিব আনসারীকেও দিয়েছেন) আনসারদেরকে তা হতে কিছুই দেননি, কারণ তারা সম্পদশালী ছিলেন, তখন কোনো কোনো আনসারী বললেন, এ ফাইয়ের মধ্যে আমাদেরও অধিকার রয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং তাতে বললেন যে, রাসূল যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো আর যা দেননি তার জন্য লালায়িত হয়ো না। -[সাফওয়া]

মুফাসসিরগণ আরও বলেছেন, এ আয়াত ফাইয়ের মাল সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এ আয়াতের হুকুম রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে সমস্ত করেছেন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং তার মধ্যে 'ফাই' সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশও থাকবে। মোদ্দকথা হলো, মুসলমানগণ সব ব্যাপারে রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে, তাই হলো এ আয়াতের দাবি। মুফাসসিরগণ তাদের এ তাফসীরের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কয়েকটি হাদীসেরও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন- "আমি যখন তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ করবো তখন যতদূর সম্ভব তদনুযায়ী কাজ করো। আর যে কাজ হতে বিরত রাখবো তা পরিহার করে চলো।' -[বুখারী ও মুসলিম]

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا اَوْ رَدَّ شَيْئًا اَمَرْتُ بِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِيْ جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ اَبُوْ يَعْلٰى وَالطَّبَرَانِيْ)

'যে লোক আমার নামে মিথ্যা রটনা করেছে, অথবা আমার কোনো নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামে একটা বাড়ি নির্ধারণ করে নেয়।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, একবার তিনি ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুক অমুক [ফ্যাশনাকারী] স্ত্রীলোকের উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, এ কথা শুনে জনৈক স্ত্রীলোক তার নিকট এসে বলল, এ কথাটি আপনি কোথায় পেলেন? আল্লাহর কিতাবে তো এরূপ কথা আমি কোথাও দেখতে পাই নি। হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, তুমি যদি আল্লাহর কিতাব পড়ে থাকতে, তাহলে এ কথাটি তুমি তাতে নিশ্চয় দেখতে পেতে। তুমি কি কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি পড়নি? وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

স্ত্রীলোকটি বলল, হ্যাঁ এ আয়াতটিতো আমি পড়েছি, তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বললেন, তাহলে আর কি, রাসূল ﷺ -ই তো এ সকল ফ্যাশন হতে নিষেধ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, এসব কাজে লিপ্ত স্ত্রীলোকের উপর আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন। এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বলল, এখন আমি বুঝতে পেরেছি।-[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে আবূ হাতেম]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব এ প্রসঙ্গে তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআনে বলেছেন, এখানে একই উৎস হতে শরিয়ত তথা বিধান গ্রহণের মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। তেমনি এ আয়াত ইসলামি সংবিধানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করছে। ইসলামি আইনের ক্ষমতা এ কারণেই যে, এ শরিয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন ও হাদীস হিসাবে নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করার ক্ষমতা রাখে না। এ শরিয়তের পরিপন্থি কোনো আইন রচনা করলে সে আইনের এ ক্ষমতা থাকবে না। কারণ সে আইনের প্রথম সনদ বা ভিত্তিই নেই, যা হতে ক্ষমতা অর্জন করবে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি মানব-রচিত যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি, সাথে সাথে সে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপন্থি, যা উম্মত তথা জাতিকে ক্ষমতার উৎস বলে দাবি করে। অর্থাৎ যেখানে বলা হয়, জাতি নিজের জন্য যে রকম ইচ্ছা সে রকম আইন রচনা করতে পারবে এবং যাই রচনা করবে তাই ক্ষমতাশালী হবে। ইসলামে ক্ষমতার উৎস হলো সে আল্লাহর শরিয়ত যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ে এসেছেন। উম্মতের কর্তব্য হলো এ শরিয়ত মেনে চলা, তার হেফাজত করা এবং বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে ইমাম হলো জাতীয় প্রতিনিধি, এখানেই জাতির অধিকার সীমাবদ্ধ। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ যে শরিয়ত নিয়ে এসেছেন তার খেলাফ করার কোনো অধিকার জাতির নেই।

তবে এমন কোনো বিশেষ সমস্যা জাতির সামনে দেখা দিলে, যার সামাধান কুরআন অথবা হাদীসে নেই, তখন সে সমস্যা সমাধানের পথ হলো এমন আইন বিধান প্রণয়ন করা, যা রাসূল প্রদত্ত কোনো উসূলের খেলাফ না হয়। এটা দ্বারা সে দৃষ্টিভঙ্গির নিয়ম ভাঙ্গানো হচ্ছে না, বরং তা হলো তারই শিক্ষা (فَرْعٌ) সুতরাং মূলকথা হলো যে, কোনো বিধানে কুরআন এবং হাদীস থাকলে রাসূল যা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করতে হবে। আর কুরআন-হাদীসে না থাকলে এমন বিধান রচনা করতে হবে যা ইসলামের কোনো উসূলের পরিপন্থি হবে না; এখানেই জাতি এবং জাতির প্রতিনিধি ইমামের ক্ষমতা শেষ। এটা এমন এক অনন্য বিধান মানব-রচিত যেসব বিধানের কথা মানুষের জানা তাদের কোনো বিধানই এ বিধানের সমকক্ষ হতে পারবে না।

-[যিলাল]

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ ...... وَابْنِ السَّبِيْلِ : আল্লাহ তা'আলা আপন রাসূলগণকে অপরাপর জনপদ তথা কাফেরগণ হতে ফাই ইত্যাদির যে সকল মাল প্রদান করে থাকেন, তাতে আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ ও রাসূল ﷺ -এর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, পথের ভিখারী, ইত্যাদি লোকদের প্রাপ্য হক রয়েছে। তাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশ পাওয়ার অধিকারী, কারণ উক্ত ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার বিবেচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে কেবলমাত্র বনূ নাযীর গোত্রের 'ফাই' সম্পর্কেই নির্দেশ ছিল, বর্তমান আয়াতে যে কোনো ক্ষেত্রের 'ফাই' -এর সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। ফাই-এর মালে একমাত্র রাসূলেরই অধিকার থাকবে। আল্লাহর নাম কেবল বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে মালের ফজিলত ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। নতুবা আল্লাহ তো সব সম্পদেরই মালিক। রাসূলের ﷺ অবর্তমানে ইমাম বা রাষ্ট্রনায়ক এর ব্যবহার যথাযথ জনকল্যাণ কাজেও ব্যবহার করতে পারবেন।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ফাই থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে যে দান করতেন তাতে তারা (আত্মীয়রা) দরিদ্র হওয়া আবশ্যক নয়; বরং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তারা সকলেই পেতেন। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, তারা রাসূলের সাহায্যকারী হওয়ার কারণে পেতেন।

ধনের লেন-দেন আদান-প্রদান শুধুমাত্র ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে সীমিত না থাকে, ধনীরা যাতে মউজ না করে, গরিবরা যাতে দুর্ভোগ ভোগ করতে বাধ্য না হতে হয়। ধন যাতে ব্যক্তি বিশেষ অথবা গোষ্ঠী বিশেষের চির কুক্ষিগত না হয়ে থাকে। গরিব ধনী নির্বিশেষে যাতে সর্বসাধারণের হাতে ধনের আনা-গোনার পথ অবারিত থাকে। এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের তত্ত্বাবধানে যাতে অসুবিধা না হয়; তজ্জন্যই এমন বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর "ফাই"-এর মাল যে কোনো গোত্র থেকেই অর্জিত হবে। সে মালের ক্ষেত্রেই এ বিধান বলবৎ থাকবে। কারণ, مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى দ্বারা হুকুম আম হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (র.)-এর মতে উক্ত আয়াতে বর্ণিত "اَهْلُ الْقُرٰى" দ্বারা বনূ নাযীর, কুরাইযা, খাইবার, ফাদাক ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত সম্পদের কথা বলা হয়েছে। -[তাফসীরে আযহারী, আশরাফী, তাফসীরে তাহের]

হকদারদের সাথে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করার তাৎপর্য : উপরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নাম উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ধন-সম্পদ ও আভিজাত্য হালাল পূত-পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা নবীগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেননি। 'ফাই' আর গনিমতের মাল কাফেরদের থেকে অর্জন করা হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ মাল নবীদের জন্য কিভাবে হালাল হলো? এখানে আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন; কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায় তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে নবীদেরকে ঐশীবাণীসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা নবীদের দাওয়াতে সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামি আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নির্ধারিত জিজিয়া ও খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে তাদের মোকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জান-মাল সম্মানই নয়। তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয় তা কোনো মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়; বরং তা সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এ সম্পদকে 'ফাই' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোনো হক নেই। যেসব হকদারকে তা হতে অংশ দেওয়া হবে, তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া হবে। কাজেই এ ধন-সম্পদ আকাশ হতে বর্ষিত পানি এবং স্বউদ্গত ঘাসের ন্যায় আল্লাহর দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারকথা এই যে, এ স্থলে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত আছে যে, এ সব ধন-সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার। তাঁর পক্ষ হতে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা কারো সদকা-খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচজন রয়ে গেল- রাসূল, তার আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফির। -[মা'আরেফুল কোরআন]

রাসূল ﷺ -এর অংশ প্রসঙ্গ : এ সম্পদে প্রথম হকদার রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি এ বিধানটি কিভাবে কার্যকর করেছেন-মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান হযরত ওমরের বর্ণনার ভিত্তিতে তা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম ﷺ এ অংশ হতে নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের খরচাদি গ্রহণ করতেন। -[বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি।]

এ সম্পদে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে অংশ ছিল তা রাসূলের অন্তর্ধানের পর মওকুফ হয়ে যাবে- হানাফী মাযহাব মতে, কারণ খোলাফায়ে রাশেদীন তা মওকুফ করেছেন। রাসূলের অন্তর্ধানের পর তা খোলাফাদের জন্য হবে তা মনে করলে তারা তা মওকুফ করতেন না।

অন্য আর এক কারণ হলো, এ অংশ বণ্টন করা হয়েছে রাসূলের জন্য। রাসূল রিসালাত হতে উদ্ভূত। তা হতে প্রতীয়মান হয় যে রিসালাত হলো এ অংশ বণ্টনের কারণ। সুতরাং রিসালাতের তিরোধানের সাথে সাথে এ অংশও মওকুফ হয়ে যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী (র.) মত প্রকাশ করেছেন যে, যে অংশটি রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তিরোধানের পর তাঁর খলীফার জন্য থাকবে, কেননা তিনি তাঁর নেতৃপদে অসীন থাকার কারণেই তা গ্রহণ করতেন, রাসূল হিসাবে নয়।

তবে শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফিক্হবিদগণের মত জমহুর ফকীহগণের মতের অনুরূপ। অর্থাৎ উক্ত হিসসা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণকর কাজেই ব্যয় হবে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের হিসসা সম্পর্কে বর্ণনা : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট ছিল তা তাঁর ওফাতের পর পরই নির্ধারিত করা বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর (ذَوِى الْقُرْبٰى) তাঁর নিকট মতো আত্মীয়-স্বজনের জন্য নির্ধারিত অংশ প্রদান করার দু'টি কারণ তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে,

১. তাঁরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ইসলাম প্রচার তথা ধর্মীয় কার্যে তাঁকে বিশেষ সহানুভূতি করতেন, সুতরাং সে লক্ষ্যে ধনী ও দরিদ্র সকলেই সমান অংশে অংশীদার হতেন।

২. আর হযরত ﷺ -এর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন কারো জন্য সদকা অথবা যাকাতের মাল খাওয়া সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আইন মোতাবেক হারাম ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য "ফাই" সম্পদের অংশ হালাল করে দিয়েছেন। আর অপর দিকে যেহেতু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ওফাত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর নুসরত ও মদদ -এর পথ বন্ধ হয়ে গেল। সেহেতু তাঁর আত্মীয়গণের ধনাঢ্য লোকদেরকে দেওয়ার নিষ্প্রয়োজন দাঁড়াল। তখন কেবলমাত্র গরিব আত্মীয়দেরকে 'ফাই' এর মাল অপরাপর দরিদ্র فُقَرَاءُ -এর সমান অংশে দেওয়া ব্যবস্থা বহাল রাখা হলো। হ্যাঁ, যদিও রাসূলের ন্যায় তাঁর ধনাঢ্য লোকদেরকে দেওয়ার কারণ বন্ধ হয়ে গেল। তথাপিও কাফের আত্মীয়-স্বজনকে অন্যান্য সাধারণ (مَسَاكِيْن) মিসকিন হতে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যবস্থা রইল। -[মা'আরেফুল কুরআন, হেদায়া]

অত্র যেহেতু জাকাত হতে রাসূলের ﷺ আত্মীয়গণ কোনো অংশ পেতেন না, সেহেতু অন্যান্যদের (অভাবগ্রস্তদের) তুলনায় রাসূলের আত্মীয় গরিবদের হকের প্রাধান্য দেওয়া হলো।

আত্মীয়-স্বজনদের অংশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর, ওমর ও ওসমান (রা.)- এর খেলাফত আমলে প্রথম দুটি অংশ প্রত্যাহার করে অবশিষ্ট তিন অংশ অর্থাৎ এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ 'ফাই' প্রাপকদের মধ্যে শামিল থাকতে দেওয়া হলো এবং হযরত আলী (রা.)ও তাঁর খেলাফত আমলে এ নীতি অনুসারে কাজ করে গেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইমাম মুহাম্মদ বাকের -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তা হলো– হযরত আলী (রা.) -এর ব্যক্তিগত মত যদিও তাই ছিল, যা আহলে বায়ত -এর ছিল। (তা হলো, এ অংশ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক, কিন্তু তিনি হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) -এর মতের বিপরীত কাজ করতে রাজি হননি।

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াহ (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর এ দু'টি অংশ তথা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিজের ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অংশ নিয়ে মত-বিরোধের সৃষ্টি হয়। কারো মত ছিল প্রথম অংশ (রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিজের অংশ) তাঁর খলীফার পাওয়া উচিত। অপর কিছু লোক এ মত প্রকাশ করেছেন যে, দ্বিতীয় অংশ রাসূলে কারীম ﷺ -এর আত্মীয় স্বজনকেই দেওয়া উচিত। আবার কারো মত ছিল দ্বিতীয় অংশ খলীফার আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত ঐকমত্যে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, উভয় অংশই জিহাদের প্রয়োজনে ব্যয় হবে।

আতা ইবনে সায়েব (র.) বলেন, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাঁর খেলাফত আমলে নবী করীম ﷺ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের অংশ বনূ হাশেমের লোকদেরকে দিতে শুরু করেছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহগণের মত হলো, এ পর্যায়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করাই অধিক নির্ভুল কর্মনীতি। -[কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবূ ইউসুফ, ১৯, ২১ পৃ.]

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মত হলো যেসব লোক হাশেমী ও মোত্তালিব বংশোদ্ভূত বলে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত কিংবা সাধারণভাবে সর্বজন জ্ঞাত হবে। তাদের ধনী-গরিব উভয় পর্যায়ের লোকদেরকে "ফাই" থেকে অংশ দেওয়া যেতে পারে।

হানাফী আলিমগণের মত হলো তাদের মধ্য হতে কেবলমাত্র গরিব লোকদেরই তা হতে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য অন্যদের তুলনায় তাদের হকই বেশি হবে। -[রূহুল মা'আনী]

ইমাম মালেকে (র.)-এর মতে, এ ব্যাপারে ইসলামি রাষ্ট্রের উপর কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। যে খাত হতে যেরূপ সমীচীন বিবেচিত হবে ব্যয় করতে পারবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লোকজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া অধিক উত্তম।

-[শরহে কাবীর, ইবনে সাবীল]

অবশিষ্ট তিনটি অংশ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী ও অপর তিনজন ইমামের মধ্যে অপর একটি দিক নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শফেয়ী (র.)-এর মতে "ফাই" -এর সমস্ত মালকে পাঁচটি সমান অংশে বিভক্ত করে তার একটি অংশ উপরিউক্ত ব্যয়খাতসমূহে এমনভাবে ব্যয় করতে হবে যে, তার এক-পঞ্চমাংশ বনূ হাশেম ও বনূ মোত্তালেবের জন্য, এক-পঞ্চমাংশ এতিমদের জন্য, এক-পঞ্চমাংশ মিসকিনদের জন্য এবং এক-পঞ্চমাংশ পথিক মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করতে হবে। ইমাম মালিক, আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এ মতে বণ্টন সমর্থন করেন না। তাদের মত হলো "ফাই" সাধারণ মুসলিম জনগণের কল্যাণে ব্যয় হবে।

শত্রুদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মালামাল সম্বন্ধে আলোচনা : যেসব ধন-সম্পদ শত্রুদের নিকট হতে পাওয়া যায়, সেসব সম্পদের হুকুম সম্বন্ধে কুরআনের তিন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত সূরা আল-আনফালে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ .

'আর জেনে রাখো, যুদ্ধে যা তোমরা গনিমত পাও তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, এতিমদের, দরিদ্রদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ।' –[সূরা আল-আনফাল–৪১]

দ্বিতীয়ত সূরা আল-হাশরের উপরিউক্ত প্রথম আয়াত, যাতে বলা হয়েছে– وَمَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ (الاية)

তৃতীয়ত সূরা আল-হাশরের দ্বিতীয় আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে–

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ .

এ আয়াতগুলোর তাফসীর সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এ সব আয়াতে তিনটি আলাদা আলাদা হুকুম বিবৃত হয়েছে– সূরা আনফালে শত্রুদের যেসব সম্পত্তি যুদ্ধের ফলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাওয়া গেছে সেসব সম্পদের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে ধন-সম্পদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে চারভাগ আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টন করতে হবে আর বাকি এক-পঞ্চমাংশ রাসূল, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন প্রমুখের জন্য বরাদ্ধ হবে।

সূরা আল-হাশরের প্রথম আয়াতে যেসব ধন-সম্পদ কাফিররা ফেলে চলে গেছে, তারপর মুসলমানরা তা যুদ্ধ ছাড়াই পেয়েছে সেসব মলের শরয়ী হুকুম বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে তাতে সেনাবাহিনীর কোনো হক নেই। তা কেবল রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট।

সূরা আল-হাশরের দ্বিতীয় আয়াতে যেসব মাল চুক্তির বিনিময়ে মুসলমানদের হাতে আসে অর্থাৎ জিজিয়া, খারাজ ইত্যাদির হুকুম বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো রাসূল, রাসূলের আত্মীয় স্বজন, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরগণের জন্য। –[আয়াতুল আহকাম]

আবার কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, সূরা আনফালের আয়াতে যুদ্ধের বিনিময়ে প্রাপ্ত সম্পদের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, আর সূরা হাশরের উভয় আয়াতে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রু-সম্পদের হুকুম বিবৃত হয়েছে। তাঁরা আরো বলেছেন যে, সূরা হাশরের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ সম্পদগুলোর প্রকৃত স্বরূপ এ নয় যে, সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এগুলো দখল করে নিয়েছে। আর এ কারণে এগুলোকে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য তাদের অধিকার স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এ সমস্ত ধন-সম্পদের প্রকৃত হকদার কারা সে বিষয়ে বলা হয়েছে।

ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, সূরা হাশরের প্রথম আয়াতে যে ধন-সম্পদের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট। আর সূরা হাশরের দ্বিতীয় আয়াত এবং সূরা আনফালের আয়াতে শত্রুদের কাছ থেকে যে কোনোভাবে প্রাপ্ত সম্পদের হুকুম বিবৃত হয়েছে। তবে এ অবস্থায় দু' আয়াতের মধ্যে কোনো একটিকে মানসূখ বা রহিত মানতে হবে। কারণ আনফালের আয়াতে এক-পঞ্চমাংশ রাসূল, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন .... প্রমুখের জন্য বলা হয়েছে। আর এখানে সূরা হাশরের আয়াতে পুরোটাই রাসূল, রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

আবার কোনো কোনো মুফাসসির সূরা হাশরের প্রথম আয়তটিকেই মানসূখ বলে দাবি করেছেন। তাঁদের মতে, বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত শত্রু-সম্পদের হকদার ছিলেন ইসলামের প্রথম যুগে কেবল রাসূল ﷺ পরে সে হুকুম মানসূখ হয়ে যায় সূরার দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা। সুতরাং তাঁদের মতে আয়াত দু'টি একত্রে থাকলেও একত্রে অবতীর্ণ হয়নি। –[আয়াতুল আহকাম]

আমাদের মতে তিনটি আয়াতে আলাদা আলাদা হুকুম বিবৃত হয়েছে। সুতরাং কোনো আয়াতই মানসূখ নয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى كَيْلَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ : এখানে উপরিউক্ত সম্পদ বণ্টনের কারণ ব্যক্ত হয়েছে। সাথে সাথে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামি অর্থনীতির মূলনীতি কি হবে, তাও ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যেন তা (সম্পদ) তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে; অর্থাৎ ধন-সম্পদের আবর্তন গোটা সমাজের মধ্যে অবাধ ও

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সাধারণ হতে হবে। কেবল ধনশালী লোকদের মধ্যেই ধন-সম্পদ আবর্তিত হতে থাকবে, কিংবা ধনীরা আরও অধিক ধনশাল আর গরিবররা আরও অধিক গরিব হতে থাকবে তা কুরআনের এ মূলনীতি নির্ধারণী আয়াতটির সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

ইসলামি অর্থনীতির এ নীতিতে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত কিন্তু তা এ মূলনীতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ধন-সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়ে গোটা সমাজের মধ্যে আবর্তিত হওয়ার বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং যেসব বিধানে কেবল ধনিক শ্রেণির মধ্যে সম্পদ আবর্তিত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে তা ইসলামি অর্থনীতির পরিপন্থি, ব্যক্তি সম্পদের মালিক হতে পারবে তবে বল্গাহীন মালিক হওয়ার সুযোগ নেই। বস্তুত কুরআন মাজীদে এ নীতিটিকে বলে দিয়েই ইতি করা হয়নি। ঠিক এ উদ্দেশ্যেই কুরআনে সূদকে হারাম করা হয়েছে, যাকাত ফরজ করা হয়েছে, গনিমতের মাল হতে এক-পঞ্চমাংশ সাধারণ্যে বণ্টন করার বিধান দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন কাফফারার এমন সব পন্থা পেশ করা হয়েছে, যাতে ধন-সম্পদের স্রোত সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের দিকে প্রবাহিত হয়। মিরাস বণ্টনের পদ্ধতি রচনা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি অধিকতর ব্যাপক ক্ষেত্রে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। নৈতিকতার দিক দিয়ে কার্পণ্যকে ও অতীব ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় এবং বদান্যতা ও দানশীলতাকে অতীব উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে। তা দান নয়, তাদের হক সুস্পষ্ট অধিকার হিসাবে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্রের উপর আরবের একটা বিরাট উৎস 'ফাই' সম্পর্কে এ আইন করে দেওয়া হয়েছে যে, তার একটা অংশ সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের সাহায্য দানে ব্যয় করতে হবে, এ পর্যায়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস দু'টি– একটি যাকাত, দ্বিতীয়টি 'ফাই'।

মুসলমানদের নির্দিষ্ট পরিমাণ (نِصَابٌ) অতিরিক্ত সম্পদ, গৃহপালিত পশু, ব্যবসা পণ্য ও কৃষি ফসল হতে যাকাত গ্রহণ করা হয় এবং তার অধিকাংশই গরিব লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। আর 'ফাই' পর্যায়ে জিজিয়া ও ভূমি রাজস্বসহ এমন সমস্ত আয়ই গণ্য যা অমুসলমানদের নিকট হতে আসবে। তারও বিরাট অংশ গরিবের জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ব্যবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের সমস্ত আর্থিক ও সম্পদ সম্পর্কীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে, যার ফলে ধন-সম্পদের উৎস ও উপায়ের উপর কেবলমাত্র ধনশালী ও প্রভাবশালী লোকদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম না হয়– ধন-সম্পদের স্রোত ধনীদের হতে গরিবের দিকে যেতে পারে, তা কেবলমাত্র ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে; বরং সব হবে তার বিপরীত ধারায়। উপরিউক্ত বিধান হতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মূলত ইসলামের পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই এ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ব্যক্তির অগাধ মালিকানার উপর একটা বড় বাধা।

অতএব, ইসলাম ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে; কিন্তু তাই বলে ইসলাম পুঁজিবাদ নয়, তেমনি পুঁজিবাদও ইসলাম হতে সৃষ্ট নয়, পুঁজিবাদ সুদ ও মজুদদারী ছাড়া কায়েম হতে পারে না, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এক বিশেষ ব্যবস্থা যা একাকী সৃষ্ট, একাকী চলছে এবং একাকী আজ পর্যন্ত বাকি আছে– এমন এক বৈশিষ্টমণ্ডিত ব্যবস্থা যা ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুষম অধিকার ও হক সম্বলিত। –[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ .... فَانْتَهُوْا : উক্ত আয়াতাংশে মহান রাব্বুল আলামীন সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা প্রত্যেক কার্য ক্ষেত্রে তোমাদের দলনেতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করো। তিনি তোমাদেরকে যা করার নির্দেশ প্রদান করে থাকেন তাই করবে, আর যা থেকে বিরত থাকার হুকুম দান করেন তা হতে বিরত থাকবে। তাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। উক্ত বর্ণনার মাধ্যমে 'ফাই'-এর মালের প্রতি ইশারা করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে বলেন– 'ফাই'-এর মাল যেহেতু তোমাদের কষ্ট-ক্লেশ ব্যতীত অর্জন হয়েছে অথবা এমনি বিনা কষ্টে যা হস্তগত হয় তা বণ্টনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর রাসূলকেই একক অধিকার দিয়েছেন, সার্বজনীন প্রয়োজন বশত যথা ইচ্ছা তিনিই তথায় তা খরচ করবেন। (হাকীমূল উম্মত) সুতরাং ধন হোক জ্ঞান হোক, অথবা আদেশ নিষেধ যাই হোক না কেন পয়গম্বর ﷺ থেকে যার অনুমতি পাওয়া যায় মুসলমান মাত্রকেই তা সানন্দে ও সাগ্রহে বরণ করতে হবে। তাই শিরোধার্যরূপে গ্রহণ করতেই হবে। আর পয়গম্বরের বিরোধিতা আল্লাহর বিরোধিতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

উক্ত আয়াতখানি দ্বারা যদিও আল্লাহ ফাই-এর অংশীদারদের বর্ণনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ তবুও অংশীদারদের কাকে কতটুকু দান করবেন সেই কথা রাসূলের উপর ন্যস্ত রয়েছে। যাকে না দেওয়া হয়ে থাকে সে যেন তা প্রাপ্ত হওয়ার চিন্তায় বিভোর না হয়। আর যারা বাহানা করে প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে তাও জঘন্য অপরাধ হবে। –[তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন ও তাফসীর তাহের]

আর আয়াতটির প্রয়োগ কেবল ফাই -এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং সাধারণ দৃষ্টিতেও তাকে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়, এ প্রসঙ্গে হুযূর ﷺ বলেছেন– إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)
আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ কুরআনের নির্দেশের ন্যায়, সুতরাং তার উপর হুবহু আমল করা ওয়াজিব। –[আল-হাদীস]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

رَوٰى اَبُوْ يَعْلٰى وَالطَّبَرَانِىْ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا اَوْ رَدَّ شَيْئًا اَمَرْتُ بِهٖ فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ فِىْ جَهَنَّمَ .

قَوْلُهٗ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الخ : আয়াতের অনুসরণে বহু সংখ্যক সাহাবী প্রত্যেক কার্যে কুরআন মাজীদের নির্দেশের অনুগমন করতেন এবং তাকে (وَاجِبُ الْعَمَلِ) হিসাবে গ্রহণ করতেন। -[মাআরেফ]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে اَتٰى শব্দের মোকাবিলায় نَهْى শব্দটি আনয়ন করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় اَتٰى শব্দটির অর্থ اَمَرَ যা نَهْى শব্দের হুবহু বিপরীত অর্থবোধক। আর কুরআনে কারীমে نَهْى শব্দের বিপরীতে اَمَرَ শব্দকে না নিয়ে اَتٰى শব্দ ব্যবহার করার কারণ সম্ভবত তাই হতে পারে। যে বিষয় প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়েছে [অর্থাৎ ফাই প্রসঙ্গে] তাতে আয়াতাংশ শামিল থাকবে।

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তাকে নির্দেশ দিলেন যে, এই কাপড় (পরণ থেকে) খুলে ফেল, তখন ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে বসল যে, এ প্রসঙ্গে আপনি কোনো আয়াত পেশ করতে পারবেন, যাতে সেলাইকৃত কাপড় ইহরামের অবস্থায় পরিধান করার কথা নিষেধ করা হয়েছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত আয়াত وَمَآ اٰتٰكُمُ الخ পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

একদা ইমাম শাফেয়ী (র.) মানুষদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষমতা রাখি, সুতরাং তোমরা যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। অতঃপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইহরাম অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি (ذُنْبُوْر) জাম্বুর মেরে ফেলল এখন তার কি হুকুম হবে? (কুরআনের মাধ্যমে উত্তর দিন) তখন ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত আয়াত وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ الخ তেলাওয়াত করলেন এবং তার প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করে লোকটিকে তার হুকুম বলে সন্তুষ্ট করে দিলেন। -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ..... الْعِقَابُ : 'তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দান করেন তা গ্রহণ করো, আর যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো' আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলার পর মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী।'

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আয়াতের শেষাংশে وَاتَّقُوا اللّٰهَ বলে পূর্বোক্ত নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ছলচাতুরী করলে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে গড়িমসি করলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তার খবর রাখেন, তিনি এজন্য শাস্তি দিবেন।

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ আয়াতে উপরিউক্ত দু' মূলনীতিকে মু'মিনদের অন্তরে তাঁর প্রথম উৎসের তথা আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আহ্বান করেছেন তাকওয়া অবলম্বন করতে এবং আল্লাহর আজাব হতে ভয় দেখাচ্ছেন "এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদানকারী" এটাই হলো বড় জামিন যাতে গড়িমসি চলে না। যা হতে পলায়ন সম্ভব নয়। মুসলমানগণ জানেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন খবর রাখেন, তাদের আমল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। আরো জানে যে, আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদানকারী, তাদেরকে কেবল ধনীদের মধ্যে সম্পদের আবর্তন যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে যা দান করেছেন তা সন্তুষ্ট চিত্তে এবং আনুগত্যের সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং রাসূল যা করতে নিষেধ করেছেন, তাতে অবহেলা প্রদর্শন না করে বিরত থাকতে হবে। কারণ, তাদের সামনে এক কঠিন দিন রয়েছে। -[যিলাল]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মালে 'ফাই' সম্পর্কে গভীর আলোচনা ছিল, উক্ত আয়াত হতে রুকূর শেষ পর্যন্ত কয়েকটি আয়াতে মুহাজির ও আনসার মুসলমানদের প্রশংসা ও তাঁদের কিছু প্রাপ্য হকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ الخ-এর শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির হযরত ইয়াযীদ ইবনে আসামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারগণ নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এই আবেদন পেশ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের এবং মুহাজিরদের মধ্যে আমাদের জমিন ভাগ করে দিন। অর্থাৎ মুহাজিরদেরকেও আমাদের জমিনের অর্ধেক দিয়ে দিন, যাতে তারা সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, জমিনের মালিকানা তোমাদেরই থাকবে। মালিকানায় কোনো অংশীদারিত্ব থাকবে না। অবশ্য তোমাদের জমিনে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ প্রদান করো এবং উৎপন্ন ফসলকে ভাগ করে নিও। তখন মহান আল্লাহ তাদের উদারতার কথা উল্লেখ করে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[নূরুল কোরআন]

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আনসারকে মেহমান হিসাবে আহলে সুফফার একজন লোক দিলেন। আনসার সে লোকটিকে নিয়ে নিজ গৃহে গমন করলেন। বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীকে বললেন, বাড়িতে কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হলো, না, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, অতঃপর খাবার নিয়ে আসো। তুমি খাবার নিয়ে আসলে আমি বাতি নিভিয়ে দিবো। স্ত্রী আনসারীর কথা মতো কাজ করলেন। আনসারী খেতে বসে নিজের সামনের খাবার মেহমানের দিকে এগিয়ে দিলেন। অতঃপর সকালবেলায় মেহমানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আসমানের অধিবাসীগণ তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। তখন আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

–[বুখারী, মুসলিম, মা'আরিফুল কোরআন, ইবনে কাছীর, কুরতুবী, আসবাবুন নুযূল]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলের একজন মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি ছাগলের মাথা উপঢৌকন দিলেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অমুক ভাই ও তার বাচ্চারা আমার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত। সে মতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয়জন চতুর্থজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে আসল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলো وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ –[মা'আরিফ, আসবাব]

সাহাবীদের اِيْثَارٌ (অন্যকে প্রাধান্য দান)-এর আরো বহু ঘটনা বিভিন্ন তাফসীরে বিবৃত হয়েছে। মোটকথা হলো, আনসারগণ নিজেদের প্রয়োজন, দারিদ্র্য, ক্ষুধা-ক্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে প্রাধান্য দান করতেন।

قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ .... وَاَمْوَالِهِمْ الخ : لِلْفُقَرَاءِ শব্দটি وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ হতে بَدَل হয়েছে। যেন বলা হয়েছে, ইতঃপূর্বে যে চার প্রকারের লোকদেরকে অভাবের কারণে ফাই-এর হকদার বলা হয়েছে, সে লোকগুলো হলেন এ গরিব মুহাজিরগণ। যাদের পরিচয় হলো এই..... এই। –[কাবীর]

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ .... وَاَمْوَالِهِمْ **আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য :** এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ এতিম, মিসকিন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে 'ফাই' -এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকিন এ মালের হকদার কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ তাদের দীনি খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।–(মা'আরিফুল কোরআন)

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ .... وَاَمْوَالِهِمْ **আয়াতের কারীমা হতে নির্গত শরয়ী মাসআলাসমূহ :** উক্ত আয়াত হতে ইসলামের নীতি অনুসারে কয়েকটি মাসআলা সাব্যস্ত করা যায়–

১. কাফেরগণ জবর দখল করে মুসলমানদের মালের উপর মালিকানা, অধিকার স্থাপন করতে পারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে মুহাজিরদেরকে ফকির বলেছেন, অথচ তাদের দেশে সকল মাল সম্বল রয়েছে। সুতরাং এ মাসআলার জন্য আয়াতখানা প্রমাণ স্বরূপ।
২. এটা হতে আরো মাসআলা নির্ধারিত করা যায় যে, দেশত্যাগ অথবা নির্বাসিত ব্যক্তি সে দেশের সম্পদের উপর পরবর্তীতে মালিকানা স্বত্ব দাবি করতে পারে না।– (يُقَالُ لَهُ اِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ)
৩. ধর্ম পরিবর্তনের কারণেও সম্পদের মালিকানা স্বত্ব থাকে তাকে ধর্ম পরিবর্তন اِخْتِلَافُ دِيْنَيْنِ বলা হয়। كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّنْزِيْلِ
৪. সদকা ও ফাই-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ও ধার্মিক দীনের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাবে।
৫. ইসলাম তথা ধর্ম রক্ষার্থে পুনর্বাসিত হলে, তাদেরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বে ফাই অথবা সদকার মাল হতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬. উক্ত ব্যবস্থা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের জন্য সীমিত নয়; বরং এ নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। –[মাদারেক]

উক্ত আয়াতটি মুহাজির সম্প্রদায়ের ফাজায়েল বর্ণনাকারী স্বরূপ : قَوْلُهُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الخ আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরগণের গুণ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে–

১. মুহাজিরগণ আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনয়ন করেছে। অর্থাৎ ঈমানদারের গুণে গুণান্বিত হয়েছে। এর কারণেই তাদেরকে কাফের সম্প্রদায় ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজন থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। আর তারা জীবন দিয়ে হলেও হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আল্লাহ তা'আলার সাহায্যকারী হয়ে থাকবে। এ কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার দুরাচার ও অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে ফলে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তাদের কেউ কেউ কখনো ক্ষুধার জ্বালায় অসহ্য হয়ে পেটে পাথর বেঁধেছেন। আবার কেউ কেউ শীতের সম্বল না থাকার কারণে মাটির গর্ত তৈরি করে তাতে গা ঢাকা দিয়ে শীত হতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। –[তাফসীর মাযহারী, কুরতুবী]

২. মুহাজিরগণ ইসলাম গ্রহণের পিছনে লালায়িত হয়ে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় দেশান্তর হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জন করা। দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে নয়। যাতে তাঁদের পূর্ণ এখলাসের সাথে আল্লাহমুখি হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

আর (فَضْلٌ) শব্দটি সাধারণত দুনিয়ার নিয়ামত ও (رِضْوَانٌ) শব্দটি পরকালীন নিয়ামতের জন্য বলা হয়। এ স্থলে উভয় শব্দ ব্যবহার করে এ মর্মটুকুই বুঝানো হয়েছে যে, ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হয়ে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় শান্তি এবং আখেরাতের শান্তি অর্জন করার কামনা করেছিলেন। সে মর্মেই আল্লাহ বলেছেন– يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا

৩. মুহাজিরগণ দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির জন্য আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সাহায্য একান্ত আবশ্যক মনে করেছেন, কারণ আল্লাহর সাহায্য ও রাসূলের সাহায্যের অর্থই দীন -এর সাহায্য। সুতরাং তারা দীনের জন্য অশেষ ও অবর্ণনীয় জান-মাল কুরবানি করেছেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছেন وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ।

৪. মুহাজিরগণ মুখে স্বীকার করে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে যে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন তার উপর অটল রয়েছেন।

উক্ত আয়াতে সকল সাহাবী ও মুহাজিরগণের সত্যতার সাধারণ বর্ণনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁদের কাউকেও যদি মিথ্যাবাদী বলে গালি দেওয়া হয়, তাহলে তার ঈমান থাকবে না। রাফেযিয়া সম্প্রদায় তাঁদেরকে (মুহাজিরদেরকে) মুনাফেক বলে উক্ত আয়াতের নির্দেশের সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং রাফেযিয়া সম্প্রদায় ঈমানদার নয়। অথচ রাসূল ﷺ উক্ত মুহাজিরগণের অসিলা দ্বারা দোয়া করতেন। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন– أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ –[বাগাবী]

এ আয়াত দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতের সত্যতার দলিল পেশ করা : যারা এ আয়াত হতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খেলাফত বৈধ হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে চান তাঁরা বলেন, সেসব ফকির মুহাজির ও আনসারগণ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলতেন, ইয়া খালীফাতু রাসূলিল্লাহ–[হে রাসূলুল্লাহর খলীফা] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁরা সত্যবাদী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, সুতরাং তারা যে 'ইয়া খালীফাতু রাসূলিল্লাহ' বলতেন তাদেরও সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য। যখন অবস্থা এই দাঁড়াল, তখন হযরত আবূ বকরের খেলাফত বৈধ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও অপরিহার্য হয়ে গেল। –[কাবীর]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে লিখেছেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফত বৈধ প্রমাণ করার জন্য এ জাতীয় দলিল দুর্বল এবং অপ্রয়োজনীয়। কারণ তাঁর খেলাফত সাহাবীদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আলী ও তাঁর খেলাফত মেনে নিয়েছিলেন। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ ...... هَاجَرَ اِلَيْهِمْ (الاية) : وَالَّذِيْنَ অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে পূর্বোক্ত আয়াতের اَلْمُهَاجِرِيْنَ শব্দের উপর عَطْف সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে "এ সম্পদ তাদের জন্যও যারা এ মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে মদীনায় বসবাস আরম্ভ করেছিল। তারা ভালোবাসে সে লোকদেরকে যারা হিজরত করে মদীনায় এসেছে।"

পূর্বোক্ত আয়াতে মুহাজিরদের প্রশংসা করার পর এখানে আল্লাহ তা'আলা আনসারদের প্রশংসা করেছেন।

تَبَوَّؤُا শব্দের অর্থ– অবস্থান গ্রহণ করা। এখানে اَلدَّارَ মানে দারুল হিজরত মদীনা তাইয়্যেবা, সুতরাং تَبَوَّؤُا الدَّارَ -এর অর্থ হলো মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছে; কিন্তু এখানে اَلدَّارَ -এর উপর اَلْاِيْمَانَ -কে عَطْف করা হয়েছে। অবস্থান গ্রহণ কোনো স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ঈমান কোনো জায়গা নয় যে, তাতে অবস্থান গ্রহণ সম্ভবপর হয়। তাই কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে اَخْلَصُوْا অথবা تَمَكَّنُوْا ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং ঈমানে পাকাপোক্ত ও খাঁটি হয়েছে।

এখানে এ ব্যাখ্যা করা যেতে পরে যে, ঈমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

–[মা'আরিফুল কোরআন, ফাতহুল কাদীর, কাবীর, কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, এখানে اَلدَّارَ -এর ال -কে مُضَافٌ اِلَيْهِ -এর পরিবর্তে বলা যেতে পারে। অর্থাৎ মূলত دَارَ الْهِجْرَةِ ছিল, اَلْاِيْمَانَ -এর মধ্যে مُضَافٌ -কেই حَذْف করা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে تَبَوَّؤُا دَارَ الْهِجْرَةِ وَ دَارَ الْاِيْمَانِ তখন উভয় دَارَ -এর অর্থ হবে মদীনা তাইয়্যেবা। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِهِمْ : مِنْ قَبْلِهِمْ -এর অর্থ : এখানে مِنْ قَبْلِهِمْ -এর هُمْ ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হলো, মুহাজিরগণ। অর্থাৎ যারা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং ঈমানকে খাঁটি করেছেন মুহাজিরদের পূর্বে। এখন এখানে প্রশ্ন উঠে تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ -এর যে ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে এ রকম, "যারা মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং ঈমানকে পাকাপোক্ত করেছেন মুহাজিরদের পূর্বে" এটা কিন্তু বাস্তব সত্য ইতিহাসের পরিপন্থি। কারণ মূলত মুহাজিররাই প্রথমে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে, পরে ইসলাম মদীনায় সম্প্রসারিত হয়। এ প্রশ্ন হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মুফাসসিরগণ এখানে مُضَافٌ اِلَيْهِ উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ هِجْرَتِهِمْ তথা তাদের হিজরতের পূর্বে। -[রূহুল মা'আনী]

আবার কেউ কেউ كَثِيْر শব্দটি উহ্য مُضَافٌ মেনেছেন, অর্থাৎ قَبْلَ كَثِيْرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ অনেক মুহাজিরের পূর্বেই তারা ঈমান গ্রহণ করেছেন। -[সাফওয়া, ইবনে কাছীর]

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ الخ আয়াতটি আনসারদের মর্যাদা বর্ণনা স্বরূপ : উক্ত আয়াতে تَبَوَّؤُا শব্দের পরে دَارَ সাথে ঈমানের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ বাসস্থান তৈরি করার জন্য কোনো স্থান বা ঘর আবশ্যক, ঈমনের সাথে বাসস্থান তৈরি করার অর্থের কোনো হেতু হয় না। তাই কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, এখনে تَمَكَّنُوْا অথবা, اَخْلَصُوْا শব্দ مَحْذُوْف মানতে হবে। তখন অর্থ হবে, আনসারগণ এমন ব্যক্তিবর্গ, যারা হিজরতের যোগ্য স্থানে বাসস্থান তৈরি করেছেন এবং ঈমান গ্রহণ করে ঈমানের শক্তিতে শক্তিশালী হলেন।

অথবা, বলা যায় ঈমানকে اِسْتِعَارَةً হিসেবে একটি রক্ষিত স্থানের সাথে تَشْبِيْه দিয়ে তথায় বাসস্থান বা আশ্রয়স্থল নির্ধারিত করে নেওয়ার অর্থ নেওয়া হয়েছে।

৩আর مِنْ قَبْلِهِمْ দ্বারা মুহাজিরগণের পূর্ববর্তীগণকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মতলব এই হবে যে, মদীনা তাইয়্যেবাহ -এর আনসারগণের আর একটি ফজিলত এই যে, যে শহরটি আল্লাহর دَارُ الْهِجْرَةِ অথবা دَارُ الْاِيْمَانْ হওয়ার উপযোগী ছিল, মুহাজিরগণের পূর্বে সে শহরটিতে আনসারগণ বসবাস রত আছেন। আর মুহাজিরগণ মদীনায় গিয়ে ঈমান দৃঢ় করার পূর্বেই আনসারগণ ঈমান গ্রহণ করে তথায় ঈমানদার হিসেবে অতি পাকা হয়ে আছেন। -[মা'আরেফুল কোরআন]

উক্ত আয়াতটি মদীনা মুনাওয়ারাহ-এর ফজিলত বর্ণনাকারীও বটে : কারণ উক্ত আয়াতে تَبَوَّؤُا শব্দটি স্থান নির্ধারণকরণের প্রতি ইঙ্গিতবহ, আর دار শব্দটি দ্বারা دَارُ الْهِجْرَةِ অথবা دَارُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ মদীনায়ে তাইয়্যেবাহ উদ্দেশ্য।

এ লক্ষ্যে ইমাম মালিক (র.) মদীনা শরীফকে দুনিয়ার সকল শহর হতে উত্তম শহর বলেছেন। কেননা পৃথিবীর যে সকল শহরগুলোতে ইসলামের আলো পৌঁছেছে, তাতে যুদ্ধ ব্যতীত পৌঁছতে পারেনি; কিন্তু মদীনা শরীফে বিনা যুদ্ধে ইসলাম পৌঁছেছে। এমনকি মক্কা শরীফে ইসলামের উৎপত্তিস্থল হওয়া সত্ত্বেও তথায় জিহাদ ব্যতীত ইসলামের জ্যোতি পৌছানো সম্ভব হয়নি। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ : "তারা ভালোবাসে সেসব লোকদেরকে যারা তাদের নিকট হিজরত করে এসেছেন।" এ কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, মুহাজিরগণ যখন মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আসলেন তখন মদীনার অধিবাসী আনসারগণ তাদেরকে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন এবং তাদের ধন-সম্পদের একটা অংশ মুহাজির ভাইগণকে দিয়ে দিলেন। -[খাযেন, সাফওয়া]

হযরত আবূ হুরায়রা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ মদীনায় আসলে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে প্রস্তাব করলেন- আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান আছে। আপনি তা আমাদের ও মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, এ লোকেরা বাগ-বাগিচা চাষাবাদের কাজ জানে না। এরা যেখানে হতে এসেছে সেখানে বাগ-বাগিচা নেই। এমনকি হতে পারে না যে, এসব বাগ-বাগিচায় চাষাবাদের কাজ তো তোমরা করবে আর তা হতে ফসলের অংশ তাদেরকে দিবে? আনসাররা বললেন, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।" -[বুখারী, ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর]

Free @ www.e-ilmweebly.com

মুহাজিরগণের জন্য আনসারদের ভালোবাসার বহু ঘটনা ও বহু ত্যাগের কথা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। দুনিয়ার অন্য কোথাও–অন্য কোনো সমাজে এ রকম নজির মিলা অসম্ভব। সাধারণত লোকেরা ভিটা-মাটিহীন নির্বাসিত মানুষকে স্থান দিতে চায় না। সর্বত্রই দেশী ও বিদেশীর প্রশ্ন উঠে; কিন্তু আনসারগণ কেবল তাদেরকে স্থানই দেননি; বরং নিজের বাড়িতেই পুনর্বাসিত করেছেন, নিজের ধন-সম্পদের অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইজ্জত ও সম্ভ্রমের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন, যা দেখে স্বয়ং মুহাজিরগণ আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, 'এ রকম ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত লোক আমরা কখনো দেখিনি।"
–[মুসনদের আহমদ, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً (الاية) : আনসারদের গুণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, لَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوْتُوْا এবং তাদের অন্তরে কোনো প্রয়োজন (হিংসা) অনুভব করে না; তাতে যা মুহাজিরদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। এ আয়াত নিম্নোক্ত ঘটনার ইঙ্গিত করে।

যে সময় বনূ নযীর গোত্রের ফাই'য়ের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বণ্টনের এখতিয়ার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোনো বাড়ি-ঘর, আর না ছিল কোনো সহায়-সম্বল। তাঁরা আনসারগণের বাড়িতে বাস করতেন এবং তাঁদের বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত-মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফাইয়ের সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রাসূল ﷺ আনসারদের সরদার সাবেত ইবনে কায়েসকে ডেকে বললেন, তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন, সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিজের গোত্র খাযরাজের আনসারগণকে ডাকবো না সমস্ত আনসারকে ডাকবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না সবাইকে ডাকো, অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সালাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করলেন– আপনারা আপনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন তা নিঃসন্দেহে অনন্য অসাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা বনূ নাযীরের ধন-সম্পদ আপনাদের হস্তগত করেছেন। যদি আপনারা চাহেন তাহলে আমি এ সম্পদ আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিবো এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহে বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এ সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায় সম্বলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বণ্টন করে দিবো এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আলাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নিবে।

এ বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দু'জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) ও সা'দ ইবনে মায়ায (রা.) দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অভিমত এই যে, এ ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আপনি কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদ্বয়ের এ উক্তি শুনে উপস্থিত আনসারগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা এ সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করলেন এবং ধন-সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন, আনসারদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবূ দজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন। গোত্র নেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.)-কে ইবনে আবী হাকীমের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করলেন। –[মাযহারী, মা'আরেফুল কুরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى .... خَصَاصَةٌ : আনসারদের গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ আর তারা নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় তারা নিজেদের অভাব থাকলেও। اِيْثَارٌ -এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা।

خَصَاصَةٌ -এর অর্থ দারিদ্র, ক্ষুধা, প্রয়োজন, অভাব।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ : شُحٌّ শব্দের অর্থ হলো– কৃপণতা। بُخْلٌ ও شُحٌّ শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। তবে شُحٌّ শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে شُحٌّ -এর অর্থ হলো অতিশয় কৃপণতা। হযরত ইবনে ওমর (রা.) شُحٌّ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, নিজের ধন-সম্পদ অন্যকে না দেওয়া شُحٌّ নয়। তবে شُحٌّ হলো যেসব ধন-সম্পদ তার নয় সেসব ধন-সম্পদের প্রতি লোভ করা [হাদীস]।

* হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, شُحٌّ শব্দের অর্থ হলো তুমি তোমার ভাইয়ের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে হজম করা, তবে তা কৃপণতা নয়।
* হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র.) বলেছেন, شُحٌّ হলো হারাম পথে অর্থ-সম্পদ অর্জন করা এবং তার যাকাত আদায় না করা।

* কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন شُحٌّ শব্দের তাৎপর্য হলো এমন অদম্য লোভ যা নিষিদ্ধ পথে রোজগারের কারণ হয়।

* ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন তা গ্রহণ করা, আর যা দান করার আদেশ দিয়েছেন তাকে কৃপণতার কারণে রেখে দেওয়া, যদি সে আল্লাহর পথে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করে তবে বলা যাবে যে এই বক্তি شُحٌّ থেকে সংরক্ষিত। –[নূরুল কোরআন]

شُحٌّ বা লোভ থেকে আমাদের সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত। شُحٌّ বা বখিলি সম্পর্কে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, হুযূর ﷺ বলেন–

اِتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَ هُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ .(رواه البُخَارِىُّ فِى الْاَدَبِ وَالْمُسْلِمْ - وَالْمُسْنَدُ لِاَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِىِّ)

এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ঘটনা : ইবনে কাছীর ইমাম আহমদ (র.)-এর বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন–একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে বসা ছিলাম, তখন তিনি বলেন, তোমাদের নিকট এখন একজন বেহেশতী আগমন করেছেন, এমতাবস্থায় আনসার গোত্রের একজন লোক বাম হাতে জুতা নিয়ে আসছেন যার দাড়ি হতে তাজা অজুর পানি ফোঁটায় ফোঁটায় বয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিন একই ব্যক্তির মাধ্যমে একই ঘটনা প্রকাশ পেল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস থেকে উঠে গেলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) সে ব্যক্তির বেহেশতী হওয়ার গুপ্ত রহস্য জানবার জন্য তার পিছনে লাগলেন এবং সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কোনো কথা প্রসঙ্গে ঝগড়া করে শপথ করেছি যে, তিন দিন বাড়িতে যাবো না, সুতরাং আমাকে আপনার সাথে স্থান দেওয়া মুনাসিব মনে করলে স্থান দিন। তখন তিনি তাকে গ্রহণ করলেন ও স্থান দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ তিন রাত পর্যন্তই তার সাথে ছিলেন, কিন্তু রাতে তাহাজ্জুদ; এর জন্যও উঠতে দেখেননি বরং রাতে শোয়ার সময় কিছু তাছবীহ পাঠ করে শুতেন এবং ফজরের নামাজ রীতিমতো জামাতে পড়তেন। কিন্তু ভালো কথাবার্তাই সর্বদা বলতেন এবং অশ্লীল বলতেন না। তখন এ অবস্থা দেখে আব্দুল্লাহ-এর মনে তার আসল সম্পর্কে নিন্দনীয় ধারণা পোষণ করার উপক্রম হলে তিনি তাকে তার সকল ঘটনা ভেঙ্গে বললেন। এ কথা শুনে ব্যক্তিটি হযরত আব্দুল্লাহকে বলল, আমার কাছে তো আপনি যা দেখেছেন, তা ব্যতীত আর কিছুই নেই। তখন আব্দুল্লাহ বাড়িতে ফিরে আসতে লাগলেন, তখনই সে ব্যক্তি আব্দুল্লাহকে পুনরায় ডাক দিয়ে বললেন, আমার একটি কথা মনে পড়ে তা হলো আমি কখনো কারো সাথে হাসাদ করি না এবং কাউকেও হিংসা করি না। অতিরিক্ত থাকলে তাই আমার আমল।

এ কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) নিশ্চিত হলেন ও বললেন এ দিকেই হযরত ﷺ -এর ইঙ্গিত ছিল এবং এটাই আপনাকে বেহেশতের কারণ বানিয়েছে। –[ইবনে কাছীর, নাসায়ী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا ...... سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ : এখানে মুহাজির ও আনসারদের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে। আর وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا এ আয়াতকে اَلْمُهَاجِرِيْنَ-এর উপর **عَطْف** করে বলা হয়েছে 'ফাই'-এর মাল সে সমস্ত লোকদের জন্যও যারা এ অগ্রবর্তীদের পরে এসেছে। যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সে ভাইকে ক্ষমা কর যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে।

এ আয়াত সমস্ত মু'মিনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কারণ মু'মিনগণ হয়তো মুহাজির, না হয় আনসার, নতুবা এদের পরে আগমনকারী অন্য যে কোনো মুসলমান। এখানে আরও বলা হয়েছে যে, মুহাজির ও আনসারগণের পরে যাদের আগমন হয়েছে সেসব মুসলমানদের উচিত পূর্বের আনসার ও মুহাজিরদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে দোয়া করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং যেসব লোক এরূপ করবে না; বরং তাদেরকে গালাগালি করবে বা তাদেরকে খারাপভাবে চিহ্নিত করবে, এ আয়াত মতে তারা মু'মিনগণের দল হতে বের হয়ে যাবে। –[সাফওয়া]

মূলকথা, এ আয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ আয়াত তাদের সবাইকে 'ফাই' -এর মালের হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণে-ই খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রা.) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করেননি; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াকফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন। যাতে এ সব সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামি বাইতুল মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোনো কোনো সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার জন্য আবেদন করলে তিনি এ আয়াতের বরাত দিয়ে জবাব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করতাম তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে?

−[কুরতুবী, মা'আরেফুল কুরআন]

হযরত ওমরের এই কথা শুনে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো যে, এ সমস্ত বিজিত অঞ্চলই সাধারণ মুসলমানদের জন্য 'ফাই' স্বরূপ থাকবে, যারা এ সব জমির চাষাবাদের কাজ করছে তা তাদেরই হাতে থাকবে এবং তার উপর খারাজ ও জিজিয়া বসিয়ে দেওয়া হবে। −[কিতাবুল খারাজ, আহকামুল কোরআন]

চাষাবাদের এ অধিকার বংশানুক্রমে তাদের অধস্তন পুরুষেরা লাভ করতে থাকবে। এ অধিকার তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে; কিন্তু এ জমি ক্ষেতের মালিক তারা নয়, মুসলিম মিল্লাতই এ সবের আসল মালিক। −[কিতাবুল আমওয়াল]

এ সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে বিজিত দেশসমূহের যেমন ধন-মাল মুসলমানদের সমষ্টিক ও জাতীয় মালিকানা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা হলো−

১. যেসব জমি ও অঞ্চল কোনোরূপ সন্ধির ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে।
২. কোনো অঞ্চলের লোকেরা যুদ্ধ ব্যতীতই মুসলামানদের নিকট নিরাপত্তার আশ্রয় পাবার উদ্দেশ্যে যেসব বিনিময় মূল্য (فِدْيَةٌ) কিংবা ভূমিকর (خَرَاجٌ) অথবা জিজিয়া দিতে প্রস্তুত হবে তা।
৩. যেসব জমি-জায়গা ও বিত্ত-সম্পত্তি তার মালিকরা পরিত্যাগ করে ছেড়ে যাবে। [সর্ব প্রকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি]।
৪. মালিকবিহীন বিষয়-সম্পত্তি, যার কোনো মালিক বেঁচে নেই।
৫. যেসব জমি-জায়গা পূর্ব হতে কারো মালিকানাধীন নয়।
৬. যেসব শুরু হতেই লোকদের দখলে ছিল, কিন্তু সে সবের প্রাক্তন মালিকগণকে বহাল রেখে তাদের উপর জিজিয়া ও খারাজ ধার্য করা হয়েছিল।
৭. প্রাক্তন শাসক পরিবারসমূহের জায়গীরসমূহ।
৮. প্রাক্তন শাসকদের মালিকানাভুক্ত জমি-জায়গা ও বিষয়-সম্পত্তি। −[কিতাবুল খারাজ, বাদায়ে ওয়া সানায়ে]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا ...... اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ : এখানে বলা হয়েছে পরবর্তীতে যারা আসে তারা পূর্বের মুহাজির ও আনসারগণের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে গিয়ে বলেন, "আর আমাদের ঈমানদার লোকদের জন্য কোনো হিংসা ও শত্রুতার ভাব রেখো না, হে আমাদের রব! তুমি বড়ই অনুগ্রহ সম্পন্ন এবং করুণাময়।"

এ আয়াতে মুসলমান জনগণকে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষাও দান করা হয়েছে। সে নৈতিক শিক্ষা এই যে, কোনো মুসলমানের অন্তরে অপর কোনো মুসলমানদের প্রতি এক বিন্দু হিংসা ও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়; বরং পূর্ববর্তী লোকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকা এবং তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ ও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের উক্তি না করাই তদের সঠিক ও নির্ভুল আচরণ।

মুসলমানদের সম্পদের উপর কাফিরগণের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ মাসআলা : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الخ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরগণকে ফকির আখ্যায়িত করেছেন [অথচ ইসলামের পরিভাষায় ফকির সে ব্যক্তিকে বলা হয় যার কোনো সম্পদ বলতেই নেই (يَعْنِىْ وَالْفَقِيْرُ مَنْ لَا شَيْئَ لَهُ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَهُ شَيْئٌ) এবং মিসকিন তাকে বলা হয় যার সামান্য সম্পদ আছে। অথবা কোনো কোনো ফকীহ তার বিপরীত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন] [অথবা কমপক্ষে যার بِقَدْرِ نِصَابٍ সম্পদ নেই সেই ফকির) আর মুহাজিরগণের মক্কা ভূমিতে অনেক সম্পদ রয়ে গিয়েছে। যদি হিজরতের পরও সে সম্পদে তাঁদের অধিকার থাকত, তাহলে তাদেরকে ফকির বলা জায়েজ হতো না। কুরআনে আল্লাহ তাদেরকে কিভাবে ফকির বলেছেন?

তার উত্তর এই যে, আল্লাহ তাদেরকে ফকির বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, হিজরতের মুহূর্তে যে সম্পদ তারা মক্কাতে ফেলে এসেছে তাতে কাফিরগণ হস্তক্ষেপ করে ফেলেছে; সুতরাং তা তাদের মালিকানা হতে খারিজ হয়ে গেছে।

তাই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, যদি কোথাও কোনো কাফির কোনো মুসলমানদের মালের উপর অধিকার স্থাপন করে ফেলে, অথবা কোনো دَارُ الْاِسْلَامِ এর উপর তারা জয়ী হয়ে মুসলমানদের সম্পদের উপর তারা প্রভুত্ব পেয়ে যায়, অথবা মুসলমান دَارُ الْاِسْلَامِ থেকে دَارُ الْحَرْبِ -এর দিকে হিজরত করে চলে যায়, তখন সে সম্পদের উপর মুসলমানদের মালিকানা সত্ত্ব থাকবে না এবং সে সম্পদ পুনরায় মুসলমানদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে। হাদীস দ্বারা তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থের উক্ত অংশে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে।

−[মা'আরিফুল কোরআনেও এই মতই বর্ণিত]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. اَلَمْ تَرَ تَنْظُرْ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَهُمْ بَنُو النَّضِيْرِ وَاِخْوَانِهِمْ فِى الْكُفْرِ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ فِى الْاَرْبَعَةِ اُخْرِجْتُمْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ فِىْ خُذْلَانِكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَاِنْ قُوْتِلْتُمْ حُذِفَتْ مِنْهُ اللَّامُ الْمُوَطِّئَةُ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ.

১১. আপনি কি দেখেননি লক্ষ্য করেননি মুনাফিকদের প্রতি। তারা আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে তাদের ভ্রাতৃদেরকে বলে। তারা হলো বনূ নাযীর গোত্রীয় ইহুদিগণ ও কুফরির মধ্যে তাদের অন্যান্য সাথীগণ। যদি لَئِنْ -এর মধ্যে চার স্থানে لَامْ হরফটি قَسَم -এর জন্য। তোমরা বহিষ্কৃত হও মদীনা হতে তবে আমরাও তোমাদের সঙ্গে দেশত্যাগ করবো। আর আমরা মান্য করবো না তোমাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অপদস্থ করায় কারো আদেশ কোনো সময়েই। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও এখানে لَامُ قَسَم উহ্য করা হয়েছে। তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

١٢. لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ج وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ج وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ جَاءُوْا لِنَصْرِهِمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ قف وَاسْتَغْنٰى بِجَوَابِ الْقَسَمِ الْمُقَدَّرِ عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ فِى الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ اَىِ الْيَهُوْدُ.

১২. যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকগণ তাদের সঙ্গে দেশত্যাগী হবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, মুনাফিকগণ তাদের সাহায্য করবে না। আর যদি তারা এদের সাহায্য করেও সাহায্য করার জন্য আগমন করেও তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। পাঁচ স্থানেই জওয়াবে কসম থাকার কারণে শর্তের জওয়াব উহ্যরূপে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। অতঃপর তারা কোনোই সাহায্য পাবে না অর্থাৎ ইহুদিরা।

١٣. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً خَوْفًا فِىْ صُدُوْرِهِمْ اَىِ الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ اللّٰهِ ط لِتَاْخِيْرِ عَذَابِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ.

১৩. বাস্তবিক পক্ষে তোমরা অধিক ভয়ঙ্কর ভয়ানক তাদের অন্তঃকরণে অর্থাৎ মুনাফিক গোষ্ঠীর অন্তরে। আল্লাহর তুলনায় তাঁর শাস্তি বিলম্বে আগমনের কারণে এটা এ কারণেই যে, তারা এক অবুঝ সম্প্রদায়।

١٤. لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ اَىِ الْيَهُوْدُ جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ اِلَّا فِىْ قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جِدَارٍ سُوْرٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ جُدُرٍ بَاْسُهُمْ حَرْبُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ط تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا مُجْتَمِعِيْنَ وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ط مُتَفَرِّقَةٌ خِلَافَ الْحِسْبَانِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ مِثْلُهُمْ فِىْ تَرْكِ الْاِيْمَانِ.

১৪. এরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। অর্থাৎ ইহুদিগণ সকলে মিলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তবে হ্যাঁ সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে কিংবা প্রাচীরের অন্তরালে থেকে যুদ্ধ করবে। এখানে جِدَارٌ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে দেয়াল, আর অন্য এক কেরাতে جِدَارٌ -এর পরিবর্তে جُدُرٌ বলা হয়েছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে দারুন সংঘর্ষ এখানে بَاْسُهُمْ অর্থ حَرْبُهُمْ অর্থাৎ তাদের মধ্যকার বিরোধ আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছেন দলবদ্ধ অথচ তাদের অন্তরগুলো পরস্পর ভিন্ন। বিচ্ছিন্ন, ধারণার বিপরীত, এটা এ কারণেই যে, তারা এক নির্বোধ জাতি। ঈমান গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে তাদেরকে নির্বোধ জাতির সাদৃশ্য বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ نَافَقُوْا এটি পূর্ববর্তী اَلَمْ تَرَ হতে مَفْعُوْل হিসেবে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ : এখান থেকে اَبَدًا পর্যন্ত يَقُوْلُوْنَ -এর مَفْعُوْل বা مَقُوْلَة হিসেবে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

قَوْلُهُ مِنْ وَّرَاءِ جِدَارٍ : জমহুর মুফাসসির جُدُرٌ অর্থাৎ বহুবচন করে পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে মুহাসেন, ইবনে কাছীর, আবূ আমর (র.) جِدَارٍ অর্থাৎ একবচন করে পড়েছেন। আবূ উবাইদ, আবূ হাতেম প্রথম কেরাতকেই পছন্দ করেছেন, কারণ সে কেরাতটি قُرًى مُحَصَّنَةٍ -এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ এখানেও قُرًى শব্দটিকে বহুবচন পঠিত হয়েছে। মালেকী মাযহাবের কোনো কোনো লোক جَدْرٌ অর্থাৎ ج -এ যবর দিয়ে আর د -এ সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

–[ফাতহুল কাদীর, কাবীর, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى : وَقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى শব্দটি দু'ভাবে পঠিত হয়েছে– ১. জমহুর شَتّٰى পড়েছেন। ২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) وَقُلُوْبُهُمْ اَشَتُّ পড়েছেন। অর্থাৎ شَتّٰى হতে اِسْمُ تَفْضِيْل করে اَشَتُّ পড়েছেন। অর্থাৎ তাদের অন্তর পুরোপুরিই বিচ্ছিন্ন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَشَدُّ رَهْبَةً : اَشَدُّ رَهْبَةً -এ অবস্থিত رَهْبَةً শব্দটি مَنْصُوْب হয়েছে تَمْيِيْز হওয়ার কারণে। এ رَهْبَةً শব্দটি مَصْدَرٌ - مَبْنِىْ لِلْمَفْعُوْل হতে বা فِعْل مَجْهُوْل হতে, কারণ উদ্দেশ্য মু'মিনগণ, আর তারা হলো مَرْهُوْب مِنْهُمْ (যাদেরকে ভয় করে) رَاهِبُوْنَ [যারা ভয় করে] নয়। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী মু'মিনদের গুণাবলি আলোচনা করেছেন। অতঃপর এখানে ধোঁকাবাজ মুনাফিকদের পরিচয় প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। যারা মু'মিনদের পক্ষ ত্যাগ করে মু'মিনগণের শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। পরে তাদের সঞ্চিত ধোঁকাবাজি করেছিল। –[সাফওয়া]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন বনূ নাযীর গোত্রকে অবরুদ্ধ করতে ছিলেন এবং বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তখনই তাদের দলীয় নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের নিকট এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করল যে, আমরা সর্বদা তোমাদের পক্ষে কাজ করবো এবং তোমাদের সহানুভূতি করতে থাকব। যদি তোমাদেরকে মুসলমানগণ দেশান্তর করে দেয়, তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে দেশান্তর হয়ে যাবো। তবে দু' হাজার সৈনিক এখন তোমাদের জন্য পাঠাচ্ছি। যখন সময় ঘনীভূত হলো এবং মুসলমানগণ তাদেরকে আক্রমণ করল, তখন মুনাফিকদের সেসব অঙ্গীকারের কোনো ফল দেখা গেল না। তাদের সে অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُهُ اَلَمْ تَرَ .... يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা কি দেখনি সে মুনাফিকদেরকে যারা আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে তাদের ভ্রাতৃদেরকে বলে,...।" এখানে اَلَّذِيْنَ نَافَقُوْا বলে ইমাম সুদ্দীর মতে বনূ নাযীর ও বনূ কুরাইযা হতে যারা মুনাফিক হয়েছিল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। [রূহুল মা'আনী]। তবে অধিক সংখ্যক মুফাসসিরগণের মতে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, আব্দুল্লাহ ইবনে নাবতাল, রেফায়া ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় যে, উপরিউক্ত মুনাফিকগণ পূর্বে ইহুদি ছিল না– তারা আনসারীদের মধ্যে ছিল, তাহলে কিভাবে يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمْ "তাদের ভ্রাতৃদেরকে বলে" একথা বলা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হয়? এ প্রশ্নের জবাব কয়েকভাবে দেওয়া হয়েছে–

১. মুনাফিক এবং ইহুদিদেরকে পরস্পর ভাই এ জন্য বলা হয়েছে যে, উভয়েই একই সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের অবিশ্বাসী। মুসলমানগণ যেমন পরস্পর ভাই اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ তেমনি নবুয়তে অবিশ্বাসী কাফিররা সকলে পরস্পর ভাই– যেমন বলা হয়, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সাহায্য-সহযোগিতা ছিল, যার ফলে তাদের একদলকে অপর দলের ভাই বলা হয়েছে।

৩. তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শত্রুতায় একে অপরের সাথে শরিক ছিল। যার ফলে তাদেরকে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে।

৪. আকিদা-বিশ্বাসে পারস্পরিক মিল ছিল বলে তাদেরকে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে। –[কাবীর, রুহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ : এখানে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ বলে আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে বনূ নাযীরকে বুঝানো হয়েছে। আর তাদেরকে কাফের এ জন্য বলা হয়েছে যে, তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের প্রতি কুফরি করেছিল। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত তারা স্বীকার করত না বলে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ .... اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ : মুনাফিক সর্দার ইহুদি বনূ নাযীর গোত্রকে মুসলমানদের অবরোধ কালে যে আশ্বাস বাণী শুনিয়েছিল এবং তাদের মনে সান্ত্বনা দান করেছিল এ উক্তিতে তাই ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ দলপতিগণ বলেছিল, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও তাহলে শপথের সাথে বলছি আমরা কালবিলম্ব না করেই তোমাদের সাথী হিসেবে স্বেচ্ছায় বহিষ্কৃত হবো। কারণ তোমরা বহিষ্কৃত হওয়া আর আমরা বহিষ্কৃত হওয়া একই কথা। আর এখন যা বলছি তা বহাল থাকবে। যদি কোনো প্রবঞ্চনাকারী আমাদেরকে তোমাদের বিপক্ষে প্রবঞ্চনা দ্বারা তোমাদের থেকে বিরত রাখতে চায়, তথাপিও তা আমরা কস্মিনকালেও মানবো না। তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিবনা। আর যদি তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও অথবা হত্যাকাণ্ডে আটকে পড়ো তাহলে শপথের সাথে বলছি, আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো। তাদের এ সব আশা সম্পূর্ণরূপে ধোঁকা মাত্র। আল্লাহ বলেন, তারা এ অঙ্গীকার কখনো পূরণ করবে না, অতীতেও এমনভাবে বহু ধোঁকা দিয়েছে। এরা মিথ্যাবাদী বলে আল্লাহ স্বয়ং বলে দিচ্ছেন। আল্লাহর উক্ত ঘোষণায় ইহুদি বনূ নযীরদের অন্তরে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হলো। কারণ এ অঙ্গীকার যদি সত্যই মিথ্যা হয়ে থাকে তবে ইহুদিগণ পরাজয় বরণ করা অনিবার্য। আর মুসলমানদের অন্তরে এতে অত্যন্ত খুশি সঞ্চার হয়েছে। কারণ এতে মুসলমানদের পক্ষে জয় অবশ্যম্ভাবী।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ : আয়াতের এ অংশের অর্থ হলো "যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এ মুনাফিকরা ইহুদিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে, তাহলেও তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে এবং ইহুদিদেরকে তাদের শত্রুর হাতে ছেড়ে যাবে।" কারণ পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা ইহুদিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না; সুতরাং এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কিভাবে তা ঘটতে পারে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন? এ প্রশ্ন এড়াবার জন্য আয়াতের অর্থ "যদি ধরে নেওয়া হয় যে ...." করা হয়েছে। যুজাজ এ আয়াতের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, যদি তারা ইহুদিদের সাহায্য করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে পরাজিত হয়ে। অতঃপর ইহুদিরা বিজয়ী হতে পারবে না যখন তাদের সাহায্যদাতাগণ পরাজিত হবে। কোনো কোনো মুফাসসির ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ -এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ ঘটনার পর মুনাফিকরা আর কখনও বিজয়ী হতে পারবে না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তাদের নিফাক কোনো কাজে আসবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুনাফিকরা ইহুদিদেরকে সাহায্য করবে না। আর যদি বাধ্য হয়ে সাহায্য করতে আসেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। আর কেউ বলেছেন, অর্থ এই যে, মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং সাহায্য অব্যাহত রাখবে না। তবে প্রথম অর্থই উত্তম অর্থ বলে মনে হয়।
–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে মুনাফিকদের চারিত্রিক দুর্বলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। আর অত্র আয়াতসমূহে তাদের অবস্থার আরো কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।

قَوْلُهُ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ .... لَا يَفْقَهُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা মরদে মুজাহিদ, তোমাদের ভিতর ও বাহির এক, তোমাদের অন্তরে আল্লাহ রয়েছেন। তাই তারা তোমাদেরকে আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক মনে করে। মূলত কাকে ভয় করতে হবে এটাও তাদের বিবেচনার বহির্ভূত। এ কারণেই তাদের অন্তরে একে অপরের জন্য ভালোবাসা জন্মাতে পারে না। তাদের অন্তরে এ ভয়ও রয়েছে যে, তোমরা তাদের কোনো গুপ্ত ব্যাপারে অবগত হয়ে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করতে পার।

উক্ত আয়াতে فِيْ صُدُوْرِهِمْ -এর মধ্যে هُمْ -এর مَرْجِعْ মুনাফিকগণও হতে পারে। তখন আয়াতের উদ্দেশ্য হবে– এ মুনাফিকদের অন্তরে আল্লাহ অপেক্ষা তোমাদের ভয় সর্বাধিক।

অথবা, هُمْ-এর مَرْجِعْ কেবলমাত্র ইহুদিগণ হতে পারে। তখন অর্থ হবে– ইহুদিগণের অন্তরে তোমরা আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ভয়ের কারণ।

অথবা, هُمْ -এর প্রত্যাবর্তন স্থল উভয় সম্প্রদায় হতে পারে। তখন তোমরা অধিক ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ সম্বন্ধে তাদের ধারণা নিতান্ত কম বরং আল্লাহর শক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে তারা অনবহিত। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ الخ : এখানে মুনাফিকদের প্রথম দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুসলমানগণ! ইহুদি সম্প্রদায় সাহসহীন গোত্র, তোমাদের সাথে কি করে একাকী যুদ্ধ করতে সাহস করবে; বরং গোটা ইহুদি জাতি মিলেও তোমাদের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। তবে যদি তাদের বাসস্থানে কোথাও কিল্লা তৈরিকৃত থাকে, অথবা দালানের আড়ালে থেকে, নতুবা জমিনে গর্ত খনন করে তাতে লুকিয়ে যুদ্ধ করতে সাহস করবে। যেমনিভাবে খায়বার ইত্যাদিতে যুদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং হে মুসলিম জাতি! তোমরা কখনো ভয় করো না যে, তাদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ করতে হবে। তারা যুদ্ধ ক্ষমতায় খুবই দুর্বল জাতি; এদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাদের অন্তরে আল্লাহ তোমাদের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। –[আশরাফী, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ الخ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ মুনাফিক ও ইহুদিগণের দুর্বলতার আর একটি দিক তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, তারা একক শক্তিসম্পন্ন জাতি নয়। তাদের মধ্যে একতার অভাব রয়েছে। যদিও তোমরা তাদেরকে একদল ও এক খেয়ালের বলে মনে কর। তা ভুল ধারণা, তারা একই দলভুক্ত কেবলমাত্র মুনাফেক হওয়ার লক্ষ্যেই হয়েছে, তারা কেবলমাত্র এ জন্য একতাবদ্ধ হয়েছিল যে, নিজেদের নগরের উপর মুহাম্মদ ﷺ -এর দল (বহিরাগত হিসেবে) কর্তৃত্ব করতে না পারে। তাদের স্বদেশীদের জন্য মদীনাবাসীগণ সর্বস্ব বিলীন করতে দেখে তাদের অন্তরে যেন শেল পড়েছিল। এ অসহনীয় হিংসা অন্তরে ঢুকে পড়ার কারণে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আশে পাশের ইসলামের দুশমন লোকদের সাথে যোগ সাজস করে কোনো না কোনোভাবেই বহিরাগত প্রতিপত্তি (মুসলমান) নির্মূল করে দেওয়ার লক্ষ্যে একজোট হয়েছিল। এটাই ছিল তাদের একমাত্র নেতিবাচক। তারা একত্রিভূত হওয়ার জন্য এটা ব্যতীত অন্য নেতিবাচক বিষয় কিছুই ছিল না। প্রত্যেক গোত্রপতিরই আলাদা আলাদা এক একটা বাহিনী ছিল। প্রত্যেকেই স্বীয় মাতাব্বুরী চালাবার জন্য সচেতন ছিল। প্রকৃতপক্ষে কেউ কারো অকৃত্রিম বন্ধু ছিল না; বরং সত্য কথা এই যে, প্রত্যেকেরই জন্যে অন্যদের প্রতিপত্তি ছিল হিংসা ও বিদ্বেষ, এ কারণেই যাকে তারা সকলের শত্রু মনে করেছিল, তাকে উৎখাত করার জন্য পারস্পরিক শত্রুতা সাময়িকের জন্যও ভুলতে সক্ষম ছিল না।

তাদের এ আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই তারা মুসলমানদেরকে দেয়ালের পিছন থেকে যুদ্ধ করার ভয় দেখায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাদের একে অপরের দুশমন হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى আয়াত পেশ করেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালত সত্যতার অসংখ্য নাজির তাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ভাসার পরও তারা সেসব প্রমাণসমূহকে অকাট্য দলিলরূপে বোধগম্য করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতা করছে। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٥. كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا بِزَمَنٍ قَرِيْبٍ وَهُمْ اَهْلُ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ج عُقُوْبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِي الْاٰخِرَةِ مَثَلُهُمْ اَيْضًا فِيْ سَمَاعِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَتَخَلُّفِهِمْ عَنْهُمْ

১৫. তাদের পূর্ববর্তীগণের ন্যায়। অতি সম্প্রতি স্বল্প কিছুকাল পূর্বে। তারা বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকগণ। যারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করেছে হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে জাগতিক শাস্তি। আর তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি কষ্টদায়ক, আখেরাতে। তদ্রূপ মুনাফিকদের নিকট হতে শ্রবণ করা ও তাদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করার উদাহরণ হলো।

١٦. كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ كِذْبًا مِنْهُ وَ رِيَاءً.

১৬. শয়তানের ন্যায় যখন সে মানুষকে বলে, কুফরি করো। অতঃপর যখন সে কুফরি করে তখন সে বলে "আমি তোমার থেকে সম্পর্কমুক্ত, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' মিথ্যা ও রিয়াকারীর সাথে এ রূপে বলে থাকে।

١٧. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَيِ الْغَاوِيْ وَالْمَغْوِيِّ وَقُرِئَ بِالرَّفْعِ اِسْمُ كَانَ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزٰؤُا الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

১৭. ফলে উভয়ের পরিণাম অর্থাৎ ভ্রষ্টকারী ও ভ্রষ্ট। অপর এক কেরাতে পেশ যোগে كَانَ -এর اِسْم রূপে পঠিত হয়েছে। এই হবে যে, তারা উভয়ই জাহান্নামী। তারা তথায় চির অবস্থানকারী। এটাই জালিমদের প্রতিফল কাফেরদের।

١٨. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

১৮. হে মু'মিনগণ আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে কিয়ামত দিবসের জন্য। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তৎসম্পর্কে সম্যক অবহিত।

١٩. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ تَرَكُوْا طَاعَتَهُ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ط اَنْ يُقَدِّمُوْا لَهَا خَيْرًا اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

১৯. আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে তাঁর ইবাদত বর্জন করেছে ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন যে, তারা নিজের জন্য পুণ্য অগ্রিম পাঠাবে। তারাই পাপাচারী।

٢٠. لَا يَسْتَوِيْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ط اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

২০. দোজখবাসী ও বেহেশতবাসী সমপর্যায়ের নয়। বেহেশতবাসীগণই কৃতকার্য।

٢١. لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ وَجُعِلَ فِيْهِ تَمْيِيْزٌ كَالْاِنْسَانِ لَرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مُتَشَقِّقًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ الْمَذْكُوْرَةُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ فَيُؤْمِنُوْنَ .

২১. আমি যদি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম এবং তাতে মানুষের ন্যায় পার্থক্য– জ্ঞান দান করা হতো তবে তুমি তাকে দেখতে বিনীত ও বিদীর্ণ বিখণ্ডিত, আল্লাহর ভয়ে । আর এ সকল উদাহরণ উল্লিখিত আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে এবং ঈমান আনয়ন করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ : قَرِيْبًا তারকীবে ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অন্য আর এক মতে ذَاقُوْا শব্দ قَرِيْبًا ক্রিয়ার مَفْعُوْل فِيْه হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ : كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ এ বাক্যটি অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে, مُبْتَدَا مَحْذُوْف -এর خَبَرْ আর সে مُبْتَدَا বা বিলুপ্ত مُبْتَدَا টি হলো مَثَلُهُمْ সুতরাং উহ্য বাক্যটি হবে– مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ -

কোনো কোনো নাহুবিদের মতে, كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ এ বাক্যটি দ্বিতীয় خَبَرْ তখন তার এ দুই خَبَرْ -এর মধ্যে حَرْف - وَاو -কে حَذْف করা হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে। عَطْف

قَوْلُهُ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكَ : জমহুর اِنِّىْ -এর ى -কে سَاكِنْ করে পড়েছেন। নাফে', ইবনে কাছীর ও আবূ ওমর ى -এ فَتْح সহকারে পড়েছেন।

قَوْلُهُ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا : জমহুর عَاقِبَتَهُمَا শব্দটি كَانَ -এর خَبَرْ আর اَنَّهُمَا فِى النَّارِ -কে كَانَ -এর اِسْم হিসেবে عَاقِبَتَهُمَا তে نَصَبْ সহকারে পড়েছেন। হাসান ও আমর ইবনে উবাইদ عَاقِبَتُهُمَا তে رَفْع দিয়ে অর্থাৎ اِسْمِ كَانَ হিসেবে পড়েছেন।

قَوْلُهُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا : خَالِدِيْنَ শব্দটি জমহুর حَالْ হিসেবে مَنْصُوْب পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ, আ'মাশ, যায়েদ ইবনে আলী ও ইবনে আবী আবলী اَنَّ -এর خَبَرْ হিসেবে خَالِدَانِ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদি সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে ভয় করার বিষয় বর্ণনা ছিল। আর উক্ত আয়াতে তাদেরকে শয়তানের সাথে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ ..... عَذَابٌ اَلِيْمٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাদের উদাহরণ সে লোকদের মতো, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বলা হয়েছে যে, ইহুদি বনূ নাযীরের উদাহরণ সে লোকদের মতো যারা নিকট-অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। 'নিকট-অতীতে শাস্তি ভোগ করেছে' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে সাধারণত দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়।

এক. মক্কার কুরাইশদের সে কাফিরগণ যারা ইতঃপূর্বে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল। তাদের সত্তরজন লোক নিহত হয়, আর সত্তরজন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। অবশিষ্টরা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। তারা ইসলাম, মুসলমান ও নবীর বিরোধিতা করে এ রকম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, ঠিক তেমনি বনূ নাযীরও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। তাদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। এটা হযরত মুজাহিদের অভিমত।

Free @ www.eilmweebly.com

Free @ www.al-ilm.weebly.com

দুই. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হলো, যারা ইতঃপূর্বে শাস্তিভোগ করেছে তারা হলো ইহুদি বনূ কায়নুকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসার পর মদীনার ইহুদিদের সাথে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন তার একটি শর্ত ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের কোনো শত্রুকে ইহুদিরা কোনো প্রকার সাহায্য করবে না; কিন্তু এ চুক্তির কয়েক মাস পরে ইহুদি বনূ কায়নুকা এ শর্তের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। বদর যুদ্ধের সময় তারা মক্কার কাফিরদের সাথে গোপন যোগসাজশ করে। এ ঘটনার পর একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে বলে দেওয়া হয় "চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যদি কোনো সম্প্রদায় হতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা দেখা যায়, তাহলে আপনি শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে দিতে পারেন।" এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে বনূ কায়নুকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং তাদের দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনেরো দিন পর তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল, আমাদের সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে সিদ্ধান্তই নিবেন আমরা তাই মেনে নেবো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের পুরুষগণকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন কিন্তু মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণ রক্ষার আবেদন জানালে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন, তাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হবে, আর তাদের ধন-সম্পদ গনিমতের মালে পরিগণিত হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনূ কায়নুকা মদীনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যায়।

ঠিক বনূ কায়নুকার মতো বনূ নাযীরকেও মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। সুতরাং তাদের উদাহরণ যথার্থই বনূ কায়নুকার মতোই হয়েছে। -[মা'আরেফুল কুরআন, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

এ শাস্তি তো তারা এ দুনিয়াতে ভোগ করেছে, পরকালেও তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ ...... اِلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উদাহরণ পেশ করেছেন। যারা বনূ নাযীর গোত্রকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সিদ্ধান্ত অবমাননা করার জন্য উত্তেজিত করেছিল এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধ বাঁধলে সাহায্য করার অঙ্গীকার দিয়েছিল। মূলত যখন মুসলমানগণ বনূ নাযীরকে ঘেরাও করে বসেছেন তখন মুনাফিকগণের অঙ্গীকার দানকারীগণ কেউই সাহায্যার্থে এগিয়ে আসল না। তাকে আল্লাহ তা'আলা শয়তানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন যে, শয়তান মানুষকে যখন আল্লাহর সাথে কুফরি ও নাফরমানি করার জন্য প্রভাবিত করে, তখন বলে وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ আমি তোমাদের হিতৈষী। অতঃপর যখন কুফরি করে বসে তখন সে উত্তর দেয়- اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ অর্থাৎ পরিশেষে সে আর কাফিরকে পাত্তা দেয় না। অতঃপর কাফির জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হতে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কালামুল্লাহ -এর সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِئٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ - فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ - (مَعَارِفُ الْقُرْآنِ)

তাফসীরে তাহের গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, শয়তান কিয়ামতের দিনও এমন কথা বলবে।

বদরের যুদ্ধের দিনও জনৈক ব্যক্তি কাফেরের বেশে কাফেরদেরকে উত্তেজিত করার পর প্রচণ্ড সংঘর্ষ কালে এই (উপরে উল্লিখিত আয়াত মোতাবেক) বলে দূরে সরে গেছে, পলায়ন করেছে। এরূপে অন্যকে ফাসিয়ে নিজে চম্পট দেওয়াই তার কাজ। শয়তানের ন্যায় বনূ নাযীরদেরকেও এমনিভাবে উত্তেজিত করতে থাকে। অবশেষে যখন বনূ নযীরের বিপদ ঘনিয়ে আসল এবং দুঃসময় শুরু হলো হয়, তখন তারা নিজ নিজ ঘরে বসে থাকে। আর ঐ সময় মনে হয় যেন বনূ নাযীরের লোকদের সাথে কোনো কালেই তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। শয়তানের ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে বনী ইসরাঈলদের অলিগণ কুফরি করার প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী, ইবনে কাছীর ইত্যাদি গ্রন্থে বহু ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

এতদ সংক্রান্ত ঘটনা : বনী ইসরাঈলদের একজন রাহেব সর্বদা নিজ খানকাহ শরীফে থেকে দিনে রোজা রাখতেন ও সারা রাত্র ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। এভাবে তাঁর ৭০ বৎসর কেটে গেল। তখন শয়তান তাঁর পিছনে পড়ল। শয়তান তাকে ধ্বংস করার ইচ্ছায় অতি বড় ধোঁকাবাজ একটি শয়তানকে ঐ রাহেবের সম্মুখে অতি বড় অলির বেশে ইবাদতে লিপ্ত করে দিল। অতঃপর রাহেব এ অবস্থা দেখে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল যে, সে তার চেয়েও বড় দরবেশ। তৎপর সে শয়তান রাহেবকে এমন কিছু আশ্চর্য ফলপ্রদ দোয়া শিখিয়ে দিল যা পড়ে ফুঁক দিলে রোগ মুক্ত হয়ে যায়। এরপর শয়তান কিছু সংখ্যক লোককে রোগাক্রান্ত করে চিকিৎসার জন্য ঐ রাহেবের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিত এবং রাহেব দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে দিলে শয়তান তার প্রভাব আক্রান্ত ব্যক্তি হতে সরিয়ে দিল, অতঃপর রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

এ অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান তার সর্দারের একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ের উপর উক্ত প্রভাব বিস্তার করে তাকে রোগাক্রান্ত করে দিল এবং রাহেবের নিকট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়ে গেল। পরিশেষে উক্ত রাহেব সে মেয়েটির উপর আকৃষ্ট হয়ে তার সাথে জেনা করে বসল এবং মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে গেল। তখন লজ্জার ভয়ে রাহেবকে শয়তান যুক্তি দিয়ে গর্ভবতী মেয়েটিকে হত্যা করিয়ে ফেলল। তখন মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন বিচারের জন্য আসল এবং রাহেবকে হত্যা করে শূলি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে ফেলল। এরপর শয়তানটি রাহেবের নিকট গিয়ে তাকে বলল, এখন তোমার প্রাণ রক্ষার কোনো ব্যবস্থা দেখা যায় না। তবে যদি তুমি আমাকে সিজদা কর তাহলে আমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। অতঃপর রাহেব শয়তানকে সিজদা করল। তখনই শয়তান বলে উঠল– إِنِّىٓ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ اللّٰهَ الخ উক্ত ঘটনাটি এখনে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারী ও কুরতুবী গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا ..... الظّٰلِمِيْنَ : উক্ত আয়াতটি একটি বিশেষ আইন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, শয়তান ও শয়তানের অনুসারী উভয় ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত হলো জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে চিরকাল বসবাস করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা দুরাত্মা জালিমদের শাস্তি এটাই নির্ধারণ করে রেখেছেন। اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ الخ –[তাফসীরে আশরাফী]

হযরত মোকাতেল (র.) বলেন, মুনাফিক এবং ইহুদিদের পরিণাম ছিল মানুষ এবং শয়তানের পরিণামের মতো, অর্থাৎ জাহান্নামী। (কাবীর) শয়তান এবং মানুষ কাফেরের পরিণাম নিশ্চিত জাহান্নাম। –[ফাতহুল কাদীর]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : সূরা হাশরের শুরু থেকেই মুনাফিক, ইহুদি ও কাফের মুশরিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শাস্তির বর্ণনা এবং তাদের উদাহরণ পেশ করার পর সূরার শেষাংশে মু'মিনদেরকে সতর্কবাণী দান ও সৎকাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেন তাদের অবস্থা পূর্বে উল্লিখিত লোকদের অবস্থার মতো না হয়। –[সাফওয়া, মা'আরিফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ" الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সকল ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ঈমানদার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর নির্দেশাবলি প্রতিপালনের মাধ্যমেই আল্লাহকে ভয় করে চলো। দু'দিন পূর্বে হোক অথবা পরে হোক ইহধাম ত্যাগ করতে হবে। মৃত্যুর পেয়ালা সকলকেই পান করতে হবে। لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ মৃত্যুর পরের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে আগামী দিনের জন্য আত্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করো। আর কিয়ামতের আসন্ন ও অশেষ দিনের জন্য কে কি অর্জন করেছে ভেবে দেখ। আর জেনে রাখো, আল্লাহ ও রাসূলের তাঁবেদারী, তাঁদের মর্জি মোতাবেক নিজের আচরণ গড়ে তোলা ইত্যাদিই পরকালের জন্য মূলধন। এ পুঁজি যে যত বেশি পরিমাণে সঞ্চয় করতে পার সে তত বেশি সৌভাগ্যবান।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মালিক ইবনে দীনার (র.) বলেন, বেহেশতের দরজায় এ কথাটিও লিপিবদ্ধ রয়েছে– وَجَدْنَا مَا عَمِلْنَا رَبِحْنَا مَا قَدَّمْنَا خَسِرْنَا مَا خَلَّفْنَا –[মা'আরিফ, তাহির, মাদারিক]

তাকওয়ার নির্দেশ দু'বার প্রদান করার কারণ : উক্ত আয়াতে তাকওয়া সম্বন্ধে দু'বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত বলা হয়– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে– وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তার কারণ হচ্ছে– প্রথমবার ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক যাবতীয় সৎকর্ম অর্থাৎ ফরায়েয ওয়াজিবাত ইত্যাদি আদায় করার প্রতি তাকিদ প্রদান করে তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– فَقَالَ تَعَالٰى يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

দ্বিতীয়বার যাবতীয় পাপাচার হতে মানবতাকে নিষ্কলুষ বা মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হয়েছে– فَقَالَ تَعَالٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ –[মা'আরিফ, কাবীর]

অর্থাৎ তাকওয়ার নির্দেশ বারংবার দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহভীতির প্রতি তাকিদ করা হয়েছে। কেননা নাহুবিদগণের নীতিমালা অনুসারে اَلتَّكْرَارُ لِلتَّاكِيْدِ তাকওয়ার প্রসঙ্গে হযরত মালিক ইবনে দীনার (রা.) আরও বলেন–

اِتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ اَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ لِاَنَّهٗ قَرَنَ بِمَا هُوَ عَمَلٌ وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِىْ تَرْكِ الْمَعَاصِىْ لِاَنَّ قَرَنَ بِمَا هُوَ مَجْرَى الْوَعِيْدِ – (كَمَا فِىْ مَدَارِكِ التَّنْزِيْلِ)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোনো কোনো মুফাসসির تَأْوِيْل করে বলেন, প্রথম তাকওয়ার নির্দেশ দ্বারা আল্লাহর প্রেরিত আহকামগুলোর অনুসরণে পরকালীন জীবনের সম্বল তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় তাকওয়ার নির্দেশ দ্বারা বলা হয়েছে যে, তোমরা যে সকল সম্বল প্রেরণ করছ তা অকৃত্তিম ও পরকালে চলমান ও মূল্যায়ন হবে কিনা তার প্রতি লক্ষ্য করো?

পরকালে অচল সম্বল বলে তাই গণ্য হবে। যে আমল দৃশ্যত তা মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করা হয়নি; বরং কোনো নাম, যশ বা মানবিক স্বার্থের বশীভূত হয়ে করা হয়েছে।

অথবা, আমলটি দৃশ্যত নয়, বরং ধর্ম তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। তা মূলত পথভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় তাকওয়ার শব্দটি দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, পরকালের জন্য দৃশ্যত (রিয়াকারী) ইবাদত সম্বল হিসেবে যথেষ্ট নয়। −[মা'আরেফুল কোরআন]

কিয়ামত দিবসকে اَلْغَدُ (আগামীকাল) নামকরণের কারণ : এ আয়াতে কিয়ামত বুঝাবার জন্য غَدٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। কিয়ামতকে غَدٌ তথা আগামীকাল কয়েকটি কারণে বলা হয়েছে−

১. কিয়ামতকে আগামীকাল বলা হয়েছে কিয়ামত সুনিশ্চিত বুঝাবার জন্য, যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ করতে পারে না। ঠিক তেমনি এ দুনিয়ার পর কিয়ামতের আগমনও সুনিশ্চিত, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। −[ফাতহুল কাদীর]

২. কিয়ামতকে নিকটবর্তী বুঝাবার জন্য। আজকের পর আগামীকাল যেমন নিকটে, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও নিকটে। −[কাবীর]

৩. কিয়ামত দিবসকে আগামীকাল বলে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বুঝাতে চান যে, যে ব্যক্তি আজকের আনন্দ-ফুর্তি ও স্বাদ-আস্বাদনে নিজের সবকিছু ঢেলে দেয়, কালকে তার নিকট ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাবার ও মাথা গুঁজাবার জন্য ঠাঁই থাকবে কিনা তার চিন্তাও করে না। সে লোকটি যেমন অজ্ঞ, মূর্খ ও অপরিণামদর্শী তেমনি সে লোকটি নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মারে যে লোক নিজের ইহজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ বানাতে ব্যস্ত হয়ে পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে উদাসীন হয়ে যায় অথচ প্রকৃতপক্ষে পরকাল ঠিক তেমনিভাবে অবশ্যই আসবে যেমন আজকের পর আগামীকাল অবশ্যই আসবে।

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ الاية বাক্যে نَفْس শব্দটিকে 'নাকেরা' ব্যবহার করার ফায়েদা : এখানে نَفْس শব্দটিকে نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্ট ব্যবহার করে প্রত্যেক নাফ্স বা ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে নিজের হিসাব গ্রহণকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি লক্ষ্য করুক সে আগামীকাল কিয়ামতের জন্য কি কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। −[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ ..... الْفٰسِقُوْنَ : উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বিভিন্ন তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন।

১. আল্লামা আবূ হাইয়ান (র.) বলেন, উক্ত আয়াতখানি "যেমন কর্ম তেমন ফল" প্রবাদের ন্যায় বলা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কীয় কাজকর্মগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে এবং তাঁর আদেশ নিষেধগুলোর অবমাননা করেছে তাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। সুতরাং পরকালের মঙ্গলার্থে তারা কোনো কাজ আল্লাহর কৃপায় করে যেতে পারেনি।

২. কেউ বলেন, তার অর্থ ও তাফসীর এই যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা সেসব লোকের ন্যায় হয়ো না, যারা আল্লাহর জিকির ইত্যাদি ভুলে গেছে। অতঃপর তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর কার্যসমূহ করতে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. কেউ কেউ [ইমাম রাযী (রা.)] বলেন, যারা আল্লাহর হক সম্পর্কীয় কার্য করতে ভুলে যাওয়ার ফলে তাদের নিজদের হক হতে তাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না।

৪. কারো মতে, উক্ত আয়াতের তাফসীর হলো যারা নিজেদের সুদিনে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে, অতএব তাদের দুর্দিনেও আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ দ্বারা আয়াতে কাদেরকে সাব্যস্ত করা হলো? : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা ফাসিক বলে আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তারা হলো, যারা কবীরা গুনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে থাকে। অথবা, আল্লাহর যে কোনো প্রকার নির্দেশ অবমাননাকারীগণই আয়াতের উদ্দেশ্য। −[কাবীর, সাবী]

আল্লামা তাহের (র.) বলেন, وَلَا تَكُوْنُوْا الخ আয়াতের অর্থ হলো, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারা নিজেদের হিতাহিত ভালোমন্দ বুঝে উঠতে পারছে না, তাদের মতো হতভাগ্য কেউ নেই। তাদের কপালে চরম দুর্ভোগ ও আল্লাহর আজাব অনিবার্য। খবরদার, খবরদার, মু'মিনরা তোমরা তাদের মতো হয়ো না। আল্লাহকে ভুলে থেকে নিজেদের চরম সর্বনাশ ডেকে এনো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ মা'আরিফুল কোরআন গ্রন্থে উক্ত আয়াতাংশের তাফসীর এভাবে করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার ফলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি সাধিত হয়নি; বরং তারা নিজেরাই ক্ষতির দায়ে এত গভীরভাবে নিমজ্জিত হয়ে গেছে যা তাদের কখনো ধারণা করাও সম্ভব হয়নি।

قَوْلُهُ "لَايَسْتَوِىْ اَصْحٰبُ ..... الْجَنَّةِ (الاية) : প্রথমে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য যা কল্যাণকর তার প্রতি তাদেরকে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ বলে আহ্বান করার পর কাফিরদের اَلَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ বলে ধমক দান করেছেন, অতঃপর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেছেন لَايَسْتَوِىْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ (الاية) "দোজখবাসী ও বেহেশতবাসী সমপর্যায়ের নয়, বেহেশতবাসীগণই কৃতকার্য।"

এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য সর্বজন স্বীকৃত এবং সর্বজ্ঞাত, তা সত্ত্বেও এরকম স্থানে তার উল্লেখকরণের উদ্দেশ্য হলো এ পার্থক্যের গুরুত্বের প্রতি সচেতন করা।

জিম্মি হত্যার বদলায় মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না বলে শাফেয়ীদের এ আয়াত হতে দলিল গ্রহণ : শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ এ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে বলেছেন যে, কোনো মুসলমানকে কোনো জিম্মি হত্যার কেসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। কারণ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দোজখবাসী [অর্থাৎ কাফের] আর বেহেশতবাসী [অর্থাৎ মুসলমান] সমপর্যায়ের নয়। সুতরাং কাফের জিম্মি হত্যার বদলায় মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না।

তবে হানাফী মাযহাবের ইমামগণ এ ইস্তিদ্‌লালকে অসার মনে করে থাকেন। কারণ এ আয়াতে আখেরাতে জান্নাতবাসী এবং দোজখবাসীর মধ্যে পার্থক্য ও ব্যবধান আলোচনা করা উদ্দেশ্য, দুনিয়াবী ব্যাপারে পার্থক্য বলা এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা জিম্মির কেসাসের দলিল দান যথার্থ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَوْ اَنْزَلْنَا .... لَرَاَيْتَهُ (الاية) : উপরে দোজখবাসী এবং জান্নাতবাসী সমান হতে পারে না এ কথা বলে মু'মিনদেরকে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য কাজ করতে নসিহত করা হয়েছে। এ আয়াতে যে কুরআন এত সুন্দর সুন্দর নসিহত সম্বলিত সে কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ (الاية) "আমরা যদি এ কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখতে পেতে।"

অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতের যদি আকল-জ্ঞান থাকত– যেমন মানুষের রয়েছে, অতঃপর তার উপর কুরআন অবতীর্ণ করা হতো তাহলে তোমরা মানুষেরা দেখতে পেতে যে, পর্বত আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে এবং দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে।" সুতরাং তোমাদেরও উচিত কুরআনের নসিহত গ্রহণ করা, কুরআনের বিধান মেনে চলা। কারণ তোমাদের আকল-জ্ঞান রয়েছে।

কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটা একটি রূপক দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে। এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহর বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব এবং তাঁর সমীপে বান্দার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বাধ্য-বাধকতার কথা কুরআন মাজীদে যেভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পর্বতের ন্যায় বিরাট সৃষ্টিও যদি তার সঠিক উপলব্ধি লাভ করতে পারত এবং মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে নিজের আমলের জন্য যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে তা যদি সে জানতে পারত, তা হলে ভয়ে-আতঙ্কে সে কেঁপে উঠত। কিন্তু মানুষের নিশ্চিন্ততা ও চেতনাহীনতা অধিক বিস্ময়কর। তারা কুরআন বুঝে এবং তার সাহায্যে সেসব কিছুর মূলতত্ত্ব ও যথাযথ ব্যাপার জানতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হয় না। যে বিরাট দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তারা আল্লাহর নিকট কি জবাবদিহি করবে সে বিষয়ে এক বিন্দু চিন্তা তাদেরকে প্রকম্পিত করে না; বরং দেখা যায় কুরআন শুনে কিংবা পড়ে উহা হতে তারা এক বিন্দু প্রভাব গ্রহণ করে না। মনে হয় তারা মানুষ নয় নিষ্প্রাণ-নির্জীব ও চেতনাহীন পাথর মাত্র। দেখাশুনা ও উপলব্ধি করা যেন তাদের কাজই নয়। মানুষের এ অবস্থা সত্যই হতাশাব্যঞ্জক।

উদাহরণ দানের উদ্দেশ্য : এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেছেন, "আমি এ সব দৃষ্টান্ত মানুষের উপকারের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে এবং উপকৃত হয়।" অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ দেখে এবং তাঁর একত্বের দলিল দেখতে পেয়ে তারা যেন ঈমান আনে। এ উদ্দেশ্যে কুরআনের এ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٢. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ .

২২. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়। তিনি করুণাময় ও পরম দয়ালু।

٢٣. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الطَّاهِرُ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ السَّلَامُ ذُو السَّلَامَةِ مِنَ النَّقَائِصِ الْمُؤْمِنُ الْمُصَدِّقُ رُسُلَهٗ بِخَلْقِ الْمُعْجِزَةِ لَهُمْ الْمُهَيْمِنُ مِنْ هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ اِذَا كَانَ رَقِيْبًا عَلَى الشَّيْءِ اَىِ الشَّهِيْدُ عَلٰى عِبَادِهٖ بِاَعْمَالِهِمْ الْعَزِيْزُ الْقَوِىُّ الْجَبَّارُ جَبَرَ خَلْقَهٗ عَلٰى مَا اَرَادَ الْمُتَكَبِّرُ ط عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ سُبْحٰنَ اللّٰهِ نَزَّهَ نَفْسَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِهٖ .

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, পুত-পবিত্র। তাঁর শানের উপযোগী নয়, এমন বস্তু হতে পবিত্র। তিনিই নিরাপদ দোষ-ত্রুটি হতে নিরাপদ ও মুক্ত। তিনিই সত্য প্রতিপন্নকারী রাসূলগণের জন্য মু'জিযা সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদেরকে সত্য প্রতিপন্নকারী। তিনিই রক্ষণাবেক্ষণকারী শব্দটি هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ হতে নিষ্পন্ন, যখন কোনো বস্তুর উপর রক্ষক নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ স্বীয় বান্দাগণের আমল রক্ষাকারী। তিনিই শক্তিধর শক্তিশালী তিনিই পরাক্রমশালী সৃষ্টির বিকৃতিকে স্বীয় ইচ্ছার আলোকে সংশোধনকারী। তিনিই মহিমান্বিত যা তাঁর শানের অনুপযোগী তা হতে। আল্লাহ পবিত্র তিনি স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। তারা যা অংশী সাব্যস্ত করে তা হতে তাঁর সাথে।

٢٤. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُنْشِئُ مِنَ الْعَدَمِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى التِّسْعَةُ وَالتِّسْعُوْنَ الْوَارِدُ بِهَا الْحَدِيْثُ وَالْحُسْنٰى مُؤَنَّثُ الْاَحْسَنِ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تَقَدَّمَ اَوَّلَهَا .

২৪. তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দানকারী। আকৃতিদানকারী। তাঁর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ নিরানব্বই নাম যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর حُسْنٰى শব্দটি اَحْسَنُ শব্দের مُؤَنَّثْ স্ত্রীলিঙ্গ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই শক্তিধর ও প্রজ্ঞাময়। সূরার প্রারম্ভে এ সকল শব্দের ব্যাখ্যা উল্লিখিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُدُّوْسٌ : জমহুর قُدُّوْسٌ শব্দটির ق এ পেশ দিয়ে পড়েছেন। আবূ যর ও আবূ ছাম্মাক উভয়ই ق-এ فَتْحٌ দিয়ে পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ الْمُؤْمِنُ : জমহুর এ শব্দটি مِيْم-এ كَسْرَةٌ দিয়ে اَلْمُؤْمِنُ পড়েছেন। অর্থাৎ اَمَنَ হতে اِسْمُ فَاعِلٍ পড়েছেন। আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন শব্দটির মীমে فَتْحٌ দিয়ে اَلْمُؤْمَنُ পড়েছেন। অর্থাৎ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ পড়েছেন। আবূ

খাতেমের মতে এভাবে এ শব্দটিকে পড়া বৈধ নয়। কারণ তখন অর্থ হয়ে যায় যে, তিনি ভীত ছিলেন কেউ তাঁকে নিরাপত্তা বিধান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার শানে এ কথা বলা যায় না। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ الْمُصَوِّرُ : হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতায়া (রা.) এ শব্দটি اَلْبَارِئُ শব্দের مَفْعُوْل بِه হিসেবে অর্থাৎ مُصَوَّرَ এবং وَاو-এ رَاء এ نَصَبْ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ .... الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ" : এমন মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন মা'বূদের ইবাদত করা যেতে পারে, যিনি ছাড়া খোদায়ী গুণ, ক্ষমতা ও এখতিয়ার আর কারো নেই, অথবা থাকতেও পারে না। সৃষ্টিজগতে সৃষ্টির নিকট যা অস্পষ্ট ও গোপন তিনি তাও অবগত আছেন, আর যা তার নিকট সুস্পষ্ট ও সু-প্রকাশিত সে বিষয়েও তিনি জ্ঞাত। যে সম্বন্ধে কারো অবগত হওয়া অসম্ভব, সে বিষয়েও তিনি অবগত আছেন। যা দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে তাও তাঁর নিকট স্পষ্ট। ইহকাল ও পরকালে তাঁর রহমত ও দয়ার ভাণ্ডার মাখলুকাতের জন্যই। উক্ত আয়াত হতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বান্দাগণ যা কিছু করে থাকে সবই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই সবকিছু করা হয়। যেভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ প্রত্যেকেই একমাত্র আল্লাহর জন্য সর্বকিছু নিবেদিত করে থাকে। আর সকল নবীগণ ও রাসূলগণকে প্রেরণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাঁর ইবাদত করা كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ সুতরাং সকলেই উক্ত আয়াতের লক্ষ্যে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধ্য থাকতে হবে। তথাপিও হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন মক্কার নাস্তিকদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত প্রদানের কাজে বের হলেন, তখন তারা তা শুধু অবিশ্বাস করত না; বরং তাদের মক্কাগৃহে তৈরিকৃত ৩৬০ খোদার পূজায় মত্ত থাকত। সেগুলোকে তারা তাদের পৃষ্ঠপোষক মনে করত। সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন- اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا তারা কি এক ইলাহ -এর পরিবর্তে বহু খোদা নির্মাণ করেছে? অরো বলেন- ও اِتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا তারা কি এমন কিছু সংখ্যক খোদা বানিয়ে নিয়েছে যারা কিছুই তৈরি করতে ক্ষমতা রাখে না।

উক্ত আয়াতে عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ -এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। হযরত সাহাল (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। কারো মতে, এর অর্থ যা ঘটেছে ও ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। কেউ কেউ বলেন, যা বান্দাগণ জেনেছে আর যা শুনেনি ও জানেনি সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। اَلرَّحِيْمُ ও اَلرَّحْمٰنُ শব্দদ্বয় আল্লাহর গুণবাচক নাম, এগুলো اَلرَّحْمَةُ শব্দমূল হতে নির্গত হয়েছে।

-[কুরতুবী, ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ .... اَلرَّحِيْمُ : عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এ বাক্যের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো 'গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে প্রাজ্ঞ।' সাহাল বলেছেন, এর অর্থ হলো 'আখেরাত এবং দুনিয়া সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ 'যা ঘটেছে এবং যা ভবিষ্যতে ঘটবে সবকিছু সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ। আর কারো মতে اَلْغَيْبُ -এর অর্থ হলো 'যা বান্দা জানে না' আর اَلشَّهَادَةُ -এর অর্থ 'যা তারা জেনেছে এবং দেখেছে।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এসব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ অর্থ 'তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু' এগুলো হলো আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম অর্থাৎ اَلرَّحْمٰنُ এবং اَلرَّحِيْمُ হলো আল্লাহ তা'আলার নাম, আর এ দু'টি যে মূল হতে উদ্গত (অর্থাৎ اَلرَّحْمَةُ) তাহলো আল্লাহ তা'আলার গুণ বা সিফাত।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ **কে তাকরার করার উদ্দেশ্য :** "তিনিই আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।" এ কথাটি পুনর্বার উল্লেখ করার কারণ হলো, তার প্রতি গুরুত্বদান। কারণ এতে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। আর এটাই হলো তাওহীদের মূলকথা। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা মানুষ এবং জিনজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি মানুষ এবং জিনজাতিকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ -এর মধ্যকার পার্থক্য : এ দু'টি শব্দ আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। অর্থ প্রকাশের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. اَلرَّحْمٰنُ শব্দের মধ্যে রহমতের আধিক্য রয়েছে, আর اَلرَّحِيْمُ -এর মধ্যে কিছুটা কম রয়েছে।
২. اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে اَلرَّحِيْمُ শব্দটি অন্যের জন্যও ব্যবহার করা যায়।
৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, দু'টি শব্দই পরম করুণাময় অসীম দয়ালু অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতিসূক্ষ্ম।
৪. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, বিশ্ববাসীর প্রতি যিনি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়, আর রহীম বলা হয় তাঁকে যিনি পরকালে দয়া করবেন।
৫. হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, যিনি আসমান বাসীর প্রতি দয়া করেন তাঁকে রহমান বলা হয়, আর যিনি দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করেন তাঁকে রাহীম বলা হয়।
৬. তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, রহমান তিনিই যাঁর নিকট চাওয়া হলে তিনি স্বীয় বান্দার চাহিদা পূরণ করেন। আর রাহীম তিনিই যাঁর নিকট চাওয়া না হলে তিনি রাগান্বিত হন।
৭. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) বলেছেন, রহমানের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা সর্বাবস্থায় তোমার প্রতি দয়াবান। আর রাহীমের অর্থ হলো তিনি সকল বালা-মসিবত থেকে বান্দার হেফাজতকারী।
৮. কারো মতে, রহমান অর্থ হলো যিনি দোজখ থেকে নাজাত দান করেন, আর রাহীম অর্থ যিনি বান্দাকে বেহেশত দান করেন।
৯. কারো মতে রাহীম তিনি, যিনি মানুষের অন্তরে দয়া সৃষ্টি করেন। আর রহমান তিনি যিনি মানুষের দুঃখ দূর করেন।
১০. কেউ বলেন, যিনি মানুষের পাপসমূহ ক্ষমা করেন তিনি রাহীম, আর যিনি মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন তিনি রহমান।
১১. কেউ কেউ বলেন, যিনি মানুষকে পাপসমূহ থেকে রক্ষা করে ইবাদতের তৌফিক দান করেন তিনি রহমান, আর যিনি পরকালের বিষয়ে দয়া করেন তিনি রাহীম।
১২. কারো মতে, যিনি পরকালের বিষয়ে দয়া করেন তিনি রাহীম, আর যিনি দুনিয়া জীবনের সকল বিপদাপদ দূর করেন তিনি রহমান। –[নূরুল কুরআন]

قَوْلُهُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ .... اَلْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি (আল্লাহ) মালিক বাদশাহ, অতীব মহান পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি-নিরাপত্তা, শান্তি-নিরাপত্তাদাতা সংরক্ষক, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ বিধানে শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী।

اَلْمَلِكُ – শব্দের অর্থ– বাদশাহ, নিরঙ্কুশ অধিনায়ক, শুধু اَلْمَلِكُ শব্দ ব্যবহার হওয়ায় তার অর্থ হয় তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের অধিপতি, বাদশাহ, সবকিছুরই প্রকৃত মালিক তিনি। তাঁর এ মালিকানায় কোনো সংকীর্ণতা নেই। তিনি ছাড়া অন্যান্য যারা মালিকানার দাবিদার প্রকৃতপক্ষে তাদের মালিকানা আল্লাহ তা'আলার দান।

اَلْقُدُّوْسُ – এ শব্দটি মুবালিগার সীগাহ বা আতিশয্যবোধক শব্দ, قُدْسٌ -এর মূল। তার অর্থ সব রকমের দোষমুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি হতে পবিত্র। আর قُدُّوْسٌ -এর অর্থ এমন সত্তা যিনি কোনোরূপ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা, কিংবা অশোভনতা ও অসুচিতা হতে অনেক অনেক দূরে। মূলকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত দোষত্রুটি ও দুর্বলতা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কুদ্দূস হতে পারে না। অন্য কাউকেও আল্লাহর ন্যায় কুদ্দুস মনে করা হলে তা হবে শিরক।

اَلسَّلٰمُ – আল্লাহ তা'আলাকে এখানে 'সালাম' বলা হয়েছে। সালাম অর্থ– শান্তি, নিরাপত্তা। আল্লাহ কিভাবে 'সালাম' তার তিন রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে– ১. আল্লাহ 'সালাম' মানে আল্লাহ তা'আলার জুলুম হতে স্বীয় সৃষ্টিকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখেন। ২. যিনি সর্বপ্রকারের দোষ এবং দুর্বলতা হতে নিরাপদ ও মুক্ত। ৩. যিনি নিজের বান্দাদেরকে জান্নাতে 'সালাম' দাতা। যেমন, আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন– سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ কেউ কেউ বলেছেন, 'সালাম' মানে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে শান্তিদাতা। –[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাকে اَلسَّلٰمُ বলার তাৎপর্য হলো তিনি পুরোপুরি নিরাপদ, তা হতে কোনোরূপ বিপদ বা দুর্বলতা কিংবা ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটতে পারে না অথবা তাঁর পরিপূর্ণতা ও পূর্ণাঙ্গতায় কখনও ভাঙ্গন বা ভাটা পড়তে পারে, এটা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْمُؤْمِنُ – এ শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এটার অর্থ হয় আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর বিশ্বাসী। আর যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক। অর্থাৎ তিনি ঈমানদারগণকে সর্বপ্রকারের আজাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন। –[মা'আরিফ]

কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, কিন্তু তিনি নিরাপত্তা কাউকে দেন এটার উল্লেখ না হওয়ার কারণে স্বতই সমগ্র সৃষ্টিলোক এবং সৃষ্টিলোকের প্রত্যেকটি জিনিসই এটার অন্তর্ভুক্ত বুঝায়।

اَلْمُهَيْمِنُ – এর তিনটি অর্থ, ১. পাহারাদার ও সংরক্ষণকর্তা। ২. পর্যবেক্ষক, এটা হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ এবং মুজাহিদের অভিমত। ৩. যিনি সৃষ্টি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে সদা কর্মতৎপর।

اَلْعَزِيْزُ – এ শব্দ এমন এক মহাপরাক্রমশালী সত্তা বুঝায়, যাঁর বিরুদ্ধে কেউই মাথা জাগাতে পারে না। যাঁর সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই। যার সম্মুখে অন্য সকলই নিঃশক্তি, অসহায় ও অক্ষম। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْجَبَّارُ – এ শব্দটি جَبْرٌ হতে উদ্গত, অর্থ– জোর করা ও শক্তি প্রয়োগ করা; কিন্তু তার আসল অর্থ সংশোধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ। جَبَّارٌ শব্দটি মুবালিগার সীগাহ অর্থাৎ আতিশয্যবোধক শব্দ। আল্লাহ তা'আলাকে جَبَّارٌ বলা হয়েছে এ অর্থে যে, তিনি তাঁর এ বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা বল প্রয়োগপূর্বক যথাযথ করে থাকেন; সুস্থ, সঠিক ও সবল করে রাখেন। এ ছাড়া জাব্বার শব্দের বিরাটত্ব ও মহানত্বের অর্থও নিহিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

اَلْمُتَكَبِّرُ – বড়ত্ব প্রকাশকারী, বড়াইকারী। প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি কোনো বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী সে বড় হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজেকে বড় মনে করা, নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, বড়াই করে বেড়ানো। এটা মিথ্যা এবং গুনাহের কাজ। কারণ সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্বের দাবি করা মানে আল্লাহর বিশেষ গুণে শরিক হওয়ার দাবি করা। –[মা'আরিফ, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ : উপরে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি এবং নামসমূহের আলোচনার পর বিশেষত আল্লাহ তা'আলার মুতাকাব্বির গুণের আলোচনার পর বলা হয়েছে, "আল্লাহ পবিত্র মহান সে শিরক হতে যা লোকেরা করছে।"

এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষেরা যে মিথ্যা বড়ত্বের দাবি করে এবং মিথ্যা অহমিকার প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে শরিক হওয়ার দাবি করে, সেসব হতে আল্লাহ পবিত্র মহান। –[কাবীর]

বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, অর্থাৎ তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা-এখতিয়ার এবং গুণাবলিতে কিংবা তাঁর মূল সত্তায় অন্যকোনো সৃষ্টিকে তাঁর শরিকদার যারাই মনে করে মূলতই তারা একটা অযৌক্তিক কথা বলে। কোনো দিক দিয়েই এবং কোনো অর্থেই কেউ তাঁর শরিক হবে– এটা হতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

সংশয় নিরসন : এখানে কারো কারো মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে সে প্রশ্নটি হলো, এখানে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলির আলোচনা হয়েছে ঠিক সেসব গুণাবলি কোনো কোনো সৃষ্টির জন্যও কুরআনের অন্যত্র আছে বলে প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন, উপরে هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ বলে যে رَحْمَةٌ বা দয়া আল্লাহর জন্য প্রমাণ করা হয়েছে, অন্যত্র এ رَحْمَةٌ বা দয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যও প্রমাণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ –

এ আয়াতে রাসূলের জন্য رَحْمَةٌ এবং رَأْفَةٌ গুণ দু'টি স্বীকার করা হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র এই رَأْفَةٌ গুণটি আল্লাহ তা'আলার আছে বলে দাবি করা হয়েছে। বলা হয়েছে اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অতএব, এটা আল্লাহর গুণে রাসূলকে শরিক করা নয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাওহীদের আলিমগণ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা رَحْمَةٌ এবং رَأْفَةٌ গুণ দু'টি দ্বারা গুণান্বিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এ গুণ দু'টি দ্বারা গুণান্বিত, তবে আল্লাহর গুণ এবং রাসূলের গুণের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, যেমন আল্লাহ এবং রাসূলের যাতের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলার رَحْمَةٌ এবং رَأْفَةٌ নিজস্ব, আর রাসূলের رَحْمَةٌ এবং رَأْفَةٌ হলো আল্লাহ প্রদত্ত। অন্যান্য সিফাত বা গুণাবলি সম্বন্ধেও ঠিক একথা বলতে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহর নাম এবং গুণাবলি পর্যালোচনার পদ্ধতি : আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলি সম্বলিত যেসব আয়াত বা হাদীস রয়েছে. সে সবের পর্যালোচনার পদ্ধতি হলো, সেসব গুণাবলি আল্লাহ তা'আলার আছে বলে স্বীকার করা। তবে উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলি পর্যালোচনার সময় দু'টা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে–

১. কোনো সৃষ্টির সাথে আল্লাহর গুণাবলিকে তুলনা করা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা চলবে না। কারণ, আল্লাহ বলেছেন– فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ "সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করো না। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।" –[নাহল– ৭৪]

২. যেসব গুণাবলি স্বয়ং আল্লাহ নিজের জন্য আছে বলে স্বীকার করেছেন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর জন্য আছে বলে দাবি করেছেন সেসব গুণাবলি আছে বলে স্বীকার করা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" এখানে লক্ষ্যণীয় হলো, প্রথমে আল্লাহর সদৃশ অস্বীকার করা হয়েছে অতঃপর আল্লাহ তা'আলার দু'টি গুণ স্বীকার করা হয়েছে। এক, সর্বশ্রোতা দ্বিতীয়, সর্বদ্রষ্টা। সুতরাং এ দুই সিফাত বা গুণ সম্বন্ধে বলতে হবে আল্লাহর শুনা এবং দেখা কোনো সৃষ্টির দেখা আর শুনার মতো নয়, বরং আল্লাহর দেখা এবং শুনা হলো আল্লাহর মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিজস্ব।

বাকি গুণাবলি সম্বন্ধেও এ কথা বলতে হবে। অর্থাৎ সদৃশবিহীন স্বীকার করতে হবে এবং আল্লাহর যাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই বিশ্বাস করতে হবে। কোনো সৃষ্টির কোনো গুণকে তাঁর গুণের সাথে তুলনা করা চলবে না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى : সূরা হাশ্‌র -এর শেষোক্ত অংশে বর্ণিত আল্লাহর কয়েকটি সিফাতী নাম সম্পর্কে এখনো আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন, তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, বারী, মুসাওয়ির অর্থাৎ জগতের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টির প্রাথমিক পরিকল্পনা হতে শুরু করে বিশেষ আকার-আকৃতি ও প্রকৃতিতে অস্তিত্ব স্থাপন হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁরই নির্মাণ ও লালনের অধীন, কোনো জিনিসই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে অস্তিত্বশীল অথবা তার নির্মাণ ও লালনে অন্য কারো এক বিন্দু দখল নেই। এ পর্যায়সমূহ একের পর এক এসে থাকে। প্রথম পর্যায় হলো خَلْقٌ -এর অর্থ– পরিমাণ নির্ধারণ, পরিমাণ নির্ণয় ও পরিকল্পনাকরণ। যেমন কোনো প্রকৌশলী একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্য সর্বপ্রথম সংকল্প গ্রহণ করে যে, এ বিশেষ উদ্দেশ্য এ ধরনের ও রককমের একটি প্রাসাদ তৈরি করতে হবে। তখন মনের পর্দায় একটি চিত্র চিন্তা করে, উদ্দেশ্যানুসারে প্রস্তাবিত প্রাসাদের বিস্তারিত রূপ কি হবে তা সে চিন্তার রং তুলি দিয়ে মনের পর্দায় রূপায়িত করে নেয়। কুরআনের পরিভাষায় এ পর্যায়ের যাবতীয় কাজকে خَلْقٌ বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে بَرْءٌ শব্দ, এর মূল অর্থ– ভিন্ন করা, ছিন্ন করা, দীর্ঘ করা, ছিড়ে আলাদা করে দেওয়া। خَالِقٌ স্বীয় পরিকল্পিত চিত্রকে কার্যকর করে যে জিনিসের চিত্র সে চিন্তা করেছে তাকে অনস্তিত্বের অন্ধকার হতে মুক্ত করে অস্তিত্বের আলোকে টেনে আনে। এ কারণে خَالِقٌ [খালেক] শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে بَارِئٌ শব্দ বলা হয়েছে এবং তা এ অর্থেই বলা হয়েছে। যেমন প্রকৌশলী প্রাসাদের যে চিত্র মানসপটে এঁকেছিল তদনুযায়ী সে যথাযথ পরিমাপ অনুযায়ী মাটির উপর চিত্র ও রেখা অংকন করে। তার উপর মূল ভিত্তি খোদাই করে প্রাচীর বানায় ও নির্মাণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ একের পর এক করে যায়। এটাও ঠিক তেমনি।

তৃতীয় পর্যায়ে হলো তাসবীর تَصْوِيْر এর অর্থ– আকার, আকৃতি, রচনা, এখানে এর অর্থ একটি জিনিসকে তার চূড়ান্ত রূপে বানিয়ে দেওয়া। এ তিনটি পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ও মানবীয় কাজের মধ্যে কোনোই সদৃশ নেই।

অতঃপর اَلْمُصَوِّرُ -এর অর্থ আকৃতি সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি দান করেছেন যার কারণে তা অপর একটি সৃষ্টি হতে অন্য প্রকার আকার আকৃতি ধারণ করে এবং তা চেনা যায়। পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকাতকে পৃথক পৃথক আকৃতি দ্বারা চেনা যায়। তা চাই আসমানি হোক চাই জমিনী হোক। অতঃপর তাতে প্রকারভেদে প্রত্যেক প্রকারের আকৃতি প্রকৃতি এবং মানবীয় একই জাতির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী জাতির গঠন পদ্ধতির বিবর্তন, আর যে কোনো পুরুষ ও স্ত্রী জাতের চেহারার পরিবর্তন ইত্যাদির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের গঠন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। এ সকল পরিবর্তন একমাত্র একই সৃষ্টিকর্তার পরিপূর্ণ কুদরতের বাস্তবায়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাতে কারো কোনো ক্ষমতার যৌথ ব্যবহার করা হয়নি।

সুতরাং যেভাবে غَيْرُ اللّٰهِ-এর জন্য تَكَبُّر জায়েজ নয়, অনুরূপভাবে تَصْوِيْر سَازِيْ তথা সৃষ্টিজগতের আকৃতি তৈরি করার ক্ষমতায়ও দ্বিতীয় কারো জন্য হস্তক্ষেপ করা জায়েজ নয়। কারণ এগুলো আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট গুণ। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى : আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার ভালো ভালো [উৎকৃষ্ট] নামসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কালামে আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের কোনো সংখ্যা নির্ধারিতভাবে বর্ণনা করা হয়নি, তবে সহীহ সনদ সম্পন্ন হাদীস শরীফে তার একটি সূচি পেশ করা হয়েছে। যেমন, তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে ৯৯টি নাম গণনা করা হয়েছে। তবে এগুলোতে সীমিত নয়, বরং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলিম ও ফকীহ, মুফাসসিরগণের মতে এসব নাম সাদৃশ্য ও তুলনাবিহীন বরং আল্লাহ তা'আলার নিজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে যে সকল নাম আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে সেগুলো আল্লাহর কাছে সাদৃশবিহীন অবস্থায় আছে বলে আমরা স্বীকার করি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞাত আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁকে ডাকবে। বিকৃতকারীদের ব্যবহৃত বিকৃত নামের দ্বারা তাঁকে ডাকবে না। তাঁর নামের বিকৃতি সম্পূর্ণ অস্বীকারের মাধ্যমে অর্থের বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, অথবা বাতিল প্রভুদের নাম ইত্যাদি বহু প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার اَسْمَاءُ الْحُسْنٰى-এর উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুনাজাতে মাকবুল নামক কিতাবের প্রথমাংশে মা'আরেফুল কোরআন গ্রন্থকারের একটি পুস্তিকাও রচিত হয়েছে। -[মা'আরিফ]

আল্লাহকে এমন নামে ডাকা জায়েজ হবে কিনা যা তিনি ও তাঁর রাসূল ﷺ বলেননি : আল্লাহ তা'আলার গুণ প্রকাশক যে সকল নাম তিনি নিজের জন্য দাবি করেননি, অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও দাবি করেননি, সে সকল নামে তাঁকে আহ্বান করা যাবে কি?

উক্ত প্রশ্নের সমাধানে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর মত হলো, যে সকল নাম কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়নি, সে সকল নামে তাঁকে আহ্বান করা জায়েজ হবে না। তবে আরবি নামের অন্য ভাষায় অর্থকরণ ও ব্যাখ্যা করা অন্যকথা। কারণ অন্য নামে আল্লাহকে ডাকতে গেলে এমন নামে ডাকার সম্ভাবনা থেকে যায়, যা তার ইজ্জত এবং সম্মানের উপযুক্ত নয়। এ কারণেই ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন- لَا يُوْصَفُ اللّٰهُ اِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهٖ نَفْسَهٗ اَوْ وَصَفَهٗ بِهٖ رَسُوْلُهٗ لَا يَتَجَاوَزُ الْقُرْاٰنَ وَالْحَدِيْثَ

অর্থাৎ যে গুণবাচক নামে আল্লাহ নিজকে নামকরণ করেছেন বা তাঁর রাসূল তাঁকে নামকরণ করেছেন তা ব্যতীত অন্য নামে তাঁকে নামকরণ করা যাবে না এবং এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের ব্যতিক্রম করা চলবে না। وَهٰكَذَا عَقِيْدَةُ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى এটাই ইমাম আবূ হানীফাহ (র.)-এর অভিমত। (هٰكَذَا فِيْ عَقِيْدَةِ الْاِسْلَامِ وَالْاِمَامِ الْمَاتُرِيْدِيْ - شَرْحُ الْعَقِيْدَةِ الْوَاسِطِيَّةِ وَغَيْرِهَا)

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُسَبِّحُ لَهٗ ..... الْحَكِيْمُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আসমান-জমিনের প্রত্যেকটি জিনিস তাঁর তাসবীহ করে, আর তিনি অতীব প্রবল, মহাপরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী।' অর্থাৎ কথা ও অবস্থার ভাষায় বলছে যে, তার স্রষ্টা সর্বপ্রকারের দোষত্রুটি, দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহ তা'আলার তাসবীহের আলোচনা করে এ সূরা আরম্ভ করা হয়েছিল, আবার তাসবীহের আলোচনার মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে। এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, তাসবীহ পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ এবং তাই মূল উদ্দেশ্য। -[সাবী]

Free@ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ : সূরা আল-মুমতাহিনাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ –

"যে সব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসবে ও মুসলমান হওয়ার দাবি করবে তাদের যাচাই ও পরীক্ষা করতে হবে।" উপরিউক্ত فَامْتَحِنُوْهُنَّ শব্দ হতে সূরার নামকরণ اَلْمُمْتَحِنَةُ (আল-মুমতাহিনাহ) করা হয়েছে। এ শব্দটির উচ্চারণ 'মুমতাহিনাহ' করা হয়েছে অর্থাৎ ইমতিহান হতে ইসমে ফায়েল, যার অর্থ– পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা। আর কেউ কেউ এর উচ্চারণ মুমতাহানাহ করেছেন অর্থাৎ ইসমে মাফউল, যার অর্থ– সে স্ত্রীলোক যার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে।

অত্র সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল মোয়াদ্দা। এতে ১৩টি আয়াত, ৩৪৮টি বাক্য এবং ১৫১০ টি অক্ষর রয়েছে।

–[নূরুল কোরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যে ঈমানের দাবিদার হলেও কাফেরদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের, আর এ সূরায় মু'মিনদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা কাফিরদের সাথে কোনো প্রকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখে। –[রুহুল মা'আনী]

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় এমন দু'টি ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, যার সময়কাল ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন জ্ঞাত। প্রথম ব্যাপার হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) সম্পর্কিত। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে কুরাইশ সরদারদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা আক্রমণের সংবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে একখানা গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যেসব মুসলমান স্ত্রীলোক মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলমান পুরুষদের ন্যায় মুসলমান স্ত্রীলোকদেরকে কাফেরদের হাতে প্রত্যর্পণ করতে হবে কি হবে না এ বিষয়ে একটা জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এ দু'টি ব্যাপার উল্লেখে এ কথা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু :

১. এ সূরার প্রথমে শুরু হতে ৯ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া যিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার মানসে রাসূলে কারীম ﷺ -এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামরিক গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তার নিন্দা করা হয়েছে। এখানে প্রথমেই অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে– এ দুনিয়ার বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এবং সম্পর্ক পরকালে কোনো কাজে আসবে না। পরকালে কেবল ঈমান এবং আমলে সালেহই কাজে আসবে। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর অনুসারীদের আদর্শ হতে শিক্ষা অর্জন করতে বলা হয়েছে। –[সাফওয়া]

২. ১০ নং এবং ১১ নং আয়াত দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যার সমাধান পেশ করা হয়েছে। সমস্যাটি তখন খুব বেশি জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। সমস্যাটি ছিল এই যে, মক্কায় বহুসংখ্যক মুসলিম নারীর স্বামী কাফের ছিল। তারা কোনো না কোনো উপায়ে হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হতেন। অনুরূপভাবে বহুসংখ্যক মুসলিম পুরুষ এমন ছিলেন যাদের স্ত্রীরা ছিল কাফির আর তারা মক্কাতেই থেকে গিয়েছিল। অতঃপর এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অক্ষত আছে কিনা? সে সম্পর্কে তীব্র প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টিতে সে সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো এই যে, মুসলিম নারীর জন্য কাফের স্বামী হালাল নয় এবং মুসলিম পুরুষের জন্যও জায়েজ নয় কাফের নারীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখা।

৩. ১২ নং আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেসব স্ত্রীলোক ইসলাম কবুল করবে তাদের নিকট হতে জাহেলিয়াতের যুগে আরব নারীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত বহু বড় বড় দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। সে সঙ্গে এ কথারও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন যে, ভবিষ্যতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলে কারীম ﷺ -এর পক্ষ হতে উপস্থাপিত যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গলময় নিয়মনীতি, আইন-কানুন অনুসরণ ও পালন করে চলতে তারা বাধ্য ও প্রস্তুত থাকবেন।

৪. সূরার শেষ আয়াত অর্থাৎ ১৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতটিও প্রথম দিকের আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

সূরাটির শানে নুযূল : তাফসীরে মাযহারী, কুরতুবী ও খতীব গ্রন্থের বর্ণনা মতে উক্ত সূরার শানে নুযূল হচ্ছে– হযরত কোশাইরী ও ছা'আলাবী (রা.) বর্ণনা করেন ৮ম হিজরিতে হুযূর ﷺ মদীনা শরীফ হতে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য গুপ্তভাবে কিছু সংখ্যক ছাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনাক্রমে তৈরি হতে লাগলেন। সারাহ নামক একজন মহিলা ছিল। হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কা বিজয়ের প্রসঙ্গটি সম্বন্ধে সংবাদ জানিয়ে উক্ত সারাহ নামক মহিলার মাধ্যমে একটি পত্র মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। বার্তাবাহক মহিলাটি মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন এবং তাও অবহিত করে দিলেন যে, অমুক স্থানে এই এই আকৃতি প্রকৃতির বার্তাবাহক একটি মহিলাকে পাওয়া যাবে। তার নিকট অবশ্যই চিঠি রয়েছে। তাকে অবশ্যই ধরে আনতে হবে। সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.)-কে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, তাকে পাওয়া মাত্রই তার থেকে চিঠি নিয়ে আসবে। তখন হযরত আলী (রা.) উক্ত মহিলাকে যথাস্থানে গিয়ে পেলেন এবং চিঠি খোঁজ করলে প্রথমত মহিলাটি তা অস্বীকার করল। অতঃপর হযরত আলী ও হযরত জোবায়ের (রা.) বললেন, আমরাও সত্য বলছি এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সত্যই বলেছেন, তোমার সাথে হাতিব (রা.)-এর লিখিত পত্র রয়েছে। সুতরাং তা তাড়াতাড়ি বের করে দাও। অন্যথায় তোমাকে উলঙ্গ করে চিঠি বের করবো।

এ ধমকি দেখে মহিলাটি ভয়ে তার চুলের খোপা হতে পত্রখানা বের করে দিলেন। অতঃপর হযরত আলী ও জোবায়ের (রা.) তা এনে নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌঁছালেন। এরপর হযরত হাতিব (রা.)-কে ডাকানো হলে তিনি উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি অত্যন্ত মিনতির সুরে শপথ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঈমানদার, মুনাফিক নই। দীন ইসলামের জন্য আমার আত্মা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। ইসলামের সাথে শত্রুতার মানসে এ পত্র লিখিনি; বরং তার কারণ এই যে, আমার ছোট ছোট সন্তানগণ মক্কায় রয়ে গেছে। তাদের ভালোবাসার কারণে আমার হতে এহেন কার্য ঘটেছে? এ কাজের বদৌলতে আমার বাচ্চাকাচ্চাগণকে তারা রক্ষণাবেক্ষণ করতে মর্জি করবে। হযরত হাতিব (রা.)-এর বর্ণনা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি নির্দেশ দেন তবে এ মুনাফিকের শিরশ্ছেদ করে দিতে চাই।

উত্তরে হুযূর ﷺ বললেন, ওমর এটা কখনো হয় না, কারণ আল্লাহ তা'আলা বদরের মুজাহিদগণের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। হাতিব ইবনে আবূ বালতায়াহ আমার সাথে বদরের ময়দানে শরিক ছিল। আর বদরের অংশীদার সকলকে আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং আরও বলেছেন– اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ সুতরাং তাকে ক্ষমা করা যায়। এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) থেমে গেলেন এবং তার চক্ষু যুগল থেকে কান্নার পানি বের হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, হযরত হাতিব (রা.) বলেন, মুসলমান ও ইসলামের ক্ষতির লক্ষ্যে আমি এ পত্র লিখিনি। সুতরাং হাতেব (রা.)-এর পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সূরা নাজিল হলো। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-মুমতাহিনাহ মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلَاثَ عَشَرَ اٰيَةً : ১৩ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ تُوْصِلُوْنَ اِلَيْهِمْ قَصْدَ النَّبِىِّ ﷺ غَزْوَهُمُ الَّذِىْ اَسَرَّهُ اِلَيْكُمْ وَ وَرَّى بِحُنَيْنٍ بِالْمَوَدَّةِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ كَتَبَ حَاطِبُ بْنُ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَيْهِمْ كِتَابًا بِذٰلِكَ لِمَالِهٖ عِنْدَهُمْ مِنَ الْاَوْلَادِ وَالْاَهْلِ الْمُشْرِكِيْنَ فَاسْتَرَدَّهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ اَرْسَلَهُ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى لَهٗ بِذٰلِكَ وَقَبِلَ عُذْرَ حَاطِبٍ فِيْهِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ج اَىْ دِيْنِ الْاِسْلَامِ وَالْقُرْاٰنِ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ مِنْ مَكَّةَ بِتَضْيِيْقِهِمْ عَلَيْكُمْ. اَنْ تُؤْمِنُوْا اَىْ لِاَجْلِ اَنْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا لِلْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ.

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা সংবাদ প্রেরণ করবে পৌঁছাবে তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংকল্প বিষয়ে, মক্কাবাসী কাফিরগণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা প্রসঙ্গে যা তিনি তোমাদেরকে গোপনভাবে অবহিত করেছেন এবং বাহ্যত খায়বরের দিকে 'তাওরিয়া'- ভান করেছেন। বন্ধুত্বের কারণে তোমাদের ও তাদের মধ্যে পরস্পর। হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া এ বিষয়ে মক্কাবাসী কাফেরদের নিকট একটি চিঠি লিখেছিল। যেহেতু তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন মুশরিকদের সাথে ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে এ সম্পর্কে অবগত হয়ে উক্ত চিঠি ফেরত আনিয়ে নেন এবং হাতিবের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য আগমন করেছে, তা অস্বীকার করেছে অর্থাৎ দীন ইসলাম ও কুরআন মাজীদ। তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে মক্কা হতে, তোমাদের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এ কারণে যে, তোমরা ঈমান আনয়ন করেছ অর্থাৎ তোমাদের ঈমান আনয়নের কারণে। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি। যদি তোমরা বের হয়ে থাক জিহাদে জিহাদের জন্য আমার পথে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبْلَهُ اَىْ فَلَا تَتَّخِذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ اَىْ اِسْرَارَ خَبَرِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ اَخْطَأَ طَرِيْقَ الْهُدٰى وَالسَّوَاءُ فِى الْاَصْلِ الْوَسْطُ.

ইতঃপূর্বেকার বক্তব্য শর্তের জওয়াবের প্রতি নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ তবে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে গোপনীয়ভাবে বন্ধুত্ব করেছ, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, আমি সম্যক অবহিত। আর তোমাদের মধ্য হতে যে তা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিকল্পনা গোপনে তাদেরকে খবর দিবে সে সরল পথ বিচ্যুত হবে হেদায়েতের পথ হতে বিভ্রান্ত হবে سَوَاءٌ শব্দটি মূলত 'মাঝামাঝি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : এ বাক্যটি تَتَّخِذُوْا -এর ضَمِيْر হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। তাকে جُمْلَةْ مُسْتَاْنِفَةْ ও বলা যেতে পারে। তখন এ বাক্যটি বন্ধুত্বের কারণের ব্যাখ্যা হবে। একে اَوْلِيَاءُ -এর صِفَتْ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলা যেতে পারে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ : এ বাক্যটি تُلْقُوْنَ -এর فَاعِلْ হতে বা لَاتَتَّخِذُوْا -এর فَاعِلْ হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। একে جُمْلَةْ مُسْتَاْنِفَةْ ও বলা যেতে পারে, তখন একে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনাকারী বাক্য বলতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ : জমহুর بِمَا جَاءَكُمْ অর্থাৎ ب সহকারে পড়েছেন। জুহদারী এবং আসেম হতে এক বর্ণনায় لِمَا جَاءَكُمْ অর্থাৎ لَامْ সহকারে দেখা যায়।

قَوْلُهُ جِهَادًا وَابْتِغَاءً : এ শব্দদ্বয় মানসূব হওয়ার কারণ হলো, শব্দদ্বয় خَرَجْتُمْ ক্রিয়া হতে مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে। অর্থাৎ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ لِاَجْلِ الْجِهَادِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ অর্থাৎ যদি তোমরা জিহাদ এবং আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো। -[কাবীর, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ..... اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করে নির্দেশ প্রদান করছেন, যেন তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রুদের সাথে বন্ধুসুলভ ভাব দেখায়ো না এবং তাদেরকে তোমরা সহায়ক মনে করিও না। আর বন্ধুত্বের কারণে তোমরা তাদেরকে সংবাদ আদান প্রদান করে থাক।

উক্ত আয়াতের ইঙ্গিতে এটাই প্রকাশিত হয় যে, কাফেরদের নিকট বার্তা সম্বলিত পত্র লিখন অর্থ তাদের সাথে বন্ধুত্বের পরিচয় দান করা মাত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ -শিরোনাম পেশ করে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর শত্রু ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা অমার্জনীয় অপরাধ এবং মুসলমানদের সাথে এটা মারাত্মক ধোঁকাবাজি, সুতরাং তোমরা তা হতে বেঁচে থাক।

আর এটাও বুঝিয়েছেন যে, যতক্ষণ কাফের কুফরির মধ্যে এবং মুসলমান ইসলামের অন্তর্ভুক্ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর বন্ধু হতে পারে না। কারণ মুসলমানগণ আল্লাহর বন্ধু হয়ে তাঁর শত্রুদের সাথে কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে- اَلْاِيْمَانُ وَالْكُفْرُ مُتَضَادَّانِ অথচ ঈমান কুফরির বিপরীত।

আর ঈমানদারগণকে বলা হয়েছে, تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ অর্থাৎ তোমরা কাফেরদের প্রতি বন্ধুত্বের আচরণসুলভ বার্তা পাঠাও যদিও হযরত হাতিবের অন্তরে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের পরিচয় ছিল না। তথাপিও এ পত্র দ্বারা প্রকাশ্য বন্ধুত্বের পরিচয় বহন করে। সুতরাং মুসলমানদেরকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, اَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ صَدَقَ অর্থাৎ তোমাদের সাথী সত্যই বলেছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ -[মা'আরিফ]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহর বাণী- قَوْلُهُ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ -এর অর্থ প্রকাশ্যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের ভাব পেশ করা। কারণ মূলত হযরত হাতিব -এর আত্মা বিশুদ্ধ ছিল, নিফাক তার ছিল না, এর প্রমাণ স্বয়ং মহানবী ﷺ -এর বাণী- اَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ صَدَقَ এটাই তার মুসলমান থাকা ও সহীহ আত্মাসম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ। -[খতীব]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَدْ كَفَرُوْا ..... اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ : উক্ত আয়াতে কাফেরগণ মুসলমানগণের শত্রু এবং ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর শত্রু হওয়ার কারণ দর্শানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাফেরগণ আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সত্যের নাফরমানি করেছে বিশেষত ঈমানদারদেরকে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বীয় মাতৃভূমি ও বাসস্থান হতে বিতাড়িত করে দিয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস আনয়ন করেছে, যিনি তোমাদের অর্থাৎ সকল ঈমানদার তথা সকল মানবজাতির প্রভু।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ (حَقّ) দ্বারা পবিত্র কুরআন অথবা ইসলাম উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আর তাদের মুসলমানদের সাথে শত্রুতার মূল কারণ এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমানরা আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করেছ। এতে ইহকালীন লাভ ছাড়া আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এতে আরো প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ কস্মিনকালেও ঈমান থাকা সত্ত্বে কাফেরদের সহচর ও বন্ধু হতে পারে না। সুতরাং হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.) যে ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, কাফেরদের নিকট বার্তা পৌঁছিয়ে কিছু ইহসান করবো, যাতে তারা আমার পরিবার-পরিজনের উপর কিঞ্চিৎ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবে, এ ধারণা সরাসরি বিভ্রান্তি মাত্র। কেননা কাফেরগণের সাথে তোমাদের ঈমানদারদের শত্রুতার একমাত্র কারণ যেহেতু ঈমান, আল্লাহ না করুক, তোমাদের ঈমান কখনো বিধ্বংস হওয়ার পূর্বে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের আশা পোষণ করা কেবল ধোঁকাবাজি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ ..... مَرْضَاتِيْ : আল্লাহ বলেন, যদি তোমাদের হিজরত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, তাহলে কোনো কাফির যে আল্লাহর দুশমন, তার থেকে কি করে তোমরা শান্তি ও সহানুভূতি আশা করতে পার।

উক্ত আয়াতাংশটি শর্তস্বরূপ, সুতরাং তার জাযা আবশ্যক। তবে তা কোথায় বা কি এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, পূর্ব বর্ণিত বাক্য لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ তার জাযা, অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন- তার জাযা উহ্য রয়েছে। আর উপরিউক্ত অংশ জাযা হলে তখন তার অর্থ এভাবে হবে যে,

لَا تَتَّخِذُوْا اَعْدَائِيْ اَوْلِيَاءَ اِنْ كُنْتُمْ اَوْلِيَائِيْ .

শত্রুতা ও ভালোবাসা পরস্পর বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ কিভাবে বললেন? : এটার প্রতি উত্তরে বলতে হবে, কাফেরগণ ঈমানদারদের শত্রু কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের লক্ষ্যেই। তবুও দুনিয়ার যাবতীয় কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত বিষয়ে ঈমানদারদের সাথে কাফেরদের ভালোবাসা স্থাপন করা জায়েজ রয়েছে। তাই আল্লাহ এটা হতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। فَلَمْ يَتَحَقَّقْ وَحْدَةُ النِّسْبَةِ مِنَ الْوَاحِدَةِ الثَّمَانِ وَحَيْثُ لَمْ يَكْتَفِ بِقُوَّةٍ তাই قَوْلُهُ عَدُوِّيْ শব্দ বলে আল্লাহ ক্ষান্ত হতে পারেননি; বরং عَدُوَّكُمْ শব্দও উল্লেখ করেছেন, যাতে তাদের মরুয়াতের পরিচয় বিলীন হয়ে যায়, নতুবা عَدُوِّيْ শব্দ বলা দ্বারাই ঈমানদারদের শত্রু বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, আর এটাও বুঝাবার উদ্দেশ্য যে, তারা আল্লাহর শত্রু, ঈমানদারদের শত্রু হোক, বা না হোক। -[রুহুল বয়ান]

কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের হুকুম : কাফেরদের সাথে যাবতীয় পার্থিব সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন- লেনদেন, সামাজিক আচার-আচরণ, বেচাকেনা, সন্ধিচুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করা বা তাদের সাথে আপোষ করা কোনোক্রমেই মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়। কারণ তারা আল্লাহ ও রাসূলের চিরন্তন শত্রু। সুতরাং তারা কোনো দিনই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমাদের গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অধিক অবহিত রয়েছি। অথচ তোমরা ধারণা পোষণ করেছিলে যে, তোমরা ধূর্ত। অথচ তোমরা জেনে রাখবে যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়ই আমার সামনে সমান। আর তোমরা যা অস্পষ্ট রাখবে তা আমি স্বীয় রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে দেবো। -[মাদারেক]

قَوْلُهُ اَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ এটা আল্লাহ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ হওয়ার জন্য দলিল স্বরূপ, যেভাবে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

এখানে اَعْلَمُ শব্দটিকে مُضَارِعٌ وَاحِدٌ مُتَكَلِّمٌ-এর অর্থ করলে "আমি অবগত আছি" অর্থ হবে। অন্যথায় بِصِيْغَةِ تَفْضِيْلٍ পড়লে অধিক অর্থে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ আমি সবচেয়ে অধিক অবগত আছি। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ وَمَنْ يَفْعَلْهُ .... سَوَاءَ السَّبِيْلِ : وَمَنْ يَفْعَلْهُ-এর ضَمِيْر-এর مَرْجِعْ আগত বিষয়গুলো হতে যে কোনো একটি যেমন হতে পারে, তেমনি এক সাথে তিনটিও হতে পারে; ১. কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন; ২. ভালোবাসার বার্তা প্রেরণ, ৩. গোপনে পরামর্শ দান বা মুসলমানদের গোপন সংবাদাদি জানিয়ে দেওয়া। -[কাবীর]

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ বাক্যেরও দু'টি অর্থ হতে পারে-

এক. "সত্যপথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।" এটা হযরত মুকাতিল (র.)-এর অভিমত।

দুই. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হলো, اِنَّهٗ عَدَلَ عَنْ قَصْدِ الْاِيْمَانِ فِيْ اِعْتِقَادِهٖ অর্থাৎ সে তার আকীদায় ঈমানের পথ হতে বিপথগামী হয়েছে।

অনুবাদ :

٢. إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَظْفَرُوا بِكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ بِالسَّبِّ وَالشَّتْمِ وَوَدُّوا تَمَنَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ .

২. তারা যদি তোমাদেরকে কাবু করতে পারে তোমাদের উপর জয়লাভ করে তবে তারা তোমাদের শত্রু হবে এবং তোমাদের প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করবে হত্যা ও প্রহারের মাধ্যমে ও জবান দরাজী করবে মন্দের সাথে গাল-মন্দ বলার মাধ্যমে। আর তারা কামনা করবে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যে, তোমরাও কাফের হয়ে যাও।

٣. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ قَرَابَتُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ج الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ لِأَجْلِهِمْ أَسْرَرْتُمُ الْخَبَرَ مِنَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج يَفْصِلُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ بَيْنَكُمْ ط وَبَيْنَهُمْ فَتَكُونُونَ فِي الْجَنَّةِ وَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

৩. তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না তোমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ নিকটাত্মীয়গণ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ তোমাদের মুশরিক সন্তান-সন্ততিগণ, যাদের কারণে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপন সংবাদ প্রেরণ করেছ পরকালীন শাস্তির মোকাবিলায়। কিয়ামতের দিন, আল্লাহ ফয়সালা করে দেবেন শব্দটি مَجْهُوْل ও مَعْرُوْف উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে। তখন তোমরা বেহেশতবাসী হবে আর তারা কাফেরদের সাথে দোজখবাসী হবে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, তা প্রত্যক্ষকারী।

٤. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ قُدْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيمَ أَيْ بِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَالَّذِينَ مَعَهُ ج مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا جَمْعُ بَرِيْئٍ كَظَرِيْفٍ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ أَنْكَرْنَاكُمْ . وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ وَاوًا حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ .

৪. তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে أُسْوَةٌ শব্দটি দু' স্থানেই হামযার মধ্যে যের ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, এর অর্থ আদর্শ। ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে অর্থাৎ তাঁর বাণী ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে এবং যারা তার সঙ্গে রয়েছে মু'মিনগণ হতে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছিল, আমরা সম্পর্কমুক্ত بُرَآؤُا শব্দটি ظَرِيْف -এর ওযনে بَرِيْئ -এর বহুবচন তোমাদের হতে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের হতে। আমরা তোমাদের সাথে বিরুদ্ধাচরণ করেছি তোমাদের অস্বীকার করেছি। আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হলো সার্বক্ষণিক শব্দটি উভয় হামযা বহাল রেখে ও দ্বিতীয়টিকে ওয়াও দ্বারা পরিবর্তন করে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যাবৎ তোমরা একক আল্লাহর উপর ঈমান আন, তবে ব্যতিক্রম শুধু তাঁর পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি "নিশ্চয় আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

مُسْتَثْنٰى مِنْ اُسْوَةٍ اَىْ فَلَيْسَ لَكُمُ التَّأَسِّىْ بِهٖ فِىْ ذٰلِكَ بِاَنْ تَسْتَغْفِرُوْا لِلْكُفَّارِ وَقَوْلُهٗ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ اَىْ مِنْ عَذَابِهٖ وَثَوَابِهٖ مِنْ شَيْءٍ ط كَنٰى بِهٖ عَنْ اَنَّهٗ لَا يَمْلِكُ لَهٗ غَيْرَ الْاِسْتِغْفَارِ فَهُوَ مَبْنِىٌّ عَلَيْهِ مُسْتَثْنٰى مِنْ حَيْثُ الْمُرَادِ مِنْهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ ظَاهِرِهٖ مِمَّا يَتَأَسّٰى فِيْهِ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاسْتِغْفَارُهٗ قَبْلَ اَنْ يَتَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِلّٰهِ كَمَا ذُكِرَ فِىْ بَرَاءَةٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ مِنْ مَقُوْلِ الْخَلِيْلِ وَمَنْ مَّعَهٗ اَىْ وَقَالُوْا ـ

এটা اُسْوَةٌ হতে مُسْتَثْنٰى অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তিনি তোমাদের আদর্শ নন যে, তোমরাও কাফেরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর তাঁর এ উক্তি যে, আর আমি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট অধিকারী নই অর্থাৎ তাঁর শাস্তি ও ছওয়াবের ব্যাপারে। কোনো কিছুই এটা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুর অধিকারী নন। সুতরাং এ বক্তব্যটি পূর্বোক্ত لَاَسْتَغْفِرَنَّ-এর উপর عَطْف-এর অন্তর্ভুক্ত যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ বক্তব্যটি আয়াত قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا-এর ভিত্তিতে অনুসরণীয় ও আদর্শ। আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনাটি– সে আল্লাহর শত্রু– এটা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেকার বিষয়। যেমন, সূরা বারাআতের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি ও তোমারই মুখাপেক্ষী হয়েছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন। এটা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনগণের উক্তি। অর্থাৎ তাঁরা বলেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ : وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ বাক্যটিকে উহ্য جَوَابُ شَرْطٍ-এর উপর আতফ করা হয়েছে। অথবা একে পুরো جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ-এর উপর আতফ বলতে হবে, আবু হাইয়ান একে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ : يَفْصِلُ শব্দটি জমহুর يُفْصَلُ অর্থাৎ يَاءْ তে ضَمَّةٌ এবং فَاءْ তে سَاكِنْ দিয়ে আর صَادْ এ فَتْح দিয়ে مَجْهُوْل করে পড়েছেন। আবু ওবাইদ এ কেরাতকে পছন্দ করেছেন।

আসেম একে يَفْصِلُ অর্থাৎ يَاءْ তে فَتْح এবং صَادْ এ كَسْرَةٌ দিয়ে مَعْرُوْف করে পড়েছেন।

আর হামযা এবং কেসায়ী يُفَصِّلُ অর্থাৎ يَاءْ তে ضَمَّةٌ. فَاءْ তে فَتْح এবং صَادْ-এ تَشْدِيْد যুক্ত كَسْرَةٌ দিয়ে পড়েছেন।

আলকামা نَفْصِلُ অর্থাৎ نُوْنْ সহকারে صَادْ-এ كَسْرَةٌ দিয়ে পড়েছেন।

তালহা এবং নাখয়ী نُوْنْ সহকারে এবং صَادْ-এ تَشْدِيْد যুক্ত كَسْرَةٌ দিয়ে نُفَصِّلُ পড়েছেন।

কাতাদাহ এবং আবূ হাইওয়া ضَمَّةٌ যুক্ত يَاءْ এবং صَادْ-এ كَسْرَةٌ দিয়ে يُفْصِلُ পড়েছেন। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : جُمْلَهٗ مُسْتَاْنِفَهٗ হয়েছে। অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কীয়গণ দ্বারা সেদিন কোনো ফল পাওয়া যাবে না [আবূ ইউসুফ] আর يَوْمَ الْقِيَامَةِ-কে لَنْ تَنْفَعَكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ করাও শুদ্ধ হবে। অর্থাৎ لَنْ تَنْفَعَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অথবা, তাকে পরবর্তী يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ করাও শুদ্ধ হবে। [জুমাল] সর্ব অবস্থায় يَوْمَ الْقِيَامَةِ টি ظَرْف হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ؟ : وَالَّذِيْنَ مَعَهُ উক্তিটি أُسْوَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অথবা حَسَنَةٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অথবা, একে أُسْوَةٌ-এর صِفَتٌ বলতে হবে। অথবা, একে حَسَنَةٌ এ লুপ্ত ضَمِيْر হতে حَالٌ হয়েছে বলতে হবে। অথবা, كَانَ-এর خَبَرْ বলতে হবে, অবশ্য তখন لَكُمْ ব্যাখ্যার জন্য হবে।

قَوْلُهُ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ؟ : وَمَا اَمْلِكُ لَكَ এ উক্তিটিকে لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ-এর উপর عَطْف বলা যায়। তখন প্রশ্ন আসবে لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ উক্তিটির আদর্শ না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; কিন্তু দ্বিতীয় উক্তি وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ উক্তিটির আদর্শ না হওয়ার কারণ কি? এটা একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর তাফসীরে দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা শাওকানী এ উক্তিটিকে لَاَسْتَغْفِرَنَّ-এর ضَمِيْر হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলে দাবি করেছেন, তখন আয়াতের অর্থ হবে– কিন্তু হযরত ইবরাহীমের এ উক্তিতে তোমাদের জন্য কোনো আদর্শ নেই যে উক্তিতে তিনি নিজের পিতাকে বলেছেন, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তবে আমার অবস্থা এই যে, তুমি শিরক করলে আল্লাহর আজাব হতে তোমাকে আমি বাঁচাতে পারবো না, অর্থাৎ তখন কেবল ক্ষমা প্রার্থনাটাই আদর্শ হতে ব্যতিক্রম হবে দ্বিতীয় উক্তিটি নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَنَا بُرَاٰؤُا : بُرَاٰؤُا শব্দটি بَرِيْءٌ-এর বহুবচন, সাধারণ কেরাত হলো بُرَاٰءُ - فُعَلَاءُ-এর মতো, ঈসা ইবনে ওমর এবং ইবনে ইসহাক একে بِرَاءٌ অর্থাৎ بَاء তে كَسْرَةٌ যুক্ত করে فِعَالٌ-এর মতো পড়েছেন। এটা بَرَاءٌ - بُرَاءٌ - بِرَاءٌ ও পঠিত হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ .... تَكْفُرُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থা এই যে, তারা পরাজিত অবস্থায়ও ঈমানদারগণকে অপ্রীতিকর আচরণ করতে থাকে। হে ঈমানদারগণ! যদি কখনো কোথাও তারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাদের হাতে শক্তি আসে, তবে তারা মুসলমানদেরকে কষ্ট প্রদান করতে কখনো কমতি করবে না। শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার লাঞ্ছনায় নিপতিত করবে। আর প্রথমে হত্যা ও মার-ধর করবে। অতঃপর মুসলমানদের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করবে। এরপর তাদেরকে কাফের ও মুরতাদ হওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

অর্থাৎ সুযোগ মিললে অশালীন কথা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় নিকৃষ্ট ব্যবহার তো করবেই এবং এহেন দুরবস্থা ব্যতীত তোমরা তাদের থেকে অন্যকোনো আশা পোষণ করতে পারবে না।

আর وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যখনই তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করবে, তবে তা একমাত্র ঈমানের মূল্যের উপরই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফরিকে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না। –[আশরাফী, মা'আরিফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ : "তারা চায় যে, তোমরাও কাফের হয়ে যাও।" এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরিতে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। –[মা'আরেফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ ..... يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ (الاية) : এ আয়াতে হযরত হাতিব যে ওজর করেছিলেন এটা বলে যে, মক্কাতে তাঁর যে আত্মীয়-স্বজন এবং সন্তানাদি রয়েছে তাদেরকে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার হতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তিনি কাফেরদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা অভিযানের গোপন সংবাদ পাঠিয়েছেন– তা খণ্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যকার এ সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা ছিন্ন করে দেবেন।

يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ বাক্যটির তিনটি অর্থ করা হয়েছে–

এক. তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহর অনুগতদেরকে জান্নাতে আর নাফরমানদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

দুই. প্রচণ্ড ভয়ের কারণে সেদিন একে অপর হতে পালিয়ে যাবে। যেমন, অপর আয়াতে বলা হয়েছে يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ "সেদিন লোক নিজের ভাই হতে পালিয়ে যাবে।" –[ফাতহুল কাদীর]

তিন. সে কঠিন দিবসে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন এবং কাফিরদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। অতঃপর মু'মিনদেরকে জান্নাতের নিয়ামতে আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের আজাবে প্রবেশ করানো হবে। –[ছাফওয়া]

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ الخ : পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে বলা হয়েছে। এ আয়াত কয়টিতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে কি করতে হবে, সে বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আদর্শ অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সাথীদের উদাহরণ পেশ করে মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, কেবল তোমাদেরকে কাফির আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং তোমাদের পূর্বের নবীগণ এবং তাঁদের সাহাবীগণও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। এটা আল্লাহর বিধান, ঈমানের প্রমাণের জন্য এটা অপরিহার্য।

قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ الخ : মহান আল্লাহ বলেন, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথা স্মরণ করো। তোমাদের জন্য তাঁর ও তাঁর সাথীদের জীবনটি এক উত্তম আদর্শ স্বরূপ। যখন তাঁরা নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের আত্মীয়তার সকল বন্ধনের কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য করে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন যে, আমরা তোমাদের বন্ধুত্ব হতে দূরে সরে গেলাম। তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তোমাদের সকল তাগুত হতেও বিমুখ হয়ে গেলাম, তোমাদের নাফরমানি ও কুফরির কারণে এবং আমাদের ঈমানের কারণে তোমরা আমাদের জন্য চিরতরে শত্রু সেজে গেলে। তবে যখন তোমরা মহান আল্লাহর একত্ববাদের উপর বিশ্বাসী হবে তখন পুনরায় তোমরা আমাদের জন্য পূর্ণ আত্মীয়তার বন্ধনে আসবে।

উক্ত আয়াতে হযরত হাতিব (রা.)-কে তাওবীখ (تَوْبِيْخ) করা হয়েছে যে, মুসলমান হয়ে অমুসলমানদের জন্য কিভাবে আত্মীয়তা বহাল রাখার আশা পোষণ করতে পারে।

আয়াতে اُسْوَةٌ অর্থ কি? : اُسْوَةٌ অর্থ- خَصْلَةٌ আদত, অভ্যাস আল্লামা রাগেব বলেন- اُسْوَةٌ ও اِسْوَةٌ শব্দদ্বয় قُدْوَةٌ فِى قُدْوَةٍ -এর ন্যায়, অর্থাৎ তা এমন এক গুণাবলি বা অবস্থার নাম, যা অন্যের চরিত্রে ফুটে উঠে এবং যাতে মানুষ অন্যের অনুসরণ করতে আকৃষ্ট হয়। চাই তা উত্তম হোক অথবা অধম হোক, সৎপথের পক্ষে হোক বা অসৎ পথের পক্ষে হোক। যদি উক্ত গুণাবলি উত্তম পথের সন্ধান দেয়, তাকে اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ বা উত্তম আদর্শ বলা হয়। كَمَا قَالَ تَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ আর যদি তা নিকৃষ্ট পথের সন্ধান দেয়, তাহলে তাকে اُسْوَةٌ سَيِّئَةٌ নিকৃষ্ট আদর্শ বলা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ : আল্লামা জালালুদ্দিনের মতে- وَالَّذِيْنَ مَعَهُ দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপর ঈমান আনয়নকারী মুসলমানগণকে লক্ষ্য করা হয়েছে। আর ইবনে যায়েদের মতে وَالَّذِيْنَ مَعَهُ দ্বারা পূর্বেকার নবীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ شَرَائِعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا فِيْهِمَا اَخْبَرَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ : এ আয়াতটি পূর্বের শরিয়তের যেসব সংবাদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল দিয়েছেন তা আমাদের জন্য শরিয়ত হওয়ার দলিল : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত বা আদর্শ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পূর্বের শরিয়তগুলোর যেসব সংবাদাদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছেন, তা আমাদের জন্যও শরিয়ত তথা পালনীয়। -[কুরতুবী]

لِقَوْمِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : তাফসীরে সাবীতে বর্ণনা করা হয়েছে- اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ দ্বারা তদানীন্তন বাদশাহ নমরূদকে এবং তার দলকেই আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ وَحْدَهٗ শব্দ কেন বললেন? : তার উত্তরে বলা হবে যে, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ এই নয় যে, তাঁর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ মানা যাবে; বরং তার অর্থ এই যে, আল্লাহকে একক বলে মানতে হবে, তার কোন শরিক নেই। আর সে যুগের কিছু ঈমানদার এমন ছিল যে, আল্লাহকে স্বীকার করত কিন্তু তার সমকক্ষতাকেও সাথে সাথে স্বীকার করত। আবার নবীগণকে অবমাননা করত। ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, বেহেশত ও দোজখ ইত্যাদিকে বিশ্বাস করত না। অথচ ঈমান বিল্লাহ বলতে আল্লাহর একত্ববাদের সাথে, ফেরেশতা, আসমানি সকল কিতাব ও সকল রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস, তাকদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস, অর্থাৎ এক কথায় আল্লাহ ও আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সকল বিষয়ের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান। যা তাদের মধ্যে ছিল না, তাই وَحْدَهٗ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ঈমানে মুফাসসাল ও কুরআনের আয়াতের অনুসরণ একমাত্র ঈমান بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ -এর পরিচায়ক হতে পারে। যেমন প্রকৃত ঈমানদারগণের উক্তি আল্লাহ নকল করে বলেন- كَمَا قَالَ تَعَالَى وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে আগত সকল কিছুর উপর আমরা ঈমান এনেছি।

قَوْلُهُ كَفَرْنَا بِكُمْ : كَفَرْنَا بِكُمْ তথা আমরা তোমাদের সাথে কুফরি করেছি। অর্থাৎ তোমাদের কর্মকাণ্ডের কারণে আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি এবং তোমরা হক পথে আছ এ দাবি আমরা অস্বীকার করি। কোনো কোনো তাফসসির এর অর্থ করেছেন, তোমরা যেসব মূর্তির প্রতি ঈমান এনেছ আমরা তার সাথে কুফরি করেছি। -[কুরতুবী]

আল্লামা শওকানী (র.)-এর আরো একটা তাফসীর করে বলেছেন, আমরা তোমাদের দীন অস্বীকারকারী। -[ফাতহুল কাদীর]

وَحْدَهُ বলার ফায়দা : ঈমান কেবল এক আল্লাহর উপর আনলে চলে না, আরো অনেক কিছুর উপর আনতে হয়, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ "সকলেই আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন। তাহলে এখানে কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলার ফায়দা কি? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবীগণ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অপরিহার্য অংশ। অর্থাৎ এ সবের প্রতি ঈমান আনলেই কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান পূর্ণ হয়। এ সব অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বলা মিথ্যা দাবি। সুতরাং এখানে "যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে", এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে কেবল আল্লাহকেই যতক্ষণ পর্যন্ত ইলাহ এবং মাবুদ স্বীকার না করবে, কারণ আল্লাহর সাথে আরো কিছুকে ইলাহ মানা হলে আল্লাহর প্রতি ঈমান শুদ্ধ হয় না। কেননা এটাই তো আসল শিরক। মুশরিক কি কখনো মু'মিন হতে পারে? -[কাবীর]

قَوْلُهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ .... مِنْ شَيْءٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিন্তু হযরত ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে "আমি অবশ্যই তোমার জন্য [আল্লাহর কাছে] ক্ষমা প্রার্থনা করবো" এ আদর্শের ব্যতিক্রম।

এখানে একটি সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ এবং সুন্নত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে। সূরা তাওবায় তার উল্লেখ আছে। অতএব সন্দেহ হতে পারে যে, মুশরিক পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করা মিল্লাতে ইবরাহীমী বা ইবরাহীমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং তা জায়েজ হওয়া উচিত। তাই একে ইবরাহীমী আদর্শের ব্যতিক্রম ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহীমী আদর্শের অনুসরণ জরুরি; কিন্তু তাঁর এ কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্য নয়। এটাই হলো اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ আয়াতের মর্ম। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ওজর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন অথবা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন এ বিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন। فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। -[মা'আরেফুল কোরআন, কাবীর, সাফওয়া]

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতার জন্য দোয়া করার কারণ : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতা যখন তাঁকে ঘর হতে বহিষ্কার করেন তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করার জন্য আল্লাহর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। যথা আল্লাহ বলেন- مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ সূরায়ে মারইয়ামে আল্লাহ সে ভাষা উল্লেখ করে বলেন- سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا আপনার উপর সালাম বর্ষিত হোক। আমি আল্লাহর নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। -[সূরা মারইয়াম : ৪৭]

وَفِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى : رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

অন্য আয়াতে রয়েছে- হে প্রভু, আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল ঈমানদারকে কিয়ামতের দিবসের জন্য ক্ষমা করে দাও। -[সূরা ইবরাহীম : ৪১]

وَفِيْ اٰيَةٍ اَيْضًا : وَاغْفِرْ لِاَبِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ - وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ.

অন্য আয়াতে আরো বলেন- হে প্রভু, আমার পিতাকে ক্ষমা করে দিন, তিনি অবশ্যই পথভ্রষ্ট ছিলেন, আমাকে কিয়ামতের দিন লজ্জিত করবেন না। [সূরা শু'আরা : ৮৬, ৮৭] এ দোয়া করা হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পূর্ব সময়ে। কিন্তু যখন তিনি স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার পিতা একজন নির্ঘাত মুশরিক লোক, তখন তিনি ক্ষমার দোয়া হতে বিমুখ হয়ে গেলেন এবং অনুতপ্ত হলেন। যেমন, আল্লাহ বলেন- فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ

قَوْلُهُ رَبَّنَا عَلَيْكَ .... وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হযরত ইবরাহীম এবং তার সঙ্গী সাথীদের প্রার্থনা ছিল "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমার উপর নির্ভর করেছি ও তোমার মুখাপেক্ষী হয়েছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।"

এ উক্তিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের উক্তি বলে-তাফসীরবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন। আবার কোনো কোনো তাফসীরবিদগণ বলেছেন, মু'মিনদেরকে এ রকম বলতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাফেরদের হতে বিমুখ হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো, বল رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার উপরই নির্ভর করেছি।" -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَىْ لَا تُظْهِرْهُمْ عَلَيْنَا فَيَظُنُّوْٓا اَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ فَيُفْتَنُوْا اَىْ تَذْهَبُ عُقُوْلُهُمْ بِنَا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ مُلْكِكَ وَصُنْعِكَ

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য বিভ্রান্তির কারণ বানিয়ো না অর্থাৎ তাদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করো না। ফলে তারা নিজেদেরকেই হকপন্থিরূপে কল্পনা করবে ও বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। অর্থাৎ আমাদের কারণে তারা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ও বিবেকশূন্য হয়ে পড়বে। আর আমাদেরকে ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় তোমার রাজত্ব ও ক্রিয়াকলাপে।

٦. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ جَوَابُ قَسَمٍ مُقَدَّرٍ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ كُمْ بِاِعَادَةِ الْجَارِ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ط اَىْ يَخَافُهُمَا اَوْ يَظُنُّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ وَمَنْ يَتَوَلَّ بِاَنْ يُوَالِىَ الْكُفَّارَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ عَنْ خَلْقِهِ الْحَمِيْدُ لِاَهْلِ طَاعَتِهِ.

৬. তোমাদের জন্য রয়েছে হে উম্মতে মুহাম্মদী! এটা উহ্য শপথের জবাব। তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ অর্থাৎ তোমরা যারা এটা كُمْ সর্বনাম হতে جَارْ -কে পুনরুল্লেখের প্রেক্ষিতে بَدَلُ اشْتِمَالٌ আল্লাহ ও আখেরাতের প্রত্যাশা করো। অর্থাৎ এতদুভয়কে ভয় করো অথবা ছওয়াব ও শাস্তির প্রতি আস্থা রাখো। আর যে ব্যক্তি বিমুখ হবে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা জেনে রাখুক যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী স্বীয় সৃষ্টি হতে এবং প্রশংসিত তার আনুগত্যকারীদের নিকট।

٧. عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ طَاعَةً لِلّٰهِ تَعَالٰى مَوَدَّةً ط بِاَنْ يَّهْدِيَهُمْ لِلْاِيْمَانِ فَيَصِيْرُوْا لَكُمْ اَوْلِيَآءَ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ط عَلٰى ذٰلِكَ وَقَدْ فَعَلَهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ لَهُمْ مَا سَلَفَ رَحِيْمٌ بِهِمْ.

৭. সম্ভবত আল্লাহ অচিরেই সৃষ্টি করবেন তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ বন্ধুত্ব তাদেরকে ঈমানের প্রতি হেদায়েত করার মাধ্যমে। তখন তারা তোমাদের বন্ধু হবে আল্লাহ শক্তিমান তার উপর। আর মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাই করেছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল তাদের অতীত কার্যকলাপের জন্য ও দয়াময় তাদের প্রতি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨. لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ
مِنَ الْكُفَّارِ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنَ
الَّذِيْنَ وَتُقْسِطُوْا تَقْضُوْا اِلَيْهِمْ ط
بِالْقِسْطِ اَىْ اَلْعَدْلِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ
بِالْجِهَادِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
الْعَادِلِيْنَ.

৮. আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না, তাদের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি কাফেরদের মধ্য হতে দীনের ব্যাপারে, আর তোমাদেরকে তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করতে এটা اَلَّذِيْنَ হতে بَدَلُ اشْتِمَالٍ এবং ন্যায়বিচার করবে সুবিচার করবে তাদের প্রতি ন্যায়দণ্ড তথা ন্যায় বিচার দ্বারা। আর এ আদেশ জিহাদ সংক্রান্ত আদেশের পূর্বেকার আদেশ নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন ন্যায় বিচারকারীগণ।

٩. اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى
الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا
عَاوَنُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ج بَدَلُ
اشْتِمَالٍ مِنَ الَّذِيْنَ اَىْ تَتَّخِذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

৯. আল্লাহ তো নিষেধ করেন তাদের প্রসঙ্গে যারা তোমাদের সাথে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, আর তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে, আর প্রকাশ করেছে সহযোগিতা করেছে তোমাদের বহিষ্করণে যে, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে। এটা اَلَّذِيْنَ হতে بَدَلُ اشْتِمَالٍ অর্থাৎ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হতে বাধা দান করে। আর যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই অত্যাচারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাথীদেরকে উত্তম আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার দরবারে তারা যে দোয়া করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে।

আর অত্র আয়াতেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আরো কিছু দোয়া স্থান পেয়েছে, যাতে করে সকল যুগের মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে এভাবে এ ভাষায় দোয়া করতে পারে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাথীগণ প্রার্থনা করে বলেছিলেন- ওগো প্রভু! কাফেরদের মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা করো না। যাতে তারা আমাদেরকে অত্যাচার উৎপীড়ন এবং আমাদের সঙ্গে যথেচ্ছা আচরণ করে বেড়াতে সুযোগ পাবে, এমন অবস্থায় আমাদেরকে ফেলো না। অর্থাৎ আমাদেরকে নিয়ে তাদেরকে ছিনিমিনি খেলতে সুযোগ দিও না। তোমার এ ভক্ত অনুরক্ত বান্দাদেরকে তুমি তাদের অত্যাচারের কবল হতে রক্ষা করো। এটাই তোমার নিকটে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তুমি অশেষ জ্ঞান-বিবেচনা ও ক্ষমতার অধিকারী। -[তাফসীরে তাহির]

মু'মিনগণ কাফেরদের জন্য কিভাবে ফেতনার কারণ হবে? : আল্লাহ তা'আলা বলেন, [হযরত ইবরাহীম (আ.) আরো বলেছেন] "হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফেরদের জন্য ফেতনা বানিয়ে দিও না। হে আমাদের রব! আমাদের অপরাধগুলোকে মাফ করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমি মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ।"

ঈমানদার লোকেরা কাফেরদের জন্য ফেতনার কারণ বিভিন্নভাবে হতে পারে :

১. কাফেররা মু'মিনদের উপর বিজয়ী হলে, তখন তারা একে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলবে, আমরাই সত্যপথগামী তা না হলে আমরা কি মু'মিনদের উপর বিজয়ী হতে পারতাম। অতএব, আমরাই হকপন্থি। এটা ইমাম জুবায়ের (র.)-এর অভিমত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. মুসলমানরা তাদের ইসলামি চরিত্র আদব-আখলাক এবং নৈতিকতা হারিয়ে ফেললে তখন দুনিয়ার লোকেরা মুসলমানদের মধ্যেও ঠিক সে চরিত্রই দেখতে পাবে যা ইসলাম বিরোধী সমাজে লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে দেখা যায়। এর ফলে কাফেররা বলার সুযোগ পাবে যে, দীন ইসলামে এমন কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে আমাদের কুফরির উপর তারা অধিক মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী বিবেচিত হতে পারে।

৩. কাফেরদের দ্বারা মু'মিনগণ লাঞ্ছিত হলে বা মু'মিনদের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো আজাব আসলে, তখন কাফেররা বলতে পারে, মুসলমানরা যদি সত্যপথগামী হতো তাহলে তারা লাঞ্ছিত হতো না বা তাদের উপর আল্লাহর আজাব আসত না। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

৪. কাফেররা মুসলমানদের তুলনায় অধিক ধন-সম্পদের অধিকারী হলে তখন তারা বলতে পারে, তোমরা আল্লাহর কাছে প্রিয় হলে তোমাদের এ দুরবস্থা কেন? এভাবে মুসলমানদের দুরবস্থা কাফেরদের ফেতনার কারণ হতে পারে। –[কাবীর]

৫. এটাও হতে পারে যে, হে আমাদের রব, কাফিরদের আজাব দেওয়ার কারণ আমাদেরকে বানিও না। তখন এ আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তির অংশ হবে না। উম্মতে মুহাম্মদীকে এ দোয়া করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বুঝতে হবে। এ অভিমত মুজাহিদের। –[কাবীর]

৬. আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, কখনো কখনো বাতিলপন্থিদের পক্ষ থেকে সত্য অনুসারীদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা হয়, আর তা হয় মু'মিনদের দ্বারা সংঘটিত পাপাচারের কারণে তাদের জানা-অজানা গুনাহসমূহের কারণে, এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং বিপদমুক্ত হওয়াই হলো একমাত্র পথ। যেমন, হাদীসে এসেছে–

اِذَا عَصَانِیْ مَنْ یَعْرِفُنِیْ سَلَّطْتُ عَلَیْهِمْ مَنْ لَا یَعْرِفُنِیْ .

قَوْلُهُ تَعَالٰی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْهِمْ اُسْوَةٌ .... الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ الخ : উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তার আদর্শ ও তার অনুসারীদের আদর্শ অনুসরণের জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং আখেরাতের আশা রাখে, আর কিয়ামতের দিবসে মুক্তির আশা করে, আল্লাহর প্রসন্নতা এবং আখেরাতের সফলতা যাদের কাম্য, তাদের পক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাদের সঙ্গীদের মধ্যে অনুকরণীয় উন্নত আদর্শ রয়েছে। তারা যেন তা অবলম্বন করে চলে। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি বিমুখ হয় তাতে, তবে সে নিজেরই সর্বনাশ করে আনবে। আল্লাহর বিন্দুমাত্রও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। তিনি যেমন চির বেনিয়াজ ও চির প্রশংসিত তেমনি চির বেপরোয়া ও চির প্রশংসিতই থাকবেন সন্দেহ নেই। –[তাহের]

আর আল্লাহর শত্রুদের সাথে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

قَوْلُهُ رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا الخ -এর মধ্যে رَبَّنَا -কে বারবার উল্লেখ করার কারণ : উক্ত আয়াতে رَبَّنَا الخ দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়েছে। আর দোয়ার মহলে সাধারণত কাকুতি-মিনতিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং যত কাকুতি-মিনতি দ্বারা আল্লাহকে আহ্বান করা হয়, আল্লাহ ততই তাড়াতাড়ি ডাকে সাড়া দেন। তাই আয়াতে رَبَّنَا -কে বারবার উল্লেখ করত নম্রতা দেখানো হয়েছে।

আর আল্লাহ ওয়ালাগণ যতই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে থাকে তাদের নিকট ততই মধুর লাগে ও আত্মার তৃপ্তি গ্রহণ করে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তার সহচরগণও আল্লাহর প্রেমের সাগরে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই ঈমানের প্রেম ও ভালোবাসার টানে আল্লাহকে বারংবার স্মরণ করে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَمَنْ یَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیْدُ : এ বাক্যটির দু'টি অর্থ করা হয়েছে।

১. "আর যে লোক মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জানা উচিত যে, আল্লাহ পরমুখাপেক্ষীহীন এবং স্বতঃই প্রশংসিত।"–[কুরতুবী, কাবীর]

২. তাফসীরে জালালাইনে এর অর্থ করা হয়েছে, "আর যে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, [এই নিষেধাজ্ঞার পরও] তার জানা উচিত যে, আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন [তার এ বন্ধুত্বের দ্বারা আল্লাহর কিছু যায় আসে না] তিনি স্বপ্রশংসিত।

عَسَی اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَكُمْ الخ আয়াতটির শানে নুযূল : পূর্বের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রকৃত নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকেরা যদিও অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে আমল করতেছিলেন; কিন্তু তথাপি নিজেদের বাপ-মা, ভাই-বোন ও নিকটতম আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যে কত বড় কঠিন ও দুঃসহ কাজ এবং তার ফলে ঈমানদার লোকদের মনের উপর দিয়ে কি প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানতেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, সেদিন দূরে নয় যখন তোমাদের এসব আত্মীয়-স্বজন মুসলমান হয়ে যাবে এবং আজকের শত্রুতা আগামীকাল ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। –[কুরতুবী, কাবীর, আসবাব]

Free © www.e-ilm.weebly.com

এ কথাগুলো যখন বলা হয়েছিল তখন কারো বোধগম্য হচ্ছিল না যে, কিভাবে তা সম্ভব; কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই যখন মক্কা বিজিত হয়ে মুসলমানদের হাতে চলে আসল তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, কুরাইশের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। যার ফলে মুসলমানরা স্বচক্ষেই দেখতে পেলেন কিভাবে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের বন্ধুত্বে পরিণত হচ্ছে।

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : বুখারী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রা.)-এর জননী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী কাবীলা হোদাইবিয়ার সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা হতে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্য কিছু হাদিয়াও সাথে নিয়ে যান; কিন্তু হযরত আসমা (রা.) সে হাদিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূল ﷺ -এর কাছে জিজ্ঞেস করেন– আমার জননী আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের, আমি তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করব? রাসূল ﷺ বললেন, জননীর সাথে সদ্ব্যবহার কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[আসবাব, মা'আরিফ, কাবীর]

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, হযরত আসমার জননী কাবীলাকে হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম পূর্বকালেই তালাক দিয়েছিলেন। –[ইবনে কাছীর, মা'আরিফ]

যেসব কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং মুসলমানদেরকে দেশ হতে বহিষ্কারেও অংশগ্রহণ করেনি; আলোচ্য আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় ও সুবিচার তো প্রত্যেক কাফেরের সাথেও জরুরি। এতে জিম্মি কাফের, চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের এবং শত্রু কাফের সবই সমান, বরং ইসলামে জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করা ওয়াজিব, অর্থাৎ তাদের পৃষ্ঠে সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপানো যাবে না এবং ঘাস পানি ও বিশ্রামের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। –[মা'আরেফুল কোরআন, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَسَى اللّٰهُ الخ : মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা ভীত হয়ো না। অচিরেই তোমাদের শত্রু কাফেরগণ ঈমান গ্রহণ করার পূর্ণ ধারণা অর্জন করতে পারে। তোমাদের জন্য তখন তারা বন্ধু হয়ে যাবে। তাদেরকে আজ যদিও শত্রু ভাবছ, তাদেরকে ঈমানদার বানানো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। তাঁর দয়ার সাগর সকল ব্যক্তি ও বস্তুকেই পরিবর্তন করতে সমস্যা হয় না। সুতরাং মক্কা বিজয় করে তিনি বহুসংখ্যক কাফেরদেরকে মুসলমান বানিয়ে মুসলমানদের সাথী করে দিয়েছেন। ফলে কাফেরদের কুফরির শক্তি মুসলমানদের শক্তিতে পরিবর্তন হয়ে গেল। আর তারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের জন্য জান-প্রাণ হয়ে গেল। এসবগুলোই আল্লাহর কুদরতের ফয়সালা মাত্র।

উক্ত আয়াতটি ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানগণকে তাদের কাফের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তদনুসারে প্রকৃত নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকেরা অত্যন্ত সহনশীলতার সাথে আমল করছিলেন। অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হওয়া এবং ইহকাল ও পরকালের শান্তি অর্জন করার লক্ষ্যে যখন ঈামন আনয়ন করেছিল। তখন তাদের সকল আত্মীয় স্বজন ও ভাই বন্ধুগণ তাদের প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এমতাবস্থায় ধর্ম রক্ষার্থে সকল আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন। আপনজনের বিয়োগ ব্যথা যে কত বড় আঘাত হানে তা অবর্ণনীয়। ঈমানদারদের অন্তরে তখন কেমন আর্তনাদ বয়ে গিয়েছিল তা আল্লাহই ভালো জানতেন।

সুতরাং তাদের অন্তরে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলা عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ আয়াত নাজিল করলেন। আর এ আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর সকলেই ভাবনা করছিল যে, কিভাবে শত্রুগণ মিত্র হবে, কিভাবে কাফিরদের শত্রুতা বিদূরিত হয়ে মিত্রতা প্রকাশ পাবে এবং কিভাবে তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু স্বল্পকাল পরই যখন মক্কাভূমি মুসলমানদের মাধ্যমে বিজয় হলো এবং দলে দলে লোক মুসলমান হতে লাগল তখনই তারা অনুভব করতে পারল যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ এখন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং শত্রুমিত্র হয়ে গেল, কাফেরগণ মুসলমানদের বন্ধু হয়ে গেল, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের বিয়োগ ব্যথা দূরীভূত হলো। –[কাবীর, আসবাব, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ ..... الْمُقْسِطِيْنَ : আল্লাহ উক্ত আয়াতে বলেন– যারা তোমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিতে শত্রু সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে যেসব লোক তোমাদেরকে হত্যাকার্যে লিপ্ত হয়নি, তোমাদেরকে দেশান্তরেও বাধ্য করেনি, তোমাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নও করেনি, তোমরা তাদের সাথে আত্মীয়তার কারণে সদ্ব্যবহার করা তোমাদের জন্য দূষণীয় কাজ নয়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ এমন লোকদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে কোনো বাধা নেই। সততা ও ন্যায়পরায়ণতাতো সকল কাফেরদের সাথে মানবিক কারণে করার নির্দেশ ইসলাম প্রদান করেছে, শত্রু, জিম্মি ও হরবী সকলই এ ক্ষেত্রে সমান; বরং ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক চতুষ্পদ জন্তুদের সাথেও ইনসাফ করা আবশ্যক। কারণ আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا -এর অনুপাতে শক্তি ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাউকে চাপ সৃষ্টি করা জায়েজ হবে না। উক্ত আয়াতে আল্লাহ ইহসান ও সদাচার বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন। -[মা'আরিফ]

মুশরিক ও কাফিরদের হাদিয়া গ্রহণের হুকুম : উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রমাণিত হয় যে, হযরত আসমা বিনতে আবী বকর (রা.)-এর মাতা তার জন্য যে হাদিয়া নিয়ে সাক্ষাতে আসলেন হুযূর ﷺ তা ফিরিয়ে দিতে বলেননি। সুতরাং কাফেরদের হাদিয়া গ্রহণ করাও জায়েজ। আর হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও হাদিয়া গ্রহণ করতেন। যেমন হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَةَ وَلَوْ جُرْعَةَ لَبَنٍ . (اَلْحَدِيْثُ) উক্ত হাদীসে কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে প্রভেদ বর্ণনা করা হয়নি।

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের হুকুম : উক্ত আয়াতের দ্বারা এটা স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসলমানের পক্ষে তার কাফের মাতা-পিতা ও ভাই-বোন ইত্যাদির সেবা সহায়তা করা জায়েজ হবে। আর যদি তারা শত্রুতা পোষণ করে তবে তা জায়েজ হবে না। অনুরূপভাবে ফকির মিসকিনদেরকেও সদকা খয়রাত করা যেতে পারে। যদি কাফেরগণ মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে ও নির্দেশ পালন করে ইসলামিক রাষ্ট্রে বসবাস করে তবে তাদের ক্ষেত্রে সদাচার করা আবশ্যক। ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য দুনিয়াবী কাজকর্ম ইত্যাদিও নিষিদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিম্মিদের ক্ষেত্রে বলেছেন- دِمَائُهُمْ كَدِمَائِكُمْ وَاَمْوَالُهُمْ كَاَمْوَالِكُمْ আর হুযূর ﷺ হোদাবিয়ার সন্ধি মুশরিকদের সাথে করেছেন। এটাও مُوَالَاةٌ জায়েজ হওয়ার একটি বিশেষ প্রমাণ। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের অগ্রাধিকার থাকবে, যেমন সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে বলবে- اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى . (اَلْحَدِيْثُ)

قَوْلُهُ اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ .... فِى الدِّيْنِ (الْاٰيَةَ) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং বহিষ্কার কার্যে সাহায্য করেছে। যারা এ জাতীয় লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা জালিম।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে লোকদের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল। সে ভুল ধারণাটি হলো, তাদের কাফের হওয়ার দরুনই বুঝি এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে আলোচ্য আয়াত কয়টিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের কাফের হওয়াই আসল কারণ নয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতা ও অত্যাচারমূলক আচরণে কারণেই সে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই শত্রু কাফের ও অশত্রু কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য করা মুসলমানদের কর্তব্য। যেসব কাফের তাদের সাথে কোনোদিন খারাপ আচরণ করেনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা কর্তব্য। হযরত আবূ বকরের কন্যা হযরত আসমা (রা.) এবং তাঁর কাফের মাতার মধ্যে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তাই এ কথাটির সর্বোত্তম বাস্তব ব্যাখ্যা [পূর্বে তার উল্লেখ হয়েছে]।

এ ঘটনা হতে জানা যায় যে, একজন মুসলমানের পক্ষে তার কাফের পিতা-মাতার খেদমত করা ও নিজের কাফের ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা সম্পূর্ণ জায়েজ। যদি তারা ইসলামের শত্রু না হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে জিম্মি মিসকিন লোকদের প্রতিও দান-সদকা করা যেতে পারে। -[আহকামুল কুরআন, জাচ্ছাছ, রুহুল মা'আনী]

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ আয়াতগুলোতে মুসলমানদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক কি রকম হবে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার একটা মূল্যবান বিধান বিবৃত হয়েছে। সে বিধান হলো- সম্পর্কচ্ছেদ ও হানাহানি হবে বিশেষিত শত্রুতা এবং সীমালঙ্ঘনের অবস্থায়। আর যখন শত্রুতা থাকবে না, কোনো সীমালঙ্ঘিত হবে না, তখন যারা সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। মুয়ামালার ক্ষেত্রে এটাই হলো ইনসাফ। এ বিধানই হলো ইসলামের আন্তর্জাতিক শরয়ী বিধানের মূলভিত্তি। যে বিধানে মুসলমানদের সাথে অন্যসব মানুষের শান্তিময় অবস্থাকে আসল অবস্থা মনে করা হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন যুদ্ধ জাতীয় সীমালঙ্ঘন এবং তার প্রতিরোধের প্রয়োজন ছাড়া হয় না। অথবা, চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পর তা লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই হতে পারে। অথবা, দাওয়াতের স্বাধীনতা এবং আকীদার স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিসহ অবস্থানের জন্য হতে পারে। এ ছাড়া অন্যাবস্থায় এ বিধানের তাৎপর্য হলো শান্তি, ভালোবাসা, সদাচার এবং সমস্ত মানুষের সাথে ইনসাফ। -[যিলাল]

Free @ www.eilm.weebly.com

١٠. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ
بِاَلْسِنَتِهِنَّ مُهٰجِرٰتٍ مِنَ الْكُفَّارِ بَعْدَ
الصُّلْحِ مَعَهُمْ فِى الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَنَّ مَنْ
جَاءَ مِنْهُمْ اِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ يُرَدُّ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط
بِالْحَلْفِ اَنَّهُنَّ مَا خَرَجْنَ اِلَّا رَغْبَةً فِى
الْاِسْلَامِ لَا بُغْضًا لِاَزْوَاجِهِنَّ الْكُفَّارِ وَلَا
عِشْقًا لِرِجَالٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَذَا كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ يُحَلِّفُهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج
فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ ظَنَنْتُمُوْهُنَّ بِالْحَلْفِ
مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ تَرُدُّوْهُنَّ اِلَى
الْكُفَّارِ ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ
لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ اَىْ اَعْطُوا الْكُفَّارَ اَزْوَاجَهُنَّ
مَا اَنْفَقُوْا ط عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمُهُوْرِ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ بِشَرْطِهِ اِذَا
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط مُهُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا
بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
زَوْجَاتِكُمْ لِقَطْعِ اِسْلَامِكُمْ لَهَا بِشَرْطِهِ اَوِ
اللَّاحِقَاتِ بِالْمُشْرِكِيْنَ مُرْتَدَّاتٍ لِقَطْعِ
وَاسْئَلُوْا ارْتِدَادِهِنَّ نِكَاحَكُمْ بِشَرْطِهِ .
اُطْلُبُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْمُهُوْرِ
فِىْ صُوْرَةِ الْاِرْتِدَادِ مِمَّنْ تَزَوَّجَهُنَّ مِنَ
الْكُفَّارِ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ط عَلٰى
الْمُهَاجِرَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ اَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَهُ ذٰلِكُمْ
حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط بِهِ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

অনুবাদ :

১০. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নিকট আগমন করে মু'মিনা স্ত্রীলোকগণ তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি মতো দেশত্যাগী হয়ে কাফিরগণ হতে, যখন তাদের সাথে এ মর্মে হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি হয়েছে যে, তাদের নিকট হতে যে ব্যক্তি মু'মিনদের নিকট আগমন করবে, তাকে ফেরত পাঠানো হবে, এটার পর। তবে তোমরা সেই স্ত্রীদেরকে পরীক্ষা করো এরূপ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যে তারা ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বহির্গত হয়েছে, তাদের কাফের স্বামীগণের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা কোনো মুসলিম পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্তির কারণে নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হতে এরূপ শপথই গ্রহণ করতেন। আল্লাহই তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। অনন্তর তোমরা যদি জানতে পার শপথের কারণে তোমাদের ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তারা মু'মিন, তবে তাদেরকে ফেরত পাঠিও না ফিরিয়ে দিও না কাফেরদের নিকট। মু'মিন নারীগণ তাদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেরগণ মু'মিন নারীদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা তাদেরকে প্রদান করো অর্থাৎ তাদের কাফের স্বামীগণকে দাও যা তারা ব্যয় করেছে। উক্ত মু'মিন নারীগণের প্রতি মোহর ইত্যাদি। আর তোমরা তাদেরকে বিবাহ করায় কোনো অপরাধ নেই উক্ত শর্ত সাপেক্ষে যখন তোমরা তাদের বিনিময় আদায় করেছ তাদের মোহর। আর তোমরা বজায় রেখো না تُمْسِكُوْا শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ সহকারে উভয় কেরাতেই পঠিত হয়েছে। কাফের নারীগণের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক কাফের স্ত্রীগণের সাথে। কারণ তোমাদের ইসলাম গ্রহণ উক্ত সম্পর্ককে তার শর্তসহ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অথবা সেই স্ত্রীগণ যারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছে। কারণ তাদের ধর্মত্যাগ তোমাদের সাথে বিবাহ বন্ধনকে তার শর্তসহ ছিন্ন করে দিয়েছে। আর তোমরা দাবি করো ফেরত চাও যা তোমরা ব্যয় করেছ তাদের উপর মোহর ইত্যাদি। তারা যে সকল কাফেরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছে তাদের নিকট হতে, স্ত্রী ধর্মত্যাগী হওয়ার ক্ষেত্রে। আর তারা দাবি করবে, যা তারা ব্যয় করেছে মুহাজির নারীগণের নিকট। যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, তাদেরকে তা ফেরত দান করা হবে। এটাই আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন এটার মাধ্যমে আল্লাহ সর্ববিষয়ে প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَا تُمْسِكُوْا : জমহুর এ শব্দটি اِمْسَاكٌ হতে উদ্ভূত হিসেবে تُمْسِكُوْا অর্থাৎ تَخْفِيْف করে পড়েছেন। আবূ ওবাইদও এ কেরাত পছন্দ করেছেন, অপর আয়াত فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ -এর উপর ভিত্তি করে। অপরদিকে হাসান, আবূ আলিয়া ও আবূ আমর تُمَسِّكُوْا অর্থাৎ تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন। অর্থাৎ তারা তাকে (تَمَسَّكُوْا) উদ্ভূত মনে করেছেন।

–[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ষষ্ঠ হিজরিতে মুসলমান এবং কুরাইশদের মধ্যে হোদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর প্রথম প্রথম মক্কা হতে পুরুষেরা ইসলাম গ্রহণ করে পালিয়ে আসছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সেসব মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আত্মীয়দের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন। পরে মুসলমান স্ত্রীলোকদের আগমন আরম্ভ হলে একটা নতুন সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যাটি হলো স্ত্রীলোকদেরকেও তাদের আত্মীয় কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; না অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

সর্বপ্রথম কোন্ মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিলেন সেই ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়।

১. এক রেওয়ায়াতে দেখা যায় যে, মুসলমান সাঈদা বিনতে হারিছ কাফের সায়ফী ইবনে আনসারীর পত্নী ছিলেন। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে সায়ফীর নাম মাখযূমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এ মুসলমান মহিলা মক্কা হতে পালিয়ে হোদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে তাঁর স্বামীও হাজির হলো। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দাবি জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা আপনি এ শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তির কালি এখনও শুকায়নি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী, মা'আরিফ]

২. আর কোনো কোনো রেওয়ায়াত মতে, সর্বপ্রথম যে মহিলা হিজরত করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিলেন তিনি হলেন উকবা ইবনে মুয়াইতের কন্যা উম্মে কুলছূম (রা.)। তাঁর দুই ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাঁকে ফেরত চাইলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

–[কুরতুবী, ইবনে কাছীর, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

এ দুই নারী ছাড়া আরো কয়েকজন নারী সে সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করে মুসলমানদের কাছে চলে এসেছিলেন বলে জানা যায়। হতে পারে এ সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যাই হোক এ আয়াতগুলো যে এ সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হোদায়বিয়ার ঘটনা : হোদায়বিয়া হেরেম শরীফের সীমানার একেবারে নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। বর্তমানে এটা শামসিয়া নামে পরিচিত। আবদ ইবনে হুমায়েদ, ইবনে জারীর, বায়হাকী প্রমুখের রেওয়ায়াতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মদীনায় অবস্থানকালে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে পবিত্র মক্কায় গমন করেছেন এবং ওমরা পালন করে মাথা মুড়িয়ে অথবা চুল ছোট করে নিয়েছেন। স্বপ্নের ঘটনাটি তিনি সাহাবায়ে কেরামের নিকট ব্যক্ত করলে সকলে কা'বা ঘর জেয়ারত এবং বহুদিনের বঞ্চিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে সাথে সাথেই প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

পবিত্র জিলকাদ মাসে প্রাচীন আরবি প্রথানুযায়ী যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ পুণ্যভূমি দর্শন এবং ওমরা হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে চৌদ্দশত সাহাবী সহকারে মদীনা হতে মক্কাভিমুখে যাত্রা করলেন।

মুসনাদে আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাত্রার প্রাক্কালে গোসল করলেন এবং নতুন পোশাক পরিধান করে নিজের কসওয়া নামীয় উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা এবং আনসার ও মদীনার পল্লী থেকে আগত বেদুইনের এক বিরাট দলও ছিল।

রাসূলে কারীম ﷺ যুলহুলাইফা নামক স্থান হতে ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হলে মক্কাবাসী জানতে পেরে মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। এদিকে রাসূলে কারীম ﷺ মক্কার সন্নিকটে খুযয়া গোত্রের বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার নিকট কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে অন্য পথ অনুসরণ করলেন এবং মক্কার তিন মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হুযূর ﷺ পূর্বেই বাশার ইবনে সুফিয়ানকে দূত হিসেবে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি অতি সংগোপনে মক্কাবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। তিনি মক্কা শরীফ হতে এসে কাফিরদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হবেন, না যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেবেন এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ নিলে সকলে এ উত্তর দিলেন যে, আমরা ওমরা করতে এসেছি যুদ্ধ করতে নয়। মক্কার কাফিরদের পক্ষ হতে উরওয়া ইবনে সাকাফী এসে হুযূর ﷺ-এর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে এসেছি। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে পুনরায় আবওয়া ইবনে মাসুদকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট পাঠাল। কিন্তু আবওয়ার দুর্ব্যবহারের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদের সন্ধি স্থাপনের জন্য প্রথমে খোবাস এবং পরে হযরত ওসমান (রা.)-কে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশ নেতাদের নিকট পাঠান। কিন্তু কাফেররা তাঁকে নজরবন্দি করে রাখলে জনরব উঠল যে, কুরাইশগণ হযরত ওসমান (রা.)-কে হত্যা করেছে।

এ সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের নিচে একত্রিত হয়ে জিহাদের জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে বাইআত গ্রহণ করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে 'বাইআতুর রিদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। ভয়ে কুরাইশগণ হযরত ওসমান (রা.)-কে মুক্তি দেয় এবং সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে সুহাইলকে পাঠায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সানন্দে এ শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

সন্ধির শর্তাবলি এরূপ ছিল যে, আগামী দশ বৎসরের জন্য মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে। তারা একে অপরের বিরোধিতায় লিপ্ত হবে না। এ বৎসর মুসলমারা ওমরা না করে চলে যাবে। আগামী বৎসর বিনা অস্ত্রে মক্কায় এসে ওমরা করে যেতে পারবে। মক্কার কোনো লোক মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে, পক্ষান্তরে মদীনার কোনো লোক মক্কায় আসলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। এভাবেই হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির ঘটনা সংঘটিত হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা, ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের নিকট আসবে তখন তাদের (ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটি) যাঁচাই-পরখ করে নাও, আর তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানতে পার যে, তারা মু'মিন তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিও না।"

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকগণ যদি মু'মিনা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের নিকট ফেরত দেওয়া যাবে না। এখানে কয়েকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়, প্রশ্নগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. আল্লাহ তা'আলা কি এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সন্ধির শর্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে অমান্য করার নির্দেশ দিলেন?

২. নাকি সন্ধির শর্তের মধ্যে মহিলারা পড়ে না? তাহলে সন্ধির শর্ত কি রকম ছিল? এ দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব জানা গেলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরও সহজেই পাওয়া যাবে।

মহিলারাও পুরুষদের সাথে সন্ধিচুক্তির শর্তের মধ্যে শামিল কিনা? : এ প্রশ্নের জবাবে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। এক. হ্যাঁ, মহিলারাও চুক্তির শর্তের অন্তর্ভুক্ত। দুই. না মহিলারা চুক্তির শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। দু' রকমের মতামত হওয়ার কারণ হলো, হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে যত বর্ণনা আমরা পাই তার অধিকাংশই ভাব বর্ণনা মাত্র। আলোচ্য শর্ত সম্পর্কে একটি বর্ণনার ভাষা এরূপ- مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوْهُ عَلَيْنَا

তোমাদের যে লোক আমাদের নিকট আসবে আমরা তাকে ফেরত পাঠাবো না, কিন্তু আমাদের যে লোক তোমাদের নিকট যাবে তোমরা তাকে ফেরত পাঠাবে।

কোনোটির ভাষা ছিল- وَمَنْ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَصْحَابِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহর নিকট তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যে লোক নিজের অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আসবে তাকে তিনি ফেরত দিবেন।

আবার কোনোটিতে রয়েছে- مَنْ اَتٰى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ

কুরাইশদের যে লোক মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট তাঁর অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই আসবে তাঁকে তিনি কুরাইশদের হাতে ফেরত দিবেন।

এ বর্ণনাসমূহের বাচনভঙ্গি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বর্ণনা সন্ধির মূলভাষা ও শব্দের অনুরূপ নয়। বর্ণনাকারী সন্ধির মূলকথা নিজ নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বিপুল সংখ্যক বর্ণনা এ ধরনের হওয়ার কারণে তাফসীরকার ও হাদীসবিদগণ সাধারণভাবেই মনে করে নিয়েছেন যে, সন্ধির শর্তসমূহে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ হিসেবে পুরুষদের ন্যায়

Free @ www.eelm.weebly.com

স্ত্রীলোকদেরও ফেরত দেওয়া উচিত। অতঃপর তাঁদের সম্মুখে আল্লাহর নির্দেশ আসল যে, মু'মিন স্ত্রীলোককে ফেরত দেওয়া যাবে না। তখন তাঁরা এটার ব্যাখ্যা করলেন– আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মু'মিন স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; কিন্তু এটা খুব সামান্য কথা নয়, এত সহজেই একথা মেনে নেওয়া যায় না। সন্ধি যদি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ছিল, তাহলে একপক্ষ হতে একতরফাভাবে সংশোধন করে নিবে কিংবা নিজস্বভাবে তার একটা অংশ বদলিয়ে দিবে এটা কিভাবে সঙ্গত মনে করা যেতে পারে? যদি ধরে নেওয়া যায় এটা করা হয়েছে তবুও কুরাইশের লোকেরা এতে কোনো আপত্তি করল না তাই বা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? কুরাইশরা তো রাসূলে কারীম ﷺ-এর ও মুসলমানদের এক একটি দোষ ধরার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে রয়েছিল। রাসূলে কারীম ﷺ সন্ধি শর্তের বিরুদ্ধাচরণ করে বসেছেন এ কথা তারা জানতে পারলে তো চিৎকার করে আরবের পথে-প্রান্তরে বলে বেড়াত; কিন্তু কুরআনের ফয়সালা সম্পর্কে প্রতিবাদ স্বরূপ টু শব্দটিও উচ্চারণ করেছে এমন কোনো বর্ণনাই কোথাও পাওয়া যায় না। এ প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা হলে সন্ধি-চুক্তির আসল শব্দ ও ভাষা সন্ধান করে এ জটিলতার রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হতো। কাজি আবূ বকর ইবনে আরাবী প্রমুখ এদিকে কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন; কিন্তু কুরাইশদের আপত্তি না জানানোর একটা যেনতেন ব্যাখ্যা দিয়েই তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি মু'জিযা হিসেবেই কুরাইশদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু এ ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁরা কিভাবে স্বস্তি পেলেন তাই আশ্চর্য।

আসল কথা হলো, সন্ধি-চুক্তির এ শর্তটি মুসলমানদের পক্ষ হতে নয়, কুরাইশ কাফেরদের পক্ষ হতে পেশ করা হয়েছিল। তাদের পক্ষ হতে তাদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর সন্ধি-চুক্তিতে এ শব্দগুলো লিখেছিল–

عَلٰى اَنْ لَّا يَاْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَّهٗ اِلَيْنَا

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আমাদের কোনো পুরুষ যদি আসে তোমাদের ধর্মমতের হলেও তোমরা তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাবে।

সন্ধির এ কথাগুলো বুখারী শরীফে كِتَابُ الشُّرُوْطِ بَابُ الشُّرُوْطِ فِى الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ সহীহ সনদ সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। সুহাইল হয়তো رَجُلٌ শব্দটি 'ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহার করেছিল; কিন্তু এটা ছিল তার নিজের চিন্তা। সন্ধিতে رَجُلٌ শব্দ লিখা হয়েছিল। আরবি ভাষায় এ শব্দটি পুরুষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই উম্মে কুলছূম (রা.)-কে ফেরত নেওয়ার দাবি নিয়ে তাঁর ভাই যখন রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো, (ইমাম যুহরীর বর্ণনা অনুযায়ী) তখন রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন كَانَ الشَّرْطُ فِى الرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ "শর্ত ছিল পুরুষদের সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে নয়।" –(কাবীর, আহকামুল কুরআন)

ইমাম রাযী (র.) 'যাহ্হাক' -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সন্ধিচুক্তিতে মহিলাদের ব্যাপারে আলাদা একটা কথা ছিল, সে কথার শব্দাবলি এ রকম–

لَا تَاْتِيْكَ مِنَّا اِمْرَأَةٌ لَيْسَتْ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَّهَا اِلَيْنَا فَاِنْ دَخَلَتْ فِىْ دِيْنِكَ وَلَهَا زَوْجٌ رَدَدْتَّ عَلٰى زَوْجِهَا مَا اَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِلنَّبِىِّ ﷺ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ ذٰلِكَ –

অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমাদের কোনো মহিলা যদি আসে, যদি সে তোমাদের ধর্মমতের না হয় তাহলে সেই মহিলাকে আমাদের কাছে ফেরত দিবে। আর যদি সে তোমাদের দীন গ্রহণ করে থাকে এবং তার স্বামী [আমাদের কাছে] থাকে, তাহলে স্বামী যে দেন-মোহর দিয়েছিল তা ফেরত দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এরও এ রকম শর্ত ছিল।

এ মত অনুসারে আয়াতগুলো সন্ধিচুক্তির সমার্থবোধক এবং তার পুনরুল্লেখ মাত্র, এ মতই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। কারণ তা ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওয়াদা পালন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। এক পক্ষের এককভাবে সন্ধিচুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাফ করা বা কোনো শর্ত বাতিল করা সম্ভব নয়। তা ইসলামের মূল শিক্ষারও পরিপন্থি, সুতরাং এটাই প্রমাণিত হলো যে, এ আয়াতগুলো সন্ধিচুক্তির বিপরীত নয় বরং পরিপূরক। –[রাওয়ায়ে]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'মিন মুহাজির মহিলাদের কিভাবে পরীক্ষা করতেন? : যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসত তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, সে আল্লাহর তাওহীদ ও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালতের প্রতি ঈমানদার কিনা এবং কেবলমাত্র আল্লাহর এবং রাসূলের জন্যই দেশত্যাগ করেছেন কিনা? এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো। স্বামী বিরাগী হয়ে ঘর হতে পালিয়ে এসেছে, নাকি এখানকার কোনো মুসলমানের প্রেমে পড়ে এসেছে অথবা অন্য কোনো বৈষয়িক স্বার্থ বা উদ্দেশ্য তাকে এখানে নিয়ে এসেছে– যেসব মহিলা এসব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দিতে পারত কেবলমাত্র তাদেরকেই মদীনায় অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া হতো, এতদ্ব্যতীত অন্য সকলকেই মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হতো। –[তাবারী]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেছেন, রাসূলে কারীম ﷺ তাদের সামনে এ আয়াতগুলো পড়ে শুনাতেন। এটাই ছিল পরীক্ষা। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাদের ঈমানের পরীক্ষা হলো কালিমায়ে তাওহীদের স্বীকৃতি মাত্র। -[ফাতহুল কাদীর]

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ -এর অর্থ : পূর্বে বলা হয়েছে- যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে মুসলমানদের কাছে চলে আসবে, পরীক্ষা নেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, তারা মু'মিন তাহলে তাদেরকে আর তাদের কাফের আত্মীয়-স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। এখানে কেন ফেরত দেওয়া যাবে না তার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে, বলা হয়েছে, "না, তারা কাফেরদের জন্য হলাল, আর না কাফের পুরুষেরা তাদের জন্য হালাল।"

ইতঃপূর্বে মুসলমান কাফের-এর মধ্যে বিবাহ হতে পারত। এ আয়াতের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মুসলমান এবং কাফেরদের মধ্যে বিয়ে-শাদিকে হারাম ঘোষণা করা হলো।

এটা হতে এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, কোনো স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে তার কাফের স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন এবং পৃথক করে রাখতে হবে। ইসলামই হলো এটার কারণ। কোনো মুসলিম মহিলা কোনো কাফের স্বামীর জন্য হালাল নয়। -[ফাতহুল কাদীর]

মাসআলা : সুতরাং ধর্মত্যাগের সাথে সাথে বিবাহ সম্পর্কও ছেদন হয়ে যায়।

১. ইচ্ছাকৃত তার স্বামী তাকে তালাক প্রদান করতে হয় না। কাজির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন নষ্ট করারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। এ কারণেই নারীদেরকে সন্ধিচুক্তি হতে পৃথক রাখা হয়েছে। তাই বলা হয়- فِعْلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخْلُوْ عَنِ الْحِكْمَةِ আল্লাহর কোনো কার্যই হিকমত হতে খালি নয়।

২. বিবাহিতা স্ত্রীলোক হিজরত করে দারুল হরব হতে দারুল ইসলামে আসলে তার বিবাহ স্বতই ছিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর যে কোনো মুসলমান মোহরানা দিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারবে।

৩. যে পুরুষ মুসলমান হবে তার স্ত্রী কাফের থেকে গেলে তাকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاٰتُوْهُمْ مَّاۤ اَنْفَقُوْا : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুসলমান মুহাজির নারীর স্বামীদেরকে বিবাহের সময় বা পরে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছিল তা সবই ফিরিয়ে দাও। কারণ ইসলাম গ্রহণের ফলে তারা যখন তাদের স্ত্রীদেরকে হারিয়েছে তখন সম্পদগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে উভয় রকমের ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ এমন যেন না হয় স্ত্রীও গেল মালও গেল।

এ নির্দেশ সেই মুহাজির মহিলাকে দেওয়া হয়নি দেওয়া হয়েছে ইসলামি রাষ্ট্রের অধিনায়ক বা মুসলমানদেরকে। সুতরাং এটা বায়তুল মাল হতে বা চাঁদা করে মুসলমানদেরকে আদায় করতে হবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এ কথা স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, হিজরত করে আগমনকারিণী মুসলমান নারীদের পূর্ব বিবাহ তাদের কাফের স্বামী হতে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং এ মহিলা ঐ কাফেরের জন্য হারাম হয়ে গেছে। এ আয়াতে সেই হুকুমটির পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে, ঐ হিজরতকারিণী মহিলার বিবাহ মুসলমান পুরুষের সাথে সংঘটিত হতে পারে। যদিও সাবেক স্বামী জীবিত রয়েছে এবং সে এটাকে তালাকও দেয়নি, তথাপিও এমতাবস্থায় যেহেতু শরিয়তে ইসলাম তাদের বিবাহ বন্ধন বিনষ্ট করে দিয়েছে, তাই অন্য পুরুষ তাকে বিবাহ করা হালাল হবে। তবে স্ত্রীকে নতুনভাবে মোহর দেওয়া আবশ্যক হবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেছেন- اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ যখন তোমরা মোহর দিবে তখন বিবাহ করতে পারবে। মূলত শব্দ দ্বারা মোহরকে বিবাহের জন্য শর্ত বুঝানো হয়নি। কারণ উম্মতে মুসলিমাহ-এর সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ মোহর-এর উপর মওকুফ বা মোহর বিবাহের শর্ত নয়। কিন্তু মোহর আদায় করা একান্ত আবশ্যক। সম্ভবত মোহরকে শর্ত হিসেবে এ জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যেন এরূপ ধারণা না করে যে, তাদেরকে তো কাফের স্বামী হতে মুক্ত করানোর জন্য মোহর দেওয়া হয়েছে। এটাই তার মোহরের জন্য যথেষ্ট, নতুন মোহরের আবশ্যক নেই; বরং জানতে হবে যে তাকে এখন বিবাহ করতে হলে নতুন মোহর দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

قَوْلُهُ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ : عِصَمٌ শব্দটি عِصْمَةٌ -এর বহুবচন, এটার আসল অর্থ- সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বুঝানো হয়েছে। আর كَوَافِرُ শব্দটি كَافِرَةٌ -এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ বাক্যের অর্থ হলো, "তোমরা কাফের নারীদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক বজায় রেখো না।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে যেসব মুসলমান কাফের মহিলাদেরকে নিজেদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিলেন তাঁদেরকে সেসব কাফের মহিলাদেরকে মুক্ত করে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর যে সাহাবীর বিবাহে কোনো মুশরিক নারী ছিল তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর (রা.)-এর বিবাহে দু'জন মুশরিকা নারী ছিল, তিনি সে দু'জনকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর পরিত্যাগ করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে যে, এ আয়াতে কেবল মুশরিক নারীদেরকে মুসলমান পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে, আহলে কিতাব মহিলাদেরকে হারাম করা হয়নি। কিতাবী মহিলার স্বামী ইসলাম গ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। কারণ মুসলমান পুরুষ কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। −[কুরতুবী, মাআরিফ]

এ আয়াত হতে প্রাপ্ত শরয়ী বিধান :

১. কোনো স্ত্রীলোক ইসলাম গ্রহণ করলে সে স্ত্রীলোক কাফের স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে, যেমন তার জন্য তার স্বামী হারাম হবে। لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ এবং তাদের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবার কারণ :

ক. হানাফী মাযহাব মতে দেশ ভিন্ন হওয়া। অর্থাৎ একজন দারুল ইসলামে অপরজন দারুল হারবে হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর উভয় যদি দারুল ইসলামে হয় তখন কাফের স্বামীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হবে, সে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের সম্পর্ক থাকবে। আর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

খ. ইমাম শাফেয়ী, মালিক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ হলো ইসলাম, তবে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণ করার পর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্বামী ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের পূর্বসম্পর্ক টিকে থাকবে, আর গ্রহণ না করলে ছিন্ন হয়ে যাবে। −[রাওয়ায়েউল বায়ান]

২. পুরুষ ইসলাম গ্রহণের পরও তার স্ত্রী কাফের থেকে গেলে তাকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রাখা জায়েজ নয়। এটার দলিল কুরআনের এই আয়াত وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ অর্থাৎ কাফের মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখো না।

৩. যে বিবাহিতা স্ত্রীলোক মুসলমান হয়ে দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে হিজরত করে আসবে তার বিবাহ স্বতই ছিন্ন হয়ে যাবে। এখানে যেই মুসলমানই চাবে মোহরানা দিয়ে তাকে বিবাহ করতে পারবে।

৪. দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মধ্যে যদি সন্ধি-সমঝোতার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে কাফেরদের যেসব স্ত্রী মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে হিজরত করে এসেছে তাদের মোহরানা মুসলমানদের পক্ষ হতে ফেরত দেওয়া এবং মুসলমানদের (বিবাহিতা) কাফের স্ত্রীদের যারা দারুল কুফরে রয়ে গেছে মোহরানা কাফেরদের নিকট হতে ফেরত পাওয়া সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে ইসলামি রাষ্ট্রকে দারুল কুফরের রাষ্ট্রের সাথে একটা মীমাংসায় আসতে হবে।

قَوْلُهُ وَاسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ الخ : অর্থাৎ মহিলাগণ মুসলমান হয়ে মক্কা হতে মদীনায় উপস্থিত হলে তাদেরকে মক্কায় পুনরায় পাঠানো যাবে না; কিন্তু ঐ সকল মুশরিক মহিলাগণের মুশরিক স্বামীগণ মোহর ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে যা প্রদান করেছে তাও তোমরা মুসলমানগণ তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিবে। আর তদ্রূপভাবে কোনো মুসলমান মহিলা (আল্লাহ না করুক) যদি মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে যায়, তবে তাদেরকে তোমরা মুসলমানগণ মোহর ইত্যাদির বিনিময় যা দান করেছিলে তাও কাফেরগণ হতে ফেরত চেয়ে নিবে।

এ বর্ণনাটি যদিও বলা হয়েছে, তবে কোনো মুসলমান মহিলা মুরতাদ হয়ে কাফেরের ধর্মমতে পুনরায় উপনীত হয়নি। তবে কিছু সংখ্যক কাফের মহিলার স্বামী ইসলাম গ্রহণের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং কাফির রয়ে গেছে। যদি এমন কেউ মুরতাদ হতো, তবে তার জন্য এ হুকুম বলবৎ থাকত। সুতরাং পক্ষদ্বয় থেকে যে মোহর ইত্যাদি দান করা হয়েছে সে ব্যাপারে উভয় পক্ষ সমঝোতায় বসে মীমাংসা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ব্যক্তি দুই দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তথা আদায়কৃত মোহরানাও পাবে না, স্ত্রীকেও পাবে না। এটা আল্লাহ পছন্দ করেননি। তা-ই মোহরানা ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এটাই আল্লাহর প্রকৃত বিধান। তিনি তোমাদের উপর এ বিধান প্রণয়ন করেন। আর আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও মহাবিচারক।

Free @ www.eelm.weebly.com

١١. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ أَيْ وَاحِدَةٌ
فَأَكْثَرُ مِنْهُنَّ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مُهُوْرِهِنَّ بِالذَّهَابِ
إِلَى الْكُفَّارِ مُرْتَدَّاتٍ فَعَاقَبْتُمْ فَغَزَوْتُمْ
وَغَنِمْتُمْ فَآتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِنَ
الْغَنِيْمَةِ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوْا لِفَوَاتِهِ عَلَيْهِمْ
مِنْ جِهَةِ الْكُفَّارِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ
بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ وَقَدْ فَعَلَ الْمُؤْمِنُوْنَ مَا أُمِرُوْا
بِهٖ مِنَ الْإِيْتَاءِ لِلْكُفَّارِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ ثُمَّ
ارْتَفَعَ هٰذَا الْحُكْمُ.

অনুবাদ :

১১. আর যদি তোমাদের হাতছাড়া হয় তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হতে কেউ অর্থাৎ এক বা একাধিক, কিংবা তাদের মোহর হতে কোনো কিছু। গমনের কারণে কাফেরদের নিকট ধর্মত্যাগী হয়ে। অতঃপর তোমরা সুযোগ লাভ করেছ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার ফলে গনিমত স্বরূপ পেয়েছ তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়েছে তাদেরকে প্রদান করো গনিমত হতে সেই পরিমাণ যা তারা ব্যয় করেছে। যেহেতু কাফেরদের পক্ষ হতে তাদের তা হাতছাড়া হয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর উপর তোমরা ঈমান রাখো মুসলমানগণ এ বিধানের উপর আমল করতে গিয়ে কাফের ও মু'মিনদেরকে স্ব-স্ব প্রাপ্য দান করে। অতঃপর এ হুকুম রহিত হয়ে যায়।

١٢. يٰۤأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ
يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى أَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا
وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ
كَمَا كَانَ يُفْعَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ وَأْدِ
الْبَنَاتِ أَيْ دَفْنِهِنَّ أَحْيَاءً خَوْفَ الْعَارِ
وَالْفَقْرِ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ
أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ أَيْ بِوَلَدٍ مَلْقُوْطٍ يَنْسِبْنَهُ
إِلَى الزَّوْجِ - وَوَصَفَ بِصِفَةِ الْوَلَدِ
الْحَقِيْقِيِّ فَإِنَّ الْأُمَّ إِذَا وَضَعَتْهُ سَقَطَ بَيْنَ
يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ
هُوَ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى كَتَرْكِ
النِّيَاحَةِ وَتَمْزِيْقِ الثِّيَابِ وَجَزِّ الشَّعْرِ
وَشَقِّ الْجَيْبِ وَخَمْشِ الْوَجْهِ فَبَايِعْهُنَّ
فَعَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ بِالْقَوْلِ
وَلَمْ يُصَافِحْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

১২. হে রাসূল! যখন মু'মিন নারীগণ আপনার নিকট এসে বাইয়াত করে, এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না এবং তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না যেমন জাহিলিয়া যুগে কন্যা সন্তানকে জীবিত সমাধিস্থ করার প্রচলন ছিল। লজ্জা ও দারিদ্র্যের ভয়ে তাদেরকে জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করা হতো। আর তারা স্বয়ং জেনে শুনে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবে না। অর্থাৎ 'লোকতা' তথা পথে পাওয়া সন্তানকে স্বামীর প্রতি সম্বন্ধ করে। এখানে প্রকৃত সন্তানের অর্থ প্রকাশক শব্দ এ জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, যেহেতু মা যখন সন্তান প্রসব করে তখন উক্ত সন্তান তার সম্মুখেই জন্মলাভ করবে। আর সৎকর্মে আপনার অবাধ্যাচরণ করবে না বিধান সম্মত কাজ, যা আল্লাহর বিধানের সাথে সঙ্গত হবে। যেমন– গলা ফাটিয়ে কান্না, কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলা, চুল কেটে ফেলা, মুখাবয়ব বিক্ষত করা ইত্যাদি কাজ হতে বিরত থাকবে। তবে আপনি তাদেরকে বাইয়াত করুন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিকভাবে মহিলাগণের বাইয়াত করেন; কিন্তু তাদের কারো সাথে মুসাফাহা করেননি। আর আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.) -এর মেয়ে উম্মুল হাকীম মুরতাদ হয়ে কাফেরদের সাথে যোগদান করেছে এবং বনী ছাকীফ-এর একজন পুরুষের সাথে বিবাহ করে ফেলেছে।

তার মূল কারণ এই ছিল যে, ধর্ম ত্যাগের কারণে যে সকল নারীগণের বিবাহ বন্ধন বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদেরকে দেন-মোহর ফেরত নেওয়া ও দেওয়ার জন্য পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ তা অবমাননা করেনি; বরং যেভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই প্রতিপালন করেছিল। কিন্তু কাফেরগণ তা অমান্য করেছিল এবং মুরতাদ মহিলাদের মোহর মুসলমানদেরকে ফেরত দিতে অস্বীকার করে। সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ..... مُؤْمِنُونَ আয়াত নাজিল করেন।

* আল্লামা কুরতুবী (র.)-এর মতে উক্ত মোহর ফেরত চেয়ে মুসলমানগণ কাফিরদের নিকট পত্র লিখেছিল। তারা প্রতি উত্তরে মোহর ফেরত দিতে অস্বীকার জানিয়ে বার্তা লিখলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন।

* মুজাহিদ ও ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেন, এ আয়াত উক্ত কাফেরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয় যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তিপত্রও ছিল না। তাদের নিকট যখন কোনো স্ত্রী লোক পালিয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ ...... فَعَاقَبْتُمْ (الْآيَةَ) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ (الْآيَةَ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটার অর্থ করেছেন, তোমাদের (মুহাজিরদের) মধ্যের কারো স্ত্রী যদি কাফেরদের কাছে পালিয়ে যায়, তাহলে যার স্ত্রী পালিয়ে গেছে তাকে গনিমত হতে ততটুকু অর্থ আদায় করে দাও, যতটুকু সে তার স্ত্রীকে মোহর হিসেবে দিয়েছিল।

কেউ কেউ এটার অর্থ করেছেন, তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেওয়া মোহরানা হতে কিছু অংশ যদি তোমরা কাফেরদের নিকট হতে ফেরত না পাও আর এরপরই তোমাদের সময় উপস্থিত হয়, তাহলে যাদের স্ত্রীরা ঐদিকে রয়ে গেছে তাদেরকে এতটা সম্পদ আদায় করে দাও যা তাদের দেওয়া মোহরানার সমান হবে।

অর্থাৎ তোমরা মুহাজির নারীদের দেয় আটককৃত মুহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও যাদের স্ত্রী কাফেরদের কাছে রয়ে গেছে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

মুসলিম রমণী কি মুরতাদ হয়েছে, আর তারা কতজন? : কোনো মুসলমান মহিলা মুরতাদ হয়েছিল কি, হলে তারা কতজন ছিল? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, মাত্র আইয়াস ইবনে গমন এর স্ত্রী উম্মুল হাকাম বিনতে আবূ সুফিয়ান মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গিয়েছিল, কিছুকাল পর তিনি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে সর্বমোট ছয়জন মহিলা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। একজন উক্ত أُمُّ الْحَكَمِ ছিলেন, বাকি পাঁচজনকে হিজরতের সময়ই মক্কাতে আটক রাখা হয়েছিল। যখন وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখনও তারা ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়নি। ফলে তাদের স্বামীগণকে কাফেরগণ যা মোহর স্বরূপ দেওয়ার কথা ছিল তা না দেওয়ার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে গনিমতের মাল হতে তা দিয়ে দিলেন। এতে এ কথাই স্বীকৃত হলো যে, মাত্র একজনই মুরতাদ ছিল। বাকি পাঁচজন প্রথমেই কুফরির উপর রয়ে গেল এবং মুসলমানদের বিয়ে বন্ধন হতে পৃথক হয়ে গেল। -[মাযহারী, মা'আরিফ]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কা বিজয়ের দিন যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট দলে দলে লোকজন কুরাইশ বংশ হতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সাফা পর্বতের উপর নিজেই পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন, অতঃপর যখন মহিলাগণ বাইয়াত গ্রহণের জন্য আসতে লাগল তখনই এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। -[আশরাফী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে ইবনে জারীর, কাতাদাহ, ইবনে আবূ হাতিম হতে বিভিন্ন বর্ণনা মতে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কায় হযরত ওমর (রা.)-কে হুযূর ﷺ মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এবং মদীনায়ও হযরত ওমর (রা.)-কে একটি বাড়িতে আনসারদের নারীগণকে একসাথে করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং পরে বাইয়াত করার জন্য আদেশ প্রদান করেন, সে প্রসঙ্গেই এ আয়াত নাজিল হয়।

'মু'মিনা মহিলারা আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করো' এ কথা কেন বলা হয়নি? : ইমাম রাযী (র.) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এর কারণ দু'টি–

এক. এ আয়াতেই যেখানে 'শিরক করবে না বলা হয়েছে' এতে তাঁদের পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের আবার পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুই. মুহাজির মহিলাগণ আসছিলেন 'দারুল হারব' হতে, যার ফলে তাঁদের ইসলামি শরিয়ত-এর জ্ঞান ছিল না, এ কারণেই তাদের পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু মু'মিনা মহিলাগণ দারুল ইসলামেই আছেন, তাঁরা ইসলামি বিধি-বিধান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। অতএব, তাদের পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا : এখানে শিরক বলতে شِرْكٌ فِى الرُّبُوْبِيَّةِ এবং شِرْكٌ فِى الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ তথা সর্বপ্রকারের শিরক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আল্লাহর সাথে কোনো রকমের শিরক তারা করবে না।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ শেষ হলে স্ত্রীলোকদের বাইয়াত গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সাফা পাহাড়ের উপর বসে থেকে হযরত ওমর (রা.)-কে স্ত্রীলোকদের বাইয়াত নিতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন সেখানে হযরত আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দা বিনতে উত্‌বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করে উপস্থিত ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে বাইয়াত করাচ্ছি এই শর্তে যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো জিনিসকে শরিক করবে না। তখন হিন্দা মাথা তুলে বলল, আল্লাহর কসম! আমরা মূর্তি পূজা করেছি, আপনি আমাদের উপর এমন এক শর্ত আরোপ করেছেন যা পুরুষদের উপর আরোপ করতে দেখিনি। আপনি পুরুষদের বাইয়াত নিয়েছেন কেবল ইসলাম এবং জিহাদের শর্তের ভিত্তিতে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চুরি করবে না, তখন হিন্দা বলল, আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমি তাকে না বলে তার সম্পদ হতে কিছু গ্রহণ করেছি, জানি না তা আমার জন্য হালাল না হারাম? হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু হাসলেন এবং তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, তুমি কি হিন্দা বিনতে উতবা? সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী! আমাব অতীতের দোষ ক্ষমা করুন আল্লাহ আপনার কল্যাণ করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জেনা-ব্যভিচার করবে না। তখন হিন্দা বলল, স্বাধীন স্ত্রীলোক কি জেনা-ব্যভিচার করতে পারে? অন্য এক বর্ণনায় আছে, কোনো স্বাধীনা মহিলা কখনো জেনা করে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না। এবার হিন্দা বলল, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ছোট হতে লালন-পালন করে বড় করেছি; কিন্তু বড় হবার পর আপনারা তাদেরকে হত্যা করলেন। আপনারা এবং তারা এ বিষয়ে ভালো জানেন। তার ছেলে হানযালা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) হাসতে হাসতে চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও একটু হাসলেন। অতঃপর বললেন, কোনো মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না। অর্থাৎ অন্য কোনো লোক দ্বারা গর্ভবতী হয়ে স্বামীর বলে চালিয়ে দেওয়া। তখন হিন্দা বলল, আল্লাহর কসম, মিথ্যা দোষারোপ করা একটা জঘন্য কাজ, আপনি আমাদেরকে উত্তম চরিত্র ও সৎপথের সন্ধানই দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো স্পষ্ট পরিচিত বিষয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এ কথা শুনে হিন্দা বলল, আল্লাহর কসম, আমরা এখানে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করার মনোবৃত্তি নিয়ে বসিনি। –[কাবীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ : সন্তান হত্যা বিভিন্নভাবে হতে পারে। ইসলাম-পূর্ব জাহিলিয়া যুগে কন্যা সন্তানদেরকে অনেক লোকই জীবন্ত কবর দিত। অনেকেই এটাকে ছওয়াবের কাজ মনে করত। এ আয়াতে এটাকে নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তা ছাড়া যে কোনো প্রকারে সন্তান হত্যা করাও এটার অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.)-এর মতে গর্ভপাত করানোও সন্তান হত্যার মধ্যে গণ্য। ফিক্‌হবিদদের মধ্যে অনেকেই ভ্রূনে প্রাণ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত করানোকে হত্যার মধ্যে গণ্য হবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। -[দুররুল মুখতার, ফিক্‌হুস সুন্নাহ, সুবুলুস সালাম]

قَوْلُهُ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ الخ : উক্ত بُهْتَانٌ-এর অর্থ- মিথ্যা তোহমত বা অপবাদ রটানো। بُهْتَانٌ শব্দের সাথে بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ-এর قَيْد লাগানো হয়েছে। অর্থ- হস্ত ও পদ -এর মধ্যস্থলের তোহমত যেন না দেয়। এ অপবাদ দেওয়া হতে এ কারণে নিষেধ করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেকের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ নিজেই ব্যক্তির পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। সুতরাং গুনাহ করার সময় কিয়ামতের দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আর بُهْتَانٌ শব্দটি পুরুষ-নারী, মুসলিম, অমুসলিম [কাফের]-এর জন্যও ব্যবহার করা হারাম। অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দেওয়া কাফেরের জন্যও হালাল নয়। সুতরাং নিজ স্বামীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া স্ত্রীর জন্য অতি জঘন্যতম অপরাধ হবে।

بُهْتَانٍ-এর এক অর্থ- চুগলখোরি অর্থাৎ এক ব্যক্তির কথা অপর ব্যক্তির নিকট বলা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) بُهْتَانٌ -এর অর্থ বলেছেন, এমন কোনো সন্তানকে স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত করো না যে সন্তান তার নয়।

বুহতান -এর পদ্ধতি : بُهْتَانٌ-এর পদ্ধতি বিবিধ হতে পারে-

১. স্ত্রী অন্য কারো সন্তান আনয়ন করে বলত যে, এটা তোমার ঔরসজাত সন্তান এবং এটা তোমার বংশ। -[কাবীর]

২. পর পুরুষের সাথে যৌন সংযোগ করে গর্ভধারণ করত, আর স্বামীর সাথেও সহবাস চলত যাতে সন্তান স্বামীর পক্ষ থেকেই বিবেচিত হতো। "كَمَا قَالَ الْفُقَهَاءُ "اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ অর্থাৎ যেভাবে ফকীহগণ বলেছেন সন্তান বিছানা ওয়ালার জন্য নির্ধারিত। (মা'আরিফ) বর্তমানেও এমন নিকৃষ্টতম কুসংস্কার রয়েছে। আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে স্ত্রীলোক কোনো বংশে এমন কোনো সন্তান নিয়ে আসে [প্রসব করে] যা সেই বংশীয় সন্তান নয়, তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।

قَوْلُهُ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ : এ সংক্ষিপ্ত কথাটিতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আইনের ধারা বলা হয়েছে।

১. প্রথম ধারাটি এই যে, নবী করীম ﷺ -এর আনুগত্যও 'ভালো কাজের আনুগত্য' হওয়ার শর্তাধীন। অথচ নবী করীম ﷺ কখনও অবৈধ কাজের নির্দেশ দিতে পারেন এমন সন্দেহের এক বিন্দু অবকাশও তাঁর সম্পর্কে থাকতে পারে না। এটা হতে স্বতই একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা শক্তিরই আনুগত্য করা যেতে পারে না। কেননা আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের ব্যাপারেও যখন ভালো কাজের আনুগত্য হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তখন বিনা শর্তে নিরঙ্কুশ আনুগত্য পেতে পারে এমন অধিকার কারো থাকতে পারে না। কাজেই আল্লাহর আইনের পরিপন্থি কারো কোনো হুকুম-নির্দেশ, আইন বা নিয়ম-বিধান কখনো মেনে নেওয়া যেতে পারে না। নবী করীম ﷺ এ কথাটি নিজ ভাষায় এভাবে বলেছেন- لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ "আল্লাহর নাফরমানি করে অন্য কারো আনুগত্য বা আইন-নির্দেশ মেনে নেওয়া যেতে পারে না। আনুগত্য করা যেতে পারে কেবল মাত্র ভালো বলে পরিচিত কাজে।" -[মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

বস্তুত এ কথাটি ইসলামে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার ভিত্তি প্রস্তর। প্রত্যেকটি কাজ যা ইসলামি আইনের বিপরীত তাই অপরাধ। এটা একটি মৌলিক নীতি। কাজেই এ ধরনের কোনো কাজ করার নির্দেশ অন্য কাউকেও দেওয়া কারো অধিকার নেই। ইসলামি আইনের বিরুদ্ধে কোনো কাজের নির্দেশ যে দেয় সে-ও অপরাধী। কোনো অধীনস্থ কর্মচারী এ কৈফিয়ত দিয়ে বেঁচে যেতে পারে না যে, তার উপরস্থ অফিসার তাকে এমন কাজের নির্দেশ দিয়েছিল, যা ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. আইনের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো, এ আয়াতে পাঁচটি নেতিবাচক নির্দেশ দেওয়ার পর ইতিবাচক নির্দেশ মাত্র একটি দেওয়া হয়েছে। তা হলো সমগ্র নেক, ন্যায়সঙ্গত ও ভালো কাজে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নির্দেশ অনুসরণ করা। এটার পূর্বে যেসব বড় বড় অন্যায় ও পাপ কাজের উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই এমন যাতে ইসলাম-পূর্বকালের স্ত্রীলোকেরা জড়িত ছিল। এ বাইয়াতে তাদের নিকট হতে সেসব কাজ হতে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে; কিন্তু ভালো ও ন্যায়সঙ্গত কাজসমূহের কোনো তালিকা উল্লেখ করা হয়নি এবং সেই তালিকার ভিত্তিতে এ ওয়াদা নেওয়া হয়নি যে, এসব কাজ করার নির্দেশ নবী করীম ﷺ দিলে তা তোমরা পালন করবে। এখন ভালো ও ন্যায়সঙ্গত কাজ যদি শুধু সেই কয়টি হয় যার উল্লেখ কুরআন মাজীদে রয়েছে, তাহলে এ পর্যায়ে প্রতিশ্রুতির ভাষা এরূপ হওয়া উচিত ছিল যে, তোমরা আল্লাহর নাফরমানি করবে না, কিংবা কুরআনী বিধানের নাফরমানি করবে না; কিন্তু তা করা হয়নি। এখানকার ভাষা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নেক কাজের নির্দেশ দিবেন তোমরা তাতে তাঁর অবাধ্যতা ও বিরোধিতা করবে না। এটা হতে একটি কথা স্বতই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সমাজ সংস্কারের জন্য নবী করীম ﷺ -কে বিপুল ও ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ অবশ্যই পালনীয়–কুরআন মজীদে তার উল্লেখ থাকুক কি না-ই থাকুক।

এ আইনগত ক্ষমতা ও এখতিয়ারের ভিত্তিতে রাসূলে কারীম ﷺ বাইয়াত গ্রহণকালে তদানীন্তন আরবসমাজের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অবস্থিত অনেক বড় বড় অন্যায় ও পাপ কাজ পরিত্যাগ করার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন এবং অনেক অনেক কাজের নির্দেশ দিলেন, কুরআন মাজীদে যার উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ فَبَايِعْهُنَّ : فَبَايِعْهُنَّ শব্দটি হলো তারকীবে جَوَابٌ অর্থাৎ এসব শর্তের ভিত্তিতে যদি তারা বাইয়াত গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তুমি তাদেরকে বাইয়াত করাও।

বাইয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি : মুফাস্সিরগণের মধ্যে বাইয়াতের পদ্ধতি নিয়ে মতান্তর দেখা যায়–

১. কেউ কেউ বলেছেন, বাইয়াত গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের হাতে হাত দিতেন না। একটা কাপড়ের এক মাথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে থাকত অপর মাথা মহিলাদের হাতে থাকত, এভাবেই বাইয়াত সম্পন্ন হতো।

২. আর কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইয়াতের শর্তগুলো নিজ মুখে বলতেন, তখন হযরত ওমর (রা.) স্ত্রীলোকদের হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত গ্রহণ করতেন। এটা কালবীর অভিমত।

৩. আবার কেউ কেউ বলেছেন, কেবল কথার মধ্যে সেই বাইয়াত গ্রহণ করা হতো।

৪. আর একদলের মতে এক বাটি পানিতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাত ভিজাতেন পরে স্ত্রীলোকেরা ভিজাত।

তবে কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো বেগানা মহিলার হাতে হাত রাখেননি। অর্থাৎ আজনবী মহিলার সাথে মোসাফাহা করেননি।

এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! বাইয়াত নেওয়ার সময় রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাত কখনো কোনো মহিলার হাত স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। তিনি নারী সমাজের বাইয়াত নেওয়ার সময় শুধু মুখে বলতেন যে, আমি তোমার নিকট হতে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। –[বুখারী, ইবনে মাজাহ]

কখন কোথায় কতবার বাইয়াত করানো হয়েছিল? : হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা যা বুঝায় তাতেই প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের ক্ষেত্রে বাইয়াত মাত্র হোদায়বিয়া -এর পরেই হয়েছে যে কেবল তা নয়; বরং মক্কা বিজয়ের দিবসেও মুহাম্মদ ﷺ পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ করার পর সাফা পাহাড়ের উপর মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মাধ্যমে হুযূর ﷺ বাইয়াতের শব্দাবলি বারংবার তেলাওয়াত করিয়ে সাফা পাহাড়ের নিম্নে একত্রিত মহিলাগণের বাইয়াত গ্রহণ করেন। এভাবে আরো বিভিন্ন স্থানে বাইয়াত নেওয়া হয়। সুতরাং এতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাইয়াতের ব্যাপারটি বারংবার সংঘটিত হয়েছে। –[মা'আরেফুল কুরআন]

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْيَهُوْدُ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ اَىْ مِنْ ثَوَابِهَا مَعَ اِيْقَانِهِمْ بِهَا لِعِنَادِهِمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهٖ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ الْكَائِنُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ اَىِ الْمَقْبُوْرِيْنَ مِنْ خَيْرِ الْاٰخِرَةِ اِذَا تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ مَقَاعِدُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ كَانُوْا اٰمَنُوْا وَمَا يَصِيْرُوْنَ اِلَيْهِ مِنَ النَّارِ .

১৩. হে ঈমানদারগণ! সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারা ইহুদি সম্প্রদায়। তারা আখেরাত হতে হতাশ হয়েছে অর্থাৎ আখেরাতের ছওয়াব হতে, যদিও তারা তা দৃঢ়তা সহকারেই বিশ্বাস করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্যতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি তাদের শত্রুতার কারণে। যেমন হতাশ হয়েছে কাফেরগণ যারা অন্তর্ভুক্ত হবে কবরবাসীগণ হতে অর্থাৎ সমাধিস্থ অবস্থায়, তারা আখেরাতের কল্যাণ হতে হতাশ হবে। যখন তাদেরকে বেহেশতের ঠিকানা প্রদর্শিত হবে, যা তারা ঈমানদার হওয়ার ক্ষেত্রে লাভ করত এবং জাহান্নাম যাতে তারা অবস্থান করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَوَلَّوْا ..... الْقُبُوْرِ **আয়াতের শানে নুযূল :** কিছু সংখ্যক গরিব ঈমানদারগণ জীবিকা নির্বাহের আশা ভরসায় ইহুদিগণের সাথে গভীর যোগাযোগ রাখতেন, এমনকি মুসলমানদের কিছু খোঁজ-খবর ইহুদিগণকে পৌঁছে দিতেন। তাদের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –[আশরাফী]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুসলমানদেরকে যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর আক্রোশ ও গজবের পাত্র কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নেই। কবর হতে কেউ জ্যান্ত হয়েও উঠতে পারেন বলে কাফেররা যেমন বিশ্বাস করে না, উল্লিখিত কাফেরজাতিও তেমনি আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। কবরে কাফেররা যেমন আল্লাহর রহমত হতে চির নিরাশ হয়ে গেছে, এরাও তদ্রূপ আখেরাতে আল্লাহর রহমত লাভে নিরাশ হয়ে রয়েছে।

অথবা, এই বলা যেতে পারে যে, যেভাবে কাফিরগণ স্বীয় মুরদাগণ হতে নিরাশ হয়ে গেছে যে, যাদের মৃত্যু হয়ে গেছে তারা চিরতরে তাদের হতে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে গেছে। কারণ তাদের কিয়মাত সংঘটিত হওয়ার উপর বিশ্বাস নেই। তদ্রূপ ইহুদিগণ আখেরাতের ছওয়াব হতে নিরাশ হয়ে গেছে, কেননা জেনে শুনে সত্যকে তারা গোপন করেছে এবং নবী করীম ﷺ -কে অস্বীকার করেছে। তাদের এ বিশ্বাস রয়েছে যে, কিয়ামতে তাদের এটার উপর নির্ঘাত বিশ্বাস জন্মেছে সুতরাং তাহলে এমন বেঈমান গোষ্ঠির সাথে কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে?

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত যায়েদ ইবনে হারিছ (রা.) কোনো কোনো ইহুদির সাথে বন্ধুত্ব রাখতেন ফলে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে এরূপ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন।
–[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... اللّٰهُ عَلَيْهِمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সেসব লোকদেরকে বন্ধু বানিয়ো না যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা গজব নাজিল করেছেন।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ সূরার প্রথমেই আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করতে বলা হয়েছিল, এখানে আবারও সব শেষ আয়াতেও মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে তারা যেন যেসব লোকদের উপর আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে বন্ধু না বানায়। পুনর্বার আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এটার প্রতি তাকিদ ও গুরুত্ব আরোপ করা। –[সাফওয়া]

قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য কারা? : এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন।

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন (র.)-এর মতে ইহুদি জাতিকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ শানে নুযূল প্রসঙ্গে তার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২. অথবা, মক্কার মুশরিকগণ হতে পারে। কারণ সূরার প্রথমাংশে যেভাবে হযরত হাতিব ইবনে আবূ বালতায়া (রা.)-কে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাও ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত মাত্র এবং শেষ সাবধানতা স্বরূপ।

৩. আবার অনেকেই আয়াতকে সাধারণ নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য সকল ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহ হবে। এটাই অতি উত্তম ব্যাখ্যা বলে বিবেচিত হয়। কারণ যখন যারাই মুসলমান তথা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কিভাবে করা যাবে।

هٰكَذَا كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةُ وَابْنُ زَيْدٍ وَكَلْبِىْ وَمُقَاتِلُ وَمَنْصُوْرُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ .

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ يَئِسُوْا مِنْ ..... اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ : এটার দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, তারা পরকালীন কল্যাণ ও ছওয়াব হতে তেমনিভাবে নিরাশাগ্রস্ত, যেমন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অমান্যকারী লোকেরা নিরাশাগ্রস্ত হয়ে থাকে একথা হতে যে, তাদের নিকট আত্মীয় লোকেরা যারা মরে গেছে তারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে কখনো পুনরুত্থিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, কাতাদাহ, যাহহাক (র.) প্রমুখ এ অর্থ বলেছেন।

এটার দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, তারা পরকালীন রহমত ও মাগফিরাত হতে ঠিক তেমনি নিরাশ, যেমন কবরস্থ কাফেররা সর্বপ্রকার কল্যাণ হতে নিরাশ। কেননা তারা যে আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে সে বিষয়ে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ, ইকরামা, ইবনে যায়েদ, কালবী, মুকাতিল, মানসূর (র.) প্রমুখ হতে এ অর্থই বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। –[মাযহারী]

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الصَّفِّ : সূরা আস্-সাফ্ফ

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার চতুর্থ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا এখানকার صَفّ শব্দটি হতে অত্র সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'আস্ সাফ্ফ' তথা এ সূরায় উল্লিখিত 'সাফ্ফ' শব্দের মাধ্যমে একে صَفّ নামে নামকরণ করা হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন যে, এ সূরার অপর নাম হলো সূরাতুল হাওয়্যারিয়্যীন এবং একে সূরাতু ঈসাও বলা হয়। এতে ২ রুকূ', ১৪টি আয়াত ২২১টি বাক্য এবং ৯২৬টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে এ সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল জানা যায়নি; কিন্তু এর বিষয়বস্তু হতে অনুমান করা যায়, সম্ভবত সূরাটি উহুদ যুদ্ধের সমসাময়িক কালে নাজিল হয়ে থাকবে। কেননা এতে যে অবস্থাবলির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে তা এ সময়ই বিরাজ করছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ১–৪ আয়াত কয়টি ঈমানের ক্ষেত্রে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা গ্রহণ এবং আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৫–৭ আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ -এর উম্মতকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, তোমাদের রাসূল ও তোমাদের দীন ইসলামের সাথে তোমাদের সেরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয় যা হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের লোকেরা অবলম্বন করেছিল।

৮–৯ আয়াতে পুনঃ বলিষ্ঠতা সহকারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইহুদি, খ্রিস্টান ও তাদের সাথে যোগ-সাজশকারী মুনাফিকরা আল্লাহর এ নূরকে চিরতরে নির্বাপিত করার জন্য যত চেষ্টাই করুক না কেন এটা পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে দুনিয়ায় বিস্তার ও প্রসার লাভ করতে থাকবেই। আর মুশরিকদের পক্ষে যতই অসহ্য ব্যাপার হোক না কেন মহান রাসূলের প্রচারিত দীন ইসলাম অন্যান্য প্রত্যেকটি দীন ও ধর্মের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিজয়ী হবেই।

১০–১৩ আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি মাত্র উপায় আছে। তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সত্যিকারভাবে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা। পরকালে এটার ফলশ্রুতিতে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং চির সুখের জান্নাত পাওয়া যাবে, আর দুনিয়াতেও বিজয় ও সাফল্য পাওয়া যাবে।

১৪ নম্বর আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরা যেভাবে আল্লাহর পথে তাঁকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে মু'মিনরাও যেন আল্লাহর আনসার ও সাহায্যকারী হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে কাফেরদের মোকাবিলায় তারাও ঠিক তেমনি আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করতে পারবে, যেমন আগের কালের ঈমানদার লোকেরা লাভ করেছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আস্-সাফ্ফ মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

اَرْبَعَ عَشَرَةَ اٰيَةً : ১৪ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج اَىْ نَزَّهَهُ فَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ وَجِيْئَ بِمَا دُوْنَ مَنْ تَغْلِيْبًا لِلْاَكْثَرِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِىْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِىْ صُنْعِهِ.

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে অর্থাৎ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে اَللّٰه শব্দের ل হরফটি অতিরিক্ত। আর প্রাণীবাচক مَنْ অব্যয়টির পরিবর্তে অপ্রাণীবাচক مَا অব্যয়টি সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে বিজ্ঞানময় তাঁর সৃষ্টিকার্যে।

٢. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ فِىْ طَلَبِ الْجِهَادِ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ اِذَا انْهَزَمْتُمْ بِاُحُدٍ.

২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন বল জিহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করার ব্যাপারে যা তোমরা কর না। যখন উহুদ যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় হয়েছে।

٣. كَبُرَ عَظُمَ مَقْتًا تَمْيِيْزٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا فَاعِلُ كَبُرَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

৩. এরূপ কথা জঘন্য বড়োই অসন্তোষজনক এটা تَمْيِيْز রূপে ব্যবহৃত। আল্লাহর নিকট যে, তোমরা বলবে এটা كَبُرَ-এর فَاعِل যা তোমরা কর না।

٤. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ يَنْصُرُ وَيُكْرِمُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهِ صَفًّا حَالٌ اَىْ صَافِّيْنَ كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ مُلْزَقٌ بَعْضُهُ اِلٰى بَعْضٍ ثَابِتٌ

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন সাহায্য করেন এবং সম্মানিত করেন। সেই সমস্ত লোককে যারা আল্লাহর রাহে সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে এটা হালরূপে ব্যবহৃত অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যেন তারা সুদৃঢ় প্রাচীরস্বরূপ একে অন্যের সাথে মিলিতভাবে, সুদৃঢ়।

٥. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ قَالُوْا اِنَّهٗ اٰدَرُ اَيْ مُنْتَفِخُ الْخُصْيَةِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَكَذَّبُوْهُ وَقَدْ لِلتَّحْقِيْقِ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ط اَلْجُمْلَةُ حَالٌ وَالرَّسُوْلُ يُحْتَرَمُ فَلَمَّا زَاغُوْا عَدَلُوْا عَنِ الْحَقِّ بِاِيْذَائِهٖ اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ط اَمَالَهَا عَنِ الْهُدٰى عَلٰى وَفْقِ مَا قَدَّرَهٗ فِي الْاَزَلِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ . اَلْكَافِرِيْنَ فِيْ عِلْمِهٖ .

৫. আর স্মরণ করা যখন হযরত মূসা (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছো? লোকেরা বলাবলি শুরু করে যে, তাঁর একশিরা রোগ হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর একটি অণ্ডকোষ অনেক বড় হয়েছে। বাস্তবে এমন কিছুই ছিল না। তারা মিথ্যা বলেছিল। অথচ قد অব্যয়টি গুরুত্বারোপের জন্য তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল বাক্যটি হাল রূপে ব্যবহৃত আর রাসূল হলেন অপরিহার্যরূপে সম্মান প্রদর্শনযোগ্য। অনন্তর যখন তারা বক্র পথ অবলম্বন করল হযরত মূসা (আ.)-কে কষ্ট দানের মাধ্যমে সত্য-বিচ্যুত হলো। তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন হিদায়েত বিমুখ করে দিলেন, তাদের ব্যাপারে সৃষ্টির আদিতে গৃহীত ফয়সালা মোতাবেক। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না যারা আল্লাহর ইলমে কাফেররূপে সাব্যস্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا : صَفًّا শব্দটি مَصْدَرٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। এতে فِعْلٌ ও مَفْعُوْلٌ উভয়ই مَحْذُوْفٌ রয়েছে। আসলে বাক্যটি ছিল يَصُفُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ صَفًّا কেউ কেউ صَفًّا শব্দটিকে مَصْدَرٌ যা حَالٌ-এর স্থানে বলে মনে করেন। তখন আসল عِبَارَتْ হবে এ রকম صَافِّيْنَ اَوْ مَصْفُوْفِيْنَ।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ : এ বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ - يُقَاتِلُوْنَ-এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে, صَفًّا-কে حَالٌ হিসাবে গ্রহণ করলে صَفًّا-এর ضَمِيْرٌ হতেও এ বাক্যটিকে حَالٌ মনে করে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ বলা যেতে পারে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يُقَاتِلُوْنَ : জমহুর يُقَاتِلُوْنَ শব্দটি مَعْرُوْفٌ পড়েছেন, আর যায়েদ ইবনে আলী তাকে مَجْهُوْلٌ পড়েছেন। এ শব্দটি يُقَتِّلُوْنَ অর্থাৎ تَشْدِيْد যুক্ত করেও পড়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতসমূহের শানে নুযূল :

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলের সাহাবীদের কয়েকজন বসে বলাবলি করছিলাম যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটা তা জানতে পারলে আমরা সেই আমল করতাম, তখন سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ সূরাটি পড়ে শুনান।
–[আসবাব, মা'আরিফ, ইবনে কাছীর]

২. এ প্রসঙ্গে অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ একথাও বলাবলি করলেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি তা জানতে পারলে আমরা তার জন্য জান ও মাল সব কুরবানি করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি তা সম্বন্ধে অবহিত করলেন, এ কথা বলে "আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করেন।" একদিন যখন তাদেরকে যুদ্ধ করতে বলা হলো তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পশ্চাতে ফিরে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। –[আসবাব]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَاتَفْعَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সেই কথা বল যা কার্যত কর না?" এ আয়াতটি কোন্ প্রকারের লোকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে কয়েকটি মতামত লক্ষণীয়–

১. এ আয়াতটি একদল মু'মিন সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে জানতে এবং তদনুযায়ী আমল করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ এবং اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ আয়াত দু'টি অবতীর্ণ করে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা, কিন্তু আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পরও তাঁরা দুনিয়ার জীবনকেই বেশি ভালোবাসলেন এবং উহুদ যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন।

২. কেউ কেউ বলেছেন, এটা ঐ সব লোকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যারা বলে 'আমরা যুদ্ধ করেছি' কিন্তু আসলে করেনি; 'তীর নিক্ষেপ করেছি' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে করেনি। 'এ কাজ করেছি' কিন্তু আসলে করেনি।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, এটা মুনাফিকদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ তারা যুদ্ধ কামনা করেছিল, কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন তখন তারা বলল, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ জিহাদ ফরজ করলেন। –[কাবীর]

৪. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও এ আয়াতে যেসব লোক ওয়াদা পালন করে না, কথা দিয়ে কথা রাখে না, মুখে যা বলে তার বিপরীত কাজ করে তাদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। –(কাবীর, সাফওয়া) কাজেই সাচ্চা, নিষ্ঠাবান মুসলমানের কথা ও কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য সঙ্গতি থাকা আবশ্যক। সে যা বলবে তাকে তা করে দেখাতে হবে। আর করার ইচ্ছা বা সাহস না করলে মুখেও তা করার কথা বলবে না। বলা এক আর করা অন্য, এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের স্বভাব। আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবিদারের পক্ষে এরূপ বদ-স্বভাব কখনোই শোভন হতে পারে না। নবী করীম ﷺ বলেছেন, কারো মধ্যে এরূপ বদ-স্বভাবের অবস্থিতি এমন একটা নিদর্শন যা প্রমাণ করে যে, সে মুসলমান নয়– মুনাফিক। একটি হাদীসে বলা হয়েছে "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; ওয়াদা করলে পূরণ করে না এবং কোনো কিছু তার নিকট আমানত রাখলে তাতে বিশ্বাস ভঙ্গ করে।"

বস্তুত যারা ইসলামের জন্য আত্মদান বা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে এমন সব কথা বলে বেড়ায় যা নিজেরা করে না এখানে আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদের বিশেষভাবে তিরস্কার করেছেন। পরের আয়াতে আরো কড়া ভাষায় তাদের তিরস্কার করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না।

অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে সৎকাজ করতে বলবে আর নিজেরা করবে না, মন্দকাজ হতে বিরত থাকতে বলবে আর নিজের মন্দকাজ করবে– এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি ঘৃণ্য কাজ। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ الخ : আল্লাহ বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্নিকটে সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ করতে পারবে বলে লড়াই হাঁকছে এতই যদি তোমাদের সখ হয়, তবে চল তোমাদেরকে বলে দেওয়া যাচ্ছে, শত্রু সম্মুখে সিসাবিগলিত সুশক্ত প্রাচীর সাদৃশ্য অনড় অবিচলিত থেকে সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে লড়াই, করা তাঁর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ। তোমাদের কয়জন এ আদর্শে অবিচল থাকতে পারবে ভেবে দেখ। কোনো সন্দেহ নেই।

সাহাবীগণের অনেকে এ অগ্নি পরীক্ষায় নিজকে খাঁটি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, আবার দুর্বল ঈমানদারগণের কেউ কেউ বলেছেন– وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ অর্থাৎ তারা বলেছিল যে, ওগো প্রভু! আমাদের উপর এখন কেন জিহাদ ফরজ করেছ, যদি আরো কিছুকাল আমাদেরকে সময় দিতে? –[তাহের]

সুতরাং আল্লাহর নিকট ঐ সকল লোকই প্রিয়তম যারা আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় আল্লাহর كَلِمَةٌ -কে উচ্চ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ও সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে থাকে এবং তাদের পদস্খলন যেন না ঘটে।

–[মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আয়াতে কারীমাটি মুজাহেদীনদের তিনটি বিশেষ গুণাবলিকে আবশ্যক করেছে : যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে তাদের তিনটি গুণাবলি এই–

এক. তারা গভীর চেতনা ও তীব্র উপলব্ধি সহকারে আল্লাহর পথে লড়াই করবে। এমন পথে লড়াই করে না, যা ফী সাবীলিল্লাহ পর্যায়ে পড়ে না।

দুই. তারা উচ্ছৃঙ্খলতা, সংগঠন বিরুদ্ধতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতায় নিমজ্জিত হবে না। তারা সুদৃঢ় সাংগঠনিকতা, সুসংবদ্ধতা ও নিয়মানুগত্যতা সহকারে কাতার বন্দী হয়ে লড়াই করতে থাকবে।

তিন. শত্রুদের মোকাবিলায় ইস্পাত কঠিন প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য হবে। এই শেষ কথাটি অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত যুদ্ধ ময়দানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে কেবল সেই বাহিনীটিই দাঁড়াতে পারে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকবে।

১. উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র বর্তমান থাকা একান্ত আবশ্যক। বাহিনীর কর্মকর্তা ও সাধারণ সিপাহী সেই মান হতে বিচ্যুত হলে পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা সৃষ্টি হতে পারে না। কেউ কাউকেও সম্মানের চোখে দেখবে না। ফলে পারস্পরিক কোন্দল ও সংঘর্ষতা হতে তারা রক্ষা পাবে না।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ থাকা আবশ্যক। লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ় সংকল্পই সমগ্র বাহিনীকে আত্মদান ও জীবন উৎসর্গকরণের দুর্জয় আবেগে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সক্ষম। এর ফলেই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ইস্পাত কঠিন ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে অবিচল ও অটল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ সবের ভিত্তিতে হযরত নবী করীম ﷺ-এর মহান নেতৃত্বাধীনে এমন এক মহান সামরিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল যার সংঘর্ষে এসে তদানীন্তন দুনিয়ার প্রধান শক্তিগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং শত শত বৎসর পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো শক্তিই তার সম্মুখে টিকতে পারেনি।

হযরত ঈসা এবং মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলি আলোচনার কারণ : আল্লাহ তা'আলার কাছে মুজাহিদরাই সর্বাধিক প্রিয়–এ আলোচনার পর হযরত ঈসা এবং মূসা (আ.)-এর ঘটনা আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, উম্মতে মুহাম্মদীকে সতর্ক করে দেওয়া– এই বলে যে, তোমাদের উপরও আল্লাহর আজাব আসবে যদি তোমরাও হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে সেরূপ আচরণ করা যেরূপ আচরণ করেছিল হযরত ঈসা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মত হযরত ঈসা এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে এবং এর ফলে তাদের উপর আল্লাহর আজাব এসেছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

বনী ইসরাঈল কিভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে কষ্ট দান করত? : বনী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মূসা (আ.)-কে বিভিন্নভাবে জ্বালা-যন্ত্রণা দিত, তাঁর সাথে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করেছে কুরআন মাজীদের বহু স্থানে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে তার কয়েকটা আলোচনা করা হলো। কখনো তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছে لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً কখনো বলেছে اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ আবার কখনো বলেছে فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ হাদীস শরীফে আছে যে, তারা হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত হারূন (আ.)-কে হত্যা করার অভিযোগও এনেছিল। তাঁকে অণ্ডকোষের রোগে আক্রান্ত বলেও পরিহাস করেছে। বাইবেলেও ইহুদিদের নিজেদের বর্ণনা করা ইতিহাসও এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনাবলি দ্বারা পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

কুরআন মজীদের এ স্থানে সেসব ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– মুসলমানদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে। তারা যেন নিজেদের নবীর সাথে সেরূপ আচরণ না করে যা বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের নবীর সাথে করেছিল। নতুবা বনী ইসরাঈলীদের যে পরিণতি হয়েছে তা হতে তারা কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। –[কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ : হযরত মূসা (আ.)-এর বিভিন্ন মু'জিযা বনী ইসরাঈলের লোকেরা স্বচক্ষে দেখেছিল, যার ফলে তারা ভালো করেই জানত যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নবী ও রাসূল। তাঁর রিসালতের কারণে তাঁর প্রতি সদাচরণ করা হবে, এটাই ছিল যুক্তিযুক্ত; কিন্তু তা না করে তাঁর সাথে নানাভাবে উৎপীড়নমূলক আচরণ করা হয়েছে, সে কারণেই হযরত মূসা (আ.) স্বীয় জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "তোমরা কেন আমাকে উৎপীড়িত কর? অথচ তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।"

فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ -এর অর্থ : এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে–

১. তারা যখন সত্য পরিত্যাগ করে বক্রতা অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের দিলকে হিদায়েতের পথ হতে বাঁকা করে দিলেন।

২. যখন তারা আনুগত্য না করে বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের অন্তরকে হেদায়েতের পথ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন।

৩. যখন তারা ঈমান গ্রহণ না করে বক্রতা অবলম্বন করল তখন আল্লাহও তাদের দিলকে ছওয়াবের পথ হতে বাঁকা করে দিলেন।

৪. যখন তারা তাদেরকে রাসূলের সম্মান এবং আল্লাহর আনুগত্যকরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা অমান্য করল তখন আল্লাহও তাদের অন্তরে গোমরাহী সৃষ্টি করে দিলেন তাদের এ কর্মের শাস্তি হিসেবে। -[কুরতুবী, কাবীর]

কেউ কেউ বলেছেন যে, যেসব লোক নিজেরা বাঁকা পথে চলতে চায় তাদেরকে জবরদস্তি সহজ সরল পথে পরিচালিত করা আল্লাহ তা'আলার নিয়ম নয়। যারা নিজেরা আল্লাহর নাফরমানি করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে তাদেরকে জোর করে হেদায়েত দানে বাধ্য করবেন- এটাও আল্লাহ তা'আলার নীতি নয়। এটা হতে স্বতস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, কোনো ব্যক্তির বা কোনো জাতির গোমরাহীর সূচনা আল্লাহর দিক হতে হয় না। সেই ব্যক্তি বা জাতিই সর্বপ্রথম এ পথে পা বাড়ায়। অবশ্য আল্লাহর বিধান এই যে, যে লোক গোমরাহী পছন্দ করে তিনি তাদের জন্য হিদায়েতের পথে চলার নয় গোমরাহীর পথে চলার উপায়-উপকরণই সংগ্রহ করেছেন। কেননা ব্যক্তির গোমরাহ হওয়ার স্বাধীনতাটুকু যেন সে পুরোপুরি ভোগ করতে পারে, তাই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহতো মানুষকে বাছাই ও গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। অতঃপর আল্লাহর আনুগত্য গ্রহণ করা হবে কিনা এবং হেদায়েতের পথে চলা হবে কি বাঁকা-গোমরাহীর পথে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টির নিজেদের দায়িত্ব। এ বাছাই ও গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো বিশেষ জবরদস্তি নেই। কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য ও হেদায়েতের পথে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে জোরপূর্বক গোমরাহী ও নাফরমানির দিকে ঠেলে দিবেন না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নাফরমানি করার এবং হেদায়েতের পথ পরিহার করে চলারই সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আল্লাহর আনুগত্য ও হেদায়েতের পথে চলতে বাধ্য করবেন- এ নীতি আল্লাহর নয়। এতদসত্ত্বেও এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, যে লোক নিজের জন্য যে পথই গ্রহণ করুক না কেন কার্যত সেই পথে সে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা সেই পথে চলার জন্য জরুরি সামগ্রী সংগ্রহ করে দিবেন।

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ বাক্যটির অর্থ : وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়েত দেন না।' এ কথাটির অর্থ হলো, যেসব লোক নিজেদের জন্য ফিসক-ফুজুরী ও নাফরমানির পথ বাছাই করে নিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্য ও ফরমাবরদারির পথে চলার তৌফিক দেন না।

যুজাজ বলেছেন, এর অর্থ হলো 'যার সম্পর্কে আল্লাহর ইলমে রয়েছে যে, সে ফাসিক হবে তাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত দান করবেন না। -[ফাতহুল কাদীর]

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলকে কষ্ট দান অতি মারাত্মক ধরনের অপরাধ যা কুফরি ও দিলকে হিদায়েতের পথ হতে সরিয়ে অন্যদিকে নিয়ে যায়। -[কাবীর]

হযরত মূসা (আ.)-কে বনী ইসরাঈগণ কি কষ্ট দিয়েছিল? : বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহর সত্য নবী ও তাদের উপর অনুগ্রহকারী জেনে কেমন করে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েছে, তাঁর সাথে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ করেছে কুরআন মাজীদের বহুস্থানে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রয়েছে। যথা, সূরা বাক্বারাহ অংশে-

لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا .... يَعْتَدُوْنَ -

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِىَ الْاٰيَةَ -

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا الْاٰيَةَ (بَقَرَة)

اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۤءُ مِنَّا اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا الْاٰيَةَ (اَعْرَاف)

وَيَقُوْلُوْنَ يُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ (اَعْرَاف)

ইত্যাদি আরো বহুবিধ আয়াত এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ বাক্যটির মহল্লে ই'রাব : وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ (الاية) বাক্যটি حَالٌ হওয়ার কারণে نَصَبٌ -এর স্থানে অবস্থিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. وَ اذْكُرْ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىٓ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَقُلْ يَا قَوْمِ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ قَبْلِىْ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ط قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَمَّا جَاءَهُمْ جَاءَ اَحْمَدُ الْكُفَّارَ بِالْبَيِّنٰتِ الْاٰيَاتِ وَالْعَلَامَاتِ قَالُوْا هٰذَا اَىِ الْمَجِئُ بِهٖ سِحْرٌ وَفِىْ قِرَاءَةٍ سَاحِرٌ اَىِ الْجَائِىْ بِهٖ مُّبِيْنٌ بَيِّنٌ .

৬. আর স্মরণ করো যখন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! হে আমার সম্প্রদায় এ জন্য বলেনি, যেহেতু তিনি তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল এবং সত্য প্রতিপন্নকারী যা আমার সম্মুখে রয়েছে আমার পূর্ব হতে তাওরাত গ্রন্থ এবং সেই রাসূল সম্পর্কে সুসংবাদ দানকারী যিনি আমার পর আগমনকারী ও তাঁর নাম হবে আহমদ আল্লাহ তা'আলা বলেন অতঃপর যখন তিনি তাদের নিকট আগমন করলেন কাফিরদের নিকট আহমদ ﷺ আগমন করলেন স্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ আয়াত ও নিদর্শনাবলিসহ তারা বলল, এটা তাঁর আনীত বস্তু যাদুমন্ত্র অপর কেরাতে سَاحِرٌ যাদুকর অর্থাৎ আগমনকারী, পঠিত হয়েছে যা সুস্পষ্ট প্রকাশ্য।

٧. وَمَنْ لَا اَحَدَ اَظْلَمُ اَشَدُّ ظُلْمًا مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ بِنِسْبَةِ الشَّرِيْكِ وَالْوَلَدِ اِلَيْهِ وَ وَصْفِ اٰيَاتِهٖ بِالسِّحْرِ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ .

৭. আর কে কেউই নয় অধিক অত্যাচারী জঘন্যরূপ জালিম সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটনা করে তাঁর প্রতি অংশীদার ও সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাঁর আয়াতকে যাদুরূপে আখ্যায়িত করে অথচ সে ইসলামের দিকে আহূত হয়েছে। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না কাফিরদেকে।

٨. يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا مَنْصُوْبٌ بِاَنْ مُقَدَّرَةٍ وَاللَّامُ مَزِيْدَةٌ نُوْرَ اللّٰهِ شَرْعَهٗ وَبَرَاهِيْنَهٗ بِاَفْوَاهِهِمْ بِاَقْوَالِهِمْ اِنَّهٗ سِحْرٌ وَشِعْرٌ وَكَهَانَةٌ وَاللّٰهُ مُتِمُّ مُظْهِرُ نُوْرِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ .

৮. তারা নির্বাপিত করতে চায় উহ্য اَنْ-এর দ্বারা يُطْفِئُوْا শব্দটি مَنْصُوْبٌ এবং ل হরফটি তন্মধ্যে অতিরিক্ত আল্লাহর নূরকে তাঁর শরিয়ত ও প্রমাণাদিকে তাদের মুখের ফুঁকের দ্বারা তাদের এ কথা দ্বারা যে, এটা যাদু, কবিতা ও গণকতা আর আল্লাহ পূর্ণতাদানকারী প্রকাশকারী তাঁর নূরকে এক কেরাতে مُتِمُّ نُوْرِهٖ ইযাফতের সাথে পঠিত হয়েছে। যদিও কাফিরগণ অপছন্দ করে তা।

٩. ذٰلِكَ هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ يُعْلِيَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ لَا جَمِيْعِ الْاَدْيَانِ الْمُخَالِفَةِ لَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দীনসহ, তাকে প্রকাশিত করার জন্য শ্রেষ্ঠত্বদানের জন্য সকল দীনের উপর তার বিপরীত সমস্ত দীনের উপর যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا وَمُبَشِّرًا : مُصَدِّقًا ও مُبَشِّرًا শব্দদ্বয় حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। উভয় শব্দই رَسُوْلٌ-এর মধ্যে যে اِرْسَالٌ অর্থ রয়েছে তা হতে حَالْ হয়েছে, অর্থাৎ

اِنِّىْ اَرْسَلْتُ اِلَيْكُمْ حَالَ كَوْنِىْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِمَنْ يَّأْتِىْ بَعْدِىْ .

قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِىْ : নাফে', ইবনে কাছীর, আবূ আমর, সুলামী, যার ইবনে হোবাইশ ও আবূ বকর (রা.) হযরত আসেমের বরাত দিয়ে مِنْ بَعْدِىَ অর্থাৎ ى তে فَتْحٌ দিয়ে পড়েছেন। বাকি কারীগণ يَاءْ তে সাকিন দিয়ে পড়েছেন।

–[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ "سِحْرٌ مُّبِيْنٌ" : জমহুর سِحْرٌ পড়েছেন, কিন্তু হামযা এবং কিসায়ী سَاحِرٌ পড়েছেন। –[কুরতুবী, ফতহুল কাবীর]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ : وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে حَالْ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ : হযরত ইবনে কাছীর, হামযা ও কেসায়ী এবং হাফস (আসেম -এর সনদে) مُتِمُّ نُوْرِهٖ অর্থাৎ اِضَافَتْ করে পড়েছেন। আর বাকি কারীগণ তাকে مُتِمٌّ অর্থাৎ تَنْوِيْن সহকারে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা যা সে বলেছিল– হে বনী ইসরাঈল!' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ তুমি তোমার উম্মতকে হযরত ঈসার সেই ঘটনা শুনাও যখন তিনি বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! তাওরাতে বর্ণিত গুণাবলি সম্বলিত সেই রাসূল আমিই।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর মতো 'হে আমার জাতি' না বলার কারণ হলো, হযরত ঈসার বনী ইসরাঈলের সাথে কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, সে কারণেই তিনি হে বনী ইসরাঈল! বলে সম্বোধন করেছেন।

আয়াতে يٰقَوْمِ না বলে يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ বলার কারণ : এ প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.) يٰقَوْمِ বলেননি; বরং يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ বলেছেন, এর কারণ এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে বনী ইসরাঈলগণের কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না, তাই তিনি يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ বলেছেন। আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। –[কাবীর]

قَوْلُهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ : অর্থাৎ "সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের যা আমার পূর্বে এসেছে।" মুফাস্সিরীনে কেরামের মতে, এ বাক্যটির তিনটি অর্থ। এ তিনটি অর্থই এখানে গ্রহণীয় এবং যথাযথ। একটি এই যে, আমি কোনো নতুন ও অভিনব নবী নই। আমি সেই দীন নিয়েই এসেছি যা হযরত মূসা (আ.) নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাওরাত প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে আসিনি; বরং তার সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি। আল্লাহর রাসূলগণ চিরকাল স্বীয় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণ ও প্রকাশ করে থাকেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম। অতএব, তোমরা আমার রিসালাত সম্পর্কে কোনোরূপ সংশয় বা দ্বিধাবোধ করবে তার কোনোই কারণ নেই।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাওরাতে আমার আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তারই বাস্তবরূপে হয়ে আমি এসেছি। কাজেই তোমরা আমার বিরোধিতা তো করতেই পার না; বরং তার পরিবর্তে আমার সম্বর্ধনাই তোমাদের জানানো উচিত। তা এ হিসেবেও যে, অতীত কালের নবী-রাসূলগণ আমার যে আগমন সংবাদ দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, আমি এসে গেছি।

এ বাক্যটি পরবর্তী বাক্যসমূহের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় একটি অর্থ নির্গত হয়। আর তা এই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে তাওরাতের দেওয়া সুসংবাদের সত্যতা ও যথার্থতা আমি ঘোষণা করছি এবং আমি নিজেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ শুনাচ্ছি। এ তৃতীয় অর্থের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ.)-এর এ কথাটির ইঙ্গিত সেই সুসংবাদের দিকে যা হযরত মূসা (আ.) নিজ জাতির জনগণকে সম্বোধন করে ভাষণ দান প্রসঙ্গে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন :

"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবেন, তারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করবে, কেননা হোব্রেধে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এ প্রার্থনাইতো করেছিলে– যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বর পুনবার শুনতে ও এ মহাগ্নি আর দেখতে না পাই পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, তারা ভালোই বলেছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করবো ও তার মুখে আমার বাক্য দিবো, আর আমি তাঁকে যা যা আজ্ঞা করবো তা তিনি তাদেরকে বলবেন, আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলবেন, তাতে যে কর্ণপাত না করবে তার কাছে আমি পরিশোধ নিবো।" –[ধর্মপুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ– ১৮:১৫-১৯]

এটা তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এবং এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত অন্য কারো উপর খাটে না। এতে হযরত মূসা (আ.) নিজের জাতির জনগণকে আল্লাহর এ বাণী শুনিয়েছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের মধ্য হতে একজন নবী বানাব। এক জাতির ভাইদের বলে সেই জাতিরই কোনো গোত্র বা বংশ-পরিবার বুঝানো হয়নি; বরং এর অর্থ অপর এমন কোনো জাতি যার সাথে তার নিকটবর্তী বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। স্বয়ং বনী ইসরাঈলের কোনো নবী আগমন সম্পর্কে যদি এ সুসংবাদ হতো, তাহলে বলা হতো– আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদের মধ্য হতে একজন নবী প্রতিষ্ঠিত করবো, কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে 'তাদের জন্য তাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হতে' কাজেই বনী ইসমাঈলীদের ভাই বনী ইসরাঈল-ই হতে পারে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার কারণে তাদের সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। উপরন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী বনী ইসাঈলের অপর কোনো নবী সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না এ কারণেও যে, হযরত মূসা (আ.)-এর পর বনী ইসরাঈল বংশে এ দু'জন নয় বহু সংখ্যক নবী এসেছেন। বাইবেল তাদের উল্লেখে পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

এ পর্যায়ে সুসংবাদে দ্বিতীয় বলা হয়েছে, যে নবী পাঠানো হবে তিনি হযরত মূসার মতো হবেন; কিন্তু আকার-আকৃতি-চেহারা ও জীবন অবস্থার দিক দিয়ে সাদৃশ্যের কথা যে এটা নয়, তাতো সুস্পষ্ট। কেননা এসব দিক দিয়ে দুনিয়ার কোনো দুই ব্যক্তি একই রকম হয় না। নিছক নবুয়ত সংক্রান্ত গুণাবলির সাদৃশ্যও এ কথার উদ্দেশ্য নয়। কেননা হযরত মূসা (আ.)-এর পরে আগত সমস্ত নবীই এ ব্যাপারে অভিন্ন। কাজেই কোনো একজন নবীর এমন কোনো বিশেষত্ব থাকতে পারে না, যে দিক দিয়ে তিনি তার মতো হবেন। এ দু'টি দিকের সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলে তৃতীয় কোনো সাদৃশ্যের বিষয় হতে পারে এবং সেই দিকের বিশেষত্ব তাঁর অনন্য হওয়ার কথা বোধগম্য। আর তা একমাত্র ইহাই হতে পারে যে, সেই নবী এক নবতর স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শরিয়তের বিধান নিয়ে আগমনের ব্যাপারে তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর মতো হবেন। আর এ বিশেষত্ব হযরত মুহাম্মদ ﷺ ছাড়া আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর পূর্বে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যত নবীই এসেছেন, তাঁরা সকলেই হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের কেউই কোনো স্বতন্ত্র শরিয়ত নিয়ে আসেননি।

قَوْلُهُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ الخ : আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের যিনি আমার পর আসবেন, যার নাম হবে আহমদ। উক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পরবর্তী সময়ে আগমনকারী নবীর নামটিও সুসংবাদরূপে শুনিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর নাম হবে আহমদ। আর সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর এক নাম আহমদ বলে প্রমাণিত রয়েছে। মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী গ্রন্থে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (র.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ অর্থাৎ 'আমার নাম মুহাম্মদ, আমার নাম আহমদ ও হাশির।' যুবাইর ইবনে মুতইম হতে ইমাম মালিক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও দারেমীও এ অর্থেরই বহু কয়টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ নাম সুপরিচিত ছিল। হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) -এর কবিতার একটি ছত্র এর সাক্ষী, صَلَّى الْاِلٰهُ وَمَنْ تَحُفُّ بِعَرْشِهٖ * وَالطَّيِّبُوْنَ عَلَى الْمُبَارَكِ اَحْمَدَ . অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর আরশের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত অসংখ্য ফেরেশতা ও সব পবিত্র আত্মা মহা বরকতওয়ালা আহমদের প্রতি দরূদ পাঠিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ঈসা (আ.)-এর ভাষায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করার মধ্যে হিকমত : এতে হিকমত এই যে, তা দ্বারা বনী ইসরাঈলদেরকে এই হেদায়েত দান করা হয়েছে, যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ তশরিফ আনয়ন করবেন, তখন তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করা তোমাদের উপর ফরজ হবে। আর সর্বদা তাঁর আনুগত্য করবে। আয়াতে বর্ণিত শব্দ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ দ্বারা এ বর্ণনা দেওয়া উদ্দেশ্য হতে পারে। তাতে আগমনকারী রাসূলের নাম আহমদ বলা হয়েছে। এটা ব্যতীত হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নাম আরো অনেক ছিল। যেমন- بَشِيْرٌ ، نَذِيْرٌ ، طٰهٰ ، يٰسٓ ، مُزَّمِّلٌ ، مُدَّثِّرٌ ইত্যাদি কুরআনেই উল্লেখ করা হয়েছে। -[মা'আরিফ]

كَمَا قَالَ تَعَالٰى : طٰهٰ - مَآ اَنْزَلْنَا الخ - يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ - يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا -

ইনজীল কিতাবে মুহাম্মদ ﷺ -এর নাম আহমদ বলে উল্লেখ করার কারণ : আরব দেশে পূর্বযুগ হতেই কোনো কোনো ব্যক্তির নাম মুহাম্মদ রাখা হতো। সুতরাং মুহাম্মদ নামে বহু লোকই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু আরবে আহমদ নামের প্রচলন ছিল না, তাই মুহাম্মদ ﷺ-কে অন্যান্য মুহাম্মদ নামক লোকদের হতে مَخْصُوْص করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম 'আহমদ' রাখা হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম বলা প্রসঙ্গে عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ কেন বলেছিলেন? : হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বিশেষ কুদরতের পরিচয় দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কারণ মূলত নিয়ম ছিল মাতাপিতার মিলনের ফলে সন্তান জন্ম হওয়া, যেভাবে সারা বিশ্বের মানবকুল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নীতির পরিবর্তন করেও যে আল্লাহ মূল উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন এটা দেখাবার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-কে পিতাবিহীন অবস্থায় একমাত্র তাঁর মাতা বিবি মরিয়মের গর্ভ হতে সৃজন করেছেন, তাই কেবল মাতার সন্তান বলে মাতার সম্পর্ক ঠিক রেখে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলেছেন।

অথবা, এতে আরবের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আরববাসীদের নিয়ম ছিল সন্তানের সুপরিচিতির উদ্দেশ্যে সন্তানের পিতামাতার মধ্যে সুপরিচিত ব্যক্তির নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানের নাম রাখত, যাতে সন্তানের পরিচিতির ক্ষেত্রে কোনো গণ্ডগোল না হয়। কারণ এক নামে বহু ব্যক্তির নাম রাখা হতো। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.)-কেও তাঁর সুপরিচিতির জন্য মাতার নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে।

অথবা, বনী ইসরাঈলের বংশীয় ইসলাম ও নবীদের শত্রুদের অপবাদ হতে রক্ষা করার জন্যই তাঁকে عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ বলা হয়েছে। কারণ বনী ইসরাঈলগণ বলেছিল اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তিন খোদার তৃতীয় খোদা। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র খোদা, হযরত মরিয়াম (আ.) আল্লাহর স্ত্রী খোদা, আল্লাহ তার স্বামী খোদা, (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) এ অপবাদ হতে বাঁচাবার জন্য এবং হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর নবী এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বুঝানোর জন্য ইবনে মারইয়াম বলা হয়েছে। যাতে কেউ ইবনে আল্লাহ না মনে করে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- যখন হযবত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের নিকট অকাট্য প্রমাণাদি নিয়ে উপস্থিত হলেন তখনই তারা তাকে প্রকাশ্য ধোঁকাবাজের ধোঁকা বলে গালি দিতে লাগল। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার এ আয়াতটির দু' প্রকার তাফসীর বর্ণনা করেন।

এক. হযরত ঈসা (আ.) যখন তাঁর উম্মতবর্গের নিকট তাঁর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণাদি নিয়ে এবং মু'জিযা পেশ করে তাদের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তারা তাদের মু'জিযা ও প্রমাণাদি দেখে বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু বা প্রতারণা মাত্র। আল্লামা শওকানীও এ তাফসীরকে পছন্দ করেছেন।

দুই. যখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের কাছে আসল নিজ নবুয়তের প্রমাণাদি ও মু'জিযা সহকারে, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট প্রতারণা বা জাদু।

قَوْلُهٗ سِحْرٌ : মুফাস্সিরগণ سِحْر -এর অর্থ ধোঁকা বা দাগাবাজি করার অর্থ বলেছেন। سِحْر -এর হাকিকত সম্পর্কে মুফাসসিরীন ও মুহাদ্দিসীনগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

সুতরাং মোল্লা আলী কারী, মু'তাযিলাহ, আবূ জা'ফর ইস্তেবরাদী শাফেয়ী, আবূ বকর রাযী হানাফী, ইবনে হাযম যাহেরী (র.) -এর মতে سِحْر -এর কোনো অস্তিত্বই নেই: বরং এটা এক প্রকার ধারণা মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন- فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ অর্থাৎ তাদের রশি ও লাঠিসমূহ তার প্রতি হাউ হাউ করে তাদের سِحْر -এর কারণে অগ্রসর হয়েছিল। -[ইবনে কাছীর]

ইমাম নববী (র.) বলেন, তার এক প্রকার হাকিকত রয়েছে। একেবারেই বৃথা ও মিথ্যা নয়। জমহুর মুহাদ্দিসীনগণের মতামতও এই। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- اَلْعَيْنُ حَقٌّ অন্য বর্ণনায় বলেন اَلسِّحْرُ حَقٌّ অর্থাৎ চক্ষুর কুদৃষ্টি ও জাদু প্রক্রিয়া সত্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ج وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا (الاية) ও وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ অর্থাৎ বাবেল শহরের হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতা এর উপর যা অবতীর্ণ ... ...। আর তাগার গিরায় ফুঁকদানকারীদের কুকার্য হতে।

শরহে ফিক্‌হে আকবর গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াত يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الخ দ্বারা যেই سِحْر সম্বন্ধে বলা হয়েছিল তা ভিন্ন প্রকারের سِحْر সম্পর্কে বর্ণনা ছিল। মূল سِحْر সম্পর্কীয় আলোচনা সেখানে করা হয়নি।

سِحْر এবং كَرَامَاتْ ও مُعْجِزَةْ -এর মধ্যে পার্থক্য : আল্লামা মাযহারী (র.) বলেন, কার্য ও কথাবার্তায় বিশেষ কোনো নীতির মাধ্যমে আকস্মিক যা ঘটে থাকে, তাকে سِحْر বলা হয়। পক্ষান্তরে مُعْجِزَةْ ও كَرَامَاتْ হঠাৎ বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আকস্মিকভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বে হয়ে থাকে।

আর سِحْر সাধারণত শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে। كَرَامَاتْ ও مُعْجِزَةْ কোনো শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমের অপেক্ষা করে না এবং কোনো বিশেষ কার্যাদির দ্বারা হয় না।

অথবা, জাদু সাধারণ লোকের মাধ্যমে হয়ে থাকে, আর كَرَامَاتْ ও مُعْجِزَةْ অসাধারণ লোক অর্থাৎ مُعْجِزَةْ নবীগণ হতে আর كَرَامَاتْ আওলিয়াগণ হতে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ যে নবী ও ওলী হতে যে সময় যার জন্য প্রয়োজন মনে করেন সে সময় ঐ নবী অথবা ওলী হতে مُعْجِزَةْ ও كَرَامَاتْ প্রকাশ করেন।

আর سِحْر -এর জন্য মোকাবিল আবশ্যক হয়, কিন্তু مُعْجِزَةْ ও كَرَامَاتْ -এর জন্য মোকাবিল আবশ্যক হয় না।

হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারীদের মতে سِحْر -এর কার্য فِسْق এবং শিক্ষা হারাম, কিন্তু কুফরি হবে না।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় অত্যাচারী আর কে হবে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছিল? এরূপ জালিমদেরকে আল্লাহ কখনো হেদায়েত দান করেন না।

আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করার অর্থ আল্লাহর প্রেরিত নবীকে মিথ্যা নবুয়ত দাবিকারী বলে অভিহিত করা এবং নবীর প্রতি আল্লাহর যে কালাম নাজিল হয় তাকে নবীর স্বকল্পিত বলা।

وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ -এ يُدْعَىٰ শব্দটি অপর এক কেরাতে يَا، তে فَتْح এবং دَالْ -এ كَسْرَهْ তাশদীদ দিয়ে এবং عَيْن -এ كَسْرَه দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ يَدَّعِىْ সে দাবি করে, তখন পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে, অথচ সে নিজেকে ইসলামি বলে দাবি করে। এরূপ জালিমকে আল্লাহ কখনো হেদায়েত দান করেন না।

এ কথাটি আশ্চর্য হয়ে বলা হয়েছে সেই লোকদের সম্পর্কে যারা হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের মু'জিযাদি ও প্রমাণাদি দেখার পরও তাদের নবুয়ত অস্বীকার করছে। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ الخ : উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত ওহী আগমন বন্ধ ছিল। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ অন্যান্য মুশরিক ও কাফেরদের নিকট ফুটিয়ে তুলল যে, তোমরা একটি সুসংবাদ শুন এই যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে ধর্মমত নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর নিকট সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদি সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর জাগতিক পথ রহিত হয়ে গেছে। এতে তাঁর কার্য খতম হয়ে যাবে। এখনই বুঝা যাবে কি করতে পারে। আল্লাহর আলোর পূর্ণতা এখানেই শেষ। এ কথাগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে ব্যথার সঞ্চার হলো, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ الخ নাজিল করেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللّٰهِ : অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিক, কাফেরগণ নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে অর্থাৎ ইসলামকে নির্বাপিত করতে চায়। অর্থাৎ দুনিয়া হতে চিরতরে বিদায় করতে চায়।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, যেসব লোক কুরআনকে জাদু বলে ইসলামকে বাতিল করতে চায় তাদেরকে সেই লোকের সাথে তুলনা করে যে স্বীয় মুখের ফুৎকারে সূর্যের আলোকে নির্বাপিত করতে চায়, তাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হয়েছে। -[কাবীর]

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ "আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো তিনি তাঁর নূরকে অর্থাৎ ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ও প্রসারিত করবেন-ই, কাফেরদের পক্ষে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।"

অর্থাৎ গোটা বিশ্বে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিয়ে, দীনে ইসলামকে অন্যান্য দীনের উপর দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা বা ক্ষমতা দ্বারা বিজয়ী করে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ও প্রসারিত করবেন। যেমন এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য জমিনকে একত্রিত করে দিয়েছিলেন, তখন আমি মাশরিক-মাগরিব [পূর্ব-পশ্চিম] সবই দেখেছি। আমার জন্য যতটুকু একত্রিত করা হয়েছিল সেসবের উপর অচিরেই আমার উম্মতের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। [মুসলিম] অর্থাৎ এ দীন অচিরেই পূর্ব-পশ্চিমে পৌছে যাবে।

আয়াতে আল্লাহর নূরের অর্থ : উক্ত আয়াতে نُوْرَ اللّٰهِ -এর মুফাস্‌সিরগণ কর্তৃক বিভিন্ন তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে।

১. نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা قُرْاٰن উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তখন অর্থ হবে- يُرِيْدُوْنَ اِبْطَالَ الْقُرْاٰنِ وَتَكْذِيْبَهٗ তারা আল্লাহর কুরআনকে বাতিল ও মিথ্যা বলতে চায়।

২. অথবা, نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা ইসলামকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তখন এর অর্থ সুদ্দী (র.)-এর মতে এই যে, তারা ইসলামের আওয়াজকে নিজ মুখেই উড়িয়ে দিতে চায়- يُرِيْدُوْنَ دَفْعَةَ الْكَلَامِ

৩. অথবা, نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য ছিল। যাহহাক (র.) বলেন, তখন অর্থ হবে- يُرِيْدُوْنَ هَلَاكَهٗ بِالْاَرَاجِيْفِ হঠাৎ তাঁকে নিধন করতে চেয়েছেন।

৪. অথবা, نُوْرَ اللّٰهِ দ্বারা حُجَجُ اللّٰهِ وَ دَلَائِلُهٗ উদ্দেশ্য হবে, হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, তখন অর্থ হবে- يُرِيْدُوْنَ اِبْطَالَهَا بِاِنْكَارِهِمْ وَتَكْذِيْبِهِمْ। অর্থাৎ তারা আল্লাহর নূরকে মিথ্যা সাব্যস্ত ও অস্বীকার করে বাতিল করতে চায়।

৫. ইবনে ইসা (র.) বলেন, তা একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কেউ তা নির্বাপিত করতে চায় তখন সূর্যরশ্মির মতো তাকে নির্বাপিত করা কখনো সম্ভব নয়। তদ্রূপ যে তাকে বাতিল প্রমাণ করতে চাইবে তার পক্ষে বাতিল বলে একে প্রমাণ করা কস্মিনকালেও সম্ভব হবে না। (জামাল) আল্লাহ যে নূরের পরিপূর্ণতার মূলেই রয়েছেন তা কে নিধন করবে?

قَوْلُهُ تَعَالٰى هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ .... الْحَقِّ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনিইতো নিজের রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সর্বপ্রকারের দীনের উপর বিজয়ী করে দেন। তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হোক না কেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে কুরআন আর সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন সেই দীন অন্যান্য ধর্ম যেমন- ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের উপর বিজয়ী হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজ হলো দীন ইসলামকে বিজয়ী করা, দীন ইসলামের বিজয় কয়েক রকমের হতে পারে।

Free @ www.eilm.weebly.com

১. **সামরিক ও প্রশাসনিক জয় :** অর্থাৎ ইসলামপন্থিরাই ইসলামি বিধি-বিধান মতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কুরআন আর সুন্নাহ-ই হবে সেই রাষ্ট্রের সংবিধান। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে, খুলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগে এবং তারপরও এভাবে ইসলাম বিজয়ী ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেবল ইসলামি বিধান মতোই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল, পরে বিভিন্ন কারণে ইসলাম আর বিজয়ী থাকেনি। অদূর ভবিষ্যতেও ইসলাম আবার বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যেই ইসলামের বিজয়ী হওয়ার আলামত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভবিষ্যদ্বাণী হলো–

اِنَّ اَوَّلَ دِيْنِكُمْ نُبُوَّةً وَ رَحْمَةً ، وَتَكُوْنُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اَنْ تَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ ، ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ - تَكُوْنُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيًّا فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَكُوْنَ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ ؛ ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ تَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ، وَيَلْقِى الْاِسْلَامَ بِجِيْرَانِهِ فِى الْاَرْضِ يَرْضٰى عَنْهَا سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَاتَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرٍ اِلَّا صَبَّتْهُ مِدْرَارًا وَلَا تَدَعُ الْاَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا وَلَا بَرَكَاتِهَا شَيْئًا اِلَّا اَخْرَجَتْهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

২. **মূলভিত্তি ও যুক্তিগত বিজয় :** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ হতে আজ পর্যন্ত ইসলামের এ বিজয় রয়েছে, কারণ ইসলামে কুরআনের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী, ইসলামি আকীদা ত্রুটিহীন এবং ইসলামি শরিয়তের ভিত্তি ও শাখা-প্রশাখা দুর্বলতাহীন।

ক. কুরআনের প্রতিটি আয়াত মুতাওয়াতির সনদে প্রাপ্ত। কুরআনে আজ পর্যন্ত কোনো রকমের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃতি সংঘটিত হয়নি। কুরআনের কোনো বক্তব্য বিজ্ঞানের ও সহীহ যুক্তির পরিপন্থি বলে প্রমাণিত হয়নি।

খ. ইসলামের আকীদা যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থি নয়, যেমন খ্রিস্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদে, ইহুদি ধর্মের আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসে এবং অন্যান্য ধর্মের পৌত্তলিকতায় দেখা যায়।

গ. ইসলামি শরিয়ত এমন অনেক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা অন্যান্য বিধানে নেই। যেমন–

১. ইসলামি শরিয়ত আল্লাহ প্রদত্ত, তাই তাতে কোনো বিশেষ শ্রেণি বা দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই।

২. ইসলামি শরিয়ত আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক উন্নয়নের পূর্ণ ব্যবস্থা সম্বলিত।

৩. দৃঢ় মূল ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. সহজ ও পালনীয়।

৫. ব্যক্তি ও জামাতের সমানভাবে স্বার্থ রক্ষাকারী।

৬. সব যুগে এবং সব সমাজে বাস্তবায়ন যোগ্য।

এ সব কারণেই ইসলাম আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের উপর বিজয়ী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। আর এ কারণেই সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। মানুষ স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করছে। অসংখ্য অমুসলিমও এটা স্বীকার করছে।

সুতরাং ইসলাম বিজয় হওয়া মানে দুনিয়া হতে অন্যান্য ধর্ম বিদায় গ্রহণ করা নয়। বিজয়ী হওয়া মানে ইসলামের প্রাধান্য থাকা, ইসলামপন্থিদের প্রাধান্য থাকা। –[কুরতুবী] দলিল-প্রমাণে বা শক্তি-সামর্থ্যে (সাফওয়া) অর্থাৎ মতবাদ হিসেবে অন্যান্য মতবাদের উপর ইসলামের প্রাধান্য থাকায় গোটা দুনিয়ায় আজ ইসলামকে মানবজাতির মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করার আলোচনা হচ্ছে। ধীরে ধীরে হলেও ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। তাই বলা যায় যে, ইসলাম মতবাদ হিসেবে এখনও দুনিয়ায় বিজয়ী রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٠. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ فَكَاَنَّهُمْ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ .

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার প্রতি পথ-নির্দেশ দান করবো, যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি হতে পীড়াদায়ক। অনন্তর যেন তারা বলেছে হ্যাঁ, অতঃপর তিনি বলেন,

١١. تُؤْمِنُوْنَ تَدُوْمُوْنَ عَلَى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ خَيْرٌ لَّكُمْ فَافْعَلُوْهُ .

১১ তোমরা ঈমান আনয়ন করবে ঈমানের উপর স্থিতিশীল থাকবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে, তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞাত হও যে, তা তোমাদের জন্য উত্তম। তবে তোমরা তা করো।

١٢. يَغْفِرْ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ اَيْ اِنْ تَفْعَلُوْهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط اِقَامَةٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

১২. আল্লাহ ক্ষমা করবেন এটা উহ্য শর্তের জবাব। অর্থাৎ যদি তোমরা তা কর, তবে ক্ষমা করবেন তোমাদেরকে তোমাদের পাপসমূহ এবং তোমাদের প্রবিষ্ট করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত ও স্থায়ী জান্নাতের উত্তম নিবাসসমূহে স্থায়ী।

١٣. وَ يُؤْتِكُمْ نِعْمَةً اُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ط نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ .

১৩. আর তোমাদেরকে দান করবেন নিয়ামত অপর একটি যা তোমরা ভালোবাস। আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয় আর মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দান করো। সাহায্য ও বিজয় সম্পর্কে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تُؤْمِنُوْنَ فِي التَّرْكِيْبِ : আখফাশ বলেছেন, تُؤْمِنُوْنَ শব্দটি তারকীবে تِجَارَةٌ শব্দের عَطْف بَيَان হয়েছে। আল্লামা শওকানী (র.)-এর মতে, তাকে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَهْ [যা পূর্বের বর্ণনাকারী] হিসেবে গ্রহণ করাই উত্তম। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يَغْفِرْلَكُمْ : يَغْفِرْلَكُمْ শব্দ مَجْزُوْم হওয়ার দু'টি কারণ বলা হয়েছে।

১. تُؤْمِنُوْنَ-এর মধ্যে যে اَمْر উহ্য রয়েছে তার জবাব হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে।

২. يَغْفِرْلَكُمْ শব্দটি شَرْط مَحْذُوْف-এর জওয়াব হওয়ার কারণে مَجْزُوْم হয়েছে সেই شَرْط টি হলো اِنْ تُؤْمِنُوْا অর্থাৎ اِنْ تُؤْمِنُوْا يَغْفِرْلَكُمْ।

قَوْلُهٗ تُؤْمِنُوْنَ : জমহুর তাকে تُؤْمِنُوْنَ পড়েছেন; কিন্তু ইবনে মাসউদ তাকে اٰمِنُوْا وَجَاهِدُوْا অর্থাৎ শব্দ দু'টিকে اَمْر হিসেবে পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

يَغْفِرْ لَكُمْ-এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ** : জমহুর একে إِدْغَامْ হীন পড়েছেন; কিন্তু কোনো কোনো লোক رَاءْ-কে لَامْ-এর মধ্যে إِدْغَامْ করে পড়েছেন। আল্লামা শওকানী (র.)-এর মতে إِدْغَامْ হীন পড়াই উত্তম। কারণ رَاءْ হলো حَرْفُ مُتَكَرَّرْ সুতরাং لَامْ-এর মধ্যে তাকে إِدْغَامْ করা সমুচিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ الخ : আয়াতের শানে নুযূল :

ক. আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ হুযূর ﷺ -কে লক্ষ্য করে আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যদি আমরা অবগত হতে পারতাম যে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম কার্য কোনটি তবে আমরা তা অবশ্যই করতে থাকতাম। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

খ. আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছিলেন যে, এটা হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.)-এর ক্ষেত্রে নাজিল হয়েছিল। অর্থাৎ ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.) একদা রাসূলে কারীম ﷺ-এর অনুমতি চেয়ে প্রার্থনা করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ যদি আপনি অনুমতি প্রদান করেন তবে আমি স্বীয় স্ত্রী খাওলা (রা.)-কে তালাক দিয়ে দিবো এবং সর্বদা দিনে রোজা রাখবো এবং রাত্রি ভরে ইবাদতে মশগুল থাকবো, খাসি হয়ে যাবো, বৈরাগ্যতা অবলম্বন করবো, গোশত খাওয়া চিরদিনের জন্য আমার উপর হারাম করে দিবো। এটা শুনে মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে বললেন, আমার নীতি হলো, বিবাহ করা, আর ইসলাম কোনো বৈরাগ্যতাকে পছন্দ করে না। এটার পর ওসমান ইবনে মাযঊন (রা.)-কে হুযূর ﷺ বলেছিলেন- اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنْ اُمَّتِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ مِنِّيْ অর্থাৎ বিবাহ করা আমার সুন্নত, সুতরাং যে আমার সুন্নতের বরখেলাফ করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথবা উম্মত নয়। -[সাবী] [কাবীর গ্রন্থকারের মতে উক্ত আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনাকারী মুকাতিল ও ইবনে আব্বাস (রা.)।]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... تُنْجِيْكُمْ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসার কথা বলবো যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আজাব হতে রক্ষা করবে?"

এখানে যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে সে ব্যবসা হলো আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ব্যবসা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেছেন- اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ "আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন।" এর প্রমাণ মিলে تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ উক্তির মধ্যে। ব্যবসা হলো কোনো বস্তুর বিনিময়ে অন্যকোনো বস্তু গ্রহণ করা। ব্যবসা যেরূপ ব্যবসায়ীকে দারিদ্র্যের কষ্ট হতে মুক্ত রাখে, ঠিক তেমনি এ ব্যবসা অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদও মানুষকে আল্লাহর আজাব হতে মুক্ত রাখবে। -[কাবীর]

ব্যবসা এমন জিনিস যাতে মানুষ নিজের মূলধন, সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখানে ঈমান ও আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে 'তিজারত' বা ব্যবসা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এ পথে নিজের সর্বস্ব নিয়োজিত করলেই সেরূপ মুনাফা লাভ করতে পারবে যার কথা এর পরে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ..... كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- তোমাদের অশেষ লাভবান হওয়া ব্যবসার একটি স্তর হলো তোমরা আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাঁর রাসূল ﷺ -এর রিসালাত ও নবুয়তের উপর অকাট্য বিশ্বাস রাখবে। নিজেদের মাল ও প্রাণ দিয়ে হলেও ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলায় দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করো। কারণ এ ব্যবসা দুনিয়ার প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম। যদি তোমরা জ্ঞান ও বোধশক্তি রাখ।

উক্ত আয়াতে اِيْمَانٌ وَمُجَاهِدٌ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ-কে ব্যবসা বলা হয়েছে, কেননা যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছু সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে সম্পদ লাভ হয় সেভাবেই ঈমান বহাল রেখে আল্লাহর পথে প্রাণ ও সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন স্থায়ী নিয়ামত অর্জন হয়। -[মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

تُؤْمِنُوْنَ وَتُجَاهِدُوْنَ-কে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বলা হলো কেন? : তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, تُؤْمِنُوْنَ وَتُجَاهِدُوْنَ দ্বারা যে কাজ করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ অনুসরণ করার প্রতি আবশ্যকতা বুঝাবার জন্যই جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ ব্যবহার করা হয়েছে। −[মাদারেক]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, জিহাদ তিন প্রকার : ১. جِهَادٌ بِالْهَوٰى অন্তরের সাথে জিহাদ করা, এটাই সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। অর্থাৎ মনকে কু-প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখা। ২. جِهَادٌ بِالْخَلْقِ আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সাথে জিহাদ করা ও তাদের উপর দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। ৩. جِهَادٌ مَعَ عَدُوِّ اللّٰهِ আল্লাহর শত্রুদের সাথে জিহাদ করা। তা হলো আল্লাহর দীন রক্ষার্থে জান-মাল কুরবানি করা। −[কাবীর]

قَوْلُهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : এর অর্থ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেন। একটি অর্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ২. দ্বিতীয় অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা তোমাদের জন্য তোমাদের জানমাল হতে উত্তম। ৩. তৃতীয় তোমদেরকে ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করা তোমাদের জন্য এ জীবনের সবকিছু হতে অধিক উত্তম। −[ছাওরী]

ঈমানদার লোকদের ঈমান আনার নির্দেশ দানের হেতু কি? : ঈমানদার লোকদেরকে 'ঈমান আন' বলা হলে স্বতই তার অর্থ হয়, 'খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও'। ঈমানের শুধু মৌখিক দাবিকেই যথেষ্ট মনে করো না, বরং যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছ, সেই জিনিসের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হও।

قَوْلُهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ (الاية) : আলোচ্য আয়াতটি পূর্বোক্ত আয়াত تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ যে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ তার জাবাব, কারণ তা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ হলেও কিন্তু اَمْرٌ বা নির্দেশের অর্থ দান করে। অর্থাৎ তার অর্থ হলো– তোমরা আল্লাহর উপর ঈমন আনো, আর আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যদি তোমরা তা কর, তাহলে (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যে সবের তলদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত এবং চিরকাল অবস্থিতির জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন। এটা বিরাট সাফল্য। −[কাবীর]

এটা আলোচ্য ব্যবসার আসল লাভ। এটা পাওয়া যাবে পরকালের চিরন্তন জীবনে। একটি হলো, আল্লাহর আজাব হতে নিষ্কৃতি পাওয়া ও সুরক্ষিত থাকা। দ্বিতীয় হলো গুনাহ-খাতার ক্ষমা লাভ। আর তৃতীয় হলো, আল্লাহর সেই জান্নাতে প্রবেশ যার নিয়ামতসমূহ অশেষ ও অবিনশ্বর।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاُخْرٰى ...... وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ الخ : اُخْرٰى ও نِعْمَةٌ-এর বিশেষণ, অর্থাৎ পরকালে আল্লাহর আজাব হতে নিষ্কৃতি গুনাহ ক্ষমা ও জান্নাত তো পাওয়া যাবেই, ইহকালেও এমন একটি নগদ নিয়ামত পাওয়া যাবে যা তোমরা পছন্দ করবে। সেই নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।

اُخْرٰى শব্দটিকে ফাররা এবং আখফাশ تِجَارَةٌ শব্দের উপর عَطْف হিসেবে مَحَلًّا مَكْسُوْر বলে দাবি করেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে "তোমাদেরকে অন্য আর একটি নিয়ামতের কথা কি বলবো, যা তোমরা আখেরাতের ছওয়াবের সাথে ইহকালে চাইবে? সেই নিয়ামত হলো আল্লাহর সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়।"

পরকালের নিয়ামতের আলোচনার পর ইহকালীন নিয়ামতের আলোচনার হিকমত : পরকালের জীবনে যে ফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ সর্বপ্রথম করা হয়েছে, এরপর দুনিয়ার জীবনে যে ফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ দুনিয়ার বিজয় ও সাফল্য আল্লাহ তা'আলার একটি অতি বড় নিয়ামত হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনদের নিকট গুরুত্ব এটার নয়; বরং পরকালীন সাফল্যই তাদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও কাম্য। সুতরাং পরকালীন সাফল্যের উল্লেখ আগে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

فَتْحٌ قَرِيْبٌ বলে কোন বিজয় বুঝানো হয়েছে? : 'নিকটবর্তী বিজয়' বলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে পারস্য এবং রোম রাজ্যের বিজয় বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ মক্কা বিজয় বলে দাবি করেছেন। আর কোনো কোনো মুফাস্সির দুনিয়ার যে কোনো নিয়ামত ও বিজয় এর উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। আমাদের মতে দুনিয়ার যে কোনো বিজয় হতে পারে। কারণ পূর্বে আখেরাতের নিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। তার মোকাবিলায় দুনিয়াবী নিয়ামতের আলোচনা প্রসঙ্গে فَتْحٌ قَرِيْبٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দুনিয়ার যে কোনো বিজয়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ لِدِيْنِهِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ كَمَا كَانَ الْحَوَارِيُّوْنَ كَذٰلِكَ الدَّالُّ عَلَيْهِ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اَيْ مَنِ الْاَنْصَارُ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ مَعِيْ مُتَوَجِّهًا اِلٰى نُصْرَةِ اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ وَالْحَوَارِيُّوْنَ اَصْفِيَاءُ عِيْسٰى عم وَهُمْ اَوَّلُ مَنْ اٰمَنَ بِهِ وَكَانُوْا اِثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحُوْرِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوْا قَصَّارِيْنَ يَحُوْرُوْنَ الثِّيَابَ يُبَيِّضُوْنَهَا فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِعِيْسٰى وَقَالُوْٓا اِنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ لِقَوْلِهِمْ اِنَّهُ ابْنُ اللّٰهِ رَفَعَهُ اِلَيْهِ فَاقْتَتَلَتِ الطَّائِفَتَانِ فَاَيَّدْنَا قَوَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الطَّآئِفَتَيْنِ عَلٰى عَدُوِّهِمْ الطَّائِفَةِ الْكَافِرَةِ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ غَالِبِيْنَ .

১৪. হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও তাঁর দীনের জন্য। এক কেরাতে اَنْصَارُ اللّٰهِ শব্দটি اِضَافَتْ -এর সাথে পঠিত হয়েছে। যদ্রূপ হাওয়ারীগণ এরূপ ছিল, যেমন পরবর্তী বাক্য তাই নির্দেশ করছে ঈসা ইবনে মারইয়াম হাওয়ারীগণকে বলেছিলেন, আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী কে? অর্থাৎ সে সাহায্যকারী কারা, যারা আমার সঙ্গী হবে আল্লাহর সাহায্যকারী হিসেবে। হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হাওয়ারী হলো, হযরত ঈসা (আ.)-এর নির্বাচিত শিষ্যমণ্ডলী। তারাই প্রথম তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল। তাঁরা সংখ্যায় ছিল বারোজন। حَوَارِيّ শব্দটি حُوْر হতে নিষ্পন্ন, আর তা হলো নির্ভেজাল সাদা। মতান্তরে তারা ধোপা ছিল, যারা কাপড়কে ধৌত করে সাদা করত। অতঃপর বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে একদল ঈমান আনয়ন করল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি। আর তারা বলে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁকে আকাশে জীবিতাবস্থায় উত্থিত করা হয়েছে। অপর একদল কুফরি করেছে যেহেতু তারা বলত, ঈসা আল্লাহর পুত্র, যাকে তিনি নিজের নিকট উত্থিত করেছেন। অতঃপর উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে অনন্তর আমি সাহায্য করেছি শক্তিশালী করেছি ঈমানদারদেরকে, দুই দলের মধ্য হতে তাদের শত্রুগণের উপর। কাফির দলের উপর। ফলে তারা বিজয়ী হয়েছে ظَاهِرِيْنَ শব্দটি غَالِبِيْنَ অর্থে ব্যবহৃত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَمَا قَالُوْا : كَمَا قَالُوْا শব্দে অবস্থিত ك বর্ণটি একটি مَصْدَرٌ مَحْذُوْفٌ -এর صِفَتْ হয়েছে। যার تَقْدِيْر হলো, كُوْنُوْا كَوْنًا كَمَا قَالَ আর কেউ কেউ এ كَافْ -কে একটা فِعْل উহ্য মেনে مَحَلًّا مَنْصُوْب বলে মনে করেছেন।

–[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর সাহায্যকারী হও।" ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, 'এ আয়াতে তুলনা অর্থের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে' অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও যেমন হাওয়ারীগণ আল্লাহর সাহায্যকারী ছিলেন।" –[কাবীর]

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এখানে কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে যখন সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকুলের উপর অনির্ভরশীল, মুখাপেক্ষীহীন, সকলই তাঁর উপর নির্ভরশীল ও তাঁর মুখাপেক্ষী, তখন কোনো বান্দার পক্ষে তাঁর সাহায্যকারী হওয়া কিরূপে সম্ভবপর? এ প্রশ্নের জবাবদান ও এ সমস্যার সমাধান কল্পে আমরা এখানে আরো অধিক ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজের ব্যাপারে তাঁর কোনো বান্দার সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং এ লোকদেরকে সে কারণে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে মূলত এ কথা সত্য নয়– বস্তুত জীবনের যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নিজে মানুষকে কুফর ও ঈমান, আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানি করার স্বাধীনতা দান করেছেন সেসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা জবরদস্তিমূলকভাবে তাদেরকে ঈমানদার ও অনুগত বানান না, বরং তাঁর নবী-রাসূল ও নিজের প্রেরিত কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে সত্য দীনের পথে পরিচালিত করার জন্য উপদেশ-নসিহত শিক্ষাদান, বুঝানো ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করেন। এ উপদেশ-নসিহত শিক্ষাদানকে যে লোক নিজের সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা-আগ্রহে কবুল করে সে মু'মিন। যে লোক কার্যত অনুগত হয়, সে মুসলিম, আবিদ ও 'কানিত'। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে সে মুত্তাকী ব্যক্তি। যে লোক নেক আমলসমূহের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায় সে মুহসিন। আর এসব হতেও এক কদম সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যে লোক এ শিক্ষাদান ও উপদেশ-নসিহতের সাহায্যে আল্লাহর বান্দাগণের সংশোধন বিধানের জন্য এবং কুফর ও ফাসিকীর পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করতে শুরু করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের 'সাহায্যকারী' বলে অভিহিত করেছেন।

এ ধরনের লোকদেরকে 'আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী' না বলে 'আল্লাহর সাহায্যকারী' বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে– এটার দ্বারা তারা দীনের কাজে আরও বেশি অগ্রসর ও অনুপ্রাণিত হোক।

হাওয়ারী অর্থ ও তারা কারা? তাদের সংখ্যা কত ? : হওয়ারী حَوَارِيٌّ শব্দটি মূল حَوْرٌ হতে উৎপত্তি অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ, (مُخْلِصٌ) প্রকৃত বন্ধু, মুরুব্বি ইত্যাদি। ধোপাকে হাওয়ারী বলা হয়, যেহেতু তারা কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে তোলে। খাঁটি ও অমিশ্রিত জিনিসকেও হাওয়ারী বলা হয়, তখন বলা হবে এরা খাঁটি প্রকৃতভাবে মূসা (আ.)-এর উপর ঈমানদার।

আর যে আটা হতে চালনি দিয়ে ভূষি বের করা হয়, তাকে حُوَارَى (হুয়ারা) বলা হয়; সুতরাং এ দৃষ্টিতে নিঃস্বার্থ ও অকৃত্রিম বন্ধুকে এবং সমর্থক বা সাহায্যকারীকেও হাওয়ারী বলা হয়।

ইবনে সাইয়েদাহ বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সাহায্য করে, সে তার হাওয়ারী। –[লিসানুল আরব]

হাওয়ারীগণ সংখ্যায় বারোজন ছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর خَاصٌ খাদেম ও বন্ধুসুলভ লোক ছিলেন। যখন হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলদের নাফরমানি ও জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে নিরাশ অবস্থায় বলে উঠলেন, হে মানব সকল! আল্লাহর পক্ষ হয়ে আমার সাহায্যকারী কেউ হতে পারবে কি? যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে? এবং আমার সহানুভূতি করবে? তখন উক্ত বারোজন বলল, আমরাই আপনার সাহায্যকারী। সুতরাং তারাই হযরত ঈসা (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিল এবং সত্যকে প্রচার ও প্রকাশ করতে লাগল। কিছু সংখ্যক ঈমান আনয়ন করল, আর কিছু লোক কাফেরই রয়ে গেল। মোটকথা, ধর্মীয় ব্যাপার ও পার্থক্যতার ভিত্তিতে পরস্পর যুদ্ধ বাঁধল এবং শত্রুতা বেড়ে গেল। সর্বশেষ আল্লাহর পক্ষই জিতল।

আর হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর ঈমানদারগণের মধ্যেও তিন দল হয়ে গেল।

১. একপক্ষ বলল, نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ হযরত ঈসা (আ.) খোদা ছিলেন। কিছু দিনের জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন। অতঃপর পুনরায় নিজ বাসস্থানে চলে গেলেন।

২. আর একপক্ষ বলল, তিনি খোদা ছিলেন না; বরং খোদার পুত্র ছিলেন كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللّٰهِ পিতার আহ্বানে চলে গেলেন। -[উক্ত দুই দল কাফের হয়ে গেল]

৩. আর একপক্ষ আহলে হক ছিল। যারা বলতেন, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ছিলেন, মাখলুকাতের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন। যেভাবে অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ আগমন করেছেন। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর হেফাজতের উদ্দেশ্যে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। কাফের পক্ষ কিছু কাল পর্যন্ত সত্যবাদী পক্ষের উপর বিজয়ী রইল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেন, তখনই উক্ত কাফের পক্ষের উপর ঈমানদারগণ বিজয় লাভ করেন। -[খাযেন ও মাদারেক কাবীর]

হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতগণের মধ্যেই যুদ্ধ বেঁধেছিল আর তাদের ধর্মে এটা বৈধ ছিল কি? : এটার উত্তরে কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর তার উম্মতের মধ্যে দুপক্ষ হয়ে গেল। একপক্ষ হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা বা খোদার পুত্র বলে মুশরিক হয়ে গেল, অপর পক্ষ প্রকৃত ঈমানের উপর স্থায়ী রইল। অতঃপর হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিশ্বাসী ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধল এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত ঈমানদার উম্মতগণের জয় তাঁর কাফের উম্মতগণের উপর হলো। তবে এ মত স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মে জিহাদ ও হত্যার নির্দেশ ছিল না। তাই ঈমানদারগণের যুদ্ধ করার কথা কঠিন মনে হয়। -[রুহুল মা'আনী]
তবে এটা হতে পারে যে, যুদ্ধের সূচনা কাফের নাসারাগণের পক্ষ থেকে হয়েছে। ঈমানদারগণ তখন তাকে প্রতিরোধ করতে অপারগ হয়ে গেলেন। এ মর্মে বুঝলেন উম্মতে ঈসা (আ.)-এর মু'মিনগণ যুদ্ধ করেছিলেন, এ কথা সাব্যস্ত হয়ে যায় না। -[মা'আরিফ]

তাশবীহ দানের জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর কথা কেন উল্লেখ করা হলো? : এর কারণ–

১. যেহেতু হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মত সম্পর্কে কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আলোচনা হয়েছে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে আলোচনা করলে বা উদাহরণ দিলে সহজবোধ্য হবে।

২. অথবা, হতে পারে বনী ইসরাঈলগণ যেহেতু আল্লাহর নিকট মূলত অধিক প্রিয় ছিল, সুতরাং প্রিয়পাত্রদের নাফরমানি অসহনীয়, তদ্রূপ উম্মতে মুহাম্মদীয়াহও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়, এদের নাফরমানিও অসহনীয় হবে। সুতরাং তারা যেন এ উদাহরণ শুনে হুঁশিয়ার হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَآمَنَتْ طَّائِفَةٌ .... فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল, অন্য আর একদল কুফরি করল, অতঃপর আমরা ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম। আর তারাই বিজয়ী হয়ে থাকল।" আয়াতের আলোচ্য অংশের এক তাফসীর জালালাইনে করা হয়েছে। এটার অপর এক তাফসীর হলো, হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন আসমানে তুলে নেওয়া হলো, তখন তাঁর উম্মত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল বলল, তিনি খোদা ছিলেন, অতঃপর তিনি উঠে গেছেন। এদেরকে ইয়াকূবিয়া বলা হয়। আর একদল বলল, খোদার সন্তান ছিলেন, খোদা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। এদেরকে নাস্তূরিয়া বলা হয়। আর একদল বলল, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন– এরাই হলেন মুসলিম। এসব দলের সাথে আরো অনেক লোক ভিড়ল। কাফির দল দু'টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এবং তাদেরকে দেশ হতে বিতাড়িত করল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন পর্যন্ত তারা নির্যাতিত ও নির্বাসিত ছিলেন, অতঃপর তারা কাফেরদের উপর বিজয়ী হলেন। এটাই হলো "ঈমান গ্রহণকারীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম" উক্তিটির তাৎপর্য। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর সত্যতা বিধানের মাধ্যমে হযরত ঈসার প্রতি সত্যিকারের ঈমান আনয়নকারীদের বিজয় হলো। সুতরাং এ বিজয় দলিল প্রমাণের মাধ্যমেই বিজয়, অস্ত্রের বলে নয়। এটা যায়েদ ইবনে আলীর অভিমত। -[কাবীর]
কেউ কেউ বলেছেন, ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার জানিয়েছে ইহুদিরা এবং ঈমান এনেছে খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয়ই। আর আল্লাহ তা'আলা উভয় জাতিকে মসীহর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকারকারী লোকদের উপর বিজয়ী করেছেন। এ কথাটি এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদেরকে এ কথার বিশ্বাস করানো যে, অতীতে যেভাবে হযরত ঈসার প্রতি ঈমানদার লোকেরা তাঁকে অমান্যকারী লোকদের উপর বিজয়ী হয়েছিল অনুরূপভাবেই এখন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমানদার ও তাঁর অনুসারী লোকেরা তাঁর অমান্যকারী লোকদের উপর বিজয়ী হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ : সূরা আল-জুমুআহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : নবম আয়াতের অংশ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ হতে এ সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে। এ সূরায় জুমার সালাতের বিধানও উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু এটাতে আলোচিত বিষয়াদির দৃষ্টিতে 'জুমু'আহ' এটার সামষ্টিক শিরোনাম নয়. অন্যান্য সূরার মতো এখানেও একটি চিহ্ন হিসেবেই এ নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত; ১৮০টি বাক্য এবং ৭৪৮টি অক্ষর রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং বনী ইসরাঈল জাতিকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِىْ اسْمُهٗ اَحْمَدُ

আর অত্র সূরা মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রেরিত হওয়ার কথা ইরশাদ হয়েছে যে- هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ الخ

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার প্রথম রুকূর আয়াতসমূহ ৭ম হিজরিতে নাজিল হয়েছে। আর সম্ভবত এটা 'খায়বার' বিজয়কালে কিংবা তারপর নিকটবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে জারীর (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা নবী করীম ﷺ -এর দরবারে বসা অবস্থায় ছিলাম, সে সময়ই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। আর ইতিহাস হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হোদায়বিয়া সন্ধির পর ও খায়বার বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ইবনে হিশামের বর্ণনানুযায়ী খায়বার বিজয় ৭ম হিজরির মহররমে আর ইবনে সা'দের বর্ণনানুযায়ী (ঐ বছরের) জামাদিউল আউয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব, অনুমান করা যায়, ইহুদিদের এ সর্বশেষ প্রাণকেন্দ্র জয় করার পরই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধনপূর্বক এ আয়াতসমূহ নাজিল করে থাকবেন; কিন্তু এটা নাজিল হয় তখন, যখন খায়বার-এর পরিণতি দেখে উত্তর হিজাযের সমস্ত ইহুদি বসতিগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গিয়েছিল।

সূরার দ্বিতীয় রুকূর আয়াতসমূহ হিজরতের পর নিকটবর্তী সময়ে নাজিল হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ মদীনা শরীফ উপস্থিত হয়েই প্রথম দিনে জুমার সালাত কায়েম করেছিলেন, তা স্পষ্ট বলছে যে, জুমা কায়েম হওয়ার ধারাবাহিকতা শুরু হওয়ার পর তা অবশ্যই এমন কোনো সময় সংঘটিত হয়ে থাকবে যখন লোকেরা দীনি সভা সম্মেলনের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দা তখন পর্যন্ত পুরামাত্রায় শিক্ষালাভ করতে পারেনি।

এ দুই রুকূ'র আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার সময়কালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও একটি বিশেষ সম্পর্ক সামঞ্জস্যের কারণে তা এ সূরায় শামিল করে দেওয়া হয়েছে। আর তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের জন্য 'সাবত' বা শনিবারের মোকাবিলায় মুসলমানদেরকে জুমা দান করেছেন। তিনি মুসলমানগণকে সাবধান করে দিতে ইচ্ছা করেছেন যে, তারা যেন জুমার সঙ্গে সেরূপ আচরণ না করে যা ইহুদিরা করেছে সাবতের সঙ্গে। এ রুকূ'র আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল এবং তারা ঢোল-বাদ্যের আওয়াজ শুনা মাত্র বারোজন লোক ছাড়া উপস্থিত সমস্ত মুসল্লি মসজিদে নববী হতে বের হয়ে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের দিকে দৌড়ে গিয়েছিল। অথচ এ সময় রাসূলে কারীম ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এ কারণেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, জুমার আজান হওয়ার পর সর্ব প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সব ব্যস্ততা সম্পূর্ণ হারাম। এ সময় সমস্ত কাজ-কর্ম পরিহার করে আল্লাহর জিকির-এর জন্য দৌড়ে যাওয়া ঈমানদার লোকদের কর্তব্য। তবে সালাত শেষ হওয়ার পর নিজেদের কায়-কারবার চালাবার জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার অধিকার তাদের রয়েছে। জুমার সালাত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম সমন্বিত এ রুকূ'টিকে একটি স্বতন্ত্র সূরাও বানানো যেত। কিংবা অন্য কোনো সূরায়ও তাকে শামিল করে দেওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু তা করা হয়নি। তার পরিবর্তে বিশেষভাবে এ আয়াত কয়টিকে এখানে সে আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ইহুদিদের মর্মান্তিক দুঃখময় পরিণতির কার্যকারণ উল্লেখ করে তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এটার অন্তর্নিহিত মূলকথা যা তাই আমরা উপরে লিখেছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : অত্র সূরার দু'টি রুকূ' রয়েছে এবং উভয় রুকূ' ভিন্ন ভিন্ন সময় নাজিল হয়েছে, তাই আলোচ্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। এ দু'টি অংশের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্যও রয়েছে বলেই এ দু'টি অংশকে একই সূরার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিন্তু এ সামঞ্জস্য কি তা জানবার পূর্বে উভয় অংশের আলোচ্য বিষয় পৃথকভাবেই বুঝবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা অর্থাৎ আসমান জমিনের সকল সৃষ্টি জগতের মতো তোমরা মানবজাতিও তাঁর গুণ কীর্তন বর্ণনা করো।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলি এবং বহু কার্যাদির বিবরণ দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং মানুষকে শিরক, বিদআত, জেনা, হত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি ও মানুষকে কষ্ট প্রদান ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেন। তাঁর এ কার্য সাহাবী ও তাবেয়ীন এবং তৎপরবর্তী আগমনকারীদের জন্য বাস্তবায়ন হবে। এটা আল্লাহর রহমত স্বরূপ।

৫ম আয়াতে আল্লাহ তাওরাতপ্রাপ্ত ইহুদিদেরকে তাদের কিতাবের আহকামসমূহকে বুঝে-শুনেও অবমাননা করার কারণে গাধার সাথে সামঞ্জস্য প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত এবং অসন্তুষ্টির কথা বলেছেন।

৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে সকল ইহুদি আল্লাহর বন্ধু ও প্রিয় পাত্র হওয়ার দাবি করে, তাদের সে দাবি সত্যায়িত করার মৃত্যু কামনা করতে বলা হয়েছে। যেহেতু তাদের অত্র দাবি মিথ্যা ছিল, তাই তারা সে আকাঙ্ক্ষা জাহির করবে না। আল্লাহর এটা অজানা নয়। আর মুহাম্মদ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, তারা মৃত্যু হতে বাঁচতে যতই চেষ্টা করুক, মৃত্যু অবধারিত এটা শুনিয়ে দিন।

শেষ রুকূ'তে জুমার নামাজ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং জুমার আজান দেওয়ার পর যাবতীয় কার্যাদি ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং জুমার দিকে সায়ী করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। আর নামাজান্তে দুনিয়াবী সকল কাজকর্ম হালালের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহর প্রতি তারগীব দেওয়া হয়েছে। কারণ যাবতীয় কাজকর্ম ও ধন-দৌলত হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অতি উত্তম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-জুমু‘আহ্ মদীনায় অবতীর্ণ

إِحْدَى عَشَرَةَ آيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ يُنَزِّهُهُ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فِيْ ذِكْرِ مَا تَغْلِيْبٌ لِلْأَكْثَرِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْمُنَزَّهِ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ فِيْ مُلْكِهِ وَصُنْعِهِ.

১. আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে পবিত্রতা বর্ণনা করে, لِلّٰهِ মধ্যকার ل হরফটি অতিরিক্ত যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অপ্রাণীবাচকের জন্য ব্যবহৃত مَا অব্যয়টিকে সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয়েছে। যিনি অধিপতি, পবিত্র তাঁর শানের অনুপযোগী বস্তু হতে পবিত্র মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় তাঁর রাজত্ব ও সৃষ্টিকার্যে।

٢. هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ الْعَرَبِ وَالْأُمِّيُّ مَنْ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأُ كِتَابًا رَسُوْلًا مِنْهُمْ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهِ الْقُرْاٰنَ وَيُزَكِّيْهِمْ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْقُرْاٰنَ وَالْحِكْمَةَ مَا فِيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ أَيْ وَإِنَّهُمْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ قَبْلَ مَجِيْئِهِ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ.

২. তিনিই প্রেরণ করেছেন উম্মীগণের মধ্যে আরবদের মধ্যে। اَلْاُمِّيُّ এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কোনো কিতাব পড়েনি এবং লিখেনি। তাদের মধ্য হতে রাসূল তিনি মুহাম্মদ ﷺ যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত আবৃত্তি করেন কুরআন। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন তাদেরকে শিরক হতে পবিত্র করেন, আর তাদেরকে শিক্ষা দান করেন কিতাব কুরআন ও বিজ্ঞান তন্মধ্যকার আহকামসমূহ। যদিও اِنْ ছাকীলা হতে খফীফাকৃত, আর তার ইসমটি উহ্য অর্থাৎ وَاِنَّهُمْ ছিল। তারা ইতঃপূর্বে ছিল তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত প্রকাশ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣. وَاٰخَرِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الْاُمِّيِّيْنَ اَىِ الْمَوْجُوْدِيْنَ مِنْهُمْ وَالْاٰتِيْنَ مِنْهُمْ بَعْدَهُمْ لَمَّا لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط فِى السَّابِقَةِ وَالْفَضْلِ وَهُمُ التَّابِعُوْنَ وَالْاِقْتِصَارُ عَلَيْهِمْ كَافٍ فِىْ بَيَانِ فَضْلِ الصَّحَابَةِ الْمَبْعُوْثِ فِيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ بُعِثَ اِلَيْهِمْ وَاٰمَنُوْا بِهٖ مِنْ جَمِيْعِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لِاَنَّ كُلَّ قَرْنٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَلِيْهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فِىْ مُلْكِهٖ وَصُنْعِهٖ .

৩. আর অন্যান্যের জন্য এটা اَلْاُمِّيِّيْنَ -এর প্রতি عَطْف অর্থাৎ তাদের মধ্যে বিরাজকারীগণ এবং পরবর্তীতে আগমনকারীগণ তাদের মধ্যে হতে তা... পরে যারা এখনো لَمَّا অব্যয়টি لَمْ অর্থে ব্যবহৃত। তাদের সাথে মিলিত হয়নি অগ্রবর্তীতা ও সম্মান-মর্যাদা বিবেচনায়। আর তাঁরা হলেন তাবেঈগণ। আর সাহাবায়ে কেরাম যাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন, অন্যান্য যাদের নিকট তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানব ও জিনদের মধ্য হতে যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী তাদের সকলের মোকাবিলায় সাহাবায়ে কেরামদের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য তাবেঈগণের উপর সংক্ষিপ্ত করাই যথেষ্ট। কেননা প্রত্যেক যুগই তৎসংশ্লিষ্ট পরবর্তী যুগ অপেক্ষা উত্তম। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় স্বীয় রাজত্বে ও সৃষ্টিকার্যে।

٤. ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ط النَّبِىَّ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهٗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

৪. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে। আর আল্লাহ সুমহান অনুগ্রহের অধিকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ : জমহুর এ শব্দগুলোকে اَللّٰهِ শব্দের صِفَتْ হিসেবে جَرّ দিয়ে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ بَدَلْ হিসেবে جَرّ দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। আর আবূ ওয়ায়েল ইবনে মাহারেব, আবুল আলীয়া, নসর ইবনে আসেম ও রুবা مُبْتَدَأ مَحْذُوْف -এর خَبَر হিসেবে رَفْع দিয়ে اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ পড়েছেন। -[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَلْقُدُّوْس : জমহুর اَلْقُدُّوْسِ -এর قَاف -এ ضَمَّه দিয়ে পড়েছেন, আর যায়েদ ইবনে আলী قَاف -এ فَتْح দিয়ে اَلْقَدُّوْس পড়েছেন।

قَوْلُهُ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ فِى التَّرْكِيْبِ؟ : لَمَّا يَلْحَقُوْ بِهِمْ বাক্যটি তারকীবে اٰخَرِيْنَ শব্দের صِفَتْ হয়েছে অর্থাৎ আর অন্যান্য বা যারা তাদের সাথে মিলিত হয়নি। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ ... الْحَكِيْمِ : পবিত্র কুরআনে যে সকল সূরা يُسَبِّحُ অথবা سَبَّحَ শব্দ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে, সে সকল সূরাগুলোকে مسبحات (মুসাব্বাহাত) বলা হয়। সে সকল শব্দগুলো দ্বারা আসমান ও জমিনে এবং তার মধ্যবর্তীতেও যত সৃষ্টিকুল রয়েছে, সকলের তাসবীহ পাঠ করার কথা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এ তাসবীহগুলো

কোনো কোনো সৃষ্টি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করে থাকে। আর কোনোগুলো ভাষায় ব্যক্ত করে থাকে। ভাষাহীন ও প্রাণহীনগণ অবস্থায় আল্লাহর প্রভুত্বের উপর ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে। আর প্রাণীজগৎ নিজ নিজ ভাষায় তা প্রকাশ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্য আয়াতে বলেন– وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টিই নিজ নিজ নীতিমালায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে, কিন্তু মানুষ তা সম্পূর্ণ অনুভব করতে অক্ষম। কেননা অনুভূতিশক্তি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার অবস্থা অনুপাতেই দিয়েছেন এবং তার অনুভূতি অথবা জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ বা তাঁকে স্মরণ করা আবশ্যক করে। তবে মানুষ তা শ্রবণ করতে পারে না।

আর অধিকাংশ সূরায় سَبَّحَ শব্দটি مَاضِىْ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাত্র দুটি سُوْرَة অর্থাৎ সূরা জুমু'আহ ও সূরা তাগাবুন -এর মধ্যে يُسَبِّحُ অর্থাৎ مُضَارِعْ ব্যবহার করা হয়েছে। মাযীর صِيْغَه গুলো قَطْعِت এবং يَقِيْن বুঝায়, আর মুযারের صِيْغَه গুলো دَوَام এবং اِسْتِمْرَار বুঝিয়ে থাকে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাযী ব্যবহার করা হয়েছে। আর মাত্র দু' জায়গায় مضارع ব্যবহার করা হয়েছে। –[মা'আরিফ]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ৪টি صِفَاتْ -এর বর্ণনা রয়েছে। এগুলো উক্ত সূরার বিষয়বস্তুর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। তা হলো اَلْمَلِكُ - اَلْقُدُّوْسُ - اَلْعَزِيْزُ - اَلْحَكِيْمُ - اَلْمَلِكُ রাজাধিরাজ, সকল সৃষ্টিকুলের বাদশাহ। (اَلْقُدُّوْسُ) আর মহান পবিত্র, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। (اَلْعَزِيْزُ) বলে আল্লাহকে পরাক্রমশালী বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁর সাথে (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) যুদ্ধ করেও কেউ জয়ী হতে পারবে না। اَلْحَكِيْمُ অর্থাৎ তাঁর সকল কর্তৃত্ব বিবেক-বুদ্ধিসম্মত।

قَوْلُهُ هُوَ الَّذِىْ ..... رَسُوْلًا مِّنْهُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি প্রেরণ করেছেন উম্মীগণের মধ্যে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল। اُمِّىْ অর্থ–লেখাপড়া না জানা লোক। এখানে আরবজাতিকে উম্মী বলা হয়েছে। কারণ আরব জাতির অধিকসংখ্যক লোক লেখাপড়া জানত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিজের অঙ্গুল দ্বারা নির্দেশ করে– মাস এ রকম এ রকম হয়ে থাকে। অতঃপর বলেছেন, আমরা হলাম উম্মী জাতি, হিসাবও জানি না, লিখতেও জানি না। যারা লেখাপড়া জানে না তাদেরকে উম্মী বলা হয়েছে, উম্মুন বা মায়ের উদর হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে। কারণ লেখাপড়া পরিশ্রম করে শেখার পরই জানতে পারে।

এখানে উম্মী বলতে অ-ইসরাঈলীও হতে পারে। কারণ ইহুদিরা তাদের পরিভাষায় অ-ইহুদিদেরকে উম্মী বলত, যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে এ অবিশ্বাস পরায়ণতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলত উম্মীদের (অ-ইহুদিদের) ধনমাল লুটে খাওয়ায় আমাদের কোনো বাধা নেই।

–[সূরা আলে ইমরান : ৭৫]

এ শব্দটি হিব্রু ভাষায় گوىم শব্দের সমার্থবোধক, বাইবেলে তার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে [GENTILES] এটার অর্থ–সমস্ত অ-ইহুদি কিংবা অ-ইসরাঈলী সমাজ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, উম্মী অর্থ যাদের কোনো কিতাব নেই, আর তাদের মধ্যে কোনো নবীও প্রেরিত হয়নি।

–[কাবীর]

رَسُوْلًا مِّنْهُمْ "তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল।" সে রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ। কারণ তিনি আরবের লেখাপড়া না জানা লোকদের মধ্যে একজন যেমন ছিলেন, তেমনি তিনি অ-ইসরাঈলীও।

রাসূল ﷺ -কে উম্মীরূপে প্রেরণ করার হিকমত : আল্লাহ তা'আলা আরবের উম্মী লোকদের জন্য তাদের মধ্য হতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেন, তাদেরকে তিনি আল্লাহর কালাম পড়ে শুনাবার জন্য এবং তাদেরকে শোধরাবার জন্য এবং আল্লাহর কিতাব ও হিকমত, জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। আরবের অশিক্ষিত এ জাতি আল্লাহর কিতাব এবং পবিত্র ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষায় অতি অল্পকালের মধ্যেই জ্ঞানে-গুণে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে সভ্যতা ও ভদ্রতা, নৈতিক আদর্শ ও মানবতায় বিশ্বের সকল জাতিকে ডিঙ্গিয়ে যায়। বিশ্ব সভ্যতায় সর্বশীর্ষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব লাভ করে। اُمِّيِّيْنَ শব্দটি اُمِّىْ -এর বহুবচন, অশিক্ষিত লোকদেরকে উম্মী বলা হয়। আরবের লোকেরা اُمِّىْ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, এমনকি কোনো আসমানি কিতাবও তাদের ছিল না। সামান্য লেখাপড়া জানে, অক্ষর জ্ঞান রাখে, এমন লোকও তাদের মধ্যে বিরল ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আর যে রাসূল প্রেরণ করেছেন তিনিও তাদের মধ্য হতে ছিলেন। অর্থাৎ উম্মী ছিলেন। উম্মী জাতির হেদায়েতের জন্য উম্মী নবী প্রেরণ করা এটা অতি হয়রানকারী বিষয়। আর যে নির্দেশনামা রাসূলের সোপর্দ করা হয়েছে, তা এমন একটি জ্ঞান ও শিক্ষার সংশোধনী যা কোনো উম্মী লোক বুঝতে পারবে না, আর কোনো উম্মী জাতিও তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে না। এটা একমাত্র আল্লাহর কুদরতের পূর্ণাঙ্গ নমুনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর مُعْجِزَه মাত্র।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতার দলিল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়ত ও কুরআনের সত্যতার দলিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মী হওয়া তাঁর নবুয়ত এবং কুরআন আল্লাহর ওহী হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। কারণ তিনি লেখাপড়া জানলে একটা জীবন-বিধান দান করার মধ্যে তেমন আশ্চর্যের কিছু থাকত না; কিন্তু উম্মী হয়েও ইসলামের মতো একটি জীবন-বিধান গোটা মানবজাতির সামনে পেশ করতে পারা, কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ গোটা মানবজাতির সামনে পেশ করে আবার সেখানে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা চাট্টিখানি কথা নয়। তিনি আল্লাহর নবী না হলে কুরআন আল্লাহর কিতাব না হলে অন্য কারো পক্ষে এ রকম জীবন বিধান দেওয়া ও কুরআনের মতো গ্রন্থ লেখা সম্ভব হচ্ছে না কেন? সুতরাং তিনি উম্মী হয়ে প্রমাণ করলেন যে, তিনি আল্লাহর নবী ও রাসূল, আর তাঁর আনীত ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর কিতাব। –[তাফসীরে রূহুল কোরআন]

رَسُوْلًا مِّنْهُمْ উক্তি হতে আরো প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৃষ্টির উপাদান সাধারণ আরবজাতি তথা গোটা মানবজাতির সৃষ্টির উপাদান হতে ভিন্ন কিছুই নয়।

قَوْلُهُ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ .... وَالْحِكْمَةَ : আল্লাহ তা'আলা সে রাসূলের গুণাবলি আর পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছেন, যে তাদেরকে তাঁর [আল্লাহর] আয়াত শুনায়, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়। اٰيَاتٌ অর্থ কুরআনের আয়াতও হতে পারে, আবার নবুয়তের প্রমাণ ও নিদর্শনাবলিও হতে পারে। –[কাবীর]

আর জীবন পরিশুদ্ধ করে অর্থ জীবনকে কুফর ও শিরকের গুনাহ হতে পাক-পবিত্র করে দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটার অর্থ হলো– ঈমান দ্বারা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে দেয়। আর সুদ্দী বলেছেন, وَيُزَكِّيْهِمْ-এর অর্থ হলো– তাদের সম্পদের যাকাত গ্রহণ করেন। –[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া, রূহুল কোরআন]

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ "এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন।" কিতাব অর্থ–কুরআন, কেউ কেউ লিখনও বলেছেন, আর হিকমত অর্থ হলো–সুন্নত বা হাদীস অথবা কুরআনী বিধি-বিধান। –[সাফওয়া, ফতহুল কাদীর]

এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ চারটি গুণাবলি উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো, ইহুদিদেরকে একথা বলা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাজগুলো করছেন তাতো নিঃসন্দেহে একজন রাসূলের কাজ। তিনি যেসব কাজ করছেন সেসব কাজই তো আগেকার রাসূলগণ করেছেন। আর এসব কাজের মাধ্যমেই তো রাসূলগণের রিসালাতের প্রমাণ মিলে। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী মেনে নিতে তোমরা দ্বিধা করছ কেন? আসলে তাকে নবী মেনে নিতে তোমরা কেবল এ কারণে অস্বীকার করছ যে, তিনি এমন এক জাতির মধ্যে আসছেন যাদেরকে তোমরা উম্মী বল। এটা নিঃসন্দেহে চরম হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : উক্ত আয়াতে শব্দসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সাধারণত শব্দের তারতীব অনুসারে প্রথমত তেলাওয়াত (يَتْلُوْا) ও (وَيُعَلِّمُهُمْ) তৎপর তা'লীম এবং শেষে (وَيُزَكِّيْهِمْ) তাযকিয়া শব্দের ব্যবহার করা উত্তম হতো। কারণ يَتْلُوْا . وَيُزَكِّيْهِمْ . وَيُعَلِّمُهُمْ শব্দত্রয়ের وَظِيْفَه طَبْعِيْ এটাই যে, প্রথমত শব্দ শিক্ষা অতঃপর তার অর্থ শিক্ষা এবং পরিশেষে চরিত্র ও আমলের কার্যে নিয়োজিত হতে হয়। অন্যথায় শিক্ষাহীন আমল দ্বারা কোনো উপকৃত হওয়া খুবই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনে হাকীম-এর অধিকাংশ স্থানেই তারতীব পরিবর্তন অর্থাৎ تِلَاوَت وَتَعْلِيْم -এর মাঝে تَزْكِيَه -কে ব্যবহার করা হয়েছে। এটার কারণ কি?

এটার উত্তরে রূহুল মা'আনী ও মা'আরিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি تَرْتِيْب طَبْعِيْ বা সাধারণ নিয়মের অনুসরণ করা হতো, তবে উক্ত তিন শব্দের مَفْهُوْم একই হয়ে যেত এবং বিষয় বুঝা যেত। যেমন হেকিমী গ্রন্থসমূহে কয়েকটি ঔষধের সমষ্টিকে একই ঔষধ বলা হয়ে থাকে এবং একই রোগের শেফা-এর জন্য ঐগুলোকে নির্ধারিত বলে বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, ঠিক এখানেও তদ্রূপ অর্থ। অর্থাৎ تِلَاوَت . تَعْلِيْم . تَزْكِيَه তিনটিই পৃথকভাবে আল্লাহর তিনটি নিয়ামত স্বরূপ, আর তিনটিকেই

Free @ www.e-ilmweebly.com

পৃথক পৃথক فَرَائِض رِسَالَتْ রিসালাতের তিনটি দায়িত্ব বুঝানো হয়েছে। যদি বর্ণিত তারতীব পরিবর্তন করে تَرْتِيْب طَبْعِيْ অনুসারে বলা হয়, তাহলে তিনটির সমষ্টিকে এক বলে বুঝার সম্ভাবনা থাকত এবং আল্লাহর মূল উদ্দেশ্যে আঘাত হতো। সুতরাং বর্ণিত تَرْتِيْب-ই সবচেয়ে উত্তম হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'এর পূর্বে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল, গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।' উক্ত আয়াতটি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের আর একটি প্রমাণ– ইহুদিদের চক্ষু উন্মীলিত করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত পেশ করা হয়েছে। এ লোকেরা শত শত বৎসর ধরে আরবের বিস্তীর্ণ উষর ধূসর প্রান্তরে বসবাস করছিল এবং আরবদের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কোনো একটি দিকও তাদের নিকট গোপন ছিল না। তাদের সে প্রাক্তন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে এখানে বলা হয়েছে যে, মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্বে এ জাতির যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, হে ইহুদিরা, তোমরা তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এ লোকদের কি অবস্থা ছিল, তা তোমরা নিজেরাই দেখতে পেয়েছ। আর ইসলাম গ্রহণের পর তাদের কি অবস্থা হয়েছে, তাও তোমরা দেখতে পেয়েছ। এ সঙ্গে যারা এখনও ইসলাম কবুল করেনি, তাদের অবস্থাও তোমাদের সম্মুখে স্পষ্ট ভাসছে। আর এদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তা একজন অন্ধ লোকও দেখতে পাচ্ছে। এরূপ পার্থক্য সৃষ্টি যে একজন নবীর মহান অবদান ছাড়া সম্ভব নয়, তা তোমাদেরকে বুঝাবার জন্য এটা কি যথেষ্ট নয়? এবং এ পরিবর্তন ও পার্থক্য এতই বিরাট যে, এটার সম্মুখে অতীত নবী-রাসূলগণের কাজও ম্লান হয়ে গেছে।

এ আয়াত দ্বারা রাসূলের নবুয়ত কেবল আরবদের জন্য নির্দিষ্ট বলে দাবি করা শুদ্ধ নয় : ইহুদিরা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত কেবল আরবদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কারণ তাঁকে উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের এ দাবি শুদ্ধ নয়। কারণ কুরআনের অপর আয়াত وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ-এর অর্থ এটা নয় যে, "তোমার ডান হস্তে লিখনি" বাম হস্তে লিখেছ, বরং এটার অর্থ হলো 'তোমার স্বহস্তে কোনো কিতাব লিখনি' ঠিক তেমনি بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ-এর অর্থ কেবল উম্মীদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে– এ অর্থও ঠিক নয়। তোমাদের এ কথার প্রমাণ হলো পরের আয়াত وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর কুরআনের অপর আয়াত যেখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে كَافَّةً لِّلنَّاسِ অর্থ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে গোটা মানবজাতির জন্য। এটা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনী হতেও প্রমাণিত হয়, কারণ তিনি আরব ছাড়া অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠির কাছেও ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আবেদন জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। –[কাবীর] অতএব, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাত কেবল আরবদের জন্য বা অ-ইসরাঈলীদের জন্য একথা বলা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ .....(الْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর (এ রাসূলের আগমন) অন্যান্য সেসব লোকদের জন্যও যারা এখনও তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি। আল্লাহ মহাশক্তিধর এবং সব কিছুর মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত।'

وَاٰخَرِيْنَ বাক্যটিকে اُمِّيِّيْنَ-এর উপর عَطْف করা হয়েছে, অর্থাৎ অন্যান্য সেসব লোকদের জন্য এ রাসূল প্রেরিত হয়েছে যারা ...এ اخرين বাক্যটিকে يُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيْهِمْ শব্দদ্বয়ের هُمْ-এর উপরও عَطْف মনে করা যেতে পারে, তখন আয়াতের অর্থ হবে– এ রাসূল অন্যান্য সেসব লোকদেরকে শিক্ষা দেন এবং পবিত্র করে যারা এখনও বর্তমানদের সাথে মিলিত হয়নি। –[কুরতুবী]

অর্থাৎ ভবিষ্যতে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদেরকেও এ রাসূল শিক্ষা দিবেন, অর্থাৎ তারা যে শিক্ষা পাবে তা রাসূলের শিক্ষা হবে।

হযরত ইকরামা এবং মুকাতিল (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اٰخَرِيْنَ শব্দটি দ্বারা তাবেয়ীনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়। ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে সকলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আমর ইবনে সায়ীদ–ইবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এ শব্দ দ্বারা অনারবদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা আরবদের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে বসা ছিলাম। হযরত সালমান ফারসী (রা.) আমাদের মাঝেই ছিলেন, এমন সময় সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ﷺ আলোচ্য আয়াত পাঠ করলে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আলোচ্য আয়াতে কাদের কথা বলা হয়েছে? নবী করীম ﷺ কোনো জবাব

দিলেন না। লোকটি দুই বা তিনবার একই প্রশ্ন করল, তখন নবী করীম ﷺ হযরত সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে এরশাদ করলেন, যদি ঈমান সূরাইয়া নামক নক্ষত্রের নিকটও থাকে, তবে এ ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কিছু লোক তা অর্জন করবে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পারস্যের কিছু লোক এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। যাদের কথা অত্র আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এবং হাদীস ও তাফসীরের অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, এ ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-কে। –[নূরুল কোরআন]

আয়াতটি কুরআনী মু'জিযা এবং নবুয়তের সত্যতার দলিল : এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অনারব অন্যান্য অনেক জাতি-গোষ্ঠি ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের কয়েক বছর পর কুরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অনেক অনারব জাতি ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলাম গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইসলাম প্রসারের ও প্রচারের এ কথা নিজ থেকে কোনো মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, এ দীনের দাওয়াতের প্রতি তার আস্থা যতই প্রবল হোক না কেন। এটা তখনই সম্ভব হতে পারে, কেবল যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী এমন কোনো উৎস হতে ঘোষিত হয়– যার হাতে সমগ্র ক্ষমতা রয়েছে এবং যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সুতরাং এটা হতে প্রমাণিত হলো– এ ভবিষ্যদ্বাণী কোনো মানুষের নয় বরং মানব স্রষ্টা আল্লাহর। আর এটাও প্রমাণিত হলো যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ও নবী। –[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ .... الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা তাঁর অপার ও অশেষ অনুগ্রহ মাত্র, তিনি যাকে চান, নিজ কৃপায় ধন্য করবেন। তাঁর ফজল, কৃপা ও অনুগ্রহের অন্ত নাই, তিনি মহান অনুগ্রহকারী। অর্থাৎ এমন অসামাজিক ও উম্মী জাতির মধ্যে এমন মহানবী সৃষ্টি করেছেন। যা শিক্ষা ও হেদায়েত অতীব উচ্চ মাত্রার বিপ্লবাত্মক, উপরন্তু তা সার্বজনীন বিশ্বব্যাপক ও চিরন্তন আদর্শের ধারক। তার ভিত্তিতে সমগ্রজাতি একত্রিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হতে পারে এবং সর্বকালে ও সর্বদেশে এসব মূলনীতি হতে মানুষ হেদায়েত লাভ করতে পারে। বস্তুত এটা একমাত্র মহান আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের অবদান। কোনো কৃত্রিমতাকারী মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন এমন মর্যাদা ও সম্মান কিছুতেই লাভ করতে পারবে না। আরবের মতো একটা অনুন্নত ও পশ্চাদপদ দেশে তো দূরের কথা, দুনিয়ার বড় ও উন্নত জাতিরও কোনো সর্বাধিক, প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষেও একটি জাতির এরূপ আমূল পরিবর্তন সাধন করা এবং সমগ্র জাতি একটি সভ্যতার ব্যবস্থায় পরিচালিত হওয়ার যোগ্য হতে পারে, এমন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ মূলনীতিসমূহ দুনিয়াতে উপস্থাপিত হওয়া সম্ভবপর নয়। মূলত এটা একটি মু'জিযা বিশেষ, আল্লাহর কুদরতেই মু'জিযা বাস্তবায়িত হতে পারে।

فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে তাফসীরকারকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. মাদারেক গ্রন্থকার বলেন, فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে তদানীন্তন আরবের উম্মীগণের বংশধর হিসেবে নবী করে পাঠানো, আর তাকে তদীয় উম্মীগণ ও তাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্যও নবী হিসেবে প্রেরণ করে তাদের উপর আল্লাহ যে রহম করেছেন, এটাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

খ. আবার কেউ কেউ বলেন, দীন ইসলাম একমাত্র মানুষের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ এবং ইসলাম গ্রহণ করাও আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই তাঁর অনুগ্রহের শামিল করেন। সুতরাং যাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেছেন, সে জাতির জন্য ইসলাম একটি فَضْلُ اللّٰهِ স্বরূপ।

গ. কেউ কেউ বলেন, فَضْلُ اللّٰهِ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালাত উভয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে এ মতামতটা অধিক পছন্দনীয় বলে মনে হয়। কারণ ইহুদিগণের ধারণা ছিল যে, তারাই কেবল আল্লাহর মনোনীত সম্প্রদায় এবং তারাই নবুয়ত ও রিসালাতের অধিকারী উক্ত আয়াতটি তাদের এ দাবির জবাব স্বরূপ। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহ উম্মীদের মধ্য হতে মনোনীত করেছেন, নবুয়ত ও রিসালাত তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এ নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই পছন্দ করতে পারেন। যেহেতু এতে কোনো জাতির ব্যক্তিগত বা জাতিগত কোনো অধিকার নেই। সুতরাং মুহাম্মদ ﷺ -কেই এ فَضْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ নবুয়ত ও রিসালাতের উপযোগী মনে করে তাঁকে তা দান করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥. مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ كُلِّفُوا الْعَمَلَ بِهَا ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا لَمْ يَعْمَلُوْا بِمَا فِيْهَا مِنْ نَعْتِهٖ ﷺ فَلَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط اَیْ كُتُبًا فِیْ عَدَمِ اِنْتِفَاعِهٖ بِهَا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ط اَلْمُصَدِّقَةِ لِلنَّبِیِّ ﷺ مُحَمَّدٍ وَالْمَخْصُوْصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوْفٌ تَقْدِيْرُهٗ هٰذَا الْمَثَلُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৫. যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তদুপর আমল করায় বাধ্য করা হয়েছে, অতঃপর তারা তা বহন করেনি তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিচিতি ও প্রশংসা বিষয়ে যা কিছু উল্লিখিত আছে, তদুপর আমল করেনি এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করেনি তাদের উদাহরণ সে গর্দভের ন্যায় যে পুস্তক বহন করে অর্থাৎ কিতাবসমূহ, তা দ্বারা তার কোনো উপকার সাধিত না হওয়ার বেলায়। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের উদাহরণ, যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের সত্যতা সাব্যস্ত হয়। এখানে مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ هٰذَا الْمَثَلُ আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না কাফিরদেরকে।

٦. قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ تَعَلَّقَ بِتَمَنِّيْهِ الشَّرْطَانِ عَلٰى اَنَّ الْاَوَّلَ قَيْدٌ فِی الثَّانِیْ اَیْ اِنْ صَدَقْتُمْ فِیْ زَعْمِكُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ وَالْوَلِیُّ يُؤْثِرُ الْاٰخِرَةَ وَمَبْدَؤُهَا الْمَوْتُ فَتَمَنَّوْهُ.

৬. আপনি বলুন, হে ইহুদিগণ! তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু; অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী ব্যতীত, তবে তোমরা মৃত্যু কামান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও মৃত্যু কামনার সাথে উভয় শর্ত সম্পর্কিত। এভাবে যে, প্রথম শর্তটি দ্বিতীয় শর্তের জন্য قَيْد হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের ধারণায় সত্যবাদী হও যে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু, আর আল্লাহর বন্ধুগণ আখেরাতকে অগ্রাধিকার দান করে, যার সূচনা হলো মৃত্যু। সুতরাং তোমরা তা কামনা কর।

٧. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا ۢبِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِیِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِكِذْبِهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢبِالظّٰلِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ.

৭. কিন্তু তারা কখনো তার কামনা করবে না, তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে তাদের মিথ্যাশ্রয়ীতার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি যে অবাধ্যচারিতা সাব্যস্ত হয়, তার কারণে। আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত কাফেরদের সম্পর্কে।

٨. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَيُجَازِيْكُمْ بِهٖ.

৮. আপনি বলুন, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, নিশ্চয় তা এখানে ف হরফটি অতিরিক্ত তোমাদের সাথে সাক্ষাৎকারী। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে গোপন ও প্রকাশ্য। তখন তোমরা যা করেছ তা তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদেরকে তার প্রতিফল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

কিভাবে مَثَلُ -কে بِئْسَ বিশেষণে বিশেষিত করা হলো ? : بِئْسَ বিশেষণটা বাহ্যত مَثَلُ -এর বিশেষণ হলেও তা قَوْم বা জাতির বিশেষণ। যেন বলা হয়েছে بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمًا مَثَلُهُمْ هٰكَذَا অর্থ নিকৃষ্ট 'কাউম' হলো সে 'কাউম' যাদের উদাহরণ এ রকম। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَحْمِلُ : يَحْمِلُ শব্দটি حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب অথবা حِمَارٌ -এর صِفَتْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَجْرُوْر কারণ, এ حِمَار কোনো নির্দিষ্ট 'হেমার' না হওয়াতে نَكِرَة -এর حُكْم তার উপর অর্পিত হতে পারে।

–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : حُمِّلُوْا শব্দটি حُمِّلُوْا অর্থাৎ تَشْدِيْد যুক্ত করে। আর حُمِلُوْا অর্থাৎ تَخْفِيْف করে উভয়ভাবে পঠিত হয়েছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ : فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ -এর মধ্যে فَاء বর্ণের প্রবেশ শুদ্ধ হয়েছে এ কারণে যে, ان -এর اِسْم -এ مُتَضَمِّنْ مَعْنَى الشَّرْطِ হয়েছে। যেন বলা হয়েছে اِنْ فَرَرْتُمْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ কেউ কেউ এ فَاء -কে অতিরিক্তও বলেছেন। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ : জমহুর এ শব্দটিকে فَتَمَنَّوُا অর্থাৎ وَاوْ বর্ণে ضَمَّة দিয়ে পড়েছেন। ইবনে সুমাইকা তাকে فَتْح দিয়ে تَخْفِيْف করে فَتَمَنَّوُا পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বে ইহুদিদের হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের প্রতি ঈমান না আনার কারণ এবং তাদের দারি ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে আলোচনা করার পর তাদের দাবি ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছে সে মূসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাতের সাথেও ভালো ব্যবহার করেনি। তাওরাতের বিধি-বিধান ও শিক্ষা যথার্থভাবে গ্রহণ করেনি, মেনে চলেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে গাধার সাথে তুলনা করেছেন যার পিঠে অনেক বই রক্ষিত আছে কিন্তু সে গাধা সেসব বইয়ের জ্ঞান হতে কিঞ্চিৎও ফায়দা লাভ করতে পারে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَثَلُ الَّذِيْنَ ... الْحِمَارِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যেসব লোককে তাওরাতের ধারক বানানো হয়েছিল কিন্তু তারা তা বহন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত সে গর্দভের ন্যায় যার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।" অর্থাৎ যেসব লোকদের উপর তাওরাত প্রচারের দায়িত্ব এবং তাওরাতের বিধি-বিধান ও শিক্ষা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা না দায়িত্ব পালন করল, আর না তাওরাতের বিধি-বিধান মেনে চলল, বিশেষত তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমন সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট বাণী রয়েছে এবং আগমনের পর তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা মানল না; বরং এ নবীর আগমনের পর সকলের আগে যারা তাওরাতের ধারক-বাহক হয়েও বিরুদ্ধাচরণ করল এবং তাঁর সাথে সর্ব প্রকার শত্রুতা আরম্ভ করল, তাদের উদাহরণ সে গর্দভের ন্যায় যার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা না থাকার কারণে সে ঐসব কিতাব হতে কোনো রকমের ফায়দা হাসিল করতে পারে না; বরং এসব লোকেরা গর্দভের চেয়ে অধম, কারণ এদের জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জেনে-বুঝে এরা জ্ঞানার্জন হতে বিরত থাকছে। –[সাফওয়া, কুরতুবী] অতএব এরা আরো অধম ও নিকৃষ্ট। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থাৎ "এটা হতেও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হলো সেসব লোকেরা যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করে অমান্য করেছে। এ ধরনের জালিম লোককে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না।"

আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করেছে অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনবাণী সম্বলিত তাওরাতের আয়াতসমূহ অমান্য করেছে– হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত অস্বীকার করে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এখানে আয়াত অর্থ পবিত্র কুরআনের আয়াত যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করা। –[রূহুল কোরআন]

অন্যান্য প্রাণীদের বাদ দিয়ে গর্দভকে নির্দিষ্ট করার হিকমত : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এটার পশ্চাতে কয়েকটি হিকমত রয়েছে–

১. এ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে ইহুদি জাতির অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এটা গর্দভকে নির্দিষ্টকরণ দ্বারা অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠে।
২. গাধা একটা নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছিত প্রাণী। এখানে উদাহরণের উদ্দেশ্য হলো, ইহুদি জাতিকে তা দ্বারা লাঞ্ছিত করা। সুতরাং গাধার উদাহরণ পেশ করলেই তা যথোপযুক্ত হয়। অন্য আরেক কারণ হলো, গাধার পিঠে বোঝা বহন করা সহজসাধ্য। কারণ গাধা শান্ত ও বাধ্য প্রাণী, ছোট বড় সকলেই সহজে গাধাকে ব্যবহার করতে পারে। এ কারণেও অন্যান্য প্রাণী বাদ দিয়ে গাধার উদাহরণ পেশ করা হতে পারে।

৩. আরবি ভাষার ছন্দ-মিলের জন্যও হতে পারে। কারণ أَسْفَار আর حِمَارٌ-এর মধ্যে যে ছন্দ-মিল রয়েছে তা بِغَالٌ ও خَيْلٌ ইত্যাদি অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। সুতরাং এখানে এ ছন্দ-মিল ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে حِمَارٌ ব্যবহার করাই উত্তম। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ : كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ-এর অর্থ সাধারণত তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করেছে। অথবা اٰيٰتِ اللّٰهِ দ্বারা তাওরাতে বর্ণিত যে সকল বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলোকে ইহুদিদের অবমাননা করার কথা বলা হয়েছে। যাতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলির বর্ণনাও বিদ্যমান ছিল।

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا الخ আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে তাফসীরে সাবী ও আরো অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইহুদিগণের জোর দাবি ছিল যে, তারাই আল্লাহর পুত্র জাতি ও আল্লাহর প্রিয়তম গোষ্ঠী। আর পরকালে এ জন্যই তারা ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরকালে শাস্তি প্রদান করবেন না, কেবল শান্তির বাগানসমূহ তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবে। তাদের এ উক্তিসমূহকে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করে বলেছেন– وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى الخ. نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ –তাদের এহেন অবান্তর ধারণাসমূহকে বাতিল ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহকে নাজিল করেন, আর মুহাম্মদ ﷺ -এর ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ ..... صٰدِقِيْنَ : নির্লজ্জ ইহুদি জাতি কুফর ও শিরক আর চরিত্রহীনতা ও মূর্খতার কারণে, তারা আল্লাহর একমাত্র প্রিয়তম বান্দা হওয়ার দাবি করার প্রতিউত্তরে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলেন– হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি ইহুদিগণকে বলে দিন যে, তোমাদের ধারণা মতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও যে, কেবলমাত্র তোমরাই আল্লাহর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কেউ আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারী হবে না, তাহলে তোমরা এ দুঃখের মধ্যে কেন বসবাস করছ? এ কষ্টময় সংসারের ঝামেলায় কেন মরছ? বরং মৃত্যুর সদর পথে সোজাসুজি স্বর্গে চলে যাওয়ার জন্য মৃত্যু কামনা করো, যাতে অতিসত্বর পৃথিবীর ঝামেলা হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারবে। স্বর্গ সুখ যার ভাগ্যে সুনিশ্চিত সে দুঃখের সাগরে কি করে পড়ে থাকতে পারে। স্বর্গে প্রবেশের সদর দ্বার মৃত্যুর মধ্যেই তোমাদের দাবির সত্যতা প্রকাশ পাবে। আল্লাহর প্রিয়পাত্র যথা অলী-আবদাল, পয়গাম্বরগণ প্রভুর প্রেমে উদ্বুদ্ধ চিত্তে দ্রুত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় মৃত্যু কামনায় কুণ্ঠাবোধ করে না। মৃত্যুর পেয়ালা মধুর সুরার চেয়েও তাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا বলে সম্বোধন করার হিকমত : এখানে 'হে ইহুদিরা' বলা হয়নি– বলা হয়েছে 'হে লোকেরা যারা ইহুদি হয়ে গেছে' কিংবা যারা ইহুদিবাদ গ্রহণ করেছ। এরূপ বলার নিশ্চয়ই একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং তা অবশ্যই অনুধাবনীয়। এরূপ বলার কারণ হচ্ছে– হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে দীন নিয়ে এসেছেন মূলত তা দীন ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয়। এ নবী-রাসূলগণের মধ্যে কেউই ইহুদি ছিলেন না। ইহুদিবাদ বলতে তাঁদের সময়ে কোনো ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। এ নামের একটা ধর্ম বহু পরবর্তী কালের ফসল, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার বংশের সম্পর্ক দেখে এ ধর্মের নাম ইয়াহুদ বা ইহুদি রাখা হয়েছে। হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পর রাষ্ট্র যখন দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন এ বংশের লোকেরা ইহুদিয়া নামক রাষ্ট্রের মালিক ও অধিপতি হয়েছিল। আর বনী ইসরাঈলের অপর গোত্রসমূহ নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করে নিয়েছিল। সে রাষ্ট্রটি সামেরিয়া নামে খ্যাত হয়েছিল। উত্তরকালে আসিরিয়ারা শুধু সামেরিয়াকে ধ্বংস করেনি; বরং এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ইসরাঈলী গোত্রের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত নিঃশেষ করে ফেলেছিল। অতঃপর কেবল মাত্র ইয়াহুদ ও এর সঙ্গে বিন ইয়ামীন-এর বংশই অবশিষ্ট থেকে গেল। এর উপর ইয়াহুদ বংশের অধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকার কারণে তার জন্য শেষ কালে ইহুদি শব্দটি ব্যবহৃত হতে লাগল। এ বংশের পাদ্রী-পুরোহিত, রাব্বী ও আহবাররা নিজেদের চিন্তা-মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ঝোঁক-প্রবণতা অনুযায়ী আকিদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ও ধর্মীয় নিয়ম প্রণালীর যে খোলস শত শত বছরকাল ধরে তৈরি করেছিল তার নামই ইহুদিয়াত বা ইহুদিধর্ম। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক হতে এটা গঠন শুরু হয় এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এটা গঠন হতে থাকে। মূলত আল্লাহর নবী-রাসূলগণের নিয়ে আসা হেদায়েতের খুব অল্প উপকরণই এতে শামিল হয়েছে। তার মূল প্রকৃতি অনেকখানি বিকৃত হয়ে গেছে। এ কারণে কুরআন মাজীদে বহু কয়টি স্থানে তাদেরকে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا 'যারা ইহুদি হয়েছে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত সব লোকই ইসরাঈলী ছিল না। যেসব অ-ইসরাঈলী ইহুদি ধর্মমত গ্রহণ করেছিল তারাও এতে গণ্য হতে লাগল। কুরআন মাজীদে যেখানে বনী ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে 'হে বনী ইসরাঈল' বলা হয়েছে, আর যেখানে ইহুদি ধর্মের অনুসারী লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেখানে اَلَّذِيْنَ هَادُوْا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۤءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ : আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমাদের যদি এ আত্ম-অহঙ্কার থেকে থাকে যে, অন্যান্য সব লোককে বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহর 'আহলাদের দুলাল'....।"

Free @ www.eilm.weebly.com

এখানে ইহুদি জাতির আত্ম-অহঙ্কার ও অহমিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত ও বাছাইকৃত সম্প্রদায় বলে দাবি করে তাঁর বন্ধুত্ব ও বিশেষ অনুগ্রহের হকদার ভাবত। তারা কখনোও বলত نَحْنُ اَبْنَآءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ "আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।" [আল-মায়িদা-১৮] আবার কখনো বলত لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا "ইহুদি ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" [আল-বাক্বারা-১১১] আবার কখনো বলত لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ "দিন কতেক ব্যতীত আমাদের অগ্নি স্পর্শ করবে না।" -[আলে-ইমরান ২৪]

ইহুদিদের নিজেদের কিতাবসমূহেও এ ধরনের অনেক দাবির কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তারা যে নিজেদেরকে আল্লাহর বাছাই করা লোক شَعْبُ اللّٰهِ الْمُخْتَارُ [Chosen people] মনে করে, অন্তত এতটুকু কথা তো সারা দুনিয়ার লোকদেরই জানা আছে। আল্লাহর সাথে তাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক অন্য কোনো জনগোষ্ঠির সাথে নেই। তাদের এ ধরনের আত্মম্ভরিতার কথাও কারো অজানা নয়। -[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهٗ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗ .... عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এরা কক্ষণই মৃত্যু কামনা করবে না, তারা যেসব কার্য-কলাপ করেছে সে কারণে। আর আল্লাহ এ জালিম লোকদেরকে খুব ভালো করেই জানেন।" অর্থাৎ তারা যে আল্লাহর কিতাবের যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন করেছে, যে বিধান ও আয়াত তাদের মনঃপূত নয় তা গোপন করেছে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত অস্বীকার করেছে, এসব কারণে তারা কখণও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ মৃত্যুর পরে এসব অপকর্মের কারণে কি কি শাস্তি ভোগ করতে হবে তা তাদের ভালো করেই জানা আছে। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, তাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করবে না, কারণ তারা জানত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সত্য নবী। সুতরাং তারা জানত যে, যদি তারা মৃত্যু কামনা করে তাহলে সাথে সাথেই তাদের মৃত্যু ঘটবে। এটা রাসূল ﷺ-এর একটি মু'জিযা। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, মৃত্যু কামনা করলে কোনো ইহুদি না মরে দুনিয়ার বুকে বাকি থাকত না। -[রূহুল মা'আনী]

মৃত্যু কামনার হুকুম : হাদীস শরীফে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর হায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং যখনই যার হায়াত শেষ হয়ে যাবে তখনই তার মৃত্যু হবে। যদি কেউ কোনো কঠিন বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করে তাহলে যদি তখনই তার মৃত্যু নির্ধারিত না থাকে, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির বহির্ভূত কাজ হবে। এতে আল্লাহ নারাজ হবেন। যেমন হুযূর ﷺ বলেন- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَمَنّٰى اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَاِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَسْتَعْتِبَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ যদি সে নেক বান্দা হয়, তবে নেক বৃদ্ধি করতে পারছে। আর যদি গুনাগার হয়, তবে সে মৃত্যুর পর হয়তো ক্ষতির সম্মুখীন হবে। -[বুখারী]

وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ ﷺ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهٗ فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যেন বিপদে পতিত হওয়ার কারণে কিছুতেই মৃত্যুকামানা না করে। যদি সে একান্তই বলতে চায়, তাহলে যেন বলে- হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জীবন ধারণ সুখকর হয়, কল্যাণকর হয় ততদিন আপনি আমায় হায়াত দান করুন। আর যখন আমার মৃত্যু মঙ্গলজনক হয় তখন আপনি আমার জীবন নাশ করুন। -[বুখারী ও মুসলিম]

মৃত্যু হতে পলায়ন করার অর্থ : মৃত্যু হতে পলায়ন করার অর্থ হলো মৃত্যুর নির্দেশের সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করা। অথবা যে সকল কার্য করতে গেলে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে, সে সকল কার্যে নিয়োগ হতে অস্বীকার করা। যেমন- جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আর মৃত্যুকে ভয় করাও فِرَارٌ مِنَ الْمَوْتِ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ .... فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ (اَلْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "[হে মুহাম্মদ তুমি] তাদেরকে বলো, যে মৃত্যু হতে তোমরা পালাচ্ছ তা তোমাদের নিকট আসবেই। অতঃপর তোমরা সে মহান সত্তার নিকট উপস্থিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন, আর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন তা সবই যা তোমরা করছিলে।" অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত বিকৃতির ফলে যে মৃত্যু হতে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ সে মৃত্যু অবশ্যই আসবে, পালাতে পারবে না। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কর্মই দেখানো হবে। অর্থাৎ তোমরা তাওরাতের যেসব আয়াত ও বিধান প্রচার-প্রকাশ করেছ তা এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত যে আয়াতগুলো এবং অন্তরের যে বিশ্বাস তোমরা গোপন করেছ সবই তোমাদের সামনে উপস্থিত করা হবে, অতঃপর সেসব অপকর্মের সাজা দেওয়া হবে। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৯. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ بِمَعْنٰى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا فَامْضُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ اَيِ الصَّلٰوةِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ط اَيْ اُتْرُكُوْا عَقْدَهٗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ خَيْرٌ فَافْعَلُوْهُ .

৯. হে ঈমানদারগণ! যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় জুমার দিনে এখানে مِنْ অব্যয়টি فِيْ অর্থে ব্যবহৃত। তখন তোমরা ধাবিত হও গমন করো আল্লাহর স্মরণের প্রতি অর্থাৎ সালাতের প্রতি। এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করো তা সংঘটন ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞাত হও যে, তা উত্তম, তবে তোমরা তা করো।

১০. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ اَمْرُ اِبَاحَةٍ وَابْتَغُوْا اَيْ اُطْلُبُوا الرِّزْقَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ تَفُوْزُوْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدِمَتْ عِيْرٌ وَضُرِبَ لِقُدُوْمِهَا الطَّبْلُ عَلَى الْعَادَةِ فَخَرَجَ لَهَا النَّاسُ مِنَ الْمَسْجِدِ غَيْرَ اِثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَ .

১০. অনন্তর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এটা মুবাহ সাব্যস্তকারী আদেশ। আর অন্বেষণ করো অর্থাৎ জীবিকার সন্ধান করো আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্য হতে। আর আল্লাহকে স্মরণ করো স্মরণ করো অধিক পরিমাণে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। কৃতকার্য হও। রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন, এ সময় বণিকদের একটি কাফেলা মদীনায় উপস্থিত হলো। আর প্রথানুযায়ী বাণিজ্য কাফেলার আগমন বার্তা ঘোষণা করে তবলা বাজানো হলো। তখন বারোজন লোক ব্যতীত সমস্ত লোক মসজিদ হতে বের হয়ে গেল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১১. وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا اَيِ التِّجَارَةَ لِاَنَّهَا مَطْلُوْبُهُمْ دُوْنَ اللَّهْوِ وَتَرَكُوْكَ فِي الْخُطْبَةِ قَآئِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ . يُقَالُ كُلُّ اِنْسَانٍ يَرْزُقُ عَائِلَتَهٗ اَيْ مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

১১. যখন তারা কোনো ব্যবসায়ী কাফেলা কিংবা কৌতুকপ্রদ বস্তু দেখে, তখন তারা তার প্রতি ছুটে যায় অর্থাৎ ব্যবসার প্রতি, যেহেতু তা-ই তাদের লক্ষ্য, কৌতুক নয়। আর আপনাকে ত্যাগ করে খুতবার মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায়। আপনি বলুন, আল্লাহর নিকট যা আছে ছওয়াবের মধ্য হতে তা উত্তম যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদের জন্য। কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকা দানকারী। বলা হয়ে থাকে যে, মানুষ তার পরিবার-পরিজনকে জীবিকা দান করে অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া জীবিকা হতে।

Free@www.eelm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا نُوْدِىَ .... يَوْمِ الْجُمُعَةِ : اِذَا হলো حَرْف شَرْط আর نُوْدِىَ হলো فِعْل مَجْهُول এবং مِنْ হলো فِىْ -এর অর্থে অর্থাৎ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ; এ রকম অপর আয়াতেও مِنْ ـ فِىْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ فِى الْاَرْضِ -

আবুল বাকারের মতে مِنْ শব্দ تَبْعِيْضِيَّة -ও হতে পারে। তাফসীরে কাশ্শাফে এই مِنْ -কে اِذَا -এর بَيَانْ এবং تَفْسِيْر বলা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। সহীহ মত হলো এটাকে فِىْ -এর অর্থ নেওয়া।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا : اُذْكُرُوْا হলো فِعْل اَمْر আর وَاوْ হলো তা فَاعِل আর اَللّٰهَ শব্দটি مَنْصُوْب একে সূরা ذِكْرًا كَثِيْرًا হবে تَقْدِيْرِىْ عِبَارَتْ যার صِفَتْ -এর مَفْعُول مُطْلَق এক উহ্য كَثِيْرًا আর عَلَى التَّعْظِيْمِ تَأَدُّبًا আহযাবে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

قَوْلُهُ تَعَالٰى مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ : জমহুর جِيْم এবং مِيْم -এ ضَمَّه দিয়ে مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ পড়েছেন। যুহরী, আ'মাশ جِيْم -এ ضَمَّه আর مِيْم -এ سَاكِنْ যুক্ত করে جُمْعَة পড়েছেন, এটা তামীম গোত্রের لغة অনুযায়ী। আবুল আলীয়া, নাখয়ী جِيْم -এ ضَمَّه দিয়ে مِيْم -এ فَتْح দিয়ে جُمَعَه পড়েছেন। মোদ্দাকথা হলো, جُمُعَة -তে সর্বমোট তিন لُغَة রয়েছে।

قَوْلُهُ "وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا" : قَائِمًا শব্দটি حَال হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب আর সাহেবে حَال হলেন নবী করীম ﷺ যার দিকে وَتَرَكُوْكَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত ইবারত হলো- تَرَكُوْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ حَالَ كَوْنِكَ قَائِمًا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের বিষয়বস্তু : আলোচ্য আয়াতসমূহ এবং তার পরবর্তী আয়াতে জুমার নামাজের বিধি-বিধান, আদব-কায়দা ও নিয়ম-নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য ঘোষণা দেওয়া হবে তখন আল্লাহর জিকির -এর দিকে দৌড়াও এবং বেচাকেনা পরিত্যাগ করো। এটা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জান।" সালাতের ঘোষণা দ্বারা আজান বুঝানো হয়েছে যা সারা দুনিয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য প্রত্যেকটি মসজিদে দেওয়া হয়। তবে এখানে দ্বিতীয় আযান যা খতীব মিম্বরের উপর বসার পর তাঁর সামনে দেওয়া হয় তা বুঝানো হয়েছে। কারণ রাসূল ﷺ -এর যুগে এ দ্বিতীয় আযান ছাড়া অন্য কোনো আযান জুমার নামাজের পূর্বে দেওয়া হতো না। রাসূল ﷺ মিম্বরের উপর উপবেশন করলেই হযরত বেলাল (রা.) মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর যুগেও এ নিয়ম চালু ছিল। হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি মানুষকে জমায়েত করার উদ্দেশ্যে 'যাওরা' নামক বাজারের এক বাড়িতে আজান দিতে নির্দেশ দেন, আবার ইমাম মিম্বরের উপর বসার পর দ্বিতীয়বার তার সামনে আজান দিতে বলা হয়। -[রূহুল কোরআন, ফাতহুল কাদীর, কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ : আয়াতে বর্ণিত نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ দ্বারা দ্বিতীয় আজান অর্থাৎ ইমাম সাহেব খুতবা প্রদানের সময় মিম্বারের উপর বসা অবস্থায় যে আজান দেওয়া হয়, তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে কেবল মাত্র খুতবা -এর আজানই দেওয়া হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাত্র একজন মুয়াজ্জিন ছিল, যখন তিনি মিম্বারের উপর উপবেশন করতেন তখন মসজিদের দরজায় মুয়াজ্জিন আজান দিয়ে দিত। অতঃপর যখন মিম্বার হতে নেমে যেতেন, তখন নামাজ আরম্ভ করতেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর, ওমর (রা.)-এর যুগ এমনিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে যখন মানুষ অধিকতর ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হলো, আর যোগাযোগের সমস্যা দেখা দিল, এমতাবস্থায় হযরত ওসমান (রা.) زوراء নামক স্থানে প্রথমবারের মতো আর একটি আজান দেওয়ার প্রথা চালু করলেন। সে আজান শুনে সকলেই নামাজের প্রতি দৌড়ে আসল। তবে কেউ কোনো কথা সমালোচনা করেননি। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) মিম্বারে দণ্ডায়মান হওয়ার পর তাঁর সম্মুখে পুনরায় আজান দেওয়া হলো। কিন্তু কেউই এতে দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাসূলে কারীম ﷺ -এর বর্ণিত হাদীস শরীফের عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ -এর উপর আমল করলেন। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, আয়াতে نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ দ্বারা খুতবা-এর আজান উদ্দেশ্য। আর হানাফীগণের মতে প্রথম আজান উদ্দেশ্য। –[ইবনে আবী শায়বা কাবীর- হাশিয়ায়ে জালালাইন]

يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলে জুমার দিনের নামকরণ করার কারণ : জুমার দিনকে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলে নামকরণ করার কারণ হচ্ছে- উক্ত দিনটি মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার দিন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একত্রিত হওয়ার জন্য উক্ত দিনটি নির্ধারিত করেছিলেন। সুতরাং প্রতি সপ্তাহে এ দিনটি একত্রিত বা মিলনের দিন। পূর্ববর্তী উম্মতগণের এ ভাগ্য হয় না, কেননা ইহুদিগণ শনিবারকে তাদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন নির্ধারিত করেছিল, নাসারাগণ রবিবারকে ধার্য করেছিল। উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আল্লাহ তা'আলা শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ঈদের দিন নির্ধারিত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে এ মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

অজ্ঞতার যুগে শুক্রবারকে (يَوْمُ عَرُوْبَةَ) বলা হতো। সর্বপ্রথম কা'ব ইবনে লুয়াই নামক এক ব্যক্তি এ দিনকে জুমা বলে নাম দিয়েছেন। আর কুরাইশগণও উক্ত দিনে একত্রিত হতো এবং কা'ব ইবন লুয়াই তাদেরকে সম্বোধন করে খুতবা পেশ করতেন এবং এটা রাসূল ﷺ -এর আগমনের ৫০০ পাঁচ শত বছর পূর্বেকার ঘটনা ছিল।

কা'ব ইবনে লুয়াই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দাদাবর্গের লোক ছিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি জাহেলিয়াতের যুগেও মূর্তি পূজা হতে রক্ষা পেয়েছেন, একত্ববাদের তৌফিক অর্জন করেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর অবির্ভাবের সু-সংবাদ মানুষকে শ্রবণ করিয়েছেন। কুরাইশ বংশে তাঁর বিশেষত্ব এমন ছিল যে, যদিও তিনি রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাবের ৫৬০ পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন তথাপিও তার মৃত্যুর সময়কাল হতে তা ঐতিহাসিকগণ গণনা করতে থাকে। আরবে প্রথমত বায়তুল্লার প্রথম ভিত্তির সময় হতে ঐতিহাসিক সন-গণনা করা হয়েছিল, পরে কা'ব বিন লুয়াই এর মৃত্যুকাল হতে ঐতিহাসিক সন গণনা করা শুরু হয়। অতঃপর যখন এর ঘটনাটি ঘটে গেল তখন সে ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সন গণনা আরম্ভ হলো। মূল কথা হলো, ইসলামের পূর্বে কা'ব ইবনে লুয়াই -এর সময়কাল হতেই। আরবে জুমার দিনের গুরুত্ব ছিল। –[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর হিজরতের পূর্বেই মদীনার আনসারগণ জুমার فَرْضِيَّتْ নাজিল হওয়ার পূর্বে থেকেই সেদিনের এহতেমাম করে উক্ত দিনের ইবাদত করা ও সকলের একত্রিত হওয়ার দিন ধার্য করেছিল। যেমনটি আব্দুর রায্যাক মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। –[মাযহারী]

আর ইবনে খুযাইমাহ হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এ দিনে একত্রিত হয়েছেন, তাই এ দিনকে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলা হয়।

কারো মতে, মহান আল্লাহ ছয় দিনে এ সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ জুমার দিনেই তার পূর্ণতা লাভ করেছে, তাই একে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলা হয়েছে।

জুমার নামাজ কখন ফরজ হয়? : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও আবূ মাসউদ আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা হতে জানা যায় জুমা ফরজ হওয়ার হুকুম হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা শরীফে থাকা কালেই নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নাজিল হয়ে ছিল। কিন্তু তখন তিনি এ হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে পারতেন না। কেননা মক্কা শরীফে তখন সামষ্টিক পর্যায়ে কোনো ইবাদত করা সম্ভবপর ছিল না। এ কারণে যেসব লোক তাঁর পূর্বে মদীনায় পৌছেছিলেন তাদেরকে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, মদীনায় যেন তারা জুমার সালাত কায়েম করে। এ আদেশ অনুযায়ী প্রথম হিজরতকারীদের নেতা হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) বারো জন লোক সঙ্গে নিয়ে মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম জুমার সালাত আদায় করেন। –[তাবারানী, দারে কুতনী]

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (র.) ও ইবনে সীরীন (রা.) বর্ণনা করেছেন, মদীনার আনসারগণ নবী করীম ﷺ -এর নির্দেশ পৌছারও পূর্বে নিজস্বভাবে সপ্তাহে একটি দিন সামষ্টিকভাবে ইবাদত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে তারা ইহুদিদের শনিবার ও খ্রিস্টানদের রবিবার বাদ দিয়ে জুমার দিন বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং বনূ বায়াজা নামক অঞ্চলে হযরত আসয়াদ ইবনে জুরারাহ প্রথম জুমার সালাত কায়েম করেন। এ সালাতে ৪০ ব্যক্তি শরিক হয়েছিলেন।

–[মুসনাদে আহমদ আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, আবদ ইবনে হুমাইদ, আবদুর রায্যাক, বায়হাকী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রাসূলে কারীম ﷺ হিজরতের পর মদীনায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে কয়টি কাজ করেছেন, জুমার সালাত আদায় করা তার অন্যতম। তিনি মক্কা শরীফ হতে হিজরত করে সোমবার দিন মদীনার উপকণ্ঠে 'কুবা' নামক স্থানে উপস্থিত হন। চার দিন তিনি এখানে অবস্থান করেন। পঞ্চম দিন ছিল শুক্রবার। এই দিন সেখান হতে মদীনায় রওয়ানা হয়ে যান। পথে বনূ সালেম ইবনে আউফ গোত্রের বসতিতে উপনীত হলে জুমার সালাতের সময় উপস্থিত হলো। আর এখানে, তিনি প্রথম জুমার সালাত আদায় কর... –[ইবনে হিশাম]

যিকরুল্লাহ বলতে কোন যিকির উদ্দেশ্য : অধিক সংখ্যক মুফাসসিরগণের মতে "যিকরুল্লাহ" মানে জুমার 'খোতবা'। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এখানে যিকরুল্লাহ বলে নামাজ বুঝানো হয়েছে। –[কাবীর]

আমাদের মতে খোতবা এবং নামাজ উভয়ই বুঝানো হয়েছে। কারণ, খুতবাও জুমার নামাজের অংশ। হযরত ওমর (রা.) জুমার নামাজকে সংক্ষিপ্ত করার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, وَاِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِاَجْلِ الْخُطْبَةِ "জুমার নামাজ সংক্ষিপ্ত [দুই রাকাতের] করা হয়েছে খুতবার কারণে।" সুতরাং খুতবার জন্যও দৌড়ে আসতে হবে। –[আহকামুল কোরআন লিল্ জাস্সাস]

سَعْى শব্দের অর্থ দৌড়ে আসা হলেও এখানে তার অর্থ হলো, গুরুত্ব সহকারে আসা। কারণ নামাজের জন্য দৌড়ে আসতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ : ذَرُوا الْبَيْعَ অর্থ– বিক্রয় বন্ধ করে দাও। উক্ত আয়াতে কেবল ذَرُوا الْبَيْعَ বলে بَيْع শব্দের উপর বর্ণনা ক্ষান্ত করা হয়েছে। شراء শব্দকে উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ হলো بَيْع শব্দটি উল্টো অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ بَيْع وَشِرَاء উভয় অর্থই এ শব্দে নিহিত রয়েছে। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় উভয় কার্য বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে। কারণ বিক্রয় বন্ধ করলে ক্রয় করাও বন্ধ হবে। অর্থাৎ বিক্রয় বন্ধ হওয়ার ফলে ক্রয়ের পন্থা বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জুমার আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় হারাম, এটার ব্যাখ্যা কি? উক্ত আয়াতের উপর আমল করা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের উপর ফরজ। সুতরাং আয়াতের উপর এভাবে আমল করতে হবে যে, যখন আজান দেওয়া হবে, তখনই দোকানসমূহ বন্ধ করে দিবে। তাহলে গ্রাহকগণ ক্রয় করতে আসা বন্ধ করবে কারণ খরিদ্দারগণের কোনো নির্দিষ্ট নেই কে কখন আসবে তাও নির্ধারিত নেই এ কারণে তাদেরকে এ পদ্ধতি ব্যতীত ফিরানো সম্ভব নয়। –[মা'আরিফ]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– জুমার আজান দেওয়ার পর সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয় ও যাবতীয় কাজকর্ম হারাম হবে। জমহুর ও হানাফী মাজহাব অবলম্বনকারী তাফসীরকারকগণের মতে, আজান দেওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে। কেননা আয়াতে নাহী (نَهْى) - عَقْد بَيْع -এর উপর শামিল নয়। আর بَيْع -এর জন্য তা لَازِمْ ও নয়, বরং نَهْى টি خَارِجْ عَنِ الْعَقْدِ -

মালেকীগণ বলেন– নিকাহ, হেবা, সদকা ইত্যাদি ব্যতীত সর্বপ্রকার عَقْد এই সময় ফসখ বা নিষিদ্ধ হবে। তাই যদি বস্তুটি عَقْد -এরপর অথবা সেই সময়ই হাতে বহাল থাকে, তবে তা বিক্রেতাকে فَسْخ بَيْع বা فَسْخ عَقْد -এর কারণে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর বস্তুটি যদি বহাল না থাকে, তবে তার মূল্য বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে।

আতা (র.) বলেন– জুমার দিন প্রথম আজান দেওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় কাজকর্ম, খেলাধুলা, নিদ্রা যাওয়া, স্ত্রী সহবাস করা, লেখাপড়া সবই হারাম হবে। –[আব্দুর রায্যাক]

মাদারেক গ্রন্থে বলা হয়েছে– যে সকল কার্য দ্বারা আল্লাহর স্মরণকার্যে বাধা আসে, অথবা নেশায় লিপ্ত হয়ে যায়, সে সকল কার্য করা আয়াত দ্বারা হারাম বুঝানো হয়েছে। আর بَيْع -কে আয়াতে নির্দিষ্টভাবে বলার কারণ এই যে, উক্ত আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করার কাজ আরবে অধিক প্রচলিত ছিল, তাই بَيْع -কে উল্লেখ ও খাছ করা হয়েছে। –[কাবীর]

জুমার জামাতের জন্য শর্তাবলি এবং তাতে ইমামগণের মতভেদ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত : ইমাম ব্যতীত তিনজন পুরুষ মুক্তাদী হওয়া আবশ্যক। কারণ سَعْى -এর অর্থে جَمْعِيَّتْ -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর جَمْعِيَّتْ হওয়ার জন্য কমপক্ষে তিনজন হওয়া শর্ত। আর সাহেবাইন (র.) বলেন, ইমাম ব্যতীত দু'জন মুক্তাদী আবশ্যক। কারণ جَمْع صَحِيْح মোট তিন-এর মধ্যে নিহিত। সুতরাং ইমামসহ তিনজন হলে চলবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে অন্ধ ব্যক্তির জুমা আদায় করতে হয় না। জুমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য খুতবা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দান করা অন্যতম শর্ত। কেননা নবী করীম ﷺ কখনো বিনা খুতবায় জুমা আদায় করেননি এবং তা قَبْلَ الصَّلٰوةِ হওয়া আবশ্যক। দু'টি খুতবা হতে হবে। খুতবা দানের উদ্দেশ্যে ইমাম মিম্বারের উপর উপবেশন করলে যাবতীয় কথাবার্তা ও এমনকি নামাজও বন্ধ করতে হবে। لِقَوْلِهٖ (ع) إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ আর জুমা জোহরের সময় পড়া আবশ্যক। জোহরের পরে বা পূর্বে পড়া জায়েজ হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে : ইমামসহ ৪০ জন লোক এমন হওয়া আবশ্যক যাদের উপর জুমা ফরজ। বিদেশ সফরকালে, কোনো স্থানে চারদিনের অথবা তার কম সময় অবস্থানের নিয়ত হলে, অথবা এমন যুদ্ধ বা রুগ্‌ণ হয় যানবাহনে বসেও জুমার জন্য যাওয়ার সক্ষমতা না থাকে, অন্ধ ব্যক্তিকে জুমার নামাজের জন্য নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তি না থাকলে, জান-মাল অথবা সম্মানের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা হয় তবে জুমা ফরজ নয়।

মালেকী মাযহাব মতে : زوال বা মধ্যাহ্ন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। দ্বিতীয় আজান হতে কেনাবেচা হারাম ও জুমার প্রতি সায়ী ওয়াজিব হয়ে যায়। এরপর কেনাবেচা হলে তা বাতিল হবে। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় তারা স্থায়ী হলে জুমা ফরজ হবে। অস্থায়ী বশতি যতই অধিক হোক তাদের উপর জুমা ফরজ নয়। আর জনসবসিতর অভ্যন্তরীণ অথবা তৎসংলগ্ন স্থানের মসজিদে জুমা জায়েজ হবে।

অধিকাংশ মালেকী মাজহাবীগণের মতে, মসজিদ ছাদ বিশিষ্ট হওয়া শর্ত নয়; বরং পাঞ্জেগানা জামাতের ব্যবস্থা না থাকলেও নির্মিত মসজিদে জুমা জায়েজ হবে। আর ইমাম ছাড়া ১২ জন বালেগ এমন হওয়া শর্ত যাদের উপর জুমা ফরজ।

হাম্বলী মাযহাব মতে : সূর্যোদয়ের খানিকটা পর হতে আসরের পূর্ব পর্যন্ত জুমা পড়া জায়েজ। তবে قَبْلَ الزَّوَالِ জায়েজ ও بَعْدَ الزَّوَالِ ওয়াজিব বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আজানের পর সংঘটিত বেচাকেনা সংঘটিত হয়নি বলে বিবেচিত হবে। বসতিগুলো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিতি হলেও স্থায়ী বসতি এলাকায় জুমা জায়েজ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শর্তাবলি মালেকী মাহাবের প্রায় অনুরূপ।

হযরত এরাক ইবনে মালিক (র.) জুমার নামাজ শেষ করার পর যখন মসজিদ হতে বের হয়ে আসতেন, তখন যাবতীয় দুনিয়াবী কাজকর্মের বরকতের জন্য মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এ দোয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ ـ وَرَازِقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ كَثِيْرٍ)

قَوْلُهٗ تَعَالٰى ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এটা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জান। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার উদ্দেশ্যে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে গুরুত্ব সহকারে যাওয়া, ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করা, যাবতীয় কাজ-কারবার ছেড়ে নামাজের দিকে যাওয়া তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর। তা বুঝতে যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাকো।

আলোচ্য আয়াতে জুমার নামাজের ফায়দা ও কল্যাণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র ফায়দা বা লাভ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি।

১. জুমার নামাজ জামাতে পড়তে হয়, আর জামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় সৃষ্টি করা, সামাজিক বৈষম্য দূর করা এবং পারস্পরিক কল্যাণের বিনিময় করার উদ্দেশ্যে। এখানে মুসলমানরা একে অপরের সাথে পাশাপাশি দাঁড়ায়, রাষ্ট্রপ্রধান ফকির-মিসকিন যে কোনো নাগরিকের পাশে, ধনী দরিদ্রের পাশে, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের পাশে দাঁড়ান। সকলেই একই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করে। সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের দাবি কেবল শ্লোগানেই থেকে যায়, যদি না তা মানুষের ব্যক্তি-জীবনে এবং চিন্তা-ভাবনায় বাস্তবায়িত হয়। ইসলাম নামাজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করে থাকে।

২. জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো নামাজের পূর্বে খুতবা দান। এ খুতবায় খতীব মুসল্লিদেরকে তাকওয়া ও সৎকাজের প্রতি আহ্বান জানান। সামাজিক অনাচার-ব্যভিচার রোধ করার প্রতি উৎসাহ দান করেন। অনৈসলামিক কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার উপদেশ দান করেন। শ্রোতাদের ব্যক্তি-জীবনে এর বিরাট প্রভাব থাকে, যা সৎ ব্যক্তি ও সৎ সমাজ গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৩. একত্রিত হয়ে আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করলে নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হলে আল্লাহর রহমত ও বরকত নাজিল হয়। এ কারণে জুমার খুতবায় দোয়া করা সুন্নত। ইমাম দোয়া করবে আর মুসল্লিগণ আমীন বলবে।

–[রূহুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتِ ..... وَابْتَغُوا مِنْ (اَلْآيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অতঃপর সালাত যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো। আর আল্লাহকে খুব বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।

"সালাত সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো" এটার অর্থ এ নয় যে, জুমার সালাত আদায় করার পরই দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়া ও জীবিকার সন্ধানে চেষ্টা-সাধনায় লেগে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। এটার অর্থ শুধু এতুটুকু যে, এটা করার অনুমিত আছে, নিষেধ নয়। জুমার আজান শুনামাত্র সব কাজ-কারবার পরিহার করার জন্য পূর্বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে যে, সালাত সমাপ্ত হওয়ার পর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া ও নিজ নিজ কারবারে লেগে যাওয়ার অনুমতি তোমাদের জন্য রয়েছে। এ নির্দেশটি ঠিক এ নির্দেশের অনুরূপ, যেমন কুরআন মাজীদে ইহরাম বাধা অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ করার পর বলা হয়েছে, فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا "তোমরা যখন ইহরাম খুলে ফেলবে তখন শিকার করো।' এর অর্থ এই নয় যে, ইহরাম খোলার পর অবশ্যই শিকার করতে হবে; বরং এর তাৎপর্য হলো, ইহরাম খুলে ফেলার পর শিকার করায় কোনো নিষেধ নেই। ইচ্ছা করলে শিকার করতে পার।

وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো" অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে হালাল রিজিক সন্ধান করতে থাকো। হালাল রুজিকে আল্লাহর অনুগ্রহ এ জন্য বলা হয়েছে যে, রিজিক মূলত আল্লাহরই দান, তাঁরই কল্যাণ। তদুপরি হালাল রিজিক আল্লাহর দয়া, রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া অর্জন করা কি সম্ভব? –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا : এর অর্থ "আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো" বিভিন্নভাবে রুজি-রোজগার করার অনুমতি দানের পর আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ দানের উদ্দেশ্য এই যে, রুজি-রোজগারের যত উপায়-উপকরণ রয়েছে, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কাজ, লেনদেন ইত্যাদিতে আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, তাঁর বিধান অনুযায়ী করবে। অতএব, কারো উপর জুলুম করবে না, ধোঁকাবাজি করবে না, মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিবে না, কারো কোনো ক্ষতি করবে না। এটা হলো অন্তরের ও কর্মের জিকির। এটা ছাড়া মুখেও আল্লাহ তা'আলার জিকির করতে থাকবে। এভাবে আল্লাহ জিকির করতে থাকলে "সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে" অর্থাৎ দুনিয়াতে রুজি-রোজগারে বরকত হবে। আর আখেরাতে তার বিনিময়ে ছওয়াব ও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

সাঈদ ইবনে জোবাইর (রা.) বলেছেন, আল্লাহর জিকির হলো তাঁর আনুগত্য। সুতরাং যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করল সে তাঁর জিকির করল। আর যে তাঁর আনুগত্য করল না সে বেশি বেশি তাসবীহ পড়লেও আল্লাহর জিকিরকারী হবে না।
–[সাফওয়া, হাশিয়ায়ে বায়হাকী]

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো হতে গৃহীত বিধানসমূহ :

১. কোন আজানের পর سَعْى বা গুরুত্ব সহকারে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব হবে? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে–

ক. এক দল আলিমের মতে, প্রথম আজানের সাথে সাথে 'সায়ী' ওয়াজিব। সুতরাং إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ এ نِدَاء -এর অর্থ প্রথম আযান, এটাই হানাফীদের অভিমত।

খ. অন্য দলের মতে, نِدَاء মানে ইমাম মিম্বরে বসার পর যে আজান দেওয়া হয় তাই উদ্দেশ্য। সুতরাং দ্বিতীয় আজানের পরই নামাজের জন্য যাওয়া ওয়াজিব হবে। এটাই জমহুর ওলামার মাযহাব। আর হানাফী ইমামগণের দ্বিতীয় মত এ মতকেই গ্রহণীয় ও অগ্রাধিকার যোগ্য মনে করা হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

২. আজানের সময় এবং আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য চুক্তি সহী-শুদ্ধ কিনা?

وَذَرُوا الْبَيْعَ বাক্য হতে বুঝা যাচ্ছে যে, আজানের সময় এবং আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। কোনো রকমের চুক্তি সম্পাদন বা কোনো মুয়ামেলা নতুনভাবে গ্রহণ করা হারাম। হারাম হওয়া সত্ত্বেও কেউ ক্রয়-বিক্রয় করলে তা জায়েজ হবে কি? এ প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ–

ক. কোনো কোনো আলিমের মতে, এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না, কারণ এ ক্ষেত্রে নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে **وَذَرُوا الْبَيْعَ দ্বারা।**

খ. অধিকাংশ আলিমদের মতে, এ ক্রয়-বিক্রয় সহীহ ও শুদ্ধ, ফাসেদ নয়। এ ক্রয়-বিক্রয় জবরদখলকৃত জমিনে নামাজ পড়ার ন্যায় মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও সহীহ হবে।

৩. জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত কি?

ক. কুরআনের আয়াত فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ হতে বুঝা যাচ্ছে যে, জুমার নামাজ সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা শর্ত। কারণ ذِكْرِ اللّٰهِ -এর অর্থ শুধুমাত্র খুতবা বলা হোক অথবা খুতবা আর নামাজ উভয় বলা হোক খুতবা তাতে থাকছেই। সুতরাং খুতবা জুমার জন্য শর্ত। অন্য আর এক কারণ হলো, জুমার নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে খুতবার উদ্দেশ্যে। অতএব খুতবা শর্ত হবে। এটা জমহুর -এর মাযহাব।

খ. হানাফী ইমামগণের মতে, জুমা সহীহ হওয়ার জন্য দেশীয় প্রথানুযায়ী যাকে খুতবা বলা হয় তেমন কোনো খুতবা শর্ত নয়। কারণ কুরআনে কেবল জিকির -এর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যাকে জিকির বলা চলে ততটুকু হলেই খুতবা আদায় হয়ে যাবে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল হতে যে দীর্ঘ খুতবার প্রমাণ পাওয়া যায় তাকে ওয়াজিব বা সুন্নত বলা যায়–এমন শর্ত বলা যাবে না, যা না হলে নামাজই শুদ্ধ হবে না।

৪. জুমার জামাতে কতজন লোক হলে জুমা শুদ্ধ হবে?

ইমামগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই যে, জুমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাত শর্ত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً . مَمْلُوْكٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

জুমা জামাত সহকারে সব মুসলমানের উপর ওয়াজিব হক। তবে চার শ্রেণির মানুষের উপর ওয়াজিব নয়– ক্রীতদাস, নারী, শিশু অথবা রুগ্‌ণব্যক্তি।

অন্য আর এক কারণ হলো, জুমা শব্দটি হতে বুঝা যাচ্ছে, এ নামাজে জামাত হতে হবে। তবে জামাত কতজনের হতে হবে তা না কুরআনে স্পষ্ট আছে না হাদীসে। এ কারণেই এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে।

ক. হানাফী ইমামগণ বলেছেন, ইমামসহ চারজন হতে হবে। হানাফীদের মধ্যে কেউ কেউ ইমামসহ তিন জনের কথা বলেছেন।

খ. শাফেয়ী এবং কতিপয় হানাফী ইমামগণ বলেছেন, কমপক্ষে ৪০ জন লোকের এক জামাত হতে হবে।

গ. মালেকী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে এমন এক জামায়াতের প্রয়োজন হবে যাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে; কিন্তু তিনজন চারজন লোক দ্বারা জামাত হতে পারবে না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীন (র.) এ শেষোক্ত মাযহাবকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন, বিভিন্ন দলিলের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে।

–[রাওয়ায়েউল বায়ান, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম]

জুমা ও জোহরের নামাজের মধ্যে পার্থক্য : জুমা ও জোহর নামাজের মধ্যে পার্থক্য এই যে জোহরের নামাজ [ফরজ] চার রাকাত, আর জুমার নামাজ দু' রাকাত। কারণ হুযূর ﷺ ও এই সালাত দু' রাকাতই আদায় করতেন। তবে জুমার নামাজের পূর্বে খুতবা (ভাষণ) পেশ করা হয়, কিন্তু জোহরের নামাজে কোনো খুতবা পেশ করা হয় না। তবে খুতবার মধ্যে দু' রাকাত নামাজের ছওয়াব পাওয়া যায়, তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন–

صَلٰوةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنَّمَا قُصِرَتِ الْجُمُعَةُ لِاَجْلِ الْخُطْبَةِ . (اَحْكَامُ الْقُرْاٰنِ لِلْجَصَّاصِ)

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ : জমহুর فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ এবং হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ই فَامْضُوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ পড়েছেন। এ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, ইবনে মাসউদের কেরাত মূলত কেরাত নয়। আসলে তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে –ব্যাখ্যা করে কুরআন পড়া বৈধ।

–[রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তারা যখন ব্যবসায়ী কাফেলা ও খেল-তামাশা দেখল তখন সে দিকে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল, তাদেরকে বলো, আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা খেল-তামাশা অপেক্ষা অতীব উত্তম। আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা অতি উত্তম রিজিকদাতা।"

আলোচ্য আয়াতে– যেসব সাহাবী রাসূল ﷺ-কে খুতবাদানে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ব্যবসায়ী কাফেলার দিকে চলে গিয়েছিলেন তাদেরকে মৃদু ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। সাহাবীদের দ্বারা যে ভুলটা সংঘটিত হয়েছিল, তা কি ধরনের ছিল তা এ আয়াত হতে

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বুঝতে পারা যায়। আল্লাহ না করুন, এটা যদি ঈমানে অভাব ও পরকালের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দানের ইচ্ছামূলক অপরাধ হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ-আক্রোশ ও প্রতিবাদের ভঙ্গি ভিন্নতর হতো, কিন্তু সেখানে এ পর্যায়ের কোনো অপরাধ বা ত্রুটি স্থান লাভ করেনি। যা কিছু হয়েছিল তা প্রশিক্ষণের অভাব জনিত করণে সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণেই প্রথমে শিক্ষাসুলভ কোমল সহানুভূতির ভঙ্গিতে জুমার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। পরে উপদেশের স্বরেও বুঝানো হয়েছে যে, জু... ...তবা শ্রবণ এবং জুমার সালাত আদায় করাতে আল্লাহর নিকট তোমরা যে ছওয়াব পাওয়ার অধিকারী হবে, তা এ দুনিয়ার ব্যব... ও খেল-তামাশার তুলনায় অনেকগুণ বেশি উত্তম।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমা হতে নির্গত শরয়ী মাসআলাসমূহ : উক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا শব্দ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে–

ক. হযরত রাসূলে কারীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা পেশ করতেন, সুতরাং দাঁড়িয়ে খুতবা পেশ করা জায়েজ হওয়া সম্বন্ধে কোনো মত পার্থক্য নেই। বরং দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নত কি ওয়াজিব এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

খ. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া শর্ত, বসে খুতবা দেওয়া শুদ্ধ হবে না। কেননা কুরআনে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার কথা বলা আছে। আর নবী করীম ﷺ হতে হযরত আবূ বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.) ও খুতবা দাঁড়িয়ে দিতেন।

গ. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নত। তিনি বলেন, কুরআনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং বর্ণনা রয়েছে, এতে শর্ত বুঝায় না, আর খোলাফায়ে রাশেদার দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া দ্বারাও শর্ত প্রমাণ হয় না; বরং তার জন্য نَصّ قَطْعِيّ আবশ্যকতা নেই। আর তা ছাড়া সাহাবীগণের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)ও খুতবা বসে দিতেন। দাঁড়ানো শর্ত হলে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তা করতেন না। –[আয়াতুল আহকাম]

ঘ. আয়াতে তবলা বাজানোকে لَهْو বলা হয়েছে। لَهْو বলতে খেল-তামাশা ইত্যাদিকে বুঝায় لَهْو وَلَعِب থেকে পবিত্র কুরআন নিষেধ করেছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ আর অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ يُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ যারা لَهْو وَلَعِب খরিদ করেছে আল্লাহর পথ হতে গোমরাহ করার জন্য অজ্ঞানার্থে সুতরাং জ্ঞানবানগণ لَهْو وَلَعِب করতে পারেন না। আর তা দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং তা অবৈধ ও অশ্লীল কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

ঙ. নবীগণের সম্মুখে অসম্মানসূচক আচরণ খুবই জঘন্যতম অপরাধ, কারণ নবীগণকে এহেন অবস্থায় রেখে যাওয়ার ফলে আল্লাহ তার প্রতি সতর্ক করে সরাসরি আয়াত নাজিল করেছেন।

দোয়া কবুলের বিশেষ সময় : অনেক হাদীস দ্বারা একথা স্বীকৃত যে, জুমার দিন এমন একটা সময় আছে যখন দোয়া কবুল হয়। এ সময়টি সম্পর্কে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালীন (র.) ফতহুল বারীতে জুমার দিনের ঐ সময়ের ব্যাপারে ৪০টি মতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

* আল্লামা আলূসী (র.) হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জুমার দিনের যে সময়টিতে আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করেন আমি আশা করি তা হলো যখন মোয়াজ্জিন জুমার নামাজের আজান দেয় অথবা ইমাম যখন মিম্বরে বসেন অথবা জুমার নামাজের জন্য যখন ইকামত দেওয়া হয়।
* তাউস ও মুজাহিদ (রা.) বলেছেন, সে সময়টি হলো আসরের পর মাগরিব পর্যন্ত।
* তত্ত্ব জ্ঞানীদের মতে লাইলাতুল কদর ও ইসমে আযমের মতো এটিও আল্লাহ তা'আলা গোপন রেখেছেন।
* ইমাম জাযরী (র.)-এর মতে খুতবার জন্য ইমাম যখন আসেন তখন থেকে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়টিতে।
* ইবনে খোযাইমা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট সে সময়টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জবাবে তিনি বলেছেন। আমি জানতাম কিন্তু এরপর আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন শবে-কদরের কথা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ : সূরা আল-মুনাফিকূন

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াত إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ হতে তার নামটি গৃহীত। মূলত তা এ সূরাটির নাম এবং তা আলোচিত বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কেননা এ গোটা সূরায় মুনাফিকদের আচরণ এবং কর্মনীতির সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ১৮০টি বাক্য ও ৭৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রত্যাবর্তন কালে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়, কিংবা মদীনায় পৌছে যাওয়ার পর পরই তা নাজিল হয়েছে। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরি সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ সূরাটি নাজিল হওয়া সংক্রান্ত ইতিহাস এভাবেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

সূরার বিষয়বস্তু :

এক : ১ থেকে ৮ নং আয়াত পর্যন্ত নিফাক আর মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম দিকে বলা হয়েছে মুনাফিকরা যখন নবী করীম ﷺ -এর সামনে আসে তখন তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে; কিন্তু আসলে তারা তা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে না। অতঃপর নবী ও সাহাবীদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্বন্ধে তাদের মারাত্মক কথা,-"রাসূলের দাওয়াত, দীন অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে; তারা বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং রাসূলের মুহাজির সাহাবীগণকে মদীনা হতে বের করে দিবে"-প্রসঙ্গে আলাচনা করা হয়েছে।

দুই : ৯ থেকে ১১নং আয়াতে মুসলমানদেরকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, সৌন্দর্য, ফ্যাশনে পড়ে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য হতে দূরে সরে না যেতে বলা হয়েছে। যেমনটি মুনাফিকগণ সরে পড়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি হতে বিরত থাকা হলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, সময় থাকতে আল্লাহর পথে দান করো, সময় চলে গেলে আবার জীবন ফিরে চাইলেও পাওয়া যাবে না। তখন আল্লাহর পথে দান না করার কারণে আফসোস করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। -[সাফওয়া]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ও ঐতিহাসিক পটভূমি : যে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে তার উল্লেখের পূর্বে মদীনার মুনাফিকদের ইতিহাস পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা আবশ্যক। কেননা, যে বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি নাজিল হয়, তা কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা ছিল না। তার পশ্চাতে বহু ঘটনা পরম্পরায় একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং তা-ই শেষ পর্যন্ত সে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করার কিছু দিন পূর্বে মদীনার প্রধান দু' বিবদমান গোত্র খাযরাজ গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদীনার বাদশাহ বানাবার জন্য একমত হয়েছিল। ইতোমধ্যে উভয় গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদীনায় হিজরত করে চলে আসতে আহ্বান জানায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় চলে আসলে মদীনার অধিকাংশ লোকই ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অসহায় হয়ে পড়ল। স্বীয় নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য অবশেষে সে-ই তার দলবল নিয়ে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাফেরই রয়ে গেল। তার অন্তর জ্বলে যাচ্ছিল এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের ফলে সে মদীনার বাদশাহ হতে পারল না। এ কারণেই সে বিভিন্নভাবে ইসলাম, মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে জাল বুনতেছিল। তার এ সব ষড়যন্ত্র দিন দিন স্পষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের সামনে ধরা পড়ছিল। সে বিভিন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলামের শত্রুদের সাথে গোপনে হাত মিলাতে লাগল, অনেক সময় প্রকাশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করল।

ষষ্ঠ হিজরি সনে সে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বনূ মুস্তালিক অভিযানে অংশগ্রহণ করল। এ যুদ্ধে সে এমন দু'টি ঘটনা ঘটাল যা মুসলমানদের সংহতি ও ঐক্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারত; কিন্তু কুরআন মাজীদের শিক্ষা এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর সংস্পর্শে ঈমানদার লোকেরা যে সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন তার দরুন এ উভয় ফিতনার মূল উৎপাটন সম্ভব হয়েছিল। এ সূরাতে তন্মধ্যে একটি ফিতনার উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় ফিতনার আলোচনা সূরা নূরে রয়েছে।

ঘটনার বিবরণ : মুরাইসী নামক পানির কূপের পার্শ্বে একটি জনবসতি অবস্থিত ছিল। বনূ মুস্তালিকদের পরাজিত করার পর মুসলিম বাহনী এখানেই অবস্থান করছিল। এ সময় হঠাৎ পানি নিয়ে দু' ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। তাদের একজনের নাম ছিল জাহজাহ ইবনে মাসউদ গিফারী। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মচারী। তাঁর ঘোড়া সামলানোর দায়িত্বও এ

Free @ www.eelm.weebly.com

লোকটিই পালন করতেন। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন সিনান ইবনে ওয়াবর আল-জুহানী। তাঁর গোত্র খাযরাজের একটি গোত্রের মিত্র ছিল। ঝগড়া মুখের তিক্ত কথাবার্তা ছাড়িয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। জাহজাহ সিনানকে একটি লাথি মেরেছিলেন। প্রাচীন ইয়ামেনী ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে আনসাররা এ ব্যাপারটিকে খুবই অপমানকর মনে করতেন। তখন সিনান আনসারদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন, আর জাহাজাহ মুহাজিরদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করলেন। ইবনে উবাই এ ঝগড়ার কথা শুনে পেয়ে আউস ও খাযরাজের লোকদেরকে উসকানি দেওয়ার জন্য চিৎকার করে করে বলতে লাগল, শীঘ্র দৌড়াও এবং মিত্র গোত্রের লোককে সাহায্য করো। অপর দিক হতে কতিপয় মুহাজিরও বের হয়ে আসলেন। খুব বিরাট ধরনের সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার উপক্রম হলো এবং তখনই আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারতেন। আর তা এমন এক স্থানে যেখানে অল্পদিন পূর্বেই তারা সকলেই সম্মিলিতভাবেই এক দুশমন গোত্রের সাথে লড়াই করে তাকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। চিৎকার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ বের হয়ে আসলেন এবং বললেন–

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ مَا لَكُمْ وَلِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ .

"এ বর্বরতার চিৎকার কেন? তোমরা কোথায় আর এ জাহেলিয়াতের চিৎকার কোথায়? [অর্থাৎ তা তোমাদের জন্য শোভা পায় না] তোমরা তা ত্যাগ করো। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীন কাজ।"

তখন উভয় দিকের নেককার লোকেরা অগ্রসর হয়ে আসলেন এবং ব্যাপারটি সঠিকরূপে মিটমাট করে দিলেন। সিনান জাহজাহকে মাফ করে দিয়ে সন্ধি করলেন।

অতঃপর যার যার অন্তরে মুনাফেকী ছিল এমন প্রত্যেকটি লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট উপস্থিত হলো। তারা সকলে একত্রিত হয়ে তাকে বলল, এতদিন তোমার প্রতি তো আমাদের অনেক আশা ভরসা ছিল। তুমি প্রতিরোধ করতেও ছিলে; কিন্তু এখন মনে হয়েছে; তুমি আমাদের বিরুদ্ধে এ কাঙ্গালীদের সাহায্যকারী হয়ে গেছে। ইবনে উবাই আগে হতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বসেছিল। লোকদের এ কথা শুনে সে যেন ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলল, সব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম, তোমরাই এ লোকদেরকে নিজেদের দেশে স্থান দিয়েছ। নিজেদের ধনমাল এদের মধ্যে বণ্টন করেছ। শেষ পর্যন্ত এরা ফুলে-ফেঁপে খোদ আমাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজের কুকুরকে খাইয়ে পরিয়ে মোটাতাজা করেছ তোমাকেই ছিন্নভিন্ন করার উদ্দেশ্য। এ উপমাটা আমাদের ও এ কুরাইশ কাঙ্গালদের [হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং সাহাবীদের] সম্পর্কে হুবহু খেটে যায়। তোমরাই তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো, হাত গুটিয়ে নাও তখন তারা কোথাও থাকবে না। আল্লাহর শপথ মদীনায় পৌঁছার পর আমাদের সম্মানিত পক্ষ, হীন ও লাঞ্ছিত পক্ষকে বহিষ্কৃত করবে।

এ বৈঠকে ঘটনা বশত হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি ছিলেন এক অল্প বয়স্ক বালক মাত্র। তিনি এসব কথাবার্তা শুনে তাঁর চাচাকে বলে দিলেন। তাঁর চাচা ছিলেন আনসারদের মধ্যে একজন ধনী ব্যক্তি, তিনি গিয়ে সমস্ত কথাবার্তা রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট পেশ করে দিলেন। [অপর এক বর্ণনা মতে হযরত যায়েদ নিজেই সব ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন।] নবী করীম ﷺ হযরত যায়েদকে ডেকে জিজ্ঞসা করলে তিনি আদ্যপ্রান্ত সব কিছু শুনিয়ে দিলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, সম্ভবত তুমি ইবনে উবাই-এর কথা শুনতে ভুল করেছ। ইবনে উবাই এ কথা বলেছে– এ ব্যাপারে তোমার হয়তো সংশয় বা সন্দেহ হয়ে থাকবে; কিন্তু হযরত যায়েদ এ কথার জবাবে বললেন, না হুযূর! আল্লাহর শপথ আমি তাকেই এসব কথাবার্তা বলতে শুনেছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করা হলে সে সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করল। শপথ করে বলতে লাগল, আমি এসব কথা কখনোই বলিনি। আনসারগণও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটি বালকের কথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? সম্ভবত তার ভুল হয়েছে। ইবনে উবাইতো আমাদের খুবই সম্মানিত ও বুজুর্গ ব্যক্তি। তার বিপরীতে একজন বালকের কথা আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। গোত্রের বয়োবৃদ্ধরাও হযরত যায়েদকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি অবস্থা দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চুপচাপ বসে থাকলেন; কিন্তু নবী করীম ﷺ যেমন যায়েদকে জানতেন, তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকেও জানতেন। কাজেই প্রকৃত ব্যাপার যে কি ঘটেছিল তা তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) এ ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। আর আমাকে অনুমতি দেওয়া সমীচীন মনে না হলে মুয়ায ইবনে জাবাল, উব্বাদ ইবনে বিশির, সাঈদ ইবনে মুয়ায, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা প্রমুখ আনসারদের মধ্য হতে কোনো একজন আনসারকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দিন; কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, না তা করো না। লোকেরা বলবে, দেখ! মুহাম্মদ নিজেই তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যা

Free© www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করাচ্ছেন। অতঃপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, যদিও রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এখনো রওয়ানা হওয়ার সময় উপস্থিত হয়নি। ক্রমাগত ৩০ ঘণ্টা চলতে থাকলেন। লোকেরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। পরে একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকেরা মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বস্তুত মুরাইসী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রভাব লোকদের মন-মগজ থেকে বিলীন করার উদ্দেশ্যেই নবী করীম ﷺ এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। পথিমধ্যে আনসার সর্দার হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনি এমন সময় যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন যখন সফরের উপযুক্ত সময় ছিল না। আপনি কখনো এরূপ সময় সফর শুরু করতেন না। নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, তুমি শুননি? তোমাদের এ সাহেব কি কথাটি বলেছে? হযরত উসাইদ জিজ্ঞাসা করলেন– কোন সাহেব? বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বলেছেন? তিনি জবাবে বললেন, বলেছেন মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিতগণ হীন-নিকৃষ্টদের বহিষ্কৃত করবে। উসাইদ বললেন, আল্লাহর শপথ! সম্মানিত তো আপনি, আর হীন নিকৃষ্ট তো সে। আপনি যখন ইচ্ছা তাকে বহিষ্কৃত করতে পারেন।

ক্রমে ক্রমে কথাটি আনসার গোত্রের সমস্ত লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ল, ইবনে উবাইর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হলো। লোকেরা ইবনে উবাইকে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে ক্ষমা চাও; কিন্তু সে তীব্র বিদ্রূপাত্মক স্বরে জবাব দিল, তোমরা বলেছ তার প্রতি ঈমান আনো, আমি ঈমান এনেছি। তোমরা বললে, নিজের ধনমালের যাকাত দাও, আমি যাকাতও দিয়েছি। এখনতো বাকি আছে শুধু এতটুকু যে, আমি মুহাম্মদ ﷺ -কে সিজদা করবো। এসব কথার দরুন তার বিরুদ্ধে মু'মিন আনসারদের মনে অসন্তোষ ও ক্ষোভ অধিকতর বৃদ্ধি পেল এবং চারদিক হতে তার উপর অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ নগ্ন তরবারি উত্তোলিত করে তার পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আপনি বলেছেন, মদীনা পৌঁছে সম্মানিতগণ অসম্মানিতকে বহিষ্কার করবে। সম্মানিত আপনি না আল্লাহ ও তাঁর রাসূল? তা এখন আপনি জানতে পারবেন। আল্লাহর শপথ রাসূলে কারীম ﷺ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আপনি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেন না। একথা শুনে ইবনে উবাই চিৎকার করে বলল, হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা দেখে যাও, আমার নিজের পুত্রই আমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। লোকেরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছাল। নবী করীম ﷺ আব্দুল্লাহকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর পিতাকে নিজের ঘরে যেতে দেন। আব্দুল্লাহ এ কথা শুনে বললেন, নবী করীম ﷺ যদি অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি ঘরে যেতে পারেন। তখন নবী করীম ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর! কি মনে কর তুমি, যে সময় ইবনে উবাইকে হত্যা করতে চেয়েছিলে তখন তাকে হত্যা করা হলে নানা রকমের কথা উঠত; কিন্তু আজ অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আমি যদি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেই তবে তা অনায়াসেই করা যেতে পারে। হযরত ওমর নিবেদন করলেন, আল্লাহর শপথ, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার অপেক্ষা আল্লাহর রাসূলের কথা অধিকতর বিচক্ষণতাপূর্ণ। এ পটভূমিতে এ সূরাটি নাজিল হয় এবং নাজিল হয় সম্ভবত নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরে।

উপরোল্লিখিত ঘটনা হতে প্রাপ্ত ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলামি প্রশাসনিক ক্ষমতার মূল ভিত্তি হলো, প্রকৃত ইসলাম বা মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

২. ইসলামে বর্ণবাদ, গোত্রীয়, দেশীয় ও বৈদেশিক জাতীয়তাবাদ-এর পার্থক্যকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।

৩. ইসলামের জন্য সাহাবায়ে কেরামগণ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ইসলামের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন। যার কোনো প্রকার উপমা বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় না।

৪. মুসলমানদের সর্বসাধারণের জন্য হিতকর কার্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

৫. মুসলমানদের পরস্পর ভুল ধারণা হতে রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরাতে নবী করীম ﷺ-এর শুভাগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে এবং এরপর যারা তাঁকে অন্তরে বিশ্বাস করত এবং প্রকাশ্যে সমালোচনা করত সে অভিশপ্ত ইহুদিদের কথা আলোচিত হয়েছে, আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে, যারা মুখে ঈমানের দাবিদার; কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না।

দ্বিতীয়ত পূর্ববর্তী সূরার শেষে নবী করীম ﷺ -এর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, আর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, মুনাফিকরা প্রিয়নবী ﷺ-কে সম্মান করলেও তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি ভক্তি ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি আন্তরিক ভক্তি বা সম্মান না করা মুনাফেকীর লক্ষণ। এমন গর্হিত কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা মুসলমানদের একান্তই কর্তব্য। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُنَافِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-মুনাফিক মদীনায় অবতীর্ণ

إِحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا بِأَلْسِنَتِهِمْ عَلٰى خِلَافِ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ م وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ط وَاللّٰهُ يَشْهَدُ يَعْلَمُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ فِيْمَا أَضْمَرُوْهُ مُخَالِفًا لِمَا قَالُوْهُ .

১. যখন মুনাফিকগণ আপনার নিকট আসে, তখন তারা বলে তাদের মুখে, তাদের অন্তরে যা আছে তার বিপরীতে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আর আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন যে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল; কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, জানেন নিশ্চয় মুনাফিকগণ মিথ্যাবাদী তাদের মৌখিক স্বীকারোক্তি বিপরীত তাদের অন্তরে তারা যা গোপন রেখেছেন তাতে।

٢. اِتَّخَذُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً سُتْرَةً عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَدِمَائِهِمْ فَصَدُّوْا بِهَا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط أَيْ عَنِ الْجِهَادِ فِيْهِمْ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

২. তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করেছে। তাদের সম্পদ ও জীবন হতে অন্তরায়। আর তারা আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে। তাদের মধ্যে জিহাদ করা হতে নিঃসন্দেহে তারা যা করেছে, তা অতিশয় মন্দ।

٣. ذٰلِكَ أَيْ سُوْءُ عَمَلِهِمْ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِاللِّسَانِ ثُمَّ كَفَرُوْا بِالْقَلْبِ أَيْ اِسْتَمَرُّوْا عَلٰى كُفْرِهِمْ بِهٖ فَطُبِعَ خُتِمَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ بِالْكُفْرِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ الْإِيْمَانَ .

৩. এটা অর্থাৎ তাদের মন্দকাজ এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছে মৌখিকভাবে অতঃপর কুফরি করেছে অন্তরের সাথে। অর্থাৎ তারা কুফরির মধ্যে স্থিতিশীল থাকে। ফলে মোহর করে দেওয়া হয় সীল মেরে দেওয়া হয় তাদের অন্তরসমূহে কুফর-এর মাধ্যমে। সুতরাং তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না ঈমানকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤. وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ط
لِجَمَالِهَا وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ط
لِفَصَاحَتِهِ كَاَنَّهُمْ مِنْ عِظَمِ اَجْسَامِهِمْ فِيْ
تَرْكِ التَّفَهُّمِ خُشُبٌ بِسُكُوْنِ الشِّيْنِ
وَضَمِّهَا مُّسَنَّدَةٌ ط مُمَالَةٌ اِلَى الْجِدَارِ
يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ تُصَاحُ كَنِدَاءٍ فِي
الْعَسْكَرِ وَاِنْشَادِ ضَالَّةٍ عَلَيْهِمْ ط لِمَا
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الرُّعْبِ اَنْ يَنْزِلَ فِيْهِمْ مَا
يُبِيْحُ دِمَاءَهُمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَاِنَّهُمْ
يُفْشُوْنَ سِرَّكَ لِلْكُفَّارِ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ز
اَهْلَكَهُمْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ كَيْفَ يُصْرَفُوْنَ عَنِ
الْاِيْمَانِ بَعْدَ قِيَامِ الْبُرْهَانِ .

অনুবাদ :

৪. আর আপনি যখন তাদের প্রতি তাকান, তখন তাদের দৈহিক আকৃতি আপনাকে বিস্মিত করে তার সৌন্দর্যের কারণে। আর যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা সাগ্রহে শ্রবণ করেন তার পাণ্ডিত্য ও লালিত্যের কারণে। তারা যেন যাদের দৈহিক বিশালতা সত্ত্বেও উপলব্ধি হীনতা বিচারে কাষ্ঠসমূহ خُشُبٌ শব্দটি ش সাকিন ও পেশ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যা ঠেকানো হয়েছে দেওয়ালের সাথে ঠেকানো হয়েছে তারা সকল প্রকার শোরগোলকে মনে করে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, যেমন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কোনো ঘোষণা বা কোনো হারানো বিজ্ঞপ্তির কারণে হয়ে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে ভয় থাকার কারণে তারা ধারণা করে যে, হয়তো আমাদের হত্যার ব্যাপারে কোনো হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে। তারাই শত্রু, সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করুন কারণ তারাই আপনার গোপনীয়তা কাফেরদের নিকট ব্যক্ত করে দেয়। আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলেছে? প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও তারা কিরূপে ঈমান হতে বিমুখ হচ্ছে?

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ : (الاية) اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ شَرْط হলো আর তার জবাব হলো قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ আবার কেউ কেউ جَوَابُ الشَّرْطِ উহ্য বলে মনে করেন, তারা বলেন قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ বাক্যটি حَالْ আর جَوَابُ الشَّرْطِ উহ্য ؛ تَقْدِيْر হলো اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَائِلِيْنَ نَشْهَدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُمْ আর কেউ কেউ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً -কে জবাবে শর্ত মনে করেন, ইমাম শওকানী (র.) বলেন, তা আমাদের মতে ঠিক নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَيْمَانَهُمْ : জমহুর هَمْزَة তে فَتْح দিয়ে أَيْمَانَهُمْ পড়েছেন। আর হাসান (র.) তাতে كَسْرَة দিয়ে إِيْمَانَهُمْ পড়ছেন।

قَوْلُهُ "كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ" : এ বাক্যটি তারকীবে جُمْلَة مُسْتَانِفَة হতে পারে। আবার একে উহ্য مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوْب ও বলা যেতে পারে।

قَوْلُهُ "فَطُبِعَ" : জমহুর فَطُبِعَ শব্দটি مَجْهُوْل পড়েছেন। তখন عَلٰى قُلُوْبِهِمْ - جَار -এর- مَجْرُوْر -কে- نَائِب فَاعِلْ -এর قَائِم مَقَام করা হবে। হযরত যায়েদ ইবনে আলী তাকে مَعْرُوْف করে পড়েছেন। তখন তার فَاعِل হবে طَبَعَ -এর ضَمِيْر যার مَرْجِعْ হলো আল্লাহ তা'আলা। হযরত আ'মাশের কেরাতে তারই প্রমাণ মিলে, তিনি পড়েছেন فَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "خُشُبٌ" : জমহুর خَا، এবং شِيْن উভয় বর্ণে ضَمَّه দিয়ে خُشُبٌ পড়েছেন। আবূ আমর, কিসায়ী কেবল شِيْن এ- سَاكِنْ যুক্ত করে خُشْبٌ পড়েছেন। হযরত বারা ইবনে আযেবও এ রকমই পড়েছেন। আবূ ওবাইদ এ কেরাত পছন্দ করেছেন, কারণ এর একবচন হলো خَشَبَةٌ যেমন– بَدَنَةٌ ও بُدْنٌ আবূ খাতেম প্রথম কেরাত পছন্দ করেছেন, সাঈদ ইবনে জোবাইর ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) উভয় বর্ণে فَتْح দিয়ে خَشَبٌ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ যখন আপনার নিকট মুনাফিকগণ আসে তখন তারা বলে আমরা এ মর্মে সাক্ষ্য দান করছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। কথাটি মূলত বাস্তব সত্য, তথাপিও আল্লাহ তা'আলা জেনে শুনে পুনঃ সাক্ষ্য দান করেছেন এবং সরাসরি বলেন– নিঃসন্দেহে আপনি সত্য রাসূল তবে মুনাফিকগণ মিথ্যুক, আপনি জেনে রাখুন! তারা আপনার রিসালাত সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দান করেছে, তাতে তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ যা তারা মুখে বলে, এ কথা সত্য, তবে এ সত্যতাকে আন্তরিকতার সাথে তারা বিশ্বাস করে না।

বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে, সাক্ষ্য দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। একটি সে আসল কথা যা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আর অপরটি হলো সাক্ষ্যদানকৃত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতার নিজের বিশ্বাস। সুতরাং যে বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তা যদি মূলত সত্য হয় আর সাক্ষ্যদাতার বিশ্বাসও তাই হয়, যা সে মুখে উচ্চারণ করছে তাহলে সাক্ষ্যদাতা সত্যবাদী বলে প্রতীয়মান হবে।

আর মিথ্যা বিষয়কে মিথ্যা হিসাবে সাক্ষ্য দানকারীকেও সত্যবাদী বলা হয়। কেননা সে নিজের বিশ্বাস প্রকাশে সত্যবাদী। অপর আরেক হিসাবে তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হবে, কেননা যে বিষয়টি সত্য হওয়া সম্পর্কে সে সাক্ষ্য দিচ্ছে তা মূলত মিথ্যা ও অসত্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাবে যেমন একজন ইহুদি যদি তার ধর্মমতে বহাল থেকে ইসলামকে সে মানে বলে সাক্ষ্য দেয় তবে বিচারের ক্ষেত্রে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না, যদিও সে মূলত মিথ্যাবাদী হবে। কারণ সে ইসলামকে সত্য মেনে সত্য বলেনি; বরং না মেনে ও স্বীকার না করে মাত্র মুখে সত্য বলেছে। তদ্রূপভাবে মুনাফিকগণকে আল্লাহ মিথ্যাবদী বলেছে। আর মুশরিকরাও মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যই এভাবে বিশ্বাস দেখিয়েছিল।

অন্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন– وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ তারা শপথ করে বলে যে, তারা আপনাদের দলভুক্ত অথচ মূলত তারা এমন নয়। –[মা'আরেফুল কোরআন]

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ বাক্যটি جُمْلَه مُعْتَرِضَه হিসাবে পৃথকভাবে বর্ণনা করার হিকমত : উক্ত বাক্যটিকে جُمْلَه مُعْتَرِضَه হিসাবে বর্ণনা করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরে ছাওরী গ্রন্থকার বলেন– যদি বাক্যটিকে তৎপূর্ববর্তী نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰه -এর সাথে মিলিত হিসাবে বলা হতো, তাতে তাদের বর্ণিত বাক্যটি (نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ) মূলত মিথ্যা হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়াত, এ কারণেই পৃথক বাক্য হিসাবে বলা হয়েছে। –[সাবী]

এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান আসলে অন্তরের বিশ্বাস : মুনাফিকরা আসলেই বিশ্বাস করত না যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; কিন্তু তারা মুখে মুখে হলফ করে বলত যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তাদের এরূপ আচরণকে আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন। এ হতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান মূলত অন্তরের বিশ্বাসের নাম। আর অন্তরের কথাটাই আসল কথা। বিশ্বাসের পরিপন্থি কথা মিথ্যা। –[কাবীর, কুরতুবী]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মুনাফিকরা বিভিন্নভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে। মানুষকে এ কথা বুঝাবার জন্য যে, তারা আসলেই মু'মিন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থাৎ "তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। আর এ উপায়ে তারা আল্লাহর শপথ হতে নিজেরা বিরত থাকে ও অন্যান্যদেরও বিরত রাখে। তারা যা করছে তা কতইনা নিকৃষ্ট তৎপরতা।"

اَلْاَيْمَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে শপথ বলতে– তারা নিজেদেরকে ঈমানদার প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সাধারণত যে কসম করে তাও হতে পারে। আর নিজেদের কোনো মুনাফেকীর কাজ ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে যেসব কসম করে এ উদ্দেশ্যে যে, মুসলমানরা যেন মনে করে না বসে যে, মুনাফেকীর কারণে তারা এরূপ কাজ করেছে– তাও হতে পারে। তারা মুনাফেকীর কারণে এ কাজ করেনি– কসম করে মুসলমানদেরকে এ বিশ্বাস করাতে চায়। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের দেওয়া সংবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যেসব কসম করেছিল– তাও বুঝানো হতে পারে। তার যে কোনো একটি বুঝানো হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। সে সঙ্গে এটাও সম্ভব যে, তারা যে বলত 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল' এ কথাটিকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের শপথ বলে গণ্য করেছেন।

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি'-কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর শপথ হিসেবে গণ্যকরণ : মুনাফিকদের এ উক্তি 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল'-কে আল্লাহ তা'আলা তাদের শপথ বলে গণ্য করেছেন, এ সম্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর সঙ্গীগণ (ইমাম যুফার ব্যতীত) সহ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং ইমাম আউযায়ী (র.) তাকে শপথ বা ইয়ামীন মনে করেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

ইমাম যুফার (র.) বলেন, এটা শপথ নয়। ইমাম মালিকের দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে– ১. একটি হলো তা শপথ। ২. 'সাক্ষ্য দিচ্ছি' বলার সময় যদি শপথের নিয়ত করে, তাহলে শপথ হবে, নতুবা নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি' এ স্পষ্ট শব্দগুলোও যদি বলা হয় তবুও তা সে ব্যক্তির শপথমূলক কথা বলে মনে করা যাবে না। অবশ্য সে যদি শপথ করার ইচ্ছা মনে নিয়ে এ কথা বলে, তাহলে অন্য কথা। –[আহকামুল কোরআন–জাস্‌সাস, আহকামুল কোরআন–ইবনুল আরবী]

جُنَّةً -এর অর্থ : جُنَّةً অর্থ– ঢাল, লৌহবর্ম, যোদ্ধারা যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের আঘাত হতে বাঁচার জন্য যা পরিধান করে থাকে। পবিত্র কুরআনে جُنَّةً শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা কাপড়ের মতো সাধারণ পর্দা চায় না। তারা মনে করে যে, তারা সর্বদা স্নায়ুযুদ্ধে রয়েছে, সুতরাং তাদের মনের অবস্থা গোপন করার জন্য পর্দার প্রয়োজন, তবে শর্ত হলো, সে পর্দা যুদ্ধ-সামগ্রী হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কুরআন جُنَّةً শব্দ মনোনীত করেছে, যাতে তাদের মনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। –[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : صَدُّوْا শব্দটি আরবি ভাষায় এক সঙ্গে দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. নিজে বিরত থাকা। দুই. অন্যকে বাধা দিয়ে বিরত রাখা। প্রথম অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, 'তারা নিজেরা আল্লাহর পথ হতে বিরত থাকে।' অর্থাৎ তারা নিজেদের এসব কসমের সাহায্যে মুসলিম সমাজের মধ্যে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নেওয়ার পর, তারা নিজেদের জন্য ঈমানের দাবি অনুযায়ী কাজ না করার এবং বাস্তবে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ না করার সুবিধাদি বের করে নেয়। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, তারা অন্যান্য লোকদেরকে আল্লাহর পথে চলতে দেয় না। অর্থাৎ তারা এসব মিথ্যা কসমের আড়ালে নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার খেলায় মেতে থাকে। মুসলমান হয়ে মুসলিম সামাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। মুসলমানদের গোপন তত্ত্ব জেনে শত্রুপক্ষকে সেসব বিষয়ে জানিয়ে দেয়। অমুসলিমদেরকে ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে। তাদের খারাপ ধারণা উদ্রেক করে এবং সরল অন্তঃকরণের মুসলমানদের মনে নানারূপ শোবাহ-সন্দেহ ও ভুল ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এমন সব হাতিয়ার প্রয়োগ করে, যা একজন মুসলিম বেশধারী মুনাফিকই করতে পারে। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুরা সেসব হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে না।

মুনাফিকদের কর্মকাণ্ডকে নিকৃষ্ট বলার কারণ : যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগেও আলোচনা করেছেন; কিন্তু কোথাও তাকে নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেননি; কিন্তু এখানে নিকৃষ্ট বলার কারণ কি?

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এখানে তাদের কর্মকাণ্ডকে নিকৃষ্ট বলার কারণ হলো, তাদের অন্তরের বিশ্বাস গোপন করার জন্য তারা মিথ্যা শপথের আশ্রয় নিয়েছে। আর এ মিথ্যা শপথ দ্বারা তারা তাদের ধন-সম্পদকে মুসলমানদের হাত হতে রক্ষা করেছে। এরূপ পন্থা অন্য কোথাও তারা গ্রহণ করেনি। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اٰمَنُوْا الخ : আল্লাহ বলেন, তাদের এমন জঘন্য আচরণের কারণ এই যে, তারা কেবল মাত্র মুখেই ঈমান গ্রহণ করেছে, অন্তর তাদের কুফরিতে ভরা। তাদের এ দাগাবাজীর ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। তাই প্রকৃত ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। আর তারা ঈমান সম্পর্কীয় কোনো কিছুই বুঝে না।

অনবরত ও অত্যধিক পাপাচারে লিপ্ত থাকলে মানুষের অন্তর বিকৃত হয়ে যায়, সৎ ও মহৎ আর পুণ্য কাজের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, এমতাবস্থায় পাপ-পুণ্য ও হিতাহিত জ্ঞান বিবেচনার শক্তি কোথায় পাবে। –[তাহের]

কেউ কেউ এ আয়াতের তাৎপর্য এভাবে করেছেন যে, তারা যখন খুব ভালোভাবে বুঝে শুনে ঈমান না এনে অথবা কুফরির পথ অবলম্বন না করে মুনাফিকীর পথ অবলম্বন করেছে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। আর তাদের অকৃত্রিম ও ভদ্র মানুষের আচরণ অবলম্বনের ক্ষমতাই হরণ করে নেওয়া হয়েছে। এ স্থলে তারা সুস্থ বুঝ ও সমঝের যোগ্যতাই হারিয়েছে। এ পথে চলতে তাদের মনে কখনো চেতনা জাগ্রত হয় না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ الخ : فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ অর্থ "এ জন্য তাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে" এখন তারা কিছুই বুঝে না। এ কথার তাৎপর্য হলো, তারা যখন খুব ভালোভাবে বুঝে শুনে সোজাসুজি ঈমান আনা কিংবা সুস্পষ্ট কুফরির পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে এ মুনাফিকীর আচরণ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের অকৃত্রিম, সাচ্চা ও ভদ্র মানুষের আচরণ অবলম্বনের ক্ষমতাই হরণ করে নেওয়া হয়েছিল। এক্ষণে তারা সঠিক ও সুস্থ বুঝ-সমঝের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। তাদের নৈতিক চেতনাই নিঃশেষ হয়ে গেছে। এ পথে চলতে তাদের মনে কখনো এ চেতনা জাগ্রত হয় না যে, দিন রাতের মিথ্যা ও সার্বক্ষণিক ধোঁকা প্রতারণা; কথা এবং কাজের চিরস্থায়ী বিরোধ ও পার্থক্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও হীনতম অবস্থা এবং এ অবস্থার মধ্যেই তারা নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে রেখেছে। –[কাবীর]

Free @ www.eelm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ ..... لِقَوْلِهِمْ : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কিছু আলামত ও আচরণ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাদের প্রতি তাকালে তাদের অবয়ব তোমাদের খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। আর তারা কথা বললে তাদের কথা শুনতে মগ্ন হয়ে যাবে।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বড়ো স্বাস্থ্যবান সুডৌল দেহসম্পন্ন, সুদর্শন ও বাকপটু লোক ছিল। তার সঙ্গী-সাথীও এ গুণে গুণান্বিত ছিল। এরা সকলে মদীনার ধনী লোক ছিল। তারা যখন নবী করীম ﷺ -এর মজলিসে উপস্থিত হতো, তখন সেখানে প্রাচীরের গায়ে বালিশ লাগিয়ে ঠেশ দিয়ে বসত ও বড় রসালো কথাবার্তা বলত। তাদের আকার-আকৃতি দেখে এবং তাদের কথাবার্তা শুনে কেউ চিন্তা বা কল্পনা করতে পারতো না যে, এসব সম্মানিত ব্যক্তি চরিত্রের দিক দিয়ে এত নীচ ও হীন হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উদাহরণ পেশ করে বলেছেন, 'তারা যেন কাষ্ঠসমূহ যা দেওয়ালের সাথে ঠেকানো হয়েছে" অর্থাৎ এ লোকেরা যারা প্রাচীর গায়ে ঠেশ লাগিয়ে বসে, তারা আসলে মানুষ নয়। তারা নির্জীব কাষ্ঠখণ্ড মাত্র। তারা কিছু জানেও না, কিছু বুঝেও না। তারা ফলদায়ক কাষ্ঠের মতোও নয়, সুতরাং উপকারহীন বস্তু মাত্র।

উপকারীবস্তুর সাথে তুলনা না করে প্রাচীরে লাগানো কাষ্ঠ খণ্ডের সাথে তুলনা করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, তাতে এমন অনেক ফায়দা আছে যা অন্যত্র নেই।

১. তাফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে, ঈমান ও কল্যাণহীন অবস্থায় তাদেরকে মোটাতাজা, দেওয়ালে ঠেশ লাগানো শরীরগুলোকে, দেওয়ালে ঠেশ দেওয়া কাষ্ট খণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ কাষ্ঠ যদি কোনো কাজ দেয়ই তাহলে তা তখনই ছাদে, দেওয়ালে ও অন্যান্য লাভজনক স্থানে ব্যবহৃত হয়। আর যখন কোনো কাজ দেয় না, তখন তা প্রাচীরের সাথে ঠেশ লাগিয়ে ফেলে রাখা হয়, অতএব ফল না দেওয়া লাভহীন হওয়াতে তাদেরকে ঠেশ দেওয়া কাঠের সাথে তুলনা করেছেন। আর তার অর্থ ঠেশ লাগানো খোদাইকৃত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার সাথেও সৌন্দর্যে ও ফায়দাহীন হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তুলনা হতে পারে।

২. প্রাচীরে ঠেশ লাগানো শুকনা কাষ্ঠখণ্ডও আসলে কাঁচা গাছের ডাল ছিল, যা যে কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারযোগ্য ছিল। অতঃপর শুকিয়ে গিয়ে ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি মুনাফিকরাও যে কোনো কল্যাণমূলক কাজের যোগ্য ছিল। অতঃপর তারা কল্যাণ-যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

৩. দেওয়ালের সাথে ঠেশ লাগানো কাঠের এক মাথা এক দিকে আর অন্য মাথা অন্য দিকেই থাকে। ঠিক তেমনি মুনাফিকদের অবস্থাও। কারণ মুনাফিকদের একদিক অর্থাৎ অন্তর কাফেরদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর অপর দিক অর্থাৎ বাহ্যিক দিক মুসলমানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ : আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, "প্রত্যেকটি জোর আওয়াজকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।" এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাদের অপরাধী মন-মানসিকতার পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করে দেওয়া হয়েছে। তারা বাহ্যিক ঈমানের অন্তরাল সৃষ্টি করে মুনাফেকির যে মারাত্মক খেলায় মেতে রয়েছে, তা তারা খুব ভালো করেই জানত। এ কারণে যে কোনো সময় তারা ধরা পড়ে যায়, তাদের অপরাধের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে; কিংবা তাদের কুটিল কারসাজি সহ্য করতে করতে মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ কোনো সময় ভেঙ্গে ক্রোধের বান ডেকে উঠে, সেজন্য প্রতি মুহূর্তেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয়ে থাকত। বসতির কোনো একদিক দিয়েও কোনো উচ্চ ধ্বনি উঠলে কিংবা কোথাও কোনো কোলাহল শ্রুতিগোচর হলে তারা সংকুচিত হয়ে পড়ত। তারা মনে করত হয়তো দুর্ভাগ্যের নির্দিষ্ট মুহূর্তটি এসে পড়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ : "তারা পাকা শত্রু তাদের হতে সতর্ক হয়ে থাক।" অর্থাৎ তারা মুসলিম সমাজে লুকিয়ে থাকা গোপন শত্রু, আর গোপন শত্রু প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ ও মারাত্মক হয়ে থাকে। কারণ গোপন শত্রু সমাজের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে। –(রূহুল কোরআন) সুতরাং এদের ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থেকো। কারণ তারা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো রকমের অঘটন বাঁধিয়ে দিতে পারে, যে কোনো সময় ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالَى قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ : প্রকাশ্য অর্থে এ অংশে গজব দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। মূলত তা একটি ঘোষণা মাত্র। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তারা নিজেদের ক্রিয়া-কলাপের কারণে আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর মার অবশ্যই পড়বে। এ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে আরবি কথন অনুযায়ী অভিশাপ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা যেমন বলি লোকটি কেমন খারাপ, ওর সর্বনাশ হোক, সে ধ্বংস হয়ে যাক, যেমন–হাদীস শরীফে হুযূর ﷺ বলেছেন– رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ আবূ যরের নাক মাটি মিশ্রিত হোক, تَرِبَتْ يَدَاكَ তোমার হাত মাটি মিশ্রিত হোক। এ সকল বাক্য দ্বারা যেমন তিরস্কার করা হয়েছে তদ্রূপ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ শব্দ দ্বারাও তিরস্কার করা হয়েছে; কারো বিরুদ্ধে কোনো ধ্বংসাত্মক কথা বা বদদোয়া স্বরূপ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مُعْتَذِرِيْنَ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ عَطَفُوْا رُؤُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ يُعْرِضُوْنَ عَنْ ذٰلِكَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ .

৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আসো ওজর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। তখন তারা ফিরিয়ে নেয় শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ ফিরিয়ে নেয় তাদের মস্তকসমূহ, আর আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা ফিরে যায়। তা হতে বিমুখ হয় দাম্ভিকভাবে।

٦. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ إِسْتَغْنٰى بِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ .

৬. এটা সমান কথা যে, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এখানে هَمْزَه إِسْتِفْهَامْ বিদ্যমান হেতু هَمْزَه وَصْل -এর প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেনি। কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা না করুন, আল্লাহ কখনোই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ পাপাচারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

٧. هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لِاَصْحَابِهِمْ مِنَ الْاَنْصَارِ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ط يَتَفَرَّقُوْا عَنْهُ وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالرِّزْقِ فَهُوَ الرَّازِقُ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَغَيْرِهِمْ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ .

৭. তারাই বলে তাদের সাথী আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের উপর ব্যয় করো না, যারা রাসূলের সঙ্গে রয়েছে মুহাজিরগণ হতে যাবৎ তারা সরে পড়ে তাঁর নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আল্লাহরই জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার জীবিকার ভাণ্ডার। সুতরাং তিনিই মুহাজির ও অন্যদের জীবিকা দানকারী। কিন্তু মুনাফিকগণ তা উপলব্ধি করে না

٨. يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا أَىْ مِنْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ عَنَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط عَنَوْا بِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ الْغَلَبَةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ .

৮. তারা বলে, আমরা প্রত্যাবর্তন করলে বনী মুসতালিক যুদ্ধ হতে মদীনা হতে সবলগণ বের করবে। এটা দ্বারা তারা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করেছে। দুর্বলদেরকে তথা হতে এটা দ্বারা মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করেছে। অথচ সম্মান তো আল্লাহরই জন্য শক্তি এবং তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণের জন্য; কিন্তু মুনাফিকগণ জানে না তা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "يَصُدُّوْنَ" : يَصُدُّوْنَ ক্রিয়াটি حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। কারণ رَاَيْتَهُمْ-এর رُؤْيَةْ এখানে بَصَرِيَّة বা চাক্ষুষ দেখা। সুতরাং দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর প্রয়োজন নেই। তখন বাক্যটির অর্থ হবে- وَرَاَيْتَهُمْ صَادِّيْنَ مُسْتَكْبِرِيْنَ

قَوْلُهُ "وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ" : وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ বাক্যটি তারকীবে প্রথম حَالْ -এর فَاعِلْ হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب অর্থাৎ يَصُدُّوْنَ -এর فَاعِلْ হতে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ "لَوَّوْا" : জমহুর এ শব্দটিতে تَشْدِيْد যুক্ত করে لَوَّوْا পড়েছেন। আর নাফে' তাকে تَخْفِيْف করে لَوَوْا পড়েছেন। আবূ ওবাইদ প্রথম কেরাতকে পছন্দ করেছেন। −[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "اَسْتَغْفَرْتَ" : জমহুর একে মদহীন কেবল একটা فَتْح বিশিষ্ট هَمْزَة দিয়ে এবং هَمْزه اِسْتِفْهَامْ -কে حَذْف করে পড়েছেন। এ কারণে যে, اَمْ অব্যয়টি هَمْزَة اِسْتِفْهَامْ -এর উপস্থিতি বুঝাচ্ছে। আর ইয়াযীদ ইবনে কা'কা' هَمْزَة অতঃপর اَلِفْ যুক্ত করে পড়েছেন। −[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "يَنْفَضُّوْا" : জমহুর اِنْفِضَاضْ হতে উদ্ভূত মনে করে يَنْفَضُّوْا পড়েছেন। যার অর্থ− ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আর ফজল ইবনে ঈসা আর-রাকাসী اَنْفَضَ শব্দ হতে উদ্ভূত মনে করে يُنْفِضُوْا পড়েছেন। বলা হয় اَنْفَضَ الْقَوْمُ যখন তাদের মাল-পত্র ধ্বংস হয়ে যায়। −[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল :

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন বলেছিল− لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই মদীনায় পৌঁছার পর সম্মানিত ব্যক্তিগণ অসম্মানিতদেরকে মদীনা হতে বের করে দিবে, এ অসৎ আচরণের উপর ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাকে যেতে বলা হয়েছিল; তখন সে এ কথার উপর মাথা ঝাঁকুনি দেয় এবং রাসূলের দরবারে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়।

২. কেউ কেউ বলেন− আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার আত্মীয়-স্বজনদের ঈমানদার ব্যক্তিগণ তাকে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর আয়াতের মাধ্যমে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তুমি রাসূলের দরবারে যাও এবং তোমার গুনাহ মার্জনা করে নাও এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমার দোয়া করিয়ে নাও। তখন ইবনে উবাই বলল, واه واه হায় হায়! তোমরা প্রথমে ঈমান আনয়নের জন্য বললে, তখন ঈমান এনেছি। অতঃপর যাকাত প্রদানের জন্য বলেছ, তাও ইচ্ছা অনিচ্ছায় পালন করেছি। এখন সর্বশেষ তোমাদের কথানুসারে মুহাম্মদকে সিজদা করতে বলতে চাও নাকি? তা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাজিল করেন। −[আশরাফী, কাবীর, মা'আরিফ]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন উহুদের ময়দান হতে ইবনে উবাই বহুসংখ্যক (সাতশত -এর মতো) লোক নিয়ে ফিরে আসল, তখন মু'মিনরা তার সমালোচনা ও নিন্দা শুরু করল, তখন তার কোনো এক ভাই তাকে বলল, তুমি মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট যাও এবং ক্ষমা চাও তবে তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমার জন্য দোয়া করবেন। তখন সে বলল, না আমি যাবো না, সে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক বা নাই করুক, এই বলে মাথা নেড়ে-ঝেড়ে হেলতে লাগল, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন। তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থে বলা হয় এ অবস্থার পর ইবনে উবাই অতিশয় মরে গেল।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর এদেরকে যখন বলা হয় আসো, তাহলে আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবেন, তখন তারা মাথা ঝাঁকানি দেয় ; আর তোমরা লক্ষ্য করেছ– তারা আসা হতে বড়োই অহমিকা সহকারে বিরত থাকে।"

অর্থাৎ তারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট ইস্তিগফার এবং মাগফিরাত চাওয়ার জন্য আসে না; শুধু তাই নয়, মাগফিরাত বা ক্ষমা চাওয়ার কথা শুনতেই তাদের মধ্যে অহমিকা ও অহংকার প্রচণ্ড হয়ে উঠে এবং দাম্ভিকতা সহকারে তারা মাথা ঝাঁকানি দেয়। রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়াকে তারা নিজেদের পক্ষে বড়োই অপমানকর মনে করে নিজ নিজ স্থানে শক্ত হয়ে বসে থাকে। তারা যে প্রকৃতই মু'মিন নয় তাদের এরূপ আচরণ হতে তা প্রকট হয়ে উঠে।

قَوْلُهُ تَعَالَى سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে নবী! আপনি তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন আর নাই করুন তাদের জন্য সমান কথা, আল্লাহ কখনই তাদেরকে মাফ করবেন না। আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনোই হেদায়েত দেন না।"

হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, এ আয়াতটি সূরা তওবার আয়াত–

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ . (التوبة : ٨٠)

যখন অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমার প্রভু আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, আমি তাদের জন্য সত্তরবার মাগফিরাতের দোয়া করবো।" তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন। অর্থাৎ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে জানিয়ে দিলেন যে, মুনাফেকী না ছাড়লে তাদেরকে কখনই ক্ষমা করা হবে না। কারণ "আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনই হেদায়েত দেন না।" সুতরাং বুঝা গেল যে, মাগফিরাতের দোয়া কেবলমাত্র হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। যারা স্বেচ্ছায় নাফরমানি আর ফাসেকীর পথ অবলম্বন করে নিয়েছে, তাদের জন্য স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ ও যদি দোয়া করেন, সে দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। আর যারা হেদায়েত পেতে চায় না তাদেরকে হেদায়েত দান আল্লাহ তা'আলার নিয়ম নয়। আল্লাহ তা'আলা র নিয়ম হলো, যে লোক হেদায়েত পেতে চায় তাকে হেদায়েত দান করা।

মুনাফিকদেরকে هِدَايَةٌ হতে বঞ্চিত করার কারণ : মুনাফিকদের হেদায়েত হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে রুহুল বয়ান গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাদেরকে হেদায়েত নসিব করা (مُرْشِدٌ) আল্লাহর ইচ্ছা নেই অথবা আলমে আরওয়াহতে তাদের রূহসমূহে হেদায়েতের নূরের ঝলক পৌঁছেনি; তাই আল্লাহ বলেন– وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ –[রুহুল বয়ান]

قَوْلُهُ تَعَالَى هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ .... حَتّٰى يَنْفَضُّوْا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা সে লোক যারা বলে যে, রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ করে দাও, যাতে তারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।" এ বাক্যটি 'জুমলায়ে মুস্তানাফা' অর্থাৎ এখানে পূর্বোক্ত আয়াতের শেষাংশ 'আল্লাহ ফাসেক লোকদেরকে কখনো হেদায়েত দেন না।' এর কারণ বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ মুনাফিকগণ ফাসেক হওয়ার এবং ফাসেকদেরকে ক্ষমা না করার কারণ বলা হয়েছে যে, তারা তাদের আনসারী মু'মিন ভাইদেরকে বলে থাকে যে, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে যারা মক্কা হতে হিজরত করে মদীনায় আস্তানা বেঁধেছে তাদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান বন্ধ করে দাও। তাদের উপর যদি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ কর, তাহলে তারা মদীনা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে আর থাকবে না। একেকজন একেক দিকে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ পরিকল্পনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং মু'মিনদেরকে অভয় দিয়েছেন যে, মুনাফিকদের এ পরিকল্পনা অবশ্যই ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে। "অথচ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহই; কিন্তু এ মুনাফিকরা তা বুঝে না।" অর্থাৎ তারা আল্লাহর নিয়ম-নীতি বুঝে না, তিনি তো যারা তাঁর নাফরমানি করে তাদেরকেও রিজিক দান করেন, তাহলে কিভাবে তিনি যারা তাঁর বিধান মানে, বন্দেগি করে, তাদেরকে বঞ্চিত করবেন? সুতরাং তারা অর্থনৈতিক অবরোধ করে মু'মিনদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى لَئِنْ رَّجَعْنَا ...... مِنْهَا الْاَذَلَّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে যে সম্মানিত সে হীনকে সেখান হতে বহিষ্কৃত করবে।" এ উক্তি মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদেরকে অসম্মানিত আর নিজেকে এবং তার মুনাফিক সঙ্গী-সাথীদেরকে সম্মানিত ভেবে বলে, আমরা মদীনায় পৌঁছলে এ কুলাঙ্গারদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করবো। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল কোরআন, সাফওয়া]

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (র.) বলেন, আমি যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এ কথা রাসূলে কারীম ﷺ-কে বললাম এবং সে যখন তা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করল, আর সে জন্য 'কসম' করল, তখন আনসার সমাজের বয়োবৃদ্ধ লোকেরা আর আমার নিজের চাচা আমাকে খুবই তিরস্কার করলেন। এমনকি আমিও যেন অনুভব করতে লাগলাম যে, নবী করীম ﷺ বুঝি আমাকে মিথ্যাবাদী ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সত্যবাদী মনে করেছেন। এ কারণে আমার এত দুঃখ হলো যা সারা জীবনে কখনো হয়নি। আমি তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের ঘরে বসে রইলাম। পরে এ আয়াতটি যখন নাজিল হলো তখন রাসূলে কারীম ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি হাসতে হাসতে আমার কান ধরলেন এবং বললেন, ছেলেটির কান সত্যিই শুনেছিল, আল্লাহ নিজেই তার সত্যতা স্বীকার করেছেন। –[ইবনে জারীর, তিরমিযী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ ..... لَايَعْلَمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অথচ মান-মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং মু'মিনদের জন্য; কিন্তু এ মুনাফিকরা (তা) জানে না।' আল্লাহর ইজ্জত ও মর্যাদা হলো আল্লাহর দীনের শত্রুদেরকে পরাজিত করা। আর রাসূলের ইজ্জত হলো অন্যান্য ধর্মের উপর তাঁর দীনকে বিজয়ী করা। আর মু'মিনদের ইজ্জত হলো শত্রুদের উপর তাদেরকে আল্লাহ কর্তৃক সাহায্য-সহযোগিতা দান করা। –[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : আসমান ও জমিনের সমস্ত ধনভাণ্ডারের একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ; জান্নাতের নিয়ামতসমূহ, বৃষ্টি, রিজিক, জমিনের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত সকল সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। মহান আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ এর অধিকারী হতে পারে না। কিন্তু মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার শান ও কুদরত সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দান করেন সে-ই তা লাভ করে। যাকে আল্লাহ তা'আলা বঞ্চিত করেন কেউ তাকে দিতে পারে না। মহান আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেন কেউ তাকে অপমানিত করতে পারে না, আর যাকে তিনি অপমানিত করেন কেউ তাকে সম্মানিত করতে পারে না। কিন্তু এ নির্জলা সত্য মুনাফিকরা বুঝতে পারে না। –[নূরুল কোরআন]

لَايَفْقَهُوْنَ ও لَايَعْلَمُوْنَ -এর মধ্যকার পার্থক্য : لَايَعْلَمُوْنَ ও لَايَفْقَهُوْنَ -এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, মানুষ মানুষের রিজিকের জিম্মাদার হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সরাসরি প্রকৃত বিবেকের বিপরীতমুখি কথা। তার এ কথার প্রতি বিশ্বাস আসা বেকুফ হওয়ার নিদর্শন মাত্র। তাই প্রথম আয়াতে لَايَفْقَهُوْنَ বলেছেন।

আর দুনিয়াতে কখনো এক ব্যক্তি আবার কখনো অপর ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। তাতে যদি কোথাও তা ভুল ক্রমে ব্যতিক্রম হয়– তবে তা সম্বন্ধে অবগত না থাকা ব্যক্তির বে-খবর হওয়ার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। তাই শেষোক্ত আয়াতে لَايَعْلَمُوْنَ বলেছেন।

এ আয়াত মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ : আলোচ্য আয়াতটি মহানবী ﷺ -এর নবুয়তের সত্যতার এক দলিল। কারণ এখানে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ও মু'মিনরাই শেষ পর্যন্ত ইজ্জত এবং সম্মানিত হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যা কিছুদিন পরই প্রমাণিত হয়েছে। এ আয়াত যেদিন নাজিল হয় সেদিনও ইসলাম দুর্বল ছিল; কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর দীন বিজয়ী হলো। গোটা আরব উপদ্বীপে ইসলাম একমাত্র বিজয়ী দীন হিসাবে ঘোষিত হলো। সমগ্র বাতিল, আল্লাহদ্রোহী শক্তি ইসলামের সামনে মাথা নত করল। রাসূলের ইন্তেকালের পর পারস্য সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যদ্বয় খোলাফায়ে রাশেদীনের হাতে চলে আসল। এরও পর দুনিয়ার প্রায় অর্ধেক অংশ মুসলমানদের হাতে চলে আসল। এভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করল যে, এটা কোনো মানুষের নয়, তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর বাণী। আর এ বাণীর বাহক আল্লাহর রাসূল ﷺ।
–[রূহুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ تُشْغِلْكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج الصَّلَوٰاتِ الْخَمْسِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

৯. হে ঈমানদারগণ! যেন তোমাদেরকে উদাসীন না করে অমনোযোগী না করে তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর স্মরণ হতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হতে, আর যে ব্যক্তি এরূপ উদাসীন হবে, তরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

١٠. وَاَنْفِقُوْا فِي الزَّكَاةِ مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ بِمَعْنٰى هَلَّا اَوْلَا زَائِدَةٌ وَلَوْ لِلتَّمَنِّىْ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ بِاِدْغَامِ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الصَّادِ اَتَصَدَّقُ بِالزَّكٰوةِ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ بِاَنْ اَحُجَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ مَا قَصَّرَ اَحَدٌ فِى الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ اِلَّا سَاَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ .

১০. আর তোমরা ব্যয় করো জাকাত আদায়ে আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা হতে, তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু আগমন করার পূর্বে। অন্যথায় তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক যদি لَوْلَا শব্দটি هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত অথবা لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত এবং لَوْ অব্যয়টি تَمَنِّىْ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জন্য। আমাকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দান কর, তবে আমি সদকা করবো অর্থাৎ আমি জাকাতের মাধ্যমে সদকা করবো। শব্দটি মূলত اَتَصَدَّقُ ছিল। মূল শব্দে تَاء হরফটিকে صَاد হরফের মধ্যে اِدْغَام করা হয়েছে এবং আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে হজব্রত পালন করবো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হজ ও জাকাতের মধ্যে ত্রুটি করবে সে অবশ্যই মৃত্যুকালে দুনিয়াতে আরও কিছুকাল থাকার আবেদন করবে।

١١. وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ .

১১. কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকে অবকাশ দিবেন না। আর আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর, তদ্বিষয়ে সম্যক অবহিত। শব্দটি تَاء ও يَاء যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَاَصَّدَّقَ" : فَاَصَّدَّقَ শব্দটি মূলত فَاَتَصَدَّقَ ছিল। জমহুর এর تَاء-কে صَاد-এর মধ্যে اِدْغَام করে فَاَصَّدَّقَ পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ এবং সাঈদ ইবনে জোবাইর (র.) اِدْغَام না করে فَاَتَصَدَّقَ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ" : فَاَصَّدَّقَ শব্দ مَنْصُوْب হয়েছে جَوَاب تَمَنِّىْ হিসাবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, لَوْلَا-এর মধ্যের لَا অব্যয়টি অতিরিক্ত। সুতরাং মূল হলো لَوْ اَخَّرْتَنِىْ فَاَصَّدَّقَ অর্থাৎ তখন فَاَصَّدَّقَ হবে مَحَلًّا مَجْزُوْم জমহুর এ فَاَصَّدَّقَ-এর مَحَل-এর উপর عَطْف করে وَاَكُنْ শব্দটিকেও مَجْزُوْم পড়েছেন। যেন বলা হয়েছে اِنْ اَخَّرْتَنِىْ اَتَصَدَّقْ وَاَكُنْ আবূ আমর ইবনে মুহাইমিন এবং মুজাহিদ وَاَكُوْنَ শব্দটিকে مَنْصُوْب পড়েছেন, فَاَصَّدَّقَ-এর উপর عَطْف করে যার ......

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কারণ সুস্পষ্ট। আবূ ওবাইদ বলেছেন, আমি মাসহাফে ওসমানীতে এ শব্দটি وَاوْ হীনভাবে اَكُنْ দেখেছি। ওবাইদ ইবনে ওমাইর وَاَكُنْ-কে رَفْع দিয়ে جُمْلَه مُسْتَانِفَة হিসাবে পড়েছেন। অর্থাৎ وَاَنَا اَكُوْنُ –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "تَعْمَلُوْنَ" : জমহুর এ শব্দটিকে تَعْمَلُوْنَ পড়েছেন সম্বোধন হিসাবে। আবূ বকর আসেম হতে এবং সুলামী خَبَرْ হিসাবে يَعْمَلُوْنَ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ .... اَمْوَالُكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

এ সূরার প্রথম রুকূ'তে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল হতে আত্মরক্ষা এবং অপর দিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল তার পশ্চাতে এ কারণই নিহিত ছিল। এ দ্বিতীয় রুকূ'তে খাঁটি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেও না। –[মা'আরিফ, কুরতুবী]

অন্যান্য বস্তু বাদ দিয়ে ধন-সম্পদ আর সন্তানাদির আলোচনার কারণ : যেসব জিনিস মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহর জিকির হতে গাফেল করে তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ দু'টি– ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, তাই এ দু'টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্য সম্ভারই উদ্দেশ্য।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়; বরং এগুলো নিয়ে মশগুল থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েজ নয়, ওয়াজিবও হয়ে যায়; কিন্তু সর্বদা এ সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ বা জিকির হতে গাফিল না করে দেয়। এখানে আল্লাহর জিকিরের অর্থ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, কারো মতে হজ ও যাকাত এবং কারো মতে কুরআন। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এখানে জিকিরের অর্থ যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। (কুরতুবী, মা'আরিফ!) আমাদের মতে শেষোক্ত অর্থই অধিক যুক্তি-সঙ্গত এবং গ্রহণীয়। কারণ সবই তো আল্লাহর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

মোদ্দাকথা, সাংসারিক কাজে এভাবে মাশগুল হয়ে যাওয়া যার কারণে আল্লাহকেই ভুলে যায়, ফরজ, ওয়াজিব কার্যে বিঘ্ন ঘটে, একজন মু'মিনের জন্য তা কখনো উচিত নয়। সে কারণে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'যারা সাংসারিক কাজে মাশগুল হয়ে আল্লাহর জিকির হতে গাফিল হয়ে পড়ে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنْفِقُوْا ... اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যে রিজিক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর– তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে।' অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে আল্লাহর পথে অর্থাৎ যে কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করো। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, তার অর্থ 'জাকাত আদায় করো মৃত্যুর আলামত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে।' কারণ মৃত্যু এসে গেলে তখন আল্লাহর পথে দান করার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। সেই অবস্থায় আফসোস করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَيَقُوْلُ رَبِّ .... مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : মৃত্যুর ঘণ্টা বাজার পর যারা আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করেনি, তারা কি বলবে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, 'তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাকে আর একটু অবকাশ দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।'

অর্থাৎ মৃত্যু এসে পড়লে সকলেই আবারও সময় চাইবে এবং প্রতিজ্ঞা করবে যে, সময় পেলে সদকা করবো এবং নেককার বনে যাবো। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, সব সীমালঙ্ঘনকারীই মৃত্যু আসলে লজ্জিত হয়ে পড়বে এবং অতীতের ভুল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শোধরাবার জন্য আরো সময় চাইবে। কিন্তু আফসোস! কোনো সময়ই তাদেরকে আর দেওয়া হবে না। তাদেরকে জবাবে বলা হবে, 'যখন কারো মৃত্যুর সময় এসে পড়ে তখন আল্লাহ তাকে কখনো অবকাশ দেন না। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছেন।'

এখানে মৃত্যু আসার পূর্বে দান-সদকা করতে, ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত হয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তির বায়তুল্লাহর হজ করার মতো সম্পদ রয়েছে, অথবা জাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো ধন-সম্পদ রয়েছে; কিন্তু সে হজ করল না, জাকাত দিল না, যখন তার মৃত্যু আসবে তখন সে পুনর্বার সময় চাইবে। এ কথা শুনে এক লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -কে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো (যা ইচ্ছা তা মনগড়া বলো না) সময় চাইবে তো কাফেররা! তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আমার বক্তব্যের পক্ষে তোমাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করছি। এই বলে তিনি পড়লেন– وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ . –[সাফওয়া]

اِنْفَاقِ مَالْ -এর বর্ণনা পৃথকভাবে করার কারণ : আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু'টি কারণ মা'আরিফ গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন–

১. আল্লাহ এবং তার আহকামগুলো অনুসরণে থেকে মানুষকে বিরত ও গাফেল রাখার কারণগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান কারণ হলো "ধন-সম্পদ" তাই যে সকল ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা হয় যথা– জাকাত, হজ ইত্যাদি সে বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করো, তবে ধ্বংস হবে না, আল্লাহর স্মরণ হতে বঞ্চিত থাকবে না। কারণ সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা বালা-মসিবত হতে রক্ষা পাওয়া যায়, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– اَلصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْبَلَاءَ وَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ সদকা বালা-মসিবত দূর করে এবং আল্লাহর গজব হতে রক্ষা করে।

২. দ্বিতীয় কারণটি হলো, মৃত্যুর নিশানা প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তে তা কারো ধারণা থাকে না, অথবা কারো শক্তির আওতাভুক্ত থাকে না যে, সে কাজা নামাজ অথবা রোজা ইত্যাদি আদায় করে নিষ্পাপ হয়ে যাবে। অথবা, তার উপর ফরজ হজ কার্যটি সে এখন করে নিবে; বরং একমাত্র ধন-সম্পদ তখন তার সম্মুখে হাজির থাকে এবং তার এ বিশ্বাস নির্ঘাত এসে যায় যে, এ মাল তার এখনই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন তার হয়তো এ আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, হাতের মালগুলো ব্যয় করে হলেও ইবাদতে মালী-এর [অনাদায়ী] গুনাহ হতে পরিত্রাণ অর্জন করবে। তা اِنْفَاقِ مَالْ -কে পৃথকভাবে বিশেষ একটি ইবাদতের দিক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ : উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যে ব্যক্তির উপর জাকাত ওয়াজিব ছিল, অথবা হজ ফরজ ছিল তা সে কিছুই আদায় করতে পারেনি। মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার সময় সে আল্লাহ তা'আলার সমীপে এ আকাঙ্ক্ষা জানাবে যে, হে আল্লাহ! আমি দুনিয়াতে কিছু দিনের জন্য পুনরায় ফিরে যেতে চাই, তবে আমি সদকা-খয়রাত করবো এবং তোমার ফরজ ইবাদতগুলো আদায় করে পবিত্র হয়ে যাবো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَ كُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : অর্থাৎ আমাকে কিছু সময় দিলে এমন কতগুলো কাজ করবো, যাতে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। ফরজ ওয়াজিব ইত্যাদি যা অনাদায়ী রয়ে গেছে তা পূরণ করে নির্ভীক হয়ে যাবো। তবে আল্লাহ তা'আলা কাউকেও কখনো তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়সীমা উপস্থিত হওয়ার পর জীবিত রাখবেন না; কারণ আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের সর্ব কাজের খবর রাখেন।

তাই কবি বলেছেন– در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری * وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگاری

অর্থাৎ যৌবনকালে তওবা করা পয়গাম্বরী নিশানা এবং অভ্যাস, আর বৃদ্ধকালে জালিম বাঘের শক্তি নিস্তব্ধ হয়ে গেলে সে পরহেজগার হয়ে যায়।

Free @ www.e-ilmweebly.com

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ : সূরা আত্-তাগাবুন

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরায় বর্ণিত নয় নং আয়াত ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ -এর تَغَابُنْ শব্দ হতে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে। আর ধোঁকা বা প্রতারণা সাদৃশ্য হবে কিয়ামতের দিন, অর্থাৎ সেদিন ঈমানদারগণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলো [illegible]ফেররা দখল করবে। অথবা তার বিপরীত হবে, আপাত দৃষ্টিতে তখন তা ধোঁকা বলে মনে হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কেও অত্র সূ[illegible] রয়েছে। সে একটি বিষয়ের উপর পূর্ণ সূরার নাম করা হয়েছে। অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ১৮টি আয়াত, ২৪১টি বাক্য এবং ১০৭০টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটির অবতীর্ণ কাল : হযরত মুকাতিল ও কালবী (র.) বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর অপর অংশ মদীনায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, শুরু হতে ১৩নং আয়াত পর্যন্ত অংশটুকু মাক্কী আর ১৪নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মাদানী; কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ পূর্ণ সূরাটিই মাদানী, হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও এ সূরায় এমন কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে তার নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু তার মূল বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-বিবেচনা করলে একটা ধারণা এই হয় যে, সম্ভবত তা হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়ে থাকবে। এ কারণেই হয়তো তাতে কিছুটা মাক্কী সূরার ভাবধারা আর কিছুটা মাদানী সূরার ভাবধারা পাওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এক : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো ঈমান ও আনুগত্য গ্রহণের আহ্বান এবং উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদান। কথার পরম্পরা এরূপ যে, প্রথম চারটি আয়াতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার কুদরত, মহত্ত্ব এবং বড়ত্বের আলোচনার পর মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহকে স্বীকার করে আর যারা তাঁকে স্বীকার করে না.তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আবার আল্লাহর সিফাত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই : ৫ম আয়াত হতে ১০ম আয়াত পর্যন্ত সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে যারা কুরআনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করেছে। এ ক্ষেত্রে অতীতের লোকদের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে যারা মানুষ নবী হওয়ার কারণে নবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের এ অস্বীকৃতির ফলে তাদের উপর যে আল্লাহর আজাব ও ক্ষোভ পতিত হয়েছিল, পরে তা আলোচনা করা হয়েছে।

তিন : ১১শ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে কুরআনের আহ্বান যারা মেনে নিয়েছে তাদের লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে এবং তাদের আনুগত্য হতে বিমুখ না হতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর স্ত্রী-পুত্র ও সন্তানাদির শত্রুতা হতে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। শেষের দিকে আল্লাহর দীন কায়েমের লক্ষ্যে দান-সদকা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ : হযরত কালবী, মুকাতিল (র.) বলেন, এ সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আতা ও ইয়াসার (র.) বলেন, প্রথম থেকে ১৩ নং আয়াত পর্যন্ত মক্কায় এবং বাকি অংশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মতে এ সূরা সম্পূর্ণটি মাদানী। তবে মূলত কখন কিভাবে নাজিল হয়েছে তা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিতরূপে যদিও কিছু বলা যায় না তথাপিও তার বিষয়বস্তু নিয়ে গভীর গবেষণা চালালে এ ধারণা জন্মে যে, তা মাদানী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হতে পারে। তাই তাতে মাক্কী ও মাদানী উভয় প্রকারের সূরা হওয়ার ভাব প্রকাশিত হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : ইমাম রাযী (র.) উভয় সূরার সম্পর্কের ব্যাপারে বলেছেন যে, সূরা আল-মুনাফিকূনে মিথ্যুক মুনাফিকদের মিথ্যাবাদিতা এবং প্রতারণার বিবরণ দিয়ে তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ হয়েছে যে, يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ . অর্থাৎ 'আসমান জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন।'

অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলার আজাবকে ভয় করা এবং পরকালীন জীবনের জন্য সম্বল সংগ্রহ করা। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আত-তাগাবুন মক্কা অথবা মদীনায় অবতীর্ণ

ثَمَانِى عَشَرَةَ اٰيَةً : ১৮ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج يُنَزِّهُهُ فَاللَّامُ زَائِدَةٌ وَاَتٰى بِمَا دُوْنَ مَنْ تَغْلِيْبًا لِلْاَكْثَرِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। لِ অক্ষরটি অতিরিক্ত। আর প্রাণীবাচকের জন্য ব্যবহৃত مَنْ -এর স্থলে অপ্রাণীবাচকের জন্য ব্যবহৃত مَا সংখ্যাধিক্যের প্রাধান্য বিবেচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। রাজত্ব তাঁরই জন্য এবং প্রশংসা তাঁরই নিমিত্ত। আর তিনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

২. هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط فِىْ اَصْلِ الْخِلْقَةِ ثُمَّ يُمِيْتُهُمْ وَيُعِيْدُهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর তোমাদের মধ্য হতে কতিপয় কাফের ও কতিপয় মু'মিন সৃষ্টিগতভাবে। অতঃপর তিনি তাদের মৃত্যুদান করেন এবং পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত করেন। আর আল্লাহ তোমরা যা কিছু কর, তা সম্যকরূপে প্রত্যক্ষকারী ।

৩. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اِذْ جَعَلَ شَكْلَ الْاٰدَمِىِّ اَحْسَنَ الْاَشْكَالِ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ .

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অনন্তর তিনি তোমাদের আকৃতিকে উত্তম ও শোভনীয় করেছেন। কেননা মানবজাতিকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন।

৪. يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْاَسْرَارِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ .

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তিনি সমস্ত কিছুই জানেন এবং তোমরা যা কিছু গোপন কর ও প্রকাশ কর তিনি তাও জানেন। আর আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত তন্মধ্যে গোপন রহস্য ও আকীদা-বিশ্বাসের মধ্য হতে যা কিছু আছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ" : জমহুর صَادْ এ ضَمَّة দিয়ে فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ পড়েছেন। হযরত যায়েদ ইবনে আলী, আ'মাশ ও আবূ যাইদ (র.) صَادْ -এ كَسْرَه দিয়ে فَاَحْسَنَ صِوَرَكُمْ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ لِلّٰهِ ...... عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, ব্যক্তি-বস্তু, জীব-নির্জীব, পদার্থ-অপদার্থ, যতকিছু তাঁর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সকলেই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে থাকে। রাজত্ব ও একচ্ছত্র প্রভুত্ব তাঁরই, তাই প্রশংসার অধিকারীও তিনিই। তাঁর শক্তি সর্ববিষয়ে ও সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবী হতে মহাকাশের বিস্তৃতি পর্যন্ত যে দিকেই তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না কেন, বিবেক-বুদ্ধি যদি তোমাদের থেকে থাকে, জ্ঞানান্ধ যদি তোমরা না হয়ে থাক, সজীবতা যদি তোমাদের মধ্যে বহাল থাকে, তবে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, একটি অণু হতে আরম্ভ করে মহাকাশের বিশালাকায় স্থায়ী পথ ও নীহারিকা পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসই একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব ও অবস্থিতির সত্যতার উপর সাক্ষ্য প্রদান করে। উপরন্তু এ সাক্ষ্যও দেয় যে, আল্লাহ সর্বপ্রকার দোষত্রুটি, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ও ভুল-ভ্রান্তি আর মানবীয় সকল পরিস্থিতি হতে মুক্ত বা পবিত্র। তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এবং তাঁর কাজকর্ম ও আদেশ-নিষেধসমূহে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার সামান্য দোষ থাকার সম্ভাবনা যদি থাকত, তাহলে এ পূর্ণমানের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্বব্যবস্থা অস্তিত্বই লাভ করতে পারত না। অনন্তকাল হতে এমন অবিচল ও ব্যতিক্রমহীন পন্থায় তার চলাও সম্ভব হতো না।

সুতরাং গোটা সৃষ্টিজাতির আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা ও বশ্যতা স্বীকার করা অপরিহার্য। যেহেতু তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের মালিক ও বাদশাহ। সকল সৃষ্টি তাঁর তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসায় লিপ্ত থাকা একান্ত উচিত। কারণ তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর শক্তির অধিকারী। তিনি যা খুশি তা-ই করতে পারেন। তাঁর শক্তিকে কোনো শক্তি ক্ষীণ অথবা সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত বা বাধা প্রদান করতে পারে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِىْ .... وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন , "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের কেউ মু'মিন।" এ কথাটির চারটি অর্থ হতে পারে এবং এ চারটি অর্থই এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক : তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তোমাদের কেউ তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার কথাকে অস্বীকার করে, আবার কেউ এ মহাসত্য মেনে নিচ্ছে।

দুই : তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তোমরা ইচ্ছা করলে কুফরি করতে পার, আবার ইচ্ছা করলে ঈমানও গ্রহণ করতে পার। কোনো ব্যাপারেই তোমরা বাধ্য নও। আয়াতের শেষ অংশে এ অর্থের সমর্থন রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– "তোমরা যা কিছু কর সবই আল্লাহ দেখেন।" অর্থাৎ তোমরা স্বেচ্ছায় কুফরি করছ কিংবা ঈমান গ্রহণ করছ আল্লাহ তা'আলা সবই লক্ষ্য করছেন।

তিন : আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ ও সৎ প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি এই হওয়া উচিত ছিল যে, তোমরা সকলে ঈমানের পথ অবলম্বন করবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাদের কিছু লোক ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, আর কিছু লোক কুফরি করেছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে 'সব সন্তানই সৎ প্রকৃতির উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নি-পূজক বানায়।'

চার : আল্লাহ তোমাদেরকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে এনেছেন। তোমরা ছিলে না, পরে তোমরা হয়েছ। এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে চিন্তা করলে তোমরা বুঝতে পারতে যে, তোমাদের এ অস্তিত্ব আল্লাহ তা'আলার এক মহা দান। তা চিন্তা করে তোমাদের একদল ঈমান গ্রহণ করেছে। অপর একদল চিন্তা-ভাবনা না করে তাঁকে অস্বীকার করেছে। –[কুরতুবী]

মানুষদেরকে সৃষ্টি করার উপর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি : পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে– কাফির ও মু'মিন, এতে প্রতীয়মান হলো যে, সকল আদম সন্তান একই ভ্রাতৃত্ব বিশেষ, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সে ভ্রাতৃত্বের প্রতিফল ও সংখ্যা মাত্র এবং এ ভ্রাতৃত্ববোধকে বিনষ্ট করার একমাত্র কারণ হলো কুফরি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাফির হয়ে গেছে সে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করেছে। বিশ্বের মানুষের মধ্যে পৃথকতা সৃষ্টি হয়েছে ঈমান ও কুফরির কারণেই। ভাষা, রং, বংশ, গোত্র, দেশ ইত্যাদির কোনো কিছুই মানুষকে পৃথক করার মূল কারণ হতে পারে না। একমাত্র মতবাদই পৃথক করতে সক্ষম।

Free @ www.eilm.weebly.com

অজ্ঞ যুগের বংশ ও গোত্রের পার্থক্য পার্টিগত ও দলগত বিভক্তির একমাত্র কারণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে দেশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণেও মানুষ বিভিন্নতর মতবাদে পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল পার্থক্যকে চিরতরে ভঙ্গ করে দিয়েছেন। মুসলমানদের দেশ ও জাতি, রং-রূপ, উঁচু-নীচু ভেদে সকলকে এক সারিতে সারিবদ্ধ করে দিয়েছেন. যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে সকল মুসলিম ভাই ভাই।' তদ্রূপভাবে اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ অর্থাৎ কাফিরগণও যে দেশ ও যে গোত্রের হোক না কেন, প্রত্যেক দলই একই সম্প্রদায় ভুক্ত।

পবিত্র কালামের উক্ত আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানকারী যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে কাফের ও মু'মিন এ দু' প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তাদের ভাষা ও রং -এর বিভিন্নতাকে কুরআনুল কারীম আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এবং মানুষের জন্য জীবিকা নির্বাহের বহু উপকরণ হিসাবে রেখে এক বিশেষ নিয়ামতের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাকে আদম সন্তানদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়নি। ঈমান ও কুফরির দিক দিয়ে দু'সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হওয়া এটা একটি أَمْرٌ إِخْتِيَارِيٌّ কেননা ঈমান ও কুফর উভয়টি أَمْرٌ إِخْتِيَارِيٌّ যদি কেউ একটি মতবাদ ত্যাগ করত অপর একটি মতবাদে প্রবেশ করতে চায়, তবে অতি সহজেই তার পক্ষে তা সম্ভব হবে। তবে বংশ, রং, ভাষা এবং দেশ পরিবর্তন করা তার একা খুশিমতেই সম্ভব নয়। অথবা, তার ইচ্ছাধীন সম্ভব নয়। তবে ভাষা ও দেশ পরিবর্তন করা যদিও সম্ভব, তথাপিও নিজ বংশ মর্যাদার পরিচয় বিসর্জন অথবা রং পরিবর্তন সম্ভব হয় না, স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়সমূহ অন্য দেশের অধিবাসীকে নিজেদের দেশে স্থান দান করা মোটেই সহ্য করে না, যদিও সে সেই (পরদেশের) ভাষা বলে অথবা তথায় বসবাস রত থাকুক না কেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ : "তিনি সৃষ্টি করেছেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে।" এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে।

এক. তিনি আসমানসমূহ এবং জমিন সত্যই সৃষ্টি করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুই. এখানে بَاء হলো لَامٌ -এর অর্থে। অর্থাৎ তিনি আসমানসমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যারা সৎকর্ম করবে তাদেরকে সৎ প্রতিদান এবং যারা কুকর্ম করবে তাদেরকে শাস্তিদানের জন্য। -[কুরতুবী]

আল্লামা শওকানী (র.) এতদ্ব্যতীত আরও একটি অর্থ করেছেন, তা হলো 'তিনি আসমানসমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ হিকমত সহকারে।'

قَوْلُهُ تَعَالَى وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ الْاٰيَة : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি তোমাদের আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং অতীব উত্তম বানিয়েছেন।"

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত আদম (আ.)-কে সম্মানিত করে আল্লাহ তা'আলা এত সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বিতীয় অর্থ হলো, সমস্ত মানবজাতি। সমস্ত মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা এত সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ অন্য কোনো প্রাণীর আকৃতি গ্রহণ করতে চায় না। মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর মতো না করে দু' পায়ে চলার শক্তি দিয়েছেন, তাকে এমন আকার-আকৃতি দান করেছেন যে, সে নিজেকে অন্য কোনো আকৃতিতে দেখতে চায় না।
-[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

কেউ কেউ বলেছেন, صُوْرَةٌ তথা আকার-আকৃতি বলতে কেবলমাত্র বাহ্যিক চেহারই বুঝায় না; বরং মানুষের সমস্ত দৈহিক ও আঙ্গিক সংগঠন এবং এ দুনিয়াতে কাজ করার জন্য যেসব শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা মানুষকে দেওয়া হয়েছে তা সবই এখানে বুঝাতে হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিশ্বলোকে সৃজন করেছেন এবং তাদের জীবনের নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত করেছেন। আর সে সময়ের জন্য প্রত্যেককে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য যুগে যুগে পয়গাম্বরগণকে পাঠিয়ে তাদেরকে সচেতন করেছেন। সুতরাং জীবনের শেষ প্রান্তে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিয়ে সকল হিসাব-নিকাশ পেশ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন-

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا - وَاِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ - وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ প্রত্যেকেই আল্লাহর সমীপে হাজির হতে হবে, আল্লাহর নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। অচিরেই তোমাদের সহজ হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى মানুষ কি মনে করে যে তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?

আদম সন্তানদেরকে প্রথম দিনেই [রোযে আযলে] ৪ প্রকার সৃষ্টি করেছেন–

(١) خَلَقَ سَعِيْدًا فِى الْاَزَلِ وَيَظْهَرُ مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ عَلَيْهِ .

১. রোযে আযলেই তাকে নেককার করে সৃষ্টি করেছেন, মু'মিন হিসাবে দুনিয়াতে বসবাস করবে এবং মু'মিন হিসাবে মারা হবে।

(٢) كُتِبَ شَقِيًّا فِى الْاَزَلِ فَيَعِيْشُ كَافِرًا وَ يَمُوْتُ كَذٰلِكَ .

২. রোযে আযলেই বদবখত হিসাবে সৃজীত, কাফের হিসাবে জীবন যাপন করবে। কাফের হিসাবেই মৃত্যুবরণ করবে।

(٣) كُتِبَ سَعِيْدًا فِى الْاَزَلِ فَيَعِيْشُ كَافِرًا وَيُخْتَمُ لَهُ بِالْاِيْمَانِ وَهٰذِهِ الثَّلَاثَةُ كَثِيْرَةُ الْوُقُوْعِ .

৩. নেককার হিসাবেই রোযে আযলে তার ভাগ্য নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কাফেরের ন্যায় জীবন-যাপন করবে। ঈমানদার হিসাবে ইন্তেকাল করবে। এ তিন প্রকৃতির লোক অধিক হবে।

(٤) وَشَخْصٌ يَعِيْشُ مُؤْمِنًا وَيُخْتَمُ لَهُ بِالْكُفْرِ .

৪. ঈমানদার হিসাবে জীবন-যাপন করবে, কাফের হয়ে ইন্তেকাল হবে। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) –[সাবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَعْلَمُ مَا فِى .... بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে তিনি জানেন। তোমরা যা কিছু গোপন কর আর যা কিছু প্রকাশ কর তা সবই তিনি জানেন। তিনি অন্তরসমূহের অবস্থাও জানেন।" অর্থাৎ এ বিশ্বলোকের এমন কোনো বিষয় নেই যা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা জানেন না। মানুষ যা প্রকাশ্যে করে, আর যা গোপনে করে সবই তাঁর জ্ঞাত। কোনো কিছুই তাঁর জানা বাহির্ভূত হতে পারে না। তিনি অন্তরের গোপন রহস্যসমূহ সম্বন্ধেও অবগত। সুতরাং তোমরা মানুষরা কিভাবে ভাবতে পার যে, তোমাদের প্রকাশ্য আমল সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ থাকবেন? তোমাদের আমল তাঁর কাছে গোপন থাকবে? –[সাফওয়া]

এ সত্যতা এবং বাস্তবতা যখন মানুষ জানতে পারে তখন সে নিজেকে ছোট ও হেয় মনে করে। কারণ মানুষ এ বিশ্ব-ব্রাহ্মণ্ডের প্রকাশ্য অল্প-কিছু বিষয় সম্বন্ধেই কেবল জানে, বাকি সব রহস্য তার কাছে অজানা থাকে; কিন্তু আল্লাহর কাছে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের কোনো বিষয়ই গোপন থাকে না–তিনি সবই জানন। যেমনি তিনি মানুষ যা গোপনে করে আর যা প্রকাশ্যে করে সবই জানেন। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো সর্বাবস্থায় সতর্ক থাকা যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে নাফরমানি অবস্থায় দেখতে না পান। ফাসেকী ও ফাজেরীতে না দেখেন। –[রূহুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. اَلَمْ يَاْتِكُمْ يَا كُفَّارُ مَكَّةَ نَبَأُ خَبَرُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ عُقُوْبَةَ كُفْرِهِمْ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ اَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ .

٦. ذٰلِكَ اَىْ عَذَابُ الدُّنْيَا بِاَنَّهُ ضَمِيْرُ الشَّاْنِ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ الْحُجَجِ الظَّاهِرَاتِ عَلَى الْاِيْمَانِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ اُرِيْدَ بِهِ الْجِنْسُ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا عَنِ الْاِيْمَانِ وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط عَنْ اِيْمَانِهِمْ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ عَنْ خَلْقِهِ حَمِيْدٌ مَحْمُوْدٌ فِىْ اَفْعَالِهِ .

অনুবাদ :

৫. তোমাদের নিকট কি আগমন করেনি? হে মক্কাবাসী কাফেরগণ। বৃত্তান্ত সংবাদ পূর্ববর্তী কাফেরগণের। তারা তাদের কৃতকর্মের মন্দফল ভোগ করেছিল দুনিয়াতে তাদের কুফরির পরিণাম ভোগ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক।

৬. এটা পার্থিব শাস্তি এ জন্যই যে, সর্বনামটি ضَمِيْرُ الشَّاْنِ। তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আগমন করতেন ঈমান সম্পর্কিত প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণসহ। তখন তারা বলত, তবে কি মানুষই তা দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য করা হয়েছে আমাদেরকে পথের সন্ধান দান করবে? অতঃপর তারা কুফরি করল ও বিমুখ হলো ঈমান আনয়ন করা হতে। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী তাদের ঈমান হতে আর আল্লাহ অভাবমুক্ত তাঁর সৃষ্টি হতে প্রশংসিত তাঁর কার্যাবলিতে প্রশংসিত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا : اَبَشَرٌ শব্দটি আরবি তারকীবে مُبْتَدَأ হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। কেউ কেউ তার مَرْفُوْع হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, اَبَشَرٌ শব্দটি একটি فِعْل مَحْذُوْف -এর فَاعِل হওয়ার কারণে مَرْفُوْع হয়েছে। -[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ يَاْتِكُمْ ....الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ইতঃপূর্বে যারা কুফরি করেছে এবং তারপর নিজেদের কুকর্মের স্বাদ আস্বাদন করেছে, তাদের কোনো খবর তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি? তাদের জন্য (পরকালেও) যন্ত্রণাদায়ক আজাব রয়েছে।" অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা তাদের নিজেদের কুকর্মের যে তিক্ত ফল ভোগ করেছে তা তাদের অপরাধের আসল শাস্তি ছিল না, পূর্ণ শাস্তিও ছিল না। আসল ও পূর্ণ শাস্তি তো তাদেরকে পরকালে ভোগ করতে হবে; কিন্তু দুনিয়াতে তাদের উপর যে আজাব এসেছে, তা হতে লোকেরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, যেসব জাতি নিজেদের মা'বূদের বিরুদ্ধে কুফরিমূলক আচরণ অবলম্বন করেছে তারা ক্রমাগতভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত কঠিন ও মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে।

وَبَال -এর অর্থ :

اَصْلُ الْوَبَالِ الثِّقْلُ وَمِنْهُ الْوَبِيْلُ لِطَعَامٍ يَثْقُلُ عَلَى الْمِعْدَةِ وَالْوَابِلُ الْمَطَرُ الثَّقِيْلُ الْقِطَارُ اُسْتُعْمِلَ الْعُقُوْبَةَ لِاَنَّهُ يَثْقُلُ عَلَى الْاِنْسَانِ ثِقْلًا مَعْنَوِيًّا .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূলত ওয়াবাল অর্থ কঠিনতা, তা হতে বলা হয় وَبِيْل অর্থাৎ যে সকল খাদ্য হজম করা অত্যন্ত কঠিন, وَابِلٌ অর্থ– মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া। এখানে وَبَالٌ বলে শাস্তি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ শাস্তি যদিও বোঝা নয় তবুও রূপক অর্থে তা মারাত্মক বোঝা স্বরূপ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى ذٰلِكَ بِاَنَّهُ ...... بِالْبَيِّنٰتِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা এরূপ পরিণতির সম্মুখীন এ জন্য হয়েছে যে, তাদের নিকট তাদের নবী-রাসূলগণ স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা বলেছে মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত দিবে নাকি? এভাবে তারা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন আল্লাহও তাদের ব্যাপারে বে-পরোয়া হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ তো স্বতই পরোয়াহীন ও স্বীয় সত্তায় সুপ্রশংসিত।"

فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَهْدُوْنَنَا আয়াতে بَشَرٌ শব্দটি একবচন হলেও জিনস হিসেবে বহুবচনের অর্থ দেয়। তাই يَهْدُوْنَ বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুয়ত ও রিসালাতের পরিপন্থি মনে করাও কাফেরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কুরআনের স্থানে স্থানে এ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে, পরিতাপের বিষয় এখন মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম ﷺ-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুয়তের পরিপন্থি নয় এবং রিসালতের উচ্চ মর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূর এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল। –[মা'আরিফ]

যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানবত্ব অস্বীকার করে তারা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো একবার পড়ুন।

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سُوْرَةُ الْكَهْفِ : ١١٠)

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا . (بَنِىْ اِسْرَائِيْل : ٩٣)

لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ . (اَلْبَرَاۤءَةُ : ١٤٨)

হাদীস শরীফে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজে ভুল হয়ে গেলে এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, নামাজ কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘটনা অবহিত করার পর তিনি বললেন–

لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلٰوةِ شَئٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ كِتَابِ الصَّلٰوةِ : ٣١)

অর্থাৎ নামাজের ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করা হলে আমি তা তোমাদের জানিয়ে দিতাম; কিন্তু আমিও তোমাদের মতো মানুষ, তোমরা যেরকম ভুলে যাও, ঠিক তেমনি আমিও ভুলে যাই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا : فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا -এর দু'টি অর্থ করা হয়েছে। এখানে দু'টি অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক. 'তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।' অর্থাৎ রাসূলগণ যখন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন তখন তারা মানুষ বলে তাঁদেরকে রাসূল ও নবী বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করল। তারা মনে করত, মানুষ আবার রাসূল হবে কিভাবে? রাসূল হতে হলে মানুষ না হয়ে অন্য কোনো পবিত্র কিছু হতে হবে।

দুই. তখন তারা তাদের এ উক্তি (যে, 'মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত দিবে না কি?') দ্বারা কাফির হয়ে গেল। অর্থাৎ এই বলে রাসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করার কারণে তারা কাফের হয়ে গেল। –[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া, কুরতুবী]

নবুয়ত ও বাশারিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য : بَشَرِيَّةٌ আর নবুয়তের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, بَشَرِيَّةٌ . نُبُوَّةٌ -এর জন্য لَازِمٌ নয়; বরং بَعْضُ الْبَشَرِ نَبِىٌّ وَاَكْثَرُ الْبَشَرِ لَيْسَ نَبِىٌّ নয় আবার بَشَرٌ ও نُبُوَّةٌ -এর জন্য مُنَافِىٌّ নয়।

কাফেরদের বাতিল ধারণা এই ছিল যে, نُبُوَّتٌ ও رِسَالَتٌ মানুষের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে না। এটা সত্য নয়। তবে আফসোসের বিষয় হলো, কিছু সংখ্যক মানুষ নবীদের ও রাসূলদেরকে بَشَرِيَّةٌ হতে خَارِجٌ মনে করে থাকেন। وَهٰذَا زَعْمٌ بَاطِلٌ তাও বাতিল ধারণা, কেননা স্বয়ং নবী করীম ﷺ বলেছেন– اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ, তবে পার্থক্য হলো যে, তোমাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় না, আর আমার নিকট প্রেরণ করা হয়।

সুতরাং যারা نَبِىْ গণকে بَشَرٌ বলে স্বীকার করেন না তাদেরকে এ বিবেক খরচ করা উচিত যে, মানুষের জন্য نُبُوَّةٌ নিষিদ্ধ নয়, রিসালাতও নিষিদ্ধ নয়। আর রাসূল নূরের তৈরি, বরং রাসূল আল্লাহর নূর এবং রাসূলও বটে। তবে তাদের নূরকে সূর্য ও চেরাগের নূরের সাথে তুলনা করা মারাত্মক ভুল হবে। বলতে হবে তিনি نُوْرٌ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ আল্লাহর নূরের অংশমাত্র। তাঁকে সে নূরের সংমিশ্রণে মানুষ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। –[মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ مُخَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهُمْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ .

৭. কাফেরগণ ধারণা করে যে, اَنْ মুখাফ্ফাফা, তার اِسْم উহ্য অর্থাৎ اَنَّهُمْ তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। আপনি বলুন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আর তা আল্লাহর পক্ষে অতিশয় সহজ।

٨. فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الْقُرْاٰنِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

৮. অতএব, তোমরা ঈমান আনয়ন কর আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি আর সে জ্যোতির প্রতি কুরআন যা আমি অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

٩. اُذْكُرْ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط يَغْبِنُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ بِاَخْذِ مَنَازِلِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ فِى الْجَنَّةِ لَوْ اٰمَنُوْا وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ فِى الْفِعْلَيْنِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

৯. স্মরণ কর যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন সমাবেশ দিবসের জন্য কিয়ামতের দিন এটাই লাভ-লোকসানের দিন মু'মিনগণ কাফিরদেরকে লোকসানে ফেলে দিবে, বেহেশতে তাদের নিবাস ও স্ত্রীদেরকে অধিকার করে নেওয়ার মাধ্যমে, যা তারা ঈমান আনয়নের মাধ্যমে লাভ করতে পারত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করে দিবেন, আর তাকে প্রবিষ্ট করবেন অপর এক কেরাতে نُكَفِّرْ ও نُدْخِلْ উভয় ফে'লই নূনযোগে অর্থাৎ صِيْغَه مُتَكَلِّمْ-এর সাথে পঠিত হয়েছে। জান্নাতে যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তারা তথায় চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহান সাফল্য।

١٠. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِىَ .

১০. আর যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে কুরআনকে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় চির অবস্থানকারী আর কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন ক্ষেত্র তা।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ : ইমাম যুজাজের মতে, لَتُبْعَثُنَّ ক্রিয়াই তার عَامِلْ তাফসীরে কাশশাফে لَتُنَبَّؤُنَّ -কে তার عَامِلْ বলা হয়েছে। অনেকেই خَبِيْر -কে তার عَامِلْ মনে করেছেন, কারণ তাতে তিরস্কারের অর্থ রয়েছে। যেন বলা হয়েছে وَاللّٰهُ مُعَاقِبُكُمْ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ আর কেউ কেউ বলেছেন তার عَامِلْ লুপ্ত রয়েছে। আর তা হলো اُذْكُرْ

–[ফাতহুলকাদীর, কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يَجْمَعُكُمْ : জমহুর يَا، তে فَتْح দিয়ে আর عَيْن -এ ضَمَّة দিয়ে يَجْمَعُكُمْ পড়েছেন। আবূ আমর হতে এক বর্ণনায় عَيْن -কে سَاكِنْ করে পড়ার কথা জানা যায়। তবে تَخْفِيْف করা ছাড়া তার অন্য কোনো কারণ দেখা যায় না। এ تَخْفِيْف ও এখানে অপ্রয়োজনীয়। হযরত যায়েদ ইবনে আলী, শা'বী, ইয়াকূব ও নসর ইবনে আবী ইসহাক এবং জুহদারী (র.) يَجْمَعُكُمْ -এর পরিবর্তে نَجْمَعُكُمْ পড়েছেন।

قَوْلُهُ "يُكَفِّرْ وَيُدْخِلْهُ" : জমহুর উভয় শব্দ يَا، দ্বারা অর্থাৎ يُكَفِّرْ ও وَيُدْخِلْهُ পড়েছেন। নাফে' এবং ইবনে আমের উভয় স্থানে نُوْن দিয়ে نُكَفِّرْ ও وَنُدْخِلْهُ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِيْنَ .... عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাফেরদের দাবি ছিল যে, তাদেরকে কখনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে এ কারণেই বলেছেন যে, হে রাসূল! আপনি সে দুরাত্মা পাপাচারীদেরকে এ কথা বলে দিন যে, তোমরা যা ভাবনা করছ, তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ধারণা। তবে আমি আমার প্রভুর শপথ করে বলছি। তোমরা শুনে নাও, তোমরা জেনে নাও নিঃসন্দেহে তোমদেরকে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হবে যে, তোমরা কে কখন কি কি কাজ করে কি অর্জন করেছ। তোমরা পরকালকে অস্বীকার করলে চলবে না। অথচ যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সে মানুষদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়, বরং একেবারেই সহজসাধ্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাদের এ ধারণাও কোনো যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে

وَيَسْتَنْبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ـ قُلْ اِيْ وَ رَبِّيْ اِنَّهُ الْحَقُّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - (يُوْنُس ٥٣)

আবার সূরা সাবায় বলা হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَ رَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ الخ - (سَبَا ٣)

পরকালে অবিশ্বাসীকে কসম করে পরকালের খবরদানের উপকারিতা : যে লোক পরকাল অস্বীকার করে, তাকে কসম করে পরকালের সংবাদদানে লাভ কি? এ কসমের কারণে সে কি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে যাবে?

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, নবী করীম ﷺ এমন লোকদের সামনে কথা বলেছেন, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানত যে, এ লোকটি সারা জীবনে কখনই মিথ্যা কথা বলেনি। এ কারণে মূলত তারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যত মিথ্যা কথাই প্রচার করুক না কেন, এরূপ সত্যবাদী ব্যক্তি আল্লাহর নামের কসম খেয়ে কখনো এমন কথা বলতে পারেন, যার প্রকৃত সত্য হওয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় নেই। এ রকম কথা তারা অন্তরে ধারণা পর্যন্ত করতে পারত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, নবী করীম ﷺ কেবল পরকাল বিশ্বাসের কথাই বর্ণনা করছেন না; বরং সে জন্য তিনি অতীব অকাট্য দলিল-প্রমাণও পেশ করতেন; কিন্তু নবী ও অ-নবীর মধ্যে তো পার্থক্য আছে। এ পর্যায়ের বড় পার্থক্য হলো, একজন অ-নবী পরকালের সত্যতা পর্যায়ে যতটা অকাট্য দলিলই দিক না কেন তার সর্বাধিক লাভ এই হতে পারে যে, তার কারণে পরকাল না হওয়ার তুলনায় হওয়ার সম্ভাব্যতা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও অধিক বিশ্বাস্য মনে হতে পারে; কিন্তু নবীর ব্যাপারটি এটা হতে ভিন্নতর, তাঁর স্থান একজন দার্শনিকের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর হয়ে থাকে। নবীকে নিছক বিবেক-বুদ্ধিগত দলিল-প্রমাণের সাহায্যে পরকাল হওয়ার কথা বিশ্বাস করতে হয় না; বরং নবী তো পরকাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন এবং তা যে হবেই তা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই বলতে পারেন। এ কারণেই একজন নবীই কসম করে এরূপ কথা বলতে পারেন, একজন দার্শনিক যুক্তিবাদী এ জন্য কসম খেতে পারেন না। কারণ তাতে কোনো লাভ নেই। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর এরূপ [পুনরুজ্জীবিত] করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।' অর্থাৎ এ বিশ্বলোক এবং তার ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা যার পক্ষে কঠিন হয়নি, আর যার পক্ষে এ দুনিয়ার মানুষকে সৃষ্টি করা কঠিন ছিল না; এ মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে নিজের সম্মুখে উপস্থিত করা ও তার যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ করা তাঁর পক্ষে কেন অসম্ভব হবে? তার পরকাল হওয়ার দ্বিতীয় দলিল। -[কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ ...... اَنْزَلْنَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'অতএব ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে নূরের প্রতি যা আমি নাজিল করেছি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।'

Free @ www.e-ilmweebly.com

ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, পরকালীন জীবন অবশ্যম্ভাবী। অতঃপর বলা হয়েছে- আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর নাজিলকৃত নূর তথা কুরআনের প্রতি ঈমান আনো, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পরকালীন জীবনে সুখ-শান্তি এবং মুক্তি চাইলে অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে। অতঃপর وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ বলে বলা হয়েছে যে, কেবল মুখের ঈমান যথেষ্ট নয়, তার সাথে সাথে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমলও করতে হবে। ঈমানের দাবি অনুযায়ী তোমরা আমল করছ, না ঈমানের পরিপন্থি আমল করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা সম্যক অবহিত।

এখানে পবিত্র কুরআনকে রূপকভাবে নূর বা আলো বলা হয়েছে, কারণ আলোর মাধ্যমে যেমন চতুষ্পার্শ্বের জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি পবিত্র কুরআন দ্বারা গোমরাহীর অন্ধকারে সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

-[রূহুল কোরআন, কাবীর, সাফওয়া, ফাতহুল কাদীর]

وَالنُّوْرِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا আয়াতের ফায়দা : وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে (নূর) বলেছেন, কারণ নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ শেষ শরিয়তের বিধিবিধান সম্বলিত গ্রন্থ বাস্তবিক পক্ষে তৎপূর্ববর্তী বিধি-বিধান অপেক্ষা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে যাতে কোনো কিছুই অস্পষ্ট নয়; বরং সর্ব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত كَمَا قَالَ تَعَالٰى هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ আর মূলত তা কুফর ও শিরক -এর যাবতীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে দেয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ সূর্য যেভাবে বিশ্বজগতের সব কিছুর উপর আলোক দান করে থাকে সেভাবে মুহাম্মদ ﷺ অর্থাৎ خَاتَمُ الْمُرْسَلِيْنَ -এর রিসালত দ্বারা তিনি সকল মানবজাতিকে হেদায়েতের নূরে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। আর যাদের রূহানী চক্ষু রয়েছে তাদের জন্য কুরআন নূর স্বরূপ কাজ করেছে। আর যাদের জন্য অন্তরচক্ষু নেই তাদের জন্য কুরআন নূর স্বরূপ কাজ করছে না। যেমন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)ও হুযূর ﷺ-কে সূর্য বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন তিনি বলেন-

لَنَا شَمْسٌ وَلِلْاٰفَاقِ شَمْسٌ ٭ وَشَمْسِيْ اَفْضَلُ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ
فَاِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الصَّبَاحِ ٭ وَشَمْسِيْ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অর্থাৎ 'আমার একটি সূর্য রয়েছে' আকাশেরও একটি সূর্য রয়েছে; তবে আকাশের সূর্য অপেক্ষা আমার সূর্য অতি উত্তম। আর আকাশের সূর্য উদিত হয় সুবহে সাদিকের পরপর; কিন্তু আমার সূর্য উদিত হয় ইশার নামাজের পর।' কারণ হাদীসে বলা হয়েছে- হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইশার নামাজের পর اَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتْ (رض) -এর কামরায় যেতেন এবং ইশার নামাজান্তেই সোহবত করতেন। অন্যান্য হাদীসে আরও এরূপ বহু বর্ণনা রয়েছে। আর পবিত্র কালামে মূলত রূপক অর্থে নূর বলা হয়েছে। কারণ বাতি হতে যেমনিভাবে আলোক পাওয়া যায়, তেমনিভাবে কুরআন হতে হেদায়েতের আলো পাওয়া যায়, যা অনুসারে জীবন পদ্ধতি পাওয়া যায়। -[রূহুল কোরআন, কাবীর, ফতহুল কাদীর]

আর নূর (نُوْر) -এর হাকিকত এই যে, তা নিজে আলোকিত ও ظَاهِر এবং অন্যকেও আলোকিত করতে সক্ষম, কুরআন গ্রন্থটি স্বয়ং اِعْجَاز হওয়ার কারণে رَوْشَن এবং ظَاهِر হওয়া স্পষ্ট কথা, তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণ এবং আহকামে শরীয়াহ ও حَقَائِقِ عِلْمِ اٰخِرَتْ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগুলো পবিত্র কুরআন দ্বারা رَوْشَن ও স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই কুরআনকে نُوْر বলা হয়েছে। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যখন একত্রিত হওয়ার দিন তিনি তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিনটি হবে তোমাদের পরস্পরের হার-জিতের দিন।"

এখানে কিয়ামতের দিনের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এক. "একত্রিত হওয়ার দিন।" দুই. "পরস্পরের হার-জিতের দিন।" কিয়ামত দিবসকে একত্রিতকরণের দিন বলা হয়েছে এ কারণে যে, প্রথম মানব সৃষ্টির দিন হতে চূড়ান্ত প্রলয়ের দিন পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের সকলকে একই সময়ে জীবিত করে সেদিন একত্রিত করা হবে। কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ কথাটি অধিক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যেমন- সূরা হূদ-এ বলা হয়েছে-

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ .

"সেদিনটি হবে এমন, যাতে সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে। অতঃপর সেদিন যা কিছু ঘটবে তা সকলের চোখের সম্মুখেই সংঘটিত হবে।" -[সূরা হূদ : ১০৩]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরা ওয়াকিয়াতে বলা হয়েছে– قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ . অর্থাৎ "তাদেরকে বল, পূর্বে অতীত হওয়া ও পরে আসা সমস্ত মানুষকে নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করা হবে।

–[সূরা ওয়াকি'আহ : ৪৯-৫০]

আর পরস্পর হার-জিতের দিন বলা হয়েছে এই কারণে যে, কিয়ামত দিবসে কাফেরগণ তথা নবুয়তে অস্বীকারকারীগণ নবুয়ত স্বীকারকারী ও আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারীদের সামনে হেরে যাবে। সেদিন এমন হারা হারবে যার পূর্ণতা বিধান আর কোনো দিন সম্ভব হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, একদল লোককে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেওয়া হবে, অপর একদল লোক সেদিন জান্নাতে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত ভোগ করবে। তাই হলো তাগাবুন বা পরস্পর হার-জিত।

يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে يَوْمُ التَّغَابُنِ নামকরণের কারণ : হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তাফসীরের ইমামগণ বলেন, يَوْمُ التَّغَابُنِ -কে এ নামে ভূষিত করার কারণ হচ্ছে– সে غَبْن ও حَسْرَتْ কেবল কাফের ও ফাসিকগণই করবে না; বরং ঈমানদার নেক ব্যক্তিগণও এ মর্মে আক্ষেপ ও আফসোস করবে যে, হায়! যদি আমরা আরও অধিক পরিমাণে নেক আমল করতাম তবে বেহেশতে আরও উন্নতমানের ব্যবস্থাসমূহ পেতাম, কেননা আমরা জীবনে বহু সময় বৃথা কাটালাম। যথা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيْهِ كَانَ عَلَيْهِ تَرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اَلْحَدِيْثُ)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে يَوْمُ التَّغَابُنِ এ কারণে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নেক আমলের স্বল্পতার উপর আফসোস করবে। যেভাবে আল্লাহ সূরা مَرْيَمَ -এ বলেছেন وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ রূহুল মা'আনীতে এর তাফসীর এভাবে করা হয়েছে যে, সেদিন জালিম ও গুনাহগার লোকগণ নিজ নজ কৃতকর্মের উপর আক্ষেপ করবে, ঈমানদার নেককারগণ ইহসান -এর ক্ষেত্রে যে কমতি করেছেন তার উপর আফসোস করবে, তদ্রূপভাবে কিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের স্বল্পতার উপর আফসোস করতে থাকবে। তাই يَوْمُ التَّغَابُنِ বলে কিয়ামতের দিনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করে থাকে ও নেক কাজ করে থাকে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ সব ঝেড়ে ফেলবেন এবং তাকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে সর্বদা বিভিন্ন প্রকার নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। এ সকল লোকেরা এতে সর্বদা বসবাস করতে থাকেব। এটাই হলো তাদের বড় সাফল্য অর্জন।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন অর্থ "কেবল আল্লাহ এক আছেন" এ কথাই নয়; বরং আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ ও নীতি অনুসারে ঈমান আনতে হবে। অর্থাৎ ঈমানে মুফাসসাল আনতে হবে। এরূপ–

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

অথবা, ঈমানের সমস্ত لَوَازِمَاتْ বা উপকরণগুলো পালন করতে হবে। অনুরূপভাবে নেক আমল করার অর্থ, শরিয়তভিত্তিক যা নেক আমল বলে গণ্য হবে, তাই করতে হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ..... (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর যেসব লোক কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে তারা দোজখের অধিবাসী হবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর তা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনের স্থান।"

অর্থাৎ যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে এবং অন্যান্য যেসব জিনিসের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য সেসবকে অস্বীকার করেছে। আর "আয়াতসমূহ" অর্থাৎ আল্লাহর, অস্তিত্বের, রাসূলের সত্যতার, পরকাল হওয়ার এবং কুরআনের ঐশীগ্রন্থ হওয়ার দলিল-প্রমাণসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। অথবা, যারা আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহে যে বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ ও আইন-কানুন উদ্ধৃত হয়েছে তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, তাদেরকে দোজখের অধিবাসী হতে হবে এবং সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের এ পরিণাম হবে অতি খারাপ ও দুঃখময়। –[সাফওয়া, রূহুল কোরআন]

আল্লাহ তা'আলা এখানে নেককার আর বদকার উভয় শ্রেণির লোকের পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, উপরে যে হার-জিতের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ এ হার-জিত হবে ঈমান আর কুফরির কারণে। প্রথম শ্রেণিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করানো হবে এবং তাকে চিরস্থায়ী বাসিন্দা বানানো হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ط بِقَضَائِهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ فِيْ قَوْلِهِ إِنَّ الْمُصِيْبَةَ بِقَضَائِهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ط لِلصَّبْرِ عَلَيْهَا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

১১. কোনো বিপদ আপতিত হয় না, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর ফয়সালায় আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে তার এ উক্তিতে যে, বিপদাপদ আল্লাহর ফয়সালায় আসে। তিনি তার অন্তরকে পথ নির্দেশ দান করেন তদুপরি ধৈর্য ধারণে আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।

١٢. وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ الْبَيِّنُ.

১২. আর আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। অনন্তর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টরূপে প্রচার করা প্রকাশ্যভাবে।

١٣. اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

১৩. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং মু'মিনগণের আল্লাহর উপরই নির্ভর করা উচিত।

١٤. يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج بِأَنْ تُطِيْعُوْهُمْ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْخَيْرِ كَالْجِهَادِ وَالْهِجْرَةِ فَإِنَّ سَبَبَ نُزُوْلِ الْاٰيَةِ الْإِطَاعَةُ فِيْ ذٰلِكَ وَإِنْ تَعْفُوْا عَنْهُمْ فِيْ تَثْبِيْطِهِمْ إِيَّاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مُعْتَلِّيْنَ بِمَشَقَّةِ فِرَاقِكُمْ عَلَيْهِمْ وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিগণের মধ্য হতে তোমাদের শত্রু আছে। সুতরাং তাদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করো জিহাদ ও হিজরত ইত্যাদি পুণ্য কাজ হতে বিরত থাকার প্রশ্নে তাদের মতামত মান্য করার ক্ষেত্রে। কারণ এরূপ মতামত মান্য করার প্রসঙ্গই অত্র আয়াতের শানে-নুযূল। আর যদি তোমরা মার্জনা কর তাদের তোমাদেরকে ঐ সকল পুণ্য কাজে বাধাদানের অপরাধ, তাদের বিয়োগ ব্যথা ও বিচ্ছেদ কষ্ট স্বীকারের প্রতি সদয় হয়ে আর তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

١٥. إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط لَكُمْ شَاغِلَةٌ عَنْ أُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ أَجْرٌ عَظِيْمٌ فَلَا تُفَوِّتُوْهُ بِاشْتِغَالِكُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ.

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততিগণ তো পরীক্ষা তোমাদের জন্য, যা তোমাদেরকে আখেরাতের পুণ্য কাজ হতে বিরতকারী। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার অতএব সম্পদ ও সন্তানের মোহে তা হাতছাড়া করো না।

Free@www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ : فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ হলো شَرْط আর এ শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে। যার تَقْدِيْر হলো فَلَا بَأْسَ عَلَى الرَّسُوْلِ আর فَإِنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ বাক্যটি جَوَاب مَحْذُوْف -এর عِلَّة বা কারণ। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "يَهْدِىْ قَلْبَهُ" : জমহুর يَاء তে فَتْح এবং دَال এ- كَسْرَه দিয়ে يَهْدِىْ পড়েছেন। হযরত কাতাদাহ, আস্‌সুলামী যাহ্‌হাক ও আবূ আবদুর রহমান يَاء তে ضَمَّه আর دَال -এ فَتْح দিয়ে অর্থাৎ مَجْهُوْل হিসেবে يُهْدٰى পড়েছেন। আর হযরত তাল্‌হা ইবনে মুসাররফ, আ'রয, সাঈদ ইবনে জোবাইর, ইবনে হরমুয ও আযরাক يَاء -এর পরিবর্তে نُوْن দিয়ে نَهْدِىْ পড়েছেন। আর হযরত মালিক ইবনে দীনার, আমর ইবনে দীনার এবং ইকরামা يَهْدَأُ অর্থাৎ هَمْزَه سَاكِنَة সহ قَلْبُهُ -কে رَفْع দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ عَدُوًّا : এটা তৎপূর্ববর্তী إِنَّ -এর إِسْم হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ فَإِنَّ اللّٰهَ الخ : তার পূর্বে উল্লিখিত (اِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا) شَرْط -এর جَزَاء হয়েছে।

قَوْلُهُ "فَاحْذَرُوْهُمْ" : فَاحْذَرُوْهُمْ -এ যে ضَمِيْر রয়েছে তার مَرْجِع হলো, اَلْعَدُوُّ শব্দটি অথবা اَلْاَزْوَاجُ وَالْاَوْلَادُ -তবে একে مَرْجِع হিসেবে গ্রহণ করা হলে বলতে হবে যে, সব স্ত্রী এবং সব সন্তান শত্রু নয়। সুতরাং সব স্ত্রী এবং সন্তান হতে সতর্কও থাকতে হবে না। কেবল যেসব স্ত্রীগণ এবং সন্তানগণ শত্রু হিসেবে গণ্য হবে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। ضَمِيْر -এর مَرْجِع যদি عَدُوٌّ -কে গ্রহণ করা হয়, তখন প্রশ্ন আসে বহুবচন ব্যবহার করা কিভাবে সংগত হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, عَدُوٌّ শব্দটি এক, দুই এবং দুই-এর অধিক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বহুবচনের ضَمِيْر ব্যবহার করা সঙ্গত হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এ আয়াত নাজিল হয় : মনে রাখতে হবে যে, যে সময় এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছিল তখন মুসলমানদের জন্য বড়োই দুঃসময় ছিল। নানাবিধ বিপদ-আপদ চারদিক হতে তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলেছিল। মক্কায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁরা এসেছিলেন। আর মদীনায় যে সত্যপন্থি লোকেরা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের উপর এসেছিল দ্বিগুণ মসিবত। একদিকে শত শত মুহাজিরকে আশ্রয় দানের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছিল। কেননা তাঁরা আরবের বিভিন্ন অংশ ও অঞ্চল হতে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর অপরদিকে ইসলামের শত্রু সমগ্র আরবের জনতা তাঁদেরকে নিপীড়ন দানে সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উঠেছিল।

এ রকম পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মু'মিনদের ঈমান-আকীদায় কদরের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিপদ এখন তাদের উপর এসে পড়েছে তা আল্লাহর হুকুম ও অনুমতি ক্রমেই এসেছে। এমনি এমনি আসেনি। সুতরাং মসিবতের সময় আহাজারি না করে যেমন ধৈর্যধারণ করেন এবং তাঁরা যেন মনে করেন যে, এটা এক মহাপরীক্ষা। এ পরীক্ষায় ধৈর্য অবলম্বন করে যেন তাঁরা সফলতা লাভ করেন। মু'মিনগণ এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পূর্ণ সফলতা সহকারে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিস্ময় প্রকাশ করে মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা দিতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَايَقْضِ اللّٰهُ لَهُ قَضَاءً اِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ . فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ)

অর্থাৎ মু'মিন লোকের অবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর! আল্লাহ তার জন্য যে ফয়সালাই করেন তা তার জন্য ভালোই হয়, বিপদে পড়লে ধৈর্য অবলম্বন করে, আর এটা তার জন্য ভালোই হয়। সফলতা লাভ হলে শোকর করে আর তাও তার জন্য মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা মু'মিন লোক ছাড়া আর কারো হয় না। –[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ تَعَالَى مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন– আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কারো উপর কোনো বিপদ পতিত হতে পারে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ এ কথাটি ধ্রুব সত্য যে, আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোথাও বিন্দুমাত্র কোনো কিছু ঘটতে পারে না। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত কারো কোনো ক্ষতি বা লাভ কিছুই হতে পারে না। শান্তি ও অশান্তি আল্লাহর হাতেই নিহিত রয়েছে। যার ঈমান আল্লাহর উপর থাকে না, বিপদের মুহূর্তে তার অন্তরে সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থাই হয় না। যার তাকদীরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আল্লাহ তার প্রাণে শান্তি আনয়ন করে দেন। তখন সে মনে মনে ভাবতে থাকেন যা ঘটেছে তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়েছে, আল্লাহ কারো কোনো ক্ষতি করেন না। যেমন তিনি বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ পাহাড় নড়তে পারে তার ঈমান নড়তে পারে না,

কোনো দুঃখ আসলে আল্লাহ ব্যতীত তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এ ধারণার দ্বারা বৃহৎ হতে বৃহত্তম দুঃখও সে কেটে উঠতে পারে। এটা একমাত্র ঈমানেরই প্রতিফল। এক কথায় বুঝে নিতে হবে বিপদাপদের প্রবল ঝঞ্ঝাব্যথায় মানুষকে যে জিনিস সঠিক পথে অবিচল ও প্রতিষ্ঠিত রাখে, কঠিন থেকে কঠিনতম বিপদও পদস্খলন ঘটায় না, তা-ই হলো ঈমান। যার অন্তরে এ ঈমান নেই সে বিপদাপদকে দুর্ঘটনা জনিত মনে করে এবং বৈষয়িক শক্তিগুলো এটা এনেছে অথবা রোধ করতে পারে মনে করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জানে ও অন্তর হতে মানে যে, সব কিছুই আল্লাহর হাতে, তিনিই এ বিশ্বলোকের মালিক ও প্রশাসক, বিপদাপদ তাঁরই অনুমতিক্রমে আসে ও চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকেও ধৈর্য সহনশীলতা এবং আল্লাহর ফয়সালায় থাকার যোগ্যতা দান করেন। –[মা'আরিফ]

আর ঈমানদারদের লক্ষণ হলো, তারা যখন কোনো বিপদে পতিত হয় তখন তারা ইন্নালিল্লাহ বলে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন, আল্লাহ বলেন– اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ١٥٧)

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু বিপদের দুর্বহ চাপে ঘাবড়ে গিয়ে এই আনুগত্য যদি পরিহার কর, তবে নিজেরই ক্ষতিসাধন করবে। আমার রাসূলের দায়িত্ব হলো শুধু এতটুকু যে, তিনি সঠিক সত্য পথের সন্ধান তোমাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিবেন। এটাই তাঁর দায়িত্ব আর রাসূল যে যে কাজ সুসম্পন্ন করেছেন, তা তো অনস্বীকার্য। –[তাহের, রুহুল কুরআন]

আল্লামা তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করো কুরআন অনুসরণ করে, রাসূলের আনুগত্য করো তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে ; আর যদি আনুগত্য পরিহার কর তবে জেনে রাখো, রাসূলের দায়িত্ব হলো পৌঁছিয়ে দেওয়া।

আল্লামা সাবূনী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতের তাফসীর হলো, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ যেসব আদেশ-নিষেধ করেছেন, সর্বক্ষেত্রে তাঁদের আনুগত্য করো।

قَوْلُهُ اَطِيْعُوا الخ আয়াতে اَطِيْعُوْا-কে বারবার উল্লেখ করার কারণ : উক্ত আয়াতে اَطِيْعُوْا শব্দটিকে اَمْر হিসেবে দু'বার উল্লেখ করার একটি কারণ এই হতে পারে যে, تَكْرَارْ দ্বারা কোনো হুকুমের تَاكِيْد বুঝানো হয়ে থাকে। কেননা বিধান রয়েছে اَلتَّكْرَارُ يَدُلُّ عَلَى التَّاكِيْد। তাই, যেভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা ফরজ ও ওয়াজিব, সেভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর اِطَاعَتْ-ও ওয়াজিব। অথবা, যারা কেবল হাদীস অনুসরণ করে, কুরআনকে অনুসরণ করে না। যথা– اَهْل حَدِيْث তারাও এ আয়াতের অনুসারে কুরআনের অনুসরণ না করলে রক্ষা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কুরআন ও হাদীস শরীফ উভয়কেই একই সাথে সমভাবে মেনে নিতে হবে। আর পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদীস শরীফ। সুতরাং مُجْمَلْ ও مُفَسَّرْ উভয়কেই মানতে হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ .... الْمُؤْمِنُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তো তিনিই যিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। অতএব, ঈমানদার লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা।"

আল্লামা সাবী (র.) বলেছেন, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর উপর ভরসা রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। সাথে সাথে এখানে উম্মতকেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করার এবং তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। –[সাবী]

ইসলামের পরিভাষায় তাওয়াক্কুল বা ভরসা হলো, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থা রাখা। এ তাওয়াক্কুল ইবাদত, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির উপর এমন কোনো বিষয়ে গায়েবী ভরসা রাখা, যে বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই-তা সম্পূর্ণ শিরক। কারণ তাওয়াক্কুল ইবাদত, আর ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা শিরক। 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই' এ বাক্যের পর 'মু'মিন লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা' এ বাক্য জুড়িয়ে দেওয়ার তাৎপর্য এটাই। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর উপরই মু'মিনদেরকে ভরসা রাখতে হবে।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. ইমাম তিরমিযী ও হাকিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, মক্কার কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ বাসস্থান হতে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। এমতাবস্থায় তাদের সন্তানসন্তুতি ও স্ত্রী-পুত্রগণ হায় হায় করে রোধন করতে লাগল, আরও বলতে লাগল, আমাদের কি উপায় হবে! আমাদের জীবন কিভাবে চলবে, আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন? এসব ক্রন্দন ও শোকাক্রান্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি তাকিয়ে তারা তাদের সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়ল, অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাই তারা এ সময় হিজরত করেননি। পরবর্তী কিছুদিন অপেক্ষা করে পুনরায় হিজরত করে মদীনায় চলে আসলেন। মদীনায় এসে দেখলেন, তাদের পূর্বে মক্কা হতে মদীনায় হিজরতকৃত সাহাবীগণ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সোহবত পেয়ে নবুয়তের আকর্ষণ গ্রহণ করে কেউ বা ফকীহ হলেন, আর কেউ বা অলী হয়ে গেলেন। এটা দেখে তারা তাঁদের ওই সকল স্ত্রী পুত্রগণকে সাজা দিতে ও মারধর করতে চাইলেন। কেউ কেউ খাদ্য

Free @ www.eilm.weebly.com

ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে চাইলেন, যা তাদেরকে হিজরত করার জন্য প্রথম বাধা দান করেছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (মা'আরিফ, আসবাবুন নুযূল, মায়ালিমুত তানযীল, ফাতহুল কাদীর, তিরমিযী, হাকিম فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

২. হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আতা ইবনে রাবাহ (রা.) বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা.) -এর প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। তার ঘটনা এই ছিল যে, তিনি মদীনায় অবস্থান করতেন, যখন কোনো যুদ্ধ ও জিহাদের ডাক আসত তখন তিনি যুদ্ধের ময়দানের উদ্দেশ্যে বাহির হতেন; কিন্তু স্ত্রী পুত্রের কেউই তাঁকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দিত না। শেষ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে যেতেন না, কারণ বাচ্চা-কাচ্চাগণ বলতে থাকত যে, 'আমাদেরকে কার নিকট রেখে যাচ্ছেন, আমাদের কি উপায় হবে' এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করলেন। -[রুহুল বয়ান, ইবনে কাছীর]

উভয় বর্ণনা-ই শানে নুযূল হতে পারে। উভয়ের حَاصِلٌ একই প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা আল্লাহর ফরজ আদায় করতে যে কেউ বাধা প্রদান করবে তারাই আল্লাহর শত্রু হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ... عَدُوًّا لَّكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।" এখানে পবিত্র কুরআন স্ত্রী এবং ছেলে-সন্তানদের যেসব প্রভাব মানুষের উপর পড়ে, যে প্রভাব মানুষকে ঈমানের দাবি ও কর্তব্য পালন হতে বিরত রাখে সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। বলা হয়েছে যে, তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তানদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে যারা তোমাদেরকে ভালো ও মঙ্গলজনক কাজ হতে বিরত রাখে। তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, আবার কখনো দীনি কাজ করতে বাধা সৃষ্টি করে, কখনো ওয়াজিব আদায়করণের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তোমাদের এসব স্ত্রী ও সন্তানগণ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের শত্রু। সুতরাং এ জাতীয় শত্রুদের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক।

ঠিক তেমনি কখনো কখনো স্বামীরা স্ত্রীদেরকে দীনি কাজে বাধাদান করে, ওয়াজিব আদায় করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ রকম অবস্থায় এ জাতীয় স্বামীরাও স্ত্রীদের জন্য আসলে শত্রু। এ শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক। আয়াতের اَزْوَاجٌ শব্দটি زَوْجٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই হতে পারে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা তোমাদের স্বামীগণ এবং সন্তানসন্ততিদের মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। -[নূরুল কোরআন]

মনে রাখতে হবে, কুরআনের কোনো আয়াত কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও তার হুকুম সাধারণ হয়ে থাকে। সুতরাং যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর জিকির ও দীনি কাজে বাধা দিবে, সেসব স্থানে আয়াতের হুকুম প্রয়োগ হবে।
-[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا : আলোচ্য অংশের অর্থ হলো, "আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা অনুসরণ কর ও ক্ষমা করে দাও, তাহলে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান।" তার অর্থ এই যে, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে শুধু তোমাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্য, যেন তোমরা সতর্ক থাকো এবং দীন ইসলামকে তাদের ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা করো। এটার মূলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে কিংবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ ও দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক এতটা তিক্ততার সৃষ্টি করবে যার ফলে তোমাদের ও তাদের পারিবারিক জীবনই দুঃসহ হয়ে উঠবে, এটা কখনও উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তা করা হলে দু'টি বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একটি এই যে, এর ফলে স্ত্রী-পুত্রকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় এই যে, এর কারণে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি হতে পারে। আশে-পাশের লোকেরা মুসলমানদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কঠোর ও রূঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ ... اَجْرٌ عَظِيْمٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো একটা পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহই এমন সত্তা যাঁর নিকট বড় প্রতিফল রয়েছে।" অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি হলো [আল্লাহর পক্ষ হতে] তোমাদের জন্য পরীক্ষা বিশেষ। তারা কখনো তোমাদেরকে হারাম উপার্জনের জন্য বাধ্য করে এবং আল্লাহর হক আদায় না করতে এবং নাফরমানির কাজে লিপ্ত হতে সাহায্য করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নাফরমানিতে তাদের আনুগত্য করো না। আর মনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে বড় প্রতিফল- যা পাবে সে লোকেরা, যারা ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিদের মহব্বতের উপর আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, রুহুল কোরআন]

মানুষের জন্য ধনসম্পদ ও সন্তানাদি মহা ফিতনা স্বরূপ : এ কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে- মানুষ অধিকাংশ গুনাহ ও হারাম কাজসমূহ বিশেষত সন্তানের মোহে পড়ে করতে বাধ্য হয়। একটি হাদীসে হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক লোক দেখে মানুষ বলবে اَكَلَ عِيَالُهُ حَسَنَاتِهِ। অর্থাৎ তার সন্তানগণ তার নেকসমূহ খেয়ে ফেলেছে। (رُوْح)

অপর একটি হাদীসে হযরত নবী করীম ﷺ বলেন- اَلْاَوْلَادُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ অর্থাৎ সন্তানগণ দুর্বলতা ও বখিলীর কারণ স্বরূপ, তাদের ভালোবাসায় মানুষ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা হতে বিরত থাকে। তাদের মমতায় মানুষ জিহাদ করা হতে বিমুখ হয়ে থাকে। কতিপয় সালাফে সালিহীন বলেছেন, اَلْعِيَالُ سُوْسُ الطَّاعَاتِ পরিবার-পরিজন মানুষের নেক কাজসমূহকে ধ্বংস করার জন্য ঘুন স্বরূপ। যেভাবে ঘুন কাষ্ঠ অথবা ধান চাউলকে খেয়ে ধূলিতে পরিণত করে দেয়, তদ্রূপ সন্তানসন্ততি নেক কাজসমূহকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনষ্ট করে দেয়। -[মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٦. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَاسْمَعُوْا مَا اُمِرْتُمْ بِهِ سَمَاعَ قَبُوْلٍ وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا فِي الطَّاعَةِ خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ ط خَبَرُ يَكُنْ مُقَدَّرَةً جَوَابُ الْاَمْرِ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ الْفَائِزُوْنَ.

১৬. তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো এটা اِتَّقُو اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর শ্রবণ করো যা তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করা। ও আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো পুণ্য কাজে তোমাদের নিজেদের কল্যাণে। এটা উহ্য يَكُنْ-এর خَبَرْ এবং جَوَاب اَمْر আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম কৃতকার্য।

١٧. اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا بِاَنْ تَتَصَدَّقُوْا عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَفِيْ قِرَاءَةٍ يُضَعِّفْهُ بِالتَّشْدِيْدِ بِالْوَاحِدَةِ عَشْرًا اِلٰى سَبْعِمِائَةٍ وَاَكْثَرَ وَهُوَ التَّصَدُّقُ عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ وَيَغْفِرْ لَكُمْ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ مُجَازٍ عَلَى الطَّاعَةِ حَلِيْمٌ فِي الْعِقَابِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ

১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর এভাবে যে, তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে সদকা করবে তিনি তা তোমাদের জন্য বর্ধিত করবেন অপর এক কেরাতে শব্দটি তাশদীদযোগে يُضَعِّفْهُ পঠিত হয়েছে, একের বিনিময়ে দশ হতে সাতশত ও ততোধিক পর্যন্ত। আর উত্তম ঋণ হলো, সন্তুষ্টচিত্তে সদকা করা। আর তোমাদের কে ক্ষমা করবেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। আল্লাহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ইবাদতের প্রতিদান দানকারী ধৈর্যশীল পাপের শাস্তিদানে।

١٨. عٰلِمُ الْغَيْبِ السِّرِّ وَالشَّهَادَةِ الْعَلَانِيَةِ الْعَزِيْزُ فِيْ مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ فِيْ صُنْعِهِ.

১৮. তিনি অদৃশ্য গোপন ও দৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাতা প্রকাশ্য মহাপরাক্রমশালী তাঁর রাজত্বে বিজ্ঞানময় তাঁর সৃষ্টিকর্মে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ : خَيْرًا শব্দটি একটি উহ্য فِعْل দ্বারা مَنْصُوْب হয়েছে, যা বুঝাচ্ছে اَنْفِقُوْا ক্রিয়াটি। যেমন, বলা হয়েছে اِئْتُوْنِي الْاِنْفَاقَ خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ অথবা قَدِّمُوْا خَيْرًا لَهَا - এটা ইমাম সীবওয়াইহ-এর মত। ইমাম কিসায়ী আর ফাররার অভিমত হলো- خَيْر একটি উহ্য مَصْدَرْ-এর صِفَتْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। تَقْدِيْر হলো اِنْفَاقًا خَيْرًا - আবূ ওবাইদের মতে তা كَانَ مُقَدَّرَةْ-এর خَبَرْ সুতরাং مَنْصُوْب হয়েছে। تَقْدِيْر হলো يَكُنِ الْاِنْفَاقُ خَيْرًا لَكُمْ কূফীদের মতে তা حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب আর কেউ কেউ তাকে اَنْفِقُوْا ক্রিয়ার مَفْعُوْل بِهِ বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ اَنْفِقُوْا خَيْرًا । -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল ও ব্যাখ্যা : ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, যখন আয়াত قَوْلُهُ تَعَالٰى اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ নাজিল হলো, তখন হযরাতে সাহাবায়ে কেরামগণ দিবারাত্র ইবাদতে মশগুল থাকতে লাগলেন, এমনকি পা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। সিজদা করতে করতে কপালসমূহ পচে-গলে মাথার ভিতরের দিকে ঢুকে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় সহজতার নির্দেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহর পরিপূর্ণ হক আদায় করে ইবাদত করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে যতটুকু সম্ভব, শক্তি অনুসারে ইবাদত করে যাও। আল্লাহর সকল বিধান নতশিরে মেনে নাও। আর নিজেদের পরকালে আত্মার শান্তির লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে যাও। আর সন্তানসন্ততির মালিক হয়ে কৃপণ হয়ো না। কেননা যারা কৃপণতা ত্যাগ করতে সক্ষম হবে তারাই আল্লাহর পথে সফল হবে। আল্লাহ তা'আলা কাউকেও শক্তি-সামর্থ্যের অধিক কোনো চাপ দেন না, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا তাই শক্তি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করলেই তাঁর হক আদায় হয়ে যাবে। -[আশরাফী, কাবীর]

আয়াতটি মানসূখ হওয়ার প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, উক্ত আয়াতটি وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আয়াতটি مَنْسُوْخٌ নয় বরং مُحْكَمٌ হবে এবং তিনি উভয় আয়াতের মাঝে تَطْبِيْقٌ তথা সামঞ্জস্য এভাবে বিধান করেন যে, আয়াতদ্বয়ের মূল অর্থ হলো, আল্লাহকে তোমরা ভয় করো পরিপূর্ণভাবে যতটুকু তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়। আর তার একটি দিক এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর ভয় অন্তরে রয়েছে এ প্রমাণ জিহাদ করে দেখিয়ে দাও। আর তোমাদের শক্তি মোতাবেক জিহাদ করো। কেননা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ অথা আল্লাহ কাউকেও সামর্থ্যের বাইরে কোনো নির্দেশ দেন না। তাকওয়ার হক এই হবে যে, যেমনিভাবে আল্লাহভীতি অর্জন করলে তাকওয়া আছে বলে আল্লাহ ভক্ত লোকগণ স্বীকার করে, সেভাবে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। আর তা فَوْقَ الْاِسْتِطَاعَةِ হওয়া আবশ্যক নয়। -[খতীব, রূহুল মা'আনী]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ আয়াতটি রহিতকরণ বিষয়টি সঠিক নয়। কারণ যেক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে ভয় করা اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর অর্থ নয়। কারণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاتَّقُوا اللّٰهَ .... وَاَطِيْعُوْا : আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদেরকে তাদের কল্যাণের জন্য কয়েকটি নসিহত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "কাজেই তোমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আর শুনো ও অনুসরণ করো এবং নিজের ধনমাল ব্যয় করো, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যে লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু সে লোকই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে।" অর্থাৎ সন্তানসন্ততি ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধান পালনে বাধা দিতে না পারে, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিকরণের পথে বাধা না হয়।

আলোচ্য আয়াতটি হযরত কাতাদাহ, রাবী ইবনে আনাস, সুদ্দী ও ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতে কুরআনের অপর আয়াত اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ -এর রহিতকারী। অর্থাৎ "তোমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব আল্লাহকে ভয় করতে থাকো" এ আয়াত দ্বারা "আল্লাহকে এমনভাবে ভয় কর যেমন তাকে ভয় করা বাঞ্ছনীয়" আয়াত রহিত করা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি মানসূখ হয়নি; কিন্তু حَقَّ تُقَاتِهٖ -এর অর্থ হলো "আল্লাহর জন্য এমনভাবে জিহাদ করো যেমনভাবে জিহাদ করা বাঞ্ছনীয়।" আর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেন কারো নিন্দা ও বাধা বিরত না রাখে। আর নিজের ও নিজেদের পিতা-মাতা ও সন্তানাদির ক্ষতি হলেও যেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। -[কুরতুবী]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, রহিত হওয়ার কথা ঠিক নয়। কারণ اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ-এর অর্থ- যে ক্ষেত্রে সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রেও ভয় করা নয়। কারণ তা সাধ্যাতীত ও অসম্ভব। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে তা তোমরা ভালো করে কান পেতে শুনো এবং রাসূলের পক্ষ হতে যেসব আদেশ-নিষেধ আসে তার অনুগত হও। وَاَنْفِقُوْا অর্থাৎ নিজের ধন-মাল ব্যয় করো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এর অর্থ যাকাত আদায় করো। হযরত যাহ্হাক (র.) বলেছেন, এটার অর্থ- জিহাদে অর্থসম্পদ ব্যয় করো। ইমাম হাসানের মতে, এটার অর্থ- নিজের জন্য ব্যয় করো। আল্লামা কুরতুবীর মতে, সব ধরনের দান-সাদকা এর অন্তর্ভুক্ত: আর এটাই গ্রহণযোগ্য। পরিশেষে বলা হয়েছে, "এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" দান করার নিদের্শ দানের পর "এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর" বলাতে প্রমাণ হলো যে, মূলত দান-সদকা দাতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, গ্রহীতার জন্য নয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, কল্যাণমূলক খাতে দান-সাদকা গোটা সামজের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল নিয়ে আসে। দাতা সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে এ কল্যাণ তার জন্যও হয়ে থাকে। -[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤئِكَ الْمُفْلِحُوْنَ। অর্থাৎ যে লোক কৃপণতা এবং ধন-মালের লোভ-লালসা হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ধন-মাল ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছ, সেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করে নিজের অন্তরের কৃপণতা দূর করতে পেরেছে, নিজেকে লোভ-লালসা মুক্ত বলে প্রমাণ করতে পেরেছে, শুধু তারাই কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ تُقْرِضُوْا .... يُضَاعِفْهُ لَكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহকে করযে হাসান দাও তবে তিনি তোমাদেরকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ অতীব মর্যাদা দানকারী ও ধৈর্যশীল।" এখানে ইহসানকে (যে কোনো কল্যাণমূলক পথে অর্থ ব্যয়কে) আল্লাহ তা'আলাকে করজ দেওয়া বলা হয়েছে। অথচ করজের প্রয়োজন হয় মুহতাজদের। আল্লাহ আসমান-জমিনের মালিক, বিশ্বলোকের কারো প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী নন। এভাবে বর্ণনা করার অর্থ হলো, ইহসান তথা দান-সদকাকরণের প্রতি উৎসাহ দান এবং মুহতাজদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের প্রতি অনুপ্রাণিত করা। যে মানুষ আপন স্রষ্টাকে করজ দিতে কার্পণ্যতা করবে, যে স্রষ্টা তাকে ধন-মাল দিয়েছেন, যিনি আবার সে ধন-মাল কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিবেন, তার অতিরিক্ত- স্বীয় মাগফিরাতে তাকে শামিল করে নিবেন- সে মানুষ কতইনা দুর্ভাগা কতই না অপয়া! -[রূহুল কোরআন]

করযে হাসানা হলো, কারো মতে হালাল ধন-সম্পদ সদকা করা। আর কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, খুশিমনে নিষ্ঠার স্যথে দান করা। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ : সূরা আত্-তালাক্ব

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আত-তালাক্ব। কেবল নামই নয়, এটার বিষয়বস্তুর শিরোনামও তালাক। কেননা এতে তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এ সূরাকে اَلنِّسَاءُ الْقُصْرٰى তথা সংক্ষিপ্ত সূরা নিসা নাম দিয়েছেন। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ২৪৭টি বাক্য এবং ১১৭০টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সূরার আলোচিত বিষয়াদির অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতেও প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি আল-বাক্বারার তালাক সংক্রান্ত আইন-বিধান সম্বলিত প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতসমূহের পর নাজিল হয়েছে। যদিও নাজিল হওয়ার নির্দিষ্ট সময়কাল ঠিক করা সহজ নয়; কিন্তু হাদীসের বর্ণনাসমূহ হতে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, সূরা আল-বাক্বারাতে দেওয়া আইন-বিধানসমূহ বুঝার ব্যাপারে লোকেরা যখন ভুল করতে লাগল এবং কার্যতও তাদের ভুলভ্রান্তি দেখা যেতে লাগল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের জন্য এ হেদায়েতসমূহ নাজিল করেছেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার সম্পূর্ণ অংশেই মূলত তালাক সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এসব বিধি-বিধানের মধ্যে রয়েছে–

১. তালাকে সুন্নী এবং তালাকে বিদ'য়ী সম্বন্ধে আলোচনা। এক পর্যায়ে দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে, অতঃপর একসাথে আর জীবনযাপন অসম্ভব মনে হলে তালাকের উত্তম পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিধান মতে, যথাসময়ে তালাক দিতে বলা হয়েছে। আর তা হলো সহবাসহীন পবিত্র অবস্থায় তালাক দিয়ে অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকা।

২. তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে সুস্থ-মস্তিষ্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। কারণ তালাক হালাল হলেও আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। নিতান্ত প্রয়োজনেই এটা হালাল করা হয়েছে।

৩. ইদ্দতকে যথার্থভাবে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সময় দীর্ঘ হয়ে মহিলার ক্ষতি না হয়। আর যেন 'নসব' মিশ্রিত হয়ে না যায়।

৪. ইদ্দতের বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'আয়েসা' অর্থাৎ যে মহিলার ঋতু চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, নাবালেগ মেয়ে এবং গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত সম্বন্ধে পরিষ্কার করে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশ-নিষেধও করা হয়েছে।

৫. এসব বিধি-বিধানের আলোচনার সাথে সাথে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অবলম্বনের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। যাতে স্বামী-স্ত্রী কারো কোনো রকমের ক্ষতি না হয়।

৬. ইদ্দতের সময় 'নাফকা' আর 'সুকনা' অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া ও থাকার খরচ সংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে যারা সীমালঙ্ঘন করবে তাদের পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। –[সাফওয়া]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো স্ত্রী-পুত্রাদি আল্লাহ ও মানুষের শত্রু বটে। কখনও এটা তাদের ওয়াজিব হকসমূহ পালনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত তখন তাতে প্রকাশ্য বিচ্ছেদও ঘটে যায়। সুতরাং অত্র সূরায় তালাকপ্রাপ্তা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কিত বিধানাবলি বর্ণনা দ্বারা উক্ত শত্রুতার ধারণা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। যে বিচ্ছেদের অবস্থায়ও তাদের প্রকৃত হক আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব। আর ঐক্যতার সময় তো সে হকসমূহ আদায় করা আরও অধিক ওয়াজিব ছিল। যেহেতু উক্ত নির্দেশসমূহের ভিতর দিয়ে চার স্থানে আল্লাহভীতির নির্দেশ ও তৎপ্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কাজেই দ্বিতীয় রুকূ'র বিষয়গুলোর অবতারণা উক্ত নির্দেশ এবং উৎসাহ প্রদানের দৃঢ়তা সাবধানের জন্যই করা হয়েছে, এতদ্ভিন্ন তা দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, পার্থিব কাজ-কারবারেও শরিয়তের নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কোনো কোনো লোক এ ধারণা করে বসে যে, পার্থিব কাজকর্মে শরিয়ত পালন করা নিষ্প্রয়োজন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আত-তালাক্ব মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلَاثَ عَشْرَةَ آيَةً : ১৩ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُرَادُ أُمَّتُهُ بِقَرِيْنَةِ مَا بَعْدَهُ اَوْ قُلْ لَهُمْ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اَرَدْتُّمُ الطَّلَاقَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ لِاَوَّلِهَا بِاَنْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ فِيْ طُهْرٍ لَمْ تَمَسَّ فِيْهِ لِتَفْسِيْرِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج اِحْفَظُوْهَا لِتُرَاجِعُوْا قَبْلَ فَرَاغِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ اَطِيْعُوْهُ فِيْ اَمْرِهِ وَنَهْيِهِ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْهَا حَتّٰى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ زِنًا مُّبَيِّنَةٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا اَيْ بُيِّنَتْ اَوْ بَيِّنَةٍ فَيَخْرُجْنَ لِاِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِنَّ وَتِلْكَ الْمَذْكُوْرَاتُ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ الطَّلَاقِ اَمْرًا مُرَاجَعَةً فِيْمَا اِذَا كَانَ وَاحِدَةً اَوْ ثِنْتَيْنِ .

অনুবাদ :

১. হে নবী! এটা দ্বারা স্বয়ং নবী ﷺ ও তাঁর উম্মতগণ উদ্দেশ্য। যেমন, পরবর্তী বহুবচন শব্দ দ্বারা তার প্রতি নির্দেশ করছে; কিংবা বক্তব্যটি এরূপ হবে قُلْ لَهُمْ তাদেরকে বলুন। যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দান কর তালাক দানের ইচ্ছা কর। তবে তাদেরকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রদান করো। ইদ্দতের আগে এমন তুহুরে তালাক প্রদান করো, যে তুহুরে স্বীম-স্ত্রীর মিলন হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটার তাফসীর এরূপ করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তোমরা ইদ্দতের হিসাব রাখো তৎপতি লক্ষ্য রাখো, যাতে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তোমরা রাজয়াত করতে পার। আর তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করো। তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় তা হতে ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। হ্যাঁ, যদি তারা লিপ্ত হয় অশ্লীলতায় ব্যভিচারে প্রকাশ্য مُبَيِّنَةٍ শব্দটি ي অক্ষরে যবর ও যের যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশ্য অশ্লীলতা বা বর্ণিত অশ্লীলতা। তবে সে ক্ষেত্রে হদ বা শরয়ী দণ্ড কার্যকর করার জন্য বের হবে। আর এগুলো উল্লিখিত আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, সে তার নিজ আত্মার উপরই অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এটার পরে তালাকের পরে কোনো উপায় করে দিবেন রাজয়াতের ব্যবস্থা করবেন, যেক্ষেত্রে তালাক এক বা দুই হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "مُبَيِّنَةٍ" : এ শব্দটি কেউ কেউ مُبَيِّنَةٍ অর্থাৎ اِسْمُ فَاعِلٍ হিসাবে পড়েছেন অর্থাৎ স্বয়ং অশ্লীল কাজ দেখলেই স্পষ্ট জানা যাবে যে, তা অশ্লীল। আর কেউ কেউ مُبَيَّنَةٍ অর্থাৎ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ হিসাবে পড়েছেন। তখন অর্থ হলো– দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে যে, উক্ত কাজ অশ্লীল। –[কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ **আয়াতের শানে নুযূল :**

১. সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর হযরত ইবনে আব্বাস ও ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিয়েছিলেন, অতঃপর রাজয়াত করেছিলেন।

কাতাদাহ হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসা (রা.)-কে তালাক দিলে তিনি পিতার বাড়ি চলে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন, يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয় তুমি রাজয়াত করো। কারণ সে সারা দিন রোজা রাখে আর সারা রাত নফল ইবাদত করে। সে জান্নাতে তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল থাকবে।

২. কালবী বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হলো, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসাকে কিছু গোপন কথা বলেন, হযরত হাফসা (রা.) সে কথাগুলো হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলে দিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর রাগান্বিত হলেন এবং তাঁকে একটি তালাক দিলেন, তখন এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো।

৩. সুদ্দী বলেছেন, এ আয়াতসমূহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্বন্ধে নাজিল হয়। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের সময় এক তালাক দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এবং যতদিন পর্যন্ত সে পবিত্র না হবে ততদিন পর্যন্ত স্ত্রী বানিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আবার স্রাব হতে পবিত্র হলে, যদি ইচ্ছা হয় তখন তালাক দিতে পরামর্শ দিলেন। এমন পবিত্র অবস্থায় যে অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হয়নি। এটা হচ্ছে সে ইদ্দত যার জন্য তালাক দিতে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَاَيُّهَا النَّبِيُّ .. بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সকল উম্মতগণকে সম্বোধন করেছেন। কারণ, طَلَّقْتُمْ শব্দটিকে جَمْع নেওয়া হয়েছে। হে নবী, যখন আপনারা আপনাদের স্ত্রীগণকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করবেন তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের অনুসরণে তালাক দিবেন অর্থাৎ এমন طُهْر -এর মধ্যে তালাকটি হতে হবে, যে তুহুরে সহবাস হয়নি। (هٰكَذَا كَمَا رَوَى الشَّيْخَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) আর তালাকের পর ইদ্দতসমূহ গণনা করা যাতে ইদ্দতের মধ্যেই তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হও। আল্লাহর নির্দেশ পালনে যাথাযথ তাঁকে ভয় করো।

আর তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণকে ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের করে দিও না, আর তারাও যেন সেচ্ছায় বের না হয়। হ্যাঁ, তবে যদি তারা ব্যভিচার বা জেনা করে বসে তবে জেনার শাস্তি গ্রহণের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া এ নির্দেশের অন্তর্গত হবে না। উল্লিখিত আলোচনাকে আল্লাহর নির্দেশাবলি ও সীমারেখা বলা হয়েছে। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে তবে তারা স্বীয় সত্তার উপরই জুলুম করল। হে রাসূল! আপনি অবগত নন যে, আল্লাহ তা'আলা এরপর কি নির্দেশ জারি করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধনে নির্দিষ্ট করার কারণ : উক্ত আয়াতে কেবল হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে খেতাব করা হয়েছে। এটার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন, তিনি رَئِيْسُ الْكَامِلِ পরিপূর্ণ নেতা, পূর্ণ নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ইহকালে ও পরকালে কেবল তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নেতাকে লক্ষ্য করলে সকল দলভুক্ত লোকজন অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। –[সাবী]

অথবা, এটা দ্বারা (خِطَابُ عُمُوْمِيْ) আম ও খাস সকলকেই লক্ষ্য করা হয়েছে, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সময়কালীন হতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতে মুহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হুযূর ﷺ খাস এবং উম্মত সকল আম। অথবা, হুযূর ﷺ-কে মাতবূ' (مَتْبُوْعٌ) হিসাবে এবং উম্মতকে তাবে' (تَابِعٌ) হিসাবে শামিল করা হয়েছে।

আর একে বলা হয় (تَغْلِيْبُ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْغَائِبِ) অনুপস্থিতগণের উপর উপস্থিতকে প্রাধান্য দেওয়া। সুতরাং এ হিসাবে অর্থ হবে– يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا طَلَّقْتَ اَنْتَ وَاُمَّتُكَ অথবা اِذَا طَلَّقْتُمْ الخ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কাশ্‌শাফ গ্রন্থকার বলেন, خِطَابٌ عَامٌ -এর কারণ এই যে, হুযূর ﷺ তাঁর উম্মতগণের জন্য যেহেতু ইমাম এবং (مُقْتَدِيْ) অনুসরণীয়, তাই ইমামকে বলার অর্থই মুক্তাদিগণকে বলা। মূলত হুযূর ﷺ-কে বলা উদ্দেশ্য নয়। كَمَا يُقَالُ لِرَئِيْسِ الْقَوْمِ اِفْعَلُوْا كَيْتَ وَكَيْتَ যেমন– يَاَيُّهَا النَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ الخ –[কাবীর]

অর্থাৎ এটাও বলা হয়েছে যে, خِطَابٌ প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ ﷺ-কে করা হয়েছে, তবে خِطَابٌ -এর মধ্যে اَمْر-কে حَذْف করা হয়েছে, সুতরাং অর্থ হবে يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاُمَّتِكَ اِذَا طَلَّقْتُمُ الخ অথবা يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا هَمَمْتُمُ الطَّلَاقَ فَطَلِّقُوْهُنَّ الخ অথবা, এটাও বলা যাবে যে, خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوَّلًا وَاٰخِرًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কেই প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এটাতে বহুবচন শব্দের মাধ্যমে خِطَابٌ করার কারণ হলো, নবীর বিশেষত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

অথবা, নবী করীম ﷺ-এর জ্ঞানকে গোটা উম্মতের জ্ঞানের সমতুল্য করে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ নবীকে নির্দেশ যা দেওয়া হয়েছে, তাই উম্মতগণ পালন করতে বাধ্য থাকবে। [তবে নবীর জন্য নির্দিষ্ট কার্যসমূহ নয়।]

অথবা, [কুরতুবী (র.) বলেন,] এখানে خِطَابٌ عَامٌ করা হয়েছে, কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন নবী ও তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করেন, তখন يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ الخ - يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ - يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ইত্যাদি অর্থাৎ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ দ্বারা خِطَابٌ করে থাকেন। আর যখন কেবল নবীর জন্য خُصُوْص خِطَابٌ হয় তখন يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে خِطَابٌ করে থাকেন। যথা– يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ ইত্যাদি।

–[বাহরুল মুহীত, কাবীর, কুরতুবী, রুহুল মা'আনী, আহকামুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ এর অর্থ– "তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্য তালাক দাও।" এ কথাটির দু'টি তাৎপর্য রয়েছে।

১. ইদ্দত শুরু করার জন্য তালাক দাও। অন্য কথায়, তালাক দিবে এমন সময় যে সময় হতে তাদের ইদ্দত শুরু হতে পারে। অর্থাৎ যে তুহুরে [স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায়] স্বামী-স্ত্রীতে সঙ্গম হয়নি সে রকম তুহুরে স্ত্রীকে তালাক দিবে। এ তুহুরে তালাক দিলে পরবর্তী হায়েয হতে স্ত্রীর ইদ্দত আরম্ভ হতে পারবে। আর এটার প্রয়োগ হবে সেসব স্ত্রীর ব্যাপারে যাদের সাথে স্বামীর সঙ্গম হয়েছে, যাদের হায়েয হয় এবং যাদের গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২. এর দ্বিতীয় তাৎপর্য হলো, তালাক দিলে ইদ্দত পর্যন্ত সময়ের জন্য তালাক দাও। অর্থাৎ এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তালাক দিও না; বরং এক বা বেশির পক্ষে দু'তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকো। কেননা এ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ তোমার রয়েছে। এ দৃষ্টিতে সেসব স্বামীসঙ্গম পাওয়া স্ত্রীদের ব্যাপারেও এ আয়াতের প্রয়োগ সম্ভব যাদের হায়েয আছে, যাতের হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে কিংবা এখনও যাদের হায়েয আসতে শুরু করেনি। অথবা, তালাকের সময় যাদের গর্ভবতী হওয়ার কথা জানা গেছে।

তালাককে সুন্নী আর বিদয়ীতে বিভক্তিকরণ : উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী তালাক দেওয়াকে সুন্নী তালাক বলা হয়, অর্থাৎ যে তুহুরে স্ত্রীর সংগম হয়নি সে তুহুরে তালাক দেওয়া অথবা গর্ভবতী হওয়ার কথা অবগতির পর তালাক দেওয়া, আর একসাথে তিন তালাক না দেওয়াকে সুন্নী তালাক বলা হয়।

আর যদি যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়েছে সে তুহুরে তালাক দেওয়া হয়, অথবা হায়েযের সময় তালাক দেওয়া হয়, অথবা একসাথে তিন তালাক দেওয়া হয়, তাহলে এ তালাক হবে بِدْعِيٌّ তালাক। –[আহকামুল কোরআন-সাবূনী]

এর কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে হাদীস, যাতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে হায়েযের সময় তালাক দিলে রাজয়াত করতে নির্দেশ দেন।

সুন্নতের পরিপন্থি তালাক কি পতিত হয়? : এ বিষয়ে জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, সুন্নত নিয়মের পরিপন্থি তালাক কেউ দিলে তা পতিত হবে। তবে এভাবে তালাক দেওয়ার জন্য দাতা গুনাহগার হবে। কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক লোক নবী করীম ﷺ -এর সামনে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিল, এটা দেখে নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, আমি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায়ও তোমরা কি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করছ? এটা হতে বুঝা যায় যে, তালাক পতিত হবে, না হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রকম কথা বলতেন না। অপর এক হাদীসে ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ

Free @ www.e-ilmweebly.com

وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ "তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যা দৃঢ় চিত্তে দিলেও পড়ে, খেলা করে দিলেও পড়ে, তা হলো বিবাহ, তালাক ও রাজয়াত। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

অপর এক হাদীসে আছে যে, এক লোক তাঁর স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছিল, এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, মাত্র তিনটি তালাক দ্বারাই স্ত্রী তার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর সে সঙ্গে আল্লাহর নাফরমানীও হয়েছে। আর অবশিষ্ট ৯৯৭ তালাক জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের নিদর্শন স্বরূপ রয়েগেছে। এর কারণে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে আজাব দিবেন কিংবা ক্ষমা করে দিবেন। –[কাবীর, রাওয়ায়েউল বায়ান]

ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা কি নিজ প্রয়োজনে বাড়ি হতে বের হতে পারে? : পবিত্র কুরআনের আয়াত لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ হতে বুঝা যায় যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যতদিন পর্যন্ত তাঁর ইদ্দত শেষ না হবে নিজের বাড়ি (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যে বাড়িতে বসবাস করত সে বাড়ি) হতে বের হবে না। যদি সে বিনা প্রয়োজনে বের হয়ে পড়ে, তাহলে গুনাহগার হবে; কিন্তু ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে না। আর স্বামীর পক্ষেও তাকে বাড়ি হতে বের করে দেওয়া বৈধ নয়। তবে স্ত্রীর কোনো বিশেষ প্রয়োজন থাকলে তখন বের হতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. হানাফী ইমামগণের মতে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা রাতে বা দিনে কোনো প্রয়োজনেও বের হতে পারবে না। তবে স্বামীর মৃত্যু জনিত কারণে ইদ্দত পালনাকারিণী মহিলা দিনের বেলায় প্রয়োজনে বাড়ি হতে বের হতে পারবে।

খ. ইমাম মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে, প্রয়োজনে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা দিনের বেলায় বাড়ি হতে বাইরে যেতে পারবে। তবে রাতের বেলায় তাকে অবশ্যই বাড়ি ফিরে আসতে হবে।

গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা দিনে-রাতে কখনও কোনো প্রয়োজনেও বাড়ি হতে বের হতে পারবে না। তবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা দিনের বেলায় বের হতে পারবে না। –[রাওয়ায়েউল বায়ান]

اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ-এর তাৎপর্য কি? এবং مُّبَيِّنَةٍ শব্দের সম্পর্ক কিসের সাথে? : বিভিন্ন ফিকহবিদগণ এর কয়েকটি তাৎপর্য বলেছেন–

হযরত হাসান বসরী, আমের, শা'বী, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহহাক, মুজাহিদ, ইকরামা, ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ ও লাইস (র.) বলেন, 'সুস্পষ্ট অন্যায়' বলতে বদকারী ও ব্যভিচারী বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ অশ্লীল ও খারাপ কথাবার্তা, ঝগড়াঝাড়ি। অর্থাৎ তালাকের পরও যদি স্ত্রীর মনমেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি ভালো না হয়; বরং ইদ্দত পালন কালেও যদি সে স্বামী ও তার পরিবারের অন্যান্য লোকদের সাথে ঝগড়া-ঝাটি ও গালাগালি করতে থাকে [তবে বের করে দেওয়া যাবে]।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এর অর্থ– বিদ্রোহ। অর্থাৎ স্ত্রীকে যদি বিদ্রোহের কারণে তালাক দেওয়া হয়ে থাকে এবং ইদ্দত পালন কালেও সে স্বামীর বিদ্রোহ করা হতে বিরত না হয়।

তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, সুদ্দী, ইবনে সায়েব ও ইব্‌রাহীম নখয়ী (র.) বলেন, এর অর্থ ঘর হতে স্ত্রীর বের হয়ে চলে যাওয়া। এটা একটা সুস্পষ্ট অন্যায় কাজ করার শামিল। আর যে বলা হয়েছে– 'আর না তারা নিজেরা ঘর হতে বের হয়ে যাবে, তবে যদি তারা কোনো সুস্পষ্ট অন্যায় কাজ করে বসে'– এটা এমন ধরনের কথা, যেমন কেউ বলে "তুমি কাউকে গালি দিও না তবে যদি অশালীন হয়ে গিয়ে থাকে।"

এ চারটি মতের প্রথমোক্ত তিনটি মত অনুযায়ী اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ-এর সম্পর্ক বা تَعَلُّقٌ হলো لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ-এর সাথে। আর এ বাক্যের অর্থ হলো, সে যদি চরিত্রহীনতা, বা খারাপ কথাবার্তা, কিংবা বিদ্রোহ করার অপরাধ করে, তবে তাকে ঘর হতে বের করে দেওয়া জায়েজ হবে। আর চতুর্থ মতের দৃষ্টিতে এ কথাটির সম্পর্ক وَلَا يَخْرُجْنَ -এর সঙ্গে এবং এর তাৎপর্য এই যে, তারা যদি ঘর হতে বের হয়ে যায়, তবে তারা সুস্পষ্ট অন্যায় করবে। –[রাওয়ায়ে, কাবীর, কুরতুবী]

এ শেষোক্ত মতই ইমাম আবূ হানীফার অভিমত। তবে ইমাম আবূ ইউসুফের মত হলো, হাসান বসরী ও যায়েদ ইবনে আসলামের মতোই। অর্থাৎ জেনা-ব্যভিচার করলে তখন হদ কায়েম করার জন্য বাড়ি হতে বের করা হবে।

আবূ বকর জাস্‌সাস (র.) বলেছেন, আয়াতের শব্দগুলোর অর্থ উপরোক্ত সবই হতে পারে। সুতরাং এসব কারণে তাদেরকে বাড়ি হতে বের করে দেওয়া যাবে। আর এসব কারণ অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত হবে। –[রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالٰى تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ الخ : মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে حُدُوْدُ اللّٰهِ দ্বারা শরয়ী বিধিবিধানসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তালাক সম্পর্কীয় মাসআলাগুলোকেই حُدُوْدُ اللّٰهِ বলা হয়েছে, وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশনাসমূহের ব্যতিক্রম কোনো কাজ করে, তবে فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ সে স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করল। তবে এটাতে আল্লাহর অথবা ইসলামের কোনো ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا . (اَلْحَدِيْث)

অর্থাৎ এ লোকসানটি ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জগতই ভোগ করতে হবে। পরকালীন বা ধর্মীয় লোকসান অর্থাৎ গুনাহের বোঝা পোহাবে আর তার শাস্তি ভোগ করবে।

ইহকালীন ক্ষতিগ্রস্ত অর্থ যে ব্যক্তি শরয়ী হেদায়েতের বিপরীতভাবে তালাক দিবে, তবে সে তিন তালাক প্রদান করে ফেলল। যার ফলে পুনরায় ওই স্ত্রীকে رَجْعَةٌ অথবা নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরায়ে রাখতে পারবে না। আর সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর আফসোস করতে থাকে এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে যায়। বিশেষত একটি ছোট সন্তান থাকা অবস্থায় যদি তালাক প্রদান করে, তবে তার ইহকালীন কষ্ট ও দুঃখের সীমা থাকে না। আমাদের অত্র অঞ্চলে বহু ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অত্যাচার ও কষ্টদানের উদ্দেশ্যেই তালাক দেওয়া হয়, তবে এতে পুরুষটি অধিকতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا : আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তুমি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা সম্ভবত উক্ত রাগান্বিত অবস্থার পর অন্য আরও দ্বিতীয় অবস্থা বা হুকুম প্রদান করতে পারেন। অর্থাৎ স্ত্রীর মাধ্যমে যে শান্তি পেতে, সন্তানগণের লালনপালনের যে সুব্যবস্থা ছিল, তাকে তালাক দানের মাধ্যমে বিনষ্ট করে দিয়েছ। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাকে বায়েনা প্রদান করো না, বরং رَجْعِيْ তালাক দান করা, যাতে رَجْعَةٌ করার ব্যবস্থা হতে পারে। رَجْعَةٌ করা দ্বারা পূর্ব বিবাহ বন্ধন বহাল থাকবে।

উক্ত আয়াতে أَمْرًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা সম্পর্কে আল্লামা জালাল উদ্দিন (র.) বলেন, তা দ্বারা رَجْعَةٌ করার নির্দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম হাসান, নাখয়ী ও শায়বী (রা.) হতে হযরত আবদ ইবনে হোমাইদ (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে أَمْرًا দ্বারা مُرَاجَعَتْ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ কথার ভিত্তিতে سَلَفْ صَالِحِيْن গণ বলেন, তালাকে বায়েনপ্রাপ্তা মহিলাগণকে سُكْنٰى দেওয়া ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا ও سُكْنٰى পাবে না।

মাসনদে আহমদ ও তাবারানী গ্রন্থে ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা রয়েছে–

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى لِلْمَرْأَةِ عَلٰى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنٰى .

অর্থাৎ তালাকে رَجْعِيْ প্রাপ্তা মহিলা খোরপোশ স্বামীর পক্ষ হতে পাবে, আর তালাকে বায়েনাপ্রাপ্তা মহিলা খোরপোশ ইত্যাদি কিছুই পাবে না। –[কাবীর]

ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা ঘর হতে বের হওয়া জায়েজ হওয়া বা না হওয়া প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ : وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الخ - আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন তাফসীরকারক ও ফকীহগণ যে সকল মতামত ব্যক্ত করেছেন তাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা কখনো নিজ স্বামী-স্ত্রীর বাড়ি হতে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোথাও [বাইরে] যেতে পারবে না। নিষ্প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া গুনাহের কারণ হবে। তবে স্ত্রী বিশেষ প্রয়োজন বশত কোথাও যেতে পারবে না তাতে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

তালাকে رجعى ও তালাকে বায়েনাপ্রাপ্তা মহিলা স্বীয় বাসস্থানেই (স্বামীর ঘরে), অথবা ভাড়া নেওয়া ঘরে, অথবা স্বীয় মালিকানা ঘরে, অথবা ধারকৃত ঘরে ইদ্দত পালন করতে হবে। হানাফী ইমামগণের মত এটাই। তবে ওফাতের ইদ্দত পালনকারিণী দিবা রাতে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে, তবে ঘরে রাত যাপন করা আবশ্যক বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, مُعْتَدَّةُ رَجْعِيَّةٍ, مُعْتَدَّةُ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا অথবা بَائِنَةٌ বা কেউই কখনো কোনো ক্রমেই বের হতে পারবে না।

হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারীগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেন।

اِنَّ رِجَالًا اِسْتَشْهَدُوْا بِاُحُدٍ فَقَالَ نِسَائُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَسْتَوْحِشُ فِىْ بُيُوْتِنَا اَفَبِيْتُ عِنْدَ اَحَدٍ لَنَا فَاَذِنَ لَهُنَّ اَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ اِحْدٰيهُنَّ فَاِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِىْ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اِلٰى بَيْتِهَا - اَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالشَّافِعِىِّ - (عُمْدَةُ الرِّعَايَةِ)

অর্থাৎ কিছু সংখ্যক পুরুষ উহুদের ময়দানে শাহাদাত বরণ করলে তাদের স্ত্রীগণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে রাত যাপনের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পরস্পরের সাথে দিবাভাগে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেন এবং রাতে নিজ ঘরে রাত যাপনের হুকুম দেন। সুতরাং দিবাভাগে বা রাতে অন্যত্রে প্রয়োজনে গমন করার বৈধতা প্রকাশ পেল। তবে যদি স্বামীর ঘরে বসবাস করার দ্বারা মান-সম্মানের আশঙ্কাজনক হয় অথবা স্বামী বের করে দেয়, অথবা সম্পদ ধ্বংস করার সম্ভাবনা থাকে তবে বের হওয়ার বৈধতা রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে সে স্বীয় সুবিধা মতো উপযুক্ত স্থানে عِدَّتْ পালন করবে।

তবে স্বামীর ঘর যদি সংকীর্ণ হয়, তবে স্ত্রী পর্দা ব্যবহার করে রাত যাপন করবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্যত্র থাকাই উত্তম হবে। তদ্রূপ ফসখে নিকাহ -এর ইদ্দত পালনেও, কিন্তু সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত সত্যবাদী বা বিশ্বস্ত মহিলার দায়িত্বে স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের ব্যবস্থা করে দেওয়া উত্তম হবে। -(عُمْدَةُ الرِّعَايَةِ)

لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا কথাটি কিসের দলিল হিসাবে ব্যবহৃত? : এর অর্থ হলো, "তোমরা জান না সম্ভবত আল্লাহ তারপর (মিল-মিশের) কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায় হয়তো লজ্জিত হতে পারে এবং ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তার মনে মহব্বত সৃষ্টি হতে পারে, (এটা সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হবে)। এতে প্রমাণ হয় যে, তালাক দানের মোস্তাহাব নিয়ম হলো, আলাদা আলাদাভাবে তালাক দেওয়া, একসাথে তিন তালাক না দেওয়া। আবূ ইসহাক (র.) বলেন, একই সময় যদি তিন তালাক দেওয়া হয় তাহলে, لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "সম্ভবত আল্লাহ কোনো মিলমিশের ব্যবস্থা সৃষ্ট করে দিবেন" এ উক্তির কোনো মানে হতে পারে না। অর্থাৎ পুনর্বার রাজয়াত করার সুযোগ না থাকার কারণে মিলমিশের আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না। -[কাবীর]

মোদ্দাকথা হলো, আয়াত হতে প্রমাণিত হয় যে, একসাথে তিন তালাক না দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে তালাক দেওয়া সুন্নত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

২. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ قَارَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِاَنْ تُرَاجِعُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ مِنْ غَيْرِ ضِرَارٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اُتْرُكُوْهُنَّ حَتّٰى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ بِالْمُرَاجَعَةِ وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ عَلَى الرَّجْعَةِ اَوِ الْفِرَاقِ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط لَا لِلْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ اَوْ لَهٗ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

২. অনন্তর যখন তাদের সময়কাল আসন্ন হবে তাদের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন তাদেরকে রেখে দিবে তাদের সাথে রাজয়াত করত সঙ্গতভাবে কোনোরূপ ক্ষতি সাধন ব্যতীত। অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করো সঙ্গতভাবে তাদের ইদ্দত পূর্ণ করা অবধি তাদের পরিত্যাগ করো এবং রাজয়াতের মাধ্যমে তাদের ক্ষতিসাধন করো না। আর তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখো রাজয়াত বা পরিত্যাগ করার উপর। আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দান করো বিরুদ্ধে কিংবা পক্ষে নয়। এটা দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ করে দিবেন দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদাপদ হতে।

৩. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط يَخْطُرُ بِبَالِهٖ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فِىْ اُمُوْرِهٖ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط كَافِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ مُرَادِهٖ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِضَافَةِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ كَرْخَاءٍ وَشِدَّةٍ قَدْرًا مِيْقَاتًا .

৩. আর তাকে জীবিকা দান করবেন তার ধারণাতীত উৎস হতে অন্তরে কল্পনা হয়নি এমনভাবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার ব্যাপারসমূহে তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট তাকে যথেষ্টরূপে সাহায্যকারী। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কার্য পূর্ণকারী তাঁর সঙ্কল্প অপর এক কেরাতে শব্দটি اِضَافَتْ -এর সাথে পঠিত হয়েছে। আল্লাহ স্থির করেছেন প্রত্যেক বস্তুর জন্য যেমন স্বাচ্ছন্দ্য ও অনটন নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট সময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ : জমহুর بَالِغٌ اَمْرَهٗ অর্থাৎ بَالِغٌ -এ তানবীন আর اَمْرَهٗ তে نَصَبْ দিয়ে পড়েছেন। আর হাফস اِضَافَتْ করে পড়েছেন। ইবনে আবূ আবলা, দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ এবং আবূ আমর (র.) এক বর্ণনায় بَالِغٌ -এ তানবীন দিয়ে এবং اَمْرُهٗ তে رَفع দিয়ে بَالِغٌ اَمْرُهٗ পড়েছেন। অর্থাৎ اَمْرُهٗ -কে بَالِغٌ -এর فَاعِلْ হিসাবে পড়েছেন। অথবা اَمْرُهٗ -কে مُبْتَدَأْ আর بَالِغٌ -কে خَبَرْ مُقَدَّمْ হিসাবে পড়েছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ করতে ইচ্ছা করেন তা অবশ্যই করেন, কোনো কিছুই তাঁকে দুর্বল করতে পারে না। কোনো কিছু অপূর্ণও থাকে না। তৃতীয় কেরায়াত অনুযায়ী বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়-বাস্তবায়নযোগ্য। কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না। আর মুফাযযল بَالِغًا অর্থাৎ حَالْ হিসাবে পড়েছেন। তখন قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا -কে اِنَّ -এর خَبَرْ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا بَلَغْنَ .... وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ : উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যখন তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীদেরকে রাজয়ী তালাক দিয়ে থাক এবং স্ত্রীগণ ইদ্দত শেষ করার নিকটবর্তী হয়ে আসে, তখন তোমরা অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে, যদি তাদেরকে রাজয়াত করে রাখা উত্তম বা সমীচীন মনে কর, তবে সুন্নত নিয়মানুসারে তাদেরকে রেখে দাও। আর যদি ছেড়ে দেওয়া উত্তম মনে কর, তাহলেও সুরীতির ভিত্তিতেই ছেড়ে দিবে, তবে উভয় ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষী রাখা একান্ত আবশ্যক। সে সাক্ষীগণ অতি ন্যায্য বিচারক বা সৎব্যক্তি হতে হবে। উক্ত উপদেশাবলি পরকালীন শান্তিকামীদের জন্যই ব্যক্ত করা হয়েছে।

أَجَلَهُنَّ -এর অর্থ : উক্ত আয়াতে বর্ণিত أَجَلَهُنَّ শব্দ দ্বারা ইদ্দতের অর্থ নেওয়া হয়েছে, যা হানাফীগণের মতে তিন حَيْض অথবা তিন মাস নির্ধারিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ মহিলাগণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করবে। আর হানাফীগণ ইদ্দত طُهْر দ্বারা গণনা করেছেন এবং قُرُوْء অর্থ طُهْر নিয়েছেন।

আর بُلُوْغُ أَجَلٍ অর্থ ইদ্দত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া। অর্থাৎ ইদ্দত কয়েকদিন তথা ৬, ৭ বা ৮ দিন বাকি থাকে।

هٰذَا حُكْمٌ خَامِسٌ لِلطَّلَاقِ এটা তালাক সম্পর্কীয় ৫ম হুকুম অর্থাৎ বলা হয়েছে, رَجْعَةٌ -এর মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন বহাল রাখা। ৬ষ্ঠ নম্বরে বলা হয়েছে রাখা সমীচীন না হলে বিধান মতে ত্যাগ করে দেওয়া। ৭ম নম্বরে বলা হয়েছে, দু'জন সত্য লোককে সাক্ষী রাখা। ৮ম নম্বরে বলা হয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সাক্ষী রাখবে, কোনো বান্দার উদ্দেশ্যে নয়।

রাজয়াত এবং বিচ্ছিন্নকরণের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বানানোর হুকুম : আলোচ্য আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে রাজয়াত করতে নতুবা বিচ্ছিন্ন করে দিতে বলা হয়েছে। আর এ উভয় কাজে সাক্ষ্য বানাতে বলা হয়েছে, এর প্রেক্ষিতে এ নির্দেশ ওয়াজিব না মোস্তাহাবের জন্য সে ব্যাপারে ইমামাদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে।

ক. ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, বিচ্ছিন্নকরণ এবং রাজয়াতকরণ উভয় ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বানানো মোস্তাহাব। কারণ আল্লাহর বাণী وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ "যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় কর তখন সাক্ষ্য রাখো" এ নির্দেশের ফলে সাক্ষ্য বানানো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তেমনি এখানে সাক্ষ্য বানানো মোস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে রাজয়াত করতে বলেছেন, অতঃপর সাক্ষ্য বানাতে বলেছেন, তা হতে বুঝা যায় যে, সাক্ষ্য রাখার পূর্বে রাজয়াত করলে জায়েজ হবে। কারণ তাতে সাক্ষ্য গ্রহণকে রাজয়াত বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়নি। এটা ইমাম মালিক এবং আহমদ ও শাফেয়ীর উভয়ের দু' মতের একমত।

খ. ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (র.) অন্য মতে বলেছেন, রাজয়াতের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বানানো ওয়াজিব, আর বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার প্রাক্কালে সাক্ষ্য বানানো মোস্তাহাব। -[রাওয়ায়েউল বায়ান]

সাক্ষ্য বানানোর লাভ বা ফায়দা : সাক্ষ্য না বানালে তালাক হবে না বা রাজায়াত শুদ্ধ হবে না এবং চূড়ান্ত বিচ্ছেদও শুদ্ধ হবে না-এমন কথা যখন নয়, অর্থাৎ সাক্ষ্য বানানো যখন এসব কাজের জন্য জরুরি নয় তখন সাক্ষ্য বানানোর লাভ কোথায়? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, সাক্ষ্য বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। কেননা পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনো একটি পক্ষ পরে কোনো ব্যাপারে অস্বীকার করে বসতে পারে, যা ঝগড়ার কারণ হতে পারে এবং তার ফলে সহজে মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এ পরিস্থিতি যাতে না হতে পারে সে জন্যই সাক্ষ্য রাখার এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সন্দেহের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়।

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, সাক্ষ্য বানানোতে লাভ হলো- দু' জনের কেউই যেন কোনো কিছু পরে অস্বীকার করতে না পারে। আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখতে চাইলে যেন স্বামীকে কোনো তোহমত বা অভিযোগের সম্মুখীন না হতে হয়। আর এ অবস্থাও যেন না হয় যে, দু'জনের মধ্যে একজন মরে গেল তখন অন্যজন মিরাস পাওয়ার আশায় স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বহালের দাবি করল। আরো বলা হয়েছে যে, সাক্ষ্য বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে। যেন স্ত্রী রাজয়াত অস্বীকার করে ইদ্দত শেষে অন্যস্থানে বিবাহ বসতে না পারে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا : উক্ত আয়াতের অর্থ "যে লোক আল্লাহকে ভয় করে কাজ করবে আল্লাহ তার জন্য অসুবিধাজনক অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো না কোনো পথ করে দিবেন।"

ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো, যে লোক ইদ্দতের জন্য তালাক দিবে- অর্থাৎ যে তুহুরে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হয়নি; সে তুহুরে তালাক দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য রাজয়াত করার পথ খুলে দিবেন। অন্যরা বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো যে কোনো বিপদ সংকুল অবস্থা হতে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন। কলবী বলেছেন, যে লোক মসিবতে ধৈর্য অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হতে জান্নাতে যাবার পথ খুলে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, এর অর্থ দুনিয়ার সন্দেহসমূহ হতে, মৃত্যুর যন্ত্রণা হতে এবং কিয়ামত দিবসের কঠোরতা হতে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দিবেন।

উক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ : অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেছেন, এ আয়াতটি এবং তার পরের আয়াত হযরত আউফ ইবনে মালিক আল-আশজায়ী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁর এক ছেলে শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে পড়লে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং নিজের দুঃখ আর দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেন। এ কথা শুনে তাকে বললেন. আল্লাহকে ভয় করো, আর ধৈর্য অবলম্বন করো এবং বেশি বেশি لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ো। তখন লোকটি তা করতে থাকেন। একদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন তখনই তাঁর সন্তান চলে আসল। শত্রুরা তাঁকে ভুলে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় সে শত্রুদের একশত উট নিয়ে চলে আসল। তখন তিনি (পিতা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সব ঘটনা বললেন এবং এ উটগুলো খেতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খেতে বললেন। তখনই وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ আয়াতটি নাজিল হলো। [এ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় কিছুটা রদ বদল রয়েছে]।-[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

আয়াতে কারীমা হতে নির্গত মাসআলাসমূহ : শানে নুযূলে বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, যদি কোনো মুসলমান কাফিরদের নিকট (قَيْد) আটকা পড়ে যায়, অতঃপর তাদের কোনো সম্পদ নিয়ে পলায়ন করে আসতে পারে, তবে তা مَالُ غَنِيْمَتْ -এর حُكْم অনুসারে তার পাঁচ ভাগের এক অংশ بَيْتُ الْمَالِ -এ সোপর্দ করা وَاجِبْ নয়। কেননা উক্ত مَالِكُ الْاَشْجَعِىْ -এর পুত্র যে উট বা বকরি নিয়ে পালিয়ে আসছিল সেগুলো সম্পূর্ণ তাদেরকে স্বীয় কাজে ব্যয় করতে বলেছেন। ফকীহগণ বলেন, যদি কোনো মুসলমান চুপিসারে শত্রুদের রাষ্ট্রে বিনা নির্দেশে ঢুকে যায় এবং কাফেরদের দেশ হতে তাদের কোনো মালামাল নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, তবে উক্ত হাদীসের আলোকে তা মুসলমানদের খাওয়া বৈধ হবে। আর তা হতে بَيْتُ الْمَالِ -এ কোনো অংশ দেওয়া আবশ্যক নয়।

তবে যদি কোনো মুসলমান কাফেরদের দেশে (دَارُ الْحَرْبِ) যাওয়ার জন্য ভিসা ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে যায়, তখন তাদের অনুমতিবিহীন কোনো সম্পদ নিয়ে আসা জায়েজ হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে مُعَاهَدَةْ বা চুক্তিপত্র হয়েছে বলেই ভিসার মাধ্যমে আগমন প্রস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা আমানতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোনো কাফের থেকে কোনো মুসলমান নির্দেশবিহীন কোনো বস্তু হরণ করলে ওয়াদা ভঙ্গ করার দায়ে আবদ্ধ হবে। আর ওয়াদা ভঙ্গ করা شَرْعًا হারাম বলা হয়েছে।

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বহু কাফের বহু আমানত রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের মুহূর্তে সেগুলো হযরত আলী (রা.) -এর নিকট বুঝিয়ে দিয়ে হিজরত করেছেন, তবে আমানত খেয়ানত করেননি। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ الخ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, আল্লাহ তার সকল ক্ষুদ্র ও মহাগুরুত্বপূর্ণ কার্যগুলো সমাধানের জন্য যথেষ্ট হবেন। কেননা তিনি তার সকল কার্য যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করেই থাকেন। তিনি সকল বিষয়ের জন্য একটি اِنْدَازْ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তা অনুসারেই সকল কার্য করে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাঁর হক অনুসারে তাওয়াক্কুল করতে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমনভাবে রিজিক প্রদান করতেন, যেভাবে পক্ষীদেরকে দিয়ে থাকেন। তারা সকালবেলায় স্বীয় বাসা হতে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় পেট পুরিয়ে বাসায় ফিরে আসে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, يَدْخُلُ فِى الْجَنَّةِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنْ اُمَّتِىْ كُلُّهُمْ مُتَوَكِّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ (اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ) অর্থাৎ সত্তর হাজার তাওক্কুলকারী আমার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে।

তাওয়াক্কুল-এর অর্থ : تَوَكُّلْ -এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিকৃত সকল বিষয় ও ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে; বরং সকল বিষয়ের সকল উপকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে বসে থাকবে। এটাই تَوَكُّلْ -এর মূল অর্থ। তাদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেছেন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ـ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤. وَالّٰـئِىْ بِـهَـمْـزَةٍ وَيَـاءٍ وَبِـلَا يَـاءٍ فِـى الْمَوْضَعَيْنِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ بِمَعْنَى الْحَيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِىْ عِدَّتِهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالّٰـئِىْ لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَالْمَسْئَلَتَانِ فِىْ غَيْرِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ اَمَّا هُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ مَا فِىْ اٰيَةِ الْبَقَرَةِ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ انْقِضَاءُ عِدَّتِهِنَّ مُطَلَّقَاتٍ اَوْ مُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

৪. আর যে সকল স্ত্রী শব্দটি উভয় ক্ষেত্রেই হামযা ও ইয়া এবং ইয়া ব্যতীত উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। নিরাশ হয়েছে ঋতুস্রাব হতে اَلْمَحِيْض শব্দটি حَيْض অর্থে ব্যবহৃত তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্য হতে, যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর তাদের ইদ্দত প্রশ্নে সন্দিহান হও তবে তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস। আর যে সকল স্ত্রী এখনও ঋতুবতী হয়নি স্বল্প বয়স্কতার কারণে, তাদের ইদ্দতও তিন মাস। আর এ উভয় মাসআলা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন তাদের স্বামী মৃত্যুবরণ করেনি। অর্থাৎ তালাকের ইদ্দত, স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত নয়; কিন্তু স্বামী মৃত্যুর ক্ষেত্রে এরূপ স্ত্রীলোকের ইদ্দত চার মাস দশ দিন। যেমন, সূরা বাক্বারায় يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا। উল্লিখিত হয়েছে। আর গর্ভবতী মহিলাগণের ইদ্দতকাল ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার সময়কাল যদিও সে তালাকপ্রাপ্তা কিংবা স্বামী মৃত হোক তাদের গর্ভ খালাস পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন দুনিয়া ও আখেরাতে।

٥. ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرُ فِى الْعِدَّةِ اَمْرُ اللّٰهِ حُكْمُهٗ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗ اَجْرًا.

৫. এটা ইদ্দত সম্পর্কে উল্লিখিত বিধান আল্লাহর বিধান আদেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পাপ মোচন করে দিবেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَئِسْنَ : জমহুর এটাকে يَئِسْنَ অর্থাৎ فِعْل مَاضِىْ হিসাবে পড়েছেন। আবার তাকে يَيْئِسْنَ অর্থাৎ দুই يَاءٌ দিয়ে مُضَارِعْ হিসাবেও পঠিত হয়েছে। -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী, বাহরুল মুহীত]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى حَمْلَهُنَّ : জমহুর حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ একবচন পড়েছেন, আর যাহহাক তাকে اَحْمَالَهُنَّ অর্থাৎ বহুবচন করে পড়েছেন। -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يُعْظِمْ : জমহুর তাকে اَعْظَمَ-এর مُضَارِعْ হিসাবে يُعْظِمْ পড়েছেন। আর আ'মাশ نُعْظِمْ পড়েছেন। অর্থাৎ يَا-এর স্থানে نُوْن দিয়ে পড়েছেন। আর ইবনে মাকছাম يُعَظِّمْ অর্থাৎ ظَاء তে تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : وَأُولَاتُ الْاَحْمَالِ হলো مُبْتَدَأٌ আর اَجَلُهُنَّ হলো مُبْتَدَأٌ ثَانِى আর اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ হলো مُبْتَدَأٌ ثَانِى - خَبَرٌ -এর خَبَرٌ মিলে مُبْتَدَأٌ ثَانِى -এর সাথে তার خَبَرٌ মিলে مُبْتَدَأٌ اَوَّلٌ -এর خَبَرٌ হয়েছে। আর اَجَلُهُنَّ -কে اُولَاتُ হতে بَدَلْ اِشْتِمَالٌ -ও বলা যেতে পারে। তখন اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ হবে خَبَرٌ । –[রাওয়ায়েউল বায়ান]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল :

১. বর্ণিত আছে যে, হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে মহিলার হায়েজ হয় তার ইদ্দত সম্পর্কে তো জানতে পেরেছি; কিন্তু যাদের হায়েজ হয় না তাদের ইদ্দত কি রকম? তখন وَاللَّائِى يَئِسْنَ আয়াতটি নাজিল হয়। –[কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, রাওয়ায়ে]

২. হাকিম, ইবনে জারীর, তাবারী এবং বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন সূরা বাক্বারায় তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং স্বামীমৃত মহিলাদের ইদ্দত সম্বলিত আয়াত নাজিল হলো, তখন উবাই ইবনে কা'ব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ মদীনার কিছু মহিলা বলছেন যে, কিছু কিছু মহিলা এখনও এমন রয়ে গেছে যাদের সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন কোন মহিলা সম্বন্ধে বলা হয়নি? তখন তিনি বললেন, ছোট এবং বড় (অর্থাৎ যাদের হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে) আর গর্ভবতী মহিলা। তখনই এ আয়াতটি নাজিল হয়। –[কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

৩. ইমাম বাগবী, ওয়াহেদী ও খাযেন (র.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ আয়াতটি নাজিল হলো, তখন খালেদ ইবনে আন-নো'মান আনসারী (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যেসব মহিলার হায়েজ হয় না, আর যাদের হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে এবং গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত কি রকম? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো।

–[রাওয়ায়ে, কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

মুজাহিদের মতে, এ আয়াত যেসব মহিলার ইস্তেহাযার কারণে হায়েজের রক্ত না রোগের রক্ত জানা যায় না, তাদের ইদ্দত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ : ইমাম জাস্‌সাস (র.) বলেছেন, এর অর্থ 'আয়েসা' হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ হতে পারে না, কারণ আমরা কোনো মহিলা 'আয়েসা'র বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ করলে বলিনা যে, তার ইদ্দত তিন মাস। অতঃপর তিনি বলেন, এখানে সন্দেহ বা اِرْتِيَابٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শানে নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করে। সুতরাং এর অর্থ হলো, তোমাদের যেসব স্ত্রীলোক হায়েজ হতে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে [তোমরা জেনে রেখো যে,] তাদের ইদ্দত তিন মাস।

ইমাম তাবারীও এ অর্থকেই গ্রহণ করেছেন, গ্রন্থকারেরও এ অভিমত, ইমাম তাবারী বলেন, 'যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, আর তোমরা তাদের হুকুম কি তা না জানতে পার, তাহলে জেনে রাখো যে, তাদের হুকুম হলো তাদের ইদ্দত তিন মাস।'

হযরত ইকরামা এবং কাতাদাহ (রা.) বলেছেন, 'রীবা' বা সন্দেহের অন্তর্ভুক্ত হলো সে রুগ্ণ মহিলা, যার হায়েজ ঠিক থাকে না। মাসের প্রথম দিকে কয়েকবার হয়েজ হয়, আবার কতেক মাসে একবারও হয়।

আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ, 'যদি তোমাদের ইয়াকীন হয়' এ শব্দটি পরস্পর বিরোধী অর্থ দানকারী শব্দসমূহের মধ্যে একটি। –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, জাস্‌সাস, কাবীর, রাওয়ায়ে]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ : وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ হলো مُبْتَدَأٌ আর এর خَبَرٌ উহ্য রাখা হয়েছে। আর তা হলো فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ যাদের এখনও হায়েজ আসেনি তাদের ইদ্দত হলো তিন মাস। অর্থাৎ হায়েজ অল্পবয়স্কতার কারণে আসেনি, কিংবা অনেক স্ত্রীলোকের যেমন বহু বিলম্বে হায়েজ হয়, এমনিভাবে সারা জীবনে হায়েজ হয় না এমন স্ত্রীলোক কমই হয়ে থাকে। যা হোক না কেন সব অবস্থাই এ ধরনের স্ত্রীলোকের ইদ্দত তা-ই যা হায়েজ হওয়া হতে নিরাশ স্ত্রীলোকের ইদ্দত। অর্থাৎ তালাকের সময় হতে তিন মাস।

এখানে মনে রাখতে হবে, কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় সে স্ত্রীলোকের যার সাথে স্বামী নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হয়েছে। কারণ নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক হলে আদৌ কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না। –[আল-আহযাব–৪৯]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ কারণে যেসব স্ত্রীলোকের হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত বর্ণনা করার সুস্পষ্ট তাৎপর্য এই যে, এ বয়সে স্ত্রীলোকের শুধু বিবাহ দেওয়াই জায়েজ নয়; বরং তার সাথে স্বামীর নিবিড় একাকীত্বে মিলিত হওয়াও জায়েজ। ফলে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে যাকে জায়েজ বলা হয়েছে তাকে নিষিদ্ধ করার সাহাস বা অধিকার কোনো মুসলমানেরই হতে পারে না।

যে স্ত্রীলোকের হায়েজ আসা শুরু হয়নি, তাকে যদি তালাক দেওয়া হয় এবং পরে ইদ্দত পালনকালে তার হায়েজ এসে পড়ে, তাহলে সে সেই হায়েজ হতেই ইদ্দত পালন শুরু করবে এবং হায়েজ সম্পন্না স্ত্রীলোকের মতোই তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। -[কুরতুবী]

কোন সময় থেকে ইদ্দত পালন করবে? : চন্দ্র মাসের শুরুতে তালাক দেওয়া হলে চন্দ্র দেখা অনুযায়ী তালাকের সময় বা ইদ্দত হিসাব করতে হবে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত।

আর যদি মাসের মাঝামাঝি সময়ে তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে ৩০ দিনের মাস গণনা করে তিনটি ইদ্দত পালন করতে হবে।

যে সকল স্ত্রীলোকের হায়েজ হওয়ার মধ্যে অনিয়মতা দেখা দিয়েছে, তাদের ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.)-এর মতে যদি مُطَلَّقَة মহিলাটির ২/১টি হায়েজ আসার পর হায়েজ আসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে ৯ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ইকরামাহ ও কাতাদাহ (রা.) বলেন, যে স্ত্রীর সারা বছরও হায়েজ হয়নি, তার ইদ্দত তিন মাস।

হযরত তাউস (রা.) বলেন, যে স্ত্রীলোকের বছরে মাত্র একবার হায়েজ হয়েছে তার ইদ্দত তিন হায়েজ।

হযরত ওসমান, আলী, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)ও এ মত প্রকাশ করেন।

ইমাম মালিক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস, ওসমান, আলী ও যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর মতো মত প্রকাশ করে বলেন, যে স্ত্রীর বছরে মাত্র একবার হায়েজ হয়েছে তার ইদ্দত তিন হায়েজ পালন করতে হবে। তিনি হাব্বান নামক এক ব্যক্তির ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। ঘটনাটি এই- হাব্বান নামক জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেন, তখন স্ত্রী তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করাচ্ছিল, এমতাবস্থায় এক বছর অতিবাহিত হলো, কিন্তু স্ত্রীর হায়েজ হয়নি। তারপর হাব্বান মারা গেলে স্ত্রী তার সম্পত্তির মিরাসের দাবি করল।

এ মামলা হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট পেশ হলে তিনি হযরত আলী ও যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) এর পরামর্শক্রমে উক্ত স্ত্রীকে মিরাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক করলেন। কারণ স্ত্রী আয়েসাও নয় আবার সগীরাহও নয়; সুতরাং স্ত্রীর হায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় স্ত্রী এক হায়েজের লক্ষ্যে স্বামীর স্ত্রীর রূপে গণ্য রয়েছে, তাই মিরাস পাবে।

হানাফী মাযহাব অবলম্বীগণ বলেন, যে স্ত্রীর হায়েজ আগমন বন্ধ হয়নি; বরং তাতে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তালাক হয়ে গেলে সে তিন হায়েজ অনুপাতে ইদ্দত পালন করতে হবে। কারণ উক্ত মহিলা সগীরা ও আয়েসা কোনো এক প্রকারের নয়। হ্যাঁ, তবে একেবারেই যদি حَيْض বন্ধ হয়ে আয়েসা হয় অথবা অনুপযুক্তা হয়, তবে ইদ্দত তিন হায়েজ পালন করবে।

ইমাম শাফেয়ী, সাবী, লাইস, হযরত আলী ও ওসমান (রা.) -এর মতও এটাই।

হাম্বলী মাযহাব অবলম্বনকারীগণের অভিমত হলো, যে স্ত্রীলোকের ইদ্দত হায়েজ হিসাবে গণনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সে ইদ্দতের মধ্যে হায়েজ হয়নি, যদি এমন স্ত্রীলোক হয় (অর্থাৎ হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়) তবে সে আয়েসা মহিলার ন্যায় ইদ্দত পালন করতে হবে। আর যদি অজ্ঞাত কারণে হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন প্রথমত ৯ মাস অতিবাহিত করবে, পরে আরও তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। আর হায়েজ বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে অবহিত হলে হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হায়েজ হিসেবে ইদ্দত পালন করবে।

(اَلْاِنْصَافُ فِيْ مَعْرِفَةِ الرَّاجِعِ مِنَ الْخِلَافِ عَلٰى مَذْهَبِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ)

আল-আহযাব গ্রন্থের বর্ণনায় বলা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর خَلْوَتْ صَحِيْحَة নিবিড় একাকিত্বে মিলন হয়ে থাকলে عِدَّتْ পালন করা আবশ্যক, অন্যথায় عِدَّتْ পালন জরুরি নয়। -[আল-আহযাব- ৪৯]

মৃত্যুর ইদ্দতের সাথে গর্ভবতী থাকলে তার হুকুম : হামল ও ওফাতের ইদ্দত একত্রিত হলে, তখন কিভাবে ইদ্দত পালন করতে হবে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। এ মতবিরোধের একমাত্র কারণ হলো, সূরা আল-বাক্বারা -এর ২৩৪ নং আয়াতে স্বামীমৃত স্ত্রীর ইদ্দত। স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন পালন করতে বলা হয়েছে। সাধারণ বিধবা ও গর্ভাবস্থায় বিধবা স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে এ ইদ্দত প্রযোজ্য হবে কিনা তা এখানে বিস্তারিত বলা হয়নি। স্বামীমৃত স্ত্রীর ইদ্দত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا الاية আর গর্ভবতীদের ইদ্দত সম্পর্কে বলা হয়েছে। (وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الاية এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা.) এভাবে মাসআলা বের করেছেন ও বলেছেন যে, গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত গর্ভ প্রসব হওয়া পর্যন্ত শেষ হবে। কিন্তু গর্ভবতী বিধবা মহিলার ইদ্দত দু'টি মিয়াদের মধ্যে দীর্ঘতম মেয়াদ। অর্থাৎ গর্ভবতী ও তালাকের ইদ্দতের মধ্যে যা দীর্ঘতম হয় তাই পালন করতে হবে। যাথ– ৪ মাস ১০ দিনের মধ্যে যদি গর্ভখালাস হয়ে যায়, তাহলে এটাই ইদ্দত। আর যদি ৪ মাস ১০ দিনের মধ্যে গর্ভখালাস না হয়, তবে যত দিনে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তত দিনই ইদ্দত। এতে ১২ মাস প্রয়োজন হলে ১২ মাসই পালন করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, সূরা আত-তালাক্বের এ আয়াত وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ সূরা বাক্বারাহ-এর আয়াতের পর নাজিল হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী আয়াতকে পরবর্তী আয়াতের দ্বারা মানসূখ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, গর্ভবতী বিধবার জন্য ইদ্দত সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা হোক, কিংবা বিধবা হোক, গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, সূরা তালাক্বের আয়াতটি নাজিলকালে আমি হুযূরের সমীপে উপস্থিত ছিলাম। যখন তা নাজিল হয়, তখন আমি হুযূরকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি তালাকপ্রাপ্তা বিধবা ও গর্ভবতী সকলের জন্য? তখন হুযূর ﷺ জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

অপর একটি বর্ণনায় এর স্বপক্ষে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ اَنْ تَضَعَ مَا فِىْ بَطْنِهَا ইবনে জারীরা ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হাজার (র.)ও এ মত পেশ করেন।

এটা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সমর্থন পাওয়া যায় সুবাইয়া আসলামীয়ার ঘটনা হতে, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিল। সে গর্ভবতী অবস্থায় বিধবা হয়েছিল এবং স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরই [কোনো কোনো বর্ণনায় ২০ দিন, কোনোটিতে ২৩ দিন, কোনোটিতে ২৫ দিন, কোনোটিতে ৪০ দিন, আবার কোনোটিতে ৩৫ দিন বলা হয়েছে।] তার সন্তান প্রসব হয়েছিল। নবী করীম ﷺ-এর নিকট তার ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাকে পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি দিলেন। –[বুখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

মুসলিম শরীফে স্বয়ং সুবাইয়া আসলামিয়ার এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, আমি হযরত সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলাম। বিদায় হজের সময় আমার স্বামীর ইন্তেকাল হয়, তখন আমি গর্ভবতী ছিলাম। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর আমার সন্তান প্রসব হয়। তখন একজন বলল, তুমি চার মাস দশ দিনের পূর্বে পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি ফতোয়া দিলেন, 'তুমি সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইদ্দত মুক্ত হয়েছ এবং ইচ্ছা করলে পুনরায় বিবাহ করতে পার।' বুখারী শরীফেও এ বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত হয়েছে। –[রাওয়ায়েউল বায়ান]

তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ বারবার দানের কারণ : আবূ হাইয়ান বলেছেন, যেহেতু এখানে তালাক এবং তালাক সংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধানের আলোচনা হয়েছে, আর স্বামীরা সাধারণত ঘৃণা এবং হিংসা প্রবণ হয়েই স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে থাকেন। সেহেতু কোনো কোনো বাক্যের বা বিষয়ের আলোচনার পর বারবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তালাকদাতা স্বামী কখনও কখনও স্ত্রী সম্বন্ধে এমন সব কথাবার্তা প্রচার করে থাকে, যার ফলে স্ত্রীর সম্মানহানী ঘটে এবং তার পাণি-প্রার্থীরা ফিরে যায়, তারা মনে করে– পূর্বের স্বামী এ স্ত্রী লোকটির বড় কোনো দোষের কারণে তাকে তালাক দিয়েছে। এসব কারণেই বারবার তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে স্ত্রীগণের অধিকার আদায় এবং অন্যান্য ব্যাপারে স্বামীরা আল্লাহকে ভয় করে, তাদেরকে কষ্ট না দেয় এবং তাদের প্রাপ্য তাদেরকে যথার্থভাবে বুঝিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে ভয় করে কাজ করলে আল্লাহ তাদের গুনাহখাতা মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে অধিক পরিমাণে ছওয়াব দিবেন।

–[রাওয়ায়েউল বয়ান]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. اَسْكِنُوْهُنَّ اَىِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ اَىْ بَعْضَ مَسَاكِنِكُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ اَىْ سَعَتِكُمْ عَطْفُ بَيَانٍ اَوْ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِاِعَادَةِ الْجَارِ وَتَقْدِيْرِ مُضَافٍ اَىْ اَمْكِنَةِ سَعَتِكُمْ لَا مَا دُوْنَهَا وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ط اَلْمَسَاكِنَ فَيَحْتَجْنَ اِلَى الْخُرُوْجِ اَوِالنَّفَقَةِ فَيَفْتَدِيْنَ مِنْكُمْ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ج فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ اَوْلَادَكُمْ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ج عَلَى الْاِرْضَاعِ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ج بِجَمِيْلٍ فِىْ حَقِّ الْاَوْلَادِ بِالتَّوَافُقِ عَلٰى اَجْرٍ مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِرْضَاعِ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ تَضَايَقْتُمْ فِى الْاِرْضَاعِ فَامْتَنَعَ الْاَبُ مِنَ الْاُجْرَةِ وَالْاُمُّ مِنْ فِعْلِهِ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ لِلْاَبِ اُخْرٰى وَلَا تُكْرَهُ الْاُمُّ عَلٰى اِرْضَاعِهٖ ـ

৬. তোমরা তাদেরকে বাসস্থান দান করো তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণকে যেথায় তোমরা বসবাস কর অর্থাৎ তোমাদের বাসগৃহ মধ্য হতে কোনো বাসগৃহে তোমাদের সামর্থ্যানুযায়ী অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের জন্য সম্ভব, এটা عَطْفُ بَيَانٍ অথবা পূর্ববর্তী বক্তব্যের بَدَلٌ হরফে জার পুনরুল্লেখ করে অথবা مُضَافٌ উহ্য সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ তোমাদের সামর্থ্যানুরূপ বাসগৃহ দান করো, তদপেক্ষা নিম্নমানের নয়। আর তাদেরকে উত্যক্ত করো না, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য সঙ্কীর্ণ বাসস্থান দেওয়ার মাধ্যমে, যাতে সে বের হতে বাধ্য হয়, কিংবা নাফকা দান ক্ষেত্রে যাতে সে তোমাদের নিকট হতে ফিদিয়া গ্রহণে বাধ্য হয়। আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে তারা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করো। অনন্তর তারা যদি তোমাদের পক্ষ হতে স্তন্য দান করে তোমাদের সন্তানকে তার স্তন হতে দুগ্ধ পান করায় তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দান করো। স্তন্যদানের বিনিময়ে আর তোমাদের মধ্যে পরামর্শ করো এবং তাদের মধ্যে সঙ্গতভাবে উত্তমরূপে, সন্তানের কল্যাণ বিষয়ে স্তন্য দানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর একমত হওয়ার মাধ্যমে। আর যদি তোমরা অনমনীয় হও স্তন্য দান প্রশ্নে সঙ্কটে পতিত হও, এভাবে যে, পিতা পারিশ্রমিক দানে অস্বীকৃত হয় এবং মা স্তন্য দানে অনীহা প্রকাশ করে তবে তার পক্ষে স্তন্য দান করবে পিতার পক্ষে অন্য কোনো নারী মাকে স্তন্য দানে বাধ্য করা হবে না।

٧. لِيُنْفِقْ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُرْضِعَاتِ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ ط وَمَنْ قُدِرَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتٰهُ اَعْطَاهُ اللّٰهُ ط اَىْ عَلٰى قَدْرِهٖ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا ط سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا وَقَدْ جَعَلَهٗ بِالْفُتُوْحِ ـ

৭. যেন ব্যয় করে তালাকপ্রাপ্তা ও স্তন্য দানকারিণীগণের জন্য সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সামর্থ্যানুযায়ী। আর যার উপর সীমিত হয়েছে সঙ্কীর্ণ হয়েছে তার জীবিকা, তবে সে যেন ব্যয় করে যা তাকে দান করেছেন দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা অর্থাৎ সে পরিমাণে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দান করেছেন, তিনি তার উপর তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা আরোপ করেন না। অচিরেই আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন। বিজয়সমূহ মাধ্যমে আল্লাহ সে অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حُكْمُ النَّفَقَةِ : স্ত্রীর জন্য স্বামীর সামর্থ্যানুসারে نَفَقَةٌ -এর ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব।

قَوْلُهُ مِنْ وُجْدِكُمْ : জমহুর وَاو -এ ضَمَّة দিয়ে مِنْ وُجْدِكُمْ পড়েছেন। হাসান বসরী এবং আরো অনেকেই وَاو -এ فَتْح দিয়ে مِنْ وَجْدِكُمْ পড়েছেন। আর ইবনে মাকছাম এবং আরো অনেকেই وَاو -এ كَسْرَة দিয়ে مِنْ وِجْدِكُمْ পড়েছেন। এভাবে এ শব্দটিকে তিন রকম পড়া হয়েছে। -[রাওয়ায়ে, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ : জমহুর لِيُنْفِقْ অর্থাৎ لَامْ اَمْر হিসাবে পড়েছেন। আর আবূ মা'আজ لِيُنْفِقَ -এর কেরাত বর্ণনা করেছেন, لَامٌ -কে لَامْ كَيْ হিসাবে পড়ে قَاف -এ فَتْح দিয়ে পড়া। তখন একটি جُمْلَةٌ مَحْذُوْف -এর সাথে এর সম্পর্ক হবে, যার تَقْدِيْر হবে- شَرَعْنَا ذٰلِكَ لِيُنْفِقَ । -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী, যাদুল মাসীর, বাহার]

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ : জমহুর একে قُدِرَ পড়েছেন অর্থাৎ مُخَفَّفٌ করে পড়েছেন, আর ইবনে আবূ আয়লা تَشْدِيْد যুক্ত করে قُدِّرَ পড়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব قُدِّرَ পড়েছেন। অর্থাৎ قَافٌ -এ ضَمَّة আর دَالٌ -এ تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন। -[রাওয়ায়ে, রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَسْكِنُوْهُنَّ ...... لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাদেরকে (ইদ্দতের সময়কালে) সেস্থানে থাকতে দাও যেখানে তোমরা বসবাস কর, যে রকম স্থানই তোমাদের হোক না কেন এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না। আর তারা যদি গর্ভধারিণী হয়, তাহলে তাদের ব্যয়ভার বহন করো, সে সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না তাদের গর্ভ প্রসব হয়।"

এক. এ ব্যাপারে সব ফিক্‌হবিদই এক মত যে, স্ত্রীকে যদি রিজয়ী তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তার বাসস্থান ও খোরপোশ দেওয়ার দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে।

দুই. আর স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে তাকে রেজয়ী তালাক দেওয়া হোক কিংবা তিন তালাকই দেওয়া হয়ে থাকুক, সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার বসবাস ও খোরপোশ দেওয়ার দায়িত্ব স্বামীকেই বহন করতে হবে। এতে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

তিন. যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী নয়, তাকে যদি তিন তালাক দেওয়া হয়ে থাকে, সে স্ত্রীলোকের বাসস্থান ও খোরপোশের ব্যাপারে ফিক্‌হবিদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ক. কিছু সংখ্যক ফিক্‌হবিদদের মত হলো, সে থাকা-খাওয়া-পরা সব কিছুই পাবে। হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আলী ইবনে হোসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন), কাযী শুরাইহ ও ইমাম নাখয়ী (র.) এ মত দিয়েছেন। হানাফী মাযহাব এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী এবং হাসান ইবনে সালেহও এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে নিম্নে বর্ণিত দলিলসমূহ পেশ করে থাকেন-

১. পবিত্র কুরআনে বাসস্থান দিতে বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, "কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না" খাওয়া-পরা না দেওয়ার চেয়ে আর বড় কষ্ট কি হতে পারে?

২. দারাকুতনীতে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- "اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ" অর্থাৎ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতকালে বাসস্থান ও খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী।

৩. কয়েকটি হাদীসে বলা হয়েছে ফাতিমা বিনতে কায়েস বর্ণিত হাদীসটিকে হযরত ওমর (রা.) এই বলে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন যে, আমরা একজন স্ত্রীলোকের কথায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুন্নতকে ত্যাগ করতে পারি না। এটা হতে প্রমাণিত হয়, হযরত ওমর (রা.) নিশ্চিত জানতেন যে, এ ধরনের স্ত্রীকে বাসস্থান ও খোরপোশ দেওয়াই রাসূলে কারীম ﷺ-এর সুন্নত। ফলে এ সব হাদীস হতে আলোচ্য মতের সমর্থন পাওয়া যায়; বরং হযরত ইব্রাহীম নাখয়ীর একটি বর্ণনায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস প্রত্যাখ্যান করার সময় বলেছেন- سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَهَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ. "আমি রাসূলে কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি- এ ধরনের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী।"

এ মতাবলম্বীরা এ ছাড়া আরও অনেক যুক্তি পেশ করেছে, যা ফিক্‌হ এবং তাফসীরের কিতাবগুলোতে রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. অন্য কতিপয় ফিক্‌হবিদ বলেন, তিন তালাকে বায়েন দেওয়া স্ত্রী বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী, কিন্তু খাওয়া-পরা পাওয়ার অধিকারী হবে না। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব, সুলাইমান, ইয়াসার, আতা, শা'বী, আওযায়ী, লাইস, আবূ ওবাইদ (রা.) প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকও এ মত গ্রহণ করেছেন। তারা তাঁদের মতের স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যখন বসবাসের স্থানের আলোচনা করেছেন, তখন তাকে সব তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য মুতলাক রেখেছেন। আর যখন খাওয়া-পরা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন তখন কিন্তু গর্ভের শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং তা হতে বুঝা গেল যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের জন্য নাফকা বা খাওয়া-পরা স্বামীকে দিতে হবে না।

গ. আর কিছু সংখ্যক ফিকহবিদ বলেন, তিন তালাকে বায়েন দেওয়া স্ত্রী না বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী, না খাওয়া-পরা পাওয়ার। হাসান বসরী, হাম্মাদ ইবনে আবূ লাইলা, আমর ইবনে দীনার, তাউস, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, আবূ ছাওর প্রমুখের এ মত। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাসের এ মত উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত গ্রহণ করেছেন।

এ মতের একটি দলিল হলো, কুরআন মাজীদের এ আয়াত لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "তুমি জান না আল্লাহ তা'আলা হয়তো এরপর মিলমিশের কোনো অবস্থা সৃষ্টি করে দিতে পারেন।"

এ আয়াত হতে তাঁরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, এ আয়াতটি রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে– বায়েন তালাকপ্রাপ্তার জন্য নয়। এ কারণে তালাকপ্রাপ্তার জন্য ঘরে থাকার যে অধিকার, তাও রিজয়ী তালাকপ্রাপ্তার জন্য নির্দিষ্ট।

ফাতিমা বিনতে কায়েসের হাদীস– রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে তার স্বামী তাকে বায়েন তালাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তার খোরপোশের জন্য কিছু খরচও দিয়েছিলেন, যা অপর্যাপ্ত ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, তা আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবগত করবো। সত্যই আমি যদি খাওয়া-পরার হকদার হয়ে থাকি তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়ে নিবো। আর যদি হকদার না হই তাহলে কিছুই নিবো না। তিনি বলেন, তা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবগত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنٰى "তোমার জন্য না খাওয়া পরার খরচ আছে না বসবাসের স্থান।"

আমরা আগেই বলেছি, হযরত ওমর (রা.) এ হাদীস প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন এবং তিনি প্রত্যাখ্যানের প্রাক্কালে একথাও বলেছিলেন যে, আমি এক মহিলার কথা গ্রহণ করে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত ত্যাগ করতে পারি না। অতঃপর তিনি বলেছেন– আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বাসস্থান ও খোরপোশ পাবে। তা ছাড়া আরো অনেক কারণে এ হাদীসকে গ্রহণযোগ্য মনে করা যেতে পারে না। –[রাওয়ায়ে, জাস্‌সাস, ফাতহুল কাদীর]

চার. যে স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হয়েছে সে স্ত্রীলোক কি খাওয়া-পরার খরচ পাবে, না পাবে না এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ক. হযরত আলী, ইবনে ওমর, ইবনে মাসউদ (রা.), কাযী শুরাইহ, ইমাম নাখয়ী, শা'বী, হাম্মাদ ইবনে আবূ লাইলা ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) এবং আরও আনেকেই বলেছেন যে, স্বামীর যাবতীয় সম্পদ হতে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাকে খাওয়া-পরার খরচ দিতে হবে।

খ. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (রা.) বলেন, মৃতের সম্পত্তিতে তার জন্য না থাকার স্থান পাওয়ার অধিকার আছে, না খাওয়া-পরা পাওয়ার। কেননা মৃত্যুর পর মৃতের কোনো মালিকানাই নেই। অতঃপর তা সবই ওয়ারিশানদের সম্পত্তি। তাদের সম্পত্তি হতে গর্ভবতী বিধবার খরচাদি বহন করা কি করে ওয়াজিব হতে পারে? [হেদায়া জাস্‌সাস] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)ও এ মত দিয়েছেন। –[আল-ইনসাফ]

গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাঁর খরচাদি প্রাপ্য নয়। তবে সে থাকার স্থান পেতে পারে। [মুগনী-উল মুহতাজ] তিনি দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন–হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর ভগ্নি ফুরাইয়া বিনতে মালিকের একটি ঘটনাকে। ঘটনাটি এই যে, তাঁর স্বামী যখন শহীদ হলেন, তখন রাসূলে কারীম ﷺ তাঁকে হুকুম দিলেন যে, স্বামীর ঘরেই ইদ্দতকাল অতিবাহিত করবে। [আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী] তিনি দারাকুতনীর একটি বর্ণনাকেও দলিল বানিয়েছেন। বর্ণনাটি এই– রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, لَيْسَ لِلْحَامِلِ وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ অর্থাৎ বিধবা গর্ভবতীর খরচাদি পাওয়ার কোনো অধিকার নেই। ইমাম মালিক (র.)ও এ মত প্রকাশ করেছেন। –[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَإِنْ أَرْضَعْنَ .... بِمَعْرُوفٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "পরে সে যদি তোমাদের জন্য [সন্তানকে] দুধ পান করায় তবে তার পারিশ্রমিক তাদেরকে দাও এবং [পারিশ্রমিকের ব্যাপারটি] ভালোভাবে পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও।" এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তখন সে নবজাতক সন্তানকে কে দুধ পান করাবে? এ সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখতে হবে– যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে সে পর্যন্ত সন্তানকে দুধপান করানো স্ত্রীর জিম্মায় ওয়াজিব, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ অর্থাৎ "মায়েরা তাদের সন্তনদেরকে দুধ পান করাবে।" সুতরাং ওয়াজিব কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক নিতে পারবে না, ইদ্দতকালও যেহেতু বিবাহ-কালের মধ্যেই গণ্য সেহেতু ইদ্দতকালেও পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে না। তবে সন্তান প্রসবের পর যখন ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তখন [স্ত্রী চাইলে] স্তন্য দানের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়াকে আলোচ্য আয়াতে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ আয়াতের তাফসীরে ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, এ নির্দেশ হতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিকথা জানা যায়–

১. স্ত্রী নিজেই তার বুকের দুধের মালিক। নতুবা তা কোনো শিশুকে সেবন করাবার জন্য মূল্য গ্রহণ করার অধিকারী হতো না।
২. সন্তান প্রসব হওয়ার পরই সে যখন তার পূর্ব স্বামীর বিবাহ হতে মুক্ত হয়ে গেল, তখন শিশুকে দুধ পান করাতে সে আইনত বাধ্য নয়। পিতা যদি তার দুধ শিশুকে খাওয়াতে চায় এবং সেও তাতে রাজি থাকে, তবে সে শিশুকে দুধ খাওয়াবে এবং সেজন্য সে মজুরি গ্রহণ করার অধিকারী হবে।
৩. পিতাও এ মায়ের দুধই শিশুকে সেবন করাতে আইনত বাধ্য নয়।
৪. সন্তানের খরচাদি বহন করা পিতার দায়িত্ব।
৫. শিশুকে দুধ খাওয়াবার সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রগণ্য অধিকারী তার মা। অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা দুধ খাওয়াবার কাজ গ্রহণ করা যেতে পারে কেবলমাত্র তখন, যখন সন্তানের মা নিজে দুধ খাওয়াতে রাজি না হবে, কিংবা সে জন্য এমন পরিমাণ মজুরি দাবি করবে যা দেওয়া পিতার সামর্থ্যের বাইরে।
৬. এটা হতেই ষষ্ঠ নীতি এই জানা যায় যে, অন্য স্ত্রীলোককেও যদি অনুরূপ পরিমাণ দিতে হয় যা শিশুর মা দাবি করেছে, তাহলে মায়ের অধিকার সর্বাগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ .... أُخْرَىٰ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কিন্তু তোমরা (পারিশ্রমিক ঠিক করার ব্যাপারে) যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে সন্তানকে অপর কোনো স্ত্রীলোকের দুধ খাওয়াবে।" অর্থাৎ অবস্থা যদি এমন হয়ে যায় যে, যে পারিশ্রমিক মা চাইল তা আদায় করা পিতার পক্ষে অসম্ভব অথবা দেশের প্রচলিত নিয়মের তুলনায় বেশি; অথবা, পিতা যদি কোনো পারিশ্রমিকই দিতে রাজি না হয়, তখন অন্য কোনো স্ত্রীলোককে দুধ পান করানোর জন্য ঠিক করা যেতে পারে।

হযরত আবূ হাইয়ান (র.) বলেছেন, এখানে মা'কে সূক্ষ্ম ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে, যেমন তুমি কোনো লোককে কোনো কাজ করতে বললে, আর সে লোক সে কাজ করতে চাইল না, তখন তুমি তাকে বলে থাক–ঠিক আছে অন্য কাউকে দিয়ে করানো হবে। এ কথা বলে বুঝানো হয় যে, এ কাজ পড়ে থকবে না– কেউ না কেউ তা আদায় করবেই; কিন্তু এ অস্বীকৃতির কারণে তুমি দুঃখিত।

হযরত যাহহাক (র.) বলেছেন, মা দুধ পান করাতে অস্বীকৃতি জানালে সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা করা হবে। আর যদি সেও রাজি না হয় তাহলে মাকে দুধ পান করাতে বাধ্য করা হবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। –[সাফওয়া]

উক্ত আয়াত সম্পর্কিত একটি মাসআলা : সন্তানের মাতা ব্যতীত অন্য মহিলা হতে স্তন্য পান সাব্যস্ত হয়ে গেলে তখন স্তন্য দানকারিণী সন্তানের মাতার ক্রোড়ে রেখেই দুগ্ধপান করানো ওয়াজিব। কারণ বিভিন্ন সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণ রয়েছে যে, সন্তানের মাতার উপরই তার লালনপালনের ভার ন্যস্ত হয়েছে। এ দায়িত্ব ছিনিয়ে নেওয়া জায়েজ হবে না। –[মাযহারী]

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ ...... بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অর্থ-সামর্থ্য অনুসারে নিজ নিজ সন্তানের দুগ্ধপানের খরচাদি এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণের খোরপোশ ইত্যাদি বহন করবে তা দ্বারা একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীর খোর-পোশ ইত্যাদি বহন করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অবস্থার কোনো প্রকার অনুসরণ করা আবশ্যক নয়; বরং স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। সুতরাং স্বামী যদি সম্পদশালী হয়, তবে উন্নত ধরনের ভরণপোষণ দেওয়া ওয়াজিব। যদি এক্ষেত্রে স্ত্রী দরিদ্র হয় তথাপিও কম দিতে পারবে না। আর যদি স্বামী দরিদ্র ও সম্পদহীন হয় তখন গরীবানা অবস্থার খোরপোশ প্রদান করবে। স্ত্রী যদি সম্পদশালী হয় সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবও এটাই। অন্যান্য ফকীহগণের অভিমত অবশ্য ভিন্ন ধরনের রয়েছে।
–[তাফসীরে মাযহারী]

পূর্বোক্ত বাক্যের অতিরিক্ত আরও ব্যাখ্যা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকেও তার শক্তি-সামর্থ্য হতে অধিক কষ্ট প্রদান করেন না। তাই যার যখন যতটুকু ক্ষমতা থাকে সে অনুযায়ী তার স্ত্রীর উপর খরচ করতে হবে। স্ত্রীগণ যেন স্বামীর ক্ষমতা ও প্রদান কৃত অর্থ-সম্পদের উপর খুশি থাকে, কখনও অসন্তুষ্ট না হয়। এ কথার تَلْقِيْن ও শিক্ষা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কঠিন ও দুরবস্থা হতে সচ্ছল অবস্থা ফিরিয়ে দিবেন। সুতরাং কেউ যেন এ ধারণা না করে যে, বর্তমান দুরবস্থা সর্বদাই থাকবে; বরং শান্তি ও অশান্তি সবই আল্লাহর হস্তে, ধন-সম্পদ সবই আল্লাহর ধনভাণ্ডার হতে বণ্টিত হয়ে থাকে। তাঁর ধন-ভাণ্ডারের কমতি নেই।
–[মা'আরিফ]

দ্রি. দ্র. উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওই সকল স্বামীগণকে আল্লাহর পক্ষ হতে সচ্ছলতা পাওয়ার অঙ্গীকার ও ইশারা প্রদান করেছেন। যারা স্বীয় স্ত্রীগণকে সামর্থ্যানুযায়ী ভরণপোষণ উত্তম মতে দেওয়ার চেষ্টায় থাকে এবং স্ত্রীদেরকে কষ্ট দানের উদ্দেশ্যও না থাকে। –[রূহুল মা'আনী]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ الخ আয়াত সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা :

ক. যেহেতু আয়াতে কারীমা -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবাহকারী পুরুষ, তাই সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব একমাত্র স্বামী বা পিতার উপর ন্যস্ত।

খ. ব্যক্তির অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষীতে স্ত্রী ও সন্তানদের অন্নবস্ত্রের তারতম্য হতে পারে।

গ. ভরণপোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বামীর অবস্থার অনুসরণ করা হবে, স্ত্রীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন নেই। কেননা মোহরের ক্ষেত্রেও স্ত্রীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয়নি। যেমন, প্রবাদ রয়েছে اَلْمَالُ غَادٍ وَرَاحٍ অর্থাৎ মাল কখনো আসে কখনো যায়, এর কোনো ধর্তব্য নেই।

ঘ. স্বামীর অসচ্ছলতার উপর ভিত্তি করে বিবাহ সম্পর্ক নষ্ট করা চলবে না। কারণ আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا الخ সে কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে। সুতরাং ভরণপোষণের কঠিনতার দরুন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। –[আহকামে কুরআন, কুরতুবী]

নফকাহ -এর অর্থ এবং তার হুকুম : نَفَقَةٌ শব্দটি اِنْفَاقٌ হতে নির্গত, অর্থ– খরচ করা। সাধারণত نَفَقَةٌ তাকেই বলা হয় যা দ্বারা জীবন রক্ষা করা হয়। অর্থাৎ যা খাওয়ার পর বেঁচে থাকা যায় এবং শরীর ও শক্তি রক্ষা থাকে। পবিত্র কুরআনে তাকে রিজিক বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨. وَكَأَيِّنْ هِيَ كَافُ الْجَرِّ دَخَلَتْ عَلَىٰ أَيِّ بِمَعْنَى كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَيْ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْقُرَىٰ عَتَتْ عَصَتْ يَعْنِي أَهْلُهَا عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنٰهَا فِي الْاٰخِرَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِئْ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُكْرًا بِسُكُوْنِ الْكَافِ وَضَمِّهَا فَظِيْعًا وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ

৮. আর কত এটা জরদানকারী كَافْ যা كَمْ অর্থে ব্যবহৃত اَيِّ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়েছে জনপদ অর্থাৎ অনেক জনপদ বিরুদ্ধাচারণ করেছে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে অর্থাৎ তার অধিবাসীগণ তাদের প্রতিপালকের বিধান ও তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের, ফলে আমি তাদের নিকট হতে হিসাব গ্রহণ করেছি আখেরাতে, যদিও তা এখনও আসেনি, তথাপি তা কার্যকর হওয়া অবশ্যম্ভাবী হিসাবে অতীতকালীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কঠিন হিসাব এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেছি نُكْرًا শব্দটি ك -এ সাকিন ও পেশযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ কঠোর তা দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি উদ্দেশ্য।

٩. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا عُقُوْبَتَهُ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا خَسَارًا وَهَلَاكًا

৯. ফলে তারা আস্বাদন করেছে তাদের কৃতকর্মের মন্দফল তার পরিণতি ও শাস্তি। আর তাদের কর্মপরিণাম ছিল ক্ষতিগ্রস্ততা ক্ষতি ও ধ্বংস।

١٠. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا تَكْرِيْرُ الْوَعِيْدِ تَاكِيْدٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَآ أُولِي الْأَلْبَابِ صلے اَصْحَابَ الْعُقُوْلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج نَعْتٌ لِلْمُنَادٰى اَوْ بَيَانٌ لَهُ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا هُوَ الْقُرْاٰنُ.

১০. আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন দ্বিতীয়বার ভয় প্রদর্শন تاكيد -এর জন্য। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো, হে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ জ্ঞানবান। যারা ঈমান আনয়ন করেছে এটা منادى -এর বিশেষণ অথবা তার বিবরণ। আল্লাহ তোমাদের প্রতি উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন তা হলো কুরআন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْقَرْيَةَ : প্রশ্ন. اَلْقَرْيَةَ বলে اَهْلُ الْقَرْيَةِ কিভাবে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে? : উত্তর : প্রকাশ থাকে যে, قَرْيَةٌ শব্দ বলে উক্ত অংশে اَهْلُ الْقَرْيَةِ -কে উদ্দেশ্য করা, এটা বালাগাতের একটি নীতির ভিত্তিতে শুদ্ধ হয়েছে; বরং উত্তম হয়েছে। একে مَجَازٌ مُرْسَلٌ বলা হয়। اِرَادَةُ صَاحِبِ الْمَحَلِّ مِنْ اِطْلَاقِ الْمَحَلِّ অর্থাৎ মহল বর্ণনা করে صَاحِبْ মহল উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এগুলো কুরআনের উর্ধ্বতন বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। কুরআন মাজীদ এ প্রকার بَلَاغَتْ وَفَصَاحَتْ দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে, যা اِعْجَازُ الْقُرْاٰنِ -এর বিষয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তারকীবে مَنْصُوْبٌ مَحَلًّا হয়েছে اَعْنِيْ ক্রিয়াকে مَحْذُوْفٌ রেখে। অথবা, يَآ أُولِي الْأَلْبَابِ -এর যে مُنَادٰى তার بَيَانٌ হবে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অথবা, তার عَطْفُ بَيَانٍ হিসাবে। অথবা, نَعْتٌ হিসাবে مَنْصُوْبٌ مَحَلًّا বলতে হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ .... فَحَاسَبْنَاهَا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অনেক জনবসতি এমন রয়েছে যারা নিজেদের প্রতিপালক এবং তাঁর নবী-রাসূলগণের আইন-বিধানকে অমান্য করেছে, ফলে আমি তাদের উপর হতে অত্যন্ত কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি।"

গ্রন্থকার আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের আইন-বিধান অমান্য করার কারণে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা এ লোকদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করণের মাধ্যমে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন।

এর তাফসীরে হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের হিসাব নিয়াছেন, অতঃপর তাদের কঠোর আজাব দিয়েছেন। অতঃপর আখেরাতেও তাদেরকে কঠোর আজাব দেওয়া হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, দুনিয়াতে ক্ষুধা, খরা বা অনাবৃষ্টি, মাসখ, হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে কঠোর আজাব দেওয়া হয়েছে এবং আখেরাতেও তাদের কঠোর হিসাব নেওয়া হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمُضَارِعْ-এর স্থলে مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ দোষী সম্প্রদায়ের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন- তাতো মূলত আখেরাতেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এখানে যেভাবে فِعْل مَاضِىْ-এর শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন এতে বুঝা যায় যে, তা করে ফেলেছেন। যেমন বলেছেন فَحَاسَبْنَاهَا وَعَذَّبْنَاهَا এতে فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করা تَحَقُّقْ وُقُوْعْ অথবা تَيَقُّنْ-এর দৃষ্টিতে হয়েছে। অর্থাৎ পরকালে তাদের এ সকল কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই مَاضِىْ-এর صِيْغَة দ্বারা বলা হয়েছে। যেভাবে দুনিয়াতে কেউ কোনো বস্তু পাওয়ার উপর নিশ্চিত বিশ্বাস থাকলে সে অনেক সময় বলে থাকে- তা পেয়েছি অথচ পাবে, এখনও তা পায়নি। আল্লাহও এভাবেই বলেছেন। অথবা, فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ এই যে, হিসাব অর্থ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, বিনা প্রশ্নেই তার শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অথবা, فِعْل مَاضِىْ নেওয়ার কারণ এইও হতে পারে যে, হিসাব-কিতাব যদিও আখেরাতে হবে তবে দুনিয়াতে সে সম্পর্কে আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং হিসাব-নিকাশের জন্য লিপিবদ্ধ করাই যথেষ্ট এটাকেই فَحَاسَبْنَاهَا وَعَذَّبْنَاهَا বলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন- দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বহু কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। তার উদাহরণে কেউ কেউ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মাসখ, হত্যা হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বলেছেন এবং পরকালেও কঠোর আজাব দেওয়া হবে এবং কঠোরভাবে হিসাবও পুনরায় নেওয়া হবে। তাই فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করা হয়েছে। -[মা'আরিফ ও ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَذَاقَتْ وَبَالَ .... عَاقِبَةُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং তাদের পরিণাম অত্যন্ত ক্ষতিপূর্ণ হয়ে গেল।" অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের বিধি-বিধান না মানা এবং তাঁদের আনুগত্য করতে অস্বীকার করার ফলে তাদের এ কৃতকর্মের ফল তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। আর এ ফল ছিল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকর। তাতো তারা দুনিয়াতে ভোগ করেছে। আখেরাতেও তাদেরকে অত্যন্ত কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে। আখেরাতের এ আজাবের কথা পরের আয়াতে বলা হয়েছে। অতঃপর মু'মিন বান্দাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যাতে তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহর আজাবের সম্মুখীন হতে না হয়। কারণ, তাকওয়ার মূলকথা হলো, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলা। যেহেতু পূর্বের লোকদের উপর এ কাজ না করার ফলে আজাব এসেছে, সেহেতু তোমাদের উপরও আজাব আসবে যদি তোমরাও তাদের মতো আচরণ কর। সুতরাং সাবধান! হে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা, তোমরা যা কর বুদ্ধি-বিবেচনা করে যাঁচাই-বাছাই করে করো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاتَّقُوا اللّٰهَ .... الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا : এর অর্থ- "অতএব তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় করো, হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি একটা উপদেশ নাজিল করেছেন।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

গ্রন্থকারের মতে এখানে জিকির বা উপদেশ অর্থ হলো পবিত্র কুরআন। আল্লামা যুজাজ (র.) বলেছেন, জিকির অবতীর্ণ করা হতে প্রমাণিত হয় যে, জিকিরের সাথে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের কাছে কুরআন এবং রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। আর কেউ কেউ এখানে জিকির বলতে রাসূলকে বুঝানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন। সুতরাং অধিক সংখ্যক মুফাসসিরের মতে, এখানে জিকির বলতে আল-কুরআন আর রাসূল বলতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে।

-[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا .... اِلَيْكُمْ ذِكْرًا : পূর্ববর্তী আয়াতে নাফরমানদেরকে শাস্তি দিয়েছেন বলা হয়েছে। দুনিয়াতে তাদের শাস্তি ও লাঞ্ছনা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ক্ষান্ত হননি; বরং পরবর্তী কালের জন্যও তিনি বিশ্বাসঘাতকদের জন্য নিকৃষ্টতম শাস্তির সুব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুতরাং যাদের জ্ঞান-বিবেচনা ও হুঁশ রয়েছে তাদেরকে সতর্কবাণী শুনিয়ে বলা হয়েছে- হে জ্ঞানীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে রক্ষা করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে পবিত্র উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ 'আল-কুরআন' নাজিল করেছেন।

আয়াতে বর্ণিত ذِكْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ও তাতে মতভেদ : তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার উক্ত আয়াতে বর্ণিত ذِكْرًا শব্দটি দ্বারা কুরআন মাজীদকে উদ্দেশ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ ذِكْرًا বলতে স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-কে বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ -এর সত্তাই ছিল পরিপূর্ণ উপদেশ অথবা ذِكْرُ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে অধিক পরিমাণে প্রসার লাভ করার কারণে তিনি স্বয়ং ذِكْرُ اللّٰهِ হয়ে গেছেন, তাই ذِكْرًا দ্বারা রাসূলকে উদ্দেশ্য করা সঠিক হবে। -[রূহুল মা'আনী]

অথবা, ذِكْرٌ অর্থ شَرَفٌ উদ্দেশ্য করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ اَىْ شَرَفٌ لَّكَ وَكَرَامَةٌ لَّكَ اَوْ ذُوالشَّرْفِ وَالْمَجْدِ عِنْدَ اللّٰهِ তবে তা এ মর্মে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ নিশ্চয়ই আপনি مُذَكِّرٌ উপদেশ দানকারী। আপনি তাদের উপর দারোগা নন। আর ذِكْرٌ দ্বারা কুরআন অর্থ নেওয়া সঠিক হবে। কারণ অন্য আয়াতে কুরআনকে সরাসরি ذِكْرٌ বলেছেন- كَقَوْلِهِ تَعَالٰى ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ

আর আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে ذِكْرُ اللّٰهِ অর্থ হযরত জিবরাঈল (আ.)।

هُوَ جِبْرِيْلُ بَدْلٌ مِنْ ذِكْرًا لِاَنَّهُ وَصْفُهُ بِتِلَاوَةِ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَكَانَ اِنْزَالُهُ فِىْ مَعْنٰى اِنْزَالِ الذِّكْرِ فَصَحَّ اِبْدَالُهُ مِنْهُ (جُمَلْ)

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. رَسُوْلًا اَىْ مُحَمَّدًا مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ اَىْ وَاَرْسَلَ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بَعْدَ مَجِيْئِ الذِّكْرِ وَالرَّسُوْلِ مِنَ الظُّلُمٰتِ الْكُفْرِ الَّذِىْ كَانُوْا عَلَيْهِ اِلَى النُّوْرِ ط الْاِيْمَانِ الَّذِىْ قَامَ بِهِمْ بَعْدَ الْكُفْرِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالنُّوْنِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا هُوَ رِزْقُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ لَا يَنْقَطِعُ نَعِيْمُهَا .

১১. আর তিনি প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ رَسُوْلًا শব্দটি উহ্য ফে'লের কারণে مَنْصُوْب হয়েছে অর্থাৎ وَاَرْسَلَ আর তিনি প্রেরণ করেছেন। যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াত স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করেন مبينت শব্দটি ى -এর মধ্যে যবর ও যের যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যেমন, ইতঃপূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে বের করার জন্য উপদেশ ও রাসূল আগমনের পর অন্ধকার হতে কুফর হতে, যার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল আলোর দিকে ঈমানের দিকে, কুফরির পর তারা যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাকে প্রবিষ্ট করা হবে শব্দটি অপর এক কেরাতে ن যোগে نُدْخِلْهُ পঠিত হয়েছে। জান্নাতে, যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। তারা তথায় চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাকে উত্তম জীবিকা দান করবেন। তা জান্নাতের জীবিকা, যার নিয়ামত কখনো বন্ধ ও স্থগিত হবে না।

١٢. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط يَعْنِىْ سَبْعَ اَرَضِيْنَ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ الْوَحْىُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَنْزِلُ بِهٖ جِبْرَئِيْلُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ اِلَى الْاَرْضِ السَّابِعَةِ لِتَعْلَمُوْا مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ اَعْلَمَكُمْ بِذٰلِكَ الْخَلْقِ وَالتَّنْزِيْلِ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٧ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا .

১২. আল্লাহই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীও তাদের অনুরূপে অর্থাৎ সপ্ত জমিন। অবতারিত হয় তাঁর আদেশ ঐশী প্রত্যাদেশ। তাদের মধ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে। হযরত জিবরাঈল (আ.) সপ্তম আকাশ হতে সপ্তম জমিনে তা অবতীর্ণ করেন। যাতে তোমরা জানতে পার এটা একটি উহ্য বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ اَعْلَمَكُمْ بِذٰلِكَ الْخَلْقِ وَالتَّنْزِيْلِ -এর মাধ্যমে তোমাদেরকে সৃষ্টি অবতরণ জ্ঞাত করেছেন। যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا : قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে حَالٌ হওয়ার কারণে, আর حَالٌ হয়েছে خَالِدِيْنَ-এর ضَمِيْر হতে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ : اَللّٰهُ শব্দটি আলোচ্য বাক্যে مُبْتَدَأٌ হয়েছে। আর اَلَّذِيْ শব্দটি اِسْمٌ مَوْصُوْلٌ এবং তার صِلَةٌ মিলে خَبَرٌ হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اٰيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ : জমহুর তাকে مُبَيَّنٰتٍ অর্থাৎ اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর صِيْغَةٌ হিসাবে পড়েছেন। যার অর্থ- আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইবনে আমের, হাফসা, কিসায়ী اِسْمُ فَاعِلٍ-এর صِيْغَةٌ হিসাবে مُبَيِّنٰتٍ পড়েছেন। অর্থাৎ আয়াতসমূহই মানুষের যেসব বিধান প্রয়োজন সেসব বিধান বর্ণনা করে, আহকাম জানিয়ে দেয়। আবূ হাতিম ও আবূ ওবাইদ প্রথম কেরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ এর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে। কারণ সেখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে বলা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يُدْخِلْهُ : জমহুর তাকে يَاء দিয়ে يُدْخِلْهُ পড়েছেন। নাফে' এবং ইবনে আমের نُوْن দিয়ে نُدْخِلْهُ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ رَسُوْلًا : তাফসীর (جُمَل) গ্রন্থে তাফসীরকারগণের মাধ্যমে رَسُوْلًا শব্দটি مَنْصُوْبٌ হওয়ার কারণ মোট নয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. যুজাজ নাহুবী বলেন, رَسُوْلًا-এর পূর্বে একটি মাসদার مَحْذُوْفٌ مَنْوِيٌّ মেনে তা হতে مَنْصُوْبٌ পড়া হবে অর্থাৎ اَرْسَلَ رَسُوْلًا
২. পূর্ববর্তী ذِكْرًا শব্দকে مُبْدَلٌ مِنْهُ এবং رَسُوْلًا-কে بَدَلٌ মেনে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ বলা হয়েছে।
৩. اَنْزَلَ وَاذْكُرْ رَسُوْلًا অর্থাৎ اِنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ عَلٰى حَذْفِ مُضَافٍ مِنَ الْاَوَّلِ বা اُذْكُرْ হতে بَدَلٌ হয়েছে তখন মূল ইবারত হবে اِنْزِلْ وَاذْكُرْ
৪. তদ্রূপ اَنْزَلَ وَاذْكُرْ-কে مَحْذُوْفٌ মেনে رَسُوْلًا-কে نَعْتٌ এবং اَنْزَلَ وَاذْكُرْ-এর প্রথমটিকে مَنْعُوْتٌ মানতে হবে।
৫. اَنْزَلَ وَاذْكُرْ-এর দ্বিতীয় শব্দ হতে رَسُوْلًا-কে بَدَلٌ মানতে হবে। তখন عِبَارَتٌ হবে- ذِكْرًا ذَا رَسُوْلٍ
৬. رَسُوْلًا টি কেবলমাত্র উল্লিখিত ذِكْرًا হতে نَعْتٌ হবে এবং مُضَافٌ مَحْذُوْفٌ মানবে। অর্থাৎ ذِكْرًاذَا رَسُوْلًا
৭. رَسُوْلًا অর্থাৎ رِسَالَةً তখন رَسُوْلًا টি بَدَلٌ صَرِيْحٌ হবে, কোনো تَاوِيْلٌ-এর প্রয়োজন হবে না। আর কারো কারো মতে, তা بَيَانٌ হবে।
৮. অথবা, اَرْسَلَ فِعْلٌ-কে উহ্য মেনে رَسُوْلًا-কে مَنْصُوْبٌ পড়া হবে এবং اَرْسَلَ হতে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হবে।
৯. اِتَّبِعُوْا وَالْزِمُوْا رَسُوْلًا مَنْصُوْبٌ عَلَى الْاِغْرَاءِ অর্থাৎ উহ্য فِعْلٌ-কে اِغْرَاءٌ স্বরূপ মেনে তা হতে مَنْصُوْبٌ পড়া হবে। অর্থাৎ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى رَسُوْلًا يَتْلُوْا .... مُبَيِّنٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে তোমাদের নিকট নবী ও রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর দেওয়া পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান তোমাদেরকে শুনানোর জন্য। পবিত্র কুরআনের এসব বিধান-যাতে হালাল-হারাম সম্পর্কীয় সব আহকামই রয়েছে। যদি তোমরা তা মেনে চল, রাসূলের আনুগত্য কর এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন কর তাহলে তোমরা গোমরাহীর অন্ধকার হতে ইসলাম ও ঈমানের আলোতে বের হয়ে আসতে পারবে। তোমাদেরকে ঈমানের আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে পবিত্র কুরআন দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

ওলামায়ে কেরামগণ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, "মূর্খতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার হতে জ্ঞান ও অবহিতির আলোকোজ্জ্বল পরিমণ্ডলে বের করে আনার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠানো হয়েছে। যে প্রসঙ্গে এ বাক্যটি বলা হয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং তার গুরুত্ব ও যথার্থতা পুরাপুরিভাবে বুঝতে পারা যায় যদি তালাক, ইদ্দত, ব্যয়-ভার, খোরপোশ ইত্যাদি বহন সংক্রান্ত দুনিয়ার অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক পারিবারিক বিধানসমূহ তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করা যায়। কেননা এ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@ www.eilm.weebly.com

তুলনামূলক অধ্যয়ন হতে জানা যাবে যে, বারবার পরিবর্তন ও নিত্য-নতুন আইন-বিধান রচনা করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো একটা জাতিও বিবেক ও যুক্তিসম্মত স্বাভাবিক ও সমাজের জন্য সাধারণভাবে কল্যাণকর এমন কোনো আইন-বিধান রচনা করতে সক্ষম হয়নি। যেমন এ কিতাব এবং এর বহনকারী রাসূলে কারীম ﷺ দেড় হাজার বছর পূর্বে দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন। বস্তুত কুরআন বা রাসূলে কারীম ﷺ -এর দেওয়া বিধানে কখনো কোনো পুনর্বিবেচনা বা রদবদল করার প্রয়োজনবোধ হয়নি এবং কখনো তা হবেও না।

قَوْلُهُ تَعَالَى اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ الخ : এ আয়াত দ্বারা এ কথাতো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, যেভাবে আসমান ৭টি জমিনও ৭টি, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, আল্লাহ তিনিই যিনি ৭ স্তবক আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মাঝেই ওহী নাজিল হয়ে থাকে। এতে আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানবজাতি যেন জেনে নেয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব কিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং প্রত্যেকটি বস্তুর উপর আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি দ্বারা বেষ্টনী রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُّؤْمِنْ .... يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর যে কেউই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন, যার নিচ হতে ঝরনাধারাসমূহ সদা প্রবহমান থাকবে। এরা তাতে চিরকাল ও সব সময়ই বসবাস করবে। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা অতীব উত্তম রিজিক রেখে দিয়েছেন।'

অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে– তাতে ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ও কদরের প্রতি বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নেক আমল করবে, অর্থাৎ কেবল ঈমান যথেষ্ট নয়, পরবর্তীতে বর্ণিত ফলাফল ভোগ করার যোগ্য হওয়ার জন্য ঈমানের দাবি হলো নেক আমল করা, যারা ঈমানের সাথে সাথে নেক আমলও করবে তাদের জন্য রয়েছে পরকালে এমন জান্নাত যার অট্টালিকাসমূহের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। সেখান হতে তাদেরকে আর কখনো বের হতে হবে না। আর কোনো দিন তাদের মৃত্যুও হবে না। আর সেখানে তাদের জন্য অতি সুস্বাদু ও মজাদার খাবার রয়েছে।

আল্লামা তাবারী (র.) বলেছেন, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা রিজিক প্রশস্ত করবেন। আর সে রিজিক হবে খাদ্য ও পানীয় জাতীয় এবং এমন সব বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নেক বান্দা ও আওলিয়াগণের জন্য রেখেছেন। –[সাফওয়া]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ সবের প্রমাণ হিসাবে নিজের কুদরত ও শক্তি-সামর্থ্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন–

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا -

অর্থাৎ আল্লাহ তিনিই যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনও সে পরিমাণে [সৃষ্টি করেছেন] এ সবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান এবং সব কিছুই তাঁর গোচরীভূত।

মুফাসসিরগণের মধ্যে আসমান যে সাতটি, সে ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাপারে দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়।

এক. জমিনও আসমানের ন্যায় সাতটি, এ মতই কুরআন-হাদীসের আলোকে অধিক গ্রহণযোগ্য।

দুই. জমিন একটি তবে আলোচ্য আয়াতে যে জমিনও তদ্রূপ বলা হয়েছে, তার অর্থ সৃষ্টিকৌশল, নিয়ম-শৃঙ্খলা এর দিক দিয়ে জমিনও আসমানের ন্যায়– সংখ্যার দিক দিয়ে নয়। –[সাফওয়া, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] .

এ প্রসঙ্গে মুফতি শফী (র.) তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে বলেছেন, اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ এ আয়াত হতে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি জমিনও তেমনি সাতটি। এখন সপ্ত জমিন কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে-নিচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে-নিচে স্তরে স্তরে থাকে তবে সপ্ত আকাশের প্রত্যেক দুই আকাশের মাঝখানে যেমন বিরাট ব্যবধান আছে এবং প্রত্যেক আকাশে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে তেমনি প্রত্যেক দুই জমিনের মধ্যখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কিনা, তাতে কোনো সৃষ্টিজীব আছে কিনা? অথবা সপ্ত জমিন পরস্পর গ্রথিত কিনা? এ সব প্রশ্নের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ এগুলোকে বিশুদ্ধ, আবার কেউ কেউ মিথ্যা মনগড়া বলে দাবি করেছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে যুক্তির নিরিখে সবগুলোই সম্ভবপর। –[মা'আরেফুল কোরআন]

ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, مِثْلَهُنَّ "তার মতো" বলে এ কথা বুঝানো হয়নি যে, যতসংখ্যক আকাশ ততসংখ্যক পৃথিবীও বানানো হয়েছে; বরং একথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যেমন কতগুলো আকাশ বানানো হয়েছে তেমনি কতিপয় পৃথিবীও বানানো হয়েছে। আর "পৃথিবী পর্যায়" অর্থ এ পৃথিবী যাতে মানুষ বসবাস করে এটা যেমন এখানে অবস্থিত সব কিছুর জন্য বিছানার মতো বা দোলনার মতো হয়ে আছে অনুরূপভাবে এ মহাবিশ্বলোকে আল্লাহ তা'আলা আরো অনেক পৃথিবী বানিয়ে রেখেছেন। তাও সেখানে অবস্থিত সব কিছুর জন্য বিছানার মতো অনুকূল সুবিধাজনক ও দোলনার মতো আরামদায়ক; বরং কুরআনে কোনো

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কোনো স্থানে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে– জীবন্ত সৃষ্টি কেবল এ পৃথিবীতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয় তা ঠিক বা চূড়ান্ত কথা নয়। উচ্চতর জাগতেও জীবন্ত সত্তার অবস্থিতি রয়েছে। অন্য কথায় আকাশলোকে এই যে লক্ষ কোটি তারকা-নক্ষত্র-উপগ্রহ দেখা যায়, এসব নিতান্তই শূন্য ও বিরান হয়ে যায়নি; বরং পৃথিবীর ন্যায় তাতেও এমন বহু স্থান রয়েছে যাতে শত শত দুনিয়া আবাদ হয়ে আছে।

প্রাচীনকালের তাফসীরকারকদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এমন একজন মুফাসসির যিনি সে যুগে এ তত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করেছেন, যে যুগের মানুষ ধারণা পর্যন্ত করতে পারত না যে, এ সৃষ্টিলোকে আমাদের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহলোক এবং আরো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সৃষ্টি বসবাস করতে পারে। বর্তমানের এ বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকরা পর্যন্ত তার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান রয়েছে। আজ হতে ১৪ শত বছর পূর্বেকার লোকদের জন্য এ কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। এ কারণে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির লোকদের নিকট এ তত্ত্ব প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। কেননা তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাবেয়ী মুজাহিদ (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট এ আয়াতটির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন– "এ আয়াতের তাফসীর আমি যদি তোমাদের নিকট বলি, তাহলে (আমার আশঙ্কা হয় যে,) তোমরা হয়তো কাফের হয়ে যাবে। আর তোমাদের সে কুফর হবে এই যে, তোমরা তাকে অসত্য মনে করে বসবে।" সাঈদ ইবনে জোবাইর হতেও প্রায় অনুরূপ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনানুযায়ী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এর তাৎপর্য আমি যদি তোমাদেরকে বলি তাহলে তোমরা যে কাফের হয়ে যাবে না তার ভরসা কি আছে? তা সত্ত্বেও ইবনে জরীর, ইবনে আবূ হাতিম, হাকেম ও বায়হাকী তার كِتَابُ الْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ ও شُعَبُ الْاِيْمَانِ গ্রন্থে আবুয যোহা'র মাধ্যমে শব্দের ও ভাষার পার্থক্য সহকারে হযরত ইবনে আব্বাসের এ তাফসীর উদ্ধৃত করেছেন–

فِيْ كُلِّ اَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَاٰدَمُ كَاٰدَمَ وَنُوْحٌ كَنُوْحٍ وَاِبْرَاهِيْمُ كَاِبْرَاهِيْمَ وَعِيْسٰى كَعِيْسٰى

অর্থাৎ "অন্যান্য পৃথিবীতে তোমাদের নবীর মতো নবী আছেন, আদমের মতো আদম আছেন, নূহের মতো নূহ, ইব্রাহীমের মতো ইব্রাহীম ও ঈসার মতো ঈসা রয়েছেন।" হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর ফতহুল বারী গ্রন্থে ও ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম যাহাবী (র.) বলেছেন, এ বর্ণনাটির সনদ সহীহ। অবশ্য আমার জানা মতে আবুয যোহা ভিন্ন অন্য কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। এ কারণে নিতান্তই বিরল ও অপরিচিত কথা। অন্যান্য কতিপয় আলিম তা অসত্য ও মনগড়া বলে ঘোষণা করেছেন। আর মোল্লা আলী ক্বারী তাঁর মাউযূআতে কাবীর [১৯ পৃ.] গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করে তাকে মনগড়া বলেছেন এবং লিখেছেন, তা যদি ইবনে আব্বাসের বর্ণনা হয়েও থাকে তবুও তা ইসরাঈলী কিংবদন্তি বিশেষ। কিন্তু আসল কথা হলো, এ কথাটি তাদের বিবেকবুদ্ধির অগম্য বলেই তাঁরা তাকে مَوْضُوْعٌ বা মনগড়া বলেছেন। নতুবা তাকে মনগড়া বলার কোনো কারণ নেই। কেননা এতে বিবেকবুদ্ধির বিপরীত কোনো কথাই নেই। আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে বলেছেন "তাকে সহীহ মনে করে নেওয়ার পথে না বিবেকবুদ্ধিগত কোনো বাধা আছে, না শরিয়াতের দিক দিয়ে কোনো কারণ আছে। এটার অর্থ হলো প্রত্যেকটি পৃথিবীতেই একটি সৃষ্টি রয়েছে যা তার একটা মূল উৎসের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, আমাদের এ পৃথিবীতে সমস্ত বনী আদম হযরত আদমের বংশোদ্ভূত এবং প্রত্যেকটি পৃথিবীতে এমন সব ব্যক্তিও রয়েছে যারা নিজের মধ্যে অন্যদের তুলনায় বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, যেমন আমাদের এখানে হযরত নূহ ও ইব্রাহীম (আ.) প্রমুখ বিশিষ্ট মর্যাদাবান। তারপর আল্লামা আলূসী (র.) আরও লিখেছেন– সম্ভবত পৃথিবী সাতটিরও বেশি হবে এবং অনুরূপভাবে আকাশমণ্ডলও কেবল সাতটি নাও হতে পারে। সাত এটা পূর্ণ সংখ্যা। এ সংখ্যাটির স্পষ্ট উল্লেখ একথা অনিবার্য হয়ে পড়েনি যে, পৃথিবী এ সংখ্যার বেশি হতে পারবে না।"

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, এক একটি আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বছরের। এ সম্পর্কে আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন هُوَ مِنْ بَابِ التَّقْرِيْبِ لِلْاَفْهَامِ অর্থাৎ তার অর্থ এই নয় যে, ঠিক পরিমাপ করেই এ দূরত্বের পরিমাণ বলা হয়েছে; বরং এরূপ বলা হয়েছে লোকদেরকে দূরত্ব সম্পর্কে একটা মোটামুটি বোধগম্য ভাষায় ধারণা দেওয়ার জন্য যেন লোকেরা সহজে বুঝতে পারে, এখানে উল্লেখ্য আমেরিকার টৈভড উমরযরর্টধমভ নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনুমান করেছে যে, আমাদের এ পৃথিবীটি যে ছায়াপথে অবস্থিত কেবলমাত্র তার মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি এমন গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে, যেসবের প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের এ পৃথিবীর সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যশীল। আর সেসবের মধ্যেও প্রাণী ও জীবের বসবাস করার খুব সম্ভাবনা রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ : সূরা আত-তাহরীম

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম সূরার প্রথম শব্দ لِمَ تُحَرِّمُ হতে গৃহীত। এটি এ সূরায় আলোচিত বিষয়াদির শিরোনাম নয়। এরূপ নামকরণের অর্থ হলো, এটা সেই সূরা যাতে 'তাহ্রীম' (হারামকরণ) সংক্রান্ত একটা ঘটনার উল্লেখ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ১২টি আয়াত, ৩৪৯টি বাক্য ও ১০৬০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরায় তাহরীম তথা কোনো কিছু হারাম করে নেওয়া সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দু'জন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'জন মহিলা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হেরেমভুক্ত ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন হযরত সফীয়া (রা.), আরেকজন হলেন হযরত মারিয়ায়ে কিবতীয়া (রা.)। খায়বর বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত সফীয়ার বিবাহ হয়। এ খায়বার বিজয় সর্বসম্মতভাবে ৭ম হিজরিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহিলা হযরত মারিয়াকে ৭ম হিজরিতে মিসর অধিপতি মুকাউকাস নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এ সব ঐতিহাসিক ঘটনা হতে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সূরাটি ৭ম বা ৮ম হিজরির কোনো এক সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিলের কয়েকটি শানে নুযূল রয়েছে। যথা–

১. বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্ত্রীদের সাথে থাকার পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন হযরত হাফসার দিন আসল, তিনি তাঁর মাতাপিতাকে দেখতে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। রাসূল তাঁকে অনুমতি দিলেন। হযরত হাফসা (রা.) চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসার ঘরে হযরত মারিয়াকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সেখানে একাকিত্বে অবস্থান করলেন। ইতোমধ্যেই হযরত হাফছা চলে আসলে তাঁর ঘরে হযরত মারিয়াসহ রাসূল ﷺ -কে দেখতে পেলেন। এটা দেখে হযরত হাফসা (রা.) অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমার ঘরে আমার অনুপস্থিতিতে একে নিয়ে আসলেন এবং একাকিত্বে কাটালেন, এটা আমাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে আমি আজ হতে তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলাম। এ সংবাদ তুমি অন্য কাউকেও দিও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে গেলে হযরত হাফসা এ সংবাদ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জানিয়ে দেন এবং গোপন কথাও ফাঁস করে দেন। এটা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে শপথ করলেন যে, আগামী এক মাস তিনি তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে প্রবেশ করবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের হতে আলাদা থাকলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতটি নাজিল করলেন। –[সাফওয়া, আসবাব, কুরতুবী, তাবারী, সাবী]

২. সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই স্ত্রীগণের কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নবের কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসার সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছেই আসবেন সেই বলবে, আপনি 'মাগাফীর' পান করেছেন। [মাগাফীর হলো এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠা] সে মতে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না আমিতো মধু পান করেছি। সে স্ত্রী বললেন, সম্ভবত কোনো মৌমাছি মাগাফীর বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল এ কারণেই মধু দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু হতে সযত্নে বেঁচে থাকতেন, তাই তিনি অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব মনঃক্ষুণ্ন হবে চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করবার জন্যও বলেছিলেন, কিন্তু সে স্ত্রী বিষয়টি অন্য স্ত্রীর কাছে বলে দিল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। –[মা'আরিফ, আসবাব]

কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত সাওদার কাছে, আর কোনো কোনো রিওয়ায়াতে হযরত হাফসার কাছে মধু পান করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার কারণ উভয় ঘটনা হতে পারে। (আসবাব, সুয়ূতী) দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণ হতে সনদের দিক দিয়ে অধিক সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হলেও মুফাসসিরগণের কাছে প্রথম কারণটিই অধিক প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় কারণটিকে অনেকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁরা নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলির প্রতি লক্ষ্য করে প্রথম কারণকেই এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ বলে মত পোষণ করেছেন।

১. মধু পান হারামকরণের মাধ্যমে নবীজী কোনো স্ত্রীকে খুশি করতে চেয়েছিলেন এটা অবান্তর। মধু পান হারাম করেছিলেন মূলত দুর্গন্ধের কথা শুনে-স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। সুতরাং স্ত্রীকে খুশি করানোর জন্য মারিয়াকে হারাম করাই যুক্তিসঙ্গত।

২. আলোচ্য সূরায় রাসূলের স্ত্রীদের প্রতি যে কঠোর হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদেরকে যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণের মধ্যে ঈর্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেয়েছিলেন এবং তাঁর কোনো দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন স্ত্রীদেরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। মধু পান হারাম করার কারণে স্ত্রীদেরকে এ রকম কঠোর হুশিয়ারী দান অসম্ভব মনে হয়। এ সব কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন,

كَوْنُ قَضِيَّةِ شُرْبِ الْعَسَلِ سَبَبًا لِلنُّزُوْلِ فِيْهِ نَظْرٌ .

অর্থাৎ মধুপানের ব্যাপারটিকে সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ হিসেবে গ্রহণ করা কঠিন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর মাঝে এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর পবিত্রা স্ত্রীদের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমে বলা হয়েছে– হারাম-হালাল বা জায়েজ ও নাজায়েজ সম্পর্কে সীমা নির্ধারণ করার বিশেষ ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর হস্তে সুনিশ্চিতরূপে নিবদ্ধ রয়েছে, এ বিষয়ে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, নবীর হাতেও এটার এখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

আল্লাহর ইঙ্গিত ব্যতীত নবীও নিজ ক্ষমতা বলে কোনো হালালকে হারাম করার ক্ষমতা পাননি। আল্লাহর সাথে যোগাযোগ ব্যতীত কোনো কাজ করার ক্ষমতা নবীকে দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, মানবসমাজে একজন নবীর মর্যাদা অতি উচ্চে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো জঘন্য ঘটনা ঘটানো তেমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। তবে নবীগণের সামান্যতম অপরাধও জঘন্য অপরাধের কারণ। যেহেতু তাদের কার্যাবলি জগতের জন্য নিখুঁত দলিল-প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য। তাই নবীগণের প্রতি রাব্বুল আলামীনের তীব্র দৃষ্টি রক্ষিত হয়, তাই আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের জীবনে কোনো কলঙ্ক আসতে দেওয়া হয়নি। যদিও কোথাও পদস্খলন ঘটতে চায় তাও তৎক্ষণাৎ শোধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ ইসলামের আইন কেবল কুরআনের নির্দেশই নয়; বরং নবীর পালনীয় আদর্শও ইসলামের আইন। সুতরাং তা সঠিকরূপে বান্দাদের নিকট যেন পৌঁছতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে যে পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত থাকলে মূলত তা আল্লাহ ও সকল ফেরেশতাগণ পর্যন্ত অবগত হয়ে গেছেন।

চতুর্থত বলা হয়েছে– নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ যেন পরস্পর হিংসা ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করে। নবীর কোনো আচরণ তাদের নিকট অপছন্দনীয় হলে সেজন্য নবীর পক্ষে স্ত্রীগণের তোয়াক্কা করতে হবে না।

ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলা বর্তমান স্ত্রীদের অপেক্ষা আরো অধিক উত্তম স্ত্রী ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। নবীর স্ত্রীগণকে এতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর ঈমানদারগণের প্রতি সতর্কবাণী পেশ করা হয়েছে এবং ঈমানদারগণের সন্তানসন্তানাদি সহ যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালীন দোজখের শাস্তি হতে নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা করে আল্লাহর নির্দেশ সকলের জন্যই সমানভাবে কার্যকরি করে।

পরবর্তী আয়াতে কাফিরগণকে সতর্ক করা হয়েছে। কাফিররা যতই পরকালকে অস্বীকার করুক না কেন একদিন তা সত্য প্রমাণিত হবে। প্রত্যেককেই নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করা আবশ্যক। ভালো কাজের প্রতিদান ভালো এবং মন্দ কাজের প্রতিফল নিতান্ত মন্দ হবে।

তৎপরবর্তী আয়াতে সকল ঈমানদারকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করলে খাঁটি মনেই প্রতিজ্ঞার সাথে তওবা করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নবীর সংশ্রবে থাকলে পরকালে বেহেশ্ত পাওয়া যাবে।

এরপর কাফেরদের সাথে জিহাদ করার জন্য মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী এবং ফিরআউনের স্ত্রীর করুণ ঘটনা বলে সূরা তাহরীম শেষ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সূরায়ও বিশেষত নারী জাতি সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি কিভাবে অর্জিত হয় তার পথ-নির্দেশ রয়েছে এ সূরায়। এ পর্যায়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, পরস্পরের হক আদায়ের প্রেরণা একান্ত অনুসরণীয় মূলনীতি। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আত-তাহরীম মদীনায় অবতীর্ণ

اِثْنَتَا عَشَرَةَ اٰيَةً : ১২ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ج مِنْ اُمَّتِكَ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةَ لَمَّا وَاقَعَهَا فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ وَكَانَتْ غَائِبَةً فَجَاءَتْ وَشَقَّ عَلَيْهَا كَوْنُ ذٰلِكَ فِيْ بَيْتِهَا وَعَلٰى فِرَاشِهَا حَيْثُ قُلْتَ هِيَ حَرَامٌ عَلَيَّ تَبْتَغِيْ بِتَحْرِيْمِهَا مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ط اَيْ رِضَاهُنَّ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ غَفَرَلَكَ هٰذَا التَّحْرِيْمَ.

১. হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তাকে হারাম করছেন কেন? অর্থাৎ মারিয়া কিবতিয়াকে, যে আপনার জন্য বৈধ। হাফসা (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে আপনি তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হয়েছেন। আর সে যখন ফিরে এসে দেখল যে, এ সব কিছু তার আবাসগৃহে এবং তারই শয্যায় সংঘটিত হয়েছে। তার নিকট এটা বিরক্তিকর মনে হলো। তখন আপনি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলেছেন, 'আমার জন্য সে অর্থাৎ মারিয়া হারাম আপনি কি চাচ্ছেন তাকে হারাম করার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি অর্থাৎ তাদের খুশি ও সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু আপনার এ হারাম করা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

٢. قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ شَرَعَ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ج تَحْلِيْلَهَا بِالْكَفَّارَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِيْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ وَمِنَ الْاَيْمَانِ تَحْرِيْمُ الْاَمَةِ وَهَلْ كَفَّرَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُقَاتِلُ اَعْتَقَ رَقَبَةً فِيْ تَحْرِيْمِ مَارِيَةَ وَقَالَ الْحَسَنُ لَمْ يُكَفِّرْ لِاَنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَهُ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ ط نَاصِرُكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

২. আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন বিধান রেখেছেন তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভ করার সূরা মায়িদায় উল্লিখিত কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে তা ভঙ্গ করার ব্যবস্থা করেছেন। দাসীটিকে হারাম করাও শপথের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে কাফ্ফারা আদায় করেছেন কিনা? মুকাতিল (র.)-এর বর্ণনা মোতাবেক তিনি মারিয়াকে হারাম করার বিষয়ে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করেছেন। আর হাসানের বর্ণনা মোতাবেক তিনি এ জন্য কোনো কাফ্ফারা আদায় করেননি। যেহেতু এটা তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের সহায় সাহায্যকারী আর তিনিই সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞানময়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ : تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ বাক্যাংশটি তারকীবে فَرَضَ ক্রিয়ার مَفْعُوْل হয়েছে। এ কারণে তা منصوب হয়েছে।

قَوْلُهُ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ : আলোচ্য বাক্যটি তারকীবে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ নতুবা مُفَسِّرَةٌ এবং تَحْرِيْمٌ -এর তাফসীর বা ব্যাখ্যাদানকারী বাক্য। অথবা একে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ বলতে হবে, تُحَرِّمُ -এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ : জমহুর এটাকে تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ পড়েছেন, অন্য এক কেরাতে تَحِلَّةَ كَفَّارَةِ اَيْمَانِكُمْ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ كَفَّارَةٌ শব্দটি বৃদ্ধি করে পঠিত হয়েছে। -[কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ .... تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ (اَلْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে নবী! তুমি কেন সে জিনিস হারাম কর যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হালাল করেছেন? (তা কি এ জন্য যে) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও? "আল্লাহ মহাক্ষমাকারী, বিশেষ অনুগ্রহ দানকারী।'

অর্থাৎ হে নবী আপনি আল্লাহর হালাল করা জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার যে কাজটি করেছেন তা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেছেন। এটা হতে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করার ক্ষমতা বা এখতিয়ার কারো থাকতে পারে না, এমনকি স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এরও এ ক্ষমতা নেই।

تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ : এর তাৎপর্য হলো নবী করীম ﷺ যে কাজটি করেছিলেন সে ব্যাপারে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়াই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সাথে সাথে নবীর স্ত্রীগণকেও সতর্ক করে দেওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নবীর স্ত্রী হওয়ার ফলে তাঁদের উপর যে কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা তাঁরা পুরোপুরি অনুধাবন করেননি। এর ফলে তাঁরা নবী ﷺ-এর দ্বারা এমন একটা কাজ করিয়েছেন যার কারণে একটা হালাল জিনিস হারাম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারত।

তাসহীলে বলা হয়েছে, 'তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাও?' এর অর্থ হলো দাসীকে নিজের জন্য হারাম করে হযরত হাফসার সন্তুষ্টি চাও। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, এ সূরা দাসী হারামকরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নাজিল হয়েছে। কারণ মধু হারামকরণ দ্বারা স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা করেননি। মধু হারাম করেছেন দুর্গন্ধের কথা শুনে। -[সাফওয়া]

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা নবীর জন্য যা হালাল করেছিলেন তা নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার ফলে নবীকে যে তিরস্কার করা হয়েছে তা হতে অনুমিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো এটা দ্বারা শাস্তি দিবেন। সে সন্দেহ দূর করে নবী করীম ﷺ-এর মনে প্রশান্তি সৃষ্টি করার জন্য বলা হয়েছে, আল্লাহ মহাক্ষমাশীল ও দয়াময়। -[রূহুল কোরআন]

নবী করীম ﷺ মধু নাকি মারিয়ায়ে কিবতিয়াকে হারাম করেছেন? : এ প্রশ্নে আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর দাসী মারিয়া কিবতিয়াকে তার জন্য হারাম করার প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাজিল করেছিলেন। -[তাফসীরে কাবীর]

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ দ্বারা মধুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ মধু খাওয়া পরবর্তী সময়ের জন্য হারাম করেছিলেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইবনে মারদুবিয়া আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনার উদ্ধৃতি প্রকাশ করে বলেন, مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ -কেই হুযূর ﷺ হারাম করেছিলেন, কেননা ঘটনাটি হযরত হাফসা (রা.) এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল এবং সে ঘটনার শব্দগুলো ছিল-

وَشَقَّ عَلَيْهَا فَعَاتَبَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَفْعَلُ هٰذَا مِنْ دُوْنِ نِسَائِكَ قَالَ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ اُحَرِّمَهَا فَلَا اَقْرَبُهَا قَالَتْ بَلٰى فَحَرَّمَهَا .

ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত আনাস (রা.) হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন كَانَتْ لَهٗ اَمَةٌ يَطَأُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهٖ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ حَتّٰى حَرَّمَهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ (الاية) অর্থাৎ রাসূলে কারীম ﷺ-এর একটি দাসী ছিল, যার সাথে তিনি যৌন সম্পর্ক রাখতেন, হযরত হাফসা ও আয়েশা (রা.)-এর কারণেই শেষ পর্যন্ত তিনি দাসীকে নিজের জন্য হারাম করেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা মধু পান করাকে হারাম করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং হযরত জাবের (রা.)-এর হাওলা দিয়ে বলা হয়েছে-

وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهٗ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَوَاطَئَتْ بِهٖ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ فَقُلْنَ لَهٗ اِنَّا نَشُمُّ مِنْكَ رِيْحَ الْمَغَافِيْرِ فَحَرَّمَ الْعَسَلَ فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ .

Free @ www.eilm.weebly.com

আল্লামা নববী (র.) বলেন- اَلصَّحِيْحُ اَنَّهُ نَزَلَتْ فِىْ قِصَّةِ الْعَسَلِ لَا فِىْ قِصَّةِ الْمَارِيَةِ মধু সম্পর্কীয় ঘটনাটির প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত নাজিল হওয়া বিশুদ্ধ কথা, মারিয়া কিবতিয়াকে হারাম করা প্রসঙ্গে আয়াত নাজিল হওয়া বিশুদ্ধ কথা নয়।

صَحِيْحَيْن -এর বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বর্ণনা রয়েছে (আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা ব্যতীত) সেগুলোর সনদ বিশুদ্ধ নয় বলে তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেন। আর সেগুলোর অধিকাংশেই مَارِيَة قِبْطِيَّة -কে হারাম করার প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর صَحِيْحَيْن -এর কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে وَاللّٰهِ لَا اَشْرَبُهُ 'আল্লাহর শপথ করে বলি আমি আর কখনো মধু পান করবো না।' কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ 'কখনো মধু পান করবো না আর আমি তার উপর শপথ করেছি। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ 'কখনো ভবিষ্যতে আর তার প্রতি দৃষ্টিও করবো না।' তাফসীরকারগণের মতামতের সার ও নিয়ম স্বরূপ এটাই বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ মধু খাওয়াকে হারাম করেছেন বলে শপথ করার উপর আয়াত لِمَ تُحَرِّمُ الخ অবতীর্ণ হয়েছে। مَارِيَةُ الْقِبْطِيَة -কে হারাম করার উপর আয়াত নাজিল হওয়ার বর্ণনাগুলো সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। (حَاشِيَةُ الْجَلَالَيْنِ)

কোনো হারাম বস্তুকে হালাল অথবা হালাল বস্তুকে হারাম বলে নিজের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়ার হুকুম প্রসঙ্গে : যদি কেউ আল্লাহর কোনো (حَلَال قَطْعِىْ) সরাসরি হালাল বস্তুকে عَقِيْدَة গতভাবে হারাম সাব্যস্ত করে, তবে এটা কুফরি ও কবীরা গুনাহ হবে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সহীহ হাদীস ও ফিক্হশাস্ত্রে যথেষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (اِسْتِحْلَالُ الْحَرَامِ وَعَكْسُهُ كُفْرٌ)

- আর যদি عَقِيْدَة গতভাবে হারাম সাব্যস্ত না করে থাকে এবং নিষ্প্রয়োজনে ও অহেতুকভাবে হালাল বস্তুকে কেবল নিজের জন্য হারাম বলে শপথ করে থাকে, তবে এমন শপথ ভঙ্গ করা ও তার কাফ্ফারা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি কোনো প্রয়োজন অথবা مَصْلَحَتْ -এর খাতিরে অথবা স্বীয় কল্যাণার্থে এরূপ করা হয়ে থাকে, তবে উত্তম হবে না, জায়েজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আর عَقِيْدَة গতভাবে হারাম সাব্যস্ত যদি না করে থাকে এবং শপথও তার হারামের উপর না করে থাকে বরং সর্বকালে তা হতে বিরত থাকে অথবা বিরত থাকার জন্য এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তা হতে বিরত থাকা ثَوَابْ -এর কারণ হবে। তবে তা رَهْبَانِيَّتْ বা بِدْعَتْ অর্থাৎ শরিয়ত পরিপন্থি ও বৈরাগ্যতা হবে। শরিয়তে ইসলাম বৈরাগ্যতা ও বিদআতকে খুবই নিন্দা করেছে। আর যদি নিজস্ব কোনো রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অথবা বিশেষ সুবিধার্থে হালাল বস্তু হতে বিরত থেকে থাকে, ছওয়াব মনে করে নয়, তাহলে بِلَا كَرَاهَتٍ جَائِزٌ হবে। কোনো কোনো সুফীগণও এরূপ করে থাকতেন। -[মা'আরেফ]

নবী বলে সম্বোধন করা হতে প্রমাণ হয় যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী : আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নবী ও রাসূলকে যখন কুরআনে সম্বোধন করেছেন, তখন হে নূহ! হে ইবরাহীম! হে মূসা! এভাবে তাঁদের নাম নিয়ে সম্বোধন করেছেন; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে যখনই সম্বোধন করেছেন তখন তাঁকে নাম নিয়ে সম্বোধন না করে; বরং 'হে নবী!' বা 'হে রাসূল'! বলে সম্বোধন করেছেন। এটা হতে স্বতই প্রমাণ হয় যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ শ্রেষ্ঠ নবী ও শ্রেষ্ঠ রাসূল। -[সাফওয়া]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত হালাল জিনিসকে হারাম বলে বিশ্বাস করেননি, হারাম বলে ঘোষণাও করেননি। তিনি যা করেছিলেন তা হলো, যে জিনিস আসলেই তাঁর জন্য হালাল সে জিনিসের উপভোগ হতে নিজেকে বিরত রাখার সংকল্প। এটাকে আল্লাহ তা'আলা 'নিজের জন্য হারাম করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রথমে নবী বলে সম্বোধন করে অতঃপর হারাম আখ্যা দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, যা তিনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছেন তা বড় কোনো অপরাধ না হলেও আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ .... اَيْمَانِكُمْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের সহায়, তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।' অর্থাৎ কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কসম হতে নিষ্কৃতি লাভের সুযোগ করে দিয়েছেন। অতএব, আপনি হালাল জিনিসকে হারাম করে নেওয়ার জন্য যে কসম করেছেন তা কাফ্ফারা আদায় করার মাধ্যমে ভঙ্গ করে দিন।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন আসে তা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মারিয়াকে নিজের জন্য হারাম করতে গিয়ে কি কসম করেছিলেন? অথবা মধু খাবেন না বলে ঘোষণা দানের সময় কি কসম করেছিলেন? নাকি হারাম করে নেওয়াকেই কসম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মধু হারাম করে নেওয়া সংক্রান্ত এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষা এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন– فَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ "অতঃপর আমি এটা কখনই পান করবো না, আমি কসম খেলাম।" হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে যে বর্ণনাটি ইবনুল মুনযির ইবনে আবূ হাতিম, তাবারানী ও ইবনে মারদুবিয়া উদ্ধৃত করেছেন তাতে এ ভাষায় কথাটি উদ্ধৃত রয়েছে– وَاللّٰهِ لَا أَشْرَبُهُ 'আল্লাহর নামে শপথ করছি আমি তা পান করবো না।'

আলোচ্য বর্ণনা হতে জানা গেল যে, মধু হারাম করার ফলে হারাম হয়ে যায়নি; কিন্তু হারাম করার সাথে সাথে শপথ করার কারণে, সে শপথের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আলোচ্য আয়াতে কাফ্ফারা আদায় করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাকি রইল হযরত মারিয়াকে হারাম করার ব্যাপারটি। আলোচ্য সূরাটি যদি হযরত মারিয়াকে হারাম করার কারণেই নাজিল হয়েছে এ কথা বলা হয়, তাহলে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা হলো, হযরত মারিয়াকে হারাম করা সংক্রান্ত কোনো বর্ণনায় হারাম করার আগে-পরে কসমও করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ কারণে প্রশ্ন আসে কেবল হারাম করে নেওয়াটাই কি কসম খাওয়ার সমতুল্য ও সমার্থবোধক? কসম শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক, আর এ কারণেই কি বলা হয়েছে قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ আয়াতটি।

এই প্রশ্নের জবাবে ফিকহবিদদের মধ্যে নিম্নরূপ মতভেদ রয়েছে–

১. কিছু সংখ্যক ফিকহবিদ বলেন, শুধু হারাম করে নেওয়াই কসম নয়। কেউ কোনো জিনিস স্ত্রী হোক বা অন্য কোনো হালাল জিনিস কসম না খেয়েও নিজের জন্য হারাম করে নিলে এটা একটা তাৎপর্যহীন কাজ হবে। এতে কাফ্ফারা দেওয়া কর্তব্য হবে না। কাফ্ফারা ছাড়াই সে তার ব্যবহার পুনরায় করতে পারে, যা সে হারাম করে নিয়েছিল। মাসরূক, শা'বী, রাবীয়া ও আবূ সালমা এ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে জারীর ও যাহেরী ফিক্হবিদগণও এ মত গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে কোনো জিনিস শুধু হারাম করে নিলে তা কসম সমতুল্য, যখন এটা করার সময় কসম শব্দ উচ্চারণ করা হবে। তাঁদের দলিল হলো রাসূলে কারীম ﷺ যেহেতু হালাল জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কসমও খেয়েছিলেন। বেশ কয়টি বর্ণনায় (মধু হারাম করা সংক্রান্ত বিষয়ে) এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে বলেছেন, আমি কসমের বাধ্যবাধকতা হতে বের হওয়ার যে পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি আপনি তদনুযায়ী আমল করুন।

[[আলোচ্য সূরাটি হযরত মারিয়াকে হারাম করাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে, এ কথা বললে তবে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। কারণ, সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কসম খেয়েছিলেন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।]

২. অপর কিছু লোক বলেন, কসম শব্দ উচ্চারণ না করে কোনো জিনিস হারাম করে নেওয়াটাই কসম সমতুল্য নয়; কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারটি ভিন্নতর।

কোনো কাপড় বা খাদ্য জাতীয় জিনিসকে যদি কেউ নিজের জন্য হারাম করে নেয়, তবে তা তাৎপর্যহীন ব্যাপার। কোনোরূপ কাফ্ফারা দেওয়া ছাড়াই সে তা ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু স্ত্রী বা ক্রীতদাসীকে যদি কেউ বলে যে, তার সাথে সঙ্গম করা তার জন্য হারাম, তবে তা হারাম হবে না; কিন্তু তার সাথে সঙ্গম করার পূর্বে কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা দিতে হবে। শাফেয়ী মাযহাবের এ মতও সমস্যা মুক্ত নয়। মালেকী মাযহাবের মতও প্রায় এরূপ। –[আহকামুল কোরআন-ইবনে আরাবী]

৩. তৃতীয় দলটি অর্থাৎ ফিক্হবিদগণ বলেন, কোনো জিনিসকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়াই কসমের ব্যাপার হলে স্বতই কসম হয়ে যায়। কসম শব্দ উচ্চারণ করা হোক আর না-ই হোক। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত আয়েশা, হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন। যদিও হযরত ইবনে আব্বাসের অপর একটি মতও বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তা হলো, إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 'কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে হারাম করে নেয় তবে তা কিছুই নয়– অর্থহীন কথা' কিন্তু এটার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বলে যে, এটার অর্থ তাঁর মতে তালাক নয়, এটা কসম মাত্র। আর তাতে কাফ্ফারা দিতে হবে। কেননা বুখারী, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে ইবনে আব্বাসের এ কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, হারাম করা হলে কাফ্ফারা দিতে হবে। আর নাসায়ী গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাসের নিকট যখন এ মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, সে তোমার প্রতি হারাম তো নয়, তবে তোমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। ইবনে জরীরের বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাসের কথার শব্দ হলো, "লোকেরা যদি নিজের প্রতি কোনো জিনিস হারাম করে নেয় যা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন, তাহলে তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করা কর্তব্য।" হযরত হাসান বসরী, আতা, তাউস, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, ইবনুয্ যুবাইর এবং কাতাদা (র.)-এরও এ মত। হানাফী মাযহাবেও এ মত গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র.) বলেন, لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ আয়াতের প্রকাশ্য শব্দগুলো হতে বুঝা যায় না যে, রাসূলে কারীম ﷺ হারাম করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কসমও খেয়েছিলেন, এই কারণে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, হারাম করাটাই কসম। কেননা এরপরই আল্লাহ হারাম করার ব্যাপারে কসমের কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব বলেছেন। পরে আবার ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র.) বলেছেন, হানাফী মাযহাবে হারাম করাটাকে কসম গণ্য করা হয়েছে তখন, যখন তার সঙ্গে তালাকের নিয়ত না হবে। কেউ যদি স্ত্রীকে 'হারাম' বলে তবে তার অর্থ হবে সে যেন বলেছে, "আল্লাহর কসম আমি তোমার নিকট যাবো না।" এ কারণে সে যেন 'ঈলা' করল, আর কেউ যদি কোনো খাদ্য-পানীয় জিনিস নিজের জন্য হারাম করে নেয় তবে সে যেন বলেছে, "আল্লাহর কসম আমি তা ব্যবহার করবো না।" কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন, আপনি সে জিনিস হারাম করেন কেন, যা আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য হালাল করেছেন? তারপর বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য কসমের বাধ্যবাধকতা হতে নিষ্কৃতি লাভের পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা হারাম করাকেই কসম বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ফলে হারাম করা স্বীয় তাৎপর্য ও শরিয়তী ফয়সালা অনুযায়ী কসমের সমতুল্য হয়ে গেছে।

এখানে একথাও বলে রাখা ভাল যে, স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য জিনিস হারাম করে নেওয়ার মধ্যে ফিকাহবিদদের মতে শরিয়তী হুকুমে পার্থক্য রয়েছে।

হানাফীদের মত হলো, তালাকের নিয়ত ছাড়াই যদি কেউ স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয় কিংবা কসম খায় যে, সে তার সাথে সঙ্গম করবে না, তাহলে এটাকে 'ঈলা' (اِيْلَاءٌ) বলা হবে। এরূপ করা হলে তার সাথে সঙ্গমের পূর্বে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। আর সে যদি তালাকের নিয়তে এরূপ বলে থাকে যে, তুমি আমার জন্য হারাম, তাহলে তার নিয়ত কি ছিল তা জানতে হবে। তিন তালাকের নিয়ত থাকলে তিন তালাক হয়ে যাবে। আর তার কম সংখ্যক তালাকের নিয়ত থাকলে তা এক তালাক হোক কিংবা দুই তালাক, উভয় অবস্থাতেই এক তালাক হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে যে, আমার জন্য যা হালাল ছিল তা হারাম হয়ে গেছে, তবে এটা তার স্ত্রীর উপর তখন পর্যন্ত আরোপ হবে না যতক্ষণ সে স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করার নিয়তে এটা না বলে থাকবে। স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো জিনিস হারাম করে নেওয়া হলে সে তা তখন পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে কসমের কাফ্ফারা আদায় না করবে।

–[বাদায়েউস-সানায়ে, হেদায়া, ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কোরআন– জাস্সাস]

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ .... الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেথায় শপথ ভঙ্গ করা আবশ্যকীয় অথবা উত্তম হবে, এমন অবস্থাসমূহের ক্ষেত্রে তোমাদের শপথসমূহ হতে হালাল হওয়া অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করে তার কাফফারা আদায় করার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বের করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তোমাদের কার্য নির্বাহক আর তিনি মহাজ্ঞানী ও মহান হিকমতের অধিকারী।

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা এরূপ বলেছেন যে, হে ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শপথসমূহ ভঙ্গের নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, অর্থাৎ কসমের কাফ্ফারা যদি আদায় করে দেয় তবে তা ভঙ্গ করা জায়েজ হবে। আর আল্লাহ তোমাদের মালিক আর তিনিই সব কিছু সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত এবং আকল ও হিকমতের অধিকারী।

মূলকথা হলো, তোমাদের কসম হতে নিষ্কৃতি বা নাজাত পাওয়ার ব্যবস্থা কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ ধার্য করে দিয়েছেন, অতএব নবী করীম ﷺ -কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কাফফারা আদায় করে শপথ ভঙ্গ করে নিন। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও হিকমত অনুসারেই কসমের কাফফারা ধার্য করেছেন। এটা আপনাদের জন্য খুবই সহজ ব্যবস্থা।

تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ -এর মর্মার্থ : تَحِلَّةً শব্দটি মূলত تَحْلِلَةً ছিল, দু'টি لَامٌ একত্র হওয়ার কারণে একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। বাবে تَفْعِيْل -এর مَصْدَرٌ অর্থ হলো খুলে দেওয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ হতে মুক্তিলাভের বিধান দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে শপথকে যেন একটি গিট্টার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর কাফ্ফারা দানকে যেন খোলার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ কাফ্ফারার মধ্যে লোকেরা যা নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল তা হালাল হয়ে যায়।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, এ আয়াতের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাফ্ফারার বর্ণনা দিয়েছেন সূরা মায়েদায়। এখানে তিনি স্বীয় নবীকে শপথের কাফ্ফারা আদায় করত স্বীয় দাসীর প্রতি মুরাজায়াত করার নির্দেশ দিলে তিনি গোলাম আজাদ করে মুরাজায়াত করেছিলেন।

ইমাম যুজাজ (র.) বলেছেন, এ আয়াত হতে বুঝা গেল যে, কোনো লোকেরই আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার অধিকার নেই। -[ফাতহুল কাদীর]

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ আয়াতকে ভিত্তি করে কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, যে লোক স্বীয় দাসী বা স্ত্রীকে বা অপর কোনো খাদ্যবস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নিল তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আহমদ (র.)-এর মাযহাব।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্ত্রী এবং দাসী ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নিজের জন্য হারাম করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তালাক বা আজাদ করার উদ্দেশ্যে হারাম করে থাকলে তা কার্যকর হবে। -[ইবনে কাছীর]

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন কিনা? : গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ কোনো কাফ্ফারা আদায় করেননি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম ﷺ মাসুম, তাঁর আগের পরের সব কিছুই মাফ। শেখ মুহাম্মদ আলী ছায়েছ এটা উল্লেখ করে বলেছেন, এটা এমন এক যুক্তি যা গ্রহণযোগ্য নয়।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ কাফ্ফারা হিসেবে একজন ক্রীতদাস আজাদ করেছিলেন। মুদাওয়ানা নামক গ্রন্থে ইমাম মালিক (র.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ কাফ্ফারা আদায় করেছিলেন। আল্লামা কুরতুবী এ দ্বিতীয় মতকে অধিক সহীহ বলে দাবি করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমরা পূর্বে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন দাস মুক্ত করে কাফ্ফারা আদায় করেছেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এটা ইমাম শা'বীরও অভিমত বলে দাবি করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

اَلْيَمِيْنُ-এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ : يَمِيْنٌ শব্দটি একবচন, তার বহুবচন হলো اَيْمَانٌ-এর শাব্দিক অর্থ- শপথ করা, কসম করা, কোনো কিছুকে গ্রহণ করা বা না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

যথা- وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই এ কাজ করবো। تَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُكَ قَطُّ আল্লাহর কসম আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না ইত্যাদি।

يَمِيْن-এর প্রকারভেদ : يَمِيْن বা শপথ তিন প্রকার। যথা- ১. لَغْو ২. مُنْعَقَدْ ৩. غُمُوْس - নিম্নে এদের পরিচিতি তুলে ধরা হলো,

১. يَمِيْن لَغْو [নিরর্থক শপথ] يَمِيْن لَغْو-এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তাফসীরকারগণ মতভেদ করেছেন। সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেন- যে ব্যক্তি কোনো হালাল বস্তুর উপর কসম খায়, তাকে (يَمِيْن لَغْو) বলা হয়।

মুজাহিদ (র.) বলেন- ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন ক্রেতা বলে- আল্লাহর শপথ আমি কখনো খরিদ করবো না। বিক্রেতা বলে- আল্লাহর শপথ আমি কখনো বিক্রয় করবো না।

হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, কেউ যদি শপথ করাকে কথার বা বাক্যের ভঙ্গিমা বা নীতি বাক্য বানিয়ে নেয়, তাকে يَمِيْن لَغْو বলা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র.) غالب گمان অনুসারে শপথ করাকে يَمِيْن لَغْو বলা হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ব্যক্তি অনিচ্ছায় যে শপথ করে, তাই (يَمِيْن لَغْو) যথা- وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ কেউ বলেন, اَللَّغْوُ فِى الْيَمِيْنِ السَّاقِطُ الَّذِىْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ حُكْمٌ.

মুজাহিদ (র.) বলেন- اَنْ يَحْلِفَ عَلٰى شَىْءٍ يَظُنُّ اَنَّهٗ كَذٰلِكَ وَلَيْسَ كَمَا يَظُنُّ অর্থাৎ ধারণানুসারে সত্য বলে কোনো কিছুর উপর শপথ করা যা তার ধারণার মূলত ব্যতিক্রম।

২. يَمِيْن مُنْعَقَدَه (ইয়ামীনে মুনআকাদাহ) যে কথার উপর শপথ করা হয়ে থাকে, তা পূর্ণ করার দৃঢ় সংকল্প থাকে যদি, তবে তাকে يَمِيْن مُنْعَقَدَه বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে দৃঢ়ভাবে শপথ করাকে يَمِيْن مُنْعَقَدَة বলে।

৩. يَمِيْن غُمُوْس (ইয়ামীনে গুমূস) জেনে শুনে কোনো কিছুর উপর অথবা কোনো ব্যাপারে মিথ্যা শপথ করাকে يَمِيْن غُمُوْس বলা হয়।

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

كَفَّارَه يَمِيْن শপথের কাফ্ফারা প্রসঙ্গ :

يَمِيْن لَغْو -এর কোনো কাফ্ফারা শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত হয়নি এবং তাতে বিশেষ কোনো গুনাহও হয় না। তবে তা (شَرْعًا مَكْرُوْه) শরিয়তে মাকরূহ বলা হয়েছে- كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ الخ

يَمِيْن مُنْعَقِدَه -এর কাফ্ফারা প্রদান করা আবশ্যক, অন্যথায় গুনাহ হবে।

كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗ الخ ـ

يَمِيْن غَمُوْس -এর কোনো কাফ্ফারা নির্ধারিত নেই, তবে তার مُرْتَكِبْ মারাত্মক গুনাহগার হবে। এ রূপে শপথ করার জন্য (تَوْبَه وَاسْتِغْفَارْ) তাওবা ও ইস্তেগফার করলে গুনাহ মাফ হতে পারে। অন্যথা আল্লাহর দরবারে কিয়ামতে পাকড়াও করা হবে। -[হাকীমুল উম্মত থানবী (র.)]

কসমের কাফ্ফারা সম্পর্কীয় শরয়ী বিধি-বিধান হলো এই যে,

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِذَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ـ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ الْاٰيَةَ ـ (مَائِدَه)

আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ যখন তোমরা কোনো শপথ করে থাক, তখন তার কাফ্ফারা হলো, তোমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচলিত মধ্যম মূল্যের খাদ্য তালিকা অনুসারে দশজন মিসকিনকে খাদ্য খাইয়ে দেওয়া, অথবা তাদেরকে কাপড় প্রদান করা, অথবা একটি দাস মুক্ত করে দেওয়া। আর যে তা করতে পারবে না তিনটি রোজা রাখাই তার জন্য কসমের কাফফারা। তোমাদের এ কাফফারা তখনই আদায় করতে হবে যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ করে ফেলবে।

কাফফরা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়কে এখতিয়ার স্বরূপ নির্ধারিত করেছেন- অর্থাৎ দশ জন মিসকিনকে মধ্যম পদ্ধতির খাওয়া খাইয়ে দেওয়া অথবা, তাদেরকে কাপড় দেওয়া, অথবা দাসমুক্ত করা, এদের মধ্যে যে কোনো একটি আদায় করলেই চলবে, আর উপরিউক্ত তিনটির কোনটিই যদি না হয় তবে তিনটি রোজা রাখা আবশ্যক।

(هٰكَذَا قَالَ فِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ وَحَاشِيَةِ الْجَلَالَيْنِ مِنْ تَفْسِيْرِ الْاَحْمَدِىْ)

খাদ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মিসকিনকে এক মুদ্দ অর্থাৎ (نصف صاع) অর্ধ সা' আটা বা চাউল প্রদান করবে।

আর যদি কাপড় প্রদান করে, তাহলে তা এমন হতে হবে যাতে শরীর ছতর ঢাকা সম্ভব হয়। হযরত ইব্নে ওমর (রা.) এ ক্ষেত্রে বলেতেন যে, পরনের জন্য একটি এবং গায়ের জন্য একটি মোট দু'টি কাপড় দিতে হবে। يَعْنِىْ اِزَارٌ وَقَمِيْصٌ اَوْرِدَاءٌ وَكِسَاءٌ আর হানাফীগণের মতে একই মিসকিনকে দশদিনে ঐ খাদ্য অথবা কাপড় দান করাও জায়েজ হবে, এটা اِشَارَةُ النَّصِّ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

কারণ, এতে মূল উদ্দেশ্য হলো মিসকিনদের প্রয়োজনপূর্ণ করা। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) ও এ মত প্রকাশ করেছেন যে, একই ব্যক্তিকে দশদিনে উক্ত খাদ্য দান করলে বা কাপড় প্রদান করলে হুকুম আদায় হবে না। আর تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ -এর ক্ষেত্রে কেবল গোলাম আজাদ করাই যথেষ্ট হবে, এতে কাফির বা মু'মিন হওয়ার যেহেতু কোনো قَيْد লাগানো হয়নি; বরং বলা হয়েছে যে, اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ [হাশিয়ায়ে জালালাইন, কাবীর] এটাই হানাফীদের অভিমত। এমনিভাবে উল্লেখ রয়েছে, ظِهَار এবং قَتْل -এর كَفَّارَه ও মুতলাকভাবে যে কোনো গোলাম আজাদ করলে যথেষ্ট হবে। আর চতুর্থ নম্বরের কাফফারা হলো তিনটি রোজা রাখা। এটা তখনই কর্যকর করবে। উল্লিখিত তিনটির কোনো একটিও আদায় করা সম্ভব না হয়।

আর রোজা আদায়ের ক্ষেত্রে تَتَابُعْ তথা লাগাতার তিনটি রোজা রাখা হানাফীগণের মতে আবশ্যক, শাফেয়ীদের মতে আবশ্যক নয়।

হানাফীদের মতে রোজা লাগাতার আদায় করার শর্ত এ জন্য যে, হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব (রা.) -এর قِرَاءَةْ মতে যেহেতু আমাদের তেলাওয়াত চলে থাকে এবং সে কেরাতে تَتَابُعْ শর্ত বলা হয়েছে-

كَقَوْلِهٖ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣. وَ اذْكُرْ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ هِيَ حَفْصَةُ حَدِيثًا ج هُوَ تَحْرِيمُ مَارِيَةَ وَقَالَ لَهَا لَاتُفْشِيهِ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عَائِشَةَ ظَنًّا مِنْهَا أَنْ لَا حَرَجَ فِي ذٰلِكَ وَأَظْهَرَهُ اللّٰهُ اِطَّلَعَهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُنَبَّأِ بِهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ لِحَفْصَةَ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ج تَكَرُّمًا مِنْهُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذَا ط قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ أَيِ اللّٰهُ.

৩. আর স্মরণ করো যখন নবী তাঁর কোনো এক স্ত্রীর নিকট গোপনে বলেছিলেন সে হচ্ছে হাফসা (রা.) একটি কথা তা হলো, মারিয়া কিবতীয়াকে হারাম করা এবং তিনি হাফসা (রা.)-কে বলেছিলেন, এটা কাউকেও বলো না। অতঃপর যখন সে এটা অন্যকে বলে দিল আয়েশা (রা.)-কে এ ধারণায় যে, এতে কোনো দোষ নেই। আর আল্লাহ তাঁর নিকট প্রকাশ করে দিলেন তাঁকে অবহিত করলেন সে বিষয় বলে দেওয়া বিষয়, তখন তিনি এ সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করলেন হাফসা (রা.)-এর নিকট আর কিছু হতে বিরত থাকলেন স্বীয় সৌজন্যবোধের কারণে। অনন্তর যখন তিনি তা তাঁর সে স্ত্রীকে জানালেন, সে বলল, আপনাকে কে এ সংবাদ দিয়েছে? তিনি বললেন, আমাকে সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবহিত সত্তা সংবাদ দান করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা।

٤. اِنْ تَتُوبَا أَيْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ إِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا مَالَتْ إِلَى تَحْرِيمِ مَارِيَةَ أَيْ سَرَّكُمَا ذٰلِكَ مَعَ كَرَاهَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ وَ ذٰلِكَ ذَنْبٌ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ أَيْ تُقُبِّلَا وَأُطْلِقَ قُلُوبٌ عَلَى قَلْبَيْنِ وَلَمْ يُعَبَّرْ بِهِ لِاسْتِثْقَالِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَثْنِيَتَيْنِ فِيمَا هُوَ كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ تَظَاهَرَا بِإِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّاءِ وَفِي قِرَاءَةٍ بِدُونِهَا تَتَعَاوَنَا عَلَيْهِ أَيِ النَّبِيِّ فِيمَا يَكْرَهُهُ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ فَصْلٌ مَوْلَاهُ نَاصِرُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحَلِّ اِسْمِ إِنَّ فَيَكُونُونَ نَاصِرِيهِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ نَصْرِ اللّٰهِ وَالْمَذْكُورِينَ ظَهِيرٌ ظُهَرَاءُ أَعْوَانٌ لَهُ فِي نَصْرِهِ عَلَيْكُمَا

৪. যদি তোমরা উভয় প্রত্যাবর্তন কর অর্থাৎ হাফসা ও আয়েশা। আল্লাহর দিকে, যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে মারিয়াকে হারাম করার প্রতি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ এটা তোমাদেরকে আনন্দিত করেছে, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এ হারাম করা কষ্টকর ছিল। আর এটাও এক প্রকার অপরাধ। এখানে শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের তওবা আল্লাহ কবুল করে নিবেন। আর এখানে দু'টি অন্তরের উপর বহুবচনীয় শব্দ قُلُوْب প্রয়োগ করা হয়েছে قَلْبَيْن ব্যবহার করা হয়নি, দু'টি দ্বিবচন একত্রিত হওয়া কষ্টসাধ্য হওয়ার কারণে। যেখানে উভয় মিলিয়ে একটি শব্দতুল্য। আর যদি তোমরা পরস্পর পোষকতা (বিক্ষোভ) কর এ শব্দটি تَتَظَاهَرَا ছিল, মূল শব্দে দ্বিতীয় تَاء কে ظَا-এর মধ্যে اِدْغَام করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে উক্ত تَاء ব্যতীত পঠিত হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অর্থাৎ নবী করীম ﷺ -এর সে বিষয়ে যা তিনি অপছন্দ করেন। তবে আল্লাহ তিনিই এটা ضَمِيْر فَصْل তাঁর বন্ধু সাহায্যকারী। আর জিবরাঈল এবং পুণ্যবান মু'মিনগণ আবূ বকর ও ওমর (রা.)। এটা اِنَّ-এর ইসমের مَحَلّ-এর প্রতি আত্ফ হয়েছে। সুতরাং এতদুভয়ও তাঁর সাহায্যকারী। আর অন্যান্য ফেরেশতাগণ অতঃপর আল্লাহ ও উল্লিখিত সাহায্যকারীগণের সাহায্যের পর তাঁর সাহায্যকারী ظَهِيْر শব্দটি ظُهَرَاءُ -এর অর্থে ব্যবহৃত। তোমাদের মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

Free @ www.e-ilmwebly.com

৫. عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَىْ طَلَّقَ النَّبِىُّ اَزْوَاجَهٗ اَنْ يُّبْدِلَهٗ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ خَبَرُ عَسٰى وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ وَلَمْ يَقَعِ التَّبْدِيْلُ لِعَدَمِ وُقُوْعِ الشَّرْطِ مُسْلِمٰتٍ مُّقِرَّاتٍ بِالْاِسْلَامِ مُّؤْمِنٰتٍ مُّخْلِصَاتٍ قٰنِتٰتٍ مُّطِيْعَاتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ صَائِمَاتٍ اَوْ مُهَاجِرَاتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا .

৫. অতি সত্বর তার প্রভু, যদি তিনি তালাক প্রদান করেন তোমাদেরকে, অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান করেন, তাঁকে পরিবর্তে দিয়ে দিবেন (يُّبْدِلَهٗ শব্দটি) তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পাঠ করা হয়েছে। এমন স্ত্রীগণ যা তোমাদের তুলনায় অধিক উত্তম হবে, خَيْرًا مِّنْكُنَّ টি عَسٰى -এর خَبَر হয়েছে, আর পূর্ণ বাক্যটি شَرْط -এর جَوَاب -এ পতিত হয়েছে। আর যেহেতু شَرْط পাওয়া যায়নি, সুতরাং পরিবর্তিতকরণ কার্যকরী লাভ করেনি। যারা ইসলাম গ্রহণকারিণী, ইসলামের সম্মুখে আত্মসমর্পণকারিণী, ঈমান আনয়ন-কারিণী, প্রকৃত ঈমান গ্রহণকারিণী আনুগত্যকারিণী, আনুগত্য তওবাকারিণী ইবাদতকারিণী, রোজা পালনকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অথবা হিজরতকারিণী, কতক বিধবা এবং কতক কুমারী হবে।

তাহকীক ও তারকীব

جِبْرِيْلُ শব্দটি কিসের উপর আতফ করা হয়েছে? : جِبْرِيْلُ শব্দটি مَوْلَاهُ শব্দের উপর عَطْف হয়েছে। এ হিসেবে বাক্যের অর্থ হবে, আল্লাহ তাঁর সাহায্যকারী এবং জিবরাঈল তাঁর সাহায্যকারী। এ অবস্থায় مَوْلَاهُ -এর উপর وَقْف করা ঠিক হবে না। جِبْرِيْلُ -এর উপর وَقْف করতে হবে। তখন وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ হবে مُبْتَدَأ আর وَالْمَلٰٓئِكَةُ হবে তার مَعْطُوْف আর ظَهِيْرًا হবে خَبَر –[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ : জমহুর একে نَبَّاَتْ পড়েছেন, আর তাল্‌হা ইবনে মুসাররেফ একে فَلَمَّا اَنْبَاَتْ بِهٖ পড়েছেন। আসলে এর দু'টি لُغَةٌ রয়েছে। এক اَنْبَاَ অপরটি হলো نَبَّاَ –[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ عَرَّفَ بَعْضَهٗ : জমহুর তাকে تَعْرِيْف হতে উদ্ভূত হিসেবে عَرَّفَ অর্থাৎ رَاء -কে تَشْدِيْد যুক্ত করে পড়েছেন। আর আলী, তালহা, ইবনে মুসাররেফ, আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী, হাসান, কাতাদাহ এবং কিসায়ী عَرَفَ تَخْفِيْف করে পড়েছেন। আবূ ওবাইদ, আবূ হাতিম প্রথমোক্ত কেরাতটি পছন্দ করেছেন وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করে। অর্থাৎ আর কিছু জানাননি। আর যদি শব্দটি عَرَفَ হতো তাহলে وَاَنْكَرَ بَعْضًا হতো। –[ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ اِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ : জমহুর দু'টি تَاء -এর মধ্য হতে একটি تَاء -কে حَذْف করে অতঃপর تَخْفِيْف করে تَظَاهَرَ পড়েছেন। ইকরামা শব্দটি মূলত যে রকম ছিল সে রকম রেখে تَتَظَاهَرَا পড়েছেন। হাসান, আবূ রেযা, নাফে, আসেম এক বর্ণনানুযায়ী ظَاء এবং هَاء -কে تَشْدِيْد যুক্ত করে এবং اَلِف বাদ দিয়ে تَظَّهَّرَا পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا -এ حَدِيْث বলতে কি বুঝানো হয়েছে? : তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার বলেছেন, এখানে 'হাদীস' বলতে হযরত মারিয়াকে হারাম করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর একজন স্ত্রী বলতে হযরত হাফসা (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ হযরত হাফসার কাছে হযরত মারিয়াকে হারাম করার ঘটনা বা ব্যাপারটি অন্য কাউকেও না বলার অনুরোধ করেছিলেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এখানে حَدِيْثًا -এর অর্থ মধু হারাম করার ব্যাপারটিও হতে পারে। অর্থাৎ হযরত হাফসাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি এটা প্রকাশ করে না দেন। ইমাম কালবী (র.) বলেছেন, হযরত হাফসার কাছে রাসূলে কারীম ﷺ একথা গোপন রেখেছিলেন যে, আমার পরে তোমার পিতা এবং আয়েশার পিতা আমার উম্মতের জন্য খলীফা হবে। হযরত হাফসা এ গোপন সংবাদ হযরত আয়েশাকে বলে দিলে এটা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে অবহিত করেন।

بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ দ্বারা উদ্দেশ্য : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতে بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ দ্বারা আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে হযরত হাফসা (রা.) বিনতে ওমরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, তিনি بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন هِيَ حَفْصَةُ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এ মত প্রকাশ করেছেন।

আর আল্লামা জিয়া উদ্দীন তার মুখতারাহ গ্রন্থে ইব্‌নে ওমর (রা.) হতে উদ্ধৃতি দিয়ে بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ -এর তাফসীরে বলেছেন قَالَ النَّبِيُّ لِحَفْصَةَ لَا تُخْبِرِيْ أَحَدًا الخ এটা দ্বারাও হযরত হাফসা (রা.) -এর কথাই প্রকাশ পায়।

ইবনে মুনযির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ রূপই বর্ণনা করেছেন। আর তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করে যা বলেন তা এই–

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ دَخَلَتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُخْبِرِيْ عَائِشَةَ حَتّٰى أُبَشِّرَكِ بِبِشَارَةٍ فَإِنَّ أَبَاكِ يَلِي الْأَمْرَ بَعْدَ أَبِيْ بَكْرٍ إِذَا نَامَتْ فَذَهَبَتْ حَفْصَةُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُوْ نَعِيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ هٰكَذَا فِيْ حَاشِيَةِ جَلَالَيْنِ ٦٤ ـ

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا : উক্ত আয়াতে حَدِيْثًا দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ নিয়ে মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ইব্‌নে আদী, আবূ নুয়াইম ও ইব্‌নে আসাকের, হযরত আলী ও ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে যা বর্ণনা করেছেন তা এই যে, হযরত হাফসা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার পর হযরত আবূ বকর অতঃপর হযরত ওমর (রা.) খলিফা নিযুক্ত হবেন, তবে এ কথা কারো নিকট প্রকাশ করবে না। এটাকে ভিত্তি করে হযরত আলী ও হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলতেন– وَاللّٰهِ إِمَارَةُ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْكِتَابِ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلٰى بَعْضِ أَزْوَاجِهٖ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীর নিকট গুপ্ত স্বরে যেহেতু বলেছেন, সেহেতু (আল্লাহর শপথ) আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর খিলাফত আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এভাবেই কালবী উল্লেখ করেছেন।

আল্লামাহ জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) حَدِيْثًا দ্বারা হযরত মারিয়া কিবতিয়াকে হারাম করার কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। (بِقَوْلِهٖ هُوَ تَحْرِيْمُ مَارِيَةَ)

আবার কেউ কেউ (অধিকাংশ বর্ণনা মতে) বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত যয়নব (রা.)-এর গৃহে যে মধু পান করেছিলেন যা অন্যান্য স্ত্রীগণের নিকট খারাপ মনে হলো এবং তিনি অন্যান্য সকল স্ত্রীগণকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ভবিষ্যতে কখনো মধু পান করবেন না বলে শপথ করেছিলেন এবং এ কথা কারো নিকট না বলার জন্য যে উপদেশ দান করেছেন, [যাতে যয়নব (রা.)-এর অন্তরে ব্যথা না লাগে] সে কথাকেই حَدِيْثًا বলে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এ মতটিকে বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত বলে মনে করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরকার হযরত আয়েশা (রা.)-এর কিসসা– যা শানে নুযূলের পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তার প্রতি حَدِيْثًا দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন এবং সে ঘটনায় হুযূর ﷺ যে বলেছিলেন, 'এটা কারো নিকট প্রচার করো না' তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা-ই ছিল হুযূর ﷺ -এর মধু পান করার ঘটনা, অথবা মধু হারাম করার ঘটনা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَرَّفَ بَعْضَهٗ ... بَعْضٍ (الْآيَة) : অর্থাৎ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং তখন স্ত্রী বললেন, কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? তিনি বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ তিনিই আমাকে অবহিত করেছেন। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে নবী করীম ﷺ হযরত হাফসাকে তিরস্কার করলেন, কিন্তু সব কথার উল্লেখ করলেন না। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভদ্রতা এবং লজ্জাশীলতা। কারণ ভদ্রলোকদের অভ্যাসই হলো দোষ-ত্রুটি মাফ করা এবং বেশি তিরস্কার না করা।

খাযেন বলেছেন, এর অর্থ হলো, হযরত হাফসা (রা.) যে হযরত আয়েশা (রা.)-কে নবীর নিজের জন্য মারিয়াকে হারাম করার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিলেন সে ব্যাপার অবগত করলেন; কিন্তু খেলাফত সংক্রান্ত কথা ফাঁস করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করলেন না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা মানুষের মধ্যে জানাজানি হোক এটা চাইতেন না। (সাফওয়া) এ কথা শুনে হযরত হাফসা জানতে চাইলেন নবী করীম ﷺ-এর কাছে, আপনাকে এ কথা কে বলেছেন? এ কথা জানতে চাওয়ার কারণ হলো, হযরত হাফসা হযরত আয়েশাকে এসব কথা বলার পর কাউকেও না জানাতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে এসব কথা শুনতে পেয়ে মনে করলেন, আয়েশা (রা.) বুঝি নিষেধ করা সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ -কে এ সব কথা বলে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

দিয়েছেন। এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বললেন, মহান আল্লাহই এসব কথা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তখন হযরত হাফসা চুপ করেছিলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। -[সাফওয়া]

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে যে, গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাফসাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক দিতে বিরত রাখেন এবং বলেছেন যে, হযরত হাফসা (রা.) অনেক নামাজ পড়েন এবং রোজা রাখেন। তাঁর নাম আপনার স্ত্রীগণের তালিকায় লিখিত রয়েছে। -[মাযহারী, মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ : অর্থাৎ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর নিকট তওবা কর।" এরপর তওবা করলে কি হবে তা বলা হয়নি। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে শর্তের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে সে জওয়াবে শর্ত হলো تُقْبَلَا "দু'জনের (তওবাই) কবুল করা হবে।" আল্লামা সাবূনী (র.) বলেছেন, এর জবাব হলো, كَانَ خَيْرٌ لَّكُمَا "তোমাদের দু'জনের জন্যই কল্যাণকর হবে। নবীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করার চেয়ে।"

اِنْ تَتُوْبَا-এর মধ্যে مُخَاطَبْ দু'জন কারা? : পবিত্র কুরআনে اَزْوَاجِ مُطَهَّرَاتْ গণের মধ্য থেকে দু'জনের প্রসঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধু পান করাও তা হারাম করার প্রসঙ্গে হয়েছে এবং যে দু'জন পরস্পর সহযোগী হয়ে তাঁর ব্যাপারে অপছন্দনীয় কথা রটালেন। তারা দু'জন কে ছিলেন এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে অবশ্যই বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে।

বুখারী শরীফে হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) হতে এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে (ইব্‌নে আব্বাস (রা.) বলেন,) বহুদিন যাবৎ আমার অন্তরে এ প্রেরণা জেগেছে যে, এই দু'জন মহিলা সম্পর্কে (যাদেরকে সূরা তাহরীমে (اِنْ تَتُوْبَا) দ্বারা خِطَابٌ করা হয়েছে) হযরত ওমর (রা.)-কে প্রশ্ন করবো এবং জেনে নেবো। অতঃপর একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হজকার্য সমাপনে ভ্রমণে বের হলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গী হলাম। পথিমধ্যে একবার তিনি قَضَاءِ حَاجَتْ -এর প্রয়োজনে জঙ্গলে গেলেন, আবার ফিরে আসলেন।

অতঃপর আমি তাঁর অজুর জন্য তৈরিকৃত পানি নিয়ে অজু করাতে করাতে প্রশ্ন করলাম যে, হযরত যে দু'জন মহিলার প্রসঙ্গে (اِنْ تَتُوْبَا) আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তারা কারা? তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, কি আশ্চর্যের বিষয়! আপনার কি অবগতি নেই যে, সে দু'জন মহিলা হযরত 'হাফসা ও হযরত আয়েশা' (রা.) ছিলেন, অতঃপর এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) আরো কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন, যা তাফসীরে মাযহারী নামক গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। (هٰكَذَا فِىْ مَعَارِفِ الْقُرْاٰنِ)

اِنْ تَتُوْبَا-এর মধ্যে যে তওবা করতে বলা হয়েছে তার কারণ فَقَدْ صَغَتْ-এর মধ্যে যে فَاءْ অক্ষর নেওয়া হয়েছে তাকে تَعْلِيْلِيَّةْ বলা হয়েছে আর এ تَعْلِيْل টি শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ইবারত হবে-

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ لِاَجْلِ الذَّنْبِ الَّذِىْ صَدَرَ مِنْكُمَا وَهُوَ اَنَّهُ قَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا (جَمَلْ)

অর্থাৎ তোমাদের দু'জন হতে যে গুনাহের কার্য প্রকাশ পেয়েছে তার কারণে তোমাদের দু'জনের তওবা করা আবশ্যক। আর সে গুনাহটি হলো (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) তোমাদের দু'জনের অন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বেঁকে গেছে।

قُلُوْبُ শব্দটি تَثْنِيَةْ ব্যবহার না করে جَمْعْ ব্যবহার করার কারণ : এর একটি কারণ জালালাইন গ্রন্থকারের পক্ষ হতে এই বলা হয়েছে যে, যদি দু'টি تَثْنِيَه-এর শব্দ একই কালিমার রূপ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে দুই كَلِمَه হিসেবে একই সাথে ব্যবহার করা আরবি ভাষায় কঠিন।

مِنْ شَانِ الْعَرَبِ اِذَا ذَكَرُوا الشَّيْئَيْنِ مِنْ اِثْنَيْنِ جَمَعُوْهُمَا لِاَنَّهُ لَا يُشْكَلُ (فَرُوِىَ اِجْتِمَاعُ الْمُتَجَانِسَيْنِ فِىْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ) وَاَيْضًا اِذَا اُضِيْفَ التَّثْنِيَةُ اِلَى التَّثْنِيَةِ يُسْتَعْمَلُ الْاَوَّلُ بِالْجَمْعِيَّةِ.

অর্থাৎ আরবদের নিয়ম হলো, যখন দু'টি বস্তু একই রূপের দু'জনের পক্ষ থেকে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বহুবচন ব্যবহার করতে হয়। কেননা এতে ভাষার সহজতা পাওয়া যায়। আর একটি নিয়ম হলো, যখন একটি تَثْنِيَه-কে অপর تَثْنِيَه-এর দিকে اِضَافَتْ করতে হয়, তখন প্রথম تَثْنِيَه-কে جَمْعْ ব্যবহার করতে হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا : صَغَتْ শব্দটি صَغْوٌ শব্দমূল হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ- বাঁকা হয়ে যাওয়া, উল্টে যাওয়া, বা ডিগবাজী খাওয়া। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) ও হযরত শাহ রফী উদ্দীন (র.) এর যে উর্দু অনুবাদ করেছেন তার অর্থ হলো- বস্তুত তোমাদের দু'জনের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে আর হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সুফিয়ান ছাওরী ও যাহহাক (রা.) উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য লিখেছেন এভাবে যে, فَقَدْ زَاغَتْ قُلُوبُكُمَا অর্থাৎ তোমাদের অন্তর সত্য-সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। ইমাম রাযী (র.) এ ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

عَدَلَتْ وَمَالَتْ عَنِ الْحَقِّ وَهُوَ حَقُّ الرَّسُوْلِ ﷺ .

অর্থাৎ সে সত্য অধিকার হতে সরে গেছে আর সে অধিকার হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিকার। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো– مَالَتْ عَنِ الْوَاجِبِ مِنْ مُوَافَقَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مَا يُحِبُّهُ وَكَرَاهَةِ مَايَكْرَهُهُ إِلٰى مُخَالَفَتِهِ অর্থাৎ তোমাদের কর্তব্য ছিল, রাসূলে কারীম ﷺ যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা। আর তিনি যা অপছন্দ করেন তার অপছন্দের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা;

কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের অন্তর তাঁর সাথে সহযোগিতা ও সাদৃশ্য রক্ষা করা হতে সরে গেছে এবং তার বিরুদ্ধতার দিকে ঝুঁকে গেছে।

إِنْ تَتُوبَا -এর جَزَاء কি? : إِنْ تَتُوبَا শর্তের جَزَاء প্রসঙ্গে জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, جواب الشرط محذوف জওয়াবে শর্ত বা شَرْط -এর جَزَاء উহ্য রয়েছে, আর তা হলো تُقْبَلَا তওবা কবুল হবে। তাফসীরে خطيب গ্রন্থে বলা হয়েছে, তা হলো– إِنْ تَتُوبَا كَانَ خَيْرًا لَكُمَا অর্থাৎ كَانَ خَيْرًا لَكُمَا

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ الخ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তাফসীরকারের মতামত : মা'আরেফ গ্রন্থকার উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন– যদি তোমরা তওবা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাজি না কর, তবে এ কথা বুঝে নিও না যে, তাঁর কোনো ক্ষতি হবে। কেননা আল্লাহ তো তার মাওলা ও জিম্মাদার রয়েছেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) ও সকল নেককার মুসলমান এবং তাদের পর সকল ফেরেশতা যাঁর বন্ধুত্বে ও সাহায্যে নিয়োজিত রয়েছে, কে তার কি ক্ষতি করতে পারবে? লোকসান ও ক্ষতি যা-ই হবে তা তোমাদেরই হবে।

কোনো কোনো গ্রন্থকার বলেন, تَظَاهَر শব্দটির অর্থ হলো– কারো বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করা, অথবা কারো বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলা।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) এ অংশের যে অনুবাদ করেছেন তার অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মানসিক কষ্ট দানে তোমরা যদি একতাবদ্ধ হয়ে থাক। শাহ আব্দুল কাদিরের অনুবাদের অর্থ হলো– তোমরা যদি চড়াও হয়ে বস তার উপর।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-এর মতে وَإِنْ تَظَاهَرَا -এর অনুবাদের অর্থ হলো– তোমরা দু'জন যদি নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে এভাবে কর্মতৎপরতা করতে থাক।

মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (র.) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন, তোমরা দু'জন যদি এভাবে কর্মতৎপরতা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাক।

قَوْلُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস ও আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এরা দু'জনই বৃহৎশক্তি। এরা যেখানে থাকবেন বাকি ঈমানদারগণের কথা উল্লেখ না করলেও তাঁরা تَبَعًا রয়েছেন। দু'জন বলে সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়। এদের সাথে সকল ঈমানদারগণই রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার نُصْرَة বা সাহায্যই সর্ববৃহৎ ও যথেষ্ট সাহায্য। তদুপরী অন্যান্যের সাহায্যের কথা বর্ণনা করার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে? : এ প্রশ্নের উত্তরে তাফসীর সাবী গ্রন্থকার বলেন– আল্লাহর সাহায্য একাই যথেষ্ট, তবুও অন্যান্য ঈমানদারগণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সম্মান মহান আকারে প্রদর্শন করিয়েছেন। অপর দিকে ঈমানদারদের মন যোগানোও উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনগণ যেন রাসূলের প্রতি এবং তাঁর আনীত ইসলাম ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। নতুবা আল্লাহর সাহায্যের তুলনায় অন্য কারো সাহায্য নিষ্প্রয়োজন।

অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই তাঁর নবীকে সাহায্য করতে পারেন। সুতরাং ফেরেশ্‌তা ও ঈমানদারগণকে সঙ্গে মিলানো প্রকাশ্য একটা অসিলা মাত্র। কেননা দুনিয়া হলো دَارُ الْأَسْبَابِ আর ফেরেশতার সাহায্য মহান আল্লাহর সরাসরি সাহায্য এবং ঈমানদারগণের দ্বারা সাহায্য করা তাও আল্লাহর সাহায্য, তবে এটা একটা বিশেষ নিয়মনীতির মাধ্যম মাত্র। কারণ সব কাজেই এক একটা নিয়মনীতি রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَسٰى رَبُّهُ ..... أَزْوَاجًا خَيْرًا (الاية) : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, অসম্ভব নয় যে, নবী যদি তোমাদের সব কয়জনকে তালাক দিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিয়ে দিবেন যারা তোমাদের চাইতে উত্তম হবে। সত্যিকার মুসলমান, আনুগত্যশীল, তাওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সওম পালনকারিণী, কুমারী হোক কিংবা স্বামীপ্রাপ্তা।"

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এটা হতে জানা গেল যে, কেবল হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.)-এরই অপরাধ ছিল না, অন্যান্যরাও কিছু না কিছু অপরাধী ছিলেন। এ কারণে এ দু'জনের পরে এ আয়াতে অন্যান্য স্ত্রীগণকেও সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের এমন কি বড় অপরাধ ছিল, যার কারণে তাদেরকে এত কড়া ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে? কুরআন মাজীদে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। এখানে প্রশ্ন উঠে যে, শানে নুযূলে বর্ণিত দু'টি কারণের যে কোনো একটি কারণকে কেন্দ্র করে কি তাদেরকে এ সতর্ক করা হয়েছে? না আরো কারণ ছিল?

হাফেয বদরুদ্দিন আইনী (র.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে হযরত আয়েশার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একটি দলে স্বয়ং হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত সাওদা ও হযরত সফিয়া (রা.) ছিলেন, আরেকটি দলে ছিলেন হযরত উম্মে সালমা ও অবশিষ্ট বিবিগণ।

বুখারী শরীফের এক বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ পারস্পরিক ঈর্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে জোট বেঁধে রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিচ্ছিলেন।

আর একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণ জোট বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিজেদের 'নাফকার' [পারিবারিক খরচাদি] দাবি করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ২৮-২৯ আয়াত নাজিল করেছিলেন। −[কুরতুবী]

এসব বর্ণনা সামনে রাখলে তখন নবী পরিবারে কি ঘটেছিল যার ফলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা হস্তক্ষেপ করে নবীর স্ত্রীগণকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হলেন এবং কঠোর ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করলেন তা জানা যায়। নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ যদিও সমাজের সর্বোত্তম মহিলা ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও তো ছিলেন মানুষ। অতএব, মানবীয় প্রকৃতির ভিত্তিতে তাঁদের দ্বারা এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যা সাধারণ মানবীয় জীবনে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না; কিন্তু যে ঘরের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে দান করেছিলেন, তাঁর মান ও মর্যাদার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এসব কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক জীবন যখন বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল করে নবী পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস পেলেন এবং তাঁদেরকে সংশোধন করে দিলেন।

উক্ত আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত হয়ে থাকে এ কথার প্রতি যে, নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ উপরোল্লিখিত (مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ الخ) গুণাবলিতে গুণান্বিত ছিলেন না, এর উত্তর কি হবে? : এর তাৎপর্য এভাবে করা যায় যে, মূলত সে যুগে নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ উল্লিখিত গুণাবলিতে গুণান্বিত ছিলেন বটে। তবে তাঁদের সাময়িক কিছু আচরণের দরুন নবীর মনে যে ব্যথার উদ্রেক হয়েছে তা আল্লাহর সহ্য হয়নি। সুতরাং তা দূর করার জন্য তাঁদেরকে মৃদু ভাষায় সতর্ক করে এ কথার প্রতি উৎসাহিত করেছেন যে, উল্লিখিত গুণাবলি তোমাদের মধ্যে আরো অধিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করো। একবার ভুল করলে তা সংশোধন করে নেওয়া যায়। সংশোধন না করলে স্বীয় মর্যাদা ও আত্মা মাটি হয়ে যায়। যাতে নবী পরিবারে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। মুসলিম উম্মাহ এ শিক্ষা গ্রহণ করে সংশোধন হতে সক্ষম হয়।

নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক প্রদান করেছেন কিনা? আর তার পরিবর্তনে তাঁকে স্ত্রী দেওয়া হয় কিনা?: এর উত্তর তাফসীরকার وَلَمْ يَقَعِ التَّبْدِيْلُ لِعَدَمِ وُقُوْعِ الشَّرْطِ বলে দিয়েছেন। সাবী গ্রন্থকার বলেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ব্যবহৃত تَرَجِّىْ সমূহ تَحْقِيْق-এর জন্য ব্যবহৃত। তবে এখানে তা (تَحْقِيْق) হাসিল হয়নি। কেননা تَرَجِّىْ টি شَرْط-এর সাথে مُعَلَّقٌ রয়েছে। আর إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ তাই নবী করীম ﷺ স্ত্রীগণকে তালাক দেননি এবং তার পরিবর্তনও দেওয়া হয়নি। সুতরাং عَسٰى টি উক্ত আয়াতে تَخْوِيْف-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ عَسٰى رَبُّهٗ الخ বলে তাঁদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, আরো বাড়লে তোমরা নবুয়তের স্ত্রীত্বের লিষ্ট বহির্ভূত হয়ে যাবে। সুতরাং নিজকে শোধরিয়ে নাও। −[সাবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ بِالْحَمْلِ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ الْكُفَّارُ وَالْحِجَارَةُ كَاَصْنَامِهِمْ مِنْهَا يَعْنِيْ اَنَّهَا مُفْرِطَةُ الْحَرَارَةِ تَتَّقِدُ بِمَا ذُكِرَ لَا كَنَارِ الدُّنْيَا تَتَّقِدُ بِالْحَطَبِ وَنَحْوِهٖ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ خَزَنَتُهَا عِدَّتُهُمْ تِسْعَةَ عَشَرَ كَمَا سَيَاْتِيْ فِي الْمُدَّثِّرِ غِلَاظٌ مِنْ غِلَظِ الْقَلْبِ شِدَادٌ فِي الْبَطْشِ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ بَدَلٌ مِنَ الْجَلَالَةِ اَيْ لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ تَاكِيْدٌ وَالْاٰيَةُ تَخْوِيْفٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ الْاِرْتِدَادِ وَلِلْمُنَافِقِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ دُوْنَ قُلُوْبِهِمْ.

৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আল্লাহর আনুগত্যে প্রস্তুত করে অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ কাফিরগণ এবং প্রস্তর যেমন, তাদের প্রস্তর নির্মিত মূর্তিসমূহ। অর্থাৎ সে আগুন চরম উত্তপ্ত হবে, যা এদের মাধ্যমে প্রজ্বলিত করা হবে। দুনিয়ার আগুনের ন্যায় নয় যে, লাকড়ি ইত্যাদি দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়। যেহেতু নিযুক্ত রয়েছে ফেরেশতাগণ তার রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ তাদের সংখ্যা উনিশ। যেমন সূরা মুদ্দাসসির -এর মধ্যে আলোচনা আসছে। নির্মম হৃদয় নির্মম হৃদয়ের অধিকারীগণ হতে কঠোর স্বভাবে পাকড়াও করার ক্ষেত্রে। যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন এটা بَدَلْ হয়েছে اَللّٰهُ হতে অর্থাৎ لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। আর তারা তাই করে, যা করতে তারা আদিষ্ট হয় এ বাক্যটি তাকীদরূপে ব্যবহৃত। এটা দ্বারা মু'মিনদেরকে মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য এবং মুনাফিকদেরকেও ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য যারা শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের দাবি করে, আন্তরিকভাবে নয়।

٧. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ط يُقَالُ لَهُمْ ذٰلِكَ عِنْدَ دُخُوْلِهِمُ النَّارَ اَيْ لِاَنَّهٗ لَا يَنْفَعُكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَيْ جَزَاءَهٗ.

৭. হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করো না দোজখে প্রবেশ করাকালে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বলা হবে। অর্থাৎ যেহেতু তা তোমাদের উপকারে আসবে না। তোমরা তো প্রতিফলপ্রাপ্ত হবে তা-ই যা তোমরা আমল করতে অর্থাৎ তার প্রতিফল।

তাহকীক ও তারকীব

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ -এর মধ্যে مَا -এর অবস্থান কি? : مَا اَمَرَهُمْ -এর মধ্যে مَا টি مَوْصُوْلَه হতে পারে। তখন তার صِلَة -কে مَحْذُوْف বলতে হবে। অর্থাৎ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ اَمَرَهُمْ بِهٖ এ مَا -কে مَصْدَرْ-ও বলা যেতে পারে, তখন تَقْدِيْر হবে- لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ اَمْرَهٗ
তখন اَمَرَهُمْ-কে اَللّٰهَ শব্দ হতে بَدَل اِشْتِمَالْ বলতে হবে। অথবা مَا-কে حَرْف جَرّ - فِيْ -এর পরিবর্তে বলতে হবে। অর্থাৎ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ فِيْ اَمْرِهٖ এখানে مَا-কে مَنْصُوْب مَحَلًّا বলা যেতে পারে। بَدَلْ হিসেবে, তখন عِبَارَةْ হবে, لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ اَمْرَهٗ -[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ : قُوْا اَنْفُسَكُمْ এটা জমহুরের কেরাত। অপর এক কেরাতে قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلُوْكُمْ পড়া হয়েছে, قُوْا-এর ضَمِيْر-এর উপর عَطْف করে উভয়ের মধ্যে مَفْعُوْل থাকার কারণে আতফকরণ ভালো হয়েছে। −[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্বে তওবা করতে এবং আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হতে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে মু'মিনদেরকে হেদায়েতের পথে চলতে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে তাদেরকে নিজের বাড়ির প্রতি দৃষ্টি দিতে এবং নিজ স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিদেরকে সঠিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে দীনি কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا : অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা স্বীয় সত্তা ও পরিজনকে দোজখ হতে বাঁচাও। কেবল নিজেরাই আল্লাহর আজাব হতে বেঁচে থাকবে, ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য কেবল এতটুকুর মধ্যে সীমিত নয়; বরং সকল মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, পরিবার ও বংশের নেতৃত্বের ভার তার উপর অর্পিত হয়েছে। সে পরিবার ও পরিজনের এবং বংশধরদেরকে সাধ্যমতো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল্লাহর পছন্দানুসারে জীবন যাপন করার মতো বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করাও তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তারা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তার পক্ষে যতটা সম্ভব তাদেরকে সেদিক হতে ফিরিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকবে। সন্তানাদি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সচ্ছল হবে পিতাগণের কেবল সেই চিন্তাই হওয়া উচিত নয়; বরং জাহান্নামের ইন্ধন হওয়া হতে বিরত রাখার জন্য তা অপেক্ষা বেশি চিন্তা করতে হবে।

বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনায় একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন−

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ .

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক এবং নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে প্রত্যেককেই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। দেশ প্রশাসক ও রক্ষক, সে তার প্রজা সাধারণের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। পুরুষ নিজের ঘরের লোকজনের রক্ষক এবং সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। স্ত্রী নিজের স্বামীর ঘর ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়ী। অতএব, সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।

আল্লাহর বাণী وَاَهْلِيْكُمْ-এর মধ্যকার اَلْاَهْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে اَهْلِيْكُمْ-এর মধ্যে اَهْل وَعِيَال অর্থাৎ স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও সকল সন্তানসন্ততি, গোলাম-বাঁদি, বর্তমান চাকর-চাকরানিসহ সবই শামিল রয়েছে।

হাদীস শরীফের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, যখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে, তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আরজ করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি হতে বাঁচানোর কথা তো বুঝে এসেছে। অর্থাৎ আমাদের গুনাহ হতে বাঁচতে হবে এবং আল্লাহর আহকামসমূহের অনুসরণ করতে হবে; কিন্তু اَهْل وَعِيَال-কে আমরা কিভাবে জাহান্নাম হতে রক্ষা করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, তার নিয়ম এই যে, তোমাদেরকে যে কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকেও তোমরা সে কাজ হতে বিরত রেখো। আর যা করার জন্য তোমরা নির্দেশিত হয়েছ তাদেরকেও তা করার জন্য আদেশ করো। তবে এ নীতি তাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করতে পারবে। −[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতটি আমাদেরকে দাওয়াতের দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে প্রথমে নিজেকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। অতঃপর বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তির দায়িত্ব কেবল এটা নয় যে, সে নিজেই আল্লাহর আজাব হতে বাঁচতে চাইবে; বরং নিজের সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও সাধ্যমতো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর পছন্দমতো বানাতে চেষ্টা করবে। এ হতে বুঝা গেল যে, দাওয়াতী কাজ প্রথমে নিজের পরিবার-পরিজন হতে শুরু হবে। প্রথমে নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে আল্লাহর পছন্দনীয় পথে পরিচালিত করার ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে কেবলমাত্র

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সচ্ছল করার চেষ্টা করা কর্তব্য মনে না করে এটা অপেক্ষা অধিক বেশি চিন্তা করতে হবে তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন হওয়া থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে। এ কথাটি কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'ভয় প্রদর্শন করো তোমার নিকটবর্তী স্বজনদেরকে' আর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا - তোমার পরিবার-পরিজনদেরকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং নিজে তাতে অটল থাকো।"

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-এর তাৎপর্য : অর্থাৎ জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। জাহান্নাম জ্বালানো হবে কাফের এবং পাথর দিয়ে। গ্রন্থকার বলেছেন, কাফেরদের মূর্তি দ্বারা– যা পাথর দ্বারা তৈরি। সুতরাং জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো হবে না। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইমাম মুহাম্মদ, আল-বাকের ও সুদ্দী (র.) বলেন, এটা হবে গন্ধকের প্রস্তর। আমাদের মনে হয় এটা হবে পাথুরে কয়লা। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে হয়তো মানুষের কাছে পাথর ইন্ধন হওয়ার বিষয়টি আশ্চর্যজনক ছিল; কিন্তু কুরআন নাজিল হওয়ার অনেকদিন পর পাথুরে কয়লা আবিষ্কার হওয়ার পর এটা আর কারো কাছে আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে না। সাধারণ আগুন হতে পাথুরে কয়লার আগুনের উত্তাপ যে অনেক বেশি এটাও কারো অজানা নয়। যে পাথুরে কয়লা দিয়ে জাহান্নামের ইন্ধন দেওয়া হবে তা যে কত শক্তিশালী হবে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, হে কাফের গোষ্ঠী, তোমরা আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় আজ কোনো বাহানা পেশ করো না, কারণ সে বাহানা আজ কোনো কাজে আসবে না। তোমরা দুনিয়াতে যে সকল কাজকর্ম করছিলে তারই কেবল প্রতিফল আজ দেওয়া হবে।

পূর্বোক্ত আয়াতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেরা এবং নিজেদের সকল আত্মীয়-স্বজন কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তি হতে দুনিয়াতে থাকতেই রক্ষা পাওয়ার সু-ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেয়। আর এ আয়াতে কাফেরদেরকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছে যে, তারাও যেন কুফরির উপর অচেতন অবস্থায় বসে না থাকে। এতে তাদের কোনো ফল হবে না। এ হতে উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহকে ভুলে গেলে কারো নিস্তার নেই, সুতরাং প্রত্যেকেই যেন নিজেদের বাঁচার পথ অবলম্বন করে নেয়। নতুবা পরে সময় পার হয়ে গেলে কোনো কিছুতেই কোনো শান্তির আশা করা যাবে না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন– مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا (اَلْحَدِيْث) অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর সরঞ্জাম যোগাড় করে নাও। আরো বলেছেন مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তার কিয়ামত তখনই আরম্ভ হয়ে যায়। মৃত্যুমুখে পতিত হলে যদি কেউ বলে যে, لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ হে আল্লাহ! আমাকে যদি আরো কিছু সময় প্রদান করতে, তাহলে আমি দান-খয়রাত ইত্যাদি করে নিতাম এবং নেককার হয়ে আসতে পারতাম তবে তাও শোনা হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৮. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط بِفَتْحِ النُّوْنِ وَضَمِّهَا صَادِقَةً بِاَنْ لَّا يُعَادَ اِلَى الذَّنْبِ وَلَا يُرَادَ الْعَوْدَ اِلَيْهِ عَسٰى رَبُّكُمْ تَرْجِيَةٌ تَقَعُ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ بِاِدْخَالِ النَّارِ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ اَمَامَهُمْ وَ يَكُوْنُ بِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ مُسْتَانِفٌ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمُنَافِقُوْنَ يُطْفَأُ نُوْرُهُمْ وَاغْفِرْ لَنَا ج رَبَّنَآ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা করো, বিশুদ্ধ তওবা نَصُوْحًا শব্দটি ن হরফটিতে যবর ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। বিশুদ্ধ তওবা, এরূপে যে, পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হবে না এবং পুনর্লিপ্ততার ইচ্ছাও করবে না। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক আশা, যা বাস্তবায়িত হবে। তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবিষ্ট করবেন জান্নাতে উদ্যানে যার পাদদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ অপদস্থ করবেন না জাহান্নামে প্রবিষ্ট করে নবী ﷺ-কে এবং তাঁর মু'মিন সঙ্গীদেরকে। তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে তাদের সম্মুখে অগ্রভাগে। আর হবে তাদের ডানে, তারা বলবে এটা مُسْتَانِفَه বাক্য। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন বেহেশতে প্রবেশ করা পর্যন্ত আর মুনাফিকদের জ্যোতি নিভে যাবে। আর আমাদেরকে ক্ষমা করুন হে আমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

৯. يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ بِالسَّيْفِ وَالْمُنٰفِقِيْنَ بِاللِّسَانِ وَالْحُجَّةِ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط بِالْاِنْتِهَارِ وَالْمَقْتِ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِيَ ـ

৯. হে নবী! জিহাদ করুন কাফেরদের সাথে তরবারির মাধ্যমে আর মুনাফিকদের সাথে জবান ও দলিল-প্রমাণ দ্বারা। এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন ধমকানো ও বিরক্তি প্রকাশের মাধ্যমে আর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা কতই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন ক্ষেত্র তা।

১০. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ـ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فِى الدِّيْنِ اِذْ كَفَرَتَا ـ

১০. আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন। তারা আমার বান্দাগণের মধ্য হতে দু'জন সৎকর্মশীল বান্দার অধীনে ছিল; কিন্তু তারা উভয়ে তাঁদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল দীনের বিবেচনায়, যেহেতু তারা কাফের হয়েছিল।

وَكَانَتِ امْرَأَةُ نُوحٍ وَاسْمُهَا وَاهِلَةُ تَقُولُ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ مَجْنُونٌ وَامْرَأَةُ لُوطٍ وَاسْمُهَا وَاعِلَةُ تَدُلُّ عَلَى اَضْيَافِهِ إِذَا نَزَلُوا بِهِ لَيْلًا بِاِيْقَادِ النَّارِ وَنَهَارًا بِالتَّدْخِيْنِ فَلَمْ يُغْنِيَا أَىْ نُوحٌ وَلُوطٌ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهِ شَيْئًا وَقِيلَ لَهُمَا ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ مِنْ كُفَّارِ قَوْمِ نُوحٍ وَقَوْمِ لُوطٍ .

হযরত নূহ (আ.) -এর স্ত্রী যার নাম ছিল ওয়াহেলা। সে তার সম্প্রদায়কে বলত, নূহ তো উন্মাদ হয়ে গেছে। আর হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়েলা। সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে রাতে আগমনকারী মেহমানদের সম্পর্কে অগ্নি প্রজ্বলিত করে এবং দিনে আগমনকারী মেহমানদের সম্পর্কে ধোঁয়া সৃষ্টি করে সংবাদ দান করত। বস্তুত তারা উভয়ে উপকারে আসেনি নূহ ও লূত তাদের জন্য আল্লাহ হতে তাঁর শাস্তি হতে। আর বলা হলো তাদেরকে তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করো হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কাফেরগণের সাথে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيُدْخِلَكُمْ : يُدْخِلَكُمْ শব্দটি يُكَفِّرَ-এর উপর عَطْف হয়েছে, অতএব يُكَفِّرَ যে اَنْ দ্বারা مَنْصُوْب হয়েছে ঠিক একই اَنْ দ্বারা يُدْخِلَكُمْ ও مَنْصُوْب হয়েছে। يُدْخِلَكُمْ-কে জমহুর نَصَب দিয়ে পড়েছেন। অন্য আরেক কেরাতে مَحَل تُوْبُوا يُوْجِبْ تَكْفِيْرَ سَيِّئَاتِكُمْ -এর উপর عَطْف করে جَزْم দিয়ে يُدْخِلْكُمْ পঠিত হয়েছে। যেন বলা হয়েছে– عَلٰى وَيُدْخِلْكُمْ .

قَوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ : اَلَّذِيْنَ শব্দটি اَلنَّبِىَّ-এর উপর عَطْف হয়েছে। কেউ কেউ اَلَّذِيْنَ-কে مُبْتَدَأ আর نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ-কে তার خَبَر হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে প্রথম মতটাই উত্তম। তখন نُوْرُهُمْ يَسْعٰى جُمْلَة বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে حَال হওয়ার কারণে। অথবা, তাকে এদের অবস্থার বর্ণনা দানের উদ্দেশ্যে مُسْتَانِفَه বলতে হবে। আর يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا الخ টি حَال হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। اَلَّذِيْنَ-কে مُبْتَدَأ বলা হলে এ বাক্যটিকে তার দ্বিতীয় خَبَر বলতে হবে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ضَرَبَ اللّٰهُ ...... وَامْرَاَةَ لُوْطٍ : ضَرَبَ হলো فِعْل আর اَللّٰهُ শব্দটি তার فَاعِل আর لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَفْعُوْل ثَانِىْ আর مَثَلًا হলো তার مَفْعُوْل اَوَّل আর اِمْرَاَةَ نُوْحٍ وَامْرَاَةَ لُوْطٍ হলো ضَرَبَ-এর শব্দটি ضَرَبَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ - اِمْرَاَة এখানে مَفْعُوْل اَوَّل-কে تَاخِيْر করা হয়েছে যাতে তার ব্যাখ্যাদানকারী বাক্যাবলি তার সাথে মিলিত হতে পারে। আর ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا مِثْلَ অর্থাৎ মানা হয়। مَحْذُوْف-কে مُضَاف বলা যেতে পারে, যদি একটি بَدَل-ও-এর مَثَلًا-কে نُوْحٍ اِمْرَاَةِ نُوْحٍ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহর সম্মুখে সত্য এবং পাকা-পোক্তভাবে তওবা করো। (থানবী) আর কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশুদ্ধ মনে আল্লাহর দরবারে তওবা করো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তওবার অর্থ : তওবা শব্দের শাব্দিক অর্থ– ফিরে আসা অর্থাৎ গুনাহসমূহ হতে ফিরে আসা। আর কুরআন ও সুন্নাহ -এর ব্যবহার বিধি মতে, ব্যক্তি স্বীয় অতীত জীবনে কৃত গুনাহসমূহের উপর লজ্জিত হওয়া আর ভবিষ্যতে তার নিকটেও না যাওয়ার উপর দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়াকে তওবা বলা হয়।

نَصُوْحٌ নাসূহ শব্দের অর্থ : نَصُوْحٌ শব্দটি আরবি, এটি نَصَحٌ وَنَصِيْحَةٌ মাসদার হতে যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে خَالِصٌ বা প্রকৃত করা। আর যদি نَصَاحَةٌ হতে مُشْتَقٌ মানা হয় তখন অর্থ হবে, কাপড় সেলাই করা ও তাতে জোড়া লাগানো।

প্রথমোক্ত অর্থের দৃষ্টিতে نَصُوْحٌ -এর অর্থ হলো, ব্যক্তি رِيَاءٌ অথবা লোক দেখানো হতে خَالِصٌ হয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর শাস্তি হতে বাঁচার জন্য কৃত গুনাহসমূহের উপর লজ্জিত হয়ে তা ছেড়ে দেওয়া।

আর দ্বিতীয় অর্থে نَصُوْحٌ -এর অর্থ হবে গুনাহের কারণে নেক আমলের যে আবরণ কেটে গেছে তাকে তওবার মাধ্যমে জোড়া দেওয়া। (فَيُقَالُ نَصَاحَةُ الثَّوْبِ)

তওবায়ে নাসূহা -এর সংজ্ঞা : হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, ব্যক্তি তার অতীত জীবনে কৃত যাবতীয় গুনাহের উপর লজ্জাবোধ করে ভবিষ্যতে তাতে পদার্পণ না করার দৃঢ় ইচ্ছা করা।

কালবী (র.) বলেন, তওবায়ে নাসূহা তাকে বলা হয়, যাতে ভাষায় اِسْتِغْفَارٌ করা হয় এবং আন্তরিকভাবে লজ্জাবোধ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নিজকে সে গুনাহের কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখে।

ইসলামি শরিয়তে এর তাৎপর্য হলো, এমন তওবা যাতে তিনটি শর্ত একত্রিত হবে, ১. গুনাহ হতে বিরত হওয়া, ২. অতীতে যে গুনাহ করা হয়েছে তার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। ৩. আর ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর কখনো না করার সংকল্প করা। যদি কোনো মানুষের হক আত্মসাৎ করে থাকে, তাহলে চতুর্থ আরেকটি শর্ত বেড়ে যাবে। তা হলো মালিককে বা তার ওয়ারিসকে হক আদায় করে দেওয়া অথবা তার কাছে গিয়ে মাফ করিয়ে নেওয়া। –[রূহুল মা'আনী, সাফওয়া]

ইবনে আবূ হাতিম জির ইবনে হোবাইশের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'বের নিকট تَوْبَةً نَصُوْحًا শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য জানতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ -এর নিকট এ প্রশ্নই করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'এর তাৎপর্য হলো, তোমার দ্বারা যখন কোনো অপরাধ হয়ে যায় তখন নিজের গুনাহের কারণে তুমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হও এবং এ লজ্জা সহকারে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। আর ভবিষ্যতে কখনো এ কাজ করো না।' হযরত ওমর ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও এ তাৎপর্যই বর্ণিত হয়েছে। একটি বর্ণনা মতে হযরত ওমর (রা.) 'তাওবাতান নাসূহা'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, তওবা করার পর পুনরায় সে গুনাহ করা তো দূরের কথা তা করার ইচ্ছা পর্যন্ত করবে না। –[ইবনে জারীর]

হযরত আলী (রা.) একবার একজন বেদুঈনকে খুব দ্রুত তওবা-ইস্তিগফারের শব্দগুলো উচ্চারণ করতে শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'এটা মিথ্যুকদের তওবা।' সে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে খাঁটি তওবা কি? বললেন, তার সাথে ছয়টি জিনিস থাকা আবশ্যক– ক. যা ঘটে গেছে তার জন্য লজ্জিত হবে। খ. নিজের যেসব কর্তব্যে অবহেলা দেখেছ তা রীতিমতো আদায় করবে। গ. যার হক নষ্ট বা হরণ করেছ তা ফিরিয়ে দিবে। ঘ. যাকে কষ্ট দিয়েছ তার নিকট ক্ষমা চাবে। ঙ. ভবিষ্যতে এ গুনাহ না করার দৃঢ়সংকল্প করবে এবং চ. নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিঃশেষিত করবে যেভাবে তুমি তাকে আজ পর্যন্ত নাফরমানির কাজে অভ্যস্ত বানিয়ে রেখেছ। তাকে আল্লাহর আনুগত্যের তিক্তরস পান করাবে– যেরকম তাকে তুমি আজ পর্যন্ত নাফরমানির মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করাচ্ছিলে। –[কাশশাফ, রুহুল মা'আনী, মা'আরেফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ ... كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : অর্থাৎ আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের আমলনামা হতে গুনাহসমূহ মোচন করে দিবেন, আর তোমাদেরকে ঐ বাগিচাসমূহে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, সেদিন আল্লাহ দুরাচার কাফেরদেরকে দিকে দিকে বিভিন্ন প্রকারের লাঞ্ছনা দিবেন। আর ঈমানদারগণকে কখনো লজ্জিত করবেন না। আর তাদের নেক কার্যসমূহ এবং সততার কারণে তাদের আল্লাহ প্রদত্ত জ্যোতি তাদের অগ্রে-পশ্চাতে, ডানে-বামে, ছুটতে থাকবে। তারা সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের প্রভুর নিকট আরজ করবে– হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের নূরকে পূর্ণত্ব দাও। আমাদেরকে ক্ষমা করো। নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুই করতে সক্ষম।

عَسٰى শব্দের তাৎপর্য : এটা মূলত فِعْلُ مُقَارِبْ তাফসীরকারগণের মতে عَسٰى শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, আশা করা যায়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকলে ওয়াদার অর্থ নেওয়া হয়, যা বাস্তবায়ন হওয়ার মধ্যে সন্দেহ থাকে না। যেভাবে قُرْآن كَرِيْم -এর মধ্যে لَعَلَّ শব্দটি يَقِيْنِيْ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আল্লাহর তা'আলা عَسٰى শব্দ ব্যবহার করে وَعْدَه উদ্দেশ্য করে এ দিকে ইশারা করেছেন যে, তওবা হোক অথবা বান্দাগণের অন্য কোনো নেককাজ হোক, কোনো কিছুই বেহেশতের মূল্য হতে পারে না, আর আল্লাহ তা'আলার উপরও এটা আবশ্যক বা ওয়াজিব হয়ে যায় না যে, সে নেককাজকারী অথবা তওবাকারীকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দিতেই হবে; বরং এটা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র। আল্লাহর উপর কোনো কিছুই ওয়াজিব নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْعَقَائِدِ وَمَا هُوَ الْاَصْلَحُ لِلْعَبْدِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

কেননা নেক আমলের প্রতিদান প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ দুনিয়াতে যাবতীয় নেয়ামতের মাধ্যমে কিছু কিছু প্রদান করেন, তার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহর নিয়মতান্ত্রিকভাবে বেহেশ্‌ত পাওয়াও আবশ্যক নয়; বরং আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে তাঁর দয়ার উপর নির্ভরশীল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কাউকেও তার কোনো আমল নাজাত দান করতে পারবে না। সাহাবীগণ আরজ করলেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ আপনাকেও নাজাত দান করবে না? হুযূর ﷺ বললেন না, আমাকেও পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ার মাধ্যমে নাজাত দান না করবেন ততক্ষণ আমিও নাজাত পাবো না। -[বুখারী ও মুসলিম, মাযহারী]

তবে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাকে ক্ষমা পাওয়ার আশা পোষণ করতেই হবে এবং ক্ষমা পাওয়ার আশায় কোনো গুনাহ করা কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় হবে না।

فِيْ حَاشِيَةِ الْجَلَالَيْنِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ وَفِيْ عَسٰى اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ هٰذَا التَّرَجِّيْ وَاجِبُ الْوُقُوْعِ ـ

জালালাইনের হাশিয়াতে বলা হয়েছে, কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এখানে عَسٰى শব্দের ইশারায় এ আশা কার্যত পরিণত করা ওয়াজিবতুল্য। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমা করবেনই।

নূর তো কোনো রূহসম্পন্ন জন্তু নয় তথাপিও نُوْرُهُمْ يَسْعٰى কিভাবে বলা হয়েছে? যা জন্তু জগতের কার্য : এর উত্তরে বলা হবে, যদিও নূর কোনো জন্তু নয় তথাপিও এটা জন্তু সাদৃশ্য হওয়া আবশ্যক নয়। এটা আল্লাহর কুদরতি এক প্রকার শক্তি বা সৃষ্টি, আল্লাহর হুকুমে এটা আল্লাহর পক্ষ হতে আবেদগণের সাথে এসে সংমিশ্রিত হয়। যেমনি মানুষের শারীরিক শক্তি এবং রং, রূপ ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টিগত, এটাও এরূপ। আল্লাহর কুদরতি শক্তিতে এটা নড়াচড়া ও চকচক করতে থাকবে, যেভাবে আয়না ইত্যাদির আলো চকচক করতে থাকে। সুতরাং এটা অসম্ভব কিছু নয়। গুনাহগার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে যেরূপ তার শরীর বিশ্রি রং ধারণ করে এটাও সেরূপ মনে করবে। হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَلصَّلٰوةُ نُوْرٌ অর্থাৎ নামাজ নূর স্বরূপ, আর কবিগণ বলেছেন- ظلمت دل نور کرتی ہے نماز * نور ایماں دل میں بھرتی ہے نماز

অর্থাৎ অন্তরের অন্ধকারকে নামাজ আলোকিত করে তোলে। আর ঈমানের নূরকে নামাজ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে।

বুজুর্গানে দীনগণ অথবা আল্লাহর ওলীগণ, গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে যখন আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হতেন তখন তাদের সম্মুখে আসমান, জমিনে লম্বালম্বি লাইটের আলোর ন্যায় আলোকবর্তিকা উপস্থিত হতো। এর হাজারও প্রমাণ কারো নিকট অজানা নয়। সুতরাং ঐ আলোকবর্তিকা যেভাবে আগমন করা সম্ভব সেভাবে نُوْرُهُمْ يَسْعٰى কথাটাও বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।

মু'মিনগণ কোথায় رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا বলবে : তাফসীরে দুররে মানছূর গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতে প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে কিছু না কিছু নূর প্রদান করা হবে। যখন পুলসিরাতের নিকট পৌছবে তখন মুনাফিকদের নূরগুলো নির্বাপিত হয়ে যাবে এবং ঈমানদারগণের নূর তখনও বহাল থাকবে। এমতাবস্থায় দেখে মু'মিনগণ আল্লাহর সমীপে দোয়া করতে থাকবে, হে আল্লাহ! মুনাফিকদের ন্যায় আমাদের নূরও যেন নির্বাপিত না হয়ে যায়। -[মা'আরেফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَسٰى رَبُّكُمْ ..... سَيِّاٰتِكُمْ : এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সকল صَغِيْرَه ও كَبِيْرَه গুনাহ মাফ হবে বলে আশা করা যায়। কেননা সগীরা গুনাহগুলো নেককাজ দ্বারা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন বলে কুরআনের আয়াতে ইঙ্গিত দিয়েছেন। كَمَا قَالَ تَعَالٰى اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ আর হাদীস শরীফের বর্ণনানুসারে كَبِيْرَه গুনাহসমূহ তওবা দ্বারা ক্ষমা পাওয়ার আশা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তওবা করলে যেহেতু আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলেছেন, এতে গুনাহসমূহ দাখিল হবে। যার কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা হবে তার সগীরা গুনাহ ক্ষমা بِطَرِيْقِ اَوْلٰى করা হবে।

আর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একজন লোক এসে ইসলাম গ্রহণ করার মনস্কামনা জানাল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে প্রশ্ন করল যে, এতে আমার অতীত গুনাহসমূহ মাফ হবে? হুযূর ﷺ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর সে আবার প্রশ্ন করল, আমি যে হত্যাকাণ্ডসমূহ করেছি তা কি ক্ষমা হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ আয়াত নাজিল করেন-

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

সুতরাং এতেও প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতে كَبِيْرَه ও صَغِيْرَه সকল গুনাহই ক্ষমা করে দিবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ ...... وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন, হে নবী! এ কাফের মুশরিক ও মুনাফিকরা যদি ধর্মের পথে ফিরে না আসে, তবে আপনারা কাফের ও মুনাফিকদের মোকাবিলায় জিহাদ পরিচালনা করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। দুনিয়াতে তো তারা এভাবে সাজাপ্রাপ্ত হবেই। আর পরকালীন জীবনেও তাদের ঠিকানা এবং বাসস্থান দোজখের অগ্নিকুণ্ডে নির্ধারিত করা হয়েছে। আর এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, দোজখ সর্বনিকৃষ্টতম স্থান। -[মাওলানা আশরাফ আলী থানবী]

তাফসীরকারদের মতে, ইসলামের শত্রু দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণি বাহির হতে ইসলামের সরাসরি বিপক্ষে কাজ করে থাকে। তারা হলো কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়। অপর শ্রেণি ভিতরগতভাবে ইসলামের সাথে শত্রুতা করে থাকে। তারা হলো, মুনাফিক সম্প্রদায়।

আল্লামা জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, কাফেরদের সাথে অস্ত্রসস্ত্র বা তরবারির মাধ্যমে যুদ্ধ করতে এবং মুনাফিকদের সাথে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে জিহাদ করতে হুযূর ﷺ -কে বলা হয়েছে এবং উভয় পক্ষের সাথেই কঠোরতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কারো মতে, দাওয়াতে ইসলাম এবং শরয়ী আহকামসমূহ বাস্তবায়নে তাদের সাথে কঠোরতা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে, حُدُوْد شَرْعِيَّة বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলা হয়েছে। কারণ তারা এমন সব কাজকর্ম করত যাতে তাদের উপর শরিয়তের শাস্তি কায়েম করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। -[ফাতহুল কাদীর]

আল্লামা সাবূনী (র.) বলেন, কথাবার্তায় তাদের সাথে কঠোর হওয়া তথা কখনো শালীনতা, ভদ্রতা, নম্রতার ব্যবহার দেখাতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে মনের শক্তির দিক দিয়ে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

আর কারো মতে, মুনাফিকদের সাথে যদি প্রয়োজন হয় তবে কথাবার্তার পরিস্থিতি অনুসারে তরবারিও ব্যবহার করা বৈধ হবে, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ অর্থে এটাও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। -[খাতীব]

قَوْلُهُ تَعَالَى ضَرَبَ اللّٰهُ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শেষ যুগের কাফের ও নাফরমানদেরকে বুঝানোর জন্য আমার নবী হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী এবং হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীর অবস্থা বর্ণনা করছি যে, সে দু'জন স্ত্রীলোক যদিও আমার বিশিষ্ট এবং উচ্চ মর্যাদাশীল দু'জন নবীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। অতঃপর যখন তারা স্ব-স্ব স্বামীর সাথে ধোঁকাবাজির কাজ করেছিল। আর তাঁদেরকে সত্য নবী হিসেবে জেনে শুনেও আনুগত্য দেখায়নি। তাই আমার দুই নেক বান্দা আল্লাহর সমীপে সে স্ত্রীগণের কোনো উপকার করতে পারেননি। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারেনি। অতএব, কিয়ামতের দিবসে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হবে যে, জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর। এটাই তোমাদের বাসস্থান।

উদাহরণ পেশের কারণ : এ উদাহরণটি পেশ করার কারণ এই যে, মানুষ যেন এ কথা ভালোভাবে বুঝে নেয় যে, নিজে কোনো সৎকর্ম না করে কেবল সৎ লোকদের সহচরে বসবাস করলেই পরকালে আল্লাহর আজাব হতে নাজাত পাওয়া যাবে না। যদি তা-ই হতো তবে হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীগণকেও নাজাত দেওয়া হতো। অসৎকাজের পরিণতি কোনো দিন ভালো হয় না। জাহান্নামের কাজ করে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করা যায় না।

উক্ত সূরা তাহরীমের শেষাংশে মোট ৪ জন মহিলার সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে- ১. হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী, ২. হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী, ৩. ফিরাউনের স্ত্রী, ৪. হযরত মরিয়ম (আ.)। এখানে দু'জনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ জনের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে বলা হবে।

تَنْبِيْه [সতর্কবাণী] : সবগুলোর বর্ণনাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানদারের ঈমানের বরকতে কোনো কাফের উপকৃত হতে পারে না। তদ্রূপ কোনো কাফেরের কুফরির কারণে ঈমানদারের কোনো ক্ষতি হতে পারে না।

সুতরাং কোনো নবীগণের অথবা اَوْلِيَاءِ كِرَام-এর স্ত্রীগণ যেন এ মর্মে গাফেল না হয়ে যায় যে, আমাদের স্বামীদের কারণে আমরা রক্ষা পাবো। আর কোনো কাফের যেন এ ধারণা না করে যে, আমাদের স্ত্রীগণের দ্বারা আমরা রক্ষা পাবো বা স্ত্রী যেন এ ধারণা না করে যে, তার নাফরমান স্বামী তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَخَانَتَاهُمَا : নবীগণের স্ত্রীদের জন্য কর্তব্য এই ছিল যে, তাদের স্বামী যেহেতু নবী, তাই তাদের অনুসরণ করা। কিন্তু অনুসরণ ও অনুগমন তারা করেনি। এটাই ছিল দোষ। তাই গ্রন্থকার فَخَانَتَاهُمَا -এর তাফসীর করেছেন فِى الدِّيْنِ ধর্মের লক্ষ্যে। কারণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– إِنَّهُ مَا زَنَتْ إِمْرَأَةُ نَبِيٍّ قَطُّ অর্থাৎ নবীগণের স্ত্রীগণ কখনো (না'উযুবিল্লাহ) জেনা করেননি। [সাবী] আর মূলত এ দু'জন মহিলা (হযরত নূহ ও লূত (আ.)-এর স্ত্রী) হযরত নূহ ও লূত (আ.)-এর দীন কবুল করেনি। তদুপরি দীনের সমকালীন শত্রুদের সহযোগিতা করেছিল।

কালবী (র.) বলেন, তাদের খেয়ানত হলো نِفَاقِىْ অর্থাৎ ঈমান প্রকাশ করত আর নেফাক গোপন রাখত।

وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ خِيَانَةَ اِمْرَأَةِ نُوْحٍ قَوْلُهَا اِنَّهُ مَجْنُوْنٌ وَخِيَانَةُ اِمْرَأَةِ لُوْطٍ . دَلَالَتُهَا عَلٰى ضَيْفِهِ (كَبِيْر)

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীগণের নাম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কাবীর ও মা'আরেফ গ্রন্থকার এবং জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে, হযরত নূহ (আ.) -এর স্ত্রীর নাম ছিল (وَاهِلَةَ) আর হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল ওয়ায়েলা।

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মৃত্যুর পরই হাশরের পূর্বে জান্নাত অথবা জাহান্নামের ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ হুযূর ﷺ বলেছেন, (اَلْحَدِيْثُ) مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখনই যেন তার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল। আর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামতও এটাই। –[মাওলানা আশরাফ আলী থানবী]

আয়াতটি একটি সূক্ষ্ম তাম্বীহ এর প্রতি ইঙ্গিত করছে : তা হলো হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা.)-এর প্রতি সূক্ষ্ম ইশারা অর্থাৎ যেন হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা.)-কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিপক্ষে যে উভয়ে যোগসাজস বা পরামর্শ করেছ তা হতে তোমরা স্ব-স্ব দায়িত্বে হেফাজত হয়ে যাও এবং এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করো।

আর পরোক্ষভাবে জগতের সকল নারীদেরকেও উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি নেক স্ত্রী হতে চাও তবে কোনো কালেও স্বামীর অসন্তুষ্টিকর কোনো কাজ করতে যেয়ো না। নতুবা জাহান্নামী হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। –[মাওলানা আশরাফী আলী থানবী]

শায়খ মাওলানা আব্দুল হক (র.) বলেন, হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা.) এরপর কখনো ঈর্ষান্বিত হয়েও প্রিয়নবী হযরত ﷺ -এর আনুগত্যে বিন্দুমাত্রও মৃত্যু পর্যন্ত ব্যতিক্রম করেননি। –[মাওলানা আশরাফী আলী থানবী]

এ আয়াতে قِيْلَ শব্দটিকে فِعْل مَاضِىْ ব্যবহার করার কারণ : এর এক কারণ এই হতে পারে যে, মৃত্যুকালে তাদেরকে সত্যই বলা হয়েছে যে, اُدْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ দোজখে প্রবেশকারীদের সাথে দোজখে প্রবেশ করো। অথবা হিসাব-নিকাসের পর কিয়ামতে তাদেরকে বলা হবে, এর অর্থ হলো– تَحَقُّق وُقُوْع যদি تَحَقُّق وُقُوْع হয় তখন فِعْل مَاضِىْ -এর صِيْغَه ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কালামে পাকে এরূপ বহু ব্যবহার রয়েছে।

كَقَوْلِهِ تَعَالٰى قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ . وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ .

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ : অর্থাৎ দু'জনকেই বলা হয়েছে যে, "আগুনে প্রবেশকারীদের সাথে প্রবেশ করো।" এ কথাটি মৃত্যুর প্রাক্কালে তাদেরকে বলা হয়েছে। অথবা পরকালে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে, কাফের, মুশরিক ও নাফরমানদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ করো। এ কথাটি তাদেরকে অবশ্যই বলা হবে। এটা বুঝানোর জন্য এখানে 'مَاضِىْ' বা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَةَ فِرْعَوْنَ م اٰمَنَتْ بِمُوْسٰى وَاسْمُهَا اٰسِيَةُ فَعَذَّبَهَا فِرْعَوْنُ بِاَنْ اَوْتَدَ يَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَاَلْقٰى عَلٰى صَدْرِهَا رَحٰى عَظِيْمَةً وَاسْتَقْبَلَ بِهَا الشَّمْسَ فَكَانَتْ اِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا مَنْ وُكِّلَ بِهَا ظَلَّلَتْهَا الْمَلٰۤئِكَةُ اِذْ قَالَتْ فِىْ حَالِ التَّعْذِيْبِ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ فَكَشَفَ لَهَا فَرَأَتْهُ فَسَهُلَ عَلَيْهَا التَّعْذِيْبُ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَتَعْذِيْبِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ اَهْلِ دِيْنِهٖ فَقَبَضَ اللّٰهُ رُوْحَهَا وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ رُفِعَتْ اِلَى الْجَنَّةِ حَيَّةً فَهِىَ تَاْكُلُ وَتَشْرَبُ

১১. আর আল্লাহ মু'মিনদের জন্য উপস্থাপন করছেন ফিরআউন পত্নীর দৃষ্টান্ত তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল আসিয়া। ফিরআউন তাঁকে হস্ত ও পদে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে এবং তাঁর বক্ষে প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে শাস্তি প্রদান করে। আর তাকে প্রখর উত্তপ্ত রৌদ্রে শুইয়ে রাখে। যখন শাস্তি দাতারা তার থেকে পৃথক হয়ে চলে যেত তখন ফেরেশতাগণ এসে তাঁকে ছায়া দান করত। যখন সে বলেছিল শাস্তি দানকালীন অবস্থায় হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো তখন তাঁর সম্মুখে বেহেশত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ফলে তাঁর নিকট শাস্তি সহজসাধ্য অনুভূত হতে লাগল। এবং আমাকে মুক্তি দান কর ফিরআউন ও তার কর্ম হতে তার শাস্তি হতে আর আমাকে মুক্তি দান করো জালিম সম্প্রদায় হতে যারা ফিরাউনের মত অনুসরণ করে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রূহ কবজ করে নেন। আর ইবনে কায়সানের মতে তাঁকে জীবিতাবস্থায় জান্নাতে উত্তোলন করে নেওয়া হয়, তিনি তথায় পানাহার করেন।

١٢. وَمَرْيَمَ عَطْفٌ عَلٰى اِمْرَاَةَ فِرْعَوْنَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا حَفِظَتْهُ فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا اَىْ جِبْرَئِيْلَ حَيْثُ نَفَخَ فِىْ جَيْبِ دِرْعِهَا بِخَلْقِ اللّٰهِ فِعْلَهُ الْوَاصِلَ اِلٰى فَرْجِهَا فَحَمَلَتْ بِعِيْسٰى وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا بِشَرَائِعِهٖ وَكُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ مِنَ الْقَوْمِ الْمُطِيْعِيْنَ.

১২. আর মরিয়ম এটা اِمْرَاَةَ فِرْعَوْنَ -এর উপর عَطْف ইমরান কন্যা, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল তাকে হেফাজত করেছে অনন্তর আমি তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর আঁচলে ফুঁকে দেন। আল্লাহর হুকুমে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর ফুঁকের প্রভাব জরায়ুতে গিয়ে পৌছায় এবং তিনি ঈসা (আ.)-কে গর্ভ ধারণ করেন। আর সে সত্যারোপ করে তার প্রতিপালকের বাণীসমূহে তাঁর বিধানসমূহে এবং তাঁর কিতাবসমূহে যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর সে ছিল অনুগতগণের অন্তর্ভুক্ত আনুগত্যকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا : জমহুর تَشْدِيْد যুক্ত করে صَدَّقَتْ পড়েছেন। হামযা আল-উমরী, ইয়াকূব, কাতাদাহ, আবূ মিজলায এবং আসেমের এক বর্ণনায় تَخْفِيْف করে صَدَقَتْ পড়েছেন। كَلِمٰتِ শব্দটিকে জমহুর বহুবচন হিসেবে بِكَلِمٰتِ পড়েছেন। আর হাসান, মুজাহিদ, জুহদারী একবচন হিসেবে بِكَلِمَةِ পড়েছেন। তেমনি كِتَابِهٖ শব্দটি كُتُبِهٖ পঠিত হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى ضَرَبَ اللّٰهُ ...... فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ মু'মিনদের জন্য ফিরআউন পত্নীর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, সে যখন বলল "হে আমার পালনকর্তা, আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম হতে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের হাত হতে মুক্তি দিন।" আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ফেরাউনের স্ত্রীকে মু'মিন মহিলাদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তিনি দুনিয়ার বুকে সে যুগের সর্বাধিক বড় সম্রাটের স্ত্রী ছিলেন। অট্টালিকায় বসবাস করতেন এবং দুনিয়ার নানা ভোগ-বিলাসের কোনো অভাব সেখানে ছিল না; কিন্তু এসব ভোগ-বিলাস বাদ দিয়ে তিনি গ্রহণ করলেন ঈমানের পথ– আল্লাহর সন্তুষ্টির রাস্তা। এ কারণেই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে অমানবিক নির্যাতন ও শাস্তি। এসব জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ঈমানের পথ পরিহার করেননি। দীন হতে বিচ্যুত হননি। আল্লাহ তা'আলার কাছে চেয়েছেন, তাঁর সন্নিকটে জান্নাতে একটা ঘর। আবেদন জানিয়েছেন ফেরাউনের শিরক কুফরি-এর জুলুম-অত্যাচার হতে মুক্তিদানের। হযরত হাসান বসরী (র.) এবং ইবনে কায়সান বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাঁকে জান্নাতে তুলে নিয়েছেন। তিনি বর্তমানে সেখানে পানাহার করছেন। তিনি ফেরাউনের মতো খোদাদ্রোহীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি। ঈমান এবং ইহসানে অটল থাকার কারণে পেয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টি। অতএব, কোনো ভালো লোক বা খারাপ লোকের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্কের কারণে কারো কোনো লাভ বা ক্ষতি হতে পারে না। পরকালে মুক্তি এবং বিপর্যয় আসবে একমাত্র বান্দার আমল এবং ঈমানের উপর নির্ভর করে। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল কোরআন]

এখানে নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণকেও এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এ মহিলা ফেরাউনের মতো খোদাদ্রোহীর স্ত্রী হয়েও যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হযরত মূসা (আ.)-এর আনুগত্য করতে পারে, নানা ধরনের নির্যাতনে ধৈর্য এবং আল্লাহর উপর আস্থা রেখে মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে তারা কেন যে কোনো পরিস্থিতিতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য হতে বিচ্যুত হবে? তারা কেন এ দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য নবীকে কষ্ট দিবে, পরকালের সুখ-শান্তিকে কেন ভুলে যাবে?

এখানে বলে রাখা ভালো যে, এ সূরা নাজিল হওয়ার পর বিভিন্ন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, নবীর স্ত্রীগণ আর কখনো নবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো কাজ করেননি।

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ "হে আমার প্রতিপালক আমার জন্য তোমার সন্নিকটে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো।" কোনো কোনো আলিম বলেছেন, এ কথাটি অত্যন্ত সুন্দর এবং তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে, তিনি বাড়ি চাওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলাকে প্রতিবেশী হিসেবে কামনা করেছেন। এখানে আরো জানা যায় যে, তিনি পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী ছিলেন। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ : আল্লাহ বলেন, "আর ইমরানের কন্যা মরিয়মের দৃষ্টান্ত এই যে, সে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছিল। পরে আমি তাঁর ভিতরে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুঁকেছিলাম এবং সে স্বীয় রবের বাক্যসমূহ এবং তাঁর কিতাবাদির সত্যতা স্বীকার করল। আর আসলে সে অনুগত ও বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল।"

وَمَرْيَمَ- কে اِمْرَاَةَ فِرْعَوْنَ -এর উপর আত্‌ফ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইমরানের কন্যা মরিয়মের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন এবং ইহুদিদের নির্যাতন ও জুলুমের মোকাবিলায় তাঁর ধৈর্যের উদাহরণ দিচ্ছেন, হযরত মরিয়ম মু'মিন মহিলাদের জন্য ইখলাস লিল্লাহ এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বন্দেগিকরণের এক উঁচু ধরনের উদাহরণ এবং উত্তম আদর্শ।

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, এ দু'স্ত্রীলোক পাক-পবিত্র, মু'মিন, সত্যবাদী এবং ইবাদতকারিণীদের জন্য দু'টি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এ দু'টি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'আলা পেশ করেছেন নবী ﷺ -এর স্ত্রীগণের সামনে। এ সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো যে প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে। এ দু'জন স্ত্রীলোক সর্ব যুগের এবং সর্বস্থানের মু'মিন মহিলাদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। –[যিলাল]

اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا এ কথা বলে ইহুদিদের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা ইহুদিরা প্রচার করত যে, তাঁর গর্ভে হযরত ঈসার জন্ম অবৈধভাবে [নাউযুবিল্লাহ] হয়েছে। সূরা নিসার ১৫৬ আয়াতে এ মিথ্যাবাদী লোকদের এ মিথ্যা কথাকে বুহতানে আযীম– "একটি বিরাট মিথ্যা দোষারোপ" বলা হয়েছে।

চারজন মহিলার পরিপূর্ণতা : নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন, কামেল পুরুষতো অনেক রয়েছে কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে চারজন হলো কামেল– ১. আসিয়া বিনতে মোযাহেম ফিরাউনের স্ত্রী, ২. মারইয়াম বিনতে ইমরান, ৩. খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ এবং ৪. ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ ﷺ। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট শুনেছি, পূর্বের জাতিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম স্ত্রীলোক ছিল মারইয়াম বিনতে ইমরান এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম স্ত্রীলোক হলো খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْجُزْءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُوْنَ : ২৯তম [উনত্রিংশতিতম] পারা

سُوْرَةُ الْمُلْكِ : সূরা আল-মুলক

সূরাটির নামকরণের কারণ : পবিত্র কুরআনের অত্র সূরার নামকরণ তার প্রথম আয়াতাংশ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ -এর মধ্যকার اَلْمُلْكُ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে। এতে ৩০টি আয়াত, ৩৩৫টি বাক্য এবং ১৩১৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির অন্যান্য নাম : এ সূরাটিকে তাবারাকা, মুনজিয়াহ ও মানেয়া নামও দেওয়া হয়েছে। তাবারাকা নাম দেওয়ার কারণ হলো– এর পাঠকারী অশেষ কল্যাণ ও বরকত লাভ করে থাকে। আর মুনজিয়াহ নামের কারণ হলো– এর পাঠকারীকে কবর আজাব হতে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। আর মানেয়া নাম দেওয়ার কারণ হলো– এর পাঠকারীকে এটা কবর আজাব হতে রক্ষা করে এবং বাধা দিয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু সূরাটির ভাষা, বর্ণনাভঙ্গির বক্তব্য ও বিষয়বস্তু দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা নবী করীম ﷺ -এর মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ জন্য তাকে মক্কী সূরা বলা হয়। কতক তাফসীরকার বলেন, এ সূরাটি তূরের পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ইবনে শেহাব (রা.) বলেন, إِنَّهُ كَانَ يُسَمِّيْهَا الْمُجَادَلَةَ لِاَنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِى الْقَبْرِ 'এ সূরাকে সূরাতুল মুজাদালাহও বলা হয়। কেননা এ সূরা তেলাওয়াতকারীর পক্ষ থেকে ফেরেশেতাগণের সাথে ঝগড়া করবে এবং তেলাওয়াতকারীকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করবে।' যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

১. رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا هِىَ اِلَّا ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَاَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ وَهِىَ سُوْرَةُ تَبَارَكَ .

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন মাজীদের একটি সূরা রয়েছে, যা ৩০ আয়াত বিশিষ্ট, যে তা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এ সূরা তার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে দোজখ হতে বের করাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবে। আর সে সূরাটি হলো– سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ

২. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِىْ قَبْرِهٖ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُوْلُ رِجْلَاهُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهٗ يَقُوْمُ بِسُوْرَةِ الْمُلْكِ ثُمَّ يُؤْتٰى مِنْ قِبَلِ رَاْسِهٖ فَيَقُوْلُ لِسَانُهٗ لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيْلٌ لِاَنَّهٗ كَانَ يَقْرَأُ بِىْ سُوْرَةَ الْمُلْكِ ثُمَّ قَالَ هِىَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ وَهِىَ فِى التَّوْرَاةِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَاَهَا فِىْ لَيْلَةٍ فَقَدْ اَكْثَرَ وَاَطْنَبَ .

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে শায়িত করা হয় তখন সর্বপ্রথম তার পা যুগলের দিক থেকে আজাবের ফেরেশতা আসতে শুরু করে। তখন মৃতব্যক্তির পা দু'খানি ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে, এ ব্যক্তির নিকটে আসার তোমাদের কোনো সুযোগ নেই। কেননা সে সূরা আল-মুলক সর্বদা পড়ত। অতঃপর তার মাথার দিক থেকেও পুনরায় আজাবের ফেরেশতা আসতে থাকে, তখন মৃতব্যক্তির মুখ বলবে এ ব্যক্তির নিকট তোমাদের আগমনের কোনো পন্থা নেই। কেননা, সে আমার (মুখমণ্ডলের) মাধ্যমে সূরা মুলক তেলাওয়াত করত। অতঃপর তিনি বললেন, এটা আল্লাহর আজাবকে ফিরিয়ে দেয়। তাওরাত কিতাবেও এটা সূরাতুল মুলক নামে পরিচিত ছিল। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তা তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি অত্যধিক নেক কার্য করল এবং তার নেক আমলনামাকে দীর্ঘ করল।

অপর একটি হাদীস শরীফে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– هِىَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ) এটা (سُوْرَةُ تَبَارَكَ الَّذِىْ) আল্লাহর শাস্তিকে প্রতিহতকারী, যে এটা তেলাওয়াত করবে তাকে তা কবরের শাস্তি থেকে নাজাত দান করবে। –[কুরতুবী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যেন প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক ব্যক্তি শিখে নেয় এবং তেলাওয়াত করে।

وَاَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَبَارَكَ الْمُلْكِ فِىْ قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ .

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অচেতন ও গাফেল লোকদেরকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা হয়েছে। মক্কায় প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের বিশেষত্ব হলো,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এগুলোতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে খুব সংক্ষেপে অথচ হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষের অন্তঃকরণে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসসমূহ সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। মানুষ তার প্রতি গভীর দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়।

সূরাটির ১ থেকে ৫নং আয়াত পর্যন্ত মহামহিম অসীম শক্তিধর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সর্বময় ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বর্ণনা দিয়ে সৃষ্টিকুলে তাঁর তুলনাহীন সৃষ্টি নৈপুণ্যের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা সৃষ্টিলোকের প্রতি আতিপাতি করে খোঁজাখুজি করলেও কোথাও কোনো খুঁত, অসমাঞ্জস্য ও ত্রুটি দেখবে না। জীবন-মৃত্যুকে এ জগতে তোমাদের পরীক্ষার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে তাদের মধ্যে কারা সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করে নিতে পারেন।

৬ থেকে ১১নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সাথে কুফরি করার ভয়াবহ ও মারাত্মক পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন এবং জাহান্নামের আজাবের বর্ণনা দিয়ে, যেন তার বাস্তব চিত্রটি লোকদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

১২ থেকে ১৪নং আয়াতে আল্লাহভীরু লোকদের শুভ পরিণাম ও সাফল্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ যে সর্বজ্ঞাতা, ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সকল শ্রেণির কাজ ও কথা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা এবং আল্লাহর অন্তর্যামী হওয়ার কথাও তুলে ধরেছেন।

১৫ থেকে ২৩ নং আয়াতে আল্লাহভীরু মানুষের নিকট কম গুরুত্বপূর্ণ অথচ চিরন্তন ও শাশ্বত মহাসত্য তুলে ধরে স্বীয় অসীম ক্ষমতা, কুদরত ও সৃষ্টি-কৌশলের অবিসংবাদিত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে– এ ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-পৃষ্ঠকে আমি নরম ও চলনোপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। আকাশকে শূন্যলোকে ঝুলন্ত রেখেছি। বায়ুমণ্ডলকে বিহঙ্গকুলের উড্ডয়নের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তোমাদেরকে যদি আল্লাহ তা'আলা ভূমির তলদেশে ধ্বসিয়ে দেন, কংকর বর্ষণ করেন, তবে তোমাদের রক্ষা করার কে আছে? অতএব তোমরা সে মহাশক্তিধরের সম্মুখে অবনত হও, তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দাও, তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতা ও অধিকারকে মেনে নাও। ইতঃপূর্বে যারা তাঁকে স্বীকার করেনি, তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাকে মেনে নেয়নি, তাদের আমি [আল্লাহ] কঠোর শাস্তি দিয়েছি। আর আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের এমন কোনো সেনাবাহিনীও নেই, যারা আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। তিনি যদি তোমাদের জীবিকা ও জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের জীবিকা দান করার কেউ আছে কি? এ বাস্তব সত্যগুলোর প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে তোমাদের ঈমান আনা উচিত। বস্তুত আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। এসব কথার উদ্দেশ্য হলো নির্ভেজালরূপে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও আস্থাশীল হওয়া।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াত পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; কিন্তু সে সময়টা কখন তা বলা নবীর দায়িত্ব নয়; বরং ঐ সময়টি আগমনের সংবাদটি দেওয়াই হলো নবীর কাজ। সে সময়টির আগমন মুহূর্তটি জানিয়ে দেওয়ার যে দাবি তোমরা উত্থাপন করেছে, তা সম্পর্কে নবী ﷺ অবগত নন। সে নির্ঘাত মুহূর্তটি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত রয়েছেন। তা যখন তোমরা অবলোকন করবে, তখন তোমরা ভীতবিহ্বল, কম্পমান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

পরিশেষে ২৮-৩০নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা মক্কার মুশরিকদের সেসব অবাঞ্ছিত কথার জবাব দিয়েছেন, যা তারা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলত। তারা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি নানারূপ কটূক্তি ও গালাগাল করত এবং ঈমানদারদের ধ্বংস কামনা করত। এর জওয়াবে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে– নবী করীম ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ ধ্বংস হোন বা তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণার আশিসধারা বর্ষিত হোক, তাতে তোমাদের ভাগ্যের কোনোই পরিবর্তন হবে না। তোমাদের ব্যাপারটি তোমাদেরই চিন্তা করতে হবে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ হলে তোমাদের কেউই রক্ষা পাবে না। তোমরা ঈমানদারদেরকে ভ্রান্ত ভাবছ, কিন্তু আসলে কারা ভ্রান্ত, তা একদিন অবশ্যই উদ্ঘাটিত হবেই।

সূরাটির সর্বশেষে কাফিরদের কাছে এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এ ধূসর মরু ও পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে তোমাদের অন্যতম জীবনোপকরণ হলো পানি, সে পানি যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে বল তো তোমাদের জন্য কে সে সঞ্জীবনী সুরা এনে দিতে পারে?

সূরা তাহরীমের সাথে সূরা মুলকের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে রিসালাতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরাতে তাওহীদের কথা দলিল সহকারে পেশ করা হয়েছে এবং তাওহীদের দায়িত্বের ব্যাপারে ত্রুটি করলে তার পরিণতির কথাও পেশ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরাতে নেককার ও বদকার নারীদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে এ আলোচনাকে সাধারণ ও ব্যাপক করে তুলে ধরা হয়েছে।

বলা হয়েছে, এ সূরাটির সম্পর্ক রয়েছে সূরা আত্-তালাক্বের সাথে। সূরা আত্-তালাক্বে সপ্ত আকাশ ও জমিনের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরাতে তার উপর আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের কথা দলিল-প্রমাণসহকারে পেশ করা হয়েছে। এ মতে সূরা তাহরীম সূরা আত্-তালাক্বের অংশ বিশেষের মতো অথবা সূরা আত্-তালাক্বের সম্পূরক। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-মুলক মক্কায় অবতীর্ণ

ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً : ৩০ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. تَبٰرَكَ تَنَزَّهَ عَنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثِيْنَ الَّذِيْ بِيَدِهِ فِيْ تَصَرُّفِهِ الْمُلْكُ السُّلْطَانُ وَالْقُدْرَةُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

٢. الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْحَيٰوةَ فِي الْاٰخِرَةِ اَوْ هُمَا فِي الدُّنْيَا فَالنُّطْفَةُ تَعْرِضُ لَهَا الْحَيٰوةُ وَهِيَ مَا بِهِ الْاِحْسَاسُ وَالْمَوْتُ ضِدُّهَا اَوْ عَدَمُهَا قَوْلَانِ وَالْخَلْقُ عَلَى الثَّانِيْ بِمَعْنَى التَّقْدِيْرِ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ فِي الْحَيٰوةِ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط اَطْوَعُ لِلّٰهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ فِيْ اِنْتِقَامِهِ مِمَّنْ عَصَاهُ الْغَفُوْرُ لِمَنْ تَابَ اِلَيْهِ -

অনুবাদ :

১. তিনি মহিমান্বিত সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলি হতে পবিত্র যাঁর হস্তে করায়ত্তে সর্বময় কর্তৃত্ব রাজত্ব ও ক্ষমতা আর তিনি সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু পার্থিব জীবনে ও জীবন আখেরাতে, অথবা উভয়টিই ইহজগতে। যেমন, বীর্যের মধ্যে জীবন আসে, যা দ্বারা তাতে অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আর মৃত্যু তার বিপরীত কিংবা তা না থাকার নাম। এ সম্পর্কে দু'টি মতামত রয়েছে। আর خَلَقَ শব্দটি দ্বিতীয় মতের প্রেক্ষিতে تَقْدِيْر অর্থে পরিগণ্য। তোমাদেরকে পরীক্ষা করার নিমিত্তে পার্থিব জীবনে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক হতে উত্তম? আল্লাহ তা'আলার প্রতি অধিক আনুগত্যশীল। তিনি পরাক্রমশালী তাঁর সাথে অবাধ্যাচরণকারী হতে প্রতিশোধ গ্রহণে। ক্ষমাশীল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ : অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির একাধিপত্য এবং অবিমিশ্র সাম্রাজ্য যাঁর, যিনি সব কিছু করতে পারেন, তাঁর ক্ষমতা অসীম এবং অপার মহিমার অধিকারী তিনি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন– আয়াতের অনুবাদ হলো, সে আল্লাহর সত্তা বড়ই বরকতসম্পন্ন ও পবিত্র, যাঁর কুদরতি কবজায় সারা বিশ্বের কর্তৃত্ব রয়েছে, যাঁর হুকুমত ও বাদশাহী দুনিয়ার অপ্রকৃত বাদশা ও হাকিমগণের রাজত্বের ন্যায় ধ্বংসশীল নয় এবং অসম্পূর্ণও নয়; বরং তিনিই সকল বাদশা ও সম্রাটদের সম্রাট। যিনি সকল বস্তুর উপর সর্বদা পূর্ণঅধিকার বিস্তার করে আছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى تَبَارَكَ : تَبَارَكَ শব্দটি بَرَكَةٌ হতে مُشْتَقٌ হয়েছে, শব্দ গঠনের বিশেষ ধরনের কারণে এতে বিপুলতার অর্থ শামিল রয়েছে। অর্থাৎ উচ্চতরতা, বিরাটত্ব, বিপুলত্ব, প্রাচুর্য, স্থিতি এবং কল্যাণের ব্যাপকতা ও অশেষ ধারা এর অর্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ মা'আরেফ গ্রন্থকারের মতে, বৃদ্ধি হওয়া ও অতিরিক্ত হওয়া।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

تَبَارَكَ শব্দটি যখন আল্লাহর শানে বলা হবে তখন অর্থ হবে সর্বোত্তম, সর্ববৃহৎ সম্মানী বা মর্যাদাশীল এবং পবিত্র। যথা, আল্লাহু আকবর (اَللّٰهُ اَكْبَرُ)।

অথবা, এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা অসাধারণ, মহান ও বিরাট, স্বীয় সত্তার গুণাবলিতে ও কার্যাবলিতে তিনি অনন্য সাধারণ ও সকলের চাইতে অতুলনীয়ভাবে উচ্চতর। সীমাহীন কল্যাণের প্রস্রবণ তাঁর সত্তা হতে সদা প্রবহমান। সর্বদিকে তাঁর পূর্ণত্ব চিরন্তন ও শাশ্বত।

اَلْمُلْكُ শব্দের হাকিকত : بِيَدِهِ الْمُلْكُ শব্দের অর্থ হলো– রাজত্ব তাঁর হস্তে। اَلْمُلْكُ শব্দটি পবিত্র কালামের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তদ্রূপ يَدٌ শব্দকেও বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলার শানে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা শরীর ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং এরূপ শব্দসমূহ اٰيَاتٌ مُتَشَابِهَةٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আয়াতে মুতাশাবেহাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই কেবল ওয়াজিব।

আল্লাহর হস্ত ও চেহারা ইত্যাদির রূপরেখা ও হাকিকত সম্বন্ধে কারো কোনো কিছুই জানা নেই। আর সে বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগা শরিয়তের বিধান মতেও জায়েজ নয়। অতএব اَلْمُلْكُ শব্দটিকে সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। اَلْمُلْكُ-এর এক অর্থ আসমান-জমিন ও দুনিয়া-আখেরাতের হুকুমত বা সমগ্র সৃষ্টিলোকের ও বিশ্ব নিখিলের উপর রাজকীয় সার্বভৌমত্ব এবং নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব তাঁর কুদরতী হস্তে নিবদ্ধ। –[মা'আরিফ]

জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টিতত্ত্ব : মানবকুলের জীবন ও মৃত্যুর অব্যাহত ধারাটি আল্লাহরই সৃষ্টিকৃত একটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। মানবকুলের জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পিছনে আল্লাহর বিশেষ একটি উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল। মানব সৃষ্টির পিছনে যেমন আল্লাহর একটি উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তেমনি রয়েছে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির পিছনে একটি মহান উদ্দেশ্য। আর তাহলো কারা এ পার্থিব জগতে কর্মে সৎ ও সুন্দর হয় এবং কারা কর্মে দুষ্ট ও অসুন্দর প্রমাণিত হয়, তা পরীক্ষা করা। মানুষের জড় দেহটি হচ্ছে এ জাগতিক জীবনে আত্মার বিচরণ ও অবস্থানের একটি বাহন মাত্র। এ বাহন সৃষ্টির পূর্বে আত্মার ক্রিয়াশীলতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং দেহটিকে আত্মার ক্রিয়াশীলতার বাহন সৃষ্টি করে তাকেই হায়াত বা জীবন নামকরণ করা হয়েছে। আর আত্মা যখন এ বাহন ছেড়ে চলে যায়, তখনকার অবস্থাটিকে নাম দেওয়া হয়েছে মৃত্যু। কারণ আত্মার ক্রিয়াশীলতার কোনো বাহন বা অস্তিত্ব নেই; সুতরাং তা-ই মৃত্যুবৎ অবস্থা।

আয়াতে মাউত শব্দটি হায়াত শব্দের পূর্বে উল্লেখ করে আত্মার প্রথমত বাহনহীন ও অস্তিত্বহীনতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাথে সাথে এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, জীবনদানকারী ও মৃত্যুদানকারী একমাত্র আল্লাহই। তিনি ব্যতীত আর কেউ এ অবস্থা ঘটাতে পারে না। আর প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে ভালো কাজ করার এবং খারাপ কাজ করার উপাদান বর্তমান তাও ইঙ্গিতে বুঝা যায়। সূরা আশ-শামসের ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে– "আমি তাদের মধ্যে ভালো ও খারাপের উপাদান রেখে দিয়েছি।" সুতরাং এ সৎ স্বভাব ও অসৎ স্বভাবের সমন্বয়ে গঠিত মানুষের মধ্যে কারা ভালো ও উত্তম কাজ করে, তাও পরীক্ষা করা জীবন ও মৃত্যুদানের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া ভালো ও মন্দের মাপকাঠি নির্ধারণকর্তা যে পরীক্ষার্থী নিজে নয়, বরং আল্লাহ, এখানে তাও বুঝা যায়। অতএব কোনটি ভালো ও কোনটি খারাপ কাজ তা পরীক্ষার্থীগণের পূর্বাহ্নে জেনে নেওয়া আবশ্যক। উক্ত আয়াতে সর্বশেষে যে তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে, তা হলো পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া-নাহওয়া অনুপাতেই প্রতিফল নির্ধারণ হবে। ভালো কাজ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শুভ প্রতিফল এবং খারাপ কাজ করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে খারাপ প্রতিফল ভোগ করবে, এটাই পরীক্ষার দাবি। কেননা প্রতিদান না দেওয়া হলে পরীক্ষা-ই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

হায়াত ও মউতের অবস্থান বিভিন্নতর : তাফসীরে মাযহারী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর মহাকুদরত ও হিকমতের দ্বারা সৃষ্টিজগতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার সৃষ্টির হায়াতও বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। এর মধ্যে সবচাইতে পরিপূর্ণ জীবন মানবজাতিকেই প্রদান করেছেন। আর মানবজাতির হায়াতের মধ্যে এমন ক্ষমতাও প্রদান করেছেন যে, তারা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হয়। আর এ অভিজ্ঞতাই مُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ হওয়ার কারণ হয়েছে এবং এটাই আল্লাহ তা'আলার আমানতপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বিশেষ কারণ হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন– إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الخ - আর এ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির কারণেই তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ হায়াত এসেছে, সে হায়াতের বিপরীত হলো এমন মৃত্যু যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– (اَلْاٰيَةَ) اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ - উক্ত আয়াতে কাফেরকে মৃত এবং মু'মিনকে জীবিত বলা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, কাফের কি মৃতব্যক্তির সমান ছিল না? অতঃপর আমি তাকে জীবন দান করেছি, অর্থাৎ ঈমান নসিবের মাধ্যমে জীবিত করেছি। কাফের ব্যক্তি নিজ পরিচয় গ্রহণ করার অনুভূতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে, যা মানুষের বিশেষ হায়াত হিসেবে পরিগণিত ছিল। এটা হলো প্রথম প্রকারের হায়াত।

২. কিছু সংখ্যক মাখলুকাতের মধ্যে এরূপ হায়াত বিদ্যমান নেই। কিন্তু (حِسٌّ وَحَرَكَتٌ) অনুভূতি রয়েছে। এ প্রকার হায়াতের বিপরীতমুখী মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ الخ - উক্ত আয়াতে হায়াত অর্থ حِسٌّ وَحَرَكَتٌ আর মৃত্যু বলে সে حِسٌّ وَحَرَكَتٌ বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটা দ্বিতীয় প্রকারের হায়াত।

৩. আর কিছু সংখ্যক সৃষ্টির মধ্যে উক্ত (حِسّ وَحَرَكَتْ) অনুভূতিশক্তিও বিদ্যমান নেই, বরং (نُمُو) বৃদ্ধি ক্ষমতা রয়েছে। যেমন– সাধারণ উদ্ভিদজগৎ ও গাছপালা ইত্যাদির জীবন, এ জীবনের বিপরীত যে মৃত্যু রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ – হায়াত -এর এটি তৃতীয় প্রকার। এ তিন প্রকারের হায়াত কেবল মানুষ, জানোয়ার ও উদ্ভিদজগতের মধ্যে সীমিত রয়েছে। অন্যান্য সৃষ্টিজগতের মধ্যে এরূপ হায়াত দেওয়া হয়নি। তাই আল্লাহ তা'আলা পাথর দ্বারা তৈরিকৃত মূর্তিসমূহ সম্পর্কে বলেছেন اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ এতৎসত্ত্বেও পাথরসমূহের মধ্যে এক প্রকার হায়াত রয়েছে যা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ জাতীয় হায়াতের اثر। রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অর্থাৎ এমন কোনো বস্তু নেই যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ সম্বন্ধে অবগত নও। –[মা'আরিফ, মাযহারী]

হায়াত মৃত্যুর অগ্রে, তথাপিও হায়াত -এর পূর্বে মৃত্যুকে উল্লেখ করার কারণ : এর কয়েকটি কারণ হতে পারে :

১. মূলগত দিক থেকে বিবেচনা করলে মৃত্যুই مُقَدَّمْ এবং হায়াত مُؤَخَّرْ হবে। কেননা যে সকল জীবজন্তু বা বস্তু ইত্যাদির যখন অস্তিত্ব হয়েছে, তখন এর পূর্বে তা মৃত্যুর কবলে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর তাতে হায়াত এসেছে। তাই মৃত্যুকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হায়াতকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অথবা, মৃত্যু ও হায়াতের সৃষ্টির কারণ মানুষকে পরীক্ষা করা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا এ পরীক্ষা হায়াতের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক পরিমাণে রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুকে উপস্থিত মনে করবে, সে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে নেক আমল করতে আগ্রহী হবে। যদিও এ পরীক্ষা তারা অধিক পরিমাণে বাঁচার আশায়ও করা সম্ভব। তথাপিও মৃত্যুর চিন্তায় মূলত নিজ নেক আমলসমূহের মধ্যে খুবই উন্নতি লাভ হয় এবং সে আমল খুবই مُؤَثِّرْ হয়ে থাকে।

হযরত আমের ইবনে ইয়াসির (রা.) বলেন– كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا وَكَفٰى بِالْيَقِيْنِ غِنًى অর্থাৎ 'উপদেশ গ্রহণের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট আর তুষ্ট হওয়ার জন্য একিনই যথেষ্ট।' সুতরাং নিজের আপনজন ও প্রিয়তমদের মৃত্যুর মোশাহাদাহ সর্ববৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। যে ব্যক্তি তাতে مُتَاَثِّرْ হয় না সে ব্যক্তি অন্যের মাধ্যমে مُتَاَثِّرْ হওয়া বড়োই মুশকিল। আর যাকে আল্লাহ ঈমান ও একিনের ন্যায় দৌলত দান করেছেন, তার সমকক্ষ কোনো বৃহৎ ধনী ব্যক্তি হতে পারে না।

হযরত আনাস ইবনে রবী' (রা.) বলেন, মৃত্যু মানুষকে দুনিয়া হতে বিমুখ এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানে খুবই কার্যকর। এ জন্য মৃত্যুকে হায়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা মানুষকে যেহেতু نُطْفَه হতে সৃষ্টি করা হয় এবং نُطْفَه মৃতবৎ আর نُطْفَه সন্তানের জন্মের উপায়, এ কারণে مَوْت -কে مُقَدَّمْ ও হায়াতকে مُؤَخَّرْ করা হয়েছে।

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا বাক্যে اَحْسَنُ عَمَلًا -এর অর্থ : اَحْسَنُ عَمَلًا বা উত্তম আমল কে করেছে, তা আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করে দেখবেন। উত্তম আমলের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ খালেস এবং সঠিক আমল। কেননা কোনো আমল আল্লাহর জন্য খালেস এবং রাসূলের সুন্নতের পন্থায় সঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হবে না। কেউ কেউ বলেন, اَحْسَنُ عَمَلًا -এর অর্থ হচ্ছে– আকলের সাথে আমল করা। কেননা যার জ্ঞান সঠিক থাকে সে ব্যক্তিই ভালোভাবে আমল করতে পারে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো "তোমাদের মাঝে দুনিয়া থেকে কে বেশি বিমুখ।" কেননা দুনিয়াকে ত্যাগ না করলে উত্তম কাজ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। –[কাবীর]

মৃত্যু হওয়া সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের মতামত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কালবী এবং মুকাতিলের মতে, মৃত্যু একটি দেহ বা শরীর বিশিষ্ট। অতএব মৃত্যুর অস্তিত্ব রয়েছে। এমনিভাবে حَيَاةْ তথা জীবনেরও অস্তিত্ব রয়েছে। একটির উপস্থিতিতে অন্যটি অনুপস্থিত থাকে।

কারো মতে مَوْت [মৃত্যু] حَيَاةْ [জীবন] না থাকাকে বলা হয়। হায়াতবিহীন রূহশূন্য অবস্থাকে مَوْت বা মৃত্যু বলা হয়ে থাকে। এর 'দেহবিশিষ্ট' হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, مَوْت একটি গুণ, যার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু حِسّ وَحَرَكَتْ -এর আওতায় আনা যায় না। যেমন, গরম ও ঠাণ্ডা। –[পার্শ্বটীকা জালালাইন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣. الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ مَمَاسَّةٍ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ لَهُنَّ وَلَا لِغَيْرِهِنَّ مِنْ تَفٰوُتٍ ط تَبَايُنٍ وَعَدَمِ تَنَاسُبٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ اَعِدْهُ اِلَى السَّمَاءِ هَلْ تَرٰى فِيْهَا مِنْ فُطُوْرٍ صُدُوْعٍ وَشُقُوْقٍ.

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশকে স্তরে স্তরে একটির উপর অপরটিকে, যা-পরস্পর মিলিত নয়। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে দেখবে না আকাশমণ্ডলী ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টির মধ্যে কোনোরূপ ব্যতিক্রম বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি। পুনরায় তাকিয়ে দেখ পুনর্বার আকাশের প্রতি তুমি কি দেখতে পাও? তাতে কোনো রূপ ত্রুটি ফাটল ও ভাঙ্গন।

٤. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ يَنْقَلِبْ يَرْجِعْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا ذَلِيْلًا لِعَدَمِ اِدْرَاكِ خَلَلٍ وَّهُوَ حَسِيْرٌ مُنْقَطِعٌ عَنْ رُؤْيَةِ خَلَلٍ.

৪. অতঃপর তুমি বারংবার দৃষ্টি ফেরাও পুনঃ পুনঃ ফিরে আসবে প্রত্যাবর্তন করবে তোমার প্রতি সে দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে বিফল হয়ে, কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি না পেয়ে ক্লান্ত অবস্থায় ত্রুটি-বিচ্যুতি না দেখার কারণে অবসাদগ্রস্ত হয়ে।

٥. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا الْقُرْبٰى اِلَى الْاَرْضِ بِمَصَابِيْحَ بِنُجُوْمٍ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا مَرَاجِمَ لِلشَّيٰطِيْنِ اِذَا اسْتَرَقُوا السَّمْعَ بِاَنْ يَنْفَصِلَ شِهَابٌ عَنِ الْكَوْكَبِ كَالْقَبَسِ يُؤْخَذُ مِنَ النَّارِ فَيَقْتُلَ الْجِنِّىْ اَوْ يَخْبِلَهُ لَا اِنَّ الْكَوْكَبَ يَزُوْلُ عَنْ مَكَانِهِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ النَّارِ الْمُوْقَدَةِ.

৫. আমি অবশ্যই সুশোভিত করেছি দুনিয়ার আকাশকে জমিন হতে নিকটবর্তী। প্রদীপমালা দ্বারা তারকাপুঞ্জ দ্বারা। এবং আমি তাদেরকে করেছি নিক্ষেপের উপকরণ নিক্ষেপ করার উপকরণ শয়তানের জন্য যখন সে চুপিসারে শুনার অপচেষ্টা করে। তখন নক্ষত্র হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় একখণ্ড ছুটে শয়তানকে ভস্ম করে দেয়, কিংবা তাকে অনুভূতিহীন করে দেয়। এটা নয় যে, নক্ষত্ররাজি স্বীয় অবস্থান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি প্রজ্বলিত অগ্নি।

তাহকীক ও তারকীব

كَرَّتَيْنِ শব্দের অর্থ এবং তারকীবে তার অবস্থান : এখানে كَرَّتَيْنِ শব্দটি مَصْدَرٌ -এর স্থলে অবস্থিত। সুতরাং مَنْصُوْب হয়েছে। কারণ তার অর্থ হলো বারবার, একের পর এক দৃষ্টি ফেরাও। -[কুরতুবী]

বারবার দৃষ্টি ফেরাতে বলার কারণ হলো, একবার দেখলে কোনো বস্তুর দোষগুণ বিচার করা যায় না, আর বারবার দেখলে তার দোষগুণ দৃষ্টিগোচর হয়।

مِنْ تَفَاوُتٍ বাক্যে অবতীর্ণ কেরাতদ্বয় : জমহুর تَفَاوُتٍ শব্দটি فَاء -এর পরে আলিফ দিয়ে পড়েছেন। ইবনে মাসউদ, হামযা এবং কিসায়ী এ শব্দটিকে تَفَوُّتٍ তথা وَاو বর্ণে تَشْدِيْد দিয়ে পড়েছেন। দুই قِرَاءَة -এর একই অর্থ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا : অর্থাৎ আল্লাহ তিনিই, যিনি সাতটি আসমানকে পরস্পর উপর-নিচ করে তৈরি করেছেন এবং একটি অপরটি হতে বহুদূরে রেখেছেন। যথা হাদীস শরীফে রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, একটি আসমানের পর অপরটি আসমান পর্যন্ত বহু দূর-দূরান্তের দূরত্ব বিরাজমান রয়েছে। অতঃপর আরেকটি আসমান এভাবে ৭টি আসমান বিদ্যমান রয়েছে। মাদারেক গ্রন্থকার বলেন- طِبَاقًا অর্থ- طَبَقًا عَلٰى مُطَابَقَةً بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ مِنْ طَابِقِ النَّعْلِ اِذَا خَصَفَهَا طَبَقٍ اَوْ عَلٰى خَرَاتِ طِبَاقٍ اَوْ عَلٰى طُوْبِقَتْ طِبَاقًا - দু'টি আসামানের মাঝে শূন্যস্থান বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর মি'রাজ গমনের ঘটনাটিও প্রমাণস্বরূপ পেশ করার যোগ্য, অর্থাৎ তিনি একটি আসমান হতে অপর আসমানের দিকে পরিভ্রমণ করেছেন।

অপরাপর হাদীসসমূহ দ্বারা এও জানা যায় যে, দু'টি আসমানের মধ্যকার শূন্যস্থানটুকু ৫০০ (পাঁচশত) বছরের রাস্তা। কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে, দু'টি আসমানের মধ্যকার প্রভেদ নেই; বরং সকল আসমানই সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, طِبَاقًا অর্থ একটি স্তরের পর আরেকটি স্তরবিশিষ্ট ৭টি আসমান।

قَالَ الْبِقَاعِىُّ بِحَيْثُ يَكُوْنُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا مُطَابِقًا لِلْجُزْءِ مِنَ الْاُخْرٰى وَلَا يَكُوْنُ جُزْءٌ مِنْهَا خَارِجًا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ وَهِىَ لَا تَكُوْنُ كَذٰلِكَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ كُرَةً وَالسَّمَاءُ الدُّنْيَا مُحِيْطَةٌ بِهَا اِحَاطَةَ قِشْرِ الْبَيْضَةِ مِنْ جَمِيْعِ الْجَوَانِبِ وَالثَّانِيَةُ مُحِيْطَةٌ بِالدُّنْيَا وَهٰكَذَا اِلٰى اَنْ يَكُوْنَ الْعَرْشُ مُحِيْطًا بِالْكُلِّ وَالْكُرْسِىُّ الَّذِىْ هُوَ اَقْرَبُ بِهَا بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِىْ فَلَاةٍ فَمَا ظَنُّكَ بِمَا تَحْتَهُ وَكُلُّ سَمَاءٍ فِى الَّتِىْ فَوْقَهَا بِهٰذِهِ النِّسْبَةِ. وَقَدْ قَرَّرَ اَهْلُ الْهَيْئَةِ اَنَّهَا كَذٰلِكَ وَلَيْسَ فِى الشَّرْعِ مَا يُخَالِفُهُ بَلْ ظَوَاهِرُهُ تُوَافِقُهُ. (ج)

কি বস্তু দ্বারা সাত আসমান তৈরি হয়েছে : আল্লামা বাগাবী (র.) কা'বে আহবার (র.)-এর কথার উক্তির বরাতে বলেছেন যে, পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমান মেঘমালার ঢেউয়ের জমাট আস্তরণে নির্মিত। দ্বিতীয় আসমান হলো সাদা জমরদ পাথরের, তৃতীয় আসমান হলো লৌহনির্মিত, চতুর্থ আসমান পিতলের নির্মিত, পঞ্চম আসমান রৌপ্যনির্মিত, ষষ্ঠ আসমান স্বর্ণনির্মিত, আর সপ্তম আসমান লালবর্ণের ইয়াকূত পাথরে নির্মিত। -[নূরুল কোরআন]

সৃষ্টিলোকের সামঞ্জস্যশীলতা : এ বিশ্বলোক ও মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি মহাপরিকল্পনা মাফিক বিরতি এবং একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানের অধীনে পরিচালিত। বিশ্বলোকের সব কিছু সঠিক ও সমাঞ্জস্যশীল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোথাও কোনো অমিল ও অসামঞ্জস্য নেই। এটার প্রতিটি গ্রন্থি ও বাঁধন যেন যথাযথ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিশ্বলোক ও মহাবিশ্ব ব্যবস্থাটিকে আমরা একটি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনশীল মেশিনের সাথে তুলনা করতে পারি। মেশিনটি যেমন নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সঠিক ও সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করা হয়। কোথাও কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি, অমিল বা সামঞ্জস্যহীনতা থাকলে বা ফাটল থাকলে মেশিনটি অচল হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবেই সৃষ্টিলোকের কোথাও অমিল-অসঙ্গতি থাকলে, সৃষ্টিলোক সঠিকভাবে বাঁধাধরা নিয়মে আবহমানকাল ধরে চলতে পারত না। অবশ্যই কোনো এক সময় বিকল ও অচল হয়ে পড়ত। দিবা-রাত্রির আবর্তন, সূর্যের উদয় ও অস্তমিত হওয়া, চন্দ্র ও নক্ষত্রকুলের আলোক দান, যথাযথ নিয়মে বায়ুর প্রবাহ ও গতিশীলতা, স্থান ও অঞ্চল উপযোগী তাপমাত্রা উর্ধ্ব-নিম্ন হওয়া, বৃক্ষ-তরুলতা ও উদ্ভিদজগতের আগমন, নির্গমন, জন্ম ও বিলুপ্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকালে সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, এ সৃষ্টিলোকের কোথাও কোনো ত্রুটি, খুঁত ও ফাটল নেই। সর্বত্রই সুসামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বিরাজমান। উপরিউক্ত ৩নং আয়াতে "তোমরা মহাদয়াবানের সৃষ্টিলোকে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবে না।" কথা দ্বারা বিশ্বলোকের মহাশক্তিমানের নিখুঁত সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কথাই বলা হয়েছে। تَفٰوُتٍ শব্দটির অর্থ হলো-অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, একটি অন্যটির সাথে মিল না হওয়া, খাপ না খাওয়া। সুতরাং মূলকথা হলো, সৃষ্টিলোককে তোমরা অবিন্যস্ত, অমিল, বেমানান ও বেখাপ্পা দেখতে পাবে না সবকিছু একটি ধারাবাহিক নিয়মে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা দ্বারা মহাশক্তিধর আল্লাহর সীমাহীন কুদরত, ক্ষমতা ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যতার স্বীকৃতি কামনা করে আল্লাহর একত্বতা ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার সম্মুখে মস্তক অবনত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, পুনরায় লক্ষ্য করে দেখ, এ বিশাল সৃষ্টির মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র ও ফাটল রয়েছে কি? নিখিল সৃষ্টির প্রত্যেক কিছুই একই আইন, একই নিয়ম-শৃঙ্খলা ও একই নিয়ন্ত্রণসূত্রে গ্রথিত রয়েছে। প্রত্যেকটি সৃষ্টি যেমনই চাই তেমনি হয়েছে।

আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) বলেন- فَارْجِعِ الْبَصَرَ الخ আয়াত অংশ পড়তে গিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ বারবার আল্লাহর সকল সৃষ্টি ও আসমানের দিকে লক্ষ্য করেছি এবং আয়াতে যে কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। সৃষ্টিকুলের সকল জীবজন্তু ও বস্তুজগতের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টি কার্যের যথেষ্ট সামঞ্জস্য বিরাজ করছে।

মাদারেক গ্রন্থকার এ আয়াতের তাফসীর লিখেছেন এভাবে فَارْجِعِ الْبَصَرَ اَيْ رُدَّهُ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى يَصِحَّ عِنْدَكَ مَا اُخْبِرْتُ بِهِ بِالْمُعَايَنَةِ فَلَا تَبْقٰى مَعَكَ شُبْهَةٌ فِيْهِ অর্থাৎ তুমি তোমার দৃষ্টিকে আসমানের দিকে নিক্ষেপ করো, তবে দেখতে পাবে যে আল্লাহর এ কথাটি বাস্তবে সম্পূর্ণ সত্য এবং তোমার কোনো সন্দেহ থাকবে না যে, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনোরূপ তারতম্য নেই। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথা আরও তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ .....حَسِيْرٌ : অর্থাৎ উপরের দিকে আবারও বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, কোথাও কোনো খুঁত পরিলক্ষিত হয় কিনা? কারণ এক-আধবার দেখায় ভুলের সম্ভাবনা থাকতে পারে, সুতরাং তন্ন তন্ন করে দেখ, তখন তোমার (দর্শকের) চোখ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্তও তাঁর সৃষ্টিতে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবে না। তুমি দেখতে পাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। যেমন ইচ্ছা তেমন তৈরি করতে তিনি সক্ষম। অথচ কোটি কোটি বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে তবুও সৃষ্টি নিখুঁত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে বলেছেন, اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَ زَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ অর্থাৎ তারা কি লক্ষ্য করেনি আকাশের প্রতি যে, আমি তাদের মাথার উপর এটা কেমন কুদরত খাটিয়ে বানিয়েছি। কেমন সৌন্দর্যময় করেছি, অথচ তার কোথাও কোনো একটি সুড়ঙ্গও নেই। -[মা'আরেফ, তাহেরী]

كَرَّتَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য : প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আয়াতে كَرَّتَيْنِ শব্দের মূল অর্থ (দ্বিবচন শব্দ হিসেবে) দু'বার; কিন্তু এখানে দু'বারের অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং এটা দ্বারা تَكْثِيْر [বহুবার] উদ্দেশ্য করা হয়েছে। يَعْنِيْ لَا بِتَاتَيَانِ بِنَظْرَتَيْنِ وَلَاثَلْثٍ وَاَمَّا الْمَعْنٰى كَرَّاتٌ এটা لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ -এর অনুরূপ শব্দ। তবে এ অর্থে মূল আয়াতের তারতম্যও হবে না; বরং সঠিক হবে। কেননা কায়দা রয়েছে- وَالتَّثْنِيَةُ قَدْ تُفِيْدُ التَّكْثِيْرَ অর্থাৎ দ্বিবচন শব্দ কখনও আধিক্যের অর্থ প্রদান করে থাকে। হযরত ইবনে আতিয়্যাহ (র.) বলেন, كَرَّتَيْنِ مَعْنَاهُ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ كَرَّتَيْنِ শব্দটি مَرَّتَيْنِ অর্থে ব্যবহৃত। আর كَرَّتَيْنِ শব্দটি مَصْدَرٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। যদি দু'বার তাকানোর অর্থ হয় তবে কারো কারো মতে, প্রথম দৃষ্টি আসমানের সৌন্দর্য ও মসৃণতা দেখার জন্য, আর দ্বিতীয় দৃষ্টি তারকারাজি ইত্যাদির গতিপথ লক্ষ্য করার জন্য। -[জামাল]

قَوْلُهُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ : خَاسِئًا - শব্দটি ذَلِيْلًا অর্থে এবং حَسِيْرٌ শব্দটি مُنْقَطِعٌ عَنْ رُؤْيَةِ خَلَلٍ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। -[জালালাইন গ্রন্থকার]

اَلْبَصَرُ-কে বারবার উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে بَصَرٌ শব্দটি তিনবার উল্লিখিত হয়েছে। এর কারণ নিম্নরূপ-

১. প্রথমবার লক্ষ্য করার যে আদেশ রয়েছে, তা হলো সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, কেননা তারা কোনো সৃষ্টির প্রকাশ্য রূপ দেখেই তার স্রষ্টার গুণের উপর আস্থা স্থাপন করে।

২. দ্বিতীয়বার ইরশাদ হয়েছে- ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ এবারের আদেশ হলো সেসব লোকদের জন্য, যারা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য লক্ষ্য করে এ সত্য উপলব্ধি করে যে, এর চেয়ে উত্তম কিছু সম্ভব নয়।

৩. আর তৃতীয়বার ইরশাদ হয়েছে- يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ একথা বলা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে বিশেষ নৈকট্যধন্য। যারা আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে শুধু যে তার পরাক্রমশালী হওয়ার কথা বিশ্বাস করে তা-ই নয়; বরং নিজেদের ক্ষমতা এবং অজ্ঞানতা স্বীকার করে দরবারে এলাহীতে বিনয় প্রকাশ করেন। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا .... عَذَابَ السَّعِيْرِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত করে দিয়েছি। আর সে তারকারাজিকে শয়তানের জন্য বিতাড়নী হিসেবে বানিয়েছি। অর্থাৎ তাদের মারণাস্ত্র হিসেবে কিছুসংখ্যক তারকা সাজিয়ে রেখেছি। ফেরেশতারা তা দ্বারা শয়তানদেরকে তখনই আঘাত করেন, যখন শয়তানের দল আকাশের পথে অগ্রসর হতে চায় এবং আল্লাহর বিশেষ গোপনীয় বিষয়াদির সম্পর্কে জানতে চায়। এ দ্রুতগমনশীল উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ব্যবস্থা দ্বারাই কেবল শয়তানকে ক্ষতবিক্ষত করাই যথেষ্ট শাস্তি নয়, বরং রোজ কিয়ামতেও তাদের জন্য কঠোর শাস্তির সুব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত مَصَابِيْحَ দ্বারা তারকারাজি উদ্দেশ্য। مَصَابِيْحَ -এর মূল অর্থ ছিল চেরাগসমূহ। সুতরাং মাদারেক গ্রন্থকার বলেন, এটার অর্থ- চেরাগসমূহ। ভূ-পৃষ্ঠের নিকটতম আকাশকে তারকা দ্বারা সুসজ্জিত করার জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তারকা আসমানের সাথে সম্মিলিত হবে; বরং তারকাগুলো আসমানের বহু নিচে খোলা জায়গায় হওয়াই যথেষ্ট। -[মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ : শয়তানকে বিতাড়নের জন্য তারকারাজি অঙ্গার হিসেবে তৈরি করার অর্থ এই হতে পারে যে, তারকারাজি হতে অগ্নিমূলের কোনো কিছু শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তারকা তখন নিজ স্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে শয়তানকে নিক্ষিপ্ত উল্কাপিণ্ড স্বীয় স্থান হতে সরে পড়ে, তাই আরবিতে এ অবস্থাকে اِنْقِضَاضُ الْكَوَاكِبِ বলা হয়। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এটাতে আরও একটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শয়তানের দল যখন আকাশের সংবাদ চুরি করার জন্য ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে গমন করতে থাকে, তখন তাদেরকে তারকারাজি থেকে বহু দূরে থাকতেই বিতাড়িত করে দেওয়া হয়। -[কুরতুবী]

মাদারেক গ্রন্থকার বলেন- رُجُوْم শব্দটি رَجْمٌ শব্দের বহুবচন, এটা مَصْدَرٌ অর্থাৎ مَا يُرْجَمُ بِهٖ যা দ্বারা رَجْم করা হয়। শয়তানকে বিতাড়নের জন্য এটা এক প্রকার উল্কাপিণ্ড বা বিধ্বংসী যন্ত্রবিশেষ। এ উল্কাপিণ্ড দ্বারা তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়। সুতরাং কোনো শয়তান শেষ পর্যন্ত আসমানের গুপ্ত সংবাদ শুনতে সক্ষম হয় না।

আধুনিক মতের অনুসারীগণ বলেন, বর্তমানযুগে এ উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে বহু তথ্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আজও এ বিষয়ে কেউ পৌঁছতে পারেনি। তথাপিও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণকারীগণ যে তথ্যে উপনীত হয়েছেন, তা হলো এ সব উল্কা কোনো গ্রহে বিস্ফোরণ সৃষ্টি হওয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাশূন্যে আবর্তিত হতে থাকে। পরে কোনো এক সময় পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ পরিমণ্ডলের মধ্যে এসে পড়ার ফলে তা পৃথিবীর উপর নিপতিত হয়। এটাই সর্বাধিক জনপ্রিয় মত হিসেবে বিবেচিত।

তারকাগুলোকে مَصَابِيْح -এর সাথে তাশবীহ দান ও তারকারাজি দ্বারা আসমানকে সুশোভিত করার হেকমত :

১. বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ তা'আলা এ কুরআন নাজিল করেছেন। সুতরাং যেরূপ উদাহরণের মাধ্যমে জগতবাসী তার বিষয়বস্তুসমূহ বুঝতে সহজ হয়, সেরূপ উদাহরণ দ্বারা কুরআন অবতীর্ণ করাই আল্লাহ উত্তম মনে করেছেন। এ কারণেই এখানে বুঝার সুবিধার্থে তারকাগুলোকে বাতির সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

২. আর মানুষ দুনিয়াতে মসজিদসমূহকে যেভাবে বাতি দ্বারা সাজিয়ে সৌন্দর্যময় করে তোলে, সেভাবেই আল্লাহ তা'আলা আসমানকেও তারাকা দ্বারা সৌন্দর্যময় করেছেন। সেভাবেই আসমান দুনিয়ার ছাদ স্বরূপ, যেভাবে ঘরের চাল তার ছাদস্বরূপ।

৩. তারকাগুলো যদিও মূলে বাতি নয়, কিন্তু আমাদের নজরে সচরাচর সেগুলো বাতির অনুরূপ দেখা যায়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তারকাগুলোকে বাতির সাথে সাদৃশ্য দান করেছেন।

ক. মহান রাব্বুল আলামীন যতকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো সবই অপরূপ গুণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। এত বিরাট আসমান যদি খালি রেখে দেওয়া হতো তবে এটা তেমন সুন্দর দেখাত না। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর খচিত সৌন্দর্য যে কত সীমাহীন ও মানব রচিত সৌন্দর্যসমূহ হতে যে তাঁর খচিত সৌন্দর্য অতুলনীয় রূপরেখার অধিকারী, তা বুঝানোর জন্য এ মহা আসমানকে সৌন্দর্যময় করেছেন এবং প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন, যা মানুষের কল্পনার বাইরে, আর কিভাবে কি জিনিস দ্বারা এত সুন্দর নকশা করেছেন কিয়ামত পর্যন্তও মানুষ এটা যেন বুঝে কুল করতে সক্ষম না হয়। আর এ কুদরতের ফেরেশতার প্রতি লক্ষ্য করে মানুষ যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

খ. অপর দিকে যদি আকাশে রাতের বেলায় এ তারকাগুলোর মাধ্যমে আকাশকে এমনিভাবে উজ্জ্বল ও সুশোভিত করা না হতো তবে মানুষের পক্ষে রাতের বেলা চলাফেরা করা কখনও সম্ভবপর হতো না, ঘন অন্ধকারে সারা জগৎ নিমজ্জিত হয়ে থাকত। জগৎবাসী অন্ধকার রাতে হাবুডুব খেতে থাকত।

গ. দিক-দর্শনের জন্যও তারকাগুলো বিশেষ কার্য করে থাকে। বহুকাল অতীত থেকেই সাগরে পরিভ্রমণকারীগণ এ তারকাগুলোর মাধ্যমে দিক নির্ণয় করে থাকে। যদি তারকা না থাকত মানুষ তখন সাগরে ডুবে মরত।

ঘ. শয়তানকে দগ্ধ করার জন্য যে তারকারাজি সৃষ্টি করা হয়েছে এ বিষয়টি তো আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং সে বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ফায়দা : কথিত আছে যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যখন মসজিদে এশার নামাজ আদায় করতে যেতেন, তখন মসজিদে শুকনো খেজুর পাতায় নির্মিত একপ্রকার বাতি জ্বালাতেন। যখন হযরত তামীমুদ্দারী (রা.) মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন ক্যাণ্ডেল [মোমবাতি] ও যয়তুনের তেল ব্যবহার করতে শুরু করলেন, অর্থাৎ মসজিদের চতুর্দিকে তা জ্বালাতে শুরু করলেন। এটা দেখে রাসূলাল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, نَوَّرْتَ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ তুমি যেহেতু মসজিদকে নূরান্বিত করেছ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও নূরান্বিত করুন, আর যদি আমার একটি মেয়ে থাকত তবে তাকে তোমার নিকট বিবাহ দান করতাম।

হযরত ওমর (রা) হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর তারাবীহের নামাজ পড়া অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখে অধিক পরিমাণে বাতির ব্যবস্থা করেন। এটা দেখে হযরত আলী (রা.) হযরত ওমর (রা)-কে দোয়া করেন এবং বলেন-

نَوَّرْتَ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ قَبْرَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ـ (رُوْح)

এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা সম্ভাব্য পরিমাণে জায়েজ ও উত্তম।

আর এ আয়াতে খুব সূক্ষ্মভাবে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ বলেছেন, যেভাবে আকাশকে তারকাপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি, তোমরাও সেভাবে মসজিদকে সুশোভিত করো।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۤءَ الخ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি বর্ণনা দিয়েছেন। তা এই যে, সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে থাকেন। তবে সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে কিছুই বাড়িয়ে জানান না, আর যদি কোনো আয়াতে এ সম্পর্কে কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়, তবে তাও খুব গোলমালভাবেই বর্ণনা করা হয়। আর তা اَهْلِ عِلْم ও اَرْبَابِ نَظَر -এর জন্য বর্ণনা করে দেওয়া থাকে। কারণ সাধারণ লোকের حَقِيْقَتِ اَشْيَاء সম্বন্ধে অবগত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাই اَهْلِ عِلْم গণের উদ্দেশ্যেই অত্র আয়াতে زِيْنَتِ سَمَاء ও خِلْقَتِ نُجُوْم সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ :

٦. وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ هِيَ.

৬. আর যারা অবাধ্যাচরণ করে তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল তা।

٧. إِذَآ أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا صَوْتًا مُنْكَرًا كَصَوْتِ الْحِمَارِ وَهِيَ تَفُوْرُ تَغْلِيْ.

৭. যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার শব্দ শুনতে পাবে গাধার স্বরের ন্যায় শ্রুতিকটু স্বর। আর তা উদ্বেলিত হতে থাকবে উপচাতে থাকবে।

٨. تَكَادُ تَمَيَّزُ وَقُرِئَ تَتَمَيَّزُ عَلَى الْأَصْلِ تَنْقَطِعُ مِنَ الْغَيْظِ ط غَضَبًا عَلَى الْكُفَّارِ كُلَّمَآ أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سُؤَالَ تَوْبِيْخٍ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ رَسُوْلٌ يُنْذِرُكُمْ عَذَابَ اللّٰهِ تَعَالٰى.

৮. ফেটে পড়ার উপক্রম হবে অপর এক কেরাতে শব্দটির মূলরূপ تَتَمَيَّزُ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। স্বক্রোধে কাফেরদের উপর রোষভরে। যখনই তাতে কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্য হতে একদল। তাদেরকে রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে ধমকিমূলক জিজ্ঞাসা তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি কোনো রাসূল, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করবেন।

٩. قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ج إِنْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِ الْمَلٰئِكَةِ لِلْكُفَّارِ حِيْنَ أَخْبَرُوْا بِالتَّكْذِيْبِ وَأَنْ يَكُوْنَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ لِلنُّذُرِ

৯. তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, "আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ শেষোক্ত বাক্যটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে কথিত ফেরেশতাগণের বক্তব্য হতে পারে, যখন তারা তাদের মিথ্যারোপ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেছে। কিংবা তা কাফেরদেরই বক্তব্য হতে পারে, যা তারা সতর্ক-কারীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল।

١٠. وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَيْ سَمَاعَ تَفَهُّمٍ أَوْ نَعْقِلُ أَيْ عَقْلَ تَفَكُّرٍ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

১০. আর তারা আরও বলবে, "আমরা যদি শুনতাম" অর্থাৎ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শুনা। অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করার মতো বিবেক, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।

١١. فَاعْتَرَفُوْا حَيْثُ لَا يَنْفَعُ الْإِعْتِرَافُ بِذَنْبِهِمْ ج وَهُوَ تَكْذِيْبُ النُّذُرِ فَسُحْقًا بِسُكُوْنِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا لِأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ فَبُعْدًا لَهُمْ عَنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

১১. বস্তুত তারা স্বীকার করবে কিন্তু, তখন সে স্বীকারোক্তি তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তাদের অপরাধ আর তা হলো সতর্ককারীগণের প্রতি অসত্যারোপ করা। সুতরাং ধিক্কার سُحْقًا শব্দটি حَاءٌ বর্ণে সকুন ও পেশযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। জাহান্নামবাসীদের জন্য। সুতরাং তারা আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ হতে দূর হোক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا (اَلْاٰيَة) : وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক كَائِنٌ -এর সাথে كَائِنٌ তার জার ও মাজরূর মিলে فِىْ مَحَلِّ الرَّفْعِ খবরে মুকাদ্দাম। পরবর্তী عَذَابُ جَهَنَّمَ -এর মহল্লে ই'রাব মুবতাদা মুয়াখ্খার হিসাবে রফা'র স্থানে অবস্থিত।

قَوْلُهُ تَمَيَّزُ : জমহুর-এর নিকট এ শব্দটির কেরাত হলো تَمَيَّزُ একটি 'তা' দ্বারা। তালহা শব্দটিকে দু'টি 'তা' দিয়া تَتَمَيَّزُ পড়েছেন। যাহহাক শব্দটিকে تَمَايَزُ পড়েছেন। تَمَيَّزُ শব্দটির মহল্লে ই'রাব হলো হাল হওয়ার কারণে নসব।

قَوْلُهُ "عَذَابُ" : জমহুর عَذَابُ শব্দটিকে রফা' দিয়ে পড়েছেন। রফা' দিয়ে পড়লে এর মহল্লে ই'রাব রফা, মুবতাদা হিসেবে এবং খবর لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا। হাসান, যাহহাক এবং আ'রাজ عَذَابَ শব্দটিকে নসব দিয়ে পড়েছেন। নসব দিয়ে পড়লে মহল হবে নসব, عَذَابَ السَّعِيْرِ -এর উপর আত্ফ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ "شَهِيْقًا" "وَهِىَ تَفُوْرُ" وَ"سُحْقًا" : شَهِيْقًا শব্দটি سَمِعُوْا -এর মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। لَهَا হাল হিসেবে নসবের স্থানে অবস্থিত। وَهِىَ تَفُوْرُ বাক্যটি فِيْهَا -এর যমীর হতে হাল হয়েছে।

سُحْقًا এটা মাফউল বিহী হিসেবে মানসূব হয়েছে অর্থাৎ اَلْزَمَهُمُ اللّٰهُ سُحْقًا অথবা এটা মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসূব হয়েছে। উহ্য বাক্যটি হলো– سَحَقَهُمُ اللّٰهُ سُحْقًا –[জুমাল]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক : পূর্বে আকাশকে তারকা দ্বারা সুসজ্জিত করার কথা বলা হয়েছে এবং তারকা দ্বারা শয়তানকে বিতাড়নের কথা ও শয়তানের শাস্তি বিধানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে শয়তানের অনুসারী কাফিরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। –[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... وَهِىَ تَفُوْرُ : উক্ত আয়াত হতে কাফেরদের শাস্তি প্রসঙ্গে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহর হুকুম-আহকামকে লঙ্ঘন করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের অনলকুণ্ড নির্ধারিত রয়েছে। আর অনলকুণ্ড কতইনা নিকৃষ্টতম স্থান, জিন-ইনসান উভয় জাতির মধ্যে যারাই কুফরি করবে, তারাই এ শাস্তির সম্মুখীন হবে। আর তাদেরকে যখনই দোজখে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তারা জাহান্নামের ভয়ংকর গর্জন শুনতে পাবে।

شَهِيْق শব্দটির অর্থ হলো নিকৃষ্টতম আওয়াজ, যা গর্দভের আওয়াজের ন্যায়। অর্থাৎ জাহান্নাম হতে এ নিকৃষ্টতম শব্দ শুনতে পাবে। অথবা জাহান্নামের ধ্বনিই এরূপ হবে। অর্থাৎ এ সকল কাফেরদের পূর্বে যে সকল লোক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদের চিৎকারের ভয়াবহ শব্দটিই জাহান্নাম হতে শুনা যাচ্ছে। তাদের আওয়াজে এ শোরগোল হতে থাকবে। যেমন– সূরা হূদ-এর ১০৬ আয়াতে আল্লাহ বলেন– فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا الخ - সূরা ফোরকানে আল্লাহ বলেছেন, كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِذَاۤ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيْرًا (اَلْاٰيَة) যখন সে কাফেরদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করতে নেওয়া হবে, তখন তারা ক্রোধ ও আক্রোশের শব্দসমূহ শুনতে পাবে। এতে প্রতীয়মান হলো যে জাহান্নামীদের নিজেদের যেমন চিৎকার হবে তেমন জাহান্নামের আগুনের শব্দও হতে থাকবে। তাই আল্লাহর দরবারে আমরা এ দোয়া করি–

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا عَنْ ذٰلِكَ الْعَذَابِ فَاِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ . وَاَيْضًا اِلٰهِىْ لَا تُعَذِّبْنِىْ فَاِنِّىْ مُقِرٌّ بِالَّذِىْ قَدْ كَانَ مِنِّىْ .

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার কাফিরদের কথাই উল্লেখ করেছেন এবং সকল শ্রেণির তথা জিন-ইনসান কাফিরদের শাস্তি হবে জাহান্নাম।

কুফরের তাৎপর্য : কুফর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– গোপন করা, ঢেকে রাখা, এ থেকেই অস্বীকার করার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামের পরিভাষায় যারা সত্যকে গোপন রাখে, তারাই কাফের। আর এভাবে ঈমানের বিপরীত অর্থে ব্যবহার শুরু হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহতে ঈমান আনে না, তারাই আল্লাহর সাথে কুফরি করে। ঈমানের অর্থ হলো– মেনে নেওয়া, স্বীকার করা। আর কুফরির অর্থ হলো– অমান্য করা, অস্বীকার করা। কুরআন কারীমের দৃষ্টিতে কুফরির আচরণ নানারূপে হতে পারে।

এক : আল্লাহ তা'আলাকে আদৌ স্বীকার না করা। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। অথবা, আল্লাহকে নিজের ও বিশ্বের মালিক বলে মানতে অস্বীকার করা, কিংবা আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় মা'বূদ বলে মানতে অস্বীকার করা।

দুই : আল্লাহকে মেনে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করে তাঁর নির্দেশকে জ্ঞান ও আইনের উৎসরূপে না মানা।

তিন : আল্লাহর বিধান মেনে চলা উচিত, নীতিগতভাবে এটা মেনেও বিধান ও আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে নবী রাসূলগণকে অস্বীকার করা।

চার : নবীদের মধ্যে পার্থক্য করা। নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসের কারণে কোনো নবীকে সত্য বলে স্বীকার করা এবং কোনো নবীকে মিথ্যা বলে অমান্য করা।

পাঁচ : নবীগণ আল্লাহর নিকট হতে আকীদা-বিশ্বাস, আইন-কানুন, নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-আচরণের নিয়মকানুন যা কিছু পেয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে অস্বীকার করা।

ছয় : সব কিছুকেই নীতিগতভাবে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বিধানকে কার্যতভাবে অস্বীকার করা এবং তার বিরোধিতা করা, তাকে জীবনের ভিত্তিরূপে আদৌ গ্রহণ না করা।

কুরআন মাজীদ এ ধরনের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে আল্লাহদ্রোহিতা নামে আখ্যায়িত করেছে। আর এটার প্রতিটি প্রকরণ ও পদ্ধতিকেই কুফর নামে অভিহিত করেছে। এ ছাড়া কুফর শব্দটি কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই অকৃতজ্ঞতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শোকর ও কৃতজ্ঞতার বিপরীত শব্দরূপেই কুফরের ব্যবহার দেখা যায়। শোকরের অর্থ হলো– কোনো নিয়ামতদানকারীর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেওয়া, তাঁর বদান্যতা দ্বারা উপকৃত হয়ে তাঁর প্রশংসা করা। আর না-শোকরী বা অকৃতজ্ঞতার অর্থ হলো, নিয়ামত দানকারীর অনুগ্রহের স্বীকৃতি না দেওয়া, তার অনুগ্রহকে দাম্ভিকতার সাথে অস্বীকার করা, একে নিজের প্রচেষ্টার ফল বলে গর্ব-অহংকার করা। এটাকেই আমাদের পরিভাষায় নিমকহারামী, গাদ্দারী, না-শোকরী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর সাথে মানুষের কুফরির ভয়াবহ পরিণাম ও জাহান্নামের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। কাফেরদের প্রতি জাহান্নামের রোষানলের অবস্থাটি কিরূপ হবে, কাফেরগণ জাহান্নামের নিপতিত হওয়ার পর জাহান্নাম রক্ষীগণ তাদের নিকট কি জিজ্ঞাসা করবে এবং জবাবে তারা কি বলবে, আর সর্বশেষে তাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি এবং জাহান্নামের যোগ্য হওয়ার কথা তাদের ভাষায়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সম্মুখে এমন হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন, যেন তারা জাহান্নাম ও এসব কথোপকথন চোখের সম্মুখেই সবকিছু অবলোকন করছে।

আজাবের কয়েকটি বিশেষণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা :

এক : شَهِيْقًا শব্দটির অর্থ হলো– জাহান্নাম হতে উদ্ভূত বিকট শব্দ। মূলত এ শব্দটি গর্দভের শব্দ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যাংশের অর্থ দু'ভাবে হতে পারে। জাহান্নাম হতে আওয়াজ উত্থিত হবে অথবা এটাই হবে জাহান্নামের ধ্বনি অথবা তাদের নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে যারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা চিৎকার করতে থাকবে। সূরা হূদের ১০৬ নং আয়াতে উল্লেখ্য যে, জাহান্নামীগণ জাহান্নামে হাঁপাইতে ও রোষধ্বনি করতে থাকবে। সুতরাং এটা যে জাহান্নামীদের ধ্বনি হবে, তা সূরা হূদের এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। আর সূরা আল-ফুরকানের ১২নং আয়াতের বর্ণনা দ্বারা দ্বিতীয় অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় যে, জাহান্নামে গমনকারীগণ দূর হতে তার আক্রোশ ও রোষানলের শব্দ শুনতে পারবে। এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ বিকট শব্দ হবে জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নির। বস্তুত উল্লিখিত দু' সূরার বর্ণনা প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ আওয়াজ জাহান্নামের আক্রোশ ও প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ ও জাহান্নামীদের চিৎকার ও হাহাকার উভয় মিলে একটি বিকট আওয়াজ এবং হট্টগোল।

দুই : تَفُوْرُ শব্দটির অর্থ হলো– উথাল-পাথাল করতে থাকা। মুজাহিদ (র.) বলেন, হাঁড়িতে বা পাতিলে গরম পানিতে যেমন কোনো দানা ফুটালে টগবগ ও উথাল-পাথাল করতে থাকে, ঠিক তেমনই জাহান্নামের আগুন উথাল-পাথাল এবং টগবগ করতে থাকবে। এটাতে যা কিছুই দেওয়া হবে, যাকেই নিক্ষেপ করা হবে তাকেই ভাত ফুটাবার মতো করে টগবগ করে ফুটাবে। এর আজাব এত ভয়াবহ যে, সে সবসময় উথাল-পাথাল করতে থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তিন : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ক্রোধ আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। যেমন, কোনো মানুষ খুব বেশি ক্রোধান্বিত হলে তার চোখেমুখে সব রক্ত জমা হয় এবং মনে হয় যেন তা এখনই ফেটে পড়বে। ঠিক জাহান্নাম তার আক্রোশে ফুলতে থাকবে এবং ক্রোধের কারণে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। মূলত এ কথার দ্বারা জাহান্নামের ভয়াবহতা ও কাঠিন্য বুঝানো হয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى : تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ..... اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, দোজখ তখন উথাল-পাথাল করতে থাকবে। ক্রোধ-আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় তা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। প্রতিবারে যখনই তাতে কোনো জনসমষ্টিকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার কর্মচারীগণ জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের নিকট কি কোনো সাবধানকারী আসেনি?

উক্ত আয়াতে اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ - বাক্যটি বাহ্যত দেখা যায় প্রশ্নবোধক। তবে এটা জানার ইচ্ছায় প্রশ্ন নয়; বরং একে سُؤَال تَوْبِيْخ [ধমকিমূলক প্রশ্ন] বলা হয়। এ প্রশ্নটি দোজখের দারওয়ানের মাধ্যমে সকল দোজখীদের দলকেই করা হবে। কেননা সকল দোজখী একই প্রকার হবে না। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর হবে। সুতরাং স্তরভেদে সকল দল পৃথক পৃথকভাবে জাহান্নামের দিকে থাকবে, আর এ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

জাহান্নামীদের সাথে কোনোরূপ দুরাচরণ করা হচ্ছে কিনা বা ব্যভিচার হচ্ছে কি সুবিচার হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের থেকে স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে। দুনিয়াতে আল্লাহর নবী-রাসূলগণ তাদের নিকট সত্যই আগমন করেছিলেন। সত্য ও অসত্য পথ সম্পর্কে তারা অবগত হয়েছিল, সত্য পথের বিরোধিতার কারণে তারা সেদিন জাহান্নামী হয়ে যাচ্ছে, আল্লাহর সকল বাণী সত্য ছিল, তারা মিথ্যার উপর ছিল, এ কথাগুলো বুঝিয়ে স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যই এ প্রশ্ন করা হবে। [মা'আরিফ, জালালাইন] সে স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আয়াতে বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : قَالُوْا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ الخ : বলা হয়েছে কাফের সম্প্রদায় স্বীকারোক্তি স্বরূপ বলবে যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী পয়গাম্বর আগমন করেছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে আমরাই তাঁদেরকে অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের উপর কোনো আসমানি গ্রন্থ ও কোনো আহকাম নাজিল করেননি। আর আপনারা বড়োই ভুল-ভ্রান্তির পথে নিমজ্জিত রয়েছেন।

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ كَبِيْرٍ -এর প্রবক্তা : এর বক্তা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত-

১. জালালাইন গ্রন্থকার (র.) বলেন- এটা ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে উপলক্ষ করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তখনই কাফেরদেরকে বলবেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই মহাভ্রষ্টতায় লিপ্ত, যখনই কাফেরদের দল ফেরেশতাগণকে অসত্যে থাকার কথা বলে ছিল।

২. অথবা কাফেরগণ (مُنْذِرِيْنَ) নবী-রাসূলগণকে একথা বলেছিল।

قَوْلُهُ تَعَالَى ضَلَالٍ كَبِيْرٍ : এ বাক্যাংশটির অর্থ বা মর্ম সম্বন্ধে কারো কারো অভিমত এই যে,

১. যারা দুনিয়াতে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবর্তিত হতো তা ব্যাপক ছিল, তারা দুনিয়াতে চরম গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত ছিল।
২. আবার কারো কারো মতে, এর মর্ম হলো চরম ধ্বংস, তাদের প্রত্যেকটি কাজকর্মই ছিল চরম ধ্বংসকারী এবং তারা নিজেরা ধ্বংসের কাজে লিপ্ত ছিল। -[কাবীর]

ফায়দা : উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর دَلِيْل اَدِلَّه সমূহ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার পূর্ব পর্যন্ত কাউকেও দোজখে নিক্ষেপ করবেন না।

সুতরাং যাদের নিকট সত্যের বাণীসমূহ পৌছেনি, [যথা- পাগল, বেহুঁশ, নির্বোধ, অবুঝ সন্তানসন্ততি ইত্যাদি] তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবেন না।

সলফে সালেহীনের প্রকৃত মতামত এটাই। নতুবা আল্লাহ তা'আলার উপর জুলুমের অন্যায়-অপবাদ পড়বে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ . اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ . اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ অর্থাৎ আমি বান্দাগণের উপর অত্যাচার করি না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের উপর অণু পরিমাণও অত্যাচার করেন না। আল্লাহ তা'আলা কি সকল হাকিম ও বিচারক থেকে সর্ব বৃহৎ বিচারক নন? -[আশরাফী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন– চরম লজ্জাকর অবস্থায় আফসোস করতে করতে তারা বলবে হায়! আমরা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় যদি নবী ও রাসূলগণের কথা শ্রবণ করতাম ও ভালোরূপে বিবেক-বিবেচনা খাটিয়ে তা অনুধাবন করতাম তাহলে আজ আমরা কখনও দাউ দাউকারী অগ্নিকুণ্ডের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না, বরং বেহেশতে খুব আনন্দ ও উৎফুল্লে বসবাস করতে থাকতাম।

অতঃপর তারা নিজেরাই নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। তাদেরকে যে বিনা দোষে দণ্ডাদেশ দেওয়া হচ্ছে না এটা তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে। কিন্তু তখন তাদের এ অনুতাপের দ্বারা কোনো লাভ হবে না; বরং তাদেরকে স্পষ্ট বলা হবে যে, তোমাদের জন্য অনুগ্রহের জগতে কোনো ঠাই নেই। দূর হও, নিপাত যাও জাহান্নামই তোমাদের আসল ঠাঁই।

কাফেরদের এ জবাব ও তার প্রতি উত্তরের দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা আকল ও বিবেক-বিবেচনা খরচ করবে না এবং সত্যের অনুসন্ধানী হবে না তারা চতুষ্পদ জন্তুর সমতুল্য। কেননা আকল আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। এই নিয়ামতের যারা শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে না তারাই নাশোকর এবং তারাই জানোয়ার।

উক্ত আয়াতটি ঐ সকল লোকদের জন্য تَرْدِيْد স্বরূপ যারা ইসলামের বিধানের যৌক্তিকতা অস্বীকার করে। তারা জানোয়ার ব্যতীত আর কিছুই নয়। –[মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)]

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ-এর মধ্যে اَلذَّنْبُ শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে اَلذَّنْبُ শব্দটিকে একবচন করার কারণ হচ্ছে, নবী ও রাসূলগণকে অমান্য করা ও তাদের বাণীসমূহকে অস্বীকার করা এবং এতদসম্পর্কীয় সকল গুনাহের মূল হলো একটি গুনাহ তা হলো 'ঈমান' আনয়ন না করা। এ কারণে ذَنْب শব্দটি وَاحِدْ ব্যবহার করা হয়েছে।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ-এর মধ্যে سَمْع-কে مُقَدَّمْ ও عَقْل-কে مُؤَخَّر করার কারণ :

ক. সাধারণত কোনো কথা বললে সর্বপ্রথম শ্রবণশক্তিই কাজ করে থাকে, অতঃপর বিবেচনাশক্তি কাজ করে থাকে, এ কারণে سَمْع-কে عَقْل-এর উপর প্রাধান্য দান করা হয়েছে।

খ. তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকার বলেন, এর কারণ হলো যখন কাফিরা রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সর্বপ্রথম তাঁর কথা শুনবে। রাসূলগণ মানুষকে দীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং প্রথমে মানুষগণ রাসূলদের কথা শুনে থাকেন। এর পর সেই দাওয়াত গ্রহণ বা বর্জন করার কথা সিদ্ধান্ত করে থাকেন। এ কারণেই প্রথমে শ্রবণের ও পরে বিবেচনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। –[কাবীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٢. إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يَخَافُوْنَهُ بِالْغَيْبِ فِي غَيْبَتِهِمْ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ فَيُطِيْعُوْنَهُ سِرًّا فَيَكُوْنُ عَلَانِيَةً أَوْلٰى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ أَيِ الْجَنَّةُ.

১২. নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাঁকে ভয় করে দৃষ্টির অগোচরে তারা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে থাকাবস্থায় এবং গোপনভাবে তাঁরা আল্লাহর আনুগত্য করে। সুতরাং প্রকাশ্য আনুগত্য তো উত্তম রূপেই করবে। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান অর্থাৎ বেহেশত।

١٣. وَأَسِرُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ إِنَّهُ تَعَالٰى عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ بِمَا فِيْهَا فَكَيْفَ بِمَا نَطَقْتُمْ بِهِ وَسَبَبُ نُزُوْلِ ذٰلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ لَا يَسْمَعُكُمْ إِلٰهُ مُحَمَّدٍ.

১৩. আর তোমরা চাই গোপন কর হে লোক সকল! তোমাদের কথা, কিংবা তা প্রকাশ্যে বল নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ তা'আলা অন্তরে লুক্কায়িত বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত অন্তরের মধ্যে যা কিছু আছে। সুতরাং কিরূপে তিনি– তোমরা যা ব্যক্ত করেছ তা সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন। এ আয়াতটির শানে নুযূল এই যে, মুশরিকগণ একে অন্যকে বলত, তোমরা তোমাদের কথাবার্তা গোপনে বলো, যাতে মুহাম্মদ ﷺ -এর উপাস্য তা শুনতে না পায়। তৎসম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

١٤. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ج مَا تُسِرُّوْنَ أَيَنْتَفِيْ عِلْمُهُ بِذٰلِكَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ فِيْ عِلْمِهِ الْخَبِيْرُ فِيْهِ لَا.

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না যা তোমরা গোপন কর। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে কি তিনি অনবহিত? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী তাঁর অবহিতি ক্ষেত্রে সম্যক অবগত তৎসম্পর্কে। না, তিনি স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে অনবহিত নন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَأَسِرُّوْا.....الخ -এর শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– উপরিউক্ত ‑১৪নং আয়াতদ্বয় মুশরিকদের উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নবী করীম ﷺ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের গাচরে অনেক কথাবার্তা ও আলোচনা করত; কিন্তু হযরত জিবরাঈল (আ.) সেই কথা ও আলোচনার সংবাদ নবী করীম ﷺ ক জানাতেন। পরবর্তীতে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদের নিকট হতে তাদের এ সব কথাবার্তা ও আলোচনার বিষয় শুনতে য়ে বিস্মিত হতেন। সুতরাং কাফেরগণ এক পরামর্শ বৈঠকে পরস্পর বলল, তোমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের আলোচনা নীরবে ও গোপনে করবে। কেননা মুহাম্মদের প্রভু এটা শুনতে পেলে তাঁকে জানিয়ে দিবেন। কাফেরদের এ উক্তির জবাবেই লোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। পরিশেষে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কি তোমাদের বিষয় কোনো সংবাদ রাখেন তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ববিষয়ে পূর্ণ অবগত। শুধু মানুষের বেলায়ই সংবাদ রাখেন না; বরং সৃষ্টিলোকের সব তত্ত্ব সম্পর্কেই নি অবহিত। –[খাযেন, কামালাইন, জালালাইন]

قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ الخ : মহান আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য আলোচ্য আয়াতে কালে বিশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁকে মেনে য়েছে তাঁরা প্রতাপ এবং দাপটের ভয়ে কম্পিত হয়েছে, তাঁর অসন্তোষ এবং আজাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, লোকচক্ষের অন্তরালে তে-নীরবে আল্লাহকে স্মরণ করে কাঁদে, অশ্রুজলে ভাসে, পরিণামে তারা আনন্দের হাসি হাসবে। আল্লাহর দরবারে বিরাট তদান পাবে এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির মার্জনা পাবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করবে। –[তাহেরী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহকে না দেখেও ভয় করার দু'টি অনিবার্য ফল রয়েছে বলে উক্ত আয়াত প্রমাণ দিচ্ছে। একটি হলো– মানবীয় দুর্বলতার দরুন মানুষ কর্তৃক যে অপরাধই সংঘটিত হয়ে থাকবে তা মাফ করে দেওয়া হবে। তবে অবশ্যই তার গভীরমূলে আল্লাহর ভয় লুক্কায়িত থাকতেই হবে এবং তাঁকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার কোনো ভাব থাকতে পারবে না।

অপরটি হলো, আল্লাহকে ভয় করে মানুষ যে নেক আমলই করবে, সেজন্য সে অতি বড় সুফল লাভ করবে।

আয়াতের মূলকথা : আল্লাহ সকল নাফরমানদেরকে প্রকাশ্যভাবে এবং সকল মানুষকে অপ্রকাশ্যভাবে বলেন– হে মানুষ তোমরা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ না বটে, কিন্তু তিনি তোমাদের সকলকেই দেখতে পাচ্ছেন। তোমাদের সকল গোপন ও প্রকাশ্য আচার-আচরণ সবই লক্ষ্য করছেন, তোমাদের গোপন কথা কিংবা প্রকাশ্য কথা, এমনকি মনের কথা পর্যন্ত তিনি জানেন। কেননা তিনি সকলের পক্ষেই অন্তর্যামী।

قَوْلُهُ حَاصِلُ الْإِسْتِدْلَالِ مِنَ الْآيَةِ : আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর خَالِقٌ مُخْتَارٌ সুতরাং তিনি মানুষের সকল কার্য এবং কথারও সৃষ্টিকর্তা। কোনো জিনিসের সম্বন্ধে অবগতি লাভ করতে না পারলে সে জিনিস সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়, তাই আল্লাহ সকল বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞ। –[মা'আরিফ]

উক্ত আয়াতে কেবল أَقْوَالُ إِنْسَانٍ-কে নির্দিষ্ট করার কারণ : উক্ত আয়াতে যদিও أَقْوَالٌ-কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে তথাপি أَقْوَالٌ-এর সাথে أَفْعَالٌ ও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। তবে মা'আরিফ গ্রন্থকারের মতে, أَقْوَالٌ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, أَقْوَالٌ সমূহ অধিকভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে, أَفْعَالٌ সমূহ তদপেক্ষা কম সংখ্যক সংঘটিত হয়ে থাকে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ :

এটা একটি উপদেশ ও সতর্ক বাণী স্বরূপ : এ কথাটি সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এটাতে মু'মিনদের জন্য এই শিক্ষা নিহিত রয়েছে যে, দুনিয়াবী জীবন যাপনকালে তাকে এই তীব্র অনুভূতি হৃদয়মনে সদা জাগ্রত রাখতে হবে যে, শুধু তার প্রকাশ্য সকল বিষয় নয়, বরং তার মনের গভীরে নিহিত নিয়ত ও ভাবধারা চিন্তাধারা পর্যন্ত আল্লাহর নিকট স্পষ্ট।

আর কাফেরদের জন্য এতে একটি বিশেষ সতর্কবাণী হলো এই, সে আল্লাহকে ভয় না করে নিজ স্বভাবে যাই করুক না কেন তার কোনো একটি বিষয়েও আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচতে পারবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ : বলা হয়েছে যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ মানুষের নাড়িভুঁড়ি সবই তাঁর নখদর্পণে, তিনি সর্বজ্ঞানী ও অন্তর্যামী।

উক্ত আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের সার-সংক্ষেপ স্বরূপ। অর্থাৎ যখন আল্লাহই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক সব কিছুই সৃজন করেছেন, তখন তিনি মানুষের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কি হেতু হবে। আর যখন সকল সৃষ্টির হাকিকত সম্পর্কে অবগত রয়েছেন তখন পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে কি করে তাঁর জ্ঞান না থাকতে পারে। তাঁকে কোনো সংবাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। [থানবী (র.)]

قَوْلُهُ هٰذِهِ الْاٰيَةُ دَالَّةٌ عَلٰى خَلْقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ : উক্ত আয়াতটি এ কথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণের সকল কার্যকলাপের সৃষ্টিকর্তা ও সকল কথাবার্তা তাঁরই শক্তিতে মানুষ বলতে সক্ষম। সুতরাং তিনি যেমনি خَالِقُ الْاَقْوَالِ তেমনি خَالِقُ الْاَفْعَالِ –[মাদারিক]

وَاَيْضًا قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْاَصَمِّ وَجَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ مِنْ مَفْعُوْلٍ وَالْفَاعِلُ مُضْمَرٌ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاحْتَالَا بِهٰذَا النَّفْيِ خَلْقَ الْاَفْعَالِ. (مَدَارِكٌ)

উক্ত আয়াতটির অনুবাদ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন মতান্তর রয়েছে। যথা– কারো কারো মতে, এটার অনুবাদ হলো, তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকে জানেন না? মূল ভাষা হলো مَنْ خَلَقَ এটা অর্থ যিনি সৃষ্টি করেছেন। অথবা কে সৃষ্টি করেছেন? অথবা তিনি যা সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে জানবেন না এটা কিভাবে হতে পারে? হ্যাঁ, তবে সৃষ্টি নিজেকে নিজে জানতে পারে না, এটা হতে পারে।

قَوْلُهُ اللَّطِيْفُ : এর একটি অর্থ হলো অদৃশ্য অনানুভূত পন্থায় কর্ম সম্পাদনকারী। অপর অর্থ হলো– সূক্ষ্ম ও গোপনতম সত্যসমূহ জানেন এমন সত্তা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٥. هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا سَهْلَةً لِلْمَشْيِ فِيْهَا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا جَوَانِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ ط الْمَخْلُوْقِ لِاَجْلِكُمْ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ مِنَ الْقُبُوْرِ لِلْجَزَاءِ.

১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন তার উপর চলাচল সহজ করে দিয়েছেন। অনন্তর তোমরা তার দিক-দিগন্তে বিচরণ করো) তার পথে-প্রান্তরে। আর তাঁর প্রদত্ত জীবিকা হতে ভক্ষণ করো তোমাদের উদ্দেশ্যে সৃজিত। আর তাঁরই প্রতি পুনরুত্থান কবরসমূহ হতে প্রতিফল গ্রহণের জন্য।

١٦. ءَاَاَمِنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْاُخْرٰى وَتَرْكِهَا وَاِبْدَالِهَا اَلِفًا مَّنْ فِي السَّمَاۤءِ سُلْطَانُهُ وَقُدْرَتُهُ اَنْ يَّخْسِفَ بَدَلٌ مِنْ مَنْ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ تَتَحَرَّكُ بِكُمْ وَتَرْتَفِعُ فَوْقَكُمْ.

১৬. তোমরা কি নিশ্চিত হয়েছ? শব্দটি উভয় হামযাকে বহাল রেখে, দ্বিতীয়টিকে সহজ করে, উভয়ের মধ্যখানে আলিফ যোগ করে, আলিফকে বর্জন করে, হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে পঞ্চবিধ কেরাতে পঠিত হয়েছে। যে, যিনি আকাশে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতা তিনি ধসিয়ে দেবেন এটা পূর্বোক্ত مَنْ হতে بَدَلٌ রূপে ব্যবহৃত। তোমাদেরসহ জমিনকে, আর তা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাঁপতে থাকবে তোমাদের নিয়ে প্রকম্পিত হবে এবং তোমাদের উপরে উত্থিত হবে।

١٧. اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاۤءِ اَنْ يُّرْسِلَ بَدَلٌ مِنْ مَنْ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط رِيْحًا تَرْمِيْكُمْ بِالْحَصْبَاءِ فَسَتَعْلَمُوْنَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ كَيْفَ نَذِيْرِ اِنْذَارِيْ بِالْعَذَابِ اَيْ اَنَّهُ حَقٌّ.

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়েছ যে, যিনি আকাশে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি প্রেরণ করবেন এটা مَنْ হতে بَدَلٌ রূপে ব্যবহৃত। তোমাদের উপর কঙ্করবর্ষী ঝঞ্ঝা সেই প্রবল বাতাস যা তোমাদের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে শাস্তি প্রত্যক্ষ করাকালে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী আমার সম্পর্কে আমার সতর্কবাণী অর্থাৎ তা যথার্থ ছিল।

١٨. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْاُمَمِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ اِنْكَارِيْ عَلَيْهِمْ بِالتَّكْذِيْبِ عِنْدَ اِهْلَاكِهِمْ اَيْ اَنَّهُ حَقٌّ.

১৮. আর মিথ্যা আরোপ করেছিল এদের পূর্ববর্তীগণ উম্মতগণ। ফলে কিরূপ হয়েছিল শাস্তি মিথ্যা আরোপের প্রতিফলস্বরূপ প্রদত্ত আমার শাস্তি, যখন তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। অর্থাৎ তা যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৯. أَوَلَمْ يَرَوْا يَنْظُرُوا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ فِى الْهَوَاءِ صَافَّاتٍ بَاسِطَاتٍ اَجْنِحَتِهِنَّ وَيَقْبِضْنَ ۚ اَجْنِحَتَهُنَّ بَعْدَ الْبَسْطِ اَىْ وَقَابِضَاتٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ عَنِ الْوُقُوْعِ فِى حَالِ الْبَسْطِ وَالْقَبْضِ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ط بِقُدْرَتِهِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ اَلْمَعْنٰى لَمْ يَسْتَدِلُّوْا بِثُبُوْتِ الطَّيْرِ فِى الْهَوَاءِ عَلٰى قُدْرَتِنَا اَنْ نَفْعَلَ بِهِمْ مَا تَقَدَّمَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعَذَابِ ـ

১৯. তারা কি তাকায় না দেখে না বিহঙ্গকুলের প্রতি, তাদের উর্ধ্বে শূন্যলোকে যারা বিস্তারকারী তাদের পক্ষ বিস্তাকারী আর তাকে সঙ্কুচিত করে তাদের পক্ষকে বিস্তার করার পর অর্থাৎ এবং সঙ্কোচনকারী তাদেরকে স্থির রাখেন বিস্তার ও সঙ্কোচনকালে পতিত হওয়া হতে। একমাত্র দয়াময় আল্লাহ তাঁর কুদরত দ্বারা নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। এটার মর্মার্থ এই যে, কাফিরগণ শূন্যলোকে উড়ন্ত বিহঙ্গকুলকে দেখেও আমার কুদরত উপলব্ধি করতে পারে না যে, আমি পূর্বোল্লেখিত পন্থায় এবং অন্যবিধ উপায়ে শাস্তি দানে সক্ষম।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ءَاَمِنْتُمْ : এতে পাঁচটি কেরাত রয়েছে–

১. উভয় হামযাহকে বহাল রেখে। যথা– ءَاَمِنْتُمْ

২. দ্বিতীয় হামযাহকে সহজ করে। যথা– اَمِنْتُمْ

৩. উভয় হামযার মাঝে اَلِفْ প্রবেশ করিয়ে যথা– ءَاٰاَمِنْتُمْ

৪. দ্বিতীয় হামযাহকে বাদ দিয়ে যথা– اَمِنْتُمْ

৫. দ্বিতীয় হামযাহকে اَلِفْ দ্বারা পরিবর্তন করে। যথা– اٰمِنْتُمْ

قَوْلُهُ يُمْسِكُهُنَّ : একে জমহুর বাবে اِفْعَالٌ হতে পড়েছেন, তখন س টা كَسْرَه যুক্ত হবে। আর ইমাম যুহ্‌রী (র.) তাকে بَاب تَفْعِيْل হতে অর্থাৎ س-কে كَسْرَه সহ مُشَدَّدْ করে পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَرْض ذَلُوْل-এর তাৎপর্য বর্ণনা : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ভূতলকে শয্যা, আশ্রয়স্থল, অধীন ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। একটি শিশু দোলনায় যেভাবে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, মানুষও এ বিশালকায় পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে ঘুমায়, বিচরণ করে, নানারূপ ক্রিয়া-কলাপ করে। অথচ এটাতে তারা কোনোই ভয়ভীতি ও অনিশ্চয়তা অনুভব করে না। এ বিশালকায় ভূমণ্ডলটি শূন্যলোকে দোদুল্যমান একটি গ্রহবিশেষ, যা স্বীয় কক্ষপথে ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ঘূর্ণায়মান এবং মেরুদণ্ডটির গতিবেগ ঘণ্টায় ছয় লক্ষ ছিষট্টি হাজার মাইল। আবার এর গর্ভে রয়েছে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা। মাঝে মাঝে রয়েছে আগ্নেয়গিরি, যার অগ্নোদগমনের গলিত লাভা স্রোত প্রবাহিত করে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শন করে; কিন্তু এত কিছু থাকা ও হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জন্য ভূ-লোককে তার সৃষ্টিকর্তা খুব শান্তশিষ্ট ও আরামের স্থানরূপে সৃষ্টি করেছেন। চলা-ফেরা, আহার-বিহার, নর্তন-কুর্দন, আনন্দস্ফূর্তি সাধারণভাবেই মানুষ করে যাচ্ছে। এ ভূমিকে মানুষের জন্য অধীন করে দেওয়ার পিছনে তাঁর বিচক্ষণ কর্মকুশলতাও ক্রিয়াশীল। এমন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ভূমিকে তৈরি করেছেন যাতে স্বাভাবিকভাবেই নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনোপকরণ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তিনি এটাকে অথৈ সম্পদের ভাণ্ডাররূপে করেছেন। মানুষ এ অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে। যেখানে হাত দেয়, পায় তারা রাশি রাশি নিয়ামত। মাটির বুক চিরে ফলায় অফুরন্ত ফসল। তার বুকে উদ্ভিদ বীজ ছড়িয়ে গড়ে তোলে নিবিড় বন ও বাগ-বাগিচা। সাগরের অথৈ জলের মধ্য হতে লাভ করে নিজেদের জীবিকা। ভূ-গর্ভ হতে উত্তোলন করে রাশি রাশি নিয়ামত ও খনিজ সম্পদ। অথচ এই বিশালকায় ভূমি, অথৈ জলরাশির সাগর তাদেরকে কোনোই বাধা দেয় না, কিছুই বলে না। মানুষ নির্বিঘ্নে সাধারণতভাবে প্রয়োজনের তাকীদে সবকিছু করে যাচ্ছে। সুতরাং একথা মানতে হবে যে, ভূ-মণ্ডল ও ভূমিকে মানুষের জন্য সুগম ও তাদের অধীন করে দেওয়ার পিছনে এক মহান শক্তিধর সত্তারই বিচক্ষণ ও নিপুণ নির্মাণ-কৌশলই ক্রিয়াশীল। অতএব মানুষের উচিত সেই মহান সত্তা ও শক্তিধরের সমীপে নিজেদের অস্তিত্ব লুটিয়ে দেওয়া, নিজেদেরকে তাঁরই অনুগত দাসে পরিণত করা।

قَوْلُهُ تَعَالَى "فَامْشُوْا..... رِزْقِهِ" : উপরিউক্ত আয়াতে জমিনের বক্ষের উপর চলাফেরা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। مناكب শব্দের তাফসীরে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কেউ এর অর্থ করেছেন 'বক্ষ', কেউ অর্থ করেছেন পাহাড়-পর্বত। অন্য এক অর্থে রাস্তা-ঘাট বলা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে তার পাহাড়ের চূড়ায় যেখানেই তোমার প্রয়োজন হয় চলে যাও। কেউ তোমাকে বাধা দেওয়ার নেই। দুনিয়াকে পদানত করার ক্ষেত্রে তোমাকে দেওয়া হয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এ দুনিয়ায় সর্বত্র বিচরণ করে তুমি আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত সংগ্রহ করো। তাঁর সৃষ্টি-রহস্য অবলোকন করে তাঁরই নিকট মাথা নত করো। তাঁর দেওয়া রিজিক ভক্ষণ করো। রিজিক এর অর্থ এখানে ব্যাপক। দুনিয়াতে যত উপাদান ও উপকরণ আছে সবই আল্লাহর দেওয়া রিজিক। যে অক্সিজেন আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করি তাও আমাদের জন্য রিজিক। এখানে রিজিক ভক্ষণ করার কথা বলা হলেও আমরা সব রিজিকই ভক্ষণ করি না, কিছু ব্যবহার করি, কিছু উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করি। যেহেতু কিছু ভক্ষণ করাটাই তা থেকে উপকৃত হওয়ার উত্তম পন্থা বা চূড়ান্তরূপ বলে আমরা গণ্য করি সেহেতু এখানে ভক্ষণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে রিজিক শব্দের অর্থ : রিজিক বলতে সাধারণত মানুষ তাকেই বুঝে থাকে, যা খেয়ে মানুষ জীবন ধারণ করে। প্রকৃত অর্থে রিজিক শব্দটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী صَاحِب عَقَائِدْ রিজিক -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- اَلرِّزْقُ اِسْمٌ لِمَا يَسُوْقُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلنَّاسِ اَوْ مِمَّا يُتَغَذّٰى بِهٖ - অর্থাৎ রিজিক ঐ সকল কিছুর নাম, যা আল্লাহ মানুষের জন্য নির্ধারণ করে দেন। অথবা যা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। যাই হোক রিজিক বলতে খাদ্যদ্রব্য সন্তানসন্ততি বা আল্লাহর সৃষ্টি হতে যত কিছু মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সবই রিজিক -এর অন্তর্ভুক্ত। কেবল ভক্ষণ করার উপযোগী বস্তুকে রিজিক -এর অর্থে ব্যবহৃত করাই যথার্থ নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতানুসারে রিজিক -এর تَعْرِيْف হলো- اَلرِّزْقُ اِسْمٌ لِمَا يَسُوْقُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ ذٰلِكَ قَدْ يَكُوْنُ حَلَالًا وَقَدْ يَكُوْنُ حَرَامًا অথবা اَلرِّزْقُ اِسْمٌ بِمَا يُتَغَذّٰى بِهِ الْحَيَوَانُ مَاكُوْلًا اَوْ مَشْرُوْبًا রিজিক তার নাম, যা আল্লাহ তাকে (ব্যক্তিকে) দান করে থাকেন। আর তা কখনও হালাল বস্তু বা কখনও হারাম বস্তু হতে পারে। অথবা যা দ্বারা কোনো جَانْدَارْ জীবন ধারণ করে থাকে। كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

মু'তাযিলাগণের মতে اَلرِّزْقُ اِسْمٌ بِمَا يَاْكُلُهُ الْمَالِكُ وَ ذٰلِكَ لَا يَكُوْنُ حَرَامًا অর্থাৎ রিজিক তাকে বলে যা ব্যক্তি নিজ মালিকানা স্বত্ব বিশেষে ভক্ষণ করে থাকে।

اَلْاَكْلَ বলার পর اَلنُّشُوْرُ বলার কারণ : এ পৃথিবীতে চলাফেরা করে এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিজিক ভোগ-ব্যবহার কালে আমাদের মাঝে স্বভাবতই পরকালের কথা স্মরণ নাও আসতে পারে। আমরা হিসাব-নিকাশের দিনের কথা ভুলে যেতে পারি। আল্লাহর নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে-এ কথা খেয়াল না-ও থাকতে পারে। এ কারণেই আয়াতের শেষে اَلنُّشُوْرُ বা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আমাদের পরীক্ষা করছেন। এ কথা যেন খেয়াল থাকে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহর অবস্থান : উপরিউক্ত ১৬-১৭নং আয়াত দ্বারা বাহ্যত প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলার অবস্থান হলো আকাশমণ্ডল। অথচ আল্লাহ স্থান-কাল-পাত্রের অতীত এক সত্তা, এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত। বাহ্যিকরূপে আয়াত দ্বারা যে মর্ম উদ্ধার হয়, আসলে আয়াতের মর্ম তা নয়। আল্লাহ যে আকাশেই অবস্থান করেন না তা সত্য কথা। 'যিনি আকাশে রয়েছেন' এ কথাটি মানুষের ধারণা ও উপলব্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই নিজের তুলনায় বড়কে সর্বদা উর্ধ্বে মনে করে। বড়লোক বললে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ধারণা এদিকে চলে যায় যে, বড়লোক তারাই, যারা পাঁচতলা, দশতলা বিশিষ্ট অট্টালিকায় বসবাস করে। এমনিভাবে নিরাকার ও ধরা-ছোঁয়ার অতীত মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার কথা বললেই তাদের ধারণা উর্ধ্বলোকের দিকে চলে যায়। এ জন্যই মানুষ যখন আল্লাহর দিকে একাগ্রচিত্ত হয়, তখন উর্ধ্বে তাকায়, উর্ধ্বে হাত তুলে প্রার্থনা করে। বিপদ-আপদে উর্ধ্বে মুখ তুলে ফরিয়াদ জানায়। ইত্যাকার সবকিছু সীমাহীন মহান সত্তার দিকে ধারণা গমন করারই অনিবার্য ফলশ্রুতি। এ দিকেই লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে যে, 'আকাশে যিনি রয়েছেন'। অন্যথায় আল্লাহ সর্বত্রই বিরাজমান। কুরআন মাজীদে সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে।' উপরিউক্ত আয়াতের মর্মটি সেই হাদীসের ন্যায়, যা হযরত খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা.) সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– "তিনি সেই মহিলা, যার অভিযোগ সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে।" এ হাদীসেও 'সপ্ত আকাশে শ্রুত ও গৃহীত হওয়া' দ্বারা তথায় আল্লাহর অবস্থানকে বুঝানো হয়নি; বরং আল্লাহ আকাশের ন্যায় সীমাহীন মহান সত্তা– সেকথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহর নিকট তাঁর নালিশ শ্রুত ও গৃহীত হয়েছে। মানুষের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দৃষ্টিকোণেই এরূপ বলা হয়। যেমন বলা হয়– উপর ওয়ালা যেন বিচার করেন। এটার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ উর্ধ্বলোকে অবস্থান করেন, ভূ-তলে করেন না; বরং এর দ্বারা সীমাহীন মহান সত্তার কথাই বুঝানো হয়।

قَوْلُهُ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاۤءِ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাফেরদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করার সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন। তোমরা কি নির্ভীক হয়ে গেছে যে, কারূনের ন্যায় তোমাদেরকে আসমানের অধিপতি (আল্লাহ) জমিনের নিচের দিকে দাবিয়ে নেবেন না? এবং জমিন তোমাদেরকে গিলে ফেলতে পারবে না? যদিও আল্লাহ তা'আলা জমিনকে সাধারণ অবস্থায় চলাফেলার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। জমিনকে মানুষ খনন করা ব্যতীত জমিনের দিকে কোনো কিছু গাড়াইতে সক্ষম নয়। তবে আল্লাহ সে বিষয়ে বিনা খননেও সক্ষমতা রাখেন। তিনি ইচ্ছা করলে সাধারণভাবে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে সব কিছুকেই জমিনের গর্ভে ঢুকিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন। সুতরাং কাফের যেন সেই কথা জেনে রাখে যে, যেমনিভাবে না চাইলেও তাঁর অশেষ ও অফুরন্ত নিয়ামত পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর রোষ ও আক্রোশ সর্বাধিক। তিনি নারাজ হলে আর কারো রক্ষা নেই। –[মা'আরিফ, আশরাফী, তাহের]

خَسْف শব্দের অর্থ : خَسْف জমিনের নিচের দিকে দেবে যাওয়া। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের প্রসিদ্ধ সম্পদশালী কারূনকে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ জমিনের নিচের দিকে দাবিয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ (اَلْاٰيَة) অর্থাৎ আমি কারূনকে তার ঘরবাড়িসহ জমিনের দিকে দাবিয়ে দিয়েছি, তখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো দলবল কেউই সাহায্যকারী ছিল না এবং সর্বশেষ তার সাহায্যকারী কেউ ছিল না। হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও এ বিষয়ে বলেছেন– لِكُلِّ اُمَّةٍ خَسْفٌ وَمَسْخٌ

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ বাক্যে نَذِيْر-এর মর্মার্থ : فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ বাক্যে نَذِيْر-এর মর্ম কি তা সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ এর মর্মার্থ বলেন যে, نَذِيْر-এর অর্থ مُنْذِرٌ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-কে-ই বুঝানো হয়েছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে এবং তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে জানতে পারবে। তখন তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। তাঁর সম্পর্কে এখনই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো, তাঁকে অনুসণ করো। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এখানে اِنْذَار অর্থাৎ সতর্কীকরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা আমার সতর্ককীকরণের পরিণাম জানতে পারবে। আমি তোমাদেরকে আমার রাসূল ও কিতাব-এর মাধ্যমে পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম, কিন্তু তোমরা তা শোননি। এর পরিণতি যখন টের পাবে তখন কিন্তু তোমাদের করার কিছুই থাকবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ : আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়াতে শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের ঘটনাবলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন [এরা তো কি] ইতঃপূর্বে এদের অপেক্ষাও শত সহস্রগুণে বেশি শক্তিশালী ধনবল, জনবল এবং বাহুবলে বলীয়ান কত জাতি তাঁর অবাধ্যতার কারণে তাঁর গজব ও আক্রোশের ফলে নিপাত গেছে। তোমাদের শিক্ষা ও সতর্কতার পক্ষে তাদের শোচনীয় দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

এটা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, كُفْر আল্লাহর রোষের কারণ, কোনো বিশেষ স্বার্থের খাতিরে যদিও আল্লাহর শাস্তি নাজিল না হয়ে থাকে তবে তা পরকালে অবশ্যই নাজিল হবে। এতদুভয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে, فَكَيْفَ كَانَ نَذِيْرِ ও فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ বলেছেন এতে اِسْتِفْهَام تَعَجُّبْ হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি তাদের ক্ষেত্রে যে কত ভয়াবহ ও কঠিনভাবে অবতীর্ণ হবে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। সুতরাং এতে আল্লাহর এ শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতি আবশ্যকতা বুঝানো হয়েছে। -[মা'আরিফ, তাহেরী, জালালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ الـ : উক্ত আয়াত হতে আল্লাহ জাল্লাশানুহু তাঁর قُدْرَت مُطْلَقَ -কে বিভিন্ন প্রকারভেদে বর্ণনা করেছেন এবং প্রথমে খোলা আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীসমূহের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন- তাদের মাথার উপর আকাশমণ্ডলে অর্থাৎ হাওয়ার উপর যে পাখিসমূহ তাদের পাখা প্রসার করে উড়ে বেড়াচ্ছে, আবার কখনও বা পাখাগুলো গুটিয়ে উড়ছে। নিজেদের দেহভার সত্ত্বেও মাটিতে পড়ে যাচ্ছে না, শূন্যলোকেই স্বাচ্ছন্দ্যে অবাধে মনের সুখে বিরাজ করছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদেরকে টানতে পারছে না , একমাত্র আল্লাহর অশেষ কুদরতের মাধ্যমেই যে এটা সম্ভব হচ্ছে, এটাতে তিনি প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, তিনি সকল ব্যাপারেই শক্তিশালী, সবকিছুই দেখতে পান। এ অবস্থা কি তারা দেখতে পায়নি এবং এ দৃশ্যের উপর লক্ষ্য করে কি তারা ঈমান আনয়ন করতে পারে না।

এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নজিরবিহীন কুদরতের প্রমাণ। এর প্রতি একটুও যদি চিন্তা-ভাবনা করা হয় তবে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ব্যতীত গতি থাকে না। -[মা'আরিফ, জালালাইন]

এ থেকে আরও স্পষ্টতর কুদরতের উদাহরণ হলো আকাশে উড্ডীয়মান উড়োজাহাজসমূহ তা এত শত শত মন ওজন হওয়া সত্ত্বেও ভূমিতে পড়ে যায় না। লক্ষ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করে বেড়ায় জগতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করে থাকে। এগুলোতে যদি আল্লাহ কুদরত না ঘটাতেন তবে এটা কখনও এভাবে উড়ে বেড়ানো সম্ভব হতো না। মানুষের মেধা শক্তিতে এই কুদরত কার্যকরী করে রেখেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٠. أَمَّنْ مُبْتَدَأٌ هٰذَا خَبَرُهُ الَّذِيْ بَدَلٌ مِنْ هٰذَا هُوَ جُنْدٌ أَعْوَانٌ لَّكُمْ صِلَةُ الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ صِفَةُ جُنْدٍ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ط أَيْ غَيْرِهِ يَدْفَعُ عَنْكُمْ عَذَابَهُ أَيْ لَا نَاصِرَ لَكُمْ إِنِ مَا الْكٰفِرُوْنَ إِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ غَرَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِأَنَّ الْعَذَابَ لَا يَنْزِلُ بِهِمْ.

২০. কিংবা কে আছে مَنْ অব্যয়টি مُبْتَدَأٌ এমন هٰذَا এটা পূর্বোক্ত مَنْ-এর خَبَر যে এটা هٰذَا হতে بَدَل সৈন্যবাহিনী সাহায্যকারী তোমাদের জন্য এটা الَّذِيْ ইসমে মাউসূলের জন্য صِلَة যারা তোমাদের সাহায্য করবে এটা جُنْد সৈন্যবাহিনী -এর সিফাত [দয়াময় আল্লাহ ভিন্ন] অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অপর কেউ, যে তোমাদের হতে তাঁর শাস্তি প্রতিরোধ করবে। অর্থাৎ বাস্তবে তোমাদের কোনোই সাহায্যকারী নেই। কাফেরগণ তো إِنْ অব্যয়টি مَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভ্রান্তিতেই রয়েছে শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে যে, তাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হবে না।

٢١. أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ الرَّحْمٰنُ رِزْقَهُ ج أَيِ الْمَطَرَ عَنْكُمْ وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ أَيْ فَمَنْ يَرْزُقُكُمْ أَيْ لَا رَازِقَ لَكُمْ غَيْرُهُ بَلْ لَجُّوْا تَمَادَوْا فِيْ عُتُوٍّ تَكَبُّرٍ وَنُفُوْرٍ تَبَاعُدٍ عَنِ الْحَقِّ.

২১. কিংবা এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে জীবিকা দান করবে, যদি বন্ধ করেন দয়াময় তাঁর জীবিকা অর্থাৎ তোমাদের হতে বৃষ্টি। আর শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে, পূর্ববর্তী বক্তব্য যৎপ্রতি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ তখন কে তোমাদেরকে জীবিকা দান করবে? সারকথা, তিনি ব্যতীত অপর কেউ তোমাদের জীবিকা দানকারী নেই। বরঞ্চ তারা অবিচল রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত করেছে অবাধ্যতা অহঙ্কার ও সত্য বিমুখতায় সত্য হতে দূরে রয়েছে।

٢٢. أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا وَاقِعًا عَلٰى وَجْهِهٖ أَهْدٰى أَمْ مَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا مُعْتَدِلًا عَلٰى صِرَاطٍ طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَخَبَرُ مَنِ الثَّانِيَةِ مَحْذُوْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ خَبَرُ الْأُوْلٰى أَيْ أَهْدٰى وَالْمَثَلُ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ أَيْ أَيُّهُمَا عَلٰى هُدًى.

২২. তবে কি যে ব্যক্তি ঝুঁকে চলে পতিত হয়ে তার মুখের উপর সে-ই পথপ্রাপ্ত? নাকি যে স্থিরভাবে চলে সরলভাবে সঠিক পথের উপর দ্বিতীয়টির খবর উহ্য! যৎপ্রতি প্রথমটির খবর নির্দেশ করেছে। অর্থাৎ أَهْدٰى পথপ্রাপ্ত আর এ উদাহরণ মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে কে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে?

٢٣. قُلْ هُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَكُمْ خَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ط الْقُلُوْبَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ مَا مَزِيْدَةٌ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ مُخْبِرَةٌ بِقِلَّةِ شُكْرِهِمْ جِدًّا عَلٰى هٰذِهِ النِّعَمِ

২৩. বলুন, তিনিই তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ অন্তর তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত, আর বাক্যটি মুস্তানিফা বাক্য। যা এ সকল নিয়ামতের উপর তাদের স্বল্প কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে সংবাদদানকারী।

٢٤. قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَأَكُمْ خَلَقَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ لِلْحِسَابِ.

২৪. বলুন, তিনিই, তোমাদেরকে বিস্তৃত করেছেন সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবিষ্ট করা হবে হিসেবে-নিকাশের জন্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ الخ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল : উক্ত দু'টি আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কাফের সম্প্রদায় দু'টি কথার উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করত না এবং তাঁর সাথে সর্বদা শত্রুতা পোষণ করত। সেই কথা দু'টি হলো। ১. তারা নিজেদেরকে ধন ও জনবলের অধিক শক্তিশালী মনে করত। ২. তাদের ধারণা ছিল, তাদের মূর্তিসমূহ তাদেরকে মহান আল্লাহর নিকটে পৌঁছিয়ে দেবে এবং নিজেদের জন্য সকল উন্নতি সাধন করবে এবং সকল ক্ষতিকারক বিষয় হতে বিরত রাখবে। এ ধারণাগুলোকে আল্লাহ তা'আলা খণ্ডন করে আয়াত দু'টি নাজিল করলেন। [এরূপই তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকার বলেছেন।] আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, ওহে কাফিরগণ! তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ তা'আলা রাহমানুর রাহীমের নির্ধারিত ফেরেশতাগণ ব্যতীত দুনিয়াতে তোমাদের আর কোনো সাহায্যকারী দল রয়েছে? যারা সর্বক্ষণ তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকবে। যারা তোমাদেরকে আগুনে জ্বলতে, পানিতে ডুবতে দেবে না। হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি জেনে রাখুন, এরা শয়তানের ধোঁকাবাজিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর এমন দয়াময় আল্লাহকে ভুলে শয়তানের সমীপে মাথানত করছে। আল্লাহ আরও বলেন, হে মূর্তিপূজকগণ! আসমান হতে বৃষ্টিবর্ষণ ও জমিন থেকে উদ্ভিদের মাধ্যমে যদি আল্লাহ তোমাদের রিজিকের বন্দোবস্ত না করতেন তবে তোমরা কোথা হতে রিজিক পেতে, কে তা ব্যবস্থা করে দিত? আল্লাহ ব্যতীত কারোও পক্ষে এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এ কথা জেনে রেখো! কার দেওয়া রিজিক খেয়ে কার ইবাদতে মশগুল হয়েছ। মূলত তারা সর্বদা রাসূলের বিপক্ষে কাজ করে থাকে। সত্য হতে ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

اَمْ-এর অর্থ ও তা দ্বারা উদ্দেশ্য : اَمْ টি এখানে مُتَّصِلَه হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি হতে মুক্তি লাভ করেছ? আর তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রক্ষক নাকি তোমাদের সহচরগণ।

আবূ হাইয়ান বলেন, এটা اَمْ مُنْقَطِعَه আর এটা بَلْ অর্থে ব্যবহৃত, هَمْزَهِ اِسْتِفْهَامْ অর্থে ব্যবহৃত নয়। যদি هَمْزَهِ اِسْتِفْهَامْ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে দু'টি اِسْتِفْهَامْ একত্র হয়ে যাবে, যা كَلَامُ اللّٰهِ -এর সৌন্দর্য বিনষ্টকারী।

ঈমান থেকে কাফেরদের বিরত থাকার কারণ এবং তা খণ্ডনের পদ্ধতি : কাফেররা ঈমান কবুল করত না এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতের দিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করত না। এর কারণ ছিল মূলত দু'টি। **এক.** তাদের শক্তি-সামর্থ্য থাকার কারণে। তাদের ধন-সম্পদ ও শক্তি সামর্থ্যের উপর তাদের বিশেষ আস্থা ও ভরসা ছিল। **দুই.** তারা বলত, আমাদের এই মূর্তিগুলো যাদের আমরা পূজা করি এরাই সমস্ত কল্যাণের আধার, এরাই আমাদেরকে সব ধরনের কল্যাণ দেয় এবং আমাদের বিপদ-আপদ দূর করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধরনের দাবি ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করেন এবং এদের এ কথাকে এখানে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। তাদের প্রথম কথার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন "তোমাদের এমন কোনো সৈন্যবাহিনী রয়েছে যা আমার গজব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তোমাদের এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এর পূর্বেও তা অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কত বড় বড় বাদশাহ দুনিয়াতে ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদেরকে কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা বা সাহায্য করতে পারে না।

তাদের দ্বিতীয় ধারণার ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ভালো-মন্দের চাবিকাঠি তো একমাত্র আমার হাতে। আমি যদি তোমাদের রিজিক বন্ধ করে দেই, তোমাদের জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দেই-যেমন বৃষ্টি বা গাছপালা শস্য উৎপাদন তাহলে কে তোমাদেরকে রিজিক দেবে? তোমাদেরকে কেউ রিজিক দেওয়ার নেই। তোমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া। এরপরও তোমরা তোমাদের ভ্রান্তির মাঝে রয়েছ। সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও তোমরা বাতিলের উপর আঁকড়ে রয়েছ। এটা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হচ্ছে। তোমরা আসলে সুস্থ চিন্তাধারার অধিকারী নও। –[কাবীর]

তাদের অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতার কারণ : কাফেররা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তা গ্রহণ করেনি। তারা সত্য হতে দূরে সরে থাকে। অহংকার ও দাম্ভিকতার ভাব দেখায়। তাদের অবাধ্যতার কারণ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মোহ। এটা তাদের কর্মশক্তির বিকৃতির লক্ষণ। তারা নিজেদের কর্মশক্তিকে সঠিক খাতে পরিচালিত করছে না। তাদের সত্যবিমুখতার কারণ হলো তাদের অজ্ঞতা। এটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনার বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপন্থা সঠিক খাতে প্রবাহিত না করলে সত্য পথের দিশারী হতে পারবে না। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "اَفَمَنْ يَّمْشِىْ .... صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ" : اَفَمَنْ يَّمْشِىْ আয়াতটিতে আল্লাহ তাআলা দু'টি উদাহরণ পেশ করেছেন। **এক.** মু'মিনদের, **দুই.** কাফেরদের। মু'মিনদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যে মাথা উঁচু করে সোজাসুজি একটি সমতল সড়কের উপর দিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ তার গন্তব্যস্থল জানা রয়েছে। তার পথ মাত্র একটিই। সে শুধু ইসলামের পথেই- আল্লাহর পথেই চলবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণটি কাফেরদের জন্য দেওয়া হয়েছে। তাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে উল্টা দিকে মুখ করে চলছে। তার পথে কোথায় কোনো অজগর বা ভয়ংকর জীবজন্তু বসে রয়েছে যা সে দেখতে পায় না। তার পথে কোনো গর্ত বা বিপদ-আপদ রয়েছে সেদিকেও তার কোনো দৃষ্টি নেই। এ ব্যক্তি কি কোনো দিন গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে? কখনও কি সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারে? তার পক্ষে নাজাত কখনও কি পাওয়া সম্ভবপর? না এটা কখনও সম্ভবপর হতে পারে না। –[কাবীর, যিলাল]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

* আর মুকাতিল (র.) বলেছেন, এ দৃষ্টান্ত সকলের জন্য নয়, বরং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। কাফিরদের মধ্যে আবূ জাহলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর ঈমানের প্রতীক ও আহ্বায়ক হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-কে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
* হযরত আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এর দ্বারা আবূ জাহল এবং হামযা ইবনে আব্দুল মোত্তালিব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
* হযরত ইকরিমা (র.) বলেছেন, অত্র আয়াতে যে কাফেরের কথা বলা হয়েছে সে হলো আবূ জাহল আর যে মু'মিনের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)। -[কাবীর]

হেদায়েতপ্রাপ্ত ও গোমরাহকে আল্লাহ ভালো করে জানেন, তথাপিও আবার কেন প্রশ্নের সুরে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন? : এর উত্তর হচ্ছে- সবকিছুই আল্লাহ জানেন, মানুষও তা জানে। তথাপিও প্রশ্ন করে সত্যকে সত্যরূপে স্পষ্ট করে বর্ণনা করিয়ে দেওয়া এবং তার সৃষ্টি জগতের মানুষকে সজাগ ও সচেতন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এভাবে প্রশ্নসহ তাঁর বক্তব্য পেশ করে থাকেন।

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَكُمْ .... وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ : আয়াত দু'টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর দেওয়া নিয়ামতসমূহের কথা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ আপনি বলে দিন, মহান রাব্বুল আলামীন এমন অগণিত ও অমূল্য নিয়ামতও দেওয়ার শক্তি রাখেন যা অস্বাভাবিক। তিনি বহিরাগত বহুবিধ নিয়ামত তো দিয়েই দিয়েছেন। অতঃপর প্রত্যেকটি আদম সন্তানকে তার দেহে খচিত করে এমন কতগুলো নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তন্মধ্যে কতগুলো হলো اِدْرَاك حِسِّىْ অনুভূতিশক্তির মাধ্যমে আর কতগুলো হলো اِدْرَاك غَيْر حِسِّىْ অনুভূতিশক্তির মাধ্যমে নয়। যথা- কর্ণ ও নাসিকা প্রকাশ্য অনুভূতি শক্তির মাধ্যম হিসেবে খুবই স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আর অন্তর বা কলব اِدْرَاك عَقْلِىْ জ্ঞানের অনুভূতির অদৃশ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সৃজন করেছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর সৃষ্টি করেছেন তবে তোমাদের মধ্যে খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই এগুলোর শোকর করে থাকে। আরও বলেন- يَا نَبِىَّ اللّٰهِ আপনি শুনিয়ে দিন, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করে রেখেছেন, যাতে তোমরা কুদরতের দৃশ্যসমূহ অবলোকন করতে পাও এবং তা হতে উপদেশাবলি অর্জন করতে পার এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাক। নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পর একদিন তাঁর দরবারে তোমাদের সবারই হাজিরা দিতে হবে।

اَلْقَلْبُ وَالْبَصَرُ وَالسَّمْعُ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : অন্যান্য অঙ্গগুলো হতে قَلْب - سَمْع - بَصَر -কে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করার কারণ উক্ত আয়াতে মানুষের অঙ্গগুলো হতে কেবল মাত্র তিনটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে এর কারণ হচ্ছে- উক্ত অঙ্গগুলোর মধ্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বিশেষ কার্যগুলো নির্ভরশীল রয়েছে অর্থাৎ اِدْرَاك - عِلْم দার্শনিকগণ اِدْرَاك ও عِلْم-এর জন্য পাঁচটি মাধ্যম বর্ণনা করেছেন। সেই পাঁচটি মাধ্যমকে حَوَاس خَمْسَه বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ১. قُوَّة سَامِعَه শ্রবণশক্তি; ২. قُوَّة بَاصِرَه দৃষ্টিশক্তি; ৩. قُوَّة شَامَّه ঘ্রাণশক্তি; ৪. قُوَّة ذَائِقَة স্বাদ গ্রহণশক্তি; ৫. قُوَّة لَامِسَه স্পর্শশক্তি। ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য নাক, স্বাদ গ্রহণের জন্য জিহ্বা, স্পর্শ করার জন্য সকল শরীরে শক্তি ও শ্রবণ করার জন্য কর্ণ এবং দৃষ্টিপাত করার জন্য চক্ষু তৈরি করে দিয়েছেন। এখানে মাত্র এ পাঁচটি হতে দু'টির [কান ও চক্ষুর] কথা উল্লেখ করেন।

এর কারণ হচ্ছে- ঘ্রাণ নিয়ে স্বাদ গ্রহণ ও স্পর্শ করে মানুষ খুব কম সংখ্যক জিনিসের সম্পর্কে عِلْم অর্জন করতে পারে। সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা শ্রবণ ও দেখার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। তদুপরি سَمْع বা শ্রবণশক্তির কথাকে প্রথমে বলা হয়েছে। কারণ মানুষ তার সারা জীবনে যত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তন্মধ্যে শ্রবণকৃত বিষয় অন্যান্য বিষয় হতে অধিক। এ সকল কারণেই حَوَاس خَمْسَه হতে কেবল দু'টিকে উল্লেখ করেছেন। কারণ, অধিকাংশ অভিজ্ঞতা এ দুই শক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

তৃতীয় পর্বে قَلْب সম্পর্কে বলা হয়েছে। তা মানুষের মূল এবং জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করার মূল মাধ্যম। কর্ণ দ্বারা শ্রবণকৃত চক্ষু দ্বারা দর্শনকৃত বিষয়সমূহের অভিজ্ঞতা লাভ করা অন্তরের উপরই নির্ভরশীল।

পবিত্র কালামের বহু আয়াতেই قَلْب-কে مَرْكَز عِلْم বলা হয়েছে। অর্থাৎ عِلْم অর্জনের সেন্টার। যেমন আল্লাহ বলেন كَقَوْلِهِ تَعَالٰى وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا الخ তবে দার্শনিকগণ স্মৃতিশক্তিকে জ্ঞানের ভাণ্ডার বলে থাকেন। -[মা'আরিফুল কুরআন, মাদারিকুত তানযীল]

ا هُوَ وَجْهُ تَخْصِيْصِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْقَلْبِ عَلٰى بَوَاقِىْ اَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ.

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٥. وَيَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ وَعْدُ الْحَشْرِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ فِيْهِ .

২৫. আর তারা বলে মু'মিনদের উদ্দেশ্যে কখন এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে? সমাবেশিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি যদি তোমরা সত্যবাদী হও এ দাবিতে।

٢٦. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ بِمَجِيْئِهِ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْإِنْذَارِ .

২৬. বলুন, এর ইলম তো এটার আগমন সম্পর্কে আল্লাহর নিকট। আর আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র প্রকাশ্য সতর্কীকরণ।

٢٧. فَلَمَّا رَأَوْهُ أَيِ الْعَذَابَ بَعْدَ الْحَشْرِ زُلْفَةً قَرِيْبًا سِيْئَتْ اِسْوَدَّتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ أَىْ قَالَ الْخَزَنَةُ لَهُمْ هٰذَا أَيِ الْعَذَابُ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ بِإِنْذَارِهٖ تَدَّعُوْنَ أَنَّكُمْ لَا تُبْعَثُوْنَ وَهٰذِهٖ حِكَايَةُ حَالٍ تَأْتِىْ عُبِّرَ عَنْهَا بِطَرِيْقِ الْمُضِيِّ لِتَحَقُّقِ وُقُوْعِهَا

২৭. অনন্তর যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে অর্থাৎ সমাবেশিত হওয়ার পর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে অত্যাসন্ন অতিশয় নিকটবর্তী মলিন হয়ে যাবে কালো হয়ে যাবে কাফেরদের মুখমণ্ডল। আর বলা হবে অর্থাৎ রক্ষীগণ তাদের উদ্দেশ্যে বলবে এটাই শাস্তি তো যাকে তোমরা সতর্কীকরণ কালে দাবি করতে যে, তোমরা পুনরুত্থিত হবে না। আর এটা ভবিষ্যতে আগমনকারী অবস্থার বর্ণনা; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়া অবধারিত হিসেবে مَاضِىْ অতীতকালীন শব্দযোগে ব্যবহার করা হয়েছে।

٢٨. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِعَذَابِهٖ كَمَا تَقْصِدُوْنَ أَوْ رَحِمَنَا لَا فَلَمْ يُعَذِّبْنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ أَىْ لَا مُجِيْرَ لَهُمْ مِنْهُ .

২৮. বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ? যদি আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করেন এবং যারা আমার সঙ্গে রয়েছে মু'মিনগণ মধ্য হতে তাঁর শাস্তির মাধ্যমে, যেমন তোমরা ইচ্ছা পোষণ কর। অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন সুতরাং আমাদের শাস্তি দান না করেন। তবে কাফেরদেরকে কে পীড়াদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? অর্থাৎ তা হতে কেউ তাদেরকে রক্ষাকারী নেই।

٢٩. قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ بَيِّنٍ أَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ أَمْ هُمْ .

২৯. বলুন, তিনিই দয়াময় আল্লাহ। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর ভরসা করেছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে শব্দটি يَا . تَا ও যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, শাস্তি প্রত্যক্ষ করার প্রাক্কালে। কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে প্রকাশ্য, আমরা না তোমরা, না তারা?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٠. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا غَائِرًا فِى الْأَرْضِ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ جَارٍ تَنَالُهُ الْاَيْدِىْ وَالدِّلَاءُ كَمَائِكُمْ أَىْ لَا يَأْتِىْ بِهِ إِلَّا اللّٰهُ فَكَيْفَ تُنْكِرُوْنَ أَنْ يَّبْعَثَكُمْ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَّقُوْلَ الْقَارِئُ عَقِيْبَ مَعِيْنٍ اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ وَتُلِيَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَجَبِّرِيْنَ فَقَالَ تَأْتِىْ بِهِ الْفُؤُوْسُ وَالْمَعَاوِلُ فَذَهَبَ مَاءُ عَيْنِهِ وَعَمِىَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى اللّٰهِ وَعَلٰى اٰيَاتِهِ.

৩০. বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যায় ভূমিতে অদৃশ্য তবে কে তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনয়ন করবে? প্রবাহিত। যাকে হস্ত ও বালতিসমূহ নাগালের কাছে পাবে। যেমন তোমাদের পানিসমূহ এরূপ নাগালের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তা আনয়ন করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা কিরূপে তোমাদের পুনরুত্থানকে অস্বীকার কর। পাঠকের জন্য মোস্তাহাব এই যে, مَعِيْنٍ শব্দটি পাঠের পর বলবে اَللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ আল্লাহ সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। যেমন হাদীস শরীফে এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। এই আয়াতটি কোনো এক অহংকারীর নিকট পঠিত হলে সে বলল, কুড়াল ও কোদাল তা আনয়ন করবে। তখন তার চোখের পানি শুকিয়ে যায় এবং সে অন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর নিদর্শনাবলি সম্পর্কে দুঃসাহস হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।

তাহকীক ও তারকীব

تَدَّعُوْنَ ও سَتَعْلَمُوْنَ শব্দদ্বয়ে বর্ণিত কেরাত : تَدَّعُوْنَ শব্দটিকে جُمْهُوْر তাশদীদ দিয়ে تَدَّعُوْنَ পড়েছেন। কাতাদা, ইবনে আবী ইসহাক, ইয়াকূব এবং যাহ্হাক এ শব্দটাকে দাল সাকিন সহকারে تَدْعُوْنَ পড়েছেন।

سَتَعْلَمُوْنَ শব্দ জমহুর কর্তৃক 'তা' দ্বারা سَتَعْلَمُوْنَ পড়া হয়েছে। কিসায়ী এটাকে جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহ ধরে 'ইয়া' দ্বারা سَيَعْلَمُوْنَ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : মক্কার কাফেরগণ নবী করীম ﷺ এবং সাহাবীদের জন্য বদদোয়া করত এবং তাঁদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করত। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন [নূরুল কুলূব।] অথবা ইমাম যাহেদ (র.) বলেছেন, কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যু কামনা করত এবং তাঁর সাহাবীদের ধ্বংস চাইত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে ঐ সমস্ত নরাধমদের উত্তর দানের জন্য উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[হোসাইনী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : উক্ত আয়াতে কাফেরগণ নবী করীম ﷺ ও ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে যা বলেছিল তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে কাফেররা কিয়ামতের সম্ভাব্যতাকে অলীক ও বিবেক-বুদ্ধি বহির্ভূত মনে করত। আর তাকে অস্বীকার ও অবিশ্বাসের একটা ছুঁতা হিসেবেই তার দিন-তারিখের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তাদের এ কথাটির তাৎপর্য হলো, হে নবী ও মু'মিনগণ! তোমরা আমাদের হাশর-নাশরের যে আশ্চর্যজনক খবরাদি শুনাচ্ছ, তা কবে কার্যত বাস্তবায়িত হবে? কখন পাঠাবার জন্য তাকে তুলে রাখা হয়েছে? তা আমাদের চোখের সামনে এনে হাজির করে দাওনা কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমরা মেনে নিতে পারি। মূলত এ ধরনের কথায় বিদ্রূপের সুর অনুরণিত। কেননা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বিবেক-বুদ্ধি সম্মত যুক্তি-প্রমাণের অকাট্যতা দেখিয়ে লোকেরা কিয়ামতে বিশ্বাসী হতে পারে

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে ঠিক এ উদ্দেশ্যেই এ সকল যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করা হয়েছে। তবুও এর সময়ও তারিখের প্রশ্ন করা হলে বলতে হবে এরূপ প্রশ্ন কেবল মূর্খ লোকেরাই তুলতে পারে। কেননা এ তারিখ যদি বলেও দেওয়া হয় তবুও তারা বলতে পারে ঠিক আছে সেই ঘোষণা অনুসারে সেই তারিখ যখন আসবে, তখন আমরা দেখে নেবো, মেনে নেবো। তা যে নিঃসন্দেহ তা এখন আমরা কিভাবে মেনে নেবো।

قَوْلُهُ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ : এটা কাফিরদের প্রশ্নের জবাবস্বরূপ। এর বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলেন, হে নবী! আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন, কিয়ামত কখন আসবে তা আল্লাহই ভালো জানেন, তা ঠিক কোন দিন আসবে এ সংবাদদাতা আমি নই। তিনি ছাড়া তা জানা কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। আর সেদিন কখন সংঘটিত হবে তা জানা জরুরিও নয়। অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الخ আর আমি একজন প্রকাশ্যভাবে কিয়ামতের দিনের ভয় প্রদর্শনকারী।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوهُ ..... بِهِ تَدَّعُونَ : আল্লাহ তাআলা আরও বলেন- হে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন যখন তারা দেখবে যে কিয়ামত একেবারেই নিকটবর্তী হয়ে আসছে তখন সে সময়ে ভয়ে কাফেরদের মুখসমূহ বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদের হুঁশ-জ্ঞান সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা খুবই বেপরোয়া হয়ে যে দিনটি আগমনের জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষা জাহির করেছ তা এখন হয়েছে। সুতরাং এখন এত বেহুঁশ কেন হলে? অর্থাৎ ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিতব্য অপরাধীকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার যেমন অবস্থা হয়, ঠিক সেদিন ঐ লোকদের তা অপেক্ষা আরও ভয়ানক অবস্থা হবে।

قَوْلُهُ سِيْئَتْ وُجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : অত্র আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ঐ কাফেররা যখন আল্লাহ তা'আলার আজাব দেখতে পাবে অথবা কিয়ামত নিকটবর্তী হবে তখন তারা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হবে যে, ভয়-ভীতির কারণে তাদের চেহারা বিবর্ণ এবং বিকৃত হয়ে যাবে তখন তাদের হৃদপিণ্ড দুরুদুরু কাঁপতে থাকবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, এ আজাবই তো তোমরা কামনা করছিলে।

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, চেহারা বিবর্ণ হওয়ার অবস্থা হলো এমন, যখন কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তদ্রূপ এ কাফিরদের অবস্থাও তেমন হবে, যখন তারা আসমানি আজাব দেখবে অথবা কিয়ামত আসন্ন হবে। -[নূরুল কোরআন]

وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ .... বাক্যটির বক্তা কে? এবং تَدَّعُونَ-এর অর্থ কি? : وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ বাক্যটির قَائِلْ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। এক. এটা জাহান্নামের প্রহরীদের উক্তি। তারা কাফেরদেরকে এ কথা বলবেন। দুই. কেউ কেউ বলেন, এই উক্তিটি হচ্ছে কাফেরদের। তারা আজাব প্রত্যক্ষ করার পর একে অপরকে লক্ষ্য করে একথা বলবে। تَدَّعُونَ -এর অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। ফাররা এর মতে এ শব্দটি دُعَاءٌ শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে তোমরা প্রার্থনা ও কামনা করছিলে এবং খুব তাড়াতাড়ি আজাব চাইছিলে তা আজ তোমাদের সামনে উপস্থিত। কেউ কেউ বলেন, تَدَّعُونَ শব্দটি মূলত دَعْوٰى শব্দ হতে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে তোমরা দাবি করছিলে যে, তোমরা পুনরুত্থিত হবে না এবং কোনো আজাব আসবে না, দেখ আজ তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং তোমাদের নিকট সেই আজাব এসে উপস্থিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এটা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِيْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি এটা দাবি করছিলে? না বরং তোমরা এটা সংঘটিত হবে না, তাই দাবি করছিলে কিন্তু আজ তা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ .... (الْاٰيَة) : আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কি কখনো চিন্তা-ভাবনা করেছ যে, তোমাদের কূপের পানি যদি তলিয়ে যায়, ঝরনাধারার যে প্রবাহ বিদ্যমান সেই পানি যদি ভূ-গর্ভে নিঃশেষ হয় এবং নাগালের বাইরে চলে যায়, তবে এমন কোনো শক্তিধর আছে যে, পানি প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে পারে?

এসব বিষয় তোমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত এবং তোমাদের মনের কাছেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, ইবাদত পাওয়ার যোগ্য দেবদেবীগণ, না এক লা-শরিক আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কেউ এই পানি ফিরিয়ে আনার শক্তি রাখে না। সুতরাং যারা আল্লাহকে একক সত্তা ও শরিকহীন মনে করে তারা ভ্রান্ত, না যারা তাঁর সাথে শরিক করে তারা ভ্রান্ত এ প্রশ্ন তোমাদের মনের কাছেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

سُوْرَةُ الْقَلَمِ : সূরা আল-ক্বালাম

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নাম নূন অথবা আল-ক্বালাম, কেননা এ শব্দ দু'টি অত্র সূরার প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'টি শব্দের অনুসরণেই অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২ রুকূ', ৫২টি আয়াত, ৩০০টি বাক্য ও ১২৪৬টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটি নাজিলের কারণ ও সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কা শরীফে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়্যতী জীবনের প্রথম দিকে নাজিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম। মক্কা শরীফে নতুন দীন প্রচার শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.), হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ (রা.) এবং হযরত উম্মে আয়মান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এদিকে নবী করীম ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে অজু ও নামাজের তালিম দেওয়া হলো। নবী করীম ﷺ এবং নব মুসলমানগণের এ নতুন কাজ অবলোকন করে কাফেরগণ বিস্মিত হলো। মক্কার প্রতিটি ঘরে ঘরে, অলিগলিতে তাদের এ নবতর কাজ ও ইবাদতি অনুষ্ঠান এবং কুরআনের অলৌকিক বিস্ময়কর বাণীর কথা আলোচিত হতে লাগল। কাফের সরদারগণ তাদের শিরকি মতবাদের উপর একে একটি আঘাত মনে করল। কেননা কুরআনের প্রবল আকর্ষণে মানুষ বিমোহিত হয়ে শিরকি মতবাদ ছেড়ে এ নবতর দীনে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। ফলে কাফের সরদারগণ এর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে উঠল। নবী করীম ﷺ-কে নানাভাবে উপহাস, তিরস্কার ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিতে লাগল। এমনকি তাঁকে উন্মাদ-পাগল নামে আখ্যায়িত করতেও ছাড়ল না। সুতরাং এতে নবী করীম ﷺ-এর মনে আঘাত পাওয়া এবং মনঃক্ষুণ্ন হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এই সূরা অবতীর্ণ করে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেন; কিন্তু নাজিলের সময় কোনটি তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, মক্কী জীবনে কাফেরদের বিরোধিতার মাত্রা যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল, সম্ভবত তখনই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : উক্ত সূরাতে আল্লাহ তা'আলা মোট তিনটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও ওজর-আপত্তির জবাব, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও সদুপদেশ প্রদান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং অবিচলতার জন্য উপদেশ দান।

অত্র সূরার প্রথম পর্যায়ে রাসূলে কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের প্রতি আপনার ইসলামের দাওয়াত পেশ করার প্রেক্ষিতে তারা আপনাকে যে গালি দিচ্ছে, তাতে আপনার কিছু আসে যায় না। আপনি নৈতিকতার উচ্চমানে অধিষ্ঠিত, আপনি প্রভুর মহাসত্য প্রচারে রত। আপনি পাগল নন, বরং কে পাগল আর কে ভালো তা তো সকলেই অবগত রয়েছে।

আপনার বিরুধিতার যে প্রচণ্ড ঝড় বইছে, এটার কোনো চাপই আপনি মেনে নিবেন না, কোনো না কোনো এক পর্যায়ে আপনি কেবল তাদের কথায় বাধ্য হয়ে যান, এটাই তাদের কামনা। এরা সত্য হতে মানুষকে পথভ্রষ্টকারী। সীমালঙ্ঘনকারী বটে এবং চুগলখোর। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যকার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সকল মক্কাবাসীদের নিকট সে সুপরিচিত [তখনও তাদের সকলের নিকট নবী করীম ﷺ-এর সুমহান চরিত্র উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হয়েছিল। তথাপিও মুহাম্মদ ﷺ তাদের উক্ত সুপরিচিত ব্যক্তির নিকট আল্লাহর বাণী প্রচার করলে বলত, এটা প্রথম যুগের বা পূর্বযুগের মানুষদের কিস্সা-কাহিনী মাত্র। তবে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির কথার জবাব খুব শক্তভাবেই দিয়েছেন। ১৭-৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এ বাগানের অধিকারী মালিকগণ আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত পেয়েও তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন হতে বঞ্চিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগানকে সম্পূর্ণ নিধন করে দিয়েছিলেন। ফলে তারা তাঁর নিয়ামত হতে বঞ্চিত রয়ে গেল। এ বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে মক্কাবাসী তথা সমগ্র বিশ্বের কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদেরকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, রাসূলে করীম ﷺ-এর আদর্শ ও চরিত্রে চরিত্রবান না হলে যে কোনো যুগে যে কোনো জাতিই এরূপ আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে তাঁর গজবের সম্মুখীন হবে। ৩৪-৪৭ আয়াতসমূহে কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে কাফেরদেরকে ক্রমান্বয়ে নসিহত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কোথাও কাফেরদেরকে আবার কোথাও নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে। সেসব সম্বোধন ও আলোচনার নির্যাস এ যে, যারা আল্লাহকে মান্য করবে আর যারা অমান্য করবে, এ উভয় পক্ষের পরকালীন পরিণতি এক হবে না, অথচ কাফেরদের এ বিষয়ে ধারণা হলো, শেষ পরিণতি তাদেরই পক্ষে হবে।

তাদের এহেন ধ্যান-ধারণার কোনো মূল্য নেই, এটা ভিত্তিহীন, এর পক্ষে তাদের কোনো প্রমাণাদি পেশ করা অসম্ভব। মূলত মু'মিনগণ জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর কাফেররা জাহান্নামী হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মতামত সত্যায়িত করার জন্য তাদের দলনেতাগণও শত চেষ্টা করে কোনো ফল বের করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তাঁর দস্তুর মতেই স্বীয় কাজ চালিয়ে যাবেন।

৪৮ হতে শেষ আয়াত পর্যন্ত রাসূলে কারীম ﷺ-কে বিশেষভাবে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা আগমন করা পর্যন্ত দীন প্রচারে যত কঠোরতা ও দুঃখ-কষ্টেরই সঙ্গী হতে হয়, তা যেন তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে অতিক্রম করে যান। হযরত ইউনুস (আ.)-এর মতো যেন ধৈর্যহারা না হন। কারণ এ ধৈর্যহারা হওয়ার দরুন তিনি বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমত তাঁকে রক্ষা করেছিল। অতএব কাফেরদের সকল লাঞ্ছনার মোকাবিলায় তিনি যেন হতাশ না হন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আল মুলকে বেশির ভাগ আলোচনা ছিল একত্ববাদ এবং তার অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আর এ সূরার অধিকাংশ আলোচনা রেসালাতের অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে করা হয়েছে। আর নবুয়তকে অবিশ্বাস করা কুফরি সুতরাং কুফরির প্রতিফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। -[বায়ানুল কুরআন, মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-ক্বালাম মক্কায় অবতীর্ণ

ثِنْتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً : ৫২ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. نٓ حَرْفٌ مِنْ حُرُوْفِ الْهِجَاءِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِهِ وَالْقَلَمِ الَّذِىْ كُتِبَ بِهِ الْكَائِنَاتُ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ اَىِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ .

১. নূন আরবি বর্ণমালার একটি বর্ণ। আল্লাহই এর উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। আর শপথ কলমের যার মাধ্যমে লাওহে মাহফূযে সমগ্র সৃষ্টিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এবং যা তারা লিপিবদ্ধ করে অর্থাৎ ফেরেশতাগণ। কল্যাণ ও পুণ্যের মধ্য হতে।

٢. مَآ اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ اَىِ انْتَفَى الْجُنُوْنُ عَنْكَ بِسَبَبِ اِنْعَامِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا وَهٰذَا رَدٌّ لِقَوْلِهِمْ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ

২. আপনি নন হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ অর্থাৎ নবুয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রকাশিত হওয়ার কল্যাণে আপনার মধ্যে উন্মাদতা নেই। আর এটা কাফেরদের বক্তব্য اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ "সে তো একজন উন্মাদ" -এর প্রত্যুত্তর।

٣. وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ مَقْطُوْعٍ .

৩. আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার অবিচ্ছিন্ন।

٤. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ دِيْنٍ عَظِيْمٍ .

৪. নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রে দীনে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

٥. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ .

৫. অচিরেই আপনি দেখবেন ও তারা দেখবে।

٦. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ مَصْدَرٌ كَالْمَعْقُوْلِ اَىِ الْفُتُوْنُ بِمَعْنَى الْجُنُوْنِ اَىْ اَبِكَ اَمْ بِهِمْ .

৬. তোমাদের মধ্য হতে কে বিকারগ্রস্ত اَلْمَفْتُوْنُ শব্দটি مَعْقُوْل -এর ন্যায় মাসদার অর্থাৎ جُنُوْن অর্থে ব্যবহৃত فُتُوْن -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আপনার সাথে, না তাদের সাথে।

٧. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ لَهُ وَاَعْلَمُ بِمَعْنَى عَالِمٌ .

৭. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অধিক পরিজ্ঞাত, কে তার পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই সৎপথপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত তাঁর প্রতি। اَعْلَمُ শব্দটি এখানে عَالِمٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ : এ বাক্যে وَاوْ কসমের জন্য مَا মাওসূলা, يَسْطُرُوْنَ সেলাহ, বাক্যটি قَلَمِ -এর উপর আতফ হয়েছে। مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ الخ বাক্যটি জওয়াবে কসম। وَاِنَّ لَكَ الخ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। وَاِنَّكَ لَعَلٰى الخ বাক্যটি তার পূর্ব বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। এ তিনটি বাক্যই জওয়াবে কসম। بِاَيِّكُمُ খবর মুকাদ্দাম, اَلْمَفْتُوْنُ মুবতাদা মুআখখার। মুবতাদা এবং খবর মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة এই জুমলাটি নসবের স্থলে আছে পূর্বের জুমলার সাথে مُتَعَلِّق হওয়ার কারণে।

উক্ত আয়াতে خُلُق শব্দকে একবচন এবং عَظِيْم শব্দকে তার صِفَتْ নেওয়ার কারণ : এর কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল চারিত্রিক গুণাবলির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন সেগুলো মূলত বহুবিধ চারিত্রিক গুণাবলির সমষ্টি। এ কারণে خُلُق শব্দটি لَفْظًا যদিও একক হয়ে থাকে তবে مَعْنًى তা বহুবচনের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে এবং عَظِيْم -কে তার صِفَتْ নেওয়া হয়েছে। আর مَكَارِم اَخْلَاقْ -এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলি সবগুলোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ এবং اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ আয়াতদ্বয়ের শানে নুযূল : ইবনে জুরাইজ (রা.) বলেন, মক্কার কাফেররা যখন নবী করীম ﷺ-কে পাগল বা উন্মাদ, অতঃপর শয়তান নামে আখ্যায়িত করেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের এ উক্তির প্রতিবাদে উপরিউক্ত ২নং আয়াত অর্থাৎ "আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নন" অবতীর্ণ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর চেয়ে কেউই সুন্দর চরিত্রের ছিল না। এরূপ উত্তম চরিত্রের যেমন তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন না, তেমনি তাঁর পরিবারের কোনো লোকই ছিলেন না। যখনই তাঁর কোনো সাহাবী বা পরিবারের কোনো লোক তাঁকে ডাকতেন, তখনই তিনি বলতেন, আমি উপস্থিত। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উপরিউক্ত ৪নং আয়াত অবতীর্ণ করে সুমহান চরিত্র ও সুউচ্চ নৈতিকতার আসনে সমাসীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা কলম ও লেখকগণের লেখার শপথ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি আপনার প্রভুর নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন, আপনি পাগলামি করছেন না, যদিও ধর্মবিরোধীদের নিকৃষ্ট মুখে আপনাকে পাগল বলা হয়েছে, এতে আপনি কর্ণপাত করবেন না। আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার এই সালামের মহৎ কাজের প্রতিফল পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবন পেতেই থাকবেন। আর আপনি তো মহাউত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কাফেররাই কেবল নিকৃষ্টতম চরিত্রে নিমজ্জিত রয়েছে। সুতরাং আপনি অবিচলভাবে আপনার মহতী কার্যে অবিচলভাবে দায়িত্ব পালন করে যান।

قَوْلُهُ نٓ -এর মধ্যে نٓ -এর তাৎপর্য : قَوْلُهُ نٓ একে حَرْف مُقَطَّعْ বলা হয়, পবিত্র কালামুল্লাহ- এর বহু সূরার প্রথমে এরূপ বহু حُرُوْف مُقَطَّعَاتْ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- سُوْرَه اَحْقَافْ -এর প্রথমে حٰمٓ সূরা ইয়াসীনের প্রথমে يٰسٓ ইত্যাদি। এটাকে তাফসীরকারগণ حُرُوْف مُعْجَمْ ও বলেছেন। এর সঠিক অর্থ ও তথ্যের পেছনে উঠে পড়ে লাগা বান্দাদের জন্য নিষ্প্রয়োজন, তাই তাফসীরকারগণ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন- اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ بِذٰلِكَ আল্লাহ এটা দ্বারা কি অর্থ নিয়েছেন তা তিনিই ভালোরূপে জানেন- كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلَّا اللّٰهُ -[মা'আরিফ]

তথাপিও বিভিন্ন তাফসীরকারগণ এটার বিভিন্ন تَاوِيل করেছেন, হযরত ইবনে মুনযির, ইবনে জুরাইজ ও মুজাহিদ (র.) বলেন, اَلنُّوْنُ هُوَ الْحُوْتُ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْاَرْضُ - নূন ঐ মাছটির নাম যার উপর সারা ভূ-পৃষ্ঠ দণ্ডায়মান রয়েছে। আল্লামা তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নূন অর্থ মাছ।

আব্দুর রায্যাক, ইবনুল মুনযির এবং কাতাদাহ হাসান (রা.) হতে বর্ণনা করেন, اَلنُّوْنُ الدَّوَاةُ وَهٰكَذَا رَوٰى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَيْضًا -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জালালাইন গ্রন্থকার বলেন, এটা একটি حَرْف هِجَائِيّ [হরফে হিজায়ী] একটি আরবি বর্ণমালা মাত্র। তিনি এ তাফসীর করার মূল কারণ হলো, যারা বলে যে আল্লাহর নামসমূহের অংশ বিশেষ তাদের কথাকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করা।

তাদের দাবি ছিল نٓ টি আল্লাহর নাম اَلرَّحْمٰنُ বা اَلنَّصِيْرُ অথবা اَلنَّاصِرُ শব্দের একটি অংশ। কারো কারো মতে এটা اِسْمُ السُّوْرَةِ। কারো কারো মতে এটা اِسْمُ الْقُرْاٰنِ ইত্যাদি। -[জামাল]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে প্রাচীনতম তাফসীকারগণ এ অভিমত পেশ করেছেন যে, এ نُوْن অক্ষরের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মু'মিনদের প্রতি একটি সাহায্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

কারো কারো মতে লাওহে মাহফূযে যে দোয়াতের কালি দ্বারা মানুষের তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয় এখানে সে অক্ষরের উল্লেখ করে দোয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[খাযেন, ম'আলিম, হোসাইনী]

কারো কারো মতে, এটি সেই মাছ যেটি হযরত ইউনুস (আ.)-কে তার উদরে ধারণ করে রেখেছিল। -[নূরুল কোরআন]

প্রথম আয়াতের قَلَمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উপরিউক্ত ১নং আয়াতে কলমের শপথ দ্বারা সেই কলমের কথা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাময় সকল বস্তু ও বিষয় লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ অনেক তাফসীরকারকের অভিমত। তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম মুজাহিদ (র.)-এর মতে এখানে কলম দ্বারা সেই কলমকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা জিকির অর্থাৎ কুরআন মাজীদ লেখা হতো।

আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, তাকদীর লিপিবদ্ধকারী কলমটি ছিল, নূরের যার দৈর্ঘ্য ছিল আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা এখানে 'কলম' উল্লেখ করে যারা কলম ব্যবহার করেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এমতাবস্থায় মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য হতে পারে।

অথবা যে ওলামায়ে কেরাম কলম দ্বারা ইলমে দীন লিপিবদ্ধ করেন তাদেরকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

وَمَا يَسْطُرُوْنَ-এর মর্মার্থ : وَمَا يَسْطُرُوْنَ-এর মর্ম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হচ্ছে লিখিত বস্তু। এখন যদি কলম বলতে সমস্ত কলম বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে 'দুনিয়াতে যা কিছু লেখা হচ্ছে সেই সবের কসম।' কেউ কেউ বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে, যা কিছু কিরামান কাতেবীন মানুষের আমলনামায় লেখে তার শপথ। কেউ কেউ বলেন, এটার মর্ম হলো, লাওহে মাহফূযে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। يَسْطُرُوْنَ বলে বহুবচন বুঝানো হয়নি; বরং এটা দ্বারা تَعْظِيْم বুঝানো হয়েছে। অথবা দুনিয়ায় সংঘটিত সমস্ত কাজকর্ম যা কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে তা বুঝানো হয়েছে। -[কাবীর]

কলম ও مَا يَسْطُرُوْنَ-এর নামে শপথ করার কারণ : উক্ত আয়াতে قَلَمٌ দ্বারা যদি قَلَم تَقْدِيْر উদ্দেশ্য করা হয় যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি, তবে তা প্রথম সৃষ্টি হিসেবে অন্যান্য সৃষ্টির উপর তার বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং তা দ্বারা শপথ করা (مُنَاسِبٌ) উপযোগী হয়েছে।

আর যদি قَلَمٌ দ্বারা সাধারণ কলম উদ্দেশ্য করা হয় যা দ্বারা قَلَم تَقْدِيْر এবং ফেরেশতা ও ইনসানের সকল কলম তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তখন বলতে হবে যে, কলমের শপথ এ কারণে করা হয়েছে যে, জগতের বিশাল বিশাল রাজ্যসমূহ বিজয় করার জন্য তলোয়ারের অপেক্ষাও অধিক কাজ করে থাকে "কলম" অর্থাৎ কলমের গুরুত্ব তলোয়ার অপেক্ষা অধিক, যা কারোও বোধগম্য হতে আর বাকি থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আবূ হাতেম বুসতী দু'টি শ্লোক (شِعْر) বলেছেন–

اِذَا اَقْسَمَ الْاَبْطَالُ يَوْمًا بِسَيْفِهِمْ * وَعَدُّوْهُ مِمَّا يُكْسِبُ الْمَجْدَ وَالْكَرَمْ

كَفٰى قَلَمُ الْكُتَّابِ عِزًّا وَرِفْعَةً * مَدَى الدَّهْرِ اِنَّ اللّٰهَ اَقْسَمَ بِالْقَلَمِ

অর্থাৎ যখন কোনো বাহাদুর কোনো দিন স্বীয় তলোয়ারের শপথ করে থাকে, তখন সে তার তলোয়ারকে এমন বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে তোলে যেগুলো মানুষকে মর্যাদাশীল ও সম্মানী করতে পারে।

সে মর্মে বলতে হয় যে, লেখকদের জন্য কলম সর্বদা তার সম্মান বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন কলমের দ্বারা। -[মা'আরিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূলকথা হলো, উক্ত আয়াতে عَامٌ قَلَمٌ বা قَلَم تَقْدِيْر উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে। উভয় অর্থই বিশুদ্ধ হবে। অতঃপর يَسْطُرُوْنَ বলে যা قَلَم تَقْدِيْر অথবা قَلَم عَام দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয় তার শপথ করে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সেই সকল অপবাদকে খণ্ডন করে দিয়েছেন যেগুলো দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে তারা লাঞ্ছনা দিয়েছিল। যেমন তারা বলেছিল– يَاَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ.

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ মক্কাবাসীদের নিকট একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ এবং আল-আমীন বা বিশ্বাসী লোক ছিলেন। সত্যের বাণী নিয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করলেন তখনই তাদের চোখে তিনি একজন পাগল, উন্মাদ ও প্রবঞ্চনাকারী হয়ে গেলেন, তখনই তারা তাঁর সত্যতা, বিচার-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা ভুলে গেল এবং নানা প্রকার কটূক্তির দ্বারা তাঁকে অপমানিত করতে শুরু করল। মিথ্যা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনতে লাগল, তাদের এ সকল কটূক্তি ও মিথ্যার প্রতিবাদেই আল্লাহ তা'আলা কলমের ও তার লেখার শপথ করলেন এবং কখনও কখনও কুরআনের শপথ এবং অন্যান্য সৃষ্টির শপথ করে তাদের কটূক্তির খণ্ডন করলেন এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে জানিয়ে দিলেন যে, তাদের উক্তি মতে আপনি পাগল বা মিথ্যুক ও জাদুকর নন। তাঁর মনে যে সংকোচবোধ হচ্ছিল, করুণাময় তা দূর করে দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন এবং তাদের কটূক্তির কঠোর প্রতিবাদ বা নিন্দা করেছেন।

কাফেরদের উক্তির খণ্ডন : মহানবী ﷺ মক্কার লোকদের নিকট তাঁর নবুয়তের দাবি উত্থাপন করার পূর্বে তিনি তাদের নিকট একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও উত্তম চরিত্রের লোকরূপে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর সততা, বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার উপর সকলেই ছিল সংশয়হীন-আস্থাবান; কিন্তু তিনি যখন তাদের কাছে কুরআনুল কারীম পেশ করলেন, তখন তারা তাঁকে উন্মাদ বা পাগল ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতে লাগল। তাঁদের এ সব কটূক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন লেখার কলমের শপথ করে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। যে কুরআনের কারণেই তাঁর উপর মিথ্যা অভিযোগ দিত; সেই কুরআনের শপথ করেই প্রতিবাদ জানানো হয়েছে যে, আপনি তাদের উক্তি মতে উন্মাদ বা পাগল নন। যদিও এ কথাটি রাসূলে কারীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে; কিন্তু এর লক্ষ্য হলো মক্কার লোকদের এ মিথ্যা অভিযোগের প্রতিবাদ জানানো। এরূপ নয় যে, নবী করীম ﷺ নিজে নিজে উন্মাদ হওয়ার আশঙ্কাবোধ করছিলেন এবং তাদের মুখেও উন্মাদ হওয়ার কথা শুনেছিলেন, তাই "আপনি আপনার প্রতিপালকের করুণায় উন্মাদ নন" বলে তাঁর মনের সংশয় ও দ্বিধা দূর করে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ -এর মনে এরূপ দ্বিধা-সংশয় উদ্রেক হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। তাঁর নিকট যে আল্লাহর প্রত্যাদেশ আসে এবং তিনি তাঁর মনোনীত রাসূল এতে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। সুতরাং উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর خُلُقٍ عَظِيْمٍ সম্পর্কে আলোচনা : রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, خُلُقٍ عَظِيْمٍ -এর অর্থ دِيْنٍ عَظِيْمٍ বা দীন ইসলাম, অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে এ দীন ইসলাম অপেক্ষা আর কোনো ধর্ম এত বেশি প্রিয় নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ তাঁর চরিত্রটাই হলো কুরআনুল কারীম। অর্থাৎ কুরআনে কারীম যে সকল উত্তম কাজ ও চরিত্রের শিক্ষা প্রদান করেছে সেসব বিষয়ে বাস্তব প্রয়োগ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কার্যাবলি এবং কথাবার্তা ও আচার-আচরণের মাধ্যমেই ফুটে উঠে।

হযরত আলী (রা.) বলেন, خُلُقٍ عَظِيْمٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (اٰدَابُ قُرْاٰن) আদাবে কুরআন। অর্থাৎ ঐ সকল অভ্যাস যা কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে যাবতীয় উত্তম চরিত্রকে তাঁর মধ্যে জমা করে দিয়েছেন তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলেছেন بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি স্বচ্ছচরিত্রতা পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত একাধারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করেছি, তথাপিও কোনো কাজে তিনি আমাকে কখনও اُفٍّ করেননি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

রত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে তাঁর নিজ হাতে প্রহার করেননি। তবে ইসলামের জন্য জিহাদ াতে যেখানে যখন গেছেন তখন সেখানে কাফের ও মুশরিকদেরকে হত্যা না করে ছাড়েননি। অন্যথা কখনো তার কোনো লাম বা চাকরানি অথবা স্বীয় স্ত্রীদেরকেও প্রহার করেননি। তবে শরয়ী কানুন মোতাবেক তাকে সাজা দেওয়াতেন। কারো াথাও ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলেও তার কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। –[মুসলিম]

রত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কখনো এমন প্রশ্ন করা হয়নি যার উত্তর তিনি দেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

রত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো বাজারে যেয়ে হৈ চৈ করতেন না আর অসৎ কার্যের প্রতিউত্তর অসৎ র্যের মাধ্যমেও দেননি। যদিও جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا -কে জায়েজ রাখা হয়েছে। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, য়ামতের দিন خُلُقٌ حَسَنٌ -এর ন্যায় আমলের পাল্লায় এত বেশি ওজনী আর কোনো কিছুই হবে না।

রত আয়েশা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মুসলমানগণ, তাদের حُسْنِ خُلُقٍ -এর বদৌলতেই ঐ ক্তির মর্যাদায় মর্যাদশীল হবে, যে ব্যক্তি রাতে ইবাদত এবং দিনে রোজা পালন করে। –[আবূ দাউদ]

قَوْلُهُ تَعَالَى "فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ" : "অতঃপর অচিরেই আপনি প্রত্যক্ষ করবেন এবং তারাও প্রত্যক্ষ াবে যে, আপনাদের মাঝে কে উন্মাদ।" এখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর কাফেরদের অপবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে ং তাদের কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে। প্রথম অংশে "আপনি অচিরেই প্রত্যক্ষ করবেন এবং তারা প্রত্যক্ষ করবে" এ কথাটির ট অর্থ হতে পারে।

ক. দুনিয়াতে কার পরিণতি কি হবে। আপনি দুনিয়াবাসীদের সকলের অন্তরে দুনিয়াবাসীর বিরাট মর্যাদা লাভ করবেন, আর তারা ঞ্ছিত-অপমানিত হবে। আপনি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবেন, তাদেরকে হত্যা করতে পারবেন।

খ. পরকালে দেখা যাবে কার কি অবস্থা হয়। সেখানে আপনি হবেন কামিয়াব আর কাফেররা হবে ব্যর্থ, ক্ষতিগ্রস্ত। আর مفتن -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে– বিপদগ্রস্ত হওয়া, উন্মাদ হওয়া, ধন-সম্পদহারা বা জ্ঞানহারা হওয়া, পাগল বা বিকারগ্রস্ত ওয়া। অর্থাৎ কে প্রকৃত জ্ঞানবান, সফলকাম; আর কে উন্মাদ ও ব্যর্থ তা অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবে। সময়ই বলে দেবে যে, সূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সফলকাম এবং প্রকৃত জ্ঞানী আর কাফেররা ছিল ব্যর্থ এবং উন্মাদ-পাগল। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ.

৮. সুতরাং আপনি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করবেন না।

٩. وَدُّوْا تَمَنَّوْا لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ تُدْهِنُ تَلِيْنُ لَهُمْ فَيُدْهِنُوْنَ يَلِيْنُوْنَ لَكَ وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى تُدْهِنُ وَاِنْ جُعِلَ جَوَابُ التَّمَنِّى الْمَفْهُوْمُ مِنْ وَدُّوْا قُدِّرَ قَبْلَهُ بَعْدَ الْفَاءِ هُمْ.

৯. তারা কামনা করে আশা করে যদি لَوْ অব্যয়টি মাসদারিয়্যাহ নমনীয় হন আপনি তাদের প্রতি বিনম্র হন, তবে তারা নমনীয় হবে আপনার প্রতি বিনম্র হবে يُدْهِنُوْنَ শব্দটি تُدْهِنُ -এর প্রতি عَطْف হয়েছে। আর যদি তাকে جَوَاب تَمَنِّىْ রূপে গণ্য করা হয় যা وَدُّوْا হতে উপলব্ধিত হয়; তবে يُدْهِنُوْنَ -এর পূর্বে فَاء -এর পরে একটি هُمْ উহ্য গণ্য করা হবে। অর্থাৎ فَهُمْ يُدْهِنُوْنَ

١٠. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ كَثِيْرِ الْحَلْفِ بِالْبَاطِلِ مَّهِيْنٍ حَقِيْرٍ.

১০. আর অনুসরণ করো না সেই ব্যক্তির যে অধিক শপথকারী অপ্রয়োজনে অধিক শপথকারী, যে লাঞ্ছিত তুচ্ছ ও নগণ্য।

١١. هَمَّازٍ عَيَّابٍ اَىْ مُغْتَابٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ سَاعٍ بِالْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلٰى وَجْهِ الْاِفْسَادِ بَيْنَهُمْ.

১১. যে পরচর্চাকারী নিন্দাকারী অর্থাৎ পশ্চাতে নিন্দাকারী। যে একের কথা অন্যের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কথা লাগিয়ে বেড়ায়।

١٢. مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ بَخِيْلٍ بِالْمَالِ عَنِ الْحُقُوْقِ مُعْتَدٍ ظَالِمٍ اَثِيْمٍ اٰثِمٍ.

১২. যে কল্যাণে বাধাদনকারী হক আদায়ে সম্পদে কার্পণ্যকারী যে সীমালঙ্ঘনকারী অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ পাপাচারী।

١٣. عُتُلٍّ غَلِيْظٍ جَافٍ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ دَعِىٍّ فِىْ قُرَيْشٍ وَهُوَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ اِدَّعَاهُ اَبُوْهُ بَعْدَ ثَمَانِىْ عَشَرَةَ سَنَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَا نَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى وَصَفَ اَحَدًا بِمَا وَصَفَهُ مِنَ الْعُيُوْبِ فَالْحَقَ بِهِ عَارًا لَا يُفَارِقُهُ اَبَدًا وَتَعَلَّقَ بِزَنِيْمٍ الظَّرْفُ قَبْلَهُ.

১৩. রূঢ় স্বভাব কঠোর ও সঙ্গি-সাথীকে কষ্টদানকারী তদুপরি কুখ্যাত কুরাইশদের মধ্যে যে এ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। আর সে হলো অলীদ ইবনে মুগীরা, যার পিতা আঠার বছর পর তাকে সন্তানরূপে স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার যে পরিমাণ নিন্দাবাদ করেছেন, তদ্রূপ আর কারও করেছেন কিনা? সুতরাং এ দুর্নাম তার চিরসাথী হয়েছে। আর بَعْدَ ذٰلِكَ যরফ্ যা زَنِيْمٍ এর সাথে মুতা'আল্লিক।

١٤. اِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ اَىْ لِاَنْ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ.

১৪. এ জন্য যে, সে সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। اَنْ শব্দটি لِاَنْ অর্থে ব্যবহৃত, তার সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যে নির্দেশনার সাথে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٥. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا الْقُرْاٰنُ قَالَ هِيَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اَيْ كَذَّبَ بِهَا لِإِنْعَامِنَا عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ أَأَنْ بِهَمْزَتَيْنِ مَفْتُوْحَتَيْنِ .

১৫. যখন তার নিকট আমার আয়াত পঠিত হয় কুরআন, সে বলে এটা পূর্ববর্তীগণের রূপকথা অর্থাৎ সে তৎপ্রতি মিথ্যা আরোপ করে। তার উপর আমার উল্লিখিত অনুগ্রহরাজির কারণে। আর أن শব্দটি أأن দু'টি হামযায়ে মাফতূহাহ-এর মাধ্যমে এক কেরাতে পড়া হয়েছে।

١٦. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ سَنَجْعَلُ عَلٰى أَنْفِهٖ عَلَامَةً يُعَيَّرُ بِهَا مَا عَاشَ فَخُطِّ أَنْفُهُ بِالسَّيْفِ يَوْمَ بَدْرٍ .

১৬. অচিরেই আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দিবো তার নাসিকায় এমন চিহ্ন করে দিবো, যাতে চিরদিন সে লজ্জিত থাকবে। বদর যুদ্ধের দিন তরবারি দ্বারা তার নাসিকায় দাগ দেওয়া হয়েছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ : فَيُدْهِنُوْنَ আতফ হয়েছে تُدْهِنُ -এর উপর। অর্থাৎ فَهُمْ يُدْهِنُوْنَ আর لَوْ -এর জওয়াব উহ্য। অনুরূপভাবে وَدُّوْا -এর মাফঊলও উহ্য। অর্থাৎ وَدُّوْا إِدْهَانَكَ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ এটাও হতে পারে যে, فَيُدْهِنُوْنَ উহ্য খবরের মুবতাদা হয়ে لَوْ -এর জওয়াব হবে। শর্ত এবং জাযা وَدُّوْا -এর মাফঊল হয়েছে।

قَوْلُهُ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ : বাক্যটি মুতা'আল্লিক হয়েছে لَا تُطِعْ ফে'ল -এর সঙ্গে। কোনো কোনো কেরাতে أَنْ -কে إِنْ পড়া হয়েছে। إِنْ যদি شَرْطِيَّةٌ হয় তবে এটার খবর হচ্ছে উহ্য। মূলে ছিল إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ يَكْفُرُ عَلَيْهِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ বাক্যটি مُسْتَأْنِفَةٌ যা نَهِيْ -এর কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের সাথে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক : আল্লাহ তা'আলা পূর্বে কাফেরদের আচরণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তারা যে উন্মাদনার অভিযোগ আনয়ন করেছে এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে যে কথাবার্তা বলেছে অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁর দীন ও নবীর চরিত্রকে সুমধুর করেছেন– তা উল্লেখ করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে কাফেরদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তাদের ব্যাপারে নমনীয়তা গ্রহণ না করার জন্য নবীকে জানিয়ে দিচ্ছেন, যদিও তাঁর অনুসারীর সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় অতি নগণ্য। কেননা এটা মাক্কী জীবনের প্রথম দিকের সূরা। এখানে কাফেরদের ব্যাপারে, তাদের মূর্তিপূজার ব্যাপারে পরিষ্কার ও কাটছাঁট কথা বলার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলে দেওয়া হয়েছে। –[কাবীর]

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ الخ -এর শানে নুযূল : আবূ হাতেম আল্লামা সুদ্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন, উপরিউক্ত ৯নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কার প্রখ্যাত দুষ্ট আখনাস ইবনে শোরায়েককে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়। বিশিষ্ট তাফসীরকারক কালবী থেকেও ইবনে মুনযির অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মুজাহিদ (র.)-এর মতে উপরিউক্ত আয়াত আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের পরিচয়দানে অবতীর্ণ হয়।

অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কাছে যখন উপরিউক্ত ১০-১১নং আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখনও আমরা বঞ্চিত লোকটিকে চিনতে পারিনি। পরিশেষে যখন তাকে জারজ নামে আখ্যায়িত করা হয় তখনই আমরা তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারলাম। তখন বুঝতে পারলাম যে, সে ব্যভিচারপ্রসূত জারজ সন্তান। –[লোবাব]

অথবা, হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, এ আয়াতগুলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আঠার বছর পর তার পিতা মুগীরা তাকে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করে। –[বায়যাবী, মা'আলিম]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ : "তারা চায় আপনি নমনীয় হোন, তবে তারাও নমনীয় হবে।" এটাই দর কষাকষি। যেমন সাধারণ মানুষ লেনদেন ও ব্যবসায়ে করে থাকে: কিন্তু আকীদা ও ব্যবসার মাঝে বিরাট ব্যবধান! আকীদার ধারক তার আকীদার ব্যাপারে সামান্য ছাড় দিতে কখনও প্রস্তুত নয়। তার আদর্শ তার নিকটে সবচেয়ে বড়। এ ব্যাপারে সে সব কিছুকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত; কিন্তু তার আকীদা-আদর্শকে সে কখনও ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। কাফেররা নবীর নিকট অনেক প্রস্তাব ও প্রলোভন নিয়ে এসেছিল। সুন্দরী নারী, অর্থসম্পদ, দেশের বাদশাহী, আরো কত লোভনীয় প্রস্তাব; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব কিছুকে আদর্শের কারণে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি তাঁর আদর্শের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, যদি আমার এক হাতে চন্দ্র ও অন্য হাতে সূর্য এনে দাও তবুও আমি আমার আদর্শ প্রচার থেকে বিরত হবো না। আমার আদর্শের ব্যাপারে কোনোই আপোষ নেই। নবীর নিকট থেকে তারা আদর্শের ব্যাপারে যে নমনীয়তা আশা করে তা কখনো সম্ভবপর নয়। দুনিয়াবী কাজে তিনি অত্যন্ত নরম; কিন্তু দীনের ব্যাপারে তিনি পাহাড়ের চেয়েও অনড়, ইস্পাতের চেয়েও কঠিন।

قَوْلُهُ تَعَالَى حَلَّافٍ : حَلَّافٍ এটা اِسْم فَاعِل مُبَالَغَه -এর শব্দ অর্থাৎ বেশি বেশি কসমকারী। মিথ্যাবাদীরাই অধিক শপথ করে থাকে। কথায় বলা হয়, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। তারা অধিকাংশ মিথ্যা কথা বলে থাকে। তাই তারা মিথ্যাকে আড়াল করার জন্য অধিক কসম করে। মানুষকে তার প্রতি আস্থাবান করতে সে চেষ্টা করে। নবুয়তের যুগে এহেন প্রকৃতির লোক বহু সংখ্যক ছিল। সুতরাং বর্তমানেও এ ধরনের লোকদের হতে দূরে সরে থাকা একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ও وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ -এর মধ্যে نَهِيْ কি تَحْرِيْم -এর জন্য? : উক্ত আয়াতে যে কাফেরদের অনুসরণ করতে দু'বার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সম্পর্কে যেহেতু কোনো প্রকার قَرَائِنْ পাওয়া যায় না, সুতরাং তা تَحْرِيْم হারামের জন্যই সাব্যস্ত হবে। তবে এরা যেহেতু মিথ্যাচারী ও সত্য হতে মানুষকে স্পষ্ট বিরতকারী। সুতরাং যেহেতু আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য নিষেধ করা হচ্ছে এটা অমান্য করা অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করা হারাম হবে। لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ মা'আরিফ গ্রন্থকারও এটাকে হারামের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ : সে লোক গালাগালি করে, চুগলি করে বেড়াতে বেশি অভ্যস্ত অর্থাৎ মানুষকে কথায় কথায় দোষী সাব্যস্ত করতে চায়, সামনে মানুষকে খুবই ভালো বলে, পিছনে খুবই মন্দ বলে। এটাই هَمَّازٍ -এর অর্থ এটাকে গিবত বলা হয়। আর চুখলি করার অর্থ হলো– شَاعَ بِالْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلٰى وَجْهِ الْإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ মানুষের মাঝে এমন কিছু কথাবার্তা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে যাতে মানুষে মানুষে খুবই বিবাদ ঘটে। এরূপ লোককে نَمَّامٌ বলা হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ চুগলখোর বেহেশেতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর গিবত সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا সুতরাং কুরআন ও হাদীসের লক্ষ্যে উভয় কার্যই নিন্দনীয় ও হারাম। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে– الغيبة اشد من الزنا আরও হুযূর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো গিবত করল সে যেন তার মায়ের সাথে জেনা করল।

قَوْلُهُ تَعَالَى مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ : উক্ত আয়াতের দু'টি তাৎপর্য হতে পারে এবং এই অর্থদ্বয় خَيْر শব্দের অর্থের বিভিন্নতার কারণেই হতে পারে।

১. যদি خَيْر শব্দের অর্থ ধন-মাল নেওয়া হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে সে লোকটি ভয়ানক কৃপণ ও বখিল। কাউকে একটা কুটাকড়ি পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত নয়।
২. আর যদি ভালো ও কল্যাণ অর্থ নেওয়া হয়, তখন আয়াতের অর্থ হবে সে লোকটি সকল প্রকার ভালো, কল্যাণময় এবং সকল প্রকার নেককাজের প্রতিবন্ধক। ইসলামের ন্যায় এক ব্যাপক কল্যাণময় জীবনাদর্শ হতে সে লোকদেরকে বিরত রাখছে। অর্থাৎ তা গ্রহণ করতে বাধা দান করছে। এই বাধা দানে সে খুবই তৎপর। –[খাযেন, মাদারিক]

مُعْتَدٍ -এর মর্মার্থ : مُعْتَدٍ অর্থ– সীমা অতিক্রমকারী, সীমালঙ্ঘনকারী। হক এবং ন্যায়-নীতির সীমা অতিক্রমকারী। সে নবী করীম ﷺ -এর উপর সীমালঙ্ঘনকারী, মুসলমানদের এবং ইসলামের ধারক-বাহকদের ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকারী। সে লোকদের দীনের পথে, হেদায়েতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সীমালঙ্ঘন করা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অভ্যাস। ইসলাম সব ধরনের সীমালঙ্ঘনকে নিষেধ করে। খানাপিনাতেও ইসলামের সীমারেখা মেনে চলা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, "তোমরা হালাল রিজিক খাও এবং এতে বাড়াবাড়ি করো না' কেননা ইনসাফ এবং ভারসাম্য রক্ষা করাটাই ইসলামের প্রকৃতি, ইসলামের মূল শিক্ষা। –[যিলাল]

عُتُلٍّ -এর অর্থ : عُتُلٍّ শব্দটি এমন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যে খুব দুর্ধর্ষ ও বেশি পানাহারকারী, আর এটার সাথে সাথে ঝগড়াটে, চরিত্রহীন ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। কতকের মতে অশ্লীল গালিগালাজকারী ব্যক্তির বেলায় এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। আবার কতেক বলেছেন, কুফরিতে দৃঢ় প্রত্যয়কারী লোককে বুঝাবার জন্য এ শব্দের ব্যবহার হয়। –[খাযেন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

زَنِيْمٌ শব্দের মর্মার্থ : زَنِيْمٌ শব্দটি আরবি ভাষায় ব্যভিচারপ্রসূত জারজ সন্তানকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যে কোনো পরিবারের লোক না হওয়া সত্ত্বেও সে তারই অন্তর্ভুক্ত থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে 'যানীম' অর্থ জারজ সন্তান। -(রূহুল মা'আনী) সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, স্বীয় দুষ্কৃতির কারণে সর্বজন পরিচিত ও প্রখ্যাত লোককে বুঝাবার জন্যও এ শব্দের ব্যবহার হয়। এখানে যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মনে হয় লোকটি মক্কার খুব প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত লোক ছিল। যদিও আল-কুরআন তার নাম উল্লেখ করেনি। ফলে তাফসীরকারকদের মধ্যে নাম নিয়ে নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে। শানে নুযূলে সম্ভাব্য নামগুলোর আলোচনা রয়েছে। হযরত ইকরিমা (র.) زَنِيْمٌ -এর ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত কবিতা বর্ণনা করেছেন- زَنِيْمٌ لَا يُعْرَفُ مَنْ اَبُوْهُ * بَغِى الْاُمُّ ذُوْ حَسَبٍ لَئِيْمٍ [জারজ ঐ ব্যক্তি যার পিতা অজ্ঞাত, মা ব্যভিচারিণী, এমন ব্যক্তি নিকৃষ্ট বংশের।]

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত নিকৃষ্ট অভ্যাসসমূহ : আলোচ্য আয়াতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার ১০টি নিকৃষ্ট অভ্যাসে আলোচনা. করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ-

(١) حَلَّافٍ (٢) مَهِيْنٍ (٣) هَمَّازٍ (٤) مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ (٥) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ (٦) مُعْتَدٍ (٧) اَثِيْمٍ (٨) عُتُلٍّ (٩) زَنِيْمٍ (١٠) اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ.

অর্থাৎ ১. মিথ্যাভাবে অধিক শপথ করা, ২. নির্লজ্জ হওয়া, ৩. অন্যের দোষ খুঁজে বের করা, ৪. চুগলখোরি করা, ৫. সৎকার্যসমূহ হতে আল্লাহর বান্দাদেরকে প্রতিবন্ধকতায় আবদ্ধ করা, ৬. আল্লাহর নিয়মের অবাধ্য চলা, ৭. গুনাহের কার্য করা, ৮. নিকৃষ্ট অভ্যাসের অনুকরণকারী হওয়া, ৯. জেনার সন্তান হওয়া, ১০. আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে পুরাতন যুগের কেসসা-কাহিনী বলে গালি দেওয়া। দশম প্রকারের বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

মাদারেক গ্রন্থকার বলেন-হযরত ইয়াযীদ, ইয়াকূব ও সাহল (র.) বলেছেন, যেহেতু ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ নবী করীম ﷺ-কে একটি মিথ্যা অপবাদ দিল অর্থাৎ مجنون বলে গালি দিল, এটার প্রতিফলে আল্লাহ তাকে দশটি গালি দিলেন, অর্থাৎ দশটি অপবাদ দিলেন। এটার কারণ এই যে, নবী করীম ﷺ-এর উপর যদি একবার দরূদ পাঠ করা হয়, তবে দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহর পক্ষ হতে দশটি রহমত প্রেরণ করা হয় এবং দশটি পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কাজেই মহান আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়েছে যে, তার একটির প্রতিউত্তরে ১০টি বদ স্বভাবের উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اٰيَاتُنَا ...... عَلَى الْخُرْطُوْمِ : আল্লাহ তা'আলা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ সম্বন্ধে বলেন- যখন আমার নাজিলকৃত আয়াতসমূহ তার নিকট পড়ে শুনানো হয়, তখন হঠকারিতার ছলে সে বলে, এটাতো কেবল পুরানা যুগের কেসসা-কাহিনী মাত্র। এ ধরনের নিকৃষ্টতম মন্তব্য করার কারণে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে তাদের হতে সতর্ক করে দিয়েছেন।

প্রথমোক্ত আয়াতটির সম্পর্ক যদি পূর্ব হতে চলে আসা কথার সাথে ধরা হয় তখন আয়াতের অর্থ এরূপ হতে পারে যে, এ ব্যক্তির দাপট ও প্রভাব এ জন্য যে, সে বিপুল ধন-জনের অধিকারী, আদৌ এমন লোককে মেনে নেবেন না। [তাহলে ধর্মের কলঙ্ক হতে পারে।] অথবা, পরবর্তী বাক্যের (سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ) সাথে ও সম্পর্কে করা যাতে পারে। তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে এই যে, বহু ধন-জনের মালিক হওয়ার দরুন লোকটি খুব অহংকারী হয়ে পড়েছে। এ কারণে কুরআনের আয়াত তাকে শুনানো হলে সে অহংকারে অন্ধ হয়ে বলে উঠে, এটাতো আগেকার যুগের লোকদের কথাবার্তা।

আর সে লোকটি যেহেতু নিজেকে খুব উঁচু দরের লোক বলে মনে করত এ কারণে তার নাকটিকে শুঁড় বলা হয়েছে। নতুবা শুঁড় যে কেবল হাতির থাকে তা কারো অজানা নয়। আর আল্লাহ বলেছেন, তাকে নাকের উপর দাগ লাগিয়ে দিবো। অর্থাৎ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে দেবো। অর্থাৎ তাকে ইহকাল ও পরকাল এমনভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো যা হতে সে কখনো নিষ্কৃতি পাবে না। -[মা'আরিফ]

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ কখন কার জন্য বলা হয়েছে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. কিয়ামতের দিন তার নাকের উপর কুফরির কারণে অপদস্থমূলক এমন নিশান লাগিয়ে দেওয়া হবে, যাতে সে খুব অসম্মানিত হবে।

২. অথবা, مُوْضِحُ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঐ ব্যক্তি ছিল ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ। সে কুরাইশ বংশের নেতৃবর্গের একজন লোক ছিল। এটার ذِلَّتْ দুনিয়াতেও হতে পারে অথবা আখেরাতে। যদি দুনিয়াতে হয় তবে বদরের যুদ্ধেই হয়েছে। কারণ সেদিন তার নাকের মধ্যে খুবই জখম হয়েছিল এবং আল্লাহর قَوْل সত্যায়িত হয়েছিল। আখেরাতের বিষয়ে কোনো কথা বলা হয়নি এবং বদরের দিনের সে জখমটি তার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বহাল রইল। -[সাবী]

خُرْطُوْمٌ অর্থ : এটার অর্থ- শুঁড়, হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার নাসিকাকে শুঁড় বলা হয়েছে। নতুবা, কোনো মানুষের শুঁড় হতে পারে না। যেমন সাধারণ পরিভাষায় কোনো ব্যক্তির চেহারাকে تھوبڑی (ব্যাঙ্গার্থে মুখ) বলা হয়। অথচ কুকুরের ক্ষেত্রে تھوبڑی শব্দ ব্যবহার করা হয়। আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (র.) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। -[খাযেন, বায়হাকী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٧. إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ اِمْتَحَنَّا اَهْلَ مَكَّةَ بِالْقَحْطِ وَالْجُوْعِ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْبُسْتَانِ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا يَقْطَعُوْنَ ثَمَرَتَهَا مُصْبِحِيْنَ وَقْتَ الصَّبَاحِ كَيْلَا يَشْعُرَ لَهُمُ الْمَسَاكِيْنُ فَلَا يُعْطُوْنَهُمْ مِنْهَا مَا كَانَ اَبُوْهُمْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْهَا .

১৭. আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি মক্কাবাসীকে আমি দুর্ভিক্ষ ও অনাহার দ্বারা পরীক্ষা করেছি। যেভাবে আমি পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে বাগানের অধিপতিদেরকে। যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা আহরণ করবে বাগানের ফল কর্তন করবে প্রত্যুষে প্রভাতকালে, যাতে দরিদ্রগণ তা টের না পায়। সুতরাং তা হতে তাদেরকে দিতে হবে না যা তাদের পিতা দরিদ্রদেরকে তা হতে দিত।

١٨. وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ فِيْ يَمِيْنِهِمْ بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ اَيْ وَشَاْنُهُمْ ذٰلِكَ .

১৮. আর তারা ইচ্ছা প্রার্থনা করেনি তাদের শপথে ইনশাআল্লাহ যোগ করেনি। আর বাক্যটি মুসতানিফ বাক্য। অর্থাৎ আর তাদের অবস্থা এরূপ।

١٩. فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ نَارٌ اَحْرَقَتْهَا لَيْلًا وَهُمْ نَآئِمُوْنَ .

১৯. অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে অর্থাৎ রাত্রে সেই বাগানে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল। যখন তারা নিদ্রিত ছিল।

٢٠. فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ كَاللَّيْلِ الشَّدِيْدِ الظُّلْمَةِ اَيْ سَوْدَاءَ .

২০. ফলে তা তিমির রজনীতুল্য হয়ে পড়ল প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রির ন্যায় হলো, অর্থাৎ জ্বলে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।

٢١. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ .

২১. প্রত্যুষে তারা একে অন্যকে ডেকে বলল।

٢٢. اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ غَلَّتِكُمْ تَفْسِيْرٌ لِلتَّنَادِيْ اَوْ اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ اَيْ بِاَنْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ مُرِيْدِيْنَ الْقَطْعَ وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ .

২২. তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের বাগানে চলো তোমাদের শস্যক্ষেত্রে, এটা تَنَادَوْا-এর ব্যাখ্যা অথবা اَنْ অব্যয়টি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ بِاَنْ যদি তোমরা ফল আহরণকারী হও ফল কর্তনের ইচ্ছা কর। শর্তের জবাবের প্রতি পূর্ববর্তী বক্তব্য নির্দেশ করছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ : বাক্যে لَيَصْرِمُنَّهَا জওয়াবে কসম, مُصْبِحِيْنَ হাল হয়েছে لَيَصْرِمُنَّهَا হতে। وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ জুমলায়ে মুস্তানাফা, فَتَنَادَوْا শব্দটি اَقْسَمُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে, وَهُمْ نَآئِمُوْنَ বাক্যটি মহল্লে নসবে আছে حَال হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ اَنِ اغْدُوْا : -এর মধ্যস্থ اَنْ মাসদারিয়া, কেউ কেউ বলেন, মুফাসসিরা اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ শর্ত, তার জওয়াব فَاغْدُوْا উহ্য।

Free@www.eilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর সম্পর্ক : মক্কার যেসব কাফের দুষ্ট-দুরাচার লোক নিজেদের ধন-সম্পদের কারণে খুব অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে মহানবী ﷺ -এর দীনের দাওয়াতের বিরোধিতা করত এবং পদে পদে দীনের দাওয়াতি কাজে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করত; আর কুরআনকে সেকালের রূপকথা এবং মহানবী ﷺ -কে উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল, পূর্বের আয়াতগুলোতে সেসব আলোচনার পর এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্মুখে ইয়েমেন এলাকার ধ্বংসকৃত বাগানটির দৃষ্টান্ত পেশ করে বলছেন– বাগানের মালিকগণকে বাগানের শস্য সম্পদ দ্বারা আমি যেভাবে পরীক্ষা করেছি, অনুরূপভাবেই আমি তোমাদেরকেও ধন-সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ও প্রাচুর্য দান করে পরীক্ষা করছি। তোমরা যদি এ প্রাচুর্যের দর্পে গর্বিত হয়ে আমার দীনকে অবহেলা কর, নবীর দাওয়াতি কাজে বাধা দাও এবং তাঁর নামে এ কটূক্তি কর, তবে বাগানের মালিকদের ন্যায় তোমাদের ধন-সম্পদকেও সমূলে ধ্বংস করে ছাড়ব। অতএব সাবধান! ঐ বাগানের ঘটনাটি হতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। হাদীসে এসেছে– মক্কাবাসীদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দোয়ার কারণে এরূপ দুর্ভিক্ষ এসেছিল, যেরূপ বাগানের মালিকদের উপর দুর্ভিক্ষ এসেছিল।

বাগানের ঘটনা : বিভিন্ন তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, ইয়েমেন প্রদেশের কোনো একটি বাগানের মালিক ছিল একজন আল্লাহভীরু লোক। সে বাগানের ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশ গরিব-মিসকিনগণকে দান করত; কিন্তু তার মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র তার মালিক হলো। তারা ভাবল যে, আমাদের লোকসংখ্যা অনেক। আমাদের পরিবার-পরিজনের তুলনায় বাগানের ফসল সম্পদ খুবই অপ্রতুল। সুতরাং গরিব-মিসকিনগণকে ফসলের নির্দিষ্ট একটি অংশ দান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়; কিন্তু কোনো এক ছেলে এই চিন্তাধারার বিপরীত ছিল। সে গরিব-মিসকিনের প্রতি ছিল সহানুভূতিশীল। তবে তার কথায় অন্যান্যরা কান দিল না। তারা প্রতিজ্ঞা করল যে, আগামী দিন সকালবেলা আমরা ভিক্ষুক দল আসবার পূর্বেই গিয়ে ফসল কেটে আনবো; কিন্তু এ শপথ ও প্রতিজ্ঞায় আল্লাহর ইচ্ছাকে শামিল করল না। অর্থাৎ তারা এ কথা বলল না যে, আল্লাহ চাইলে [ইনশাআল্লাহ] আমরা আগামীকল্য সকাল সকাল গিয়ে ফসল কেটে আনবো। এ ইনশাআল্লাহ না বলা এবং গরিব-মিসকিনগণকে না দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের অপরাধে তাদের ঘুমে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগানের উপর গজব নাজিল করলেন। ফলে প্রচণ্ড মরুঝঞ্ঝা বায়ু বাগানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাগানের ফসলকে মথিত করে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ ও ধ্বংস করে ফেলল। বাগানটি দেখলে মনে হতো যে, মথিত হয়ে চর্বিত ফসলের ন্যায় হয়ে গেছে। অতঃপর অতি প্রত্যুষে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, তোমরা ফসল কাটতে চাইলে সকাল সকাল বাগানে চলো। ভিক্ষুকের দল ভিড় জমাবার পূর্বেই ফসল তুলে আনতে হবে। অতঃপর তারা বাগানে যেয়ে অবস্থা মনে করল যে তারা ভুল করেছে, এটা তাদের বাগান নয়। কারণ তাদের বাগানতো এই রকম ছিল না। এটাতো ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

قَوْلُهُ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ .... مُصْبِحِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে পূর্বযুগের একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করে মক্কাবাসীদেরকে একটু হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। সুতরাং আল্লাহ বলেন, আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেভাবে বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যখন তারা পরস্পর হলফ করে এ অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো যে, এবারের সুযোগে তারা খুবই ভোরবেলায় যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে নেবে। যাতে ফকির-মিসকিনগণ সংবাদ না পায়। আর তাদের এ অঙ্গীকারে তারা কৃতকামী হবে বলে তাদের এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তারা ইনশাআল্লাহ বলতেও ভুলে গেল। অর্থাৎ বলার তৌফিক হয়নি।

بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ আয়াতে মক্কাবাসীদের পরীক্ষা করার অর্থ : মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষা করার অর্থ এও হতে পারে যে, আয়াতে বর্ণিত বাগানওয়ালা সম্প্রদায়কে যেরূপ নিয়ামত দ্বারা সুশোভিত করেছি। এর শুকরিয়া আদায় না করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসেছে এবং তাদের উপর হতে নিয়ামত হরণ করে নেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে মক্কাবাসীদের উপর আল্লাহর মহান নিয়ামত "হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -কে তাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করা হয়েছে" এটার তুল্য নিয়ামত আর প্রয়োজন নেই। তদুপরি তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে অত্যন্ত বরকত দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তির জীবন যাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ সকল হতে আল্লাহর পরীক্ষা হলো, তারা এগুলো তাঁর নিয়ামত বলে স্বীকার করে কিনা এবং রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করে কিনা, অথবা কুফরির উপর অটল থাকে।

অথবা, তাদের বাগানওয়ালাদের ঘটনা হতে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত ছিল, যদি এটা দ্বারা নসিহত কবুল না করে তবে তাদের উপরও তেমিনভাবে আল্লাহর গজব নাজিল হতে পারে। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ)

بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا الخ -এর উক্ত ব্যাখ্যা ঐ সময় সঠিক প্রতীয়মান হবে যখন এ আয়াতগুলোকে মাক্কী আয়াত বলে সাব্যস্ত করা হয়। তবে বহু সংখ্যক তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে মাদানী আয়াত বলেছেন। তখন 'পরীক্ষা' দ্বারা মক্কার দুর্ভিক্ষের শাস্তি উদ্দেশ্য করেছেন। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদদোয়ার কারণে তাদের উপর পতিত হয়েছিল। সে দুর্ভিক্ষের দিনে তারা ক্ষুধার জ্বালায় মরতে লাগল। মৃত জীবজন্তু ও বৃক্ষের ঢালসমূহ পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছে, আর এ অবস্থা যা ঘটনাটি হিজরতের পরেই হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

مَحَلِّ جَنَّة সম্পর্কে দু'টি জরুরি কথা : উক্ত আয়াতে كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ বলে যে বাগানটির প্রতি ইশারা কর হয়েছে। সে বাগানটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আরও কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে ইয়েমেনেই ছিল। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত মতে, উক্ত বাগানটি صَنْعَاء নামক ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ শহর বা রাজধানী হতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। কারো কারো মতে, উক্ত বাগানটি হাবশায় অবস্থিত ছিল। –[ইবনে কাছীর] বাগানের মালিগণ আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার কিছু দিন পরেই হয়েছিল। –[কুরতুবী, মা'আরিফ]

আর আয়াতের বর্ণনা মতে এ কথাই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তারা বাগানওয়ালা হিসেবেই প্রসিদ্ধ। তবে আয়াতের বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, তাদের নিকট কেবল বাগানই ছিল না; বরং বাগানের সাথে ক্ষেতি-জিরাত করার জায়গাও ছিল এবং ক্ষেতি-জিরাতও করত। সুতরাং তখন বলতে হবে যে, হতে পারে বাগানের সাথে সাথে ক্ষেতও ছিল তবে ক্ষেতের কথা প্রকাশ লাভ করেনি। বাগানের কথাই প্রসিদ্ধ হওয়াতে তাদের নাম اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ হিসেবেই প্রসিদ্ধ হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ানের রেওয়ায়েতে উক্ত বাগানকে ضَرَوَانْ বলা হতো। আর মৃতব্যক্তির ওয়ারিশ হিসেবে তিন ছেলে ছিল। অন্যান্য রেওয়ায়েত মতে ৫ ছেলে ছিল। আর বাগানের উৎপন্ন ফসলাদি দ্বারা তাদের বছরের খরচ মেটাতে খুবই কষ্ট হতো, তাই তারা ফকিরদেরকে দান করতে অসম্মত হলো। হযরত থানবী (র.)-এর রেওয়ায়েতে এ কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ : لَا يَسْتَثْنُوْنَ-এর অর্থ হলো, তারা اِسْتِثْنَاء করল না, অর্থাৎ ইনশাল্লাহ বলল না। কেউ কেউ বলেন, اِسْتِثْنَاء না করার অর্থ, তারা সম্পূর্ণরূপে ফসল নিয়ে নিত, ফকিরদের হিস্‌সা তাদের পিতার ন্যায় পৃথক করত না। –[মাযহারী]

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ প্রকাশ্যত شَرْط -এর স্থলে রয়েছে তথাপিও তাকে اِسْتِثْنَاء কেন বলা হয়েছে? : এটার উত্তর এই যে, যদিও وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ প্রকাশ্যত শর্ত এবং তাকে اِسْتِثْنَاء বলা হয়েছে, তবুও বাস্তবে এটা اِسْتِثْنَاء এবং শর্ত যাই বলা হোক উভয় অর্থে একই হবে। আর এটা لَاَخْرُجَنَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ এবং وَلَا اَخْرُجُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ -এর অনুরূপ অর্থাৎ সুরতে দু'টি বাক্য হলেও উভয় বাক্যের অর্থ মূলত একই দাঁড়াবে। –[মাদারিক]

قَوْلُهُ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ .... كَالصَّرِيْمِ -এর ব্যাখ্যা : অতঃপর তার উপর আপনার প্রভুর পক্ষ হতে এক আগমনকারী (طَائِفٌ) আগমন করল, সে সময় তা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। অতঃপর সকালবেলায় বাগানটি শস্য কাটা ক্ষেতের মতো পড়ে রইল।

طَائِفٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে طَائِفٌ বলতে যে কোনো এক প্রকার শাস্তি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। –[বায়যাবী]

আর কেউ কেউ বলেন, طَائِفٌ দ্বারা উক্ত আয়াতে অগ্নি (نَارٌ) -কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তিস্বরূপ এক প্রকার আগুন এসে জ্বালিয়ে তছনছ করে দিয়েছে।

কাবীর গ্রন্থকার বলেন, طَائِفٌ বলতে রাত্রিকালে আগমনকারী শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে। আর طَائِفٌ -এর অপর একটি অর্থ হলো প্রদক্ষিণকারী, রাত্রিবেলায় উক্ত অগ্নিটি তাদের বাগানের চতুর্দিকে বেষ্টন করে প্রদক্ষিণকারীর মতো প্রদক্ষিণ করে সম্পূর্ণ বাগানকে ছাই করে দিয়েছিল। এ অনুসারে এটাকে (عَذَابٌ -কে) طَائِفٌ বলা হয়েছে। –[মাদারিক, কাবীর]

قَوْلُهُ كَالصَّرِيْمِ : صَرْمٌ শব্দের অর্থ হলো– ফল, ফসল বা এমন ধরনের কোনো কিছু কর্তন করা। আর صَرِيْم অর্থ مَقْطُوْع বা مَصْرُوْم আয়াতের مَطْلَبْ এই যে, আগুন সেই বাগান এমন করে ছেড়েছে, যেভাবে ফসল কাটার পর জমিন খালি পড়ে থাকে।

صَرِيْم -এর এক অর্থ– রাত্র, তখন অর্থ হবে রাত যেভাবে কালো অন্ধকার হয়ে যায়, তদ্রূপ উক্ত ক্ষেতও পুড়ে কালো হয়ে গেছে। –[মা'আরিফ]

كَالصَّرِيْمِ -এর আরেক অর্থ হলো كَالصُّبْحِ [মাদারেক] অর্থাৎ জমিন বৃক্ষহীন হওয়ার পর সাদা হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : "فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ..... صَارِمِيْنَ" : এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের যে পরিকল্পনা ছিল এবং তা তারা বাস্তবায়ন কিভাবে করতে যাচ্ছিল সেই চিত্র তুলে ধরেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٣. فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ يَتَسَارُّوْنَ.

٢٤. اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ تَفْسِيْرٌ لِمَا قَبْلَهُ اَوْ اَنْ مَصْدَرِيَّةٌ اَىْ بِاَنْ

٢٥. وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ مَنْعٍ لِلْفُقَرَاءِ قٰدِرِيْنَ عَلَيْهِ فِىْ ظَنِّهِمْ.

٢٦. فَلَمَّا رَاَوْهَا سَوْدَاءَ مُحْتَرِقَةً قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ عَنْهَا اَىْ لَيْسَتْ هٰذِهٖ ثُمَّ قَالُوْا لَمَّا عَلِمُوْهَا

٢٧. بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ثَمَرَتَهَا بِمَنْعِنَا الْفُقَرَاءَ مِنْهَا.

٢٨. قَالَ اَوْسَطُهُمْ خَيْرُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا هَلَّا تُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ تَائِبِيْنَ.

٢٩. قَالُوْا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ بِمَنْعِ الْفُقَرَاءِ حَقَّهُمْ.

٣٠. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُوْنَ.

٣١. قَالُوْا يَا لِلتَّنْبِيْهِ وَيْلَنَا هَلَاكُنَا اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ.

٣٢. عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ لِيَقْبَلَ تَوْبَتَنَا وَيَرُدَّ عَلَيْنَا خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِنَا رُوِىَ اَنَّهُمْ اُبْدِلُوْا خَيْرًا مِّنْهَا.

অনুবাদ :

২৩. অতঃপর তারা চলল, নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে।

২৪. যেন আজ তাতে তোমাদের নিকট কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের ব্যাখ্যা। অথবা اَنْ অব্যয়টি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ بِاَنْ যেন।

২৫. অতঃপর তারা প্রভাতে যাত্রা করল, নিবৃত্ত করতে দরিদ্রদেরকে বাধাদান করতে সক্ষম হওয়ার ধারণা নিয়ে তাদের ধারণায় তারা এতে সক্ষম এ অবস্থায়।

২৬. অনন্তর যখন তারা তাকে দেখল পুড়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে এমতাবস্থায়। তারা বলল, আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি তা হতে। অর্থাৎ এটা সেই বাগান নয়। অতঃপর যখন তারা নিঃসন্দেহ হলো, তখন বলল।

২৭. বরং আমরা তো বঞ্চিত তার ফল হতে, তা হতে দরিদ্রদেরকে আমাদের নিবৃত্ত করার কারণে।

২৮. তাদের মধ্য হতে মধ্যম ব্যক্তি বলল তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? তোমরা কেন لَوْلَا শব্দটি هَلَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না আল্লাহ তা'আলার, তৎপ্রতি প্রত্যাবর্তনপূর্বক।

২৯. তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা মহিম ঘোষণা করছি। আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম দরিদ্রদেরকে তাদের হক হতে বঞ্চিত করার দরুন।

৩০. তখন তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে আরম্ভ করল।

৩১. তারা বলল, হায় يَا হরফে নেদা تَنْبِيْه-এর জন্য। আমাদের দুর্ভোগ ধ্বংস আমরা অবশ্যই অবাধ্যচারী সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম।

৩২. সম্ভবত অচিরেই আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এটার পরিবর্তে দান করবেন يُبْدِلَنَا শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। এটা অপেক্ষা উত্তম উদ্যান। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হলাম। যাতে তিনি আমাদের তওবা কবুল করেন এবং আমাদের উদ্যান অপেক্ষা উত্তম বাগান আমাদেরকে প্রত্যর্পণ করবেন। বর্ণিত আছে যে, তাদেরকে অপেক্ষাকৃত উত্তম উদ্যান তৎপরিবর্তে প্রদত্ত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٣. كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ الْعَذَابِ لِهٰؤُلَاءِ الْعَذَابُ لِمَنْ خَالَفَ اَمْرَنَا مِنْ كُفَّارِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ عَذَابَهَا مَا خَالَفُوْا اَمْرَنَا ـ

৩৩. এরূপই অর্থাৎ এদের শাস্তিদানের ন্যায় শাস্তি ? আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে মক্কাবা কাফেরগণের মধ্য হতে আর আখেরাতের শাস্তিই ব যদি তারা জানতে পারত আখেরাতের শাস্তি সম্প তবে তারা আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করত না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَ هُمْ يَتَخَافَتُوْنَ : বাক্যটি فَانْطَلَقُوْا -এর ফায়েল হতে হাল হয়েছে। قَادِرِيْنَ মানসূব হয়েছে حَالْ হওয়া কারণে। قَادِرِيْنَ শব্দ غَدَوْا -এর ফায়েল থেকে حَالْ হয়েছে।

قَوْلُهُ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ : كَذٰلِكَ খবর মুকাদ্দাম, اَلْعَذَابُ মুবতাদা মুয়াখখার। খবরকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে حَصْر -এ ফায়েদা দেওয়ার জন্য। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ .... حَرْدٍ قَادِرِيْنَ : উক্ত আয়াতে يَتَخَافَتُوْنَ -এর অর্থ হলো يَتَسَاوَرُوْنَ বা يَتَشَاوَرُوْنَ বিনা শব্দে বা চুপে কথা বলে, আলোচনা করে। অর্থাৎ তারা এমনভাবে চলমান অবস্থায় কথা বলতে বল যাচ্ছিল যাতে ফকির-মিসকিনগণ তাদের সম্বন্ধে টের না পায়। যে কথা গোপনে বলাবলি করছিল তা হলো তাদের ফসল ক্ষে বা বাগানে যেন আজ কোনো মিসকিন ঢুকতে না পারে। এ বিষয়ে খুবই চৌকান্না থাকতে হবে।

আর حَرْدٍ শব্দের অর্থ হলো مَنْع এবং غَيْض وَغَضَبْ দেখানো। সুতরাং وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ -এর অর্থ হচ্ছে লোকগুলো নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে এই বুঝে যাচ্ছিল যে, কোনো ফকির-মিসকিনকে কোনো অংশ না দেওয়া আমা ক্ষমতার অধীনের কাজ। আর কেউ যদি এসে যায় তবে তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে। -(মা'আরিফ) মাদারেক গ্রন্থকার বলে দَوْا قَادِرِيْنَ اِلٰى جَنَّتِهِمْ بِسُرْعَةٍ قَادِرِيْنَ عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ اَلْقَصْرُ وَالسُّرْعَةُ فِيْهِ অথবা جَدٌّ فِى الْمَنْعِ অর্থ حَرْد ى حَرَامِهَا مَنْفَعَتَهَا عَنِ الْمَسَاكِيْنِ اَوْ هُوَ عَلَمٌ لِلْجَنَّةِ اَىْ غَدَوْا عَلٰى تِلْكَ الْجَنَّةِ قَادِرِيْنَ عَلٰى حَرَامِهَا عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ আর মিসকিনদেরকে বাগানে প্রবেশ করা হতে যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে তাকে نَهْىٌ عَنِ التَّمْكِيْنِ বলা يَعْنِىْ لَا تَمَكَّنُوْا مِنَ الدُّخُوْلِ فِيْهِ ।

বিভ্রান্তির দশা অপসারিত : তারা পূর্ব সিদ্ধান্তমাফিক খুব দাম্ভিকতা ও অহংকারী মনে সকালবেলা ফসল কাটার জন্য রওয় হলো। আর পরস্পর চুপে চুপে বলাবলি করতে লাগল–সাবধান! আজ যেন কোনো প্রকারে তোমাদের কাছে ভিক্ষুকের দল ি জমাতে না পারে। তারা আসার পূর্বেই ফসল তোলার কাজ শেষ করতে হবে। ভিক্ষুক ও গরিবদেরকে তাড়িয়ে দেওয়ার মনো নিয়ে তারা বাগানে পৌছল। বাগানের বিনাশ ও ধ্বংসযজ্ঞ অবলোকন করে বলল– আমরা পথ ভুলে হয়তো অন্য কোনো বাগ এসেছি। আমাদের বাগানতো এটা নয়। আমাদের বাগান কত সুন্দর, সুজলা-সুফলা শস্যভরা, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি, ি বাগানের চতুর্দিকের সীমানা ও আলামত দেখে তারা চেতনা ফিরে পেল। তাদের নিজেদের গর্ব-অহংকার ও আল্লাহর স নাফরমানি করার কথা মনে হলো। আর বলল, আমাদের উপর আল্লাহর লানত এসেছে, আমাদেরকে ফসল হতে বঞ্চিত ব হয়েছে। তখন তাদের মধ্যে যে লোকটি স্বভাব-চরিত্রে উত্তম ছিল এবং ভিক্ষুকদের প্রতি সংবেদনশীল ছিল, সে বলল, আমি পূর্বে তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে নাফরমানি না করার জন্য বলেছিলাম না? এটা আল্লাহর সাথে নাফরমানিকরণ, ভিক্ষুকগণ বঞ্চিত করার ইচ্ছা এবং গর্ব-অহংকারের পরিণতি ছাড়া কিছুই নয়। এখনও সময় রয়েছে, গুনাহ হতে তওবা করো। আল্লা মহিমা ঘোষণা এখনও কেন করছ না? সর্বহারা হওয়ার পরই তাদের বিভ্রান্তির দশা কাটল। তারা মনে মনে তওবা করে আল্লা নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার মহিমা প্রকাশ করছি। আপনিই মহাশক্তিধর। আ আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছি। ক্ষমা না করলে আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

قَوْلُهُ تَعَالَى رَاَوْهَا ..... نَحْنُ مَحْرُوْمُوْ : আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসকৃত বাগান দেখার পর যে অবস্থার সৃষ্টি য়েছিল এবং তারা যে কথোপকথন করেছিল তার কিছুটা চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন। "তারা যখন বাগান দেখল তখন তারা লল, আমরা পথ ভুল করেছি; না বরং আমরা বঞ্চিত।" এটার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক. তারা যখন ভস্মীভূত বাগান দেখল খন তারা মনে করল, আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে পড়েছি। এটা আমাদের বাগান নয়। পরে যখন তারা ভালোভাবে লক্ষ্য রে দেখল এবং বুঝতে পারল যে, এটাই তাদের বাগান। তখন তারা বলল, আমরাই বঞ্চিত, আমাদের খারাপ নিয়তের কারণে পণতার কারণে আমরা নিজেরাই বঞ্চিত হলাম। **দুই.** তারা বাগান দেখার পর বলল, আমরা পথভ্রষ্ট। আমরা গরিব-দুঃখীদের ঞ্চিত করার চিন্তায় বিভোর ছিলাম অথচ আমরা তাদের উপকার করতে সক্ষম ছিলাম। আজ অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। াজকে আমরাই বঞ্চিত।

قَوْلُهُ تَعَالَى "قَالَ اَوْسَطُهُمْ .... لَوْلَا تُسَبِّحُوْ : আল্লাহ তা'আলা এখানে বাগানের মালিকদের কথা বলতে য়ে তাদের মাঝে যে উত্তম ব্যক্তিটি ছিল তার কথা উল্লেখ করেছেন। সে লোকটি তার সাথীদেরকে যে নসিহত করেছেন তা লে ধরেছেন। اَوْسَطُهُمْ -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। اَوْسَطُهُمْ বলতে তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, তাদের মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে মধ্যবয়সী। -[রূহুল মা'আনী]

উত্তম ব্যক্তিটি তাঁর সাথীদের বললেন, আমি কি তোমাদের তাসবীহ করার কথা, আল্লাহর প্রশংসা করার কথা, তোমাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন তার কথা স্মরণ করে আল্লাহর প্রশংসা করার কথা বলিনি? তোমরা আমার কথা শুননি। এখন দেখ বস্থাটা কি হলো? এ কথার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, ঐ লোকটির ইচ্ছা অন্য রকম ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অন্যদের মতেরই নুসরণ করে। সে ছিল একাই এ মতের এবং হকের উপর, সে অনড় থাকতে পারেনি। ফলে সেও তাদের সাথে একইভাবে ঞ্চিত হলো। -[যিলাল]

ওবার প্রতিদান : অতঃপর তারা পরস্পর দোষারোপ করতে লাগল। পরিশেষে নিজেদের ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্য নিজেদেরকেই াষী সাব্যস্ত করল এবং বলল, এটা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্যই হয়েছে। তারা আল্লাহর নিকট খাঁটি অন্তরে ওবা করে আশা করল যে, আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। সুতরাং আমরা আশা করতে পারি যে, তিনি নিজগুণে ামাদের ক্ষমা করে এ বাগানের পরিবর্তে উত্তম বাগান আমাদেরকে দান করতে পারেন। আমরা আমাদের যাবতীয় সমস্যা তাঁর কট অর্পণ করলাম এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করলাম। তাফসীরকারগণ লিখেছেন- তাদের এই তওবার ফলে এবং জেদের যাবতীয় সমস্যা আল্লাহর নিকট সোপর্দকরণ এবং সত্যদীনের ধারক হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা এটার তুলনায় নেক অনেক গুণ উত্তম ও সুজলা-সুফলা শস্যভরা উদ্যান দান করে অপূর্ব সম্পদশালী করেছিলেন।

িক্ষা গ্রহণের আহ্বান : আল্লাহ তা'আলা ঘটনাটি বর্ণনার শেষে উপসংহারে বলছেন, এ পার্থিব জগতে আল্লাহ এবং তাঁর াসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী লোকদের জীবনে এমনিতর শাস্তিই নেমে আসে। আর পরকালেও থাকবে তাদের জন্য বিরাট শাস্তি; ন্তু মানুষ সে শাস্তি সম্পর্কে কোনো কিছু অবগত নেই বলে তারা তাতে বিশ্বাসী হয় না। তাদের এই পার্থিব শাস্তি অবলোকন রে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অতীতের ইতিহাসই জ্ঞানীলোকদের জন্য পথের সন্ধান দেয়। বস্তুত হে মক্কার পাপিষ্ঠ দুষ্ট-দুরাচার াফেরকুল! তোমরা সময় থাকতে সতর্ক হও। ধনসম্পদ ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের অহংকারে আল্লাহর দীনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ য়ো না, তোমাদের জীবনেও এমনিভাবে অপমান, লাঞ্ছনা ও শাস্তির অমানিশা নেমে আসতে পারে এবং পরকালেও হবে ঠিনতর শাস্তি। অতএব, তোমরা এ ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহর দীনের ছায়াতলে আশ্রয় নাও; রাসূলের নেতৃত্বে মবেত হও। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর প্রাচুর্যের ভাণ্ডার খুলে দেবেন। নতুবা তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে শাস্তি বধারিত। উপসংহারের ৩৩নং আয়াতের ভাষণের মর্ম এটাই।

াধ্যম ব্যক্তি কি করে উত্তম হতে পারে? : এটার উত্তর একেবারেই সহজভাবে দেওয়া যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বেহেশ্‌ত াম্পর্কে এ কথাটি বলেছিলেন-(جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ اَعْلَى الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ اَوْسَطُهَا (اَوْكَمَا قَالَ ﷺ) (وَخَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا) জান্নাতুল ফিরদাউস উত্তম বেহেশ্‌ত আর উত্তম বেহেশ্‌ত মাঝারী ধরনের বেহেশ্‌ত (اَوْ كَمَا قَالَ ﷺ) [আর সকল কার্যে মাঝারী াস্থা অবলম্বন করাই উত্তম।]

াই বুঝা গেল যে, মাঝারী বস্তুই উত্তম বস্তু, আর বিভিন্ন তাফসীরকারের বর্ণনায়ও প্রমাণিত হয় যে, তাদের মেঝো ব্যক্তি ার্মিকতার দিক দিয়ে উত্তম ছিল, তাই সকলের পূর্বেই সে তাদেরকে নসিহত বাণী শুনিয়ে দিল। সর্বোপরি কথা হলো আল্লাহ া'আলা যেহেতু তার নাম উল্লেখ করেছেন, সুতরাং اَوْسَطُ -কে উত্তম বলতে হবে। অতএব, اَوْسَطُ -কে اَعْلٰى ও اَخْيَرُ বলা ঠিক হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ : এটার অর্থ হলো هَلَّا تَسْتَثْنُوْنَ কেন তোমরা আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসা কর া। কেননা, اِسْتِثْنَا অর্থ তাসবীহ, আর তাসবীহ ও ثَنَا উভয় শব্দই এর অর্থকে শামিল করে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ অথবা لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ تَفْوِيْضٌ إِلَيْهِ وَالتَّسْبِيْحُ تَنْزِيْهٌ لَهُ وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّنْزِيْهِ تَعْظِيْمٌ -এর অর্থ হবে لَوْلَا تَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ তোমরা আল্লাহকে কেন স্মরণ কর না? অথবা لَوْلَا تَتُوْبُوْنَ إِلَيْهِ তাঁর নিকট কেন তওবা করছ না? কেননা তোমাদের নিয়তের মধ্যে خَبَاثَتْ নিকৃষ্টপনা খেয়াল সংযোগ অর্থাৎ তাদের মধ্যে মেঝো ব্যক্তি বা উত্তম ব্যক্তি তাদের এ নিকৃষ্টপনা ও ঘৃণিত খেয়াল দেখে [আমরা ফকিরদেরকে কেন ফলদান করবো, আমাদের পিতার বোকামির কারণেই তিনি দিয়েছিলেন, বা আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা অবস্থায় আমরা কেন ফকিরদেকে ফল দান করবো] বলেছিল- لَوْلَا تَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ وَتُسَبِّحُوْنَ لَهُ وَتَتُوْبُوْنَ إِلَيْهِ مِنْ خُبْثِ نِيَّتِكُمْ তথাপিও তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল ছিল, আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেনি, নিকৃষ্টতম খেয়াল পোষণ করা হতে বিরত ছিল না, তাই আল্লাহ তাদের এই সাজা দিয়েছিলেন। অতঃপর তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়ে বলেছিল, سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ -[মাদারিকুত তানযীল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا .... عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ : উক্ত আয়াত দু'টির তাৎপর্য এই যে, প্রথম আয়াতটি তাদের নিজেদের দোষের স্বীকারোক্তি স্বরূপ, অর্থাৎ তাদের উত্তম ভাইয়ের প্রথম সময়ের উপদেশকে কেউই গ্রাহ্য করেনি, সব কিছু হারিয়ে শেষকালে তার কথায় আসতে বাধ্য হয়েছে এবং স্বীকারোক্তি প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র রয়েছেন সকল প্রকার দোষত্রুটি হতে। আমরাই জালিম সাব্যস্ত হয়েছি। আমরা ফকিরদের হিস্সাও খেয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম, ফকিরদেরকে না দেওয়ার আশা করা আমাদের জঘন্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে। (মা'আরিফ) মাদারেক গ্রন্থকার এ আয়াতের তাফসীর এরূপ লিখেছেন যে-

تَكَلَّمُوْا بَعْدَ خَرَابِ الْبَصَرَةِ بِمَا كَانَ يَدْعُوْهُمْ إِلَى التَّكَلُّمِ بِهٖ أَوَّلًا وَأَقَرُّوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ بِالظُّلْمِ فِيْ مَنْعِ الْمَعْرُوْفِ وَتَرْكِ الْإِسْتِثْنَاءِ . وَنَزَّهُوْا عَنْ أَنْ يَّكُوْنَ ظَالِمًا .

অতঃপর فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ الخ আয়াতটি দ্বারা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বচ্ছতা জাহির করছিল। অর্থাৎ একে অন্যের উপর দোষ চাপাতে শুরু করল যে, তুমিই প্রথমে ভুল ধারণা দিয়েছিলে, (অপরজনও অপরজনকে এরূপ বলছিল) ফলে এ আজাব এসেছে। অথচ তাদের কারো এটা একা দোষ ছিল না; বরং অধিকাংশ অথবা সকল ভাই এই মতামতে বহাল রইল ও শরিক ছিল। [মাদারেক, মা'আরিফ] গ্রন্থকার বলেন, এটার অর্থ হলো- يَتَلَاوَمُوْنَ أَيْ يَلُوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلٰى مَا صَدَرَ مِنْهُمْ سَابِقًا অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল, তাদের থেকে পূর্বে যে কাজটি প্রকাশ পেয়েছিল তার জন্য একে অন্যকে দোষী করল। -[সাবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَالُوْا يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ....رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা বলল, হায় আফসোস! আমরা সবাই সীমালঙ্ঘনকারী, সবাই গুনাহগার। তাদের এই স্বীকারোক্তি তওবার স্বরূপ হয়েছে। এই অনুসারে আল্লাহর নিকট তাদের এ আশা হয়েছে যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ বাগান হতে উন্নততর বাগান দান করবেন। তাদের সীমালঙ্ঘন হলো কেবল ফকিরদের হক বিনষ্টের চেষ্টা ও তাদের কথায় إِسْتِثْنَاء বা ইনশাআল্লাহ শব্দ না বলা।

হযরত মুজাহিদ (র.) হতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সত্যই এ বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনের পর তওবা করেছে। অতঃপর তাদেরকে উক্ত বাগান অপেক্ষা উন্নত বাগান দান করা হয়েছে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, উক্ত বাগানের অধিকারী সম্প্রদায় খালেস তওবা করেছে এবং আল্লাহ তাদের সত্যতা যাচাই করে পেয়েছেন। অতঃপর এ বাগানের পরিবর্তে তাদেরকে اَلْحَيَوَانُ নামক বাগান দান করেছেন। তথায় আঙ্গুর ফল এতবেশি হতো যে খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে তা নেওয়া আবশ্যক হতো এবং একটি ছড়াতেই এক বোঝা হতো। ইমাম বাগাবী (র.)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা যমখশারী (র.)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন।
-[মাদারিক, কাবীর ও মা'আরিফ]

উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য : এটার উদ্দেশ্য হলো-

ক. জগৎবাসীদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া যে, ফকির, এতিম, মিসকিন বা গরিব-দুঃখীদের হক বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য করা হলে সেই ক্ষেত্রে নিজেরাই বঞ্চিত হতে হয়। আল্লাহর হক নষ্ট করলে তার প্রতিফল নিজেরাই ভোগ করতে হবে। এ কিস্সাটি তার উপর জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ। সুতরাং দুনিয়াবাসী যেন এটা হতে এ শিক্ষা গ্রহণ করে নেয়।

খ. এটা একটি বিশেষ ঈমানী পরীক্ষা। এ পরীক্ষা দ্বারা ঈমানদারদের ঈমান পাকা হয়েছে এবং পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ .... وَالثَّمَرَاتِ এটা ثَمَرَاتْ -এর মাধ্যমে পরীক্ষা ছিল।

গ. আল্লাহর নির্দেশ যথাযথ পালন না হলে তথায় গজব নাজিল হবে। আল্লাহ নাফরমানদেরকে কখনোও ছাড়বেন না। মক্কাবাসীদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা আল্লাহর নাফরমানি করলে তাদেরকে এভাবে নিধন করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ : মক্কাবাসীদের শাস্তি ও দুর্ভিক্ষের বর্ণনার পর বাগানের অধিকারীদের বাগানের পরিণতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহর সাধারণ নীতি সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে যে, যখন আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি এসে থাকে তখন তা এমনিভাবেই এসে থাকে। আর দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে আখেরাতের শাস্তির কাফ্ফারা হয়ে যায় না; বরং আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٤. وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوْا اِنْ بُعِثْنَا نُعْطٰى اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ .

৩৪. পরবর্তী আয়াত মক্কাবাসীদের এ উক্তির জবাবে অবতীর্ণ হয় যে, তারা বলেছিল, আমরা যদি পুনরুত্থিত হই, তবে তোমরা– মুসলমানদের তুলনায় উত্তম অবস্থার অধিকারী হবো। নিশ্চয় মুত্তাকীগণের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত রয়েছে।

٣٥. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ اَىْ تَابِعِيْنَ لَهُمْ فِى الْعَطَاءِ

৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করবো? অর্থাৎ দান করার ক্ষেত্রে আনুগত্যকারীদেরকে অবাধ্যচারীদের অনুগামী করবো?

٣٦. مَا لَكُمْ تف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ هٰذَا الْحُكْمُ الْفَاسِدُ .

৩৬. তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করছ? এরূপ সিদ্ধান্ত বাতিলরূপে গণ্য।

٣٧. اَمْ بَلْ لَكُمْ كِتَابٌ مُنَزَّلٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ تَقْرَؤُوْنَ .

৩৭. নাকি اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে। তোমাদের নিকট কিতাব আছে অবতারিত যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর পাঠ কর।

٣٨. اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ تَخْتَارُوْنَ .

৩৮. যে, তোমাদের জন্য তথায় রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর তোমরা বেছে নাও।

٣٩. اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عُهُوْدٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ وَاثِقَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا مُتَعَلِّقٌ مَعْنًى بِعَلَيْنَا وَفِىْ هٰذَا الْكَلَامِ مَعْنَى الْقَسْمِ اَىْ اَقْسَمْنَا لَكُمْ وَجَوَابُهُ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ بِهِ لِاَنْفُسِكُمْ .

৩৯. নাকি তোমাদের সাথে অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি আছে আমার পক্ষ হতে, যা বলবৎ থাকবে কার্যকর থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত অর্থ বিবেচনায় اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ বাক্যাংশটি عَلَيْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ -এ বাক্যের মধ্যে শপথের অর্থ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের সাথে শপথ করেছি', আর শপথের জবাব হলো যে, তোমরা নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তা-ই তোমরা প্রাপ্ত হবে তোমাদের বেলায় যেই সিদ্ধান্ত করবে।

٤٠. سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ الْحُكْمِ الَّذِىْ يَحْكُمُوْنَ بِهِ لِاَنْفُسِهِمْ مِنْ اَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ فِى الْاٰخِرَةِ اَفْضَلَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ زَعِيْمٌ كَفِيْلٌ لَهُمْ .

৪০. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্য হতে কে এটার সাথে তাদের নিজের বেলায় তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার সাথে– এই মর্মে যে, তাদেরকে আখেরাতে মু'মিনদের অপেক্ষা উত্তম মর্যাদা দান করা হবে। দায়িত্বশীল তাদের জন্য জিম্মাদার।

Free @ www.eilm.weebly.com

٤١. اَمْ لَهُمْ اَيْ عِنْدَهُمْ شُرَكَاءُ ج مُوَافِقُوْنَ لَهُمْ فِيْ هٰذَا الْقَوْلِ يَكْفُلُوْنَ لَهُمْ بِهِ فَاِنْ كَانَ كَذٰلِكَ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمُ الْكَافِلِيْنَ لَهُمْ بِهِ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ .

৪১. নাকি তাদের জন্য অংশীগণ রয়েছে। অর্থাৎ তাদের নিকট এমন কোনো অংশী আছে, যে তাদের সাথে এ দাবিতে একমত এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য জিম্মাদার হবে। যদি এমন হয় তবে তাদের অংশীদেরকে উপস্থিত করুক যারা এ ব্যাপারে তাদের জন্য জিম্মাদার হবে। যদি তারা সত্যবাদী হয়।

٤٢. اُذْكُرْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْاَمْرِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ يُقَالُ كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ اِذَا اشْتَدَّ الْاَمْرُ فِيْهَا وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ اِمْتِحَانًا لِاِيْمَانِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَصِيْرُ ظُهُوْرُهُمْ طَبَقًا وَاحِدًا .

৪২. স্মরণ করুন যে দিন চরম সঙ্কট দেখা দেবে এটা দ্বারা কিয়ামতের দিনকার হিসাব-নিকাশের কঠোরতা উদ্দেশ্য, যেমন যুদ্ধ ঘোরতরভাবে শুরু হলে বলা হয় كَشَفَ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ এবং তাদেরকে সিজদা করার নিমিত্ত আহ্বান করা হবে তাদের ঈমান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারা সক্ষম হবে না তাদের পিঠ একটি কাষ্ঠ হয়ে যাবে।

٤٣. خَاشِعَةً حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُدْعَوْنَ اَيْ ذَلِيْلَةً اَبْصَارُهُمْ لَا يَرْفَعُوْنَهَا تَرْهَقُهُمْ تَغْشَاهُمْ ذِلَّةٌ ط وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ فِي الدُّنْيَا اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ فَلَا يَاْتُوْنَ بِهِ بِاَنْ لَا يُصَلُّوْا .

৪৩. অবনত অবস্থায় এটা يُدْعَوْنَ -এর ضَمِيْر হতে حَالْ অর্থাৎ লাঞ্ছিত অবস্থায় তাদের দৃষ্টিসমূহ তারা তাকে উর্ধ্বমুখি করতে পারবে না। তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ঢেকে রাখবে হীনতা আর তারা আহূত হয়েছিল পার্থিব জীবনে সিজদা দানের প্রতি এবং তারা তখন সুস্থ ছিল তথাপি তারা তা আদায় করেনি। তথা তারা নামাজ আদায় করত না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ : ইসমে اِنَّ আর اَلْمُتَّقِيْنَ খবরে اِنَّ . عِنْدَ رَبِّهِمْ যরফ হতে পারে, অথবা جَنّٰتِ হতে হালও হতে পারে।

قَوْلُهُ اَفَنَجْعَلُ : -এর হামযাটি اِنْكَارٌ বা অস্বীকৃতির জন্য এসেছে। উহ্য বাক্যের উপর ف টি আতফ হয়েছে, বাক্যটি এরূপ ছিল- نَحِيْفُ فِي الْحُكْمِ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ

قَوْلُهُ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ : বাক্যে فِيْهِ জার এবং মাজরূর মিলে মুতা'আল্লিক হয়েছে تَدْرُسُوْنَ -এর, فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ জুমলাটি كِتَابٌ -এর সিফাত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ : বাক্যটি سَلْ -এর দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে এবং এ জুমলাটি মহল্লে নসবে আছে। يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ الخ -এর মধ্যস্থ يَوْمَ শব্দটি فَلْيَاْتُوْا অথবা اُذْكُرْ উহ্য ফে'লের মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। يُدْعَوْنَ শব্দটি يُكْشَفُ -এর উপর আতফ হয়েছে। فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ শব্দটি يَوْمَ يُكْشَفُ -এর জবাব। خَاشِعَةً শব্দটি يُدْعَوْنَ -এর যমীর হতে হাল হয়েছে। اَبْصَارُهُمْ . خَاشِعَةً -এর ফায়েল হিসেবে মারফূ' হয়েছে। وَهُمْ سَالِمُوْنَ বাক্যটি يُدْعَوْنَ হতে হাল হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কার কাফের সরদারগণ বলত, এ পার্থিব জগতে আমরা যেসব ধন-সম্পদ ও নিয়ামতের অধিকারী হয়েছি, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, আমরা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়পাত্র এবং পরকালেও আমরা অনুরূপভাবে সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়ে সানন্দে জান্নাতে কালাতিপাত করবো। পক্ষান্তরে তোমরা যে চরম দুঃখ-দুর্দশা ও দৈন্যতার মধ্যে নিপতিত রয়েছ, তাতে বুঝা যায় যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন নও। পরকালেও তোমরা এমনিভাবে চরম দুঃখ-দুর্দশা, শাস্তি-অপমান ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে। তাদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন; কিন্তু তাফসীরে খাযেন, হোসাইনী, কামালাইন প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন উপরিউক্ত ৩৪নং আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন কাফিরগণের মুখেই উপরিউক্ত কথাগুলো ধ্বনিত হয়েছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার প্রতিবাদে ৩৫-৩৯নং আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ .... كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই মুত্তাকী ও পরহেজগারদের জন্য তাদের পরওয়ারদেগারের নিকট বিভিন্ন রকমের নিয়ামতসম্পন্ন বেহেশ্‌তসমূহ তৈরি রয়েছে। মুশরিকগণ তার আরামদায়ক হাওয়া পর্যন্ত পাবে না। কারণ তাদের মধ্যে তাকওয়া নেই।

আর মক্কার কাফের ও মুশরিকরা কি করে এ কথা বলতে সাহস পেল যে, আমি তাদেরকে মুসলমানদের সমান করবো। এটাতো কখনও হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ বে-ইনসাফী। এমন বে-ইনসাফী আমার থেকে প্রকাশ পাওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। কেয়াসের ব্যতিক্রম এমন হুকুম তারা কিভাবে দিতে পারে। তবে সম্ভবত এটা তাদের আত্মপ্রসন্নতা বা আত্মগরিমার কারণেই হতে পারে। যদি কাফেরদের নাজাতের ব্যবস্থা হয় তবে আল্লাহর সকল ওয়াদা মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন– اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ অর্থাৎ এমন সময় হবে, যে সময় গুনাহগারদের জন্য কোনো ব্যবস্থা থাকবে না। اِنْصَافٌ ও اِنْصَافِىْ-এর সকল সত্য ফয়সালা করা হবে। সেদিন কাফেরদের এই সকল আকাশকুসুম চিন্তা কোনো কাজে আসবে না। অথচ বলা হয়েছে– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

প্রত্যেকটি জান্নাতেই তো নিয়ামত থাকবে তথাপিও جَنّٰتِ النَّعِيْمِ-কে কেন خَاصّ করা হলো? : এই প্রশ্নের عَقْلِىْ উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, ১. যদিও সকল বেহেশত আল্লাহর নিয়ামতসম্পন্ন তথাপিও جَنّٰتِ النَّعِيْمِ সম্ভবত উত্তম নিয়ামতসম্পন্ন, তাই এটার কথা বলা হয়েছে। ২. অথবা, جَنّٰتِ النَّعِيْمِ বলে تَخْصِيْص উদ্দেশ্য নয়; বরং বর্ণনা تَبْيِيْن উদ্দেশ্য নতুবা প্রত্যেক বেহেশতেই নিয়ামত অবর্ণনীয় হিসেবে থাকবে। আর مُتَّقِىْ দ্বারা যদি مُتَّقِىْ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْمُبَاحَاتِ উদ্দেশ্য হয় তখন হয়তো উত্তম جَنّٰتٌ বুঝানোর জন্য এটার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। [আল্লাহই সঠিক সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।]

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ الخ-এর মধ্যে কোন প্রকারের প্রশ্ন করা হয়েছে? : মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, এ অংশে اِسْتِفْهَامْ اِنْكَارِىْ নেওয়া হয়েছে, কারণ اَفَنَجْعَلُ الخ এ উক্তিটি তার এ কথার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, لَوْ كَانَ مَا يَقُوْلُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَنَحْنُ نُعْطٰى فِى الْاٰخِرَةِ خَيْرًا مِمَّا يُعْطٰى هُوَ وَمَنْ مَعَهٗ كَمَا فِى الدُّنْيَا অতঃপর বলা হয়েছে যে, اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ . اَنَحِيْفُ فِى الْحُكْمِ অর্থাৎ আমি কি কখনো বক্র হুকুম দান করবো যা পড়া না পড়া একই সমান হবে এটা কখনও নয়।

قَوْلُهُ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে কাফেরদের দল! তোমাদের নিকট আসমান হতে এমন কোনো কিতাব খাসভাবে এসেছে কি? যাতে তোমরা ঐ সব কথা পেয়েছ যা বলছ, আর সে আসমানি কিতাবে তোমাদের ইচ্ছামতো ভালো দিক বলে যাবে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মাদারিক গ্রন্থকার এ আয়াত দু'টির তাফসীর এরূপ লিখেছেন تَدْرُسُوْنَ اَنَّ لَكُمْ مَا تَخَيَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের যা যেরূপ পছন্দ হয় তোমরা সেরূপ বা সে পছন্দনীয় অংশই তেলাওয়াত করে থাক। যা তোমাদের পছন্দ হয় না তা তোমরা তেলাওয়াত কর না। আর تَدْرُسُوْنَ -কে مَدْرُوْس অর্থাৎ مَقْرُوْء অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অথবা تَدْرُسُوْنَ -কে حِكَايَةً لِلْمَدْرُوْسِ হিসেবে তাফসীর করা যেতে পারে। যেমন- আল্লাহ বলেন, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ আর تَخَيَّرَ الشَّيْئَ وَاخْتَارَهُ يَعْنِىْ اَخَذَ خَيْرَهُ -[মাদারিক]

قَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ حَاصِلُهُ هَلْ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ كِتَابٌ تَقْرَؤُوْنَ فِيْهِ اَنَّ مَا تَشْتَهُوْنَهُ وَتَخْتَارُوْنَهُ لَكُمْ . (كَمَالَيْن)

قَوْلُهُ تَعَالٰى "مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ" : আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফেরদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের ব্যাপারে যেসব মন্তব্য করত সে ব্যাপারে তাদের কথাকে ধিক্কার দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করছেন যে, তোমরা কিসের ভিত্তিতে এ সব মন্তব্য করছ? কিসের ভিত্তিতে তোমরা ফয়াসালা করছ, কিভাবে তোমরা আদর্শের বিচার ও যাচাই-বাছাই করছ যে, তোমাদের দৃষ্টিতে একজন আল্লাহর অনুগত বান্দা আর একজন অপরাধী এক রকম হতে পারে? এটা কখনও হতে পারে না। আয়াতে উল্লিখিত ইসতিফহামটি اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِىْ -[যিলাল]

اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ বাক্যটির মুতা'আল্লিক এবং তার অর্থ : اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ কার সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটা بَالِغَةٌ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। এটার অর্থ হলো তোমাদের কি এমন কসম রয়েছে যার শক্তি এবং কামালিয়াত কিয়ামত পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। অন্য অভিমতটি হলো اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ মুতা'আল্লিক হয়েছে উহ্য ثَابِتَةٌ -এর সাথে। এটার অর্থ হলো তোমাদের নিকট এমন কসম কি রয়েছে যা তাকীদের সাথে কিয়ামত পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে যা খুবই সঠিক এবং উত্তম, এ রকম তোমাদের কোনো অঙ্গীকার কি রয়েছে? -[কাবীর]

"جَنّٰتِ النَّعِيْمِ" -এর অর্থ : উল্লিখিত ৩৪নং আয়াতে "জান্নাতুন নাঈম" দ্বারা আল্লাহর অর্থে নিয়ামতে ভরপুর একটি বিশেষ জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, যা পরকালে মুত্তাকীগণ লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন লোকদের পরকালে সুখী করার জন্য আটটি জান্নাত সৃষ্টি করে রেখেছেন, যার নাম হলো- ১. জান্নাতুল ফিরদাউস, ২. জান্নাতুল আদন, ৩. জান্নাতুল মাওয়া, ৪. জান্নাতুল খুলদ, ৫. দারুস সালাম, ৬. দারুল মাকাম, ৭. ইল্লিয়্যীন এবং ৮. জান্নাতুন নাঈম। এ জান্নাতগুলোতে আল্লাহ পরকালে শ্রেণিভেদে মু'মিন বান্দাগণকে স্থান দেবেন।

قَوْلُهُ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ ...... اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সে কফেরদেরকে প্রশ্ন করুন যে, তাদের যে দাবি তারা প্রকাশ করছে যে, পরকালের সুখ-শান্তি মুসলমানদের অপেক্ষা তাদের জন্য অধিকতর হবে। সে সুখ-শান্তি সেদিন তোমাদেরকে দান করার দায়িত্ব কে নিয়েছে? আর যদি তাদের এ দাবিকে সত্যায়িতকারী কোনো দেবতা থাকে তবে তারা তাদেরকে যেন উপস্থিত করে। এতে যেন কাল বিলম্ব না হয়।

বাস্তবিকপক্ষে তাদের এ সকল দাবি-দাওয়া সম্পর্কে কোনো অসমানি গ্রন্থে কোনো কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। অন্যথা কোনো ওহীর মাধ্যমেও তাদের এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়নি বা বর্ণনা করাও হয়নি। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের এ বিষয়ে কেউ দায়িত্ব নিতে পারবে না। সুতরাং এগুলো মিথ্যা দাবি। -[মা'আরিফ]

زَعِيْمٌ -এর অর্থ : زَعِيْمٌ শব্দের অর্থ হলো- আরবি ভাষায় যে কোনো পক্ষীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা মুখপাত্র। সুতরাং এটার অর্থ হবে তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিকে যে তোমাদের জন্য আল্লাহর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দাবি করতে প্রস্তুত হবে যে, সে আল্লাহর নিকট হতে কোনো চুক্তি বা ওয়াদা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাফরমানদের মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জস্বরূপ। আল্লাহর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বাতিল পক্ষ কখনো টিকতে পারবে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ : জালালাইন ও মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, كَشْفُ سَاقٍ বলে شِدَّةُ اَمْرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের হিসাব-কিতাবের ব্যাপার খুবই কঠিন হবে। আর আরব দেশে যদি কোনো কাজে কঠোরতা অবলম্বন করা হয় তখন বলা হয় كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং এটা

Free @ www.e-ilm.weebly.com

একটি প্রবাদ বাক্য স্বরূপ। অনুরূপভাবে আরো বলা হয় يَدُهُ مَغْلُوْلَةٌ তার হাত বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন ইহুদি সম্প্রদায় বলেছিল يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ আল্লাহর কোনো হাত নেই। كَقَوْلِهِ تَعَالٰى يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَلَا وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِى الْحَقِيْقَةِ

হযরত ইকরামা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (র.) প্রমুখের মতে كَشْفُ سَاقٍ -এর অর্থ হলো কিয়ামতের কঠিন দিনে মহাবিপদের মুখোমুখি হওয়া।

হযরত ইবনে জারীর (র.) বলেছেন كَشْفُ سَاقٍ হলো কিয়ামতের সেই কঠিন বিপদ যা প্রত্যেকের উপর আপতিত হবে।

অধিকাংশের মতে এর দ্বারা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নূরের তাজাল্লী প্রকাশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। سَاقٌ শব্দের অর্থ হলো পায়ের গোড়ালির উপরিভাগ। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন 'সাক' বা তাঁর কদম মোবারকের গোছা প্রকাশ করবেন তথা বিশেষ নূরের তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হবে। –[নূরুল কোরআন]

وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ -এর ব্যাখ্যা : দারে কুতনী, তাবারানী ইসহাক ইবনে মারদুবিয়াহ -এর মুসনাদে এবং হাকেম যে হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্র করবেন এবং তিনি আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। তখন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, হে লোক সকল! তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমাদের প্রভু যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের সুন্দর অবয়ব দান করেছেন এবং তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন, তিনি চান যে, তোমরা দুনিয়াতে যে যার ইবাদত করতে এখন সে সবেরই ইবাদত আবার করতে শুরু করবে। এটা কি তোমাদের জন্য ইনসাফ নয়? তারা বলবে হ্যাঁ, এটা ইনসাফ। অতঃপর প্রত্যেকেই যে যার ইবাদত করত তা তার সামনে আসবে। যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করত তাদের সামনে ঈসা'র শয়তান আসবে। এ ধরনের যারা পাথর, বৃক্ষ, কাঠ প্রভৃতি যারই ইবাদত করত তাদের সামনে তা এসে হাজির হবে এবং তারা তা নিয়ে চলবে। আর ইসলামের অনুসারীরা দাঁড়িয়ে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের বলবেন, তোমাদের কি হয়েছে? কেন তোমরা যাচ্ছ না? যেমন অন্য মানুষেরা চলে গেছে? তখন তারা বলবে, আমাদের একজন প্রভু আছেন। তাঁকে আমরা এখনও দেখিনি। তিনি বলবেন যে, তোমরা তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে? তারা বলবে হ্যাঁ, আমরা তাঁকে দেখলে চিনতে পারবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পায়ের নিম্নদেশ খুলে দেবেন। তখন মুসলমানেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, আর কাফের ও মুনাফিকরা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের পিঠ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় কঠিন ও শক্ত হয়ে যাবে। তারা পিঠ বাঁকা করে সিজদা করতে পারবে না। –[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ বাক্যে يَوْمَ -এর মর্ম এবং سَاقٌ -এর অর্থ কি? : يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ বাক্যে উল্লিখিত يَوْم -এর মর্ম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। জমহুরের নিকট এটার মর্ম হলো يَوْم বা দিন বলতে কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। সেদিন লোকদেরকে সিজদার জন্য বলা হবে এবং এ হুকুম হবে তাদেরকে নামাজি ও বে-নামাজি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে। এটার মাধ্যমেই প্রমাণ করা হবে, কে দুনিয়ায় নামাজ পড়ত আর কে পড়ত না। দ্বিতীয় অভিমতটি হলো, এটার মর্ম হচ্ছে, দুনিয়ার দিন। কেননা পরকালে কোনো تَكْلِيْفٌ নেই। দুনিয়াতেই নামাজ-রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসের আলোকে দেখলে জমহুরের অভিমতটিই সহীহ বলে প্রতীয়মান হয়।

سَاقٌ -এর অর্থ সম্পর্কেও কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ ভয়াবহতা। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ প্রকৃত অবস্থা, যেদিন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা হবে। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ জাহান্নামের 'সাক' বা আরশের 'সাক' বা পায়ের নিম্নদেশ খোলা হবে। –[কাবীর]

Free@www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٤. فَذَرْنِىْ دَعْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ط الْقُرْاٰنِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَاْخُذُهُمْ قَلِيْلًا قَلِيْلًا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ .

৪৪. সুতরাং আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে অবকাশ দাও আর যারা এ বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কুরআনকে, অচিরেই আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরবো তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবো, এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না।

٤٥. وَاُمْلِىْ لَهُمْ ط اُمْهِلُهُمْ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ شَدِيْدٌ لَا يُطَاقُ .

৪৫. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি তাদেরকে অবকাশ দান করি। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ সুকঠিন, যা সহ্যের অতীত।

٤٦. اَمْ بَلْ تَسْـَٔلُهُمْ عَلٰى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مِمَّا يُعْطُوْنَكَهُ مُّثْقَلُوْنَ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ لِذٰلِكَ .

৪৬. নাকি اَمْ শব্দটি بَلْ অর্থে, আপনি তাদের নিকট চাচ্ছেন রিসালাত প্রচারের বিনিময়ে পারিশ্রমিক, ফলে তারা সেই দণ্ডকে যা তারা আপনাকে প্রদান করবে দুর্বহ বোঝা মনে করে যে জন্য তারা ঈমান আয়নন করে না।

٤٧. اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ اَىِ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ الَّذِىْ فِيْهِ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ مِنْهُ مَا يَقُوْلُوْنَ .

৪৭. নাকি তাদের নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান আছে অর্থাৎ লাওহে মাহফূয, যাতে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে। যে, তারা তা লিখে রাখে তন্মধ্যে হতে, যা তারা বলে বেড়াচ্ছে।

তাহকীক ও তারকীব

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ বাক্যটি مُسْتَأْنِفَةٌ হয়েছে। তাদের জন্য যে শাস্তি হবে فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ الخ আয়াত হতে তার كَيْفِيَةٌ বর্ণনা করার জন্য। فَذَرْنِىْ-এর। وَمَنْ মাফঊলে মাআহু হয়েছে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ .... اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ : উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কিয়ামত সম্পর্কীয় বিষয়ে আপনার সাথে কটু আচরণকারীদের আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না; বরং তাদের ব্যাপার আমার হস্তে অর্পণ করে দিন। আমি তাদেরকে দেখে নিবো। তাদের শাস্তিদানে যদিও কালবিলম্ব হয় তবেও তারা রেহাই পাবে না। আমি কলা-কৌশলের মধ্য দিয়ে তাদেরকে এমন সুন্দরভাবে কবজা করে নেবো, তারা একটুও টের পাবে না। শেষ পর্যন্ত তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বো।

আর তাদের রশি ছেড়ে দিচ্ছি, কুকর্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিফল ভোগাবো না, এতে তাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমার তদবির খুবই শক্ত।

আল্লাহর বাণী ذَرْنِىْ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলার এ বাক্যটি একটি প্রচলিত বাক্য হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন, এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকুন। কথাটির মূল অর্থ হলো এই যে, কাফেরগণ বারবার হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দরবারে এ কথাটি তুলে ধরত যে, যদি সত্যই আমরা প্রভুর দরবারে দোষী হয়ে থাকি এবং তিনি আমাদেরকে শাস্তি প্রদানে ক্ষমতাশীল, তবে তিনি কেন বিলম্ব করেন? এ সমস্ত কথাবার্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তঃকরণেও এ ভাব সৃষ্টি হয় যে, যদি তার কথা কখনো সত্য প্রতিফলিত হয়ে যেত তবে অবশিষ্ট লোকগণ সংশোধন হয়ে যেত। এ মর্মে কখনও হযরত ইউনুস (আ.)-এর ন্যায় তিনি দোয়াও করেছিলেন। তবে তাঁর সে দোয়া সাথে সাথেই কার্যকর হয়নি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আর তাদেরকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও না করা আল্লাহর বিশেষ কোনো মঙ্গলের খাতিরে হতে পারে। সুতরাং সে মঙ্গলের লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সবর করতে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহর কাজ আল্লাহ সুবিধামতো করবেন। অথবা নবী করীম ﷺ-এর উম্মতকে সরাসরি এভাবে ধ্বংস করে বিধর্মীদের চোখের পর্দা নষ্ট করবে না। তাই নবী করীম ﷺ-কে একটু ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে।

اِسْتِدْرَاجٌ-এর মূলতত্ত্ব : কাবীর ও মাদারিক গ্রন্থকার এর তাফসীর করেছেন–

سَنُدْنِيْهِمْ مِنَ الْعَذَابِ دَرَجَةً دَرَجَةً يُقَالُ اِسْتَدْرَجَهُ اِلٰى كَذَا اِذَا اسْتَنْزَلَهُ دَرَجَةً فَدَرَجَةً حَتّٰى يُوَرِّطَهُ فِيْهِ وَاسْتِدْرَاجُ اللّٰهِ تَعَالٰى عِبَادَهُ الْعُصَاةَ اَنْ يَرْزُقَهُمُ الصِّحَّةَ وَالنِّعْمَةَ فَيَجْعَلُوْنَ رِزْقَ اللّٰهِ ذَرِيْعَةَ الْمَعَاصِىْ . هٰكَذَا قَالَ الزَّمَخْشَرِىْ اَيْضًا .

অর্থাৎ অচিরেই আমি তাদেরকে আস্তে আস্তে আজাবের নিকটে নিয়ে যাবো। যেমন বলা হয় اِسْتَدْرَجَهُ اِلٰى كَذَا যখন তাকে কিঞ্চিৎ অবতরণ করা হয় এবং সর্বশেষ একেবারেই ঘনিয়ে আনা হয়। আর আল্লাহ তাঁর গুনাহগার বান্দাগণকে اِسْتِدْرَاجٌ করার অর্থ হলো, তাদের তাঁর নিয়ামতের ভেতর ডুবিয়ে রাখবেন এবং সুস্থতার উচ্চশিখরে পৌঁছিয়ে দেবেন। সর্বশেষ তাদের উপর দেয় নিয়ামতসমূহকে গুনাহের কারণ বানিয়ে দেন।

আল্লামা যমখশারী (র.)ও এমনি মতামত পেশ করেন। জালালাইন গ্রন্থকার বলেন– এর অর্থ হলো, وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ نَاْخُذُهُمْ قَلِيْلًا قَلِيْلًا যখন আল্লাহর গুনাহগার বান্দা গুনাহকে নতুন নতুনভাবে আরম্ভ করে। আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামত নতুনভাবে প্রদান করতে থাকেন এবং সে দেয় নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করাকে সে ভুলে যায়।

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُنْعِمُ عَلٰى عَبْدِهٖ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَاعْلَمْ اَنَّهُ اِسْتِدْرَاجٌ يُسْتَدْرَجُ بِهِ الْعَبْدُ . (كَبِيْر)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন তোমরা দেখবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাগণের উপর নিয়ামত দান করছেন, অথচ সেই বান্দা গুনাহের উপর বহাল রয়েছে, তখন জানবে যে, এটাই اِسْتِدْرَاجُ اللّٰهِ এটার দ্বারাই বান্দাকে পাকড়াও করা হবে।

–[কাবীর]

ধ্বংসের অজ্ঞাত পথ : আল্লাহ তা'আলা পূর্বভাষণের পাশাপাশি উপরিউক্ত ভাষণসমূহ যদিও নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, কিন্তু এটার মূল লক্ষ্য মক্কার ভ্রান্ত কাফের দল এবং দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত মানুষসমূহ। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হে নবী! তাদের সাথে বুঝাপড়া করার দায়িত্ব আপনার নয়। আমার কাছে তাদেরকে ছেড়ে দিন, আমিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করবো। তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে এমনভাবে নিয়ে যাবো যে, তারা বুঝতেও পারবে না, তারা কোথায় যাচ্ছে, কোথায় তাদের শেষ মঞ্জিল। অজ্ঞাতসারে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ হলো– সত্যের দুশমন ও জালিম লোকদেরকে দুনিয়ায় বহুবিধ নিয়ামত ধন-ঐশ্বর্য এবং বিত্ত-সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি দান করা হয়। বৈষয়কি জীবনে সাফল্য দান করে তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, তারা যা কিছু করছে ভালোই করছে। তাদের সব কাজ-কর্মই সঠিক ও নির্ভুল। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের পাপাচারী ভূমিকা এবং সত্যের বিরোধিতার গতিবেগ বহুগুণে বেড়ে যায়। এ দুনিয়ায় যা কিছু নিয়ামত দান করা হয় তা সবই তাদের ধ্বংস ও বিনাশের কার্যকারণে পরিণত হয়। উপরিউক্ত ৪৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন, আর পরবর্তী আয়াতে বলেছেন, আমি তাদেরকে নিয়ামত ও প্রাচুর্যের মধ্যে রেখে অবকাশ দিয়ে চলেছি। এ নিয়ামত ও অবকাশদান তাদেরকে ধ্বংস করার আমার একটি সুদৃঢ় ও সুচতুর কৌশল বিশেষ। বস্তুত আমার কৌশল এতই সূক্ষ্ম যে, মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

كَيْدِىْ শব্দের তাৎপর্য : এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো ষড়যন্ত্র করা। নির্দোষ ও শত্রুতার জন্য গোপনে কারো বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র করা মহাপাপ; কিন্তু কোনো লোকের কর্মদোষে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, তার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র ব্যতীত কোনো গত্যন্তর থাকে না, তখন ষড়যন্ত্র করা দোষ নয়। উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের নিজ কর্মদোষে সৃষ্ট পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করেই তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর গোপন ষড়যন্ত্র ও কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "أَمْ تَسْئَلُهُمْ ... مُثْقَلُونَ (الاية)" : এখানে আল্লাহ তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলছেন যে, "আপনি কি তাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছেন যে, এরা এ অর্থ-দণ্ডের বোঝার তলে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে?" বাহ্যত প্রশ্নটি রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট করা হয়েছে; কিন্তু আসলে এ প্রশ্ন করা হয়েছে সেই লোকদের প্রতি যারা রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরোধিতা করার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, আমাদের রাসূল কি তোমাদের নিকট কোনো কিছু চাচ্ছেন? তিনি যে প্রকৃতই একজন নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। তিনি তোমাদের সম্মুখে দীনের দাওয়াত পেশ করছেন কেবলমাত্র এ কারণে যে, এতেই তোমাদের সঠিক কল্যাণ নিহিত বলে তিনি বিশ্বাস করেন। এ ছাড়া এর পিছনে আর কোনো কারণ নেই, তা তোমরা জান। এটার পরও তোমরা যদি তা মেনে নিতে প্রস্তুত না হও তবে মেনে নিও না। সেজন্য তোমাদের এতটা রাগান্বিত হয়ে উঠার কারণ থাকতে পারে? তোমরা তাঁর সাথে এ কোন্ ধরনের আচরণ করছ?

আল্লাহর আনুগত্যের উপর বিনিময় চাওয়া জায়েজ হবে কি? : এ প্রসঙ্গটি খুবই দীর্ঘালোচনার বিষয় বটে। তবে এখানে খুবই দীর্ঘালোচনার স্থান নয় বিধায় খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বলা আবশ্যক মনে হয়।

মূলত أُجْرَةٌ عَلَى الطَّاعَةِ তথা আল্লাহর অনুগত্যের উপর বিনিময় গ্রহণ করা হযরাতে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম হতে مُتَقَدِّمِيْنَ [মুতাকাদ্দেমীন]-এর সময় পর্যন্ত জায়েজ ছিল না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন–

قَوْلِهِ ﷺ اتَّخِذُوْا مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا .

তোমরা এমন একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করো যে তার আজানের কোনো বিনিময় গ্রহণ করবে না। এ হাদীসটিকে দলিলরূপে গ্রহণ করে مُتَقَدِّمِيْنَ ধর্মীয় কার্যাবলির উপর কোনো প্রকার বিনিময় গ্রহণ করাকে হারাম বলেছেন।

মুতাআখখিরীনগণ এ মাসআলার উপর খুবই তীক্ষ্ণ নজর পেশ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদি এমনিভাবে কেবল تَعْلِيْمِ دِيْن -কে ছেড়ে রাখা হয় তবে ছাত্র-শিক্ষক কাউকে এটার উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে না। ফলে দীনে এলাহী অচিরেই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করবে। তাই দীন রক্ষার্থেও ছাত্র-শিক্ষক গণের ধর্মের প্রতি আগ্রহ জন্মানো ও ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেখানে ধর্ম বিলীন হওয়ার ভয় থাকবে সেখানে আল্লাহর অনুগত্যের উপর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হবে। যথা– কুরআন শিক্ষা দেওয়া, ইমামতি করা, দীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। আর যেখানে ধর্ম বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না সেখানে তথা আল্লাহর অনুগত্যের উপর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ" (الاية) : উল্লিখিত আয়াতটির দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত তাদের নিকট কি লাওহে মাহফূয আছে? সুতরাং তারা তার মধ্যে নিজেদের কুফরি এবং শিরকের জন্য নিজেদের খাতায় নেকী লিখে নিচ্ছে আর এ কারণেই তারা শিরক ও কুফরির উপর অটল এবং অনড় রয়েছে। দ্বিতীয় অর্থটি হলো যে, গায়েবী জিনিসসমূহ তাদের মন-মগজে এসে উপস্থিত হয়েছে, এটার ফলে তারা আল্লাহর উপর কলম ধরছে– লিখছে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের উপর স্ব-ইচ্ছা হুকুম এবং ফরমান চালাচ্ছে। আয়াতে উল্লিখিত জিজ্ঞাসাবোধক অব্যয়টি তথা اِسْتِفْهَامْ টি اِنْكَارْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٨. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فِيْهِمْ بِمَا يَشَاءُ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۚ فِي الضَّجَرِ وَالْعَجَلَةِ وَهُوَ يُوْنُسُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ إِذْ نَادٰى دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ مَكْظُوْمٌ مَمْلُوْءٌ غَمًّا فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ.

৪৮. সুতরাং আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় তাদের ব্যাপারে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। আর আপনি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হবেন না অধৈর্য ও তড়িঘড়ি করায়। আর তিনি হলেন হযরত ইউনুস (আ.)। যখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তখন বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর ছিলেন মৎস্য উদরে চিন্তায় অস্থির।

٤٩. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ أَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ بِالْعَرَاءِ بِالْأَرْضِ الْفَضَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ لٰكِنَّهُ رُحِمَ فَنُبِذَ غَيْرَ مَذْمُوْمٍ.

৪৯. যদি না তাঁর নিকট পৌছত তাঁকে সহায়তা করত অনুগ্রহ রহমত তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে, তবে তিনি নিক্ষিপ্ত হতেন মৎস্য উদর হতে উন্মুক্ত প্রান্তরে খোলা জায়গায় লাঞ্ছিত হয়ে কিন্তু তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। তাই লাঞ্ছনাহীনভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

٥٠. فَاجْتَبٰهُ رَبُّهُ بِالنُّبُوَّةِ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ الْأَنْبِيَاءِ.

৫০. অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে নির্বাচিত করলেন নবুয়ত মাধ্যমে এবং তাঁকে সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত করলেন নবীগণের।

٥١. وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا بِأَبْصَارِهِمْ أَيْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ نَظْرًا شَدِيْدًا يَكَادُ أَنْ يُّصْرِعَكَ وَيُسْقِطَكَ عَنْ مَكَانِكَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ الْقُرْاٰنَ وَيَقُوْلُوْنَ حَسَدًا إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ بِسَبَبِ الْقُرْاٰنِ الَّذِيْ جَاءَ بِهِ.

৫১. আর কাফেরগণ যেন আপনাকে আছড়ে ফেলে দিবে يُزْلِقُوْنَ শব্দটি ى -এর মধ্যে পেশ ও যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ তারা আপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, যেন তারা আপনাকে আছড়ে ফেলবে এবং আপনাকে স্বীয় মর্যাদা হতে ছুঁড়ে ফেলবে। যখন তারা উপদেশ শ্রবণ করে কুরআন। এবং তারা বলে বিদ্বেষবশে। এতো পাগল এ কুরআনের কারণে, যা তিনি আনয়ন করেছেন।

٥٢. وَمَا هُوَ أَيِ الْقُرْاٰنُ إِلَّا ذِكْرٌ مَوْعِظَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ لَا يَحْدُثُ بِسَبَبِهِ جُنُوْنٌ.

৫২. আর তা তো কুরআন উপদেশ নসিহত জগদ্বাসীর জন্য মানব ও জিনের জন্য। তার কারণে উন্মাদনা সৃষ্টি হয় না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَهُوَ مَكْظُوْمٌ : বাক্যটি মহল্লে নসবে আছে হাল হওয়ার কারণে। বাক্যটি نَادٰى -এর ফায়েল হতে حَالٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ (الاية) : تَدَارَكَ ফে'ল, نِعْمَةٌ মাউসূফ, مِنْ رَبِّهِ সিফাত। সম্পূর্ণ বাক্যটি تَدَارَكَ -এর ফায়েল, ة যমীর মাফউল। لَنُبِذَ শব্দটি لَوْلَا -এর জওয়াব।

قَوْلُهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ : বাক্যটি مُسْتَأْنِفَةٌ অথবা মহল্লে নসবে আছে يَقُوْلُوْنَ -এর ফায়েল হতে হাল হওয়ার কারণে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الخ -এর শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে সাবী গ্রন্থকার বলেন, যখন উহুদের ময়দানে রাসূল ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুনাফিকদের উত্তেজিত ভাব দেখে পলায়ন করেছিলেন, তখন পলাতক ব্যক্তিবর্গের প্রতি হুযূর ﷺ বদদোয়া করতে মনস্থ করলেন, এমতাবস্থায় তাঁকে বদদোয়া হতে বিরত থাকার নিমিত্তে আয়াত নাজিল হলো।

কারো কারো মতে, মক্কাবাসীদের অত্যাচার-ব্যভিচারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে খুব ব্যথা জেগেছিল এবং মক্কার কাফেররা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। কারো কারো মতে, এ অত্যাচারী লোকগণ ছিল ক ছাকীফ গোত্রীয় লোক। অত্যাচারীগণ রাসূল ﷺ-কে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পা মুবারক রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বদদোয়া করতে চেয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন– فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ الخ

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الخ আয়াতের শানে নুযূল : কাফেররা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি তাদের তীব্র শত্রুতার কারণে তাঁর কথা শ্রবণ করার সময় তাঁর প্রতি এরূপ চক্ষু ফিরিয়ে দেখত যেন তাকে মাটিতে ফেলে দেবে, অথবা ক্রোধের দ্বারা যেন তাঁকে খেয়ে ফেলবে। তাদের মন-মগজ ও সর্ব শরীরের শত্রুতা চক্ষু দ্বারা প্রকাশ করত। তখন কাফেরদের উক্ত অবস্থা বর্ণনায় وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآيَةَ অবতীর্ণ হয়।

অথবা, তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে– বনী আসাদ গোত্রে কয়েকজন কুদৃষ্টি নিক্ষেপক লোক ছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁর উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তখন إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ ... لِلْعٰلَمِينَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয় অবগত করা এবং কুদৃষ্টির কোনো প্রভাব তাঁর উপর পড়বে না বলে জানিয়ে দেওয়া এবং তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করা উদ্দেশ্য। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুদৃষ্টির সর্বপ্রকার প্রভাব হতে মুক্ত রেখেছেন। সিহাহ সিত্তায় হযরত আবূ হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, اَلْعَيْنُ حَقٌّ কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য। অর্থাৎ কুদৃষ্টি নিক্ষেপক ব্যক্তি কোনো বস্তুর প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই এ বস্তুর ক্ষতি হবে। এটা হতে বাঁচার জন্য তাবিজ-কবজ ইত্যাদি দ্বারা তদবির করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত হাসান হতে বর্ণিত হয়েছে, বদ-নজর দূর করার জন্য এ আয়াতদ্বয় পাঠ করে ফুঁক দিলে বদ-নজরের প্রভাব দূরীভূত হয়। –[রূহুল মা'আনী, খাযেন]

সাহেবে হূতের ঘটনা : আল্লাহ তা'আলা পূর্ব ভাষণের জের টেনে মহানবী ﷺ-কে কাফেরদের তিরস্কার-জ্বালাতন, দীনের বিরোধিতাকরণ এবং তাঁকে উন্মাদ ও পাগল আখ্যাদান ইত্যাদি ব্যাপারে অতিষ্ঠ ও অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আর বহু বছর পূর্বেকার একটি ঐতিহাসিক কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, আপনি সেই মাছওয়ালার ন্যায় ধৈর্যহারা হবেন না; যে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করেই দেশ ছেড়ে পলায়ন করেছিল। এ মাছওয়ালা হলেন আল্লাহর একজন মনোনীত নবী। তাঁর জীবন চরিত্র অতি সংক্ষেপে প্রথম তিনটি আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। এ মহামতি নবী হলেন হযরত ইউনুস (আ.)। তাঁকে 'মাছওয়ালা' কেন সম্বোধন করা হয়েছে তার কারণ উদ্ঘাটনের জন্য এখানে আমরা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী উল্লেখ করছি।

হযরত ইউনুস (আ.) কখন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, তার সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পিতার নাম ছিল মাত্তা তা অনেক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন তাঁর বয়স ২৮ বছর হয়, তখন তিনি নবুয়ত লাভ করেন। ইতিহাস গ্রন্থ দ্বারা জানা যায় যে, তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর মধ্যবর্তী সময়ের নবী ছিলেন। তাঁকে অসুরীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের জন্য পাঠানো হয়েছিল। অসুরীয়দের বিরাট এক গোত্রভিত্তিক সাম্রাজ্য ছিল, যার কেন্দ্রীয় শহর ছিল প্রাচীন নিনাওয়া শহর। এ শহরটি বর্তমান ইরাকে অবস্থিত। এ নগরীর ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ বর্তমানেও দাজলা নদীর পূর্বতীরে বর্তমান মুসেল শহরের বিপরীত দিকে বিদ্যমান রয়েছে। এ অঞ্চলে 'ইউনুস নবী' নামে একটি স্থান এখনও রয়েছে। এ জাতির লোকেরা সেকালে যে কত উন্নত ছিল, তা রাজধানী নিনাওয়া প্রায় ৬০ মাইল ব্যাপী এলাকা জুড়ে থাকার দ্বারা অনুমান করা যায়। এ নিনাওয়া শহরেই অসুরীয়দের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে নবী করে পাঠান। কুরআনের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়– ঐ সময় ঐ শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষ হতেও বেশি ছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে দীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন; কিন্তু তাঁর দাওয়াতে কেউ কর্ণপাত করল না। তখন তিনি তাদের প্রতি চল্লিশ দিনের মধ্যে আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে শহর ছেড়ে দূরে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন।

এদিকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে নগরীর লোকজন আল্লাহর গজব নাজিল হওয়ার পূর্বাভাস পেয়ে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সন্ধানে বের হলো। তারা ভাবল হযরত ইউনুস (আ.) সত্যই আল্লাহর নবী। তাঁর কথা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-কে না পেয়ে নগরীর রাজাসহ সকল লোক নিজেদের পশুপালসহ ময়দানে গিয়ে জমায়েত হয়ে খালেস

ওবা করল এবং হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দীনকে কবুল করে নিল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর হতে আজাবের ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা নিরাপদে রয়ে গেল; কিন্তু এ সব হযরত ইউনুস (আ.) কিছুই জানলেন না। তিনি চল্লিশ দিন অপেক্ষা করার পর আজাব না আসতে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। শহরবাসীদের নিকট তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছেন। তিনি লজ্জায় কিভাবে মুখ দেখাবেন। তাই তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করে ঐ অঞ্চল ছেড়ে পশ্চিম দিকে রওয়ানা হলেন, পথে ফোরাত নদী পার হওয়ার জন্য খেয়াতরীতে অনেক লোকসহ উঠলেন। খেয়া নদীর মাঝখানে যাওয়ার পর নদীতে তুফান সৃষ্টি হলো। খেয়া ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ সময় লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, নিশ্চয় হয়তো আমাদের মধ্যে মনিব হতে ভেগে আসা কোনো গোলাম থাকবে; তার কারণেই খেয়াতরীর এ অবস্থা। হযরত ইউনুস (আ.) ভাবলেন আমিই তো আমার প্রভুর আদেশের অপেক্ষা না করে চলে আসছি। পরিশেষে তিনি নিজে পলায়নকারী গোলাম বলে পরিচয় দিলেন। তখন এরূপ লোক কে? তা অবগত হওয়ার জন্য তিনবার লটারী করা হলো। তিনবারই হযরত ইউনুস (আ.)-এর নাম উঠল। অতঃপর তাঁর এবং লোকদের ইচ্ছায় তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ করা হলো, নদীর তুফান থেমে গেল। খেয়াতরী নিরাপদ হলো। এদিকে আল্লাহর নির্দেশে বিরাট এক মৎস্য হযরত ইউনুস (আ.)-কে গিলে ফেলল। মৎস্যের পেটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে তিনি আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনা জানালেন لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ – আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করলেন। আল্লাহর নির্দেশে মৎস্য তাঁকে নদীর তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বমি করে ফেলে দিল। তখন তাঁর অবস্থা ছিল অতিশয় দুর্বল ও নাজুক। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা উক্ত স্থানে একটি ছায়াবৃক্ষ জাগিয়ে দিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) এ বৃক্ষতলে থেকে প্রখর রৌদ্রতাপ হতে নিরাপদ রইলেন। কিছুটা সুস্থতা বোধ করার পর তথায় একটি ঝুপড়ি নির্মাণ করে বৃক্ষ তরুলতার ফল আহার করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। অতঃপর আবার আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ব মর্যাদায় ফিরিয়ে নিয়ে নিনাওয়াবাসীদের হেদায়েতের দায়িত্ব দিয়ে তথায় পাঠালেন। বাকি জীবন নিনাওয়া অধিবাসীদের হেদায়েত ও নসিহতে কাটিয়ে দিয়ে ঐ নিনাওয়া শহরেই ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাধিস্থ হন। –[কাসাসুল কোরআন, নাদওয়া]

হযরত ইউনুস (আ.) গুনাহ করেছেন কিনা? : বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, হযরত ইউনুস (আ.) হেদায়েতের দায়িত্ব লাভ করে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা না করে সে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার দ্বারা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং এ জন্য তিনি গুনাহগারও হয়েছেন; কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও আহলে সুন্নতের অভিমত অনুযায়ী নবীগণ নবুয়তি দায়িত্ব লাভ করার পর হতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ থাকেন। আল্লাহ তাঁদেরকে গুনাহ হতে নিরাপদ রাখেন। তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে চলে আসার ঘটনাকে এভাবে ব্যাখ্যা দেন যে, মূলত তিনি দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেননি; বরং মুখ-লজ্জার ভয়ে দূরে সরে পড়েছিলেন। এ জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতে হবে তা তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। সুতরাং কোনো কাজ অনিচ্ছায় হয়ে পড়লে তাকে অপরাধ বা গুনাহ বলা যায় না। তাফসীরে খাযেন এবং কাবীর-এর লেখক এ প্রশ্নের উত্তরে তিনটি সমাধান পেশ করেছেন। **এক.** উপরোল্লেখিত ৪৯নং আয়াতের لَوْلَا শব্দই প্রমাণ করে যে, তাঁর দ্বারা এমন কোনো দূষণীয় কাজ হয়নি, যা গুনাহকে অপরিহার্য করে। **দুই.** হয়তো এটা দ্বারা আফযাল ও মুস্তাহাব পর্যায়ের কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে– ফরজ ওয়াজিব শ্রেণির কোনো কর্তব্য নয়। **তিন.** এ ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর নবুয়ত লাভ করার পূর্বে। কেননা পরবর্তী ৫০নং আয়াত প্রমাণ দেয় যে, এ ঘটনার পরই তাঁকে নবীরূপে নির্বাচিত করে তাঁর নিকট ওহী পাঠানো হয়েছিল। বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী فَاجْتَبٰهُ শব্দের فَ অক্ষরটি পূর্ববর্তী অবস্থার জের বুঝাবার জন্যই ব্যবহার হয়।

قَوْلُهُ لَوْلَا اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ .... فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলার ইহসান তার প্রতি না হতো তিনি যে ময়দানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন মাছের গর্ভ হতে, তখন তথায় তিনি খুবই সংকটময় অবস্থায় এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতেন تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ দ্বারা এখানে তওবা কবুলকে বুঝানো হয়েছে। এটার তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার লিখেছেন اَدْرَكَهٗ رَحْمَةٌ [তাকে রহমত পেয়েছে]

সূরা صَافَّاتْ-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ যদি তিনি তওবা ও ইস্তিগফার না করতেন, তবে অবশ্যই মাছের পেটে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকতেন। আর যদি তিনি তওবা করতেন এবং আল্লাহ তাঁর তওবা ও ইস্তিগফার কবুল ও মঞ্জুর না করতেন, তবে দুনিয়াতে এটার বরকত অবশ্যই হতো এবং মাছের গর্ভ থেকেও নাজাত পেতেন, আর যেভাবে তওবা কবুল -এর পর ময়দানে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সেভাবেই নিক্ষিপ্ত হতেন, তবে তখন তাঁর অবস্থা مَذْمُوْمٌ খুবই নিকৃষ্ট হতো, অর্থাৎ তাঁর উপর عِتَابٌ বা ভর্ৎসনা আসত, তওবা কবুল -এর কারণে حَالَتْ مَذْمُوْمٌ হয়নি। কেননা তওবা কবুল -এর পর مَذَمَّتْ ও مَلَامَتْ আসে না, এটা আল্লাহর নীতিমালা।

অতঃপর তাঁর প্রভু তাঁকে আরও অধিক পছন্দশীল বানিয়ে নিয়েছেন নবুয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে এবং তাঁকে নেককারদের মধ্যে অধিক মর্যাদাশীল করে দিলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : এ শব্দটির তাফসীর বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্নরূপ করেছেন। জালালাইন গ্রন্থকার বলেন, مِنَ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ নবীগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এটা হতে বুঝা যায় উক্ত ঘটনা তাঁর নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ঘটেছিল। কারো কারো মতে, তিনি ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও নবী ছিলেন। তখন اِجْتَبَاهُ অর্থ হবে اِنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ بَعْدَ اَنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ অর্থাৎ ঘটনার সময় ওহী আগমন বন্ধ হয়ে গেছে, পুনরায় আবার ওহীর আগমন ঘটেছে। -[জুমাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاِنْ يَّكَادُ .... اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ" : সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতকে রাগ ও ক্ষোভের সাথে দেখত তারা কিভাবে রাসূলের দিকে বিষচক্ষে দেখত, তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখত। কুরআন তাদের চিত্রটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে। তারা এমনভাবে চাইত যে, তারা যেন আপনাকে আছড়ে ফেলবে, আপনাকে সমূলে উৎপাটন করবে তাদের দৃষ্টির বানে। যখন তারা কুরআন শুনত, আর তারা বলত "সে নিশ্চয় পাগল" তাদের এই দৃষ্টি যেন রাসূলের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তাদের চাহনীর মাধ্যমে যেন তারা রাসূলকে গিলে খেতে চায়। এটার মাধ্যমেই জানা যায়, তারা রাসূলের দাওয়াতের ব্যাপারে কতটা উন্মত্ত ছিল, কতটা ক্ষিপ্ত ও ক্রোধান্বিত ছিল। তারা রাসূলকে বিষচক্ষে দেখত। রাসূলুল্লাহ তাদের চোখের বিষে পরিণত হয়েছিলেন। তারা চাইত যে, দৃষ্টি বানে তাকে ভস্ম করে ফেলতে। আর তারা রাসূলকে কুরআনের বাণী শুনাতে দেখে পাগল বলত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে চরম ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পাগল বলে গালি দিত। -[যিলাল]

আয়াতের ব্যাখ্যা : বলা হয়েছে যে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি উপরে ইঙ্গিতকৃত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করুন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার হেদায়েতের পাবন্দ হোন। আর কাফেরদের থেকে সদা হুঁশিয়ার থাকা চাই, কেননা তারা আপনার প্রাণের শত্রু। যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন মনে হয় যেন তারা তাদের কুদৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আপনার স্থান হতে দূরে নিক্ষেপ করে ফেলবে। আর তারা এমন বদকার যে, কুরআন শুনে আপনাকে পাগল ও উন্মাদ বলে বেড়ায়। আর বলে এ কুরআন নামক বিষয়টি সাধারণ কেস্সা-কাহিনীসমূহের একটি গ্রন্থ মাত্র। অথচ এ কালাম সারা বিশ্ববাসীদের জন্য কেবল জিকির ও নসিহত বৈ আর কিছুই নয় আর এটা তাদের فَلَاحْ وَصَلَاحْ করার মূল ব্যবস্থাপনা। এমন বাণীর বাহককে কি করে مَجْنُوْنْ ও دِيْوَانْ বলা যেতে পারে আফসোস শত আফসোস।

ইমাম বাগাবী (র.) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ উপরিউক্ত আয়াতসমূহের সম্পর্কে বলেন, মানুষের বদনজর বা কুদৃষ্টি মানুষ ও অন্যান্য সব কিছুর উপর কার্যকর করা যেভাবে সকলেরই নিকট জানাশুনার বিষয় সেভাবে এটার সম্পর্কে হাদীস শরীফেও বর্ণনা রয়েছে। হুযূর ﷺ বলেন, وَاِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ وَالرَّجُلَ الْقَبْرَ اَلْعَيْنُ حَقٌّ অর্থাৎ কুদৃষ্টি উটকে হালাক করে দেয় এবং মানুষকে ধ্বংস করে এমনকি কবর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর কুদৃষ্টি সত্য।

আরব দেশেও এ বিষয়টি সকলেরই জানাশুনা ছিল। মক্কা নগরে এক ব্যক্তি বদ-নজর দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। উট অথবা মানুষ বা অন্যান্য জানোয়ার ইত্যাদির মধ্যে যদি তার বদ-নজর লাগত তবে তা তৎক্ষণাৎ মরে যেত। যথা বলত لَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مِثْلَهُ [আজ আমি এটার তুল্য কোনো কিছু দেখিনি।] মক্কাবাসী কাফিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিঃশেষ করার জন্য সর্বপ্রকার হীন চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলো। একদা সে মক্কার বনী আসাদ গোত্রের লোকটির মাধ্যমে বদ-নজর লাগিয়ে তাঁকে শেষ করার উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল এবং শত চেষ্টা-চালিয়েও কিছু করতে পারেনি। (মা'আরিফ, মাদারিক) কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ৯৯ বিমারের দোয়াটি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়ে নিলেন। ফলে তার স্বীয় মনোস্কামনায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল।

বি. দ্র. হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির উপর বদ-নজর লেগে যায় তবে অত্র সূরার শেষ আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করে উক্ত ব্যক্তির প্রতি ফুঁক দিলে বদ-নজরের দোষ বিনষ্ট হয়ে যাবে। -[মাযহারী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের উক্তি খণ্ডন করে বলছেন যে, তিনি পাগল নন। তিনি যে কুরআন পাঠ করে শুনান তা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ। মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে চরম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন তখনই আল্লাহ ঘোষণা করেন কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ, কুরআন বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছবে। এতে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, কুরআন একদিন বিজয় লাভ করবে, বিশ্ববাসীর কাছে কুরআন উপস্থিত হবে। এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম তার যাত্রালগ্ন থেকেই সারা দুনিয়ায় তার দাওয়াত ছড়াতে চায়- এটাই আল্লাহ চান। ইসলাম মক্কা থেকেই বিশ্ববাসীর নিকট তার দাওয়াত পেশ করেছে, বিশ্ববাসীর নিকট উপদেশ পেশ করেছে। -[যিলাল]

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ : সূরা আল-হাক্কাহ্

এ সূরাটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে দু'টি রুকূ এবং ৫২ টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায় ২৫৬ টি বাক্য ও ১৪৮০ অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম اَلْحَاقَّةُ রাখা হয়েছে সূরাটির প্রথম শব্দের দিকে লক্ষ্য করে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেছেন اَلْحَاقَّةُ কিয়ামতের একটি নাম যার অর্থ অবশ্যম্ভাবী বা আবশ্যকীয় ঘটনা। আর এ নামকরণের কারণ হলো, কিয়ামতের দিনই সকল প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়ন হবে। কিয়ামত ধ্রুব সত্য এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। অথবা, এ নামকরণের কারণ এও হতে পারে যে, কিয়ামতের দিনই সকল বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য জানা যাবে। সেদিনই সকল আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে। এ সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ' এবং ৫২টি আয়াত, ২৫৬টি বাক্য ও ১৪৮০টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

নাজিল হওয়ার সময়কাল : আল-কুরআনের এ সূরাটি ওহী অবতীর্ণের প্রাথমিক পর্বে নাজিলকৃত সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত। তবে কখন অবতীর্ণ হয়, তা সঠিক করে কিছু বলা যায় না; কিন্তু হযরত ওমর (রা.)-এর একটি বর্ণনা হতে জানা যায় যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক পূর্বেই এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বর্ণটি হলো এই- হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূলুল্লাহকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হলাম। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি হেরেমের মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং নামাজে দাঁড়িয়ে গেছেন। আমি গিয়ে শুনতে পেলাম যে, তিনি সূরা আল-হাক্কাহ্ পাঠ করছেন। আমি কুরআনের বাচন-ভঙ্গি ও বাক্য-বিন্যাসের মধুরতা ছন্দের ঝংকার শ্রুত হয়ে অভিভূত হলাম এবং মনে মনে বললাম- ইনি নিশ্চয় একজন উন্নত শ্রেণির কবি হবেন, নতুবা এমনি মোহনীয় ছন্দের বাক্য আর কে-ই বা রচনা করতে পারে। কুরাইশগণ তো এটাই বলে থাকেন। তখনই মহানবীর কণ্ঠে শুনতে পেলাম 'এটা এক মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের বাণী, কোনো কবির বাক্য নয়।' আমি মনে মনে বললাম, কবি না হবেন তো গণকঠাকুরের কথা অবশ্যই হবে। আর তখনই তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো 'এটা কোনো গণকঠাকুরের কথা নয়।' তোমরা চিন্তা-ভাবনা খুব কমই কর। এটা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। এটা শুনার ফলে তো ইসলাম আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। -[মুসনাদে আহমদ]

হযরত ওমর (রা.)-এর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই অবতারিত। কেননা এ ঘটনার পরও বহুদিন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার প্রথম রুকূ'তে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কীয় আলোচনা এবং দ্বিতীয় রুকূ'তে কুরআন আল্লাহর অবিসংবাদিত মহাসত্য কালাম এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সূরার ১-১২নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ঘটিতব্য বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিয়ামতের অস্বীকারকারী প্রাচীন আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের সম্প্রদায়সমূহকে এ অবিশ্বাসের কারণে ধ্বংস করার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১৩-১৭নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে, তার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অতঃপর ১৮-৩৭নং আয়াত পর্যন্ত মূল বিষয়টি বলে দেওয়া হয়েছে। তা হলো, পার্থিব জীবনের পর পরকালীন অনন্ত জীবন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর সকল মানুষ হিসাব-নিকাশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে সমবেত হবে। এই পার্থিব জগতে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি; কিয়ামত, হাশর-নশর ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মশীল জীবন যাপন করেনি, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তথায় জ্বালাময়ী শাস্তি ও অসম্মানজনক খাদ্য আহার প্রদান করা হবে। তখন কারো কোনো আমল গোপন করা হবে না। সকলের গোপন কথাই তুলে ধরা হবে এবং মু'মিনগণকে ডান হস্তে ও কাফেরগণকে বাম হস্তে আমলনামা দেওয়া হবে। মু'মিনগণ চিরন্তন-শাশ্বত, সুখ-সমৃদ্ধি ও আনন্দমুখর জীবন যাপন করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে কেউ রেহাই দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত চিরন্তর জাহান্নামই হবে তাদের স্থান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩৮-৫২নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিষয় আলোচনা রেখেছেন। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। এটা কোনো কবির রচিত কবিতার চরণ নয় এবং কোনো গণকঠাকুরের বল কাহিনীও নয়; বরং বিশ্ব-পালকের নিকট হতে অবতারিত কিতাব। রাসূল ﷺ যদি নিজ পক্ষ হতে কিছু রচনা করে তা আমার নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, তবে কঠোর হস্তে তা দমন করা হতো। তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। এ কুরআন হচ্ছে আল্লাহভীরু লোকদের জন্য উপদেশ ভাণ্ডার বিশেষ। তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছে, যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকে ভালোভাবেই জানি। এ কুরআনই হবে কাফেরদের জন্য পরকালে অনুশোচনার কার্যকারণ। এ কুরআন এক মহাসত্য আল্লাহর কালাম। সুতরাং হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসায় ও গুণগানে মশগুল থাকুন। কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় নবী করীম ﷺ-এর রেসালাতের সত্যতার প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। অহংকার এবং নাফরমানির শোচনীয় পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। আর এ সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইতঃপূর্বে যেসব জাতি আল্লাহ তা'আলার নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তাও বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য সূরায়। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বিভিন্ন ফজিলত তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন–

১. যদি কারো কেবল গর্ভ বিনষ্ট হয়ে যায় কোনো প্রকারেই রোধ করা যায় না। তখন কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে অত্র সূরা লিখে গর্ভধারণকারিণীর সাথে তাবিজ বানিয়ে ব্যবহার করলে ইনশাল্লাহ তার গর্ভ নষ্ট হবে না, সুস্থ-নিরাপদ থাকবে। -[আ'মালে কুরআনী]

২. মায়ের গর্ভ থেকে কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যদি অত্র সূরা তেলাওয়াত করে ফুঁক দেওয়া পানি শিশুকে খাইয়ে দেওয়া যায়, অথবা এক ফোঁটা কেবল মুখে দেওয়া যায়, তখন ঐ বাচ্চার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে [আ'মলে কুরআনী] এবং সকল প্রকার বিপদাপদ ও অসুস্থতা হতে রেহাই পাবে। এটার সংখ্যা ৮১৭০৯।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-হাক্কাহ্ মক্কায় অবতীর্ণ

إِحْدٰى أَوْ اِثْنَتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً : ৫১ বা ৫২ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلْحَاقَّةُ اَلْقِيٰمَةُ الَّتِىْ يُحَقُّ فِيْهَا مَا أُنْكِرَ مِنَ الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ اَوِالْمُظْهِرَةُ لِذٰلِكَ .

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কিয়ামত, যাতে সে সমুদয় বিষয়ই বাস্তবে প্রমাণিত হবে, যেগুলো অস্বীকার করা হয়েছিল। অর্থাৎ পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফলন দান কিংবা কিয়ামত এ সকল বিষয়কে প্রকাশ করে দেবে।

٢. مَا الْحَاقَّةُ تَعْظِيْمٌ لِشَانِهَا وَهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ خَبَرُ الْحَاقَّةِ .

২. কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? এটা দ্বারা কিয়ামতের বিশালত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। مَا অব্যয়টি مُبْتَدَأٌ আর দ্বিতীয় اَلْحَاقَّةُ তার خَبَرٌ আর এ বাক্যটি প্রথম الحاقة -এর خَبَرٌ।

٣. وَمَآ اَدْرٰكَ اَىْ اَعْلَمَكَ مَا الْحَاقَّةُ زِيَادَةُ تَعْظِيْمٍ لِشَانِهَا فَمَا الْاُوْلٰى مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ وَمَا الثَّانِيَةُ وَخَبَرُهَا فِىْ مَحَلِّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ لِاَدْرٰى .

৩. আর আপনাকে কিসে জানাবে অর্থাৎ অবহিত করবে যে, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি? তার বিশালত্ব বর্ণনায় অতিরিক্ত। সুতরাং প্রথমোক্ত مَا অব্যয়টি مُبْتَدَأٌ ও তৎপরবর্তী বক্তব্য তথা اَلْحَاقَّةُ তার خَبَرٌ আর দ্বিতীয় مَا অব্যয়টিও তার خَبَرٌ মিলে বাক্য হয়ে اَدْرٰى ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ ثَانِىْ -এর স্থলে অবস্থিত।

٤. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ الْقِيَامَةِ لِاَنَّهَا تَقْرَعُ الْقُلُوْبَ بِاَهْوَالِهَا .

৪. ছামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়কে কিয়ামত, এটাকে قَارِعَةٌ এ জন্য বলা হয়েছে, যেহেতু তার বিভৎসতা মনুষ্য অন্তরে করাঘাত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَلْحَاقَّةُ : মুবতাদা مَا الْحَاقَّةُ খবর। وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحَاقَّةُ বাক্যে وَاوْ হরফে আত্ফ, مَا মুবতাদা, اَدْرٰى এটার খবর كَ যমীর প্রথম মাফউল, مَا الْحَاقَّةُ দ্বিতীয় মাফউল اَدْرٰى ক্রিয়ার। سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ জুমলায়ে মুস্তানিফা তাদের ধ্বংসের كَيْفِيَّةٌ বর্ণনা করার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ .... وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ

اَلْحَاقَّةُ : অর্থ : আল্লামা যমখশরী (র.) বলেন, اَلْحَاقَّةُ -এর আসল হলো اَىُّ شَيْءٍ هِىَ الْحَاقَّةُ অর্থাৎ اَلْحَاقَّةُ কেমন মহাগুরুত্বপূর্ণ ও কতইনা ভয়াবহ ব্যাপার। অধিক ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য ظَاهِرِىْ অবস্থাকে بَاطِنِىْ অক্ষর সংযুক্ত করে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে اَلْحَاقَّةُ শব্দটি দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ কিয়ামতের এক নাম হলো–

الْحَاقَّةُ وَاَيْضًا فِى الْكَبِيْرِ اَجْمَعُوْا عَلٰى اَنَّ الْحَاقَّةَ هِىَ الْقِيَامَةُ .

আর اَلْحَاقَّةُ -এর শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে–

১. اَلْحَقُّ অর্থ হলো اَلْكَائِنُ ও اَلثَّابِتُ অর্থাৎ اَلْكَائِنُ وَالثَّابِتُ -এর লক্ষ্যে اَلْحَاقَّةُ বলতে ঐ সময়কে বুঝানো হয়েছে যা সংঘটিত হওয়া ও আগমন করা সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সন্দেহ নেই।

২. অর্থাৎ اَلْحَاقَّةُ এমন বিষয় যাতে সকল বিষয় উপস্থাপিত হবে। অর্থাৎ সব কিছুর হাকিকত সম্পর্কে জানা যাবে। আর কিয়ামত স্বয়ং حَقٌ ও সত্য এবং তা স্থাপিত হওয়া নিগূঢ় সত্য ও নিশ্চিত বিষয়। আর কিয়ামত ঈমানদারদের জন্য বেহেশত হবে এবং কাফেরদের জন্য জাহান্নাম সাব্যস্ত করবে।

আর اَلْحَاقَّةُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ হতে ব্যবহৃত يُثْبِتُ অর্থ يُحِقُّ তখন كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ হিসেবে حَاصِلُ اٰيَاتٍ হবে– 'যে কিয়ামতকে তদানীন্তন কাফেরগণ কিয়ামত ও পরকালকে এবং পরকালে একদিন বিধাতার দরবারে হিসাব নিয়ে হাজির হতে হবে' এ কথা অমান্য করেছিল তা মিথ্যা। বরং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া চিরন্তন সত্য কথা। আর তা কত যে ভয়াবহ ও মহাবিপদের দিন হবে তা বলার অবকাশ রাখে না। 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় যদিও তাকে অবিশ্বাস করেছিল তথাপিও তা বাস্তব সত্য হিসেবে প্রকাশ পাবে।

اَلْقَارِعَةُ অর্থ : এটা قَرْعٌ হতে উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ ফারসি ভাষায় অর্থ (صِرَاحْ) دَرِ كُوْفْتَنْ আর করাঘাতকারী বিষয়কে قَارِعَةٌ বলা হয় কিয়ামতের দিবস বুঝাবার জন্য। এ শব্দ এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা সকল মানুষকে অধৈর্য ও অস্বস্তি করে তুলবে এবং আসমান-জমিনকে ভেঙ্গে চিরে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে।

আর قَارِعَةٌ অর্থ মহাবিপদ ও বিধ্বংসকারী দুর্যোগ, অথবা মহাপ্রলয় অর্থাৎ তার ভয়-ভীতি মানুষের অন্তরে ঘণ্টার মতো ভীতির শব্দ বেজে উঠে এবং অন্তরকে কিয়ামতের ভয়ে প্রকম্পিত করে তোলে।

আর যদি قَارِعَةٌ অর্থ "শাস্তি" নেওয়া হয় তখন অর্থ হবে, যারা তাদের নবীগণের মুখে শাস্তির কথা শুনে তা অমান্য করেছে, যেমন– قَوْمُ ثَمُوْدْ ও قَوْمُ عَادْ সর্বশেষ যখন তাদের উপর মহাশাস্তি নাজিল হয়েছে তখন তাদের হৃদয় থরথর করে কেঁপে উঠেছে।

আল-হাক্কাহ্ সম্পর্কে দু'টি জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য : আল-হাক্কাহ্ সম্পর্কে পরপর দু'টি জিজ্ঞাসা রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং শ্রোতামণ্ডলীকে বিস্মিত করে দেওয়াই এরূপ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য, যেন তারা কথার গুরুত্ব গভীরভাবে অনুধাবন করে এবং পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে পরবর্তী কথা শুনতে আগ্রহী ও উৎকর্ণ হয়ে উঠে।

অন্যান্য মিথ্যারোপকারীদের কথা উল্লেখ না করে ছামূদ ও 'আদ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করার কারণ : এর কারণ এই যে, যুগে যুগে বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামগণের উম্মতগণ যেভাবে তাদের নবীগণের কথা অমান্য করেছে সেভাবে তারা তার সাজাও প্রাপ্ত হয়েছে। তবে قَوْمُ ثَمُوْدْ ও قَوْمُ عَادْ তাদের নবীগণকে জঘন্যতমভাবে অবমাননা করে জঘন্যতম সাজাও প্রাপ্ত হয়েছে এরা জঘন্যতম জাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

সুতরাং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করানো এবং তাদেরকে দুর্নীতির সাজার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া আল্লাহ উদ্দেশ্য করেছেন। সাধারণ দুর্নীতিবাজদের কথা স্মরণ করিয়ে মক্কার কাফেরগণকে উচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতো না। অবস্থা বিশেষ ব্যবস্থা না করলে হয় না। তাই 'আদ ও ছামূদ জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৫. فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ بِالصَّيْحَةِ الْمُجَاوِزَةِ لِلْحَدِّ فِى الشِّدَّةِ .

٦. وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ شَدِيْدَةِ الصَّوْتِ عَاتِيَةٍ قَوِيَّةٍ شَدِيْدَةٍ عَلٰى عَادٍ مَعَ قُوَّتِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ .

٧. سَخَّرَهَا اَرْسَلَهَا بِالْقَهْرِ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ اَوَّلُهَا مِنْ صُبْحِ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْ شَوَّالٍ وَكَانَتْ فِىْ عَجُزِ الشِّتَاءِ حُسُوْمًا قف مُتَتَابِعَاتٍ شُبِّهَتْ بِتَتَابُعِ فِعْلِ الْحَاسِمِ فِىْ اِعَادَةِ الْكَيِّ عَلَى الدَّاءِ كَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى حَتّٰى يَنْحَسِمَ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى مَطْرُوْحِيْنَ هَالِكِيْنَ .

٨. كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ اُصُوْلُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ج سَاقِطَةٍ فَارِغَةٍ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ صِفَةُ نَفْسٍ مُقَدَّرَةٍ وَالتَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ اَىْ بَاقٍ لَا .

অনুবাদ :

৫. আর ছামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক বিকট চিৎকার দ্বারা এমন এক চিৎকার যা সীমাহীন বিকট ছিল।

৬. আর 'আদ সম্প্রদায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা প্রচণ্ড শব্দবিশিষ্ট عَاتِيَةٌ শব্দের অর্থ– সুকঠিন। 'আদ সম্প্রদায় শক্তিশালী ও কঠোর হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর উক্ত ঝঞ্ঝা-বায়ু সুকঠিন ছিল।

৭. যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন অভিশাপরূপে তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। তাদের উপর সাত রাত ও আট দিন যার প্রথম দিন ছিল বুধবার সকালবেলা, শাওয়াল মাসের আট দিন অবশিষ্ট থাকতে অর্থাৎ চব্বিশ তারিখে, শীত মওসুমের শেষাংশে। বিরামহীনভাবে ধারাবাহিকভাবে, যদ্রূপ দাগদানকারী একের পর এক দাগ বসাতে থাকে, যাবৎ তা দাগবিশিষ্ট না হয়। তদ্রূপ তাদের উপর অবিরাম শাস্তি চলতে থাকে। তখন তুমি সেই সম্প্রদায়কে তথায় লুটিয়ে পড়ে আছে দেখবে ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকাবস্থায় যেন তারা কাণ্ডসমূহ মূলসমূহ সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুরের ভূমিতে পতিত শূন্য।

৮. অতঃপর তুমি কি তাদের মধ্যে হতে কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও? بَاقِيَةٌ শব্দটি উহ্য نَفْس -এর সিফাত এবং তন্মধ্যস্থিত تَاءٌ বর্ণটি مُبَالَغَةٌ -এর জন্য। অর্থাৎ بَاقٍ অবশিষ্ট। না, কেউ অবশিষ্ট নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ : এটা তৎপূর্ববর্তী মুবতাদা -এর খবর হয়ে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ : এটা عَادٌ থেকে خَبَرٌ হিসেবে جُمْلَةٌ হয়ে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে। আর صَرْصَرٍ টি رِيْحٍ -এর প্রথম صِفَتٌ হয়েছে এবং عَاتِيَةٌ টি দ্বিতীয় صِفَتٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ : উভয়ই عَطْف وَمَعْطُوْف হয়ে ظَرْفُ زَمَانٍ مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হয়েছে।

قَوْلُهُ حُسُوْمًا : اَيَّامٍ টি سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ হতে نَعْت বা صِفَتٌ হয়েছে। অথবা, سَخَّرَهَا -এর ضَمِيْرُهَا مَفْعُوْلٌ হতে حَال হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ وَالْحُسُوْمُ هٰهُنَا اِسْتِعَارَةٌ بِتَشْبِيْهِ تَتَابُعِ الرِّيْحِ الْمُسْتَاصِلَةِ بِتَتَابُعِ الْكَيِّ لِلْقَاطِعِ لِلدَّاءِ اَىِ الْمَرَضِ অর্থাৎ حُسُوْمًا -কে এখানে অনবরত বয়ে যাওয়া ঝঞ্ঝা-বায়ুর জন্য اِسْتِعَارَةٌ নেওয়া হয়েছে। যেভাবে দাগদানকারী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উপর রোগের ক্রিয়া দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত দাগ দিতে থাকে, সেভাবে ঝঞ্ঝা-বায়ুকে আল্লাহর দুশমনগণ দুনিয়া হতে মূলোৎপাটন হওয়া পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ صَرْعَى : এটা صَرِيْع -এর বহুবচন। تَرَى হতে حَال হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। كَأَنَّهُمْ -এর هُمْ ضَمِيْر টির ইশারা হলো قَوْم عَادٍ এবং هُمْ টি مُشَبَّهْ আর أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ টি مُشَبَّهْ بِهِ হয়েছে। আর بَاقِيَةٍ টি উহ্য نَفْس -এর صِفَتْ হয়ে مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَأَمَّا ثَمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ : ثَمُوْد সম্প্রদায়ের পরিচিতি সংক্ষিপ্ত আকারে এই- (فَتْحُ الْبَيَانِ) ثَمُوْدُ بْنُ عَادِ بْنِ اِرَمَ অথবা ثَمُوْدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ اِرَمَ (মা'আলিম, বায়যাবী) এরা মদীনা ও শাম -এর মধ্যবর্তী (وَادِىْ قُرٰى) নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মত ছিল। হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে ধর্মের প্রতি খুবই আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তারা তার কথা অমান্য করে ইচ্ছাধীন চলেছিল। তাই আল্লাহ তাদেরকে طَاغِيَةٌ দ্বারা বরবাদ করে দিয়েছিলেন. এদেরকে قَوْمُ صَالِحٍ ও বলা হয়ে থাকে।

طَاغِيَةٌ শব্দের মর্ম ও অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, هِىَ الرَّجْفَةُ এমন এক বিকট আওয়াজ যা দুনিয়ার সকল প্রকার বৃহৎ আওয়াজ হতে অধিক তীক্ষ্ণ আওয়াজ সম্পন্ন বজ্রধ্বনি। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ চিৎকারের শব্দ। -[মাদারিক, মা'আরিফ]

কেউ কেউ বলেন, طَاغِيَةٌ শব্দ طُغْيَانٌ হতে مُشْتَقْ অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারী। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল বিকট আওয়াজের সীমালঙ্ঘনকারী, যা মানুষের শ্রবণশক্তির সীমাতীত। অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আজাব এমন কঠিন আওয়াজ সহকারে এসেছে যাতে দুনিয়ার সকল বজ্র শব্দ একত্রে আওয়াজ করলে যে শব্দ হতো তা হতেও বিকট শব্দ হয়েছে। এতে তাদের কলিজা ফেটে গেছে এবং তারা মরে গেছে।

قَوْلُهُ عَاتِيَةٍ : তাফসীরকারগণ عَاتِيَةٌ শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য করেছেন। কাবীর গ্রন্থকারের মতে এটার অর্থ عَتَتْ عَلٰى خُزَّانِهَا فَخَرَجَتْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاَصْلُ الْعُتُوِّ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ তার অর্থ হলো সীমালঙ্ঘন করা। সুতরাং যখন কোনো কিছু স্বীয় স্থান ত্যাগ করত বে-হিসাব অবস্থায় বের হয়ে যাওয়া শুরু করে তখন তাকে عَاتِيَةٌ বলা হয়।

জালাইন গ্রন্থকার এটার তাফসীর করেছেন قَوِيَّةً شَدِيْدَةً عَلٰى عَادٍ আদ সম্প্রদায়ের উপর তা খুবই মারাত্মক শক্তিশালী আকার ধারণ করেছিল। কেউ কেউ বলেন- عَتَتْ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ

عَاتِيَةٌ অর্থ হলো كَيْلِىْ বা وَزْنِىْ পরিমাপ ব্যতীত তা সীমালঙ্ঘন করেছে। এর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হতে গ্রহণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কখনো বায়ুকে পরিমাপ ব্যতীত ছেড়ে দেন না। আর পানির ফোঁটাকেও পরিমাপ ব্যতীত ছেড়ে দেন না।

তবে 'আদ' ও নূহ সম্প্রদায়ের দিন পরিমাপ ব্যতীত ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর বংশকে ধ্বংস করার দিন পরিমাপ সীমা খুবই লঙ্ঘন করে গেছে। যাতে নূহজাতির বাঁচবার কোনো পথ বাকি ছিল না। আর আদজাতির ধ্বংসের দিন বায়ু তার পরিমাপ সীমা এমনভাবে ত্যাগ করেছে যাতে তাদের বাঁচবার কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং عَاتِيَةٌ অর্থ- ওজন ও পরিমাপ ছাড়া সীমালঙ্ঘন করা এ অর্থও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। -[সাবী]

قَوْلُهُ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ ...... خَاوِيَةٌ : অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা 'আদ' সম্প্রদায়ের উপর এক তীব্র ঝঞ্ঝাবর্তের আঘাতকে একাধারে সাত রাত ও আট দিন যাবৎ স্থায়ী করে দিলেন। আপনি যদি তথায় থাকতেন তবে দেখতে পেতেন যে, 'আদজাতি ইতস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। যেমন, পুরাতন খেজুর গাছসমূহ গোড়াসহ পড়ে রয়েছে।

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ আয়াতে বলা হয়েছে সাত রাত ও আট দিন তাদের উপর তীব্র ঝঞ্ঝা অনবরত স্থায়ী ছিল। তার সময় সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। জালালাইন ও মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, শাওয়ালের ২২ তারিখ বুধবার সকালবেলায় শীতকালের শেষের দিকে।

قَوْلُهُ وَاَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ : তাদের উপর শাস্তি আরম্ভ হওয়ার তারিখ ছিল শুক্রবার সকালবেলা। আর তাদের শাস্তির অষ্টম দিবসে সন্ধ্যাকালে তারা মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর সে ঝঞ্ঝাই তাদেরকে সাগরে নিক্ষেপ করেছিল। -[কাবীর]

কাবীর গ্রন্থের বরাত দিয়ে (ওহাব) বলেন, আরব দেশে শীতের মৌসুমের শেষাংশকে اَيَّامُ الْعَجُوْزِ বলা হতো।

আদজাতি-কে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহের সাথে উপমা দেওয়ার কারণ : এটার কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষ পুরাতন ও বড় হলে তার কাণ্ড বা জড়ও খুবই বিরাটকায় দেখায়। অর্থাৎ খুবই বড় কায়া বিশিষ্ট দেখায়। কথিত আছে যে, قَوْمُ عَادٍ সম্প্রদায় সে যুগে খুবই লম্বাচৌড়া অর্থাৎ আকৃতি-প্রকৃতিতে খুবই বড় ছিল। উজাড় খেজুরের বৃক্ষ যেমন দেখাত তাদের মৃত লাশকেও তেমনি দেখিয়ে ছিল। এ জন্য তাদেরকে খেজুর বৃক্ষের ঝাড়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আকৃতির বিরাটত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٩. وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ اَتْبَاعُهُ وَفِى قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُوْنِ الْبَاءِ اَىْ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْاُمَمِ الْكَافِرَةِ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ اَىْ اَهْلُهَا وَهِىَ قُرٰى قَوْمِ لُوْطٍ بِالْخَاطِئَةِ بِالْفِعْلَاتِ ذَاتِ الْخَطَأِ .

৯. আর লিপ্ত হয়েছে ফেরাউন ও তার সঙ্গীগণ তার অনুসারীগণ, অপর এক কেরাতে শব্দটি قَافْ বর্ণে যবর ও بَاءْ বর্ণে সাকিন যোগে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফের জাতিসমূহ। এবং উপড়ে ফেলানো বস্তিসমূহ অর্থাৎ তার অধিবাসীগণ। আর তা হলো লূত সম্প্রদায়ের বস্তি। পাপাচারিতায় এমন কাজ যা পাপযুক্ত।

١٠. فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ اَىْ لُوْطًا وَغَيْرَهُ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً زَائِدَةً فِى الشِّدَّةِ عَلٰى غَيْرِهَا .

১০. তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করে অর্থাৎ লূত (আ.) ও অন্যান্য নবী (আ.) গণ। ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দান করলেন, সুকঠিন শাস্তি অন্যদের তুলনায় অধিকতর কঠোর।

١١. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَآءُ عَلَا فَوْقَ كُلِّ شَئٍ مِنَ الْجِبَالِ وَغَيْرِهَا زَمَنَ الطُّوْفَانِ حَمَلْنٰكُمْ يَعْنِىْ اٰبَآءَكُمْ اِذْ اَنْتُمْ فِىْ اَصْلَابِهِمْ فِى الْجَارِيَةِ السَّفِيْنَةِ الَّتِىْ عَمِلَهَا نُوْحٌ صَلَوٰتُ اللّٰهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِ وَنَجَا هُوَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فِيْهَا وَغَرِقَ الْبَاقُوْنَ .

১১. নিশ্চয় আমি যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তুফানের সময় পানি পাহাড় ইত্যাদির উপরে উত্থিত হয়েছিল তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছি অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষগণকে, যখন তোমরা তাদের পৃষ্ঠে অবস্থান করছিলে। নৌযানে যা হযরত নূহ (আ.) তৈরি করেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ মুক্তি লাভ করেছিলেন। আর অন্যরা ডুবে ধ্বংস হয়েছিল।

١٢. لِنَجْعَلَهَا اَىْ هٰذِهِ الْفِعْلَةَ وَهِىَ اِنْجَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِهْلَاكُ الْكَافِرِيْنَ لَكُمْ تَذْكِرَةً عِظَةً وَّتَعِيَهَا لِتَحْفَظَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ حَافِظَةٌ لِمَا تَسْمَعُ .

১২. আমি এটাকে করার জন্য এ কাজকে, অর্থাৎ মু'মিনগণকে মুক্তিদান ও কাফেরদেরকে ধ্বংসকরণ তোমাদের জন্য শিক্ষা উপদেশ আর এটা সংরক্ষণ করে সংরক্ষণ করার জন্য সংরক্ষণকারী কর্ণ হেফাজতকারী, শ্রুত বস্তুকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ الخ : বাক্যে مَنْ হলো মাওসূলা, قَبْلَهُ তার সিলাহ, উভয় মিলিত হয়ে فِرْعَوْنُ -এর উপর আতফ হয়েছে। فِرْعَوْنُ শব্দটি جَآءَ -এর ফায়েল। وَالْمُؤْتَفِكَاتُ আতফ হয়েছে جَآءَ -এর উপর। بِالْخَاطِئَةِ মাফউল جَآءَ -এর।

قَوْلُهُ رَسُوْلَ رَبِّهِمْ : বাক্যটি عَصَوْا -এর মাফউল, اَخْذَةً মাফউল মুতলাক-মাওসূফ, رَابِيَةً সিফাত।

قَوْلُهُ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ الخ : বাক্যে اِنَّا -এর نَا ইসমে اِنَّ. حَمَلْنٰكُمْ বাক্যটি খবর, فِى الْجَارِيَةِ হাল হয়েছে মাফউল كُمْ হতে। لَمَّا طَغَى الْمَآءُ যরফ حَمَلْنَا -এর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে قَوْمُ عَادٍ ও قَوْمُ ثَمُوْدَ -এর ধ্বংসের চিত্র কথা অংকন করা হয়েছে। উক্ত আয়াত হতে فِرْعَوْنُ ও তার সমসাময়িক কাফেরদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং বলা হয়েছে তদানীন্তন اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলে বড় খোদার দাবিদার ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তী বড় বড় কাফের সম্প্রদায় যেমন হযরত লূত (আ.)-এর বংশগণ জঘন্য হতে জঘন্যতম অপরাধ করেছিল। কিন্তু তাদের কাউকেও আল্লাহ ছাড়েননি; বরং খুব কঠোর সাজা দান করেছেন। আর তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে (যথা) হযরত নূহ (আ.)-এর বংশধরকে তাদের নাফরমানির কারণে এক অবিস্মরণীয় শাস্তি

দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) সহ তাঁর অনুসারীদেরকে নৌকার মাধ্যমে নাজাত দেওয়া হয়েছে এবং গোস্তাখদেরকে প্লাবন দ্বারা চির নস্যাৎ করা হয়েছে। এ ঘটনাটি পরবর্তী আগমনকারী সকল উম্মতদের জন্য একটি মহাস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে কুরআনের পাতায় খচিত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ ... فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً : পূর্ববর্তী বহু জাতিকে তাদের কৃতকর্মের ফল শোচনীয়ভাবে ভোগানোর কথা শুনানো হয়েছে। এতদসত্ত্বেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না। যে একটুখানি ঐশ্বর্য ও সম্পদশালী হয়ে উঠে সে তখনই মাথানাড়া দিয়ে উঠে। ফেরাউন এবং তৎপূর্ববর্তী কাফের জাতিগণ বহু নাফরমানি করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাওমে লূত (আ.)-কে পেশ করা যেতে পারে তারা পুরুষেরা পুরুষদের সাথে সমকামিতা (لَوَاطَتْ) করত। এটা জেনা অপেক্ষা আরও জঘন্যতর অপরাধ। এ অপরাধে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জমিনসহ উল্টিয়ে ধ্বংস করেছিলেন। আর ফেরাউনকে তার জাতিসহ হযরত মূসা (আ.)-এর বিরোধিতার কারণে নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছিলেন। সুতরাং এভাবে যারাই যে যুগে যত অপরাধ করেছিল তাদেরকে ক্রমান্বয়ে কঠিন হতে কঠিনতর শাস্তি দিয়ে ইহকাল হতে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অপরাধ যত বড় করেছে শাস্তিও তত মারাত্মকভাবে দেওয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে এ কথাটা এই ভাষায় বলা হয়েছে যে– فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا

مُؤْتَفِكَاتْ বলে কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? اَلْمُؤْتَفِكَاتُ বলতে মাদারেক ও জালালাইন গ্রন্থকারে মতে কাওমে লূত (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে– وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْمُؤْتَفِكَاتِ الْاُمَمِ الَّذِيْنَ ائْتَفَكُوْا بِذُنُوْبِهِمْ فَهَلَكُوْا

মুতাফিকাতদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ : এটার কারণ হচ্ছে– শাব্দিক অর্থের দিক বিবেচনায় مُؤْتَفِكَاتْ শব্দটি বা اِئْتِفَاكٌ শব্দ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। اِئْتِفَاكٌ অর্থ اِنْفِعَالٌ সুতরাং اِئْتَفَكَتْ অর্থ اِنْقَلَبَتْ বা اِنْفَعَلَتْ অর্থাৎ উল্টে গিয়েছিল। সুতরাং যেহেতু লূত জাতিকে জমিনসহ উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই তাদের قَوْمٌ مُؤْتَفِكَاتٌ বা উল্টানো জাতি বলা হয়ে থাকে। –[কাবীর]

بِالْخَاطِئَةِ -এর অর্থ করা হয়েছে ذَاتُ الْخَطَأِ অর্থাৎ ذَاتُ الْفِعْلَاتِ তাফসীর খতীব গ্রন্থকার بِالْفِعْلَاتِ -এর তাফসীরে বলেন– ذَاتُ الْخَطَأِ (গুনাহের প্রতি ধাবিতকারী কার্য বা গুনাহসম্পন্ন কার্য) যাতে গুনাহের প্রতি পদার্পণ করতে বাধ্য করে। যথা– লেওয়াতাত . ضِرَاطٌ ও صَفْقٌ ও শিরক ইত্যাদি যাবতীয় ফিস্‌ক-ফুযূরীর কার্য।

গ্রন্থকারের মতে اَلْخَاطِئَةُ শব্দটি একটি مَوْصُوْفٌ مَحْذُوْفٌ -এর صِفَتْ হয়েছে। তা হতে পারে فِعْلٌ خَاطِئٌ অথবা, خِيَالٌ خَاطِئٌ।

قَوْلُهُ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ .... اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ : হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, যখন হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে তাঁর জাতি তাঁর হেদায়েত অমান্য করল, তখন হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি মুষ্টিমেয় ঈমানদারদেরকে ব্যতীত অন্যান্য সকল নাফরমানদেরকে তুফানের পানি দিয়ে খতম করে দিয়েছি। আর হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সহচরদেরকে নৌকায় উঠিয়ে রক্ষা করেছি। যাতে এটা পরবর্তী জাতির জন্য স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে।

উক্ত আয়াতে সম্বোধন সচরাচরভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর মূল বংশধরগণকে করা হয়নি; বরং সম্বোধিতদের পূর্বপুরুষগণকে করা হয়েছে। তাফসীরকার সেই কথাটা حَمَلْنٰكُمْ يَعْنِيْ اٰبَائَكُمْ বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তখন অর্থ হতো হে নূহ (আ.)-এর উপর বিশ্বাসীগণ, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঔরশে যখন তোমরা ছিলে তখন তাদেরকে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকার মাধ্যমে ঔরশজাত ও সন্তানরূপে তোমাদের রক্ষা করেছি। وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ বলে সকল উম্মতকে হুঁশিয়ারি করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ঘটনাকে স্মরণ রেখে যেন ভবিষ্যাতের জন্য প্রত্যেক জাতি নিজেদেরকে এহেন দূষণীয় কার্য হতে রক্ষা করতে থাকে। যত জাতিই কিয়ামতকে অস্বীকার করবে তত জাতিই এভাবে তার ফল ভুগতে হবে।

طُغْيَانُ الْمَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত নূহ (আ.)-এর সময়কালের নাফরমানদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে তুফান চালিয়েছিলেন তখন তুফানের সাথে পানি উপচে সারা জগৎ প্রলয় হয়ে গিয়েছিল, সেই প্লাবনের প্রতি طُغْيَانٌ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। فِى الْجَارِيَةِ বলে হযরত নূহ (আ.)-এর তৈরিকৃত নৌকার কথা বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ : এটার অর্থ মাদারিক গ্রন্থকারের মতে اُذُنٌ حَافِظَةٌ لِمَا تَسْمَعُ হযরত কাদাতাহ (র.) বলেন, এটার অর্থ اُذُنٌ عَقَلَتْ عَنِ اللّٰهِ وَانْتَفَعَتْ بِمَا سَمِعَتْ যা কর্ণের মাধ্যমে শ্রবণ করে তা বুঝে এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে তার প্রতি আমল করে থাকে। –(মাদারিক) প্রকৃতগতভাবে এখানে রক্ষণাবেক্ষণকারী কান বলে (প্রকাশ্য অর্থে) কান বুঝায়নি; বরং সে সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা শুনে স্মরণ রাখতে পারে ও স্মরণে রাখে এবং তা হতে শিক্ষা উপদেশাবলি গ্রহণ করে। আর পরকালে অস্বীকৃতি ও আল্লাহর হুকুম অমান্যতার ভয়াবহ পরিণতির কথা তারা ভুলে যায় না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ .... اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ : আল্লাহ তা'আলা 'আদ, ছামূদ, ফেরাউন, লূত, নূহ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করেছেন। তাদের অবাধ্যতার পরিণামের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এসব সম্প্রদায়সমূহকে নসিহত ও শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ ও বাস্তব নজির বানিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের–কিয়ামত, পরকাল ও নবীদেরকে অবিশ্বাস করার পরিণতির কথা ভেবে তাতে বিশ্বাসী হয় এবং নবী করীম ﷺ-এর উত্থাপিত জীবনাদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলে। هَا যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْوَاقِعَةُ কেউ কেউ বলেছেন هَا যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْجَارِيَةُ এ মতটিকে তাফসীরে কাবীরে ضَعِيْفٌ বলা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ .

১৩. যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার সৃষ্টি জগতের মধ্যে ফয়সালা করার উদ্দেশ্যে। এটা দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য।

١٤. وَحُمِلَتِ رُفِعَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دُقَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً .

১৪. এবং বহন করা হবে উৎক্ষিপ্ত হবে পৃথিবী পর্বতমালাসহ, আর উভয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে একই ধাক্কায়।

١٥. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ قَامَتِ الْقِيَامَةُ .

১৫. সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় কিয়ামত সংঘটিত হবে।

١٦. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ضَعِيْفَةٌ .

১৬. আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে দুর্বল।

١٧. وَالْمَلَكُ يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ عَلَى أَرْجَائِهَا جَوَانِبِ السَّمَاءِ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ أَيِ الْمَلَائِكَةِ الْمَذْكُوْرِيْنَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ مِنْ صُفُوْفِهِمْ .

১৭. আর ফেরেশতা অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তার প্রান্ত দেশে থাকবে আকাশের প্রান্তদেশে আর তোমার প্রতিপালকের আরশ বহন করবে তাদের উপর অর্থাৎ উল্লিখিত ফেরেশতাগণের উপরে সেদিন আটজন ফেরেশতা আটজন ফেরেশতা কিংবা ফেরেশেতাগণের আটটি সারি।

١٨. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لِلْحِسَابِ لَا تَخْفَى بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ مِنَ السَّرَائِرِ .

১৮. সেদিন উপস্থাপন করা হবে হিসেবের জন্য তোমাদের কোনো গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না গোপন রহস্যাদি হতে।

١٩. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ خِطَابًا لِجَمَاعَتِهِ لِمَا سُرَّبِهِ هَاؤُمُ خُذُوْا اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ تَنَازَعَ فِيْهِ هَاؤُمُ وَاقْرَءُوْا .

১৯. তখন যাকে দেওয়া হবে তার কর্মলিপি তার দক্ষিণ হস্তে, সে বলবে তার সঙ্গী-সাথীদের খুশির খবর শুনিয়ে নাও গ্রহণ করো আমার কর্মলিপি পাঠ করো كِتَابِيَهْ শব্দটি هَاؤُمُ ও اِقْرَءُوْا এই فِعْل দু'টি আমল করার জন্য تَنَازُعْ করেছে।

٢٠. إِنِّي ظَنَنْتُ تَيَقَّنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ .

২০. আমি ধারণা করেছি বিশ্বাস করেছি যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হবো।

٢١. فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ مَّرْضِيَّةٍ .

২১. সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন উত্তম।

٢٢. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ .

২২. সুমহান বেহেশতে।

٢٣. قُطُوْفُهَا ثِمَارُهَا دَانِيَةٌ قَرِيْبَةٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ .

২৩. যার ফল-ফলাদি তার ফল অবনমিত হবে নিকটবর্তী হবে, ফলে দণ্ডায়মান ব্যক্তি, বসা ব্যক্তি ও শায়িত ব্যক্তির নাগালের মধ্যে থাকবে।

٢٤. فَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا حَالٌ أَيْ مُتَهَنِّئِيْنَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ الْمَاضِيَةِ فِي الدُّنْيَا .

২৪. তখন তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে খাও এবং পান করো তৃপ্তির সাথে এটা حَالٌ রূপে ব্যবহৃত অর্থাৎ তৃপ্তি লাভকারী অবস্থায় তারই বিনিময় স্বরূপ যা তোমরা অতীত দিনে সম্পাদন করেছ অতীতকালে পৃথিবীতে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ : নায়েবে ফায়েল হয়েছে نُفِخَ -এর। وَاحِدَةٌ তাকিদের জন্য। وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ الخ আতফ হয়েছে نَفَخَ -এর উপর।

قَوْلُهُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ : يَوْمَئِذٍ বাক্যে وَقَعَتْ যরফ -এর। وَانْشَقَّتْ আতফ হয়েছে وَقَعَتْ -এর উপর। পরবর্তী يَوْمَئِذٍ শব্দটি وَاهِيَةٌ -এর যরফ। فَيَوْمَئِذٍ এবং এটার পরবর্তী বাক্যটি نُفِخَ اِذَا -এর জওয়াব হয়েছে। لَا يَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ বাক্যটি মানসূব হয়েছে تُعْرَضُوْنَ -এর যমীর হতে হাল হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ : এখানে كِتَابِيَهْ টি হয়তো هَاؤُمُ -এর مَفْعُوْلٌ হবে। এটা কূফীদের মতে। আর বসরীদের মতে اِقْرَءُوْا -এর مَفْعُوْلٌ হবে। তারা নিকটবর্তী فِعْل -এর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর কূফীগণ প্রথমটিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। (يَعْنِى الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ)

قَوْلُهُ اِنِّىْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ : এটা ظَنَنْتُ -এর مَفْعُوْلٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ : এটা তৎপূর্ববর্তী مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ الخ : এরা عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ -এর বয়ান অথবা بَدَل হতে পারে।

قَوْلُهُ هَنِيْئًا : এটা উহ্য মাসদার অর্থাৎ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا اَكْلًا وَشُرْبًا -এর صِفَتٌ হতে পারে। অথবা ضَمِيْر -এর হতে حَال হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ الخ : মক্কার কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, হে কাফের গোষ্ঠী! এমন বড় বড় শক্তিশালী অতীত জাতিসমূহ তাদের রাসূলদের নাফরমানি করে কি অবস্থায় পৌঁছেছে তা তোমাদের জানার আর বাকি নেই। সেই তুলনায় তোমরা কোনো দিক হতেই কিছুই নও; বরং জ্ঞানীর পরিচয় হবে এখন এই, স্বপ্নের অচেতনতা হতে জাগ্রত হয়ে উঠ। আর ঐ সময়কে স্মরণ করো, যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে। আর জমিন ও পাহাড়সমূহ নিজ নিজ স্থান হতে উঠিয়ে দেওয়া হবে। তখন কি করতে পারবে? কিয়ামত তো তখনই শুরু হয়ে যাবে।

نَفْخٌ অর্থ কি? نَفْخُ الصُّوْرِ কার দ্বারা হবে? আর আয়াতে বর্ণিত نَفْخَةً وَاحِدَةً অর্থ কি নেওয়া হয়েছে? : نَفْخُ الصُّوْرِ অর্থ– শিঙ্গায় ফুঁক দান করা। ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে একটি مَرْفُوْعٌ حَدِيْثٌ বর্ণনা করেছেন যে, صُوْر বলতে সিংয়ের আকৃতিবিশিষ্ট একটি বস্তু, যাতে কিয়ামতের দিন ফুঁক দেওয়া হবে। হাদীসটি হলো এই–

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصُّوْرُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

শিঙ্গায় ফুঁকদানকারী কে হবেন? : শিঙ্গায় ফুৎকারী হবেন হযরত ইসরাফীল (আ.)। আর কেউ কেউ বলেন, তাঁর সাথে হযরত জিবরাঈল (আ.)ও থাকবেন। কেননা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা রয়েছে শিঙ্গায় আকৃতিকে শিংয়ের ন্যায় হওয়া এবং ফুঁকদানকারীদের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদীসখানা নকল করেছেন।

আর এ শিঙ্গার ফুঁককে نَفْخَةُ الصَّعْقِ অথবা نَفْخَةُ الْفَزَعِ ও বলা হয়েছে। এটা হলো نَفْخَةٌ اُوْلٰى বা প্রথম ফুৎকার। এটার সাথে সকল জীবিত মাখলুক মরে যাবে, তবে হযরত ইসরাফীল, আযরাঈল, জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.)-কে পৃথক রাখা হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে شُهَدَاءُ كِرَامٌ -কে اِسْتِثْنَاءٌ করা হয়েছে। لِقَوْلِهٖ هُمْ الشُّهَدَاءُ اِذْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ অর্থাৎ শহীদগণ প্রথম শিঙ্গার ফুৎকারের সাথে বিলীন হবেন না। কেননা তারা তাদের প্রভুর দরবারে রিজিক ভক্ষণ করতে থাকবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জালালাইন গ্রন্থকার إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ -এর তাফসীরে সূরা জুমু'আর অংশে বলেন–

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ يَعْنِى مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَالْوِلْدَانِ .

কয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে? : জালালাইন গ্রন্থকারের মতে এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার। এখানে উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের সময় মোট কতটি ফুৎকার দেওয়া হবে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে তিনটি ফুৎকার হবে। কেউ কেউ বলেন যে, দু'টি মাত্র ফুৎকার হবে। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাসমূহ পর্যালোচনা করলে তিনটি ফুৎকার হওয়ার কথা বুঝা যায়। যথা– ১. نَفْخَةُ الْفَزَعِ ২. نَفْخَةُ الصَّعْقِ ৩. نَفْخَةُ الْبَعْثِ । কেউ কেউ نَفْخَةُ الْفَزَعِ এবং نَفْخَةُ الصَّعْقِ -কে একটি মাত্র نَفْخَةٌ হিসেবে ধরেছেন। তাঁদের মতে এটা একটি মাত্র ফুৎকার যার প্রথম দিকটি نَفْخَةُ الْفَزَعِ বা ভীতসন্ত্রস্তকারী আর শেষ দিকটি نَفْخَةُ الصَّعْقِ বা সব কিছুকে মৃত্যুদানকারী বা ধ্বংসকারী। আর শেষটি نَفْخَةُ الْبَعْثِ বা সবাইকে হাশর মাঠে একত্রকারী ফুৎকার। এ দুইটি মতকে সামনে রাখলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং জালালাইনের লেখকের মাঝে কোনো মতপার্থক্য থাকে না; আর বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) نَفْخَةُ الْفَزَعِ এবং نَفْخَةُ الصَّعْقِ -কে একটি মাত্র نَفْخَةٌ ধরেছেন। আর জালালাইন গ্রন্থকার نَفْخَةُ الْفَزَعِ ও نَفْخَةُ الصَّعْقِ -কে আলাদা আলাদা نَفْخَةٌ গণ্য করেছেন। –[মা'আরিফুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ .... ثَمَانِيَةٌ : আল্লাহ বলেন, আসমান ফেটে যাবে এবং সেদিন তা একেবারেই জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাবে। আর যে সকল ফেরেশতা আসমানে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে তারা আকাশ ফেটে যাওয়ার মুহূর্তে আসমানের পার্শ্বদেশে চলে যাবে। এতে বুঝা যায় আকাশ মধ্যখান থেকে ফেটে যাওয়া আরম্ভ হবে। তাই ফেরেশতাগণও কিনারার দিকে ফিরে আসবে। অতঃপর فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ দ্বারা বুঝা যায় ফেরেশতাগণও তখন মরে যাবে। (অনুরূপ কাবীর গ্রন্থে রয়েছে।) আর এ সকল ঘটনা نَفْخَةُ أُوْلٰى -এর পর হতে থাকবে এবং মহান আল্লাহর আরশকে সেদিন আটজন ফেরেশতা উঠিয়ে নিয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আরশকে চারজন ফেরেশতা উঠিয়ে নিয়ে আছে। মোটকথা, কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশ্তা আরশকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং তখন হিসাব শুরু হবে।

ফেরেশত্াগণ আকাশের কিনারায় যাওয়ার কারণ : ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে যাওয়ার কারণ হলো, তারা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহর হুকুম তখন কি হয় এবং তাদের উপর কি নির্দেশ এসে থাকে তা পালনের জন্য আকাশের প্রান্তে আসবে এবং নির্দেশকৃত হুকুম পালন করার জন্য প্রয়োজন হলে জমিনেও অবতরণ করবে, যাতে বিলম্ব না হয়। –[সাবী]

ফেরেশ্তা সকল প্রথম ফুৎকারের সাথে মৃত্যুবরণ করবে لِقَوْلِهِ تَعَالٰى فَصَعِقَ الخ সুতরাং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তে যাবে এ কথা কিভাবে বলা শুদ্ধ হবে? এটার উত্তর এভাবে দেওয়া যাবে, যে সকল ফেরেশতা আকাশের প্রান্তে অবস্থান করবে তারা মৃত্যুবরণ করবে না فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ الخ -এর আয়াতে এদেরকেও مُسْتَثْنٰى -এর অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে।

আকাশের পার্শ্বদেশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের আকৃতির বর্ণনা : হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন–

يَحْمِلُ ثَمَانِيَةُ مَلَكٍ عَلٰى صُوْرَةِ الْاَوْعَالِ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْهُ رُؤُوْسُهُمْ عِنْدَ الْعَرْشِ وَاَقْدَامُهُمْ فِى الْاَرْضِ السُّفْلٰى وَلَهُمْ كَقُرُوْنِ الْوَعْلَةِ مَا بَيْنَ اَصْلِ قُرُوْنِ اَحَدِهِمْ اِلٰى مُنْتَهَاهُ خَمْسُمِاَةِ عَامٍ . وَ رُوِىَ اَنَّ مَا بَيْنَ اَظْلَافِهِمْ اِىْ رُكَبُهُمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَ رُوِىَ اَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمْ وَجْهُ رَجُلٍ وَ وَجْهُ اَسَدٍ وَ وَجْهُ ثَوْرٍ وَ وَجْهُ نَسْرٍ وَلِابْنِ جَرِيْرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ مَرْفُوْعًا يَحْمِلُهُ الْيَوْمَ اَرْبَعَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِيَةٌ . (كَبِيْر)

قَوْلُهُ ثَمَانِيَةٌ : আল্লাহর আরশকে আট ফেরেশতা উঠাবে। এ কথাটিকে জালালাইন গ্রন্থকার দুই দিকে ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন মাত্র আটজন ফেরেশতা অথবা আট সারি ফেরেশতা। এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ثَمَانِيَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَلَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ اِلَّا اللّٰهُ تَعَالٰى ফেরেশতার আটটি সারি, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না। হযরত ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, মাত্র আটজন ফেরেশতা। হযরত হাসান (রা.) বলেন, তারা কি আটজন মাত্র, অথবা, আটটি সারি, অথবা আট হাজার হবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। وَفِى الْكَبِيْرِ اِنَّ حَامِلِيْنَ الْعَرْشَ هُمْ ثَمَانِيَةُ اَشْخَاصٍ . (خَطِيْب) অর্থাৎ কাবীর গ্রন্থে তাদের সংখ্যা আট বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা মোট আট প্রকারের হবে। –[মাদারিক]

হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে দেখা যায়, কিয়ামতের পূর্বে আরশ বহনকারী ফেরেশতা চারজন নির্ধারিত রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে আরও চারজন সহচর দেওয়া হবে এবং মোট আটজন হবে। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ الخ : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য সকলকে উপস্থাপন করবেন। সেদিন কোনো কিছু গোপন থাকবে না। সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিন সবই হবে খোলা, প্রকাশিত। সেদিন মানুষের দেহ খোলা, অন্তর খোলা, আমল সকলের সামনে প্রকাশিত, তাদের অবস্থানও খোলা। সেদিন কোনো পর্দাই থাকবে না। মানুষ তার সব ধরনের চেষ্টা-তদবির থেকে নিরুপায়। সমস্ত সৃষ্টিলোকের সামনে তার আমল উপস্থিত। একান্ত গোপনীয় জিনিসও সবার সামনে খোলা ও প্রকাশিত। সেদিন সকলের সামনে তার সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ায় সে হবে অপদস্থ, অপমানিত। আল্লাহর কাছে সেতো সব সময়ই আড়ালহীন। কিয়ামতের দিন সে সমস্ত সৃষ্টিকুলের নিকট হবে আড়ালহীন, খোলা। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে বিচারের জন্য। -[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ .... اِقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ (الاية) : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরার পর এখানে লোকদের বিচারের অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে নেককার লোকদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। নেককার লোকদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। সে তখন সকলকে বলবে আসো, আসো আমার কিতাব পড়ো। ডান হাতে আমলনামা দেওয়াটা স্বতই স্পষ্ট করে প্রকাশ করবে যে, তার হিসাব সম্পন্ন হয়েছে, তার কোনো কিছু বাকি নেই। আল্লাহর দরবারে সে অপরাধীরূপে নয়, একজন নেককার, চরিত্রবান, সদাচারী ব্যক্তি হিসেবেই উপস্থিত হয়েছে। নেককারগণ আমলনামা দক্ষিণ হস্তে লাভ করে খুব আনন্দিত ও পুলকিত হয়ে অন্যকে অর্থাৎ নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার-পরিজনকে বলবে- এই যে, আমি ডান হাতে আমলনামা পেয়েছি, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। দুনিয়ায় মানুষ পরীক্ষায় পাশ করে সনদ অথবা প্রাইজ লাভ করে পুলকিত মনে যেমন তা আত্মীয়-স্বজন ও অপরকে দেখায়, পরকালেও নেককারগণ অনুরূপভাবে খুশিতে মত্ত হয়ে নিজেদের আমলমানা অন্যদের পাঠ করতে দেবে। ইবনে আবী হাতেম আবী ওসমান থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, মু'মিন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা গোপনে ডান হাতে তার আলমানাম দেবেন। তখন সে তার গুনাহসমূহ পাঠ করতে থাকবে। যখন সে তার পাপসমূহ পাঠ করতে থাকবে তখন চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর যখন সে তার নেক আমলসমূহ পাঠ করবে তখন তার মুখমণ্ডলের চেহারা আবার পূর্বের ন্যায় ফিরে আসবে। অতৎপর সে তার পুরা আমলনামার দিকে দৃষ্টি দেবে তখন দেখতে পাবে যে, তার গুনাহগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় সে খুশি হয়ে সকলের নিকট বলবে- আসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ। -[যিলাল]

আয়াতে كِتَابِيَهْ দ্বারা কোন কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? : كِتَابِيَهْ দ্বারা এখানে কি কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার ইঙ্গিত অবশ্য خُلَاصَةٌ অংশে দেওয়া হয়েছে। তবে তা হলো দুনিয়াবী জীবনের কৃতকার্য, যা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাগণ সারা জীবন লিখেছিলেন, এটাই প্রত্যেকের নেকী ও বদীর সকল চূড়ান্ত হিসাব। তার উপরই নির্ভর করবে ব্যক্তির বেহেশত অথবা দোজখ। এক কথায় বুঝতে হবে, তা হলো দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের ফলাফল বহি।

قَوْلُهُ هَاؤُمُ : এটা اِسْمُ فِعْل - خُذُوْا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাকে দু' অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ তা কখনও فِعْل صَرِيْح হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে, আবার কখনো اِسْمُ فِعْل হিসেবে। তবে উভয় অবস্থায় خُذُوْا অর্থে ব্যবহার হয়। আর যখন اِسْم فِعْل হিসেবে ব্যবহার হবে, তখন দুই অবস্থায় পড়া যাবে- ১. اَلْمَدُّ ২. اَلْقَصْرُ যেমন- (يَاءٌ بِالْمَدِّ) - هَا دِرْهَمًا يَا زَيْدُ (হে যায়েদ এই দেরহাম নাও।) (يَاءُ بِالْقَصْرِ) - هَا دِرْهَمًا يَا زَيْدُ - [হে যায়েদ এই দেরহাম নাও।]

আর এরা وَاحِدْ . تَثْنِيَه . جَمْع . مُذَكَّرْ . مُؤَنَّثْ এ একইরূপ থাকে। এদের সাথে كَافْ خِطَابْ সংযুক্ত হয়ে থাকে। তখন তার রূপ হবে এই- هَاءَكَ . هَاكَ . هَانَ . هَا ءَن ইত্যাদি।

আর যখন এরা فِعْل صَرِيْح হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ضَمِيْر بَارِزْ مَرْفُوْع -এর সাথে মিলিত হয়ে থাকে, তখন তিনটি অবস্থায় পড়া হয়ে থাকে।

১. তা عَاطٰى يُعَاطِىْ -এর অনুরূপ পড়া হবে-

هَاىْ يَا زَيْدُ . فَيُقَالُ هَاتَيْنِ يَاهِنْدَاتُ . هَاتُوْنَ يَا زَيْدُوْنَ . يَا هِنْدَاتُ . اَوْ . هَائِيَانِ يَا زَيْدَانِ . هَائِى يَا هِنْدُ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. অথবা, هَبْ -এর অনুরূপ পড়া হবে- هَاهِىْ . هَاءِ . هَاؤُا . هَانَ যেমন- هَبِىْ . هَبْ . هَبْنَ . هَبُوْا . هَبَا

৩. অথবা, خَفْ -এর অনুরূপ পড়া হবে। আর خَفْ টি خَوْف -এর اَمْر হবে। তখন বলা হবে- هَانَ . هَاءُوا . هَاءَا . هَاى . هَاءْ অনুরূপভাবে خَفْنَ . خَافُوْا . خَافَا . خَفْ তার مَدْلُوْل সম্পর্কে কিছু মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতে এটা خُذُوْا অর্থে ব্যবহৃত। কারো কারো মতে تَعَالَوْا অর্থে ব্যবহৃত। তখন اِلٰى দ্বারা مُتَعَدِّىْ হবে। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ اَلْقَصْدُ ইচ্ছা করা।

قَوْلُهٗ ظَنَنْتُ : এটা تَيَقَّنْتُ অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ ظَنّ টি يَقِيْن অর্থে ব্যবহৃত। আর পবিত্র কালামে এ শব্দ এরূপ ব্যবহার হয়ে থাকে। وَ ذٰلِكَ تَحَدُّثًا بِنِعْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى এ কথা (يَقِيْن حِسَابْ) দ্বারা এই বুঝানো হয়েছে যে, সে ব্যক্তি يَوْمِ الْحِسَابِ -এর ভয়ে সর্বদা আল্লাহর দরবারে নত থাকত এবং এ ভয়ভীতির কারণেই সেই ব্যক্তি নাজাত পেয়েছে এবং সর্বদা পরকালীন আমলের প্রতি সচেতন থাকত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভয়ভীতির প্রতিফলে তাকে ক্ষমা করে তার বাণীর সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। -[সাবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "اِنِّىْ ظَنَنْتُ اِنِّىْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ" : এ আয়াতটির দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এক. নেককার ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পেয়ে সকলকে উল্লসিত মনে পড়তে বলবে এবং সে যে দুনিয়ায় পরকালের ব্যাপার সম্পর্কে কিছুমাত্র গাফিল হয়ে থাকেনি; বরং একদিন তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে ও নিজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এ কথা মনে মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেই সে জীবন-যাপন করছিল তাও সকলকে অবহিত করবে।

দুই. সে বলবে, আমি ধারণা করেছিলাম আমার বিচার করা হবে এবং আল্লাহ আমার গুনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন, কিন্তু আল্লাহ আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমার গুনাহ-খাতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেননি, তিনি আমাকে উত্তম প্রতিফল দান করেছেন। আসো তোমরা আমার আমলনামা পড়ো। -[কাবীর, যিলাল]

اِنِّىْ ظَنَنْتُ -এর মধ্যে عِلْم -এর স্থানে ظَنّ -কে ব্যবহারের কারণ : উক্ত আয়াতে عَلِمْتُ শব্দ বলা উত্তম বলে মনে হয়, অথচ ظَنَنْتُ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার কারণে মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, সাধারণত আরবি ভাষায় ظَنّ غَالِبْ -এর অবস্থাকে عِلْم বলা চলে। অর্থাৎ ظَنّ غَالِبْ টি عِلْم-এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। اَحْكَامْ شَرْعِيَّةْ -এর ক্ষেত্রে এমন ব্যবহারবিধি রয়েছে। আর এ কারণও হতে পারে যে, لِاَنَّ مَا يُدْرَكُ بِالْاِجْتِهَادِ قَلَّمَا يَخْلُوْ عَنِ الْوَسْوَاسِ وَالْخَوَاطِرِ وَهِىَ تُفْضِ اِلَى الظُّنُوْنِ فَجَازَ اِطْلَاقُ لَفْظِ الظَّنِّ عَلَيْهَا لَمَّا لَا يَخْلُوْ عَنْهُ চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে যা অনুভব করা হয়।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ .... فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যার আমলনামা তার ডান হস্তে দেওয়া হবে সে ব্যক্তি এমন খুশিতে জীবন যাপন করবে, যা দেখে তার আশেপাশের ব্যক্তিগণ অথবা, সাথীগণ খুবই খুশি হবে। অর্থাৎ তার আশপাশের কেউ তার এ অবস্থার জীবনের উপর রাগ করবে না বা হাসাদও করবে না। কেননা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- وَفِى الْحَدِيْثِ اَنَّهُمْ يَعِيْشُوْنَ وَلَا يَمُوْتُوْنَ اَبَدًا وَيَصِحُّوْنَ وَلَا يَمْرَضُوْنَ اَبَدًا وَيَنْعَمُوْنَ فَلَا يَرَوْنَ بَأْسًا اَبَدًا অর্থাৎ তারা চিরজীবী হবে, কখনো মরবে না, সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। সর্বদা নিয়ামতে ডুবে থাকবে, কখনো বিপদ আসবে না। -[মাদারিক, সাবী] আর সেই নিয়ামতের স্থান হবে বেহেশ্‌ত, যা সুউচ্চ মর্যাদা অথবা সুউচ্চ ইমারতের ন্যায় হবে। যেমন দুনিয়াতে বড় লোকগণ নির্মাণ করে থাকে। আর বেহেশ্‌তের বাগানসমূহের ফল-ফলাদি প্রত্যেক বেহেশতীর হাতের নাগালের মধ্যে থাকবে। শায়িত ব্যক্তি শোয়া হতে, বসা ব্যক্তি বসা হতে, দাঁড়ানো ব্যক্তি দাঁড়ানো হতে ফলের জন্য নড়তে হবে না। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা অতীত জীবনে এগুলো বেহেশতের জন্য প্রেরণ করেছ, তাই এখন এটা পানাহার করতে থাকো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ শব্দগুলো صَائِمِيْنَ রোজাদারের জন্য বলা হবে, যেহেতু তারা রোজা রেখেছে। কারো কারো মতে اَسْلَفْتُمْ -এর অর্থ হলো اَسْلَفْتُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ অতীতে যেই নেককাজ করেছিলে তার বিনিময়ে এই নিয়ামত। -[কাবীর, মাদারিক]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٥. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ.

২৫. আর যাকে দেওয়া হবে তার কর্মলিপি বাম হস্তে, সে তখন বলবে হায়! يا হরফে নেদাটি تنبيه -এর জন্য। যদি আমাকে দেওয়া না হতো আমার কর্মলিপি।

٢٦. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.

২৬. আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব-নিকাশ ।

٢٧. يَا لَيْتَهَا أَيِ الْمَوْتَةُ فِي الدُّنْيَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ الْقَاطِعَةَ لِحَيَاتِيْ بِأَنْ لَا أُبْعَثَ.

২৭. হায়! তাই যদি হতো অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যুবরণ আমার চূড়ান্ত পরিণাম আমার জীবনকালকে বিচ্ছিন্নকারী হতো এবং আমি পুনরুত্থিত না হতাম।

٢٨. مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ.

২৮. আমার কোনোই কাজে আসল না আমার সম্পদ।

٢٩. هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ قُوَّتِيْ وَحُجَّتِيْ وَهَاءُ كِتَابِيَهْ وَحِسَابِيَهْ وَمَالِيَهْ وَسُلْطَانِيَهْ لِلسَّكْتِ تَثْبُتُ وَقْفًا وَ وَصْلًا اِتِّبَاعًا لِمُصْحَفِ الْإِمَامِ وَالنَّقْلِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَذَفَهَا وَصْلًا.

২৯. আমার নিকট হতে ধ্বংস হয়েছে আমার ক্ষমতা আমার ক্ষমতা ও দলিল-প্রমাণ। سُلْطَانِيَهْ - مَالِيَهْ - حِسَابِيَهْ - كِتَابِيَهْ এ শব্দগুলোর মধ্যকার ها বর্ণটি سَكْتَة 'সাকতাহ'-এর জন্য, যা বিরাম ও অবিরাম উভয় অবস্থায় বহাল থাকে, মাসহাফে ওসমানীর মধ্যে এরূপই উদ্ধৃত হয়েছে। আর কোনো কোনো ক্বারী সাহেবের মতে وَصْل তথা অবিরাম পড়ে যাওয়ার সময় তা বিলুপ্ত হবে।

٣٠. خُذُوْهُ خِطَابٌ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ فَغُلُّوْهُ اجْمَعُوْا يَدَيْهِ إِلٰى عُنُقِهِ فِي الْغُلِّ.

৩০. তাকে ধরো দোজখের রক্ষী ফেরেশতাগণের প্রতি সম্বোধন। অতঃপর তার গলদেশে বন্ধনী পরিধান করিয়ে দাও হাতগুলোকে গলায় বেঁধে দাও।

٣١. ثُمَّ الْجَحِيْمَ النَّارَ الْمُحْرِقَةَ صَلُّوْهُ أَدْخِلُوْهُ.

৩১. অতঃপর জাহান্নামে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তাকে নিক্ষেপ করো তাকে প্রবিষ্ট করো।

٣٢. ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْمَلَكِ فَاسْلُكُوْهُ أَيْ أَدْخِلُوْهُ فِيْهَا بَعْدَ إِدْخَالِهِ النَّارَ وَلَمْ تَمْنَعِ الْفَاءُ مِنْ تَعَلُّقِ الْفِعْلِ بِالظَّرْفِ الْمُقَدَّمِ.

৩২. পুনরায় এমনি এক শৃঙ্খলে তাকে শৃঙ্খলিত করো, যার দৈর্ঘ্য সত্তর গজ ফেরেশতাগণের গজে। তৎপর তাকে প্রবিষ্ট করো অর্থাৎ তাকে তাতে প্রবিষ্ট করো, দোজখে প্রবিষ্ট করার পর। فَاءْ অব্যয়টি ظَرْف مُقَدَّمْ -এর মধ্যে فِعْل -এর আমল করার অন্তরায় নয়।

٣٣. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ.

৩৩. সে মহান আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাসী ছিল না।

٣٤. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.

৩৪. আর সে অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৩৫. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ قَرِيْبٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ ـ

৩৫. অতএব এ দিন যেথায় তার কোনো সুহৃদ থাকবে না এমন কোনো আত্মীয়, যার দ্বারা সে উপকৃত হবে।

৩৬. وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ اَوْ شَجَرٍ فِيْهَا ـ

৩৬. আর না কোনো খাদ্য ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত দোজখীগণের স্রাব অথবা তন্মধ্যকার একটি বৃক্ষ।

৩৭. لَا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ الْكَافِرُوْنَ ـ

৩৭. যা অপরাধী ব্যতীত অপর কেউ খাবে না কাফেরগণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ : বাক্যটি مُسْتَأْنِفَةٌ পূর্বের تَعْلِيْل বর্ণনা করার জন্য বাক্যটি উল্লিখিত হয়েছে। لَا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ বাক্যটি غِسْلِيْن -এর সিফাত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ ..... كَانَتِ الْقَاضِيَةَ" : এ আয়াতদ্বয়ে কাফেরদের কিয়ামতে কি অবস্থা হবে তার বর্ণনা রয়েছে। হাশরের মাঠে তাদের কিভাবে আমলনামা দেওয়া হবে এবং তা পেয়ে তাদের মানসিক অবস্থা কি হবে তা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে "যার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে।" সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে– "আর যার আমলনামা পেছন দিকে হতে দেওয়া হবে।" সম্ভবত তার বাস্তব অবস্থাটা এরূপ দাঁড়াবে যে অপরাধী ব্যক্তি আগে হতেই নিজে অপরাধী হওয়া সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং তার আমলনামায় কি কি জিনিস লিপিবদ্ধ রয়েছে তা তার ভালোভাবেই জানা থাকবে বিধায় সে অত্যন্ত মনমরা ভাব ও উৎসাহহীনতা সহকারে নিজের বাম হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে তা গ্রহণ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাকে পিছনের দিকে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে। যেন কেউ দেখতে না পায়। অতঃপর বলবে 'হায় আমার আমলনামা, আমাকে যদি না-ই দেওয়া হতো। আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম।' অর্থাৎ এ আমলনামা দ্বারা হাশরের ময়দানে প্রকাশ্যভাবে সকলের সামনে আমাকে যদি লাঞ্ছিত, অপমানিত করা না হতো এবং শাস্তি যা দেওয়ার তা যদি গোপনে গোপনে দিয়ে দেওয়া হতো তাহলেই ভালো হতো। সে আরও আফসোস করে বলবে "হায় আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো।" অর্থাৎ দুনিয়ায় মরার পর আমি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। দ্বিতীয় কোনো জীবন-ই যদি না হতো। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, মানসিক শাস্তি শারীরিক শাস্তি হতেও পীড়াদায়ক।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَهْ" : উল্লিখিত আয়াতে سُلْطَانِيَهْ শব্দের অর্থ দু'টি। এক অর্থ হলো– দলিল, প্রমাণ ও যুক্তি। এ অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্ম হবে, আমি পার্থিব জীবনে অবস্থানকালে পুনরুত্থান, কিয়ামত, হাশর-নশর, বিচার ও আমলনামা লাভকরণের অবিশ্বাসের অনুকূলে যেসব দলিল ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করতাম আমা হতে তা সবই অপসৃত হলো। সেই যুক্তি-প্রমাণ এখন অসার প্রমাণিত হচ্ছে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, ক্ষমতা, আধিপত্য ও প্রতিপত্তি। এই অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের মর্ম হবে, পার্থিব জীবনে অবস্থানকালে আমার যে ক্ষমতা-আধিপত্য ও প্রভুত্ব বজায় ছিল, তা সবই আমা হতে অপসারিত হয়েছে। আমি এখন অসহায় ও নিরুপায় হয়েছি। আমার কোনো ক্ষমতা ও আধিপত্য নেই।

মাদারিক গ্রন্থকার এটার তাফসীরে লিখেছেন–

هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطَانِيَةُ اَىْ مُلْكِىْ وَتَسَلُّطِىْ عَلَى النَّاسِ وَبَقِيْتُ فَقِيْرًا وَ ذَلِيْلًا ـ

অর্থাৎ মানুষের উপর আমার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অকেজো হয়ে গেছে। কেবল এখন আমিই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায় পড়ে রইলাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, سُلْطَان শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– غَلَبَة وَتَسَلُّط প্রাধান্য লাভ করা এবং লেলিয়ে পড়া। তাই سُلْطَنَتْ-কে حُكُومَتْ বলা হয় এবং سُلْطَانْ-কে حَاكِمْ ও বলা হয়। আয়াতের তাৎপর্য তখন এই বলেন– দুনিয়াতে অন্যান্য মানুষের উপর যে বড়ত্ব ও প্রধানত্ব ছিল, সকলেই আমাকে বড় জেনে ছিল, তা আজ কোনো কাজে আসেনি। আর حُجَّتْ অর্থে ব্যবহৃত হলে তাঁর মতে আয়াতের তাফসীর হবে– হায় আফসোস! আজ আমার হাতে এমন কোনো সনদ নেই, যা দ্বারা আমি আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা পেতে পারি। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلْقَاضِيَةُ ، مَالِيَهْ ، سُلْطَانِيَهْ : শব্দসমূহে বর্ণিত هَاء-এর তাৎপর্য : উক্ত শব্দগুলোর মধ্যে যে هَاءْ শেষাংশে রয়েছে এটাকে هَاء سَاكِنَة বলা হয়। ওয়াকফের সময় বাক্য বা শব্দের শেষাংশে এরূপ উপযুক্ত হয়ে سَاكِنْ هَاءْ হয়ে থাকে।

আল-মুফাস্সাল গ্রন্থে বলা হয়েছে– كُلُّ مُتَحَرِّكٍ لَيْسَتْ حَرَكَتُهُ اِعْرَابِيَّةً يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْوَقْفُ بِالْهَاءِ ثُمَّهْ যথা এবং ওয়াকফ ও ওয়াছল উভয় অবস্থায় তা বহাল থাকে। অধিকাংশ কারীগণের অভিমত এটাই। তবে مُصْحَفْ اِمَامْ বা مُصْحَفْ عُثْمَانِىْ-এর অনুসরণে সেই هَاءْ-এর حَرَكَتْ-কে تَرْك করাই বিধেয়।

مُصْحَفْ اِمَامْ নামে অভিহিত করার কারণ : উক্ত مُصْحَفْ اِمَامْ-কে مُصْحَفْ اِمَامْ নামে ভূষিত করার কারণ হলো, তা اَصْلُ الْمَصَاحِفِ আর সকলেই তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর مُصْحَفْ اِمَامْ-ই نَقْل مُتَوَاتِرْ হিসেবে مَنْقُوْل হয়েছে। কেবল তাকে অধিক অনুসরণ করার দরুনই مُصْحَفْ اِمَامْ বলা হয় না। এরূপই আল্লামা যমখশরী (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার কারো কারো মতে وَصْل মিলিয়ে পড়ার সময় উক্ত هَاءْ-কে حَذْف বা বিলুপ্ত করে পড়া জায়েজ।

তবে যাই হোক উক্ত هَاءْ-কে حَذْف বা ثَابِتْ রাখা উভয়ই দুরস্ত রয়েছে। কারণ সকল কেরাতই নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ .... بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ : যাদের আমলনামা বাম হস্তে আসবে সেই দুর্ভাগাদের সেদিনের অনুতাপ কোনো কাজেই আসবে না। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে দিবেন এবং বলবেন, তোমরা সে নাফরমানকে পাকড়াও করে ৭০ গজ লম্বা শিকল পরিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। পৃথিবীতে তার অহংকারের অন্ত ছিল না। এমনকি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত না।

গুনাহগারদেরকে শিকল দ্বারা বাঁধার কারণ : গুনাহগারদের জন্য আল্লাহর শাস্তির নির্দেশই যথেষ্ট তথাপিও তাদেরকে শিকল দ্বারা আটকানোর প্রয়োজন কি?

এটার উত্তরে বলা যায়, যদিও শিকল দ্বারা আটকানোর প্রয়োজন করে না তবুও গুনাহ যেহেতু জঘন্যতম, তাই তার শাস্তিও জঘন্যতম হওয়া আবশ্যক। সুতরাং শাস্তির কঠিনতা বৃদ্ধি করার জন্য শিকল দ্বারা বেঁধে শাস্তি দেওয়া হবে। যাতে এদিকওদিক নড়াচড়া করার সুযোগ না হয়, আর খুব ভালোভাবে শাস্তি অনুভব করতে পারে। অথবা, এটার কারণ এই হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الخ

قَوْلُهُ تَعَالٰى سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا : উক্ত আয়াতে ذِرَاعًا বলতে আরবি-ফারসি ভাষায় একগজ = ১ হাতকে বুঝায়, তবে এটা কার গজ, এটা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এটা দ্বারা (ذِرَاعُ الْمَلَكِ) ফেরেশতাদের গজ বা পরিমাণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
২. হাসান বসরী (র.) বলেন, এটা দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট গজ বা পরিমাপ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং ذِرَاعْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এটা আল্লাহই ভালো জানেন।
৩. ইবনে মুনযির নায়েফ বাকালী হতে বর্ণনা করে বলেন–
اَلذِّرَاعُ سَبْعُوْنَ بَاعًا وَالْبَاعُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَّةَ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ هُوَ بِالْكُوْفَةِ .
৪. ইমাম আহমদ (র.)-এর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সত্তর গজ বলে সে পরিমাণ লম্বা আকারের শিকল বুঝানো হয়েছে। এতে আসমান-জমিনের দূরত্বের পরিমাণ লম্বা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শিকলটি আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত দূরত্ব সম্পন্ন দীর্ঘ। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاسْلُكُ : মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, এটার প্রকৃত অর্থ হলো– তাকে জিঞ্জিরে আটক করো। অর্থাৎ জিঞ্জির কে তার শরীরের এক দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অপর দিক দিয়ে বের করে দাও। যেমনিভাবে তাসবীহ ও মনিমুক্তার হার গাঁথা য়ে থাকে। –[মাযহাবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ الخ : দোজখীগণ আল্লাহর আজাব ও গজবের সম্মুখীন হওয়ার একটি বিশেষ রণ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় কারণ ও তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

তরাং বলা হয়েছে, সে নাফরমান ব্যক্তি তো নিজে কোনো অনাথকে অন্নদান করা দূরের কথা, অন্যকেও অন্নদানে উৎসাহিত রে না। এটাতে বুঝা যায় সে ব্যক্তি পুনরুত্থানকেও বিশ্বাস করত না। কেননা মানুষ মিসকিনদের সাহায্য দ্বারা একমাত্র আল্লাহর তুষ্টিই কামনা করে এবং পরকালের ছওয়াব পাওয়ার আশা করে থাকে। যখন পরকালের ছওয়াবের আশা করে না বা তাকে বিশ্বাস করে না তখন এতিম-মিসকিনদের অন্নদান করার কোনো অর্থই হয় না।

 আয়াত দ্বারা এ কথার اِسْتِدْلَالْ করা যায় যে, মিসকিনদেরকে অন্নদান না করা মারাত্মক অপরাধ।

 আয়াত وَلَا يَحُضُّ الخ টি এ কথা প্রমাণ করে যে, মিসকিনদের অন্নদান না করা অপেক্ষা অন্নদানের জন্য উৎসাহিত করা উত্তম, তরাং এটার ব্যাখ্যা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– যারা অনাথদেরকে অন্নদানে উৎসাহ দান করে না তাদের অপরাধ যদি এত মারাত্মক হয় তবে অন্নদান না করাতো আরো মহাঅপরাধ সাব্যস্ত হবে। এ কথাটি বুঝানোর উদ্দেশ্যে আয়াতে এরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে একটি বর্ণনা এরূপ উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে সর্বদা [খাওয়ার জন্য পাকানো তরকারিতে] অধিক শুরুয়া দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন, যাতে মিসকিনদেরকে তা দ্বারা বিদায় করতে সহজ হয়। আর তিনি বলতেন– خَلَعْنَا نِصْفَ السِّلْسِلَةِ بِالْاِيْمَانِ فَلْنَخْلَعْ نِصْفَهَا بِهٰذَا .(مَدَارِكْ)

আর আয়াতটি এ কথাও প্রমাণ করে যে, কাফেরগণ মানুষকে দয়া বর্ষণ করে না, আর মু'মিনগণ দয়া বর্ষণ করে থাকে। কারণ তিনি মানুষকে দু' শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন– ১. ঈমানদার, ২. কাফের, অর্থাৎ اَهْلُ يَمِيْنٍ ও اَهْلُ شِمَالٍ প্রথম পক্ষের বেলায় বলেছেন, اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ আর দ্বিতীয় পক্ষের বেলায় বলা হয়েছে– اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ –[মাদারিক]

غِسْلِيْنٌ -এর মর্মার্থ : غِسْلِيْنٌ শব্দটি غَسْلٌ শব্দ হতে উদ্ভূত। এটার অর্থ হলো– ব্যবহৃত পানি। বিধৌত পানি সর্বদাই ময়লাযুক্ত হয়। আল-কুরআনে এ শব্দটি ক্ষত-নিঃসৃত পানি বা পচা রক্ত বা পুঁজ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কতক তাফসীরকারের মতে এটা দ্বারা যাক্কুম বা কাঁটাযুক্ত বৃক্ষকে বুঝানো হয়েছে, তবে এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, যদি এক বালতি 'গিসলীন' এ দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হতো তবে এ পৃথিবী দুর্গন্ধে ভরে যেত। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٨. فَلَا لَا زَائِدَةٌ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ مِنَ الْمَخْلُوْقَاتِ.

৩৮. অনন্তর ঁ অব্যয়টি অতিরিক্ত আমি শপথ করছি তার যা তোমরা দেখছ সৃষ্টির মধ্য হতে।

٣٩. وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ مِنْهَا اَىْ بِكُلِّ مَخْلُوْقٍ.

৩৯. আর যা তোমরা দেখতে পাও না তা হতে অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির।

٤٠. اِنَّهُ اَىِ الْقُرْاٰنَ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ اَىْ قَالَهُ رِسَالَةً عَنِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى.

৪০. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ফেরেশতা এটাকে বহন করে এনেছেন।

٤١. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ.

৪১. এটা কোনো কবির কবিতা নয়, তোমরা সামান্য বিশ্বাস কর।

٤٢. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِى الْفِعْلَيْنِ وَمَا زَائِدَةٌ مُؤَكِّدَةٌ وَالْمَعْنٰى اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِاَشْيَاءَ يَسِيْرَةٍ وَتَذَكَّرُوْهَا مِمَّا اَتٰى بِهِ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْخَيْرِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ شَيْئًا.

৪২. আর না কোনো গণকের কথা, তোমরা সামান্যই অনুধাবন কর শব্দটি يَاءٌ ও تَاءٌ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, উভয় ক্রিয়ার মধ্যে। আর مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত ও গুরুত্বারোপের জন্য অর্থাৎ এ সকল লোক এ সমস্ত কথাতো স্বীকার করে এবং স্মরণ রাখে যা অতিশয় নগণ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনীত শিক্ষার মোকাবিলায়। অর্থাৎ কল্যাণ, প্রতিদান ও পুণ্যাত্মতা। সুতরাং কিছুই তাদের কোনো কাজে আসবে না।

٤٣. بَلْ هُوَ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৪৩. বরং এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত গ্রন্থ।

٤٤. وَلَوْ تَقَوَّلَ اَىِ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ بِاَنْ قَالَ عَنَّا مَا لَمْ نَقُلْهُ.

৪৪. যদি সে স্বয়ং রচনা করত অর্থাৎ নবী করীম ﷺ আমার নামে কোনো কল্পকথা যেমন, আমার পক্ষে এমন কথা বলত, যা আমি বলিনি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ : বাক্যে لَا অতিরিক্ত বা নাফিয়া لَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ কসম, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ জবাবে কসম। وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ বাক্যটি তাকিদের জন্য, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ আতফ হয়েছে بِقَوْلِ شَاعِرٍ বাক্যের উপর। تَنْزِيْلٌ খবর هُوَ উহ্য মুবতাদার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَا اُقْسِمُ الخ-এর শানে নুযূল : মক্কার কাফের সরদারেরা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করত। তারা রাসূলের দাওয়াত বাইরের লোকজন যেন গ্রহণ না করে এ উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-কে বিভিন্ন অপবাদ দিতে চেষ্টা করত। মুকাতিল বলেন যে, ওয়ালীদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাদুকর বলেছিল এবং আবূ জাহল বলেছিল, মুহাম্মদ ﷺ একজন কবি; আর উতবা বলেছিল, মুহাম্মদ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

একজন গণকঠাকুর। তোমরা কেউ তার কথাবার্তা শুনো না, তাঁর কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ো না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা খণ্ডন করে এ আয়াতগুলো নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَلَآ اُقْسِمُ ... وَمَالَا تُبْصِرُوْنَ." : আয়াতে উল্লিখিত لَا অব্যয়টি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এটা অতিরিক্ত। আর কেউ কেউ বলেন, এটা نَفِىْ لِلْقَسَمِ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। لَا زَائِدَةٌ হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- তোমরা যা কিছু দেখছ এবং যা কিছু তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে সব কিছুরই কসম করছি। আর لَا نَفِىْ لِلْقَسَمِ হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তোমরা যা কিছু দেখছ এবং যা কিছু তোমাদের জন্য অদৃশ্য সব কিছুরই কসম করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা তোমরা যা দেখছ ও দেখছ না, যেমন- সত্য কথা তেমনি রাসূলের কথাগুলোও সত্য এবং হক। সেজন্য কসম করার কোনো প্রয়োজন হয় না। -[কুরতুবী]

"তোমরা যা দেখছ এবং যা দেখছ না" বলে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ ব্যাপক। কেউ বলেন, যা দেখতে পাওয়া যায় না তা হলো পরকাল, জিন, ফেরেশতা। আর যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা এ দুনিয়ার সৃষ্টিকুল। অপর কেউ বলেন, তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, যে ব্যক্তি কুরআন পেশ করছেন তিনি অতিশয় ভদ্র এবং আমানতদার। এতে তার কোনো স্বার্থ নেই।

কসম নেওয়ার কারণ : মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, এখানে শপথ বাক্য ব্যবহার করার কারণ হলো কোনো কোনো সৃষ্টি স্বীয় بِالْفِعْلِ يَا بِالْقُوَّةِ স্বীয় দৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা রাখে, আবার কোনো সৃষ্টি দেখার ক্ষমতা রাখে না, অর্থাৎ কুরআন মাজীদ অবতরণকারীকে দেখা যায় না, আর যাদের উপর অবতীর্ণ করা হয় তাদেরকে দেখা যায়, এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য। -[মা'আরিফ]

আর لَا اُقْسِمُ টি কারো কারো মতে زِيَادَهْ নেওয়া হয়েছে। তখন মূল ইবারত হবে- اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ

আবার কেউ কেউ তাকে نَفِىٌّ لِلْقَسَمِ ও বলেন, তখন হাসেলে ইবারত হবে। অর্থাৎ-

لَاضَرُوْرَةَ الْقَسْمِ بِالْاَشْيَاءِ الَّتِىْ تَرَوْنَ وَالَّتِىْ لَا تَرَوْنَهَا كُلُّهَا .

قَوْلُهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ : رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটাতেও মতবিরোধ রয়েছে। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ অথবা হযরত জিবরীল (আ.) উদ্দেশ্য। يَعْنِىْ يَقُوْلُهُ يَتَكَلَّمُ بِهٖ عَلٰى وَجْهِ الرِّسَالَةِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى অর্থাৎ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাত হিসেবে এটা সম্বন্ধে তাবলীগ করছেন বা বলাবলি করছেন।

এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবস্বরূপ হয়েছে। তা হলো اِنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللّٰهِ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى فَكَيْفَ يُقَالُ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ؟ অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী, সুতরাং এটাকে قَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ কি করে বলা শুদ্ধ হয়েছে? এটার উত্তর দেওয়া হয়েছে- (جُمَلْ) وَالْجَوَابُ اِنَّهٗ يَقُوْلُهٗ عَلٰى سَبِيْلِ التَّبْلِيْغِ لَا اَنَّهٗ وَصْفٌ لَهٗ كَمَا اَنَّهٗ كَذٰلِكَ اللّٰهُ تَعَالٰى অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কালামকে তাবলীগ-স্বরূপ বর্ণনা করছেন। (এটা স্বীয় বাক্য নয়) এ বাণীর উচ্চারণ তাঁর কোনো وَصْف নয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন তার এ নির্দেশ।

اَلرَّسُوْلُ الْكَرِيْمُ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত ৪০নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'এ কুরআন' এক মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের কথা। এটা দ্বারা রাসূলে কারীম ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে। আর সূরা তাকবীরে ১৯নং আয়াতে এরূপ একই কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে। কুরআন রাসূলের বা জিবরাঈলের নিজস্ব কথা নয় বরং আল্লাহ তা'আলারই কথা, এটার প্রমাণ স্বয়ং রাসূল শব্দটি। কেননা রাসূল তো বার্তাবাহক ও প্রতিনিধিকেই বলা হয়। এটা ছাড়া ৪৩নং আয়াতে পরিষ্কার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, "এটা বিশ্বের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" তবে 'সম্মানিত বার্তাবাহকের কথা' এদিক দিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নিকট হতে, রাসূল জিবরাঈলের মুখ হতে এবং শ্রোতামণ্ডলী রাসূলের মুখের ধ্বনি হতে শুনত। এই কারণেই বলা হয়েছে যে, এটা মহাসম্মানিত বার্তাবাহকের মুখে উচ্চারিত আল্লাহর কথা। আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের শপথ করে বলছেন যে, এ কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের নিজস্ব কোনো কথা নয়। তাঁর রচিত কোনো কবিতার চরণ নয়। কোনো গণকঠাকুরদের উক্তি নয়। রাসূল নিজ পক্ষ হতে কিছু রচনা করে বললে আমি

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম। এমনভাবে শাস্তি দিতাম যে, তোমাদের মধ্যে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না। এ কথাগুলো বলার কারণ হলো যে, আল-কুরআনের অবিসংবাদিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাক্য-বিন্যাস ও ছন্দের ঝংকার অবলোকন করে মক্কার অনেক লোকই মহানবী ﷺ-কে কাব্যকার নামে অভিহিত করেছিল। আল-কুরআনের পরকালীন গায়েবী সংবাদ ও তত্ত্ব শ্রবণ করে লোকেরা ভাবত যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ একজন উন্নত মানের গণক। জ্যোতিষ্ক জ্ঞানের সহায়তায় এ সব অলৌকিক ও মহাশূন্য সম্পর্কীয় তত্ত্ব প্রকাশ করছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সব ধারণা ও কথার প্রতিবাদেই বলেছেন যে, আল-কুরআন কোনো কবির কাব্যচরণ বা কোনো গণকের অদৃশ্য সংবাদ কাহিনী নয়। সূরা ইয়াসীনেও বলা হয়েছে যে, "আমি তোমাকে কবিতা শিক্ষা দেই নি এবং এটা শিক্ষা করাও তোমার পক্ষে সমীচীন নয়।" বস্তুত আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনের অবিসংবাদিত এবং তা আল্লাহর কালাম হওয়ার প্রমাণের জন্যই উপরিউক্ত কথাগুলো বলেছেন।

قَوْلُهُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا ... مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ : কুরাইশদের মেধাশক্তি সাধারণত কবিতা বা কবিত্বের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, سَلَامَتْ وَطَلَاقَتْ اَوْر فَصَاحَتْ بَلَاغَتْ -এর ক্ষেত্রে তারা খুবই প্রসিদ্ধ ছিল, তাদের এমনও ধারণা ছিল যে, কবিগণ অসাধারণ শক্তির অধিকারী তাই কুরআনের মধ্যে বালাগতের পরিপূর্ণতা দেখে মুহাম্মদ ﷺ-কে তারা কবি বলে বেড়াত। তাই আল্লাহ বলেন, এটা কোনো কবির কবিতা নয়। অর্থাৎ আমার রাসূল কোনো কবি নন। তবে এটা তোমাদের খুব কমই বিশ্বাস আসবে। কেননা তোমরা কবিত্বের পথে মাতাল রয়েছ। তোমাদের সৃষ্টিতে কবিত্বের জ্ঞান ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর মক্কাবাসীগণ কুরআনের বালাগাত ও ফাসাহাত দেখে যেমনি তাঁকে কবি বলত, তেমনি যেহেতু কুরআনুল কারীমে অতীত যুগের অবিস্মরণীয় ঘটনাবলি প্রকাশ করত এবং ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য বহু ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত করে দেখতে পেল এবং তা সত্য প্রমাণিত হতে লাগল। তাই তারা তাঁকে كَاهِنٌ বা গণক বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করল।

আল্লাহ বলেন, এটা কোনো كَاهِنٌ-এর বক্তব্য নয়। আর তোমরা তো একটু ভেবে দেখ না যে, গণকের কথা ও কুরআনের বক্তব্যে কি অসাধারণ পার্থক্য রয়েছে। গণকরা অপবিত্র এবং গণকদের কথা শতকরা ৯৯% মিথ্যা এবং কুরআনের বাণী পবিত্র এবং তার ১০০% সত্য হচ্ছে! তথাপিও কুরআনকে কিভাবে قَوْلُ كَاهِنٍ বলছে! তাই বুঝে নাও যে, এটা رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এর পক্ষ থেকে রচিত সত্য বাণী বৈ অন্য কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে তোমরা যে সকল দাবি করছ তা সম্পূর্ণই মিথ্যা।

গণক বা কাহিন কাকে বলে? : কাহিন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি جِنَّاتْ অথবা শয়তান জাতি সংশ্রবে এবং তারকারাজির দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে আন্দাজ করে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রচনা করে থাকে। এটাতে অধিকাংশ কথাই মিথ্যা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ" : "তোমরা খুব কমই ঈমান গ্রহণ কর" কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম হলো, "তোমরা ঈমান আন না"। দ্বিতীয় অর্থ হলো, কুরআনের বক্তব্য শুনে তোমাদের হৃদয় স্বতই এ কথা বলে উঠে যে, এটা মানুষের কালাম হতে পারে না; কিন্তু তোমরা তো নিজেদের জিদের উপর অবিচল হয়ে থাকছো এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করছ না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٥. لَاَخَذْنَا لَنِلْنَا منه عقابا بِالْيَمِيْنِ بالقوة والقدرة ـ

৪৫. তবে আমি তাকে ধৃত করতাম শাস্তিদান উদ্দেশ্যে পাকড়াও করতাম দক্ষিণ হস্তের মাধ্যমে শক্তি ও ক্ষমতার সাথে।

٤٦. ثم لقطعنا مِنْهُ الْوَتِيْنَ نِيَاطَ الْقَلْبِ وَهُوَ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِهِ إِذَا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ ـ

৪৬. অতঃপর কর্তন করে দিতাম তার জীবন-ধমনী আত্মার শিরা, তা হলো তার সাথে সংশ্লিষ্ট শিরা, যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

٤٧. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ هُوَ اسْمُ مَا وَمِنْ زَائِدَةٌ لِتَاكِيْدِ النَّفْيِ وَمِنْكُمْ حَالٌ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ مَانِعِيْنَ خَبَرُ مَا وَجُمِعَ لِاَنَّ اَحَدًا فِيْ سِيَاقِ النَّفْيِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ وَضَمِيْرُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْ لَا مَانِعَ لَنَا عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْعِقَابِ ـ

৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ নেই أَحَدٍ ইসমে 'মা' আর مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত, যা نَفْيٌ-এর تَاكِيْد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আর مِنْكُمْ শব্দটি أَحَدٌ হতে حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হতে রক্ষাকারী প্রতিরোধকারী। এটা مَا -এর خَبَرْ আর এটাকে এ জন্য বহুবচন নেওয়া হয়েছে, যেহেতু أَحَدٌ শব্দটি نَفْيٌ -এর সিয়াকে অবস্থিত হিসেবে বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত। আর عَنْهُ মধ্যকার যমীর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আজাব হতে মুক্তির কোনো উপায় হতো না।

٤٨. وَاِنَّهُ اَيِ الْقُرْاٰنَ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ

৪৮. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন মুত্তাকীগণের জন্য উপদেশ।

٣٩. وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ مُكَذِّبِيْنَ بِالْقُرْاٰنِ وَمُصَدِّقِيْنَ ـ

৪৯. আর আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছে হে মানুষ! মিথ্যারোপকারী কুরআনের প্রতি এবং সত্যারোপকারী।

٥٠. وَاِنَّهُ اَيِ الْقُرْاٰنَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ اِذَا رَاَوْا ثَوَابَ الْمُصَدِّقِيْنَ وَعِقَابَ الْمُكَذِّبِيْنَ بِهِ

৫০. আর নিশ্চয় এটা কুরআন কাফেরদের জন্য অনুশোচনার কারণ যখন তারা সত্যারোপকারীদের ছওয়াব এবং মিথ্যারোপকারীদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

٥١. وَاِنَّهُ اَيِ الْقُرْاٰنَ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ اَيْ لِلْيَقِيْنِ حَقَّ الْيَقِيْنِ ـ

৫১. আর নিশ্চয় এটা কুরআন নিশ্চিত সত্য অর্থাৎ বিশ্বাস করার জন্য যথার্থ বিশ্বাসযোগ্য।

٥٢. فَسَبِّحْ نَزِّهْ بِاسْمِ زَائِدَة رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ـ

৫২. অতএব পবিত্রতা ঘোষণা করো মহিমা কীর্তন করো নামের সাথে এটা অতিরিক্ত তোমার সুমহান প্রতিপালকের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যদি মুহাম্মদ ﷺ পবিত্র কুরআনের সাথে নিজের পক্ষ হতে ২/৪টি কথা মিলায়ে দেয় অর্থাৎ এটা যদি হয়ে থাকেও (তবে তার পরিণাম কি হবে তা বলেননি)। অত্র আয়াতে তার পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ .... عَنْهُ حَاجِزِيْنَ : এ বাক্যটির মর্মার্থ হলো, মহান আল্লাহ বলেন- যদি আমার নবী ﷺ স্বীয় অন্তর হতে কোনো কথা বানিয়ে তাকে আমার প্রতি সম্পর্ক করে দেন, তবে এ মারাত্মক অপরাধের কারণে সর্বপ্রথম আমিই তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। তা এভাবে যে, প্রথমে আমি স্বীয় ক্ষমতা বলে তাঁকে পাকড়াও করতাম অতঃপর তাঁর রগ কেটে দিতাম, তখন তোমাদের কেউ তাকে সেই আজাব হতে রক্ষা করতে পারত না। এ কথাটি এভাবেও বুঝিয়ে নেওয়া যায় যে, বাদশাহ কর্তৃক সনদ-প্রমাণ এবং নিয়োগপত্রসহ দায়িত্ব সম্পাদনে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার মর্যাদার অপব্যবহার করে, তখন তার যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা বাদশাহের উপর অনিবার্য হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র তথাপিও কিভাবে আল্লাহ বলেন- لَاَخَذْنَا بِالْيَمِيْنِ [আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করবো]? : এ বাক্যের মর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্ন তাফসীর করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ يَعْنِىْ لَاَخَذْنَا بِيَمِيْنِهِ অর্থাৎ অবশ্যই তাকে তার ডান দিক হতে পাকড়াও করতাম যাতে তার সর্বশক্তি প্রথমেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

অথবা, يَمِيْن -কে خَاصْ করার কারণ হচ্ছে- যখন হত্যাকারীগণ কারো পিঠদেশ হতে হত্যা করতে চায় তখন তার (হত্যাকৃত ব্যক্তির) বাম হস্ত ধরে ফেলে, আর যখন তার গর্দনায় হত্যা করার ইচ্ছা হয় তখন তার ডান হস্ত ধরে ফেলে থাকে, যাতে হত্যাকৃত ব্যক্তি তলোয়ার দেখতে পায় এবং হত্যাকাণ্ডে অধিক কষ্ট অনুভব করে থাকে। -[মাদারিক]

কেউ কেউ বলেন- এটার অর্থ হলো তাকে শক্তির সাথে ধরা হবে। -[জালালাইন]

কারো মতে, এটার অর্থ হলো খুবই কড়াক্রান্তি হিসাব করে তার হিসাব নেওয়া হবে।

কেউ বলেন, এটার মর্ম হলো আমি তাকে ধৈর্যের সাথে হত্যা করবো। যেভাবে রাজা-বাদশাহগণকে কেউ মিথ্যাবাদী বললে তখন খুবই রাগান্বিত হয়ে হঠাৎ তাকে আক্রান্ত করে বসে। এভাবে হত্যা করাকে قَتْلِ صَبْر বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কঠোর হস্তে দমন করার জন্য يَمِيْن -এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। -[মাদারিক]

অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা ডান বাম ইত্যাদির মুখাপেক্ষী নন। বান্দাগণের সহজ বোধের জন্য এরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى اَلْوَتِيْنَ : اَلْوَتِيْن সম্পর্কে জালালাইন গ্রন্থকার ও মাদারিক গ্রন্থকার বলেন- اَلْوَتِيْنُ نِيَاطُ الْقَلْبِ وَهُوَ عِرْقٌ مُتَّصِلٌ بِالْقَلْبِ اِذَا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ. অর্থাৎ اَلْوَتِيْن অন্তঃকরণের রগকে বলা হয়, যার সম্পর্কে অন্তর হতে বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরূপই বর্ণনা করেছেন, আর মুজাহিদ (র.) বলেন- هُوَ الْحَبْلُ الَّذِىْ فِى الظَّهْرِ -[কাবীর]

قَوْلُهُ وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ : হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর 'মাথা' হতে 'পা' পর্যন্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেবল সত্য বাণীর নিশানস্বরূপ। যে পয়গাম আমার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয় তা বিন্দু-বিসর্গসহ তিনি তোমাদের নিকট পেশ করে থাকেন। তাই এ কালামের প্রত্যেকটি অক্ষর সম্পূর্ণরূপে সত্য। আল্লাহভীরুদের জন্য এটাতে সম্পূর্ণ নসিহত ও উপদেশ বাণী দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে।

مُتَّقِيْن -দের জন্য কুরআনকে تَذْكِرَةٌ বলে নির্দিষ্ট করার কারণ : এটার কারণ এই যে, যারা এটা হতে উপকৃত হতে চেষ্টা করবে, তারাই উপকৃত হতে সক্ষম হবে। মুত্তাকীনগণ যেহেতু তাকে উপদেশ বা নসিহত হিসেবে কবুল করে থাকে বা তাদের মধ্যে সে مَادَّهْ রয়েছে তারাই তা থেকে উপকৃত হতে সক্ষম হবে। আর কাফেরদের মধ্যে যেহেতু উপদেশ গ্রহণের مَادَّهْ নেই, তারা গ্রহণ করতে পারবে না। তাই تَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে এ কথাটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে বলেন, ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ যারা উপদেশ গ্রহণ করবে তাদের জন্যই এটা উপদেশ দান করবে। অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে নসিহত বাণী সম্বলিত হওয়াই তার صِفَاتْ كَمَالِيَّهْ اِضَافِيَّهْ হওয়ার কারণ হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِيْنَ : এ আয়াতে কুরআন অমান্যকারীদেরকে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে। নিজেরা নিজেদেরকে সত্যবাদী বললেই চলবে না; বরং সবই আল্লাহর জানা রয়েছে- কে সত্যের পথে রয়েছে, আর কে মিথ্যার পথে রয়েছে। কেননা- اِنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ . اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ : যারা আল্লাহকে ভয় করে পবিত্র কুরআন ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর রহমত হিসেবে কাজ করবে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে অমান্য করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হয় না। এমন একদিন আসবে যেদিন এই মূর্তিমান রহমত তাদের বিপক্ষে আক্ষেপ-অনুতাপের কারণে পরিণত হবে। তারা আক্ষেপ করে বলতে থাকবে হায়! যদি দুনিয়াতে এ কুরআনকে মেনে নিতাম- এর বাণীর উপর আমল করতাম, তবে এমনভাবে আজ চরম সর্বনাশের সম্মুখীন হতে হতো না। আর এ কথা তখনই বলতে থাকবে যখন কুরআনের অনুসরণকারীগণকে ছওয়াব ও অন্যায়কারীদেরকে শাস্তি দেওয়া শুরু হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ : আর প্রকৃতপক্ষে এটাই বিশ্বাসযোগ্য। অর্থাৎ যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে এ কুরআনকেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ কুরআনের প্রত্যেকটি বিষয়ই দ্বিধা-সন্দেহের উর্ধ্বে। এটাতেই অবিচল বিশ্বাস যোগাতে হবে।

১. عِلْمُ يَقِيْنٍ যে কোনো বস্তুর একিনের স্তর তিনটি। হাকিকত সম্বন্ধে বর্ণনা দ্বারা অবহিত হওয়া যথা– اَلْعَسَلُ حُلْوٌ মধু মিষ্টি। এটা শুনে তাকে বিশ্বাস করা এবং সাধারণভাবে মিষ্টির সম্বন্ধে অবগতি লাভ করা যায়।

২. حَقُّ الْيَقِيْنِ কোনো একটি বস্তুর হাকিকত সম্বন্ধে শুনে চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রহণ করা। যথা– شَرِبْتُ الْعَسَلَ بِلَذَّةٍ আমি তৃপ্তিসহকারে মধু পান করলাম।

৩. عَيْنُ الْيَقِيْنِ যথা– رَأَيْتُ يَشْرَبُ النَّاسُ الْعَسَلَ بِلَذَّةٍ আমি মানুষকে তৃপ্তিসহকারে মধু পান করতে দেখেছি। অর্থাৎ শ্রুতিগত জ্ঞানের পরিধির মাধ্যমে বিশ্বাস করাকে عِلْمُ الْيَقِيْنِ আর স্বচক্ষে দৃষ্টির মাধ্যমে অনুভব করলে حَقُّ الْيَقِيْنِ এবং বাস্তবে উপলব্ধি করে নিলেই عَيْنُ الْيَقِيْنِ হবে। এটাই তাসাউফ পন্থিদের অভিমত।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ" : এ বাক্যাংশটির অর্থ হলো, কুরআন আল্লাহর সুনিশ্চিত বাস্তব সত্য কালাম। যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাতিলের কোনো ক্ষত চিহ্ন নেই। আদ্যোপান্ত জ্বলন্ত সত্যের প্রতীক। ইয়াকীনের সাধারণ অর্থ হলো দৃঢ় বিশ্বাস। তাসাউফের পরিভাষায় একিনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। পুঁতিগত বিদ্যা বা শ্রুত জ্ঞানের মাধ্যমে যে বিশ্বাস লাভ হয়, তাকে 'ইলমুল ইয়াকীন' বলা হয়। এ ধরনের বিশ্বাস বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর চাক্ষুষ দর্শনের জ্ঞানের মাধ্যমে যে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় 'আইনুল ইয়াকীন'। এরূপ বিশ্বাস লাভ হলে তা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর বাস্তব ব্যবহারিক উপলব্ধি জ্ঞানের দ্বারা যে বিশ্বাস লাভ হয় তাকে বলা হয় 'হাক্কুল ইয়াকীন।' এ বিশ্বাস 'আইনুল ইয়াকীনের তুলনায় অনেক সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। বিশ্বাসের এ তিনটি পর্যায়কে আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারি। যেমন– ভূগোলশাস্ত্রের জ্ঞানের মাধ্যমে বা কারো নিকট শুনে অবগত হলাম যে, বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। ফলে বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে আমাদের মনে একটি প্রবল বিশ্বাস জন্মিল, কিন্তু অন্য কোনো লোক যদি বলে যে, বঙ্গোপসাগর বলতে কিছুই নেই বা কোনো ভূগোল দ্বারা যদি পাল্টা প্রমাণ করা যায় যে, বঙ্গোপসাগর বলতে কিছুই নেই। তবে আমাদের মনের অর্জিত বিশ্বাসটি হয় দোদুল্যমান বা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির পথে। একে 'ইলমুল ইয়াকীন' বলা যেতে পারে। আর যদি বাংলার দক্ষিণপ্রান্তে গিয়ে নিজেই বঙ্গোপসাগরকে অবলোকন করে আসে, তবে বঙ্গোপসাগর সম্পর্কে কোনো যুক্তি জ্ঞানই আমার চাক্ষুষ জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারবে না। আর যদি আমি বঙ্গোপসাগরের অথৈ পানিতে নেমে গোসল করি, সন্তরণ করি, সেখান হতে পাথরকুচি ও সাগরের পানি নিয়ে আসি, তবে এ ব্যবহারিক জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস পূর্বটির তুলনায় আরো দৃঢ় ও মজবুত হয়। আমি বিরুদ্ধবাদীগণকে পাথরকুচি ও পানি পান করিয়ে নিজের মতে মতাবলম্বী করতে পারবো। এটাকেই বলা হয় 'হাক্কুল ইয়াকীন'। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনকে এ ধরনের বিশ্বাসজনিত গ্রন্থরূপে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ কুরআন যারা শ্রবণ করেন কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে যারা গবেষণা করে ও কুরআনের বিধানসমূহ যারা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করে তাদের অন্তরের মণিকোঠায় এ ধরনেরই অবিসংবাদিত বিশ্বাস লাভ করে।

তারা বাস্তবরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, এ কুরআন মহাসত্য ও আল্লাহর বাণী। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কুরআনের বাণীর ন্যায় একটি বাক্য রচনা করার ক্ষমতা আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের হয়নি। অথচ অতিবাহিত চৌদ্দশত বছরের মধ্যে কত জ্ঞানীগুণী ও যুগস্রষ্টা, সাহিত্যিক ও কাব্যকারের উদ্ভব হলো, কেউ তো কুরআনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হলো না। তাই আল্লাহ বলেছেন, হে অবিশ্বাসীগণ! তোমরা গ্রাহ্য কর আর নাই কর, আল-কুরআন একটি মহাসত্য, দৃঢ় প্রত্যয়শীল বাস্তব সত্য, আল্লাহর কালাম। যারা একে স্বীকার করে না, তারাই হতভাগ্য, তারাই আল্লাহর নিয়ামত হতে বঞ্চিত।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ : কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার কালাম। এটা আল্লাহভীরুদের জন্য উপদেশাবলিতে ভরপুর। কুরআন বিরোধীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত। তাই উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে تَسْبِيْح পাঠ করার জন্য বলছেন। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার খাস রহমত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেই ওহী নাজিলের জন্য মনোনীত করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন এ আয়াতটি নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এটা রুকুতে রাখ' এ জন্য রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া এবং তা তিন বার পড়া উম্মতের সম্মিলিত মতে সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজিবও বলেছেন। –[মা'আরিফুল কোরআন]

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এখানে تَسْبِيْح টি নামাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তথা হে রাসূল! আপনি আল্লাহকে স্মরণ করুন, নামাজ আদায় করতে থাকুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের আদেশ মোতাবেক নামাজ আদায় করুন।
–[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ : সূরা আল-মা'আরিজ

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার তৃতীয় আয়াতে উল্লিখিত ذِى الْمَعَارِجِ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে; একে اَلْمَوَاقِعُও বলা হয়। এতে ২টি রুকূ', ৪৪টি আয়াত, ২১৬টি বাক্য এবং ৮৬১টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটিও মক্কায় অবস্থানকালে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু সূরাটি কখন নাজিল হয়; তা সঠিকরূপে বলা যায় না। সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা اَلْحَاقَّةُ যে অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এ সূরাটিও প্রায় অনুরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি اَلْحَاقَّةُ -এর পর মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়। -[নূরুল কোরআন]

মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু : মক্কার কাফেরগণ কিয়ামত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে মহানবী ﷺ এবং তাঁর অনুসারীগণকে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাসা ও ক্রীড়া-কৌতুক করত। আর বলত- হে মোহাম্মদ! তোমার কথা যদি সত্য হয় এবং তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে থাক, তবে সে কিয়ামত সংঘটিত করিয়ে দেখাও দেখি। তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ আমরা তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ তা'আলা গোটা সূরাটিই কাফেরদের এই চ্যালেঞ্জের জবাবে অবতীর্ণ করেছেন।

প্রথম থেকে ১৪ নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের অনিবার্যতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, জনৈক লোক কিয়ামতের শাস্তি চাচ্ছে। এ শাস্তি কাফেরদের জন্য বিলম্ব হলেও অবশ্যই হবে। কেননা আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতির বিপরীত কিছু করেন না। সুতরাং আপনি তাদের অসদাচরণে ধৈর্যহারা হবেন না। তারা তাকে খুব দূরের বিষয় ভাবে; কিন্তু আমি অতি সন্নিকটে দেখছি। যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে সেদিন আকাশমণ্ডলী বিগলিত ধাতুর ন্যায় হবে। পাহাড়গুলো রঙ্গিন পশমের ন্যায় উড়বে। সেদিন পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও কেউ কারো নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না। বন্ধু-বান্ধব সংবাদ নিবে না। লোকেরা শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তান, স্ত্রী, ভাই-বোন, জাতি-গোষ্ঠীকে মুক্তিপণ রাখতে চাইবে; কিন্তু কিছুতেই তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না।

১৫ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত লেলিহান অগ্নিশিখার শাস্তির কথা বলা হয়েছে। সে আগুন দ্বারা দেহের চর্ম জ্বলে খসে পড়বে। এ পৃথিবীতে যারা ঈমান আনেনি এবং দীন হতে দূরে সরে রয়েছে তাদেরকে জাহান্নাম নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে।

১৯ থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে- জাহান্নাম হতে কোন ধরনের লোক মুক্তি পাবে তাদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে- যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে, ভিক্ষুক ও অভাবীদের জন্য নিজেদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করে, অপাত্র হতে নিজেদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে চলে এবং যারা প্রতিশ্রুতি ও আমানত রক্ষা করে, আর সঠিক সাক্ষ্য দানে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকে, তারাই লাভ করবে অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাত। সেখানে তারা সম্মানজনক জীবন যাপন করবে।

৩৬ থেকে ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত কাফেরদের আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের হলো কি? তারা আপনার কাছে দলে দলে এসে ভিড় জমায় কেন? তারা কি অথৈ নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের আশা করে নাকি? কখনো তারা জান্নাত লাভ করতে পারবে না। জান্নাত লাভের একটি গুণগত মান রয়েছে। সে মানে তাদের পৌঁছতে হবে- অন্যথা নয়। তারা যদি ঈমান না আনে তবে আমি তাদের পরিবর্তে নতুন জাতি সৃষ্টিতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এ কথা আমি বহু উদয়াচল ও অস্তাচলের একক প্রতিপালকের শপথ করে বলছি। আমি তাতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাবান।

পরিশেষে বলেছেন যে, হে নবী! আপনি তাদেরকে আমোদ-ফূর্তি ও কৌতুকের মধ্যে থাকতে দিন। তাদের প্রতি আপনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। কিয়ামতের দিন তারা কবর হতে উত্থিত হয়ে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে দ্রুতবেগে দৌড়াতে থাকবে। সেদিন লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে। তাদের নয়নযুগল থাকবে সর্বদা অবনমিত। নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য অনুতাপ করতে থাকবে, কপালে হাত মেরে বলবে- হায়! কি করলাম; কিন্তু তখন সে অনুশোচনায় কোনোই কাজ হবে না।

সূরা আল-হাক্কাহ্-এর সাথে সূরা আল-মা'আরিজ-এর যোগসূত্র : সূরা আল-হাক্কাহ্তে কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, কিয়ামতের অবিশ্বাসীর পরিণাম আলোচা করা হয়েছে। সেখানকার আলোচনাকে সূরা আল-মা'আরিজ -এ পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এ সূরটি সূরা আল-হাক্কাহ্ -এর বক্তব্যের পূর্ণতা দানকারী হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-মা'আরিজ মক্কায় অবতীর্ণ

أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً : ৪৪ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. سَأَلَ سَائِلٌ دَعَا دَاعٍ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ .

২. لِلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ هُوَ النَّضْرُ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ الْآيَةَ .

৩. مِنَ اللّٰهِ مُتَّصِلٌ بِوَاقِعٍ ذِي الْمَعَارِجِ مَصَاعِدِ الْمَلٰئِكَةِ وَهِيَ السَّمٰوٰتُ .

৪. تَعْرُجُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ جِبْرِيْلُ إِلَيْهِ إِلٰى مَهْبَطِ أَمْرِهِ مِنَ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ أَيْ يَقَعُ الْعَذَابُ بِهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكَافِرِ لِمَا يَلْقٰى فِيْهِ مِنَ الشَّدَائِدِ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ أَخَفَّ مِنْ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ يُصَلِّيْهَا فِي الدُّنْيَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ .

৫. فَاصْبِرْ هٰذَا قَبْلَ أَنْ يُّؤْمَرَ بِالْقِتَالِ صَبْرًا جَمِيْلًا أَيْ لَا فَزَعَ فِيْهِ .

৬. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ أَيِ الْعَذَابَ بَعِيْدًا غَيْرَ وَاقِعٍ .

৭. وَنَرٰهُ قَرِيْبًا وَاقِعًا لَا مُحَالَةَ .

অনুবাদ :

১. এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করল আবেদনকারী আবেদন করল অবধারিত শাস্তি সংঘটিত হতে।

২. কাফেরদের জন্য এর প্রতিরোধকারী কেউই নেই অর্থাৎ নযর ইবনে হারিছ, সে এ দোয়া করেছিল যে, اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ فَامْطِرْ عَلَيْنَا

৩. আল্লাহর পক্ষ হতে এটা পূর্বোক্ত وَاقِعٌ -এর সাথে সম্পৃক্ত। যিনি সোপানসমূহের অধিকারী ফেরেশতাগণের আরোহণের বাহন, আর তা হলো আকাশমণ্ডলী।

৪. ঊর্ধ্বারোহণ করে শব্দটি تَاءٌ ও يَاءٌ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। ফেরেশতাকুল ও আত্মা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর প্রতি আকাশের যে অংশে তাঁর আদেশ অবতারিত হয়। এমন একদিনে তার সম্পর্ক উহ্য বক্তব্যের সাথে অর্থাৎ يَقَعُ الْعَذَابُ بِهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيٰمَةِ যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এ পরিমাণ কাফেরদের নিকট অনুভূত হবে, যেহেতু তারা কঠোরতম শাস্তিতে লিপ্ত থাকবে। অবশ্য মু'মিনের নিকট তা দুনিয়ায় এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করার তুল্য সময় অনুমিত হবে। যেমন হাদীস শরীফে অনুরূপ উদ্ধৃত হয়েছে।

৫. সুতরাং ধৈর্যধারণ করুন এটা যুদ্ধসংক্রান্ত আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার বিধান। পরম ধৈর্য যাতে কোনোরূপ অস্থিরতা থাকবে না।

৬. তারা এটাকে মনে করে অর্থাৎ শাস্তিকে সুদূর অবাস্তব।

৭. কিন্তু আমি তাকে অত্যাসন্ন দেখছি যা অবশ্যম্ভাবীরূপে বাস্তবায়িত হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْقِرَاءَةُ فِيْ سَأَلَ سَائِلٌ : سَأَلَ শব্দের দু'টি কেরাত বর্ণিত হয়েছে। জমহুরের নিকট سَأَلَ হামযা দিয়ে পঠিত হয়েছে। নাফে' এবং ইবনে আমের এ শব্দটিকে سَالَ হামযা ব্যতিরেকেই পড়েছেন। سَالَ হামযা ব্যতিরেকে পড়ার কারণ দু'টি হতে পারে- ১. سَالَ মূলে سَأَلَ ছিল। তাখফীফের কারণে আলিফ পরিবর্তিত হয়েছে। ২. এ শব্দটি سَيَلَانٌ শব্দ থেকে উৎপত্তি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কেরাত এর প্রমাণ। তিনি পড়েছেন سَالَ سَيْلٌ।

قَوْلُهُ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ : বাক্যে سَأَلَ ফে'ল سَائِلٌ ফায়েল, بِعَذَابٍ وَاقِعٍ দ্বিতীয় মাফউল, প্রথম মাফউল উহ্য, অর্থাৎ اَللّٰهَ অথবা নবী করীম ﷺ।

قَوْلُهُ لِلْكٰفِرِيْنَ : জার মাজরূর মিলিত হয়ে মুতা'আল্লিক হয়েছে وَاقِعٍ-এর সাথে, উহ্য শিবহে ফে'ল ثَابِتٌ এর সাথেও মুতা'আল্লিক হতে পারে। তখন لِلْكٰفِرِيْنَ শব্দ عَذَابٌ-এর দ্বিতীয় সিফাত হবে। প্রথম সিফাত হলো وَاقِعٌ।

قَوْلُهُ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ : বাক্য عَذَابٌ-এর দ্বিতীয় সিফাত। অথবা عَذَابٌ হতে হাল হয়েছে, অথবা জুমলায়ে মুস্তানাফা। مِنَ اللّٰهِ মুতা'আল্লিক হয়েছে وَاقِعٌ-এর সাথে। অর্থাৎ وَاقِعٌ فِيْ جِهَةِ سُبْحَانَهٗ تَعَالٰى অথবা মুতা'আল্লিক হয়েছে دَافِعٌ-এর সাথে। অর্থাৎ- لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ مِنْ جِهَةِ تَعَالٰى

قَوْلُهُ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ الخ : জুমলায়ে মুস্তানাফা, فِيْ يَوْمٍ মুতা'আল্লিক হয়েছে تَعْرُجُ-এর সাথে, অথবা وَاقِعٌ-এর সাথে অথবা سَأَلَ-এর সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : ইবনে আবূ হাতেম ও নাসায়ী হতে বর্ণিত, ইমাম ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন নযর ইবনে হারিছ ইবনে কালাদাহ কাফের কা'বা ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ তাঁর কথায় ও কাজে সত্য হয়ে থাকলে আপনি আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন, অথবা আমাদের উপর কঠিন জ্বালাময়ী শাস্তি আপতিত করুন। তার এ কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নযর বদর যুদ্ধে নিহত হয়।

ইবনে মুনযির হতে বর্ণিত, হযরত হাসান (রা.) বলেন, যখন سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন মুসলিম অমুসলিম সকলের মধ্যে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তারা জিজ্ঞাসা করল এ শাস্তি কাদের জন্য হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা لِلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[লোবাব, খাযিন]

অথবা, নাসায়ী ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ শাস্তি প্রার্থনাকারী ছিল নযর ইবনে হারিছ ইবনে কালাদাহ কাফের। এ পাষণ্ড সূরা আল-হাক্কাহ্ শুনে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল- যদি তা সত্যই হয়ে থাকে অবশ্যই আমাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য কাফেররাও বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা বলতে লাগল, সে শাস্তি কেন আসে না? তাদের ধারণা মতে কিয়ামতের আগমন একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। এ জন্য অস্বীকৃতির সুরে প্রশ্ন করত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র সূরা অবতীর্ণ করেন। -[হাক্কানী]

শাস্তি প্রার্থনাকারী : শাস্তি প্রার্থনাকারীর ব্যাপারে ছয়টি মত উল্লেখ হয়েছে।

১. শাস্তি প্রার্থনাকারী ছিল নযর ইবনে হারিছ। সে বলেছিল, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কথায় ও কাজে সত্য হয়ে থাকলে আপনি আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন, অথবা আমাদের উপর কঠিন জ্বালাময়ী শাস্তি আপতিত করুন।
২. আবূ জাহল; সে নবীকে অস্বীকার করেছিল এবং বিদ্রূপ করে শাস্তি প্রার্থনা করেছিল।
৩. প্রশ্নকারী ছিল হারিছ ইবনে নু'মান আল-ফাহরী।
৪. আজাব প্রার্থনারী ছিল মক্কার কাফেরদের একটি দল। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এসব কথা বলেছিল এবং নবী করীম ﷺ-কে আজাব নিয়ে আসার জন্য আবেদন করেছিল।
৫. আজাব প্রার্থনারী ছিলেন হযরত নূহ (আ.)।
৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের উপর আল্লাহর আজাব কামনা করেছিলেন।

এ মতগুলোর মধ্যে প্রথম মতটিই গ্রহণীয় বলে তাফসীরকারগণ মন্তব্য করেছেন। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى "سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ" : কোনো কোনো তাফসীরকার سَأَلَ -কে سُؤَالٌ বা জিজ্ঞাসা করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে এর অর্থ হলো, জিজ্ঞাসাকারী জিজ্ঞাসা করেছে যে, আমাদেরকে যে আজাবের সংবাদ দেওয়া হয়েছে তা কার উপর বা কখন সংঘটিত হবে। অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, سَأَلَ প্রার্থনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নাসায়ী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। বর্ণনাটি এই– নযর ইবনে হারিছ ইবনে কালাদাহ বলেছে, হে আল্লাহ! এটা যদি বাস্তবিকই তোমার পক্ষ হতে সত্য ও যথার্থ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আকাশ হতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করো অথবা আমাদের প্রতি কঠিন পীড়াদায়ক আজাব নাজিল করো। –[কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاقِعٍ لِلْكٰفِرِيْنَ : অর্থাৎ যে আজাব প্রার্থনা করেছিল তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, দুনিয়াতে হোক। চাই আখেরাতে হোক। যদি দুনিয়াতে হয় তবে বদরের যুদ্ধে হয়েছে। আর যদি আখেরাতে হয়, তবে তা হবে عَذَابُ النَّارِ الْخِزْىُ আর তা কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত হবে। কারণ, তারা তা নিজেদের উপর ডেকে এনেছে। আর তা তাদের মূর্খতা ও বোকামির প্রতিফল মাত্র, আর তারা যে রাসূলের সাথে ঠাট্টা করেছিল সে কারণেই এ শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ : অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে কাফেরদের উপর যে আজাব আগমন করবে তা প্রতিহত করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। আর তিনি হলেন ذِى الْمَعَارِجِ সিঁড়িওয়ালা اَىْ مَصَاعِدُ السَّمَآءِ - لِلْمَلٰئِكَةِ مَعَارِجُ শব্দটি مِعْرَاجٌ -এর বহুবচন– عُرُوْجٌ শব্দ হতে উৎপত্তি ঘটেছে– مَعْرَجٌ وَمِعْرَاجٌ এমন সিঁড়িকে বলা হয় যাতে নিচ হতে উপরে চড়ার জন্য অনেকগুলো ধাপ থাকে।

অতএব, ذِى الْمَعَارِجِ বলে আল্লাহ তা'আলার এ صِفَتٌ বুঝানো হয়েছে যে, তিনি دَرَجَاتٌ عَالِيَةٌ -এর অধিকারী (এরূপই হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) মত ব্যক্ত করেছেন।) আর এ دَرَجَاتٌ عَالِيَةٌ দ্বারা সাত আসমান ও আসমানের স্তরসমূহকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, ذِى السَّمٰوَاتِ يَعْنِىْ مَالِكَ السَّمٰوَاتِ জালালাইন গ্রন্থকার বলেন, এরূপ– مَصَاعِدُ الْمَلٰئِكَةِ وَهِىَ السَّمٰوَاتُ

সাবী গ্রন্থকার বলেন– ذِى الْمَعَارِجِ অর্থ مَعَارِجُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْجَنَّةِ অর্থাৎ মু'মিনগণকে সিঁড়ির মাধ্যমে বেহেশতে চড়াবেন যিনি। আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে তাৎপর্য হবে, তিনি অতীব উচ্চ, উন্নত, মহান ও অসীম মর্যাদার অধিকারী সত্তা। তাঁর সমীপে হাজির হতে হলে ফেরেশতাগণকে ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণ করতে হয়। তবে নবী করীম ﷺ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

قَوْلُهُ تَعَالَى تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ : অর্থাৎ একের পর একটি সিঁড়ি যেভাবে স্থাপিত হয় আকাশমণ্ডলও তেমনিভাবে স্তরে স্তরে রয়েছে। ফেরেশতা ও রুহুল আমিন সেই আসমানগুলোতে চড়তে থাকবে।

رُوْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং رُوْحٌ -কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ : رُوْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.)। হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আয়াতেও رُوْحُ الْاَمِيْنِ বলে সম্বোধন করেছেন। হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.) একজন বিশেষ স্বর্গীয় দূত এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা। তাঁর কিছু বিশেষত্ব থাকার কারণে তাঁর নাম رُوْحُ الْاَمِيْنِ বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত জিব্রাঈল (আ.) -এর বিশেষত্ব এই যে, তিনি ছিলেন একজন স্বর্গীয় দূত, অর্থাৎ ঐশী বাণীসমূহকে আল্লাহর পক্ষ হতে নবীগণের নিকট আদান প্রদান করতেন। সে বাণীর মধ্যে وَحْىِ جَلِىْ এবং وَحْىِ خَفِىْ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস শরীফ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অথবা, তাকে ঐ সকল ফেরেশতাগণের প্রতি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যারা বিশেষ বিশেষ কাজে দায়িত্বশীল রয়েছে। –[মাদারিক]

শাস্তির দিনের পরিমাণ : উল্লিখিত ৪ নং আয়াতে ফেরেশতা ও হযরত জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর নিকট পৌছতে যে পথ অতিক্রম করতে হয় তা মানুষের অতিক্রম করতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় লাগে; কিন্তু ফেরেশতাগণ তা নিমিষের মধ্যে অতিক্রম করে থাকেন, তাই আয়াতের মর্ম। কতেক তাফসীরকারক লিখেন, উপরিউক্ত আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছর দ্বারা কিয়ামতের দিন কাফেরদের পক্ষে শাস্তির দিনগুলোকে পার্থিব দিনগুলোর পরিমাণ অনুযায়ী বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের পর হবে অনন্ত জীবন। তার কোনো শেষ নেই; কিন্তু মু'মিনদের পক্ষে এ সময়টি হবে খুবই ক্ষীণ। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ করে বলছি– মু'মিনগণ এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতে যে সময় ব্যয় করেন, কিয়ামতের এক একটি দিন তাদের পক্ষে এর চেয়েও খুব হালকা হবে।

মোদ্দাকথা, এ আয়াতটি মুতাশাবিহ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক তত্ত্ব জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। শাস্তির সময় বা দিনের যে পরিমাণ বলা হয়েছে, তা মানুষকে বুঝানোর জন্য একটি রূপক কথা মাত্র। কেননা সূরা আল-হজের ৪৭ নং আয়াতে এবং সূরা আস্-সাজদার ৫ নং আয়াতে পরিমাণ বলা হয়েছে, পার্থিব জগতের এক হাজার বৎসরের সমতুল্য। মোটকথা সৃষ্টির সূচনা ও আদি সম্পর্কে আমাদের যখন কোনো জ্ঞান নেই এবং আল্লাহর পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা কিছুই যখন জানি না, তখন এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়। যারা আল্লাহর পরিকল্পনাকে শেষ করে তার পরিণতি কাল তাদের সম্মুখে উপস্থিত করার দাবি করে এবং তা না করলে পরিণতির ব্যাপারটা উদ্ভট হওয়ার প্রমাণ পেশ করে; তারা নিজেদের নির্বোধ হওয়ারই পরিচয় দেয়। -[খাযেন]

'এক হাজার বছর' এবং 'পঞ্চাশ হাজার বছর'-এর সামঞ্জস্য বিধান : সূরা আস্-সাজদায় কিয়ামতের দিনের পরিমাণ এক হাজার বছর বলা হয়েছে এবং সূরা মা'আরিজে তা পঞ্চাশ হাজার বছর বলা হয়েছে। এ দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন পঞ্চাশটি অধ্যায় বা مَوْطِنٌ হবে। প্রত্যেকটি অধ্যায় এক হাজার বছরের পরিমাণ হবে। সূরা আস্-সাজদায় একটি অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে এবং সূরা মা'আরিজে পঞ্চাশটি অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে। আর এত অধিক সময়ও একজন মু'মিনের নিকট এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়ার চেয়েও কম বলে মনে হবে। মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে একটি বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করছেন যে, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! সেদিনটি একজন মু'মিনের নিকট এত কম সময় বলে মনে হবে যে, এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ পড়তে যে সময় লাগে তার চেয়েও কম বলে মনে হবে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا : এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সান্ত্বনা প্রদানকারী বাণী স্বরূপ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন আবূ জাহল এবং নযর ইবনে হারিছ আর কুরাইশগণ দলবদ্ধভাবে আল্লাহর নিকট আজাব প্রার্থনা করল এবং তারা সত্য ও মুহাম্মদ ﷺ এবং তার বাণী মিথ্যা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে এবং তারা আল্লাহর আজাবকে খুবই দূরে বুঝে রয়েছে এহেন অশ্লীল ভাষা রাসূলের সম্মুখে বর্ণনা করেছে। তাতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর অন্তর ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক কথা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ধৈর্যধারণের প্রতি আহ্বান করেছেন এবং তাদের হঠকারিতা হতে দুঃখিত না হওয়ার জন্য সান্ত্বনা দান করেছেন।

صَبْر جَمِيْل-এর অর্থ : এর তাফসীরে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেছেন اَلصَّبْرُ الَّذِىْ لَا جَزْعَ فِيْهِ অর্থাৎ এমন ধৈর্য যাতে কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় না। ধীর ও স্থিরতা রক্ষা করে বিপদকে নীরবে সহ্য করা। সহ্যহীন অবস্থাকেও সহ্য করে নেওয়া। বিপদে ভেঙ্গে না পড়া, বিপদের মুহূর্তেও নিজের কার্যে অবিচল থাকা।

صَبْر-কে جَمِيْل-এর সাথে সংযুক্ত করার কারণ : এর কারণ হচ্ছে- আয়াতের মধ্যে সম্বোধিত হলেন হুযূর ﷺ। তাঁর প্রত্যেক কার্যেই حُسْن وَجَمَالٌ থাকা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে شَانْ نُبُوَّتْ-এর বিপরীত কাজ হবে। যেমন, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রসঙ্গেও বলা হয়েছে- فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ এভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের সকল কার্যেই حُسْن وَجَمَالٌ দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে। তাই বলা হয়েছে- فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَنَرَاهُ قَرِيْبًا : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কিয়ামত এবং কিয়ামতের আজাবকে বহু দূরে মনে করে অর্থাৎ তা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে, তবে তাকে যত দূরেই মনে করুক না কেন তা ততদূরে নয়, বরং এটা তাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আর আমি তো কিয়ামতকে অতি নিকটে দেখতে পাচ্ছি। এখানে بَعِيْد وَقَرِيْب দ্বারা بُعْد اِمْكَانِىْ এবং قُرْب اِمْكَانِىْ-কে বুঝানো হয়েছে। সময় অথবা দূরত্বের অনুসারে بَعِيْد ও قَرِيْب বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ যতই তা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে তা ততই অবশ্যম্ভাবী। -[মা'আরিফ, মাদারিক]

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ এখনও প্রকাশ পায়নি, তথাপিও কিভাবে আল্লাহ বলেছেন যে, আমি তাকে খুবই নিকটে দেখতে পাই।

এর উত্তরে বলা হবে যদিও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করেনি, তবে আংশিকভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ হলো- ইলম লোপ পাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, জেনা ও শরাব পান বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং এগুলো তো বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে হুযূর ﷺ বলেন, مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তার কিয়ামত তখনই শুরু হয়। প্রত্যেক মানুষই কালক্রমে মৃত্যুবরণ করবে বা করছে তাই ব্যক্তিদের লক্ষ্যেই 'কিয়ামত নিকট' এ কথা যথার্থ হয়েছে।

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, 'কাফেররা কিয়ামতের আজাবকে দূরে দেখে' এর তাৎপর্য হলো তারা কিয়ামত অসম্ভব মনে করে; তারা মনে করে এমন ঘটনা তখনো ঘটবে না। তাদের ধারণা আসমান-জমিন চন্দ্র-সূর্য সব ঠিকই থাকবে। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨. يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اَىْ يَقَعُ كَالْمُهْلِ كَذَائِبِ الْفِضَّةِ.

৮. সেদিন আকাশ হবে তার সম্পর্ক উহ্য ক্রিয়া অর্থাৎ يقع -এর সাথে। গলিত ধাতুর মতো বিগলিত রৌপ্যের ন্যায়।

٩. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ كَالصُّوْفِ فِى الْخِفَّةِ وَالطَّيَرَانِ بِالرِّيْحِ.

৯. আর পর্বতসমূহ হবে রঙীন পশমের ন্যায় পাতলা ও হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার বিবেচনায়।

١٠. وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا قَرِيْبٌ قَرِيْبَهُ لِاشْتِغَالِ كُلٍّ بِحَالِهِ.

১০. এবং সুহৃদ সুহৃদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করবে না আত্মীয় আত্মীয়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে না। সকলেই নিজের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত থাকার কারণে।

١١. يُبَصَّرُوْنَهُمْ ط يُبْصِرُ الْاَحِمَّاءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَتَعَارَفُوْنَ وَلَا يَتَكَلَّمُوْنَ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ يَتَمَنَّى الْكَافِرُ لَوْ بِمَعْنَى اَنْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِكَسْرِ الْمِيْمِ وَفَتْحِهَا بِبَنِيْهِ.

১১. তাদেরকে পরস্পরে দৃষ্টি গোচর করানো হবে সুহৃদগণ পরস্পর একে অপরকে দেখতে পাবে, চিনতে পারবে; কিন্তু কথাবার্তা বলবে না, বাক্যটি মুসতানাফা বাক্য। অপরাধী কামনা করবে কাফেরগণ আশা পোষণ করবে পণ দিতে لَوْ অব্যয়টি اَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে শাস্তি হতে সেদিন يَوْمَئِذٍ শব্দটি مِيْم বর্ণে যের ও যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তার সন্তানসন্ততি দ্বারা।

١٢. وَصَاحِبَتِهِ زَوْجَتِهِ وَاَخِيْهِ.

১২. আর তার সঙ্গিনী দ্বারা স্ত্রী এবং তার ভাইয়ের দ্বারা ।

١٣. وَفَصِيْلَتِهِ عَشِيْرَتِهِ لِفَصْلِهِ مِنْهَا الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ تَضُمُّهُ.

১৩. এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির দ্বারা তার বংশধরদের, বংশধরদেরকে فَصِيْلَةٌ এ জন্য বলা হয়, যেহেতু সন্তানসন্ততি, পিতামাতার বিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ তারা তাকে আশ্রয় দিত তার জিম্মাদার হতো।

١٤. وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ذٰلِكَ الْاِفْتِدَاءُ عَطْفٌ عَلٰى يَفْتَدِىْ.

১৪. এবং পৃথিবীর সকলের দ্বারা। অতঃপর তা তাকে মুক্তি দান করে সে মুক্তিপণ, এটা পূর্বোক্ত يَفْتَدِىْ -এর উপর আতফ।

١٥. كَلَّا ط رَدْعٌ لِمَا يَوَدُّهُ اِنَّهَا اَىِ النَّارُ لَظٰى اِسْمٌ لِجَهَنَّمَ لِاَنَّهَا تَتَلَظّٰى اَىْ تَتَلَهَّبُ عَلَى الْكُفَّارِ.

১৫. না, কখনো নয় তার কামনার প্রতি শাসানো উদ্দেশ্য। তা তো অগ্নি লেলিহান অগ্নি জাহান্নামের নাম। কেননা তা কাফেরদের প্রতি লেলিহান হবে।

١٦. نَزَّاعَةً لِلشَّوٰى جَمْعُ شَوَاةٍ وَهِىَ جِلْدَةُ الرَّاْسِ.

১৬. যা মস্তক হতে চামড়া খসিয়ে দিবে شَوٰى শব্দটি شَوَاةٌ -এর বহুবচন, আর তা হলো মস্তকের চামড়া।

١٧. تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى عَنِ الْاِيْمَانِ بِاَنْ تَقُوْلَ اِلَىَّ اِلَىَّ.

১৭. জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ঈমান হতে। এরূপ বলতে থাকবে যে, আমার মধ্যে আস, আমার মধ্যে আস।

١٨. وَجَمَعَ الْمَالَ فَاَوْعٰى اَمْسَكَهُ فِىْ وِعَائِهِ وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُ.

১৮. আর সে পুঞ্জীভূত করেছিল সম্পদ এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল তার ভাণ্ডের মধ্যে হেফাজত করেছিল এবং তা হতে আল্লাহর হক আদায় করেনি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَوْمَ : এ শব্দটি পূর্বোল্লেখিত قَرِيْبًا হতে মাফউল, অথবা এটা পূর্ববর্তী فِىْ يَوْمٍ হতে বদলও হতে পারে। يُبَصَّرُوْنَهُمْ বাক্যটি মুসতা'নাফাহ অথবা حَمِيْمًا -এর সিফাত।

كَلَّا হরফে রদা', اِنَّهَا -এর যমীর هَا নার -এর দিকে ধাবিত, অথবা এটা যমীরে মুবহাম, যার তাফসীর করা হয়েছে। لَظٰى খবর, অথবা বদল, অথবা কিসসা, نَزَّاعَةً এটা اِنَّ -এর দ্বিতীয় খবর, অথবা উহ্য মুবতাদার খবর, অথবা لَظٰى যমীরে মানসূব হতে বদল হয়েছে। اِنَّ খবরে نَزَّاعَةٌ, আবার কেউ نَزَّاعَةً হাল হিসাবে নসব দিয়েও পড়েছেন।

قَوْلُهُ كَالْعِهْنِ : এটা مُشَبَّهٌ بِهٖ আর اَلْجِبَالُ টি مُشَبَّهٌ

قَوْلُهُ كَالْمُهْلِ : এটাও مُشَبَّهٌ بِهٖ এবং اَلسَّمَاءُ টি مُشَبَّهٌ

قَوْلُهُ يُبَصَّرُوْنَهُمْ : এটা مُسْتَقِلْ جُمْلَهْ হবে এবং جُمْلَهْ فِعْلِيَّهْ হতে পারে।

قَوْلُهُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ الخ : এটা বাক্য হয়ে পূর্ববর্তী يَوَدُّ الْمُجْرِمُ হতে مَفْعُوْلْ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبْ হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ يُنْجِيْهِ : এটা لَوْ يَفْتَدِىْ -এর উপর عَطْف হয়েছে।

يَسْأَلُ শব্দে কেরাতসমূহ এবং বিভিন্ন কেরাতের অর্থসমূহ : يَسْأَلُ শব্দে দু'টি কেরাত। জমহুর এটাকে فَتْحَ দিয়ে يَسْأَلُ পড়েছেন। এর অর্থ কোনো বন্ধু বা আপনজন নিজ আপনজনের কথা জিজ্ঞাসা করবে না। ইবনে কাছীর তাকে ضَمَّة দিয়ে يُسْأَلُ মাজহুলের সীগাহ পড়েছেন। এর অর্থ দাঁড়ায়, কোনো আপনজনকে কোনো আপনজনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তার বন্ধুর বা আপনজনের অবস্থা জানার জন্য। যেমন কোনো লোকের খবর তাদের আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব থেকে নেওয়া হয়ে থাকে যে, সে কোথায় কেমন আছে ইত্যাদি। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ" : مُهْل -এর আভিধানিক অর্থ– গলিত খনিজ পদার্থ, যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি। তৈলের গাদ, কফ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত আয়াতে বিগলিত ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত হাসান (রা.) বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

يَوْمَ শব্দটি মানসূব হওয়ার চারটি কারণ হতে পারে– ১. মানসূব হয়েছে قَرِيْبًا -এর দ্বারা অর্থাৎ يَوْمَ শব্দটি قَرِيْبًا -এর মাফউল হয়েছে। ২. يَوْمَ শব্দটি পূর্বে উল্লিখিত وَاقِعٌ -এর مَفْعُوْلْ অথবা ظَرْف হয়েছে। ৩. يَوْمَ শব্দটি একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাক্যটি ছিল এভাবে يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ كَانَ كَذَا وَكَذَا ৪. يَوْمَ শব্দটি পূর্বের يَوْمٍ হতে بَدَلْ হয়েছে। –[কাবীর]

পাহাড়কে পশমের সাথে তুলনা করার কারণ : পাহাড়কে পশমের সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে– পাহাড়সমূহ লাল, কালো, সাদা অর্থাৎ রংবেরঙের আকার হয়ে থাকে, আর পশম বা উলও তদ্রূপ বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। বিভিন্ন রঙের উল যখন উড়িয়ে দিলে রংবেরঙের আকার ধারণ করবে, পাহাড়সমূহও সেদিন পশমের মতো উড়তে থাকবে। রঙের সাদৃশ্যে উভয়ই সমান রূপের দেখা যাবে। এ কারণে পাহাড়সমূহকে রুইয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। –[কাবীর]

মাদারিক গ্রন্থকার এর তাফসীর ও وَجْه تَشْبِيْه এই বর্ণনা করেছেন যে, كَالْعِهْنِ يَعْنِىْ كَالصُّوْفِ الْمَصْبُوْغِ اَلْوَانًا لِاَنَّ الْجِبَالَ جُدَدٌ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ فَاِذَا بُسَّتْ وَطُيِّرَتْ فِى الْجَوِّ اِشْتَبَهَتِ الْعِهْنَ الْمَنْفُوْشَ. هٰكَذَا قَالَ فِىْ سُوْرَةِ الْقَارِعَةِ - وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ. আর প্রত্যেকেই কার কি অবস্থা ঘটছে তা দেখতে পাবে এবং চোখের উপর ভাসতে থাকবে, তবে কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না, কেবল প্রত্যেকই يَا نَفْسِىْ يَا نَفْسِىْ করতে থাকবে। কেউ কারো ভালোমন্দের কথা চিন্তাও করবে না।

আর কেউ কারো সহানুভূতিও করবে না। কারো কি হচ্ছে তা দেখেও জানতে চাইবে না। নিজের চরম সংকট নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরা আস-সাফ্ফাতের আয়াতে বলা হয়েছে একে অপরকে মুখামুখি প্রশ্ন করবে. আর অত্র সূরার আয়াতে বলা হয়েছে যে কোনো বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না, তাই প্রকাশ্য আয়াতসমূহের দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কিভাবে দ্বন্দ্ব নিরসন করা যাবে।

তার উত্তরে মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, সূরা আসা-সাফ্ফাতের আয়াতে যে পরস্পর প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা পরস্পর বিবাদ স্বরূপ এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদ স্বরূপ প্রশ্নবাণ করার কথা বলা হয়েছে। কোনো কিছু জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করার কথা নয়। এ সুরতে যে প্রশ্ন করবে না বলা হয়েছে এতে জানার অথবা সহানুভূতি করার লক্ষ্যে বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মধ্যে পরস্পর অর্থের দ্বন্দ্ব থাকল না; বরং উভয়ের উদ্দেশ্য সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

مُجْرِمٌ-এর অর্থ এবং আয়াতে তার মর্মার্থ : مُجْرِمٌ শব্দটি جُرْمٌ শব্দ হতে নির্গত। তার অর্থ হলো- অপরাধী, পাপী, অন্যায়কারী। আয়াতে مُجْرِمٌ বলতে কাফির বা যে কোনো পাপী বুঝানো হয়েছে, যে কিয়ামতের দিন অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং জাহান্নামের উপযোগী হবে সে কাফের। যার জন্য জাহান্নাম অবধারিত সে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তার যা কিছু আছে দুনিয়ার সব কিছু দিয়ে হলেও যদি জাহান্নাম হতে মুক্তি পাওয়া যেত তাহলেও ভালো ছিল। সে যেকোনো মূল্যে হোক আজাব হতে বাঁচতে চাইবে; কিন্তু হায়! কিভাবে সে পরিত্রাণ পাবে। -[কাবীর, যিলাল]

জাহান্নামের ডাক : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কাফিরদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বলেছেন, তারা যদি পৃথিবীর যাবতীয় ধন-সম্পদ ও মুক্তিপণরূপে দিতে চায়, তবুও তাতে কোনো কাজ হবে না। তাদের শাস্তির জন্য হবে জাহান্নামের অগ্নিশিখা। এ শাস্তির দু'টি কারণ আল্লাহ তা'আলা এখানে উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো ঈমান না আনা। 'أَدْبَرَ' শব্দ দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছেন। আর দ্বিতীয়টি হলো দুনিয়াদার হওয়া। وَتَوَلَّىٰ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। মানুষ দুনিয়াদার ও বৈষয়িকতাবাদ গ্রহণ করলে স্বভাবতই কৃপণ হয়, সম্পদ পুঞ্জীভূত করে। তাই আল্লাহ বলেছেন, তারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখত; তার জাকাত আদায় করত না। অতঃপর তাদের শাস্তি হলো জাহান্নাম। জাহান্নাম তাদেরকে এভাবে ডাকবে, হে মুশরিক! হে মুনাফিক! এদিকে আসো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, জাহান্নাম কাফের ও মুশরিকগণের নাম ধরে ধরে ডাকতে থাকবে। জবাব না পেয়ে প্রকাণ্ড একটি চিৎকার দিবে। অতঃপর পাখি দানা গলাধঃকরণের ন্যায় তাদেরকে জাহান্নাম গলাধঃকরণ করবে। -[খাযেন, ইবনে কাছীর]

জাহান্নামের ডাকার পদ্ধতি : জাহান্নামের ডাকার পদ্ধতির ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। **এক.** জাহান্নাম কাফেরদেরকে লেসানে হাল তথা অবস্থার ভাষা দ্বারা ডাকবে। **দুই.** আল্লাহ তা'আলা সেদিন জাহান্নামের মাঝে বাক ক্ষমতা সৃষ্টি করবেন এবং সে ডাকবে, 'হে কাফের, হে মুনাফিক' এবং তাদেরকে পাখি যেমন দানা গিলে খায় সেরূপ গিলে খাবে। **তিন.** জাহান্নামের রক্ষীরা সেদিন কাফেরদেরকে ডাকবে। এখানে مُضَافٌ -কে লুপ্ত করে জাহান্নামের সাথে ডাকাকে যুক্ত করা হয়েছে। **চার.** ডাকা-এর অর্থ হলো ধ্বংস করা অর্থাৎ যারা ঈমান থেকে বিমুখ এবং ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখবে তাদেরকে জাহান্নাম ধ্বংস করবে। আরবি ভাষায় دَعَا শব্দটি هَلَكَ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- আরবদের কথা دَعَاكَ اللّٰهُ অর্থাৎ اَهْلَكَكَ -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَاَوْعَىٰ : এ শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যথা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, বেরোখ হয়ে যাবে। লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে অন্যের হক নষ্ট করে সম্পদ যোগাড় করবে। সম্পদ অর্জন করে অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করে রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের হক বিনষ্ট করবে।

অথবা, আকীদা ও চরিত্র ধ্বংস করার অর্থের প্রতি اَدْبَرَ وَ تَوَلّٰى দ্বারা ইশারা করা হয়েছে। মূলকথা হলো এমন গুণাবলি সে নাফরমানগণের মধ্যে পাওয়া যাবে যার কারণে তারা দোজখে প্রবেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

আর جَمَعَ فَاَوْعٰى বলে কাফেরদের مُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ হওয়া বুঝানো হয়নি এবং مُكَلَّفٌ بِالشَّرْعِ হওয়াও আবশ্যক হয় না। কারণ কাফেরদের ঈমান বহাল নেই। সুতরাং তাদের উপর কেবল কুফরির আজাব পতিত হবে এবং গুনাহগার ঈমানদারদের উপর গুনাহের শাস্তি পতিত করা হবে। [আল্লাহই ভালো জানেন।]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٩. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ وَتَفْسِيْرُهُ ـ	১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে হতোদ্যম কৃপণ রূপে حَالٌ مُقَدَّرَةٌ যার ব্যাখ্যা হলো [পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে]।
٢٠. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَقْتَ مَسِّ الشَّرِّ	২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করতে থাকে বিপদ স্পর্শ করার সময়।
٢١. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا وَقْتَ مَسِّ الْخَيْرِ اَىِ الْمَالِ لِحَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُ	২১. আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে হয় অত্যন্ত কৃপণ কল্যাণ স্পর্শ করার সময়, অর্থাৎ সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর তা হতে আল্লাহর হক আদায়ে কার্পণ্য করে।
٢٢. اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ اَىِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ	২২. তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত অর্থাৎ মু'মিনগণ
٢٣. الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ مُوَاظِبُوْنَ ـ	২৩. যারা তাদের সালাত আদায়ে সর্বদা নিষ্ঠাবান সদা পালনকারী।
٢٤. وَالَّذِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ هُوَ الزَّكٰوةُ ـ	২৪. আর যাদের সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক তা হলো যাকাত
٢٥. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ الْمُتَعَفِّفِ عَنِ السُّؤَالِ فَيُحْرَمُ ـ	২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতগণের জন্য যে প্রার্থী না হওয়ার কারণে বঞ্চিত থাকে।
٢٦. وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ ـ	২৬. আর যারা সত্যারোপ করে কর্মফল দিবসের প্রতি কর্মফল লাভের দিন অর্থাৎ কিয়ামত।
٢٧. وَالَّذِيْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ خَائِفُوْنَ ـ	২৭. আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভয় [পোষণকারী] ভীতসন্ত্রস্ত।
٢٨. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ نُزُوْلُهُ ـ	২৮. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। তা অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ هَلُوْعًا : হালে মুকাদ্দারা خُلِقَ হতে। অনুরূপভাবে مَنُوْعًا ও جَزُوْعًا উভয়ই হাল। প্রথম اِذَا টি جَزُوْعًا -এর যরফ, আর দ্বিতীয় اِذَا টি مَنُوْعًا-এর যরফ। اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ মুসতাছনা, اَلْاِنْسَانَ মুসতাছনা মিনহু।

قَوْلُهُ اُولٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ : বাক্যে اُولٰئِكَ মুবতাদা, فِىْ جَنّٰتٍ খবর, এটা مُكْرَمُوْنَ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হতে পারে। مُكْرَمُوْنَ দ্বিতীয় খবর اُولٰئِكَ -এর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে দোজখের আলোচনা করা হয়েছে। অত্র আয়াতসমূহে ঈমানদারদের কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا : هَلُوْعًا শব্দের অর্থ হলো– সংকীর্ণমনা, ছোট অন্তর, অতিশয় কৃপণ, অস্থির প্রকৃতির, অত্যধিক লোভী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে هَلُوْعًا শব্দটির ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াত দু'টিতে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ هَلُوْعًا -এর অর্থ হলো বিপদ-আপদে হা-হুতাশ করা, অধৈর্য হওয়া এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণতা করা, ধন-সম্পদকে কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা। উল্লিখিত আয়াতে اَلْاِنْسَانَ বলতে কি বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমত اِنْسَانٌ দ্বারা এখানে কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এসব কু-স্বভাব হতে মু'মিনদেরকে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত اِنْسَانٌ দ্বারা সাধারণভাবে সকল মানুষকেই বুঝানো হয়েছে; কিন্তু মু'মিনদেরকে পরে বাদ দেওয়া হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী, কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নুষের প্রকৃতিগত স্বভাব এবং আয়াতে মুসল্লিদেরকে ব্যতিক্রম করার কারণ : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ, লোভ-লালসা, পণতা, অস্থিরতা ও ক্রোধ ইত্যাদি গুণাবলি ও স্বভাবগত দুর্বলতার সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। তবে তাদের এ স্বভাবসমূহ ব্যবহারিক ব্রভেদে ভালো ও মন্দ পরিচয় লাভ করে থাকে। যেমন অপচয় না করলে তখন বলা হয় মিতব্যয়িতা। কিন্তু সম্পদ ব্যয় হওয়ার আশঙ্কায় ল্লাহর হুকুমের বিপরীত যাকাত ও দান-সাদকা হতে বিরত থাকলে তখন এ স্বভাবটিকে বলা হয় কৃপণতা। বস্তুত মানুষের স্বভাবগত র্বলতাকে নিয়ন্ত্রিত ও ভারসাম্য রক্ষা করে তারাই চলতে পারে, যারা ঈমানদার ও আল্লাহভীরু হয়। এ স্বভাবসমূহকে নির্মূল করা অসম্ভব াপার, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সঠিক পাত্রে ব্যবহার করাই হলো মূলকথা। ঈমানদার ও আল্লাহভীরু লোকগণ এরূপ পারে বলেই াদেরকে উপরিউক্ত আয়াতসমূহে ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। ঈমানদার না হলে এ স্বভাবগুলো মানুষের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, াকে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিকপাত্রে ব্যবহারের ক্ষমতাই তাদের থাকে না। নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও সঠিক পাত্রে ব্যবহারের শক্তিটি মানুষের মধ্যে মানই জন্ম দেয়। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ جَزُوْعًا وَمَنُوْعًا : এ স্থানে جَزُوْعًا বলতে অস্থির, অধৈর্য, উৎকণ্ঠিত, দুঃখিত ও ঘাবড়ানো ইত্যাদি। এখানে جَزُوْعًا বলে ঐ কল লোকদেরকে উদ্দেশ্য হয়েছে, যারা শরিয়তে ইসলামের নীতিমালার বাহিরে কার্যকলাপ করতে সংকোচ করেন না।
ার مَنُوْعًا বা কৃপণ বলতে ঐ সকল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সচরাচর فَرَائِضْ وَ وَاجِبَاتْ আদায় করতে সংকোচ করে। -[মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ .... الـ : উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকৃতির মানুষকে مُسْتَثْنَىٰ করেছেন।
. প্রথম পর্যায়ে সেই সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর হকসমূহ আদায় করে থাকে, অর্থাৎ فَرَائِضْ خَمْسَةْ -কে রীতিমতো আদায় করে থাকে। আর আল্লাহর জন্য সকল ইবাদত অনবরতভাবে আদায় করে।

مُصَلِّيْنَ দ্বারা اِسْتِثْنَاءْ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদারদের ঈমানের প্রথম ও প্রধান চিহ্ন। ঈমানদার বলার যোগ্য তারাই যারা নামাজ সমাপন করে। আর صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ বলে সে সকল নামাজিদেরকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যারা নামাজের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকায় না।

ইমাম বাগাবী (র.) স্বীয় সনদে "আব্দুল খায়ের" হতে রেওয়ায়েত করে বলেন, আমরা হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন- مُدَاوِمٌ عَلَى الصَّلٰوةِ 'নামাজের উপর অনবরত প্রতিষ্ঠিত' সে ব্যক্তি নয় যে সর্বদা নামাজ পড়ে; বরং সে বক্তিই নামাজের উপর مُدَاوِمٌ যে নামাজের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নামাজের প্রতি খেয়াল রাখে, এদিক-সেদিক লক্ষ্য না করে। যেমন এ অর্থে সূরা মু'মিনূন-এ বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ .... مُحَافَظَةٌ عَلَى الصَّلٰوةِ .

. দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বান্দাগণের হকসমূহ আদায় করে থাকে। তাদের সম্পদে এতিম-মিসকিনদের যে অংশ রয়েছে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রার্থী ও অপ্রার্থীদেরকে দিয়ে থাকেন। এদের মধ্যে তারাও শামিল থাকবে যারা ওয়াদা ভঙ্গ হতে বিরত থাকে, আমানতের খেয়ানত করে না, সত্য সাক্ষীদান করে, এতে কারো পক্ষপাতিত্ব করবে না।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ : আয়াতে উল্লিখিত حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ বা নির্ধারিত হক বলতে কি বুঝায়, সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো তা দ্বারা ইসলাম নির্ধারিত জাকাতের অংশ বুঝানো হয়েছে। কেননা সাধারণ দান-খয়রতের কোনো নির্ধারিত পরিমাণ নেই। এ মতটিই হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান এবং ইবনে সিরীন (র.)-এর। দ্বিতীয় মতটি হলো, তা দ্বারা জাকাত নয়; বরং নফল দান-খয়রাত বুঝায়। কেননা এ আয়াতটি মাক্কী সূরার, আর জাকাত ফরজ হয়েছে মদীনাতে। প্রথম মতের অনুসারীরা বলেন যে, তা দ্বারা জাকাত বুঝায় কেননা প্রাথমিকভাবে মক্কায় জাকাতের কথা বলা হয়েছে এবং মদীনায় তা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তা ছাড়া حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ কথাটি নামাজের সাথে উল্লেখ করায় জাকাত বলেই বুঝা যায় এবং এটা সেসব লোকদের গুণাবলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যরা مَذْمُوْمٌ নন। আর জাকাত আদায় না করলে সে ব্যক্তি مَذْمُوْمٌ হবে। এ কারণে তা দ্বারা জাকাত বলাটাই যুক্তিযুক্ত। -[কাবীর, রুহুল মা'আনী]

سَائِلْ এবং مَحْرُوْمٌ শব্দদ্বয়ের অর্থ : سَائِلْ অর্থ- প্রার্থী, প্রার্থনাকারী, ভিক্ষুক এবং مَحْرُوْمٌ অর্থ বঞ্চিত, অধিকার থেকে বঞ্চিত। এখানে سَائِلْ বা প্রার্থী বলতে পেশাদার ভিক্ষুক বুঝানো হয়নি, সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী লোক বুঝিয়েছে। আর مَحْرُوْمٌ বা বঞ্চিত বলতে বেকার, রুজি-রোজগারহীন বা উপার্জনের চেষ্টা করেও প্রয়োজন পরিমাণ আর্জনে অক্ষম থাকা লোক, অথবা দুর্ঘটনার কবলে নিপতিত বা আকস্মিক বিপদগ্রস্ত হওয়ার দরুন অভাবী হয়ে পড়া লোক, কিংবা উপার্জনে অক্ষম ব্যক্তি বুঝিয়েছে। এ ধরনের লোক সম্পর্কে যখন নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, সে বাস্তবিকই বঞ্চিত, অভাবগ্রস্ত, তখন মু'মিন ব্যক্তি তার প্রার্থনা করার অপেক্ষা না করেই নিজেই অগ্রসর হয়ে আগে-ভাগেই তার সাহায্য করবে, এটাই স্বাভাবিক।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ..... مُشْفِقُوْنَ : উক্ত আয়াতে সে সকল লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর মহাশক্তির কথা বিশ্বাস করে কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে এবং তার শাস্তি হতে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে বিশ্বাস বা আকীদা সত্য এবং আমলসমূহও নেক, তারাই পরিপূর্ণ আকল সম্পন্ন লোক। আল্লাহর সাথে যেমন তাদের সম্পর্ক গভীর তেমনি তাঁর বান্দাদের সঙ্গেও অদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ ..... غَيْرُ مَأْمُوْنٍ : আর তারা এমন লোক যারা কোনো বিপদে ভীত হয়ে যায়। আর আরাম পেয়েও খুব উত্তেজিত হয়ে যায় না। তারা সকল ভালো-মন্দ দুঃখ সব কিছুই নিরর্থক মনে করে। প্রভুর পক্ষ হতে আগত আজাবকে খুবই কঠিন মনে করে থাকে। আর তাদের প্রভুর আজাব হতে রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٩. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ـ

২৯. এবং যারা তাদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে ।

٣٠. اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ مِنَ الْاِمَاءِ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ـ

৩০. হ্যাঁ, তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত ক্রীতদাসীগণ। নিশ্চয় তারা এ জন্য নিন্দিত হবে না।

٣١. فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ الْمُتَجَاوِزُوْنَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ ـ

৩১. অনন্তর যারা এতদ্ভিন্ন অন্য কাউকেও কামনা করে, তবে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের প্রতি সীমালঙ্ঘনকারী।

٣٢. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْاِفْرَادِ مَا اُئْتُمِنُوْا عَلَيْهِ مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَعَهْدِهِمْ الْمَاْخُوْذِ عَلَيْهِمْ فِىْ ذٰلِكَ رٰعُوْنَ حَافِظُوْنَ ـ

৩২. আর যারা তাদের আমানতসমূহের অপর এক কেরাতে শব্দটি একবচন রূপে পঠিত হয়েছে। তার প্রতি দীন বা দুনিয়া সংক্রান্ত যে সকল বিষয় আমানত রাখা হয়েছে এবং তাঁদের অঙ্গীকার যা এ ব্যাপারে তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে। রক্ষাকারী হেফাজতকারী।

٣٣. وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالْجَمْعِ قَآئِمُوْنَ يُقِيْمُوْنَهَا وَلَا يَكْتُمُوْنَهَا ـ

৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অপর এক কেরাতে শব্দটি বহুবচন রূপে পঠিত হয়েছে। অটল তার উপর অবিচল থাকে এবং তা গোপন করে না।

٣٤. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ بِاَدَائِهَا فِىْ اَوْقَاتِهَا ـ

৩৪. এবং যারা তাদের সালাত সম্পর্কে হেফাজতকারী তাকে সময় মতো আদায় করার ব্যাপারে।

٣٥. اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ـ

৩৫. তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।

٣٦. فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ نَحْوَكَ مُهْطِعِيْنَ حَالٌ اَىْ مُدِيْمِى النَّظَرِ ـ

৩৬. কাফেরদের কি হয়েছে যে, আপনার প্রতি আপনার দিকে ছুটে আসছে তা حَالٌ রূপে ব্যবহৃত অর্থাৎ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

٣٧. عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ مِنْكَ عِزِيْنَ حَالٌ اَيْضًا اَىْ جَمَاعَاتٍ حَلَقًا حَلَقًا يَقُوْلُوْنَ اِسْتِهْزَاءً بِالْمُؤْمِنِيْنَ لَئِنْ دَخَلَ هٰؤُلَآءِ الْجَنَّةَ لَنَدْخُلَنَّهَا قَبْلَهُمْ قَالَ تَعَالٰى ـ

৩৭. ডান দিক ও বা দিক হতে আপনার দলে দলে এটাও حَالٌ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তারা দলে দলে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলে, যদি এরা জান্নাতে প্রবেশ করে, তবে আমরাও তাতে প্রবেশ করবো। আল্লাহ তা'আলা তদুত্তরে বলেন।

٣٨. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ـ

৩৮. তাদের প্রত্যেকেই কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩৯. كَلَّا ط رَدْعٌ لَهُمْ عَنْ طَمْعِهِمْ فِى الْجَنَّةِ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ كَغَيْرِهِمْ مِمَّا يَعْلَمُوْنَ مِنْ نُطْفٍ فَلَا يُطْمَعُ بِذٰلِكَ فِى الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا يُطْمَعُ فِيْهَا بِالتَّقْوٰى.

৩৯. না, কখনো নয় এটা তাদের জান্নাত লাভের প্রত্যাশার ব্যাপারে শাসানো উদ্দেশ্য। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি অন্যদের ন্যায় এমন বস্তু হতে যা তারা জ্ঞাত আছে বীর্য হতে, আর তার কল্যাণে জান্নাতের প্রত্যাশা করা যায় না, হ্যাঁ, কেবল তাকওয়ার মাধ্যমেই তা প্রত্যাশা করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَمَنِ ابْتَغٰى الخ : বাক্যটি شَرْط এবং فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ জুমলা হয়ে جَزَاءْ হয়েছে। অতঃপর مَعْطُوْف عَلَيْهِ এবং পরবর্তী বাক্যগুলো مَعْطُوْف হয়েছে এবং এ বাক্যগুলোও شَرْط এবং أُولٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُكْرَمُوْنَ বাক্যটি جَزَاء-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَمَانَاتِهِمْ : আয়াতে দু'টি কেরাত রয়েছে। অধিকাংশ কারীদের মতে, এটা بِصِيْغَةِ جَمْعٍ হয়ে থাকে। অর্থাৎ اَلِف -এর পরে نُوْن - اَمَانَتِهِمْ -কে اَلِف সহকারে পড়া হবে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) بِصِيْغَةِ وَاحِدْ অর্থাৎ اَمَانَتِهِمْ ব্যতীত পড়েছেন।

عَنِ الْيَمِيْنِ এবং عَنِ الشِّمَالِ মুতা'আল্লিক হয়েছে عِزِيْنَ অথবা مُهْطِعِيْنَ -এর সাথে। عِزِيْنَ হাল।

قَوْلُهُ اَنْ يَّدْخُلَ الخ : বাক্যটি يَطْمَعُ -এর মাফঊল হয়েছে। اِنَّا لَقَادِرُوْنَ জওয়াবে কসম। وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ কসমের দ্বিতীয় জবাব অথবা قَادِرٌ হতে হাল।

قَوْلُهُ يَوْمَ يَخْرُجُ : -এর মধ্যস্থ يَوْمَ শব্দটি পূর্ববর্তী يَوْمَ হতে বদল হয়েছে। سِرَاعًا শব্দটি يَخْرُجُوْنَ -এর ফায়েল হতে حَالٌ। আনুরূপভাবে كَاَنَّهُمْ نُصُبٌ - حَالٌ হয়েছে يَخْرُجُوْنَ -এর ফায়েল হতে। خَاشِعَةً - حَالٌ হয়েছে يُوْفِضُوْنَ -এর যমীরে ফায়েল হতে। اَبْصَارُهُمْ মারফূ' হয়েছে خَاشِعَةً -এর ফায়েল হিসাবে। تَرْهَقُهُمْ الخ জুমলায়ে মুস্তানাফা বা حَالٌ হয়েছে يُوْفِضُوْنَ -এর ফায়েল হতে, অথবা يَخْرُجُوْنَ -এর ফায়েল হতে। ذٰلِكَ মুবতাদা اَلْيَوْمَ الخ খবর। অথবা সম্পূর্ণ বাক্যটি মুবতাদা, খবর উহ্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حِفَاظَتْ فَرْج -এর তাৎপর্য : প্রত্যেক বনী আদমকে আল্লাহ তা'আলা পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ অবশ্যই দান করেছেন, এটাই হলো তার যৌনাঙ্গ। আর এ যৌনাঙ্গের হেফাজতের একমাত্র ব্যবস্থাপনা হলো বৈবাহিক জীবন বা বিবাহ বন্ধন এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলন কার্য। এতে যৌনক্ষুধা মিটে যায় এবং জেনার কার্যে ধাবিত হওয়া হতে বিরত থাকা যায়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- اَلنِّكَاحُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ বিবাহ চক্ষুকে নিচু করে দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতেরও বিশেষ বিহিত ব্যবস্থা।

সুতরাং যারা বিয়ে বন্ধন ব্যতীত যৌন স্পৃহা মিটাবে তারা যেন فُرُوْج -কে حِفَاظَتْ করল না, তারাই فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ الخ আয়াতের ধমকির সম্মুখীন হবে। উক্ত আয়াত হতে হযরত ফুকাহায়ে কেরাম এ মাসআলা নির্গত করেন যে, নিকাহে মুত'আ, সমকামিতা, চতুষ্পদজন্তুর সাথে সঙ্গম, হস্ত মৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে যৌন কামনা নিবারণ করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ এ সবগুলোই শরয়ী বিধান মতে সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এ সবগুলোই حُدُوْدُ اللّٰهِ -কে লঙ্ঘন করার অন্তর্ভুক্ত।

-[মাদারিক, মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ : আর যারা তাদের আমানতগুলো সঠিকভাবে রক্ষা করে। চাই দুনিয়ার আমানত হোক অথবা আখেরাতের আমানত হোক।

আমানতের তাৎপর্য হলো তা আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। আমানত দুই শ্রেণির হতে পারে–

১. دُنْيَوِىٌّ যদি হয় তবে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের حُقُوْقٌ বিষয়ক হতে পারে। যেমন কারো রক্ষিত সম্পদ টাকা পয়সা ইত্যাদি কারো নিকট আমানত রাখলে তার সময়মতো সে বস্তুটিই ফিরিয়ে দেওয়া হলো আমানত।

২. আর যদি اُخْرَوِىٌّ হয় তবে ইসলামের বিধিবিধান অথবা নিয়মনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করতে হবে, তবে তো আমানত রক্ষা করা হবে।

হযরত জুনায়েদ (র.) বলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর রক্ষণাবেক্ষণই হলো আমানত। আল্লাহর একত্ববাদের উপর আত্মার অঙ্গীকার বহাল রাখা আর সযত্নে ও সংশোধনের সাথে কোনো বস্তুর উপর স্থিরতা অবলম্বন করার নাম رِعَايَتْ -আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমানতকে খেয়ানত করা, কথা বলতে মিথ্যা কথা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ঝগড়ায় ফিসক ও ফুজূরী করা ইত্যাদি মুনাফিকের চিহ্ন। –[রূহুল মা'আনী]

আমানত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ যার আমানত নেই, তার ঈমান নেই, যার অঙ্গীকার সঠিক থাকে না তার ধর্ম ঠিক থাকে না। সুতরাং আয়াতের লক্ষ্যে হাদীসের মাধ্যমে আমানত রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট তাকিদ ও হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

উক্ত আয়াতে عَهْد অর্থ- وَالْاِيْمَانُ - وَالنُّذُوْرُ - وَعُهُوْدُ خَلْقٍ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা কারো কারো মতে, عَهْدُ مَا اَتَى بِهِ الرَّسُوْلُ ﷺ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে আমাদের নিকট আগমন করেছেন, তা পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিপালন করাকে বলা হয়েছে। –[মাদারিক]

নামাজ সর্বদা কায়েম করা ও সংরক্ষণ করার তাৎপর্য : জাহান্নামের আগুন হতে পরিত্রাণ লাভ ও জান্নাত লাভের প্রথম পূর্বশর্ত মানুষের নামাজি হওয়া। এখানে কথা শুরু করা হয়েছে [২২নং আয়াতে] 'নামাজ কায়েম করুন' দ্বারা এবং কথা শেষ করা হয়েছে 'নামাজ রীতিমতো সংরক্ষণ' দ্বারা। এতে নামাজের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তাই প্রকাশ পায়। আর ঈমানের পরই নামাজ আদায়করণ মু'মিনের প্রাথমিক কর্তব্য এখানে তাই বুঝায়। নামাজ সংরক্ষণ দ্বারা দেহ ও পোশাকের পবিত্রতা, স্থানের পবিত্রতা, দেহ আবৃতকরণ এবং আরকানসমূহ যথারীতি আদায় করা, নামাজে ডানে বামে নজর না করা একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে থাকা, দুনিয়ার শত কাজ ও ঝামেলা ফেলে আজান পড়ার সাথে সাথে জামাতে শরিক হওয়া, আরামকে হারাম করে শীত ও বর্ষায় জামাতে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কার্যাবলিসহ নামাজ আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। সেরূপ নামাজ নয় যেমন মোরগ দানা ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে আহার করে। এরূপ নামাজ দ্বারা ব্যক্তির জীবনে যেমন কোনো পরিবর্তন আসে না, তেমনি সমাজ জীবনেও কোনো প্রভাব রাখে না। উপরিউক্ত ৩৪ নং আয়াতে নামাজ সংরক্ষণের তাৎপর্য এটাই। –[কাবীর]

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوْنَ আয়াতে شَهَادَةٌ **শব্দটিকে বহুবচনে উল্লেখের কারণ :** উপরিউক্ত আয়াতে شَهَادَةٌ শব্দ বহুবচনে উল্লেখ করার পিছনে কারণ হলো, শাহাদত বা সাক্ষ্যদান অনেক প্রকার হতে পারে, সেদিকে ইঙ্গিত করা এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্যদান করা যে অপরিহার্য কর্তব্য, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এতে ঈমান, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্যও শামিল রয়েছে। রমজানের চাঁদ দেখা, শরিয়তের হুদূদ ও মানুষের মাঝে বিভিন্ন সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত। এসব সাক্ষ্য প্রকাশ করা যেমন কর্তব্য তেমনি তা গোপন করা হারাম। এসব সাক্ষ্য সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এটা যে মু'মিন জীবনের একটি মহান ও মহৎ গুণাবলির অন্তর্গত তা এ আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায়। –[মা'আরিফুল কোরআন, কাবীর]

সাক্ষ্যদান বা شَهَادَةٌ যদিও আমানতের মাঝে শামিল রয়েছে তবুও তাকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার ফলে شَهَادَةٌ -এর বিশেষ গুরুত্ব এবং ফজিলত প্রকাশ পায়। কেননা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। হকদার তার প্রাপ্য হক ফিরিয়ে পায়। সমাজ থেকে অন্যায় ও জুলুম দূর হয়। –[কাবীর]

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ **আয়াতের শানে নুযূল :** মক্কার কাফির লোকগণ গ্রুপ গ্রুপ হয়ে নবী করীম ﷺ -এর চতুর্দিকে এসে বসত, আর দীন ইসলাম সম্পর্কে নানা কটূক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করত। গরিব মুসলমান ও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলত, এসব ছোট লোকগণ বুঝি অথৈ নিয়ামতের ভাণ্ডার জান্নাতের আশায় পাগলপারা। তারা যদি জান্নাতী হয়, তবে আমরা তাদের অনেক আগেই জান্নাতী হবো। আল্লাহ তা'আলা এসব কাফিরদের উক্তির জবাবে উপরিউক্ত আয়াত (الاية) فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অবতীর্ণ করেন। –[খাযেন, মা'আলিম, রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... الخ : কাফেরদের হাসিঠাট্টা সম্পর্কে উক্ত আয়াতে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাফেরগণ কুরআনের পবিত্র বর্ণনা শুনে আপনার ডানে বামে ভীত ও আতঙ্কিত চিত্তে বাঁকা ঘাড়ে ছুটে আসছে কেন? আর ভিড় জমাচ্ছে কেন? তারা যেমনিভাবে মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করেছে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে তা কিভাবে হতে পারে। আবার তারা কেমন করে বেহেশতের আশাও করে থাকে। তবে তা তাদের জন্য মিথ্যা ও অবাস্তব স্বপ্ন মাত্র। এ দুঃস্বপ্ন কখনো বাস্তবে রূপায়িত হবে না। আর আমি তাদেরকে কি নিকৃষ্ট বস্তু হতে সৃষ্টি করেছি তা তো তাদের অজানা নয়।

কাফেরগণ রাসূলের দরবারে দৌড়ে আসার কারণ : তার কারণ হলো তাদের চরম ও পরম শত্রু হলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। অতএব তারা তাদের চিরশত্রু হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও দীন ইসলাম, আর মুসলমানগণকে চিরতরে দুনিয়া হতে উৎখাত করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর নিকটে দৌড়ে আসত। যে কোনোভাবেই তাঁকে লজ্জিত ও অপদস্থ করে অথবা যে কোনোভাবেই তাঁকে নিধন করার মানসে তাঁর কাছে আসত।

قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ الخ : كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ বাক্যটি যদি তৎপূর্ববর্তী আয়াতের اَيَطْمَعُ الخ সারমর্ম মনে করা হয়, তখন আয়াতের তাৎপর্য হবে, اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ প্রত্যেক ব্যক্তি এ বেহেশতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে যদি এই হয় যে, বস্তুগত মূল যে উপাদান হতে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তা-ই বেহেশতে যাবে। তবে সকল মানুষ মাত্রই বেহেশতে যাওয়া আবশ্যক হবে। তাতে আলিম, ফাজিল, জাহিল, জালিম, মু'মিন, মুশরিক কেউই বাদ পড়বে না। তবে সাধারণ উপাদানভিত্তিক মানুষ বেহেশতে যাবে না; বরং তাদের গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই মানুষ বেহেশতে যাবে।

নতুবা كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ الخ বাক্যটি তৎপরবর্তী বাক্যগুলো فَلَآ اُقْسِمُ الخ-এর ভূমিকাও হতে পারে। তখন كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ الخ আয়াতের তাৎপর্য হবে, এ লোকেরা নিজেদেরকে আমার আজাব হতে সুরক্ষিত বলে মনে করে, যে লোক তাদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, 'তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-উপহাস করে। অথচ আমার ইচ্ছামতো যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়ার আজাবে নিক্ষেপ করতে পারি। আবার যখন ইচ্ছা পুনরুজ্জীবিত করতে পারবো। এ লোকেরা ভালোভাবেই জানে যে, এক ফোঁটা শুক্রকীট হতে তাদের সৃষ্টির সূচনা করে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়েছি। যদি তারা চিন্তা-বিবেচনা করত, তবে তারা কস্মিনকালেও নিজেদেরকে আমার কর্তৃত্বের আওতা হতে মুক্ত মনে করার মতো চরম একটা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে পারত না।

মানব সৃষ্টির তাৎপর্য এবং জান্নাতে প্রবেশের মাপকাঠি : উল্লিখিত كَلَّآ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হলো, তারা কখনো জান্নাতী হবে না। আমি তাদেরকে কি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি তা তারা অবগত।' এ আয়াতটির মর্ম কয়েকটি হতে পারে। প্রথমত তাকে যদি পূর্ব আয়াতের বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত ভাবা হয়, তবে মর্ম হবে– আমি সমস্ত মানুষকে একই জাগতিক উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এ দিক থেকে তারা এক ও অভিন্ন; কিন্তু জান্নাত লাভ হওয়া না হওয়ার মাপকাঠি এ জাগতিক উপাদান নয়; বরং জান্নাত লাভের জন্য একটি গুণগত মাপকাঠি রয়েছে। আর তা হলো ঈমান ও নেক আমল। সুতরাং তোমরা যতই ভাবনা কেন যে, আমরা একই বস্তুর উপাদানে সৃষ্টি এবং তারা জান্নাতী হলে আমরা তাদের পূর্বেই জান্নাতী হবো, তা তোমাদের অহমিকা ও বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতী হতে পারবে না। দ্বিতীয় মর্ম হলো, আমি তোমাদেরকে কি কারণে সৃষ্টি করেছি তা তোমরা অবগত। অর্থাৎ আমার আদেশ-নিষেধ পুরস্কার ও শাস্তি কার্যকর করার জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অতএব যারা আমার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী চলবে তারাই জান্নাতী হবে এবং যারা চলবে না তারা হবে জাহান্নামী। তৃতীয় মর্ম হলো, আমি তোমাদেরকে কিরূপ সৃষ্টি করেছি তা তোমরা অবশ্যই জ্ঞাত। তোমাদেরকে পশুর ন্যায় সৃষ্টি করিনি। তোমাদেরকে জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক ইত্যাদি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তোমরা কিরূপে জান্নাতী হতে পার তা তোমরাই চিন্তা করে দেখ। –[খাযিন]

Free@ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤٠. فَلَا لَا زَائِدَةٌ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ .

৪০. অনন্তর এখানে لَا অতিরিক্ত আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির সূর্য, চন্দ্র ও সকল নক্ষত্রপুঞ্জ এতে শামিল। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।

٤١. عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ نَأْتِىَ بَدْلَهُمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ بِعَاجِزِيْنَ عَنْ ذٰلِكَ .

৪১. যে, আমি স্থলবর্তী করবো তাদের পরিবর্তে সৃষ্টি করবো, তাদের অপেক্ষা উত্তম সৃষ্টি এবং আমি তাতে অপরাগ নই তা করতে অক্ষম নই।

٤٢. فَذَرْهُمْ اُتْرُكْهُمْ يَخُوْضُوْا فِىْ بَاطِلِهِمْ وَيَلْعَبُوْا فِىْ دُنْيَاهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ فِيْهِ الْعَذَابَ .

৪২. অতএব তাদেরকে থাকতে দিন ত্যাগ করুন বাক-বিতণ্ডায় তাদের বাতিল বিশ্বাসে এবং ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত তাদের পার্থিব অবস্থায় যাবৎ তারা সম্মুখীন হয় মিলিত হয় সে দিবসের, যা সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। তাতে সংঘটিত শাস্তির বিষয়ে।

٤٣. يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ الْقُبُوْرِ سِرَاعًا اِلَى الْمَحْشَرِ كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْحَرْفَيْنِ شَىْءٌ مَنْصُوْبٌ كَعَلَمٍ اَوْ رَايَةٍ يُّوْفِضُوْنَ يُسْرِعُوْنَ .

৪৩. সেদিন তারা কবর হতে বের হবে সমাধি হতে দ্রুত বেগে হাশর মাঠের প্রতি যেন তারা কোনো লক্ষ্য বস্তুর প্রতি অপর এক কেরাতে শব্দটি উভয় অক্ষরে পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সে বস্তু যা গেড়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন পতাকা ও ঝাণ্ডা ইত্যাদি ধাবিত হয়েছে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে।

٤٤. خَاشِعَةً ذَلِيْلَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ تَغْشٰهُمْ ذِلَّةٌ ط ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ذٰلِكَ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ الْخَبَرُ وَمَعْنَاهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

৪৪. অবনমিত ক্ষেত্রে দীন-হীনভাবে তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ঢেকে রাখবে হীনতা, এটাই সেদিন, যার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছিল। ذٰلِكَ মুবতাদা ও তৎপরবর্তী বাক্যাংশ তার খবর। আর এর অর্থ হলো কিয়ামত দিবস।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ .... بِمَسْبُوْقِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা مَشَارِقُ وَمَغَارِبُ-এর শপথ করে বলেছেন যে, তিনি তার পৃথিবীর নাফরমানদেরকে চির নস্যাৎ করে তদস্থলে উত্তম ও ভিন্ন জাতিকে বসিয়ে দিতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাশীল, তাতে তিনি কারো নিকট ঠেকবেন না। অর্থাৎ কোনো শক্তিই তাকে কিছুই করার নেই।

Free @ www.eilm.weebly.com

مَشَارِقْ وَمَغَارِبْ শব্দদ্বয়কে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ : এর বিভিন্ন কারণ হতে পারে–

১. প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যহ সূর্য একই স্থান দিয়ে উদয় ও অস্ত যায় না; বরং প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিয়ে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। তদ্রূপভাবে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয়স্থল ও অস্তস্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা مَشَارِقْ وَمَغَارِبْ -কে বহুবচনের শব্দ দ্বারা ব্যবহার করেছেন।

২. অথবা, এটাও বলা যায় যে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য নিজগতিতে চলমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ الخ -সুতরাং সূর্য যেহেতু প্রতিদিন উদয় ও অস্ত হয়েছে, তাই রাত্রিকালে তা (সূর্য) আমাদের বিপরীত দিকে অবস্থান করে। তাতে পৃথিবীর এক অংশে যখন রাত তখন অপর অংশে দিন থাকে। এ হিসাবে সূর্যের উদয় ও অস্তস্থল বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা مَشَارِقْ ও مَغَارِبْ -কে বহুবচন ব্যবহার করেছেন।

অত্র আয়াতে مَشَارِقْ وَمَغَارِبْ শব্দদ্বয় বহুবচনে এসেছে এবং অন্য আয়াতে مَشْرِقَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ শব্দদ্বয় দ্বিবচনে এসেছে অপর এক আয়াতে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ শব্দদ্বয় একবচনে এসেছে। সুতরাং এদের মধ্যে সামঞ্জস্য কিভাবে হবে? : এর উত্তরে বলা যায় যে, যে আয়াতে مَشَارِقْ ও مَغَارِبْ -কে বহুবচনে নেওয়া হয়েছে, সেখানে বছরের বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনে উদয়াচল ও অস্তাচলের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যে স্থানে مَشْرِقَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ -কে দ্বিবচনে নেওয়া হয়েছে সে আয়াতে مَشْرِقُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ এবং مَغْرِبُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ -এর লক্ষ্যে দ্বিবচন নেওয়া হয়েছে। আর যে আয়াতে مَشْرِقْ وَمَغْرِبْ -কে একবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে সাধারণভাবে উদয় ও অস্তের দিক হিসাবে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের অনুসারে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

(هٰذَا هُوَ التَّوْفِيْقُ مَا بَيْنَ الْاٰيَاتِ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِالْحَقَائِقِ)

نُبَدِّلَ خَيْرًا বলে আল্লাহ তা'আলা কোন দিকের উত্তমতা বুঝিয়েছেন? : সাবী গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাতে বলতে চান যে, পরিবর্তিত জাতির অবস্থা পরিবর্তন করে দিবো সৃষ্টিগত দিক হতে। অতএব, তারা শারীরিক মানসিক ও অন্যান্য গুণাবলিতে অতি উন্নততর হবে। অর্থাৎ তারা খুবই ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট হবে, ধন-দৌলতেও খুব ভরপুর হবে। দৈহিক শক্তিতেও শক্তিশালী, বড় শরীর বিশিষ্ট হবে, প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে খুবই প্রসারতা লাভ করবে এবং তারা আপনার বাক্য ও দাওয়াতের কথা শ্রবণে আপনাকে ইজ্জতদানে এবং আমার ও আপনার সন্তুষ্টিমূলক কার্যে খুব বেশি অগ্রসর হতে থাকবে।

অতঃপর তাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা হযরত সাহাবায়ে কেরামগণকে সৃষ্টি করেছেন। তদ্রূপ তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণকেও সৃষ্টি করেছেন। আর তাদেরকে جَبَّارِيْنَ আর قَهَّارِيْنَ দের ধনমাল ও রাজত্ব প্রদান করেছেন এবং পৃথিবীতে তারা যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করতে থাকেন। –[সাবী] সর্বশেষ ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব তাদেরই হস্তে থাকবে।

কারো কারো মতে, সে জাতির মধ্যেই تَبْدِيْل حَقِيْقِىْ হয়েছে। আর কারো কারো মতে, তাদের পরবর্তী জাতিগণের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আর তারাও কুফরি ও নাফরমানির মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا الخ : সুতরাং হে রাসূলুল্লাহ ﷺ! এখন আপনি তাদের সাথে অধিক পরিমাণে কিছু বলবেন না, আর তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর থাকতে দিন। তাদেরকে তাদের দুনিয়াদারীর কার্যে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হতে দিন। শেষ পর্যন্ত যেন কিয়ামতের দিন আগমন করে। অর্থাৎ সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কবরসমূহ হতে জীবিত হয়ে তাড়াতাড়ি বের হতে থাকবে। যেভাবে তারা দুনিয়াতে খুবই উত্তেজনার সাথে মন্দিরের দিকে গিয়েছিল। তখন লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকবে এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তারা কম্পিত হতে থাকবে। এটাই সেদিন যেদিন সম্পর্কে অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছিল এবং ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল।

خَوْض এবং لَعْبٌ -এর অর্থ : خَوْضٌ শব্দের অর্থ– বানাওয়াট করা, কথা বানিয়ে বলা। আর لَعْبٌ অর্থ– খেলা করা, এখানে لَعْبٌ শব্দটি তামাশাচ্ছল বা হাসিঠাট্টা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং خَوْضٌ وَلَعْبٌ অর্থ হবে, তারা নিজ নিজ খেয়াল-খুশিমতে নিজেদের জীবন যাপন করতে দেওয়া। শরিয়তের বিধিবিধান অথবা নবীর নির্দেশের কোনো তোয়াক্কা না করা। বাতিল পন্থায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে জীবন ধ্বংস করা।

আল্লাহ হেদায়েতদানকারী তথাপিও আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন, তাদেরকে তামাশাচ্ছলে চলতে দিন? : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককেই হেদায়েত দান করবেন এবং হেদায়েতের জন্য একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং কুরআন মাজীদেও বলা হয়েছে, তা মুত্তাকীনদের হেদায়েতের জন্য। অর্থাৎ যারা হেদায়েত কবুল করে তাদের জন্য হেদায়েতের বাণী। আর বান্দাগণকে ইহকাল ও পরকালের ভালোমন্দ বিবেচনা করে ভালো পথে চলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ইচ্ছা করলে মন্দপথেও চলতে পারবে, তবে মন্দ পথে চলাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। তবে বান্দাকে যেহেতু চলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে যে পথে চলতে চাইবে আল্লাহ সে পথেই চালাবেন। আবার মন্দ পথে চলার ক্ষতিগ্রস্ততা সম্বন্ধেও জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব, ইচ্ছাধীন চলার জন্য সুযোগ দেওয়ার কথা বলে মূলত তাদেরকে ধমক দিয়েছেন। অসৎ পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে তাদেরকে বলা হবে- وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার জীবনে যে দোজখকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছ, সে মিথ্যার প্রতিফলে আজ দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকো।

আর উক্ত আয়াতে ذَرْ শব্দটির দ্বারা যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ প্রকার اَمْر -কে تَوْهِيْن বা تَهْدِيْد -এর জন্য ব্যবহার করা যাবে।

اَلنُّصُبْ দ্বারা উদ্দেশ্য : نُصُبْ শব্দের উদ্দেশ্য হলো কোনো উড্ডয়মান পতাকা যা অনুসরণ করে ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে থাকে, এরূপ অবস্থা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর আবূ আমর বলেন- هِىَ شَبَكَةُ الصَّائِدِ অর্থাৎ نَصَبْ হলো শিকারির খোঁচা মারা বা আঘাত করা।

نُصُبْ শব্দের মর্মার্থ এবং তাতে পঠিত কেরাতসমূহ : نُصُبْ -এর অর্থ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ মূর্তি। সুতরাং তাঁদের মতে এ বাক্যটির মর্ম হলো, হাশরের দিন কবর হতে উত্থিত হয়ে তারা নির্দিষ্ট একটি স্থানের দিকে এমনভাবে দৌড়াবে যেমন বর্তমানে তারা দেবদেবীর বেদীমূলের দিকে দৌড়ে থাকে। কতেক তাফসীরকার বলেছেন, তার অর্থ হলো- দৌড়ের প্রতিযোগীদের জন্য নির্ধারিত সে নিশানাটি যে পর্যন্ত সর্বাগ্রে পৌঁছার উদ্দেশ্যে প্রতিযোগীগণ প্রাণপণ চেষ্টা চালায়।

نُصُبْ শব্দটি তিনটি কেরাতে পড়া হয়েছে। এক. "ن" এবং "ص" অক্ষরদ্বয়ে পেশ দ্বারা তখন অর্থ হবে প্রতিমা বা দেবদেবীগণ যার পূজা করা হতো। দুই. "ن" অক্ষরে পেশ এবং "ص" -এ জযম দ্বারা ضُعْف -এর ওজনে। তিন. "ن"-এ যবর এবং "ص"-এ জযম দ্বারা তখন অর্থ হবে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ نُوْحٍ : সূরা নূহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম হলো 'নূহ'। অত্র সূরার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে বিধায় এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২২৪টি বাক্য এবং ৯২৯টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতারিত প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত। অত্র সূরা অবতীর্ণের সঠিক সময়কালটি কখন তা বলা যায় না; কিন্তু বিষয়বস্তু হতে অনুমান হয় যে, মক্কায় কাফেরদের ইসলাম ও মহানবীর প্রতি বিরোধিতা যখন তীব্র আকার ধারণ করেছিল, তখনই প্রাচীন ইতিহাস হতে তাদের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

বিষয়বস্তু ও সারমর্ম : এ সূরাতে হযরত নূহ (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু তা সাধারণ কাহিনী রূপে নয়। মক্কার কুরাইশ কাফেরদরকে সতর্ককরণে যেটুকু বিষয়বস্তু আলোচনার প্রয়োজন ছিল, ঠিক ততটুকুই আলোচনা করা হয়েছে। এ কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সময় তখনকার জনগণ ও সমাজপতিগণ যে আচার-আচরণ ও ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তোমরাও ঠিক অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছ। অতএব তাদের যে পরিণতি ঘটেছে, তোমাদেরও অনুরূপ নির্মম পরিণতির সম্মুখীন হওয়া বিচিত্র নয়। প্রথম থেকে ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আজাব আপতিত না হওয়া পর্যন্ত দীনের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর নির্দেশ মাফিক স্বীয় পরিচয় তুলে ধরে তাদের কাছে আল্লাহর দাসত্ব, নবীর আনুগত্য এবং আল্লাহ ভীরুতা অবলম্বন, এ তিন দফা দাওয়াত পেশ করলেন। আর তিনি বললেন, এ দাওয়াত গ্রহণ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট একটি সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন; কিন্তু তাঁর নির্ধারিত সময়কালটির আগমন হলে তোমাদেরকে আর কোনো অবকাশ দেওয়া হবে না। হযরত নূহ (আ.) দিবারাত্রি গোপনে প্রকাশ্যে কৌশল অবলম্বন করে স্বীয় সম্প্রদায়কে দীনের পথে আনার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাদের বোধোদয় হলো না। তারা হযরত নূহ (আ.) -এর কথা শুনলেই কানে আঙুল দিত এবং মুখমণ্ডল ঢেকে সরে পড়ত। তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে লাগল। সমাজপতিগণ অহংকার ও দাম্ভিকতাসহ এ আন্দোলন ও দাওয়াতের বিরোধিতায় অবিচল রইল। হযরত নূহ (আ.) বললেন, তোমরা এ তিন দফা দাওয়াত মনে-প্রাণে গ্রহণ করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি মহাক্ষমাশীল এবং তোমাদের জন্য আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেশকে সুজলা-সুফলা করে তুলবেন। তোমাদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

১৫ থেকে ২০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বলোক সৃষ্টি, মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি, আকাশকে সপ্তস্তরে বিন্যস্তকরণ, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির উপকারিতা, উদ্ভিদের ন্যায় মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে ক্রমোন্নতি দান, সে মাটিতেই বিলীন হওয়া এবং ঐ মাটি হতেই পুনরায় উথিত হওয়া। পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করে মানুষের চলাচলের উপযোগী করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত, মহত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব এবং একচ্ছত্র আধিপত্যকে হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে তৎকালীন লোকদের কাছে তুলে ধরেছেন।

২১ থেকে ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত নূহ (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের হেদায়েতের ব্যাপারে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থায় উপনীত হয়ে বললেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জনগণ আমার অবাধ্য। তারা সমাজপতি ও গোত্রীয় সরদারদের কথা মেনে চলছে। অথচ তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তাদের ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতাই ডেকে আনছে। সমাজ পতিগণ আমার ও দীনি আন্দোলনের বিরোধিতায় সোচ্চারকণ্ঠ এবং কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা জনগণকে উদ্দা, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর প্রতিমার পূজা পরিত্যাগ না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করে আসছে। তারা বহু মানুষকে এ পথে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা শিরক-এর অপরাধে তাদেরকে মহা প্লাবনের পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন। এটাই ছিল তাদের পার্থিব শাস্তি। আর পরকালে তাদেরকে নিক্ষেপ করবেন জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে।

২৬ থেকে ২৮ নং পর্যন্ত আয়াতে হযরত নূহ (আ.) চরম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায়ের বেঈমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য যে বদদোয়া করেছেন, তা তুলে ধরা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.) প্রার্থনা করলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের বেঈমানগণকে গজবে নিপতিত করে সমূলে ধ্বংস করুন। একটিকেও অব্যহতি দিবেন না। কোনোটিকে অব্যহতি দিলে তারা আপনার ঈমানদার বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে এবং দুষ্কৃতকারী ও কাফের-বেঈমান জন্ম দিয়ে দুনিয়াকে শিরকী ও পাপাচারে ভরে ফেলবে। আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ও আমার সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে, আর সকল যুগের মুসলিম নর-নারীগণকে আপনার করুণায় ক্ষমা করে দিন, আপনি মহাক্ষমাশীল ও করুণাময়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ نُوحٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مَكِّيَّةٌ : সূরা নূহ মক্কায় অবতীর্ণ

ثَمَانٍ اَوْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২৮ বা ২৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ أَىْ بِالْإِنْذَارِ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا عَذَابٌ أَلِيْمٌ مُؤْلِمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

১. নিশ্চয় আমি নূহকে প্রেরণ করলাম, তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি যে, তুমি ভয় প্রদর্শন করো অর্থাৎ ভয় প্রদর্শন করার নির্দেশসহ তোমার সম্প্রদায়কে তাদের নিকট আগমনের পূর্বে যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে পীড়াদায়ক শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদানকারী।

২. قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيِّنُ الْإِنْذَارِ .

২. সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

৩. أَنِ أَىْ بِأَنْ أَقُوْلَ لَكُمْ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ .

৩. যে, অর্থাৎ এ বিষয়ে যে, আমি তোমাদেরকে বলছি আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো।

৪. يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ مِنْ زَائِدَةٌ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يُغْفَرُ بِهٖ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَبْعِيْضِيَّةٌ لِإِخْرَاجِ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَيُؤَخِّرْكُمْ بِلَا عَذَابٍ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ط أَجَلِ الْمَوْتِ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ بِعَذَابِكُمْ إِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ م لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ لَاٰمَنْتُمْ .

৪. তিনি তোমাদের পাপ মার্জনা করে দিবেন এখানে مِنْ অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারণ ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা তৎপূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়। অথবা, مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْضِيَّةٌ 'কতিপয়' অর্থব্যঞ্জক, যাতে তা হতে বান্দার হকের পৃথকীকরণ হয়, যেহেতু তা ক্ষমা হয় না। আর তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দান করবেন শাস্তি দান ব্যতিরেকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত মৃত্যুকাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময় তোমাদের শাস্তিদানে, যদি তোমরা ঈমান আনয়ন না কর। যখন আসবে তখন বিলম্ব করা হবে না। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে। তা, তবে তোমরা ঈমান আনয়ন করতে।

৫. قَالَ رَبِّ إِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا دَائِمًا مُتَّصِلًا .

৫. সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক? আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি ডাকছি সর্বদা ক্রমাগত।

٦. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْٓ اِلَّا فِرَارًا عَنِ الْاِيْمَانِ .

৬. কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন-প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে ঈমান আনয়ন হতে।

٧. وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ لِئَلَّا يَسْمَعُوْا كَلَامِىْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ غَطَّوْا رُؤُوْسَهُمْ بِهَا لِئَلَّا يَنْظُرُوْنِىْ وَاَصَرُّوْا عَلٰى كُفْرِهِمْ وَاسْتَكْبَرُوْا تَكَبَّرُوْا عَنِ الْاِيْمَانِ اِسْتِكْبَارًا .

৭. আর যখনই তাদেরকে আহ্বান করি, যাতে আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তখনই তারা কর্ণে অঙ্গুলি স্থাপন করে যাতে তারা আমার বক্তব্য না শুনে। আর তারা নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে তা দ্বারা নিজেদের মস্তক আবৃত করে রাখে, যেন তারা আমাকে না দেখে। আর তারা হঠকারিতা প্রদর্শন করে তাদের কুফরি আচরণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ঈমান আনয়ন প্রশ্নে জঘন্য রূপে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরা আল-মা'আরিজে এসেছে যে, اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ অর্থাৎ 'অবশ্যই আমি তোমাদের স্থলে উত্তম জাতি আনয়নে সক্ষম।'

এরপরই সূরা নূহে হযরত নূহ (আ.) -এর জাতির কথা বর্ণিত হয়েছে। কিভাবে তাদেরকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়েছে। পৃথবীতে তাদের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট থাকেনি। এভাবে পূর্ববর্তী সূরার ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

সংক্ষিপ্তভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা : হযরত নূহ (আ.) হলেন হযরত ইদরীস (আ.)-এর বংশধর নবী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল গাফফার। তবে তিনি স্বীয় নেক আমলের স্বল্পতা এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে সর্বদা কান্নাকাটি করতে থাকতেন, তাই তার নাম হয়ে গেল نُوْحٌ। তাঁর যুগের মানুষের মধ্যে কুফরি ও শিরক সীমাহীনভাবে বেড়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তখন হযরত নূহ (আ.)-কে পয়গাম্বর বানিয়ে মানুষদের হেদায়েতের জন্য পাঠালেন। প্রথমে মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে আনতে শুরু করলেন। এভাবে বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ চলে যেতে লাগল, কিন্তু মানুষ কিছুতেই তাঁর কথার প্রতি লক্ষ্য করছিল না; বরং তাদের কুফরির পর্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। সারা জীবনে তিনি মাত্র ৮০ জন মানুষকে হিদায়েত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একদা তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, যখন তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে এবং তাদের অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, তারা হেদায়েত কবুল করবে না। আর তাদের বংশধরগণও ঈমান গ্রহণ করবে না। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বৃক্ষ রোপণের নির্দেশ মেতাবেক বৃক্ষ রোপণ করলেন। ৪০ বছর পর সে বৃক্ষের দ্বারা তাঁকে নৌকা বানানোর নির্দেশ প্রদান করা হলো। ৬০০ গজ লম্বা এবং ৩০০ গজ চওড়া নৌকা বানানো হলো এবং আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সকল প্রকার জীব জন্তুর এক এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নেওয়ার নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, যাতে نَسْل বিনষ্ট না হয়। যখন নৌকা তৈরি করছিলেন, তখনো কাফেরগণ তার সম্মুখে এসে নৌকা বানাতে দেখে বলত হে নূহ! তুমি কি নবুয়ত হারিয়ে মিস্ত্রি হয়ে গেছ? কি পয়গাম্বরীর কাজ সমাপ্ত করেছ? আবার কখনো বলত, বড় মিয়া, নৌকা তো তৈরি করছ তবে পানি কোথা হতে আনয়ন করবেন? যা হোক হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর হুকুমে ঈমানদারদেরকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে গেলেন। তাদের নাফরমানির কারণে অনবরত ৪০ দিন পর্যন্ত তুফান ও তুফান বৃষ্টি বর্ষণ হলো এবং সকল নদী-নালা ভরে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত ৪০ গজ পানির নিচে তলিয়ে গেল। فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ হযরত নূহ (আ.) নৌকায় সওয়ার হওয়ার পূর্বে তাঁর ছেলে কেনানকে নৌকায় আরোহণ করতে আহ্বান করলেন। তার ছেলে তখন উত্তর দিল–আমি পাহাড়ের আশ্রয়ে থাকবো, যাতে পানির প্লাবন হতে রক্ষা পেয়ে যাবো। শেষ পর্যন্ত সেও ডুবে মরল। অপর দিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ الخ -এর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রেক্ষিতে উত্তর দিলেন إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ إِنِّيْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ. এরপর হযরত নূহ (আ.) পুনঃ আল্লাহর নিকট উক্ত দোয়া হতে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। যখন তাঁর নৌকা কা'বা শরীফের বরাবর উপস্থিত হলো এবং جُوْدِىْ পাহাড়ের তলায় এসে পৌছল, তখন ছয়মাস সময় তুফানের পর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং তুফান বন্ধ হয়ে গেল। পুনরায় তাঁর ঔরস থেকেই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল, তুফানের পরবর্তী বংশধর তাঁর তিন ছেলের ঔরস মাত্র।

১. সাম (سَامٌ) আরব ও পারস্য অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ।

২. হাম (حَامٌ) সুদান, হিন্দু, সিন্ধু, কিবতী ইত্যাদির পূর্বপুরুষ।

৩. ইয়াফাস (يَافِسْ) তুরকী, চীন, ইয়াজুজ মাজুজ ইত্যাদিদের পূর্বপুরুষ।

এ জন্যই হযরত নূহ (আ.)-কে اٰدَمُ ثَانِىْ বলা হয়। অথবা, نَجِىُّ اللّٰهِ شَيْخُ الْاَنْبِيَاءِ ও বলা হয়। দিবারাত্র তিনি তিনশত রাকাত নামাজ আদায় করতেন, তাঁর বয়স ছিল ১ হাজার চারশত বছর, অথবা নয়শত পঞ্চাশ বছর ছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর লাশ মুবারক بَيْتُ الْمَقْدِسْ শরীফে দাফন করা হয়েছে।

নূহ শব্দটির অর্থ : নূহ শব্দটি অনারবীয় শব্দ। কিরমানী বলেন, এটা সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে- নিশ্চুপ, অবিচল, স্থির। এ শব্দটি তিন অক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যের অক্ষর সাকিন হওয়ার কারণে মুনসারেফ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, نُوْحٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে- অতিশয় কাকুতিমিনতি করা, ক্রন্দন করা। তিনি অতিশয় কাকুতিমিনতি ও ক্রন্দন করতেন বলে তাঁকে নূহ নামে ডাকা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন? 'কাওমে নূহ' কারা? : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম।' হযরত নূহ (আ.) কি রাসূল ছিলেন এবং হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় কারা? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا এ কথায় বুঝা যায় হযরত নূহ (আ.) রাসূল বা প্রেরিত। তিনি রাসূল ছিলেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এটা সর্বসম্মত অভিমত। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

হযরত নূহ (আ.) -এর কওম সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হচ্ছে, জাযীরাতুল আরবের অধিবাসীগণ। তদানীন্তন কালে যারা আরব উপদ্বীপে বাস করত তারাই ছিল হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়। কেউ কেউ বলেন, হযরত নূহ (আ.) -এর কওম হয়েছে যারা জাযীরাতুল আরব এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতেন তারা। কেউ কেউ বলেন, যাঁরা কূফা এবং কূফার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের অধিবাসী ছিলেন তারাই হযরত নূহ (আ.)-এর কওম। -[রূহুল মা'আনী]

أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ ..... عَذَابٌ أَلِيْمٌ আয়াতে عَذَابٌ أَلِيْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উপরিউক্ত আয়াতে عَذَابٌ أَلِيْمٌ-এর অর্থ সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে। **এক.** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে عَذَابٌ أَلِيْمٌ-এখানে পরকালের দোজখের আগুন বুঝানো হয়েছে। **দুই.** কালবী (র.)-এর মতে عَذَابٌ أَلِيْمٌ দ্বারা হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের প্রতি যে প্রলয় বা তুফান পাঠানো হয়েছিল, তা বুঝানো হয়েছে। **তিন.** তৃতীয় মতটি হলো, عَذَابٌ أَلِيْمٌ দ্বারা মূলত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা বলা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনবে না। এ অভিমত অনুযায়ী عَذَابٌ أَلِيْمٌ-এর অর্থ عَامٌّ বা ব্যাপক। হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমকে দাওয়াত দিতেন এবং পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করতেন, কিন্তু তাঁর কওম এ দাওয়াত গ্রহণ করত না; বরং তাকে অত্যাচার করে বেহুঁশ করে দিত। তখন তিনি বললেন "হে আমার প্রভু! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করো। তারা আমাকে প্রকৃতপক্ষে জানে না, চিনে না।" -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ." : 'ইবাদত' বলতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ সর্বাবস্থায় মেনে চলা বুঝায়। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার অর্থ হলো তাঁর সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কাজ, তা অন্তরের কাজই হোক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজই হোক আদায় করা, মেনে চলা। 'তাকওয়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বেঁচে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

থাকা, বিরত থাকা, ভয় করা। তাকওয়া বলতে সাধারণত আমরা আল্লাহভীতি এবং পরহেজগারিতা বুঝি। আয়াতে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়ে সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা মেনে নিতে এবং তাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। −[কাবীর]

হযরত নূহ (আ.)-এর আনুগত্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা এবং তাঁর প্রতি ভয়ভীতির নির্দেশের মাঝে যদিও হযরত নূহ (আ.)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ শামিল আছে এবং আল্লাহর ইবাদত করতে গেলে, তাঁর বিধি-নিষেধকে ভয়ভীতির সাথে পালন করতে গেলে তাঁর নবীকেও মানতে হয়, তবুও বিশেষভাবে হযরত নূহ (আ.) -এর আনুগত্যের কথা উল্লেখ করে তার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বিশেষ তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। আর তা যে বান্দাদের উপর বিশেষ কর্তব্য তা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। −[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "এবং তিনি তোমাদের অবকাশ দান করবেন নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।" সুতরাং প্রশ্ন হলো কিভাবে তিনি অবকাশ দানের কথা বললেন অথচ তিনিই (অন্যত্র) জানিয়েছেন নির্ধারিত সময়ের পর কোনো অবকাশ দেওয়া হয় না− এটা কি পরস্পর বিরোধী কথা নয়? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়−

আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন লাওহে মাহফূযে। তিনি সেখানে বান্দার আজল বা সময় দুই ধরনের নির্ধারণ করেছেন। قَطْعِيٌّ এবং مُعَلَّقٌ। قَطْعِيٌّ যেমন, অমুক ব্যক্তি এক শত বছর বাঁচবে। مُعَلَّقٌ যেমন, অমুক ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর বাঁচবে তবে আল্লাহর আনুগত্য বা অমুক কাজ করলে সত্তর বছর বাঁচবে। আল্লাহ তা'আলা জানেন, সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করবে কিনা? এবং সে মোট কতদিন বাঁচবে, তা লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে এবং তাই আযলে কাতয়ী। ফেরেশতার নিকট আল্লাহ তা'আলা বান্দার যে সময়সীমা জানিয়ে দেন তা আযলে মু'আল্লাক উল্লেখ থাকে এবং তাতেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটানো হয়। এ কথাটাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে− يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তা মিটিয়ে দেন এবং যা চান ঠিক রাখেন এবং তাঁর নিকটই মূল কিতাব রয়েছে।' মূল কিতাব বলতে লাওহে মাহফূয বুঝানো হয়েছে। তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ফেরেশতার নিকট যে আযল লিপিবদ্ধ আছে তাতেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে। তা হতেই বুঝা যা যে, এ দুয়ের মাঝে কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। −[রূহুল মা'আনী, মা'আরিফুল কুরআন, কাবীর]

وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ -এর অর্থ এবং কাপড়াবৃত করার কারণ : وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ -এর অর্থ− তারা যখন হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত শুনত তখন নিজেদের মস্তক বা মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত। তাঁর দাওয়াতকে গ্রহণ করত না। তাঁর সাথে দেখা করতে চাইত না। তাদের নিজেদের মস্তক বা মুখমণ্ডল কাপড় দিয়ে ঢাকার কয়েকটি কারণ হতে পারে। **এক.** এ জন্য যে, তারা হযরত নূহ (আ.)-এর কথা শুনা তো দূরের কথা, তাঁর মুখ দেখতেও প্রস্তুত ছিল না। **দুই.** তারা এরূপ করত এ জন্য যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সম্মুখ দিয়ে মুখ ঢেকে এমনভাবে চলে যেত যেন তাদেরকে চিনতে পেরে হযরত নূহ (আ.) তাদের সাথে কথা বলারও সুযোগ না পান। −[কাবীর]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : উক্ত আয়াতের প্রথম অংশ يُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সময় দেওয়া যাবে এবং শেষাংশ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ দ্বারা বুঝা যায় যে তাদেরকে সময় দেওয়া হবে না। সুতরাং আয়াতটির এক অংশ অপর অংশের জন্য প্রকাশ্য বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

এ দ্বন্দ্বের تَطْبِيقٌ এরূপে দেওয়া যায় যে, এখানে يُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى দ্বারা অর্থ হলো, تَأْخِيرُهُمْ بِلَا عَذَابٍ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْإِيمَانِ إِلَىٰ أَجَلِ الْمَوْتِ তাদেরকে মৃত্যুর মূল নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঈমান থাকা অবস্থায় শাস্তি দিবেন না। আর إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ অর্থ হবে− عَدَمُ تَأْخِيرِ أَجَلِ الْعَذَابِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِيمَانِ ঈমান না থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দান করতে বিলম্ব করবেন না। এরূপ অর্থে আয়াতের প্রথম ও শেষাংশের মধ্যে কোনো تَعَارُضٌ থাকে না। তবে এ তাফসীর অনুসারে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রমাণিত হয় যে, أَجَلْ মোট দু'টি يَعْنِى الاَجَلُ اَجَلاَنِ - قَرِيبٌ غَيْرُ مُبْرَمٍ - بَعِيْدٌ مُبْرَمٌ وَهُوَ الاَجَلُ الْمُسَمّٰى অর্থাৎ أَجَلْ মৃত্যু সময় মোট দু'টি। একটি হলো أَجَلْ قَرِيبْ নিকটতম সময় যা অন্য কোনো অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট, আর অপরটি হলো أَجَلْ بَعِيْدْ যা দূরবর্তী সময় এবং তা কোনো শর্তের সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই أَجَلْ مُسَمّٰى দ্বারা উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-এর তাৎপর্য হলো, যদি তোমরা জানতে যে তোমাদের উপর কি আজাব অবতীর্ণ হবে তোমাদের হায়াত শেষ হওয়ার মুহূর্তে তবে অবশ্যই তোমরা ঈমান আনতে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ ...... وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا : বছরের পর বছর হেদায়েতের পর হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাতির ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেন, হে প্রভু! আমার জাতিকে আপনার পথে আহ্বান করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি। তথাপিও কেউই আমার হেদায়েতের প্রতি একটুও দৃষ্টিপাত করেনি। তারা নসিহতকে পালন করা তো দূরের কথা; বরং আমার আহ্বানকে উপেক্ষা করে তারা কেবল স্ব-স্ব সুযোগমতো অন্যপথে ভেগে যেতে লাগল। আমি যতবেশি তাদেরকে আপনার পথে ডাকতে চাই, তারাও ততবেশি করে দূরে সরে যায়। প্রকাশ্যে ও গোপনে দিবা-রাত্রে সর্বোতভাবে তোমার পথে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। কিছুতেই তারা আমার কথায় কর্ণপাত করেনি।

প্রত্যেক কাজে আল্লাহই হলেন مُؤَثِّرْ حَقِيْقِىْ তথাপিও নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় ইসলাম হতে পলায়ন করার কারণ তাঁর দাওয়াতকে কেন বলা হয়েছে? : হযরত নূহ (আ.) তাঁর দাওয়াতের কারণে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের পলায়ন করার কারণ তাঁর দাওয়াতকে করা হয়েছে এ জন্য যে, প্রকাশ্যত যেহেতু তাঁর আহ্বানেই তারা পলায়ন করেছে, যদিও মূলত তাঁর আহ্বান তাদের পলায়ন করার কারণ নয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর কোনো দোষ নয়। অতএব, قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْ اِلاَّ فِرَارًا আয়াতটি قَوْلُهُ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا الخ আয়াতের মর্ম সাদৃশ্য হয়েছে। অর্থাৎ যতই তাদেরকে (বক্র অন্তর সম্পন্ন লোকদের) কুরআনের হেদায়েতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়, ততই তারা বেশি করে বক্রতার প্রতি ধাবিত হতে যায়। তাই কুরআনকে তাদের গোমরাহীর কারণ বলা যাবে না; বরং বলতে হবে যে, যারা যে কাজ আদৌ পছন্দ করে না সে কাজের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করলে তা তাদের অন্তরে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু করে এ কারণেই তারা পলায়ন করে। আর প্রাণপণে ঘৃণিত বিষয় হতে স্বভাবগতভাবে মানুষ দূরে সরে থাকতে চেষ্টা করে। অতএব, دَعْوَتْ نُوْح (ع) তাদের পলায়ন করার প্রকাশ্য কারণ। এ জন্যই فِرَارْ-এর কারণ তার দাওয়াতকে করা হয়েছে। আর سَبَبْ حَقِيْقِىْ বা سَبَبْ بَاطِنِىْ তাদের কুফরিকেই সাব্যস্ত করা হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨. ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا اَىْ بِاِعْلَاءِ صَوْتِىْ .

৮. অতঃপর আমি তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেছি অর্থাৎ আমার আওয়াজকে সমুচ্চ করে।

٩. ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ صَوْتِىْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ الْكَلَامَ اِسْرَارًا .

৯. তৎপর আমি সোচ্চার প্রচার করেছি আমার স্বর আর গোপন করেছি তাদের প্রতি বক্তব্যকে একান্ত গোপনভাবে।

١٠. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ مِنَ الشِّرْكِ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا .

১০. অনন্তর আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অংশীবাদিতা হতে নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

١١. يُرْسِلِ السَّمَاءَ الْمَطَرَ وَكَانُوْا قَدْ مُنِعُوْهُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا كَثِيْرَ الدُّرُوْرِ .

১১. তিনি আকাশকে বর্ষণশীল করবেন বৃষ্টিপাত করবেন, তাদেরকে বৃষ্টি হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। তোমাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে অধিক পরিমাণে।

١٢. وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا جَارِيَةً .

১২. আর তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন সম্পদ ও সন্তান দ্বারা। আর তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ স্থাপন করবেন বাগানসমূহ আর তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন ঝরনাধারা প্রবহমান।

١٣. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا اَىْ تَامُلُوْنَ وَقَارَ اللّٰهِ اِيَّاكُمْ بِاَنْ تُؤْمِنُوْا .

১৩. তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর জন্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যাশা কর না? অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কর না এবং ঈমান আনয়ন কর না।

١٤. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا جَمْعُ طَوْرٍ وَهُوَ الْحَالُ فَطَوْرًا نُطْفَةً وَطَوْرًا عَلَقَةً اِلٰى تَمَامِ خَلْقِ الْاِنْسَانِ وَالنَّظْرُ فِىْ خَلْقِهِ يُوْجِبُ الْاِيْمَانَ بِخَالِقِهِ .

১৪. অথচ তিনিই তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন اَطْوَار শব্দটি طَوْر -এর বহুবচন। যার অর্থ- অবস্থা। যেমন- এক অবস্থা ছিল نُطْفَةً বীর্য, অতঃপর عَلَقَةً গোশত পিণ্ড হতে সৃষ্টির পূর্ণতা পর্যন্ত আরেক অবস্থা ছিল। আর সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করা স্রষ্টার প্রতি ঈমান আনয়নের সহায়ক হয়ে থাকে।

١٥. اَلَمْ تَرَوْا تَنْظُرُوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ .

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য করনি? দেখনি যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশমণ্ডলীকে স্তরে স্তরে একটিকে অপরটির উপর।

١٦. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ اَىْ فِىْ مَجْمُوْعِهِنَّ الصَّادِقِ بِالسَّمَاءِ الدُّنْيَا نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا مِصْبَاحًا مُضِيْئًا وَهُوَ اَقْوٰى مِنْ نُوْرِ الْقَمَرِ .

১৬. এবং তথায় স্থাপন করেছেন চন্দ্রকে অর্থাৎ সেগুলোর সমষ্টির মধ্যে, যার বহিঃপ্রকাশ দুনিয়ার আকাশে হয়ে থাকে। আর সৃষ্টি করেছেন সূর্যকে প্রদীপ রূপে প্রজ্বলিত আলোকবর্তিকা। আর তা চন্দ্রের জ্যোতি অপেক্ষা অধিক আলোকোজ্জ্বল।

١٧. وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ خَلَقَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا اِذْ خَلَقَ اَبَاكُمْ اٰدَمَ مِنْهَا .

১৭. আর আল্লাহই তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন সৃষ্টি করেছেন। মাটি হতে উদ্ভূত করার মতো যেহেতু তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে তা হতেই সৃষ্টি করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٨. ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا مَقْبُوْرِيْنَ وَيُخْرِجُكُمْ لِلْبَعْثِ اِخْرَاجًا ـ

১৮. অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তথায় প্রত্যাবর্তন করবেন। সমাধিস্থরূপে আর তোমাদেরকে বের করবেন পুনরুত্থানকল্পে বের করার ন্যায়।

١٩. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا مَبْسُوْطَةً ـ

১৯. আর আল্লাহই স্থাপন করেছেন তোমাদের জন্য জমিনকে শয্যারূপে সম্প্রসারিত অবস্থায়।

٢٠. لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا طُرُقًا فِجَاجًا وَاسِعَةً ـ

২০. যাতে তোমরা চলতে পর রাস্তায় পথে যা সুপ্রশস্ত উন্মুক্ত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جِهَارًا : মাসদার হিসাবে মানসূব হয়েছে। হালের মাসদারও হতে পারে। অথবা উহ্য মাসদারের সিফাত। অর্থাৎ دُعَاءً جِهَارًا

قَوْلُهُ اِسْرَارًا : মাফউলে মুতলাক يَجْعَلْ ـ يُمْدِدْ ـ يُرْسِلْ হতে اَسْرَرْتُ শব্দগুলো মহল্লে জযম হয়েছে আমরের জবাব হিসাবে।

قَوْلُهُ مِدْرَارًا : শব্দ اَلسَّمَاءُ হতে হাল হিসাবে মানসূব হয়েছে। অথবা উহ্য মাসদারের না'ত। অর্থাৎ اِرْسَالًا مِدْرَارًا لِلّٰهِ -এর লামটি বয়ানের জন্য। এটা وَقَارًا -এর সিলাহও হতে পারে।

قَوْلُهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ : বাক্যটি كُمْ -এর যমীর হতে حَالٌ হয়েছে। اَطْوَارًا হাল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, خَلَقَ -এর দ্বিতীয় মাফউল। আবূ লাইস বলেন, এটা একটি حَالٌ -এরপর অপর আর একটি حال।

আল্লাহ তা'আলা سُبُلًا فِجَاجًا বলেছেন وَاسِعَةً শব্দ বলেননি কেন? অথচ উভয় শব্দ একই অর্থবোধক : এর কারণ এই যে, فِجَاجًا শব্দটি صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ এবং তা سُبُلًا -এর نَعْتٌ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যদি তা طُرُقٌ وَاسِعَةٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তা سُبُلًا -এর عَطْفُ بَيَانٍ হবে বা بَدَلٌ হবে। سُبُلًا وَاسِعَةً বললে উভয় শব্দ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে যায়। অথচ নাহুবিদগণের নিয়মানুসারে مُفْرَدْ مُؤَنَّثٌ দ্বারা جَمْعُ مُؤَنَّثٍ -এর صِفَتْ নেওয়া বিধেয়।

قَوْلُهُ طِبَاقًا : এটা سَبْعَ سَمٰوٰتٍ হতে حَالٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ كَيْفَ الخ : বাক্যটি اَلَمْ تَرَوْا হতে مَفْعُوْلٌ হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হবে। আর وَجَعَلَ الْقَمَرَ الخ ও وَجَعَلَ الشَّمْسَ الخ বাক্য দু'টি عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ হয়েছে।

قَوْلُهُ نُوْرًا وَسِرَاجًا : এরা পরস্পর اَلشَّمْسُ ও اَلْقَمَرُ হতে حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ نَبَاتًا : শব্দটি اَنْبَتَكُمْ হতে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে, অতঃপর جُمْلَةٌ টি اَللّٰهُ শব্দ হতে خَبَرٌ হবে।

قَوْلُهُ بِسَاطًا : টি اَلْاَرْضُ হতে حَالٌ হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য عِلَّةٌ হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ ...... لَهُمْ اِسْرَارًا : এ আয়াতগুলোতে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর দাওয়াত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। এক. প্রথমে তিনি গোপনে এবং চুপিসারে দাওয়াত দিয়েছেন। লোকদেরকে গোপনে দীনের কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। দুই. চুপিসারে দাওয়াতে কোনো ফল না পেয়ে তিনি প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু করেন। লোকদের প্রতি প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত পেশ করেন। জনসম্মুখে ইসলামের কথাবার্তা আলোচনা করেন। তাদেরকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। **তিন.** প্রকাশ্য দাওয়াতেও আশানুরূপ ফল না পেয়ে তিনি গোপন ও প্রকাশ্য দাওয়াতের সমন্বয় সাধন করেন। তাদেরকে যেমন গোপনে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দিতে থাকেন, তেমনি প্রকাশ্য জনসম্মুখে দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ আয়াতগুলো হতে আরও বুঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল প্রকারের পন্থাকেই ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। ثُمَّ শব্দটি প্রয়োগের ফলে বুঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) -এর দাওয়াতের পর্যায়গুলোর মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে দাওয়াত পেশ করার হেকমত : এর হেকমত এই যে, প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া অপ্রকাশ্য অবস্থা হতে খুবই কঠিন কাজ, এ কারণে প্রথমে গুপ্তভাবে পরে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দেন। আবার কখনো প্রকাশ্য আবার কখনো অপ্রকাশ্যভাবে দাওয়াতের অপেক্ষা একত্রে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে দাওয়াত দান করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। এ কারণে সর্বশেষ কঠিনতম পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হলেন।

اَلْجَهْر ও اَلْإِعْلَان-এর মধ্যে পার্থক্য : তাফসীরকারগণ শব্দদ্বয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য করেছেন–

جِهَار : অর্থ খোলা মজলিসে কাউকেও সম্বোধন করে কিছু বলা, যা সকলেই শুনতে পায়।

اِعْلَان : এটা اِذْعَان অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে اِعْلَانٌ -কে اِسْرَارٌ -এর মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ছোট ছোট শব্দ করে বলা, যা কোনোরূপে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়– উচ্চৈঃস্বরে নয়। আর ফুকাহায়ে কেরাম اِعْلَانٌ -কে اِذْعَانٌ -এর مُرَادِفٌ হিসেবে ব্যবহার করেছেন, আর جَهْر -কে خَفِىْ -এর মোকাবিলায় ব্যবহার করেছেন। যেমন– صَلٰوة جَهْرِيَّة এবং صَلٰوة خَفِيَّة বা قِرَاءَة بِالْجَهْر অর্থাৎ শব্দ করে কেরাত পড়া, আর قِرَاءَة بِالْخَفِىْ অর্থাৎ চুপে চুপে কেরাত পড়া।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا ...... وَيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا" : আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান ও তাঁর আইন যে মানুষের পক্ষে শুধু পারলৌকিক কল্যাণ বয়ে আনে, জাগতিক জীবনে তার কোনো সুফল পাওয়া যায় না– এমন নয়; বরং আল্লাহর দেওয়া জীবন-বিধান ইহ-পারলৌকিক উভয় জগতের রক্ষাকবচ, উভয় জগতে শান্তির নিয়ামক, উভয় জগতেই মানবের জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তির স্রোতস্বিনী। সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা লাভ করে তারা সমৃদ্ধশালী জীবন। পক্ষান্তরে আল্লাদ্রোহীতামূলক আচরণ, নৈতিকতা বিধ্বংসী কার্যকলাপ শুধু পরকালীন জীবনেরই অশান্তি ও অকল্যাণের কার্যকারণ নয়, এ পার্থিব জীবনেও তা দ্বারা অশান্তি-অকল্যাণ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার এ পার্থিব জীবনে মানুষকে সুখের উপকরণ, বিলাস জীবনের সামগ্রী ধন-সম্পদ দানে দু'টি নীতি ক্রিয়াশীল থাকে। এক প্রকার ধন-সম্পদ দ্বারা মানুষ প্রতারিত হয়, খোদদ্রোহীতার আচরণে পড়ে যায়, নৈতিকতার বিপর্যয় ঘটে এবং বাহ্যিকরূপে সম্পদশালী পরিলক্ষিত হলেও ভিতরে জ্বলতে থাকে অশান্তির অনল শিখা, এ ধন-সম্পদই যেন তার জন্য বিরাট একটি আজাবে পরিণত হয়। জীবনে কোথাও এতটুকু শান্তির লেশ খুঁজে পায় না। দ্বিতীয় এক প্রকারের মানুষ ধন-সম্পদের দ্বারা হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পায়। তাদের জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের প্রবৃদ্ধি ঘটে, নৈতিকতার উন্নয়ন হয়। জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তির অমিয় সুধা। এ ধন-সম্পদই যেন তার জন্য ইহকাল ও পরকালের সুখ ও সমৃদ্ধির উপকরণে ও কার্যকরণে পরিণত হয়, অথচ উভয় প্রকার ধন-সম্পদ আল্লাহই দিয়ে থাকেন। প্রথম প্রকারের সম্পদকে আল-কুরআন مَتَاعُ الْغُرُوْرِ [প্রতারণাময় সম্পদ] নামে অভিহিত করেছেন, আর দ্বিতীয় প্রকার সম্পদকে অভিহিত করা হয়েছে مَتَاعٌ حَسَنًا [সুন্দর সম্পদ] নামে।

যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলগণ দীনের দাওয়াত, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান অনুযায়ী জীবন গঠনের আহ্বানের পাশাপাশি তাদেরকে ইহকাল-পরকাল উভয় জগতের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহর পয়গাম ও জীবন-বিধানের সাথে যে ব্যক্তি, জাতি ও সমাজের ভাগ্য জড়িত হয়েছে, সে ব্যক্তি, জাতি ও সমাজ জাগতিক জীবনে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ও শান্তিময় জীবনের সামগ্রী লাভ করে ধন্য হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর গায়েবের ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। আর পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এর তুলনায় শতগুণে বেশি সুখ-সমৃদ্ধির উপায়-উপকরণ ও জান্নাতী শান্তির অনাবিল ধারা। কুরআন মাজীদে সূরা ত্বা-হা ১২৪ নং আয়াত, সূরা মায়িদা ৫৬ নং আয়াত, সূরা আ'রাফ ৯৩ নং আয়াত, সূরা হুদ ৪২ নং আয়াত সহ অনেক আয়াতই রয়েছে, যা হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর জীবন বিধান ইহকাল-পরকাল উভয় জীবনের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির ধারক-বাহক। আর তার পরিপন্থি জীবন উভয় জগতেই অশান্তি, অকল্যাণ, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্বিসহ জ্বালা বয়ে আনার কার্যকারণ।

১০ থেকে ১৩ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে উভয় জগৎ শান্তিময়, কল্যাণময় ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হওয়ারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের জন্য আসমান হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত করে তার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অধিক মাত্রায় ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। আর পরকালে সুখময়

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জান্নাত ও তার তলদেশ হতে ঝরনাধারা প্রবাহিত হওয়ার কথা বলে চিরসুখী করার সুখবর জানিয়েছেন। মহানবী ﷺ-এর দাওয়াতী কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, তিনিও উভয় জগতে কল্যাণময়, মঙ্গলময় ও সুখ-সমৃদ্ধশালী হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। সূরা হূদের ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা যদি তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে আস, তবে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে উত্তম জীবন-সামগ্রী দান করবেন। আর অনুদান ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য প্রতিটি লোককে তিনি অনুগ্রহ (সুখ-সম্পদ) দান করবেন; কিন্তু তোমরা [এ জীবন-বিধান ও আল্লাহ হতে] যদি মুখ ফিরিয়ে থাক, তবে আমি তোমাদের জন্য এক ভীষণ দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান।'

মহানবী ﷺ কুরাইশদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা যদি একটি বাণীতে বিশ্বাসী হও, তবে তোমরা আরব-অনারব গোটা বিশ্ব জগতের প্রশাসক, চালক ও নেতা হয়ে যাবে। একবার হযরত ওমর (রা.) দেশময় দুর্ভিক্ষের সময় বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন এবং শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করেই ক্ষান্ত হলেন, বৃষ্টির প্রার্থনা করেননি। লোকেরা বলল, আমীরুল মু'মিনীন বৃষ্টির জন্য তো দোয়াই করলেন না? তিনি উত্তরে বললেন– আমি আকাশমণ্ডলের সেসব দুয়ারে ধাক্কা দিয়েছি যেখান হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অতঃপর তিনি সূরা নূহের উল্লিখিত আয়াত তিনটি পাঠ করলেন। সারকথা হলো, আল্লাহর বিধানের ছত্র-ছায়ায় জীবন যাপন করা এবং আল্লাহর নিকট সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করে চলাই হচ্ছে ইহকাল-পরকালের অফুরন্ত নিয়ামত, সুখ-সমৃদ্ধি উত্তম জীবন সামগ্রী এবং অনাবিল শান্তি ও কল্যাণ লাভের নিশ্চয়তা এবং তার পরিপন্থি সমুদয় পথই অকল্যাণ-অশান্তি, দুঃখ ও অমঙ্গলের কার্যকারণ।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ঘটনা : বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি বড় অভাবগ্রস্ত। তিনি তাকে বললেন, মহান আল্লাহর নিকট তওবা করো। আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমার কোনো পুত্র সন্তান নেই। তিনি বললেন, তওবা করো। অপর এক ব্যক্তি বলল, আমার শষ্যক্ষেত্র শুকিয়ে গেছে। তিনি বললেন, তওবা ইস্তিগফার করো। আরেক ব্যক্তি বলল, আমার কূপের পানি শুকিয়ে গেছে। তিনি বললেন, তওবা ইস্তিগফার করো। উপস্থিত লোকদের সকলেই তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, প্রত্যেককেই আপনি কেন তওবা ইস্তিগফারের কথা বললেন। তখন হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, দেখ আমি নিজের থেকে কিছুই বলিনি। আল্লাহ কুরআনে হাকীমে যা ইরশাদ করেছেন তা-ই আমি বলেছি। তখন তিনি এ আয়াতসমূহ তেলওয়াত করলেন। –[তাফসীরে কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا : وَقَارٌ বলতে সম্মান-মর্যাদা বুঝায়। এর তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ার ছোট ছোট রাজা-বাদশাহ, ধনী ও সরদার শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে তোমরা তো মনে কর যে, তাদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর কোনো কাজ করা বিপজ্জনক; কিন্তু মহান আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা এই নয় যে, তিনিও কোনো মান-মার্যাদা সম্পন্ন সত্তা হতে পারেন। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, তাঁর প্রভুত্ব, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, তাঁর সার্বভৌমত্বে তোমরা অন্যদের অংশীদার মেনে নাও, তাঁর প্রদত্ত হুকুম-আহকাম তোমরা অমান্য করো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন এমন ভয় ও আশঙ্কাবোধও তোমাদের মনে জাগে না। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا : আলোচ্য আয়াতের تَرْجُوْنَ শব্দটি رَجَاءٌ থেকে নিষ্পন্ন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে رَجَاءٌ শব্দটির অর্থ হলো– বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের কথা কেন বিশ্বাস কর না। মুফাসসিরগণ বলেন, বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করার জন্যই رَجَاءٌ শব্দটির এ অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের কথা নেই।

হযরত কালবী (র.) বলেছেন, এ ক্ষেত্রে رَجَاءٌ শব্দটির ভয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁকে ভয় কর না।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলার হক সম্পর্কে অবগত নও? তোমরা তাঁর অনন্ত-অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর শোকর গুজার হও না।

ইবনে কাইসান (র.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা তোমাদের ইবাদতের ব্যাপারে এ আশা করো না যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, আর এ জন্য তিনি আমাদেরকে ছওয়াব দান করেন।

অথবা, এর অর্থ হলো– তোমাদের ইবাদত-বন্দেগিতে কি তোমাদের এ আশা নেই যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ইবাদত বন্দেগির শুভ পরিণতি দান করবেন। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا" : উল্লিখিত وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার যে কথা বলেছেন, তার মর্ম হলো এই- আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি কর্মটি বিভিন্ন পর্যায়ে সুসম্পন্ন করেছেন। প্রথমত মানুষ পিতা ও মাতার দেহাভ্যন্তরে শুক্রকীটরূপে থাকে। স্বীয় কুদরতে মাতৃগর্ভে তার মিলন ঘটান। অতঃপর রক্তপিণ্ড মাংসপিণ্ডে রূপ দিয়ে একটি মানবাকৃতি দান করেন এবং তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন। সেখানে আলো, বাতাস, খাদ্য, অক্সিজেন পৌঁছিয়ে ক্রমান্বয়ে নয়-দশটি মাস পর্যন্ত প্রতিপালন করতে থাকেন। অতঃপর কোনো একদিন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ করিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। শিশু, কিশোর, যৌবন ইত্যাদি পর্যায়গুলো অতিক্রম করে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে অতিক্রম করানো হয়। এ পর্যায়সমূহের দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন- আমি তোমাদেরকে পর্যাক্রমে সৃষ্টি করেছি, সে সৃষ্টিতে তোমাদের কোনো হাত ছিল না। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অন্ধ, বধির, পঙ্গু করে সৃষ্টি করতে পারতাম। তোমাদের স্থলে অন্যকেও সৃষ্টি করতে পারতাম। এ সৃষ্টিকালে তোমরা আমার কত নিয়ামত ভোগ করেছ; কিন্তু আমার এ নিয়ামতের শোকর আদায়ের পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা-প্রকাশ, আমার দয়া ও মেহেরবানির বিনিময় বিদ্রোহমূলক আচরণ তোমাদের দ্বারা কিরূপে শোভা পায়? এ বেয়াদবি ও বিদ্রোহের শাস্তি তোমাদের পেতে হবে না, এ কথা তোমরা কিরূপে মনে করলে? -[রূহুল মা'আনী]

এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের ব্যাপারে এক অকাট্য দলিল। তিনি যে পর্যায়ক্রমে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তা কি অন্য কারো পক্ষে সম্ভব? -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا : এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) -এর সে কথা বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছেন। তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তা'আলা স্তর বিশিষ্ট করে সাত আসমান কিভাবে তৈরি করেছেন।

মা'আরিফ গ্রন্থকারের মতে, এখানে تَرَوْا শব্দটি عِلْم -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর জালালাইন গ্রন্থকারের মতে, نَظَر অর্থাৎ স্বচক্ষে দেখানো অর্থে নেওয়া হয়েছে, যাকে رُؤْيَتْ بَصَرِىْ বলা হয়।

আবার কখনো 'রায় দান অর্থে' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে, مَا رَأَيْتَ আপনার অভিপ্রায় কি? مَا تَرٰى তোমার মতামত কি?

خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا : -এর অর্থ : طَبْقَةٌ বলতে সম্মিলিতভাবে একটির সাথে একটি, এ অর্থ নয়; বরং একটি অপরটির উপর বা নিচে। কারণ হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে একটি আসমান অপর আসমান হতে ৫০০ বছরের পথ উপরে অবস্থিত, ইবনে আবী হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি বর্ণনায় এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন বড় বড় ইমারতসমূহের বহু কয়টি তলা থাকে এবং একটি অপরটি হতে ৩/৪ গজ দূরে অবস্থিত হয়। তবে আসমানসমূহকে সৃষ্টির কুদরত হলো, যদিও স্তর বিশিষ্ট হয় তথাপিও তাতে কোনো খুঁটি লাগানো হয়নি।

كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا .

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا : আর তিনি চাঁদকে আকাশসমূহে নূর এবং সূর্যকে জ্বলন্ত প্রদীপ করে রেখেছেন। তাফসীরকারগণ চাঁদ সম্পর্কে বলেছেন جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ অর্থাৎ চাঁদকে আকাশসমূহে স্থাপিত করেছেন, এতে বুঝা যায় সকল আকাশেই চাঁদ খচিত রয়েছে। মূলত আমরা দেখতে পাই একটি আকাশে চাঁদ উদিত হয়। সুতরাং বলতে হবে আকাশসমূহ হতে একটির মধ্যে চাঁদকে স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ سَمَاءُ دُنْيَا প্রথম আকাশে রয়েছে। কারণ আকাশসমূহের মধ্যে স্তর হিসাবে সামঞ্জস্য রয়েছে, তাই كُلّ বলে جُزْء উদ্দেশ্য নেওয়া সঠিক হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আসমানসমূহের দিকে অর্থাৎ উপরের দিকে চন্দ্র এবং সূর্যের সম্মুখের দিক (وَجْه) আলো দান করছে। আর পিছনের দিক (ظَهْر) পৃথিবীর দিকে আলো দান করছে এ কারণে نُوْرُ الْقَمَرِ সকল আসমানকে আলো দান করছে। কারণ نُوْرُ الْقَمَرِ এমন স্বচ্ছ যা সাধারণত বাধাপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ বলা শুদ্ধ হয়েছে। তদ্রূপভাবে যদি কেউ বলে যে, زَيْدٌ فِى الْمَدِيْنَةِ এ কথা দ্বারা زَيْد শহরের সর্বস্থানে হওয়া আবশ্যক হয় না; বরং যে কোনো একটি স্থানে থাকলেই বাক্য শুদ্ধ হবে। তাই চন্দ্র আকাশের যে কোনো স্থানেই থাকুক جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ বলা শুদ্ধ হয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। -[মাদারিক]

সূর্যের বেলায়ও একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে, কেননা جَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ -এর উপর شَمْس -কে আতফ করা হয়েছে।

নূর ও সিরাজ-এর মধ্যকার পার্থক্য : نُوْر নূর বলা হয় জ্যোতিকে যা খুবই স্নিগ্ধ হয়, ঠাণ্ডা হয় এবং যা আলোকিত করতে পারে। আর তা লাবণ্যময় হয়ে থাকে। যথা বৈদ্যুতিক ডিমলাইটের আলো, চন্দ্রের আলো, ইবাদতকারীগণের চেহারায় ভাসমান আল্লাহ প্রদত্ত আলো ইত্যাদি। আর نُوْر -এর মধ্যে দাহন শক্তি থাকে না ... জ্বালিয়ে দেয় না, আর চন্দ্রের আলো কোনো কিছুকে জ্বালিয়ে দেয় না, এ কারণে তাকে نُوْر বলা হয়েছে।

سِرَاجٌ বলা হয় এমন আলোকে যা অন্ধকারকে তো দূরীভূত করেই; বরং তাতে উত্তাপ থাকে এবং দাহন বা জ্বালানো শক্তি থাকে, তা খুবই প্রখর হয়-ঠাণ্ডা হয় না। নূর বা জ্যোতি অপেক্ষা তাতে আলো অত্যধিক হয়ে থাকে, সরিষা পর্যন্ত যাতে একটি একটি করে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। তার আলো দ্বারা সিক্ত (ভিজা) বস্তু শুকিয়ে যায়। চন্দ্রের আলোতে কোনো কিছু শুকায় না। চেরাগের ন্যায় সূর্যেরও জ্বালানো শক্তি আছে, তাই সূর্যকে سِرَاجٌ বলা হয়েছে।

কোন আকাশে চন্দ্র ও সূর্য অবস্থিত রয়েছে এবং এ বিষয়ে মতভেদ কি? : তাফসীরকারকগণের মতে মহান আল্লাহর বাণী- وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا আয়াতের মূল ইবারত এই যে- جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ فِيهِنَّ سِرَاجًا অর্থাৎ الشَّمْسَ -এর পরে فِيهِنَّ একটি শব্দ مَحْذُوفٌ রয়েছে। তাহলে আয়াতের তাৎপর্য হবে যে جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ فَجَعَلَ الشَّمْسَ اَيْضًا فِيهِنَّ যেভাবে চন্দ্রকে আকাশে খচিত করা হয়েছে, সেভাবে সূর্যকেও আকাশে খচিত করা হয়েছে। অতএব, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

মতভেদ : চন্দ্র যে প্রথম আকাশে খচিত রয়েছে এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মতে কোনো মতভেদ নেই। সূর্য সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। কারো কারো মতে সূর্য পঞ্চম আকাশে রয়েছে, কারো কারো মতে চতুর্থ আকাশে, কেউ বলেন শীতকালে চতুর্থ আকাশে এবং গ্রীষ্মকালে সপ্ত আকাশে থাকে। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, ইজমা এ মতে যে, চতুর্থ আকাশেই সূর্য অবস্থান করেছে। -[সাবী]

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের মতে চন্দ্র প্রথম আকাশ হতেও বহু নিচে অবস্থান করছে যা فَضَاءٌ বা খালিস্তান নামে অভিহিত। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা সূরায়ে فُرْقَانٌ -এর تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ ..... قَمَرًا الخ আয়াতে ব্যাখ্যা রয়েছে।

মানব সৃষ্টিকে উদ্ভিদ সৃষ্টির সাথে তুলনা করার কারণ : উদ্ভিদের সৃষ্টি এবং প্রবৃদ্ধিকে সাধারণত اِنْبَاتٌ বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে দুনিয়াকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাতে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। এ গাছপালা আবার মাটিতে মিশে যায়। তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আবার মাটির মাঝেই কবর দেওয়া হবে। আবার মাটির মধ্য হতে উঠানো হবে। যেমন গাছপালা সৃষ্টি করা হয়। এসবের দিকে লক্ষ্য করেই মানব সৃষ্টিকে গাছপালা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং গাছপালা প্রবৃদ্ধির জন্য যে اِنْبَاتٌ শব্দ ব্যবহার করা হয় সে শব্দটিই মানবসৃষ্টির ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে।-[যিলাল, কাবীর, কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا : মানবসৃষ্টি এবং তাদের এ পৃথিবীতে আবাদ করার পর তাদেরকে জমিনে প্রত্যাবর্তন করা এ দুয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান রয়েছে। এ কারণেই ثُمَّ (অতঃপর) দ্বারা আতফ করা হয়েছে। জমিন থেকে উঠানো এবং জমিনে প্রত্যাবর্তনের মাঝে যদিও সময়ের ব্যবধান রয়েছে কিন্তু জমিনের প্রত্যাবর্তন এবং তা হতে পুনরায় উঠানোর কাজকে এ পর্যায়ের অর্থাৎ সকলই পরকালীন কাজ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এ জন্য وَيُخْرِجُكُمْ -এ وَاوْ দ্বারা আতফ করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টির পর, তারা এ পৃথিবীকে আবাদ করবে অতঃপর বেশ কিছুকাল পর তাদেরকে জমিনে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করানো হবে এবং পুনরায় তাদেরকে জমিন হতে উঠানো হবে। -[রূহুল মা'আনী]

بِسَاطٌ -এর অর্থ : بِسَاطٌ শব্দের অর্থ- গালিচা, বিছানা, সম্প্রসারিত সমতলভূমি। আল্লাহ তা'আলা জমিনকে শয্যারূপে সৃষ্টি করেছেন। তাকে গালিচারূপে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে 'পৃথিবী গোলাকার' এ কথার সাথে তার কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা এত বড় গোলাকৃতির মাঝে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শ্বে সমতলই লক্ষ্য করি। পৃথিবী যে গোলাকৃতির তা সত্যকথা। তবে গোলাকৃতি হওয়াতে বা যদি তা নাও হয় শরিয়তের এতে কিছু যায় আসে না এবং তা জানা না জানার তেমন কোনো প্রয়োজন পড়ে না। -[রূহুল মা'আনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর]

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا আয়াতের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, জমিন গোলাকার নয়, তার উত্তর কি হবে? : এর উত্তরে বলা হবে الْاَرْضَ بِسَاطًا দ্বারা যদিও জমিন গোলাকার বুঝায় না তথাপিও গোলাকার নয় এ কথাও তো বুঝায় না। কারণ যদি কোনো একটি বিশেষ বড় গোলাকৃতি বস্তুর উপর একটি ক্ষুদ্র প্রাণী বিচরণ করতে থাকে এবং গোলাকৃতি বস্তুটির পরিধি কয়েক মাইল পরিমাণ হয় তখন বস্তুটি গোলাকৃতি বলে অনুভব করা ক্ষুদ্র প্রাণীটির পক্ষে সম্ভব নয়। মনে হবে যে কেবল সমতলভূমি। এর একমাত্র কারণ হলো গোলাকৃতি বস্তুটির প্রশস্ততা, অতএব পৃথিবীটাও প্রশস্ততার দিক দিয়ে এত বড় যার উপর পায়ে চলে বা গাড়ি ঘোড়ায় চড়েও তার গোলাকৃতি অনুভব করা সম্ভব নয়। তবে যুগ যুগ ধরে বিচরণ করার পর তা প্রমাণিত হবে। সর্বোচ্চ কথা হলো, পৃথিবী গোল হতে হবে এ কথাও তো শরিয়তের বিধান মতে আবশ্যক নয়। -[কামালাইন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২১. قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا اَىِ السَّفَلَةَ وَالْفُقَرَاءُ مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَهُمُ الرُّؤَسَاءُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ بِذٰلِكَ وَ وُلْدٌ بِضَمِّ الْوَاوِ وَسُكُوْنِ اللَّامِ وَبِفَتْحِهِمَا وَالْاَوَّلُ قِيْلَ جَمْعُ وَلَدٍ بِفَتْحِهِمَا كَخَشَبٍ وَخُشْبٍ وَقِيْلَ بِمَعْنَاهُ كَبُخْلٍ وَبَخَلٍ اِلَّا خَسَارًا طغيانا وكفرا ـ

২২. وَمَكَرُوْا اَىِ الرُّؤَسَاءُ مَكْرًا كُبَّارًا عَظِيْمًا جِدًّا بِاَنْ كَذَّبُوْا نُوْحًا وَاٰذَوْهُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ ـ

২৩. وَقَالُوْا لِلسَّفَلَةِ لَاتَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدًّا بِفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّهَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا هِىَ اَسْمَاءُ اَصْنَامِهِمْ ـ

২৪. وَقَدْ اَضَلُّوْا بِهَا كَثِيْرًا ج مِنَ النَّاسِ بِاَنْ اَمَرُوْهُمْ بِعِبَادَتِهَا وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا عَطْفٌ عَلٰى قَدْ اَضَلُّوْا دعا عَلَيْهِمْ لَمَّا اُوْحِىَ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ ـ

২৫. مِمَّا مَا صِلَةٌ خَطَايَاهُمْ وَفِىْ قِرَاءَةٍ خَطِيْئٰتِهِمْ بِالْهَمْزَةِ اُغْرِقُوْا بِالطُّوْفَانِ فَاُدْخِلُوْا نَارًا عُوْقِبُوْا بِهَا عَقِبَ الْاِغْرَاقِ تَحْتَ الْمَاءِ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اَىْ غَيْرِ اللّٰهِ اَنْصَارًا يَمْنَعُوْنَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ ـ

অনুবাদ :

২১. নূহ বলেছিল, হে প্রতিপালক! তারা আমার অবাধ্যাচারণ করেছে, আর তারা তাদেরই অনুসরণ করেছে অর্থাৎ নিকৃষ্ট ও দরিদ্র শ্রেণির লোক যাদের সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করেনি নেতৃস্থানীয়গণ যাদের উপর আল্লাহ সম্পদ ও সন্তান দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। وُلْد শব্দটি وَاو পেশ ও لَام সাকিন যোগে এবং উভয় বর্ণে যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। কারো মতে প্রথম কেরাত অনুযায়ী শব্দটি وَلَد-এর বহুবচন, যেমন خَشَب-এর বহুবচন خُشْب হয়ে থাকে। আর কারো মতে, শব্দটি অর্থগতভাবে বহুবচন। যেমন– بُخْل-এর অর্থগত বহুবচন بَخَل ক্ষতিগ্রস্ততা ব্যতীত কিছুই সীমালঙ্ঘন ও কুফরি আচরণ।

২২. আর তারা ষড়যন্ত্র করেছে অর্থাৎ নেতৃস্থানীয়গণ। ভয়ানক ষড়যন্ত্র জঘন্য রূপ ষড়যন্ত্র, এভাবে যে, তারা হযরত নূহ (আ.) -কে মিথ্যারোপ করেছে এবং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে।

২৩. আর তারা বলেছে নিকৃষ্ট শ্রেণির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্য দেবদেবীগুলোকে এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ শব্দটি ওয়াও বর্ণে যবর ও পেশযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে সুয়ায়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে এগুলো তাদের দেবমূর্তিদের নাম।

২৪. আর তারা বিভ্রান্ত করেছে তা দ্বারা অনেককে মানুষদের মধ্য হতে, তারা তাদেরকে এগুলোর উপাসনা করতে আদেশ করেছে। সুতরাং এ জালিমদেরকে বিভ্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। এটা قَدْ اَضَلُّوْا-এর উপর عَطْف যখন হযরত নূহ (আ.) -এর নিকট এই মর্মে ওহী আসে যে, اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ 'তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তারা ব্যতীত আর কেউই ঈমান আনয়ন করবে না', তখন তিনি তাদের জন্য এ বদদোয়া করেন।

২৫. তাদের এ সকল مَا অব্যয়টি صِلَة-এর জন্য গুনাহের কারণে অপর এক কেরাতে শব্দটি হামযা যোগে خَطِيْئٰتِهِمْ পঠিত হয়েছে। তারা নিমজ্জিত হয়েছে তুফানে। অতঃপর তারা দোজখে প্রবিষ্ট হয়েছে পানির নীচে দোজখের আগুনে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, নিমজ্জিত হওয়ার পর। তখন তারা পায়নি তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত তাঁর অপর কোনো সাহায্যকারী যে তাদের হতে শাস্তিকে বিরত রাখবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ : জুমলায়ে اِسْمِيَّةْ হয়ে قَالَ -এর মাফউল। মাওসূলটি اِتَّبَعُوْا -এর মাফউল, যমীর তার ফায়েল। مَالُهُ وَ وَلَدُهُ ফায়েল, يَزِدْ -এর ، যমীর মাফউল, اِلَّا خَسَارًا ইস্তিছনায়ে মুফাররাগ।

قَوْلُهُ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ : বাক্যটি رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ -এর উপর আতফ হয়েছে, আবূ হাব্বান বলেন- وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ বাক্যটি قَدْ اَضَلُّوْا -এর উপর আতফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى قَالَ نُوْحٌ رَبِّ الخ : অবশেষে হযরত নূহ (আ.) কাওমকে হিদায়েত করতে করতে শেষ পর্যন্ত নৈরাশ হয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলেন, হে আল্লাহ! এরা তো আমার কথা মোটেই শুনে না, বরং এরা সমাজের এমন সব লোকদের কথাবার্তা মেনে চলছে যারা অত্যন্ত দরিদ্র ও লজ্জাহীন আর কিছু সংখ্যক হলো অসামাজিক বড় ধনবান তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এ লোকদেরকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে।

হযরত নূহ (আ.) -এর সম্প্রদায়ের নাফরমানি কি ছিল? : হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির নাফরমানি সম্পর্কে ইতঃপূর্বেও আলাচনা করা হয়েছে, তা হলো, তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহর আনুগত্য করাকে অস্বীকার করা, নাফরমানির কার্যে আল্লাহকে ভয় করা, হযরত নূহ (আ.)-এর অনুসরণ করা, এ তিনটি হুকুম পালন করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তারা এগুলো অত্যন্ত বেয়াদবির সাথে অমান্য করেছিল। হযরত নূহ (আ.) -এর নির্দেশ মোতাবেক যদি তারা চলত তখন বেহেশতে স্থানলাভ করত, আর সম্প্রদায়ের সর্দারদের আনুগত্য করে তারা শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছে। সর্বশেষ তিনি তাদেরকে তওবার ডাক দিয়েছেন, তাও তারা অমান্য করে বসেছে এবং তওবার ফলে তাদেরকে যে সকল নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাও তারা গ্রহণ করেনি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ .... اِلَّا ضَلَالًا : উল্লিখিত আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আল্লাদ্রোহীতা, হযরত নূহ (আ.)-কে অমান্য করা, তৎকালীন সমাজ নেতা ও সরদারদের আনুগত্য করা এবং হযরত নূহ (আ.)-এর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমাজ নেতাদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজের প্রভাবশালী নেতা ও সমাজপতিগণ সর্বদা জনগণকে হযরত নূহ (আ.)-এর আন্দোলন ও দীনি দাওয়াত এবং তাঁর উপস্থাপিত আদর্শ ও শিক্ষা হতে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জোর প্রয়াস চালাত। তারা বলত, নূহ তো তোমাদের ন্যায়ই একজন মানুষ। তার প্রতি আল্লাহর ওহী নাজিল হয়েছে তা কিরূপে মানা যায় [সূরা আ'রাফ ৬৩ আয়াত]। সমাজের গরিব, হীন ও নিম্ন শ্রেণির লোকগণই হযরত নূহের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে, তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করেছে। তাঁর কথাগুলোর গুরুত্ব থাকলে সমাজের উচ্চ শ্রেণির লোকগণ অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনত। [সূরা হূদ-২৭ আয়াত] কাউকেও আল্লাহ তা'আলার পাঠানোর প্রয়োজন থাকলে ফেরেশতাকেই পাঠাতে পারতেন। [সূরা মু'মিন- ২৪ আয়াত] এমনিভাবে নানা প্রবঞ্চনা ও কথা দ্বারা সমাজের নেতাগণ সাধারণ লোকদেরকে হযরত নূহ (আ.) হতে ফিরিয়ে রাখত। তারা নিজেদের উপাস্য দেবদেবীগণকে পরিত্যাগ না করার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি নির্দেশ দিত। নেতা ও সমাজপতিগণের এহেন ন্যক্কারজনক ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা মক্কার সমাজ-নেতা, গোত্র-নেতা ও সাধারণ মানুষকে এ কথাই বলতে চান যে, তারা নবীর শিক্ষা ও আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁকে নবীরূপে স্বীকৃতি না দেওয়ার দরুন, মহাপ্লাবনের পানিতে ডুবে চিরতরে ধ্বংস হয়েছিল। তোমরাও সাবধান হও। তোমরা মহানবীর শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ না করলে এবং সমাজের সাধারণ লোকদেরকে মহানবীর বিরোধিতায় প্ররোচিতকরণ হতে বিরত না থাকলে তোমাদের উপরও অনুরূপ শাস্তি আপতিত হওয়া বিচিত্র নয়।

তাদের চক্রান্ত কি? : তাদের চক্রান্ত কি ছিল সে সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের চক্রান্ত ছিল হযরত নূহ (আ.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে সমাজের গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া। কেউ কেউ বলেন, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে অন্যদের প্রভাবিত করা। শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোকেরা বলেছিল যে, তারা যদি সঠিক পথে না থাকত তাহলে তাদের এত সম্পদ ও নিয়ামত দেওয়া হতো না। কেউ কেউ বলেন, তাদের চক্রান্ত ছিল, তারা সাধারণ লোকদেরকে বলত-তোমরা তোমাদের দেবতাদের পূজা ত্যাগ করো না। -[কুরতুবী]

মানুষের মাঝে মূর্তিপূজার প্রচলন কিভাবে শুরু হয়? : দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম শিরক ও মূর্তিপূজার প্রচলন হয় হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের দ্বারা। হযরত আদম ও নূহ (আ.) -এর মধ্যবর্তী সময় অনেক মুত্তাকী নামযাদা ও শীর্ষস্থানীয় লোক জনগণের কাছে সুপরিচিত ছিল এবং তাদের প্রতি জনগণ অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখত ও তাদের অনুসরণ করে চলত। যুগের আবর্তনের সাথে সাথে শয়তানের প্রবঞ্চনার ফলে জন্মগত ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্যে তাদের নামে মানতকরণ, তাদের নামে পশু জবাইকরণ, বলি দেওয়া, তাদের কবরকে সিজদা করা এবং তাদেরকে আল্লাহর সমক্ষমতাসম্পন্ন বান্দা ভাবতে লাগল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এমনিভাবে ক্রমান্বয়ে মানুষের মনোজগতে তারা প্রভু ও মা'বুদরূপে স্থান পেল। মানুষ তাদের ইবাদতে মাশগুল হয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে শয়তান মানুষের মনে এ বলে প্রবঞ্চনা দিল যে, যার ইবাদত করা হয়, তার একটি প্রতিমূর্তি বানিয়ে সম্মুখে রেখে ইবাদত করা হলে ইবাদতে প্রভুর স্বাদ উপলব্ধি হয় এবং ইবাদতেও মন গভীরভাবে বসে যায়। শয়তানের এ কুমন্ত্রণায় মানুষ ঐ সব নামকরা মুত্তাকী ও আল্লাহওয়ালা লোকদের প্রতিমূর্তি বানিয়ে তার পূজা ও ইবাদত শুরু করে দিল। সেসব প্রতিমূর্তিসমূহেরই নাম আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে উদ্দ, সুওয়া', ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসর নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হলো হযরত নূহ (আ.) সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজার ইতিহাস। তাদের হতেই দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা ও শিরকের প্রচলন শুরু হয়। হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায় পানিতে ডুবে ধ্বংস হওয়ার কারণে প্রতিমূর্তিগুলো মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়। পরবর্তীকাল শয়তান সে প্রতিমূর্তিসমূহ খুঁজে বের করে হযরত নূহ (আ.) -এর পৌত্র ও বংশধরগণকে পূজা করার জন্য এবং পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ও মতাদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানায়। ফলে তারা আবার মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয় এবং এ মূর্তিপূজার ধারাটিই পরম্পরা সূত্রে বিভিন্ন আরবি গোত্র এবং ভারতীয়, সুদানীয় ও মিসরীয় লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও প্রথম দিক দিয়ে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকগণের মধ্যে এসব মূর্তির এবং অন্যান্য নামের অনেক মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল।

উদ্দ, সুওয়া', ইয়াগুছ, ইয়াউক, ও নসর -এর তাফসীর : উপরোক্ত নামগুলো কাফেরদের মূর্তিসমূহের নাম :

وَدّ : এটা ছিল কুজায়া গোত্রের শাখা, অর্থাৎ বনী কালব উপগোত্রের উপাস্য দেবতা। دُوْمَةُ الْجَنْدَلْ নামক স্থানে তার একটি পদপীঠ নির্মাণ করে রেখেছিল। আরবের প্রাচীনকালীন শিলালিপিতে তার নাম 'আদম আবাস" (আদ্দ বাপু) লিখিত আছে। ঐতিহাসিক كَلْبِى বলেন, এটা একটি পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট বিরাটাবয়ব সম্পন্ন মূর্তি ছিল। কুরাইশগণ একে উপাসনা করত। তাদের নিকট তা 'উদ্দ' নামে পরিচিত ছিল।

سُوَاعْ : এটা ছিল هُزَيْل গোত্রের দেবী। তা নারী আকৃতিসম্পন্ন মূর্তি ছিল। يَنْبُوْع -এর নিকট রুহাত নামক স্থানে এটার মন্দির ছিল।

يَغُوْث : এটা ছিল هُزَيْل গোত্রের 'আন উম' শাখা ও 'মাযহেজ' গোত্রের কোনো কোনো শাখার লোকদের স্বীকৃত উপাস্য। মাযাহেজগণ ইয়েমেন ও হিজাজের মধ্যবর্তী 'জুরাস' নামক স্থানে তার বাঘাকৃতি সম্পন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কুরইশ বংশের কারো কারো عَبْد يَغُوْث নাম ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

يَعُوْق : এটা ইয়েমেনের হামদান অঞ্চলের 'হামদান' গোত্রের গাইয়ান শাখার উপাস্য ছিল। তার মূর্তি ছিল অশ্বাকৃতি বিশিষ্ট।

نَسْر : এটা حِمْيَرْ অঞ্চলের অধিবাসী حِمْيَرْ গোত্রের 'আলেযুল কুলা' নামক শাখার লোকদের উপাস্য ছিল نَسْر। 'বালখা' নামক স্থানে তার প্রতিমূর্তি শকুনের আকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাবার প্রাচীন শিলালিপিতে তার নাম লিখিত ছিল নসওয়ার, তার পূজারীদেরকে বলা হয় নসওয়ার ওয়ালা। -[মাদারিক]

অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে। উপরিউক্ত পাঁচটি নাম হযরত আদম (আ.) -এর পাঁচ পুত্রের নাম ছিল, তন্মধ্যে وَدّ ছিল বড় জনের নাম।

হযরত নূহ (আ.) জাতির হেদায়েতের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। তাই জাতির উপর বদদোয়া করা কিভাবে শোভা পেল? : হযরত নূহ (আ.) যখন ওহীর মাধ্যমে স্বজাতির হেদায়েত কবুল না করার উপর নিশ্চিত অবগতি লাভ করলেন যে, لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ আপনার সম্প্রদায় হতে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, এরা ব্যতীত আর কেউ ঈমান গ্রহণ করবে না, অতএব আপনি তাদের কৃতকার্যের উপর চিন্তিত হবেন না। এতে তিনি তাদের হতে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তারা নাফরমান বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। আর নাফরমানদের এবং কাফেরদের জন্য বদদোয়া জায়েজ হয়েছে যেভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও কাফেরদের জন্য বদদোয়া করেছেন, اَللّٰهُمَّ زَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ আবূ জাহল ও অন্যান্য কাফেরদের প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এরূপে বদদোয়া করা হয়েছে اَبُوْجَهْلَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا : اِغْرَاقْ বলতে পানিতে ডুবিয়ে মারা বুঝায়। নূহ সম্প্রদায়কে মহাপ্লাবন দিয়ে ডুবিয়ে মারার কথা এখানে বলা হয়েছে। আর তাদেরকে ডুবানো হয়েছিল তাদের অপরাধ তথা গুনাহের কারণে। তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারাই শেষ নয়। এরপর তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এর অর্থ হলো তাদেরকে কবরে আজাব দেওয়া, কেননা দোজখের আগুন আসবে কিয়ামতের পরে। তাই তাদেরকে আগুনে প্রবেশ করানো হয়েছে বলে কবরের আজাবের কথাই বুঝানো হয়েছে। -[কুরতুবী, কাবীর]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং তাদেরকে মধ্যলোকে কবরের আজাবে গ্রেফতার করা হয়। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٦. وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا أَيْ نَازِلَ دَارٍ وَالْمَعْنٰى أَحَدًا .

২৬. আর নূহ বলেছিল, হে প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না অর্থাৎ কোনো গৃহে অবতরণকারী, এর অর্থ হলো কাউকেও।

٢٧. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا مَنْ يَّفْجُرُ وَيَكْفُرُ قَالَ ذٰلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِيْحَاءِ إِلَيْهِ .

২৭. যদি তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দান কর, তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে, আর তারা পাপাচারী ও কুফরি আচরণকারী ব্যতীত কোনো সন্তান জন্ম দিবে না, যারা পাপাচারে লিপ্ত হবে এবং কুফরি আচরণ করবে। এ বদদোয়াও তিনি পূর্বোক্ত ওহী আসার পর করেছেন।

٢٨. رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَكَانَا مُؤْمِنَيْنِ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مَنْزِلِيْ أَوْ مَسْجِدِيْ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا هَلَاكًا فَأُهْلِكُوْا .

২৮. হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করো তারা উভয়ে মু'মিন ছিল। আর ক্ষমা করো তাদেরকে যারা আমার গৃহে প্রবেশ করেছে আমার আবাসগৃহ বা মসজিদে মু'মিনরূপে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীদেরকে ক্ষমা করো কিয়ামত পর্যন্ত। আর জালিমদেরকে ধ্বংস ব্যবতীত কিছুই বৃদ্ধি করো না ধ্বংসপ্রাপ্তি। সুতরাং তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا : বাক্যটি قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ -এর উপর আতফ হয়েছে। مُؤْمِنًا শব্দটি لِمَنْ دَخَلَ হতে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) -এর তাঁর সম্প্রদায়ের উপর বদোয়ার কারণ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে বেঈমান কাফিরের জন্য হযরত নূহ (আ.)-এর বদদোয়া এবং ঈমানদার মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা প্রকাশ পেয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর বদদোয়ার কারণ এটা নয় যে, তিনি খুবই ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন; বরং তিনি সুদীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত দীনের প্রচার চালিয়ে তার হক আদায় করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর জাতির লোকজনের ঈমান গ্রহণের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়েছেন। আর এ চরম নৈরাশ্যের মধ্যেই তাঁর কণ্ঠে এ দোয়া স্বতই উচ্চারিত হয়ে যায়। এর মূলে অস্থিরতা বা ধৈর্যহীনতার কোনো স্থান নেই। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا : এ অংশে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বিতীয় বদদোয়াটির কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর দোয়ার ভাষা ছিল আল্লাহ যেন কোনো একটি কাফেরকেও বাঁচিয়ে না রাখেন, কারণ তাদেরকে রাখলে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানগণও তাদের মতো কাফের হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত নূহ (আ.) কিভাবে বলেছিলেন যে, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও কাফের ও ফাজির হবে অথচ আল্লাহই জানেন কে হেদায়েত প্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট হবে : হযরত নূহ (আ.)-এর বিষয়টি জানার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ এটাই অকাট্য দলিল এবং হযরত নূহ (আ.)-এর এ কথা বলার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ যেখানে لَنْ يُؤْمِنَ বলেছেন সেখানে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, পরীক্ষণ নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ হযরত নূহ (আ.) যে হায়াত পেয়েছিলেন, তা মূলত অত্যন্ত বেশি হায়াত। হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা ৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) বছর হায়াত দান করে তাঁর জাতিকে হেদায়েতের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরের মধ্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তাদের হেদায়েতের জন্য চালিয়েছেন, কিন্তু কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হয়নি। এ দীর্ঘকালের মধ্যে তাদের স্বভাব ও চরিত্র জানতে আর কিছু বাকি ছিল না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ .... اِلَّا تَبَارًا : এ আয়াতটির প্রথমাংশ হযরত নূহ (আ.)-এর মাতা-পিতা ও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান নরনারীর জন্য দোয়া এবং শেষাংশ কাফেরদের প্রতি বদদোয়া স্বরূপ। হযরত নূহ (আ.) বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে মাফ করে দিন, আর আমার সাথে যারা রয়েছে তাদের সকলকেই ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আর জালিম কাফেরদেরকে নিঃশেষ করে দিন।

قَوْلُهُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ : হযরত নূহ (আ.) তাঁর মাতা-পিতার জন্য দোয়া করার প্রসঙ্গে যদি প্রশ্ন করা হয় যে তারা মুসলমান ছিল কিনা? নতুবা কাফেরদের জন্য দোয়া করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? এ প্রসঙ্গে বলা হবে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর মাতাপিতা উভয়েই মুসলমান ছিলেন, জালালাইন গ্রন্থকার এ কথাটি স্পষ্ট করে বলেছেন وَكَانَا مُسْلِمَيْنِ তারা দু'জন মুসলমান ছিলেন, সুতরাং মুসলমান হিসাবে اَلِدَيْنِ-এর জন্য দোয়া ওয়াজিব, তিনি ওয়াজিব আদায় করেছেন–

لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا .

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا আয়াতে بَيْتِىَ শব্দের অর্থ : হযরত নূহ (আ.) যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তা ছিল নিজের জন্য, পিতামাতার জন্য এবং যারা তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিল তাদের জন্য। এখানে بَيْتِىَ বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। ইমাম যাহহাক বলেন, بَيْتِىَ বা আমার ঘর বলতে 'আমার মসজিদ' বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ঘর বলতে এখানে হযরত নূহ (আ.)-এর কিস্তি বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ঘর বলতে এখানে দীন বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকেও ক্ষমা করো যারা আন্তরিকতার সাথে আমার দীনকে কবুল করেছে। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْجِنِّ : সূরা আল-জিন্ন

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'আল-জিন্ন' শব্দটি এ সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা এ সূরাতে জিনদের কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ন করে স্বজাতির লোকদের নিকট প্রচার করার কথা বিবৃত হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ২৮টি আয়াত, ২৮৫টি বাক্য এবং ৮৭০ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীসহ হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবীসহ উকায নামক বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। এমতাবস্থায় জিনদের একটি বাহিনী সে অঞ্চল অতিক্রম করে যাচ্ছিল। কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনে তারা থেমে গেল এবং গভীর মনোনিবেশের সাথে কুরআনের বাণী শ্রবণ করল। এ প্রেক্ষিতে সূরা আল-জিন্নটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

অধিক সংখ্যক তাফসীরকার এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে করেছেন যে, আসলে তা প্রখ্যাত তায়েফ যাত্রাকালীন একটি ঘটনা। হিজরতের তিন বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দশম বর্ষে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ তায়েফ সফরকালে জিনদের যে কুরআন শ্রবণের ঘটনা ঘটেছে তা একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। সূরা আহকাফে তার ব্যাখ্যা রয়েছে। আর জিনগণ কুরআন শুনে ঈমান আনয়নের পূর্ব থেকেই তারা হযরত মূসা (আ.) ও আসমানি কিতাবাদির উপর ঈমান রাখত। অত্র সূরার ২ থেকে ৭ পর্যন্ত আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, এ সময় কুরআন শ্রবণকারী জিনেরা বহু সংখ্যক ছিল, আর তারা মুশরিক ছিল। ইতিহাসের বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তায়েফ সফরকালে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) কেবল হুযূরের সঙ্গী ছিলেন।

আর উকায নামক বাজারে সফরকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে অনেকজন সাহাবী সঙ্গী ছিলেন। অনেকগুলো হাদীসের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে, অত্র সফরে সঙ্গী জিনেরা রাসূলে কারীম ﷺ থেকে কুরআন শুনেছিল। আর এ সফরটি ছিল তায়েফের সফরের পর মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনকালে অর্থাৎ উকায বাজারের দিকে যাওয়ার কালে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাজ পড়ার সময় কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের ঘটনা।

এসব কারণে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সূরা আহকাফ ও সূরা আল-জিন্নে একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি; বরং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ছিল।

আর জিনগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইচ্ছাকৃত কুরআন শ্রবণ করাননি; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে সাথে করে উকায বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। আর এ মুহূর্তে শয়তান যখন আকাশের مَلَأُ اَعْلٰى তে আল্লাহ কি আলোচনা করেছেন তা শ্রবণ করতে যেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ شِهَابٌ ثَاقِبٌ দ্বারা তাদেরকে আঘাত করা হয় তখনই তারা পরস্পর একত্রিত হয়ে যুক্তি করল যে, আকাশের সংবাদ নেওয়ার কাজে আমরা যে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি দুনিয়াতে এমন কিছু ঘটেছে যা আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধা দানকারী হয়েছে, সুতরাং مَشْرِقِ থেকে مَغْرِبِ এবং شِمَالٌ থেকে جُنُوْبُ পর্যন্ত গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। অতএব, তাদের আলোচনা মোতাবেক হেজাজ -এর তেহামাহ নামক স্থানে যে দল পৌঁছল তারা 'নাখলা' নামক স্থানে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ফজরের নামাজ পড়তে দেখল। সে স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফজরের নামাজের কেরাত শ্রবণ করে তারা পরস্পর শপথ করে বলাবলি করতে লাগল যে, এটাই আমাদের আসমানি সংবাদ নেওয়ার কাজে বাধাদানকারী বিষয়। তখন তারা তাদের অন্যান্যদের নিকট গিয়ে কুরআন শ্রবণের ঘটনা বর্ণনা করল। ভাষাটি ছিল اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا -[মা'আরিফ]

বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরায় জিনদের আসমানি সংবাদ সংগ্রহের পথ বন্ধ হওয়ার কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মহানবীর কণ্ঠে কুরআন শ্রবণ করে বিমোহিত হওয়া এবং ঈমান আনা অতঃপর স্বজাতির মধ্যে প্রচার করার কথা বলা হয়েছে।

প্রথম থেকে ১৫ পর্যন্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক জিন কুরআনের বাণী শুনে স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রচার করেছে, যা নবী করীম ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে। জিনগণ স্বজাতির নিকট গিয়ে বলেছে, আমরা এমন এক বিস্ময়কর বাণী শুনেছি যা মানব ও জিন সম্প্রদায়ের জন্য সত্য পথের দিশা দেয়। আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরিক করবো না। তিনি মহান, তাঁর স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই কিন্তু আমাদের মধ্যে নির্বোধগণ আল্লাহর

Free @ www.e-ilmweebly.com

শানে অবাস্তব উক্তি করে থাকে। আমরা জানতাম, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা উক্তি করতে পারে না। কতিপয় মানুষ জিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের অহমিকা বাড়িয়ে দেয়। মানুষ এ মিথ্যা ধারণায় নিপতিত রয়েছে। আমরা যখন আসমানের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে যাই, তখনই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হই এবং কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আসমানকে পরিপূর্ণ পাই। আমরা আসমানে কোনো এক গোপন স্থানে আরশের ফয়সালাকৃত সংবাদসমূহ জানার জন্য এর পূর্বে ওঁৎ পেতে বসে থাকতাম; কিন্তু এখন কেউ অনুরূপ বসলে সে জ্বলন্ত শেলের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের এ সংবাদ সংগ্রহের দ্বার বন্ধকরণ দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীবাসীর অমঙ্গল চান, না পথের দিশা দিতে চান তা আমরা কিছুই বলতে পারি না। আমাদের মধ্যে অনেক নেককার ও পাপিষ্ঠ রয়েছে। আমরা আল্লাহকে কোনোক্রমেই পরাভূত করতে পারবো না। তাঁর আবেষ্টনীর মধ্যেই আমাদের আহ্বান। আমরা সত্যের বাণী শুনে ঈমান এনেছি। যারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাদের পুরস্কার লাঘব হওয়া এবং শাস্তি বৃদ্ধির কোনো আশঙ্কা নেই। আমাদের মধ্যে কিছু রয়েছে মুসলমান এবং কিছু অমুসলমান। যারা হেদায়েত গ্রহণ করে তারা চিন্তা-ভাবনা করার পরই তা গ্রহণ করে। আর যারা জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী তারা কিছুই চিন্তা-ভাবনা করে না। তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

১৬ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে শিরক পরিহার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা শিরক বর্জন করবে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আর যারা তা করবে না তারা চরম ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১৯ থেকে ২৩ নং আয়াত পর্যন্ত মক্কার কাফেরগণকে তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আল্লাহর নবী যখন ইবাদতে দণ্ডায়মান হয় তখন তোমরা তাঁর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ো। অথচ তিনি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করেন, তাঁর সাথে কাউকেও অংশীদার সাব্যস্ত করেন না। নবী তোমাদের অনিষ্ট বা কল্যাণ কিছুই করতে পারেন না। ভালোমন্দ করার কোনো কিছু তাঁর হাতে নেই। তা করার অধিপতি একমাত্র আল্লাহ। রাসূলের দায়িত্ব হলো মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে না, তারা চিরন্তনভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

২৪ থেকে ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত শাস্তি আগমনের সময় জানতে চাচ্ছ। তা অতি নিকটে না দীর্ঘ দিন পর হবে, নবী তা কিছুই জানেন না। তোমরা নবী এবং তাঁর দলবলকে ক্ষুদ্র ও দুর্বল ভাবছ। তোমরা স্মরণ রেখো! সে শাস্তি যখন প্রত্যক্ষ করবে, তখনই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, কারা দুর্বল এবং কারা সংখ্যায় স্বল্প। আল্লাহ গায়েবী বিষয় সম্পর্কে তাঁর মনোনীত নবী ব্যতীত কাউকেও অবহিত করেন না। একমাত্র নবুয়তের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই তাঁকে এ বিষয় অবিহত করা হয়। নবীর দায়িত্ব হলো আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। এ পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ ফেরেশতাগণকে প্রহরী ও সংরক্ষকরূপে নিয়োজিত করেন। সব কিছুই তাঁর আবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা নূহে ইরশাদ হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। আর এ সূরায় জিনদের ঈমান আনয়নের কথা রয়েছে যে, তারা কুরআনে হাকীম শ্রবণ করে তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর মানুষ বিশেষত মক্কার কাফেররা কুরআনে কারীমের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। আল্লামা সুয়ূতি (র.) লিখেছেন, আমি অনেক দিন যাবৎ দু' সূরার সম্পর্কের বিষয়টি চিন্তা করেছি। অবশেষে আমার নিকট যা প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো সূরা নূহে রয়েছে–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا .

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাপ্রিয়। যদি তোমরা তাঁর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে তিনি আসমান থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। –[আয়াত : ১১]

আর সূরা আল-জিন্নে রয়েছে– وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا . অর্থাৎ যদি এ কাফেররা সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম। –[আয়াত : ১৬] –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-জিন্ন মক্কায় অবতীর্ণ

ثَمَانٍ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً : আয়াত সংখ্যা– ২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَخْبِرْتُ بِالْوَحْيِ مِنَ اللّٰهِ اَنَّهُ الضَّمِيْرُ لِلشَّاْنِ اسْتَمَعَ لِقِرَاءَتِيْ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ وَ ذٰلِكَ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِبَطْنِ نَخْلَةَ مَوْضَعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَهُمُ الَّذِيْنَ ذُكِرُوْا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ الْاٰيَةَ فَقَالُوْا لِقَوْمِهِمْ لَمَّا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ فِيْ فَصَاحَتِهِ وَغَزَارَةِ مَعَانِيْهِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ .

১. বলুন হে মুহাম্মদ! মানুষকে উদ্দেশ্য করে আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে ওহীর মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দেওয়াও হয়েছে যে, এটা ضَمِيْر شَانِيَة শ্রবণ করেছে আমার কেরাত জিনদের মধ্য হতে একদল নসীবাইন নামক স্থানের জিনগণ উদ্দেশ্য। তা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী বাতনে নাখলা নামক স্থানে সংঘটিত ফজর নামাজের ঘটনা। আয়াত وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ (الْاٰيَةَ)-এর মধ্যেও এ সকল জিনের প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর তারা বলেছে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করার পর আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি যার ভাষাগত লালিত্য, অলংকারিত ও অর্থের ব্যাপকতা ইত্যাদি মানুষকে বিস্মিত করে।

২. يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ الْاِيْمَانِ وَالصَّوَابِ فَاٰمَنَّا بِهِ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بَعْدَ الْيَوْمِ بِرَبِّنَآ اَحَدًا .

২. যা সঠিক পথ নির্দেশ করে ঈমান ও ছওয়াবের প্রতি সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি এবং আমরা অংশীদার স্থির করবো না আজকের দিনের পর হতে আমাদের প্রতিপালকের সাথে অন্য কাউকেও।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّهُ اسْتَمَعَ : বাক্যটি اُوْحِيَ-এর নায়েবে ফায়েল, اَنَّهُ-এর যমীর শান বা মর্যাদাজ্ঞাপক। عَجَبًا – কুরআন -এর সিফাত, মাসদার মুবালাগার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। يَهْدِيْ – বাক্যটি قُرْاٰنً-এর দ্বিতীয় সিফাত। অথবা তা হতে হাল. كَذِبًا – মাসদার হিসাবে মানসূব হয়েছে অথবা মাউসূলের সিফাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে জিনদের ঘটনা সম্পর্কে যে ওহী করেন তা তাঁর সাহাবীদের নিকট প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করার ফায়েদা : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন তিনি তাঁর সাহাবীদের নিকট জিনদের সম্পর্কে যে ওহী নাজিল করা হয়েছে তা প্রকাশ করে দেন। এ নির্দেশ প্রদানে যে ফায়েদা রয়েছে তা হলো :

Free @ www.eilm.weebly.com

১. সাহাবীরা যেন জানতে পারেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যেমন মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছেন– তেমনি তিনি জিনদের নিকটও প্রেরিত হয়েছেন।
২. মানুষ যেন জানতে পারে যে, তাদের মতো জিনেরাও মুকাল্লাফ, তারাও আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করতে আদিষ্ট।
৩. মানুষ যেন জানতে পারে যে, জিনেরা তাদের কথা শুনতে পায় এবং তাদের ভাষা বুঝতে পারে।
৪. কুরইশদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, জিনেরা কুরআন শুনে তার মু'জিযা বুঝতে পেরেছে এবং ঈমান গ্রহণ করেছে। আর তোমরা তা বুঝতে পেরেও এখন পিছুটান কেন?
৫. এ কথা ও জানিয়ে দেওয়া যে, ঈমানদার জিনেরা তাদের সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে আহ্বান জানায়। –[কাবীর]

জিন-এর পরিচয় : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাঝে জিনও একটি। জিন দেহবিশিষ্ট এক প্রকার জীব। তাদের দেহের উপদানে অগ্নির প্রাধান্য বিদ্যমান, আর মানুষের দেহের উপাদানে বিদ্যমান মাটির প্রাধান্য। মানুষের মতো তাদেরও বিবেক, বুদ্ধি, অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষের মতো নারী ও পুরুষে তারা বিভক্ত এবং তাদের বংশ বৃদ্ধিও হয়। তারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। মানুষের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে তাদের অবস্থান। জিন শব্দের অর্থ– লুক্কায়িত, গোপন থাকা। আর জিন আমাদের চোখের অন্তরালে থাকে বলে তাদের জিন বলা হয়। জিনদের মাঝে দুষ্ট প্রকৃতির যারা তাদের শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জিনদের অস্তিত্ব প্রমাণিত। তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কুফরি।

জিন সম্পর্কে মতভেদ : কারো কারো মতে জিনজাতি ইবলিসের সন্তানসন্ততি, যেভাবে মানুষ সকল হযরত আদম (আ.) -এর সন্তান إِنَّ الْجِنَّ وَلَدُ الْجَانِّ - وَالشَّيَاطِيْنَ وَلَدُ إِبْلِيْسَ يَمُوْتُوْنَ কারো মতে وَلٰكِنَّ الْمُتَمَرِّدَ مِنَ الْجِنِّ يُسَمّٰى شَيْطَانًا مَعَ إِبْلِيْسَ عِنْدَ النَّفْخَةِ. – তবে প্রথম অভিমতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

আর যে জিনটি ঈমান আনয়ন করবে তখন তার পিতা হতে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে হযরত আদম (আ.)-এর সাথে ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যাবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কুফরি করে থাকে তার সম্পর্ক হযরত আদম (আ.) হতে ছিন্ন হয়ে ইবলিসের সাথে কুফরির সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। –[সাবী]

তবে কেউ কেউ বলেন, ঈমানদার জিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে দোজখের আগুনেও নিক্ষিপ্ত হবে না; বরং বেহেশত ও দোজখের মাঝে থাকবে। তবে এ অভিমতটি خِلَافُ عَقْلٍ বলে ধারণা হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.

বহুসংখ্যক মানব ও দানবকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করেছেন। সকলকে তো জাহান্নামী তৈরি করেছেন বলেননি। আর অন্যান্য আয়াতে যা বলা হয়েছে এবং হাদীস শরীফেও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, জিন ও ইনসান উভয় জাতির হিসাব-নিকাশ হবে। যদি বেহেশত ও দোজখের শাস্তি ও শান্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকত তবে হিসাব-নিকাশেরও আবশ্যকতা কি ছিল, অতএব জিনজাতির ঈমানদারগণ বেহেশতে প্রবেশ করাটাই হবে ইনসাফ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি জিনদের দেখেছিলেন না দেখেননি? : হযরত মুহাম্মদ ﷺ জিনদের দেখেছিলেন কিনা এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, তিনি তাদের দেখেননি। সূরা জিনের উপরিউক্ত আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় যে, তিনি তাদের দেখেননি। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখেছেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখেছেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলেছেন। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জিনদের একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতের ব্যাপারে এবং এ সূরার আয়াতের ব্যাপারে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রথম আগমনের কথা জানতে পারেননি এবং তাদেরকে দেখতে পাননি। তাদের আগমনের কথা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন এবং দীনের কথা শুনেছেন, যা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। –[কাবীর, যিলাল]

ঈমানদার জিনদের জান্নাতে প্রবেশ সম্পর্কে মতপার্থক্য : জিনদের মাঝে যারা আল্লাহর অবাধ্য তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে যারা ঈমানদার তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কিনা সে ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হবে। দ্বিতীয় অভিমত হলো, তারা জান্নাতবাসী হবে। কেননা

বেহেশতি হুরদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে, তাদেরকে কোনো মানুষ ও জিন স্পর্শ করেনি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতে জিনরাও প্রবেশ করবে। তা ছাড়া পাপী জিনদের যখন জাহান্নামে দেওয়া হবে তখন ঈমানদার জিনদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে এটাই আশা করা সঙ্গত এবং ইনসাফের দৃষ্টিতে এরূপ হওয়াই সমীচীন।

نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ – বলে জিনদের কোন দলের প্রতি ইশারা করা হয়েছে? : তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ -এর তাফসীর করেছেন جِنُّ نَصِيْبِيْنَ অর্থাৎ তারা নসীবাইন -এর অধিবাসী ছিল, আর তা ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম, [মায়ারেফ গ্রন্থকারের মতে তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৯ জন] আর ইয়েমেনের সে জিনগণ মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি স্থানে অর্থাৎ 'নাখলা' নামক জায়গায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ফজরের নামাজের সময় তেলাওয়াতকৃত কেরাত শ্রবণ করেছিল।

কুরআন মাজীদের ২৬ নং পারার সূরায়ে আহকাফেও এদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ .

قُرْاٰنًا عَجَبًا -এর মর্মার্থ : কালামে মাজীদে মূল শব্দটি হলো قُرْاٰنًا عَجَبًا -কুরআন অর্থ– পঠিতব্য বিষয়। আর عَجَبًا অর্থ– অতিশয় বিস্ময়কর। عَجَبٌ শব্দটি আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থাৎ এটা দ্বারা গুণগত দিকটির আধিক্য, প্রাবল্য ও আতিশয্যতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়। সুতরাং এর মর্ম হবে পঠিতব্য বিষয়টি অতিশয় মনোমুগ্ধকর ও বিস্ময়কর। তা দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, জিনগণ তাকে তখন কুরআন ভেবে কুরআন বলেনি। কেননা সেটাই ছিল এ মহাকালামের সাথে তাদের প্রথম পরিচয়। এর পূর্বে এ মহান কালামের সাথে তাদের আদৌ কোনো পরিচিতি ছিল না; তারা একে আভিধানিক অর্থেই বুঝিয়েছে। আর এ বাক্যাংশ দ্বারা এটাও বুঝা যায় যে, জিন জাতি মানবজাতির ভাষা বুঝে থাকে। কেননা তারা কুরআনের অবিসংবাদিত আরবি ভাষা, তার বৈয়াকরণিক অলংকার মাধুর্যতা, ছন্দের ঝংকার ও ভাবের দ্যোতনাকে উপলব্ধি করেই বুঝেছিল যে, তা কোনো মানব রচিত কালাম নয়। এ কালাম অবতীর্ণ হওয়ার কারণেই তাদের জন্য আসমানি সংবাদ সরবরাহ করার পথ বন্ধ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ ...... بِرَبِّنَآ اَحَدًا : পবিত্র কালাম সম্পর্কে জিনগণ বলেছিল, তা এমন কালাম, যা নেককাজের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। অতএব, আমরা তার সত্যতা বুঝে তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আর আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, আজ হতে কখনো আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের সাথে কাউকে শরিক করবো না।

উক্ত আয়াতটি কতগুলো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ–

১. জিনজাতিদের মধ্যেও মুসলমান অমুসলমান রয়েছে। অন্যথায় তারা ঈমান আনয়ন করার কোনো অর্থই থাকতে পারে না।

২. পবিত্র কুরআন মানুষকে সত্যই সঠিক পন্থার প্রতি আহ্বান করে, জিনজাতির ইসলাম গ্রহণের এ ঘটনাটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ কারো প্ররোচনায় তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। কুরআনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

৩. মানব জাতির হেদায়েতের জন্য যে নবী প্রেরণ করা হয়ে থাকে তাদের দ্বারাই জিনজাতি হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

৪. জিনজাতি আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা ও লালনপালনকারী রূপে বিশ্বাসী।

رُشْد দ্বারা উদ্দেশ্য : জালালাইন গ্রন্থকারের মতে رُشْد দ্বারা এখানে طَرِيْقُ الصَّوَابِ এবং طَرِيْقُ الْاِيْمَانِ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মাদারেক গ্রন্থকার رُشْد -এর তাফসীর করেছেন– يَدْعُوْا اِلَى الصَّوَابِ اَوْ اِلَى التَّوْحِيْدِ وَالْاِيْمَانِ অর্থাৎ কুরআনে এমন বাণী রয়েছে, যা সত্য পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, ঈমান ও আল্লাহর একত্ববাদের দিকে মানুষকে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। শান্তির পথ সম্বন্ধে উপদেশ দান করে।

সূরা اَسْرٰى -এর আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا . – অপরাপর আয়াতেও বলা হয়েছে [অনুরূপভাবে]–

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣. وَاَنَّهُ الضَّمِيْرُ لِلشَّانِ فِيْهِ وَفِى الْمَوْضَعَيْنِ بَعْدَهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا تَنَزَّهَ جَلَالُهُ وَ عَظْمَتُهُ عَمَّا نُسِبَ اِلَيْهِ مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً زَوْجَةً وَّلَا وَلَدًا ـ

৩. আর নিশ্চয় এখানে এবং তার পরবর্তী দু'স্থানে ضَمِيْر গুলো ضَمِيْر شَانِيَه আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সুউচ্চ হয়েছে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সকল প্রকার অসঙ্গত কথাবার্তা হতে পূত-পবিত্র। তিনি গ্রহণ করেননি কোনো সঙ্গিনী স্ত্রী আর না কোনো সন্তান।

٤. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا جَاهِلُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا غُلُوًّا فِى الْكِذْبِ بِوَصْفِهٖ بِالصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ ـ

৪. আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধগণ বলত মূর্খগণ আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথাবার্তা তাঁর প্রতি স্ত্রী-পুত্রের সম্পর্ক করে জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত হতো।

٥. وَاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهُ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا بِوَصْفِهٖ بِذٰلِكَ حَتّٰى بَيَّنَّا كِذْبَهُمْ بِذٰلِكَ قَالَ تَعَالٰى ـ

৫. অথচ আমরা ধারণা করতাম যে, اَنْ অব্যয়টি মুখাফফাফা, মূলত বক্তব্যটি ছিল اَنَّهُ মানুষ ও জিনজাতি আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা বলবে না এ ধরনের মিথ্যার সাথে তাঁকে বিশেষিত করবে না, যার অসত্যতা আমাদের বর্ণনা করতে হয়েছে।

٦. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ يَسْتَعِيْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ حِيْنَ يَنْزِلُوْنَ فِىْ سَفَرِهِمْ بِمَخُوْفٍ فَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ اَعُوْذُ بِسَيِّدِ هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ شَرِّ سُفَهَائِهٖ فَزَادُوْهُمْ بِعَوْذِهِمْ بِهِمْ رَهَقًا طُغْيَانًا فَقَالُوْا سُدْنَا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ ـ

৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর মানুষের মধ্য হতে কতিপয় লোক শরণাপন্ন হতো আশ্রয়প্রার্থী হতো জিনদের মধ্য হতে কতিপয়ের যখন তারা তাদের সফরকালীন সময় কোনো ভীতিপ্রদ স্থানে অবতরণ করত, তখন তারা প্রত্যেকে বলে উঠত اَعُوْذُ بِسَيِّدِ هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ شَرِّ سُفَهَائِهٖ 'আমি এ স্থানের দলপতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি এখানকার নিকৃষ্টদের অনিষ্ট হতে' তখন তারা তাদেরকে বৃদ্ধি করে দেয় তাদের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করে আত্মম্ভরিতা অহমিকা, ফলে তারা সদর্পে বলে বেড়াত, আমরা মানুষ ও জিনজাতির উপর নেতৃত্ব করেছি।

٧. وَاَنَّهُمْ اَىِ الْجِنَّ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ يَا اِنْسُ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهُ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا بَعْدَ مَوْتِهٖ ـ

৭. আর তারা জিনগণ ধারণা করেছে যেমন তোমরা ধারণা কর হে মানুষ সকল। যে, اَنْ অব্যয়টি মুখাফফাফা অর্থাৎ اَنَّهُ আল্লাহ কখনো কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না তার মৃত্যুর পর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ رَهَقًا : শব্দটি زَادُوْا-এর মাফউল। مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا বাক্যটি وَجَدْنَا-এর দ্বিতীয় মাফউল। شَدِيْدًا সিফাত হয়েছে حَرَسًا-এর। فِى الْاَرْضِ হাল। فَلَا يَخَافُ الخ বাক্য জওয়াবে শর্ত فَمَنْ-এর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا : এখানে আল্লাহ তা'আলাকে পূর্বসূরি হওয়া হতে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে আমাদের প্রভুর শান এবং মহিমা সবার উর্ধ্বে এবং সবার উপরে, তিনি কখনো জায়া- পুত্র ধারণ করেন না। কারণ তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। জায়া-পুত্র, সন্তান-সন্ততি হওয়া থেকে তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, এগুলো উচ্চমর্যাদার পরিপন্থি।

উক্ত আয়াতে جَدُّ অর্থ হলো– তার মর্যাদা উচ্চতম, এখানে جَدُّ-এর ضَمِيْر টিকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করার পরিবর্তে رَبّ-কে তার স্থলে নিয়ে তার উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। কেননা যিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক তিনি সর্ব বিষয়েই মাখলুকাত হতে উচ্চমর্যাদার অধিকারী। –[মা'আরেফ, তাহের]

উক্ত আয়াত হতে দু'টি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে :

১. একটি এই যে, এ জিনেরা হয় খ্রিস্টানপন্থি জিন ছিল, অথবা এমন কোনো মতবাদে বিশ্বাসী ছিল, যাতে আল্লাহর স্ত্রী-পুত্র আছে বলে মনে করা হতো।

২. দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ তখন নামাজে সম্ভবত এমন একটা অংশ পাঠ করেছিলেন, যা শুনে তারা নিজেদের ধর্মমতকে ভুল বলে বুঝতে পেরেছিল, তখন তারা জানতে পারল যে, আল্লাহ উচ্চ ও মহান পবিত্র সত্তা, তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে মনে করা মারাত্মক ধরনের মূর্খতা ও চরম বেয়াদবি।

سَفِيْهُ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং তার অর্থ : سَفِيْهُ অর্থ নির্বোধ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি বুঝায়। মূলশব্দ হলো سَفِيْهُنَا এটা এক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে, একটি দল বা গোষ্ঠী কিংবা একটি বাহিনীর ক্ষেত্রেও তা ব্যবহৃত হতে পারে। একজন অজ্ঞ-মূর্খ-বোকা লোক বুঝানোর উদ্দেশ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকলে তখন তার অর্থ হবে ইবলীস শয়তান। আর একটি দল-গোষ্ঠী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে অর্থ হবে, একদল নির্বোধ জিন, যারা এ ধরনের বিবেকহীন কথাবার্তা বলত।

"اَلنَّاصِبُ "كَذِبًا :

كَذِبًا শব্দটির নসবদানকারী অব্যয় : كَذِبًا শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ হলো–

১. كَذِبًا শব্দটি একটি উহ্য মাসদারের সিফাত হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। মূলে ছিল–

اَنْ لَنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ قَوْلًا كَذِبًا .

২. অথবা, كَذِبًا মানসূব হয়েছে মাফঊলে মুতলাক হওয়ার কারণে।

একজন জিন সাহাবীর ঘটনা : আল্লামা ইবনে জাওযী 'সাফওয়াতুস সফওয়ান' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি কোনো এক সময় আদ সম্প্রদায়ের আবাসভূমিতে ভ্রমণে বের হলাম। পথ চলতে চলতে একটি শহর দেখতে পেলাম। এ শহরটিতে পাহাড় খোদাই করেই সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। সে শহরটি জনশূন্য কোথাও মানুষের আবাদ পরিলক্ষিত হয়নি। জিনগণ তথায় নিজেদের আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছে। আমি সে সুরম্য দালান-কোঠার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ একটি কামরায় অতিশয় বৃদ্ধ একটি লোক দেখতে পেলাম। সে কা'বার দিকে ফিরে নামাজরত রয়েছে। তার দেহের পোশাকটি অতি চমৎকার মনে হলো, যেন পোশাকটি নতুন, সবেমাত্র তৈরি করা হয়েছে। আমি তাকে সালাম করলাম, সেও সালামের জবাব দিল। অতঃপর সে আমাকে বলল, হে সাহল! দেহ কখনো পোশাককে পুরাতন করে না; বরং পাপাচারের দুর্গন্ধ এবং হারাম খাদ্যের ফলেই পোশাক পুরাতন হয়। এ পোশাকটি সাতশত বছর যাবৎ আমার দেহে শোভা পাচ্ছে। এ পোশাক পরিধান করেই আমি হযরত ঈসা (আ.) ও মহানবী মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাদের উভয়ের প্রতিই ঈমান এনে মুসলমান হয়েছি। এ কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি সে জিন, যাদের সম্পর্কে আল-কুরআনের ... قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ – আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। –[লোবাব, মা'আরেফুল কোরআন]

فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا বাক্যে رَهَقًا -এর অর্থ এবং زَادَ ফে'লের ফায়েল : رَهَقًا শব্দের অর্থ হলো গুনাহ, অহংকার, অহমিকা, দাম্ভিকতা, অবাধ্যতা। উক্ত আয়াতে তার মর্মার্থ হলো– তারা এসব করে তাদের গুনাহ-খাতা, পাপ ও অপরাধ আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। কেউ কেউ বলেন, এসব করে তাদের অহমিকা, দাম্ভিকতা, অহংকার আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে। তারা যখন আমাদের নিকট এভাবে আশ্রয় চেয়েছে তখন আমার মতো আর কে আছে? زَادَ -এর ফায়েল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। হযরত আতা (রা.) বলেন, زَادَ -এর ফায়েল হলো জিন। অন্য একটি অভিমত হলো, زَادَ -এর ফায়েল হলো– اِنْسَانٌ।

শানে নুযূল ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা : ইবনে মুনযির, আবূ হাতেম ও আবূ শায়খ প্রমুখ হতে বর্ণিত, ফরযম ইবনে আবূ সায়েব আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে কোনো এক বিশেষ প্রয়োজনে মদীনায় গিয়েছিলাম। এ সময়টি ছিল মহানবী ﷺ-এর নবীরূপে পরিচিতির প্রথম যুগ। পথে রাত্রি আমাদেরকে এক বকরি পালকের নিকট আশ্রয় দিল। রাতের কালো আঁধার যখন চতুর্দিক হতে নেমে আসল তখন একটি শৃগাল আক্রমণ করে একটি বকরি পাল হতে নিয়ে গেল। মেষপালক সাথে সাথে লাফিয়ে পড়ে বলল, হে উপত্যকার পরিচালক! আমি তোমার আশ্রয়াধীন প্রতিবেশী। আমার বকরি শৃগাল নিয়ে যাচ্ছে। তখন অদৃশ্য হতে কে যেন ডেকে বলতে লাগল, হে সরহান! সৈন্য পাঠিয়ে দাও। অতঃপর বকরিটি শৃগালের নিকট হতে ছিনিয়ে আনা হলো। বকরিটি স্বীয় পালে প্রবেশ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলের নিকট মক্কায় উপরিউক্ত وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ ..... আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব, খাযেন, কাছীর]

দ্বিতীয় ঘটনা : ইবনে সা'দ হতে বর্ণিত, বনী তামীম গোত্রের আবূ রেজায়া আল-আতুরদী (র.) বলেন, মহানবী ﷺ যখন নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেন, তখন আমি আমার পারিবারিক তত্ত্বাবধানে ছিলাম এবং আমিই এ কাজের জন্য যথেষ্ট ছিলাম। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর তাওহীদী আন্দোলন শুরু হলে আমরা পালিয়ে 'ফলাত' নামক স্থানে এসে আশ্রয় নিলাম এবং তথায় রাতের আঁধার নেমে আসলে আমাদের সঙ্গী বৃদ্ধজন বলল, আমরা এ উপত্যকার জিন সম্প্রদায়ের মহাপরিচালক ও সর্দারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা বললাম, বন, অরণ্য ও উপত্যকায় রাত যাপন করলে কি এরূপই বলতে হয়? আমাদের বলা হলো, তাহলে সে ব্যক্তির পথ, যে এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রাসূল। যে লোক তা পাঠ করে তার প্রাণ ও ধনসম্পদ নিরাপদ হয়। সুতরাং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং ইসলামে প্রবিষ্ট হলাম। হযরত আবূ রেজায়া বলেন, ... وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ আয়াত আমাদের ও আমাদের সঙ্গীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে কিনা তা আমরা জানি না। –[লোবাব, খাযেন, ইবনে কাছীর]

তৃতীয় ঘটনা : আল-খারায়েতী 'হাওয়াতিফুল জান' গ্রন্থে সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.)-এ উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, বনী তামীম গোত্রের রাফে' ইবনে ওমায়ের তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে একথা বর্ণনা করেছেন। রাফে' বলেন, আমি কোনো এক রাতে আলেজ সম্প্রদায়ের বালুকাময় উপত্যকা দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। আমার চোখে নিদ্রা এসে পড়ল। সুতরাং আমি সওয়ারি হতে অবতরণ করে সওয়ারিটি বেঁধে ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশ্য নিদ্রার পূর্বে একথা বলেছিলাম যে, আমি এ উপত্যকার জিন অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সুতরাং নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, এক লোকের হাতে একটি ধনুক; সে তা দ্বারা আমার উটকে জবাই করতে চায়। তা দেখে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিদ্রা হতে জাগলাম। আমি ডানে বামে লক্ষ্য করে কিছুই দেখতে পেলাম না। মনে মনে বললাম এটা আমার বায়ু রোগ। অতঃপর আমি নিদ্রা গেলাম। এবারও পূর্বানুরূপ স্বপ্ন দেখতে পেয়ে জাগলাম। দেখলাম আমার উটটি খুব বিব্রত ও অস্থির হয়ে পড়েছে। আর আমার স্বপ্নে দেখা লোকটির ন্যায় এক যুবককে দেখতে পেলাম, যার হাতে রয়েছে তীর ধনুক। এক বৃদ্ধ তাকে হাত দ্বারা উটটিকে জবাই করা হতে বিরত রাখছে। ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। এ সময় তথায় তৃতীয় একটি বন্য গাভী দেখা গেল। তখন বৃদ্ধ লোকটি যুবকটিকে বলল, মানুষের উষ্ট্রের পরিবর্তে এটাকে মুক্তিপণরূপে নিয়ে যাও। যুবকটি বন্য গাভীটিকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। অতঃপর আমি বৃদ্ধ লোকটির দিকে তাকালাম। তখন বৃদ্ধ লোকটি আমাকে বলল, ওহে! যখন তুমি কোনো উপত্যকায় অবতরণ কর এবং সেখানে নিজেকে নিরাপদ মনে না কর, তখন তুমি এ কথা বলবে, আমি মুহাম্মদের প্রতিপালকের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

নিকট এ উপত্যকার অনিষ্টতা হতে অশ্রয় প্রার্থনা করছি। কখনো তুমি জিনের নিকট আশ্রয় প্রার্থী হবে না। এরূপ প্রার্থনা বাতিল হয়েছে। তখন আমি বললাম, মুহম্মদ কে? তখন সে বলল, তিনি হলেন আরবের নবী। তাঁর নিকট পূর্ব-পশ্চিম বলতে কিছু নেই। তিনি সোমবার দিন নবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি বললাম, তাঁর বাড়ি কোথায়? সে বলল, তিনি ইয়াসরিবে বাস করেন। আমি তৎক্ষণাৎ সওয়ারিতে আরোহণ করলাম। তখন প্রভাত ঘনিয়ে আসছিল। আমি সওয়ারিকে খুব দ্রুত পরিচালনা করে মদীনার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হলাম। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার বলার পূর্বে পূর্বকার সংঘটিত ঘটনাটি আমার কাছে বলতে লাগলেন এবং আমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। সা'দ ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন, আমরা মনে করি যে, আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেই وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ ...... رَهَقًا আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। –[লোবাব]

হযরত সাঈদ ইবনে জোবাইর (রা.) এ ঘটনাটি ব্যক্ত করে বলেন, আমার মতে এ ঘটনা প্রসঙ্গেই কুরআনের উক্ত আয়াত وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا নাজিল হয়েছে। –[মা'আরিফ]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا: আর এটাও অস্বীকার করার মতো নয় যে, হে জিনজাতি! তোমরা যেভাবে ধারণা করেছিলে সেভাবে মানবজাতিও ধারণা পোষণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা একবার মৃত্যু দান করার পর পুনরায় কাউকেও জীবিত করতে সক্ষম হবেন না। এতে বুঝা যায় যে, জিনজাতিও بَعْث -কে অস্বীকার করত, অতঃপর ঈমান গ্রহণের পর তা বিশ্বাস করেছে। সুতরাং মানবজাতি কেন ঈমান গ্রহণ করে না এবং পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করে না। –[আশরাফ আলী থানবী (র.)]

كَمَا ظَنَنْتُمْ দ্বারা মাদারিক গ্রন্থকারের মতে اَهْلُ مَكَّةَ -কে خِطَابْ করা হয়েছে। আর اَنَّهُمْ -এর ضَمِيْر هُمْ টি দ্বারা জিনজাতিকে خِطَابْ করেছেন।

কাবীর গ্রন্থকার বলেন, এর দু'টি تَوْجِيْه বা ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. ظَنَنْتُمْ দ্বারা مُخَاطَبْ হলো قُرَيْش এবং

২. আয়াতটি যদি পূর্ববর্তী كَلَامْ -এর সাথে সম্পর্কিত করা হয় তখন اِنَّهُمْ -এর ضَمِيْر এর مَرْجِعْ মানবজাতি হবে। আর ظَنَنْتُمْ -এর خِطَابْ জিনজাতিকে উদ্দেশ্য করা হবে। –[কাবীর]

আবার কেউ কেউ উক্ত لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا -এর দু'টি তাফসীর করেন, তা হলো–

১. আল্লাহ তা'আলা কাউকেও রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।

২. আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না এবং প্রথমোক্ত তাফসীরকে এ কারণেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, অনেক ঈমানদার জিনেরাও নিজেদের জাতির জনতাকে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকেও নবীরূপে পাঠাবেন না বলে তোমাদের যে ধারণা ছিল তা ভুল ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল পাঠিয়েছেন বলেই ঊর্ধ্বজগতের দ্বারসমূহ আমাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ :

٨. قَالَ الْجِنُّ وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ رُمْنَا
اِسْتِرَاقَ السَّمْعِ مِنْهَا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ
حَرَسًا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ شَدِيْدًا وَشُهُبًا
نُجُوْمًا مُحْرِقَةً وَذٰلِكَ لَمَّا بُعِثَ
النَّبِيُّ ﷺ .

৮. জিনেরা বলে, আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহের মনস্থ করেছি আমরা তথায় গোপনে কান পেতে শুনার সঙ্কল্প করেছি। তখন আমরা তাকে পরিপূর্ণ পেয়েছি ফেরেশতাগণের মধ্য হতে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা তাদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তৈরি তারকাপুঞ্জ। আর এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবির্ভূত হওয়ার পর।

٩. وَاَنَّا كُنَّا اَىْ قَبْلَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط اَىْ
نَسْتَمِعُ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ
شِهَابًا رَّصَدًا اَىْ اُرْصِدَ لَهٗ لِيُرْمٰى بِهٖ .

৯. আর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্য বসতাম অর্থাৎ আমরা গোপনে কান পেতে শুনতাম। আর বর্তমানে যে কান পেতে শুনার ইচ্ছা করে, সে তার প্রতি নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে তৈরি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ তার প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।

١٠. وَاَنَّا لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بَعْدَ اِسْتِرَاقِ
السَّمْعِ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا خَيْرًا .

১০. আর আমরা জানি না যে, অমঙ্গলই কি ইচ্ছা করা হয়েছে গোপনে কান পেতে শুনার পর জগদ্বাসীর জন্য, না, তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি মঙ্গলের ইচ্ছা করেছেন কল্যাণ।

١١. وَاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ بَعْدَ اِسْتِمَاعِ
الْقُرْاٰنِ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ط اَىْ قَوْمٌ غَيْرُ
صَالِحِيْنَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا فِرَقًا
مُخْتَلِفِيْنَ مُسْلِمِيْنَ وَكَافِرِيْنَ .

১১. আর আমাদের মধ্যে কতেক সৎকর্মপরায়ণ কুরআন শ্রবণ করার পর এবং কতেক তার বিপরীত অর্থাৎ অসৎ কর্মপরায়ণ আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কেউ মুসলমান আর কেউ কাফের।

١٢. وَاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ مُخَفَّفَةٌ اَىْ اَنَّهٗ لَّنْ نُّعْجِزَ
اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا
اَىْ لَا نَفُوْتُهٗ كَائِنِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَوْ
هَارِبِيْنَ مِنْهَا اِلَى السَّمَاءِ .

১২. আর আমরা ধারণা করেছি যে, اَنْ অব্যয়টি মুখাফ্ফাফা অর্থাৎ اَنَّهٗ আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবো না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না। অর্থাৎ আল্লাহ হতে অব্যহতি লাভ করে দুনিয়াতে কিংবা পলায়ন করে আকাশে আমরা তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না।

١٣. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى الْقُرْاٰنَ اٰمَنَّا بِهٖ ط
فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بِتَقْدِيْرِ هُوَ
بَعْدَ الْفَاءِ بَخْسًا نَقْصًا مِنْ حَسَنَاتِهٖ
وَلَا رَهَقًا ظُلْمًا بِالزِّيَادَةِ فِىْ سَيِّئَاتِهٖ .

১৩. আর আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শ্রবণ করলাম কুরআন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অনন্তর যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, তবে সে ভয় করবে না এখানে فَا -এর পরে هُوَ সর্বনাম উহ্য রয়েছে কোনোরূপ ক্ষতি তার পুণ্যের স্বল্পতার আশঙ্কা এবং কোনো অন্যায়ের তার পাপ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অত্যাচারিত হওয়া।

Free@www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَوَجَدْنَاهَا الخ : বাক্যটি مُلِئَتْ হতে حَال হিসেবে مَحَل مَنْصُوب হয়েছে। حَرَسًا ও مَنْصُوب عَلَى حَالَةٍ ও التَّمْيِيز যেমন বলা হয় اِمْتَلَأَ الْإِنَاءُ مَاءً ।

قَوْلُهُ شَدِيدًا : এটা পূর্ববর্তী حَرَسًا -এর صِفَت হয়েছে।

قَوْلُهُ شُهُبًا : এটা حَرَسًا এর উপর عَطْف হয়েছে সুতরাং তা مَحَلًّا مَنْصُوب

قَوْلُهُ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا : এখানে شِهَابًا رَصَدًا উভয়ই صِفَت এবং مَوْصُوف এবং يَجِدْ لَهُ বাক্য فَمَنْ يَسْتَمِعِ হতে مَحَلًّا جَزَاء হবে।

قَوْلُهُ وَاَنَّا لَا نَدْرِي : এখানে اَنَّ টির عَطْف হবে পূর্ববর্তী বাক্য وَاَنَّا ظَنَنَّا -এর উপর এবং পরবর্তী اَنَّ পূর্বের ন্যায় তার উপর عَطْف হবে।

অথবা اَنَّ بِفَتْحِ هَمْزَة হিসেবে عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلَى الْجُمْلَةِ হবে। তবে পড়া যাবে مَكْسُوْر তে هَمْزَة এর-اِنَّ হিসাবে اِبْتِدَاءُ كَلَام শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ اَشَرٌّ اُرِيدَ : এরা উভয়ই نَدْرِي ফেলের مَفْعُول হিসেবে مَحَلًّا مَنْصُوب হবে। তবে قَوْلُهُ مِنْ অর্থে বর্ণিত মুবতাদা دُوْنَ তার খবর মুয়াখখার।

قَوْلُهُ مِنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا : সিফাত ও মাওসূফ মিলে كُنَّا -এর خَبَر হবে।

قَوْلُهُ اَنْ لَنْ نُعْجِزَ الخ : বাক্যটি ظَنَنَّا হতে جُمْلَة মিলে مَفْعُول হিসাবে مَحَلًّا مَنْصُوب হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ .... شِهَابًا رَصَدًا : জিনজাতির অবস্থা বলে- আমরা এখনতো আসমানের কাছাকাছি গিয়ে দেখি যে, সেখানে অভূতপূর্ব কঠিন এবং দুর্ভেদ্য প্রহরা বর্তমান। সাধ্য কি যে কেউ লুকিয়ে ঢুকে গিয়ে গায়েবী খবর শুনতে পারে; ইতঃপূর্বে এমন কড়া প্রহরা ছিল না বলে কখনো কখনো তা সম্ভব হতো। কিন্তু এখন যে কেউ এরূপ দুশ্চেষ্টা করতে যাবে তার রক্ষা নেই, জ্বলন্ত অঙ্গার তার অপেক্ষায় ওৎপেতে আছে। জ্বলন্ত অঙ্গার এবং উল্কার বৃষ্টির হাত হতে কেউই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

এসব প্রজ্বলিত উল্কাপিণ্ড কি রাসূল ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে বর্তমান ছিল ? : জিনদেরকে যে উল্কাপিণ্ড দ্বারা বিতাড়িত করা হয় তা কি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ছিল, কি ছিল না? সে সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। প্রথমত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এসব উল্কাপিণ্ড নবুয়তের পূর্বে ছিল না। জিনেরা আকাশে উঠে ওহী শ্রবণ করত এবং কোনো একটি কথা শুনলে তাতে আরও নয়টি কথা যোগ করে নিত। একটি কথাই তার মধ্যে সত্য, বাকি নয়টি মিথ্যা ও ভ্রান্ত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহী নাজিল আরম্ভ হয় এবং তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন জিনদেরকে আকাশে উঠে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত এসব উল্কাপিণ্ড নবুয়তের পূর্বেও ছিল। তবে নবুয়তের পর অধিক পরিমাণে মোতায়েন করা হয়েছে এবং পূর্ণতা দান করা হয়েছে। এ মতটির পক্ষে কুরআনের আয়াত ইঙ্গিত করে। কেননা, কুরআনের শব্দ হচ্ছে فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ আমরা পেয়েছি যে, তা পরিপূর্ণ হয়েছে। এটা হতে বুঝা যায় যে, পূর্বেও ছিল; তবে এখন তা সংখ্যায় বেশি করা হয়েছে এবং পুরা আকাশে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। -[কাবীর]

শয়তানগণ কোথায় কোন আকাশে বসত অথচ সকল আসমান রক্ষিবাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল? : মুফাসসিরগণ বলেন, আকাশের কোনো কোনো স্থানে হুযূর ﷺ-এর প্রেরণের পূর্বে রক্ষিবাহিনী (ফেরেশতা) দ্বারা রক্ষিত ছিল না এবং অঙ্গার নিক্ষেপের ব্যবস্থাও তথায় ছিল না, সে স্থানেই গিয়ে শয়তানগণ কান লাগিয়ে বসে থাকত।

অথবা, শয়তানগণ নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে গোপনে বসে থাকত, যাকে চোরপথ বলা হয়ে থাকে। সে দিকেই كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ বলে ইশারা করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّا لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ ..... وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا : জিনজাতি বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা জগৎবাসীদের সাথে কি ভালো উদ্দেশ্য করেছেন না মন্দ উদ্দেশ্য করেছে, তা আমরা জানি না। এ কথা বলার একটি কারণ এও হতে পারে যে, তারা গায়েবী খবর গণকদের নিকট পৌছিয়ে যে দুষ্কৃতি কাজ করত তাদের সে সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এতে তারা [বলা বাহুল্য] সম্ভবত এ কথাও বুঝাতে চেয়েছে যে, তারা আসমান হতে গুপ্তভাবে খবর এনে মানুষদের উপকার করতে পারবে না। আসলে তারা যে কতটুকু উপকার করেছে তা কারো অজানা নয়। যারা নিজেই জাহান্নামী হয়েছে তারা অন্যের উপকার সাধনের চিন্তা করার কথা শুনলেও হাসি পাবে। মা'আরিফ গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, রাসূলদের আগমন ঘটবে কিনা তা তো জানা নেই। কেননা রাসূলদের অনুসরণ দ্বারা হেদায়েত পাওয়া যায়। আর তাঁদের বিরোধিতার মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতি নসীব হয়। আর তাঁদের আগমন হওয়ার পর মানুষ কি তাঁদের অনুসরণ করবে- না বিরোধিতা করবে, এ সম্পর্কেও তো জানা নেই। এ কারণেই তারা বলেছিল যে, ভবিষ্যতে আল্লাহ মানবজাতিকে ধ্বংস করবেন, না হেদায়েত করবেন।

আর এ তাফসীর এ জন্য করা হয়েছে যে, জিন্নাতগণের স্বীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে অভিমত রয়েছে যে, ঈমানদারের সংখ্যা খুবই কম হবে, আর বাকিসকল শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আর نَفْىُ عِلْم বুঝানোর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রসার হয়ে গেছে, তা হলো, জিনগণ عِلْم غَيْب সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলে কারো কারো ধারণা রয়েছে। এ আয়াতের তাৎপর্য হতে তা মিথ্যা প্রতিফলিত হয়েছে। যদি জিনগণ عِلْم غَيْب সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতো তাহলে لَا نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ الخ এটা বলত না।

اَشَرٌّ اُرِيْدَ-এর قَائِلْ কে? : কারো কারো মতে এ বাক্যটির قَائِلْ হলো مَلْعُوْنْ اِبْلِيْس আর কেউ কেউ বলেন, জিন্নাতগণের মধ্যে যে কোনো একজন বলেছেন। আর এ বাক্যটি হুযূর ﷺ -এর قُرْاٰنْ تِلَاوَتْ শ্রবণ করার পূর্বেকার সময়ে বলেছিল।

قَوْلُهُ اَلشَّرُّ وَالرُّشْدُ : رَشَدًا দ্বারা এখানে ঈমান আনয়নের প্রতি এবং شَرّ দ্বারা কুফরি করার প্রতি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর জিনদেরকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ মারার কারণ কারো কারো মতে একমাত্র সাজা দান করার উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَاَنَّا مِنَّا ...... طَرَائِقَ قِدَدًا : উল্লিখিত আয়াতে জিনদের কথা বলা হয়েছে। তারা বলে যে, তদের মাঝে কিছু সংখ্যক সদাচারী ও নেক লোক রয়েছে, আর কিছু লোক তাদের তুলনায় হীন বদকার রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন পন্থায় বিভক্ত হয়ে আছে এ আয়াত এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, তাদের মাঝে নেক ও বদকার লোক রয়েছে। সুদ্দী (র.) বলেন, তাদের মাঝে কাদরিয়া, মুরজিয়া, খাওয়ারেজও রয়েছে। আমাদের মতো তাদের মাঝেও বিভিন্ন দল ও উপদল রয়েছে।

অনুবাদ :

١٤. وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ط الْجَائِرُوْنَ بِكُفْرِهِمْ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا قَصَدُوْا هِدَايَةً ـ

১৪. আর আমাদের মধ্যে কতেক আত্মসমর্পণকারী মুসলিম এবং আমাদের মধ্যে কতেক সীমালঙ্ঘনকারী– তাদের কুফরির কারণে অত্যাচারী। অনন্তর যে আত্মসমর্পণ করে, সে সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। হেদায়েতের সংকল্প করে।

١٥. وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وُقُوْدًا وَ اَنَّا وَاَنَّهُمْ وَاَنَّهُ فِيْ اِثْنَيْ عَشَرَ مَوْضِعًا هِيَ وَاَنَّهُ تَعَالٰى اِلٰى قَوْلِهِ وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اِسْتِيْنَافًا وَبِفَتْحِهَا بِمَا يُوَجَّهُ بِهِ قَالَ تَعَالٰى فِيْ كُفَّارِ مَكَّةَ ـ

১৫. বস্তুত সীমালঙ্ঘনকারীগণ তো জাহান্নামেরই কাঠ-খড়ি ইন্ধন। اَنَّا - اَنَّهُمْ - اَنَّهُ এ সকল শব্দ اَنَّهُ تَعَالٰى হতে وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ পর্যন্ত বারো স্থানে হামযার মধ্যে যের যোগে مُسْتَانِفَةٌ রূপে এবং হামযার মধ্যে যবর যোগে ব্যাখ্যা দানকারী রূপে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসী কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন।

١٦. وَاَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَيْ وَاَنَّهُمْ وَهُوَ مَعْطُوْفٌ عَلٰى اَنَّهُ اسْتَمَعَ لَوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ اَيْ طَرِيْقَةِ الْاِسْلَامِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّاءً غَدَقًا كَثِيْرًا مِّنَ السَّمَآءِ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا رُفِعَ الْمَطَرُ عَنْهُمْ سَبْعَ سِنِيْنَ ـ

১৬. আর এটা যে, اَنْ অব্যয়টি ছাকীলা হতে মুখাফ্ফাফা। তার ইসম উহ্য অর্থাৎ وَاَنَّهُمْ আর এটা পূর্বোক্ত اِنَّهُ اسْتَمَعَ -এর প্রতি عَطْفٌ যদি তারা সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত থাকত অর্থাৎ ইসলামের পথে তবে আমি তাদেরকে প্রচুর বারিবর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম প্রচুর বৃষ্টিপাত করত দীর্ঘ সাত বছর অনাবৃষ্টির পর।

١٧. لِنَفْتِنَهُمْ لِنَخْتَبِرَهُمْ فِيْهِ ط فَنَعْلَمَ كَيْفَ شُكْرُهُمْ عِلْمَ ظُهُوْرٍ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ الْقُرْاٰنِ نَسْلُكْهُ بِالنُّوْنِ وَالْيَاءِ نُدْخِلْهُ عَذَابًا صَعَدًا شَاقًّا ـ

১৭. যাতে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম তাদেরকে যাঁচাই করতাম। তা দ্বারা খোলাখুলিভাবে জানতে পারতাম যে, তাদের কৃতজ্ঞতা কিরূপ হয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ কুরআন হতে বিমুখ হয়, আমি তাকে প্রবিষ্ট করবো শব্দটি ن ও ى যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। দুঃসহ শাস্তির মধ্যে কষ্টকর।

١٨. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ مَوَاضِعَ الصَّلٰوةِ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا فِيْهَا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا بِاَنْ تُشْرِكُوْا كَمَا كَانَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى اِذَا دَخَلُوْا كَنَائِسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ اَشْرَكُوْا ـ

১৮. আর মসজিদসমূহ সালাতের স্থানসমূহ আল্লাহরই জন্য, সুতরাং তোমরা আহ্বান করো না তাথায় আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও অংশী স্থির করত যেমন ইহুদি-খ্রিস্টানগণ নিজেদের মঠ ও গীর্জাসমূহে প্রবেশ করে শিরক করত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

١٩. وَأَنَّهُ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ اِسْتِيْنَافًا وَالضَّمِيْرُ لِلشَّانِ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُ يَعْبُدُهُ بِبَطْنِ نَخْلٍ كَادُوْا اَيِ الْجِنُّ الْمُسْتَمِعُوْنَ لِقِرَاءَتِهِ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا بِكَسْرِ اللَّامِ وَضَمِّهَا جَمْعُ لِبْدَةٍ كَاللِّبَدِ فِىْ رُكُوْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا اِزْدِحَامًا حِرْصًا عَلٰى سِمَاعِ الْقُرْاٰنِ.

১৯. আর এই যে اَن অব্যয়টি হামযার মধ্যে যের ও যবর যোগে جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ আর যমীরটি ضَمِيْر شَانِيَةٌ যখন আল্লাহর বান্দা দণ্ডায়মান হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে আহ্বান করতে বাতনে নাখল্ নামক স্থানে ইবাদত করতে দাঁড়িয়েছে তখন লোকেরা অর্থাৎ জিনেরা তাঁর কেরাত শ্রবণ করার জন্য তার নিকট ভিড় জমিয়েছে لِبَدًا শব্দটি ل -এর মধ্যে যের যোগে ও পেশ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। এটা لِبْدَةٌ -এর বহুবচন, কুরআন শ্রবণ করার আগ্রহে একে অন্যের ঘাড়ে সওয়ার হতে থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَاَنْ لَوِ اسْتَقَامُوْا : বাক্যটি আতফ করা হয়েছে اَنَّهُ اسْتَمَعَ الخ বাক্যের উপর। اَنْ ছাকীলা হতে মুখাফফাফা। اَن -এর ইসেম যমীরে শান উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اَنَّهُ শর্ত ও জাযা মিলিত হয়ে খবরে - اَنْ يَسْلُكْهُ শর্তের জাওয়াব হিসাবে জযম বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ مَنْ يُعْرِضْ يَسْلُكْهُ - صَعَدًا শব্দটি عَذَابًا -এর সিফাত, সিফাত ও মাওসূফ মিলিত হয়ে يَسْلُكْ -এর মাফউল।

قَوْلُهُ وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ : বাক্যটি اَنَّهُ اسْتَمَعَ বাক্যের উপর আতফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ .... لِجَهَنَّمَ حَطَبًا : এটাও জিনজাতির বক্তব্য, [আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করে বলেন] তারা বলে, আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর ভয় এবং কুরআনের অনুপ্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর কিছু সংখ্যক লোক পূর্বনীতি অনুযায়ী আল্লাহর নাফরমানি করে নিজেদের উপর অত্যাচারী হয়ে গেছে। সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনমিত করে দিয়েছে। তারাই নিজেদের পরকালের নাজাতের ফয়সালা করে নিয়েছে, আর কাফেরদের সেদিন দোজখের আগুনে প্রজ্বলিত করা হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ الخ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে اَلْقَاسِطُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা হক থেকে দূরে সরে যায়।

* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো জালেম।
* ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অন্যায়কারীগণ।
* ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত রয়েছে।
* ইমাম রাযী (র.) قَاسِطُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন এর অর্থ اَلْكَافِرُوْنَ তথা যারা কাফের, যারা সত্য পথ হতে দূরে গেছে আর যারা জালেম। –[নূরুল কোরআন]

জিনেরা আগুনের তৈরি সুতরাং তারা কিভাবে জাহান্নামের ইন্ধন হবে? : উল্লিখিত ১৫ নং আয়াতের মর্ম দ্বারা স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, জিনজাতি আগুনের তৈরি। সুতরাং তাদেরকে আগুনে ফেলে শাস্তি দানের মধ্যে কি অর্থ থাকতে পারে। এ জিজ্ঞাসার জওয়াব হলো, মানুষ মাটি দ্বারা তৈরি; কিন্তু যখন মানুষের উপর একটি শক্ত মাটির ঢিল ছোড়া হয়, তখনই সে আঘাত অনুভব করে। এর কারণ হলো যে, মানুষ মাটির উপাদান দ্বারা রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা ইত্যাদির সমন্বয় একটি দেহ-অবয়বে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সুতরাং সে দেহের উপরই মাটি দ্বারা আঘাত হানার ফলে সে ব্যথা ও কষ্ট অনুভব করেছে। বস্তুত মানুষ যে বস্তু দ্বারা সৃষ্টি সে বস্তুর আঘাতেই যে কষ্ট পাওয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্য বিষয়। অনুরূপ জিনজাতিও আগুন দ্বারা সৃষ্টি হয়ে যখন একটি দেহ অবয়ব লাভ করে একটি চেতনাসম্পন্ন অস্তিত্বময় প্রাণী হবে তখন সে আগুনই তার জন্য কষ্টদায়ক ও উৎপীড়ক হওয়া সম্ভবপর। উপরন্তু সাধারণ আগুনের তুলনায় জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়া হবে সত্তরগুণ বেশি। অতএব, তা দ্বারাও বুঝা যায় যে, জিনদেরকে জাহান্নামে ফেলে কষ্ট প্রদান একটি অর্থবহ শাস্তি। –[কাবীর]

اِسْتَقَامُوْا-এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল : اِسْتَقَامُوْا -এর যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থল সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। এক. জিনদের দিকে, যাদের সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সীমালঙ্ঘনকারীরা যদি ঈমান গ্রহণ করত, তাহলে আমি তাদের জন্য অমুক অমুক কাজ করতাম। দুই. اِسْتَقَامُوْا -এর যমীর মানুষের দিকে প্রত্যাবর্তিত। এ মতের অনুসারীরা নিজেদের পক্ষে দু'টি দলিল পেশ করেন।

ক. পানির প্রাচুর্য ও পানি পান করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা চলে মানুষকে–জিনকে নয়।

খ. মক্কার কাফেরদের নিকট বেশ কয়েকটি বছর পানি বর্ষণ বন্ধ থাকার পর এ আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। এতটুকু বলা যেতে পারে যে, পূর্বে মানুষের উল্লেখ নেই; কিন্তু যেহেতু এ ব্যাপারটি সকলের জানা। তখন তা উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنْ لَوِ اسْتَقَامُوْا ..... مَاءً غَدَقًا : উল্লিখিত আয়াতটি হতে মহানবী ﷺ -এর মুখে আল্লাহ তা'আলার ভাষণ শুরু হয়েছে। মুকাতিল (র.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর বদদোয়ায় আল্লাহ তা'আলা সাত বছর যাবৎ মক্কার কাফেরদের জন্য বৃষ্টির পানি বন্ধ করে যখন দেশময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন [লোবাব]। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মক্কার জনগণ যদি আমার দীনের উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং তা হতে বিমুখ হয়ে বিরোধিতা না করত, তবে আমি তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আকাশ হতে বৃষ্টির পানি বর্ষণ করতাম। ফলে দেশময় সবুজের মহা সমারোহ দেখা দিত, ফুলে ফলে সুশোভিত হতো দেশের খামারগুলো এবং জীবকুল ও মানবকুলের জন্য শস্যভাণ্ডার গড়ে উঠত এবং তা দ্বারা তাদের যাবতীয় অভাব পূরণ হয়ে যেত। পানিই হচ্ছে জীবকুল ও মানবকুলের বেঁচে থাকার মূল উপাদান, পানির দ্বারাই জীবকুল ও মানবকুলের খাদ্য ভাণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং তার উপর নির্ভরশীল হয় কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা। তার অভাবে সবকিছুই বিকল ও অচল হয়ে যায়। এ হিসাবেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তাদেরকে স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের পানি পান করাতাম এবং এটাই তাঁর কথার আসল মর্ম।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ .... اللّٰهِ اَحَدًا" : এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। হযরত কাতাদা (রা.) বলেছেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ তাদের ইবাদতখানায় প্রবেশ করে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করত। তাই তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, তোমরা আল্লাহকে সিজদা করার স্থানে প্রবেশ করে তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করো না। দ্বিতীয় অভিমত হলো, উক্ত আয়াতে مَسَاجِدْ দ্বারা হাত, পা, কপাল, নাসিকা ও হাঁটু এ সাত অঙ্গকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে সাত অঙ্গ দ্বারা সিজদা করে থাক। সুতরাং এ সাত অঙ্গকে গায়রুল্লাহর সিজদা করার কাজে ব্যবহার করো না এবং আল্লাহর সাথে শরিক করে তাদেরকেও ডেকো না। তৃতীয় অভিমত হলো, মাসাজিদ দ্বারা এখানে সমগ্র দুনিয়াকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম হাসান বসরীসহ অনেক ওলামায়ে কেরাম এর প্রবক্তা। সুতরাং এ অভিমত অনুসারে আয়াতের মর্ম হবে, গোটা দুনিয়াটাই আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করার স্থান। সুতরাং তাঁর এ সিজদা করার স্থানে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরিক করে ডেকো না। এ অভিমতের প্রমাণে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তা

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হচ্ছে-মহানবী ﷺ বলেছেন, আমার জন্য গোটা দুনিয়াটাকে ইবাদতের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে। বস্তুত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে, গোটা দুনিয়াটাই আল্লাহর মসজিদ স্বরূপ। অতএব, হে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর এই মসজিদকে তোমরা শিরকের দুর্গন্ধ হতে পবিত্র রাখো– এটাই আয়াতের মূল মর্ম।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ : অর্থাৎ আল্লাহর ওহীসমূহের মধ্য হতে একটি এই যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি বলে দিন, মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্যই নির্মিত হয়েছে, সুতরাং মানবজাতির অথবা জিনজাতির মধ্যে কেউ যেন তথায় আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকেও স্মরণ না করে। যেমন ইহুদি ও নাসারাগণ করে থাকে।

উক্ত আয়াতে مَسَاجِدُ বলে কোন প্রকারের মসজিদের কথা বলা হয়েছে, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

১. মাদারিক গ্রন্থে বলা হয়েছে নামাজের জন্য (اَلْبُيُوْتُ الْمُبْنِيَّةُ لِلصَّلٰوةِ) তৈরিকৃত ঘরগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব, পাঞ্জেগানা ও জুমা মসজিদ এবং সর্ব প্রকারের নামাজের ঘর আয়াতের হুকুমের শামিল হবে।

২. কারো কারো মতে مَوَاضِعُ الصَّلٰوةِ তথা নামাজের স্থান উদ্দেশ্য।

৩. অথবা مَسَاجِدُ বলে মক্কার হারাম শরীফ ও বাইতুল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।

৪. আর مَسَاجِدُ اللّٰهِ বলে সমগ্র বিশ্বকেও উদ্দেশ্য করা যেতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ الخ : আর বলা হয়েছে যে, আল্লাহর خَاصّ বান্দা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন আল্লাহর ইবাদত করার জন্য দণ্ডায়মান হয়ে যান; তখন এ কাফেরের দল এই বান্দার উপর ভিড় জমাতে শুরু করে। অর্থাৎ আশ্চর্যান্বিত ও শত্রুতা পোষণ করে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার দিকে তাকাতে থাকে, মনে হয় যেন তারা তাকে হামলা করবে।

قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ বলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর حَجُوْن নামক স্থানের ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে এবং সে সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)ও সঙ্গে ছিলেন। আর জিনের সংখ্যা সে সময় বারো হাজার ছিল, অন্য মতে ৭০ হাজার ছিল, এরা সকলেই হুযূর ﷺ -এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন, اِنْشِقَاقُ الْقَمَرِ -এর সময় তারা بَيْعَتْ গ্রহণ থেকে অবসর হন।

এতে বুঝা যায় যে, হুযূর ﷺ -এর নিকট জিনগণ একবার نَخْل এবং আবার حَجُوْن স্থানে বায়'আত بَيْعَتْ নিয়েছিল। আর نَخْل -এর স্থানে ৭/৯ জন জিন বায়'আত হলো, আর حَجُوْن -এর স্থানে ১২,০০০ অথবা ৭০,০০০ সত্তর হাজার জিন বায়'আত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٠. قَالَ مُجِيْبًا لِلْكُفَّارِ فِىْ قَوْلِهِمْ اِرْجِعْ عَمَّا اَنْتَ فِيْهِ وَفِىْ قِرَاءَةٍ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّىْ اِلٰهًا وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا .

২০. বললেন কাফেরদের এ উক্তির প্রত্যুত্তরে যে, আপনি স্বীয় ব্রত পরিত্যাগ করুন। অপর এক কেরাতে শব্দটি قُلْ পঠিত হয়েছে। আমি তো আমার প্রতিপালককেই আহ্বান করি উপাস্যরূপে এবং আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করি না।

٢١. قُلْ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا غَيًّا وَلَا رَشَدًا خَيْرًا .

২১. বলুন, আমি তোমাদের অনিষ্টের মালিক নই ক্ষতি আর না ইষ্টের কল্যাণের।

٢٢. قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَذَابِهٖ اِنْ عَصَيْتُهٗ اَحَدٌ ۙ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ اَىْ غَيْرِهٖ مُلْتَحَدًا مُلْتَجَاً .

২২. বলুন, আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ হতে তাঁর শাস্তি হতে, যদি আমি তাঁর অবাধ্যাচরণ করি কেউই, আর আমি তিনি ভিন্ন অর্থাৎ তাঁর অপর কোনো আশ্রয়ও পাব না আশ্রয়স্থল।

٢٣. اِلَّا بَلٰغًا اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ مَفْعُوْلِ اَمْلِكُ اَىْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ اِلَّا الْبَلَاغَ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ اَىْ عَنْهُ وَرِسٰلٰتِهٖ ط عَطْفٌ عَلٰى بَلٰغًا وَمَا بَيْنَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ وَالْاِسْتِثْنَاءُ اِعْتِرَاضٌ لِتَاكِيْدِ نَفْىِ الْاِسْتِطَاعَةِ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فِى التَّوْحِيْدِ فَلَمْ يُؤْمِنْ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ مَنْ فِىْ لَهٗ رِعَايَةً لِمَعْنَاهَا وَهِىَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ وَالْمَعْنٰى يَدْخُلُوْنَهَا مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا اَبَدًا .

২৩. কেবলমাত্র পৌঁছানো এটা পূর্বোক্ত اَمْلِكُ ক্রিয়ার مَفْعُوْل হতে اِسْتِثْنَاء অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য কিছুরই মালিক নই কেবলমাত্র তোমাদের প্রতি পৌঁছানো আমার দায়িত্ব আল্লাহর নিকট হতে অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে এবং তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করা এটা بَلٰغًا-এর প্রতি عَطْف আর مُسْتَثْنٰى ও مِنْهُ اِسْتِثْنَاء-এর মধ্যবর্তী বাক্যটি جُمْلَهْ مُعْتَرِضَةٌ যা সামর্থ্য অস্বীকারের প্রতি তাকিদ বিশেষ। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে তাওহীদ প্রসঙ্গে অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করে না। তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, তারা প্রবিষ্ট হবে এটা لَهٗ-এর যমীর হতে حَالٌ যার مَرْجِعٌ পূর্বোক্ত مَنْ অর্থের বিবেচনায়। আর তা حَالٌ مُقَدَّرَةٌ অর্থাৎ يَدْخُلُوْنَهَا مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ সেথায় স্থায়ীভাবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ اِلَّا بَلٰغًا : শব্দটি اَمْلِكُ মাফউল হতে ইস্তিছনা অর্থাৎ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ اِلَّا بَلَاغَ اِلَيْكُمْ আর وَرِسَالَاتِهٖ শব্দটি بَلٰغًا-এর উপর আতফ হয়েছে। মুসতাছনা এবং মুসতাছনা মিনহু -এর মধ্যে সামর্থ্যে অস্বীকৃতি জোরদার করার উদ্দেশ্যে ব্যবধান করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ : হাল হয়েছে مَنْ-এর যমীর হতে اَبَدًا তাকিদ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَاۤ أُشْرِكُ بِرَبِّىْۤ أَحَدًا : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলেন, হে নবী! আপনি এই দুরাত্মাদের বলুন যে, আমি তোমাদের কি করেছি: আমি তো তোমাদের মন্দ কিছুই করিনি, অকল্যাণ করিনি, কোনো অন্যায় বা যুক্তি বিরুদ্ধ কথাও বলিনি। তবুও কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপে আছ! আমি তো শুধু এ ঘোষণাই করছি যে, আমি একমাত্র আমার লা শরীক আল্লাহকেই ডাকি। এতে এমন শত্রুতার কি রয়েছে; তবুও তোমরা সকলে একজোট হয়ে যদি আমার বিরোধিতা কর এবং শত্রুতা পোষণ কর তবে তোমরা আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি।

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنِّىْ لَاۤ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا .... مُلْتَحَدًا : অর্থাৎ আল্লাহর সাম্রাজ্যে আমার কোনো কর্তৃত্ব আছে, অথবা লোকদের ভাগ্য রচনায় আমার কোনো ক্ষমতা আছে বলে আমি কখনো দাবি করি না। আমি একজন রাসূল মাত্র, রাসূলদের এমন কিছু বলার বা করার ক্ষমতা নেই। এসব আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ ক্ষমতা তাঁরই হস্তে নিহিত, বরং জেনে নিবে خَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى আর আমার নিজের লাভ-লোকসান সম্পর্কেও আমার কিছু করার নেই। অন্যের লাভ-লোকসান সম্পর্কে বলা তো বহুদূরের কথা, আমি নিজেও যদি তাঁর নাফরমানি করি তবে তিনি আমাকেও ছাড়বেন না। আর তিনি ব্যতীত কারো দরবারে রক্ষা পাওয়ারও কোনো উপায় নেই।

অথবা, এ আয়াতটি কাফেরদের উক্তি إِنْ هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ -এর জবাব স্বরূপ হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরকারক ضَرًّا শব্দের অর্থ করেছেন غَيًّا অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা তখন مُسَبَّبٌ বলে سَبَبٌ উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। কেননা ضَرَرٌ বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো পথভ্রষ্টতা, তখন তা مَجَازٌ مُرْسَلٌ হবে।

আর رَشَدًا -কে خَيْرًا বলে তাফসীর করেছেন এবং তা দ্বারা هِدَايَةٌও উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। কারণ হেদায়েত خَيْر -এর পথেই রয়েছে। হুযূর ﷺ বলেন, مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ আল্লাহ যার জন্য ভালো কামনা করেন তাকেই ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। আর ধর্মীয় জ্ঞান তখনই অর্জন সম্ভব হবে যখন هِدَايَة প্রাপ্ত হবে।

وَهٰذَا أَيْضًا دَلِيْلٌ عَلٰى أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ بَلِ اللّٰهُ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ .

قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللّٰهِ .... فِيْهَاۤ أَبَدًا : আর আপনি বলুন; বরং আল্লাহর পয়গামগুলো তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা বা দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আর আমি তোমাদেরকে এটাও শুনিয়ে দেই যে, যে কেউই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথা না মানবে, তবে তার জন্য দোজখের অগ্নি তৈরি রয়েছে। এমন লোকগুলো চিরজীবন দোজখে জ্বলতে থাকবে।

رِسَالَاتِه শব্দটিকে جَمْع ব্যবহার করার কারণ : رِسَالَاتِه শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করেন, মূলত রিসালত একটি বিষয় সম্পর্কে দান করা হয়নি; বরং বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান সম্বলিত একটি গ্রন্থকে رِسَالَاتٌ বলা হয়েছে। সুতরাং رِسَالَتٌ -এর أَجْزَاء مُتَفَرِّقَة -এর লক্ষ্যে সম্ভবত رِسَالَاتٌ -কে বহুবচন করা হয়েছে। আর যদি সব আহকামগুলোর সমষ্টিকে এক উদ্দেশ্য বলা হয়, তখন رِسَالَتٌ একবচন ব্যবহার করা শুদ্ধ হবে। অতএব, رِسَالَاتٌ বহুবচন বা একবচন ব্যবহার করা একই কথা।

উক্ত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, কোনো গুনাহগার ব্যক্তি চির জাহান্নামী হবে। সুতরাং এর তাৎপর্য কি? : এর তাৎপর্য এই যে, আয়াতে مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ দ্বারা مُؤْمِنٌ عَاصِىْ উদ্দেশ্য নয়; বরং عاصى كافر উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নতুবা مَنْ قَالَ لَاۤ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ হাদীসটির তাৎপর্য বহাল থাকবে না।

আর ظاهرى وباطنى ভাবে যারা কাফের তারা চির জাহান্নামী হবে। কারণ এ সম্পর্কে আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولٰۤئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ . وَفِىْ أٰيَةٍ أُخْرٰى وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَغَيْرَهٗ .

আর مُؤْمِنٌ عَاصِىْ সম্পর্কে সারকথা হলো, তারা নাফরমানির পরিমাণ অনুপাতে দোজখে প্রবেশ করে শাস্তি ভোগ করবে, অতঃপর বেহেশতে প্রবেশ করবে।

যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করলেই কি চিরদিন জাহান্নামে জ্বলবে? : প্রত্যেকটি গুনাহ ও প্রত্যেকটি নাফরমানির শাস্তিই চিরন্তন জাহান্নাম নয় এবং যে কোনো গুনাহ করলেই জাহান্নামে চিরদিন জ্বলতে হবে না; বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট হতে তাওহীদের যে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি তা মানবে না এবং শিরক হতে বিরত থাকবে না, তার জন্যই রয়েছে চিরকালীন জাহান্নাম। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٤. حَتّٰى إِذَا رَأَوْا حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ فِيْهَا مَعْنَى الْغَايَةِ لِمُقَدَّرٍ قَبْلَهَا اَىْ لَايَزَالُوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ اِلٰى اَنْ يَّرَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ فَسَيَعْلَمُوْنَ عِنْدَ حُلُوْلِهٖ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ اَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا اَعْوَانًا اَهُمْ اَمِ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى الْقَوْلِ الْاَوَّلِ اَوْ اَنَا اَمْ هُمْ عَلَى الثَّانِىْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ فَنَزَلَ.

২৪. যাবৎ তারা দেখবে এখানে حَتّٰى اِبْتِدَائِيَّةٌ যাতে غَايَتْ-এর অর্থ অন্তর্নিহিত আছে যা তৎপূর্বে উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَا يَزَالُوْنَ عَلٰى كُفْرِهِمْ اِلٰى اَنْ يَّرَوْا তারা তাদের কুফরি আচরণে দেখা পর্যন্ত অবিচল থাকবে। যা তাদের সাথে প্রতিশ্রুত হয়েছে শাস্তির মধ্য হতে তখন অচিরেই তারা উপলব্ধি করতে পারবে উক্ত শাস্তি তাদের প্রতি আপতিত হওয়ার সময় বদর যুদ্ধের দিন অথবা কিয়ামতের দিন। যে, কে সাহায্যকারী হিসাবে দুর্বল এবং সংখ্যা হিসাবে নগণ্য সাহায্যকারী তারা না, মু'মিনগণ? প্রথম অভিমতের প্রেক্ষিতে। আর দ্বিতীয় অভিমতের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে, আমি– না তারা? এতদ শ্রবণের পর তাদের কেউ কেউ বলল, এই প্রতিশ্রুতি কখন আগত হবে? তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٢٥. قُلْ اِنْ اَىْ مَا اَدْرِىْ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ مِنَ الْعَذَابِ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا غَايَةً وَاَجَلًا لَا يَعْلَمُهٗ اِلَّا هُوَ.

২৫. বলুন, আমি জানি না اِنْ অব্যয়টি مَا অর্থে ব্যবহৃত তোমাদের উদ্দেশ্যে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি নিকটবর্তী শাস্তি বিষয়ে না, আমার প্রতিপালক তজ্জন্য মেয়াদ স্থির করবেন? চূড়ান্ত সীমা ও নির্ধারিত সময়, যা তিনি ছাড়া অপর কেউ জানে না।

٢٦. عٰلِمُ الْغَيْبِ مَا غَابَ بِهٖ عَنِ الْعِبَادِ فَلَا يُظْهِرُ يُطْلِعُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ.

২৬. তিনি অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত যা তাঁর বান্দা হতে অদৃশ্য। সুতরাং প্রকাশ লাভ করে না অবহিত হয় না তাঁর অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান, কারো নিকট মানুষের মধ্য হতে।

٢٧. اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ مَعَ اِطِّلَاعِهٖ عَلٰى مَا شَاءَ مِنْهُ مُعْجِزَةً لَهٗ يَسْلُكُ يَجْعَلُ وَيُسَيِّرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اَىِ الرَّسُوْلِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا مَلَائِكَةً يَحْفَظُوْنَهٗ حَتّٰى يُبَلِّغَهٗ فِىْ جُمْلَةِ الْوَحْىِ.

২৭. হ্যাঁ, তার মনোনীত রাসূলগণের মধ্য হতে যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে সে তাঁর মু'জিযা হিসাবে আল্লাহর ইচ্ছায় যা অবগত হয়েছে। প্রেরণ করে পরিচালিত করে তার সম্মুখে অর্থাৎ রাসূলের এবং পশ্চাতে প্রহরীবৃন্দ হেফাজতকারী ফেরেশতাকুল যারা পূর্ণ ওহী পৌছা পর্যন্ত তাকে হেফাজত করতে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৮. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَيْ اَنَّهُ قَدْ اَبْلَغُوْا اَيِ الرُّسُلُ رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ رُوْعِيَ بِجَمْعِ الضَّمِيْرِ مَعْنٰى مَنْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ عَطْفٌ عَلٰى مُقَدَّرٍ اَيْ فَعَلِمَ ذٰلِكَ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تَمْيِيْزٌ وَهُوَ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمَفْعُوْلِ وَالْاَصْلُ اَحْصٰى عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ.

২৮. যাতে তিনি জানতে পারেন আল্লাহ তা'আলা, তা দ্বারা عِلْمَ ظُهُوْرٍ প্রকাশ্যভাবে জানা উদ্দেশ্য। যে, اَنْ অব্যয়টি মুছাক্কালাহ হতে মুখাফ্‌ফাফাহ অর্থাৎ اَنَّهُ তারা পৌঁছেছে অর্থাৎ রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের রিসালতের দায়িত্ব এখানে বহুবচনের যমীর আনয়ন পূর্বক مَنْ অব্যয়ের অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করা হয়েছে। আর তিনি পরিবেষ্টিত করেছেন যা কিছু তাদের নিকট রয়েছে তা উহ্য বক্তব্যের প্রতি عَطْفٌ অর্থাৎ فَعَلِمَ ذٰلِكَ এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন। এটা تَمْيِيْزٌ রূপে ব্যবহৃত। আর তা مَفْعُوْلٌ হতে পরিবর্তিত হয়েছে, মূলত বক্তব্যটি এরূপ ছিল اَحْصٰى عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ -

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ مَنْ اَضْعَفُ : -এর مَنْ মুবতাদা, اَضْعَفُ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে বাক্যটি اَدْرِيْ -এর দ্বিতীয় মাফউল হয়েছে। اَقَرِيْبٌ খবর মুকাদ্দাম, مَا تُوْعَدُوْنَ মুবতাদা মুআখখার।

قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ : বদল হয়েছে رَبِّيْ হতে অথবা উহ্য মুবতাদার খবর এবং তা جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنِ ارْتَضٰى : -এর مَنْ জিনস হতে ইসতিছনা। কেউ কেউ বলেন, مَنْ মুবতাদা এবং اِرْتَضٰى তার খবর। رَصَدًا মাফউল يَسْلُكُ -এর। عَدَدًا মাসদার অথবা তামঈয।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "حَتّٰى اِذَا رَاَوْا ...... اَقَلُّ عَدَدًا" : উল্লিখিত আয়াতের মর্ম হলো, সেকালে কুরাইশের যেসব লোক মহানবী ﷺ-এর মুখে দীনের দাওয়াত ও আল্লাহর ইবাদতকরণের কথা শুনামাত্রই আক্রোশে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং নিজেদেরকে সংখ্যায় অনেক ও শক্তিশালী ভাবত, তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে– তোমরা নিজেদেরকে খুব শক্তিশালী ও সর্দার মনে করছ এবং আমাকে ও আমার অনুসারীগণকে মুষ্টিমেয় ভেবে আমাদের প্রতি নির্মম অত্যাচার-অবিচার করছ। তোমরা স্মরণ রেখো যে, হার-জিতের আসল স্থান এ জগৎ নয়। খেলার মাঠ আরেকটি রয়েছে, সেখানকার হার-জিতই হলো তাৎপর্যপূর্ণ আসল হার-জিত; কিন্তু তোমাদেরকে যে মহাবিপদের দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং যে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা যেদিন তোমরা অবলোকন করবে, সেদিনই হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারবে, কোন পক্ষের সাহায্যকারী দুর্বল এবং কোন পক্ষ সংখ্যায় স্বল্প। সেদিনই হবে আসল ফয়সালা এবং সেদিনই প্রদর্শিত হবে শক্তির বাহাদুরি।

حَتّٰى প্রান্তসীমা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, এখানে তা ব্যবহারের কারণ : حَتّٰى শব্দ দ্বারা বাক্য শুরু করে মূলত কাফেরদের যে অহংকার ও দাম্ভিকতা ছিল তার একটা সময়-সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের এ দাম্ভিকতা তো মাত্র অল্প কিছু দিনের জন্য। অতঃপর তোমরা জানতে পারবে, কে ছিল প্রকৃতপক্ষে সামর্থ্যবান-শক্তিধর এবং কে সামর্থ্যহীন ও দুর্বল। এ দুনিয়ার হার-জিত প্রকৃত হার-জিত নয়; বরং প্রকৃত হার-জিত পরকালে। অথবা এখানেও জানতে পারবে হার-জিতের কথা, যেমনটি ঘটেছিল বদরে।

قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ اِنْ اَدْرِىْ ..... رَبِّىْٓ اَمَدًا : বর্ণনাভঙ্গি হতেই উপলব্ধি করা যায় যে, এ কথাটি একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব স্বরূপ বলা হয়েছে। পূর্বের আয়াতের কথা শুনে বিরুদ্ধবাদীরা সম্ভবত ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে প্রশ্ন করে থাকবে যে, আপনি যেদিনের কথা বলে আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন, সেদিন কবে নাগাদ এসে উপস্থিত হবে? তারই জবাবে রাসূলে কারীম ﷺ-কে এ কথাটি বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আপনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিন যে, সে দিন-ক্ষণটি যে আসবেই তাতে তো একবিন্দু সন্দেহ নেই। সেদিনটি খুব শীঘ্র আসবে– না অনেক দীর্ঘ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর উপস্থিত হবে, তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না, কেউই বলতে পারে না।

مَا يُوْعَدُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে, দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি হবে। যেমন, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের শাস্তি হয়েছে।

২. প্রতিশ্রুত বিষয়টি হলো কিয়ামতের দিবস।

৩. এর দ্বারা মৃত্যুর মুহূর্তও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন; কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সে পর্যন্ত হয় না; যে পর্যন্ত না তাকে তার পরকালের আবাসস্থল দেখানো হয়। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى ...... خَلْفِهٖ رَصَدًا : পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, عِلْم غَيْب সম্পর্কে কাউকেও আল্লাহ অবহিত করেন না। উক্ত আয়াতে اِسْتِثْنَاءْ-এর মাধ্যমে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, عِلْم غَيْب-এর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়নি; বরং রিসালাত-এর জন্য প্রয়োজনীয় যতটুকু عِلْم غَيْب আবশ্যক, ততটুকু পরিমাণ আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। আর তা অত্যন্ত রক্ষণশীলতার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ ওহী নাজিলের মুহূর্তে রাসূলের চতুর্দিকে ফেরেশতা দ্বারা প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, যাতে কোনো শয়তান তাতে প্রবিষ্ট হতে না পারে। আর এতে عِلْمُ اَحْكَامْ اِسْلَامْ বা عِلْمُ شَرِيْعَتْ এবং প্রয়োজনীয় গুপ্ত তথ্য প্রদান করা হয়।

সুতরাং তা হতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উক্ত اِسْتِثْنَاءْ দ্বারা যতটুকু عِلْم غَيْب নবী এবং রাসূলগণের জন্য পৃথক করা হয়েছে তা সীমিত কিছু পরিমাণ عِلْمُ غَيْب স্বরূপ, যা رِسَالَتْ-এর দায়িত্ব পালনার্থে অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য।

অতএব, ব্যবহার-বিধি অনুসারে তাকে اِسْتِثْنَاءْ مُنْقَطِعْ বলা হবে। অর্থাৎ غَيْرُ اللّٰهِ হতে এর عِلْم غَيْب যে নফী করা হয়েছে এ مُسْتَثْنٰى-এর মধ্যে তার সম্পূর্ণ اِثْبَاتْ নয়; বরং নির্দিষ্ট কতটুকু عُلُوْم غَيْب-কে বিশেষভাবে পৃথক করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে যাকে اَنْبَاءُ الْغَيْبِ বলা হয়েছে।

غَيْب ও عِلْمُ الْغَيْبِ-এর মধ্যে পার্থক্য : কিছু সংখ্যক বিবেকহীন লোক اَنْبَاءُ الْغَيْبِ আর غَيْب-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝে না, যার ফলে তারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে বিশেষত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে عِلْمُ الْغَيْبِ-এর জন্য حَاوِىْ মনে করেন। অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ عِلْمُ الْغَيْبِ জানেন বলে মনে করেন। আর বলে থাকেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে অণু-পরমাণুর প্রতি পর্যন্ত عِلْمُ الْغَيْبِ রাখেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তেমনি জানেন। যা স্পষ্টভাবে শিরক ব্যতীত আর কিছুই নয়। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ মনে করি, যদি কেউ তার নিজস্ব গুপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কে স্বীয় কোনো নিকটতম বন্ধুর নিকট আলোচনা রাখে, যা অন্য কেউই জানে না, তবে তাকে দুনিয়াতে কেউই عَالِمُ الْغَيْبِ বলবে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا : মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুর সংখ্যার হিসাব রাখেন এর ব্যাখ্যা হলো পাহাড়ের সংখ্যা এবং ওজন, সমুদ্রের পরিমাপ, বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যা, বৃক্ষগুলোর পাতার সংখ্যা, এক কথায় পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই। তিনি বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তভাবে জানেন, রাতের অন্ধকারে অথবা দিনের আলোতে যা কিছু হয়। সবই তিনি জানেন। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلُ : সূরা আল-মুয্যাম্মিল

Free @ www.e-ilmweb.com

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির নাম সূরা اَلْمُزَّمِّلُ [আল-মুয্যাম্মিল]। অত্র সূরার প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত শব্দ اَلْمُزَّمِّلُ হতে অত্র সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর একটি নামও مُزَّمِّلٌ। একদা হযরত মুহাম্মদ ﷺ রাত্রিকালে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, এমতাবস্থায় গায়েবের পক্ষ হতে يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এটা হতেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلُ তবে সূরার বিষয়বস্তুর সাথে শিরোনামের তেমন কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায় না; কিন্তু এটা দ্বারা নামকরণ স্বার্থক না হওয়ারও কোনো কারণ নেই। অত্র সূরায় ২টি রুকূ', ২০টি আয়াত, ২৮৫টি শব্দ এবং ৮৩৮টি অক্ষর রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরাতে মাত্র দু'টি রুকূ' রয়েছে তবে দু'টি রুকূ'ই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। বিষয়বস্তু ও হাদীস শরীফের দলিলসমূহও এ কথা সত্যায়িত করে। প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহ হতে বুঝা যায় যে, প্রথম রুকূ'টি নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে, কারণ তখন নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে আপনি রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠুন ও আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হোন, তবে তো নবুয়তের যথাযথ দায়িত্ব পালনে আপনার মধ্যে শক্তি অর্জিত হবে।

আর এতে তাহাজ্জুদ নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াতে অর্ধেক রাত্রি বা তার চাইতে একটু কম সময় অতিবাহিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর প্রথম রুকূ'র আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বিরুদ্ধে বাদীদের সর্ব প্রকার অত্যাচারমূলক আচরণের মোকাবিলায় পরম ধৈর্য গ্রহণের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। আর সাথে সাথে মক্কার কাফেরদেরকে আজাবের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এগুলো হতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন তাঁর শত্রুগণ প্রবলভাবে বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেছিল। আর এগুলো নবুয়তের প্রথম অবস্থায়ই হয়েছিল।

দ্বিতীয় রুকূ'র আয়াত সম্পর্কে যদিও বহুসংখ্যক মুফাস্সিরগণ বলেছেন যে, ঐগুলো মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তথাপিও কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে ঐ গুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াতসমূহ দ্বারাও যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। আর হুযূর ﷺ মাদানী জীবনেই যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং দ্বিতীয় রুকূ'টি মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার মতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু তিনটি। প্রথম রুকূ'তে রাত্রের একটি অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ বাধ্যতামূলককরণ ও কাফেরদের কটূক্তি ও গালাগালকে উপেক্ষা করে চলার উপদেশ, দ্বিতীয় রুকূ'তে তাহাজ্জুদের নামাজ ঐচ্ছিক বিধানরূপে ঘোষণা করা।

১ হতে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে কাফেরদের কথাবার্তায় চিন্তাযুক্ত ও ব্যথিত হওয়ার কারণে তাঁর চিন্তা দূরকরণ এবং তাঁর মনোবল বৃদ্ধিকরণের বিধান দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথমেই তাঁকে চাদর আবৃত করে শয়নকারীরূপে আখ্যায়িত করে তাঁর মনের চিন্তা-বেদনা ও কষ্টক্লেশ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতঃপর নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আধ্যাত্মিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি ফর্মুলা পেশ করে বলা হয়েছে যে, আপনি রাত্রির একটি অংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থেকে কাটিয়ে দিন। এতে আপনার মনের অবিচলতা, অস্থিরচিন্তা এবং যে কোনো কঠিন বিপদের মুহূর্তেও অবিচল হয়ে সুদৃঢ় পদে দণ্ডায়মান থাকার ক্ষমতা লাভ করবেন এবং নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব পালন করতেও সমর্থ হবেন। দিবাভাগের কর্মব্যস্ততার দরুন এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ দিনের বেলা আপনার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিঝুম-নিথর-নিস্তব্ধ যামিনীতে আরাম ও বিলাসিতাকে পরিহার করে সাধনায় মশগুল থাকাই আপনার পথ।

অতঃপর ৮ হতে ১৩ আয়াতে একনিষ্ঠ মনে ঐকান্তিক অনুরাগ নিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়ার এবং পার্থিব যাবতীয় সমস্যা আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করার কথা বলা হয়েছে। আর কাফেরদের সর্বপ্রকার অবজ্ঞা, কটূক্তি ও গালাগালের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে সৌজন্যমূলক পন্থা গ্রহণ এবং তাদের কথার প্রতিবাদ না করার জন্য বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যেসব সম্পদশালী লোক আপনার বিরোধিতায় সোচ্চার কণ্ঠ তাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করুন, আপনি প্রতিবাদে যাবেন না। আমি তাদেরকে ইহ-পরকালে কঠিন হস্তে শায়েস্তা করবো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর ১৪ হতে ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে লোকেরা! তোমাদের কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি, যেরূপ ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে নবীর বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণের আমি তার পরিণতি কি করেছি, ইতিহাসের পাতাগুলো তার সাক্ষী। মহাপ্রলয়ের পর তোমাদের সকলের যখন আমার কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হতে হবে, তখন তোমরা কিরূপে আমার শাস্তি হতে বাঁচবে। তোমাদের উচিত আমার পথ গ্রহণ করা। আমি উপদেশ দিচ্ছি। যার ইচ্ছা হয় সে নবীর বিরোধিতা পরিহার করে আমার পথ গ্রহণ করুক।

২০নং আয়াতে তাহাজ্জুদের বাধ্যতামূলক বিধানকে ঐচ্ছিককরণের কারণসমূহ বর্ণনা করে তাকে ঐচ্ছিক ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, তাহাজ্জুদ নামাজ যত হালকা করা সম্ভব হয় তাই কর; কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও যাকাত আদায় এবং বিনা স্বার্থে দরিদ্র ও অভাবীগণকে ঋণদান করবে। তোমরা পরকালের কল্যাণার্থে যা কিছু ভালো ও কল্যাণজনক কাজ করবে তাই আমার নিকট বিরাট পুরস্কার আকারে লাভ করবে। তোমরা সর্বদা মাগফিরাত কামনায় থাকো, আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও করুণানিধান। তিনি কারো ক্ষমা প্রার্থনাকে বিফল করবেন না।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত এ সূরা পাঠ করবে মহান আল্লাহ তাকে সুখে-শান্তিতে রাখবেন এবং দোজখের আজাব হতে তাকে রক্ষা করবেন।

* সর্বদা এ সূরা পাঠ করলে স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ-এর জিয়ারত লাভ করবে।

* এ সূরা পাঠ করে হাকীমের নিকট উপস্থিত হলে হাকীম সহৃদয় ব্যবহার করবে।

* নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ সূরা বিপদের সময় পাঠ করলে বিপদ দূর হবে।

* প্রত্যহ সাতবার পাঠ করলে রিজিক বৃদ্ধি পায়। -[নূরুল কোরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা (আল-জিন্ন)-এর মধ্যে কাফেরদেরকে তাওহীদ, রিসালাত ও কর্মফলের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অত্র সূরায় তাদের ঈমান না আনয়ন করার কারণে হুযূরে আকরাম ﷺ-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। আর তিনি যেন তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্বকে দৃঢ়তার সাথে বজায় রাখেন সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[তাফসীরে আশরাফী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّل مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-মুয্যাম্মিল মক্কায় অবতীর্ণ

أَوْ اِلَّا قَوْلَهُ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اِلَى اٰخِرِهَا فَمَدَنِيٌّ تِسْعَ عَشْرَةَ اَوْ عِشْرُوْنَ اٰيَةً

অথবা, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৯/২০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ النَّبِيُّ وَاَصْلُهُ الْمُتَزَمِّلُ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الزَّاءِ اَيِ الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ حِيْنَ مَجِيْءِ الْوَحْيِ لَهُ خَوْفًا مِنْهُ لِهَيْبَتِهِ.

২. قُمِ اللَّيْلَ صَلِّ اِلَّا قَلِيْلًا.

৩. نِصْفَهُ بَدَلٌ مِنْ قَلِيْلًا وَقِلَّتُهُ بِالنَّظْرِ اِلَى الْكُلِّ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ مِنَ النِّصْفِ قَلِيْلًا اِلَى الثُّلُثِ.

৪. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ اِلَى الثُّلُثَيْنِ وَاَوْ لِلتَّخْيِيْرِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَثَبَّتْ فِيْ تِلَاوَتِهِ تَرْتِيْلًا.

৫. اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا قُرْاٰنًا ثَقِيْلًا مَهِيْبًا اَوْ شَدِيْدًا لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّكَالِيْفِ.

৬. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ الْقِيَامَ بَعْدَ النَّوْمِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً مُوَافَقَةَ السَّمْعِ لِلْقَلْبِ عَلٰى تَفَهُّمِ الْقُرْاٰنِ وَاَقْوَمُ قِيْلًا اَبْيَنُ قَوْلًا.

অনুবাদ :

১. হে বস্ত্রাবৃত! নবী, مُزَّمِّلٌ শব্দটি মূলত مُتَزَمِّلٌ ছিল, تَاءٌ -কে زَاءٌ -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে অর্থাৎ ওহী আগমনকালে ভয়ের কারণে বস্ত্রাবৃতকারী।

২. রাত্রি জাগরণ করো সালাত আদায় করো কিয়দংশ ব্যতীত।

৩. অর্ধরাত্রি এটা قَلِيْلًا হতে بَدَلٌ আর অর্ধরাত্রিকে সম্পূর্ণ রাত্রির মোকাবিলায় স্বল্প বলা হয়েছে। কিংবা তা হতে কম কর অর্ধরাত্রি হতে স্বল্প পরিমাণ রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

৪. কিংবা তদুপর অতিরিক্ত কর দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত اَوْ অব্যয়টি ঐচ্ছিকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কুরআনকে সুস্পষ্ট রূপে আবৃত্তি করো ধীরস্থিরভাবে পাঠ করো।

৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি এমন বাণী কুরআন যা কঠিন ও কষ্টসাধ্য ভীতিপ্রদ অথবা তন্মধ্যকার বিধি-নিষেধের কারণে সুকঠিন।

৬. নিশ্চয় রাত্রিকালের উত্থান নিদ্রাযাপনের পর উত্থান সামঞ্জস্যতায় অধিক শক্তিশালী কুরআন বুঝার ব্যাপারে শ্রবণ করা, অন্তরের সামঞ্জস্যতা বর্তমান থাকে। এবং বাক্যস্ফুরণে অধিক সুদৃঢ় বাক্য উচ্চারণে সুস্পষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نِصْفَهُ : نِصْفَهُ শব্দটি তারকীবে اَللَّيْلَ হতে بَدَلٌ হয়েছে। সুতরাং ضَمِيْر-এর مَرْجِعٌ হলো لَيْلٌ অতএব আয়াতের অর্থ হলো, অর্ধরাত জাগ্রত থাক, ... আর কেউ কেউ نِصْفَهُ শব্দটি قَلِيْلًا হতে بَدَلٌ বলেছেন। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, রাত্র জাগরণ কর তবে অর্ধরাত্র ব্যতীত। -[ফাতহুল কাদীর]

তারকীবে نِصْفَهٗ শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ : نِصْفَهٗ শব্দটি اَللَّيْلَ হতে بَدَلْ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে, আর ৭। اَلنِّصْفُ হলো مَرْجِعٌ এর ضَمِيْر-এর عَلَيْهِ এবং مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হতে اَلنِّصْفُ হলো قَلِيْلًا সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, অর্ধরাত্রি জাগ্রত থাকো, অথবা অর্ধ হতে কিছু কমিয়ে এক-তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধ হতে কিছু বাড়িয়ে দুই-তৃতীয়াংশ জাগ্রত থেকে ইবাদত করো। কেউ কেউ نِصْفَهٗ শব্দটিকে قَلِيْلًا হতে بَدَلْ হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হলো- রাত্রি জাগ্রত থাকো কিন্তু অর্ধাংশ বাদ দিয়ে অথবা অর্ধ হতে কিছু কম বাদ দিয়ে অথবা অর্ধেক হতে বেশি বাদ দিয়ে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ : জমহুর ইদগাম করে اَلْمُزَّمِّلُ পড়েছেন। আর উবাই মূলত যে রকম ছিল সে রকম রেখে اَلْمُتَزَمِّلُ পড়েছেন। আর ইকরামা زَاءْ-কে تَخْفِيْف করে এবং مِيْم-এ তাশদীদ ও ফাতহ দিয়ে ইসমে মাফঊল হিসেবে اَلْمُزَمَّلُ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

اَشَدُّ وَطْأً-এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর وَاوْ-এ فَتْح এবং طَاءْ তে سَاكِنْ যুক্ত করে وَطْأً পড়েছেন। আবী হাতিম এ কেরাত পছন্দ করেছেন। আবুল আলীয়া, ইবনে আবী ইসহাক, মুজাহিদ, আবূ আমর, ইবনে আমের, হোমাদ ইবনে মুহাইছেন, মুগীরা, আবূ হাইওয়া وَاوْ তে كَسْرَه যুক্ত করে এবং طَاءْ তে فَتْح ও مَدْ যুক্ত করে وِطَاءً পড়েছেন। আবূ ওবাইদ এ কেরাত পছন্দ করেছেন। প্রথম কেরাত অনুযায়ী অর্থ হলো, রাত্রি জাগরণ করে নামাজ পড়া দিনের নামাজের তুলনায় মুসল্লির পক্ষে অধিক কষ্টকর। আর দ্বিতীয় কেরাত অনুযায়ী অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটি নাজিল হওয়ার কারণ :

১. বায্যার এবং তাবারানী হযরত জাবের হতে এক অতি দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এক সময় কুরাইশগণ 'দারুন নাদওয়াহ' তে একত্রিত হয়ে বলল, এ লোকটির এমন একটা নাম দাও যা শুনে যেন লোকেরা তাঁর কাছে আর না ভিড়ে। কেউ প্রস্তাব দিল কাহেন বা জাদুকর বললে কেমন হয়? বলা হলো, না কারণ সে জাদুকর নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা শুনতে পেয়ে নিজের কাপড় মুড়ি দিয়ে থাকলেন এবং তাতে আবৃত হয়ে রইলেন। এ সময় হযরত জিবরাঈল এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ এবং يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ।

২. ইবনে হাতিম ইব্রাহীম নাখয়ী হতে বর্ণনা করেছেন, يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ সূরাটি যখন নাজিল হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর জড়ানো অবস্থায় ছিলেন। -[আসবাবুন নুযূল, ইবনে কাসীর]

৩. বর্ণিত আছে যে, হেরা গুহায় যখন নবী করীম ﷺ-এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রথমবার ওহী নিয়ে আসলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভয় পেয়ে ছিলেন এবং কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে ছিলেন, বাড়ি ফিরে হযরত খাদীজা (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমাকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দাও এবং কাপড়ে আবৃত করে দাও। আমার ভয় লাগছে। যখন তিনি এ অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁর কাছে হযরত জিবরাঈল এসে يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ অতঃপর يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ সূরা দু'টি নাজিল করেন। -[রূহুল কোরআন, সাফওয়া]

এ গুণে সম্বোধন করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'হে কাপড়ে আবৃত শয্যাগ্রহণকারী' বলে সম্বোধন করার কারণ হলো, মহানবী ﷺ-এর প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহশীলতা প্রকাশ করা। আরবরা কোনো ব্যক্তিকে স্নেহ করে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সম্বোধন করতে হলে সে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এবং অবস্থার সাথে জড়িত করে সম্বোধন করেন। যেমন হযরত আলী (রা.) একদিন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সাথে রাগ করে মাটিতে শুয়ে পড়লে তাঁর শরীরে মাটি লাগে, এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল। قُمْ يَا اَبَا تُرَابٍ [উঠ হে মাটিওয়ালা!] এটা এ কথা বুঝবার জন্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি স্নেহবৎসল, তিরস্কারকারী নন।

দ্বিতীয় অন্য একটি কারণ হলো, রাতের বেলায় সমস্ত চাদর আবৃত শয্যা গ্রহণকারী লোকদেরকে সতর্ক করা যে, তারা যেন কিয়ামুল লাইল এবং আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে উঠার জন্য সতর্ক হয়ে যায়। কারণ কোনো فِعْل হতে কোনো اِسْم-কে مُشْتَقّ করা হলে তখন যাকে এটা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তার সাথে সাথে যেসব লোকের মধ্যে এ ওয়াসফ পাওয়া যাবে সকলেই এটার অন্তর্ভুক্ত হবে। -[সাফওয়া]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'হে কাপড়ে আবৃত শয়নকারী! রাত্রিকালে নামাজে দণ্ডায়মান হয়ে থাকো, কিছু অংশ ব্যতীত।' আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আপনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে উঠে পড়ুন এবং রাত্রের নামাজ আদায় করুন আর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও জিকির-আযকারে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এভাবে আপনি নিজেকে অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ এক কাজের জন্য প্রস্তুত করে নিন। সে কাজটি হলো, মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌছে দেওয়া এবং তাদেরকে নতুন দীন সম্বন্ধে অবহিত করা। –[সাফওয়া]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, اِلَّا قَلِيْلًا 'কিছু অংশ ব্যতীত' কথাটির অর্থ হলো– এক-তৃতীয়াংশ ব্যতীত। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ সূরার শেষের দিকে বলেছেন, اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ কেয়াম করা আবশ্যক। আর এটা হতে বুঝা যায় যে, দুই-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে এক-তৃতীয়াংশ অবশ্যই ঘুমানো যাবে। সুতরাং اِلَّا قَلِيْلًا কথাটির তাৎপর্য হলো, এক-তৃতীয়াংশ ব্যতীত। আর সম্পূর্ণ আয়াত কয়টির অর্থ হলো– নামাজের জন্য রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন (এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে) দুই-তৃতীয়াংশ, অথবা অর্ধ রাত্রি জাগরিত থাকুন, অথবা অর্ধরাত্রি হতে কিছু কম, অথবা বেশি। এ হিসাব অনুযায়ী উপরের সংখ্যা হলো দুই-তৃতীয়াংশ আর নিম্ন সংখ্যা হলো এক-তৃতীয়াংশ। –[কাবীর]

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? : يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। প্রথম মতটি হলো হযরত ইকরামার– يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ হে নবুয়তে আবৃত, রেসালাতের বাহক। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, হে সেই লোক যিনি দায়িত্ব বহন করেছেন। তিনি زَاءْ-কে تَخْفِيْف করে مِيْم-এ فَتْح দিয়ে এবং تَشْدِيْد যুক্ত করে এবং مَفْعُوْل-কে حَذْف করে পড়তেন।

দ্বিতীয় মতটি হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, হে কুরআনে আবৃত।

তৃতীয় মত হলো কাদাহ ও অন্যান্যদের– হে স্বীয় বস্ত্রাবৃত! তিনি চাদরে আবৃত ছিলেন বলে তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

কিয়ামুল লাইল কি রাসূল ﷺ-এর উপর ফরজ ছিল? :

১. একদল আলিমের অভিমত হলো– কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ মহানবী ﷺ-এর উপরই কেবল ফরজ ছিল। তাঁরা قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا-কে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯নং আয়াতে وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ "এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে এটা তোমার জন্য নফল হিসেবেই।" তাহাজ্জুদ মহানবী ﷺ-এর জন্য নফল বলা হয়েছে। আর এ আয়াতটি قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا-এর পরে নাজিল হয়েছে। এটা হতে বুঝা যায় যে, قُمِ الَّيْلَ-এ যা ফরজ করা হয়েছিল তাকে এক্ষণে বনী ইসরাঈলের আয়াত দ্বারা মানসূখ করে নফল করা হয়েছে। এখানে নফল অর্থ করা এবং না করা উভয়ই জায়েজ এমন নয়। কারণ নফলের অর্থ যদি এখানে এটাই হয় তাহলে রাসূলের জন্য খাস হতে পারে না। আর যদি বলি রাসূলের জন্যও নফল, তাহলে বলতে হয় গোটা উম্মতের জন্য ফরজ। অন্যথায় বিশেষত 'তোমার জন্য' এটার কি অর্থ? সুতরাং এখানে নফল মানে ইস্তেলাহী নফল নয়। –[রাওয়ায়েউল বায়ান, সাবূনী]

২. আরেকদল আলিম বলেছেন, তাহাজ্জুদ কখনো মহানবী ﷺ-এর উপর ফরজ ছিল না। তাঁরা وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, তাহাজ্জুদ এ আয়াত মহানবী ﷺ-এর জন্য নফল বলা হয়েছে ফরজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটার জবাবে বলেছেন, نَافِلَةً لَّكَ অর্থ তোমার জন্য বিশেষত ওয়াজিব, অথবা তোমার জন্য ওয়াজিব অতিরিক্ত। (কারণ এ অর্থ না করে নফল অর্থ করা হলে, উম্মতের উপর ওয়াজিব বলতে হবে।) এরা আরো বলেন, তাহাজ্জুদ যদি নবী করীম ﷺ-এর উপর ফরজ হয়ে থাকে, তাহলে তা উম্মতের উপরও ফরজ হবে। কারণ উম্মতকে وَاتَّبِعُوْهُ দ্বারা নবীর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। এ যুক্তি খাটে না, কারণ نَافِلَةً لَّكَ হতে নবী ﷺ-এর জন্য নফল তা বিশেষভাবে বুঝা যাচ্ছে।

৩. আরেক দল আলিমের মতে তাহাজ্জুদের নামাজ মহানবী ﷺ এবং গোটা উম্মতের উপর ফরজ ছিল। তারা এ সূরার শেষের দিকের আয়াত– "اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الخ-কে দলিল হিসেবে গ্রহণ

করেছেন। তাঁরা বলেন, এ আয়াত হতে জানা যায় যে, সাহাবীগণও নবীর মতোই কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। এটা তাঁরা রাত্রির কখনো দুই-তৃতীয়াংশ আবার কখনো অর্ধাংশ, কখনো এক-তৃতীয়াংশ জেগে থেকে করতেন। এটা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য হলে তাদেরকে যতটুকু সহজ ততটুকু আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁরা তাদের এ মতের সমর্থনে বলেন, এ প্রেক্ষিতে কয়েকটি হাদীসও রয়েছে।

ক. ইবনে আবী হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, সূরা মুয্যাম্মিল এর প্রথমাংশ যখন নাজিল হয় তখন সাহাবীগণ রমজানে যেমন কিয়ামুল লাইল করা হয় তেমনি কিয়ামুল লাইল করতেন। অতঃপর সূরার শেষাংশ নাজিল হয়, এ প্রথমাংশ এবং শেষাংশের নাজিলের ব্যবধান ছিল প্রায় এক বছর।

খ. ইবনে জারীর হযরত আবূ আব্দুর রহমান হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ নাজিল হলো তখন প্রায় এক বছর পর্যন্ত সাহাবীগণ কিয়ামুল লাইল করলেন। এটার ফলে তাঁদের পা ফুলে গেল এবং রানে ব্যথা হতে লাগল। অতঃপর فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ আয়াতটি নাজিল হলে তাঁরা নিষ্কৃতি পেলেন।

গ. ইমাম আহমদ (র.) মুসনাদ গ্রন্থে সাঈদ ইবনে হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাত্রি জাগরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন, তুমি কি সূরা আল-মুয্যাম্মিল পড়নি? বললাম, হ্যাঁ পড়েছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রথমাংশ দ্বারা রাত্রি জাগরণ ফরজ করে দিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বছর পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ করতে থাকলেন, যার ফলে তাঁদের পা ফুলে গিয়েছিল, সূরার শেষাংশ আল্লাহ তা'আলা আসমানে বারোটি মাস রেখে দিলেন। অতঃপর সূরার শেষাংশ নাজিল করে তাখফীফ বা সহজ করে দিলেন। এরপর হতেই রাত্রি জাগরণ ফরজ হওয়ার পর নফল হয়ে গেল।

গ্রহণযোগ্য অভিমত : এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এ শেষোক্ত তৃতীয় মত। যে মতে বলা হয়েছে, তাহাজ্জুদ নবী এবং সাহাবীগণের উপর ফরজ ছিল, অতঃপর মানসূখ করা হয়েছে। এ মত গ্রহণ করার মাধ্যমেই আয়াতগুলোর মধ্যে সমন্বয় স্বাধীন সম্ভব। তা ছাড়া এ তৃতীয় মতের স্বপক্ষে রয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস।

অধিকাংশ আলিমগণের মতে তাহাজ্জুদের নামাজ উম্মতের ক্ষেত্রেই কেবল মানসূখ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওয়াজিব ছিল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ সব সময় সফরে হাযরে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন, কখনও কোনো কারণে আদায় করা সম্ভব না হলে দিনের বেলা বারো রাকাত আদায় করতেন।

-[আহকামুল কোরআন, কাবীর, রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا : আল-মা'আরিফ গ্রন্থকার এর তাফসীর এভাবে লিখেছেন- تَرْتِيْل-এর শাব্দিক অর্থ হলো- শব্দসমূহকে সহজভাবে ও ধীরস্থিরভাবে মুখ হতে বের করা। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে কুরআন তেলাওয়াতের সময় তাড়াহুড়া করবে না; বরং تَرْتِيْل ও تَسْهِيْل (সহজভাবে) উচ্চারণ আদায় করবে তার সাথে সাথে তার অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবে। -[কুরতুবী]

আর رَتِّلْ ও قُمِ اللَّيْلَ এরা পরস্পর عَطْف وَمَعْطُوْف হয়েছে, সুতরাং অর্জিত অর্থ হবে- রাত্রে দণ্ডায়মান হোন এবং নামাজে তাহাজ্জুদ আদায় করুন। তাহাজ্জুদ নামাজ যদিও قِيَام قِرَاءَت رُكُوْع وَسُجُوْد ইত্যাদির মধ্যে শামিল রয়েছে, তথাপিও এখানে তাহাজ্জুদ দ্বারা শেষ রাত্রির কুরআন তেলাওয়াত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ জন্যই সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণনা রয়েছে যে, হুযূর ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজে অনেক লম্বা কেরাত করতেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও এ অভ্যাস ছিল।

অতএব, বুঝা গেল যে, তাহাজ্জুদের সময় কেবল কুরআন তেলাওয়াত করাই উদ্দেশ্য নয়, বরং تَرْتِيْل-এর সাথে তেলাওয়াত উদ্দেশ্য, যাতে প্রত্যেক كَلِمَة ও حَرْف সহীহভাবে স্পষ্ট অবস্থায় আদায় হয়ে যায়। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এমনিভাবে تَرْتِيْل-এর সাথে পড়তেন।

হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) হতে কেউ কেউ নবী করীম ﷺ -এর তাহাজ্জুদ আদায়ের সময় কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর প্রদান করলেন যে, হুযূর ﷺ এমনভাবে তেলাওয়াত করতেন যাতে এক একটি حَرْف স্পষ্টভাবে বর্ণনা হয়ে যেত।

আর تَرْتِيْل-এর মধ্যে تَحْسِيْن صَوْت সম্ভাব্য খোশ আওয়াজ করে কুরআন পড়াও শামিল রয়েছে।

আর মূলত تَرْتِيْل বলা হয় حُرُوْف وَ اَلْفَاظ গুলো আদায় করার সময় খুব স্পষ্ট ভাষায় বিশুদ্ধভাবে আদায় করা, যাতে তেলাওয়াতকারী তার মর্মবাণীর উপর গভীর মনোনিবেশ করে এবং তার মর্ম দ্বারা তার আত্মা প্রভাবান্বিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জালালাইন গ্রন্থকার এটার তাফসীর করেছেন- تَثَبُّتُ فِى تِلَاوَتِهِ অর্থাৎ ধীরগতিতে আগ্রহের সাথে তাড়াহুড়া না করে পড়বে, যাতে শ্রোতাবৃন্দ আয়াতসমূহ এবং শব্দসমূহ বুঝতে ও ইচ্ছা করলে শুনতে সক্ষম হয়।

আর হোযাইফা (রা.) হতেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- حَسِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ অর্থাৎ 'তোমরা আরববাসীদের এলহানে কুরআন তেলাওয়াত করো।' আর আহলে কিতাব এবং ফাসিকদের এলহানেও পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় তারতীল ওয়াজিব না সুন্নত? : হযরত মুহাম্মদ ﷺ হাদীস শরীফে যা বলেছেন সে প্রসঙ্গে বলতে হবে যে, তাজবীদের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।

كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ اٰثِمٌ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তাজবীদসহ কুরআন পড়বে না সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।' আর অনেক ক্ষেত্রে তাজবীদের ব্যতিক্রমের দরুন নামাজ বিনষ্ট হয়ে যায়। তাজবীদ ব্যতীত কুরআন তেলাওয়াতের ফলে তেলাওয়াতকারীর উপর কুরআন লানত করে থাকে।

অতএব, বলতে হবে যে, تَرْتِيْل ও تَجْوِيْد ইত্যাদির সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা ওয়াজিব।

গান করে এবং লাহান করে কুরআন পড়া সম্বন্ধে ফিক্‌হবিদগণের মাযহাব :

এক. হাম্বলী এবং মালেকী মাযহাব মতে লাহান করে কুরআন পড়া মাকরূহ। হযরত আনাস ইবনে মালিক, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবনে জোবাইর, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ, হাসান বসরী, ইব্‌রাহীম নাখয়ী এবং ইবনে সীরীন (র.)-এরও এ অভিমত। তাঁদের দলিল হলো-

১. হযরত হোযাইফা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আরবদের লাহান এবং শব্দ উচ্চারণে কুরআন পড়ো। সাবধান, আহলে কিতাব এবং ফাসিকদের লাহানে কখনও পড়ো না। কারণ আমার পর এমন কিছু লোক আসবে যারা কুরআনকে কান্না এবং গানের মতো করে টেনে টেনে পড়বে। তাদের পড়া তাদের গণ্ড অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হবে ফিতনায় পতিত। আর যারা তাদেরকে পছন্দ করবে তাদেরও একই অবস্থা। -[তিরমিযী]
এখানে যারা লাহান করে গানের মতো করে কুরআন পড়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

২. অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَتَّخِذُوْنَ الْقُرْاٰنَ مَزَامِيْرَ، يُقَدِّمُوْنَ اَحَدَهُمْ لَيْسَ بِاَقْرَءِهِمْ وَلَا اَفْضَلِهِمْ لِيُغَنِّيَهُمْ غِنَاءً .

-[সালামুল কোরআন-ছায়েছ]

৩. কুরআনকে লাহান বা গান করে পড়লে তাতে এমন বর্ণ হামযা, বা মদ বেড়ে যেতে পারে যা মূলত কুরআনে নেই, এটা জায়েজ নয়। তা ছাড়া গানের মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে খুশি করা; ভাব ও মর্মার্থ অনুভব করা নয়।

দুই. হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহযাব মতে তালহীন করে বা গান করে পড়া বৈধ। এটা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আব্দুর রহমান, ইবনে আল-আসওয়াদ এবং ইবনে যায়েদেরও এ অভিমত। মুফাসসিরদের মধ্যে আবূ জা'ফর তাবারী এবং আবূ বকর ইবনুল আরাবীরও এ অভিমত।

তাঁদের দলিল :

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ "কুরআনকে তোমাদের উচ্চারণ দ্বারা সৌন্দর্য দান করো।"
-[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

২. রাসূলের উক্তি لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ "যে লোক কুরআনকে গান করে পড়েন, সে লোক আমাদের দলভুক্ত নয়।"

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফিল বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের সময় একবার বাহনের উপর বসে সূরা فَتْح "ফাতাহ" টেনে পড়েছিলেন। -[বুখারী]

৪. এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর কেরাত শুনতে পেয়েছিলেন, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ "তোমাকে হযরত দাউদ (আ.)-এর বংশের সুর দান করা হয়েছে।" এটা শুনে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছিলেন, "আপনি শুনেছেন একথা জানতে পারলে আমি আপনার জন্য আরো সুন্দর করে পড়তাম।"

৫. অপর এক হাদীসে আছে- مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ اَذِنَهُ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ

৬. তারা আরো বলেন, এভাবে কুরআন পড়লে অন্তরে বেশি প্রভাব ফেলে এবং মনে তার ক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মোটকথা হলো, উভয় দলের দলিল এবং মতামতের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, উচ্চারণে ত্রুটি ঘটিয়ে শব্দের বিকৃতি করে কেবল গানের মতো ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দানের জন্য পড়া কারো কাছেই জায়েজ নয়। তবে তাজবীদ সহকারে, সুন্দর উচ্চারণের মাধ্যমে মাদ, ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি ঠিক রেখে পড়াকে কেউ হারাম বলেন না। সুতরাং তাদের মধ্যে মূলত কোনো মতদ্বন্দ্ব নেই। -[আহকামুল কোরআন আলী ছায়েছ এবং রাওয়ায়েউল বায়ান]

قَوْلُهُ قَوْلًا ثَقِيلًا : প্রাচীন তাফসীরকারকদের হতে এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটার অর্থ কঠিন বাণী। হাসান বলেছেন এটার অর্থ হচ্ছে, লোকগণ যদিও এ সূরায় উল্লিখিত বিধান সম্পর্কে খুব আগ্রহী; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করা খুব কঠিন। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, ওহী দ্বারা নাজিলকৃত ফরজ ও দণ্ডবিধানগুলো খুবই কঠিন ও গুরুভার। হযরত মুকাতিল বলেন, তার আজ্ঞাসূচক, নিষেধাজ্ঞাসূচক ও দণ্ডবিধানগুলো কার্যকর করা খুব কঠিন। আবুল আলীয়া বলেন, ওহী দ্বারা নাজিলকৃত প্রতিশ্রুতি, শাস্তির ভয় এবং হালাল-হারামের বিধান খুব গুরুভার। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, এটা মুনাফিকদের জন্য খুবই গুরুভার হোসাইন ইবনে ফজল বলেন, মুখে যদিও উচ্চারণে তা সহজ, কিন্তু মীযানে এটা খুবই গুরুভার হবে।

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং প্রাচীন তাফসীরকারদের কথার সার হলো- মহানবী ﷺ-কে রাত্রিকালে নামাজ পড়ার নির্দেশের কারণ হলো- আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি এমন এক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবতীর্ণ করছেন যা বহন করার যোগ্যতা তার নেই। নিশীথের এ নামাজ দ্বারা তাঁর মধ্যে সে যোগ্যতার জন্ম দিবে। তার বিধানসমূহ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা তার শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা নিজেকে একটি জীবন্ত প্রতীকে পরিণত করা এবং দুনিয়ার সম্মুখে স্বীয় চিন্তাধারা, নৈতিকতা, কথা ও কাজ দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত করা মহানবীর কর্তব্য। এটার কারণে মহানবী ﷺ-কে দুর্বিসহ ও কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। সে মুহূর্তে তাঁকে তা ধারণ করে দুনিয়ার সম্মুখে নির্ভয়ে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকতে হবে। এটা একটি মহাসাধনার কাজ। এ সাধনাই হলো নিথর-নিস্তব্ধ নিমিত্তের নামাজ।

এটাকে দুর্বহ কালাম বলার আর একটি কারণ হতে পারে যে, তার নাজিল হওয়া এবং নিজের মধ্যে ধারণ করা খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার। রাত্রিকালীন নামাজ দ্বারা নবী করীম ﷺ-এর কলব ও অন্তরের ধারণশক্তি বর্ধিত হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রচণ্ড শীতের সময়ও আমি নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ওহী নাজিল হতে দেখেছি। তখন তাঁর দেহ ও ললাট ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। নবী করীম ﷺ উষ্ট্রের উপর থাকাকালে ওহী নাজিল হলে উষ্ট্রটি মাটির সাথে বুক লাগিয়ে বসে যেত। ওহী নাজিল হওয়া শেষ না হলে উঠতে পারত না। এ সব হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে ওহী ছিল একটি বিরাট গুরুভার বিষয়। -[খায়েন, মা'আলিম]

আল্লামা সাবূনী (র.) বলেন, উপরিউক্ত তাৎপর্যে কিয়ামুল লাইল এবং তেলাওয়াতে কুরআনের মধ্যে এক সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক নতুন দীনের দাওয়াতদানের দায়িত্ব দিয়েছেন। আর এ দায়িত্ব পালন এক অতি কঠিন কাজ। এ দীনের বিধি-বিধান মেনে চলা এবং অন্যকে এ বিধান মানানো আরও কঠিন। সন্দেহ নেই এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন মুজাহাদা এবং ধৈর্যের, কারণ এতে তাদের চিরাচরিত আক্বীদা-বিশ্বাস এবং পুরাতন আচার-আচরণ ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং হে মুহাম্মদ ﷺ তোমাকে অনেক কষ্ট পরিশ্রম করতে হবে এবং এ দাওয়াতের পথে ও এ দীনের অনুসারী বানাতে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। কাপড় জড়ানো, বস্ত্রাবৃত অবস্থায় থাকলে, আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে এ কঠিন দায়িত্ব পালন তোমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে? সুতরাং বিছানা ছেড়ে কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করে উঠে পড়ুন এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় আল্লাহর মুনাজাতে, নামাজে, কুরআন তেলাওয়াতে মাশগুল হয়ে থাকুন। যাতে আপনার মধ্যে কঠিন দায়িত্ব পালনের নতুন দীনের দাওয়াত দানের গুণাবলি সৃষ্টি হতে পারে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَّأَقْوَمُ قِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠা আত্মসংযমের জন্য খুব বেশি কার্যকর এবং কুরআন যথাযর্থভাবে পড়ার জন্য যথার্থ।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামুল লাইলের ফায়েদা এবং হিকমত বিবৃত করেছেন। বলা হয়েছে যে, রাত্রি জাগরণ করে নামাজ পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং ইবাদতে মশগুল থাকার মধ্যে দু'টি হিকমত ও কল্যাণ রয়েছে।

এক : রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে উঠা এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানব স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। মানুষের প্রকৃতি এ সময় বিশ্রাম লাভেচ্ছুক হয়ে থাকে। ফলে এরূপ অবস্থায় এ কাজটি করা একটি কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনার ব্যাপার সন্দেহ নেই। এ কৃচ্ছ্রসাধনা মানুষের নাফসকে দমন করা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি প্রবল প্রভাবশালী ব্যাপার। এ পন্থায় যে লোক নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সংস্থাপিত করে নেয় এবং স্বীয় দেহ ও মনের উপর প্রবল প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় ও নিজের শক্তিকে আল্লাহর পথে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়, সে সর্বাধিক দৃঢ়তাসহকারে সত্য শাশ্বত দীনের দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করতে পারে।

গ্রন্থকার এটার আরেকটি হিকমতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সে হিকমত হলো, দিল ও মুখের মধ্যে বা দিল ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির তা একটি অতি বড় উপায় ও মাধ্যম। কারণ রাত্রিকালে যে লোক শয্যা ত্যাগ করে একাকিত্বে আল্লাহর ইবাদত করে সে তা অবশ্যই ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে করে থাকে।

দ্বিতীয় ফায়দাটি হলো, এ সময় কুরআনকে অধিক প্রশান্তি, নিশ্চিত ও মনোনিবেশ সহকারে পড়া যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) اَقْوَمُ قِيْلًا-এর তাৎপর্য বলেছেন, اَجْدَرُ اَنْ يَّفْقَهُ فِى الْقُرْاٰنِ "কুরআন অধিক চিন্তা-গবেষণা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যেতে পারে।" -[আবূ দাউদ]

আর এটা দীন দাওয়াতি কার্যে তোমার জন্য অধিক উৎসাহ ব্যঞ্জক এবং সহায় হতে পারে। -[আহকামুল কুরআন সায়েদ]

نَاشِئَةَ الَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য : এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি মতভেদ পাওয়া যায়। যথা-

১. হযরত আয়েশা (রা.)-এর মতে রাতের কিছু অংশ বিশ্রাম করে নামাজের জন্য উঠাই হলো نَاشِئَةَ الَّيْلِ ।
২. ইবনে কাইসান (র.) বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য শেষ রাতে উঠাকেই نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়।
৩. হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, আবিসিনীয় ভাষায় نَشَاءُ অর্থ قَامَ অর্থাৎ দাঁড়িয়েছে। অতএব, রাতের যে কোনো অংশে যদি কেউ নামাজের জন্য দাঁড়ায় তাকেই نَاشِئَةٌ বলা হয়। ইবনে যায়েদও এ মত পোষণ করতেন।
৪. হযরত ইকরামা (রা.) বলেছেন, রাতের প্রথম অংশে তাহাজ্জুদের নামাজে দাড়ানোকে نَاشِئَةَ الَّيْلِ বলা হয়।
৫. আল্লামা বাগাবী হযরত যাইনুল আবেদীন (র.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম হুসাইন (রা.) মাগরিব ও এশার মধ্যে নফল নামাজ আদায় করতেন এটিই হলো نَاشِئَةَ الَّيْلِ ।
৬. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এশার নামাজের পর প্রত্যেক নামাজকেই نَاشِئَةٌ বলা হয়।
৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইবনে জোবায়ের (রা.)-কে نَاشِئَةٌ শব্দটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়েই বলেছেন, সমস্ত রাত ইবাদত করাই হলো نَاشِئَةٌ । -[নূরুল কোরআন]

هِىَ اَشَدُّ وَطْاً-এর ব্যাখ্যা : وَطْاً শব্দটি যদি بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُوْنِ الطَّاءِ অর্থাৎ ضَرَبَ-এর ওজনে হয় তখন এটার অর্থ হবে- অর্থাৎ শাসানো, পিশানো। তখন আয়াতের مَطْلَبْ হবে- রাত্রির নামাজ আত্মাকে তার খাহেশ অনুসারে নাজায়েজ পন্থায় পরিচালিত হওয়া হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাহাজ্জুদ নামাজ বড়োই কার্যকর ক্ষমতা রাখে।

আর যদি وَطْاً অর্থাৎ كِتَابْ-এর ওজনে যদি নেওয়া হয়, তখন এটা مُوَافَقَتْ بِمَعْنَى مُوَاطَاةٌ মাসদারের অর্থে হবে।

وَاَقْوَمُ قِيْلًا-এর তাৎপর্য : اَقْوَمُ শব্দের অর্থ হলো- অতি উত্তম পর্যায়ে সঠিক ও অতি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ রাত্রিবেলায় কুরআন তেলাওয়াত অতি শুদ্ধ ও অন্তরে স্থাপিত হওয়ার ক্ষেত্রে উপযোগী হয়। কেননা বিভিন্ন প্রকার আওয়াজ ও শব্দ সেই সময় হট্টগোল করে না, বরং নীরব থাকে।

সারকথা হলো, উক্ত আয়াত দ্বারা قِيَامُ الَّيْلِ-এর حِكْمَتْ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। রাত্রিকালে শেষ রাত্রে কুরআন তেলাওয়াত করা দ্বারা আত্মার কি শান্তি এবং ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে এটার কি ফলাফল তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

তাহাজ্জুদ নামাজের হুকুম দেওয়ার কারণ : আর উক্ত আয়াতগুলো হতে সূক্ষ্মভাবে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাহাজ্জুদ নামাজের হুকুম আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দান করেছেন যে, তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করে মানুষ কষ্ট করে ইবাদত করার জন্য ভালোভাবে যেন অভ্যস্ত হয়। আর রাত্রিবেলায় গভীর নিদ্রা ও আরামকে নষ্ট করে আল্লাহর পথে আত্মার সাথে একটি অতি বড় জেহাদ করা হচ্ছে। এটা দ্বারা ভারি বোঝাসম্পন্ন -এর ভার বহন করার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয় এবং তা পালন করা যাতে সহজতর হয়। তাই কবি বলেন- اَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوٰى * وَمَا كَرَمُ الْمَرْأِ اِلَّا التُّقٰى

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا تَصَرُّفًا فِىْ اِشْتِغَالِكَ لَا تَفْرُغُ فِيْهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ .

৭. নিশ্চয় দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে সুদীর্ঘ কর্ম-ব্যস্ততা তোমার কাজ-কর্মের ব্যস্ততা, যদ্দরুন তুমি তাতে তিলাওয়াতে কুরআনের অবকাশপ্রাপ্ত হও না।

٨. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اَىْ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ اِبْتِدَاءِ قِرَاءَتِكَ وَتَبَتَّلْ اِنْقَطِعْ اِلَيْهِ فِى الْعِبَادَةِ تَبْتِيْلًا مَصْدَرُ بَتَّلَ جِىْءَ بِهِ رِعَايَةً لِلْفَوَاصِلِ وَهُوَ مَلْزُوْمُ التَّبَتُّلِ .

৮. আর তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো অর্থাৎ তেলাওয়াতের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করো। আর মগ্ন হও অন্যদের হতে বিচ্ছিন্ন হও তাঁর প্রতি ইবাদত প্রাক্কালে একনিষ্ঠভাবে تَبْتِيْلًا শব্দটি بَتَّلَ-এর مَصْدَرٌ আয়াতের فَوَاصِلُ-এর সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে এ ওজনে আনয়ন করা হয়েছে। আর এটা تَبَتُّلٌ-এর مَلْزُوْم হিসেবে ব্যবহৃত।

٩. هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا مَوْكُوْلًا لَهُ اُمُوْرَكَ .

৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, অতএব তাঁকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করো তোমার যাবতীয় বিষয়কে তাঁরই প্রতি সোপর্দ করো।

١٠. وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنْ اَذَاهُمْ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا لَا جَزَعَ فِيْهِ وَهٰذَا قَبْلَ الْاَمْرِ بِقِتَالِهِمْ .

১০. আর লোকেরা যা বলে, তাতে ধৈর্যধারণ করো অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফিরগণ, তোমাদের উত্যক্ত করে আর তাদেরকে সৌজন্য সহকারে এড়িয়ে চলো যাতে কোনোরূপ অভিযোগ অনুযোগের অভিব্যক্তি থাকবে না। আর এ বিধানটি জিহাদ সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেকার বিধান।

١١. وَ ذَرْنِىْ اُتْرُكْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ عَطْفٌ عَلَى الْمَفْعُوْلِ اَوْ مَفْعُوْلٌ مَعَهُ وَالْمَعْنٰى اَنَا كَافِيْكَهُمْ وَهُمْ صَنَادِيْدُ قُرَيْشٍ اُولِى النَّعْمَةِ التَّنَعُّمِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا مِنَ الزَّمَنِ فَقُتِلُوْا بَعْدَ يَسِيْرٍ مِنْهُ بِبَدْرٍ

১১. আর আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে অবকাশ দাও এবং অসত্যারোপকারীদেরকে এটা পূর্বোক্ত مَفْعُوْل-এর আতফ অথবা مَفْعُوْل مَعَهُ এটার অর্থ এই যে, আমিই তাদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট। আর 'তারা' বলতে কোরায়শ দলপতিদের বুঝানো হয়েছে। যারা অনুগ্রহরাজির অধিকারী বিলাস সামগ্রীর অধিকারী। আর তাদেরকে সামান্য অবকাশ দান করো স্বল্প সময়ের জন্য। যেমন, এর কিছুকাল পরই বদর যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছিল।

١٢. اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا قُيُوْدًا ثِقَالًا جَمْعُ نِكْلٍ بِكَسْرِ النُّوْنِ وَجَحِيْمًا نَارًا مُحْرِقَةً .

১২. আমার নিকট রয়েছে শৃঙ্খলসমূহ শক্ত বন্ধনীসমূহ, শব্দটি নূন-এ যের যোগে نِكْلٌ শব্দের বহুবচন। আর প্রজ্বলিত অগ্নি জ্বলন্ত আগুন।

١٣. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ يُغَصُّ بِهِ فِى الْحَلْقِ وَهُوَ الزَّقُّوْمُ اَوِ الضَّرِيْعُ اَوِ الْغِسْلِيْنُ اَوْ شَوْكٌ مِنْ نَارٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَنْزِلُ وَعَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا زِيَادَةً عَلٰى مَا ذُكِرَ لِمَنْ كَذَّبَ النَّبِىَّ ﷺ .

১৩. আর গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য যা গলদেশে আটকে পড়ে, এটা দ্বারা زَقُّوْم বা ضَرِيْع কিংবা غِسْلِيْن অথবা অগ্নিকন্টক উদ্দেশ্য। যা গলায় বিদ্ধ হয়ে থাকে, বের হয় না এবং গিলে ফেলাও যায় না। এবং পীড়াদায়ক শাস্তি কষ্টদায়ক, উল্লিখিত শাস্তির অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে। আর এটা নবী করীম ﷺ -এর প্রতি অসত্যারোপণের বিনিময়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٤. يَوْمَ تَرْجُفُ تَزَلْزَلُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا رَمْلًا مُجْتَمِعًا مَهِيْلًا سَائِلًا بَعْدَ اجْتِمَاعِهٖ وَهُوَ مِنْ هَالَ يَهِيْلُ وَاَصْلُهٗ مَهْيُوْلٌ اُسْتُثْقِلَتِ الضَّمَّةُ عَلَى الْيَاءِ فَنُقِلَتْ اِلَى الْهَاءِ وَحُذِفَتِ الْوَاوُ ثَانِى السَّاكِنَيْنِ لِزِيَادَتِهَا وَقُلِبَتِ الضَّمَّةُ كَسْرَةً لِمُجَانَسَةِ الْيَاءِ.

১৪. সেদিন প্রকম্পিত হবে কেঁপে উঠবে। পৃথিবী ও পর্বতমালা এবং পবর্তমালা বালুকারাশিতে পরিণত হবে একত্রীভূত বালি যা হবে প্রবহমান একত্রিত হওয়ার পর বহমান। مَهِيْلًا শব্দটি هَالَ - يَهِيْلُ হতে নিষ্পন্ন, মূলত তা مَهْيُوْلٌ ছিল ى -এর মধ্যে পেশকে কঠিন জ্ঞান করে তাকে পূর্ববর্তী هَا -এর মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে দু'টি সাকিন একত্রিত হওয়ায় وَاوْ অতিরিক্ত বর্ণ হিসেবে তাকে বিলুপ্ত করা হয়। অতঃপর هَا মধ্যকার পেশটিকে ى-এর সাথে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে যের যোগে পরিবর্তন করা হয়।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ رَبُّ الْمَشْرِقِ : হামযা, কিসায়ী, আবূ বকর, ইবনে আমের رَبِّ -এ جَرٌّ দিয়েছেন رَبِّكَ-এর صِفَتٌ বা بَدَلٌ অথবা عَطْفُ بَيَانٍ হিসেবে। আর বাকি ক্বারীগণ رَبُّ -কে مُبْتَدَأٌ হিসেবে رَفْعٌ দিয়ে পড়েছেন। তাঁদের মতে এ مُبْتَدَأٌ -এর خَبَرٌ হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আর কেউ কেউ এটাকে مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ -এর خَبَرٌ বলে দাবি করেছেন। সে مُبْتَدَأٌ টি হলো هُوَ আর যায়েদ ইবনে আলী এটাকে نَصَبٌ দিয়েছেন مَدْحٌ হিসেবে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ سَبْحًا طَوِيْلًا : জমহুর سَبْحًا অর্থাৎ حَاءٌ - مُهْمَلَةٌ হিসেবে পড়েছেন অর্থ ব্যস্ততা। আর ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মার, আবূ ওয়ায়েল, ইবনে আবী আবলা خَاءٌ -এ مُعْجَمَةٌ দিয়ে سَبْخًا পড়েছেন। অর্থাৎ আরাম-আয়েশ করার অবকাশ তার জন্য রয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর উভয় শব্দকে مُفْرَدٌ হিসেবে اَلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পড়েছেন। ইবনে মাসউদ এবং ইবনে আব্বাস বহুবচন হিসেবে اَلْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

قَوْلُهٗ قَلِيْلًا : قَلِيْلًا শব্দটি مَصْدَرٌ مَحْذُوْفٌ -এর صِفَتٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অথবা زَمَانٌ مَحْذُوْفٌ -এর صِفَتٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। প্রথম অবস্থায় তার تَقْدِيْرٌ হবে تَمْهِيْلًا قَلِيْلًا আর দ্বিতীয় অবস্থায় تَقْدِيْرٌ হবে زَمَانًا قَلِيْلًا।

يَوْمَ تَرْجُفُ -এর يَوْمَ শব্দটি مَنْصُوْبٌ হওয়ার কারণ : يَوْمَ - ظَرْفٌ টি ذَرْنِىْ দ্বারা مَنْصُوْبٌ হয়েছে। অথবা, عَذَابٌ -এর صِفَتٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। তখন এক مَحْذُوْفٌ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হবে আর তা হলো عَذَابًا وَاقِعًا يَوْمَ تَرْجُفُ অথবা اِلَيْهَا-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

تَرْجُفُ -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : تَرْجُفُ শব্দটি জমহুর تَاءٌ তে فَتْحٌ এবং جِيْمٌ -এ পেশ দিয়ে فِعْلٌ مَعْرُوْفٌ পড়েছেন। আর যায়েদ ইবনে আলী একে مَجْهُوْلٌ করে تُرْجَفُ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রাত্রিবেলায় জাগরণ করে ইবাদতে, নামাজে মাশগুল থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, অতঃপর আলোচ্য আয়াতে দিন বাদ দিয়ে রাত্রিবেলাকে কেন ইবাদতের জন্য মনোনীত করেছেন। তার কারণ বিবৃত করেছেন, এরপর কিয়ামুল-লাইলের সময় কোন আমল উত্তম সেদিকে আলোকপাত করেছেন। -[কাবীর]

قَوْلُهُ إِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً : سَبْحٌ-এর শাব্দিক অর্থ- প্রবহমান হওয়া বা ঘুরাফিরা করা, আর পানিতে সাঁতার কাটাকেও سَبْحٌ বলা হয়। আর পানিতে কোনো প্রকার বাধা-বিপত্তি ব্যতীত সাঁতার কাটাই সহজ কার্য; তাই এটাকে سَبَاحَتْও বলা হয়। উক্ত আয়াতে বর্ণিত سَبْحٌ-এর অর্থ দিনের বেলায় দুনিয়ার কাজকর্ম অথবা ধর্মীয় তাবলীগ এবং শিক্ষাদীক্ষা اَصْلَاحِ خَلْقٍ অথবা স্বীয় জিবীকা নির্বাহের জন্য যাবতীয় উপকরণে ব্যস্ত থাকা সবই দাখিল রয়েছে।

ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতটুকুর দু'টি তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন–

১. দিনের বেলায় আপনার নিজস্ব নানা ব্যস্ততা রয়েছে, ফলে আল্লাহর খেদমতে সময় ব্যয় করা সম্ভব নাও হতে পারে, এ কারণেই রাত্রিতে আপনাকে নামাজ ও ইবাদত আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. রাত্রিকালে ঘুম এবং আরাম করতে গিয়ে যদি কখনো নামাজ পড়া বা ইবাদত করা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে দিনের বেলায় রয়েছে আপনার জন্য যথেষ্ট সময়। এ সময় আপনি তা আদায় করতে পারেন। –[কাবীর]

হযরাতে ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেন, উক্ত আয়াত হতে এ কথা সাব্যস্ত হয় ওলামা মাশায়েখগণ تَعْلِيْم وَتَرْبِيَتْ وَاِصْلَاحِ خَلْقٍ-এর কার্যে নিবেদিত থাকেন, তাঁদের জন্যও উচিত দিনের বেলায় তাঁরা সে কার্যগুলো সমাধান করে ফেলবেন, আর রাত্রির সময়টাকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা কর্তব্য বা উচিত। ওলামায়ে সলফ এরূপই করতেন। কখনো বা যদি রাত্রিবেলায়ও সে কার্যগুলো করার আবশ্যকতা দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা।

قَوْلُهُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "তোমার রবের নামের জিকির করতে থাকো। আর সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই হয়ে থাকো।" আলোচ্য আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে দু'টি কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– ১. আল্লাহর নামের জিকির, ২. একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহতে মগ্ন হওয়া।

গ্রন্থকার "আল্লাহর নামের জিকির করো" এটার অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এটার অর্থ হলো, তেলাওয়াতের পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া। কিছু কিছু তাফসীরবিদ লিখেছেন, দিনের বেলার ব্যতিব্যস্ততার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে– 'তোমার রবের নামে জিকির করতে থাকো।' এরূপ বলায় এ তাৎপর্য স্বতই প্রকাশিত হয় যে, দুনিয়ায় সর্বপ্রকারের কাজ করতে থাকা অবস্থায়ও তোমার রবের স্মরণ হতে তুমি গাফিল হয়ে থেকে না। যেভাবেই হোক তাঁর জিকির অবশ্যই করতে থাকবে।

আর কেউ বলেছেন, এটার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার 'আসমায়ে হুসনা' দ্বারা তাঁকে ডাকা। শেখ আলী আন্ছায়েছ বলেছেন, এটার অর্থ ব্যাপক; সর্বদা তাসবীহ, তাহমীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কুরআন এসব জিকির হতে বিরত না রাখে, তোমার সব কাজের উদ্দেশ্য যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে থাকে। –[আহকামুল কুরআন]

قَوْلُهُ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلاً : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দ্বিতীয় যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলাতে মগ্ন থাকা। মূলশব্দ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً এখানে تَبَتُّلْ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– বিচ্ছিন্ন হওয়া, সম্পর্ক ছিন্ন করা। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ মনে ও গভীর ঐকান্তিকতার সাথে মনোনিবেশ করার কথা বলা হয়েছে। এটা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়নি; বরং মনের যাবতীয় দুঃখ-বেদনা, চিন্তা ও অলীক কল্পনা যা কিছু মানসিক ক্ষেত্রে উদয় হয়ে থাকে, তাকে মন হতে ধুয়ে মুছে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে– আপনার প্রতিপালকের ইবাদত ও আরাধনায় এমনভাবে মাশগুল হোন, যেন মনে অন্য কোনো পার্থিব চিন্তা ও কল্পনার স্থান না থাকে। মনকে সর্বপ্রকার চিন্তামুক্ত করে পূর্ণরূপে তাঁর দিকে একনিষ্ঠ হোন, তাঁর ধ্যানের সাগরে ডুবে প্রেমের অমিয় সুধা পান করুন।

আর ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে রত হওয়া অর্থাৎ মনের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে রাখা, আর অন্য সব কিছু থেকে মনকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া।–[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ-এর তাফসীর লিখেছে قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ আপনার তেলাওয়াতের পূর্বে আপনি বিসমিল্লাহ তেলাওয়াত করে নিবেন।

আল্লামা যমখশরী বলেন, আপনি আমার স্মরণে দিন-রাত মশগুল থাকুন এবং ذِكْرٌ দ্বারা তাসবীহ, তাকবীর, তেলাওয়াতে কুরআন সব কিছুই শামিল করে। –[মাদারিক]

আর এখানে اُذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ الخ দ্বারা আল্লাহর স্মরণে এমনভাবে সার্বক্ষিণক লিপ্ত থাকা বুঝানো হয়েছে, যাতে কখনও গাফেল না হওয়া অথবা কসুরী না করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা وَاذْكُرْ رَبَّكَ না বলে وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ বলার কারণ : ذِكْرٌ-কে اِسْمٌ-এর সাথে مُقَيَّدٌ করে বলার দ্বারা সম্ভবত ইশারা এই যে, اِسْمِ رَبِّ অর্থাৎ اَللّٰهُ اَللّٰهُ জিকিরের تَكْرَارْ-এর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জাস্সাস (র.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, কারো কারো মতে আয়াতের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার أَسْمَاءُ حُسْنٰى সমূহ দ্বারা তাঁকে ডাকতে থাকো।
অথবা, কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাত-দিন তাঁর জিকিরে লিপ্ত থাকো। যে কোনো প্রকার ব্যস্ততা যেন তোমাকে আল্লাহর জিকির হতে গাফেল না করে। আর তোমার সকল কার্যই যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا : উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, যিনি পবিত্র ও মহান সত্তা مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ তথা সারা জগতের সমস্ত প্রয়োজনসমূহ পূরণকারী, তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার ক্ষেত্রে একমাত্র উপযুক্ত তিনি রয়েছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর প্রতি ভরসা করো, আর তাঁর উপর যে ভরসা রাখবে সে কখনো বঞ্চিত হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ ভাগ্যে লিখিত পূর্ণ রিজক গ্রহণ করবে না। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তাই তোমরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য লেগে যাও।
এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, تَرْكُ دُنْيَا তাকে বলা হয় না যে, তোমরা আল্লাহর হালালকে তোমাদের জন্য হারাম করে নিবে। অথবা তোমাদের জন্য যে সম্পদ আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন তাকে অনর্থক উড়িয়ে দিবে; বরং تَرْكُ دُنْيَا বলা হয় তাকেই যা আল্লাহর নিকট রয়েছে। তাতে তোমাদের হাতের সম্পদ হতে অধিকতর ভরসা রাখবে।

قَوْلُهُ وَكِيْلًا : যার উপর নিজের কাজের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাকেই বলা হয় উকিল। আমরা আমাদের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য উকিল নিয়োগ করি। সে আমাদের পক্ষ হতে যা কিছু করা প্রয়োজন তা করবে বলে তার প্রতি আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে। আমাদের এ বিশ্বাসও থাকে যে, সে আমাকে মোকদ্দমায় জয়ী করে দিবে। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে উকিল নিয়োগ করার অর্থ হলো– আপনার যাবতীয় ব্যাপারগুলো আল্লাহর নিকট সোপর্দ করুন, তাঁকেই আপনার কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করুন। তিনিই আপনার যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিবেন। কেননা তাঁর তুলনায় বড় শক্তিমান কেউ নেই। তিনি দিবারাত্রি অর্থাৎ দুনিয়ার বুকে যাবতীয় ব্যাপারে ঘটক ও নিয়ন্ত্রণক। তিনি আপনার উকিল হলে আপনার কোনোই চিন্তা থাকতে পারে না। দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, কাফেরগণকে দমন করা, তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎকরণে তিনিই ক্ষমতাবান। এটার প্রতিবিধানের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাছে ছেড়ে দিন।

قَوْلُهُ وَاصْبِرْ عَلٰى .... هَجْرًا جَمِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর লোকের যেসব কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে সেজন্য তুমি ধৈর্যধারণ করো, আর সৌজন্য রক্ষাসহকারে তাদের হতে সম্পর্কহীন হয়ে যাও।" অর্থাৎ আপনি যখন আমাকে উকিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন এ কাফেররা আপনার সম্পর্কে যাই বলুক তাতে কর্ণপাত না করে তাদের ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দিন, কারণ আমি যখন আপনার উকিল হয়েছি আপনার এ সমস্যার সমাধান আপনার নিজের চেয়ে উত্তমভাবে করার দায়িত্ব আমার। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا : এ আয়াতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে সামাজিক জীবনে একঘরে হয়ে থাকার কথা বলা হয়নি– বলা হয়নি আত্মীয়তার ও বংশীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে; বরং তাদের কটূক্তির প্রতিবাদ না করা, তাদের দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মক্কার কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু বলছে ও করছে, সেসব আজেবাজে বিষয়কে আপনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে চলুন। তার কোনো জবাব ও প্রতিকারে যাবেন না। এ উপেক্ষা ও পরিত্যাগের নীতির সাথে কোনোরূপ অস্বস্তি ও ক্ষোভ থাকা উচিত নয়। একজন সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ও নীতিবান লোকের পক্ষে এহেন অবাঞ্ছিত লোকদের কথায় কর্ণপাত না করাই শ্রেয়। আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ হতে এ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, নবী করীম ﷺ-এর আচার-ব্যবহার খারাপ ছিল বা তিনি তাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, বরং এ নির্দেশ দ্বারা কাফেরগণকে এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্যে যে, তোমাদের অশোভনীয় উক্তির প্রতিবাদ না করা মুহাম্মদ ﷺ -এর দুর্বলতার জন্য নয়, বরং প্রতিবাদ না করাই হলো আল্লাহর নির্দেশ। এ জন্যই তিনি প্রতিবাদ হতে বিরত থাকতেন।
মুফাস্সিরগণ বলেছেন, 'আল-হাজরুল জামীল' -এর অর্থ হলো কষ্ট না দিয়ে তিরস্কার না করে সম্পর্কচ্ছেদ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জিহাদ ফরজ হওয়ার পূর্বে। অতঃপর জিহাদ ফরজ হলে এ হুকুম মানসূখ হয়ে যায়। এটার হিকমত এই যে, মু'মিনগণ মক্কায় সংখ্যায় কম ছিল, তারা সেখানে দুর্বল ছিল, এ কারণেই তাদেরকে ধৈর্য অবলম্বন করতে কষ্ট সহ্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ আদায় করে ইবাদতে মশগুল থেকে দুশমনের মোকাবিলাকরণের আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের তারবিয়াত গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, পরে যখন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন দুশমনদের মোকাবিলায় ইস্পাতনির্মিত প্রাচীরের মতো দাঁড়াবার নির্দেশ দেওয়া হলো; কিন্তু এ শক্তি সঞ্চয় করার পূর্বে কেবল মৌখিক দাওয়াত ও ধৈর্য অবলম্বন করা অপরিহার্য। –[সাফওয়া, কাবীর]
অপরেক দল মুফাসসির বলেছেন, এ আয়াত মানসূখ হয়নি; বরং এটার তাৎপর্য এই যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হিকমত অবলম্বন করত সম্পর্ক ছিন্ন করা বা উপদেশ করে চলা। ইমাম রাযী (র.) এ দ্বিতীয় মতকেই অধিক সহীহ বলে মত পোষণ করেছেন। –[কাবীর]

هَجْرًا جَمِيْلًا-এর কয়েদ লাগানোর কারণ : কাফের ও মুশরিকগণ হতে যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে যে সকল গালি-গালাজ ইত্যাদি করত তাদের থেকে এটার প্রতিশোধ নিতে বলা হয়নি, বরং তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করার মুহূর্তে সাধারণত মানবিক অভ্যাস হলো কিছু ভালোমন্দও বলে ফেলে, তাই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলা হয়েছে যে, আপনি উত্তম চরিত্রবান ও মহাসম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে আপনার জন্য শোভনীয় হবে যেন তাদেরকে ভালোমন্দ কিছুই না বলেন, যাতে আপনার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ هَجْرٌ جَمِيْلٌ আপনার জন্য একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ ذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا : হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্য কাফিরদের উপর আখিরাতের আজাব সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন– কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারে আপনি অধৈর্য হওয়া ঠিক হবে না; বরং আপনি ছেড়ে রাখুন তাদেরকে এবং আমাকে তাদের পাকড়াও করার জন্য একটু সুযোগ দিন। কেননা তারা আপনার কথায় কান না দিয়ে আল্লাহর দীন-ধর্ম, হক ও সত্যকে না মেনে তাদের ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশে মেতে রয়েছে। একটু পরেই আমি তাদের সাথে বুঝাপড়া করছি।

قَوْلُهُ تَعَالَى مَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা সে কাফেরদেরকে مَهْل قَلِيْل দেওয়ার কথা বলেছেন, مَهْل كَثِيْر বলেননি, এটার ব্যাখ্যায় হাকিম (র.) তার اَلْمُسْتَدْرَكُ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) হতে সহীহ সনদ বর্ণনা করে বলেন, বেশি সময়ের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাদের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এ অবস্থা হওয়ার কিছু দিন পরেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে নিঃসহায় অবস্থায় মুসলমানদের হাতে হত্যা করিয়েছেন। –[কাবীর]

এতে বুঝা যায়– যারা আখেরাতকে অসত্য বলে মনে করে তারাই দুনিয়ার সকল نَازُ وَنِعْمَتْ পেয়ে তাতে মত্ত হয়ে যায়। তবে কখনো বা ঈমানদারগণকেও এ সকল নিয়ামত দেওয়া হয় কিন্তু তারা সে নিয়ামত পেয়ে তাতে এমনিভাবে মাতাল হয় না, যেমনি কাফেরগণ হয়ে থাকে। –[মা'আরিফ]

اَلْمُكَذِّبِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمُكَذِّبِيْنَ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ বিষয়ে অধিকাংশ তাফসীরকারদের অভিমত হলো, কুরাইশদের নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমনি মাদারিক ও জালালাইন গ্রন্থকারদ্বয় ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আল-ক্বালামের আয়াতে রয়েছে– فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ الخ সে সমস্ত মক্কার কুরাইশ বংশীয় লোকদেরকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى اُولِى النَّعْمَةِ : اُولِى النَّعْمَةِ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে– এ কথাটি হতে স্পষ্ট মনে হয় মক্কার যে সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অগ্রাহ্য ও অমান্য করত, তারা নানারূপে ধোঁকা দিয়েও হিংসা-বিদ্বেষ উজ্জীবিত করত, আর জনগণকে রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছিল তাদের প্রতিই আয়াতাংশ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا .... وَّعَذَابًا اَلِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমাদের নিকট (এদের জন্য) দুর্বহ বেড়ি আছে, আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, গলায় আটকিয়ে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আজাবও।" অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করেছে, রাসূল সম্পর্কে নানাকথা প্রচার করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কাছে চার রকমের আজাব। ১. তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে, ২. দাউ দাউ করা আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, ৩. গলায় আটকানো-খাদ্য খেতে দেওয়া হবে এবং ৪. এটার অতিরিক্ত আরও কষ্টকর আজাব দেওয়া হবে।

اَنْكَالًا-এর অর্থ : اَنْكَالُ শব্দটি বহুবচন, একবচনে نِكْل অর্থ– শিকল, বেড়ি। ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, اَنْكَال হলো অগ্নি দ্বারা তৈরি শিকলসমূহ।

বড় দুর্বহ বেড়ি পরিয়ে দেওয়ার কারণ : জাহান্নামে বড় ও দুর্বহ বেড়ি পাপী ও অপরাধী লোকদের পায়ে বেঁধে দেওয়া হবে; কিন্তু এটা এ জন্য নয় যে, এরূপ বেড়ি না পরালে তারা পালিয়ে যেতে পারে বলে ভয় করা হবে; বরং এ বেড়ি পরানোর আসল উদ্দেশ্য হলো, এটার দরুন তারা উঠতে ও চলাফেরা করতে পারবে না, এটা শাস্তির বেড়ি, এ শাস্তির উপর শাস্তি, শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এটা পরানো হবে। পালিয়ে যাওয়া হতে বিরত রাখা এটার উদ্দেশ্য নয়। কেননা জাহান্নাম হতে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই।

قَوْلُهُ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ الخ : যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে, সেদিন থেকেই শুরু হবে কাফের মুশরিক ও বে-দীনদের কঠোর শাস্তি। এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া থেকে জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোজখীরা দোজখে পৌছা পর্যন্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, كَثِيْبًا مَّهِيْلًا-এর অর্থ হলো এমন বন্ধুর স্তূপ যে তার কোনো অংশ যদি তুমি উঠিয়ে নাও তবে সাথে সাথে সে স্থলে অন্য একটি অংশ এসে যাবে, তাফসীরকার কালবী (র.)ও এ মতই পোষণ করেছেন।

–[নূরুল কোরআন]

অনুবাদ :

১৫. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ رَسُوْلًا هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْكُمْ مِنَ الْعِصْيَانِ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا وَهُوَ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

১৫. নিশ্চয়ই আমি প্রেরণ করেছি তোমাদের প্রতি, হে মক্কাবাসীগণ, এমন একজন রাসূল তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ যিনি সাক্ষ্য প্রদানকারী তোমাদের উপর, কিয়ামতের দিবসে তোমাদের পক্ষ থেকে যে সকল নাফরমানিমূলক কার্য প্রকাশ পায় সে বিষয়ে যেরূপ আমি প্রেরণ করেছি, ফিরআউনের নিকট একজন রাসূল। তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আ.)।

১৬. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْلًا شَدِيْدًا.

১৬. অতঃপর যখন অবমাননা করেছিল ফিরআউন উক্ত রাসূলকে তখন আমি (ফলে) তাকে পাকড়াও করেছিলাম খুব কঠোরভাবে সুকঠিনভাবে।

১৭. فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ فِي الدُّنْيَا يَوْمًا مَفْعُوْلُ تَتَّقُوْنَ أَيْ عَذَابَهُ أَيْ بِأَيِّ حِصْنٍ تَتَحَصَّنُوْنَ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا جَمْعُ أَشْيَبَ لِشِدَّةِ هَوْلِهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ وَالْأَصْلُ فِيْ شِيْنِ شِيْبًا الضَّمُّ وَكُسِرَتْ لِمُجَانَسَةِ الْيَاءِ وَيُقَالُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ يَوْمٌ يُشَيِّبُ نَوَاصِيَ الْأَطْفَالِ وَهُوَ مَجَازٌ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ الْحَقِيْقَةَ.

১৭. অতএব, কেমন করে তোমরা আত্মরক্ষা করবে যদি কুফরি কর, দুনিয়াতে, সেই দিবসে يَوْمًا টি تَتَّقُوْنَ -এর مَفْعُوْل অর্থাৎ তাঁর শাস্তি হতে, অর্থাৎ কোন কিল্লায় তোমরা আশ্রয় গ্রহণ করবে সেদিনের আজাব হতে? যেদিন বানিয়ে দিবে বালকদেরকে বৃদ্ধ। شَيْب টি أَشْيَبْ-এর বহুবচন, দিনের ভয়াবহতার দরুন আর তা হলো কিয়ামতের দিন। আর شَيْبًا -এর شِيْن -এ ضَمَّةْ হওয়া বিধেয় ছিল, يَاءْ -এর সম্পর্কের দরুন তাতে كَسْرَةْ দেওয়া হয়েছে। আর কোনো কঠিন দিন সম্পর্কে বলা হয়। তা বালকদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে ছাড়বে, এটা مَجَازْ হিসেবে। আর আয়াতের حَقِيْقِيْ অর্থও উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে।

১৮. اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ ذَاتُ انْفِطَارٍ أَيْ انْشِقَاقٍ بِهِ ط بِذٰلِكَ الْيَوْمِ لِشِدَّتِهِ كَانَ وَعْدُهُ تَعَالَى بِمَجِيْءِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَفْعُوْلًا أَيْ هُوَ كَائِنٌ لَا مُحَالَةَ.

১৮. আসমান ফেটে যাবে যেদিন ফাটলযুক্ত টুকরা টুকরা হওয়ার অবস্থা সেদিনটির ভয়াবহতার কারণে নিঃসন্দেহে তাঁর ওয়াদা সেদিনের আগমন সম্পর্কে আল্লাহর অঙ্গীকার, প্রতিপালিত হবে। অর্থাৎ তা কার্যে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

১৯. إِنَّ هٰذِهِ الْآيَاتِ الْمُخَوِّفَةَ تَذْكِرَةٌ ج عِظَةٌ لِلْخَلْقِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ سَبِيْلًا طَرِيْقًا بِالْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ.

১৯. নিঃসন্দেহে এটা ভয় প্রদর্শনকারী আয়াতসমূহ উপদেশবাণী স্বরূপ। মাখলুকাতের জন্য নসিহত। অতএব, যার ইচ্ছা হয়! সে অবলম্বন করুক তার প্রভুর পন্থা। ঈমান ও আনুগত্যের পথ গ্রহণ করুক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالَى "يَوْمًا" : يَوْمًا শব্দটি তারকীবে تَتَّقُوْنَ-এর مَفْعُوْل بِهٖ হয়েছে। ইবনুল আনবারী বলেছেন, কেউ কেউ يَوْمًا-কে كَفَرْتُمْ-এর مَفْعُوْل بِهٖ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে বলে দাবি করেছেন। আল্লামা শাওকানী এটাকে জঘন্য বলে মনে করেছেন, কারণ তখন অর্থ হবে "কিভাবে তোমরা আল্লাহর আজাব হতে বাঁচবে যদি সেদিন কুফরি কর যেদিন তরুণরা ভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে।" আর এটা অসম্ভব। কারণ কিয়ামত দিবসে কেউ কুফরি করতে সাহস করবে না।

اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرَةٌ না বলে مُنْفَطِرٌ বলার কারণ : আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী اَلسَّمَاءُ শব্দটি مُؤَنَّثٌ সুতরাং তার خَبَرٌ ও مُؤَنَّثٌ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়েছে مُذَكَّرٌ এর কারণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা রয়েছে– ১. এখানে اَلسَّمَاءُ-কে شَيْئٌ-এর স্থানে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কারণ তখন দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়ার পর আসমান আর আসমান থাকবে না شَيْئٌ-এ পরিণত হবে। ২. আবূ আমর ইবনে আলা বলেন, اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرَةٌ বলা হয়নি এ কারণে যে, তার مَجَازٌ হলো سَقْفٌ ৩. ফাররা বলেছেন, اَلسَّمَاءُ শব্দটি اِسْمُ جِنْسٍ সুতরাং مُذَكَّرٌ এবং مُؤَنَّثٌ উভয়ই হতে পারে। ৪. আবূ আলী আল-কারেসী বলেছেন, এটা اِمْرَاَةٌ مُرْضِعٌ-এর মতো। অর্থাৎ এখানে ذَاتٌ একটি مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। সুতরাং تَقْدِيْرٌ হলো اَلسَّمَاءُ ذَاتُ مُنْفَطِرٍ। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাথে কাফিরদের নাফরমানী এবং নাফরমানির সাজা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। অত্র আয়াতসমূহে মক্কাবাসী তথা জগৎবাসীদেরকে তাদের নাফরমানি হতে ফিরানোর জন্য ফিরআউনের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে শতর্ক করা হচ্ছে।

ফেরাউন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর উদাহরণ দানের কারণ : আল্লাহ তা'আলা এ উদাহরণ দ্বারা মক্কার কাফেরগণকে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা যদি সত্য পথের আশ্রয় গ্রহণ না কর এবং আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাক তবে তোমাদের এ পার্থিব জীবনে চরম দুর্দশায় নিপতিত হতে হবে এবং পরকালে থাকবে তোমাদের জন্য চরম শাস্তি। তোমাদের আমার শাস্তি হতে পালাবার কোনোই উপায় থাকবে না। –[আবূ দাউদ]

বিশেষত হযরত মূসা (আ.) এবং ফেরাউনের উল্লেখ করার কারণ : আল্লামা খাযেন বলেছেন, অন্যান্য নবী-রাসূল এবং উম্মতের উদাহরণ বাদ দিয়ে বিশেষ হযরত মূসা (আ.) এবং ফেরাউনকে ইতিহাসের পাতা হতে টেনে আনার কারণ হলো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে মক্কাবাসীগণ কষ্ট দিয়েছে এবং এ কারণে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা করেছিল যে, তিনি তাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছিলেন। ঠিক তেমনি হযরত মূসা (আ.)-কেও ফেরাউন অবজ্ঞা করেছিল এ কারণে যে, তিনি তার বাড়িতে লালিতপালিত হয়েছিলেন। –[খাযেন]

আল্লাহ তা'আলা এখানে ফিরআউনকে শাস্তিদান করা এবং তার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-ঐশ্বর্য যে তাকে আল্লাহর আজাব হতে বাঁচাতে পারেনি এ কথা বলার পর আবার মক্কার কাফেরদেরকে সম্বোধন করে পরকালের কথা এবং পরকালের শাস্তির আলোচনা করে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, ফিরআউন যেমন আল্লাহর আজাব হতে বাঁচতে পারেনি ঠিক তেমনি তোমরাও বাঁচতে পারবে না, যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত এবং তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার কর। এ প্রসঙ্গ আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَالَ تَعَالٰى : فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا.

"সুতরাং তোমরা যদি সেদিনকে অস্বীকার কর তবে তোমরা কিভাবে শাস্তি হতে বাঁচবে, যেদিনের ভয়াবহতা তরুণকে বৃদ্ধে পরিণত করবে।" –[সাফওয়া]

অর্থাৎ তোমাদের মনে এ ভয় জাগ্রত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, তোমরা যদি আমার পাঠানো রাসূলকে অমান্য ও অগ্রাহ্য কর, তাহলে ফিরআউন অনুরূপ অপরাধের ফলে যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল তোমাদেরকেও এ দুনিয়ায় অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে; কিন্তু মনে কর দুনিয়ায় তোমাদের উপর আজাব আসল না, তাহলে তোমরা বেঁচে গেলে ভাবছ নাকি? না, তা মনে করতে

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পার না। কেননা দুনিয়ায় এ আজাব না আসলেও কিয়ামতের দিন এ আজাব ভোগ করতে তোমরা অবশ্যই বাধ্য হবে। তাহলে কিয়ামতের সে আজাব হতে তোমরা বেঁচে যাবে এমন কথা কি করে মনে করতে পার?

قَوْلُهُ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا : এটার তাৎপর্য বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। জালালাইন গ্রন্থকারের মতে এটার مَعْنٰى حَقِيْقِيْ ও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ সত্যই বালক বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যাবে, বালক বালক অবস্থায় হাশর ময়দানে উঠবে না, তবে এ কথা দ্বারা পূর্ণবৃদ্ধ বয়স হওয়া আবশ্যক নয়; বরং বৃদ্ধ বয়সের ধাপে পৌঁছার অর্থও হতে পারে।

কারণ, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো বৃদ্ধ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ বালকের ন্যায় হয়ে বেহেশ্‌তে যাবে।

অথবা, এটা দ্বারা কিয়ামতের দিনের ভয়বাবহতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বালকগণও সেদিনের ভয়বাহ দুরবস্থা ও কঠিনতা সহ্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত শক্তিহারা হয়ে বৃদ্ধদের অবস্থায় পৌঁছে যাবে।

আল্লামা তাবারানী (র.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম ﷺ একদিন উক্ত আয়াত يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا তেলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন, এটা কিয়ামতের দিন হবে, যখন হযরত আদম (আ.) বলবেন, কত থেকে কত সংখ্যাকে দোজখে নিতে হবে? তখন আল্লাহ বলবেন, প্রতি এক হাজার হতে ৯৯৯ জনকে দোজখে নিবেন। এ কথা শুনে প্রত্যেক বালক কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধদের মতো হয়ে যাবে। –[তাবারী, ইবনে কাছীর, সাফওয়া]

আল্লামা যামাখশারী বলেছেন, এটার তাৎপর্য হলো কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্যের বর্ণনা দান। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এমন দীর্ঘ হবে যে, দীর্ঘতার ফলে তরুণরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে। –[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالسَّمَاءُ ..... وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا : "এবং যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর তাঁর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।" অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এতই ভয়াবহ ও কঠোর হবে যে, এ বিরাট আসমানও ভয়াবহতার দরুন দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। এ দিনের আগমন সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা খেলাফ করেন না। মুকাতিল বলেছেন, দীন ইসলাম বিজয়ী হওয়া সম্বন্ধীয় আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا : অর্থাৎ উপরোল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে উপদেশ বাণী স্বরূপ অর্থাৎ আল্লাহর আজাবের ভয়াবহতা বর্ণনার আয়াতগুলোর সাথে বাণী স্বরূপ। অতএব, যে চায় সে যেন ওয়াজ হিসেবে এটা গ্রহণ করে নেয়। আর তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়-ভীতি অন্তরে স্থান দিয়ে যেন আল্লাহর পথে উপনীত হয়। এটাই হবে মানবিক দায়িত্ব। এটা দ্বারা ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি আগ্রহী করা হয়েছে।

এটার অর্থ হলো, যে ব্যক্তি নাজাত কামনা করে সে যেন আল্লাহর পথ অনুসরণ করে।

قَوْلُهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا : দ্বারা প্রকাশ্যত বুঝা যায় যে, ঈমান গ্রহণ করা না করা বান্দার এখতিয়ারে দেওয়া হয়েছে এবং ঈমানের আবশ্যকতাও প্রকাশ পায় না।

এটার উত্তরে বলবো, এখানে যদিও প্রকাশ্যভাবে ঈমানের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বুঝা যায় না। এ ধারণা করা ঠিক হবে না। বরং আয়াতটিতে ঈমানের প্রতি কঠোরভাবে তাকিদ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতটি বুঝতে হলে সাধারণ ব্যবহারী একটি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই হয় যেমন কেউ কারো প্রতি রাগ হলে বলে যদি তুমি ভালো মনে কর তবে আমার সঙ্গেই এ পথে চল। নতুবা তোমার কোনো ক্ষতি হলে আমি জানি না। তদ্রূপ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ও তেমনি অর্থাৎ যারা বাঁচতে চাও তারা যেন সত্যের পথের পথিক হয়, অন্যথায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার সম্পর্কে আর আল্লাহ কিছু জানেন না। অপ্রকাশ্যভাবে যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ হতে দূরে রয়েছে তাদেরকে ধমক দেওয়া হচ্ছে এ নির্দেশের ব্যতিক্রমকারীদের পরকাল বেশি শুভ হবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٠. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى اَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلٰى ثُلُثَيْ وَبِالنَّصَبِ عَطْفٌ عَلٰى اَدْنٰى وَقِيَامُهٗ كَذٰلِكَ نَحْوُ مَا اُمِرَ بِهٖ اَوَّلَ السُّوْرَةِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ط عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ تَقُوْمُ وَجَازَ مِنْ غَيْرِ تَاكِيْدٍ لِلْفَصْلِ وَقِيَامُ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ كَذٰلِكَ لِلتَّاَسِّيْ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ لَايَدْرِيْ كَمْ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ وَكَمْ بَقِيَ مِنْهُ فَكَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ كُلَّهٗ اِحْتِيَاطًا فَقَامُوْا حَتّٰى انْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ سَنَةً اَوْ اَكْثَرَ فَخَفَّفَ عَنْهُمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ يُحْصِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط عَلِمَ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَيْ اَنَّهٗ لَنْ تُحْصُوْهُ اَيِ اللَّيْلَ لِتَقُوْمُوْا فِيْمَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِيْهِ اِلَّا بِقِيَامِ جَمِيْعِهٖ وَذٰلِكَ يَشُقُّ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ رَجَعَ بِكُمْ اِلَى التَّخْفِيْفِ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط فِي الصَّلَاةِ بِاَنْ تُصَلُّوْا مَا تَيَسَّرَ .

অনুবাদ :

২০. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো সামান্য কম প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, আর কখনো অর্ধ রাত্রি এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি نِصْفَهٗ ও ثُلُثَهٗ শব্দ দু'টি ثُلُثَيْ-এর প্রতি আতফ হিসেবে পঠিত হলে যের যোগে এবং اَدْنٰى -এর প্রতি আতফ হিসেবে পঠিত হলে পেশ যোগে পঠিত হবে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রি জগারণও সূরার প্রারম্ভে কৃত আদেশ অনুযায়ী ছিল। আর তোমার সঙ্গীগণ মধ্য হতো একদল এটা تَقُوْمُ ক্রিয়ার ضَمِيْر-এর প্রতি আতফ আর مَعْطُوْف عَلَيْهِ ও ضَمِيْر -এর মধ্যে ব্যবধান থাকার কারণে مَعْطُوْف مُتَّصِل-এর تَاكِيْد আনয়ন ছাড়াও এরূপ করা জায়েজ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতেও একদল অনুরূপ রাত্রি জাগরণ করত; কিন্তু কোনো কোনো সাহাবী এটা অনুমান করতে পারত না যে, রাত্রির কি পরিমাণ সময় নামাজ পড়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ রাত্রি অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে তারা সতর্কতার স্বার্থে সারা রাত্রি জাগরণ করত। যদ্দরুন তাদের পায়ে পানি জমা হয়ে ফুলে যেত। এক বৎসর বা ততোধিক সময় পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। অতঃপর রাত্রি জাগরণের বিধানটিকে সহজ করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– আল্লাহ নির্ধারিত করেন পরিমাণ নির্ণয় করেন রাত্রি ও দিনের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, اَنْ অব্যয়টি اَنَّ ثَقِيْلَةٌ হতে مُخَفَّفَةٌ অর্থাৎ মূলত শব্দটি اَنَّهٗ ছিল। তোমরা তার পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে না অর্থাৎ রাত্রির, যাতে তোমরা ওয়াজিব পরিমাণ সময় জাগরণ করতে পার, কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণ করা ব্যতীত তোমরা এটা করতে পার না। অথচ এটা তোমাদের জন্য কষ্টকর। সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি মনসংযোগ করেছেন তোমাদের প্রতি সহজীকরণে মনোনিবেশ করেছেন। কাজেই তোমাদের জন্য যতটুকু সহজসাধ্য, কুরআনের ততটুকু আবৃত্তি করো। নামাজের মধ্যে। এভাবে যে, তোমরা সহজসাধ্য পরিমাণ আবৃত্তি করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ : জমহুর نِصْفَهُ-কে ثُلُثَيِ اللَّيْلِ আর ثُلُثَهُ-কে نِصْفَهُ-এর উপর عَطْف করে جَرْ দিয়ে نِصْفِهِ وَثُلُثِهِ পড়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই-তৃতীয়াংশের কম এবং অর্ধেকের কম ও এক-তৃতীয়াংশের কম রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবূ ওবাইদ, আবূ হাতিম এ কেরাতকেই পছন্দ করেছেন। ইবনে কাছীর এবং কূফীগণ نِصْفَهُ-কে أَدْنٰى-এর উপর عَطْف করে আর ثُلُثَهُ-কে نِصْفَهُ-এর উপর عَطْف করে نَصَبْ দিয়ে نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ পড়েছেন। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই-তৃতীয়াংশের কম এবং অর্ধ রাত্রি ও এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইসলামের প্রথম অবস্থায় মুসলমানদের উপর রাত্রির ইবাদত করা অর্থাৎ রাত্রির বেলায় নামাজ আদায় করা ফরজ ছিল, সে যুগে বর্তমান যুগের ন্যায় যেহেতু ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না এ কারণেই রাত্রের বেলায় সময়ের তারতম্য করা মুশকিল হয়ে যেত। অনেকেই রাত্রির আরাম-আয়েশ ইত্যাদি ত্যাগ করতে বাধ্য হলো, সারা রাত্র আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। কিছুকাল পর এমন কঠিন ইবাদতের কারণে শারীরিক বিভিন্ন রোগ দেখা দিল, পা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল, পা ফুলে গেল, এভাবে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহর রহমত তাদের উপর ঘনিয়ে আসল এবং إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْمُ أَدْنٰى مِنْ الخ আয়াত নাজিল হলো। আর হুকুম হলো যে, এখন আর নামাজে তাহাজ্জুদ ফরজ নয় যার ইচ্ছা সে পড়ুক, আর যার ইচ্ছা না হয় না পড়ুক।

قَوْلُهُ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ .... مَعَكَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "তোমার রব জানেন যে, তুমি কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় আর কখনো অর্ধেক রাত্র এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাক। আর তোমার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যেও কিছু লোক এ কাজ করে।" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ﷺ তোমার রব জানেন যে, তুমি তোমার সাথীদেরকে নিয়ে তাহাজ্জুদের জন্য রাত্রির দুই-তৃতীয়াংশের কম, কখনও অর্ধেক আবার কখনো এক-তৃতীয়াংশ সময় দাঁড়িয়ে থাক। এ আয়াত হতে স্বতই জানা গেল যে, রাসূলের সাহাবীগণ তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। এটা কি ফরজ হিসেবে আদায় করতেন না নফল হিসেবে আদায় করতেন তা আয়াতের এ অংশে জানা না গেলেও পরের অংশের বর্ণনা-ভঙ্গি হতে মনে হয় যে, এটা তাঁদের উপরও ওয়াজিব বা ফরজ ছিল। পরের অংশে এক জায়গায় বলা হয়েছে- আল্লাহ জানেন যে, এ কিয়ামুল লাইল তোমাদের কোনো কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব হবে না রোগের কারণে বা সফরের কারণে বা জিহাদের কারণে, তাই আল্লাহ তা'আলা এটাকে তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। নফল হলে সহজ করার প্রয়োজন কি ছিল? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা হতে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, কিয়ামুল লাইল রাসূলের সাহাবীদের উপর ওয়াজিব ছিল, অতঃপর নফল করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য নবী করীম ﷺ-এর উপর এখনও ফরজ রয়ে গেছে। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَلِمَ أَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ : বিভিন্ন তাফসীরকার কর্তৃক এ অংশের দু'টি তাফসীর করা হয়েছে-

১. তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের পরিমাণ যথাযথভাবে গুনে রাখতে পারবে না। এ হেতু তিনি তোমাদের কল্পে অনুগ্রহ করেছেন।

২. আল্লামা তাবারী ও ইবনে জারীর (রা.) এ অংশের তাফসীর এই বলেন- তোমাদের প্রভু জানেন যে, তোমাদের পক্ষে পুরা রাত্রি ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, এ কারণে তাখফীফ করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

মূলকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামগণের অশেষ কষ্ট দেখে কিয়ামুল লাইল-এর ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ فَرْضِيَّتْ-এর পর্যায়কে হালকা করে نَفْلِيَّتْ-এর পর্যায়ে রূপায়িত করে দিয়েছেন। আর জালালাইন গ্রন্থকার فَخَفَّفَ عَنْهُمْ একটি শব্দ উল্লেখ করেছেন, এটা দ্বারা তাহাজ্জুদের فَرْضِيَّتْ-এর হুকুমকে শিথিলতা করার প্রতি ইঙ্গিত বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহাজ্জুদ-এর হুকুম প্রদানের হেকমত : আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামগণের উপর তাহাজ্জুদ বা রাত্রির ইবাদত করার উদ্দেশ্য হলো, দিবা-রাত্রির কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার মাধ্যমে তারা যেন আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আর তিনি قِيَامُ اللَّيْلِ-এর মেহনত সহ্য করে কুরআনের ভার বহন করতে যেন সক্ষম হয়ে উঠেন, যা قِيَامُ اللَّيْلِ-এর তুলনায় বহুগুণ কষ্ট সহ্যের ব্যাপার হবে।

মূলকথা হলো, عِلْمِ اَزَلِىْ অনুসারে মুহাম্মদ ﷺ -কে রিসালাতের জন্য উপযোগী করার উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাওয়ার পর قِيَامُ اللَّيْلِ-এর হুকুম مَنْسُوْخ করে দেওয়া হয়েছে এবং এটার فَرْضِيَّتْ তখন نَفْلِيَّتْ-এর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ : আয়াতাংশের শাব্দিক অনুবাদ হলো 'যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার ততটাই পড়তে থাক।' এটার তাৎপর্য এই যে, যতটুকু তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয় কেবল ততটুকুই আদায় কর। এখানে কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা নামাজ বুঝানো হয়েছে। এ কারণে যে, নামাজের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকে কুরআন তেলাওয়াত।

আয়াতটি নামাজে কেরাত ফরজ হওয়ার দলিল : এ আয়াতটি হতে আরো একটি কথা জানতে পারা যায়, তা হলো, সালাতে যেভাবে রুকু'-সিজদা ফরজ, কুরআনের আয়াত পাঠ করাও অনুরূপ ফরজ। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেভাবে অন্যান্য স্থানে রুকু ও সিজদার কথা-বলে সালাত বুঝেয়েছেন আলোচ্য আয়াতেও অনুরূপভাবে কুরআন পাঠের কথা বলা হয়েছে। আর তা বলে সালাতে কুরআন পাঠ করাই বুঝিয়েছেন।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ আয়াতটির আর এক অর্থ হলো "নামাজে কুরআনের যে অংশ বা যে সূরা তোমাদের জন্য সহজতর হয় তা পড়ো।" অর্থাৎ নামাজের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট নেই বরং কুআনের যে কোনো জায়গা হতে এতটুকু পড়লেই হবে যতটুকুকে কেরাত বলা চলে।

ইমামগণের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতান্তর নেই যে, নামাজে কেরাত পড়া ফরজ, অতঃপর তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে যে, এ ফরজ কি পবিত্র কুরআনের যে কোনো জায়গা হতে পড়লেই আদায় হয়ে যাবে? না ফরজিয়াত আদায় করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সূরা পড়তে হবে?

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী (র.)-এর মতে, যে কোনো জায়গা হতে পড়লে ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। কোনো সূরা এটার জন্য নির্দিষ্ট করে পড়তে হবে না, কারণ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ আয়াতটিতে মুতলাক বা শর্তহীনভাবে কেরাত পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটার সাথে সূরা আল-ফাতিহা পড়াকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দেওয়া যায় না। কারণ এটা করা হলে পবিত্র কুরআনের উপর হাদীস দ্বারা অতিরিক্তকরণ লাযিম হবে, যা না-জায়েজ।

অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়তে হবে। এটা না পড়লে নামাজের ফরযিয়াতই আদায় হবে না। এরা আরো বলেছেন– আয়াতটি মুতলাক বা শর্তহীন হলেও সহীহ হাদীস দ্বারা এটাকে মুকাইয়াদ বা শর্ত সাপেক্ষ করতে হবে। এটার জবাবে হানাফীদের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, কুরআন এবং হাদীসকে যথাস্থানে রাখতে হলে কুরআন দ্বারা যা প্রমাণিত তাকে ফরজ আর হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত তাকে ওয়াজিব বলতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হানাফী ইমামগণ কুরআনের যে কোনো স্থান হতে কেরাত পড়াকে ফরজ আর সূরা আল-ফাতিহাকে নির্দিষ্ট করে পড়া ওয়াজিব বলেছেন। –[আহকামুল কুরআন, আজ্জায়েছ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٠. عَلِمَ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ اَىْ اَنَّهُ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى لا وَاٰخَرُوْنَ
يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يُسَافِرُوْنَ يَبْتَغُوْنَ
مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ يَطْلُبُوْنَ مِنْ رِزْقِهِ
بِالتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ز وَكُلٌّ مِنَ الْفِرَقِ الثَّلَاثِ
يَشُقُّ عَلَيْهِمْ مَا ذُكِرَ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ
فَخَفَّفَ عَنْهُمْ بِقِيَامِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ثُمَّ
نُسِخَ ذٰلِكَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَاقْرَءُوْا
مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ لا كَمَا تَقَدَّمَ وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا
اللّٰهَ بِاَنْ تُنْفِقُوْا مَا سِوَى الْمَفْرُوْضِ مِنَ
الْمَالِ فِىْ سَبِيْلِ الْخَيْرِ قَرْضًا حَسَنًا
عَنْ طِيْبِ قَلْبٍ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ
مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا مِمَّا
خَلَفْتُمْ وَهُوَ فَصْلٌ وَمَا بَعْدَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ
مَعْرِفَةً يُشْبِهُهَا لِاِمْتِنَاعِهِ مِنَ التَّعْرِيْفِ
وَاَعْظَمَ اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ
اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

২০. তিনি অবগত আছেন যে, اَنْ টি এখানে مُثَقَّلَهْ হতে مُخَفَّفَهْ অর্থাৎ اَنَّهُ অচিরেই হবেন তোমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ অসুস্থ আর বাকি কেউ কেউ ছড়িয়ে পড়বেন দেশ বিদেশে ভ্রমণ করবেন, অন্বেষণে আল্লাহর ফজল ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া রিজিক অর্জনে, আর কেউ কেউ যুদ্ধ জিহাদে লিপ্ত হবেন আল্লাহর পথে, উপরিউক্ত তিন দলের লোকগণের উপরই উল্লিখিত রাত্রি জাগরণ অত্যন্ত কষ্টকর হবে। এ জন্য সহজতার ভিত্তিতে রাত্রি জাগরণের হুকুম প্রদান করেছেন। অতঃপর তাকে পাঞ্জেগানা নামাজের হুকুম দ্বারা মানসূখ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আপনারা পড়ুন সহজসাধ্য পরিমাণ তা হতে যেমন স্বল্প পূর্বে আলোচনা হয়েছে। আর প্রতিষ্ঠা করুন নামাজ যা নির্ধারিত করা হয়েছে। আর প্রদান করুন জাকাত এবং কর্জ প্রদান করুন আল্লাহকে, অর্থাৎ زَكٰوة مَفْرُوْضَهْ ব্যতীত তোমাদের সম্পদ হতে কিছু কিছু সৎপথে ব্যয় কর উত্তমরূপে। সন্তুষ্টচিত্তে, আর যে নেককার্য প্রেরণ করবেন পূর্বাহ্নে, নিজেদের জন্য, পাবেন তাকে আল্লাহর সমীপে পৌঁছে তাকে সর্বোৎকৃষ্টতমভাবে তা হতে যে সমস্ত সম্পদ তোমরা ছেড়ে গেছে (هُوَ) টি ضَمِيْر فَصْل আর তার পরবর্তী বাক্যাংশ যদিও مَعْرِفَهْ হতে নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন তা مَعْرِفَهْ হয়নি তথাপিও তা مَعْرِفَهْ -এর অনুরূপ হয়েছে। আর শ্রেষ্ঠতম বিনিময়রূপে লাভ করবেন। আর ক্ষমা প্রার্থনা করুন আল্লাহর দরবারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড়োই ক্ষমাশীল এবং বড়োই দয়ালু। ঈমানদারগণের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ خَيْرًا : خَيْرًا শব্দটি تجدوه-এর مَفْعُوْل ثَانِىْ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। তখন ضَمِيْر হলো هُوَ . ضَمِيْر فَصْل জমহুর خَيْرًا-কে مَنْصُوْب করে পড়েছেন, আবূ সাম্মাক, ইবনে সুমাইফ هُوَ-কে مُبْتَدَأ হিসেবে এবং خَيْر-কে خَبَر হিসেবে رَفْع দিয়ে পড়েছেন, তখন هُوَ خَيْرٌ বাক্যটি مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে تَجِدُوْهُ-এর مَفْعُوْل ثَانِىْ হিসেবে।

-[ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কোরআন, ছাওয়েছ]

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ "اَعْظَمَ اَجْرًا" : জমহুর اَعْظَمَ -কে- خَيْرًا -এর উপর عَطْف করে مَنْصُوْب পড়েছেন। আবূ সাম্মাক ইবনে সুমাইফ اَعْظَمُ রَفْع দিয়ে اَعْظَمُ পড়েছেন। তারা যেমনি خَيْرٌ -কে- رَفْع দিয়ে পড়েছেন। আর اَجْرًا -কে- تَمْيِيْز হিসেবে مَنْصُوْب পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ ... مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক রোগী হতে পারে, আর কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে বিদেশ যাত্রা করে, কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। কাজেই কুরআনের যা খুব সহজেই পড়া যায় তাই পড়ে নাও।"

এটার তাফসীরে আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস্ছাবুনী বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ মানসূখ হওয়ার কারণ হিকমত, পূর্বে عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوْهُ -তে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে তা সবিস্তারে বলা হয়েছে। তাহাজ্জুদের নামাজের ফরযিয়াত রহিত হওয়ার কারণ হলো কষ্ট দূরীকরণ। আল্লাহ তা'আলা এখানে এমন তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন যে তিনটিই সহজকরণ কামনা করে, কারণ এ তিনটি কারণের কোনো একটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কিয়ামুল লাইল অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। এক. রুগ্নতা, দুই. সফর, তিন. জিহাদে থাকা। রোগ নিয়ে কিয়ামুল-লাইল করা অতি কষ্টসাধ্য। আর সফর এবং জিহাদের সময় মানুষ দিনের বেলা তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে কারণে তার পক্ষে আবার রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের জন্য দীর্ঘক্ষণ ইবাদতে মাশগুল হয়ে থাকা অতি কষ্টকর। তা ছাড়া এভাবে রাত্রিজাগরণ করে ইবাদতে মশগুল থাকলে তাদের পক্ষে যথাযথভাবে দিনের বেলায় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। যা হবে মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং কষ্ট লাঘবের জন্য তাহাজ্জুদের নামাজের ফরযিয়াতকে রহিত করা হলো, فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ কথাটি আবার বলার উদ্দেশ্য হলো সহজকরণের প্রতি তাকিদ দান। -[কাবীর, সাফওয়া, আহকামুল কোরআন]

فَاقْرَءُوْا الخ -এর- تَكْرَارٌ নেওয়ার কারণ : উক্ত সূরায় فَاقْرَءُوْا الخ আয়াতকে বারবার বলার কারণ তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকারের মতে تَاكِيْد -এর উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের فَرْضِيَّتْ যদিও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তথাপিও তা পড়ার জন্য বারবার তাগিদ করা হয়েছে। কারণ তাহাজ্জুদ গুজারদের প্রসঙ্গে কুরআনের বহু স্থানে প্রশংসা করা হয়েছে। কখনও তাদেরকে اَهْلُ تَقْوٰى বলা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ .... وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاقْرَءُوْا الخ আয়াতে যে اَمْرٌ রয়েছে তাতে যদি فَاقْرَءُوْا অর্থ صَلُّوْا (নামাজ পড়) নেওয়া হয়, তখন اَمْر টি وُجُوْب -এর জন্য মানতে হবে। তখন হুযূর ﷺ -এর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে কারণ তাঁর জন্য তাহাজ্জুদ ওয়াজিব-এর পর্যায়ে ছিল। আর যদি فَاقْرَءُوْا অর্থ (তেলাওয়াতে কুরআন) নেওয়া হয়, তখন اَمْر টি نَدْبٌ ইত্যাদির জন্য হবে। কারণ সে সময় তেলাওয়াতে কুরআন ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ : "সালাত কায়েম করো আর জাকাত দাও।" অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ভালো করে আদায় করো এবং ফরজ জাকাত প্রাপকদের হাতে পৌঁছো দাও। তাফসীরকারগণ বলেছেন, কুরআনে সালাতের আলোচনার সাথে সাথে প্রায় জাকাতের আলোচনা করা হয়, কারণ নামাজ হলো আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে ভিত। আর জাকাত হলো দাতা এবং গ্রহীতা মুসলিম ভাইদের মধ্যে ভিত। সালাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদত, আর জাকাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মালী ইবাদত। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى : وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا : وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম কর্জ দিতে থাকো।" এটার তাৎপর্য হলো, গরিব, ফকির, মিসকিনদেরকে যাকাত ছাড়া অন্যান্য নফল সদকা দিয়ে ফকির-মিসকিনদেরকে দানকরণকে আল্লাহ তা'আলাকে কর্জদান বলা হয়েছে, এ কথা বুঝাবার জন্য যে, এ দানের ছওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে, এতে কোনো রকমের হেরফের হবে না। যেমন কোনো বিশ্বস্ত ভালো লোককে কর্জ দিলে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে- তেমনি ফকির-মিসকিনদেরকে দান করলেও তার ছওয়াব আল্লাহর কাছে অবশ্যই পাওয়া যাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর দ্বারা জাকাত ব্যতীত অন্যান্য-খয়রাত উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয় করা।

অথবা, এর অর্থ হলো– তোমরা ভালোভাবে জাকাত আদায় করো।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, قَرْضًا শব্দের পর حَسَنًا শব্দ সংযোজন করে দান-খয়রাতের ছওয়াবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

কোনো কোনো মুফাসসির এটার তাফসীরে বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলাকে উত্তম কর্জ দিতে থাকো।" এ কথাটির অর্থ হলো, তোমাদের উপর ফরজকৃত জাকাত উত্তমভাবে আদায় করো। অর্থাৎ তোমাদের উত্তম হালাল মাল হতে ফকির-মিসকিনদেরকে সহীহ খালেস নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিতে থাকো। এ অর্থ গ্রহণ করলে বলতে হবে "এবং জাকাত দাও" এ কথাটির পর "আল্লাহ তা'আলাকে কর্জে হাসানা দিতে থাক" এটা বলে আবার ফরজ জাকাত আদায় করার কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, যাকাত আদায়করণের প্রতি উৎসাহ দান। কারণ এ দান যেন আল্লাহকেই কর্জ দান, যা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা একশত ভাগ সত্য। –[আহকামুল কোরআন, ছায়েছ]

قَوْلُهُ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ (الاية) : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামি দৃষ্টিতে যা কিছু কল্যাণকর ও উপকারী যারা তা করবে তা পরকালে বিরাট পুরস্কাররূপে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানে خَيْرٌ শব্দ দ্বারা কোনো কোনো লোক ধন-সম্পদ দানের কথা প্রকাশ করলেও মূলত তা দ্বারা শরিয়তের দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার ভালো ও উত্তম কাজ বুঝানো হয়েছে, তা যে প্রকার কাজই হোক না কেন। সুতরাং আয়াতের মর্ম হলো– তোমরা পরকালের কল্যাণ ও উপকারার্থে যা কিছু অগ্রিম পাঠিয়েছ তা এ দুনিয়ায় রেখে যাওয়া সম্পদের তুলনায় অধিকতর কল্যাণকর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন– তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে রয়েছে যার নিকট নিজের ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তরাধিকাররের ধন-মাল অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নিজের ধন-সম্পদের তুলনায় উত্তরাধিকারীদের ধন-সম্পদ প্রিয়বস্তু। নবী করীম ﷺ বললেন, খুব চিন্তা-ভাবনা করে বলো। লোকগণ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সত্য কথাই বলছি। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদ হলো তা যা তোমার পারকালের জন্য পাঠিয়েছে। আর উত্তরাধিকারের জন্য যা রেখে দিয়েছ তা হলো তাদের সম্পদ।
–[বুখারী, নাসায়ী, তিরমিযী]

এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, উপরিউক্ত আয়াতে পরকালের উদ্দেশ্যে যা কিছু করা হয় ও বলা হয় তারই বিনিময় আল্লাহ তা'আলা বিরাট পুরস্কাররূপে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। –[আহকামুল কোরআন, ছায়েছ]

তাহাজ্জুদের فَرْضِيَّتْ রহিত করার মধ্যে হেকমত : এটার হিকমত হলো– যেহেতু তখনকার মুসলমানগণকে দিবারাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হতো, আবার কেউ কেউ সফররত থাকত। আবার তাহাজ্জুদ গুজারের দরুন কেউ কেউ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল, এমতাবস্থা তাহাজ্জুদ আদায় করা ও রাত্র জারগণ খুবই কষ্টকর। সুতরাং এ কষ্ট দূরীভূত করার জন্য তাহাজ্জুদ বাতিল করা হলো।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতগণকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন– তোমাদের জন্য ইসলামে কোনো কঠিন্যতা নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ .... رَحِيْمٌ : মূলত মানুষ শত চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয় না। কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। এ জন্য ইবাদতের পর তওবা-ইস্তিগফার করা অবশ্যই কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত এতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি মানুষ যেন তার নেক আমলের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর না করে, বরং নেক আমলের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা মানুষ যত বড় নেক আমলই করুক এবং যত নিখুঁত এবং সুন্দরভাবেই করুক না কেন কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারের শান মোতাবেক হয় না। তাই বান্দার কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং নিজের ত্রুটি স্বীকার করা।

তাফসীরকার মোকাতেল (র.) বলেন, অত্র আয়াতে غَفُوْرٌ শব্দের ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহ মাফ করবেন। আর غَفُوْرٌ -এর পর رَحِيْمٌ শব্দটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে সামান্য আমলেরও অনেক বেশি ছওয়াব দান করবেন। –[কাবীর, ইবনে কাছীর, মাযহারী]

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرُ : সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরাটির প্রথম আয়াতের শব্দ (اَلْمُدَّثِّرُ) হতে সূরাটির নাম দেওয়া হয়েছে। اَلْمُدَّثِّرُ এটা دَثْرٌ থেকে এসেছে। এটার অর্থ হলো কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাগমনকারী। এতে ২টি রুকূ', ৫৬টি আয়াত, ২৫৫টি বাক্য এবং ১০১০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কারণ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত জাবির (রা.) হতে বেশ কয়টি হাদীস এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।
আর اِجْمَاعُ اُمَّتْ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .... مَا لَمْ يَعْلَمْ আয়াতগুলো সর্বপ্রথম মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। [হেরা গুহায়] এবং এটার পর হুযূর ﷺ -এর উপর বহুদিন যাবৎ ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল এবং এটার পর আবার নতুনভাবে যখন ওহী নাজিল হতে আরম্ভ করল, তখন প্রথমেই সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম থেকেই নাজিল হওয়া আরম্ভ করল। [ইমাম যুহরীও এ বর্ণনা প্রদান করেছেন] এটার পর ধারাবাহিকভাবে ওহী নাজিল হতে থাকে। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনে জারীর, সীরাতে ইবনে হিশাম ও আরও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা মতে ৮ম আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো ঐ সময় নাজিল হয়েছিল যখন হুযূর ﷺ সরাসরিভাবে ইসলাম প্রচারের কার্য শুরু করলেন এবং মক্কায় প্রথম হজ্বব্রত পালন করতে আসছিলেন।
فَتْرَةُ الْوَحْيِ : ওহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকার সময়ের কথা উল্লেখ করে স্বয়ং নবী করীম ﷺ বর্ণনা করেছেন, একদা আমি পথ চলতে ছিলাম, হঠাৎ আমি উর্ধ্বলোক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পাই– তখনই উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে ফেরেশ্তাকে যিনি আমার নিকট হেরা গুহায় ওহী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। আসমান-জমিনের মাঝে একটি আসনে উপবেশন করে আছেন। এটা দেখে আমি ভীত হয়ে ঘরে চলে গেলাম এবং আমাকে কাপড় জড়িয়ে দিতে বললাম যে, আমার এ কারণে ভয় লাগছে। চাদরাবৃত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَاَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটিতে মূলত মহানবী ﷺ -এর নবুয়তি জীবনের জন্য পহেলা কর্মসূচি, কিয়ামতের বর্ণনা, কাফের সর্দার ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আলোচনা, কুরাইশগণের ঈমান না আনার কারণ এবং তার ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচিত হয়েছে
সূরার ১ থেকে ৭ আয়াতে নবী করীম ﷺ -এর ইসলামি আন্দোলনের কর্মসূচি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি তৌহিদের পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান হোন এবং তৌহিদের বিপরীত আচরণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করতে থাকুন। আর দুনিয়ায় গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে, আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রভুত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের কথা ঘোষণা করতে থাকুন। তৃতীয়ত আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র-নৈতিকতা এবং সামাজিক পরিবেশের সকল ক্ষেত্রে আপনার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখুন। কাফেরদের প্রতিমাগুলো হতে পূর্ণমাত্রায় দূরে থাকুন এবং কারো কোনোরূপ অনুগ্রহ করলে তা নিঃস্বার্থভাবে করুন। আর এ দাওয়াতি আন্দোলনে আপনার উপর বিরাট বিপদ-আপদ আপতিত হতে পারে এবং পদে পদে দুঃখ-নির্যাতন দেখা দিতে পারে, আপনি এসব কিছু আপনার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করবেন। এতে আদৌ কোনোরূপ ঘাবড়াবেন না।
৮ থেকে ১০ আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়টি হবে কাফেরদের জন্য মহাসংকট কাল; কিন্তু মু'মিন লোকদের পক্ষে কোনো অসুবিধার কারণ হবে না।
১১ থেকে ৩১ আয়াতে কুরাইশ সর্দার মুগীরার আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আমি তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সৃষ্টি করে পার্থিব জীবনে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে সুখী করেছি। সামাজিক জীবনে নেতা ও সর্দার বানিয়েছি কিন্তু আমার কুরআন সত্য শাশ্বতবাণী জেনেও তাকে অন্তরে চাপিয়ে সমাজে স্বীয় প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং মহানবীর নামে বদনাম রটিয়েছে। আমি তাকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করবো এবং জাহান্নামের পাহাড়ের চূড়ায় চড়িয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিবো।
৩২ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত জান্নাতী লোকদের সাথে জাহান্নামী লোকদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, জান্নাতী লোকগণ জাহান্নামীদের কাছে এ শাস্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে আমরা পার্থিব জীবনে নামাজ আদায় করতাম না, অভাবীগণকে খাদ্য দিতাম না এবং ইসলামের বিরোধী গ্রুপের সাথে থাকতাম। আর পরকালকে অবিশ্বাস করতাম। এভাবে আমাদের জীবনটি শেষ হয়েছে। ফলে আমরা এ শাস্তি পাচ্ছি।
৪১ থেকে ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, কাফেরদের হলো কি তারা দীনের দাওয়াত শুনে এভাবে কেন পালাচ্ছে যেভাবে শিকারি হতে জংলী গাধা পালিয়ে থাকে। তারা যতই দাবি করুক না কেন কোনোক্রমেই তাদের দাবি পূরণ করা হবে না। এসব দাবি হলো তাদের বাহানামাত্র। মূলত পরকাল সম্পর্কে মনে কোনোরূপ ভয়ই রাখে না। সুতরাং তারা ঈমান না আনলে তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। কুরআনকে তাদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এটা দেখে যার মনে চায় সে ঈমান আনয়ন করুক। অথবা মন না চাইলে না আনুক। ভালো পথ মন্দ পথ গ্রহণ করা তাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, কাউকেও ভয় করতে হলে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। অপরাধকে একমাত্র তিনি ক্ষমা করতে পারেন। সুতরাং তাদের কৃত অপরাধ হতে তওবা করে ঈমানের পথ গ্রহণ করা উচিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির মক্কায় অবতীর্ণ

اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً : ৫২ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ النَّبِيُّ وَاَصْلُهُ الْمُتَدَثِّرُ اُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ اَيِ الْمُتَلَفِّفُ بِثِيَابِهِ عِنْدَ نُزُوْلِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ .

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! মহানবী ﷺ مُدَّثِّرْ শব্দটি মূলত مُتَدَثِّرْ ছিল। دَالْ -কে تَاءْ -এর মধ্যে اِدْغَامْ করা হয়েছে অর্থ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় স্বীয় বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদনকারী।

٢. قُمْ فَاَنْذِرْ خَوِّفْ اَهْلَ مَكَّةَ بِالنَّارِ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا .

২. উঠ, সতর্কবাণী প্রচার করো মক্কাবাসীদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করো, যদি তারা ঈমান আনয়ন না করে।

٣. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ عَظِّمْ عَنْ اِشْرَاكِ الْمُشْرِكِيْنَ .

৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো মুশরিকদেরকে শিরক হতে ঊর্ধ্বে হওয়ার কথা বিবৃত কর।

٤. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ عَنِ النَّجَاسَةِ اَوْ قَصِّرْهَا خِلَافَ جَرِّ الْعَرَبِ ثِيَابَهُمْ خُيَلَاءَ فَرُبَمَا اَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ .

৪. তোমার পরিচ্ছদকে পবিত্র রাখো অপবিত্রতা হতে অথবা স্বীয় বস্ত্রকে ছোট করে প্রস্তুত করো। আরবরা যে অহংকার বশত বস্ত্রকে দীর্ঘায়িত করে, যার ফলে প্রায়শ তাতে অপবিত্রতা লেগে যায়, তার বিপরীতে।

٥. وَالرُّجْزَ فَسَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْاَوْثَانِ فَاهْجُرْ اَيْ دُمْ عَلٰى هَجْرِهِ .

৫. আর প্রতিমা হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ اَلرُّجْزَ শব্দটির তাফসীর اَلْاَوْثَانَ প্রতিমা দ্বারা করেছেন দূরে থাকো অর্থাৎ তা হতে দূরে থাকার প্রশ্নে স্থিতিশীলতা অবলম্বন করো।

٦. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ بِالرَّفْعِ حَالٌ اَيْ لَا تُعْطِ شَيْئًا لِتَطْلُبَ اَكْثَرَ مِنْهُ وَهٰذَا خَاصٌّ بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهُ مَامُوْرٌ بِاَجْمَلِ الْاَخْلَاقِ وَاَشْرَفِ الْاٰدَابِ .

৬. আর অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করো না تَسْتَكْثِرْ শব্দটি পেশ যোগে حَالْ রূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ কোনো বস্তু এ উদ্দেশ্যে দান করো না যে, তদপেক্ষা অধিক লাভ করবে। এ আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নির্দিষ্ট। কেননা তিনি সুন্দরতম স্বভাব ও উত্তম শিষ্টাচারের সাথে আদিষ্ট হয়েছেন।

٧. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ عَلَى الْاَوَامِرِ وَالنَّوَاهِيْ .

৭. আর তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করো আদেশ ও নিষেধসমূহ পালন ক্ষেত্রে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَلَا تَمْنُنْ : জমহুর وَلَا تَمْنُنْ অর্থাৎ ইদগাম হীনভাবে পড়েছিলেন, আর হাসান বসরী, আবুল ইয়ামান আল-আশহাব আল-উফাইলী একে اِدْغَام করে وَلَا تَمُنَّ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদির]

قَوْلُهُ فِيْ وَلَا تَسْتَكْثِرْ : জমহুর تَسْتَكْثِرُ -এ- حَالٌ হিসেবে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ وَلَا تَمْنُنْ حَالَ كَوْنِكَ مُسْتَكْثِرًا -কেউ কেউ বলেছেন, এটা আসলে وَلَا تَمْنُنْ اَنْ تَسْتَكْثِرُ ছিল। اَنْ -কে- حَذْف করে تَسْتَكْثِرُ -তে- رَفْع দেওয়া হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে ওয়াচ্ছাব এবং আ'মাশ تَسْتَكْثِرْ -তে একটি اَنْ -কে- مُقَدَّرٌ মেনে এবং তার আমলকে বাকি রেখে نَصَبْ দিয়ে تَسْتَكْثِرَ পড়েছেন। হযরত ইবনে মাসউদের কেরাত হতে এই কেরাতের তায়ীদ হচ্ছে, তিনি وَلَا تَمْنُنْ اَنْ تَسْتَكْثِرَ অর্থাৎ اَنْ সহ পড়েছেন। হযরত হাসান বারী এবং ইবনে আবূ আবলা تَسْتَكْثِرْ অর্থাৎ تَمْنُنْ -এর بَدَلْ হিসেবে جَزْم দিয়ে পড়েছেন। তবে এ কেরাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, لَا تَسْتَكْثِرْ আসলে لَا تَمْنُنْ -এর بَدَلْ হতে পারে না। কারণ مَنْ আর اِسْتِكْثَارٌ একই জিনিস নয়। আর এটাকে جَوَابُ نَهْيٍ ও বলা যায় না। –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ : এগুলো মুবতাদা ও খবর।

قَوْلُهُ قُمْ فَاَنْذِرْ : এগুলো পরস্পর عَطْفٌ وَمَعْطُوْفٌ এবং وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ থেকে وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ পর্যন্ত جُمْلَةٌ সমূহ فَاَنْذِرْ مَعْطُوْفٌ হয়েছে -এর উপর।

قَوْلُهُ فَكَبِّرْ : কাবীর গ্রন্থে فَكَبِّرْ -এর فَاءٌ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পেশ করা হয়েছে।

১. اَبُوْ الْفَتْحِ الْمَوْصِلِيْ বলেন, فَاءٌ টি زَائِدَة নেওয়া হয়েছে।

২. আল্লামা যুজাজ (র.) বলেন, فَاءٌ টি جَزَائِيَّةٌ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। وَالْمَعْنٰى قُمْ فَكَبِّرْ رَبَّكَ এবং পরবর্তী বাক্যগুলোও অনুরূপভাবে হবে।

৩. কাশ্শাফ গ্রন্থকার (র.) বলেন, এখানে فَاءٌ টি مَعْنَى الشَّرْطِ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

وَالْمَعْنٰى اَىُّ شَيْءٍ كَانَ فَلَا تَدَعْ تَكْبِيْرَهُ .

قَوْلُهُ تَسْتَكْثِرُ : এটা حَالٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হতে পারে। অর্থাৎ اَىْ لَا تُعْطِ مُسْتَكْثِرًا رَائِيًا لِمَا تُعْطِيْهِ كَثِيْرًا আর হযরত হাসান বসরী (র.) একে جَوَابُ نَهْيٍ হিসেবে بِالسُّكُوْنِ اَوْ طَالِبًا اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَيْتَ পড়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অত্র সূরার শানে নুযূল : অত্র সূরার শানে নুযুল সম্পর্কে লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে প্রথম প্রথম অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ নির্জনতাকে খুবই ভালোবাসতেন। হযরত খাজীদা (রা.) প্রতিদিন তাঁর আহার্য তৈরি করে তাঁর সাথে দিয়ে দিতেন। তিনি তা নিয়ে হেরা গুহার একটি কোণে বসে ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বয়ং হুযূর ﷺ ইরশাদ করেছেন, একদা আমি সে নির্জনতা হতে ঘরে ফিরে আসছিলাম। অতঃপর যখন ময়দানে গেলাম, তখন গায়েব হতে আমার কানে আওয়াজ আসল, তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। যখন আকাশের দিকে লক্ষ্য করলাম তখন দেখলাম আসমান জমিনের মাঝে চেয়ারের উপর একটি ফেরেশতা বসে আছে বলে অনুভব হয়েছে যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। এমতাবস্থায় ভয়ে আমার শরীর শীতল হয়ে উঠল, তখনই ঘরে এসেছে চাদর ইত্যাদি দ্বারা আবৃত হয়ে গেলাম। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন।

লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ فَتْرَةُ الْوَحْيِ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে বলেন, আমি হাঁটাহাঁটি করছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট আসত সেই ফেরেশতাটি আসমান জমিনের মাঝে অবস্থিত রয়েছে, এতে আমি ভয় পেয়ে ঘরে চলে আসলাম এবং পরিবারকে বললাম زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, অলীদ ইবনে মুগীরা কুরাইশগণের জন্য খাবার তৈরি করে তাদেরকে জমায়েত করল। পানাহার শেষে সে বলল, এ লোকটিকে অর্থাৎ মুহাম্মদকে তোমরা কি বলতে চাও? কেউ বলল, সে তো যাদুকর। অন্য একজন বলল, না সে যাদুকর নয়। কেউ বলল, সে গণৎকার, প্রতিবাদে কেউ বলল, না সে গণৎকার নয়। আবার কেউ বলল, সে কবি। প্রতিবাদে কেউ বলল, সে কবিও নয়। কতক বলল, সে পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত একজন জাদুকর। এ আলোচনার কথা মহানবী ﷺ-এর কর্ণে পৌছলে তিনি খুব মর্মাহত হলেন এবং বালিশের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁর দেহটি কম্বল দ্বারা জড়িয়ে দেওয়া হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা (يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (الاية আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব, ইবনে কাছীর, খাযেন]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে কম্বল জড়ানো শয্যাগ্রহণকারী, উঠুন অতঃপর ভীতি প্রদর্শন করুন।" এ আয়াত দু'টির তাৎপর্য এই যে, আমরা শানে নুযুল উল্লেখ করেছি যে, উপরিউক্ত নির্দেশনামাটি হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাজিলের দীর্ঘ এক মাস পর অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ﷺ শূন্যলোকে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর আকৃতি দর্শন করে প্রকম্পিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। বাড়ি ফিরে কম্বল জড়িয়ে শয্যাশায়ী হলেন এবং মাথায় পানি ঢালতে বললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন– হে কম্বল জড়ানো ব্যক্তি! আপনার কম্বল জড়িয়ে শয্যা গ্রহণের অবকাশ কোথায়। আপনার প্রতি আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার এক বিরাট দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, আপনি উঠুন। আমার একত্ববাদ প্রচার করুন এবং যারা আমার সত্তায়, গুণে ও ক্ষমতায় আমার সাথে অন্যান্য বস্তুকে শরিক করে তাদেরকে এটার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন। আপনার শয়ন করার সময় নেই। নবী করীম ﷺ -এর প্রতি এ নির্দেশ এমন এক সময় ও পরিবেশে অবতীর্ণ হয়, যখন মক্কাসহ সমগ্র আরবের লোক ও জনপদগুলো শিরক-এর দুর্গন্ধময় কূপে নিপতিত ছিল এবং তিনি ছিলেন একাকী। তাঁর সঙ্গী-সাথী কেউই ছিল না। এহেন পরিবেশে সর্বজন বিরোধী একটি মতাদর্শ নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া এবং তা জনসম্মুখে প্রচার করা কত বড় বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার ছিল তা একটু চিন্তা করলেই বোধগম্য হয়। এহেন পরিবেশের মধ্যেই আল্লাহ বললেন, আপনি তৌহিদের পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান হোন এবং মানুষকে তৌহিদের পরিপন্থি আকীদা-বিশ্বাসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করতে থাকুন। এটাই আপনার প্রথম কাজ।

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধনের হেকমত : এখানেও সূরা আল-মুয্যাম্মিলের মতো يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। স্নেহ ও আদর প্রকাশের উদ্দেশ্যে এখানে আল্লাহ নিজের হাবীবকে তাঁর ওয়াস্‌ফ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। তাঁর নাম ধরে 'হে মুহাম্মদ' ﷺ বলেননি, উদ্দেশ্য এই যে, এটার মাধ্যমে সহানুভূতি ও আদরে প্রকাশ ঘটুক। রাসূল বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন, আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর প্রতি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দীনের দাওয়াত দান এবং তৌহিদের প্রচারের সময় তিনি তা পাবেন। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির এবং সূরা আল-মুয্যাম্মিল একই ঘটনার পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এটার হাকীকত কি?

তাফসীরে রুহুল মা'আনী গ্রন্থে হযরত জাবির ইবনে যায়েদ তাবেয়ী (র.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আল-মুয্যাম্মিলটি সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের পূর্বে নাজিল হয়েছে। আর এ বর্ণনাটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তবে صَحِيْحَيْن -এর বর্ণনানুসারে সর্ব প্রথম সূরা আল্-মুদ্দাছ্ছির অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, এটার হাকিকত সম্পর্কে এ কথাই অনুমান করা যায় যে, فَتْرَةُ وَحْي -এর পর সর্বপ্রথম সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরটিই অবতীর্ণ হয়েছে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ اٰيَاتِ السُّوْرَتَيْنِ : সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের যে সকল বর্ণনা রয়েছে, তাতে অধিকাংশই দাওয়াতে ইসলাম ও সকল মানবাত্মার সংশোধন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

আর সূরা আল-মুয্যাম্মিলের শুরুতে যে সকল বিধি-বিধানের আলোচনা করা হয়েছে তার অধিকাংশেই বিশেষত হুযূর ﷺ-এর নিজ আত্মার সংশোধন অথবা সাহাবায়ে কেরামগণের আত্মার পরিশুদ্ধতার আলোচনা করা হয়েছে।

مُدَّثِّر ও مُزَّمِّل শব্দদ্বয়ের অর্থগত পার্থক্য কি ? : এদের অর্থগত দিক দিয়ে তাফসীরকারগণ তেমন কোনো পার্থক্য নির্ণয় করেননি; বরং উভয় শব্দের তাফসীর করেছেন– চাদর দ্বারা শরীরকে আবৃত ব্যক্তি।

হযূর ﷺ আল্লাহর বান্দাদেরকে দোজখের ভীতি এবং বেহেশ্‌তের সু-সংবাদ দান করার জন্য প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয়াতে কেবল اِنْذَارٌ -এর কথার উপর হুকুমকে সীমিত করার কারণ : এটার কারণ এই যে, যখন উক্ত আয়াত قُمْ فَاَنْذِرْ নাজিল হয়েছে তখন এমন লোক ছিল না যাদেরকে বেহেশতের শুভ সংবাদ শুনাতে পারেন। একেবারে মুষ্টিময় ও নগণ্য সংখ্যক বেহেশতের শুভ সংবাদ শ্রবণ করার উপযুক্ত ছিল। অতঃপর যখন ইসলামের প্রসার ঘটল এবং লোকজন বৃদ্ধি হলো তখন اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا الخ আয়াত নাজিল হলো এবং বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ এবং দোজখের কু-সংবাদ শুনানোর জন্য বলা হলো। অন্যথায় মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে بَشِيْر وَنَذِيْر হিসেবেই শ্রবণ করা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

قَوْلُهُ قُمْ فَاَنْذِرْ -এর অর্থ এবং قِيَامٌ -এর অর্থ : সূরা আল-মুদ্দাছ্‌ছিরের মধ্যে যে সমস্ত বিধানাবলির আলোকপাত করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হলো قُمْ فَاَنْذِرْ 'আপনি দণ্ডায়মান হোন এবং সম্প্রদায়কে আল্লাহর ভয় দেখান।' এখানে قِيَامٌ -এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য হতে পারে, অর্থাৎ আপনি যে কাপড় জড়িয়ে শুয়েছেন তা হতে উত্থিত হোন। আর এ অর্থও হতে পারে যে, আপনি হিম্মত ও সাহস করে আল্লাহর বান্দাগণকে সংশোধন করার জন্য তৈরি হয়ে যান এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে আনয়ন করার খেদমতে নিয়োজিত হয়ে যান।

اِنْذَارٌ বলা হয় এমন ভয় প্রদর্শন করাকে যাতে مُحَبَّتٌ এবং شَفْقَتٌ রয়েছে। যেমনিভাবে মাতা-পিতা তাদের সন্তানদেরকে সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের শানও এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করা। এ কারণেই তাদেরকে بَشِيْر وَنَذِيْر বলে لَقَبْ প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে, হে নবী! বর্তমান জগতের মানুষ আমার মহানত্ব, বিরাটত্ব ও অসীমত্বের কথা ভুলে আমার ব্যাপারে নানারূপ কাল্পনিক আকীদা পোষণ করে রয়েছে। আপনি আমার মহানত্ব, বিরাটত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করতে থাকুন এবং লোকদেরকে এটার পরিপন্থি কাজ পরিহার করতে বলুন। এ জগতকে তারা নানারূপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তারা বিভিন্ন সত্তাকে আমার উপর দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করছে। এ জগতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত আর কিছুই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জগতের সর্বত্রই থাকবে আমার শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ। মানুষের আকীদা-বিশ্বাস হতে শুরু করে তাদের কর্মময় জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে থাকবে আমারই শ্রেষ্ঠত্বের ফলিতরূপ। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা করতে থাকুন। এ জন্যই ইসলামি জীবন ব্যবস্থার স্তরে স্তরে আমরা 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্ মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ) কথাগুলোর সমুচ্চারিত হতে শুনতে পাই। দৈনিক পাঁচবার মুয়াজ্জিন মিনারে দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে 'আল্লাহু আকবার'। নামাজ শুরু হয় 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণের মাধ্যম। পশু জবাই করা হয় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে। শোভাযাত্রা ও জিহাদের ময়দানে সেনানীগণ আল্লাহু আকবার ধ্বনির সমুচ্চারিত কণ্ঠ দ্বারা দুনিয়ার মানুষ ও প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয়– আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর দুনিয়ার বুকে গায়রুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মুছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। মহানবী ﷺ-এর প্রতি এই নির্দেশ জারি হওয়ার সাথে সাথেই মু'মিনের কাজকর্ম, ইবাদত-বন্দেগির সর্বত্র প্রতিফলিত হতে শুরু করল فَكَبِّرْ -এর জবাব আল্লাহু আকবার। চরিত্র, আচার-আচরণ জীবনের কর্মময় ভূমিকা হতে প্রকাশ হতে লাগল تَكْبِيْر -এর ফলিত ভাবধারা।

اَلْاَمْرُ بِالْاِنْذَارِ -এর পরে اَلْاَمْرُ بِالتَّكْبِيْرِ উল্লেখ করার তাৎপর্য : উঠুন এবং ভীতি প্রদর্শন করুন– এ কথাটির পর "আপনার প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা করুন" বলার তাৎপর্য এই যে, নবী করীম ﷺ-কে এ বাক্যের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে যে, তিনি যেন কাফিরদেরকে ভয় না করেন, গুরুত্ব না দেন। কারণ, সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক ও অধিপতি হচ্ছেন আল্লাহ। সুতরাং কোনো সৃষ্টিকে গুরুত্ব দেওয়া নবীর জন্য অপ্রয়োজন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করা তাঁর জন্য কখনো উচিত নয়, কারণ সব ক্ষমতাশীলরাইতো আল্লাহ তা'আলার অধীন। –[সাফওয়া]

সুতরাং দাওয়াত দানে এবং আল্লাহর আজাব হতে ভীতি প্রদর্শনকরণের ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ -এর কাউকেও ভয় করা উচিত নয় এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করা অপরিহার্য।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَثِيَابَكَ فَطَ : এর একটি প্রকাশ্য অর্থ হলো স্বীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।

াম কাতাদাহ, মুজাহিদ, ইব্রাহীম, যাহহাক, শা'বী ও যুহরী (র.) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেন, এর অর্থ হলো– নিজেকে নাহ থেকে পবিত্র রাখুন।

াম যাহহাক (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো নিজ নিজ আমল ঠিক করে নাও।

াম সুদ্দী (র.) বলেছেন, নেক আমলকারী মানুষকে পবিত্র পোশাক পরিধানকারী বলা হয় আর বদকার মানুষকে অপবিত্র াশাকধারী বলা হয়।

ঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো– মন ও গৃহকে পবিত্র করো।

সান বসরী (র.) বলেছেন, নৈতিক গুণাবলি অর্জন করো।

বনে সীরীন এবং ইবনে-যায়েদ (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখারই আদেশ দেওয়া হয়েছে। কননা, মুশরিকরা তাদের পোশাক পবিত্র রাখত না।

াম তাউস (র.) বলেন, নিজের ব্যবহারের পোশাককে সুদীর্ঘ করো না। কেনন পোশাকে দৈর্ঘ্য কখনো কখনো অপবিত্রতার ারণ হয়। এক কথায় দৈহিক ও আর্থিক সর্বপ্রকার পবিত্রতা অর্জনই মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি লাভের অন্যতম সোপান। –[নূরুল কোরআন]

ত্রতা অবলম্বনের জন্য রাসূলে কারীম ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়ার কারণ : এটার হিকমত হলো– ব্যক্তি অনুসারে ব্যক্তির াক-পরিচ্ছদ হয়ে থাকে। পোশাক দ্বারা ব্যক্তির হাকিকত প্রায় অংশই প্রকাশ পেয়ে থাকে। অতএব, যারা আল্লাহভক্ত ও রহম নর অধিকারী তাদের পোশাক অন্যান্যদের পোশাকের ন্যায় হওয়া সমীচীন নয়। সেকালে আরবদের যে নীতি ও চরিত্র ছিল ং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যেরূপ ছিল তা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়, তাদের আদত অভ্যাস আল্লাহর সন্তুষ্টি মতে ছিল না। লে কারীম ﷺ যেন তাদের সে সকল অবস্থা হতে ভিন্ন প্রকৃতি ও উত্তম নীতি বা আদর্শে-আদর্শবান হন, যাতে সকল মানুষ র এ আদর্শে-আদর্শবান হয়ে উঠতে অতি সহজেই অনুপ্রাণিত হয় আর ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলকামী হতে সক্ষম হয়। এ ্য জগতবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে তাকে আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ঈদেরকে পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দান : আলোচ্য আয়াতে দাঈদেরকে পাক-পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ ওয়া হয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ ছিলেন দীনের দাঈ ও মুবাল্লিগ। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক-পবিত্র পোশাক পরিধানের নির্দেশ দানের মাধ্যমে পরবর্তীকালের সমস্ত দাঈ ও মুবাল্লিগদেরকে তাদের বাহ্যিক াশাক-পরিচ্ছদকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্মল করার আহ্বান করেছেন, যার দরুন লোকেরা তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে খেন। মানুষের মনে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে যেন কখনোও ঘৃণা জন্মাতে পারে এমন মলিনতা যেন কখনোও তাদের াশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনে না থাকে।

আয়াতে মুসলমানদেরকে এ কথাও জানানো হয়েছে যে, দীনদারী আর পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য বিধানের মধ্যে কোনো কমের দ্বন্দ্ব নেই। পোশাক-পরিচ্ছদকে অপবিত্র ও অসুন্দর করে বৈষ্ণব ও দুনিয়া ত্যাগী হওয়ার কোনো স্থান ইসলামে নেই। ঈ এবং মুবাল্লিগণ হলেন অন্যান্য মুসলমানদের জন্য আদর্শ। সুতরাং এ আদর্শ সমস্ত মু'মিনদের জন্যই গ্রহণীয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُ : মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদাহ, যুহরী, ইবনে যায়েদ এবং আবূ সালামা প্রমুখ ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, رُجْز অর্থ মূতি অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে বর্জন করো, এগুলোর কাছেও যেয়ো না।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো পাপাচার পরিহার করা।
* আবূ আলীয়া এবং রবী (র.) বলেছেন, رُجْز অর্থ– মূর্তি, আর رِجْز অর্থ– অপবিত্রতা এবং গুনাহ, এগুলো পরিহার করো।
* ইমাম যাহহাক (র.) বলেছেন, এর অর্থ শিরক অর্থাৎ তোমরা শিরক বর্জন করো।
* কালবী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো আজাব অর্থাৎ তোমরা এমন আকীদা-বিশ্বাস এবং কর্ম বর্জন করো, যা আজাবের কারণ হতে পারে। –[নূরুল কোরআন]

একটি সন্দেহের নিরসন : এখানে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে উদয় হতে পারে তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খনোও মূর্তি আর দেব-দেবীর পূজা করেছিলেন? পূজা না করে থাকলে তাঁকে এটা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দানের হেতু কি?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এই প্রশ্নের জবাবে বলতে হয় যে, হাদীস শরীফ হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোটকাল হতে এ মূর্তিপূজার কাজটিকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এটা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার নির্দেশদানের অর্থ এই যে, তুমি যেভাবে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে আসছিলে তেমনি ভবিষ্যতেও এটা পরিত্যাগ করে চলবে। এটা ঠিক اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দ্বারা সত্যপথ প্রার্থনা করার মতো। এটার অর্থ যেমন এই কথা নয় যে, যে মুসলমান এটা বলছেন তিনি সুপথে নেই। সে জন্যই তাঁকে এটা প্রার্থনা করতে হচ্ছে; বরং এটার অর্থ হলো আমাকে সত্যপথে সর্বদা দৃঢ় রাখো। ঠিক তেমনি আয়াতের অর্থও "তুমি সদা-সর্বদা মূর্তিপূজা পরিহার করে চলো।" –[সাফওয়া]

এ প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাব এই হতে পারে যে, মূলত এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়নি– বলা হয়েছে আরববাসীকে উদ্দেশ্য করে। অর্থাৎ হে আরববাসীরা তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করো।

আল্লামা সাবূনী বলেছেন, رُجْزَ শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটার দ্বারা সর্বপ্রকার খারাপ জিনিস উদ্দেশ্য হতে পারে। এটার তাৎপর্য এই যে, তুমি একজন দাঈ মুবাল্লিগ, সুতরাং তোমার চরিত্রে কোনো রকমের খারাপ কিছু থাকতে পারে না। অতএব, আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর মাধ্যমে সমস্ত দাঈদেরকে তাদের চরিত্র হতে সর্বপ্রকারের খারাপ ও নিন্দনীয় জিনিস ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ : মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন–

১. অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে এর অর্থ হলো– এ উদ্দেশ্যে মানুষকে নিজের সম্পদ দিও না যে, তোমাকে তা সঠিক পরিমাণে দেওয়া হবে।

২. ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো জাগতিক বিনিময় প্রাপ্তির লোভে কাউকে কিছুই দিও না; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দিও।

৩. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, নিজের নেক আমলকে অনেক বেশি মনে করে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিজের আমলের ইহসান রেখো না। তিনি আরো বলেন, আমলকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক মনে করো না। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতের মোকাবিলায় তোমার আমল অতি সামান্য।

৪. মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো সঠিক পরিমাণ কল্যাণের অন্বেষণে নিজেকে দুর্বল মনে করো না।

৫. ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হে রাসূল! নবুয়তের ইহসানের বিনিময়ে মানুষের নিকট হতে জাগতিক কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবেন না।

৬. এ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে যে, নিজের দানকে বড় মনে করে দরিদ্র মানুষের প্রতি ইহসান রাখবেন না।

–[মাযহারী, ইবনে কাছীর, নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ : এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ কথার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আপনি যে মতাদর্শ নিয়ে সে বিপরীতমুখি পরিবেশে দণ্ডায়মান হয়েছেন, সেখানে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, বিপদের সম্মুখীন হওয়া, নানা প্রকর জুলুম ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব, সর্বাবস্থায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে আপনাকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় দুঃখ-কষ্টকে অম্লান বদনে সহ্য করতে হবে। অতএব, আপনি এ ব্যাপারে পূর্ব হতেই তৈরি থাকুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ধৈর্যধারণ করতে বলার কারণ : পূর্ববর্তী আয়াতে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন সাধারণভাবে সকল মানব গোষ্ঠীকে সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করেন এবং কুফরি ও শিরক হতে তাদেরকে বিরত রাখতে জোর প্রচেষ্টা চালান। অতএব, এ কথাটিও স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, হঠাৎ করে সকল মানবকে তাদেরর বাপ-দাদার ধর্মত্যাগ করে নতুন একটি ধর্মের প্রতি আহ্বান করলে তাদের মন মেধা এটাকে গ্রহণ করতে চাইবে না, ফলে বহু লোক তাঁর শত্রুতা পোষণ করতে উদ্ধত হবে। সুতরাং নতুন ধর্মের আহ্বায়ক সেই মুহূর্তে যদি ধৈর্যশীল না হয়; বরং কথায় কথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে তখন আর কোনো কাজই হবে না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে ধৈর্য অবলম্বন করতে বলেছেন।

আর যেহেতু সাধারণত বাতিলপন্থি দুনিয়াতে সর্ব যুগেই অধিক হয়ে রয়েছে। এ জন্য সত্যের পথে অগ্রসর হতে প্রত্যেক পদে পদে বাঁধা ও সমস্যা আসবেই, তাই সে ক্ষেত্রে অধৈর্য হওয়ার কারণে মূল লক্ষ্য অর্জনে ফল পাওয়া যাবে না। অতএব, ধৈর্য ও সহনশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ বলেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৮. فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ وَهُوَ الْقَرْنُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ.

৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে এটা দ্বারা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার উদ্দেশ্য।

৯. فَذٰلِكَ اَىْ وَقْتُ النَّقْرِ يَوْمَئِذٍ بَدَلٌ مِمَّا قَبْلَهُ الْمُبْتَدَأُ وَبُنِىَ لِاِضَافَتِهِ اِلٰى غَيْرِ مُتَمَكِّنٍ وَخَبَرُ الْمُبْتَدَأِ يَوْمٌ عَسِيْرٌ وَالْعَامِلُ فِىْ اِذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ اَىْ اِشْتَدَّ الْاَمْرُ

৯. তবে তা অর্থাৎ ফুৎকারের দিন সেদিন এটা পূর্ববর্তী مُبْتَدَأ হতে بَدَل হয়েছে। যেহেতু غَيْرُ مُتَمَكِّنْ শব্দের প্রতি اِضَافَتْ হয়েছে তাই তা فَتْحَة-এর উপর مَبْنِىْ হয়েছে। উক্ত مُبْتَدَأ-এর خَبَرْ হলো পরবর্তী বাক্যাংশ ভীষণ সংকটময় দিন আর اِذَا -এর মধ্যে বাক্যের উদ্দিষ্ট বস্তু مَدْلُوْل جُمْلَة আমিল হয়েছে। অর্থাৎ اِشْتَدَّ الْاَمْرُ ব্যাপার সুকঠিন হয়েছে।

১০. عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهُ يَسِيْرٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ فِىْ عُسْرِهِ.

১০. যা কাফেরদের জন্য সহজ নয় এতে এ নির্দেশনা রয়েছে যে, তা মু'মিনদের জন্য সহজ হবে। তা সুকঠিন হওয়া সত্ত্বেও।

১১. ذَرْنِىْ اُتْرُكْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ عَطْفٌ عَلَى الْمَفْعُوْلِ اَوْ مَفْعُوْلٌ مَعَهُ وَحِيْدًا حَالٌ مِنْ مَنْ اَوْ مِنْ ضَمِيْرِهِ الْمَحْذُوْفِ مِنْ خَلَقْتُ اَىْ مُنْفَرِدًا بِلَا اَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَهُوَ الْوَلِيْدُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ.

১১. আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ত্যাগ করো আর তাকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি এটা مَفْعُوْل-এর প্রতি عَطْف অথবা مَفْعُوْل مَعَهُ একাকীত্বে এটা مَنْ হতে অথবা خَلَقْتَ-এর উহ্য সর্বনাম হতে حَالْ অর্থাৎ পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদশূন্য অবস্থায় একাকী হিসেবে। আর সে হলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ।

১২. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا وَاسِعًا مُتَّصِلًا مِنَ الزُّرُوْعِ وَالضُّرُوْعِ وَالتِّجَارَةِ.

১২. আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ পরিব্যাপ্ত, যা ক্ষেত-খামার, গৃহপালিত পশু ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ : এটা بِتَاوِيْلِ مُفْرَدْ মুবতাদা হয়েছে, فَذٰلِكَ -এর فَاءْ টি جَزَائِيَّةْ এবং يَوْمَئِذٍ তৎপূর্ববর্তী مُبْتَدَأ হতে بَدَلْ এবং يَوْمٌ عَسِيْرٌ টি مَوْصُوْف وَصِفَتْ মিলে فَاِذَا الخ -এর خَبَرْ হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ : একটি পৃথক বাক্য হবে এবং وَمَنْ خَلَقْتُ টি ذَرْنِىْ হতে مَفْعُوْل مَعَهُ এবং وَحِيْدًا টি ذَرْنِىْ-এর يَاءْ হতে حَالْ হিসেবে مَنْصُوْبْ হবে।

قَوْلُهُ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا : টি পৃথক বাক্য অথবা পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হবে। مَمْدُوْدًا টি مَالًا হতে صِفَتْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন যখন সূরা গাফিরের এ আয়াত- حٰمٓ . تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ...... لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ . নাজিল হয় তখন নবী করীম ﷺ মসজিদে হারামে এ আয়াতসমূহ পাঠ করলেন পাশেই ছিল ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ। সে এ আয়াতের পাঠ শ্রবণ করে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়ল। তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ তার গোত্র বনী মাখযূমের মজলিসে গমন করে বলল, আমি এই মাত্র মুহাম্মদের নিকট এমন বাণী শ্রবণ করেছি যা মানুষের কথা নয়, এমনকি জিনের কথাও নয়; এতে দারুণ আকর্ষণ রয়েছে এবং রয়েছে সৌন্দর্য, সে একদিন বিজয়ী হবে, পরাজিত হবে না। তার এসব কথা শুনে কুরাইশগণ ইসলামের দিকে ধাবিত হতে লাগল। কাফেরদের দলপতি দুর্মতি আবূ জাহল এ সংবাদ শ্রবণ করে বিচলিত হয়ে অতি দ্রুত ওয়ালীদের নিকট অত্যন্ত পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত অবস্থায় গমন করল।

আবূ জাহল এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ-এর মাঝে কথোপকথন : আবূ জাহল ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ-এর সাথে প্রথমেই এমন সুরে কথাবার্তা বলতে শুরু করল যাতে ওলীদের রাগান্বিত ও ক্রোধান্বিত হওয়া স্বাভাবিক হয়। ওয়ালীদ প্রথমেই আবূ জাহলকে প্রশ্ন করল যে, ভাই তোমাকে এত ব্যথিত মনে হচ্ছে কেন? আবূ জাহল বলল, চিন্তিত হবো না কেন? এ সকল আরববাসী তোমাকে চাঁদা করে সম্পদ দিয়ে থাকে। এখন তুমি বৃদ্ধাবস্থায় পৌছেছ, তবে তাদের এ কথা কর্ণ গোচর হয়েছে যে, তুমি নাকি মুহাম্মদ ﷺ এবং আবূ কোহাফার বেটা (আবূ বকর)-এর নিকট কিছু খাওয়া-দাওয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে গিয়ে থাক, আর তাদের পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম জানানোর ফলে তুমি তাদের কথাবার্তার প্রশংসা করে থাক, [মূলত এ মিথ্যা কথাগুলো দ্বারা তাকে রাগান্বিত করে তোলাই উদ্দেশ্য ছিল।]

এ কথাগুলো শুনে ওয়ালীদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। অর্থাৎ তার মধ্যে অবর্ণনীয় ক্ষোভ জাগল। ফলে তার মাথায় পাগলামি সওয়ার হলো এবং সে বলতে লাগল, তোমরা কি জান না আমার সম্পদ কি পরিমাণ রয়েছে। আমি কি মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট রুটির মুখাপেক্ষী? তোমরা যে বলছ মুহাম্মদ ﷺ একজন পাগল, এটা একেবারেই মিথ্যা, তোমরা কি কেউ তাঁকে কোনো পাগলামির কাজ করতে দেখেছ? তখন আবূ জাহল স্বীকারোক্তি করে বলল, لَا وَاللّٰهِ না, আল্লাহর কসম! কখনো না। অতঃপর ওলীদ বলল, তোমরা তাকে কবি বলে থাক, কিন্তু কখনো কবিতাবৃত্তি করতে দেখেছ কিনা? এহেন মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে লজ্জিত করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উত্তরে আবূ জাহল বলল, لَا وَاللّٰهِ না, আল্লাহর কসম! কখনোও নয়। অতঃপর ওয়ালীদ বলল, তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলছ, তবে বল কখনো তাঁর হতে মিথ্যা উক্তি শ্রবণ করেছ কিনা? বল। এটার উত্তরেও আবূ জাহল বলল, لَا وَاللّٰهِ অতঃপর ওয়ালীদ বলল, তোমরা তাকে كَاهِنٌ বলে থাক, বলতো দেখি কখনোও كَاهِنٌ গণকদের মতো গল্প বলতে শুনেছ কিনা? আমি كَاهِنٌ দের কথা ভালোভাবেই বুঝি, তার বাক্যসমূহ কোনো كَهَانَتٌ হতে পারে না। আবু জাহল তখনও বলল, لَا وَاللّٰهِ পূর্ণ কুরাইশ বংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ صَادِقُ الْاَمِيْنِ উপাধিতে ভূষিত রয়েছেন।

আবূ জাহল এখন চিন্তায় পড়ল যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ -এর মন-মস্তিষ্ক যেভাবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এটা হতে তাকে কিভাবে ফিরানো যায়। তখন সে ফন্দি করে বলল, আচ্ছা দেখ হে ওয়ালীদ! তুমি স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে এবং সম্প্রদায়ের নিয়ম-নীতি হতে বঞ্চিত হয়ে নিজের সম্মুখের একটি অবুঝ বাচ্চা মুহাম্মদের ধর্ম অবলম্বন করবে এটা খুবই বিবেকহীনতা এবং বেইজ্জতির কথা। সুতরাং তুমি এখন এমন একটি কথা বলা উচিত হবে, যাতে সকলেরই বিশ্বাস হয় যে, তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্ম প্রকৃতপক্ষেই কখনো বিশ্বাস কর না।

তখন ওয়ালীদ বলল, তোমরা খুব ভালোভাবেই জান যে, বর্তমানে কবিতাবৃত্তি বা কবি হিসেবে সমগ্র আরব বিশ্বে কেউই আমার সমকক্ষ নেই। তবে আমি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর তেলাওয়াতকৃত বাক্যসমূহ এমন মধুর এবং আকর্ষণীয় অনুভব করেছি যার মধুরতা আমি জীবনে কখনো ভুলবো না।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

...বূ জাহল বলল, তোমাকে এখনই এমন বাক্য প্রকাশ করতে হবে যাতে তোমার বিষয়ে সম্প্রদায়ের সকলের কু-ধারণা দূরীভূত ...য়ে যায়। তখন ওয়ালীদ বলল, আচ্ছা, এখন যাও আমি চিন্তা করে দেখবো। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে ওয়ালীদ বলে উঠল إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন سِحْرٌ يُؤْثَرُ বলার কারণ ছিল, জাদুকরদের জাদুমন্ত্রের কারণে যেভাবে ...কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিবর্তন করা যায়, তেমনিভাবে মুহাম্মদ ﷺ -এর আনীত সত্য বাণীর প্রভাবেও মানুষকে ...ল্লাহদ্রোহীতা হতে আল্লাহ অভিমুখি করা যায়, জাহিলকে আলিম বানানো যায়, বিপথগামীকে সৎপথে আনা সহজেই সম্ভব হয়। ...ই তারা ভাবল سِحْرٌ يُؤْثَرُ বললে মানুষ সহজেই তাকে প্রতারক ভাববে। তবে তারা مَعَاذَ اللّٰهِ অসৎ উদ্দেশ্যেই এটা রটনা ...রেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আবূ জাহলের কারণেই ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ ইসলাম গ্রহণ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, আর কট্টর ...ফের থেকে যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে তার পরিণাম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা রয়েছে আল্লামা বাগবী (র.) লিখেছেন এ ঘটনার ...ই আলোচ্য আয়াত ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا নাজিল হয়। -[মাযহারী, ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُ... : نَقْر শব্দের আভিধানিক অর্থ আওয়াজ, আর نَاقُوْر শব্দটির অর্থ শিঙ্গা। আর গোটা ...ক্যের অর্থ হলো, যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ করা হবে। গ্রন্থকার এর তাফসীরে বলেছেন, তার অর্থ যখন দ্বিতীয় ...কার দেওয়া হবে। এখানে ফুৎকারকে দ্বিতীয় ফুৎকার বলে ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, প্রথম ফুৎকারের কারণে সমস্ত জীবিত ...ী বেহুঁশ হয়ে যাবে। এ ফুৎকারই কেবল কাফেরদের জন্য ভয়ের কারণ হবে না। দ্বিতীয় ফুৎকার দানের পরে সমস্ত মানুষকে ...বিত করা হবে, তখন কাফেররা তাদের অপকর্মের কারণে প্রচণ্ড ভয় পাবে এবং এ অবস্থায় তাদের দুরবস্থার কথা বুঝতে ...রবে। -[কাবীর]

...নে হাব্বান 'কিতাবুল আযমতে' ওহাব ইবনে মুনাব্বিহের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সাদা চকচকে একটি ...া থেকে শিঙ্গা সৃষ্টি করেছেন। এরপর আরশকে আদেশ দিয়েছেন শিঙ্গাকে ধরে রাখো, তখন শিঙ্গা আরশের সাথে ঝুলে ...ল। এরপর আল্লাহ তা'আলা كُنْ বললেন, তখন হযরত ইস্রাফীল (আ.) সৃষ্টি হলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শিঙ্গা গ্রহণ ...ার আদেশ দিলেন, হযরত ইস্রাফীল (আ.) তাই করলেন এবং যতগুলো রূহ সৃষ্টি হয়েছে তার সংখ্যা অনুযায়ী শিঙ্গায় ছিদ্র ...য়েছে, একটি ছিদ্র দিয়ে দু'টি রূহ বের হবে না। শিঙ্গার মধ্যস্থলে গোলাকার ছিদ্র রয়েছে। হযরত ইস্রাফীল (আ.) তাতে মুখ ...খে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, কিয়ামতের জন্য ঘোষণা করার দায়িত্ব আমি তোমার প্রতি অর্পণ ...রছি। হযরত ইস্রাফীল (আ.) তখন আরশের সম্মুখভাগে প্রবেশ করেন ডান পা আরশের নিচে এবং বাম পা আরশের ...্যন্তরে রেখে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। -[নূরুল কোরআন]

...ذ দ্বারা ইঙ্গিত করার কারণ : আরবি ভাষায় দূরের কোনো বস্তুকে ইঙ্গিত করতে হলে ذَٰلِكَ -এর ব্যবহার করা হয়। এখানে ...ذ اِسْمُ اِشَارَةْ দ্বারা ইঙ্গিত করার কারণ হলো- কিয়ামত দিবসের প্রচণ্ডতা এবং ভয়ঙ্করতা বুঝানো।

-[সাফওয়া, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فَذٰلِكَ يَوْمَ ..... غَيْرُ يَسِيْ... : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি অর্থ করা যেতে পারে।

...থম অর্থ হলো, সেদিনটি বড়োই কঠোর ও সাংঘাতিক হবে, কাফেরদের জন্য কিছু মাত্র সহজ করা হবে না। অর্থাৎ সেদিনের ...র্ব প্রকারের কঠোরতা একান্তভাবে নির্দিষ্ট হবে কাফেরদের জন্য, ঈমানদার লোকদের জন্য সে দিনটি হবে খুবই সহজ ও ...লকা।

...তীয় অর্থ হলো, يَوْمٌ عَسِيْرٌ -এর উপর عَطْف করে অর্থাৎ সেদিনটি হবে বড়োই কঠোর ও সাংঘাতিক, (সকলের জন্য) ...ফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না।

...র্থাৎ কিয়ামত দিবস সকলের জন্য কঠোর হবে, বর্ণিত আছে যে, নবী রাসূলগণ পর্যন্ত সেদিন প্রচণ্ড ভয় পাবে, সেদিন এতই ...াবহ হবে যে, তরুণরা ভয়ে বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তবে কাফেরদের জন্য সেদিনটি ঈমানদারদের তুলনায় অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ...। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ আয়াত দ্বারা বিপরীত অর্থ হুজ্জত হওয়ার পক্ষে দলিল দান : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, সেদিনটি কাফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না–এটা হতে বুঝা গেল যে, সেদিনটি মু'মিনদের জন্য সহজ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ উক্তি হতে দলিল গ্রহণ করে কোনো কোনো লোক বলেছেন, কুরআনের আয়াতের বিপরীত অর্থ হুজ্জত না হলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) "সেদিন কাফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না" কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে মু'মিনদের জন্য সহজতর হবে এমন কথা বলতেন না। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا : আলোচ্য আয়াতটি তিনটির অর্থ হতে পারে, এবং তিনটি অর্থই সঠিক। মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য আয়াতটি রাসূলে করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আয়াতের তিনটি অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো, আমাকে ছেড়ে দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি। এর তাৎপর্য হচ্ছে, যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা হাজীদের মধ্যে তোমাকে জাদুকর বলে প্রচার করার পরামর্শ দিয়েছে, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম তখন তাকে একাকী সম্পদহীন, সন্তান-সন্ততিহীন ও মান-মর্যাদাহীন সৃষ্টি করেছিলাম। পরে তাকে আমি এসব কিছু দান করেছি। এটা সত্ত্বেও যখন সে তোমার নবুয়ত অস্বীকার করেছে তখন এ অস্বীকৃতির প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। এ ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দ্বিতীয় অর্থ হলো, "আমাকে একাই [প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য] ছেড়ে দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাকে আমি সৃষ্টি করেছি। এর তাৎপর্য এ যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা হতে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারটি পুরাপুরিভাবে তুমি আমার উপরই ছেড়ে দাও। যেহেতু আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি, তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া আমার জন্য তেমন কঠিন কাজ নয়। সুতরাং আমি একাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট। এ ব্যাপারে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

তৃতীয় অর্থ হলো "আমাকে ছেড়ে দাও, আর সেই লোকটাকে যাকে আমি এককভাবে সৃষ্টি করেছি।" আমি ছাড়া আর কেউ তার সৃষ্টিকর্তা নয় কোনোদিন ছিল না, যেসব উপাস্য দেবতার খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষত রাখার জন্য এ লোকটি তোমার পেশ করা তাওহিদী দাওয়াতের বিরোধিতায় এতটা তৎপর হয়ে আছে। তাকে সৃষ্টি করার কাজে তারা কেউই আমার সাথে শরিক ছিল না। কারণ আমিই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা। –[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا : অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি তার জন্য বহু সম্পদ দান করেছি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে, ওয়ালীদের সম্পদ যথেষ্ট ছিল তার উদাহরণ এতটুকু দিয়েছেন-মক্কা হতে তায়েফ পর্যন্ত তার জমিন ও বাগান ইত্যাদি বিস্তীর্ণ ছিল এবং হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা.)-এর ভাষ্য মতে, তার বাৎসারিক আমদানি বা আয় এক কোটি দিনার হতো।

হযরত মুজাহিদ এবং সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, তার নিকট হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সুফিয়ান বলেছেন তার নিকট লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ছিল। –[নূরুল কোরআন]

তবে এ কথায় সকল তাফসীরকারগণই একমত যে, শীত গ্রীষ্ম ভেদাভেদে বছরের সকল ঋতুতেই তার ফসল ইত্যাদি বরাবর কাটতে হতো। এতেই অনুমান করা যায় যে সে কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল। কুরআনুল কারীমের ভাষায় একে বলেছে وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا। সে আরবের সর্দার রূপে সকলেরই নিকট একবাক্যে সু-পরিচিত ছিল, তার لَقَبٌ ছিল رَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ সে গর্ব করে নিজেকে নিজেই ওয়াহীদ ইবনুল ওয়াহীদ বলত। অর্থাৎ এককের ছেলে একক, অর্থাৎ আমার পিতা মুগীরা অথবা আমার কোনো নজির আর জগতে নেই। অতএব, এ কারণেও তাকে আল্লাহ তা'আলা হয়তো لَقَبَ وَحِيدًا বলেছেন, অর্থাৎ এককের বেটা একক বলে দাবিকারীকে আমার হাওলা করে দিন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. وَبَنِيْنَ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ شُهُوْدًا يَشْهَدُ الْمَحَافِلَ وَتُسْمَعُ شَهَادَتُهُمْ .

১৩. এবং পুত্র সন্তান দশ বা ততোধিক সংখ্যক যারা সাক্ষ্যদানকারী তারা সমাবেশসমূহে সাক্ষ্যদান করে এবং তাদের সাক্ষ্যসমূহ গ্রহণযোগ্য রূপে বিবেচিত হয়।

١٤. وَمَهَّدْتُّ بَسَطْتُّ لَهُ فِى الْعَيْشِ وَالْعُ وَالْوَلَدِ تَمْهِيْدًا .

১৪. আর প্রস্তুত করেছি তার জন্য যাবতীয় স্বচ্ছন্দ জীবনোপকরণ তার জন্য প্রশস্ত করেছি, স্বাচ্ছন্দ্য জীবন আয়ুষ্কাল ও সন্তানসন্ততি যথেষ্টরূপে।

١٥. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ .

১৫. এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাঁকে অধিক দান করবো।

١٦. كَلَّا ط لَا أَزِيْدُهُ عَلٰى ذٰلِكَ إِنَّهُ كَانَ لِاٰيٰ اَىِ الْقُرْاٰنِ عَنِيْدًا مُعَانِدًا .

১৬. না, কখনোও নয়; আমি এ অবস্থার উপর তাকে আর বৃদ্ধি করবো না সে তো আমার নিদর্শনাবলির অর্থাৎ কুরআনের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী ঔদ্ধত্য সহকারে বিরোধিতাকারী।

١٧. سَأُرْهِقُهُ أُكَلِّفُهُ صَعُوْدًا مَشَقَّةً مِ الْعَذَابِ أَوْ جَبَلًا مِنْ نَارٍ يَصْعَدُ فِيْهِ يَهْوِىْ أَبَدًا .

১৭. অচিরেই আমি তাকে আরোহণ করাবো কষ্ট দান করবো জাহান্নামের পাহাড়ে আজাবের কষ্ট অথবা জাহান্নামের পাহাড় যাতে সে আরোহণ করবে এবং সর্বদা নিচে অবতরণ করবে।

١٨. إِنَّهُ فَكَّرَ فِيْمَا يَقُوْلُ فِى الْقُرْاٰنِ الَّ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدَّرَ فِىْ نَفْسِهِ ذٰلِ

১৮. সে তো চিন্তা করল কুরআনে যা বলা হয়েছে তাতে যা সে নবী করীম ﷺ হতে শ্রবণ করেছে এবং সিদ্ধান্ত করল স্বীয় অন্তরে তদ্বিষয়ে।

١٩. فَقُتِلَ لُعِنَ وَعُذِّبَ كَيْفَ قَدَّرَ عَلٰى حَالٍ كَانَ تَقْدِيْرُهُ .

১৯. সে অভিশপ্ত হোক অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হোক কিরূপে সে এ সিদ্ধান্ত করল তার এ সিদ্ধান্ত কিরূপে হয়েছিল।

٢٠. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ .

২০. পুনঃ সে অভিশপ্ত হোক, কিরূপে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো।

٢١. ثُمَّ نَظَرَ فِىْ وُجُوْهِ قَوْمِهِ أَوْ فِيْمَا يَقْدَحُ بِ

২১. পুনঃ সে চেয়ে দেখল তার সম্প্রদায়ের লোকদের মুখপানে কিংবা তৎপ্রতি যার ছিদ্রান্বেষণ করা হয়।

٢٢. ثُمَّ عَبَسَ قَبَضَ وَجْهَهُ وَكَلَحَهُ وَكَلَ ضَيِّقًا بِمَا يَقُوْلُ وَبَسَرَ زَادَ فِى الْقَبْ وَالْكُلُوْحِ .

২২. তৎপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল তার মুখমণ্ডলকে কুঞ্চিত করল ও স্বীয় কথায় হতোদ্যম হয়ে বিমর্ষ হলো। এবং মুখ বিকৃত করল ভ্রূকুঞ্চন ও বিমর্ষতায় আধিক্য সৃষ্টি করল।

٢٣. ثُمَّ أَدْبَرَ عَنِ الْإِيْمَانِ وَاسْتَكْبَرَ تَكَبَّرَ اِتِّبَاعِ النَّبِىِّ ﷺ .

২৩. অতঃপর সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল ঈমান আনয়ন করা হতে এবং অহঙ্কার করল মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করার প্রশ্নে দম্ভ প্রকাশ করল।

٢٤. فَقَالَ فِيْمَا جَاءَ بِهِ اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ يُنْقَلُ عَنِ السَّحَرَةِ.

২৪. এবং সে বলল আনীত বিষয় তথা ওহী প্রসঙ্গে এটা-তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নয় জাদুকরগণ হতে উদ্ধৃত।

٢٥. اِنْ مَا هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ كَمَا قَالُوْا اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ.

২৫. এটাতো মানুষেরই কথা যদ্রূপ মুশরিকগণ বলে বেড়াত যে, কোনো মানুষ মহানবী ﷺ -কে এটা শিক্ষাদান করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا : এটা পূর্ববর্তী مَالًا مَّمْدُوْدًا وَجَعَلْتُ لَهُ -এর عَطْف হয়ে মহল্লান মানসূব হয়েছে আর بَنِيْنَ হতে شُهُوْدًا টি حَال হিসেবেও মানসূব হতে পারে। تَمْهِيْد টি مَهَّدْتُ হতে مَفْعُوْلٌ مُّطْلَقٌ হিসেবে মানসূব; এটা كَانَ -এর ضَمِيْر হতে خَبَر হয়ে মহল্লান মানসূব হবে।

قَوْلُهُ صَعُوْدًا : এটা اَرْهِقُ -এর ضَمِيْر হতে مَفْعُوْلٌ فِيْه হিসেবে মানসূব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا : অর্থাৎ তার সাথে উপস্থিত থাকা বহু পুত্র-সন্তান দান করেছি। ওয়ালীদ তৎকালীন আরবের সেরা ধনী ব্যক্তি ছিল, সন্তানসন্ততিও আল্লাহ তা'আলা তাকে কম দেননি। জালালাইন গ্রন্থকারের মতে, তার দশটি বা আরো অধিক পুত্র সন্তান ছিল। অন্য বর্ণনায় সাতজন তারা হলো- ১. ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, ২. খালেদ, ৩. আম্মারা, ৪. হেশাম, ৫. আস, ৬. কায়েস, ৭. আবদুশ শামস। যারা সর্বক্ষণ তার নিকট উপস্থিত থাকত। বিভিন্ন সভা মজলিসে তারা উপস্থিত হতো এবং তাদের মর্যদা সামাজিক ক্ষেত্রে এত অধিক ছিল যে, তাদের সাক্ষ্য ইত্যাদি সকল প্রকারেই গ্রাহ্য হতো। -[নূরুল কোরআন]

ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ -এর সন্তানদের ব্যাপারে মতভেদ : ইবনে মুনযির হযরত মুজাহিদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদের দশটি পুত্র সন্তান ছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) বর্ণনা করেছেন, ওয়ালীদের তেরোটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে তিনজন ইসলাম গ্রহণ করেন। ১. খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ২. হিশাম, ৩. আম্মার, আবার কারো কারো মতে عَمَّارٌ -এর পরিবর্তে "ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ" ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আম্মার সম্পর্কে অভিমতটি ভুল বর্ণনা। উল্লেখ্য যে, বিখ্যাত বীর কেশরী খালেদ ইবনে ওয়ালীদ এ ওয়ালীদেরই সন্তান।

شُهُوْدًا শব্দটি আল্লাহ তা'আলা কেন সংযোজন করেছেন? : এর উত্তরে বলা হবে, ওয়ালীদের সম্পদ অশেষ পরিমাণে ছিল, অর্থসম্পদের জন্য তার অভাব ছিল না। রোজগারের জন্য বিদেশ ভ্রমণের প্রয়োজন হতো না। তাই তারা সদা পিতার খেদমতে নিয়োজিত থাকত।

আর তারা সভা মজলিসসমূহে উপস্থিত হওয়ার এবং তাদের কথাবার্তা শ্রবণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো তারা স্বদেশে ও স্ববংশে প্রভাব লাভ করেছে।

অথবা, এর অপর একটি কারণ হতে পারে ওয়ালীদ অর্থবৃত্তের জন্য যেহেতু কারো মুখাপেক্ষী নয়, তাই তার খাদেম-খোদ্দাম যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হতো, এ কারণেও তারা তার নিকটে হাজির থাকত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا : অর্থাৎ দুনিয়ার আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, সম্মান-ক্ষমতা ও নেতৃত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে মক্কার লোকেরা তার কথা শুনত এবং তার আনুগত্য করত ও তাকে মেনে চলত। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, তা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এ জন্য যে, আমি তাকে আরো অধিক দিবো। এ কথাটির এক অর্থ হচ্ছে- এতদসত্ত্বেও এ লোকটির লোভ-লালসা শেষ হচ্ছে না। এত কিছু পাওয়ার পরও লোকটি সব সময় আরো বেশি করে নিয়ামত ও ধন-দৌলত লাভ করার জন্য চিন্তান্বিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছে- হযরত হাসান বসরী ও অন্যান্য কয়েকজন মনীষী বলেছেন যে, লোকটি সব সময় বলত- মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কোনো জীবন আছে এবং তাতে জান্নাত নামে-ও কোনো জিনিস অবস্থিত থাকবে। মুহাম্মদ ﷺ -এর একথা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহলে সবই জান্নাত তো আমার জন্যই নির্মিত হয়ে থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا : এর অর্থ হচ্ছে আমি অতি সত্বর তাকে সাউদে আরোহণ করাবো। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা নবী করীম ﷺ বলেছেন, সাউদ হচ্ছে জাহান্নামের একটি পাহাড়। সে পাহাড়ে আরোহণের জন্য বাধ্য করা হবে। যখনই তাতে হাত রাখবে, তখনই হাত পুড়ে উঠবে। হাত উঠালে তা অবস হয়ে যাবে। পা রাখলে পুড়ে উঠবে এবং পা উঠালে অবস হয়ে পড়বে। আয়াতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে জাহান্নামের সে পাহাড়ে চড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

* হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, صَعُوْدٌ দোজখের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি পাহাড়। ওলীদ সত্তর বছর যাবৎ তাতে আরোহণ করতে থাকবে। এরপর তার নিম্নদেশ নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরদিন এ অবস্থায়ই থাকবে।

* কালবী (র.) বলেছেন, صَعُوْدٌ হলো দোজখের একটি উপত্যকা। ওয়ালীদকে তাতে আরোহণের হুকুম দেওয়া হবে। উপর থেকে লৌহ নির্মিত জিঞ্জির দ্বারা তাকে টানা হবে। আর নীচ থেকে হাতুড়ি দ্বারা তাকে প্রহার করা হবে। চল্লিশ বছর যাবৎ উপরের দিকে উঠতে থাকবে। যখন উচ্চ চূড়ায় পৌছে যাবে তখন তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে, এরপর পুনরায় উপরের দিকে উঠার আদেশ হবে এবং উপর থেকে টেনে তোলা হবে, এরপর পেছন থেকে প্রহার করা হবে। এ অবস্থা সর্বদা অব্যাহত থাকবে। −[রূহুল মা'আনী, মাযহারী]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ .... ثُمَّ نَظَرَ : আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে তার মানসিক অবস্থার প্রতি আলোকপাত করেছেন। বলা হয়েছে যে, সে জানত যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। এ কথা জানা সত্ত্বেও কুরআন হতে মানুষকে ফিরানোর উদ্দেশ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এমন এক কথা বলল, যা সম্বন্ধে তার নিজেরও বিশ্বাস ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত সে কিভাবে দিতে পারল", আয়াতগুলোর অর্থ হলো "সে চিন্তা করেছে এবং একটি সিদ্ধান্ত স্থির করেছে। অতএব সে ধ্বংস হোক। কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত স্থির করল। অতঃপর সে আরো ধ্বংস হোক, কেমন করে এ সিদ্ধান্ত স্থির করল, অতঃপর সে চেয়ে দেখল।"

অর্থাৎ সে জেনে-বুঝে কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল। সিদ্ধান্ত কি স্থির করেছিল তা পরে বলা হয়েছে। সে সিদ্ধান্তটি ছিল, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্বন্ধে জাদুকর বলা, আর পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে জাদুর কথা, মানুষের বানানো কথা বলে ঘোষণা দেওয়া। এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে কুরআন বিমুখ করে তোলা এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে সমাজের মানুষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করা।

قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ ... إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর চিন্তাভাবনা করে বক্তব্য স্থির করে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এমনভাবে মুখ বাঁকা ও কপালের চামড়া জড়ো করে তাকাল, যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে যে সে বিশেষত এমন চিন্তা করছে যাতে মুহাম্মদ ﷺ সকলেরই শত্রু এবং শত্রুকে খুব নিকৃষ্ট খেতাব দিয়ে শেষ করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাই করল এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার মনোভাব ফিরিয়ে ফেলল, আর মনের খেতাবটি উল্লেখ করে দিল যে, কুরআনের ভাষা নামে এটা একটা আকর্ষণীয় জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ দ্বারা এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ওয়ালীদ সত্যই বুঝেছে যে, এ কুরআন ও মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত নিশ্চিত সত্য। স্বজাতির নামকে সে ক্ষুণ্ন করবে না। সত্যের প্রতি গৃহীত সিদ্ধান্তকে ত্যাগ করে অসত্যকে প্রাধান্য দিল এবং গ্রহণ করল। ইসলামকে বড় দৌলত মনে করল না। জাতির কুসংস্কার ও কুপ্রথা এবং বর্বরতাকে মূল্যায়ন করল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দোজখের অগ্নি পছন্দ করলেন। যেমন কর্ম তেমন ফল।

কেউ কেউ يُؤْثَرُ শব্দটিকে إِيْثَارٌ হতে গ্রহণ করে তাফসীর করেছেন, অর্থাৎ এটা এমন জাদুমন্ত্র যা অন্যান্য জাদুমন্ত্রসমূহ হতে অতি উত্তম ও উচ্চ পর্যায়ের জাদু। তাহলে অর্থ হচ্ছে− মুহাম্মদ ﷺ ও অতি বড় ধরনের একজন জাদুকর।

আর তারা বলেছে এটা হলো মানবের কথা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণী− وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ আর এটা কোনো গণকের গণনাও নয়। আল্লাহ চাহেন কাফেরদেরকে রক্ষা করার জন্য, তারা চায় নিজেরা দোজখে যাওয়ার জন্য, এ হেতু আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেন سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ আমি তার জন্য سَقَر নামক দোজখ নির্ধারিত রেখেছি। অচিরেই তাকে তাতে প্রবেশ করাবো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٦. سَاُصْلِيْهِ اُدْخِلُهُ سَقَرَ جَهَنَّمَ .

২৬. অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করবো প্রবিষ্ট করবো। সাকারে সাকার নামক দোজখে।

٢٧. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ تَعْظِيْمٌ لِشَانِهَا .

২৭. তুমি কি জান সাকার কি? এটা দ্বারা জাহান্নামের ভয়াবহতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

٢٨. لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ شَيْئًا مِنْ لَحْمٍ وَلَا عَصَبٍ اِلَّا اَهْلَكَتْهُ ثُمَّ يَعُوْدُ كَمَا كَانَ .

২৮. এটা অবশিষ্ট রাখবেনা এবং পরিত্যাগ করবে না মাংস ও হাড়ের মধ্য হতে কোনো কিছু; কিন্তু তাকে ধ্বংস করে দিবে। পুনরায় প্রত্যেক বস্তু নতুনভাবে স্ব-স্ব অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে।

٢٩. لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ مُحْرِقَةٌ لِظَاهِرِ الْجِلْدِ .

২৯. এটা গায়ের চামড়া দগ্ধ করবে প্রকাশ্য চামড়াকে জ্বালিয়ে ভস্ম করবে।

٣٠. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكًا خَزَنَتُهَا قَالَ بَعْضُ الْكُفَّارِ وَكَانَ قَوِيًّا شَدِيْدَ الْبَاْسِ اَنَا اَكْفِيْكُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ اكْفُوْنِىْ اَنْتُمْ اِثْنَيْنِ قَالَ تَعَالٰى .

৩০. এর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন উনিশজন প্রহরী ফেরেশতা। একজন কাফের যে অতিশয় শক্তিশালী ছিল, সে বলল, আমি তন্মধ্য হতে সতেরো জনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। তোমরা অবশিষ্ট দু'জনের মোকাবিলা করো। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

٣١. وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً ص اَىْ فَلَا يُطَاقُوْنَ كَمَا يَتَوَهَّمُوْنَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ ذٰلِكَ اِلَّا فِتْنَةً ضَلَالًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا بِاَنْ يَقُوْلُوْا لِمَ كَانُوْا تِسْعَةَ عَشَرَ لِيَسْتَيْقِنَ لِيَسْتَبِيْنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اَىِ الْيَهُوْدُ صِدْقَ النَّبِىِّ فِىْ كَوْنِهِمْ تِسْعَةَ عَشَرَ الْمُوَافِقِ لِمَا فِىْ كِتَابِهِمْ .

৩১. আমি তো জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ ছাড়া কাউকেও নিযুক্ত করিনি অর্থাৎ তারা তাদের মোকাবিলার শক্তি রাখে না, যেমন তারা ধারণা করছে। আর আমি তো এদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি উল্লিখিত পরিমাণ। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিভ্রান্ত করার নিমিত্ত তাদেরকে যারা কুফরি করেছে। যাতে তারা এরূপ বলবে যে, এ উনিশজন কেন? যাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে স্বপ্রমাণিত হয় তাদের নিকট যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ ইহুদিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাদের সংখ্যা উনিশ হওয়ার প্রশ্নে সত্যায়ন করে, যেহেতু তাদের কিতাব তাওরাতের সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ سَقَرَ : এটা سَاُصْلِيْهِ হতে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হিসেবে মহল্লান মানসূব।

قَوْلُهُ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ : এখানে مَا শব্দটি মুবতাদা, আর اَدْرٰكَ তার খবর অর্থাৎ اَىُّ شَيْءٍ اَعْلَمَكَ
আর مَا سَقَرُ-এর مَا মুবতাদা এবং سَقَرُ তার খবর এবং পুরা বাক্য اَدْرٰكَ-এর মাফউলে ছানী হবে।

قَوْلُهُ تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ : এরা উভয়ই حَالٌ হিসেবে মহল্লান মানসূব এবং عَامِلُ مَعْنَى التَّعْظِيْمِ (كَذَا قَالَهُ اَبُوْ الْبَقَاءِ) অর্থাৎ مَا سَقَرُ প্রশ্নটিই مَعْنَى التَّعْظِيْمِ তখন অর্থ হবে اِسْتَعْظَمُوْا سَقَرَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالِ আর لَا تُبْقِىْ وَلَا تَذَرُ-এর مَفْعُوْلٌ টি مَحْذُوْفٌ হবে اَىْ لَا تُبْقِىْ مَا بَقِىَ فِيْهَا وَلَا تَذَرُهُ بَلْ تُهْلِكُهُ আর কেউ কেউ বলেন لَا تُبْقِىْ عَلٰى مَنْ اُلْقِىَ فِيْهَا وَلَا تَذَرُ غَايَةَ الْعَذَابِ اِلَّا وَصَلَتْهُ اِلَيْهِ অথবা এরা পরস্পর جُمْلَةٌ مُسْتَاْنِفَةٌ হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ এটা উহ্য মুবতাদার খবর হবে اَىْ هِىَ আর হাসান ইবনে আবী আবলাহ ও যায়েদ ইবনে আলীর মতে এরা বাক্য
লে مَنْصُوْبٌ عَلَى الْحَالِ হবে। এটাও তিন কারণে হবে।
اَنَّهَا حَالٌ مِنْ سَقَرَ وَالْحَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى التَّعْظِيْمِ
اَنَّهَا حَالٌ مِنْ لَا تُبْقِىْ
حَالٌ مِنْ لَا تَذَرُ আল্লামা যামাখশারী (র.)-এর মতে حَالُ اخْتِصَاصٍ -
রো কারো মতে حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ . عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ এটা শিবহে ফে'লের এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে পৃথক বাক্য তথা
مُسْتَقِلٌ جُمْلَةٌ হবে।

قَوْلُهُ مَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً : এখানে اِلَّا مَلٰئِكَةً টি اَصْحٰبَ النَّارِ হতে مُسْتَثْنٰى এবং উভয় মিলে جَعَلْنَا
তে مَفْعُوْلٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا فِتْنَةً : এটা جَعَلَ হতে মাফউলে ছানী, আর لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا টি فِتْنَةً-এর সিফাত।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ : জমহুর لَوَّاحَةٌ শব্দটিকে উহ্য মুবতাদার خَبَرٌ হিসেবে مَرْفُوْعٌ পড়েছেন। আর কেউ কেউ তাকে سَقَرَ এর صِفَتٌ হিসেবেও مَرْفُوْعٌ পড়েছেন, তবে প্রথম তারকীব-ই হলো উত্তম। হাসান বসরী, নাসর ইবনে আসেম, ঈসা ইবনে ওমর ইবনে আবূ আবলাহ, যায়েদ ইবনে আলী (র.) হাল হিসেবে মানসূব পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تِسْعَةَ عَشَرَ : জমহুর عَشَرَ-এর شِيْن-এ فَتْح দিয়ে تِسْعَةَ عَشَرَ পড়েছেন। আর আবূ জা'ফর ইবনে কা'কা এবং তালহা ইবনে সোলাইমান شِيْن-এ سَاكِنْ যুক্ত করে عَشْرَ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম বায়হাকী হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক নবী করীম ﷺ -এর এক সাহাবীর নিকট জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে প্রশ্ন করল। সাহাবী নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে ব্যাপারটি জানালেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব, কাছীর]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উপরিউক্ত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াতে জাহান্নামের প্রহরীদের উনিশজনের সংখ্যাটি উল্লেখ হওয়ায় কাফেরদের মনে নতুন এক প্রশ্নের উদ্রেক হলো। তারা বলতে লাগল হযরত আদম হতে শুরু করে জাহান্নামে অগণিত মানুষের জন্য মাত্র উনিশজন প্রহরী হওয়া একটা বিস্ময়কর কথা। অতএব এটা নিয়ে কাফেরগণ হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা বলল, এ কয়জন ফেরেশতাকে কুপোকাত করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। আবূ জাহল প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল, তোমরা কি এতই দুর্বল যে দশ-দশজন লোকও এক-একজন ফেরেশতার সাথে মোকাবিলা করতে পারবে না? তখন বনী জুহাম গোত্রের একজন পালোয়ান বলল, ১৭ জনের সাথে আমি একাই মোকাবিলা করতে সক্ষম। অবশিষ্ট দু' জনকে তোমরা কাবু করে নিবে। এ ধরনের হাস্যকর কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। –[খাযেন, কাছীর]

আল্লামা সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ অবতীর্ণ হওয়ার পর আবুল আসাদ নামে কুরাইশের এক লোক বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! উনিশজন ফেরেশতা তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারবে না। আমি ডান হাত দিয়ে দশজন এবং বাম হাত দ্বারা নয়জনকে কুপোকাত করবো। তখন আল্লাহ তা'আলা.... اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً আয়াত অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُهُ سَقَرَ : উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ওয়ালীদের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলে আমি তাকে سَقَرْ নামক দোজখে প্রবিষ্ট করাবো। এখানে سَقَرْ -এর কথা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন– سَقَرْ দোজখসমূহের মধ্যে খুবই মারাত্মক পীড়াদায়ক ও কঠিন। সুতরাং ওয়ালীদ এমনি ধরনের দুষ্ট প্রকৃতির কাফের ছিল তাকে শাস্তি দানের ক্ষেত্রেও তেমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অথবা سَقَرْ সম্পর্কে আমাদের যেমন ধারণা যে তা সাধারণত কঠিন মূলত কেবল তা কঠিনই নয়, বরং তা যে কত বড় কঠিন তা মানবিক ধারণার মাধ্যমে অনুমান সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে তার ভয়াবহতা বুঝাতে গিয়ে বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি কি জানেন যে, سَقَرْ কি প্রকৃতির দোজখ? জেনে রাখুন তাতে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে তাদের রক্ত-মাংশ-হাড় ইত্যাদির কোনো কিছুই তথায় থাকবে না। জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অর্থাৎ দেহের কোনো চিহ্ন বলতে কিছুই থাকবে না। তখন পুনরায় সুগঠন যুক্ত তাজা শরীর তৈরি করে দেওয়া হবে। এটাও পূর্বেকার মতো শেষ হয়ে যাবে। এরূপ হতেই থাকবে।

প্রশ্নের উদ্দেশ্য : وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ "তুমি কি জান সাকার কি?" এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তুমি কি জান সাকার জিনিসটি কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে– তুমি সর্বাধিক জ্ঞানী এবং আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও তোমার পক্ষেও সম্ভব নয় যে, সাকার কত ভয়ঙ্কর স্থান-তা জানা। মূল উদ্দেশ্য এখানে সাকার দোজখের ভয়াবহ অবস্থা এবং ভীতিকর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তা অবশিষ্ট রাখে না, ছেড়েও দেয় না।" এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি এই যে, যে ব্যক্তিই তাতে নিক্ষিপ্ত হবে তা তাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিবে; কিন্তু জ্বলে মরে গেলেও তা তাকে ছেড়ে দিবে না; একবিন্দু নিষ্কৃতি দিবে না। তাকে আবার জীবিত করা হবে, পরে আবার তাকে জ্বালানো হবে। অপর একটি আয়াতে এ কথাটি বলা হয়েছে এ ভাষায়– لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى সে তাতে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না (আল-আ'লা : আয়াত ১৩) এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, আজাব পাওয়ার যোগ্য অধিকারী একজনকেও তা অবশিষ্ট থাকতে দিবে না। তার আয়ত্তের বাইরে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না, আর যে-ই তার আয়ত্তে আসবে তাকে আজাব না দিয়ে ছাড়বে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ : এ বাক্যেরও দু'টি অর্থ করা হয়েছে। একটি হলো لَوَّاحَةٌ শব্দটি لاح . يَلُوحُ হতে মুবালাগার সীগাহ, আর بَشَرٌ অর্থ– মানুষ। এ হিসেবে বাক্যের অর্থ হলো, জাহান্নাম বা সাকার মানুষের দৃষ্টির সামনে চমকাতে থাকবে। অর্থাৎ ভয়ঙ্কর হওয়ায় দূর হতে লোকেরা জাহান্নামকে দেখতে পাবে, ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেছেন, পাঁচ শত মাইল দূর হতে লোকেরা জাহান্নামের আগুন দেখতে পাবে। ইমাম রাযী, আল্লামা সাবূনী ও আল্লামা কুরতুবী (র.) এ তাফসীর করেছেন। আল্লামা কুরতুবী (র.) এটা হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত বলে দাবি করেছেন। এটার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, بَشَرٌ -কে بَشَرَةٌ -এর বহুবচন মনে করা। তখন বাক্যের অর্থ হবে, চামড়া ঝলসিয়ে দানকারী। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন দোজখবাসীদের চামড়া ঝলসিয়ে দিবে, কোনো অংশকে বাদ রাখবে না। মুখমণ্ডল এবং শরীরের অন্যান্য চামড়া ঝলসিয়ে দিবে। আল্লামা কুরতুবী, সাবূনী এবং ইমাম রাযী (র.) প্রথমোক্ত অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ "অর্থ তা অবশিষ্টও রাখে না, ছেড়েও দেয় না" –এ কথার পর "চামড়া ঝলসিয়ে দেয়" একথা বলার প্রয়োজন থাকে না; সুতরাং এটার অর্থ দ্বিতীয়টি–প্রথমটি নয়। তবে কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, চামড়া ঝলসিয়ে দেওয়ার কথা আবার আলাদাভাবে বলার কারণ হলো, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকট ও প্রকাশকারী আসল জিনিস হলো তার মুখাবয়ব ও তার দেহের চর্ম, তার কুশ্রীতাই তাকে খুব বেশি মানসিক অস্বস্তিতে নিমজ্জিত করে। দেহের আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকুক না কেন, সে জন্য কেউ তেমন দুঃখিত হয় না, যতটা দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও মানসিক যন্ত্রণায় নিমজ্জিত হয় তার মুখমণ্ডলের কুশ্রীতা কিংবা দেহের প্রকাশ্য অংশের উপর কুশ্রী ক্ষত চিহ্ন থাকলে, কেননা তা দেখে তার প্রতি প্রত্যেকটি লোকই ঘৃণাবোধ করতে পারে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, এ সুন্দর-সুশ্রী মুখাবয়ব ও চাকচিক্যপূর্ণ এবং নির্মম কান্তিধারী দেহের অধিকারী যেসব লোক বর্তমানে দুনিয়াতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে গৌরবে স্ফীত হয়ে আছে, তারা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহর ন্যায় শত্রুতামূলক আচরণ করতে থাকে, তাহলে তাদের মুখাবয়ব ঝলসিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের চামড়া জ্বালিয়ে কয়লার মতো কালো করে দেওয়া হবে।

এ আলোচনা হতে জানা গেল যে, গ্রন্থকার এবং আরো অনেকের কাছে আয়াতের দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণীয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ : ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে যে দোজখে প্রবেশ করানো হবে সে দোজখের উনিশজন রক্ষিবাহিনী থাকবে। যারা কাফেরদেরকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে থাকবে।

একজন ফেরেশতাই কাফেরদেরকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট। তদুপরি ১৯ জন ফেরেশতা তথায় নিযুক্ত করার অর্থ কি?

এটার বিভিন্ন কারণ হতে পারে :

১. হতে পারে জাহান্নামের আজাব বিভিন্ন প্রকারে হবে, প্রত্যেক প্রকারের জন্য এক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে।

২. অথবা, একজন ফেরেশতার মাধ্যমেই আজাবের কাজ সমাধা করা যেত ঠিকই, তবে আজাবের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে সে কাজের সুষ্ঠু আয়োজনের এবং সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একাধিক ফেরেশতা ব্যবহার করা হবে। আজাবের কার্যে কোথাও বিঘ্ন ঘটে কিনা সে দিকের প্রহরী হিসেবে একাধিক ফেরেশতা থাকবে।

৩. অথবা, উনিশ সংখ্যা দ্বারা ফেরেশতাদের আধিক্যের সমাগম হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নয়।

৪. অথবা, تِسْعَةَ عَشَرَ উনিশ দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা আল্লাহ সব চেয়ে ভালো জানেন।

কামালাইন গ্রন্থকার বলেন, تِسْعَةَ عَشَرَ বলে যে সকল ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে তাদের অন্তর থেকে রহমত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর তারা প্রত্যেকেই ৭০ হাজার গুনাহগারকে হাঁকিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তাদেরকে এ জন্য নির্ধারিত করেছেন।

Free @ www.eilm.weebly.com

৫. ইমাম রাযী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন। আল্লাহ তা'আলা দোজখের ব্যবস্থাপনায় উনিশজন ফেরেশতার যে কথা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন তার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন تِسْعَةَ عَشَرَ -এর পর আরেকটি কথা উহ্য থাকতে পারে, আর তা হলো صِنْفًا তথা উনিশ প্রকার ফেরেশতা।

৬. আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, تِسْعَةَ عَشَرَ -এর পর صِفٌ শব্দটি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ উনিশ কাতার ফেরেশতা। -[কাবীর, মা'আরিফ]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً : অর্থ- "আমি দোজখের কর্মচারী ফেরেশতা ছাড়া অন্য কাউকেও বানাইনি।" আলোচ্য আয়াতে এক শ্রেণির লোকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। সে লোকেরা বলাবলি করেছিল যে, হযরত আদম (আ.) হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক পাপ করেছে তাদের সকলকে আজাব দানের জন্য মাত্র ১৯ জন ফেরেশতা কি যথেষ্ট হতে পারে? সে ১৯ জনের মোকাবিলা করাতো কয়েকজন শক্তি-সামর্থ্য মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তাদের এ জাতীয় কথাবার্তার জবাব আলোচ্য আয়াতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- দোজখের কর্মচারী আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকে নিযুক্ত করেননি। যাদেরকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে তারা ফেরেশতা। তাদের শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। তারা সংখ্যায় কম হলেও সমস্ত পাপী লোকদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়েও তাদের মোকাবিলা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ফেরেশতাদের শক্তি-সামার্থ্যেরে প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ "আর তোমার প্রতিপালকে সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।" অর্থাৎ তারা কত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

জাহান্নামের কর্মচারী ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামে কর্মরত ফেরেশতাগণের সংখ্যা উল্লেখ করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১. কাফেরদেরকে পরীক্ষা করা এর উদ্দেশ্য। কেননা শানে নুযূল হতে জানা যায় যে, তারা এ সংখ্যার কথা শুনে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের কথা বলাবলি করেছে এতেই তাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে।

২. আহলে কিতাবগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধিকরণ। এ সংখ্যার কথা শুনে ঈমানদারগণ মেনে নিয়েছেন। সে কারণেই তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আহলে কিতাবগণের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার এবং কতিপয় তাফসীরকার বলেছেন, ইহুদি, খ্রিস্টান, আহলে কিতাবদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতেও দোজখের ফেরেশতাদের এ সংখ্যাই উদ্ধৃত হয়েছে বিধায় এ সংখ্যাটির কথা শুনে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, এ কথাটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর বলা কথা। ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলে এটাই বুঝিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এ তাৎপর্য দু'টি কারণে যথার্থ নয়। একটি এই যে, ইহুদি ও নাসারাদের যেসব ধর্মীয় বই-কিতাব দুনিয়াতে পাওয়া যায়, তাতে শত খোঁজাখুজি করেও দোজখের ফেরেশতাদের এ সংখ্যার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি। কাজেই তাফসীরকারদের উক্ত কথার কোনো ভিত্তি নেই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে- কুরআন মজীদে এমন অনেক কথাই পাওয়া যায়, যা আহলে কিতাবদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলিতেও বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে না, উপরন্তু এ বলে মিথ্যা অভিযোগ তোলে যে, মুহাম্মদ ﷺ এসব কথা তাদের গ্রন্থাবলি হতে গ্রহণ করেছেন। এসব কারণে আমাদের মতে, আলোচ্য আয়াতটির সঠিক তাৎপর্য এই হবে যে, মুহাম্মদ ﷺ ভালোভাবেই জানতেন যে, তাঁর মুখে দোজখের উনিশজন ফেরেশতার কথা শুনা মাত্রই তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ ওহীতে যে কথাই বলা হয়েছে, তা তিনি কোনোরূপ ভয়ভীতি ও দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই প্রকাশ্যভাবে লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন এবং কোনোরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপের একবিন্দু পরোয়া করলেন না। আরবের মূর্খ লোকেরা নবীগণের মান-মর্যাদা সম্পর্কে কিছুই জানত না; কিন্তু নবী-রাসূলগণ যে আল্লাহর নিকট হতে আসা প্রত্যেকটি কথাই যথাযথভাবে জনগণের নিকট উপস্থাপিত করে থাকেন- তা লোকদের পছন্দ হোক না-ই হোক -এ কথা আহলে কিতাবগণ ভালোভাবেই জানত। এ কারণে নবী করীম ﷺ-এর কর্মনীতি প্রত্যক্ষ করে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করবে যে, এত কঠিন বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও বাহ্যত এরূপ আশ্চর্যজনক কথাটিও কোনোরূপ দ্বিধা-ভয়-সংকোচ ব্যতীতই জনগণের নিকট পেশ করে দেওয়া কেবলমাত্র প্রকৃত নবী-রাসূলেরই কাজ হতে পারে- আহলে কিতাবদের প্রতি এটা ছিল একটা বড় আশা।

৩. আহলে কিতাব এবং ঈমানদার লোকদের অন্তর হতে সন্দেহ দূরীকরণ। এ কথাটি পূর্বের কথার সম্পূরক। কারণ এ সংখ্যার ব্যাপারে কারো অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিলে অবশ্যই সন্দেহ মন হতে দূরীভূত হয়ে যাবে।

আর মুনাফিক এবং কাফিরগণ বলবে- এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং তার দ্বারা জানতে চান কে এ সংখ্যা বিশ্বাস করে হেদায়েত গ্রহণ করে; আর কে অবিশ্বাস করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। মূলতঃ জাহান্নামের এ বিবরণ মানুষের জন্য সাবধান বাণী হিসেবেই দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣١. وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِيْمَانًا تَصْدِيْقًا لِمُوَافَقَةِ مَا اَتٰى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِمَا فِىْ كِتَابِهِمْ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لا مِنْ غَيْرِهِمْ فِىْ عَدَدِ الْمَلَائِكَةِ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ شَكٌّ بِالْمَدِيْنَةِ وَالْكَافِرُوْنَ بِمَكَّةَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا الْعَدَدِ مَثَلًا ط سَمَّوْهُ لِغَرَابَتِهِ بِذٰلِكَ وَاُعْرِبَ حَالًا كَذٰلِكَ اَىْ مِثْلَ اِضْلَالِ مُنْكِرِ هٰذَا الْعَدَدِ وَهُدٰى مُصَدِّقِهِ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۤءُ لا وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ الْمَلَائِكَةَ فِىْ قُوَّتِهِمْ وَاَعْوَانِهِمْ اِلَّا هُوَ ط وَمَا هِىَ اَىْ سَقَرُ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ .

অনুবাদ :

৩১. আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে তাদের ঈমানে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আনয়ন করেছেন, তা তাদের কিতাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর আহলে কিতাব ও মু'মিনগণ সন্দেহে পতিত না হয় অন্যের দ্বারা ফেরেশতাগণের সংখ্যা সম্পর্কে। আর যেন বলে, তারা যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে মদীনায় অবস্থানকারী সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এবং কাফেরগণ মক্কায় অবস্থানকারী আল্লাহ কি ইচ্ছা করেছেন এটা দ্বারা এ সংখ্যা দ্বারা উদাহরণ হিসেবে এর অভিনবত্বের কারণে কাফেরগণ একে উদাহরণ রূপে আখ্যায়িত করেছে এবং حال রূপে তাতে ই'রাব দেওয়া হয়েছে। এভাবে অর্থাৎ অস্বীকারকারীগণের পথভ্রষ্টতা ও বিশ্বাসীদের হেদায়েতের ন্যায় যাকে ইচ্ছা আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। আর তোমার প্রতিপালকের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে তিনি ব্যতীত অপর কেউ জানে না ফেরেশতাগণের শক্তি ও তাদের সহযোগিতা সম্পর্কে। আর এটা তো জাহান্নামের এ বর্ণনা মানুষের জন্য সাবধান-বাণী মাত্র।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَيَزْدَادَ : এটা তৎপূর্ববর্তী لِيَسْتَيْقِنَ -এর উপর হয়েছে অর্থাৎ لَامْ كَيْ -এর পর اَنْ مُقَدَّرْ থেকে তাদেরকে نَصَبْ প্রদান করেছে।

قَوْلُهُ اِيْمَانًا : এটা يَزْدَادُ -এর মাফঊল হিসেবে মানসূব হয়েছে। الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ এবং وَالْمُؤْمِنُوْنَ অংশ لَايَرْتَابَ হতে مَحَلْ فَاعِلْ হিসেবে মারফূ' হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلِيَقُوْلَ وَالْكَافِرُوْنَ : এরাও يَزْدَادُ -এর উপর আতফ হয়েছে।

كَذٰلِكَ -এর مُشَارٌ اِلَيْهِ উহ্য থাকবে অর্থাৎ مَعْنَى الْجُمْلَةِ ।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا : এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের দোজখের রক্ষক নিযুক্ত করার আর একটি রহস্য বর্ণনা করেছেন– আল্লাহ বলেন, দোজখের রক্ষিবাহিনীর সংখ্যা মাত্র উনিশ, এ কথা শুনামাত্রই ঈমানদারদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

اَلْاِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ . فَكَيْفَ قَالَ تَعَالٰى وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا .

ঈমান বৃদ্ধিও হয় না এবং তাতে কোনো কমতিও হয় না তথাপি আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বলেছেন– وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا জালালাইন গ্রন্থকার তার তাফসীরে এর একটি উত্তর দিয়েছেন, তাহলো– تَصْدِيْقًا لِمُوَافَقَةِ مَا اَتٰى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ كِتَابِهِمْ

১. অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থেও এ উনিশ সংখ্যার কথা বর্ণনা রয়েছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সেই অনুরূপ কথাই পুনরায় ব্যক্ত করেছেন।

অতএব এ বিষয়টিকে তারা মনে-প্রাণে সত্য বলে মেনে নিতে তাদের আর কোনো সন্দেহ রইল না। এতে তাদের একিন ও দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জীল যা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা সত্য সত্যই পাওয়া গেছে। যার ফলে মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য বলে মেনে নেওয়ার বিষয়ে সংকোচ বোধ করতে হবে না।

২. অথবা, ঈমান বৃদ্ধি হওয়ার অর্থ হলো– ثَمَرَةُ الْاِيْمَانِ তথা ঈমানের নূর বা ফোকাস বৃদ্ধি হবে, ঈমানের শক্তি ও مَضْبُوطِىْ বৃদ্ধি হবে, ঈমান ও একিন প্রগাঢ় হবে। এমন বিশ্বাস অন্তরে জন্মিলে, অগাধ সম্পদের বিনিময়েও যাকে প্রাণকেন্দ্র হতে বিলীন হতে দিবে না। নতুবা হাকিকতে ঈমান বৃদ্ধি ও কমতি হয় না। –[মা'আরিফ, মাদারিক]

وَلَا يَرْتَابَ .... وَالْمُؤْمِنُوْنَ : قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ ... بِهٰذَا مَثَلًا আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সংখ্যা বর্ণনার আরো একটি কারণ বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, আমি উক্ত উনিশ সংখ্যার কথা বর্ণনা করেছি এ জন্য যাতে সাধারণ মু'মিন ও মুসলমান এবং ইহুদি ও নাসারাগণ নিঃসন্দেহ হয়ে যায় যে, আমি আল্লাহ যা বলেছি তা-ই সত্য দোজখীদেরকে উনিশজন ফেরেশতার মাধ্যমে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া আমার পক্ষে সত্যই সম্ভব, আর এ কথাও যেন তারা জেনে রাখে যে, এ নগণ্য ক্ষমতা দ্বারা আমি অতি বৃহৎ কার্য সমাধান করতে ভালোরূপেই ক্ষমতা রাখি।

আর وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ الخ আয়াত দ্বারা বলা হয়েছে, বক্র অন্তরের অধিকারীগণও আল্লাহর নাফরমানগণ। আল্লাহর কোনো কুদরত বা ক্ষমতাকে বিশ্বাস করতে চায় না, এ বিষয়টি শুনে তারা যেন আরো বেশি বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এবং নাফরমানির সাগরে আরও বেশি করে হাবুডুবু খেতে থাকে। আল্লাহর কুদরতের সাথে তামাশা করে যেন নিজেদের পাপের বোঝা আরো বাড়িয়ে তোলে, কারণ মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীদেরকে পাপ কাজের সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তাদেরকে ধ্বংসের গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। সুতরাং তারা ধ্বংসের সাগরে লিপ্ত হওয়ার জন্য যেন আরো অধিক সুযোগ গ্রহণ করে, ফলে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার সুব্যবস্থা লাভ করে। আর বলতে থাকে যে, আল্লাহ এত মহান সত্তা অথচ তিনি কত হীন কল্পনায় লিপ্ত হয়েছেন। আর বক্র অন্তরে আল্লাহর হেকমত সম্পর্কে আলোচনা করে কেবল পথভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۤءُ (الاية) : আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে ও আদেশাবলিতে মাঝে-মধ্যে এমন কিছু কথা বলে দেন– যা এক শ্রেণির লোকদের জন্য ঈমান পরীক্ষার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। মূলত তাকে একজন সত্যপন্থি, সুস্থ মন-মেজাজ ও সঠিক চিন্তা-ভাবনার লোক শুনতে পেয়ে তার সহজ-সরল অর্থ বুঝতে পেরে সঠিক পথ অবলম্বন করে। সে কথাটিই বক্রবুদ্ধি ও সত্য-সততা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ শুনতে পেলে তার বাঁকা অর্থই গ্রহণ করে থাকে। আর প্রকৃত সত্য হতে দূরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য একেকটি বাহানা বানিয়ে নেয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজেই যেহেতু সত্যবাদী ও সত্যপন্থি, তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে হেদায়েত দান করেন। কেননা, যে লোক বাস্তবিকই হিদায়েত পেতে চায় তাকে জোরপূর্বক গুমরাহ করে দিবেন, এটা কখনো আল্লাহর নিয়ম নয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যেহেতু নিজেই হেদায়েত পেতে ইচ্ছুক নয়, সে নিজের জন্য পথভ্রষ্টতাকেই পছন্দ করে নিচ্ছে, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে গুমরাহীর পথেই চলার সুযোগ দেন। কেননা যে লোক নিজেই সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় এবং তাকে ঘৃণা করে, আল্লাহ তাকে জোরপূর্বক সত্যের পথে নিয়ে আসবেন তাও তাঁর নিয়ম নয়। উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ : পূর্বে যে উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের অধিনায়ক স্বরূপ। তাদের অধীনে কত ফেরেশতা আছে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন সপ্তম আসমানে রয়েছে বাইতুল মা'মূর, তাতে প্রতি দিন সত্তর হাজার নতুন ফেরেশতা তওয়াফ করে, এরা জীবনে আর কখনো তওয়াফ করার সুযোগ পায় না। অতএব, ফেরেশতার সংখ্যা কত হবে তা কল্পনা করাও কঠিন। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٢. كَلَّا اِسْتِفْتَاحٌ بِمَعْنَى اَلَا وَالْقَمَرِ .

৩২. যথার্থই كَلَّا শব্দটি اَلَا অর্থে اِسْتِفْتَاحْ -এর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে চন্দ্রের শপথ।

٣٣. وَالَّيْلِ اِذَا بِفَتْحِ الذَّالِ دَبَرَ جَاءَ بَعْدَ النَّهَارِ وَفِيْ قِرَاءَةٍ اِذْ اَدْبَرَ بِسُكُوْنِ الذَّالِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ اَيْ مَضٰى .

৩৩. শপথ রাতের, যখন তা اِذَا শব্দের ذَالْ -এ যবর যোগে পঠিত আগত হয় দিনান্তে আগমন করে। অপর এক কেরাতে শব্দটি اِذْ اَدْبَرَ তথা اِذْ ذَالْ -এ সাকিন যোগে তৎপরে একটি হামযাসহ পঠিত হয়েছে অর্থাৎ অবসান ঘটেছে।

٣٤. وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ ظَهَرَ .

৩৪. আর শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়েছে প্রকাশ লাভ করেছে।

٣٥. اِنَّهَا اَيْ سَقَرَ لَاِحْدَى الْكُبَرِ الْبَلَايَا الْعِظَامِ .

৩৫. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ সাকার নামক জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের একটি বৃহত্তম মসিবতের মধ্যে অন্যতম।

٣٦. نَذِيْرًا حَالٌ مِنْ اِحْدَى وَ ذُكِّرَ لِاَنَّهَا بِمَعْنَى الْعَذَابِ لِلْبَشَرِ .

৩৬. সতর্ককারী এটা اِحْدٰى হতে حَالٌ আর তাকে مُذَكَّرْ অর্থে এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু এটা عَذَابٌ অর্থে ব্যবহৃত মানুষের জন্য ।

٣٧. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ بَدْلٌ مِنَ الْبَشَرِ اَنْ يَتَقَدَّمَ اِلَى الْخَيْرِ اَوِ الْجَنَّةِ بِالْاِيْمَانِ اَوْ يَتَاَخَّرَ اِلَى الشَّرِّ اَوِ النَّارِ بِالْكُفْرِ .

৩৭. তোমাদের মধ্য হতে যে চায় এটা পূর্বোক্ত بَشَرٌ হতে بَدْلٌ অগ্রগামী হতে কল্যাণ অথবা বেহেশতের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে কিংবা পশ্চাৎগামী হতে মন্দ বা জাহন্নামের দিকে কুফরির মাধ্যমে।

٣٨. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ مَرْهُوْنَةٌ مَاْخُوْذَةٌ بِعَمَلِهَا فِي النَّارِ .

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ رَهِيْنَةٌ শব্দটি مَرْهُوْنَةٌ (দায়বদ্ধ) অর্থে ব্যবহৃত। দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে স্বীয় আমলের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হবে।

٣٩. اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ فَنَاجُوْنَ مِنْهَا كَائِنُوْنَ .

৩৯. দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ ব্যতীত। তারা হলো মু'মিনগণ, তারা তা হতে পরিত্রাণ লাভ করবে।

٤٠. فِيْ جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ بَيْنَهُمْ .

৪০. তারা অবস্থান করবে স্বর্গীয় উদ্যানে এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে তাদের মধ্যে একে অপরকে।

٤١. عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ وَحَالِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ لَهُمْ بَعْدَ اِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ .

৪১. অপরাধীগণ সম্পর্কে এবং তাদের অবস্থা সম্বন্ধে এবং একত্ববাদীদেরকে দোজখ হতে বের করে আনার পর তাদের উদ্দেশ্যে বেহেশতীগণ বলতে থাকবে।

٤٢. مَا سَلَكَكُمْ اَدْخَلَكُمْ فِيْ سَقَرَ .

৪২. কিসে তোমাদেরকে পরিচালিত করেছে প্রবিষ্ট করেছে জাহান্নামে।

٤٣. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ .

৪৩. তারা বলবে, আমরা মুসল্লিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না ।

٤٤. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ .

৪৪. আর আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٥. وَكُنَّا نَخُوضُ فِى الْبَاطِلِ مَعَ الْخَائِضِيْنَ .

৪৫. আর আমরা ছিদ্রান্বেষণ করতাম বাতিল পন্থায় ছিদ্রান্বেষণকারীদের সাথে।

٤٦. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ .

৪৬. আর আমরা কর্মফল দিবসের প্রতি অসত্যারোপ করতাম পুনরুত্থান ও প্রতিফলের দিনের।

٤٧. حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ الْمَوْتُ .

৪৭. এমনকি আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল মৃত্যু।

٤٨. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْمَعْنٰى لَا شَفَاعَةَ لَهُمْ .

৪৮. ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না ফেরেশতা, নবী (আ.) ও নেককারগণের সুপারিশ। এর অর্থ হলো, তাদের জন্য কোনোই সুপারিশ নেই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَلَّا : এটা حَرْفُ رَدْعٍ অথবা حَرْفُ اِسْتِفْتَاحٍ

قَوْلُهُ وَالْقَمَرِ الخ : وَاللَّيْلِ الخ . وَالصُّبْحِ الخ এগুলো جُمْلَةٌ مُسْتَقِلٌ অর্থাৎ عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ হয়েছে এবং جُمْلَةٌ قَسَمِيَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ نَذِيْرًا : এটা اِحْدٰى হতে تَمْيِيْز বা حَالٌ হিসেবে মানসূব مَعْنَى التَّعْظِيْمِ-এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার দরুন। فِعْلٌ مُقَدَّرٌ টি نَذِيْرًا অথবা نَكِيْر بِمَعْنَى اِنْكَار যেমন, اِنْذَار অর্থ হবে نَذِيْر তখন اَعْظَمُ الْكِبَرِ انذر যেমন বলা হয়েছে اِحْدٰى অথবা مَنْصُوْبٌ হিসেবে حَالٌ হতে ضَمِيْرٌ-এর اِنَّهَا অথবা তা। অনুরূপ ইমাম ফাররার বক্তব্য - مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ হবে كِبَرٌ হতে حَالٌ অথবা فَاعِلٌ-এর قَسَمٌ হতে অথবা اَعْظَمُ الْكِبَرِ مُنْذِرَةً তখন অর্থ হবে حَالٌ থেকে ضَمِيْرٌ-এর كِبَرٌ বা حَالٌ-এর ضَمِيْر হতে حَالٌ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ : এটা كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ হতে مُسْتَثْنٰى হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ جَنّٰتٍ : এটা مُبْتَدَأٌ مَحْذُوْفٌ-এর খবর, অথবা اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ হতে হাল, বা يَتَسَاءَلُوْنَ হতে حَالٌ হিসেবে মানসূব।

قَوْلُهُ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ : এটা جُمْلَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ আর الَّذِيْنَ ...... قَالُوْا لَمْ نَكُ বাক্যগুলো جَوَابُ اِسْتِفْهَامٍ স্বরূপ।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَلَّا : আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, "كَلَّا" 'কখনো নয়', একথা বলে আবূ জাহল ও তার সাথীদের ভিত্তিহীন কথার উপর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, এ মর্মে যে, তারা কখনো দোজখের প্রহরীদের মোকাবিলা করতে পারবে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

অথবা, ফেরেশতাগণ যাদের কথা ইতঃপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে।

অথবা, এ সূরাতে বর্ণিত সব বিষয়গুলো হলো মানুষের জন্য উপদেশ কিন্তু কাফেররা এর দ্বারা কখনো উপদেশ গ্রহণ করবে না।

অথবা, এর অর্থ হলো, যারা পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের কথাকে বিদ্রূপ করত তাদের জন্য রয়েছে এতে বিশেষ সতর্কবাণী।

–[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَلَّا وَالْقَمَرِ ... اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "কখনো নয়, চন্দ্রের শপথ, শপথ রাত্রের– যখন তা প্রত্যাবর্তন করে। আর প্রভাতকালের যখন তা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এ দোজখ বড় বড় জিনিসগুলোর মধ্যের একটি।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, রাত্রি ও প্রভাতের শপথ করেছেন। এ শপথের তাৎপর্য হলো, চন্দ্র, সূর্য এবং রাত্রির প্রত্যাগমন আল্লাহ তা'আলার মহাক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন, যা মানুষের সম্মুখে দেদীপ্যমান, মানুষ এগুলোকে অহরহ অবলোকন করছে; কিন্তু এর কোনো একটিকে যেমন সূর্যকে লুকিয়ে রেখে যদি বলা হতো যে, সূর্য বিরাট একটি অনলকুণ্ড যা জীবকুল ও জড় জগতের জন্য তাপ বিতরণ করে; তবে অনেকের মনে হয়তো বিশ্বাস হতো না। কারণ তারা তো এটাকে দেখছে না। চোখে না দেখলে অবিশ্বাস করা অথবা তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতার কাজ। তাই আল্লাহ চন্দ্র, রাত্রি ও প্রভাতের শপথ দ্বারা বুঝাচ্ছেন যে, এগুলো যেমন আমার কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর, তেমনি জাহান্নামও আমার কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর, তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য, তোমরা বিশ্বাস না করলে তার অবাস্তবতা প্রমাণ হয় না। তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, চন্দ্র ও দিবা-রাত্রির আবর্তন যখন সত্য তখন জাহান্নামও নিঃসন্দেহে সত্য ব্যাপার। চন্দ্র, রজনী ও প্রভাতের শপথ দ্বারা মূলত আল্লাহ তা'আলা এ কথাই বুঝাতে চাচ্ছেন।

সকালবেলা রাত্রি ও চন্দ্রের শপথ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলার দস্তুর রয়েছে, তিনি তাঁর যে কোনো সৃষ্টি অথবা স্বীয় সত্তার শপথ করে অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছুর সততা প্রকাশ করে থাকেন। তাই এখানেও উপরোল্লিখিত বিষয়ের শপথ করে سَقَرْ -এর সত্যতা বর্ণনা করেছেন।

অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, চন্দ্র আল্লাহর মহাকুদরতের একটি সৃষ্টি, তা তাঁর কুদরতেই প্রতিদিন নিয়মিতভাবে উদিত ও অস্তমিত হয়। অনুরূপভাবে রাত্রিও তাঁর বিশেষ কুদরতের এক লীলা, প্রতি ২৪ ঘণ্টায় যা মানুষকে একবার আচ্ছাদিত করে এবং প্রত্যেক রাত্রির শেষে উজ্জ্বল হয়ে দিনের চিহ্ন প্রকাশিত হয়। এগুলো যেমনিভাবে তাঁর মহান কুদরতের মহান লীলা হিসেবে আগমন প্রস্থান করছে, অনুরূপভাবে বুঝে নিতে হবে যে দোজখও সময় সাপেক্ষে আল্লাহর মহান কুদরতে একদিন সংঘটিত হবেই হবে। তা ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে তৈরি হবে। তাকে অস্বীকার করা চলবে না। যে আল্লাহ কুদরতের এত বড় বড় নিদর্শন দ্বারা দুনিয়া ভরপুর করেছেন, তিনি দোজখ সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে কেউ ধারণা করতে পারে? কেউ যদি তা অস্বীকার করে তবুও তার বাস্তবতা প্রকাশ পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ : গ্রন্থকার আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেছেন [اِنَّهَا -এর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ سَقَرْ হিসেবে, আর كُبَرْ -এর অর্থ বিপদ হিসেবে] "এ জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদের অন্যতম।" আর কেউ কেউ ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করাকে মনে করে অর্থ করেছেন, "তাদের হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকারকরণ এক ভয়াবহ অন্যায় বা বিপদ।" আর কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, "কিয়ামত সংঘটিত হওয়া হলো ভয়াবহ বিপদের অন্যতম বিপদে।" আবার কেউ বলেছেন, এর অর্থ "এ 'সাকার' জাহান্নামসমূহের মধ্যে অন্যতম।"

قَوْلُهُ تَعَالٰى نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ : نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ আয়াতের অর্থ "এটা (জাহান্নাম) মানুষকে সতর্ক করার জন্য"। অর্থাৎ জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা'আলা এ আলোচনার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষকে সতর্ক করেছেন। তারা যেন এমন কোনো কাজ না করে যার ফলে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়। এটা ইমাম হাসান বসরী (র.)-এর অভিমত।

আর কেউ কেউ বলেছেন, এখানে 'নাযীর' বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন সতর্ককারী এবং আল্লাহর আজাব হতে বাঁচানোর জন্য সাবধানবাণী উচ্চারণকারী।

আর কেউ বলেছেন, نَذِيْرٌ -এর অর্থ হলো পবিত্র কুরআন 'সতর্কবাণী'। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে মানুষকে উদ্দেশ্য করে অসংখ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এখানে মানুষকে হেদায়েতের পথ দেখানো যেমন হয়েছে তেমনি আল্লাহর আজাব হতে বাঁচার জন্য সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ : এখানে অগ্রসর হতে চাওয়ার অর্থ হলো ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য হতে পশ্চাতে থাকা। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– জাহান্নামের শাস্তি হতে কাফের মু'মিন সকলকেই সতর্ক করা হয়েছে, অতঃপর এ সতর্কবাণী শুনে যার ইচ্ছা সে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে। আর যার ইচ্ছা হয় না, সে ঈমান ও আনুগত্যের পথ হতে পশ্চাতে থেকে যেতে পারে।

সুদ্দী (র.) বলেছেন, এটার অর্থ যার ইচ্ছা হয় সে উপরে উল্লিখিত জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে পারে, অথবা ইচ্ছা করলে পশ্চাতে থেকে জান্নাতের দিকে যেতে পারে। –[ফাতহুল কাদীর, মা'আরিফ]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা যার সম্পর্কে চান যে, সে ঈমান এবং আনুগত্যের পথ গ্রহণ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে অথবা কুফরির পথ অবলম্বন করে পশ্চাতে পড়ে থাকতে পারে। আল্লামা শওকানী (র.) বলেন প্রথমোক্ত অর্থই উত্তম। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, প্রত্যেক লোকই স্বীয় কাজের জন্য দায়বদ্ধ। رَهِيْنَةٌ শব্দের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে ঋণের অনুকূলে জামানত রাখা। নির্দিষ্ট সময় ঋণের অর্থ প্রত্যর্পণ করে জামানত ছিড়িয়ে আনতে হয়। নতুবা তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এ জগতে মানুষকে যাবতীয় উপায়-উপকরণ দ্রব-সামগ্রী, শক্তি-যোগ্যতা-ক্ষমতা মানুষকে নেককাজ করার জন্য ঋণ দিয়েছেন। আর বিনিময়ে মানুষের সত্তাটিকে তাঁর নিকট জামানত বা রেহেন রাখা হয়েছে। সুতরাং পরকালে মানব সত্তাকে নেককাজ দ্বারাই ছড়িয়ে আনতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করবেন। এ কথাই উপরিউক্ত كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, মানব সত্তাটি তার কৃতকর্মের অনুকূলে আবদ্ধতার সত্তাকে বন্দীদশা হতে ছাড়াতে হলে নেককাজের বিনিময়ে ছাড়াতে হবে। নতুবা চিরদিনের জন্য তা জাহান্নামেরই খোরাকে পরিণত হবে। ইসলাম অতি গুরুত্বপূর্ণ যেসব কথা এবং যে বাস্তব সত্য জিনিস প্রচার করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে– প্রত্যেক লোক স্বীয় আমল দ্বারা দায়বদ্ধ, অন্যের বদ আমল বা গুনাহ তাকে বহন করতে হবে না। তার নিজের আমলই তাকে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি দিবে আর আপন কর্ম ফলেই সে জাহান্নামে যাবে। এখানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) বা মাতা-পিতার অথবা পূর্ব-পুরুষদের দোষে কাউকেও দোষী করা হবে না, কাউকেও পাকড়াও করা হবে না। যেমনটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় মনে করে থাকে। তেমনি কোনো ব্যক্তি দোষী হলে অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজনের সৎকর্ম দ্বারা তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। –[রূহুল কোরআন]

পূর্বে "যার ইচ্ছা সে জান্নাতের পথে অগ্রসর হতে পারে অথবা পশ্চাতেও থেকে যেতে পারে" বলার পর এখানে "প্রত্যেক লোক স্বীয় আমল দ্বারা দায়বদ্ধ" কথাটি বলার তাৎপর্য হচ্ছে– প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আপন আমল দ্বারা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়া। আপন কর্মের ফলে আত্মঘাতি পথ বেছে নেওয়া কারো জন্য কখনো উচিত নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ" : অর্থ "দক্ষিণপন্থি লোকদের ব্যতীত।" অন্য কথায় বামপন্থি লোকেরা তো তাদের অর্জন করা গুনাহ-খাতার কারণে গ্রেফতার হয়ে যাবে, কিন্তু দক্ষিণপন্থি লোকেরা নিজেদের এহেন বন্দীদশা থেকে নিজেদেরকে নিজেরাই নিষ্কৃত করে নিবে।

اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ এবং اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ এ কথা দু'টি পবিত্র কুরআনে আখেরাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ও সৌভাগ্যবান লোকদের জন্য ব্যবহার করে থাকেন। তদ্রূপ যেসব লোক পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জাহান্নামী হবে তাদেরকে বুঝানোর জন্য اَصْحَابُ الشِّمَالِ এবং اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ ব্যবহার করে থাকেন। –[রূহুল কোরআন]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ তারাই হবে যারা পবিত্র সত্তা, যারা মোবারক।

ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন, اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ দ্বারা একনিষ্ঠ ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত কাসেম (র.) বলেন, যে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে সেই اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ তথা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।

হযরত আলী (রা.)-এর মতে, اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ দ্বারা মুসলমানদের শিশুদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা শৈশবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তারা কোনো আমলও করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর বর্ণায় এসেছে যে, এর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ : অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ (ডানপন্থিগণ) জাহান্নামীদেরকে তাদের জাহান্নামী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন করবে, হে জাহান্নামী দল! তোমাদেরকে কি কারণে দোজখে প্রবেশ করানো হয়েছে?

আর জান্নাতীগণ জান্নাতে স্থায়িত্ব লাভ করার পর এ প্রশ্ন করবেন।

কাবীর গ্রন্থকার يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ -এর তাফসীর করেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে স্থান লাভ করবে, তখন গায়েব হতে আওয়াজ আসবে।

يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ بِلَا مَوْتٍ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ بِلَا مَوْتٍ উক্ত আওয়াজ শুনে জান্নাতীগণ পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্ন করবে। দোজখবাসী (اَهْلَ النَّارِ) বলে যাদেরকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তারা কারা? তারা কোথায়? ইত্যবসরেই জান্নাতবাসীদের ও জাহান্নামীদের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর জান্নাতীগণ জাহান্নামীদেরকে লক্ষ্য করে স্বয়ং প্রশ্ন করবে যে, مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ তোমাদেরকে কি কারণে দোজখে আসতে হয়েছে?

অথবা, يَتَسَاءَلُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنْ حَالِ الْمُجْرِمِيْنَ - يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ -এর মর্মার্থ এই হবে যে, বেহেশতবাসীগণ নিজেরাও নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى "لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ .... بِيَوْمِ الدِّيْنِ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, জাহান্নামবাসীরা বলবে- "আমরা নামাজি ছিলাম না, আমরা অভাবীগণকে পানাহার করাতাম না। আর আমরা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে কথা রচনাকারীদের সাথে মিলিত হয়ে আমরাও অনুরূপ কথা রচনা করতাম। আর আমরা কিয়ামত দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম।" অর্থাৎ এ চারটি কারণেই তাদেরকে জাহান্নামী হতে হয়েছে। এ আলোচনা হতে এ চার কাজের গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝা যাচ্ছে। নিম্নে এ চারটি কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো-

১. উপরিউক্ত لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ আয়াতের বক্তব্যে প্রকাশ পায় যে বে-নামাজি হওয়ার কারণেই জাহান্নামী হতে হয়েছে। ঈমানদার হয়েও যদি নামাজ আদায় করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামী হবে, কেননা নামাজ হলো ঈমানের ফলিতরূপ। ঈমান গ্রহণের সাথে সাথেই নামাজকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নামাজ আদায় না করলে সে আল্লাহর নিকট ঈমানদার থাকলেও সামাজিক জীবনে তাকে ঈমানদার ভাবা যায় না। নবী করীম ﷺ বলেছেন, নামাজ মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে প্রভেদকারী। তিনি আরো বলেছেন, যে লোক ইচ্ছাপূর্বক নামাজ পরিত্যাগ করল সে যেন কুফরি করল। আল-কুরআনের উপরিউক্ত বক্তব্য এবং হাদীসের বিবৃতি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বে-নামাজির স্থান কোথায় তা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয়।

২. আলোচ্য আয়াতে জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামী হওয়ার দ্বিতীয় কারণ প্রসঙ্গে বলেছে, "আমরা মিসকিনদের খাদ্য খাওয়াতাম না" এটা হতে জানা গেল যে কোনো লোককে ক্ষুধায় কাতর দেখে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে খাবার না খাওয়ানো ইসলামের দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহের কাজ। মানুষ যেসব কারণে দোজখী হবে সে কারণসমূহের মধ্যে এ ব্যাপারটিকেও গণনা করা হয়েছে। এটা হতে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে। মিসকিনদেরকে কাপড়-চোপড় দান, বাসস্থান দানও খাদ্য দানের অন্তর্ভুক্ত। তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ না করার ফলেই তারা অপরাধী এবং তারা অন্যান্য সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। যেমনি তারা সংঘবদ্ধ হয়ে হত্যা, রাহাজানি চালাচ্ছে। এসব কারণেই যারা মিসকিনদেরকে তাদের ন্যূনতম জীবন-যাপনের অধিকার হতে বঞ্চিত করছে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী। -[রূহুল কোরআন]

৩. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ এর তাৎপর্য হচ্ছে- এ জাহান্নামীরা ইসলাম, কুরআন এবং নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা কথা প্রচার করত। এর ফলেই তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হয়েছে। আজকে যেসব লোক ইসলামি আকীদা, ইসলামের ইবাদত, ইসলামের বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে তাদের ক্ষেত্রেও আলোচ্য আয়াত পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য হবে। -[রূহুল কোরআন, যিলাল]

৪. জাহান্নামী হওয়ার চতুর্থ কারণ হলো পরকাল অবিশ্বাস করা, পরকালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। তার কারণ হচ্ছে- পরকাল অবিশ্বাস মানুষকে প্রবৃত্তি-পূজারী এবং লাগামহীন করে ছাড়ে। আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানুষকে জাগ্রত মন এবং সচেতন করে তোলে, সে প্রতি মুহূর্তে আপন কাজের হিসেব নেয় এবং পরকালে আল্লাহর আজাব হতে বাঁচার উপায় খুঁজতে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى أَتَانَا الْيَقِيْنُ : يَقِيْن অর্থ প্রত্যয়। এখানে প্রত্যয় বলে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, মৃত্যু আসার পর যেসব বিষয় তারা অস্বীকার করত, সেসব বিষয় তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর যেসব জিনিসের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করত সেসব জিনিস সম্বন্ধে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে। তাদের কথার মর্ম হচ্ছে, মৃত্যুর মাধ্যমে দৃঢ় প্রত্যয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ আচরণের উপর অবিচল হয়েছিলাম। মৃত্যুই তাদের বোধোদয় ঘটিয়েছে কিন্তু তাদের এ বোধোদয় তাদের আর কোনো কল্যাণে আসবে না।

قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ : "এ সময় সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো কাজেই আসবে না।" অর্থাৎ যেসব লোক মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছিল, কোনো শাফায়াতকারী যদি তাদের সম্পর্কে শাফায়াত করেও তবু তারা ক্ষমা পেতে পারে না। শাফায়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদের বহু কয়টি আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত করে বলা হয়েছে। যার ফলে শাফায়াত কে করতে পারে, আর কে করতে পারে না, কোন অবস্থায় করা যাবে, কোন অবস্থায় করা যাবে না, কার জন্য করা যাবে, কার জন্য করা যাবে না, কার জন্য তা কল্যাণকর, আর কার জন্য তা কল্যাণকর নয়- এ সব বিষয়ে বিস্তারিতরূপে জানতে পারা কারো জন্য কঠিন থাকেনি। দুনিয়ার লোকদের গুমরাহীর যতগুলো কারণ রয়েছে শাফায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা এটার মধ্যে একটি। এ কারণে কুরআন মাজীদে এ বিষয়টি এত বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে কার্যত এ ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয় বা কিছুমাত্র অস্পষ্ট অবশিষ্ট থাকেনি।

شَفَاعَة অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ : এর কারণ আয়াত হতেই বুঝে নেওয়া যায়। অর্থাৎ আয়াতের শেষ পর্বে বলা হয়েছে وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ আমরা কিয়ামতকে মানতাম না। কিয়ামতকে না মানার অর্থই হলো তারা كَافِر ছিল। কোনো ঈমানদার মুসলমান কিয়ামতকে অবিশ্বাস করলে তার ঈমান থাকবে না, যদিও সে ঈমান গ্রহণ করে থাকে। কাফেরদের জন্য شَفَاعَتْ করার কোনো হুকুম বর্ণিত হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন- لِلْكُفَّارِ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمٌ অথবা فَمَا تَنْفَعُهُمْ অর্থ হবে شَفَاعَتْ করতে পারবে তবে এটা কোনো কাজে আসবে না। যা করার কোনো বৈধতা নেই, তা করা না করা একই সমান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

৪৯. فَمَا مُبْتَدَأٌ لَهُمْ خَبَرُهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوْفٍ اِنْتَقَلَ ضَمِيْرُهُ اِلَيْهِ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيْرِ وَالْمَعْنٰى اَىُّ شَيْءٍ حَصَلَ لَهُمْ فِىْ اِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْاِتِّعَاظِ.

৪৯. তবে কি এটা مُبْتَدَأٌ হয়েছে তাদের এটা خَبَرٌ এবং উহ্য বক্তব্যের সাথে মুতা'আল্লিক, আর خَبَرٌ -এর ضَمِيْر তৎপ্রতি رَاجِعٌ হয়েছে। যে, তারা উপদেশ হতে বিমুখ রয়েছে مُعْرِضِيْنَ শব্দটি ضَمِيْر হতে حَالٌ অর্থাৎ উপদেশ হতে বিমুখ হওয়ার মাধ্যমে তাদের কি লাভ হয়েছে?

৫০. كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ وَحْشِيَّةٌ.

৫০. তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ বন্য।

৫১. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ اَسَدٍ اَىْ هَرَبَتْ مِنْهُ اَشَدَّ الْهَرَبِ.

৫১. যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন করেছে সিংহ অর্থাৎ তার সম্মুখ হতে প্রাণপণ দৌড়িয়ে পলায়ন করেছে।

৫২. بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً اَىْ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِاتِّبَاعِ النَّبِىِّ ﷺ كَمَا قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهٗ.

৫২. বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যেন তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হয় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে, যেমন তারা বলেছে, আমরা সে পর্যন্ত আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো না, যে পর্যন্ত আমাদের প্রতি এমন একটি গ্রন্থ অবতারিত হয়, যা আমরা পাঠ করবো।

৫৩. كَلَّا ط رَدْعٌ عَمَّا اَرَادُوْهُ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ اَىْ عَذَابَهَا.

৫৩. না, কখনোও এরূপ হবে না তাদের ইচ্ছার প্রতি অস্বীকৃতি বরং তারা তো আখেরাতের প্রতি ভয় পোষণ করে না অর্থাৎ তার শাস্তির।

৫৪. كَلَّا اِسْتِفْتَاحٌ اِنَّهٗ اَىِ الْقُرْاٰنُ تَذْكِرَةٌ عِظَةٌ.

৫৪. না, কখনো এরূপ হবে না এখানে كَلَّا শব্দটি اِسْتِفْتَاحٌ -এর জন্য নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন উপদেশবাণী নসিহত।

৫৫. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ قَرَاَهٗ فَاتَّعَظَ بِهٖ.

৫৫. সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে তা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক এটা পাঠ করত তা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।

৫৬. وَمَا يَذْكُرُوْنَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى بِاَنْ يُّتَّقٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بِاَنْ يَّغْفِرَ لِمَنِ اتَّقَاهُ.

৫৬. আর উপদেশ গ্রহণ করবে না শব্দটি يَاءٌ ও تَاءٌ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে। তিনিই ভয় করার যোগ্য পাত্র যে, তাঁকে ভয় করা হবে এবং ক্ষমা করার অধিকারী যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, যে তাঁর প্রতি ভয় পোষণ করে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ : বাক্যটি তারকীবে مُعْرِضِيْنَ -এর ضَمِيْر হতে حَالٌ مُتَدَاخِلَةٌ হয়েছে। জমহুর نَاءٌ বর্ণে كَسْرَةٌ দিয়ে مُسْتَنْفِرَةٌ পড়েছেন, আর নাফে' ইবনে আমের فَاءٌ তে فَتْحٌ দিয়ে مُسْتَنْفَرَةٌ পড়েছেন। আর আবূ হাতিম এবং আবূ ওবাইদ এ দ্বিতীয় কেরাতটি পছন্দ করেছেন।

قَوْلُهٗ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً : জমহুর ش বর্ণকে تَشْدِيْد যুক্ত করে مُنَشَّرَةٌ পড়েছেন। আর সাঈদ ইবনে জোবাইর تَخْفِيْف করে مُنْشَرَةٌ পড়েছেন। জমহুর صُحُفًا শব্দটির حَاءٌ বর্ণে ضَمَّةٌ দিয়ে صُحُفٌ পড়েছেন। আর সাঈদ ইবনে জোবাইর তাতে سَاكِنٌ যুক্ত করে صُحْفٌ পড়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ يَذْكُرُوْنَ : জমহুর এটাকে يَا، সহকারে يَذْكُرُوْنَ পড়েছেন। আর নাফে' এবং ইয়াকূব تَا، দিয়ে تَذْكُرُوْنَ পড়েছেন। সকলেই কিন্তু تخفيف করে পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ : এখানে تَذْكِرَةٌ দ্বারা পবিত্র কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা تذكرة -এর শাব্দিক অর্থ স্মরণ করিয়ে দেওয়া বস্তু বা বিষয়, আর কুরআনে হাকীম আল্লাহর صِفَاتْ كَمَالْ এবং তাঁর রহমত ও গজব, বেহেশতিদের জন্য ছওয়াব ও দোজখীদের জন্য আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তুলনাহীন গ্রন্থ। অতএব, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা এমন উত্তম উপদেশবাণী হতে উপদেশ গ্রহণ করবে না তবে আর কোথা হতে উপদেশ নিবে! যেহেতু এত উত্তম উপদেশ গ্রহণ করা যখন তাদের ভাগ্যে জোটেনি তখন তাদের কপালটাই মন্দ।

قَسْوَرَةٌ-এর অর্থ :

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের قَسْوَرَةٌ শব্দটির অর্থ– বাঘ। হযরত আতা ও কালবী (র.) এ মতই পোষণ করেছেন।

২. হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহহাক (র.)-এর মতে قَسْوَرَةٌ শব্দটির অর্থ হলো তীর নিক্ষেপে দক্ষ শিকারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন।

৩. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো শক্তি। আর সকল মোটাতাজা হৃষ্ট-পুষ্ট শক্তিশালী বস্তুকেই আরবরা قَسْوَرَةٌ বলে।

৪. হযরত ইকরামা (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আরেক বর্ণনা মতে قَسْوَرَةٌ শব্দের অর্থ শিকারির জাল।

৫. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) শব্দটির অর্থ বলেছেন শিকারি। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَمَا لَهُمْ .... قَسْوَرَةٌ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অতএব তাদের কি হলো যে, তারা নসিহত হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত বন্য গাধা, যা সিংহ হতে পলায়ন করছে।"

এখানে মূল শব্দ হলো اَلتَّذْكِرَةُ বাংলায় যার অর্থ করা হয়েছে নসিহত। কোনো কোনো তাফসীরকারক এর ব্যাখ্যা করেছেন কুরআনের আয়াত, কুরআনী নসিহত এবং কুরআনী বিধি-বিধান ইত্যাদি। আর কেউ কেউ এটার ব্যাখ্যায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ এ সব লোকদের কি হলো যে, তারা কুরআন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ বা কুরআনী নসিহত হতে সেই রকম পলায়ন করছে যে রকম বন্য-গাধারা সিংহ দেখে বা শিকারি দেখে পলায়ন করে। এটা একটি আরবি রূপকথা, আরবের লোকেরা অস্বাভাবিকভাবে দিশেহারা হয়ে পলায়নকারীকে সেই বন্য-গাধার সাথে তুলনা করে, যে গাধা ব্যাঘ্রের গন্ধ ব শিকারির পদধ্বনি শুনা মাত্র পালিয়ে যেতে থাকে।

কুরআন হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার প্রকার : হযরত মুকাতিল বলেছেন, কুরআন হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দু'ভাবে হতে পারে। ১. কুরআনকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করা। ২. পুরোপুরিভাবে অস্বীকার না করে কুরআনের মতে আমল না করা। অথবা কুরআনী বিধি-বিধান না-মানা। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কুরআন বর্জন বর্তমান বিশ্বের সমস্ত উম্মতে মুসলিমার মধ্যে কমবেশি রয়েছে। কোথাও পুরোপুরিভাবে কুরআনের বিধি-বিধান, আইন-কানুন মেনে চলা হচ্ছে না। সুতরাং আয়াত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। –[কুরতুবী]

সত্যকে শ্রবণ করা হতে পলায়ন করার কারণ : কাফেরদের কুরআন বা সত্যের বাণী শ্রবণ করা হতে পলায়নের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। ১. যদি তারা সত্যের সম্মুখে মাথা নত করে তবে তাদের পৌত্তলিকতা এবং স্ব-গোত্রীয় প্রভাব বা ব্যক্তিত্ব টিকে থাকবে না। ২. কুফরি ও নাফরমানির কারণে তাদের অন্তরে সত্যের জ্যোতি স্থান লাভ করার মতো জায়গা ছিল না– অন্তর কুফরির কালিমা দ্বারা ভরে গেছে। ৩. মুহাম্মদ ﷺ ও ইসলাম তখন প্রথমত খুবই সংকীর্ণ অবস্থায় ছিল। তাই তাদের ধারণা ছিল ইসলাম গ্রহণ করলে তারা সংকীর্ণতায় পতিত হয়ে যাবে। ৪. পরকালকে তারা বিশ্বাস করত না ইহজীবনকেই প্রাধান্য দিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ ..... صُحُفًا مُّنَشَّرَةً : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "বরঞ্চ তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি প্রেরিত হোক।" অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি বাস্তবিকই মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে তিনি যেন মক্কার এক-একজন সর্দার ও এক-একজন শায়খের নামে একটি করে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে, মুহাম্মদ ﷺ আমার নিয়োজিত নবী। তোমরা সকলে তাঁকে মেনে চলো, তাঁর অনুসরণ করো। আর এ চিঠি যেন এমন হয় যা দেখে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, এটা আল্লাহ তা'আলা লিখে পাঠিয়েছেন। কুরআনের অপর একটি স্থানে মক্কার কাফিরদের এ কথাটি উদ্ধৃত হয়েছে– "আমরা কিছুতেই মানবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদেরকে তা দেওয়া হবে, যা আল্লাহর রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে।" [সূরা আল-আনআম : আয়াত ১২৪] অপর একটি আয়াতে তাদের এ দাবিটির উল্লেখ করা হয়েছে এই ভাষায়, "আপনি আমাদের সম্মুখে আকাশে আরোহণ করুন এবং সেখান হতে একটি সম্পূর্ণ লিখিত কিতাব এনে আমাদেরকে দিন, যা আমরা পাঠ করবো।" –[বনী ঈসরাইল : আয়াত ৯৩]

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তা কখনো দেওয়া হবে না, (এদের ঈমান না আনার আসল কারণ হলো) এরা পরকাল সম্পর্কে মনে ভয় পোষণ করে না।" অর্থাৎ তাদের নামে কখনো কোনো চিঠি প্রেরণ করা হবে না। নবুয়তের এত সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আরো প্রমাণ চাওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, যেসব প্রমাণ তাদের সামনে রয়েছে তা যথার্থ নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো, আরো জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করা, গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকা। এদের ঈমান না আনার মূল কারণ হলো এরা আসলে পরকালে বিশ্বাসী নয়। পরকালে আল্লাহর সামনে এ জীবনের সব হিসাব দিতে হবে, এ কথা তারা আদৌ বিশ্বাস করে না। এ কারণেই তারা এ জীবনে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নিরুদ্বিগ্ন ও দায়িত্বহীন জীবন যাপন করছে। আর এ কারণেই ঈমান আনয়নের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করছে না। আর এ কারণেই তাদেরকে ঈমান আনয়নের কথা বলা হলে তারা ঈমান না আনার জন্য নিত্য নতুন দাবি-দাওয়া ও দলিল-প্রমাণ খুঁজতে থাকবেই। নতুন নতুন বাহানা খুঁজতে থাকবে। অতএব, তাদের এ কার্যকলাপ দেখে নবীর উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ" : এর তাৎপর্য হচ্ছে– তাদের এ ধরনের দাবি কখনো পূরণ করা হবে না। পবিত্র কুরআন একটি উপদেশ মাত্র। যার ইচ্ছা সে এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তবে আল্লাহ যদি তা চান। পবিত্র কুরআনে একজন মু'মিনকে কি বিশ্বাস করতে হবে, কি আমল করতে হবে তা সবই বিস্তারিত আছে। কোনো মানুষ ইচ্ছা করলে কুরআনের এসব বিধি-বিধান হতে শিক্ষা গ্রহণ করে চলতে পারে– কুরআনের আলোকে আলোকিত হতে পারে। তবে শর্ত হলো, তখনই সে শিক্ষা লাভ করতে পারবে যখন আল্লাহও চাইবেন যে, সে নসিহত লাভ করুক এবং নসিহত লাভের তৌফিকও তিনি তাকে দান করেন। –[কুরতুবী]

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর চাওয়া ও ইরাদা দুই প্রকারের–

১. **اَلْإِرَادَةُ الشَّرْعِيَّةُ** – অর্থাৎ শরিয়ত সম্মত যে কোনো কাজ বান্দা করুক এটা আল্লাহ চান। শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ বান্দা করুক এটা আল্লাহ চান না। শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ বান্দা করুক এটা আল্লাহ তা'আলার ইরাদা ও ইচ্ছায় শরীয়ার বিরোধী-পরিপন্থি।

২. **اَلْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ** – অর্থাৎ বান্দা যা কিছু করে তা তখনই করতে পারে, যখন তা আল্লাহ তা'আলার এই ইচ্ছা ও ইরাদায়ে কাউনিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। বান্দার কোনো আমলই এ দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছা ও ইরাদা বহির্ভূত নয়। তবে বান্দার নাফরমানি ও যাবতীয় শরিয়ত বিরোধী কাজ-কারবার আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে শরীয়ার পরিপন্থি [শারহুল আকীদাতুত ত্বাহাবীয়া] যদিও তা ইরাদায়ে কাউনিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চাইলেই বান্দা কুরআন হতে শিক্ষা লাভ করতে পারবে বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি বান্দার চাওয়ার সাথে আল্লাহর ইরাদায়ে কাউনিয়া সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখনই সে হেদায়েত লাভ করতে পারবে– নতুবা নয়।

قُرْاٰن-কে تَذْكِرَة বলার কারণ : ইতঃপূর্বেও এর একটি আলোচনা করা হয়েছে। تَذْكِرَةٌ শব্দের অর্থ অভিধানে "টিকেট" বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন এমন বস্তু, যার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেই ব্যক্তি জীবন হতে সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় জীবন এমনকি পরকালীন সম্বন্ধেও তার দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক হয়। যাবতীয় বিধিবিধান ও নিয়ম-নীতিমালাকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

স্মরণ করা হয়ে থাকে। মানুষ সৃষ্টি এবং জগৎ সৃষ্টির সকল ইতিহাস ও সকল রহস্যকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় তাই পবিত্র কুরআনকে تَذْكِرَةٌ বলা হয়েছে।

অথবা, ذِكْرٌ অর্থ যদি হেদায়েত, নসিহত ইত্যাদি নেওয়া হয় তখনো বলা যাবে, পবিত্র কালামুল্লাহ -এর মধ্যেই সকল দিকেরই হেদায়েত নসিহত নিহিত। যে ইচ্ছা করবে সেই এটা হতে হেদায়েত ও নসিহত পাবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ - هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ : অর্থাৎ আসলে আল্লাহ তা'আলা তৌফিক দিলেই তো তারা তা (কুরআন) দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে। কার কিসের কি পরিমাণ যোগ্যতা রয়েছে আল্লাহই তা ভালো জানেন এবং তদনুসারেই তার সাথে ব্যবহার হয়ে থাকে। আর মানুষ যতই পাপ ও গুনাহ করুক না কেন, যদি আল্লাহকে ভয় করে, তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে তবে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে থাকেন, তওবা কবুল করে থাকেন।

اَهْلُ التَّقْوٰى ও اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলাকে اَهْلُ التَّقْوٰى এ মর্মে বলা হয়েছে যে, তিনি তাকওয়ার অধিকার রাখেন, তাঁর জন্যই তাকওয়া অবলম্বন করা যায়। আর নাফরমানি হতে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র তাঁর নাফরমানি হতেই নিজেদেরকে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

আর اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ তিনি এমন সত্তা যিনি অতি মহান হতে মহান, গুনাহকারীদের গুনাহসমূহ যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ক্ষমা করে দেন, এরূপ ক্ষমা করার কারো অধিকার বা ক্ষমতা নেই।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ -এর মধ্যে مَشِيَّتُ اللّٰهِ এর তাৎপর্য কি? : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা مَشِيَّتٌ -এর কথা বলেছেন, অপরাপর আয়াতসমূহ কখনো اِرَادَةٌ -এর কথা বলেছেন। আবার কখনো কখনো رَضِى -এর কথা বলেছেন।

اَلْمَشِيْئَةُ ও اَلْاِرَادَةُ ও اَلْمَرْضِىْ -এর মধ্যে পার্থক্য : اَلْمَشِيْئَةُ অর্থ হলো চাওয়া, অর্থাৎ কোনো বিষয় করতে বা হতে চাওয়া। اَلْمَرْضِىْ হলো, সন্তুষ্টি, আর اِرَادَةٌ অর্থ হলো মনোবাঞ্ছা করা, ইচ্ছা করা।

অতএব, এক-কথায় বুঝতে হলে এরূপ বুঝতে হবে যে, مَشِيَّتٌ এর জন্য مَرْضِى শর্ত হবে না, অর্থাৎ কোনো কিছু করতে চাইলে তা সন্তুষ্টির সাথে হবে, তা আবশ্যক নয়। কারণ অনেক সময় অসন্তুষ্টির মাধ্যমেও অনেক কাজ করতে চাওয়া হয়। আর اَلْمَرْضِىْ -এর জন্য مَشِيَّتٌ শর্ত হবে। অর্থাৎ কোনো কাজ সন্তুষ্টির সাথে করলে তাতে ইচ্ছা অবশ্যই থাকবে। বিনা ইচ্ছায় কোনো কাজ সন্তুষ্টির সাথে হয় না।

আর اِرَادَةٌ -এর মধ্যে مَرْضِى এবং مَشِيَّتٌ পাওয়া যাবে। কেননা সন্তুষ্টি ও মনের প্রেরণা বা আকাঙ্ক্ষা থাকলেই কোনো কাজের জন্য ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাগণের ব্যাপারে এ বিষয়টি প্রায় প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন- وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ এখানে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করার জন্য ইচ্ছা করার কথা বলা হয়েছে. সুতরাং বান্দাকে ক্ষমার জন্য যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি না থাকত তবে তিনি ক্ষমার জন্য আবেগ প্রকাশ করতেন না [আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।]

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ : সূরা আল-ক্বিয়ামাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ হতে اَلْقِيٰمَةُ শব্দটি দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে। বস্তুত এ সূরায় কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার কারণে এ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৪০টি আয়াত, ৯৯টি বাক্য এবং ৬৫২ টি অক্ষর রয়েছে।

শানে নুযূল : অত্র সূরা নাজিল হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে হাদীস শরীফের এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না; কিন্তু এতে আলোচিত বিষয়ে এমন একটি অন্তর্নিহিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যা হতে জানা যায় যে, তা মক্কার প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি। কারণ এর আয়াত لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ -এর অর্থ হলো, ওহী দ্রুত স্মরণ করে নেওয়ার জন্য স্বীয় জিহ্বা নাড়িও না। তা অন্তরে বসিয়ে দেওয়া ও পড়িয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। ইত্যাদি বর্ণনাসমূহ ওহীর প্রথম অবস্থা, সে সময় রাসূলে কারীম ﷺ ওহীসমূহকে পুরাপুরি সংরক্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। আর সে সময়টুকুই ছিল মাক্কী জীবনের ওহীর প্রথম অবস্থা। সুতরাং তা মাক্কী সূরা -এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার মূলবিষয় হলো কিয়ামত সম্পর্কীয় অবস্থাসমূহের আলোচনা। পরকালে অবিশ্বাসীদের প্রতি সম্বোধন করে তাদের অনেক সন্দেহকে দূরীভূত করে দেওয়া হয়েছে। খুবই অকাট্য দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাব্যতা, তা সংঘটিত এবং তার অপরিহার্যতা প্রকট করে তোলা হয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যারা পরকালকে অস্বীকার করে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাকে অসম্ভব বলে মনে করে। তার মূল কারণ তাদের মনের কামনা ও বাসনা তা না দেখে মেনে নিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসের শপথ ও নফসে লাওয়ামাহ -এর শপথ করে বলেন, মানুষ যত কিছুই মনে করুক না কেন আমি সব কিছুকেই পুনরুজ্জীবনে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। পবিত্র কালামের স্থানে স্থানে বহু আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলার পরও তারা জেনেশুনেও যেহেতু আপনাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে, তখন আপনি তাদরকে জানিয়ে দিন– কিয়ামত এমন একদিন সংঘটিত হবে, যেদিন মানুষ চক্ষু দ্বারা সরিষাফুল দেখবে। প্রতিপালক ছাড়া কোথাও আশ্রয় পাবে না। চন্দ্র-সূর্য সেদিন একত্র হয়ে যাবে। সূর্য ১২ গুণ অতিরিক্ত তাপ প্রদান করতে থাকবে।

সকল মানুষের কৃতকর্মসমূহ অর্থাৎ আমলনামা তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে। ইচ্ছা করে কিছুই গোপন করার মতো সুযোগ হবে না। স্কন্ধের ফেরেশতাহগণ সবই সত্যভাবে লিখে রাখবে।

১৬ নং আয়াত হতে ধারাবাহিকভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ওহী নাজিল হওয়ার প্রথম অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। যখন ওহী প্রথম নাজিল হতো তখন তিনি পূর্ণভাবে তা বুঝে স্মরণ রাখতে মুশকিলজনক হতো। তাই ওহীর বিষয়টি সাথে সাথেই পড়তে থাকতেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সহানুভূতির জন্য ওহীকে তাঁর অন্তরে স্থায়ী করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর পর ২০ নং আয়াত হতে পুনরায় কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন সত্যবাদীদের কপাল বা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, আর কাফেরদের চেহারা খুবই ঘৃণিত হবে এবং আল্লাহর শাস্তির প্রতিফলে শরীরের সকল হাড় একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাবে।

৩১ নং আয়াত হতে কাফেরদের দুরবস্থার সকল কারণ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ তারা নামাজ, রোজা ইত্যাদি বলতে সত্যের নিকটও যেত না। প্রত্যেকেরই কড়া-ক্রান্তি হিসাব নেওয়া হবে।

সর্বশেষ মানুষের সৃষ্টির মূলের প্রতি ইঙ্গিত করে সূরাটি খতম করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীনতা হতে এত বড় মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাদের পুনরুজ্জীবিত করতেও নিশ্চয়ই সক্ষম হবেন। পরকাল অবিশ্বাসীরা যেন এ কথা জেনে রাখে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা اَلْمُدَّثِّرُ-এর শেষার্ধে একটি আয়াত হচ্ছে– كَلَّا بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ 'কখনো নয়, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।' যেহেতু কাফেররা পরকালকে ভয় করে না, কিয়ামতকে অস্বীকার করে, তাই আলোচ্য সূরায় কিয়ামতের বিবরণ রয়েছে এবং ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানবদেহ থেকে কিভাবে রূহ বের হয়ে যাবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-ক্বিয়ামাহ মক্কায় অবতীর্ণ

اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً : ৪০ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَآ زَائِدَةٌ فِى الْمَوْضِعَيْنِ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ.

১. উভয়স্থানে ٧ অতিরিক্ত আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করছি।

٢. وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ الَّتِىْ تَلُوْمُ نَفْسَهَا وَاِنِ اجْتَهَدَتْ فِى الْاِحْسَانِ وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ اَىْ لَتُبْعَثُنَّ دَلَّ عَلَيْهِ.

২. আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার পুণ্যকাজে অশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও, যে তার আত্মাকে তিরস্কার করে। এখানে জওয়াবে কসম উহ্য অর্থাৎ لَتُبْعَثُنَّ যৎপ্রতি পূর্ববর্তী বক্তব্য নির্দেশ করছে।

٣. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَىِ الْكَافِرُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ لِلْبَعْثِ وَالْاِحْيَاءِ.

৩. মানুষেরা কি মনে করে অর্থাৎ কাফেরগণ যে, আমি তার অস্থিসমূহকে একত্র করবো না পুনরুত্থান ও পুনর্জীবিত করার জন্য।

٤. بَلٰى نَجْمَعُهَا قٰدِرِيْنَ مَعَ جَمْعِهَا عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ وَهُوَ الْاَصَابِعُ اَىْ نُعِيْدُ عِظَامَهَا كَمَا كَانَتْ مَعَ صِغَرِهَا فَكَيْفَ بِالْكَبِيْرَةِ.

৪. হ্যাঁ, অবশ্যই আমি একত্র করবো। আমি তাতেও সক্ষম একত্র করার সাথে যে, আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করবো অর্থাৎ তার অঙ্গুলির ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গে যেখানে আমি হাড়-মাংস স্থাপন করবো, তবে বৃহৎ অঙ্গসমূহে কেন করব না।

٥. بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اللَّامُ زَائِدَةٌ وَنَصْبُهٗ بِاَنْ مُقَدَّرَةٍ اَىْ اَنْ يَّكْذِبَ اَمَامَهٗ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ دَلَّ عَلَيْهِ.

৫. তথাপি মানুষ ইচ্ছা করে অস্বীকার করতে لِيَفْجُرَ -এর মধ্যে لَامْ অতিরিক্ত, আর উহ্য اَنْ -এর কারণে তা যবরযুক্ত অর্থাৎ অস্বীকার করার জন্য যা তার সম্মুখে আছে অর্থাৎ কিয়ামত দিবস, যৎপ্রতি পূর্বোক্ত বক্তব্য নির্দেশ করছে।

٦. يَسْئَلُ اَيَّانَ مَتٰى يَوْمُ الْقِيٰمَةِ سُؤَالَ اِسْتِهْزَاءٍ وَتَكْذِيْبٍ.

৬. সে প্রশ্ন করে কবে কখন আসবে কিয়ামত দিবস? বিদ্রূপ ও অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَوْلُهُ لَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ : এটার উভয়টিই قَسَم এবং جَوَاب قَسَم উহ্য মেনে নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থকার উহ্য جَوَابْ টি لَتُبْعَثُنَّ বলে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ اَلَّنْ : উক্ত শব্দটির هَمْزَه ও لَامْ -এর মাঝে কোনো نُوْن মূলত নেই।

قَوْلُهُ قَادِرِيْنَ : তারকীবে এক فِعْل مُقَدَّرْ -এর ضَمِيْر হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ بَلْ نَجْمَعُهَا نَقْدِرُ قَادِرِيْنَ আর কারো মতে তা كَانَ -এর خَبَرْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ بَلْ كُنَّا قَادِرِيْنَ فِى الْاِبْتِدَاءِ আর ইবনে আবূ আবলাহ ও আবুস সোমাই তাকে مَرْفُوْع অর্থাৎ قَادِرُوْنَ পড়েছেন– مُبْتَدَأ مَحْذُوْف -এর খবর হিসাবে। তাকদীর হলো, بَلْ نَحْنُ قَادِرُوْنَ।

قَوْلُهُ لِيَفْجُرَ : لِيَفْجُرَ শব্দটি তারকীবে কয়েক রকম হতে পারে। ১. يُرِيْدُ ক্রিয়ার مَفْعُوْل হলো مَحْذُوْف কিন্তু لِيَفْجُرَ ক্রিয়াটি তা বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ شَهْوَةً وَمَعَاصِيَةً لِيَفْجُرَ ২. لِيَفْجُرَ -এর لَامْ বর্ণটি অতিরিক্ত, তার পূর্বে اَنْ শব্দ مُقَدَّرْ রয়ে তাকে مَنْصُوْب করেছে। যথা– يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَفْجُرَ اَمَامَهُ গ্রন্থকার এ শেষ তারকীবই উল্লেখ করেছেন, আর তা-ই উত্তম। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ الخ আয়াতের শানে নুযূল : আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ আয়াতটি নাজিল হয়েছে আদী ইবনে রায়ীয়া সম্পর্কে। আদী ছিল আখনাস ইবনে সোরায়েক ছাকাফীর জামাতা। এই আদী ও আখনাস সম্পর্কেই নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে মন্দ প্রতিবেশির ঘৃণ্য আচরণ থেকে রক্ষা করো।

একবার আদী রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, আমাকে বলুন, কিয়ামত কবে হবে? তার অবস্থা কি হবে? নবী করীম ﷺ তার নিকট কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করেন। সব কথা শুনে সে বলল, যদি আমি স্বচক্ষেও কিয়ামত দেখি তবুও আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো না এবং আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেবো না। আল্লাহ কি ভেঙ্গে যাওয়া এ হাড়গুলোকে একত্র করবেন? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কিয়ামতের দিবসের শপথ করছি এবং এমন আত্মার শপথ করছি যা নিজের উপর নিজে ভর্ৎসনা করে থাকে। উক্ত আয়াত বা গোটা সূরাটিকে না-বোধক বাক্য দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এটা হতে ইঙ্গিত মাত্র বুঝা যায় যে, পূর্ব হতে কোনো কথা চলে আসছিল। যার প্রতিবাদে না-বোধক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের স্থূল অর্থ হয় এরূপ।

তোমরা যা বলছ তা সত্য নয়, রাসূল সত্য। আর আমি কসম করে বলছি যে, আমার কথাই সত্য। উক্ত আয়াতে যে শপথ করা হয়েছে এর جَوَابْ আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি; বরং আল্লামা জালালুদ্দীন (র.)-এর মতে এর جَوَابْ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ (لَتُبْعَثُنَّ) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। কারণ, পরবর্তী আয়াতটি তার প্রতি ইঙ্গিত করছে।

لَا -এর অর্থ প্রসঙ্গ : উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত لَا অক্ষরটি কোন অর্থে নেওয়া হ' এর মধ্যে তাফসীরকারদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন (র.) -এর মতে لَا অক্ষরটি উভয় আয়াতেই زَائِد বা অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। জমহুরও এ মত প্রকাশ করেছেন। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারী কাফেরদের تَرْدِيْد আকীদার খণ্ডনের উদ্দেশ্যে لَا নেওয়া হয়েছে। ইবনে কাছীর গ্রন্থকারের মতে لَامْ টি এখানে اِبْتِدَاء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, لَا اُقْسِمُ -এর আসল হলো لَاُقْسِمُ এবং লাম ل টি مُبْتَدَأ তার خَبَرْ হলো اُقْسِمُ ; কারণ مُصْحَفُ الْاِمَامِ -এ এর রূপ হলো اَلِفْ لَاُقْسِمُ অর্থাৎ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বিহীন। কারো কারো মতে উক্ত اَلِفْ টি اِشْبَاعْ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, যখন কোনো কথাকে কেউ অস্বীকার করে থাকে, তখন তার কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য حَرْف لَا زَائِدْ নেওয়া হয়ে থাকে। আরবে এরূপ ভাষায় যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে।

আয়াতকে শপথের সাথে নেওয়ার হিকমত : আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত দু'টিতে যে শপথ করেছেন, তাতে কি হিকমত রয়েছে। এর মূল ইলম আল্লাহর নিকটই রয়েছে। অবশ্য পরবর্তী আয়াতের মধ্যে তার সামান্য ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দান করেছেন।

ক. প্রথমে কিয়ামতের প্রসঙ্গই বিবেচনা করা যাক। বস্তুত কিয়ামত যে হবে তা নিঃসন্দেহ। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থাই অকাট্যভাবে সাক্ষ্য দান করে যে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়, শাশ্বতও নয়– এটা চিরকাল ছিলও না। এর পরিবর্তনশীল অবস্থা এ কথা বুঝাচ্ছে যে, তা ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী। আর তার স্থায়িত্বের উপর কোনো অকাট্য প্রমাণও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খ. অথবা, কাফেরদের কিয়ামতকে অস্বীকার করার ব্যাপারটি যত কঠিন অবস্থা ধারণ করেছিল তা হতে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তত শক্তিশালী ভাষা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে শপথ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে তারা মানতে বাধ্য হয় যে, আল্লাহর বাণী সঠিক ও কিয়ামত সত্য। অর্থাৎ যেমন অস্বীকার তেমন প্রতিবাদ।

গ. এ বিশ্বলোক বিধ্বংস হওয়ার পর যে পুনরায় হিসাব-নিকাশ হবে। পরকাল শাস্তি ও শান্তির ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তা সেই অজ্ঞ যুগের মানুষ জেনেশুনেও তাকে মূল্যায়ন করত না। সুতরাং রোজ কিয়ামতের নিশ্চয়তা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা শপথ বাক্য ব্যবহার করেছেন।

ঘ. অথবা, আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মানুসারে কোনো বিষয়কে সত্য বলে মানবকুলে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য শপথ করেছেন তা কালামুল্লাহ ভাষায় এক প্রকার অলংকার।

قَوْلُهُ اَلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ : نَفْس অর্থ– প্রাণ বা আত্মা, অথবা রূহ। আর لَوَّامَة অর্থ– ভর্ৎসনা করা, তিরস্কার করা, তা لَوْم অর্থাৎ يَفْتَحْ لَامْ হতে উৎপত্তি হয়েছে।

নফস-এর প্রকারভেদ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নফসকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। অর্থাৎ তার তিন প্রকার রূপ দান করেছেন।

১. নফসে লাওয়ামাহ– যেমন অত্র সূরায় বলা হয়েছে وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ নফসে لَوَّامَة ঐ নফসকে বলা হয়' যা স্বীয় عَمَلْ কার্যকলাপসমূহ করার পর নিজেকে নিজে তিরস্কার করতে থাকে।

২. নফসে আম্মারাহ প্রসঙ্গে সূরা ইউসুফে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي নফসে আম্মারাহ ঐ প্রকার নফসকে বলা হয় যা সদাসর্বদা মানুষকে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর কার্যের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য উসকানি দিয়ে থাকে। ঈমান অথবা নেক কার্যসমূহের প্রভাবে মানুষ তাতে লিপ্ত হওয়া হতে বাঁচতে সক্ষম হয়।

৩. নফসে মুতমাইন্নাহ ঐ নফসকে বলা হয় যা ভুল বা অন্যায় পথ পরিহার করার দরুন অথবা সঠিক পথে সর্বদা পরিচালিত হওয়ার দরুন মানুষের মধ্যে স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা প্রদান করে থাকে। নফসে মুতমাইন্নাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফাজর -এ বলেন يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً নফসে মুতমাইন্নাহ -এর প্রভাবে ব্যক্তির আত্মা শরিয়তের পাবন্দ ও অনুসারী হয়ে যায়।

ফায়দা : কারো কারো মতে نَفْس لَوَّامَة দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর আত্মাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তার আত্মা সব সময় এই তিরস্কার তাকে করত যে, তিনি কেন বেহেশত হতে বের হওয়ার কার্যে লিপ্ত হলেন। –[মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ ..... عِظَامَهُ : 'মানুষ কি ধারণা করে, আমি তার অস্থিপুঞ্জ একত্র করতে পারবো না।' অর্থাৎ কিছু কিছু লোক কেবল এ কারণেই পরকাল অস্বীকার করে যে, তাদের কাছে মৃত্যুর পর কবরে মানুষের দেহ পচে যাওয়ার পর আবার মানুষের অঙ্গগুলো একত্র করে পুনরুত্থিত করা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার। তারা পরকালের ধারণাকে অবাস্তব ও অসম্ভব মনে করে তা অস্বীকার করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى بَلَى قَادِرِيْنَ اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ : পূর্বে পরকাল অস্বীকারকারীদের সন্দেহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদের সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা হয়েছে, বড় বড় অস্থিগুলো সংগ্রহ ও একত্র করে তোমাদের দেহ কাঠামো পুনঃ নির্মাণ করাতো খুবই সামান্য ও সাধারণ ব্যাপার। তোমাদের সূক্ষ্মতম দেহাংশ এমনকি তোমাদের আঙুলসমূহের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনরায় সেই রকম অমরা বানিয়ে দিতে পারি যেমন তা পূর্বে ছিল।

অঙ্গুলির অগ্রভাগের বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : বিশেষভাবে অঙ্গুলির অগ্রভাগের কথা আলোচনা করার কারণ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা এক মানুষকে অন্য মানুষ হতে পৃথক করার জন্য তার সর্বাঙ্গে যেসব বৈশিষ্ট্য রেখেছেন তার মধ্যে অঙ্গুলির অগ্রভাগের রেখা অন্যতম। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- তোমরাতো এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর যে, এ মানুষ কিভাবে পুনরায় জীবিত হবে। আরও সামান্য অগ্রসর হয়ে চিন্তা কর যে, কেবল জীবিতই হবে না; তার অঙ্গুলিসমূহের রেখা যেভাবে ছিল পুনঃ সৃষ্টিতেও তদ্রূপই থাকবে। -[মা'আরিফ]

কিয়ামত ও পরকালে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণ : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও নফসের লাউওয়ামার শপথ করার পর তিনি মানবকুলকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করতে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম বলে মানুষের কিয়ামত ও পরকালে বিশ্বাসী না হওয়ার কারণটি উপরোক্ত ৫নং আয়াতে তুলে ধরেছেন। মানুষের ঐ জগতে বন্ধনহারা ও লাগামহারা হয়ে চলাই তার নফসে আম্মারার দাবি। মানুষ মনে যা চায় তা অবাধে করে বেড়ায়, কোনো কাজের জন্য কারো নিকট কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তা তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুতরাং কিয়ামত ও পরকালটিকে স্বীকার করে নিলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা ও বাঁধন মেনে নিতে হয়। যার ফলে মন যা চায় এবং প্রবৃত্তি যা করতে চায় তার সবগুলো সে করতে পারে না। করতে পারে না সে মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার। পারে না সে মানুষের হক ও অধিকারকে নস্যাৎ করতে। পারে না অন্যায়-অবিচার-কুসংস্কার ও চরিত্রহানীকর কাজে লিপ্ত হতে। আর কিয়ামত, পরকাল ও পুনরুজ্জীবনকে বিশ্বাস না করলে প্রবৃত্তির প্রত্যেকটি চাহিদা সে পূরণ করতে পারে। বাধা-বন্ধনহীন চিত্তে এই জগতে সে বিচরণ করতে পারে। চালাতে পারে সে মানুষের উপর আকীদার খণ্ডনে বর্ণিত। সুতরাং এ মর্ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা যেরূপ আকীদা পোষণ কর তা কখনই সঠিক নয়। আমি স্বয়ং কিয়ামতের শপথ করে বলছি। আর কতক তাফসীরকারের মতে لَا বচনটি দ্বারা শপথই করা হয়েছে এবং তাকে অধিকতর তাকিদ প্রদান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় তাকীদার্থে وَ কসমিয়ার পূর্বে এমনি لَا বচন অনেক স্থানেই ব্যবহৃত হয়। যেমন ইমরুল কায়েসের এই কবিতার চরণে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا وَاَبِيْكَ اِبْنَةِ الْعَامِرِىْ * لَا يَدَّعِى الْقَوْمَ اِلَى اَفِرِ

এ মর্ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয়, 'আমি অবশ্যই শপথ করেছি কিয়ামতের দিনের, যে কিয়ামতের কথা কাফেরগণ অস্বীকার করে'।

قَوْلُهُ تَعَالَى بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ الخ : উক্ত আয়াতে পরকাল অমান্যকারী লোকদের মূল রোগের স্পষ্ট নির্ধারণ ও নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামত অবিশ্বাসকারীগণ চায় যে, ভবিষ্যৎ জীবনেও তারা নির্ভীকচিত্তে ফিসক ও ফজুরী করতে থাকবে। তাই হঠকারিতার সুরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করতে থাকে যে, কিয়ামত কখন আগমন করবে? এ প্রশ্নটি আসলে কিয়ামতের সন-তারিখ সম্বন্ধে অবগতি লাভ করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং তা জানা তাদের উদ্দেশ্য তো দূরের কথা তা জানলে তাদের সকল আনন্দ ম্লান হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা বিভোর হয়ে থাকে। আর পরকাল বিশ্বাস করলে তাদের যে কতগুলো বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হতে হয়, তা মানতে তারা প্রস্তুত নয়। এটাই ছিল এই লোকদের পরকাল অস্বীকৃতির আসল কারণ।

অনুবাদ :

٧. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا دَهِشَ وَتَحَيَّرَ لَمَّا رَاى مِمَّا كَانَ يُكَذِّبُ بِهٖ ـ

৭. যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে بَرِقَ শব্দটি رَا।-এর মধ্যে যের ও যবর যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তারা যে জিনিস অস্বীকার করেছে, তা সম্মুখে দেখতে পেয়ে হতভম্ব ও বিহ্বল হয়ে যাবে।

٨. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اَظْلَمَ وَ ذَهَبَ ضَوْءُهٗ ـ

৮. এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে এবং তার জ্যোতি লোপ পাবে।

٩. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَطَلَعَا مِنَ الْمَغْرِبِ اَوْ ذَهَبَ ضَوْءُ هُمَا وَ ذٰلِكَ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ

৯. আর সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে তখন তারা পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে অথবা তাদের আলো লোপ পাবে। আর এরূপ কিয়ামতের দিনে হবে।

١٠. يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ الْفِرَارُ ـ

১০. যেদিন মানুষেরা বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? কোন দিকে ভাগবো?

١١. كَلَّا رَدْعٌ عَنْ طَلَبِ الْفِرَارِ لَا وَزَرَ لَا مَلْجَأَ يُتَحَصَّنُ بِهٖ ـ

১১. কখনো নয় তা পলায়ন কামনা করার প্রতি অস্বীকার কোনোই আশ্রয়স্থল নেই এমন কোনো আশ্রয়স্থল নেই যাতে আশ্রয় নেওয়া যাবে।

١٢. اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمُسْتَقَرُّ مُسْتَقَرُّ الْخَلَائِقِ فَيُحَاسَبُوْنَ وَيُجَازُوْنَ ـ

১২. সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট ঠাঁই হবে সৃষ্টি জগতের ঠাঁই, তারা হিসাব-নিকাশের জন্য একত্র হবে।

١٣. يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ بِاَوَّلِ عَمَلِهٖ وَاٰخِرِهٖ ـ

১৩. সেদিন মানুষকে যে যা অগ্রে পাঠিয়েছে এবং যা পশ্চাতে রেখে এসেছে, তদ্বিষয়ে অবহিত করা হবে তার আমলের শুরু ও শেষ সম্পর্কে।

١٤. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ شَاهِدٌ تَنْطِقُ جَوَارِحُهٗ بِعَمَلِهٖ وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ جَزَائِهٖ ـ

১৪. বরং মানুষ তার নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত সাক্ষ্য, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে بَصِيْرَةٌ-এর মধ্যে هَا বর্ণটি مُبَالَغَه-এর জন্য মোদ্দাকথা, আমলের প্রতিদান প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী।

١٥. وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ جَمْعُ مَعْذِرَةٍ عَلٰى غَيْرِ قِيَاسٍ اَىْ لَوْ جَاءَ بِكُلِّ مَعْذِرَةٍ مَا قُبِلَتْ مِنْهُ ـ

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে مَعَاذِيْرَ শব্দটি কিয়াসের বিপরীতে مَعْذِرَةٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ যদিও সবধরনের অজুহাত পেশ করে, তার নিকট হতে তার কোনোটিই গ্রহণ করা হবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ بَرِقَ الْبَصَرُ : بَرِقَ শব্দের رَا،-তে كَسْرَة এবং فَتْح উভয় যুক্ত করে পঠিত হয়েছে। আবুচ্ছাম্মাল بَرِقَ-এর স্থলে بَلِقَ পড়েছেন অর্থ খুলে গেছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ خَسَفَ الْقَمَرُ : জমহুর خَسَفَ শব্দটি خَا، তে এবং سِيْن-এ فَتْح দিয়ে خَسَفَ পড়েছেন। অর্থাৎ مَعْرُوْف করে পড়েছেন। আর ইবনে আবূ ইসহাক, ঈসা, আ'রায, ইবনে আবূ আবলাহ, আবূ হাইওয়া خَا،-তে ضَمَّه এবং سِيْن-এ كَسْرَة যুক্ত করে مَجْهُوْل করে خُسِفَ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ أَيْنَ الْمَفَرُّ : জমহুর مِيْم এবং فَاء -তে فَتْح দিয়ে مَصْدَرْ হিসাবে أَيْنَ الْمَفَرُّ পড়েছেন। অর্থাৎ পলায়ন কোথায়। আর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান বসরী, কাতাদাহ مِيْم -এ فَتْح এবং كَسْرَة দিয়ে إِسْم مَكَانْ হিসাবে পড়েছেন। অর্থ পালানোর জায়গা কোথায়। জহুরী مِيْم -এ كَسْرَة এবং فَاء -তে فَتْح দিয়ে أَيْنَ الْمَفَرُّ পড়েছেন। অর্থ- أَيْنَ الْإِنْسَانُ الْجَيِّدُ الْفِرَارِ "খুব পালাতে পারে সে লোকগুলো আজকে কোথায়" বলেছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্বের আয়াতে পরকাল অস্বীকারকারীগণ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব এবং অবাস্তব মনে করে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং তাচ্ছিল্য করে প্রশ্ন করেছিল- যে কিয়ামতের কথা বলছ সে কিয়ামত কবে কখন সংঘটিত হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের এমন প্রশ্নের প্রতিবাদ হিসাবে কিয়ামত দিবসে বাস্তবে কি ঘটবে তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ : بَرِقَ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- বিদ্যুৎ ছটায় চোখ ঝলসে যাওয়া। আরবি কথনে এরূপ অর্থ হয় না; বরং ভীত, শঙ্কিত, বিস্মিত, হতভম্ব অথবা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে দিশেহারা হয়ে যাওয়া। অথবা কাতর উদ্বিগ্ন করে দেওয়া দৃশ্যের প্রতি চক্ষু ঝলসে যাওয়া বা স্থির হয়ে যাওয়া অথবা চোখে ধাঁধা দেখবে বিস্ফোরিত ক্ষেত্রে তাকাবে ইত্যাদি রকমের অর্থ বুঝাবার জন্য এ বাক্য বলা হয়।

মাদারিক গ্রন্থকার বলেন, بَرِقَ শব্দটি بِكَسْرِ الرَّاءِ হলে অর্থ হবে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ও অস্থির হওয়া। আর যদি بِفَتْحِ الرَّاءِ হয়, তখন অর্থ হবে স্বচক্ষে দেখতে পাওয়া। অর্থাৎ নবীগণ দুনিয়াতে যে সকল ওয়াদা অঙ্গীকার করেছেন সেগুলো তারা মানেনি। আখেরাতে সেসব কিছু সত্য বলে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে হয়রান হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَخَسَفَ الْقَمَرُ : خَسَفَ শব্দটি خُسُوْفٌ হতে مُشْتَقٌّ হয়েছে। অর্থাৎ চন্দ্রের আলোক নিঃশেষ হয়ে তা অন্ধকার হয়ে যাবে যেমন চন্দ্রগ্রহণের ও সূর্যগ্রহণের সময় হয়ে থাকে। স্পষ্ট দিবাভাগ রাত্রির ন্যায় হয়ে যায়। সে সময় এরূপ অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ : উক্ত আয়াতে কিয়ামতের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কেবল চন্দ্রই আলোকহীন হবে না; বরং সূর্যও আলোকহীন হয়ে পড়বে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণের অভিমত হলো চন্দ্রের আলোক সূর্য হতে এসে থাকে- চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই। সুতরাং যখন চন্দ্র আলোকহীন হবে, সূর্যও আলোকহীন হয়ে পড়া আবশ্যক আর চন্দ্র ও সূর্য উভয় সেদিন একত্র হয়ে যাবে। জালালাইন গ্রন্থকার বলেন وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, অর্থ হলো তারা উভয়ই পশ্চিমাকাশে উদিত হবে। অর্থাৎ সেদিন দুনিয়ার পরিস্থিত অন্য দিকে ধাবিত হতে থাকবে। যা উল্টা হয়ে যাবে।

অথবা, আয়াতের অর্থ হবে-চন্দ্র সেদিন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হারিয়ে সূর্যের গহরে নিপতিত হবে। সুতরাং جُمِعَ অর্থ এখানে একই দিক হতে উদয় হওয়া। তবে একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষে জড়িত হবে না। আর একই সময়ই উদিত হওয়াও আবশ্যক হবে না; বরং ভিন্ন ভিন্ন সময়েও উদিত হতে পারে। অথবা কুদরতের ইচ্ছা হলে একই সময়েও বিনা সংঘর্ষে একই দিক হতে উদিত হওয়াও সম্ভব হবে। অথবা, جُمِعَ হবে তখনই যখন উভয় আলোকহীন অবস্থায় একত্রিত হবে। অথবা, চন্দ্র-সূর্য উভয়কে জ্যোতির্ময় অবস্থায় একত্রিত করা হবে, অতঃপর সাগরে উভয়কে নিক্ষেপ করে মহা অগ্নির পানি তৈরি করা হবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'সেদিন মানুষ বলবে পালাবার জায়গা কোথায়? অর্থাৎ সেদিনের ভয়াবহতা আর কঠোরতা দেখে কিয়ামত অস্বীকারকারী কাফেরগণ হতাশ হয়ে বলতে থাকবে এ মহাবিপদ ও আজাব হতে পালানোর জায়গা কোথায়? কোথায় গিয়ে আশ্রয় পাই? কারণ প্রাথমিক অবস্থা দেখেই তারা বুঝতে পারবে যে, সেদিন পালানোর স্থান থাকবে না- কোনো আশ্রয় স্থল পাওয়া যাবে না। -[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ : এ বাক্যটির দুটি অর্থ হতে পরে। এক. সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে আবাসস্থল। অর্থাৎ অন্য কোথাও তারা কোনো আবাসস্থল পাবে না, কোনো আশ্রয় কেন্দ্র থাকবে না। দুই. সেদিন তোমার আল্লাহর কাছেই ঠিকানা হবে জাহান্নাম বা জান্নাত যেকোনো একটি। অর্থাৎ এ দুয়ের যেকোনো একটি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ইরাদায় নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তিনি যাকে পছন্দ করবেন তাকে জান্নাত দিবেন, আর যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে দেবেন। -[কাবীর]

Free @ www.eelm.weebly.com

قَوْلُهُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ : এ বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো, মৃত্যুর পূর্বে যা কিছু নেক আমল করেছে ও বদ আমল করেছে তা এবং মৃত্যুর পর তার কাজের ফলে যে ভালো নিয়ম ও খারাপ নিয়ম প্রচলিত হয়েছে সে সম্পর্কে হাশরের দিন মানুষকে পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আর এক মর্ম পাওয়া যায় যে, যা কিছু খারাপ কাজ পূর্বে করেছে এবং পরে যা কিছু ভালো ও নেক কাজ করা হয়েছে, সবগুলো সম্পর্কেই অবহিত করা হবে।

হযরত কাতাদাহ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যমূলক যা কিছু কাজ করেছে এবং আল্লাহর যেসব হক ও অধিকার নষ্ট করেছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় ধন-সম্পদ হতে নিজের জন্য যা কিছু ব্যয় করেছে এবং মৃত্যুর পর ওয়ারিসদের জন্য যা কিছু রেখে গেছে, তার সম্পর্কেই মানুষকে হাশরের দিন অবগত করানো হবে।

হযরত আতা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, তা দ্বারা জীবনের প্রথম আমল ও শেষের আমলের কথা বুঝানো হয়েছেন।

—[মা'আলিম, খাযেন]

* আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কাজকে চিরস্থায়ী আখেরাতের কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া বা তার বরখেলাফ করা, উভয় প্রকার কর্ম সম্পর্কে তাকে কিয়ামতের দিন অবহিত করা হবে। —[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, বরং মানুষ তখন নিজেই নিজের অবস্থান সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হবে। যদিও মজ্জাগত অভ্যাসবশত সেখানেও মিথ্যা এবং স্থূল কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিভিন্নভাবে ওজরখাহী করতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলেন– قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সকল প্রকার দলিল ও প্রমাণসমূহ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে তার প্রতি লক্ষ্য করবে সে নিজেই উপকৃত হবে। আর যে তা উপেক্ষা করবে তার প্রতিফল নিজেরই উপর পতিত হবে। আর আমি তোমাদের উপর সর্বদা দরবান সমেত থাকবো না। بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ -এর অর্থ কেউ কেউ বলেন, মানুষ যদি নিজের কথায় নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখে তবে সহজেই আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাতে প্রভৃতি সত্য বলে বুঝতে পারবে।

قَوْلُهُ بَصِيرَةٌ : بَصِيرَةٌ -এর অর্থ হলো– দর্শক, অথবা بَصِيرَةٌ অর্থ حُجَّتٌ প্রমাণাদি। বলা হয়ে থাকে أَنْتَ حُجَّةٌ عَلَى نَفْسِكَ بَصِيرَةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো بَصَائِرُ অথবা এর অর্থ شَاهِدٌ সাক্ষী حَاضِرٌ উপস্থিত।

قَوْلُهُ مَعَاذِيرَهُ : مَعَاذِيرَهُ শব্দটি مِعْذَارٌ -এর সম অর্থ, অর্থাৎ ওজর-আপত্তি, عُذْرٌ এর একবচন। আল্লামা ওয়াহিদী (র.) বলেন, এটা مَعْذِرَةٌ শব্দের অনিয়মিত বহুবচন। আর কাশ্শাফ গ্রন্থকার বলেন, مَعَاذِيرَهُ শব্দটি اِسْمُ جَمْعٍ বরং مَعْذِرَةٌ -এর বহুবচন হলো مَعَاذِرُ - اَلْمَعَاذِيرُ অর্থ– আবরণ, তার একবচন হলো مِعْذَارٌ সুতরাং বাক্যটির অর্থ হলো, তারা যদি তাদের অপকর্মের উপর পর্দা আবরণ ঢেলে দেয়।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . فَمَا وَجْهُ الْحُجَّةِ عَلَى أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

আল্লাহ বলেছেন, প্রত্যেক মানুষই তার কৃত সকল আমল সম্বন্ধে অবহিত থাকবে, সুতরাং বনী আদমের আমলসমূহের উপর রোজ কিয়ামতে حُجَّةٌ পেশ করার প্রয়োজন কি?

এর জবাবে বলা হবে, যদিও أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ সম্বন্ধে প্রত্যেক আদম সন্তানই অবগত রয়েছে এবং কিয়ামতে তারা সবগুলোই স্বচক্ষে ভালোমন্দ দেখতে পাবে, তথাপিও তা আল্লাহর আদালতের বিচার কার্য সমাধানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। আল্লাহ যেহেতু দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে অথবা কোনো দলিল-প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমেই বিচার করাকে হক বিচার বলেছেন, তাই ব্যতিক্রমভাবে তার স্বয়ং বিচার করা ইনসাফ হবে না। সেদিন তিনি নিজেই হাকিম হবেন, আর হাকিম কখনো তার নিজ আইনের বহির্ভূত কাজ করা সমীচীন নয়। وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ -

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٦. قَالَ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ بِالْقُرْاٰنِ قَبْلَ فَرَاغِ جِبْرَئِيْلَ مِنْهُ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ خَوْفَ اَنْ يَنْفَلِتَ مِنْكَ.

১৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি তার সাথে সঞ্চালন করো না কুরআনের সাথে, হযরত জিবরাঈল তা আবৃত্ত করা হতে অবসর না হওয়ার পূর্বে তাকে দ্রুত আত্মস্থ করার উদ্দেশ্যে এ ভয়ে যে, না জানি কুরআনের কোনো অংশ ছুটে যায়।

١٧. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ فِىْ صَدْرِكَ وَقُرْاٰنَهٗ قِرَاءَتَكَ اِيَّاهُ اَىْ جَرَيَانَهٗ عَلٰى لِسَانِكَ.

১৭. নিশ্চয় আমারই দায়িত্ব তা সংরক্ষণ করা তোমার বক্ষে এবং তা পাঠ করাবার তুমি তা পাঠ করার অর্থাৎ তোমার মুখে তা জারি করার।

١٨. فَاِذَا قَرَاْنَاهُ عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ جِبْرَئِيْلَ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ اِسْتَمِعْ قِرَاءَتَهٗ فَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ ثُمَّ يَقْرَأُ.

১৮. সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তোমার নিকট হযরত জিবরাঈলের মাধ্যমে তখন তুমি সে পাঠের অনুসরণ করো তার কেরাত শ্রবণ করো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হতে শ্রবণ করতেন এবং অতঃপর স্বয়ং পাঠ করতেন।

١٩. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ بِالتَّفْهِيْمِ لَكَ وَالْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَمَا قَبْلَهَا اَنَّ تِلْكَ تَضَمَّنَتِ الْاِعْرَاضَ عَنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذِهٖ تَضَمَّنَتِ الْمُبَادَرَةَ اِلَيْهَا بِحِفْظِهَا.

১৯. পুনরায় এর বিশদ ব্যাখ্যা দান করা আমারই দায়িত্ব তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। পূর্ববর্তী আয়াতও এ আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যতা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আয়াত হতে বিমুখতা ছিল, আর এ আয়াতে তা মুখস্থ করার মাধ্যমে তৎপ্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে।

٢٠. كَلَّا اِسْتِفْتَاحٌ بِمَعْنٰى اَلَا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ الدُّنْيَا بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِى الْفِعْلَيْنِ.

২০. না كَلَّا শব্দটি اِسْتِفْتَاح -এর জন্য এবং اَلَا অর্থে ব্যবহৃত বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাস দুনিয়াকে, تُحِبُّوْنَ ও تَذَرُوْنَ এ فِعْل দু'টি يَا ও تَاء যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে।

٢١. وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ فَلَا تَعْمَلُوْنَ لَهَا.

২১. আর আখেরাতকে উপেক্ষা কর তাই তজ্জন্য আমল কর না।

٢٢. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ اَىْ فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَّاضِرَةٌ حَسَنَةٌ مُضِيْئَةٌ.

২২. সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উজ্জ্বল হবে সুদর্শন ও আলোকোজ্জ্বল।

٢٣. اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

২৩. তার প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিদানকারী।

٢٤. وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ كَالِحَةٌ شَدِيْدَةُ الْعُبُوْسِ.

২৪. আর কোনো কোনো মুখমণ্ডল সেদিন বিবর্ণ হয়ে পড়বে মলিন ও ফ্যাকাশে।

٢٥. تَظُنُّ تُوْقِنُ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ دَاهِيَةٌ عَظِيْمَةٌ تَكْسِرُ فَقَارَ الظَّهْرِ.

২৫. এ ধারণায় বিশ্বাসে যে, ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন এমন ভয়ানক বিপদ যার কারণে পাঁজর ভেঙ্গে যাবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ لِتَعْجَلَ بِهِ : অংশটি لَا تُحَرِّكْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে। قَوْلُهُ اِنَّ عَلَيْنَا الخ এটা পৃথক বাক্য।

قَوْلُهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ : এটা পূর্ববর্তী اِذَا قَرَأْنَاهُ-এর جَوَابْ হবে, তাই مَجْزُوْم হয়েছে। কেননা جَوَابِ شَرْط-এর اِعْرَابْ জযম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ : এখানে ثُمَّ টি تَرَاخِيْ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আর এটা حَرْف عَطْف হওয়ার কারণে তার পূর্ববর্তী বাক্যের উপর عَطْف হবে। একে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ বলে।

قَوْلُهُ نَاضِرَةٌ : এটা وُجُوْهٌ-এর خَبَرْ হিসাবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ وَوُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ : বাক্য হতে تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ الخ বাক্যটি حَالْ হিসাবে মহল্লান মানসূব।

تَذَرُوْنَ এবং تُحِبُّوْنَ-**এর অবতীর্ণ কেরাতসমূহ** : মদীনাবাসী এবং কৃফাবাসীগণ تُحِبُّوْنَ এবং تَذَرُوْنَ অর্থাৎ تَ . দিয়ে পড়েছেন। সম্বোধনসূচক বাক্য হিসাবে। আবূ ওবাইদ এ কেরাত পছন্দ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, এ সব ক্বারীদের বিরোধিতা করা আমার কাছে অপছন্দনীয় না হলে আমি يَا . যুক্ত করে পড়তাম। কারণ, পূর্বে اِنْسَانْ উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি ক্বারীগণ খবর হিসাবে يَا . যুক্ত করে পড়েছেন। তা আবূ হাতিমের গ্রহণীয় মত। —[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ الخ আয়াতের শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কাছে যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি তা মুখস্থ করার জন্য তাড়াতাড়ি করে ওষ্ঠ ও জিহ্বা সঞ্চালন করতে তৎপর থাকতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং বলেন– হে নবী! আপনি কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না এবং ব্যস্ত হবেন না। তা আপনার স্মৃতিতে মুদ্রিত করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন তা পাঠ করে, আপনি তখন চুপ থাকবেন। অতঃপর তাকে অনুকরণ করে পাঠ করবেন। তা বর্ণনাকরণ এবং মানুষের নিকট প্রচার করার ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব আমার, আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না। —[খাযেন, লোবাব]

উল্লিখিত কথার পটভূমি : সূরার প্রথম হতে কিয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল– পরেও আবার কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে; কিন্তু মধ্যের এ আয়াত চারটি ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করে সম্পূর্ণ একটি নতুন কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে– হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন সূরা 'আল-ক্বিয়ামাহ' পাঠ করে তাঁকে শুনাচ্ছিলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তা মুখস্থ করার জন্য শানে নুযূলে বর্ণিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, এ জন্য প্রসঙ্গ কথা বাদ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে এ হেদায়েত দেওয়া হলো যে, আপনি এখনই ওহীর শব্দ ও ভাষা মুখস্থ করার জন্য চেষ্টা করবেন না; বরং আপনি মনোযোগ সহকারে তা শুনতে থাকুন। তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং পরে তা যথাযথভাবে পড়িয়ে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। আপনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।

এ ব্যাপারটি যেন এমনই যে, একজন শিক্ষক শিক্ষা কক্ষে ছাত্রদেরকে পড়াতে একটি শিক্ষার্থীকে অন্যদিকে মনোনিবেশকারীরূপে পেলেন তিনি তখনই পাঠদান থামিয়ে প্রসঙ্গ ভঙ্গ করে ছাত্রটিকে বলেন 'আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো।' তারপর তিনি তার শিক্ষাদান প্রসঙ্গের কথা বলতে শুরু করে দিলেন। এর কারণেই সূরার মধ্যের এ কথাটি বেখাপ্পা ও অপ্রাসঙ্গিক নয়, তার পটভূমি জানা না থাকলেই কেবল বেখাপ্পা মনে হতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا تُحَرِّكْ بِهِ-এর মধ্যকার بِهِ অর্থ : এর অর্থ দুই পদ্ধতিতে করা যায়। একটি হলো لَا تُحَرِّكْ بِالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ কালে তা তেলাওয়াতের প্রতি ত্বরান্বিত করবেন না। অর্থাৎ পড়তে তাড়াতাড়ি করবেন না। অপর অর্থ হলো لَا تُحَرِّكْ بِالْوَحْيِ অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণকালে তা তেলাওয়াতের প্রতি ত্বরান্বিত করবেন না. অর্থাৎ পড়তে তাড়াতাড়ি করবেন না। অপর অর্থ হলো لَا تُحَرِّكْ بِالْوَحْيِ অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণকালে তা পাঠ করার জন্য জবানকে হেলাবেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ওহীকে গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়া করার কারণ : মা'আরিফ গ্রন্থকার এর দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন–

১. ওহী যা অবতীর্ণ হচ্ছে তা পরোক্ষণে কিছু অংশ হুজুর ﷺ হতে ছুটে যায় কিনা।

২. অথবা, ওহীর মাধ্যমে যে যে বিষয়ে যে যে নির্দেশ যেমনি পালন করতে বলা হয়েছে সে নিয়ম-পদ্ধতিতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে যায় কিনা– এই আশঙ্কায় হুযূর ﷺ ওহীসমূহ কণ্ঠস্থ করার জন্য খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

قَوْلُهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ -এর মধ্যে قُرْآنَهُ-এর অর্থ : এর অর্থও সাধারণত দু'টি হতে পারে। এক অর্থ হয়- قِرَاءَتْ পঠন করা, তেলাওয়াত করা, আরেকটি অর্থ হলো– إِثْبَاتُهُ অর্থাৎ إِثْبَاتُ قِرَاءَتِهِ عَلَى لِسَانِكَ তখন অর্থ হবে হযরত জিবরাঈলের কেরাতকে আপনার অন্তরে স্থায়ী করে দেওয়া। দ্বিতীয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এরপর যে فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ বলা হয়েছে সেখানে قُرْآنَهُ অর্থ হলো قِرَاءَةٌ অর্থাৎ হযরত জিবরাঈলের কেরাতের অনুসরণ করুন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ : প্রকাশ থাকে যে, إِتِّبَاعْ অর্থ এই নয় যে, পাঠকের সাথে সাথেই পাঠ করতে হবে; বরং إِتِّبَاعِ قِرَاءَةٌ অর্থ এই হবে যে, যখন পাঠক বা ইমাম قِرَاءَةٌ পড়তে শুরু করবে তখন তাকে ধীরস্থিরভাবে শুনে নেবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, উক্ত আয়াত দ্বারা এ মাসআলার إِسْتِدْلَالْ করা যায় যে, ইমাম সাহেবের পিছনে মুক্তাদীগণ কেরাত পড়া নিষিদ্ধ। যেমন হযরত ইমামে আ'যম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মুক্তাদীগণের জন্য ইমমের إِتِّبَاعْ করা ওয়াজিব এবং মুক্তাদীগণ ইমামের إِتِّبَاعْ করার জন্য ইমাম নির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং রুকু ও সিজদা ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে মুক্তাদীগণকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। ইমামের পূর্বে কেউ কোনো কাজ নামাজের মধ্যে করতে পারবে না।

وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ فِيْ هٰذِهِ الْآيَةِ উক্ত আয়াতে فَاتَّبِعْ - أَمْر টি ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ -এর মধ্যে قِرَاءَةٌ -এর সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি করার কারণ : তার কারণ হচ্ছে– মূলত হযরত জিবরাঈল (আ.) যা তেলাওয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শুনাতেন তা প্রকৃতপক্ষে হযরত জিবরাঈলের কেরাত নয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) কেবল তার মাধ্যম মাত্র। মূল কালামুল্লাহর রচয়িতা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তার কালাম পাঠ করতেন। এ জন্য قِرَاءَةٌ-এর نِسْبَتْ টি হযরত জিবরাঈলের প্রতি না করে আল্লাহ নিজের প্রতি করেছেন। আল্লাহ পাঠ না করলে হযরত জিবরাঈল (আ.) তা পাঠ করার কোনো ক্ষমতাই রাখেন না।

১. অথবা বলা যায়, হযরত জিবরাঈলকে যদিও আপাত বর্ণনা ভঙ্গিমায় শিক্ষক বলে অনুমান হয় তথাপিও তিনি শিক্ষক নন; বরং আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিকেই হযরত জিবরাঈল (আ.) মুহাম্মদ ﷺ -কে প্রদান করেছেন। অতঃপর মুহাম্মদ ﷺ সেই শক্তি পেয়ে ওহী তেলাওয়াত করেছেন।

২. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ -এর যদি সরাসরি অর্থ নেওয়া হয় তখন قَرَأْنَا -এর فَاعِل حَقِيْقِيْ আল্লাহ হয়ে থাকেন। অর্থাৎ আমিই তাঁকে পড়িয়েছি। যেহেতু দুনিয়া বস্তু জগৎ তাই কোনো একটা মাধ্যম অবলম্বন করা আবশ্যক। তাই হযরত জিবরাঈলকে প্রকাশ্য বা জাহেরী قِرَاءَةٌ-এর سَبَبْ বানানো হয়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বহাল ছিল। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ অর্থাৎ আমি তাকে شِعْر শিক্ষা দেইনি। এখানে সরাসরি تَعْلِيْم -এর সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে। তদ্রূপ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ -এর মধ্যেও قِرَاءَةٌ -এর সম্পর্ক আল্লাহর প্রতি করা হয়েছে সাজা হিসেবে। আর হুযূর ﷺ নিজেই বলেছেন بعثت معلما অর্থাৎ তিনি নিজেই শিক্ষক হিসাবে مَبْعُوْث সুতরাং তাঁর কেউই শিক্ষক হওয়া জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'পরে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে।' এটা হতে কতিপয় নীতিগত কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, নিম্নে তা উল্লিখিত হলো :

১. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ হতে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ থাকা ওহী ছাড়া নবী করীম ﷺ -কে ওহীর মাধ্যমে আরও জ্ঞান দান করা হতো। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের তাৎপর্য ওহী দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হতো। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের 'ওহীকে ওহীয়ে খফী' বলা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. কুরআনের বক্তব্যের তাৎপর্য এবং তার আদেশ, নিষেধ ও আহকামের ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জানিয়েছেন এ জন্য যে, রাসূল নিজের কথা ও কাজ দ্বারা লোকদেরকে কুরআন বুঝাবেন এবং কুরআনের বিধি-বিধান মতে আমল শেখাবেন। এ সম্পর্কে কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ "আর হে নবী! এই কিতাব তোমার প্রতি আমি নাজিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যেন তুমি লোকদের সম্মুখে তাদের জন্য অবতীর্ণ সেই শিক্ষা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাক।"

৩. কুরআনের শব্দসমূহের যে ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলে দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় কথা ও কাজ দ্বারা তার যে শিক্ষা তাঁর উম্মতকে দিয়েছেন, তা জানার একটি উপায়ই আমাদের নিকট রয়েছে, সেই উপায়টি হলো হাদীস বা সুন্নত।

কোনো কোনো আলিম কর্তৃক নামাজে কুরআন শ্রবণ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণদান : কোনো কোনো আলিম فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ আয়াত হতে এস্তেম্বাত করে বলেছেন, ইমাম যখন নামাজে কুরআন তেলাওয়াত করবেন তখন মুক্তাদীদেরকে তা শুনতে হবে। কারণ, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন তেলাওয়াত করেন তখন চুপ থেকে শুনতে বলা হয়েছে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। -[মা'আরিফুল কোরআন)

পূর্বাপর যোগসূত্র : এখান হতে আবার পূর্বের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা كَلَّا 'কখনো নয়' কথাটির তাৎপর্য হলো, বিশ্বলোক স্রষ্টা মহান আল্লাহকে তোমরা কিয়ামত সৃষ্টি করতে এবং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম মনে কর বলেই যে, তোমরা পরকালকে অস্বীকার করছ তা নয়– এ অস্বীকৃতির মূল কারণও তা নয়। আসল কারণ পরে বিবৃত হয়েছে بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ বাক্যে।

পরকাল অস্বীকৃতির দ্বিতীয় কারণ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরকাল অস্বীকারের দ্বিতীয় কারণ তুলে ধরেছেন। মানুষ এ জগতে আত্মার তাড়নায় ও লোভ-লালসার জন্য কোনো নৈতিক বাঁধনে শৃঙ্খলিত হতে চায় না। এ জগতে আনন্দ ও সুখ-সমৃদ্ধিকেই আসল ভেবে তার জন্য সমস্ত ক্ষমতা ও চেষ্টা-তদবির কেন্দ্রীভূত করে থাকে। পরকালে কি পাবে, না পাবে সে চিন্তা করে না এবং সে জন্য কষ্ট-ক্লেশ করতেও প্রস্তুত নয়। সে যেন 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য রাখ', এ জাহিলিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী। মোটকথা দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ, আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা, মায়া-মহব্বত ও এখানের জীবনকেই সব কিছু মনে করে এবং পরকাল না হওয়ার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। মূলত তার এই যুক্তি, যুক্তিই নয়। আসলে সত্যকে চাপা দেওয়া। আর বিবেকের বিশ্বাসের পরিপন্থি যুক্তিজাল বুনা। তাই আল্লাহ তা'আলা ২০ নং আয়াতে বলেছেন, তোমরা কিয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসের পক্ষে যতই যুক্তি প্রদর্শন কর না কেন আসল কথা এটা নয়; বরং কিয়ামত ও পরকালকে অস্বীকার করার আসল কারণ হলো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি এবং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার জন্য পাগলপারা হয়ে যাওয়া। যাবতীয় কর্মতৎপরতা পার্থিব জীবনের জন্যই কেন্দ্রীভূত করা। এটাই হলো পরকাল। অবিশ্বাসের মূল কারণের দ্বিতীয় কারণ। এটা না হলে তোমরা অবশ্যই পরকালে বিশ্বাসী হতে এবং নৈতিক বাঁধন ও বাধ্য-বাধকতাগুলোও মেনে নিয়ে পবিত্রময় জীবন-যাপন করতে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেদিন কিছু সংখ্যক মুখাবয়ব উজ্জ্বল হবে।" অর্থাৎ আনন্দ ও খুশিতে উৎফুল্ল ও আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কেননা যে পরকালের প্রতি তারা ঈমান এনেছিল তা এখন তাদের দৃঢ় প্রত্যয় অনুরূপ তাদের সম্মুখে সমুপস্থিত। যে পরকালের প্রতি ঈমান এনে তারা দুনিয়ায় অবৈধ উপায়-উপকরণ পরিহার করেছিল ও প্রকৃতই ক্ষতি স্বীকার করেছিল, তাকে চোখের সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তারা নিশ্চিত মনে করতে পারবে যে, তারা তাদের জীবন-আচরণ গ্রহণে নির্ভুল সিদ্ধান্তই করেছিল এবং এক্ষণে তার সঠিক, শুভ ও সর্বোত্তম ফল পাওয়ার সময় উপস্থিত।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহকে দেখার প্রমাণ : اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'তারা নিজেদের প্রতিপালকের দিকে তাকাতে থাকবে.' এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনরা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। কাফির-মুনাফিকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে কি পাবে না; এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। জান্নাতিরা সকলেই আল্লাহর দীদার লাভ করবেন। তবে স্তর অনুযায়ী কেউ দৈনিক দু'বার, কেউ একবার, কেউ সপ্তাহে একবার লাভ করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

গোটা উম্মাতে মুসলিমার এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, দুনিয়াতে কেউ স্বীয় চোখে আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ করতে পারবে না। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন কিনা, এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। একদল বলেছেন, নিজ চোখেই দেখেছেন, অপরদল বলেছেন অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন। এ দ্বিতীয় মতটাকেই সত্য বলে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম মন্তব্য করেছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ নূর কিভাবে দেখবো? –[শারহু আক্বীদাতুত্ ত্বাহাবিয়া, কুরতুবী]

অতীব দুঃখের বিষয় বর্তমানে এ দেশের কিছু কিছু ভণ্ডপীর দাবি করছে যে, তারা আল্লাহকে দেখতে পায়। তারা কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে এবং জাল হাদীস দ্বারা তাদের বক্তব্য প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে সচেতন আলিম সমাজের প্রতিবাদ করা অপরিহার্য। দুনিয়ার চোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব নয়, সেই কারণে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহকে দেখতে চাইলে আল্লাহ তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। যেমন, আল্লাহর বাণী–

قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ .

'তখন (মূসা) বলল, হে আমার রব আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো। আল্লাহ বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পার না।' কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ 'দৃষ্টিশক্তিসমূহ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন, তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী এ সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।'

আখেরাতে আল্লাহকে দেখার মতো যোগ্যতা ও গুণাবলি দেওয়া হবে। সেখানে চোখের এ দুর্বলতা থাকবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত। –[শরহুল আক্বীদাহতু ত্বাহাবিয়া, আক্বীদাতুল মু'মিন আল-আক্বীদাতুল ইসলামিয়া ওয়া উসুসিহা]

قَوْلُهُ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ .... بِهَا فَاقِرَةٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে বিষণ্ন। তারা ধারণা করতে থাকবে যে, তাদের সাথে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার আচরণ করা হবে।"

অর্থাৎ পরকাল অস্বীকারকারী কাফির-মুশরিকদের চেহারা সেদিন বিষণ্ন হয়ে পড়বে, যখন তারা জানতে পারবে তাদের স্বীয় আমলনামা সম্বন্ধে। তারা আরও মনে করবে যে, আজও তাদেরকে কঠোর আজাব ও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। যে শাস্তি তাদের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ভেঙ্গে দিতে পারে। কালবী বলেছেন, 'ফাকেরা' অর্থ তাদের প্রভুকে তারা দেখতে পাবে না, কারণ পর্দা টাঙ্গানো হবে (কাবীর)। কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ "কখনো নয়, তারা (গুনাহগার লোকেরা) এদিন নিজেদের রবকে দর্শন হতে বঞ্চিত হবে। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারগণ প্রথম অর্থই গ্রহণযোগ্য মনে করেন।" –[সূরা আল-মুত্বাফ্ফিফীন : আয়াত ১৫]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٦. كَلَّا بِمَعْنٰى أَلَا إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ التَّرَاقِيَ عِظَامَ الْحَلْقِ ـ

২৬. ন كَلَّا শব্দটি أَلَا অর্থে ব্যবহৃত যখন পৌছাবে প্রাণ কণ্ঠদেশে কণ্ঠস্থিত হাড় পর্যন্ত।

٢٧. وَقِيْلَ قَالَ مَنْ حَوْلَهُ مَنْ سَكْتَه رَاقٍ يُرْقِيْهِ لِيَشْفٰى ـ

২৭. আর বলা হবে আশপাশের লোকজন বলবে কে রক্ষা করবে তাকে আরোগ্য দান করে রক্ষা করবে।

٢٨. وَظَنَّ أَيْقَنَ مَنْ بَلَغَتْ نَفْسُهُ ذٰلِكَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ فِرَاقُ الدُّنْيَا ـ

২৮. আর সে ধারণা করবে প্রত্যয় জাগবে, সেই ব্যক্তি যার প্রাণ এ পর্যন্ত পৌছেছে, যে, এটা বিদায়ের সময় ।

٢٩. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أَيْ إِحْدٰى سَاقَيْهِ بِالْأُخْرٰى عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْتَفَّتْ شِدَّةُ فِرَاقِ الدُّنْيَا بِشِدَّةِ إِقْبَالِ الْاٰخِرَةِ ـ

২৯. এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে অর্থাৎ মৃত্যুকালে তার এক পা অপর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে কিংবা দুনিয়া হতে বিদায় ও আখেরাতে প্রবেশের কঠোরতা একত্র হবে।

٣٠. إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ أَيِ السَّوْقُ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى الْعَامِلِ فِىْ إِذَا الْمَعْنٰى إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ الْحُلْقُوْمَ تُسَاقُ إِلٰى حُكْمِ رَبِّهَا ـ

৩০. সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাগমন سَاقٌ শব্দটি سَوْق অর্থে ব্যবহৃত, আর এ বাক্যটি إِذَا-এর عَامِلٌ-এর প্রতি নির্দেশ করছে। অর্থাৎ প্রাণ যখন কণ্ঠদেশে পৌছাবে, তখন তার হুকুম পানে অগ্রসর হবে।

٣١. فَلَا صَدَّقَ الْإِنْسَانُ وَلَا صَلّٰى أَيْ لَمْ يُصَدِّقْ وَلَمْ يُصَلِّ ـ

৩১. সে বিশ্বাস করেনি মানুষেরা এবং সালাত আদায় করেনি অর্থাৎ বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি।

٣٢. وَلٰكِنْ كَذَّبَ بِالْقُرْاٰنِ وَتَوَلّٰى عَنِ الْإِيْمَانِ ـ

৩২. বরং অসত্যারোপ করেছে কুরআনের প্রতি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঈমান আনয়ন করা হতে।

٣٣. ثُمَّ ذَهَبَ إِلٰى أَهْلِهِ يَتَمَطّٰى يَتَبَخْتَرُ فِىْ مِشْيَتِهِ إِعْجَابًا ـ

৩৩. অতঃপর তার পরিবার-পরিজনের নিকট সদর্পে ফিরে গেছে আত্ম অহঙ্কারের সাথে সদর্পে হেঁটেছে।

তাহকীক ও তারকীব

إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ এবং وَقِيْلَ الخ - وَظَنَّ এবং وَالْتَفَّتِ الخ - شَرْط-এর স্থলাভিষিক্ত। আর إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ বাক্যটি হলো جَزَاء।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ : كَلَّا 'কখনো না' বলার তাৎপর্য এই যে, পরকাল অস্বীকারকারী কাফেরগণের ঈমান গ্রহণ কোনো সহজ ব্যাপার নয় তা সুদূর পরাহত। সুতরাং তাদের ঈমান আনয়নের আশা বৃথা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلتَّرَاقِىْ শব্দটি تَرْقُوَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ- কণ্ঠনালী। এখানে تَرَاقِىْ শব্দটি بَلَغَتْ-এর مَفْعُوْل হয়েছে। তার فَاعِل-কে বোধগম্য হওয়ার ফলে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন- فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ-এ উহ্য রাখা হয়েছে- একই কারণে। تَقْدِيْر হলো إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ التَّرَاقِىْ অর্থাৎ যখন প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে পৌঁছবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ : আয়াতে رَاقٍ শব্দটির মূল হলো رُقْيَةٌ তার দু'টি অর্থ। একটি হচ্ছে তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁককারী। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে উর্ধ্বে আরোহণকারী। প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হলে, আয়াতের মর্ম হবে, মৃত্যুর সময় রোগীর জীবন বাঁচাবার জন্য ঔষধপত্র হতে নিরাশ হয়ে নিকটবর্তী লোকগণ বলবে, ঔষধে কোনো কাজ হবে না। তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁককারী কে আছে তাকে ডেকে আনো। তাকে তাবিজ-তুমার ও ঝাড়ফুঁক দ্বারা হয়তো রক্ষা করা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ এই হয় যে, মৃতব্যক্তির রূহ আজাবের ফেরেশতাগণ কবজ করবে, না রহমতের ফেরেশতা কবজ করবে- তা নিয়ে তাদের মধ্যে বাদানুবাদ হবে। পরিশেষে লোকটি নেককার হলে রহমতের ফেরেশতা প্রাণ হরণ করে নেবে। আর তা না হলে প্রাণ হরণ করবে আজাবের ফেরেশতা।

কেউ কেউ বলেছেন, "এ রূহকে নিয়ে যাবে" এ কথাটি মালাকুল মাউত ফেরেশতা বলবেন, কারণ কাফেরদের প্রাণ নিয়ে যেতে ফেরেশতারা অস্বীকৃতি জানাবে, তারা কাফেরদের প্রাণের কাছেও যেতে চাইবে না। তা দেখে মালাকুল মাউত প্রথমে বলবে "এটা কে নিয়ে যাবে।" পরে কোনো একজন ফেরেশতাকে তিনি নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেবেন, তখন সে ফেরেশতা অগত্যা নিয়ে যাবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ : উক্ত আয়াতাংশের কয়েকটি তাফসীর বর্ণনা রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন (র.) বলেন, মৃত্যুর সময় মৃত্যুযন্ত্রের তাড়নায় দিশাহারা হয়ে ভয়ভীতির পরে পড়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি এক পাকে অপর পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে খিঁচিয়ে যাওয়াকেই اِلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অথবা, দুনিয়ার মৃত্যুযন্ত্রণা ও আখেরাতের যন্ত্রণার সম্মিলিত কঠিন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মৃত্যুযন্ত্রণায় এবং আখেরাতের শাস্তির ভীষণ অবস্থায় তার পায়ের গুচ্ছসমূহ উলটপালট হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। -[কাবীর]

* মা'আরিফ গ্রন্থকারের মতে এর অর্থ হলো, একটি পাকে অপর পায়ের সাথে মিলিয়ে ফেলা। আর মৃত্যুর কঠিনতার কারণে হাতে হাত এবং পা পায়ের উপর এভাবে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এদিক সেদিক মারতে থাকবে।
* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এর দ্বারা জীবন ও মৃত্যুর সম্মিলিত ঘণ্টাকে বুঝানো হয়েছে।
* হযরত হাসান (র.) বলেন, এর দ্বারা মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির পদযুগলের নালা দু'টি শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো শুকিয়ে একত্র হয়ে যাবে।
* সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) বলেন, এর অর্থ হলো মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তিকে কাফন পরিয়ে পদযুগলকে কাফনসহ টেনে হেঁচড়ে বাঁধাকে বুঝানো হয়েছে। -[মাদাবিক. খাযেন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلَا صَدَّقَ ...... اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিন্তু না সে সত্য মেনে নিল, না সালাত আদায় করল, বরং [সত্যকে] মিথ্যা মনে করল, [মেনে নিতে অস্বীকার করল] এবং ফিরে গেল। পরে অহমিকা সহকারে নিজের ঘরের লোকদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

কে এই লোক যার সম্বন্ধে এইসব কথাবার্তা বলা হয়েছে? কোন কোন তাসীরকারকের মতে 'মানুষ কি মনে করে যে, আমরা তার অস্থিগুলো একত্র করতে পারবো না।' এতে যে মানুষের কথা বলা হয়েছে এখানেও সে মানুষটি উদ্দেশ্য। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ বলেন, এ ব্যক্তি ছিল আবূ জাহল। আয়াতের শব্দসমূহ হতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, এখানে যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে সে সূরা আল-ক্বিয়ামার উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করার পর এ আচরণই গ্রহণ করেছিল।

নামাজের গুরুত্ব এবং তা ঈমানের দাবি হওয়া : এ আয়াতে فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى "না সে সত্য মেনে নিল, না সালাত আদায় করল" বাক্যটি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য। তা হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের সত্যতা মেনে নেওয়ার ও তার প্রতি ঈমান আনার প্রাথমিক ও অনিবার্য দাবি হচ্ছে রীতিমত সালাত আদায় করা। আল্লাহর শরিয়তের অন্যান্য বিপুল ও ব্যাপক আইন-বিধান পালন করার পর্যায় তো পরে আসে। ঈমানের পরপরই অনতিবিলম্বে সালাতের সময় উপস্থিত হয় এবং তখনই জানতে পারা যায় যে, মুখে যে সত্যের প্রতি ঈমান আনা হয়েছে ও মেনে নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবিকই তার অন্তরের প্রতিধ্বনি না একটা মৌখিক কথা মাত্র, যা কতিপয় শব্দের মাধ্যমে তার মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছে এবং ধ্বনিত ও উচ্চারিত হয়েছে। সালাতই হলো ঈমানের বাস্তব প্রমাণ।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى বাক্যটি কিসের উপর عَطْف করা হয়েছে? : আল্লামা যামাখশারীর মতে এ বাক্যটি يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ বাক্যের উপর عَطْف হয়েছে। সুতরাং বাক্যের অর্থ হলো, যে পরকালের কথা বলছে সে পরকাল কবে আসবে? [এটা ঠাট্টা করে এবং পরকাল অস্বীকার করারচ্ছলে বলা হয়েছে।] অতঃপর সে দীনের মূল অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করেনি এবং অন্যতম দাবি অর্থাৎ নামাজ আদায় করেনি। -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٤. اَوْلٰى لَكَ فِيْهِ اِلْتِفَاتٌ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْكَلِمَةُ اِسْمُ فِعْلٍ وَاللَّامُ لِلتَّبْيِيْنِ اَىْ وَلِيَكَ مَا تَكْرَهُ فَاَوْلٰى اَىْ فَهُوَ اَوْلٰى بِكَ مِنْ غَيْرِكَ .

৩৪. তোমার জন্য দুর্ভোগ এখানে صِيْغَه غَائِبْ হতে صِيْغَه حَاضِرْ-এর প্রতি اِلْتِفَاتْ হয়েছে। আর اَوْلٰى শব্দটি اِسْمِ فِعْلٍ আর لَامْ টি بَيَانِيَه অর্থাৎ তোমার দুর্ভোগ আগত হয়েছে। এবং দুর্ভোগ অর্থাৎ অন্যের তুলনায় তুমিই এর উপযুক্ত।

٣٥. ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى تَاكِيْدٌ .

৩৫. পুনরায় তোমার জন্য দুর্ভোগ এবং দুর্ভোগ এটি تَاكِيْد হিসাবে দ্বিরুক্ত হয়েছে।

٣٦. اَيَحْسَبُ يَظُنُّ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى هَمَلًا لَا يُكَلَّفُ بِالشَّرَائِعِ اَىْ لَا يَحْسَبُ ذٰلِكَ .

৩৬. তবে কি ধারণা করে মনে করে মানুষেরা যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে অর্থহীনভাবে এবং কোনো শরিয়তের অনুসরণে বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। অর্থাৎ এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়।

٣٧. اَلَمْ يَكُ اَىْ كَانَ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ تُصَبُّ فِى الرَّحِمِ .

৩৭. সে কি ছিল না يَكُ ক্রিয়াটি كَانَ অর্থে স্খলিত শুক্রবিন্দু يُمْنٰى শব্দটি تَا. ও يَا. যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। জরায়ু নিক্ষিপ্ত শুক্রবিন্দু।

٣٨. ثُمَّ كَانَ الْمَنِىُّ عَلَقَةً فَخَلَقَ اللّٰهُ مِنْهَا الْاِنْسَانَ فَسَوّٰى عَدَّلَ اَعْضَاءَهُ .

৩৮. অতঃপর ছিল সে শুক্রবিন্দু জমাট রক্ত, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করেন আল্লাহ তা'আলা তা হতে মানুষ। এবং সুবিন্যস্ত করেন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সামঞ্জস্যশীল করে

٣٩. فَجَعَلَ مِنْهُ مِنَ الْمَنِىِّ الَّذِىْ صَارَ عَلَقَةً اَىْ قِطْعَةَ دَمٍ ثُمَّ مُضْغَةً اَىْ قِطْعَةَ لَحْمٍ الزَّوْجَيْنِ النَّوْعَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى يَجْتَمِعَانِ تَارَةً وَيَنْفَرِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ تَارَةً .

৩৯. তৎপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন শুক্রবিন্দু হতে যে আলাকা অর্থাৎ জমাট রক্ত এবং তারপর মাংসপিণ্ড অর্থাৎ এক খণ্ড মাংসে পরিণত হয়েছিল যুগল দুই প্রকার নর ও নারী কখনো উভয়টি একত্র হয়, অর কখনো পৃথক পৃথক।

٤٠. اَلَيْسَ ذٰلِكَ الْفَعَّالُ لِهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى قَالَ ﷺ بَلٰى .

৪০. তিনি কি এ সকল কার্য সম্পাদনকারী সত্তা মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করায় সক্ষম নন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اَوْلٰى : প্রথম اَوْلٰى لَكَ হতে ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى টি تَاكِيْد হয়েছে। –[কাবীর]

যেমন বলা হয়– فَوَيْلٌ لَكَ فَوَيْلٌ لَكَ ثُمَّ وَيْلٌ لَكَ فَوَيْلٌ لَكَ

قَوْلُهُ اَيَحْسَبُ الخ : এটা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ হয়েছে اَىْ لَا يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى এখানে سُدًى শব্দটি حَالٌ হয়েছে يُتْرَكَ হতে।

قَوْلُهُ اَلَمْ يَكُ : এতে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ হয়েছে। আর نُطْفَةً টি يَكُ ফে'ল হতে حَالٌ হবে। عَلَقَةً টি كَانَ-এর اِسْم হতে حَالٌ হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى : এটা الزَّوْجَيْنِ হতে بَيَانٌ হবে।

قَوْلُهُ أَلَيْسَ ذٰلِكَ الخ : এটাও اِسْتِفْهَامٌ تَقْرِيرِيٌّ হয়েছে।

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً -এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর أَلَمْ يَكُ অর্থাৎ يَا، সহকারে এবং اِنْسَان -কে- ضَمِيْر -এর مَرْجِعٌ হিসাবে পড়েছেন। আর হাসান বসরী সম্বোধন হিসাবে أَلَمْ تَكُ অর্থাৎ تَا، দিয়ে পড়েছেন। −[ফাতহুল কাদীর]

تُمْنٰى -এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর تَا، দিয়ে এবং نُطْفَةً -কে- ضَمِيْر -এর مَرْجِعٌ হিসাবে تُمْنٰى পড়েছেন, আর হাফস, ইবনে মুহাইসেন, মুজাহিদ, ইয়াকূব ضَمِيْر -এর- مَرْجِعٌ - منى হিসাবে يَا، দিয়ে يُمْنٰى পড়েছেন। এটা ইবনে ওমর হতেও বর্ণিত আছে। আবূ হাতিম এটাকে পছন্দ করেছেন। −[ফাতহুল কাদীর]

بِقَادِرٍ ও اَنْ يُّحْيِىَ -এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর এ শব্দটিকে بِقَادِرٍ পড়েছেন। যায়েদ ইবনে আলী তাকে يَقْدِرُ অর্থাৎ فِعْلٌ مُضَارِعٌ হিসাবে পড়েছেন।

আর يُّحْيِىَ শব্দটিকে জমহুর اَنْ দ্বারা مَنْصُوْب করে يُحْيِىَ পড়েছেন। আর তালহা ইবনে সোলাইমান, ফাইয়ায ইবনে গাযওয়ান তাকে تَخْفِيْف করে سَاكِنٌ যুক্ত করে يُحْيِى পড়েছেন। অথবা وَقْف -এর স্থানে وَصْل করে পড়েছেন। −[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ [জাহান্নামের উপর উনিশজন পাহারাদার রয়েছে।] আয়াত নাজিল করেন, তখন আবূ জাহল কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের মাতা তোমাদেরকে নিপাত করুক। অপর দিকে ইবনে আবূ কাবশা বলে উঠল যে, মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামে উনিশজন প্রহরী নির্ধারিত রয়েছে। অথচ তোমরা তো অনেকজন রয়েছ, তোমরা দশজন মিলেও কি জাহান্নামের একজন প্রহরীকে নিধন করতে পারবে না?

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর নিকট ওহী প্রেরণ করে বললেন, আবূ জাহল আপনার নিকট আসছে। সুতরাং আপনি তাকে শুনিয়ে দিন أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى ثُمَّ أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى তুমিই অভিশপ্ত হও, তোমার নিপাত যাক, অনন্তর তোমার নিপাত যাক, তোমার নিপাত ঘটুক।

قَوْلُهُ تَعَالٰى أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى : তাফসীরকারদের হতে এ কথাটির অর্থে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। কতক বলেন, এর অর্থ দুর্ভোগ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, তোমার জন্য দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ, অন্তহীন দুর্ভোগ। কতক বলেন, এর অর্থ অভিশপ্ত। সুতরাং এর অর্থ হবে, অভিশপ্ত তুমি, অভিশপ্ত। অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহর অনন্ত লানত। কেউ কেউ এর অর্থ ধ্বংস ও বিপর্যয়ও বলে থাকেন। সকল কথার অর্থ মূলত একই। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এর মর্ম হলো− আবূ জাহলকে বলা হয়েছে, তুমি যখন সৃষ্টিকর্তা, কিয়ামত ও পরকালকে অস্বীকার করেছ, তখন তোমার জন্য এ চালচলনই শোভা পায় যা তুমি অবলম্বন করেছ। আসলে এ কথাটি একটি বিদ্রূপাত্মক কথা।

এ কথাটি প্রথমত কার হতে প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্পর্কে সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, অভিশপ্ত হও তুমি (أَوْلٰى لَكَ) কথাটি কি নবী করীম ﷺ আবূ জাহলকে নিজ পক্ষ হতে বলেছেন, না আল্লাহর হুকুমে বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, প্রথমত নবী করীম ﷺ নিজ পক্ষ হতেই বলেছেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা অবতীর্ণ করেছেন। −[মা'আলিম, খাযেন, কাছীর, লোবাব]

قَوْلُهُ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُّتْرَكَ سُدًى : سُدًى শব্দের অর্থ হলো مُهْمَلٌ নিরর্থক, যাকে কোনো আদেশ-নিষেধ কিছুই করা হয় না। আরবি ভাষায় ابل سدى বলা হয় ঐ সব উটকে যা বিনা কাজে ছেড়ে দেওয়া হয়, এমনিতেই সে ঘুরে বেড়ায় যাকে বলগা উটও বলা হয়।

সুতরাং আয়াতের তাৎপর্য হবে মানুষ কি আল্লাহর সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহ সারা জীবন উপভোগ করে এবং সকল বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে চলবার পর পরকালে তাদেরকে এমনিতেই অহেতুক ছেড়ে দেওয়া হবে, তার কি কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না? তার কি কৃত-কর্মের খেসারত দিতে হবে না? তাদেরকে কি কর্তব্য ও দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

Free @ www.eilm.weebly.com

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই বের করা যেতে পারে যে, মানুষ যেন এ ধারণা না করে যে, তাদের ইহকালীন স্বাধীনতা পেয়ে তারা মত্ত হয়ে জীবন যাপন করেই চলবে; বরং তারা সকল কৃতকর্মের তিলে তিলে হিসাব দিতেই হবে। তারা কোনো চতুষ্পদ জন্তু অথবা ইতর প্রাণী নয়, সুতরাং ইতর প্রাণী অথবা অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় তাদেরকে বিনা হিসাবে মাটির সাথে মিশিয়ে যেতেও নির্দেশ দেওয়া হবে না।

أَنْ يُتْرَكَ سُدًى -এর অর্থ : আরবি ভাষায় سُدًى বলা হয় ঐ সব উষ্ট্রকে যা অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং যার কোনো চালক থাকে না, লাগামহীন অবস্থায় থাকে। উপরিউক্ত ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে– মানুষ কি ভাবে যে, তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে? এর তাৎপর্য হলো জন্তু-জানোয়ারগুলোর জীবনের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এ পার্থিব জীবনে তাদের উপর কোনো নৈতিক বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়নি। তারা নিজেদের স্বভাবের স্বাভাবিক তাকিদে চলাফেরা করে। তাদেরকে কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়নি কোনো ইচ্ছা ও স্বাধীনতা। এ কারণে তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরুজ্জীবনের কোনো প্রয়োজন থাকে না। তাদের জন্য জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারণ করা হয়নি। হে মানুষ! তোমরাও কি নিজদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মতো ভাবলে যে, তোমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা হবে না এবং তোমরা তাদের ন্যায়ই মাটির সাথে মিশে যাবে, তোমাদের কর্মের কোনো ফলাফল ঘোষণা করা হবে না এবং জান্নাত-জাহান্নাম তোমাদের জন্য রাখা হয়নি; তোমাদেরকে এ জগতে জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় এমনি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এ জগতে তোমাদের কোনো নৈতিক বাধ্য-বাধকতা ও দায়িত্ব পালন করতে হবে না? এটা তোমাদের ভুল ধারণা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এ পার্থিব জগতেই যদি একটি অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি হওয়া তোমাদের বিবেক সাক্ষ্য দেয়, তবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুন তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না, তা বুঝলে কোন বিবেকে?

কোনো কোনো তাফসীরকার এর তাফসীর করেছেন, "লোকেরা কি মনে করছে যে, তাদেকে কবরে অনর্থক চিরকালের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। আর কখনো তাদেরকে বিচারের জন্য উত্তোলন করা হবে না। এ রকম মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।" –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَلَمْ يَكُ .... يُحْيِ الْمَوْتٰى : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সে কি নিকৃষ্টতম পানির একটি শুক্র ফোঁটা ছিল না, যা মায়ের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়? পরে তা একটি মাংসপিণ্ড হলো। পরে আল্লাহ তার দেহ বানালেন, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সংগতিপূর্ণ করে দিলেন। পরে তা হতে পুরুষ ও নারী দুই ধরনের (মানুষ) বানালেন। এ আল্লাহ মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?

মৃত্যুর পর জীবন যে সম্ভবপর, এটাই তার অকাট্য প্রমাণ। প্রাথমিক শুক্রকীট হতে সৃষ্টিকার্য শুরু করার পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানব দেহ বানিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই নিজস্ব কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলতার অনিবার্য ফলশ্রুতি– এ কথা যারা মনেপ্রাণে সত্য মেনে নিয়েছে, তাদের নিকট এ প্রমাণটির জবাবে বলবার মতো কোনো কথাই নেই। কেননা যে আল্লাহ এভাবে মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন, তিনি যে পুনরায় এ মানুষকেই অস্তিত্ব দিতে পারেন– তারা যত ধৃষ্টতাই দেখাক না কেন, তাদের বিবেক-বুদ্ধি এটা মেনে নিতে কখনো অস্বীকৃত হতে পারে না। তবে যারা এ বিজ্ঞানসম্মত কার্যক্রমকে নিছক দুর্ঘটনা বলে সাব্যস্ত করে, তারা যদি নিতান্ত হটকারী না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের নিকট কঠিন প্রশ্ন তুলতে চাই। সৃষ্টির সূচনা হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতিটি অংশে ও প্রতিটি জাতিতে একই ধরনের সৃষ্টিকর্মের ফলে মেয়ে সন্তান ও পুরুষ সন্তানের জন্ম ক্রমাগত এমন হারে সংঘটিত হয়ে চলছে যার ফলে কোনো সমাজেই কেবল মেয়ে বা কেবল ছেলেরই জন্ম হয়নি। কেননা তাহলে ভবিষ্যতে তার বংশধারা সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেত। সৃষ্টিকর্ম কেবল মাত্র দুর্ঘটনা সঞ্জাত হলে এটা কিরূপে সম্ভবপর হচ্ছে? এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া কি তাদের পক্ষে সম্ভবপর? মেয়ে ও ছেলের আনুপাতিক হারে জন্মগ্রহণও কি একটা দুর্ঘটনারই ফলশ্রুতি? যদি তাই বলা হয় তাহলে বলবো এটা একটা নিবুর্দ্ধিতাব্যঞ্জক দাবি। এরূপ দাবি একজন নিতান্ত নির্লজ্জ ও দায়িত্বহীন ব্যক্তিই করতে পারে। যদি কেউ দাবি করে বলে যে, লন্ডন, নিউইয়র্ক, মস্কো ও পিকিং প্রভৃতি দুনিয়ার বড় বড় শহর-নগর কেবলমাত্র দুর্ঘটনার ফলেই গড়ে উঠেছে তবে তা যতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে তাও ঠিক সেই পর্যায়েরই একটি দাবি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْاِنْسَانِ/الدَّهْرِ : সূরা আল-ইনসান/আদ্-দাহার

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির দু'টি নাম রয়েছে– একটি হলো اَلدَّهْرُ [আদ্-দাহার] আরেকটি নাম হলো اَلْاِنْسَانُ [আল-ইনসান]। আর এ দু'টি শব্দই অত্র সূরার প্রথম আয়াতে রয়েছে। এ দু'টি শব্দ হতেই এ দু'টি নাম গৃহীত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا আর কেউ কেউ কেবল اَلْاِنْسَانُ নামেই এটাকে ভূষিত করেছেন। তবে তাও যথার্থ। কেননা অত্র সূরায় যে আলোচনার বিষয়বস্তু রয়েছে, তাতে মানুষের জীবন বৃত্তান্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব হতে আজীবন কালের অবস্থা এবং মৃত্যুর পর বেহেশত ও দোজখের যাবতীয় সুখ-দুঃখ কার ভাগ্যে কি ঘটবে সেই মর্মে ব্যক্তি বিশেষ, অবস্থা বিশেষ, সময় বিশেষ সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। তাই উভয় নামেই নামকরণ করা যথার্থ হয়েছে। এতে ২টি রুকূ', ৩১টি আয়াত, ২৪০টি বাক্য ও ১০৫৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার অবতীর্ণকাল সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসীরকার বিভিন্ন মতামত জাহির করেছেন। তবে আল্লামা যামাখশারী, ইমাম রাযী, কাজি বাইযাবী, আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছীর, আল্লামা নিযামুদ্দীন নীশাপুরী (র.) প্রমুখ আরও বহু কয়জন তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা আলূসী (র.) -এর মতে তা সর্বসমর্থিত মতামত বলে গৃহীত। আর কেউ কেউ গোটা সূরাটিকে মাদানী বলে অভিহিত করেছেন। আবার কারো কারো মতে ৮ – ১০ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং বাকি অংশ মক্কায় অবতীর্ণ। কারো কারো মতে এটা মাক্কী সূরাসমূহের শেষগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারো মতে তার আয়াত قَوْلُهٗ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ব্যতীত অবশিষ্ট সকল আয়াত মাদানী। (এটা হযরত হাসান বসরী ও ইকরামা (র.)-এর অভিমত।) কেউ কেউ বলেন, প্রথম হতে ২৩ নং আয়াত অর্থাৎ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا পর্যন্ত আয়াতগুলো মাক্কী এবং বাকি আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য হলো– এ দুনিয়ায় মানুষের স্থান কোথায় এবং তার অবস্থানের স্বরূপ কি? তাদেরকে এ জগতে কেন পাঠানো হয়েছে, এখানে তাদের কর্তব্য কি? এ জগতে তাদেরকে কুফরের পথ ও ঈমানের পথ এ দু'য়ের কোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে– যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করবে তাদের পুরস্কার পরকালে কি হবে এবং যারা কুফরের পথ গ্রহণ করবে তাদের পরিণাম ফলাফল কি হবে, এসব বিষয়ই এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে।

১-৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন নর-নারীর দেহাভ্যন্তরে অণু আকারে শুক্রকীটরূপে অবস্থান করছিল, তখন তারা উল্লেখযোগ্য বস্তু বলতে কিছুই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে নর-নারীর মিলিত শুক্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জীবনটিকে তাদের জন্য একটি পরীক্ষাগার করা। এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই তাদেরকে চক্ষু ও কর্ণ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা ভালোমন্দ দেখতে ও শুনতে পায়। আর তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে তাদের নিকট নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা সঠিক পথ কোনটি তা জানবার সুযোগ পায়। সুতরাং এরপর তাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনে ভালোমন্দ, ঈমানী ও কুফরি পথের যে কোনো একটি পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা কুফরির পথ গ্রহণ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ঈমানের পথও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যারা কুফরির পথ গ্রহণ করে অকৃতজ্ঞ হবে তাদের শাস্তির জন্য শৃঙ্খল-বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত রয়েছে। আর যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করে নেককার হবে তাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে চিরন্তন জান্নাত। তাতে তারা কাফুর মিশ্রিত পানীয় পান করবে।

৭-২২ নং আয়াতে মু'মিন বান্দাদের প্রশংসা করে জান্নাতে তাদের অপূর্ব ও অফুরন্ত অর্থ নিয়ামতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আমার মু'মিন বান্দাগণ আমার নামে যে মান্নত করে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তারা এতিম, মিসকিন ও বন্দীগণকে পানাহার করায় দুনিয়ার কোনো স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য নয়; বরং নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও আশা তারা করে না। তারা ভয়াবহ কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশের ভয় করে। সুতরাং পরকালে তারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে পরম আনন্দ ও সুখ ভোগ করবে, তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাদেরকে এ জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতরাজি– আল্লাহর পথে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রতিদানে দেওয়া হবে। তথায় তারা রেশমবস্ত্র পরিধান করবে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার তাদের দেহে শোভা পাবে। তাদের সেবাযত্নের জন্য থাকবে হুর-গেলমান। তাদের জন্য উন্নত মানের পানীয়ের ব্যবস্থা থাকবে। তাদের আসবাবপত্রগুলো হবে রৌপ্য নির্মিত ও কাঁচের আসবাব। হে নবী! আপনি যদি এ সব দেখেন, তবে দেখবেন কেবল অথৈ ও রাশি রাশি নিয়ামত এবং বিশাল সাম্রাজ্য। এ সব নিয়ামত আপনাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ এবং আপনাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে প্রদান করা হবে।

২৩–৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআন আমারই কালাম। আমিই বিভিন্ন সময় প্রয়োজন অনুসারে খণ্ড খণ্ড করে তা অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং কাফেরগণ যা কিছুই বলুক সেদিকে কর্ণপাত করবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকুন। আপনি পাপিষ্ঠ ও কাফের লোকদের কথা মেনে চলবেন না। আপনি সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের স্মরণে থাকুন এবং রাত্রিকালে দীর্ঘক্ষণ নামাজে অতিবাহিত করুন। কাফেরগণ এ দুনিয়াকে অতিশয় ভালোবাসে বলেই পরকালকে ছেড়ে দিয়েছে। এ কাফের পাপিষ্ঠগণকে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে আমি পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। বস্তুত আমার এ কুরআন হচ্ছে উপদেশ ভাণ্ডার। যার ইচ্ছা হয় সে তার উপদেশ গ্রহণ করে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক; অথবা তাকে পরিহার করুক। এ ব্যাপারে মানুষকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন রাখা হয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ দান করেন; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী কাফেরদের প্রতি রয়েছে তাঁর নির্মম চিরন্তন শাস্তি। অতএব, হে মানবকুল সাবধান!

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বর্ণনা রয়েছে। মানুষকে তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর মানুষের সম্মুখে তিনি হেদায়েত ও গোমরাহীর দু'টি স্বতন্ত্র পথ তুলে ধরেছেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং হেদায়েতের পথ গ্রহণ করে সে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত লাভ করবে। যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে না, হেদায়েতের স্থলে গোমরাহীকে গ্রহণ করবে তার শাস্তি অবধারিত। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْاِنْسَانِ / الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আল-ইনসান/আদ্-দাহার মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

اِحْدٰى وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً : ৩১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. هَلْ قَدْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ اٰدَمَ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا كَانَ فِيْهِ مُصَوَّرًا مِّنْ طِيْنٍ لَا يُذْكَرُ اَوِ الْمُرَادُ بِالْاِنْسَانِ الْجِنْسُ وَبِالْحِيْنِ مُدَّةُ الْحَمْلِ .

১. নিঃসন্দেহে هَلْ অব্যয়টি قَدْ অর্থে মানুষের উপর এসেছিল আদমের কালপ্রবাহে এমন এক সময় চল্লিশ বছর যখন ছিল না সে সময় সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু সে সময় সে মৃত্তিকা নির্মিত এক পুতুল বিশেষ ছিল, যা কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। অথবা اِنْسَانٌ শব্দ দ্বারা মনুষ্যজাতি উদ্দেশ্য, আর حِيْن সময় দ্বারা গর্ভকালীন সময় উদ্দেশ্য।

٢. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ق اَخْلَاطٍ اَىْ مِنْ مَّاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْءَةِ الْمُخْتَلَطَيْنِ الْمُمْتَزَجَيْنِ نَّبْتَلِيْهِ نَخْتَبِرُهُ بِالتَّكْلِيْفِ وَالْجُمْلَةُ مُسْتَانِفَةٌ اَوْ حَالٌ مُّقَدَّرَةٌ اَىْ مُرِيْدِيْنَ اِبْتِلَاءَهٗ حِيْنَ تَاَهُّلِهٖ فَجَعَلْنٰهُ بِسَبَبِ ذٰلِكَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا .

২. আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মনুষ্যজাতিকে মিলিত শুক্রবিন্দু হতে সংমিশ্রিত অর্থাৎ নর ও নারীর শুক্রবিন্দুকে সংমিশ্রিত করে তা হতে তাকে পরীক্ষা করার জন্য তাকে শরিয়তের বাধ্যানুগত করার মাধ্যমে পরীক্ষা করার জন্য। আর এ বাক্যটি مُسْتَانِفَه অথবা حَال مُقَدَّرَه অর্থাৎ তার উপযুক্ততা লাভের পর তাকে শরিয়তের বাধ্যানুগত করার উদ্দেশ্যে সুতরাং আমি তাকে করেছি এ কারণে শ্রবণ ও দৃষ্টশক্তি সম্পন্ন।

٣. اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ بَيَّنَّا لَهٗ طَرِيْقَ الْهُدٰى بِبَعْثِ الرُّسُلِ اِمَّا شَاكِرًا اَىْ مُؤْمِنًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا حَالَانِ مِنَ الْمَفْعُوْلِ اَىْ بَيَّنَّا لَهٗ فِىْ حَالِ شُكْرِهٖ اَوْ كُفْرِهِ الْمُقَدَّرَةِ وَاِمَّا لِتَفْصِيْلِ الْاَحْوَالِ .

৩. আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি। রাসূল প্রেরণ করে তাকে হেদায়েতের পথ দেখিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে মু'মিন হবে না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে শব্দ দু'টি مَفْعُوْل হতে حَال অর্থাৎ তার কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা উভয় অবস্থায় আমি তার জন্য হেদায়েতের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছি। اِمَّا হলো اَحْوَال تَفْصِيْل -এর জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا : لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا বাক্যটি اِنْسَانٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা حِيْنٌ-এর صِفَتٌ হিসেবে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ نَبْتَلِيْهِ : نَبْتَلِيْهِ বাক্যটি خَلَقْنَا-এর فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب অর্থাৎ مُرِيْدِيْنَ اِبْتِلَائَهُ - তাকে اِنْسَانٌ হতেও حَالٌ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ نَبْتَلِيْهِ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَبِالتَّكَالِيْفِ -

قَوْلُهُ تَعَالٰى "شَاكِرًا" وَ "كَفُوْرًا" : شَاكِرًا وَكَفُوْرًا শব্দদ্বয় مَنْصُوْب হয়েছে هَدَيْنَاهُ-এর مَفْعُوْل হতে حَالٌ হওয়ার কারণে। অর্থাৎ مَكَّنَّاهُ مِنْ سُلُوْكِ الطَّرِيْقِ فِىْ حَالَتَيْهِ جَمِيْعًا কেউ কেউ سَبِيْلَ হতে حَالٌ - مَجَازًا হয়েছে বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ عَرَّفْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا سَبِيْلًا شَاكِرًا وَاِمَّا سَبِيْلًا كَفُوْرًا -

اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا **আয়াতে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ** : জমহুর اِمَّا-এর هَمْزَه-তে كَسْرَه দিয়ে পড়েছেন। আর আবূ সাম্মাক, আবুল উজাজ উভয় স্থানে هَمْزَه-তে فَتْح দিয়ে اَمَّا পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

اِمَّا অব্যয়টি অবস্থার বিবরণ দানের জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى هَلْ اَتٰى عَلَى الخ : উক্ত আয়াতে هَلْ অব্যয়টি اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর তা بِمَعْنٰى تَقْرِيْب অর্থাৎ নিকটতম সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত। কেননা هَلْ টির অর্থ (قَدْ) নেওয়া হয়েছে আর قَدْ অব্যয়টি নিকটতম অতীতকাল বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যাকে নিশ্চয়তাসূচক অতীতকালও বলা হয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ তখন এরূপ হতে পারে যে, নিশ্চয়ই মানুষের উপর এমন এক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর যদি প্রথমোক্ত اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ অর্থে হয় তাতেও এরূপ অর্থ হবে। নতুবা এরূপ অর্থেও বলা যেতে পারে যে, মানুষের উপর কি এমন এক সময় ছিল না যে, সে কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু হিসাবেই ছিল না। তবে এ সকল তরজমার মূল রূপ একই হবে। মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, هَلْ অব্যয়টি অনেক সময় জানাশুনা বস্তুকে আরও অধিক বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর কাবীর গ্রন্থকার বলেছেন, সূরা আদ্-দাহার-এর প্রথম هَلْ এবং সূরা আল-গাশিয়াহ্ -এর প্রথম অক্ষর (هَلْ) উভয়টি قَدْ অর্থে ব্যবহৃত হবে। জালালাইন গ্রন্থকারও এ অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে সরাসরি প্রশ্নবোধক অর্থে هَلْ-কে ব্যবহার করলে اٰيَة-এর অর্থ মাটির সাথে মিশে যাবে। যাতে আল্লাহ মানুষকে প্রশ্ন করার অর্থ প্রকাশ পাবে। (نَعُوْذُ بِاللّٰهِ) এতে আল্লাহর عَاجِزِىْ প্রকাশ লাভ করবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ الخ : আল্লাহ বলেন, মানুষের জীবনের এমন একটি কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুই ছিল না। আর মানুষ যদি মনে রাখে যে, একদা সৃষ্টির বুকে তার নাম-নিশানাও ছিল না তখন আর নিজে নিজে তার অস্তিত্ব লাভের প্রশ্নই উঠে না। একমাত্র আল্লাহর মহান কৃপাই তার অস্তিত্ব সম্পদ। তার এ সুন্দর দেহের আকৃতি ও সুগঠন এবং হাত-পা ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি খুব একটা মহা মূল্যবান পদার্থের মাধ্যমে তৈরি করা হয়নি। কিসের দ্বারা সে তৈরি হয়েছে– পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা ইরশাদ করবেন।

اَلْاِنْسَانُ-এর মর্মার্থ : উল্লিখিত আয়াতে ইনসান দ্বারা কি মর্ম গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একটি হলো, তা দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, হযরত আদম (আ.) প্রথমত চল্লিশ বছর শুধু মাটিরূপে, অতঃপর চল্লিশ বছর বিন্যস্ত ও মাখানো মাটিরূপে, অতঃপর চল্লিশ বছর মাটির কায়ারূপে ছিলেন। একশত বিশ বছর পর তাঁকে পূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়। আর এক অভিমত অনুযায়ী ইনসান দ্বারা সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের কথা বলা হয়েছে। এর দলিলরূপে পরবর্তী আয়াতকে পেশ করা হয়। এ অভিমতকে অধিকাংশ তাফসীরকার গ্রহণ করেছেন। –[খাযেন]

حِيْنٌ-এর অর্থ : একে تَنْوِيْن-এর সাথে যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে অর্থ হবে অনির্দিষ্ট যে কোনো একটি দীর্ঘ সময়কে উদ্দেশ্য করা। এ মতে আল্লামা বাগাবী (র.) -এর মতে حِيْنٌ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-কে মাটির পুতুল বানানোর পর যে ৪০ বছর যাবৎ নির্জীব অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সেই সময়টুকু উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে যাহহাকের বর্ণনা মতে সেই সময়টুকু হলো সর্বমোট ১২০ বছর কাল পর তার মধ্যে যে رُوْح প্রদান করা হয়েছিল সে সময়টুকু উদ্দেশ্য। –[খাতীব]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আর বহু সংখ্যক তাফসীরকারদের মতে এটা দ্বারা গর্ভধারণ করার প্রথম সময় হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়টুকু যা সাধারণত ১০ মাস ১০ দিন পর্যন্ত উদ্দেশ্য। কারণ এতে نُطْفَه হতে আরম্ভ করে রক্ত-মাংশ ও হাড় এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলে রূহ আগমন করা পর্যন্ত সকল অবস্থায়ই শামিল থাকে। এর পূর্বে সে بِشَئٍ غَيْرِ مَذْكُوْر ছিল এবং তার পূর্বে কেউ জানত না যে, তা কি পুরুষ না মেয়ে, আর এর কোনো شَكْل وَصُوْرَتْ সম্বন্ধেও কারো কোন ধারণা ছিল না। আর যদি আরও দীর্ঘতর অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে نُطْفَه-এর পূর্ববর্তী সময় যখন খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ছিল, অতঃপর খাদ্য হতে نُطْفَه হয়েছে এবং খাদ্যগুলো বিভিন্ন ফলমূল ইত্যাদি হতে আর সে ফলমূলগুলো বৃক্ষরাজি হতে, তা মাটি হতে হয়েছে। এভাবে সে حِيْنٌ অর্থ হাজার হাজার বছরকাল হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ "لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তখন উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিস ছিল না।" এর মর্ম এই যে, তখন ব্যক্তি সত্তার একাংশ পিতার শুক্রে একটি অণুবীক্ষণী কীটরূপে এবং তার অপর অংশ মা'র শুক্রে একটি অণুবীক্ষণী ডিম্বরূপে পড়ে রয়েছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ এতটুকু কথাও জানতে পারেনি যে, আসলে তার অস্তিত্ব এ শুক্রকীট ও ডিম্বের সম্মিলনে সম্ভবপর হয়ে থাকে। এ কালে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ দু'টি অণুই গোচরীভূত হয়েছে; কিন্তু মানুষের কতটা অংশ পিতার শুক্রকীটে আর কতটা মাতার এ ডিম্বাণুতে মওজুদ রয়েছে তা এখনও কেউ বলতে পারে না। উপরন্তু গর্ভ সঞ্চার কালে এতদুভয়ের সম্মিলনে যে প্রাথমিক কোষ গড়ে উঠে তা পরিমাণহীন এমনই একটা বিন্দু বা অণু যে, তা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না, আর তা দেখেও তার দ্বারা যে একটি মানুষ গড়ে উঠছে, তা প্রথম দৃষ্টিতে কেউই বলতে পারে না। এ নগণ্য সূচনা হতে লালিতপালিত হয়ে কোনো মানবদেহ গড়ে উঠলেও তার আকার-আকৃতি যোগ্যতা ও প্রতিভা কি রকমের হবে, তার ব্যক্তিত্ব কতটা হবে তা এ সময় বলে দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। আল্লাহর বাণী মানুষ তখন কোনো উল্লেখযোগ্য জিনিস ছিল না– এটাই সঠিক তাৎপর্য। এ সময় মানুষ হিসেবে তার অস্তিত্বের সূচনা হয়ে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে কি ধরনের মানুষ হবে তা কারো পক্ষে পূর্বাহ্নে জেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّا خَلَقْنَا ...... اَمْشَاجٍ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমরা মানুষকে এক সংমিশ্রিত বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি।" অতীতের মুফাস্সিরগণ বলেছেন, এর তাৎপর্য এই যে, নারীর ডিম্বাণু আর পুরুষের শুক্রকীটের সংমিশ্রণ হতে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু কথা হলো, পবিত্র কুরআন نُطْفَةٌ (নুতফা)-এর বিশেষণ হিসাবে 'আমশাজ' (اَمْشَاج) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর কুরআনের অপর এক আয়াতে نُطْفَةٌ পুরুষের বীর্য সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ 'নারী-পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ হতে সৃষ্টি করা হয়েছে'– এটা নয়; বরং আয়াতের অর্থ হলো, "আমরা মানবজাতিকে বিভিন্ন উপাদানে সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেছি" পবিত্র কুরআনের এ বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ করেছেন আধুনিক বিজ্ঞান শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা, এ আবিষ্কার হতে আবারও প্রমাণ হলো কুরআনের সত্যতা। পবিত্র কুরআন আল্লাহর কিতাব না হলে কিভাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পক্ষে চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানুষের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে এহেন তত্ত্বপূর্ণ কথা বলা সম্ভব হলো?

শুক্র সম্বন্ধে আধুনিক অভিমত এই যে, তা শুক্রকোষ প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থিনিঃসৃত রস ও অণ্ডকোষ সৃষ্ট শুক্রকীটের সমষ্টি। –[রূহুল কোরআন]

তা হতে জানা যায় যে, মানুষের বীর্য বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি। পবিত্র কুরআন এ কথা চৌদ্দশত বছর পূর্বেই বলেছে; কিন্তু সেকালের মানুষের পক্ষে পবিত্র কুরআনের এ বক্তব্য বুঝা সম্ভব হয়নি। আধুনিক যুগে নব আবিষ্কারের ফলে তা বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআন কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নয়, আর এ সব বৈজ্ঞানিক বক্তব্য বুঝার উপর ইসলাম জানা, ইসলামের বিধান মতে আমল করা, দীন মেনে চলা নির্ভর করে না। এ কারণেই আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এ সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেননি। **لَفْظ نُطْفَةٌ টি বহুবচন ব্যবহার করার কারণ** : তা হলো, যে نُطْفَه হতে মানুষ সৃষ্টি হয় তা কেবল পুরুষ অথবা কেবল মহিলার نُطْفَه নয়; বরং উভয়ের মিলিত نُطْفَةٌ -এর প্রতিফলন, যেহেতু দু'জনের نُطْفَةٌ একত্র হয়ে থাকে, সুতরাং نُطْفَةٌ -কে جَمْع ব্যবহার করা হয়েছে, অথবা نُطْفَةٌ -এর বিভিন্ন اَجْزَاء রয়েছে, সে اَجْزَاء বা অংশগুলোর কিছু অংশ একটু হলুদবর্ণের আবার কিছু অংশ শ্বেতবর্ণের আবার কিছু কঠিন ও কিছু পাতলা ধরনের এবং সমস্ত نُطْفَةٌ গুলো একই খাদ্যের নির্যাস নয়; বরং বিভিন্ন খাদ্যের নির্যাস এই হেতু نُطْفَةٌ শব্দকে তার مَادَّةٌ عُضْو -এর প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ نَبْتَلِيْهِ : نَبْتَلِيْهِ শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা একটি মহাসত্য ও নিগূঢ় তত্ত্বের দিক-নির্দেশ করেছেন। তা হলো মানুষের বয়স নামের এ পার্থিব জীবনকালটি একটি পরীক্ষার ক্ষেত্রবিশেষ। আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই এ বয়স নামের সময়কালটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং এ সময়টিতে মানুষের প্রতিটি কাজই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশেষ। সে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পরীক্ষার মধ্যে কাটাচ্ছে। তার জীবনের এক একটি পল নিঃশেষ হয়ে তাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তার সময় কতটুকু কমে গেল। সে পরীক্ষা হচ্ছে– মানুষের আত্মাসমূহ আত্মিক জগতে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র রব বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এ পার্থিব জীবনে তারা সে স্বীকারোক্তিতে বহাল থাকে কিনা, তাদের কাজকর্ম, আচার-আচরণে তাই

Free @www.e-ilm.weebly.com

প্রতিফলিত হয় কিনা, তা প্রমাণ করিয়ে নেওয়াই আল্লাহর উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাঁর ভবিষ্যৎজ্ঞান দ্বারা অবগত রয়েছেন যে, তাঁর বান্দাদের কে পাশ করবে, কে ফেল করবে, কে কোন ডিভিশনে উত্তীর্ণ হবে; কিন্তু প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য এ বাস্তব পরীক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষক পূর্ব হতেই অবগত থাকেন যে, তাঁর কোন ছাত্রটি পাশ করবে এবং কোনটি ফেল করবে। তথাপি তার নিকট হতে হাতে-কলমে পরীক্ষার হলে প্রশ্ন-উত্তর লেখিয়ে নেওয়া হয়, যেন ফল প্রকাশের সময় তাকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করতে পারে। পরীক্ষার সময়কালটিতে যেমন ফল প্রকাশ হয় না, তেমন মানব জীবনের এ পরীক্ষার ফলাফল এ পার্থিব জগতে হবে না; বরং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত একটি সময়ে সকলকে পূর্ণ রেকর্ডসহ তা অবহিত করা হবে। তা-ই হচ্ছে نَبْتَلِيْهِ -এর তাৎপর্য।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا : মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা লাভের বাহন হলো তার কর্ণ ও চক্ষু। কর্ণ দ্বারা শুনে, চক্ষু দ্বারা অবলোকন করে মানুষ তা হতে একটি ফল গ্রহণ করে মস্তিষ্কে তা পাচার করে। অতঃপর মস্তিষ্ক, কর্ণ ও চক্ষুর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলটি দ্বারা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এ সিদ্ধান্তই হয় তার পার্থিব জীবনের কর্মনীতি। ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে এ দুনিয়ায় চলে এবং তার নির্দেশিকা মাফিকই হয় তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড। তাই আল্লাহ বলছেন, সুতরাং আমি তাকে শ্রোতা ও দর্শক বানিয়েছি। অর্থাৎ সে যেন আমার বাণী শ্রবণ করে এবং সৃষ্টিলোকে আমার অসংখ্য নিদর্শন অবলোকন করে তা হতে একটি ফল গ্রহণ করতে পারে এবং সে ফল দ্বারা তার জ্ঞান ও মস্তিষ্ক তাকে পরীক্ষার হলে প্রতিটি প্রশ্নের কি উত্তর লিখতে হবে তা যেন নির্দেশ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ মানুষকে শ্রবণশীল যন্ত্র দুটি দান করেছেন। তা-ই হচ্ছে উপরিউক্ত আয়াত অংশের তাৎপর্য।

سَمْع -কে بَصَر -এর উপর অর্থাৎ শ্রবণশক্তিকে দৃষ্টিশক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণ : মানুষকে যখন লক্ষ্য করে কোনো বিষয়ে কিছু বলা হয়, তখন সর্বপ্রথম শ্রবণশক্তিই কার্যকরী হয়ে থাকে। আর দেখার পূর্বে শ্রবণ করা আবশ্যক নতুবা কোনো বিষয় সম্পর্কে না শুনে না বুঝে তা কেবল দেখলেই কোনো ফল হয় না; বরং সে বিষয়ে শুনে জ্ঞানার্জন করা জরুরি হয়ে পড়ে। এ কারণেই قُوَّة سَامِعَه -কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ ..... كَفُوْرًا : পূর্ববর্তী আয়াতের জন্য অত্র আয়াতটি تَعْلِيْل স্বরূপ বলা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব আয়াতে যে মানুষকে اِبْتِلاء বা পরীক্ষা করা হবে বলা হয়েছে– অত্র আয়াতটি তার কারণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে পরীক্ষা করার কারণ হলো, তাদেরকে অন্যান্য সকল সৃষ্টি হতে অতুলনীয় উত্তম রূপরেখা ও গুণাবলি দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। অন্য আয়াতেও এ কথাটা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ আমি তাকে উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছি। আর সূরা আশ্-শামস -এ এভাবে বলা হয়েছে অর্থাৎ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا আর শপথ নফসের এবং সেই মহান সত্তার যিনি তাদেরকে সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ দিয়ে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। পরে তাদেরকে তাকওয়া ও ফুজূর উভয়ই পথের ইলহাম করেছেন। যে ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র করে নিয়েছে সে সফলতা অর্জন করেছে। আর যে ব্যক্তি তাকে ফুজূরীর মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে সে ব্যক্তি অকৃতকামী হয়েছে।

মানুষ কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন : পরীক্ষার হলে ছাত্রকে প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য বাধ্য করা হয় না। কেননা বাধ্য করা হলে বা সঠিক উত্তরটি কি হবে তা ঐ সময় বলে দিলে ফল লাভের কোনোই মূল্য থাকে না। এ পার্থিব জগতের বয়স নামের হলটিতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তার জীবন পাতায় কি উত্তর লিখতে হবে ও লিখতে হবে না তাও জানিয়ে দিয়েছেন। উপরিউক্ত ৩ নং আয়াতে 'আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি' এ কথাটির কয়েকটি তাৎপর্য হয়। ১. আমি তাকে বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছি, যাতে সে ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বাছাই করতে পারে। ২. আমি তাকে নফসে লাওয়ামার অধিকারী করেছি, যাতে তার অন্যায় ও গর্হিত আচরণের জন্য তাকে সর্বদা খোঁচাতে ও তিরস্কার করে সঠিক পথটি জানিয়ে দিতে পারে। ৩. আমি মানুষের নিম্নজগৎ ও উর্ধ্বমণ্ডলে আমার অসংখ্য নিদর্শন রেখেছি, যাতে তারা তা অবলোকন করে সঠিক পথ পেতে পারে। ৪. বর্তমান ও প্রাচীনকালের ইতিহাস তাদের সম্মুখে রেখে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছি। ৫. আমি নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করে সঠিক-অসঠিক উভয় পথ প্রদর্শন করেছি। তা-ই হলো اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ -এর মর্ম। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক পথ লাভের এবং পরীক্ষার হলের জীবন পাতায় সঠিক উত্তর লেখার জন্য এ সব বাহন ও মাধ্যমসমূহ দান করেছেন। অতঃপর তাকে সঠিক উত্তর লেখা অথবা না লেখার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে সঠিক উত্তর না লিখলে আল্লাহ তাকে সঠিক উত্তর লেখার জন্য বাধ্য করবেন না। কেননা তা পরীক্ষকের নীতি বিরোধী কাজ। ইচ্ছা করলে সে সঠিক উত্তর লিখতে পারে, ইচ্ছা না করলে নাও লিখতে পারে। তা হচ্ছে اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا -এর মর্ম। অর্থাৎ তাদের মনে চাইলে এ পার্থিব জীবনে তারা ঈমান ও কৃতকজ্ঞতার পথ গ্রহণ করুক অথবা ইচ্ছা হলে কুফরি ও বেঈমানীর পথ গ্রহণ করুক। উভয় ক্ষেত্রেই তারা স্বাধীন-মুক্ত। যে কোনো পথই গ্রহণ করার স্বাধীনতা তাদের বর্তমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে জীবন-কালের এ পরীক্ষায় পাশকারীগণ কি ফল লাভ করবে এবং ফেলকারীগণ কি ফল লাভ করবে তারই আলোচনা করা হয়েছে। –[আনোয়ার

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৪. إِنَّآ أَعْتَدْنَا هَيَّأْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلَاسِلَ يُسْحَبُوْنَ بِهَا فِى النَّارِ وَأَغْلٰلًا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ تُشَدُّ فِيْهَا السَّلَاسِلُ وَسَعِيْرًا نَارًا مُسْعَرَةً أَىْ مُهَيَّجَةً يُعَذَّبُوْنَ بِهَا .

৫. إِنَّ الْأَبْرَارَ جَمْعُ بَرٍّ أَوْ بَارٍّ وَهُمُ الْمُطِيْعُوْنَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ هُوَ إِنَاءُ شُرْبِ الْخَمْرِ وَهِىَ فِيْهِ وَالْمُرَادُ مِنْ خَمْرٍ تَسْمِيَةً لِلْحَالِ بِاسْمِ الْمَحَلِّ وَمِنْ لِلتَّبْعِيْضِ كَانَ مِزَاجُهَا مَا تُمْزَجُ بِهٖ كَافُوْرًا .

৬. عَيْنًا بَدَلٌ مِنْ كَافُوْرًا فِيْهَا رَائِحَتُهُ يَّشْرَبُ بِهَا مِنْهَا عِبَادُ اللّٰهِ أَوْلِيَاءُهُ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا يَقُوْدُوْنَهَا حَيْثُ شَاءُوْا مِنْ مَنَازِلِهِمْ .

অনুবাদ :

৪. আমি প্রস্তুত রেখেছি তৈরি করেছি অকৃতজ্ঞদের জন্য শৃঙ্খল যা দ্বারা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে বন্ধনী তাদের ঘাড়ে যাতে শঙ্খল বাঁধা হবে এবং লেলিহান অগ্নি প্রখর উত্তাপ বিশিষ্ট আগুন। অর্থাৎ শিখাবিশিষ্ট আগুন যাতে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

৫. নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণ أَبْرَارٌ শব্দটি بَرٌّ অথবা بَارٌّ-এর বহুবচন, আর তারা হলো আনুগত্যশীলগণ। পান করবে এমন পাত্র হতে كَأْسٍ শব্দটির অর্থ পানপাত্র, যা দ্বারা মদ্য পান করা হয়, যখন তাতে মদ বর্তমান থাকে; কিন্তু এখানে পানপাত্র দ্বারা পানীয় উদ্দেশ্য। কারণ, مَحَلّ উল্লেখ করত حَالّ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর مِنْ كَأْسٍ মধ্যকার مِنْ অব্যয়টি تَبْعِيْضِيَّه যার মিশ্রণ হবে যা মিলানো হয় কাফূর নামীয় স্বর্গীয় ঝর্ণাধারা।

৬. এমন প্রস্রবণ এটা كَافُوْرًا হতে بَدَلٌ তাতে কাফূরের সৌরভ থাকবে। তা দ্বারা পান করবে তা হতে আল্লাহর বান্দাগণ পুণ্যাত্মাগণ তারা উক্ত প্রস্রবণ যথেচ্ছ প্রবাহিত করবে তাদের আবাসস্থলে সেখানে ইচ্ছা তথায় প্রবহমান করে নেবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "سَلَاسِلًا" : নাফে', কিসায়ী, আবূ বকর আসেম হতে এবং হিশাম ইবনে আমের হতে تَنْوِيْن যুক্ত করে سَلَاسِلًا পড়েছেন। কুনবল ইবনে কাছীর হতে এবং হামযা তা اَلِفْ ছাড়া وَقْف করে অর্থাৎ سَلَاسِلَ পড়েছেন। আর বাকি ক্বারীগণ তা الف সহকারে وَقْف করে পড়েছেন سَلَاسِلًا –[ফাতহুল কাদীর]

عَيْنًا শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কারণ : عَيْن শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কারণ হলো তা كَافُوْر হতে بَدَلْ হয়েছে। মক্কীর মতে كَأْسٍ-এর مِنْ-এর مَحَلّ হতে بَدَلْ হয়েছে একটি مُضَاف-কে حَذْف করে যেন বলা হয়েছে– يَشْرَبُوْنَ خَمْرًا خَمْرَ عَيْنٍ আর কোনো কোনো লোক তা مَنْصُوْب হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তা يَشْرَبُوْنَ-এর مَفْعُوْل হয়েছে। আর কোনো কোনো লোক তাকে এক فِعْل مَحْذُوْف-এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে বলে দাবি করেছেন। যার تَقْدِيْر হলো يَشْرَبُوْنَ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ আল্লামা শাওকানী প্রথম অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য ও উত্তম বলেছেন।

–[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّا اَعْتَدْنَا ...... وَسَعِيْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমি কাফেরদের জন্য শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।" অর্থাৎ আমি মানুষের সামনে ভালো এবং মন্দ, কল্যাণ এবং অকল্যাণ, হেদায়েত এবং গোমরাহীর পথ স্পষ্ট করে দিয়েছি। নবী-রাসূলগণের মাধ্যম হেদায়েতের পথের দিকে আহ্বান করেছি এবং তাদেরকে দু'য়ের যে কোনো একটি পথ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতাও দান করেছি। অতঃপর যারা স্বেচ্ছায় হেদায়েতের পথ পরিত্যাগ করে গোমরাহীর পথ অবলম্বন করল এবং কুফরির রাস্তায় চলতে আরম্ভ করল তাদের জন্য তিনটি জিনিস প্রস্তুত রেখেছি। ১. سَلَاسِلَ অর্থাৎ পায়ের বেড়ি। ২. اَغْلَالٌ অর্থাৎ হাতের শৃঙ্খল। ৩. سَعِيْر অর্থাৎ আগুনের লেলিহান শিখা। অর্থাৎ জাহান্নামে তাদের হাতে-পায়ে বেড়ি ও শৃঙ্খল লাগিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। -[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الْاَبْرَارَ ..... كَافُوْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "নেককার লোকেরা (জান্নাতে) শুরার এমন সব পাত্র পান করবে যার সাথে কর্পূর পানির সংমিশ্রণ হবে।" এখানে মূলে ব্যবহৃত শব্দ হলো اَبْرَارٌ এ শব্দ দ্বারা সেসব লোক বুঝানো হয়েছে, যারা নিজেরা আল্লাহর আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় করেছে, তাঁর ধার্যকৃত যাবতীয় ফরজ যথাযথ আদায় করেছে এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো পরিহার করে চলেছে।

হাদীস শরীফে আছে 'আবরার' হলো সেসব লোক যারা কোনো লোককে কষ্ট দেয় না। -[কুরতুবী]

كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا এর অর্থ তা কর্পূর মিশ্রিত পানি হবে– তা নয়; বরং এমন একটা নৈসর্গিক ঝরনা বা প্রস্রবণ হবে যার পানি স্বচ্ছতা, শীতলতা ও সুগন্ধি কর্পূরের ন্যায় হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَيْنًا يَّشْرَبُ ...... تَفْجِيْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটি একটি প্রবহমান ঝরনা হবে যার পানির সঙ্গে আল্লাহর বান্দারা পানীয় পান করবে এবং যেখানে ইচ্ছা অতি সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।"

عِبَادُ اللّٰهِ বলতে আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষকে বুঝালেও কুরআনে তা আল্লাহ তা'আলার 'নেক বান্দা' বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নেক বান্দাদেরকে عِبَادُ اللّٰهِ বলে আল্লাহর নামের সাথে সংযুক্ত করে সম্মানিত করা হয়েছে। মোদ্দাকথা, এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের দু'টি সিফাতের উল্লেখ করেছেন। **এক.** তাদের আমলের প্রতি লক্ষ্য করে আবরার বা নেককার, **দুই.** আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের প্রতি লক্ষ্য করে عِبَادُ اللّٰهِ বা আল্লাহর বান্দা, অতঃপর পরের আয়াতে তাদের আরও কিছু গুণাবলি আলোচিত হয়েছে।

يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا-এর অর্থ এই নয় যে, এ লোকেরা সেখানে খন্তা-কোদাল নিয়ে খাল কাটবে এবং এভাবেই সে প্রস্রবণের পানি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে; বরং তাদের একটা ইশারা-ইঙ্গিতই সে জন্য যথেষ্ট হবে। জান্নাতে যেখানেই তাদের ইচ্ছা হবে সেখান হতেই সে প্রস্রবণ উৎসারিত হবে। সহজে বের করে নেবে। কথাটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا مُنْتَشِرًا .

৭. তারা কর্তব্য পালন করে আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে এবং সে দিনের ভয় করে, যে দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক সম্প্রসারিত।

٨. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ أَيِ الطَّعَامِ وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ مِسْكِينًا فَقِيرًا وَيَتِيمًا لَا أَبَ لَهُ وَأَسِيرًا يَعْنِي الْمَحْبُوسَ بِحَقٍّ .

৮. আর আহার্য দান করে তৎপ্রতি আসক্তি সত্ত্বেও সে খাদ্যের প্রতি নিজেদের আসক্তি সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত দরিদ্র অনাথ পিতৃহীন এবং বন্দীকে যাকে হকের জন্য বন্দী করা হয়েছে।

٩. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لِطَلَبِ ثَوَابِهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا شُكْرًا فِيهِ عَلَى الْإِطْعَامِ وَهَلْ تَكَلَّمُوا بِذٰلِكَ أَوْ عَلِمَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ فَأَثْنٰى عَلَيْهِمْ بِهِ قَوْلَانِ .

৯. আর বলে আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর জন্য আহার্য দান করি তাঁর পুরস্কার লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের হতে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি না আহার্য দানের বিনিময়ে, জান্নাতবাসীগণ এ উক্তি করেছে– না আল্লাহ তা'আলা তাদের হতে এ মনোভাব জেনে তাদের প্রশংসাস্বরূপ এ বাণী উচ্চারণ করেছেন, এ সম্পর্কে দুটি মতামত রয়েছে।

١٠. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا تَكْلَحُ الْوُجُوهُ فِيهِ أَيْ كَرِيهَ الْمَنْظَرِ لِشِدَّتِهِ قَمْطَرِيرًا شَدِيدًا فِي ذٰلِكَ .

১০. আমরা আমাদের প্রতিপালক হতে আশঙ্কা করি এক ভয়ঙ্কর দিনের যেদিন মুখমণ্ডল বিবর্ণ তথা মলিন হয়ে পড়বে, তার কঠোরতার কারণে ভীষণরূপে বিবর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে।

١١. فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ أَعْطَاهُمْ نَضْرَةً حُسْنًا وَإِضَاءَةً فِي وُجُوهِهِمْ وَسُرُورًا .

১১. পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের বিপত্তি হতে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দান করবেন لَقّٰهُمْ শব্দটি أَعْطَاهُمْ অর্থে উৎফুল্লতা সুদর্শন ও আলোকোজ্জ্বলতা তাদের মুখমণ্ডলে ও আনন্দ।

١٢. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا بِصَبْرِهِمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ جَنَّةً أُدْخِلُوهَا وَحَرِيرًا أُلْبِسُوهُ .

১২. আর তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন তাদের ধৈর্যশীলতার জন্য পাপ হতে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীলতার জন্য স্বর্গোদ্যান যাতে তারা প্রবিষ্ট হবে ও রেশমি পরিধেয় মাধ্যমে যা তারা পরিধান করবে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى "إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ" : إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ বাক্যটি তারকীবে حَال হওয়ার কারণে قَوْل উহ্য রেখে مَحَلًّا مَنْصُوب হয়েছে। অর্থাৎ يَقُولُونَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ অথবা قَائِلِيْنَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে জারীর (র.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনও ইসলামপন্থিদেরকে বন্দী করতেন না; বরং উপরিউক্ত ৮নং আয়াতে যেসব বন্দীগণের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা হলো মুশরিক বন্দীগণের কথা। তাদেরকে বন্দী করে শাস্তি দেওয়া হতো। তাদের সম্পর্কে যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম ﷺ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন। –[লোবাব]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উপরিউক্ত ৮নং আয়াত আবূ দাহদাহ নামের এক আনসার ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়। তিনি একদিন রোজা রেখেছিলেন। যখন ইফতারের সময় সমাগত হলো তখন এতিম, মিসকিন ও বন্দী লোক আসল। তখন তিনি এ তিনজনকে তিনটি রুটি প্রদান করলেন এবং নিজের ও পরিবারের জন্য মাত্র একটি রুটি রাখলেন। তাঁর প্রশংসায় এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[খাযেন]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াত হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তিনি এক ইহুদির কাজ করে বিনিময়স্বরূপ তার নিকট হতে কিছু গম আনলেন। অতঃপর তার এক-তৃতীয়াংশ পিষে তা দ্বারা খাদ্য তৈরি হওয়ার পর একজন মিসকিন আসল। তিনি তাকে এ খাদ্য দান করলেন। অতঃপর এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা খাদ্য তৈরি করলে এক এতিম লোক এসে উপস্থিত হলো। সে কিছু খাবার চাইলে তাকে সব খাদ্য দিয়ে দিলেন। অতঃপর বাকি গম দ্বারা খাদ্য তৈরি করলেন। এবারে একজন মুশরিক বন্দী এসে খাদ্য চাইল। তখন তিনি তাকে এ খাদ্য দিয়ে দিলেন। আর পরিবার-পরিজনসহ নিজেরা সকলে দিবারাত্র অনাহারে কাটালেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত এতিম, মিসকিন ও বন্দীগণকে খাদ্যদানকারীদের প্রশংসায় অবতীর্ণ করেন। -[খাযেন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ الخ : পূর্ববর্তী আয়াতের বয়ানস্বরূপ এ আয়াতটি, অর্থাৎ আল্লাহর নেক বান্দাগণকে নিয়ামতে ভূষিত করার কারণ এই যে, তাদের বিশ্বাসও সঠিক এবং আমলগুলো সঠিক, আর তারা যে কাজ করার মান্নত করে থাকে, তা সঠিকভাবেই পূরণ করে থাকে। অর্থাৎ তারা কথায় এবং কাজে সঠিক থাকে। আর কিয়ামতের অতি কঠিন বিপদকে খুবই ভয় করে থাকে। যে দিনের বিপদ সারা জগৎ জুড়ে হবে, কোনো দোষী ব্যক্তি সে দিন তা হতে রক্ষা পাবে না। মোটামুটি কথা হলো উক্ত আয়াত মান্নত পূর্ণ করা (অঙ্গীকার পূরণ করা) এবং কিয়ামতের ভয়-ভীতিকে আখেরাতের শান্তির কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। -[আশরাফী, মা'আরিফ]

এতে বুঝা যায় যে, বর্ণিত প্রকৃতির লোকগণ যেহেতু নিজেদের পক্ষ থেকে নিজেদের উপর ধার্যকৃত কাজ করতে এতবেশি গুরুত্ব দান করে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহর ধার্যকৃত ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ ইত্যাদি অর্থাৎ শরয়ী কার্যাদি আদায়ে আরও বহু তৎপর থাকেন। -[মা'আরিফ]

نَذْر-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ : نَذْر অর্থ হলো ব্যক্তি নিজের উপর কোনো কিছু ওয়াজিব করে নেওয়া। আর পরিভাষায়, কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হলে অমুক কাজ করবো, যদি কেউ এরূপ বলে থাকে তবে তাকে মানত বা نَذْر বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণের মতে نَذْر বা মানত চার ভাগে বিভক্ত হতে পারে। ১. যদি কেউ এই বলে ওয়াদা করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সে অমুক নেক কাজটি করবে, তবে তা মানত হবে। ২. আল্লাহ যদি আমার অমুক প্রয়োজন হাসিল করে দেন তবে আমি শোকর আদায়স্বরূপ অমুক নেক কাজটা করবো। এ দুই প্রকারকে ফিকহবিদগণ نَذْر تَبَرُّعٌ নেক কাজ করার মানত বলে থাকেন। আর এ মানত পূর্ণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। ৩. কোনো নাজায়েজ কাজ করার কিংবা কোনো ওয়াজিব কাজ না করার ওয়াদা করা। ৪. কোনো মুবাহ [জায়েজ] কাজ করাকে নিজের উপর কর্তব্য করে নেওয়া কিংবা কোনো মোস্তাহাব কাজ না করার অথবা, অউত্তম কাজ করার ওয়াদা করা। ৩য় ও ৪র্থ প্রকারের মানতকে ফিকহবিদগণ "নজরে লাজাজ" মূর্খতার মানত বলে নাম দিয়েছেন।

তৃতীয় প্রকারের সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, এটা মানত হিসাবে সংঘটিত হয় না এবং এটা পূরণ করা ও পালন করা জরুরি নয়। ৪র্থ প্রকারের نَذْر সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে।

কারো মতে তা পূরণ করতে হবে। আবার কারো মতে তাতে কাফ্‌ফারায়ে কসম আদায় করতে হবে। কেউ বলেন, এরূপ মানতকারী তা ইচ্ছা করলে পূরণ করতে পারে, অথবা কাফফারাহ দিয়ে তার দায়িত্ব হতে মুক্তিও লাভ করতে পারে।

শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব অবলম্বীগণের মতে এ 'মানত' সংঘটিত হয় না এবং তা পালন করাও ওয়াজিব হয় না।

হানাফীদের মতে এ উভয় প্রকারের যে কোনো এক সুরতে মানত মানলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

قَوْلُهُ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ : এর কয়েকটি অর্থ করা হয়েছে। **এক.** نَذْر-এর অর্থ ওয়াজিব, সুতরাং বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যেসব ইবাদত বান্দাদের উপর ওয়াজিব করেছেন তা [এই] মু'মিনরা পালন করে। হযরত কাতাদাহ এবং মুজাহিদ বলেছেন- তার অর্থ নামাজ, হজ ইত্যাদি ইবাদতগুলো তারা পালন করে। **দুই.** ইকরামা বলেছেন- এর তাৎপর্য এই যে, হকুল্লাহর কোনো মানত যদি তারা করে থাকেন তাহলে তারা সেই মানত পালন করেন। ইসলামি শরয়ী পরিভাষায় মানত হলো, বান্দার নিজের উপর ওয়াজিব নয় এমন কোনো কাজকে ওয়াজিব করে নেওয়া। সুতরাং আয়াতের অর্থ 'তারা যা নিজেদের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছে তা পালন করেন।' **তিন.** نَذْر -এর অর্থ ওয়াদা, অর্থাৎ তাঁরা যেসব ওয়াদা করে থাকেন তা তাঁরা পালন করেন। আল্লামা শাওকানী (র.) বলেছেন, এখানে نَذْر শব্দটি মানত অর্থে গ্রহণ করাই উত্তম। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মানতের মাধ্যমে মানুষ নিজের উপর অনাবশ্যক কিছু কাজ আবশ্যক করে নেয়। এ কারণেই মানত করার সময় মানতকারীকে অবশ্যই কয়েকটি জিনসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

এক. এমন কাজের মানত করতে হবে যে কাজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- إِنَّمَا النَّذْرُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ প্রকৃত মানত তো তা-ই যার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। -[ত্বাহাবী]

দুই. মানত কেবল আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করতে হবে, গাইরুল্লাহর নামে কখনো মানত করা যাবে না। কারণ মানত ইবাদত। এ ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই হতে হবে। অন্য কারো নামে মানত করলে তা হবে শিরক। সে মানত কখনো পালন করা যাবে না। হাদীস শরীফে আছে- مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهِ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করার মানত মানল তার সেই আনুগত্য করা উচিত। আর যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানির মানত মানে তবে তা তার করা উচিত নয়। -[বুখারী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

তিন. এমন কোনো কাজ বা বিষয়ে মানত করবে না যার মালিক সে নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ -

আল্লাহর নাফরমানি করার কোনো মানত পূরণ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন জিনিসেও নয়, মানতকারী যার মালিক নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ الخ : বেহেশতীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে এত নিয়ামতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ দর্শিয়ে অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন- আল্লাহর ভালোবাসায় মাতাল হয়ে এ সকল মুসলমান গরিব, এতিম, মিসকিন, ফকির ও বন্দীকৃত ইত্যাদি লোকদেরকে খাবার দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, বন্দীকৃত লোক যদি জালেম হয় তবেও খুব দুরবস্থায় তার সহানুভূতি করাও মুস্তাহসান বলা হয়েছে। আর যদি বন্দীকৃত ব্যক্তি مَظْلُوْم অবস্থায় হয়ে থাকে তথাপিও তাকে বন্দীকৃত অবস্থায় সেবা করা মোস্তাহাব।

عَلٰى حُبِّهٖ-এর অর্থ : বিভিন্ন তাফসীরকারগণ এ শব্দের বিভিন্ন অর্থ করেছেন-

ক. হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ (র.) বলেন, عَلٰى حُبِّهٖ -এর অর্থ হলো, عَلٰى حُبِّ الْاِطْعَامِ দরিদ্রদেরকে খাওয়াবার আগ্রহ ও উৎসাহে তারা এ কাজ করে।

খ. হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায ও আবূ সুলাইমানুদ্দারানী বলেন, তারা আল্লাহর ভালোবাসায় এরূপ কাজ করে। আপাত দৃষ্টিতে এ অর্থ উত্তম মনে হয়। কারণ পরবর্তী বাক্য إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ দ্বারা এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে।

গ. মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, এ আয়াতে عَلٰى حُبِّهٖ -এর মধ্যে عَلٰى بِمَعْنٰى مَعَ নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এ সকল লোক এমন অবস্থায়ও গরিবদেরকে খাওয়া প্রদান করে থাকে, যখন তাদের নিজেদের জন্যই সেই খাওয়া অতি আবশ্যক ও প্রিয় হয়ে থাকে। এই অর্থ নয় যে, নিজেদের খাওয়ার অতিরিক্ত বা খাওয়ার অযোগ্য খাওয়াগুলো এতিম মিসকিনদেরকে দিয়ে থাকে।

اَسِيْر-এর তাফসীর : ১. ইবনুল মুনযির হযরত ইবনে জোবায়ের হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ কোনো মুসলমানকে বন্দী করতেন না। এ জন্য আলোচ্য আয়াতে اَسِيْر শব্দটি দ্বারা মুসলমান বন্দী নয়; বরং অমুসলমান বন্দীই উদ্দেশ্য হবে।

২. কিন্তু মুজাহিদ (র.) এবং সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, এর দ্বারা অমুসলমান কয়েদিও উদ্দেশ্য হতে পারে।

৩. আর কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَسِيْرًا শব্দ দ্বারা বাঁদি ও গোলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারাও বন্দীদের ন্যায়ই জীবন যাপন করে।

৪. আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীলোক কেননা এরা হলো দুর্বল জনগোষ্ঠী। -[নূরুল কোরআন]

আয়াতসমূহে বর্ণিত নেককার লোকদের গুণাবলি : যেসব গুণাবলির কারণে নেককার লোকেরা জান্নাতে যাবেন এবং বিভিন্ন নিয়ামত ভোগ করবেন, উল্লিখিত আয়াতসমূহে যা বিবৃত হয়েছে- তা নিম্নরূপ :

১. তারা মানত পূর্ণ করে। ২. তারা পরকালকে ভয় করে। ৩. মিসকিন, এতিম ও কয়েদিদেরকে তারা আহার্য দান করে। ৪. এ আহার্যদান কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকে। মানুষের কাছে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আশায় করে না; বরং কিয়ামত দিবসকে ভয় করে বলে আহার্য দান করে থাকে।

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ (الاية) : আলোচ্য আয়াতে নেককার লোকদের মিসকিন, এতিম ও কয়েদিদেরকে খাদ্য দানের সম্পর্কে বলা হয়েছে– তারা বলেন যে, আমরা এ আহার্য দান কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করে থাকি, দুনিয়ার কোনো লাভের আশায় বা প্রতিদানের আশায় অথবা কৃতজ্ঞতা পাবার আশায় করি না।

এ কথা কি তাদের নিজেদের মুখের বলা কথা, নাকি তাদের অন্তরের কথা, এ বিষয়ে দু'টি মত লক্ষ্য করা যায়। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহর কসম তাঁদের মুখে এ কথা কখনো বলেননি, কিন্তু আল্লাহ তাঁদের অন্তরের কথা জানতে পেরে নিজেই তাঁদের মনের কথা তাঁদের প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছেন। –[সাফওয়া]

ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, মুখে বলার কথা এখানে বলা হয়েছে এ কারণে যে, যার সাহায্য করা হচ্ছে সে যেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও আশ্বস্ত হতে পারে যে, তার সাহায্য করে তার নিকট হতে কোনোরূপ শুকরিয়া বা বিনিময় চাওয়া হচ্ছে না। তাহলেই সে নিশ্চিন্তে খাবার খেতে পারে বা সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا : "আমরা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ দিনকে ভয় করছি।" এখানে মিসকিন, এতিম ও কয়েদিদেরকে আহার্য দানের দ্বিতীয় কারণ বিবৃত হয়েছে, অর্থাৎ নেককার লোকেরা বলে থাকেন যে, আমরা তাদেরকে আহার্য দান করি এই কারণেও যে, এ কর্মের মাধ্যমে আমরা একটি ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ দিনে আল্লাহর আজাব হতে বাঁচতে পারবো বলে মনে করি। যে দিনের কঠোরতায় মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং যে দিন অতি দীর্ঘ হবে। –[সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الخ : উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন– তাদের এরূপ ইখলাস ও কৃচ্ছ্র সাধনা এ ভয়ভীতি আল্লাহর দরবারে বৃথা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিত হতে রক্ষা করবেন। তাদেরকে স্বর্গের মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করাবেন। তারা সুখের স্বর্গে মনের সুখে বসবাস করবেন। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসবেন। সেখানে সূর্যের তাপ, অথবা শীতের কষ্ট নেই। ফলমূল ভরা বৃক্ষ শাখা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে থাকবে। স্বর্গীয় পরিবেশ স্বর্গসুখের চিত্রাঙ্কন মানুষের সাধ্যাতীত।

আর এক কথায় মুখমণ্ডলের সবুজতা ও উজ্জ্বলতা এবং মনের আনন্দ সব মু'মিনদের জন্য থাকবে। সকল দুঃখ-দুর্দশা, কঠোরতা এবং ভয়াবহতা কেবল কাফের ও অপরাধী লোকদেরই ললাটে লিপিবদ্ধ থাকবে।

আর ঈমানদারদের ধৈর্যের ফলে তাদেরকে বেহেশতের অভ্যন্তরে রেশমি পোশাকে ভূষিত করে দেওয়া হবে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের হাতে হাত মিলিয়ে বলবে, এটা তোমাদের সেদিনটি যেদিন সম্পর্কে দুনিয়াতে তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল। আজ তা সত্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ধৈর্যের তাৎপর্য : اَلصَّبْرُ অর্থ ধৈর্য ধারণ করা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, অতি আনন্দে বা অতি দুঃখ-কষ্টে দিশাহারা না হওয়া। স্থিরতা অবলম্বন করা। এ শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নেককার ও ঈমানদার লোকদের গোটা বৈষয়িক জীবনটাকেই সবর বা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জীবন বলে অভিহিত করা হয়েছে। সকল পুণ্যের প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে। আল্লাহর উপর এ অবিচল বিশ্বাস রেখে ঈমান গ্রহণের পর মৃত্যু পর্যন্ত স্বীয় অবৈধ কামনা বাসনা দমন করা, আল্লাহর উপর এই অবিচল বিশ্বাস রেখে ঈমান গ্রহণের পর মৃত্যু পর্যন্ত স্বীয় অবৈধ কামনা-বাসনা দমন করা, আল্লাহর সকল নির্দিষ্ট সীমারেখাগুলো মেনে চলা, আল্লাহর সকল ফরজসমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের সময়, সম্পদ, শ্রম, মেহনত শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা। এমনকি প্রয়োজনে প্রাণটা পর্যন্ত কুরবানি করে দেওয়া, আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্তকারী সকল প্রকার লোভ-লালসা ও আকর্ষণ উপেক্ষা করা, সত্য অন্বেষণের পথে জীবন পরিচালিত করা, সর্বপ্রকার বিপদ ও দুঃখ কষ্ট অকাতরে বরদাশত করে যাওয়া। হারাম উপায়ে অর্জিত সকল স্বার্থ সুবিধা ও আনন্দ পরিত্যাগ করা, সত্য পন্থা অবলম্বনের কারণে ঘনীভূত হয়ে আসা তিক্ততা ও জ্বালা-যন্ত্রণা অকাতরে সহ্য করে যাওয়া, ইত্যাদি কর্মনীতি মু'মিন ব্যক্তির গোটা জীবনটাকেই সবর -এর জীবন বানিয়ে দেয়। এ ধৈর্যের জীবন গঠন করতে অক্ষম হলে অসত্যের হাওয়ার সাথে মিশিয়ে ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই হয় না। তাই পবিত্র কালামে আল্লাহ বলেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. مُتَّكِئِيْنَ حَالٌ مِنْ مَرْفُوْعِ اُدْخُلُوْهَا الْمُقَدَّرَةِ وَكَذَا لَا يَرَوْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ ج السُّرُرِ فِي الْحِجَالِ لَا يَرَوْنَ يَجِدُوْنَ حَالٌ ثَانِيَةٌ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا اَيْ لَا حَرًّا وَلَا بَرْدًا وَقِيْلَ الزَّمْهَرِيْرُ الْقَمَرُ فَهِيَ مُضِيْئَةٌ مِنْ غَيْرِ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ .

১৩. তারা হেলান দিয়ে থাকবে এ مُتَّكِئِيْنَ এবং لَا يَرَوْنَ শব্দ দু'টি উহ্য اُدْخُلُوْهَا হতে حَالٌ তথায় সুসজ্জিত আসনে নব দম্পতির জন্য সজ্জিত শয্যা। তারা দেখবে না পাবে না, এটা দ্বিতীয় حَالٌ তথায় সূর্যতাপ, আর না ঠাণ্ডা অর্থাৎ গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। আর কেউ কেউ বলেছেন– زَمْهَرِيْر শব্দের অর্থ চন্দ্র, সে হিসাবে বেহেশত সূর্য ও চন্দ্র ব্যতিরেকেই আলোকময় হবে।

١٤. وَدَانِيَةً قَرِيْبَةً عَطْفٌ عَلَى مَحَلِّ لَا يَرَوْنَ اَيْ غَيْرَ رَائِيْنَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ ظِلٰلُهَا شَجَرُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا اُدْنِيَتْ ثِمَارُهَا فَيَنَالُهَا الْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ .

১৪. আর নিকটবর্তী করা হবে এটা لَا يَرَوْنَ -এর مَحَلّ -এর প্রতি عَطْف অর্থাৎ যারা দেখবে না, তাদের প্রতি তাদের হতে তার ছায়া তন্মধ্যস্থিত বৃক্ষের ছায়া আর তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। তার ফলমূল তাদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। যাতে দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত সকলেই পেতে পারবে।

١٥. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ فِيْهَا بِاٰنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَاَكْوَابٍ اَقْدَاحٍ بِلَا عُرًى كَانَتْ قَوَارِيْرَا .

১৫. তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে ও পান পাত্রে হাতলবিহীন পেয়ালাকে اَكْوَابٍ বলা হয়, যা স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ।

١٦. قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ اَيْ اِنَّهَا مِنْ فِضَّةٍ يُرٰى بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا كَالزُّجَاجِ قَدَّرُوْهَا اَيِ الطَّائِفُوْنَ تَقْدِيْرًا عَلٰى قَدْرِ رِيِّ الشَّارِبِيْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَذٰلِكَ اَلَذُّ الشَّرَابِ .

১৬. রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে অর্থাৎ তা স্ফটিক নির্মিত তার বাহির হতে ভিতর দৃষ্ট হবে, আয়নার মতো। পূর্ণ করবে অর্থাৎ পরিবেশনকারীগণ তাকে যথাযথভাবে পানকারীদের চাহিদা মোতাবেক, কম বা বেশি করা ব্যতিরেকে। এরূপ পানীয় তৃপ্তিদায়ক হয়ে থাকে।

١٧. وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا اَيْ خَمْرًا كَانَ مِزَاجُهَا مَا تُمْزَجُ بِهٖ زَنْجَبِيْلًا .

১৭. আর তাদের পান করানো হবে সেথায় এমন পানপাত্র অর্থাৎ পানীয় যার সংমিশ্রণ হবে যা দ্বারা পানীয় মিশ্রিত হয় আদ্রক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১৮. عَيْنًا بَدَلٌ مِنْ زَنْجَبِيْلًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا يَعْنِىْ اَنَّ مَاءَهَا كَالزَّنْجَبِيْلِ الَّذِىْ تَسْتَلِذُّ بِهِ الْعَرَبُ سَهْلُ الْمَسَاغِ فِى الْحَلْقِ.

১৮. সেই প্রস্রবণ তা زَنْجَبِيْل হতে بَدَلٌ - কে তথায় সালসাবীল নামকরণ করা হয় অর্থাৎ তার পানি আর্দ্রকের ন্যায় হবে, যা আরবদের নিকট পছন্দনীয় এবং সহজে গলাধঃকরণ করা যায়।

তাহকীক ও তারকীব

مُتَّكِئِيْنَ শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ : جَزَاهُمْ -এর مَفْعُوْل হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مُتَّكِئِيْنَ শব্দটি مَنْصُوْب হয়েছে। আবুল বাকা তাকে جَنَّةً হতে صِفَتْ হতে পারে বলে মনে করেছেন। ফাররা তাকে تَابِعٌ বলেছেন। যেমন বলা হয়েছে جَزَاهُمْ جَنَّةً مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا আখফাশ مَدْح হিসাবে مَنْصُوْب হতে পারে বলে মনে করেন। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, কাবীর]

قَوْلُهُ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا : এ জুমলাটি جَزَاهُمْ -এর مَفْعُوْل হতে حَالٌ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। আর এ হিসাবে তা হলো حَالٌ مُتَرَادِفَة ; অথবা مُتَّكِئِيْنَ -এর ضَمِيْر হতে حَالٌ হয়েছে। এ অবস্থায় তা حَالٌ مُتَدَاخِلَة হবে। অথবা তাকে جَنَّةً -এর দ্বিতীয় صِفَتْ বলতে হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

دَانِيَةً -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর دَانِيَةً -কে مَنْصُوْب পড়েছেন لَا يَرَوْنَ -এর স্থানের উপর তাকে عَطْف করে, অথবা مُتَّكِئِيْنَ -এর উপর عَطْف করে, অথবা উহ্য اِسْم -এর উপর عَطْف করে অর্থাৎ جَزَاهُمْ جَنَّةً دَانِيَةً যেন বলা হয়েছে جَنَّةً دَانِيَةً ; যুজাজ বলেছেন, তা পূর্বে উল্লিখিত جَنَّةً -এর صِفَتْ হিসাবে مَنْصُوْب হয়েছে। ফাররা বলেছেন, তা مَنْصُوْب عَلٰى نَسْخٍ -

আবূ হাইওয়া তাকে رَفْع দিয়ে دَانِيَةٌ পড়েছেন خَبَر مُقَدَّم হিসেবে, তখন ظِلَالُهَا হলো তার مُبْتَدَأ مُؤَخَّر আর গোটা جُمْلَة হলো مَحَلًّا مَنْصُوْب - حَالٌ হিসাবে। ইবনে মাসউদ (রা.) তাকে وَدَانِيًا عَلَيْهِمْ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا -এ অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর قَدَّرُوْهَا -এর قَاف -এ فَتْح দিয়ে مَعْرُوْف হিসাবে পড়েছেন। হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আচ্ছুলামী, শা'বী, যায়েদ ইবনে আলী, ওবাইদ ইবনে উমাইর, আবূ আমর এক বর্ণনায় قَاف -এ ضَمَّة দিয়ে এবং دَالٌ -এ كَسْرَة দিয়ে مَجْهُوْل হিসাবে قُدِّرُوْهَا পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

عَيْنًا শব্দটি مَنْصُوْب হওয়ার কারণ : عَيْنًا শব্দটি كَأْسًا হতে بَدَلٌ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। তা فِعْل مُقَدَّر দ্বারাও مَنْصُوْب হতে পারে অর্থাৎ يُسْقَوْنَ عَيْنًا আর حَرْف جَرّ -কে حَذْف করেও তা مَنْصُوْب পঠিত হতে পারে, মূলত ছিল مِنْ عَيْنٍ এ مِنْ -কে حَذْف করে দেওয়া হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا الخ : বেহেশতীগণ বেহেশতে অশেষ আরামের সাথে আলীশান খাটসমূহে হেলান দিয়ে থাকবেন। সূর্যতাপ অথবা সর্দি কিছুই তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। উক্ত আয়াতের زَمْهَرِيْر শব্দটির অর্থ কারো কারো মতে নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ বেশি শীতও নয় আর বেশি গরমও নয়। কারো কারো মতে زَمْهَرِيْر -এর অর্থ হলো- চন্দ্র সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হবে- তারা বেহেশতে চন্দ্র-সূর্য দেখতে পাবে না; বরং চন্দ্র ও সূর্যালোক ব্যতীতও বেহেশতে

Free @ www.eilm.weebly.com

স্থানগুলো নূরের আলোকে আলোকিত থাকবে। চন্দ্র-সূর্যের তাপ বা আলোর প্রয়োজন থাকবে না। মাদারিক গ্রন্থকার বলেন- زَمْهَرِيْر অর্থ চন্দ্র ও সূর্যালোক থাকবে না। এর অর্থ হলো- হাওয়াও সাধারণ থাকবে, আর এমন উত্তাপ থাকবে না; যা অসহ্যকর হবে, এমন শীতও থাকবে না; যা অসহ্যকর হবে। আর হাদীস শরীফেও এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- زَمْهَرِيْرٌ هَوَاءُ الْجَنَّةِ سَجْسَجٌ لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ অর্থ হলো- الْبَرْدُ الشَّدِيْدُ অতিশীত।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন- বেহেশতের বৃক্ষরাজির ছায়াসমূহ নিয়ামত হিসাবে বেহেশতীদের উপর দিয়ে ঘনীভূত অবস্থায় ছায়া দিতে থাকবে। আর সে সকল বৃক্ষসমূহের ফলগুলো তাদের ইচ্ছার অনুরূপ অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ সর্বদা বিনা কষ্টেই খেতে পারবে। ছড়াসমূহ তাদের হাতের কাছাকাছি হয়ে ঝুলতে থাকবে।

জান্নাতে সূর্য থাকবে না- কিভাবে ছায়া পাওয়া যাবে? : وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا অর্থ "জান্নাতের ছায়া তাদের উপর অবনত হয়ে থাকবে।" তা কিভাবে সম্ভবপর হবে, অথচ পূর্বে বলা হয়েছে, জান্নাতে সূর্য থাকবে না। সূর্য থাকলেই ছায়া দেখা যায়, আর না থাকলে দেখা যায় না। আর গরম না থাকলে ছায়ার প্রয়োজনও হয় না। এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, জান্নাতের বৃক্ষাবলি এমন পর্যায়ে থাকবে যে, সূর্য থাকলে এ সব বৃক্ষ অবশ্যই তাদেরকে ছায়া দান করত- তাই হলো এ আয়াতের তাৎপর্য। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى يُطَافُ عَلَيْهِمْ .... تَقْدِيْرًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর তথায় তাদেরকে রৌপ্য পাত্র [আহার্য] পরিবেশ করা হবে এবং পানপাত্রসমূহ হবে কাঁচের। আর রজতশুভ্র কাঁচের পাত্রে পরিবেশনকারীগণ তা যথাযথরূপে পূর্ণ করে রাখবে।"

আলোচ্য আয়াতে রৌপ্য পাত্র দ্বারা আহার্য পরিবেশন করার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু সূরা যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলা হয়েছে "তাদের সম্মুখে স্বর্ণের পাত্র আবর্তিত হবে।" তা হতে জানা গেল যে, সেখানে কখনো স্বর্ণের পাত্র ব্যবহৃত হবে, কখনো হবে রৌপ্য পাত্র। -[কাবীর]

আর ঐ রৌপ্য পাত্রগুলো হবে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ঝকঝকে। এ ধরনের পাত্র এই দুনিয়ায় পাওয়া যায় না। এটা জান্নাতেরই একটি বিশেষ বিশেষত্ব যে, সেখানে কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ রৌপ্য নির্মিত পাত্র জান্নাতী লোকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হবে।

زَنْجَبِيْل-এর অর্থ : 'যানজাবীল' জান্নাতের একটি পানীয়ের প্রস্রবণের নাম, যা হতে নেককার লোকগণ পানীয় পান করবে। সে খালেস পানীয় আল্লাহর নিকটতম ও একান্ত প্রিয় বান্দাগণ পান করবে এবং তাতে কর্পূর মিশ্রিত করে সাধারণ জান্নাতীগণকে পান করানো হবে। কেউ কেউ বলেন, জান্নাতীদের জন্য শীতল কাফূরের পানীয় হবে, আর এ যানজাবীল হবে মেশকের সুগন্ধ মিশ্রিত এক শ্রেণির খাবার। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে জান্নাতী লোকদের পানাহারের যেসব বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তা দুনিয়ার কোনো বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়- তাই বাস্তব কথা। কেননা দুনিয়ার যানজাবীলের সাথে জান্নাতের যানজাবীলের কোনো সাদৃশ্য নেই।

سَلْسَبِيْل-এর অর্থ : 'সালসাবীল' বলতে এমন পানি বুঝায় যা মিষ্টি, হালকা, সুপেয় ও সুরুচিসম্পন্ন হবে বিধায় তা কণ্ঠনালী হতে খুব সহজে নির্গলিত হবে। অধিকাংশ তাফসীরকার মনে করেন, 'সালসাবীল' শব্দটি এখানে কোনো নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। তার দ্বারা প্রস্রবণের পরিচিতিই পাওয়া যায় মাত্র।

অনুবাদ :

١٩. وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج بِصِفَةِ الْوِلْدَانِ لَا يَشِيْبُوْنَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لِحُسْنِهِمْ وَانْتِشَارِهِمْ فِى الْخِدْمَةِ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا مِنْ سِلْكِهٖ أَوْ مِنْ صَدَفِهٖ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فِىْ غَيْرِ ذٰلِكَ .

১৯. তাদেরকে পরিবেশন করবে চির-কিশোরগণ কৈশরে স্থিতিশীল, যারা কখনো বৃদ্ধ হবে না। যখন তুমি তাদের দেখবে তখন ধারণা করবে তাদের সৌন্দর্য ও সেবা-কর্মে বিক্ষিপ্ততায় যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা তার মালা অথবা ঝিনুক হতে বিক্ষিপ্ত। অন্য অবস্থার তুলনায় মুক্তার এ অবস্থায়ই অধিকতর মনোমুগ্ধকর হয়।

٢٠. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ أَىْ وُجِدَتِ الرُّؤْيَةُ مِنْكَ فِى الْجَنَّةِ رَأَيْتَ جَوَابُ إِذَا نَعِيْمًا لَا يُوْصَفُ وَّمُلْكًا كَبِيْرًا وَاسِعًا لَا غَايَةَ لَهٗ .

২০. আর তুমি যখন সেথায় দেখবে। অর্থাৎ যদি তোমার বেহেশত দেখার সুযোগ হয় দেখতে পাবে তা إذا -এর জওয়াব সুমহান অনুগ্রহরাজি যার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত এবং সুবিশাল রাজ্য সুবিস্তৃত, যার শেষ সীমা নেই।

٢١. عٰلِيَهُمْ فَوْقَهُمْ فَنَصْبُهٗ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَهُوَ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ بَعْدَهٗ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِسُكُوْنِ الْيَاءِ مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهٗ خَبَرُهٗ وَالضَّمِيْرُ الْمُتَّصِلُ بِهٖ لِلْمَطُوْفِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ حَرِيْرٍ خُضْرٌ بِالرَّفْعِ وَّإِسْتَبْرَقٌ ز بِالْجَرِّ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَهُوَ الْبَطَائِنُ وَالسُّنْدُسُ الظَّهَائِرُ وَفِىْ قِرَاءَةٍ عَكْسُ مَا ذُكِرَ فِيْهِمَا وَفِىْ أُخْرٰى بِرَفْعِهِمَا وَفِىْ أُخْرٰى بِجَرِّهِمَا وَّحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَفِىْ مَوْضِعٍ أٰخَرَ مِنْ ذَهَبٍ لِلْإِيْذَانِ بِأَنَّهُمْ يُحَلَّوْنَ مِنَ النَّوْعَيْنِ مَعًا وَّمُفَرَّقًا وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا مُبَالَغَةً فِىْ طَهَارَتِهٖ وَنَظَافَتِهٖ بِخِلَافِ خَمْرِ الدُّنْيَا .

২১. সেই বেহেশতীগণের উপর তা ظَرْف হিসাবে مَنْصُوْب এবং পরবর্তী مُبْتَدَأ -এর خَبَرْ অপর এক কেরাতে শব্দটি يَا -এর মধ্যে সাকিন যোগে مُبْتَدَأ রূপে পঠিত হয়েছে, তখন পরবর্তী বক্তব্য তার خَبَرْ হবে। আর তৎসংশ্লিষ্ট ضَمِيْر পূর্ববর্তী مَعْطُوْف عَلَيْه অর্থাৎ اَبْرَارْ -এর প্রতি رَاجِعْ হবে। রেশমি বস্ত্র سُنْدُسْ শব্দের অর্থ حَرِيْر যা সূক্ষ্ম-সবুজ পেশ যোগে ও স্থুল রেশমি হবে اِسْتَبْرَقْ শব্দটি যের যোগে, তা হলো পুরু রেশমি বস্ত্র, যা অভ্যন্তরভাগে ব্যবহৃত হয় এবং سُنْدس যা উপরিভাগে ব্যবহৃত হয়। অপর এক কেরাতে শব্দ দু'টি তার বিপরীতে পঠিত হয়েছে। তৃতীয় আরেক কেরাতে উভয় শব্দ পেশ যোগে পঠিত হয়েছে। অন্য এক কেরাতে উভয় শব্দ যের যোগে পঠিত হয়েছে, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে অন্যত্র স্বর্ণ নির্মিত উল্লিখিত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, উভয় প্রকার কংকনে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে। কখনো একত্রিতভাবে, আর কখনো পৃথক পৃথকভাবে। এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতায় উৎকর্ষিত, যা জাগতিক পানীয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত

٢٢. إِنَّ هٰذَا النَّعِيْمَ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا .

২২. নিশ্চয় তা এ সকল অনুগ্রহ তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মপ্রয়াস স্বীকৃত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ" : নাফে', হামযা ও ইবনে মুহাসেন ـٰيَا -তে سَاكِنْ এবং هَا -তে كَسْرَه দিয়ে عَالِيْهِمْ পড়েছেন خَبَر مُقَدَّمْ হিসাবে, তখন ثِيَابٌ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ বাকি ক্বারীগণ ـٰيَا -তে فَتْح দিয়ে এবং هَا -তে ضَمَّ দিয়ে عَالِيَهُمْ পড়েছেন। ইবনে সীরীন, মুজাহিদ, আবূ হাইওয়া, ইবনে আবূ আবলাহ عَلَيْهِمْ পড়েছেন, আবূ উবাই প্রথমোক্ত কেরাতকে পছন্দ করেছেন, হযরত ইবনে মাসউদের কেরাত عَالِيَهُمْ -এর উপর ভিত্তি করে। –[ফাতহুল কাদীর]

আর জমহুর ثِيَابٌ -কে سُنْدُسٍ -এর দিকে إِضَافَتْ করে ثِيَابُ سُنْدُسٍ পড়েছেন, আর আবূ হাইওয়া, ইবনে আবূ আবলা ثِيَابٌ -এ تَنْوِيْن যুক্ত করে উভয়ের মধ্যে قَطْع করে আর سُنْدُسٍ -এ رَفْع দিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ سُنْدُسٍ -কে ثِيَابٌ -এর صِفَتْ হিসাবে পড়েছেন। আর خُضْرٌ হলো سُنْد -এর صِفَتْ আর إِسْتَبْرَقٌ হলো سُنْدُسٍ -এর উপর عَطْف –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির হতে বর্ণিত আছে, হযরত আকরামা (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) একবার নবী করীম ﷺ -এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি খেজুর পাতার বুনানো চাটাইতে শায়িত অবস্থায় রয়েছেন। আর চাটাইর দাগ তাঁর দেহ মোবারকে পড়েছে। হযরত ওমর এটা দেখে কেঁদে ফেললেন। তা দেখে নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কারণে কাঁদছ? তখন হযরত ওমর (রা.) রোম সম্রাট ও আবিসিনিয়ার সম্রাটদের বিলাস-পরায়ণতা, চাকচিক্য, আরামপ্রিয়তা এবং তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করলেন। আর বললেন– তারা এমনি শান-শওকতের অবস্থায় রয়েছে, আর আপনি দীন-দুনিয়ার মহান সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে খেজুর পাতার চাটাইতে শয়ন করছেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাদের জন্য এ জগতের সুখ-সম্পদ হোক এবং আমাদের জন্য হোক পরকালের সুখ-সম্পদ– এতে কি তুমি খুশি নও? তখন আল্লাহ তা'আলা وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ .... আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ الخ : উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরিবেশনের মাধুর্য যে পান ভোজনের আনন্দকে বৃদ্ধি করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বর্গবাসীদের পানীয়-আহার্য ও পানীয়সমূহ পরিবেশনের জন্য এমন সব স্বর্গীয় বালকেরা নির্ধারিত রয়েছে, যারা চিরজীবন বালকই থাকবে, বৃদ্ধ হবে না। আর তারা এমন সুন্দর সুন্দর রং-রূপের অধকারী হবে যে, [হে শ্রোতাবৃন্দ!] তোমরা যখনি তাদেরকে দেখতে পাবে তোমাদের মনে হবে যে, তারা চলাফেরায় সুন্দর সুন্দর মণি-মুক্তার ন্যায়। মাল্যগাঁথা মণি-মুক্তা হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিটিয়ে বিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। অথবা ঝিনুক হতে নিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তার মতো ছড়িয়ে রয়েছে।

বালকসমূহকে মনি-মুক্তার সাথে তুলনা করার কারণ : মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, মণি-মুক্তার সাথে বালকদের তুলনা করার কারণ বালকদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রং-রূপের বালকের অনুসারে আর চলাফেরার বিক্ষিপ্ততার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছে। কারণ মণি-মুক্তাসমূহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে এক একটি এক এক অবস্থায় ঝলসিতে থাকে, তেমনি বালকগণ অপরূপ সৌন্দর্যের অবস্থায় বেহেশতবাসীদের খেতমতে ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকলে খুবই মনোরম দেখায়। সুতরাং তা অতি উত্তম তুলনা হয়েছে।

আল্লামা কাজি বায়যাবী (র.) বলেছেন, এটা একটি অতি আশ্চর্য ধরনের তুলনা হয়েছে। কারণ মুক্তা যখন ছড়িয়ে, ছিটিয়ে থাকে, তখন অধিক সুন্দর দেখায়, একটার জ্যোতি অন্যটির উপর বিচ্ছুরিত হওয়ার ফলে একত্র অবস্থার বিপরীত হয়ে থাকে। –[কাবীর]

তুলনার জন্য لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا -কে নির্দিষ্ট করার কারণ এই যে, বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তার ঝলক সাধারণত মাল্যগাঁথা মুক্তা অপেক্ষা সৌন্দর্য দেখায়। তাই زِيْنَتْ বৃদ্ধির জন্য لُؤْلُؤْ مَنْثُوْر নির্দিষ্ট করা হলো। –[মাদারিক]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তোমরা যখন জান্নাতে তথাকার কোনো দালান ও বিল্ডিং -এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, তখন দেখতে পাবে যে, তথায় কোনো জিনিসের দুর্লভতা থাকবে না, সর্বদিকেই শুধু সকল প্রকারের নিয়ামত আর নিয়ামতে পরিপূর্ণ দেখবে। আর একটি বিশাল সাম্রাজ্য বেহেশতের সরঞ্জামাদি দ্বারা আবাদ হয়ে রয়েছে। দুনিয়ার নিঃস্ব ও সর্বনিম্ন প্রকারের দরিদ্রই হোক না কেন সে স্বীয় নেক আমলসমূহের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করলে মনে করবে তথায় সেই প্রতাপশালী সম্রাট। অর্থাৎ যেমনিভাবে মানুষ দুনিয়ার প্রশস্ততাকে ভালোবাসে তদ্রূপ বেহেশতীদের জন্য বেহেশতে তেমন স্থানের প্রসস্ততা মিলবে। আর এ সকল নিয়ামতের প্রকাশ মৃত্যুর পরেই ঘটবে। কেননা ইহকালে থেকে আমরা পরকালের বা রুহানী জগতের সকল অবস্থা অনুধাবন করা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ الخ : কোনো কোনো তাফসীরকার এ সব কাপড় বেহেশতবাসীদের সেবায় সদা কর্মব্যস্ত বালকদের পোশাক হবে, কিংবা বেহেশতবাসীদের পালংকের উপর থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন। তাদের এ ব্যাখ্যা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয় এ কারণে যে, সূরা কাহাফের ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ـ

"জান্নাতিরা সূক্ষ্ম রেশমি ও কিংখাবের সবুজ কাপড় পরিধান করবে। উচ্চ আসনসমূহের উপর ঠেশ লাগিয়ে বসবে।" সুতরাং গ্রন্থকার এবং অন্যান্য অনেক তাফসীরকারদের তাফসীরই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। অর্থাৎ তা জান্নাতবাসীরাই পরিধান করবে। তাদের শরীরের উপরেই থাকবে।

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে سُنْدُسٌ সৃষ্টি হবে, যা দ্বারা জান্নাতীদের পোশাক তৈরি হবে। -[তাবারানী]

শারাবান তাহুরান-এর তাৎপর্য : ইতঃপূর্বে দুই শ্রেণির পানীয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জান্নাতী লোকদের জন্য এক শ্রেণির পানীয় হবে কর্পূর মিশ্রিত। আর এক শ্রেণির পানীয় হবে যানজাবীল প্রস্রবণের পানীয়। তারপরই 'শারাবান তাহুরা' বা পরিচ্ছন্ন পানীয়ের কথা বলা হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, তা অপর দু'টি শ্রেণির তুলনায়ও অনেক উন্নত মানের পানীয়।

কেউ কেউ বলেছেন, এ পানীয় এমন উন্নত মানের হবে যে, তা পান করার পর দেহ হতে মেশকের সুগন্ধী বের হতে থাকবে আবার এরূপ কথাও পাওয়া যায় যে, এ পানীয় জান্নাতের দুয়ারের নিকট একটি প্রস্রবণে থাকবে। যাদের মনে হিংসা-প্রতারণা ও ছল-চাতুরী থাকবে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। -[খাযেন]

আবূ কালাবা এবং ইবরাহীম (র.) বলেছেন, জান্নাতের যে পানীয়ের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে তা পান করার পর জান্নাতীদের দেহে প্রস্রাবে পরিণত হবে না; বরং তা ঘামে পরিণত হবে। যার সুগন্ধী হবে কস্তুরীর ন্যায়। -(নূরুল কোরআন)

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ هٰذَا ...... مَشْكُورًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "[তখন বলা হবে] এটা তোমাদের কর্মের প্রতিদান এবং তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা স্বীকৃত হলো।" এখানে চেষ্টা-প্রচেষ্টা বলতে বান্দা দুনিয়ায় সমগ্র জীবন ব্যাপী যেসব কার্যক্রম করেছে তা বুঝায়। যেসব কাজে সে স্বীয় শ্রম-মেহনত ব্যয়িত করেছে, যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে, সে সবেরই সমষ্টি-সমন্বয় হচ্ছে তার চেষ্টা, আর তার 'স্বীকৃতি' বা যথার্থ মূল্যায়ন হওয়ার তাৎপর্য হলো, তা আল্লাহর নিকট সাদরে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর জন্য বান্দার শুকরিয়ে অর্থ আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার। আর আল্লাহর দিক হতে বান্দার শোকর আদায় করার অর্থ বান্দার কার্যাবলি আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়া। মনিবের সর্বাধিক বড় অনুগ্রহ হলো, বান্দা যখন মনিবের মর্জিমতো স্বীয় কর্তব্য পালন করে তখন মনিব তার শোকর আদায় করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٣. إِنَّا نَحْنُ تَاكِيْدٌ لِاسْمِ إِنَّ أَوْ فَصْلٌ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا خَبَرُ إِنَّ أَيْ فَصَّلْنَاهُ وَلَمْ نُنَزِّلْهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً.

২৩. নিশ্চয় আমি نَحْنُ শব্দটি إِنَّ-اِسْم-এর تَاكِيْد অথবা ضَمِيْر فِعْل তোমার প্রতি কুরআনকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি خَبَر إِنَّ এটা অর্থাৎ আমি তাকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করেছি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ করিনি।

٢٤. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِتَبْلِيْغِ رِسَالَتِهِ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَيِ الْكُفَّارِ اٰثِمًا أَوْ كَفُوْرًا أَيْ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ قَالَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ وَيَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ كُلُّ اٰثِمٍ وَكَافِرٍ أَيْ لَا تُطِعْ أَحَدَهُمَا أَيًّا كَانَ فِيْمَا دَعَاكَ إِلَيْهِ مِنْ إِثْمٍ أَوْ كُفْرٍ.

২৪. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের আদেশ পালনে ধৈর্য ধারণ করো তার রিসালাত প্রচার সম্বন্ধীয় যে আদেশ তোমাকে দেওয়া হয়েছে আর অনুসরণ করো না তাদের মধ্য হতে কাফেরদের মধ্য হতে যে পাপিষ্ঠ ও অবাধ্যাচারী অর্থাৎ আতাবাহ ইবনে রবীয়াহ ও ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, এ কাজ হতে ফিরে এসো। আর প্রত্যেক পাপিষ্ঠ ও অবাধ্যাচারী উদ্দেশ্য হওয়াও জায়েজ হবে। অর্থাৎ তাদের কারো অনুসরণ করো না, সে যেই হোক না কেন। যে তোমাকে পাপ ও অবাধ্যাচারিতার প্রতি আহ্বান করে।

٢٥. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فِي الصَّلٰوةِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ.

২৫. আর তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো সালাতে সকাল ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ ফজর, জোহর ও আসর।

٢٦. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا صَلِّ التَّطَوُّعَ فِيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ ثُلُثَيْهِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ.

২৬. আর রাত্রির কিয়দংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হও অর্থাৎ মাগরিব ও এশা। আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর মহিমা ঘোষণা করো তাতে নফল ইবাদত করো। যেমন ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ রাত্রি, অর্ধ রাত্রি ও এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : ইবনুল মুনযির হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এ সংবাদ পেলেন যে, আবূ জাহল বলেছে– আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজ পড়তে দেখতে পাই তবে তার ঘাড় ধরে তাকে তা হতে বিরত রাখবো। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا أَوْ كَفُوْرًا আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[লোবাব]

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এ আয়াত উতবা ইবনে রাবীয়াহ ও অলীদ ইবনে মুগীরাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নবী করীম ﷺ-কে নামাজ পড়তে দেখে বলেছিল– তোমাকে যদি নারীদের ন্যায় পুনরায় আচরণ করতে দেখি তবে তোমাকে ধরে তা হতে ফেরাবো। উতবা বলল, তোমার নিকট আমার কন্যা বিনা মোহরেই বিবাহ দেবো। ওয়ালীদ বলল, আমি তোমাকে অনেক ধন-সম্পদ দেবো যদি তুমি নতুন ধর্মমত ও নতুন আচরণ হতে ফিরে থাকো। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা না শোনার জন্য উপরিউক্ত وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا أَوْ كَفُوْرًا আয়াত অবতীর্ণ করেন। –[খাযেন]

Free @ www.eilm.weebly.com

آثِمًا اَوْ كَفُوْرًا দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত আয়াতে বর্ণিত اٰثِمًا দ্বারা আল্লামা জালালুদ্দীন (র.) উতবাকে উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা সে-ই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে গুনাহের কার্যের প্রতি ধাবিত করতে চেয়েছিল।

আর كَفُوْرًا দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কেননা সে কুফর ও নাফরমানির প্রতি শক্তি ব্যয় করতে বেশি বেশি চেয়েছিল। আর সাধারণ অর্থের প্রতি ধাবিত হতে গেলে اٰثِمٌ اَوْ كَفُوْر দ্বারা সাধারণত সকল গুনাহগার ও ফাসিক-ফাজির কাফেরকেই উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। সুতরাং সকল নাফরমান থেকে বিরত ও হেফাজতে থাকার জন্য নির্দেশ আরোপ করা হয়েছে।

اٰثِمٌ এবং كَفُوْر -এর মধ্যে পার্থক্য : اٰثِمٌ শব্দের অর্থ হলো– পাপিষ্ঠ ও গুনাহগার। যে কোনো রকমের গুনাহে লিপ্ত লোককে اٰثِمٌ বলা হয়। আর كَفُوْر শব্দের অর্থ হলো, অবাধ্যাচারী, সত্য দীন অস্বীকারকারী। সুতরাং সব অবাধ্যাচারীই পাপিষ্ঠ; কিন্তু সব পাপিষ্ঠই অবাধ্যাচারী নয়। কারণ যে লোক গাইরুল্লাহর ইবাদত করে সে পাপিষ্ঠ, সাথে সাথে অবাধ্যাচারীও। কারণ সে গাইরুল্লাহর ইবাদত করে যেমন পাপ করেছে তেমনি আল্লাহর অবাধ্যাচারণও করেছে। –[খাযেন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ الخ : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আবশ্যকীয় ইবাদতসমূহের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং বলেছেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রভুর নাম স্মরণ করুন। আর রাত্রের কিছু অংশেও তাকে স্মরণ করুন এবং সিজদা করুন। এখানে রাত্রের অংশে ইবাদত করত বলে বহু সংখ্যক তাফসীরকারদের মতে মাগরিব ও ইশাকে উদ্দেশ্য করা হয়। আর بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا দ্বারা ফজর, জোহর ও আসরের নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারো কারো মতে وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা সাধারণ নফল ইবাদতসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মূলত بُكْرَةً শব্দটির অর্থ সকালবেলা অর্থাৎ صُبْح صَادِقْ হতে قَبْلَ الزَّوَالِ বেলা ঠিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর اَصِيْل শব্দটির অর্থ সূর্য হেলে যাওয়া হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বুঝায়। এ কারণেই بُكْرَةً দ্বারা ফজর এবং اَصِيْلًا দ্বারা জোহর ও আসর। আর اَصِيْل দ্বারা مَغْرِبْ وَعِشَاء -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا আয়াতে আমরটি ওয়াজিবের জন্য হয়েছে নাকি نُدُبْ -এর জন্য নেওয়া হয়েছে? : এ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ -এর اَمْر টি ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাও কেবল মুহাম্মদ ﷺ -এর ক্ষেত্রে। আর অন্যান্যদের জন্য اَمْر টি نُدُبْ হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٧. إِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ الدُّنْيَا يَخْتَارُوْنَ عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا شَدِيْدًا اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يَعْمَلُوْنَ لَهٗ .

২৭. এরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দান করে। এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে ভয়ঙ্কর। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এবং তজ্জন্য আমল করে না।

٢٨. نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا قَوَّيْنَا اَسْرَهُمْ ج اَعْضَاءَهُمْ وَمَفَاصِلَهُمْ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا جَعَلْنَا اَمْثَالَهُمْ فِى الْخِلْقَةِ بَدَلًا مِنْهُمْ بِاَنْ نُهْلِكَهُمْ تَبْدِيْلًا تَاكِيْد وَ وَقَعَتْ اِذَا مَوْقَعَ اِنْ نَحْوَ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ لِاَنَّهٗ تَعَالٰى لَمْ يَشَاْ ذٰلِكَ وَاِذَا لِمَا يَقَعُ .

২৮. আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং সুদৃঢ় করেছি সুঠাম করেছি তাদেরকে গঠন তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জোড়া। আমি যখন ইচ্ছা করবো, পরিবর্তন করবো সৃষ্টি করবো তাদের অনুরূপ সৃষ্টির মধ্যে তাদের পরিবর্তে তাদেরকে ধ্বংস করত পরিবর্তন করার মতো পরিবর্তন তা تَاكِيْد রূপে উল্লিখিত। এখানে اِذَا অব্যয়টি اِنْ -এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ কেননা আল্লাহ তা'আলা তা ইচ্ছ করেননি। অথচ اِذَا বাস্তবে পরিণত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

٢٩. اِنَّ هٰذِهٖ السُّوْرَةَ تَذْكِرَةٌ ج عِظَةٌ لِلْخَلْقِ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا بِالطَّاعَةِ.

২৯. তা এ সূরা একটি উপদেশ মানুষের জন্য নসিহত সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক আনুগত্যের মাধ্যমে।

٣٠. وَمَا تَشَاءُوْنَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ اِتِّخَاذَ السَّبِيْلِ بِالطَّاعَةِ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ط ذٰلِكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا بِخَلْقِهٖ حَكِيْمًا فِىْ فِعْلِهٖ .

৩০. আর তারা ইচ্ছা করবে না শব্দটি يَاء ও تَاء যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। আনুগত্য মাধ্যমে পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তা নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানময় তাঁর কার্যে।

٣١. يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط جَنَّتِهٖ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالظّٰلِمِيْنَ نَاصِبُهٗ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ اَىْ اَعَدَّ يُفَسِّرُهٗ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا مُؤْلِمًا وَهُمُ الْكَافِرُوْنَ .

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন তাঁর সৃষ্টি বেহেশতে, তারা হলো মু'মিনগণ। আর অত্যাচারীগণ তার নসবদানকারী فِعْل উহ্য। অর্থাৎ اَعَدَّ পরবর্তী বাক্যাংশ তারই ব্যাখ্যা করছে তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি পীড়াদায়ক, তারা হলো কাফেরগণ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ : এটা خَبَر اِنَّ আর وَيَذَرُوْنَ الخ -এর উপর عَطْف ।

قَوْلُهٗ اِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا : এখানে اِذَا টি اِنْ অর্থে ব্যবহৃত। অথবা اِذَا -এর স্থলে اِنْ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। [যেমনি আল্লামা যামাখশারী (র.) মত ব্যক্ত করেছেন।] এটা আল্লাহর বাণী وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ -এর মতো। তদ্রূপ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ এ প্রসঙ্গে মূলকথা হলো, اِنْ টি কোনো اِحْتِمَالِىْ বিষয়ের জন্য এবং اِذَا টি কোনো تحقيقى বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এখানে আল্লাহর مَشِيَّتْ -এর وُجُوْد বা অস্তিত্ব আসে নাই, তাই এখানে اِنْ ব্যবহার করা اَحَقّ ছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَا আর حَرْف اِسْتِثْنَاء. টি اِلَّا এবং مُسْتَثْنٰى টি اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ : قَوْلُهُ وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ مُسْتَثْنٰى مِنْهُ টি تَشَاءُوْنَ

قَوْلُهُ وَالظّٰلِمِيْنَ يُعَذِّبُ : এটা গ্রন্থকারের মতে اَعَدَّ -এর مَفْعُوْل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা উহ্য يُعَذِّبُ দ্বারা مَنْصُوْب হয়েছে। অথবা উহ্য يُعَذِّبُ দ্বারা مَنْصُوْب হয়েছে। জমহুরের মতে اَلظّٰلِمِيْنَ টি مَنْصُوْب এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জোবাইর ও অন্যান্যগণ رَفْع পড়েছেন। ইমাম রাযী (র.) حَالَت رَفْع -কে পছন্দ করেননি। কারণ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ -এর عَطْف করলে ظٰلِمُوْنَ যেহেতু جُمْلَه اِسْمِيَّه হবে। اِسْمِيَّه -এর عَطْف - فِعْلِيَّه -এর উপর لَازِمْ আসে, তা উত্তম নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الخ : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এরা দুনিয়ার মায়া মমতা ও পার্থিব সুখ-সম্পদ আর ভোগ-বিলাসের অত্যধিক আসক্তি হেতুই আপনার নসিহত কবুল করে না। যা সহজ ও শীঘ্রলভ্য তারা তা-ই চায় সব কিছুই তাড়াতাড়ি পেতে চায়, আখেরাতের প্রতি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। আখেরাতকে আদৌ বিশ্বাস করে না, মনে করে জন্মিলাম, বাঁচলাম, আবার মারলাম, মাটির শরীর মাটিতেই মিশে যাবে, আখেরাত আবার কি জিনিস। অথচ আখেরাত একটি ভয়াবহ দিবস দুনিয়ার ভালোবাসা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে। তাই সত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে মনে হিংসা জাগে। –[মা'আরিফ, তাহের]

قَوْلُهُ تَعَالٰى نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ ..... تَبْدِيْلًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমরাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জোড়া জোড়া শক্ত করে দিয়েছি। আমরা যখনই চাইবো, তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলবো।"

এর তাৎপর্য এই যে, যেসব লোক এ পার্থিব জীবনকে ভালোবেসে ঈমান আনয়ন হতে বিরত রয়েছে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরাই তাদেরকে সুন্দর দেহাবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছি। আর আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধ্বংস করে অন্যদেরকে সৃষ্টি করতে পারি। এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু করবার নেই। যেভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম তেমনি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সক্ষম। সুতরাং এ সব কথা ভেবে তাদের ঈমান গ্রহণ করা অপরিহার্য। –[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ...... عَلِيْمًا حَكِيْمًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটি একটি নসিহত বিশেষ এক্ষণে যার ইচ্ছা নিজের রবের নিকট যাওয়ার পন্থাবলম্বন করতে পারে। আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ চাইবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী।"

অর্থাৎ এ সূরা বা এ আয়াতগুলো হলো নসিহতস্বরূপ। তা হতে কেউ ইচ্ছা করলে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তা হতে স্বতই প্রমাণিত হলো যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। সেই স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্যলাভের পন্থাবলম্বন করতে পারে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তার এ ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার 'মশিয়াতে কাউনিয়া' বা ইচ্ছার অধীন। আল্লাহর মশিয়াতে কাউনিয়া না থাকলে বান্দার ইচ্ছায় কিছুই হতে পারে না। এ কথাটিই বলা হয়েছে।

পরের আয়াত وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ এ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সামনে মজবুর বা বাধ্য; বরং এর অর্থ এই যে, সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার আযলী ইচ্ছার আওতাধীন, সেক্ষেত্রে শরয়ী ইচ্ছা থাক বা না-ই থাক। বান্দার সৎকর্মে আল্লাহর কাউনী এবং শরয়ী উভয় ইচ্ছার সমন্বয় ঘটে; কিন্তু অপকর্মে কাউনী ইচ্ছা থাকলেও শরয়ী ইচ্ছা অবশ্যই থাকে না। এ কারণেই শাস্তি এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, 'কেউ নিজেকে হেদায়েত করতে পারে না, ঈমানের সীমায় অনুপ্রবেশ করতে পারে না, নিজের কোনো কল্যাণ করতে পারে না; আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া।" –[ইবনে কাছীর, সাফওয়া]

يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ **-এর তাৎপর্য :** আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করেন।"

গ্রন্থকার 'রহমত'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'জান্নাত' দ্বারা। এর তাৎপর্য হলো, জান্নাতে কেউ নিজের যোগ্যতা বলে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহর অনুগ্রহ দানে, ইহসান ও ইচ্ছার বলে– বান্দার কোনো যোগ্যতার বলে নয় রহমতের ব্যাখ্যা "জান্নাত" এ কারণে যে, আল্লাহর রহমতের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হলো [বান্দার ক্ষেত্রে] জান্নাত দান। ইমাম রাযী (র.) এবং আরো কতক তাফসীরকার 'রহমত' -এর ব্যাখ্যা করেছেন 'ঈমান' দ্বারা। কারণ ঈমানও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম রহমত। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি ঈমান আনয়নের শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলেই কেবল কোনো ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করতে পারে।

আল্লামা খাযেন রহমতের তাফসীর করেছেন, 'দীন' দ্বারা। তখন আয়াতের তাৎপর্য এই হবে যে, দীনে অনুপ্রবেশ করা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ যাকে চান তাকে এই দীন গ্রহণের তৌফিক দান করেন। –[খাযেন, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.eilmweebly.com

سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ : সূরা আল-মুরসালাত

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দ اَلْمُرْسَلَاتُ অবলম্বনে। এতে ২টি রুকূ', ৫০টি আয়াত, ১৮১টি শব্দ ও ৮১৬ টি অক্ষর রয়েছে। একে সূরাতুল আরফও বলা হয়। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। কেননা সূরার বিষয়বস্তু হতে প্রমাণিত হয় যে, এটা মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন, পরকাল ও মহাবিচার দিন- হাশরের কথা।

১-৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রলয় কিয়ামত সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শনে মৃদু বায়ু, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ু এবং মেঘ পরিচালনাকারী বায়ুর শপথ করে বলেছেন, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী ও অবশ্যই ঘটিতব্য ব্যাপার। কেননা প্রথমে আল্লাহ মানব কল্যাণে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহ করে তাকে ক্রমান্বয়ে সতেজ, প্রচণ্ড ও ঘূর্ণিবায়ুতে পরিণত করেন। অতঃপর বায়ু দ্বারা কালো আঁধারময় মেঘমালা নিয়ে আসেন। ফলে ধরণীর উপরে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হয় এবং গাছপালা, উদ্ভিদ ও ঘরবাড়িকে মথিত ও লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এ প্রলয় সৃষ্টি মুহূর্তে মু'মিন বান্দাদের মনে আল্লাহর স্মরণ জেগে উঠে এবং বেঈমান কাফিরদের মনে সৃষ্টি হয় অনুশোচনা অথবা ভীতি। মহাক্ষমতাবান আল্লাহ যখন এ প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেন তদ্রূপ এ পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায়ও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৮-১৫ নং আয়াতে সে মহাপ্রলয় তথা কিয়ামত সংগঠনের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে- উর্ধ্বলোকের সমস্ত ব্যবস্থাপনা সেদিন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ স্খলিত হয়ে আলোহীন হয়ে পড়বে। আকাশ ফেটে যাবে। পর্বতমালা পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। আর সেদিন সমস্ত নবী-রাসূলগণকে সাক্ষীর জন্য সমবেত করা হবে যাদের কথা কাফেরগণ অবিশ্বাস করছে। সেদিনটি হলো বিচার দিন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। এ দিনটির মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পক্ষে খুবই ভয়াবহ ও দুর্গতির দিন হবে। তাদের দুঃখ-কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না।

১৬-৪০ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত ও পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতার অনুকূলে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যুক্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। বলা হয়েছে- নগণ্য এক বিন্দু পানি যা এ ভূমির উৎপাদিত উপকরণে পরিণত করেছেন। তাকে নির্দিষ্ট একটি সময় নারীর গর্ভাশয়ে রেখে একটি অভিনব পূর্ণ অবয়বরূপী মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তার প্রয়োজনে কত অফুরন্ত সম্পদ ভূমির বুক চিরে বের হয়ে থাকে। আবার সবই সে ভূমির বুকেই লয় হয়। মানুষের লাশটিও সেই ভূমির বুকেই স্থান পায়। সুতরাং যে একক অনন্য শক্তিধর সত্তা এটা করতে সক্ষম হলেন, তিনি মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন না; এটা কোনো নির্বোধ লোকও স্বীকার করবে না। যারা এ কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হবে না তাদের পরকালে দুঃখের সীমা থাকবে না। প্রচণ্ড সূর্যতাপে তারা ছায়া খুঁজতে থাকবে। সেদিন জাহান্নামের ধুম্রকে কুণ্ডলীর আকারে দেখতে পেয়ে তারা তার তলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটাছুটি করবে; কিন্তু মূলত তার ছায়া না হবে শীতল, আর না পারবে সূর্যতাপকে বাধা দান করতে। তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও দুর্গতির সীমা থাকবে না। তাদের অপরাধ যখন আল্লাহর আদালতে প্রমাণ হবে তখন তাদের ওজর-আপত্তি করার বা কথা বলার কোনো অবকাশ থাকবে না। এ দিনই হবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন।

৪১-৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঐ দিন মুত্তাকী-পরহেজগার লোকগণ মহাশান্তিতে থাকবে। জান্নাতে মনের স্বাদ মিটিয়ে ফলমূল আহার করবে এবং চিরস্থায়ীভাবে পরম আনন্দে কাল কাটাবে।

উপসংহারে আল্লাহ কাফেরগণকে ধমক দিয়ে বলেছেন, তোমরা অপরাধী ও জালিম- এ দুনিয়ায় কয়েকটি দিন স্বাদ আস্বাদন নাও, পরকালে পাবে আসল সাজা। তোমাদের উচিত কিয়ামত ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী হওয়া। এ কুরআনই যদি তোমাদেরকে হেদায়েত করতে না পারে, তবে কোন্ গ্রন্থ তোমাদেরকে হেদায়েত করতে পারবে?

সূরাটির শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বুখারী শরীফে একটি বর্ণনা এই মর্মে পাওয়া যায় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা একদা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে লাইলাতুল জিন -এ (لَيْلَةُ الْجِنِّ) ভ্রমণ করছিলাম। মিনা নামক স্থানের একটি গর্তে আমরা উপনীত হলাম। ইত্যবসরেই সূরা وَالْمُرْسَلَاتِ অবতীর্ণ হলো। রাসূলে কারীম ﷺ সূরা আল-মুরসালাত পড়ছিলেন এবং হযরতের মুখ এটার পবিত্র তেলাওয়াতের অবস্থায় একটু রসাল হয়ে উঠল। শুনে আমিও তেলাওয়াত শুরু করলাম। হঠাৎ একটি সাপ এসে আমাদের আক্রমণ করল। হুযূর ﷺ বললেন, একে হত্যা করো। তখনই আমরা তার প্রতি আক্রমণ করলে তা পলায়ন করল। তখন হুযূর ﷺ বললেন, যেভাবে তোমরা উক্ত সর্পের ক্ষতিগ্রস্ত হতে রক্ষা পেলে সেও তোমাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। (মা'আরিফ, ইবনে কাছীর, সাবী) কারো কারো মতে, এটা মক্কা শরীফে প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে একটি।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আদ-দাহারে মানবজাতির ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমনও সময় ছিল যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না, আল্লাহ তা'আলাই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আর অত্র সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং কিয়ামতের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-মুরসালাত মক্কায় অবতীর্ণ

خَمْسُوْنَ اٰيَةً : ৫০ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا اَيِ الرِّيَاحُ مُتَتَابِعَةً كَعُرْفِ الْفَرَسِ يَتْلُوْبَعْضُهُ بَعْضًا وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ .

১. শপথ বায়ুর যা অগ্রে-পশ্চাতে প্রেরিত হয় অর্থাৎ ধারাবাহিক বাতাস, যেমন ঘোড়াসমূহ একটি অপরটির পিছনে চলতে থাকে, عُرْفًا শব্দটি حَالْ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

٢. فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا اَلرِّيَاحُ الشَّدِيْدَةُ .

২. আর প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার সজোরে প্রবাহিত বাতাস।

٣. وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا اَلرِّيَاحُ تُنْشِرُ الْمَطَرَ .

৩. শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর যে বাতাস বৃষ্টি সঞ্চালন করে।

٤. فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا اَىْ اٰيَاتُ الْقُرْاٰنِ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ .

৪. আর শপথ সে আয়াতসমূহের যা পার্থক্যকারী অর্থাৎ কুআনের আয়াত যা হক ও বাতিল এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।

٥. فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا اَيِ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِلُ بِالْوَحْيِ اِلَى الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ يُلْقُوْنَ الْوَحْيَ اِلَى الْاُمَمِ .

৫. আর তার শপথ যে মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌঁছিয়ে দেয় অর্থাৎ সেই ফেরেশতা যিনি নবী-রাসূলগণের নিকট প্রত্যাদেশ আনয়ন করে, যাতে তিনি তা স্বীয় উম্মতের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

٦. عُذْرًا اَوْ نُذْرًا اَىْ لِلْاِعْذَارِ وَلِلْاِنْذَارِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ ذَالِ نُذُرًا وَقُرِئَ بِضَمِّ ذَالِ عُذُرًا .

৬. অনুশোচনাস্বরূপ কিংবা সতর্কতাস্বরূপ অর্থাৎ অনুশোচনার জন্য ও আল্লাহ তা'আলা হতে ভয় প্রদর্শনের জন্য। এক কেরাতে نُذُرًا শব্দটি ذَالْ-এর মধ্যে পেশযোগে এবং عُذُرًا শব্দটি ذَالْ-এর মধ্যে পেশযোগে পঠিত হয়েছে।

٧. اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ مِنَ الْبَعْثِ وَالْعَذَابِ لَوَاقِعٌ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ .

৭. নিশ্চয় তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদেরকে পুনরুত্থান ও শাস্তি সম্পর্কে তা অবশ্যম্ভাবী নিশ্চিতরূপে বাস্তব রূপ লাভ করবে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا" : عُرْفًا শব্দটি مَفْعُول لَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ اَلْمُرْسَلَاتِ لِاَجْلِ الْعُرْفِ অথবা, حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে আগত। অথবা, مَصْدَر হওয়ার কারণে مَنْصُوْب যেন বলা হয়েছে وَالْمُرْسَلَاتِ اِرْسَالًا অথবা حَرْف جَرّ -কে مَحْذُوْف করে مَنْصُوْب করা হয়েছে, মূলত وَالْمُرْسَلَاتِ بِالْعُرْفِ ছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا : عُذْرًا اَوْ نُذْرًا উভয়ই ذِكْرًا হতে بَدَل হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে, অথবা مَفْعُوْل لَهٗ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ لِلْاِعْذَارِ اَوِ الْاِنْذَارِ আর কারো মতে উভয় حَال হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে مُعْذِرِيْنَ اَوْ مُنْذِرِيْنَ –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا" : জমহুর لَامْ -এ سَاكِنْ এবং قَافْ -কে تَخْفِيْف করে اِسْمِ فَاعِلْ হিসেবে مُلْقِيَاتِ পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) لَامْ -এ فَتْح দিয়ে এবং قَافْ -এ تَشْدِيْد যুক্ত করে تَلْقِيَةٌ হতে উদ্ভূত হিসেবে مُلَقِّيَاتِ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا আয়াতে অবতীর্ণ কেরাতসমূহ : জমহুর উভয় শব্দের ذَالْ বর্ণে سَاكِنْ যুক্ত করে عُذْرًا اَوْ نُذْرًا পড়েছেন। আর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) এবং তাঁর ছেলে হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ উভয় শব্দে ذَالْ -এ ضَمَّة দিয়ে عُذُرًا اَوْ نُذُرًا পড়েছেন। আর হারমিয়ান, ইবনে আমের ও আবূ বকর عُذْرًا -এর ذَالْ -এ سَاكِنْ যুক্ত করে আর نُذُرًا -এর ذَالْ -এ ضمة যুক্ত করে عُذْرًا اَوْ نُذُرًا পড়েছেন।

জমহুর اَوْ দ্বারা عَطْف করে عُذْرًا اَوْ نُذْرًا পড়েছেন, আর হযরত ইবরাহীম তাইমী এবং কাতাদাহ اَلِفْ বিহীন কেবল وَاوْ দ্বারা عَطْف করে عُذْرًا وَنُذْرًا পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ "اَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا" : গ্রন্থকার عُرْفًا -এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে চালিত বা ধারাবাহিকভাবে চালিত। অর্থাৎ যে বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। তাফসীরকারদের মতে এটার তাৎপর্য হলো, সেই আজাবের বা শাস্তির বায়ু যা জালিমদেরকে ধ্বংস করে দেয়। কোনো কোনো তাফসীরকার عُرْفًا -এর অর্থ 'কল্যাণের জন্য' করেছেন। বলাবাহুল্য বৃষ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, "শপথ সেই বাতাসের যা পরপর ও ক্রমাগতভাবে প্রেরিত হয়।" অথবা "শপথ সেই বায়ুর যা কল্যাণের জন্য প্রেরিত।"

কালবী, মুকাতিল ও আবূ সালেহ বলেছেন, مُرْسَلَاتِ হলো مَلَائِكَة -এর বিশেষণ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, 'শপথ সেই ফেরেশতাগণের যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় ঐশীবাণী আদেশ-নিষেধ দিয়ে যুগে যুগে পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করেছেন। অথবা মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদেরকে ঐশীবাণী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।'

কোনো কোনো তাফসীরকার তাকে اَنْبِيَاء -এর বিশেষণ বলে দাবি করেছেন। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হলো, 'শপথ নবীদের নামে যারা আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাঁর শরিয়তের তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অথবা মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত।" –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا .... عُذْرًا اَوْ نُذْرًا" : عَاصِفَاتِ শব্দটি عَصْفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া, উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঘূর্ণিবায়ু। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, 'শপথ প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবায়ুর।' কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, عَاصِفَاتِ শব্দটি ফেরেশতার বিশেষণ। সুতরাং অর্থ হলো, 'শপথ ফেরেশতাগণের যাদেরকে ঘূর্ণিবায়ুর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।" –[ফাতহুল কাদীর, খাযেন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا : গ্রন্থকার এটার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ছাড়া এটার অপর এক ব্যাখ্যা হলো, 'শপথ সেসব ফেরেশতাদের যারা মেঘমালা এদকি সেদিক সঞ্চালন করে' অথবা যারা ওহী অবতীর্ণকালে স্বীয় ডানা বাতাসে প্রসারিত করে দেয়। যাহহাক বলেছেন, আয়াতের তাৎপর্য হলো, তারা আদম সন্তানদের আমলনামা এবং কিতাবাদি প্রসারিত করে দেয়।

-[ফাতহুল কাদীর, খাযেন]

قَوْلُهُ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا : গ্রন্থকার একে পবিত্র কুরআনের বিশেষণ গণ্য করত তাফসীর করেছেন, "শপথ সেই আয়াতসমূহের যা হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।" আল্লামা ইবনে কাছীর, সাবূনী, শাওকানী ও আরো অনেকেই এটাকে ফেরেশতার বিশেষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, "শপথ সেসব ফেরেশতাদের যারা এমন সব জিনিস নিয়ে আসে যা দ্বারা হক-বাতিল ও হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।" আর কোনো কোনো তাফসীরকার তাকে রাসূলের বিশেষণ গণ্য করে অর্থ করেছেন, "শপথ রাসূলগণের যারা সত্য-মিথ্যার মধ্যে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।"

قَوْلُهُ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا : জমহুর এটার অর্থ করেছেন, 'শপথ সেসব ফেরেশতাদের যারা জিকির অবতীর্ণ করে।' অতঃপর জিকির -এর ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন উপদেশ, কেউ বলেছেন ওহী, কেউ বলেছেন ওহী সম্বলিত আল্লাহর কিতাব- যা ফেরেশতাগণ নবী-রাসূলদের কাছে বহন করে নিয়ে আসে। কেউ বলেছেন, এটার তাৎপর্য হলো হযরত জিবরাঈল (আ.), তিনিই আল্লাহর ওহী নবীগণের কাছে নিয়ে অবতীর্ণ হন, তবে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে তাঁর সম্মানার্থে। হযরত কুতরুব বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, "রাসূলগণের শপথ যারা আল্লাহর ঐশী বিধান উম্মাতগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেন।" এ সবের মধ্যে প্রথমটাই উত্তম ও অগ্রাধিকার প্রাপ্য।

قَوْلُهُ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا : এ আয়াতটি مُلْقِيَاتِ ذِكْرًا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ জিকির তথা ওহী নবীগণের কাছে অবতীর্ণ করা হয় যাতে তা মু'মিনদের জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে ওজর-আপত্তির কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্য সতর্ককারী হয়ে যায়। -[মা'আরেফুল কোরআন] এ আয়াতের অপর এক তাৎপর্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা নবীগণের কাছে ওহী অবতীর্ণ করে তাঁর বিধান বান্দাগণকে জানিয়ে দেন, যাতে বান্দারা এ ওজর-আপত্তি না করতে পারে যে, আমাদের কাছে কোনো বিধান আসেনি, আমরা কোনো নবীর দাওয়াত পাইনি। আর আল্লাহ তা'আলা এ ওহীর মাধ্যমে বান্দাগণকে সতর্ক করে দিতে চান যে, আল্লাহর বিধান না মানলে যে পরকাল অবশ্যই আসবে তাতে তারা শাস্তির মুখোমুখি হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ" : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমাদের নিকট যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।" এটার আর একটি অর্থ হতে পারে, তা হলো "তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে অর্থাৎ কিয়ামত ও পরকাল তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।"

অর্থাৎ পরকালে যেসব জিনিস ও কর্মকাণ্ড সংঘটিত হবে বলে ওয়াদা করা হয়েছে অথবা ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সূরায় যেসব জিনিসের নামে শপথ করা হয়েছে তা অস্পষ্ট রাখার কারণ : আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় যেসব জিনিসের নামে শপথ করেছেন তা অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত রেখেছেন। এ কারণেই বিভিন্ন তাফসীরকার তা নির্ণয়ে বিভিন্ন রকমের কথা বলেছেন, তবে এ মহাবিশ্বে এবং মানবজীবনে সেসব জিনিসের কি প্রভাব তা উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- এ সব জিনিস অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত হয়েও তার প্রভাব যেমন সত্য তেমনি এ সব জিনিসের শপথ করে যে পরকালের সত্যতার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে তা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট হলেও অবশ্যই সত্য ও বাস্তব। যেমন এ সব বস্তু বাস্তব ও সত্য। -[যিলাল]

Free @ www.e-ilmweebly.com

অনুবাদ :

٨. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ مُحِيَ نُورُهَا .

৮. যখন নক্ষত্ররাজীর আলো নির্বাপিত হবে তার আলো বিলীন হয়ে যাবে।

٩. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ شُقَّتْ .

৯. আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে খণ্ড-বিখণ্ড হবে।

١٠. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ فُتِّتَتْ وَسُيِّرَتْ .

১০. আর যখন পর্বতমালা উন্মুলিত হবে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে।

١١. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ بِالْوَاوِ وَبِالْهَمْزَةِ بَدَلًا مِنْهَا أَيْ جُمِعَتْ لِوَقْتٍ .

১১. এবং রাসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে। أُقِّتَتْ শব্দটি وَاوْ যোগে এবং তৎপরিবর্তে হামযা যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ যথাসময় উপস্থিত করা হবে।

١٢. لِأَيِّ يَوْمٍ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ أُجِّلَتْ لِلشَّهَادَةِ عَلَى أُمَمِهِمْ بِالتَّبْلِيغِ .

১২. কোন দিবসের জন্য মহান দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? তাদের উম্মতগণের প্রতি প্রচার করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দানের জন্য।

١٣. لِيَوْمِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلْقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ إِذَا أَيْ وَقَعَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ .

১৩. বিচার দিবসের জন্য সৃষ্টি জগতের মধ্যে এটা হতে إِذَا -এর জওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সকলের বিচারকার্য সংঘটিত হবে।

١٤. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ تَهْوِيلٌ لِشَأْنِهِ .

১৪. বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান? এটা সেদিনের ভয়াবহতা নির্দেশক।

١٥. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا وَعِيدٌ لَهُمْ .

১৫. সেদিন অসত্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ এটা তাদের প্রতি ধমকীস্বরূপ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ "لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ" فِي التَّرْكِيبِ : এ বাক্যটি قَوْل مُقَدَّرْ -এর مَقُوْلَه, যা إِذَا -এর জবাব হয়েছে, অথবা أُقِّتَتْ -এর ضَمِيْر হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ" : مَا হলো مُبْتَدَأ আর أَدْرَاكَ হলো তার خَبَرْ অথবা أَدْرَاكَ হলো مُبْتَدَأ مُؤَخَّرْ আর مَا হলো خَبَر مُقَدَّمْ এটা ইমাম সীবাওয়াইহ-এর অভিমত। আর দ্বিতীয় مَا হলো مُبْتَدَأ আর يَوْمُ الْفَصْلِ হলো তার خَبَرْ মুবতাদা এবং খবর মিলে أَدْرَى ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِيْ -এর স্থানে পতিত হয়েছে। أَدْرَى ক্রিয়াটি স্বীয় مَفْعُوْل দু'টিসহ خَبَرْ হয়েছে। আর প্রথম বাক্যটি হলো مُبْتَدَأ –[ফাতহুল কাদীর]

أُقِّتَتْ -এর هَمْزَة কোথা হতে এসেছে? : أُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيْتٌ হতে উদ্ভূত, তাহলে هَمْزَة আসল কোথা হতে? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা শাওকানী বলেছেন, أُقِّتَتْ -এর هَمْزَة টি وَاوْ مَضْمُوْمَة হতে বদল হয়ে هَمْزَة হয়েছে। কারণ যেসব وَاوْ ضَمَّه বিশিষ্ট হয় আর তার ضَمَّة টি লাযেমী বা আবশ্যকীয় হয়, তখন সেই وَاوْ -কে هَمْزَة দ্বারা বদল করা বৈধ হয়। আবূ আমর, শাইবানী এবং আ'রায وَاوْ দিয়ে وُقِّتَتْ পড়িছেন। বাকি ক্বারীগণ তাকে هَمْزَة দিয়ে أُقِّتَتْ পড়েছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ "إِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ" : ইমাম রাযী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন- ১. إِذَا -এর জবাব পূর্বে অর্থাৎ إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ إِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ তিনি বলেছেন, এ জবাবটি শক্তিশালী নয়, কারণ জবাব إِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ -এর উপর (অর্থাৎ শর্তের উপর) পতিত হয়। ২. জবাব উহ্য, যার تَقْدِيْر হলো-

فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ وَ.......وَ.......فَحِيْنَئِذٍ تَقَعُ الْمُجَازَاةُ بِالْأَعْمَالِ وَتَقُوْمُ الْقِيَامَةُ .

অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে পড়বে এবং ...... এবং .... তখন আমলের প্রতিফল পাওয়া যাবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ يَوْمُ الْفَصْلِ : এটি لِأَيِّ يَوْمٍ হতে بَدَلْ হিসেবে مَحَلًّا مَجْرُوْر হবে। আর ইমাম সীবওয়াইহ -এর মতানুসারে مَا أَدْرَاكَ مَا -এর মধ্যে প্রথম (مَا) টি হলো مُبْتَدَأْ আর أَدْرَاكَ তার خَبَرْ অথবা أَدْرَاكَ টি مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ এবং مَا টি خَبَرْ مُقَدَّمْ। আর দ্বিতীয় (مَا) مُبْتَدَأْ এবং يَوْمُ الْفَصْلِ উহার خَبَرْ এরা جُمْلَه হয়ে أَدْرٰى ক্রিয়ার مَفْعُوْل ثَانِىْ।

قَوْلُهُ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ : এটি مُبْتَدَأْ হয়েছে। যদিও এটা نَكِرَه فِى الْأَصْلِ হয়ে থাকে। আর এটা মূলত মাসদার এবং ঐ মাসদারটি قَائِم مَقَامْ হয়েছে فِعْل -এর। আর তার উপর رَفْع হওয়ার কারণ হচ্ছে- حَدَّ عَوْلَهُ -এর ধ্বংস ও নিধন হওয়ার উপর যেন দালালত করে। কেননা, دَوَامْ وَثُبَاتْ وَاسْتِمْرَارْ টি مَصْدَرْ -এর উপর দালালত করে থাকে। সুতরাং قَائِم مَقَامْ হয়ে رَفْع হওয়া জায়েজ হয়েছে। যেমন- سَلَامٌ عَلَيْكَ এটাও نَكِرَه হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া জায়েজ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ : অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি মলিন হয়ে যাবে, আসমান খান খান হয়ে যাবে আর পর্বতমালাও তুলা বা পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে।

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন- এটার অর্থ তারকাগুলো বিলীন হয়ে যাবে। অথবা মওজুদ থাকবে বটে, কিন্তু আলো নষ্ট করে দেওয়া হবে। এতে সারা বিশ্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

ইমাম রাযী (র.)-এর মতে, এটার অর্থ নক্ষত্ররাজি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ اِنْكَدَرَتْ ও اِنْتَشَرَتْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। (কাবীর) কারো কারো মতে, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি জগতের পরস্পরের বর্তমান যে বন্ধনের মাধ্যমে গতিবিধি রয়েছে তাদের সকল বন্ধন বিনষ্ট ও শিথিল করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا السَّمَاءُ نُسِفَتْ : কাবীর গ্রন্থে বলা হয়েছে- وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ -এর তাৎপর্য দু'টি হতে পারে। একটি হলো পাহাড়গুলোকে যখন ধুনে তুলার ন্যায় করা হবে। অপরটি হলো পাহাড়গুলো স্ব-স্ব স্থান হতে স্বয়ং সজোরে উৎখাত হয়ে যাবে।

জালালাইন গ্রন্থকার তার তাফসীর করেছেন اُقْتِتَتْ وَسُيِّرَتْ অর্থাৎ আঁশ আঁশ হয়ে যাবে এবং উড়তে থাকবে। সকল তাফসীরকারের তাফসীরের মর্মকথা সর্বশেষে একইরূপ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ : এটার দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থ হলো, 'যখন পাহাড়কে ধুনে ফেলা হবে।" অর্থাৎ তুলার মতো ধুনে ফেলা হবে। অপর অর্থ হলো, যখন পর্বতমালা স্বীয় স্থান হতে স্বজোরে উৎক্ষিপ্ত হবে।" -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ : গ্রন্থকার বলেন, اُقِّتَتْ অর্থ- নির্দিষ্ট সময়েই একত্রিভূত করা হবে, নির্দিষ্ট সময় বলতে কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে- وَالْوَقْتُ الْأَجَلُ الَّذِىْ يَكُوْنُ عِنْدَهُ شَيْءُ الْمُؤَخَّرِ إِلَيْهِ তখন অর্থ হবে কিয়ামতের জন্য নির্ধারিত সময় করে দেওয়া হয়েছে তখনই সকল ফয়সালা হবে।

মা'আরিফ গ্রন্থকার বলেন, اُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيْتٌ হতে مُشْتَقْ হয়েছে। তার অর্থ- নির্ধারিত সময়। আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেন, এটার অর্থ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে যাওয়া এবং আয়াতের এই অর্থ হবে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় ধার্য করা হয়েছিল যে, তাঁরা তাঁদের উম্মতগণের কার্যাদিতে সাক্ষ্য দানের জন্য হাজির হবেন, তারা সে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছে গেছেন এবং তাদের হাজিরা প্রদানের সময় এসে গেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ : উপরে পরকাল বাস্তবায়ন মুহূর্তের চারটি অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে "কোন দিনের জন্য এ কাজটি বাকি রাখা হয়েছে?" অর্থাৎ মানুষের হিসাব-নিকাশ দেরি করা হচ্ছে কোন দিনের অপেক্ষায়? জবাবে বলা হয়েছে لِيَوْمِ الْفَصْلِ অর্থাৎ সেই কিয়ামতের দিনের অপেক্ষা করা হচ্ছে যেদিন আল্লাহ তা'আলা সত্য-মিথ্যার ফয়সালা করবেন, বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। অতঃপর বলা হয়েছে مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ অর্থ "সেই ফয়সালার দিনটি কি তা কি তোমার জানা আছে"? এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে– এই দিন এতই ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ যে, তোমার পূর্বাপর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার ভয়াবহতার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এ দিন সম্বন্ধে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ অবস্থা তখন অন্যান্য লোকের জন্য তা কত সংকটপূর্ণ হবে তা উপলব্ধি করা যায় না।

কিয়ামত দিবসের এ ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ চিত্র অঙ্কনের পর যেন প্রশ্ন করা হয়েছে এ দিবসকে অস্বীকারকারীদের অবস্থা কি হবে? তখন স্পষ্ট করে জবাব দেওয়া হয়েছে وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ "সেদিন চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় হবে [অস্বীকারী] অমান্যকারী লোকদের জন্য"। অর্থাৎ যারা কিয়ামত অস্বীকার করে তাদের জন্য এ দিন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে। وَيْلٌ শব্দের অর্থ– ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানে পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। –[মা'আরেফুল কোরআন]

اَلْوَيْلُ-এর পরিচিতি : নবী করীম ﷺ বলেছেন, اَلْوَيْلُ হলো দোজখের একটি ঘাঁটি। চল্লিশ বছর যাবৎ কাফেররা তাতে ধাক্কা খেতে থাকবে তবু তারা গভীরে পৌঁছতে পারবে না। –[আহমদ, তিরমিযী, বায়হাকী]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, ওয়াইল হলো দোজখের একটি ঘাঁটি তাতে দোজখীদের পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে। যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করছে, তাদের শাস্তির জন্যই ঐ স্থানটি নির্দিষ্ট।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র.) বলেছেন, وَيْلٌ হলো দোজখের এমন একটি ঘাঁটি যা দোজখীদের পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ। যদি পাহাড়কেও ঐ ঘাঁটিতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তার তাপের কারণে পাহাড় গলে যাবে।

–[বায়হাকী, ইবনে জারীর, ইবনে মোবারক]

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, ওয়াইল হলো দোজখের একটি পাহাড়। ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা তাওহীদ, নবুয়ত এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে। –[কাবীর, মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٦. اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ بِتَكْذِيْبِهِمْ اَىْ اَهْلَكْنَاهُمْ .

১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? তাদের অসত্যারোপের কারণে অর্থাৎ আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি।

١٧. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ مِمَّنْ كَذَّبُوْا كَكُفَّارِ مَكَّةَ فَنُهْلِكُهُمْ .

১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করবো যারা অসত্যারোপ করেছে। যেমন মক্কাবাসী কাফেরগণ সুতরাং আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো।

١٨. كَذٰلِكَ مِثْلَ فِعْلِنَا بِالْمُكَذِّبِيْنَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ بِكُلِّ مَنْ اَجْرَمَ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ فَنُهْلِكُهُمْ .

১৮. এরূপই অসত্যারোপকারীদের সাথে কৃত আমার আচরণের ন্যায় আমি পাপাচারীদের সাথে আচরণ করবো। ভবিষ্যতেও যারা পাপাচারিতায় লিপ্ত হবে আমি তাদেরকে একইভাবে ধ্বংস করবো।

١٩. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ تَاكِيْدًا .

১৯. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ এটা تَاكِيْد স্বরূপ পুনরুক্ত হয়েছে।

٢٠. اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ضَعِيْفٍ وَهُوَ الْمَنِيُّ .

২০. আমি কি তোমাদেরকে নগণ্য পানি হতে সৃষ্টি করিনি? তুচ্ছ তা হলো শুক্রবিন্দু।

٢١. فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ حَرِيْزٍ وَهُوَ الرَّحِمُ .

২১. তৎপর আমি তাকে নিরাপদ আধারে স্থাপন করেছি সুরক্ষিত, আর তা হলো জরায়ু।

٢٢. اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ وَهُوَ وَقْتُ الْوِلَادَةِ .

২২. এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা হলো প্রসবকালীন সময়।

٢٣. فَقَدَرْنَا عَلٰى ذٰلِكَ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ نَحْنُ .

২৩. অনন্তর আমি তাকে সুগঠিত করেছি এটার উপর সুতরাং কতই নিপুণ স্রষ্টা আমি।

٢٤. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ .

২৪. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

٢٥. اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا مَصْدَرُ كَفَتَ بِمَعْنٰى ضَمَّ اَىْ ضَامَّةً .

২৫. আমি কি পৃথিবীকে ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করিনি? كَفَتَ শব্দটি ضَمَّ অর্থে مَصْدَرْ অর্থাৎ ضَامَّةً ধারণকারী।

٢٦. اَحْيَآءً عَلٰى ظَهْرِهَا وَّاَمْوَاتًا فِىْ بَطْنِهَا .

২৬. জীবিতদের জন্য তার পৃষ্ঠে এবং মৃতদের জন্য তার গর্ভে।

٢٧. وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ جِبَالًا مُّرْتَفِعَاتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا عَذْبًا .

২৭. আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উঁচু পর্বতমালা সুউচ্চ পাহাড় এবং তোমাদেরকে সুপেয় পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করেছি মিষ্টি।

٢٨. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ وَيُقَالُ لِلْمُكَذِّبِيْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

২৮. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ। আর কিয়ামতের দিন মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

نُتْبِعُهُمْ-এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর عَيْن ও ضَمَّة দিয়ে جُمْلَة مُسْتَانِفَة হিসেবে ثُمَّ نُتْبِعُهُمْ পড়েছেন। অর্থাৎ ثُمَّ نَحْنُ نُتْبِعُهُمْ আবুল বাকা বলেন, এটা مَعْطُوْف নয়, কারণ عَطْف হলে এটার অর্থ হবে "পূর্বের লোকদেরকে ধ্বংস করেছি অতঃপর তাদের পরে পরবর্তী লোকদেরকেও ধ্বংস করেছি" –এটা সত্য নয়, কারণ পরবর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করা হয়নি।

হযরত ইবনে মাসউদ (র.) তাকে ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ পড়েছেন। আ'রায হযরত আব্বাস, ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করে عَيْن-এ جَزْم দিয়ে نُتْبِعْهُمْ পড়েছেন نُهْلِكْ-এর উপর عَطْف হিসেবে। শেহাবুদ্দিন বলেছেন, نُتْبِعُهُمْ ক্রিয়াটি اَلَمْ نُهْلِكْ পুরা বাক্যটির উপর عَطْف হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

كِفَاتًا : এটি نَجْعَلْ-এর ضَمِيْر হতে حَال হিসেবে مَحَلًّا মানসূব হয়েছে।

شَامِخٰتٍ : এটা رَوَاسِىَ-এর صِفَتْ হয়েছে।

فَقَدَرْنَا-এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর فَقَدَرْنَا শব্দটিকে تَخْفِيْف করে পড়েছেন, নাফে', কিসায়ী তাতে تَشْدِيْد যুক্ত করে تَقْدِيْر হতে উদ্ভূত হিসেবে فَقَدَّرْنَا পড়েছেন। ফাররা এবং কিসায়ী বলেছেন, উভয়ের অর্থ অভিন্ন। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا : ফাররা বলেছেন, اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا শব্দদ্বয় مَنْصُوْب হয়েছে كِفَاتٌ তার উপর পতিত হওয়ার কারণে। অর্থাৎ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا কেউ কেউ বলেছেন, اَرْضَ হতে حَالْ হওয়ার কারণে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ مِنْهَا كَذَا وَمِنْهَا كَذَا –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ الخ : তাফসীরকারগণের বর্ণনা মতে, এর তাৎপর্য এই যে, ১৬-১৯ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ বলতে চান যে, যারা কিয়ামত অবিশ্বাস করে তারা তাদের অতীত জাতিদের ইতিহাস দেখে না যে, আল্লাহ তাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে তাদের দৌরাত্ম্য ও ধৃষ্টতা হেতু নিপাত করে দিয়েছেন। তবে তাই বলে এ পৃথিবীও মানবশূন্য নেই। বসুন্ধরার কোনো অংশ খালি হয়নি। আল্লাহ অন্যান্য জাতিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের স্থানে সৃষ্টি করেছেন। এক গেছে অন্য এসে তার স্থান দখল করেছে। অতএব, বর্তমান দৌরাত্ম্যদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। দুর্বৃত্ত ও দৌরাত্ম্যদের সঙ্গে এটাই আল্লাহর চিরাচরিত নীতি চলে এসেছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ" : এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, 'আউয়ালীন' বলতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর পূর্বের সমস্ত কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি কি তোমার পূর্বের সমস্ত কাফিরদেরকে ধ্বংস করিনি?

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ এ বাক্যটি جُمْلَه مُسْتَانِفَه অর্থাৎ ভবিষ্যতেও পরের কাফেরদেরকে পূর্বের কাফেরদের অনুগামী করবো। অর্থাৎ তাদেরও একই পরিণতি হবে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, এটা আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত ও স্থায়ী বিধান।

–[কাবীর]

গ্রন্থকার বলেছেন, এখানে পরবর্তী বলে মক্কাবাসীদের বুঝানো হয়েছে। এটার তাৎপর্য হচ্ছে– মক্কার কাফেরদেরকেও পূর্বের কাফেরদের মতো ধ্বংস করা হবে, কারণ তারা অপরাধী। আর অপরাধীদের সম্বন্ধে আমাদের শাশ্বত ও চিরাচরিত বিধান হলো, ধ্বংস করা। সুতরাং ভবিষ্যতে যত অপরাধী অপরাধ করবে তাদের সকলকেই ধ্বংস করা হবে।

এটাতো দুনিয়াতে হবে আর পরকালে? : পরকালে মিথ্যারোপকারী মুজরিম বা অপরাধীদের কি হবে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য বড়োই দুর্ভোগ রয়েছে।' অর্থাৎ দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানেই তাদেরকে দুর্ভোগ পোহাতে হবে। যেমন কুরআনের একস্থানে বলা হয়েছে– خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ 'দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় নষ্ট হলো।' –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ : এটার অর্থ 'সেই সময়টা সুনির্দিষ্ট' কিন্তু প্রকৃত অর্থ শুধু এতটুকুই নয়। এটার তাৎপর্য হলো যে, তার সময় বা মিয়াদটা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোন শিশু কতমাস, কতদিন, কত ঘণ্টা, কত মিনিট ও কত সেকেণ্ড মাতৃগর্ভে অবস্থান করবে এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঠিক সময় কি? তা পূর্বাহ্নে জেনে নেওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেকটি শিশুর জন্য আল্লাহ তা'আলাই এ সময়কালটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনিই এ সময় ও মিয়াদ সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল রয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلَمْ نَجْعَلِ ...... وَّاَمْوَاتًا : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন "আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য কিফাত করিনি?" كِفَاتًا শব্দটি كَفْتٌ থেকে উদ্ভূত, এটার অর্থ হলো মিলানো বা জমায়েত করা, এই ভূমি সমস্ত মানবজাতিকে একত্র করে তার গর্ভে। জীবিত মানুষেরা তার পৃষ্ঠে আর মৃত মানুষেরা তার গর্ভে অবস্থান করে। -[সাফওয়া]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى "এখান থেকেই সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে, আবার তোমাদেরকে এখানেই ফিরিয়ে আনবো, পুনরায় এখান হতে তোমাদেরকে বের করবো।"

ইমাম শা'বী (র.) বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো, "ভূমির গর্ভ হলো তোমাদের মৃত মানুষদের জন্য, আর পৃষ্ঠদেশ হলো তোমাদের জীবিতদের জন্য। -[সাফওয়া]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-কে বারংবার আনয়ন করার কারণ : কাফেরদের যে যেই বিষয়ে যেই প্রকারের মিথ্যারোপের প্রকাশ লাভ করেছে সে সেই বিষয়ে ও স্থানেই আল্লাহ তাদের ধ্বংসের কথা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যত তাকযীব, তত তাহদীদ يَعْنِىْ عَلٰى قَدَرِ التَّكْذِيْبِ التَّهْدِيْدِ প্রত্যেক প্রকারের মিথ্যাবাদীর জন্য পৃথক পৃথক শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তাই আয়াতটিতে تَكْرَارْ এসেছে। আবার হয়তো তাদের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা আল্লাহর সমীপে খুবই মারাত্মক অপরাধরূপে গণ্য হয়েছে। তাই অপরাধের স্থানে আল্লাহ বারংবার শাস্তির ধমকি দিয়েছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) এ ধমকির আয়াতগুলোকে تَكْرَارْ আনয়ন করার দু'টি কারণ ব্যক্ত করেছেন

১. আরবের ফাসাহাত ও বালাগাত বিশারদদের নীতি ছিল যে, তাদের বক্তব্যের মধ্যে তারা কয়েকটি কথা বলার পর একটি বিশেষ বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। আবার কয়েকটি বাক্য ব্যবহার করার পর পুনরায় ঐ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকেন, যাতে তাদের বক্তব্যটি শ্রোতাবৃন্দ খুব গভীর মনযোগের সাথে শ্রবণ করে। আর এতে শ্রোতাদেরকে বক্তব্যের প্রতি আকর্ষিত করা হয়।
   তদ্রূপ এটাও অর্থাৎ কালামুল্লাহর প্রতি এবং তাতে বর্ণিত উদ্দেশ্য আদর্শ ও আদেশ-নিষেধের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করার জন্যই এ বাক্যটি বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে। আর কালামুল্লাহর প্রভাবে যেন তারা প্রভাবান্বিত হয়ে উঠে।
২. এ বাক্যটি وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-কে অত্র সূরায় মোট দশবার ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে থাকে তাদের উপর দশটি কারণে সেদিন মসিবত এসে পড়বে এবং ভয়াবহ বিপদে পতিত হবে। সে দশটি বিষয়ের প্রত্যেকটি ব্যক্ত করার ব্যাপারেই একবার সেই আয়াতটি বলা হয়েছে।

ভূ-পৃষ্ঠের উপর পাহাড়সমূহকে উঁচু উঁচু করে স্থাপনের কারণ ও হিকমত : ভূপৃষ্ঠের উপর পাহাড়সমূহকে উঁচু উঁচু করে স্থাপনের কারণতো আল্লাহ তা'আলাই স্পষ্ট ভাষায় পবিত্র কালামে বলে দিয়েছেন যে, اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا، وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا আমি কি জমিনকে সমতল বিছানারূপে তৈরি করিনি এবং পাহাড়গুলোকে পেরেগ স্বরূপ স্থাপন করিনি? [সূরা আন-নাবা] অন্য আয়াতে আরো বলেন- وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا তিনি ভূপৃষ্ঠে তোমাদের হুজুরে পাহাড়সমূহকে স্থাপন করেননি? যাতে তোমরা পৃথিবীতে দোলাতে না থাক আর নহর ও পথসমূহ সৃষ্টি করিনি? মূলত যদি আল্লাহ এই জমিনের বুকে পাহাড়-পর্বত সৃজন না করতেন তথাপিও জমিন হেলতে দোলতে হতো না। কারণ কুদরত সব কিছুই করতে সক্ষম, সুতরাং পাহাড়গুলোকে জমিন নড়াচড়া করার থেকে রক্ষা করার জন্য স্থাপন করাটা একটা অসিলা মাত্র, আর অপর পক্ষে এগুলো তার মহান কুদরতের নিদর্শন যে, তিনি সকল অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম।

জমিন নড়াচড় করার কারণতো মূলে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তথাপিও কুরআন-হাদীস হতে যা জানা যায় তাতে প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্বভূমি সাগরের পানির মাঝে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছে সুতরাং পানির উপর টলমল অবস্থা হতে রক্ষা করার জন্য পাহাড়কে পেরেগস্বরূপ স্থাপন করা হয়েছে।

Free@ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٩. اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ مِنَ الْعَذَابِ تُكَذِّبُوْنَ ـ

২৯. চল তারই দিকে যার ব্যাপারে শাস্তি সম্পর্কে তোমরা মিথ্যারোপ করেছিলে ।

٣٠. اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلَاثِ شُعَبٍ هُوَ دُخَانُ جَهَنَّمَ اِذَا ارْتَفَعَ اِفْتَرَقَ ثَلَاثَ فِرَقٍ لِعَظْمَتِهٖ ـ

৩০. চল, ত্রিশাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে তা জাহান্নামে ধুম, এটা উঁচু হওয়ার পর বিরাটত্বের কারণে তিনভাগে বিভক্ত হবে।

٣١. لَّا ظَلِيْلٍ كَنِيْنٍ يُظِلُّهُمْ مِنْ حَرِّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَّلَا يُغْنِىْ يَرُدُّ عَنْهُمْ شَيْئًا مِنَ اللَّهَبِ لِلنَّارِ ـ

৩১. যে ছায়া শীতল নয় যা সেই দিনের উত্তাপ হতে বাঁচিয়ে ছায়া দিতে পারে এবং রক্ষা করবে না তাদের হতে কোনো কিছুকে প্রতিরোধ করবে না অগ্নি শিখা হতে দোজখের।

٣٢. اِنَّهَا اَىِ النَّارَ تَرْمِىْ بِشَرَرٍ هُوَ مَا تَطَايَرَ مِنْهَا كَالْقَصْرِ مِنَ الْبِنَاءِ فِىْ عَظْمِهٖ وَارْتِفَاعِهٖ ـ

৩২. নিশ্চয় তা অর্থাৎ জাহান্নাম উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ যা তথা হতে উৎক্ষিপ্ত হবে অট্টালিকা তুল্য তার বিশালত্ব ও উচ্চতা বিচারে অট্টালিকার ন্যায়।

٣٣. كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ جَمْعُ جِمَالَةٍ جَمْعُ جَمَلٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ جِمَالَةٌ صُفْرٌ فِىْ هَيْئَتِهَا وَلَوْنِهَا وَفِى الْحَدِيْثِ شِرَارُ جَهَنَّمَ اَسْوَدُ كَالْقِيْرِ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى سُوْدَ الْاِبِلِ صُفْرًا لِشَوْبِ سُوْدِهَا بِصُفْرَةٍ فَقِيْلَ صُفْرٌ فِى الْاٰيَةِ بِمَعْنٰى سُوْدٍ لِمَا ذُكِرَ وَقِيْلَ لَا وَالشَّرَرُ جَمْعُ شَرَرَةٍ وَالشِّرَارُ جَمْعُ شِرَارَةٍ وَالْقِيْرُ الْقَارُ ـ

৩৩. যেন তা উষ্ট্র শ্রেণি جِمٰلَتٌ শব্দটি جِمَالَةٌ এর বহুবচন, যা جَمَلٌ এর বহুবচন। অপর এক কেরাতে শব্দটি جِمَالَةٌ পীতবর্ণ তার আকৃতি ও বর্ণে। হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে যে, জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ আলকাতরার ন্যায় কাল হবে আর আরবগণ কালো উষ্ট্রকে صُفْر বলে থাকে। কারণ কাল ও পীতবর্ণ প্রায় একইরূপ। এ জন্য কারো মতে আয়াতে উল্লিখিত صُفْر শব্দটির অর্থ سُوْد বা কাল। আর কেউ বলেন, না, এরূপ অর্থ ঠিক নয়। আর, শব্দটি شَرَرَةٌ-এর বহুবচন এবং شِرَارٌ শব্দটি شِرَارَةٌ-এর বহুবচন। আর قِيْرٌ শব্দটি قَارٌ অর্থে ব্যবহৃত।

٣٤. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ـ

৩৪. সেই দিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ كَالْقَصْرِ : জমহুর তাকে صَادْ- এ سَاكِنْ যুক্ত করে كَالْقَصْرِ পড়েছেন, قَصْرٌ হলো قُصُوْرٌ -এর একবচন। অর্থ- প্রাসাদ বা অট্টালিকা। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, হোমাইদ, আস্সুলামী صَادْ -এ فَتْح দিয়ে كَالْقَصَرِ পড়েছেন। অর্থাৎ উষ্ট্রের কল্লা বা গর্দান قَصَرٌ টি قَصَرَةٌ -এর বহুবচন [ফাতহুল কাদীর], আর সাঈদ ইবনে জোবাইর তার قَافْ -এ كَسْرَه দিয়ে আর صَادْ -এ فَتْح দিয়ে كَالْقِصَرِ পড়েছেন। তাও قَصَرَةٌ -এর বহুবচন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "تَرْمِيْ بِشَرَرٍ" : জমহুর شِيْن -এ فَتْح দিয়ে بِشَرَرٍ পড়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাকছাম شِيْن -এ كَسْرَه এবং দুই رَا، -এর একটি اَلِفْ যুক্ত করে بِشِرَارٍ পড়েছেন। হযরত ঈসাও হযরত ইবনে আব্বাসের মতানুসারে, তবে তিনি شِيْن বর্ণে فَتْح দিয়ে পড়েছেন।

قَوْلُهُ "جِمَالَاتٌ" : জমহুর جِيْم -এ كَسْرَه দিয়ে جِمَالَاتٌ পড়েছেন। হামযা-কিসায়ী ও হাফস جِمَالَةٌ পড়েছেন। অর্থাৎ جَمَلٌ -এর বহুবচন। ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জোবাইর, কাতাদাহ এবং আবূ রেজা جِيْم -এ ضَمَّة দিয়ে جُمَالَاتٌ পড়েছেন, অর্থ নৌকার বৈঠা। -[ফাতহুল কাদীর]

هٰذَا يَوْمُ -এর তারকীব এবং তাতে অবতীর্ণ কেরায়াতসমূহ : জমহুর يَوْمُ -এ رَفْع দিয়ে اِسْم اِشَارَة -এর خَبَر হিসেবে পড়েছেন। যায়েদ ইবনে আলী, আ'রায, আ'মাশ, আবূ হাইওয়া এবং এক বর্ণনায় আসেমও مَبْنِيٌّ হিসেবে فَتْح দিয়ে পড়েছেন, ক্রিয়ার দিকে اِضَافَتْ হওয়ার কারণে, মূলত তার স্থান হলো رَفْع . خَبَر হবার কারণে। কেউ কেউ তাকে ظَرْف হওয়ার কারণে مَنْصُوْب পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْطَلِقُوْا اِلٰى مَا ..... يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ বলেন- [কিয়ামতের দিবসে কাফের সম্প্রদায়কে বলা হবে।] তোমরা এখনই সেই ভয়াবহ শাস্তির দিকে ধাবিত হও যাকে তোমরা দুনিয়ার জীবনে অসত্য মনে করেছিলে। এটাই পরকাল অমান্যকারীদের প্রাপ্ত শাস্তি। তাদের একটি শাস্তির বর্ণনা এই দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ বলবেন, তোমরা এমন এক প্রকার ছায়ার আশ্রয়ে চল, যা তিনটি শাখাযুক্ত হবে, তবে তাতে কোনো ঠাণ্ডা পাবে না। বরং তা জাহান্নাম থেকে নির্গত এক প্রকার ধোঁয়া, আধিক্যের দরুন তা উঁচু হয়ে খান খান হয়ে প্রথমতঃ তিন খণ্ডে বিখণ্ডিত হবে। কাফেরগণকে আল্লাহ তা'আলা সেই দিবসের সকলের হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধোঁয়ায় নিমজ্জিত করে রাখবেন। আর আল্লাহর মাকবুল বান্দাগণ আরশের রহমতে ছায়াতলে শান্তিতে এই সময় কাটাবে।

আর সেই ধোঁয়ার আরও ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করে বলেন- সেই ধোঁয়াসমূহ হতে এমন কতগুলো অগ্নির টুকরা চতুর্দিকে বিস্ফুরিত ও উথলিয়ে পড়তে থাকবে সেগুলো দেখতে মনে হবে যেন বড় বড় দালান ও রাজপ্রাসাদ। আর মনে হবে হলুদ বর্ণের লম্পদানকারী আরবের উটগুলো খুব ক্ষীপ্ত হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সুতরাং যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে এবং يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে অবিশ্বাস করবে তারা যেন জেনে রাখে যে, সেই দিন তাদের এই দুরবস্থার অগ্নিতে দগ্ধ হতে হবে।

জাহান্নামের ধোঁয়া তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়ার কারণ : দোজখের ধোঁয়া তিনটি শাখায় বিভক্ত হওয়ার কারণ হলো দোজখে তিন শ্রেণির মানুষ প্রবেশ করবে।

১. সেসব কাফের যারা সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

২. সেসব বিদআতী যারা পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং এর অপব্যাখ্যা করে আর যেসব বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করে তার বিরোধিতা করে।

৩. যারা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পাপাচারে লিপ্ত থাকে, ফরজসমূহ পরিত্যাগ করে। এ তিনটি দলের অপকর্মের শাস্তিস্বরূপই দোজখের ধোঁয়া তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে দোজখ থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যা তিনটি শাখায় বিভক্ত হবে।

১. একটি শাখা নূর হবে, যা মু'মিনদের মাথার উপর এসে বসবে।
২. দ্বিতীয় শাখাটি ধোঁয়া, যা মুনাফিকদের মাথার উপর এসে বসবে।
৩. তৃতীয় শাখাটি জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা কাফেরদের মাথার উপর এসে বসবে অথবা এর ছায়া দোজখে নেওয়ার তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে যাতে তিন ধরনের লোক গমন করবে।

১. প্রকাশ্যে যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।
২. পরোক্ষভাবে যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।
৩. যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। −[নূরুল কোরআন]

আয়াতসমূহে বর্ণিত ছায়ার সিফাতসমূহ : জাহান্নামবাসী কাফেরদেরকে বলা হবে, আজকে তোমরা ছায়ার দিকে যাও যাতে নিম্নবর্ণিত সিফাতসমূহ বিদ্যমান− ১. ত্রিশাখা বিশিষ্ট। ২. ছায়াদাতা বা শীতল নয়। ৩. আগুনের লেলিহান বা উত্তাপ হতে রক্ষা করে না। ৪. অট্টালিকার মতো স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপণ করে যা পীতবর্ণের উষ্ট্রসমূহের মতো।

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّهَا تَرْمِىْ .... صُفْرٌ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সেই আগুন প্রাসাদের ন্যায় বিরাট স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। (তা লাফাতে থাকলে মনে হবে) যেন তা হলুদ বর্ণের উষ্ট্র।" অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গ এক একটি প্রাসাদের মতো হবে, আর এই বড় বড় স্ফুলিঙ্গসমূহ যখন বিস্ফুরিত হবে ও চতুর্দিকে উড়তে শুরু করবে, তখন মনে হবে, যেন হলুদ বর্ণের উষ্ট্র লম্ফঝম্প করছে।

আল্লামা আফীফ তাব্বারা বলেছেন, পবিত্র কুরআন− অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যখন আগুন হতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাকে প্রাসাদের সাথে তুলনা করেছে। আর যখন নীচু হয়ে পড়ে এবং অসংখ্য শাখায় চতুর্দিকে উড়তে থাকে তখন তাকে হলুদ বর্ণের লম্ফঝম্পকারী উষ্ট্রের সাথে তুলনা করেছে। আয়াতে এই তুলনা ব্যবহার করার সময় আরবজাতির মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে এবং তাদের অতি পরিচিত বস্তুর ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি করা হতো এবং বাড়ির আশেপাশে উষ্ট্রের ঝাঁক থাকত। পবিত্র কুরআন আগুনের ভয়াবহতার চিত্র অংকন করেছে তার স্ফুলিঙ্গের চিত্র অংকন করে। কারণ স্ফুলিঙ্গ আগুনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই হয়। −[রূহুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ : কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী صُفْر শব্দটির অর্থ سُوْر করেছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের উষ্ট্রের ন্যায় এখানে প্রথম দৃষ্টান্তটিতে স্ফুলিঙ্গগুলোর উচ্চতা এবং ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে। আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে আগুনের বর্ণ এবং তার গতিশীলতা বুঝানোর জন্য। −[নূরুল কোরআন]

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٥. هٰذَا اَىْ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ فِيْهِ بِشَىْءٍ.

৩৫. এটা অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এমন একদিন যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না তথায় কোনো বিষয়ে ।

٣٦. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فِى الْعُذْرِ فَيَعْتَذِرُوْنَ عَطْفٌ عَلٰى يُؤْذَنُ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ عَنْهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِىْ حَيِّزِ النَّفْيِ اَىْ لَا اِذْنَ فَلَا اِعْتِذَارَ.

৩৬. এবং তাদেরকে অনুমতি দান করা হবে না অজুহাত পেশ করার জন্য যে, অজুহাত পেশ করবে এটা يُؤْذَنُ -এর প্রতি عَطْف সাবাবের মধ্যে শরিক হওয়া ব্যতিরেকে। সুতরাং এটা نَفِىْ -এর স্থলে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যেহেতু অনুমতি নেই, কাজেই অজুহাত পেশ করার অবকাশ নেই।

٣٧. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

৩৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ ।

٣٨. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ اَيُّهَا الْمُكَذِّبُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَالْاَوَّلِيْنَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ قَبْلَكُمْ فَتُحَاسَبُوْنَ وَتُعَذَّبُوْنَ جَمِيْعًا.

৩৮. এটাই ফায়সালার দিন, আমি তোমাদেরকে একত্র করব হে এই উম্মতের মধ্য হতে মিথ্যারোপকারীগণ। এবং পূর্ববর্তীদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তী মিথ্যারোপকারীগণ। তাই তোমাদের সকলেরই হিসেব-নিকাশ ও শাস্তি কার্যকরী হবে।

٣٩. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ حِيْلَةٌ فِىْ دَفْعِ الْعَذَابِ عَنْكُمْ فَكِيْدُوْنِ فَافْعَلُوْهَا.

৩৯. যদি তোমাদের কোনো কৌশল থাকে তোমাদের হতে শাস্তি প্রতিরোধ করার কোনো ফন্দি থাকে তবে তোমরা সেই কৌশল প্রয়োগ করো তা কাজে লাগাও।

٤٠. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

৪০. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ جَمَعْنَاكُمْ : এটা তৎপূর্ববর্তী اَلْفَصْلُ হতে تَقْرِيْر وَبَيَانٌ হয়েছে (بَيْضَاوِىْ) আর اَلْاَوَّلِيْنَ টি جَمَعْنٰكُمْ -এর كُمْ -এর উপর عَطْف হয়েছে। অথবা اَلْاَوَّلِيْنَ টি مَفْعُول مَعَهٗ হয়েছে جَمَعْنَا ফে'ল হতে- اَىْ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُحِقِّ وَالْمُبْطِلِ اِلَّا اِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمْ.

قَوْلُهُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ لِيَعْتَذِرُوْنَ : এর মধ্যে একটি প্রশ্ন এই যে, فَاء এবং وَاوْ দ্বারা যা عَطْف হয় সেই مَعْطُوْف টি مَنْصُوْب হয়ে থাকে, এটাই নাহবিদগণের নীতি, কিন্তু وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ -এর মধ্যে এটা বহাল রইল না কেন?

এটার উত্তর এই যে, فَاء এবং وَاوْ দ্বারা مَعْطُوْف তখনই مَنْصُوْب হবে যখন مَعْطُوْف টি مَنْفِىْ হতে مُتَسَبَّبْ হবে যথা- لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا অর্থাৎ (فَاَنْ يَمُوْتُوْا) নতুবা مَعْطُوْف তখন مَنْصُوْب হবে না।

قَوْلُهُ يَعْتَذِرُوْنَ : এটা مَرْفُوْع হওয়ার কারণ سَمِيْن গ্রন্থকারের মতে দু'টি রয়েছে।

১. এটা جُمْلَه مُسْتَانِفَه হিসেবে مَرْفُوْع مَحَلًّا হয়েছে। অর্থাৎ فَهُمْ يَعْتَذِرُوْنَ

২. অথবা, এটা يُؤْذَنُ -এর উপর مَعْطُوْف হবে। তখন مَرْفُوْع مَحَلًّا হবে এবং جُمْلَه مَنْفِىْ হবে। হযরত ইবনে আতিয়্যাহ বলেন, এখানে مَنْصُوْب না হওয়ার কারণ হলো تَشَابُهُ رُؤُوْسِ الْاٰيِ ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَا يُؤْذَنُ-এ **অবতীর্ণ কেরাতসমূহ :** জমহুর তাকে فِعْل مَجْهُوْل হিসেবে يُؤْذَنُ পড়েছেন। আর যায়েদ ইবনে আলী فِعْل مَعْرُوْف হিসেবে لَا يَأْذَنُ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একটি প্রশ্ন এবং তার জবাব : যদি প্রশ্ন করা হয় যে, هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ আর ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ এবং وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ এবং وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا আয়াতগুলোকে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব?

অর্থাৎ প্রথম আয়াতটিতে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসে তারা কোনো কথা বলবে না। আর পরের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, তারা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করবে এবং বিভিন্ন ওজর-আপত্তি করবে। সুতরাং আয়াতগুলোর পরস্পর বিরোধী হলো। এই প্রশ্নটির কয়েক রকম উত্তর দেওয়া হয়েছে।

১. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, আজকে তারা কোনো দলিল পেশ করতে পারবে না, যেহেতু তাদের বাকি অন্যান্য কথাগুলো যেন কোনো কথাই নয়।
২. ফাররা বলেছেন, তারা সেদিন কোনো কথা বলবে না অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশের মুহূর্তে কোনো কথা বলবে না। কারণ পালা ইতঃপূর্বেই খতম হয়ে গেছে। এখন কথা বলে আর কোনো লাভ হবে না, সুতরাং চুপচাপ জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।
৩. 'কথা বলবে না' অর্থ সব সময় নিশ্চুপ থাকবে এমন নয়। কারণ কিয়ামত দিবসে কাফেররা কখনো বিভিন্ন ওজর-আপত্তি করবে, আবার কোনো কোনো সময় কথা বলবে না। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

ওজর পেশ করতে না দেওয়া ইনসাফের খেলাফ : وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ আয়াত হতে মনে হয়, তাদের ওজর থাকবে, কিন্তু তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না। এটা ইনসাফের খেলাফ।

এ সন্দেহের জবাব এই যে, তাদের অপরাধ পূর্বেই এমন অকাট্য দলিল-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ হয়ে যাবে যে, পুনর্বার পেশ করবার মতো কোনো ওজর আসলেই তাদের থাকবে না। আর যেসব সন্দেহ তাদের মনে উদিত হবে তা মূলত কোনো ওজরই নয়, হয়তো তাদের মনে আসতে পারে যে, আমরা তোমারই বান্দা যা করেছি সবই তোমারই ইচ্ছায়- ইরাদায় তোমার জ্ঞাতার্থে এবং ফয়সালায় করেছি। সুতরাং কেন আমরা অপরাধী হবো, কেন আমাদেরকে শাস্তি দেবে? তাদের এ ওজর অবশ্যই অবান্তর, কারণ অপরাধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাধ্য করেননি। আল্লাহ তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, সত্য-মিথ্যা জানবার জন্য নবী পাঠিয়েছিলেন। এরপরও তারা স্বেচ্ছায় অপরাধ করে এ কথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবান্তর। -[কাবীর]

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, অপরাধীদের কীর্তিকলাপের পক্ষে পেশ করার মতো কোনো ওজর-আপত্তিও থাকবে না। তাদের কৃতকর্মের সাক্ষী হবে তাদের আমলনামা।

দ্বিতীয়ত দুনিয়ার জীবনে তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য প্রদান করবে।

তৃতীয়ত প্রত্যেকটি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الخ : আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে তো তোমরা প্রতারণামূলক কাজ খুবই করেছ, সকল প্রকারের কৌশল কার্যে পরিণত করেছ। (وَهٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ) এটাতো ফয়সালার দিন। তোমরা একে অস্বীকার করতে, সুতরাং আমি তোমাদেরকেও তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সেই বিষয় ফয়সালার জন্য সমবেত করেছি। যদি তোমরা আমার ফয়সালা হতে বাঁচবার কোনো ব্যবস্থা করতে পার তবে কর। আমি একটু দেখে নেই। তবে জেনে নাও সত্যকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের আজ নিস্তার নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ : এক্ষণে তোমরা যদি আমার বিরুদ্ধে কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পার তাহলে তা প্রয়োগ করে দেখ। অর্থাৎ দুনিয়াতে তো তোমরা খুব বেশি প্রতারণামূলক কাজ করেছ, বহু প্রচারের কলা-কৌশল অবলম্বন করেছ, কিন্তু এখানে তোমরা কোনোরূপ কৌশল অবলম্বন করে একটুও বাঁচতে পারবে না।

এটা তাদেরকে লজ্জা এবং মানসিক শাস্তি ও যন্ত্রণা দানের লক্ষ্যে বলা হবে।

আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে ইসলামের বিরুদ্ধে যাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে তাদের সকলকে আমি একসাথ করে দিয়েছি, অতএব সম্ভব হলে তাদের সাথে পরামর্শ করে দোজখের আজাব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর। দুনিয়াতে মু'মিনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তোমরা ছিলে সিদ্ধহস্ত। এখন চেষ্টা করে দেখ তেমন কিছু করা যায় কিনা।

দুনিয়াতে আবূ জাহল তার সমর্থকদেরকে বলত, তোমরাতো শক্তিশালী বীরপুরুষ- তোমরা দশজন মিলেও দোজখের একজন প্রহরীকে কাবু করতে পারবে না? কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, এখন চেষ্টা করে দেখ আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে পার কিনা? -[কবীর; রুহুল মাআনী, মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤١. إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ اَىْ تَكَاثُفِ اَشْجَارٍ إِذْ لَا شَمْسَ يُظَلُّ مِنْ حَرِّهَا وَّعُيُوْنٍ نَابِعَةٍ مِّنَ الْمَاءِ .

৪১. নিশ্চয় মুত্তাগীগণ অবস্থান করবে সুশীতল ছায়ায় ঘন বৃক্ষের নিচে, কারণ সেখানে সূর্য থাকবে না যে, তার উত্তাপ ও প্রখরতা হতে বাঁচার জন্য ছায়ার প্রয়োজন হবে এবং প্রস্রবণ বহুল স্থানে যার পানি প্রবহমান।

٤٢. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ فِيْهِ إِعْلَامٌ بِاَنَّ الْمَأْكَلَ وَالْمَشْرَبَ فِى الْجَنَّةِ بِحَسْبِ شَهَوَاتِهِمْ بِخِلَافِ الدُّنْيَا فَبِحَسْبِ مَا يَجِدُ النَّاسُ فِى الْاَغْلَبِ وَيُقَالُ لَهُمْ .

৪২. আর তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে এটা দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বেহেশতে আহার্য ও পানীয় প্রত্যেকের অভিরুচি মতো সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। পার্থিব আহার্য ও পানীয় এটার বিপরীত। কারণ দুনিয়ায় মানুষ সাধারণত তাই পানাহার করে যা সে সংস্থান করতে সক্ষম হয়।

٤٣. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا حَالٌ اَىْ مُتَهَنِّئِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الطَّاعَاتِ .

৪৩. আর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার কর هَنِيْئًا শব্দটি حَالٌ অর্থাৎ مُتَهَنِّئِيْنَ তোমাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্য হতে।

٤٤. إِنَّا كَذٰلِكَ كَمَا جَزَيْنَا الْمُتَّقِيْنَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ .

৪৪. নিশ্চয় আমি এভাবে যদ্রূপ তোমাদের পুরস্কৃত করেছি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

٤٥. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ .

৪৫. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ ।

٤٦. كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا خِطَابٌ لِلْكُفَّارِ فِى الدُّنْيَا قَلِيْلًا مِنَ الزَّمَانِ وَغَايَتُهُ إِلَى الْمَوْتِ وَفِىْ هٰذَا تَهْدِيْدٌ لَهُمْ إِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ .

৪৬. তোমরা পানাহার কর এবং উপভোগ কর কাফেরদের প্রতি দুনিয়ায় সম্বোধন। সামান্য পরিমাণ সময়, যার শেষসীমা মৃত্যু পর্যন্ত, এটা দ্বারা তাদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।

٤٧. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ .

৪৭. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ ।

٤٨. وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا صَلُّوْا لَا يَرْكَعُوْنَ لَا يُصَلُّوْنَ .

৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা রুকু কর সালাত আদায় কর তারা রুকু করে না সালাত আদায় করে না।

٤٩. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ .

৪৯. সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

٥٠. فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ اَىِ الْقُرْاٰنِ يُؤْمِنُوْنَ اَىْ لَا يُمْكِنُ إِيْمَانُهُمْ بِغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَعْدَ تَكْذِيْبِهِمْ بِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْإِعْجَازِ الَّذِىْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ .

৫০. সুতরাং তারা এটার পরিবর্তে কোন কথায় অর্থাৎ কুরআনের পরিবর্তে ঈমান আনয়ন করবে অর্থাৎ কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করার পর তাদের পক্ষে অপর কোনো আসমানি কিতাবে ঈমান আনয়ন সম্ভব নয়। যেহেতু কুরআন মজীদে এমন সমস্ত অলৌকিক বিষয় স্থান পেয়েছে, যা অপর কোনো আসমানি গ্রন্থে স্থান পায়নি। এতদ্সত্ত্বেও তারা যখন কুরআনকে অস্বীকার করছে, তবে তাদের পক্ষে অন্য কোনো আসমানি গ্রন্থের উপর ঈমান আনার কল্পনা করা যায় না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ ظِلَالٍ : জমহুর ظِلَالٍ পড়েছেন। আর আ'মাশ, যুহরী, তালহা, আ'রায ظُلَّةٌ -এর বহুবচন হিসেবে ظُلَلٍ পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ يُؤْمِنُوْنَ : জমহুর صِيْغَةُ غَائِبْ হিসেবে يُؤْمِنُوْنَ পড়েছেন। আর ইবনে আমের এক বর্ণনায় এবং ইয়াকূব صِيْغَه خِطَابْ হিসেবে تَاء দিয়ে تُؤْمِنُوْن পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ فِيْ ظِلَالٍ وَّعُيُوْنٍ الخ : এটা خَبَر اِنَّ হয়ে مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে।

قَوْلُهُ هَنِيْئًا : এটা كُلُوْا -এর ضَمِيْر হতে حَالْ হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَرْكَعُوْنَ : এটা قِيْلَ اِذَا হতে شَرْط হিসেবে ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই আয়াতের শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (র.) বলেন– উল্লিখিত ৪৮ নং আয়াতটি ছাকীফ সম্প্রদায়কে উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়। তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে নামাজ পড়ার কথা বললেন এবং নামাজের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। তখন তারা বলল, আমরা রুকু দিতে পারবো না। কেননা রুকু করতে আমাদের লজ্জা হয়। মানুষকে সোজা করে সৃষ্টি করা হয়েছে। রুকু করা হলে মানুষকে গরুর ন্যায় দেখায়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে ধর্মে রুকু-সিজদা করার বিধান নেই, তাতে উত্তম কোনো কিছু নেই। এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে উপরিউক্ত ৪৮ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلَالٍ الخ : ঈমানদারগণের নেককার্যসমূহের প্রতিদান সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করে আল্লাহ বলেন, পক্ষান্তরে মু'মিন-মুত্তাকীগণ আল্লাহর আরশ এবং বেহেশ্‌তের মনোরম ছায়ায় নিশ্চিন্ত মনে থাকবে। তাদের স্বাদের পানাহারের জন্য মনের মতো যাবতীয় বেহেশ্‌তী ফলমূল এবং দুধ, মধু, সরবত, পানি ইত্যাদির নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখান থেকে ইচ্ছামতো পান করা সম্ভব হবে। আর তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে– দুনিয়াতে তোমরা যে পুণ্য সাধনা করেছ, তারই বদৌলতে আজ এখানে মনের সুখে পানাহার করতে থাক, আল্লাহ তার পুণ্যাত্মা লোকদেরকে এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। এটাই আল্লাহর শাশ্বত বিধান। বেহেশতীগণ বেহেশ্‌তের নিয়ামত ভোগ করা যেমন আনন্দের ব্যাপার হবে তেমনি আনন্দ ভোগ করার জন্য যে নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে তাও পরম আনন্দের কারণ হবে। (روح) আর দুনিয়ার বহু স্বাদের বস্তু রয়েছে, যা সময়ের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু বেহেশতে এ স্বাদ সর্বদা বহাল থাকবে।

আয়াতে اَلْمُتَّقِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত মুকাতিল, কালবী এবং ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেসব লোককে যারা দুনিয়ার জীবনে শিরক থেকে আত্মরক্ষা করত।

কারো মতে, اَلْمُتَّقِيْنَ শব্দ দ্বারা সেসব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা যাবতীয় পাপাচার হতে বেঁচে চলত। -[কবীর, নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى كُلُوْا وَاشْرَبُوْا ..... تَعْمَلُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, [তাদেরকে বলা হবে] তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

এ কথাটি হয়তো আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজেই জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন। আল্লাহর এ সম্বোধন এবং কথাটি হবে তাদের জন্য একটি অত্যন্ত বড় নিয়ামত, হবে তাদের জন্য সম্মান ও আনন্দের বস্তু। অথবা এ কথাটি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ফেরেশ্‌তাগণ বলবেন, তাদের সম্মানার্থে। -[রূহুল কোরআন]

অতঃপর এটার কারণ ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, আমাদের শাশ্বত বিধান ও নিয়ম এই যে, আমরা সৎকর্মশীল লোকদেরকে এভাবে পুরস্কৃত করে থাকি; কিন্তু যারা সৎকর্মশীল নয় এবং যারা পরকাল স্বীকার করে না তাদের জন্য বড়োই দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا ..... مُجْرِمُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, [হে কাফেরগণ!] 'তোমরা অল্প কিছু দিনের জন্য পানাহার ভোগ করে নও। তোমরা তো অপরাধী নিঃসন্দেহে।'

সমস্ত কাফেদেরকে সম্বোধন করে এ কথাটি বলা হয়েছে। এটার তাৎপর্য এ যে, তোমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে, খেল-তামাশায়, আনন্দ-উল্লাসে মশগুল হয়ে যে আখেরাতকে অস্বীকার করছে, এ দুনিয়ায় যতদিন আছ ভোগ করে নাও। আনন্দ-ফূর্তি যতটুকু সম্ভব করে নাও। মনে রাখবে যে, পরকাল অস্বীকার করে তোমরা মুজরিম বা অপরাধী হয়ে গেছ। আর অপরাধীদের সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত শাশ্বত বিধান হলো অপরাধীদেরকে শাস্তি দান। সুতরাং শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাক। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا الخ : অর্থাৎ যখন তাদেরকে রুকু করতে বা নামাজ পড়তে আদেশ দেওয়া হয় তখন তারা তা করে না, তবে রোজ কিয়ামতে তারা আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়! দুনিয়াতে যদি আমরা আল্লাহর হুজুরে মাথা নত করতাম, তবে আমাদের মাথা আজ এমনিভাবে হেঁট হতো না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শ্রবণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, হে রাসূল- কুরআনের ন্যায় এত ফসীহ ও বলীগ অর্থাৎ জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ প্রভাব বহুল বাণীকে যারা অস্বীকার করল অতঃপর আর কোনো এমন বাণী নেই যাতে তারা ঈমান আনয়ন করতে পারবে। সুতরাং আপনি তাদের ঈমান আনয়নের আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করুন।

এ আয়াত দ্বারা أَمْر ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলিল দান : যেসব লোক "আমর ওয়াজিব বুঝায়" বলে দাবি করেন, তারা এ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। কারণ এ আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল নির্দেশ পালন না করার কারণেই তাদের নিন্দা করেছেন। এটা হতে বুঝা যায় যে, আমর বা আদেশ ওয়াজিবের জন্য। কারণ ওয়াজিবের জন্য না হলে নিন্দা করা কিভাবে সঙ্গত হয়। -[কাবীর]

কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এ কথাটি তাদেরকে আখিরাতে বলা হবে; কিন্তু যখন তাদেরকে সিজদা করতে বলা হবে তখন তারা শত চেষ্টা করেও সিজদা করতে পারবে না। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটার পর [অর্থাৎ কুরআনের পরিবর্তে] কোন কথার প্রতি তারা ঈমান আনবে?" অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ বুঝাবার এবং হেদায়েতের পথ দেখাবার জন্য সবচেয়ে বড় যা হতে পারে তা কুরআনরূপে নাজিল করে দেওয়া হয়েছে। এটা পাঠ করে, শুনে-বুঝেও যদি কেউ ঈমান না আনতে পারে তাহলে অতঃপর তাদেরকে হেদায়েতের পথে নিয়ে আসার আর কি জিনিস থাকতে পারে? বস্তুত এমন দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা কোনো ভালো কথাকেই বিশ্বাস করে না। তাই তাদের শাস্তি অবধারিত, ধ্বংস অনিবার্য। -[নূরুল কোরআন]

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ-কে বারবার উল্লেখের কারণ : আলোচ্য সূরায় মহান আল্লাহ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ-কে দশবার উল্লেখ করেছেন। দশটি কারণে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য তাই দশবার উল্লেখ করেছেন। মানুষকে আল্লাহ তা'আলার এমন যোগ্যতা ও শক্তি দান করেছেন যদি এর সদ্ব্যবহার করা হয়, তবে জীবন সাধনা সার্থক হয়। পক্ষান্তরে যদি তা সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তবে আকীদা-বিশ্বাস সঠিক হয়। কাফের ও মুশরিকরা এদিক থেকে হতভাগা। কেননা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করেনি বরং তাঁর সাথে শিরক করেছে।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছে এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলেছে।

তৃতীয়ত ফেরেশতাদের ব্যাপারেও তারা ভ্রান্ত ধারণা করেছে।

চতুর্থত তারা ধারণা করেছে, মানুষের জীবন এ পৃথিবীতেই সীমিত। এরপর হাশর-নশর ও পুনর্জীবন বলতে কিছুই নেই।

পঞ্চমত তারা তাকদীরকে অস্বীকার করেছে।

ষষ্ঠত তারা পূর্বকালের নবী-রাসূলগণকে এবং আসমানি কিতাবসমূহকে অস্বীকার করেছে। এ ছাড়া মানুষের যে দৈহিক শক্তি রয়েছে তার অপপ্রয়োগ করে মানুষ অন্যের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে। প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লাগে এমনিভাবে হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায় মানুষ একে অন্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে।

এ ছাড়া নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার যে বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা লঙ্ঘন করার কারণে মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে চতুষ্পদ জন্তুর পর্যায়ে অবনমিত হয়। মূলত যারা কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না, যারা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে নিজের জীবনে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে বলে ভয় করে না তারাই উল্লিখিত অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকে। এমনিই দশটি অপরাধের প্রেক্ষিতেই وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ কথাটি বারংবার উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْجُزْءُ الثَّلَاثُوْنَ : ৩০তম [ত্রিংশতিতম] পারা

سُوْرَةُ النَّبَأِ : সূরা আন-নাবা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার নাম 'আন-নাবা'। সূরার দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ-এর মধ্য হতে اَلنَّبَأُ শব্দকে কেন্দ্র করেই اَلنَّبَأُ নামকরণ করা হয়েছে। 'নাবা' শব্দটির অর্থ সংবাদ বা খবর। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, কারণে اَلنَّبَأُ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এ সূরাকে عَمَّ ও عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ এবং 'তাসাওল'ও বলা হয়। এতে ২টি রুকূ', ৪১টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ এবং ৬৯০টি অক্ষর রয়েছে। −[খাযেন, কাবীর, নূরুল কোরআন]

সূরাটির মূলকথা ও আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরাটিতে প্রধানত কিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সূরা আল-মুরসালাতে'ও অনুরূপভাবে পরকাল ও কিয়ামতের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরার প্রথম অংশে নাবায়ে আযীম বা কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। এর সমর্থনে পরবর্তী ৬ হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নাবায়ে আযীম-এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে ১৭ হতে ২০ আয়াতে। কিয়ামতের পরে দোজখবাসী ও বেহেশতবাসীদের পর্যায়ক্রমে শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উপসংহারে হাশরের ময়দানে অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এ সূরায় বলা হয়েছে− পরকালের কথা শুনতে পেয়ে মক্কাবাসীরা শহরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আলোচনা সমালোচনা শুরু করেছিল। তাই সূরার প্রথম বাক্যেই সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তোমরা কি এ পৃথিবী ও এ জমিনকে দেখতে পাও না? একে তো আমিই তোমাদের শয্যারূপে বানিয়ে দিয়েছি। এ সুউচ্চ পর্বতমালা কি তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না? একে আমিই খুঁটির মতো মাটিতে পুঁতে রেখেছি। তোমরা কি নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখ না? আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন হিসেবে সৃষ্টি করেছি। রাতকে আচ্ছাদনকারী এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের উপায় বানিয়ে দিয়েছি। সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং আলো ও তাপ প্রদানকারী উজ্জ্বল সূর্য সৃষ্টি করেছি। আকাশে ভাসমান মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং ঐ বৃষ্টির পানির দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য, শাক-সবজি ও ঘন বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছি। এটা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না? আমি যদি এ সমস্ত কর্মকাণ্ড করতে পারি তবে এ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে আবার পুনঃ সৃষ্টি করতে পারবো না− এটা তোমরা কিভাবে ধারণা কর? এ বিশ্ব জগতের যাবতীয় সৃষ্টি লক্ষ্যহীন নয়। সৃষ্টিলোকের এ বিরাট কারখানা মূলত মানবজাতির কল্যাণের জন্যই পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশীলতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাই মানবজাতিকে এর উৎকৃষ্ট ব্যবহারের প্রচুর ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ যথেচ্ছভাবে এসব কিছুর ভোগ-ব্যবহার করবে, আর সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ মানবে না, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না, তা কেমন করে বোধগম্য হতে পারে?

এ সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের পরে বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন নিঃসন্দেহে যথাসময়ে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমরা যে যেখানে বা যখনই মৃত্যুবরণ করে থাক না কেন, সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে দলে দলে পুনরুত্থান করে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। সে দিন আকাশসমূহের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো স্থানচ্যুত হয়ে ছিন্নভিন্ন বালুকণায় পরিণত হবে। পুনরুত্থানের পরে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে− যারা আল্লাহদ্রোহী তাদের জন্য জাহান্নাম হবে ঘাঁটি বিশেষ। অনন্তকাল তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। তৃষ্ণায় তারা ঠাণ্ডা পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। শাস্তিস্বরূপ অসহনীয় গরম পানীয় ও পুঁজ পরিবেশন করা হবে। যেহেতু তারা হিসাব-নিকাশের ভবিষ্যদ্বাণীকে তোয়াক্কা করেনি; বরং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে ঈমানদারদের পুরস্কার সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ সফলকাম হবে। তাদেরকে বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর সমবয়স্কা যুবতী নারী এবং উপচে পড়া পানপাত্র প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে আরো বিচিত্র রকমের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হবে।

শেষ দিকের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার আদালতের চিত্র পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঐ দিন জীবাত্মাসমূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। যা বলবে তাও যথার্থ বলবে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে আগাম যে খবর দেওয়া হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যার ইচ্ছা সে দিনটির সত্যতা স্বীকার করে আল্লাহর পথ অবলম্বন করতে পারে। এ সতর্কবাণী শুনেও যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করবে, তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তাদের চোখের সামনে উপস্থাপন করা হবে। তখন অনুতাপ করা ছাড়া আর তাদের কোনো উপায় থাকবে না। তখন তারা অনুতাপ করে বলবে, হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে সৃষ্টি না হতাম, অথবা পশু-পাখি ও বৃক্ষ-লতার মতো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতাম তবে কতইনা ভালো হতো। −[খাযেন, কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ النَّبَأِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আন-নাবা মক্কায় অবতীর্ণ

اِحْدٰى وَاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً : ৪১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. عَمَّ عَنْ اَيِّ شَيْءٍ يَتَسَاۤءَلُوْنَ يَسْاَلُ بَعْضُ قُرَيْشٍ بَعْضًا ۔

১. কি সম্পর্কে/কোন বিষয় সম্পর্কে এরা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে কুরাইশগণ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছে।

২. عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ بَيَانٌ لِذٰلِكَ الشَّيْءِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِتَفْخِيْمِهٖ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ ۔

২. সে মহাসংবাদ বিষয়ে/সে বিষয়ের বিবরণ। আর প্রশ্নবোধকটি এর মাহাত্ম্য প্রকাশার্থে। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ আনীত কুরআন। যাতে পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

৩. الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ فَالْمُؤْمِنُوْنَ يُثْبِتُوْنَهٗ وَالْكَافِرُوْنَ يُنْكِرُوْنَهٗ ۔

৩. সে বিষয় যাতে তারা পরস্পরে মতভেদ করছে মু'মিনগণ তা সাব্যস্ত করে আর কাফেরগণ তা অস্বীকার করে।

৪. كَلَّا رَدْعٌ سَيَعْلَمُوْنَ مَا يَحِلُّ بِهِمْ عَلٰى اِنْكَارِهِمْ لَهٗ ۔

৪. কখনো নয় এটা তিরস্কার ও ধমকদান উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অর্থাৎ তাদের ধারণা ঠিক নয়। অচিরেই তারা জানতে পারবে এটা অস্বীকার করার পরিণতিতে তাদের উপর কি আপতিত হয়?

৫. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ تَاكِيْدٌ وَجِيْءَ فِيْهِ بِثُمَّ لِلْاِيْذَانِ بِاَنَّ الْوَعِيْدَ الثَّانِيْ اَشَدُّ مِنَ الْاَوَّلِ ۔

৫. আবার বলি, কখনো নয়, তারা অচিরেই জানতে পারবে এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের তাকিদ, আর এখানে ثُمَّ টি এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় সাবধান বাণীটি পূর্ববর্তী বক্তব্য অপেক্ষা অধিক কঠোর।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ "عَمَّ" : ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, عَمَّ শব্দটির মূল عَنْ مَا ছিল। নূন কে মীমের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। কেননা, উভয় অক্ষর গুন্নাহর দিক দিয়ে একই রকম। তারপর اَلِفْ -কে হযফ করা হয়েছে।

–[কুরতুবী, সাফওয়া, কামালাইন, ফাতহুল কাদীর]

আরবি ভাষায় আটটি শব্দ থেকে مَا -এর اَلِفْ -কে অধিক ব্যবহার হওয়ার কারণে হযফ করে দেওয়া হয়। যেমন–

عَنْ - مِنْ - بَا - فِيْ - عَلٰى - اِلٰى - حَتّٰى - لَا

এভাবে ব্যবহার করা হয়- لِمَ - حَتَّامَ - اِلَامَ - عَلَامَ - فِيْمَ - بِمَ - مِمَّ - عَمَّ -[কামালাইন, কাবীর]

আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, এখানে عَنْ হরফটি প্রশ্নবোধক مَا -এর উপর এসেছে। তারপর প্রশ্নবোধক এবং অপ্রশ্নবোধকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য اَلِفْ -কে হযফ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্নবোধক হলে مَا হতে اَلِفْ পড়ে যাবে।

-[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আল-মুরসালাতের সাথে সূরা আন-নাবার যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় ইরশাদ হয়েছে যে, اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি দ্বারা সৃষ্টি করিনি?' আরো ইরশাদ হয়েছে যে, اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا তথা 'আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে?' আর অত্র সূরায় এসেছে যে, اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا অর্থাৎ 'আমি কি ভূমিকে করিনি বিছানাস্বরূপ?' এটাই হলো পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক। এ ছাড়া পূর্বোক্ত সূরায় কিয়ামত দিবসের যে বিপদাপদ দেখা দেবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায়ও কিয়ামতের দিনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এটিও হলো সম্পর্কের ভিত্তি। -[নূরুল কোরআন]

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, সূরা আল-মুরসালাত فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ এ আয়াত দিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে حَدِيْثٌ শব্দটি দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, তারা যদি এমন কুরআনকে বিশ্বাস না করে, যে কুরআন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতের পূর্ণ স্বীকৃতি দিচ্ছে, তাহলে তাঁর আর কোনো কথাকে বিশ্বাস করবে? আর এ সূরাতে اَلنَّبَاُ বলে সেই কুরআন মাজীদের আলোচনাকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। -[রুহুল মা'আনি]

অথবা, সূরা আন-নাবার প্রথমে পুনরুত্থানের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে, আর সূরা আল-মুরসালাতে কাফেরদের পক্ষ হতে পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি উল্লিখিত হয়েছে। মনে হয় যেন এ সূরাতে তাদের ঐ অস্বীকৃতির দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করা হয়েছে।

সূরার শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবূ হাতিম ও হাসান (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পরেই মক্কাবাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন মক্কার কুরাইশগণ একে অপরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

-[লোবাব, ফাতহুল কাদীর]

অথবা, হযরত মুহাম্মদ ﷺ হিজরতের পূর্বে মক্কার মানুষকে তাওহীদের প্রতি, তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, কিয়ামত ও হাশর মাঠের পুনরুত্থান, বিচার অনুষ্ঠান, পাপ-পুণ্যের পরিণাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান, তখন মক্কার কাফেরগণ এসব বিষয়সমূহকে অলীক ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়। আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে একে অপরকে বলতে থাকে, ওহে! আমাদের ধ্বংসের দিন কখন আসবে? মৃত লোকদের হাড়-মাংস একসাথ হয়ে তারা কবে পুনরুজ্জীবিত হবে এবং কখনই বা শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করবে? কাফেরদের উপহাস ও হঠকারিতার জবাবে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

-[খাযেন, হোসাইনী]

এখানে প্রশ্নবোধক দ্বারা উদ্দেশ্য : عَمَّ শব্দটির মধ্যে যে প্রশ্নবোধক রয়েছে তা দ্বারা নিছক প্রশ্নবোধক উদ্দেশ্য নয়, বরং ব্যাপারটিকে খুব বড় করে দেখানো উদ্দেশ্য। কেননা, কাফেরগণ কিয়ামতের ব্যাপারে বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে শুনত তারা একে কঠোরভাবে অস্বীকার করে যেত এবং ঠাট্টাচ্ছলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বেড়াত। অতএব, আল্লাহ তাদের অবস্থাকে মারাত্মকভাবে শ্রোতার সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, দেখ, এদের অবস্থা দেখ, কি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে?

-[সাফওয়া, কাশ্শাফ, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর, জালালাইন]

اَلنَّبَاُ الْعَظِيْمُ : দ্বারা উদ্দেশ্য : আভিধানিক অর্থ- মহাসংবাদ, মহান বাক্য বা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

ইমাম রাযী বলেন, মুফাস্সিরিগণ اَلنَّبَاُ الْعَظِيْمُ -এর তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন।

∴ এর দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য, আর এটাই প্রকৃত অর্থ, ইবনে যায়েদ এ মত পোষণ করেন। আর এটি কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ক. পরবর্তী আয়াতে سَيَعْلَمُوْنَ আছে "অর্থাৎ অনতিবিলম্বে তারা জানতে পারবে" আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তারা যে বিষয়ে প্রশ্ন করছে, ঐ ব্যাপারটি অনতিবিলম্বে মরে যাওয়ার পর জানতে পারবে; কিন্তু তখন 'এ জানা' তাদের কোনো ফায়দা দিবে না। ফায়দা না আসার ব্যাপারটি হলো কিয়ামতের দিন।

খ. সামনে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের উপর বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, نَبَاِ الْعَظِيْمِ কথাটি পরের আলোচনার ভূমিকাস্বরূপ।

গ. অথবা, اَلْعَظِيْمِ শব্দটি কিয়ামতের একটি পরিচিত নাম। যেমন, কুরআন মাজীদের অপর আয়াতে রয়েছে যে, اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

২. نَبَاءٌ বলে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে, এটা মুজাহিদের অভিমত। এ কথার পেছনে দু'টি দলিল রয়েছে–

ক. যে বড় ব্যাপারটি নিয়ে কাফেরগণ মতবিরোধ করছে, তা হলো কুরআন। কেননা তাদের মধ্য হতে কেউ কুরআনকে জাদু, কেউ কবিতা, কেউ পূর্ববর্তী যুগের কিংবদন্তী বলেছিল।

খ. কেনেনা, اَلنَّبَاُ শব্দটি خَبَرٌ-এর مُخْبَرٌ عَنْهُ - اِسْم-এর اِسْم নয়। অতএব اَلنَّبَاُ শব্দটির তাফসীর 'পুনরুত্থান' বা 'নবুয়ত' করার চেয়ে 'কুরআন' করাই উত্তম।

৩. اَلنَّبَاِ الْعَظِيْمِ বলে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়তকে বুঝানো হয়েছে। কেননা হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন কাফেরগণ পরস্পর বলাবলি শুরু করেছিল যে, কি হলো? এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ অবতীর্ণ করলেন। –[কাবীর, খাযেন]

প্রকৃতপক্ষে এখানে اَلنَّبَاِ الْعَظِيْمِ দ্বারা কুরআনে হাকীম, নবুয়তে মুহাম্মদী ﷺ এবং কিয়ামত সবই উদ্দেশ্য। কেননা, এগুলোর একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

"عَمَّ" হতে আলিফ হযফ করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন যে, কয়েকটি কারণে اَلِفْ-কে হযফ করা হয়েছে, যেমন–

১. গুন্নাহর সময় এক আলিফ বরাবর গুন্নাহ করতে হয়, যেন গুন্নাহতেই আলিফের কাজ আদায় হয়ে যায়।

২. জুরজানী (র.) বলেন, প্রশ্নবোধক مَا এবং ইসমে মাওসূলের مَا-এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য প্রশ্নবোধক مَا হতে اَلِفْ-কে হযফ করা হয়েছে।

৩. হরফে জার عَنْ-এর সাথে مَا-এর এমন সংযোগ হয়েছে যে, এখন মনে হয় مَا টি عَنْ-এর একটি অংশ বিশেষ। اَلِفْ থাকলে এ সংযোগ বুঝা যায় না। কেননা مَا اَلِفْ সহ ভিন্ন একটি শব্দ।

৪. اَلِفْ-কে এখানে تَخْفِيْف [সংক্ষিপ্তকরণ] -এর জন্য হযফ করা হয়েছে। কেননা এ শব্দটি উচ্চারণে বারবার আছে। –[তাফসীরে কাবীর]

عَمَّ তে কয়েকটি কেরাত : عَمَّ শব্দটিতে নিম্নোক্ত কয়েকটি কেরাত দেখা যায়।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), উবাই, ইকরামা ও ঈসা (র.) প্রমুখ عَمَّ-এর স্থলে عَمَّا আলিফ যুক্ত করে পড়েন।

২. আলিফ ব্যতীত عَمَّ এই কেরাতটি হলো জমহুরের। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

৩. আলিফ ব্যতীত হায়ে সাক্তা (ة) যুক্ত করে পড়তেন ইমাম বায়যী এবং ইবনে কাছীর (র.)। যেমন– عَمَّهْ কিন্তু দ্বিতীয় কেরাতটি অধিক বিশুদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য। –[ফাতহুল কাদীর]

يَتَسَاءَلُوْنَ-এর সর্বনামের مَرْجِعْ ও অর্থ :

১. يَتَسَاءَلُوْنَ-এর মধ্যে যে সর্বনামটি আছে, তা কুরাইশী কাফেরদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন অর্থ হবে কতিপয় কুরাইশ অন্য কুরাইশীদেরকে প্রশ্ন করছে। –[জালালাইন, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

২. ইমাম রাযী (র.) বলেন, সর্বনামটির দ্বারা কাফের এবং মু'মিন সকলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সকলেই কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিল; কিন্তু মু'মিনগণ তাদের ঈমান পরিপক্ক করার নিয়তে প্রশ্ন করেছিল, আর কাফেরগণ করেছিল ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে। –[তাফসীরে কাবীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ : কিয়ামত ও আখেরাতের ব্যাপারে মানুষ বিভিন্ন মতামত পোষণ করে থাকে। এ ব্যাপারে যারা ইসলামি আকিদার সাথে দ্বিমত পোষণ করে তাদের মধ্যেও আবার মতবিরোধ দেখা যায়। তাদের কেউ কেউ ঈসায়ী চিন্তাধারায় প্রভাবিত। তারা পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে স্বীকার করে, তবে তাদের কথা হলো শরীর নয়; বরং আত্মা জীবিত হবে। কারো মতে, শুধু শরীর উঠে দাঁড়াবে। কেউ আবার এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পোষণ করেন, তারা বলেন যে, পরকাল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। إِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ [আমরা নিছক ধারণা করি মাত্র–এ ব্যাপারে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই।] একে তারা অস্বীকার করে না আবার পুরোপুরি স্বীকারও করে না। অন্য এক দল একে পরিষ্কার অস্বীকার করে। তাদের মতে এ পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। এর পরে আর কিছু নেই। মৃত্যুর পর কখনো পুনরায় জীবিত করা হবে না। তাদের উক্তি নিম্নোক্তভাবে কুরআন মাজীদে তুলে ধরা হয়েছে। "مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْىٰ مَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ" [আমাদের দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। এখানে আমরা কেউ মৃত্যুবরণ করি আবার কেউ জন্ম গ্রহণ করি। যুগই আমাদের ধ্বংসকর্তা।] "اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ" [দুনিয়ার জীবন একমাত্র জীবন আমরা পুনরুজ্জীবিত হবো না।] আবার কেউ বা আল্লাহকে স্বীকার করত, কিন্তু কিয়ামতকে অস্বীকার করত। যাদের হাড়-মাংসের অস্তিত্বই থাকবে না তারা কিভাবে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে তা তাদের বুঝে আসছিল না। মোটকথা, যত জন তত মত।

যেহেতু তাদের নিকট এ ব্যাপারে কোনো নির্ভুল জ্ঞান ছিল না, সেহেতু অনুমানের উপর নির্ভর করে যার যা মনে চাইত তা বলত। সঠিক জ্ঞান থাকলে সকলেই একথা বলত। যেমন ঈমানদারগণের নিকট এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকায় তারা ঐকমত্যে পৌঁছতে পেরেছে। সুতরাং হযরত আদম (আ.) হতে এ পর্যন্ত সকল নবীগণও তাঁদের অনুসারী মু'মিনগণের বক্তব্য হলো শরীর ও আত্মা উভয় [একযোগে] পুনরায় জীবিত হবে। তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে।

–[রুহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

কিয়ামতের ব্যাপারে কারা মতবিরোধ করত? :

ক. কাফের ও মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরে কিয়ামতের ব্যাপারে মতবিরোধ করত, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে 'নানা মুনীর নানা মত, প্রচলিত ছিল।

খ. কাফের ও মু'মিনগণ এ ব্যাপারে মতবিরোধ করত। কাফেররা একে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করত। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ একে স্বীকার ও সাব্যস্ত করত।

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ" : নবী ও রাসূলগণ সর্বসম্মতভাবে পুনরুত্থানের ও পরকালের ঘোষণা করে গেছেন। তথাপি তারা উক্ত আকীদা বা বিশ্বাসকে মান্য করছে না; বরং নিজেদের ভুল আকীদা-বিশ্বাসের উপর অটল থেকেছে। সুতরাং সে দিবস দূরে নয়, যখন সে বিভীষিকাময় দৃশ্য সামনে পেশ করা হবে যে ব্যাপারে তারা সমালোচনা করছে, তা তারা নিজেরাই স্বচক্ষে দেখতে পাবে। যখন হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করবে যে, কিয়ামত কাকে বলে? আর এটাও বুঝতে পারবে যে, একে অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মহানবী ﷺ-এর প্রতিটি কথা হাতে হাতে পাবে। كَلَّا ও ثُمَّ শব্দদ্বয়কে কেউ কেউ বলেছেন যে, তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। আর কারো কারো মতে প্রথমটি বরযখকে এবং দ্বিতীয়টি কিয়ামতকে সাব্যস্ত করার জন্য নেওয়া হয়েছে। বরযখের শাস্তি তো খেয়াল করার মতো হবে। আর কিয়ামতের শাস্তি ও প্রতিদান বাস্তবেই হবে। তথায় শরীর ও আত্মা এক সাথেই থাকবে। দুনিয়ায় যদ্রূপ আত্মার উপর শরীরের প্রাধান্য রয়েছে তদ্রূপ বরযখে শরীরের উপর আত্মার প্রাধান্য থাকবে। মোটকথা এ দৃশ্যমান জগতে শরীর প্রধান এবং আত্মা অপ্রধান। আর সে অদৃশ্য জগতে আত্মা প্রধান ও শরীর অপ্রধান হবে। এর প্রকৃত অবস্থা মৃত্যুর পূর্বে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

একটি অভিযোগ ও এর জবাব : আল্লাহ তা'আলা এখানে কিয়ামত দিবসের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন– "كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ" অথচ সূরা আত-তাকাছুরে কিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন– "كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ" এখন প্রশ্ন হয় যে, مُضَارِعْ-এর পূর্বে س হলে অদূর ভবিষ্যৎকে বুঝায় এবং سَوْفَ হলে দূরবর্তী ভবিষ্যৎকে বুঝায়। সুতরাং একই কিয়ামতের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী উক্ত দু'টি শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, সূরা আন-নাবার মধ্যে যেহেতু ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা কিয়ামতকে স্বীকার করেন, তাই سَيَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে, যা নিকট ভবিষ্যৎকে বুঝায়। পক্ষান্তরে সূরা আত-তাকাছুরের মধ্যে কাফেরদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে। এ জন্য سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে– যা দূর ভবিষ্যৎকে বুঝায়। কেননা অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَنَرَاهُ قَرِيْبًا অর্থাৎ কাফেররা মনে করে কিয়ামত সুদূর পরাহত, অথচ আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে, এটা অতি নিকটে।

كَلَّا 'কখনো না', এটা حُرُوْف غَيْر عَامِلَة বা কার্যকর শক্তিহীন অব্যয়সমূহের অন্যতম। একে حَرْف رَدْع তথা অস্বীকারবোধক বা বিরতমূলক অব্যয়ও বলা হয়। كلا শব্দটির সাধারণ রীতি হলো, এটা পূর্ববর্তী বাক্য বা বাক্যাংশের হুকুম রহিত করে পরবর্তী বাক্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। বলা বাহুল্য, কুরআন মাজীদের প্রথমার্ধে কোথাও كَلَّا শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তবে শেষার্ধের বিভিন্ন স্থানে ধমক এবং সতর্ক করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমার্ধে নরম ও মার্জিত ভাষায় মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে, আর শেষার্ধে কঠিন ও রুক্ষ ভাষায় সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে كَلَّا শেষার্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও হরফটি সতর্ক করার জন্য এসেছে। -[আযীযী]

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ -কে দু'বার উল্লেখ করার কারণ কি? : তাফসীর বিশারদগণ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ -কে দু'বার উল্লেখের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন–

ক. প্রথমটির তাকিদের জন্য দ্বিতীয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ثُمَّ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় সতর্ক বাণী প্রথমটি অপেক্ষা কঠোরতর।

খ. প্রথম বাক্য দ্বারা سَكَرَاتُ الْمَوْتِ বা মৃত্যু যন্ত্রণা -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা কিয়ামতের বিভীষিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ. প্রথম বাক্য দ্বারা যারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা কিয়ামত অস্বীকারকারীদেরকে সাবধান করা হয়েছে।

ঘ. প্রথম বাক্যের দ্বারা পুনরুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার প্রতিফলের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

ঙ. প্রথম বাক্যের দ্বারা কাফিরদের অবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা মু'মিনগণের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কাফেররা প্রথমত নিজেদের অবস্থা জানতে পারবে এবং তারপর মু'মিনগণের হাল-হাকিকত অবগত হবে।

চ. প্রথমোক্ত বাক্য দ্বারা শারীরিক শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা রুহানী শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

ছ. প্রথমোক্ত سَيَعْلَمُوْنَ -এর কর্তা হলো মু'মিনগণ এবং দ্বিতীয় سَيَعْلَمُوْنَ -এর কর্তা হলো কাফেররা। আর উভয়ের مَفْعُوْلٌ (কর্ম) হলো اَلْعَاقِبَةُ [পরিণাম]। অর্থাৎ সে দিবস মু'মিন ও কাফের উভয়ই তাদের স্ব-স্ব কর্মফল লাভ করবে। এমতাবস্থায় প্রথমটি وَعْدٌ ও দ্বিতীয়টি وَعِيْد-এর জন্য হবে।

জ. ইবনে মালিক (র.) বলেছেন, উক্ত বাক্যদ্বয়ে তাকীদে লফযী (শাব্দিক তাকিদ) হয়েছে।

ঝ. কারো মতে, প্রথমটি দ্বারা বরযখ ও দ্বিতীয়টি দ্বারা কিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

سَيَعْلَمُوْنَ -এর বর্ণিত কেরাতসমূহ : এখানে দু'টি আয়াতে سَيَعْلَمُوْنَ শব্দটি এসেছে। অতএব,

১. জমহুরের কেরাত হলো 'ইয়া' দ্বারা অর্থাৎ سَيَعْلَمُوْنَ

২. ইমাম হাসান, ইবনে আমের ও মালিক ইবনে দীনার (র.) উভয় স্থানে 'তা' দ্বারা অর্থাৎ سَتَعْلَمُوْنَ পড়েছেন।

৩. ইমাম যাহহাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি প্রথমটিতে 'তা' দ্বারা سَتَعْلَمُوْنَ এবং দ্বিতীয়টিতে 'ইয়া' দ্বারা سَيَعْلَمُوْنَ পড়েছেন। -[রূহুল মা'আনী, কাবীর]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. ثُمَّ اَوْمَأَ تَعَالٰى اِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ فَقَالَ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا فِرَاشًا كَالْمَهْدِ .

৬. অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে পুনরুত্থানে সক্ষম, সেদিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন- আমি কি পৃথিবীকে শয্যা করিনি বিছানা, দোলনার ন্যায়।

٧. وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا يُثَبَّتُ بِهَا الْاَرْضُ كَمَا يُثَبَّتُ الْخِيَامُ بِالْاَوْتَادِ وَالْاِسْتِفْهَامُ لِلتَّقْرِيْرِ .

৭. আর পাহাড়সমূহকে কীলক? যা দ্বারা পৃথিবী স্থির হয়েছে, যেমন তাঁবুসমূহ কলকের দ্বারা স্থির থাকে। আর প্রশ্নবোধকটি সাব্যস্ত করণার্থে।

٨. وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ذُكُوْرًا وَاِنَاثًا .

৮. আর আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীরূপে।

٩. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا رَاحَةً لِاَبْدَانِكُمْ .

৯. আর তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছি তোমাদের দেহের জন্য প্রশান্তি।

١٠. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا سَاتِرًا بِسَوَادِهٖ .

১০. আর রাতকে আবরণ করেছি স্বীয় অন্ধকারে আচ্ছাদনকারী।

١١. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَقْتًا لِلْمَعَايِشِ .

১১. আর দিবসকে জীবিকার সময় করেছি জীবিকা আহরণ করার সময়।

١٢. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سَبْعَ سَمٰوٰتٍ شِدَادًا جَمْعُ شَدِيْدَةٍ اَىْ قَوِيَّةٍ مُحْكَمَةٍ لَا يُؤَثِّرُ فِيْهَا مُرُوْرُ الزَّمَانِ .

১২. আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উপরে সাতটি সপ্ত আকাশ। যা সুস্থিত شِدَادٌ শব্দটি شَدِيْدَةٌ -এর বহুবচন অর্থাৎ সুদৃঢ় ও মজবুত, দীর্ঘকালের অতিক্রম তাতে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

١٣. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا مُنِيْرًا وَّهَّاجًا وَقَّادًا يَعْنِى الشَّمْسَ .

১৩. আর আমি সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ আলোকবর্তিকা যা সমুজ্জ্বল আলোকবিকীরণকারী অর্থাৎ সূর্য।

١٤. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ السَّحَابَاتِ الَّتِىْ حَانَ لَهَا اَنْ تَمْطُرَ كَالْمُعْصِرِ الْجَارِيَةِ الَّتِىْ دَنَتْ مِنَ الْحَيْضِ مَآءً ثَجَّاجًا صَبَّابًا

১৪. আর বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে বর্ষণ আসন্ন মেঘমালা সে যুবতী মেয়ের ন্যায় যার ঋতুস্রাব আসন্ন হয়েছে। প্রচুর বারি মুষলধারে বৃষ্টি।

١٥. لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا كَالْحِنْطَةِ وَنَبَاتًا كَالتِّبْنِ .

১৫. যাতে আমি উৎপন্ন করতে পারি শস্য যেমন গম এবং উদ্ভিদ যেমন, ঘাসের চারা।

١٦. وَجَنّٰتٍ بَسَاتِيْنَ اَلْفَافًا مُلْتَفَّةً جَمْعُ لَفِيْفٍ كَشَرِيْفٍ وَاَشْرَافٍ .

১৬. আর উদ্যানসমূহ বাগানসমূহ ঘন-সন্নিবিষ্ট জড়িয়ে থাকা, اَلْفَافٌ শব্দটি لَفِيْفٌ -এর বহুবচন, যেমন اَشْرَافٌ -এর বহুবচন شَرِيْفٌ

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا : বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের نَجْعَلُ ক্রিয়ার সাথে و হরফে আতফ দ্বারা যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ اَلَمْ نَجْعَلِ الْجِبَالَ اَوْتَادًا পূর্ববর্তী বাক্যে مِهٰدٌ ও اَرْضٌ শব্দদ্বয় نَجْعَلُ ক্রিয়ার যথাক্রমে ১ম ও ২য় مَفْعُوْلٌ। পরবর্তী বাক্যের

Free @ www.e-ilm.weebly.com
اَوْتَادًا ও اَلْجِبَالَ অনুরূপভাবে نَجْعَلْ ক্রিয়ার যথাক্রমে ১ম ও ২য় مَفْعُوْل হয়ে প্রথম বাক্যের সাথে مَعْطُوْف হয়েছে।
اَلْجِبَالُ : [পর্বতসমূহ] বহুবচন, একবচনে اَلْجَبَلُ - اَوْتَادٌ : পেরেকসমূহ, খুঁটাসমূহ, কীলকসমূহ, বহুবচন, একবচনে وَتَدٌ। –[রূহুল মা'আনী]

وَهَّاجًا-এর মহল্লে ই'রাব : وَهَّاجًا শব্দটি তার পূর্বে উল্লিখিত سِرَاجًا শব্দের বিশেষণ (صِفَةٌ) হয়েছে। جَعَلْنَا-কে- وَهَّاجًا ক্রিয়ার দ্বিতীয় মাফউল বলা যায় না। কেননা جَعَلْنَا এমন দু'টি اِسْم-কে- مَفْعُوْل বানায়, যাদের মধ্যে একটি مَعْرِفَةٌ হবে। এ কারণেই এ আয়াতে جَعَلْنَا-এর অর্থ خَلَقْنَا করা হয়েছে। অতএব, سِرَاجًا শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণে এর সিফাত وَهَّاجًاও মানসূব হয়েছে। –[কামালাইন ও কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের কিয়ামত ও পরকালকে অস্বীকার করার কথা বলা হয়েছে। তারা মূলত এ জন্যই একে অস্বীকার করেছে যে, এটা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যা দ্বারা বস্তুত তারা আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতকেই অস্বীকার করেছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন কুদরতের পরিচয় বাণী। সুতরাং যিনি এ সকল বিষয় সম্পাদন করতে সক্ষম তিনি কিয়ামত সঙ্ঘটনেও পূর্ণ সক্ষম।

قَوْلُهُ تَعَالَى "اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا" : আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا এখানে اَلْمِهَادُ অর্থ বিছানা বা সমতল ভূমি। আর مهد শব্দের আভিধানিক অর্থ দোলনা বিশেষ। مِهَادٌ শব্দটি مَهْدٌ হতেই উদ্গত হয়েছে। দোলনা এক রজ্জুর সাথে ঝুলন্ত থাকে অথচ এ দোদুল্যমান অবস্থায়ই তাতে শিশু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। এ পৃথিবী দোলনার সাথে তুলনীয়। মহাশূন্যে এ দোদুল্যমান পৃথিবীকেও মানুষের জন্য আরামদায়ক করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ এ পৃথিবী প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কক্ষপথে এর গতি ঘণ্টায় ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল। এর গর্ভে এমন তাপ বিদ্যমান রয়েছে যে, কঠিন শিলাখণ্ডও গলে যাবে। আগ্নেয়গিরির অগ্নুদগীরণের গলিত লাভাস্রোতই এর যথার্থ প্রমাণ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা এ পৃথিবীকে এমন প্রশান্ত বানিয়েছেন যে, তোমরা এর সাথে মধ্যাকর্ষণের শক্তিতে উল্টাভাবে ঝুলেও আদৌ কোনো কিছু অনুভব করতে পারছ না। তোমরা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করছ। বন্দুকের গুলীর চেয়েও দ্রুতগামী বাহনের উপর তোমরা সওয়ার হয়ে আছ, অথচ আদৌ বুঝতে পারছ না। মহাশূন্যে গতিবান পৃথিবীর পৃষ্ঠে আল্লাহর কুদরতি শক্তিতে মধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে পৃথিবীর বস্তুনিচয়কে স্থির রেখে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট-জীবের জন্য বসবাস উপযোগী করার অতুলনীয় ক্ষমতার কথা অত্র আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। اَلْمَهْدُ-এর শাব্দিক অর্থ বিছানা হলেও একে বসবাসের উপযোগী স্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। اَلْمِهَادُ-এর বহুবচন হলো مُهُدٌ [মুহুদ] এবং اَمْهِدَةٌ [আমহিদাতুন]।

قَوْلُهُ "مِهَادًا" : অধিকাংশ ক্বারীগণ مِهَادًا-কে মীমের নিচে যের দিয়ে পড়েন। আর মুজাহিদ, ঈসা ও কিছু কূফাবাসী ওলামায়ে কেরামের কেরাত হলো مَهَادًا মীমের উপর যবর দিয়ে।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا" : 'পর্বতসমূহকে কি কীলক স্বরূপ নির্মাণ করিনি?' অবশ্যই করেছি। অর্থাৎ এ পৃথিবী পৃষ্ঠকে শূন্য-সমতল প্রান্তর না বানিয়ে; বরং তাতে স্থানে স্থানে ছোট-বড় পর্বতমালা স্থাপন করে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেছি যাতে তা নড়াচড়া করতে না পারে। বিজ্ঞানীদের মতে অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের মতো পৃথিবীও নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে। এ ঘূর্ণায়মান অবস্থায় পৃথিবী সর্বদা দুলতে থাকলে এর পৃষ্ঠে নিশ্চিন্তে বসবাস করা সম্ভবপর ছিল না। দোলায়মান নৌকায় ভারি পাথর বোঝাই করলে তা স্থির হয়ে সঠিকভাবে চলতে পারে। তদ্রূপ আবর্তনশীল পৃথিবীতে স্থানে স্থানে পর্বত সৃষ্টি করে এর ভারসাম্য ও স্থিরতা বজায় রাখা হয়েছে। ফলে মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে বসবাস করতে পারছে। এটাও আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরতের নিদর্শন। –[তাফসীরে হক্কানী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ ছাড়া এ সমস্ত মওসুম পরিবর্তনে, বৃষ্টি বর্ষণে, ঝর্ণা, খাল ও নদী সৃষ্টিকরণে, শস্য-শ্যামল উর্বর উপত্যকা সৃষ্টিতে, বড় বড় কাণ্ডসম্পন্ন বৃক্ষরাজি উৎপাদনে, নানা ধরনের খনিজ ও শিলা সংগ্রহে এ সমস্ত পর্বতমালার ব্যাপক অবদান রয়েছে। সমুদ্রের লোনা পানি হতে বাষ্পীভূত মেঘমালা কীলক সদৃশ পর্বত গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মিঠা পানির বৃষ্টি বর্ষণ করে। বর্ষণ প্রবাহই স্রোত সৃষ্টি করে নদ-নদীগুলোর নাব্যতা বজায় রাখে। পর্বতমালাকে কীলক বা খুঁটার মতো সৃষ্টি করার মধ্যে মাখলুকের আরো হাজারও রকমের কল্যাণ রয়েছে। এটা রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরতের অন্যতম প্রমাণ।

পাহাড় কখন সৃষ্টি করা হয়েছে? : এ ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়, হাদীসটি নিম্নরূপ–

আল্লাহ তা'আলা জমিন সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তা ভীষণভাবে কাঁপছিল। অতঃপর জমিনের উপর পহাড়কে স্থাপন করা হলো। এতে জমিন স্থির হয়ে গেল। ফেরেশতাগণ আরজ করলন– হে আমাদের রব! পাহাড় থেকে ভারি শক্ত আর কোনো বস্তু কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তর দিলেন, নিশ্চয় তা হলো লৌহ। তারপর তারা আবার প্রশ্ন করলেন, হে আমদের রব! লৌহ থেকে মারাত্মক কি কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? উত্তর দিলেন, নিশ্চয় তা হলো আগুন। ফেরেশতাগণ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, হে আমাদের রব! আগুন থেকে অধিকতর মারাত্মক কোনো বস্তু কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তর করলেন, তা হলো পানি। আবার প্রশ্ন হলো যে, হে আমাদের রব, পানি থেকে মারাত্মক কোনো জিনিস সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ–বাতাস। তারপর প্রশ্ন হলো বাতাস হতে তীব্রতর কোনো বস্তু কি সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে বললেন, বনী আদম যারা ডান হাতে এমনভাবে দান করবে যে, বাম হাতে তা জানবে না।

এ হাদীসটির উপর ভিত্তি করে সকল দার্শনিকগণ ঐকমত্যে পৌছেছেন যে, জমিন সৃষ্টির পরই পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রথম পাহাড়ের নাম আবূ কায়েস। এ হাদীসটিকে হাকিম সহীহ বলেছেন।

১. জোড়া জোড়া অর্থ পুরুষ এবং স্ত্রীরূপে। পুরুষ সৃষ্টি করে বিপরীতে স্ত্রী এবং স্ত্রীর বিপরীতে পুরুষ সৃষ্টি করা বুঝিয়েছেন।
২. আবার ব্যাপক অর্থে কোনো গুণের বিপরীতেও হতে পারে। যেমন– ভালো ও মন্দ, সুন্দর ও অসুন্দর, সাদা ও কালো, ধনী ও গরিব, জ্ঞানী ও মূর্খ ইত্যাদি। –[হোসাইনী, হাক্কানী, কাবীর]
৩. কারো মতে أَزْوَاجًا অর্থ أَلْوَانًا [বিভিন্ন রঙের]। –[কুরতুবী ও ফাতহুল কাদীর]

প্রকৃতপক্ষে "জোড়া জোড়া" সৃষ্টি বলতে যদি মানবজাতির নর-নারীকেই ধরা হয় তবুও সৃষ্টিকর্তার অসীম সৃষ্টি-নৈপুণ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। নর ও নারী মানবতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন হলেও দৈহিক কাঠামো, আবেগ-আবেদনের দিক হতে পরস্পর স্বতন্ত্র। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের জন্য পরিপূরক ও জুড়ি হওয়ার ব্যাপারে একটা অনুকূল সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এ সামঞ্জস্য সৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি চলছে। কোনো মানুষ ইচ্ছা করে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারে না। তবু এমন দেখা যায়নি যে, পৃথিবীর কোনো ভুখণ্ডে শুধু পুত্র-সন্তান বা শুধু কন্যা-সান্তান জন্মলাভ করে নর ও নারীর সংখ্যাগত ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছে। আবার কন্যা সন্তানেরা ক্রমাগত নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবং পুত্র সন্তানেরা ক্রমাগত পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে এক অব্যক্ত আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে একশ্রেণি অপর শ্রেণির উপযুক্ত জুড়ি হতে পারছে। নারী-পুরুষের জন্মও ক্রমাগত এমন মাত্রায় সামঞ্জস্য মণ্ডিত, যার উপরে মানুষের কোনো হাত নেই। এ কর্মকুশলতা দ্বারাই সৃষ্টিকর্তা সংসার-সংগঠন, বংশ সংরক্ষণ এবং মানবীয় সভ্যতা ও তামাদ্দুন সৃষ্টি করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا" : কোনো কোনো নাস্তিকের পক্ষ হতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, سُبَاتٌ শব্দের অর্থ نَوْمٌ (নিদ্রা)। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ نَوْمًا অর্থাৎ 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে নিদ্রা করেছি।' এ কথাটির মধ্যে কোনো বালাগাত আছে বলে বুঝা যায় না। আর এটা বলারই বা দরকার কি ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে মুফাসসিরীনে কেরামের উক্তিগুলো উল্লেখ করা যায় তা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা যুজাজ বলছেন, سُبَاتٌ 'সুবাত' অর্থ এ স্থানে 'মৃত্যু' নেওয়া হবে। তখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াবে– 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে মৃত্যুসম করেছি।' কেননা 'সুবাত' শব্দটি سَبْتٌ হতে নির্গত। সাবত্ অর্থ– কেটেফেলা, বন্ধ হয়ে যাওয়া। মৃতব্যক্তির যেমন সর্বপ্রকার চিন্তাভাবনা এবং নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। এ কথার পেছনে দু'টি দলিল দেওয়া হয়েছে।
ক. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ 'তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে রাতে মৃত্যু দেন।' এখানে রাতের ঘুমকে মৃত্যু বলা হয়েছে।
খ. نَوْم -কে যখন مَوْت বলা হয়েছে, তখন يَقْظَةٌ বা জাগ্রতকে مَعَاشٌ বলা হয়েছে। আর مَعَاشٌ অর্থ حَيَاةٌ বা জীবন। অতএব, বুঝা যায় যে, এখানে سُبَاتٌ অর্থ 'মৃত্যু' এবং সামনের আয়াতে مَعَاشٌ অর্থ 'জীবন' হবে।
২. ইমাম লাইছ বলেছেন, سُبَاتٌ বলা হয় ঐ নিদ্রাকে যে নিদ্রায় মানুষের প্রায় হুঁশ থাকে না। ঐ রুগীকে مَسْبُوتٌ বলা হয় যে রুগী হুশ হারিয়ে ফেলেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. মূলত اَلسَّبْتُ শব্দটির আভিধানিক অর্থ– কেটে ফেলা, বন্ধ করা। বলা হয়ে থাকে যে, سَبَتَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ অর্থাৎ লোকটি নিজের মাথা কেটেছে। إِذَا حَلَقَ شَعْرَهُ অর্থাৎ যখন মাথার চুল মুড়ে ফেলে। কেটে ফেলা অর্থের কয়েকটি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো–

ক. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ نَوْمًا مُنْقَطِعًا لَا دَائِمًا অর্থাৎ "তোমাদের ঘুমকে আমি সময় মতো ভাগ ভাগ করে দিয়েছি। একাধারে নিদ্রার ব্যবস্থা করিনি।" কেননা প্রয়োজন অনুযায়ী ঘুম যাওয়া মানব জীবনের জন্য সর্বোপকারী ব্যাপার। পক্ষান্তরে সব সময় বা একাধারে নিদ্রা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। অতএব, 'ভাগ-ভাগ নিদ্রা' বা 'কাটা-কাটা নিদ্রা' যখন মানব জীবনের জন্য বিরাট নিয়ামত, তখন ঐ নিদ্রাকে নিয়ামত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া যথার্থ হয়েছে।

খ. কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষ স্বাভাবিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নিদ্রার মাধ্যমে ঐ ক্লান্তি দূর হয়। ঐ 'দূর হওয়া' -কে قَطْع বা سَبْت বলা হয়েছে। এ কারণেই ইবনে কুতাইবা سُبَاتٌ-এর অর্থ رَاحَةٌ বা প্রশান্তি করেছেন। কেননা নিদ্রা মানুষের ক্লান্তিকে কেটে দিয়ে প্রশান্তি আনয়ন করে।

গ. অথবা, অর্থ এভাবে করতে হবে যে, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ نَوْمًا خَفِيفًا يُمَكِّنُكُمْ دَفْعَهُ وَقَطْعَهُ অর্থাৎ আমি তোমাদের নিদ্রাকে হালকা করে রেখেছি, যেন তোমাদের পক্ষে তা কেটে উঠা সম্ভব হয়। যদি তাদের উপর নিদ্রা প্রবল হতো, তাহলে নিদ্রা হতে উঠা কষ্টকর হতো। নিদ্রাই তখন একটি মারাত্মক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হতো। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

মূলত নিদ্রা মানুষের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এক বড় নিয়ামত, এর মাধ্যমে মানুষ তার অবসাদগ্রস্ততা দূর করে পুনঃ কার্যক্ষমতা ফিরে পায়। এটা মানুষের মৌলিক চাহিদা। এটা ব্যতীত মানুষ বাঁচতে পারে না। জোর করে একে প্রতিরোধ করতে চাইলে মানুষের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু মানুষ কেন অন্যান্য প্রাণীও ঘুম ব্যতীত বাঁচতে পারে না। মানুষ ও অপরাপর সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্যই মহান আল্লাহ ঘুমকে সৃষ্টি করেছেন। এর নিগূঢ় ও অপার রহস্য একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا" : রাত্রিকে পোশাক বানিয়ে দেওয়ার মর্মার্থ হলো– এর মধ্যে মানুষ তাদের গোপনীয় কার্যাবলি নির্বিঘ্নে করতে পারে। যেমন– স্বীয় স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং ভালো-মন্দ পরামর্শ করা ইত্যাদি। গোপন শলা-পরামর্শ, শত্রু হতে আত্মরক্ষা, আনন্দ উপভোগ, হাসি-তামাশা, চুরি-ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, তাহাজ্জুদ ও মুরাকাবাহ ইত্যাদি বহু কার্য রাতের বেলায় উত্তমভাবে করা যায়। জনৈক কবি বলেছেন–

اَللَّيْلُ لِلْعَاشِقِيْنَ سِتْرًا * يَا لَيْتَ أَوْقَاتَهُ تَدُوْمُ

অর্থাৎ প্রেমিকদের জন্য রাত হলো আবরণ স্বরূপ। হায়! কতই না উত্তম হতো যদি সর্বদা রাত থাকত।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, লেবাসের মাধ্যমে যেমন মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, গরমের প্রখরতা হতে নিষ্কৃতি পায়, ঠাণ্ডার প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে– তদ্রূপ রাত্রের ঘুমের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য বাড়ে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সজীব ও মোলায়েম হয়, শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়, কর্ম ক্ষমতা ফিরে পায়, মানসিক অস্থিরতা দূর হয়।

উল্লেখ্য যে, আখেরাতে না রাত হবে আর না ঘুম। বিবেকের দাবিও হলো এগুলো না হওয়া। কেননা নেককার সর্বদা আনন্দে বিভোর থাকবে। প্রথমত নিদ্রার তথায় প্রয়োজন হবে না। তা ছাড়া ঘুমের কারণে বড় বড় উপকার হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং স্থায়ী প্রতিদান হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। ইরশাদ হচ্ছে–"لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ" [বেহেশতবাসীগণ বলবে কষ্টকর ও অনর্থক কিছুই তথায় আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।] পক্ষান্তরে কাফের মুশরিক সর্বদাই আজাবে লিপ্ত থাকবে। নিদ্রা যাওয়ার সুযোগ তাদের কোথায়?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে কেউ প্রশ্ন করল যে, বিবাহের মজলিস দিনে হওয়া ভালো না রাতে। তিনি জবাবে বললেন, রাতে হওয়া ভালো। কেননা রাতকেও লেবাস বলা হয়েছে। আবার মহিলাদেরকেও লেবাস বলা হয়েছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–"هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ" কাজেই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا" : রাতকে তো আরাম লাভের জন্য অন্ধকারের আবরণ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে দিবসকে এ জন্য আলোক উজ্জ্বল করা হয়েছে যে, মানুষ যেন অনায়াসে এবং সহজে জীবিকা অর্জন করতে পারে। বস্তুত দিনকে এভাবে অনবরত পরিবর্তন করার মধ্যে অগণিত হেকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। এটা গতানুগতিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে না। মানুষ না একাধারে দীর্ঘ সময় কাজ করতে পারে আর না একেবারে আলস হয়ে বসে থাকতে পারে। আর এ জন্য দিন-রাতের উক্ত রুটিন করে দেওয়া হয়েছে। জান্নাতে যেহেতু জান্নাতীগণের নিকট নিয়তের চাহিদা থাকবে না। আর না জাহান্নামীরা শান্তির প্রয়োজন অনুভব করবে, সেহেতু দিবারাত্র হবে না। لَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা দিবসকে জীবিকা অর্জনের সময় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে مَعَاشٌ-এর মধ্যস্থিত মীমটি মাসদারের مِيْم ও হতে পারে, তখন এর পূর্বে মুযাফ উহ্য মেনে তাকে ظَرْف করতে হবে। অর্থাৎ "جَعَلْنَا النَّهَارَ وَقْتَ مَعَاشٍ" অর্থাৎ আমি দিবসকে রুজির সময় বানিয়েছি।

অথবা مِيْم টি ظَرْف -এর জন্যও হতে পারে, তখন এটা ظَرْف زَمَانٌ বা ظَرْف مَكَانٌ হবে। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

ঘুমের জন্য سُبَاتً এবং দিনের জন্য مَعَاشٌ উল্লেখ করার তাৎপর্য : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিদ্রার সময় সমস্ত কার্যাবলি বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি কার্যাবলি এবং নিদ্রা একই ব্যক্তি থেকে একই সময়ে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নিদ্রা ও কাজ এক সময় হয় না। কেননা নিদ্রা মানুষের জন্য মৃত্যুসম। মৃতব্যক্তির মতো তার সকল কাজ বন্ধ হয়ে যায়। নিদ্রার জন্য কাজ বন্ধ করে দিতেই হয়। এ কারণেই নিদ্রার ব্যাপারে سُبَاتً (বন্ধ করা, কেটে ফেলা) ব্যবহার করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে দিনকে রুজি-রোজগারের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কেননা রুজি-রোজগার করতে হলে নড়াচড়া করতে হয়, যা সম্পূর্ণভাবে ঘুমের বিপরীত। অতএব, দিনে জেগে থেকে নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবিকার্জন করতে হয়। এ কারণেই نَهَارٌ-এর জন্য مَعَاشٌ-কে ব্যবহার করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالَى "سَبْعًا شِدَادًا" : سَبْعًا شِدَادًا বাক্যটির প্রকৃতরূপ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ شِدَادًا আসমান বা সামাওয়াত শব্দটি উহ্য করে বস্তুর গুণের বিশালত্বের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। আমি তোমাদের উর্ধ্বালোকে সাতটি মজবুত আসমান তৈরি করেছি যাতে কালের আবর্তন সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না।

-[জালালাইন, হোসাইনী]

'সাত মজবুত' দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরকারই 'সাত আসমান' ব্যাখ্যা করেছেন। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অনুরূপ। সাত আসমান তথা নভোমণ্ডলের সাতটি স্তরে বা সাতটি শূন্য তরঙ্গের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর এক স্তর হতে অন্য স্তরের দূরত্ব পাঁচশত আলোকবর্ষ মাইল। গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-এর প্রথম স্তরেই বিচরণ করছে। আমাদের এ পৃথিবী হতে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় গ্রহ-নক্ষত্র এতে লাটিমের মতো ঘূর্ণায়মান ও আবর্তনশীল হয়ে রয়েছে। সূর্য হতেও হাজার হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল তারকা এতে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের এ গোটা সৌরজগতটা এক একটি ছায়াপথের এক কোণে রয়েছে। এ একটি ছায়াপথেই সূর্যের মতো তিনশত কোটিরও বেশি নক্ষত্ররাজি রয়েছে। অদ্যাবধি মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঐরূপ দশ লক্ষেরও বেশি ছায়াপথের (থটফটসহ) সন্ধান পাওয়া গেছে। এ লক্ষ লক্ষ ছায়াপথগুলোর মধ্যে আমাদের নিকটতম ছায়াপথের দূরত্ব এতটা যে, এর আলো প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হলে দশ লক্ষ বৎসরে পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে পৌঁছবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সুবিশাল রাজত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেওয়া মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে, আল্লাহর সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে তা হতে অনেক ব্যাপক ও বিশাল হবে। মানুষের সংকীর্ণ জ্ঞান ও অসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা অদ্যাবধি নভোমণ্ডলের প্রথম স্তরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শক্তি মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা কি লক্ষ্য করছ না যে আমি তোমাদের উপর মজবুত কাঠামো বিশিষ্ট সাতটি স্তরে মহাকাশ নির্মাণ করেছি এবং পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য (তোমাদের নিকটতম নক্ষত্র) সূর্যকে প্রদীপের মতো অফুরন্ত জ্যোতির্ময়রূপে সৃষ্টি করেছি? আর আমারই আদেশে বর্ষণশীল মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ হয় এবং এ বর্ষণের মাধ্যমেই সমগ্র মাখলুকাতের জন্য পৃথিবীর বুকে শস্য-সবজি, বৃক্ষরাজি ও পত্র-পুষ্পে সুশোভিত উদ্যানসমূহের উৎপত্তি হয়।" কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে সাতটি মজবুত দ্বারা পৃথিবীর উর্ধ্বদেশে অবস্থিত সাতটি প্রধান গ্রহ-বৃহস্পতি, শনি, শুক্র, মঙ্গল, বুধ, নেপচুন ও চন্দ্র বুঝিয়েছে। شِدَادًا অর্থ- শক্ত, মজবুত, এটা شَدِيْدٌ-এর বহুবচন।

بَنَيْنَا শব্দটি ব্যবহারের রহস্য : কোনো ঘরের নিচের অংশকে بِنَاءٌ বলা হয়। নিচের অংশ তৈরি করা বুঝাতে اَلْبِنَاءُ ব্যবহার করা হয়; কিন্তু আকাশ আমাদের মাথার উপরে রয়েছে, এখানে بِنَاءٌ শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে কি রহস্য নিহিত রয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া হয় যে, بِنَاءٌ [ভিত্তি] সবসময় মসিবত থেকে দূরে থাকে। بِنَاءٌ থেকে কোনো মসিবত আসার সম্ভাবনা থাকে না, আর না এর উপর কোনো মসিবত অর্পিত হয়। কেননা তা মাটির নিচে সুদৃঢ়ভাবে বসে থাকে। আর যা নড়বড় করে, তা بِنَاءٌ হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এক কথায় ছাদ ভেঙ্গে পড়ে মানুষ বা অন্য কিছুর ক্ষতি হয়, কিন্তু بِنَاءٌ কোনো দিকে পড়ে না। আর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে এখন ছাদ হিসেবে দিয়েছেন যা بِنَاءٌ-এর মতো দৃঢ় মজবুত। তাহলে কোনো কিছু পড়ে বা তা ভেঙ্গে পড়ে কোনো কিছুর ক্ষতি হবে না। এ কারণেই رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ না বলে بَنَيْنَا فَوْقَكُمْ বলা হয়েছে।

-[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilmweebly.com

سِرَاجًا وَهَّاجًا-এর মর্মার্থ : উল্লিখিত আয়াতে سِرَاج বলে তার বিশেষণ হিসেবে وَهَّاج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। سِرَاج অর্থ- প্রদীপ। وَهَّاج শব্দের ধাতু وَهْج। এর অর্থ স্বয়ং উজ্জ্বল ও অন্যকে দীপ্তি ও তাপদানকারী (রাগেব)। এ আলোক ও উত্তাপের সংস্থান হয়ে থাকে সূর্য হতে। এখানে তারই কথা বলা হয়েছে।

وَهَّاجًا : অর্থ অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অতিশয় উজ্জ্বল। اِسْمُ فَاعِلٍ مُبَالَغَه মূলবর্ণ وهج - وَهَّاجًا শব্দটি পূর্ববর্তী سِرَاجًا মাওসূফের সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত একত্র হয়ে جَعَلَ ফে'লের মাফউল হয়েছে। এ বাক্যে جَعَلَ-এর দ্বিতীয় মাফউল নেই। কেননা প্রথম মাফউল কখনো نَكِرَه হতে পারে না। -[কামালাইন]

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, اَلْوَهَّاجُ শব্দের অর্থ নিয়ে ভাষাবিদগণ বেশ ব্যস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ এ শব্দটির কয়েকটি অর্থ রয়েছে-

১. اَلْوَهْجُ هُوَ مَجْمَعُ النُّوْرِ وَالْحَرَارَةِ অর্থাৎ এটা আলো এবং গরমের সমাগম। আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে আলো এবং গরমের চরম সীমা দান করেছেন। যে আলো আর গরম অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না।

২. কালবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, اِنَّ الْوَهَّاجَ مُبَالَغَةٌ فِى النُّوْرِ فَقَطْ অর্থাৎ وَهَّاجٌ শব্দটির অর্থ শুধু অতিরিক্ত আলো। অর্থাৎ আলোর চরম সীমাকে وَهَّاجٌ বলা হয়।

৩. খলীল বলেন, حَرُّ النَّارِ وَالشَّمْسِ অর্থাৎ দোজখ এবং সূর্যের তাপকে وَهْج বলা হয়। উপরোল্লিখিত কয়েকটি অর্থের মধ্য হতে সবকয়টি অর্থই আয়াতে প্রযোজ্য। -[কবীর, খাযেন]

এ প্রদীপ [সূর্য] কোথা অবস্থিত? : আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, সূর্য কোথায় অবস্থিত এ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মতটি হলো সূর্য চতুর্থ আসমানে রয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.)-এর একটি হাদীস ছাড়া আর কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, 'সূর্য চতুর্থ আকাশে অবস্থিত, সে স্থান হতেই তা আমাদের দিকে এর আলো এবং তাপ প্রেরণ করে।'

বৈজ্ঞানিকদের বইতে পাওয়া যায় যে, সাত আকাশের জন্য সাতটি গ্রহ দেখা যায়। সেগুলো নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করছে- সপ্ত আকাশে (زُحَلْ) যাহ্‌ল, ষষ্ঠতে (مُشْتَرِىْ) মুশতারী, পঞ্চম আকাশে (مُرِيْخ) মুরীখ, চতুর্থতে সূর্য, তৃতীয়তে (زُهْرَة) যাহরা, দ্বিতীয়তে (عَطَارِدْ) আতারিদ এবং প্রথম আকাশে চন্দ্র। -[রূহুল মা'আনী]

সূর্য সৃষ্টির রহস্য : আল্লাহ বলেন, 'আমি (সূর্যকে) করেছি একটি প্রদীপ যা সমুজ্জ্বল' এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশে আল্লাহর অসীম কুদরত ও বিরাট নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূর্যের ব্যাস পৃথিবী হতে ১০৯ গুণ এবং আয়তন ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার গুণ বড়। এর তাপমাত্রা ১ কোটি ৪ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী হতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এর রশ্মি এতই উত্তপ্ত যে, পৃথিবীর কোনো কোনো অংশ এর প্রভাবে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌছে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিশেষ সৃষ্টি-কুশলতায় এটা হতে পৃথিবীকে এতটা দূরত্বে রেখেছেন যে, পৃথিবী বেশি উত্তপ্ত হয় না এবং ঠাণ্ডায়ও জমে যায় না। নাতিশীতোষ্ণ করে সৃষ্ট জীবের বসবাস উপযোগী করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا" : ইমাম রাযী (র.) লিখেন, مُعْصِرَاتِ সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়-

১. হযরত মুজাহিদ, মুকাতিল, কালবী, কাতাদাহ (র.) এবং আদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দু'টি মতের একটিতে مُعْصِرَاتٌ শব্দের অর্থ 'ঐ বাতাস, যে বাতাস মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।' এ মতের স্বপক্ষে তাঁরা কুরআন মাজীদের একটি আয়াত পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا অর্থাৎ 'তিনি আল্লাহ যিনি বাতাসকে প্রবাহিত করেন, সে বাতাস মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে।'

এ অর্থের উপর একটি আপত্তি আসে যে, যদি مُعْصِرَاتٌ-এর অর্থ বাতাস হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْمُعْصِرَاتِ না বলে بِالْمُعْصِرَاتِ (بَاءْ مِنْ স্থলে) বলতেন।

এ আপত্তির জবাবে দু'টি কথা বলা যায়-

ক. বৃষ্টি মেঘ থেকে হয়, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু বাতাস উক্ত মেঘকে বৃষ্টি আকারে জমিনে পড়ার ব্যবস্থা করে। যেহেতু বাতাস বৃষ্টি হওয়ার একটি سَبَب বা মাধ্যম। অতএব, سَبَبْ বলে مُسَبَّبْ মুরাদ নেওয়ায় দোষ নেই।

খ. অথবা, এখানে مِنْ অর্থ بَاءْ তখন মূলবাক্য এরূপ দাঁড়াবে, وَاَنْزَلْنَا بِالْمُعْصِرَاتِ অর্থাৎ بِالرِّيَاحِ الْمُثِيْرَةِ لِلسَّحَابِ

Free @ www.e-ilmweebly.com

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বিতীয় মত, যে মতকে আবুল আলিয়া, রবী এবং যাহহাক (র.) গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন তা হলো, اَلْمُعْصِرَات অর্থ- মেঘমালা।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, مُعْصِرَاتٌ অর্থ سَحَابٌ বা মেঘমালা নেওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা অধিকাংশ ভাষাবিদদের মতে مُعْصِرٌ ঐ মেঘকে বলা হয়, যে মেঘ হতে বর্ষণ সন্নিকটে।

মুবারাবাদ বলেন, مُعْصِرٌ ঐ মেঘরকে বলা হয়, যে মেঘ পানি ধারণ করে থাকে এবং সেখান হতে অল্প অল্প করে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকে। এ অর্থেই مَلْجَأ-কে اَلْعَصْرُ বলা হয়। কেননা مَلْجَأ অর্থ- আশ্রয়স্থল। আর اَلْعَصْرُ-এর মধ্যে পানি আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ বালিকাকে مُعْصِرٌ বলা হয়, যে বালিকা বালেগা হওয়ার পথে। কেননা তাকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। তখন ঘর তার জন্য مَلْجَأ বা আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়।

ইমাম কুরতুবী مُعْصِرَاتٌ-এর তৃতীয় অর্থ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

৩. উবাই ইবনে কা'ব, হাসান ইবনে জুবাইর, যায়েদ ইবনে আসলাম, মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান مُعْصِرَاتٌ-এর অর্থ اَلسَّمٰوَاتُ করেছেন। مِنَ الْمُعْصِرَاتِ অর্থ- مِنَ السَّمٰوَاتِ -[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

৪. ইবনে কাইসান (র.) বলেন, اَلْمُعْصِرَات হলো বৃষ্টি বর্ষণকারী বাদল। -[নূরুল কোরআন]

سَحَابٌ উল্লেখ না করে مُعْصِرَاتٌ উল্লেখ করার কারণ : তাফসীর বিশারদগণ এ প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন-

১. কেননা, কুরইশদের ভাষায় مُعْصِرَاتٌ অর্থ- سَحَابٌ -

২. ইমাম মাযেনী বলেছেন, مُعْصِرَاتٌ এখানে ঐ سَحَابٌ বা মেঘমালাকে বলা যায়, যে سَحَابٌ-এ প্রবল বাতাস রয়েছে। কেননা যে মেঘকে প্রবল বাতাসে পেয়ে বসে, সে মেঘ হতে অবশ্যই বৃষ্টি নামে, سَحَابٌ বললে শুধু মেঘ বুঝায়, বৃষ্টিওয়ালা মেঘ বুঝায় না।

৩. مُعْصِرَاتٌ বলা হয় ঐ মেঘকে যা বর্ষণের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যেমন- أَعْصَرَتِ الْجَارِيَةُ ঐ সময় বলা হয়, যখন ঐ বালিকার হায়েয আসা নিকবর্তী হয়ে পড়ে। -[কাবীর]

ثَجَّاجٌ-এর অর্থ : ইমাম রাযী (র.) বলেন, মুষলধারে বর্ষণকে اَلثَّجُّ বলা হয়। যেমন বলা হয়, مَطَرٌ ثَجَّاجٌ অর্থাৎ মুষলধার বৃষ্টি। دَمٌ ثَجَّاجٌ অর্থাৎ অনর্গল প্রবাহিত রক্ত। اَلثَّجُّ শব্দটি কখনো لَازِمٌ হয়ে থাকে, আবার কখনো مُتَعَدِّيٌ-যে সময় لَازِمٌ হবে তখন অর্থ হবে اَلْاِنْصِبَابُ অর্থাৎ প্রবাহিত হওয়া। আর যখন مُتَعَدِّيٌ হবে তখন অর্থ হবে اَلصَّبُّ অর্থাৎ প্রবাহিত করা। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, اَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ অর্থাৎ উত্তম হজ হলো, উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়া এবং কুরবানির জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে مثج বলা হতো। কেননা তিনি তাঁর খুতবায় অনলবর্ষী ছিলেন। ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেন, ثَجَّاجًا-এর অর্থ হলো সর্বদা বর্ষণকারী; আর মুজাহিদ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো প্রচুর বৃষ্টিপাতকারী। -[নূরুল কোরআন]

حب - نَبَاتٌ ও جَنَّةٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : উদ্ভিদকে আমরা প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করতে পারি- ১. কাণ্ডযুক্ত- একে আরবিতে شَجَرٌ বলে। ২. কাণ্ডবিহীন- এটা আবার দু'প্রকার- ক. উপরে আবরণযুক্ত। যেমন শস্যদানা। একে আরবিতে حَبٌّ বলে। খ. আবরণ থাকবে। যেমন ঘাস একে আরবিতে نَبَاتٌ বলে। এ শস্যদানা ও ঘাস তথা শাক-সবজির দিকে ইঙ্গিত করে কুরআন মাজীদে (অন্যত্র) বলা হয়েছে- "كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ" "তোমরা খাও এবং চতুষ্পদ জন্তু চরাও।" এমনিভাবে বিভিন্ন প্রকার তরুলতা ও গাছ-পালা যেখানে একসাথে হয় সে স্থানকে جَنَّةٌ বা বাগান বলে। جَنَّةٌ শব্দের অর্থ মূলত ঢাকা, অন্ধকার। অধিক গাছ-পালার কারণে বাগান ঢাকা অবস্থায় থাকে, যার ফলশ্রুতিতে বাগান অন্ধকার হয়ে যায়। এ জন্য বাগানকে জান্নাত (جَنَّةٌ) বলে।

কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর মানুষের সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ ও দুঃখ-যাতনা ঢাকা পড়ে যাবে। এ জন্য জান্নাতকে জান্নাত বলা হয়।

জমহুর মুফাসসিরে কেরামের মতে حَبٌّ বলতে মানুষের খাদ্য যেমন- গম, আটা, যব, ধান, চাউল ইত্যাদিকে বুঝায়। আর نَبَاتٌ বলতে চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য যেমন- ঘাস, ভূষি ইত্যাদিকে বুঝায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রয়োজন ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে প্রথমে حَبّ তারপর نَبَاتٌ এবং সর্বশেষে جَنّٰتٌ-এর উল্লেখ করা হয়েছে। حَبّ বা শস্যদানাকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এটাই মৌলিক খাদ্য। আর গুরুত্বের দিক দিয়ে نَبَاتٌ বা শাক-সবজির স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে হওয়ায় একে তারপর উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে বাগানের ফল-ফলাদি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় না হওয়ার কারণে একে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে। -[কাশশাফ, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

جَنّٰتٌ ও نَبَاتٌ - حَبٌّ-কে একের পর এক সাজিয়ে বলার কারণ : حَبّ বা শস্যদানাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। কেননা, এটাই মূল খাদ্য। তারপর نَبَاتٌ-কে উল্লেখ করেছেন। কেননা, বাগানের ফল-ফলাদি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় নয়। মোদ্দাকথা, গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনটি বিষয়কে সাজানো হয়েছে। -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত বস্তু প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানে সক্ষম : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের উপরিউক্ত নিদর্শনাবলি উল্লিখ করত কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকারকারীদেরকে বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা যদি চক্ষু মেলে তোমাদের জন্য, নিদ্রা-জাগরণ, দিবা-রাতের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন, জমিন-আসমান এবং পাহাড়-পর্বতকে দেখ, সূর্যের ন্যায় বিশাল অগ্নিকুণ্ডের প্রতি দৃষ্টি দাও, মেঘ হতে বর্ষিত বৃষ্টি এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচার প্রতি গভীর মনোনিবেশের সাথে তাকাও, তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, যে আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতায় এ সকল কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে, সে আল্লাহর পক্ষে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা এবং হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত করা মোটেই কঠিন নয়।

এত বিশাল একটি কারখানা সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না-এর কোনো পরিণাম ও পরিণতি থাকবে না তা কি করে হতে পারে? নিঃসন্দেহে এর পিছনে আল্লাহর একটি বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। এর একটি অনিবার্য পরিণতিও রয়েছে। উক্ত পরিণতিকেই আমরা আখেরাত বা পরকাল বলি। ঘুমের পর যেমন জাগরণ এবং রাতের পর দিন আগমন করে তদ্রূপ দুনিয়ার শেষে আখেরাতের আগমন অনিবার্য।

মোটকথা, আল্লাহর অসীম কুদরত ব্যতীত এ বিশাল পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত বস্তু নিয়ে না অস্তিত্ব লাভ করতে পারত আর না একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-রীতিতে চালু থাকত। তাঁর কোনো কার্যই হেকমত ও উদ্দেশ্যশূন্য নয়। এটা শুধু কোনো গণ্ড-মূর্খের মুখেই শোভা পায় যে, যে মহীয়ান আল্লাহ এ সুবিশাল জগৎ সৃষ্টি করতে ও এটা ধ্বংস করতে সক্ষম সে পবিত্র সত্তা তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। আর এটা কোনো নাদানই বলতে পারে যে, যে আল্লাহ উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছুই সৃষ্টি করেন না- তিনি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করবেন, সমগ্র সৃষ্টির উপর তাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়ে রেখেছেন, মানুষ তাদের যথেচ্ছা ব্যবহার করবে; অথচ এর জন্য তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। কেউ আজীবন পুণ্যের কাজ করে মৃত্যুবরণ করবে অথচ এর জন্য কোনো পুরস্কার পাবে না। অন্যপক্ষে কেউ সারাজীবন পাপাচারে মশগুল থাকবে অথচ এর কোনো প্রতিফল লাভ করবে না।

"قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে বাগানে রকমারি গাছ-পালা, ফল-ফলাদি ইত্যাদি থাকে, তাকে جَنَّة বলা হয়। جَنَّة শব্দের অর্থ- 'ঢাকা', 'অন্ধকার'। কেননা অধিক গাছপালার কারণে এ বাগানটি ঢাকা অবস্থায় থাকে, যার ফলশ্রুতিতে বাগান অন্ধকার হয়ে যায়। এ কারণে বাগানকে জান্নাত বলা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে মানুষের সকল কষ্ট-ক্লেশ জান্নাতে প্রবেশ করার সাথে সাথে ঢাকা পড়বে বা মুছে যাবে। এ কারণে জান্নাতকে 'জান্নাত' বলা হয়।

اَلْفَافٌ-এর বিশ্লেষণ : اَلْفَافٌ শব্দটির ব্যাপারে মুফাসসিরীনের মধ্যে নিম্নোক্ত মতভেদ দেখা যায়-

১. এ শব্দটি এমন যে, এর একবচন নেই। যেমন اَوْزَاعٌ এবং اَخْيَافٌ-এর একবচন নেই।

২. ভাষাবিদদের মধ্য হতে অনেকেই একবচন আছে বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে-

   ক. আখফাশ, কিসাঈর মতে একবচন হলো لِفٌّ [লামের নিচে যের দিয়ে]।

   খ. কাসাঈ লামের উপরে পেশ দিয়েও সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

   গ. মুবাররাদ বলেছেন, لَفَّاءُ-এর বহুবচন لِفٌّ এবং لِفٌّ-এর বহুবচন اَلْفَافٌ

   ঘ. কারো মতে اَلْفَافٌ শব্দ لَفِيْفٌ-এর বহুবচন। যেমন- اَشْرَافٌ শব্দটি شَرِيْفٌ-এর বহুবচন।

-[কাবীর, রূহুল মা'আনী, কাশশাফ, ফাতহুল কাদীর

৩. কারো মতে مُلْتَفَّةٌ-এর বহুবচন। বহুবচনের সময় অতিরিক্ত হরফগুলো বাদ পড়ে গেছে। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٧. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلَائِقِ كَانَ مِيقَاتًا وَقْتًا لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.

১৭. নিশ্চয়ই ফয়সালার দিন সৃষ্টি জগতের মাঝে [সুনির্ধারিত রয়েছে] পুরস্কার ও শাস্তিদানের জন্য নির্ধারিত সময়।

١٨. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ الْقَرْنِ بَدَلٌ مِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ اَوْ بَيَانٌ لَهُ وَالنَّافِخُ اِسْرَافِيلُ فَتَأْتُونَ مِنْ قُبُوْرِكُمْ اِلَى الْمَوْقِفِ اَفْوَاجًا جَمَاعَاتٍ مُخْتَلِفَةً.

১৮. সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে صُوْر শব্দের অর্থ শিঙ্গা, এটা ফয়সালার দিন হতে بَدَلٌ অথবা তার بَيَانٌ আর ফুৎকারদানকারী ইসরাফীল (আ.)। তখন তোমরা আগমন করবে তোমাদের সমাধি ক্ষেত্র হতে অবস্থান ক্ষেত্র পানে দলে দলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে।

١٩. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ شُقِّقَتْ لِنُزُوْلِ الْمَلَائِكَةِ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ذَاتَ اَبْوَابٍ.

১৯. আর আকাশ উন্মুক্ত করা হবে فُتِحَتْ শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থ ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বিদীর্ণ হবে। ফলে তা বহু দ্বার বিশিষ্ট হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট।

٢٠. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ذُهِبَ بِهَا عَنْ اَمَاكِنِهَا فَكَانَتْ سَرَابًا هَبَاءً اَيْ مِثْلَهُ فِيْ خِفَّةِ سَيْرِهَا.

২০. আর গতিশীল করা হবে পর্বতমালাকে এদেরকে স্বস্থান হতে হটিয়ে নেওয়া হবে ফলে তা মরীচিকা হয়ে পড়বে ধুলাবালি অর্থাৎ ধুলাবালির ন্যায়, এর চলার দ্রুততায়।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ يُنْفَخُ...اَفْوَاجًا -এর বিশ্লেষণ : ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার ব্যাপারে দু'টি মত উল্লেখ করেছেন।

ক. রূহগুলোকে শরীরের মধ্যে ফুঁকের মাধ্যমে স্থাপন।

খ. শিঙ্গা একটি শিং-এর নাম যেখানে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতা ফুঁক দেবেন। এ ফুঁকের সাথে সাথে সৃষ্টজীব প্রাণবন্ত হয়ে একস্থানে একসাথে থাকবে। -[কাবীর]

يَوْمَ يُنْفَخُ ও اَفْوَاجًا -এর মহল্লে ই'রাব : يَوْمَ يُنْفَخُ পূর্বে উল্লিখিত يَوْمَ الْفَصْلِ থেকে بَدَلٌ হয়েছে।

অথবা, عَطْفُ بَيَانٍ হয়েছে।

অথবা, اَعْنِيْ উহ্য ক্রিয়ার مَفْعُوْلٌ হিসেবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, কাবীর, ফতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ اَفْوَاجًا : শব্দটি تَأْتُوْنَ ক্রিয়ার فَاعِلٌ হতে حَالٌ হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

فَتَأْتُوْنَ -এর فَاءٌ-এর অর্থ : فَتَأْتُوْنَ -এর মধ্যে যে فَاءٌ দেখা যায়, এ ধরনের فَاءٌ -কে فَصِيْحَةٌ বলা হয়। এ فَاءٌ একটি বাক্যের কাজ দেয়। যে বাক্যটির অর্থ অবস্থার আলোকে বুঝা যায় এবং ঐ বাক্যটি 'মানুষের আসাটা খুব তাড়াতাড়ি হবে' এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে। মূলবাক্যটি এভাবে ছিল-

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَحْيَوْنَ فَتُبْعَثُوْنَ مِنْ قُبُوْرِكُمْ فَتَأْتُوْنَ اِلَى الْمَوْقِفِ عَقَبَ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ اَصْلًا اَفْوَاجًا

-[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : সূরার প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামতের ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে তাঁর এমন কিছু কুদরতের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাদের সামনে রয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলে কিয়ামত ও পরকালের সম্ভাবনা সহজেই অনুধাবন করা যায়। উপরন্তু পরকালের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতাও যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

অতঃপর আলোচ্য আয়াত কয়টিতে মহান আল্লাহ সরাসরি কিয়ামত ও পুনরুত্থানের আলোচনা করেছেন এবং এগুলো সংঘটিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : "مِيْقَاتًا" مِيْقَاتًا-এর অর্থ : নিশ্চয়ই বিচারের একটি নির্দিষ্ট দিন পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এটা দেরিতেও আসবে না; আগেও চলে আসবে না। তবে কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানবে না। ঐ নির্ধারিত দিন এসে পড়লে দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটবে।

অথবা, অর্থ এই হবে যে, إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ حَدٌّ لِلْخَلَائِقِ يَنْتَهُوْنَ إِلَيْهِ অর্থাৎ নিশ্চয় ফয়সালার দিন সৃষ্টজীবের জন্য শেষ সীমা হিসেবে নির্ধারিত হবে তারা ঐ সীমা পর্যন্ত পৌছবে। প্রথম نَفْخَة-এর সাথে সাথে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে।

অথবা, كَانَ مِيْقَاتًا لِمَا وَعَدَ اللّٰهُ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ অর্থাৎ ঐদিন সৃষ্টজীবের জন্য ঐ ওয়াদা কার্যকর হবে, যে ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা পুণ্য ও পাপের জন্য করেছেন।

অথবা, كَانَ مِيْقَاتًا لِاجْتِمَاعِ كُلِّ الْخَلَائِقِ فِيْ فَصْلِ الْحُكُوْمَاتِ وَقَطْعِ الْخُصُوْمَاتِ অর্থাৎ ঐ দিন সমস্ত সৃষ্টজীবের একত্র হওয়ার দিন, ঐদিনে সমস্ত অধিকারের ফয়সালা হবে এবং ঝগড়ার মীমাংসা হবে।

–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কাশশাফ]

يَوْمَ الْفَصْلِ নামকরণের কারণ : চূড়ান্ত বিচারের দিনকে يَوْمَ الْفَصْلِ বলা হয়েছে। অথচ فَصْل অর্থ কেটে ফেলা, পৃথক করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ঐদিন সকল মানুষের মধ্যে [তথা শাসক-শাসিত, জালিম-মজলুম ইত্যাদির মাঝে] পার্থক্য করে দেবেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কাজের জন্য এক আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যাবে।
–[ফাতহুল কাদীর, সাফওয়া, কুরতুবী]

শিঙ্গায় ফুঁকের সংখ্যা : কুরআন মাজীদের সূরা আয্-যুমার -এর ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى দ্বারা বুঝা যায়– শিঙ্গায় ফুঁক দু'বার হবে; কিন্তু সূরা নমলের আয়াতে এ দু'টি ফুঁকের পূর্বে আরো একটি ফুঁকের উল্লেখ রয়েছে। ঐ তিনটি ফুঁকের তারতীব বিন্যাস নিম্নে দেওয়া হলো,

১. نَفْخَةُ الْفَزَعِ -এ ফুঁকের মাধ্যমে উপস্থিত সকল প্রাণী হতবুদ্ধি বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে।
২. نَفْخَةُ الصَّعْقِ -এ ফুঁকের মাধ্যমে সবাই মরে যাবে।
৩. نَفْخَةُ الْقِيَامِ -এ ফুঁকের মাধ্যমে সমস্ত মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে এবং আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য স্ব-স্ব শয়নকক্ষ থেকে বের হয়ে পড়বে।

আলোচ্য আয়াতে উক্ত ফুঁকের পর কি ঘটবে? : আলোচ্য আয়াতে শিঙ্গার শেষ ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। এ ফুঁক ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে সকল মানুষ মৃত অবস্থা হতে জীবিত হয়ে উঠবে। এখানে 'তোমরা' বলে শুধু তাদেরকে বুঝানো হয়নি। যারা এ আয়াত নাজিল হওয়ার সময় বর্তমান ছিল; বরং প্রথম সৃষ্টি সূচনার দিন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ায় আগমন করেছে সকলকেই 'তোমরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের অন্যান্য কয়েকটি আয়াতের ন্যায় এখানেও কিয়ামতের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের উল্লেখ এক সঙ্গে করা হয়েছে প্রথম আয়াতে সে অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে, যা শেষ বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। আকাশমণ্ডল উন্মুক্ত করে দেওয়ার অর্থ হলে উর্ধ্বতন জগতে কোনোরূপ বাধা প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব থাকবে না। পাহাড় চালিয়ে দেওয়া ও সেগুলো মরীচিকার ন্যায় হয়ে যাওয়ার অর্থ এই যে, চোখের সামনেই পাহাড় নিজ স্থান হতে উৎপাটিত হয়ে শূন্যলোকে উড়তে শুরু

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করবে। অতঃপর এটা চূর্ণবিচূর্ণ ও বিন্দু বিন্দু হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, কিছুক্ষণ পূর্বেও যেখানে বিশাল পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল সেখানে বিরাট বালু সমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়বে না। সূরা ত্বাহা-এর মধ্যে এ ব্যাপারে নিম্নরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে– এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে সে দিবসে এ পাহাড়সমূহ কোথায় উধাও হয়ে যাবে? তাদেরকে বল, আমার রব এদেরকে ধূলিকণায় পরিণত করে উড়িয়ে দেবেন। আর ভূ-পৃষ্ঠকে এমন সমতল করে দেবেন যে, তোমরা তাতে কোনোরূপ উঁচু-নিচু ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।

হযরত থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে লিখেন, বিচারের সময় নিকটবর্তী হলে পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করে নিম্নভূমির সমান করে দেওয়া হবে। যাতে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ সমতল ভূমিতে পরিণত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠের একাংশ হতে অন্য অংশের সকল মানুষকে একই মাঠে দেখা যায়। প্রথম ফুৎকারের সময় যদি পাহাড় স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনাটিকে ধরে নেওয়া হয়, তবে বলা যায় যে, প্রথম ফুৎকার পৃথিবী ধ্বংসের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হবে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। অতঃপর সেগুলো বালুকারাশির আকারে উড়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। –[কামালাইন, বয়ানুল কুরআন]

কিয়ামত কখন এবং কোথায় সংঘটিত হবে : কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য হতে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশসমূহ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না; বরং শুধু বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে মাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। অতঃপর প্রথম শিঙ্গার ফুঁক এবং শেষ শিঙ্গার ফুঁকের মাঝখানে একটি বিশেষ সময়ে যা কেবল আল্লাহ-ই জানেন পৃথিবী ও আকাশসমূহের বর্তমান রূপ ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আর তদস্থলে অপর এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা অন্য ধরনের প্রাকৃতিক আইন সহকারে চালু করে দেওয়া হবে। এটা হলো পরকালের জগৎ বা হাশরের ময়দান। অতঃপর শেষবারের শিঙ্গা ফুঁকের সঙ্গে আদম হতে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টির সমস্ত মানুষকে নতুন করে জীবন্ত করা হবে এবং তারা বিভিন্ন দলে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। কুরআনের ভাষায় এটাই হাশর। হাশর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো চারদিক হতে গুছিয়ে আনা বা একত্রিত করা। কুরআনের ভাষা ও ইঙ্গিতে এবং হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণায় এ কথাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জমিনের উপরই হাশর অনুষ্ঠিত হবে। আদালত এখানেই কায়েম হবে এবং পাপ-পুণ্য ওজনের দাঁড়িপাল্লা এখানেই বসানো হবে। হাশর শুধু আধ্যাত্মিক হবে না; বরং তথায় মানুষ, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে (স্বশরীরে) উত্থিত হবে।

শিঙ্গায় কখন ফুঁক দেওয়া হবে এবং কিয়ামত কখন কায়েম হবে, তা নির্ধারিত রয়েছে। তবে তা আমাদের জানা নেই। তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন।

কিয়ামত কোন অবস্থায় কায়েম হবে : কিয়ামত অকস্মাৎ ও অতি দ্রুত সংঘটিত হবে। পূর্ব হতে মানুষ মোটেই তা আঁচ করতে পারবে না। মানুষ পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কাজ করতে থাকবে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিন্দুমাত্র ধারণাও মানুষের মনে জাগবে না। হঠাৎ একটি বিকট শব্দ হবে। এক মুহূর্তেই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং সকলেই ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছে যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, মানুষ রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে থাকবে, বাজারে বেচাকেনা করতে থাকবে, বসে আলাপরত থাকবে এমন সময় হঠাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। কেউ কাপড় ক্রয় করতে থাকবে অথচ হাত হতে কাপড়টি রাখার সময় পাবে না, মৃত্যু এসে পড়বে। কেউ জন্তুকে পানি পান করানোর জন্য পানি দ্বারা হাউজ ভর্তি করতে থাকবে অথচ পানি পান করানোর পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে। কেউ খাদ্য খেতে বসবে অথচ এক গ্রাস শেষ করারও সুযোগ পাবে না– কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

'দলে দলে' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : কিয়ামতের ময়দানে লোকেরা দলে দলে উপস্থিত হবে। এ দলে দলে দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

প্রত্যেক নবীর উম্মতগণ পৃথক পৃথকভাবে দলবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হবে।

অথবা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেও বিভিন্ন দল হবে। নবী করীম ﷺ-কে أَفْوَاجًا শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, আমার উম্মত দশ প্রকারের রূপ ধারণ করে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে। যেমন– ১. বানর, ২. শূকর, ৩. উল্টামুখ, ৪. অন্ধ, ৫. বোবা-বধির, ৬. জিহ্বা বক্ষের উপর ঝুলন্ত, নিজের জিহ্বা নিজে চর্বন করবে। তাদের দেখে হাশরবাসীগণ ঘৃণায় নাক ছিটকাবে, ৭. হাত-পা কর্তিত, ৮. অগ্নির শূলে বিদ্ধ, ৯. মৃতের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধযুক্ত, ১০. আগুনের পোশাক পরিহিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রথম দল হলো চুগলখোর, তারা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াত। এ জন্য তাদেরকে বানরের আকারে হাশরে উত্থাপিত করা হবে। **দ্বিতীয়ত** হারাম ভক্ষণকারী। তাদেরকে শূকরের আকৃতিতে উঠানো হবে। **তৃতীয় দল** হলো সুদখোর-তাদেরকে উল্টোমুখি করে উপস্থিত করা হবে। **চতুর্থ দল** হলো অবিচারকারী বিচারক। তারা অন্ধ হয়ে উত্থিত হবে। **পঞ্চম দল** হলো জাদু প্রদর্শনকারী ও অশ্লীল পোশাক পরিধানকারী– তারা বোবা ও বধির হয়ে উঠবে। **ষষ্ঠ দল** হলো এমন আলিম যাদের কথা ও কাজে মিল ছিল না– তারা নিজের জিহ্বা নিজে চর্বন করবে। **সপ্তম দল** হলো যারা প্রতিবেশির সাথে দুর্ব্যবহার করেছে– তাদের হাত-পা কর্তিত হবে। **অষ্টম দল** হলো চুগলখোর শাসক ও বিচারকদের ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগকারী– তাদের শূলিতে চড়ানো হবে। **নবম দল** হলো যারা জাকাত আদায় করেনি এবং কামভাবে মগ্ন ছিল– তারা দুর্গন্ধময় অবস্থায় থাকবে। **দশম দল** হলো যারা অহঙ্কারী ও বিলাসী ছিল– তাদরকে আগুনের পোশাক পরিয়ে উঠানো হবে। –[বয়ানুল কুরআন, রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ আমাদের নিকট সত্যই বলছেন যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করা হবে।

১. একদল হবে, যারা পানাহারে তৃপ্ত থাকবে, উত্তম পোশাক পরিহিত থাকবে এবং যানবাহনে আরোহী থাকবে।

২. দ্বিতীয় দল পদব্রজে দাঁড়াতে থাকবে।

৩. তৃতীয় দল মাটির উপর মুখ থুবড়ে পড়বে এবং সে অবস্থায়ই চলতে থাকবে। –[নাসায়ী, হাকিম, বায়হাকী]

فَتَأْتُونَ-এর মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : فَتَأْتُونَ শব্দটি বহুবচন, মধ্যম পুরুষের। অর্থ– 'তোমরা আসবে।' এখানে 'তোমরা' বলতে কেবল সে লোকদের বুঝানো হয়নি, যারা এ আয়াত নাজিল হওয়ার সময় বর্তমান ছিল; বরং প্রথম সৃষ্টির সূচনার দিন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়ার বুকে জন্মগ্রহণ করেছে, সেসব মানুষকেই 'তোমরা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا" : অর্থাৎ "আর আকাশসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং এতে অসংখ্য দুয়ার হবে।" এর অর্থ উর্ধ্ব আকাশসমূহে কোনো প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। তখন চতুর্দিক হতে আসমানি মসিবত এমন অব্যাহত ধারায় বর্ষিত হতে থাকবে যে, মনে হবে এটার বর্ষণের সব দুয়ারই যেন খুলে দেওয়া হয়েছে। অথবা, ফেরেশতাদের ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করার জন্যই এভাবে আসমানের মধ্যে বহু সংখ্যক ছিদ্রপথ করে দেওয়া হবে। সূরা ফোরকানের يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ আয়াতেও এ কথারই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আসমানের ছিদ্র পথসমূহ দেখা দিবে এবং তাতে ফেরেশতাগণ অবতরণ করবে। অথবা, আকাশের অনেক দরজা আছে। ঐ দরজাগুলো সহই আকাশের সৃষ্টি। ঐ দরজাগুলোই খুলে দেওয়া হবে। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, فُتِحَتْ অর্থ قُطِعَتْ অর্থাৎ আকাশকে দরজার ন্যায় টুকরো টুকরো করে দেওয়া হবে।

অথবা, প্রত্যেক বান্দার জন্যে আসমানের মধ্যে দু'টি দরজা আছে। একটি তার রিজিকের জন্য আর একটি আ'মালের জন্য। কিয়ামত যখন এসে পড়বে তখন ঐ দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। –[ফাতহুল কাদীর ও কুরতুবী]

আর কারো মতে, এর অর্থ হলো আসমানে এত ফাটল ধরবে যে, সমগ্র আসমান যেন বহু দ্বারে পরিণত হয়ে যাবে। –[নূরুল কোরআন]

পূর্ণ আকাশ দরজাময় হয়ে যাওয়ার অর্থ : আকাশ খুলে দেওয়ার পর এটা দরজা হয়ে যাবে। বাক্যটির মূল বক্তব্য এটা নয়; বরং আয়াতটির অর্থ করতে হলে কিছু উহ্য শব্দ মেনে নিতে হবে। সুতরাং فُتِحَتْ শব্দের পরে اَبْوَابًا মুযাফ উহ্য ধরতে হবে। মূলে فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ ছিল।

অথবা, اَبْوَابًا-এর পূর্বে ذَاتَ মুযাফ উহ্য ধরতে হবে। মূলে فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ ذَاتَ اَبْوَابٍ ছিল। তখন অর্থ এই দাঁড়াবে– আকাশের সকল দরজা খুলে দেওয়া হবে, তখন পূর্ণ আকাশটিই দরজায় পরিণত হবে।

দরজায় পরিণত হওয়ার কারণ : বেশি ফেটে যাওয়ার কারণে, অথবা আগে থেকেই দরজা থাকার কারণে, অথবা ফাটা অংশটি বেশি ফাঁক হয়ে যাওয়ার কারণে। অথবা, আকাশের দরজা অর্থ এর পথসমূহ, অথবা যখন আকাশের দরজা বেশি হবে, তখন শুধু দরজা আর দরজা দেখা যাবে। সব দরজাগুলো খোলা থাকবে। বেশি দরজার কারণে পূর্ণ আকাশটিকে দরজাময় দেখা যাবে। –[রূহুল মা'আনী, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

অতীতকালের শব্দ উল্লেখের কারণ : আয়াতে কারীমায় فُتِحَتْ শব্দটি অতীতকালের। আকাশ খোলার ঘটনা ভবিষ্যতে কিয়ামতের সময় হবে। ভবিষ্যৎকালের শব্দ تُفْتَحُ উল্লেখ না করে অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো– কেননা এ ঘটনা অবশ্যই এবং নিশ্চিতভাবেই ঘটবে। যে ঘটনা নিশ্চিত ঘটবে এর ব্যাপারে অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করার নিয়ম রয়েছে। যেমন–পূর্ণ বিবরণী লেখার পর 'চিঠি' হয়, কিন্তু লেখা শুরুর পূর্বেই বলা হয়–'চিঠি' লিখবো।

–[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا" : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের সময় পাহাড়ের ছয়টি অবস্থা হবে, যেমন–

১. حَالَةُ الْاِنْدِكَاكِ তথা চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা। যেমন, কুরআন মাজীদের আয়াত– وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ ভূতল এবং পর্বতরাশিকে উপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

২. اَلْحَالَةُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ তথা ধুনা পশমের মতো অবস্থা। যেমন, আল্লাহর ঘোষণা– وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ অর্থাৎ পাহাড় রঙ-বেরঙ-এর ধুনা পশমের ন্যায় হবে।

৩. اَلْحَالَةُ كَالْهَبَاءِ তথা ধূলিকণার ন্যায় অবস্থা। এ অবস্থাটি ধুনা পশমের মতো হওয়ার পর হবে। যেমন, কুরআনের বাণী– وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ـ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا অর্থাৎ পাহাড় এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেওয়া হবে যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

৪. حَالَةُ النَّسْفِ তথা ধূলিকণায় পরিণত হয়ে পড়ে থাকা অবস্থা। যেমন, কুরআন মাজীদের আয়াত– وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا অর্থাৎ তারা পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলুন, আমার রব এগুলোকে ধূলিকণায় পরিণত করে দিবেন। এ অবস্থায় ধূলিকণাগুলো মাটির উপর পড়ে থাকবে। মাটি দেখা যাবে না। শুধু ধূলি আর ধূলি।

৫. حَالَةُ الْغُبَارِ তথা উল্লিখিত ধূলিকণা জমিনের উপর হতে প্রবল বাতাসের মাধ্যমে উড়তে থাকবে। এমতাবস্থায় জমিন দেখা যাবে, সমস্ত ধূলি উপরে উড়তে থাকবে। যেমন, আল্লাহর বাণী– وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ـ تَمُرُّ مِنَ السَّحَابِ

৬. حَالَةُ السَّرَابِ তথা মরীচিকার ন্যায়। অর্থাৎ পাহাড়ের স্থানগুলো এমন হবে যে, কিছুই বিদ্যমান থাকবে না। মরীচিকার ন্যায় পাহাড় আছে ধারণা হবে, কিন্তু সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলে কিছুই পাওয়া যাবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا –[কাবীর, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে سَرَابًا অর্থ : سَرَابًا শব্দটির আভিধানিক অর্থ– মরীচিকা, যা দিনের মধ্যভাগে সূর্যের প্রখরতার মধ্যে পানির ন্যায় মনে হয়; কিন্তু আয়াতে سَرَابًا অর্থ কি – এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

১. জালালাইনের ব্যাখ্যাকার বলেন, سَرَابًا اَىْ هَبَاءً অর্থাৎ سَرَابٌ অর্থ এখানে ধুলাবালি।

২. কারো মতে سَرَابٌ এখানে আভিধানিক (মরীচিকা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন আয়াতে তাশবীহ উদ্দেশ্য হবে। অর্থ এই দাঁড়েব– ঐ পাহাড়গুলো মরীচিকার ন্যায় দেখাবে। তবে سَرَابٌ-এর অর্থ هَبَاءٌ হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলা হয় যে, এ অর্থ কোনো অভিধানে পাওয়া যায় না। অতএব, سَرَابٌ-এর আসল অর্থ 'মরীচিকা' করাই উত্তম। কেননা অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ –[জালালাইনের প্রান্ত টীকা, রূহুল মা'আনী]

অনুবাদ :

٢١. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا رَاصِدَةً اَوْ مُرْصَدَةً .

২১. অবশ্যই জাহান্নাম একটি ঘাঁটি বিশেষ, এটা ওতপেতে রয়েছে। অথবা এটা ওতপেতে থাকার স্থান [এ স্থলে مِرْصَادًا-শব্দটি رَاصِدَةً অথবা مُرْصَدَةً -এর অর্থে হবে।

٢٢. لِلطَّاغِيْنَ الْكَافِرِيْنَ فَلَا يَتَجَاوَزُوْنَهَا مَابًا مَرْجِعًا لَهُمْ فَيَدْخُلُوْنَهَا .

২২. আল্লাহদ্রোহীদের জন্য তথা কাফেরদের জন্য। কাজেই তারা তা অতিক্রম করে যেতে পারবে না। আশ্রয়স্থল অর্থাৎ তা তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে। সুতরাং অবশ্যই তাতে তারা প্রবেশ করবে।

٢٣. لٰبِثِيْنَ حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَىْ مُقَدَّرًا لُبْثُهُمْ فِيْهَا اَحْقَابًا دُهُوْرًا لَا نِهَايَةَ لَهَا جَمْعُ حُقْبٍ بِضَمِّ اَوَّلِهِ .

২৩. তারা অবস্থান করবে لٰبِثِيْنَ শব্দটি حَالٌ مُقَدَّرَةٌ হয়েছে। অর্থাৎ তাদের তথায় অবস্থান করা অবধারিত তথায় যুগ যুগ ধরে অশেষ কালব্যাপী। বহু যুগ পর্যন্ত যার কোনো শেষ নেই। এ স্থলে اَحْقَابٌ শব্দটি حُقْبٌ [প্রথম অক্ষর তথা ح অক্ষরটি পেশযোগে] -এর বহুবচন।

٢٤. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا لَا نَوْمًا وَّلَا شَرَابًا مَا يُشْرَبُ تَلَذُّذًا .

২৪. তারা আস্বাদন করবে না ঠাণ্ডা তথা ঘুম এবং কোনো পানীয় যা স্বাদ আস্বাদনের জন্য পান করা হয়। [অর্থাৎ পান উপযোগী]।

٢٥. اِلَّا لٰكِنْ حَمِيْمًا مَاءً حَارًّا غَايَةَ الْحَرَارَةِ وَغَسَّاقًا بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مَا يَسِيْلُ مِنْ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُمْ يَذُوْقُوْنَهُ جُوْزُوْا بِذٰلِكَ .

২৫. তবে কিন্তু ফুটন্ত উত্তপ্ত গরম পানি অত্যধিক গরম পানি। আর পুঁজ [ক্ষতের ক্ষরণ] غَسَّاقٌ শব্দটি তাশদীদ যোগে এবং তাশদীদ ব্যতীত উভয়ভাবেই পড়া জায়েজ। غَسَّاقٌ দ্বারা এখানে জাহান্নামীদের শরীর হতে প্রবাহিত পুঁজকে বুঝানো হয়েছে। তারা এর স্বাদ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।

٢٦. جَزَاءً وِّفَاقًا مُوَافِقًا لِعَمَلِهِمْ فَلَا ذَنْبَ اَعْظَمُ مِنَ الْكُفْرِ وَلَا عَذَابَ اَعْظَمُ مِنَ النَّارِ .

২৬. সমুচিত প্রতিফল তাদের কৃতকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল। সুতরাং কুফরির চেয়ে মহাপাপ আর কিছুই নেই এবং জাহান্নাম অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তিও হতে পারে না।

٢٧. اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ يَخَافُوْنَ حِسَابًا لِاِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ .

২৭. নিশ্চয় তারা আশা করত না, আশঙ্কা করত না, হিসাব-নিকাশের, কেননা তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত।

٢٨. وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا الْقُرْاٰنِ كِذَّابًا تَكْذِيْبًا .

২৮. আমার আয়াতসমূহকে তারা অস্বীকার করত। অর্থাৎ কুরআনকে অস্বীকার করত সম্পূর্ণভাবে, অর্থাৎ মোটেই বিশ্বাস করত না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٩. وَكُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ أَحْصَيْنٰهُ ضَبَطْنَاهُ كِتٰبًا كَتْبًا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ لِنُجَازِيَ عَلَيْهِ وَمِنْ ذٰلِكَ تَكْذِيْبُهُمْ بِالْقُرْاٰنِ.

২৯. আর সব কিছু সকল প্রকার আমলকে আমি সংরক্ষণ করেছি, রেকর্ড করেছি। লিপিবদ্ধ আকারে লাওহে মাহফূযে [সংরক্ষিত ফলকে] যাতে আমি তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দিতে পারি। আর তাদের আমলসমূহের মধ্যে কুরআন অস্বীকার করাও অন্তর্ভুক্ত।

٣٠. فَذُوْقُوْا أَيْ فَيُقَالُ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عِنْدَ وُقُوْعِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ ذُوْقُوْا جَزَاءَكُمْ فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا فَوْقَ عَذَابِكُمْ.

৩০. সুতরাং আস্বাদন কর অর্থাৎ আখেরাতে তাদের উপর শাস্তি অবতরণকালে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে। তোমাদের প্রতিফল আস্বাদন করো। আমি তো তোমাদেরকে শাস্তি ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করবো না তোমাদের শাস্তির উপরে।

তাহকীক ও তারকীব

لِلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا-এর তারকীবী অবস্থা : এ আয়াতটির তারকীবী অবস্থা কয়েকটি হতে পারে। যথা–

ক. طٰغِيْنَ শব্দটি পূর্বের আয়াতের مِرْصَادًا-এর বিশেষণ (صِفَةٌ) হয়েছে। তখন মূলবাক্য এভাবে হবে–
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا كَائِنًا لِلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا

খ. অথবা, لِلطّٰغِيْنَ শব্দটি مَاٰبًا হতে حَالٌ হয়েছে। তখন অর্থ এই হবে যে, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مَرْجِعًا مَأْوٰى كَائِنًا لَهُمْ يَرْجِعُوْنَ إِلَيْهِ لَامُحَالَةَ জাহান্নাম তাদের আশ্রয়স্থল এবং প্রত্যাবর্তনের স্থান, এমতাবস্থায় যে, তারা তথায় অবশ্যই ফিরে যাবে।

গ. অথবা, كَانَتْ-এর দ্বিতীয় খবর।

ঘ. অথবা, مِرْصَادٌ শব্দের সাথে সম্পর্কিত (مُتَعَلِّقٌ) তখন مِرْصَادٌ শব্দের অর্থ হবে مُعَدَّةٌ [প্রস্তুত]। আর مَاٰبًا শব্দটির তারকীবেও কয়েকটি দিক দেখা যায়–

ক. مَاٰبًا শব্দটি مِرْصَادًا হতে بَدَلٌ হয়েছে।

খ. কারো মতে– كَانَتْ-এর দ্বিতীয় خَبَرٌ হয়েছে।

গ. অথবা, مِرْصَادًا শব্দের বিশেষণ হয়েছে।

ঘ. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে مِرْصَادًا হতে حَالٌ হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, এখানে দু'টি দিক রয়েছে–

ক. যদি আমরা বলি– তা শুধু কাফেরদের জন্য مِرْصَادٌ বা ঘাঁটি। তাহলে لِلطّٰغِيْنَ কথাটি পূর্বের কথার পরিপূরক হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তখন বাক্য এভাবে হবে যে, إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطّٰغِيْنَ তারপর مَاٰبًا শব্দটি مِرْصَادًا হতে بَدَلٌ হবে।

খ. আর যদি বলি– তা সাধারণভাবে মু'মিন ও কাফের সকলের জন্য ঘাঁটি বা অতিক্রম করার রাস্তা, তাহলে আয়াতটি مِرْصَادًا পর্যন্ত যাবে لِلطّٰغِيْنَ হতে নতুন আয়াত এবং নতুন কথা শুরু। মনে হয় যেন বলা হয়েছে– إِنَّ جَهَنَّمَ مِرْصَادٌ لِلْكُلِّ وَمَاٰبٌ لِلطّٰغِيْنَ خَاصَّةً অর্থাৎ জাহান্নাম প্রত্যেকের জন্য অতিক্রমস্থল ; কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা এবং প্রত্যাবর্তনস্থল।

প্রথম অর্থ করলে مِرْصَادًا-এর উপর وَقْف করা যাবে না, আর দ্বিতীয় অর্থ করলে مِرْصَادًا-এর উপর وَقْف করতে হয়। –[কাবীর]

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا-এর মহল্লে ই'রাব :

১. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا আয়াতটি مَنْصُوْبٌ অবস্থায় রয়েছে। কেননা, এটা طٰغِيْنَ হতে حَالٌ হয়েছে।

২. অথবা أَحْقَابٌ-এর বিশেষণ (صِفَتٌ) হিসেবে مَنْصُوْبٌ-এর অবস্থায় আছে।

৩. অথবা, এটা মুস্তানাফা অর্থাৎ নতুন বাক্য। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

Free@ www.e-ilm.weebly.com

وَغَسَّاقًا আয়াতটির তারকীব : আয়াতটি সম্পূর্ণ مُسْتَثْنٰى হয়েছে। মুসতাছনা মুত্তাসিল এবং মুনকাতি' উভয় ধরনের হতে পারে।

১. যদি اَلْبَرْدُ-এর অর্থ نَوْمٌ হয়, তাহলে মুসতাছনা মুনকাতি' হবে।

২. আর যদি اَلْبَرْدُ অর্থ اَلْبُرُوْدَةُ হয়, তাহলে بَدَل হবে। -[কুরতুবী]

৩. আর যদি شَرَابًا হতে মুসতাছনা হয়, তাহলে মুসতাছনা মুত্তাসিল হবে। -[ফাতহুল কাদীর, হাশিয়ায়ে জালালাইন]

جَزَاءً وِّفَاقًا-এর মহল্লে ই'রাব : কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আয়াতটির মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, جَزَاءً মাফউলে মুতলক হিসেবে মানসূব হয়েছে এবং وِفَاقًا তার صِفَتٌ [বিশেষণ] হয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হবে- جَازَيْنَاهُمْ جَزَاءً وَافَقَ اَعْمَالَهُمْ.

আর কেউ কেউ মূলবাক্য এভাবে দেখাচ্ছেন যে, جُوْزُوْا جَزَاءً وَافَقَ اَعْمَالَهُمْ -[সাবী, ফাতহুল কাদীর, জালালাইন]

আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ হিসেবেও মানসূব হতে পারে। অথবা, فِعْلٌ مُقَدَّرٌ সহ মুস্তানাফা বাক্য হতে পারে। -[রূহুল মা'আনী]

وِفَاقٌ শব্দের বিশ্লেষণ : এ শব্দটির বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত মতামত পরিলক্ষিত হয়-

১. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, اَلْوِفَاقُ শব্দটি اَلْوَفْقُ-এর বহুবচনে আর اَلْوَفْقُ এবং اَلْمُوَافِقُ একই অর্থ প্রকাশ করে। -[ফাতহুল কাদীর]

২. আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে- اَلْوِفَاقُ শব্দটি وَافَقَ ক্রিয়ার মাসদার। -[রূহুল মা'আনী]

৩. সর্বাবস্থায় অর্থ নিতে হবে-উপযুক্ত, উপযোগী, অনুকূল বা অনুরূপ।

كِذَّابًا -এর মহল্লে ই'রাব :

১. مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে।

২. مَفْعُوْلٌ بِهٖ হিসেবে মানসূব হয়েছে। এ সময় كِذَّابًا - كَاذِبٌ শব্দের বহুবচন হবে। অথবা كِذَّابٌ মাসদারটি ইসমে ফায়েল-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। -[কাবীর]

৩. আবূ হাতিম (র.) كِذَّابًا-কে حَالٌ হিসেবে মানসূব বলেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে যোগসূত্র : সূরার প্রথমে কাফেরদের পক্ষ হতে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, সে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিস্তারিত ভূমিকা পেশ করা হয়েছে। তারপর যুক্তি-প্রমাণসহ তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেই উত্তরে يَوْمَ الْفَصْلِ -এর আলোচনা এসেছে। এখন قَوْلُهٗ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا হতে يَوْمَ الْفَصْلِ-এর আহকামের বিস্তারিত বিবরণ আরম্ভ হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। শাস্তির প্রকৃত বর্ণনা করে এর কারণসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ২৯ নং আয়াতে اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا বাক্যাংশ দ্বারা মানুষের আমলনামার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীরা অগণিত মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় কার্যাবলি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক লিপিবদ্ধ করে রাখার কথাকে অসম্ভব ও অযৌক্তিক মনে করত। উক্ত আয়াতে এ সমস্ত অবিশ্বাসীর ধারণার পূর্ণ জবাব দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে- তাদের এ অবিশ্বাস ও নাফরমানির সমুচিত প্রতিফল হিসেবে তারা অপেক্ষ্যমাণ জাহান্নামে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তৃষ্ণায় তাদের ছাতি ফেটে যাবে, কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণের উপযোগী কোনো পানীয় তারা পাবে না। অতিরিক্ত শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে অসহনীয় গরম বা ঠাণ্ডা বস্তু এবং পচা রক্ত ও পুঁজ জাতীয় ঘৃণ্য বস্তুসমূহ পিপাসা নিবারণের জন্য পরিবেশন করা হবে।

مِرْصَادٌ শব্দটি مِفْعَالٌ-এর ওজনে اَلرَّصْدُ থেকে নির্গত। مِعْطَارٌ - مِغْمَارٌ এবং مِطْعَانٌ-এর ওজনে مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ অর্থ- অধিক অপেক্ষমাণ। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে- জাহান্নাম কাফেরদের জন্য অধিক অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ -[কাবীর]

১. আযহারী বলেন, যেখানে পাহারাদার শত্রুকে পাহারা দেয়, সে স্থানকে مِرْصَادٌ বলা হয়। -[ফাতহুল কাদীর]
কেননা, জাহান্নামের পার্শ্ব দিয়ে সবাই গমন করবে, সেখানে সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ের প্রতিদানদাতা ফেরেশতাগণ অপেক্ষা করতে থাকবে। জাহান্নামীদের গ্রেফতার করা হবে এবং জান্নাতীদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দেওয়া হবে। -[মাযহারী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

২. হযরত হাসান (রা.) বলেন, জাহান্নামের পুলের উপর ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, তাদেরকে অতিক্রম করে কেউ সামনে যেতে পারবে না।
যাদের হাতে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতিপত্র পাওয়া যাবে, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর যাদের হাতে ঐ পত্র না থাকবে তাদেরকে আটক করা হবে। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

মুকাতিল (র.) বলেন- مِرْصَادٌ এখানে مَحْبَسٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আটক করার স্থান, কয়েদখানা, বন্দী করার স্থান। কেননা, জাহান্নাম তার অধিবাসীদের জন্য কয়েদখানা হবে। কেউই ঐ স্থান হতে বের হতে পারবে না।

কারো মতে مِرْصَادٌ এখানে রাস্তা এবং অতিক্রম করার স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা বেহেশতে যেতেও দোজখ পথে পড়বে। এ জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামকে ঘাঁটিস্থল বলেছেন। হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) বর্ণনা করেছেন যে, জাহান্নামের রাস্তা অতিক্রম ছাড়া কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। যদি পুণ্যবান হয় তবে কোনো কষ্ট ছাড়া পার হয়ে যাবে। আর যদি পাপী হয়, তবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহান্নামের পুলের উপরে সাতটি কারাগারের দ্বার থাকবে। বান্দাদেরকে প্রথম কারা-ফটকে কালিমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বা তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বান্দা সঠিক উত্তর প্রদান করতে পারলে সম্মুখে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় কারা ফটকে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সঠিক জাবাবদানকারীরা কৃতকার্য হবে এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তৃতীয় ফটকে পৌছবে। তৃতীয় ফটকে যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কামিয়াব বান্দারা চতুর্থ ফটকে পৌছবে। অনুরূপভাবে চতুর্থ ফটকে রোজা সম্পর্কে, পঞ্চম ফটকে হজ সম্পর্কে, ষষ্ঠ ফটকে ওমরা সম্পর্কে এবং সপ্তম ফটকে পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যারা সঠিক উত্তর প্রদান করবে তারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পাবে। -[নূরুল কোরআন, খাযেন]

পুলসিরাতের স্বরূপ : বায়হাকী হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, পুলসিরাত তলোয়ারের চেয়েও ধারালো এবং সূক্ষ্ম হবে। ফেরেশতাগণ ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের হেফাজত করবে। হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার কোমর ধরে রাখবে। আমি বলতে থাকবো হে আল্লাহ! রক্ষা করো, হে আল্লাহ! রক্ষা করো, আর হোঁচট খেয়ে বহু নারী ও পুরুষ পড়ে যাবে।

ইবনে মুবারক (র.) বায়হাকী এবং ইবনে আবিদ দুনিয়া হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, দোজখের উপর যে পুল রয়েছে তা তলোয়ারের চেয়ে বেশি ধারালো হবে। -[নূরুল কোরআন]

জাহান্নাম ঘাঁটি হওয়ার কারণ : শিকার ধরার জন্য তৈরি করা বিশেষ স্থানকেই مِرْصَادٌ বা ঘাঁটি বলা হয়। শিকার অজানাভাবে আসে এবং তাতে আটকা পড়ে। এখানে জাহান্নামকে ঘাঁটি বলা হয়েছে। এ জন্য যে, আল্লাহদ্রোহী লোকেরা জাহান্নামের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে দুনিয়ার বুকে নেচে-কুদে বেড়ায় এ কথা মনে করে যে, আল্লাহর এ বিশাল জগৎ যেন তাদের জন্য এক উন্মুক্ত লীলা ক্ষেত্র এবং এখানে ধরা পড়ার কোনোই আশঙ্কা নেই; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জাহান্নাম তাদের জন্য এক প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি হয়ে রয়েছে। তাতে তারা আকস্মিকভাবেই আটকা পড়বে এবং তাতে আটকা থাকবে। -[যিলাল]

জান্নাতবাসী জাহান্নাম অতিক্রম করার কারণ : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- নেককারদের মধ্য হতে কিছু লোক বিদ্যুতের মতো, কিছু লোক চোখের পলকে, কিছু লোক প্রবল বায়ুর ন্যায়, কিছু লোক দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে প্রবশে করবে। এভাবে কতিপয় পাপী মুসলমান ধীরে ধীরে সাত হাজার বৎসরে এ পুলসিরাত পার হবে। হযরত ফুযাইল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, পুলসিরাতের দূরত্ব তিন হাজার বৎসরের পথ। এটা চুল হতে চিকন এবং তরবারি হতে ধারালো হবে। -[আযীযী]

জাহান্নামের উপর দিয়ে জান্নাতবাসীদের রাস্তা নির্মাণ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এটা হতে পারে যে, যারা নেক বান্দা তারাও স্বচক্ষে জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে যাবে। জাহান্নামের সীমাহীন আজাবের সাথে নিজেদের প্রাপ্ত জান্নাতের অনাবিল শান্তি ও নিয়ামতকে তুলনা করে রাব্বুল ইয্যতের শুকরিয়া ও হামদ পাঠ করবে।

طَاغِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : طَاغِيْنَ-এর ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে অহংকার করে এবং তাঁর বিরোধিতায় মেতে উঠে, তাকে طَاغِيْ বলা হয়। -[কাবীর]
২. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, طَاغِيْ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কুফরির মধ্যে সীমা অতিক্রম করে। -[ফাতহুল কাদীর]
৩. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, যারা অবাধ্যতার মধ্যে সীমা অতিক্রম করে। -[রূহুল মা'আনী]

৪. যারা কুফরির মাধ্যমে তাদের দীনের মধ্যে অথবা দুনিয়াতে অত্যাচারের মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করে। -[কুরতুবী]
৫. যারা আল্লাহর রাসূলের চরম বিরোধিতা করেছে তাদেরকেই طَاغِيْنَ বলা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর]
মোটকথা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছিল, তারাই হলো طَاغِيْنَ তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

اَحْقَابًا-এর ব্যাপারে একটি সন্দেহ ও তার নিরসন : আল্লাহর বাণী اَحْقَابًا-এর উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জান্নাত তো চিরন্তন থাকবে; কিন্তু জাহান্নাম চিরদিন থাকবে না। তাদের যুক্তি হলো اَحْقَابٌ (যুগসমূহ) একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। এর ধারাবাহিকতা অসীম হতে পারে না; বরং কোনো না কোনো এক সীমায় গিয়ে তা নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য। নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১. আরবি ভাষায় اَحْقَابٌ এমন সময়কে বলে যার শেষ নেই। এটা সীমাহীন সময়।
২. কুরআন মাজীদের ৩৪ স্থানে জাহান্নামের ব্যাপারে خُلُوْد শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো চিরন্তন।
৩. কুরআন মাজীদের তিন স্থানে خُلُوْد-এর সঙ্গে اَبَدًا শব্দটিকে আনয়ন করা হয়েছে যা জাহান্নাম চিরন্তন হওয়াকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে।
৪. সূরা আল-মায়িদার মধ্যে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামীরা জাহান্নাম হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে। কিন্তু কোনোমতেই বের হতে পারবে না।
৫. জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ এতদসত্ত্বেও জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে এ পার্থক্য কিভাবে আবিষ্কার করা যায় যে, জান্নাত চিরন্তন হবে, কিন্তু জাহান্নাম চিরন্তন হবে না।
৬. শাহ আব্দুল আযীয (র.) বলেন, حُقُبٌ-এর মুদ্দত যদিও জানা রয়েছে তথাপি اَحْقَابٌ-এর মুদ্দত জ্ঞাত হওয়া কিভাবে এটা দ্বারা সাব্যস্ত হয়?

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে সময়সীমার কথা বলা হয়নি; বরং পরকালের সময়ের পরিমাপ জ্ঞাপক শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়াতে যেমন সপ্তাহ, মাস, বৎসর ও যুগ ইত্যাদির মাধ্যমে সময় পরিমাপ করা হয়; তদ্রূপ আখেরাতে حُقُبٌ-এর মাধ্যমে সময়ের হিসাব করা হবে।

নাহুবিদ ফাররা (র.) বলেছেন, اَحْقَابًا শব্দটি لٰبِثِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়নি; বরং এটা لَا يَذُوْقُوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অর্থাৎ এ দীর্ঘ সময় ধরে তো তারা অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে থাকবে এবং ঠাণ্ডার ছোঁয়াও পাবে না। অতঃপর তাদেরকে জামহারীর (প্রচণ্ড শৈত্য)-এর স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। বহু যুগ পর্যন্ত শৈত্য দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পর পুনরায় আগুনের স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। অশেষ সময় পর্যন্ত পালাক্রমে এরূপ শাস্তি চলতেই থাকবে।

ইমাম কুরতুবী (র.)-এর মতে عَشَرَةُ اَحْقَابٍ বা خَمْسَةُ اَحْقَابٍ বলা হলে সসীম সময় উদ্দেশ্য করা সঠিক হতো। কিন্তু যখন শুধু اَحْقَابٌ বলা হয়েছে; তখন এর দ্বারা অসীম সময়ই উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম যুজাজ (র.)-এর মতে, কয়েক হুকবা সময় হবে গরম পানি এবং রক্ত পুঁজের জন্য। অর্থাৎ তারা এক নির্দিষ্ট কাল ব্যাপি গরম পানি এবং রক্ত পুঁজ পান করবে, তারপর আজাব শুরু হবে। -[কুরতুবী]

অথবা, اَحْقَابٌ-এর আয়াতটি فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। -[হাশিয়ায়ে জালালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا" : فِيْهَا-এর সর্বনাম দুই দিকে ফিরতে পারে।

ক. সর্বনামটি اَحْقَابٌ-এর দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ হবে 'তারা ঐ হোকবাতে ঠাণ্ডা ও পানীয় বস্তুর স্বাদ পাবে না।' এমতাবস্থায় উক্ত আয়াতটি পিছনের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি ইমাম যুজাজ (র.) বলেছেন।
খ. সর্বনামটি جَهَنَّمَ-এর দিকে ফিরেছে। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি পিছনের আয়াতের সাথে সম্পর্ক না রেখে মুস্তানাফা হবে। তখন অর্থ হবে তারা অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে ঠাণ্ডা এবং পানীয় বস্তুর স্বাদ পাবে না। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে بَرْدًا-এর অর্থ : আয়াতে بَرْدًا অর্থ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়।

১. হযরত আবূ উবায়দা (রা.) بَرْد-এর অর্থ নিদ্রা (نَوْم) করেছেন। এ অর্থটিই হযরত মুজাহিদ, সুদ্দী, কিসায়ী, ফযল ইবনে খালেদ এবং আবূ মু'আয (র.) হতে বর্ণিত। জালালাইনে এ অর্থকে গ্রহণ করা হয়েছে।
এ মতের উপর এক বিরাট আপত্তি আছে- হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ একদা জিজ্ঞাসিত হলেন যে, বেহেশতে কি নিদ্রা আছে? তদুত্তরে তিনি বললেন 'না, নিদ্রা তো মৃত্যুর ভাই, আর বেহেশতে মৃত্যু নেই।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) بَرْدٌ -এর অর্থ بَرْدُ الشَّرَابِ (পানীয় বস্তুর পানের ঠাণ্ডা) করেছেন। অর্থাৎ জাহান্নামীগণ জাহান্নামে পানীয়বস্তু পান করে ঠাণ্ডা অনুভব করবে না; বরং এমন বস্তু পান করবে যা তাদের জন্য আজাবের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে نَوْم অর্থও বর্ণিত আছে।

৩. যুজ্জাজ বলেন, بَرْدُ رِيْحٍ وَلَا ظِلٍّ وَلَا نَوْمٍ অর্থাৎ 'তারা না বাতাসের ঠাণ্ডা পাবে, না ছায়ার ঠাণ্ডা, আর না নিদ্রার প্রশান্তি।' তিনি بَرْدٌ বলতে প্রত্যেক বস্তুর ঠাণ্ডাকে বুঝিয়েছেন, যা ব্যক্তিকে আরাম প্রদান করে। কেননা এমন ঠাণ্ডা আছে যা মানুষকে অতিশয় কষ্ট দেয় যেমন- اَلزَّمْهَرِيْرُ অর্থাৎ বায়ুর সে স্তর যেখানে পৌঁছে বাষ্প অতিশয় শীতলতা প্রাপ্ত হয়। এ ঠাণ্ডাকেও দোজখে আজাব হিসেবে দেওয়া হবে।

৪. হযরত হাসান, আতা এবং ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, بَرْدٌ অর্থ رَوْحًا তথা আরাম-আয়েশ বা প্রশান্তি। -[কুরতুবী, কাবীর]

ইমাম রাযী (র.) بَرْدٌ অর্থ ঠাণ্ডা বা প্রশান্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা তাবীল (জটিল ব্যাখ্যা) না করে শব্দকে সরাসরি অর্থে ব্যবহার করাই উত্তম।

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا আয়াতে حَمِيْمًا -এর অর্থ : حَمِيْمًا শব্দের কয়েকটি অর্থ দেখা যায়। যেমন-

ক. اَلْمَاءُ الْحَارُّ বা গরম পানি। এটা হযরত আবূ উবায়দার উক্তি।

খ. ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, জাহান্নামীদের চোখের পানি একটি হাউজে ভর্তি করে রাখা হবে, তারপর ঐ পানি তাদেরকে পান করানো হবে, এটাই حَمِيْم।

মূলত حَمِيْم গরম পানিকেই বলা হয়। এখান থেকেই حُمّٰى ও حَمَا ব্যবহার করা হয়। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, জাহান্নামীগণ যা কিছুই ঠাণ্ডার জন্য পান করবে সব কিছুই সেখানে মারাত্মক গরম হবে। -[কুরতুবী]

হযরত রাবী' ইবনে আনাস (র.) বলেন, حَمِيْم ঐ গরমকে বলা হয় যার গরম শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে। -[ইবনে কাছীর]

غَسَّاقًا -এর অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরদের অভিমত : غَسَّاقًا শব্দের অর্থ নিয়ে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন-

১. কারো মতে ঠাণ্ডার দ্বারা যা মরে যায় তাকে غَسَّاقٌ বলা হয়। রাত্রকে غَاسِقٌ বলা হয়, কেননা তা দিন হতে ঠাণ্ডা।

২. ইবনে আবী হাতিম ইবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, غَسَّاقٌ হলো একটি ঝরনা যাতে সাপ বিচ্ছু সহ সকল বিষাক্ত জন্তুর বিষ প্রবাহিত হয়ে একসাথ হবে আর যখন কোনো লোককে তাতে একবার নিমজ্জিত করা হবে তখন সাথে সাথে লোকটির চর্ম এবং গোশত খসে পড়ে যাবে। -[মাযহারী]

৩. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, ব্যভিচারিণীদের গুপ্তাঙ্গ হতে যা বিগলিত হবে এবং কাফেরদের গোশত এবং চামড়ার গন্ধকে غَسَّاقٌ বলা হয়। -[ফাতহুল কাদীর]

৪. হযরত রাবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন, জাহান্নামীদের পুঁজ, ঘাম, অশ্রু এবং রক্ত মিশ্রিত বস্তুকে غَسَّاقٌ (গাস্‌সাক) বলা হয়। তা হবে অসহনীয় ঠাণ্ডা আর মারাত্মক দুর্গন্ধ। -[ইবনে কাছীর, কুরতুবী]

৫. ইমাম রাযী (র.) বলেন, غَسَّاقٌ শব্দে কয়েকটি অর্থ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন-

ক. আবূ মু'আয বলেন, আমি আমাদের মাশায়েখদেরকে বলতে শুনেছি যে, غَسَّاقٌ শব্দটি ফারসি غَاسَاكٌ বা غَاسَاقٌ হতে গৃহীত, অথবা خَاشَاكٌ হতে এ শব্দটি তারা দুর্গন্ধ-ময়লাযুক্ত বিষয়ের ব্যাপারে ব্যবহার করে থাকে।

খ. অকল্পনীয়-অসহ্য ঠাণ্ডাকে غَسَّاقٌ বলা হয়। আর এ ঠাণ্ডাকে اَلزَّمْهَرِيْرُ [যামহারীর] বলা হয়।

গ. غَسَّاقٌ বলা হয় যা জাহান্নামীদের চক্ষু এবং চামড়া হতে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হবে। যেমন-পুঁজ, রক্ত, কফ, ঘাম এবং অন্যান্য দুর্গন্ধ ভিজা প্রবহমান বস্তু।

ঘ. দুর্গন্ধ ছড়ায় এমন সব বস্তুকেই غَسَّاقٌ বলা হয়। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- لَوْ اَنَّ دَلْوًا مِنَ الْغَسَّاقِ يُهْرَاقُ عَلَى الدُّنْيَا لَاَنْتَنَ اَهْلَ الدُّنْيَا অর্থাৎ যদি এক বালতি গাসসাক দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হতো তাহলে সারা দুনিয়াবাসী সে গন্ধ পেত।

ঙ. غَاسِقٌ শব্দের অর্থ অন্ধকার। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অতএব غَسَّاقٌ ঐ কালো ঘৃণিত পানীয়বস্তুকে বলা হয় যা অন্ধকারের ন্যায় ঘৃণিত। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অবাধ্যদের জন্য এ (ধরনের মারাত্মক) প্রতিফলের কারণ : ইমাম হাসান বসরী এবং ইকরামা (র.)-এর মতে কাফেরদের সকল কার্যাবলি ছিল মারাত্মক খারাপ ও ধ্বংসাত্মক, এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ ধরনের মারাত্মক প্রতিফল দিবেন। আর মুকাতিল (র.) বলেন, তাদের ভূমিকানুযায়ীই শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। তাদের পক্ষ হতে যে শিরক পাওয়া গেছে সে শিরক হতে বড় আর কোনো গুনাহ্ নেই। অতএব, বুঝা যায় যে, শিরকই বড় অপরাধ। তাই বড় অপরাধের জন্য বড় শাস্তি নির্ধারিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত আর সে বড় শাস্তির জন্য নরকই প্রযোজ্য। কেননা নরকের চেয়ে বড় শাস্তি আর হয় না।

-[ফাতহুল কাদীর, জালালাইন]

جَزَاءً وِّفَاقًا আয়াতের ব্যাখ্যা : কাফেরদেরকে জাহান্নামে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা তাদের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তি। এখানে একটি সন্দেহ হতে পারে যে, কুফর ও শিরক তো সসীম, অথচ জাহান্নামের শাস্তি হলো অসীম। কাজেই জাহান্নামের আজাব কুফর ও শিরকের জন্য যথোচিত হয় কিভাবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, ঈমান ও কুফরের সম্পর্ক হলো আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলির সাথে, আর তা হলো অসীম। কাজেই ঈমান এবং কুফরও অসীম হবে। তা ছাড়া কুফর ও শিরক এবং এগুলোর কার্যাবলি তাদের রূহের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। এটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আর রূহ যেহেতু চিরন্তন সেহেতু অভ্যাস ও আমল এর তাবে' বা অনুগামী। নিধেন পক্ষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলিকে সীমিত বলা যেতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস ও অবিশ্বাস আত্মার মতোই চিরন্তন। এটা রূহের সাথে চিরস্থায়ী হবে। কাজেই এটা [অবিশ্বাসী] -এর শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে। মোটকথা, কুফরের চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু নেই এবং জাহান্নামের ন্যায় কঠোর আজাবও আর হতে পারে না। "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

মুফাসসির (র.)-এর جُوْزُوْا بِذٰلِكَ কথার কারণ : তাফসীরে জালালাইনের লেখক এবং হযরত যুজাজ (র.) جَزَاءً وِّفَاقًا-এর তাফসীর করতে গিয়ে جُوْزُوْا بِذٰلِكَ শব্দযোগ করে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, جَزَاءً وِّفَاقًا একটি উহ্য فِعْل-এর মাফউলে মুতলাক হয়েছে। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا" :

১. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, اَىْ لَا يَرْجُوْنَ ثَوَابَ حِسَابٍ অর্থাৎ তারা কিয়ামতের দিনে প্রতিদানের আশা করে না।

-[যিলাল]

২. আল্লামা যুজাজ (র.) বলেন, তারা ঐ পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসই রাখে না, যা দ্বারা তারা হিসাবের আশা করতে পারে।

-[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, খাযেন]

৩. আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, উল্লিখিত শাস্তি এ কারণে যে, তারা তাদের কৃতকর্মের হিসেবের ব্যাপারে ভয় করে না।

-[রূহুল মা'আনী, জালালাইন]

৪. ইবনে কাছীর (র.) বলেন, তারা এ বিশ্বাস রাখে না যে, সেখানে আরো একটি সংসার হবে। তথায় তাদের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান দেওয়া হবে।

মোদ্দাকথা, لَا يَرْجُوْنَ -এর তিনটি অর্থ করা হয়েছে- ১. لَا يُؤْمِنُوْنَ ২. لَا يَتَوَقَّعُوْنَ ৩. لَا يَخَافُوْنَ

لَا يَرْجُوْنَ-এর স্থলে لَا يَخَافُوْنَ উল্লেখ না করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) বলেন, হিসাব-নিকাশ মানুষের উপর বিরাট কষ্টের ব্যাপার। কষ্টসাধ্য বস্তুর ব্যাপারে رَجَاءٌ বা 'আশা করা' শব্দ ব্যবহার করা হয় না; বরং উচিত ছিল لَا يَرْجُوْنَ -এর স্থলে لَا يَخَافُوْنَ বা يَخْشَوْنَ বলা। এ اِعْتِرَاضٌ বা আপত্তির কয়েকটি উত্তর দেওয়া যায়। যেমন-

১. মুকাতিল (র.) এবং অনেক মুফাসসিরদের মতে لَا يَرْجُوْنَ -এর অর্থ এখানে لَا يَخَافُوْنَ কেননা, رَجَاءٌ -এর আভিধানিক অর্থ خَوْفٌ ও ব্যবহৃত হয়।

২. মু'মিনদের উচিত, যেন তারা আল্লাহর রহমত কামনা করে। কেননা, সর্বব্যাপারে তাঁর রহমতই চূড়ান্ত। আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ছওয়াব, সমস্ত গুনাহের শাস্তির উপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। অতএব, গুনাহ করেও ঈমান থাকার কারণে হিসেবের আশা করতে পারে, কিন্তু কাফেরগণের ঈমান না থাকার কারণে সে আশা করে না।

৩. অথবা, এখানে رَجَاءً অর্থ تَوَقُّعٌ অর্থাৎ আশা করা এবং تَوَقُّعٌ অর্থ কোনো বস্তুর আশা করে অপেক্ষা করা। কেননা কোনো বস্তুর আশা পোষণকারী رَاجِيٌّ ঐ বস্তুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, تَوَقُّعٌ -এর প্রকারভেদের মধ্যে অন্যতম উন্নত প্রকার হলো رَجَاءً। অতএব, উন্নত প্রকারের উল্লেখ করে جِنْسٌ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. এ আয়াতে আল্লাহর সাথে হিসাবের ব্যাপারে আশা-ভরসার দিকটা خَوْفٌ-এর চেয়ে অধিক। কেননা ওয়াদা করার কারণ আল্লাহর উপর ছওয়াব দানের ব্যাপারে বান্দার হক রয়েছে। পক্ষান্তরে বান্দার উপর শাস্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহর হক রয়েছে। আর কারীম ব্যক্তি কখনো কখনো নিজের হক ছেড়ে দিয়ে থাকেন। কিন্তু তার উপর অন্যের হককে বাদ দেন না। (অর্থাৎ আল্লাহ নিজের হক ছেড়ে দিতে পারেন; কিন্তু তাঁর উপর বান্দার যে হক রয়েছে তা তিনি বাদ দিবেন না। অতএব, এখানে আশার দিকটাই প্রকট। এ কারণেই এখানে رَجَاءً ব্যবহার করা হয়েছে, خَوْفٌ ব্যবহার করা হয়নি। -[কাবীর]

শুধু হিসাবকে উল্লেখ করার কারণ : ইমাম রাযী (র.) বলেন, কাফেরগণ বিভিন্ন প্রকারের মন্দকাজ এবং নানা রকম কুফরি কাজ করে থাকে, কোনোটির উল্লেখ না করে শুধু হিসাব-নিকাশ অর্থাৎ আখেরাতের কথা উল্লেখ করার কারণ কি?

এর উত্তর এই যে, ভালো কাজের প্রতি মানুষের সাধারণত ঝোঁক প্রবণতা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা বেশি থাকে। এটা এ কারণে যে, ঐ ভালো কাজ দিয়ে তাঁরা আখেরাতে উপকৃত হওয়ার আশা পোষণ করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ আখেরাতের জন্য পেশ করে না। এমনকি খারাপ কাজ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণও করে না। অতএব, إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا এ আয়াত দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, কাফেরগণ সমস্ত খারাপ কাজ করে এবং সমস্ত ভালো কাজকে বর্জন করে। -[কাবীর]

اٰيَاتٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম শাওকানী (র.) اٰيَاتٌ দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য নির্ণয় করেছেন-

১. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত সমস্ত আয়াত।

২. অথবা সাধারণ আয়াত, যার অধীনে নিদর্শন বলতে যত কিছু বুঝায় সব শামিল হয়ে যায়। -[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, সমস্ত নবীগণ যা কিছু নিয়ে দুনিয়াতে এসেছিলেন সব কিছুই 'আয়াত'।

কারো কারো মতে, যত কিতাব নবীদের উপর নাজিল হয়েছিল, সবগুলোকেই আয়াত বলা হয়েছে। -[কুরতুবী]

ইমাম রাযী (র.) বলেন, যা তাওহীদ, নবুয়ত, পুনরুত্থান, শরিয়ত এবং কুরআনের ব্যাপারে রয়েছে সব কিছুই আয়াত। -[কাবীর]

কাফেরগণ শাস্তির যোগ্য হওয়ার কারণ : তারা দুনিয়ায় জীবন-যাপন করছে একথা মনে করে যে, আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কাজকর্মের হিসেব-নিকাশ পেশ করতে হবে এমন দিন ও ক্ষণ কখনোই আসবে না। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের হেদায়েতের জন্য যেসব আয়াত ও নিদর্শন পাঠিয়েছেন, তা মেনে নিতে তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিল ও সেগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিল।

كُلَّ شَيْءٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : كُلَّ شَيْءٍ দ্বারা সকল সৃষ্ট বস্তুকে বুঝানো হয়েছে। যাতে মানুষের اَعْمَالٌ ও শামিল রয়েছে। আবূ হাইয়ান (র.) বলেন, যে সমস্ত বস্তুতে পুণ্য এবং শাস্তি রয়েছে তাই এখানে উদ্দেশ্য। -[কাবীর, সাফওয়া]

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا : আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের হেদায়েতের জন্য যে সব আয়াত ও নিদর্শন পাঠিয়েছিলেন তা মেনে নিতে তারা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিল। সেগুলোকে তারা মিথ্যা মনে করেছিল। যা তারা আদৌ বিশ্বাস করেনি। আজ তাই তাদের চোখের সামনে বাস্তব আকারে দেখা দিয়েছে। আজ স্বচক্ষে তারা তাই দেখতে পাচ্ছে।

এখানে একটি সন্দেহ হতে পারে যে, কুফর ও শিরক তো অন্তরের কার্য, যা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তার সম্পর্ক নেই। কাজেই জাহান্নামের বাহ্যিক শাস্তিসমূহ কেন দেওয়া হবে? وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ -এর দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। অন্তরের কার্য হোক আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্য হোক সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার ইলমে রয়েছে। তদনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে দপ্তরসমূহে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। ভালোমন্দ কোনো কার্যই সংরক্ষিত থাকে না। কথা, কার্য, নড়াচড়া এমনকি তারা অন্তরে যা কল্পনা করে তাও রেকর্ড করা হয়। অথচ কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন মনে করে বসেছে যে, তাদের মনে যা চায় তাই তারা করতে পারে। তাদেরকে এর জন্য কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না। বস্তুত তাদের জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে কড়া-ক্রান্তি করে হিসাব দিতে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى "فَذُوْقُوْا الخ" : দুনিয়ার জীবনে তোমরা মহান আল্লাহর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ ছিলে, তোমাদের পাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তোমরা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতায় যেভাবে মেতে ছিলে যদি মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান তোমাদের ব্যাপারে কার্যকর না হতো, তবে তোমরা চিরদিন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতেই লিপ্ত থাকবে। তাই আজ থেকে তোমরা চিরদিন আল্লাহ তা'আলার আজাব ভোগ করতে থাকো। তোমাদের কীর্তিকলাপের পরিণতি ভোগ করতে থাকো। আর কখনো এ আশা করো না যে, এ আজাব কোনো এক সময় কম হয়ে যাবে, তোমাদের জন্য আজাব ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করা হবে না, বরং সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রতি আজাব বৃদ্ধি করা হবে, কেননা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের পাপাচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের প্রতি দিনের পর দিন আজাব বৃদ্ধি করা হবে। -[নূরুল কোরআন]

زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ : অর্থাৎ আমি তাদের আজাবের উপর আরো আজাব বাড়িয়ে দিয়েছি।

অবশ্য গুনাহগার মু'মিন- যারা জাহান্নামে যাবে তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না। কেননা তাদের আত্মা ঈমানের কারণে পবিত্র ছিল। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরাধী ছিল। কাজেই তাদের শাস্তি সীমিত এবং সাময়িক হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মসিবত এবং কষ্ট যখন স্থায়ী হয়ে যায় তখন তা মসিবত থাকে না; বরং এটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কজেই জাহান্নামী কাফেরদের জাহান্নামে আজাবের কিছু দিন পর আজাবই থাকবে না; বরং এটা তাদের গা সওয়া হয়ে যাবে এবং অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং এটা কিভাবে তাদের জন্য আজাব হতে পারে?

এর জবাবে বলা যায় যে, শাস্তি ও কষ্ট শরীরের চামড়ায় অনুভূত হয়ে থাকে। চামড়া যদি গলে যায় তাহলে যন্ত্রণা অনুভূত হওয়ার স্থান বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তথায় পুনরায় নতুন চামড়া গজিয়ে যায় তাহলে অনুভূতিও পূর্ববৎ; বরং ততোধিক মাত্রায় ফিরে আসে। জাহান্নামীদের এক চামড়া গলে পড়লে তথায় নতুন চামড়া গজিয়ে দেওয়া হবে, যাতে তারা পূর্ণ মাত্রায় উক্ত আজাব ভোগ করতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে- "بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ"

অথবা, আজাব এক ধরনের হলে উপরিউক্ত প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে বিচিত্র ধনের আজাব দেওয়া হবে।

অথবা, আখেরাতকে দুনিয়ায় অবস্থার উপর কেয়াস করা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা আখেরাতের অবস্থা দুনিয়ার বিপরীত।

চরম আজাবের ঘোষণা : এ আয়াতটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, এটা আজাবের ঘোষণার জন্য একটি চূড়ান্ত আয়াত। কেননা এতে কয়েকটি দিক পরিলক্ষিত হচ্ছে, যে দিকগুলো অন্য স্থানে পাওয়া যায় না। যেমন-

১. لَنْ لِلتَّاكِيْدِ فِى النَّفْىِ "لَنْ" অর্থাৎ আজাবকে তাদের সাথে খাস করার জন্য حَصْر ব্যবহার করতে গিয়ে এমন 'নফী' [নিষেধসূচক হরফ] ব্যবহার করা হয়েছে, যা 'নফীতে' তাকিদ বুঝায় এবং যা দ্বারা আজাবের স্থায়িত্ব বুঝায়।

২. كَانُوْا لَايَرْجُوْنَ حِسَابًا আয়াতে তাদের আলোচনা গায়েব হিসেবে করা হয়েছে, এখন এ আয়াতে সরাসরি তাদরেকে ذُوْقُوْا বলে আজাবের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

৩. এ সূরার প্রথম হতে বিভিন্ন শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি তাদের কৃতকর্মের অনুরূপই হয়েছে। অর্থাৎ 'যেমন কর্ম তেমন ফল।' তারপর তাদের কুকর্মের ধরনও আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা فَذُوْقُوْا বলেছেন, মনে হয় যেন তিনি ফতোয়া দিলেন এবং দলিল তুলে ধরেছেন, তারপর হুবহু এ ফতোয়াগুলো পুনরায় উল্লেখ করেছেন। এটা দ্বারা কাফেরদের জন্য চূড়ান্ত আজাবের ঘোষণা বুঝায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'জাহান্নামীদের ব্যাপারে এ আয়াতটি কুরআন মাজীদের সবচেয়ে কঠোরতম আয়াত।" -[কাবীর, রুহুল মা'আনী]

হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি একদা আবূ বারযা আসলামীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুরআন মাজীদে জাহান্নামীদের ব্যাপারে কোন আয়াতটি বেশি মারাত্মক। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বাণী- فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا -[রুহুল মা'আনী, কুরতুবী]

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে বেশি মারাত্মক আয়াত জাহান্নামীদের ব্যাপারে আর অবতীর্ণ হয়নি। -[ইবনে কাছীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣١. اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا مَكَانَ فَوْزٍ فِى الْجَنَّةِ .

৩১. মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য বেহেশতে সাফল্যের স্থান।

٣٢. حَدَآئِقَ بَسَاتِيْنَ بَدَلٌ مِنْ مَفَازًا اَوْ بَيَانٌ لَهُ وَاَعْنَابًا عَطْفٌ عَلٰى مَفَازًا .

৩২. বাগানসমূহ উদ্যানসমূহ, এটা পূর্বোক্ত مَفَازًا হতে بَدَل অথবা এর بَيَان ও আঙ্গুরসমূহ এটা مَفَازًا-এর উপর عَطْف

٣٣. وَكَوَاعِبَ جَوَارِىَ تَكَعَّبَتْ ثُدِيُّهُنَّ جَمْعُ كَاعِبٍ اَتْرَابًا عَلٰى سِنٍّ وَاحِدٍ جَمْعُ تِرْبٍ بِكَسْرِ التَّاءِ وَسُكُوْنِ الرَّاءِ .

৩৩. আর নব যৌবনা তরুণী যাদের স্তন যুগল ফুলে উঠেছে, كَوَاعِبَ শব্দটি كَاعِبٌ-এর বহুবচন, যারা পরস্পর সমবয়সী একই বয়সী, اَتْرَابٌ শব্দটি تِرْبٌ (تَاءٌ মধ্যে যের ও رَاءٌ-এর মধ্যে সাকিন যোগে)-এর বহুবচন।

٣٤. وَكَاْسًا دِهَاقًا خَمْرًا مَالِئَةً مَحَالَّهَا وَفِى الْقِتَالِ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ .

৩৪. আর পূর্ণ পানপাত্র শরাবের পানপাত্র যা শরাবে পূর্ণ সূরায়ে মুহাম্মদ -এর মধ্যে একই বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ

٣٥. لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا اَىِ الْجَنَّةِ عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْاَحْوَالِ لَغْوًا بَاطِلًا مِنَ الْقَوْلِ وَلَا كِذَابًا بِالتَّخْفِيْفِ اَىْ كَذِبًا وَبِالتَّشْدِيْدِ اَىْ تَكْذِيْبًا مِنْ وَاحِدٍ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا يَقَعُ فِى الدُّنْيَا عِنْدَ شُرْبِ الْخَمْرِ .

৩৫. সেথায় তারা শ্রবণ করবে না বেহেশতে মদ্য পান ও অন্যবিধ অবস্থায়, অসার বাক্য বাতিল কথা হতে আর না মিথ্যা كِذَابًا শব্দটি তাখফীফ-এর সাথে অর্থাৎ كَذِبًا মিথ্যা এবং তাশদীদ যোগে অর্থাৎ تَكْذِيْبًا তথা একে অন্যের প্রতি মিথ্যারোপ, যেমন পার্থিব জগতে মদ্য পায়ীদের মধ্যে মদ্যপানকালে এরূপ হয়ে থাকে।

٣٦. جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ اَىْ جَازَاهُمُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ جَزَآءً عَطَآءً بَدَلٌ مِنْ جَزَاءً حِسَابًا اَىْ كَثِيْرًا مِنْ قَوْلِهِمْ اَعْطَانِىْ فَاَحْسَبَنِىْ اَىْ اَكْثَرَ عَلَىَّ حَتّٰى قُلْتُ حَسْبِىْ .

৩৬. এটা পুরস্কার তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে এর মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন। দান স্বরূপ এটা পূর্বোক্ত جَزَاءً হতে بَدَل পরিমিত অর্থাৎ প্রচুর, যেমন লোকেরা বলে থাকে اَعْطَانِىْ فَاَحْسَبَنِىْ অর্থাৎ আমাকে এ পরিমাণ দিয়েছে যে, আমি حَسْبِىْ বা যথেষ্ট বলেছি।

তাহকীক ও তারকীব

حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا-এর মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতটিতে দু'টি শব্দ রয়েছে। উভয়টি পূর্বে উল্লিখিত مَفَازًا হতে بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ অথবা بَدْلُ الْكُلِّ হিসেবে মানসূব হয়েছে। যখন بَدْلُ الْكُلِّ হবে– তখন مَفَازًا -এর মুবালাগা হিসেবে حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا -কে ধরতে হবে।

অথবা, حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا একটি উহ্য ক্রিয়া أَعْنِيْ-এর مَفْعُوْل হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। উভয় অবস্থাতে مَفَازًا-কে ইসমে যরফ পড়তে হবে। আর যদি مَفَازًا অর্থ فَوْز হয়, তখন একটি উহ্য مُضَاف মেনে নিতে হবে। এমতাবস্থায় মূলবাক্য এভাবে হবে যে, فَوْزُ حَدَائِقَ -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

অথবা, بَدَلُ بَعْض হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

أَتْرَابًا শব্দের বিশ্লেষণ এবং অর্থ : أَتْرَابًا শব্দটি মান্‌সূব -এর হালতে রয়েছে। أَتْرَابٌ বলা হয় اَلْمُتَّحِدَاتُ فِى السِّنِّ অর্থাৎ সমবয়স্কা রমণীগণকে অথবা اَلْمُتَسَاوِيَاتُ فِى الْحُسْنِ অর্থাৎ সমান সুন্দরীদেরকে أَتْرَابٌ বলা হয়। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, যারা পরস্পর ভগ্নিসম হয়ে বসবাস করবে, হিংসা-বিদ্বেষ যাদের মধ্যে অনুপস্থিত তাদেরকে أَتْرَابٌ বলা হয়।

-[ফাতহুল কাদীর]

কোনো কোনো তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, বেহেশতী রমণীগণ ষোল বৎসরের যুবতী হবে, আর পুরুষগণ তেত্রিশ বৎসরের হবে। -[রূহুল মা'আনী]

আবার কোনো কোনো তাফসীরে বেহেশতী পুরুষ ও রমণী সকলেরই বয়স তেত্রিশ বৎসর এবং পূর্ণ উজ্জ্বল যৌবনের অধিকারী হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। -[বায়ানুল কুরআন]

وَعَطَاءً ও جَزَاءً -এর মহল্লে ই'রাব : جَزَاءً শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার মাফউলে মুতলাক হয়েছে। উহ্য বাক্য এভাবে হবে- جَزَاهُمْ جَزَاءً এমনিভাবে عَطَاءً শব্দটিও উহ্য ক্রিয়ার মাফউলে মুতলাক হয়েছে। মূল ইবারত এভাবে ছিল أَعْطَاهُمْ عَطَاءً -[কুরতুবী]

আল্লামা যমখশরী বলেন, عَطَاءً শব্দটি جَزَاءً মাসদারের কারণে [মাফউলে বিহী হিসেবে] মানসূব হয়েছে। -[কাশ্‌শাফ]

আল্লামা আলূসী (র.) جَزَاءً তাকীদী মাসদার [অর্থাৎ মাফউলে মুতলাক] হয়েছে। আর তাকীদী মাসদার কোনো সময় আমল করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতগুলোর সাথে যোগসূত্র : সূরার প্রথম হতে কাফেরদের কৃতকর্ম এবং এর পরিণামের কথা আলোচিত হয়েছে। তাদের জীবনের চরম ব্যর্থতা এবং সীমাহীন লাঞ্ছনার কথাও ঘোষিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا হতে আল্লাহতে বিশ্বাসী তথা মুত্তাকীনদের সফলতা এবং সীমাহীন শান্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের এক স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হলো, এক পক্ষের আলোচনা হলে সাথে সাথে অন্য পক্ষের আলোচনাও হয়। ঠিক একই নিয়মে কাফেরদের আলোচনার সাথে সাথে মু'মিনদের আলোচনা শুরু হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

এখানে 'মুত্তাকীন' দ্বারা উদ্দেশ্য : মুত্তাকীন-এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহভীতিপূর্ণ সাবধানী ব্যক্তিবর্গ। এখানে মুত্তাকীন শব্দটি কাফের ও অবিশ্বাসী লোকদের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা কোনোরূপ হিসাব-নিকাশ হবে বলে মনে করে না এবং যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করেছিল। এ ক্ষেত্রে মুত্তাকীন-এর অর্থ হবে সেসব লোক, যারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ মেনেছিল এবং ইহকালে সকল সময় এ অনুভূতি সহকারে জীবন যাপন করে যে, তাদের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে এবং নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে বাধ্য হবে।

قَوْلُهُ "مَفَازًا" : مَفَازٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন مَفَاوِزُ-এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা আছে- ক. এটি মাসদার হবে। [মীম মাসদারের জন্য হবে।] এমতাবস্থায় অর্থ হবে فَوْز সফলতা, খ. অথবা, এটা ইসমে যরফ (اِسْمُ ظَرْف) হবে। তখন এর অর্থ হবে "مَكَانُ الْفَوْزِ" সফলতার স্থান।

ইমাম রাযী (র.) -এর মতে এখানে مَفَازٌ-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

১. اَلْفَوْزُ بِالْمَطْلُوْبِ কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাসিলের মাধ্যমে সফলতা অর্জন, ২. اَلْفَوْزُ بِالنَّجَاةِ مِنَ الْعَذَابِ তথা শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন, ৩. أَوْ كِلَاهُمَا مَعًا অথবা উভয় সফলতা একসাথে অর্জন।

ইমাম রাযী (র.)-এর মতে উপরিউক্ত তিনটি অর্থের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থই অগ্রগণ্য। কেননা সফলতার মধ্যে শাস্তি পাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حَدَائِقُ-এর অর্থ ও এর নামকরণ : حَدَائِقُ শব্দটি حَدِيْقَةٌ-এর বহুবচন। মুফাস্‌সিরগণ حَدِيْقَةٌ-এর বিভিন্ন তাফসীর করেছেন।

ক. ইমাম রাগিব (র.)-এর মতে পানিসহ জমিনের টুকরাকে حَدِيْقَةٌ বলে। অর্থাৎ حَدِيْقَةٌ অর্থ উদ্যান।

খ. তাফসীরে খাযেন-এর ভাষ্যমতে যে বাগানে চাহিদানুযায়ী সব ধরনের গাছ-পালা ও ফল-ফলাদি মওজুদ রয়েছে,তাকে حَدِيْقَةٌ বলে।

গ. কারো কারো মতে যে বাগানের চতুর্দিকে দেয়াল বা অন্য কিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাকে حَدِيْقَةٌ বলে।

ঘ. অন্য এক দল মুফাস্‌সিরের মতে حَدِيْقَةٌ এমন বাগানকে বলে যাতে ফলদার বৃক্ষরাজি, সুন্দর পরিবেশ এবং রকমারি ফুল রয়েছে। -[খাযেন, কাবীর, রূহুল মা'আনী, কাশশাফ]

حَدِيْقَةٌ-এর নামকরণ : حَدِيْقَةٌ-কে حَدِيْقَةٌ নামকরণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন। আরবিতে اَحْدَقُوْا بِهٖ কথাটি اَحَاطُوْا بِهٖ-এর অর্থে হয়ে থাকে; اِحْدَاقٌ শব্দটি اِحَاطَةٌ-এর অর্থে হয়ে থাকে। সুতরাং حَدِيْقَةٌ অর্থাৎ مَحْدُوْدَةٌ মানে যা পরিবেষ্টিত। যেহেতু এরূপ বাগানের চারিদিক দেয়াল বা অন্য কিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে সেহেতু একে حديقة বলে।

আল্লামা আলূসী (র.)-এর মতে حَدِيْقَةُ الْعَيْنِ-এর সাথে সামঞ্জস্য থাকার দরুন حَدِيْقَةٌ-কে حَدِيْقَةٌ নামকরণ করা হয়েছে। চোখের পুতুলী যেমনটি পরিবেষ্টিত ও পানি পানি থাকে তদ্রূপ حَدِيْقَةٌও পরিবেষ্টিত ও পানি পানি অবস্থায় থাকে। -[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا" : জান্নাতে জান্নাতীদের জন্য এমন নব যৌবনা কুমারী মহিলা থাকবে যাদের স্তনযুগল স্ফীত [উঁচু] সুগঠন ও সুদর্শন হবে। যারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অথবা তাদের স্বামীগণের সমবয়স্কা হবে। কেননা সমস্ত রূহ একই সময় তথায় শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সময় তাদের স্ব-স্ব শরীরে প্রবেশ করবে। অথবা তারা সকলে একই সময় জন্মগ্রহণ করবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- "اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ـ عُرُبًا اَتْرَابًا لِاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ" যা হোক, জান্নাতী স্ত্রীগণ তা তাদের স্বামীগণের সমগোত্রীয় ও সমবয়সী হবে। যাতে তারা পরিপূর্ণভাবে দাম্পত্য সুখ-সম্ভোগ করতে পারে। কেননা অসমগোত্রীয় হলে যদ্রূপ আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে তদ্রূপ বয়সের তারতম্যের কারণে ভালোবাসা পূর্ণ হয় না। এ জন্য যুবক যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধা ও বৃদ্ধের মিল-মহব্বত ও বনি-বনা হয় না। অধিকাংশ তাফসীরের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, জান্নাতী পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বয়স হবে তেত্রিশ বছর। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনাতে মহিলাদের বয়স হবে ১৭/১৮ এবং পুরুষের বয়স হবে তেত্রিশ। সুতরাং পুরুষরা হবে পোক্তা ফল সাদৃশ্য। আর মহিলারা হবে সে ফলের তুল্য যার পাকা অপেক্ষা কাঁচা উত্তম। যেমন- খিরা, শসা ইত্যাদি।

كَوَاعِبُ-এর অর্থ : كَوَاعِبُ শব্দটি كَاعِبَةٌ-এর বহুবচন। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, নব যৌবনা এমন কুমারীকে كَاعِبَةٌ বলা হয় যার স্তনযুগল কেবল মাত্র উঁচু ও গোলাকার হয়ে উঠেছে।

খ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ-এর মতে এখানে كَوَاعِبُ দ্বারা নব যৌবনে পদার্পণকারিণী জান্নাতী হুরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল শব্দের শব্দমূলে (ك ـ ع ـ ب) রয়েছে এদের মধ্যে উঁচু -এর অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং كَاعِبَةٌ অর্থ উঁচু স্তনযুগলধারিণী। كَعْبَةٌ কা'বা শরীফকে বলে যা ভূমি হতে উঁচু। كَعْبٌ পায়ের ছোট গিরাকে বলে যা উঁচু।

-[ইবনে কাছীর, কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ "دِهَاقًا" : আল্লামা শাওকানী (র.) دِهَاقًا শব্দের কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন-

১. دِهَاقًا اَىْ مُمْتَلِئَةً অর্থাৎ পরিপূর্ণ। এ তাফসীর হলো হযরত হাসান, কাতাদাহ এবং ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতে। যেমন বলা হয়, اَدْهَقْتُ الْكَاْسَ اَىْ مَلَأْتُهَا "আমি পেয়ালা ভর্তি করলাম"।

২. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরামা এবং মুজাহিদ (র.) বলেন, دِهَاقًا اَىْ مُتَتَابِعَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا অর্থাৎ পর পর পেয়ালা আসতে থাকবে।

৩. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, دِهَاقًا اَىْ صَافِيَةً অর্থাৎ স্বচ্ছ। -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কাবীর]

আল্লামা কুরতুবী دِهَاقٌ শব্দের আরো কয়েকটি অতিরিক্ত অর্থ উল্লেখ করেছেন।

৪. হযরত আসমায়ী বলেন, নরম, মোলায়েম ও উত্তম খাদ্যকে دِهَاقٌ বলা হয়।

৫. دَهْقٌ এক প্রকার আজাবকে বলা হয়। [অর্থাৎ পেয়ালাকে অবসর না দিয়ে পর-পর বেহেশতবাসীর সামনে পেশ করা হবে, যা পেয়ালার জন্য এক প্রকার শাস্তি বলা চলে।]

৬. ইমাম মুবাররাদ বলেন, اَلْمَدْهُوْقُ : اَلْمُعَذَّبُ بِجَمِيْعِ الْعَذَابِ الَّذِيْ لَا فُرْجَةَ فِيْهِ অর্থাৎ অনর্গল সর্বপ্রকারের আজাবপ্রাপ্ত বস্তুকে مَدْهُوْقٌ বলা হয়। এ অর্থ ৫ম অর্থের সাথে মিল দেখা যায়। –[কুরতুবী]

মোটকথা, বেহেশ্‌তবাসীদের পানের জন্য পবিত্র-স্বচ্ছ শরবত-ভর্তি পেয়ালা ইচ্ছামতো অনর্গল পরিবেশন করা হবে।

كَاْسٌ-এর অর্থ : اَلْكَأْسُ هُوَ الْاِنَاءُ الْمَعْرُوْفُ অর্থাৎ كَاْس ঐ পাত্রকে বলা হয় যা সমাজে সুপরিচিত; কিন্তু সকল পাত্রকে كَاْس বলা হয় না, শুধুমাত্র পানীয়ভর্তি পেয়ালাই كَاْسٌ হিসেবে পরিগণিত। –[ফাতহুল কাদীর]

হযরত যাহ্‌হাক বলেন, কুরআন মাজীদে যত كَاْسٌ ব্যবহৃত হয়েছে, সব كَاْس দিয়ে خَمْر বা মদ উদ্দেশ্য। –[কাবীর]

لَغْوٌ-এর অর্থ : মুফাসসিরগণ لَغْو-এর বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন–

অনর্থক ও বেহুদা কথাবার্তা ও গল্পগুজবকে لَغْو বলে। কখনও মন্দ অশ্লীল কথাকেও لَغْو বলে। কোনো কোনো সময় এমন অগ্রহণীয় কথাকেও لَغْوٌ বলে, যা বলার পর কেউ এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না।

মূলত চড়ুই পাখির কিচিরমিচির ধ্বনিকে আরবের লোকেরা لَغْوٌ বলে। অতঃপর যে সমস্ত কথার মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না; কোনোরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই যা প্রকাশিত হয়, তাকে রূপকার্থে لَغْو বলা হয়েছে।

وَلَا كِذَّابًا-এর অর্থ : আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, বেহেশতবাসী পরস্পর একে অপরকে মিথ্যা সম্বোধন করবে না। –[ফাতহুল কাদীর]

কোনো কোনো মুফাসসিরদের মতে, জান্নাতে লোকেরা কর্ণকুহরে মিথ্যা ও অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একে জান্নাতের অসংখ্য বড় বড় নিয়ামতের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ কারো নিকট মিথ্যা কথা বলবে না, কেউ কাউকেও মিথ্যাবাদী বলবে না, কেউ কাউকেও অবিশ্বাস করবে না। দুনিয়ায় গালিগালাজ, মিথ্যা অভিযোগ, দোষারোপ, ভিত্তিহীন দুর্নাম রটনা, অন্যের উপর অকারণে দোষ চাপানো প্রভৃতি অবাঞ্ছিত কাজের যে তুফান সৃষ্টি হয়েছে, জান্নাতে এর নাম-চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে না।

কিভাবে একই বস্তুকে প্রতিফল এবং পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত করা হলো? : উল্লিখিত আয়াতে একটি প্রশ্ন জাগে তা নিম্নরূপ– একই বস্তু প্রতিফল এবং পুরস্কার উভয়টি হতে পারে না, অসম্ভব; কেননা প্রতিফল হলো পাওনা, আর পুরস্কার পাওনা নয়। 'পাওনা' আর 'পাওনা নয়' কোনো দিন একত্রিত হতে পারে না।

উদ্ভাবিত প্রশ্নটির জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, পরস্পর দ্বন্দ্বশীল দু'টি বিষয় একসাথ হতে পারে না এ কথাটি যথার্থ। কিন্তু এ আয়াতে উভয়টি একত্রিত হয়েছে এ অর্থে যে, আল্লাহর ওয়াদার কারণে বেহেশতবাসীগণ 'পাওনা' পাবে, তবে এ অর্থে নয় যে, এটা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অতএব, এদিক থেকে একে প্রতিফল বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ প্রতিফল পরিশোধ করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। তিনি পুরস্কারের ন্যায় দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। অতএব, এদিক দিয়ে এটা পুরস্কারও বটে। –[কাবীর]

ওলামায়ে কেরামগণ এ প্রশ্নের সুন্দর একটি সমাধান উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, প্রতিফল-এর পর পুরস্কার দানের উল্লেখ হওয়ার মোটামুটি অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ লোকদেরকে কর্মফল কাজ অনুপাতে কেবলমাত্র ফল-দান করেই ক্ষান্ত হওয়া যাবে না। কেননা তারা তো নিজেদের নেক আমলের কারণে এটুকু পাওয়ার অধিকারী হবে; বরং তাদেরকে এরও অধিক পুরস্কার দান করা হবে। এর বিপরীতে জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, তাদেরকে শুধু তাদের কাজের পুরোপুরি বদলা দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাদের অপরাধ অনুপাতে যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য হতে পারে তার কম দেওয়া হবে না এবং তার বেশিও দেওয়া হবে না।

حِسَابًا-এর অর্থ : حِسَابًا-এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

ক. হযরত আবূ উবায়দাহ (র.) বলেছেন– حِسَابًا اَيْ كَافِيًا অর্থাৎ তাদরকে যথেষ্ট পতিদান দেওয়া হবে।

খ. ইবনে কুতাইবাহ (র.)-এর মতে حِسَابًا এখানে كَثِيْرًا-এর অর্থে হয়েছে অর্থাৎ তাদেরকে অত্যধিক পরিমাণে দান করা হবে। যেমন, বলা হয়– اَحْسَبْتُ فُلَانًا اَيْ اَكْثَرْتُ لَهُ الْعَطَاءَ অর্থাৎ আমি তাকে অধিক দান করেছি।

গ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন– حسابا এখানে قدر-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নির্ধারিত প্রতিদান কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে। যেমন কারো জন্য একটি নেক কাজের দশটি ছওয়াব, কাউকে সাত শত আবার কাউকেও বা অসংখ্য [আল্লাহ যতটুকু ইচ্ছা করেন] দান করার ওয়াদা করা হয়েছে। তদনুযায়ী হিসেব করে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। –[কবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٧. رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْجَرِّ وَالرَّفْعِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ كَذٰلِكَ وَبِرَفْعِهِ مَعَ جَرِّ رَبِّ السَّمٰوٰتِ لَا يَمْلِكُوْنَ اَىِ الْخَلْقُ مِنْهُ تَعَالٰى خِطَابًا اَىْ لَا يَقْدِرُ اَحَدٌ اَنْ يُخَاطِبَهُ خَوْفًا مِنْهُ.

৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এটা মাজরূর ও মারফূ' উভয়রূপে পঠিত হয়েছে। এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের যিনি দয়াময় তেমনিভাবে, اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি মারফূ' পঠিত হবে, যদি رَبِّ السَّمٰوٰتِ -কে মাজরূররূপে পড়া হয়। তারা অধিকারী হবে না সৃষ্টির মধ্য হতে তাঁর পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আবেদন নিবেদন করার অর্থাৎ তাঁর ভয়ের কারণে সৃষ্টি জগতের কেউ তাঁর সাথে কথা বলতে সক্ষম হবে না।

٣٨. يَوْمَ ظَرْفٌ لِلَا يَمْلِكُوْنَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ جِبْرِيْلُ اَوْ جُنْدُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا حَالٌ اَىْ مُصْطَفِّيْنَ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اَىِ الْخَلْقُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ فِى الْكَلَامِ وَقَالَ قَوْلًا صَوَابًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ كَاَنْ يَّشْفَعُوْا لِمَنِ ارْتَضٰى.

৩৮. সেদিন এটা لَا يَمْلِكُوْنَ-এর ظَرْف দণ্ডায়মান হবে রূহ জিবরাঈল বা আল্লাহর সৈন্যগণ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে এটা حَالٌ অর্থাৎ مُصْطَفِّيْنَ সারিবদ্ধ হয়ে তারা কথা বলবে না অর্থাৎ সৃষ্টিজগত দয়াময় যাকে অনুমতি দান করবেন সে ভিন্ন কথাবার্তা বলার ব্যাপারে আর সে বলবে কথা যথার্থ মুমিন অথবা ফেরেশতা হোক, তারা এমন লোকের জন্যই সুপারিশ করবে, যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি তারদেরকে প্রদান করা হবে।

٣٩. ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ج الثَّابِتُ وُقُوْعُهُ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا مَرْجِعًا اَىْ رَجَعَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِطَاعَتِهٖ لِيَسْلَمَ مِنَ الْعَذَابِ فِيْهِ.

৩৯. এ দিবস সুনিশ্চিত তা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, আর তা হলো কেয়ামত দিবস। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল ঠিক করুক ঠিকানা, অর্থাৎ সেদিনকার শাস্তি হতে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করুক।

٤٠. اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ اَىْ كُفَّارَ مَكَّةَ عَذَابًا قَرِيْبًا اَىْ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ الْاٰتِىْ وَكُلُّ اٰتٍ قَرِيْبٌ.

৪০. আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম হে মক্কাবাসী কাফেরগণ! আসন্ন শাস্তির ব্যাপারে কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে যা অবগত হবে। আর প্রত্যেক আগত বস্তুই নিকটবর্তী।

٤١. يَوْمَ ظَرْفٌ لِعَذَابًا بِصِفَتِهٖ يَنْظُرُ الْمَرْءُ كُلُّ اَمْرِءٍ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا حَرْفُ تَنْبِيْهٍ لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا يَعْنِىْ فَلَا اُعَذَّبُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عِنْدَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْبَهَائِمِ بَعْدَ الْاِقْتِصَاصِ مِنْ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ كُوْنِىْ تُرَابًا.

৪১. সেদিন এটি সমুদয় বিশেষণসহ عَذَابٌ -এর ظَرْف লোকেরা প্রত্যক্ষ করবে প্রত্যেক লোক যা তার হস্ত যুগল অগ্রে প্রেরণ করেছে ভালো ও মন্দ হতে আর কাফের বলবে, হায় يَا অব্যয়টি حَرْفُ تَنْبِيْهٍ আমি যদি মৃত্তিকায় পরিণত হতাম। অর্থাৎ তাহলে আমি শাস্তি পেতাম না। তারা এ কথা তখন বলবে, যখন আল্লাহ তা'আলা জীব-জন্তুসমূহের পরস্পর হতে পরস্পরের প্রতিশোধ গ্রহণ শেষে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, তোমরা মাটিতে পরিণত হও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلرَّحْمٰنُ ও رَبّ শব্দদ্বয়ের মহল্লে ই'রাব : ই'রাবের দিক দিয়ে اَلرَّحْمٰنُ ও رَبِّ শব্দদ্বয়ের তিনটি অবস্থা দেখা যায়–

১. উভয়টি رَفْع-এর অবস্থায় আছে, এটা ইবনে কাছীর, নাফে' ও আবূ আমর -এর পঠিত কেরাত।

২. আসিম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আমের উভয়টিকে যের দিয়ে পড়েছেন।

৩. হামজা এবং কিসায়ী رَبِّ-কে যের এবং اَلرَّحْمٰنُ-কে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। –[কাবীর]

প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ উভয়টি مَرْفُوْعٌ হলে তারকীবের কয়েকটি ধরন হতে পারে। যেমন–

১. رَبُّ السَّمٰوٰتِ মুবতাদা এবং اَلرَّحْمٰنُ খবর। তারপর لَا يَمْلِكُوْنَ হতে নতুন বাক্য শুরু হয়েছে।

২. অথবা, رَبِّ السَّمٰوٰتِ মুবতাদা الرَّحْمٰن বিশেষণ (صِفَةٌ) এবং لَا يَمْلِكُوْنَ খবর হয়েছে।

৩. অথবা, هُوَ মুবতাদা উহ্য আছে এবং رَبُّ السَّمٰوٰتِ খবর, তারপর আবার মুবতাদা এবং اَلرَّحْمٰنُ খবর।

৪. অথবা, اَلرَّحْمٰن এবং لَا يَمْلِكُوْن মুবতাদার দু'টি খবর হিসেবে رَفْع অবস্থায় আছে।

আর যখন উভয়টিকে যের দিয়ে পড়া হয়, তখন পূর্বের رَبِّكَ হতে بَدَل ধরতে হবে। আর اَلرَّحْمٰنُ-কে صِفَةٌ বলতে হবে। আর যখন رَبِّ-কে যের দিবে তখন بَدَل হিসেবে দিবে। আর اَلرَّحْمٰنُ-কে পেশ দিবে مُبْتَدَأٌ হিসেবে, ঐ সময় لَا يَمْلِكُوْنَ শব্দ اَلرَّحْمٰنُ মুবতাদার খবর হবে।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ : ذٰلِكَ ইসমে ইশারা মুবতাদা, اَلْيَوْم হলো খবর এবং اَلْحَقُّ শব্দটি اَلْيَوْم-এর সিফাত বা বিশেষণ। অথবা, ذٰلِكَ ইসমে ইশারা এবং اَلْيَوْمُ মুশারুন ইলাইহ, উভয়টি মিলে মুবতাদা এবং اَلْحَقُّ খবর। –[ফাতহুল কাদীর]

يَوْمَ يَنْظُرُ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : এখানে يَوْمَ শব্দটি عَذَابً শব্দ হতে بَدَل অথবা একটি উহ্য ضَمِيْر-এর ظَرْف হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে। তখন উহ্য বাক্য এভাবে হবে, ... عَذَابًا كَائِنًا يَوْمَ অথবা قَرِيْبًا-এর ظَرْف হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতের সাথে বর্তমান আয়াতের যোগসূত্র : সূরার প্রথমে অবিশ্বাসীদের জন্য ব্যাপক ধমকের কথা আলোচনা হয়েছে। তারপর মুত্তাকীনদের জন্য বিভিন্ন ওয়াদার কথা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান আয়াত رَبِّ السَّمٰوٰتِ দ্বারা সে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ..... خِطَابًا" : আলোচ্য আয়াতে মূলত কিয়ামতের বিচার ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ তা'আলার দানশীলতা ও দয়া দাক্ষিণ্যের উল্লেখ করা হয়েছিল। আর অত্র আয়াতে এর পাশাপাশি আল্লাহর মাহাত্ম্য ও বিশালত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব এমনভাবে প্রকাশ পাবে যে, কেউ তাঁর সামনে টু শব্দটি করার সাহস পাবে না। আল্লাহর আদালতের সামনে কেউই মুখ খোলার সাহস করবে না। কাজেই আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত আপনা হতে কেউই কিছু বলবে না।

বক্ষ্যমাণ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি গুণের বিশেষ তাৎপর্য এবং বর্ণিত বিষয়ের সাথে সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। সুতরাং رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যকার যাবতীয় বস্তু নিচয়ের মালিক ও প্রতিপালক দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই কিয়ামত ও হাশর দিনের যাবতীয় কার্য পরিচালনায় সক্ষম। رَحْمٰن-এর দ্বারা এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, তিনি মু'মিনদের প্রতি দয়া করতে সেদিন বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবেন না। لَا يَمْلِكُوْنَ-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবেন– আল্লাহর আদালতে এমন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করবে যে, কি আসমানবাসী আর কি জমিনবাসী কেউই তাঁর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সামনে মুখ খোলার সাহস করবে না বা বিচারকার্যে হস্তক্ষেপ করার প্রয়াস পাবে না। অবশ্য পরবর্তী আয়াতে আলোচ্য বক্তব্যের জের টেনে বলা হয়েছে إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ অর্থাৎ 'তবে দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন।' যা হোক আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুমতি দিবেন সে-ই কেবল সুপারিশ করতে পারবে। কেউ স্বাধীনভাবে আপনা হতে সুপারিশ করতে পারবে না। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী তিনিই যে প্রকৃত প্রভু, পুরস্কার ও প্রতিদানদাতা এবং সম্মানের উচ্চাসনের সমাসীন– আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ ও দাপট এমনভাবে প্রকাশ পাবে আসমান জমিনের কেউই তাঁর সামনে মুখ খোলার কিছু বলার কিংবা বিচারকার্যে হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র সাহস করবে না। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

يَمْلِكُونَ-এর সর্বনামের মারজি' : يَمْلِكُونَ-এর মারজি' নিয়ে তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বনামটি মুশরিকদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অতএব, মুশরিকগণ আবেদন করার শক্তি রাখবে না, কিন্তু মু'মিনগণ সুপারিশ করবে এবং আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন।

২. অথবা, মু'মিনদের দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ এই দাঁড়াবে যে, মু'মিনগণ কোনো ব্যাপারে আবেদন করতে পারবে না। কেননা যখন একথা প্রমাণিত যে, তিনি ন্যায় বিচারক, তখন কাফেরদের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, তাও ন্যায্য, তাদের হক নষ্ট করা হয়নি। অতএব, কেন তাঁর কাছে আবেদন করতে হবে? –এই মতটি প্রথম মতের চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা এ আয়াতের পূর্বে মু'মিনদের উল্লেখ হয়েছে, কাফেরদের নয়।

৩. অথবা সর্বনামটি أَهْلُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ-এর দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টজীব। আর এ মতটি সর্বাধিক গ্রহণীয়, কেননা কোনো মাখলুক ঐ দিন আল্লাহকে সম্বোধন করে কিছু বলার সাহস রাখবে না। তবে সুপারিশ করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা এটা আল্লাহরই অনুমতিক্রমে করা হবে। لَا يَمْلِكُونَ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সুপারিশ মানুষ বা কোনো মাখলুকের মালিকানায় নয়। তা আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। মাখলুকের মালিকনায় হলো خِطَابَ তারই নফী করা হয়েছে। –[কাবীর]

শুধুমাত্র مَلَائِكَةُ-এর উল্লেখ করার কারণ : সম্মান ও মার্যাদার দিক দিয়ে ফেরেশতাগণ অন্যান্য মাখলুক হতে অধিক মর্যাদার অধিকারী, শক্তি ও সাহসের দিক দিয়ে প্রাচুর্যতার শীর্ষে অবস্থিত, এতদসত্ত্বেও তাঁরা হাশরের ময়দানে আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সামনে বিনীত হওয়ার কারণে টু শব্দ পর্যন্ত করতে পারবে না। ফেরেশতাদের যদি এ অবস্থা হয়, অন্যদের তো কোনো কথাই নেই। অন্যদের কি অবস্থা হবে, তা সহজেই বুঝা যায়। –[কাবীর]

رُوْحٌ-এর অর্থ নিয়ে মতভেদ : কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আয়াতে اَلرُّوْحُ শব্দের অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে সমস্ত ফেরেশতাদের মধ্য হতে এমন একজনকে رُوْح বলা হয়েছে। তিনি সপ্তাকাশ, সপ্ত জমিন এবং সমস্ত পাহাড়সমূহ হতে বড়।

২. ইমাম শা'বী, যাহ্হাক এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.)-এর মতে اَلرُّوْح বলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

৩. আবূ সালেহ এবং মুজাহিদ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ সৈন্যদলকে رُوْح বলা হয়েছে, ফেরেশতাগণ নয়।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল (রা.) বলেন, رُوْح বলতে ফেরেশতাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত পাহারাদারদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৫. ইবনে আবী মুজাইহ্‌র মতে رُوْح বলতে ফেরেশতাদের পাহারাদারদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৬. হাসান এবং কাতাদাহ (র.) বলনে, رُوْح বলতে বনী আদমকে বুঝানো হয়েছে।

৭. আতিয়া আল-আওফী (র.) বলেন, রূহ হলো বনী আদমের রূহ। তারা একটি সারিতে দাঁড়াবে এবং ফেরেশতাগণ একটি সারিতে দাঁড়াবেন। আর এটা হবে দুই نَفْخَةٌ-এর মধ্যবর্তী সময়ে এবং শরীরে রূহকে ফেরত দেওয়ার পূর্বে।

৮. যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, رُوْح বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে।

–[ফাতহুল কাদীর, কাবীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

৯. কারো মতে আদম (আ.) অবয়বে এমন এক সৃষ্টি যা বণী আদম নয়। –[কাবীর]

১০. আবুশ শেখ হযরত আলী (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, রূহ হলো একজন ফেরেশতা। যার সত্তর হাজার মুখ রয়েছে। প্রত্যেক মুখে সত্তর হাজার জিহ্বা রয়েছে। আর প্রত্যেক জিহ্বায় সত্তর হাজার ভাষা রয়েছে। সে সমস্ত ভাষায় আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে।

১১. আবুশ শেখ আতা (র.)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, রূহ একজন ফেরেশতা যার দশ হাজার বাহু রয়েছে এবং এটাও বর্ণিত আছে যে, দৈহিক দিক থেকে ফেরেশতাদের মধ্যে রূহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

১২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রূহ আল্লাহর সৈন্যদের মধ্যে একটি সৈন্যের দল যা ফেরেশতা নয়, তার মাথা আছে হাত পাও আছে এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। -[নূরুল কোরআন]

(الاية) اِلَّا مَنْ اَذِنَ আয়াতে মুস্তাছনা মিনহু : مُسْتَثْنٰى مِنْهُ -এর ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়-

১. مُسْتَثْنٰى مِنْهُ হলো اَلرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ তখন অর্থ এভাবে হবে যে, রূহ এবং ফেরেশতাগণ কোনো কথাই বলবে না, হ্যাঁ, তখন বলবে যখন আল্লাহ তাদের মধ্য হতে কাউকে কথা বলার অনুমতি দিবেন।

২. مُسْتَثْنٰى مِنْهُ শুধু 'মালাইকা' নয়; বরং সকল আকাশ ও জমিনবাসী। তখন অর্থ হবে এই যে, আকাশ ও জমিনবাসীদের মধ্য হতে কেউ কোনো কথা বলবে না, হ্যাঁ তখন বলবে, যখন আল্লাহ তাদের মধ্য হতে কাউকেও কথা বলার অনুমতি দিবেন। -[কাবীর]

وَقَالَ صَوَابًا -এর উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে প্রথমে কেউ কোনো কথা বলার সাহস করবে না; কিন্তু যখন অনুমতি মিলবে, তখন স্বভাবত আল্লাহর সামনে সত্য ও যথার্থ কথাই বলবে। অতএব, وَقَالَ صَوَابًا বলার প্রয়োজন ছিল না বলে বুঝা যায়। কোন ধরনের ফায়দাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা وَقَالَ صَوَابًا বলেছেন? এ প্রশ্নের দু'টি জবাব হতে পারে।

১. করুণাময় আল্লাহ সাধারণভাবে কথা বলার অনুমতি প্রদান করবেন। অনুমতি প্রাপ্তির পর তারা সত্য ব্যতীত কোনো কথাই বলবে না। মনে হয় যেন আয়াতের মূল বক্তব্য এই যে, তারা কোনো কথা-ই বলবে না তবে অনুমতি পাওয়ার পর বলবে। এ অনুমতি পাওয়ার পর সত্য বলারই চেষ্টা করবে। এটা তাদের যথার্থ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ বৈ আর কিছু নয়।

২. অথবা, উহ্য বাক্য এভাবে হবে যে, لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا فِىْ حَقِّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا অর্থাৎ ঐ সে ব্যক্তির ব্যাপারেই শুধু সুপারিশ করা যাবে, যার ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি আল্লাহ দিবেন এবং ঐ ব্যক্তি যথার্থ সত্য বলা লোকদের মধ্য হতে হবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ-এর সত্য বাণী উচ্চারণ করে মু'মিন হয়েছিল, কিন্তু পাপকার্য করে পাপী হয়ে গেছে। -[কাবীর]

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ এর মর্মার্থ : اَلْيَوْمَ শব্দটির সঙ্গে একটি বিশেষ বিশেষণ যোগ করা হয়েছে যে, তা اَلْحَقُّ বা যথার্থ সত্য। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. কেননা ঐ দিন সর্বপ্রকার সত্য প্রকাশিত হবে এবং সর্বপ্রকার প্রকার অসত্য বিলুপ্ত হবে। যেহেতু সকল সত্য ঐ দিনে প্রকাশিত হবে সেহেতু ঐ দিনকেই হক বা সত্য বলা হয়েছে। যেমন- কোনো ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশ দিক ভালো বুঝাতে বলা হয় فُلَانٌ خَيْرٌ كُلُّهُ অতএব, ঐ দিনটিই প্রকৃত সত্য, ঐ দিন ছাড়া সব দিনই বাতিল। কেননা দুনিয়ার দিনগুলো অধিকাংশই বাতিল।

২. অথবা, اَلْحَقُّ শব্দের অর্থ এখানে اَلثَّابِتُ অর্থাৎ মওজুদ। এ অর্থেই আল্লাহর ব্যাপারে বলা হয়- اِنَّ اللّٰهَ حَقٌّ অর্থাৎ তিনি মওজুদ আছেন, কোনো সময় তিনি ধ্বংস হবেন না। এমনিভাবে يَوْمَ الْقِيَامَةِ ও হক এবং মওজুদ হবে, ধ্বংস হবে না।

৩. অথবা, অর্থ এভাবে হবে যে, ঐ দিনটিই দিন হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কেননা এ দিন সকল কিছু উদ্ঘাটিত হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ার দিনগুলোতে ঐসব ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ গোপন থাকে। এমতাবস্থায় اَلْحَقُّ অর্থ اِسْتِحْقَاقٌ [যোগ্যতা] ধরা হয়েছে। -[কাবীর]

فَمَنْ -এ فَاءٌ -এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলার বাণী فَمَنْ شَآءَ তে যেই فَاءٌ রয়েছে, এটা একটি উহ্য শর্তের جَزَاءٌ হয়েছে। একে আরবি ভাষায় اَلْفَاءُ الْفَصِيْحَةُ বলা হয়ে থাকে। উহ্য বাক্য এভাবে বলা যায়- اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَمَا ذُكِرَ مِنْ تَحَقُّقِ الْاَمْرِ الْمَذْكُوْرِ لَا مُحَالَةَ فَمَنْ شَآءَ .... -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَآبًا শব্দের অর্থ : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, مَآبًا اَىْ سَبِيْلًا অর্থাৎ পথ। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে– এখন যার ইচ্ছা নিজে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করার পথ গ্রহণ করুক।

অন্যান্য মুফাসসিরদের মতে مَآبًا-এর অর্থ مَرْجِعًا প্রত্যাবর্তন স্থল। তখন পূর্ণ অর্থ করতে হলে رَبِّه-এর পূর্বে ثَوَابُ শব্দ مُضَافٌ হিসেবে উহ্য মানতে হবে, উহ্য বাক্য এভাবে হবে, فَمَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ مَرْجِعًا اِلٰى ثَوَابِ رَبِّه فَلْيَفْعَلْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার রবের নিকট ছওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে আমলের মাধ্যমে গমন করতে চায় সে যেন তা করে।

ثَوَابٌ শব্দ কেন উহ্য ধরা হয় এ ব্যাপারে বলা হয় যে, আল্লাহর ذَاتٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়, বিধায় ثَوَابٌ শব্দ উহ্য ধরে অর্থ করতে হয়। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, সাফওয়া]

عَذَابٌ قَرِيْبٌ-এর মর্মার্থ : 'নিকটতম আজাব'-এর মর্মার্থ নিরূপণ করতে গিয়ে মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন–

১. অধিকাংশ মুফাসসিরগণ কিয়ামতের বা আখেরাতের শাস্তিকে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ অর্থের উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে– عَذَابًا قَرِيْبًا তথা 'সন্নিকটবর্তী শাস্তির' ভয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমসাময়িক কালের মক্কার কাফেরদেরকে প্রদর্শন করা হয়েছিল তারপর অদ্যাবধি প্রায় দেড় হাজার বছর সময়কাল অতীত হয়ে গেছে। এখনো বলা যায় না যে, কিয়ামত কখন বা কত সহস্র বছর পরে অনুষ্ঠিত হবে। তাহলে কেনইবা 'অতি নিকটবর্তী শাস্তি' বলে উল্লেখ করা হলো। আর সূরার শুরুতে কেনবা 'অতিশীঘ্রই জানতে পারবে' বলে বলা হলো। তফসীরে আযিযীতে বর্ণিত হয়েছে– এখানে عَذَابًا قَرِيْبًا দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর 'আলমে বরযখের' শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, মানুষ যতদিন এ দুনিয়ায় স্থান ও কালের সীমার মধ্যে দৈহিকভাবে জীবন যাপন করছে, কেবল ততদিনই তাদের সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকবে। মৃত্যুর পর যখন কেবল রূহই অবশিষ্ট থাকবে তখন সময় ও কালের কোনো চেতনা থাকবে না। কিয়ামতের দিন মানুষ যখন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তাদের মনে হবে এইমাত্র কেউ তাদেরকে গভীর নিদ্রা হতে জাগিয়ে দিয়েছে। তারা যে হাজার হাজার বছর মৃত থাকার পর পুনরায় জীবিত হয়েছে সে অনুভূতি তাদের মোটেই থাকবে না।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, দুরবর্তী বস্তু তো তাই যা অতীত হয়ে গেছে, আর নিকটবর্তী বস্তু হলো তাই, যা এখনো আসার অপেক্ষায় রয়েছে। অতএব, কিয়ামতের শাস্তি আসবেই, এ কারণে একে নিকটতম শাস্তি বলা হয়েছে।

অথবা, আল্লাহর কাছে এটা অতি নিকটে তাই عَذَابًا قَرِيْبًا বলা হয়েছে।

অথবা, আখেরাতের জীবন মৃত্যু হতে শুরু হয়। আর মৃত্যু নিকটবর্তী বলে সবাই বিশ্বাস করে।

২. হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, عَذَابًا قَرِيْبًا বলতে 'আযাবে দুনিয়া'কে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা আখেরাতের আজাবের তুলনায় অতি নিকটবর্তী।

৩. হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, عَذَابًا قَرِيْبًا বলে বদরের প্রান্তরে কুরাইশ বাহিনীর চরম শোচনীয় পরাজয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

يَنْظُرُ الْمَرْءُ-এর মধ্যস্থ اَلْمَرْءُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَرْءُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের তিনটি অভিমত দেখা যায়–

১. اَلْمَرْءُ দ্বারা عَامٌ ভাবে সকলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, যদি ব্যক্তির সামনে মুত্তাকীনদের আমল পেশ করা হয়, তাহলে সে উত্তম প্রতিদানই পাবে। আর যদি কাফিরদের আমল পেশ করা হয়, তাহলে শুধু শাস্তিই তার জন্য অবধারিত। অতএব, এ দুটি ব্যাপার ছাড়া হাশরের ময়দানে অন্য কোনো ব্যাপার বা ব্যবস্থা দেখা যাবে না।

২. হযরত আতা (র.) বলেন اَلْمَرْءُ দ্বারা কেবল কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মু'মিন যেমন পেশকৃত আমলের অপেক্ষা করবে তেমনি আল্লাহর ক্ষমা এবং করুণারও প্রত্যাশা করবে। আর কাফের তো শুধু আজাবই দেখতে পাবে। সে অন্য কিছুই দেখতে পাবে না; বরং দেখতে পাবে শুধু তার দুনিয়ার কৃতকর্ম। কেননা যে আজাব তার কাছে আসবে, তা তার বদ কর্মেরই ফলাফল।

৩. হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) বলেন, اَلْمَرْءُ বলতে মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। তাঁরা এ মতের পক্ষে দু'টি দলিল পেশ করে থাকেন–

ক. কেননা, আল্লাহ তা'আলা এ কথার পর পরই বলেছেন وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا এটা যদি কাফেরদের অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে এ কথার পূর্বে নিশ্চয় মু'মিনদের অবস্থার বর্ণনা হবে। অতএব, اَلْمَرْءُ দ্বারা মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে।

খ. মু'মিন যখন ভালো-মন্দ উভয় কাজই করেছেন, তখন ভালো কাজের সুফল আর মন্দের জন্য ক্ষমার আশা করে অপেক্ষা করতে থাকবে। পক্ষান্তরে কাফের শুধু মন্দই করেছে, অতএব তার জন্য আজাব তো অবধারিত। কোনো কিছুর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। –[কাবীর]

আল্লামা শাওকানী (র.) চতুর্থ একটি মত উল্লেখ করে বলেন, اَلْمَرْءُ দ্বারা উবাই ইবনে খালফ এবং উকবা ইবনে আবী মুয়ীত-কে নির্দেশ করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا :

يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا আয়াতাংশের মর্মার্থ : কাফেরের উক্তি 'হায়' আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম এর মর্মার্থের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, চতুষ্পদ জন্তুদের পরস্পরের কেসাস গ্রহণের পর তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা মাটি হয়ে যাও।" এটা দেখে কাফেররা বলবে যে, হায় যদি আমরাও মাটি হয়ে যেতাম, তাহলে জাহান্নামের আজাব হতে মুক্তি পেতাম।

২. কেউ কেউ বলেছেন, কিয়ামতের আজাব দর্শনে কাফেররা মনে করবে যে, তাদের রূহ অবশিষ্ট থাকার দরুনই তারা আজাব ভোগ করছে। যদি তারা নিছক শরীরে বা মাটিতে পরিণত হয়ে যেত তাহলে আর আজাব অনুভব করত না।

৩. কাফের দ্বারা যদি ইবলীস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর মর্মার্থ হবে ইবলীস আদম (আ.) ও আদম সন্তানদের আনন্দ উৎসব দেখে জ্বলে পুড়ে মরবে এবং আফসোস করে বলবে হায়! আমি যদি আগুনের তৈরি না হয়ে মাটির তৈরি হতাম।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো আমি যদি মোটেই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ না করতাম, আমাকে যদি মাটি থেকে পয়দাই করা না হতো, কিংবা মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতাম, পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠার সুযোগ না হতো। তাহলে কতই না ভালো হতো। কেননা তাহলে আমি আজকে যে আজাবের সম্মুখীন হয়েছি তা হতে মুক্তি পেতাম।

৫. সুফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন, এখানে মাটি হওয়ার অর্থ হলো নম্র হওয়া এবং অহংকারী না হওয়া। অর্থাৎ কাফের সেদিন আফসোস করে বলবে 'হায়' আমরা যদি দুনিয়ায় অহংকারী না হতাম, আল্লাহ ও রাসূলের কাছে মাথা নত করে দিতাম, তাহলে আজ এ কঠোর আজাবের সম্মুখীন হতাম না।

৬. আল্লামা বাগাবী (র.) বলেন, যিয়াদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন ফয়সালা করে ফেলবেন এবং জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং দোজখীদেরকে দোজখে প্রেরণ করার আদেশ দিয়ে দেবেন এবং অন্যান্য জীব জন্তুর ব্যাপারেও মীমাংসা দিয়ে দেবেন এবং তারা মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে তখন কাফেররা বলবে, হায়! আফসোস যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ : সূরা আন-নাযি'আত

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلنَّازِعَاتُ শব্দ نَزْعٌ হতে নিষ্পন্ন। نَازِعٌ-এর বহুবচন نَازِعَاتٌ-এর আভিধানিক অর্থ– আকর্ষণকারীগণ, সজোরে কোনো বস্তুকে টেনে আনয়নকারীগণ। সূরাটি نَازِعَاتٌ শব্দ যোগে শুরু করা হেতু এর নামকরণ হয়েছে اَلنَّازِعَاتُ। এ ছাড়া এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– سَاهِرَةٌ ও طَامَّةٌ এ সূরায় ২টি রুকু', ৪৬টি আয়াত, ১৭৩টি বাক্য এবং ৯৫৩টি অক্ষর রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামত দিবসের আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে তাদের শাস্তির ঘোষণা এসেছে, আর অত্র সূরায় শপথ করে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন, এর পাশাপাশি এ কথাও ইরশাদ হয়েছে যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা হককে বাতিলের উপর বিজয়ী করেন। এ মর্মে হযরত মূসা (আ.) -এর ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, কিভাবে হযরত মূসা (আ.) অহংকারী ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কিভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন। –[বাহ্‌রুল মুহীত]

শানে নুযূল : হিজরতের পূর্বে যেসব অকাট্য প্রমাণসহ আয়াত নাজিল হয়েছিল মক্কার হঠকারী কাফেররা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির ফলে ঐ সকল আয়াত বিশ্বাস করত না এবং এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করত না। অথচ কিয়ামতের ধ্বংস-প্রলয় সম্পর্কে বারবার তাদেরকে বলা হচ্ছিল। আল্লাহর অসীম কুদরতের কথাও তাদের নিকট বারবার বিবৃত হচ্ছিল। তবু তারা বলত কিয়ামত হবেই এ কথাটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরা নাজিল করে কিয়ামতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ করেন। –[মা'আলিম]

সূরাটির ফজিলত : সূরা আন-নাযি'আত দুশমনের সামনে পাঠ করলে তার শত্রুতা এবং অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে উক্ত সূরাটি তেলাওয়াত করতে দেখে অথবা এমনিতেই দেখে, তার অন্তর হতে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। –[নূরুল কুলূব]

একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আন-নাযিরাত সর্বদা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে কবর ও হাশরে এত আরামে রাখবেন যে, তার মনে হবে, সে যেন এই মাত্র এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় পরিমাণ তথায় অবস্থান করেছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় কিয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং এর সংশ্লিষ্ট কতিপয় অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

সুতরাং জান কবজকারী, আল্লাহর হুকুম অবিলম্বে পালনকারী ও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এরূপ কথা দ্বারা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে। মৃত্যুর পর অন্য এক জীবন অবশ্যই যাপন করতে হবে। উক্ত দু'টি বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যেসব ফেরেশতার হাতে এখানে জান কবজ করানো হচ্ছে, তাদের হাতেই পুনরায় তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার করানো কঠিন কিছু নয়। যে ফেরেশতারাই সেদিন সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই সমস্ত সৃষ্টি লোকের বর্তমান শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুনভাবে অপর একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয় যে, একটি ধাক্কায় বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আর তার পুনরুজ্জীবনের জন্যও একটি ধাক্কারই প্রয়োজন মাত্র। আজ যারা এর অস্বীকার করেছে তাদের চোখের সামনেই তা সংঘটিত হবে, তখন তারা ভীত-বিহবল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূলকে অবিশ্বাসকারী, হেদায়েতকে অস্বীকারকারী এবং রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা তাদের উক্ত অপকর্মসমূহ বর্জন করত হেদায়েতের পথে না আসে তাহলে তাদেরকে ফেরাউনের ন্যায় মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পুনরায় জীবিত হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে–তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা কঠিন কাজ; কিংবা মহাশূন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিস্তীর্ণ এ বিরাট-অসীম বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর পক্ষে এ কাজটি করা কঠিন ছিল না– তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? পরকাল হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্য এ অকাট্য যুক্তি একটি কার্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। তারপর পৃথিবী এবং তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রদত্ত সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এখানে প্রতিটি জিনিসই উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করছে, এটা অতি উচ্চ কর্মকুশলতা সহকারে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ হতে মানুষের বিবেকের নিকট একটি অতি বড় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। তা এই যে, এ সুবিশাল সৃষ্টিলোকে মানুষকে ক্ষমতা এখতিয়ার দেওয়ার পর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত মনে হয় না। পৃথিবীতে যথেচ্ছা বিচরণ করা ও স্বেচ্ছাচারিতা করে মৃত্যুবরণ করা ও মাটির সাথে চিরতরে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নিশ্চহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ করেছে, কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উপর কোনোরূপ আলোচনা ব্যতীতই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে মানুষের স্থায়ী ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তা এ ভিত্তিতে হবে যে, কে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-বিলাসকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছে? পক্ষান্তরে কে স্বীয় প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে নাফরমানদের কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসাকে সামলিয়েছে? সুতরাং যে ব্যক্তি হঠকারিতা পরিহার করে বিশ্বাসী অন্তর নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করবে সে আপনা হতেই উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব পাবে। কেননা বিবেক, যুক্তি ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানুষের উপর কোনো দায়িত্ব অর্পণের অর্থ এই যে, পরিশেষে তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, এর হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তার সফলতার কারণে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পক্ষান্তরে ব্যর্থতার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

পরিশেষে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? জবাবের সারমর্ম এই যে, পয়গাম্বরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পয়গাম্বরের দায়িত্ব তো শুধু সতর্ক করে দেওয়া যে, সেদিন অবশ্যই আসবে। কখন আসবে তা জানা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বের বিষয় হলো, তোমরা এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সুতরাং যার মনে চায় সে একে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করে নিক। আর যার ইচ্ছা সে যথেচ্ছভাবে সময় কাটিয়ে দিক। যখন বিচারের দিন সমাগত হবে, তখন যারা এ পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে বসেছিল, তারা অনুভব করবে যে, দুনিয়াতে তারা মাত্র কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিল। তখন তারা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে যে, দুনিয়ার অল্প কয় দিনের জীবনের সুখ-শান্তির মোহে পড়ে কিভাবে ভবিষ্যতের স্থায়ী শান্তিকে খুইয়ে বসেছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ وَالنَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আন-নাযি'আত মক্কায় অবতীর্ণ

سِتٌّ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً : ৪৬ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. وَالنّٰزِعٰتِ اَلْمَلَائِكَةِ تَنْزِعُ اَرْوَاحَ الْكُفَّارِ غَرْقًا نَزْعًا بِشِدَّةٍ ـ

১. শপথ উৎপাটনকারীদের সে ফেরেশতাদের যারা কাফেরদের রূহ উৎপাটন করবে নির্মমভাবে কঠোরভাবে উৎপাটন করার মাধ্যমে।

২. وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا اَلْمَلَائِكَةِ تَنْشِطُ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ تَسُلُّهَا بِرِفْقٍ ـ

২. আর যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্তকারী সে ফেরেশতাগণ যারা মু'মিনদের রূহকে সন্তুষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ সহজভাবে তাদের রূহকে বের করে নেয়।

৩. وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا اَلْمَلَائِكَةِ تَسْبَحُ مِنَ السَّمَاءِ بِاَمْرِهٖ تَعَالٰى اَىْ تَنْزِلُ ـ

৩. আর যারা সন্তরণে সন্তরণকারী সে ফেরেশতারা যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে আকাশ হতে সন্তরণ করে অর্থাৎ অবতরণ করে।

৪. فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا اَىِ الْمَلَائِكَةِ تَسْبِقُ بِاَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى الْجَنَّةِ ـ

৪. এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে অর্থাৎ সে ফেরেশতাগণ যারা মু'মিনগণের রূহকে নিয়ে বেহেশত পানে ছুটে যায়।

৫. فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا اَلْمَلَائِكَةِ تُدَبِّرُ اَمْرَ الدُّنْيَا اَىْ تَنْزِلُ بِتَدْبِيْرِهٖ وَجَوَابُ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ مَحْذُوْفٌ اَىْ لَتُبْعَثُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ وَهُوَ عَامِلٌ فِىْ ـ

৫. অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে সে ফেরেশতারা যারা পার্থিব কর্মকাণ্ড নির্বাহ করে। অর্থাৎ এরা নির্বাহ উদ্দেশ্যে অবতরণ করে। আর এ সকল শপথের জবাব উহ্য। অর্থাৎ لَتُبْعَثُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ "অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে, হে মক্কাবাসী কাফেরগণ!" আর তাই পরবর্তী আয়াত মধ্যকার يَوْمَ -এর মধ্যে عَامِلٌ

তাহকীক ও তারকীব

غَرْقًا -এর মহল্লে ই'রাব : غَرْقًا শব্দটি তারকীবে মাফউলে মুতলাক হিসেবে মানসুব হয়েছে। মূলবাক্যটি এভাবে ছিল যে, وَالنَّازِعَاتِ اَىِ النُّفُوْسُ النَّازِعَاتُ الَّتِىْ تُغْرِقُ اِغْرَاقًا এখানে মূলে اِغْرَاقًا ছিল, অতিরিক্ত (فَحُذِفَتِ الزَّوَائِدُ وَبَقِىَ غَرْقًا) বাবে اِفْعَالٌ-এর হরফগুলোকে হযফ করে غَرْقٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

অথবা, غَرْقٌ শব্দটি حَالٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قوله "وَالنّٰزِعَاتِ الخ" : وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا এটা একটি বাক্য। এখানে وَاوْ কসমের জন্য اَلنَّازِعَاتُ শিবহে ফে'ল, هِيَ সর্বনাম এতে ফায়েল এবং غَرْقًا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউল মিলে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়ে কসম হয়েছে। لَتُبْعَثُنَّ উহ্য ক্রিয়াটি কসমের জবাব। কসম ও জবাবে কসম মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে। [অন্যান্য বাক্যগুলোর তারকীবও একই রূপ হবে।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا" আল্লাহ তা'আলা এখানে সে সকল ফেরেশতার শপথ করেছেন, যারা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে কাফেরদের আত্মসমূহ টেনে-হেঁচড়ে বের করে আনেন।

اَلنَّازِعَاتُ-এর অর্থ : اَلنَّازِعَاتُ শব্দটি اَلنَّازِعُ-এর বহুবচন। মুফাস্সিরগণ -এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে اَلنَّازِعَاتُ-এর দ্বারা এখানে যোদ্ধা এবং তীরন্দাজদের বুঝানো হয়েছে।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর মতে কাফেরদের দেহের গভীরে পৌঁছে প্রতিটি ধমনি, প্রতিটি লোমক, প্রত্যেকটি নখ এবং প্রত্যেকটি পায়ের পাতা হতে অতি কঠোরভাবে প্রাণ টেনে বের করে। আবার ফেরত দেয় আবার বের করে, এভাবে টানা-হেঁচড়া করে তাদের রূহ কবজ করা হয়।

৩. কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, মালাকুল মউত কাফেরদের প্রাণকে রগসহ টেনে বের করেন।

৪. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে اَلنَّازِعَاتُ দ্বারা সেসব ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে, যারা অতি কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা সহকারে কাফেরদের আত্মা টেনে বের করে; তাদের রূহ কবজ করেন।

نَزْعٌ-এর অর্থ হলো কঠোরতার সাথে টেনে বের করা। আর غَرْقًا-এর অর্থ– অতি কঠোর। অথবা غَرْقًا-এর দ্বারা ডুবে তথা দেহের গভীরে পৌঁছে রূহকে টেনে আনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, نَزْعٌ এমনভাবে সম্পন্ন হবে যা অন্যদের দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরি নয়। কাজেই কোনো সময় মৃত্যুযন্ত্রণা পরিলক্ষিত হয় আবার কোনো সময় পরিলক্ষিত হয় না। এতে বলার জো নেই যে, কাফেরদের মৃত্যুযন্ত্রণা হয় না; বরং আত্মার উপর সকল শাস্তি অতিবাহিত হয় বলে অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারে না। -[কামালাইন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, নূরুল কোরআন]

اَلنَّاشِطَاتِ শব্দের মর্মার্থ : اَلنَّاشِطَاتُ শব্দটি نَشْطٌ শব্দ হতে নির্গত। نَشْطٌ শব্দটির অর্থ হলো– বন্ধন খুলে দেওয়া। এ সমস্ত ফেরেশতাদেরকে نَاشِطَاتٌ বলা হয়েছে, যারা মানব শরীর হতে সহজে তাদের নফসকে বের করে আনে। যেমন– উটের পা হতে রশি খুলে আনা হয়।

আবার نَاشِطٌ ঐ বন্য ষাঁড়কে বলা হয়, যা একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যায়। অর্থাৎ যথা ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়ায়। যোদ্ধারা যুদ্ধ যাত্রার পর এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার পূর্বে পথিমধ্যে যে গনিমতের মাল হস্তাগত হয়, তাকেও 'নাশিতা' বলা হয়। অমুক লোক ডোল দ্বারা কূপ হতে পানি নাশত করল– অর্থাৎ ডোল কূপ হতে সহজে উঠে আসল।

এখানে نَاشِطَاتٌ দ্বারা মু'মিনের রূহ কবজকারী ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। তথা তারা অতি সহজে অনায়াসে মু'মিনের রূহকে কবজ করে নেন, কোনোরূপ কঠোরতা করে না। -[মা'আরিফুল কুরআন]

ফেরেশতাদেরকে نَاشِطَاتٌ-এর সাথে তুলনা করার কারণ : সহজতার দিক থেকে ঈমানদারদের রূহ বের করাকে نَاشِطَاتٌ -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, যে সকল ফেরেশতাকে ঈমানদারদের রূহ বের করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা অতি সহজে তাদের রূহ বের করে নিয়ে যায়, কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না। এ সহজতা যদিও দেখা যায় না, কিন্তু মু'মিন ব্যক্তির রূহ তা অনুভব করে। অনেক সময় মু'মিনের মৃত্যুর সময় কষ্ট পেতে দেখা যায়, যদিও বাহ্যত কষ্ট দেখা যায়; কিন্তু তা কষ্ট নয়। মৃত্যুর সময় মু'মিনের সামনে বেহেশত তুলে ধরা হয়, এ কারণে তাদের রূহ তাড়াতাড়ি সেদিকে যাওয়ার জন্য পাগল প্রায় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কাফেরদের সামনে দোজখের লেলিহান শিখা প্রজ্বলিত করা হয়, তাই তাদের রূহ শরীর হতে বের হতে চায় না জোর করে বের করতে হয়। -[মাযহারী, কুরতুবী]

اَلسَّابِحَاتُ-এর মর্মার্থ : اَلسَّابِحَاتُ শব্দটি سَبْحٌ থেকে নির্গত। سَبْحٌ অর্থ সাতার কাটা। আয়াতে سَابِحَاتٌ বলতে ঐ সমস্ত ফেরেশতারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা রূহ বের করার জন্য শরীরের রগরেষায় বিচরণ করে থাকে। যেমন সমুদ্রের অতল গভীরে অবস্থিত মণি-মুক্তা সংগ্রহকারী সমুদ্রে সহজে বিচরণ করে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ক. হযরত আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ (র.), সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবূ সালিহ (র.) প্রমুখগণের মতে اَلسَّابِحَاتِ-এর দ্বারা সে সকল ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর হুকুম পালনে এত দ্রুত গতিশীল ও তড়িৎকর্মী যে, মনে হয় তারা মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।

খ. কারো কারো মতে سَابِحَاتٌ -এর দ্বারা ঐ সমস্ত ফেরেশতারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা রূহ বের করার জন্য শরীরের শিরা-উপশিরায় বিচরণ করে থাকে। যেমন সমুদ্রের অতল গভীরে অবস্থিত মণি-মুক্তা সংগ্রহের জন্য ডুবুরিগণ সহজেই সমুদ্রে বিচরণ করে থাকেন।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর سَابِحَاتٌ-এর দ্বারা মু'মিনগণের ঐ সমস্ত আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে যাওয়ার জন্য দ্রুত ভ্রমণ করতে চায়।

ঘ. হযরত আতা (র.) -এর মতে سَابِحَاتٌ-এর অর্থ ঐ নৌকা বা জাহাজসমূহ যা পানিতে বিচরণ করে বেড়ায়।

ঙ. হযরত মুজাহিদের এক বর্ণনা অনুযায়ী এটা ঐ মৃত্যু যা বনূ আদমের নাফসে ভ্রমণ করে।

চ. কেউ কেউ বলেছেন, দ্রুতগতিশীল ঘোড়াকে سَابِحَاتٌ বলে।

ছ. হযরত মুজাহিদ (র.) ও আবূ সালিহ (র.) হতে অন্যমত অনুযায়ী তারা ঐ ফেরেশতা যারা আল্লাহর নির্দেশে আকাশ হতে অতি তাড়াতাড়ি অবতরণ করে এবং তড়িৎ গতিতে ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়।

জ. হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.)-এর মতে سَابِحَاتٌ-এর দ্বারা সে তারকারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ করা হয়েছে- وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ অর্থাৎ আর এরা [তারকারাজি] স্ব-স্ব কক্ষপথে গতিশীল-প্রদক্ষিণরত।

اَلسَّابِقَاتِ-এর **মর্মার্থ :** اَلسَّابِقَاتُ শব্দটি سَبْقٌ হতে নির্গত। তা اَلسَّابِقَةُ-এর বহুবচন। অর্থাৎ দ্রুতগামী- প্রতিযোগিতায় যারা অন্যদেরকে অতিক্রম করে যায়। এখানে এর উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. জমহুরের মতে তারা সে সকল ফেরেশতা যারা মু'মিনগণের রূহ নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে জান্নাতের দিকে ধাবিত হন।

খ. ইমাম রাযী (র.) -এর মতে سَابِقَاتٌ-এর দ্বারা মু'মিনগণের আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর পানে যাওয়ার জন্য রূহ বহনকারী ফেরেশতাদের দিকে অগ্রগামী হয়।

গ. হযরত আতা (র.) বলেন, যুদ্ধের দিকে অগ্রগামী ঘোড়াকে سَابِقَةٌ বলে।

ঘ. হযরত কাতাদাহ, হাসান ও মা'মার (র.) প্রমুখগণের মতে سَابِقَاتٌ-এর দ্বারা সে তারকারাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা ভ্রমণে একটি অপরটি হতে অগ্রগামী হয়ে যায়।

ঙ. হযরত মাসরূক ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখগণের মতে ফেরেশতাগণ শয়তানের আগে নবীগণের (আ.) ওহী নিয়ে যায়, বিধায় তাদেরকে 'আস-সাবিকাত' বলে।

চ. হযরত আবূ রাওফ (র.) বলেন, ফেরেশতাগণ যেহেতু মানুষের পূর্বে ভালো ও যোগ্য কাজ করে অগ্রগামী হয়েছিল, তাই তাদেরকে سَابِقَاتٌ বলে।

ছ. ফেরেশতারা মু'মিনদের রূহ নিয়ে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হয় বলে তাদেরকে سَابِقَاتٌ বলে। এটা হযরত মুকাতিল (র.) হতে বর্ণিত হয়েছে। -[কামালাইন, কুরতুবী, কাবীর]

اَلْمُدَبِّرَاتِ-**এর মর্মার্থ :** ইমাম কুশাইরী (র.) বলেন, এ কথাটি স্বতঃসিদ্ধ যে, এখানে اَلْمُدَبِّرَاتِ বলতে ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে।

ইমাম মাওয়ারদী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয় তন্মধ্যে জমহুরের অভিমত হলো মালাইকাহ বা ফেরেশতাকুল। আর মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি সাতটি তারকা বলে উল্লেখ করেছেন।

এখন যদি ফেরেশতা অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا -এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ফেরেশতাগণ হালাল-হারাম এবং সকল বিধানের বিশ্লেষণ নিয়ে আসেন, তাই তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সকল কাজের তাদবীরকারী একমাত্র আল্লাহ; কিন্তু যখন ফেরেশতাগণ তা নিয়ে অবতরণ করেন, তখন তাদেরকে এ গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে। অথবা ফেরেশতাগণ দুনিয়াবাসীর জন্য বাতাস, বৃষ্টিসহ অন্যান্য বিষয়ের তদবীর করে থাকেন। এ তদবীর আল্লাহর নির্দেশেই হয়। তাই তাদেরকে তদবীরকারী বা আঞ্জামদাতা বলা হয়েছে।

আব্দুর রহমান ইবনে সাবাত (র.) বলেন, দুনিয়ার ব্যাপারগুলো চারজন ফেরেশতার উপর ন্যস্ত। হযরত জিবরাঈল, হযরত মীকাঈল, হযরত আযরাঈল ও হযরত ইসরাফীল (আ.)। ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) বাতাস এবং সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতার কাজে লিপ্ত, হযরত মীকাঈল (আ.) বৃষ্টি এবং গাছপালার দায়িত্বে, হযরত আযরাঈল (আ.) রূহ গ্রহণের দায়িত্বে এবং হযরত ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। ইমাম রাযী (র.) বলেন, কোনো কোনো ফেরেশতা বনী আদমের হেফাজতের দায়িত্বে রয়েছেন। তাদের মধ্য হতে একদল মানুষের কর্মকাণ্ড রেকর্ড করবার দায়িত্ব পালন করেন। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

অথবা, এর দ্বারা মুজাহিদদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তথা মুজাহিদদের হাতে থাকে কামান, তারা নিজেদের শক্তি একত্রিত করে দুশমনের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে, তারা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং দুশমনের মোকাবিলায় একসাথ হয় এবং সামরিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে। -[নূরুল কোরআন]

أُمُورًا না বলে أَمْرًا বলার কারণ : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা أَمْرًا বলেছেন, أُمُورًا বলেননি। অথচ ফেরেশতাগণ অনেক কাজেরই তাদবীর বা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন একটি ব্যাপার বা একটি কাজ নয়।

এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, এখানে أَمْر বলতে أَمْر-এর جِنْس উদ্দেশ্য। আর কোনো শব্দ দ্বারা جِنْس উদ্দেশ্য হলে সেখানে বহুবচনের অর্থ লুক্কায়িত থাকে। অতএব, এখানে أَمْر বলতে جِنْس أَمْر বা সকল প্রকার أَمْر-ই উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

আল্লাহ তা'আলার কসমকৃত বিষয়সমূহের কসমের জবাব : কসমের জবাব উহ্য রয়েছে। মূলবাক্য এভাবে ছিল যে, وَالنَّازِعَاتِ ..... لَتُبْعَثُنَّ অর্থাৎ 'তোমরা পুনরুত্থিত হবেই' এ কথাটি উহ্য আছে। কেননা পরবর্তী আয়াতসমূহ হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, শপথের জবাব لَتُبْعَثُنَّ হবে।

* আর শপথের জবাব সকল শ্রোতার নিকট পরিষ্কার হওয়ার কারণে উহ্য রাখা হয়েছে।
* কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, কসমের জবাব হলো إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ইবনে আম্বারী (র.) বলেন, এ মতটি যুক্তিতে টিকে না, কেননা কসম এবং জবাবে কসমের মাঝে অনেক কথাবার্তা অতিক্রম হয়েছে।
* কারো মতে هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى আয়াতটি হলো কসমের জবাব।
* কারো মতে يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ আয়াতটি হলো কসমের জবাব।

উল্লিখিত কয়েকটি মতের মধ্য হতে প্রথম মতটিই উত্তম-গ্রহণযোগ্য। -[ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত ফেরেশতাগণের শপথ করেছেন কেন? : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত কয়টিতে বিভিন্ন প্রকারের ফেরেশতাগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অন্য কথায় বিভিন্ন শ্রেণির ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে। যদিও অনুরূপ তাফসীর স্বয়ং নবী করীম ﷺ হতে সরাসরি বর্ণিত হয়নি তথাপি কতিপয় বড় বড় সাহাবী ও তাঁদের শাগরেদ তাবেয়ীগণ এরূপ অর্থই বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এ অর্থ তাঁরা নবী করীম ﷺ হতে জেনেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কিয়ামত ও পুনরুত্থান প্রসঙ্গে এসব ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হলো কেন? অথচ কিয়ামত ও পুনরুত্থানের মতো ফেশেতারাও ইন্দ্রিয় অগোচর- দৃষ্টি সীমার বাইরে। সুতরাং একটি অদৃশ্য বস্তুকে সাব্যস্ত করার জন্য অন্য একটি অদৃশ্য বস্তুর শপথ কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন, মক্কার কাফেররা যদিও কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত তথাপি তারা ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, ফেরেশতারাই জান কবজ করে। তারা আরো বিশ্বাস করত, ফেরেশতাগণ অত্যন্ত তীব্র গতিসম্পন্ন। চোখের পলকে তাঁরা পৃথিবী হতে আকাশে চলে যেতে পারেন। যে কোনো কাজ তাঁরা নিমিষে সুসম্পন্ন করতে পারেন। তাদের এ বিশ্বাসও ছিল যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার আদেশে বিশ্ব জাহানের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তারা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী ও স্বপরিচালিত নন। তাঁদের নিজস্ব মত বলতে কিছু নেই। অবশ্য মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলত। তারা ফেরেশতাদের ইবাদতও করত। অবশ্য ফেরেশতাদেরকে তারা বিশ্ব-জাহানের মূল পরিচালক মনে করত না।

উপরিউক্ত কারণেই কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে প্রমাণ করার জন্য উক্ত পরিচিতিসহ ফেরেশতাদের শপথ করেছেন। সুতরাং এর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা তোমাদের জান কবজ করে, তাঁরাই নির্দেশে তারা তোমাদের মধ্যে পুনরায়, প্রাণের সঞ্চার করতে পারবে। আল্লাহর হুকুমে যেমন তারা বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনার কাজ চালাচ্ছেন, তারাই আবার তাঁর হুকুমেই এ বিশ্ব-জগতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছারখার করে দিবে। আল্লাহর নির্দেশেই তারা এক নবতর জগৎ নির্মাণ করবে। আল্লাহর হুকুম পালনে তারা বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى بِهَا يَرْجُفُ كُلُّ شَيْءٍ اَىْ يَتَزَلْزَلُ فَوُصِفَتْ بِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا .

٧. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ وَبَيْنَهُمَا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الرَّاجِفَةِ فَالْيَوْمُ وَاسِعٌ لِلنَّفْخَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَصَحَّ ظَرْفِيَّتُهٗ لِلْبَعْثِ الْوَاقِعِ عَقَبَ الثَّانِيَةِ .

٨. قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ خائفة قلقة .

٩. اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ذَلِيْلَةٌ لِهَوْلِ مَا تَرٰى .

١٠. يَقُوْلُوْنَ اَىْ اَرْبَابُ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ اِسْتِهْزَاءً وَاِنْكَارًا لِلْبَعْثِ اَئِنَّا بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيْلِ الثَّانِيَةِ وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِى الْمَوْضَعَيْنِ لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ اَىْ اَنُرَدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ اِلَى الْحَيٰوةِ وَالْحَافِرَةُ اِسْمٌ لِاَوَّلِ الْاَمْرِ وَمِنْهُ رَجَعَ فُلَانٌ فِىْ حَافِرَتِهٖ اِذَا رَجَعَ حَيْثُ جَاءَ .

١١. ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً وَفِىْ قِرَاءَةٍ نَاخِرَةً بَالِيَةً مُتَفَتِّتَةً نُحْىٰ .

١٢. قَالُوْا تِلْكَ اَىْ رَجْعَتُنَا اِلَى الْحَيَاةِ اِذًا اِنْ صَحَّتْ كَرَّةٌ رَجْعَةٌ خَاسِرَةٌ ذَاتُ خُسْرَانٍ .

অনুবাদ :

৬. সেদিন প্রকম্পনকারী প্রকম্পিত করবে প্রথম শিঙ্গাধ্বনি দ্বারা প্রত্যেক বস্তু প্রকম্পিত হবে। অর্থাৎ কম্পমান হয়ে উঠবে। এ জন্য শিঙ্গাকে তা দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে।

৭. একে অনুসরণ করবে পরবর্তী আগমনকারী দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনি আর উভয়য়ের মধ্যে ব্যবধান হবে চল্লিশ বৎসর। এ বাক্যটি رَاجِفَةٌ হতে حَالٌ হয়েছে, কিয়ামত দিবসে উভয় শিঙ্গাধ্বনি ও অন্যান্য ঘটনাবলি সংঘটিত হবে। সে জন্য দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনির পর সে পুনরুত্থান সংঘটিত হবে, এটা তজ্জন্য ظَرْف হতে পারে।

৮. বহু অন্তর সেদিন সন্ত্রস্ত হবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে।

৯. এদের দৃষ্টি ভীত-বিহ্বলতায় অবনমিত হবে। ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলি দেখে ভয়ে জড়োসড় হয়ে পড়বে।

১০. তারা বলে অর্থাৎ আত্মমর্যাদা ও দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা, বিদ্রূপ ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে আমরা কি শব্দটি উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয়টিকে সহজ করে এবং উভয় ক্ষেত্রে মধ্যখানে আলিফ বৃদ্ধি করে পঠিত হয়েছে। পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকারী অর্থাৎ আমরা কি মৃত্যুর পর জীবিতাবস্থায় ফিরে যাবো। প্রত্যেক প্রথম বিষয়কে حَافِرٌ বলা হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে رَجَعَ فُلَانٌ فِىْ حَافِرَتِهٖ যখন কেউ পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে।

১১. গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও কি এক কেরাতে نَخِرَةً শব্দটি نَاخِرَةً পঠিত হয়েছে। খণ্ড-বিখণ্ড, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়ার পরও কি আমরা জীবিত হবো?

১২. তারা বলে, তা অর্থাৎ জীবতাবস্থার প্রতি আমাদের প্রত্যাবর্তন তবে যদি সত্য এমন হয় এ প্রত্যাবর্তন পুনরায় ফিরে যাওয়া হবে সর্বনাশা অপমানকর।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٣. قَالَ تَعَالَى فَإِنَّمَا هِيَ أَيِ الرَّادِفَةُ الَّتِي يُعْقِبُهَا الْبَعْثُ زَجْرَةٌ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ .

১৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা তো পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি যার পর পুনরুত্থান সংঘটিত হবে এক বিকট ধ্বনি ফুৎকার, অনন্তর যখন শিঙ্গাধ্বনি শ্রুত হবে।

١٤. فَإِذَا نُفِخَتْ فَإِذَا هُمْ أَيْ كُلُّ الْخَلَائِقِ بِالسَّاهِرَةِ بِوَجْهِ الْأَرْضِ أَحْيَاءً بَعْدَ مَا كَانُوا بِبَطْنِهَا أَمْوَاتًا .

১৪. তখনই তারা অর্থাৎ সকল সৃষ্টি ময়দানে আবির্ভূত হবে ধরাপৃষ্ঠে জীবিতাবস্থায় যার গর্ভে তারা মৃত অবস্থায় বিরাজ করছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ : অত্র আয়াতে হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা সমস্ত বস্তুর মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হবে, বিধায় একে اَلرَّاجِفَةُ বলা হয়েছে। এটা পৃথিবী ও এর সব কিছুকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে। সূরা জুমু'আ-এ এহেন অবস্থার কথা বলা হয়েছে এ ভাষায়– "এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। তখন জমিন ও আসমানে যা কিছু আছে তা সবই মরে পড়ে যাবে। সেসব ব্যতীত যেসবকে জীবিত রাখা আল্লাহর ইচ্ছা হবে। পরে আর একবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সহসা তারা সকলে উঠে দেখতে শুরু করবে।"

اَلرَّاجِفَةُ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ اَلرَّاجِفَةُ শব্দটির একাধিক অর্থ উল্লেখ করেছেন–

১. কারো কারো মতে এখানে اَلرَّاجِفَةُ দ্বারা ভারি পদার্থ যেমন– জমিন, পাহাড় ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।
২. কেউ কেউ বলেছেন, اَلرَّاجِفَةُ দ্বারা জমিনের কম্পনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
৩. আল্লামা জালালা উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, اَلرَّاجِفَةُ দ্বারা হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম ফুৎকার উদ্দেশ্য। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।
৪. অথবা এর অর্থ বিকট শব্দ, যা মেঘের গর্জন رَجَفَ الرَّعْدُ يَرْجُفُ رَجْفًا যেমন কুরআনে এসেছে যে, فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

اَلرَّادِفَةُ শব্দের অর্থ : জমহুরে মুফাসসিরীনের মতে اَلرَّادِفَةُ বললে দ্বিতীয় নাফ্খাহ বা ফুঁক বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা পুনরুত্থান হবে। আর رَادِفَةٌ-কে রাদফাহ্ এ কারণে বলা হয়েছে যে, এ ফুঁকটি প্রথম ফুঁকের পরে হবে। কেননা رَدِفَتْ শব্দের অর্থ অনুগামী যে পরে আসে অন্যের পিছনে আসে।

ইবনে যায়েদের মতে اَلرَّادِفَةُ দ্বারা উদ্দেশ্যে কিয়ামত।

মুজাহিদ (র.) বলেন, কম্পন সৃষ্টির পর যে শব্দের সৃষ্টি হবে, একে اَلرَّادِفَةُ বলা হয়। –[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম বায়াহাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রথম শিঙ্গাধ্বনিকে رَاجِفَةٌ বলার কারণ হলো এর ফলে সারা বিশ্বে ভয়াবহ ভূমিকম্প দেখা দেবে, সৃষ্টি জগতের সব কিছুই চুরমার হয়ে যাবে এবং সকল প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। আর দ্বিতীয় শিঙ্গাধ্বনিকে এ জন্য رَادِفَةٌ বলা হয়েছে যে, তা প্রথম শিঙ্গাধ্বনির পরে আসবে। আর উভয় শিঙ্গাধ্বনির মাঝে চল্লিশ বছর কাল অতিবাহিত হবে। –[নূরুল কোরআন]

اَلْوَاجِفَةُ-এর মর্মার্থ : আলোচ্য আয়াতে اَلْوَاجِفَةُ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন

ক. কামালাইন গ্রন্থকার (র.) লিখেছেন– وَاجِفَةٌ এটা وَجِيْفٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো شَدِيْدُ الْاِضْطِرَابِ অর্থাৎ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়া ইত্যাদি।
খ. ইমাম সুদ্দী (র.) বলেছেন, وَجِيْفٌ হলো যা স্থানান্তর হয়। অর্থাৎ যা অস্থির ও ব্যস্ত-ত্রস্ত।
গ. কেউ কেউ বলেছেন, যে মানসিক অস্থিরতার দরুন কি করবে ভেবে পায় না, তাকে اَلْوَجِيْفَةُ বা اَلْوَاجِفَةُ বলে।
ঘ. কারো কারো মতে وَجَفَ الْقَلْبُ দ্বারা এখানে اِضْطِرَابُ الْقَلْبِ-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানসিক অশান্তি।

Free @ www.eilm.weebly.com

قُلُوْبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : قُلُوْبٌ যদিও বহুবচন, কিন্তু এখানে কতিপয় অন্তর উদ্দেশ্য। যদি সমস্ত অন্তর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে বলা হতো جَمِيْعُ الْقُلُوْبِ অথবা جَمِيْعُ قُلُوْبِ الْاِنْسَانِ কিন্তু তা না বলে শুধু বহুবচনের শব্দই বলা হয়েছে। তাই এখানে কতিপয় অন্তর উদ্দেশ্য।

কারো মতে 'কতিপয় অন্তর' এ জন্য বলা হয়েছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে কেবল কাফের, নাফরমান ও মুনাফিকরাই কিয়ামতের দিন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। নেককার মু'মিন লোক সেদিন ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া হতে সুরক্ষিত থাকবে। সূরা আম্বিয়ায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- সে অতীব বিভীষিকাপূর্ণ সময় তাদেরকে একবিন্দু কাতর করবে না এবং ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে তাদেরকে দু'হাতে সাদরে গ্রহণ করবে। আর বলবে, এটা সেদিন যেদিনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল। -[কাবীর]

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ বাক্যের قُلُوْبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে مُبْتَدَأٌ হওয়া বৈধ হলো? : উত্থিত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে বাক্যটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। قُلُوْبٌ মুবতাদা, وَّاجِفَةٌ সিফাত এবং يَوْمَئِذٍ মুতা'আল্লিক হয়েছে وَاجِفَةٌ -এর সাথে।

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব এই যে, কোনো نَكِرَةٌ শব্দের যখন সিফাত আসে তখন ঐ শব্দটি মুবতাদা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ এ উদাহরণে عَبْدٌ শব্দটি অনির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হয়েছে। কেননা مُؤْمِنٌ সিফাতটি তার সাথে যুক্ত হয়েছে। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ আয়াতের মর্মার্থ : কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে মানুষের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, তারই একটি বাস্তব চিত্র আল্লাহ তা'আলা এখানে তুলে ধরেছেন। যদিও ঐ সময়ের অবস্থা আরো মারাত্মক হবে; যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়; অনুভূতির ব্যাপার। সেদিন বিনয়তার পূর্ণ ছাপ তাদের মাঝে বিকশিত হবে। তাদের সকল ঔদ্ধত্য সেদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে; ভয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকবে।

হযরত আতা (র.) বলেন, এখানে اَبْصَارٌ বলতে ঐ সমস্ত লোকের اَبْصَارٌ উদ্দেশ্য, যারা অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। -[ফাতহুল কাদীর]

اَبْصَار শব্দটি بَصَرٌ -এর বহুবচন, بَصَرٌ অর্থ- চক্ষু। এখানে بَصِيْرَةٌ বোধশক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন কোন দিক হতে কি হচ্ছে কিছুই টের করা যাবে না। সবাই নির্বাক দর্শকের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে, কিয়ামতের ভয়াবহতার সম্মুখে তারা যেন এক নিশ্চল প্রাণ অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : اَبْصَارُهَا -এর هَا -এর যমীরের مَرْجِعْ হলো قُلُوْبٌ সুতরাং অর্থ দাঁড়াচ্ছে اَبْصَارُ الْقُلُوْبِ বা অন্তরের চক্ষুসমূহ। অথচ অন্তরের জন্য اَبْصَارٌ হতে পারে না। তথাপি কিভাবে اَبْصَارُهَا বলা হলো?

এর জবাবে মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, এখানে اَبْصَارُ الْقُلُوْبِ -এর দ্বারা اَبْصَارُ اَصْحَابِ الْقُلُوْبِ অর্থাৎ অন্তরসমূহের মালিকের চক্ষুকে বুঝানো হয়েছে। এর পরবর্তী বাক্য يَقُوْلُوْنَ -এর দ্বারা তা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। কেননা يَقُوْلُوْنَ -এর فَاعِل হলো هُمْ যার مَرْجِعْ হলো اَبْصَارٌ ও قُلُوْبٌ -এর মালিকগণ।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, قُلُوْبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ হওয়া সত্ত্বেও এটা মুবতাদা হলো কিভাবে?

এর জবাব হচ্ছে- قُلُوْبٌ শব্দটি نَكِرَةٌ হলেও তার সাথে وَاجِفَةٌ সিফাতের উল্লেখ রয়েছে। আর نَكِرَةٌ -এর সাথে যখন صِفَت -এর উল্লেখ থাকে তখন এটা مُبْتَدَأٌ হতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে "وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ" এখানে عَبْدٌ শব্দটির সাথে مُؤْمِنٌ (সিফাত)-এর উল্লেখ থাকায় এটা نَكِرَةٌ হওয়া সত্ত্বেও مُبْتَدَأٌ হতে পেরেছে।

اَلْحَافِرَة -এর অর্থ : আরবদের নিকট اَلْحَافِرَةُ হলো কোনো বস্তু বা কোনো বিষয়ের শুরু বা প্রথম অবস্থার নাম। এ কারণেই তারা বলে থাকে- رَجَعَ فُلَانٌ عَلٰى حَافِرَتِهٖ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি তার ঐ রাস্তায় ফিরে এসেছে, যে রাস্তা দিয়ে সে প্রথমে

Free @ www.eilm.weebly.com

এগিয়েছে। আরো বলে- اِقْتَتَلَ الْقَوْمُ عِنْدَ الْحَافِرَةِ তথা عِنْدَ اَوَّلِ مَا الْتَقَوْا অর্থাৎ কওমের লোকেরা সংঘর্ষের প্রথম স্থানে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছে, যে রাস্তা দিয়ে আসা হয় সে রাস্তাকে حَافِرَةٌ বলার কারণ হলো ঐ রাস্তার উপর দিয়ে চলার কারণে রাস্তায় পায়ের চিহ্ন পড়ে যায়। কেননা, حَفْر-এর অর্থ গর্ত করা বা চিহ্ন।

১. কারো মতে, اَلْحَافِرَةُ অর্থ اَلْعَاجِلَةُ অর্থাৎ দুনিয়া, তখন মূলবাক্যের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, "اِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ اِلَى الدُّنْيَا" আমরা কি পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাবো?

২. কারো মতে, اَلْحَافِرَةُ বলা হয় ঐ গর্তকে যা তাদের জন্য কবর হিসেবে করা হয়ে থাকে। তখন মূলবাক্যের অর্থ এ হবে যে, اَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِىْ قُبُوْرِنَا اَحْيَاءً অর্থাৎ আমরা কি আমাদের কবরে জীবন্ত ফিরে যাবো? এটা খলীল, ফাররা এবং হযরত মুজাহিদের অভিমত।

৩. হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, 'হাফেরা' বলতে نَارٌ তথা দোজখকে বুঝানো হয়েছে।

-[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

৪. হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা.) বলেছেন, حَافِرَةٌ অর্থ হলো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন, অর্থাৎ মুশরিকরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে বলত যে, আমাদের মৃত্যুর পরও কি পুনরায় জীবন লাভ করবো? আর তা কি করে সম্ভব? আমাদের হাড় গোশত সবই তো নিঃশেষ হয়ে যাবে। -[নূরুল কোরআন]

نَخِرَةٌ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : এখানে দু'টি কেরাত রয়েছে نَخِرَةٌ ও نَاخِرَةٌ কেউ কেউ বলেছেন, এতদুভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। আর তা হচ্ছে পুরানো [জীর্ণ-শীর্ণ] টুকরো টুকরো ও পচাগলা। এটাই জমহুরের মাযহাব। অন্যান্যরা উভয়ের অর্থের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য করেছেন। সুতরাং

ক. কেউ কেউ বলেছেন, نَخِرَةٌ বলে এমন বস্তুকে, যার সম্পূর্ণ অংশ নষ্ট হয়ে গেছে, আর نَاخِرَةٌ বলে যার অংশ বিশেষ পচে গেছে।

খ. কারো কারো মতে نَخِرَةٌ অর্থ হচ্ছে যা পচে গেছে, আর نَاخِرَةٌ এমন বস্তুকে বলে যা শীঘ্রই পচে যাবে।

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে نخرة দ্বারা এখানে এমন হাড়কে বুঝানো হয়েছে, যা পচে গেছে এবং এর মধ্যে বায়ু প্রবেশ করেছে। যা হোক نَخِرَةٌ ও نَاخِرَةٌ যাই পড়া হোক না কেন এদের অর্থে খুব একটা পার্থক্য হবে না।

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا আয়াতে قَالُوْا উল্লেখের কারণ : পিছনের আয়াতে বলা হয়েছে يَقُوْلُوْنَ দ্বারা কাফেরদের কুফরির স্থায়িত্ব বুঝায়, কিন্তু এ আয়াতে قَالُوْا (অতীত কালের শব্দ) ব্যবহারের দ্বারা বুঝা যায় যে, নির্দিষ্ট এ কুফরিটি তাদের পক্ষ হতে অতীতেই হয়েছিল। সব সময় স্থায়ী ছিল না। হয়তো দু' একজন বা দু' একবার এ কথাটি বলা হয়েছে। এ কারণেই এখানে قَالُوْا বলা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

خَاسِرَةٌ শব্দের অর্থ : خَاسِرَةٌ অর্থ- অনিষ্টকর, ক্ষতি। ইমাম হাসান (রা.) বলেন, خَاسِرَةٌ অর্থ كَاذِبَةٌ মিথ্যা। অর্থাৎ এটা অবশ্যই হওয়ার নয়।

রবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন, خَاسِرَةٌ অর্থ خَاسِرَةٌ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ بِهَا অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর উপর ধ্বংস এসে পড়বে। -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهُ "تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ" : কাফেররা কিয়ামতের মতো এমন সুনিশ্চিত ব্যাপারের প্রতিও সন্দেহ পোষণ করত এবং ব্যঙ্গ করে বলত, আমরা যখন গলিত হাড়ে পরিণত হয়ে যাবো, তখন বুঝি পুনরায় আমাদেরকে আগের অবস্থার দিকে ফিরে যেতে হবে? যদি এমন হয়, তাহলে তো মহাসর্বনাশ, সন্দেহ নেই। আমরা তো এ নতুন জন্ম লাভের জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। -[যিলাল]

আয়াতে কাফেরদের উক্তিগুলো প্রশ্নের আকারে উল্লিখিত হলেও জিজ্ঞাসা করে কথাটি জানা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এটা অভিনব ও অসম্ভব ব্যাপার, একথা বুঝাবার জন্যই তারা প্রশ্ন করেছে।

Free @ www.e-ilmweekly.com

ইমাম শাওকানী (র.) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যা হলো মৃত্যুর পরে যদি আমাদেরকে আবার পুনরুজ্জীবিত করানো হয়, তাহলে তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। মুহাম্মদের কথানুযায়ী তো আমাদের উপর বিরাট অমানিশা নেমে আসবে।

হযরত কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র.) বলেন, অর্থাৎ মৃত্যুর পর আমাদেরকে যদি পুনরায় জীবিত করা হয়, তাহলে তো আমরা আগুনের দ্বারা/দোজখের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবো। তারা এ কথা এ কারণেই বলেছিল যে, তাদেরকে দোজখের ভয় দেখানো হয়েছিল। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ زَجْرَةٌ : زَجْرَةٌ অর্থ صَيْحَةٌ বা বিকট শব্দ। আরবগণ বলে থাকে যে, زَجَرَ الْبَعِيْرَ এটা ঐ সময় বলা হয় যখন উটের ব্যাপারে কেউ চিৎকার দেয়, কিন্তু আয়াতে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁককে বলা হয়েছে, যা হযরত ইসরাফীল (আ.) -এর মাধ্যমে সংঘটিত হবে। মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ মাটির পেটে সকলকে জীবিত করবেন, অতঃপর ঐ বিকট আওয়াজ তারা শ্রবণ করবে তারপর তাদের কিয়ামত হবে (অর্থাৎ সবাই দাঁড়িয়ে যাবে) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে ইরশাদ করেছেন, وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, ইবনে কাছীর]

اَلسَّاهِرَةُ -এর অর্থ : ইমাম ওয়াহেদী (র.) বলেন, اَلسَّاهِرَةُ বলতে সমতল ময়দানকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশের মতে প্রকাশ্য ময়দানকেই اَلسَّاهِرَةُ বলা হয়েছে।

ইমাম ফাররা (র.) বলেন, জমিনকে سَاهِرَةٌ এ কারণে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীব-জন্তু সেখানে নিদ্রা যায় এবং জাগে। [কেননা سَهَرٌ অর্থ– জাগ্রত হওয়া।]

কেউ কেউ বলেন, ময়দানে ভয়ে মানুষ জাগ্রত থাকে, বিধায় سَاهِرَةٌ বলা হয়েছে। কারো মতে সাদা জমিনকে سَاهِرَةٌ বলা হয়। কারো মতে, যে জমিনে আল্লাহর নাফরমানি হয়নি। কেউ সপ্তম জমিনকে, কেউ সিরিয়ার জমিনকে এবং কাতাদাহ জাহান্নামকে বুঝিয়েছেন। কেননা সেখানে কেউ ঘুমাতে পারবে না। –[নূরুল কোরআন, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَاِنَّمَا هِىَ جَزْرَةٌ ..... بِالسَّاهِرَةِ" : এ লোকেরা তো কিয়ামতকে অসম্ভব বিষয় মনে করে একে বিদ্রূপ করছে। অথচ আল্লাহর পক্ষে এটা বিন্দুমাত্র কঠিন কাজ নয়। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য খুব বড় ও ব্যাপক কোনো প্রস্তুতি গ্রহণেরও কোনো প্রয়োজন নেই। এর জন্য কেবলমাত্র একটি হুমকি বা ধমকই যথেষ্ট। এর সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের মৃত্তিকা বা ছাই যেখানেই পড়ে থাকুক না কেন সর্বদিক হতে গুটিয়ে এসে তা একস্থানে সঞ্চিত হয়ে যাবে এবং নিমিষের মধ্যে তোমরা নিজেদেরকে পৃথিবীর উপর জীবন্ত উপস্থিত পাবে। এ প্রত্যাবর্তনকে এভাবে জীবনে পুনরায় ফিরে আসাকে তোমরা যতই ক্ষতির প্রত্যাবর্তন মনে কর না কেন এবং এটা হতে যতই পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা কর না কেন, এটা তো অবশ্যই হবে, এটা হতে নিষ্কৃতি নেই। তোমাদের অস্বীকৃতি কিংবা পলায়ন অথবা ঠাট্টা বিদ্রূপ একে রুখে রাখতে পারে না। কিয়ামত ও পুনরুত্থানের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে পক্ষান্তরে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছ। –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٥. هَلْ اَتٰكَ يَا مُحَمَّدُ حَدِيْثُ مُوْسٰى عَامِلٌ فِىْ .

১৫. তোমার নিকট কি পৌছেছে হে মুহাম্মদ! মূসার বৃত্তান্ত এটা পরবর্তী إِذْ نَادَاهُ -এর মধ্যে عَامِلٌ ।

١٦. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اِسْمُ الْوَادِىْ بِالتَّنْوِيْنِ وَتَرْكِهٖ فَقَالَ .

১৬. যখন তাকে তার প্রতিপালক তুয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন طُوًى শব্দটি তানবীনসহ ও তানবীন ব্যতীত পঠিত হয়েছে, একটি উপত্যকার নাম এবং বলেছেন,

١٧. اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى تَجَاوَزَ الْحَدَّ فِى الْكُفْرِ .

১৭. ফেরাউনের নিকট গমন করো, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন করেছে কুফরির মধ্যে সীমা অতিক্রম করে গেছে।

١٨. فَقُلْ هَلْ لَّكَ اَدْعُوْكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الزَّاىِ بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الْاَصْلِ فِيْهَا تَطَهَّرُ مِنَ الشِّرْكِ بِاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

১৮. এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে? আমি কি তোমাকে আহ্বান করবো তোমার পবিত্র হওয়ার প্রতি এক কেরাতে শব্দটি زَا -এর মধ্যে তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় تَا -কে মূলবর্ণের সাথে পরিবর্তিত করে اِدْغَامْ করা হয়েছে। অর্থাৎ তখন শব্দটি মূলত تَتَزَكّٰى ছিল তথা তুমি 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই' এ সাক্ষ্যদান পূর্বক শিরক হতে পবিত্র হবে।

١٩. وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ اَدُلُّكَ عَلٰى مَعْرِفَتِهٖ بِالْبُرْهَانِ فَتَخْشٰى فَتَخَافَهٗ .

১৯. আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি তাঁকে চিনবার প্রশ্নে প্রমাণ দ্বারা আমি তোমাকে পথিনির্দেশ করি। যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর তাঁর প্রতি ভয় পোষণ কর।

٢٠. فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى مِنْ اٰيَاتِهِ التِّسْعِ وَهِىَ الْيَدُ اَوِ الْعَصَا .

২০. অনন্তর যে তাকে মহা নিদর্শন প্রদর্শন করল তার নয়টি নিদর্শনাবলির মধ্য হতে, আর তা শুভ্র হাত বা লাঠি।

٢١. فَكَذَّبَ فِرْعَوْنُ مُوْسٰى وَعَصٰى اللّٰهَ تَعَالٰى .

২১. অতঃপর সে মিথ্যারোপ করল ফেরাউন মূসাকে এবং অবাধ্যাচরণ করল আল্লাহ তা'আলার।

٢٢. ثُمَّ اَدْبَرَ عَنِ الْاِيْمَانِ يَسْعٰى فِى الْاَرْضِ بِالْفَسَادِ .

২২. অতঃপর সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল ঈমান আনয়ন হতে সচেষ্ট হলো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কাজে

٢٣. فَحَشَرَ جَمَعَ السَّحَرَةَ وَجُنْدَهٗ فَنَادٰى .

২৩. অনন্তর সে সমবেত করল জাদুকর ও তার সৈন্য-সামন্তদেরকে এবং ঘোষণা প্রদান করল

٢٤. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى لَا رَبَّ فَوْقِىْ .

২৪. আর বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٥. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ اَهْلَكَهُ بِالْغَرَقِ نَكَالَ عُقُوْبَةَ الْاٰخِرَةِ اَىْ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَالْاُوْلٰى اَىْ قَوْلِهِ قَبْلَهَا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ وَكَانَ بَيْنَهُمَا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً .

২৫. অতঃপর আল্লাহ তাকে শাস্তি দান করেন, তাকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেন. শাস্তি আজাব স্বরূপ শেষোক্ত এ বাক্যের অর্থাৎ উপরিউক্ত বাক্যের শাস্তিস্বরূপ আর পূর্ববর্তী বাক্যের অর্থাৎ ইতঃপূর্বে তার কথিত বাক্যের, তা এই যে, সে বলেছিল, আমি ভিন্ন তোমাদের আর কোনো উপাস্যের সন্ধান আমি পাইনি। আর এতদুভয়ে বাক্য উচ্চারণ করার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল।

٢٦. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الْمَذْكُوْرِ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشَى اللّٰهَ تَعَالٰى .

২৬. নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বর্ণনায় উপদেশ রয়েছে তার জন্য যে ভয় করে আল্লাহ তা'আলাকে।

তাহকীক ও তারকীব

اِذْهَبْ .... طَغٰى **-এর মহল্লে ই'রাব :** কেউ কেউ একে আল্লাহর قَوْل (নিজস্ব কথা) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কারো মতে এটা পিছনের نِدَاءٌ -এর তাফসীর। অর্থাৎ তিনি হযরত মূসা (আ.)-কে ডাক দিয়েছেন এই বলে যে, যাও ....।

কারো মতে اِذْهَبْ-এর পূর্বে اَنْ مُفَسِّرَةٌ-এ উহ্য রয়েছে। এ মতের পক্ষে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাতই যথেষ্ট। তিনি এভাবে পড়েছেন– اِنْ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى

আর اِنَّهُ طَغٰى বাক্যাংশটি পিছনের (اِذْهَبْ) নির্দেশসূচক ক্রিয়ার ইল্লত বা কারণ। –[ফাতহুল কাদীর]

نَكَالَ**-এর মহল্লে ই'রাব :** نَكَالَ শব্দটি এখানে মহল্লান মানসূব হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে।

ক. এটা (نَكَالَ) উহ্য فِعْل-এর مَفْعُوْل مُطْلَق হয়েছে। মূলত বাক্যটি ছিল فَاَخَذَهُ اللّٰهُ وَنَكَّلَ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ الخ অর্থাৎ আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেছেন এবং ইহ-পরকালের কঠোর আজাব দিয়েছেন।

খ. অথবা এটা مَفْعُوْل لَهُ হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে اَخَذَ اللّٰهُ لِاَجْلِ نَكَالِ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ইহ ও পরকালের আজাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাকে পাকড়াও করেছেন।

গ. অথবা এটা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে। মূলবাক্য হবে فَاَخَذَهُ اللّٰهُ بِنَكَالِ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ আল্লাহ তাকে ইহ-পরকালীন আজাবের দ্বারা পাকড়াও করলেন। সুতরাং بَاءٌ -কে হযফ করত (এর পরিবর্তে) نَكَالَ -এর উপর যবর দেওয়া হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : নবুয়ত প্রাপ্তির পর নবী করীম ﷺ মক্কার লোকদেরকে ঈমান আনার জন্য আহ্বান করলেন। তারা ঈমান তো গ্রহণ করলেই না; বরং নবী করীম ﷺ ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করল। এতে মহানবী ﷺ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের মধ্যে সংঘটিত কতিপয় ঘটনার বিবরণ পেশের উদ্দেশ্যে এ আয়াতগুলো নাজিল করেন। যাতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে জানিয়ে দিলেন যে, এটা যে শুধু আপনার বেলায় হয়েছে তা নয়; বরং ইতঃপূর্বে যত নবী রাসূল দুনিয়ায় আগমন করেছে সকলের বেলায়ই তা ঘটেছে। হযরত মূসা (আ.) -এর ন্যায় প্রভাবশালী রাসূলও ফেরাউনকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে গিয়ে এমনতর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন; কাজেই এতে আপনার মর্মাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পূর্বাপর যোগসূত্র : ইমাম রাযী (র.) বলেন, বর্তমান ভাষ্যের সাথে পূর্বের আলোচনা দু'দিক হতে মিল রয়েছে–

ক. পূর্বের আলোচনায় কাফেরদের হঠকারিতা বিবৃত হয়েছে, এ হঠকারিতা যে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টায় রূপ পরিগ্রহ করেছে তাও আলোচিত হয়েছে। আর এটা বরদাশত করা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। অতএব, হযরত মূসা (আ.) -এর কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তিনি ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সুতরাং আপনার কষ্ট নতুন নয়, দাওয়াতের কাজ সর্ব যুগেই ছিল কঠিন।

খ. ফেরাউনের শক্তি কুরাইশদের শক্তির চেয়েও বেশি ছিল, তার জনশক্তি ও বাধা ছিল প্রকট, এতদসত্ত্বেও যখন সে হঠধর্মীতা করেছিল, আল্লাহ তাকে চরম বে-ইজ্জতের সাথে পাকড়াও করেছিলেন। এমনিভাবে এ মুশরিকগণ যখন আপনার সাথে বেয়াদবি করবে আল্লাহ তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করবেন। অতএব, কোনো বিকল্প চিন্তার প্রয়োজন নেই। –[কাবীর]

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা কি? : এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বলতে নিম্নোক্ত ঘটনাবলিকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট গেলেন এবং বললেন যে, তুমি যদি তোমার কল্যাণ চাও এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চাও তাহলে আমি তোমাকে সেদিকে পথ নির্দেশ করতে পারবো। যাতে তোমার অন্তরে আল্লাহভীতির সঞ্চার হবে এবং আল্লাহর মারেফত (পরিচয়) লাভ করতে পারবে। কেননা আল্লাহর পূর্ণ মারেফত অধ্যয়ন করা ব্যতীত তাঁর ভীতি হাসিল হয় না।

এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বনী ইসরাঈলকে স্বাধীন করাই শুধু হযরত মূসা (আ.) -এর লক্ষ্য ছিল না; বরং ফেরাউনকে সংশোধন করাও ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রমাণ স্বরূপ হযরত মূসা (আ.) -এর সাথে মোকাবিলা করার জন্য জাদুকরদের প্রস্তুত করলেন। লোকদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা করলেন যে, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব। সুতরাং মূসাকে আবার কে প্রেরণ করল? এভাবে ফেরাউন কুফরের মধ্যে সীমা ছাড়িয়ে গেল।

কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যে নীল নদের ব্যাপারে ফেরাউনের গর্ব ছিল, যার উপর তার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল, সে নীল নদেই আল্লাহ তা'আলা তাকে দলবল সহ ডুবিয়ে মারলেন। আখেরাতের আজাব তো রয়ে গেছে। তার বিরাট শক্তি তাকে আল্লাহর শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারেনি। যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্য অবশ্যই উপরিউক্ত ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

طُوًى দ্বারা উদ্দেশ্য : بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى বাক্যাংশ দ্বারা তাফসীরকারকগণ সাধারণত অর্থ করেছেন– 'সে পবিত্র উপত্যকা যার নাম তুয়া।' এটা সিরিয়ার পবিত্র সিনাই পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত এর আরো দু'টি অর্থও বলা হয়েছে।

এক : এটা সে উপত্যকা যা দু'বার পবিত্র করা হয়েছে। একবার যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয়বার যখন হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলগণকে মিসর হতে বের করে এনে এখানে পৌঁছেছিলেন।

দুই : রাতের বেলা পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছেন। আরবি কথোপকথনে جَاءَ بَعْدَ طُوًى বললে বুঝায় অমুক ব্যক্তি রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে আমার নিকট এসেছে।

এ অর্থদ্বয় ছাড়াও ইমাম রাযী (র.) আরো দু'টি অর্থ করেছেন–

এক : طُوًى অর্থ يَا رَجُلُ [হে ব্যক্তি] ইবরানী ভাষায়। তখন অর্থ হবে– হে লোকটি, ফেরাউনের নিকট যাও।

দুই : মদীনা এবং মিসরের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম।

طُغْيَانٌ-এর অর্থ : طُغْيَانٌ অর্থ হলো مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ সীমালঙ্ঘন করা, কিন্তু ফেরাউন কোন ব্যাপারে– কোন জিনিসে সীমালঙ্ঘন করেছে তা স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়নি। এ কারণে কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, সে আল্লাহর উপরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে এবং তাঁকে অস্বীকার করেছে।

অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, সে বনী ইসরাঈলের উপর অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন করেছে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, আমার নিকট উত্তম হলো উভয় মতকে এক করে অর্থ নেওয়া। অর্থাৎ ফেরাউন আল্লাহকে অস্বীকার করে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর মানুষের সাথে সীমালঙ্ঘন করেছে এভাবে যে, তাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে এবং তাদের নিকট থেকে ইবাদতের প্রত্যাশী হয়েছে।

মোদ্দাকথা, ফেরাউন তার প্রজা সাধারণকে সমবেত করে ঘোষণা করল, 'আমি তোমারে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান রব'। তার রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দল, উপদল ও শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখেছিল, দুর্বল শ্রেণির উপর সে অমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছিল। গোটা জাতিকে বোকা বানিয়ে তাদরকে নিজের নিকৃষ্ট দাসে পরিণত করে নিয়েছে। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَقُلْ هَلْ لَّكَ ...... فَتَخْشٰى : আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি ফেরাউনের নিকট গিয়ে তাকে বল যে, হে ফেরাউন তুমি কি পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত আছ। "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই" এ ঘোষণা দিয়ে তুমি শিরক হতে পবিত্রতা অর্জন করতে চাও কিনা? তাহলে আমি প্রমাণের দ্বারা তোমাকে আল্লাহর পরিচয় লাভের পথ প্রদর্শন করবো। যাতে তোমার অন্তরে আল্লাহভীতির সৃষ্টি হবে।

সূরা ত্বা-হা-এর ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন–"তুমি ও হারূন দু'ভাই ফেরাউনের নিকট গিয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহকে ভয় করতে পারে।" বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতে এ নম্র কথার একটা নমুনা পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদের এ সকল আয়াতে দীনি দাওয়াত ও তাবলীগের নির্ভুল পন্থা ও পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে।

এখানে পবিত্রতা অর্জন করার যে কথাটা বলা হয়েছে এর অর্থ আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র এবং আমল বা বাস্তব জীবনের শব্দ সর্বক্ষেত্রে সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অর্জন করা। অন্য কথায় এটাই ছিল ইসলাম কবুল করার দাওয়াত।

ইবনে যায়েদ (র.) বলেছেন, কুরআন মাজীদের যেখানেই تَزَكّٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই এর তাৎপর্য হবে ইসলাম কবুল করা। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত তিনটি আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

১. وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ এটা তার প্রতিফল যে পবিত্রতা কবুল করে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।

২. وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى অর্থাৎ তুমি কি জান, সে হয়তো পবিত্রতা কবুল করতে পারে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

৩. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى অর্থাৎ সে পবিত্রতা তথা ইসলাম গ্রহণ না করলে তার জন্য তোমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই।

আমি তোমাকে তোমার আল্লাহর দিকে (চলার) পথ দেখাবো, তাহলে তাঁর ভয় হয়তো তোমার দিলে জাগবে। এ বাক্যের তাৎপর্য এই যে, তুমি যখন তোমার রব আল্লাহকে চিনতে পারবে ও জানতে পারবে যে, তুমি তাঁরই বান্দা, কোনো স্বাধীন ব্যক্তি নও, তখন অবশ্যই তোমার দিলে তাঁর ভয়ের সঞ্চার হবে। আর আল্লাহর ভয়ই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দুনিয়ার মানুষের নির্ভুল ও সঠিক পথ চলা এর উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ পরিচিতি ও আল্লাহভীতি ব্যতীত পবিত্রতা লাভ করা যায় না।

اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى আয়াতাংশটি কিসের সাথে সম্পর্ক : মহান প্রভুর বাণী اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى উহ্য اَدْعُوْكَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। কেননা, এখানে هَلْ لَّكَ অংশটুকু اَدْعُوْكَ-এর অর্থে হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা উহ্য رَغْبَةٌ অথবা قَبْلَ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

পথ প্রদর্শক ছাড়া আল্লাহকে চিনার উপায় আছে কি? : যাঁরা আধ্যাত্মিকতাকেই শুধু প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তাঁরা উক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলে বেড়ান যে, هَادِيْ ছাড়া সঠিকভাবে আল্লাহকে চিনা-বুঝা যায় না। কেননা ফেরাউনের মতো নাস্তিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, আর তিনি তথায় গিয়ে বলেছেন যে, "আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো।"

আর যারা আধ্যাত্মিকতার সাথে সাথে ইসলামি নীতিমালাকেও সংযোজন করে থাকেন তাঁরা বলেন, আল্লাহর মারেফত প্রদর্শক ছাড়াও অর্জন করা ফরজ। যে সম্প্রদায়ে রাসূল বা মুয়াল্লিম আসবে না, সে কওমের লোকদের উপর আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি তাকিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে স্রষ্টাকে বের করা ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ। –[কাবীর]

মারেফত ব্যতীত ভয় হয় না : আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মূসা (আ.)-কে দাওয়াতের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে গিয়ে اَهْدِيَكَ কে فَتَخْشٰى-এর উপর মুকাদ্দাম করেছেন। এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, خَشْيَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর ভয় মনে বদ্ধমূল করতে হলে প্রথমে মারেফত অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় আগে জানতে হবে, বুঝতে হবে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আল্লাহর ভয়ই হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। দুনিয়ায় মানুষের নির্ভুল ও সঠিক পথ চলা এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহর পরিচিতি ও আল্লাহভীতি ব্যতীত কোনোরূপ পবিত্রতা লাভের ধারণামাত্র করা যায় না।

হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করার কারণ : হযরত মূসা (আ.) কেবল বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করানোর উদ্দেশ্যেই ফেরাউনের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন না। যেমন কোনো কোনো লোক এ ধারণা করে নিয়েছেন; বরং প্রকৃতপক্ষে তাকে পাঠাবার প্রথম উদ্দেশ্য হলো ফেরাউন এবং তার জাতিকে দীনের পথ দেখানো।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সে যদি হেদায়েত কবুল না করে, তাহলে বনী ইসরাঈলীদেরকে-যারা মূলত এক মুসলমান জাতি-তার দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে মিসর হতে বের করে নিয়ে যাওয়া। আলোচ্য আয়াতসমূহ হতেও এ কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। কেননা এ আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলীদের মুক্ত করার কোনো কথা আদৌ উল্লিখিত হয়নি; বরং হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের সামনে কেবলমাত্র সত্য দীনের দাওয়াত পেশ করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেসব আয়াতে হযরত মূসা (আ.) ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বনী ইসরাঈলীদের মুক্তির দাবিও জানিয়েছেন বলে উদ্ধৃতি হয়েছে। তাতেও একথা প্রমাণিত হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহর পথে ডাকার পন্থা : উক্ত আয়াতে দাওয়াতের সুন্দর একটি প্রক্রিয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নরম নরম কথায় যাতে প্রতিপক্ষ বিরক্ত হয়ে না যায়। এ পন্থাকে সূরা 'ত্বা-হা' তে এভাবে বলা হয়েছে- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ অর্থাৎ তুমি ও হারুন দু'ভাই এর (ফিরাউনের) সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এবং আল্লাহকে ভয় করতে পারে।

এটা হতে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিভ্রান্ত ও শত্রু স্বভাবের ব্যক্তিকে হেদায়েতের পথে আনার জন্য এরূপ মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতেই কথা বলতে হবে। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ" : হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফেরাউনকে ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিলেন। ফেরাউন তা প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল যে, তুমি যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছ তার প্রমাণ কি? তখন হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে একটি মহা অলৌকিক ক্ষমতা (আল্লাহর পক্ষ হতে পাওয়া একটি মহা নিদর্শন) দেখালেন।

মহা নিদর্শন দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, এখানে اَلْآيَةَ الْكُبْرَىٰ [বড় নিদর্শন]-এর দ্বারা عَصَا [লাঠি] অথবা يَدٌ بَيْضَاءُ সমুজ্জ্বল হস্ত-কে বুঝানো হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, বড় নিদর্শন অর্থ লাঠির অজগররূপে প্রতিভাত হওয়া কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত একটি নিষ্প্রাণ লাঠি স্পষ্ট দর্শকদের চোখের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে অজগর হয়ে যাবে। এটা অপেক্ষা বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে। তাঁর মোকাবিলা করতে এসে জাদুকররা লাঠি ও রশিকে কৃত্রিম অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর অজগর সেসব কিছুকেই গিলে ফেলল। অথচ পর মুহূর্তেই হযরত মূসা (আ.) যখন একে নিজের হাতে তুলে নিলেন তখন এটা মূল লাঠিই হয়ে গেল। এটা একটি অকাট্য প্রমাণ। এটা হতে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক-ই প্রেরিত হয়েছিলেন।

হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযাসমূহ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.)-কে যে সমস্ত নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা প্রদান করা হয়েছিল তা দু' প্রকার, এক প্রকার নীল দরিয়া পারাপারের পূর্বে, অন্য প্রকার পরে সংঘটিত হয়েছিল। এর বর্ণনা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকারে করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের নয়টি নিদর্শনের বর্ণনা সূরা বনী ইসরাঈলে করা হয়েছে। وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ অর্থাৎ (আমি মূসা (আ.)-কে নয়টি নিদর্শন দিয়েছি) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এটা বর্ণিত আছে যে, কুরআনে উল্লিখিত এ নয়টি অলৌকিক বস্তু হচ্ছে-

১. লাঠি, ২. সমুজ্জ্বল হস্ত, ৩. দুর্ভিক্ষ, ৪. ফল-মূলের স্বল্পতা, ৫. তুফান, ৬. টিড্ডি, ৭. উকুন, ৮. ভেক ও ৯. রক্ত।

উপরিউক্ত নয়টির মধ্যে প্রথম দু'টি চাড়া অন্য সাতটি ফিরাউন এবং মিসরবাসীদের জন্য আজাব-স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রকারের নিদর্শনসমূহ হচ্ছে- ১. নীল দরিয়া ভাগ হওয়া, ২. মান্ন ও সালওয়া, ৩. মেঘমালার ছায়া, ৪. পাথর হতে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া, ৫. বনী ইসরাঈলের মাথার উপরে পাহাড় উত্তোলন, ৬. ধন-সম্পদ পাথরে পরিণত হওয়া, ৭. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়া। -[কাসাসুল কুরআন]

فَأَرَاهُ الخ আয়াতে فَاءٌ কি অর্থে হয়েছে? : আল্লাহর বাণী فَأَرَاهُ الخ-এর মধ্যে فَاءٌ শব্দটি عَاطِفَةٌ হয়েছে। এটা এখানে فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ مَا ذُكِرَ কয়েকটি উহ্য বাক্যের কাজ দেয় বলে একে فَصِيْحَةٌ বলে। মূলত বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ- فَطَلَبَ مِنْهُ آيَةً فَأَرَاهُ الخ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনের নিকট গেলেন এবং যা বলার ছিল বললেন। হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ফেরাউন মু'জিযা তলব করে। তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে মহা মু'জিযা দেখালেন।

فَأَرَاهُ-এর মধ্যে إِرَاءَةٌ-এর অর্থ : আলোচ্য আয়াতে إِرَاءَةٌ-এর দু'টি অর্থ হতে পারে-

১. اَلتَّبْصِيْرُ অর্থাৎ দেখানো। অর্থাৎ তিনি মহা নিদর্শন ফেরাউনকে দেখিয়েছিলেন, যা সে চর্মচোখে দেখতে পেয়েছে।

২ اَلتَّعْرِيْفُ (اَلتَّفْهِيْمُ) অর্থাৎ তার নিকট আল্লাহর নিকট আল্লাহর মারেফত (পরিচয়) তুলে ধরেছেন, সত্যকে তার বোধগম্য করে দিয়েছেন। কিন্তু স্বীয় হঠকারিতার কারণে সে তা গ্রহণ করেনি। -[রূহুল মা'আনী]

فَأَرَاهُ-এর মধ্যে فَاعِلٌ [কর্তা] : আল্লাহর বাণী فَأَرَاهُ-এর মধ্যে ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ তথা ضَمِيْرٌ فَاعِلٌ-এর مَرْجِعٌ হলো হযরত মূসা (আ.)। আর ضَمِيْرٌ بَارِزٌ তথা ضَمِيْرٌ مَفْعُوْلٌ (ه)-এর مَرْجِعٌ হলো ফেরাউন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ.) ফেরাউনকে মহানিদর্শন দেখিয়েছিলেন।

অবশ্য কোনো আয়াতে মু'জিযা [নিদর্শন] দেখানোর নিসবত স্বয়ং আল্লাহর দিকে করা হয়েছে। তা এ জন্য যে, মু'জিযা তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু তা জাহির করা হয় নবী-রাসূলের মাধ্যমে। কাজেই একে কখনো নবী-রাসূলের দিকে নিসবত করা হয়, আবার কখনো খোদ আল্লাহর দিকেই নিসবত করা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

فَكَذَّبَ وَعَصَى .... يَسْعٰى আয়াতে عَصٰى উল্লেখের কারণ : একথা প্রত্যেকই জানে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করবে সে ব্যক্তিই عِصْيَانٌ তথা নাফরমানি করবে। এ জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কেন كَذَّبَ-এর পরে عَصٰى শব্দটির উল্লেখ করেছেন?

এর উত্তর: এখানে আল্লাহ তা'আলা এ কথা বুঝাতে চান যে, كَذَّبَ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَصٰى بِاَنْ اَظْهَرَ التَّمَرُّدَ অর্থাৎ অন্তর এবং জবান দ্বারা অস্বীকার করল, আর নাফরমানির পরিচয় দিল এভাবে যে, অবাধ্যতা এবং হঠকারিতা প্রকাশ করল। -[কাবীর]

قَوْلُهُ فَكَذَّبَ وَعَصٰى : ফিরাউনের সামনে আল্লাহর নির্দেশে হযরত মূসা (আ.) যখন বড় বড় নিদর্শন দেখিয়েছিলেন, তখন ফেরাউন নিজের হঠকারিতার কারণে হযরত মূসা (আ.)-কে অস্বীকার করল এবং তাঁর মু'জিযাকে জাদু বলে উড়িয়ে দিল। আর পূর্ণ ব্যাপারটির সত্যতা অনুধাবন করার পরও অবাধ্যতার পরিচয় পেশ করে আল্লাহর নাফরমানি করল, ইবাদত করার জন্য প্রস্তুত হলো না; বরং পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক চরম বিরোধিতায় মেতে উঠল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى আয়াতে اِدْبَارٌ অর্থ : اِدْبَارٌ-এর কয়েকটি অর্থ দেখা যায়-

ক. ইবাদত হতে বিমুখ হওয়া, অনুকরণ হতে ফিরে থাকা। যেহেতু ফেরাউন আল্লাহর ইবাদত হতে বিমুখ হয়ে বিরোধিতায় মেতে উঠেছিল, সেহেতু তার ব্যাপারে اَدْبَرَ বলা হয়েছে।

খ. অথবা, ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত তাঁর মজলিস হতে ফিরে গিয়েছিল, বিধায় তার ব্যাপারে اَدْبَرَ ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এর আভিধানিক অর্থ প্রযোজ্য হবে।

গ. অথবা, হযরত মূসা (আ.) লাঠি ছেড়ে দেওয়ার পর যখন এটা বিশালাকার অজগর সর্পে পরিণত হলো তখন ফেরাউন ও তার দলবল দৌড়ে পালাল।

সুতরাং বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) তাঁর হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেন, লাঠি বিশাল এক অজগর সর্পে পরিণত হলো। এর হাড় ষাট গজ হয়েছিল নিচের চোয়াল মাটিতে এবং উপরের চোয়াল রাজ প্রাসাদের উপর গিয়ে পৌঁছেছিল। এতদর্শনে ফেরাউন ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। উপস্থিত জনতার মধ্য হতে ২৫ হাজার লোক ভয়ে ছুটাছুটি করতে গিয়ে মারা যায়।

অপর এক বর্ণনা মতে উক্ত লাঠি সর্পে পরিণত হওয়ার পর এক মাইল ঊর্ধ্বলোকে উঠে গিয়েছিল। অতঃপর এটা ফেরাউনের সামনে পতিত হয় এবং হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আদেশ কামনা করল। এতে ফেরাউন আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে হযরত মূসা (আ.)-কে সম্বোধন করে বলল, সে সত্তার কসম! যে তোমাকে প্রেরণ করেছেন! সাপটিকে বারণ করো। এরপর হযরত মূসা (আ.) একে ধরে ফেললেন সাথে সাথে তা লাঠিতে পরিণত হয়ে গেল।

ঘ. অথবা এখানে اَدْبَرَ শব্দটি اَقْبَلَ-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর বিরোধিতায় এগিয়ে আসল। কিন্তু اَقْبَلَ শব্দটি একটি ভালো গুণের ইঙ্গিতবাহী হওয়ার কারণে ادبر শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বিরোধিতায় এগিয়ে আসার অর্থ হলো হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত গ্রহণ হতে পিছিয়ে যাওয়া। এ জন্য اَقْبَلَ শব্দ ব্যবহার না করে اَدْبَرَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। -[কাবীর]

হযরত মূসা (আ.) কিভাবে পিছিয়ে গেলেন এবং কি চেষ্টা করলেন? : ফেরাউন যখন বুঝতে পারল যে, হযরত মূসা (আ.) তার সিংহাসন দখল করে ফেলবে, তার দাসত্বের পরিবর্তে আল্লাহর দাসত্ব কায়েম করবেন, তার প্রতিপত্তি লোপ করবে, তখন সে মিসরের বাহির হতে বড় বড় প্রখ্যাত জাদুকরদের ডেকে এনেছিল। উক্ত জাদুকররা হাজার হাজার জনতার সামনে তাদের লাঠি ও রশিকে অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল। যাতে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, হযরত মূসা (আ.) কোনো নবী নয়; বরং তিনিও অন্যান্য জাদুকরদের মতোই একজন জাদুকর। হযরত মূসা (আ.) যা দেখাতে পারেন অন্যান্য যাদুকররাও তা দেখাতে পারে। লাঠিকে অজগর বানানোর যে কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন, তা অন্যান্য জাদুকররাও অনায়াসেই দেখাতে পারে। কিন্তু তার এ চাল তারই বিরুদ্ধে কাজ করল, উল্টা ফল দেখাল; কেননা জাদুকররা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পরাজিত হওয়ার পর মুসলমান হয়ে গেল। তা ছাড়া তারা ঘোষণা করল যে, হযরত মূসা (আ.) যা দেখিয়েছেন তা কখনো জাদু হতে পারে না; বরং অবশ্যই তা ঐশী ক্ষমতা।

فَحَشَرَ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য : فَحَشَرَ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন।

১. কারো মতে جَمَعَ جُنُوْدَهٗ لِلْقِتَالِ وَالْمُحَارَبَةِ অর্থাৎ সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী একত্রিত করল।

২. কারো মতে جَمَعَ السَّحَرَةَ لِلْمُعَارَضَةِ অর্থাৎ বিরোধিতা ও প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে সকল জাদুকরদের একত্রিত করল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. অথবা, جَمَعَ النَّاسَ لِلْحُضُوْرِ لِيُشَاهِدُوْا مَا يَقَعُ অর্থাৎ সকল জনতাকে দৃশ্য দেখার নিমিত্তে উপস্থিত করেছিল।

৪. অথবা, তাকে সাপ হতে রেহাই দেওয়ার জন্য সকল শ্রেণির জনতাকে উপস্থিত করেছিল। جَمَعَ النَّاسَ لِيُمْنَعُوْهُ مِنَ الْحَيَّةِ -[কাবীর, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

فَنَادٰى -এর অর্থ এবং কিভাবে ডাক দিয়েছিল? : এ প্রশ্নদ্বয়ের জবাবে মুফাসসিরগণের কয়েকটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য-

১. সমস্ত উপস্থিত জনতার সামনে ডাক দিয়ে ফেরাউন তার নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেছিল।

২. অথবা, ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল।

৩. অথবা, ফেরাউন নিজে বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেরাউন জনতার সামনে দু'টি বক্তব্য রেখেছিল, তন্মধ্যে একটি হলো 'আমি ছাড়া তোমার কোনো ইলাহ নেই'; দ্বিতীয়টি হলো 'আমিই তোমাদের বড় রব বা প্রতিপালক'।

উপরোল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা অভিশপ্ত ফেরাউন নিজেকে ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং নিজের মাহাত্ম্য এবং উত্তমতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, কাবীর]

ডাকের আগে কি একত্র হওয়া যায়? : কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে যে, فَحَشَرَ فَنَادٰى "সমবেত করল তারপর ডাক দিল।" এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে সমবেত করা হয়েছে তারপর ডাক দিয়েছে। অথচ ডাক দেওয়ার আগে সমবেত করা সম্ভব নয়। এ কারণে বলা হয়েছে, বাক্যটির মধ্যে আগ-পর রয়েছে। মূলবাক্য এভাবে ছিল যে, فَنَادٰى فَحَشَرَ -[কুরতুবী]

অথবা, فَنَادٰى অর্থ ডাক বা আহ্বান হয়; বরং ঘোষণা করা। তখন অর্থ হবে, ফেরাউন সকলকে একত্র করল, তারপর কিছু ঘোষণা দিল।

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আয়াতের মর্মার্থ : ফেরাউনের উপরিউক্ত দাবিটি কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। এক জায়গায় সে হযরত মূসা (আ.) -কে লক্ষ্য করে বলে, তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও আল্লাহ বানাও, তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো। (সূরা শু'আরা : আয়াত ২৯) একবার সে নিজ দরবারের লোকজনদেরকে সম্বোধন করে বলল, হে জাতির নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ আছে- এ কথা আমার জানা নেই। (সূরা আল-কাসাস : আয়াত ৩৮) কিন্তু এ ধরনের কথা বলে বাহ্যত খোদা হওয়ার দাবি করলেও মূলত সে তা দাবি করতে চায়নি যে, সেই বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা এবং এ সবকিছু সে সৃষ্টি করেছে। বস্তুত সে নিজে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করত না এবং নিজেকে রাব্বুল আলামীন বলে কখনো মনে করত না। এ সঙ্গে ধর্মীয় অর্থের দিক দিয়ে কেবলমাত্র নিজেকেই সে মাবুদ ঘোষণা করত এমন কথাও নয়। কুরআনেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধর্মীয় দিক দিয়ে সে নিজেই অন্য মাবুদের উপাসনা করত। তার দরবারের লোকেরা একবার তাকে বলেছিল, আপনি কি মূসা ও তার লোকজনকে এ স্বাধীনতা দিতে থাকবেন যে, তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার উপাসকদেরকে ত্যাগ করবে? [সূরা আল-আ'রাফ : আয়াত ১২৭] এটা হতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউন ধর্মীয় সৃষ্টিতে ইলাহ হবার দাবি করেনি। সে একান্তই রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নিজেকে ইলাহ বা শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক বলে দাবি করত। অন্যকথায় তার দাবির তাৎপর্য এই যে, সে নিজেকে সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক বলে দাবি করত। তার বক্তব্য এরূপ ছিল যে, আমার এ রাজ্যে আমি ছাড়া আইন-বিধান চালাবার অধিকার আর কারো নেই এবং আমার উপর অন্য কোনো উচ্চতর এমন ক্ষমতাশালী কেউ নেই, যার ফরমান এখানে কার্যকর হতে পারে। -(ফাতহুল কাদীর, কাবীর)

এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, ছা'লাবী তার 'আরায়েস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মিসরের একটি গোসলখানায় ফেরাউনের সামনে শয়তান মানুষের ছবি ধরে এসেছিল; কিন্তু ফেরাউন তাকে চিনতে পারেনি। শয়তান তাকে বলল, তুমি কি আমাকে চিনতে পারনি? উত্তরে সে বলল, না। শয়তান বলল, তাহলে ব্যাপারটি কেমন হলো- আমাকে তুমি সৃষ্টি করলে অথচ আমাকে চিনছ না? তুমি কি বলনি যে, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى অর্থাৎ আমিই তোমাদের মহান-শ্রেষ্ঠ রব? -[কুরতুবী]

رَبّ -এর অর্থ এবং আয়াতে তা দ্বারা উদ্দেশ্য : আরবি ভাষায় 'রব' শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়-

১. মালিক, প্রভু, মনিব। ২. লালনপালনকারী, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৩. আদেশদাতা, বিধানদাতা, শাসক, বিচারক, কার্যনির্বাহক, শৃঙ্খলা বিধায়ক। আল্লাহ তা'আলা এ সকল অর্থেই বিশ্বের 'রব'।

আয়াতে نِدَاءٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : অত্র আয়াতে نِدَاءٌ-এর অর্থে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ক. ফেরাউন নিজেই বক্তা হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছিল। খ. অথবা কোনো ঘোষণাকারীর মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিল। গ. অথবা, উপস্থিত জনতা তার বক্তব্য শোনার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেছিল। ঘ. রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, ফেরাউন তার বক্তব্যে দু'টি দাবি করেছিল, এক. আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মা'বুদ আছে বলে আমার জানা নেই। দুই. আমিই তোমাদের বড় রব-প্রভু।

মোটকথা, ফেরাউন আত্ম অহংকারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে জাহির করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন, জমা করল ও আহ্বান করল, অথচ আহ্বান করা তো একত্রিত করার পূর্বে হয়? : মুফাসসিরগণ আলোচ্য প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন–

১. আল্লাহর বাণী فَحَشَرَ فَنَادٰى -এর মধ্যে আগপর (تَقْدِيْم - تَاخِيْر) হয়ে গেছে। মূলত বাক্যটি এরূপ فَنَادٰى فَحَشَرَ অর্থাৎ প্রথমে আহ্বান জানাল, তারপর একত্রিত করল, কেননা প্রথমে সমবেত হওয়ার জন্য জনতাকে আহ্বান করতে হয় তারপর তারা একত্রিত হয়। এমন নয় যে, আগে তারা একত্রিত হয়, তারপর তাদেরকে আহ্বান করা হয়।

২. অথবা এখানে نداء -এর দ্বারা আহ্বান উদ্দেশ্য নয়; বরং বক্তব্য পেশ করা কিংবা কোনো কথার দ্বারা স্বীয় বক্তব্যের প্রতি জনতার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন তার সেনাবাহিনীকে কখন এবং কেন পাকড়াও করেছিলেন? : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের দু'টি উক্তির কারণে তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। তার প্রথম উক্তিটি হলো, সে তার অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিল–"مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ" অর্থাৎ 'আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ [মাবুদ] আছে বলে আমার জানা নেই।' অতঃপর আবার সে তার লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলল, "اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى" অর্থাৎ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব আমার উপর তোমাদের অন্য কোনো রব নেই।

উক্ত দু'টি দাবির মাঝে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। প্রথম উক্তিটি করার পরও আল্লাহ তা'আলা তাকে সংশোধনের সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সেই সুযোগ গ্রহণ করেনি; বরং তার ঔদ্ধত্য ও আল্লাহদ্রোহীতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেল। হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াত সে শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলো না; বরং বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে দিল। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। তাকে ও তার অনুসারী (সৈন্য) দেরকে নীল নদে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিলেন।

نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : এ ব্যাপারে মুফাসসিরের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

ক. এখানে "نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى" দ্বারা ফেরাউনের প্রথম উক্তি ও শেষ উক্তিকে বুঝানো হয়েছে। প্রথম উক্তি হলো "مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ" অর্থাৎ আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো মাবুদ আছে বলে আমার জানা নেই। আর দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা তার নিম্নোক্ত উক্তিকে বুঝানো হয়েছে "اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى" অর্থাৎ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত মুজাহিদ ও ইকরামাহ (র.) প্রমুখগণ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, "نَكَالَ الْاُوْلٰى" দ্বারা তার প্রথম বয়সের শাস্তি এবং "نَكَالَ الْاٰخِرَةِ"-এর দ্বারা তার শেষ বয়সের শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে,

গ. একদল মুফাসসিরের মতে "نَكَالَ الْاُوْلٰى" দ্বারা হযরত মূসা (আ.) -কে অস্বীকার করার শাস্তি এবং "نَكَالَ الْاٰخِرَةِ" -এর দ্বারা اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى বলার আজাবকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ. কারো কারো মতে "نَكَالَ الْاُوْلٰى" হলো নীল নদীতে ডুবিয়ে মারা আর نَكَالَ الْاٰخِرَةِ হলো পরকালের শাস্তি। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

পরকালের শাস্তিকে ইহকালের শাস্তির পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কেন? : আলোচ্য আয়াতে "نَكَالَ الْاٰخِرَةِ" -কে "نَكَالَ الْاُوْلٰى" -এর পূর্বে নেওয়া হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে।

ক. পরকালের শাস্তি স্থায়ী এবং ইহকালের শাস্তি ক্ষণস্থায়ী।

খ. পরকালের তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি নগণ্য ও লঘু।

গ. পরকালের শাস্তিই প্রকৃত শাস্তি, দুনিয়ার শাস্তি শুধু শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেওয়া হয়।

ঘ. অন্যান্য আয়াতের সাথে قَافِيَة -এর সমতা রক্ষার জন্য اَلْاٰخِرَةُ শব্দটিকে পরে এবং اَلْاُوْلٰى -কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। –[যিলাল]

ফেরাউনের ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় : একথা দিবালোকের মতো সত্য যে, দুনিয়ার শাস্তি ক্ষণস্থায়ী, আখেরাতের শাস্তির তুলনায় তা কিছুই নয়। তারপরও ফেরাউনের শাস্তি ছিল মারাত্মক। তার জন্য দুনিয়ার শাস্তি যদি এমন মারাত্মক হয়, তাহলে আখেরাতের শাস্তি কত মারাত্মক হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। যে ফেরাউন এতবেশি শক্তির অধিকারী ছিল, ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছিল, তার যদি শেষ পরিণাম এই হয় তাহলে অন্যদের কি অবস্থা হতে পারে? –[যিলাল]

অতএব, সকল প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও সমাজপতির উচিত ফেরাউনের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, আল্লাহর অবাধ্যতা ছেড়ে দেওয়া, নবীদেরকে স্বীকার করে নেওয়া, নচেৎ ফেরাউনের যে পরিণতি হয়েছিল এখনও তাদের ঐ পরিণতি হতে পারে। কেননা যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদের সহযোগিতা করেছিলেন। বস্তুত হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের এ ঘটনায় বিরাট শিক্ষা রয়েছে, একমাত্র আল্লাহভীরুদের জন্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২৭. ءَاَنْتُمْ بِتَحْقِيْقِ الْهَمْزَتَيْنِ وَابْدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسْهِيْلِهَا وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاُخْرٰى وَتَرْكِهٖ اَىْ مُنْكِرُوا الْبَعْثِ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ ج اَشَدُّ خَلْقًا بَنٰهَا بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ خَلْقِهَا .

অনুবাদ :

২৭. তোমরাই কি শব্দটি উভয় হামযাকে বহাল রেখে দ্বিতীয়টিকে আলিফ রূপে পরিবর্তিত করে তাসহীল করত তাসহীলকৃত হামযা ও অপরটির মাধ্যখানে আলিফ বর্ধিত করে এটা বর্জন করে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত অস্বীকারকারীগণ। সৃষ্টিকরণ কঠিনতর, না আকাশ? সৃষ্টিকরণে কঠিনতর। তিনিই তা স্থাপন করেছেন এটা সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পর্কিত বর্ণনা।

২৮. رَفَعَ سَمْكَهَا تَفْسِيْرٌ لِكَيْفِيَّةِ الْبِنَاءِ اَىْ جَعَلَ سَمْتَهَا مِنْ جِهَةِ الْعُلُوِّ رَفِيْعًا وَقِيْلَ سَمْكُهَا سَقْفُهَا فَسَوّٰهَا جَعَلَهَا مُسْتَوِيَةً بِلَا عَيْبٍ .

২৮. তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন এটা স্থাপন করার প্রকৃতির ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তার আকৃতিকে উচ্চতার দিক হতে সমুচ্চ করেছেন। আর কেউ কেউ তা দ্বারা ছাদ উদ্দেশ্য করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন তাকে ত্রুটিমুক্তভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন।

২৯. وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا اَظْلَمَهٗ وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا اَبْرَزَ نُوْرَ شَمْسِهَا وَاُضِيْفَ اِلَيْهَا اللَّيْلُ لِاَنَّهٗ ظِلُّهَا وَالشَّمْسُ لِاَنَّهَا سِرَاجُهَا .

২৯. আর তিনি তার রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন তাকে অন্ধকার করেছেন আর তার সূর্যালোককে প্রকাশিত কারেছেন তার সূর্যের আলোক প্রকাশ করেছেন। রাত্রিকে আকাশের প্রতি এ জন্য সম্পর্কিত করেছেন, যেহেতু তা তারই আলোকবর্তিকা।

৩০. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا بَسَطَهَا وَكَانَتْ مَخْلُوْقَةً قَبْلَ السَّمَاۤءِ مِنْ غَيْرِ دَحْوٍ .

৩০. আর পৃথিবীকে তারপর বিস্তৃত করেছেন সম্প্রসারিত করেছেন। আর পৃথিবী আকাশের পূর্বে অবিস্তৃত অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল।

৩১. اَخْرَجَ حَالٌ بِاِضْمَارِ قَدْ اَىْ مُخْرِجًا مِنْهَا مَاۤءَهَا بِتَفْجِيْرِ عُيُوْنِهَا وَمَرْعٰهَا مَا تَرْعَاهُ النَّعَمُ مِنَ الشَّجَرِ وَالْعُشْبِ وَمَا يَاْكُلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاَقْوَاتِ وَالثِّمَارِ وَاِطْلَاقُ الْمَرْعٰى عَلَيْهِ اِسْتِعَارَةٌ .

৩১. বহির্গত করেছেন এটা قَدْ উহ্য করে حَالٌ অর্থাৎ مُخْرِجًا তা হতে এটার পানি তা হতে ঝরনাধারা সৃষ্টি করে এবং এর তৃণরাজি বৃক্ষচারা ও ঘাস যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে এবং যা কিছু মানুষ খাদ্য ও ফল ভক্ষণ করে। সেক্ষেত্রে এর উপর مَرْعٰى শব্দের ব্যবহার اِسْتِعَارَةٌ হিসেবে গণ্য হবে।

৩২. وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا اَثْبَتَهَا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ لِتَسْكُنَ .

৩২. আর পর্বতকে তিনি প্রোথিত করেছেন পৃথিবীর উপরিভাগে স্থাপন করেছেন, যাতে এটা স্থির থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٣٣. مَتَاعًا مَفْعُوْلٌ لَهُ الْمُقَدَّرِ اَىْ فَعَلَ ذٰلِكَ مُتْعَةً اَوْ مَصْدَرٌ اَىْ تَمْتِيْعًا لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ جَمْعُ نَعَمٍ وَهِىَ الْاِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ .

৩৩. ভোগ সম্পদ এটা উহ্য فَعَلَ অর্থাৎ فَعَلَ ذٰلِكَ এবং مَفْعُوْلٌ لَهُ অথবা مَصْدَرٌ অর্থাৎ تَمْتِيْعًا তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য اَنْعَام শব্দটি نَعَمٌ-এর বহুবচন, আর তা হলো উষ্ট্র, গরু ও ছাগল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَالْاَرْضَ دَحٰهَا" : উক্ত আয়াতে اَلْاَرْضَ-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়।

১. এটা مَرْفُوْعٌ-এর মহল্লে হবে। এমতাবস্থায় এটা মুবতাদা হবে এবং دَحٰهَا এটার খবর হবে। আবূ হাসান, আমর ইবনে মায়মূন, ইবনে আবী আবলা, আবু হাইওয়াহ,আবুস সিমাক ও ইবনে আসেম (র.) প্রমুখগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. এটা মহল্লান মানসূব হবে। এমতাবস্থায় এটা "مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ" -এর শ্রেণিভুক্ত হবে। মূলত বাক্যটি ছিল دَحَا الْاَرْضَ دَحٰهَا এটা জমহুরের মাযহাব।

اَلْجِبَالَ-এর মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী اَلْجِبَالَ-এর মধ্যেও দু' ধরনের ই'রাব প্রযোজ্য।

১. এটা مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ হিসেবে মানসূব-এর মহল্লে হবে। মূলত বাক্যটি হবে اَرْسٰى الْجِبَالَ اَرْسٰهَا

২. অথবা এটা মুবতাদা হিসেবে মহল্লান মারফূ' হবে।

مَتَاعًا-এর মহল্লে ই'রাব : مَتَاعٌ-এর মহল্লে ই'রাব সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়-

১. 'মাফউলে লাহু' হিসেবে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ পিছনের সকল বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন- কেন করেছেন? একমাত্র مَتَاعًا لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর ভোগের জন্য।

২. مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে। এর পূর্বে একটি ক্রিয়া উহ্য রয়েছে। তা হলো মূলবাক্য এভাবে হবে যে, مَتَّعَكُمْ بِذٰلِكَ مَتَاعًا .

৩. অথবা, مَصْدَرٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهٖ হয়েছে। কেননা, পিছনের اَخْرَجَ ক্রিয়াটি مَتَّعَ-এর অর্থ দেয়। -[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা প্রথমত কাফের ও মুশরিকদের কর্তৃক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। অতঃপর ফেরাউনের ঘটনার উল্লেখ করত পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আর আলোচ্য আয়াতগুলোতে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতার উপর দলিল পেশ করেছেন। অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ভাষায় বিষয়টি বিরোধীদেরকে বোধগম্য করাতে চেয়েছেন। কাজেই একেবারে সহজ-সরল ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, যিনি এ মহাসৌরজগৎকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা মোটেই কঠিন কিছু নয়।

ءَاَنْتُمْ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : উল্লিখিত আয়াতে ঐ সমস্ত মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে। তাদের ধারণা ছিল যে, পুনরুত্থান একটি কঠিন কাজ, এটা কোনোরূপেই সম্ভব নয়। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

অথবা, সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। -[ইবনে কাছীর]

কিয়ামতের যৌক্তিকতা : আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে ভ্রান্ত মানব! তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না এ আকাশ সৃষ্টি করা কঠিনতর। যে সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টা এ বিশাল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং তার ছাদকে সুউচ্চ করে যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন এবং যিনি রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করত দিনকে আলোক উদ্ভাসিত করেছেন, তাঁর পক্ষে আকাশের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র মানবকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত করা কি একান্তই তুচ্ছ ব্যাপার নয়? -[কাবীর]

এখানে কাজের গুরুত্ব ও লঘুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই কেবল কঠিন ও সহজ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট কোনো কিছুই কঠিন নয়। সকল কাজই সমান সহজ।

উদ্ধৃত আয়াতে 'আকাশের রাত্র' এবং 'আকাশের দিন' এ জন্য বলা হয়েছে যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত দ্বারাই রাত্র ও দিন আসে। আর ছাড়া সূর্য আকাশের মধ্যে অবস্থিত।

পুনরুজ্জীবন আল্লাহর পক্ষে সহজ : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা আরো লক্ষ্য করে দেখ যে, এ পৃথিবী তোমাদের জন্য কিরূপে সম্প্রসারিত করে সমভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার কিছু অংশ পানিপূর্ণ নদী ও প্রস্রবণ আর কিছু সমভূমি। এ সমভূমির মধ্যে আবার কিছু অংশে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আর কিছু অংশে তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য শস্যশ্যামল ও তৃণলতাপূর্ণ চারণভূমি তৈরি করেছি। এটা প্রত্যক্ষ করলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, পরকালে পুনরুজ্জীবন দান করা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا আয়াতাংশের وَقْف নিয়ে মতভেদ : ইমাম কিসায়ী, ফাররা, যুজাজ (র.) اَلسَّمَاءُ শব্দের পরে وَقْف করে পড়েছেন এবং بَنَاهَا হতে নতুন বাক্য শুরু বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আর আবূ হাতিমের নিকট بَنَاهَا-এর পরে وَقْف কেননা بَنَاهَا শব্দদ্বয় اَلسَّمَاءُ-এর صِلَةٌ মূল্যবাক্য এভাবে ছিল أَمِ السَّمَاءُ الَّتِى بَنَاهَا এখানে اَلَّتِى-কে উহ্য করা হয়েছে। এরূপ উহ্য বৈধ। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

بَنَاهَا ক্রিয়ার কর্তা : بَنَاهَا ক্রিয়ার কর্তা উহ্য রয়েছে। তা হলো اَللّٰهُ আকাশের সৃষ্টিকর্তাকে এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে সকলের নিকট পরিষ্কার আছে বলে উল্লেখ করা হয়নি। এতে আল্লাহর শান বুলন্দ বুঝায়। -[রূহুল মা'আনী]

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا আয়াতে سَمْك ও سَوَّاهَا-এর অর্থ : মুফাসসির سَمْك-এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ক. কেউ কেউ বলেছেন اَلسَّمْكُ هُوَ الْاِرْتِفَاعُ অর্থাৎ سَمْك অর্থ উপরে উঠানো। যেমন- বলা হয় سَمَكْتُ الشَّئَ অর্থাৎ বস্তুকে হাওয়ার উপর উঠিয়ে দিলাম।

খ. ইমাম বাগাবী (র.) বলেছেন, اَلسَّمْكُ هُوَ السَّقْفُ অর্থাৎ سَمْك অর্থ- ছাদ।

গ. কারো কারো মতে আসমানের দিককে سَمْك বলে।

ঘ. কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, জমিন হতে আসমান পর্যন্ত দূরত্বকে سَمْك বলে। এর দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা। -[কুরতুবী, যিলাল]

سَوَّاهَا-এর অর্থ : মহান আল্লাহ আসমানকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ত্রুটিমুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে কোনোরূপ ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা নেই, যেমনি বলা হয় سَوّٰى فُلَانٌ اَمْرَهٗ অর্থাৎ সে তার কাজটি পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্তভাবে সমাপন করেছে।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا বাক্যে اَلْغَطْشُ- এর অর্থ : اَلْغَطْشُ শব্দের অর্থ হলো اَلظُّلْمَةُ অন্ধকার। আর اَغْطَشَ অন্ধকার করেছেন। যখন পুরুষ এবং মহিলা হেদায়েত গ্রহণ না করে তখন বলা হয়- رَجُلٌ اَغْطَشُ ও اِمْرَاَةٌ غَطْشَاءُ

ইমাম রাগিব (র.) বলেন, اَلْاَغْطَشُ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার চক্ষুতে দুর্বলতা এসেছে ঐ দুর্বলতার কারণে সে রাস্তা-ঘাট দেখতে পায় না। এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, فَلَاةٌ غَطْشٰى অর্থাৎ যে মাঠে পথ পাওয়া যায় না। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

রাত্রকে আকাশের দিকে সম্বোধন করার কারণ : اَغْطَشَ لَيْلَهَا আয়াতাংশে لَيْل শব্দটিকে هَا সর্বনামের দিকে اِضَافَةٌ করা হয়েছে। আর هَا দ্বারা اَلسَّمَاءُ-ই উদ্দেশ্য। অর্থ দাঁড়ায় 'আকাশের রাত্রি'। কেননা, সূর্যাস্তের মাধ্যমে রাত্রি হয়। আর সূর্য হলো আকাশে। এ কারণে نُجُوْمُ اللَّيْلِ বা রাত্রের তারকারাজি বলা হয় ঐ তারকাপুঞ্জকে যেগুলো রাত্রে উদিত হয়। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

ضُحٰى অর্থ এবং আয়াতে ضُحٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়কে ضُحٰى বলা হয়; কিন্তু আয়াতে পূর্ণ দিনই উদ্দেশ্য। তবে প্রশ্ন হলো نَهَارٌ না বলে ضُحٰى কেন বলা হয়েছে? মুফাসসিরগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, ضُحٰى এমন একটি সময় যা দিনের উত্তম সময়কে বুঝায়। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মূল অংশের দ্বারা পূর্ণ বস্তুর নাম রাখা যায়। যেমন- رَأْسٌ বলে পূর্ণ শরীর বুঝানো যায়। এ ব্যাপারে ইমাম রাযী (র.) বলেন, ضُحٰى তে আলো বেশি, তাই ضُحٰى দিয়ে نَهَارٌ বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ "وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا" : "অতঃপর জমিনকে সমভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন" এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টির পর জমিন সৃষ্টি করেছেন। এখানে কথার ধরনটি এমন, যেমন আমরা কোনো প্রসঙ্গে বলে থাকি, তারপর এ কথাও চিন্তা করতে হবে ইত্যাদি। এতে কখনো ঘটনার পরপর বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না। দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা কথাটি অনিবার্যভাবে প্রথম কথাটির পরে হতে হবে এমন জরুরি নয়। আসলে একটা কথার পর আর একটা কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এ ধরনের কথার মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বাক্যরীতির একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। সূরা আল-কালামে বলা হয়েছে عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ অর্থাৎ অত্যাচারী, অতঃপর জারজ। এটার সঠিক অর্থ হলো সে লোকটি দুর্ধর্ষ অত্যাচারী, উপরন্তু জারজও।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

পবিত্র কুরআনে সূরা হা-মীম সাজদাহ এবং সূরা বাকারার ২৯ আয়াতে ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ "অতঃপর আকাশের দিকে লক্ষ্য করলেন" বা মনোযোগ করলেন। এ বাক্যাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবী প্রথমে সৃষ্টি করার পর আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ প্রথমে জমিন সৃষ্টি করেন, অতঃপর আকাশ সৃষ্টি করেন। অতঃপর আকাশকে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত করলেন, তারপর জমিনকে প্রশস্ত করে বিছিয়ে দিলেন। ফলে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকছে না। ইমাম হাকেম হতে বর্ণিত হয়েছে– রবি ও সোমবারে ভূ-মণ্ডল, মঙ্গলবারে পাহাড়-পর্বত, বুধবারে বৃক্ষরাজি লতাপাতা এবং বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নভোমণ্ডলকে সৃজন করা হয়েছে। –[জালালাইন]

কেউ কেউ বলেন– وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا এবং عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ উভয় আয়াতেই بَعْدَ ذَٰلِكَ-এর পরিবর্তে প্রকৃত অর্থে مَعَ ذَٰلِكَ 'উক্ত' হবে। অর্থ হবে– উপরন্তু জমিনকে সমভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন। –[খাযেন, রূহুল মা'আনী]

কেউ কেউ বলেন, بَعْدَ অর্থ قَبْلَ [পূর্বে] যেমন কুরআন মাজীদে আছে وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ অর্থাৎ مِنْ قَبْلِ الذِّكْرِ –[ফাতহুল কাদীর]

دَحَا-এর অর্থ : আরব ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ হতে دَحَا -এর কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

ক. دَحَا অর্থ بَسَطَ অর্থাৎ বিছিয়ে দিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জমিনবাসীর জন্য জমিনকে সমতল করে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

খ. دَحَا অর্থ سَوّٰى অর্থাৎ সমান করে দিয়েছেন, যাতে তা বসবাস উপযোগী হয়।

গ. ইমাম রাগিব (র.)-এর মতে دَحْي-এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে এর মূল স্থান হতে হটিয়ে দেওয়া। এটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের মতে পৃথিবী মূলত আকাশের একটি [নক্ষত্রের] অংশ যাকে তা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

مَاءٌ ও مَرْعٰى দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন যে, এখানে مَاءٌ-এর দ্বারা নদী-নালাকে বুঝানো হয়েছে এবং مَرْعٰى-এর দ্বারা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য যেমন গাছ-পালা, তরুলতা, খাদ্য-দ্রব্য ও ফলমূল ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.)ও অনুরূপ লিখেছেন।

যা হোক مَرْعٰى দ্বারা যদিও সাধারণত চতুষ্পদ জন্তু খাদ্য (যা উদ্ভিদ জাতীয় হয়ে থাকে) তাকে বুঝানো হয়ে থাকে, তথাপি এখানে শুধু তাই উদ্দেশ্য নয়; বরং যেসব উদ্ভিদ মানুষ ও জন্তু উভয়েরই খাদ্য রূপে গণ্য, তাকে বুঝানো হয়েছে। আরবি ভাষায় رَعْى ও رَتْع বলতে যদিও সাধারণত জন্তু-জানোয়ারের চারণ (খাদ্য) বুঝায় তথাপি কখনো কখনো মানুষের (খাদ্যের) বেলায়ও তার প্রয়োগ হতে দেখা যায়। সূরা ইউসুফে আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর ভাইয়েরা তাদের পিতাকে বলল– أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ অর্থাৎ আগামী কাল ইউসুফকে আপনি আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে খানিকটা বিচরণ করে নিবে এবং খেলা-বেড়া করবে। সুতরাং অত্র আয়াতে জঙ্গলে বিচরণ করে ফলমূল খাওয়াকে يَرْتَعْ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

এসব কিছুই আল্লাহ ও জীব-জন্তুর কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে তাদের আহার ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আল্লাহর নিকট তাদের নত হওয়া এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

পানি এবং চারণভূমিকে পাহাড় গাড়া'র উপর অগ্রাগামী করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে বলেছেন– أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا তারপর বলেছেন وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا অথচ ভূমি বিন্যস্ত করার সময় প্রথমে পাহাড় সংস্থাপন করেছেন, তারপর ঝরনাধারা এবং চারণভূমির ব্যবস্থা করেছেন। এটার জবাবে বলা হয় যে, খাওয়া-দাওয়া এবং পানীয় বস্তুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য সেগুলোকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

أَرْسَاهَا-এর অর্থ : اَلْإِرْسَاءُ-এর অর্থ اَلْإِثْبَاتُ সংস্থাপন করা, সুদৃঢ় করা, মজবুত করা। আর আয়াতে কারীমায় অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলা পাহাড়কে পেরেক হিসেবে দিয়ে জমিনকে সুদৃঢ় করেছেন, মজবুত করেছেন। –[কুরতুবী]

পাহাড় স্থাপন ও পানি এবং গাছ-পালা সৃষ্টির অর্থ ও রহস্য : إِرْسَاءُ الْجِبَالِ-এর অর্থ হলো জমিনের মধ্যে পাহাড়-পর্বতকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে দেওয়া, যাতে জমিন হেলেদুলে না পড়ে।

إِخْرَاجُ الْمَاءِ তথা পানি বের করার অর্থ হলো, নদী-নালা সমুদ্র সৃষ্টি করা, যাতে পানির দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য জীব জীবন ধারণ করতে পারে।

إِخْرَاجُ الْمَرْعٰى তথা চারণভূমি সৃষ্টি করার অর্থ হলো গাছপালা ও শস্যদানা ও অন্যান্য জীবনোপকরণ সৃষ্টি করা যাতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٤. فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى اَلنَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ.

৩৪. অনন্তর যখন মহাসঙ্কট উপস্থিত হবে দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুৎকার।

٣٥. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ بَدَلٌ مِنْ اِذَا مَا سَعٰى فِى الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে এটা اِذَا হতে بَدَلٌ যা সে সাধন করেছে দুনিয়ায় পুণ্য ও পাপ।

٣٦. وَبُرِّزَتِ اُظْهِرَتِ الْجَحِيْمُ النَّارُ الْمُحْرِقَةُ لِمَنْ يَّرٰى لِكُلِّ رَاءٍ وَجَوَابُ اِذَا.

৩৬. আর প্রকাশ করা হবে উন্মুক্ত করা হবে জাহান্নামকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড দর্শককুলের জন্য সকল দর্শকের জন্য। আর اِذَا-এর জওয়াব হলো পরবর্তী বক্তব্য।

٣٧. فَاَمَّا مَنْ طَغٰى كَفَرَ.

৩৭. অন্তর যে বিরুদ্ধাচরণ করেছে কুফরি করেছে।

٣٨. وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ.

৩৮. আর পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

٣٩. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى مَاْوَاهُ.

৩৯. নিশ্চয় জাহান্নাম হবে আবাসস্থল তার আশ্রয়স্থল।

٤٠. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَهَى النَّفْسَ الْاَمَّارَةَ عَنِ الْهَوٰى الْمُرْدِىْ بِاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ.

৪০. আর যে ভয় করেছে তার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিতিকে তাঁর সম্মুখে হাজির হওয়াকে এবং নফসকে বারণ রেখেছে নফসে আম্মারাহকে নফসানি খাহেশ হতে যে খাহেশ অনুসরণে ধ্বংস অনিবার্য।

٤١. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى وَحَاصِلُ الْجَوَابِ فَالْعَاصِىْ فِى النَّارِ وَالْمُطِيْعُ فِى الْجَنَّةِ.

৪১. নিশ্চয় জান্নাত তার আবাসস্থল জবাবের সারমর্ম এই যে, পাপাচারী জাহান্নামে যাবে এবং বাধ্যানুগত ব্যক্তি বেহেশতে গমন করবে।

٤٢. يَسْئَلُوْنَكَ اَىْ كُفَّارُ مَكَّةَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا مَتٰى وُقُوْعُهَا وَقِيَامُهَا.

৪২. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরগণ কিয়ামত সম্পর্কে, এটা কখন সংঘটিত হবে তা কখন সংঘটিত হবে ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

٤٣. فِيْمَ فِىْ اَىِّ شَىْءٍ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا اَىْ لَيْسَ عِنْدَكَ عِلْمُهَا حَتّٰى تَذْكُرَهَا.

৪৩. কি সম্পর্ক فِيْمَ শব্দটি فِىْ اَىِّ شَىْءٍ অর্থে ব্যবহৃত তোমার এই আলোচনার সাথে অর্থাৎ তোমার নিকট এর ইলম নেই যে, তুমি তা আলোচনা করবে।

٤٤. اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا مُنْتَهٰى عِلْمِهَا لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.

৪৪. তোমার প্রতিপালকের নিকটই এর শেষ সীমা এর জ্ঞানের শেষ সীমা। তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানে না।

٤٥. اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ اِنَّمَا يَنْفَعُ اِنْذَارُكَ مَنْ يَّخْشٰهَا يَخَافُهَا.

৪৫ তুমি তো ভয় প্রদর্শনকারী তোমার ভয় প্রদর্শনই তো উপকার করবে তাকে যে ভয় করে একে ভয় করে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤٦. كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا فِىْ قُبُوْرِهِمْ اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا اَىْ عَشِيَّةَ يَوْمٍ اَوْ بُكْرَتَهُ وَصَحَّ اِضَافَةُ الضُّحٰى اِلَى الْعَشِيَّةِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُلَابَسَةِ اِذْ هُمَا طَرَفَا النَّهَارِ وَحَسَّنَ الْاِضَافَةَ وُقُوْعُ الْكَلِمَةِ فَاصِلَةً.

৪৬. যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা অবস্থান করেনি তাদের কবরসমূহে এক সন্ধ্যা কিংবা এক সকাল মাত্র অর্থাৎ একদিনের সন্ধ্যা বা এর সকাল। সকালের সম্পর্ক সন্ধ্যার সাথে এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা এরা দিবসের দু'প্রান্ত। আর বাক্যটির ব্যবধানের কারণে এই اِضَافَتْ বা সম্পর্কিতকরণের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى এ আয়াতটির মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতটির মহল্লে ই'রাব নিয়ে নাহুবিদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায় اِذَا جَاءَتْ হতে بَدَلْ كُلْ অথবা بَدَلْ بَعْض হয়েছে।

কারো মতে- اَلطَّامَّةُ الْكُبْرٰى হতে بَدَلْ হয়েছে, তখন তা মারফূ' হবে কিন্তু বাহ্যিকভাবে يَوْمَ শব্দের উপরে فَتْح দেখা যায়। কেননা কূফাবাসীদের মতে يَوْمَ ক্রিয়ার দিকে اِضَافَةْ হওয়ার কারণে فَتْح হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, جَاءَتْ-এর ظَرْفْ হিসেবে مَنْصُوْب হয়েছে।

কারো মতে اَعْنِىْ উহ্য ক্রিয়ার মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। আর তা اَلطَّامَّةُ-এর তাফসীর হয়েছে।

-[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى আয়াতের মহল্লে ই'রাব : পূর্বে উল্লিখিত اِذَا যদি شَرْطِيَّةْ হয়, তাহলে فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ঐ শর্তের জবাব হবে। কারো মতে اِذَا-এর জবাব উহ্য আছে। আর ঐ উহ্য জবাবের ব্যাখ্যা হলো فَاَمَّا مَنْ طَغٰى -[রূহুল মা'আনী]

هِىَ الْمَاْوٰى-এর هِىَ সর্বনামটির মহল্লে ই'রাব : هِىَ সর্বনামটি ضَمِيْر فَصْل এমতাবস্থায় لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْاِعْرَابِ অর্থাৎ ঐ সর্বনামটির কোনো মহল্লে ই'রাব হবে না।

অথবা, هِىَ সর্বনামটি جَحِيْم-এর দিকে ফিরেছে, তারকীবে মুবতাদা হয়েছে। আর এ هِىَ দিয়ে বাক্যটিকে حَصْر করা হয়েছে। তখন অর্থ এই দাঁড়াবে যে, ঐ জাহান্নামই তাদের ঠিকানা। এটা ছাড়া তাদের আর কোনো ঠিকানাই নেই।

-[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি হাশর-নশর-এর উপর শক্তিশালী। প্রথম সৃষ্টি ছিল কঠিন, কিন্তু প্রথমবার-ই যখন তিনি সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর নিকট একেবারেই সহজ। এ কথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন তিনি ঐ হাশরের বাস্তব প্রকাশ সম্পর্কে আলোকপাত শুরু করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ.. -[কাবীর]

পেছনে مَتَاعًا لَّكُمْ আয়াত দ্বারা মানব জীবনের সমস্ত مَعَاشْ [জীবিকা]-এর অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে, এখন مَعَادْ (পুনরুত্থান) সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছে। [অর্থাৎ পূর্বে দুনিয়ার আলোচনা ছিল, এখন আখেরাতের আলোচনা শুরু হয়েছে।]

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى .... هِىَ الْمَاْوٰى উক্ত আয়াত কয়টির শানে নুযূল : উক্ত আয়াত কয়টির একাধিক শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে।

১. রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াতসমূহ হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) ও তাঁর ভাই আবূ আমির ইবনে ওমায়েরের শানে নাজিল হয়েছে। এ দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু' চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) ছিলেন পূর্ণ মু'মিন, আখেরে রাসূল ও পরকালমুখি। পক্ষান্তরে তার ভাই আবূ আমির ছিল কাফের। রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রাণের শত্রু এবং দুনিয়াদার। আবূ আমির যখন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় তখন মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর খাতিরে সাহাবীগণ তাকে বাঁধেননি। হযরত মুসআব (রা.) তা শুনে ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে বাঁধার জন্য বলেন। তিনি আরো বলেন যে, তাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা-পয়সা ও সম্পদ তার মায়ের নিকট রয়েছে।

আল্লামা কাশ্শাফ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, উহুদের যুদ্ধে মুসআব (রা.) তার ভাই আবূ আমিরকে হত্যা করেছিলেন।

উহুদের ময়দানে যখন অন্যরা নবী করীম ﷺ -এর পাশ হতে সরে গিয়েছিল, তখন মুসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) নিজের জীবন দিয়ে মহানবী ﷺ-কে রক্ষা করেছিলেন। নবী করীম ﷺ -এর চেহারার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল ছিল।

তাঁর এ আত্মত্যাগে সন্তুষ্ট হয়ে নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন। রাসূলে কারীম ﷺ সাহাবীগণকে বলেছেন যে, আমি তাকে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর গায়ে দামী দু'খানা চাদর রয়েছে এবং তাঁর জুতার ফিতা ছিল স্বর্ণের। মুসআব (রা.)-কে নবী করীম ﷺ হিজরতের পূর্বে মদীনায় পাঠিয়ে ছিলেন নবদীক্ষিত মুসলিমদেরকে দীনের তালীম দেওয়ার জন্য।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী প্রথমোক্ত আয়াতগুলো মুসআব এবং আবূ আমিরের ব্যাপারে এবং শেষোক্ত আয়াতগুলো আবু জাহলের শানে নাজিল হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম প্রকারের আয়াতগুলো নযর ও তার ছেলে হারিছ-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

মূলত আলোচ্য আয়াতগুলো কারো ব্যাপারে খাস নয়; বরং সকল মু'মিন ও কাফেরের ব্যাপারে প্রযোজ্য। এর সারকথা হলো, আল্লাহর নাফরমান জাহান্নামী হবে এবং তাঁর আনুগত্যকারী জান্নাতী হবে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ الخ আয়াতসমূহের শানে নুযূল : মক্কার কাফিররা বারবার বিদ্রূপ করে মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করত যে, হে মুহাম্মদ! তুমি যে কিয়মাত (বা পুনরুত্থান)-এর ওয়াদা করছ তা কবে সংঘটিত হবে? মূলত তা জানা ও মানার উদ্দেশ্যে তারা জিজ্ঞাসা করত না; বরং বিদ্রূপ ও রসিকতা করার জন্য তারা এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করত। তাদের এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াত কয়টি নাজিল করেন।

فَاِذَا جَآءَتِ-এর মধ্যকার فَا-এর অর্থ : উক্ত আয়াতে فَا অক্ষরটি تَرْتِيْب (ধারাবাহিকতা) বুঝানোর জন্য হয়েছে। কেননা এর পূর্বে দুনিয়ার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এখানে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টির পরই হয় ধ্বংস। তা ছাড়া পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে যে مَتَاع [সম্ভোগ উপকরণ]-এর উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষ এর কিরূপ ব্যবহার করেছে কিয়ামতের দিবসে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। সুতরাং কাজের পরই পরিণামের ধারাবাহিকতায় এর প্রতিদান আসে। -[রূহুল মা'আনী]

فَاِذَا جَآءَتِ الخ-এর মধ্যস্থিত اِذَا-এর জবাব কি? : আলোচ্য আয়াতে اِذَا-এর জওয়াব সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে اِذَا-এর জওয়াব হলো فَاَمَّا مَنْ طَغٰى الخ অর্থাৎ যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে; জাহান্নামকে প্রত্যেক দৃষ্টিমান ব্যক্তির সম্মুখে পেশ করা হবে; তখন আল্লাহর নাফরমানরা হবে জাহান্নামী এবং আল্লাহর ফরমাবরদারগণ হবে জান্নাতি। এটা জমহুরের মাযহাব।

খ. কারো কারো মতে উক্ত اِذَا-এর জওয়াব উহ্য রয়েছে, তবে সেই উহ্য জওয়াব কি তার ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়-

উহ্য জওয়াব হলো عَايَنُوْا অর্থাৎ তারা প্রত্যক্ষ করবে।

তা হলো عَلِمُوْا অর্থাৎ তারা জানতে পারবে।

অথবা, তা হলো اُدْخِلَ اَهْلُ النَّارِ النَّارَ وَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ তখন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে এবং জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করানো হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلطَّامَّةُ -এর মর্মার্থ : اَلطَّامَّةُ-এর অর্থ নিরূপণে মুফাসসিরীনের পক্ষ হতে কয়েকটি মতামত পরিলক্ষিত হচ্ছে–

১. ঐ মহাবিপদ যা অন্যান্য সকল বিপদকে ঢেকে ফেলবে।

২. হযরত হাসান (র.) বলেন, শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক।

৩. হযরত যাহ্হাকসহ আরো কয়েকজনের মতে কিয়ামত, কিয়ামতকে طَامَّةٌ বলা হয়েছে; কেননা এটা অন্যান্য মসিবত হতে ভয়াবহতার দিক হতে বড় হবে।

৪. ইমাম মুবাররিদ বলেন, আরবদের নিকট طَامَّةٌ বলা হয় دَاهِيَةٌ বা বিপদকে যা শক্তির বাইরে হয়। আমার ধারণা যে, طَامَّةٌ শব্দটি তাদের প্রচলিত কথা طَمَّ الْفَرَسُ طَمِيْمًا হতে গৃহীত হয়েছে। কেননা এটা ঐ সময় বলা হয়ে থাকে, যখন ঘোড়া তার গতিতে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করতে শুরু করে। طَمَّ الْمَاءُ বলা হয় ঐ সময় যখন নালা সম্পূর্ণ পানিতে ভর্তি হয়ে যায়।

৫. মুজাহিদসহ আরো কয়েক জনের মতে طَامَّةٌ বলতে এখানে ঐ সময়ের কথাকে বুঝানো হয়েছে, যে সময় বেহেশতীকে বেহেশতে এবং দোজখীকে দোজখে পৌঁছে দেওয়া হবে। –[ফাতহুল কাদীর, রুহুল মা'আনী]

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, দুনিয়ার জীবন ভোগের জীবন, সুবিধার জীবন; কিন্তু ঐ ভোগ সূক্ষ্ম এবং মজবুতভাবে সুনিয়ন্ত্রিত, ঐ ভোগ এমন একটি নিয়মের অধীনে যে নিয়ম পূর্ণ সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। তবে এ ভোগ একটি সীমায় গিয়ে বিদায় নিবে, আর এসে পড়বে মহাবিপদ যে মহাবিপদ সকল কিছুকে ঢেকে ফেলবে। ঢেকে ফেলবে পূর্ণ সৃষ্টিকে আকাশ, জমিন আর পাহাড়-পর্বতমালাকে।

৬. ইবনে আবী শায়বা, ইবনুল মুনযির, কাসেম ইবনুল ওয়ালীদ (র.) হামানীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, اَلطَّامَّةُ الْكُبْرٰى সেই মুহূর্ত, যখন দোজখীদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। –[নূরুল কোরআন]

হাশরের ময়দানের অবস্থা : পরলোকে অবধারিত পুনরুত্থানের সত্যতা সম্বন্ধে নিজের অলৌকিক সৃষ্টিশক্তির বিষয় বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যেদিন সে মহাসংকট দিবস উপস্থিত হবে, সেদিন মানব নিজেদের কৃতকর্মকে স্মরণ করবে ঐ দিনই সেই ভয়াবহ জাহান্নামকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ করা হবে। তখন অবস্থা এরূপ হবে, যে ব্যক্তি সত্যপথ ছেড়ে নাফরমানি করেছে এবং পরকালের প্রতি আস্থাহীন হওয়ার কারণে দুনিয়ার জিন্দেগিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার জন্য জাহান্নামই বাসস্থান হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় থাকতে নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে, অর্থাৎ পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখার কারণে হাশরের বিচার সম্বন্ধে ভয় পোষণ করেছে ও আত্মাকে কুপ্রবৃত্তির হাত হতে বাঁচিয়ে রেখেছে অবশ্যই তার স্থান বেহেশতে হবে। বেহেশতে তার কোনো কামনাই অপূর্ণ থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার হতে বিরত থাকে, কিংবা আল্লাহর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নির্জনে রোদন করে, এরূপ ব্যক্তিকে আল্লাহ মহান আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

مَا سَعٰى আয়াতাংশের مَا-এর অর্থ : مَا سَعٰى-এর مَا এর দুধরনের হতে পারে–

ক. مَا মাওসূলাহ্, এর সেলাতে একটি সর্বনাম উহ্য রয়েছে। তা হলো ه তখন মূলবাক্য এভাবে হবে يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى لَهُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ -

খ. مَا মাসদারিয়াহ্, তখন মূলবাক্য এভাবে হবে যে, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ سَعْيَهُ –[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى-এর মর্মার্থ : কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভালোমন্দ কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করবে, দেখতে পাবে যে, সমস্ত কর্মকাণ্ড দফতরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। অথচ তা সে চরম গাফিলতির দরুন অথবা অধিক সময়ের ব্যবধানে অথবা হাশরের ময়দানে ভয়াবহতার কারণে অথবা নিজের কৃতকর্মের কারণে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ –[রূহুল মা'আনী]

মানুষ যখন নিজেই প্রত্যক্ষ করবে যে, যে হিসাব-নিকাশ হবে বলে তাকে আগাম খবর দেওয়া হয়েছিল, তাই আজ সম্মুখে উপস্থিত, তখন তার হাতে তার আমলনামা এসে পৌঁছার আগেই দুনিয়ার জীবনে তার নিজের কৃতকর্ম এক একটি করে তার স্মরণে ভেসে উঠবে। এরূপ যে হতে পারে কোনো কোনো লোক এ দুনিয়ায়-ই তার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। কেউ যদি এমন কোনো কঠিন বিপদে নিপতিত হয়, যখন মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত বলে মনে হয়, তখন তার নিজের অতীত জীবনে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা ও কাজকর্ম ফিল্মের রূপালী পর্দার মতো মানস পটে সহসাই ভাস্বর হয়ে উঠে।

মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে, স্মৃতিপটে উপস্থাপন করবে, এমতাবস্থায় তার আফসোস আর আফসোসই বাড়বে, অন্য কোনো উপকারে আসবে না। আর কিছুক্ষণ পরে সেই ওয়াদাকৃত প্রকট শাস্তি পাবে–এ কথাও তার স্মৃতিপটে ভাসতে থাকবে। –[যিলাল]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى বাক্যে بُرِّزَتْ-এর অর্থ : بُرِّزَتْ অর্থ اَظْهَرَتْ اِظْهَارًا তথা পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে, কারো নিকট গোপন থাকবে না।

হযরত মুকাতিল বলেন, জাহান্নামের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়া হবে, তখন সকল সৃষ্টজীব তা প্রত্যক্ষ করবে।
-[ফাতহুল কাদীর, রুহুল মা'আনী]

এক কথায়, সেদিন জাহান্নাম সকলের নিকট প্রকাশিত হবে, কারো নিকট গোপন থাকবে না।

بُرِّزَتْ শব্দটি তাশদীদযুক্ত করার কারণ : মূলত بَرَزَ . يَبْرُزُ বাবে اِفْعَالٌ হতেও اِبْرَازٌ অর্থ 'প্রকাশ করা' আসে; কিন্তু ঐ বাব হতে সীগাহ ব্যবহার না করে বাবে تَفْعِيْلٌ হতে তাশদীদযুক্ত ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা- كَثْرَةُ الْحُرُوْفِ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِىْ (শব্দের মধ্যে বেশি অক্ষর হলে অর্থও বেশি) বুঝায়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, تَشْدِيْد যুক্ত শব্দ যেমন পড়তে একটু شَدِيْد তদ্রূপ অর্থেও شَدِيْد বা কঠিন।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, بُرِّزَتْ শব্দে তাশদীদযুক্ত হওয়ায় অর্থেও তাশদীদ বুঝায়। এমতাবস্থায় দর্শকের অবস্থা হিসেবে জাহান্নাম দেখা যাবে। যে যত মারাত্মক তার দৃষ্টিতে ততই মারাত্মক অনুভূত হবে। -[যিলাল]

لِمَنْ يَّرٰى আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য : কারা দেখবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়-

কারো মতে, কাফেরগণ দেখবে মু'মিনগণ নয়- মূলত প্রত্যেক দর্শকই দেখবে। তবে মু'মিনগণ দেখামাত্র আল্লাহর নিয়ামতের কদর বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তাদেরকে এমন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু কাফেরগণের চিন্তার পরিবর্ধন ঘটবে, পূর্বের হায়-হুতাশ আরো বৃদ্ধি পাবে। -[ফাতহুল কাদীর]

জাহান্নাম প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক চক্ষু ও দৃষ্টিবান ব্যক্তি তা দেখতে পাবে। তাতে মু'মিন ও কাফের উভয়ই শামিল, কিন্তু তা একমাত্র কাফেরদের আবাসস্থল, আর মু'মিনগণ তার উপর দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। এ ব্যাখ্যার পিছনে অন্য একটি আয়াত পূর্ণ সহযোগিতা করছে। যেমন- وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا হতে ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا তবে শুধু কাফিরদের ব্যাপারে একটি আয়াত পাওয়া যায় وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ এখানে غَاوِيْنَ দের জন্য খাস করা হয়েছে। তখন জবাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রকাশিত করা হবে غَاوِيْنَ দের জন্য, কিন্তু মু'মিনগণ যখন এর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতে থাকবে তখন তা দেখবে।
-[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَمَّا مَنْ طَغٰى .... الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে আল্লাহর নাফরমানদের কার্যকলাপ ও এর পরিণাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে-

যারা এ দুনিয়ায় অবস্থানকালে সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত হয়ে কুফরকে এখতিয়ার করেছে, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে আখেরাতে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম তথায় সে স্থায়ী আজাব ভোগ করবে।

অপরদিকে যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করেছে এবং এ ভয় করেছে যে, পরকালে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে তার প্রতিটি কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। তার কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। উপরন্তু সে নিজেকে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বিরত রেখেছে, আখেরাতে তার আবাসস্থল হবে জান্নাত, তথায় সে চিরকাল শান্তিতে অবস্থান করবে।

পরকালে ফয়সালার মাপকাঠি [ভিত্তি] কি হবে? : পরকালে আসল ফয়সালার ভিত্তি কি হবে এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দে তা বলে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত দুনিয়াই জীবনের একটি আচরণ এরূপে যে, মানুষ আল্লাহর দাসত্ব সীমা অতিক্রম করে সুস্পষ্ট আল্লাহ দ্রোহিতায় নিমজ্জিত হবে এবং সিদ্ধান্ত করে নিবে যে, যে কোনো উপায়েই সম্ভব দুনিয়ার স্বার্থ সুযোগ-সুবিধা ও স্বাদ আস্বাদন লাভ-ই তার চরম লক্ষ্য। অন্য একটি আচরণ এরূপ যে, এখানে জীবন যাপন করতে গিয়ে প্রতিটি ব্যাপারে মানুষ পরকালে আল্লাহর নিকট হাজির হয়ে হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এ কথা মনে রাখবে এবং নফসের খারাপ বাসনা-কামনা দমন করে রাখবে। এ কথা মনে রাখবে যে, এখানে যদি সে নিজের প্রবৃত্তির তাকিদ মেনে নিয়ে জায়েজ নাজায়েজ নির্বিশেষে স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে তা হলো সে আল্লাহর নিকট কি জবাব দিবে, নিজের সে কাজের কি কৈফিয়ত দিবে? মানুষ এ দুনিয়ায় উপরিউক্ত দু' আচরণের মধ্যে কোন প্রকারের আচরণ গ্রহণ করল, পরকালে তাই হবে চূড়ান্ত ফয়সালার মাপকাঠি (ভিত্তি)। প্রথমোক্ত ধরনের আচরণ যারা এখানে গ্রহণ করবে জাহান্নামই হবে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি। পক্ষান্তরে যারা দ্বিতীয় প্রকারের আচরণ গ্রহণ করবে, জান্নাতে যাওয়া ও থাকাই হবে তাদের ভাগ্যলিপি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَقَامَ رَبِّهٖ আয়াতাংশের উদ্দেশ্য : مَقَامَ رَبِّهٖ বলতে কি বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনের পক্ষ হতে কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়-

১. مَنْ خَافَ مَقَامَهٗ بَيْنَ يَدَىْ رَبِّهٖ অর্থাৎ যে তার প্রভুর সামনে তার নিজের দণ্ডায়মানকে ভয় করেছে।

২. হযরত রবী' বলেন, مَقَامَهٗ يَوْمَ الْحِسَابِ অর্থাৎ হিসাবের দিন তার নিজের অবস্থানকে ভয় করেছে।

৩. হযরত কাতাদাহ্ বলেন- اِنَّ لِلّٰهِ مَقَامًا قَدْ خَافَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য একটি অবস্থান রয়েছে মু'মিনগণই ঐ অবস্থানকে ভয় করে।

৪. হযরত মুজাহিদ বলেন, هُوَ خَوْفُهٗ فِى الدُّنْيَا مِنَ اللّٰهِ عِنْدَ مُوَاقِعِهِ الذَّنْبِ অর্থাৎ এটা হলো দুনিয়াতে পাপ করার সময় মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, যেন তা হতে বিরত থাকতে পারে। -[ফাতহুল কাদীর]

আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখার গুরুত্ব : কুপ্রবৃত্তি হতে আত্মাকে বিরত রাখা, ধৈর্যের সাথে দুনিয়ার জন্য অশ্লীলতা হতে মনকে নিয়ন্ত্রণ করাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য। ভালো দিকগুলোকে গ্রহণ ও নিছক দুনিয়ার ভোগকে বর্জন করা দরকার। দুনিয়ার কৃত্রিম চাকচিক্যে নিজেকে ভাসিয়ে না দেওয়া; বরং যতটুকু করলে দুনিয়াও চলে আখেরাতও পাওয়া যায়; আখেরাতের ক্ষতি হয় না ততটুকু গ্রহণ করা বৈধ। হযরত ইবনে আব্বাস ও মুকাতিল (রা.) বলেন, কোনো এক ব্যক্তি পাপ করার ইচ্ছা করল; কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে হিসাব দেওয়ার কথা স্মরণ করে ভয় করল এবং তা ছেড়ে দিল একেই نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى বলা হয়। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ ..... اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সম্পর্কে কাফেরদের জিজ্ঞাসা ও এর জবাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, হে হাবীব! মক্কায় কাফেররা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, এটা কখন সংঘটিত হবে? অথচ এর সাথে আপনার কি সম্পর্ক? যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে তা অবহিত না করবো ততক্ষণ আপনার পক্ষে তা জানা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহই তা জানেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

মক্কার কাফিররা রাসূলে কারীম ﷺ -কে বারবার এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিয়ামত আগমনের দিন সন বা তারিখ জেনে নেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করা এবং একে নিয়ে তামাশা বা রসিকতা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

اَيَّانَ مُرْسٰهَا -এর মর্মার্থ :

১. জমহুর মুফাসসিরীনের মতে- اَيَّانَ مُرْسٰهَا অর্থ مَتٰى وُقُوْعُهَا وَقِيَامُهَا অর্থাৎ কখন কিয়ামত সংঘটিত হবে?

২. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, مُنْتَهٰى قِيَامِهَا অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হওয়ার শেষ সীমা কি? নোঙ্গর দ্বারা যেরূপ নৌকার সীমা নির্ধারণ করা হয় তেমনি কিয়ামতের সীমা কোথায়? এ ব্যাপার তাদের প্রশ্ন।

৩. আবূ উবায়দা (র.) বলেন, مُرْسَى السَّفِيْنَةِ حِيْنَ تَنْتَهِىْ অর্থাৎ জাহাজের যেখানে চলন শেষ হয় সেখানে এর مُرْسٰى বা শেষ সীমা। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ "فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا" :

১. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো- হে রাসূল! কিয়ামত সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। এটা তো একমাত্র আল্লাহই জানেন। এটা কাফেরদের প্রশ্নের একটি জবাব। অর্থাৎ কোথায় কিয়ামতের জ্ঞান, আর কোথায় আপনি? এই ব্যাপারটি আপনার জানার কথা নয় যে, তারা এসে আপনাকে প্রশ্ন করতে থাকবে। -[ফাতহুল কাদীর]

২. ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর অর্থ- আপনি-ই সেই কিয়ামতের একটি স্মরণ। অর্থাৎ আমি (আল্লাহ) আপনাকে শেষ নবী করে পাঠিয়েছি। আর 'শেষ নবী' বলাটা-ই কিয়ামতের একটি নিদর্শন। 'কিয়ামত নিকটবর্তী' এ কথা বুঝানোর জন্য 'আপনি শেষ নবী' এ দলিলই যথেষ্ট। অতএব, কিয়ামতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ওয়াজিব, প্রশ্ন করার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই। -[কাবীর]

৩. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এর অর্থ- কিয়ামতের জ্ঞান না আপনার কাছে দেওয়া হয়েছে, আর না কোনো মাখলুকের কাছে; বরং পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে তিনিই জানেন। যেমন- অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ বলুন, কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটে। -[ইবনে কাছীর]

৪. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো তা তো আপনার জানা নেই যে, আপনি তাদেরকে অবহিত করে দেবেন। -[জালালাইন]

قَوْلُهُ "إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشَاهَا" : আপনি একমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত, কিয়ামতের সময় বর্ণনাকারী বা ঘোষক হিসেবে নয়। -[রূহুল মা'আনী]

কিয়ামতের ভয়ে যারা ভীত, তাদের জন্য আপনি ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরিত, ভয় প্রদর্শন করা-ই আপনার কাজ। এটা ছাড়া অন্য কিছুর খবর প্রদান আপনার দায়িত্ব নয়, যেমন দায়িত্ব নয় কিয়ামতের বিষয় খবর প্রদান করা। কেননা, এটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাজ। তিনি এটা নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

মূলত নবী করীম ﷺ -কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ক্ষণ গোপন রাখার মধ্যে হেকমত নিহিত রয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى "كَأَنَّهُمْ يَوْمَ ...... عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا" : কারো মতে এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো تَقْلِيلُ مُدَّةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ দুনিয়ার সময়ের স্বল্পতা। কারো মতে- لَمْ يَلْبَثُوْا فِيْ قُبُوْرِهِمْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا অর্থাৎ তারা কবরে একটি দিনের সন্ধ্যা বা প্রভাত বেলা মাত্র অবস্থান করেছে। -[ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, তারা মনে করবে যে, মনে হয় যেন দুনিয়াতে দিনের কিয়দংশ অবস্থান করেছিল।

ضُحٰى-কে عَشِيَّة-এর দিকে إِضَافَتْ করার কারণ : আয়াতে ضُحٰهَا অর্থ ضُحَى الْعَشِيَّةِ অথচ عَشِيَّة-এর জন্য কোনো ضُحٰى নেই। عَشِيَّة এবং ضُحٰى ভিন্ন দু'টি সময়ের নাম তথা সকাল এবং সন্ধ্যা।

এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ه ও أَلِف অর্থাৎ هَا পিছনের বাক্যের শেষাংশের সাথে মিলানোর জন্য যোগ করা হয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হতো- إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰى

ইমাম ফাররা এবং যুজাজ (র.) বলেন, মূল إِضَافَةٌ এভাবে ছিল- إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰى يَوْمِهَا অর্থাৎ সন্ধ্যা অথবা সন্ধ্যার দিনের সকাল। আরবদের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন বলা হয় أَتَيْتُكَ الْعَشِيَّةَ أَوْ غَدَاتَهَا

-[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

তাদের সকাল-সন্ধ্যা উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, অবিশ্বাসী কাফেররা যে কিয়মাত ও পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করছে, পরকালে যখন সেই মহাসংকটময় কিয়মাতকে তারা প্রত্যক্ষ করবে, তখন ঐ প্রজ্বলিত দিনের কঠোরতাকে দুনিয়ার জীবনের সাথে তুলনা করলে এটা বর্তমান দীর্ঘ জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে। এমনকি মনে হবে, যেন মাত্র একদিন দুনিয়াতে অবস্থান করেছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, সন্ধ্যা বা সকাল উল্লেখ করে আরবি বাক্যরীতি অনুযায়ী একদিনকে বুঝানো হয়েছে কোন কোনো তাফসীরকার বলেন, সন্ধ্যা অথবা সকাল শব্দ দ্বারা কবরে অবস্থান (আইয়ামে বারযাখ)-এর সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। কবরে যারা হাজার হাজার বৎসর ধরে ঘুমিয়েছিল তারা হাশর ময়দানে পুনরুত্থিত হয়ে মনে করবে যে, দুনিয়ার জিন্দেগির পরে কবরে মাত্র এক সন্ধ্যা ঘুমিয়েছিল। আর দুনিয়াতে মাত্র এক সকাল অবস্থান করেছে। অথবা সন্ধ্যা অতীত হতে না হতেই কিয়ামত বা হাশর সংঘটিত হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ও প্রভাত শব্দ দ্বারা দুনিয়া ও কবরের সুদীর্ঘ জীবনকে অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর ও স্বল্প বলে মনে হওয়া বুঝিয়েছে। -[খাযেন]

বস্তুত কাফেররা কিয়ামত সম্পর্কে যত চেচামেচিই করুক না কেন যখন তারা কিয়ামত দেখতে পাবে সে কঠিন মুহূর্তটি যখন আসবে তখন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে, দুনিয়ার এ সুদীর্ঘ জীবন কিছুই নয়, তা বেশি হলে একটি সকাল বা এক সন্ধ্যার ন্যায়। দুনিয়ার জীবন ও মধ্যলোকের জীবন যতই সুদীর্ঘই হোক না কেন তা সীমিত এক সময় শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন থেকে যে জীবন আসবে তা কখনো শেষ হবে না, তাই তখন দুনিয়ার জীবনকে শুধু একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা বলে মনে হবে। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ عَبَسَ : সূরা আবাসা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির প্রথম শব্দ عَبَسَ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে 'আবাসা' –কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ-এর রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সূরাটির আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন- الْاَعْمٰى ও اَلسَّفَرَةُ وَالصَّاخَّةُ ইত্যাদি।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : মুফাসসির মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর সাথে নবী করীম ﷺ -এর একটি আচরণকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একবার নবী করীম ﷺ -এর দরবারে মক্কার কতিপয় বড় বড় সরদার ও সমাজপতি বসেছিল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে ইবনে উম্মে মাকতূম নামে একজন অন্ধ সাহাবী নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। এ সময়ে নবী করীম ﷺ -এর বাক্যালাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এতে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এ সময় আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনা হতে আলোচ্য সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামের প্রথম দিকেই নাজিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনে কাছীর (র.) প্রমুখগণ লিখেছেন– اِنَّهُ اَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا

দ্বিতীয়ত হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত ঘটনার সময় তিনি হয়তো পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলেন, না হয় তখন ইসলাম গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় আছে, তিনি এসে বললেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ অন্য দিকে অত্র সূরার ৩নং আয়াত لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى-এর তাফসীরে ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন– لَعَلَّهُ يُسْلِمُ

তৃতীয়ত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে তখন যারা বসা ছিল হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তারা হলো উতবাহ, শাইবাহ, আবু জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখগণ। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, তখনো তাদের সাথে মহানবী ﷺ -এর মেলামেশা ও উঠাবসা চালু ছিল এবং সংঘাত চরম আকার ধারণ করেনি। উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায় যে, উক্ত সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় নাজিল হয়েছে।

আয়াতের সংখ্যা : অত্র সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে ৪২টি আয়াত, ১৩০টি বাক্য এবং ৫৩৫ টি অক্ষর রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় দানের পদ্ধতি, উপদেশ গ্রহণ না করার প্রতি তিরস্কার, উপদেশ গ্রহণে বিমুখ ব্যক্তিদের পারলৌকিক শাস্তি এবং উপদেশ গ্রহণকারীদের পারলৌকিক পুরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ মধ্যমাংশের ভূমিকা এবং মধ্যমাংশ শেষাংশের ভূমিকা, আর শেষাংশ হলো মূলবক্তব্য বিষয়।

প্রথমাংশে শুরু করার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগিতা ও বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সাগ্রহ মনোযোগিতা প্রদর্শন করায় নবী করীম ﷺ -এর প্রতি শাসন ও তিরস্কারমূলক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ সূরাটির প্রতি সমগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, এ সূরায় মূলত কাফের কুরাইশ সর্দারদের প্রতিই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা সত্যবিমুখতার কারণে দীনের দাওয়াতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর সে সঙ্গে নবী করীম ﷺ -কে দীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রাথমিকভাবে নবুয়তের কাজ সম্পাদনের যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ভ্রান্তি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ কুরাইশ সরদারদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকে অবজ্ঞা করেছেন। আপাত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও মূল ব্যাপারটি ছিল ভিন্নতর। মূলত কোনো মতাদর্শ প্রচারকের প্রাথমিক

লক্ষ্যই থাকে সামনের প্রভাবশালী লোকদের প্রতি। অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃত্বহীন ও দুর্বল বলে তার প্রতি উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল না আর এর মূলে দীনি দাওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতাই ছিল একমাত্র কারণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামি আদর্শ প্রচারের এটা সঠিক পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, সে যত দুর্বল ও প্রভাবহীনই হোক না কেন। পক্ষান্তরে যাদের সত্যানুরাগ নেই তারা সামাজিকভাবে যত প্রভাব, প্রতিপত্তিশালীই হোক না কেন, তারা গুরুত্বহীন।

প্রথম হতে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এ কথাগুলো বলার পর ১৭ আয়াত হতে ঐ সমস্ত কাফেরদের প্রতি সরাসরি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ-এর দীনি দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছিল। এ পর্যায়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি যে আচরণ অবলম্বন করেছিল এর প্রতি প্রথমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শেষে পরকালে তাদেরকে একজন চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : এ সূরার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিয়ামতের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষেও কিয়মাতের বিষয় বিবৃত হয়েছে। এ জন্য অনুমিত হয় যে, কিয়ামতের বর্ণনাই এ সূরার উদ্দেশ্যগত অঙ্গ। শেষাংশে কিয়ামত বিষয়ক বর্ণনায় বিশেষভাবে কাফেরদের কঠোর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সূরার মধ্যমাংশের قُتِلَ الْإِنْسَانُ এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের উল্লেখ করত একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়মাতগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো কিছুই প্রতিবন্ধকতা ছিল না; এতদসত্ত্বেও তারা যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, এটা চরম ধর্মদ্রোহিতা বৈ কিছু নয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কঠোর আজাব হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

ধর্মদ্রোহীদের এ চরম অকৃতজ্ঞতা সংশোধনের জন্য নবী করীম ﷺ সর্বদা সচেষ্ট ও চিন্তান্বিত থাকতেন। এ কারণে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়ার সময় অন্ধ সাহাবী কর্তৃক মাঝখানে তার কথায় ব্যাঘাত ঘটানোটা তাঁর নিকট কিছুটা বিরক্তিকরই ঠেকেছিল, কিন্তু কাফেরদের প্রতি হযরতের এ মনোযোগ এবং একজন ঈমানদারের প্রতি এ সামান্যতম উদাসীনতাকেও আল্লাহ পছন্দ করেননি। এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ ঈমানের চেয়ে কাফেরদের প্রতি অধিক মর্যাদা প্রদর্শিত হয়ে যেতে দেখে মার্জিত ভাষায় আল্লাহ হযরতকে কাফেরদের হেদায়েতের প্রশ্নে এত বেশি ব্যস্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং সত্যিকার প্রেমিক ও ধর্মান্বেষীদের প্রতি সবিশেষে দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।

সূরাটির শানে নুযূল : মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে কুরাইশ কাফেরদের কতিপয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনাতে তারা হলেন আবূ জাহল ইবনে হিশাম, উকবাহ ইবনে রাবীয়াহ, উবাই ইবনে খাল্ফ, উমাইয়া ইবনে খাল্ফ এবং শাইবাহ। রাসূলে কারীম ﷺ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামে এক অন্ধ সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ তার এরূপ আচরণে রুষ্ট হলেন। কাজেই তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উক্ত সূরাটি নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। এরপর যখন ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মহানবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন নবী করীম ﷺ তার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِيْ رَبِّيْ অর্থাৎ যার কারণে আমার প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন তাকে সুস্বাগতম। মাঝে মাঝে সফরে যাওয়ার সময় নবী করীম ﷺ হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। তিনি তাকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনও নিয়োগ করেছিলেন। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটির মর্যাদা : একটি হাদীসে বর্ণিত আছে "مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ عَبَسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আবাসা পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উজ্জ্বল চেহারায় উত্তোলন করবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হাদীসখানা মাওযূ'।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ : সূরা আবাসা মক্কায় অবতীর্ণ

اِثْنَتَانِ وَاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً : ৪২ আয়াত বিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. عَبَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَحَ وَجْهُهُ وَتَوَلّٰى اَعْرَضَ لِاَجْلِ.

১. তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখমণ্ডলে বিরক্তি ফুটে উঠল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, এ কারণে যে,

٢. اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَقَطَعَهُ عَمَّا هُوَ مَشْغُوْلٌ بِهٖ مِمَّنْ يَرْجُوْ اِسْلَامَهُ مِنْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ الَّذِيْ هُوَ حَرِيْصٌ عَلٰى اِسْلَامِهِمْ وَلَمْ يَدْرِ الْاَعْمٰى اَنَّهُ مَشْغُوْلٌ بِذٰلِكَ فَنَادَاهُ عَلِّمْنِيْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى بَيْتِهٖ فَعُوْتِبَ فِيْ ذٰلِكَ بِمَا نُزِّلَ فِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لَهُ اِذَا جَاۤءَ مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِيْ فِيْهِ رَبِّيْ وَيَبْسُطُ لَهُ رِدَاۤءَهُ.

২. তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করল আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.), যার কারণে তাঁর সে মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে, যা তিনি সম্ভ্রান্ত কুরাইশদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশায় নিবদ্ধ রেখেছিলেন। আর তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু অন্ধ লোকটি তাঁর এ ব্যস্ততা বুঝতে পারেনি। তাই সে নিবেদন করল, আমাকে তা শিক্ষা দান করুন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দান করেছেন। মহানবী ﷺ উঠে স্বগৃহে চলে যান। এ কারণে এ সূরায় যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার মাধ্যমে তাঁকে শাসানো হয়। অতঃপর যখনই উক্ত অন্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগমন করত তিনি তাকে এই বলে স্বাগত জানাতেন যে, তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার কারণে আল্লাহ আমাকে শাসিয়েছিলেন এবং তার জন্য নিজ চাদর বিছিয়ে দিতেন।

٣. وَمَا يُدْرِيْكَ يُعْلِمُكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الزَّايِ اَيْ يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوْبِ بِمَا يَسْمَعُ مِنْكَ.

৩. তোমার কি খবর ইলম্ আছে যে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো এখানে يَزَّكّٰى মূলত يَتَزَكّٰى ছিল, تَا-কে زَا -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ পাপাচার হতে পবিত্র হতো তোমার নিকট হতে যা শ্রবণ করত এর মাধ্যমে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٤. اَوْ يَذَّكَّرُ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِى الْاَصْلِ فِى الذَّالِ اَىْ يَتَّعِظُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى الْعِظَةُ الْمَسْمُوْعَةُ عَنْكَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِنَصَبِ تَنْفَعَهُ جَوَابُ التَّرَجِّىْ -

৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এখানে يَذَّكَّرُ শব্দটি يَتَذَكَّرُ ছিল, تَا -কে ذَالْ-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে অর্থাৎ নসিহত গ্রহণ করত। ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। অর্থাৎ আপনার উপদেশ তার জন্য উপকারী হতো অন্য এক কেরাতে تَنْفَعَهُ -এর মধ্যকার নসব تَرَجِّىْ -এর জওয়াব হিসেবে পঠিত হয়েছে।

٥. اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى بِالْمَالِ -

৫. পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না সম্পদের কারণে।

٦. فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِتَشْدِيْدِ الصَّادِ بِاِدْغَامِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ فِى الْاَصْلِ فِيْهَا تُقْبِلُ وَتَتَعَرَّضُ

৬. তুমি তারই প্রতি মনোযোগ দিয়েছ تَصَدّٰى শব্দটি অন্য এক কেরাতে صَادْ -কে তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে শব্দটি মূলত تَتَصَدّٰى ছিল, تَا -কে صَادْ-এর মধ্যে ইদগাম করায় تَصَّدّٰى হয়েছে। অর্থাৎ তুমি মনোযোগী হবে এবং আগ্রহ প্রদর্শন করবে।

٧. وما عليك الا يزكى يؤمن -

৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই ঈমান আনয়ন না করলে।

তাহকীক ও তারকীব

اَنْ جَاءَهُ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : اَنْ جَاءَهُ আয়াতাংশ تَوَلّٰى ক্রিয়া বা عَبَسَ ক্রিয়ার দ্বারা মানসূব হয়েছে। যারা تَوَلّٰى -এর মানসূব বলেন, তারা নিকটতম ক্রিয়ার আমলকে অগ্রাধিকার দেন। আর যারা اَبْعَدْ বা দূরবর্তী ক্রিয়ার আমলকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন তারা عَبَسَ ক্রিয়ার মানসূব বলে থাকেন। –[কাবীর]

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, اَنْ নসবের স্থলে আছে। কেননা এটা মাফউলে লাহু হয়েছে। মূলবাক্য ছিল– لِاَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى –[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মধ্যম পুরুষ ব্যবহারের স্থলে عَبَسَ ক্রিয়াকে নাম পুরুষ হিসেবে ব্যবহার : عَبَسَ ক্রিয়ার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তখনকার কার্য তার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ এখানে নাম পুরুষের সীগাহ ব্যবহার না করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খেতাব করে মধ্যম পুরুষের সীগাহ ব্যবহার করা দরকার ছিল। এর কারণ এই ছিল যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ব্যাপারটি অপছন্দনীয় হয়েছিল, এমন ধরনের একটি কাজ তার পক্ষ হতে হওয়া ঠিক হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, তাই এ অপছন্দনীয় কাজের সরাসরি সম্বোধন করতে চাননি। এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অনুকম্পা, দয়া ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিন্দাজ্ঞাপন ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমত : বিশ্বনবী ﷺ সমস্ত উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হোক এটাই ছিল তাঁর কামনা। এ নিয়তে তিনি কুরাইশ সরদারদের সাথে আলাপ করছিলেন, কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় 'ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)' বাধা প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তিরস্কারের যোগ্য তিনিই ছিলেন; কিন্তু উল্টা বিশ্বনবী ﷺ তিরস্কারের যোগ্য হয়েছেন। এটা কয়েকটি কারণে হয়েছে যে,

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilmweebly.com

১. 'ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)' যদি জানতেন যে, বিশ্বনবী ﷺ বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ আলাপ করছেন, তাহলে তিনি এমন ধরনের ডাক এবং আবেদন করতেন না। জানার পরও যদি তিনি এরূপ করতেন, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়তো তাঁকে তিরস্কার করা হতো।

২. তিনি ছিলেন সহায় সম্বলহীন, এমতাবস্থায় হয়তো তিরস্কার বরদাশ্‌ত করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলবেন। আল্লাহ দুর্বল সম্বলহীন ব্যক্তিদের মন ভাঙ্গতে চাননি।

৩. অথবা, এ প্রশিক্ষণের জন্য যে, বিত্তবান-কাফের হতে গরিব-মু'মিন অত্যধিক ভালো-উত্তম। গরিব হলেও মু'মিনের দিকে তাকানো দরকার। ধনী ও সামাজিক প্রতিপত্তিশালী কাফের গরিব-মু'মিনের সামনে কিছুই নয়। -[কুরতুবী]

৪. ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর সম্মানার্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে তিরস্কার করেছেন।

৫. যেন তাঁর সহচরদেরকে সর্ব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন এবং তাদেরকে নিজের নিকট হতে দূরে ঠেলে না দেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

৬. অথবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহ্যিক প্রকাশিত কাজের নিন্দা ছিল না; বরং তাঁর অন্তরের ঝোঁক প্রবণতার নিন্দা করা হয়েছে। এটা ছিল- তাঁর অন্তর কাফেরদের প্রতি ঝুঁকে গেছে। কেননা, তারা ছিল তাঁর নিকটাত্মীয়, সামাজিক প্রতিপত্তিশালী ও উচ্চ পদাধিকারী। পক্ষান্তরে তাঁর মন ইবনে উম্মে মাকতূম হতে দূরে সরে গিয়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন অন্ধ, আত্মীয় ও প্রতিপত্তিহীন ব্যক্তি। তাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে মলিনতা ও বিমুখতার কারণে আল্লাহর পক্ষ হতে উপদেশযুক্ত নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। -[কাবীর]

ঐ সময় বিশ্বনবী ﷺ-এর কাছে যারা ছিল : বিশ্বনবী ﷺ-এর নিকট ঐ সময় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ছিল। উতবা, শায়বা, আবূ জাহল, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ। -[রূহুল মা'আনী]

আল্লামা কুরতুবী ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং উমাইয়া ইবনে খালফের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলেন, এটা একটি বাতিল কথা মাত্র। এমনকি ঐ মুফাসসিরীনদের অজ্ঞতাও বটে, যারা দীনকে তাহকীক করে গ্রহণ করে না। কেননা, উমাইয়া এবং ওয়ালীদ মক্কায় ছিল আর ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) ছিলেন মদীনায়। তাদের সাথে উপস্থিত হননি, আর না তারা তাঁর সাথে উপস্থিত হয়েছে; বরং তাদের উভয়ই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, একজন হিজরতের পূর্বে আর অন্য জন বদর প্রান্তরে। -[কুরতুবী]

চিন্তার দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় যে, আল্লামা কুরতুবীর এ ধরনের মন্তব্য অমূলক। কেননা সূরাটি মক্কী। মদীনার কোনো কথা টেনে এনে অন্যান্য মুফাসসিরদের কথাকে এভাবে উঠিয়ে দেওয়া আদৌ ঠিক হয়নি।

ইবনে উম্মে মাকতূমের পরিচিত : ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)-এর মামাত ভাই। তাঁর প্রকৃত নাম আমর ইবনে কায়েস ইবনে যায়েদা ইবনে জুনদুব ইবনে হারাম ইবনে রাওয়াহা ইবনে হুজর ইবনে মুয়ীছ ইবনে আমের ইবনে লুয়াই আল-কুরাশী। কারো মতে তাঁর নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, কারো মতে আব্দুল্লাহ ইবনে শুরাইহ্ ইবনে মালিক। তবে প্রথম মতই প্রসিদ্ধ। উম্মে মাকতূম তাঁর আম্মার উপনাম। তাঁর নাম হলো আতিকা বিন্‌তে আব্দুল্লাহ আল-মাখযূমিয়া। তিনি প্রথমে অন্ধ ছিলেন না; বরং পরে অন্ধ হয়ে গেছেন। কারো মতে তিনি অন্ধত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

তাঁর নাম 'অন্ধ' বলে উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা ইবনে উম্মে মাকতূমের সম্মানার্থে তাঁর প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধমক পর্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু সম্মানিত ব্যক্তির নাম না বলে এমন এক গুণবাচক বিশেষ্য বলা হয়েছে যা দ্বারা সম্মান বুঝা যায় না; বরং হেয় বুঝা যায়। কেননা এমন গুণ দিয়ে ডাক দিলে ঐ ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত বুঝা যায়। এর জবাব হচ্ছে-

'অন্ধ' বলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়নি, বা ক্ষুণ্ন করার জন্য বলা হয়নি; বরং এ কথা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে, তিনি 'অন্ধ' হওয়ার কারণে অধিক সাহচর্য ও করুণা পাওয়ার যোগ্য। অথচ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার দেখিয়েছেন। -[কাবীর]

গায়েব হতে খেতাবের দিকে ইলতিফাতের কারণ : সূরার প্রথমে عَبَسَ এবং تَوَلّٰى-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গায়েবের সীগাহ দ্বারা দূর হতে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে وَمَا يُدْرِيْكَ দ্বারা সরাসরি খেতাব করেছেন। এটা এ জন্য যে, সরাসরি عِتَابٌ নিন্দা বা ক্রোধ প্রকাশ করলে বেশি কার্যকরি হয়। অর্থাৎ সরাসরি রাগ দেখানো হলে, রাগ যেমন বেশি বুঝা যায়, তেমন কার্যকরিও বেশি হয়। -[ফাতহুল কাদীর]

গায়েবের সীগাহ দ্বারা দূর বুঝা যায়, তারপর নিকটতম করা এবং ভালোবাসা বুঝানোর জন্য সরাসরি খেতাব করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

لَعَلَّهٗ -এর যমীরের مَرْجِعْ কি? : আল্লাহর বাণী لَعَلَّ-এর মধ্যস্থিত ، যমীরের مَرْجِعْ-এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. উক্ত যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْاَعْمٰى অন্ধ লোকটি তথা ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) অর্থাৎ আপনি কি জানেন অবশ্যই সে পরিশুদ্ধি লাভ করত।

২. অথবা, উক্ত যমীরের مَرْجِعْ হলো কাফের। অর্থাৎ আপনি তার হেদায়েতের চিন্তা করতে থাকুন। আপনি কি জানেন হয়তো সে হেদায়েত কবুল করতেও পারে।

এখানে لَعَلَّ-এর অর্থ : আল্লাহর বাণী لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى -এর মধ্যে لَعَلَّ শব্দটি সন্দেহ বা সংশয়ের অর্থে হয়নি (যদিও সাধারণত তা উক্ত অর্থেই হয়ে থাকে)। বরং এখানে এটা নিশ্চয়তার অর্থেই হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় لَعَلَّ শব্দটির হাকীকী অর্থ সংশয় না হয়ে (আল্লাহর দিকে নিসবত হওয়ার দরুন) নিশ্চয়তা -এর অর্থে হয়েছে। সাধারণ রাজা বাদশাহ ও ক্ষমতাধরদের বেলায়ও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় উক্ত শব্দটি সম্ভাবনা ও সংশয়ের অর্থে না হয়ে নিশ্চয়তার অর্থ প্রদান করে থাকে।

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى-এর মধ্যে اِسْتَغْنٰى কোন অর্থে হয়েছে? : উক্ত আয়াতে اِسْتَغْنٰى শব্দটি কোন অর্থে হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো طَلَبُ غِنًى অর্থাৎ সম্পদ তলব। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -এর নিকট সম্পদ তালাশের জন্য আসেনি।

খ. আল্লামা কালবী (র.)-এর মতে এখানে اِسْتَغْنٰى মানে اِسْتَغْنٰى عَنِ اللّٰهِ অর্থাৎ সে আল্লাহর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

গ. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) مَنِ اسْتَغْنٰى-এর তাফসীরে লিখেছেন "مَنْ اَظْهَرَ الْاِسْتِغْنَاءَ عَنْكَ وَعَنْ دِيْنِكَ وَعَمَّا عِنْدَكَ مِنَ الْهُدٰى وَالْخَيْرِ وَالطَّهَارَةِ অর্থাৎ হে হাবীব! সে বিমুখতা প্রকাশ করে আপনার থেকে, আপনার দীন থেকে, আপনার নিকট যে হেদায়েত, কল্যাণ, আলো ও পবিত্রতা রয়েছে তা থেকে।

ঘ. কারো কারো মতে এর অর্থ হলো اِسْتَغْنٰى عَنِ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে।

تَصَدّٰى -এর মর্মার্থ কি? : আল্লাহর বাণী فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى -এর মধ্যস্থিত تَصَدّٰى -এর মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, আপনি তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, তার বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দিলেন এবং তার পরিশুদ্ধি কামনা করলেন। আল্লামা শাওকানী (র.) বলেছেন, এখানে تَصَدّٰى -এর অর্থ হলো, আপনি তার বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন, তার কথা কান পেতে শুনেছেন।

وَمَا عَلَيْكَ আয়াতে مَا -এর অর্থ : مَا না-বোধক তখন বাক্যের অর্থ হবে– সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার উপর কোনো দায়িত্ব বর্তাবে না। مَا -কে প্রশ্নবোধকও বলা যায়। তখন অর্থ হবে– আপনার উপর কি দায়িত্ব আছে তার পরিশুদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে? তবে প্রশ্নবোধক অর্থ করলেও ফলাফল না-বোধকই হয়। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৮. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى حَالٌ مِنْ فَاعِلِ جَاءَ

৯. وَهُوَ يَخْشَى اللّٰهَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَسْعٰى وَهُوَ الْأَعْمٰى .

১০. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى فِيْهِ حَذْفُ التَّاءِ الْأُخْرٰى فِي الْأَصْلِ اَيْ تَتَشَاغَلُ .

১১. كَلَّا لَا تَفْعَلْ مِثْلَ ذٰلِكَ إِنَّهَا اَيِ السُّوْرَةُ اَوِ الْاٰيَاتُ تَذْكِرَةٌ عِظَةٌ لِلْخَلْقِ .

১২. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ حَفِظَ ذٰلِكَ فَاتَّعَظَ بِهٖ .

অনুবাদ :

৮. অপর দিকে যে তোমার নিকট ছুটে আসল এটা جَاءَ -এর فَاعِل হতে حَال

৯. আর সে ভয় পোষণ করে আল্লাহকে, এটা يَسْعٰى -এর فَاعِل হতে حَال আর সে হলো অন্ধ ব্যক্তিটি।

১০. আর তুমি তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করলে এখানে দ্বিতীয় تَاء বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অমনোযোগিতা প্রদর্শন করলে।

১১. না এরূপ করো না, এটা তো অর্থাৎ সূরা বা আয়াতসমূহ উপদেশবাণী সৃষ্টির জন্য নসিহত।

১২. যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে সংরক্ষণ করবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَسْعٰى -এর মহল্লে ই'রাব : يَسْعٰى ক্রিয়াটি جَاءَ ক্রিয়ার ফায়েল হতে 'হাল' হওয়ার কারণে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ جَاءَ اِلَيْكَ حَالَ كَوْنِهٖ مُسْرِعًا فِي الْمَجْئِ

"وَهُوَ يَخْشٰى" আয়াতের মহল্লে ই'রাব : وَهُوَ يَخْشٰى আয়াতটির মহল্লে ই'রাব হলো মানসূব। কেননা পূর্ণ বাক্যটি يَسْعٰى ক্রিয়ার কর্তা হতে অথবা جَاءَكَ ক্রিয়ার কর্তা হতে حَال হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বাপর যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রতি রাগ হওয়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছেন, পাশাপাশি ইসলামের দায়িত্বশীলদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অতি সুনিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখন উল্লিখিত আয়াত কয়টিতে ইবনে উম্মে মাকতূমের গ্রহণযোগ্য পরিচিতি তুলে ধরার সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর জন্য একটি চিরস্থায়ী সার্টিফিকেট [সনদ] প্রদান করা হয়েছে।

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ আয়াতে مَنْ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَنْ অর্থ 'যে ব্যক্তি'। এখানে مَنْ বলতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছুটে এসেছিলেন ঐ সময়, যখন তিনি কুরাইশ নেতাদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন।

ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) কিসের ভয় করতেন ? : আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে ভয় করে। এখন প্রশ্ন হলো কিসে ভয় করে? জবাব তিনটি হতে পারে।

১. يَخْشَى اللّٰهَ وَيَخَافُهُ অর্থাৎ সে আল্লাহকে ভয় করে। যেন কোনো প্রকারেই কোনো নির্দেশ বাস্তবায়নে তার পক্ষ হতে অলসতা পাওয়া না যায়।

২. يَخْشَى الْكُفَّارَ وَاَذَاهُمْ অর্থাৎ সে কাফেরগণ ও তাদের যন্ত্রণাকে ভয় করে। যেন কোনো প্রকারেই তাদের যন্ত্রণা তাকে পেয়ে না বসে।

৩. يَخْشَى الْكَبْوَةَ فَاِنَّهٗ كَانَ اَعْمٰى অর্থাৎ সে [গর্তে বা রাস্তার পাশে] পড়ে যাওয়াকে ভয় করত। কেননা সে ছিল অন্ধ- তার কোনো বহনকারী পথ প্রদর্শক ছিল না। এখানে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

تَلَهّٰى শব্দের অর্থ : تَلَهّٰى -এর صِلَة যখন بَاء আসে, তখন খেল-তামাশার অর্থ দেয়, অথবা এগিয়ে আসার অর্থ হয়। আর যখন عَنْ হবে, তখন অর্থ হবে অমনোযোগী হওয়া। আয়াতে কারীমায় عَنْ সিলাহ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, تَلَهّٰى অর্থ এখানে 'অমনোযোগী, কোনো কাজ হতে বিরত থাকা' হবে। -[ফতহুল কাদীর]

ক্রিয়ার উপর أَنْتَ -কে মুকাদ্দাম করার কারণ : أَنْتَ সর্বনামটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। একে বাক্যের প্রথমে এবং ক্রিয়ারও আগে উল্লেখ করার কারণ হলো–

১. আয়াতের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বুঝানোর জন্য أَنْتَ -কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে।

২. অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য। কেননা তিরস্কারের স্থলে কিছু অনুগ্রহ প্রকাশ করা মানবিক চাহিদা, নচেৎ মন ভেঙ্গে যায়।

৩. তথা لِلْفَاصِلَةِ পৃথকীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. لِلْحَصْرِ তথা বাক্যকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সীমিত করার নিমিত্তে। –[রূহুল মা'আনী]

تَلَهّٰى শব্দে কয়েকটি কেরাত :

১. আল্লামা ইবনে কাছীর تَا -কে মুযারি'-এর বাবের تَا-এর উপর إِدْغَامْ করে পড়েন। عَنْهُ تَّلَهّٰى অর্থাৎ تَا-এর উপর তাশদীদ। পিছনের هَا এসে تَا -এর সাথে যুক্ত হয়ে পঠিত হয়।

২. হযত আবূ জা'ফর تَا -কে পেশ দিয়ে মাজহুল পড়েছেন।

৩. আর জমহুর এক تَا -কে হযফ করে تَلَهّٰى . تَا -এর উপর যবর দিয়ে পড়েন।

৪. হযরত তাল্‌হা দুই تَا -কে প্রকাশ করে تَتَلَهّٰى পড়েছেন– হযফ করে নয়।

৫. হযরত তাল্‌হা হতে দ্বিতীয় বর্ণনানুযায়ী এক تَا ; কিন্তু লামের উপর জযম হবে। –[রূহুল মা'আনী]

كَلَّا-এর বিশ্লেষণ ও অর্থ : كَلَّا একটি অব্যয়। এর কোনো আমল নেই। এটা পূর্ববর্তী বাক্যকে নাকচ করে এবং পরবর্তী বাক্যকে সমর্থন করে। হযরত হাসান (রা.) বলেন; হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের সাথে যে ব্যবহার হয়ে গেছে, এতে বিশ্ব নবীর চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ে গেছে। তিনি চিন্তা করছিলেন যে, কি ফয়সালা নাজিল হয়ে যায়; কিন্তু যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ সহ কয়েকটি আয়াত নিয়ে আসলেন তখন তাঁর চেহারা হতে চিন্তার চিহ্ন দূরীভূত হয়ে গেছে। আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, كَلَّا না, এরূপ করবেন না। –[কাবীর]

শায়খ আলূসী (র.) বলেন : كَلَّا দ্বারা রাসূলুল্লা হ ﷺ -কে এ কথার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তিরস্কারযোগ্য এমনি ধরনের কোনো কাজের পুনরাবৃত্তি না করেন । এটাতে অবতীর্ণ হয়েছিল ঐ সময়, যখন তিনি তার কথা শেষে বাড়ি চলে গেছেন। এ ঘটনার পর দেখা যায় যে, ফকির নিঃস্ব ব্যক্তিগণ তাঁর দরবারে আমিরের মর্যাদা পেতেন। –[রূহুল মা'আনী]

অথবা, كَلَّا অর্থ কখনই এরূপ কাজ করবে না। আল্লাহকে যারা ভুলে গেছে এবং নিজেদের বৈষয়িক মান-মর্যাদায় যারা আত্মম্ভরি হয়ে রয়েছে সে লোকদেরকে অকারণে বেশি গুরুত্ব দিতে যাবেন না। ইসলাম এমন মূল্যহীন জিনিস নয় যে, যারা এর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের সম্মুখে অনুনয়-বিনয় সহকারে কাতর কণ্ঠে এটা পেশ করতে হবে। এ ছাড়া হে নবী! তোমার নিজের মর্যাদার দিক দিয়েও এ পদ্ধতি শোভনীয় নয়। এ অহংকারী লোকদেরকে ইসলামের দিকে আনার জন্য এমন ভঙ্গি গ্রহণ করা, এমনভাবে চেষ্টা করা যাতে এ লোকেরা মনে করবে যে, তোমার কোনো স্বার্থ তাদের নিকট আটকা পড়েছে, যা তুমি উদ্ধার করতে চাও, তা কিছুতেই উচিত হবে না। এ লোকেরা ইসলাম কবুল করলে তবেই এটা উৎকর্ষ লাভ করবে, নতুবা এটা ব্যর্থ হয়ে যাবে, এরূপ ধারণা মূলত অর্থহীন। বস্তুত সত্যদীন, এদের প্রতি বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নয় এবং তাদের উপর নির্ভরশীলও নয়, যেমন তারাও নিজেদেরকে এর মুখাপেক্ষী মনে করে না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ" : অর্থাৎ যে কুরআনে কারীম থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় সে তা সহজেই করতে পারে, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আরবের যেসব তথাকথিত নেতৃস্থানীয় লোকেরা কুরআনকে না মানে, কুরআনে কারীম তেলাওয়াত না করে, পবিত্র কুরআনের মহান বাণী বা উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করে, তাতে কুরআনে কারীমের কিছু যায় আসে না। পবিত্র কুরআন স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল। যারা ভাগ্যবান তারাই কুরআনে কারীম পাঠ করে, তার অনুশীলন করে এবং নিজ নিজ জীবনে তার বাস্তবায়ন করে। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যাহত তারা কুরআনে কারীম পেয়েও পায় না। কুরআনে কারীমের উপদেশে নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে না। –[নূরুল কোরআন]

إِنَّهَا-এর هَا সর্বনাম এবং ذَكَرَهُ -এর ة সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল : إِنَّهَا-এর هَا সর্বনাম এবং ذَكَرَهُ-এর ة সর্বনাম একই বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অথচ هَا সর্বনামটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং ة সর্বনামটি পুংলিঙ্গ। এর জবাব হচ্ছে,

১. ইমাম মুকাতিল (র.) বলেন, إِنَّهَا أَيْ أَنَّ اٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ এখানে هَا -এর মারজি' হলো اٰيَاتُ الْقُرْاٰنِ আর এটা মুয়ান্নাস।

আর ইমাম কালবী (র.) বলেন, هٰذِهِ السُّوْرَةُ -এবং ذَكَرَهُ-এর ة পূর্বে উল্লিখিত تَذْكِرَةٌ শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আর تَذْكِرَةٌ শব্দটি অর্থগত দিক হতে পুংলিঙ্গ। কেননা এর অর্থ হলো اَلْوَعْظُ ও اَلذِّكْرُ ।

২. নাজম প্রণেতা বলেছেন, إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ দিয়ে اَلْقُرْاٰنُ উদ্দেশ্য। আর اَلْقُرْاٰنُ শব্দটি পুংলিঙ্গ। এ কারণে ذَكَرَهُ -এর সর্বনাম পুংলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে। আর قُرْاٰنٌ -কে تَذْكِرَةٌ বলা হয়েছে, সে কারণে একে هَا স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম দিয়ে تَعْبِيْر করা হয়েছে। –[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. فِىْ صُحُفٍ خَبَرٌ ثَانٍ لِاَنَّهَا وَمَاقَبْلَهُ اِعْتِرَاضٌ مُّكَرَّمَةٍ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى .

১৩ তা আছে লিপিসমূহে এটা দ্বিতীয় خَبَرٌ পূর্বোক্ত اِنَّهَا -এর জন্য, আর তৎপূর্ববর্তী বক্তব্য جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ যা সম্মানিত আল্লাহ তা'আলার নিকট।

١٤. مَّرْفُوْعَةٍ فِى السَّمَاءِ مُّطَهَّرَةٍ مُنَزَّهَةٍ عَنْ مَسِّ الشَّيَاطِيْنِ .

১৪. যা সমুন্নত আকাশে এবং পবিত্র শয়তানের স্পর্শ হতে পূত-পবিত্র।

١٥. بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كَتَبَةٍ يَنْسَخُوْنَهَا مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ .

১৫. যা এমন লিপিবদ্ধকারীর হাতে লিখিত সে সকল লিপিবদ্ধকারী যারা লাওহে মাহফূয হতে লিপিবদ্ধ করে।

١٦. كِرَامٍ بَرَرَةٍ مُطِيْعِيْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ .

১৬. যারা সম্মানিত ও পূত-পবিত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগত, আর তারা হলো ফেরেশতারা।

١٧. قُتِلَ الْاِنْسَانُ لُعِنَ الْكَافِرُ مَا اَكْفَرَهُ اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ اَىْ مَا حَمَلَهُ عَلَى الْكُفْرِ .

১৭. লানত বর্ষিত হোক এ মানুষদের প্রতি অর্থাৎ কাফেরদের উপর (আল্লাহর) অভিশাপ হোক। তারা কতইনা অকৃতজ্ঞ [সত্য অমান্যকারী]। এখানে প্রশ্নবোধক (مَا) ধমক দেওয়ার জন্য হয়েছে। অর্থাৎ কিসে তাকে কুফরের প্রতি উদ্বুদ্ধ [দুঃসাহাসী] করেছে?

١٨. مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ ثُمَّ بَيَّنَهُ فَقَالَ .

১৮. তাকে আল্লাহ তা'আলা কি বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? এখানে প্রশ্নবোধক ইতিবাচক [সাব্যস্তকরণ]-এর অর্থে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন।

١٩. مِنْ نُطْفَةٍ ط خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً اِلٰى اٰخِرِ خَلْقِهِ .

১৯. এক ফোঁটা শুক্রকীট দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার পরিমিত বিকাশ ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ জমাট রক্ত অতঃপর মাংসপিণ্ড এভাবে তার [পূর্ণাঙ্গ] সৃষ্টি পর্যন্ত।

٢٠. ثُمَّ السَّبِيْلَ اَىْ طَرِيْقَ خُرُوْجِهِ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ يَسَّرَهُ .

২০. তারপর পথ অর্থাৎ তার মাতার গর্ভ হতে বের হওয়ার পথ– তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন।

٢١. ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ جَعَلَهُ فِىْ قَبْرٍ يَسْتُرُهُ .

২১. অতঃপর তাকে মৃত্যু দিলেন এবং কবরে পৌছাবার ব্যবস্থা করলেন। কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন।

٢٢. ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ لِلْبَعْثِ .

২২. অতঃপর যখন ইচ্ছা করবেন তিনি তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবেন। পুনরুজ্জীবিত করার জন্য।

٢٣. كَلَّا حَقًّا لَمَّا يَقْضِ لَمْ يَفْعَلْ مَا اَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ .

২৩. কখনো নয়, অবশ্যই সে পূর্ণ করেনি সে পালন করেনি যা নির্দেশ দিয়েছিল তাকে (তার) তার প্রভু।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

صُحُفٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : صُحُفٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে صَحِيْفَةٌ শাব্দিক অর্থ– কিতাবের পৃষ্ঠাসমূহ, গ্রন্থ বা পুস্তিকা অর্থে, এর ব্যবহার যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এসেছে– إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى সুহুফে মুকাররামাহ অর্থ সম্মানিত পুস্তিকা। উদ্ধৃত আয়াতের অর্থ লাওহে মাহফূযে রক্ষিত কুরআন। কেউ কেউ বলেন, নবীদেরকে প্রদত্ত কিতাব বা সহীফাসমূহ। যেমন আল্লাহর বাণী– إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى তে صُحُفٌ শব্দ দ্বারা নবীদের সহীফাকে বুঝানো হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فِيْ صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ....مُطَهَّرَةٍ : হে হাবীব! আপনি কি মনে করে বসেছেন যে, এ অহংকারী মুশরিকদের দ্বারা কুরআনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? কুরআন সম্মানের উচ্চাসনে আসীন হবে? তা কখনো নয়। কুরআন তো আপনা হতেই এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে, এর আয়াতসমূহ আসমানে অত্যন্ত সম্মানের আসনে সমাসীন আছে, পবিত্র লিপিসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তা ছাড়া মু'মিনগণ এ পৃথিবীতে ও কুরআনকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে পবিত্র ও উচ্চ স্থানে রাখেন।

কুরআন মাজীদ সর্বপ্রকার ভেজাল ও মিশাল হতে পবিত্র। এতে অবিমিশ্রিত নির্জলা সত্যের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোনো প্রকারের বা কোনো ধরনেরই বাতিল এবং নষ্ট চিন্তা-বিশ্বাস বা মতাদর্শ এতে অনুপ্রবেশের একবিন্দু সুযোগ পায়নি। যেসব পূঁতিগন্ধময় আবর্জনায় দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ভরপুর হয়ে গেছে এবং একবিন্দুও কুরআন মাজীদে শামিল হতে পারেনি। মানবীয় চিন্তা কল্পনা কিংবা শয়তানী ভাবধারা সবকিছু হতেই কুরআনকে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ : এখানে সে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে, যারা কুরআন মাজীদের এ সহীফাসমূহকে আল্লাহ তা'আলার সরাসরি হেদায়েত অনুযায়ী লিখছিল, এগুলো সংরক্ষণ ও হেফাজত করছিল এবং নবী করীম ﷺ পর্যন্ত সেগুলোকে যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছিল। এদের পরিচয় স্বরূপ কুরআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, একটি হলো كِرَامٍ অর্থাৎ সুসম্মানিত। আর দ্বিতীয়টি হলো بَرَرَةٍ অর্থাৎ নেক ও সততাসম্পন্ন। প্রথম শব্দটি বলে এ কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, তারা এতই সম্মানিত যে, যে আমানতই তাদের সোপর্দ করা হবে তাতে তাদের ন্যায় অতি উচ্চ মর্যাদাবান সত্তা দ্বারা কোনোরূপ খেয়ানত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ কথা বুঝাবার জন্য যে, এ সহীফাসমূহ লিখনে, এগুলোর হেফাজতকরণে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত তা যথাযথ পৌঁছানোর যে কর্তব্য তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে, পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ববোধ সহকারে তারা তা পালন করে থাকে।

কুরআন নিজেই সম্মানিত : যে ধারাবাহিকতায় এ আয়াত কয়টি উদ্ধৃত হয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এখানে কুরআনের এ পরিচয় কেবল এর মাহাত্ম্য বুঝবার জন্যই নয়; বরং অবিশ্বাসীগণকে বলা হয়েছে যে, এটা অতি মূল্যবান ও মর্যাদাসম্পন্ন। তোমাদের সম্মুখে এটা পেশ করা হলে তোমরা অনুগ্রহ করে এটা গ্রহণ করবে, এরূপ আচরণ এ মহান কিতাবের পক্ষে অপমানকর। এটা এরূপ আচরণের অনেক উর্ধ্বে। কেননা কুরআন তোমাদের মুখাপেক্ষী নয়; বরং তোমরাই এর মুখাপেক্ষী। তোমরা নিজেদের কল্যাণ চাইলে তোমাদের মন-মগজ হতে শয়তানী মনোভাব উৎখাত করে সরাসরি এর দাওয়াত কবুল কর। তোমরা একে যত ক্ষুদ্র-নগণ্যই মনে কর না কেন তাতে এর মহত্ত্ব কিছুমাত্র লাঘব হবে না। অবশ্য তোমাদের আচরণের জন্য তোমাদের সকল অহমিকা ধূলিসাৎ করে দেওয়া হবে। –[কামালাইন]

صُحُفٌ-এর বিশ্লেষণে مُكَرَّمَةٌ নেওয়ার কারণ : مُكَرَّمَةٌ শব্দের অর্থ– সম্মানিত صُحُفٌ দ্বারা এখানে কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন বা অন্যান্য আসমানি গ্রন্থসমূহ সম্মানিত হওয়ার কারণ হলো আসমানি সকল গ্রন্থ বিশেষ করে কুরআনুল কারীম ইলম এবং হিকমতে ভরপুর, এ কারণে এটা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। অথবা এটা লাওহে মাহফূয হতে নাজিল হওয়ার কারণে সম্মানিত। –[ফাতহুল কাদীর]

অথবা, এটা সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক অবতারিত হওয়ার কারণে। অথবা, সম্মানিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত হওয়ার কারণে। –[কুরতুবী]

مَرْفُوْعَةٌ-এর অর্থ এবং এটা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য : مَرْفُوْعَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো উর্ধ্বে। এখানে এটা দ্বারা নিম্নবর্ণিত কয়েকটি অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. إِنَّهَا رَفِيْعَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা অত্যন্ত সম্মানিত।
২. مَرْفُوعَةٌ فِي السَّمَاءِ অর্থাৎ আকাশে অতি সম্মানিত।
৩. مَرْفُوعَةٌ عَنِ الشُّبْهَةِ وَالتَّنَاقُضِ অর্থাৎ সন্দেহ-সংশয় ও স্ববিরোধিতা হতে উর্ধ্বে।
৪. مَرْفُوعَةٌ عِنْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ মু'মিনগণের নিকট অতি সম্মানিত।

مُطَهَّرَةٌ-এর অর্থ এবং এটা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য : مُطَهَّرَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– পবিত্র। এখানে মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. এর অর্থ কুরআনে কারীম এমন পবিত্র যে, পবিত্র ব্যক্তিগণ ছাড়া কেউ এটা স্পর্শ করতে পারবে না. لَا يَمَسُّهٗ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ
২. অথবা, এটা সমস্ত পঙ্কিলতা হতে পবিত্র– مُطَهَّرَةٌ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ
৩. مَحْفُوظَةٌ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ لَا يَنَالُوْنَهَا অর্থাৎ এটা মুশরিকদের ধরাছোঁয়া হতে সম্পূর্ণ মাহফূয।
৪. অথবা, মুশরিকদের উপর নাজিল হওয়া হতে পবিত্র– مُطَهَّرَةٌ مِنْ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ لِاَنَّهُمْ نَجَسٌ

سَفَرَةٌ-এর অর্থ এবং আয়াতে এটা দ্বারা উদ্দেশ্য : سَفَرَةٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো سَافِرٌ যেমন كَاتِبٌ-এর বহুবচন كَتَبَةٌ এবং كَافِرٌ-এর বহুবচন كَفَرَةٌ ইত্যাদি। এখানে سَفَرَةٌ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

১. এখানে سَفَرَةٌ দ্বারা সে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মাঝে দূত হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।
২. এরা সে সম্মানিত ফেরেশতা যারা বান্দার কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করে থাকেন। سَافِرٌ শব্দটি কোনো কোনো সময় كَاتِبٌ-এর অর্থেও হয়ে থাকে। اَلْكِتَابُ-কে اَلسِّفْرُ (সীন অক্ষরটি যের যোগে) ও বলা হয়। এর বহুবচন اَسْفَارٌ হয়ে থাকে।
৩. اَلسَّفَرَةُ দ্বারা এখানে কারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা কিতাব (اَسْفَارٌ) পাঠ করে থাকেন।
৪. سَفَرَةٌ দ্বারা এখানে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে।
৫. سَفَرَةٌ শব্দটিকে এখানে ফেরেশতাদের বিশেষ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যা হোক, এখানে سَفَرَةٌ দ্বারা ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য হওয়াই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

كِرَامٍ-এর অর্থ : كِرَامٌ শব্দটি كَرِيْمٌ-এর বহুবচন। অর্থ– অভিজাতবর্গ, মহান ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, আয়াতে ফেরেশতা উদ্দেশ্য। হযরত কালবী (র.) বলেন, كِرَامٌ عَلٰى رَبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে সম্মানিত। হযরত হাসান (র.) বলেন, كِرَامٌ عَنِ الْمَعَاصِيْ فَهُمْ يَرْفَعُوْنَ اَنْفُسَهُمْ عَنْهَا অর্থাৎ যারা গুনাহ-নাফরমানি হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। অতএব, তারা স্ব-স্ব আত্মাকে পাপ হতে উর্ধ্বে রাখে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– يَتَكَرَّمُوْنَ اَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ ابْنِ اٰدَمَ اِذَا خَلَا بِزَوْجَتِهٖ اَوْ تَبَرَّزَ لِغَائِطِهٖ অর্থাৎ বনী আদম যখন স্ত্রীর সাথে নির্জনে যায় অথবা পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য একাকী হয় তখন তারা বনী আদমের সম্মানার্থে সাথে থাকে না। কারো কারো মতে يُؤْثِرُوْنَ مَنَافِعَ غَيْرِهِمْ عَلٰى مَنَافِعَ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ তারা নিজের সুবিধার উপর অন্যের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

যারা মু'মিনদের জন্য ইসতিগফারের মাধ্যমে করুণাকামী এবং তাদের কল্যাণের পথ প্রদর্শক তারাই كِرَامٌ –[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতের كِرَامٌ শব্দটির অর্থ হলো যারা কুরআন মাজীদ পাঠে ও লিপিবদ্ধ করায় রত তারা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত। –[নূরুল কোরআন]

بَرَرَةٍ-এর অর্থ : بَرَرَةٌ শব্দটি بَارٌّ-এর বহুবচন, যেমন كَفَرَةٌ শব্দটি كَافِرٌ-এর বহুবচন। بَرَرَةٌ অর্থ আল্লাহর অনুগত সত্যবাদী মু'মিন। –[ফাতহুল কাদীর]

শায়খ আলূসী (র.) বলেন, بَرَرَةٌ শব্দটি بَرٌّ-এর বহুবচন। আর اَبْرَارٌ শব্দটি بَرٌّ এবং بَارٌّ-এর বহুবচন, যেমন رَبٌّ-এর বহুবচন اَرْبَابٌ. صَاحِبٌ-এর বহুবচন اَصْحَابٌ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কেউ কেউ বলেন, কুরআন মাজীদে بَرَرَةٌ শব্দ দিয়ে مَلَائِكَةٌ বা ফেরেশতাকুল এবং أَبْرَارٌ দিয়ে মানবকুল বুঝানো হয়েছে। আর এটা এ কারণে যে, أَبْرَارٌ শব্দটি جَمْعُ الْقِلَّةِ-এর শব্দ। এটা মানুষের সাথেই প্রযোজ্য। কেননা মানুষের মধ্যে মুত্তাকীর সংখ্যা কম হবে। পক্ষান্তরে بَرَرَةٌ শব্দটি جَمْعُ الْقِلَّةِ নয়। এটা ফেরেশতাকুলের ব্যাপারে প্রযোজ্য। কেননা তাদের মধ্যে মুত্তাকীর সংখ্যা মানুষের তুলনায় অনেক বেশি।

কারো মতে, أَبْرَارٌ শব্দটি بَرَرَةٌ হতে বেশি বাগ্মিতাপূর্ণ। কেননা أَبْرَارٌ শব্দটি بَارٌّ-এর বহুবচন, আর بَرَرَةٌ শব্দটি بَرٌّ-এর বহুবচন এবং أَبْرَارٌ ও بَارٌّ লিখতে অক্ষর বেশি এবং بَرَرَةٌ ও بَرٌّ লিখতে অক্ষর কম লাগে। আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী كَثْرَةُ الْمَبَانِيْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِيْ অর্থাৎ বেশি হরফ বেশি অর্থ বহন করে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বনী-আদমে সব গুণ পাওয়া যায়, আর তা হলো صِفَاتٌ كَامِلَةٌ وَنَاقِصَةٌ তথা পূর্ণ গুণ এবং অসম্পূর্ণ গুণ থাকা। এ কারণে তাদের পরিপূর্ণ গুণে أَبْرَارٌ বলা হয়েছে। আর ফেরেশতাদের মধ্যে صِفَاتٌ نَاقِصَةٌ পরিপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত এ কারণেই তাদের জন্য بَرَرَةٌ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা তাদের মাঝে মূল গুণই বিদ্যমান, মুবালাগা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। আর বনী আদমের ফজিলতের জন্য মুবালাগা ব্যবহার করা দরকার। কেননা صِفَاتٌ نَاقِصَةٌ থাকা সত্ত্বেও صِفَاتٌ كَامِلَةٌ-এর উপযোগী হওয়া সহজ কথা নয়।

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক : ইতঃপূর্বে সূরাটির প্রথম হতে ষোল আয়াত পর্যন্ত কেবল নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন ও উপলক্ষ করেই কথা বলা হয়েছে। এর বর্ণনা ও বাচনভঙ্গি ছিল এরূপ যে, 'হে নবী! সত্যের সন্ধানকারী ব্যক্তির পরিবর্তে আপনি এ কোন সব লোকের প্রতি বেশি লক্ষ্য আরোপ করছেন, সত্য দীনের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদের তো কোনোই মূল্য বা গুরুত্ব নেই। আর আপনার ন্যায় মহাসম্মানিত নবী কুরআনের ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গ্রন্থকে এদের সম্মুখে পেশ করবেন। এর যোগ্য তারা নয়। আর অত্র আয়াত (قُتِلَ الْإِنْسَانُ الخ) হতে সে কাফিরদের প্রতি রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে যারা সত্য দীনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল।

আয়াতের শানে নুযূল : আবূ লাহাবের পুত্র উতবা বলল, আমি নক্ষত্রের প্রভুকে স্বীকার করি না, আর তাদের মালিককেও মানি না। তখন এ আয়াত قُتِلَ الْإِنْسَانُ নাজিল হয়। -[লোবাব, মা'আলিম]

কেউ কেউ বলেন, ওতবা নয়- উমাইয়া ইবনে খালফের কুফরি প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। আবার কোনো কোনো মুফাসসিরীনের মতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফেরদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। -[খাযিন]

এ ব্যাপারে ইবনুল মুনযির হযরত ইকরামা (রা.) হতে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন : তিনি বলেন, উক্ত আয়াত উতবা ইবনে আবী লাহাব সম্পর্কে নাজিল হয়, সে তার পিতাকে রাগান্বিত করে ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু পরে তার পিতা তাকে অনেক ধন-সম্পদ দিয়ে ঠিক করে ফেলল, আর শাম দেশে পাঠিয়ে দিল। সেখান হতে সে নিজের খবর দিয়ে বিশ্বনবী ﷺ-এর কাছে খবর পাঠাল যে, সে নক্ষত্রের প্রভুকে স্বীকার করে না। তখন বিশ্বনবী ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তার উপর তোমার কুকুর পাঠিয়ে দাও যেন তাকে শিকার করে।' যখন সে রাস্তায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত বদদোয়ার কথা স্মরণ হয়। তাই সে জীবিত থাকার নিমিত্তে তাকে পাহারা দেওয়ার জন্য এক হাজার দীনার ঘোষণা করল। অতএব, সঙ্গীরা তাকে তাদের মধ্যখানে রাখল এবং মাল-সামানা দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টন রাখল। অতঃপর একটি বাঘ এসে উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে টুকরা করে ফেলল। তার পিতা আহাজারি করতে করতে বলছিল, 'মুহাম্মদ যা কিছুই বলত তাই ঘটত।'-[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

اَلْإِنْسَانُ-এর অর্থ : اَلْإِنْسَانُ দ্বারা এখানে 'উতবা ইবনে আবী লাহাব' উদ্দেশ্য। কারো মতে- اَلْإِنْسَانُ দ্বারা পেছনে যাদের কথা أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তারাই উদ্দেশ্য।

কারো মতে মানবজাতি উদ্দেশ্য- এ মতটি উত্তম।

অতএব, এ মতানুযায়ী কট্টর কাফির اَلْإِنْسَانُ শব্দে শামিল হবে, আর যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সে প্রথমবারেই শামিল হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, اَلْإِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এসেছিল, যাদের কারণে আল্লাহর নবী ইবনে উম্মে মাকতূমকে তখনকার জন্য বর্জন করেছিলেন। কারো মতে اَلْإِنْسَانُ দ্বারা ঐ সমস্ত ধনী লোক উদ্দেশ্য, যার ধন-মালের প্রাচুর্যতা নিয়ে অহংকার রয়েছে। -[কাবীর]

قُتِلَ বলার কারণ :

১. قُتِلَ শব্দটি এখানে বদদোয়া এবং অভিশাপের অর্থ বহন করছে। কেননা দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য হত্যাই বড় অভিশাপ। হত্যা ছাড়া আর কোনো শাস্তি তাদের জন্য নেই। এটাই মারাত্মক শাস্তি। -[কাবীর]

Free@www.e-ilm.weebly.com

২. قُتِلَ শব্দটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করছে যে, অনতিবিলম্বে কিতালের (যুদ্ধের) আয়াত অবতীর্ণ হবে, তখন সকল মারাত্মক কাফেরদের কবর রচিত হবে। -[রূহুল মা'আনী]

৩. قُتِلَ এমন একটি সীগাহ যদ্দ্বারা রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে সেই কাফেরদের প্রতি যারা সত্য দীনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল। এ সীগাহটি এ কথার ফায়দা দিচ্ছে যে, মানুষ বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি এমন কাজ করবে যার শাস্তি একমাত্র হত্যা। -[যিলাল]

مَا أَكْفَرَ আয়াতাংশে مَا-এর অর্থ : مَا أَكْفَرَهُ আয়াতাংশে مَا-এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. اِسْتِفْهَامِيَّةٌ তথা প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহৃত। তখন অর্থ দাঁড়াবে أَيُّ شَيْءٍ دَعَاهُ إِلَى الْكُفْرِ অর্থাৎ কোন বস্তু তাকে কুফরির দিকে নিয়ে গেল?

২. لِلتَّعَجُّبِ আশ্চর্যবোধক অর্থে ব্যবহৃত। আরবদের অভ্যাস ছিল যখন তারা কোনো বস্তু সম্পর্কে আশ্চর্য বোধ করত তখন বলত قَاتَلَهُ اللّٰهُ مَا اَحْسَنَهُ এবং اَخْزَاهُ اللّٰهُ مَا أَظْلَمَهُ -[কুরতুবী]

اَلْاِنْسَانُ উল্লেখের কারণ : ইনসান অর্থ মানবজাতি বা মানব। উদ্ধৃত আয়াতে ইনসান শব্দ ব্যবহার করে মানবজাতির সব লোককে বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে কেবল সে সকল লোককে, যাদের দুষ্কর্মের বর্ণনা করা সেখানে লক্ষ্য। কুরআনে 'ইনসান' শব্দ কোথাও এ কথা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, মানবজাতির অনেক লোকের মধ্যেই কথিত দোষটি পাওয়া যায়, আর কোথাও নির্দিষ্ট কারো নাম না করে সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহারের কারণ হলো এরূপ তিরস্কারে তাদের মধ্যে জিদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্য সেখানে সাধারণ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়ার জন্য 'ইনসান' বলে উল্লেখ করা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়েছে।

মানুষের তিনটি ধাপ : একথা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর তিনটি ধাপ রয়েছে– প্রথম, মধ্য ও শেষ। এ তিনটি ধাপ মানুষের জন্যও আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন।

১. প্রথম ধাপ হলো مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ অর্থাৎ শুক্রবিন্দু হতে তাকে সৃষ্টি করেছেন।

২. দ্বিতীয় ধাপ হলো ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন, যেখানে আল্লাহ তার চলার পথ সুগম করে দিয়েছেন।

৩. তৃতীয় ধাপ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ অর্থাৎ মৃত্যুদান ও কবরস্থ ধাপ। এ ধাপের জন্য আবার তিনটি স্তর রয়েছে– اَلْاِنْشَارُ ـ اَلْاِقْبَارُ ـ اَلْاِمَاتَةُ অর্থাৎ মৃত্যু, কবরস্থ হওয়া ও পুনরুত্থান। -[কাবীর]

মানুষের সৃষ্টি نُطْفَةٌ হতে একথা উল্লেখ করার কারণ : এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, نُطْفَةٌ [বীর্য-শুক্র] একটি ঘৃণিত বস্তু। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ শব্দ উল্লেখ করে একথা বুঝাতে চান যে, যে ব্যক্তির সৃষ্টিমূল نُطْفَةٌ -এর ন্যায় একটি ঘৃণিত বস্তু, সে ব্যক্তি আবার গর্ব-অহংকার করে কিভাবে?

হযরত হাসান বলেন, কিভাবে ঐ ব্যক্তি অহংকার করতে পারে, যে ব্যক্তি মূত্রনালী দিয়ে বের হয়ে এসেছে।

-[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

এখানে نُطْفَةٌ বলে এ কথা বুঝানো হচ্ছে যে, কুফরি করার আগে মানুষের উচিত তার নিজের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করা। চিন্তা করা উচিত তার অস্তিত্ব কী জিনিস দিয়ে এবং কিভাবে সে তৈরি হয়েছে। কোথায় সে লালিত-পালিত হয়েছে। কোন পথে সে এ দুনিয়ায় এসেছে এবং কিরূপ অসহায়-অক্ষম অবস্থায় এ দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে, এসব কথা। নিজের প্রকৃতি ও সঠিক পরিচয় ভুলে গিয়ে বিভ্রান্তিতে এরা কিভাবে পড়ে গেল? নিজের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এদের মন-মগজে কিরূপে স্থান লাভ করতে পারল?

قَوْلُهُ تَعَالٰى مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ : উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৃষ্টি রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে যে, মানুষ কিভাবে দেখেছে যে, আমি তাকে কোন জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি? আমি তো এক ফোঁটা অপবিত্র শুক্রকীট হতে তাকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তার পরিমিত বিকাশ ঘটিয়েছি। সে শুক্রকীটকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি। তারপর একে মাংসপিণ্ডে রূপান্তর করেছি। এভাবে তোমার সৃষ্টিকে পূর্ণরূপ দান করেছি।

কুফরি করার আগে মানুষের উচিত তার নিজের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করা। চিন্তা করা উচিত তার অস্তিত্ব কি জিনিস দিয়ে এবং কিভাবে তৈরি হয়েছে। কোথায় সে লালিত-পালিত হয়েছে। কোন পথে সে এ দুনিয়ায় এসেছে এবং কিরূপ অক্ষম ও অসহায় অবস্থায় এ দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে? এসব কথা। নিজের প্রকৃতি ও সঠিক অবস্থা ভুলে গিয়ে কিভাবে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল? নিজের সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা এদের মন-মগজে কিভাবে স্থান লাভ করতে পারল?

ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে ব্যক্তিকে এক ফোঁটা নাপাক নুতফা [বীর্য] হতে সৃষ্টি করা হয়েছে তার আবার গর্ব ও অহংকার করার কি আছে?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ আয়াতের অর্থ : ইমাম শাওকানী উক্ত আয়াতের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, يَسَّرَ لَهُ الطَّرِيقَ إِلَى الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভ হতে বের করে ভালো-মন্দের রাস্তা তার জন্য সহজসাধ্য করে দিয়েছেন।

২. ইমাম সুদ্দী, মুকাতিল, 'আতা এবং কাতাদাহ (র.) বলেন, يَسَّرَهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তার মায়ের গর্ভ হতে বের হওয়ার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। প্রথম অর্থ এখানে অধিক গ্রহণযোগ্য। -[ফাতহুল কাদীর]

ইমাম কুরতুবী (র.) আরো দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন-

৩. হযরত ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, এর অর্থ سَبِيلُ الْإِسْلَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় আসার পর ইসলামের রাস্তা বর্ণনা করে দিলেন।

৪. হযরত আবূ বকর ইবনে তাহের (র.) বলেন, يَسَّرَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَا خَلَقَهُ لَهُ وَقَدَّرَهُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তার জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা অর্জনের জন্য সহজ পথ বলে দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ অর্থাৎ আমল করতে থাক, যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এটা (তোমার কাছে) সহজ করে দেওয়া হয়েছে। -[কুরতুবী]

৫. কারো মতে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য দুনিয়ায় সব উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যেন সে ঐগুলো ব্যবহার করে কাজে লাগাতে পারে।

فَقَدَّرَهُ-এর অর্থ : قَدَّرَهُ শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

১. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, মানুষ সৃষ্টির কয়েকটি ধাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমত نُطْفَةٌ [বীর্য], তারপর عَلَقَةٌ [গোশতের টুকরা], তারপর সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত, পুরুষ অথবা মহিলা হওয়া পুণ্যবান ও সৌভাগ্যশালী হওয়া অথবা পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য হওয়া।

২. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, قَدَّرَهُ অর্থ সৃষ্টিতে সমতা রক্ষা করেছেন।

৩. এ অর্থও হতে পারে যে, প্রত্যেকটি অঙ্গ পরিমাণ এবং গুণগত দিক হতে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন। পুরুষ ও নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠামোর ব্যবধান মায়ের পেটেই করা হয়ে থাকে। দুনিয়াতে নর ও নারীর শারীরিক গঠন কাঠামো, আকৃতি-প্রকৃতি, চলন-বলন কিরূপ হবে তা মায়ের গর্ভেই পূর্ব নির্ধারিত মতো সঠিক পরিমাপে করে দেওয়া হয়। -[তাফসীরে হাক্কানী, খাযেন, জালালাইন]

আবার কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এ শব্দটি تَقْدِيرٌ শব্দ হতে রূপান্তরিত। অর্থ মানুষ যখন মায়ের গর্ভে গঠিত ও বর্ধিত হয়ে উঠতে থাকে, ঠিক তখনি তার তকদীর বা নিয়তি নির্দিষ্ট করা হয়। সে কোন লিঙ্গের হবে; তার বর্ণ, আকৃতি, অবয়ব কেমন হবে; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতটা নিখুঁত ও কতটা অসম্পূর্ণ হবে; দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য, মেধাশক্তি কতটা হবে; কোন ভূখণ্ডে, কোন অবস্থা বা পরিবেশে সে ভূমিষ্ঠ ও লালিত-পলিত হবে; দুনিয়ায় সে কি করবে এবং কত দিন বাঁচবে এ সবই মায়ের পেটে থাকতেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, এটাই তাকদীর। উদ্ধৃত আয়াতে তাকদীরের কথাই বলা হয়েছে।

ইমাম ফাররা বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন, পাখি এবং হিংস্রজন্তুর মতো এখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকার মতো ব্যবস্থা করেননি। কেননা কবরস্থ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্মান দিয়েছেন। তাদের লাশ সংরক্ষিত হয়ে থাকে- অসম্মানে পড়ে থাকে না, শৃগাল কুকুরের খাদ্য হয় না। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। স্রষ্টা যখন মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে চাইবেন, তখন সে জীবিত হতে ও উঠতে অস্বীকার করবে এমন কোনো ক্ষমতা তার নেই। প্রথমে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল তখনো সে তাকে জিজ্ঞাসা করে সৃষ্টি করা সে দুনিয়াতে আগমন করতে ইচ্ছুক কিংবা প্রস্তুত কি সে বিষয়ে তার কোনো মতই তখন গ্রহণ করা হয়নি। যদি সে দুনিয়ায় আসতে অস্বীকার করত, তবুও তাকে সৃষ্টি করা হতো, দুনিয়ায় তাকে আসতে হতো। তার অস্বীকৃতি কোনো কাজেই আসত না। অনুরূপভাবে পুনর্বার সৃষ্টি করাও তার ইচ্ছা ও মর্জির উপর বিন্দুমাত্র নির্ভরশীল নয়। এমন নয় যে, সে মরার পর পুনরুজ্জীবিত হতে চাইলে তবেই তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে আর তা অস্বীকার করলে সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠা হতে রেহাই পেয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব কথা; বরং স্রষ্টার ইচ্ছার সম্মুখে মানুষ এ ব্যাপারেও সম্পূর্ণভাবে অক্ষম ও অসহায়। তিনি যখনই চাইবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাবেন, দাঁড় করিয়ে দিবেন। সে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে একান্তভাবে বাধ্য হবে। তার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কোনো অবকাশ রাখা হবে না, তার ধার ধরা হবে না।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে إِنْشَارٌ-এর দ্বারা بَعْثٌ বা পুনরুত্থানকে বুঝানো হয়েছে। আর إِذَا شَاءَ অর্থ হলো যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন। পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন ও কখন তা সংঘটিত হবে তা একমাত্র তিনি জানেন।

أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ-এর মর্মার্থ : 'তাকে মৃত্যুদান করত সমাধিস্থ করেন' -এর অর্থ নিজের জন্ম ও নিয়তির ব্যাপারেই কেবল মানুষ বাধ্য নয়। নিজের মৃত্যুর ব্যাপারেও সে আল্লাহর সমীপে একান্তই অসহায়। নিজের জন্ম বা মৃত্যু কোনোটার উপরেই মানুষের এখতিয়ার নেই। মৃত্যুকে সে এক মুহূর্তের জন্যও এড়াতে পারে না। যে স্থান বা যে অবস্থায়ই তার মৃত্যুর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঠিক সে সময়, সে স্থানে ও সে অবস্থায়ই তার মৃত্যু হবে। আর যে ধরনের কবর হওয়া তার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, ঠিক সেই ধরনের কবরেই তাকে সমাহিত হতে হবে। চাই তা মাটির গর্ভে হোক, কিংবা সমুদ্রের গর্ভে অথবা অগ্নিকুণ্ডে হোক, কিংবা কোনো হিংস্র জন্তুর উদরে হোক।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, কবর শব্দটি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে সমাধিস্থ করা বা কবর দেওয়া তার নিজস্ব বিধান বলে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মৃতের জন্য এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ঐশী বিধান। মৃতদেহ দগ্ধ করা বা উন্মুক্ত মাঠে ফেলে রাখা অস্বাভাবিক ও ঐশী বিধানের বিপরীত প্রথা। সামাজিক, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দিক দিয়েও সমাধি-প্রথা সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় বহু মূল্যবান দ্রব্যের ন্যায় তাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সযত্নে ভূগর্ভে রক্ষণ করা হয়। পক্ষান্তরে জীব-জন্তু ও পশু-পাখির মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়, আবার আবর্জনা পুড়ে ফেলা হয়। সমাধিস্থ করার মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুর পরেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনের অন্তরে তার অবিকৃত ও পরিপূর্ণ স্মৃতিই বিরাজমান থাকে।

অনেক মৃতদেহ কবরে দাফন করা হয় না, তবু أَقْبَرَهُ বলার তাৎপর্য হচ্ছে– কোনো কোনো মানুষের মৃতদেহ পানির গভীরে, আগুনে বা হিংস্র জীবের পেটে যায়; কিন্তু পরিণামে কোনো না কোনো সময় মাটির সাথে মিশে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। এ হিসেবে কবরে সমাধিস্থ করার কথাটা ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে فِيهَا نُعِيدُكُمْ অর্থাৎ তোমাদেরকে মাটিতেই মিশিয়ে দিবো। –[বায়ানুল কুরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ : সত্যি কথা হলো, তার প্রভু তাকে যা করার জন্য আদেশ করেছেন তা সে পালন করেনি।

كَلَّا-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : كَلَّا শব্দটি ধমকি ও হুমকির অর্থে হয়ে থাকে। এখানে এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, كَلَّا শব্দটি حَقًّا -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবিকই সে [কাফের] তার প্রভুর আদেশ পালন করেনি।

২. কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে এর উদ্দিষ্ট অর্থ হলো– لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُ الْكَافِرُ অর্থাৎ কাফেররা যা ধারণা করেছে প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কেননা পুনরুত্থানকে একেতো তারা বিশ্বাসই করত না, তা ছাড়া তারা এটাও বলত যে, وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى অর্থাৎ যদি আমাদেরকে আল্লাহর নিকট (পুনরুজ্জীবিত হয়ে) ফিরেই যেতে হয়, তাহলে তাঁর নিকট অবশ্যই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৩. অথবা, তাদেরকে গর্ব ও অহংকার হতে দূরে থাকার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করার নিমিত্তে كَلَّا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. অথবা, তাদেরকে কুফরের উপর হঠকারিতা হতে সাবধান করা হয়েছে।

৫. অথবা, যারা পরকাল ও হাশর-নশরকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে।

لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ-এর অর্থ : মহান আল্লাহ মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন আবার তিনিই তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তিনিই তার মালিক, মনিব, তিনিই তার সব কিছু করেন। এসব জানা সত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না, তার আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলে না।

ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হলো কোনো মানুষই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আরোপিত সকল দায়িত্ব সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে না। ইমাম রাযী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে যে মানুষটির কথা বলা হয়েছে তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইতঃপূর্বে এরশাদ করেছেন যে, قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ।

أَنْشَرَهُ আয়াতাংশে বর্ণিত দু'টি কেরাত : জমহুর أَنْشَرَهُ আলিফসহ পড়েছেন। আর আবূ হায়াত, নাফে' এবং শোয়াইব হতে আলিফ ব্যতীত نَشَرَهُ পঠিত হয়েছে। উভয় অবস্থাতে একই অর্থ এবং উভয় কেরাতই শুদ্ধ। –[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٤. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ نَظَرَ اعْتِبَارٍ إِلَى طَعَامِهِ كَيْفَ قُدِّرَ وَ دُبِّرَ لَهُ .

২৪. সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে লক্ষ্য করা। তার খাদ্য পানে যে, তিনি কিভাবে তার জন্য এর আয়োজন ও বন্দোবস্ত করেছেন?

٢٥. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ مِنَ السَّحَابِ صَبًّا .

২৫. আমিই বারি বর্ষণ করি মেঘমালা হতে প্রচুর পরিমাণে

٢٦. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ شَقًّا .

২৬. অতঃপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করি উদ্ভিদ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে।

٢٧. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ .

২৭. অতঃপর আমি তাতে উৎপন্ন করি শস্য যেমন– গম, যব।

٢٨. وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا هُوَ الْقَتُّ الرَّطْبُ .

২৮. আঙ্গুর ও শাক-সবজি কাঁচা তরকারি।

٢٩. وَّ زَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا .

২৯. আর যায়তুন ও খেজুর।

٣٠. وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا بَسَاتِيْنَ كَثِيْرَةِ الْأَشْجَارِ

৩০. অনেক বৃক্ষমণ্ডিত উদ্যান অধিক বৃক্ষ বিশিষ্ট বাগান।

٣١. وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا مَا تَرْعَاهُ الْبَهَائِمُ وَقِيْلَ التِّبْنُ .

৩১. ফল ও গবাদির খাদ্য যাতে চতুষ্পদ জন্তু বিচরণ করে আর কারো মতে ঘাস উদ্দেশ্য।

٣٢. مَّتَاعًا مُتْعَةً أَوْ تَمْتِيْعًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّوْرَةِ قَبْلَهَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تَقَدَّمَ فِيْهَا أَيْضًا .

৩২. ভোগ সম্পদ শব্দটি مَتَاعًا مُتْعَةً বা تَمْتِيْعًا অর্থে ব্যবহৃত। যেমন পূর্ববর্তী সূরায় আলোচিত হয়েছে। তোমাদের জন্য ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য এর আলোচনাও পূর্ববর্তী সূরায় উল্লেখ হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : কুরআন মাজীদের مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ আয়াতটির মহল্লে ই'রাব কয়েকটি হতে পারে–

ক. مَفْعُول لَهُ হিসেবে مَنْصُوْب মূলবাক্য এভাবে হবে যে .... فَعَلَ ذٰلِكَ تَمْتِيْعًا لَّكُمْ

খ. অথবা مَصْدَر مُؤَكَّدْ তথা مَفْعُول مُطْلَقْ হিসেবে মানসূব হয়েছে। তখন মূলবাক্য এভাবে হবে مَتَّعَكُمْ بِذٰلِكَ مَتَاعًا –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : কুরআন মাজীদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যেখানেই নফসের মধ্যে বিরাজমান প্রমাণাদি পেশ করেছেন, সেখানেই পরপর আশে-পাশে বিরাজমান প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন এটি তাঁর এক সাধারণ নিয়ম, এখানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ঐ নিয়মানুযায়ী এখন আশে-পাশে বিরাজমান প্রমাণাদি উত্থাপন করছেন, যেগুলোর প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মুখাপেক্ষী। –[কাবীর]

আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, মানুষ-সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়ামতগুলোর আলোচনার পর ঐ নিয়ামতগুলোর সংখ্যা এক এক করে আলোচিত হয়েছে, যেন সকলেই ঐ নিয়ামতগুলো স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করতে পারে। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلٰى طَعَامِهٖ : ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এটা চিন্তা করে দেখা দরকার যে, যে খাদ্যের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন- তা তিনি কিভাবে করেছেন। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, মানুষের খাদ্যের দু'টি অবস্থা রয়েছে-

১. প্রাথমিক অবস্থা, এটা এমন সকল প্রক্রিয়া যা খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হয়। যেমন, মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এবং তা হতে বিভিন্ন প্রকারের শস্যাদি ও ফল-মূল জন্ম লাভ করে।

২. দ্বিতীয় অবস্থা, এটা এমন সব প্রক্রিয়া যা খাদ্য-দ্রব্য হতে উপকৃত হওয়ার জন্য তার শরীরের মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন।

শেষোক্ত অবস্থা সম্পর্কে সাধারণত মানুষ অবহিত নয়, কেননা এটা মানুষের উপকারে আসবে না অপকার করে বসবে তা সঠিকভাবে কেউই কিছু বলতে পারে না।

কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থাটি মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টির সম্মুখে সংঘটিত হয় বলে এটা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। কাজেই প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য বলা হয়েছে।

মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাকে সে অতি সাধারণ মনে করে। কিন্তু এটা কিভাবে সৃষ্টি হলো তা গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। তার এ কথাও চিন্তা করা উচিত যে, যেসব কার্যকারণের ফলশ্রুতিতে মানুষ খাদ্য পায় তাতো একান্তভাবে আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি সেগুলোকে সংগ্রহ করে না দিলে জমিনের বুকে খাদ্যের একটি কণাও মানুষ সংগ্রহ করতে পারত না। এ কথা মানুষ যতই সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করবে, আল্লাহর অস্তিত্ব, অসীম ক্ষমতার কার্যকারিতা ও প্রভাবকে সে ততই স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আল্লাহর এ অসীম কুদরত বোধগম্য হলে পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করা তার জন্য মোটেই কঠিন হবে না।

أَنَّا তে বর্ণিত তিনটি কেরাত : أَنَّا তে তিনটি কেরাত বর্ণিত আছে।

১. জমহুর إِنَّا যথা হামযার নিচে যের দিয়ে পড়েছেন। তখন বাক্যটি إِنَّا হতে নতুন করে 'শুরু' ধরতে হবে।

২. কূফাবাসী এবং রুয়াইস ইয়াকূব হতে বর্ণনা করছেন যে, أَنَّا হামযার উপরে যবর হবে। এমতাবস্থায় أَنَّا হালতে জার-এ হবে। কেননা, أَنَّا হতে শেষ পর্যন্ত طَعَامِهٖ -এর بَدَلْ হবে। অথবা لَامُ الْعِلَّةِ উহ্য থেকে যের দিবে। এ কেরাত অনুযায়ী طَعَامِهٖ -এর উপর وَقْف করা সহীহ হবে না।

৩. হুসাইন ইবনে আলী (রা.) أَنّٰى তথা يَاء যুক্ত করে كَيْفَ অর্থে পড়েছেন। এ কেরাত অনুযায়ী طَعَامِهٖ -এর উপর وَقْف করা সহীহ। কেউ কেউ أَنّٰى অর্থ أَيْنَ-ও বলেছেন। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

اَلْأَرْض এবং اَلْمَاءَ উল্লেখের কারণ : আল্লামা রাযী (র.) বলেন, اَلْمَاءَ বলে اَلسَّمَاءَ তথা আকাশ থেকে পতিত বারিধারাকে বুঝানো হয়েছে। আর اَلْأَرْض বলে ফলনের উপযুক্ত জমিনকে বুঝানো হয়েছে। একথা সকলের-ই জানা যে, আকাশ হতে পতিত বারিধারা জমিনে পড়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের জন্ম হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশ হলো পুরুষ আর জমিন হলো মহিলা। পুরুষ ও মহিলার সংমিশ্রণ ছাড়া যেমন সন্তান আসতে পারে না, তেমনি পানি ছাড়া জমিনে উদ্ভিদ গজাতে পারে না।

পানি বর্ষণের প্রতি লক্ষ্য করার কারণ : কুরআন মাজীদের أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا আয়াতে اَلْمَاءَ দ্বারা বৃষ্টি বুঝানো হয়েছে। আর এ বৃষ্টিতে যে কীর্তি আল্লাহর পক্ষ হতে বিদ্যমান রয়েছে তা একবার ভেবে দেখা দরকার। কিভাবে কঠিন ভারি পানি আকাশে উড়ছে? এত ভারি হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তা খোলা আকাশে ঝুলে রয়েছে।

একটু চিন্তা করা আবশ্যক, নিকটতম ও দূরতম কারণগুলো খুঁজে বের করা দরকার। কে এবং কার মাধ্যমে এ সমস্ত কঠিন কার্য সম্পাদিত হচ্ছে? নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত সকলের সামনে একথা উজ্জ্বল দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এটা একমাত্র আল্লাহর নূর, ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা এবং বিচক্ষণতা ও নিপুণতার ফলশ্রুতি। -[কাবীর]

কেন এবং কিভাবে আল্লাহ পানি বর্ষণ করেন? : সূর্য তাপের সাহায্যে সমুদ্র হতে অপরিমেয় পানি শূন্যলোকে তুলে নেওয়া হয়। এটা হতে ঘন-ভারি মেঘ তৈরি হয়। বাতাস এ মেঘমালাকে আকাশের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। পরে শূন্যলোকে শীতল হিমের চাপে সে বাষ্প পুনরায় পানিতে পরিণত হয় এবং প্রতি অঞ্চলে একটি বিশেষ পরিমাণে তা বর্ষিত হয়। সেই পানি সরাসরি পৃথিবীর উপর পড়ে, মাটির গভীরে কূপ ও ঝর্ণাধারার রূপ পরিগ্রহ করে, নদী ও খাল-বিলে সে পানি সঞ্চিত হয়ে প্রবাহিত হয়। পর্বত-চূড়ায় বরফরূপে জমে তা গলে এবং বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য মৌসুমে তা প্রবাহিত হয়ে ঝর্ণা-খাল, নদী ও সমুদ্রে পরিণত হয়। এসব ব্যবস্থা কি মানুষ নিজে করেছে? মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা রিজিক -এর ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে পানি বর্ষণের এ স্বাভাবিক ব্যবস্থা যদি না করতেন, তাহলে মানুষ কি ভূ-পৃষ্ঠে বেঁচে থাকতে পারত?

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তারপর আমি জমিনকে বিদীর্ণ করেছি। এখানে জমিনকে বিদীর্ণ করা এর দ্বারা এতে বীজ বা দানা অথবা চারাগাছের মূল গ্রহণ করার স্থান করে দেওয়া। এটা এমনভাবে হয় যে, মানুষ যখন বীজ বা দানা অথবা কোনো চারাগাছ বপন করে অথবা বাতাসে ভর করে কিংবা পানীয় চঞ্চুতে বসে বা অন্য কোনো উপায়ে যখন তা মাটির বুকে পৌছায়, তখন মাটি নিজের বুক দীর্ণ করে একে গ্রহণ করে। এটা অঙ্কুরিত হয়, এর শিকড় মাটির গভীরে বসে যায় এবং গাছ ফুটে বের হয়। এ ব্যাপারে মানুষের কাজ নিতান্ত নগণ্য। সে হয়তো মাটি খোদাই করে, কিংবা তাতে হাল চালিয়ে মাটির উপরিভাগ ওলট পালট করে এবং আল্লাহর সৃষ্ট বীজ এতে লাগিয়ে দেয় মাত্র। এটা ছাড়া আর সব কাজই আল্লাহর। তিনি অসংখ্য রকমের উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সে বীজসমূহে এ গুণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তা জমিনে বপন করা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠে। প্রত্যেকটি বীজ হতে তার স্বজাতীয় বা স্বপ্রজাতীয় উদ্ভিদ উদ্ভূত হয়। এর অন্যথা হয় না। মাটি পানির সাথে মিলেমিশে বীজসমূহকে অঙ্কুরিত করে এবং প্রত্যেক জাতীয় উদ্ভিদকে এরই অনুকূল খাদ্য, উপাদান ও পরিবেশ, নিয়মিত ও পরিমিতভাবে দিয়ে একে সমৃদ্ধ করে– এ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যও আল্লাহরই সৃষ্টি। এ বীজসমূহকে এহেন যোগ্যতা দিয়ে এবং মাটির উপরিভাগকে এ সব গুণ দিয়ে যদি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষ এখানে নিজেদের জন্য কোনো খাদ্য জোগাড় ও তৈরি করতে পারত না।

আয়াতে উল্লিখিত কয়েকটি উদ্ভিদ : আল্লাহ তা'আলা উক্ত কয়েকটি আয়াতে যে আট প্রকারের উদ্ভিদের আলোচনা করেছেন, তা নিম্নরূপ–

১. اَلْحَبَّ বা শস্যদানা, যা মানুষ শস্য হিসেবে কেটে থাকে। যেমন– গম, যব। اَلْحَبَّ-কে সর্বপ্রথমে আনার কারণ হলো তা খাদ্য হিসেবে প্রধান খাদ্য।

২. عِنَبً বা আঙ্গুর, حَبًّ-এর পর عِنَبً-কে উল্লেখ করার কারণ হলো– এটা একদিকে যেমন খাদ্য, অপর দিকে তা ফল।

৩. قَضْبً-এর দু'টি অর্থ– ক. সতেজ তরকারী। খ. ঘাস।

৪. ও ৫. زَيْتُوْنَ ও نَخْلً বা যায়তুন এবং খেজুর।

৬. حَدَائِقَ غُلْبًا অর্থাৎ ঘন বন বা বাগ-বাগিচা। এর দু'টি অর্থ হতে পারে– ক. ঐ সমস্ত বাগান যেগুলোর গাছপালা ঘন ঘন। খ. বড় বড় গাছপালা বিশিষ্ট বাগান।

৭. فَاكِهَةً বা ফলমূল। কোনো কোনো মুফাসসির দলিল পেশ করেন যে, এখানে فَاكِهَةً-কে عِنَبً ـ زَيْتُوْنَ এবং نَخْلً-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। অতএব, আঙ্গুর, যায়তুন এবং খেজুর فَاكِهَةً-এর ভিতর শামিল হবে না। কেননা عَطْف-এর মধ্যে বৈপরীত্য থাকতে হয়।

৮. اَبًّ বা চারাগাছ, যেখানে জন্তু চরে। –[কাবীর]

قَضْبً-কে قَضْبً বলে নাম রাখার কারণ : قَضْبً অর্থ قَطْعً বা কাটা। সতেজ তরকারি এবং ঘাসকে قَضْبً বলার কারণ হলো– এটা পরপর কয়েকবার কাটা পড়ে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) قَضْبً অর্থ খেজুর করেছেন। কেননা, এটা খেজুর গাছ হতে কাটা হয়। –[কুরতুবী]

قَضْبً-এর অর্থ : قَضْبً এর কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

১. ঘাস এবং তৃণ যা জন্তুর খাদ্য।

২. গাছ থেকে যে সমস্ত ডাল কাটা হয়, যেন এটা দ্বারা তীর-ধনুক বানানো যায়।

৩. ঘাস এবং শাক-সবজি হওয়ার স্থান।

৪. ঐ সমস্ত শাক-সবজি যা মূল রেখে বাকি অংশ কেটে ব্যবহার করা হয়।

৫. কারো মতে এর দ্বারা শুকনো ঘাসকে বুঝানো হয়েছে।

৬. খেজুর। –[কুরতবী]

غُلْبًا-এর অর্থ : غُلْبًا অর্থ عِظَامًا বা বড়। মূলত এটা أَغْلَبُ-এর বহুবচন। এখানে বাগানের বড় বড় গাছকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি غُلْبًا-এর অর্থ غِلَاظٌ শক্ত এবং اَلطِّوَالُ লম্বা করেছেন। হযরত কাতাদাহ (র.) এবং ইবনে যায়েদ (র.) বলেন, اَلْغُلْبُ অর্থ اَلنَّخْلُ الْكِرَامُ বা উত্তম খেজুর গাছ। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে আরো একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, غُلْبًا অর্থ ঐ গাছ যার নিচে ছায়া নেওয়া যায়। –[ইবনে কাছীর]

Free @ www.eelm.weebly.com

أَبًّا-এর অর্থ : أَلْأَبُّ অর্থাৎ চারাগাছ। যেখানে চতুষ্পদ জন্তু বিচরণ করে। মুফাস্সিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন

ইমাম যাহ্হাক (র.) বলেছেন যে, أَبٌّ -এর দ্বারা কৃষি ফসল কেটে নেওয়ার পর যে অংশ পরিত্যক্ত হিসেবে পড়ে থাকে তাকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম যাহ্হাক (র.) হতে অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে সাধারণত যেসব তৃণ-লতা উদ্গত হয়, তাকে أَبٌّ বলা হয়েছে।

ইমাম শাওকানী (র.)-এর মতে ভূ-পৃষ্ঠে উদ্গত ঐ সব বস্তুকে أَبٌّ বলা হয় যা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এবং মানুষ তার চাষাবাদও করে না যেমন– ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি।

হযরত ইবনে আবী তালহা (রা.)-এর মতে, পাকা সতেজ ফলকে أَبٌّ বলে। ইমাম কুরতুবী (র.)-এর মতে চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য তথা ঘাসকে أَلْأَبٌّ বলে। কেউ কেউ বলেছেন, শুকনা ফলকে أَبٌّ বলে। কেননা এটা শুকিয়ে শীতকালের জন্য রাখা হয়। কারো কারো মতে ঘাস ও ঘাসের স্থানকে أَبٌّ বলে। যেসব উদ্ভিদ মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব ভক্ষণ করে, তাকে أَبٌّ বলে।

মোটকথা, এর দ্বারা এখানে চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য বিশেষত ঘাসকে বুঝানো হয়েছে।

এখানে উক্ত আটটি বস্তুর উল্লেখের উদ্দেশ্য কি? : ইমাম রাযী (র.) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে উক্ত আটটি বস্তুর উল্লেখ করে তিনটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

১. আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের উপর অকাট্য দলিল পেশ করা।

২. পুনরুত্থানের উপর অকাট্য প্রমাণ পেশ করা।

৩. এ কথাটি বুঝিয়ে দেওয়া এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, যে আল্লাহ তা'আলা এ সব নিয়ামতের মাধ্যমে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। মানুষ তার বিবেককে একটুখানি খাটালেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহর এ সব ইহ্সানকে ভুলে গিয়ে তাকে অস্বীকার করা বা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা অথবা পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাঁকে অক্ষম মনে করা চরম অকৃতজ্ঞতা ও মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, উপরে যে সকল খাদ্য-দ্রব্যের ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করা হয়েছে তা তোমাদের ভোগের সামগ্রী হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তোমাদের জন্যই নয়, বরং যেসব জন্তু-জানোয়ার হতে তোমরা গোশ্ত, চর্বি, মাখন প্রভৃতি খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করে থাক এবং যেসব তোমাদের জীবিকার জন্য আরো অনেক প্রকারের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। সে সবের জন্যও এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর প্রদত্ত এ সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহার ও ভোগ করে তাঁকেই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এটা অপেক্ষা চরম ধৃষ্টতা আর কি হতে পারে?

আয়াতে مَتَاعًا শব্দটি কোন অর্থে হয়েছে? : আল্লাহর বাণী مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ -এর মধ্যে مَتَاعًا শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. এটা مُتْعَةً -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ فُعِلَ ذٰلِكَ مُتْعَةً لَّكُمْ এটা তোমাদের সম্ভোগের বস্তু হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. অথবা এটা تَمْتِيْعًا -এর আগে হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর উপকারার্থে আমি এ সব কিছু সৃষ্টি করেছি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٣٣. فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ اَلنَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ ـ

৩৩. অনন্তর যখন কর্ণবিদারক ধ্বনি উচ্চারিত হবে দ্বিতীয় শিঙ্গা ফুৎকার।

٣٤. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ـ

৩৪. সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে।

٣٥. وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ـ

৩৫. আর তার মাতা ও পিতা।

٣٦. وَصَاحِبَتِهٖ زَوْجَتِهٖ وَبَنِيْهِ يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ اِذَا وَجَوَابُهَا دَلَّ عَلَيْهِ ـ

৩৬. তার সঙ্গিনী স্ত্রী ও তার সন্তান হতে يَوْمَ শব্দটি إِذَا হতে بَدَلٌ আর এর জওয়াবের প্রতি পরবর্তী আয়াত নির্দেশ করছে।

٣٧. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ حَالٌ يَشْغُلُهٗ عَنْ شَاْنِ غَيْرِهٖ اَىْ اِشْتَغَلَ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهٖ ـ

৩৭. তাদের মধ্য হতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেদিন এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা তাকে ব্যস্ত করে রাখবে এমন অবস্থা যা তাকে অন্যের অবস্থা হতে অমনোযোগী রাখবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে

٣٨. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ مُضِيْئَةٌ ـ

৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হাস্যোজ্জ্বল হবে আলোকিত

٣٩. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ فَرِحَةٌ وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

৩৯ সহাস্য ও উৎফুল্ল প্রফুল্লচিত, তারা হলো মু'মিনগণ

٤٠. وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ غُبَارٌ ـ

৪০. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন ধূলি-ধূসর হবে ধূলিপূর্ণ, বিমলিন।

٤١. تَرْهَقُهَا تَغْشَاهَا قَتَرَةٌ ظُلْمَةٌ وَسَوَادٌ ـ

৪১. সেগুলোকে আচ্ছাদিত করবে আচ্ছন্ন করবে কালিমা অন্ধকার ও কালিমা।

٤٢. اُولٰٓئِكَ اَهْلُ هٰذِهِ الْحَالَةِ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ اَىِ الْجَامِعُوْنَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفُجُوْرِ ـ

৪২. এরাই এ অবস্থায় বিরাজমানগণ কাফির ও পাপাচারী অর্থাৎ কুফরি ও পাপ উভয় অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিগণ।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ يَفِرُّ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব : يَوْمَ يَفِرُّ আয়াতাংশের মহল্লে ই'রাব কয়েকটি হতে পারে–

ক. পূর্বোক্ত اِذَا جَآءَتِ হতে بَدَلٌ হয়েছে।

খ. অথবা, اَعْنِىْ উহ্য فِعْل-এর মাফঊল হয়েছে।

গ. অথবা, اَلصَّآخَّةُ হতে বদল হয়ে فَتْح-এর উপর مَبْنِىْ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমটি হলো তাওহীদের উপর অকাট্য দলিল-প্রমাণ, দ্বিতীয়টি হলো– পুনরুত্থানের উপর দলিল এবং তৃতীয়টি হলো– যিনি এ পৃথিবীর নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরই ইবাদত করা দরকার।

Free @ www.eilm.weebly.com

এ তিনটি মৌলিক বিষয় উল্লেখ করে এখন পুনরুত্থানের দিনের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যখনই ঐ ভয়াবহতার কথা শ্রবণ করবে, ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে। আর এ ভয়-ই তাকে আল্লাহর পেশকৃত প্রমাণাদির উপর চিন্তা-গবেষণা, এর প্রতি বিশ্বাস এবং কুফরি থেকে বিরত থাকার প্রতি আহ্বান করবে, এমনকি মানুষের উপর গর্ব-অহংকার করার মানসিকতাটুকুও বর্জন করার প্রতি আহ্বান করবে এবং মানুষের প্রতি নম্র ও ভদ্র হওয়ার দিকে আকৃষ্ট করবে। –[কাবীর]

জীবিকা অর্জনের ব্যাপারসমূহ আলোচনার পর পুনরুত্থানের ব্যাপারসমূহের আলোচনা শুরু হয়েছে, যেন পুনরুত্থান দিনের জন্য যথার্থভাবে আমলে সালেহের মাধ্যমে পুঁজি অর্জন করে নিতে পারে। –[কুরতুবী]

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইসরাফীল (আ.) দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক প্রদান করলে যখন সমস্ত মানবকুল মহাবিচার ক্ষেত্রে উঠে আসবে; সে ঘোর সঙ্কটময় দিবসে ভাই তার ভাইয়ের নিকট হতে, পিতামাতা পুত্র-কন্যার নিকট হতে ও পুত্র-কন্যা পিতামাতার নিকট হতে এবং স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের নিকট হতে পলায়ন করবে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আত্মচিন্তায় বিভোর হয়ে পড়বে। কেউ কারো দিকে ফিরে দেখবে না এবং কেউ কারো কোনোরূপ উপকার করতে পারবে না। –[কাবীর]

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– "কিয়ামতের দিবসে হাশরের ময়দানে সব মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় উঠবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিদের একজন হযরত আয়েশা (রা.) মতান্তরে সাওদা (রা.) ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গুপ্ত অঙ্গসমূহ সেদিন সকলের সম্মুখে অনাবৃত হবে? জবাবে নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার এ বাণী পাঠ করে বলে দিলেন 'সেদিন কারো প্রতি কারো তাকাবার মতো হুঁশ-জ্ঞান থাকবে না।"

–[নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে আবূ হাতেম, ইবনে জরীর, তাবারানী, বায়হাকী, হাকিম]

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলবে– আমি দুনিয়ার জীবনে তোমার কিরূপ স্বামী ছিলাম? স্ত্রী জবাবে বলবে– খুব ভালো ছিলে। তখন লোকটি বলবে– তাহলে এ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাকে একটা নেকী দাও না? প্রত্যুত্তরে স্ত্রী বলবে, আমিও তোমার মতো বিপদের ভয়ে অস্থির হয়ে আছি। তোমাকে কোনো নেকী দান করার সামর্থ্য আমার নেই। এরূপে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে জবাব দিবে।

অতঃপর মু'মিন ও কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার বিবরণ ব্যক্ত করা হচ্ছে–

সেদিন মু'মিন ও পুণ্যবান লোকেরা আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবে এবং তাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে যারা কাফের ও পাপী লোক– আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও লাঞ্ছনার ভয়ে সেদিন তাদের মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং সে শাস্তি ও লাঞ্ছনা হতে কিছুতেই পরিত্রাণ হবে না।

اَلصَّاخَّةُ -এর অর্থ : اَلصَّاخَّةُ হলো কর্ণ বিদারী মহাধ্বনি। লৌহখণ্ডের উপর লৌহখণ্ড দ্বারা আঘাতের শব্দ, প্রলয়ের ধ্বনি, কিয়ামত। এটা দ্বিতীয়বার শিঙ্গাধ্বনি। যার শব্দ অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিকট। এ আওয়াজ ধ্বনিত হওয়ার পরই কিয়ামত হবে। মৃতব্যক্তিগণ এ আওয়াজেই পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

উক্ত বিকট শব্দ সমস্ত কানগুলোকে বধির করে ফেলবে, কিছুই শুনতে পাবে না। ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, اَلصَّاخَّةُ এমন এক বিকট শব্দকে বলা হয় যা বধিরতার জন্ম দিবে। আল্লাহর কসম, কিয়ামতের এ বিকট শব্দ মানুষকে দুনিয়া হতে বধির বানাবে এবং আখেরাতের সমস্ত ব্যাপারে শ্রোতা বানাবে। –[কুরতুবী]

ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন যে, اَلصَّاخَّةُ এমন এক বিকট শব্দকে বলে যা বধিরতার জন্ম দেয়। আল্লাহর কসম শিঙ্গায় উক্ত বিকট শব্দ মানুষকে দুনিয়া হতে বধির বানাবে এবং পরকালের সমস্ত ব্যাপার এর দ্বারা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লামা কুতুব শহীদ (র.)-এর মতে এটা শিঙ্গার এমন বিকট ধ্বনি যা বাতাস ভেদ করে দ্রুত গতিতে কানে পৌছবে– যাতে কানের ছিদ্র ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে।

يَفِرُّ الْمَرْءُ আয়াতাংশের অর্থ : يَفِرُّ الْمَرْءُ অর্থ 'মানুষ পালাবে' উক্ত কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. মানুষ তার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে সেদিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন দেখতে পেয়ে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না; বরং সে দূরে সরে যাবে এ ভয়ে যে, এরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকলে সে কিছুই করতে পারবে না।

২. দুনিয়ায় পরকালকে উপেক্ষা করে মানুষ যেভাবে পরস্পরের জন্য গুনাহ করেছে এবং একে অপরকে গোমরাহ করেছে, এর অশুভ পরিণতি সম্মুখে আসতে দেখে তাদের প্রত্যেকেই অপরের নিকট হতে দূরে পালাবে, যেন সে নিজের গুনাহের জন্য তাকে দায়ী করে না বসে। ভাই ভাইকে, সন্তান পিতামাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং পিতামাতা সন্তানকে ভয় করবে যে, সে হয়তো তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দিবে। এ ভয়ে সে আপনজন হতে দূরে পালাবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, فِرَارٌ অর্থ দূরে সরে যাওয়া। কেননা কিয়ামতের দিন এক ভাই অপর ভাইকে বলবে, তুমি তোমার মালের ব্যাপারে আমাকে অংশীদার বানাওনি। মাতা-পিতা বলবে তুমি আমাদের খিদমতে ত্রুটি করেছ। স্ত্রী বলবে, তুমি আমাকে হারাম খাইয়েছ। ছেলে-সন্তান বলবে, আমাদেরকে তুমি শিক্ষা দাওনি এবং সঠিক পথ দেখাওনি।

কথিত আছে– প্রথম যে ব্যক্তি তার ভাই থেকে পলায়ন করবে সে হলো হাবীল, যে তার পিতামাতা হতে পলায়ন করবেন তিনি হলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.), বিবি হতে প্রথম হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.) এবং ছেলে হতে প্রথম হযরত নূহ (আ.) পলায়ন করবেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিন্‌তে যামআ (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন কিয়ামতের দিন সকল মানুষ খালি পায়ে ও উলঙ্গ শরীরে হাশরের মাঠে উঠবে, ঘাম এবং চর্বি তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একে অপরের সতরের প্রতি তো তাকাবে! তিনি জবাবে বললেন, এটা হতে মানুষ বিরত থাকবে (কোনো খবরই থাকবে না) সাথে সাথে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ الخ –[রূহুল মা'আনী]

হযরত যাহ্‌হাক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, কাবীল তার ভাই হাবীল হতে পালাবে। নবী করীম ﷺ তাঁর আম্মা হতে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পিতা হতে, হযরত নূহ (আ.) তাঁর ছেলে হতে, হযরত লূত (আ.) তাঁর স্ত্রী হতে আর হযরত আদম (আ.) তাঁর সন্তানের খারাপ কর্ম হতে পলায়ন করবেন। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ الخ : কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের এমন অবস্থা হবে যে একে অপরের দিকে তাকাবার অবস্থাই থাকবে না।

নির্দিষ্ট কয়েকজনের কথা উল্লেখের কারণ : يَوْمَ يَفِرُّ .... الخ হতে শুরু করে পর পর কয়েকটি আয়াতে اَخٌ (ভাই), اُمٌّ (মাতা), صَاحِبَةٌ (স্ত্রী), بَنِىْ (সন্তান)-এর মতো কয়েকজন নিকটতম ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেক মানুষের একান্ত নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা দেখে সহযোগিতার স্থলে পলায়নের পথ বেছে নিবে। দুনিয়াতে মায়া-মমতা এবং হৃদ্যতার দিক দিয়ে এরাই হলো প্রথম কাতারের; কিন্তু হাশরের ময়দানের অবস্থা দেখে সমস্ত মায়া-মমতার জাল ছিন্ন হয়ে যাবে। কেউ কারো প্রতি তাকাবে না। 'ইয়া নাফ্‌সী ইয়া নাফ্‌সী' করতে থাকবে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ ..... مُّسْتَبْشِرَةٌ : কিয়ামতের দিন মু'মিন ও পুণ্যবান লোকেরা আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হবে এবং তাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। পক্ষান্তরে যারা কাফির ও পাপী লোক আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও লাঞ্ছনার ভয়ে সেদিন তাদের মুখমণ্ডল মলিন ও বিবর্ণ হয়ে যাবে এবং সে শাস্তি ও লাঞ্ছনা হতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'মিনদের চেহারা রাত জাগরণের মাধ্যমে ইবাদতে মশগুল হওয়ার কারণে দীপ্তিমান হবে। কেননা হাদীসে আছে مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ অর্থাৎ রাতে যার নামাজ বেশি হবে দিনে তার চেহারা সুন্দর হবে।

হযরত যাহ্‌হাক (র.) বলেন, অজুর নিদর্শনে তাদের চেহারা সুন্দর হবে। কারো মতে– আল্লাহর রাস্তায় অধিক সময় ব্যয় করার কারণে তাদের চেহারা দীপ্তিমান হবে।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন, আলমে কুদ্‌সের সাথে সম্পর্ক এবং মানাযেলে রেদওয়ান অর্জনে আকাঙ্ক্ষী হওয়ার কারণে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা হবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত কাল্বী (র.) বলেন, কিয়মাতের দিনে ভয়াবহ হিসাব হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কারণে তাদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। -[কাবীর]

غَبَرَةٌ -এর অর্থ : غَبَرَةٌ অর্থ غُبَارٌ বা ধুলাবালি, অথবা كُدُورَةٌ বা ময়লা। মূল আয়াতের মর্মার্থ হবে- কাফেরদের চেহারা আল্লাহর আজাব দেখা মাত্র ধুলা-মলিন অথবা ময়লাযুক্ত (কালো) হয়ে যাবে। -[ফাতহুল কাদীর]

চিন্তা এবং দুঃখ-বেদনার মলিনতা তাদের চেহারায় উজ্জ্বলভাবে দেখা দিবে। -[যিলাল]

যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, যার গতি জমিনের দিকে, তাকে غَبَرَةٌ বলে। -[কুরতুবী]

قَتَرَةٌ -এর অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, قَتَرَةٌ أَىْ كُسُوفٌ وَسَوَادٌ অর্থাৎ قَتَرَةٌ হলো সূর্যগ্রহণ এবং কালো। তিনি আরো বলেন, ذِلَّةٌ وَشِدَّةٌ বা অপমান এবং কাঠিন্যতা। অতএব, আয়াতের অর্থ এ দাঁড়াবে যে, কাফেরদের উপর কালিমা, অপমান এবং কাঠিন্যতা ছেয়ে থাকবে।

আরবি ভাষায় اَلْقَتَرَةُ শব্দটি اَلْقَتَرُ -এর একবচন, অর্থ হলো اَلْغُبَارُ বা ধুলাবালি। হাদীসে আছে 'জন্তু যখন কিয়ামতের দিন মাটি হয়ে যাবে তখন ঐ মাটি কাফেরদের চেহারায় মারা হবে।' হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেন, যা আকাশের দিকে উঠে, তাই قَتَرَةٌ যেমন- ধূম্র। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

اَلْفَجَرَةُ -এর অর্থ : اَلْفَجَرَةُ শব্দটি فَاجِرٌ-এর বহুবচন, فَاجِرٌ শব্দটি زَانِىْ বা ব্যভিচারী অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে فَجَرَ অর্থ كَذَبَ বা 'মিথ্যা প্রতিপন্ন করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা কাফের আল্লাহর দিকে মিথ্যার নিসবত করে। মূলত এর অর্থ اَلْمَائِلُ عَنِ الْحَقِّ তথা 'সত্য বা হক হতে বিমুখকারী'। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

اَلْكَفَرَةُ اَلْفَجَرَةُ এ দু'টি বিশেষণ একত্রীকরণের কারণ : পিছনে একদল লোকের অবস্থা বলা হয়েছে, যাদের চেহারা মলিন এবং কালো হয়ে যাবে। এখন দু'টি বিশেষণ এমনভাবে বলা হয়েছে যে, যে দু'টি তাদের সকল অপকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। ঐ লোকেরা কুফর এবং ফুজূরকে একত্রকারী। এ কারণে তাদের ব্যাপারে আরো দু'টি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে غَبَرَةٌ ও قَتَرَةٌ. غَبَرَةٌ হবে فُجُورٌ -এর কারণে আর قَتَرَةٌ হবে كُفْر -এর জন্য। -[রূহুল মা'আনী]

খারেজী ও মুরজিয়্যাহগণের এ আয়াতের দ্বারা গৃহীত মাযহাব : মুরজিয়্যাহগণ বলেন, مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ বা কবীরা গুনাহকারীগণ তথা যারা ঈমান এনেছে তারা কখনো দোজখে যাবে না এবং কোনো শাস্তি ভোগ করবে না আর খারেজীদের মতে مُرْتَكِبُ الْكَبِيْرَةِ চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। তাদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

মুরজিয়ারা এভাবে দলিল পেশ করেছে যে, অত্র আয়াতগুলো হতে বোধগম্য হয় যে, হাশরবাসীগণ দু'দলে বিভক্ত হবে। একদল হলো পুরস্কারযোগ্য তারা হলেন মু'মিনগণ। আর অন্যদল হলো শাস্তিযোগ্য তারা হলো কাফের। ফাসিকরা কাফের নয়; বরং মু'মিন, কাজেই তারা শাস্তিযোগ্য হবে না; বরং তারা চিরকালের জন্যই জান্নাতী হবে- কখনো জাহান্নামে যাবে না। মোটকথা, কাবীরা গুনাহকারী জান্নাতী হবে কখনো সে দোজখে যাবে না।

খারেজীগণ এভাবে দলিল পেশ করেছেন যে অত্র আয়াতগুলো হতে প্রতীয়মান হয় যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তারা কাফের আর অপরাপর দলিল [কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য] হতে বুঝা যায় যে, কবীরা গুনাহকারী শাস্তিযোগ্য হবে। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, কবীরা গুণাহকারী কাফের- সে চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে।

আহলে হক তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে মুরজিয়া ও খারেজীদের দলিলের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলোতে শুধু কাফের ও খালেস মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত দল চিরকালের জন্য জাহান্নামী এবং শেষোক্ত দল চিরদিনের জন্য জান্নাতী হবে। কিন্তু তৃতীয় দল যারা ঈমান আনার পর ফিস্ক-ফুজূরীতে লিপ্ত হয়েছে তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। সুতরাং অন্যান্য আয়াত ও হাদীস হতে জানা যায় যে, তারা প্রাপ্য শাস্তি ভোগের পর তাদেরকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে।

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ : সূরা আত-তাকভীর

সূরাটির নামকরণের কারণ : تَكْوِيْر অর্থ– সংকোচন। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের كُوِّرَتْ শব্দের মাসদার 'তাকভীর' হতে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ সংকুচিত করা বা গুটিয়ে নেওয়া। এর এ নামকরণের বিশেষত্ব হলো, সূরাটিতে সূর্যরশ্মিকে সংকুচিত করা বা নিষ্প্রভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি বাক্য এবং ৫৩৩টি অক্ষর রয়েছে। −[নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আবাসায় কিয়ামতের দিনের মহা বিপদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সে বিপদ সংকুল সময় একান্ত আপনজনও একে অন্যের খবর নিবে না; বরং একে অপরের নিকট হতে পলায়নপর হবে। আর এ সূরায় কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। −[নূরুল কোরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার আলোচিত বিষয়াদি এবং কথার ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট মনে হয়– এটা মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি। এর বিষয়বস্তু জানার জন্য তাফসীরে খাযেনে উল্লিখিত সহীহ তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসই যথেষ্ট। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো কিয়ামতের দিনকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে যেন সূরা আত-তাকভীর ও সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় দু'টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি পরকাল অপরটি রিসালাত। প্রথম তেরটি আয়াতে 'কিয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দশটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি আয়াতে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ বিভীষিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা কক্ষচ্যুত হয়ে খসে পড়বে, পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে মেঘের মতো শূন্যে উড়তে থাকবে, ভয়-বিহ্বল মানুষের একান্ত প্রিয় বস্তুর প্রতিও লক্ষ্য থাকবে না। বন-জঙ্গলের জীব-জন্তু দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে একস্থানে সমবেত হবে, সমুদ্রের পানি উদ্বেলিত হয়ে আগুন জ্বলে উঠবে। এর পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ সময় আত্মাসমূহ নতুন করে দেহের মধ্যে সংযোজিত হবে, আমলনামা দেখানো হবে, অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশসমূহের সমস্ত আবরণ দূর হবে এবং বেহেশত ও দোজখ তখন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। পরকালের এ বর্ণনা প্রদানের পর মানুষকে চিন্তা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেদিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে ইহকাল হতে কি সম্বল নিয়ে পরকালে এসেছে।

অতঃপর কুরআন ও রিসালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে মক্কাবাসী কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কাছে যা পেশ করছে, তা পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের কুমন্ত্রণা নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার এক সম্মানিত বার্তাবাহক ফেরেশতা তথা হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর পক্ষ হতে আনীত বাণী। হযরত মুহাম্মদ ﷺ উজ্জ্বল অরুণ প্রান্তে দিবালোকে নিজ চোখে তাঁকে দেখেছেন। এ মহান আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে তোমরা কেন বিপথগামী হচ্ছ?

সূরার শেষ তিনটি আয়াতই সূরার উপসংহার। পবিত্র কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যে কেউ ইচ্ছা করলে এ কুরআনকে বরণ করে ইহকাল ও পরকালকে সার্থক করতে পারে। আর এটা আল্লাহর কালাম হলেও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছে করলে মানব মনে এর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, "مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ التَّكْوِيْرِ أَعَاذَهُ اللّٰهُ أَنْ يَفْضَحَهُ حِيْنَ تُنْشَرُ صَحِيْفَتُهُ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আত-তাকভীর পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমলনামা খোলার সময় লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করবেন। [অবশ্য বলা হয়েছে যে উক্ত হাদীসখানা জাল।]

সূরাটির শিক্ষণীয় বিষয় : অত্র সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষদেরকে (কিয়ামতের দিন) জুড়ে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন,

يُقْرَنُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ وَيُقْرَنُ الرَّجُلُ السُّوْءُ مَعَ الرَّجُلِ السُّوْءِ فِى النَّارِ فَذٰلِكَ تَزْوِيْجُ النُّفُوْسِ

অর্থাৎ লোকদেরকে জুড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, নেককার নেককারের সাথে জান্নাতী হবে এবং পাপী পাপীর সাথে জাহান্নামী হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ" অর্থাৎ লোক যাকে ভালোবাসবে তার সঙ্গ লাভ করবে। এটা দ্বারা বোধগম্য হয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়–শায়খ ও মুরিদের সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আত-তাকভীর মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

١. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ لُفِفَتْ وَ ذُهِبَ بِنُوْرِهَا.

٢. وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ اِنْقَضَتْ وَتَسَاقَطَتْ عَلَى الْاَرْضِ.

٣. وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْاَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا.

٤. وَاِذَا الْعِشَارُ النُّوْقُ الْحَوَامِلُ عُطِّلَتْ تُرِكَتْ بِلَا رَاعٍ اَوْ بِلَا حَلْبٍ لَمَّا دَهَاهُمْ مِنَ الْاَمْرِ وَلَمْ يَكُنْ مَالٌ اَعْجَبَ اِلَيْهِمْ مِنْهَا.

٥. وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ جُمِعَتْ بَعْدَ الْبَعْثِ لِيَقْتَصَّ لِبَعْضٍ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ تَصِيْرُ تُرَابًا.

٦. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ اُوْقِدَتْ فَصَارَتْ نَارًا.

অনুবাদ :

১. যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে ঢেকে দেওয়া হবে এবং এর আলো বিদূরিত হবে।

২. যখন তারকারাজি খসে পড়বে নিঃশেষ হয়ে যাবে ও ভূমিতে খসে পড়বে।

৩. আর যখন পর্বতমালাকে চলমান করা হবে ধরাপৃষ্ঠ হতে একে উপড়ে ফেলা হবে এবং তা বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকবে।

৪. আর যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে রাখালবিহীনভাবে বা দুগ্ধ দোহন ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া হবে, ভীতি বিহ্বলতার কারণে। অথচ আরবদের নিকট এর তুলনায় অধিক আদরণীয় সম্পদ ছিলনা।

৫. আর যখন বন্য পশুকে একসাথ করা হবে একত্রিত করা হবে পুনরুত্থানের পর, তাদের পরস্পর একে অপর হতে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। অতঃপর তারা মৃত্তিকায় পরিণত হবে।

৬. সমুদ্র যখন স্ফীত হবে শব্দটি তাখফীফ ও তাশদীদ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ ধূমায়িত করে আগুনে পরিণত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَكْوِيْرٌ -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : আলোচ্য সূরায় বর্ণিত تَكْوِيْرٌ শব্দটি بَاب تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর অর্থ হলো পৌঁছে দেওয়া। মাথায় পাগড়ি পেঁচানোকে আরবিতে تَكْوِيْرُ الْعِمَامَةِ বলে। সাধারণত দেখা যায় যে, পাগড়ি লম্বা ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। পাগড়িকে মাথার চারদিকে পেঁচানো হয়ে থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এখানে تَكْوِيْرُ الشَّمْسِ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

* আয়াতে সূর্যের বেলায় تَكْوِيْرُ শব্দটি مَجَازِيْ অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের যে রশ্মি তা হতে বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ব্যাপ্তি লাভ করে থাকে, কিয়ামতের দিন সে বিস্তৃত রশ্মিকে গুটিয়ে ফেলা হবে।
* সূর্যকে আলোহীন-নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে।
* হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, يَمْحُى ضَوْءُهَا অর্থাৎ এর আলো দূরীভূত হয়ে যাবে।
* হযরত আবুল হাসান আল-আশ'আরী (র.) বলেছেন যে, সূর্যকে আসমান হতে ফেলে দেওয়া হবে- যাতে তা জমিনে লুটিয়ে পড়ে যাবে।
* সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো সূর্য শীতল হয়ে যাবে, এর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিভে যাবে। এর কর্ম ক্ষমতা বিলোপ করা হবে।

হযরত আবূ সালমাহ ইবনে আব্দুর রহমান নবী করীম ﷺ হতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাওলা দিয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "চন্দ্র এবং সূর্যকে কিয়ামতের দিন দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।" হযরত হাসান (র.) আবূ সালমাকে জিজ্ঞেস করলেন, চন্দ্র ও সূর্যের দোষ কি? তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে কেন? আবূ সালমা (রা.) বললেন, আমি তো নিজে বানিয়ে কথা বলছি না; বরং স্বয়ং নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করছি, কাজেই প্রশ্ন করা উচিত নয়। হযরত হাসান (র.) এটা শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম রাযী (র.) মন্তব্য করেছেন যে, হযরত হাসান (র.)-এর প্রশ্নই যথার্থ ছিল না। কেননা চন্দ্র-সূর্য জড়পদার্থ -এরা অনুভূতিহীন। কাজেই এগুলোকে আজাব দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে হয়তো দোজখের আগুনকে আরো তেজোদীপ্ত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, কিয়ামতের দিন চন্দ্র এবং সূর্যকে আলোহীন করে দেওয়া হবে। -[নূরুল কোরআন]

اَلشَّمْسُ وَالنُّجُوْمُ পেশযুক্ত হওয়ার কারণ : জমহুর বসরীদের নিকট اَلشَّمْسُ শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার فَاعِلْ হিসাবে মারফূ' হয়েছে। কেননা, যে اِذَا শর্তের জন্য আসে তা فِعْل-এর উপরই বসে। আয়াতে اِذَا শব্দটি اَلشَّمْسُ-এর উপর দেখা যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে একটি ক্রিয়া উহ্য রয়েছে।

আখফাশ এবং কূফাবাসীদের নিকট اَلشَّمْسُ শব্দটি مُبْتَدَأ হওয়ার কারণে মারফূ' হয়েছে। কেননা তাদের নিকট اِذَا ক্রিয়ার উপরে বসা শর্ত নয়। আর বাক্যে উহ্য মেনে নেওয়া নিয়মের খেলাফ।

একই ধরনের মতভেদ اَلنُّجُوْمُ শব্দেও রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, ফাতহুল কাদীর]

اَلنُّجُوْمُ-এর অর্থ : اَلنُّجُوْمُ অর্থ- নক্ষত্রসমূহ। نَجْمٌ-এর বহুবচন। اَلنُّجُوْمُ অর্থ اَلظُّهُوْرُ প্রকাশিত হওয়া। নক্ষত্রকে نَجْم বলার কারণ হলো তা আকাশে আলোকরশ্মি নিয়ে প্রকাশিত হয়। -[কুরতুবী]

نَجْم বলতে شَمْس (সূর্য)-কে বুঝায় না। এ কারণেই প্রথম আয়াতে شَمْس এবং দ্বিতীয় আয়াতে نَجْم-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কারো মতে نَجْم বলতে شَمْس-কেও বুঝায়। তখন ذِكْرُ الْعَامِّ بَعْدَ الْخَاصِّ (খাস শব্দ উল্লেখের পর আম শব্দ উল্লেখ করা)-এর নিয়ম প্রযোজ্য হবে। -[রূহুল মা'আনী]

اِنْكَدَرَتْ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : اِنْكَدَرَتْ-এর অর্থ হলো ভেঙ্গে যাওয়া ও জমিনে লুটিয়ে পড়া।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় আছে اَلنُّجُوْمُ হলো قَنَادِيْل বা আলোক উজ্জ্বল বাতির সমষ্টি। এদেরকে আসমান ও জমিনের মাঝে নূরের ফেরেশতার হাতে শিকলের দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আকাশ ও জমিনবাসী সকল জীব মৃত্যুবরণ করার পর ফেরেশতাদের হাত হতে তা খসে পড়বে।
* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের দিবসে সকল তারকা আসমান হতে খসে পড়বে কোনো নক্ষত্রই আকাশে অবশিষ্ট থাকবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

কেউ কেউ এর তাফসীরে বলেছেন, মহাশূন্যে কোটি কোটি তারকা নক্ষত্রকে যে বাঁধন পরস্পর সংযুক্ত ও একই কেন্দ্রবিন্দুর সাথে সংযোজিত করে রেখেছে, কিয়ামতের দিন সে বাঁধন খুলে দেওয়া হবে। ফলে সব গ্রহ নক্ষত্র মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এটা ছাড়া মূল إِنْكَدَرَ শব্দের অর্থে অন্ধকারও শামিল রয়েছে। তা হতে বুঝা যায় যে, গ্রহ-নক্ষত্রসমূহ কেবল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নই হবে না, উপরন্তু এরা অন্ধকারাচ্ছন্নও হয়ে পড়বে।

* আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.), ইমাম মুজাহিদ (র.) ও কাতাদাহ (র.) -এর মতে এ স্থলে إِنْكَدَرَتْ-এর অর্থ হলো, إِنْقَضَّتْ وَسَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ অর্থাৎ এরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে পতিত হবে। বাজপাখি যখন তার শিকারের উপর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পতিত হয় তখন বলা হয়- إِنْكَدَرَ الْبَازِيُّ

তাফসীরকার কালবী (র.) বলেছেন, সেদিন আসমান হতে জমিনের উপর তারকারাজির বৃষ্টি হবে, কোনো তারকাই অবশিষ্ট থাকবে না। সবগুলো জমিনে পড়ে যাবে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন যে, ذَهَبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ হতে একে উপড়ে ফেলা হবে তখন তা বিক্ষিপ্তভাবে উড়তে থাকবে।

* শেখ আলূসী (র.) বলেন, পাহাড়গুলোকে নিজস্ব স্থান হতে কম্পনের মাধ্যমে সরিয়ে ফেলাকে تَسْيِيْر বলা হয়েছে।

* কেউ কেউ বলেছেন, পাহাড়কে খোলা আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার পর চলমান করা হবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ অর্থাৎ তুমি তো পাহাড়গুলোকে জমাট (প্রাণহীন) বস্তু মনে করছ, অথচ এরা মেঘমালার ন্যায় চলতে (উড়তে) থাকবে।

* ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, قُلِعَتْ مِنَ الْأَرْضِ وَسُيِّرَتْ فِي الْهَوَاءِ অর্থাৎ তাদেরকে জমিন হতে উপড়ে ফেলা হবে এবং হাওয়ার মধ্যে চলমান করে দেওয়া হবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- يَوْمَ تَسِيْرُ الْأَرْضُ

* কেউ কেউ বলেছেন, سُيِّرَتِ الْجِبَالُ-এর অর্থ হলো একে পাথরের আকার হতে পরিবর্তন করে এমন হালকা বায়ুতে পরিণত করা হবে যে, তা বাতাসের উপর তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে এবং মরীচিকার মতো মনে হবে। জমিন সম্পূর্ণ সমতল হবে- এতে বিন্দুমাত্র উঁচু-নিচু থাকবে না।

* কেউ কেউ বলেছেন, পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণের কারণে বর্তমানে পর্বতসমূহ ভারি হয়ে বসে আছে এবং এক স্থানে দৃঢ়মূল ও অবিচল হয়ে রয়েছে, তাই নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তাই যখন অবশিষ্ট থাকবে না; তখন স্বাভাবিক নিয়মেই সমস্ত পাহাড় নিজ নিজ স্থান হতে উৎপাটিত হয়ে যাবে এবং ভারহীন (হালকা) হয়ে পৃথিবীর উপর এমনভাবে চলতে থাকবে, যেমন এখন মেঘমালা শূন্যলোকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

اَلْعِشَارُ উল্লেখের কারণ : এখানে আরববাসীদেরকে কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য খুবই উপযুক্ত একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানকালের ট্রাক ও বাস আবিষ্কৃত ও চালু হওয়ার পূর্বে আরবদের নিকট আসন্ন প্রসবা উষ্ট্রীর তুলনায় অধিক মূল্যবান জিনিস আর কিছুই ছিল না। উষ্ট্রীর বাচ্চুর প্রসব-মুহূর্ত যখন নিকটবর্তী হতো তখন খুব বেশি রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করা হতো। উষ্ট্রী হারিয়ে না যায়, চুরি করে নিয়ে না যায়; কিংবা অন্য কোনোভাবে তা নষ্ট হয়ে না যায়; সেদিকে খুব সজাগ দৃষ্টি রাখা হতো। এ ধরনের উষ্ট্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন আরবদের নিকট খুবই আপত্তিকর অপরাধ। কেননা, তাতে মনে হয় যে, উষ্ট্রীর মালিক এতই আত্মসম্বিতহারা হয়ে পড়েছিল যে, নিজের এ মহামূল্যবান ও অত্যন্ত প্রিয় সম্পদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনি। এ কথাটি বলে এখানে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এক ব্যক্তির ঠিক যেরূপ অবস্থা হলে সে তার মূল্যবান ও প্রিয় জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, দিশেহারা ও স্বস্তিহীন হয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের ঠিক সে অবস্থা হবে।

عُطِّلَتْ-এর অর্থ এবং এখানে উদ্দেশ্য : عُطِّلَتْ -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

ক. تُرِكَتْ مُهْمَلَةً لَا رَاعِيَ لَهَا وَلَا طَالِبَ অর্থাৎ দশ মাসের গাভীন উষ্ট্রীগুলো সেদিন এমনভাবে বিনা যত্নে ছেড়ে রাখা হবে যে, তাদের না কোনো রাখাল থাকবে, না কোনো অনুসন্ধানকারী।

খ. কারো মতে عَطَّلَهَا اَهْلُهَا عَنِ الْحَلْبِ وَصَرٍّ অর্থাৎ উষ্ট্রীর মালিক দুগ্ধ দোহন এবং বাচ্চুর বেঁধে রাখা হতে বিরত থাকবে।

গ. কেউ কেউ বলেন, عَطَّلَهَا اَهْلُهَا عَنْ اَنْ يُرْسِلَ فِيْهَا الْفُحُوْلَ অর্থাৎ মালিক উষ্ট্রীর জন্য উটের ব্যবস্থা হতে দূরে থাকবে। এ অবস্থাগুলো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার অল্প পূর্বে পরিলক্ষিত হবে। কেননা ঐ সময় তারা কিয়ামত ঘনিয়ে আসার কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কারো মতে এটা কিয়ামতের দিনই হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ঘ. আল্লামা কুরতুবী বলেন- আয়াতটি উপমা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা ঐ সময় কোনো عِشَارٌ বা সন্তান সম্ভবা উষ্ট্রী থাকবে না। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, لَوْ كَانَتْ عِشَارٌ لَعَطَّلَهَا اَهْلُهَا وَاشْتَغَلُوْا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ যদি ঐ দিন কোনো গাভীন উষ্ট্রী থাকে, তাহলে তার মালিক একে এমনিতেই ছেড়ে রাখবে এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে।

ঙ. কারো মতে এখানে عِشَارٌও আছে, عُطِّلَও আছে। আর এটা কিয়ামতের দিনই সংঘটিত হবে, এভাবে যে, যখন মানুষ কবর হতে দলে দলে উঠবে তখন বন্য পশু, চতুষ্পদ জন্তু এবং গৃহপালিত পশুকে পালে পালে দেখতে পাবে। সাথে সাথে দেখতে পাবে যে, দুনিয়ার প্রিয়তম সম্পদ عِشَارٌ অর্থাৎ গাভীন উষ্ট্রী; কিন্তু ঐ দিনের ভয়াবহতার কারণে এবং নিজেদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন ঐ গুলির প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করবে না।

কারো মতে عِشَارٌ অর্থ মেঘমালা, তখন تَعْطِيْلٌ বা 'বৃষ্টি বন্ধ করা' হবে। -[রূহুল মা'আনী]

عِشَارٌ-এর অর্থ এবং এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ্য : عِشَارٌ শব্দটি عُشَرَاءُ-এর বহুবচন, যেমন نِفَاسٌ শব্দটি نُفَسَاءُ-এর বহুবচন। দশ মাসের গাভীন উষ্ট্রীকে عُشَرَاءُ বলা হয়। আর গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত তা এ নামে পরিচিতি থাকে। গর্ভ খালাস হওয়ার পরও কোনো কোনো সময় তাকে عُشَرَاءُ বলা হয়। এটা আরবদের নিকট অতীব প্রিয় ছিল।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, এখানে عِشَارٌ বলতে বাস্তব عِشَارٌ-কে বুঝানো হয়নি; বরং عِشَارٌ বলে উপমা দেওয়া হয়েছে যে, যদি ঐ দিন কোনো عِشَارٌও থাকে, তাহলে তার মালিক তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করবে না; বরং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কারো মতে, ঐ দিন বাস্তবেই عِشَارٌ হাজির করা হবে; কিন্তু তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করা হবে না।

কারো মতে, আয়াতে عِشَارٌ দ্বারা سَحَابٌ [মেঘমালা] উদ্দেশ্য। 'দশ মাসের গাভীন উষ্ট্রী'র সাথে 'বৃষ্টি-সম্ভাবা মেঘ-মালা'কে تَشْبِيْه দেওয়া হয়েছে।

কারো মতে عِشَارٌ অর্থ دِيَارٌ বা ঘর-বাড়ি। কেননা এ দিন ঘর-বাড়ির প্রতি কারো ঝোঁক থাকবে না। সবাই ঘর-বাড়ি বিমুখ হবে। কেউ কেউ বলেছেন, عِشَارٌ বলা হয় ঐ জমিনকে যে জমিনের ফসলে ওশর হয়ে থাকে। ঐ জমিনই ফসলবিহীন পড়ে থাকবে এর প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না। -[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

اَلْوُحُوْشُ-এর অর্থ : اَلْوُحُوْشُ শব্দটি اَلْوَحْشُ-এর বহুবচন। বন্যপশুকে وُحُوْش বলা হয়। وَحْشٌ শব্দের অর্থ হলো- নিক্ষেপ করা। যেহেতু বন্যপশু মানবসমাজ থেকে নিক্ষিপ্ত জীবন যাপন করে, মানুষের সাথে তাদের ভালোবাসা স্বাভাবিকভাবে জমে উঠে না; বরং জমাতে হয়।

حُشِرَتْ-এর মর্মার্থ : حُشِرَتْ-এর অর্থ করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ বলেন-

১. جُمِعَتْ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক দিক হতে একত্রিত করা হবে।

২. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, يُحْشَرُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الذُّبَابِ لِلْقِصَاصِ অর্থাৎ সকল বস্তুকে একত্রিত করা হবে, এমনকি কিসাসের জন্য মাছিকেও। এ মত জালালুদ্দীন মহল্লী (র.)ও পেশ করেছেন।

৩. মু'তাযিলাগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেদিন সকল প্রাণীকে একত্রিত করবেন। তারপর মৃত্যু, কতল ইত্যাদি দ্বারা যে সমস্ত কষ্ট একে অপরকে দিয়েছিল তার প্রতিদান দিবেন। সে কষ্টের বদলা দেওয়ার পর আল্লাহ ইচ্ছা করলে কাউকে বেহেশতে রাখতে পারেন অথবা ধ্বংস করে মিটিয়ে দিতে পারেন। -[কাবীর]

৪. কারো মতে حُشِرَتْ অর্থ بُعِثَتْ পুনরুত্থিত করা হবে। যেন পরস্পর পরস্পর হতে কিসাস নিতে পারে। শিংবিহীন জন্তু শিং ওয়ালা হতে কিসাস গ্রহণ করবে।

৫. কারো মতে حَشْرُهَا مَوْتُهَا অর্থাৎ মৃত্যুকে حَشْر বলা হয়েছে। অতএব, তাদের মৃত্যুই হলো হাশর।

৬. কারো মতে জন্তুগুলো দুনিয়াতে মানুষের কাছ হতে দূরে থাকা সত্ত্বেও কাল-কিয়ামতে তাদের সাথে একসঙ্গে একত্রিত হয়ে উঠবে। -[ফাতহুল কাদীর]

৭. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (র.) حُشِرَتْ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, বন্যপশুদের মধ্যে সেদিন এক অস্বাভাবিক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হবে যে কারণে তারা ছুটোছুটি করবে, তাদেরকে সেদিন একত্রিত করা হবে, যাতে একে অন্যের নিকট হতে কিসাস গ্রহণ করতে পারে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وُحُوْش-এর উল্লেখের কারণ : বন্যপশু স্বাভাবিকভাবে মানুষের সংস্পর্শে আসতে চায় না– আসে না বনের মধ্যে আল্লাহর দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে। ইবাদত-বন্দেগি দ্বারা আদিষ্ট নয়। এতদসত্ত্বেও যখন তাদেরকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে, তখন মানুষের ব্যাপারটিতো সহজেই বুঝা যায়।

বন্যপশু পরস্পর ঝগড়া করে থাকলে তাদেরকে قِصَاصْ -এর জন্য হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে বনী আদমের কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

অথবা, বর্তমান দুনিয়াতে বন্যপশু বা অন্যান্য জন্তু মানুষের সাথে একসাথ হয় না, যদি হয় তাহলে মানুষ তাদের দ্বারা ফায়দা লুটতে চায়; কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন যখন মানুষের সাথে অন্যান্য জন্তুদেরকে একসাথ করা হবে, তখন কিয়ামতের ভয়াবহতার কারণে কেউ কারো প্রতি তাকাবে না। –[কাবীর, কুরতুবী]

অথবা, বন্যপশুর কোনোরূপ আকল (বিবেক) নেই। তথাপি তাদেরকে পুনরুত্থিত করে বিচারের (কিসাসের) সম্মুখীন করা হবে। তাহলে যে মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন, তাদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

মোটকথা, মানুষকে তা হতে শিক্ষা নেওয়ার জন্যই وُحُوْش -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

سُجِّرَتْ শব্দের বিশ্লেষণ এবং অর্থ : سُجِّرَتْ শব্দটি একবচন, স্ত্রীলিঙ্গের নামপুরুষ, বাবে تَفْعِيْل-এর অর্থের ব্যাপারে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হচ্ছে–

১. কারো নিকট سُجِّرَتْ অর্থ مُلِئَتْ مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ ঐ সমুদ্র পানি দ্বারা ভর্তি হয়ে যাবে। যখন কোনো হাউজ পানি দ্বারা ভর্তি করা হয় তখন বলা হয় سَجَّرْتُ الْحَوْضَ অর্থাৎ আমি হাউজ ভর্তি করলাম।

২. ইবনে আবী যাম্‌নীন (র.) বলেন, سجرت-এর মূল অর্থ হলো مُلِئَتْ অর্থাৎ ভরপুর হয়েছে। যখন সমস্ত সমুদ্র পানিতে ভরপুর হয়ে যাবে, তখন একটির পানি অন্যটিতে গড়িয়ে প্রবাহিত হবে। এমতাবস্থায় সকল সমুদ্রকে এক রকম দেখা যাবে, মনে হবে যেন একটি সমুদ্র।

৩. কেউ কেউ বলেন, أُرْسِلَ عَذْبُهَا عَلٰى مَالِحِهَا وَمَالِحُهَا عَلٰى عَذْبِهَا حَتّٰى امْتَلَأَتْ অর্থাৎ সমুদ্রের মিঠা পানিকে লবণাক্ত পানির উপর এবং লবণাক্ত পানিকে মিঠা পানির উপর পাঠানো হবে। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রগুলো ভরে যাবে।

৪. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, সমুদ্রগুলো উথলে উঠবে, অতঃপর সকল সমুদ্রগুলো একটিতে রূপান্তরিত হবে। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা দু' নদীর মধ্য হতে বাঁধ উঠিয়ে নিবেন, অতঃপর সব পানি উথলে জমিনের উপর চলে আসবে। আর তখন একটি সমুদ্রই দেখা যাবে।

৫. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, সমুদ্রের পানি শুকিয়ে যাবে এবং তাতে এক ফোঁটা পানিও থাকবে না।

৬. কালবী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো যখন সমুদ্রগুলোকে পরিপূর্ণ করা হবে। অথাৎ সমুদ্রগুলোকে যখন অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করা হবে। –[নূরুল কোরআন]

৭. আল্লামা কুরতুবী (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত উল্লেখ করেছেন। এর মধ্য হতে মুফাসসিরগণ যা গ্রহণ করেছেন তা হলো, সমুদ্র প্রথমত পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হবে। পানিতে যে আগুন রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে পানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তাছাড়া সমুদ্রের তলদেশে পেট্রোলের খনি বিদ্যমান থাকাও এ কথা প্রমাণ করে যে, কিয়ামতের পূর্বে সমুদ্রগুলো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে। পেট্রোল খনি বিদ্যমান থাকা এরই পূর্ব প্রস্তুতি।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন যে, তাফসীরকারকদের সমস্ত বক্তব্য একত্রিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো সমুদ্রগুলোকে একত্রিত করা হবে। সূর্যকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, যে কারণে সমুদ্র উত্তপ্ত হয়ে অগ্নিতে পরিণত হবে। আর তা দোজখীদের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। সমস্ত পানি শুকিয়ে যাবে। এক ফোঁটাও অবশিষ্ট থাকবে না।

অনুবাদ :

٧. وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ قُرِنَتْ بِأَجْسَادِهَا .

৭. আর যখন আত্মাসমূহ পুনঃ সংযোজিত হবে তার দেহের সাথে মিলিত হবে।

٨. وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ الْجَارِيَةُ تُدْفَنُ حَيَّةً خَوْفَ الْعَارِ وَالْحَاجَةِ سُئِلَتْ تَبْكِيْتًا لِقَاتِلِهَا .

৮. আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে যাকে লজ্জা ও অভাবের ভয়ে জীবিত সমাধিস্থ করা হয়েছে জিজ্ঞেস করা হবে তার হত্যাকারীকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য

٩. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَقُرِئَ بِكَسْرِ التَّاءِ حِكَايَةً لِمَا تُخَاطَبُ بِهِ وَجَوَابُهَا أَنْ تَقُوْلَ قُتِلْتُ بِلَا ذَنْبٍ .

৯. কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? এক কেরাতে শব্দটি تَاءِ -এর মধ্যে যেরযোগে তার প্রতি সম্বোধনকে উদ্ধৃতি দান করার অর্থে পঠিত হয়েছে। আর এর উত্তর এই হবে যে, আমাকে বিনা অপরাধে হত্যা করা হয়েছে।

١٠. وَإِذَا الصُّحُفُ صُحُفُ الْأَعْمَالِ نُشِرَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ فُتِحَتْ وَبُسِطَتْ .

১০. আর যখন লিপিসমূহ কর্মলিপি উন্মোচিত হবে শব্দটি তাখফীফ ও তাশদীদ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, অর্থাৎ খোলা হবে ও প্রসারিত করে দেওয়া হবে।

١١. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ نُزِعَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا كَمَا يُنْزَعُ الْجِلْدُ عَنِ الشَّاةِ .

১১. আর যখন আকাশকে নিবারণ করা হবে স্বস্থান হতে হটিয়ে দেওয়া হবে, যেমন ছাগলের চর্ম খুলে ফেলা হয়।

١٢. وَإِذَا الْجَحِيْمُ النَّارُ سُعِّرَتْ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ أُجِّجَتْ .

১২. আর যখন জাহান্নামকে তার অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করা হবে তাখফীফ ও তাশদীদ যোগে, অর্থাৎ লেলিহান বিশিষ্ট করা হবে।

١٣. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ قُرِّبَتْ لِأَهْلِهَا لِيَدْخُلُوْهَا وَجَوَابُ إِذَا أَوَّلَ السُّوْرَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا .

১৩. আর যখন জান্নাতকে নিকটে করা হবে তার অধিকারীদের প্রতি নিকটস্থ করা হবে, তারা তাতে প্রবেশ করার জন্য। সূরার শুরুতে উক্ত إِذَا ও তৎপ্রতি আতফকৃত বক্তব্যসমূহের জওয়াব হলো।

١٤. عَلِمَتْ نَفْسٌ أَيْ كُلُّ نَفْسٍ وَقْتَ هٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَّا أَحْضَرَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ .

১৪. প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন জানতে পারবে অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনাবলি সংঘটনকাল তথা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে। সে যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ভালো ও মন্দ থেকে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَوْءُدَةُ শব্দের বিশ্লেষণ : اَلْمَوْءُدَةُ শব্দটি একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ। ইসমে মাফউল। وَأَدَ - يَئِدُ বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلْوَأْدُ অর্থ ثِقْلٌ বা ভারি হওয়া। আয়াতে مَوْءُدَةٌ তথা জীবন্তাবস্থায় কন্যা-সন্তানকে সমাধিস্থ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা যখন কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত দাফন করা হয়, তখন প্রথমে তার উপর মাটি নিক্ষেপ করা হয়। মাটি যখন তার শরীরের উপর ভারি হয়ে যায়, তখন সে মরে যায়। মাটির বোঝা ভেদ করে উঠতে পারে না। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : পিছনে إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ হতে উক্ত আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত তেরটি আয়াতে যে শর্ত আলোচনা করা হয়েছে, সে শর্তের জবাব হয়েছে عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ আয়াতটি।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .... الخ কসম আর عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ কসমের জবাব হয়েছে তবে প্রথম মতটিই বেশি শুদ্ধ বলে বুঝা যায়। -[কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ আয়াতের তাফসীর : উক্ত আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

১. قُرِنَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَجْسَادِ অর্থাৎ প্রাণগুলো দেহের সাথে মিলিত হবে।

২. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রাণগুলো তিন দলে বিভক্ত হবে। যেমন- অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ الخ -

৩. নারী-পুরুষের মধ্য হতে যে যেই পর্যায়ের, সে সেই পর্যায়ের লোকের সাথে মিলিত হবে। অতএব, প্রথম কাতারের ইবাদতকারীগণ তাদের মতো ব্যক্তিদের সাথে, মধ্যম ব্যক্তিগণ তাদের সম পর্যায়ের বক্তিদের সাথে এবং গুনাহগার গুনাহগারদের সাথে মিলিত হবে। মোদ্দাকথা, ভালো-খারাপ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়ে দল ভারি করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- يُقْرَنُ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ كُلِّ قَوْمٍ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ كَعَمَلِهِ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দলের সাথে মিলানো হবে, যে দল তার কাজের অনুরূপ কাজ করেছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, يُقْرَنُ الْفَاجِرُ مَعَ الْفَاجِرِ وَيُقْرَنُ الصَّالِحُ مَعَ الصَّالِحِ অর্থাৎ পাপী ব্যক্তিকে পাপীর সাথে, পুণ্যাত্মাকে পুণ্যাত্মার সাথে মিলানো হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন-

ذٰلِكَ حِيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً السَّابِقُوْنَ زَوْجٌ وَأَصْحَابُ الْيَمِيْنِ زَوْجٌ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ زَوْجٌ -

অর্থাৎ সেদিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে-অগ্রগামী দল, ডানপন্থি দল ও বামপন্থি দল। তিনি আরও বলেন- মু'মিনদেরকে হুর-এর সাথে জোড় লাগিয়ে দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে শয়তানদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। -[কাবীর, কুরতুবী]

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত দ্বারা সে দু'ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যারা উভয়েই একই কাজ করত, যার কারণে তারা উভয়ে হয় জান্নাতে নতুবা দোজখে চলে যাবে।

হযরত আতা (র.) ও মুকাতিল (র.) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদেরকে বেহেশতের হুরদের সঙ্গে একত্রিত করা হবে। আর কাফেরদেরকে শয়তানদের সাথে একত্রিত করা হবে।

হযরত আতা (র.) বলেন, আত্মাসমূহকে দেহের সাথে একত্রিত করা হবে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে একত্রিত করার যে কথাটি রয়েছে তার তাৎপর্য হলো মানুষকে, তার আমলের সাথে একত্রিত করা হবে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ .... قُتِلَتْ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা সীমাহীন ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। যে পিতা-মাতা তাদের কন্যাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করেছে, তারা আল্লাহর নিকট যারপর নেই ঘৃণ্য ও মারাত্মক অপরাধী। তাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণার মাত্রা এতদূর তীব্র হবে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে এ কথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, এ নিষ্পাপ শিশুকে তোমরা কেন হত্যা করেছিলে; বরং তাদের দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং সে নিষ্পাপ শিশু কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমাকে কোন কারণে হত্যা করা হয়েছিল? তখন সে নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করবে। অত্যাচারী পিতা-মাতা তার উপর কি অমানুষিক ব্যবহার করেছে। তাকে কিভাবে জীবন্ত দাফন করেছে তা সে অকপটে বলে দিবে।

এটা ছাড়া এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে দুটি বড় বড় বিষয়ের সমাবেশ করা হয়েছে। তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি; বরং কথার ধরন হতে আপনা আপনিই তা প্রকাশিত হচ্ছে।

একটি এই যে, জাহেলিয়াত আরববাসীদেরকে নৈতিকতার দিক দিয়ে এতখানি অধঃপতনের নিম্নস্তরে পৌঁছে দিয়েছে যে, তারা নিজেদেরই হাতে নিজেদের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করেছে। এটা সত্ত্বেও এ লোকেরা নিজেদেরকে জাহেলিয়াতের উপরই অবিচল রাখতে বদ্ধপরিকর। নিজেদের জীবনকে তাঁরা সংশোধনের দিকে আদৌ প্রস্তুত নয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের অধঃপতিত ও পাপ, পঙ্কিল সমাজকে আন্তরিকতার সাথে সংশোধন করতে সচেষ্ট; কিন্তু তারা নিজেরা সে জন্য প্রস্তুত নয়; শুধু এই নয়, তারা সে জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি রীতিমতো খেপে উঠেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পরকাল যে অনিবার্য ও অপরিহার্য, এটাই তার একটি অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ। যে কন্যাটিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়েছে, তার ফরিয়াদ জানাবার ও জালিমদের এ নির্মম জুলুমের উপযুক্ত শাস্তি দানের একটা ব্যবস্থা অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু এ দুনিয়ায় তার কোনো ব্যবস্থা হওয়ার নয়। এখানে না কেউ তার ফরিয়াদ শুনবে না জালিমদের কোনো শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জাহেলিয়াতের সমাজে এ কাজটিকে সম্পূর্ণ জায়েজ মনে করা হতো। পিতামাতা যেমন সে জন্য কোনো লজ্জাবোধ করত না, তেমনি পরিবারে ও সমগ্র সমাজে এজন্য তিরস্কার করার বা পাকড়াও করার কেউ ছিল না। তাহলে এ অমানুষিক জুলুমের কি কোনো বিচার হবে না? এমন কোনো স্থান হবে না যেখানে এ নিরপরাধ জীবন্ত প্রোথিত কন্যাটি তার প্রতি কৃত জুলুমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতে পারবে এবং আপারাধীদের শাস্তির দাবি জানাতে পারবে?

কন্যা-সন্তান জীবন্ত প্রোথিতকরণের ঐতিহাসিক তথ্য : প্রাক-ইসলাম বা জাহিলিয়াতের যুগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবরা তাদের কন্যা-সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। হুযূর ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ কয়েকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এ নিষ্ঠুর কার্যটি নানা কারণে প্রচলিত ছিল। এর একটি কারণ ছিল অভাব-অনটন। এতে খাবার লোকের সংখ্যা হ্রাস করা লোকদের লক্ষ্য ছিল। কন্যা-সন্তানকে যুবতী হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা এবং পরে বিবাহ দেওয়ার ঝামেলা পোহানো তাদের জন্য কষ্টকর মনে হতো। তখন নারী জাতির মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। ইসলামই নারীকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ ছিল, তখনকার ব্যাপক সামাজিক অশান্তি। যে অবস্থায় যার পুত্র-সন্তান বেশি, তার সাহায্যকারীও তত বেশি। এ নীতি অনুযায়ী পুত্র-সন্তানদেরকে সাদরে লালন-পালন করা হতো; কিন্তু কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করা হতো। কেননা শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক কাজে কন্যাগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারত না, শুধু তাই নয়; বরং তাদের রক্ষণাবেক্ষণও তৎকালীন আরব সামাজে বড় একটা সমস্যা বলে বিবেচিত ছিল।

তৃতীয় কারণ ছিল এই যে, বিবদমান গোত্রগুলো যখন পরস্পরের উপর আক্রমণ চালাত, বিজয়ী গোত্র পরাজিতদের যে মেয়েদেরকেই ধরতে পারত, তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করত, নির্বিচারে ধর্ষণ করত, অথবা দাসী বানিয়ে রাখত, কিংবা বিক্রয় করত। এ সব কারণে তদানীন্তন আরব সমাজে কন্যা হত্যার একটা অমানবিক প্রথা চালু ছিল। আরবরা সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হলে প্রসূতির নিকটই একটা গর্ত খুড়ে রাখত, যেন কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখনই তাকে উক্ত গর্তে ফেলে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। কখনো এমন হতো যে, প্রসূতি বা পরিবারের লোকেরা বাধা দান করত। তখন পিতা বাধ্য হয়ে কিছুদিন এর লালন-পালন করত এবং পরে কোনো এক সময় একে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত প্রোথিত করে দিত। এ ব্যাপারে চরম অমানুষিকতা ও নিমর্মতা দেখানো হতো, কেউ কেউ একে বাহাদুরির কাজ মনে করে খুব ঘটা করে নিজ কন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করত। -[খাযেন]

কোনো কোনো মুফাস্সির আরও একটি কারণ উল্লেখ করেছেন, তা হলো- তারা বলত, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। অতএব, দুনিয়ার কন্যাদেরকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য জীবন্ত কবর দিত। -[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

জীবন্ত প্রোথিতাকে জিজ্ঞেস করার অর্থ : আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবন্ত প্রোথিতাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। এটা এ জন্য যে, ১. কন্যার কাছ হতে জবানবন্দী আসুক যে, সে নিরপরাধ- তার কোনো দোষ ছিল না। তার উপর অযথা অত্যাচার করা হয়েছে। আর এটাই হত্যাকারী হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার দলিল হয়ে দাঁড়াবে।

২. অথবা, হত্যাকারীকে প্রশ্ন করা হবে যে, কেন এ নিষ্পাপ কন্যাকে হত্যা করা হয়েছে?

সন্তান হত্যার বিধান :

১. সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত বা হত্যা করা সম্পূর্ণ হারাম, কবীরা গুনাহ এবং মারাত্মক জুলুম।

২. এমন কোনো উপায় অবলম্বন করা যাতে স্ত্রী গর্ভবতীই না হয়। যেমন বর্তমানকালের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিকে নবী করীম ﷺ গোপন-হত্যা বলে আখ্যায়িত করেন। তবে কোনো কোনো বর্ণনায় 'আযল' অর্থাৎ বীর্য বাচ্চাদানে প্রবেশ না করার ব্যবস্থা সম্পর্কে নবী করীম ﷺ হতে যে চুপ থাকা অথবা নিষেধ না করা সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অবশ্য কোনো বিশেষ স্থানের জন্য। ব্যাপারটি ব্যাপক নয়; কিন্তু তাও এভাবে হতে হবে যে, যাতে বংশ বিস্তারে কোনো প্রকার বাধাস্বরূপ না হয়ে দাঁড়ায়। -[মাযহারী]

৩. বর্তমানকালের জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যে সকল ঔষধ দেওয়া হয় বা চিকিৎসা করা হয়, তাতে কোনো পদ্ধতি এমনও আছে যে, সামনে আর কোনো সন্তান হবে না। শরিয়তে এমন ব্যবস্থার অনুমতি নেই। -[মা'আরিফুল কোরআন]

হত্যাকারীর শাস্তি : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন- "যে মহিলা তার সন্তানকে হত্যা করবে, সে তার ঐ সন্তানকে স্তনের সাথে যুক্ত-লটকানো অবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠবে। ঐ সন্তানের রক্ত মহিলার শরীরে মাখানো অবস্থায় থাকবে। সন্তান তখন বলবে- ইয়া রব ইনি আমার মা, আমাকে হত্যা করেছিল। -[কুরতুবী]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, যাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং যে করেছে উভয়েই দোজখী, তবে সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ : صُحُفٌ শব্দটি صَحِيْفَةٌ-এর বহুবচন, এখানে صُحُفٌ দ্বারা সেসব লিপিকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ফেরেশতাগণ মানুষের কৃতকর্মের রেকর্ড করেছেন। এক কথায় মানুষের আমলনামা ভালো হোক বা মন্দ হোক। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দেওয়া হবে, তখন সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠবে مَا لِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا অর্থাৎ এ লিপি (আমলনামা) টির কি হয়েছে– এটা তো ছোট বড় একটি কাজও বাদ দেয়নি; বরং সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন আরশের নিচে মানুষের আমলনামা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। মু'মিনের আমলনামা জান্নাতে তার হাতে গিয়ে পড়বে। আর কাফেরের আমলনামা জাহান্নামে তার হস্তগত হবে।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে বলেছেন صُحُفُ الْاَعْمَالِ فُتِحَتْ وَبُسِطَتْ অর্থাৎ আমলনামাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং বিছিয়ে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا السَّمَاۤءُ كُشِطَتْ : আরবিতে পশুর চামড়া খুলে ফেলাকে كُشِطَ বলে। কোনো বস্তুর উপর হতে পর্দা বা আবরণ সরিয়ে ফেলাকে كُشِطَ বলা হয়।

এখানে كُشِطَتِ السَّمَاۤءُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন–

কিয়ামতের দিন আকাশের সৌন্দর্য নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সব জ্যোতিহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং এগুলোকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে।

অথবা, এখানে كُشِطَ অর্থ হবে মিটে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কেননা আকাশের বিশাল ছাদ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙ্গে খান খান হয়ে মিটে যাবে।

অথবা, আকাশের বর্তমান আকৃতি ও অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যাবে। আকাশের এ পরিবর্তনকে রূপকার্থে كُشِطَ বলা হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেছেন– আরববাসীরা উটের চামড়া খসানোকে كُشِطَ বলে থাকে। এখানে আকাশ খসানো অর্থ আকাশকে তার স্থান হতে টেনে নিয়ে যাওয়া, যেমন কোনো বস্তুর উপর হতে আবরণ টেনে খুলে ফেলা হয়।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, আকাশকে তার স্থান হতে এমনভাবে খসিয়ে ফেলা হবে যেমনভাবে ছাগলের শরীর হতে তার চামড়া খুলে ফেলা হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ : কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে। سُعِّرَتْ শব্দটি تَسْعِيْرٌ হতে নির্গত। এটা অতীতকালের صِيْغَه এখানে ভবিষ্যৎকালের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উত্তপ্ত করা হবে, প্রজ্জ্বলিত করা হবে। দোজখের অগ্নিকে গরম করে কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "আগুনকে এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়েছে; তখন আগুন সাদা হয়ে গেছে। অতঃপর এক সহস্র বছর উত্তপ্ত করার পর আগুন লাল হয়ে গেছে। তারপর এক হাজার বছর উত্তপ্ত করার পর আগুন কালো আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে তা ভীষণ কালো এবং অন্ধকার।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ : জান্নাতকে মু'মিনদের নিকটবর্তী করা হবে– যাতে তারা অনায়াসে তাতে প্রবেশ করতে পারে। যেমন অন্য আয়াতে আছে وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ [আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে]।

তবে বেহেশতকে নিকটবর্তী করার অর্থ এই নয় যে, তা উপড়িয়ে জান্নাতীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে; বরং তাদেরকে জান্নাতের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে।

হাশরে দোজখের উত্তপ্ততা এবং বেহেশতের নৈকট্য দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : হাশরের ময়দানে যখন লোকদের মামলাসমূহের শুনানী হতে থাকবে, তখন তারা সকলে একদিকে জাহান্নামের দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন যেমন দেখতে পাবে, তেমনি অপরদিকে জান্নাতও সব নিয়ামত সহকারে তাদের চোখের সামনে উপস্থিত থাকবে। এর ফলে পাপী লোকেরা জানতে পারবে–তারা আজ কি সব নিয়ামত হতে বঞ্চিত হয়ে, কোন আজাবে নিক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে নেক্কার লোকেরা কোন আজাব হতে বেঁচে কোনসব নিয়ামত লাভের অধিকারী হতে যাচ্ছে তাও তারা বুঝতে পারবে।

مَا اَحْضَرَتْ-এর অর্থ : اَحْضَرَتْ ক্রিয়াটি বাবে اِفْعَالٌ হতে 'উপস্থিত করানো' 'নিয়ে আসা' অর্থে ব্যবহৃত। প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার জীবনের সকল কৃতকর্ম জানতে পারবে। তবে প্রত্যেক আমলের বিশদ বিবরণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে জানা শর্ত নয়; বরং আমলনামা ছড়ানো-ছিটানোর সময় কৃতকর্ম উপস্থিত পাবে। সেদিন কৃতকর্মকে রূপদান করা হবে।

অথবা, مَا اَحْضَرَتْ صَحَائِفُ الْاَعْمَالِ অর্থাৎ আমলের বইগুলো উপস্থিত পাবে। –[ফাতহুল কাদীর]

আয়াতে نَفْس-কে নাকেরা নেওয়ার কারণ : نَفْس শব্দকে অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। যেন এখানে প্রত্যেক فَرْدٌ বা ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক نَفْس-ই উক্ত ইলম অর্জন করবে– কেউ বাদ পড়বে না। অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির সামনেই তার কৃতকর্মের বালাম প্রকাশ করা হবে, কারো থেকে গোপন থাকবে না– একথা বুঝানোর জন্য নাকেরা নেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

১৫. فَلَآ اُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ بِالْخُنَّسِ ـ

১৫. সুতরাং আমি কসম করছি لا শব্দটি অতিরিক্ত সমস্ত নক্ষত্রের যারা পিছনের দিকে হাটতে থাকে।

১৬. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ هِيَ النُّجُوْمُ الْخَمْسَةُ زُحَلُ وَالْمُشْتَرِيُّ وَالْمِرِّيْخُ وَالزُّهْرَةُ وَعَطَارِدُ تَخْنُسُ بِضَمِّ النُّوْنِ اَيْ تَرْجِعُ فِيْ مَجْرَاهَا وَرَاءَهَا بَيْنَا تَرَى النَّجْمَ فِيْ اٰخِرِ الْبُرْجِ اِذْكُرْ رَاجِعًا اِلٰى اَوَّلِهٖ وَتَكْنِسُ بِكَسْرِ النُّوْنِ تَدْخُلُ فِيْ كِنَاسِهَا اَيْ تَغِيْبُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ تَغِيْبُ فِيْهَا ـ

১৬. যারা চলতেই থাকে এবং স্ব-স্ব স্থানে আত্মগোপন করে এ ধরনের পাঁচটি নক্ষত্র রয়েছে। তারা হচ্ছে যুহল, মুশতারী, মিররীখ, যুহরা ও আতারিদ। تَخْنُسُ -এর نُوْن -কে পেশ যোগে পড়তে হবে। অর্থাৎ পিছনের দিকে তাদের গতিপথে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ তাদের বুরূজ বা গতিপথে চলতে চলতে সর্বশেষ বুরূজে চলে যায় এবং পুনরায় ফিরে আসে تَكْنِسُ-এর نُوْن যের বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ তারা আত্মগোপনের স্থানে আত্মগোপন করে

১৭. وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ اَقْبَلَ بِظَلَامِهٖ اَوْ اَدْبَرَ ـ

১৭. আর রাতের শপথ যখন তা গমনোদ্যত হয় তার অন্ধকার সহ আগমন করে অথবা পশ্চাৎ গমন করে

১৮. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ اِمْتَدَّ حَتّٰى يَصِيْرَ نَهَارًا بَيِّنًا ـ

১৮. আর ভোরের শপথ যখন তা আবির্ভূত হয় প্রসারিত হয়। অবশেষে উজ্জ্বল দিনে পরিণত হয়।

১৯. اِنَّهٗ اَيِ الْقُرْاٰنُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَهُوَ جِبْرِيْلُ اُضِيْفَ اِلَيْهِ لِنُزُوْلِهٖ بِهٖ ـ

১৯ অবশ্যই এটা অর্থাৎ কুরআন মাজীদ একজন সম্মানিত দূতের [রাসূলের] বাণী– যিনি আল্লাহর নিকট সম্মানিত আর তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। যেহেতু তিনি কুরআন নিয়ে অবতরণ করেন সেহেতু এর তাঁর দিকে নিসবত (সম্পর্কিত) করা হয়েছে।

২০. ذِيْ قُوَّةٍ اَيْ شَدِيْدِ الْقُوٰى عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ اَيِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَكِيْنٍ ذِيْ مَكَانَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ عِنْدَ ـ

২০. শক্তিশালী অত্যন্ত শক্তিধর আরশের মালিকের নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানের অধিকারী মর্যাদা সম্পন্ন عِنْدَ শব্দটি مَكِيْنٍ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

২১. مُطَاعٍ ثَمَّ اَيْ تُطِيْعُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ فِي السَّمٰوٰتِ اَمِيْنٍ عَلَى الْوَحْيِ ـ

২১. যে তথায় মান্য অর্থাৎ আকাশে ফেরেশতারা আনুগত্য করে থাকে। আস্থাভাজন বিশ্বস্ত ওহীর ব্যাপারে।

তাহকীক ও তারকীব

فَلَآ اُقْسِمُ-এর لا-এর বিশ্লেষণ : হযরত আবূ ওবায়দা এবং কতিপয় মুফাস্সিরের মতে لا অতিরিক্ত। মূলে ছিল نُقْسِمُ সমরকন্দী বলেন, لَآ اُقْسِمُ -এর অর্থ যে اُقْسِمُ এতে সকল মুফাস্সির একমত। তবে لا-এর তাফসীর করতে গিয়ে তারা মতভেদ প্রকাশ করেছেন। অতএব, কারো মতে لا অতিরিক্ত আর এরূপ অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করা আরবি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। যায়। যেমন- مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ এখানে মূলে ছিল اَنْ تَسْجُدَ কারো মতে لا দ্বারা পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের বক্তব্যকে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। তখন মূলবাক্য এভাবে হবে لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ তোমরা যা বলাবলি করছ, আসলে মূলত ব্যাপারটি এমন নয়, আমি خُنَّس-এর কসম করে বলছি- এ মতটি হলো ইমাম ফাররা এবং অন্যান্য নাহুবিদদের। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, এটা نَفْي (অস্বীকার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কসমের নফী নয়; বরং অমুসলিমরা যেহেতু কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করত, তাদের সে উক্তিকে لَا হরফ দ্বারা বাতিল করত কিয়ামত যে সুনিশ্চিত এবং এ সম্পর্কে কুরআনের উক্তি যে দিবালোকের মতো সত্য এটা তাকীদসহ প্রমাণিত করার জন্য কয়েকটি বিশেষ বস্তুর দ্বারা কসম করা হয়েছে। শপথ ছাড়াই এটা সত্য এবং সুনিশ্চিত। তবে এরপরও যদি তোমরা শপথের প্রয়োজনীয়তা মনে কর, তাহলে শোন আমি কসম করে বলছি। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ : عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ আয়াতাংশটি مَكِيْن-এর حَال হিসেবে মানসূব হয়েছে। মূলত এটা صِفَتْ বিশেষণ ছিল, কিন্তু مَكِيْن-এর পূর্বে আসার কারণে حَالْ হয়েছে। তবে رَسُوْلٍ শব্দের نَعْت হওয়াও বৈধ। -[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ مَكِيْن : مَكِيْن শব্দটি فَعِيْل-এর ওজনে مَكَانَةٌ হতে গৃহীত। مِيْم এখানে শব্দের মূল হিসাবে আছে। এখান থেকেই ব্যবহৃত হয় تَمَكَّنَ যেমন مَسْكَنَةٌ হতে تَمَسْكَنَ ব্যবহৃত হয়।

তবে مَكِيْن-এর মধ্যে م মাসদারে মীমীও হতে পারে, তখন মূল হবে كَوْنٌ আর مَكِيْنٌ মূলে ছিল مَكْوُنٌ - نَقْل এবং قَلْب-এর দ্বারা مَكِيْن হয়ে গেছে।

مَكِيْن শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহর কাছে ذِىْ مَكَانَةٍ وَشَرَفٍ তথা মর্যাদাবান এবং তাঁর নিকট উপস্থিত থাকেন। আল্লাহর নিকট বলতে সম্মানের নৈকট্য, শারীরিক নৈকট্য নয়। -[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতের শানে নুযূল : অবিশ্বাসী আরবরা পবিত্র কুরআনের পরলোক ও পুনরুত্থান সম্পর্কিত প্রত্যাদেশগুলো শুনে বলত যে, মুহাম্মদ ﷺ নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে। নচেৎ মানুষ মরে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার সে পুনরুজ্জীবিত হবে এবং তাকে বেহেশত বা দোজখে গমন করে পাপ-পুণ্যের প্রতিফল ভোগ করতে হবে, এ সকল উদ্ভট কথা সে কখনো বলত না। সে আরো বলছে যে, এটা আল্লাহর কথা; কিন্তু এমন শক্তিশালী কে আছে যে আল্লাহর নিকট হতে এ সকল কথা জেনে আসে আবার তাকে হুবহু জানিয়ে দিবে? এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। মুহাম্মদের এ সকল কথা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার কেউ কেউ বলত, না জানি মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে (না'উযুবিল্লাহ)। তা না হলে সে মাঝে মধ্যে এমন পণ্ডিতের মতো কথা বলে কি করে? সে তো আদৌ লেখাপড়া শিখেনি। মক্কার কাফেরদের এ সমস্ত কথা ও ধারণার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উদ্ধৃত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। -[মা'আলিম]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ...... وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ : আল্লাহ তা'আলা যে কথাটি বলার জন্য এখানে শপথ করেছেন। তা পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। এ শপথ উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুহাম্মদ ﷺ অন্ধকারের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখেননি; বরং যখন তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, রাতের অবসান হয়েছিল এবং প্রভাত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, তখন উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে তিনি আল্লাহর এ মহান ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বলছেন তা তাঁর চোখে দেখা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং পূর্ণ হুঁশ জ্ঞান সহকারে দিনের উজ্জ্বলতায় অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলছেন। হযরত শাহ আব্দুল আযীয (র.) বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াত কয়টিতে সূর্যকে সাতারু মাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তা আলো প্রসারিত হওয়াকে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পানিতে যেরূপ মাছ লুকিয়ে চলাফেরা করে এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণে পানি সম্প্রসারিত হয়ে থাকে সূর্য উদিত ও আলোকজ্জ্বল হওয়ার পূর্বেও ঠিক সেরূপ অবস্থা হয়ে থাকে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, সকালের দ্বারা প্রাতঃসমীরণকে বুঝানো হয়েছে-যা সাধারণত বসন্তকালে প্রবাহিত হয়।

যা হোক, উক্ত শপথগুলোর সম্পর্ক হলো পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়ের সাথে যার মর্মার্থ হচ্ছে- উক্ত তারকাগুলোর চলাফেরা, প্রত্যাবর্তন করা এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার উল্লেখের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের নিকট বারবার ওহী এসেছিল, একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা অবশিষ্ট রয়েছে। অতঃপর তা অদৃশ্য [বিলুপ্ত] হয়ে গেছে।

নবী করীম ﷺ -এর আগমনের পূর্বে রাতের (অজ্ঞতার) অন্ধকার সমগ্র পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছিল, তখন পূর্ববর্তী ওহীর নিদর্শন ও প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছিল, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার মতো কোনো ব্যক্তিই আর জীবিত ছিল না। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ -এর আগমন ও কুরআন মাজীদ নাজিল হওয়ার মধ্য দিয়ে সুবহে সাদিকের সূত্রপাত হলো। যা সমগ্র জগতকে দিবালোকের ন্যায় হেদায়েতের আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করেছিল। যেন অন্যান্য নবী রাসূলগণ তারকার সাথে তুল্য হলে নবী করীম ﷺ হবেন উজ্জ্বল রবী সাদৃশ্য।

কারো মতে নক্ষত্ররাজি চলমান হয়ে প্রত্যাবর্তন করা এবং অদৃশ হয়ে যাওয়াকে তুলনা করা হয়েছে, ফেরেশতাগণের গমনাগমন এবং উর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সাথে। আর রাতের অবসান ও উষার আগমনকে কুরআনের আলোর মাধ্যমে কুফরের অন্ধকার দূর হয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

اَلْخُنَّسِ وَالْجَوَارِ الْكُنَّسِ -এর অর্থ : এখানে اَلْخُنَّسُ অর্থ তারকাপুঞ্জ। اَلْخُنَّسُ শব্দটি خَنَسٌ হতে সংগৃহীত হয়েছে। خَنَسٌ অর্থ পিছনের দিকে যাওয়া, উধাও হয়ে যাওয়া, অনুপস্থিত হওয়া, চেপ্টা নাক হওয়া, আয়াতে اَلْخُنَّسُ বলতে ঐ তারকারাজিকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো দিনে পিছনে থাকে, লোকচক্ষুর সামনে আসে না। রাতে প্রকাশিত হয়। তারকাগুলি হলো যুহল, মুশতারী, মিররীখ, যুহরা ও আতারিদ [সাধারণত ঐ তারকাগুলোকে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শক্র ও বুধ গ্রহ বলা হয়ে থাকে]। সিহাহ্ গ্রন্থকার বলেন– সমস্ত তারকারাজিকে اَلْخُنَّسُ বলা হয়। কেননা সকল তারকা দিনের বেলায় দূরে থাকে।

–[ফাতহুল কাদীর]

اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ সম্পর্কে হাজ্জাজ ইবনে মুনযির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–আমি জাবির ইবনে যায়েদ (র.)-কে اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "اَلظِّبَاءُ وَالْبَقَرَةُ" অর্থাৎ হরিণ এবং গাভী। তবে এখানে اَلْخُنَّسُ দ্বারা نُجُوْم বা তারকারাজি উদ্দেশ্য হতে পারে।

কারো মতে, اَلْكُنَّسُ অর্থাৎ اِنَّهَا الْمَلَائِكَةُ বলতে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْكُنَّسُ শব্দটি اَلْكِنَاسُ হতে নির্গত হয়েছে, كِنَاسٌ অর্থ গাছের উপর হরিণের ঘর, যেখানে হরিণ আত্মগোপন করে থাকে।

اَلْجَوَارِ শব্দটি جَارِيَةٌ-এর বহুবচন, جَرٰى يَجْرِىْ হতে নেওয়া হয়েছে। –[কুরতুবী]

মূলকথা এখানে আল্লাহ اَلْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ উল্লেখ করে বুঝাতে চান যে, আমি সে নক্ষত্রগুলোর শপথ করে বলছি, যেগুলো সম্মুখে চলতে চলতে হঠাৎ কোনো এক সময় পিছনে হাটতে শুরু করে। অতঃপর পিছনের দিকেই চলতে থাকে এবং কোনো কোনো সময় পিছনের দিকে চলতে চলতে স্ব-স্ব উদয় স্থলে আত্মগোপন করে। এ অবস্থা উল্লিখিত ৫টি নক্ষত্রের মধ্যে দেখা যায়। –[মা'আলিম]

عَسْعَسَ -এর অর্থ :

১. ইমাম ফাররা বলেন, সমস্ত মুফাস্‌সিরীন এ কথার উপর একমত যে, عَسْعَسَ অর্থ اَدْبَرَ অর্থাৎ শেষ হয়ে আসল, শেষ প্রান্তে পৌঁছল।

২. মাহ্দাবী বলেন, عَسْعَسَ অর্থ اَدْبَرَ بِظَلَامِهٖ অন্ধকার নিয়ে চলে গেল। অর্থাৎ রাত শেষ হয়ে আসা এবং কিছু কিছু অন্ধকার থেকে যাওয়া।

৩. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اَقْبَلَ بِظَلَامِهٖ অন্ধকার নিয়ে এগিয়ে আসল। –[কুরতুবী]

৪. জালালাইনের গ্রন্থকার বলেন, اَقْبَلَ بِظَلَامِهٖ اَوْ اَدْبَرَ অর্থাৎ অন্ধকার এগিয়ে আসল বা চলে গেল।

৫. ইমাম রাগেব বলেন, اَلْعَسْعَسَةُ وَالْعَسَاسُ رِقَّةُ الظَّلَامِ অর্থাৎ اَلْعَسْعَسَةُ وَالْعَسَاسُ উভয়টি কম অন্ধকারকে বলা হয় আর এটা রাতের প্রথম ও শেষভাগে হয়ে থাকে। –[রূহুল মা'আনী]

৬. হযর হাসান বসরী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো যখন সে অন্ধকার নিয়ে সম্মুখে আসে ও ফিরে যায়। –[নূরুল কোরআন]

تَنَفَّسَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মূলত تَنَفَّسَ-এর অর্থ হলো, পেট হতে হাওয়া বের হওয়া এবং تَنَفَّسَ الصُّبْحُ অর্থ সকালবেলার আগমন। কেননা সকালবেলা হাওয়া নিয়ে আসে। রূপক অর্থে এখন এর নামই تَنَفَّسَ রাখা হয়েছে।

আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেন, تَنَفَّسَ অর্থ সকালবেলার আলো এত দীর্ঘায়িত হওয়া যে, দিন চলে আসে।

কারো মতে, تَنَفَّسَ অর্থ اِنْشَقَّ বা اِنْفَلَقَ অর্থাৎ কেটেছে। কেননা রাতের অন্ধকার কেটে বা ভেদ করেই সকাল হয়।

মূলত এখানে تَنَفَّسَ বলে সুবহে সাদিককে বুঝানো হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

উল্লিখিত বিষয়ে আল্লাহর কসম করার কারণ : যে কথাটি বলার জন্য এ শপথ বা উক্তি করা হয়েছে তা পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে। এ শপথ বা উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুহাম্মদ ﷺ অন্ধকারের মধ্যে বসে কোনো স্বপ্ন দেখেননি; বরং যখন তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়ে পড়েছে; রাত শেষে প্রভাতের আলো ফুটে উঠেছিল তখন উন্মুক্ত আকাশের দিগন্তে তিনি এ মহান ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বলছেন, তা তাঁর চোখে দেখা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং পূর্ণ হুঁশ-জ্ঞান সহকারে দিনের উজ্জ্বলতায় অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রকাশ মাত্র।

কোনো কোনো তাফসীরকারক মন্তব্য করেছেন–বাহ্যিক জগতে যেমন নক্ষত্র উদিত হয়, অস্ত যায়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের আকাশেও পয়গম্বরগণ আল্লাহর ওহী নিয়ে উদিত হয়েছেন, যথাকর্তব্য সম্পাদন করে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তাঁদের অন্তর্ধান ঘটেছে। পৃথিবী আবার মিথ্যা ও বাতিলের ঘনঘটায় ডুবেছে। অবশেষে সকল নক্ষত্রের শেষে সূর্যের উদয়ের মতো সকল পয়গাম্বরের সর্বশেষ আধ্যাত্মিক বিশ্বের রবি রাসূলে কারীম ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর নবুয়তের উজ্জ্বল আলোয় বাতিলের অন্ধকার ডুবে গেছে। শপথের বিষয়বস্তুগুলো নবুয়তের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান পরিক্রমার সাথে পরোক্ষভাবে তুলনা করা হয়েছে।

কোনো কোনো মনীষীর মতে, ফেরেশতাদের উর্ধ্বলোকে গমনাগমন এবং অন্তর্ধানকে নক্ষত্র তারকার উদয় এবং কুরআনের আগমনে কুফরের অবসানকে ভোরের আগমনে রাতের অবসানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

اِنَّهٗ -এর সর্বনামের মারজি' : اِنَّهٗ-এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে তা দ্বারা কুরআনে কারীমকে বুঝানো হয়েছে। যদিও বাক্যে এর উল্লেখ নেই, কিন্তু শানে নুযূলের দ্বারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে 'সম্মানিত রাসূল' বলতে ওহীবাহক ফেরেশতা তথা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহ হতে এ কথা স্পষ্ট জানা যায়। কুরআনকে রাসূলের উক্তি বলার অর্থ এটা নয় যে, এটা সে ফেরেশতার নিজস্ব উক্তি। এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এটা সে মহান সত্তার কালাম, যিনি তাকে বার্তাবাহক বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সূরা আল হাক্কার ৪০ নং আয়াতে অনুরূপভাবে কুরআনকে মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তি বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, কুরআন নবী করীম ﷺ-এর নিজস্ব রচনা; বরং একে রাসূলে কারীম ﷺ-এর উক্তি বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ কালামকে তিনি আল্লাহর রাসূল হিসাবে পেশ করছেন, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ হিসাবে নয়। উভয় স্থানে কুরআনকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তি বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ কালামকে তিনি আল্লাহর রাসূল হিসেবে পেশ করেছেন, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে কুরআনকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ ﷺ-এর উক্তি বলা হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহর এ কালাম হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সম্মুখে বার্তাবাহক ফেরেশতার মুখে এবং জনগণের সম্মুখে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখে পঠিত ও ধ্বনিত হচ্ছিল।

হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহহাক (র.)-এর মতে رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ-এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা পরবর্তী আয়াতগুলোতে যে গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে তা তার জন্যই প্রযোজ্য। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ -এর দ্বারা এখানে মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর গ্রহণ যোগ্য।

قُوَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : قُوَّةٌ অর্থ– শক্তিশালী। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা شَدِيْدُ الْقُوٰى বলেছেন। তাঁর শক্তির একটি বর্ণনা দেওয়া যায় যে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা 'মাদায়েনে লূত' -এ পাঠিয়েছিলেন, সেখানে ৪টি শহর ছিল। প্রত্যেক শহরে চার লক্ষ যোদ্ধা ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে পূর্ণ মাদায়েনকে উল্টিয়ে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর নির্দেশ পালনে যে শক্তি দরকার তাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এ শক্তি সৃষ্টির প্রথম থেকে শুরু করে বিশ্ব-প্রলয় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

কারো মতে, মুখস্থশক্তি, ভুলে যাওয়া হতে দূরে থাকা এবং এক কথার সাথে অন্য কথার মিশ্রণ হতে দূরে থাকার শক্তি তার মধ্যে প্রকটভাবে রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

কুরআনকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বাণী বলার কারণ : কুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী; কিন্তু উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ কুরআন হযরত জিবরাঈলের বাণী, এটা এ কারণে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) ঐশী বাণীর মাধ্যম এবং বাহক ছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী বহন করে এনেছিলেন।
–[যিলাল, রূহুল মা'আনী]

সকল ভাষায়-ই এ ধরনের ব্যবহার রয়েছে। যেমন কোনো এক মালিক তার রাজমিস্ত্রীকে বলে থাকে এটাতো আপনার দালান, বড় সুন্দর হয়েছে– এটা এ কারণেই বলা হয় যে, রাজমিস্ত্রীর মাধ্যমে দালানটি তৈরি হয়েছে। অথচ মালিক তো রাজমিস্ত্রী নয়।

مُطَاعٍ আয়াতাংশের অর্থ : مُطَاعٍ শব্দের অর্থ হলো যার কথা মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ আকাশে সমস্ত ফেরেশতা তাঁর কথা মতো চলে, তিনি তাদের নেতা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সমস্ত ফেরেশতাগণ যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর অনুগত তার প্রমাণ হলো, মি'রাজের রাত্রে তিনি বেহেশ্তের পাহারারত ফেরেশতাদেরকে বলেছেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য দরজা খুলে দাও, অতঃপর খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রবেশ করে যা দেখার দেখেছেন। তারপর দোজখের পাহারাদারকে বলেছেন–দোজখের অবস্থা দেখার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-কে দরজা খুলে দাও। তাঁর কথায় দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, ফেরেশতাদের এ আনুগত্য ছিল নবী করীম ﷺ-এর প্রতি। আর কারো মতে ফেরেশতাদের আনুগত্যের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধ সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং তাঁর মাধ্যমে অন্য ফেরেশতাদের প্রতি পৌঁছে। -[নূরুল কোরআন]

ثَمَّ اَمِيْنٍ বাক্যে ثَمَّ -এর অর্থ : ثَمَّ অর্থ সেখানে, তথায়। আয়াতে ثَمَّ বলতে فِى السَّمٰوٰتِ বা আকাশে বুঝানো হয়েছে। কেননা, সাধারণত সকল ফেরেশতার আবাস বা অবস্থান হলো আকাশে, আর হযরত জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতাদের-ই নেতা। অতএব, ثَمَّ বলে আকাশের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কারো মতে, ثَمَّ -এর ثَا -এর উপর পেশ দিয়ে। তখন ثُمَّ অর্থ وَاوْ হবে। অথবা, تَرْتِيْبٌ -এর জন্য হবে। -[রূহুল মা'আনী]

اَمِيْنٍ -এর অর্থ : اَمِيْنٍ শব্দের অর্থ হলো مُؤْتَمِنٌ তথা বিশ্বস্ত, নিরাপদ। এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর বিশেষণ। কেননা তিনি ছিলেন ওহী বহনে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও নিরাপদ। তিনি আল্লাহর কালামের সাথে নিজের কোনো কথা শামিল করে দেওয়ার মতো কোনো অবিশ্বাসের কাজ করেন না; বরং তিনি বড়োই আমানতদার। আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নাজিল হয়, তিনি হুবহু তাই পৌঁছে দেন।

হযরত জিবরাঈল (আ.) শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ : ذِى قُوَّةٍ অর্থ– শক্তিশালী। এটা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর একটি বিশেষ গুণ। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা তাকে شَدِيْدُ الْقُوٰى (অত্যন্ত শক্তিধর) বলে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা হতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর অত্যধিক শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত জিবরাঈল (আ.) একবার হযরত লূত (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সুদ্দুম নামক এলাকাটিকে আকাশ পর্যন্ত উর্ধ্বে তুলে উল্টে ফেলে দিয়েছেন। এ স্থানে শিশু ও নারী ব্যতীত চার লাখ পুরুষ ছিল। যার ফলে তা চির দিনের জন্য কালো জলাধারে পরিণত হয়েছিল।

হযরত জিবরাঈল (আ.) ছামূদ জাতিকে এক বজ্র ধ্বনিতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন।

তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে কথোপকথনে উদ্যত শয়তানকে ডানার এক ঝাপটায় সুদূর ফিলিস্তিন হতে ভারত রাজ্যের কোনো এক পর্বতশৃঙ্গে নিক্ষেপ করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, মুখস্থ শক্তি ভুলে যাওয়া হতে দূরে থাকা এবং এক কথার সাথে অন্য কথায় মিশ্রণ হতে দূরে থাকায় শক্তি তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে রয়েছে।

কারো কারো মতে, আল্লাহর নির্দেশ পালনে যে শক্তির প্রয়োজন তাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ শক্তি বিদ্যমান থাকবে।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি দু'বার হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছি। তার বিরাট সত্তা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্যলোকে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

বুখারী, তিরমিযী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে এরূপ দেখেছেন যে, তার ছয়টি পাখা রয়েছে। এটা তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের পরিচায়ক।

কারো মতে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এ মহাশক্তি এবং তাঁর প্রবল পরাক্রম হওয়া বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝানো হয়েছে, তা মূলত আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। এ কথাগুলো আসলে কুরআন মাজীদের মুতাশাবিহাত-এর অন্তর্ভুক্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٢. وَمَا صَاحِبُكُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ عَطْفٌ عَلٰى اَنَّهٗ اِلٰى اٰخِرِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ بِمَجْنُوْنٍ كَمَا زَعَمْتُمْ.

٢٣. وَلَقَدْ رَاٰهُ رَاٰى مُحَمَّدٌ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى صُوْرَتِهِ الَّتِىْ خُلِقَ عَلَيْهَا بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ الْبَيِّنِ وَهُوَ الْاَعْلٰى بِنَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ.

٢٤. وَمَا هُوَ اَىْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ مَا غَابَ مِنَ الْوَحْىِ وَخَبَرِ السَّمَاءِ بِظَنِيْنٍ بِمُتَّهَمٍ وَفِىْ قِرَاءَةٍ بِالضَّادِ اَىْ بِبَخِيْلٍ فَيَنْقُصُ شَيْئًا مِنْهُ.

٢٥. وَمَا هُوَ اَىِ الْقُرْاٰنُ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ مُسْتَرِقِ السَّمْعِ رَجِيْمٍ مَرْجُوْمٍ.

٢٦. فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ فَاَىَّ طَرِيْقٍ تَسْلُكُوْنَ فِىْ اِنْكَارِكُمُ الْقُرْاٰنَ وَاِعْرَاضِكُمْ عَنْهُ.

٢٧. اِنْ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ عِظَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ.

٢٨. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ بَدَلٌ مِنَ الْعَالَمِيْنَ بِاِعَادَةِ الْجَارِّ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ بِاتِّبَاعِ الْحَقِّ.

٢٩. وَمَا تَشَاءُوْنَ الْاِسْتِقَامَةَ عَلَى الْحَقِّ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ الْخَلَائِقِ اِسْتِقَامَتَكُمْ عَلَيْهِ.

অনুবাদ :

২২. আর নয় তোমাদের সঙ্গী [অর্থাৎ] মুহাম্মদ ﷺ مُقْسَمٌ عَلَيْهِ এর শেষ (হওয়া) পর্যন্ত اَنَّهٗ-এর উপর আতফ হয়েছে। পাগল যেমন তোমরা ধারণা করে বসেছ।

২৩ অবশ্যই তিনি দেখেছেন তাঁকে [অর্থাৎ] মুহাম্মদ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন, যে আকৃতিতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। খোলা আকাশ প্রান্তে সুস্পষ্ট [দিগন্তে] আর তা হলো পূর্বাকাশের উচ্চ দিগন্ত।

২৪ আর নন তিনি [অর্থাৎ] মুহাম্মদ ﷺ অদৃশ্যের ব্যাপারে [অর্থাৎ] ওহী ও আসমানের সংবাদের ব্যাপারে অভিযুক্ত তথা অপবাদযুক্ত অন্য কেরাতে (ظَاء-এর পরিবর্তে) ضَادْ-এর সাথে (بِضَنِيْنٍ) রয়েছে। অর্থাৎ কৃপণ– যাতে তিনি তা হতে কিছু মাত্র হ্রাস [ত্রুটি] করবেন।

২৫. উপরন্তু নয় এটা অর্থাৎ আল-কুরআন কোনো শয়তানের বক্তব্য চুরি করে শ্রবণকারী [এর বক্তব্য] যে অভিশপ্ত বিতাড়িত।

২৬. অতএব তোমরা কোন দিকে চলছ? কুরআনকে অস্বীকার করে এবং তা হতে বিমুখ হয়ে কোন পথে চলছ?

২৭ এটা তো উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয় নসিহত [ব্যতীত কিছু নয়] বিশ্ববাসীর জন্য [অর্থাৎ] মানুষ ও জিন জাতির জন্য।

২৮. তার জন্য যে তোমাদের মধ্য হতে ইচ্ছা করে এটা اَلْعٰلَمِيْنَ হতে بَدَلٌ হয়েছে। এখানে হরফে জারকে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সরল-সঠিক পথে চলতে সত্যের অনুসরণের মাধ্যমে।

২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না সত্যের উপর অটল থাকতে তবে যদি সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের সত্যের উপর সুদৃঢ় [প্রতিষ্ঠিত] থাকার তবে থাকতে পার।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

الْمُبِيْنِ-এর মহল্লে ই'রাব : الْمُبِيْنِ-এর মহল্লে ই'রাব দু'টি হতে পারে।

ক. হযরত রাবী (র.) বলেন, الْمُبِيْنِ শব্দটি الْأُفُقِ-এর সিফাত বা বিশেষণ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা মাজরূর অবস্থায় আছে।

খ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, এটা جِبْرِيْل (অর্থাৎ যাকে রাসূল ﷺ দেখেছেন তার)-এর বিশেষণ। এমতাবস্থায় الْمُبِيْنِ মানসূব-এর অবস্থায় হবে। –[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ক্ষমতা, আমানতদারী ও বিভিন্ন গুণাবলির উল্লেখ করেছেন। আর অত্র আয়াতগুলোতে নবী করীম ﷺ-এর বিশ্বস্ততা ও কুরআন মাজীদের সত্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত হযরত জিবরাঈল (আ.), কুরআনে মাজীদ ও নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে মক্কার কাফের ও মুশরিকরা যেসব অভিযোগ আনয়ন করেছিল সেগুলোর খণ্ডন করাই ছিল এ আয়াতগুলো নাজিলের উদ্দেশ্য।

আয়াতের শানে নুযূল :

১. নবী করীম ﷺ-এর ইচ্ছা হলো যে, তিনি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে তাঁর প্রকৃত অবয়বে দেখবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে অনুমতি দিলেন। ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) যখন স্বীয় অবয়বে আকাশ জুড়ে রাসূল ﷺ-এর সামনে প্রকাশিত হলেন তখন নবী করীম ﷺ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। এমতাবস্থায় মুশরিকগণ বলতে লাগল– إِنَّهُ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ সে তো পাগল। তখন অবতীর্ণ হলো "وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ" তোমাদের সঙ্গীতো পাগল নয় তিনি তো হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে দেখে ক্ষণিকের জন্য এমন হয়েছেন। –[কুরতুবী]

২. মক্কার কুরাইশ-কাফেরগণ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ভালোভাবে চিনার পরেও বলে বেড়াত যে, إِنَّهُ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ সে পাগল। যা বলছে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে অবতারিত বক্তব্য। আবার কারো কারো মতে, এটা তার দাওয়াতের পক্ষে বানানো বক্তব্য। আবার কেউ কেউ বলত, প্রত্যেক কবির সাথে একজন করে শয়তান থাকে, সে তার জন্য উদ্ভট কথা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আসে। আবার বলত, প্রত্যেক জাদুকরের জন্য একটি করে শয়তান থাকে, সে তার জন্য দূরবর্তী অদৃশ্যের খবর নিয়ে আসে। আবার কোনো কোনো শয়তান এমন আছে যে, মানুষের উপর সওয়ার হয়ে তাদের ভাষায় সুন্দর সুন্দর কথা বানিয়ে বলে। এরপর মানুষ দাবি শুরু করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত। আসল কারণকে ছেড়ে মিথ্যা বানোয়াট কথা শুরু করে।

এমতাবস্থায় কুরআন নাজিল হয়ে আসল ব্যাপার উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। বলে দেওয়া হলো যে, যত কথা-ই তোমরা বল না কেন এটা সে সত্তার পক্ষ হতে অবতারিত, যিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। যিনি এ দুনিয়ার সকল বস্তুকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। বিনা মডেলে [বিনা উদাহরণে] বিভিন্ন রকম সৃষ্টির উদ্ভব ঘটিয়েছেন।

কুরআন নাজিল হয়ে এমন দু'টি সত্তার পরিচয় করে দিয়েছে, যাদের একজন আল্লাহর নিকট হতে ওহী গ্রহণ করেছে, অপর একজন তা বহন করে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। তিনি তাদের মধ্য হতেই একজন, যাঁকে তারা চিনে, যিনি مَجْنُوْن বা পাগল নন। তিনি যে সত্তার মাধ্যমে ওহী প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁকে বাস্তব চোখে অবলোকন করেছেন। –[যিলাল]

৩. আল্লাহর বাণী لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ নাজিল হওয়ার পর আবূ জাহল বলল– সরল পথে চলা না চলার জন্য তো আমাদেরকে এখতিয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেই দিয়েছেন, তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তখন আল্লাহর বাণী .... وَمَا تَشَاءُوْنَ নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ : মক্কার কাফিররা মহানবী ﷺ-এর উপর যেসব অপবাদ দিয়েছিল তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, তারা বলত মুহাম্মদ ﷺ পাগল। এ জন্যই সে এ সকল আবোল-তাবোলও উদ্ভট কথাবার্তা বলছে যখন হাজার হাজার খোদা মিলে পৃথিবীটাকে সামাল দিতে পারছে না তখন মুহাম্মদ ﷺ-এর এক খোদা কিভাবে এর শৃঙ্খলা বিধান করবে? তা ছাড়া মানুষ মৃত্যুর পর পচে-গলে যাওয়ার পর কিভাবে পুনরায় জীবিত হতে পারে? এ সব পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি?

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সব অপবাদের নিরসন কল্পে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ ﷺ কস্মিনকালেও পাগল নন। তিনি তোমাদের নিকট যা বলছেন, তা তাঁর নিজের কথা নয়; বরং জিবরাঈলের নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত আল্লাহর কালাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মু'মিনদের সঙ্গী না বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাফেরদের সঙ্গী বলার কারণ : [illegible] ﷺ -কে কাফেরদের সহচর বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের কোনো অপরিচিত ব্যক্তি নন; বরং তিনি তাদেরই জাতির একজন। তাদের মধ্যে রাসূলের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাদের লোকালয়ের প্রতিটি শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ জানে যে, তিনি বুদ্ধিমান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। এমন ব্যক্তিকে জেনে বুঝে 'পাগল' বলায় তাদের লজ্জা করা উচিত। 'সাহেব' বা সহচর শব্দ দ্বারা সম-আদর্শের অনুসারী বুঝানো হয়নি; বরং সহ-অবস্থানজনিত পরিচিতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ-এর অর্থ : اَلْأُفُقِ الْمُبِيْنِ অর্থ– স্পষ্ট দিগন্ত, পূর্ব দিকের সূর্য উদয় হওয়ার স্থান। কেননা সূর্য উদয় হওয়ার সময় পূর্ব দিক مُبِيْن তথা আলোকিত হয়ে যায়। এ মতটি জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন– اَلْأُفُقِ الْمُبِيْنِ হলো اَقْطَارُ السَّمَاءِ وَنَوَاحِيْهَا অর্থাৎ আকাশের সকল প্রান্ত ও দিক। -[কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কোথায় দেখলেন? : ইমাম মাওয়ারদী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়। ক. হযরত সুফিয়ান বলেন, তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে পূর্বাকাশে দেখতে পেলেন, খ. ইবনে শাজারা বর্ণনা করেন, পশ্চিমাকাশে এবং গ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, মক্কার পূর্বাঞ্চলে দেখেছেন।

ইমাম ছা'লাবী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ একদা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বললেন, আমি তোমাকে তোমার আসল আকৃতিতে দেখতে চাই, যে আকৃতি নিয়ে তুমি আকাশে অবস্থান কর। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনি অবশ্যই পারবেন না। তিনি উত্তর দিলেন, না, পারবো। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, তাহলে আমি কোথায় দেখা দিতে পারি? তিনি বললেন, 'আবতাহ' এলাকায়। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, সেখানে আমার স্থান সঙ্কুলান হবে না। তিনি বললেন, তাহলে 'মিনা'তে। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, সেখানেও সঙ্কুলান হবে না'। তিনি বললেন, তা হলে আরাফাতে আসুন। হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, সেখানে আসা যায়। উভয়ের মাঝে ওয়াদা-চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল। নবী করীম ﷺ নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে পড়লেন। হঠাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) আরাফাহ পাহাড়ের পার্শ্ব হতে খস-খস শব্দ করে সামনে এগিয়ে আসলেন, তাঁর শরীর পূর্ব আর পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। মাথা আকাশে আর পা দুটি জমিনে লেগে আছে। এটা দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বেঁহুশ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে হযরত জিবরাঈল (আ.) নিজের আকৃতি পাল্টিয়ে তাঁকে বুকের সাথে মিলিয়ে নিলেন এবং বললেন, ভয় করবেন না। আপনি যদি হযরত ইসরাফীল (আ.)-কে দেখতেন, তাহলে আপনার কি অবস্থা হতো? তাঁর মাথা আরশের নিচে এবং দুই পা সাত জমিনের নিচে, আর আরশ তাঁর ঘাড়ের উপরে। কোনো কোনো সময় তিনি আল্লাহর ভয়ে এত ছোট হয়ে যান যে, মনে হয় একটি চড়ুই পাখি। -[কুরতুবী]

ظَنِيْن অর্থ : আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, بِظَنِيْنٍ اَىْ بِمُتَّهَمٍ অর্থাৎ অভিযুক্ত, সন্দেহযুক্ত। কারো মতে ضَنِيْن অর্থ بَخِيْل বা কৃপণ। এ অর্থে মূলবাক্যের বক্তব্য এভাবে হবে যে, اِنَّهُ لَا يَبْخَلُ بِالْوَحْىِ وَلَا يَقْصُرُ فِى التَّبْلِيْغِ অর্থাৎ তিনি ওহী পৌঁছাতে কোনো প্রকারের কৃপণতা বা ত্রুটি করেন না। আবার কারো মতে ضَنِيْن অর্থ ضَعِيْف দুর্বল।

এ মতানৈক্যের কারণ হলো, ক্বারীদের কেরাতে এখতেলাফ হওয়া। কেননা কেউ ظَنِيْن (ظَاء দিয়ে) পড়েন। আবার কেউ ضَنِيْن (ضَاد দিয়ে) পড়েন। ظَاء দিয়ে পড়লে অভিযুক্ত অর্থ হবে, আর ضَنِيْن অর্থ হবে بَخِيْل কৃপণ। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

মোটকথা, নবী করীম ﷺ কোনো কথা তোমাদের থেকে লুকিয়ে রাখেন না। অজ্ঞাত জগতের যে সকল তত্ত্ব ও তথ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি নাজিল করেন– তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত করেন, তা আল্লাহর নিজস্ব সত্তা, গুণ, ফেরেশতা, মৃত্যুর পর জীবন, কিয়ামত, পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নাম যে বিষয়েই হোক না কেন, তা তিনি যথাযথভাবে তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন, এতে তাঁর বিন্দু-বিসর্গ কার্পণ্য নেই। কোনোরূপ রাখাঢাক নেই।

গায়েব বিষয়ে কার্পণ্য কেন করেননি? : তৎকালীন আরব জাদুকররা যাদুর খেলা দেখাতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য জাদু বিদ্যার গোপন রহস্য অন্যকে জানাত না। আবার জ্যোতিষ-গণকদের অভ্যাস ছিল যে, তারা টাকা-পায়সা নিয়ে কোনো গায়েবি কথা বলত। সেকালের গণকদের নিকট শয়তান সত্য-মিথ্যা পৌঁছাত। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকৃতি ঐ সকল গণকদের মতো নয়; বরং সত্যধর্ম বিষয়ে যে সমস্ত গায়েবী ওহী তাঁর উপর অর্পিত হয়, তিনি তাই সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে প্রকাশ করেন। তিনি সত্য প্রচারে মোটেই কার্পণ্য করেন না। কারো নিকট হতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। শয়তান প্রভাবিত জাদুকরদের মতো কোনো ভেদ, রহস্য লুকিয়ে রাখাও তাঁর কোনো অভ্যাস নেই।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের আনীত অভিযোগকে খণ্ডন করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, কুরআন মাজীদ বিতাড়িত মারদুদ শয়তানের বক্তব্য নয়। এমন নয় যে, কোনো শয়তান আকাশ হতে কোনো তথ্য চুরি করে এনে মুহাম্মদ ﷺ-কে শুনিয়ে গেছে।

তোমরা যে ধারণা করে বসেছ যে, কোনো শয়তান এসে মুহাম্মদ ﷺ-কে এসব কথা বলে যায়– এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শয়তান মানুষকে শিরক, মূর্তিপূজা, নাস্তিকতা ও নীতিহীনতা হতে দূরে সরিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের শিক্ষা দিবে, মানুষকে লাগামহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সম্মুখে দায়িত্ব ও জবাবদিহি করার অনুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দিবে, মূর্খতামূলক রসম-রেওয়াজ, জুলুম-পীড়ন ও নৈতিক চরিত্রহীনতা, পবিত্র ও আদর্শবাদী জীবন-যাপন, সুবিচার, ন্যায়-নীতি, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া এবং উন্নতমানের চরিত্র নৈতিকতা অনুসরণের দিকে আহ্বান জানাবে ও সেদিকে পরিচালিত করবে। এটা কি করে তোমরা ভাবতে পারলে?

رَجِيْم-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : رَجِيْم শব্দটি এখানে مَرْجُوْم-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ অভিশপ্ত ও রহমত হতে বিতাড়িত। যেমন– قَتِيْل শব্দটি مَقْتُوْل-এর অর্থে হয়ে থাকে।

হযরত আতা (র.) বলেছেন, এখানে শয়তান দ্বারা সে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর আকৃতিতে এসে তাকে ফেতনায় ফেলার চেষ্টা করত। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে ওহীর প্রভাব হতে সম্পূর্ণ হেফাজত করেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ : اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের বিভিন্ন মত দেখা যায়। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, اِلٰى اَيْنَ يَعْدِلُوْنَ عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ وَعَنْ طَاعَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কথা এবং তাঁর আনুগত্য হতে বিমুখ হয়ে কোথায় যাবে?

হযরত কাতাদাহ (র.) হতে অন্য আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ عَنْ كِتَابِىْ وَطَاعَتِىْ অর্থাৎ "আমার কিতাব এবং আমার আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাবে"?

হযরত যুজাজ (র.) বলেন, فَاَىَّ طَرِيْقَةٍ تَسْلُكُوْنَ اَبْيَنُ مِنْ هٰذِهِ الطَّرِيْقَةِ الَّتِىْ بُيِّنَتْ لَكُمْ

অর্থাৎ 'আমি যে পথ তোমাদেরকে দেখিয়েছি সে পথ হতে কোন পরিষ্কার পথ তোমরা গ্রহণ করবে"? –[কুরতুবী]

হক থেকে মুখ ফিরিয়ে কোন জায়গায় যাবে? যেখানেই যাবে, সেখানেই আল্লাহ তোমাদের সামনে থাকবেন। –[যিলাল]

اِنْ هُوَ ও مَا هُوَ-এর মধ্যকার যমীরদ্বয়ের مَرْجِعْ কি? : اِنْ هُوَ ও مَا هُوَ-এর মধ্যকার যমীরদ্বয়ের مَرْجِعْ-এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে–

ক. তাদের মারজি' হলো কুরআনে কারীম। এটা জমহুরের মাযহাব।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, উক্ত যমীরদ্বয়ের মারজি' হলো নবী করীম ﷺ।

قَوْلُهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ .... اَنْ يَّسْتَقِيْمَ : অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হাকীমের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং তা হতে কারা উপকৃত হতে পারে, তা হতে উপকৃত হওয়ার শর্ত কি তার উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং ইরশাদ হয়েছে– কুরআন তো বিশ্ববাসীর জন্য নিছক উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানব-দানব সকলের জন্যই এটা নসিহত। আর এ উপদেশ হতে শুধু তারাই কল্যাণ হাসিল করতে পারে যারা হকের অনুসরণের মাধ্যমে সরল সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়। পক্ষান্তরে যারা সরল সঠিক পথ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, কুরআন তাদের কোনো উপকারেই আসে না উপরন্তু কুরআনের বিরুদ্ধাচরণের দরুন তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত হবে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, সরল সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য আগ্রহী হওয়া আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও তৌফিক দানের মাধ্যমেই শুধু তা লাভ করা সম্ভব। কাজেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাঁর নিকট তার তৌফিক দানের জন্য আবেদন জানাতে হবে। শেষোক্ত আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই পথ প্রদর্শক, তবে মু'মিনদেরকে এটা পথ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেয়। কেউ কেউ কুরআন দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না বলে এর উপদেশ গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়, কেননা এটা কার্যকর হওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কতক মানুষের ব্যাপারে কোনো হেকমত বা গূঢ় রহস্যের কারণে আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়াতেই তারা কুরআন দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা উপকৃত হয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর বিধায় তারা উপকৃত হয়। –[বায়ানুল কুরআন]

মোটকথা, আল্লাহর এ কালাম যদিও মহান নসিহত বা উপদেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য; কিন্তু এটা হতে উপকৃত হতে পারে কেবল সে ব্যক্তি যে নিজেই সত্য গ্রহণ ও অনুসরণ করতে প্রস্তুত। এর অবদানে নিজেকে ধন্য করার জন্য নিজেরই অনুসন্ধিৎসু ও সত্যপন্থি হওয়া সর্বপ্রথম প্রয়োজন– এটাই প্রথম শর্ত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ : সূরা আল-ইনফিত্বার

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম তার প্রথম আয়াতের শব্দ اِنْفَطَرَتْ হতে চয়ন করা হয়েছে। اِنْفَطَرَتْ শব্দটি اَلْاِنْفِطَارُ হতে নির্গত। اَلْاِنْفِطَارُ-এর অর্থ হলো ফেটে যাওয়া, দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়া। এ সূরায় আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উল্লেখ থাকায় এ সূরাকে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৯ আয়াত ৮০ বাক্য এবং ১০৭টি অক্ষর রয়েছে।

–[নূরুল কোরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল : এ সূরা এবং তার পূর্ববর্তী সূরা 'আত্ তাকভীর'-এর বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল রয়েছে। অতএব, উভয় সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও প্রায় কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তা নাজিল হয়েছে। তবে এটি সূরা আন-নাযি'আতের পর অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : আলোচ্য সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু হলো পরকাল। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, হাকিম ও ইবনে মারদুইয়া বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

"مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَأْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় কিয়ামতের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ দিন যখন উপস্থিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত হবে। অতঃপর মানুষের মধ্যে আত্মসম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে মহান আল্লাহ তোমাকে জীবন দিয়েছেন, যাঁর ঐকান্তিক দয়া এবং অনুগ্রহে আজ তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে উত্তম দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়েছ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধোঁকায় কেমন করে পড়লে যে, তিনি শুধু দয়া ও অনুগ্রহ-ই করেন, ইনসাফ ও সুবিচার করেন না। তিনি দয়া ও অনুগ্রহ করেন এটা ঠিক; তবে তার অর্থ এ নয় যে, তার সুবিচারকে তোমরা ভয় করবে না। এরপর মানুষকে কোনোরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-ইনফিত্বার মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعَ عَشْرَ اٰيَةً : আয়াত সংখ্যা- ১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ اِنْشَقَّتْ .

১. আকাশ যখন ফেটে যাবে বিদীর্ণ হবে;

٢. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ اِنْقَضَّتْ وَتَسَاقَطَتْ .

২. আর যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে নিচে পতিত হবে;

٣. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ فُتِحَ بَعْضُهَا فِىْ بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا وَاخْتَلَطَ الْعَذْبُ بِالْمِلْحِ .

৩. আর সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে একটি অপরটির সাথে মিলে গিয়ে একটি সমুদ্রে পরিণত হবে। মিঠা ও লবণাক্ত পানি সংমিশ্রত হয়ে একাকার হয়ে যাবে।

٤. وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِثَ مَوْتَاهَا وَجَوَابُ اِذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا .

৪. আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে এর মাটি উল্টিয়ে দেওয়া হবে এবং এর মধ্যকার মৃতদেরকে উত্থিত করা হবে। اذا ও এর সমুদয় মা'তূফের জবাব পরবর্তী বক্তব্য

٥. عَلِمَتْ نَفْسٌ اَىْ كُلُّ نَفْسٍ وَقْتَ هٰذِهِ الْمَذْكُوْرَاتِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا قَدَّمَتْ مِنَ الْاَعْمَالِ وَمَاۤ اَخَّرَتْ مِنْهَا فَلَمْ تَعْمَلْهُ .

৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে অর্থাৎ সকলেই জানতে পারবে, এ সকল ঘটনা সংঘটনকাল তথা কিয়ামতের দিন সে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে আমলসমূহ মধ্য হতে আর যা পশ্চাতে রেখে এসেছে তা হতে এবং যা সে আমল করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা আত-তাকভীরে কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং রাসূল ও কুরআনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছে বর্তমান সূরার প্রথমে দুনিয়া প্রলয় হওয়ার কথা আলোচিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ : আল্লাহ তা'আলা এখানে কিয়ামতের প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে- যখন আকাশ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় বর্তমানে যে আকাশ রয়েছে তা ছিন্ন-ভিন্ন ও জীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে

اِنْفَطَرَتْ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : اِنْفَطَرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর صِيْغَه বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে اِنْفِعَالْ মাসদার اِنْفِطَارٌ মূলবর্ণ (ف . ط . ر) এর অর্থ– দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া।

কুরআন মাজীদে এ মর্মে আরো বহু আয়াত রয়েছে। যেমন– فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ . وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ - اِنْشَقَّتِ السَّمَاءُ ইত্যাদি।

আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কারণ কি? : কেন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে? এর ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন :

ক. কারো কারো মতে, اِنْفَطَرَتْ لِنُزُوْلِ الْمَلٰئِكَةِ অর্থাৎ আকাশ হতে ফেরেশতা অবতরণ করার কারণে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন– اِنْفَطَرَتْ لِهَيْبَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে আসমান ফেটে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

আকাশ বিদীর্ণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য : 'আকাশ বিদীর্ণ' হওয়া কিয়ামতের একটি বিশেষ নিদর্শন, কিন্তু 'আকাশ বিদীর্ণ' দ্বারা কি উদ্দেশ্য একথা নির্দিষ্ট করে বলা যেমন সুকঠিন, কিভাবে বিদীর্ণ হয়ে তা বলাও তেমন সুকঠিন।

...... দুনিয়ায় বর্তমানে যতকিছু ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আছে, সকল কিছুর পরিবর্তন এবং ধ্বংসের ধরন উপলব্ধি করা যায়। এ ধরা-ছোঁয়ার ভিতরে বস্তুগুলো যে অদৃশ্য বিধানের মাধ্যমে চলছে তা উপলব্ধি করা সহজ কথা নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে, আকাশের তুলনায় মানুষ নগণ্য ক্ষুদ্র। আকাশ যখন আল্লাহর নির্দেশে সেদিন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে; তখন মানুষের অবস্থা কি হবে, তা স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়।

اِنْتَثَرَتْ অর্থ : اِنْتَثَرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর صِيْغَه বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مَعْرُوْف বাবে اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِثَارُ মূলবর্ণ (ن . ث . ر) এর অর্থ تَسَاقَطَتْ مُتَفَرِّقَةً অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে ঝরে পড়বে, ছিটকে পড়বে। আকাশ যেখানে বিদীর্ণ হয়ে যাবে সেখানে তারকারাজির অস্তিত্ব কোথায়? –[যিলাল, ফাতহুল কাদীর]

تَفْجِيْرُ الْبِحَارِ দ্বারা উদ্দেশ্য : সমুদ্রগুলো উথলে উঠবে। পূর্ববর্তী সূরা আত-তাকভীরে বলা হয়েছে যে, সমুদ্রে আগুন উৎক্ষিপ্ত করে দেওয়া হবে। পূর্বাপর সম্পর্ক রেখে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কিয়ামতের দিন এক ভয়াবহ ভূকম্পন সৃষ্টি হবে যা কেবল একটি এলাকায়ই সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা পৃথিবী একই সঙ্গে কম্পিত হয়ে উঠবে। সমুদ্রসমূহ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে, এতে আগুন জ্বলে উঠবে। সমুদ্রে আগুন জ্বলার তাৎপর্য হচ্ছে– প্রথমে সেসব ব্যাপক ভূমিকম্পের দরুন সমুদ্রসমূহের তলদেশ ফেটে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং ভূগর্ভের তরল পদার্থ যা সর্বদা উত্তপ্ত থাকার কারণে টগবগ করে ফুটছে ও আলোড়িত হচ্ছে–সমুদ্রের পানি তথায় প্রবেশ করবে এবং এর দুটি মৌলিক উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হবে। অক্সিজেন উৎক্ষেপক ও হাইড্রোজেন প্রজ্বালক। তখন এভাবে বিশেষিত হওয়া ও অগ্নি উদগীরক হওয়ার এক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। আর এরই ফলে দুনিয়ার সমুদ্র ও মহাসমুদ্রসমূহে আগুন লেগে যাবে। –[যিলাল]

ইমাম শাওকানী (র.) বলেন, সকল সমুদ্রের পানি উথলে এক সাগরে রূপান্তরিত হবে, মিঠা পানির সাথে লবণাক্ত পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

"فُجِّرَتْ"-এর অর্থ : فُجِّرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ, বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مَجْهُوْل বাবে تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْجِيْرُ মূলবর্ণ (ف . ج . ر) এর অর্থ– প্রবাহিত হওয়া, মিলিত হওয়া। এখানে সমুদ্রের লবণাক্ত ও মিঠা পানির প্রাকৃতিক বাঁধন ছুটে উভয়ে একাকার হওয়া, অথবা ভূগর্ভের উত্তপ্ত পানির সাথে সমুদ্রের পানি মিলিত হওয়া বুঝিয়েছে।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ" : অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ কিয়ামতের সময় যে কবরসমূহকে উল্টিয়ে তাদের মধ্যকার লাশ বের করে পুনরুজ্জীবিত করবেন সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

১. হযরত জালালুদ্দিন মহল্লী (র.) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন– قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِثَ مَوْتَاهَا অর্থাৎ কবরের মাটি খুঁড়ে ফেলা হবে এবং এর ভিতর হতে মৃতদেরকে বের করা হবে।

২. কারো মতে, এর অর্থ হলো ভূগর্ভে যত গুপ্তধন রয়েছে, কিয়ামতের সময় সবই বের করে দেওয়া হবে।

بُعْثِرَتْ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : সীগাহ, بُعْثِرَتْ এটা وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর صِيْغَه বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِيْ مَجْهُوْل বাবে بَعْثَرَ মাসদার اَلْبَعْثَرَةُ এটা মূলত ছিল بُعِثَ وَاُثِيْرَ যেমন بَسْمَلَ মূলে بِسْمِ اللّٰهِ ছিল, حَمْدَلَ মূলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ছিল এবং حَوْقَلَ মূলে ছিল لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এ ধরনের সংক্ষেপণ রীতি আরবে বহুল প্রচলিত ছিল। আর بُعْثِرَتْ-এর অর্থ হবে اَلنَّبْشُ وَالْاِخْرَاجُ অর্থাৎ খোলা ও বের করা।

আবূ হাইয়ান বলেছেন, উপরিউক্ত তাহকীক যা কোনো ভাষাবিদ করেছেন, তা মূলত সঠিক নয়। এখানে رَا-কে অতিরিক্ত দেখানো কোনো নিয়মে পড়ে না। তবে এটা কারো নিজস্ব বিশ্লেষণ হতে পারে– যা অন্যান্যদের জন্য দলিল হতে পারে না; বরং بَعْثَرَ একটি একক শব্দ যৌগিক নয়। আর জমহুর এটাই গ্রহণ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالَى عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষ তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কৃত আমলসমূহ জানতে পারবে।

আলোচ্য আয়াতে مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন :

ক. মানুষ যেসব ভালো বা মন্দ আমল করে অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছে তা হলো– مَا قَدَّمَتْ আর যেসব কাজ করা হতে সে বিরত রয়েছে তা مَا اَخَّرَتْ হিসাবে গণ্য।

খ. মানুষ যা প্রথমে করেছে তা হলো مَا قَدَّمَتْ আর যা পরে করেছে তা হলো مَا اَخَّرَتْ অর্থাৎ মানুষের সমস্ত আমল তারিখ পরম্পরা অনুযায়ী তার সম্মুখে পেশ করা হবে।

গ. মানুষ তার জীবনে যেসব ভালো বা মন্দকাজ করেছে তা হলো مَا قَدَّمَتْ আর সেসব কাজের যে ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া তার মৃত্যুর পর মানবসমাজে প্রতিফলিত ও পরিলক্ষিত হয়েছে, তাকে مَا اَخَّرَتْ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ঘ. কেউ কেউ বলেছেন, مَا قَدَّمَتْ-এর দ্বারা সে আমলকে বুঝানো হয়েছে যা সে করেছে এবং مَا اَخَّرَتْ-এর দ্বারা সে আমলকে বুঝানো হয়েছে যা করার একান্ত ইচ্ছা (নিয়ত) তার ছিল কিন্তু বাস্তবে করতে পারেনি।

ঙ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এর তাফসীরে বর্ণিত আছে مَا قَدَّمَ مِنْ مَعْصِيَتِهٖ وَمَا اَخَّرَ مِنْ طَاعَتِهٖ অর্থাৎ মানুষ যেসব পাপকার্য করেছে এবং যে সমস্ত ইবাদত সে ছেড়ে দিয়েছে, তা বুঝানো হয়েছে।

চ. অথবা, مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهٖ مِنْ اَمْوَالِهٖ وَمَا اَخَّرَ لِوَرَثَتِهٖ অর্থাৎ মানুষ নিজে যে মাল ভোগ করেছে তা হলো مَا قَدَّمَتْ এবং যা তার ওয়ারিশদের জন্য রেখে গেছে তা হলো مَا اَخَّرَتْ –[নূরুল কুরআন, রুহুল মা'আনী]

মানুষ কখন তার কৃতকর্ম জানতে পারবে? : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্ম জানতে পারবে। কিন্তু কখন জানতে পারবে এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে।

ক. কেউ কেউ বলেছেন–عِنْدَ نَشْرِ الصُّحُفِ অর্থাৎ আমলানামা খোলার সময় মানুষ তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবে।

খ. কারো কারো মতে, عِنْدَ الْبَعْثِ অর্থাৎ পুনরুত্থানের সময় জানতে পারবে।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, যখন পাপী ও মু'মিনগণের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া হবে তখন জানতে পারবে। যেমন, কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ হে পাপীরা! তোমরা আজ মু'মিনগণ হতে পৃথক হয়ে যাও। আজ তাদের সাথে তোমাদের থাকার অধিকার নেই। –[রুহুল মা'আনী]

عَلِمَتْ نَفْسٌ الخ-এর দ্বারা কোনো দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? : আলোচ্য আয়াতে মানুষকে তার আমলের জবাবদিহিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। ১. এটা জেনে যাতে মানুষ আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকে। ২. যাতে মানুষ সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমলের দিকে ধাবিত হয়। কেননা, কিয়ামতের কঠিন দিনে শুধু এটাই তাকে সুখ-শান্তি ও মুক্তি দিতে পারে।

যা হোক যখন পূর্বোক্ত বিষয়গুলো যেমন আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, তারকা খসে পড়া ইত্যাদি প্রকাশ পাবে এবং মানুষের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম জানতে পারবে, তার সম্মুখে তার কৃতকর্ম হাজির করা হবে।

কেউ কেউ এর এ অর্থ করেছেন যে, যখন উক্ত বিষয়াবলি সংঘটিত হবে তখন কিয়ামত হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য হিসাবের সম্মুখীন হবে এবং আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে পাবে। আর তখনই প্রত্যেকে তার কৃতকর্ম পাঠ করতে শুরু করবে। বলা বাহুল্য যে, কৃতকর্মের ফল ভোগও তখন হতে পুরামাত্রায় শুরু হয়ে যাবে।

উক্ত বিষয়গুলো বিন্যাসের তাৎপর্য : সূরা আল-ইনফিতারের শুরুতে চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত চারটি বিষয়কে যেভাবে বিন্যাস করা হয়েছে এর মধ্যে কিছু হিকমত এবং ফায়দা লুক্কায়িত রয়েছে। যা ইমাম রাযী (র.) তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন– এ কয়েকটি আয়াত দ্বারা দুনিয়া বিধ্বস্ত এবং মানুষের উপর হতে শরিয়তের হুকুম রহিত হওয়া উদ্দেশ্য। আকাশ হলো ছাদ স্বরূপ। জমিন হলো ভিত্তি। যে ব্যক্তি ঘর ভাঙ্গতে চায়, সে প্রথমে ছাদ ভাঙ্গে, তারপর ছাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু ভাঙ্গে, তারপর ভিত্তি ভাঙ্গে, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া শেষ করার সময় প্রথমে ছাদ ভাঙ্গবেন। এ কারণে প্রথমে বললেন, اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ। তারপর আকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু তারকা ধ্বংস করবেন, যেমন বলেছেন, وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ। ছাদ ধ্বংস করার পর ভিত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সমুদ্র ধ্বংস করবেন। যেমন বলেছেন, وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ শেষ পর্যন্ত ভিটি ধ্বংস করবেন। যেমন বলেছেন وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ এ আয়াত দ্বারা জমিনের পিঠকে পেট এবং পেটকে পিঠ করা অর্থাৎ উল্টিয়ে ফেলা উদ্দেশ্য। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الْكَافِرُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ حَتّٰى عَصَيْتَهُ .

৬. হে মানুষ কাফের! তোমাকে কিসে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল যে জন্য তুমি তাঁর অবাধ্যাচারণ করেছ।

٧. اَلَّذِيْ خَلَقَكَ بَعْدَ اَنْ لَمْ تَكُنْ فَسَوّٰكَ جَعَلَكَ مُسْتَوِى الْخَلْقِ سَالِمَ الْاَعْضَاءِ فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ جَعَلَكَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ مُتَنَاسِبَ الْاَعْضَاءِ لَيْسَتْ يَدٌ اَوْ رِجْلٌ اَطْوَلَ مِنَ الْاُخْرٰى .

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যখন তোমার অস্তিত্ব ছিল না অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন যথাযথভাবে সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তোমাকে সুসম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। এমন নয় যে, হাত বা পা কোনোটি অপরটি অপেক্ষা দীর্ঘ।

٨. فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا زَائِدَةٌ شَاءَ رَكَّبَكَ .

৮. তিনি যে আকৃতিতে ইচ্ছা করেছেন এখানে مَا অব্যয়টি অতিরিক্ত তোমাকে গঠন করেছেন।

٩. كَلَّا رَدْعٌ عَنِ الْاِغْتِرَارِ بِكَرَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى بَلْ تُكَذِّبُوْنَ اَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ بِالدِّيْنِ الْجَزَاءِ عَلَى الْاَعْمَالِ .

৯. না, কখনও নয় এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে প্রতারিত হওয়া থেকে শাসানোর উদ্দেশ্যে। তোমরা তো অস্বীকার কর হে মক্কাবাসী কাফেরগণ! প্রতিফল দিবসকে আমলের প্রতিফল।

١٠. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ لِاَعْمَالِكُمْ .

১০. অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়কগণ রয়েছে ফেরেশতাদের মধ্য হতে, তোমাদের আমলসমূহ তত্ত্বাবধানের জন্য।

١١. كِرَامًا عَلَى اللّٰهِ كَاتِبِيْنَ لَهَا .

১১. সম্মানিত আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধকারীগণ তা।

١٢. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ جَمِيْعَهُ .

১২. এরা জানে যা তোমরা আমল কর সব কিছুই।

তাহকীক ও তারকীব

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ বাক্যটি حَالٌ হিসেবে নসবের অবস্থায় রয়েছে। ذُو الْحَالِ হলো تُكَذِّبُوْنَ ক্রিয়ার فَاعِلٌ বা কর্তা।

جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ ও হতে পারে। কাফেরদের تَكْذِيْب-কে বাতিল করার জন্য উক্ত বাক্যটি নেওয়া হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : এ আয়াতের তিনটি ই'রাব হতে পারে।

১. حَالٌ হিসেবে মানসূব অবস্থায় আছে, তখন ذُو الْحَالِ হবে كَاتِبِيْنَ-এর মধ্যকার সর্বনামটি।

২. অথবা, كَاتِبِيْنَ-এর সিফাত হিসেবে মানসূব অবস্থায় আছে।

৩. অথবা, নতুন বাক্য হিসেবে মারফূ' অবস্থায় আছে। -[ফাতহুল কাদীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনের আয়াতগুলোতে দুনিয়া ধ্বংসের কথা আলোচনার সাথে সাথে আখেরাতে কৃতকর্ম উপস্থিত পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখন উক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর অনুগত হয়ে আখেরাতে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা মতান্তরে আবূ শোরাইক যার প্রকৃত নাম উসাইদ ইবনে কালাদাহ নামক ধর্মদ্রোহী কাফের একবার নবী করীম ﷺ-এর অন্তরে ব্যথা দিয়েছিল। এ অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে তৎক্ষণাৎ কোনো শাস্তি দেননি, তাকে উপলক্ষ করে উপরিউক্ত يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। -[খাযেন]

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ-এর বিশদ ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহ তা'আলা নাফরমান কাফের-মুশরিককে সম্বোধন করে বলেছেন, হে কাফের! তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে কে তোমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, যার ফলে তুমি তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে রয়েছ?

পরম দয়ালু আল্লাহর অসীম রহমত ও অনুগ্রহ পেয়ে তাঁর প্রতি পরম কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়ে থাকা এবং তাঁর নাফরমানি করার লজ্জায় সংকুচিত হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হে মানুষ! তুমি একটি অতি বড় বিভ্রান্তিতে পড়ে চরমভাবে আত্ম প্রতারিত হয়েছ। তোমরা মনে করে বসেছ যে, তোমার যা কিছু হয়েছে তা তোমার চেষ্টারই ফল। অথচ তোমার মনে কখনো তোমার অস্তিত্ব দানকারীর অনুগ্রহ মেনে নেওয়ার চিন্তা জাগল না। এটা হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে– তুমি দুনিয়ায় যা চাও, তাই করতে পারছ, কোনো ভুল বা পাপের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ছ না, তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যাচ্ছে না, তোমার উপর বজ্রপাত হচ্ছে না, এটা তোমার আল্লাহর ঐকান্তিক অনুগ্রহ ছাড়া আর কি? কিন্তু আল্লাহর এ অনুগ্রহকে তুমি তাঁর দুর্বলতা মনে করেছ এবং এ ধোঁকায় পড়েছ যে, তোমার আল্লাহর রাজ্যে সুবিচার বলতে কিছুই নেই।

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاِنْسَانُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য– এ ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়–

১. কাফের উদ্দেশ্য। কেননা পরে كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ বলা হয়েছে।
২. সমস্ত গুনাহ্গার এবং কাফের اِنْسَانٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এ অর্থটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। কেননা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ খাস হলে হুকুম খাস হওয়া জরুরি নয়। -[কাবীর]
৩. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, اِنْسَانٌ বলতে পুনরুত্থান অস্বীকারকারীকে বুঝানো হয়েছে।
৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, اَلْاِنْسَانُ বলতে এখানে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা উদ্দেশ্য।
৫. হযরত ইকরামা (র.) বলেন, উবাই ইবনে খালফ উদ্দেশ্য।
৬. ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর দ্বারা সমস্ত গুনাহগার ও কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

কে এবং কিভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়? : শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। শয়তান এসে বলে যে, তোমার প্রভু করুণাময় দয়ালু। দুনিয়াতে তোমাকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন তদ্রূপ আখেরাতেও করবেন। অতএব মন যা চায় করতে থাক।

অথবা, এমন ধরনের কিছু বলে, যাতে আল্লাহর করুণাকে পেশ হয়ে থাকে। যেমন–কোনো মানুষকে শয়তান বলেছিল– تَكَثَّرْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا : سَتَلْقٰى فِىْ غَدٍ رَبًّا غَفُوْرًا অর্থাৎ গুনাহ যা করতে পার শক্তি অনুযায়ী বেশি বেশি করে নাও আগামী দিন তো করুণাময়-ক্ষমাশীল প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, মানুষকে তার উপর বিজয়ী শত্রু এসে ধোঁকা দেয়–তা হলো মূর্খতা। যেমন নবী করীম ﷺ উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, غَرَّهُ الْجَهْلُ অর্থাৎ তাকে মূর্খতা-ই ধোঁকায় নিমজ্জিত করে রেখেছে। -[রুহুল মা'আনী]

তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন যে, শয়তান বনী আদমকে বিভ্রান্ত করেছে। -[নূরুল কোরআন]

ইমাম কুরতুবী (র.) আরও লিখেন যে, কারো মতে মানুষকে عَفْوُ اللّٰهِ তথা আল্লাহর ক্ষমাই ধোঁকায় ফেলেছে। কেননা তিনি প্রথম অবস্থায় তাকে শাস্তি দেননি। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আশয়াস বলেন– একদা ফুযাইল ইবনে ইয়াদকে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যদি আল্লাহ তোমাকে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান করেন, অতঃপর প্রশ্ন করেন ؛ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ তুমি তখন কি বলবে? তখন সে উত্তর করল– আমি বলব, হে আল্লাহ তোমার سَتَّارٌ নামক গুণ আমাকে ধোঁকায় রেখেছে। কেননা তিনি سَتَّارٌ كَرِيْمٌ তিনিই [দোষ গোপনকারী]। -[কুরতুবী]

ন্য শব্দ উল্লেখ না করে إِنْسَانٌ উল্লেখের কারণ : যে মাখলুকের মধ্যে إِنْسَانِيَّةٌ (মনুষ্যত্বের)-এর মতো বিরাট গুণ য়েছে, যে গুণের মাধ্যমে মানুষ পশুত্ব থেকে আলাদা হয়ে সম্মানিত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে সে গুণে নাড়া দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করতে চান। কেননা إِنْسَانٌ [মানুষ] তো إِنْسَانِيَّةٌ (মনুষ্যত্বের)-এর কারণেই হয়েছে। إِنْسَانِيَّةٌ হারিয়ে গেলে إِنْسَانٌ থাকে না। إِنْسَانِيَّةٌ থেকে নিম্নে নেমে পশুত্বে চলে আসে। এ কারণেই বলা হয়েছে أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

একজন পরিপূর্ণ মানুষকে আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? : উল্লিখিত আয়াতটি মানব সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহ। পূর্ণ সৃষ্টি রহস্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে একটি নাপাক পানির نُطْفَةٌ তথা সূক্ষ্ম কণা-এর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যে মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তাকে একটি পূর্ণ মানবাকৃতি উপহার দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন। نُطْفَةٌ থেকে রক্তের টুকরা, রক্তের টুকরাকে গোশতের টুকরা, গোশতের টুকরাকে হাড়ে রূপান্তরিত করেছেন। সে হাড়ের চতুষ্পার্শ্বে গোশতের আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে স্থাপন করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে বিকলাঙ্গ সৃষ্টি করতে পারতেন। তা না করে মানুষকে সু-সমন্বিতভাবে তৈরি করেছেন। কোথাও কোনো থাপছাড়া অবস্থা প্রকাশ পায়নি। সকলের অবয়ব কাঠামো এক রকম হলেও পরিচিতিতে একে অপরের সাথে মিশে যায় না। সৃষ্টির এক অপূর্ব বৈচিত্র্য এখানে ফুটে উঠেছে।

হযরত ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের তালুতে থু থু রাখলেন, তারপর তাতে আঙ্গুল ধরে বললেন-"আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বনী আদম, তুমি আমাকে কোথায় অক্ষম মনে করছ, অথচ এমনি ধরনের বস্তু হতে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি?" -[ইবনে কাছীর]

মানুষের দেহে আল্লাহর আশ্চর্যজনক কুদরত : আল্লাহ তা'আলা মানবদেহে তাঁর অসীম কুদরতের লীলা লুকিয়ে রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ আর তোমাদের নিজেদের (দেহের) মধ্যেই আল্লাহর বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তোমরা কি তা দেখতে পাওনি? বস্তুত মানুষ একটু চিন্তা করলেই তা দেখতে ও বুঝতে পারে।

এ মর্মে সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) লিখেছেন যে, সুন্দর এবং ভারসাম্যপূর্ণ এ শরীরে দৈহিক, জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমাবেশ বিদ্যমান। শরীরের মধ্যে এগুলো সুসমমণ্ডিতভাবে অবস্থান করছে। মানব শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এককেটি যন্ত্রের কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা মানবদেহকে টিকিয়ে রাখার জন্য অসংখ্য যন্ত্র দেহের মধ্যে সংস্থাপন করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো হাত। মানুষের হাত একটি বিস্ময়কর যন্ত্র। দুনিয়াতে অদ্যাবধি এমন কোনো যন্ত্র তৈরি হয়নি; যা হাতের সমকক্ষ হতে পারে। হাতকে ইচ্ছেমতো খোলা যায়, বন্ধ করা যায়, দ্রুত কোনো বস্তু ধরা যায়, সাথে সাথে ছেড়ে দেওয়া যায় যেমন- বই খুলতে হাতের অবদান উল্লেখ করা যাক- সহজে বই খোলা যায়, নির্দিষ্ট পাতার উপর হাত রেখে যথাযথভাবে ধরে রাখা যায়। এক পাতা হতে অন্য পাতায় যাতে সহজে যাওয়া যায়, খোলা যায়, হাত দিয়ে কলম ধরা যায়, সহজে লেখা যায়। দুনিয়ার সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করতে হলে হাতকে ব্যবহার করতে হয়। ইত্যাদি বহু কাজই হাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারা যায়।

فَعَدَلَكَ -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : فَعَدَلَكَ শব্দটি عَدْلٌ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- ইনসাফ, ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্য ইত্যাদি। এখানে মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন-"جَعَلَكَ مُعْتَدِلَ الْخَلْقِ مُتَنَاسِبَ الْأَعْضَاءِ لَيْسَتْ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَطْوَلَ مِنَ الْأُخْرَىٰ" অর্থাৎ আল্লাহ তোমার সৃষ্টিকে সুষম করেছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসামঞ্জস্য পূর্ণ করেছেন। এমনভাবে যে, একটি হাত বা পা অন্যটি হতে দীর্ঘ নয়।

২. আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন- جَعَلَكَ مُعْتَدِلًا অর্থাৎ তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।

৩. হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, "عَدَلَ خَلْقَكَ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় সৃষ্টিতে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।

৪. হযরত আতা (র.) বলেছেন, আল্লাহ তোমার শরীরকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ আয়াতের যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অতি সুন্দর ও সম্মানিত করে সৃষ্টি করা সত্ত্বেও, মানুষ চরম অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে আল্লাহর সাথে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে। শয়তানও কু-প্রবৃত্তির চক্রান্তে পড়ে স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেছে। আলোচ্য আয়াত হতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ কেন আল্লাহকে অস্বীকার করে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে? তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরকাল পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার, অবিশ্বাস করার দরুনই তারা এ দুর্নীতি অবলম্বন করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

كَلَّا ব্যবহারের কারণ : ধোকায় পড়া থেকে বিরত থাকার জন্য كَلَّا ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এরূপ ধোকায় পড়ার কোনো যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। তোমার সত্তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন যে, তুমি নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারনি, তোমার পিতা-মাতাও তোমাকে সৃষ্টি করেনি; বরং এক মহাজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ-ই তোমাকে এ পরিপূর্ণ মানবাকৃতিতে রূপায়িত করেছেন। তোমাকে জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে ভিন্নতর সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাই তোমার মস্তক অনুগ্রহ ভারে আপনা-আপনি-ই আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়ে পড়াই ছিল তোমার বিবেক ও জ্ঞান বুদ্ধির ঐকান্তিক দাবি। আল্লাহর দয়ার কারণে তাঁর বিদ্রোহী হওয়া যে, কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না, তার সত্যতার সাক্ষ্য দানের জন্য তোমার নিজের স্বভাব-প্রকৃতিই যথেষ্ট। তোমার এ ভুল ধারণারও চিরতরে অবসান হওয়া আবশ্যক যে, তুমি যা ইচ্ছা তাই করবে, তোমাকে পাকড়াও করার কেউ নেই।

بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ আয়াতে بَلْ-এর অর্থ : بَلْ এমন একটি হরফ যা তার পূর্ববর্তী হুকুমকে নফী করে পরবর্তী হুকুমকে সাবেত বা স্থায়ী করে। আয়াতে কারীমায় بَلْ একটি উহ্য বাক্যের হুকুমকে নফী করেছে। মূল ইবারত এভাবে হবে যে–

بَعْدَ الرَّدْعِ وَاَنْتُمْ لَا تَرْتَدُّوْنَ عَنْ ذٰلِكَ بَلْ تَجَاوَزُوْنَهُ اِلٰى مَا هُوَ اَعْظَمُ مِنْهُ مِنَ التَّكْذِيْبِ بِالدِّيْنِ وَهُوَ الْجَزَاءُ اَوْ بِدِيْنِ الْاِسْلَامِ.

অর্থাৎ তোমাদেরকে ধমক দেওয়ার পরও তোমরা ফিরে আসনি; বরং ধমক দেওয়া বস্তুকে অতিক্রম করে আরো মারাত্মক কাজে লিপ্ত হয়েছ, আর তা হলো বিচার দিনের অস্বীকৃতি অথবা দীন ইসলামকে অস্বীকৃতি। –[ফাতহুল কাদীর]

فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ আয়াতে مَا-এর অর্থ : مَا شَاءَ رَكَّبَكَ আয়াতাংশের مَا-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরীনদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

১. কেউ কেউ বলেন, مَا এখানে اَلشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং পূর্ণ আয়াতের রূপ এভাবে হবে যে, فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ اَنْ يُّرَكِّبَكَ فِيْهَا رَكَّبَكَ .

হযরত আবূ সালেহ এবং মুকাতিল উক্ত বাক্যের অর্থ এভাবে করেছেন–

اِنْ شَاءَ رَكَّبَكَ فِىْ غَيْرِ صُوْرَةِ الْاِنْسَانِ مِنْ صُوْرَةِ كَلْبٍ اَوْ حِمَارٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ اَوْ قِرَدَةٍ .

অর্থাৎ তিনি [আল্লাহ] যদি তোমার আকৃতিকে মানুষের আকৃতি ছাড়া কুকুর অথবা গাধা অথাব শূকর অথবা বানরের আকৃতি করতে চাইতেন [অবশ্যই করতে পারতেন]। –[কাবীর]

২. مَا অতিরিক্ত, তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তখন অর্থ এভাবে হবে যে, فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ تَقْتَضِيْهَا مَشِيْئَتُهُ وَحِكْمَتُهُ مِنَ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَةِ অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা এবং হিকমত বিভিন্ন আকৃতি থেকে যে আকৃতি পছন্দ করতেন [তাই তিনি করতে পারেন]। –[কাবীর]

صُوَرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : صُوَرٌ [বিভিন্ন আকৃতি] বলতে কি বুঝানো হয়েছে। এ নিয়ে ওলামায়ে মুফাসসিরীনের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যেমন–

১. বিভিন্ন আকৃতি বলতে মাতাপিতা, অথবা পিতার দিক থেকে নিকটতম ব্যক্তিবর্গ অথবা মাতার দিক থেকে নিকটতম ব্যক্তিবর্গের সাদৃশ্য হওয়া বুঝিয়েছে। তখন অর্থ এ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার আকৃতি উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের আকৃতি সদৃশ্য করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

اِذَا اسْتَقَرَّتِ النُّطْفَةُ فِى الرَّحِمِ . اَحْضَرَهَا اللّٰهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اٰدَمَ .

২. ইমাম ফাররা এবং যুজাজ (র.) বলেন, বিভিন্ন আকৃতি বলতে লম্বা-খাটো, সুন্দর-কুশ্রী এবং পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ বুঝানো হয়েছে

৩. বিভিন্ন আকৃতি বলতে বিভিন্ন অবস্থার লোকও হতে পারে। যেমন–ধনী-গরিব, সুস্থ-অসুস্থ এবং অধিক ও কম বয়সী ইত্যাদি –[কাবীর]

৪. কারো মতে, ঐ ব্যক্তি হতে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত সকলের আকৃতি সম্মুখে রাখা হয়, তারপর আকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু সৃষ্টির নিয়মানুযায়ী অবিকল দু'টি আকৃতি কখনো দেওয়া হয় না। –[নূরুল কোরআন]

মানুষের উপর সংরক্ষকের সংখ্যা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন, যারা তাদের সাথে সব সময় থাকতে পারে, তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে, তাদের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব রাখতে পারে। তারা এ সকল কাজ কিভাবে করে তা আমাদের জানার বাইরে। এর ধরন জানার জন্য আমরা আদিষ্ট নই। আল্লাহ-ই জানেন যে, আমরা এটা বুঝার শক্তি রাখি না। এটা বুঝা না বুঝার মধ্যে আমাদের কোনো কল্যাণ নেই। –[যিলাল]

হযরত ওসমান (রা.) একদা নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের উপর কত ফেরেশতা থাকে? নবী করীম ﷺ বললেন, বিশজন ফেরেশতা।

কেউ কেউ বলেছেন, رَحِم তথা বাচ্চাদানীতে نُطْفَة তথা বীর্য যাওয়ার সময় হতেই চরশত ফেরেশতা দেখা-শুনার জন্য নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে যারা প্রত্যেকে কৃতকর্ম রেকর্ড করেন তাঁরা হলেন, দু'জন ফেরেশতা। ভালো কাজের রেকর্ডকারী [লেখক] ডান কাঁধে এবং অন্যান্য সকল কাজ রেকর্ডকারী [লেখক] বাম কাঁধে অবস্থান করছেন। ডান কাঁধের ফেরেশতা বাম কাঁধের ফেরেশতার উপর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে আছেন। বাম কাঁধের ফেরেশতা কোনো খারাপ কাজ রেকর্ড করতে পারেন না; যতক্ষণ না ছয় ঘণ্টা অতিক্রম হয়। এ ছয় ঘণ্টার ভিতরে যদি সে খারাপ কাজকে মিটানোর মতো কোনো কাজ না হয়, তাহলে রেকর্ড হয়ে যায়। ঐ ফেরেশতাগণ সকল কিছু রেকর্ড করেন, এমনকি রোগীর আহ-উহ্ পর্যন্ত রেকর্ড করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উলঙ্গ হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তোমাদের সাথে যে সমস্ত ফেরেশতা রয়েছেন, তাদের থেকে লজ্জা করবে। লেখক ফেরেশতাগণ তিন সময় ছাড়া তোমাদের নিকট থেকে সরেন না। এ তিন সময় হলো– পায়খানা, স্ত্রী সহবাস ও গোসল করার সময়; কিন্তু এ তিন সময় লিখা থেকে বিরত হন না। এ দু'ফেরেশতা বান্দার সাথে মৃত্যু পর্যন্ত থাকেন। তারপর কবরের উপর দাঁড়িয়ে তাসবীহ্ তাহ্লীল ও তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকেন। যদি মু'মিন ব্যক্তি হয়ে থাকে তাহলে এর ছওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত লিখেন। আর যদি কাফের হয় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত উভয়ে অভিশাপ দিতে থাকেন। –[রূহুল মা'আনী]

কাফেরদের সাথে সংরক্ষক আছে কিনা? : কাফেরদের সাথে সংরক্ষক ফেরেশতা আছে কিনা। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেছেন, তাদের সাথে حَفَظَة বা সংরক্ষক নেই। কেননা তাদের কার্যাবলি একমুখি– হিসেব করার অপেক্ষা রাখে না। এ কারণে আল্লাহ বলেছেন–يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ

২. কেউ কেউ বলেন, তাদের সাথে সংরক্ষক ফেরেশতা আছেন। যেমন বলা হয়েছে–

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ . وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَ . يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ .

অন্যত্র আছে وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ وَرَاءَ ظَهْرِهٖ অন্য জায়গায় বলা হয়েছে وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهٗ بِشِمَالِهٖ উক্ত কয়েকটি আয়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কাফেরদেরও كِتَاب (আমলনামা) হবে এবং তাদের জন্য حَفَظَة বা সংরক্ষণ আছে। তবে এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, কাফেরের ডান কাঁধের ফেরেশতা কি লিখবে, তার তো কোনো حَسَنَة [ছওয়াব] নেই? উক্ত প্রশ্নের জবাব এটা হবে যে, বাম কাঁধের ফেরেশতা তাঁর অনুমতি ছাড়া কিছুই লিখবে না এবং যা লিখবে তার উপর সাক্ষ্য দিবে। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) –[কুরতুবী]

ফেরেশতাগণ কিভাবে জানবে যে, বান্দা ভালো বা খারাপের ইচ্ছা করেছে? : কোনো বান্দা মনে মনে যদি কোনো ভালো বা খারাপ কাজের নিয়ত করে তাহলে ফেরেশতা কিভাবে জানবে এবং লিখবে? এ ব্যাপারে হযরত সুফিয়ান (র.) জিজ্ঞেসিত হলে উত্তরে বললেন– বান্দা যখন ভালো কাজের নিয়ত করে, তখন ফেরেশতাগণ মৃগনাভীর (মিশকের) সুগন্ধি পায়। আর যদি খারাপ কাজের নিয়ত করে, তখন তার নিকট হতে দুর্গন্ধ পায়। –[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ..... كَاتِبِيْنَ : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের সকল কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের সাথে ফেরেশতাগণকে নিয়োজিত রেখেছেন।

এ দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বহীন ও লাগাম ছাড়া বানিয়ে ছেড়ে দেননি। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যায্যদাবি পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শক নিযুক্ত করেছেন। অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তারা মানুষের ভালো বা মন্দকাজ লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। মানুষের কোনো কাজই তাদের অগোচরে থাকতে পারে না।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

মানুষ অন্ধকারে নিঃসঙ্গ একাকীত্বে, নির্জন অরণ্যে কিংবা এমন স্থানে যেখানে কেউই দেখতে পাবে না বলে সম্পূর্ণ নিশ্চিত-কোনো পাপের কাজ করলে তাও তাদের অজানা থাকে না।

উক্ত পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শক ফেরেশতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা كِرَامًا كَاتِبِيْنَ বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান ফেরেশতা। কারো সাথে তাদের ব্যক্তিগত ভালোবাসা বা শত্রুতা নেই। কাজেই কাউকে অকারণে সুবিধা দান অথবা কারো প্রতি অযৌক্তিক কঠোরতা অবলম্বন করে তার নামে মিথ্যা কাজের রেকর্ড তৈরি করা তাদের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়; তাঁরা অবিশ্বাসীও নয়, মূল কাজ প্রত্যক্ষভাবে না দেখে নিজের ইচ্ছে মতো কারো কারো নামে লিখে দেওয়াও তাঁদের কাজ নয়; তারা ঘুষখোর ও দুর্নীতি পরায়ণও নয়। কিছু গ্রহণ করে তার বিনিময়ে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে মিথ্যা রিপোর্ট প্রদান করবেন না।

আমল লিপিবদ্ধ করার হেকমত : আল্লাহ তা'আলা তো মানুষের সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কেই অবহিত রয়েছেন। তথাপি ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আমল লিপিবদ্ধ করার হেকমত বা রহস্য কি? মুফাস্সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। ক. যেন তাদের সামনে আমলনামা রাখলে অস্বীকার করতে না পারে। খ. এ ছাড়া 'কার্যাবলি সংরক্ষণ' করার কথা বললে মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়বে।

قَوْلُهُ تَعَالَى يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা যা কিছু কর তা তারা জানেন। এ ফেরেশতাগণ প্রত্যেকটি মানুষের সব করমের কাজ সম্পর্কেই সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তারা প্রত্যেক স্থানে সর্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই লেগে আছেন। এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা তা টেরও পায় না। কোনো পর্যবেক্ষক বা পরিদর্শক যে তার সব কাজ দেখছে ও রেকর্ড করছে, তা বাহ্যত বুঝতে পারা যায় না। এমনকি কোন লোক কোন মনোভাব নিয়ে কি কাজ করেছে তাও তারা জানতে পারেন। এ সব কারণে তাদের তৈরি করা রেকর্ড- আমলনামা পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল। কোনো একটি কাজও তা যতই ছোট ও সামান্যই হোক না কেন-অলিখিত থাকতে পারে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- কিয়ামতের দিন পাপীরা যখন দেখতে পাবে যে, তাদের যে আমলনামা পেশ করা হয়েছে, তাতে ছোট বা বড় কোনো কাজই অলিখিত থাকেনি, তারা যা কিছুই করেছে সবই এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে ও তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, তখন তাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না।

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ-এর উপর একটি অভিযোগ ও তার উত্তর : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা [মানুষেরা] যাই করনা কেন লেখক ফেরেশতাগণ তা অবগত আছেন।

অপর দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, মনে মনে আল্লাহর জিকির করার এমন সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে যা লেখক ফেরেশতাও জানতে পারে না- অথচ প্রকাশ্য জিকির হতে এর ফজিলত সত্তর গুণ বেশি।

এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো কোনো কলবী আমল বা মনের ধ্যান-ধারণা লেখক ফেরেশতাগণের নিকটও অজানা থেকে যায়। একমাত্র আল্লাহই তা অবগত হন। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, অনেক বিষয়ে মানুষ অবগত না হলেও ফেরেশতাগণ অবগত হয়ে থাকেন। আবার এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা ফেরেশতাগণও জানেন না, একমাত্র আল্লাহই তা অবগত আছেন কারণ বহু হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নেক কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করতেই এর ছওয়াব আমলনামায় লেখা হয়। তবে মনের কোনো কোনো অবস্থা তারা বুঝতে পারে না। মনের অবস্থার সীমা নির্ধারক মানদণ্ড আল্লাহই নির্ধারণ করতে পারেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জিকিরের ঐ বিশেষ অবস্থায় নিজেই স্বীয় কুদরতে কামেলার দ্বারা ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধকরণ ব্যতিরেকেই 'ইল্লীঈন' নামক স্থানে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। যেমন আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব কার্যকলাপই কোনো ফেরেশতা ব্যতীত নিজের কুদরতের সাহায্যেই সমাধা করতে পারেন। নেক বান্দাদের আন্তরিক জিকির বা ধ্যান অত্যন্ত প্রেমিকজনের প্রদত্ত উপহারের মতো সসম্মানে নিজ কুদরতেই রেকর্ড করেন- কোনো মাধ্যম ব্যবহার হয় না; কিন্তু বান্দার যে সমস্ত গোপন আমলের সংবাদ আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেন, শুধু সে বিষয় তারা অবগত হয়ে আমলনামায় লেখেন।

এ ছাড়া অন্য অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যা জানে না, তা আল্লাহর ফেরেশতাগণ জানেন। আর ফেরেশতাগণ অনেক বিষয় জানেন না, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জানেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٣. إِنَّ الْأَبْرَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْ إِيْمَانِهِمْ لَفِيْ نَعِيْمٍ جَنَّةٍ .

১৩. নিশ্চয় পুণ্যবানগণ ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী মু'মিনগণ পরম স্বাচ্ছন্দে থাকবে বেহেশতে।

١٤. وَإِنَّ الْفُجَّارَ الْكُفَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ نَارٍ مُحْرِقَةٍ .

১৪. আর পাপাচারীগণ কাফেরগণ জাহান্নামে অবস্থান করবে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে।

١٥. يَصْلَوْنَهَا يَدْخُلُوْنَهَا وَيُقَاسُوْنَ حَرَّهَا يَوْمَ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ .

১৫. তারা তথায় প্রবিষ্ট হবে ঢুকবে ও এর উত্তাপ উপলব্ধি করবে কর্মফল দিবসে প্রতিদান দানের দিনে।

١٦. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ بِمُخْرَجِيْنَ .

১৬. তারা এটা হতে অনুপস্থিত হবে না অন্তর্হিত হতে পারবে না।

١٧. وَمَآ أَدْرَاكَ أَعْلَمَكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ .

১৭. তুমি কি জান! তোমার কি জ্ঞান আছে? কর্মফল দিবস সম্বন্ধে।

١٨. ثُمَّ مَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ تَعْظِيْمٌ لِشَأْنِهِ .

১৮. আবার বলি, তুমি কি জান! কর্মফল দিবস সম্বন্ধে এটা দ্বারা কিয়ামতের গুরুত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

١٩. يَوْمَ بِالرَّفْعِ أَيْ هُوَ يَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ط مِنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ لَا أَمْرَ لِغَيْرِهِ فِيْهِ أَيْ لَمْ يُمَكِّنْ أَحَدٌ مِنَ التَّوَسُّطِ فِيْهِ بِخِلَافِ الدُّنْيَا .

১৯. সেদিন পেশ যোগে অর্থাৎ هُوَ يَوْمٌ তা সেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করার অধিকারী হবে না উপকার হতে। সেদিন সমুদয় কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য তাতে অপর কারো জন্য কোনো কর্তৃত্ব নেই। অর্থাৎ সেখানে কারো মধ্যস্থতা থাকবে না। যেমন দুনিয়ায় হয়ে থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ يَصْلَوْنَهَا : يَصْلَوْنَهَا আয়াতাংশের কয়েকটি মহল্লে ই'রাব হতে পারে–

ক. এটা جَحِيْم -এর সিফাত হিসাবে মহল্লে মাজরূর হয়েছে।

খ. অথবা, فُجَّارٌ-এর সর্বনামটি হতে حَالٌ হয়েছে।

গ. অথবা, নতুন করে বাক্য শুরু হয়েছে এবং প্রশ্নকারীর একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে যে, جَحِيْم -এ তাদের কি অবস্থা? তখন বলা হয়েছে যে, ... يَصْلَوْنَهَا ।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ আয়াতাংশের يَوْم-এর মহল্লে ই'রাব :

১. আল্লামা ইবনে কাছীর ও আবূ আমর يَوْمَ-কে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। তা পিছনের يَوْمُ الدِّيْنِ হতে بَدَلٌ হবে, অথবা উহ্য মুবতাদার খবর হিসাবে رَفْع হবে।

২. আবূ আমর থেকে অন্য একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। তখন তিনি يَوْمٌ-কে তানবীন দিয়ে পড়েছেন, إِضَافَةٌ করেননি।

৩. বাকি সকল ক্বারীগণ يَوْمَ-কে فَتْحَه দিয়ে পড়েছেন। তখন يَوْمَ শব্দটি أَعْنِي ক্রিয়া অথবা أُذْكُرْ ক্রিয়ার মাফউল হবে

৪. অথবা, مَبْنِيْ عَلَى الْفَتْحِ হবে, কেননা তা একটি বাক্যের দিকে إِضَافَةْ হয়েছে। আর এটা কূফীদের অভিমত।

৫. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, يَوْمَ শব্দটি رَفْعٌ-এর অবস্থায় আছে; কিন্তু لَا تَمْلِكُ ক্রিয়ার দিকে إِضَافَةْ হওয়ার কারণে مَبْنِيْ عَلَى الْفَتْحِ হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে সমস্ত কর্মকাণ্ডের সংরক্ষণ এবং লিখার কথা আলোচিত হয়েছে। এখন তার উপর ছওয়াব এবং শাস্তির আলোচনা শুরু হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দার আমল-লেখকদের প্রশংসা করেছেন, পাশাপাশি এখন আমলকারীদের অবস্থান-অবস্থিতির কথা আলোচনা শুরু করেছেন। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ ...... لَفِيْ جَحِيْمٍ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে অতি সংক্ষেপে মু'মিন ও কাফেরদের পরকালীন পরিণামের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে যে, যারা দুনিয়ায় পুণ্যবান হিসাবে গণ্য হয়েছে; ঈমান আনয়ন করে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন, কুফরি করেনি; কিংবা ফিসক ও নিফাকে জড়িয়ে পড়েনি। তাদের আবাস হবে জান্নাত, তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকবে। অসংখ্য নিয়ামত লাভের পর সে মহানিয়ামত তারা লাভ করবে, তা হলো আল্লাহর দীদার। তথায় তাদের কোনো আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না। অপরদিকে যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং পাপাচারে লিপ্ত রয়েছে, তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। চিরকাল তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তথায় তারা না বাঁচবে, না মৃত্যুবরণ করবে। তাদের চামড়া একবার পুড়ে যাওয়ার পর পুনরায় নতুন চামড়া গজিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে। শত কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও তারা কখনো কোনো ক্রমেই জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে না।

اَلْأَبْرَارُ ও اَلْفُجَّارُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَبْرَارٌ শব্দটি بَارٌّ-এর বহুবচন। অর্থ- পুণ্যবান, সত্যবাদী, নেককার। কুরআনে মাজীদের পরিভাষায় সৎকর্মশীল একনিষ্ঠ মু'মিনগণকে اَبْرَارٌ বলে।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেছেন, যারা আল্লাহর অনুগত এবং গুনাহ করে না তাদেরকেই اَبْرَارٌ বলে।

فُجَّارٌ শব্দটি فَاجِرٌ-এর বহুবচন। অর্থ- পাপী, বদকার, দুষ্কৃতিকারী, ব্যভিচারী ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় তাদেরকে فُجَّارٌ বলে।

আলোচ্য আয়াতে فُجَّارٌ দ্বারা পাপাচারী কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেছেন, ভালো কাজ করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে তাদেরকে اَبْرَارٌ বলে।

نَعِيْمٌ এবং جَحِيْمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : نَعِيْمٌ-এর শাব্দিক অর্থ হলো- নিয়ামত, সুখ-সম্ভোগ ইত্যাদি এবং جَحِيْمٌ-এর অর্থ হলো- প্রজ্বলিত আগুন। এখানে এতদুভয়ের দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, এখানে نَعِيْمٌ দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে এবং جَحِيْمٌ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি তথা জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, نَعِيْمٌ হলো আল্লাহর কাজে ব্যস্ত থাকা, আর جَحِيْمٌ হলো গায়রুল্লাহর কাজে মশগুল থাকা।

গ. হযরত জা'ফর সাদিক (র.) বলেছেন, نَعِيْمٌ হলো মারেফাত এবং মুশাহাদা আর جَحِيْمٌ হলো কামভাব ও কু-প্রবৃত্তির অন্ধকার।

ঘ. কারো কারো মতে, نَعِيْمٌ হলো তাওয়াককুল বা ভরসা এবং جَحِيْمٌ হলো লোভ-লালসা।

ঙ. কেউ কেউ বলেছেন, نَعِيْمٌ হলো اَلْقَنَاعَةُ বা অল্পে তুষ্টি এবং جَحِيْمٌ হলো লোভ-লালসা বা طَمَعٌ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

لَفِيْ جَحِيْمٍ وَلَفِيْ نَعِيْمٍ-এর نَعِيْمٍ ও جَحِيْمٍ-কে নাকেরা নেওয়ার কারণ : আল্লাহর বাণী- لَفِيْ نَعِيْمٍ-এর অন্তর্নিহিত نَعِيْمٍ শব্দটিকে تَفْخِيْمٌ (বড়ত্ব)-এর জন্য نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা نَعِيْمٌ তথা জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে ও জান্নাতীদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে لَفِيْ جَحِيْمٍ-এর মধ্যে جَحِيْمٌ-কে تَهْوِيْل [ভয়ংকরকরণ]-এর জন্য نَكِرَةٌ বা অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জাহান্নাম অত্যন্ত ভয়াবহ স্থান এবং তথায় জাহান্নামীদের জন্য কঠোর আজাব অপেক্ষা করছে। এর মাধ্যমে কাফেরদেরকে দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ الدِّيْنِ-কে দ্বিরুক্ত করার কারণ : কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা বুঝানোর জন্য اَلدِّيْنِ-কে দ্বিরুক্ত করা হয়েছে। যেমন অন্যস্থানে করা হয়েছে "اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ...." -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ : আল্লাহর বাণী وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ-এর তাফসীরে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন- এক মুহূর্তের জন্যও তারা আজাব হতে মুক্তি পাবে না এবং শাস্তির মধ্যে কোনোরূপ শৈথিল্য করা হবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো لَا يُفَارِقُوْنَهَا اَبَدًا অর্থাৎ তারা কখনো জাহান্নাম হতে পৃথক হতে পারবে না।

কারো কারো মতে, لَا يَغِيْبُوْنَ عَنْهَا অর্থাৎ জাহান্নাম হতে তারা অনুপস্থিত থাকতে পারবে না বা পালিয়ে যেতে পারবে না।

কেউ কেউ বলেছেন, তারা দোজখে প্রবেশের পূর্বেও পালিয়ে যেতে পারবে না; বরং কবরেও তারা দোজখের আগুনের তাপ অনুভব করবে। -[ফাতহুল কাদীর]

নবী করীম ﷺ বলেছেন, কাফেরকে কবরে তার দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে আমি জানিনা। তখন আসমান হতে এ ঘোষণা আসবে যে, সে মিথ্যা বলেছে। তাকে আগুনের বিছানা করে দাও, আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং দোজখের দিকে তার দরজা খুলে দাও। -[নূরুল কোরআন]

وَمَا اَدْرَاكَ الخ আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী وَمَا اَدْرَاكَ الخ-এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে-এ ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

কারো মতে, এখানে وَمَا اَدْرَاكَ الخ-এর দ্বারা কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেউ বলেন শুধু হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। একদল মুফাস্সিরের মতে এখানে সাধারণভাবে সকলকেই বুঝানো হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا আয়াতাংশের মর্মার্থ : সেদিন কেউ অপর কারো কোনোরূপ উপকার করতে সক্ষম হবে না। কেউই অন্যকে তার আমলের কর্মফল লাভ হতে রক্ষা করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তিই অপরকে আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না সে তার যত নিকটেরই হোক না কেন। বস্তুত সেদিন সকলেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, অন্যের উপকার করার চিন্তাও করবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, সেদিন মানুষ নিকটাত্মীয় যেমন মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হতে পৃথক হয়ে যাবে, কেউই এগিয়ে আসবে না।

قَوْلُهُ "وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ" : সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই হবে। সেদিন কর্তৃত্বের ব্যাপারে কেউ ঝগড়া করবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ আজকের ক্ষমতা কার? একমাত্র আল্লাহর। -[কুরতুবী]

সেদিন কোনো কাফের উপকার বা শান্তির কোনো বাণী শুনতে পাবে না এবং তাদের জন্য হবে আজাব আর আজাব।

ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর দ্বারা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন এ সত্য প্রকাশ পাবে যে, মহান আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো কোনো ক্ষমতা নেই, কোনো সাহায্যকারী নেই। এমনকি কেউ আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশও করতে পারবে না। সৃষ্টির প্রথম দিনের পূর্বেও যেমন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কেউ ছিল না, ঠিক তেমনিভাবে কিয়ামতের দিনও এটা সুষ্টভাবে প্রকাশ পাবে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারোই কোনো অস্তিত্ব নেই। হুকুম শুধু আল্লাহ তা'আলারই। -[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ : সূরা আল-মুত্বাফ্ফিফীন

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামটি প্রথম আয়াতের لِلْمُطَفِّفِيْنَ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। কারো মতে ত্বাফিফ অর্থ কম করা, ওজনে কম দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অবিচার করা, আমানতে খেয়ানত করা প্রভৃতি। যেহেতু অত্র সূরাতে যে সকল লোক ওজনে কমবেশি করে মানুষকে প্রতারিত করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। তাই সূরার নাম মুত্বাফফিফীন রাখা হয়েছে। এতে ৩৬টি আয়াত, ১৬৯টি বাক্য এবং ৭৩০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরেক দলের মতে এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এটা মদীনায় হিজরতের পথে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অভিমতও পাওয়া যায় যে, ২৯ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কতেকের মতে ১৩ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১ – ১২ আয়াত মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে– কুরআনের কোনো আয়াতকে বিষয় ও ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করলেই সাহাবী ও তাবেঈনগণ বলতেন এটা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ– যদি একে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ না-ও হতো। যারা এ সূরাটি মাদানী বলে অভিমত রেখেছেন, তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেমন শানে নুযূলে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু সে বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতের বক্তব্য জানতে পেরে মদীনার লোকগণ পরিমাপে কারচুপি করার বদ অভ্যাসকে বর্জন করেন। এটা দ্বারা এ সূরা মদীনায়ই অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ হয় না। যে অভ্যাসটির কথা বলা হয়েছে তা যেমন মদীনার লোকদের মধ্যে ছিল অনুরূপ কমবেশি মক্কায় লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেত। অতএব, সূরার বিষয়বস্তু প্রমাণ দেয় যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো তাফসীরকার একে মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় পরকাল। প্রথম ছয়টি আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত লোকদের মধ্যে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অবস্থিত বে-ঈমানীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা অন্যদের নিকট হতে গ্রহণকালে পুরামাত্রায় মেপে ও ওজন করে গ্রহণ করত; কিন্তু অন্যদের দেওয়ার সময় ওজন ও পরিমাপে প্রত্যেককে কিছু কম অবশ্যই দিত। বর্তমান সূরায় প্রাথমিক ছয়টি আয়াতে এর-ই প্রতিবাদ, মন্দতা ও বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটির মধ্যে এটা ছিল একটি অত্যন্ত মন্দ দোষ। একে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও উপেক্ষা এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং কড়া-ক্রান্তি হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় মনে দৃঢ়মূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো লোকের পক্ষেই বৈষয়িক কাজকর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। সততা ও বিশ্বস্ততাকে কেউ ভালো পলিসি' মনে করে ছোটখাট ব্যাপারে এটা পালন করলেও করতে পারে এটা বিচিত্র নয়; সে-ই যখন অন্য কোনো ক্ষেত্রে বেঈমানী ও দুর্নীতিকে ভালো পলিসি মনে করবে, তখন তার পক্ষে সততা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত মানুষের চরিত্রে স্থায়ী বিশস্ততা ও সততা কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের প্রত্যয়ের ফলেই আসতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় সততা ও বিশ্বস্ততা কোনো পলিসি নয়, ঐকান্তিক মানবিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এর উপর স্থায়ী ও অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীতে এ নীতি সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং পরকালের ভালো ও মন্দের চিন্তাই এ ব্যাপারে তাকে প্রভাবিত করে। মোটকথা, পরকাল বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অতঃপর ৭ – ১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী লোকদের আমলনামা প্রথমেই অপরাধ প্রবণ লোকদের খাতায় লিখিত হচ্ছে এবং পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর ১৮– ২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের অতীব উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। সে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

পরিশেষে সৎ ও ভালো লোকদের সুখ-শান্তি আলোচনা করা হয়েছে এবং কাফেরদের কটাক্ষ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আল-মুত্বাফফিফীন তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সংরক্ষিত পানীয় পান করাবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-মুতাফফিফীন মক্কী অথবা মাদানী [illegible]

سِتٌّ وَّثَلَاثُوْنَ اٰيَةً : আয়াত সংখ্যা- ৩৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

১. وَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ اَوْ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ـ

২. اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى اَىْ مِنَ النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ الْكَيْلَ ـ

৩. وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَىْ كَالُوْا لَهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ اَىْ وَزَنُوْا لَهُمْ يُخْسِرُوْنَ يَنْقُصُوْنَ الْكَيْلَ اَوِ الْوَزْنَ ـ

৪. اَلَا اِسْتِفْهَامُ تَوْبِيْخٍ يَظُنُّ يَتَيَقَّنُ اُولٰۤئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ـ

৫. لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ اَىْ فِيْهِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ـ

৬. يَوْمَ بَدَلٌ مِنْ مَحَلِّ لِيَوْمٍ فَنَاصِبُهُ مَبْعُوْثُوْنَ يَقُوْمُ النَّاسُ مِنْ قُبُوْرِهِمْ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الْخَلَائِقِ لِاَجَلِ اَمْرِهٖ وَحِسَابِهٖ وَجَزَائِهٖ ـ

অনুবাদ :

১. মন্দ পরিণাম বা ধ্বংস এটা শাস্তিমূলক শব্দ কিংবা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। মাপে কম দানকারীদের জন্য,

২. যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় عَلٰى অব্যয়টি مِنْ অর্থে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে পরিমাপ।

৩. আর যখন তারা মেপে দেয় অর্থাৎ নিজেদের হতে অন্যকে মেপে দেয়, অথবা ওজন করে দেয় অন্যকে ওজন করে দেয়। তখন তারা কম দেয় পরিমাপ বা ওজনে কম দেয়।

৪. তবে কি ভয়প্রদর্শনকল্পে প্রশ্নবোধকের অবতারণা তারা মনে করে না বিশ্বাস করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।

৫. মহা দিবসে অর্থাৎ মহান দিবসে, আর তা হলো কিয়ামত দিবস।

৬. যেদিন يَوْمَ শব্দটি পূর্বোক্ত لِيَوْمٍ-এর مَحَلّ হতে بَدَلٌ সুতরাং مَبْعُوْثُوْنَ-এর নসবদানকারী। মানুষ দণ্ডায়মান হবে তাদের কবরসমূহ হতে জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের, তাঁর আদেশক্রমে হিসাব ও প্রতিদান -প্রতিফল গ্রহণের জন্য।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ-এর মহল্লে ই'রাব : يَوْمَ শব্দটি একটি উহ্য ক্রিয়ার মাফউল হিসেবে মানসূব হয়েছে। সে উহ্য ক্রিয়ার উপরে দলিল হলো مَبْعُوْثُوْنَ মূলবাক্য এভাবে হবে যে, ... يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ অথবা, لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ-এর يَوْمَ থেকে بَدَلٌ হয়েছে এবং مَبْنِىْ فَتْحٌ হিসাবে হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, يَوْمَ শব্দটি মহল্লে মাজরুরে রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, ظَرْفٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ فِىْ اِسْم আরবি বিধান মতে يَوْمَ যখন غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ-এর দিকে اِضَافَةٌ হয়, তখন يَوْمَ -কে মানসূব পড়তে হয়। আর যখন يَوْمٌ

-এর দিকে اِضَافَةٌ হয়, তখন মাজরূর পড়তে হয়। যেমন বলা হয়- اَقِمْ اِلَى يَوْمِ يَخْرُجُ فُلَانٌ (يَوْمَ-কে নসব দিয়ে), আর قِمْ اِلَى يَوْمِ خُرُوْجِ فُلَانٍ [يَوْمِ-কে যের দিয়ে]।

কেউ কেউ বলেন, উক্ত স্থানে আগ-পর করতে হবে। মূলবাক্য এভাবে যে-

اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ.

কেউ কেউ বলেন, اَعْنِىْ ক্রিয়ার মাফঊল হিসাবে মানসূব হয়েছে। অথবা, মুবতাদার খবর হয়ে رَفْع-এর অবস্থায় আছে।
-[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরায় কিয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহর হক আদায়ের তাকিদ করা হয়েছে। আর অত্র সূরায় আখেরাতের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে বান্দার হকের তাকিদ করা হয়েছে। কেননা বান্দার হক আদায় না করা হলে তার শাস্তি অবধারিত।

অথবা, বিষয়টিকে এভাবেও দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরায় আকীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে পথ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণের তাকিদ রয়েছে। আর আখেরাতের প্রতি ঈমান না থাকার কারণে মানুষ বান্দার হক আদায় করে না। পরিণামে পরকালের শাস্তি হয় অবধারিত।

আলোচ্য সূরায় এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, বিশেষত যারা ওজনে ফাঁকি দেয়, ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। তাদের শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে সূরার শুরুতে। -[নূরুল কোরআন]

শানে নুযূল : ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরতের পর দেখতে পেলেন যে, মদীনার লোকেরা পরিমাপ করে নেওয়ার সময় বেশি করে নেয় আবার অন্যকে দেওয়ার সময় পরিমাপে ও ওজনে কম দেয়। এটা মদীনাবাসীদের একটি আর্থসামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাধিতে জড়িত লোকদেরকে লক্ষ্য করে অত্র আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। এতে মানুষ নিজেদের সংশোধন করে নেয় এবং এ মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হতে ফিরে আসে। -[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

খ. অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মদীনায় আগমনের পর দেখলেন যে, সেখানে আবূ জুহায়নাহ নামক এক ব্যক্তির দু'টি পাল্লা ছিল একটি দ্বারা সে লোকদের থেকে মাল বেশি করে বুঝে নিত এবং অপরটি দ্বারা লোকদেরকে কম করে মেপে দিত। তার এ অসাধু আচরণকে লক্ষ্য করে এ আয়াতগুলো নাজিল হয়।

গ. তবে সঠিক অভিমত হলো, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা মুকাররামায় মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করে নাজিল হয়। কেননা পরকালে বিশ্বাস না করার কারণে মক্কার মুশরিকরা অন্যের নিকট হতে কোনো দ্রব্য গ্রহণ করার সময় বেশি করে মেপে নিত। আবার মানুষকে দেওয়ার সময় মাপে ও ওজনে কম দিত। মোটকথা, দুর্নীতি ও ঠকানো তাদের চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। তাদেরকে শোধরানোর জন্য অত্র আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ...... يُخْسِرُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত কয়টিতে 'মুত্বাফ্ফিফীন' তথা পরিমাপে ও ওজনে কম প্রদানকারীদের অশুভ পরিণামের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে, যারা পরকালের শাস্তি ও হিসাব-নিকাশের কথা ভুলে গিয়ে পরিমাপে ও ওজনে কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস তথা জাহান্নামের কঠোর শাস্তি। কেননা তারা অন্যের নিকট হতে পরিমাপ ও ওজন করে নেওয়ার সময় বেশি করে নেয় এবং অন্যকে দেওয়ার সময় কম করে দেয়। বস্তুত পরকাল ও হিসাব-নিকাশের প্রতি অবিশ্বাসই তাদেরকে এহেন দুর্নীতি ও অনাচারে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় মাপে ও ওজনে কম করার তিরস্কার করা হয়েছে এবং সঠিকভাবে বিন্দুমাত্র কমবেশি না করে ওজন বা পরিমাপ করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। সূরা-আল আনআম-এ বলা হয়েছে-"ইনসাফ সহকারে পুরোপুরি পরিমাপ কর, ওজন কর। আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেইনি।"

সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে- 'যখন পরিমাপ করবে, পুরামাত্রায় পরিমাপ কর, আর নির্ভুল দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।" সূরা আর-রাহমান-এ তাগিদ করা হয়েছে- "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিক ও ইনসাফ সহকারে ওজন কর এবং পাল্লায় ত্রুটি রেখো না।" শুয়াইব জাতির উপর যে অপরাধের জন্য আজাব নাজিল হয়েছিল, তা এই ছিল যে, তাদের মধ্যে ওজনে মাপে কম করার রোগ সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত শুয়াইব (আ.) -এর বারংবার উপদেশ নসিহতেও তাঁর জাতি এ অপরাধ পরিত্যাগ করেনি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَيْلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : وَيْلٌ শব্দটি আরবি ভাষায় কারো ধ্বংস, অনিষ্ট ও মন্দ কামনার একটি বাগধারা বিশেষ। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যখন এ শব্দ উচ্চারিত হয়, তখন পরিণতি মন্দ হওয়ার নিশ্চয়তার কোনো সন্দেহ থাকে না। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 'ধ্বংস'। কেউ কেউ বলেছেন- জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম হচ্ছে 'ওয়াইল।' কুরআন মাজীদের কোনো কোনো আয়াতে যেমন- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় কতিপয় তাফসীরকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এটা দ্বারা জাহান্নামের অতিশয় নিকৃষ্ট একটি স্থানের কথা বলা হয়েছে। আমরা কথায় যেরূপ বলে থাকি- ধ্বংস হোক, নিপাত যাক, তেমনি আরবি ভাষারও অনিষ্টতা ও ধ্বংস কামনায় وَيْلٌ বলা হয়। আফসোস ও অনুশোচনার অর্থেও এটা বলা হয়। কেননা যাদের ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে জানা যায় তাদের সম্পর্কেই অনুশোচনা প্রকাশ করা হয়।

আল্লামা শাওকানী (র.) লিখেন, وَيْلٌ দ্বারা এখানে কঠিন শাস্তি, অথবা স্বয়ং আজাব অথবা কঠিন মন্দকে বুঝানো হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمُطَفِّفِيْنَ-এর অর্থ : مُطَفِّفِيْنَ শব্দটি تَطْفِيْفٌ শব্দ হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- হীন, তুচ্ছ, ছোট, অপূর্ণ, কম। আর আরবি পরিভাষায় বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দেওয়া এবং ক্রয়ের সময় ওজনে বেশি আনাকে বলা হয় تَطْفِيْفٌ আলোচ্য শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ -এর ইসমে ফায়েলের বহুবচন। সুতরাং এর অর্থ হবে- যারা হাতের সাফাই দেখিয়ে গ্রাহকগণকে কম দেয় এবং মেপে আনতে বেশি আনে, অথচ গ্রাহক অথবা বিক্রেতা এর কিছুই জানতে পারে না। মোটকথা, পরিমাপে কারচুপিকারীদেরকে আরবিতে মুত্বাফফিফীন বলা হয়।

'তাত্বফীফ' একটি সামাজিক ব্যাধি : ওজনে কারচুপি একটি সামাজিক অপরাধ। কেননা এর দ্বারা মানুষের অলক্ষ্যে তাদের সম্পদ চুরি করা হয় এবং বান্দার হক নষ্ট করা হয়। বান্দার হক নষ্ট করা হলে তা বান্দা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলারও ক্ষমা করেন না। এ কারণেই ইসলাম এ কাজটিকে জঘন্যতম পাপরূপে ঘোষণা দিয়েছে। কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই ওজনে কারচুপি না করা এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। যেমন সূরা আল-আন'আমে বলা হয়েছে-ন্যায়-নীতি সহকারে পুরোপুরিভাবে মাপ ও ওজন কর, আমি কোনো লোকের উপর তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপাইনি। (১৫২ আয়াত) সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "যখন পরিমাপ করবে, পুরোমাত্রায় কর এবং নির্ভুল দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।" সূরা আর-রাহমানের ৮৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না; ঠিক ঠিক ও ন্যায়নীতির সাথে ওজন করো এবং পাল্লায় ত্রুটি রেখো না।" হাদীস শরীফেও ওজনে কারচুপির ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।

হযরত নাফে' (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বাজারে দোকানদারদের নিকট দিয়ে গমনকালে তাদেরকে বলতেন, ওগো! ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলবে ও ওজনে পুরোপুরি আদান-প্রদান করবে, কেননা পরিমাপে কারচুপিকারীগণ কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে এত দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে যে, দেহের ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত উপনীত হবে। হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর যুগে ওজনে কারচুপি করার একটি সাধারণ প্রবণতা ছিল। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন মারাত্মক পাপাচার হতে বিরত থাকার জন্য বারবার তাকিদ করলেন; কিন্তু কোনোই লাভ হলো না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন। সুতরাং ইসলামও এ পাপাচারকে মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিরূপে গণ্য করে তা হতে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। ওজনে কম দেওয়া ও মাপে বেশি আনা, অল্প হোক বা বেশি, উভয়ই আল্লাহর ঘোষিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। অল্প হলে এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না, বেশি হলে হবে- এমন নয়। বরং কমবেশি সকল ধরনের কারচুপিই এর মধ্যে শামিল। আল্লাহর নিকট তওবা করে যথাস্থানে এ হক প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত এ পাপ ক্ষমা হওয়ার কোনো আশা নেই। এটা মারাত্মক কবীরা গুনাহের পর্যায়ভুক্ত। কেননা যে সমাজে এর প্রাদুর্ভাব থাকে, সে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় যে কত চরমে পৌঁছে তা বলাই বাহুল্য। সে সমাজের ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং কোনো দিনই উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটি তেলাওয়াত করে মদীনাবাসীদেরকে বলেছেন-তোমরা জেনে রাখো, পাঁচটি পাপের কারণে পাঁচটি আজাব নাজিল হয়- ১. সামগ্রিকভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে শত্রুদেরকে তাদের উপর প্রবল করা হয়, ২. ঘুষ গ্রহণের ফলে দরিদ্রতা আসে, ৩. যে জাতি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের প্রতি মৃত্যুর আজাব আসবে, ৪. কোনো জাতি জাকাত বন্ধ করলে রহমতের বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, ৫. পরিমাপে কারচুপি করলে শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। -[আযীযী]

"اِكْتَالُوْا" -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : "اِكْتَالُوْا" এটা جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ-এর সীগাহ। বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার اِكْتِيَالٌ মূল অক্ষর হলো (ك ـ ى ـ ل) জিনসে اَجْوَفْ يَائِىْ।

اِكْتِيَالٌ শব্দটি যখন عَلٰى -এর দ্বারা মুতা'আদ্দী হয় তখন এটা অন্যের নিকট হতে ওজন করে নেওয়ার অর্থ প্রদান করে। এজন্য মুফাস্সিরগণ এখানে عَلٰى-কে مِنْ-এর অর্থে করেছেন অর্থাৎ عَلَى النَّاسِ এখানে مِنَ النَّاسِ-এর অর্থে হয়েছে। আরবি ভাষায় اِكْتَلْتُ مِنْكَ এবং اِكْتَلْتُ عَلَيْكَ উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মোটকথা, তারা যখন অন্যের নিকট হতে নিত তখন বেশি নিত, আর যখন অন্যদেরকে পরিমাপ করে দিত তখন কম করে দিত। -[কুরতুবী]

كَالُوْا এবং وَزَنُوْا-এর উপর ওয়াকফ করা প্রসঙ্গে : আল্লাহর বাণী كَالُوْا ও وَزَنُوْا-এর মধ্যে ওয়াকফ করা হবে কিনা-এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. কোনো কোনো মুফাসসির كَالُوْا এবং وَزَنُوْا-এর মধ্যে ওয়াকফ করে পড়েছেন। কেননা উভয় هُمْ পূর্ববর্তী كَالُوْا ও وَزَنُوْا-এর মধ্যকার যমীরে মুসতাতির বা উহ্য যমীর হতে بَدَلْ হয়েছে এবং তাকিদ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. ইমাম যুজাজ (র.) বলেছেন, كَالُوْا ও وَزَنُوْا-এর মধ্যে ওয়াকফ করা জায়েজ নেই; বরং هُمْ-কে তাদের সাথে যুক্ত করে পড়তে হবে।

শেষোক্ত মতটিই এখানে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। এমতাবস্থায় লামকে উহ্য মানা হবে। মূল ইবারত হবে إِذَا كَالُوْا لَهُمْ এবং وَزَنُوْا لَهُمْ যেমন نَصَحْتُكَ বাক্যটি نَصَحْتُ لَكَ-এর অর্থে হয়ে থাকে। -[কুরতুবী]

يَظُنُّ অর্থ কি এবং কেন নেওয়া হয়েছে? : يَظُنُّ শব্দটি ظَنَّ হতে فِعْل مُضَارِع-এর وَاحِد مُذَكَّر غَائِب-এর সীগাহ। এখানে ظَنَّ অর্থ يَقِيْن বা দৃঢ় বিশ্বাস। মূলবক্তব্য এই হবে যে, أَلَا يُوْقِنُ أُولٰئِكَ وَلَوْ أَيْقَنُوْا مَا نَقَصُوْا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ অর্থাৎ তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না? যদি দৃঢ় বিশ্বাস করত তাহলে অবশ্যই মাপে কম দিত না।

কেউ কেউ বলেন, ظَنَّ অর্থ تَرَدُّدْ তথা ধারণা-সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা। মূলবক্তব্য এই হবে যে, إِنْ كَانُوْا لَا يَسْتَيْقِنُوْنَ بِالْبَعْثِ فَهَلَّا ظَنُّوْهُ حَتّٰى يَتَدَبَّرُوْا وَيَبْحَثُوْا عَنْهُ وَيَأْخُذُوْا بِالْأَحْوَطِ অর্থাৎ যদি তারা পুনরুত্থানকে দৃঢ় বিশ্বাস না-ই করে, (ধারণা তো করতে পারে) তবে তারা কেন ধারণা করে না? ধারণা করলে তো কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারত এবং গবেষণা করে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারত। -[ফাতহুল কাদীর]

أُولٰئِكَ-এর উল্লেখের তাৎপর্য : এখানে أُولٰئِكَ দ্বারা পরিমাপ ও ওজনে কম প্রদানকারী তথা مُطَفِّفِيْنَ-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অবশ্য তাদেরকে বুঝানোর জন্যই هُمْ-এর উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল। তথাপি এরপর أُولٰئِكَ-কে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, هُمْ শব্দটি تَخْصِيْص বুঝায় না পক্ষান্তরে أُولٰئِكَ-এর দ্বারা تَخْصِيْص বা নির্দিষ্টকরণ বুঝানো হয়ে থাকে।

يَوْمٍ عَظِيْمٍ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং একে يَوْمٍ عَظِيْمٍ বলার কারণ : এখানে يَوْمٍ عَظِيْمٍ-এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। একে يَوْمٍ عَظِيْمٍ বা মহা দিবস বলার কারণ হচ্ছে- এ দিন সমস্ত মানুষ ও সমস্ত জীবের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর আদালতে একই সময় গ্রহণ করা হবে এবং শাস্তি ও পুরস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা করা হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, কিয়ামতের দিনকে মহা দিবস বা বড় দিন এ জন্য বলা হয়েছে যে, উক্ত দিনটি অনেক বড় হবে এবং পুনরুত্থান হিসাব-নিকাশ শাস্তি, বেহেশতবাসীর বেহেশতে প্রবেশ এবং দোজখবাসীর দোজখে প্রবেশ ইত্যাদির মতো বড় বড় কাজ এদিনে সংঘটিত হবে।

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা : একদিন হযরত ইবনে ওমর (রা.) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ তেলাওয়াত করতে করতে يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ পর্যন্ত পৌছে কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেলেন। সামনে আর পড়তে পারেননি। তারপর তিনি বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যেদিন সকল মানুষ প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে, সেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, সেদিন ঘাম কারো টাখনু গিরা পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো বক্ষ পর্যন্ত, কারো দু'কান পর্যন্ত, এমনকি কেউ কেউ ব্যাঙের ন্যায় ঘামের ভিতর ডুবে যাবে। -[কুরতুবী]

হযরত মেকদাদ (রা.) বলেছেন, আমি নিজে হুযূর ﷺ-এর নিকট হতে শ্রবণ করেছি যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের অতি নিকটে চলে আসবে এমনকি তা এক মাইলের দূরত্বে থাকবে।

আহমদ এবং তাবরানী হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন- সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর চেয়ে কঠিন কোনো কষ্ট মানুষ ভোগ করে না। তবে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার চেয়ে মৃত্যু অনেক সহজ। কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থায় মানুষের ঘাম হবে আর সে ঘাম মুখের লাগামে রূপান্তরিত হবে। মানুষের দেহ নিঃসৃত এ ঘামের মধ্যে যদি কেউ নৌকা চালাতে চায় তবে তা চলবে। -[নূরুল কোরআন]

পক্ষান্তরে আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ এ ভয়াবহ আজাবে নিপতিত হবেন না; বরং তারা তখন স্বর্ণ নির্মিত আসনে; মেঘের ছায়াতলে থাকবেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, মু'মিনদের জন্য সেদিনটি এক ঘণ্টার সমান হবে। أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -[নূরুল কোরআন]

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতে লোকদের দণ্ডায়মান হওয়া দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? : আল্লাহর বাণী يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ-এর মধ্যে লোকদের দাঁড়ানো দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে-এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন

ক. সেদিন মানুষ প্রতিফল লাভের উদ্দেশ্যে বা হিসাব নিকাশের উদ্দেশ্যে অথবা ফয়সালার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে।

খ. কারো মতে, সেদিন মারাত্মক ঘর্মাক্ত অবস্থার (গরম ও ঘর্মের) কারণে দণ্ডায়মান হবে।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, বান্দার হক দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবে।

ঘ. কারো কারো মতে, এটা দ্বারা রাসূলগণের দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য। বিচার ফয়সালার উদ্দেশ্যে তাঁরা আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. كَلَّآ حَقًّا اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ اَىْ كُتُبَ اَعْمَالِ الْكُفَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ قِيْلَ هُوَ كِتَابٌ جَامِعٌ لِاَعْمَالِ الشَّيَاطِيْنِ وَالْكَفَرَةِ وَقِيْلَ هُوَ مَكَانٌ اَسْفَلَ الْاَرْضِ السَّابِعَةِ وَهُوَ مَحَلُّ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهٖ.

৭. কখনো নয় অবশ্যই পাপিষ্ঠদের কর্মলিপি আছে অর্থাৎ কাফেরদের কর্মলিপিসমূহ সিজ্জীনে কারো মতে তা হলো, শয়তান ও কাফেরদের কর্মলিপি সম্বলিত গ্রন্থ। আর কারো মতে তা সপ্তম জমিনের নিম্নে একটি স্থানের নাম। যা শয়তান ও তার সহযোগীদের অবস্থানক্ষেত্র।

٨. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ مَا كِتَابُ سِجِّيْنٍ.

৮. সিজ্জীন সম্বন্ধে তুমি কি জান! সিজ্জীন গ্রন্থটি কি?

٩. كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ مَّخْتُوْمٌ.

৯. এটা চিহ্নিত লিপি মোহরযুক্ত।

١٠. وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

১০. সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের জন্য ।

١١. اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ الْجَزَاءِ بَدَلٌ اَوْ بَيَانٌ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

১১. যারা কর্মফল দিবসকে অসত্যারোপ করে প্রতিফল, এটা مُكَذِّبِيْنَ হতে بَدَلٌ কিংবা এর بَيَانٌ ।

١٢. وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مُتَجَاوِزِ الْحَدِّ اَثِيْمٍ صِيْغَةُ مُبَالَغَةٍ.

১২. আর একে অস্বীকার করে না, কেবলমাত্র প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী সীমা অতিক্রমকারী পাপিষ্ঠ ব্যক্তি اَثِيْمٍ শব্দটি مُبَالَغَةٌ-এর শব্দ।

١٣. اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا الْقُرْاٰنُ قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ الْحِكَايَاتُ الَّتِىْ سُطِرَتْ قَدِيْمًا جَمْعُ اُسْطُوْرَةٍ بِالضَّمِّ اَوْ اِسْطَارَةٍ بِالْكَسْرِ.

১৩. যখন তার নিকট পঠিত হয় আমার আয়াতসমূহ কুরআন তখন সে বলে, এটা পূর্ববর্তীদের রূপকথা পুরানো দিনের গল্প কাহিনী, اَسَاطِيْرُ শব্দটি পেশ যোগে اُسْطُوْرَةٌ অথবা যের যোগে اِسْطَارَةٌ -এর বহুবচন।

١٤. كَلَّا رَدْعٌ وَ زَجْرٌ لِقَوْلِهِمْ ذٰلِكَ بَلْ سكته رَانَ غَلَبَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَغَشَّهَا مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ مِنَ الْمَعَاصِىْ فَهُوَ كَالصَّدَاءِ.

১৪. না, কখনো এরূপ নয় তাদের এ কথার প্রতি অস্বীকার ও শাসানো, বরং তাদের অন্তরে জঙ ধরেছে প্রাধান্য বিস্তার করে আচ্ছন্ন করেছে তাদের কৃত কর্মসমূহ পাপসমূহ কাজেই এটা জঙতুল্য হয়েছে।

١٥. كَلَّآ حَقًّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَحْجُوْبُوْنَ فَلَا يَرَوْنَهٗ.

১৫. না অবশ্যই নিশ্চয় তারা তাদের প্রতিপালক হতে সেদিন কিয়ামতের দিন অন্তরিত থাকবে সুতরাং তারা তাঁকে দেখবে না।

١٦. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ لَدَاخِلُوا النَّارِ الْمُحْرِقَةِ ـ ১৬. অতঃপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে জ্বলন্ত ও দাহনকারী আগুনে প্রবেশ করবে।

١٧. ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ هٰذَا أَيِ الْعَذَابُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ـ ১৭ অতঃপর বলা হবে তাদেরকে এটাই অর্থাৎ এ শাস্তিই যা তোমরা অস্বীকার করতে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ-এর মহল্লে ই'রাব : اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ-এর কয়েকটি মহল্লে ই'রাব হতে পারে।

১. মহল্লে মাজরূর অর্থাৎ পিছনের اَلْمُكَذِّبِيْنَ-এর সিফাত হিসাবে মাজরূর হয়েছে।

২. অথবা, اَلْمُكَذِّبِيْنَ হতে بَدَلْ হয়েছে।

৩. অথবা নতুন বাক্য হিসাবে مَرْفُوْعٌ-এর মহল্লে আছে।

৪. অথবা, ذَمٌّ হিসাবে, مَنْصُوْبٌ-এর মহল্লে আছে। -[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে আল্লাহ তা'আলা মুত্বাফ্‌ফিফীন তথা মাপে কমবেশি করার প্রবণতা যাদের রয়েছে, তাদের ধ্বংসের কথা আলোচনা করেছেন। এখন তাদের পরিণামের সাথে সাথে আহকাম আলোচনা করেছেন। -[কাবীর]

পুনরুত্থান এবং হিসাব-নিকাশ থেকে যারা সম্পূর্ণ বে-খবর হয়ে মাপে কমবেশি করার মতো অন্যান্য ঘৃণ্যতম কাজে লিপ্ত, তাদের জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

প্রথম ধাপে আল্লাহ তা'আলা মুতাফ্‌ফিফীনদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যারা মাপে কমবেশি করে তাদের নাম রেখেছেন মুত্বাফফিফীন। এখানে তাদেরকেই ফুজ্জার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মাপে কমবেশি করে তারা ফুজ্জারদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা আছে কিনা বাস্তব জীবনে তাদের অবস্থান কোথায় এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হলে তাদের অবস্থা কি হবে তারই আলোচনা শুরু হয়েছে। -[যিলাল]

مَا يُكَذِّبُ بِهٖ ...... اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ ও আবূ জাহল সম্পর্কে উক্ত আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, তারা বলত যে, কুরআন তো অতীতের অলীক কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমনকি ওলীদ বলত তোমরা কুরআন না শুনে আমার নিকট একত্রিত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআন অপেক্ষা উত্তম কাহিনী শুনাবো। [না'উযুবিল্লাহ]

كَلَّا-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : كَلَّا শব্দটি حَرْفُ رَدْعٍ; এর দ্বারা ধমকি, হুমকি, তিরস্কার ও প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বুঝানো হয়। পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবকে অস্বীকার করে ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে সাধারণত এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এখানে كَلَّا-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কাফেররা কুরআন ও রাসূল ﷺ সম্পর্কে বহু অবাঞ্ছিত কথা বলে বেড়াত। তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের কথা মোটেই সঠিক নয়; বরং তাদের অন্তরে পাপের কারণে মরিচা পড়ে গেছে বিধায় তারা এরূপ বলে বেড়াচ্ছে।

কারো মতে, كَلَّا শব্দটি এখানে حَقًّا-এর অর্থে হয়েছে- حَقًّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ অর্থাৎ সত্যিই নিঃসন্দেহে কাফের ও ফাজিরদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে।

দুনিয়াতে এ ধরনের অপরাধ করার পর তাদেরকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে এবং কোনোদিনই তাদেরকে আল্লাহর সম্মুখে জাবাবদিহি করতে হবে না বলে তাদের মনে যে ধারণা হয়েছে তা আদৌ সত্য ও নির্ভুল নয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

سِجِّيْن দ্বারা কি উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতগুলোতে سِجِّيْن দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'বে আহবার (রা.)-এর নিকট 'পাপীদের আমলনামা সিজ্জীনে রয়েছে'– এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন– জাবাবে তিনি বললেন, পাপীদের আত্মা আকাশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আকাশ তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর তাকে ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসা হলে ভূ-পৃষ্ঠও তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অতঃপর জমিনের সপ্তম স্তরের নিম্ন দেশে সিজ্জীনে একে রাখা হবে যেখানে ইবলীস ও তার সেনাবাহিনী অবস্থান করে। তারপর সিজ্জীন হতে এদের জন্য পাতলা একখানা চামড়া বা কাগুজে বস্তু বের করে তাতে আমল লেখা হয় এবং সুদৃঢ়ভাবে একটি পাত্রে মোহর করে শয়তানের সৈন্যদের নিম্নদেশে রাখা হয়। যাতে তারা বুঝতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এর বাহক জাহান্নামী হবে।

কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেছেন, سِجِّيْنٌ অর্থ কয়েদখানা, কারাগার। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ হবে তাদের আমলনামা কয়েদখানায় আটক করা হয় বা অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে রাখা হয়।

কারো কারো মতে, سِجِّيْنٌ দ্বারা সপ্তম জমিনের সর্বশেষ স্তরে অবস্থিত একটি পাথরকে বুঝানো হয়েছে। সে পাথরটিকে উল্টিয়ে এর তলদেশে কাফেরদের আমলনামা রেখে দেওয়া হয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, সপ্তম জমিনের সর্বশেষ স্তরকে সিজ্জীন বলে, তথায় কাফেরদের আত্মা [মৃত্যুর পর] অবস্থান করে।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, সপ্তম জমিনের সর্বশেষ স্তরের নিচে সিজ্জীন অবস্থিত, আর আকাশের উপর আরশের নিম্ন দেশে 'ইল্লিয়্যীন' অবস্থিত।

কারো কারো মতে, سِجِّيْنٌ এটা سِجْنٌ হতে নির্গত। এর মূল অর্থ কয়েদখানা। কুরআনে কারীমে [এরপর] এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা হতে জানা যায় যে, যে খাতা বইতে দণ্ডযোগ্য লোকদের আমলনামা লিখিত হয় তাকেই সিজ্জীন বলা হয়েছে। –[খাযেন, কুরতুবী]

আর কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সিজ্জীন হলো দোজখের একটি স্তর যা জমিনের সপ্তম স্তরের নিম্নদেশে রয়েছে। যেভাবে মু'মিনদের রূহ ইল্লিয়্যীনে চলে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কাফের ও পাপিষ্ঠদের রূহ সিজ্জীনে চলে যায়। –[নূরুল কোরআন]

كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ-এর অর্থ : আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, اَىْ مَكْتُوْبٌ كَالرَّقْمِ فِى الثَّوْبِ لَا يَنْسٰى وَلَا يُمْحٰى 'কাপড়ে নম্বর লাগানোর মতো লিখিত যা ভুলানো যায় না এবং মিটানো যায় না।' হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, ফুজ্জারদের [পাপীদের] একটি সংখ্যা রয়েছে, এ সংখ্যায় কেউ যেমন যোগ করতে পারবে না, তেমনি কমাতেও পারবে না। হযরত যাহ্‌হাক (র.) বলেন, مَرْقُوْمٌ হিমইয়ারী ভাষায় مَخْتُوْمٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ مَخْتُوْمٌ বা মোহর লাগানো অবস্থায়। মূলত اَلرَّقْمُ অর্থ اَلْكِتَابَةُ বা লিখা। –[কুরতুবী, কাবীর]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-এর অর্থ : উক্ত আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. উক্ত আয়াতটি পিছনের يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তখন অর্থ হবে– যেদিন সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, সেদিন পাপী, আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

২. পিছনের مَرْقُوْمٌ শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন তারা হতভাগ্য ও পাপিষ্ঠ হবে। তারপর-ই বলা হয়েছে وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ সেদিন (কিয়ামতকে) অস্বীকারকারীর জন্য ধ্বংস নেমে আসবে। –[কাবীর]

مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ-এর অর্থ : আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, اَىْ فَاجِرٌ جَائِرٌ مُتَجَاوِزٌ فِى الْاِثْمِ مُنْهَمِكٌ فِىْ اَسْبَابِهٖ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ এর অর্থ– পাপী, দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী, পাপে সীমালঙ্ঘনকারী এবং পাপকার্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে লিপ্ত।

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হক থেকে বিচ্যুত, মানুষের সাথে ব্যবহারে সীমালঙ্ঘনকারী এবং নিজের নফসের সাথে গাদ্দারকে مُعْتَدٍ বলা হয়েছে। আর এমন ব্যক্তিই আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষায় اَثِيْمٌ মহাপাপী।

আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, সীমালঙ্ঘন এবং পাপ মানুষকে কিয়ামত অস্বীকারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি কুরআনের সাথে তারা বেআদবি করতে থাকে এবং বলে, اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ কুরআন মাজীদ তো পুরানো যুগের কিচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

تُتْلٰى শব্দে বর্ণিত দু'টি কেরাত : জমহুর কারীগণ দু'টি تَاءٌ দিয়ে পড়েছেন। আবূ হাইয়াহ, আবূ সিমাক, আশহাবুল উকাইলী এবং সুলামী প্রথম تَا-এর স্থলে يَاءٌ পড়েছেন। –[কুরতুবী]

اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ-এর অর্থ : اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ বা اِسْطَارَةٌ-এর বহুবচন, অর্থ– কিচ্ছা-কাহিনী। আর اَوَّلِيْنَ এটা اَوَّلٌ-এর বহুবচন, অর্থ– প্রথম, এখানে এর দ্বারা পূর্ববর্তীগণ উদ্দেশ্য। اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থ –اَحَادِيْثُهُمْ وَاَبَاطِيْلُهُمُ الَّتِىْ زَخْرَفُوْهَا অর্থাৎ এমন কতগুলি গল্প এবং বানানো কথা যা তারা সুন্দর করে সাজিয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

পূর্বেকার মিথ্যা কথার সমষ্টি, পূর্বেকার ইতিকথা, (তাদের বক্তব্য অনুযায়ী) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের সামনে উত্থাপন করেছেন। –[কাবীর]

رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের কৃতকর্মের জাগতিক প্রতিকূলের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তারা যে আমার আয়াতসমূহকে পূর্বকালের রূপকাহিনী বলে থাকে এর কারণ হলো তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তঃকরণে মরিচা ধরেছে। ফলে তারা আসল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না এবং অন্তরের গভীরে আমার আয়াত প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। পাপাচার ও গুনাহের কারণে মানুষের অন্তঃকরণে জং ধরে যায়। যার কারণে দীনের দিকে মানুষের মন ধাবিত হয় না এবং নেককাজ করতে ইচ্ছা হয় না। এ কারণেই মহানবী ﷺ অন্তরের জং ও মরিচা পরিষ্কার করার তাকিদ দিয়েছেন। কেননা এর দরুন তার মন-মেজাজ ও চিন্তাধারা এমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়– কুফর ও সীমালঙ্ঘনের কাজকেই সে মনোমুগ্ধকর ও ভালো কাজ ভাবতে থাকে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'বান্দা যখন কোনো গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরে একটি রেখাপাত হয় এবং কঠিন দাগ পড়ে। তখন সে গুনাহের দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করলে তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। পুনরায় গুনাহ করলে অন্তঃকরণে তা আবার অধিকতর গাঢ় ও কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এহেন প্রভাবকেই আল্লাহ তা'আলা رَانَ [জং মরিচা] বলে উল্লেখ করেছেন।' [তিরমিযী] কিছু সংখ্যক তাফসীরকার উপরিউক্ত رَانَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটা দ্বারা উপর্যুপরি গুনাহ করার কারণে অন্তঃকরণ মরে যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।

কতিপয় তাফসীরকারের মতে, গুনাহের কারণে অন্তঃকরণে কালো দাগ কাটার কথা বুঝানো হয়েছে। মানুষের অন্তরে যে মরিচা ও জং ধরে যায় তা এ কালো দাগের তুলনায় অনেক কঠিন। কেউ কেউ এ অভিমত রেখেছেন যে, উল্লিখিত আয়াতে رَانَ শব্দ দ্বারা অন্তরের উপর একটি পর্দা ও আবরণ পড়ার কথা বুঝানো হয়েছে, যার ফলে এর গভীরে কোনো কিছু পৌঁছতে পারে না। আর এ অবস্থাকেই অন্তঃকরণ মরে গেছে বলে বুঝানো হয়।

সারকথা, সব কিছুর মূল হলো অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণকে মরিচামুক্ত রাখতে পারলেই তাতে সত্যের আলোক-রেখা পতিত হয় এবং এর আলোকে অন্তকরণ উদ্ভাসিত হলে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। ফলে মানুষ আল্লাহর পথের পথিক হয়। এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন–মানুষের মধ্যে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যা পবিত্র ও সজীব থাকলে মানুষের গোটা দেহটিই সুস্থ ও সজীব থাকে। আর এর মলিনতার কারণে গোটা দেহটিই খারাপ হয়। এরই নাম হলো অন্তঃকরণ বা কলব।

বস্তুত এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অন্তঃকরণের সজীবতা ও সুস্থতাই ঈমান ও নেক আমলের পূর্বশর্ত। ঈমানদার ও পুণ্যবান হওয়ার জন্য অন্তঃকরণকে মরিচামুক্ত ও সুস্থ রাখতে হবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেকটি বস্তুর পরিষ্কারের যন্ত্র রয়েছে। অন্তঃকরণ পরিষ্কারে যন্ত্র হলো আল্লাহর জিকির।' মহানবী ﷺ-এর এ প্রতিশেধকের ব্যবহার দ্বারাই অন্তঃকরণকে সজীব ও সুস্থ রাখা যায়।

رَانَ -এর অর্থ : رَانَ শব্দটি وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ, বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْفْ বাবে فَتَحَ এটা رَيْن হতে গৃহীত। অর্থ– মরিচা পড়া, জং ধরা। কেউ কেউ বলেন, رَانَ অর্থ গুনাহের উপর গুনাহ করা যার কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়।

রব হতে আড়াল থাকার অর্থ : উপরিউক্ত ১৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, মহাবিচারের দিন কাফেরগণ তাদের প্রতিপালকের দর্শন হতে আড়ালে থাকবে। তাফসীরকারগণ এ আড়ালে থাকা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। কারো কারো মতে এর অর্থ হলো, সেদিন তাদের আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভ না করা। অন্যরা বলেছেন, এর অর্থ আল্লাহ সেদিন তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিপাত করবেন না এবং গুনাহ হতেও পবিত্র করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মত হলো, কাফেরগণ সেদিন আল্লাহর দর্শন হতে পর্দার আড়ালে থাকবে এটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ কথা। –[খাযেন]

কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে কিনা? : কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে কিনা– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। জমহুরের মতে, শুধু মু'মিনগণই কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবেন। তাঁর দীদার লাভ করতে পারবেন। কেউ কেউ বলেছেন, মু'মিন ও মুনাফিকরা কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। কারো কারো মতে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিক সকলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে।

প্রথমোক্ত মতটিই এখানে গ্রহণযোগ্য। কেননা হাদীস হতে এটাই জানা যায়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ فِىْ لَيْلَةِ الْبَدْرِ অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রে তোমরা যেরূপ চন্দ্রকে দেখতে পাও, সেরূপ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। তা ছাড়া আল্লাহর দীদার সর্বাধিক বড় নিয়ামত যা কাফের ও মুনাফিকরা লাভ করতে পারে না।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, সেদিন মু'মিন নেককার বান্দাগণের মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে যে আড়াল রয়েছে তা সরিয়ে দেওয়া হবে। কাফেরদেরকে পর্দার পেছনে ফেলে দেওয়া হবে। কাফেররা সেদিন শুধু যে দীদারে এলাহী থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়; বরং তারা কঠোর ও কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٨. كَلَّا حَقًّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ اَىْ كِتٰبَ اَعْمَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ الصَّادِقِيْنَ فِىْ اِيْمَانِهِمْ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ قِيْلَ هُوَ كِتَابٌ جَامِعٌ لِاَعْمَالِ الْخَيْرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمُؤْمِنِى الثَّقَلَيْنِ وَقِيْلَ هُوَ مَكَانٌ فِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ .

১৮. অবশ্যই নিশ্চিতরূপে পুণ্যবানদের কর্মলিপি অর্থাৎ ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী মু'মিনগণের আমলনামা ইল্লিয়্যীনের মধ্যে আছে কারো মতে এটা ফেরেশতা ও পুণ্যবান মানব ও জিনের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার গ্রন্থ। আর কারো মতে তা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে একটি স্থান।

١٩. وَمَآ اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ مَا عِلِّيُّوْنَ مَا كِتَابُ عِلِّيِّيْنَ .

১৯. তুমি কি জান! তোমার কি জানা আছে? ইল্লিয়্যীন সম্বন্ধে ইল্লিয়্যীন গ্রন্থটি কি?

٢٠. هُوَ كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ مَّخْتُوْمٌ .

২২. তা চিহ্নিত আমলনামা মোহরকৃত।

٢١. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ .

২১. সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণ এটা প্রত্যক্ষ করে ফেরেশতাগণের মধ্য হতে।

٢٢. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ جَنَّةٍ .

২২. পুণ্যবানগণ তো স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে বেহেশতে।

٢٣. عَلَى الْاَرَآئِكِ السُّرُرِ فِى الْحِجَالِ يَنْظُرُوْنَ مَا اُعْطُوْا مِنَ النَّعِيْمِ .

২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে সুসজ্জিত গৃহে পাতানো শয্যায় বসে তারা অবলোকন করবে তাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজি।

٢٤. تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ بَهْجَةَ التَّنَعُّمِ وَحُسْنَهٗ .

২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে সমৃদ্ধির আনন্দ ও সৌন্দর্য।

٢٥. يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ خَمْرٍ خَالِصَةٍ مِنَ الدَّنَسِ مَّخْتُوْمٍ عَلٰى اِنَائِهَا لَا يَفُكُّ خَتْمَهٗ اِلَّا هُمْ .

২৫ তাদের পান করানো হবে বিশুদ্ধ পানীয় হতে ময়লামুক্ত ও বিশুদ্ধ পানীয় যা মোহরকৃত তার পাত্রের মধ্যে, তারা ব্যতীত কেউ তার মোহর খুলতে পারবে না।

٢٦. خِتَامُهٗ مِسْكٌ ط اَىْ اٰخِرُ شُرْبِهٖ يَفُوْحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ فَلْيَرْغَبُوْا بِالْمُبَادَرَةِ اِلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

২৬ এর সমাপ্তি কস্তুরীর অর্থাৎ এটা পানান্তে তা হতে কস্তুরীর সুগন্ধি সুরভিত হবে। আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীগণ প্রতিযোগিতা করুক সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি ছুটে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের এর প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত।

٢٧. وَمِزَاجُهٗ اَىْ مَا يُمْزَجُ بِهٖ مِنْ تَسْنِيْمٍ فُسِّرَ بِقَوْلِهٖ .

২৭. আর এর মিশ্রণ হবে এর সঙ্গে যা মিশ্রিত করা হবে তাসনীমের এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٢٨. عَيْنًا فَنَصَبَهُ بِاَمْدَحُ مُقَدَّرًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ اَىْ مِنْهَا اَوْ ضَمِنَ يَشْرَبُ مَعْنٰى يَلْتَذُّ ـ

২৮. এটা একটি প্রস্রবণ اَمْدَحُ উহ্য فِعْل-এর কারণে শব্দটি مَنْصُوْبٌ হয়েছে যা হতে সান্নিধ্য লাভে ধন্যগণ পান করবে بِهَا শব্দটি مِنْهَا অর্থে ব্যবহৃত অথবা يَشْرَبُ শব্দটি يَلْتَذُّ অর্থের ধারক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : কুরআন মাজীদে সাধারণত যেখানে কাফেরদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেখানে পাশাপাশি মু'মিনদের অবস্থা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। কেননা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি বস্তুকে পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় ও পরিষ্কার করে তুলে ধরা যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কাফেরদের আচরণ ও পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতগুলোতে মু'মিনগণের অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

عِلِّيِّيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : عِلِّيِّيْنَ শব্দটি عُلُوٌّ হতে নির্গত, عَلِىٌّ-এর বহুবচন। এটা দ্বারা মু'মিন লোকদের আত্মা ও আমলনামার অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে।

হযরত বারা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে, এটা হচ্ছে সপ্তম আসমানের আরশের নিম্নদেশের একটি স্থান।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটা সবুজ যবরজদ পাথর নির্মিত একখানা ফলক, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে এবং তাতে নেক লোকের আমলনামা লিখিত আছে। এ ছাড়াও কতিপয় তাফসীরকার হতে এরূপ অভিমতও পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন দ্বারা মু'মিন লোকদের আমলনামার উচ্চ মর্যাদা এবং তাদের মহাসম্মানের কথা বুঝানো হয়েছে।

কতিপয়ের মতে, عِلِّيِّيْنَ হলো একটি গ্রন্থের নাম যা ফেরেশতাগণ লিখেছেন। -[রূহুল মা'আনী]

ইমাম কারখী (র.) এবং হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, ইল্লিয়্যীন হলো আরশের ডান দিকের খুঁটি।

আতা (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, ইল্লিয়্যীন হলো জান্নাত।

যাহহাক (র.) -এর মতে, এটা হলো সিদরাতুল মুনতাহা। -[নূরুল কোরআন]

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ-এর অর্থ : يَشْهَدُ ক্রিয়াটির মূল হলো شُهُوْدٌ আর شُهُوْدٌ শব্দটি এখানে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে-

১. অবলোকন করা; ২. উপস্থিত হওয়া।

প্রথম অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে- ফেরেশতাগণ পুণ্যবানদের কর্ম বিবরণী অবলোকন বা পাহারা দিতে থাকবে।

দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে পুণ্যবানদের আত্মাসমূহ عِلِّيِّيْنَ-এ উপস্থিত হবে। কেননা عِلِّيِّيْنَ তাদের জন্যই নির্ধারণ করা হয়েছে।

اَلْمُقَرَّبُوْنَ কারা : আয়াতে 'মুকাররাবূন' শব্দ দ্বারা কোনো বুজুর্গ ও আল্লাহর একান্ত প্রিয় লোকের কথা বুঝানো হয়নি; বরং আরশের নিকটবর্তী এবং এর ব্যবস্থাপনার জন্য যেসব ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে, তাদের অবলোকনের কথাই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- হাদীসে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত কা'আব (রা.)-কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বললেন, মু'মিন ব্যক্তির নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতাগণও উপস্থিত হয় তখন সে ফেরেশতাদের এ শক্তি নেই যে, তারা মৃত্যুকে এক মুহূর্ত বিলম্ব কর বা এক মহূর্ত তাড়াতাড়ি কর, বরং নির্দিষ্ট সময়ে রূহ গ্রহণ করে রহমতের ফেরেশতাদের কাছে দিয়ে দেয়। তারা তাকে যা দেখানো দরকার তা দেখায়, তারপর তার রূহ নিয়ে আসমানের দিকে উঠে যায়। যাবার সময় সকল আসমানের مُقَرَّبُوْنَ তথা নিকটবর্তীদেরকে সপ্তাকাশ পর্যন্ত জানিয়ে যান। তারপর তারা তাকে তাদের সামনে রাখে, [তোমাদের দোয়ার অপেক্ষা করে না।] এবং দোয়া শুরু করে দেয় যে, হে আল্লাহ! এতো তোমার বান্দা, তার নাফ্স আমরা গ্রহণ করে নিয়ে এসেছি। অতঃপর ভালো যা বলার, তা ফেরেশতাগণ তার জন্য বলতে থাকে- দোয়া করতে থাকে। তারপর বলে আমরা চাই যে, তার আমলনামা আমাদের সামনে পেশ করার জন্য। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হতে আরশের নিচে তার আমলনামা পেশ করে খুলে দেওয়া হবে। সেখানে তার নাম সুদৃঢ় করে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় ফেরেশতাগণ অবলোকন (পাহারাদার হিসাবে দেখবেন) করবেন। এটাই হলো كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ -[রূহুল মা'আনী]

হযরত ওহাব এবং ইবনে ইসহাক (র.) বলেন, مُقَرَّبُوْنَ বলে হযরত ইসরাফীল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। যখন মু'মিন ব্যক্তি ভালো কাজ করে তখন ফেরেশতাগণ আমলনামা নিয়ে উপরে উঠবে। সে আমলনামার এত আলো যে, আকাশ আলোকিত হয়ে যাবে, যেমন সূর্যের আলো জমিনকে আলোকিত করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি এর উপর সীল-মোহর মেরে দেন। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْاَرَائِكُ-এর অর্থ : اَلْاَرَائِكُ শব্দটি اَرِيْكَةٌ-এর বহুবচন। 'আসন' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুধু খাট বা আসনকে মূলত اَرِيْكَةٌ বলা হয় না, বরং বাসর গৃহের সজ্জিত পালঙ্কের আসনকে اَرِيْكَةٌ বলা হয়।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اَلْاَرَائِكُ কি, আমরা এর উদ্দেশ্য এবং ধরন বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন ইয়েমেন থেকে একজন লোক এসে বলল, اَرِيْكَةٌ হলো বাসর গৃহের খাট বা আসন। শুধু খাটকে اَرِيْكَةٌ বলা হয় না। -[ফাতহুল কাদীর]

يَنْظُرُوْنَ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : يَنْظُرُوْنَ এটা বাবে نَصَرَ হতে مُضَارِعٌ مَعْرُوْفٌ-এর جَمْعُ مُذَكَّرٍ غَائِبٍ-এর শব্দ। মাসদার نَظَرٌ মূল অক্ষর (ن - ظ - ر) জিনসে সহীহ। অর্থ- দেখা, নজর করা ইত্যাদি। এখানে يَنْظُرُوْنَ দ্বারা "কারা কি দেখবে" এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, "يَنْظُرُوْنَ مَا اُعْطُوْا مِنَ النَّعِيْمِ" অর্থাৎ মু'মিনগণকে যে নিয়ামতরাজি দেওয়া হবে তারা তার দৃশ্যাবলি অবলোকন করতে থাকবে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেছেন, মু'মিনগণ সু-সজ্জিত আসনে বসে দোজখীদেরকে দেখতে থাকবে। কারো মতে, তাকানো দ্বারা ঘুম না হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা শয্যার উপর শয়ন করবেন ঠিকই তবে ঘুমাবেন না। কেননা ارائك বলার কারণে এ ধারণা হতে পারে যে, খাট তাদের ঘুমানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত ধারণাকে নাকচ করার জন্যই বলা হয়েছে "يَنْظُرُوْنَ" কাজেই আলোচ্য আয়াত হতে প্রসঙ্গত প্রমাণিত হয়েছে যে, জান্নাতে জান্নাতীগণের নিদ্রা হবে না এবং নিদ্রার প্রয়োজনও হবে না। কারণ সেখানে কোনোরূপ ক্লান্তি, শ্রান্তি ও অলসতা থাকবে না।

হযরত ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) বলেন, নেককারগণ তাঁদের জন্য তৈরি বিভিন্ন মর্যাদাবান বস্তুর প্রতি তাকাবেন। কারো মতে, মু'মিনগণ একে অপরের প্রতি তাকাবেন, দৃষ্টি বিনিময় করবেন ও কথাবার্তা বলবেন, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেন না।

-[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে জান্নাতীদেরকে কিরূপ পানীয় দিবেন তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জান্নাতীগণকে এমন স্বচ্ছ ও খাঁটি পানীয় (মদ) পান করানো হবে যার পাত্রের মুখে মুখবন্ধ করে মোহর এটে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র তারা ছাড়া অন্য কেউই তার মুখ খুলতে পারবে না।

رَحِيْقٌ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : رَحِيْقٌ-এর অর্থ হলো- মদ। তবে এখানে কি ধরনের মদকে رَحِيْقٌ বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। প্রখ্যাত নাহুবিদ খালিল (র.) -এর মতে- اَلرَّحِيْقُ اَجْوَدُ الْخَمْرِ অর্থাৎ رَحِيْقٌ হলো উৎকৃষ্ট শরাব। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (র.) -এর মতে- اَلرَّحِيْقُ هُوَ الْخَمْرُ الْعَتِيْقَةُ وَالْبَيْضَاءُ الصَّافِيَةُ অর্থাৎ স্বচ্ছ, সাদা ও পুরানো মদকে রাহীকুন বলে।

ইমাম যুজাজ, আখফাশ, মুবাররাদ ও আবূ উবায়দাহ প্রমুখগণের মতে- اَلرَّحِيْقُ مِنَ الْخَمْرِ مَا لَا غَشَّ فِيْهِ অর্থাৎ রাহীক এমন মদকে বলে যার মধ্যে মাতলামী নেই, যা পান করলে নেশা হয় না।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন- خَمْرٌ خَالِصَةٌ مِنَ الدَّنَسِ অর্থাৎ ময়লা হতে মুক্ত বিশুদ্ধ মদকে রাহীক বলে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى نَضْرَةَ النَّعِيْمِ : অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণের চেহারাতেই তাদের সুখ, শান্তি ও আনন্দ ফুটে উঠবে। হযরত আতা (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীগণের চেহারার মাঝে এত নূর, সৌন্দর্য এবং সজীবতা দান করবেন- যা কোনো বর্ণনাকারী বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণের মুখমণ্ডলে থাকবে সজীবতা, আর অন্তরে থাকবে আনন্দ-উল্লাস। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى خِتَامُهٗ مِسْكٌ : خِتَامٌ অর্থ- مَا يُخْتَمُ بِهٖ অর্থাৎ যা দ্বারা সমাপ্ত করা হয়। অবশ্য সীলমোহরকেও خِتَامٌ বলা হয়ে থাকে। কেননা এটা দ্বারা কোনো বস্তুর সমাপ্তি (পূর্ণতা) ঘোষণা করা হয়ে থাকে। আর مِسْكٌ অর্থ- কস্তুরী, মৃগনাভী।

মুফাস্‌সিরগণ এখানে خِتَامُهٗ مِسْكٌ-এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন-

যেসব পাত্রে সে শরাব থাকবে তার মুখ মোম বা মাটি দ্বারা বন্ধ করার পরিবর্তে মিসকের পাত্র দ্বারা মুখবন্ধ করে দেওয়া হবে। এ দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য এই হবে যে, এটা এক অতি উন্নত ও উৎকৃষ্ট মানের শরাব হবে। ঝর্ণাধারা প্রবহমান শরাব হতে তা উত্তম ও উৎকৃষ্ট মানের হবে এবং বেহেশতের সেবকগণ একে মিশকের মুখবন্ধ লাগানো পাত্রে রেখে জান্নাতীগণের সম্মুখে পেশ করবে।

অথবা, সে শরাব যখন পানকারীদের কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নামতে শুরু করবে তখন শেষকালে তারা মিশকের সুগন্ধী লাভ করবে। দুনিয়ার শরাব হতে এটা ভিন্নতর এক বিশেষ অনুভূতি সম্পন্ন। কেননা দুনিয়ার মদের বোতল খুলতেই বমি উদ্রেককারী বীভৎস এক গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে সমস্ত আঁতুড়ি ধরে নাড়া দেয়। পান করার সময়ও এ দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আর কণ্ঠনালী হতে যখন তা নিচে নামতে থাকে, তখন তার তীব্র ঝাঁঝ মগজে আঘাত হানে। বিস্বাদের এক দুঃসহ প্রতিক্রিয়া মদ্যপায়ীর মুখ ভঙ্গিতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেন, এটা পানান্তে মিশকের সুগন্ধি বের হবে।
হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, এখানে خَتْم অর্থ– শেষ মজা, অর্থাৎ বেহেশতী সুরার শেষ মজা হলো অতি বিস্ময়কর। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণের বিভিন্ন নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, যা তারা পরকালে অর্জন করবে। আর অত্র আয়াতে এরূপ নিয়ামতরাজি লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে লোকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে যে, যারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চায় তাদের উচিত এরূপ নিয়ামতরাজি অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া। আর এটা বলাই বাহুল্য যে, একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়ার মাধ্যমেই সে অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করা সম্ভব।

ذٰلِكَ দ্বারা কোন দিকে ইশারা করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী– وَفِي ذٰلِكَ-এর মধ্যে ذٰلِكَ দ্বারা কিসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে– এ ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এর দ্বারা পূর্ববর্তী رَحِيْق-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ শরাব পান করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া উচিত।

২. অথবা, এর দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত নিয়ামতের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যা পরকালে মু'মিনগণ লাভ করবেন। অর্থাৎ মু'মিনগণ পরকালে যেসব নিয়ামতের অধিকারী হবেন তা লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

فَلْيَتَنَافَسِ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : فَلْيَتَنَافَسِ-এর মধ্যে فَاءٌ হরফে আতফ। لِيَتَنَافَسْ এটা وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ, বহছ اَمْر غَائِبْ مَعْرُوْف বাবে تَفَاعُلْ মূল অক্ষর (ن . ف . س) জিনসে صَحِيْح।

ইমাম বাগাবী (র.) -এর মতে, এটা اَلشَّئُ النَّفِيْسُ (উত্তম বস্তু) হতে গৃহীত। অর্থাৎ এমন মূল্যবান বস্তু যার প্রতি মানব অন্তর আগ্রহী হয় এবং সকলেই তা পেতে চায়। কেউ কেউ বলেছেন, تَنَافُسٌ শব্দটি تَشَاجُرٌ-এর অর্থে হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো বস্তু লাভ করার জন্য ঝগড়া ও বিরোধে লিপ্ত হওয়া। এটা হতেই এখানে প্রতিযোগিতার অর্থ হয়েছে।

তাসনীম দ্বারা উদ্দেশ্য : 'তাসনীম'-এর মূল অর্থ হলো– উচ্চতা। অর্থাৎ এ পানীয় জান্নাতের প্রতিটি মনযিল ও কামরায় রাখা হবে। কতিপয় তাফসীরকারক বলেছেন, জান্নাতী লোকদের জন্য বিশেষ উন্নতমানের এক প্রকার শরাবের নাম হলো তাসনীম।

হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন– এ শ্রেণির পানীয় আল্লাহর একান্ত প্রিয়জনদের জন্য নির্দিষ্ট। তাতে সুগন্ধি পানি মিশিয়ে সাধারণ জান্নাতী লোকগণকে পান করতে দেওয়া হবে।

কতিপয় তাফসীরকারক তাসনীমের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ জলীয় পদার্থটি বায়ুর সাথে ভাসমান ও চলমান থাকে। জান্নাতী লোকদের পানীয় পাত্রগুলোতে পরিমাণ অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই তা মিশ্রিত হবে।

আল্লামা বাগাবী (র.) ইউসুফ ইবনে মেহরানের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে তাসনীমের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এটি সে অজানা বিষয়ের অন্যতম, যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ –[নূরুল কোরআন]

মোটকথা, তাসনীম মনমাতানো এক প্রকার অতিশয় সুগন্ধি জলীয় পদার্থ, যা জান্নাতী লোকদের পানীতে মিশিয়ে তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে। আর আল্লাহর নৈকট্যধন্য বান্দাদেরকে কোনো কিছুর সাথে না মিশিয়েই পান করতে দেওয়া হবে।

عَيْنًا শব্দটি মানসূব হওয়ার কারণ : عَيْنًا শব্দটি مَدْح হিসাবে মানসূব (مَنْصُوْبٌ عَلَى الْمَدْحِ) হয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হবে اَمْدَحُ عَيْنًا ইমাম যুজাজ বলেন, حَالْ হিসাবে মানসূব হয়েছে।

ইমাম আখফাশ (র.) বলেন, يُسْقَوْنَ দ্বারা মানসূব হয়েছে। মূলে ছিল– يُسْقَوْنَ عَيْنًا।

ইমাম ফাররা (র.) বলেন, تَسْنِيْمٍ কর্তৃক عَيْنًا মানসূব হয়েছে। কেননা تَسْنِيْمٍ শব্দটি اَلسَّنَامُ মাসদার হতে مُشْتَقٌّ। –[ফাতহুল কাদীর]

يَشْرَبُ بِهَا-এর بَاءٌ-এর অর্থ : কেউ কেউ বলেন, بِهَا-এর بَاءٌ অতিরিক্ত। মূলবাক্য এভাবে হবে– يَشْرَبُهَا

কারো মতে, بَاءٌ অর্থ مِنْ অর্থাৎ يَشْرَبُ مِنْهَا অথবা, يَشْرَبُ অর্থ يَرْوِىْ অর্থাৎ পরিতৃপ্তি লাভ করবে, তখন بَاءٌ-এর ব্যবহার ঠিক-ই হবে। অর্থাৎ يَرْوِىْ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

অথবা, بِهَا-এর مُتَعَلِّقْ উহ্য আছে। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, يَشْرَبُ مُلْتَذًّا بِهَا –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢٩. اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَاَبِىْ جَهْلٍ وَنَحْوِهٖ كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَعَمَّارٍ وَبِلَالٍ وَنَحْوِهِمَا يَضْحَكُوْنَ اِسْتِهْزَاءً بِهِمْ .

২৯. নিশ্চয় যারা অপরাধী যেমন, আবূ জাহল প্রমুখ। তারা তো যারা ঈমান আনয়ন করেছে যেমন আম্মার (রা.), বিলাল (রা.) প্রমুখ। তাদের প্রতি উপহাস করত তাদের প্রতি বিদ্রূপকরণার্থে।

٣٠. وَاِذَا مَرُّوْا اَىِ الْمُؤْمِنُوْنَ بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ اَىْ يُشِيْرُ الْمُجْرِمُوْنَ اِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْجَفْنِ وَالْحَاجِبِ اِسْتِهْزَاءً .

৩০. আর যখন তারা অতিক্রম করত অর্থাৎ মু'মিনগণ তাদের পাশ দিয়ে, তখন তারা বাঁকা চোখে ইশারা করত। অর্থাৎ অপরাধী কাফেরগণ মু'মিনদের প্রতি চোখের পাতা ও ভ্রূ দ্বারা ইশারা করে বিদ্রূপ করত।

٣١. وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ وَفِىْ قِرَاءَةٍ فَكِهِيْنَ مُعْجَبِيْنَ بِذِكْرِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ .

৩১. আর যখন প্রত্যাবর্তন করত ফিরে আসত তাদের স্বজনের নিকট, তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে প্রত্যাবর্তন করত فَكِهِيْنَ শব্দটি অন্য কেরাতে فَكِهِيْنَ পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ সবিস্ময়ে মু'মিনদের আলোচনা করে।

٣٢. وَاِذَا رَاَوْهُمْ رَاَوُا الْمُؤْمِنِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَضَآلُّوْنَ لِاِيْمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ تَعَالٰى .

৩২. আর যখন তারা এদেরকে মু'মিনগণকে দেখত তখন তারা বলত, এরাই তো পথভ্রষ্ট মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করার কারণে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

٣٣. وَمَآ اُرْسِلُوْا اَىِ الْكُفَّارُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حٰفِظِيْنَ لَهُمْ اَوْ لِاَعْمَالِهِمْ حَتّٰى يَرُدُّوْهُمْ اِلٰى مَصَالِحِهِمْ .

৩৩. তাদেরকে তো প্রেরণ করা হয়নি অর্থাৎ কাফেরদেরকে তাদের উপর মু'মিনদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে মুসলমানগণ ও তাদের আমলের তত্ত্বাবধান করার জন্য, যে জন্য তারা মুসলমানদেরকে তাদের ধারণায় মঙ্গলের প্রতি ফিরিয়ে আনবে।

٣٤. فَالْيَوْمَ اَىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ .

৩৪. অতএব, আজ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ কাফেরদের প্রতি উপহাস করবে

٣٥. عَلَى الْاَرَآئِكِ فِى الْجَنَّةِ يَنْظُرُوْنَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ اِلَى الْكُفَّارِ وَهُمْ يُعَذَّبُوْنَ فَيَضْحَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمَا ضَحِكَ الْكُفَّارُ مِنْهُمْ فِى الدُّنْيَا .

৩৫. সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট হয়ে বেহেশতে তারা অবলোকন করবে তাদের অবস্থান হতে কাফেরদেরকে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। তখন তারাও কাফেরদের প্রতি উপহাস করবে, যেমন দুনিয়াতে কাফেরগণ মু'মিনদের প্রতি উপহাস করেছিল।

٣٦. هَلْ ثُوِّبَ جُوْزِىَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

৩৬. প্রতিফল প্রদান করা হলো তো? শাস্তি পেল কাফেরদেরকে, যা তারা করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক : পিছনে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের শাস্তি এবং মু'মিনদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। এখন কাফের-কুরাইশদের কতিপয় লোকের কিছু কিছু খারাপ কাজের উদাহরণ পেশ করেছেন। যেগুলো তারা দুনিয়ার জীবনে মু'মিনদের সাথে তথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে করেছিল।

আয়াতগুলোর শানে নুযূল :

১. বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সাথে একদল সাহাবী মক্কার কাফেরদের এক দলের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা মু'মিনদের দেখে উপহাস করেছিল। হযরত আলী (রা.) ও তাঁর সাথীরা রাসূল ﷺ -এর দরবারে পৌঁছার পূর্বেই আয়াত নাজিল হয়ে গেল اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا -[রূহুল মা'আনী]

২. বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) কয়েকজন মু'মিনসহ আসছিলেন, তখন মুনাফিকগণ তাদেরকে নিয়ে উপহাস, হাসি এবং চোখ দিয়ে টিপা-টিপি করেছিল, তারপর তাদের সাথীদের কাছে গিয়ে বর্ণনা করল যে, আজকে কিছু টাক-মাথা দেখেছি, অতঃপর সকলে মিলে কিছুক্ষণ হাসি-ঠাট্টা করল। মু'মিনগণ রাসূলের দরবারে পৌঁছার পূর্বেই আয়াত কয়টি নাজিল হয়ে গেল।

প্রথম اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا-এর اَلَّذِيْنَ দ্বারা কোরাইশদের কিছু মুশরিককে বুঝানো হয়েছে। যেমন–আবূ জাহ্ল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, উকবা ইবনে আবী মুয়ীত, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস, আস ইবনে হিশাম এবং নযর ইবনে হারিছ। এরা মু'মিনদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের উপহাস করত। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : উপরোল্লিখিত কাফেরগণ যাঁদের নিয়ে উপহাস করত, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাঁরাই দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ অর্থাৎ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ-এর মধ্যে উল্লিখিত اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য। কেননা তাঁরা ছিলেন সমাজে গরিব। যেমন- আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব, বিলাল প্রমুখ সাহাবীগণ। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ : আর যখন কাফির- মুশরিকরা মু'মিনগণের নিকট দিয়ে যেত তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার নিমিত্তে চোখের ভ্রূ ও পাতা দ্বারা মু'মিনদের প্রতি ইঙ্গিত করত।

কেউ কেউ বলেছেন, তারা একে অপরকে চোখের পাতা দিয়ে ইশারা করত।

কারো কারো মতে, মু'মিনগণকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা এরূপ করত।

মু'মিনগণকে দেখা মাত্রই তারা বলাবলি শুরু করত যে, এ লোকগুলোর প্রতি তাকাও, তারা দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। আর পরকালের ছওয়াব পাওয়ার আশায় তারা এক আশ্চর্যজনক জীবন-যাপন করছে, তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

কাফেররা মু'মিনগণের সাথে কিভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত : কাফেররা মু'মিনগণকে বিভিন্নভাবে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। কোনো কোনো সময় তারা মু'মিনগণকে দেখামাত্র অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত। কোনো কোনো সময় তারা মু'মিনগণের নিকট দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাদের দিকে তাকিয়ে নিজেরা পরস্পরে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে চোখ টিপাটিপি করত। তারা পরস্পরে বলাবলি করত যে, এরা কতইনা নির্বোধ। পরকালের ছওয়াবের আশায় তারা দুনিয়ার সমস্ত সুখ-সম্ভোগকে ত্যাগ করে বসেছে আবার তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে বলত আজ এক মুসলমানের সঙ্গে খুবই বিদ্রূপ-কৌতুক করে এসেছি লোকটাকে একদম অপমান করে ছেড়েছি। এদের মতো বিভ্রান্ত ও পাগল আর হয় না। পরকালে কোথায় কি পাবে তার লোভে পড়ে দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাসকে বর্জন করে দিয়েছে। একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের পক্ষেই এরূপ কাজ করা সম্ভব।

মু'মিনগণ পরকালে কিভাবে কাফেরদেরকে উপহাস করবে? : কাফেররা দুনিয়াতে মু'মিনগণকে যে উপহাস করেছে মু'মিনগণ পরকালে তাদের নিকট হতে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর তা এভাবে যে, মু'মিনগণ জান্নাতে তাদের জন্য সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থাকবেন। সেখান থেকে তারা দেখতে পাবেন যে [জাহান্নামে] দোজখীদেরকে আজাব দেওয়া হচ্ছে

এটা দেখে তাঁরা হাসি-তামাশা করবেন, যেরূপ দুনিয়াতে কাফেররা তাঁদের সাথে হাসি-তামাশা করেছিল। কাফেরদেরকে তারা জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমরা তোমাদের কর্মফল হাতেনাতে বুঝে পেয়েছ তো? অথচ তখন আমাদের কথায় তোমরা কর্ণপাত করনি; বরং উল্টো আমাদেরকেই উপহাস করেছিলে, পথভ্রষ্ট বলেছিলে। আজ আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

فَكِهِيْنَ-এর অর্থ : فَكِهِيْنَ **শব্দটি** فَكِهٌ-এর বহুবচন। অর্থ– আনন্দ ভোগ করা, স্বাদ নেওয়া, আয়াতে اِنْقَلَبُوْا ফে'লে যমীর হতে فَكِهِيْنَ হাল হয়েছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হলো– "তারা একথা চিন্তা করতে করতে ফিরত যে, আজ তো বড্ড মজা পেলাম। আমি আজ অমুক মুসলিমের প্রতি ঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মক শব্দ উচ্চারণ করে এবং অপমানকর কথা বলে বড় আনন্দ লাভ করেছি।

قَوْلُهُ تَعَالَى "وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَضَاۤلُّوْنَ" : উক্ত আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে–

১. رَاَوْا-এর فَاعِلٌ কাফেরগণ আর هُمْ হলো মুসলিমগণ। তখন অর্থ হবে– কাফেরগণ যখন মুসলিমগণকে দেখবে তখন বলবে, এদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আর কাণ্ড-জ্ঞান বলতে কিছুই নেই। এরা দুনিয়ার আনন্দ-ফুর্তি, স্বার্থ, সুখ ও স্বাদ-আস্বাদন হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সব রকমের বিপদ মসিবতের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আছে। –[ফাতহুল কাদীর]

২. رَاَوْا-এর فَاعِلٌ মু'মিনগণ, আর هُمْ হলো কাফেরগণ। অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন কাফেরদেরকে দেখবে তখন বলবে যে, এরা পরকালের অনন্ত জীবনের সুখ-সম্ভোগ ছেড়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরামে ডুবে রয়েছে। তবে প্রথম অর্থই উত্তম।

–[ফাতহুল কাদীর]

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ আয়াতের উদ্দেশ্য : এ আয়াতে মুসলিমদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানকারীদের জন্য খুবই শিক্ষাপ্রদ শাসনবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, মুসলিমরা যা কিছু বিশ্বাস করে ও যেসবের প্রতি ঈমান এনেছে– যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তা সবই ভুল ও ভিত্তিহীন, তবুও প্রশ্ন হলো যে, তাতে তোমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে? তারা তো রাসূলের বিধানকে সত্য মনে করেছে এবং সে অনুযায়ী একটি বিশেষ নৈতিক আচরণ অবলম্বন করেছে। এমতাবস্থায় তোমাদের সাথে যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না, তোমরা কেন গায়ে পড়ে তাদের সাথে ঝগড়া করতে চাচ্ছ। যারা তোমাদের কোনোরূপ কষ্ট দেয় না– কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না, তোমরা কেন শুধু শুধু তাদের কষ্ট দাও? আল্লাহ তো তোমাদেরকে তাদের উপর ফৌজদারী ক্ষমতাসহ নিযুক্ত করেননি।

قَوْلُهُ تَعَالَى مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ : হযরত আবূ সালেহ (র.) বলেন, কাফেররা যখন দোজখে থাকবে তখন দোজখের দরজা উন্মুক্ত করে তাদেরকে বলা হবে যে, বের হয়ে যাও। দরজা খোলা দেখে তারা বের হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবে। আর মু'মিনগণ জান্নাত থেকেই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। কাফেররা যখন দোজখের দরজা পর্যন্ত আসবে, তখন হঠাৎ দোজখের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, তখন মু'মিনগণ কাফেরদের অবস্থা দেখে হাসতে থাকবে। যেমন, কাফেররা দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে দেখে হাসত।

হযরত কা'ব (র.) বলেছেন, জান্নাত ও দোজখের মধ্যে কিছু জানালা থাকবে। কোনো মু'মিন যখন তার দুনিয়ার জীবনের শত্রুকে দেখতে ইচ্ছা করবে, তখন সে জানালা দিয়ে দোজখের দিকে তাকাবে এবং কাফেরদের কঠিন আজাবে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। –[নূরুল কোরআন]

عَلَى الْاَرَاۤئِكِ يَنْظُرُوْنَ-এর অর্থ : এ বাক্যটি পিছনের يَضْحَكُوْنَ-এর ফায়েল হতে حَالٌ হয়েছে। অতএব, অর্থ হবে– মু'মিনগণ কাফেরদের নিয়ে হাসতে থাকবে, এমন অবস্থায় যে, তারা তাদেরকে এবং তাদের কঠিন শাস্তির অবস্থা অবলোকন করতে থাকবে। বলা হয়েছে যে, কাফেরদের জন্য বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। অতঃপর বলা হবে যে, আস, আস। যখন তারা দরজা পর্যন্ত পৌছবে তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এভাবে কয়েকবার করা হবে। শেষ পর্যন্ত তারা আর আসবে না। মু'মিনগণ তখন তাদের নিয়ে হাসবেন। কেননা দুনিয়াতে তারা মু'মিনদের নিয়ে হেসেছিল। এটা তাদের একটি প্রতিদান। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ : সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব

সূরাটির নামকরণে কারণ : এ সূরার নাম প্রথম আয়াতে উল্লিখিত اِنْشَقَّتْ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ- বিদীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা দ্বারাই সূরার ভাষণটি শুরু করা হয়েছে। এতে ২৫টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য এবং ৭৩০ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ইসলামি যুগের প্রথম দিকের সূরা। যদিও অবতীর্ণের সঠিক সময় কখন ছিল, তা জানা যায় না, তবে সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, তখনো মক্কায় ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হয়নি; বরং কুরআনকে মিথ্যা জানা হতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিকে অস্বীকার করা হতো। সম্ভবত এ সময়ই কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের অবশ্যম্ভাবিতা অবহিত করানোর জন্য এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলকথা : কিয়ামত ও পরকালই এর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম পাঁচটি আয়াতে শুধু কিয়ামতের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়নি; বরং এটা যে- নিঃসন্দেহে সত্য ও অবধারিত, তার যুক্তিও দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- সেদিন আকাশ ফেটে যাবে, জমিন সম্প্রসারিত করে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেওয়া হবে। মাটির গর্ভে যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে (মৃত মানুষের দেহাবশেষ এবং তাদের আমলের প্রমাণাদি) তা সবই বাহিরে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কিছুই থাকবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, আকাশ ও জমিনের প্রতি এটাই হবে আল্লাহর নির্দেশ। আর উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্ট, এ জন্য তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা বা অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

অতঃপর ৬ – ১৯ পর্যন্ত থেকে আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এর চেতনা থাকুক আর নাই থাকুক- আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার দিকে তারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তীব্র গতিতে গমন করছে। অতঃপর সব মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এক ভাগের লোকদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে এবং কোনোরূপ কঠিন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোকদের আমলনামা তাদের পিছনের দিক হতে সামনে ফেলে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় যে কোনোভাবে তাদের মৃত্যু আসুক, তাই হবে তাদের মনের একমাত্র কামনা। কিন্তু মৃত্যু তো নেই, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যেহেতু দুনিয়াতে এক বড় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তারা মনে করে বসেছিল যে, জাওয়াবদিহির জন্য কখনই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে না। তাদের উক্ত রূপ পরিণাম হবে ঠিক এ কারণেই। কেননা আল্লাহ তো তাদের সব আমলই দেখছিলেন। তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার তো কোনোই কারণ নেই দুনিয়ার জীবন হতে পারকালের শাস্তি ও পুরস্কার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীত ব্যাপারে। সূর্যাস্তের পর রঙীন উষার উদয়, দিনের অবসানে রাত্রের আগমন, এতে মানুষ ও গৃহপালিত চুতষ্পদ জন্তুগুলোর নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরে আসা এবং চন্দ্রের প্রথম হাঁসুলির আকার হতে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ লাভ যতটা নির্ভুল ও সন্দেহাতীত, এ ব্যাপারটিও ঠিক তেমনই নিশ্চিত।

যেসব কাফের কুরআন মাজীদ শুনে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকেই মিথ্যা মনে করে সে কাফেরদেরকে শেষের আয়াতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়ন করে নেকআমল গ্রহণ করে তাদেরকে অপরিমিত সুফল দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব মক্কায় অবতীর্ণ

ثَلٰثٌ اَوْ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২৩ বা ২৫ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ ـ

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।

٢. وَاَذِنَتْ سَمِعَتْ وَاَطَاعَتْ فِى الْاِنْشِقَاقِ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اَىْ حُقَّ لَهَا اَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيْعَ ـ

২. আর শ্রবণ করবে ও মান্য করবে শুনবে ও ফেটে যাওয়ার আদেশ পালন করবে তার প্রতিপালকের আদেশ এবং এটাই তার করণীয় অর্থাৎ শ্রবণ করা ও মান্য করাই তার করণীয়।

٣. وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ زِيْدَ فِىْ سَعَتِهَا كَمَا يُمَدُّ الْاَدِيْمُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهَا بِنَاۤءٌ وَلَا جَبَلٌ ـ

৩. আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এর প্রশস্ততা বৃদ্ধি করা হবে, যেমন, চামড়াকে টেনে দীর্ঘ করা হয়। আর তার উপর কোনো দালান-কোঠা ও পাহাড় থাকবে না।

٤. وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَوْتٰى اِلٰى ظَاهِرِهَا وَتَخَلَّتْ عَنْهُ ـ

৪. আর সে নিক্ষেপ করবে, যা কিছু তার অভ্যন্তরে আছে মৃতগণকে এর উপরিভাগের প্রতি, আর সে শূন্যগর্ভ হবে এগুলো হতে।

٥. وَاَذِنَتْ سَمِعَتْ وَاَطَاعَتْ فِىْ ذٰلِكَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَ ذٰلِكَ كُلُّهُ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَوَابُ اِذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا مَحْذُوْفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَابَعْدَهُ تَقْدِيْرُهُ لَقِىَ الْاِنْسَانُ عَمَلَهُ ـ

৫. আর শ্রবণ ও মান্য করবে এ আদেশ শ্রবণ করে প্রতিপালন করবে তাদের প্রতিপালকের আদেশ। আর এটাই তার করণীয় এ সব কিছুই কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। اِذَا এবং তৎপ্রতি যা কিছু আতফ করা হয়েছে, সমুদয়ের জওয়াব উহ্য রয়েছে। পরবর্তী বক্তব্য তার প্রতি নির্দেশ করছে। উহ্য বক্তব্যটি এরূপ لَقِىَ الْاِنْسَانُ عَمَلَهُ মানুষ তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

٦. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ جَاهِدٌ فِىْ عَمَلِكَ اِلٰى لِقَاءِ رَبِّكَ وَهُوَ الْمَوْتُ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ اَىْ مُلَاقٍ عَمَلَكَ الْمَذْكُوْرَ مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৬. হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি সাধনাকারী তোমার কাজে চেষ্টা সাধনাকারী তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ পর্যন্ত আর তা হলো মৃত্যু, কঠোর সাধনা, অনন্তর তুমি তার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমার উল্লিখিত ভালো-মন্দ আমলের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

فَمُلَاقِيْهِ-এর মহল্লে ই'রাব :

১. مُلَاقِيْهِ শব্দটি كَادِحٌ-এর উপর আতফ হতে পারে। অতএব, এটা মহল্লে رَفْع তে আছে।

২. উহ্য মুবতাদার খবর হতে পারে। অর্থাৎ فَأَنْتَ مُلَاقِيْهِ এখানেও رَفْع -এর অবস্থায় রয়েছে।

৩. কারো মতে, فَمُلَاقِيْهِ শব্দটি إِذَا -এর জবাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের সাথে বর্তমান সূরার যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরার মতো বর্তমান সূরাতেও প্রতিদান ও প্রতিফলের আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। অতএব, পূর্ববর্তী সূরার সাথে বর্তমান সূরা পূর্ণভাবে সম্পর্কিত।

পিছনের কয়েকটি সূরায় বৈষয়িক দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুর পরিবর্তন এবং ধ্বংসের কথা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সূরাতে একই আলোচনা শুরু হয়েছে, তবে একটি সূক্ষ্ম এবং শিক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। তা হচ্ছে–আসমান-জমিন যে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অনুগত, তাঁরই সামনে বিনয়ী, এ সূরায় তা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। –[যিলাল]

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ : কিয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, সেদিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। অত্র আয়াতে 'আকাশ বিদীর্ণ হওয়া' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন। রাঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, মেঘমালার মাধ্যমে আকাশ ফেটে যাবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ"

কারো কারো মতে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার কারণে আকাশ ফেটে যাবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ .

আকাশ তার প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করার অর্থ কি? : মূল আয়াতে বলা হয়েছে– أَذِنَتْ لِرَبِّهَا-এর শাব্দিক অর্থ হলো 'সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ শুনবে'। আরবি প্রচলনে "أَذِنَ لَهُ"-এর অর্থ সে হুকুম শুনল শুধু এতটুকু নয়; বরং এর তাৎপর্য হয়, সে হুকুম শুনে একজন অনুগত ব্যক্তির ন্যায় তা পালন করল এবং বিন্দুমাত্র অমান্য করল না।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ দু' প্রকার। একটি হলো تَكْوِيْنِيْ অর্থাৎ যা আদিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক মানতে বাধ্য। দ্বিতীয় প্রকার হলো تَشْرِيْعِيْ অর্থাৎ যা মানার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় না। ইচ্ছা করলে সে তা মানতে পারে আবার মনে চাইলে অমান্যও করতে পারে। তবে মান্য করলে ছওয়াব লাভ করবে এবং অমান্য করলে আজাব দেওয়া হবে। এ দ্বিতীয় প্রকারের আদেশ মানুষ ও জিন জাতির জন্য নির্দিষ্ট। অন্যান্যদের জন্য এটা প্রযোজ্য নয়। কাজেই আসমান ও জমিনকে আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তা মেনে নিতে বাধ্য। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাদেরকে আল্লাহর আদেশ মান্য করতে হয়। সূরা সাজদায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–"তারপর আল্লাহ তা'আলা আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধোঁয়ায় ভর্তি। অতঃপর তিনি তাকে এবং জমিনকে বললেন, তোমরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমার অনুগত হয়ে যাও। তারা বলল আমরা (স্বেচ্ছায়) অনুগত হয়ে গেলাম।"

কাজেই এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, আসমান জমিন আল্লাহর সম্পূর্ণ বাধ্য ও অনুগত। এদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেই আল্লাহর আনুগত্য করার প্রবণতা রয়েছে। এ জন্যই বলা হয়েছে– "حُقَّتْ" অর্থাৎ আর আল্লাহর কথা শ্রবণ করা ও তাঁর আনুগত্য করাই এর [আসমানের] যথার্থ কর্তব্য, এটাই তার দায়িত্ব। এটা হতে একবিন্দুও এদিক সেদিক করার ক্ষমতা তার নেই।

পৃথিবী বিস্তৃতিকরণের তাৎপর্য : উল্লিখিত ৩নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পর পৃথিবীকে সমতল করে বিস্তৃত করবেন। এর তাৎপর্য হলো যে, সমুদ্র ও নদী-নালা ভর্তি করে দেওয়া হবে। এটাই হবে হাশর ময়দান। এই বিশালকায় ময়দানেই পৃথিবীর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যত লোক সৃষ্টি হয়েছে তাদের জমায়েত করা হবে। সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে–"আল্লাহ তাকে এক ধূসর প্রান্তর বানিয়ে দিবেন, সেখানে তুমি কোনো বক্রতা ও ভাঁজ দেখতে পাবে না।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন– নবী করীম ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে একখানা দস্তরখানের ন্যায় বিছিয়ে সম্প্রসারিত করা হবে। সেখানে মানুষের জন্য শুধুমাত্র পা রাখারই জায়গা হবে। –[মুস্তাদরাক]

Free @ www.ailm.weebly.com

এ হাদীসের মর্ম হলো, পৃথিবীর সৃষ্টি হতে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে– তাদের সকলকেই এ প্রান্তরে আল্লাহর সম্মুখে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। কেউই লুকিয়ে থাকতে পারবে না। সুতরাং অগণিত মানুষকে একস্থানে সমবেত করার জন্য সাগর, নদী-নালা, গর্ত, উঁচু-নীচু সবকিছু ভরে সমতল করা অপরিহার্য হয়। সুতরাং এ বিশাল বিস্তৃত ময়দানে মানুষের এত বেশি সমাগম হবে যে, পা রাখার স্থান ব্যতীত আর কোনো জায়গাই পাবে না।

হাকিম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন জমিনকে এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যেমন চর্মকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সমগ্র সৃষ্টিকে জমিনের উপর উঠানো হবে। –[নূরুল কোরআন]

জমিন কি উৎক্ষেপণ করবে? জমিন তার পেটের ভিতর যত মৃত এবং খনিজসম্পদ লুক্কায়িত আছে, সব কিছু কিয়ামতের দিন বের করে দিবে– কোনো কিছুই বাকি থাকবে না।

কারো মতে, জমিনের পিঠে যা আছে, তার কথা বলা হয়েছে। জমিনের ভিতরেরগুলোর কথা বলা হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, জমিনের পিঠে যত পাহাড় আছে, সকল পাহাড়ই কিয়ামতের দিন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন; আমার কবর-ই প্রথম বিদীর্ণ করা হবে। অতঃপর আমাকে সুন্দর করে আমার কবরে বসানো হবে, এমতাবস্থায় জমিন আমাকে নিয়ে কাঁপতে থাকবে। আমি জমিনকে বলবো, তোমার কি হয়েছে? তখন সে উত্তর করবে–আমার রব আমাকে নির্দেশ করেছেন, যেন আমি আমার গর্ভস্থ সকল কিছু উৎক্ষেপণ করে দেই। পূর্বে যেমন খালি ছিলাম, তেমন যেন খালি হয়ে যাই। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জমিন স্বর্ণের পাতগুলো বাহিরে ফেলে দিবে এবং অন্যান্য সবকিছুই বাহিরে ফেলে দিবে। –[নূরুল কোরআন]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ আয়াতটিকে দ্বিরুক্তি করার কারণ : উক্ত আয়াতকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আসলে تَكْرَارْ নয়; বরং প্রথমবার আকাশের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার জমিনের ব্যাপারে বলা হয়েছে। বিষয় হলো দু'টি, উল্লেখও হয়েছে দু'বার। একে تَكْرَارْ বলার যৌক্তিকতা নেই। –[কাবীর]

اِذَا ও তার مَعْطُوْف عَلَيْهَا সমূহের জওয়াব কি? : اِذَا ও তার مَعْطُوْف عَلَيْهَا সমূহের جَوَابْ সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, এখানে اِذَا ও তার مَعْطُوْف عَلَيْهَا সমূহের جَوَابْ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো لَقِىَ الْاِنْسَانُ عَمَلَهٗ অর্থাৎ মানুষ (সেদিন) তার আমল (-এর প্রতিফল) প্রত্যক্ষ করবে। দুনিয়াতো সে যা করেছে, তার প্রতিদান পাবে।

ইমাম আখফাশ (র.) বলেছেন, এর جَوَابْ হলো فَمُلَاقِيْهِ অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার সাধনার ফল দেখতে পাবে। কেউ কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় اِذَا প্রথম اِذَا-এর খবর হয়েছে। তখন অর্থ দাঁড়াবে وَقْتُ اِنْشِقَاقِ السَّمَاءِ وَقْتُ مَدِّ الْاَرْضِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার সময়ই জমিন বিস্তৃত হওয়ার সময়।

কারো কারো মতে, এর جَوَابْ উহ্য রয়েছে। আর তাহলো بُعِثْتُمْ অর্থাৎ যখন উক্ত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হবে তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবে।

কারো কারো মতে, فَاءْ উহ্য থেকে يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ-এর جَوَابْ হবে। মূলত বাক্যটি হবে فَيَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ অর্থাৎ যখন উক্ত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হবে, তখন হে মানুষ! তুমি তোমার সাধনার ফল লাভ করবে।

অথবা, يُقَالُ لَهٗ কথাটি উহ্য থেকে يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ-এর جَوَابْ হবে। যেমন– فَيُقَالُ لَهٗ يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ অর্থাৎ তখন বলা হবে, হে মানুষ!

ইমাম ফাররা (র.) বলেছেন, প্রথম اِذَا-এর جَوَابْ হলো اَذِنَتْ এবং দ্বিতীয় اِذَا-এর جَوَابْ হলো اَلْقَتْ আর উভয় স্থানে وَاوْ অতিরিক্ত হয়েছে।

ইমাম ইবনুল আসায়ী (র.) উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এরূপ স্থানে وَاوْ অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রচলন আরবি ভাষায় নেই; বরং আরবিতে শুধু اِذَا حَتّٰى ও لَمَّا-এর পরে وَاوْ অতিরিক্ত হওয়ার প্রচলন রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– حَتّٰى اِذَا جَاؤُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا এখানে حَتّٰى اِذَا-এর জবাব فُتِحَتْ-এর পূর্বে وَاوْ অতিরিক্ত হয়েছে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ এখানে لَمَّا-এর জবাব تَلَّهٗ-এর পূর্বে وَاوْ অতিরিক্ত হয়েছে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

ইমাম মুবাররাদ (র.) ও কিসায়ী (র.)-এর মতে, তার جَوَابٌ হলো فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ মূলত বাক্যটি হবে- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَحُكْمُهُ كَذَا অর্থাৎ যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হুকুম হবে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

حُقَّتْ-এর অর্থ : حُقَّتْ অর্থ- إِطَاعَتْ অর্থ মেনে নিয়েছে। আর আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেওয়াই হলো আসমান ও জমিনের প্রকৃত এবং একমাত্র কাজ। কেননা তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এটা হযরত যাহ্হাকের অভিমত।

কারো মতে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার নির্দেশ শ্রবণ করার দায়িত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

اَلْكَدْحُ-এর অর্থ : আরবি ভাষায় اَلْكَدْحُ অর্থ- اَلْعَمَلُ وَالْكَسْبُ অর্থাৎ কাজ করা এবং উপার্জন করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, كَدْحٌ অর্থ رُجُوْعٌ বা প্রত্যাবর্তন। মূল আয়াতের অর্থ হবে-হে মানুষ إِنَّكَ رَاجِعٌ إِلَى رَبِّكَ رُجُوْعًا لَا مَحَالَةَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে। -[কুরতুবী]

قَوْلُهُ تَعَالَى يَاَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে মানুষকে তার আমলের অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, হে মানুষ! তুমি যে চেষ্টা-সাধনা, শ্রম ও তৎপরতা করছ, তুমি যতই মনে কর যে, তা সবই কেবলমাত্র এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং তা সবই বৈষয়িক স্বার্থের জন্য মাত্র; কিন্তু আসলেই সচেতনভাবে হোক অথবা অচেতনভাবে-যাচ্ছ তুমি তোমার আল্লাহ তা'আলার দিকেই এবং শেষ পর্যন্ত তোমাকে সে পর্যন্ত পৌঁছেই ক্ষান্ত হতে হবে। পৌঁছতে না চইলেও তুমি সে পর্যন্ত পৌঁছতে বাধ্য।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মানুষকে মানবতার মতো মর্যাদাবান গুণ দান করে সে গুণ উল্লেখ করে সম্বোধন করেছেন। যাতে তাদের মধ্যে এ চেতনা জাগে যে, একমাত্র তাদেরকেই ইনসানিয়াত বা মানবতা দান করা হয়েছে। কাজেই তোমার উচিত তোমার রবকে চিনা এবং তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে সকলের চাইতে অগ্রগামী হওয়া। সুতরাং বলা হয়েছে যে, তুমি তো এ জমিনে তোমার চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রেখেছ, আর এ চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে তুমি ক্রমাগতভাবে তোমার মহান রব-আল্লাহর দিকেই এগিয়ে যাচ্ছ। দিন যত যাচ্ছে ততই তুমি তার সাক্ষাতের নিকটবর্তী হচ্ছ। তার কাছে পৌঁছা ছাড়া তোমার কোনোরূপ গত্যন্তর নেই।

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.)-এর তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মানুষ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মানবতার যে গুণে বিশেষিত করেছেন, সে গুণের মর্যাদা রক্ষার্থে এগিয়ে আসো। দুনিয়ার কষ্টকে পরকালের তুলনায় তুচ্ছ মনে করো। দুনিয়ার আরামের উপর আখেরাতের আরামকে অগ্রাধিকার দাও। তাহলেই তুমি পরকালের শান্তি লাভ করবে মহাসফলতা হাসিল করে ধন্য হবে।

কারো কারো মতে আয়াতটির মর্মার্থ হলো, হে মানুষ! এ দুনিয়া তো সাধনার জায়গা, এটা আরামের জায়গা নয়। আরামের জায়গা হলো আখেরাত। আর আখেরাতে সে-ই আরামে থাকবে যে দুনিয়াতে ইবাদত করে ও সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

অথবা, এর মর্মার্থ হলো, হে মানুষ! যতক্ষণ তুমি সাধনা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করবে না। -[যিলাল]

এখানে اَلْإِنْسَانُ দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহর বাণী يَاَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ-এর মধ্যে اَلْإِنْسَانُ-এর দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আল-ইনসান দ্বারা এখানে আসাদ ইবনে আব্দুল আসাদ উদ্দেশ্য।

কারো কারো মতে, এর দ্বারা উবাই ইবনে খালফকে বুঝানো হয়েছে।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আল-ইনসান দ্বারা এখানে কাফের উদ্দেশ্য।

ইমাম শাওকানী (র.) বলেছেন, আল-ইনসান দ্বারা অত্র আয়াতে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সকল মানুষই আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তথায় তাকে কর্মফল দেওয়া হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٧. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ كِتَابَ عَمَلِهِ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ الْمُؤْمِنُ.

৭. অতঃপর যাকে প্রদত্ত হয়েছে তার কর্মলিপি তার আমলনামা তার দক্ষিণ হাতে আর সে হলো মু'মিন ব্যক্তি।

٨. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا هُوَ عَرْضُ عَمَلِهِ عَلَيْهِ كَمَا فُسِّرَ فِيْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ وَفِيْهِ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ وَبَعْدَ الْعَرْضِ يُتَجَاوَزُ عَنْهُ.

৮. অচিরেই তার হিসাব-নিকাশ সহজে গ্রহণ করা হবে তাকে শুধুমাত্র তার আমলনামা দেখিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যেমন বুখারী, মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীসে অনুরূপ উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসে এটাও উল্লিখিত আছে যে, আমলনামার ব্যাপারে যে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়বে, তার ধ্বংস অনিবার্য। মু'মিনকে তার আমলনামা দেখিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

٩. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ مَسْرُوْرًا بِذٰلِكَ.

৯. আর সে তার স্বজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে বেহেশতে প্রফুল্লচিত্তে এর কারণে।

١٠. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ هُوَ الْكَافِرُ تُغَلُّ يُمْنَاهُ إِلٰى عُنُقِهِ وَتُجْعَلُ يُسْرَاهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَيَأْخُذُ بِهَا كِتَابَهُ.

১০. আর যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎ দিক হতে প্রদত্ত হবে সে হলো কাফের, যার ডান হাত ঘাড়ের উপর এবং বাম হাত তার পিঠের পিছনে বাঁধা অবস্থায় থাকবে। আর সে তা দ্বারা কর্মলিপি গ্রহণ করবে।

١١. فَسَوْفَ يَدْعُوْا عِنْدَ رُؤْيَةِ مَا فِيْهِ ثُبُوْرًا يُنَادِيْ هَلَاكَهُ بِقَوْلِهِ يَا ثُبُوْرَاهُ.

১১. অচিরেই সে আহ্বান করবে তাতে যা রয়েছে তা দেখার সময় ধ্বংসকে হায় ধ্বংস! বলে তার ধ্বংসকে আহ্বান করবে।

١٢. وَيَصْلٰى سَعِيْرًا يَدْخُلُ النَّارَ الشَّدِيْدَةَ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَتَشْدِيْدِ اللَّامِ.

১২. আর জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কঠিন উত্তপ্ত আগুনে প্রবিষ্ট হবে। يَصْلٰى শব্দটি অপর এক কেরাতে يَا -এর মধ্যে পেশ, صَادٌ-এর মধ্যে যবর ও لَامْ -এর মধ্যে তাশদীদ যোগে পঠিত হয়েছে।

١٣. إِنَّهُ كَانَ فِيْ أَهْلِهِ عَشِيْرَتِهِ فِي الدُّنْيَا مَسْرُوْرًا بَطَرًا بِاتِّبَاعِهِ لِهَوَاهُ.

১৩. সে তো ছিল তার পরিজনগণের মধ্যে দুনিয়াতে তার স্বজনদের মধ্যে উৎফুল্লচিত্ত কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব করে গর্বিত ছিল।

١٤. إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ أَيْ أَنَّهُ لَّنْ يَّحُوْرَ يَرْجِعَ إِلٰى رَبِّهِ بَلٰى ج يَرْجِعُ إِلَيْهِ.

১৪. যেহেতু সে ভাবত যে, أَنْ অব্যয়টি ছাকীলা হতে খাফীফাকৃত, আর এর اِسْم উহ্য অর্থাৎ أَنَّهُ সে কখনো প্রত্যাবর্তন করে আসবে না তার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসবে না।

١٥. إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا عَالِمًا بِرُجُوْعِهِ إِلَيْهِ.

১৫. হ্যাঁ, অবশ্যই সে তাঁর নিকট ফিরে যাবে। নিশ্চয় তার প্রতিপালক এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর প্রতি তার প্রত্যাবর্তন বিষয়ে অবগত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَنْ يَحُوْرَ : لَنْ يَحُوْرَ সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَفِىْ تَاكِيْد بِلَنْ মাসদার حُوْر জিনসে اَجْوَفْ وَاوِىْ অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা। ইমাম শাওকানী (র.) বলেছেন– اَلْحَوْرُ فِى اللُّغَةِ الرُّجُوْعُ অর্থাৎ حَوْر-এর আভিধানিক অর্থ হলো اَلرُّجُوْعُ প্রত্যাবর্তন করা।

হযরত ইকরামা ও দাউদ ইবনে হিন্দ (র.) বলেছেন, حُوْر শব্দটি হাবশী। অর্থাৎ رُجُوْع প্রত্যাবর্তন করা।

ইমাম রাগেব (র.) বলেছেন, اَلْحُوْرُ اَلتَّرَدُّدُ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ حُوْر কোনো বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যাওয়াকে বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সহজ ও কঠোর হিসাবের পর্যালোচনা : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, বিচারের দিন মু'মিনগণ আমলনামা দক্ষিণ হস্তে লাভ করবে। তাদের হিসাব-নিকাশ হবে খুব সহজ। অর্থাৎ তাদের হিসাব গ্রহণে কোনো প্রকার কঠোরতা ও কড়াকড়ি করা হবে না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, তুমি অমুক কাজ করলে কেন? অমুক কাজ করেছ কেন তার কৈফিয়ত দাও? তাদের ভালো কাজের সাথে খারাপ কাজসমূহও আমলনামায় লিখিত থাকবে। কিন্তু ভালো কাজের ওজন যেহেতু পাপ কাজের তুলনায় অনেক বেশি হবে, সেহেতু তার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে– কোনোই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের নিকট আনন্দচিত্তে দৌড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কাফের ও পাপিষ্ঠ লোকগণ আমলনামা লোক লজ্জায় সম্মুখ হতে গ্রহণ করতে চাইবে না। কারণ তারা নিজেরাই উপলব্ধি করবে যে, তারা অপরাধী। সুতরাং বাম হাত পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিলে তাদের আমলনামা পিছন দিক হতে বাম হাতে দেওয়া হবে। তাদের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে খুব কঠোরতা ও কড়াকড়ি অবলম্বন করা হবে। সূরা রা'দে (১৮নং আয়াতে) তাদের হিসাবের কড়াকড়ির কথাটি বুঝাবার জন্য سُوْءُ الْحِسَابِ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় নবী করীম ﷺ হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেছেন– 'কিয়ামতের দিন যারই হিসাব নেওয়া হবে সে কঠিন বিপদে পড়বে। হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, মু'মিন লোকদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে এবং হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন এটা হলো আমলনামা পেশ হওয়ার কথা। কিন্তু যাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বুঝবে যে, সে ধরা পড়ল। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আমি নবী করীম ﷺ-কে একবার নামাজে এ প্রার্থনা করতে শুনলাম– হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজে গ্রহণ কর। তিনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হিসাব সহজ হওয়ার তাৎপর্য কি? জবাবে তিনি বললেন, হিসাব হাল্কা ও সহজ হওয়ার অর্থ হলো বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হে আয়েশা, সেদিন যার নিকট হতে হিসাব বুঝিয়ে নেওয়া হবে, জানবে, সে ধ্বংস হলো; ধরা পড়ল।

সারকথা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ কারো নিকট হিসাব চাইলে তার আর কোনো রক্ষা থাকবে না। হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো হবে না। পার্থিব জীবনের যাবতীয় কুটযুক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে অসহায় ও নিরুপায় হয়ে থাকতে হবে। কাফেরগণ আমলনামা পিছন দিক হতে বাম হাতে পেয়ে বুঝবে তার রক্ষা নেই। এখনই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন তাদের মানসিক অবস্থা কিরূপ হবে তা কল্পনাতীত। তখন সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে, যেন মৃত্যুর মাধ্যমে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু তা তো আর হবে না। নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে। তাই আল্লাহ বলেন, তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে অথচ পার্থিব জীবনে পরিবার-পরিজন নিয়ে খুবই সানন্দে জীবন কাটাত, ভাবত এদের পুনরুত্থান, পরকাল ও হিসাব-নিকাশ কোনো কিছুরই সম্মুখীন হতে হবে না; আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে না। তাদের এ ধারণা কোনোক্রমেই সত্য নয়। অবশ্যই তাদের মাহাবিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহর দৃষ্টি ও তত্ত্বাবধানের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এটাই হলো উপরিউক্ত আয়তসমূহের তাৎপর্য।

اِلٰى اَهْلِهٖ-এর অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ আয়াতে اَهْلِهٖ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য কয়েকটি হতে পারে। যেমন এর অর্থ হলো– اِلٰى اَهْلِهِ الَّذِيْنَ هُمْ فِى الْجَنَّةِ مِنْ عَشِيْرَتِهٖ অর্থাৎ তার বংশের মধ্য হতে যারা বেহেশতে প্রবেশ করেছে তাদের কাছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অথবা, তার আপনজনদের নিকট যাবে, যারা ছিল দুনিয়াতে আপনজন। যেমন–স্ত্রী-পুত্রের মধ্য হতে যারা আগেই জান্নাতে প্রবেশ করেছিল।

অথবা, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু তার জন্য বেহেশতে তৈরি করে রেখেছেন, যেমন–হুর, গেলমান তাদের নিকট যাবে।

অথবা, যত জন উত্তম প্রতিদান পেয়েছে সবার নিকট গমন করবে। –[ফাতহুল কাদীর]

কারো মতে, أَهْل দ্বারা জান্নাতী সহচর যেমন– হুর, গেলমান ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা, সকল জান্নাতীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ...... ثُبُورًا : ইরশাদ হচ্ছে– আর পিঠের পিছনের দিক হতে যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। অচিরেই সে নিজেই নিজের ধ্বংস কামনা করবে, এ ব্যক্তি হবে কাফের। তার ডান হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে। আর বাম হাত পশ্চাতের দিকে করে দেওয়া হবে। বাম হাত দ্বারাই সে আমলনামা গ্রহণ করবে। আমলনামায় যখন সে নিজের পাপরাশি অবলোকন করবে এবং সম্ভাব্য আজাব অনুভব করতে পারবে তখন নিজের ধ্বংস কামনা করে এরূপ আজাব হতে মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে জ্ঞান করবে এবং বলবে, আমার যদি মৃত্যু হয়ে যেত তাহলে কতই না ভালো হতো।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে তাকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। অথচ এখানে বলা হয়েছে পিছনের দিক হতে আমলনামা দেওয়া হবে। উভয় আয়াতের সমন্বয় কিভাবে হবে? : সূরা আল-হাক্কাতে বলা হয়েছে যে, কাফেরের আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে। আর এখানে বলা হয়েছে পিছন দিক হতে দেওয়া হবে। সম্ভবত তা এভাবে হবে যে, সে লোকটি তো ডান হাতে আমলনামা পাওয়া হতে পূর্বেই নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। কেননা সে তার নিজের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত ছিল এবং তার দরুন বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে বলে তার বিশ্বাস ছিল। তবে সমগ্র মানব সমাজের সামনে প্রকাশ্যভাবে আমলানামা গ্রহণে তার লজ্জা ও অপমানবোধ অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে সে তার নিজের হাত পিছনের দিকে রাখবে। কিন্তু এ উপায়েও সে তার নিজের সর্বপ্রকারের আমলের লিখিত রিপোর্ট নিজ হাতে গ্রহণ করা হতে রক্ষা পাবে না। সে হাত বাড়িয়ে সামনা-সামনি তা গ্রহণ করুক কিংবা পিছনের দিকে হাত লুকিয়ে রাখুক, উভয় অবস্থায়ই তার হাতে তা অবশ্যাই রেখে দেওয়া হবে।

কাফেরের আমলনামা কিভাবে দেওয়া হবে? : পরকালে কাফেরের আমলনামা কিভাবে কোথায় দেওয়া হবে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তার বাম হাত খুলে পেছনের দিকে স্থাপন করা হবে এবং সে অবস্থায় (বাম হাতে) আমলনামা দেওয়া হবে।

কেউ কেউ বলেছেন, তার চেহারা পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই সে দিক হতেই সে আমলনামা পাবে।

কারো কারো মতে সে ডান হাতে আমলনামা পেতে চাইবে কিন্তু তাকে ডান হাতে দেওয়া হবে না। তখন সে তার বাম হাত পিছনের দিকে নিয়ে যাবে আর সে অবস্থায়ই বাম হাতে তাকে আমলনামা দেওয়া হবে।

ইমাম কালবী (র.) বলেছেন, কাফেরের ডান হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে থাকবে এবং বাম হাত পিছনের দিকে থাকবে। কাজেই তার বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

يَصْلَىٰ-তে কয়েকটি কেরাত : يَصْلَىٰ শব্দে তিনটি কেরাত বর্ণিত আছে,

১. ইবনে আমের ও কিসাইর কেরাত হলো– يُصَلَّىٰ -এর يَاءْ-এর উপর পেশ, صَادْ-এর উপর যবর এবং لَامْ-এর উপর তাশদীদ-যবর, যেমন– আল্লাহর বাণী ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ [صَلُّوْهُ বাবে تَفْعِيْل হতে ব্যবহৃত]।

২. বাকি ক্বারীগণ يَاءْ-এর উপর যবর, صَادْ-এর উপর জযম এবং লামের উপর এক যবর দিয়ে পড়েছেন। তখন উক্ত ক্রিয়াটি لَازِمْ হবে, মুতায়াদ্দী নয়। যেমন– কুরআন মাজীদে অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى এবং ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ

৩. হযরত আসেম, নাফে' ও ইবনে কাছীর থেকে বর্ণিত হয়েছে يَاءْ-এর উপর পেশ, صاد-এর উপর জযম এবং লামের উপর এক যবর। যেমন, কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে–تَصْلٰى نَارًا

মূলত اَنْزَلَ وَنَزَلَ-এর মতো صَلّٰى وَاَصْلٰى দু'টি لُغَةٌ ব্যবহৃত হয়েছে। –[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا-এর অর্থ : উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হলো– এসব কাফেরের দলেরা পার্থিব জীবনে আপনজনদের সাথে খুব আনন্দঘন পরিবেশ মগ্ন ছিল। নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে চলত। পরকালের কোনো চিন্তা ছাড়াই হীন-লালসা চরিতার্থ করতে সময় ব্যয় করছে। অতএব, তারা কিয়ামতের দিন বেশি চিন্তিত এবং শাস্তির যোগ্য হবে। পক্ষান্তরে মু'মিনগণ দুনিয়াতে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে বেশ কষ্ট করছে। এ কারণে কিয়ামতের দিন তারাই শান্তির মধ্যে থাকবে।

ثُبُورًا-এর অর্থ : ثُبُورًا শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ হলো– ধ্বংস, মৃত্যু, অভিশাপ, বঞ্চিতকরণ ইত্যাদি। আয়াতে উদ্দেশ্য হলো– যখন কাফিরগণ আমলনামা হাতে পাবে, তখন يَا ثُبُورَهُ বলে আফসোস করতে থাকবে। অর্থাৎ মৃত্যু ও ধ্বংস কামনা করতে থাকবে; কিন্তু তাদের আর মৃত্যু হবে না।

পৃথিবীতে কাফেরদের আনন্দের কারণ : কাফেরগণ দুনিয়ার জীবনে আমোদ-প্রমোদে বসবাস করেছিল। আনন্দঘন পরিবেশে মেতে উঠেছিল। কেননা, তাদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রকটভাবে কাজ করেছিল যে, কোনো প্রকারেই পুনরুত্থান সম্ভব নয়। আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে না। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি বলতে কিছুই হবে না। এ দুনিয়ার জীবনই শেষ জীবন। পরকাল বলতে কিছুই নেই। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا : অত্র আয়াতে بَلَى-এর মর্মার্থ : কাফির তো ধারণা করে বসেছিল যে, তাকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, অবশ্যই তাকে তার রবের নিকট ফিরে আসতে হবে। আর ফিরে যে আসতেই হবে তা তার রব [আল্লাহ] খুব ভালোভাবেই অবহিত আছেন।

بَلَى দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : আল্লাহর বাণী بَلَى দ্বারা অত্র আয়াতে কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে بَلَى দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّ بَلْ يَحُوْرُ وَيَرْجِعُ অর্থাৎ কাফির যা মনে করে নিয়েছে প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; বরং সে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে– ফিরে যেতে অবশ্যই বাধ্য।

অথবা, بَلَى -এর মর্মার্থ হলো إِنَّ اللّٰهَ يُبَدِّلُ سُرُوْرَهُ بِغَمِّهِ لَا يَنْقَطِعُ অর্থাৎ আল্লাহ তাকে আনন্দের পরিবর্তে এমন বিষাদ দান করবেন যে, যা কোনো দিন শেষ হবে না।

অথবা এর মর্মার্থ হলো, لَيُبْعَثَنَّ অর্থাৎ তাকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করা হবে। –[কাবীর]

كَانَ بِهِ بَصِيرًا দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন– এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ হতে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, কাফেরকে যে, আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তা আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, সে কখন পুনরুত্থিত হবে আল্লাহ তা'আলা তা ভালোভাবে অবগত আছেন।

হযরত আ'তা (র.)-এর মতে, সে যে পাপী হবে তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

ইমাম কালবী (র.) বলেন, ঐ কাফেরের সৃষ্টি হতে, পুনরুত্থান পর্যন্ত সবই আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টি গোচরে রয়েছে।

অথবা, আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٦. فَلَآ اُقْسِمُ لَا زَائِدَةٌ بِالشَّفَقِ هُوَ الْحُمْرَةُ فِى الْاُفُقِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ .

১৬. আমি শপথ করে বলছি لَا এখানে অতিরিক্ত পশ্চিম আকাশে সন্ধা লালিমার সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের কিনারায় রক্তিম আবরণকে شَفَقْ বলা হয়।

١٧. وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ جَمَعَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا .

১৭. আর রাতের এবং তা যা কিছু সমবেত করে তার জন্তু-জানোয়ারের মধ্য হতে যারা দিনে বিচ্ছিন্ন ছিল, রাত তাদেরকে একত্রিত করে।

١٨. وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ اِجْتَمَعَ وَتَمَّ نُوْرُهُ وَ ذٰلِكَ فِى اللَّيَالِى الْبِيْضِ .

১৮. আর চন্দ্রের যখন তা পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হয় অর্থাৎ পরিপূর্ণ হয় এবং তার আলোকরশ্মি পূর্ণভাবে বিকিরণ করে। আর এ অবস্থা হয় মাসের আধা-আধি কয়েকটি রাত্রিতে।

١٩. لَتَرْكَبُنَّ اَيُّهَا النَّاسُ اَصْلُهُ تَرْكَبُوْنَنَّ حُذِفَتْ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِى الْاَمْثَالِ وَالْوَاوُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ حَالًا بَعْدَ حَالٍ وَهُوَ الْمَوْتُ ثُمَّ الْحَيَاةُ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ اَحْوَالِ الْقِيَامَةِ .

১৯. অবশ্যই তোমরা উপনীত হবে হে মানুষ, মূলত تَرْكَبُوْنَنَّ ছিল। কয়েকটি নূন একত্র হওয়াতে نُوْنِ رَفْع-কে উহ্য করা হয়েছে। তারপর দু'সাকিন একত্র হওয়াতে وَاوْ-কে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক স্তর হতে অন্য স্তরে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায়। আর তা হলো মৃত্যু। তারপর জীবন, তারপর কিয়ামাতের অবস্থাসমূহ।

٢٠. فَمَا لَهُمْ اَىِ الْكُفَّارِ لَا يُؤْمِنُوْنَ اَىْ اَىُّ مَانِعٍ لَهُمْ مِنَ الْاِيْمَانِ اَوْ اَىُّ حُجَّةٍ لَهُمْ فِىْ تَرْكِهِ مَعَ وُجُوْدِ بَرَاهِيْنِهِ .

২০. তাদের কি হলো অর্থাৎ কাফেরদের যে, তারা ঈমান আনে না অর্থাৎ কোন্ প্রতিবন্ধক তাদেরকে ঈমান থেকে বিরত রাখছে অথবা ঈমানের অনেক প্রমাণ থাকার পরও বিরত থাকার কোন দলিল তাদের কাছে রয়েছে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

شَفَقْ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) شَفَقْ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– هُوَ الْحُمْرَةُ فِى الْاُفُقِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায়, তাকে شَفَقْ বলে।

এখানে شَفَقْ দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও জমহুর মুফাস্‌সিরগণের মতে এটা দ্বারা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের রক্তিম মেঘমালার কথা বুঝানো হয়েছে।

হযরত ওয়াসিম (র.) বলেছেন, এটা দ্বারা সমগ্র দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এটা দ্বারা দিনের শেষাংশকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সূর্যাস্তের পর রক্তিম আভা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর যে সাদা আভা দেখা যায় এখানে شَفَقْ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে। –[খাযেন]

উল্লিখিত বস্তুত্রয়ের শপথ করার কারণ : এ আয়াত কয়টিতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তুর শপথ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভা, রাত্রি ও রাত্রির আচ্ছাদিত বস্তুসমূহ, পূর্ণ চন্দ্র। এদের মাধ্যমে শপথ করার তাৎপর্য এই যে, দিবসের মধ্যে যত কিছু রয়েছে রত্রিকালে যে সকল জীব এসে নিজ আস্তানায় বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং চন্দ্রের পূর্ণতা সবকিছুর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর কুদরতেই দিবসের শেষ হয়ে রাত্রির আগমন, রাত্রির কালো আঁধার শেষ হয়ে দিবসের পুনঃ আগমন ঘটে। তদ্রূপ চন্দ্রের পূর্ণতা লাভ এবং ক্রমান্বয়ে আবার তা নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া ও আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হয়ে থাকে। অতএব, এটা যেমন বাস্তব সত্য, তদ্রূপ মানব জীবনেরও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে চিরন্তন জীবন লাভ করা বাস্তব সত্য। মানুষ প্রথম পর্যায়ে পিতা-মাতার দেহে শুক্রকীট আকারে ছিল। সে শুক্রকীট মাতৃগর্ভে একটি পূর্ণ মানুষের আকৃতি ধারণ করে দুনিয়াতে আগমন করে। তারপর সে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল পার করে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং সব শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পুনরায় তাকে জীবিত করা হবে এবং হিসাব-নিকাশের পর জান্নাত অথবা জাহান্নামে চলে যাবে-তথায় সে চিরদিন থাকবে।

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ" : طَبَقٌ বলা হয় মূলত যা অন্য একটির মতো হয়। যেমন বলা হয় مَا هٰذَا بِطَبَقٍ كَذَا অর্থাৎ এটা ওটার মতো নয়। একই ধরনের দু'টি অবস্থাকে مُطَابَقَةٌ বলা হয়। এখানে طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ বলতে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে-কাঠিন্যতা এবং ভয়াবহতার দিক থেকে এক অবস্থা অন্য অবস্থার মতো।

অথবা, এখানে طَبَقٌ শব্দটি طَبَقَةٌ-এর বহুবচন হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে- পর্যায় বা ধাপ। অর্থাৎ হে মানব, তোমরা কয়েকটি অবস্থায় পরপর উপনীত হবে, যেগুলো কাঠিন্যতার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের। একটি পর্যায় অন্য পর্যায় থেকে উঁচু. আর তা হলো মৃত্যু। তারপর কিয়ামতের বিভীষিকা এবং ভায়াবহ অবস্থা। হযরত আতা (র.) বলেন, এর অর্থ হলো দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন অবস্থা। -[নূরুল কোরআন]

لَتَرْكَبُنَّ-এর কেরাতসমূহ ও অর্থ : কারো মতে لَتَرْكَبُنَّ-এর بَاءٌ তে পেশ দিয়ে। তখন সকল মানুষকে সম্বোধন করা বুঝাবে। তখন অর্থ হবে- হে মানুষ, তোমরা একের পর এক ব্যাপারে, এক ধাপের পর অন্য ধাপে, এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় এবং এক পর্যায়ের পর অন্য পর্যায়ে উপনীত হবে। শেষ পর্যন্ত বেহেশতের উপযোগীকে বেহেশতে এবং দোজখের উপযোগীকে দোজখে প্রেরণের ব্যবস্থা হবে। এখানে মানুষের সৃষ্টির ধাপের দিকে তাকিয়ে অন্য একটি অর্থ এভাবেও করা যায় যে, মানুষ নুতফা থেকে ধাপে ধাপে 'মানুষ' আকার লাভ করে। তারপর মৃত্যুবরণ করে, তারপর বরযখে, তারপর হাশরে. সর্বশেষ হয় বেহেশতে, না হয় দোজখে স্থানান্তর হবে।

কেউ কেউ لَيَرْكَبُنَّ -بَاءٌ-এর উপর যবর এবং গায়েবের সীগাহ পড়েছেন। এখানে বালাগাতের নিয়মে اَلْتِفَاتٌ হয়েছে অর্থাৎ গায়েবের সর্বনামটি মুহাম্মদ ﷺ-এর দিকে ফিরেছে। আবার কারো মতে, قَمَرٌ-এর প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। কেননা চন্দ্র বিভিন্ন অবস্থায় রূপ পরিবর্তন করে।

কারো মতে, بَاءٌ-কে تَاءٌ আর بَاءٌ-কে যের দিয়ে। তখন نَفْسٌ-কে খেতাব হবে। -[রূহুল মা'আনী, কাবীর]

فَمَا لَهُمْ-এর মধ্যকার প্রশ্নবোধকের অর্থ : فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতের মধ্যকার প্রশ্নবোধক اِنْكَارٌ বা تَعَجُّبٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শপথ করার মাধ্যমে তাঁর কুদরতে কামেলার নিদর্শনগুলোকে বলিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরেছেন। যার মাধ্যমে পরকালের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। অতএব, কেন তারা ঈমান আনবে না, এর উপর আশ্চার্যবোধ করতে হয়। ঈমান না আনা তাদের নিকট থেকে হঠকারিতা বৈ আর কিছু হতে পারে না। -[কাবীর]

فَمَا لَهُمْ-এর فَاءٌ-এর অর্থ : এখানে فَاءٌ পূর্ববর্তী اِنْكَارٌ এবং পরবর্তী تَعَجُّبٌ-এর تَرْتِيْبٌ তথা ধারাবাহিকতার জন্য নেওয়া হতে পারে। অর্থাৎ প্রথমে কিয়ামতের অবস্থা এবং দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, তাদের অবস্থা যখন কিয়ামতে এরূপই হবে তখন ঈমান নেওয়ার ব্যাপারে বাধা কোথায়?..... কেন ঈমান গ্রহণ করছে না?

অথবা, فَمَا-এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার تَرْتِيْبٌ বুঝানো হয়েছে। এটা সে সময় হবে যখন لَتَرْكَبُنَّ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হবে। অর্থ হবে- যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শান এবং অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে তাহলে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে কোন বস্তু বাধা হিসাবে কাজ করছে? অথবা, পিছনে আল্লাহর কুদরতের যে সমস্ত নিদর্শন আলোচিত হয়েছে তার সাথে تَرْتِيْبٌ দিয়ে فَمَا বলা হয়েছে অর্থাৎ "যখন আল্লাহর শান এরূপই আছে যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানী তখন কোন বস্তু পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যে পরকাল আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে সংঘটিত বস্তুসমূহের একটি?" -[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

২১. وَمَا لَهُمْ اِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ط يَخْضَعُوْنَ بِاَنْ يُّؤْمِنُوْا بِهٖ لِاِعْجَازِهٖ . — ২১. আর তাদের কি হলো যে, যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদা করে না? (এরা সামান্য) মাথা নত করে না। এটা এক (জীবন্ত) মু'জিযা হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি ঈমান আনে না।

২২. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ بِالْبَعْثِ وَغَيْرِهٖ . — ২২. বরং কাফেররা তো অস্বীকার করে পুনরুত্থান ও অন্যান্য বিষয়কে।

২৩. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ يَجْمَعُوْنَ فِيْ صُحُفِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالتَّكْذِيْبِ وَاَعْمَالِهِمُ السُّوْءِ . — ২৩. আল্লাহ ভালো করেই জানেন যা তারা জমা করেছে তারা তাদের আমলনামায় কুফর, অস্বীকৃতি ও অন্যান্য যেসব পাপকার্য সংরক্ষণ করছে।

২৪. فَبَشِّرْهُمْ اَخْبِرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ مُؤْلِمٍ . — ২৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে সু-সংবাদ দিন তাদেরকে সংবাদ দিন-যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির পীড়াদায়ক।

২৫. اِلَّا لٰكِنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ غَيْرُ مَقْطُوْعٍ وَلَا مَنْقُوْصٍ وَلَا يُمَنُّ بِهٖ عَلَيْهِمْ . — ২৫. হ্যাঁ, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য বিনিময় রয়েছে অশেষ যা কখনও নিঃশেষ হবে না হ্রাস পাবে না এবং এর কারণে তাদেরকে খোঁটাও দেওয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا قُرِئَ .... الخ আয়াতের শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ একবার আয়াতে কারীমা وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ পাঠ করলেন এবং সেজদা করলেন, তাঁর সাথে মু'মিনগণও সেজদা করলেন। এ দৃশ্য দেখে কাফের ও মুশরিকরা হাত তালি এবং শীষ দেওয়া শুরু করল। তখন তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাজিল করলেন যে, وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ কাফের ও মুশরিকদের সামনে যখন কুরআন মাজীদ পাঠ করে শুনানো হয় তখন তারা এর সম্মানে সিজদাবনত হয় না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আর কাফের ও মুশরিকদের কি হলো যখন তাদের সামনে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন তারা সেজদা করে না কেন?

অত্র আয়াতে সেজদা না করার মর্মার্থ কি– এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, তারা কুরআনের সামনে মাথা নত করে না তথা কুরআন (জীবন্ত) মু'জিযা হওয়া সত্ত্বেও তারা এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে না। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো, তারা সেজদা করে না কেন? অর্থাৎ এর জাহেরী [বাহ্যিক] অর্থ উদ্দেশ্য।

ইমাম আবূ মুসলিম এর অর্থ করেছেন, তারা বিনয় এবং প্রশান্তি [তথা খুশু-খুযু]-এর সাথে আল্লাহর ইবাদত করে না। হযরত হাসান, আতা, কালবী এবং মুকাতিল প্রমুখগণের মতে এর অর্থ হলো مَا لَهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ অর্থাৎ তাদের কি হয়েছে তারা নামাজ পড়ে না কেন?

আলোচ্য আয়াত (وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الخ)-এর মধ্যে সিজদা ওয়াজিব কিনা? : সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ অত্র আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করেছেন। ইমাম মালিক, মুসলিম ও নাসায়ী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নামাজে এ আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করেছেন এবং বলেছেন যে, স্বয়ং নবী করীম ﷺ এখানে সিজদা করেছেন।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র.) হযরত আবূ রাফে' (রা.)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন, একবার হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ'শার নামাজে এ সূরা পাঠ করেছেন এবং সেজদা করেছেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন, আমি আবুল কাসেম তথা নবী করীম ﷺ-এর ইমামতিতে নামাজ পড়েছি। তিনি এখানে সেজদা করেছেন। কাজেই আমি মৃত্যু পর্যন্ত অবশ্যই এ সিজদা করতে থাকবো।

মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র.) প্রমুখগণের উদ্ধৃত অন্য একটি বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এ সূরায় এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-এর মধ্যে সিজদা করেছি।

ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এখানে সেজদা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এখানে সেজদা করা সুন্নত। ইবনুল আরবী (র.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, আমি যখন ইমামতি করতাম তখন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতাম না। কেননা আমি এতে সেজদা দেওয়া জরুরি মনে করতাম এবং সাধারণ লোকেরা এখানে সিজদা দেওয়ার বিরোধিতা করত। কাজেই যখন আমি একাকী নামাজ পড়তাম শুধু তখনই তা তেলাওয়াত করতাম এবং সেজদাও দিতাম। কেননা কৌশলগত কারণে কোনো কোনো বিষয় সময় সময় এড়িয়ে যেতে হয়। যেমন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, হে আয়েশা! যদি তোমার সম্প্রদায় নব মুসলিম না হতো তাহলে আমি কা'বা শরীফকে ভেঙ্গে পুনরায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভিত্তির উপর স্থাপন করে দিতাম।

তারা কেন অস্বীকার করত? : তারা [কাফেরগণ] কুরআনকে অস্বীকার করত। এ কারণে সেজদা করত না।

কারো মতে, তারা রাসূল-মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার করত। তাই তাদের কাছে তাঁর উপস্থাপিত কোনো কিছুই ভালো লাগত না; বরং কোনো কিছু উত্থাপিত হলে অস্বীকারের সুরই বেজে উঠত।

يُوْعُوْنَ-এর অর্থ এবং তার উদ্দেশ্য : আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, يُوْعُوْنَ অর্থ يُضْمِرُوْنَ অর্থাৎ গোপন করে রাখে। আয়াতের অর্থ হবে- يُضْمِرُوْنَهٗ فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْحَسَدِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْبَغْىِ অর্থাৎ তারা তাদের অন্তরে কুফরি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং অবাধ্যতার মধ্য হতে যা লুকিয়ে রাখে আল্লাহ তা'আলা তা ভালো করেই জানেন। মূলত اِيْعَاءٌ অর্থ কোনো বস্তুকে وِعَاءٌ বা পাত্রতে স্থাপন করা।

মুফরাদাতে রাগেব এ আছে- اَلْاِيْعَاءُ حِفْظُ الْاَمْتِعَةِ فِىْ وِعَاءٍ

পাত্রতে মালামাল সংরক্ষণ করাকে اِيْعَاءٌ বলা হয়। এ অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত।

কেউ কেউ وِعَاءٌ অর্থ جَمْعٌ অর্থাৎ 'সঞ্চয় করা' বলেছেন। যেমন, ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত, তিনি আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন- তারা তাদের আমলনামায় খারাপ কৃতকর্ম হতে যতকিছু সঞ্চয় করেছে, আল্লাহ সবকিছু জানেন।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাদের অস্বীকারের পিছনে অনেক বড় বড় কুমন্ত্রণা লুক্কায়িত আছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেগুলো আল্লাহ জানেন।

কেউ কেউ বলেন, তারা তাদের অন্তরে কুরআন সত্য হওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত দলিল গোপন করে রেখেছে, আল্লাহ তা ভালো করে-ই অবগত আছেন। -[রূহুল মা'আনী]

يُوْعُوْنَ শব্দে দু'টি কেরাত : জমহুর এখানে يُوْعُوْنَ [বাবে اِفْعَالٌ থেকে বহুবচন, পুংলিঙ্গ] পড়েছেন। আবূ রাজা وَعْىٌ থেকে يَعُوْنَ পড়েছেন।

بَشَارَةٌ ছাড়া অন্য শব্দ উল্লেখ না করার কারণ : بَشَارَةٌ (শুভ সংবাদ) মূলত খুশির সংবাদে হয়ে থাকে; কিন্তু عَذَابٌ اَلِيْمٌ ব কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি কোনো দিন শুভ সংবাদ বা খুশির খবর হতে পারে না। তথাপি আল্লাহ তা'আলা এখানে بَشِّرْهُمْ বলেছেন।...... কেননা এর দ্বারা তাদের কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য।

অথবা, তারা সারা জীবন গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকার কারণে বুঝা যায় যে, গুনাহের কাজের প্রতি তাদের লিপ্সা রয়েছে। এটাই তাদের ইপ্সিত বস্তু। প্রাপ্য বস্তুর খবর দেওয়া একটি খুশির ব্যাপার। তাই খুশির শব্দ-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

কারো মতে নবী করীম ﷺ এ দুনিয়াতে রহমত স্বরূপ এসেছেন। খারাপ বা কঠোর শব্দ ব্যবহার করা তাঁর শানের খেলাফ। তাই শব্দের মধ্যে মাধুর্যতা এবং বিনয়তা প্রকাশের জন্য فَبَشِّرْهُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। دَاعِىْ দের ভাষা ভালো এবং মোলায়েম হওয়ার দিকেও এটা ইঙ্গিত বহন করে। -[রূহুল মা'আনী]

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا-তে اِلَّا-এর অর্থ : اِلَّا একটি হরফে ইস্তিছনা, এটা দ্বারা পূর্বের হুকুমকে নফী করে দেওয়া হয়। তবে আয়াতে اِلَّا দ্বারা اِسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ উদ্দেশ্য। তাই যেন বলা হয়েছে যে, لٰكِنَّ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا بِشَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ যারা 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে কোনো اِسْتِثْنَاءٌ-ই নেই; বরং اِلَّا অর্থ এখানে وَاوْ যেন আল্লাহ এভাবে বলেছেন- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ -[কুরতুবী]

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ : সূরা আল-বুরূজ

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের 'আল-বুরূজ' শব্দ অবলম্বনে। এতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য ও ৪৩৮টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : এ সূরাটি মহানবী ﷺ -এর মাক্কী জীবনের সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর ক্রমাগতভাবে দীনের দাওয়াতের ফলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করছিল। ইসলামের এ ক্রমোন্নতি ছিল মক্কার কাফের সর্দারদের নিকট অসহনীয়। তারা দীনের দাওয়াত ও আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ই অবলম্বন করল। অসহায়-দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করা; ধূসর মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে হাত-পা বেঁধে রাখা, জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা দেহে দাগ কাটা, শূলীতে চড়ানো, মারপিট করা ইত্যাদি কোনো পন্থাই তারা হাতছাড়া করল না। এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য-সনাতন দীন ইসলাম হতে সে সকল লোককে ফিরিয়ে রাখা। এ সময়ই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ও কাফের উভয় দলের শিক্ষার জন্য এ ঐতিহাসিক তত্ত্বসমৃদ্ধ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : কাফেররা ঈমানদারদের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং সে সঙ্গে মুসলমানদেরকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া যে, তারা যদি এ জুলুম-নির্যাতনের মুখেও নিজেদের ঈমান ও আদর্শের উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকতে পারে, তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দেওয়া হবে এবং আল্লাহ এ জালেমদের হতে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন—এটাই হলো এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য।

এ প্রসঙ্গে সূরাটির প্রথমে আসহাবে উখদূদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদার লোকদেরকে অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিল। এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, উখদূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে গেছে মক্কার কাফের সর্দাররাও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়ত, তখনকার সময় ঈমানদার লোকেরা যেভাবে অগ্নিগর্তে নিক্ষিপ্ত হতে ও প্রাণের-কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়েছিল; কিন্তু ঈমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে কোনোক্রমেই প্রস্তুত হয়নি। অনুরূপভাবে বর্তমানে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হলো সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন অকাতরে বরদাশত করে নেওয়া আর ঈমানের মহা মূল্যবান ধন কোনো অবস্থাই ইস্তচ্যুত না করা।

তৃতীয়ত, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কাফেররা ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ঈমানদার লোকেরাও তার উপর অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর সে আল্লাহ সর্বজয়ী সর্বশক্তিমান। তিনিই জমিন ও আসমানের একচ্ছত্র মালিক। তিনি স্বীয় সত্তায় প্রশংসিত। তিনি উভয় সমাজের লোকদের অবস্থা দেখছেন। কাজেই কাফেররা তাদের কুফরির শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। শুধু এটাই শেষ নয়; বরং তা ছাড়াও তাদের এ জুলুমের শাস্তি স্বরূপ দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার লোকেরা নেক আমল করে জান্নাতে যাবে। এটাই তাদের বিরাট ও চূড়ান্ত সাফল্য-এটাও নিঃসন্দেহে। এরপর কাফেরদেরকে সর্তক করা হয়েছে এ বলে যে; আল্লাহর পাকড়াও নিশ্চিত ও অত্যন্ত শক্ত। তোমাদের মনে জনশক্তির কারণে যদি কোনো অহমিকতা জেগে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমাদের পূর্বে ফিরাউন ও নমরুদের জনশক্তি বিন্দুমাত্র কম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের জনতার যে পরিণতি ঘটেছে তা দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহর অমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে আছে। এ গ্রাস হতে তোমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। তোমরা যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ ও অবিশ্বাস করার জন্য বদ্ধ পরিকর, সে কুরআনের প্রতিটি কথা অটল অপরিবর্তনীয়। তা এমন সুরক্ষিত যে, তার লেখা পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই।

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-বুরূজ মক্কায় অবতীর্ণ

اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২২ আয়াতবিশিষ্ট

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ لِلْكَوَاكِبِ اِثْنَا عَشَرَ بُرْجًا تَقَدَّمَتْ فِى الْفُرْقَانِ ـ

১. শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের নক্ষত্ররাজির জন্য বারটি বুরূজ; যে সম্পর্কে সূরা আল-ফোরকানে আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে।

٢. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

২. আর শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের কিয়ামত দিবসের।

٣. وَشَاهِدٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَشْهُوْدٍ يَوْمِ عَرَفَةَ كَذَا فُسِّرَتِ الثَّلٰثَةُ فِى الْحَدِيْثِ فَالْاَوَّلُ مَوْعُوْدٌ بِهٖ وَالثَّانِىْ شَاهِدٌ بِالْعَمَلِ فِيْهِ وَالثَّالِثُ يَشْهَدُهُ النَّاسُ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ صَدْرُهٗ اَىْ لَقَدْ ـ

৩. এবং শপথ দ্রষ্টার [উপস্থিতের] জুমার দিনে ও দৃষ্টের [উপস্থাপিতের] আরাফার দিনে। হাদীসে এ শব্দত্রয়ের এরূপ তাফসীরই উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং প্রথমটি দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য, যেহেতু তা প্রতিশ্রুত দিন, দ্বিতীয়টি দ্বারা জুমার দিন উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আমলের জন্য সাক্ষ্যদানকারী বা আমল প্রত্যক্ষকারী, আর তৃতীয়টি দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য, যেহেতু সেদিন মানুষ ও ফেরেশতাগণ সমবেত হয়। আর কসমের জবাবের প্রথমাংশ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ لَقَدْ অবশ্যই।

٤. قُتِلَ لُعِنَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ الشَّقِّ فِى الْاَرْضِ ـ

৪. ধ্বংস হয়েছে অভিশপ্ত কুণ্ডের অধিপতিগণ জমিনে গর্ত

٥. النَّارِ بَدَلُ اِشْتِمَالٍ مِنْهُ ذَاتِ الْوَقُوْدِ مَا تُوْقَدُ فِيْهِ ـ

৫. অগ্নির এটা পূর্বোক্ত اُخْدُوْد হতে بَدَلُ اِشْتِمَالٍ য ইন্ধনপূর্ণ যা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।

٦. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا اَىْ حَوْلَهَا عَلٰى جَانِبِ الْاُخْدُوْدِ عَلَى الْكَرَاسِىِّ قُعُوْدٌ ـ

৬. যখন তারা তদুপরি এর পার্শ্বে কুণ্ডের কিনারায় আসনসমূহে উপবিষ্ট ছিল।

٧. وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ مِنْ تَعْذِيْبِهِمْ بِالْاِلْقَاءِ فِى النَّارِ اِنْ لَّمْ يَرْجِعُوْا عَنْ اِيْمَانِهِمْ شُهُوْدٌ حُضُوْرٌ رُوِىَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْجَى الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُلْقِيْنَ فِى النَّارِ بِقَبْضِ اَرْوَاحِهِمْ قَبْلَ وُقُوْعِهِمْ فِيْهَا وَخَرَجَتِ النَّارُ اِلٰى مَنْ ثَمَّ فَاحْرَقَتْهُمْ ـ

৭. আর তারা যা করছিল ঈমান আনয়নকারীগণের সা আল্লাহর প্রতি, ঈমান হতে বিরত না হলে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করার শাস্তি তা প্রত্যক্ষকা সাক্ষাৎদর্শী বা উপস্থিত। বর্ণিত আছে যে, আল্লা তা'আলা উক্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত মু'মিনগণকে তা পতিত হওয়ার পূর্বেই রূহ কবজ করার মাধ্যমে মু দান করেছেন। আর আগুন তথায় উপবিষ্টজনের প্র লেলিহান শিখা বিস্তার করে তাদেরকে জ্বালিয়ে করে দেয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ الْاُخْدُوْدُ : اَلْاُخْدُوْدُ শব্দের অর্থ হলো, اَلشَّقُّ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনে গর্ত করা। একবচন, বহুবচনে اَخَادِيْد এখান থেকেই خَدٌّ [চোয়াল] ব্যবহৃত হয়। কেননা, خَدٌّ (চোয়াল) দিয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। আর مِخَدَّةٌ অর্থ– বালিশ। কেননা চোয়াল সেখানে রাখা হয়। –[কুরতুবী]

ঐ জালিমরা জমিনে গর্ত করেছিল। এ গর্তকে আগুন জ্বেলে পরিপূর্ণ করেছিল। তাদেরকে আগুনের আসহাব না বলে গর্তের আসহাব বলা হয়েছে। কেননা গর্তটি সম্পূর্ণ আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, মনে হয় যেন, গর্তটিই মু'মিনদেরকে পুড়েছিল, আর ঐ গর্তের মালিক ছিল সে জালিমগণ।

قُتِلَ الخ -এর মহল্লে ই'রাব : قُتِلَ ক্রিয়াটি কসমের জবাব হয়েছে। তবে এখানে لَقَدْ উহ্য রয়েছে। যেমন উহ্য রয়েছে আল্লাহর বাণী وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (ثُمَّ قَالَ) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا আয়াতে। অর্থাৎ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا এরপর জবাবের মধ্যে لَقَدْ হওয়া দরকার ছিল; কিন্তু لَقَدْ না বলে শুধু قَدْ اَفْلَحَ বলা হয়েছে। এটা ইমাম ফাররার অভিমত।

কারো মতে, মূলত এখানে মূল ইবারতকে আগে পরে করতে হবে। যেমন মূলে ছিল– قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ এ মতটি ইমাম আবূ হাতিম সিজিস্তানীর। –[কুরতুবী]

ঐ জালিমরা জমিনে গর্ত করেছিল। সে গর্তকে আগুন জ্বেলে পরিপূর্ণ করেছিল। তাদেরকে আগুনের আসহাব না বলে গর্তের আসহাব বলা হয়েছে। কেননা গর্তটি সম্পূর্ণ আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, মনে হয় যেন, গর্তটিই মু'মিনদেরকে পুড়েছিল, আর সে গর্তের মালিক ছিল ঐ জালিমগণ।

اَلنَّارْ শব্দের মহল্লে ই'রাব এবং অর্থ :

১. اَلنَّارْ শব্দটি اَلْاُخْدُوْدْ হতে بَدْلُ اشْتِمَالْ হিসাবে মাজরূর হয়েছে; কিন্তু رَابِطْ নেই বিধায় প্রশ্ন জাগে। তখন বলা হয় যে, رَابِطْ হলো উহ্য فِيْهِ অথবা اَلنَّارْ তথা আগুন যে اُخْدُوْدْ তথা গর্তে ছিল একথা সকলেরই জানা, তাই رَابِطْ-এর প্রয়োজন নেই।

২. আবূ হাইওয়ান بَدْلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ হিসেব মাজরূর পড়েছেন। এভাবে যে, এখানে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اُخْدُوْدُ النَّار

৩. কেউ কেউ اَلنَّارُ-কে উহ্য ক্রিয়ার ফায়েল হিসাবে মারফূ' পড়েছেন। মূলবাক্য হবে قَتَلَتْهُمُ النَّارُ এমতাবস্থায় هُمْ দ্বারা মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং পিছনের اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ দ্বারাও মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। তখন قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ এর قُتِلَ শব্দটি لُعِنَ না হয়ে মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হবে। অথবা কাফের উদ্দেশ্য হয়ে قُتِلَ তার মূল অর্থেই ব্যবহৃত হবে। যেমন রাবী ইবনে আনাস, কালবী, আবুল আলিয়া আবূ ইসহাক বলেন– ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর একটি প্রবল বাতাস প্রেরণ করে তাদের রূহসমূহ গ্রহণ করেছেন। সে বাতাসে গর্ত হতে আগুন বের হয়ে কাফেরদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যারা ঐ গর্তের আশে-পাশে ছিল।

৪. কেউ কেউ মুবতাদা মাহযূফের خَبَرْ হিসাবে اَلنَّارْ-কে رَفْعٌ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ هُوَ النَّارُ তখন هُوَ সর্বনামটি اُخْدُوْدْ-এর দিকে ফিরবে। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে ঈমানদার এবং কাফির উভয় পক্ষের প্রতিদান ও প্রতিফলসমূহের পর্যালোচনা হয়েছিল। এখন সূরা আল-বুরূজে কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে, আর কাফিরদেরকে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

আর এ সূরায় মু'মিনদেরকে কাফির-মুশরিকদের জুলুম অত্যাচারে ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং কাফিরদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ আয়াতে بُرُوْجٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহর বাণী– وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ-এর মধ্যে بُرُوْجٌ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে–এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

ক. কোনো কোনো মুফাস্সির এর অর্থ করেছেন, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী বারো বুরুজ। উক্ত বারোটি বুরুজ হলো হামল বা মেষরাশি, সাওর বা বৃশরাশি, জাওযা বা মিথুন রাশি, সারাতান বা কর্কট রাশি, আসাদ বা সিংহ রাশি, সুম্বলা বা কন্যা রাশি, মিযান বা তুলা রাশি, আক্রাব বা বৃশ্চিক রাশি, কাউস বা ধনুক রাশি, জাদয়ী বা মকর রাশি, দলোভ বা কুম্ভ রাশি, হুত বা মীন রাশি, এ সমস্ত রাশিচক্র বা কক্ষের পরিবর্তন দ্বারাই শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ইত্যাদি ঋতুসমূহেরও পরিবর্তন ঘটে।

খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ (র.), কাতাদাহ (রা.), হাসান বসরী (র.), যাহহাক (র.) ও ইমাম সুদ্দী (র.)-এর মতে এর দ্বারা বড় বড় নক্ষত্রসমূহকে বুঝানো হয়েছে।

গ. ইমাম ইবনে খোযায়মাহ (র.) বলেন, এর দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথসমূহের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর সংখ্যা হলো বারো। সূর্য এক একটি কক্ষপথে এক মাস পরিভ্রমণ করে। আর চন্দ্র তার প্রতিটিতে দু'দিন ও এক দিনের এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। আর উক্ত বারোটি বুরুজ হলো হামল, সাওর, জাওযা, সারাতান, আসাদ, সুম্বুলা, মীযান, আক্রাব, কাউস, জাভী, দালায় এবং হুত।

আকাশকে ذَاتِ الْبُرُوْجِ বলা হয়েছে কেন? : আলোচ্য আয়াতে আকাশকে 'যাতুল বুরূজ' বা কক্ষ বিশিষ্ট বলা হয়েছে। এর একাধিক কারণ হতে পারে। কেননা এরা আকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

অথবা, এ জন্য যে, চর্মচোখে দেখলে মনে হয় যেন আকাশ এদেরকে ধারণ করে আছে।

অথবা, بَرَجٌ-এর অর্থ হলো প্রকাশ্য বস্তু। আর যেহেতু আকাশে এরা প্রকাশ পায় সেহেতু এগুলোকে بُرُوْجٌ এবং আকাশকে ذَاتِ الْبُرُوْجِ বলা হয়েছে।

এখানে اَلسَّمَآءِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। কারো কারো মতে اَلسَّمَآءُ দ্বারা সকল আকাশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আরশ ছাড়া সকল ফালাককে اَلسَّمَآءُ বলা হয়েছে। কারো কারো মতে এর দ্বারা সর্ব উচ্চ ফালাক অর্থাৎ আরশ উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ বলেছেন এটা হলো 'অষ্টম ফালাক'। সর্বাধিক উজ্জ্বল হওয়ার কারণে একে فَلَكُ الْبُرُوْجِ বলে।

কারো কারো মতে, এর দ্বারা দুনিয়ার সন্নিকটস্থ আকাশ اَلسَّمَآءُ الدُّنْيَا উদ্দেশ্য। কেননা বাহ্যত এটাই পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ অর্থাৎ দুনিয়ার আকাশকে আমি বাতিসমূহ দ্বারা সুশোভিত করেছি।

প্রতিশ্রুত দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, اَلْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ দ্বারা কিয়ামতের দিবসকে বুঝানো হয়েছে। তবে এটা কিয়ামতের দিবসের কোন সময় তাতে মতভেদ রয়েছে।

কারো মতে এটা নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশের সময়। কেউ বলেন, এটা আকাশ সংকুচিত করার দিন। যেমন ইরশাদ হয়েছে– يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ

কারো মতে, এটা সে সময় যখন মানুষ কবর হতে বের হয়ে আসবে। ইরশাদ হয়েছে– يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত সবকিছুই কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। –[রূহুল মা'আনী]

شَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ-এর অর্থ : উপরিউক্ত وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার দ্রষ্টা ও দৃষ্টের নামে শপথ করা দ্বারা কি বুঝিয়েছেন, সে বিষয়ে তাফসীরকারকদের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা মতে নবী করীম ﷺ বলেন, لِلْمَوْعُوْدِ অঙ্গীকারকৃত দিবস দ্বারা কিয়ামত এবং وَمَشْهُوْدٍ তথা দৃষ্টের দ্বারা আরাফাতের দিন ও وَشَاهِدٍ তথা দ্রষ্টা দ্বারা জুমার দিন বুঝানো হয়েছে। এ দিনগুলোতে এমন একটি মোক্ষম সময় রয়েছে যে, কোনো বান্দা সে সময় আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করলে এবং অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাইলে, তিনি তা কবুল করে থাকেন। –[তিরমিযী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, দ্রষ্টা ও দৃষ্টের দ্বারা জুমার দিন ও আরাফাতের দিন বুঝানো হয়েছে।

এটা ছাড়া আরও কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন–

১. দ্রষ্টা দ্বারা জুমার দিন এবং দৃষ্টের দ্বারা কুরবানির দিন বুঝানো হয়েছে।

২. দ্রষ্টা দ্বারা তারবিয়াতের দিন এবং দৃষ্টের দ্বারা আরাফার দিন বুঝানো হয়েছে। কেননা এ দিনগুলোর ফজিলত ও মর্যাদা খুব বেশি। সমস্ত মানুষ ঐ সব স্থানে জমায়েত হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এদের নামে শপথ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৩. কেউ কেউ বলেন, দ্রষ্টা দ্বারা স্বয়ং আল্লাহর সত্তা এবং দৃষ্টের দ্বারা মহাবিচারের দিনের কথা বুঝানো হয়েছে।
৪. এটাও বলা হয় যে, দ্রষ্টা দ্বারা নবী-রাসূলগণ এবং দৃষ্টের দ্বারা তাঁদের অনুসারী উম্মতগণের কথা বুঝানো হয়েছে
৫. এটাও পাওয়া যায় যে, দ্রষ্টা দ্বারা ফেরেশতা এবং দৃষ্টের দ্বারা আদম ও তার সন্তানগণের কথা বলা হয়েছে।
৬. এটাও বলা হয় যে, দ্রষ্টা হচ্ছে– আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণ এবং দৃষ্টের দ্বারা বুঝানো হয়েছে, সাবেক নবীগণ ও তাদের উম্মতগণ।
৭. এটাও বলা হয় যে, দ্রষ্টা হচ্ছেন সাবেক নবী ও রাসূলগণ এবং দৃষ্ট হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ কেননা আমাদের নবীর সর্বশেষে আগমনবার্তা তাঁরা নিজ নিজ উম্মতগণকে শুনিয়েছেন। –[খাযেন, ইবনে কাছীর]
৮. ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেন, شَاهِدٌ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে,

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا .

আর مَشْهُوْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামতের দিন। কেননা কুরআনে রয়েছে وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ –[নূরুল কোরআন]

সূরার শুরুতে শপথের তাৎপর্য : এসব জালিম, নিষ্ঠুর ও পাপাচারীগণ আল্লাহর অভিশাপে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে, সে কথাটির গুরুত্ব প্রকাশের জন্য আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে শপথ করেছেন। প্রথম শপথ আকাশের বুরূজের নামে করে বুঝিয়েছেন যে, মানুষের উর্ধ্বমণ্ডলে এ সব বুরূজের নির্মাতা, কর্তা ও পরিচালক হলেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা। সুতরাং সে মহাশক্তিধরের পাকড়াও হতে এ জালিম আল্লাহদ্রোহীগণ কিরূপে বাঁচতে পারবে।

দ্বিতীয় শপথ করা হয়েছে কিয়ামতের দিন যার আবশ্যকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে মহাপ্রলয় যে সত্তার দ্বারা সংঘটিত হবে, তার শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার কোনোই পথ নেই।

তৃতীয় শপথ করা হয়েছে দ্রষ্টা বা দৃষ্টের, অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঈমানদার লোকদের ফরিয়াদ শ্রবণ করবেন এবং এসব জালিমকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করবেন। আর ঈমানদারগণ তখন এদের অবস্থা অবলোকন করে আনন্দ অনুভব করবেন।

আসহাবুল উখদূদ : আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে আসহাবুল উখদূদ (গর্তের কর্তাদের) প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। বলেছেন– গর্তের কর্তারা ধ্বংস হয়েছে। এ গর্তের কর্তা হলো সেসব আল্লাহদ্রোহী জালিম ও পাপিষ্ঠ শাসক ও রাজা-বাদশা এবং তাদের অনুসারীবৃন্দ, যারা ঈমানদার লোকগণকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অজুহাতে বড় বড় গর্তের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে নিক্ষেপ করেছিল। আর তারা গর্তের তীরে দণ্ডায়মান থেকে আনন্দচিত্তে অবলোকন করছিল। আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণের প্রতি এমন নির্মম অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল অবশ্যই; কিন্তু তা কোন যুগে ও কাদের দ্বারা হয়েছে, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকবৃন্দের নিকট হতে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা এখানে অধিকতর বিশুদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করছি।

আসহাবে উখদূদ-এর ঘটনা : আসহাবে اُخْدُوْدٌ সম্পর্কে চারটি ঘটনা পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ–

১. তাফসীরকারকগণ উপরিউক্ত আসহাবুল উখদূদ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ লিখেন–হযরত সোহায়েব রূমী (রা.) -এর বর্ণনা, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, পূর্ব জমানার এক বাদশা ছিল জালিম ও আল্লাহদ্রোহী। তার এক জাদুকর ছিল। জাদুকর একদিন বাদশাকে বলল, জাহাপনা! আমি অতিশয় বৃদ্ধ হয়েছি, আমার মৃত্যু আসন্ন। আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আপনার মন্ত্রীদের কোনো একটি প্রখর মেধাসম্পন্ন ছেলেকে আমার নিকট প্রেরণ করুন। আমি তাকে আমার মনের মতো জাদুবিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তুলবো। বাদশা এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয়ে একটি ছেলেকে তার নিকট জাদু শিক্ষা করতে দিল। ছেলেটি নিয়মিতভাবে জাদু শিক্ষা করতে যেত। পথে ছিল এক খ্রিস্টান আলিমের আস্তানা। সে গমনপথে সেখানেও আসা-যাওয়া করত। বালকটি পাদ্রী সাহেবের চরিত্র মাধুর্য ও শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর দীন গ্রহণ করে ঈমানদার হলো। এদিকে জাদুবিদ্যা শিক্ষাও চলতে লাগল। বালক পথে যাওয়ার সময় সম্মুখে বিরাটকায় একটি হিংস্র জন্তুকে দেখতে পেল। জন্তুটি মানুষের পথ অবরোধ করার ফলে মানুষের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা সৃষ্টি হলো। বালকটি এ সময় মনে মনে চিন্তা করল, পাদ্রী অবলম্বিত ধর্ম সত্য না জাদুর শিক্ষা সত্য, তা পরীক্ষা করার এটা একটি মোক্ষম সময়। অতএব, সে একটি পাথর খণ্ড হাতে নিয়ে বলল, হে আল্লাহ! জাদুবিদ্যার তুলনায় পাদ্রীর ধর্ম যদি সত্য ও খাঁটি হয়, তবে আমার এ ক্ষুদ্র পাথর আঘাতে জন্তুটি নিহত করুন। অতঃপর বালকটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করলে জন্তুটি মারা গেল। এতে জনমনে তার প্রতি খুব আস্থা সৃষ্টি হলো এবং সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেলল। এদিকে দীনের প্রতি বালকের ঈমান দৃঢ় হওয়ায় এবং পাদ্রীর সাহচর্যের ফলে সে কারামতি প্রদর্শনের শক্তি লাভ করল। লোকজন তার নিকট বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি নিরাময় করার উদ্দেশ্যে আসতে লাগল। এদিকে বালক পাদ্রীর নিকট জন্তুটি হত্যা করার ঘটনাটি বিবৃত করলে পাদ্রী বলল, তুমি আমার চেয়েও অনেক বেশি ফজিলত লাভ করে ফেলেছ। আমার ভয় হচ্ছে তুমি মহাপরীক্ষার মধ্যে নিপতিত হও নাকি? এরূপ অবস্থায় পড়লে আমার কথা কারো নিকট বলবে না। এদিকে তার দোয়ায় বহু লোক নিরাময় হতে লাগল।

Free @ www.eilm.weebly.com

ঘটনাক্রমে বাদশার সভাসদের একজন উপদেষ্টা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সে এ বালকের সুনাম ও খ্যাতি শুনে তার নিকট এসে অনেক উপঢৌকন দিয়ে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করার জন্য আবেদন জানাল। বালক বলল, আমার দৃষ্টি দানের কোনো ক্ষমতা নেই। নিরাময় করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আপনি যদি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত-বন্দেগি না করেন, তবে আমি আপনার দৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য দোয়া করতে পারি। লোকটি বালকের কথায় ঈমান আনলে বালক তার জন্য দোয়া করল। ফলে তৎক্ষণাৎই সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

দ্বিতীয় দিন সে বাদশার দরবারে গিয়ে বসল, বাদশা তার নিকট দৃষ্টিশক্তি লাভের কথা জিজ্ঞাসা করল জবাবে লোকটি বলল, আমার প্রতিপালক আমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাদশা বলল, তোমার 'রব' তো আমি। আমি ছাড়া আর কে আছে? লোকটি বলল– না, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাদশা পরিশেষে সন্ধান পেল– যে বালকটিকে সে জাদুবিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিল। সে বালকেরই এসব কর্মকাণ্ড। বালককে দরবারে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর সে যখন বাদশাকে 'রব' মানতে সম্মত হলো না, তখন তাকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হলে তখন সে প্রার্থনা করল– আল্লাহ আপনি আমাকে সহায়তা করুন। তখন পাহাড় কম্পনে অন্যান্য সমস্ত লোক চূড়া হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করল; কিন্তু বালকের কিছুই হলো না। এতে বালকের যশঃখ্যাতি আরো বৃদ্ধি পেল। অতঃপর বাদশা তাকে নদীতে ডুবিয়ে মারার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হলো তখন সে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে নদীতে তুফান সৃষ্টি হয়ে সকলে ডুবে মরল; কিন্তু বালকের কিছুই হলো না।

এদিকে ঐ বালকের নিকটই তার শিক্ষক পাদ্রীর সংবাদ জানতে পেরে তাকে দরবারে ডেকে আনা হলো। পাদ্রীকে তার ধর্মমত পরিত্যাগ করে বাদশাকে একমাত্র রব স্বীকার করার কথা বলা হলো কিন্তু পাদ্রী এতে সম্মত না হলে তাকে হত্যা করা হলো। অতঃপর বালককেও অনুরূপভাবে ভীতি প্রদর্শন করে ঈসায়ী ধর্মমত পরিহার করার কথা বলা হলো। তখন বালক বলল– হে বাদশা! এভাবে তুমি আমাকে মারতে পারবে না; বরং আমাকে মারতে হলে আমার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। বাদশাহ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলে বালক বলল– তুমি শহরের সমস্ত লোককে এক উঁচু জায়গায় সমবেত করবে। অতঃপর আমাকে শূলদণ্ডে চড়িয়ে 'বিসমিল্লাহে রাব্বিল গোলাম' বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলেই আমার মৃত্যু হবে। বাদশাহ তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। উপস্থিত লোকজন বালকের এমনি মৃত্যু দেখতে পেয়ে সকলে সমস্বরে বলে উঠল–'আমরা এ বালকের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।'

বাদশা যে বিষয়টির ভয় করছিল, সেটাই সর্বশেষে দেখা দিল। সমস্ত প্রজাবৃন্দকে ঈমানদার হতে দেখে বাদশা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। অতঃপর সে শহরের প্রতিটি মহল্লায় ও গলিতে বিরাট বিরাট গর্ত খননের নির্দেশ দিল। অতঃপর এতে আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে লোকদেরকে বলল, তোমরা গোলামের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান বর্জন করে আমাকে রব বলে স্বীকার করো। নতুবা তোমাদেরকে এ অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মারা হবে; কিন্তু প্রজাবৃন্দ স্বধর্ম পরিত্যাগ না করে হাসিমুখে দলে দলে অনুকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দিতে লাগল। আর বাদশা ও তার অনুসারী মোসাহেবগণ এহেন বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলো এবং উপহাস করতে লাগল। একটি মহিলাকে আগ্নিতে নিক্ষেপের জন্য আনয়ন করা হলো। তাঁর কোলে ছিল অবুঝ শিশু। মহিলা সন্তানের বাৎসল্যে প্রায় ঈমানকে বর্জন করার উপক্রম হলো, তখন ঐ অবুঝ শিশু বলে উঠল–হে মাতা! ধৈর্য অবলম্বন করুন। নির্ভয়ে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ুন। কেননা, নিঃসন্দেহে আপনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ জালিম গোষ্ঠী বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. আসহাবুল উখদূদ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো নাজরানের ঘটনা। ইবনে হিশাম, তাবারী, ইবনে খালদূন ও মাজমাউল বুলদান প্রণেতা প্রমুখ বড় বড় ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এর সারকথা হলো এই যে, হেমিয়ারের [ইয়েমেন] বাদশা তুবান আসাদ আবূ কারেব একবার ইয়াসরাব [বর্তমান মদীনায়] গমন করে সেখানে ইহুদি সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করল এবং তথাকার বনী কুজার দু'জন ইহুদি আলিমকে সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেনে যাত্রা করল। তার মৃত্যুর পর যুনাওয়াস তার উত্তরাধিকারী হয়ে দক্ষিণ আরবের ইসায়ী কেন্দ্রভূমি নাজরানের উপর আক্রমণ চালাল। সেখান হতে খ্রিস্টান ধর্মকে চিরতরে উৎখাত করে তথায় ইহুদি ধর্ম প্রতিষ্ঠাই ছিল এ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। ইবনে হিশাম বলেন, এরা মূলে ইহুদি ধর্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর সে নাজরানে উপস্থিত হয়ে তথাকার জনগণকে ইহুদি ধর্মমত গ্রহণের আহ্বান জানাল, কিন্তু তারা স্বধর্ম পরিত্যাগ করতে সম্মত হলো না। ফলে সে বহু লোককে আগুন ভর্তি গর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করল এবং অনেককে তরবারি দ্বারা হত্যা করল। এ হত্যাকাণ্ডে ঐতিহাসিকদের মতে সর্বমোট বিশ হাজার লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এ হত্যাকাণ্ড চলাকালে নাজরান হতে দওসযু সালবান নামে এক লোক পালিয়ে রোম সম্রাটের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হলো এবং এ অত্যাচার ও নির্যাতনের অভিযোগ করলে রোম সম্রাট কাইজার আবিসিনিয়ার বাদশাকে নাজরান আক্রমণ করার আহ্বান জানাল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ সত্তর হাজার নৌসেনাসহ নাজরান আক্রমণ করে তা দখল করে নিল। এ যুদ্ধে যুনাওয়াস নিহত হলো, ইহুদি সরকারের পতন হলো এবং ইয়েমেন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত হলো।

৩. হযরত আলী (রা.) হতে অপর একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন– পারস্যের এক বাদশা শরাব পান করে নিজ সহোদরার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলো এবং উভয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক সংস্থাপিত হলো। চারিদিকে যখন এটা রটনা হলো, তখন বাদশাহ জনতার মধ্যে প্রচার করে দিল যে, আল্লাহ ভগ্নির সাথে বিবাহকে বৈধ করে দিয়েছেন। কিন্তু জনসাধারণ এটা মেনে নিতে রাজি হলো না। তখন বাদশা নানাভাবে অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিয়ে জনগণকে এটা মেনে নিতে বাধ্য করল। এমনকি যারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল, তাকে সে আগুনে ভর্তি গর্তে নিক্ষেপ করতে লাগল। হযরত আলী (রা.) বলেন, এ সময় হতে অগ্নিপূজকদের ধর্মে রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়দের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। –[ইবনে জারীর]

৪. এ ঘটনাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সম্ভবত ইসরাঈলী কিংবদন্তী হতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে– বেবিলনবাসীরা বনী ইসরাঈলীদেরকে হযরত মূসা (আ.) -এর প্রচারিত ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এমনকি তারা এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক অমান্যকারীকে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করল।

جَوَابُ قَسَمٍ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الخ : ইমাম ফাররা বলেন– وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الخ এ কসমের জবাব হলো قُتِلَ اَصْحَابُ ...... الخ এ অর্থে যে, এখানে لَقَد উহ্য রয়েছে।

একদল ইমামের মতে– কসমের জবাব হলো اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ তবে এ জবাবটি তেমন সুন্দর নয়। কেননা, কসম ও জবাবে কসমের মাঝে অনেক দূরত্ব হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন– اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا হলো কসমের জবাব।

কেউ কেউ বলেন– কসমের জাবাব উহ্য রয়েছে। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ لَتُبْعَثُنَّ ইবনুল আম্বারী উক্ত মতটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। –[কুরতুবী]

اَلْوُقُوْدُ শব্দের কেরাতসমূহ : اَلْوَقُوْدُ শব্দকে জমহুর ক্বারীগণ وَاوْ-এর উপর যবর দিয়ে পড়েন। তখন এর অর্থ হবে اَلْحَطَبُ বা লাকড়ি।

হযরত কাতাদাহ, আবূ রাজা, নসর ইবনে আসেম প্রমুখ ক্বারীগণ وَاوْ-এর উপর পেশ দিয়ে পড়েন। তখন তা মাসদার হবে। অর্থাৎ ذَاتُ الْاِتِّقَادِ وَالْاِلْتِهَابِ –[ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী, কুরতুবী]

قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ-এর অর্থ : এ আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যেমন–

১. قُتِلَ দ্বারা এখানে বদদোয়া বা লানত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আসহাবুল উখদূদ–কাফের ও জালিমগণ আল্লাহর রহমত হতে দূরে সরে পড়েছে। তাদের উপর আল্লাহর লানত পড়েছে।

২. অথবা, এখানে ঐ জালিমদের পক্ষ হতে মু'মিনদের হত্যার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। اِنَّهُمْ قُتِلُوْا بِالنَّارِ فَصَبَرُوْا অর্থাৎ মু'মিনগণকে আগুন দ্বারা হত্যা করা হয়েছে, সে সময় তারা ধৈর্যধারণ করেছেন।

৩. অথবা, এখানে ঐ জালিমদের ব্যাপারেই খবর দেওয়া হয়েছে। কেননা বর্ণিত আছে যে, বেহেশতীদের রূহকে আগুনে পোড়ার পূর্বেই আল্লাহ কবজ করে নিয়েছেন। তারপর আগুন গর্ত থেকে উঠে ঐ জালিমদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

৪. অথবা, জালিমরা ধ্বংস হয়েছে, আর মু'মিনগণ নাজাত পেয়েছে। –[কুরতুবী]

قُتِلَ শব্দের দু'টি কেরাত : জমহুর قُتِلَ শব্দ ثُلَاثِىْ مُجَرَّدْ থেকে তাশদীদবিহীন পড়েছেন।

আর কেউ কেউ قُتِّلَ অর্থাৎ تَاءْ-এর উপর তাশদীদ দিয়ে ثُلَاثِىْ مَزِيْد فِيْه থেকে পড়েছেন। –[কাবীর]

اَلْعَامِلُ فِىْ قَوْلِهٖ "اِذْ" مِنْ "اِذْهُمْ عَلَيْهَا" : اِذْهُمْ عَلَيْهَا-এর মধ্য হতে اِذْ-এর عَامِلْ : اِذْ-এর আমেল হলো قُتِلَ ক্রিয়াটি। তখন অর্থ হবে– اَىْ لُعِنُوْا فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ قُعُوْدٌ عِنْدَ الْاُخْدُوْدِ يُعَذِّبُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ গর্তের নিকট বসে যখন তারা মু'মিনদের শাস্তি দিচ্ছিল, তখন তারা আল্লাহর পক্ষ হতে অভিশপ্ত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

شُهُوْدٌ -এর অর্থ কি? এখানে একে উল্লেখের কারণ কি? : شُهُوْدٌ শব্দটি বাবে سَمِعَ এর মাসদার: এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

এক : شُهُوْدٌ অর্থাৎ حُضُوْرٌ তথা উপস্থিত হওয়া। গর্ত খননকরী কাফেররা মু'মিনদেরকে অগ্নিপূর্ণ গর্তে নিক্ষেপ করার পর তামাশা দেখার জন্য গর্তের তীরে উপস্থিত হয়েছিল।

দুই : অথবা شُهُوْدٌ-এর অর্থ এখানে সাক্ষ্য প্রদান করা যা দ্বারা কোনো বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। এখানে شُهُوْدٌ উল্লেখের কারণ প্রথম অবস্থায় এখানে شُهُوْدٌ এর উল্লেখ নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে হতে পারে।

১. এর দ্বারা মূলতঃ এখানে মু'মিনগণের প্রশংসা করাই উদ্দেশ্য। কেননা কাফিররা ভেবেছিল যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ নিলে মুমিনরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। তখন উপস্থিত জনতা মু'মিনদেরকে ঈমান পরিত্যাগ করতে বলবে এবং তারা ঈমান ত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের সে আশার গুঁড়ে বালি পড়েছে। মু'মিনগণ অগ্নি গর্তে পড়ে জীবন দিয়েছেন, তথাপি ঈমান পরিত্যাগ করেননি।

অথবা, তাদের নিকট সাহায্যও প্রার্থনা করেননি। সুতরাং এক মহিলাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য আনয়ন করা হয়েছিল, মহিলার কোলে ছিল একটি শিশু। মহিলাটি শিশুর মায়ায় ঈমান বর্জন করার মনস্থ করেছিল। কিন্তু শিশুটি তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, হে মাতা! আপনি ধৈর্য ধরুন এবং নির্ভয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। কেননা আপনি অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। আর তারা অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠ।

২. অথবা এটা দ্বারা তাদের অন্তর পাষাণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কি পরিমাণ পাষাণ অন্তরের অধিকারী হলে স্বজাতির কতিপয় মানুষকে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে তামাশা দেখতে পারে তা ভাবলেও শরীর শিহরিয়ে উঠে।

৩. অথবা, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহীতা ও মিথ্যার চরম স্তরে তারা পৌঁছে গিয়েছিল। তাদেরকে মধ্যে মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে পশুত্বের প্রভাব বিস্তার করে বসেছিল। তা না হলে তারা জ্যান্ত মানুষকে আগুনে পোড়ানোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারত না– কৌতুক ভরে তা উপভোগ করা তো দূরের কথা।

দ্বিতীয় অবস্থায় شُهُوْدٌ-এর উল্লেখের কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. কেয়ামতের দিন তাদের এ অপকর্মের সাক্ষ্য স্বয়ং তারাই প্রদান করবে। অর্থাৎ যখন তারা কিয়ামতের কাঠোর আজাব দেখে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে তখন তারা এ অপকর্ম করার কথা অস্বীকার করবে। আর তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তাদের সমস্ত অপকর্মের বিবরণ তুলে ধরবে। ইরশাদ হচ্ছে–

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ .

২. অর্থাৎ এর মর্মার্থ হলো তারা নিজেরাই যে শুধু এ অপকর্ম করে তাই নয়; বরং অন্যরা যদি তা করে তাহলে তারা সেখানে সাক্ষ্যদাতা হয়। আর এতে তারা মোটেও দ্বিধাবোধ করে না।

৩. অথবা, এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য তারা বহু সাক্ষ্যদাতা নিযুক্ত করে রেখেছিল। যাতে পরস্পরের দায়িত্ব সম্পর্কে বাদশার নিকট রিপোর্ট পেশ করতে পারে। সুতরাং যার উপর শাস্তি প্রদানের সে পরিমাণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। সে তা পালন করেছে কিনা এ ব্যাপারে তারা বাদশার নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٨. وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ فِىْ مُلْكِهِ الْحَمِيْدِ الْمَحْمُوْدِ ـ

৮. তারা এদেরকে শুধু এ জন্য নির্যাতন করেছিল যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে, যিনি পরাক্রমশালী স্বীয় রাজত্বে এবং প্রশংসনীয় প্রশংসিত।

٩. اَلَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ اَىْ مَا اَنْكَرَ الْكُفَّارُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَّا اِيْمَانَهُمْ ـ

৯. যাঁরই জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা। অর্থাৎ কাফেরগণ মু'মিনগণের ঈমানের কারণেই শত্রুতা করেছে।

١٠. اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِالْاِحْرَاقِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ بِكُفْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ اَىْ عَذَابُ اِحْرَاقِهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْاٰخِرَةِ وَقِيْلَ فِى الدُّنْيَا بِاَنْ خَرَجَتِ النَّارُ فَاَحْرَقَتْهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ ـ

১০. নিশ্চয় যারা মু'মিন নর-নারীদেরকে বিপদাপন্ন করেছে আগুনে পোড়ানোর মাধ্যমে অতঃপর তারা তওবাও করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি তাদের কুফরির কারণে এবং তাদের জন্য রয়েছে দহন যন্ত্রণা মুসলমানদেরকে আগুনে পোড়ানোর প্রতিশোধ হিসাবে আখেরাতে, মতান্তরে দুনিয়ায়–যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, আগুন লেলিহান শিখা বিস্তার করে তাদেরকে দাহন করেছে।

١١. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ـ

১১. নিশ্চয় যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য সেই জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবহমান–এটাই পরম সাফল্য।

তাহকীক ও তারকীব

وَمَا نَقَمُوْا الخ আয়াতের মহল্লে ইরাব :

১. এ আয়াতটি পিছনের اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-এর উপর عَطْفٌ হয়েছে। যদিও اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ-এর আতফ اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-এর উপর সহীহ হয় না; কিন্তু اِذْهُمْ عَلَيْهَا তথা পিছনের اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ টি اِذْ দিয়ে শুরু করার কারণে عَطْف সহীহ হয়েছে। কেননা এ اِذ-কে اِذِ الْمَاضَوِيَّةُ বলা হয়। অর্থাৎ এ اِذْ এসে বাক্যকে مَاضِىْ-এর অর্থে করে দিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ-কে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ-এর উপরই عَطْف করা হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেছেন, আসলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ টি اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ ছিল। অর্থাৎ বাক্যটি এভাবে ছিল وَهُمْ مَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ-এমতাবস্থায় اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-কে اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-এর উপরই আতফ করা হয়। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতের সাথে যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল উখদূদ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সূরার প্রথম দিকে যে বর্ণনা এবং ভাষণ রেখেছেন, এর সাথে সঙ্গতি রেখে ঈমানদারদের প্রতি নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের কারণ বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন– وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ .... ।

আসহাবে উখদূদ মু'মিনগণকে কেন আজাব দিয়েছিল? : আলোচ্য সূরাটির প্রথমাংশে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে উখদূদ কর্তৃক মু'মিনদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বক্ষ্যমাণ আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, আসহাবে উখদূদ যে মু'মিনদের উপর নির্যাতন করেছিল, মূলত তাদের কোনো অপরাধই ছিল না। উক্ত কাফেরদের দৃষ্টিতে সে মু'মিনগণের একটি মাত্র অপরাধ ছিল– আর তা হলো এই যে, তারা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজাধিরাজ–সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক। অথচ এটা তো কোনো অপরাধ হতে পারে না। নিছক মানবাধিকারের দৃষ্টিতে দেখতে গেলেও এটাকে অন্যায় বলা যায় না। কেননা এটাতো তাদের স্বীকৃত মৌলিক মানবিক অধিকার যে, মানুষ তার স্রষ্টার ইবাদত করবে, তাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করে নিবে, তার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে। এ অধিকারকে যারা হরণ করবে তারা অবশ্যই অত্যাচারী হিসাবে গণ্য হবে। দুনিয়া পরীক্ষাক্ষেত্র হওয়ার কারণে যদিও তারা এরূপ অন্যায় কাজ করে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, তথাপি পরকালে তাদেরকে অবশ্যই এটার আজাব ভোগ করতে হবে। কোনো মতেই তারা আল্লাহর আজাব ও গজব হতে রেহাই পাবে না। যদি তারা ঈমান আনয়ন করে কৃতপাপ হতে তওবা না করে, তাহলে পরকালে চিরদিনের জন্য তারা জাহান্নামী হবে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়ন করে সৎকর্ম অবলম্বন করবে তাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে জান্নাতের চিরশান্তি। এটা অপেক্ষা মহাসফলতা আর কি হতে পারে?

এর মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তা'আলা মক্কার জালিম মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারাও যদি আসহাবে উখদূদ-এর ন্যায় মু'মিনগণের উপর অহেতুক নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে আসহাবে উখদূদের যে ভয়াবহ পরিণাম হয়েছে তাদেরকেও সে একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। মক্কার মুশরিকরা যদি এ অপকর্ম হতে তওবা করে ঈমান না আনে তাহলে তাদের জন্যও রয়েছে, দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও দুর্গতি এবং পরকালের কঠিন শাস্তি।

এখানে আল্লাহর উক্ত চারটি গুণের উল্লেখের তাৎপর্য : আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনগণের সাথে আসহাবে উখদূদের শত্রুতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন– وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّآ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ মু'মিনগণের সাথে তারা শুধু এ জন্যই শত্রুতা পোষণ করত যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, যিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রশংসিত, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মালিক এবং সে আল্লাহ সর্বদ্রষ্টাও বটে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার উক্ত চারটি গুণ উল্লেখ করার তাৎপর্য মুফাস্সিরগণ নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

১. اَلْعَزِيْزُ [মহাপরাক্রমশালী] : অর্থাৎ এমন সত্তা যিনি কিছু করতে চাইলে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং তার অনুমোদন ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ মহাশক্তিশালী তাঁর আজাব হতে কাফেরদেরকে কেউই রক্ষা করতে পারবে না।

২. اَلْحَمِيْدُ [প্রশংসিত] : মু'মিনগণ, ফেরেশতাগণ এমনকি সমস্ত মাখলুকাত আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও তাহমীদ করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ সকল বস্তুই আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে। কাজেই কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করলে তথা তার প্রশংসা না করলেও তাতে আল্লাহর কোনোরূপ ক্ষতি নেই।

৩. اَلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্বের মালিক যেহেতু এ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তিনিই সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু এদের মালিকও তিনিই। আবার তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন এদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। মোটকথা, আসমান ও জমিনে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক তিনিই, তাঁর এ মালিকানায় কেউ শরিক বা অংশীদার নেই। তার আজাব হতে কাফের ও মুশরিকদেরকে কেউ রেহাই দিতে পারবে না। তিনি কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে যেমন কেউ বাধা দেওয়ার নেই, তেমনটি কাউকে পুরস্কৃত করলেও কারো কিছু বলার নেই।

৪. وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ আর আল্লাহ তা'আলা সর্বদ্রষ্টা, মানুষ এমনকি কোনো জীব জন্তুর বা কোনো পদার্থের কোনো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও নাড়া-চাড়াও তার দৃষ্টিকে এড়াতে পারে না। আসহাবে উখদূদ মু'মিনদেরকে যে আজাব দিয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছেন। আর মু'মিনরা চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সেভাবে ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রয়েছে তাও আল্লাহর অজানা নয়। কাজেই কাফের ও মুশরিকদেরকে শায়েস্তা করতে যেমন আল্লাহ তা'আলা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না তেমনটি মু'মিনদেরকে পুরস্কৃত করতেও তিনি কিছুমাত্র কৃপণতা করবেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা উক্ত চারটি গুণের মাধ্যমে এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী তিনি ইচ্ছা করলে কাফেরদেকে রুখে দিতে পারতেন− তাদের আজাব হতে মু'মিনদেরকে রেহাই দিতে পারতেন, ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ কাফেরদেরকে ধ্বংস করেও দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কেননা তিনি দুনিয়াকে তাদের জন্য পরীক্ষা ক্ষেত্র বানিয়েছেন। এখানে তাদরকে ভালো-মন্দ এবং পাপ-পুণ্যের যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

نَقَمُوْا শব্দের দুটি কেরাত : نَقَمُوْا শব্দটি দু'টি কেরাতে বর্ণিত হয়েছে। জমহুর ক্বারীগণ নূনের উপর যবর দিয়ে পড়েছেন। আর আবূ হায়াত নূনের নিচে যের দিয়ে পড়েছেন। কিন্তু فَصِيْحٌ বা বিশুদ্ধ হলো যবর দিয়ে পড়া। −[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

তিনটি গুণ উল্লেখ করার পর شَهِيْدٌ উল্লেখ করার কারণ : আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় কয়েকটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম عَزِيْزٌ ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, ঐ জালিমেরা মু'মিনদের উপর যে বর্বরোচিত নির্যাতন করেছিল− তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদেরকে বারণ করতে পারতেন। তাদের আগুন নিভিয়ে দিতে পারতেন, তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। তারপর اَلْحَمِيْدُ ব্যবহার করে ইশারা করেছেন যে, তাঁর নিকট দুনিয়ার জীবনের চেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের (অনন্ত জীবনের) ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। আপাত দৃষ্টিতে যদিও প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এ কাজের উত্তম বিনিময় দিতে চেয়েছেন, আর কাফের-জালিমদেরকে পরম শাস্তি দিতে চেয়েছেন। আল্লাহর বিধান এই নয় যে, তিনি তাড়াতাড়ি করে কিছু করে ফেলবেন; বরং তিনি তাদের কার্যাবলি অবলোকন করে রেকর্ড করেছেন। এ কারণেই পরে এসে شَهِيْدٌ [দ্রষ্টা] ব্যবহার করেছেন। যেন, এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি এ ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিবেন না, দেখে দেখে রেকর্ড করেছেন। شَهِيْدٌ দ্বারা মু'মিনদের জন্য ওয়াদা এবং কাফিরদের জন্য হুমকি বুঝায়। −[কাবীর]

اَلَّذِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে اَلَّذِيْنَ দ্বারা আসহাবুল উখদূদ তথা গর্তের মালিক জালিমগণ উদ্দেশ্য হতে পারে। অথবা যারাই এ কাজ করে তারা সবাই اَلَّذِيْنَ-এর ভিতরে শামিল, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যতজন এমন ধরনের কাজ করবে সবাই এ اَلَّذِيْنَ -এর অন্তর্ভুক্ত। −[কাবীর]

আয়াতে فِتْنَةٌ -এর অর্থ : فِتْنَةٌ-এর মূল অর্থ পরীক্ষা। কেননা ঐ জালিমগণ মু'মিনদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিল, আগুনে নিক্ষেপ করেছিল এবং জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, اَلْفِتْنَةُ হলো, আগুন দ্বারা পুড়ে ফেলা, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ اَىْ حَرَقُوْهُمْ بِالنَّارِ অর্থাৎ তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলেছে। −[ফাতহুল কাদীর]

ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا-এর প্রামাণ্য বিষয় : ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا আয়াতাংশ এ কথা প্রমাণ করে যে, যদি সে জালিমগণ তওবা করে ফিরে আসত, তাহলে এ وَعِيْد [ভীতি প্রদর্শন] হতে তারা রেহাই পেত। আর এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তওবা কবূল করেন। ইচ্ছা করে হত্যা করলেও তা মাফ হয়ে যাবে বলে এ আয়াত প্রমাণ করে। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বিরোধিতা করেছেন। −[কাবীর]

'দু আজাব' দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে কারীমায় দু'বার আজাব উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমবার বলা হয়েছে عَذَابُ جَهَنَّمْ সাথে সাথেই বলা হয়েছে وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ উভয় আজাবই হবে পরকালে, তবে عَذَابُ جَهَنَّمْ হবে তাদের কুফরির কারণে, আর عَذَابُ الْحَرِيْقِ হবে কুফরির উপর অতিরিক্ত শাস্তি। কেননা তারা মু'মিনদেরকে দুনিয়ায় اِحْرَاقٌ করেছে তথা জ্বালিয়ে দিয়েছে। এটাও হতে পারে যে, প্রথম عَذَابٌ হবে عَذَابُ بَرْدٍ বা ঠাণ্ডার শাস্তি। যাকে زَمْهَرِيْر বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আজাব হবে عَذَابُ اِحْرَاقٍ জ্বালানোর শাস্তি।

এটাও হতে পারে যে, উভয় আজাব জ্বালানোর মাধ্যমেই দেওয়া হবে। তবে প্রথম শাস্তির তুলনায় দ্বিতীয় শাস্তি হবে কঠিন। −[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

আল্লামা রাযী (র.) বলেন, عَذَابُ جَهَنَّمْ দ্বারা পরকালের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। আর عَذَابُ الْحَرِيْقِ দ্বারা দুনিয়ার আগুন দ্বারা পোড়ানোর দিকে ইঙ্গিত হতে পারে। কেননা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, তাদেরকে গর্তের আগুন উপরে উঠে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। −[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٢. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ بِالْكُفَّارِ لَشَدِيْدٌ بِحَسْبِ اِرَادَتِهٖ .

১২. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও কাফেরদেরকে সুকঠিন তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক।

١٣. اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ الْخَلْقَ وَيُعِيْدُ فَلَا يُعْجِزُهٗ مَا يُرِيْدُ .

১৩. নিশ্চয় তিনি অস্তিত্বদান করেন সৃষ্টিকে ও পুনরাবর্তন ঘটান তিনি তাঁর ইচ্ছায় কখনও অপারগ হন না।

١٤. وَهُوَ الْغَفُوْرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ الْوَدُوْدُ الْمُتَوَدِّدُ اِلٰى اَوْلِيَائِهٖ بِالْكَرَامَةِ .

১৪. তিনিই ক্ষমাশীল পাপী মু'মিনদের প্রতি, প্রেমময় কারামতের মাধ্যমে স্বীয় ওলীগণের প্রতি প্রেম প্রকাশকারী।

١٥. ذُو الْعَرْشِ خَالِقُهٗ وَمَالِكُهٗ الْمَجِيْدُ بِالرَّفْعِ الْمُسْتَحِقُّ لِكَمَالِ صِفَاتِ الْعُلُوِّ .

১৫. আরশের অধিপতি এর স্রষ্টা ও অধিকর্তা। সম্মানিত শব্দটি রফা'যোগে পঠিতব্য, সমুচ্চ গুণাবলির পুণ্যত্যের যোগ্য।

١٦. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ لَا يُعْجِزُهٗ شَيْءٌ .

১৬. যা ইচ্ছা তাই সম্পাদনকারী কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না।

١٧. هَلْ اَتٰكَ يَا مُحَمَّدُ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ .

১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছেছে? হে মুহাম্মদ! সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত।

١٨. فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ بَدَلٌ مِنَ الْجُنُوْدِ وَاسْتَغْنٰى بِذِكْرِ فِرْعَوْنَ عَنْ اَتْبَاعِهٖ وَحَدِيْثُهُمْ اَنَّهُمْ اُهْلِكُوْا بِكُفْرِهِمْ وَهٰذَا تَنْبِيْهٌ لِمَنْ كَفَرَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالْقُرْاٰنِ لِيَتَّعِظُوْا .

১৮. ফিরআউন ও সামূদের এটা جُنُوْد হতে بَدَل আর ফিরআউনের উল্লেখের পর তার অনুসারীদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ছিল। আর সে বৃত্তান্ত হচ্ছে– তারা তাদের কুফরির কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের সাথে অবাধ্যাচারণকারীদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

١٩. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ بِمَا ذُكِرَ .

১৯. তথাপি কাফেরগণ মিথ্যারোপ করায় লিপ্ত উল্লিখিত ঘটনাবলি।

٢٠. وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ لَا عَاصِمَ لَهُمْ مِنْهُ .

২০. আর আল্লাহ তা'আলা তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টনকারী। তাদেরকে কেউই তা হতে রক্ষাকারী নেই।

٢١. بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ عَظِيْمٌ .

২১. বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন সুমহান।

٢٢. فِيْ لَوْحٍ هُوَ فِي الْهَوَاءِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ مَحْفُوْظٍ بِالْجَرِّ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَمِنْ تَغْيِيْرِ شَيْءٍ مِنْهُ وَطُوْلُهٗ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَعَرْضُهٗ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَهُوَ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

২২. ফলকে লিপিবদ্ধ আর তা সপ্তমাকাশের ঊর্ধ্বে শূন্যে অবস্থিত যা সংরক্ষিত শব্দটি যেরযোগে পঠিত শয়তান এবং কোনোরূপ বিকৃতি হতে সংরক্ষিত। এর দৈর্ঘ্য আকাশ ও পৃথিবীর সমপরিমাণ এবং এর প্রস্থ উদয়াচল ও অস্তাচলের সমপরিমাণ। আর এটা শুভ্র মুক্তা দ্বারা নির্মিত। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

اَلْمَجِيْد-এর মহল্লে ই'রাব : اَلْمَجِيْد শব্দে দু'টি اِعْرَابْ প্রদান করা যায়-

১. মারফূ' হিসাবে শেষাক্ষরে পেশ হবে। এমতাবস্থায় اَلْمَجِيْدُ শব্দটি আল্লাহর সিফাত বা গুণ হবে। এ কেরাতটিকে অধিকাংশ মুফাস্সিরীন এবং ক্বারীগণ গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা- مَجْد সিফাতটি আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য।

২. مَجْرُوْر হিসাবে শেষাক্ষরে যের হবে। এমতাবস্থায় اَلْمَجِيْدِ শব্দটি আল্লাহর সিফাত না হয়ে عَرْش-এর সিফাত হবে। কেননা আল্লাহর সিফাত ছাড়াও যে, اَلْمَجِيْد ব্যবহৃত হয়ে থাকে এর প্রমাণ কুরআন মাজীদের দেখা যায়। যেমন- بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَجِيْدٌ এ আয়াতে কুরআনের সিফাত مَجِيْد ব্যবহৃত হয়েছে। -[কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বের আয়াতের সাথে বর্তমান আয়াতের যোগসূত্র : পিছনে যারা মু'মিনদের উপর অকথ্য অমানবিক অত্যাচার করেছিল তাদেরকে হুমকি, আর মু'মিনদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে ঐ হুমকিকে তরান্বিত করে তাকিদ দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে .... "اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ -[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ" : উপরিউক্ত ভাষণে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব কথার জের টেনে স্বীয় পরিচয় তুলে ধরেছেন। বলেছেন- যারা ঈমানদার লোকদের প্রতি শুধু ঈমানদার হওয়ার কারণে জুলুম-অত্যাচার করার পর তওবা করে না, ঈমান আনে না; তাদেরকে আল্লাহ কোনোক্রমেই ছাড়বেন না। আল্লাহ অবশ্যই এদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন। আল্লাহ কাউকে ধরলে সে ধরা সহজ হয় না। তাঁর পাকড়াও খুবই কঠিন ও শক্ত। তাঁর পাকড়াও হতে ছুটে পালাবার সাধ্য কারও নেই। কাকে কিরূপে পাকড়াও করতে হবে, কে তার শাস্তির যোগ্য, কে যোগ্য নয়- তা তিনি ভালোরূপেই পরিজ্ঞাত। কেননা তিনি মানুষসহ প্রতিটি সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আবার তিনিই মৃত্যুর পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করবেন। অতএব, তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টির অগোচরে কিছুই নেই। মহাক্ষমাশীল বলে মানুষের মধ্যে তিনি এ আশার সঞ্চার করেছেন যে, ভুলেও শয়তানের চক্রান্তে পড়ে কেউ অন্যায় করার পর তাঁর দুয়ারে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি কাউকেও ফিরিয়ে দেন না। তিনি ক্ষমাশীল ও উদার সত্তা। ক্ষমা চাইলে অবশ্যই ক্ষমা লাভ করবে। প্রেমময় বলে এ কথা বুঝাতে চান যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে খুব ভালোবাসেন। অকারণে ও বিনা অপরাধে কাউকেও শাস্তি দিবেন না। যারা শত সুযোগ পেয়েও তাঁর নাফরমানি হতে বিরত থাকবে না, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন। তারা ভালোবাসা পাওয়ার পাত্রে পরিণত হতে পারেনি। আরশের মহান অধিপতি বলে একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সৃষ্টিলোকে তাঁরই একচ্ছত্র ক্ষমতা বিরাজমান। তাঁর ক্ষমতাবলয়ের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। অতএব, কেউ তাঁর অবাধ্যতা করে রক্ষা পাবে কি করে? এটা একটি অচিন্তনীয় ব্যাপার।

তিনি যা সংকল্প করেন, তাই সম্পন্ন করেন। এ কথা দ্বারা এটাই বুঝাতে চান যে, আল্লাহর ইচ্ছায় বাধাদানকারী কেউ নেই। তিনি যা চাবেন তাই করবেন।

অতএব, মানুষের উচিত আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির মাঝে নিজেদের ইচ্ছাকে বিলীন করে তাঁর নিকট আত্মসমর্পিত হওয়া। তাঁর প্রতি ঈমানদার ও আস্থাশীল হওয়া। এটাই হচ্ছে উপরিউক্ত ভাষণের তাৎপর্য।

يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ আয়াতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য : يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ-এর উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে গিয়ে জমহুর মুফাস্সিরীন বলেন- يَخْلُقُ الْخَلْقَ اَوَّلًا فِى الدُّنْيَا وَيُعِيْدُهُمْ اِحْيَاءً بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় প্রথমে সকল সৃষ্টি-জীবকে সৃষ্টি করেছেন এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন।

কেউ কেউ বলেছেন, يُبْدِئُ لِلْكُفَّارِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ দুনিয়ায় কাফেরদের জন্য আগুনের শাস্তি নির্ধারণ করেন, তারপর ঐ শাস্তিকে তাদের জন্য পরকালে পুনরায় নির্ধারণ করবেন। এ মতটিকে ইবনে জারীর পছন্দ করেছেন। তবে প্রথম মতটিই উত্তম। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

اَلْوَدُوْدُ-এর অর্থ : اَلْوَدُوْدُ শব্দটি সিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ, وُدٌّ ধাতু হতে নির্গত, অর্থ- প্রেমময়, খুব স্নেহশীল, আয়াতে কারীমায় اَلْوَدُوْدُ-এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়।

১. জমহুর মুফাসসিরীন বলেন, اَلْوَدُوْدُ هُوَ الْمُحِبُّ অর্থাৎ প্রেমময়।

২. কালবী বলেন, هُوَ الْمُتَوَدِّدُ اِلٰى اَوْلِيَائِهٖ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْجَزَاءِ অর্থাৎ তিনি [আল্লাহ] তাঁর ওলীদেরকে ক্ষমা এবং প্রতিদান দেওয়ার নিমিত্তে ভালোবাসা সৃষ্টির প্রত্যাশী।

৩. আযহারী বলেন, আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর সাথে ভালোবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি করে বলে তাঁকে وَدُوْدٌ বলা হয় কেননা তারাই তাঁর সমস্ত পরিপূর্ণ সিফাত ও কার্যাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত।

৪. কারো মতে اَلْوَدُوْدُ অর্থ কোনো কোনো সময় اَلْهَيَّمُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন অনুগত প্রাণীকে বলে نَاقَةٌ وَدُوْدٌ -[কাবীর]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার দয়ামায়ার দিকে লক্ষ্য কর; যাঁরা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকেও তিনি অত্র আয়াতের মাধ্যমে তওবা করার আহ্বান জানিয়েছেন। -[নূরুল কোরআন]

ذُو الْعَرْشِ দ্বারা উদ্দেশ্য : ذُو الْعَرْشِ অর্থ আরশের মালিক। কারো মতে যুল-আরশ বলতে ذُو الْمُلْكِ তথা রাজ্যের মালিক-রাজা বা اَلسُّلْطَانُ তথা বাদশাহ-সম্রাট বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয় فُلَانٌ عَلٰى سَرِيْرِ مُلْكِهٖ অর্থাৎ অমুক নিজের রাজ্যের সিংহাসনের উপর আছে, যদিও সরাসরি সিংহাসনে বসা নেই। আরো বলা হয় ثُلَّ عَرْشُ فُلَانٍ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তির বাদশাহী চলে গেছে।

অথবা, عَرْشٌ দ্বারা سَرِيْرٌ বা সিংহাসনও বুঝাতে পারে। এ অর্থে যে, আল্লাহ নিজের জন্য আকাশে একটি عَرْشٌ বা سَرِيْرٌ অর্থাৎ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার সম্মান ও প্রতিপত্তির বহর সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। কারো পক্ষে এর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। -[কাবীর]

'আরশ অধিপতি' বলে মানুষের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে, নিখিল বিশ্ব-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি; তাই তার সাথে যার বিদ্রোহাত্মক আচরণ গ্রহণ করবে তারা তাঁর পাকড়াও হতে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না।

কেউ কেউ বলেছেন, ذُوالْعَرْشِ অর্থ خَالِقُ الْعَرْشِ অর্থাৎ আরশ সৃষ্টিকারী। -[ফাতহুল কাদীর]

اَلْمَجِيْدُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْمَجِيْدُ শব্দের অর্থ হলো 'মহান শ্রেষ্ঠতর'। এ গুণ দ্বারা মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর এ মহান সত্তার বিরোধিতা করে, তাঁর অবাধ্য হয়ে এবং তাঁর সাথে বেয়াদবি করে মানুষ নিজের হীনমন্যতা ও নীচতা ছাড়া আর কিছুই প্রদর্শন করে না। অথচ আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা এবং কুদরতের কোনো সীমা নেই. তিনি মহাপরাক্রমশালী।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ -এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন, যা দ্বারা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী সব কাজ সম্পাদনকারী, যা তিনি করতে চান তা তিনি করে ফেলেন, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিলোকে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করা, আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের পথে বাধাদানকারী ও তাঁর পরিপন্থি হয়ে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই।

ফেরআউন ও ছামূদের উল্লেখ করার হেতু কি? : ইমাম রাযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে আদ ও ছামূদ জাতির কথা উল্লেখ করার কারণ হলো তারা আরবদের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। আল্লাহদ্রোহীতার ব্যাপারে এ দুটি জাতি ছিল অতি অগ্রগামী। আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তার কওমের নিকট হযরত মূসা (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ.) বহুভাবে বুঝানোর পরও তারা ঈমান গ্রহণ করেনি; বরং ফিরআউন ও তার লোকেরা উল্টো হযরত মূসা (আ.) ও নিরীহ বনী ইসরাঈলের প্রতি নির্যাতন শুরু করেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অপরদিকে ছামূদ জাতির নিকট আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন। তাদের অনুরোধে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি উটনী মু'জিযা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সালেহ (আ.)-এর নির্দেশ অমান্য করে উক্ত উটনীকে হত্যা করেছিল। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে আজাব নাজিল হলে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। যা হোক এর দ্বারা একদিকে মক্কার কুরাইশদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে মু'মিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ الخ -এর মর্মার্থ : আল্লাহর বাণী "وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ"-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

ক. ইমাম রাযী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো "وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِأَعْمَالِهِمْ" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত কার্যকলাপ পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত রয়েছেন।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন-কোনো ব্যক্তিকে পিছন হতে পরিবেষ্টন করে ফেললে তার আর পালিয়ে যাবার উপায় থাকে না। তেমনটি তারাও আল্লাহর পাকড়াও হতে পালিয়ে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মোটকথা, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, কাফের ও মুশরিকরা আমার মুষ্টির মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। আমি তাদেরকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। ইচ্ছা করলে তাদের পাপাচারের কারণে এক মুহূর্তেই আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু আমি তাদেরকে সংশোধন করে নেওয়ার জন্য সুযোগ দিয়ে যাচ্ছি। যদি তারা উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে ঈমান আনয়ন না করে এবং বিরোধিতা হতে সরে না আসে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। কাজেই হে রাসূল! তাদের ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

গ. অথবা اِحَاطَةٌ দ্বারা এখানে তাদের ধ্বংসের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অলক্ষ্যে অচিরেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। এমনভাবে ধ্বংস করবেন যে, তারা তা পূর্ব হতে বুঝেই উঠতে পারবে না। কুরআনে মাজীদের অপর কয়েকটি আয়াতে শব্দটি ধ্বংসের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

ক. وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ .খ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ قَدْ اَحَاطَ بِالنَّاسِ .গ وَالْاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا

মোটকথা, তারা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন রয়েছে, যদিও তারা তা বুঝে উঠতে পারছে না।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ আয়াত উল্লেখের কারণ : এ আয়াতটি দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি সান্ত্বনা দানের আয়াতগুলোর মধ্যে উক্ত আয়াতটির স্থান প্রথম কাতারেই রয়েছে। কেননা এ কুরআন মহাসম্মানিত, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। অতএব, যখন সে কুরআনে একটি সম্প্রদায়ের সফলতা এবং অন্য সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ের খবর রয়েছে তা কোনো প্রকারেই পরিবর্তন হতে পারে না। অবশ্যম্ভাবীভাবে একে মেনে নিতে হবে।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা নিয়ে এসেছেন তা যে নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী–মহাসম্মানিত এতে কোনো সন্দেহ নেই। যা কিছু বলা হয়েছে সকল কিছু অবশ্যই সংঘটিত হবে। –[কাবীর]

مَجِيْدٌ শব্দে বর্ণিত দু'টি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ مَجِيْدٌ শব্দেকে قُرْاٰنٌ শব্দের সিফাত হিসাবে মারফূ' পড়েছেন। কেউ কেউ مَجِيْدٌ শব্দকে مُضَافٌ اِلَيْهِ হিসাবে মাজরূর পড়েছেন। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ رَبٍّ مَجِيْدٍ অর্থাৎ "মহা সম্মানিত রবের কুরআন।' এমতাবস্থায় مَجِيْدٍ শব্দটি উহ্য মাওসূফের সিফাত হবে। –[কাবীর]

এ আয়াতগুলোতে একটি আহ্বান : আল্লাহ তা'আলা ভাষণের শেষে মক্কার জালিম, কাফের এবং প্রত্যেক যুগের আল্লাহদ্রোহীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা মিসরের স্বৈরাচারী ও আল্লাহদ্রোহী শাসক ফিরআউন এবং তার সেনাবাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে থাকবে। শুনে থাকবে শক্তিশালী ছামূদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মর্মান্তিক কাহিনী। তারা রাজক্ষমতা, অর্থবল ও জনবলে দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়েছিল। আমি তাদেরকে নবী ও কিতাব পাঠিয়ে সত্য পথে আনার চেষ্টা করেছি; কিন্তু তারা নবীর কথায় কর্ণপাত করেনি, কিতাবের কোনো মূল্য দেয়নি; বরং গায়ের জোরে সবকিছুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অসহায় ও দুর্বল ঈমানদারদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছে। ফলে আমি ফিরআউন ও তার বাহিনীকে নীল নদীতে ডুবিয়ে মেরেছি এবং ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি আসমানি গজব দ্বারা। সুতরাং তোমাদের এসব ঐতিহাসিক সত্য হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। নতুবা তোমাদের পরিণতিও অনুরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। তোমরা ক্ষমতা, শক্তি, জনবল ও অর্থবলের যতই অহমিকা প্রদর্শন কর না কেন, তোমরা কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতার বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থান করছ। আবেষ্টনীর সে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের বুহ্য ভেদ করা তোমাদের ক্ষমতার অতীত। অথচ তোমাদের ঈমান না থাকার দরুন তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছ না। সুতরাং আমার কুরআন ও নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তোমাদের ঈমানদার হওয়া উচিত।

এ কুরআন এক মহাসম্মানিত গ্রন্থ। একে তোমরা যতই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে অবলোকন কর এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, উপহাস-বিদ্রূপ কর না কেন, ধ্বংস করতে পারবে না। এর লেখক অমোঘ, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অটল, অবিচল ও চির সক্ষম। এটা আল্লাহর এমন এক সুরক্ষিত ফলকে খোদিত, যাতে কোনোরূপ পরিবর্তন ও রদবদল ঘটতে পারে না। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ একসাথ হয়েও এর বিরোধিতা করলে এর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। বস্তুত এ মহাসত্যের প্রতি তোমাদের ঈমান ও আস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। নতুবা তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। এটাই হচ্ছে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য।

مَحْفُوْظٌ কথাটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহর বাণী فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ-এর মধ্যস্থিত مَحْفُوْظ-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো "مَحْفُوْظٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ تَغْيِيْرِ شَيْءٍ مِنْهُ" অর্থাৎ কুরআন মাজীদ শয়তানের প্রভাব হতে মুক্ত এবং কোনোরূপ পরিবর্তন হতে সংরক্ষিত।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, এখানে مَحْفُوْظٌ-এর অর্থ হলো ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কোনো জীব এটা সম্পর্কে অবিহিত নয়।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো শয়তানের প্রভাব হতে একে হেফাজত করা হয়েছে। শয়তান ঐ স্থানে পৌছতে পারে না।

ঘ. কারো কারো মতে, এখানে مَحْفُوْظٌ-এর অর্থ হলো পবিত্রতা অর্জন ছাড়া (অপবিত্র অবস্থায়) কেউ এটা স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ" অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য এটা স্পর্শ করা জায়েজ নেই।

ঙ. অথবা, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কুরআনে মাজীদ বিকৃত হওয়া হতে সংরক্ষিত। [আল্লাহই ভালো জানেন।]

فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ-এর মধ্যে لَوْح-এর অর্থ কি? : আল্লাহর বাণী فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ-এর মধ্যে لَوْح-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।

ক. ইমাম কুরতুবী (র.)-এর মতে لَوْحٌ এমন এক বস্তুকে বলে যা ফেরেশতাদের জন্য উন্মোচিত হয় এবং তারা তা তেলাওয়াত করে।

খ. কারো মতে لَوْحٌ হচ্ছে এমন বস্তু যাতে সমস্ত সৃষ্ট জীবের বিবরণ, তাদের হায়াত, রিজিক, কার্যকলাপ ও পরিণতি সব কিছুরই বর্ণনা রয়েছে। এর অপর নাম হলো أُمُّ الْكِتَابِ (আদি গ্রন্থ)।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, لَوْحٌ শব্দটির প্রথম অক্ষর যবর বিশিষ্ট। এর অর্থ হলো ফলক।

ঘ. কারো কারো মতে, لَوْحٌ শব্দটির প্রথম অক্ষর পেশ বিশিষ্ট। এর অর্থ হলো আসমান ও জমিন?

ঙ. হযরত যাহহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অত্র আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, لَوْحٌ হলো লাল কঠিন পাথর যার উপরের দিক আরশের সাথে বাঁধা এবং নিচের দিক একজন সম্মানিত ফেরেশতার কোলে রাখা তাকে مَاطْرِيُوْنَ [মাতেরিউন] বলে।

আল্লাহর কিতাব ও কলম আলোর তৈরি। আল্লাহ তা'আলা এদের প্রতি প্রত্যহ ষাটবার দৃষ্টি দেন। প্রতিটি দৃষ্টিতে তিনি কোনো না কোনো কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনিই একমাত্র সত্য মাবুদ। তিনিই ধনীকে দরিদ্র এবং দরিদ্রকে ধনী করেন। জীবন ও মৃত্যু সবই তাঁর হাতে।

চ. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, لَوْحٌ হলো শুভ্র মুক্তার দ্বারা নির্মিত।

لَوْحٌ কোথায় অবস্থিতি? : لَوْحٌ কোথায় অবস্থিত এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এটা সপ্তম আকাশের উপর শূন্যে।

খ. হযরত মোকাতেল (র.) বলেন, لَوْحٌ আল্লাহ তা'আলার আরশের ডান দিকে অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন তিনশত ষাট বার এর দিকে কুদরতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

গ. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রহ.) বলেন, لَوْحٌ مَحْفُوْظٌ হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর সম্মুখে রয়েছে।

হযরত ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এ لَوْحٌ হলো সাদা ধবধবে মুক্তা দ্বারা তৈরি। এর দৈর্ঘ্য আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। এর দু'পার্শ্ব মুক্তা এবং ইয়াকূত পাথরের তৈরি, তার কলম নূর দ্বারা তৈরি। -[নূরুল কোরআন]

'লাওহে' প্রথম লিখা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, লাওহে মাহ্‌ফূযে প্রথমে লিখা হয়েছিল।

إِنِّيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا، مُحَمَّدٌ رَسُوْلِيْ، مَنْ اِسْتَسْلَمَ لِقَضَائِيْ وَصَبَرَ عَلٰى بَلَائِيْ وَشَكَرَ نَعْمَائِيْ، كَتَبْتُهُ صِدِّيْقًا وَبَعَثْتُهُ مَعَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَائِيْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلَائِيْ وَلَمْ يَشْكُرْ نَعْمَائِيْ فَلْيَتَّخِذْ إِلٰهًا سِوَايْ.

অর্থাৎ "আমিই আল্লাহ! আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ আমার প্রেরিত পুরুষ। যে আমার ফয়সালা মেনে নেয়, আমার পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে, আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাকে আমি 'সিদ্দীক' (সত্যবাদী) হিসাবে লিখবো এবং সত্যবাদীদের সাথে প্রেরণ করবো, আর যে আমার ফয়সালা মানে না, আমার পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করে না এবং আমার নিয়ামতের শুকরিয়া করে না, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্যকে ইলাহ গ্রহণ করে।" -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الطَّارِقِ : সূরা আত্-ত্বারিক্ব

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াতে اَلطَّارِقُ শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে একে سُوْرَةُ الطَّارِقِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি বাক্য এবং ২৩৯টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : সূরাটির ভাষণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, এটা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাসমূহের একটি। অবতীর্ণের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তবে মক্কার কাফেরগণ যখন কুরআনের দাওয়াত এবং এর উপস্থাপিত বিধান সম্পর্কে নানারূপ ষড়যন্ত্র এবং এর বিষয় নিয়ে কৌতুক করত, তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য দু'টি। একটি হচ্ছে– মৃত্যুর পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। আর দ্বিতীয়, কুরআন একটি চূড়ান্ত বাণী। কাফেরদের কোনো অপকৌশল কোনো ষড়যন্ত্রই এর ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

সর্বপ্রথম আকাশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ নক্ষত্ররাজিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বলোকের কোনো বস্তুই এক মহান সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিজ স্থানে স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে না। পরে মানুষের নিজ সত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মূল সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, একবিন্দু শুক্রকীট দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এক জীবন্ত, চলন্ত ও পূর্ণাঙ্গ সত্তায় পরিণত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা এভাবে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন– মৃত্যুর পর তিনি যে, তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার জীবনে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য অজ্ঞানতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়ে গেছে পরবর্তী জীবনে তাই যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। এ সময় মানুষ তার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ ফল ভোগ করা হতে না সে নিজের বলে আত্মরক্ষা করতে পারবে আর না অন্য কেউ তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাত এবং জমিনে গাছপালা ও শস্যের উৎপাদন যেমন কোনো অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়; বরং এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিরাট কাজ, কুরআনের যেসব সত্য ও তথ্য বিবৃত হয়েছে তাও ঠিক তেমনি কোনো হাসি-তামাশার ব্যাপার নয়। এটা অতীব পাকা-পোক্ত এবং অবিচল ও অটল বাণী। কাফিররা নানা অপকৌশল দ্বারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে বলে মনে করছে, তা তাদের মারাত্মক ভুল বৈ আর কিছুই নয়। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলাও তার এক নিজস্ব পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তার এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় কাফিরের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

অতঃপর একটি বাক্যাংশে নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আর সান্ত্বনা বাণীর অন্তরালে কাফেরদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপনি একটু ধৈর্যধারণ করুন। কাফেরদেরকে কিছু দিন তাদের ইচ্ছা মাফিক চলতে দিন। অপেক্ষা করুন বেশি দিন লাগবে না। তারা যেখানেই কুরআনকে আঘাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, সেখানেই কুরআন বিজয়ী হবে। আর তারা নিজেরাই তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আত্-ত্বারিক্ব মক্কায় অবতীর্ণ

سَبْعَ عَشَرَةَ اٰيَةً : ১৭ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالسَّمَاۤءِ وَالطَّارِقِ اَصْلُهُ كُلُّ اٰتٍ لَيْلًا وَمِنْهُ النُّجُوْمُ لِطُلُوْعِهَا لَيْلًا .

১. শপথ আকাশের ও রাতে আগমনকারীর মূলত প্রত্যেক রাতে আগমনকারী বস্তুকেই طَارِقٌ বলা হয়। সে হিসাবে রাতে উদিত হয় বিধায় নক্ষত্ররাজিকে طَارِقٌ বলা হয়।

٢. وَمَاۤ اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ مَا الطَّارِقُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ فِىْ مَحَلِّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ لِاَدْرٰى وَمَا بَعْدَ مَا الْاُوْلٰى خَبَرُهَا وَفِيْهِ تَعْظِيْمٌ لِشَاْنِ الطَّارِقِ الْمُفَسَّرِ بِمَا بَعْدَهُ .

২. তোমার কি উপলব্ধি আছে কি জান রাতে আগমনকারী কি? এটা مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ মিলে اَدْرٰى-এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل-এর স্থলে অবস্থিত। আর প্রথমোক্ত مَا-এর পরবর্তী اَدْرٰكَ শব্দটি উক্ত مَا-এর خَبَرٌ; এ বাক্য طَارِقٌ-এর মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। যার ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াত দ্বারা করা হয়েছে যে,

٣. هُوَ النَّجْمُ اَىِ الثُّرَيَّا اَوْ كُلُّ نَجْمٍ الثَّاقِبُ الْمُضِىْۤءُ لِثَقْبِهِ الظَّلَامَ بِضَوْئِهِ وَجَوَابُ الْقَسَمِ .

৩. এটা নক্ষত্র সুরাইয়া অথবা সকল নক্ষত্র যা সমুজ্জ্বল আলোকময়, যা স্বীয় আলো দ্বারা অন্ধকার ভেদ করে থাকে। আর কসমের জবাব হলো এই যে,

٤. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ بِتَخْفِيْفِ مَا فَهِىَ مَزِيْدَةٌ وَاِنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اِنَّهُ وَاللَّامُ فَارِقَةٌ وَبِتَشْدِيْدِهَا فَاِنْ نَافِيَةٌ وَلَمَّا بِمَعْنٰى اِلَّا وَالْحَافِظُ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ يَحْفَظُ عَمَلَهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ .

৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। مَا অব্যয়টি তাখফীফ সহকারে পঠিত হলে তা অতিরিক্তরূপে গণ্য হবে। আর اِنْ টি ছাকীলা হতে মুখাফফাফা, তার اِسْم উহ্য অর্থাৎ اِنَّهُ এবং لَامْ টি মুখাফফা ও নাফিয়ার মধ্যে ব্যবধানকারী, আর যদি مَا অব্যয়টিকে তাশদীদযোগে পাঠ করা হয়, তবে اِنْ অব্যয়টি نَافِيَةٌ বা নেতিবাকচক এবং لَمَّا অব্যয়টি اِلَّا অর্থে ব্যবহৃত। আর তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা সংরক্ষণকারী ফেরেশতা উদ্দেশ্য, যারা তার ভালো ও মন্দ উভয় কাজের সংরক্ষণ করে।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্তমান সূরার সাথে পূর্বের সূরার যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে মু'মিনদের জন্য ওয়াদা আর কাফেরদের জন্য ধমক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান সূরা তাদেরকে আজাব প্রদানের দলিল স্বরূপ তাদের কৃতকর্মসমূহকে সংরক্ষণ করার কথা আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া পুনরুত্থানের সম্ভাবনা এবং সংঘটন, এর উপর দলিল স্বরূপ কুরআনের সত্যতার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকেও ছিল। -[কামালাইন]

সূরাটির শানে নুযূল : মাহানবী ﷺ কোনো এক সময় আবূ তালিবের বাড়ি গেলেন। সে তাকে রুটি ও দুগ্ধ আহার করতে দিল. নবী করীম ﷺ তা আহার করা অবস্থায় হঠাৎ একটি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ উজ্জ্বল করে তুলল। এটা লক্ষ্য করে আবূ তালিব খুব কম্পিত হলো এবং মনে মনে ভয় পেল। তখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, এটা কি? নবী করীম ﷺ জবাবে বললেন, এটা শয়তানের উপর নিক্ষিপ্ত তারকা এবং আল্লাহর অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও একত্ববাদের একটি নিদর্শন। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসহ গোটা সূরাটিই অবতীর্ণ করেন। -[খাযেন, কুরতুবী]

اَلطَّارِقُ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য? : اَلطَّارِقُ-এর শব্দিক অর্থ হলা রাত্রে আগমনকারী বা আত্মপ্রকাশকারী। اَلطَّارِقُ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. ইমাম ফাররা (র.) বলেছেন, اَلطَّارِقُ হলো গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি-যা রাতে উদিত হয়। আর রাতে যে আগমন করে তাকেই طَارِقٌ বলে।

খ. জমহুর মুফাস্সিরগণ বলেছেন, اَلطَّارِقُ দ্বারা এখানে তারকারাজিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা এরা রাতে উদিত হয় এবং দিনে লুকিয়ে থাকে।

গ. কারো কারো মতে রাতে আগমনকারী ও আত্মপ্রকাশকারী সকল বস্তুকেই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আবার যারা বলে থাকেন যে, طارق-এর দ্বারা এখানে তারকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এর দ্বারা আমভাবে সমস্ত তারকাই উদ্দেশ্য-না বিশেষ কোনো তারকার কথা খাসভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং (ক) কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আমভাবে সকল তারকাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (খ) কারো কারো মতে এর দ্বারা ثُرَيَّا (সুরাইয়্যা) তারকাকে বুঝানো হয়েছে। (গ) একদল মুফাস্সিরের মতে এটা দ্বারা زُحَلْ (শনিগ্রহ)-কে বুঝানো হয়েছে। (ঘ) কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা ঐ সকল তারকাকে বুঝানো হয়েছে যাদের দ্বারা শয়তানকে তাড়ানো হয়ে থাকে। ঙ. কেউ কেউ বলেছেন, اَلطَّارِقُ দ্বারা ভোরের তারকাকে বুঝানো হয়েছে। সিহাহ সিত্তায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। (চ) কারো কারো মতে, اَلطَّارِقُ দ্বারা এখানে গ্রহের শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

ثَاقِبٌ-এর মর্মার্থ : ثَاقِبٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে ইসমে ফায়েল وَاحِدْ مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো- উজ্জ্বল, দীপ্তিমান। এখানে উজ্জ্বল তারকাকে বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ثَقْبٌ-এর অর্থ হলো ভেদ করা, ছিন্ন বা ছিদ্র করা। তারকারাজি রাতের অন্ধকারকে ভেদ করে আলো ছড়িয়ে দেয় বিধায় তাদেরকে اَلثَّاقِبُ বলা হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, প্রতিটি উজ্জ্বল বস্তুকেই ثَاقِبٌ বলা হয়। -[কুরতুবী]

কারো কারো মতে, এর দ্বারা 'যাহল' নামক তারকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, এ তারকাটি সর্বোচ্চ তথা সপ্তম আসমানে অবস্থান করে। -[নূরুল কোরআন]

حَافِظٌ শব্দের গুরুত্ব : প্রত্যেক মানুষের জন্যই একজন حَافِظٌ বা তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন। এ কথার তাৎপর্য ও মর্ম-বিশ্লেষণে তাফসীরকারকদের পক্ষ হতে কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়। ১. حَافِظٌ দ্বারা স্বয়ং প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। তিনি মানুষের কৃত নেক ও বদ আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন। ২. এটা দ্বারা ফেরেশতাদের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতের অনুসারী। ৩. এটা দ্বারা জনৈক সংরক্ষণকারীর কথা বলা হয়েছে, তিনি আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত। সে তাঁর কথা ও কাজ সংরক্ষণ করেন। এর কতক বিলীন করেন এবং কতক আরশে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর এটা তাঁর নিকট আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৪. এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাকদীর নির্ধারিত দুর্ঘটনা ব্যতীত অন্যান্য দুর্ঘটনা, ধ্বংস, বিপদ-আপদ ইত্যাদি হতে রক্ষার কথা বুঝানো হয়েছে।

কসমের জবাব : সূরার প্রথমে আল্লাহ যে কসম করেছেন এর জবাবের ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়-

১. কসমের জবাব হলো- اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

২. কারো মতে জাবাব হলো- اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٥. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ مِمَّ خُلِقَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ جَوَابُهُ .

৫. সুতরাং মানুষ লক্ষ্য করুক উপদেশ গ্রহণমূলক লক্ষ্য করা যে, তাকে কি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ কোন বস্তু হতে? পরবর্তী আয়াতে এরই জবাব দেওয়া হচ্ছে।

٦. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ذِىْ اِنْدِفَاقٍ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِىْ رَحِمِهَا .

৬. তাকে সবেগে স্খলিত পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যা পুরুষ হতে স্খলিত হয়ে নারীর জরায়ুতে প্রবিষ্ট হয়।

٧. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ لِلرَّجُلِ وَالتَّرَائِبِ لِلْمَرْأَةِ وَهِىَ عِظَامُ الصَّدْرِ .

৭. যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড পুরুষের ও পাঞ্জরাস্থির মধ্য হতে মহিলার, তা হলো বক্ষদেশের হাড়।

٨. اِنَّهُ تَعَالٰى عَلٰى رَجْعِهٖ بَعْثِ الْاِنْسَانِ بَعْدَ مَوْتِهٖ لَقَادِرٌ فَاِذَا اعْتَبَرَ اَصْلَهُ عَلِمَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلٰى ذٰلِكَ قَادِرٌ عَلٰى بَعْثِهٖ .

৮. নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তা'আলা এর প্রত্যানয়নে মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থানে ক্ষমতাবান প্রথম সৃষ্টিকরণে তিনি ক্ষমতাবান প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তিনি পুনরুত্থানেও ক্ষমতাবান।

٩. يَوْمَ تُبْلَى تُخْتَبَرُ وَتُكْشَفُ السَّرَائِرُ ضَمَائِرُ الْقُلُوْبِ فِى الْعَقَائِدِ وَالنِّيَّاتِ .

৯. যেদিন পরীক্ষা করা হবে যাঁচাই-বাছাই ও উন্মোচিত করা হবে গোপন বিষয়াদি নিয়ত ও আকীদা-বিশ্বাসরূপে যা কিছু অন্তরে লুক্কায়িত ছিল।

١٠. فَمَا لَهُ لِمُنْكِرِ الْبَعْثِ مِنْ قُوَّةٍ يَمْتَنِعُ بِهَا عَنِ الْعَذَابِ وَلَا نَاصِرٍ يَدْفَعُهُ عَنْهُ .

১০. অনন্তর সেদিন তার জন্য থাকবে না পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর জন্য কোনো সামর্থ্য। যা দ্বারা শাস্তি প্রতিরোধ করবে, আর না কোনো সাহায্যকারী যে তার উপর হতে উক্ত শাস্তিকে প্রতিহত করবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَ-এর আমিল : عَلٰى رَجْعِهٖ-এর অর্থ যারা عَلٰى بَعْثِ الْاِنْسَانِ করে থাকেন, তাদের নিকট يَوْمَ-এর আমিল হলো لَقَادِرٌ। يَوْمَ শব্দটি। رَجْعِهٖ এতে কোনো عَمَلْ করবে না। কেননা তখন خَبَرْ اِنَّ-এর দ্বারা مَوْصُوْل এবং صِلَةْ এর মাঝে দূরত্ব হয়ে যায়।

আর অন্যান্যদের মতে এখানে একটি عَامِلْ উহ্য রয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে عَامِلْ হলো رَجْعِهٖ –[কুরতুবী, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে সকল মানুষের কৃতকর্ম হেফাজত বা সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। পুনরুত্থান হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার প্রথম অবস্থা এবং সৃষ্টির সাধারণ নিয়মের প্রতি চিন্তা করার জন্য বলেছেন, যেন তার সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি-ই পুনরায় তাকে উঠাতে পারবেন এবং প্রতিদান তিনি-ই দিবেন। অতএব, পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবসের জন্য আমল করা দরকার।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ-এর শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইকরামা (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, আবূ আসাদ নামক আরবের বিখ্যাত মল্লবীর একটি কাঁচা চর্মের উপর দাঁড়িয়ে বলত, হে লোকেরা! যারা মুহাম্মদকে কষ্ট দেবে তাদেরকে এত এত পুরস্কার প্রদান করা হবে। আর সে এটাও বলত যে, মুহাম্মদ বলেন, দোজখের কর্মকর্তা ফেরেশতা হবে

Free @ www.e-ilmweebly.com

উনিশ, তাদের দশ জনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট, আর বাকি নয় জনের মোকাবিলা করবে তোমরা সকলে। তখন মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের সৃষ্টির মূল হলো এক ঘৃণ্য শুক্রবিন্দু, কাজেই তার গর্ব করার কোনো কিছু নেই। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ : আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বলোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের পর মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁর সত্তা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য। মানুষের চিন্তা করা উচিত: তাকে কিরূপে কেমন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। পিতার দেহ হতে নির্গত শতকোটি শুক্রকীটের মধ্য হতে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ হতে নির্গত অসংখ্য ডিম্বের মধ্য হতে একটি ডিম্ব নির্বাচিত করে কোনো বিশেষ মুহূর্তে উভয়কে মিলিত ও সংযুক্ত করে দেয় কে? কে এভাবে এক বিশেষ ব্যক্তিকে গর্ভাধারে স্থান করে দেয়? কে সে শক্তি যে গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর হতে মায়ের গর্ভে তাকে ক্রমশ বিকাশ, ক্রমবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ দান করে তাকে একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়– যার পর সে এক জীবন্ত শিশুর আকারে ভূমিষ্ঠ হয়। মায়ের গর্ভেই তার দেহের সংগঠন সংস্থাকে বানিয়ে দেয়? তার দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্যকে সংস্থাপন করে? জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার ক্রমাগত ও অব্যাহত রক্ষণাবেক্ষণ করে কে? এ সময়ে তাকে রোগ-শোক হতে বাঁচিয়ে রাখে কে? তার জন্য জীবনের এতসব উপায়-উপকরণ কে সংগ্রহ করে দেয়? নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে অবশ্যই বলতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব কিছু করেছেন। সুতরাং যিনি এসব কিছু করেছেন তিনি অবশ্যই মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম।

قَوْلُهُ تَعَالَى خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَّخْرُجُ الخ : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সবেগে স্খলিত এমন এক ফোঁটা নাপাক পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন–যা পুরুষের পিঠ ও নারীর বক্ষদেশ হতে নির্গত হয়ে নারীর গর্ভাধারে প্রবিষ্ট হয়েছে। صُلْب হলো মেরুদণ্ড এবং تَرَائِبُ হলো বুকের অস্থি–অন্য কথায় পাঁজরের হাঁড়। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের প্রজনন শুক্র যেহেতু মানুষের এ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাঁড়ের মধ্যবর্তী দেহ সত্তা হতে নিঃসৃত হয়, এ জন্য বলা হয়েছে মানুষকে সে পানি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে– যা পিঠ ও বুকের মাঝ হতে বের হয়। হাত ও পা কেটে ফেললে অবশিষ্ট দেহ হতেও এ শুক্রকীট উৎপন্ন হয়। কাজেই এটা মানুষের সমগ্র দেহ হতে নিঃসৃত হয় এ কথা বলা ঠিক নয়। মূলত দেহের প্রধান অঙ্গসমূহই এর উৎস-উৎপাদন কেন্দ্র। আর তা সবই ব্যক্তির দেহে অবস্থিত। মগজের কথা এখানে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কেননা মেরুদণ্ড মগজেরই অংশ। এর মাধ্যমেই দেহের সাথে মগজের সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়।

দেহের বিভিন্ন অংশের কাজ যদিও ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়; তবুও কোনো অংশ বা অঙ্গই সম্পূর্ণ নিজস্ব ও বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। দেহের সকল অঙ্গের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়ই নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হয়। শুক্রকীট অণ্ডকোষে উৎপন্ন হয় তাতে সন্দেহ নেই এবং তা হতে এর নিষ্কাসন এক বিশেষ পথেই হয়ে থাকে। কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, অন্তর, মগজ, গুর্দা, বৃক্ক প্রভৃতি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ কাজ যথাযথাভাবে সম্পাদন না করলে শুক্রকীট উৎপাদন ও নিষ্কাসনের এ ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় প্রস্রাবের উৎপাত হয় গুর্দায় বা বৃক্কে। অপর একটি টিউবের সাহায্যে এটা মূত্রথলিতে পৌঁছে প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়ার পথে বের হয়ে যায়; কিন্তু এটা সমগ্র দেহে আবর্তিত করে বৃক্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে প্রয়োজন যেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ তা যথাযথ কাজ না করলে বৃক্ক এককভাবে রক্ত হতে এদের আলাদা করে মুত্রথলিতে পৌঁছাতে পারে না, যার সমষ্টি প্রস্রাব। এ কারণে কুরআন মাজীদে এ কথা বলা হয়নি যে, শুক্র কীট মেরুদণ্ড ও বুকের অস্থিসমূহ হতে বের হয়; বরং বলা হয়েছে এ উভয়ের মাঝখানে দেহের যে অংশ রয়েছে; তা হতেই শুক্রকীট নিঃসৃত হয়। এটা হতে শুক্রকীটের উৎপাদন এবং এর নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ কর্মপদ্ধতির (যা দেহের কতিপয় বিশেষ অংশ সম্পন্ন করে থাকে) অবস্থিতি অস্বীকৃতি হয় না; বরং এটা হতে বুঝা যায় যে, এ কর্মপদ্ধতি কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অন্য নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নয়। আল্লাহ তা'আলা মানবদেহের মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝে যে গোটা দেহ ব্যবস্থা সংস্থাপন করেছেন। তার সামগ্রিক কার্যক্রমের ফলেই এটা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, সমগ্র দেহ এ কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা হাত ও পা কেটে ফেললেও এ ব্যবস্থা কাজ করতে থাকে। অবশ্য মেরুদণ্ড ও বক্ষ পাঁজরের মাঝে যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, তার একটিও যদি না থাকে তাহলে এ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে না। কাজেই বুঝা গেল যে, কুরআনের ঘোষণা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত।

دَافِق-এর অর্থ : মূলত دَافِقٌ শব্দটি ইসমে ফায়েলের কিন্তু অর্থ– ইসমে মাফঊলের। مَدْفُوْقٌ অর্থ– প্রবাহিত। যেমন– عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ-এর মধ্যে رَاضِيَةٌ ইসমে ফায়েলের শব্দ হওয়া সত্ত্বেও مَرْضِيَّةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম ফাররা বলেন, আরবরা তাদের ভাষায় অনেক فَاعِلٌ-কে مَفْعُوْلٌ অর্থে ব্যবহার করে। যেমন– سِرٌّ كَاتِمٌ অর্থাৎ سِرٌّ مَكْتُوْمٌ এবং لَيْلٌ نَائِمٌ অর্থ لَيْلٌ مَنَامٌ –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَاءٍ শব্দকে একবচন নেওয়ার কারণ : মানবসৃষ্টির মূলে নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য যথাসময়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রযোজ্য একজনের বীর্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টি হয় না; কিন্তু কুরআন মাজীদে مَاءٍ শব্দকে একবচন উল্লেখ করায় এ সত্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। বলার দরকার ছিল خُلِقَ مِنْ مَاءَيْنِ।

মুফাসসিরীনে কেরাম এ প্রশ্নের জবাবে বলেন– আল্লাহ তা'আলা مَاءٍ বলতে নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্যকে বুঝিয়েছেন; কিন্তু গর্ভাশয়ে যাওয়ার সময় উভয় বীর্য এক হয়ে সম্মিলিতভাবে যাওয়ার কারণে একবচন ব্যবহার করেছেন। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

অথবা, এখানে مَاءٍ বলতে বীর্যের শ্রেণি (جِنْس) -কে বুঝানো হয়েছে। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে বীর্য পুরুষ ও মহিলার-ই হয়ে থাকে।

اَلصُّلْبُ-এর অর্থ : اَلصُّلْبُ অর্থ হলো عَظْمٌ فِى الظَّهْرِ مِنَ الْكَاهِلِ اِلٰى اَسْفَلِ الظَّهْرِ ঘাড়ের মধ্য হতে কোমর পর্যন্ত পিঠের মধ্যখানের হাড়কে صُلْب বলা হয়। صُلْب শব্দটি ৪টি রূপে ব্যবহৃত হয় :

ক. صُلْب 'সাদ' এর উপর পেশ এবং লাম সাকিন,

খ. صُلُب 'সাদ' এবং লাম উভয়ের উপর পেশ,

গ. صَلَب 'সোয়াদ'-এর উপর যবর দিয়ে এবং

ঘ. صَالِبٌ - قَالِبٌ এর ওযনে। –[কুরতুবী]

اَلتَّرَائِبِ-এর অর্থ : اَلتَّرَائِبِ শব্দটি বহুবচন, একবচনে تَرِيْبَةٌ আর تَرِيْبَةٌ বলা হয় বক্ষের ঐ স্থানকে যে স্থানে অলঙ্কার থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এই অর্থই বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, দুই দুধের মধ্যখানকে تَرِيْبَةٌ বলা হয়।

হযরত ইক্‌রামা এবং যাহ্‌হাক বলেন, تَرَائِبُ الْمَرْأَةِ হলো তার দুই হাত, দুই পা এবং দুই চোখ।

হযরত মুজাহিদ বলেন, تَرِيْبَةٌ হলো দুই কাঁধ এবং বক্ষের মধ্য স্থানের অংশ।

ইমাম যুযযাজ বর্ণনা করেন, বক্ষের ডানদিকের ৪টি এবং বাম দিকের ৪টি হাড়কে تَرَائِبُ বলা হয়।

হযরত মা'মার ইবনে হাবীবা আল-মাদানীর মতে– تَرَائِبُ হলো হৃদয় নিংড়ানো রস, যার দ্বারা সন্তান সৃষ্টি হয়। তবে প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী, কাবীর]

নারী-পুরুষ উভয়ের থেকে বীর্য গ্রহণের কারণ : আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়ের থেকেই বীর্য (শুক্র) গ্রহণ করে গর্ভাশয়ে স্থাপন পূর্বক মানুষের দেহ সৃষ্টি করে থাকেন। পুরুষের বীর্য صُلْب থেকে আসে, এটা দিয়ে সন্তানের হাড় এবং রগ তৈরি হয়। আর মহিলার বীর্য تَرَائِبُ থেকে আসে, এর দ্বারা সন্তানের গোশত এবং রক্ত তৈরি হয়। –[কুরতুবী]

اِنَّهٗ শব্দের সর্বনামের [যমীরের] প্রত্যাবর্তনস্থল : اِنَّهٗ-এর সর্বনামটি خَالِقٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তবে خَالِقٌ শব্দটি পূর্বে উল্লেখ হয়নি। উল্লেখ ছাড়া সর্বনামকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা কতটুকু বৈধ হয়েছে। –এই প্রশ্নের জবাব দু'টি হতে পারে :

১. পিছনে خُلِقَ مِنْ مَاءٍ বলা হয়েছে। কোনো বস্তু এমনিতেই সৃষ্টি হয় না; বরং خَالِقٌ-এর প্রয়োজন হয়। অতএব, অর্থ এই দাঁড়াবে যে, اِنَّ ذٰلِكَ الَّذِىْ خَلَقَ قَادِرٌ عَلٰى رَجْعِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একে পুনারায় উঠানোর উপর শক্তি রাখেন।

২. যদিও সরাসরি শব্দ উল্লেখ হয়নি, কিন্তু مَرْجِعٌ যে আল্লাহ –(খালেক) হবেন এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা সৃষ্টি এবং পুনরুত্থানের মতো বড় কাজ আল্লাহর দ্বারাই সংঘটিত হবে, আর কারো দ্বারা নয়।

উভয় অবস্থাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ-ই হবেন مَرْجِعٌ অতএব, উল্লেখ না করলেও উল্লেখের মতো-ই হয়েছে। –[কাবীর]

رَجْعِهٖ-এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল এবং عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ-এর অর্থ :

১. কারো মতে, رَجْعِهٖ-এর সর্বনামটি اَلْاِنْسَانُ-এর দিকে ফিরেছে, তখন অর্থ হবে যিনি প্রথমে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মৃত্যুর পর তাকে জীবন্ত করার ব্যাপারে শক্তি রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ এবং وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. কারো মতে اَلْاِنْسَانُ নয়; বরং اَلْمَاءُ তখন অর্থ হবে তিনি আল্লাহ ঐ পানি (শুক্র)-কে যথাস্থানে বারবার স্থাপন করতে পারেন

হযরত যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে 'যেমন ছিল তেমন' (পানি) করে দিতে পারেন। এই শক্তি তাঁর রয়েছে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ মানুষকে বৃদ্ধ হতে যুবক, যুবক হতে বৃদ্ধ করতে পারেন। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়– বৃদ্ধ হতে যুবকে, যুবক হতে কিশোর এবং কিশোর হতে বীর্যে রূপান্তির করতে পারেন।

হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, তিনি আল্লাহ ঐ পানিকে (শুক্র) বন্ধ করে দিতে পারেন, যেন এটা বের না হয়। তবে প্রথম মতটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। –[কাবীর, কুরতুবী]

اِبْتِلَاءُ السَّرَائِرِ-এর অর্থ : উল্লিখিত ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, সেদিন গোপন তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। سَرَائِرُ শব্দটি سِرٌّ শব্দের বহুবচন, অর্থ– গোপন তথ্য। গোপন তথ্য দ্বারা এখানে মানুষের পার্থিব জীবনের আমলের কথা বুঝানো হয়েছে। এর তথ্য তাদের হতে গোপন করা হয়েছে। শুধু ফলিত রূপটিই তাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান। সুতরাং তথ্য সম্পর্কে মহাবিচারের দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। কাজেই সে তথ্যটি হলো কাজের পিছনে যে উদ্দেশ্য, চিন্তাধারা, কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা– এক কথায় যে নিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে, সে নিয়তের বিচার-বিশ্লেষণ হবে। কেননা নিয়তটি সর্বদা গোপনই থাকে। মানুষ তা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না। মানুষের সম্মুখে কেবল সদিচ্ছা ও কল্যাণমূলক দিকটিই তুলে ধরা হয়। তাই মহাবিচারের দিন এরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। আর দ্বিতীয় তথ্য হলো মানুষের কাজের প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত পৌঁছে। এর প্রতিক্রিয়ার সীমানাটি কতদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং তা দ্বারা সৃষ্টিকুলের কতখানি কল্যাণ-অকল্যাণ হয় তাও অনেক সময় মানুষের নিকট হতে গোপন থাকে। যেমন কোনো লোক একটি বীজ দুনিয়ার বুকে বপন করে গেল। তাতে কি ফসল ফলল, ফসল কতদিন ছিল, কারা তা ভোগ করে লাভবান হলো, কারা এর যথার্থ ব্যবহার করল, কারা করল না, এর সবকিছু তার নিকট গোপন থাকে। মহাবিচারের দিনই এর সঠিক বিচার, হিসাব-নিকাশ ও পরিসংখ্যান হবে। মোটকথা, গোপন তথ্য দ্বারা মানুষের আমল, আমলের নিয়ত ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেই বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে বলে বুঝানো হয়েছে।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ আয়াতে سَرَائِرُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আয়াত يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ-এর মধ্যে اَلسَّرَائِرُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

১. জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে, এখানে اَلسَّرَائِرُ-এর দ্বারা পার্থিব জীবনের আমলকে বুঝানো হয়েছে।

২. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, এটা দ্বারা মানুষের অন্তরে লুক্কায়িত আকীদা-বিশ্বাস ও নিয়তকে বুঝানো হয়েছে।

৩. নবী করীম ﷺ হতে একটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকে চারটি বস্তুর উপর আসীন বানিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে– নামাজ, রোজা, যাকাত ও গোসল। আর এটাই سَرَائِرُ যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পরীক্ষা করবেন।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি বস্তু যথাযথ সংরক্ষণ করবে সে বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এদের সংরক্ষণ করে না, সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর শত্রু হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে– নামাজ, রোজা ও সহবাসের পরের গোসল।

৫. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেছেন, অজু অন্তরে লুক্কায়িত গোপন তথ্যাদি, মহিলার যৌনাঙ্গ, হায়েজ, গর্ভধারণ এগুলোও سَرَائِرُ -এর অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এ সকল ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।

৬. হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তিনটি গোপন বিষয় হলো নামাজ, রোজা ও সহবাসের পর গোসল করা। আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানকে নামাজের আমানতদার বানিয়েছেন, যদি সে চায় বলতে পারে–নামাজ আদায় করেছি, অথচ সে নামাজ আদায় করেনি। তিনি আদম সন্তানকে রোজার আমানতদার বানিয়েছেন, ইচ্ছা করলে সে বলতে পারে– আমি রোজা রেখেছি, অথচ সে রোজা রাখেনি। তদ্রূপ তিনি আদম সন্তানকে সহবাসের পর গোসল করার ব্যাপারে আমানতদার বানিয়েছেন, ইচ্ছা করলে সে বলতে পারে আমি গোসল করেছি, অথচ সে গোসল করেনি। আর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার প্রকৃত অবস্থা অবশ্যই ফাঁস করে দিবেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে– يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ الْمَطَرِ لِعَوْدِهٖ كُلَّ حِيْنٍ.

১১. শপথ আকাশের যা বারিবর্ষণকারী বৃষ্টি পুনঃপুন আগমন করে বিধায় তাকে رَجْع [পুনঃপুন আগমনকারী] শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

١٢. وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ الشَّقِّ عَنِ النَّبَاتِ.

১২. আর শপথ জমিনের, যা বিদীর্ণ হয় উদ্ভিদরাজি উদ্গত হওয়ার মাধ্যমে।

١٣. اِنَّهٗ اَيِ الْقُرْاٰنُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

১৩. নিশ্চয় এটা অর্থাৎ কুরআন মীমাংসাকারী বাণী যা হক ও বাতিলের মধ্যে মীমাংসা করে।

١٤. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِاللَّعِبِ وَالْبَاطِلِ.

১৪. আর এটা নিরর্থক নয়। খেলাধুলা ও অপ্রয়োজনীয়।

١٥. اِنَّهُمْ اَيِ الْكُفَّارُ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا يَعْمَلُوْنَ الْمَكَائِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

১৫. নিশ্চয় তারা কাফের মুশরিকগণ জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

١٦. وَاَكِيْدُ كَيْدًا اَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ.

১৬. আর আমি ভীষণ কৌশল অবলম্বন করি তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করি, যা তারা টের পায় না।

١٧. فَمَهِّلِ يَا مُحَمَّدُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ تَاكِيْدٌ حَسَّنَهٗ مُخَالَفَةُ اللَّفْظِ اَيْ اَنْظِرْهُمْ رُوَيْدًا قَلِيْلًا وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِمَعْنَى الْعَامِلِ مُصَغَّرُ رُوْدٍ اَوْ اِرْوَادٍ عَلَى التَّرْخِيْمِ وَقَدْ اَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَنَسْخُ الْاِمْهَالِ بِاٰيَةِ السَّيْفِ اَيْ بِالْاَمْرِ بِالْجِهَادِ وَالْقِتَالِ.

১৭. অতএব, অবকাশ দান কর হে মুহাম্মদ! কাফেরদের, তাদেরকে অবকাশ দাও এটা তাকিদ স্বরূপ পুনরুক্ত, শব্দের বিভিন্নতা দ্বারা এর সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে সময় দাও স্বল্প কালের জন্য সামান্য। এটা আমিলের অর্থের তাকিদের জন্য مَصْدَرٌ শব্দটি تَرْخِيْم যাতে تَصْغِيْر এর-اِرْوَادٌ - رُوْدٌ করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আর জিহাদের আদেশ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত আদেশ দ্বারা অবকাশ দানের বিধান রহিত হয়ে গেছে।

তাহকীক ও তারকীব

رُوَيْدًا-এর অর্থ এবং মহল্লে ই'রাব : رُوَيْدًا অর্থ قَرِيْبًا অর্থাৎ নিকটতম সময়। হযরত ইবনে আব্বাস এবং কাতাদাহ (র.) বলেন, رُوَيْدًا অর্থ قَلِيْلًا বা কম সময় অর্থ কিছু কাল, বাবে نَصَرَ এটা رُوْدٌ শব্দের تَصْغِيْر হয়েছে। এটা চারভাবে ব্যবহৃত হয়–

১. اِسْم হিসাবে, যেমন رُوَيْدَ عَمْرًا অর্থাৎ আমরকে কিছুকাল অবকাশ দাও।

২. صِفَة হিসাবে, যেমন سَارُوْا سَيْرًا رُوَيْدًا অর্থাৎ তারা অল্প অল্প করে ভ্রমণ করেছে।

৩. حَال হিসাবে, যেমন سَارَ الْقَوْمُ رُوَيْدًا অর্থাৎ লোকেরা ধীরগতিতে ভ্রমণ করেছে।

৪. মাসদার হিসাবে, যেমন (بِالْإِضَافَةِ) رُوَيْدَ عَمْرٍو এর অনুরূপ কুরআন মাজীদে দেখা যায়, فَضَرْبُ الرِّقَابِ
কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আয়াতে মাসদারের সিফাত হিসাবে رُوَيْدًا ব্যবহৃত হয়েছে। মূলবাক্য ছিল اَمْهِلْهُمْ اِمْهَالًا رُوَيْدًا অথবা 'হাল' হয়েছে, তখন অর্থ হবে اَمْهِلْهُمْ غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ لَهُمُ الْعَذَابَ -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা পিছনের আয়াতগুলোতে যথাযথ দলিল পেশ করে তাওহীদ তথা একত্ববাদকে দৃঢ় করেছেন। সাথে সাথে পুনরুত্থানকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এখন আবার কসম করে কুরআনের সত্যতা এবং কাফিরদের ব্যর্থতা বর্ণনা করছেন।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ আয়াতে اَلرَّجْعِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে আকাশকে ذَاتِ الرَّجْعِ বলেছেন। اَلرَّجْعِ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– প্রত্যাবর্তন করা। কিন্তু আরবি ভাষায় رَجْعٌ শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ হলো– বৃষ্টিপাত। জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে অত্র আয়াতেও رَجْعٌ শব্দটি বৃষ্টিপাতের অর্থে হয়েছে। বৃষ্টিপাতকে رَجْعٌ বলার কয়েকটি কারণ হতে পারে।

এক : বৃষ্টি একবার বর্ষিত হয়ে ক্ষান্ত হয় না; বরং বর্ষা ঋতুতে বারবার এবং অন্যান্য ঋতুতে একাধিকবার বর্ষিত হয়ে থাকে। সব ঋতুতেই মাঝে মধ্যে কিছুনা কিছু বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

দুই : দুনিয়ার সমুদ্রসমূহ হতে পানি বাষ্পরূপে উত্থিত হয় এবং পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকেই ফিরে আসে।

তিন : আরবগণ বৃষ্টিপাতকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করত, তাই তারা বৃষ্টিপাতকে বারংবার কামনা করত। এ জন্যই বৃষ্টিপাতের নাম হয়েছে اَلرَّجْعِ ।

চার : কেউ কেউ বলেছেন, দীর্ঘ দিন বৃষ্টিপাত না হলে জামিন শুষ্ক হয়ে যায় এবং এর নীরব ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বৃষ্টিপাত হওয়ার পর আবার এটা সতেজ হয় এবং যেন নবজীবন ফিরে পায়। এ জন্যই বৃষ্টিপাতকে اَلرَّجْعِ নামকরণ করা হয়েছে।

রাঈসুল মাফাস্সিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (র.) সহ অধিকাংশ তাফসীরবিদগণই উপরিউক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

اَلرَّجْعِ-এর ব্যাখ্যায় অপরাপর মুফাস্সিরগণের আরো কয়েকটি মতামত নিম্নে দেওয়া হলো। ১. কারো কারো মতে اَلرَّجْعِ-এর দ্বারা এখানে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা জমিনের বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ে বারংবার আকাশে ফিরে যায়। ২. কেউ কেউ বলেছেন, اَلرَّجْعِ শব্দটি এখানে اَلنَّفْعُ বা কল্যাণের অর্থে হয়েছে। অত্র আয়াতে আকাশকে কল্যাণকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩. হযরত ইবনে যায়েদ (র.)-এর মতে اَلرَّجْعِ-এর দ্বারা এখানে আকাশের চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এরা বার বার অস্ত যায় এবং পুনরায় উদিত হয়ে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে জমহুর মুফাসসিরগণের মাযহাবই অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং আরবি ব্যবহার পদ্ধতির অধিকতর নিকটবর্তী।

اَلصَّدْعِ -এর অর্থ : صَدْعٌ অর্থ– পৃথক করা, ফেটে যাওয়া, প্রকাশ হওয়া, দু' খণ্ড হয়ে যাওয়া। বহুবচনে صُدُوْعٌ বাবে فَتَحَ যেহেতু উদ্ভিদ জমিনকে চিড়ে বের হয়, সেহেতু জমিনকে ذَاتِ الصَّدْعِ বলা হয়েছে। মনে হয় যেন এভাবে বলা হয়েছে যে, وَالْاَرْضِ ذَاتِ النَّبَاتِ [জমিনের কসম, যা উদ্ভিদের মালিক বা উদ্ভিদ নির্গমনকারী] কেননা উদ্ভিদ জমিনকে বিদীর্ণ করে।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, وَالْاَرْضِ ذَاتِ الطُّرُقِ الَّتِىْ تَصْدَعُهَا الْمُشَاةُ [ঐ জমিনের শপথ, যে জমিনে অনেক রাস্তা রয়েছে, যেগুলো বিচরণকারীগণ প্রকাশ করেছে] এখানে 'প্রকাশিত রাস্তা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

কারো মতে, اَلصَّدْعِ দ্বারা اَلْحَرْثِ (চাষ) বুঝানো হয়েছে। কেননা চাষ দ্বারা জমিনকে পৃথক করা হয়।

কারো মতে, اَلْاَمْوَاتُ-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ ذَاتِ الْاَمْوَاتِ হাশরের দিন জমিন ফেটে মুর্দাগণ জীবিত হয়ে বের হবে, এ কারণে صَدْعٌ বলা হয়েছে। –[কুরতুবী]

দুনিয়ায় পদার্পণ এবং পরকাল এ দু'টি বাস্তব সত্যকে বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা জীব সৃষ্টিকে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে জমিনের উদ্ভিদ সৃষ্টির রহস্যও তুলে ধরেছেন। এতে বুঝা যায় যে, اَلسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ كَالْاَبِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

أَبَوَانِ অর্থাৎ ধারণকারী আকাশ পিতৃতুল্য এবং উদ্ভিদ উদগমনশীল পৃথিবী মাতৃতুল্য। মাতাপিতা ছাড়া যেমন বংশ বৃদ্ধির চিন্তা করা যায় না, তেমনি আকাশ ও জমিন ছাড়া উদ্ভিদের চিন্তা করা যায় না। উভয়টি আমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত বৈ আর কিছু নয়, কেননা দুনিয়ার প্রত্যেকটি নিয়ামত আকাশে বারবার বৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী। -[কাবীর]

إِنَّهُ-এর যমীরের মারজি : إِنَّهُ-এর মারজি'র ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

ক. পিছনে উল্লিখিত আল্লাহর সকল وَعْدٌ ও وَعِيْدٌ-এর দিকে, যমীর ফিরেছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে তোমাদেরকে জীবন্ত করার যে কথা আমি তোমাদের সম্মুখে ব্যক্ত করেছি তা لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَحَقٌّ অর্থাৎ চূড়ান্ত এবং সত্য কথা।

খ. অথবা, اَلْقُرْاٰنُ-এর দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ হবে- কুরআন হক ও বাতিলের মাঝে প্রভেদকারী। যেমন, অন্য স্থানে কুরআনকে বলা হয়েছে فُرْقَانٌ।

এ দু'টি মতের মধ্যে প্রথম মতটিই গ্রহণযোগ্য। কেননা عَوْدُ الضَّمِيْرِ إِلَى الْمَذْكُوْرِ أَوْلٰى অর্থাৎ উল্লিখিত বস্তুর দিকে যমীর ফিরানো অধিক উত্তম। -[কাবীর, কুরতুবী]

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য : আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হওয়া এবং জমিন দীর্ণ হয়ে নিজের বুকের উপর উদ্ভিদ উৎপাদন কোনো ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার নয়, এটা যেমন একটি বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য, অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদ যা কিছু ঘোষণা করে, যেসব আগাম খবর দেয়, মানুষের পুনঃ জীবিত হয়ে আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়ার যে মহাবাণী শুনায় তাও কোনো হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। এটা এক অকাট্য ও অমোঘ বাণী। এক গুরুত্বপূর্ণ মহাসত্য। এক অবিচল দৃঢ় ঘোষণা। এটা অবশ্যই পূরণ হতে হবে এবং তা হবেই।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনতিবিলম্বে একটি ফিতনা দেখা দিবে। তখন আমি বললাম, এটা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? তিনি উত্তর দিলেন, একমাত্র কিতাবুল্লাহ তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে। যাতে তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের খবর রয়েছে এবং তোমাদের জন্য আহকাম বর্ণিত হয়েছে। এটা সত্য অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী, হাসি-তামাশার বিষয় নয়। যে ব্যক্তি একে বর্জন করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এটা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা যদি কেউ হেদায়েত চায় আল্লাহ তাকে গোমরাহ করে দিবেন। এটা আল্লাহর মজবুত রশি, সরল সঠিক পুণ্য পন্থা। -[রূহুল মা'আনী]

কেন এবং কিভাবে তারা ষড়যন্ত্র করেছে? : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং ইসলামি আদর্শ তথা একত্ববাদ যেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য মক্কার কাফির ও মুশরিকরা নিম্নোক্ত কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেছিল।

১. নবী করীম ﷺ-কে তারা জাদুকর ও আল-কুরআনকে জাদু-মন্ত্র বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল।

২. নবী করীম ﷺ-কে কবি এবং আল-কুরআনকে একটি নিছক কব্যগ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করেছিল।

৩. আবার কখনো কখনো তারা বলত মুহাম্মদ ﷺ-কে জিনে পেয়েছে। আল কুরআন জিনে পাওয়া এক ব্যক্তির প্রলাপ মাত্র

৪. পরকালের সত্যতার ব্যাপারে তারা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করত, যা প্রকৃত প্রস্তাবে নবী করীম ﷺ ও কুরআনে মাজীদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টির নামান্তর ছিল।

৫. পরিশেষে তারা নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। যাতে তাঁর প্রচারিত এ দীন, দুনিয়া হতে চিরতরে নির্মূল হয়ে যায়।

ষড়যন্ত্রের কারণ : নবী করীম ﷺ ও আল-কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের অনুরূপ প্রাণান্তকর অপপ্রচার ও অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল আল-কুরআনের আদর্শ ও নবী করীম ﷺ-এর নেতৃত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রূপে দুনিয়া হতে মুছে যাবে এবং তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন হয়ে পড়বে। আর এটা তাদের জন্য অসহনীয়। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা যত বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করুক না কেন এবং যত ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হোক না কেন তাতে আপনার পেরেশান হওয়ার কোনোই কারণ নেই। আমিই তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিব

وَاَكِيْدُ كَيْدًا সম্পর্কে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর রাসূল ﷺ ও কুরআনে মাজীদের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আর আমিও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি। এখানে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার ষড়যন্ত্র করার তাৎপর্য কি? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

১. কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করবেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ষড়যন্ত্র নয়। তবে শাব্দিক মিল রক্ষার্থে একে ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অপরাপর আয়াতসমূহেও অনুরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন- جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ، يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَاللّٰهُ خَادِعُهُمْ ও نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ইত্যাদি।

২. অথবা, এখানে اَكِيْدُ كَيْدًا -এর দ্বারা তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি প্রদান করবেন।

৩. অথবা, এর মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমত অপকর্ম করে যাওয়ার জন্য সুযোগ প্রদান করেন। অতঃপর তারা যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হবে তখন তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিবেন। এটা প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্র না হলেও বাহ্যত ও আকৃতিগতভাবে ষড়যন্ত্রের ন্যায় হওয়ার কারণে একে ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে।

অথবা, এখানে বাহ্যত كَيْد [ষড়যন্ত্র]-এর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে করা হলে ও প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ﷺ ও সাহাবীদের দিকেই নিসবত করা উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা যেন বলতে চেয়েছেন যে, তারা তো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে আমিও তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, আমার রাসূল ﷺ ও মু'মিনগণের মাধ্যমে।

সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী 'আল-কুরআন : 'কুরআন সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী কালাম।' আল্লাহ তা'আলার এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে- মানুষ যুগ যুগান্তর ধরে শয়তানের প্রবঞ্চনায় এবং নফসের গোলামী করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেসব মনগড়া নীতি-আদর্শ সৃষ্টি করেছে, কুরআন তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে দেয় যে, এটা বাতিল, আল্লাহর রচিত বিধান নয়। আল্লাহর বিধানের পরিপন্থি নীতি-আদর্শ ও চিন্তাধারাই হচ্ছে বাতিল ও মানুষের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়। আর এর প্রতিকূলে কুরআন যে নীতি-আদর্শ ও মতবাদ পেশ করেছে, এটাই হক, এটাই সত্য, এটাই মানুষের জন্য গ্রহণীয় ব্যক্তি জীবনে কোন কোন কাজ অবৈধ, সমাজ জীবনে কোন কোন রীতি-নীতি মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা কল্যাণকর, অর্থনীতিতে কোন্ কোন্ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর বা কল্যাণকর, এর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্গুলে নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছে-দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের জীবনে বৃহত্তর অঙ্গনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, কোন কোন মতাদর্শ ও নীতিমালা ক্ষতিকর বা কল্যাণকর। কোন আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং এসব ক্ষেত্রে কোন কোন নীতি ও আদর্শকে বর্জনীয়-আল-কুরআনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে এ বিষয়সমূহই একজন বিচক্ষণ সাহসী লোকের দৃষ্টির সামনে উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে এ মূল তত্ত্বকেই তুলে ধরেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ الخ : কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করার বা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা কৌশলগতভাবে তাদেরকে সামান্য কিছু দিনের অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। এরপরই তাদের শাস্তি হবে, যা রয়েছে অবধারিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এ আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ কাফেরদেরকে পাকড়াও করা হবে। এ সতর্কবাণীরই বাস্তবায়ন হয়েছে দ্বিতীয় হিজরির মাহে রমজানে অনুষ্ঠিত বদরের যুদ্ধে। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْأَعْلٰى : সূরা আল-আ'লা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত اَلْأَعْلٰى শব্দটি সূরার নামকরণে নির্বাচন করা হয়েছে। আল-আ'লা অর্থ– সুমহান, সুউচ্চ। অর্থাৎ এ গুণটি দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। এ সূরাটির অপর নাম হলো 'সূরাতুস-সাব্বাহা'। এতে ১৯টি আয়াত, ৭২টি বাক্য এবং ২৮৪ টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : এতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এর ৬ নং আয়াতে রাসূল ﷺ-কে বলা হয়েছে। আমি তোমাকে পড়িয়ে দিবো; অতঃপর তুমি আর ভুলে যাবে না। এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি একেবারে প্রাথমিক কালের ও সে সময়ে অবতীর্ণ যখন নবী করীম ﷺ ওহী গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। ওহী নাজিল হওয়ার সময়ে তাঁর মনে আশঙ্কা জাগত যে, তিনি এর শব্দ ও ভাষা ভুলে যেতে পারেন। এ আয়াতের সাথে সূরা ত্বাহার ১১৪ নং আয়াত এবং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ১৬-১৯ নং আয়াত মিলালে দেখা যায় এদের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। সর্বপ্রথম এ সূরার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে এই বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, স্মরণ রাখতে পারার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। অতঃপর দীর্ঘদিন পর যখন সূরা ক্বিয়ামাহ নাজিল হয়। তখন নবী করীম ﷺ অস্থিরভাবে ওহীর শব্দ সমূহ বারবার পড়ে আয়ত্ত ও মুখস্থ করতে লাগলেন, তখন তাকে বলা হলো 'হে নবী'! এ ওহীকে তাড়াহুড়ি মুখস্থ করার জন্য নিজের মুখ দ্রুত চালু করবেন না। এটা মুখস্থ করে দেওয়া ও পড়ে দেওয়া তো আমার কাজ-আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন এটা পাঠ করা হয় তখন আপনি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। তা ছাড়া এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব।

শেষবারে সূরা ত্বাহা নাজিল হওয়ার সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী করীম ﷺ-এর আশঙ্কা জাগল যে, এ ১১৩টি আয়াত-যা একই সঙ্গে ক্রমাগত নাজিল হলো। এটা হতে কোনো একটি অংশও যেন আমার স্মৃতি বহির্ভূত হয়ে না যায়। এ জন্য তিনি তা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ উপলক্ষে নবী করীম ﷺ-কে বলা হলো : 'কুরআন পড়ায় খুব তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না এ ওহী আপনার নিকট পুরা মাত্রায় পৌছে যায়। অতঃপর আর কোনো সময় ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই এবং আর কোনো কথা বলার কখনও প্রয়োজন হয়নি। কুরআন মাজীদের অন্য কোথাও এ ব্যাপারে আর কোনো উল্লেখ নেই।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– তাওহীদ। এর সাথে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দান, পাপিষ্ঠ ও বেঈমান লোকদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমানদার ও পবিত্র লোকদের পরকালীন সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ১ – ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নামে তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানিয়ে মূলত তাওহীদের কথা বলেছেন। কেননা, মহান আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তাঁর সম্পর্কে কল্পিত রূপ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তা, গুণ, ক্ষমতা ও একত্ববাদ কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ন হয় এবং দোষত্রুটি প্রকাশ পায় এমন নাম বর্জন করে তাঁর সুমহান নামসমূহের দ্বারা তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি কৌশলের কথা বলেছেন–সে মহান আল্লাহর গুণগান কর, যিনি সৃষ্টিলোককে সঠিক ও সুচারুভাবে সৃষ্টি করেছেন। এদের জন্য তাকদীর নির্ধারণ করে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আইন ও বিধান দিয়ে পথের দিশা দিয়েছেন। তিনিই জীবকুলের জন্য চারণভূমিতে সবুজের মহাসমারোহ সৃষ্টি করেন আবার একে আবর্জনায় পরিণত করেন। তাঁর নির্দেশেই ঘটে বসন্তের আগমন ও শীতের সমাগম। তিনিই মহান ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬ – ৮ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ -কে ওহী স্মরণ থাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- আপনি ওহী হৃদয়ঙ্গম করুণ এবং মন হতে এটা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা ভাববেন না। আপনার স্মৃতিপটে একে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আপনি যে উচ্চৈঃস্বরে ও নিঃশব্দে কুরআন পাঠ করেন এ সম্পর্কে আমি অবগত। আপনার জন্য এটা স্মরণ রাখাকে আমি খুব সহজতর করে দিবো। আপনার কোনোই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে ৯ – ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনি মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের কথা প্রচার করতে থাকুন এবং তাদেরকে নসিহত করার ধারা অব্যাহত রাখুন। আপনার দাওয়াত ও নসিহত তারাই গ্রহণ করবে যারা অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু যারা হতভাগ্য ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা আপনার দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করবে না এবং ঈমানও আনবে না। তারা মহাঅগ্নিকুণ্ড জাহান্নামেই প্রবেশ করবে। তাতে তারা জ্যান্ত মরা অবস্থায় অবস্থান করবে।

চতুর্থ পর্যায়ে ১৪– ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্র-আমলে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং জিকির ও নামাজ আদায় করবে পরকালে তারাই হবে সফলকাম। তারাই সফল জীবন লাভ করে মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করবে; কিন্তু অনেক লোকই পরকালীন সে মহাসুখ-শান্তি ও স্থায়ী আনন্দের কথা চিন্তা-ভাবনা করে না। পার্থিব জগতের ক্ষণকালীন আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় নিমগ্ন থেকে একেই তারা পরকালের উপর প্রাধান্য দেয় অথচ পরকালের আনন্দ ও সুখ-শান্তিই সর্বোত্তম, অনন্ত ও চিরন্তন।

সব শেষে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কথা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে মানুষের কাছে এটা পৌছিয়ে আসছি, এমনকি হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত গ্রন্থাবলিতেও এসব আলোচনা বিদ্যমান। আমি নতুন কিছুই বলিনি। অতএব তোমরা পার্থিব জীবনের ধাঁধায় পতিত হয়ে অনন্ত সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-আ'লা মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعَ عَشْرَةَ اٰيَةً : ১৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اَىْ نَزِّهْ رَبَّكَ عَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهٖ وَلَفْظُ اِسْمٍ زَائِدٌ الْاَعْلَى صِفَةٌ لِرَبِّكَ.

১. তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের মহিমা ঘোষণা কর অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের জন্য যা শোভনীয় নয়, তা হতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর। আর اِسْمٍ শব্দটি এখানে অতিরিক্ত যিনি সুমহান এটা رَبِّكَ-এর صِفَتٌ

٢. اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى مَخْلُوْقَهٗ جَعَلَهٗ مُتَنَاسِبَ الْاَجْزَاءِ غَيْرَ مُتَفَاوِتٍ.

২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সুবিন্যাস্ত করেন তাঁর সৃষ্টিকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেন, অসামঞ্জস্য রাখেন না।

٣. وَالَّذِىْ قَدَّرَ مَا شَاءَ فَهَدٰى اِلٰى مَا قَدَّرَهٗ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.

৩ আর পরিমিত বিকাশ সাধন করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন এবং পথ নির্দেশ করেন তৎকর্তৃক নির্ধারিত ভালো ও মন্দের প্রতি।

٤. وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى اَنْبَتَ الْعُشْبَ.

৪. আর যিনি তৃণলতা উৎপন্ন করেন ঘাস উৎপন্ন করেন।

٥. فَجَعَلَهٗ بَعْدَ الْخُضْرَةِ غُثَاءً جَافًّا هَشِيْمًا اَحْوٰى اِسْوَدَّ يَابِسًا.

৫. অতঃপর একে পরিণত করেন সবুজ-শ্যামল হওয়ার পর শুষ্ক খড়কুটা শুকনো ঘাস কৃষ্ণবর্ণ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে এমন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِىْ خَلَقَ-এর মহল্লে ই'রাব : اَلَّذِىْ خَلَقَ আয়াতাংশ মাজরুর অবস্থায় আছে। কেননা এটা পিছনের رَبِّ-এর সিফাত হয়েছে। আবার কারো মতে নতুন বাক্য হিসাবে মারফূ' অবস্থায় আছে। তখন এ বাক্যটি একটি প্রশ্নের জবাব হবে। প্রশ্নটি হলো যে রবের তাসবীহ বর্ণনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে রব কে? তখন জবাব দেওয়া হলো যে, اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

غُثَاءً-এর মহল্লে ই'রাব : غُثَاءً শব্দটির দু'টি অবস্থা হতে পারে। একটি হলো-তা جَعَلَ ক্রিয়ার দ্বিতীয় মাফঊল। অপরটি হলো এটা حَالٌ হয়েছে। উভয় অবস্থাতেই غثاء শব্দটি মানসূব অবস্থায় রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে প্রতিদান ও প্রতিফলের বর্ণনা ছিল। বর্তমান সূরায় (সূরাতুল আ'লা-আ'লা অর্থ সর্বোচ্চ) সর্বোচ্চ সফলতাকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সাথে সাথে সফলতা অর্জনের জন্য কিছু কাজের কথাও

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বলা হয়েছে। যেমন তাসবীহ, আল্লাহর পরিচয়, তাঁর সত্তা ও গুণাবলি, তাযকিয়া, যিক্‌র ও নামাজ। এ ছাড়া পরকালের উদ্দেশ্যে সাথে সাথে দুনিয়া যে ধ্বংস হয়ে যাবে তার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। -[কামালাইন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى : বক্ষ্যমাণ আয়াতটির শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে- 'তোমরা মহান স্রষ্টা আল্লাহর নামে পবিত্রতা বর্ণনা কর।' এটা হতে কয়েকটি কথা বুঝা যায় এবং সেসব কয়টিই এখানে প্রযোজ্য।

এক. আল্লাহ তা'আলাকে এমন সব নামে স্মরণ করো যা তাঁর জন্য উপযুক্ত ও শোভনীয়। মহান স্রষ্টার জন্য এমন নাম গ্রহণ করা মোটেই উচিত নয়, যা অর্থ ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। কিংবা যেসব নামে বেয়াদবি, ত্রুটি বা শিরকের কোনো ভাব রয়েছে। কাজেই আল্লাহর জন্য কেবল সেসব নাম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় যা তিনি স্বয়ং কুরআন মাজীদে ব্যবহার করেছেন, অথবা অন্য ভাষায় যা এর সঠিক অনুবাদ হবে।

দুই. আল্লাহর জন্য সৃষ্টিকুলের নাম অথবা সৃষ্টিকুলের জন্য আল্লাহর নাম ব্যবহার করা যেতে পারে না। সেসব গুণবাচক নাম একমাত্র আল্লাহর জন্য নয় মানুষের জন্যও ব্যবহার বৈধ হয়। যেমন- রাউফ, কারীম, রাহীম, সামী', বাসীর প্রভৃতি, এ ক্ষেত্রে এসব নাম মানুষের জন্য সে দৃষ্টিতে ব্যবহার করা যাবে না, যে দৃষ্টিতে তা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তিন. আল্লাহর নাম মর্যাদা ও সম্মানের সাথে উচ্চারণ করা উচিত। এমন স্থানে এটা উচ্চারণ করা উচিত নয় যেখানে তা অসম্মানিত হবে। যেমন মলমূত্র ত্যাগ কালে, গুনাহের কাজে, হাসি-ঠাট্টা বশত ইত্যাদি অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট কেউ কিছু চাইলে এবং তিনি তা দিতে না পারলে সর্ব সাধারণের ন্যায় "আল্লাহ দিবেন" এই বলে ফকিরকে বিদায় করতেন না। বরং অপারগতা প্রকাশ করে তাকে বিদায় করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, ফকিরকে খালি হাতে বিদায় করলে অবশ্যই সে বিরক্ত হয়। আর এমতাবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অনুচিত।

হযরত উবাই ইবনে আমের জুহানী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ আলোচ্য আয়াত سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى এর ভিত্তিতে নামাজের সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়ার হুকুম দিয়েছেন এবং সূরা ওয়াকে'আহ-এর শেষ আয়াত فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ-এর ভিত্তিতে নামাজের রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

اِسْم শব্দটি অতিরিক্ত বলার কারণ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى আয়াতে اِسْم শব্দকে কোনো কোনো মুফাসসির অতিরিক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা এখানে রবের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। নাম তো কয়েকটি হরফ (অক্ষর) দ্বারা তৈরি হরফ দিয়ে তৈরি একটি শব্দের পবিত্রতা বর্ণনা করার মধ্যে কোনো উপকারিতা নিহিত নেই। যদি শুধু হরফ দিয়ে তৈরি ইসমের পবিত্রতা উদ্দেশ্য হতো তাহলে رَبّ শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো না, তখন سَبِّحِ اسْمَهٗ বললেই চলত। -[কাবীর]

আয়াতে اِسْم শব্দটি উল্লেখ করার কারণ :

১. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে اِسْم শব্দটি এখানে تَعْظِيْم-এর উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। মূলে শব্দটি অতিরিক্ত।

২. হযরত ইবনে জারীর (র.) বলেন, শব্দটি অতিরিক্ত নয়; বরং উক্ত শব্দটি এখানে উদ্দেশ্য। তাঁর মতে অর্থ হলো- نَزِّهِ اسْمَ رَبِّكَ اَنْ يُسَمّٰى بِهٖ اَحَدٌ سِوَاهُ আল্লাহর নামে কেউ যেন নাম না রাখে সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেমন কাফেরগণ মূর্তিকে اَللَّاتُ বলত। মুসায়লামাকে رَحْمَانُ الْيَمَامَةِ বলা হতো।

৩. অথবা, এ কথার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য اِسْم উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নামের এমন ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা ফরজ যে ব্যাখ্যার কোনো প্রমাণ মিলে না। যেমন- يَدُ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যায় এ কথা বলা যে, আল্লাহর হাত-ই নেই।

৪. অথবা, আল্লাহর اِسْم-এর সম্মান সর্বাবস্থায় করতে হবে তা বুঝানোর জন্য اِسْم ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি নামাজের নাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন- اَللّٰهُ اَكْبَرُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইত্যাদি। এমতাবস্থায় سَبِّحْ অর্থ صَلِّ হবে।

৫. হযরত আবূ মুসলিম (র.) বলেন, اِسْم শব্দ দ্বারা এখানে صِفَةٌ উদ্দেশ্য। তখন অর্থ হবে-তোমার রবের সকল গুণবাচক বিশেষ্যের দ্বারা তাসবীহ কর, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا -[কাবীর]

اَلْاَعْلٰى-এর অর্থ : اَعْلٰى অর্থ- আল্লাহ তা'আলা সুউচ্চ, মহান, বাবে نَصَرَ-এর ইসমে তাফযীলের শব্দ। মূলবর্ণ (ع.ل.و) আল্লাহ মহান বা সু-উচ্চ। এর অর্থ হলো- বর্ণনাকারীদের সকল বর্ণনার উর্ধ্বে তিনি। আমাদের ধারণার অনেক উর্ধ্বে হলো তাঁর গৌরব-মর্যাদা, আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার উর্ধ্বে হলো তাঁর নিয়ামতের অবদান। আমাদের ইবাদত ও কার্যাবলির অনেক উর্ধ্বে হলো তাঁর পাওনা।

অথবা, তিনি সকল প্রকার ত্রুটি হতে اَعْلٰى বা উর্ধ্বে। -[কাবীর]

ভারসাম্য রক্ষা করার তাৎপর্য : উল্লিখিত ২নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মূলত স্বীয় মহান ক্ষমতা ও কৌশলের নিপুণতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বলা হয়েছে- সে মহান প্রভুর গুণগান কর, যিনি বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভারসাম্য রক্ষা করে সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। এখানে سَوّٰى-এর অর্থ হলো সঠিক ও নির্ভুলভাবে করা। অর্থাৎ সৃষ্টিলোকের কোথাও কোনো ভারসাম্যহীনতা অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্যতা রাখা হয়নি। যে বস্তুটির আকৃতি-প্রকৃতি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যেরূপ হওয়া উচিত তিনি তা সেরূপ করেছেন। মহাশূন্যে সৃষ্টবস্তু যেটা যেভাবে, যে নিয়মে ও যে আকৃতিতে হওয়া উচিত ছিল, ঠিক তদ্রূপই তা সৃষ্টি করেছেন। জীব-জগত ও উদ্ভিদ জগতের প্রতিটি বস্তুর যে আকৃতি-প্রকৃতি তথা কোমলতা বা কাঠিন্য ইত্যাদি সবকিছু প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তা করা হয়েছে। যে মাছিটির যেরূপ হওয়া উচিত, যে অহিংস্র প্রাণীটির যে আকৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়, যে হিংস্র প্রাণীটির যেরূপ হওয়া প্রয়োজন, তাকে সেরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনিভাবে মানুষকেও এর প্রয়োজন, উপযোগিতা ও যথার্থতার দিকে লক্ষ্য রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার চক্ষু, নাসিকা ও মুখ কাছাকাছি ও সম্মুখে থাকা উচিত ছিল বলে তা করা হয়েছে। হস্তযুগল যেভাবে লম্বা ও প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল তাই করা হয়েছে। তাকে একটি হস্ত দুইটি পা দেওয়া হয়নি। তার নাসিকাটিকে মাথার পশ্চাতে স্থাপন করা হয়নি। কর্ণরূপী শ্রবণ যন্ত্রটিকে পশ্চাত দিকে লাগানো হয়নি। নারীর বক্ষ যুগলকে পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করা হয়নি। মোটকথা সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকটি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আল্লাহ তা'আলা সুচারু ও সুন্দর পন্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। এটাই হচ্ছে اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ক্ষুদ্র আয়াতাংশের তাৎপর্য।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى قَدَّرَ فَهَدٰى : আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিসকে কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; বরং যে জিনিসই যে উদ্দেশ্যে এবং যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে কাজ সম্পাদন এবং সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সঠিক পন্থা ও পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র স্রষ্টাই নন, তিনি সে সঙ্গে বিধানদাতা ও পথপ্রদর্শকও বটে। যে জিনিস যে হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন, তার উপযোগী কর্মপদ্ধতি বলে দেওয়া এবং তার জন্য শোভনীয় পন্থায় তাকে পথ প্রদর্শন করার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। এ কারণে পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য এক ধরনের বিধান ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা অনুসরণকারীর এগুলো নিত্যচলমান ও নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা নিয়োজিত। পানি, বাতাস, আলো, প্রস্তর ও খনিসমূহের জন্য ভিন্ন এক ধরনের বিধান ও হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, তদনুযায়ী এগুলো ঠিক সে সে কাজ সম্পাদন করেছে যে উদ্দেশ্যে এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। উদ্ভিদ জগতের জন্য এক স্বতন্ত্র ধরনের বিধান দেওয়া হয়েছে। সে বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তা মাটির নিচে শিকড় গাড়ছে, এর বুকের উপর অঙ্কুরিত হচ্ছে, কাণ্ড বের করছে ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে। শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব, ফল ও ফুল উৎপাদন করছে এবং এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যই যে কাজ পূর্ব হতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তাই সুসম্পন্ন করছে। স্থলভাগ, জলভাগ ও বায়ু স্তরের জীব-জন্তুর অসংখ্য প্রকার এবং এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ধরনের দিক-নির্দেশনা দান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তুকে এমন এক অনুভূতি কেন্দ্রিক স্বভাব জাত জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা মানুষ নিজের পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা তো দূরের কথা, আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির দ্বারাও লাভ করতে পারে না- এ কথা আল্লাহকে অবিশ্বাসী ব্যক্তিও মেনে নিতে বাধ্য।

মানুষের ব্যাপারটি আরও বিস্ময়কর তাকে দু ধরনের স্বতন্ত্র ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের হেদায়েত দান করা হয়েছে। এটা মানুষের দু'টি স্বতন্ত্র ধরনের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানুষের একটি দিক পাশবিক এবং তার এ পাশবিক জীবনের জন্য তাকে এক ধরনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এরাই বলে প্রতিটি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই মায়ের স্তন চুষে দুধ সেবন করতে শুরু করে। মানুষের চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, হৃদপিণ্ড, মন-মগজ, ফুসফুস, গুর্দা, কলিজা, পাকস্থলি, অন্ত্র, স্নায়ু, রগ ও ধমনী সবকিছুই নির্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী নিজের কাজ করতে থাকে। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজে মানুষের চেতনা-অনুভূতি বা ইচ্ছার কোনো প্রভাবই

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

নেই। মানুষের দেহে মনে বাল্যকাল, পূর্ণবয়স্কতা, যৌবন, মধ্যবয়স ও বার্ধক্যকালীন সব পরিবর্তন এ স্বাভাবিক পন্থা অনুযায়ীই সাধিত হয়ে থাকে। এটা ইচ্ছা, চেতনা বা অনুভূতির উপর বিন্দুমাত্র নির্ভরশীল নয়। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনামূলক জীবনের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের এক দিকনির্দেশ।

আরো এক জীবন-বিধান দেওয়া হয়েছে। এটা অচেতন জীবনের জন্য প্রদত্ত স্বভাবজাত বিধান হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রকৃতির বিধান। কেননা, মানুষের জীবনের এ বিভাগে মানুষকে এক প্রকারের স্বাধীনতা ইচ্ছা প্রয়োগের স্বাধীন অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ বিভাগের জীবনের জন্য অবচেতন ও স্বাধীনতাহীন জীবন বিভাগের জন্য প্রদত্ত হেদায়েত কিছুতেই শোভন, যথেষ্ট ও উপযোগী হতে পারে না। মানুষ এ দ্বিতীয় প্রকারের হেদায়েতকে অস্বীকার ও অমান্য করার জন্য যত টাল বাহানা ও যুক্তি প্রদর্শন করুক না কেন, এর যৌক্তিকতা, অপরিহার্যতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত যে মহান স্রষ্টা বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের গঠন প্রকৃতি স্বরূপ ও জন্মগত মর্যাদা অনুপাতে পথ প্রদর্শনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা করেছেন, সে আল্লাহ মানুষকে নিজ ইচ্ছামতো ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগসুবিধা তো দিয়েছেন, কিন্তু তার এ অধিকার ব্যবহারের সঠিক পন্থা কোনটি, ভুল কোনটি তা বলে দেওয়ার কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, তা মেনে নেওয়া কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত হতে পারে না। যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতকে মেনে চলবে তারাই হবে সফলকাম।

اَلْمَرْعٰى-এর অর্থ : اَلْمَرْعٰى শব্দটি رَعْىٌ হতে ইসমে যরফের শব্দ হতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে চারণ ক্ষেত্র, চতুষ্পদ জন্তুর চারণ ভূমি।

অথবা, مِيْم অক্ষরটি مَصْدَرْ-এর জন্য হয়ে শব্দটি مَصْدَرْ-এর অর্থবোধকও হতে পারে। অর্থাৎ বিচরণ করা। কিন্তু পূর্বাপর কথা হতে মনে হয়, এখানে কেবল পশুচারণই এর অর্থ নয়; বরং মাটির উপর যত উদ্ভিদই উদ্গত হয় তা সবই এখানে বুঝাচ্ছে। কাজেই বলা হয়েছে– وَالْمَرْعٰى مَا تُخْرِجُهُ الْاَرْضُ مِنَ النَّبَاتِ وَمِنَ الثِّمَارِ وَالزُّرُوْعِ وَالْحَشِيْشِ অর্থাৎ উদ্ভিত ফল-ফলাদি, শস্যদানা ও ঘাস-পাতা ইত্যাদি যা জমিন উৎপাদন করে, তাকে مَرْعٰى বলে।

غُثَاءً-এর অর্থ : আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) غُثَاءً-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, جَافًّا هَشِيْمًا অর্থাৎ শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ ঘাস। কারো কারো মতে غُثَاءً হলো সে সকল শুষ্ক উদ্ভিদ যা নদীর পাশে আবর্জনার মতো পড়ে থাকে, পানির উপর ভাসে এবং বাতাসে উড়ে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতের বস্তুর সমষ্টিকে غُثَاءً বলা হয়। যারা বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে এসে একসাথ হয়ে থাকে, তাকে غُثَاء বা اَخْلَاطْ বলে।

কেউ কেউ غُثَّاء শব্দটিকে তাশদীদ যোগে পড়েছেন। এমতাবস্থায় এটা একবচন হবে এবং এর বহুবচন হলো اَغْثَاءُ।

اَحْوٰى-এর অর্থ : মুহাক্কিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, اَحْوٰى শব্দটি حَوَّةٌ হতে নির্গত হয়েছে। আর حَوَّةٌ বলে কালো বর্ণকে। কেউ কেউ বলেছেন, যার মধ্যে কালো রঙের আধিক্য রয়েছে তাকে حَوَّةٌ বলে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাদামী রঙকে বলে। এখানে এতদুভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। কেননা উদ্ভিদ শুকিয়ে গেলে কালো ও বাদামী দুই রঙই ধারণ করে থাকে। কেউ কেউ غُثَاء-এর অর্থ গাড় সবুজ রং বলে উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথমোক্ত অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. سَنُقْرِئُكَ الْقُرْاٰنَ فَلَا تَنْسٰى مَا تَقْرَؤُهُ .

৬. নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাবো কুরআন ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না পঠিত বস্তুকে।

٧. اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ط اَنْ تَنْسَاهُ بِنَسْخِ تِلَاوَتِهٖ وَحُكْمِهٖ وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ مَعَ قِرَاءَةِ جِبْرِيْلَ خَوْفَ النِّسْيَانِ فَكَاَنَّهٗ قِيْلَ لَهٗ لَا تَعْجَلْ بِهَا اَنَّكَ لَا تَنْسٰى فَلَا تُتْعِبْ نَفْسَكَ بِالْجَهْرِ بِهَا اِنَّهٗ تَعَالٰى يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَا يَخْفٰى مِنْهُمَا .

৭. আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত যার তেলাওয়াত ও হুকুম নাস্‌খ করার মাধ্যমে আল্লাহ ভুলাতে চাইবেন, তুমি তাই কেবল ভুলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর পাঠ করার সাথে সাথে জোরে জোরে পাঠ করতেন। সুতরাং তাঁকে অভয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটা আত্মস্থ করার জন্য এতখানি বিচলিত হইও না। নিশ্চয় তুমি এটা ভুলে যাবে না। কাজেই জোরে জোরে পাঠ করে কষ্ট স্বীকার করো না। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তা'আলা জানেন যা প্রকাশ্য কথাবার্তা ও কাজকর্ম এবং যা অপ্রকাশ্য এতদুভয়ে মধ্য হতে।

٨. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى لِلشَّرِيْعَةِ السَّهْلَةِ وَهِيَ الْاِسْلَامُ .

৮. আর আমি তোমার জন্য সুগম করে দিবো পথ সহজ জীবনাদর্শ, ইসলাম।

٩. فَذَكِّرْ عِظْ بِالْقُرْاٰنِ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى مَنْ تَذْكُرُهُ الْمَذْكُوْرُ فِيْ .

৯. উপদেশ দান কর কুরআনের মাধ্যমে নসিহত কর যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয় তার যাকে তুমি উপদেশ দান করবে। এর বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে উক্ত হয়েছে।

١٠. سَيَذَّكَّرُ بِهَا مَنْ يَّخْشٰى يَخَافُ اللّٰهَ تَعَالٰى كَاٰيَةِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ .

১০. সে-ই উপদেশ গ্রহণ করবে এ দ্বারা যে শঙ্কা পোষণ করে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। অন্য আয়াত فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ উল্লিখিত হয়েছে।

١١. وَيَتَجَنَّبُهَا اَيِ الذِّكْرٰى يَتْرُكُهَا جَانِبًا لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا الْاَشْقٰى بِمَعْنَى الشَّقِيِّ اَيِ الْكَافِرِ .

১১. আর একে অবজ্ঞা করবে অর্থাৎ উপদেশকে– একে একদিকে ফেলে রাখবে তার প্রতি তাকাবে না। যে নিতান্ত হতভাগ্য اَشْقٰى শব্দটি شَقِيٌّ অর্থে, অর্থাৎ কাফেরগণ।

١٢. الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى هِيَ نَارُ الْاٰخِرَةِ وَالصُّغْرٰى نَارُ الدُّنْيَا .

১২. যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করবে তা হলো আখেরাতের আগুন, আর দুনিয়ার আগুন হলো সাধারণ আগুন।

١٣. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا فَيَسْتَرِيْحَ وَلَا يَحْيٰى حَيَاةً هَنِيْئَةً .

১৩. অতঃপর তথায় সে মৃত্যুবরণ করবে না যে, তা দ্বারা নিষ্কৃতি পাবে। এবং জীবিতও থাকবে না শান্তিপূর্ণ জীবিত থাকা।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

فَلَا تَنْسٰى-এর বিশ্লেষণ : لَا تَنْسٰى শব্দটি একবচন, মসদার اَلنِّسْيَانُ বাবে سَمِعَ কারো মতে لَا টি নফীর জন্য। কারো মতে لَا নাহীর জন্য। নাহী হলে لَا تَنْسَ হওয়া দরকার ছিল। শেষে আলিফে মাকসূরা বাক্যের শেষে মিলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কুরআনে কারীমের অন্যত্র فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا তে ব্যবহৃত হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াত নাজিলের কারণ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,- মহানবী ﷺ -এর অবস্থা এই ছিল যে, যখন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আসতেন এবং তা তাঁকে পাঠ করে শুনাতেন। পাঠক্রম শেষ হওয়ার পূর্বেই ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এটা আবৃত্তি করা শুরু করে দিতেন। একে উপলক্ষ্য করেই আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত .... سَنُقْرِئُكَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[লোবাব, খাযেন, ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى سَنُقْرِئُكَ فَلَاتَنْسٰى : হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ কুরআনের শব্দসমূহ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তা বারবার আবৃত্তি করতেন। হযরত মুজাহিদ ও ইমাম কালবী (র.) বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী শুনিয়ে শেষ করতে পারতেন না, এর মধ্যেই নবী করীম ﷺ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় এর প্রথমাংশ আবৃত্তি শুরু করতেন। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে নিশ্চয়তা দিলেন এবং বললেন ওহী নাজিল হওয়ার সময় আপনি চুপচাপ শুনে থাকুন। আমি আপনাকে তা পড়ে দেবো এবং চিরকালের জন্য এটা আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে এর কোনো একটি শব্দও আপনার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে ওহী গ্রহণ করার যে নিয়ম ও পদ্ধতি বুঝিয়ে দেন- সে সম্পর্কে তৃতীয়বারের কথা এখানে বলা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দু'বারের কথা সূরা ত্বাহা-এর ১৪ নং আয়াত এবং সূরা কিয়ামাহ-এর ১৪-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি হতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদ নবী করীম ﷺ -এর উপর যেমন একটি মু'জিযারূপে নাজিল হয়েছিল, ঠিক অনুরূপ মু'জিযা স্বরূপই এর প্রতিটি শব্দ রাসূলে কারীম ﷺ-এর স্মৃতিপটে সুদৃঢ় ও স্থায়ীভাবে মুদ্রিত ও স্থায়ী করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এর কোনো একটি শব্দও তিনিও ভুলে যাবেন না। অথবা এর কোনো একটি শব্দের স্থলে এর সমার্থবোধক অপর কোনো শব্দ তার মুখে বসিয়ে যাবে এরও একবিন্দু আশঙ্কা রইল না।

اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য : এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। একদল তাফসীরকারের মতে এর অর্থ হলো, যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ভুলিয়ে দিতে চাইবেন, যার তেলাওয়াত মানসূখ করা হয়েছে এটা আপনার স্মৃতি হতে চিরতরে মুছে ফেলবেন। আর একদল মুফাসসিরীনের মতে এর অর্থ হলো- আপনি যদি কুরআনের কোনো কিছু ভুলে যান, তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে পুনরায় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন- হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস হতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেউ কেউ এরূপ অভিমতও রেখেছেন যে, উক্ত আয়াতাংশের মর্ম হলো কুরআনে কারীমের প্রতিটি শব্দসহ পূর্ণরূপে স্মরণশক্তিতে সুরক্ষিত থাকা তাঁর নিজের শক্তির কৃতিত্ব নয়। আসলে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর তৌফিকেরই অবদান নতুবা আল্লাহর ইচ্ছা হলে সব কিছু তিনি ভুলিয়ে দিতে পারেন। যেমন সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- 'আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে ওহী দ্বারা যা কিছু দিয়েছি তা সবই নিয়ে যেতে পারি।' কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম হলো- আপনি মানুষ, ফেরেশতা নন এ কথা বুঝাবার জন্য সাময়িকভাবে আল্লাহর ইচ্ছে হলে দু' একটি আয়াত ভুলিয়ে দিতে পারেন। এটা স্মরণ করে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে এ কথার যে, আপনি স্থায়ীভাবে কুরআন কখনো ভুলবেন না।

-[খাযেন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْجَهْرَ-এর অর্থ : اَلْجَهْرَ শব্দের অর্থ مَا ظَهَرَ অর্থাৎ যা প্রকাশিত। আয়াতে اَلْجَهْرَ শব্দের অর্থ নিরূপণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন– কারো মতে هُوَ اِعْلَانُ الصَّدَقَةِ অর্থাৎ সদকা বা দানের ঘোষণা, কারো মতে রাসূল যা কুরআন হতে মুখস্থ করেছেন, কারো মতে হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর নাজিলকৃত ওহীকে তাঁর সাথে উচ্চারণ করে পড়া-ই হলো جَهْر যেন হযরত জিবরাঈল (আ.) চলে গেলে তিনি তা ভুলে না যান। কারো মতে جَهْر বলতে সকল প্রকার প্রকাশ্য কথা, কাজ বা বস্তুকে বুঝায়। –[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

وَمَا يَخْفٰى-এর মর্মার্থ : مَا يَخْفٰى বলতে সকল গোপন কিছুকে বুঝায়। তা কথার মধ্য থেকে অথবা কাজের মধ্য হতে অথবা বস্তুর মধ্য হতেও হতে পারে। অথবা যা কিছু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষ হতে نَسْخ বা রহিত করে দেওয়া হয়েছে অথবা اِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ অর্থাৎ সদকা বা দানের গোপনীয়তা বা গোপন দান। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى : অত্র আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন; হে নবী! আমি দীনের তাবলীগের ব্যাপারে আপনাকে কোনোরূপ অসুবিধায় ফেলিনি। বধিরকে শুনানো ও অন্ধকে পথ দেখানোর দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। আপনাকে এ জন্য একটি সহজতর পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, তা হচ্ছে– আপনি নসিহত করতে থাকুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অনুভব করতে থাকবেন যে, কেউ না কেউ তা হতে উপকৃত হচ্ছে, কল্যাণ লাভ করছে। বস্তুত পক্ষে কে এটা হতে উপকৃত হতে প্রস্তুত, আর কে নয়। তা তো সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে জানতে ও বুঝতে পারা যাবে। কাজেই প্রচারের কাজ অবশ্যই অব্যাহত থাকতে হবে। এতে আপনার লক্ষ্য থাকবে শুধু এতটুকু যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে যারা এ উপদেশ শুনে সত্য ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করবে; আপনি সে লোকদের সন্ধান করবেন। এ লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে আপনার কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি লাভের উপযুক্ত এবং অধিকারী। এ লোকের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিই আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোকদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আপনি জানতে ও বুঝতে পারবেন যে, তারা নসিহত গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, তাদের জন্য আপনার ব্যস্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ কথাটাই সূরা আবাসায় ভিন্ন ভঙ্গিতে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ না করার আচরণ করে, তার দিকে তো তুমি খুব লক্ষ্য দিচ্ছ, অথচ তারা যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে সে জন্য তোমার দায়িত্ব কি? পক্ষান্তরে যে লোক নিজ হতে তোমার দিকে দৌড়ে আসে এবং সে ভয়ও করে, তার প্রতি আপনি অমনোযোগিতা দেখান। কখন-ই নয়! এটা তো এক নসিহত মাত্র যার মন চাইবে সে তা কবুল করবে।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى-এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : মুফাস্‌সিরগণ এর নিম্নোক্ত কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। (ক) আমি আপনাকে সহজ শরিয়তের সুযোগ দান করবো। (খ) আমি আপনাকে ইসলামের সুবিধা দান করবো। (গ) আমি আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিবো। (ঘ) কুরআন সংরক্ষণকে আমি আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছি।

نُيَسِّرُكَ ক্রিয়াকে উত্তম পুরুষ নেওয়ার রহস্য : نُيَسِّرُكَ ক্রিয়াকে উত্তম পুরুষ হিসেবে ব্যবহার করার কারণ বা রহস্য অত্যন্ত স্পষ্ট। উক্ত ক্রিয়ার ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। ঐ ক্রিয়া দ্বারা তাঁর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি দানের ঘোষণা রয়েছে, তা হলো 'সকল কিছু সহজতর করে দেওয়া।' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, 'দাতা যেমন মহান, দানটিও হবে তেমন বড়। এ দান তাঁর পক্ষ হতে আর কারো জন্য হয়নি। শুধু রাসূলের জন্যই হয়েছে। কিভাবে হবে না? তিনি তো ছিলেন অনাথ এক এতিম শিশু, বর্বর সমাজে ছিল তাঁর বসবাস। তারপর আল্লাহ তাঁকে-তাঁর কাজ ও কথায় সারা বিশ্বের নেতা এবং সৃষ্টজীবের পথ প্রদর্শকরূপে সুনির্ধারিত করেছিলেন। সকল কাজে আল্লাহই ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। এ কারণেই বলেছেন نُيَسِّرُكَ অর্থাৎ আমি-ই তোমাকে সহজ করে দিবো। –[কাবীর]

اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى আয়াতে শর্ত লাগানোর কারণ : اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى আয়াত দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে তাঁর দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ করলে বুঝা যায় যে, দায়িত্ব পালন করলে তাঁর লাভ হতেও পারে নাও হতে পারে। অথচ এমন নয় যে, নবী করীম ﷺ-এর উপদেশ তাঁর নিজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। অতএব, আয়াতের মধ্যকার শর্তের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের কয়েকটি মতামত উল্লেখযোগ্য।

ক. এখানে তাম্বীহ বা সতর্ক করা উদ্দেশ্য। যেমন– আমাদের সমাজেও প্রচলিত যে, যদি তুমি পুরুষ হয়ে থাক তবে এ কাজটি করবে। এর অর্থ হচ্ছে– তুমি অবশ্যই এ কাজটি করবে, পরিত্যাগ করবে না। আয়াতের মর্মার্থও এরূপ যে, উপদেশ লাভজনক হলে উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ আপনার উপদেশ অবশ্যই লাভজনক হবে, তাই বর্ণনা করতে থাকুন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. 'বর্বর সমাজকে নবী করীম ﷺ অনেক দাওয়াতই দিয়েছেন।' যত-ই তাঁর দাওয়াত বেশি হতো, হঠকারিতাও তত বেশিরূপ আকার ধারণ করত। এতে তাঁর আফসোস বেড়ে যেত। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমবার সাধারণ দাওয়াত দান আপনার উপর ফরজ ছিল, তা আপনি পালন করেছেন, এখন জোর করে নসিহত শুনানোর প্রয়োজন নেই لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ বারবার দাওয়াত দিতে যদি চান, ঐ দাওয়াতে যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার লাভ হবে, তাহলে দিতে থাকুন। এ অর্থ বুঝানোর জন্য আয়াতে শর্ত ব্যবহার করা হয়েছে। -[কাবীর]

গ. অথবা, إِنْ অর্থ مَا - إِنْ শর্তের জন্য নয়। তখন মূলবাক্য হবে- فَذَكِّرْ مَا نَفَعَتِ الذِّكْرٰى -

ঘ. কারো মতে إِنْ অর্থ إِذَا তখন অর্থ দাঁড়াবে 'যখন উপদেশে লাভ হবে বুঝবেন তখন উপদেশ দিতে থাকুন।'

ঙ. কারো মতে إِنْ অর্থ قَدْ তখন অর্থ হবে "উপদেশ দিতে থাকুন, উপদেশ অবশ্যই লাভজনক হবে।" -[কুরতুবী]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى -এর শানে নুযূল : উক্ত আয়াতটি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা ইবনে উম্মে মাকতুম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারো মতে হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[কাবীর, কুরতুবী]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى -এর মর্মার্থ : আয়াতটির মর্মার্থ হলো- যে ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় ও খারাপ পরিণতির শঙ্কাবোধ হবে, কেবল সে-ই চিন্তা করবে, আমি ভুল পথে যাচ্ছিলাম না তো? যে লোক তাকে হেদায়েত ও গোমরাহীর পার্থক্য বুঝাবে এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্য লাভের পথ দেখাবে, তার নসিহত কেবল এ ব্যক্তিই পূর্ণ মনযোগ সহকারে শুনতে প্রস্তুত হবে।

اَلْاَشْقٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : অত্র আয়াতে اَلْاَشْقٰى দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

১. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন, اَلْاَشْقٰى-এর দ্বারা এখানে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এটাই জমহুর মুফাসসিরগণের অভিমত।

২. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে اَشْقٰى-এর দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে উতবাহ ইবনে রাবীয়াহকে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা, এর نُزُوْل খাস হলেও حُكْمٌ আম। অর্থাৎ সকল কাফিরই এর হুকুমভুক্ত।

মহা অগ্নি দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلنَّارَ الْكُبْرٰى দ্বারা অত্র আয়াতে কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের দ্বিমত রয়েছে। ১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন- هِيَ نَارُ الْاٰخِرَةِ وَالصُّغْرٰى نَارُ الدُّنْيَا অর্থাৎ এটা পরকালের অগ্নি আর দুনিয়ার আগুন তার তুলনায় অতি সাধারণ। এটাই জমহুরের মাযহাব। ২. কেউ কেউ বলেছেন, জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের আগুনকে বলে اَلنَّارَ الْكُبْرٰى মহা অগ্নি বা অতি কঠিন অগ্নি।

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى -এর অর্থ : আয়াতটির অর্থ কত গিয়ে মুফাসসিরগণ বলেন, অর্থাৎ সেখানে তার মৃত্যু হবে না। ফলে আজাব হতেও নিষ্কৃতি পাবে না। ঠিক তেমনি বাঁচবার মতো বাঁচবেও না। জীবনের কোনো স্বাদ-ই সে পাবে না। যেসব লোক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নসিহত আদৌ কবুল করবে না, মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত কুফর, শিরক বা নাস্তিকতার উপর অবিচল হয়ে থাকবে, পূর্বোক্ত আজাব কেবল সে লোকদেরই দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক অন্তরে ঈমানদার হবে; কিন্তু নিজেদের খারাপ আমলের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা যখন তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ সম্পন্ন করে নিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর তাদের পক্ষে শাফায়াত কবুল করা এবং তাদের দগ্ধীভূত লাশ জান্নাতের খালের কিনারে এনে ফেলা হবে। জান্নাতী লোকদেরকে এর উপর পানি নিক্ষেপ করতে বলা হবে। এ পানির স্পর্শ পেয়ে তারা ঠিক তেমনিভাবে জীবন্ত হয়ে উঠবে, যেমন মরা গাছপালা পানির স্পর্শ পেয়ে নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠে। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٤. قَدْ أَفْلَحَ فَازَ مَنْ تَزَكّٰى تَطَهَّرَ بِالْإِيْمَانِ.

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে কৃতকার্য হবে যে পরিশুদ্ধ হয়েছে ঈমান আনয়নের মাধ্যমে পবিত্র হয়েছে।

١٥. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ مُكَبِّرًا فَصَلّٰى الصَّلَوٰتِ الْخَمْسَ وَ ذٰلِكَ مِنْ أُمُوْرِ الْأٰخِرَةِ وَكُفَّارُ مَكَّةَ مُعْرِضُوْنَ عَنْهَا.

১৫. আর তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে তাকবীর পাঠ করার মাধ্যমে এবং সালাত আদায় করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। এগুলো আখেরাতের বিষয়াবলি। অথচ কাফেরগণ এগুলো হতে বিমুখ থাকে।

١٦. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَوْقَانِيَّةِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأٰخِرَةِ.

১৬. কিন্তু তোমরা অগ্রাধিকার দান কর শব্দটি تَ ও يَ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। পার্থিব জীবনকে আখেরাতের উপর।

١٧. وَالْأٰخِرَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْجَنَّةِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى.

১৭. অথচ আখেরাতই যা বেহেশত সম্বলিত উত্তম ও স্থায়ী।

١٨. إِنَّ هٰذَا أَيْ فَلَاحُ مَنْ تَزَكّٰى وَكَوْنُ الْأٰخِرَةِ خَيْرًا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى الْمُنَزَّلَةِ قَبْلَ الْقُرْاٰنِ.

১৮. নিশ্চয় এ বিষয় অর্থাৎ পরিশুদ্ধ ব্যক্তির সাফল্য ও আখেরাত উত্তম হওয়া পূর্ববর্তী গ্রন্থে উল্লেখিত আছে কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থে।

١٩. صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَهِيَ عَشْرُ صُحُفٍ لِإِبْرَاهِيْمَ وَالتَّوْرَاةُ لِمُوْسٰى.

১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে আর তা হলো ইবরাহীম (আ.) -এর দশটি সহীফা ও মূসা (আ.) -এর তাওরাত গ্রন্থ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : যারা চিন্তা-গবেষণা করে না, আল্লাহর নির্দশন ও প্রমাণাদির মধ্যে যারা নিজেদের জ্ঞান খরচ করে না, তারা وَعِيْد বা ধমকের যোগ্য বলে পিছনে আলোচিত হয়েছে। এখন যারা অংশীবাদিতার পঙ্কিলতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত এবং পবিত্র রাখতে বদ্ধপরিকর তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে। -[কাবীর]

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى-এর মধ্যস্থিত পবিত্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করেছে সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। এখানে পবিত্রতা অর্জন দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ হতে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈমান আনয়নের মাধ্যমে শিরক ও কুফর হতে পবিত্রতা অর্জন করা। এটাই জমহুরের মাযহাব। খ. কেউ কউ বলেছেন, এর দ্বারা পাপকার্য পরিহার করে নেক কাজের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। গ. কারো কারো মতে, এর দ্বারা সদকা প্রদানের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আছে, "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ" হে নবী! আপনি তাদের সম্পদ হতে সদকা (যাকাত) আদায় করুন যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন। ঘ. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা বিশেষত সদকায়ে ফিতরের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে।

মোটকথা, ঈমান আনয়ন ও সৎকাজ সম্পাদনের মাধ্যমে কুফর, শিরক ও পাপাচার বর্জন করত যাবতীয় পবিত্রতা অর্জনের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى এর ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের অভিমত : ঈমান আনয়নের পর সে আল্লাহর স্মরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং নিয়মিত নামাজ পড়েও সে প্রমাণ করেছে যে, যে আল্লাহকে সে নিজের মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছে, তাঁর নাম সে মুখে ও অন্তরে স্মরণ করে কার্যত তাঁর আনুগত্য ও আদেশ পালন করতেও সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর সব সময় তাকে স্মরণ রাখার জন্য ও স্মরণ থাকার জন্য সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। আলোচ্য আয়াতে পর পর দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা এবং তারপর নামাজ পড়ার কথা।

মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্নভাবে আয়াতটির ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন :

ক. রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- বান্দা পুনরুত্থান দিবস ও আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা স্মরণ করে আল্লাহরই জন্য নামাজ আদায় করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), ইকরামাহ, আবুল আলিয়াহ ও ইবনে সিরীন (র.) প্রমুখগণের মতে, এর অর্থ হলো এর দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ঈদের জামাতে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করে অতঃপর আল্লাহর নাম স্মরণ করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়।

গ. কারো মতে, এখানে খাঁটি মু'মিনগণের নামাজের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, খাঁটি মু'মিন আল্লাহ কেন স্মরণ করে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্যই নামাজ আদায় করে থাকে। পক্ষান্তরে যে মুনাফিক সে শুধুমাত্র মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করে।

ঘ. হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, এর মর্মার্থ হলো, সে নিজের মাল হতে সদকা করে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ে।

ঙ. কারো কারো মতে এর অর্থ হলো, সে ঈদগাহে যাওয়ার সময় তাকবীর পাঠ করে এবং ঈদগাহে জামাতে নামাজ পড়ে।

চ. আল্লামা জালাল উদ্দিন মহল্লী (র.) বলেছেন, সে আল্লাহর নামে তাকবীর দিয়ে তথা আল্লাহু আকবার বলে নামাজে শরিক হয়।

ছ. আল্লাহর নাম স্মরণ অর্থ হলো, অন্তরে আল্লাহর নাম স্মরণ করা এবং মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা। এ উভয় পন্থায় আল্লাহর নাম স্মরণ করাকেই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর জিকির বলে। -[কবীর]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইয়াকূব কারখী (র.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন-

১. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى দ্বারা তওবা এবং আত্মসংশোধনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ দ্বারা মৌখিক, আন্তরিক, রূহানী, বাতেনী জিকির অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত রয়েছে।

৩. আর فَصَلّٰى দ্বারা দরবারে এলাহীতে দুর্লভ উপস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা নামাজ হলো মু'মিনের মি'রাজ। আর নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার নয়ন-মনের তৃপ্তি হলো নামাজ। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا : ইরশাদ হচ্ছে যে, তোমরা বৈষয়িক সুখ-শান্তি, আনন্দ-ফূর্তি, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-সম্ভোগের চিন্তায়ই মশগুল হয়ে থাকছ এবং এরই জন্য তোমরা তোমাদের সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও তৎপরতা নিযুক্ত রেখেছ। এখানে যা কিছু লাভ হয়। তোমরা মনে কর, এটাই হলো আসল পাওনা এবং এখানে যে জিনিস হতে তোমরা বঞ্চিত থেকে যাও, তোমরা মনে কর তাই হলো আসল ক্ষতি।

দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে : এক. আখেরাতকে মোটেই বিশ্বাস না করা, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা। এরা হলো কাফের। তারা পরকালকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দুনিয়ার শান্তি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

দুই. এর অপর অর্থ হলো আখিরাতকে বিশ্বাস করা, কিন্তু এটাও পারলৌকিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ইহকালীন স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। এরা হলো ফাসিক মু'মিন।

দুনিয়া থেকে পরকাল উত্তম হওয়ার কারণ : পরকাল বা আখেরাত কয়েকটি কারণে উত্তম-

ক. আখেরাতে মানুষের দৈহিক এবং মানসিক প্রশান্তি ও সফলতা মিলবে, দুনিয়াতে তা অনুপস্থিত।

খ. দুনিয়ার আনন্দ ও স্বাদ কষ্টসাধ্য, দুঃখ-ঘেরা; কিন্তু আখেরাতের আনন্দ তার বিপরীত।

গ. দুনিয়া ধ্বংস হবে, আখেরাত ধ্বংস হবে না। -[কাবীর]

إِنَّ هٰذَا-এর মুশারুন ইলাইহ : هٰذَا দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়। কারো মতে পূর্ণ সূরাটির প্রতি ইশারা করা হয়েছে। কেননা সূরাটিতে تَوْحِيْد (একত্ববাদ), نُبُوَّة (নবুয়ত), وَعِيْد [ধমক] ও কাফেরদের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পুরস্কারের وَعْد বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

কারো মতে هٰذَا দ্বারা قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى-এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ অনর্থক কাজ ও পঙ্কিলতা থেকে নফসকে মুক্ত রাখার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। -[কাবীর]

اَلصُّحُفِ-এর দু'টি কেরাত : অধিকাংশ কারীগণ حَا. এর উপর পেশ দিয়ে পড়েছেন; কিন্তু আ'মাশ, হারূন, আবূ আমর حَا. কে সাকিন করে পড়েছেন।

إِبْرَاهِيْمَ-এর দুটি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ رَا.-এর পরে اَلِفْ এবং هَا.-এর পরে يَا. যুক্ত করে পড়েন।

আবূ রাজা উক্ত اَلِفْ এবং يَا.-কে উহ্য করে إِبْرٰهِم পড়েছেন। তবে هَا.-কে فَتْح দিয়ে পড়েছেন।

আবূ মূসা এবং ইবনে যুবাইর দু' আলিফ দিয়ে إِبْرَاهَام পড়েছেন। -[ফাতহুল কাদীর]

গ্রন্থরাজির সংখ্যা : হযরত আবূ যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ -কে প্রশ্ন করেছেন যে, আল্লাহ কতটি গ্রন্থ নাজিল করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, একশত চারটি। তন্মধ্যে দশটি হযরত আদম (আ.) -এর নিকট, হযরত শীস (আ.)-এর নিকট পঞ্চাশটি, হযরত ইদরীস (আ.)-এর নিকট ত্রিশটি, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নিকট দশটি, আর তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন -[কাবীর, রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ : সূরা আল-গাশিয়াহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةُ শব্দকে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২৬টি আয়াত, ২৯০টি বাক্য এবং ৩৮১টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রমাণ করে যে, এটাও মক্কার প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এটা নাজিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম ﷺ দীন প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আর মক্কার লোকেরা শুনে শুনে উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করেছিল। এর প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব প্রবল হচ্ছিল।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূলকথা : সূরাটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো– তাওহীদ ও পরকাল। সর্বপ্রথম মানুষকে শঙ্কত করার উদ্দেশ্য সহসা তাদের সম্মুখে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি খবর রাখ সে সময়ের যখন সমগ্র জগত আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদ এসে পড়বে? পরে এর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তখন সমস্ত মানুষ দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্নতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। একটি দল জাহান্নামে যাবে। তাদেরকে নানাবিধ আজাব ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে অপর দল লোক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে নানা রকম নিয়ামত দেওয়া হবে। চিরদিন তারা তথায় থাকবে।

কথার মোড় পাল্টিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কুরআনের তাওহীদ শিক্ষা ও পরকাল সংক্রান্ত সংবাদ শুনে যারা নাক ছিটকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে তারা কি তাদের সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলি লক্ষ্য করে দেখে না? তারা কি একটু ভেবে দেখে না যে, কে মরুভূমির উপযোগী করে উষ্ট্রীকে সৃষ্টি করেছেন? উর্ধ্বলোকে এ আকাশ কিভাবে চতুর্দিক আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টন করে আছে? সম্মুখে ঐ পাহাড় কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? নিম্নের ধরণীতল কি করে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে? এ সব কোনো মহাশক্তিমান, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর ও সুবিজ্ঞ সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সম্ভবপর হয়েছে কি? এক সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসীম ক্ষমতা বলে এ সব তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে অপর কেউই তাঁর শরিক নেই। এটা হতে প্রমাণিত হয় তিনি পুনরুত্থানে সক্ষম। অতঃপর কাফেরদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এ লোকেরা এহেন যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত কথা যদি না-ই মানে, তো না মানুক। আপনাকে এদের উপর জবরদস্তিকারী, বানিয়ে পাঠানো হয়নি। কাজেই জোর করে তাদের দ্বারা কোনো কথা স্বীকার করানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনার কাজ হলো শুধু উপদেশ দিয়ে যাওয়া। কাজেই আপনি তাই করতে থাকুন। শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমি তাদের নিকট হতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গ্রহণ করবো এবং কাফের ও পাপিষ্ঠদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করবেন না; বরং আপনি নিশ্চিত মনে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান।

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-গাশিয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ

سِتٌّ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২৬ আয়াতবিশিষ্ট

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. هَلْ قَدْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهَا تَغْشَى الْخَلَائِقَ بِأَهْوَالِهَا

১. তোমার নিকট এসেছে কিয়ামতের সংবাদ এখানে هَلْ অব্যয়টি قَدْ অর্থে ব্যবহৃত। الْغَاشِيَة দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য, যেহেতু তা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে তার ভয়াবহতা দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নিবে।

٢. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَبَّرَ بِهَا عَنِ الذَّوَاتِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ خَاشِعَةٌ ذَلِيْلَةٌ.

২. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উভয় ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল বলতে এর অধিকারী উদ্দেশ্য। স্বভয়ে অবনত হবে অপদস্থ ও অপমানিত।

٣. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ذَاتَ نَصَبٍ وَتَعَبٍ بِالسَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ.

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে ভারি হাতকড়া ও পায়ে শিকল বহন করে ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে।

٤. تَصْلٰى بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِهَا نَارًا حَامِيَةً.

৪. সে প্রবেশ করবে শব্দটি تَا-এর মধ্যে যবর ও পেশ যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। উত্তপ্ত আগুনে

٥. تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ شَدِيْدَةِ الْحَرَارَةِ.

৫. তাদেরকে অতিশয় গরম প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে ভীষণ গরম।

٦. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الشَّوْكِ لَا تَرْعَاهُ دَابَّةٌ لِخُبْثِهِ.

৬. তাদের জন্য যারী' নামক কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত কোনো খাদ্য থাকবে না এটা এক প্রকার কণ্টকময় গুল্ম, এর বিষাক্ততার কারণে চতুষ্পদ জন্তুও তা ভক্ষণ করে না

٧. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ.

৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধা হতেও তুষ্ট করবে না।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ حَامِيَةً : حَامِيَةً শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর ইস্‌মে ফায়েলের স্ত্রীবাচক শব্দ। মূলবর্ণ (ح . م . ى) অর্থ- شِدَّةُ الْحَرِّ তথা প্রখর গরম। আয়াতে জাহান্নামের অগ্নির প্রচণ্ড তাপ এবং মারাত্মক প্রখরতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا يُسْمِنُ الخ-এর শানে নুযূল : যখন কাফেরগণ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ আয়াতটি শুনতে পেল তখন ঠাট্টা করে বলাবলি করছিল যে, তাদের উষ্টসমূহ উক্ত বৃক্ষকে খেয়ে মোটাতাজা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন যে, এটা এমন এক প্রকার খাদ্য যা দেহবর্ধকও নয় আবার ক্ষুধা নিবারকও নয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর বর্তমান সূরায় পরকালের জন্য তৈরি না হলে শাস্তির কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার উপর প্রামাণ্য দলিল এবং এর অস্বীকারকারীদের পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ যে দুঃখ পেয়েছেন তার উপর সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ : এখানে কিয়ামতের সংবাদের কথা বলা হয়েছে। এটা এমন কঠিন বিপদ যা সমগ্র জগৎকে আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টিত করে ফেলবে। মনে রাখতে হবে যে, এখানে সামগ্রিকভাবে সমগ্র পরকালের কথাই বলা হয়েছে। বর্তমান জগৎ ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় হতে সমস্ত মানুষের হাশরের ময়দানে পুনরুত্থান লাভ করা ও আল্লাহর আদালত হতে শাস্তি বা পুরস্কার পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত পর্যায় ও স্তরই এর অন্তর্ভুক্ত।

কারো মতে, اَلْغَاشِيَةُ দ্বারা এখানে জাহান্নামীদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারা জাহান্নামকে ঢেকে ফেলবে।

আবার কতিপয় মুফাস্‌সির-এর মতে اَلْغَاشِيَةُ দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু এটা জাহান্নামীদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে, সেহেতু একে اَلْغَاشِيَةُ বলা হয়েছে।

কিয়ামতকে غَاشِيَة বলা হয়েছে কেন? : اَلْغَاشِيَةُ এর অর্থ হলো– আচ্ছাদনকারী। কিয়ামতকে কেন আচ্ছাদনকারী (আল-গাশিয়াহ) বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, যেহেতু কিয়ামত তার বিভীষিকা দ্বারা মাখলুককে পরিবেষ্টন করে ফেলবে, সেহেতু একে আল-গাশিয়া বলা হয়েছে।

খ. কারো কারো মতে, এর ভয়াবহতা সকলকেই আঘাত করবে কাউকেই রেহাই দিবে না। এ জন্য একে আল-গাশিয়াহ বলা হয়েছে।

গ. কারো কারো মতে, এটা আকস্মিকভাবে এসে পড়বে বলে একে আল-গাশিয়াহ বলা হয়েছে। [আল্লাহই ভালো জানেন।]

هَلْ اَتٰىكَ আয়াতে প্রশ্নবোধকের অর্থ : ইমাম কুতরুব বলেন, هَلْ প্রশ্নবোধক দ্বারা قَدْ বুঝানো হয়েছে। তখন هَلْ اَتٰىكَ অর্থ হবে– নিশ্চয় আপনার কাছে কিয়ামতের বার্তা পৌঁছেছে। যেমন هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ-এর মধ্যকার هَلْ অর্থ قَدْ -

কারো মতে, اِسْتِفْهَامْ টি নফীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তখন অর্থ হবে هٰذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِلْمِكَ وَلَا مِنْ عِلْمِ قَوْمِكَ অর্থাৎ এটা তো আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়ের লোকের জানার মধ্য হতে নয়। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– لَمْ يَكُنْ اَتَاهُ قَبْلَ ذٰلِكَ عَلٰى هٰذَا التَّفْصِيْلِ الْمَذْكُوْرِ هٰهُنَا অর্থাৎ মূলত ইতঃপূর্বে এমন বিশদ বিবরণ সম্বলিত কিয়ামতের আলোচনা তাঁর নিকট নাজিল হয়নি। –[কুরতুবী]

কারো মতে, ইতঃপূর্বে তাঁকে জানানো হয়েছে। জানা বস্তুর উপর প্রশ্ন করার নিয়ম আমাদের সমাজেও প্রচলিত আছে। যেমন, কোনো ছাত্রকে কিছু শিখিয়ে পরে প্রশ্ন করা যে, এ ব্যাপারে কি তুমি কিছু জেনেছ বা শিখেছ? রাসূলের ব্যাপারেও একইরূপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিয়ামত ও এর ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা দিয়েছেন। যে ধারণা ইতিপূর্বে তাঁর ছিল না, না লোকদের ছিল। আকল দিয়ে কিয়ামতের অবস্থা জানা মোটেও সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহ যখন তাঁকে জানিয়েছেন তখন প্রশ্ন করতে দোষ কোথায়? –[কাবীর]

وُجُوْهٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : وُجُوْهٌ দ্বারা শুধু চেহারা উদ্দেশ্য নয়; বরং اَصْحَابُ الْوُجُوْهِ তথা চেহারার মালিকগণ উদ্দেশ্য। কেননা মানব দেহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশমান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো তার মুখমণ্ডল। এর দ্বারাই ব্যক্তির পরিচিতি লাভ সম্ভব। মানুষের উপর ভালো কিংবা মন্দ যে অবস্থাই আসুক না কেন, তার মুখমণ্ডলেই এর প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। এর দ্বারাই তার প্রকাশ সম্ভব। এ কারণে 'কতিপয় ব্যক্তি' না বলে 'কতক চেহারা' বা মুখমণ্ডল বলা হয়েছে। –[কুরতুবী]

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ-এর তাৎপর্য : عَامِلَةٌ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের ইসমে ফায়েল, অর্থ– কর্মী। نَاصِبَةٌ ও স্ত্রীলিঙ্গের ইসমে ফায়েল অর্থ– কঠোর প্রচেষ্টাকারী। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো– কঠোর পরিশ্রমী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– এ আয়াতে সেসব লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা দুনিয়াতে ইসলামের পরিপন্থি পন্থায় কঠিন ও পরিশ্রমশীল ইবাদত-বন্দেগি করে। অর্থাৎ দেব-দেবী ও প্রতিমার ইবাদত-বন্দেগিতে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। এরা হলো কাফের ও আহলে কিতাব, যারা গীর্জা ও মন্দিরে পূজা-আর্চনায় ক্লেশ ও পরিশ্রম অবলম্বন করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দুঃখ-কষ্ট জনিত ভ্রান্ত প্রচেষ্টা কবুল করবেন না; বরং কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবেন। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেন عَامِلَةٌ দ্বারা দুনিয়ার জীবনে পাপকাজ করা এবং نَاصِبَةٌ দ্বারা আখেরাতে জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বুঝানো হয়েছে। কতিপয় তাফসীরকার এরূপ ব্যাখ্যাও করেন যে, কাফেরগণকে জাহান্নামের দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজে লিপ্ত হতে হবে। কেননা পার্থিব জীবনে তারা আল্লাহর জন্য আমল করেনি। সুতরাং জাহান্নামেই তাদের দ্বারা দুঃখ-কষ্টের কাজ করানো হবে। –[খাযেন]

ইমাম সুদ্দী এবং ইকরামা (র.) বলেছেন, তারা দুনিয়াতে পাপাচারের বোঝা বহন করছে, আর পরকালে দোজখের শাস্তি বহন করবে। –[নূরুল কোরআন]

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ-এ বর্ণিত দু'টি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ উভয় শব্দকে رَفْع দিয়ে পড়েছেন। এ হিসাবে যে, উভয় শব্দ পূর্ববর্তী مُبْتَدَأ-এর خَبَر হয়েছে অথবা উভয় শব্দ একটি উহ্য مُبْتَدَأ-এর খবর।

ইবনে মুহাইসেন, ঈসা এবং ইবনে কাছীরের একটি বর্ণনায় উভয় শব্দ مَنْصُوْب হবে। এ হিসাবে যে, حَالْ অথবা ذَمٌّ হয়েছে।
–[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

تَصْلٰى-এর কয়েকটি কেরাত : অধিকাংশ ক্বারীগণ تَصْلٰى-এর . تَ-কে فَتْح দিয়ে مَعْرُوْف হিসেবে পড়েছেন।
আবূ আমর, ইয়াকূব এবং আবূ বকর . تُ-কে ضَمَّة দিয়ে مَجْهُوْل পড়েছেন।
আবূ রাজা . تُ-কে ضَمَّة এবং صَادْ-কে فَتْح ও لَامْ-কে তাশদীদ দিয়ে পড়েছেন।
সকল কেরাতেই هِىَ সর্বনামটি وُجُوْه-এর দিকে ফিরবে। -[ফাতহুল কাদীর]

اٰنِيَةٍ-এর অর্থ : اٰنِيَةٍ ঐ বস্তুকে বলা হয় যার গরম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর বেশি আর গরম হতে পারে না। اِنَّىٰ হতে গৃহীত। . اَنَّا অর্থ تَأخِيْر হাদীসে আছে কোনো এক ব্যক্তি জুমার নামাজে বিলম্ব করে এসেছে; কিন্তু মানুষের ভিড় ঠেলে সামনে চলে এসেছে তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন اٰنَيْتَ اٰذَيْتَ অর্থাৎ বিলম্ব করে আসলে আর অন্যকে কষ্ট দিলে। মুফাসসিরগণ বলেন- ঐ গরম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যদি এক ফোঁটা সে গরম হতে দুনিয়ার পাহাড়সমূহে পতিত হতো তাহলে পাহাড় গলে যেত। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]
ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী (র.)-এর কথা, উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতের اٰنِيَةٍ শব্দটির অর্থ হলো- তাপমাত্রার চরম পর্যায়, যারপর আর কোনো তাপ থাকে না। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ : অত্র আয়াত হতে বোধগম্য হয় যে, জাহান্নামীদেরকে শুধু দারী' নামক খাদ্য দেওয়া হবে। কিন্তু অন্য এক আয়াতে আছে যে, তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেওয়া হবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, জাহান্নামীদেরকে গিসলীন ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য দেওয়া হবে না। উক্ত আয়াতগুলোতে বাহ্যত বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা ক. জাহান্নামের অনেক শ্রেণি ও স্তর হবে। বিভিন্ন ধরনের পাপী ও অপরাধীকে তাদের পাপ ও অপরাধ অনুপাতে এক একটি শ্রেণিতে রাখা হবে এবং বিভিন্ন ধরনের আজাব ও খাদ্য তাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। খ. অথবা, প্রথমত তাদেরকে যাক্কুম খেতে দেওয়া হবে। এটা খেতে অস্বীকার করলে গিসলীন দেওয়া হবে তা খেতে না চাইলে তারা কাঁটাযুক্ত ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

ضَرِيْعٍ-এর অর্থে মুফাসসিরগণের মতামত : মুফাসসিরগণ ضَرِيْعٍ-এর বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন-
ক. জমহুর মুফাসসিরগণ বলেছেন, ضَرِيْعٍ হলো এক প্রকার কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ যা জাহান্নামীদের আহার্য হবে।
খ. নাহুবিদ ইমাম খলীল বলেছেন, ضَرِيْعٍ ঐ চামড়াকে বলে যা হাড়ের উপর এবং গোশতের নিচে হয়।
গ. হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে, ضَرِيْعٍ হলো খসখসে তিক্ত বস্তু।
ঘ. হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এটা এমন একটি বস্তু যা সদৃশ, খুব তিক্ত এবং মারাত্মক দুর্গন্ধযুক্ত।
ঙ. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, এটা এক ধরনের কাঁটাযুক্ত ঘাস যা এত বিস্বাদ যে চতুষ্পদ জন্তুও তা খায় না।
চ. ইবনে আবী যায়েদ বলেছেন, দুনিয়াতে যে কাঁটা বিশিষ্ট শুষ্ক ঝাড়ে পাতা থাকে না তাকে ضَرِيْعٍ বলে, আর পরকালে ضَرِيْعٍ হবে অগ্নি দ্বারা তৈরি। -[নূরুল কোরআন]

অগ্নিতে [জাহান্নামে] কিভাবে ঘাস জন্মিবে? : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামীদের জন্য দারী' নামক উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে দেওয়া হবে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাহান্নামে তো আগুন আর আগুন হবে তথায় উদ্ভিদ গজাবে কিভাবে? মুফাসসিরগণ এর উত্তরে বলেছেন-
ক. এটা আল্লাহর কুদরত আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আগুনের মধ্যেও ঘাসের উৎপাদন করতে পারেন। এটা তার জন্য মোটেই অসম্ভব নয়।
খ. অথবা এর উৎপাদন হবে জাহান্নামের বাইরে, আর বাইর হতে জাহান্নামীদের খাদ্য হিসাবে একে সরবরাহ করা হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ : আল্লাহ তা'আলা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নামীদেরকে খাদ্য হিসেবে ضَرِيْعٍ দেওয়া হবে আর এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ খাদ্যও তাদের আরামের জন্য দেওয়া হবে না; বরং এটা তাদেরকে হৃষ্টপুষ্ট করা এবং তাদের ক্ষুধা নিবারণ করা তো দূরের কথা উল্টো তাদের জন্য আজাব হয়ে দাঁড়াবে।
পূর্বোক্ত আয়াত لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ নাজিল হওয়ার পর মক্কার কাফেররা বলাবলি করতে লাগল যে, তাদের উট উক্ত বৃক্ষ খেয়ে মোটাতাজা হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন যে, এটা এমন খাদ্য যা পুষ্টিকরও নয় এবং ক্ষুধাও নিবৃত্তি করে না। কাজেই তোমাদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই; বরং এর ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তোমরা নিজেদের আজাবকে কেবল বৃদ্ধি করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

	অনুবাদ :
٨. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ حَسَنَةٌ .	৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন আনন্দোজ্জ্বল হবে প্রস্ফুটিত ও উৎফুল্ল।
٩. لِّسَعْيِهَا فِى الدُّنْيَا بِالطَّاعَةِ رَاضِيَةٌ فِى الْاٰخِرَةِ لَمَّا رَاَتْ ثَوَابَهُ .	৯. তার কর্ম সাফল্যে পার্থিব জীবনের আনুগত্যের কারণে পরিতৃপ্ত হবে আখেরাতে এর ছওয়াব প্রত্যক্ষ করে।
١٠. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ حِسًّا وَّمَعْنًى .	১০. সুমহান জান্নাতে যা অনুভূতি ও অর্থগত দিক হতে সুমহান হবে।
١١. لَّا يَسْمَعُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيْهَا لَاغِيَةً اَىْ نَفْسٌ ذَاتُ لَغْوٍ اَىْ هِذْيَانٍ مِنَ الْكَلَامِ .	১১. তারা শ্রবণ করবে না শব্দটি تَا ও يَا যোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। তথায় কোনো অসার বাক্য অহেতুক বস্তু অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা।
١٢. فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ بِالْمَاءِ بِمَعْنٰى عُيُوْنٍ .	১২. সেথায় থাকবে বহমান প্রস্রবণ যাতে পানি প্রবহমান থাকবে, عَيْنٌ দ্বারা عُيُوْنٌ বহু সংখ্যক প্রস্রবণ উদ্দেশ্য।
١٣. فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ذَاتًا وَّقَدْرًا وَّمَحَلًّا .	১৩. তথায় থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা যা স্বীয় সত্তা, মর্যাদা ও অবস্থানগত দিক হতে সুউচ্চ হবে।
١٤. وَّاَكْوَابٌ اَقْدَاحٌ لَا عُرٰى لَهَا مَّوْضُوْعَةٌ عَلٰى حَافَاتِ الْعُيُوْنِ مُعَدَّةٌ لِشُرْبِهِمْ .	১৪. আর পান পাত্রসমূহ এমন পেয়ালা যাতে ধরার হাতল নেই। প্রস্তুত অবস্থায় প্রস্রবণ তীরে পান করার জন্য প্রস্তুত অবস্থায়।
١٥. وَّنَمَارِقُ وَسَائِدُ مَصْفُوْفَةٌ بَعْضُهَا بِجَنْبِ بَعْضٍ يُسْتَنَدُ اِلَيْهَا .	১৫. আর উপাধানসমূহ বালিশ। সারিবদ্ধভাবে সাজানো গদিতে হেলান দেওয়ার জন্য সারি সারি সাজানো।
١٦. وَّزَرَابِىُّ بُسُطٌ طَنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ مَبْثُوْثَةٌ مَبْسُوْطَةٌ .	১৬. আর গালিচাসমূহ রুইযুক্ত রেশমী গালিচা। বিছানো অবস্থায় পাতানো অবস্থায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ব আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখন মু'মিনদের অবস্থা এবং পুরস্কার ঘোষণা করছেন। সর্ব প্রথমে মু'মিনদের গুণ তারপর মু'মিনদের আবাসস্থলের গুণ বর্ণনা করেছেন। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ لِّسَعْيِهَا الخ : মু'মিনগণের চেহারা কিয়ামতের দিন হাস্যোজ্জ্বল হবে। দুনিয়ার জীবনে তারা যে চেষ্টা-সাধনা করেছে পরকালে তার উত্তম প্রতিফল পেয়ে তারা সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হবে। দুনিয়ার জীবনে ঈমান, কল্যাণ নীতি ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করে তারা নাফস এবং তার কামনা-বাসনার যে কুরবানি দিয়েছে, কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট-যাতনা ভোগ করেছে, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে যে দুর্ভোগ পোহায়েছে, পাপ ও নাফরমানি হতে বাঁচবার চেষ্টায় যেসব ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং যেসব স্বার্থ ও সুযোগ, স্বাদ ও সম্ভোগ হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছে, তা সবই যে প্রকৃতপক্ষে বড় লাভজনক কারবার ছিল, পরকালের জীবনে তা দেখতে পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হবে। তাদের মন পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবে। তাদের সুখ শান্তির অন্ত থাকবে না। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে "تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ" অর্থাৎ জান্নাতীদের চেহারায় নিয়ামতের ঔজ্জ্বল্য পরিস্ফুট হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

عَالِيَةٍ-এর মর্মার্থ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন عَالِيَةٍ حِسًّا وَمَعْنًى অর্থাৎ জান্নাত দেখতে ও [আকারে] সুউচ্চ হবে এবং এটা মানেও উচ্চ (তথা অত্যন্ত দামী) হবে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ জান্নাত আসমান ও জমিনের মতো প্রশস্ত হবে। অপরদিকে মর্যাদা ও প্রতিফলের দিক দিয়ে এটা সুমহান হবে।

لَاغِيَةً দ্বারা এখানে কি উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে لَاغِيَةً দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

ক. ইমাম ফাররা ও আখফাশ (র.)-এর মতে لَغْو দ্বারা অনর্থক কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতীগণ অনর্থক কোনো কথা শুনবে না।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, لَغْو দ্বারা এখানে মিথ্যা অপবাদ, কুফরি ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

গ. কারো কারো মতে, لَغْو দ্বারা মিথ্যা শপথকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, لَغْو দ্বারা এখানে شَتْم [গালি] উদ্দেশ্য।

প্রকৃতপক্ষে لَغْو দ্বারা উপরোক্ত সবকিছুই উদ্দেশ্য হতে পারে। জান্নাতীগণ সর্ব প্রকার অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা ও শ্রবণ করা হতে মুক্ত থাকবেন। -[কবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ : জান্নাতীগণের জন্য জান্নাতে উচ্চ শয্যা [বা আসন] হবে। এখানে উচ্চাসন বা উচ্চ শয্যা বলতে কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, উক্ত আসনগুলো আকারে ও মর্যাদায় উচ্চ হবে এবং এদের উচ্চ স্থানে রাখা হবে। অর্থাৎ উচ্চ স্থানে স্থাপিত সে আসন ও শয্যাসমূহ দেখতে (আকারে) যেমন বড় হবে তেমনটি দামেও হবে অত্যন্ত মূল্যবান।

খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, শয্যাগুলোর তক্তা স্বর্ণের হবে, এতে যবরজদ ও মুক্তা ছড়ানো হবে এবং ঊর্ধ্বে [আকাশে] উত্তোলিত হবে।

গ. হযরত খারেজা ইবনে মুসআব (রা.) বলেছেন, উক্ত শয্যাগুলোকে একটির উপর অন্যটি রেখে অনেক উঁচু করা হবে। জান্নাতী এসে যখন এতে উপবেশন করবে তখন তাকে নিয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় যেখানে সেখানে নিয়ে যাবে।

ঘ. কারো কারো মতে শয্যাকে শূন্যে স্থাপন করা হবে। যাতে জান্নাতীগণ শূন্যে থেকে সমস্ত নিয়ামত স্বচক্ষে দেখতে পারে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ : اَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো- গ্লাস যার হাতল নেই। مَوْضُوْعَةٌ এটা ইসমে মাফউল وَاحِدْ مُؤَنَّثْ-এর শব্দ। বাবে ضَرَبَ অর্থাৎ রাখা। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন "مَوْضُوْعَاتٌ عَلٰى حَافَاتِ الْعُيُوْنِ مُعَدَّةٌ لِشُرْبِهِمْ" অর্থাৎ ঝরনার ধারে জান্নাতীদের পান করার জন্য এদেরকে প্রস্তুত রাখা হবে।

খ. অথবা, এগুলো তাদের সম্মুখে সৌন্দর্যের জন্য রাখা হবে। কেননা তা স্বর্ণ, রৌপ্য ও মনি-মুক্তার তৈরিকৃত হবে।

গ. অথবা, সে পানপাত্রগুলো ঝরনার পাশে রাখা হবে। যখনই তারা পানি পান করতে চাইবে তখনই ভরা অবস্থায় পাবে।

نَمَارِقُ-এর অর্থ : نَمَارِقُ শব্দটি نُمْرُقَةٌ [নূনের উপর পেশ]-এর বহুবচন, কারও মতে نُمْرُقٌ-এর বহুবচন। ইমাম ফাররা নূনের নিচে যের দিয়েও এক রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন-অর্থ বালিশ। কেউ কেউ 'ছোট বালিশও' অর্থ করেছেন।

مَصْفُوْفَةٌ-এর অর্থ : مَصْفُوْفَةٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ হতে ইসমে মাফউলের স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ। মূল হলো صَفٌّ বা সারি مَصْفُوْفَةٌ অর্থ- সারিবদ্ধকৃত। অর্থাৎ উক্ত বালিশগুলো একটির পাশে অন্যটি সারিবদ্ধকৃত। যেখানেই জান্নাতবাসী বসতে চায় সেখানেই একটিতে বসবে আর অন্যগুলোতে হেলান দিবে।

زَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ-এর অর্থ : زَرَابِيُّ শব্দটি زَرْبِيٌّ অথবা زُرْبِيَّةٌ [زَا-এর নিচে যের অথবা উপরে পেশ]-এর বহুবচন অর্থ- গিরদা, গালিচা- যার উপরে পাতলা কাপড় রয়েছে। زَرَابِيُّ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়েও ইমামদের মতামতসমূহ নিম্নরূপ-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এটা হলো- কারুকার্য বিশিষ্ট বিছানা।

২. আল্লামা যামাখশারী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো- উত্তম বিছানা।

৩. ইমাম রাগেব (র.) বলেন, এটা হলো সাধারণ কাপড়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

১৭. أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ نَظَرَ اِعْتِبَارٍ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ .

১৭. তারা কি দৃষ্টিপাত করে না, অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরগণ, উপদেশ গ্রহণ উদ্দেশ্যে দেখা উষ্ট্রের প্রতি, কিরূপে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

১৮. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ .

১৮. আর আকাশের দিকে, কিরূপে তাকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?

১৯. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ .

১৯. আর পর্বতমালার প্রতি, কিরূপে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?

২০. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَيْ بُسِطَتْ فَيَسْتَدِلُّوْنَ بِهَا عَلَى قُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَصُدِّرَتْ بِالْإِبِلِ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مُلَابَسَةً لَهَا مِنْ غَيْرِهَا وَقَوْلُهُ سُطِحَتْ ظَاهِرٌ فِيْ أَنَّ الْأَرْضَ سَطْحٌ وَعَلَيْهِ عُلَمَاءُ الشَّرْعِ لَا كُرَةٌ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْهَيْئَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الشَّرْعِ .

২০. আর ভূতলের দিকে কিরূপে তাকে সমতল করা হয়েছে? সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সারকথা, এ সকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর কুদরত ও একত্বের প্রতি ঈমান আনাই বাঞ্ছনীয় ছিল। সর্বপ্রথম উষ্ট্রের উল্লেখ এ জন্য করা হয়েছে, যেহেতু এটা তাদের সাথে অন্যগুলোর তুলনায় অধিক সম্পৃক্ত। سُطِحَتْ শব্দ দ্বারা বাহ্যত এটাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সমতল। শরিয়তের আলিমগণের মতও এটাই, ভূতত্ত্ববিদদের মতানুরূপ গোলাকার নয়। যদিও তাদের সে দৃষ্টিভঙ্গি শরিয়তের কোনো আহকামের জন্য বিপত্তিকর নয়।

২১. فَذَكِّرْ قف هُمْ نِعَمَ اللّٰهِ وَدَلَائِلَ تَوْحِيْدِهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ .

২১. অতএব তুমি উপদেশ দান কর তাদেরকে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও একত্বের প্রমাণাদি স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তুমি তো উপদেশদাতা মাত্র।

২২. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِالصَّادِ بَدَلَ السِّيْنِ أَيْ بِمُسَلَّطٍ وَهٰذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ .

২২. তুমি তাদের উপর নিযুক্ত কর্ম নিয়ন্ত্রক নও অপর এক কেরাতে শব্দটি سِيْن-এর স্থলে صَادْ দিয়ে পঠিত হয়েছে। আর এ বিধান জিহাদের আদেশ সম্বলিত বিধানের পূর্ববর্তী বিধান।

২৩. إِلَّا لٰكِنْ مَنْ تَوَلّٰى أَعْرَضَ عَنِ الْإِيْمَانِ وَكَفَرَ بِالْقُرْاٰنِ .

২৩. কিন্তু যে ব্যক্তি বিমুখ হবে ঈমান আনয়ন হতে বিরত হবে ও অবাধ্যাচারণ করবে কুরআনের সাথে।

২৪. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ وَالْأَصْغَرُ عَذَابُ الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ .

২৪. আল্লাহ তাকে মহাশাস্তি দিবেন আখেরাতের শাস্তি। আর সাধারণ শাস্তি হলো দুনিয়ার শাস্তি, যেমন হত্যা ও বন্দীত্ব।

২৫. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ رُجُوْعَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ .

২৫. নিশ্চয় আমার দিকেই তাদের প্রত্যাবর্তন মৃত্যুর পর ফিরে আসা।

২৬. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ جَزَاءَهُمْ لَا نَتْرُكُهُ أَبَدًا .

২৬. অনন্তর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে তাদের প্রতিফল দান, যা আমি কখনও ত্যাগ করবো না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

نُصِبَتْ وَسُطِحَتْ-এর বিশ্লেষণ : نُصِبَتْ শব্দটি একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ, নাম পুরুষ, মাযী মাজহুল। বাবে ضَرَبَ মাসদার اَلنَّصْبُ অর্থ– গড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সংস্থাপন করা হয়েছে।

سُطِحَتْ শব্দটি وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ-এর সীগাহ, বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাবে فَتَحَ মাসদার اَلسَّطْحُ অর্থ–সমান করা হয়েছে, বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ الخ-এর তারকীব : اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ الخ বাক্যটি মূলত ছিল اَعَمُوْا اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ এখানে। মুবতাদা। عَمُوْا ফে'ল, উহ্য যমীর هُمْ ফায়েল। ফে'ল-ফায়েল মিলে جُمْلَه فِعْلِيَّه হয়ে مَعْطُوْف عَلَيْه - فَا হরফে আতফ, لَا يَنْظُرُوْنَ ফে'ল, যমীর هُمْ ফায়েল, اِلَى হরফে জার, اَلْاِبِل মুবদাল মিনহু, كَيْفَ خُلِقَتْ এটা بَدَلْ, বদল ও মুবদাল মিনহু মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে مُتَعَلِّقْ হয়েছে لَا يَنْظُرُوْنَ-এর সাথে। لَايَنْظُرُوْنَ ফে'ল তার فَاعِلْ ও مُتَعَلِّقْ-এর সাথে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে مَعْطُوْف - مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে خَبَرْ ; মুবতাদা ও খবর মিলে جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়েছে।

كَيْفَ خُلِقَتْ-এর মহল্লে ই'রাব : كَيْفَ পদটি হাল এবং خُلِقَتْ ক্রিয়ার দ্বারা মানসূব হয়েছে। لِلْاِسْتِفْهَامِ صَدَارَةٌ প্রশ্নবোধক শব্দ বাক্যের প্রথমে আসে বলে خُلِقَتْ-এর পূর্বে এসেছে। كَيْفَ خُلِقَتْ পূর্ণ বাক্যটি اَلْاِبِل-এর সিফাত হয়েছে। এ কারণে পূর্ণ বাক্যটি মাজরূরের অবস্থায় রয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, পার্শ্ব টীকা জালালাইন]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং পরকালে মু'মিনগণ পুরস্কৃত হবেন আর কাফিরেদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে পুনরায় কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তারা কোনো মতেই পরিত্রাণ পাবে না।

আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত ও তার অশেষ নিয়ামতের বর্ণনা সম্বলিত কুরআনে মাজীদের আয়াতসমূহ নাজিল করলেন তখন মক্কার কাফেররা তা অস্বীকার করল এবং অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিল। তখন আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতগুলো নাজিল করে তাদের পাশে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অগণিত কুদরতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যা হতে প্রমাণিত হয় যে, যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তিনি জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত সৃষ্টি করতেও সক্ষম।

বিশেষভাবে উষ্ট্রকে উল্লেখ করার কারণ : উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য প্রাণী ব্যতীত শুধু উষ্ট্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করার কারণ হচ্ছে– আরববাসীদের নিকট উষ্ট্র একটি মূল্যবান সম্পদ এবং জীবকুলের মধ্যে বিরাট ও অদ্ভুত প্রাণী। অথচ মানুষের পক্ষে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশি উপকারী। দৈহিক দিক দিয়ে হাতির তুলনায় ছোট হলেও অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বড়; কিন্তু হাতির কথা উল্লেখ না করে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাতির তুলনায় এর দ্বারা মানুষ লাভবান বেশি হয়। যেমন উষ্ট্রের গোশত ভক্ষণ করা যায়, দুগ্ধ পান করা যায়, সওয়ারিরূপে ব্যবহার করা যায়, সর্বদা মালিকের অনুগত থাকে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যেতে পারে। স্থলভাগের যে কোনো ঘাস বা উদ্ভিদ সে আহার করে। মানুষ তাকে ভারবাহীরূপে ব্যবহার করতে গিয়ে বহু দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। আরবে একে মরুর জাহাজ বলা হয়। দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকাও এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্য একসাথে একটি পশুর মধ্যে পাওয়া খুবই দুর্লভ এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আরবদের সম্মুখে উষ্ট্রের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেছেন।

Free@www.e-ilm.weebly.com

নি বলেছেন- হে আরববাসী ও দুনিয়ার মানুষ! আমি কিয়ামতকে সংঘটিত করে পরলোক সৃষ্টি করতে পারবো না এবং মাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ শেষে পাপীগণকে জাহান্নামে ও নেককারগণকে জান্নাতে স্থান দিতে পারবো । এটা তোমরা কি করে বুঝলে? তোমরা তোমাদের কাছের উষ্ট্রের দিকে তাকাও না, আমি কত সুন্দর, অদ্ভুত ও উপকারীরূপে দরকে সৃষ্টি করেছি।

, আকাশ, পাহাড় এবং জমিনকে বিশেষভাবে উল্লেখের মধ্যে হিকমত : উষ্ট্র, আকাশ, পাহাড় এবং জমিনের মধ্যে দুই ক হতে আমরা সামঞ্জস্য নির্ণয় করতে পারি-

পবিত্র কুরআন আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা অধিক পর্যটনে অভ্যস্ত ছিল। কেননা তাদের দেশ ছিল কৃষিশূন্য। তাদের সফর বেশির ভাগ উষ্ট্রীর উপর ছিল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তারা একাকী চলাকে অগ্রাধিকার দিত। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ যখন একাকী হয়ে যায়, তখন নিশ্চয় কোনো ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকে। কেননা এমন কিছু নেই যে, তার সাথে কথা বলে, চোখ আর কানকে তৃপ্ত রাখে। অতএব, চিন্তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। চিন্তা যখন করতেই হয়, তখন প্রথম চিন্তার চক্ষু গিয়ে পড়ে তার উষ্ট্রের উপর, যে উষ্ট্রে সে সওয়ার হয়েছে। তখন তার সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য ভেসে উঠে, যখন উপরের দিকে তাকায়-আকাশ ছাড়া কিছুই দেখে না। ডানে-বামে পাহাড় ছাড়া কিছু নেই। নিচে জমিন ছাড়া কিছু দেখা যায় না। অতএব, আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে হয় বলে দেওয়া হয় যে, একাকী অবস্থায় যেমন উক্ত বস্তুগুলো ছাড়া কিছুই দেখছ না, সুতরাং ঐগুলো সম্পর্কেই একটু চিন্তা কর, আমাকে এবং আমার সকল কথাকে সঠিক পাবে।

দুনিয়ার সকল বস্তুই সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ দেয়। এ সকল বস্তু দুই প্রকার-

কিছু বস্তু এমন আছে যে, সেগুলোতে হিকমত তো আছেই, মানবিক আকর্ষণও বিদ্যমান, যেমন- সুন্দর চেহারার মানুষ, সুন্দর বাগান, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি। এগুলো দিয়ে আল্লাহর তথা সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতির উপর প্রমাণ নেওয়া যায়; কিন্তু তা মানুষের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সাথে জড়িত, মানুষের নফস তা পেতে চায় বলে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দেননি। কেননা এগুলোর প্রতি তাকালে মন স্থির থাকে না। সৃষ্টির হিকমত তালাশের চেয়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব প্রাধান্য পেয়ে বসে। সুচিন্তার স্থলে কুচিন্তা ঢুকে যায়। হিকমতের স্থলে মহব্বত গড়ে উঠে।

আবার কিছু বস্তু এমন আছে, যেগুলোতে শুধু হিকমতই রয়েছে, মানবিক আকর্ষণ অনুপস্থিত। যেমন-ঐ সমস্ত জন্তু-জানোয়ার যাদের অবয়বে কোনো সৌন্দর্য নেই, কুচিন্তার প্রভাব নেই। আকর্ষণ করতে পারে না; কিন্তু তার গড়ন হিকমতে ভরা, চিন্তা-গবেষণার খোরাক জোগায়, যেমন উষ্ট্রী, আকাশ, জমিন ও পাহাড় ইত্যাদি। যেহেতু এ প্রকার বস্তুতে গবেষণার ভাগ ষোল আনা, কামভাব বা আকর্ষণের লেশমাত্র নেই, তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমনি ধরনের বস্তুতে গবেষণার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -[কাবীর, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

اِ-এর অর্থ : ইমাম মাওয়ারদী বলেন, اَلْإِبِلُ-এর দু'টি তাফসীর পাওয়া যায়। ক. প্রসিদ্ধ অর্থ চতুষ্পদ জন্তু উষ্ট্রী। খ. মেঘ। ী আয়াতে মেঘ-ই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মেঘ যে আল্লাহর কত বড় সৃষ্টি এবং কত হিকমতের দলিল তা সহজেই অনুমেয়, থে সাথে তা দ্বারা যে মানবকুলের উপকার সাধিত হয় তাও স্বতঃসিদ্ধ। আর যদি উষ্ট্রীই হয় তাহলে তাও মানবকুলের জন্য শি ফলদায়ক, কেননা তাতে ৪টি উপকার নিহিত। দুধ, খাদ্য, যাত্রীবাহী, মালবাহী। إِبِلٌ শব্দের শাব্দিক একবচন নেই, শব্দটি লিঙ্গ। إِبِلٌ উষ্ট্রী জাতিকে বুঝায়। -[কুরতুবী]

টকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করার কারণ কি? : উপরিউক্ত চতুষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাগ্রে উটের উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ দু'টি রণ উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন- لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ مُلَابَسَةً لَهَا مِنْ غَيْرِهَا অর্থাৎ অপরাপর জন্তু-জানোয়ারের তুলনায় উটের সাথে আরববাসীদের সম্পর্ক বেশি- এর জন্য তাকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরববাসীদের নিকট উট একটি মূল্যবান সম্পদ এবং জীবকুলের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণী। এটা মানুষের পক্ষে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অধিক উপকারী। উষ্ট্রের গোশত ভক্ষণ করা যায়, দুগ্ধ পান করা যায়, সওয়ারিরূপে ব্যবহার করা যায় এবং এটা মালিকের অনুগত থাকে। আরবে এটাকে মরু জাহাজ বলা হয়। দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকতে পারাও তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতগুলো গুণ একটি পশুর মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। এ কারণেই সর্বপ্রথম উটের দিকে আরববাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জমিনের আকারের ব্যাপারে ভূ-তত্ত্ববিদ ও আয়াতে কুরআনীর বক্তব্য কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায়? : ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে জমিন গোলাকার। অথচ শরিয়তের আলিমগণের মতে এটা সমতল। কুরআনে কারীমের বাহ্যিক [প্রকাশ্য] অর্থ হতেও এটা সমতল হওয়াই প্রতীয়মান হয়। এ উভয় মতবাদের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়? মুফাসসিরগণের কয়েকটি জবাব দিয়েছেন।

ক. অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের মোকাবিলায় সসীম জ্ঞানের অধিকারী ভূ-বিজ্ঞানীদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. যদিও প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী গোলাকার তথাপি বিশালকায় হওয়ার কারণে সাধারণের দৃষ্টিতে সমতল বলেই মনে হয়। তাই কুরআনে মাজীদের বক্তব্য, দৃষ্টিতে সমতল বলেই এভাবে পেশ করা হয়েছে। যাতে সাধারণের দৃষ্টিকোণ বুঝতে সুবিধা হয়।

গ. অথবা, এটা বস্তুতই সমতল। অন্যথায় কোনো অবস্থাতেই মানুষ ও জীব-জন্তু এতে বসবাস করতে পারত না।

ঘ. অথবা, যদিও আহলে হাইয়াত (ভূবিজ্ঞানীগণ) বলে থাকেন যে, পৃথিবী গোলাকার তথাপি তাদের একদলের মতে ঝড়, বন্যা ইত্যাদির কারণে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে সমতল হয়ে গেছে।

ঙ. একদল বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবী কমলালেবুর মতো গোল। আর কমলালেবুর উপরের অংশ চেপ্টা ও সমতল হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের বক্তব্যের সাথে তাঁদের বক্তব্যের বিরোধ নেই।

চ. সমতল হলে যেরূপ জীবন-যাপন সহজ গোলাকার হয়েও তদ্রূপ জীবন ধারণ সহজ হওয়ার কারণে একে সমতল বলা হয়েছে।

اَلْمُسَيْطِرَةُ-এর অর্থ : مُسَيْطِرٌ শব্দটি صِيْغَةُ وَاحِدٍ مُذَكَّرٌ اِسْمُ فَاعِلٍ বহছ মূলবর্ণ (س . ط . ر) অর্থ- জবরদস্তিকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, দারোগা। মূলত سَطْرٌ অর্থ লাইন, যাকে অতিক্রম করা যায় না। বই مُسَطَّرٌ হয়ে থাকে, তার লেখক হয় مُسَيْطِرٌ হিশাম প্রমুখ শব্দটিকে সাদের স্থলে সীন (س) যোগ করে পাঠ করেন। ইমাম হামযা এখানে এশমাম করে পাঠ করেন। অবশিষ্ট ক্বারীগণ صَادٌ যোগে পড়েছেন।

উক্ত আয়াতের হুকুম : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ আয়াতটি কারো মতে اٰيَةُ السَّيْفِ বা কতলের আয়াত তথা জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো কোনো মুফাসসির বলেন– আয়াতটি রহিত নয়। কেননা এটা اٰيَةُ السَّيْفِ-এর বিপরীত নয়। দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে জবরদস্তি করা যাবে না বলে উক্ত আয়াতটি প্রমাণ। আর এটা এখনও বলবৎ রয়েছে। দাওয়াত গ্রহণ করা মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

اَلْعَذَابَ الْاَكْبَرَ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন যে, اَلْعَذَابَ الْاَكْبَرَ-এর দ্বারা পরকালের আজাবকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, দুনিয়ার আজাব তথা বন্দীকরণ ও হত্যা হতে এটা বহু গুণে বড়।

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى الخ-এর মধ্যস্থিত ইসতিছনা : আল্লাহর বাণী اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى-এর মধ্যে কোন প্রকারের اِسْتِثْنَاء হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়।

১. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ হবে। তাঁদের মতে মূলবাক্য নিম্নরূপ হবে–

لَسْتَ بِمَسْئُوْلٍ عَلَيْهِمْ لٰكِنَّ مَنْ تَوَلّٰى مِنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ الَّذِىْ هُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনয়ন হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠোর আজাব তথা জাহান্নামের আজাব দিবেন।

২. কারো কারো মতে, এখানে اِسْتِثْنَاء مُتَّصِلٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় মূল ইবারত নিম্নোক্ত তিন ধরনের হতে পারে–

ক. فَذَكِّرْهُمْ اِلَّا مَنْ قَطَعَ طَمَعَاتٍ مِنْ اِيْمَانِهٖ অর্থাৎ আপনি তাদেরকে নসিহত করুন। তবে তাকে নয় ঈমানের প্রতি যার কোনো আগ্রহই নেই।

খ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى অর্থাৎ আপনি তাদের উপর জোর প্রয়োগকারী নন, তবে যে হঠধর্মী করবে তার উপর জোর প্রয়োগ করা যাবে।

গ. فَذَكِّرْ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى فَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ অর্থাৎ আপনি নসিহত করুন। তবে যে ঈমান হতে বিমুখ হয়ে যাবে, সে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হবে।

سُوْرَةُ الْفَجْرِ : সূরা আল-ফাজর

Free @ www.e-ilm.weebly.com

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দটিই এর নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৩০টি আয়াত, ১৩৯টি বাক্য এবং ৫৯৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এর বিষয়বস্তু ও আলোচিত কথা হতে বুঝা যায় যে, মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর জুলুম-অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাজিল হয়। এ কারণে সূরাটিতে মক্কার লোকদেরকে 'আদ, ছামূদ ও ফেরআউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরার শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের ও আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাফসীরকারদের মতে এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল। আরবের অধিবাসীরা একসময় বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের জন্য সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হতেন, তবে ইহলোকেই তো তার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি যখন ইহলোকে কিছু করছেন না, তখন পরলোকেও কিছু করবেন না। পুনরুজ্জীবন, হাশর-নশর, শাস্তি ও পুরস্কার এক ভিত্তিহীন উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবিশ্বাসীদের এ সকল উক্তির জবাবেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন।

সূরার আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরায় পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, মক্কাবাসীরা এটা বিশ্বাস করত না। এ উদ্দেশ্যে সূরাটিতে ক্রমাগত ও পর পর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে সে পুরস্কার অনুযায়ী যুক্তিসমূহ বিবেচনার দাবি রাখে।

সূরাটির শুরুতেই ফজর, দশ রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের শপথ করা হয়েছে এবং শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কথাকে মান্য করছ না, এর সত্যতার সাক্ষী এবং প্রমাণ হিসাবে এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ট নয়?

এর পর মানুষের ইতিহাস হতে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। ইতিহাস খ্যাত 'আদ, ছামূদ ও ফেরআউনের মর্মান্তিক পরিণতি পেশ করে বলা হয়েছে যে, এরা যখন সীমালজ্ঘন করল এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করল, তখনই আল্লাহর আজাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হলো। এটা হতে বোধগম্য হয় যে, এক মহাবিজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ কুশলী শাসক এর উপর রাজত্ব করছেন। বুদ্ধি-বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে যাকে তিনি এ জগতে ক্ষমতা চালানোর এখতিয়ার দিয়েছেন। তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার নিকট হতে যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং এর ভিত্তিত তাকে শস্তি বা ভালো প্রতিফল দান করা তাঁরই এক অপরিবর্তনীয় নীতি।

এরপর মানব সমাজের নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে। আরবে তো তখন নৈতিক অবস্থার ছিল চরম দুর্দিন। এ অবস্থার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। একটি হলো লোকদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এর দরুনই তারা নৈতিকভাবে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে নিছক বৈষয়িক প্রতিপত্তিকেই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল। ধন-সম্পদ দান করে অথবা এটা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ যে শুধু মানুষকে পরীক্ষা করতে চান তা তারা সম্পূর্ণ ভুলেই বসেছিল।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে– পিতার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এতিম সন্তান চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। গরিবের পৃষ্ঠপোষক কোথাও কেউ নেই। সুযোগ পেলেই তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়, অর্থ লোভ এক অতৃপ্ত পিপাসার মতো মানুষকে পেয়ে বসেছে। যত সম্পদই করায়ত্ত হোক না কেন, মানুষের ধনক্ষুধা কোনো ক্রমেই চরিতার্থ হয় না। এটাই হলো মানব সামাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা। এটা দ্বারা মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে, এরপরও তাদেরকে শুভ প্রতিফল ও শাস্তির সম্মুখীন না করে ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? এটা কি কোনো বিবেক সমর্থন করতে পারে? সুতরাং এর নিরিখেই সূরার শেষ পর্যায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ অবশ্যই হবে। হবে সেদিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলার আদালত কায়েম হবে। এ হিসাব-নিকাশ অমান্যকারীরা সেদিন সে কথাটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে, যা আজ শত বুঝানোর পরও বুঝতে পারছে না। সেদিন তারা শত অনুতপ্তও হবে, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হবে না।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা আসমানি কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপস্থাপিত চরম সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাদের প্রতি রাজি হবেন। আর তারাও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের জামাতে শামিল হওয়ার এবং জান্নাতে দাখিল হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানানো হবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْفَجْرِ فِي اللَّيَالِي الْعَشَرَةِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ غُفِرَ لَهُ وَمَنْ قَرَأَهَا فِيْ سَائِرِ الْأَيَّامِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতে যে ব্যক্তি সূরা ফজর তেলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর সর্বদা যে, এটা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য নূর হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-ফাজর মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً : ৩০ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. وَالْفَجْرِ اَىْ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ ـ

১. শপথ উষার অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের উষা।

٢. وَلَيَالٍ عَشْرٍ اَىْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ ـ

২. আর দশ রজনীর অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত

٣. وَّالشَّفْعِ الزَّوْجِ وَالْوَتْرِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ الْفَرْدِ ـ

৩. আর শপথ জোড়ের জোড়া ও বিজোড়ের وَتْر শব্দটির وَاوْ বর্ণে যবর ও যের উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যা।

٤. وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اَىْ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا ـ

৪. আর শপথ রজনীর যখন তা গত হতে থাকে অর্থাৎ আসতে ও যেতে থাকে।

٥. هَلْ فِىْ ذٰلِكَ الْقَسَمِ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ عَقْلٍ وَجَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ اَىْ لَتُعَذَّبُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ ـ

৫. নিশ্চয় এর মধ্যে এই শপথের মধ্যে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য শপথ রয়েছে حِجْر শব্দের অর্থ عَقْل বা বোধশক্তি, আর শপথের জবাব উহ্য অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, হে মক্কাবাসী কাফেরগণ!

তাহকীক ও তারকীব

حِجْر-এর বিশ্লেষণ : حِجْر অর্থ- জ্ঞান, বুদ্ধি। শব্দটি একবচন, বহুবচনে حُجُرٌ [হুজুর] ও اَحْجُرٌ-আর ذِى الْحِجْرِ অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এর অপর অর্থ- বিরত থাকা। তাহলে ذِى الْحِجْرِ এর অর্থ দাঁড়ায়- প্রতিরোধকারী। যেহেতু প্রকৃত জ্ঞানীগণই নিজের পাশবিক প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করে নিজেকে আল্লাহর প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করতে পারেন। -(খাযেন)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্তমান এবং পূর্বের সূরার মধ্যে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা আল-গাশিয়াহতে পুণ্যবান ও পাপীদের প্রতিদান ও প্রতিফলের কথা বিবৃত হয়েছে। বর্তমান সূরাতে এমন সব কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর প্রতিফল শুধু শাস্তি। আর বর্তমান সূরাতে অবিশ্বাসী-কাফের সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথাও আলোচিত হয়েছে। -[কামালাইন]

সূরা আল-গাশিয়াহতে وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ এবং وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ আয়াতদ্বয়ে কাফের এবং মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বর্তমান সূরাতেও এ দু'টি দলের আলোচনা রয়েছে। সূরার প্রথমে কাফেরদের আলোচনা- তারপর يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ থেকে মু'মিনদের আলোচনা শুরু হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

قَوْلُهٗ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ : আল্লাহ তা'আলা এখানে চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। আর এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য ও অকাট্য। শেষে প্রশ্ন করা হয়েছে, কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য এ জিনিস কোনো কসম আছে কি? অর্থাৎ তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এ সব প্রমাণ পেশ করার পর বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অপর কোনো কসমের (সাক্ষীর) প্রয়োজন থাকতে পারে কি?

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূলত পরকালীন শাস্তি ও ভালো প্রতিফলই ছিল আলোচনা-পর্যালোচনার বিষয়। মক্কার কাফেররা এটা অস্বীকার ও অমান্য করে আসছিল এবং নবী করীম ﷺ তাদেরকে এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী বানাবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত প্রচার ও তাবলীগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে ফজর, দশ রাত্র, জোড়-বেজোড়া ও বিদায়ী রাত্রির শপথ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ কথাটি মেনে নেওয়ার জন্য এ চারটি বস্তুর শপথ কি যথেষ্ট নয়?

اَلْفَجْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য : একথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আল্লাহ اَلْفَجْرِ-এর শপথ করেছেন; কিন্তু اَلْفَجْرِ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে–এ ব্যাপারে বিভিন্ন তাফসীরকারের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, فَجْر স্বাভাবিক পরিচিত প্রভাতকে বলা হয়, যা সুবহে সাদেক এবং কাযেব-এর পরিচায়ক। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শপথ করেছেন। এতে রাতের সমাপ্তি এবং আলো প্রকাশের ভূমিকা বিদ্যমান। রিজিক অন্বেষণে মানব গোষ্ঠী এবং সকল প্রকার জন্তু-জানোয়ার ও পাখি চারিদিকে বের হয়ে পড়ে। এ মুহূর্তের গুরুত্ব চিন্তাশীল গবেষকদের জন্য অত্যধিক।

২. অথবা, اَلْفَجْرِ বলে রূপকভাবে صَلٰوةُ الْفَجْرِ বুঝানো হয়েছে। صَلٰوةُ الْفَجْرِ দ্বারা শপথ করার কারণ হলো– উক্ত নামাজ দিনের ভূমিকায় এবং ঐ সময় রাত এবং দিনের ফেরেশতা একসাথ হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا অর্থাৎ রাত এবং দিনের ফেরেশতা ফজরের নামাজে কেরাত শুনতে উপস্থিত হয়।

৩. অথবা, একটি নির্দিষ্ট দিনের ফজর উদ্দেশ্য। যেমন– কারো মতে فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ অর্থাৎ ১০ই যিলহজের ফজর। আর এটা এ কারণে যে, হজ এবং হজের আহকামগুলো হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বৈশিষ্ট্যাবলির একাংশ।

* কারো মতে, فَجْرُ ذِى الْحِجَّةِ অর্থাৎ যিল হজের ফজর।

* কারো মতে, فَجْرُ الْمُحَرَّمِ অর্থাৎ মহররম মাসের ফজর। এর দ্বারা শপথ করার কারণ হলো–এ মাসটি প্রত্যেক বছরের প্রথম মাস।

৪. অথবা, اَلْفَجْرِ দ্বারা ঐ সমস্ত ঝরনা উদ্দেশ্য যেগুলো থেকে পানি প্রবাহিত হয়। যে পানির অপর নাম জীবন।

–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর, রূহুল মা'আনী]

وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : لَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর দ্বারা জিলহজের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। এ মতই পোষণ করতেন। হযরত কাতাদা, মুজাহেদ যাহ্যাক, সুদ্দী ও কালবী (র.) এ দশ রাতের ফজিলত সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর হাদীস রয়েছে।

২. ইমাম যাহ্হাক (র.) বলেছেন, এ দশ রাত হলো, রমজানের প্রথম দশ রাত।

৩. আবূ জুরিয়ান (র.) বলেছেন, এর দ্বারা রমজানের শেষ দশ রাত উদ্দেশ্য। কেননা রমজানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে।

৪. আইশাম ইবনে রোবাব বলেছেন এর দ্বারা মহররমের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। কেননা তার দশ দিন হলো আশুরা।

–[নূরুল কোরআন]

জোড়-বেজোড়ের তাৎপর্য : জোড়-এর দ্বারা জিলহজের দশ তারিখ এবং বেজোড় দ্বারা নবম তারিখ বুঝানো হয়েছে। এ মন্তব্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে আছে যে, জোড় দ্বারা ফজরের নামাজ এবং বেজোড় দ্বারা মাগরিবের নামাজ বুঝানো হয়েছে। উদ্ধৃত আয়াতসমূহে যে চারটি বিষয়ে শপথ করা হয়েছে তন্মধ্যে জোড়-বেজোড় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলো সময় বিশেষের উপর ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং জোড়-বেজোড় শব্দ দু'টিও সময়বাচক হলে বেশি উপযোগী হয়। অতএব এর অর্থ নামাজ না হয়ে জিলহজের নবম ও দশম তারিখ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন তাফসীরকার এ জোড়-বেজোড়-এর ব্যাখ্যায় ৩৬টি মত উল্লেখ করেছেন। যেমন–১. জোড় বলতে সৃষ্ট বস্তু (যা জোড়া জোড়া); বেজোড় বলতে আল্লাহর একত্ব, ২. জোড় বলতে ইহকালে দিবা ও রাত্রের সমষ্টি দিন, আর বেজোড় বলতে হাশরের বিচারের দিন, ৩. জোড় বলতে আট বেহেশত, আর বেজোড় বলতে সাত দোজখ, ৪. জোড় বলতে সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলি, যেমন– ভালো-মন্দ, সবল-দুর্বল, ধনী-দরিদ্র, জীবন-মৃত্যু, বিদ্বান-মূর্খ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি গুণই বিপরীত গুণের সাথে জোড়া গাঁথা। আর বেজোড় বলতে আল্লাহ তা'আলার একক গুণাবলির কথা বুঝানো হয়েছে। ৫. হযরত আতা (র.) বলেন, اَلْوَتْرِ দ্বারা ঈদুল আযহার রাত এবং شَفْع দ্বারা আরাফার দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ৬. ইবনে যোবায়ের (রা.) -এর মতে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ আয়াতের মধ্যে যে, দু'দিনের উল্লেখ রয়েছে شَفْع হলো সে দু'দিন, এরপর وَمَنْ تَأَخَّرَ বলে যে, এক দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা হলো اَلْوَتْرِ। –[নূরুল কোরআন, খাযেন]

وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য : অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে– وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট রাত উদ্দেশ্য নয়; বরং সাধারণ রাত উদ্দেশ্য। কেননা অন্য আয়াতে আছে وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ - وَاللَّيْلِ اِذَا اَسْفَرَ যেহেতু আল্লাহর নিয়ামত রাত ও দিনের পরিক্রমার মাধ্যমে আসে। আর রাত ও দিনের মার্যাদা সৃষ্টজীবের নিকট অত্যন্ত বেশি। এ কারণেই এটা দ্বারা শপথ করা সহীহ হয়েছে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, উক্ত لَيْل দ্বারা মুযদালিফার রাত উদ্দেশ্য। কেননা ঐ রাতের প্রথম ভাগে আরাফাহ হতে মুযদালিফা আসা হয়, এ কারণে اِذَا يَسْرِ বলা হয়েছে। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. اَلَمْ تَرَ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ .

৬. তুমি কি দেখনি? জান না হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক কি আচরণ করেছেন 'আদ সম্প্রদায়ের সাথে?

٧. اِرَمَ هِيَ عَادُ الْاُوْلٰى فَاِرَمَ عَطْفُ بَيَانٍ اَوْ بَدَلٌ وَمُنِعَ الصَّرْفُ لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّانِيْثِ ذَاتِ الْعِمَادِ اَيِ الطُّوْلِ كَانَ طُوْلُ الطَّوِيْلِ مِنْهُمْ اَرْبَعَ مِائَةِ ذِرَاعٍ .

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি এটা প্রথম 'আদ সম্প্রদায়; সুতরাং اِرَمَ শব্দটি عَطْف بَيَانٌ অথবা بَدَلٌ শব্দটি عَلَمِيَّتْ ও تَانِيْث-এর কারণে غَيْر مُنْصَرِفْ যারা ছিল স্তম্ভাকৃতির অর্থাৎ দীর্ঘকায়, তাদের মধ্যে দীর্ঘতম ব্যক্তির দৈর্ঘ্য ছিল চারশত গজ।

٨. الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ فِيْ بَطْشِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ .

৮. যার সমতুল্য কোনো দেশে সৃষ্টি হয়নি। তাদের শক্তি-সামর্থ্য বিচারে।

٩. وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا قَطَعُوا الصَّخْرَ جَمْعُ صَخْرَةٍ وَاتَّخَذُوْهَا بُيُوْتًا بِالْوَادِ وَادِي الْقُرٰى .

৯. আর সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা কর্তন করেছে কেটেছে প্রস্তররাজি صَخْر শব্দটি صَخْرَةٌ -এর বহুবচন, তা দ্বারা তারা গৃহনির্মাণ করেছে। উপত্যকায় ওয়াদিউল কোরা নামক উপত্যকায়।

١٠. وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ كَانَ يَتِدُ اَرْبَعَةَ اَوْتَادٍ يَشُدُّ اِلَيْهَا يَدَىْ وَ رِجْلَىْ مَنْ يُعَذِّبُهُ .

১০. আর কীলকের অধিকারী ফিরআউনের প্রতি যে প্রতিপক্ষকে শাস্তি দানের সময় উভয় হাত ও উভয় পায়ে চারটি পেরেক বিদ্ধ করে নিত।

١١. الَّذِيْنَ طَغَوْا تَجَبَّرُوْا فِى الْبِلَادِ .

১১. যারা জুলুম-অত্যাচার চালু করে রেখেছিল ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল দেশসমূহে।

١٢. فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ الْقَتْلَ وَغَيْرَهُ .

১২. তারা তথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল হত্যা ইত্যাদি।

١٣. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ نَوْعَ عَذَابٍ .

১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর বিশেষ ধরনের শাস্তির কশাঘাত হানলেন,

١٤. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ يَرْصُدُ اَعْمَالَ الْعِبَادِ فَلَا يَفُوْتُهُ مِنْهَا شَيْئٌ لِيُجَازِيَهُمْ عَلَيْهَا .

১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন বান্দার আমলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, ফলে কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আর তিনি তাদেরকে এজন্য প্রতিদান-প্রতিফল দিবেন।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ আয়াতের মহল্লে ই'রাব : আল্লাহর বাণী اَلَّذِيْنَ طَغَوْا-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে :

Free@www.e-ilm.weebly.com

ক. اَلَّذِيْنَ طَغَوْا এটা مَحَلًّا مَرْفُوْع হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা উহ্য মুবতাদার খবর হবে। মূলত বাক্যটি হবে- هُمُ الَّذِيْنَ طَغَوْا.

খ. অথবা, এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা ذَمّ হবে।

গ. অথবা, এটা مَحَلًّا مَجْرُوْر হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা فِرْعَوْنَ .... ثَمُوْدَ .... "عَاد" হতে صِفَةٌ হয়েছে। কাজেই مَوْصُوْف মাজরূর হওয়াতে صِفَةٌ ও مَجْرُوْر হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বস্তুর শপথ করে বলেছেন যে, মক্কার কাফিরদের জন্য আজাব অবধারিত। এখানে এমন কতিপয় জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের মক্কার কাফিরদের ন্যায় কুফর ও শিরকের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার দরুণ ইতিপূর্বে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ-এর অর্থ : اَلَمْ تَرَ-এর শাব্দিক অর্থ হলো–তুমি কি দেখনি? কিন্তু আয়াতে দেখার অর্থ হবে না, বরং এর অর্থ হবে اَلَمْ تَعْلَمْ অর্থাৎ তুমি কি জান না? কেননা, পরবর্তী আলোচনা যে সম্প্রদায়সমূহের ব্যাপারে হচ্ছে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেননি; বরং ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছেন। –[কাবীর]

اَلَمْ تَعْلَمْ না বলে اَلَمْ تَرَ বলার কারণ : মূলত এখানে اَلَمْ تَعْلَمْ-এর স্থলে اَلَمْ تَرَ বলা হয়েছে। কেননা 'আদ, ছামূদ এবং ফিরআউনের সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট خَبَر مُتَوَاتِرْ তথা ধারাবাহিক খবরের মাধ্যমে এসেছে। এ ছাড়া আদ এবং ছামূদ সম্প্রদায় আরব ভূমিতেই ছিল। আর ফিরাউনের রাষ্ট্র আরব ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। خَبَرُ التَّوَاتُرِ বা ধারাবাহিক খবর عِلْم ضَرُوْرِيْ তথা অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের ফায়দা দেয়। আর عِلْم ضَرُوْرِيْ বা অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানশক্তি এবং সন্দেহমুক্ত হিসাবে رُؤْيَةٌ বা দেখার সমকক্ষ। এ কারণেই اَلَمْ تَعْلَمْ না বলে اَلَمْ تَرَ বলা হয়েছে। –[কাবীর]

আদ জাতির ঘটনা : 'আদ সম্প্রদায়, 'আদ এবং এরাম উভয় নামেই পরিচিত ছিল। কারণ এ সম্প্রদায়ের এক উর্ধ্বতন পুরুষের নাম ছিল 'আদ। আর 'আদের পিতামহ ছিল এরাম। কুরআনে এদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিকদের মতে এ জাতি হযরত ঈসা (আ.)-এর দুই হাজার বৎসর পূর্বে আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করত। 'আদ জাতি প্রাচীন আরবের একটি গোত্র অথবা হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র শাম-এর বংশধর। প্রাচীন আ'দ সম্প্রদায়কে 'আদে এরামও বলা হতো। কারণ শামের পুত্র এরামের নামানুসারে তারা এ নামে পরিচিত হয়েছিল। তৎকালীন পৃথিবীতে তাদের মতো উন্নত ও শক্তিশালী আর কোনো জাতি ছিল না। এরা অবয়বের দিক দিয়ে অত্যন্ত বৃহদাকার এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ গজের মতো লম্বা ছিল। কথিত আছে যে, তাদের একজন একবারেই একটি উটের মাংস ভক্ষণ করত। এরা ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। উঁচুস্তম্ভের উপর ছাদ বিশিষ্ট ইমারত তারাই পৃথিবীতে প্রথম নির্মাণ করেছিল। কারো মতে, কুরআনে 'যাতুল ইমাদ' বলে এ জন্যই তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে।

পথভ্রষ্ট 'আদ জাতিকে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত হুদ (আ.)-কে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন। হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে শিরক পরিত্যাগ করে আল্লাহর উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান করলেন। ইহ এবং পরকালে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করলেন; কিন্তু দুর্বৃত্ত 'আদ জাতি নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং নিজেদের শক্তি ও সম্পদের গর্বে হযরত হুদ (আ.)-কে আজাব এনে দেখাতে বলল। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাদের উপর তিন বছর বৃষ্টি বন্ধ রাখলেন। ফলে দেশময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

তৎকালীন আরবের মধ্যে একটা প্রথা ছিল যে, কোনো বিপদ-আপদ দেখা দিলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মক্কায় আল্লাহর ঘরের নিকট হাজির হয়ে বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করত অথবা কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে এক দল লোক পাঠাত, তারা প্রতিনিধি হিসেবে কা'বা ঘরের কাছে সমবেত হয়ে সকলের জন্য প্রার্থনা করত। ফলে সকলেই বিপদমুক্ত হতো।

আদ জাতির লোকগণও অনাবৃষ্টিজনিত বিপদ মুক্তির জন্য তাদের প্রাচীন রেওয়াজ মতো ফায়ীল ইবনে আনয-এর নেতৃত্বে সত্তর জন লোকের একটি কাফেলা মক্কার উদ্দেশ্যে প্রার্থনার জন্য পাঠাল। তারা কা'বা ঘরের নিকটে উপস্থিত হয়ে কা'বা ঘরের সেবক

মুয়াবিয়া ইবনে বকরের বাড়িতে অতিথি হলো এবং পরদিন কা'বার কাছে গমন করে কাকুতি-মিনতি করে বৃষ্টি প্রার্থনা করল তখনই আকাশে তিন খণ্ড মেঘ দেখা দিল: সাদা, কালো ও লাল তিন রঙের তিন খণ্ড। আর অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসল, ফায়িল এদের মধ্যে যে খণ্ড চাও গ্রহণ করতে পার। আনন্দে আটখানা হয়ে ফায়ীল বেশি পানির আশায় কালো মেঘ খণ্ডকে পছন্দ করল মেঘ খণ্ডটি ইয়ামেনের আহকাফ এলাকায় 'আদ জাতির বসতির উপর গিয়ে থামল। এটা ছিল গজবের মেঘ। সর্ব প্রথম মেহদ নাম্নী এক মহিলা আগুনের লেলিহান শিখা দেখে চিৎকার দিয়ে বলল– হে লোকেরা! তোমরা হূদের প্রতি ঈমান আনো, নতুবা তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আগুন সংকেতের পর-পরই তাদের উপরে প্রবল ঘূর্ণিঝড় শুরু হলো। অনবরত সাত রাত আট দিন ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে 'আদ জাতির বেঈমান লোকেরা এবং তাদের লোকালয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো; কিন্তু আল্লাহর অসীম দয়ায় হযরত হূদ (আ.) তাঁর মু'মিন সঙ্গীগণসহ সুস্থ ও অক্ষত থাকলেন, তাঁদের কোনো ক্ষতি হলো না। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা জালিম ও পাপাচারী জাতিকে ধ্বংস করে থাকেন।

ছামূদ জাতির ঘটনা : ছামূদ জাতি ছিল আরবের প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে অন্যতম। 'আদ জাতির পরই ছিল তাদের স্থান এরা ছিল হযরত নূহ (আ.) -এর অধঃস্তন পুরুষ ছামূদের বংশধর। ছামূদ-এর নামেই উক্ত জাতির নামকরণ করা হয়েছে। উত্তর পশ্চিম আরবের আল-হাজার নামক স্থানে ছিল তাদের বসতি। তথায় এখনও তাদের ধ্বংস স্তূপের নিদর্শনাবলি বিদ্যমান রয়েছে। পাহাড় খোদাই করে তারা তাদের গৃহনির্মাণ করেছে। উক্ত নিদর্শনাবলি হতে অনুমান করা যায় যে, এক কালে এটা লক্ষ-লক্ষ লোকের কোলাহলে মুখরিত ছিল।

তারাও এক আল্লাহর ইবাদত ভুলে শিরক, মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে হেদায়েত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরই ভাই হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী করে পাঠালেন। সালেহ (আ.) তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। মূর্তি-পূজা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। বহুদিন দাওয়াত দেওয়ার পর অধিকাংশ দরিদ্র লোকই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল, কিন্তু নেতৃস্থানীয় ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা কোনোমতেই ঈমান আনল না। তাঁরা হযরত সালেহ (আ.) -এর নিকট মু'জিযা তলব করল তারা হযরত সালেহ (আ.)-কে একটি পাথর দেখিয়ে বলল, এটা হতে একটি উষ্ট্রী বের করতে পারলে তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। হযরত সালেহ (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানানোর পর উক্ত প্রস্তর খণ্ড হতে আল্লাহর হুকুমে একটি উষ্ট্রী বের হয়ে আসল। হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, কোনো অবস্থাতেই যেন তারা উক্ত উষ্ট্রীর সাথে দুর্ব্যবহার না করে। কেননা এর সাথে খারাপ আচরণ করলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এ মু'জিযা দেখে এক দিনেই চার হাজার লোক ঈমান আনল। কিন্তু পরবর্তীতে কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাদের প্ররোচনায় তারা মুরতাদ হয়ে গেল।

কাফেররা উক্ত উটনীকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। এক ব্যক্তিকে এ কাজ সমাধা করার জন্য তারা নিযুক্ত করল। লোকটি অত্যন্ত শোচনীয় ও নির্মমভাবে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল। আল্লাহ তা'আলা তাদেকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আল্লাহর আদেশে হযরত সালেহ (আ.) তার অনুসারীদেরকে তিন দিনের মধ্যে শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। মু'মিনগণ মক্কায় এসে বসতি স্থাপন করলেন। ওদিকে ছামূদ জাতিকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিলেন। তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এক শুক্রবারে তাদের সকলের চেহারা হলুদ বর্ণ, দ্বিতীয় শুক্রবারে লাল বর্ণ এবং তৃতীয় শুক্রবারে কালো বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ.) এক বিকট ধ্বনি দিলেন–যাতে তারা সাকলেই হৃৎপিণ্ড ফেটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আজো তাদের বিরান আবাসে ধ্বংসস্তূপের নিদর্শন বিদ্যমান ।

ফেরআউন (فِرْعَوْن)-এর ঘটনা : প্রাচীনকালে মিশরের রাষ্ট্র প্রধান বা রাজাকে বলা হতো ফেরআউন। ফেরআউন (فِرْعَوْن) শব্দের অর্থ হলো– দেবতার সন্তান। হযরত মূসা (আ.) -এর সময়কার মিশরের ফেরআউনের নাম ছিল ওলীদ ইবনে মাসআব ইবনে রাইয়ান। রাইয়ান হিসাবেই সে পরিচিত ছিল। সে নিজেকে 'রাব্বুল আ'লা' বা পরমেশ্বর বলে দাবি করত। মিশরে সে ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষত সে ও তার সঙ্গী-সাথীরা বনূ ইসরাঈলের উপর সীমাহীন নির্যাতন করত।

আল্লাহ তা'আলা ফেরাউন ও তার দল-বলকে হেদায়েত করার জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। হযরত মূসা (আ.) -এর জন্মের কিছু দিন পূর্বে ফেরাউন স্বপ্নযোগে দেখতে পেল যে, বনূ ইসরাঈল হতে একটি আগুনের শিখা উত্থিত হয়ে তার রাজ সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসল এবং একে ভস্ম করে দিল। তিনি জ্যোতিষীদেরকে ডেকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, অচিরেই বনূ ইসরাঈলে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে আপনার সিংহাসন ধ্বংস হবে। আপনার রাজত্বের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free@www.e-ilm.weebly.com

অবসান ঘটবে। এটা শুনে ফেরাউন বনূ ইসরাঈলীদের গর্ভধারণ নিষিদ্ধ করে দেয় এবং সমস্ত নবজাতককে হত্যার নির্দেশ দেয়। হযরত মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করার পরপরই তাঁর মাতা তাঁকে একটি বাক্সে ভরে নীল নদীতে ফেলে দেন। বাক্সটি ফেরাউন পত্নী আসিয়ার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি একে উঠিয়ে নিয়ে হযরত মূসা (আ.) -এর লাল-পালনের দায়িত্ব নেন। ফেরআউনের ঘরেই হযরত মূসা (আ.) লালিত-পালিত হয়ে বয়স প্রাপ্ত হন।

একবার এক জালিম কুর্দীকে হত্যার কারণে ফেরআউন ও তার পরিষদ হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। হযরত মূসা (আ.) মিশর হতে পালিয়ে মাদায়েন চলে যান। তথায় হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি হযরত শোয়ায়েব (আ.)-এর এক কন্যাকে বিবাহ করেন। দীর্ঘ আট বছর পর তিনি সস্ত্রীক মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি তূর পাহাড়ে আল্লাহর পক্ষ হতে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দু'টি বিশেষ মুজিযা, লাঠি ও يَدَ بَيْضَاءَ [শুভ্র হাত] দান করেন এবং ফেরাউনকে হেদায়েত করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি ফিরআউনকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং নবুয়ত প্রমাণের জন্য মু'জিজা প্রদর্শন করেন। ফেরাউন ও তার দলের লোকেরা মু'জিযাকে জাদু বলে প্রত্যাখ্যান করে। নির্দিষ্ট দিনে ফেরাউনের ভাড়াটে জাদুকরদের সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হয়। জাদুকররা পরাস্ত হয়ে ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু ফেরআউন ও তার দলের লোকেরা ঈমান আনয়নে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর পর পর অনেকগুলো আজাব নাজিল করেন। যেমন– ক. দুর্ভিক্ষ, খ. পঙ্গপাল, গ. উকুন, ঘ. ব্যাঙ, ঙ. রক্ত ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের আজাব দেওয়া হয়। আজাব আসার পর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট দোয়ার জন্য ধরনা দেয় এবং ঈমান আনার অঙ্গীকার করে। কিন্তু আজাব চলে যাওয়ার পর তারা হযরত মূসা (আ.)-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চরম শাস্তি দেওয়ার মনস্থ করলেন। হযরত মূসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, গভীর রাতে তিনি যেন তাঁর অনুসারীগণসহ মিশর ত্যাগ করে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ.) যখন তার অনুগামীগণসহ মিশর ত্যাগ করে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন ফেরআউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদেরকে পিছন হতে ধাওয়া করল। নীল নদের তীরে এসে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় হাতের লাঠি নদীতে ফেলে দিলেন। পানির মধ্যে বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। বনূ ইসরাঈলের বারোটি গোত্র উক্ত বারোটি রাস্তা দিয়ে পর হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যরা যখন অলৌকিক পথে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের অনুসরণ করে মাঝ নদীতে গিয়ে উপস্থিত হলো তখন চারিদিক হতে অথৈ পানি এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। অবশ্য সে মুহূর্তে ফেরাউন ঈমান এনেছিল, তবে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি।

'এরাম' কি? : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এরাম বলতে 'আদ সম্প্রদায়ের ঐ অংশকে বুঝায় যাদের পূর্ব পুরুষ এরাম নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল। 'আদ সম্প্রদায় এরামের বংশধর বলে তাদেরকে কাওমে এরামও বলা হতো। এরাম হযরত নূহ (আ.)-এর পৌত্র এবং সামের পুত্র ছিল। এরামের পুত্রের নাম ছিল আবের, আর আবেরের পুত্র ছিল ছামূদ। ছামূদের নামানুসার এ সম্প্রদায়কে কাওমে ছামূদ বলা হতো। এরামের অপর পুত্র আওস -এর সন্তান ছিল 'আদ। 'আদের বংশধরদেরকে বলা হতো কওমে 'আদ। কাওমে 'আদ ও কাওমে ছামূদ উভয় গোত্রই আছে এরাম-এর অন্তর্ভুক্ত। 'আদ সম্প্রদায়ের আবার দু'টি অংশ রয়েছে– প্রাচীন 'আদ ও নবীন 'আদ। কুরআনে 'আদ-এর নাম উচ্চারণের পর 'এরাম'-এর উল্লেখ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়ই এস্থলে আলোচনার লক্ষ্যস্থল। কারণ এরাম ও প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়ের মধ্যকার ব্যবধান নবীন 'আদ সম্প্রদায়ের তুলনায় সামান্য হওয়াতেই প্রাচীন 'আদকেই 'আদে এরাম নামে অভিহিত করা হতো। –[রূহুল মা'আনী, বয়ান, খাযেন, হোসাইনী]

ذَاتِ الْعِمَادِ-এর অর্থ : এরাম জাতির পরিচিতি দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ذَاتِ الْعِمَادِ তথা খুঁটি বিশিষ্ট বলেছেন, এর কারণ নিম্নরূপ–

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তাদের দৈহিক কাঠামে খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ এবং মজবুত ছিল, তাই ذَاتِ الْعِمَادِ বলা হয়েছে।

২. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, তারা আকাশ চুম্বি ইমারতের অধিকারী ছিল। অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং মজবুত খুঁটির উপর তা স্থাপন করা হতো। –[নূরুল কোরআন]

ذُو الْأَوْتَادِ-এর অর্থ কি? এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : ذُوْ অর্থ– ওয়ালা, অধিকারী ইত্যাদি। আর أَوْتَادٌ শব্দটি وَتَدٌ-এর বহুবচন অর্থাৎ খুঁটি বা লোহার পেরেক, লৌহ শলাকা। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ফেরআউনের পরিচয় স্বরূপ **'যুল আওতাদ'** শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। এর সহজ অর্থ দাঁড়ায় লৌহ শলাকাধারী। এখানে ফেরআউনকে কেন লৌহ শলাকাধারী বলা হয়েছে–মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন।

ক. ফেরাউনের সৈন্যদেরকে এখানে লৌহ শলাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লৌহ শলাকার দ্বারা তাঁবু যেমন সুদৃঢ় থাকে ফেরাউন তার সৈন্যদের দ্বারা ঠিক তদ্রূপ নিজ সাম্রাজ্যকে মজবুত রেখেছিল।

খ. এর দ্বারা ফেরাউনের সেনাবাহিনীর বিপুলতাও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, তার সেনাবাহিনী যেখানেই অবস্থান করত তথায় চতুর্দিকে তাঁবুর লৌহ শলাকাগুলি দৃষ্টিগোচর হতো।

গ. অথবা ফেরাউন যাদেরকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করত তাদেরকে লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করে শাস্তি দিত। এ কারণে তাকে "লৌহ শলাকাধারী" বলা হয়েছে।

ঘ. অথবা, মিশরের পিরামিডকে লৌহ পেরেকের সাথে তুলনা করেও এটা বলা হতে পারে–যা হাজার হাজার বছর ধরে মিশরীয় ফেরাউন শাসকদের সৌর্যবীর্যের স্বাক্ষর বহন করে।

ফেরাউন যেসব মহিলাকে পেরেক দ্বারা শাস্তি প্রদান করেছিল : ফেরআউনের শাসনামলে এক মহিলা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। সে ছিল ফেরাউনের কোষাধ্যক্ষ হেযকীল-এর স্ত্রী। বলাবাহুল্য, হেযকীলও গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন এবং প্রায় একশত বছর তাঁর ঈমানদার হওয়ার ঘটনা গোপন করে রেখেছিলেন। হেযকীলের পত্নী ফেরাউনের কন্যার মাথার চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। একদা চুল আঁচড়ানোর সময় তাঁর হাত হতে চিরুণি মাটিতে পড়ে যায়। আর নিজ অভ্যাস বশত বলে ফেলেন 'কাফের ধ্বংস হোক'। এতদশ্রবণে ফেরআউনের তনয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করল– তুমি কি আমার বাবাকে প্রভু বলে মান না? জবাবে হেযকীল স্ত্রী বলল, না। আমার প্রভু, তোমার বাবার প্রভু এবং আসমান ও জমিনের প্রভু সে তো এক আল্লাহ। তাঁর কোনো শরিক-সমকক্ষ নেই। ফেরাউনের কন্যা এ ঘটনা সবিস্তারে ফেরাউনের কাছে বলল। ফেরআউন লোক পাঠিয়ে ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা করল। অতঃপর হেযকীলের স্ত্রীকে গ্রেফতার করে এনে একমাত্র ফেরাউনকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করতে আদেশ করল এবং আল্লাহকে অস্বীকার করতে বলল।

এ আদেশে সে অসম্মতি জানালে ফেরাউন তাঁর হস্তপদে চারটি লোহার প্রেরেক বিদ্ধ করে আটক করে রাখল এবং সাপ ও বিচ্ছু দংশনের জন্য অগণিত সাপ-বিচ্ছু তাঁর উপরে ছেড়ে দিল। আর বলল, যদি আল্লাহকে অস্বীকার না কর, তবে এভাবে দু' মাস যাবৎ শাস্তি দিতে থাকবো। হেযকীল পত্নী বলল, তুমি আমাকে সত্তর মাস শাস্তি দিলেও আমি আল্লাহকে অস্বীকার করতে পারবো না। এতে ফেরাউন আরও চটে গিয়ে হেযকীলের দুই কন্যাকে ধরে আনল। মায়ের চোখের সম্মুখে বড় মেয়েটির হৃদপিণ্ড কেটে ফেলল এবং বলল, যদি আল্লাহকে অস্বীকার না কর তাহলে ছোট শিশুটিকেও হত্যা করবো। এতেও সে নিজ ঈমানে অবিচল থাকল। যখন ছোট শিশুকে হত্যা করার মানসে তার বুকের উপর পা রাখল এবং জবাই করার মনস্থ করল তখন স্নেহশীলা মা অস্থির হয়ে পড়লেন। এমন সময় অলৌকিকভাবে শিশু কথা বলে উঠল। শিশুটি বলল, জননী! জান্নাত আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, ধৈর্যধারণ করুন, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী শীঘ্রই পাবেন। পৃথিবীতে যে চারজন দুধের শিশু (দোলনায়) কথা বলেছিল এ শিশুটি তাদের অন্যতম। তবু পাপিষ্ঠ ফেরআউন শিশুটিকে হত্যা করল। হেযকীল পত্নীও জান্নাতবাসিনী হলেন। অতঃপর ফেরআউন হেযকীলের সন্ধানে লোক পাঠাল। হেযকীল কোথায় আছে কেউ বলতে পারল না। অবশেষে এক ব্যক্তি কোনো এক পাহাড়ে তাঁকে দেখছে বলে জানালে ফেরআউন দুই ব্যক্তিকে তথায় পাঠাল। অনুচরদ্বয় হেযকীলকে তন্ময়ভাবে নামাজে রত দেখল। আর দেখল, তাঁর পিছনে হিংস্র-জীবকুল তিন সারিতে নামাজে রত রয়েছে। নামাজ শেষে হেযকীল প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, একশত বছর যাবৎ তোমার উপর ঈমান এনেছি, আর তা গোপন রেখেছি। আজ বোধ হয় আর গোপন থাকবে না। এ দুই ব্যক্তির মধ্যে যে আমার বিষয়ে গোপন রাখবে তাকে তুমি দয়া কর, আর যে প্রকাশ করবে তাকে শাস্তি দাও। অনুচরদের একজন এ সকল ঘটনা দর্শনে অভিভূত হলো ও ইসলাম গ্রহণ করল এবং সে হেযকীলের বিষয়টি গোপন করতে চাইল। অপর ব্যক্তি ফেরআউনের দরবারে গিয়ে সকল ঘটনা ফাঁস করল। ফেরআউন প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ঘটনার সাক্ষ্য হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদ করল। প্রথম ব্যক্তি অস্বীকার করল। ক্রুদ্ধ ফেরাউন ঘটনা বর্ণনাকারী ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী মনে করে শূলে চড়াল এবং হত্যা করল, আর প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে বখশিশ প্রদান করল। শূলে চড়ানোকে কেন্দ্র করেও ফেরআউনকে 'যুল আওতাদ' বলা হতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বর্ণনা করেন যে, ফেরাউন বনী ইসরাঈলের আমালিকা গোত্রের এক মহিলার পাণি গ্রহণ করে। তাঁর নাম ছিল আসিয়া বিনতে মুযাহিম। আসিয়া গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন। ফেরাউন হেযকীলের স্ত্রীর সাথে যা কিছু আচরণ করেছে তা প্রত্যক্ষ করে আসিয়া মর্মাহত হলেন। নিজে ঈমানদার বিধায় হেযকীল পত্নীর জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। এ সময় আসিয়ার কক্ষে ফেরাউন প্রবেশ করে তাঁর কাছাকাছি বসলে আসিয়া বললেন–হে ফেরআউন! তুমি তো নরাধম নিষ্ঠুর। এ

Free @ www.eilm.weebly.com

নির্দয়ভাবে হেযকীল পত্নী ও সন্তানদেরকে হত্যা করলে? তখন ফেরআউন ভাবল আসিয়ার মাথা খারাপ হয়েছে। সে আসিয়ার বাবা ও মাকে খবর দিয়ে আনল। হযরত আসিয়ার মা ও বাবা তাঁকে বুঝাল যে, পাগলামি ভালো নয়। তুমি তো আমালিকা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মেয়ে, আর তোমার স্বামী আমালিকাদের প্রভু। হযরত আসিয়া বললেন– আমি এ অপচিন্তা হতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার, ফেরাউনের এবং আসমান ও জমিনের প্রভু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কোনো শরিক নেই। অতঃপর ফেরাউন হযরত আসিয়ার উপরে নির্মম অত্যাচার করল। তাঁর হাতে ও পায়ে লোহার শলাকা বিদ্ধ করে ফেলে রাখাল। হযরত আসিয়া আল্লাহর দরবারে ফেরাউনের হাত হতে মুক্তি প্রার্থনা করল–رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ –[সূরা তাহরীম]

অতঃপর ফেরআউনের চরম অত্যাচারের মধ্যে হযরত আসিয়া জান্নতবাসিনী হলেন। হযরত আসিয়া (রা.)-কে পেরেক বিদ্ধ করার কারণেও ফেরাউনকে 'যিল আওতাদ' বলা হতে পারে। –[খাযেন]

مِرْصَادٌ-এর অর্থ : مِرْصَادٌ শব্দটি رَصْد হতে مِفْعَالٌ-এর ওজনে ইসমে আলার সীগাহ, অর্থ ঘাঁটি বা مِيْم অক্ষরটি مَصْدَرْ-এর জন্য হয়েছে। তখন অর্থ হবে– ঘাঁটিতে প্রতীক্ষা করা।

এখানে অত্যাচারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখাকে বুঝাবার জন্য ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে বসার কথা বলা হয়েছে। এটা শব্দ কয়টির ইঙ্গিতমূলক ব্যবহার। ঘাঁটি বলে এমন গোপন স্থানকে বুঝানো হয়েছে যেখানে কোনো লোক কারো অপেক্ষায় আত্মগোপন করে বসে থাকে– এ উদ্দেশ্যে যে, সে লোকটি যখনই সেখানে আসবে তখনই অতর্কিত তার উপর হামলা করবে। এ অবস্থায় যার উপর হামলা করার ইচ্ছা থাকে সে কিছুই জানতে পারে না। সে টেরই পায় না যে, তার উপর আকস্মিক আক্রমণ করা হতে পারে। সে পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত ও অসতর্ক হয়ে সে স্থান অতিক্রম করতে যায় এবং সহজেই শিকার হয়ে বসে। দুনিয়াতে যারা অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের এরূপ অবস্থাই হয়ে থাকে। আল্লাহ যে আছেন এবং তাদের কার্যকলাপ ও গতিবিধির উপর তিনি দৃষ্টি রাখছেন, সে কথা তাদের মোটেই মনে থাকে না। তারা নির্ভীক চিত্তে অন্যায়-অত্যাচার করতে থাকে। আর এমতাবস্থায় অতি আকস্মিকভাবে আল্লাহ তা'আলার আজাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিতে শুরু করে।

وَالْفَجْرِ .... الخ-এর মধ্যস্থিত শপথের জাওয়াব কি? : আল্লাহর বাণী وَالْفَجْرِ এর জাওয়াব কি এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে দ্বিমত পাওয়া যায়।

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) বলেছেন, এর جَوَابٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো "لَتُعَذَّبُنَّ يَا كُفَّارَ مَكَّةَ" হে মক্কাবাসী কাফেররা! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আজাব দেওয়া হবে। খ. আল্লামা যমখশরী (র.)-এর মতে উহ্য جَوَابِ قَسَم টি হলো "لَنُعَذِّبَنَّ الْكَافِرِيْنَ" অর্থাৎ অবশ্যই আমি কাফেরদেরকে আজাব দিব। গ. কারো কারো মতে, উহ্য جَوَابِ قَسَم হলো "اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ" অর্থাৎ অবশ্যই আপনার প্রভু ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান আছেন।

لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا-এর মধ্যে مِثْلُهَا-এর مَرْجِعْ কি? : আল্লাহর বাণী لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ-এর মধ্যস্থিত مِثْلُهَا-এর যমীরের مَرْجِعْ কি? এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

ক. هَا যমীরের مَرْجِعْ পূর্ববর্তী عَاد (শব্দটি), এমতাবস্থায় মূলবাক্য হবে لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُ عَادٍ فِي الْبِلَادِ অর্থাৎ 'আদ জাতির ন্যায় শক্তিশালী জাতি [সমকালীন] পৃথিবীতে আর সৃষ্টি করা হয়নি।

খ. অথবা, هَا যমীরটি مَدِيْنَةٌ-এর দিকে ফিরেছে। মূলত বাক্যটি হবে– لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُ مَدِيْنَةِ شَدَّادٍ فِيْ جَمِيْعِ الْبِلَادِ অর্থাৎ সাদ্দাদের শহরের ন্যায় অন্য কোনো শহর পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

গ. অথবা, উক্ত هَا যমীরের مَرْجِعْ হলো اَلْعِمَادُ মূলত বাক্যটি হবে–لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُ تِلْكَ الْعِمَادِ فِي الْبِلَادِ অর্থাৎ বিশ্বে উক্ত ইমারতসমূহের ন্যায় অন্য কোনো ইমারত তৈরি হয়নি।

Free @ www.e-ilmweebly.com

অনুবাদ :

١٥. فَأَمَّا الْإِنْسَانُ الْكَافِرُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اخْتَبَرَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَنَعَّمَهُ لا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ .

১৫. মানুষ তো কাফেরগণ এরূপ যে, যখন তাকে পরীক্ষা করেন যাচাই করেন তার প্রতিপালক সম্মানিত করে ধন-সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা ও অনুগ্রহ করে, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন

١٦. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ لا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ .

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তৎপ্রতি পরিমিত করে সংকীর্ণ করে তার উপর জীবিকা। তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অপমান করেছেন।

١٧. كَلَّا رَدْعٌ أَيْ لَيْسَ الْإِكْرَامُ بِالْغِنَى وَالْإِهَانَةُ بِالْفَقْرِ وَإِنَّمَا هُمَا بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَكُفَّارُ مَكَّةَ لَا يَتَنَبَّهُونَ لِذَلِكَ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ لَا يُحْسِنُونَ إِلَيْهِ مَعَ غِنَاهُمْ أَوْ لَا يُعْطُونَهُ حَقَّهُ مِنَ الْمِيرَاثِ .

১৭. না, কখনো নয় এটা শাসানো উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সম্মানিত করা ধনাঢ্যতা দ্বারা কিংবা অপদস্থ করা দারিদ্র্য দ্বারা নয়; বরং এগুলো আনুগত্য ও অবাধ্যতা দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। আর মক্কাবাসী কাফেরগণ এ বিষয়ে সচেতন নয়। বস্তুত তোমরা এতিমকে সম্মান করো না তাদের ধনাঢ্যতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে না। অথবা মিরাস হতে তার হক প্রদান করে না।

١٨. وَلَا تَحَاضُّونَ أَنْفُسَهُمْ وَلَا غَيْرَهُمْ عَلَى طَعَامِ إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ .

১৮. আর তারা পরস্পরে উৎসাহিত করে না নিজেকেও না এবং অন্যকেও না অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্য দানের ব্যাপারে طَعَام শব্দটি إِطْعَام অর্থে ব্যবহৃত।

١٩. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ الْمِيرَاثَ أَكْلًا لَمًّا أَيْ شَدِيدًا لِلَمِّهِمْ نَصِيبَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنَ الْمِيرَاثِ مَعَ نَصِيبِهِمْ مِنْهُ أَوْ مَعَ مَا لَهُمْ .

১৯. আর তোমরা ভক্ষণ কর উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। মিরাস সম্পদ সম্পূর্ণরূপে নিজ অংশের সাথে সকল মহিলা ও শিশুর হক সংমিশ্রিত করে আত্মসাৎ কর। অথবা নিজেরা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও এদের সম্পদের প্রতি লোভ কর।

٢٠. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا أَيْ كَثِيرًا فَلَا يُنْفِقُونَهُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْفَوْقَانِيَّةِ فِي الْأَفْعَالِ الْأَرْبَعَةِ .

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবাস তাই তা ব্যয় কর না। অপর এক কেরাতে فِعْل চতুষ্টয় تَا যোগে পঠিত হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

تُرَاثَ-এর মূল : تُرَاثَ শব্দটি মূলে وُرَاثَ ছিল। وَاو-কে تَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন– وُجَاهٌ-কে تُجَاهٌ করা হয়েছে। وَرِثَ - يَرِثُ - وِرْثًا অর্থ– উত্তরাধিকার হওয়া, পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হওয়া।

"جَمًّا"-এর অর্থ : جَمًّا শব্দটি বাবে نَصَرَ অথবা ضَرَبَ-এর মাসদার। অর্থ– অধিক বেশি, এটা সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য বস্তুর সাথে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দ হতে اَلْجَمَّةُ ব্যবহৃত হয়। অর্থ– যে স্থানে পানি একসাথে হয়। اَلْجُمُوْمُ বলা হয় অধিক পানি সম্বলিত কূপকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : হযরত মুকাতিল (রা.) বর্ণনা করেন, কুদামাহ ইবনে মাযউন নামক এক এতিম বালকের লালনপালনের ভার উমাইয়া ইবনে খালফের উপর অর্পিত হয়েছিল। উমাইয়া উক্ত এতিমকে ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করেছিল। অতঃপর كَلَّا بَلْ الخ আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

অথবা, কোনো কোনো তাফসীরকারের নিকট اِنْسَانٌ দ্বারা সাধারণ কাফের বুঝিয়েছেন। কোনো কোনো মুফাসসির فَاَمَّا الْاِنْسَانُ الخ এটা উমাইয়া ইবনে খালফ-এর উদ্দেশ্যে বলেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَاَكْرَمَهٗ : ইতঃপূর্বে পাপিষ্ঠ কাফেরদের কিছু কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে তাদের কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং মানুষের সাধারণ চারিত্রিক অবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের বিশেষত কাফেরদের জীবন দর্শন হলো সম্পূর্ণ দুনিয়ামুখি। তারা দুনিয়ার বর্তমান শান্তি ও কষ্টকেই সম্মান এবং অপমানের মাপকাঠি নির্ধারণ করে থাকে। তাদের জানা নেই যে, উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে পরীক্ষা করে থাকেন। ধন-সম্পদ দান করে তার কৃতজ্ঞতার এবং বিপদ ও দারিদ্র্যে ফেলে তার ধৈর্যের পরীক্ষা করা হয়। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরাম ও সুখ-সম্পদ আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলিল নয়। আবার এখানে অভাব-অনটন ও বিপদে থাকাও আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য হওয়ার লক্ষণ নয়; বরং আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানিই তার নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার মানদণ্ড। আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থাকলে বুঝতে হবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাজি আছেন। পক্ষান্তরে, যদি সে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আর ধন-সম্পদ পাওয়া না পাওয়া আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করেন মাত্র। সুতরাং যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা–মু'মিন তারা ধন-সম্পদ পেয়ে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে। আর যারা আল্লাহর নাফরমানি ও পাপকার্যে লিপ্ত রয়েছে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? : اَلْاِنْسَانُ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে।

১. اَلْاِنْسَانُ বলে নির্দিষ্ট দু'জন ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যেমন–হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, একজন হলো উতবা ইবনে রাবীয়া অন্যজন আবূ হুযাইফা ইবনে মুগীরা।
২. আয়াতে বর্ণিত বিশেষণে বিশেষিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই اَلْاِنْسَانُ বলে শামিল করা হয়েছে। অর্থাৎ সে হলো পরকালকে অবিশ্বাসকারী, প্রতিদান দিবস অস্বীকারকারী কাফের।

রিজিকের প্রশস্ততা ও সীমাবদ্ধতাকে পরীক্ষা বলার কারণ : মূলত অতিরিক্ত রিজিক প্রাপ্ত হওয়া এবং এতে সংকীর্ণ হওয়া উভয়টি-ই বান্দার জন্য পরীক্ষা। যখন তাকে বেশি রিজিক দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ চাচ্ছেন যে, সে কি এর শুকরিয়া আদায় করে, না কি নাফরমানি করে? আর যখন সংকীর্ণ রিজিক দেওয়া হয়, তখন তার অবস্থার পরীক্ষা এভাবে হয় যে, সে কি ধৈর্য ধারণ করে, না কি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অধৈর্য হয়ে যায়। এমনি ধরনের অন্য আয়াতে আছে– وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً

আল্লাহ বান্দাকে মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু পরে তিরস্কারও করেছেন, উভয়টির মধ্যে সামঞ্জস্য কিভাবে হবে? : আল্লাহ তা'আলা প্রথমে فَاَكْرَمَهٗ বলেছেন, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি বান্দাকে মর্যাদাবান করেছেন। পরে যখন বান্দা বলল رَبِّيْ اَكْرَمَنِ অর্থাৎ আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছে, তখন আল্লাহ এ কথার উপর তাকে তিরস্কার করেছেন। এতে বিপরীতমুখি বক্তব্য বা আচরণের আভাস পাওয়া যায়। এ বৈপরীত্যের জবাব নিম্নরূপে দেওয়া যায়–

মূলত كَلَّا শব্দ দ্বারাই বিপরীত বক্তব্য বুঝা যায়। আমরা এ كَلَّا-কে رَبِّيْ اَهَانَنِ-এর সাথে খাস করেও তো দিতে পারি, তাহলে এ বৈপরীত্য কখনো থাকতে পারে না। হ্যাঁ, যদি رَبِّيْ اَهَانَنِ এবং رَبِّيْ اَكْرَمَنِ উভয়টির সাথে মিলানো হয়, তাহলে তার জবাব নিম্নরূপ হবে–

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১. সম্ভবত رَبِّىٓ اَكْرَمَنِ বলে উক্ত ব্যক্তি কিছু পাওয়ার আশা করেছিল, তখন আল্লাহ তাকে তিরস্কার করেছেন।

২. মাল-সম্পদ পাওয়ার পূর্বেও তো ব্যক্তির জন্য অনেক নিয়ামত রয়েছে। যেমন–সুস্থ শরীর, সুস্থ মস্তিষ্ক, সাবলীল দেহ এবং ... ও মাল পাওয়ারর পূর্বেও নিয়ামতের শুকরিয়া করা দরকার ছিল। অতএব, যখন শুধু মাল পাওয়ার সময় رَبِّىٓ اَكْرَمَنِ ... শুকরিয়া আদায় করেছে, এতে বুঝা যায় যে, নিয়ামতের শুকরিয়া করা তার উদ্দেশ্য ছিল না; বরং দুনিয়াতে অধিক ধন-সম্পদ সন্তান-সন্তুতি হওয়াই তার আসল উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণেই তার তিরস্কার করা হয়েছে।

৩. দুনিয়ার নিয়ামতের প্রতি তীব্র মোহ এবং পরকালের নিয়ামত হতে বিমুখতা একথা প্রমাণ করে যে, সে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। অতএব, তিরস্কার পাওয়া তো দোষ নয়; বরং পাওনা-ই পেয়েছে। –[কাবীর]

এতিমকে সম্মান না দেওয়ার অর্থ : এতিমকে সম্মান না দেওয়ার অর্থ নিম্নরূপ–

১. তাকে দান না করা, তার প্রতি অনুগ্রহ না করা এবং অন্যকে তার ব্যাপারে উৎসাহিত না করা। যেমন, আল্লাহ বলেন– وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

২. পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা এবং তাদের সম্পদ ভক্ষণ করা। যেমন, বলা হয়েছে– تَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا

৩. তার সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিলিয়ে আত্মসাৎ করা। –[কাবীর]

لَمًّا-এর অর্থ : لَمًّا শব্দটির অর্থ হলো– অধিক একত্র করা। বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। উক্ত শব্দটির তাফসীরে কয়েকটি ... উল্লেখ করা হয়েছে–

১. ওয়াহেদী এবং কতিপয় মুফাসসির বলেন–"اَكْلًا لَّمًّا" অর্থ– شَدِيْد শক্তভাবে অর্থাৎ বেশি খাওয়া। মূলত এটা বিশ্লেষণী ... তাফসীর নয়, তাফসীর হলো لَمٌّ শব্দটি মাসদার اَكْلٌ শব্দের نَعْت হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, ইসমে ফায়েল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ "اَكْلًا لَامًّا" ক্ষুধার্ত, মনে হয় যেন তারা ক্ষুধার্ত হলে সকল কিছু ভক্ষণ করে ফেলবে।

২. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, তারা এতিমদের মাল মাত্রাধিক্যভাবে আত্মসাৎ করে বা খায়।

৩. মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছু হয় হালাল, কিছু হয় সন্দেহযুক্ত, আর কিছু হয় হারাম, অতঃপর তারা يَلُمُّ الْكُلَّ সকল কিছুকে মিলিয়ে একসাথে করে নেয় এবং খায়। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, তারা অন্যের মিরাসী সম্পদ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করে থাকে। তদানীন্তন আরব সমাজে নারী ও শিশুদেরকে মিরাস হতে বঞ্চিত করার এক সাধারণ রীতি প্রচলিত ছিল। এ ব্যাপারে তাদের এক আশ্চর্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাদের ধারণা ছিল মিরাস পাওয়ার অধিকার তো শুধু সে পুরুষদেরই রয়েছে যারা লড়াই করার ও পরিবারবর্গের সংরক্ষণ কাজের যোগ্য হবে। তা ছাড়া মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক শক্তিশালী ও অধিক প্রভাবশালী সে নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিত। আর যারা নিজেদের অংশ লাভের ক্ষমতা রাখত না তাদের ভাগের সব সম্পদ হরণ করে নিত। প্রকৃত হক, অধিকার ও কর্তব্যের কোনো মূল্য বা গুরুত্বই ছিল না তাদের দৃষ্টিতে। নিজের কর্তব্য মনে করে হকদারকে তার হক দেওয়া তা অর্জন করার কোনো শক্তি তার আছে কি নেই, সে দিকে কোনো দৃষ্টি না দিয়ে এরূপ করা তাদের মতে চরম বোকামি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ : ধন-সম্পদের মায়ায় তারা অত্যধিক কাতর। জায়েজ-নাজায়েজ ও হালাল-হারামের কোনো চিন্তা তাদের নেই। যেভাবে ও যে কোনো পন্থায়ই তারা সম্পত্তি করায়ত্ত করতে পারে, নির্বিচারে তারা তাই করে বসে। তা করতে তাদের মনে কোনোরূপ দ্বিধা-সংকোচ জাগে না। যতবেশি ধন-সম্পদই তাদের করায়ত্ত হোক না কেন তাদের অধিক পাওয়ার লোভ-লালসার আগুন নির্বাপিত হয় না।

আলোচ্য আয়াতে সম্পদের অত্যধিক মহব্বতের নিন্দা করা হয়েছে। এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মালের স্বাভাবিক মহব্বত নিন্দনীয় নয়। মালের মহব্বতের কারণ যদি দীন-ঈমান বিনষ্ট না হয়; বরং মাল যদি দীনের কল্যাণের জন্য হয়, তাহলে তা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরঞ্চ প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে– مال را گر بہر دین باشی حمول * نعم مال صالح گفتش رسول

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢١. كَلَّا رَدْعٌ لَهُمْ عَنْ ذٰلِكَ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا زُلْزِلَتْ حَتّٰى يَنْهَدِمَ كُلُّ بِنَاءٍ عَلَيْهَا وَيَنْعَدِمَ.

২১. না, এটা সঙ্গত নয় এটা তাদের প্রতি ধমক উপরোল্লিখিত কারণে। যখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে প্রকম্পিত করা হবে, ফলে এর ইমারতরাজি ধসে পড়বে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

٢٢. وَجَاءَ رَبُّكَ أَيْ أَمْرُهُ وَالْمَلَكُ أَيِ الْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا حَالٌ أَيْ مُصْطَفِّيْنَ أَوْ ذَوِيْ صُفُوْفٍ كَثِيْرَةٍ.

২২. আর যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন অর্থাৎ তাঁর আদেশ আগমন করবে আর ফেরেশতাগণও সারিবদ্ধভাবে এটা حَالٌ রূপে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সারিবদ্ধ অবস্থায়, অথবা অনেক সারিতে বিভিক্ত হয়ে।

٢٣. وَجِايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ لَا تُقَادُ بِسَبْعِيْنَ اَلْفِ زِمَامٍ كُلُّ زِمَامٍ بِاَيْدِيْ سَبْعِيْنَ اَلْفِ مَلَكٍ لَهَا زَفِيْرٌ وَتَغِيْظٌ يَوْمَئِذٍ بَدَلٌ مِنْ إِذَا وَجَوَابُهَا يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ أَيِ الْكَافِرُ مَا فَرَطَ فِيْهِ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى اِسْتِفْهَامٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ أَيْ لَا يَنْفَعُهُ تَذَكُّرُهُ ذٰلِكَ.

২৩ আর সেদিন জাহান্নাম আনীত হবে সত্তর হাজার লাগামের সাহায্যে প্রত্যেক লাগাম সত্তর হাজার ফেরেশতা টেনে আনবে। তখন এটা আগুনের লেলিহান শিখা ছড়াতে থাকবে এবং শোঁ শোঁ শব্দ করতে থাকবে। সেদিন এটা إِذَا হতে بَدَلٌ আর এর জওয়াব হলো, মানুষ উপলব্ধি করবে অর্থাৎ কাফের, যা সে সীমালঙ্ঘন ও অপরাধ করেছে। কিন্তু এ উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? এখানে اِسْتِفْهَامٌ টি نَفْيٌ অর্থে। অর্থাৎ তার এ উপলব্ধি কোনোই কাজে আসবে না।

٢٤. يَقُوْلُ مَعَ تَذَكُّرِهِ يَا لِلتَّنْبِيْهِ لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ الْخَيْرَ وَالْإِيْمَانَ لِحَيَاتِيْ الطَّيِّبَةِ فِي الْاٰخِرَةِ اَوْ وَقْتَ حَيَاتِيْ فِي الدُّنْيَا.

২৪. সে বলবে এ উপলব্ধির সাথে হায়! يَا হরফে নেদাটি تَنْبِيْه-এর জন্য আমি যদি অগ্রিম পাঠাতাম সৎকর্ম ও ঈমান আমার এ জীবনের জন্য আখেরাতের স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের জন্য, অথবা দুনিয়াতে আমার জীবিত থাকা কালীন সময়।

٢٥. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ بِكَسْرِ الذَّالِ عَذَابَهُ أَيِ اللّٰهِ اَحَدٌ أَيْ لَا يَكِلُهُ إِلٰى غَيْرِهِ.

২৫. সেদিন শাস্তি দিতে পারবে না لَا يُعَذِّبُ শব্দটি ذَالٌ বর্ণ যের যোগে তাঁর ন্যায় শাস্তি দান অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অন্য কেউই অর্থাৎ তাকে অন্য কারো প্রতি সমর্পণ করা হবে না।

٢٦. وَّ كَذَا لَا يُوْثِقُ بِكَسْرِ الثَّاءِ وَثَاقَهُ اَحَدٌ وَفِيْ قِرَاءَةٍ بِفَتْحِ الذَّالِ وَالثَّاءِ فَضَمِيْرُ عَذَابَهُ وَوَثَاقَهُ لِلْكَافِرِ وَالْمَعْنٰى لَا يُعَذَّبُ اَحَدٌ مِثْلَ تَعْذِيْبِهِ وَلَا يُوْثَقُ مِثْلَ اِيْثَاقِهِ.

২৬. আর অনুরূপ বন্ধন করতে পারবে না يُوْثِقُ শব্দটি ثَاءٌ বর্ণ যের যোগে তাঁর ন্যায় বন্ধন অন্য কেউই অপর এক কেরাতে ذَالٌ ও ثَاءٌ বর্ণ দু'টি যবর যোগে পঠিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে عَذَابَهُ ও وَثَاقَهُ-এর যমীর কাফেরের প্রতি ফিরবে। অর্থাৎ তার ন্যায় শাস্তি কেউ ভোগ করবে না এবং তার ন্যায় বন্ধনে আবদ্ধ কেউ হবে না।

٢٧. يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الْاٰمِنَةُ وَهِيَ الْمُؤْمِنَةُ .

২৭. হে প্রশান্ত চিত্ত নিরাপদ, আর তা হলো মু'মিন চিত্ত

٢٨. ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ يُقَالُ لَهَا ذٰلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ اَيْ ارْجِعِيْ اِلٰى اَمْرِهٖ وَاِرَادَتِهٖ رَاضِيَةً بِالثَّوَابِ مَّرْضِيَّةً عِنْدَ اللّٰهِ بِعَمَلِكِ اَيْ جَامِعَةً بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ وَهُمَا حَالَانِ وَيُقَالُ لَهَا فِي الْقِيَامَةِ .

২৮. তুমি প্রত্যাবর্তন করো, তোমার প্রতিপালকের প্রতি মৃত্যুর সময় তাকে এরূপ বলা হবে। অর্থাৎ তাঁর আদেশের প্রতি বা ইচ্ছার প্রতি প্রত্যাবর্তন করো সন্তুষ্ট হয়ে ছওয়াবের কারণে ও সন্তোষভাজন হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমার আমলের কল্যাণ অর্থাৎ উভয় বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায়। আর এ শব্দ দু'টি حَالٌ রূপে ব্যবহৃত। আর তাকে উদ্দেশ্য করে কিয়ামতে বলা হবে।

٢٩. فَادْخُلِيْ فِيْ جُمْلَةِ عِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ .

২৯. অন্তর্ভুক্ত হও আমার সকল বান্দাগণের মধ্যে যারা পুণ্যবান।

٣٠. وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ مَعَهُمْ .

৩০. এবং প্রবেশ করো, আমার জান্নাতে তাদের সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا : আলোচ্য আয়াত হতে কিয়ামতের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। তারা মনে করে বসেছে যে, দুনিয়াতে জীবিত থাকা অবস্থায় তারা যা ইচ্ছা করতে থাকবে। কিন্তু সে বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় কখনই আসবে না, এটা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কর্মফল তথা পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করে যে পথ তারা অবলম্বন করেছে আসলে তা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়; বরং তা একান্ত বাস্তব এবং অবশ্যই সংঘটিত হবে। আর তখন সমস্ত পৃথিবী নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

اَلدَّكُّ-এর অর্থ : ইমাম খলীল [নাহুবিদ] বলেন, اَلدَّكُّ অর্থ- প্রাচীর এবং পাহাড় ভেঙ্গে পড়া।

ইমাম মুবাররাদ বলেন, উঁচু নীচু সমান করা, এখান থেকেই ব্যবহার করা হয় دُكَّانٌ কেননা, তাতে বিছানা সমতল হয়ে থাকে অতএব, বুঝা যায় যে, জমিনের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রকারের প্রাচীর, পাহাড় এবং গাছ-পালা কিয়ামতের দিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সমান হয়ে যাবে। -[কাবীর]

وَجَاءَ رَبُّكَ অর্থ : جَاءَ رَبُّكَ -এর শাব্দিক অর্থ আপনার রব 'আসবে'। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর আসা যাওয়া ও একস্থান হতে স্থানান্তরে চলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাই এ কথাটিকে অবশ্যই রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অতএব, এর অর্থ করা হয়েছে- 'আপনার প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবেন।' এটা হতে একটি বিশেষ পরিবেশের ধারণা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। সে সময় আল্লাহর মহাক্ষমতা, নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও প্রবল প্রতাপের লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত ও পরিলক্ষিত হবে। দুনিয়ার রাজা বাদশাহের সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও রাজ পরিষদবর্গের আগমন হলে ততটা দাপট ও প্রতাপ অনুভূত হয় না, যতটা হয় দরবারে স্বয়ং বাদশাহর উপস্থিত হওয়ার কারণে, এখানে ঠিক সে পরিবেশই তুলে ধরা হয়েছে।

جَاءَ رَبُّكَ-এর মধ্যে মুযাফ এটাও হতে পারে, যেমন- جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ অর্থাৎ যেদিন আল্লাহর হুকুম হবে। -[রূহুল মা'আনী]

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- এ রকম আয়াত বা আয়াতাংশকে 'মুতাশাবিহাত' বলা হয়। সেদিন স্বয়ং আল্লাহ অসবেন এবং ফেরেশতাগণ দলে দলে উপস্থিত হবেন। সুতরাং তাঁর আগমনের অর্থ আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়, আল্লাহই বেশি জানেন। -[বয়ান]

এ ছাড়া ইমাম রাযী (র.) আরো কয়েক ধরনের مُضَافٌ উহ্য রেখে অর্থ দেখিয়েছেন। যেমন-

جَاءَ قَهْرُ رَبِّكَ অর্থাৎ তোমার রবের শাস্তি অথবা ক্রোধ আসবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অথবা, وَجَاءَ جَلَائِلُ آيَاتِ رَبِّكَ-তোমার রবের বড় বড় নিদর্শন আসবে।

অথবা, আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করতে হবে যে, زَالَتِ الشُّبْهَةُ অর্থাৎ সকল সন্দেহ দূরীভূত হবে

অথবা, رَبُّ অর্থ مُرَبِّيْ ঐ মুরুব্বী হলো একজন বড় ফেরেশ্‌তা তিনি আসবেন। -[কাবীর]

صَفًّا صَفًّا-এর অর্থ এবং ই'রাব : صَفًّا صَفًّا শব্দদ্বয় حَالٌ হিসেবে মানসূব হয়েছে, অর্থ হলো- সারিবদ্ধভাবে হযরত আতা' বলেন, এখানে ফেরেশতাদের কাতার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক আসমানবাসীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাতার হবে ইমাম যাহহাক বলেন, প্রত্যেক আকাশবাসীগণ যখন অবতরণ করবে তখন তারা সাত কাতারে সারা পৃথিবী জুড়ে অবতরণ করবে

-[ফাতহুল কাদীর]

উল্লেখ্য যে, হাশরের মাঠের বাম দিকে দোজখ থাকবে। যখন বিশ্ববাসী দোজখকে দেখবে তখন এদিক-সেদিক পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু তাদের চতুর্দিকে সাত কাতার ফেরেশতাদেরকে যখন দণ্ডয়মান দেখবে। তখন বাধ্য হয়ে যে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল সে সে দিকে ফিরে আসবে। -[নূরুল কোরআন]

وَجَايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ-এর অর্থ : جَايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ-এর মর্মার্থ কোনো কোনো তাফসীরকাবের নিকট জাহান্নাম সকল লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে নিজের স্থান হতে টেনে মানুষের সামনে আনয়ন করা হবে। একে টানার জন্য সত্তর হাজার রশি হবে, প্রত্যেকটি রশি সত্তর হাজার ফেরেশতা টানবে। আর আরশের বাম দিকে রাখা হবে। এর কঠিন ও ভয়াবহ শব্দ হবে। অতঃপর স্বস্থানে চলে যাবে। -[রূহুল মা'আনী, কাবীর]

يَوْمَئِذٍ .... لَهُ الذِّكْرٰى-এর অর্থ : এর দু'টি অর্থ হতে পারে-

১. সেদিন মানুষ দুনিয়ার কাজকর্ম স্মরণ করবে, যা সেদিন সেখানে করে এসেছে; তা স্মরণ করে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে, কিন্তু তা স্মরণ করে লজ্জিত বা অনুতপ্ত হওয়ায় কি লাভ?

২. সে দিন মানুষের হুঁশ জ্ঞান ফিরে আসবে, শিক্ষা লাভ করবে। সে বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ঠিক কথা ছিল। সত্য ও নির্ভুল ছিল এবং তাদের কথা অমান্য করে সে মহাবোকামি করেছে: কিন্তু তখন হুঁশ হলে, শিক্ষা গ্রহণ করলে এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলেও কোনো লাভ হবে না। উক্ত আয়াতে উমাইয়া ইবনে খালফের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তার কঠিন কুফরির কারণে কঠিন শাস্তি হবে। কিন্তু হুকুম সাধারণ কাফেরদের জন্যও প্রযোজ্য।

-[খাযেন]

يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ আয়াতের অর্থ : উক্ত আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে-

১. হায়! আমি যদি অস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করার সময় কিছু ভালো কাজ করে এ স্থায়ী জীবনের জন্য আগাম পাঠাতাম।

২. দোজখবাসীদের এমন অবস্থা হবে যে, মনে হয় সে জীবন্ত নয়। তখন সে বলবে, হায়! এমন কাজ করে যদি আগাম পাঠাতাম যা আমাকে অগ্নি থেকে নাজাত দিত, যাতে আমি আজকে জীবন্তদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম। -[কাবীর]

'তার আজাবের মতো আজাব কেউ দিতে পারবে না' আল্লাহ ছাড়া কেউ কি আজাব দিবে? : আল্লাহ ছাড়া পরকালে অন্য কেউ আজাব দিবে না, দিবার মতো কেউ নেই, তাহলে কিভাবে বলা হলো যে, তার আজাবের মতো কেউ আজাব দিতে পারবে না। বুঝা যায় যে, অন্য কেউ কিছু কম আজাব দিতে পারবে। এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেওয়া যায়-

ক. মূলত আয়াতের অর্থ এভাবে হবে যে, لَا يُعَذِّبُ اَحَدٌ فِى الدُّنْيَا عَذَابَ اللّٰهِ الْكَافِرَ يَوْمَئِذٍ আল্লাহ আখেরাতে কাফেরকে শাস্তি দিবেন সে শাস্তির মতো এ দুনিয়াতে কেউ কাউকে শাস্তি দিয়ে দেখাতে পারবে না, কারও শক্তি হবে না। অতএব, আখেরাতে কেউ শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

খ. অথবা, অর্থ এভাবে হবে যে, لَا يَتَوَلّٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ اللّٰهِ اَحَدٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেউ আল্লাহর দেওয়া আজাবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। কেননা সেদিন তিনিই হবেন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। -[কাবীর]

গ. অথবা, عَذَابَهُ-এর সর্বনাম اِنْسَانٌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তখন অর্থ হবে মানুষকে আল্লাহর ন্যায় কেউই শাস্তি দিতে পারবে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

... يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতের শানে নুযূল : যাহ্‌হাক ও জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন– রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি 'রুমা' কূপ ক্রয় করে জনকল্যাণের জন্য মিঠা পানির ব্যবস্থা করবে, আল্লাহ তার সকল অপরাধ-ত্রুটি মার্জনা করবেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) কূপটি ক্রয় করলেন। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি কি এ কূপটি সর্বসাধারণের ভোগ-ব্যবহারের জন্য দান করবেন? ওসমান (রা.) বললেন– জি-হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ওসমান (রা.) প্রসঙ্গে يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে উক্ত আয়াত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, অথবা হাবীব আদী, অথবা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মা'আলিম ও খাযেন গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াত সকল মু'মিন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[লোবাব, খাযেন, মা'আলিম]

প্রশান্ত আত্মা সম্পর্কে আশ্চর্যজনক ঘটনা : হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তায়েফে মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর জানাজায় শরিক হয়েছিলম। দেখলাম একটি পাখি উড়ে এসে তাঁর কফিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এরূপ আকৃতির পাখি আমি কখনো দেখিনি। অতঃপর কফিন হতে পাখিটিকে উড়ে যেতে দেখিনি। সমাধিস্থ করার পর তাঁর কবর হতে এক অদৃশ্য আওয়াজ উত্থিত হলো– يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –[নূরুল কোরআন]

নফসের শ্রেণীবিভাগ : মানুষের নফস বা আত্মাকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. اَلْاَمَّارَةُ এটা কাফের বদকারের আত্মা। তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে দুনিয়াকে ভোগ করে।

২. اَللَّوَّامَةُ এটা পাপী মু'মিনের আত্মা-তারা পাপ করে এবং অনুতপ্ত হয়।

৩. اَلْمُطْمَئِنَّةُ এটা নবী রাসূলগণের আত্মা-যারা আল্লাহকে স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, সৎকর্মশীল মু'মিনগণের আত্মাও এর অন্তর্ভুক্ত।

اِلٰى رَبِّكِ -এর মর্মার্থ : মুফাস্‌সিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং (ক) কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো اِلٰى اَمْرِ رَبِّكِ অর্থাৎ তোমার প্রভুর নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। (খ) কারো মতে, এর অর্থ হলো "اِلٰى اِرَادَةِ رَبِّكِ" তোমার রবের ইচ্ছার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। (গ) কারো মতে এর মর্মার্থ হলো "اِلٰى رَحْمَةِ رَبِّكِ" অর্থাৎ তোমার প্রভুর রহমতের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।'

তার প্রশান্তি ও নিশ্চয়তার জন্য এ কথাগুলো বারংবার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বলা হবে– যাতে সে অস্থির না হয়।

قَوْلُهُ "فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ الخ : ইবনে আবী হাতেম হযরত বোরায়দা (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত হামযা (রা.) সম্পর্কে আর যাহ্‌হাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাজিল হযেছে হযরত ওসমান গনী (রা.) সম্পর্কে।

ইবনে মারদুবিয়া আবূ নাঈম হযরত সাইদ ইবনে জোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে আমি এ আয়াত তেলাওয়াত করলাম, হযরত আবূ বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন এটি অত্যন্ত বড় সুসংবাদ, তখন হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ কলেন, ফেরেশতাগণ আপনার মৃত্যুর সময় এ আয়াত পাঠ করবেন।

–[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْبَلَدِ : সূরা আল-বালাদ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াত لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ-এর اَلْبَلَدُ শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতে ২০টি আয়াত, ৮২টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে। তা ছাড়া এমন সময় এটা নাজিল হয়েছিল বলে বুঝা যায় যখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল :

১. আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ যাহমী কুরইশদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী বীর ছিল। তার গায়ে এত শক্তি ছিল যে, সে একটি আস্ত চামড়া পায়ের নিচে রেখে লোকদেরকে তা টেনে বের করার জন্য আহ্বান জানাত। লোকেরা তা টেনে হেঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, তথাপি এটা তার পায়ের নিচ হতে বের হতো না।
নবী করীম ﷺ যখন তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করল এবং বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি আমাকে যে জাহান্নামের ভয় দেখাও তার উনিশজন প্রহরীকে শায়েস্তা করার জন্য আমার বাম হাতই যথেষ্ট। আর তুমি যে জান্নাতের লোভ দেখাচ্ছ, আমি বিবাহ করে ও মেহমানদারী করে যে সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি তা তার সমানও তো হবে না। তার অনুরূপ বক্তব্যের ব্যাপারে আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, আবূ জাহলের বর্বরোচিত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. কেউ কেউ বলেন, এটা হারিছ ইবনে আমেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

৫. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এরামবাসী 'আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ শুনার পর নবী করীম ﷺ-কে মক্কার মুশরিকরা বলল, তুমি তোমার আল্লাহকে বল, তিনি যেন আমাদের উপরও 'আদ ও ছামূদ জাতির ন্যায় আজাব নাজিল করে এ শহরসহ আমাদেরকেও ধ্বংস করে দেন। তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এটা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক প্রত্যাদেশসমূহের অন্যতম এবং অনেকের মতে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়াতের প্রথম বছরই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এ সূরার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। এ সূরায় বহুলাংশে সৎকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমাংশে ভূমিকা স্বরূপ সৎকর্মের তথা দুঃখ-কষ্টের এবং মানুষের উপর আল্লাহর দানের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরিশিষ্টে দুষ্কর্ম ও সৎকর্মের প্রতিফলের উল্লেখ রয়েছে।

এ সূরাতে একটি অনেক বড় বক্তব্যকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন এ ক্ষুদ্রকায় সূরাটির মধ্যে অতীব মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ ও মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক মর্যাদা বা হিসাবটা কি তা বুঝানোই হলো এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লাভের দু'টি পথই খুলে দিয়েছেন। আর সে পথে চলার উপায়-উপকরণও দিয়েছেন। মানুষ কল্যাণের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে, না অকল্যাণের পথে চলে অশুভ পরিণতি লাভ করবে, তা তার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। এ দুনিয়া মানুষের জন্য কোনো নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান নয়; বরং কঠোর পরিশ্রম করে পরকালের জন্য কিছু উপার্জনের স্থান। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সূরার প্রথমে মক্কা নগরে নবী করীম ﷺ-এর উপর আপতিত বিপদাপদ এবং গোটা আদম সন্তানের সঠিক অবস্থা পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর মানুষের একটা ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মানুষ মনে করে যে, সে যা কিছু নিশ্চিন্তে করছে তার কোনো হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে না। তার উপর কোনো শক্তিমান ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না, কোন পথে অর্থ উপার্জন করল আর কোন পথে ব্যয় করল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, আমি মানুষকে উপলব্ধি করার পন্থা ও যোগ্যতা দিয়েছি। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয় পথই তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে– সৌভাগ্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম, আর দুর্ভাগ্যের পথ মোহময় ও আকর্ষণীয়। মানুষ স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে দুভাগ্যের পথকে বেছে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত হয়।

উপসংহারে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যমণ্ডিত উচ্চতর পথ নির্দেশ করেছেন। লোক দেখানো কার্যকলাপ ও অহংকারমূলক অর্থ ব্যয় পরিহার করে এতিম-মিসকিনের সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা এবং ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ধৈর্য সহকারে সমাজ গঠন করাই সৌভাগ্যের পথ। আর এর বিপরীতটা হলো দুর্ভাগ্য বা জাহান্নামের পথ।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-বালাদ মক্কায় অবতীর্ণ

عِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২০ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَآ زَائِدَةٌ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ.

১. শপথ করতেছি لا অতিরিক্ত এ নগরীর মক্কা নগরীর।

٢. وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ حِلٌّ حَلَالٌ بِهٰذَا الْبَلَدِ بِأَنْ يَّحِلَّ لَكَ فَتُقَاتِلَ فِيْهِ وَقَدْ أُنْجِزَ لَهُ هٰذَا الْوَعْدُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمُقْسَمِ بِهٖ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ.

২. আর তুমি হে মুহাম্মদ যুদ্ধ বৈধতাকারী حِلٌّ শব্দটি حَلَالٌ অর্থে ব্যবহৃত এ নগরীতে এভাবে যে, তোমার জন্য এতে যুদ্ধ করা হালাল হবে এবং তুমি এতে যুদ্ধ করবে। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর সাথে এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল। এ বাক্যটি مُقْسَمٌ بِهٖ ও তার مَعْطُوْف-এর মাঝখানে মু'তারেযা বাক্য।

٣. وَوَالِدٍ اَىْ اٰدَمَ وَمَا وَلَدَ اَىْ ذُرِّيَّتَهٗ وَمَا بِمَعْنٰى مَنْ

৩. আর শপথ জন্মদাতার অর্থাৎ আদম (আ.)-এর আর যা সে জন্ম দান করেছে অর্থাৎ তার বংশধর। এখানে مَا অব্যয়টি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত।

٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَىِ الْجِنْسَ فِىْ كَبَدٍ نَصَبٍ وَشِدَّةٍ يُكَابِدُ مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَشَدَائِدَ الْاٰخِرَةِ.

৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ এর শ্রেণিকে ক্লেশের মধ্যে দুঃখ, কষ্ট যেহেতু সে দুনিয়ার বিপদাপদ ও আখেরাতের দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হবে।

٥. اَيَحْسَبُ اَىْ اَيَظُنُّ الْاِنْسَانُ قَوِىُّ قُرَيْشٍ وَهُوَ اَبُو الْاَشَدِّ بْنُ كَلْدَةَ بِقُوَّتِهٖ اَنْ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيْلَةِ وَاسْمُهَا مَحْذُوْفٌ اَىْ اَنَّهٗ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ وَاللّٰهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ.

৫. সে কি ধারণা করে অর্থাৎ কুরাইশদের মধ্যে শক্তিমান পুরুষ আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ তার শক্তির অহমিকা বশে মনে করে (যে,) اَنْ অব্যয়টি মুছাক্কালা হতে মুখাফ্ফাফা, এর ইসম উহ্য অর্থাৎ اَنَّهٗ কেউ তার উপর ক্ষমতাবান হবে না অথচ আল্লাহ তা'আলা তার উপর ক্ষমতাবান।

٦. يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ عَلٰى عَدَاوَةِ مُحَمَّدٍ مَالًا لُّبَدًا كَثِيْرًا بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ.

৬. সে বলে, আমি নিঃশেষ করেছি মুহাম্মদের শত্রুতায় প্রচুর অর্থ অনেক সম্পদ একের পর এক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. اَيَحْسَبُ اَنْ اَىْ اَنَّهُ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ فِيْمَا اَنْفَقَهُ فَيَعْلَمَ قَدْرَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِقَدْرِهِ وَاَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَتَكَثَّرُ بِهِ وَمُجَازِيْهِ عَلٰى فِعْلِهِ السَّيِّءِ .

৭. সে কি মনে করে যে, اَنْ শব্দটি اَنَّ অর্থে তাকে কেউ দেখেনি? তার সে ব্যয় করাকে যে, সে এর পরিমাণ জানাতে চায়। অথচ আল্লাহ তার পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। আর এ সম্পর্কেও তিনি জ্ঞাত আছেন যে, তা অধিক নয়। আর আল্লাহ তার এ মন্দকাজের প্রতিফল অবশ্যই দান করবেন।

٨. اَلَمْ نَجْعَلْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَىْ جَعَلْنَا لَهُ عَيْنَيْنِ .

৮. আমি কি সৃষ্টি করিনি? এটা اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِىْ তথা সাব্যস্তকরণার্থে প্রশ্নবোধক অর্থাৎ আমি সৃষ্টি করেছি। তার জন্য দু'টি চক্ষু।

٩. وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ .

৯. আর জিহ্বা ও দু'টি ওষ্ঠ?

١٠. وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ بَيَّنَّا لَهُ طَرِيْقَىِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

১০. আর আমি কি তাকে দু'টি পথই প্রদর্শন করিনি? তার জন্য ভালো ও মন্দ উভয় পথ বর্ণনা করেছি।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَعَالٰى شَفَتَيْنِ : এ শব্দটি شَفَةٌ -এর দ্বিবচন। شَفَةٌ শব্দটি মূলত شَفْهَةٌ ছিল। هَا -কে হযফ করে شَفَةٌ করা হয়েছে, তবে تَصْغِيْر এবং جَمْع -এর সময় উক্ত هَا প্রকাশ পায়। যেমন– তার تَصْغِيْر হলো شُفَيْهَةٌ এবং جَمْع হলো شِفَاهٌ ও شَفَهَاتٌ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র : পিছনে উল্লিখিত সূরা আল-ফাজরে এমন সব কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, যেগুলোর পুরস্কার বা শাস্তি পরকালে দেওয়া হবে। বর্তমান সূরাটিতেও সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পিছনের সূরায় অধিকাংশই অসৎকার্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর বর্তমান সূরায় অধিকাংশই সৎকর্ম ও ভালো কর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার শুরুতে কতক সৎকর্মের চাহিদার বর্ণনা করা হয়েছে। আর শেষভাগে ভালোমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। –[কামালাইন]

لَا اُقْسِمُ -এর لَا এর অর্থ : لَا اُقْسِمُ -এর মধ্যকার لَا এখানে অতিরিক্ত। যেমন, কতিপয় মুফাস্সিরের অভিমত। অথবা, لَا অতিরিক্ত নয়, বরং এটা আরবদের কথা– لَا وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا অর্থাৎ 'না-আল্লাহর কসম আমি অবশ্যই এরূপ করবো'-এর মতো। তখন অর্থ হবে لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ اِذَا لَمْ تَكُنْ فِيْهِ অর্থাৎ আপনি যখন এ মক্কা শহরে না থাকবেন, আমি তা দ্বারা কসম করবো না। কারো মতে لَا দ্বারা তাদের কথা এবং বক্তব্যের প্রতিবাদ করা উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে– তোমরা তো পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছ, এটা সঠিক নয়, বরং আমি এ শহরের কসম করে বলছি যে, তা ঘটবেই। আবার কারো মতে অর্থ এই হবে যে, সামনে যে বিষয় বর্ণনা করা হবে তা নিশ্চিত সত্য ও বাস্তব হওয়ার কারণে সে সম্পর্কে শপথ করারই প্রয়োজন নেই। শপথ ছাড়াই সামনের কথাগুলো বাস্তব সত্য। –[কুরতুবী]

بلد দ্বারা উদ্দেশ্য এবং তার ফজিলত : সমস্ত মুফাস্‌সির একথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, بَلَدْ বলে بَلَد حَرَامْ তথা মক্কা শহরকে বুঝানো হয়েছে। মক্কা শহরের ফজিলত সকল মানুষের কাছে সু-পরিচিত।

১. আল্লাহ তা'আলা মক্কা শহরকে সম্মানিত ও নিরাপদ করেছেন। যেমন তিনি মক্কার মসজিদের ব্যাপারে বলেছেন- وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

২. তিনি তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মানুষের কিবলা নির্ধারণ করেছেন, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

৩. তথায় অবস্থিত মাকামে ইবরাহীমের মর্যাদা দিয়ে বলেছেন, وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى

৪. মানুষকে তার হজ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

৫. তথায় শিকার নিষিদ্ধ করেছেন।

৬. তার পার্শ্বে বাইতুল মা'মূর-কে রেখেছেন।

৭. তার নিচ হতে দুনিয়া প্রসারিত করেছেন। -[কাবীর]

৮. এখানেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ পবিত্র বাইতুল্লাহ নির্মিত হয়েছে।

৯. সকল নবীর পদচারণা এ স্থানে হয়েছে।

১০. এ স্থানের কা'বা শরীফে এক রাকাত নামাজ একলক্ষ রাকাতের সমান ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ : আল্লাহ তা'আলা মহানবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, "আপনি এ শহরে হালাল" মুফাস্‌সিরগণ এটার একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন-

ক. اَنْتَ مُقِيْمٌ بِهٰذَا الْبَلَدِ অর্থাৎ আপনি এ শহরে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আর আপনার এ অবস্থানের কারণে এ শহরের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য অনেক বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

খ. দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এ শহরটি যদিও 'হেরেম' কিন্তু একটি সময় এমন আসবে যখন কিছু সময়ের জন্য এখানে যুদ্ধ করা ও দীনের শত্রুদের হত্যা করা, রক্তপাত করা আপনার জন্য হালাল করে দেওয়া হবে।

গ. এর তৃতীয় অর্থ হলো- "اَنْتَ غَيْرُ مُرْتَكِبٍ فِىْ هٰذَا الْبَلَدِ مَا يُحَرَّمُ" অর্থাৎ আপনার জন্য যা এ শহরে করা হারাম তা আপনি কখনো করবেন না।

ঘ. চতুর্থ অর্থ এই যে, এ শহরটির হেরেম হওয়ার কারণে এখানে বন্য জন্তু হত্যা করা ও গাছ, ঘাস কাটা পর্যন্ত আরববাসীদের নিকট হারাম, সকলের জন্যই এখানে নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হে নবী! এখানে আপনার জন্য কোনো নিরাপত্তা নেই। আপনাকে হত্যা করার জন্য এখানকার লোকেরা সব ব্যবস্থা গ্রহণকে নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ হালাল করে নিয়েছে।

ঙ. অথবা, এর অর্থ এই যে, মক্কা শহরে আপনার জন্য কাউকে হত্যা করা বা শাস্তি প্রদান করা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে এখানে কাউকে হত্যা করতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমা করেও দিতে পারেন। সুতরাং মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার গেলাফ জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে খাত্তালকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আবূ সুফিয়ানের ঘরকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছিলেন। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ) -[কবীর]

জনক ও সন্তান দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের দ্বারা শপথের কারণ? : وَلَدْ ও وَالِدْ-এর দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের দ্বারা শপথ করার কারণ কি? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

১. وَالِد-এর দ্বারা হযরত আদম (আ.) এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা তার সন্তানাদি উদ্দেশ্য। এটাই জমহুরের মত। আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.)ও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার কারণে তাদের শপথ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ" আর আমি আদম জাতিকে সম্মানিত করেছি।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, وَالِدْ-এর দ্বারা জন্মদানকারী ও مَا وَلَدَ-এর দ্বারা যে জন্ম দেয় না তাকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারো কারো মতে, তা দ্বারা সকল পিতা ও সন্তান উদ্দেশ্য।

৪. وَالِدٌ-এর দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-কে এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। ইতঃপূর্বে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছিল। আর এখানে এটার নির্মাতা ও অধিবাসীর শপথ করা হয়েছে।

৫. وَالِدٌ-এর দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা তাঁর সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

৬. অথবা, وَالِدٌ দ্বারা হযরত নূহ (আ.) -কে এবং مَا وَلَدَ-এর দ্বারা তাঁর সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। -[কাবীর]

৭. ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন, এখানে وَالِدٌ দ্বারা নবী করীম ﷺ আর وَلَدٌ দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ -[নূরুল কোরআন]

নবী করীম ﷺ -এর সান্ত্বনা : কাফির কুরাইশগণ যখন বলেছিল- এরাম শহরের 'আ'দ ও ছামূদ জাতির মতো আল্লাহ আমাদেরকেও এ মক্কা নগরীর সাথে ধ্বংস করে ফেলুক, তাহলে আমরা বুঝবো যে, তুমি সত্যবাদী নবী। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র মক্কা নগরীর শপথ করে বলছেন- হে নবী ﷺ! যেহেতু আপনি এ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রিয় নবী ইবরাহীম (আ.) এ নগরীর জন্য দোয়া করেছেন। আর আমি তাকে মুসলিম উম্মার কিবলারূপে মনোনীত করেছি; সেহেতু কাফিরদের কথায় আমি কখনো এ নগরীকে ধ্বংস করবো না; বরং তারা যত অন্যায়-অত্যাচারই করুক না কেন, অদূর ভবিষ্যতে আমি আপনাকে এ নগরীর বৈধ অধিকারী করে দিবো। আপনি সকল বাধা-বিঘ্ন মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নগরে অবস্থান করতে পারবেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মক্কা বিজয়ের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী।

فِىْ كَبَدٍ-এর অর্থ : كَبَدٌ অর্থ- পেটব্যথা, কষ্ট, কঠোরতা। সুতরাং فِىْ كَبَدٍ অর্থ হবে- কষ্ট নির্ভর করে বানিয়েছি। বাক্যটি পূর্ববর্তী শপথ বাক্যগুলোর জবাব। কষ্টনির্ভর কথাটির তাৎপর্য এই যে, মানুষকে পৃথিবীতে শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য তৈরি করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ পৃথিবী তার শ্রম, কষ্ট ও কঠোরতা ভোগ করার স্থান। এখানে প্রত্যেক মানুষকেই তা ভোগ করতে হয়। এ মক্কা নগরীরও কোনো এক প্রিয় বান্দার প্রাণপাতের বিনিময়ই আজ তা আরব জাতির এমনকি সারাবিশ্ব মুসলিমের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছে, মানুষকে মায়ের গর্ভে স্থান লাভ করা হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি পদে পদে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। যত শক্তিশালী ও বিত্তবান লোকই দেখা যাক না কেন, সেও যখন মায়ের গর্ভে ছিল, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল, প্রসবকালে জীবনের দারুণ ঝুঁকি ছিল। শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বাধক্য পর্যন্ত তাকে বহু প্রকারের দৈহিক পরিবর্তন গ্রহণ করতে হয়েছে। একটা স্তরেও ভুল পরিবর্তন হলে তার প্রাণ অবশ্যই বিপন্ন হয়ে পড়ত। পার্থিব কি পারলৌকিক প্রতিটি সাফল্যের জন্য মানুষকে এমন নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছে যে, সে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার জন্য অবলীলাক্রমে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। রাজা-বাদশা হয়েও সে পরিতৃপ্ত ও আশঙ্কামুক্ত নয়, আরও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, নিরাপত্তার জন্য সে দিবারাত্রি অতৃপ্ত ও শঙ্কিত আত্মা নিয়ে কঠোর দুঃখ ও পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথি (র.) বলেছেন, كَبَدٌ শব্দের অর্থ সে আমানত বহনের কষ্ট যা বহন করতে আসমান, জমিন, পাহাড়-পর্বত অস্বীকৃতি জানিয়েছে- আর মানুষ তা বহন করেছে। যদি মানুষ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তবে তার জীবন সাধনা হবে সার্থক, সে হবে সাফল্যমণ্ডিত। আর যে এ দায়িত্ব পালন করবে না, সে ইহ ও পরকাল উভয় জগতে ধ্বংস হবে। -[নূরুল কোরআন]

لُبَدٌ শব্দের বিশ্লেষণ : لُبَدٌ শব্দটি বহুবচন, একবচনে لُبْدَةٌ কারো মতে لُبَدٌ শব্দটিই একবচন। ইমাম লাইছ (র.) বলেন, لُبَدٌ বলা হয় এমন অধিক সম্পদকে যা আধিক্যের কারণে ধ্বংস হওয়ার ভয় থাকে না। কারো মতে শুধু অধিক সম্পদকে لُبَدٌ বলা হয়।

কাফের -এর اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا বলার কারণ : اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا-এর শাব্দিক অর্থ- 'আমি স্তূপ পরিমাণ ধন-সম্পদ ধ্বংস করেছি, খরচ করেছি বলা হয়নি। এটা হতে বুঝা যায় যে, যে লোক এ কথাটি বলেছে, নিজের ধন-সম্পদের গৌরবে তার বুক স্ফীত। এত খরচ করেছে-তাও তার মোট সম্পদের একটা সামান্য অংশ। তাই সে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করে না। আর অপচয় এ জন্য বলা হয়েছে যে, সে সৎ বা কল্যাণকর কোনো কাজে এ সম্পদ ব্যয় করেনি। আরবের কাফেরগণ অর্থ-বৈভবের প্রদর্শনীতে, স্তুতি গায়ক কবি সাহিত্যিকদের পুরস্কার দানে, বিবাহ-শাদি মেজবানীতে, জুয়া খেলায়, আনন্দ-মেলা ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ অপচয়

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

করত। এক গোত্রপতি অন্য গোত্রপতির সাথে জাঁকজমক, গণভোজ ও দান-দক্ষিণার প্রতিযোগিতা করত। এর ফলে এক এক জনের প্রশংসায় কবিতা ও গান রচিত হতো এবং জনসমাবেশে পঠিত হতো, এ জন্য সে নিজেও অন্যের নিকট গৌরব প্রকাশ করত। এটাই অত্র আয়াতের স্তূপ বা রাশি রাশি ধন-সম্পদ উড়ানোর পটভূমি।

কারো মতে সে কাফের বলবে যে, আমি তো মুহাম্মদের বিরোধিতায় অনেক ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন, সে যে তার ধন-সম্পদ ব্যয়ের কথা বলে বেড়ায়- সে কি জানে না যে, তার সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই অবহিত আছেন এবং তিনি তাকে তার মন্দকাজের প্রতিফল (শাস্তি) অবশ্যই প্রদান করবেন।

হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন- اَيَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرَهُ يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيْمَ اَنْفَقَهُ

অর্থাৎ সে কি মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখেনি? সে কোথা হতে কিভাবে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

ইমাম কালবী (র.) বলেন-

كَانَ كَاذِبًا لَمْ يُنْفِقْ شَيْئًا فَقَالَ اللّٰهُ اَيَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مَا رَاٰى ذٰلِكَ مِنْهُ فَعَلَ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ اَنْفَقَ اَوْ لَمْ يُنْفِقْ بَلْ رَاٰهُ وَعَلِمَ مِنْهُ خِلَافَ مَا قَالَ

অর্থাৎ [সে দাবি করেছে যে, সে বহু সম্পদ ব্যয় করেছে।] সে মূলত মিথ্যাবাদী সে কিছুই ব্যয় করেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে কি ধারণা করেছে যে, সে কি করেছে বা করেনি, ব্যয় করেছে, কি করেনি-তা আল্লাহ তা'আলা জানেন না। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তা ভালো করেই জানেন যে, সে যা দাবি করেছে প্রকৃত ঘটনা তার বিপরীত।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ : আমি মানুষের সম্মুখে ভালো ও মন্দের দু'টি পথই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি। সুতরাং এখন যেটি সে গ্রহণ করতে চায় করুক।

অর্থাৎ আমি মানুষকে কেবল চিন্তা ও বিবেকশক্তি দান করেই ক্ষান্ত হইনি এবং এর দ্বারা নিজের জীবনের পথ নিজে তালাশ করে নেওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং আমিই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছি। ভালো-মন্দ, নেকী-বদী, সৎ-অসৎ উভয় পথই তাকে স্পষ্ট করে দিয়েছি। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে-চিন্তে ও বুঝে শুনে নিজের দায়িত্বে যে পথ ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। সূরা দাহারে এ কথাটিই নিম্নোক্ত ভাষায় বলা হয়েছে- "আমি মানুষকে এক মিশ্রিত শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্টি করেছি। তার পরীক্ষা নেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ ও দর্শনশক্তি সম্পন্ন বানিয়েছি। তাকে পথ দেখিয়েছি। হয় সে শোকর আদায়কারী হবে, কিংবা হবে কুফরপন্থি।"

ইমাম যাহহাক (র.) -এর মতে, এখানে اَلنَّجْدَيْنِ-এর দ্বারা দু'টি স্তনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা মায়ের দু'টি স্তন সন্তানের জীবন রক্ষায় ও তার রিজিকের জন্য দু'টি প্রধান রাস্তার মতো কাজ করে। -[নূরুল কোরআন]

اَلنَّجْدَيْنِ -এর অর্থ : اَلنَّجْدَيْنِ শব্দটি اَلنَّجْدُ-এর দ্বিবচন। اَلنَّجْدُ অর্থ- اَلطَّرِيْقُ فِي ارْتِفَاعٍ তথা উঁচু রাস্তা। অত্র আয়াতে দুই রাস্তা বলতে ভালো-মন্দের দু'দিককে বুঝানো হয়েছে। ইমাম যাহহাকের মতে اَلنَّجْدَيْنِ বলে এখানে দু'টি স্তনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, মায়ের দু'টি স্তন সন্তানের জীবন রক্ষা ও তার রিজিকের জন্য দু'টি প্রধান রাস্তার মতো কাজ করে। বহুবচনে نُجُوْدٌ ব্যবহৃত হয়। نَجْد (নজদ)-কে নজদ এ কারণেই বলা হয় যে, তা মক্কা, হেজাজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে উঁচু।

-[ফাতহুল কাদীর, কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١١. فَلَا فَهَلَّا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ جَاوَزَهَا .

১১. তবে সে তো فَلَا শব্দটি فَهَلَّا অর্থে বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করেনি অতিক্রম করেনি।

١٢. وَمَا أَدْرَاكَ أَعْلَمَكَ مَا الْعَقَبَةُ الَّتِي يَقْتَحِمُهَا تَعْظِيمٌ لِشَأْنِهَا وَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ وَبَيَّنَ سَبَبَ جَوَازِهَا بِقَوْلِهِ .

১২. তুমি কি জান? তোমার কি জ্ঞান আছে বন্ধুর গিরিপথ কি যাকে সে দুরাতিক্রম্য মনে করে। এটা দ্বারা বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। আর এটা একটি মু'তারেযা বাক্য। আর তা অতিক্রমের উপায় বর্ণনা করে ইরশাদ হয়েছে।

١٣. فَكُّ رَقَبَةٍ مِنَ الرِّقِّ بِأَنْ أَعْتَقَهَا .

১৩. দাস মুক্তকরণ দাসত্ব হতে, তাকে আজাদ করে দেওয়ার মাধ্যমে।

١٤. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ مَجَاعَةٍ .

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান করা ক্ষুধা দারিদ্র্যের দিনে।

١٥. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ قَرَابَةٍ .

১৫. এতিম আত্মীয়-স্বজনকে আত্মীয় مَقْرَبَةٍ শব্দটি قَرَابَةٍ অর্থে।

١٦. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ أَيْ لُصُوقٍ بِالتُّرَابِ لِفَقْرِهِ وَفِي قِرَاءَةٍ بَدَلَ الْفِعْلَيْنِ مَصْدَرَانِ مَرْفُوعَانِ مُضَافُ الْأَوَّلِ لِرَقَبَةٍ وَيُنَوَّنُ الثَّانِي فَيُقَدَّرُ قَبْلَ الْعَقَبَةِ اِقْتِحَامٌ وَالْقِرَاءَةُ الْمَذْكُورَةُ بَيَانُهُ .

১৬. কিংবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত নিঃস্ব ব্যক্তিকে যে অভাব-অনটনের কারণে মাটিতে পড়ে থাকে। অপর এক কেরাতে উভয় فِعْل-এর স্থলে উভয়টি مَصْدَر مَرْفُوْع রূপে পঠিত হয়েছে। প্রথম مَصْدَرْ অর্থাৎ فَكٌّ শব্দটি رَقَبَةٍ এর প্রতি مُضَافٌ আর দ্বিতীয় مَصْدَرْ অর্থাৎ إِطْعَامٌ তানবীনযুক্ত। সে হিসাবে عَقَبَةٍ শব্দের পূর্বে إِقْتِحَام উহ্য গণ্য করা হবে। আর উল্লিখিত কেরাত তার বিবরণ হবে।

١٧. ثُمَّ كَانَ عَطْفٌ عَلَى اِقْتَحَمَ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ وَالْمَعْنَى كَانَ وَقْتَ الْاِقْتِحَامِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ الرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ .

১৭. তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া এটা اِقْتَحَمَ-এর প্রতি عَطْف আর ثُمَّ অব্যয়টি ধারাবাহিকতার জন্য অর্থাৎ كَانَ وَقْتُ الْاِقْتِحَامِ অতিক্রমকালে অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং তারা পরস্পরকে উপদেশ দান করে অর্থাৎ একে অন্যকে উপদেশ দান করে ধৈর্যধারণ করার আনুগত্য ও গুনাহ হতে বাঁচার ক্ষেত্রে। আর তারা পরস্পর উপদেশ দান করে অনুগ্রহ প্রদর্শনের সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করার।

١٨. أُولَئِكَ الْمَوْصُوفُونَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ الْيَمِينِ .

১৮. তারাই উল্লিখিত বিশেষণের অধিকারীগণ সৌভাগ্যবান দক্ষিণপন্থি مَيْمَنَة শব্দটি يَمِيْن অর্থে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ الشِّمَالِ. ১৯. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগা বামপন্থি।

٢٠. عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ بِالْهَمْزَةِ وَبِالْوَاوِ بَدَلَهُ مُطْبَقَةٌ. ২০. তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত থাকবে مُؤْصَدَة শব্দটি هَمْزَة-এর সাথে বা তৎপরিবর্তে وَاوْ-এর সাথে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ স্তরে স্তরে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَقَبَة-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : عَقَبَة অর্থ হলো- দুর্গম ও বন্ধুর গিরিপথ। এটা একবচন, বহুবচনে عِقَابٌ ও عَقَبٌ হয়ে থাকে। عَقَبَة দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

১. হযরত মুজাহিদ এবং যাহ্‌হাকের মতে, এটা জাহান্নামের উপর রাখা একটি কঠিন পথ।

২. হযরত আতা (র.) -এর মতে, عَقَبَةُ جَهَنَّمَ তথা জাহান্নামের গিরিপথ উদ্দেশ্য।

৩. ইমাম কালবী (র.)-এর মতে, عَقَبَةٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ অর্থাৎ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যখানের একটি পথ।

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, عَقَبَة হলো দোজখের একটি উপত্যকার নাম।

৫. কেউ কেউ বলেছেন, عَقَبَة হলো দুর্গম বন্ধুর পথ- যা উপরের দিকে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এ পথটি অতি দুর্গম ও বন্ধুর। এ পথে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করতে হয়। এ পথের পথিককে নিজের প্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা ও শয়তানি লোভ-লালসার সাথে রীতিমতো লড়াই করে চলতে হয়।

৬. হযরত মুজাহিদ ও কালবী (র.) বলেন, এটা হলো জাহান্নামের উপর স্থাপিত অতি ধারালো চিকন সেতু। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَكُّ رَقَبَةٍ : فَكٌّ মাসদার (بَابِ نَصَرَ)-এর অর্থ হলো- বিচ্ছিন্ন করা, ছাড়িয়ে নেওয়া, মুক্ত করা ইত্যাদি رَقَبَة-এর অর্থ- ঘাড়। এখানে رقبة-এর দ্বারা দাসকে বুঝানো হয়েছে। তবে فَكُّ رَقَبَة কথাটি আরো ব্যাপক অর্থে হয়ে থাকে যেমন- গোলামী, বন্দীদশা অথবা কেসাস হতে কাউকেও মুক্ত করা। পক্ষান্তরে عِتْقُ رَقَبَة-এর অর্থ হলো- শুধু দাসকে মুক্ত করা। কখনো কখনো মুকাতাবকে মুক্ত করার জন্য যা কিছু দেওয়া হয়, তাকেও فَكُّ رَقَبَة বলে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-একদা এক বেদুঈন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন যা করলে আমি জান্নাত লাভ করতে পারবো। নবী করীম ﷺ বললেন- عِتْقُ النَّسَمَةِ وَفَكُّ الرَّقَبَةِ তখন লোকটি বলল, উভয় কথাটি কি এক হয়ে গেল না? নবী করীম ﷺ বললেন, না عِتْقُ النَّسَمَةِ হলো কোনো দাসকে মুক্ত করা, আর فَكُّ الرَّقَبَةِ হলো কোনো দাসকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য পেশ করা, যাতে সে দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্ত হতে পারে।

কারো মতে, فَكُّ رَقَبَة হলো- ঈমান, ইবাদত ও কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেকে জাহান্নাম হতে মুক্ত করা।

উত্তম رَقَبَة : হযরত আছবাগ (র.) বলেন- মূল্যবান কাফেরদাস কম মূল্যের মু'মিনদাস থেকে [মুক্ত করার সময়] উত্তম। তিনি তাঁর এ কথার স্বপক্ষে একটি হাদীস পেশ করেছেন- "........ একদা নবী করীম ﷺ দাস মুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলেন-কোন رَقَبَة উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন-"যা মূল্যের দিক থেকে অধিক দামী এবং তার মালিকের নিকট ও অধিক মূল্যবান।"

ইবনুল আরাবী (র.) বলেন- উত্তম رَقَبَة হলো মুসলিম رَقَبَة; তিনি দলিল হিসাবে مَنْ اَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا এবং مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً-কে পেশ করে থাকেন।

মূলত আছবাগের মতটি সঠিক নয়। কেননা তিনি হাদীস দ্বারা সঠিক রায় পেশ করতে পারেননি। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দাস মুক্ত করা উত্তম, না সদকা করা উত্তম ? : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট দাস মুক্ত করা সদকার চেয়ে উত্তম; কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (র.) -এর নিকট সদকা উত্তম। কুরআনুল কারীমের আয়াত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত তথা দাস মুক্ত করার ব্যাপারে বেশি প্রমাণ পেশ করে। কেননা আয়াতে সদকার পূর্বে দাসমুক্ত করার হুকুমকে আনা হয়েছে। তা ছাড়া হযরত শা'বী ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছেন–যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত খরচ রয়েছে, এখন তা সে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দিবে, না দাস কিনে মুক্ত করে দিবে–দাস মুক্ত করাই উত্তম। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– "যে ব্যক্তি কোনো দাস মুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে দোজখের আগুন হতে মুক্ত করবেন।" –[কুরতুবী, কাবির]

ذَا مَتْرَبَةٍ-এর অর্থ : ذَا مَتْرَبَةٍ অর্থ "ধূলি সম্বল" ধূলি ছাড়া যার অন্য কোনো অবলম্বন নেই। এটা একটি আরবি বাগধারা। যা দরিদ্র আর নিষ্পেষিত' অর্থ প্রকাশ করে। বাবে سَمِعَ হতে নির্গত, তা হতে تُرَابٌ শব্দটির অর্থ– মাটি। আর মিসকিনকে ذُوْمَتْرَبَةٍ বলা হয়, যে তার দরিদ্রতার কারণে জমিনের সাথে মিশে গেছে। তার উপরে নেই কোনো ছায়া-দাতা, আর নিচে নেই কোনো বসার স্থান। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একজন মিসকিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে মাটির উপর খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি-ই হলো সে ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ –[কাবীর, কুরতুবী]

ذَا مَتْرَبَةٍ-এর মর্মার্থ : ذَا অর্থ– ওয়ালা, আধিকারী আর مَتْرَبَةٌ অর্থ– মাটি। শব্দটি বাবে ضَرَبَ হতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা تُرَابٌ-এর অন্য لُغَتْ অর্থাৎ মাটিওয়ালা মিসকিন। মূলত তা একটি আরবি বাগধারা। অর্থাৎ একেবারে নিঃস্ব ও নিঃসম্বল মিসকিন [দরিদ্র]।

আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীরে লিখিয়াছেন–"اَىْ لُصُوْقٌ بِالتُّرَابِ لِفَقْرِهِ" অর্থাৎ দরিদ্রের কারণে যে মাটিতে পড়ে গেছে, মাটির সাথে মিশে গেছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একদা এক মিসকিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মাটির উপর খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রয়েছে। তখন তিনি মন্তব্য করলেন। এ ব্যক্তিই হলো সে ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ"

قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ : অর্থাৎ উপরিউক্ত গুণাবলি বিদ্যমান থাকার সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমানদার হওয়া একান্ত জরুরি। কেননা ঈমান ব্যতীত কোনো আমল নেক বলে গণ্য হতে পারে না, আল্লাহর নিকট তা গ্রহণীয় হতে পারেন। কুরআন ও হাদীসের বহুস্থানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেবল সে আমলই গণনার যোগ্য ও মুক্তির উপায় যা ঈমান সহকারে করা হবে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে–"আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক অথবা স্ত্রীলোক আর হবে সে মু'মিন, তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন-যাপন করাবো এবং এ ধরনের লোকদের অতি উত্তম আমল অনুযায়ী শুভ প্রতিফল দান করবো।"

সূরা মুমিন-এ বলা হয়েছে– "আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক কি স্ত্রীলোক, আর হবে সে মুমিন, এ ধরনের লোকেরাই জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে এবং তথায় তাদেরকে বেহিসাব রিজিক দেওয়া হবে।" মোটকথা ঈমান ছাড়া কখনও নেক আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

ثُمَّ দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমানের পূর্বের দান গ্রহণযোগ্য : একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য ঈমান পূর্বশর্ত। اِنْفَاقٌ বা আল্লাহর রাস্তার দান অথবা গরিবকে দান করার ছাওয়াব তখনই হবে যখন দাতা মুমিন হবে। ঈমানের পূর্বে দানের কোনো ছওয়াব পাওয়া যায় না; বরং ঈমানের সাথেই ইবাদত হতে হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন–وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّا اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهِ অর্থাৎ তাদের দেওয়া ধন-মাল কবুল না হওয়ার কারণ তা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরি করেছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বিশ্বনবী ﷺ-কে বলেন–ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহিলিয়া যুগে ইবনে জুদয়ান আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখত, গরিব-মিসকিনদেরকে খাওয়াত, দাস মুক্ত করত, তা কি তার কোনো উপকারে আসবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন, না। কেননা সে কোনো দিন এ কথা বলেনি যে, হে আমার রব তুমি আমাকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা করে দিও।

অতএব ثُمَّ এর অর্থ এভাবে হবে যে, فَعَلَ هٰذِهِ الْاَشْيَاءَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ بَقِيَ عَلٰى اِيْمَانِهٖ حَتّٰى الْوَفَاةِ অর্থাৎ এ সমস্ত ভালোকাজ সে মু'মিন অবস্থায় করেছে, তারপর মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অথবা, আয়াতের অর্থ এভাবে হবে যে, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاَنَّ هٰذَا نَافِعٌ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ অতঃপর তা মুমিনদের জন্য আল্লাহর নিকট লাভজনক হবে। কারো মতে ثُمَّ অর্থ এখানে وَاوْ।

অথবা, উত্তর এভাবে হতে পারে যে, উল্লেখের দিক থেকে পরে কিন্তু অস্তিত্বের দিক থেকে আগেই হবে। -[কাবীর, কুরতুবী]

দয়া ও ধৈর্যের গুরুত্ব : কুরআনে কারীমের উক্ত সংক্ষিপ্ত আয়াতে মুমিন সমাজের দু'টি বড় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি হলো, সে সমাজের ব্যক্তিরা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের প্রেরণা দেয়। আর দ্বিতীয় হলো, তারা পরস্পরকে দয়া-অনুগ্রহের প্রেরণা দেয়।

কুরআন মাজীদে صَبْر শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত মুমিনের সমগ্র জীবন-ই ধৈর্যের জীবন। ঈমানের পথে পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথেই তার ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহর ফরজ করে দেওয়া ইবাদতসমূহ সুসম্পন্ন করার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধসমূহ পালন করার জন্য ধৈর্য অপরিহার্য। আল্লাহর হারাম করা জিনিস বা কাজ হতে বিরত থাকা ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়। নৈতিক অপরাধ ও পাপ কাজসমূহ পরিহার করা এবং পবিত্র নৈতিকতা গ্রহণ ধৈর্য থাকলেই সম্ভপর হয়। পদে পদে যে পাপের আকর্ষণ ও হাতছানি, তা হতে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব এ ধৈর্যের বলেই। জীবনে এমন অনেক সময় ও সুযোগ আসে যখন আল্লাহর আইন মানতে গেলে ক্ষতি, কষ্ট, দুঃখ, বিপদ ও বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়। আর আল্লাহর নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে স্বার্থ ও সুখ-সুবিধা লাভ হবে বলে স্পষ্ট মনে হয়। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ছাড়া কোনো মু'মিনই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো দয়া ও সহানুভূতি। বস্তুত ঈমানদার সমাজ কখনো নির্মম ও পাষাণ-হৃদয় ও অত্যাচারী সমাজ হয় না; বরং তা মানবতার প্রতি দয়াশীল, করুণাময় এবং পরস্পরের প্রতি সুহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ সমাজ হয়ে থাকে। ঈমানদার লোক একজন ব্যক্তি হিসাবেও আল্লাহর দয়াশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে থাকে। আর সমাজ হিসাবেও একটি মু'মিন জন-সমষ্টি আল্লাহর সে রাসূলের প্রতিনিধির মতো।

দয়া এবং করুণার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য অনেক হাদীসের মধ্য হতে দু একটি হাদীসের উল্লেখ-ই যথেষ্ট। যেমন-

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا- (تِرْمِذِيْ)

অর্থাৎ যে লোক আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া-স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না; সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।

ডানপন্থি এবং বামপন্থি : اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ-এর শাব্দিক অর্থ 'ডান পার্শ্বের সহচরবৃন্দ'। এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাতের বিবিধ সুখ-সম্ভোগের অধিকারী যারা, তারাই ডান পার্শ্বের সহচর। এ কারণে অনুবাদে ডানপন্থি বলতে সৌভাগ্যশালী বুঝানো হয়েছে।

اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ-এর শাব্দিক অর্থ 'বাম পার্শ্বের সহচরবৃন্দ, কুরআনে কারীমের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাম পার্শ্বের সহচর বলতে-যারা জাহান্নামের বিবিধ শাস্তি ভোগ করবে, তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ জন্য অনুবাদে বামপন্থি বলতে হতভাগা বুঝানো হয়েছে।

مُؤْصَدَةٌ **শব্দে দু'টি কেরাত :** জমহুর মীমের পর وَاوْ দিয়ে পড়েছেন অর্থাৎ مُوْصَدَةٌ আর আবূ আমর, হামযা এবং হাফস (র.) মীমের পরে هَمْزَة দিয়ে مُؤْصَدَةٌ পড়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الشَّمْسِ : সূরা আশ্-শামস

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম শব্দই হলো اَلشَّمْسُ একে কেন্দ্র করেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৫টি আয়াত, ৫৪টি বাক্য এবং ২৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা তখন প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলকথা : নেকী-বদী, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বুঝানোই এ সূরার বিষয়বস্তু। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে, তাদেরকে অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

সূরাটির মূল বক্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। সূরার প্রথম হতে ১০ আয়াত পর্যন্ত প্রথম অংশ। আর ১১ আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে।

১. চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত আসমান-জমিন পরস্পর হতে ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় পরস্পর হতে ভিন্নতর এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রভাব ও ফলাফলের দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। এ দু'টি এদের বাহ্যিকরূপের দিক দিয়ে যেমন এক নয়, তেমনি তাদের ফলাফল ও পরিণতিও এক হতে পারে না।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দেহইন্দ্রিয় ও মানসশক্তি দান করে দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর করে ছেড়ে দেননি; বরং এক স্বভাবজাত প্রত্যাদেশের সাহায্যে তার অবচেতনায় পাপ-পুণ্যের পার্থক্য, ভালো-মন্দের তারতম্য এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছেন।

৩. আল্লাহ তা'আলা মানুষর মধ্যে পার্থক্য বোধ, ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যেসব শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেগুলোকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে সে নিজের মধ্যকার ভালো ও মন্দ প্রবণতাসমূহ হতে কোনোটিকে তেজস্বী করে আর কোনোটিকে দমন করে, তার উপরই তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সে যদি ভালো প্রবণতাসমূহ সমৃদ্ধ ও তেজস্বী করে এবং খারপ প্রবণতা হতে নিজেকে মুক্ত রাখে, তাহলে সে প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে এবং খারাপ প্রবণতাসমূহকে তেজস্বী করে, তবে তার অকল্যাণ ও ব্যর্থতা অনিবার্য।

সূরাটির দ্বিতীয় অংশে ছামূদ জাতির ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করে রেসালাত ও নবুয়তের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ভালো ও মন্দ পর্যায়ে মানব প্রকৃতিতে রক্ষিত ও গচ্ছিত ইলহামী জ্ঞানই নিজ স্বভাবে মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়, তাকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে না পারার দরুন মানুষ ভালো ও মন্দ পর্যায়ে ভুল দর্শন ও মানদণ্ড নিরূপণ করে পথভ্রষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ স্বভাবজ্জাত ইলহামের সাহায্যের জন্য নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ওহী নাজিল করেছেন। তাঁরা পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দকে লোকদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন। দুনিয়াতে নবী রাসূলগণকে পাঠানোর এটাই মূল উদ্দেশ্য। ছামূদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আ.)-কে এ ধরনেরই একজন নবী করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে জাতি ও জনগণ নিজেদের নফসের দোষযুক্ত ভাবধারায় ডুবে গিয়ে এমনভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যে, তারা এ নবীকে সত্য বলে মানল না। তাদের দাবি অনুযায়ী একটি উষ্ট্রীকে যখন তিনি মু'জিযারূপে তাদের সম্মুখে পেশ করলেন, তখন তাদেরকে সতর্ক করা সত্ত্বেও উক্ত জাতির দুষ্টতম ব্যক্তি জাতির ইচ্ছানুযায়ী তাকে হত্যা করে দিল। তারই ফলে শেষ পর্যন্ত গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হলো।

ছামূদ জাতির দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা হযরত সালেহ (আ.)-এর জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, মক্কায় তখন ঠিক অনুরূপ অবস্থায়ই উদ্ভব হয়েছিল। এ কারণে সে অবস্থায় এ কাহিনী শুনানো স্বতঃই মক্কাবাসীকে একথা বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল যে, ছামূদ জাতির এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তাদের উপর পুরোপুরি খাটিয়ে যাচ্ছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ وَالشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আশ-শামস মক্কায় অবতীর্ণ

خَمْسَ عَشَرَةَ اٰيَةً : ১৫ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ضَوْءُهَا .

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের আলোর।

٢. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا تَبِعَهَا طَالِعًا عِنْدَ غُرُوْبِهَا .

২. আর শপথ চন্দ্রের যখন তা তার অনুগামী হয় তার অস্তগমনের পর পরবর্তী আগমনকারী হিসাবে উদিত হয়

٣. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا بِارْتِفَاعِهِ .

৩. আর শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে সমুচ্চ হয়ে।

٤. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا يُغَطِّيْهَا بِظُلْمَتِهِ وَإِذَا فِى الثَّلٰثَةِ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا فِعْلُ الْقَسَمِ .

৪. আর শপথ রজনীর, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে তাকে স্বীয় অন্ধকারে ঢেকে ফেলে। إِذَا অব্যয়টি তিন স্থানেই ظَرْفِيَّتْ-এর জন্য আর فِعْل قَسَم তন্মধ্যে عَامِلْ।

٥. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا .

৫. আর শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন

٦. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا بَسَطَهَا .

৬. আর শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন বিছিয়ে দিয়েছেন।

٧. وَنَفْسٍ بِمَعْنٰى نُفُوْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فِى الْخِلْقَةِ وَمَا فِى الثَّلَاثَةِ مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ بِمَعْنٰى مَنْ .

৭. আর শপথ আত্মার অর্থাৎ আত্মাসমূহের এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন সৃষ্টিতে। আর مَا অব্যয়টি তিন স্থানেই مَصْدَرِيَّه অথবা مَنْ অর্থে।

٨. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا بَيَّنَ طَرِيْقَيِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَأَخَّرَ التَّقْوٰى رِعَايَةً لِرُؤُوْسِ الْاٰيِ وَجَوَابُ الْقَسَمِ .

৮. অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন ভালো ও মন্দ উভয় পথ প্রদর্শন করেছেন আর আয়াতের সামঞ্জস্যতার জন্য تَقْوٰى-কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াত উল্লিখিত শপথের জওয়াব।

٩. قَدْ أَفْلَحَ حُذِفَتْ مِنْهُ اللَّامُ لِطُوْلِ الْكَلَامِ مَنْ زَكّٰهَا طَهَّرَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ .

৯. সে-ই সফলকাম হবে এখানে বক্তব্য দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কায় لَمْ বিলুপ্ত করা হয়েছে। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে গুনাহ হতে পবিত্র করবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

১০. وَقَدْ خَابَ خَسِرَ مَنْ دَسّٰهَا اَخْفَاهُ بِالْمَعْصِيَةِ وَاَصْلُهُ دَسَّسَهَا اُبْدِلَتِ السِّيْنُ الثَّانِيَةُ اَلِفًا تَخْفِيْفًا.

১০. আর সে-ই ব্যর্থ হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে গুনাহের দ্বারা আচ্ছাদিত করবে دَسّٰهَا শব্দটি মূলত دَسَّسَهَا ছিল। দ্বিতীয় س টিকে সহজকরণার্থে আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

র্ব সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় ঈমান ও নেককাজ এবং কুফর ও বদকাজের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছিল। অত্র রায়ও ছামূদ জাতির কুফর ও আল্লাহদ্রোহীতার উল্লেখ করে মক্কার কুরাইশদেরকে তাদের কুফর-শিরক ও আল্লাহদ্রোহীতার অশুভ রিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا আয়াতে ضُحٰى দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আয়াত "وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا" -এর মধ্যে ضُحٰى দ্বারা কি ঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে আলিমগণের বিভিন্ন মতামত দেখা যায়–

. হযরত মুকাতিল (র.)-এর মতে, ضُحٰى অর্থ– সূর্যের তাপ।

. ইমাম কালবী (র.) ও মুজাহিদের মতে, ضُحٰى অর্থ– সূর্যরশ্মি।

). হযরত কাতাদাহ (র.), ইবনে কুতাইবা (র.) ও ফাররা (র.) প্রমুখগণের মতে, ضُحٰى দ্বারা এখানে পূর্ণ দিবসকে বুঝানো হয়েছে।

. ইবনে জারীর (র.) বলেছেন–আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা সূর্য এবং দিনের শপথ করেছেন। –[নূরুল কোরআন]

. কারো কারো মতে, এখানে ضُحٰى দ্বারা সূর্যের রশ্মি ও তাপ উভয়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরবি ভাষায় ضُحٰى বলতে সে সময়কে বুঝায় যখন সকালবেলা সূর্য অনেকটা উপরে উঠে এবং তার কিরণ প্রখর হয়। কারণ তা তখন শুধু আলোই বিতরণ করে না; বরং উত্তাপও দেয়। –[কাবীর]

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا আয়াতে تَلٰهَا-এর মর্মার্থ : আয়াত وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا -এর মধ্যে تَلٰهَا -এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মতামত নিম্নরূপ–

ক. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন– "تَبِعَهَا طَالِعًا عِنْدَ غُرُوْبِهَا" অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় চন্দ্র উদিত হয়ে তাকে অনুসরণ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এরূপ বর্ণিত আছে।

খ. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, চান্দ্র সূর্যকে অনুসরণ করার অর্থ হলো এটা সূর্য হতে আলো গ্রহণ করে।

গ. হযরত কাতাদাহ ও কালবী (র.) -এর মতে, এটা দ্বারা চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখের কথা বলা হয়েছে। কেননা প্রথম তারিখে চন্দ্র সূর্যাস্তের পর পরই উদিত হয়।

ঘ. ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, চন্দ্র যখন গোল হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌছে তখন সে সূর্যের ন্যায় আলো দিতে থাকে। এখানে সে সময়ের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা আলো প্রদানে তা (এ সময়ে) সূর্যের অনুসরণ করে। উল্লেখ্য যে, تَلَا يَتْلُوْ বাবে نَصَرَ হতে ব্যবহৃত। এটার অর্থ হলো– কারো পিছু গমন করা, কারো অনুসরণ করা।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا : আয়াতের অর্থ– দিনের শপথ যখন তা সমুজ্জ হয়ে তাকে প্রকাশ করে। আলোচ্য আয়াতে جَلّٰهَا-এর هَا -এর مَرْجِعْ কি হবে এবং এর মর্মার্থ কি হবে–এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. কারো কারো মতে, هَا -এর مَرْجِعْ হবে اَلشَّمْسِ। অর্থাৎ দিনের শপথ যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, هَا -এর مَرْجِعْ হবে اَلْاَرْضِ অর্থাৎ দিবস জমিনকে প্রকাশ করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

গ. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, مَا-এর مَرْجِعْ হলো اَلدُّنْيَا অর্থাৎ দিবস (সমগ্র) দুনিয়াকে প্রকাশ করে।

ঘ. অথবা, مَا-এর مَرْجِعْ হলো ظُلْمَةٌ অর্থাৎ দিবস অন্ধকারকে আলোকিত করে।

ঙ. অথবা, আয়াতটির মর্মার্থ এই যে, عَلٰى مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ حَيْوَانِهَا حَتّٰى ظَهَرَ لِاسْتِتَارِهٖ لَيْلًا وَانْتِشَارِهٖ نَهَارًا অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাণীকুল যেহেতু রাতের বেলায় লুকিয়ে থাকে এবং দিবাভাগে আত্মপ্রকাশ করে সেহেতু যেন দিন তাদেরকে প্রকাশ করে।

উল্লেখ্য যে, উপরে কতিপয় ক্ষেত্রে مَرْجِعْ উল্লেখের পূর্বেই ضَمِيْر উল্লেখের কথা বলা হয়েছে- এটা দূষণীয় নয়, কেননা আরবি ভাষায় এরূপ প্রচলন রয়েছে। -[কুরতুবী, কবীর]

مَا-এর অর্থ : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতে যথাক্রমে مَا بَنٰهَا، مَا طَحٰهَا এবং مَا سَوّٰهَا-এর مَا শব্দটি مَصْدَرْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন তার অর্থ হবে-আকাশমণ্ডল ও তাকে নির্মাণ করার শপথ, পৃথিবী এবং তার বিস্তৃর্ণ হওয়ার শপথ, মানুষ এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার শপথ; কিন্তু পরবর্তী বাক্য এ অর্থের সাথে সামঞ্জস্য হয় না। অতএব, অন্যান্য তাফসীরকার এ مَا-কে مَنْ বা اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা অর্থ করেন- যিনি আকাশমণ্ডল নির্মাণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিক। প্রশ্ন হতে পারে যে, আরবি ভাষায় 'مَا' শব্দটি তো কেবল নিষ্প্রাণ বস্তুর ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জবাবে বলা যায় যে, এরূপ প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানেই مَا শব্দটি مَنْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ-এর স্থলে مَنْ বা اَلَّذِىْ অর্থে مَا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمَنْ بَنَاهَا না বলে وَمَا بَنَاهَا বলার কারণ : পবিত্র কুরআনে কোনো কোনো স্থানে مَنْ-এর স্থলে مَا-এর ব্যবহার দেখা যায়। এটা অপ্রতুল হলেও ভাষাগত দিক থেকে ভুল নয়। যেমন, অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ এখানে مَنْ نَكَحَ হওয়া দরকার ছিল।

অথবা, এখানে تَفْخِيْم شَان-এর জন্য وَصْف-কে বুঝানো হয়েছে। যেন এভাবে বলা হয়েছে যে, وَالْقَادِرُ الْعَظِيْمُ الشَّانِ الَّذِىْ بَنَاهَا -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

نَفْس-এর অর্থ : নফস বলতে কতিপয় তাফসীরকারক আকৃতিগত মানুষ বা মানুষের দেহ বুঝাচ্ছেন। অর্থাৎ শপথ মানুষের আর যিনি মানুষকে এমন সুঠাম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। আত্মার সুঠামতা বা সুবিন্যস্ততা বলতে ধীশক্তি-কথা বলা, কানে শোনা, চোখে দেখা ও চিন্তাশক্তিকে বুঝাচ্ছেন। নফস অর্থ আত্মা বললে মানুষের সাথে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত হয়। আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, প্রত্যেক প্রত্যক্ষ বস্তুরই শপথ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ বস্তু হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব, নফস বলতে আত্মা না হয়ে দেহ বিশিষ্ট মানুষই অর্থ করা বেশি যুক্তিযুক্ত।' -[খাযেন, মা'আলিম]

سَوّٰهَا-এর অর্থ : سَوّٰى শব্দটি تَسْوِيَةٌ হতে নির্গত। تَسْوِيَةٌ অর্থ- সুবিন্যস্ত করা। অর্থাৎ তাকে একটি দেহ দান করা হয়েছে। দেহের এ একহারা গঠন, হাত-পা ও মগজের সবকিছুই মানুষের মতো জীবন যাপনের জন্য উপযোগী। তাকে দেখার, শোনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য যে ইন্দ্রিয়শক্তি দেওয়া হয়েছে তা তার আনুপাতিকতা ও নিজস্ব বিশেষত্বের প্রেক্ষিতে মানুষের জন্য জ্ঞানার্জনের সর্বোত্তম উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। তাকে চিন্তা ও বিবেকশক্তি, যুক্তি প্রয়োগ ও মর্মগ্রহণ, কল্পনাশক্তি, স্মরণশক্তি, পার্থক্যবোধ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য সকল শক্তি স্বাভাবিকভাবে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মানুষকে-জন্মগত পাপী নয়; বরং সঠিক প্রকৃতিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তার দৈহিক গঠন ও অঙ্গ সজ্জায় এমন কোনো সৃষ্টিগত বক্রতা রেখে দেওয়া হয়নি, যার কারণে সে ইচ্ছা করলেও সঠিক, সোজা ও ঋজু পথ গ্রহণ করতে পারে না। কুরআনুল কারীমের ভাষা হলো- فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ- كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُنَصِّرَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ -[কাবীর]

অর্থাৎ প্রত্যেক সন্তানই 'ফিতরাত' তথা ইসলামের অনুসারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তার পিতামাতাই তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকে পরিণত করে।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا আয়াতে اِلْهَامٌ-এর মর্মার্থ : اِلْهَامٌ শব্দটির মূল হলো لَهْمٌ-এর অর্থ- গলাধঃকরণ করা। আরবি কথা لَهِمَ الشَّىْءَ وَالْتَهَمَهٗ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি এ জিনিসটি গিলে ফেলেছে, গলাধঃকরণ করেছে। এ মৌল শাব্দিক অর্থের প্রেক্ষিতে শব্দটি আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো ধারণা কল্পনা বা চিন্তাকে অচেতনভাবে বান্দার মন ও মগজে বদ্ধমূল করে দেওয়া

Free @ www.e-ilm.weebly.com

বুঝানোর জন্য একটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মানব প্রকৃতিতে তার পাপ ও পুণ্য এবং সতর্কতা ইলহাম করার অর্থ দু'টি- একটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকালেই মানুষের প্রকৃতিতে পাপ-পুণ্য উভয়ের প্রবণতা ও ঝোঁক রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের অবচেতনায় আল্লাহ তা'আলা এ ধারণা ও বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছেন যে, নৈতিক চরিত্রে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বলতে একটি কথা আছে : আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধ জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়েছেন। এ কথাটি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টিকে তার মর্যাদা ও স্বরূপ অনুযায়ী স্বভাবজাত ইলহাম দিয়েছেন। সূরা ত্বা-হায় এ কথাটি বলা হয়েছে এ ভাষায় اَلَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی 'তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার সৃষ্টিগত দেহ সংগঠন দান করেছেন এবং পরে পথ প্রদর্শন করেছেন, জীব-জন্তুর সকল জাতি ও প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মাছ নিজেই সাঁতার কাটার, পাখি উড়তে পারার, মৌমাছি মৌচাক রচনার, আর বাবুই পাখি বাসোপযোগী বাসা তৈরি করার জ্ঞান পেয়ে থাকে এ স্বভাবজাত ইলহামী জ্ঞান হতে। মানুষকেও তার বিভিন্ন মর্যাদা ও দায়িত্ব হিসাবে আলাদা আলাদা ধরনের ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ একাধারে একটি জীব সত্তা, এক বিবেক সম্পন্ন সত্তা এবং এক নৈতিক সত্তাও বটে। এ তিনটি সত্তার চাহিদা অনুযায়ী যা দরকার তা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইলহামের মাধ্যমে দান করেছেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ যে সকল শপথ করেছেন তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে উক্ত আয়াতদ্বয়। এখানে লক্ষণীয় যে, উপরে আল্লাহ তা'আলা কতিপয় বিপরীতধর্মী বস্তুর শপথ করেছেন। যেমন–চন্দ্র-সূর্য, রাত্রি-দিবস, আসমান-জমিন ইত্যাদি। এ সব বিশ্ব প্রকৃতির সাহায্যে-প্রমাণ পেশ করার পর মানুষের নিজের সত্তাকে পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে অত্যন্ত ভারসাম্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তার স্বভাবে পাপ ও পুণ্য দুই ধরনের গুণই ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে যদি পাপ হতে স্বীয় নফসকে পবিত্র করে পুণ্যকে প্রাধান্য দেয়, তাহলেই সে সফলকাম হবে।

تَزْكِيَةٌ : এর অর্থ হলো পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ, উৎকর্ষ সাধন ও ক্রম বিকাশ বিধান। এর মর্মার্থ এই যে, যে লোক নিজের সত্তাকে পাপ হতে পবিত্র রাখবে, তাকে উৎকর্ষ দান করে তাকওয়ার সুউচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং তাকে ভালো ও কল্যাণের ক্রমবিকাশ দান করতে থাকবে, সে কল্যাণ লাভ করবে। পক্ষান্তরে تَدْسِيَةٌ-এর অর্থ হলো– দমন করা, গোপন করা, লুকিয়ে রাখা, হরণ-অপহরণ করা এবং পথভ্রষ্ট করা, অর্থাৎ যে লোক নিজের নফস বা সত্তায় অবস্থিত ভালো প্রবণতাসমূহকে উৎকর্ষ ও বিকাশ দানের পরিবর্তে তাকে দমন করবে, তাকে বিভ্রান্ত করে খারাপ প্রবণতার দিকে পরিচালিত করবে এবং পাপ, লিপ্সা ও খারাপ প্রবণতাকে অতিশয় শক্তিশালী বানাবে সে লোক অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

কসমের জবাব : সূরার প্রথম থেকে কয়েকটি কসমের উল্লেখ রয়েছে। এ কসমগুলোর জবাব সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়, কারো মতে জবাব হলো, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا তবে এ বক্তব্যের উপর একটি প্রশ্ন জাগে যে, যদি তা কসমের জবাব হয় তাহলে لَقَدْ اَفْلَحَ হওয়া দরকার ছিল। তার উত্তরে ইমাম যুজাজ (র.) বলেন, لَامْ -কে হযফ করা হয়েছে। কেননা বক্তব্য অনেক দীর্ঘ হয়েছে। এ দীর্ঘ বক্তব্যই لَامْ-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

কারো মতে জবাব উহ্য রয়েছে, তা হলো لَتُبْعَثُنَّ

অথবা لَيُدَمْدِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰی اَهْلِ مَكَّةَ لِتَكْذِيْبِهِمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا دَمْدَمَ عَلٰی ثَمُوْدَ لِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا صَالِحًا

কারো মতে এখানে বাক্যকে আগে পরে নিতে হবে। উহ্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। তখন বাক্য এভাবে হবে যে, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا –[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

١١. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ رَسُوْلَهَا صَالِحًا بِطَغْوٰهَا بِسَبَبِ طُغْيَانِهَا ـ

١٢. إِذَا انْبَعَثَ أَسْرَعَ أَشْقٰهَا وَاسْمُهُ قُدَارُ إِلَى عَقْرِ النَّاقَةِ بِرِضَاهُمْ ـ

١٣. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَالِحٌ نَاقَةَ اللّٰهِ أَيْ ذَرُوْهَا وَسُقْيٰهَا وَشُرْبَهَا فِيْ يَوْمِهَا وَكَانَ لَهَا يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمٌ ـ

١٤. فَكَذَّبُوْهُ فِيْ قَوْلِهِ ذٰلِكَ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ نُزُوْلُ الْعَذَابِ بِهِمْ إِنْ خَالَفُوْهُ فَعَقَرُوْهَا قَتَلُوْهَا لِيَسْلَمَ لَهُمْ مَاءُ شُرْبِهَا فَدَمْدَمَ أَطْبَقَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ الْعَذَابَ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا أَيِ الدَّمْدَمَةَ عَلَيْهِمْ أَيْ عَمَّهُمْ بِهَا فَلَمْ يَفْلِتْ مِنْهُمْ أَحَدًا ـ

١٥. وَلَا بِالْوَاوِ وَالْفَاءِ يَخَافُ تَعَالٰى عُقْبٰهَا تَبِعَتَهَا ـ

অনুবাদ :

১১. অসত্যারোপ করেছিল ছামূদ সম্প্রদায় তাদের রাসূল সালেহ (আ.)-কে অবাধ্যতা বশত নিজেদের অবাধ্যতার কারণে।

১২. যখন তৎপর হয়েছিল তড়িঘড়ি উদ্যোগ গ্রহণ করল তাদের মধ্য হতে সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তার নাম কুদার, সে তার সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টিকল্পে উক্ত উষ্ট্রীকে হত্যা করতে উদ্যোগী হলো।

১৩. তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর রাসূল সালেহ (আ.) বলল, আল্লাহর উষ্ট্রী অর্থাৎ তাকে স্ব-অবস্থায় থাকতে দাও। এবং তার পানি পান করার বিষয়ে সাবধান হও অর্থাৎ তার জন্য নির্ধারিত দিনে তাকে পানি পান করতে দাও। আর তাদের জন্য একদিন ও তার জন্য একদিন নির্দিষ্ট ছিল।

১৪. তারা রাসূলকে মিথ্যারোপ করল তাঁর এ বক্তব্য যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এবং তারা যদি তাতে অন্যথা করে তবে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে। এবং তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল পানিকে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল। অনন্তর অবতীর্ণ করলেন ঘনীভূত করলেন তাদের উপর তাদের প্রতিপালক শাস্তি তাদের-ই গুনাহের কারণে এবং তাকে সর্বব্যাপী করলেন অর্থাৎ তাদের শস্তি অবতারণাকে। মোদ্দাকথা, তাদের উপর সর্বব্যাপী আজাব নাজিল হয়, ফলে তাদের মধ্য হতে কেউই বাঁচতে পারেনি।

১৫. আর তিনি শব্দটি وَاوٌ ও فَا যোগে উভয় কেরাতে পঠিত ভয় করেননি আল্লাহ তা'আলা তার পরিণাম ফলাফল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে ছামূদ সম্প্রদায়ের উল্লেখের তাৎপর্য : ইতঃপূর্বে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নফসের প্রতি ফুজূর ও তাকওয়ার ইলহাম করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, ফুজূর ও তাকওয়ার এ ইলহামী জ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় বিস্তারিত হেদায়েত লাভ করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী ও রাসূলগণকে বিস্তারিত হেদায়েত দান করেছেন। এ ছাড়া ফুজূর ও তাকওয়া এ দু'টির অনিবার্য ফল ও পরিণতি হলো শাস্তি ও শুভ প্রতিদান। নফসকে ফুজূর হতে পবিত্র করা ও তাকওয়া দ্বারা এর উৎকর্ষ সাধন করার ফল হলো কল্যাণ ও সাফল্য। আর নফসের ভালো প্রবণতাসমূহকে দমন করে একে পাপের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার নিশ্চিত পরিণতি হলো ব্যর্থতা ও বিপর্যয়।

এ কথাটি বুঝানোর জন্য একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। আর সে জন্য ছামূদ জাতিকে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে এ ছামূদ জাতির এলাকাই মক্কাবাসীদের অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। উত্তর হেজাজে এ জাতির ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি বর্তমান ছিল। মক্কাবাসীরা সিরিয়ার দিকে বাণিজ্যিক সফর উপলক্ষে এ এলাকার নিকট দিয়ে যাতায়াত করত। ইসলাম পূর্বকালীন আরবি কাব্যে এ জাতির উল্লেখ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই আরববাসীদের মধ্যে এ জাতির কথা সাধারণ পরিচয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হতো।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ছামূদ জাতির সংক্ষিপ্ত কাহিনী : ছামূদ ছিল সাম ইবনে নূহ-এর বংশধর। ছামূদের নামেই এ জাতির নামকরণ। উত্তর-পশ্চিম আরবের 'আল-হাজার' নামক এলাকায় তারা ছিল খুব শক্তিমান জাতি। তারা পাহাড় খোদাই করে বাড়িঘর নির্মাণ করত। তারা নিজেদের ধন-প্রাচুর্যে ও জ্ঞান-গরিমায় মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। লৌহের তৈরি প্রতিমা পূজা করত এবং নানা প্রকার পাপাচার ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত থাকত। তাদের হেদায়েতের জন্য তাদেরই বংশোদ্ভূত হযরত সালেহ (আ.) -কে আল্লাহ নবী রূপে পাঠালেন। নবী তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং নবীকে মিথ্যারোপ করে কোনো নিদর্শন দেখাতে বলে। হযরত সালেহ (আ.) -এর নবুয়তের মু'জিযা হিসাবে আল্লাহ পাথরের মধ্য হতে একটি জীবন্ত উষ্ট্রী তৈরি করে দেন। এ ঘটনা দেখে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত সালেহ (আ.) বললেন– এটা আল্লাহর উষ্ট্রী, সে নিজ ইচ্ছামতো যেখানে-সেখানে চরে বেড়াবে। একদিন সব পানি তার জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। আর তোমরা তার কোনো ক্ষতি করলে শক্ত আজাব নাজিল হবে। ছামূদদের মধ্যে কুদার নামক এক সর্দার উষ্ট্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল এবং তার পা কেটে মেরে ফেলল। এ অপরাধের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তাদের উপর আজাব নাজিল হলো। এক বিকট বজ্রধ্বনিতে তারা নিজ নিজ গৃহে মরে গেল।

بِطَغْوَاهَا-এর মর্মার্থ : بِطَغْوَاهَا-এর মর্মার্থের ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেছেন।

ক. জমহুরের মতে তার অর্থ হলো بِطُغْيَانِهَا অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানিতে সীমালঙ্ঘন করা। হযরত কাতাদাহ ও মুজাহিদ (র.)ও এ মত পোষণ করেছেন।

খ. মুহাম্মদ কা'আব ও একদল মুফাস্সিরে মতে بِطَغْوَاهَا অর্থ اَیْ بِاَجْمَعِهَا অর্থাৎ তারা সকলেই (মিথ্যারোপ করেছে)।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– بِطَغْوٰهَا-এর অর্থ হলো, "بِعَذَابِهَا الَّذِیْ وُعِدَتْ بِهٖ" অর্থাৎ যে আজাবের ওয়াদা করা হয়েছিল, সে আজাবকে তারা অস্বীকার করেছে।

ঘ. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন– "بِسَبَبِ طُغْيَانِهَا" অর্থাৎ তারা সীমালঙ্ঘন করার কারণে হযরত সালেহ (আ.) -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

কে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করেছে? : উষ্ট্রীটিকে কে হত্যা করেছে এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়–

১. জমহুর মুফাস্সিরগণের মতে ছামূদদের সর্দার পাপিষ্ঠ নরাধম কুদার ইবনে সালিফ উহাকে হত্যা করেছে।

২. কেউ কেউ বলেছেন কুদার সহ এক দল লোক উক্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে কওমের লোকদের সমর্থন ও সাহায্যতায় কুদার উক্ত উষ্ট্রীকে হত্যা করেছিল।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ -এর মধ্যে رَسُوْل দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? : فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ-এর মধ্যে রাসূল দ্বারা সর্বসম্মতভাবে হযরত সালেহ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।

نَاقَةَ اللّٰهِ-এর মহল্লে ই'রাব কি এবং তার মর্মার্থ কি? : نَاقَةَ اللّٰهِ মহল্লান মানসূব হয়েছে। কেননা এটা تَحْذِيْر হয়েছে। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ হবে–উষ্ট্রীটিকে হত্যা করা হতে বিরত থাক, উহাকে পানি পান করতে বাধা দিও না। যেমন–اَلْاَسَدَ اَلْاَسَدَ এবং اَلصَّبِیَّ اَلصَّبِیَّ বলা হয়ে থাকে।

دَمْدَمَ-এর অর্থ :

১. دَمْدَمَ-এর অর্থ নিয়ে মুফাসসিরীনের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কারো মতে, دَمْدَمَ অর্থ তাদের উপর চতুর্দিক হতে আজাব এসে পড়েছে।

২. কারো মতে, কোনো দাফনকৃত বস্তুকে مَدْمُوْم বলা হয়। অর্থাৎ তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়েছে যে, জমিন সমান করা হয়েছে। আর তাদের লাশ সে জমিনের নিচে পড়ে গেছে।

৩. অথবা, دَمْدَمَ অর্থ غَضِبَ অর্থাৎ دَمْدَمَةٌ বলা হয় ঐ কথাকে যা দ্বারা অন্যকে শাসানো বা ধমকানো হয়। –[কাবীর]

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا-এর অর্থ : এ বাক্যের দু'টি অর্থ–

১. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো নন। তারা কোনো জাতি বা দলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার পরিণতি ও ফলাফল শতবার চিন্তা করে; কিন্তু আল্লাহর ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও সর্বোচ্চ। ছামূদ জাতির ন্যায় অন্য কোনো শক্তি আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত এ পদক্ষেপের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠতে পারে, অথবা পশ্চাদ্ধাবন করতে পারে–এমন কোনো ভয় আল্লাহর নেই।

২. অথবা, لَا يَخَافُ-এর فَاعِلْ হযরত 'সালেহ' (আ.)। অর্থাৎ সালেহ (আ.) এ আজাবের শেষ পরিণতি সম্পর্কে কোনো ভয় করেন না। –[কাবীর]

৩. ইমাম কালবী ও সুদ্দী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উষ্ট্রীকে হত্যা করল আর এর পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, তা চিন্তাও করল না। –[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ اللَّيْلِ : সূরা আল-লাইল

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম শব্দ اَللَّيْلُ -কে কেন্দ্র করে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২১টি আয়াত, ৭১টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরা ও এর পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু প্রায় এক ও অভিন্ন। এটা হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তার পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এ সূরার বিষয়বস্তু।

এর মূলবক্তব্য দু'টি ভাগে বিভক্ত। শুরু হতে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত তার প্রথম ভাগ। এ অংশে বলা হয়েছে, মানবজাতির ব্যক্তি, জাতি ও দলসমূহ দুনিয়াতে যে শ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে, তা স্বীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধী। যেমন পরস্পর বিরোধী দিন ও রাত এবং পুরুষ জীব ও স্ত্রী জীব। এরপর দু'প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বসমূহ এই- দান-সদকা করা, আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী অবলম্বন এবং ভালো ও কল্যাণকে, ভালো ও কল্যাণ বলে মেনে নেওয়া। অপর ধরনের বিশেষত্বসমূহ হচ্ছে কার্পণ্য ও বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষ সম্পর্কে নির্ভীক হওয়া, ভালো কথাকে মিথ্যা অভিহিত করে অমান্য করা। পরে বলা হয়েছে যে, এ বিশেষত্বসমূহ নিজস্ব দিক দিয়ে যতটা পরস্পর বিরোধী, এদের ফলাফল অবলম্বনকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করবে। তাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলোকে সহজ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কর্মনীতি গ্রহণকারীদের জন্য ভালোকাজ কঠিন ও মন্দকাজ সহজ হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে দুনিয়ার এ সম্পদ যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত- তার মালিকের সাথে কবরে তো যাবে না। তাহলে মৃত্যুর পর তা মালিকের কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় অংশেও সংক্ষেপে তিনটি মৌলনীতি পেশ করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনবহিত করে ছেড়ে দেননি। জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে ঠিক কোন পথটি সুষ্ঠু ও সঠিক তা মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত মৌলতত্ত্ব এই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাত-উভয়ের নিরঙ্কুশ মালিক এক আল্লাহই। দুনিয়া পেতে চাইলে তারই নিকট হতে পেতে হবে। আর পরকাল চাইলে তার দাতাও সে আল্লাহ। এখন তুমি বান্দা তার নিকট কি চাইবে, তার ফয়সালার দায়িত্ব তোমার নিজের।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, রাসূল ও কিতাবের সাহায্যে যে কল্যাণ বিধান পেশ করা হয়েছে তা যে হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে, অমান্য ও অস্বীকার করবে তার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত হয়ে আছে। অপরদিকে যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি ঈমান এনে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ তার উপর রাজি-খুশি হবেন এবং সেও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

সূরাটির শানে নুযূল : সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আয়াতসমূহের অভিব্যক্তি সাধারণ হলেও বহু বিশিষ্ট তাফসীরকারের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ নামক জনৈক ধর্মদ্রোহী সম্বন্ধে এ সূরা নাজিল হয়েছে। আরবের মধ্যে তারা উভয়েই ধনবান ও নেতৃস্থানীয় ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে চরিত্র, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপে বিরাট পার্থক্য ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত অর্থ ইসলামের উন্নতি ও কল্যাণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহায্যে এবং মুসলমানের উপকার এবং বিভিন্নরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেছেন, পক্ষান্তরে উমাইয়া তার সঞ্চিত অর্থরাশি এক কপর্দকও কোনোরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেনি। অধিকন্তু উমাইয়া ভয়ানক ইসলাম বিদ্বেষী ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে সে তার কৃতদাস হযরত বেলালের উপর ভীষণ অত্যাচার করত। হযরত আবূ বকর (রা.) এ সংবাদ শ্রবণে দশ সহস্রাধিক স্বর্ণ মুদ্রা ও নিজ কৃতদাস নাসতাস রুমীর বিনিময়ে হযরত বেলালকে উমাইয়ার নিকট হতে ক্রয় করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) আরও কতিপয় নও-মুসলিম দাস-দাসীকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে অত্যাচারী কাফেরদের কবল হতে মুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত চল্লিশ সহস্র দিরহাম রাসূলুল্লাহ ও সমস্ত মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। চৌত্রিশ হাজার দিরহাম মক্কায় তেরো বছর যাবৎ মুসলমাদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। অবশিষ্ট ছয় হাজার দিরহাম হিজরতের পথে এবং মদীনার মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করেছেন। এভাবে ইসলাম ও ইসলামি উম্মাহর জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও তিনি কোনো দিন কারো নিকট সাহায্য ও প্রতিদান প্রার্থী হননি। একদা তিনি কম্বল জড়িয়ে বসেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর নবী, এ কম্বল জড়ানো ফকিরকে- যিনি নিজের সমস্ত সম্পদ আপনার জন্য ব্যয় করে নিঃস্ব হয়েছেন- আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সালাম জানিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেছেন, এ দরিদ্রাবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট আছেন কিনা? এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সিদ্দীক (রা.)-কে জানিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, আমি তাতেও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছি, আমি আল্লাহর উপর রাজি আছি- এ সময়ই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। -[আযীযী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ وَاللَّيْلِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-লাইল মক্কায় অবতীর্ণ

إِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً : ২১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى بِظُلْمَتِهٖ كُلَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ـ

১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে তার অন্ধকার দ্বারা, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যলোককে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

٢. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى تَكَشَّفَ وَظَهَرَ وَإِذَا فِى الْمَوْضِعَيْنِ لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّةِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا فِعْلُ الْقَسَمِ ـ

২. শপথ দিবসের, যখন সে আলোকিত হয় প্রকাশিত ও উন্মুক্ত হয়। উভয় ক্ষেত্রে إِذَا অব্যয়টি শুধুমাত্র ظَرْفِيَّه-এর জন্য। আর فِعْل قَسَم তন্মধ্যে عَامِل।

٣. وَمَا بِمَعْنٰى مَنْ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى اٰدَمَ وَحَوَّاءَ أَوْ كُلَّ ذَكَرٍ وَكُلَّ أُنْثٰى وَالْخُنْثٰى الْمُشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثٰى عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيَحْنَثُ بِتَكْلِيْمِهٖ مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ ذَكَرًا وَلَا أُنْثٰى ـ

৩. আর শপথ তাঁর যিনি مَا অব্যয়টি مَنْ অর্থে অথবা مصدرية সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী আদম ও হাওয়া কিংবা প্রত্যেক নর ও নারী। আর প্রকৃত উভয় লিঙ্গধারী আমাদের দৃষ্টিতে লিঙ্গ নির্ণয় অসম্ভব বলে গণ্য হলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট সে নর অথবা নারী। সুতরাং কেউ যদি কোনো নর বা নারীর সাথে কথা না বলার শপথ করে এবং উভয় লিঙ্গধারীর সাথে কথা বলে, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী রূপে গণ্য হবে।

٤. إِنَّ سَعْيَكُمْ عَمَلَكُمْ لَشَتّٰى مُخْتَلِفٌ فَعَامِلٌ لِلْجَنَّةِ بِالطَّاعَةِ وَعَامِلٌ لِلنَّارِ بِالْمَعْصِيَةِ

৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা তোমাদের আমল বিভিন্ন প্রকৃতির কেউ আনুগত্য দ্বারা বেহেশতের আমল করে, আর কেউ অবাধ্যাচারিতার মাধ্যমে দোজখের কাজ করে।

٥. فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى حَقَّ اللّٰهِ وَاتَّقٰى اللّٰهَ ـ

৫. সুতরাং যে ব্যক্তি দান করে আল্লাহ তা'আলার হক আর ভয় পোষণ করে আল্লাহকে,

٦. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى أَيْ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فِى الْمَوْضِعَيْنِ ـ

৬. এবং উত্তম বস্তুকে সত্যরূপে গ্রহণ করে উভয় ক্ষেত্রে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ উদ্দেশ্য।

٧. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى لِلْجَنَّةِ ـ

৭. আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ বেহেশতের জন্য।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৮. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِحَقِّ اللّٰهِ وَاسْتَغْنٰى عَنْ ثَوَابِهٖ ـ ৮. আর যে কার্পণ্য করল আল্লাহর হক আদায়ের ক্ষেত্রে আর অমুখাপেক্ষিতা প্রদর্শন করল আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার হতে।

৯. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ـ ৯. আর উত্তম বস্তুকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

১০. فَسَنُيَسِّرُهٗ نُهَيِّئُهٗ لِلْعُسْرٰى لِلنَّارِ ـ ১০. আমি তার জন্য সুগম করে দিবো প্রস্তুত করে দিবো কঠোর পরিণামের পথ জাহান্নামের জন্য।

১১. وَمَا نَافِيَةٌ يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى فِى النَّارِ ـ ১১. আর না مَا অব্যয়টি نَافِيَة তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে, যখন সে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের তাকিদ রয়েছে। আর এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে যারা এ দু'টি গুণ অর্জন না করে তাদের পরিণাম অতি ভয়াবহ। –[নূরুল কোরআন]

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى **-এর শানে নুযূল :** আল্লামা বাগাবী (র.) লিখেছেন, হযরত আবূ বকর (রা.) উমাইয়্যা ইবনে খালফের নিকট হতে হযরত বেলাল (রা.)-কে একটি গোলাম এবং কিছু পরিমাণ রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করেন। তাঁর সম্পর্কেই اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى الخ : এখানে আল্লাহ তা'আলা রাত ও দিনের শপথ করেছেন। রাতে সমস্ত জন্তু-জানোয়ার স্ব-স্ব আশ্রয়স্থলে ফিরে যায়, দিনের কর্মব্যস্ততা হতে প্রশান্তি লাভ করে, নিদ্রার ঘোরে ঢলে পড়ে, যে নিদ্রা শরীরের প্রশান্তি এবং অন্তরের খোরাক। অপরদিকে দিনের আগমনে রাতের সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়, মানব জীবনে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়, পশু-পাখিরা স্বীয় আস্তানা হতে বের হয়ে আসে। শুধু রাত বা শুধু দিন হলে মানুষের পক্ষে এ পৃথিবীতে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

সুতরাং মানুষের জীবন ধারণের সুষ্ঠু ও সুন্দর ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রাত-দিনের সৃষ্টি করে দিয়েছেন। –[কাবীর]

আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টি : হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আলো ও অন্ধকারকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অন্ধকারকে রাত এবং আলোকে দিন হিসাবে রূপ দান করেছেন। –[কুরতুবী]

يَغْشٰى-এর مَفْعُوْل কি? : وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى-এর মধ্যস্থিত يَغْشٰى-এর فَاعِلْ হলো اَللَّيْل কিন্তু এর مَفْعُوْل কি এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এর مَفْعُوْل হলো اَلنَّهَار অর্থাৎ রাত দিনকে ঢেকে দেয়।

খ. অথবা, এর مَفْعُوْل হলো اَلْاَرْض অর্থাৎ রাত্রি এর অন্ধকার দ্বারা জমিনকে ঢেকে ফেলে।

গ. অথবা, এর مَفْعُوْل হলো اَلْخَلَائِقُ অর্থাৎ সৃষ্টি জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ঘ. অথবা, এর مَفْعُوْل হলো كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে এটা আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অত্র আয়াতে পুরুষ ও স্ত্রীলোক দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'আলা وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى-এর মধ্যে اَلذَّكَر ও اَلْاُنْثٰى তথা নর ও নারী দ্বারা কি বুঝিয়েছেন; এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ক. এখানে اَلذَّكَر-এর দ্বারা হযরত আদম (আ.) ও اَلْاُنْثٰى দ্বারা হযরত হাওয়া (আ.)-কে বুঝিয়েছেন

খ. অথবা, প্রত্যেক নর-নারীকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শপথের মধ্যে নর ও নারী উভয়ের উল্লেখ করে সৃষ্টি জগতের সকল প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক প্রাণী হয়তো পুরুষ হবে নতুবা নারী।

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা-সাধনা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এ কথাটি বলার উদ্দেশ্যেই রাত ও দিন এবং পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টির শপথ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে– রাত ও দিন, পুরুষ ও স্ত্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন এবং এদের প্রত্যেকটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল যেমন পরস্পর বিরোধী, অনুরূপভাবে তোমরা যেসব পথে ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে নিজেদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা বিনিয়োগ করছ, তাও স্বীয় স্বরূপতার দৃষ্টিপাতে ভিন্ন ভিন্ন ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরস্পর বিরোধী। এর পরবর্তী আয়াত কয়টিতে বলা হয়েছে যে, এসব চেষ্টা সাধনা দু'ভাগে বিভক্ত।

দ্বন্দ্বের সমাধান : অত্র সূরার ৭ম আয়াতে বলা হয়েছে– ভালো উদ্যোগ গ্রহণকারীদের পথ সহজ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে সূরা আল-বালাদ এ পথকে عَقَبَة বা দুর্গম-বন্ধুর গিরিপথ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'টি কথার মধ্যে সামঞ্জস্যতা কোথায়? তার জবাব হচ্ছে– এ সহজ পথ মূলত অবলম্বন করার পূর্বে এবং প্রথম অবস্থায় তাকে অবশ্যই দুর্গম-বন্ধুর পথ বলে মনে হবে। এ পথে চলতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের নফসের কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা, বিত্ত-বৈভব, সর্বোপরি শয়তানের সাথে প্রবল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয়। কেননা তাদের প্রত্যেকটিই এ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ পথ সম্পর্কে তাকে ভীত ও শঙ্কিত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে যখন প্রকৃত কল্যাণ পথকে সত্য মেনে তাতে চলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত করে বসবে; নিজের ধন-সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে, তখনই সে দুর্গম পথটিকে সহজ পথ করে দেওয়া হবে– ধ্বংসের গহ্বরে পড়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

اَعْطٰى-এর অর্থ : এখানে اَعْطٰى-এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ–

১. সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কার্যে অর্থ ব্যয় করা। যেমন– দাসমুক্ত করা, বন্দী মুক্ত করা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। তা নফল হোক অথবা ওয়াজিব হোক।

২. অথবা, মাল ও নফসের হক আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে মাল ও নফস ব্যয় হয়, তাকে আরবি ভাষায় বলা হয়– اَعْطَى الطَّاعَةَ اَعْطَى السَّعَةَ ইত্যাদি।

৩. অথবা, اَعْطٰى দ্বারা আল্লাহর হক প্রদানকে বুঝানো হয়েছে।

صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى-এর মধ্যে حُسْنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহর বাণী وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى-এর মধ্যে حُسْنٰى-এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) ও একদল মুফাস্‌সিরের মতে এখানে اَلْحُسْنٰى দ্বারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উদ্দেশ্য।

২. حُسْنٰى দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা, পুণ্যকে বুঝানো হয়েছে।

৪. কিংবা ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে।

৫. অথবা, সকল ভালো কাজকেই তা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৬. হযরত কাতাদাহ, মোকাতিল, কালবী (র.) বলেছেন– এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ওয়াদাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى - আয়াতে اَلْيُسْرٰي দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াত فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى এর মধ্যে اَلْيُسْرٰى দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) ও এক দল মুফাসসিরের মতে اَلْيُسْرٰى দ্বারা এখানে জান্নাত উদ্দেশ্য। ২. কেউ কেউ বলেছেন, اَلْيُسْرٰى হলো কল্যাণ (خَيْر)। ৩. করণীয় কাজ করার এবং বর্জনীয় কাজ পরিত্যাগ করার শক্তি দানই হলো يُسْرٰى ৪. পূর্বকৃত ইবাদতের প্রতি ফিরে আসাকে اَلْيُسْرٰى বলে। ৫. এটা দ্বারা সে সহজ-সরল পথকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল, যা মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহর মর্জি অনুরূপ।

Free @ www.eilm.weebly.com

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى -এর উপর একটি অভিযোগ ও তার জওয়াব : ইতঃপূর্বে সূরা আল-বালাদে মুত্তাকীর পথকে عَقَبَةٌ তথা দুষ্কর দুর্গম ঘাঁটি (পথ) বলা হয়েছে। অথচ এখানে আয়াত فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى-এর মধ্যে তাকেই সহজতর পথ বলা হয়েছে, এ দু'টি আয়াতের মধ্যে মিল কোথায়?

এর উত্তর এই যে, এ পথ কার্যত অবলম্বন করার পূর্বে অবশ্যই দুষ্কর, দুর্গম ও বন্ধুর বলে মনে হবে। কিন্তু সে যখন তাকে সত্য মেনে তাতে চলার সিদ্ধান্ত করে নিবে এবং সে জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবে, সে সঙ্গে নিজের ধনসম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে এ সংকল্পকে কার্যত শক্ত ও পরিপক্ক করে নিবে, তখন সে ঘাঁটিতে আরোহণ করা তার পক্ষে সহজতর ও নৈতিক পতনের গহবরে পড়ে যাওয়া কঠিনতর হয়ে পড়বে।

اَلْعُسْرٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : عُسْرٰى দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

১. عُسْرٰى বলে জাহান্নাম উদ্দেশ্য। ২. عُسْرٰى বলে شِرْك অংশীবাদ উদ্দেশ্য। ৩. ভালো কাজ করা এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা কঠিন একথা বুঝানো উদ্দেশ্য ৪. কৃপণতা এবং ধনসম্পদের হক আদায় না করা।

يُسْرٰى এবং عُسْرٰى-কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়ার কারণ : এর কয়েকটি কারণ হতে পারে–

১. عُسْرٰى এবং يُسْرٰى বলতে جَمَاعَةُ الْاَعْمَالِ উদ্দেশ্য।

২. অথবা, এখানে اَلطَّرِيْقَةُ শব্দ উহ্য আছে। মূলে ছিল اَلطَّرِيْقَةُ الْيُسْرٰى এবং اَلطَّرِيْقَةُ الْعُسْرٰى –[কাবীর]

فَسَنُيَسِّرُهُ তে س নেওয়ার কারণ : কয়েকটি কারণে এখানে সীন নেওয়া হয়েছে–

১. করুণা এবং দয়া প্রদর্শনের জন্য। যেমন বলা হয়–এ কাজটি করো, একটু পরেই তোমাকে অমুক বস্তু দিবো।

২. প্রতিদান তো বেশির ভাগ পরকালেই দেওয়া হবে। সে সময়টি এখনো আসেনি। সে সময় সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি অবগত নয়। একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন– সে সময়টি মানব জীবনের পরে অবশ্যই আসবে। আর 'পর' বুঝানোর জন্য 'সীন' বসানো স্বাভাবিক নিয়ম। –[কাবীর]

مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهُ-এর মধ্যে مَا কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? : আয়াত مَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهُ-এর মধ্যে مَا-এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. مَا শব্দটি نَافِيَه [নাবোধক] হবে অর্থাৎ মৃত্যুর পর-পরকালে তার সম্পদ তার কোনো উপকারেই আসবে না।

২. অথবা, তা اِسْتِفْهَام اِنْكَارِىْ-এর অর্থে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর-পরকালে তার ধন-সম্পদ কি তার কোনো উপকারে আসবে? যার মর্মার্থ এটাই হবে যে, প্রকৃতপক্ষে তার ধন-সম্পদ তখন তার কোনো উপকারেই আসবে না।

تَرَدّٰى-এর অর্থ : تَرَدّٰى-এর দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. تَرَدّٰى শব্দটি تَرَدّٰى مِنَ الْجَبَلِ হতে গৃহীত। এ কথাটির অর্থ হলো– পাহাড় হতে পড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়েছে। মূল আয়াতের অর্থ হবে– তার ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না যখন সে দোজখের গহীনে পড়ে ধ্বংস হবে।

২. অথবা, تَرَدّٰى শব্দটি اَلرَّدٰى হতে বাবে تَفَعُّلٌ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হবে اَلْهَلَاكُ [ধ্বংস] আর উদ্দেশ্য হবে মৃত্যু। মূল আয়াতের অর্থ হবে– যখন মৃত্যু এসে পড়বে তখন তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।

–[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٢. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى لِتُبَيِّنَ طَرِيْقَ الْهُدٰى مِنْ طَرِيْقِ الضَّلَالِ لِيَمْتَثِلَ اَمْرَنَا بِسُلُوْكِ الْاَوَّلِ وَنَهْيِنَا عَنْ اِرْتِكَابِ الثَّانِيْ.

১২. আমার দায়িত্ব তো শুধুমাত্র পথ নির্দেশ করা যাতে হেদায়েতের পথ গোমরাহীর পথ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং সে প্রথমোক্ত পথ অনুসরণ করে আমার আদেশ পালন করে আর দ্বিতীয় পথ অনুসরণ হতে বিরত থাকে।

١٣. وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى اَيِ الدُّنْيَا فَمَنْ طَلَبَهَا مِنْ غَيْرِنَا فَقَدْ اَخْطَأَ.

১৩. আর আমারই অধিকারে পরকাল ও ইহকাল অর্থাৎ দুনিয়া, সুতরাং যে আমি ছাড়া অন্যের কাছে তা কামনা করল, সে ভুল করল।

١٤. فَاَنْذَرْتُكُمْ خَوَّفْتُكُمْ يَا اَهْلَ مَكَّةَ نَارًا تَلَظّٰى بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ وَقُرِئَ بِثُبُوْتِهَا اَيْ تَتَوَقَّدُ.

১৪. অনন্তর আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি ভয় প্রদর্শন করেছি, হে মক্কাবাসী! লেলিহান অগ্নিশিখা সম্পর্কে تَلَظّٰى শব্দটি মূল হতে একটি تَا উহ্য করা হয়েছে। অপর এক কেরাতে তাকে বহাল রেখেও পঠিত হয়েছে অর্থাৎ লেলিহান শিখা বিস্তারকারী।

١٥. لَا يَصْلٰهَا يَدْخُلُهَا اِلَّا الْاَشْقٰى بِمَعْنَى الشَّقِيِّ.

১৫. তাতে নিক্ষিপ্ত হবে না প্রবেশ করবে না, নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত অন্য কেউ اَشْقٰى। শব্দটি شَقِيٌّ অর্থে।

١٦. الَّذِيْ كَذَّبَ النَّبِيَّ وَتَوَلّٰى عَنِ الْاِيْمَانِ وَهٰذَا الْحَصْرُ مُؤَوَّلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَكُوْنُ الْمُرَادُ الصَّلْيُ الْمُؤَبَّدُ.

১৬. যে অসত্যারোপ করেছে নবী করীম ﷺ-কে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ঈমান আনয়ন করা হতে। এখানে حَصْر বা সীমাবদ্ধতা আয়াত وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ দ্বারা مُؤَوَّلٌ হবে সুতরাং প্রবেশ দ্বারা স্থায়ীভাবে প্রবেশ উদ্দেশ্য হবে।

তাহকীক ও তারকীব

تَلَظّٰى শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ : تَلَظّٰى মূলে تَتَلَظّٰى ছিল, একটি ت-কে সহজ করার জন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে. মূলবর্ণ ل - ظ - ظ মাসদার اَللَّظُّ [আললাযযু] বাবে نَصَرَ অর্থ– আঁকড়িয়ে থাকা, লেগে থাকা, ধারাবাহিকভাবে থাকা, প্রজ্বলিত হওয়া. تَلَظّٰى নারা মাফউলের সিফাত হওয়ার কারণে মহল্লান মানসূব।

Free @ www.e-ilmweebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى : আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্রষ্টা। এ হিসাবে তিনি স্বীয় কর্মকৌশল, নিজের সুবিচার নীতি ও স্বীয় অনুগ্রহশীলতার ভিত্তিতে তাকে এখানে অজ্ঞ ও অবিহিত না রাখার বরং সঠিক নির্ভুল পথ ও ভুল পথ বুঝিয়ে দেওয়া, পাপ-পুণ্য ও হালাল-হারাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল করার দায়িত্বও তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন। সূরা নাহলে এ কথাই নিম্নোক্ত ভাষায় বলা হয়েছে- وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ "সঠিক-সহজ পথ বলে দেওয়া আল্লাহরই দায়িত্ব- অবশ্য বাঁকা পথও আছে।"

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى : আর পরকাল ও ইহকালের প্রকৃত মালিক আমি-ই। এর নিম্নবর্ণিত কয়েকটি অর্থ হতে পারে-

ক. দুনিয়া হতে পরকাল পর্যন্ত সর্বত্রই তুমি আমার মুষ্টির মধ্যে বন্দী। কোনো একটি পর্যায়েও তুমি তা হতে মুক্ত নও; কেননা উভয় জগতের একচ্ছত্র মালিক আমি-ই।

খ. তোমরা আমার দেখানো পথে চল আর না-ই চল তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। কেননা আমার মালিকত্ব দুনিয়া-আখেরাত সর্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

গ. উভয় জগতের মালিক তো আমিই। তোমরা দুনিয়া পেতে চাইলে তা আমার নিকট হতে পেতে পার, আর পরকালীন কল্যাণ চাইলে তাও আমার নিকট হতে লাভ করতে পার। -[কাবীর]

اَلْاَشْقٰى ও اَلْاَتْقٰى-এর তাৎপর্য : اَشْقٰى ও اَتْقٰى শব্দ দু'টিকে আয়াতে ইসমে তাফযীল-এর صِيْغَه হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ- অতীব হতভাগ্য এবং অতিশয় পরহেজগার। এর অর্থ এই নয় যে, অতীব হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই জাহান্নামে যাবে না। আর অতিশয় পরহেজগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই তা হতে রক্ষা পাবে না; বরং দু'টি চরম পর্যায়ের পরস্পর বিরোধী চরিত্রকে পরস্পরের মুখোমুখি পেশ করে তাদের চরম পরস্পর বিরোধী পরিণতি বর্ণনা করাই এ কথাটির মূল উদ্দেশ্য এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপস্থাপিত যাবতীয় শিক্ষাকে অমান্য করে ও আল্লাহর আনুগত্যকে পরিত্যাগ করে। তারই প্রতিকূলে রয়েছে এমন এক ব্যক্তি যে কেবল ঈমানই আনে না, বরং ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে কোনোরূপ লোক দেখানো ও যশ খ্যাতির লোভ ব্যতীতই নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, শুধু এ কারণেই যে, সে আল্লাহর নিকট পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার বাসনা পোষণ করে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٧. وَسَيُجَنَّبُهَا يبعد عنها الْأَتْقَى بِمَعْنَى التَّقِى.

১৭. আর তা হতে দূরবর্তী রাখা হবে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীগণকে أَتْقَى শব্দটি تَقِى অর্থে।

١٨. الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكّٰى مُتَزَكِّيًا بِهِ عِنْدَ اللّٰهِ بِاَنْ يُّخْرِجَهُ لِلّٰهِ تَعَالٰى لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً فَيَكُوْنُ زَكِيًّا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهٰذَا نَزَلَ فِى الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَمَّا اشْتَرٰى بِلَالًا الْمُعَذَّبَ عَلٰى اِيْمَانِهِ وَاَعْتَقَهُ فَقَالَ الْكُفَّارُ اِنَّمَا فَعَلَ ذٰلِكَ لِيَدٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدَهُ فَنَزَلَ.

১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যয় করে। তাতে লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের প্রত্যাশা থাকে না। ফলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মশুদ্ধ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর (রা.) প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। যখন তিনি ঈমানের কারণে কাফেরদের হাতে অত্যাচারিত হযরত বিলাল (রা.)-কে ক্রয় করে আজাদ করেছেন, তখন কাফেরগণ বলতে থাকে যে, বিলাল আবূ বকরের উপকার করেছিল, সে ঋণ শোধ করার জন্য সে এটা করেছে। তদুত্তরে পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়।

١٩. وَمَا لِاَحَدٍ بِلَالٍ وَغَيْرِهِ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى.

১৯. আর নেই কারো বিলাল ও অন্য কারো তার প্রতি কোনো অনুগ্রহ, যে তার প্রতিদান দিবে।

٢٠. اِلَّا لٰكِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى اَىْ طَلَبَ ثَوَابِ اللّٰهِ.

২০. কেবল اِلَّا অব্যয়টি لٰكِنْ অর্থে কিন্তু সে এটা করেছে তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। অর্থাৎ তাঁর পুরস্কার অন্বেষায়।

٢١. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى بِمَا يُعْطَاهُ مِنَ الثَّوَابِ فِى الْجَنَّةِ وَالْاٰيَةُ تَشْتَمِلُ مِنْ فِعْلٍ مِثْلَ فِعْلِهِ فَيَبْعُدُ عَنِ النَّارِ وَيُثَابُ.

২১. আর সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে। বেহেশতে তাকে যে পুরস্কার প্রদত্ত হবে, তার মাধ্যমে। আয়াতটি সে ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করবে, যে তাঁর ন্যায় নিঃস্বার্থ কাজ করবে এবং তাকেও জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে ও পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَتَزَكّٰى-এর মহল্লে ই'রাব : يَتَزَكّٰى-এর দু'টি অবস্থা হতে পারে-

১. يَتَزَكّٰى ক্রিয়াটি পিছনে উল্লিখিত يُؤْتِى ক্রিয়া থেকে بَدَلْ হয়েছে। এমতাবস্থায় তার কোনো ই'রাবের মহল নেই, কেননা, তা তখন صِلَة-এর পর্যায়ে, আর صِلَة-এর কোনো এরাবের মহল হয় না।

২. অথবা, يُؤْتِى ক্রিয়ার মধ্যকার সর্বনাম হতে يَتَزَكّٰى ক্রিয়াটি حَالْ হয়েছে, তখন তা মানসূব হবে।

اِبْتِغَاءَ-এর মহল্লে ই'রাব :

১. অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে اِبْتِغَاءَ শব্দটি 'مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعْ' হিসাবে মানসূব হয়েছে। অথবা, মাফউলে লাহু হিসাবে মানসূব হতে পারে। ইমাম ফাররা বলেন, اِبْتِغَاءَ শব্দটি কিছু উহ্য ইবারতের সাথে মিলিত হয়ে মানসূব হয়েছে। অর্থাৎ مَا اَعْطَيْتُكَ اِبْتِغَاءَ جَزَائِكَ بَلْ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّكَ

২. ইয়াহইয়া اِبْتِغَاءُ শব্দটিকে মারফূ' পাঠ করেন। তা نِعْمَةٍ শব্দের অবস্থানস্থল হতে বদল হয়েছে। কেননা তা ফায়েল অথবা মুবতাদা হিসাবে মারফূ' অবস্থায় রয়েছে। نِعْمَةٍ শব্দের পূর্বের مِنْ অতিরিক্ত। -[ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের একটি বর্ণনা উদ্ধৃতি করেছেন, سَيُجَنَّبُهَا হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি দুর্বল, অচল, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দাস-দাসীকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে অনেক দাস-দাসীকে তিনি অত্যাচারী মনিবের হাত হতে রক্ষা করেছেন। একবার তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা (রা.) (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) বলেন–হে পুত্র! আমি দেখছি তুমি শুধু দুর্বল লোকদেরকে মুক্ত করে অর্থ ব্যয় করছ এতে তোমার কি কল্যাণ হবে? যদি সুস্থ-সবল যুবকদেরকে মুক্ত করতে তাহলে তারা তোমার কাজে লাগত; কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে তারা তোমার সাথে থেকে যুদ্ধ করত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন– আব্বাজান! আমি তো এ কাজের জন্য দুনিয়াতে কোনো নাম-কাম চাই না; বরং আল্লাহর নিকট হতেই শুধু প্রতিফল চাই। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে سَيُجَنَّبُهَا ..... আয়াতসমূহ নাজিল হয়।

অথবা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.) বলেন, হযরত বেলাল (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে তার মনিব উমাইয়া ইবনে খালফ তার উপর নির্মম অত্যাচার আরম্ভ করল। মহাত্মা বেলালকে মরুভূমির অগ্নি-ঝরা রোদে তপ্ত বালুর উপরে চিত করে শোয়ায়ে বুকে প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়ে রাখত এবং বলত 'মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমৃত্যু তোমাকে এভাবে রেখে দিবো।' একদিন এমনি কঠোর শাস্তি চলাকালীন সময়ে হযরত আবূ বকর (রা.) সে পথে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন, মহাত্মা বেলালের উপর এ লোমহর্ষক অত্যাচার দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি বেলালকে ক্রয় করার জন্য তার মনিব উমাইয়ার কাছে প্রস্তাব করলেন। উমাইয়া দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা ও হযরত আবূ বকরের সুস্থ সবল এক কাফের দাস নিসতাসকে বিনিময় মূল্য হিসাবে চাইল। নিসতাস রুমী হযরত আবূ বকরের গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত দাস ছিল। তিনি উমাইয়ার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দাস নিসতাস ও দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে মহাত্মা বেলালকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন। তখন মক্কার কাফেরগণ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে নির্বুদ্ধি ও অপরিণামদর্শী বলে সমালোচনা করতে লাগল। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে وَمَا لِأَحَدٍ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। –[খাযেন, মা'আলিম, ইবনে কাছীর]

أَتْقَى কে? : সমস্ত মুফাসসিরীনের ঐকমত্য এই যে, أَتْقَى বলে এখানে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে; কিন্তু শীয়া সম্প্রদায় এ কথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে যে, أَتْقَى বলতে এখানে হযরত আলী (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। মূলত তা ঠিক নয়। কেননা হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ আর الْأَكْرَمُ ঐ ব্যক্তি, যে অতি উত্তম। নবী করীম ﷺ-এর পরে হযরত আবূ বকরের স্থান হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত পাওয়া যায় না; শুধু শীয়া সম্প্রদায় তাদের বদ আকীদার কারণে তার বিরোধিতা করে থাকে। –[কাবীর]

বর্ণিত আছে যে, মোহাম্মদ ইবনে হানফিয়া হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, হযরত আবূ বকর (রা.)। পুণঃজিজ্ঞাসা করেন যে, এরপর কে? তিনি বলেছিলেন হযরত ওমর (রা.)। –[নূরুল কোরআন]

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য :

১. তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।
২. রাসূলের বংশের সপ্তম পুরুষের সাথে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বংশ একত্রিত হয়ে যায়।
৩. তিনি রাসূলের সাথে প্রত্যেকটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।
৪. তাঁর উপাধি ছিল আতীক। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার ইচ্ছা হয় দোজখ থেকে মুক্ত এমন লোককে দেখতে সে যেন আবূ বকর (রা.)-কে দেখে।
৫. তাঁর বংশের চার প্রজন্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন, যা আর কোনো সাহাবীর ছিল না। তথা- ক. তাঁর পিতামাতা, খ. তিনি নিজে, গ. তাঁর ছেলে ও ঘ. তাঁর পৌত্র।
৬. তাঁর জন্ম মক্কায় আর মৃত্যু মদীনায় উভয়টি পবিত্র নগরী।
৭. নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি সকলের ইহসানের বদলা দিয়ে দিয়েছি; কিন্তু হযরত আবূ বকরের ইহসানের বদলা দিতে পারিনি। তাঁকে আল্লাহ বদলা দিবেন।
৮. পবিত্র কুরআনে তাঁকে أَتْقَى ও صَاحِبٌ বলা হয়েছে।
৯. মৃত্যুর সময় তাঁর গৃহে সরকারী সম্পদের মধ্যে একটি কাঠের পাত্র ও একটি যাঁতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। উভয়টি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পাঠানোর অসিয়ত করে যান।
১০. তিনি অসিয়ত করেছেন যে, জানাজার পর আমার শবদেহ রাসূলের রওজার নিকট নিয়ে যাবে, যদি রওজার দরজা আপনা-আপনি খুলে যায় তবে আমাকে তথায় দাফন করবে, অন্যথায় জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করবে। কিন্তু তাঁর শবদেহ আনা হলে রওজার দরজা আপনা-আপনি খুলে যায়, ফলে তাঁকে তথায় দাফন করা হয় ইত্যাদি। –[নূরুল কোরআন]

وَلَسَوْفَ يَرْضَى-এর অর্থ : এ আয়াতটির দু'টি অর্থ হতে পারে। উক্ত দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য ও সঠিক। একটি এই যে, আল্লাহ অবশ্যই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আর দ্বিতীয়টি এই যে, আল্লাহ খুব শীঘ্রই এক ব্যক্তিকে এত কিছু দিবেন যে, সে তা পেয়ে যারপর নাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الضُّحٰى : সূরা আদ্ব-দুহা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম শব্দ اَلضُّحٰى-কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১০২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার আলোচ্য বিষয় হতে জানা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কিছুদিন পর্যন্ত ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে বারবার আশঙ্কা জাগছিল যে, আমার দ্বারা এমন কোনো অপরাধ তো হয়ে পড়েনি; যার কারণে আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় এ সূরাটি নাজিল হয়। এতে নবী করীম ﷺ -কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে– আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনোরূপ অসন্তোষ নেই এবং ওহী নাজিল হওয়াও এ কারণে বন্ধ হয়ে যায়নি; বরং একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। দিনের আলোর পর রাতের নিঝুম অন্ধকারের প্রশান্তির মূলে যে লক্ষ্য কার্যকর থাকে তার পশ্চাতেও ঠিক তাই নিহিত রয়েছে। মূলকথা, ওহীর তীব্র রশ্মি যদি আপনার উপর নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপতিত হতে থাকে এবং মোটেই অবকাশ দেওয়া না হতো, তাহলে আপনার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত। এ কারণে মাঝখানে বিরতি দেওয়া হয়েছে। এ বিরতিকালে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন। বস্তুত ওহী নাজিল হওয়ার প্রাথমিককালে নবী করীম ﷺ -এর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এক দুঃসহ প্রভাব পড়ত। তখন পর্যন্তও ওহীর তীব্র চাপ সহ্য করার অভ্যাস তাঁর হয়নি, এ কারণে এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে অবকাশ ও বিরতি দেওয়া অপরিহার্য ছিল। পরে অবশ্য এ চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর ওহী নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিরতি দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজন হয়নি।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে বলেছেন– আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ করেছি, তার প্রত্যুত্তরস্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং আমার নিয়ামতসমূহের শোকর কিভাবে আদায় করা উচিত, তা আপনি উত্তমরূপে বুঝে নিন এবং স্মৃতিপটে আঁকিয়ে রাখুন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করাই এ সূরার মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু। ওহী নাজিল হওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ -এর মনে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, তা দূর করাই ছিল এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরার শুরুতে দিনের দীপ্তি ও রাতের প্রশান্তির শপথ করা হয়েছে এবং নবী করীম ﷺ-কে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে এই বলে যে, আপনার আল্লাহ আপনাকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টও নন। অল্প দিনের মধ্যেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আপনার পক্ষে প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উত্তম হবে এবং এ পরিবর্তন অব্যাহত ধারায় পরিবর্তন হতে থাকবে। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তা পেয়ে আপনি অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হবেন। পরবর্তীকালে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অথচ যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন এর কোনো সম্ভাবনাই জাগতিক দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন– আমি আপনাকে পরিত্যাগ করেছি এমন ধারণা আপনার মনে কেমন করে আসল? আমি আপনাকে পরিত্যাগ করেছি– এমন ধারণা বশত আপনি উদ্বিগ্নই বা হলেন কেন? অথচ আপনার জন্ম হতেই আমি আপনার প্রতি ক্রমাগত ও অব্যাহত ধারায় অনুগ্রহ করে আসছি। আপনি তো এতিম ছিলেন, আমিই আপনার লালন-পালন ও হেফাজতের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আপনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন, আমিই আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃসম্বল আমিই আপনাকে সম্পদশালী করেছি। মোটকথা, শুরু হতেই আমার দয়া ও অনুগ্রহ আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছিল।

পরিশেষে বলা হয়েছে, হে নবী! আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ দান করেছি, তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং কিভাবে আমার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা উচিত তা আপনি ভালোভাবে বুঝে নিন এবং তদনুযায়ী আমল করুন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করবেন যাদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশ গৃহীত হবে। তা ছাড়া যত এতিম ও ভিক্ষুক আছে তাদের সংখ্যায় দশগুণ ছওয়াব তাকে দান করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ সূরা ও তার পরবর্তী সূরাসমূহ পাঠ করার পর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর উক্ত তাকবীর পাঠ করেছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ : সূরা আদ্ব-দুহা মক্কায় অবতীর্ণ

إِحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

وَلَمَّا نَزَلَتْ كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسُنَّ التَّكْبِيْرُ اٰخِرَهَا وَرُوِىَ الْاَمْرُ بِهٖ خَاتِمَتَهَا وَخَاتِمَةَ كُلِّ سُوْرَةٍ بَعْدَهَا وَهُوَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَوْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

যখন এই সূরা অবতীর্ণ হলো তখন রাসূল ﷺ তাকবীর বলেছেন, কাজেই এর শেষে তাকবীর বলা সুন্নত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সূরার শেষে এবং এর পরের প্রত্যেক সূরার শেষে তাকবীরের বিধান বর্ণিত রয়েছে আর তা হলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

১. وَالضُّحٰى اَوَّلَ النَّهَارِ اَوْ كُلَّهُ.

১. শপথ পূর্বাহ্নের দিনের প্রথমাংশ বা সমস্ত দিন।

২. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى غَطّٰى بِظَلَامِهٖ اَوْ سَكَنَ.

২. শপথ রজনীর যখন তা নিঝুম হয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় বা স্থির হয়।

৩. مَا وَدَّعَكَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى اَبْغَضَكَ نَزَلَ هٰذَا لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ عِنْدَ تَاَخُّرِ الْوَحْيِ عَنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اِنَّ رَبَّهُ وَدَّعَهُ وَقَلَاهُ.

৩. তোমাকে পরিত্যাগ করেননি হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক এবং বিরূপও হননি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি। এ সূরাটি তখন অবতীর্ণ হয় যখন পনেরো দিন যাবৎ ওহী অতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকায় কাফেরগণ বলাবলি করতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার প্রভু ত্যাগ করেছে এবং তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে গেছে।

৪. وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْكَرَامَاتِ لَكَ مِنَ الْاُوْلٰى الدُّنْيَا.

৪. আর অবশ্যই তোমার জন্য আখেরাত অধিক উত্তম হবে তাতে যে সকল মর্যাদাপূর্ণ বিষয় রয়েছে তার প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা পার্থিব জীবন অপেক্ষা।

৫. وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَيْرَاتِ عَطَاءً جَزِيْلًا فَتَرْضٰى بِهٖ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذًا لَا اَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِنْ اُمَّتِىْ فِى النَّارِ اِلٰى هُنَا تَمَّ جَوَابُ الْقَسَمِ بِمُثْبَتَيْنِ بَعْدَ مَنْفِيَّيْنِ.

৫. আর অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন অর্থাৎ আখেরাতে তুমি প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে। তখন তুমি সন্তুষ্ট হবে তার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, আমি তখন পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না, যখন আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে। দু'টি مَنْفِىْ-এর পর দু'টি مُثْبَتْ বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে এখানে এসে শপথের জওয়াব শেষ হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

فَتَرْضَى-এর মহল্লে ই'রাব : কারো মতে فَتَرْضَى কসমের জবাব হয়েছে। অর্থাৎ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ কসমের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে فَتَرْضَى জবাব হয়েছে।

কারো মতে, উহ্য কসমের জবাব হয়েছে। وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ কসমের উপযুক্ত নয়। কেননা মুযারি' ক্রিয়া দ্বারা কসম ব্যবহার করলে লাম এবং নূনে তাকীদ আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : সূরা আল-লাইলের মধ্যভাগে সফলতা ও অসফলতার মূলসূত্র এবং তার শাখা-প্রশাখা বিধানগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এসব কিছুর সত্যতা স্বীকার ও অস্বীকারের প্রতিদান ও প্রতিফল বর্ণনা করা হয়েছে। আর তন্মধ্যে রেসালাতের আলোচনা হয়েছে। সমস্ত কুরআনের সার-সংক্ষেপ সূরা আদ্ব-দুহা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত বিভিন্ন সূরাতে বর্ণিত হয়েছে। এদিক থেকে সূরাটি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরাসমূহের সাথে এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। -[কামালাইন]

সূরাটির শানে নুযূল : অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

১. হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ওহী নাজিল শুরু হওয়ার পর কিছুকালের জন্য তা বন্ধ ছিল। ইবনে যোবায়ের বলেন-১২ দিন, কালবী বলেন ১৫ দিন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন ২৫ দিন এবং মুকাতিল বলেন ৪০ দিন তা বন্ধ ছিল। তাতে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বিরুদ্ধবাদীরা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। কেননা নবী করীম ﷺ-এর প্রতি যখন কোনো সূরা নাজিল হতো, তখনই তিনি তা লোকদের পড়ে শুনাতেন। বেশ কয়েক দিন যখন কোনো নতুন ওহী লোকদের শুনালেন না তখন তারা ধারণা করল যে, ওহীর উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই ওহী আর আসবে না। তারা বলাবলি করতে লাগল- মুহাম্মদকে তাঁর আল্লাহ ত্যাগ করেছে। -[ইবনে জারীর, তাবরানী, সাঈদ ইবনে মারদুবিয়া]

২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল নবী করীম ﷺ-এর চাচী, তার ঘরের সাথেই উম্মে জামিলের ঘর ছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল- মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে। এরূপ অবস্থায় নবী করীম ﷺ তীব্র মর্মপীড়া ভোগ করছিলেন। প্রিয়জনের পক্ষ হতে উপেক্ষা, বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র শক্তির উৎস হতে বঞ্চিত হওয়া, তদুপরি মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ তাঁক বিচলিত ও চিন্তাকাতর করেছিল। ঠিক এরূপ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে আয়াতসমূহ নাজিল হয়। -[লোবাব, খাযেন, মা'আলিম]

৩. অথবা, কতিপয় তাফসীরকারের মতে- একদা মুশরিক কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -এর সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর নিকট রূহ, যুলকারনাইন ও আসহাবে কাহাফের বৃত্তান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। নবী করীম ﷺ তার উত্তরে তাদেরকে বলেছিলেন যে, আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এর বৃত্তান্ত বলবো; কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, কথাটি বলতে ভুলে গেছেন। এতে নবী করীম ﷺ -এর উপর দশ, পনেরো বা চল্লিশ দিনের মতো ওহী নাজিল বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি কুরাইশদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হন। তখন আবূ জাহল প্রমুখ কুরাইশগণ তাঁকে বলল যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। এতে নবী করীম ﷺ অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হয়ে পড়ায় তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য এ সূরা নাজিল হয়। -[খাযেন, মা'আলিম, ইবনে কাছীর]

৪. অথবা, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী করীম ﷺ -এর একটি অঙ্গুলি প্রস্তরাঘাতে এরূপ আহত হয়েছিল যে, তার যন্ত্রণায় তিনি একদিন বা দু'দিন যাবৎ নৈশকালীন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে পারেননি, এ সময় দীনের প্রচার কার্যও বন্ধ ছিল। এতে দুষ্টমতি আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল এসে নবী করীম ﷺ -কে বলল যে, যে জীন বা শয়তানটি এসে তোমাকে শিক্ষা দেয়, সে তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। তার এ অসঙ্গত উক্তির উত্তরেই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। -[লোবাব]

৫. অথবা, হযরত খাওলা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা একটি কুকুরের বাচ্চা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘরে খাটের নিচে প্রবেশ করে মরে গিয়েছিল। অতঃপর চারদিন পর্যন্ত ওহী আগমন বন্ধ থাকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওলাকে বললেন-কেন জানি কয়েকদিন পর্যন্ত আমার নিকট হযরত জিবরাঈল আসেন না, তার কারণ কি? সম্ভবত আমার ঘরে কোনো নতুন ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে, তিনি ঘরে তল্লাশী চালান। আর দেখেন একটি কুকুরের বাচ্চা মরে রয়েছে, তৎক্ষণাৎ তা ঘর হতে বের করে দেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) এ সূরা নিয়ে আগমন করেন। আর বলেন- যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে, আমি সে ঘরে প্রবেশ করি না। -[লোবাব, খাযেন]

اَلضُّحٰى বলতে কি বুঝানো হয়েছে? : اَلضُّحٰى শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. দিনের প্রথম অংশ, সকালবেলা, সকালের সূর্য তাপ ২. পূর্ণ দিবস। আয়াতে দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা اَلضُّحٰى-এর বিপরীত দিকে পূর্ণ রাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত কাতাদাহ ও মোকাতিল (র.) বলেছেন, এর দ্বারা সূর্য যখন উপরের দিকে উঠে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

سَجٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : سَجٰى শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্থই এখানে গ্রহণযোগ্য-

১. سَجٰى অর্থ- سَكَنَ তথা শান্ত হয়েছে, কোলাহলমুক্ত হয়েছে প্রশান্ত বা নিঝুম হয়েছে।

২. سَجٰى অর্থ- اَظْلَمَ তথা অন্ধকার হয়েছে।

৩. سَجٰى অর্থ- غَطّٰى তথা ঢেকে ফেলেছে, আচ্ছাদিত হয়েছে। -[কুরতুবী, কাবীর]

সূরা লাইলে لَيْل শব্দকে প্রথমে আর সূরা দুহাতে لَيْل শব্দকে পরে আনার মধ্যে হিকমত : এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব হতে পারে-

১. কোনো কোনো দিক থেকে দিন মর্যাদাবান, আবার কোনো দিক থেকে রাত্রি মর্যাদাবান। দু' সূরাতে দু'টিকে প্রথমে উল্লেখ করে উভয়ের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে।

২. প্রথম সূরাতে হযরত আবূ বকরের ঘটনা আর দ্বিতীয় সূরাতে নবী করীম ﷺ-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ বকর (রা.) ঈমান গ্রহণের পূর্বে কুফরির অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। তাই সে সূরাতে অন্ধকার বিশিষ্ট রজনীকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নবী করীম ﷺ যেহেতু সর্বদা হেদায়েতের পথে ছিলেন, সেহেতু অত্র সূরাতে আলোকিত দিবসের উল্লেখ প্রথমে করা হয়েছে।

৩. দিনের প্রথম প্রহরের সময় অন্তরে খুশি থাকে, আর রাত্রি বেলায় চিন্তা ও নিরানন্দ অনুভূত হয়, যেন এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পার্থিব জীবনের খুশি ও আনন্দ তার দুঃখ-বেদনা থেকে কম হয়ে থাকে।

৪. اَلضُّحٰى এক নির্দিষ্ট সময়ের নাম। যেমন- দিনের প্রথম প্রহর, অত্র সূরাতে দিবসের একাংশ আর পূর্ববর্তী সূরাতে পূর্ণরাত্র উল্লেখ করার কারণ এভাবে হবে যে, পূর্ণ রাত্রি একত্র হয়ে দিনের একাংশের সামান হয়, যেমন নবী করীম ﷺ সৃষ্টির একাংশ হয়েও সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে মূল্যবান বা সমান। -[কাবীর]

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى আয়াতের মর্মার্থ : নবী করীম ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত ও দয়া দিন দিন যে বৃদ্ধি হতে থাকবে-সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ডিঙ্গিয়ে তিনি যে ইহ ও পরকালীন সাফল্যের উচ্চ মার্গে আরোহণ করবেন, সে দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রতিটি পরবর্তী অবস্থা আপনার জন্য পূর্ববর্তী অবস্থা হতে উত্তম হবে। আপনার চারদিকে যে বাধার পাহাড়সমূহ দেখছেন, সবই দূরীভূত হয়ে যাবে কেউই কোনো বাধা-বিপত্তিই আপনার বিজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কাজেই আপনি ঘাবড়িয়ে যাওয়ার ও আশাহত হওয়ার কোনোই কারণ নেই।

তা ছাড়া পরকালে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যা দান করবেন; তা এ দুনিয়ার মর্যাদা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি হবে। কাজেই আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ইমাম তাবারানী (র.) আওসাত গ্রন্থে এবং বায়হাকী (র.) দালায়েল নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (র.) হতে উদ্ধৃত করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার পর আমার উম্মত যে বিজয় অর্জন করবে তা আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তখন নাজিল হলো- .... وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ অর্থাৎ অবশ্যই আখেরাত আপনার জন্য এ দুনিয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম হবে।

অথবা, এর অর্থ হলো, প্রথম অবস্থা হতে পরবর্তী অবস্থা উত্তম হবে, অর্থাৎ হে নবী ﷺ আপনার মাক্কী জীবন হতে মাদানী জীবন অধিক উন্নত হবে। -[নূরুল কোরআন]

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য কিভাবে পরকাল-ইহকাল অপেক্ষা উত্তম হবে : নবী করীম ﷺ-এর জন্য দুনিয়া অপেক্ষা পরকাল উত্তম হওয়ার বিভিন্ন দিক হতে পারে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ক. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কারণে তার কল্যাণও ক্ষণস্থায়ী। তা ছাড়া দুনিয়ার কোনো ভালোই নিখাদ নয়। পক্ষান্তরে পরকালের কল্যাণ স্থায়ী ও খাঁটি।

খ. আখেরাতে নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত উম্মতগণকে স্বীয় পাশে পাবেন। তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হবেন। কেননা উম্মতগণ তাঁর সন্তানতুল্য। ইরশাদ হচ্ছে- وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মাতাতুল্য।

গ. অথবা, যেন নবী করীম ﷺ -কে আল্লাহর পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো আপনি আপনার ইচ্ছা মাফিক সুখ ভোগ করেছেন, আর পরকালে আমি আমার ইচ্ছামতো আপনাকে দান করবো। আর তা অবশ্যই দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে।

ঘ. অথবা, দুনিয়াতে যেমন আপনার প্রশংসাকারী আছে তেমন আপনার উপর অপবাদদানকারী একটি দলও রয়েছে। পক্ষান্তরে পরকালে আপনার উপর কেউ অপবাদ দিবে না; বরং সকল নবী রাসূল ও আপনার উম্মতের পক্ষে আপনাকে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে পেশ করা হবে। আর আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। ইরশাদ হচ্ছে- وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট)।

ঙ. অথবা, এজন্য আখেরাত আপনার জন্য উত্তম যে, এটা (তথা জান্নাত) আপনি খরিদ করে নিয়েছেন। অথচ দুনিয়াকে আপনি ক্রয় করেননি। আর কোনো বস্তু পছন্দনীয় না হলে কেউ তা ক্রয় করে না।

মোটকথা, ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া হলো উপার্জনের স্থান, আর আখেরাত হলো ভোগের স্থান। কাজেই দুনিয়া অপেক্ষা আখেরাত নিঃসন্দেহে ভালো ও উত্তম হবে। নবী করীম ﷺ ফরমান- اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى : অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যাতে আপনি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবেন। অর্থাৎ দিতে তো কিছু বিলম্ব হবে, তবে সে দেওয়ার দিন বেশি দূরেও নয়। তখন তোমার প্রতি তোমার আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের এমন বৃষ্টি বর্ষণ হবে যে, তা পেয়ে তুমি অবশ্যই খুব সন্তুষ্ট হবে। বস্তুত এটা কোনো অমূলক ওয়াদা ছিল না। নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই এ ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়। দক্ষিণ উপকূল হতে উত্তরে রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর হতে পশ্চিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত সমগ্র আরবদেশ নবী করীম ﷺ -এর শাসনাধীন হয়। আরবের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এ ভূখণ্ড এক সুসংবদ্ধ আইন ও শাসনের আওতাভুক্ত হয়। এটা এতদূর শক্তিশালী হয় যে, যে শক্তিই এটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কালেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ধ্বনিতে সমগ্র দেশ মুখরিত হয়ে উঠে। অথচ মুশরিকরা এ দেশে তাদের মিথ্যা কালিমার আওয়াজ উচ্চে রাখার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের সম্মুখে জনগণের কেবল মস্তকই অবনমিত হয়নি, তাদের মন-মগজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। লোকদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও বাস্তব কাজকর্মে এক বিরাট মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হলো। চরম জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশটি বছরের মধ্যে এতখানি পরিবর্তিত হতে পারে বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। নবী করীম ﷺ -এর অন্তর্ধানের পর তাঁরই গড়া ইসলামি আন্দোলন এক প্রবল শক্তি নিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের এক বিরাট অংশের উপর এটা বিজয়ী হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর রাসূলকে দুনিয়ার জীবনে এত কিছু দান করেছেন। অতঃপর পরকালে তিনি তাঁকে যা কিছু দিবেন, তা তো এ দুনিয়ার মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না।

وَلَسَوْفَ -এর ফায়দা : আয়াতে وَلَسَوْفَ বলা হয়েছে, শুধু সীন দিয়ে سَيُعْطِيْكَ বলা হয়নি। কেননা سَوْفَ দূরবর্তী ভবিষ্যৎকাল বুঝায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর أَجَلْ বা মৃত্যুর সময় এখনো অনেক পরে। তিনি আরো একটি বিরাট সময় বেঁচে থাকবেন। অথবা কাফেরগণ বলেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ -কে তাঁর প্রভু ছেড়ে দিয়েছেন, তখন জবাব দেওয়া হয়েছে যে, না তাঁকে তাঁর প্রতিপালক কখনো ছাড়েননি। তারপর তারা বলেছিল, অনতিবিলম্বে সে মরে যাবে, তখন জবাব দেওয়া হয়েছে যে, وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ الخ -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. اَلَمْ يَجِدْكَ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَىْ وَجَدَكَ يَتِيْمًا بِفَقْدِ اَبِيْكَ قَبْلَ وِلَادَتِكَ اَوْ بَعْدَهَا فَاٰوٰى بِاَنْ ضَمَّكَ اِلٰى عَمِّكَ اَبِىْ طَالِبٍ .

৬. তিনি কি তোমাকে পাননি? এখানে اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ বা সাব্যস্তকরণার্থে অর্থাৎ তোমাকে পেয়েছেন এতিম অবস্থায় তোমার জন্মের পূর্বে বা পরে পিতৃহারা হওয়ার কারণে অতঃপর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তোমাকে পিতৃব্য আবূ তালিবের সাথে মিলিত করে।

٧. وَ وَجَدَكَ ضَالًّا عَمَّا اَنْتَ عَلَيْهِ الْاٰنَ مِنَ الشَّرِيْعَةِ فَهَدٰى اَىْ هَدَاكَ اِلَيْهَا .

৭. আর তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পেয়েছেন এ শরিয়ত যার উপর তুমি বর্তমানে আছ, এর সম্পর্কে। অতঃপর তিনি পথ নির্দেশ দান করেছেন তোমাকে সত্য পথের সন্ধান দিলেন।

٨. وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَقِيْرًا فَاَغْنٰى اَغْنَاكَ بِمَا قَنَعَكَ بِهٖ مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَغَيْرِهَا وَفِى الْحَدِيْثِ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ .

৮. আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব অবস্থায় দরিদ্র অবস্থায় অনন্তর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করেছেন গনিমত ইত্যাদি যেসবের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে তুষ্ট করেছেন তা দান করে; হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, অধিক সম্পদের অধিকারী হওয়ার নাম অভাবমুক্তি নয়; বরং আত্মার অভাবমুক্তির অনুভূতিই প্রকৃত ধনাঢ্যতা।

٩. فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ بِاَخْذِ مَالِهٖ اَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ .

৯. সুতরাং এতিমের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না তার সম্পদ ইত্যাদি ছিনিয়ে নিয়ে।

١٠. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تَزْجُرْهُ لِفَقْرِهٖ .

১০. আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করো না। তার দারিদ্র্যের কারণে তাকে কটুবাক্য বলো না।

١١. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكَ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا فَحَدِّثْ اَخْبِرْ وَحُذِفَ ضَمِيْرُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ الْاَفْعَالِ رِعَايَةً لِلْفَوَاصِلِ .

১১. আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তোমাকে নবুয়ত দান ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদত্ত অনুগ্রহ সম্পর্কে জানিয়ে দাও অবহিত করো। কোনো কোনো فِعْل হতে আয়াতের فَوَاصِل-এর কারণে সে সকল যমীর বিলুপ্ত করা হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি رَاجِعْ বা সম্পর্কিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত আয়াতের সাথে যোগসূত্র : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন– তিনি কি আপনাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তদুত্তরে বলেছেন–নিশ্চয়। তখন তিনি বলেছেন–আপনি যখন ছোট ছিলেন, দুর্বল ছিলেন, তখন আমি আপনাকে ছেড়ে দেইনি; বরং আপনাকে লালন-পালন করে যতটুকু গড়া দরকার গড়ে তুলেছি– সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে পরিগণিত করেছি। এতটুকু করার পর আপনার কি ধারণা হয় যে, আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি? –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এতিমের অর্থ ও তার গুরুত্ব : এতিম শব্দের অর্থ এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে তাফসীরকারদের দু'টি অভিমত রয়েছে।

১. মাতৃ-পিতৃহীন। যখন তাঁর পিতা পরলোক গমন করে তখন তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের উদরে। দুনিয়াতে পদার্পণ করে তিনি মা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের লালন-পালনে বড় হচ্ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় মা'কে হারানোর দু'বৎসর পরেই তিনি দাদাকেও হারালেন। আট বছর বয়সের এ অনাথ বালকের দায়িত্বভার চাচা আবূ তালিবের হাতে ন্যস্ত হয়। তিনি তাঁর সকল প্রকারের সহযোগিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়েছেন। এটাই এতিম ও আশ্রয়দানের অর্থ। −[কাবীর]

২. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে− এতিম শব্দের অর্থ− একক, অদ্বিতীয়, অর্থাৎ আপনি বিশ্বের তুলনাহীন ব্যক্তি অথবা আরবের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। সুতরাং আপনাকে নবুয়ত এবং রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করা হলো। −[খাযেন, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى : ضَالًّا শব্দ ضَلَالَةٌ হতে নির্গত, এর অর্থ− গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা, পথের সন্ধান না জানা, নিখোঁজ ও বিলুপ্ত হওয়া। কোনো কোনো সময় ضَلَالٌ শব্দ দ্বারা অসতর্কতা ও ভ্রূক্ষেপহীনতাও বুঝানো হয়ে থাকে। এ বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রথমোক্ত পথভ্রষ্টতা অর্থটি এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ বাল্যকাল হতে নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বৎসর নবী করীম ﷺ কখনো গোমরাহীর কারণে শিরক বা নাস্তিকতায় নিমজ্জিত ছিলেন না এবং জাহেলিয়াত যুগের কাজকর্ম ও রসম-রেওয়াজে তিনি মগ্ন ছিলেন না। এ জন্য وَجَدَكَ ضَالًّا দ্বারা পথহারা বা অনভিজ্ঞ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে। নবুয়ত লাভের পূর্বেও তিনি তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর জীবন গুনাহ হতে পবিত্র ছিল এবং তিনি উত্তম চরিত্রে বিভূষিত ছিলেন কিন্তু সত্য দীনের বিস্তারিত কোনো তত্ত্বাদি বা বিধি-বিধান তাঁর জানা ছিল না। সূরা শূ'রার ৫২নং আয়াতে বলা হয়েছে−'কিতাব কি, ঈমান কি, তা তুমি জানতে না।'

আলোচ্য আয়াতে ضَالًّا-এর আরেকটি অর্থ হতে পারে− নবী করীম ﷺ এক জাহিলিয়া সমাজ-পরিবেশে নিখোঁজ প্রায় হয়েছিলেন এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে নবুয়তের পূর্বে তাঁর ব্যক্তিত্ব তেমন স্পষ্ট ও ভাস্বর ছিল না। অথবা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে অসাধারণ প্রতিভা দান করেছিলেন, তা জাহেলিয়াতের প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে বিনষ্ট হচ্ছিল। ضَلَالٌ বলতে অনবহিত বা অনভিজ্ঞ বুঝায়। অর্থাৎ নবুয়ত লাভের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেসব সত্য, নিগূঢ় তত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী করেছিলেন নবুয়তের পূর্বে তিনি সে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত বা অনভিজ্ঞ ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন− ضَالًّا অর্থ− পথহারা। একদা শৈশবে নবী করীম ﷺ মক্কা নগরীর গলিতে হারিয়ে যান। আবূ জাহল তাঁকে মেশ শাবকের পিছনে ছুটতে দেখে আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) বলেন− একবার নবী করীম ﷺ চাচা আবূ তালেবের সাথে সওদাগরি কাফেলায় সিরিয়া যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে রাতের অন্ধকারে শয়তান তার উটের লাগাম টেনে তাঁকে পথের বাইরে নিক্ষেপ করে। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে এক ফুৎকারে শয়তানকে আবিসিনিয়ায় নিক্ষেপ করেন এবং নবী করীম ﷺ-কে কাফেলার পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন। তাই পথহারা ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন। −[ইবনে কাছীর, খাযেন, মা'আলিম]

ইমাম কালবী, সুদ্দী ও ফাররা বলেন, وَجَدَكَ ضَالًّا অর্থ وَجَدَكَ فِىْ قَوْمٍ ضَلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللّٰهُ لَكَ অর্থাৎ আপনাকে ভ্রষ্ট-গোমরাহ সমাজের বুকে পেয়েছেন, তারপর তিনি তাদেরকে আপনার কারণে হেদায়েত দিয়েছেন।

ইমাম সুদ্দী (র.) বলেন, তিনি চল্লিশ বৎসর তাঁর গোত্রের দীনে ছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, তিনি আল্লাহর দীনের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ 'কিতাব এবং ঈমান কি− তা আপনি জানতেন না।'

জমহুর মুফাসসিরীন, ওলামায়ে কেরাম ও মুহাককিকীন এ কথায় একমত যে, তিনি কখনো কুফরি করেননি। ضَالًّا-এর অর্থ তাই হবে যা হযরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (র.) এবং অন্যান্য সালফে সালেহীন করেছেন। −[কাবীর]

عَائِلًا فَأَغْنٰى-এর অর্থ : আয়াতে করীমায় عَائِلٌ শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে−

১. দরিদ্র বা ফকির। আর এটাই প্রসিদ্ধ অর্থ। এ অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে أَغْنٰى অর্থ হবে−আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আবূ তালিবের লালনের মাধ্যমে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। যখন আবূ তালিবের সম্পদ অসুবিধা হচ্ছিল, তখন খাদীজার সম্পদ দ্বারা সম্পদশালী করেছেন। যখন খাদীজা (রা.)-এর সম্পদে অসুবিধা হয়েছিল। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) -এর সম্পদ দ্বারা সহযোগিতা করেছেন। এটাতেও যখন অসুবিধা মনে করেছেন, তখন হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আনসারদের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন। তারপর জিহাদের নির্দেশ দিয়ে গনিমতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. عَائِل শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো, সন্তানসন্ততি বেশি হওয়া, আর তারা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সমস্ত উম্মত; তাদের আধিক্য দ্বারাই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। কারো মতে উম্মতকে রাসূলের দ্বারা সম্পদশালী করেছেন। কেননা, তারা ছিল জাহিল-মূর্খ। রাসূলের মাধ্যমে তারা দীনি ইলমের সম্পদ অর্জন করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এতিমরূপে গ্রহণের হিকমত : এটার কয়েকটি জবাব হতে পারে–

১. তিনি যেন এতিমের কদর বুঝতে পারেন। তাহলে তাদের প্রাপ্য আদায় করবেন, তাদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন। এ কারণেই হযরত ইউসূফ (আ.) পেট পুরে খেতেন না। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিয়েছেন–পেট ভর্তি করে খেলে ক্ষুধার্তদের ক্ষুধার কথা ভুলে যাওয়ার ভয় করছি।

২. গুণ ও নামের দিক থেকে তিনি আর এতিমগণ এক হবেন। অতঃপর এ কারণে তাঁকে সম্মান দিবেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন– إِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّدًا فَاَكْرِمُوهُ وَوَسِّعُوا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ 'যখন তোমরা সন্তানের নাম মুহাম্মদ রাখবে, তখন তার সম্মান করবে এবং মজলিসে তার স্থান প্রশস্ত করে দিবে।'

৩. যাদের মাতা-পিতা জীবিত থাকে তারা সকল কাজে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাতা-পিতাকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, যেন ছোটবেলা থেকেই তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো উপর ভরসা না করেন।

৪. সমাজের বাস্তব চিত্র হলো এই যে, এতিম সন্তানদের দোষত্রুটি গোপন থাকে না। এমনকি অতিরিক্ত দোষও বের হয়ে যায়। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে এতিম করে জন-সম্মুখে ছেড়ে দিয়েছেন। যেন তারা তাঁর সম্পর্কে ভালো করে বুঝে নিতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাঁর পবিত্রতা এবং নিষ্কলুষতার উপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারে–এটাই হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে। রিসালাতের দায়িত্বের পর কোনো ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর কোনো প্রকার প্রকার দোষ আরোপ করতে পারেনি।

৫. মাতা-পিতা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। রাসূলের শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন। কেননা তাঁর কেউ ছিল না।

৬. গরিব এবং এতিম হলে মানুষ সমাজে সম্মান পায় না; কিন্তু এ ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেলে এক নজির স্থাপন করেছেন যে, গরিব এবং এতিম হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকুলের মধ্যে সম্মানিত হয়েছেন। এক বাক্যে দুনিয়ার সকল মানুষ জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রকার লোক তাঁকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এটাই তাঁর এক প্রকার মু'জিযা। –[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ : 'আর আপনি سَائِلْ-কে ধমক দিবেন না।' এখানে سَائِلْ শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী, অভাবগ্রস্ত ও ভিক্ষুক। এমতাবস্থায় এর মর্মার্থ হবে, তাকে সাহায্য করতে পারলে কর। আর না পারলে, নম্রতা সহকারে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ কর। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তাকে ধমক দেওয়া যাবে না। আপনি দরিদ্র ছিলেন আল্লাহই আপনাকে ধনী করেছেন। অতএব, আপনি অপর কোনো গরিব, ভিক্ষুক, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিবেন না।

২. প্রশ্নকারী, জিজ্ঞাসাকারী, অর্থাৎ দীন ইসলামের ব্যাপারে কেউ যদি কিছু জানতে চায়, তাহলে এরূপ প্রশ্নকারী ব্যক্তি যতই অজ্ঞ বা মূর্খ হোক না কেন আর যত অশোভন ভঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করুক না কেন– অতীব স্নেহ ও দরদ সহকারে তার জবাব দিবে জ্ঞানের অহংকারী রুঢ় স্বভাবের অধিকারীদের ন্যায় ধমক দিয়ে বা তিরস্কার করে তাকে তাড়িয়ে দিও না। হযরত আবুদ দারদা, হাসান বসরী ও সুফিয়ান ছাওরী (র.) প্রমুখগণ এ দ্বিতীয় অর্থটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ : শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে হয়েছে। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে এবং পরে যত নিয়ামত মহানবী ﷺ -কে দান করা হয়েছে সবই এখানে উদ্দেশ্য। সূরার শেষে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- হে নবী! আপনি আল্লাহর দেওয়া প্রত্যেকটি নিয়ামতের উল্লেখ করুন– প্রকাশ করুন। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামতের প্রকাশ যেভাবে হতে পারে, তা এই যে, মুখে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। স্বীকার করতে হবে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহেই এ সব কিছু আমাকে দান করেছেন, আমি যোগ্যতার বলে এগুলো লাভ করিনি। নবুয়তের নিয়ামত প্রকাশের নিয়ম হলো, লোকদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচার চালানো, তার শিক্ষা লোকদের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া, হিদায়েত পাওয়া, এতিম হয়েও সুষ্ঠুভাবে লালিত-পালিত হওয়া এবং দরিদ্র হতে ধনী হওয়া– এ সবই আল্লাহর পক্ষ হতে নবী করীম ﷺ -এর জন্য একেকটি বিরাট নিয়ামত। এসব নিয়ামতের প্রকাশ পদ্ধতি হলো, পথভ্রষ্ট লোকদেরকে হেদায়েত করা, এতিম ও অনাথ লোকদেরকে আশ্রয় দান করা এবং গরিব, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সাহায্যপ্রার্থীকে সহায্য করা। সুতরাং বুখারী শরীফে হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে

যে, নবী করীম ﷺ এর নিকট– সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কোনো দিন কেউ বিমুখ হয়নি। কাউকেও কোনো দিন তিনি لَا (না) বলে ফিরিয়ে দেননি। এ মর্মে কবি ফারাযদাক (র.) খুব সুন্দর বলেছেন مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِيْ تَشَهُّدِهٖ * لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءَهُ نَعَمُ অর্থাৎ তাশাহহুদ ব্যতীত অন্য কোথাও নবী করীম ﷺ لَا (শব্দ) উচ্চারণ করেননি। যদি تَشَهُّدُ না হতো, তাহলে তার এই لَا ও نَعَمُ-এ পরিণত হতো। অর্থাৎ এখানেও তিনি لَا না বলে نَعَمُ-ই বলতেন।

হযরত মোকাতিল (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতকে স্মরণ করাই হলো তাঁর শোকর গুজারী। আর শোকর গুজারী হলো এই সত্য উপলব্ধি করা যে, এ নিয়ামত আল্লাহ তা'আলারই দান। দ্বিতীয় নিয়ামতকে নিয়ামতদাতার মর্জি মোতাবেক ব্যয় করা। আর্থিক নিয়ামতের শোকর গুজারী হলো তা আল্লাহর রাহে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর গুজারী হলো, যেসব ফরজ মানুষের প্রতি অর্পিত হয়েছে, তা আদায় করা এবং পাপাচার হতে আত্মরক্ষা করা; আর ইলমের শোকর গুজারী হলো, অন্যের নিকট ইলম পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষকে হেদায়েত করা। –[নূরুল কোরআন]

এখানে نِعْمَة দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আলোচ্য আয়াতে নিয়ামত দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন–

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন– اَلنِّعْمَةُ দ্বারা এখানে নবুয়তকে বুঝানো হয়েছে।
২. এতিম, মিসকিন ও দরিদ্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসার তৌফিককে নিয়ামত বলা হয়েছে।
৩. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এখানে নিয়ামত দ্বারা কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে।
৪. বস্তুত এর দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে প্রদত্ত সকল নিয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ : আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি অনেক অনুগ্রহ, দয়া ও করুণা প্রদর্শন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি করুণার কথা আল্লাহ এ সূরাতে উল্লেখ করেছেন।

নবীর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ হলো আল্লাহ নবীকে পিতৃহীন অবস্থায় পেয়েছেন। অতঃপর আশ্রয় দান করেছেন। অত্র আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন অথবা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এরূপ কোনো ধারণাই মনে আসতে পারে না। বস্তুত নবী করীম ﷺ যখন মাতৃগর্ভে ছয় মাসের ছিলেন, সে সময়ই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। এ জন্য তিনি জন্মাবস্থায়ই পিতৃহীন ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও অসহায় করে রাখেননি। ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর জননীই তাঁর লালন-পালন করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর জননী-স্নেহ বঞ্চিত হয়ে আট বছর বয়স পর্যন্ত দাদার স্নেহে লালিত হন। দাদা তাঁকে পরম স্নেহে ও আদরে লালন-পালন করেন। তিনি তাঁকে শুধু ভালোই বাসতেন না; বরং তাঁকে নিয়ে তিনি রীতিমতো গর্ববোধ করতেন। তিনি লোকদের বলতেন–আমার এ নাতিটি একদিন দুনিয়াতে বড় খ্যাতি ও সম্মান লাভ করবে। দাদার ইন্তেকালের পর তাঁর চাচা আবূ তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সাথে এমন স্নেহ-ভালোবাসার ব্যবহার করতেন যে, কোনো জন্মদাতা পিতাও বোধ হয় তা করতে পারে না। এমনকি নবুয়ত লাভের পর সমগ্র আরববাসী যখন তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল, তখন দশ বছর পর্যন্ত তিনিই তাঁর সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বুক পেতে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় অনুগ্রহ হলো 'পথহারাকে পথ দেখিয়েছেন।' বাল্যকাল হতে নবুয়ত লাভ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর অবস্থার বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাতে তিনি কখনো গোমরাহ হয়ে মূর্তিপূজা, শিরক কিংবা নাস্তিকতায় নিমজ্জিত হয়েছেন বলে ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। তিনি সত্যদীন, তার আইন-কানুন ও বিধি-বিধান কিছুই জানতেন না। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা তা তাঁকে শিখিয়েছেন।

তৃতীয় অনুগ্রহ হলো নিঃস্বকে সম্পদশালীতে পরিণত করা। নবী করীম ﷺ-এর জন্য তাঁর পিতা কেবলমাত্র উষ্ট্রী এবং একজন কৃতদাসী উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছেন। ফলে তাঁর জীবন আরম্ভ হয়েছিল দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে, পরে এক সময় কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী মহিলা হযরত খাদীজা (রা.) প্রথমত ব্যবসায়ে তাঁকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য নিজেই পরিচালনা করতে থাকেন। হযরত খাদীজার ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎকর্ষ দানের ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতার বিশেষ অবদান ছিল। নবী করীম ﷺ স্ত্রীর ধন-সম্পদের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল ছিলেন না। যদিও বিবি খাদীজা (রা.) তার সমস্ত ধনসম্পদ নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উৎসর্গ করেছেন। এভাবে নবীকে আল্লাহ সম্পদশালী করলেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ : সূরা আলাম নাশরাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের প্রথমাংশকে এর নাম হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ১০৩ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে অনুমিত হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা আদ্ব-দ্বুহা ও এ সূরাটি প্রায় একই সময় নাজিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে সূরা আদ্ব-দ্বুহার পরে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মূলত এ সূরাতে নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। নবুয়তের পূর্ববর্তী সময় নবী করীম ﷺ মক্কাবাসীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করতেই সমগ্র সমাজ ও জাতি যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। তখন মক্কা নগরীতে তাঁর কথা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রতি পদে তাঁর সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করতে লাগল। তাঁর জন্য এ সব খুবই মর্মন্তুদ ও নিরুৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রথমে সূরা আদ্ব-দ্বুহা ও পরে এ সূরাটি নাজিল হয়।

সূরাটিতে সর্বপ্রথম নবী করীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আমি আপনাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করেছি। এ নিয়ামতসমূহ বর্তমান থাকতে আপনার নিরুৎসাহ ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একটি হলো 'শরহে সদর'-এর নিয়ামত। দ্বিতীয় নবুয়তের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা আপনার মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা আপনার উপর হতে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো তার উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখের নিয়ামত। একমাত্র আপনি ছাড়া সৃষ্টিলোকের অন্য কাউকে এরূপ নিয়ামত দান করা হয়নি।

অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে বর্তমানের কঠিনতাপূর্ণ ও দুষ্কর সময় খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। এ সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা ও প্রশস্ততার ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে।

পরিশেষে নবী করীম ﷺ -কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এ কঠিনতা ও কঠোরতা, সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে একটি জিনিস হতেই আসবে। আর তা হলো, আপনি যখনই আপনার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে অবসর পাবেন, তখন আপনি ইবাদত-বন্দেগির শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হবেন। সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে নিবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ : সূরা আলাম নাশরাহ মক্কায় অবতীর্ণ

ثَمَانُ اٰيَةٍ : ৮ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلَمْ نَشْرَحْ اِسْتِفْهَامُ تَقْرِيْرٍ اَيْ شَرَحْنَا لَكَ يَا مُحَمَّدُ صَدْرَكَ بِالنُّبُوَّةِ وَغَيْرِهَا .

১. আমি কি প্রশস্ত করিনি? এখানে اِسْتِفْهَامْ বা প্রশ্নবোধকটি تَقْرِيْر বা সাব্যস্তকরণার্থে অর্থাৎ আমি প্রশস্ত করেছি। তোমার জন্য হে মুহাম্মদ তোমার বক্ষকে নবুয়ত ইত্যাদি অনুগ্রহের মাধ্যমে।

٢. وَوَضَعْنَا حَطَطْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ .

২. আর আমি অপসারণ করেছি বিদূরিত করেছি তোমার উপর হতে তোমার বোঝা ।

٣. الَّذِيْٓ اَنْقَضَ اَثْقَلَ ظَهْرَكَ وَهٰذَا كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ .

৩. যা দুর্বহ করেছিল ভারি করেছিল তোমার পৃষ্ঠকে এ আয়াতটি অনুরূপ–যেমন, অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে–

لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

٤. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بِاَنْ تُذْكَرَ مَعَ ذِكْرِيْ فِي الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَالْخُطْبَةِ وَغَيْرِهَا .

৪. আর আমি তোমার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি যেমন– আযান, ইকামাত, তাশাহহুদ ও খুতবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমার স্মরণের সাথে তোমর নামও উল্লিখিত হয়।

٥. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ الشِّدَّةِ يُسْرًا سُهُوْلَةً .

৫. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই বিপদাপদের সাথেই স্বস্তি আছে শান্তি আছে।

٦. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاسٰى مِنَ الْكُفَّارِ شِدَّةً ثُمَّ حَصَلَ لَهُ الْيُسْرُ بِنَصْرِهٖ عَلَيْهِمْ .

৬. নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে নবী করীম [illegible] প্রথমে কাফেরদের পক্ষ হতে অনেক দুঃখ-যাতনা সহ্য করেছেন। অতঃপর তাদের উপর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করেছেন।

٧. فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَانْصَبْ اِتْعَبْ فِي الدُّعَاءِ .

৭. অতএব যখনই তুমি অবসর হবে সালাত হতে সাধনা করো খুব প্রার্থনা করো।

٨. وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ تَضَرَّعْ .

৮. আর তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো কান্নাকাটি করো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে নবী করীম [illegible]-এর রেসালাতের কার্যকে সঠিকরূপে পরিচালনার নিমিত্তে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাথে সাথে তাঁর উপর আল্লাহর বিভিন্ন অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন নবুয়তের ভার বহনের জন্য যোগ্য করে তুলতে তাঁর বক্ষ উন্মুক্ত করার বিষয় আলোচিত হচ্ছে। নবুয়তের দায়িত্বকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য কাফেরদের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাশার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে মানযিলে মাকসূদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, উভয় সূরার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। -[কামালাইন]

সূরাটির শানে নুযূল : এ সূরা সর্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছিল। একদা নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা, হযরত দাউদ ও হযরত সোলাইমান (আ.) প্রমুখ নবীগণকে এক একটি গৌরবজনক উপাধি ও বিশিষ্ট শক্তি দান করেছ। আমার জন্য তুমি সেরূপ কোন সম্পদ দান করেছ? উক্ত প্রার্থনার উত্তরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে নবী করীম ﷺ -এর অসাধারণ দৈহিক ও আত্মিক উন্নতির বিষয় বর্ণিত হয়েছে -[খাযেন, মা'আলিম, ইবনে কাছীর]

অথবা, কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় গরিব, অসহায়, দাসদাসী ও মহিলাগণই তাওহীদে বিশ্বাস করেছিল। তখনো আরবের কোনো উল্লেখযোগ্য ধনী বা প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ সময় মক্কার মুশরিকগণ মুসলমানদের দরিদ্র ও দৈন্য দশা নিয়ে উপহাস করত। এতে নবী করীম ﷺ ও তাঁর অনুসারীগণ কিছুটা সংকোচবোধ করতেন। তাদের মানসিক দুর্বলতা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ সূরা নাজিল করেন। -[লোবাব]

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ আয়াতে شَرْحُ الصَّدْرِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? : মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে شَرْحِ صَدْرٍ 'বক্ষ উন্মোচনের' দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. সকল প্রকার মানসিক দ্বন্দ্ব, কুণ্ঠা ও ইতস্ত ভাব হতে মুক্ত হয়ে এ কথায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও প্রশান্ত হওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য পথ এবং ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসনীতি, আদর্শ নৈতিকতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আইন ও বিধান একান্তভাবে সত্য, নির্ভুল ও কল্যাণকর।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে সত্য-সঠিক পথের বিস্তারিত পথ নির্দেশ, নবী করীম ﷺ -এর জানা ছিল না। এ কারণে তার মনে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব সদা জাগ্রত থাকত। নবুয়ত দান করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনের এ উদ্বেগের চির অবসান করে দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে-

فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ـ

২. কোনো ব্যক্তির মাঝে প্রবল সাহস ও বলিষ্ঠ মানসিকতার উদ্ভব হওয়া, বড় বড় অভিযানে গমন এবং কঠিন-কঠোর, দুঃসাধ্য কাজে একবিন্দু কুণ্ঠা ও দুর্বলতা দেখা না দেওয়া মানে নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনের সাহসিকতার সঞ্চার হওয়া।

এ অর্থের দৃষ্টিতে আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, নবুয়ত দান করার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অপূর্ব সাহসিকতা, দৃঢ় মানসিকতা, উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হৃদয়ের উদারতা প্রশস্ততাও দান করেছেন। কেননা নবুয়তের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এ গুণসমূহ ছিল অপরিহার্য।

شَقُّ الصَّدْرِ-এর বর্ণনা : শরহে সাদরের পাশা-পাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষ বিদারণও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে আছে। অন্তরকে পরিষ্কার করে ঈমান ও তাওহীদের বীজ রাখার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণই শাক্কে সাদার।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বক্ষ চারবার বিদারণ করা হয়েছিল-

১. হযরত আনাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, যখন তাঁর বয়স চার বছর হয়, তিনি তখন হযরত হালীমা (রা.) -এর প্রতিপালনে ছিলেন। একদিন ছেলেদের সাথে খেলার মাঠে গেলেন। সে সময় ফেরেশতা এসে তাঁর বক্ষ বিদারণ করে। সোনার তস্তুরীতে জমজমের পানি দ্বারা তাঁর 'কলব' [হৃদপিণ্ড] ধৌত করে, আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর বক্ষে সেলাইর দাগ দেখেছি। এ বক্ষ বিদারণ দ্বারা খেলাধুলা এবং বাল্যকালের অন্যান্য দুর্বলতা দূর করা উদ্দেশ্য ছিল।

২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, দ্বিতীয়বার যখন তাঁর বয়স বিশ বছর হয়েছিল। কোনো কোনো বর্ণনা মতে- যখন তাঁর বয়স দশ বছর হয়েছিল, তখন এক ময়দানে হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ.) তাঁকে শোয়ায়ে বক্ষ বিদারণ করে, এতে কোনো রক্তও বের হয়নি, কোনো কষ্টও অনুভব করেননি। তখন একজন পানি আনয়ন করেন, দ্বিতীয়জন কলব ধৌত করেন। এটা দ্বারা হিংসা-বিদ্বেষকে একটি রক্তপিণ্ডের মতো বের করে ফেলে দেন। আর স্নেহ-মমতাকে রৌপ্যের টুকরার মতো একটি পিণ্ড আকারে অন্তরে প্রবিষ্ট করে দেন। অতঃপর বক্ষ বন্ধ করে তাতে একটি জিনিস ঔষধের মতো লাগিয়ে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্তরে স্নেহ-মমতা, দয়া, অনুগ্রহ প্রবল হয়ে উঠে। আর যৌবনের সর্বপ্রকার কু-বাসনা দূর হয়ে যায়

Free @ www.elmweebly.com

১. যখন তিনি হেরা গুহায় ছিলেন, তখন বক্ষ বিদারণ করা হয়। আর ওহী বরদাশত করার ক্ষমতা তাঁর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়।

২. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবুয়তের পর হিজরতের পূর্বে মেরাজ গমন কালে কা'বা ঘরের নিকট তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। আর হযরত জিবরাঈল (আ.) সোনার তস্তুরীতে জমজমের পানি দ্বারা তাঁর বক্ষ ধৌত করে তাতে ঈমান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ভর্তি করে আকাশমণ্ডলী সফরের শক্তি তাঁর বক্ষে ঢেলে দেন। -[খাযেন, রূহুল মা'আনী]

সারকথা, আল্লাহ তা'আলা দৈহিক ও আত্মিকভাবে নবী করীম ﷺ -এর বক্ষ উন্মুক্ত ও সম্প্রসারিত করেছেন, এ বক্ষ উন্মোচনের পর তাঁর দেহ এরূপ বিশুদ্ধ ও নির্মল এবং হৃদয় এরূপ সমুজ্জ্বল ও জ্যোতিপূর্ণ হয়েছিল যে, প্রখর সূর্য কিরণের মধ্যেও তাঁর পবিত্র দেহের ছায়া প্রতিবিম্বিত হতো না। -[আযীযী, কাযেন]

قَلْب-কে উল্লেখ না করে صَدْر-কে উল্লেখ করার কারণ : অত্র আয়াতে قَلْب -এর পরিবর্তে صَدْر উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. জমহুর মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, এখানে قَلْب -এর পরিবর্তে صَدْر-এর উল্লেখ করার কারণ এই যে, কুমন্ত্রণা, সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও কু-ধারণার স্থান হলো صَدْر বা বক্ষ, অন্তর বা قَلْب নয়। ইরশাদ হচ্ছে- اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ। কাজেই شَرْح صَدْر-এর মাধ্যমে বক্ষকে সমস্ত কুমন্ত্রণা ও কু-কামনা হতে পবিত্র করা হয়েছে।

২. ইমাম মুহম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী (র.) বলেন, মূলত قَلْب-ই হলো শয়তানের লক্ষ্যস্থল। আর قَلْب (অন্তর) صَدْر (বক্ষ) রূপ দুর্গে অবস্থিত। কাজেই শয়তান কিছুমাত্র সুযোগ করতে পারলেই তার সৈন্য-সামন্ত সহ বক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে কলব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কুচিন্তা, সন্দেহ-সংশয় ও দুশ্চিন্তার জাল এমনভাবে বিস্তারিত হয় যে, قَلْب ইবাদত ও অন্যান্য ভলো কাজ করতে মজা পায় না। একমাত্র شَرْح صَدْر-এর মাধ্যমেই এ অবস্থা হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। -[কাবীর]

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ-আয়াতে لَكَ -কে অতিরিক্ত নেওয়ার হিকমত : এখানে اَلَمْ نَشْرَحْ صَدْرَكَ বললেই বাক্য পূর্ণ হয়ে যেত তথাপি "لَكَ" শব্দটিকে অতিরিক্ত নেওয়া হয়েছে কেন? মুফাসসিরগণ তার একাধিক হিকমত বর্ণনা করেছেন।

১. এটা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَرْح صَدْر [ও নবুয়তের অন্যান্য কল্যাণ] একমাত্র নবী করীম ﷺ -এর জন্যই নিবেদিত। এতে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কোনো ফায়দা নেই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে- اِنَّمَا شَرَحْنَا صَدْرَكَ لِاَجْلِكَ "لَا لِاَجْلِىْ" অর্থাৎ আমি আপনার বক্ষকে উন্মোচন করেছি আপনারই কল্যাণের জন্য, আমার কোনো কল্যাণের জন্য নয়।

২. অথবা, এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেহেতু নবী করীম ﷺ তাঁর সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহর জন্যই করে সেহেতু আল্লাহ তা'আলা شَرْح صَدْر ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজ নবী করীম ﷺ -এর জন্যই করেছেন। -[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى اَلَمْ نَشْرَحْ بِصِيْغَةِ الْجَمْعِ؟ : اَلَمْ نَشْرَحْ – বাক্যাংশটুকু বহুবচনের সীগায় উল্লেখ করা হয়েছে কেন? : আল্লাহ তা'আলা এখানে اَلَمْ اَشْرَحْ না বলে اَلَمْ نَشْرَحْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ একবচনের صِيْغَه ব্যবহার না করে বহুবচনের صِيْغَه উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. এখানে বহুবচনের صِيْغَه সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় অনেক সময় সম্মানার্থে একবচনের স্থলে বহুবচনের صِيْغَه ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিয়ামতদাতা যেমন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তেমনটি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতও অতিশয় মর্যাদা সম্পন্ন।

২. অথবা, বহুবচনের صِيْغَه দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, شَرْح صَدْر-এর কাজটি আল্লাহ তা'আলা একা করেননি; বরং এ কাজে তিনি তাঁর ফেরেশতাগণের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। যেন বলা হয়েছে যে, হে রাসূল! আপনি আপনার উপর অর্পিত রেসালাতের দায়িত্ব পালন করে যান। আমার ফেরেশতাগণ সার্বক্ষণিকভাবে আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। -[কাবীর]

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ -এর অর্থ : وِزْر -এর শাব্দিক অর্থ- পাপ, দুশ্চিন্তা, কাপড়ের গিরা, বোঝা, ভার ইত্যাদি। সুতরাং وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ -এর অর্থ হবে- আমি আপনার উপর হতে দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- এ বোঝা অর্থ গুনাহ। জাহেলিয়াতের যুগে নবী করীম ﷺ এমন কোনো ভুল করেছেন, যা এ আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিশ্চিন্ত করে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তার ভুল মাফ করে দিয়েছেন। -[খাযেন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অথবা, এ وِزْر (দুর্বহবোঝা) দ্বারা চাচা আবূ তালেব ও খাদীজার মৃত্যুতে যে দুঃখ-চিন্তা এসেছিল, তা অপসারণের কথা বুঝিয়েছেন। -[রূহুল মা'আনী]

অথবা, وِزْرَكَ-এর মধ্যে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূলবাক্য ছিল وِزْرَ اُمَّتِكَ অর্থাৎ অধিক চিন্তা করে হতাশ হবেন না, আপনার উম্মতের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেওয়া হয়েছে। অথবা, আপনার উপস্থিতিতে তাদের উপর শাস্তি হবে না। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ -[রূহুল মা'আনী]

অথবা, কিছু দিন ওহীর অবতরণ বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আর তা ছিল মনের উপর বিরাট বোঝার ন্যায়। মহান আল্লাহ সূরা দুহা এবং সূরা ইনশিরাহ নাজিল করে তাঁর দুশ্চিন্তার বোঝা দূর করে দিয়েছেন এবং তাঁর মনেও সান্ত্বনা দান করেছেন।

কারো মতে, ইসলামের প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় নবী করীম ﷺ-এর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকত এবং দিবারাত তিনি সত্য সাধনায় মশগুল থাকতেন। কিন্তু বিরোধীদের বিরোধিতার কারণে তাঁর আকাঙ্ক্ষা মোতাবেক কাজ হতো না। তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। মহান আল্লাহ তাঁর মনকে প্রশস্ত করেছেন এবং অনেক দুঃসাধ্য কাজও সহজ করেছেন, ফলে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। -[নূরুল কোরআন]

رَفْعُ الذِّكْرِ-এর ধরন : নাম সমুন্নত করার এটা একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় [যখন সূরাটি নাজিল হয়] কেউ চিন্তাও করতে পারেনি যে, একক ও নিঃসঙ্গ ব্যক্তি, যার সাথে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক রয়েছে, তাও কেবল মক্কা শহরে সীমাবদ্ধ, তার সুনাম ও সুখ্যাতি সারা বিশ্বে কেমন করে ছড়িয়ে পড়বে। এ সুসংবাদ আল্লাহ বিস্ময়করভাবে বাস্তবায়ন করেছেন।

এ رَفْعُ الذِّكْرِ-কে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়-

প্রথম স্তর, নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায় যখন মক্কার মুশরিকগণ সমাগত হাজীদের কাছে নবী করীম ﷺ-এর নানাবিধ কুৎসা করে বেড়াত, যাতে কেউ তাঁর অনুসারী না হয়, মূলত ফল হয়েছিল বিপরীত। বিরুদ্ধবাদীদের মুখে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নাম যত্রতত্র প্রচারিত হতে লাগল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বত্র আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। তাঁর সম্বন্ধে জানার জন্য এবং তাঁকে বুঝার জন্য অনেকে কৌতূহলবোধ করল। নবী করীম ﷺ-এর সংস্পর্শে এসে অনেকেই দীনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয় স্তর, নবী করীম ﷺ-এর মদীনার জীবনে যখন ইসলামি হুকুমত কায়েম হয়েছিল। তখনও মুশরিকগণ তাঁর দুর্নাম রটনা করেছিল। মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রের আল্লাহনুগত্য, সামাজিক ন্যায়-নীতি, সাম্য, সততা ও উত্তম সামাজিকতা সাধারণ মানুষের মন-মগজকে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে তাঁর নাম আরও ব্যাপকভাবে উচ্চারিত হয়েছিল।

তৃতীয় স্তর, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগ। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে গোটা পৃথিবীতে তাঁর নামের যশ ছড়িয়ে পড়েছিল।

চতুর্থ স্তর হলো, তৎপরবর্তী, বর্তমান ও অনন্তকালের স্তর, সারা পৃথিবীর মুসলমান প্রত্যহ ভক্তিভরে তাঁর নাম উচ্চারণ করে যেখানেই আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় সেখানেই নবী করীম ﷺ-এর নামও উচ্চারিত হয়। পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত- এমনকি কিয়ামতের পরেও সর্বত্র তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হবে। এটাই رَفْعُ الذِّكْرِ-এর তাৎপর্য।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, رَفْعُ الذِّكْرِ দ্বারা আজান, ইকামত, তাশাহ্হুদ, খুতবা এবং কালিমায়ে তাওহীদে নবীর কথা জুড়ে দেওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর নামের সাথে রাসূলের নাম কুরআনের বহুস্থানে একত্রে যিকির বা উল্লেখের কথা বুঝিয়েছে। যেমন- اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ইত্যাদি -[খাযেন]

কতিপয় তাফসীরকার এটা দ্বারা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের নবীর উপর দরুদ পাঠের কথা এবং সকল উম্মতের উপর দরুদ পাঠের আদেশের কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন- আপনার নিকট আল্লাহ رَفْعِ ذِكْر-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন তিনি বলেন, আল্লাহই এর অর্থ ভালো জানেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আল্লাহ বলেন, اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ অর্থাৎ আমার নামের সাথে আপনার নাম নেওয়া হয়। -[রূহুল মা'আনী]

কারো মতে, নবী করীম ﷺ-এর সুখ্যাতি ও সুনাম বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে সারা বিশ্বে এমন কি ঊর্ধ্ব জগতেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا : 'নিশ্চয়ই সংকীর্ণতা ও কঠোরতার সাথে রয়েছে প্রশস্ততা ও সহজতা।' এ কথাটি এখানে একই সঙ্গে দু'বার বলা হয়েছে– কথাটির উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করার জন্য। নবী করীম ﷺ -কে পূর্ণমাত্রায় সান্ত্বনা দান ও আশ্বস্ত করার জন্যই এরূপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বর্তমানে যে সংকটপূর্ণ সংকীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন, তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অচিরেই সংকট কেটে যাবে এবং শুভ দিনের সূচনা হবে।

লক্ষণীয় যে, এখানে দু'টি বাক্যেই اَلْعُسْرُ শব্দটিকে মা'রেফা (مَعْرِفَة) উল্লেখ করা হয়েছে। আর আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী একটি শব্দকে একবার মা'রেফা উল্লেখ করে পুনরায় তাকে মা'রেফা নেওয়া হলে একই বস্তুকে বুঝায়। অর্থাৎ দু'টি দ্বারা একটি বস্তুই উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং এখানে উভয় عُسْر দ্বারা একটি عُسْر -ই উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে, يُسْرًا শব্দটিকে উভয় বাক্যে نَكِرَة নেওয়া হয়েছে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী যা দ্বারা দু'টি পৃথক يُسْر উদ্দেশ্য।

এটা হতে মুফাস্সিরগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছেন যে, একটি عُسْر (মুশকিল-কঠোরতা)-এর সাথে দু'টি يُسْر [আসানী-সহজতা] রয়েছে। জনৈক কবি বলেছেন–

إِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوٰى * فَفَكِّرْ فِيْ اَلَمْ نَشْرَحْ * فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ * إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ ـ

ইমাম বাগাবী (র.) লিখেছেন, যদি কষ্ট কোনো গর্তের মধ্যে থাকে, স্বস্তিও সে গর্তে হাজির হবে। এ আয়াতে মহান আল্লাহ প্রিয় নবী ﷺ -কে বিশেষ সান্ত্বনা প্রদান করেন। –[নূরুল কোরআন]

إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا না বলে إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا বলেছেন কেন? : আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে إِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا (কঠোরতার পর সহজতা) না বলে إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [কঠোরতার সাথে সহজতা] বলেছেন। এর কারণ কি?

এর জাওয়াবে বলা হয়েছে যে, 'সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা' না বলার কারণ এই যে, প্রশস্ততার কাল সংকীর্ণতার পর এতই সন্নিকটে ও কাছাকাছি যে, তাকে পৃথক একটি সময় হিসাবে গণ্য করা যায় না। মোটকথা, এটা দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সংকীর্ণতা ক্ষণস্থায়ী অচিরেই তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ জন্যই এখানে সংকীর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশস্ততা বলা হয়েছে, সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা বলা হয়নি।

قَوْلُهُ تَعَالٰى فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلٰى رَبِّكَ الخ : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– আপনি সালাত হতে অবসর হওয়ার পর অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে দোয়া ও মুনাজাতে মশগুল হয়ে যান। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করুন– তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণও প্রায় একই ব্যাখ্যা প্রদান করে লিখেছেন– এখানে 'অবসর পাওয়া'-এর অর্থ হলো, নিজের নিত্যনৈমিত্তিক ও প্রতি মুহূর্তের ব্যস্ততা হতে অবসর পাওয়া। এ নির্দেশের মূল লক্ষ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, যখন অন্য কোনো ব্যস্ততা ও লিপ্ততা থাকবে না, তখন এ অবসর মুহূর্তগুলোকে ইবাদত-বন্দেগির কষ্ট স্বীকার ও আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রমে অতিবাহিত করবেন। অন্য সব দিক হতে মুখ ফিরিয়ে অন্য সব কাফেলা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল স্বীয় আল্লাহর দিকে মন একান্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখবেন। এটা আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ নির্দেশ।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন আপনি ফরজ সালাত হতে অবসর হবেন, রাত্রি জাগরণের জন্য দণ্ডায়মান হবেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার নিজের জন্য ও উম্মতের জন্য দোয়া করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ তাফসীরকারকদের মতে, এর অর্থ হলো যখন ফরজ নামাজ শেষ হয় বা অন্য কোনো নামাজ শেষ হয় তখন বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করুন।

অথবা, এর অর্থ হলো, এক ইবাদত শেষ হলে আরেক ইবাদতে সাধনা করুন, যাতে করে এক মুহূর্তও ইবাদত ব্যতীত অতিবাহিত না হয়। –[নূরুল কোরআন]

আর হযরত হাসান এবং যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) বলেছেন, যখন জিহাদ থেকে অবসর পান তখন ইবাদতে মশগুল হোন।

আর মুজাহিদ (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো– যখন দুনিয়ার কাজ শেষ হয়; তখন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হোন। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ التِّيْنِ : সূরা আত্‌-ত্বীন

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلتِّيْنُ অর্থ– আনজীর, ডুমুর বা ঐরূপ ফল বিশেষ। কেউ কেউ একে পর্বত-প্রান্তর অথবা মসজিদ বিশেষের নাম বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দ 'ত্বীন' হতে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি বাক্য এবং ১৫৭টি অক্ষর রয়েছে।

وَقْتُ نُزُوْلِ السُّوْرَةِ :

সূরাটির অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে, একটিতে মক্কায় অপরটিতে মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটা মাক্কী সূরা হওয়ার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ হলো, এতে মক্কা শরীফ সম্পর্কে هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এ শান্তির শহর) শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যদি মদীনায় অবতীর্ণ হতো, নিশ্চয় মক্কা শহরকে 'এ শহর' বলা হতো না। এ ছাড়া সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটু চিন্তা করলেও মনে হয়, তা মক্কা শরীফে নবুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে বাচনভঙ্গি, সংক্ষিপ্ত আয়াত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা ধারা, তা এতে পুরাপুরি বর্তমান। পরকালে শুভ কর্মফল ও শাস্তি অপরিহার্য এবং অতীব যুক্তিসঙ্গত, এ কথাই এতে বুঝানো হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম– এ তিনটি প্রধান ধর্ম এবং এর জগদ্বিখ্যাত প্রবর্তকত্রয়ের ধর্ম ও কর্মের বিকাশ স্থাপনের শপথ করে মানবের উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয় বিবৃত করা হয়েছে।

ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের শাস্তি প্রমাণই এর বিষয়বস্তু। এ কথা প্রমাণের জন্যই নবী-রাসূলগণের অভ্যুদয়ের স্থানসমূহের নামে শপথ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট ও সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন, নবুয়তের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদার ধারক লোক এই মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে– মানুষ দু' প্রকার–

১. যারা অতি উত্তম মান ও কাঠামোতে সৃষ্টি হওয়ার পর খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে পৌঁছে, যে পর্যন্ত অন্য কোনো সৃষ্টি যেতে পারে না।

২. যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে এ পতন হতে রক্ষা পেয়ে যায় এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব সমাজের সর্বত্র ও সর্বদাই এ দু' প্রকারের বাস্তবতার কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সূরার শেষভাগে উপরিউক্ত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে–মানুষের মাঝে যখন এ দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী স্বভাবের মানুষ বর্তমান দেখা যায়, তখন কর্মফলকে অস্বীকার করা যেতে পারে না। অধঃপতনে পতিত লোকদেরকে কোনো শাস্তি এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লোকদেরকে কোনো পুরস্কার যদি না-ই দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে বে-ইনসাফী ও অবিচার প্রমাণিত হয়। অথচ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। অতএব, এ ব্যাপার নিঃসন্দেহ যে, মহাবিচারক আল্লাহ অধঃপতিতদেরকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন এবং ঈমান ও কর্ম দ্বারা উন্নত মর্যাদার অধিকারীদেরকে যারপরনাই পুরস্কার দান করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আত্-ত্বীনমক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

ثَمَانُ آيَةٍ : ৮ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ اَيِ الْمَاكُوْلَيْنِ اَوْ جَبَلَيْنِ بِالشَّامِ يُنْبِتَانِ الْمَاكُوْلَيْنِ.

১. শপথ ত্বীন [আনজীর] ও যায়তুনের! অর্থাৎ দু'টি খাদ্যদ্রব্য অথবা সিরিয়া অবস্থিত দুটি পাহাড় যাতে এ দু'টি খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়।

٢. وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ الْجَبَلِ الَّذِىْ كَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَمَعْنٰى سِيْنِيْنَ الْمُبَارَكُ اَوِ الْحَسَنُ بِالْاَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ.

২. শপথ তূর-এ সাইনার! এটা সে পাহাড় যাতে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেছেন। আর سِيْنِيْنَ এর অর্থ হলো, বরকতময় অথবা ফলদার বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত ও সুদর্শনীয়।

٣. وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ مَكَّةَ لِاَمْنِ النَّاسِ فِيْهَا جَاهِلِيَّةً وَاِسْلَامًا.

৩. আর শপথ এ শান্তিপূর্ণ-নিরাপদ নগরীর! এটা দ্বারা এখানে মক্কাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ইসলাম পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের যুগে এবং ইসলামের যুগে সর্বদা এটা মানুষের জন্য নিরাপদ নগরী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

٤. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ تَعْدِيْلٍ لِصُوْرَتِهِ.

৪. অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মানবজাতিকে অতীব সুন্দর কাঠামোয়-তার আকৃতিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছি।

٥. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ فِىْ بَعْضِ اَفْرَادِهِ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ لا كِنَايَةٌ عَنِ الْهَرَمِ وَالضُّعْفِ فَيَنْقُصُ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ عَنْ زَمَنِ الشَّبَابِ وَيَكُوْنُ لَهُ اَجْرُهُ.

৫. অতঃপর আমি তাকে উল্টা ফিরিয়ে দিয়েছি কোনো কোনো মানুষকে [মানুষের কোনো কোনো একককে] সর্বনিম্ন পর্যায়ে-এটা দ্বারা বার্ধক্য ও দুর্বলতার দিকে كِنَايَة [ইঙ্গিত] করা হয়েছে। কাজেই মু'মিন ব্যক্তি যৌবনকাল অপেক্ষা বার্ধক্যে আমল কম করে। কিন্তু তথাপি এর [পূর্ণ আমলের] ছওয়াব পায়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরাতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ ছিল, আর অত্র সূরায় সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দানের ঘোষণা রয়েছে যে, তিনি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন। সুন্দরতম গঠনের পাশাপাশি চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনেরও তাকিদ রয়েছে এ সূরায়। -[নূরুল কোরআন]

ত্বীন ও যায়তুন-এর অর্থ : আলোচ্য সূরায় প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা ত্বীন ও যায়তুনের শপথ করেছেন। এরা দু'টি ফল। অবশ্য উক্ত ফলদ্বয়ের গাছকেও তীন ও যায়তুন বলা হয়।

ত্বীন অনেক প্রকারের হয়ে থাকে। তা সাধারণত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উৎপন্ন হয়। মুফাস্‌সিরগণ লিখেছেন, ত্বীন খাদ্য, ফল ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন, তীন ফল লঘু পাক। তা ফুসফুস ও পেটের অভ্যন্তরের অন্যান্য যন্ত্রাংশকে পরিষ্কার ও সুস্থ-সবল রাখে। এ ভক্ষণে অর্শ রোগ নির্মূল হয়। সর্ব দিক দিয়ে এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। আর যায়তুন বলে এমন ফল যা হতে সে নামের তৈল উৎপাদিত হয়।

ত্বীন ও যায়তুন দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে তীন ও যায়তুন দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে- এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ইবনে আবী রিবাহ, জাবির ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখয়ী (র.) প্রমুখগণের মতে, ত্বীন বলতে সে ফল বুঝায়, যা লোকেরা ভক্ষণ করে। আর যায়তুন সে ফল যা হতে এ নামের তৈল বের করা হয়। ইবনে আবি হাতেম ও হাকেম (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এ মতের সমর্থনে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।
২. হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, ত্বীন এবং যায়তুন দু'টি পাহাড়।
৩. কাতাদা (র.) বলেন, ত্বীন সে পাহাড় যার উপর দামেশক নগরীটি হয়েছে আর যায়তুন হলো বায়তুল মুকাদ্দাস।
৪. আবূ মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেছেন, আসহাবে কাহাফের মসজিদ হলো ত্বীন। আর যাতুন হলো ইলইয়ার মসজিদ। -[নূরুল কোরআন]
৫. ইবনে জারীর সহ অনেকের মতে, ত্বীন হলো জুদী পাহাড়ে নির্মিত হযরত নূহ (আ.)-এর মসজিদ; আর যায়তুন দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য।
৬. কারো মতে, ত্বীন হলো কূফা শহর আর যায়তুন হলো সিরিয়া শহর।
৭. আল্লামা যামাখশারী ও আলূসী (র.) সহ প্রমুখ তাফসীরকারদের মতে, ত্বীন ও যায়তুন দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, তদানীন্তন আরব সমাজে এ দু'টি স্থান ত্বীন ও যায়তুন ফল উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

তূরে সীনীন দ্বারা উদ্দেশ্য : 'তূর' দ্বারা সে পাহাড় উদ্দেশ্য, যার উপর হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন। 'সীনীন'-এর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে-

১. নাহুবিদদের নিকট সীনীন এবং সীনা দু'টি পাহাড়ের নাম।
২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, 'তূর' হলো পাহাড়, আর সীনীন (হাবশী ভাষায়) সুন্দর।
৩. ইমাম কালবী (র.) বলেন, তা বৃক্ষযুক্ত পাহাড়। -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]
৪. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এর অর্থ সুন্দর পর্বত।
৫. কারো মতে, এটি এক প্রকার পাথর যা তূর পর্বতের কাছাকাছি পাওয়া যায়।
৬. হযরত ইকরামা (র.) বলেন, এটি সে স্থান যেখানে তূর পর্বত অবস্থিত।
৭. হযরত মোকাতিল (র.) বলেন, যে পাহাড়ের উপর ফলবান বৃক্ষ থাকে তাকে সীনীন বলে।
৮. কারো মতে, এটি হিব্রু শব্দ, যার অর্থ- বরকতময়। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

শহর 'আমীন' হওয়ার কারণ : أَمِيْن অর্থ- أَمِن অর্থাৎ শান্তিদাতা, আশ্রয়দাতা, শান্তিধাম ও নিরাপদ। মক্কা শহরকে শান্তিদাতা ও আশ্রয়দাতা বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে-

১. আবরাহা বাদশাহর আক্রমণ থেকে হস্তীর দলকে নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহ তা'আলা মক্কা শহরকে হেফাজত করেছেন-শান্তিতে রেখেছেন বিধায় একে أَمِيْن বলা হয়েছে।

২. এ শহর সকলকে আশ্রয় দেয়। হিংস্র জন্তু শিকারযোগ্য প্রাণীও এখানে আশ্রয় পায়। যেমন- আল্লাহ বলেন, وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا -[কাবীর]

৩. যুদ্ধ-বিগ্রহসহ সমস্ত খুন-খারাবি এ শহরে নিষিদ্ধ।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ আয়াতে اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'অবশ্যই আমি মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।' মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন-

১. আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.)-এর মতে, এর অর্থ হলো- 'আমি মানবজাতিকে ভারসাম্যপূর্ণ (সুষমামণ্ডিত) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ তা'আলা ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন।

২. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীকে মাথা উপুড় করে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু মানবজাতিকে সোজা দেহে মাথা উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন। তারা হাত দ্বারা আহার করে।

৩. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম (রা.) বলেন, اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ হলো সুন্দর গঠন ও সুন্দর অবয়ব।

৪. হযরত আসাম (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানবকে পরিপূর্ণ আকল, বোধশক্তি, সাহিত্য-জ্ঞান ও বর্ণশক্তি দিয়ে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

৫. কেউ কেউ বলেছেন, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার তাৎপর্য এই যে, তাকে এক উন্নতমানের দেহ দেওয়া হয়েছে, অপর কোনো প্রাণীকে এরূপ দেহ দেওয়া হয়নি। সে সঙ্গে তাকে চিন্তা, অনুধাবন, জ্ঞান অর্জন ও বিবেক পরিচালনার অধিক উন্নতমানের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। -[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ" : তাফসীরকারকগণ বাক্যটির দু'টি অর্থ করেছেন।

এক. আমি তাকে অতি বার্ধক্যের দিকে নিয়ে গিয়েছি। এটা খুবই মর্মান্তিক অবস্থা। এ অবস্থায় পৌছলে মানুষ চিন্তা ও কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে, শারীরিক কামনীয়তা ও মানবিকশক্তি হারিয়ে কুৎসিত হয়ে পড়ে।

দুই. আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করেছি।

সূরার মূল উদ্দেশ্যের সাথে এ দুই অর্থের কোনোটিই সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ ভালো বা মন্দ উভয় প্রকার লোকই বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে থাকে। কেউ এ অবস্থায় পৌছলেই মনে করা যেতে পারে না ; তাকে কোনো খারাপ আমলের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। পক্ষান্তরে কিছু লোকের জাহান্নামে যাওয়ার ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণরূপে পরকালে ঘটিতব্য ব্যাপার। সূরার মূল উদ্দেশ্য লোকদেরকে পরকালে বিশ্বাসী বানানো।

হযরত মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষ যখন তাকে প্রদত্ত অনন্ত-অসীম নিয়ামত লাভের পরও অকৃতজ্ঞ হয় এবং মহান আল্লাহর নিয়ামতসমূহের অপব্যবহার করে যেমন খুশি তেমন জীবন যাপন করে এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে তথা দোজখের নিম্নস্তরে পৌছে দেন। মানুষ যখন মানবতার অমর্যাদা করে তখন সে অবনতি অধঃপতনের সর্বনিম্নস্তরে পৌছে যায়। এ জন্য কুরআনে হাকীমে বলা হয়েছে- وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا

-[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِلَّا اَىْ لٰكِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ مَقْطُوْعٍ وَفِى الْحَدِيْثِ اِذَا بَلَغَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكِبَرِ مَا يُعْجِزُهٗ عَنِ الْعَمَلِ كُتِبَ لَهٗ مَا كَانَ يَعْمَلُ.

৬. যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইরশাদ করেছেন : কিন্তু اِلَّا এখানে لٰكِنَّ অর্থে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য তো রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার অবিচ্ছিন্ন, হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যখন মু'মিন বার্ধক্যে উপনীত হয়, যদ্দরুন সে আমলে অক্ষম হয়ে পড়ে। তার আমলনামায় সে সকল আমল লিখিত হতে থাকে, যা সে যৌবনে আমল করত।

٧. فَمَا يُكَذِّبُكَ اَيُّهَا الْكَافِرُ بَعْدُ اَىْ بَعْدَ مَا ذُكِرَ مِنْ خَلْقِ الْاِنْسَانِ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ ثُمَّ رَدِّهٖ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ الدَّالِّ عَلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِ بِالدِّيْنِ بِالْجَزَاءِ الْمَسْبُوْقِ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ اَىْ مَا يَجْعَلُكَ مُكَذِّبًا بِذٰلِكَ وَلَا جَاعِلَ لَهٗ.

৭. সুতরাং কিসে তোমাকে অবিশ্বাসী করে? হে কাফের! তারপরও অর্থাৎ মানুষকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করা, তৎপর হীনতাগ্রস্ত বয়সে উপনীত করা ইত্যাদি, যা পুনরুত্থানে সামর্থ্যবান হওয়ার প্রতি প্রমাণ পেশ করে; এগুলো উল্লেখ করার পরও কর্মফল সম্বন্ধে প্রতিফল সম্পর্কে, যা পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের পর সংঘটিত হবে। অর্থাৎ কোন বস্তু তোমাকে প্রতিফল অস্বীকারকরণে উৎসাহিত করেছে? অথচ এমন কোনো কারণই নেই।

٨. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ اَىْ هُوَ اَقْضَى الْقَاضِيْنَ وَحُكْمُهٗ بِالْجَزَاءِ مِنْ ذٰلِكَ وَفِى الْحَدِيْثِ مَنْ قَرَاَ بِالتِّيْنِ اِلٰى اٰخِرِهَا فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ.

৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? অর্থাৎ তিনিই শ্রেষ্ঠতম বিচারক। আর প্রতিফল সংক্রান্ত তাঁর এ বিধান তারই অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা ত্বীন শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে, সে তা পাঠান্তে বলবে بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ - হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আর আমি তার প্রতি সাক্ষ্য দানকারী।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهٗ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ الخ : اَلتِّيْنِ-এর মধ্যস্থ وَ কসমের জন্য। وَالزَّيْتُوْنِ...الْاَمِيْنِ পর্যন্ত আতফ হয়েছে اَلتِّيْنِ-এর উপর। لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ الخ বাক্যটি জওয়াবে কসম। কসম ও তার জওয়াব একত্র হয়ে জুমলা ফে'লিয়া হলো। اَمِيْن শব্দটি بَلَد-এর সিফাত। اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ হালের স্থলে اِنْسَان হতে। اَسْفَلَ শব্দটি سَافِلِيْنَ-এর দিকে মুযাফ হয়ে নসব বিশিষ্ট হয়েছে। এটা মাফউল হতে হাল হয়েছে। আর তা উহ্য كَوْن শব্দ হতে না'তও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি ছিল- رَدَدْنٰهُ حَالَ كَوْنِهٖ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ الخ : مَا এস্তেফহামিয়া, অর্থাৎ اَىُّ شَيْءٍ কেউ কেউ বলেন, مَنْ يُكَذِّبُكَ-এর كَ মাফউল كَذِّبْ এর, এটার ফায়েল যমীর مَا-এর দিকে ধাবিত। بِالدِّيْنِ-এর ب সববের জন্য এসেছে হরফ ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। اَللّٰهُ ফায়েল, মুবতাদা। بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ তার খবর। নফীর উপর যদি এস্তেফহাম আসে, তখন বাক্য হ্যাঁ-বাচক হয়ে যায় এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ দ্বারা উদ্দেশ্য : মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করেছেন–

১. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো غَيْرِ مَقْطُوْعٍ অর্থাৎ এমন প্রতিদান যা কোনো দিন বিচ্ছিন্ন-নিঃশেষ হবে না। অশেষ ও অফুরন্ত কর্মফল।

২. কারো কারো মতে, এর অর্থ হলো بِغَيْرِ عَمَلٍ অর্থাৎ মু'মিন কোনো আমল ছাড়াই তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। মূলত এটা আল্লাহর নিছক অনুগ্রহ বৈ আর কি?

৩. কেউ কেউ বলেছেন– غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থ "لَايُمَنُّ بِهٖ عَلَيْهِمْ" অর্থাৎ এ প্রতিদানের কারণে তাদেরকে খোঁটা দেওয়া হবে না।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্মার্থ হলো, যৌবনে মু'মিন ব্যক্তি যে আমল করত বৃদ্ধ হয়ে দুর্বলতার কারণে সে আমল করতে না পারলেও তাকে সে আমলের ছওয়াব দেওয়া হবে–যার ছওয়াবের ধারা অব্যাহত ও অবিচ্ছিন্ন হবে।

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মুসলমান শারীরিকভাবে বিপদগ্রস্ত হয় তথা কোনো প্রকার রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেন তার জন্য এখনও সে নেক আমলের ছওয়াব লিপিবদ্ধ কর, যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো। –[নূরুল কোরআন]

فَمَا يُكَذِّبُكَ-এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : فَمَا يُكَذِّبُكَ-এর মধ্যে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত পাওয়া যায়।

১. জমহুর মুফাস্‌সিরগণের মতে, এখানে কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে কাফের! আল্লাহর এত কুদরত দেখার পরও কিভাবে তুমি পুনরুত্থান ও কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতে পার? এরপরও প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করার কি কোনো কারণ থাকতে পারে?

২. হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেছেন যে, এখানে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতটির অর্থ হবে, হে হাবীব! মহাবিচারক আল্লাহর পক্ষ হতে যা নাজিল হয় তাকে আপনি দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। কেননা এত জ্বলন্ত প্রমাণ ও অকাট্য দলিল প্রত্যক্ষ করার পরও কে আছে যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করবে?

৩. কারো কারো মতে, এখানে গোটা-মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ" : দুনিয়ার ছোট বড় বিচারকদের নিকট যখন তোমরা সুবিচার পাওয়ার আশা কর, তোমরা চাও যে, তারা প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিবে এবং যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে ভালো ফল ও পুরস্কার দিবে, তখন আল্লাহর নিকট হতে তোমরা এর বিপরীত কি করে আশা করতে পার? তিনি কি সকল বিচারকের তুলনায় অনেক বড় বিচারক নন? তোমরা তাঁকেই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক মান, তাহলে তিনি কোনোরূপ সুবিচার করবেন না বলে তোমরা কিভাবে কল্পনা করতে পার? হাদীসে বর্ণিত আছে– নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা কেউ যখন সূরা 'আত্-ত্বীন' পাঠ করবে ও اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পর্যন্ত পৌছবে, তখন সে যেন বলে بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ 'হ্যাঁ, আমি-ই এর সাক্ষী।'

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْعَلَقِ : সূরা আল-আলাক্ব

সূরাটির নামকরণের কারণ : عَلَقٌ **অর্থ–** রক্ত অথবা তার ঘনীভূত প্রগাঢ় অবস্থা। এর অন্য অর্থ জলৌকাকৃতি ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা শুক্রকীট। এর মর্মার্থে প্রেম-প্রীতি, আসক্তি, আকর্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতিও পরিগ্রহণ করা যেতে পারে। এ 'আলাক্ব' ই হচ্ছে মানব সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের আলাক্ব শব্দ হতেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

এ সূরার অন্য নাম 'ইক্বরা'। অত্র সূরাতেই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাঠ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। পাঠ করার নির্দেশকে আরবি 'ইকরা' দিয়ে বুঝানো হয়। তাই সূরার নাম 'ইকরা' রাখা হয়েছে।

অত্র সূরার অন্য আরেক নাম 'ক্বালাম'। কেননা ৪র্থ আয়াতে عَلَّمَ بِالْقَلَمِ বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় ১৯টি আয়াত, ৭২টি বাক্য এবং ১২২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : আলোচ্য সূরাটির দু'টি অংশ। এক অংশ শুরু হতে পঞ্চম আয়াত مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى হতে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত চলেছে। অধিকাংশ আলেমগণের মতে, নবী করীম ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ এটাই সর্বপ্রথম ওহী। হযরত আয়েশা (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ পাঁচটি আয়াতই সর্ব প্রথম নাজিল হয়েছে।

সূরাটির দ্বিতীয় অংশ পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হারাম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এবং আবূ জাহল তাকে ধমক দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল ঠিক সে সময় এ দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়।

সূরার বিষয়বস্তু : সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথমাংশ প্রথম হতে পঞ্চম আয়াতের مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ এবং এটা অবতীর্ণ হয়েছিল পবিত্র মক্কার অনতিদূরে হেরা গিরিগুহায়।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হেরেম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আবূ জাহ্ল ধমক দিয়ে এই কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেই সময়ই এই দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয় পরে নাজিল হওয়া এ অংশ প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন। কেনন প্রথম ওহী বা প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পর ইসলামের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এ নামাজেরই মাধ্যমে। কাফেরদের সাথে তা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও এ নামাজের কারণেই শুরু হয়েছিল। অত্র সূরার কয়টি আয়াতে সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, অজানাকে জানানো ও জ্ঞান দানের রহস্য এবং মহীয়ান আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে। তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর দীর্ঘদিনের চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকে রিসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি দিবালোকের মতো দিকনির্দেশ পেয়েছেন। শেষ দিকে ভ্রান্ত কাফেরদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান করে নবী করীম ﷺ -কে ভালো কাজগুলো করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-আলাক্ব মক্কায় অবতীর্ণ

تِسْعَ عَشْرَةَ اٰيَةً : আয়াত সংখ্যা– ১৯

صَدْرُهَا اِلٰى مَا لَمْ يَعْلَمْ اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ذٰلِكَ بِغَارِ حِرَاءٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত এটার প্রথম কয়টি আয়াত প্রথম নাজিলকৃত ওহী, যা হেরা গুহায় অবতীর্ণ হয়েছে। –[বুখারী]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِقْرَأْ اَوْجِدِ الْقِرَاءَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ الْخَلَائِقَ .

১. পাঠ কর পাঠ আরম্ভ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি জগতকে।

٢. خَلَقَ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ مِنْ عَلَقٍ جَمْعُ عَلَقَةٍ وَهِيَ الْقِطْعَةُ الْيَسِيْرَةُ مِنَ الدَّمِ الْغَلِيْظِ .

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে মানব শ্রেণিকে জমাট রক্ত হতে عَلَقٌ শব্দটি عَلَقَةٌ -এর বহুবচন, আর তা হলো জমাট রক্তের একটি পিণ্ড।

٣. اِقْرَأْ تَاكِيْدٌ لِلْاَوَّلِ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِيْ لَا يُوَازِنُهُ كَرِيْمٌ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ اِقْرَأْ .

৩. পাঠ করএটা প্রথমোক্ত اِقْرَأْ -এর জন্য تَاكِيْد আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত কোনো মহিমান্বিত তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এটা اِقْرَأْ-এর যমীর হতে حَالٌ।

٤. الَّذِيْ عَلَّمَ الْخَطَّ بِالْقَلَمِ وَاَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِهِ اِدْرِيْسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

৪. যিনি শিক্ষা দিয়েছেনলিখন কলমের সাহায্যে হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম লিখার সূচনা করেন।

٥. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ مَا لَمْ يَعْلَمْ قَبْلَ تَعْلِيْمِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْكِتَابَةِ وَالصِّنَاعَةِ وَغَيْرِهَا .

৫. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেনমানব শ্রেণিকে যা সে জানত না তাকে হেদায়েত, লিখন ও শিল্পকর্ম ইত্যাদি শিক্ষাদানের পূর্বে।

তাহ্‌কীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ : এখানে بِ হরফটি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। اَلَّذِيْ خَلَقَ বাক্যটি رَبِّكَ -এর সিফাত। خَلَقَ الْاِنْسَانَ الخ বাক্যটি প্রথম বাক্যের তাফসীর।

قَوْلُهُ اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ : رَبُّكَ মাওসূফ, اَلْاَكْرَمُ সিফাত। اَلَّذِيْ মাওসূল। عَلَّمَ بِالْقَلَمِ সেলা বাক্য হয়ে দ্বিতীয় সিফাত। মাওসূফ ও সিফাতসমূহ মিলিত হয়ে মুবতাদা عَلَّمَ الْاِنْسَانَ الخ বাক্য তার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলিত হয়ে জুমলায়ে ইসমিয়া। এটা হাল হয়েছে اِقْرَأْ -এর যমীর হতে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এ সূরা পবিত্র মক্কার অদূরে হেরা গিরি গুহায় মহানবী ﷺ -এর প্রতি সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ হিসাবে অবতীর্ণ হয়। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে- নবী করীম ﷺ প্রথমত স্বপ্নযোগে ওহী বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হতে লাগলেন। প্রত্যেক স্বপ্নই প্রভাতের উজ্জ্বল রশ্মির ন্যায় সত্যভাবে প্রত্যক্ষীভূত হতো। তিনি রাতে যা স্বপ্নে দেখতেন দিনে অবিকল তা-ই সংঘটিত হতো। অতঃপর নির্জনবাস তাঁর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় হয়ে উঠল। এ সময় তিনি হেরা পর্বতের গুহায় গমন করে একাকী নির্জনে বসে দিবানিশি গভীর ধ্যান ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। তিনি এ জন্য যে খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন, তা শেষ হয়ে গেলে তিনি প্রিয় পত্নী বিবি খাদীজার নিকট আগমন করতেন এবং বিবি খাদীজা আবার কয়েক দিনের উপযোগী খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে দিলে তিনি সেগুলো নিয়ে পুনরায় হেরা গুহায় চলে যেতেন। এরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদা তিনি ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় অকস্মাৎ সত্য তাঁর নিকট আগমন করল- তাঁর প্রতি ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলো। -[সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

প্রথম ওহী অবতীর্ণকালীন প্রাসঙ্গিক ঘটনা : হেরা গিরি-গুহায় ধ্যানমগ্ন মুহাম্মদ ﷺ অকস্মাৎ প্রত্যাদেশ লাভ করলেন। হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা তাঁর নিকট সর্বপ্রথম বললেন-'ইকরা' বা পড়ুন। হযরত আয়েশা (রা.) স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বললেন-'আমি তো লেখাপড়া জানি না।' তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ -কে নিজ বক্ষে আকর্ষণপূর্বক দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে বললেন-'পাঠ করুন'। নবী করীম ﷺ পূর্বোক্তরূপে বললেন, 'আমি তো লেখাপড়া জানি না।' তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয়বার তাঁকে বক্ষে আকর্ষণ করে এরূপ দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়লেন। তৎপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পাঠ করুন। নবী করীম ﷺ ঐরূপভাবেই উত্তর করলেন- "আমি তো লেখাপড়া জানি না, কিরূপে পাঠ করবো? অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে তৃতীয়বার আলিঙ্গন করলেন এবং এরূপ কঠিনভাবে তা করলেন যে, তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হলো। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে পড়ল এবং আতঙ্কে হৃদয় প্রকম্পিত হতে লাগল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে ছেড়ে দিয়ে 'ইকরা' হতে পঞ্চম আয়াতে 'مَا لَمْ يَعْلَمْ' পর্যন্ত পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তা নবী করীম ﷺ -এর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- অতঃপর নবী করীম ﷺ ভীত-কম্পিত অবস্থায় সে স্থান হতে ফিরে আসলেন। হযরত খাদীজা (রা.) -এর নিকট পৌঁছে বললেন- 'আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও।' তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দেওয়া হলো। পরে যখন তাঁর ভীতি কেটে গেল, তখন তিনি বললেন, 'হে খাদীজা! এ আমার কি হয়ে গেল।' অতঃপর সমস্ত ঘটনার বিবরণ তাঁকে শুনালেন এবং বললেন- আমার নিজের জীবনে ভয় লেগে গেছে। হযরত খাদীজা (রা.) বললেন- ভয়ের কিছুই নেই, আপনি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহর শপথ, আপনাকে আল্লাহ কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন। আমানতসমূহ যথাযথ ফিরিয়ে দেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, দরিদ্র লোকদেরকে নিজে উপার্জন করে দান করেন। আতিথ্য রক্ষা করেন ও ভালো কাজে সাহায্য করেন। পরে তিনি নবী করীম ﷺ -কে সঙ্গে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন। জাহেলিয়াতের যুগে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন, আরবি ও হিব্রু ভাষায় ইনজীল লিখতেন। এ সময় খুব বেশি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা তাঁকে নবী করীম ﷺ -এর ঘটনার বিবরণ শুনতে বললেন। ওয়ারাকা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখতে পেয়েছ? নবী করীম ﷺ যা কিছু দেখতে পেয়েছেন তা বললেন। ওয়ারাকা বললেন- এ তো সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! যদি আমি আপনার নবুয়তকালে যুবক হতাম। হায়! আপনার জাতির লোকেরা আপনাকে যখন বহিষ্কৃত করবে তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম! রাসূলে কারীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকেরা কি আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন - হ্যাঁ, আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা যে কেউ নিয়ে আসবে, অথচ তাঁর সাথে শত্রুতা করা হবে না। এমন তো কখনো হয় নি। আপনার সেকালে আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে আমি বলিষ্ঠভাবে আপনার সাহায্য করবো। কিন্তু এর অল্প কাল পরেই ওয়ারাকার ইন্তেকাল হয়ে যায়। -[দুররে মানছূর, বয়ান, মা'আলিম]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ : ইরশাদ হয়েছে, পড়ো, তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার সংশ্লিষ্ট ঘটনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফেরেশতা যখন নবী করীম ﷺ -কে বললেন, 'পড়ো', তখন তিনি জবাবে বললেন- 'আমি পড়তে পারি না।' কিন্তু কেন তিনি তা বলেছেন-এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. একদল আলিমের মতে, ফেরেশতা ওহীর এ শব্দসমূহ লিখিত আকারে তাঁর সম্মুখে পেশ করেছিল এবং সে লিখিত জিনিসই পড়তে বলেছিল। কেননা ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো যে, আমি যেভাবে বলতে থাকি আপনি সেভাবে পড়তে থাকুন, তাহলে তার উত্তরে নবী করীম ﷺ -কে 'আমি পড়তে পারি না', বলতে হতো না। কারণ লিখিত জিনিস পড়তে না পারলেও কারো উচ্চারণকে অনুসরণ করে অনুরূপ উচ্চারণ করা যে কোনো নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

খ. অপর একদল আলিমের মতে এর অর্থ হলো, "اِقْرَأْ مَا اَقْرَأُ" অর্থাৎ আমি যা পড়ি তা আপনি আমার সাথে পড়ুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবিক দুর্বলতার কারণে বলেছেন, আমি পড়তে পারি না। জমহুর আলিমগণ শেষোক্ত মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, ওহী [নবী করীম ﷺ -এর নিকট] লিখিত নাজিল হয়নি।

কুরআনের যে অংশ প্রথম অবতীর্ণ : অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে– সূরা আল-আলাক্ব-ই সর্বপ্রথম সূরা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে অত্র সূরার প্রথম ৫টি আয়াত তাঁকে শিখিয়ে যান।

কারো মতে, সূরা 'আল-মুদ্দাছ্ছির' সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এটা হযরত জাবির (রা.)-এর অভিমত।

কারো মতে, সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এটা হযরত আবূ মাইসারার অভিমত।

হযরত আলী (রা.)-এর মতে, قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে প্রথম মতই সহীহ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সত্য ও যোগ্য স্বপ্ন দেখানো হতো। তারপর ফেরেশতা اِقْرَأْ بِاسْمِ الخ নিয়ে আসেন। –[কুরতুবী]

بِاسْمِ -এর মধ্যকার بَاء -এর অর্থ :

১. আবূ উবায়দা বলেন, এখানে بَاء অতিরিক্ত। অর্থ দাঁড়াবে اِقْرَأْ اِسْمَ رَبِّكَ অর্থাৎ 'তুমি তোমার রবের নাম পাঠ করো।' অথবা اُذْكُرْ اِسْمَهٗ অর্থাৎ 'তুমি তাঁর নাম স্মরণ করো।' এ মতটি কয়েকটি কারণে দুর্বল।

ক. যদি নাম স্মরণ করা বা নাম পড়ার জন্যই বলা হতো, তাহলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, আমি তো পড়তে জানি না।

খ. এ নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য প্রযোজ্য হয় না। কেননা তিনি তো পূর্ব হতেই আল্লাহর জিকিরে মগ্ন ছিলেন এবং এ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো কাজও তখন ছিল না।

গ. এ অর্থ করলে بَاء -এর অর্থ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ কুরআনের কোনো হরফও অর্থ ছাড়া নেই।

২. بَاء অতিরিক্ত নয়, বরং অর্থ হবে حَالْ -এর অর্থাৎ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ مُفْتَتِحًا بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ হে রাসূল, আল্লাহর নাম উল্লেখপূর্বক কুরআন পাঠ করুন। অর্থাৎ প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবেন, তারপর পাঠ করবেন। এ অর্থের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাসমিয়া পড়া ওয়াজিব।

অথবা, بَاء সহযোগিতার অর্থ দিবে, তখন ইবারত হবে اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ مُسْتَعِيْنًا بِاسْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহর নামের সহযোগিতা নিয়ে কুরআন পাঠ করো।' এখানে নামকে একটি যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা বুঝায়। যেমন বলা হয়– كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ অর্থাৎ 'আমি কলমের দ্বারা লিখেছি।

অথবা, بَاء -এর অর্থ لَامْ [লাম] হবে। অর্থাৎ اِجْعَلِ الْقِرَاءَةَ لِلّٰهِ তথা 'তোমার পড়াকে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করো।' যেমন, বলা হয় بَنَيْتُ هٰذِهِ الدَّارَ بِاسْمِ الْاَمِيْرِ অর্থাৎ এ বাড়ি আমীরের নামে [অর্থাৎ তাঁর জন্য] বানিয়েছি। –[কাবীর, কুরতুবী]

اَللّٰهُ না বলে رَبِّكَ বলার কারণ : رَبّ হলো আল্লাহর 'ইসমে সিফাত' আর 'আল্লাহ' হলো ইসমে যাত। 'ইসমে যাত' 'ইসমে সিফাত -এর উপর প্রাধান্য পায়। অথচ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর প্রথম ওহী এবং প্রথম পরিচিতির সময় ইসমে যাত ব্যবহার না করে ইসমে সিফাত ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আমরা বর্তমানে ইসমে যাত ব্যবহার করে তাসমিয়া পাঠ করি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ কেননা, তা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর প্রথম ওহী, ফেরেশতাকে দেখার সাথে সাথে তাঁর মধ্যে মারাত্মক কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজের এমন একটি সিফাত উল্লেখ করেছেন যদ্দারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মন থেকে ভীতি দূর করা। তাই তিনি বললেন, ঐ সত্তার নামে পড়ুন, যিনি আপনাকে লালন-পালন করেছেন, করছেন এবং করবেন। তুমি যখন রক্তকণিকা অবস্থায় ছিলে তখন থেকেই তোমার লালন-পালন আমি করছি, সে সময় তোমাকে ধ্বংস করিনি। যখন তোমাকে একজন মূল্যবান ব্যক্তিত্ব, একত্ববাদী এবং আমার পরিচয়প্রাপ্ত হিসাবে গড়ে তুলেছি, তখন কিভাবে তুমি চিন্তা করতে পার যে, আমি তোমাকে ধ্বংস করবো? –[কাবীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

رَبِّكَ-এর পরই اَلَّذِىْ خَلَقَ বলার কারণ : আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলি উল্লেখ না করে শুধুমাত্র اَلَّذِىْ خَلَقَ বলা হয়েছে। কেননা মনে হয় যেন বান্দা প্রশ্ন করেছে যে, হে রব! তুমি যে রব- এ কথার প্রমাণ কি? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আমি যে রব, এর প্রমাণের জন্য দূরে যাওয়া লাগবে না; বরং তোমাদের অস্তিত্বের উপর চিন্তা করো; তাহলে আমাকে পাবে ..... তুমিতো তোমার সত্তা এবং সমস্ত গুণাবলিসহ অনুপস্থিত এবং অস্তিত্বহীন ছিলে। তারপর তুমি অস্তিত্বে আসলে ; তোমার অস্তিত্বের জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন। অস্তিত্বে আসলেই তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিপালক (রব) -এর প্রয়োজন হয়। সে রব-ই হলাম 'আমি'। -[কাবীর]

اَلَّذِىْ خَلَقَ-এর مَفْعُوْل কি? : আল্লাহর বাণী اَلَّذِىْ خَلَقَ-এর مَفْعُوْل কি এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ হতে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ক. এখানে مَفْعُوْل-এর উল্লেখ করা হয়নি। আর এর উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এটা হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি সমস্ত সৃষ্টিলোক এবং সৃষ্টিলোকের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। আর বলা বাহুল্য যে, তিনিই আল্লাহ তা'আলা।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, এখানে مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে اَلَّذِىْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্ট হওয়ার কারণে كُلَّ شَيْءٍ-কে উহ্য করা হয়েছে। যেমন- বলা হয় اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ আল্লাহ সবকিছু হতে বড়।

গ. অথবা, এখানে مَفْعُوْل হলো اَلْاِنْسَانَ পরবর্তী আয়াত خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ দ্বারা তার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

عَلَقٌ-এর অর্থ : عَلَقٌ অর্থ- জমাট-বাঁধা রক্ত, রক্তপিণ্ড, বহুবচন। একবচনে عَلَقَةٌ মাতৃগর্ভে সন্তানের উন্মেষ হওয়ার পর প্রাথমিক কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ অবস্থা হয়। পরে তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর ক্রমশ তাতে মানুষের আকার-আকৃতি দানা বেঁধে উঠতে থাকে। উদ্ধৃত আয়াতে মানুষ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ এক অতি নগণ্য ও হীনতম অবস্থা হতে মানুষের সৃষ্টির সূচনা করে তাকে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় اِقْرَاْ-এর মধ্যে পার্থক্য :

১. কারো মতে, প্রথম اِقْرَاْ দ্বারা রাসূলকে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় اِقْرَاْ দ্বারা অন্যের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২. অথবা, প্রথম اِقْرَاْ দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ, আর দ্বিতীয়টির দ্বারা অন্যকে শিক্ষাদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. অথবা প্রথমটি দ্বারা নামাজ পড়ার নির্দেশ আর দ্বিতীয়টি দ্বারা নামাজের বাইরে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -[কাবীর]

৪. অথবা প্রথম اِقْرَاْ বলার পর জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَا اَنَا بِقَارِئٍ তখন দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ -[নূরুল কোরআন]

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ আয়াতের মর্মার্থ : এটা আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অবদান, এক অতি বড় অনুগ্রহ, অনুগ্রহের ফলশ্রুতি তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্নই বানাননি, কলম ব্যবহারের সাহায্যে লেখার কৌশলও শিখিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও উন্নয়ন এবং বংশানুক্রমে জ্ঞানের উত্তরাধিকার সৃষ্টি ও বিকাশ সাধন, স্থায়িত্ব সংরক্ষণের মাধ্যমে বানিয়েছেন এ কলমকে। তিনি যদি ইলহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কলম ব্যবহার ও লেখার কৌশল শিক্ষা না দিতেন, তাহলে মানুষের জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারের যাবতীয় স্বভাবসিদ্ধ যোগ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে যেত। তার বিকাশ ও উন্নয়ন এবং এক বংশ হতে বংশান্তরে ও এক যুগ হতে যুগান্তরে তার পৌঁছে যাওয়া, টিকে থাকা ও অধিকতর উন্নতি লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যিনি কলম দ্বারা লিখেছেন, তিনি হলেন হযরত ইদরীস (আ.)। আর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা প্রথম কলমকে সৃষ্টি করেছেন আর ইলম শিক্ষা দিয়ে মানবজাতিকে শিক্ষিত করে তোলা হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। -[নূরুল কোরআন]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ-এর মধ্যকার اَلْاِنْسَانَ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاِنْسَانَ দ্বারা এখানে হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে- وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ কারো মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দেশ্য। -[ফাতহুল কাদীর]

তবে উত্তম মত হলো, সাধারণভাবে সকল মানুষ উদ্দেশ্য হওয়া

অনুবাদ :

٦. كَلَّا حَقًّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰى -

৬. বস্তুত অবশ্যই মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে।

٧. أَنْ رَّاٰهُ أَيْ نَفْسَهُ اسْتَغْنٰى بِالْمَالِ نَزَلَ فِيْ أَبِيْ جَهْلٍ وَ رَأٰى عِلْمِيَّةٌ وَاسْتَغْنٰى مَفْعُوْلٌ ثَانٍ وَأَنْ رَّاٰهُ مَفْعُوْلٌ لَهُ -

৭. কারণ, সে মনে করে অর্থাৎ নিজেকে অমুখাপেক্ষী সম্পদের কারণে। এ আয়াত আবূ জাহল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। আর رَأٰى দ্বারা আন্তরিক দেখা উদ্দেশ্য। اِسْتَغْنٰى তার مَفْعُوْل ثَانِيْ আর اَنْ رَّاٰهُ পূর্বোক্ত يَطْغٰى -এর مَفْعُوْل ثَانِيْ -

٨. إِنَّ إِلٰى رَبِّكَ يَا إِنْسَانُ الرُّجْعٰى الرُّجُوْعُ تَخْوِيْفٌ لَهُ فَيُجَازِى الطَّاغِيَ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ -

৮. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের নিকটহে মানুষ! সুনিশ্চত প্রত্যাবর্তন اَلرُّجْعٰى শব্দটি اَلرُّجُوْعُ অর্থে। এটা দ্বারা তাকে ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য। অবাধ্য ব্যক্তিকে সে প্রতিফল দেওয়া হবে, সে যার উপযোগী হবে।

٩. أَرَأَيْتَ فِيْ مَوَاضِعِهَا الثَّلَاثَةِ لِلتَّعَجُّبِ الَّذِيْ يَنْهٰى هُوَ أَبُوْ جَهْلٍ -

৯. তুমি কি দেখেছ?এ শব্দটি তিন স্থানেই বিস্ময় প্রকাশার্থে তাকে যে বাধাদান করে সে হলো আবূ জাহল।

١٠. عَبْدًا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلّٰى -

১০. এক বান্দাকে তিনি নবী করীম ﷺ যখন সে নামাজ পড়ে।

١١. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَيِ الْمَنْهِيُّ عَلَى الْهُدٰى -

১১. তুমি কি লক্ষ্য করেছ? যদি সে বাধা প্রদত্ত ব্যক্তি সৎ পথে থাকে।

١٢. أَوْ لِلتَّقْسِيْمِ أَمَرَ بِالتَّقْوٰى -

১২. অথবা أَوْ অব্যয়টি تَقْسِيْم -এর জন্য তাকওয়ার নির্দেশ দান করে।

١٣. أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ أَيِ النَّاهِيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَلّٰى عَنِ الْإِيْمَانِ -

১৩. তুমি কি লক্ষ্য করেছ? যদি সে মিথ্যা আরোপ করে উক্ত বাধাদানকারী ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -কে। আর মুখ ফিরিয়ে নেয় ঈমান আনয়ন করা হতে।

١٤. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى مَا صَدَرَ مِنْهُ أَيْ يَعْلَمُهُ فَيُجَازِيْهِ عَلَيْهِ أَيْ اعْجَبْ مِنْهُ يَا مُخَاطَبُ مِنْ حَيْثُ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلٰوةِ وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَلَى الْهُدٰى أَمِرٌ بِالتَّقْوٰى وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ النَّاهِيَ مُكَذِّبٌ مُتَوَلٍّ عَنِ الْإِيْمَانِ -

১৪. তবে কি সে জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা দেখছেন? যা তার দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং তিনি তাকে এর প্রতিফল দিবেন। অর্থাৎ হে শ্রোতা! এ লোকের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করো। এ জন্য যে, সে নামাজ হতে বাধা দিচ্ছে, অথচ বাধা প্রদত্ত ব্যক্তি সৎপথে প্রতিষ্ঠিত এবং তাকওয়ার প্রতি আহ্বানকারী। আর সে নবীর প্রতি মিথ্যারোপকারী ও ঈমান আনয়ন হতে বিমুখ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.ailm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আয়াতগুলোর শানে নুযূল : নবুয়ত লাভের পরপরই এবং প্রকাশ্যভাবে ইসলাম প্রচারে কাজ শুরু করার পূর্বে নবী করীম ﷺ হারাম শরীফের মধ্যে আল্লাহর শিখানো পদ্ধতিতে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন। আর এটা দেখে কুরাইশগণ সর্বপ্রথম অনুভব করতে পারল যে, নবী করীম ﷺ কোনো নতুন ধর্মমতের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা রাসূলের এ কাজকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখছিলেন। আবূ জাহল নবী করীম ﷺ-কে এই বলে ধমকাতে লাগল যে, হেরেমের মধ্যে এ পদ্ধতিতে ইবাদত করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে- আবূ জাহ্‌ল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞাসা করল, মুহাম্মদ তাদের সামনে মাটির উপর কপাল রাখে কিনা? লোকেরা 'হ্যাঁ' বললে- আবূ জাহল রাগতঃস্বরে বলল- লাত ও উয্‌যার শপথ! আমি যদি তাকে এভাবে নামাজ পড়তে দেখতে পাই, তাহলে তার গর্দানের উপর পা রাখবো এবং তার মুখ মাটির সাথে ঘষে দিবো। একবার আবূ জাহ্‌ল তাঁকে নামাজ পড়তে দেখতে পেয়ে তাঁর গর্দানের উপর পা রাখার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো; কিন্তু সহসাই লোকেরা দেখতে পেল যে, সে পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে এবং কোনো জিনিস হতে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করছে। তার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলে-সে বলল, আমি তার নিকটবর্তী হতেই আমার ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থানে একটি ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড দেখতে পেলাম। তাতে পাখাযুক্ত জীবসমূহ বিচরণ করছিল। নবী করীম ﷺ আবূ জাহলের এ বাক্য শুনে বললেন-পাখাযুক্ত জীবগুলো ছিল ফেরেশতা, আর খানিকটা অগ্রসর হলেই তারা তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলত। এ ঘটনা প্রসঙ্গে উপরিউক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। –[দুররুল মুখতার, বায়ান]

قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ ..... اِسْتَغْنَى : সে পরম অনুগ্রহশীল আল্লাহ মানুষের প্রতি এত বড় অনুগ্রহ করেছেন, তার সাথে মূর্খতা বশতঃ সেরূপ আচরণ করা মোটেই সঙ্গত হতে পারে না, যার উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

ধন-সম্পদ, মান-সম্মান যাই মানুষ দুনিয়াতে পেতে চাচ্ছে সব কিছুই সে পেয়েছে। এতদসত্ত্বেও সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তার সাথে বিদ্রোহমূলক আচরণ করে থাকে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে বাধা দেন না অথবা তার উপর আজাব নাজিল করেন না। এটা দেখে মানুষ আরো বেশি বেশি সীমালঙ্ঘন করে।

اَرَأَيْتَ الَّذِىْ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى আয়াতে عَبْدًا দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : অত্র আয়াতে عَبْدًا দ্বারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। "سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ" অর্থাৎ মহান সে আল্লাহ যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের একাংশে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন।

সূরা জিন-এ বলা হয়েছে "وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا" [আর আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল তখন তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো।]
বস্তুত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে এভাবে 'আবদ' বান্দা বলে অভিহিত করা একটি বিশেষ ভালোবাসার ভঙ্গি, অত্যন্ত স্নেহের ডাক।

اِذَا صَلّٰى দ্বারা উদ্দেশ্য : উদ্ধৃত আয়াতে اِذَا صَلّٰى বলে নবী করীম ﷺ-এর নামাজ পাঠের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত আয়াতগুলো সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশসমূহের অন্যতম। এর পূর্বে এমন কোনো আয়াত নাজিল হয়নি; যাতে নামাজ পড়ার পদ্ধতি শিখানো হয়েছিল। তাহলে নবী করীম ﷺ কিভাবে নামাজ পড়লেন? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবুয়তের পদে অভিষিক্ত করার পর তাঁকে নামাজ পড়ার একটি বিশেষ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে সে পদ্ধতির উল্লেখ কোথাও পাওয়া যাবে না। কোথাও লিখা নেই যে, হে নবী! আপনি এভাবে নামাজ পড়ুন। এটা দ্বারা এ কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র কুরআনে সন্নিবেশিত কালামই যে ওহীর মাধ্যমে নাজিল হতো না, এ ছাড়াও আল্লাহ ওহী বা ইলহামের সাহায্যে তাঁকে কুরআন বহির্ভূত আরো অনেক কিছু বলতেন ও শিক্ষা দিতেন। আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী ঐ নামাজ পড়া হয়েছিল।

اَرَاَيْتَ-এর মধ্যকার হামযার অর্থ : اَرَاَيْتَ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে تَعَجُّبْ সহকারে সম্বোধন করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, হামযা এখানে تَعَجُّبْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ تَعَجُّبْ-এর কয়েকটি কারণ রয়েছে-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ, আপনি আবূ জাহল ইবনে হেশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাব দ্বারা ইসলামের শক্তি বাড়িয়ে দিন। সেই দোয়ার উত্তরে আল্লাহ যেন বলছেন- 'আপনার তো ধারণা ছিল যে, আবূ জাহলের দ্বারা ইসলাম শক্তিশালী হবে। তার মতো ব্যক্তি দিয়ে কি ইসলামের শক্তি বাড়ে? অথচ সে নামাজি বান্দার নামাজে বাধা দেয়! এ কল্পনায় আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

২. তার উপাধি ছিল 'আবুল হাকাম'। যেন বলা হচ্ছে যে, তার উপাধি কিভাবে তা হতে পারে, অথচ সে আল্লাহর খেদমত হতে বান্দাকে ফিরিয়ে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত! এটা কি হিকমতের পরিচয় যে, সে করুণাময়ের ইবাদত ছেড়ে পাথরের ইবাদত করে!

৩. এ আহমক-নির্বোধ নির্দেশ দেয় আর নিষেধ করে। এ বিশ্বাসে প্রকট যে, অন্য লোক তার কথায় উঠবে-বসবে। অথচ সে না সৃষ্টিকর্তা, না প্রতিপালক। তারপরেও সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালকের ইবাদত থেকে নিষেধ করে। এটা কি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়? -[কাবীর]

يَنْهَاكَ না বলে يَنْهٰى عَبْدًا বলার কারণ : যেহেতু عَبْد বলতে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বুঝানো হয়েছে সেহেতু সরাসরি كَ সর্বনাম ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু মূল্যবান কয়েকটি উপকারিতার জন্য عَبْد বলা হয়েছে।

১. عَبْد নাকেরা শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ দাসত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে যে, তিনি এমন عَبْد দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি তাঁর বর্ণনা দিয়ে শেষ করতে পারবে না। তাঁর দাসত্বের ও আন্তরিকতার বর্ণনা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। বর্ণিত আছে যে, ইহুদিদের এক সাহিত্যিক এসে হযরত ওমর (রা.)-কে বলল, তোমাদের রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দাও। তিনি বললেন- আমার চেয়ে হযরত বিলাল (রা.) বেশি জানেন। হযরত বিলাল (রা.) বললেন- হযরত ফাতিমা (রা.) -এর কাছে যাও। হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেখিয়ে দিলেন- তখন সে হযরত আলী (রা.) -কে উক্ত প্রশ্ন করলে তিনি বললেন- তুমি আমাকে দুনিয়ার পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে আগে বর্ণনা দাও, তারপর আমি তোমাকে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিবো। সে বলল, এটাতো আমার জন্য সহজসাধ্য নয়। তখন হযরত আলী (রা.) বললেন- দুনিয়ার ঐ পণ্যদ্রব্যের বর্ণনা থেকে তুমি অক্ষম হয়ে গেছ যাকে আমার আল্লাহ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ বলেছেন। আর আমার দ্বারা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, আমি ঐ ব্যক্তিত্বের চরিত্রাবলি তোমার সামনে উত্থাপন করি, যার ব্যাপারে আমার আল্লাহ বলেছেন وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ সামান্য বস্তুর বর্ণনা দান যদি অসম্ভব হয়, অসীম বস্তুর বর্ণনা তালাশ করা অজ্ঞতা আর নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়।

২. এটা দ্বারা চরম তিরস্কার বুঝায়। যেন বলা হচ্ছে যে, আবূ জাহল এমন নিকৃষ্ট ব্যক্তি, যে যেমন তেমন আবদকেও বাধা দেয়। এটা তার অভ্যাস। অতএব, হে রাসূল! তার আপনাকে বাধা দেওয়া কোনো নতুন অভিনব কিছু নয়।

৩. এটা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য সে সকল ব্যক্তিদেরকে যারা নামাজে বাধা দেয়।

৪. আবূ জাহল কি মনে করছে যে, মুহাম্মদ ﷺ যদি আমার ইবাদত না করে আমি আর কোনো ইবাদতকারী পাবো না? মুহাম্মদ ﷺ তো একজন আবদ মাত্র। আমার নিকট অনেক ফেরেশতা রয়েছে যাদের সংখ্যা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তারা সর্বদা নামাজে এবং আমার গুণকীর্তনে লিপ্ত। -[কাবীর]

اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى আয়াতে সম্বোধিত কে? : "اَرَاَيْتَ" শব্দে আল্লাহ তা'আলা কাকে সম্বোধন করেছেন, এ ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়-

১. এখানে নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে; এ মতের স্বপক্ষে দলিল হলো- প্রথম ও তৃতীয় اَرَاَيْتَ শব্দদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। এখন যদি মধ্যের اَرَاَيْتَ -এর সম্বোধন তাঁকে ছাড়া অন্যকে ধরা হয়, তাহলে বাক্যের সৌন্দর্য এবং বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায়।

২. কারো মতে এখানে কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা জালিম এবং মজলুমকে দেখছেন, একবার জালিমকে আবার মজলুমকে সম্বোধন করছেন। যেমন, কোনো হাকিমের সামনে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষ দণ্ডায়মান, কোনো সময় বাদীকে আবার কোনো সময় বিবাদীকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলেন। -[কাবীর]

قَوْلُهٗ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى : আল্লামা বাগাবী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা যখন নামাজ আদায় করে তখন অবাধ্য কাফের আবূ জাহল তাঁকে তাতে বাধা প্রধান করে; অথচ সে বান্দা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হেদায়েতের উপর রয়েছেন। আর তিনি তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বনের আদেশ দিচ্ছেন। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

١٥. كَلَّا رَدْعٌ لَهُ لَئِنْ لَامُ قَسَمٍ لَمْ يَنْتَهِ لا عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ لَنَجُرَّنَّ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى النَّارِ .

১৫. সাবধান তার প্রতি ভর্ৎসনা, যদি সে لَئِنْ মধ্যকার لَامُ অক্ষরটি শপথের জন্য বিরত না হয় যে কুফরির উপর সে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা হতে। তবে আমি তাকে হেঁচড়ে নিয়ে যাবো, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে তার মস্তকের অগ্রভাগের কেশগুচ্ছ ধরে তাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবো।

١٦. نَاصِيَةٍ بَدَلٌ نَكِرَةٌ مِنْ مَعْرِفَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ وَ وَصَفَهَا بِذٰلِكَ مَجَازًا وَالْمُرَادُ صَاحِبُهَا .

১৬. সে কেশগুচ্ছ এ نَكِرَه টি مَعْرِفَه হতে بَدَلٌ যা মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছকে এ বিশেষণ দ্বারা مَجَازًا বিশেষিত করা হয়েছে। এটা দ্বারা صَاحِبُ نَاصِيَةٍ উদ্দেশ্য।

١٧. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ أَىْ أَهْلَ نَادِيْهِ وَهُوَ الْمَجْلِسُ يَنْتَدِى يَتَحَدَّثُ فِيْهِ الْقَوْمُ وَكَانَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَرَهُ حَيْثُ نَهَاهُ عَنِ الصَّلٰوةِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْثَرُ نَادِيًا مِنِّىْ لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ هٰذَا الْوَادِىَ إِنْ شِئْتُ خَيْلًا جُرْدًا وَ رِجَالًا مُرْدًا .

১৭. অতএব, সে আহ্বান করুক, তার সভাসদদেরকে অর্থাৎ তার সভা তথা মজলিসের সদস্যদের আহ্বান করুক। মজলিসকে نَادِىْ এ জন্য বলা হয়, যেহেতু সেখানে জাতীয় বিষয় আলোচনার সময় ডাকাডাকি করা হয়। আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজের ব্যাপারে ধমক দিয়ে বলেছিল, তুমি জান যে, তোমার নিকট আমার সভাসদগণ অপেক্ষা অধিক লোক নেই। আমি যদি ইচ্ছা করি তবে উত্তম অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল দ্বারা এ উপত্যকাকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারি।

١٨. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ الْمَلَائِكَةَ الْغِلَاظَ الشِّدَادَ لِإِهْلَاكِهِ فِى الْحَدِيْثِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ الزَّبَانِيَةُ عِيَانًا .

১৮. আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করবে তাকে ধ্বংস করার জন্য কঠোর, কঠিন ফেরেশতাদেরকে। হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের প্রহরীকে আহ্বান করতেন, তবে তাৎক্ষণিক তাকে পাকড়াও করত।

١٩. كَلَّا ط رَدْعٌ لَهُ لَا تُطِعْهُ يَا مُحَمَّدُ فِىْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَاسْجُدْ صَلِّ لِلّٰهِ وَاقْتَرِبْ مِنْهُ بِطَاعَتِهِ .

১৯. সাবধান তার প্রতি ভর্ৎসনা। তুমি তার অনুসরণ করো না হে মুহাম্মদ! নামাজ বর্জনে তার কথা মান্য করো না আর সিজদা করো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো আর নৈকট্য লাভ করো তাঁর প্রতি, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ : نَاصِيَةٍ মাওসূফ, كَاذِبَةٍ প্রথম সিফাত, خَاطِئَةٍ দ্বিতীয় সিফাত। মাওসূফ নিজের দুই সিফাত মিলিত হয়ে বদল, اَلنَّاصِيَةِ মুবদাল মিনহু। আর আরবি ব্যাকরণের নিয়ম রয়েছে, নাকিরা মাওসূফা মা'রেফা হতে বদল হতে পারে।

قَوْلُهُ الزَّبَانِيَةَ : اَلزَّبْنُ মাসদার। অর্থ– দূর করা, টক্কর লাগানো, ধাক্কা দেওয়া। আবূ ওবায়দা বলেছেন– এটা বহুবচন, একবচনে زِبْنِيَةٌ (যিবনিয়াহ), নাহুশাস্ত্রবিদ ইমাম কিসায়ী বলেন– তার একবচন زِبْنِيٌّ (যিবনিউয়ুন), মূলে তার বহুবচন زَبَانِيٌّ (যবানিউন), দু'টি ইয়া সহ, একটি ى বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে ة নেওয়া হয়েছে, زَبَانِيَةٌ হয়ে গেল। আখফাশ নাহ্বী বলেন– এর একবচন زَابِنٌ কোনো কোনো ব্যাকরণবিদের মতে زَبَانِيَةٌ বহুবচন, কিন্তু তার কোনো একবচন নেই। –[রূহুল মা'আনী]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : আবূ জাহ্ল নবী করীম ﷺ -কে নামাজ পড়তে নিষেধ করত এবং নামাজ পড়ার সময় তাঁকে নানা প্রকার কষ্ট দিত। একদা হযরত ﷺ মাকামে ইবরাহীমে নামাজ পড়ার সময় আবূ জাহ্ল এসে বলল যে, আমি কি তোমাকে এখানে নামাজ পড়তে নিষেধ করিনি? নবী করীম ﷺ তাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। এতেও সে নিবৃত্ত না হয়ে বলে উঠল যে, তোমার কি জানা নেই যে, আমার কত সভাসদ আছে? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে এ উপত্যকাকে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা পূর্ণ করে দিতে পারি। তাদের সাহায্যে নিশ্চয় আমি তোমাকে পর্যুদস্ত করে দিতে পারি। –[বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী]

আল্লাহ তা'আলা আবূ জাহলের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন।

এখানে كَلَّا -এর অর্থ : كَلَّا শব্দটি ধমকের জন্য। এখানে আবূ জাহলকে ধমক দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন আল্লাহর ইবাদত থেকে কাউকেও নিষেধ না করে এবং তাদেরকে 'লাত'সহ অন্যান্য মূর্তির উপাসনা করতে যেন নির্দেশ না দেয়।

অথবা, বলা হচ্ছে যে, কখনো আবূ জাহ্ল নবী করীম ﷺ -কে হত্যা এবং ঘাড়ে পা রাখতে পারবে না; বরং নবী করীম ﷺ -এর অনুসারীরাই তাকে হত্যা করে দিবে এবং তার বক্ষের উপর পা রাখবে।

হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, আল্লাহ যে সকল কিছু অবলোকন করছেন, তা কখনো তারা জানে না। যদিও কিছু জানে, কিন্তু সে জানা তাদেরকে কোনো ফায়দা না দেওয়ায় মনে হয় যেন তারা কিছুই জানে না। –[কাবীর]

لَنَسْفَعًا -এর অর্থ : لَنَسْفَعًا -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. اَلسَّفْعُ অর্থ কোনো বস্তুকে শক্তভাবে ধরা এবং ধরে টানা। অতএব অর্থ হবে– অবশ্যই আমি তার কপালের কেশগুচ্ছ ধরে টানবো এবং দোজখের দিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবো।

২. অথবা, اَلسَّفْعُ অর্থ– اَلضَّرْبُ (মারা)। অর্থাৎ অবশ্যই আমি তার চেহারায় চড় মারবো।

৩. অথবা, اَلسَّفْعُ অর্থ– اَلْإِسْوِدَادُ (কালো করা)। অর্থাৎ অবশ্যই তার চেহারাকে কালা-মলিন করে দিবো।

৪. অথবা, اَلسَّفْعُ অর্থ হবে– আমি অবশ্যই তাকে অপদস্থ এবং অপমান করে ছাড়বো।–(কাবীর, ফাতহুল কাদীর)

لَنَسْفَعًا -এ বর্ণিত কয়েকটি কেরাত : "لَنَسْفَعًا" শব্দটিতে কয়েকটি কেরাত বর্ণিত হয়েছে।

১. لَنَسْفَعَنَّ-এর শেষের নূনটি তাশদীদযুক্ত। এটা নূনে ছাকীলা।

২. ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, لَأَسْفَعَنَّ

৩. لَنَسْفَعَنْ -এর শেষের নূনটি সাকিন। একে নূনে খাফীফা বলা হয়। পড়তে তানবীনের মতো পড়া যায় এ কারণে আলিফ লেখা হয়েছে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আবূ জাহলের মৃত্যুর অবস্থা : বদরের প্রান্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) নিহতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, আবূ জাহল মাটিতে পড়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। ইবনে মাসউদ (রা.) মনে করলেন যে, তার শরীরে শক্তি থাকতে পারে– তাই তিনি দূর থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে মারাত্মক আহত করে দিলেন। তারপর যখন বুঝতে পারলেন যে, সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে আছে। তখন তিনি গিয়ে বক্ষের উপর বসলেন। এটা দেখে আবূ জাহল বলে উঠল যে, হে বকরির রাখাল, বক্ষে উঠে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, ইসলাম উপরে থাকে, তার উপরে কেউ উঠতে পারে না তখন আবূ জাহল বলল, তোমাদের নেতাকে বলবে– আমার জীবদ্দশায় আমার কাছে তার চেয়ে বেশি ঘৃণিত এবং ক্রোধের পাত্র হিসেবে কেউ ছিল না; এখন মৃত্যুর সময়ও আমার ক্রোধের পাত্র সে ছাড়া আর কেউই নেই। [বর্ণিত আছে যে, এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ বলেছেন– হযরত 'মূসা (আ.)-এর ফেরআউনের চেয়ে আমার ফেরআউন মারাত্মক'।] তারপর ইবনে মাসউদ (র.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল– আমার মাথা আমার তলোয়ার দিয়ে কাটো। কেননা তা খুবই ধারাল। যখন তার মাথা কাটা হলো, তখন তিনি তার মাথা বহন করতে পরছিলেন না। কেননা, সেতো ছিল কুকুর। কুকুরকে বহন করা ঠিক নয় টেনে-হেঁচড়ে নেওয়াই শ্রেয়। অথবা, আল্লাহর বাণী– لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ -এর যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য এরূপ হয়েছে তারপর তিনি তার লাশ টেনে নবী করীম ﷺ-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর ফেরশতা জিবরাঈল (আ.)ও সামনে হাসতে হাসতে যাচ্ছেন। –[কাবীর]

نَاصِيَة -এর অর্থ : نَاصِيَة অর্থ– কপালের চুল। কখনো চুলের স্থানকেও نَاصِيَة বলা হয়। তবে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা نَاصِيَة বলে চেহারা এবং মাথাকে বুঝিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, আবূ জাহল কপালের উপরে চুলকে সুন্দর করে আঁচড়িয়ে যত্নের সাথে রাখত'। চুল কালো রাখারও তার প্রচেষ্টা ছিল, সম্ভবত আল্লাহ তার চুলের সাথে চেহারাকেও কালো করার ইচ্ছা করেছেন। –[কাবীর]

اَلزَّبَانِيَة -এর অর্থ : হযরত কাতাদাহ (র.)-এর ব্যাখ্যানুযায়ী আরবি ভাষায় পুলিশদের ব্যাপারে زَبَانِيَة শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। زَبَنٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ধাক্কা দেওয়া। রাজা-বাদশাহর দরবারে এ বিশেষ উদ্দেশ্যে সুবেদার নিযুক্ত করা হয়। বাদশাহ কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দরবার হতে বহিষ্কার করাই তাদের কাজ। এখানে আল্লাহর এ কথাটির তাৎপর্য এই যে, সে তার সমর্থকদের ডেকে আনুক, আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আজাবের ফেরেশতাদের ডেকে আনবো। তারা এসে সে লোকটির ও তার সমর্থকদের সাথে বুঝাপড়া করবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, زَبَانِيَة দ্বারা জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের অন্যত্র তাদের সংখ্যা ১৯ বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, সে ফেরেশতাগণ এত বিরাটকায় যে, তাঁদের মাথা আসমানে, পা জমিনে এবং মাথার চুলও মাটিতে পড়বে। চক্ষুর জ্যোতি বিদ্যুতের মতো হবে, এক কাঁধ হতে অপর কাঁধের দূরত্ব এক বছরের রাস্তা হবে। তাঁদের বাহুতে সত্তর হাজার মানুষ সংকুলান হবে। –[কাবীর]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি আবূ জাহল তখন নবী করীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে তার দলবলকে ডাকত, তবে দোজখের ফেরেশতাগণ তাদেরকে সকলের সম্মুখে পাকড়াও করত। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى لَاتُطِعْهُ : তথা আবূ জাহল নামাজ পরিত্যাগের যে কথা বলেছে– তা কোনো অবস্থাতেই মানবেন না; বরং আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সেজদা করতে থাকুন এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করতে থাকুন। –[নূরুল কোরআন]

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ -এর মর্মার্থ : এখানে সেজদা অর্থ– নামাজ অর্থাৎ হে নবী! আপনি এ পর্যন্ত যেভাবে নামাজ পড়ছিলেন নির্ভয়ে সেভাবে নামাজ পড়তে থাকুন। তার সাহায্যে আপনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাকুন। মুসলিম শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, বান্দা সে সময় তার আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয় যখন সে সেজদায় অবনমিত হয়। মুসলিম শরীফে অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ যখনই এ আয়াতটি পড়তেন, তখনই সেজদা করতেন। এ সেজদাকে সেজদায়ে তেলাওয়াত বলে। এটা ওয়াজিব।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা সিজদায়ে শোকর। কারো কারো মতে, তা দ্বারা নামাজের মধ্যকার সেজদাকে বুঝানো হয়েছে।

اِقْتَرِبْ -এর অর্থ : এর অর্থ সেজদার মাধ্যমে তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকটতম মর্যাদা অর্জনে সচেষ্ট হও।' কারো মতে–"হে মুহাম্মদ সেজদা করো, হে আবূ জাহল! তার নিকটে যাও। দেখতে পাবে তোমার পরিণতি। –[কাবীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقَدْرِ : সূরা আল-ক্বাদর

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَدْرٌ শব্দের ধাতুগত অর্থ– পরিমাণ নির্ধারণ ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। এ মূলধাতু হতেই তাকদীর বা ভাগ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ সম্মান, গৌরব ও মহিমা। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের 'কদর' শব্দ হতেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ৩০টি বাক্য এবং ১২১টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ক. আবুল হাইয়্যান তাঁর اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ সূরাটি মাদানী।

খ. পক্ষান্তরে আল্লামা আল-মাওয়ারদী (র.) বলেন, অধিকাংশ কুরআন বিশারদের মতে তা মাক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী (র.) আল-ইতকান গ্রন্থে এটাই লিখেছেন।

সূরাটির বিষয়বস্তু : কুরআন মাজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই সূরাটির মূল বিষয়বস্তু। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন– আমিই এ কিতাব নাজিল করেছি। অর্থাৎ তা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিজস্ব কোনো রচনা নয়; বরং তা আমারই নাজিল করা কিতাব। আমি এ কিতাব কদরের রাত্রে নাজিল করেছি। তা বড়োই সম্মান ও মর্যাদার রাত। পরে এ কথার ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– এটা হাজার মাসের তুলনায়ও অধিক উত্তম রাত।

সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতা ও রূহ জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত তা এক পরিপূর্ণ শান্তির রাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ রাতে কোনোরূপ অশুভ বিষয়ের স্থান হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাই যে মানবতার কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, কোনো জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফয়সালা হলেও তা অবশ্যই গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। এ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মুত্তাকী মুসলমানদের গৃহে গমন করে প্রত্যেক নর-নারীকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাম ও শান্তির বাণী জ্ঞাপন করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-ক্বাদর **মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ**

خَمْسٌ اَوْ سِتُّ اٰيَاتٍ : ৫/৬ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ اَيِ الْقُرْاٰنَ جُمْلَةً وَّاحِدَةً مِّنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ اِلٰى سَمَاءِ الدُّنْيَا فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اَيِ الشَّرَفِ وَالْعِظَمِ .

১. আমি এটা অবতীর্ণ করেছি কুরআনকে একবার লাওহে মাহফূয হতে পৃথিবীর আকাশে, মহিমান্বিত রজনীতে অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা।

٢. وَمَآ اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَعْظِيْمٌ لِشَانِهَا وَتَعْجِيْبٌ مِنْهُ .

২. আর তুমি কি জান? তোমার কি জানা আছে? হে মুহাম্মদ! মহিমান্বিত রজনী কি? এটা তার মাহাত্ম্য বর্ণনা ও তৎপ্রতি বিস্ময় প্রকাশ উদ্দেশ্য।

٣. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيْهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنْهُ فِيْ اَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَتْ فِيْهَا .

৩. মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম যে মাসে মহিমান্বিত রজনী নেই। সুতরাং সে রজনীর পুণ্য কাজ এ রজনীহীন সহস্র মাসের পুণ্য কাজ অপেক্ষা উত্তম।

٤. تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ بِحَذْفِ اِحْدَى التَّائَيْنِ مِنَ الْاَصْلِ وَالرُّوْحُ اَيْ جِبْرِيْلُ فِيْهَا فِي اللَّيْلَةِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ بِاَمْرِهٖ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ قَضَاهُ اللّٰهُ فِيْهَا لِتِلْكَ السَّنَةِ اِلٰى قَابِلٍ وَمِنْ سَبَبِيَّةٌ بِمَعْنَى الْبَاءِ .

৪. অবতীর্ণ হয় ফেরেশতাকুল تَنَزَّلُ শব্দটি মূলত تَتَنَزَّلُ ছিল, একটি تَا মূল হতে বিলুপ্ত হয়েছে। এবং রূহ অর্থাৎ জিবরীল (আ.) তাতে সে রজনীতে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে আদেশে প্রত্যেক কাজে যা আগামী বছরের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করেছেন। আর مِنْ অব্যয়টি سَبَبِيَّه এবং بَا অর্থে ব্যবহৃত।

٥. سَلٰمٌ قف هِيَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَمُبْتَدَأٌ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا اِلٰى وَقْتِ طُلُوْعِهٖ جُعِلَتْ سَلٰمًا لِكَثْرَةِ السَّلَامِ فِيْهَا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ لَا تَمُرُّ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِلَّا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ .

৫. শান্তিময় সে রজনীএটা অগ্রবর্তী خَبَرٌ আর তার مُبْتَدَأٌ হলো, ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত مَطْلَعٌ শব্দটি لَام-এর মধ্যে যবর ও যের উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ তার উদয়ক্ষণ পর্যন্ত। এ রজনীকে سَلَامٌ শান্তিময় বলার কারণ এই যে, এ রজনীতে ফেরেশতাগণ অধিক পরিমাণে সালাম পাঠ করে তারা কোনো মু'মিন পুরুষ বা নারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম না দিয়ে অতিক্রম করে না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : إِنَّا মুবতাদা, أَنْزَلْنَاهُ -এর "ه" যমীর কুরআনের দিকে ধাবিত– মাফউল। أَنْزَلْنَا-এর উহ্য যমীর ফায়েল; ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলিত হয়ে মুবতাদার খবর হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ মুবতাদা, خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الخ খবর। আর পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি مَا أَدْرٰكَ -এর মধ্যস্থ ইস্তিফহামের জওয়াব।

قَوْلُهُ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ الخ : تَنَزَّلُ ফেলে, الْمَلٰٓئِكَةُ ফায়েল, اَلرُّوْحُ শব্দটি مَلٰٓئِكَة -এর উপর আতফ হয়ে فِيْهَا জার-মাজরূর মুতা'আল্লিক تَنَزَّلُ -এর সাথে। بِإِذْنِ رَبِّهِمْ বাক্য تَنَزَّلُ -এর সাথে মুতা'আল্লিক অথবা উহ্য مُتَلَبِّسٌ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়ে তার ফায়েল হতে হাল হয়েছে। مِنْ كُلِّ أَمْرٍ এটা পূর্ববর্তী ফে'লের সাথে মুতা'আল্লিক। ফে'ল ও তার মুতা'আল্লিকসমূহ সহ জুমলায়ে মুস্তানাফা। এখানে বাক্য শেষ হয়েছে।

سَلَامٌ খবরে মুকাদ্দাম, هِيَ মুবতাদা মুয়াখখার। حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ মুতা'আল্লিক سَلَامٌ -এর সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামত দিবসের উপস্থিতির কথা উল্লিখিত হয়েছে, আর অত্র সূরায় পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার রাতের তথা লাইলাতুল কদরের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

–[নূরুল কোরআন]

সূরাটির শানে নুযূল : বনী ইসরাঈলদের মধ্যে এমন একজন ইবাদতকারী ছিল, যে সারা রাত ইবাদতে মশগুল থাকত আর প্রত্যুষে জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়ত এবং সারা দিন জিহাদে মশগুল থাকত। এভাবে সে এক হাজার বছর কাটিয়ে দিল, এ ঘটনা প্রসঙ্গে অত্র সূরা অবতীর্ণ করে সমস্ত উম্মতের উপর নবী করীমের উম্মতের মর্যাদা প্রমাণ করা হলো। –[মাযহারী]

অথবা, পূর্ববর্তী যুগের দীর্ঘায়ু ধার্মিকগণ বহু বছর পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগি করে এবং তাদের দীর্ঘ জীবনে বহু সৎকার্য করে অবশেষে পুণ্যের অধিকারী হয়ে গেছেন। সুতরাং হযরতের সমসাময়িক অথবা পরবর্তী যুগের অল্পায়ু মু'মিনদের পক্ষে প্রার্থনা বা ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকার্যে তাদের সমকক্ষ হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হবে? এক সময় নবী করীম ﷺ -এর মনে এ চিন্তা উদিত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরা অবতীর্ণ করে তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলেন– হে রাসূল! আমি আপনার এবং আপনার অনুগামীদের জন্য এমন এক মহা মহিমান্বিত রজনী নির্ধারিত করে দিয়েছি, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। সে এক রজনীর উপাসনা হাজার মাসের উপাসনার চেয়েও উত্তম। –[ইবনে জারীর]

অথবা, একদা নবী করীম ﷺ সাহাবীদের কাছে বনী ইসরাঈলের এক দরবেশের কাহিনী বর্ণনা করলেন। সে দরবেশ একটানা চুরাশি বছর অথবা হাজার মাস আল্লাহর রাহে জিহাদ করেন। এ হাজার মাস যাবৎ উলঙ্গ তরবারি তাঁর কোমরে বাঁধা ছিল। এ কাহিনী শুনে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বিস্ময় বোধ করলেন এবং অনুশোচনা করলেন। তাঁরা বললেন– আদিকালের লোকেরা দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করত; আমরা তো অল্প দিন আয়ু লাভ করি। সত্যিই আমরা হতভাগ্য। তাঁদের এ অনুশোচনার জবাবে আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরা অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– তোমরা অল্পায়ু হলেও ভাবনার কিছুই নেই। তোমাদেরকে কদরের রাত্রি দান করেছি। যা সাধারণ রাত্রি হতে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ হাজার রাত্রি ইবাদত করে যে পুণ্য অর্জন করা হয়েছে তোমাদের যুগে শুধু কদরের রাত্রির পুণ্য তার চেয়েও অনেক বেশি। –[দুররে মানছুর, লোবাব, ইবনে কাছীর]

অথবা, হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল বনী উমাইয়ার জালিম বাদশাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিম্বারে একের পর এক বানরের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে বসছে, আর প্রজাদের উপর অত্যাচার করছে। এ স্বপ্ন দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়।

হাজার মাসের দ্বারা বনী উমাইয়াদের রাজত্বকালের হাজার মাস (আশি সাল)-কে বুঝিয়েছে। যেমন- তা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উমাইয়াদের পার্থিব রাজত্বকালের আশি সাল হতে পরকালীন মর্যাদার এ রাত্রিই উত্তম।

-[রূহুল মা'আনী, আযীযী]

قَدْر -এর অর্থ কি, একে কদরের রাত বলা হয় কেন? : মুফাসসিরগণ এখানে قَدْر -এর দু'টি অর্থ করেছেন।

১. একদল মুফাসসিরের মতে, ক্বদর -এর অর্থ হলো- তাকদীর। কেননা এ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা তাকদীরের ফয়সালা জারি ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের কাছে সোপর্দ করে দেন। সূরা-দোখান -এর নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়- فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ এ রাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারের অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সুদৃঢ় ফয়সালা জারি করা হয়।

২. ইমাম যুহরীসহ একদল মুফাস্‌সিরের মতে, ক্বাদর -এর অর্থ- মাহাত্ম্য, মর্যাদা, সম্মান ও সম্ভ্রম। অর্থাৎ এটা অতীব মাহাত্ম্যপূর্ণ মর্যাদাশালী ও সম্মানিত রাত। এ সূরায় 'ক্বাদরের রাত হাজার মাসেরও তুলনায় অধিক কল্যাণকর' কথা হতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

৩. শেখ আবূ বকর ওয়াররাফ বর্ণনা করেন, এ রাতে ইবাদতের কারণে এমন লোকেরও মর্যাদা-সম্মান বৃদ্ধি পায় ইতঃপূর্বে যাদের কোনো মর্যাদা বা কদর ছিল না। এ জন্য এ রাতকে শবে কদর বলা হয়। -[নূরুল কোরআন]

লাইলাতুল কদর নিরূপণ : এ রাতকে সাধারণত 'শবে কদর' বলা হয়ে থাকে। এ শবে কদর কবে, কখন তার সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। কেউ কেউ বলেছেন- যে কোনো মাসের যে কোনো রাতে শবে কদর হতে পারে এবং সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির উপরেই তার শবে কদর প্রাপ্তির শুভ মুহূর্ত নির্ভর করে। তবে অধিকাংশের মতে রমজান মাসের মধ্যেই শবে কদর অবস্থিত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের ইঙ্গিতেও বুঝা যায়, রমজান মাসের শেষ দশ তারিখের মধ্যেই এবং তার বেজোড় রাত্রিতে শবে কদর প্রাপ্তির সম্ভাবনা। অনেক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মতে, রমজান মাসের সাতাশ তারিখের রাত্রেই শবে কদর হয়ে থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, ধর্মপ্রাণ মুসলিম নর-নারীগণ যাতে শবে কদর প্রাপ্তির আশায় রমজান মাসের সমস্ত রাত আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে অতিবাহিত করে পুণ্য ও অনন্ত কল্যাণের অধিকারী হতে পারে, তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলা এ মহিমান্বিত রাতকে রমজান মাসের মধ্যে গোপন রেখে দিয়েছেন। তবে হাদীসসমূহের বর্ণনা ও সাহাবীদের ধারণা মতে, রমজান মাসের শেষে তথা ২৭ শে রমজান তারিখে অমানিশার গভীর অন্ধকারেই মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি প্রথম প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ আধ্যাত্মিক জগতে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্র অপেক্ষা অন্ধকার রাত্রেই অধিকতর ঐশী অনুগ্রহ অবতীর্ণ হয়ে থাকে। অতএব, সবদিক বিবেচনা করলে রমজানের সাতাশ তারিখের রাত্রকেই শবে কদর হিসাবে নিরূপণ করা যেতে পারে। কারণ যুগ যুগ ও শতাব্দী ধরে লক্ষ্য করা হয়েছে-আল্লাহ তা'আলা এ পবিত্র রাতকে ঝড়-ঝটিকা, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে মুক্ত রাখেন। ঐ রাত্রে পৃথিবীর উপর কোনোই অশান্তির ঘটনা সংঘটিত হয় না।

হযরত ওসমান ইবনে আব্দুল আসের এক দাস বহু দিন ধরে নৌকা ও জাহাজ চালাত, সে একটি ঘটনা তার নিকট বলল- আমার সফরে একটি বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, বছরের মধ্যে একদিন সমস্ত নদীর লবণাক্ত পানি মিঠা হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন- যখন এরূপ আবার হবে, তখন তুমি আমাকে জানাবে। অতএব, এক বছর রমজানে তাকে জানানো হলো। তখন জানা গেল তা রমজানের ২৭ তারিখ রাত্র ছিল। -[আযীযী]

আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বললেন যে, আমি তা কদরের রাতে নাজিল করেছি। অথচ কুরআন এক দীর্ঘ সময়ে নাজিল হয়েছে :

আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি তা কদরের রাতে নাজিল করেছি।' তা হতে বাহ্যত মনে হয় সমস্ত কুরআন কদরের রাতে এক সঙ্গে নাজিল হয়েছে। অথচ নবী করীম ﷺ -এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ কুরআন নাজিল হয়েছিল। মুফাস্‌সিরগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ক. একদল মুফাস্‌সিরের মতে, কদরের রাতে পূর্ণ কুরআন মাজীদ লাওহে মাজফূয হতে প্রথম আকাশে নাজিল হয়েছে আর তখন হতে দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ অল্প অল্প করে নবী করীম ﷺ -এর উপর নাজিল হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. এ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন ওহী বাহক ফেরেশতার হাতে সমর্পণ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সময় সময় ২৩ বছরের দীর্ঘ মেয়াদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সে আয়াত ও সূরাসমূহকে নবী করীম ﷺ -এর প্রতি নাজিল করেছেন। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মনোনীত মত।

গ. ইমাম শা'বী (র.) সহ একদলের মতে, এর ব্যাখ্যা হলো এ রাতে কুরআন নাজিল হওয়া শুরু হয়েছে।

ঘ. সমস্ত কুরআন শরীফের ন্যায় এর অংশ বিশেষও কুরআন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কাজেই এখানে কুরআন দ্বারা আংশিক কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে।

লাইলাতুল কদরকে গোপন রাখার কারণ : আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি কারণে উক্ত লাইলাতুল কদরকে গোপন রেখেছেন :

১. উক্ত রাত্রকে তিনি গোপন রেখেছেন, যেমন গোপন রেখেছেন অনেক বস্তুকে। যেমন তিনি সমস্ত ইবাদতে তাঁর সন্তুষ্টি গোপন রেখেছেন, যেন সকল গুনাহ হতে বিরত থাকা যায়।

একান্ত ওলীদেরকে গোপন করে রেখেছেন, যেন পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করে। দোয়ার মধ্যে জবাব দানকে গোপন করে রেখেছেন, যেন বেশি বেশি দোয়া করা হয়। اَلصَّلَاةُ الْوُسْطٰى কে গোপন রেখে সকল সালাত (নামাজ) আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তওবা কবুলকে গোপন রেখেছেন, যেন সকল প্রকার তওবা সংঘটিত হয়। মৃত্যুকে গোপন রেখে মনে ভয়ের সঞ্চার করে রেখেছেন। এমনিভাবে লাইলাতুল কদরকে গোপন রেখেছেন, যেন বান্দা রমজানের সকল রাতকে সম্মান করে ইবাদত করে।

২. মনে হয় যেন আল্লাহ বলতে চান যে, যদি আমি লাইলাতুল কদরকে নির্ধারণ করে দিতাম, তাহলে সে রাতকে তোমাদেরকে নাফরমানির দিকে নিয়ে যেত। কেননা, আমি তোমাদের হঠকারিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। অতএব, তোমরা গুনাহগার হয়ে যেতে। এমতাবস্থায় তোমাদের গুনাহ বড় হয়ে দাঁড়াত। কেননা, জেনেশুনে গুনাহ করলে তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই না জানিয়ে গোপন করে রেখেছি।

৩. এ রাতকে তালাশ করে চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে বের করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে চেষ্টা-সাধনার ফল দান করবেন, যা অন্যান্য ইবাদতে পাওয়া যায় না।

৪. অথবা, বান্দা যখন লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য সকল রাতে চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন যে, দেখ তোমরা বলেছিলে– মানুষ জমিনের খুন-খারাবি এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ করবে– দেখ অনির্ধারিত ধারণামূলক রাতে তারা এত চেষ্টা করে আমার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে, যদি উক্ত রাতকে প্রকাশ করে দিতাম, তাহলে দেখতে কত চেষ্টা তারা করত। –[কাবীর]

দিন কি রাতের সাথে যুক্ত হবে? : রাত এবং দিন মিলে 'লাইলাতুল কদর' হয়ে থাকে। যেমন, হযরত শাবী বলেন, يَوْمُهَا كَلَيْلَتِهَا 'লাইলাতুল কদরের দিনটি রাতের মতোই মর্যাদাবান'। আরবিতে لَيْل বললে نَهَارٌ বা দিনও শামিল থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি দুই لَيْلَة -এর ই'তিকাফের নিয়ত করলে মধ্যকার দিনেও ই'তিকাফে থাকতে হবে। যদিও কারো মতে দিন শামিল নয়। –[কাবীর]

رُوْحٌ অর্থ কি? : 'রূহ' এর মর্মার্থের ব্যাপারে কয়েকটি মত দেখা যায়–

১. 'রূহ' -এর অর্থ বড় ফেরেশতা। যদি তিনি আসমান ও জমিনসমূহকে গিলতে ইচ্ছা করেন, তাহলে এক লোকমার বেশি হবে না।

২. ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দল, যাদেরকে অন্যান্য ফেরেশতাগণ 'লাইলাতুল কদর' ব্যতীত কোনো সময়ে দেখেন না।

৩. অথবা, আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি, যারা খায় ও পরে, তারা ফেরেশতাও নয়, মানুষও নয়। সম্ভবত তারা বেহেশতবাসীদের সেবক।

৪. অথবা, সম্ভবত ঈসা (আ.)। কেননা তাঁর এক নাম 'রূহ'। তিনি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

৫. অথবা, কুরআন। যেমন, আল্লাহ বলেন– وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

৬. অথবা, রহমত। মনে হয় যেন আল্লাহ তা'আলা এভাবে বলছেন যে, ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছেন, তাঁদের পিছনে রহমতও অবতরণ করেছে। অতএব, তারা দুনিয়ার সফলতার সাথে সাথে আখেরাতের সাফলতার ভাগী হচ্ছে।

৭. অথবা, ফেরেশতাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

৮. ইমাম মুজাহিদ বলেন, 'রূহ' বলতে ডান ও বাম কাঁধের ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে।

তবে সবচেয়ে সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য কথা হলো– 'রূহ' বলতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। সমস্ত ফেরেশতাদের উল্লেখের পর হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উল্লেখ দ্বারা তাঁর ফজিলত বুঝানো হয়েছে। মনে হয় যেন এ কথা বলা হয়েছে, اَلْمَلٰۤئِكَةُ فِىْ كَفَّةٍ وَالرُّوْحُ فِىْ كَفَّةٍ অর্থাৎ 'সকল ফেরেশতা এক পাল্লায় আর হযরত জিবরাঈল (আ.) এক পাল্লায়'। –[কাবীর]

سَلَامٌ -এর অর্থ : سَلَامٌ অর্থ– শুভেচ্ছা বা কল্যাণ কামনা। আল্লাহর আদেশে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রত্যেক ইবাদতে রত মুসলমান নর-নারীকে কদরের রজনীতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাম বা শুভেচ্ছাবাণী জ্ঞাপন করেন। অথবা, সকাল হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ রজনীকে শান্তি ও কল্যাণের রজনী বানিয়েছেন। সে রজনীতে পৃথিবীকে ঝড়, ঝটিকা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প বা অনুরূপ কোনো প্রাকৃতিক বিপদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখেন; বরং এর পরিবর্তে সে রাতের সকাল পর্যন্ত সমগ্র জগৎ ব্যাপি এক অনাবিল শান্তি ও স্নিগ্ধতা বিরাজ করে।

হযরত নাফে' (র.)-এর তাফসীর করেছেন এভাবে যে, কদরের রাত সবটুকুই নিরাপদ এবং মঙ্গলময়। এ রাতে অমঙ্গলের কিছুই নেই।

ইমাম শা'বী (র.) বর্ণনা করেন যে, سَلَامٌ -এর অর্থ হলো, এ রাতে সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ফেরেশতাগণ মু'মিনদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতে থাকে এবং প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন– আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। –[নূরুল কোরআন]

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -এর মধ্যে اَمْرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) লিখেছেন যে, এখানে "اَمْرٌ" দ্বারা সে সকল বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যা পরবর্তী এক বছরের জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক হুকুম বলে বুঝানো হয়েছে, প্রত্যেক বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি সঙ্গত কাজ। সূরা দুখানে তাকে اَمْرٍ حَكِيْمٍ বলা হয়েছে।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ -এর মধ্যস্থিত "ه" যমীরটির مَرْجِعْ কি? : মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ -এর মধ্যস্থিত "ه" যমীরের مَرْجِعْ হলো কুরআন মাজীদ। যদিও পূর্বে তার উল্লেখ নেই, তথাপি 'নাজিল করা' কথাটি হতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তা কুরআন সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ : সূরা আল-বাইয়্যিনাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি দ্বারা সূরাটির নামকরণ হয়েছে আল-বাইয়্যিনাহ। "বাইয়্যেনাহ" অর্থ স্পষ্ট দলিল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ। এটা দ্বারা মূলত রাসূলে কারীম ﷺ উত্থাপিত দীন ও জীবনাদর্শের কথা বুঝানো হয়েছে। উক্ত সূরাটির আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– কিয়ামাহ, বালাদ, মুনফাক্কীন, বারিইয়্যা এবং লাম-ইয়াকুন। এতে ৮টি আয়াত, ২৫টি বাক্য এবং ১৪৯টি অক্ষর রয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কতিপয় তাফসীরকার বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ সূরাটি মাক্কী। আর অপর কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে তা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে জুবাইর এবং আতা ইবনে ইয়াসার (র.) -এর মতে এটা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদা (রা.) এ পর্যায়ে দু'টি কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি কথানুযায়ী তা মাদানী। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে মাক্কী বলেছেন। আল-বাহরুল মুহীত গ্রন্থকার আবূ হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবুল মুনয়িম (র.) এ সূরাটির মাক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সূরাতে বর্ণিত কথা ও বিষয়বস্তুতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, যার ভিত্তিতে একটি কথাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : সূরাটিতে সর্বপ্রথম রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সে কথাটি হলো– দুনিয়ার মানুষ আহলে কিতাব বা মুশরিক যা-ই হোক না কেন, যে কুফরির অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল, তা হতে মুক্তি লাভের জন্য এমন এক জন রাসূল প্রেরণ অপরিহার্য ছিল যার নিজ সত্তাই হবে তাঁর রাসূল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তাকে প্রদত্ত কিতাব হবে সম্পূর্ণরূপে যথাযথ, সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

এরপর আহলে কিতাব জাতিসমূহের গোমরাহীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পথ দেখাননি বলেই যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তা নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক পথের নির্দেশ পাওয়ার পরই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই তাদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আর এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে নবী ও রাসূল-ই এসেছেন আর যে কিতাব-ই নাজিল হয়েছে, তা একটি মাত্র নির্দেশই দিয়েছে। সে নির্দেশ হলো, সকল পথ-পন্থা ও নির্দেশ পরিত্যাগ করে আল্লাহর খালেস বন্দেগি করার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা হতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাব এ আসল ও প্রকৃত দীন হতে বিচ্যুত হয়ে নিজের ধর্মে যেসব নতুন নতুন মত-পথ ও কথার উদ্ভাবন বা বৃদ্ধি করে নিয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণ বাতিল।

কাজেই আল্লাহর এ শেষ নবী যিনি এখন এসেছেন, তিনিও সে আসল দীনের দিকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে অকুল আহ্বান জানিয়েছেন। সূরার শেষ ভাগে স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে, যে আহলে কিতাব ও মুশরিক এ নবীকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। তারা নিকৃষ্টতম জীব। চিরকালীন জাহান্নামই তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে নেক আমলের পথ অবলম্বন করবে তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-বাইয়্যিনাহ মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

تِسْعُ اٰيٰتٍ : ৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ لِلْبَيَانِ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ اَيْ عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ عَطْفٌ عَلٰى اَهْلِ مُنْفَكِّيْنَ خَبَرُ يَكُنْ اَيْ زَائِلِيْنَ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُمْ اَيْ اَتَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اَيِ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ .

১. আহলে কিতাবগণ হতে যারা কাফের مِنْ অব্যয়টি بَيَانِيَه আর মুশরিকগণ অর্থাৎ প্রতিমা পূজারী এটাও اَهْلِ -এর প্রতি عَطْف বিরত হওয়ার ছিল না এটা يَكُنْ -এর خَبَرٌ অর্থাৎ স্বীয় অবস্থা পরিত্যাগকারী ছিল না তাদের নিকট না আসা পর্যন্ত تَأْتِيَهُمْ শব্দটি اَتَتْهُمْ অর্থে সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশ্য দলিল।

٢. رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ بَدَلٌ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَهُوَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً مِنَ الْبَاطِلِ .

২. আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রাসূল এটা بَيِّنَةٌ হতে بَدَلٌ আর তিনি নবী মুহাম্মদ ﷺ যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ বাতিল হতে।

٣. فِيْهَا كُتُبٌ اَحْكَامٌ مَكْتُوْبَةٌ قَيِّمَةٌ مُسْتَقِيْمَةٌ اَيْ يَتْلُوْ مَضْمُوْنَ ذٰلِكَ وَهُوَ الْقُرْاٰنُ فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ .

৩. যাতে আছে বিধানসমূহ লিখিত আহকামসমূহ সঠিক নির্ভুল। অর্থাৎ তিনি কুরআনের বিষয়বস্তু পাঠ করে শুনান। পরিণামে কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর কেউ অবাধ্যাচারিতা প্রদর্শন করে।

٤. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ فِي الْاِيْمَانِ بِهٖ ﷺ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ اَيْ هُوَ ﷺ اَوِ الْقُرْاٰنُ الْجَائِيْ بِهٖ مُعْجِزَةً لَهٗ وَقَبْلَ مَجِيْئِهٖ ﷺ كَانُوْا مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى الْاِيْمَانِ بِهٖ اِذَا جَاۤءَ فَحَسَدَهٗ مَنْ كَفَرَ بِهٖ مِنْهُمْ .

৪. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন প্রশ্নে তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আগমন করার পর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা কুরআন যা তিনি স্বীয় মু'জিযারূপে আনয়ন করেছেন। আর তারা তাঁর আগমনের পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনার প্রশ্নে ঐকমত্য ছিল; কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পর কতিপয় লোক ঈর্ষা বলে কুফরি অবলম্বন করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٥. وَمَآ أُمِرُوْا فِىْ كِتَابَيْهِمُ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ اَىْ اَنْ يَعْبُدُوْهُ فَحُذِفَتْ اَنْ وَ زِيْدَتِ اللَّامُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا مِنَ الشِّرْكِ حُنَفَاءَ مُسْتَقِيْمِيْنَ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَ دِيْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ اِذَا جَاءَ فَكَيْفَ كَفَرُوْا بِهٖ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ الْمُسْتَقِيْمَةِ.

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল তাদের কিতাবদ্বয় তাওরাত ও ইনজীলে। আল্লাহর ইবাদত করতে শব্দটি أَنْ يَعْبُدُوْهُ অর্থে ব্যবহৃত أَنْ -কে বিলুপ্ত করে তদস্থলে لَامْ ব্যবহৃত হয়েছে দীনকে তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে শিরক হতে একনিষ্ঠভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও মুহাম্মদ ﷺ -এর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। এক্ষণে যখন তিনি আগমন করেছেন, তখন তারা কিরূপে তাঁর অবাধ্যাচারণ করছে। আর নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে ও জাকাত আদায় করতে, এটাই দীন মিল্লাত যা সঠিক قَيِّمَة শব্দটি مُسْتَقِيْمَة অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় শবে কদরের ফজিলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক ভিত্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর তা হলো, বান্দার ইখলাস বা মনের একনিষ্ঠতা ও পবিত্রতা।

এ ছাড়া পূর্ববর্তী সূরায় যখন শবে কদরের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় বান্দার নেক ও বদ হওয়ার মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। যারা ঈমানদার হয় এবং নেক আমল করে তারা সৌভাগ্যবান। পক্ষান্তরে যারা কুফরি ও নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে তারা হতভাগ্য। –[নূরুল কোরআন]

সূরাটির শানে নুযূল : মহানবী ﷺ -এর পূর্বে মক্কা-মদীনার ইহুদি-নাসারাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট এই বলে প্রার্থনা জানাত– যদি আমাদের জীবদ্দশায়ই আখেরী নবীর আগমন ঘটে, তবে আমরা সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনবো। কিন্তু তাঁর নবুয়ত লাভ করার পর মাত্র কয়েকজন লোক ব্যতীত কেউই ঈমান আনল না। তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন। –[মা'আলিম]

আহলে কিতাব-এর পরিচয় : আল-কুরআনের পরিভাষায় হযরত মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর অনুসারীগণকেই আহলে কিতাব বলা হয়। কেননা, তারাই আসমানি কিতাব তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারী ছিল। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। কেননা, নবী করীম ﷺ -এর যুগে ইহুদি ও খ্রিস্টান নামে দু'টি ধর্মীয় দল ছিল, যারা নিজেদের কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অবহিত হয়েছিল যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমন অত্যাসন্ন, তাঁর গুণাবলি হবে এই ...... কিন্তু এটা অবগত থেকে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করেও তাঁর আনীত দীন ও আদর্শকে গ্রহণ না করার কারণে তাদেরকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আহলে কিতাবের মধ্যে ইহুদিগণ নিজেদের কিতাব ও ধর্মবিশ্বাসে অনেক মনগড়া কল্পিত কথা ও আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি করে নিয়েছিল। যেমন– তারা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। এটা ছিল আল্লাহর সত্তায় প্রকাশ্য শিরক। অপর দিকে খ্রিস্টানগণও নিজেদের কিতাব ও আকীদায় অনেক মনগড়া কথা ও আকীদা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। যেমন– তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র এবং মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলে ত্রিত্ববাদের আকীদা পোষণ করত। এটাও ছিল আল্লাহর সত্তায় প্রকাশ্য শিরক।

মুশরিকদের পরিচয় : উপরিউক্ত আয়াতে যেসব লোকদেরকে মুশরিক নামে অভিহিত করা হয়েছে, তারা মূলতই কোনো নবী, কিতাব ও ধর্মের অনুসারী ছিল না। শিরক করাকেই তারা ধর্ম মনে করত। সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতে আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার সারকথা হলো আহলে কিতাবগণ নির্দিষ্ট নবী ও কিতাবের অনুসারী হওয়ার এবং

তাওহীদবাদী ধর্মের দাবি করেও আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় শিরক করে। আর মুশরিকগণ কোনো কিতাব ও তাওহীদী ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় শিরক করাকে ধর্ম ভেবে থাকে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল এর অর্থ এই নয় যে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে কিছু কিছু লোক কুফরি করত আর কতক কুফরি করত না; বরং এর মর্ম হলো কুফরিতে নিমজ্জিত লোক দু'ভাগে বিভক্ত, একদল আহলে কিতাব ও অপর দল মুশরিক। কেননা তারা কুফরি না করলে তখন আহলে কিতাব বা মুশরিকরূপে তাদের পরিচয় থাকে না। তখন তারা হয়ে যায় মুসলিম ও মু'মিন।

অগ্নি উপাসক কি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত? : এ ব্যাপারে দু'টি মত দেখা যায়।

১. কতিপয় আলিমের মতে, তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন– سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

২. অন্যান্যদের মতে তারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত। –[কাবীর]

মুশরিকদের পূর্বে আহলে কিতাবকে উল্লেখের হিকমত : আল্লাহর বাণী لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الخ এর মধ্যে আহলে কিতাবকে মুশরিকদের পূর্বে উল্লেখ করার বিভিন্ন রহস্য ও কারণ মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেছেন।

ক. আহলে কিতাব ছিল আলিম, সমাজে তারা প্রভাবশালী ছিল এ জন্য তাদরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. সূরাটি মাদানী। আর মদীনায় তখন আহলে কিতাবের বসবাস ছিল। তাই মুখ্যত তাদের কথা বলা হয়েছে।

গ. আহলে কিতাব হওয়ার কারণে অন্যান্যরা তাদের অনুসরণ করত। কাজেই তারা কুফরি করার কারণে অন্যরাও কুফরি করেছেন। এ জন্য তাদেরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. আহলে কিতাবের কুফরি ও বিরোধিতা ছিল মারাত্মক। কেননা তারা নবী করীম ﷺ -কে শেষ নবী জেনেও তাঁর নবুয়তকে অস্বীকার করেছে।

ঙ. অথবা, আহলে কিতাব মুশরিকদের অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কারণে তাদেরকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। –[কাবীর]

حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ আয়াতে اَلْبَيِّنَةُ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? : পরবর্তী আয়াত رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ الخ হতে বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতে اَلْبَيِّنَةُ দ্বারা নবী করীম ﷺ-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁর নবুয়ত পূর্ব ও নবুয়ত পরবর্তী জীবন উম্মী হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের মতো একখানি জ্ঞানের বিশ্বকোষ পেশ করা, তাঁর উপস্থাপিত শিক্ষা ও সংস্পর্শে ঈমান গ্রহণকারীদের জীবনে এক বিস্ময়কর বিপ্লব সৃষ্টি হওয়া, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিভিত্তিক আকীদা-বিশ্বাস স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ইবাদত, উন্নত মানের পবিত্র নৈতিকতা ও মানব জীবনের জন্য উত্তম নীতি-আদর্শ ও আইন-বিধানের শিক্ষাদান, তার কথা ও কাজ পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া এবং সকল প্রকার বিরোধিতা অতিক্রম করে অত্যন্ত সাহসিকতা সহকারে তার নিজ দাওয়াত ও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, তার উপর সুদৃঢ় হয়ে থাকা-এ সব কিছুই অকাট্যভাবে প্রমাণ করছিল যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল। আর এ হিসাবে তিনি কাফিরদের জন্য এক অকাট্য দলিলও ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাইয়্যেনাহ বলার কারণ : এর কয়েকটি কারণ হতে পারে।

১. কেননা, তিনি নিজেই নবুয়তের এক উজ্জ্বল প্রমাণ ছিলেন। নবুয়তের সকল যোগ্যতা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

২. তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ আকলের একমাত্র ধারক। সত্যবাদিতা ছিল তাঁর জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য দিক। তাইতো তিনি হয়েছিলেন সত্যবাদিতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

৩. তাঁর জীবনে মু'জিযা ছিল স্পষ্ট এবং অধিক। স্পষ্টতা এবং আধিক্যতার দিক থেকে মনে হয় যেন তিনিই بَيِّنَة বা حُجَّة এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম দিয়েছেন سِرَاجًا مُّنِيْرًا। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

Free@www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مُطَهَّرَةً-এর অর্থ : مُطَهَّرَةً অর্থ–পবিত্র কিন্তু কোনো বস্তু হতে পবিত্র, তা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, কারো মতে مُطَهَّرَةً عَنِ الْبَاطِلِ অর্থাৎ বাতিল হতে পবিত্র। যেমন বলা হয়েছে– لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

অথবা, مُطَهَّرَةً عَنِ الذِّكْرِ الْقَبِيْحِ অর্থাৎ অশোভনীয় উক্তি উল্লেখ হতে মুক্ত-পবিত্র। কেননা কুরআনে উত্তম উক্তিই স্থান পেয়েছে। অথবা, مُطَهَّرَةً বলতে পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত তা স্পর্শ করতে পারবে না, বুঝানো হয়েছে। যেমন– অন্যত্র বলা হয়েছে لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

كُتُبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : كُتُبٌ দ্বারা আয়াতে কারীমায় সমস্ত সহীফাগুলোতে লিপিবদ্ধ আয়াত এবং বিধানসমূহকে বুঝানো উদ্দেশ্য।

অথবা, كُتُبٌ বলতে আল্লাহর আদেশসমূহকে বুঝানো হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

প্রথম আয়াতে আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের উল্লেখ আর চতুর্থ আয়াতে শুধু আহলে কিতাবকে উল্লেখ করার কারণ : মুশরিকগণ তাদের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাদের মধ্যে একদল নিহত হয়েছে। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবগণ জিজিয়া দিয়ে নিজস্ব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা বিভক্ত হয়নি বলে উক্ত চতুর্থ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর প্রথম আয়াতে একই সাথে উভয় দলের কথা এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহলে কিতাবগণ তাদের কিতাবে নবী করীম ﷺ -এর সকল পরিচয় পেয়েও যখন ঈমান আনেনি, তখন তারা মুশরিকদের মতো হয়ে গেছে। –[কাবীর]

دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-এর অর্থ : دِيْن শব্দটির অনেকগুলো আভিধানিক অর্থ রয়েছে। যেমন– মহাবিচার দিন, রাজত্ব, ক্ষমতা, হুকুম, ধর্ম, প্রভাব-প্রতিপত্তি, চরিত্র, অভ্যাস, কৌশল। আয়াতে ধর্ম ও জীবন-বিধান অর্থে ব্যবহার হয়েছে। বহুবচনে أَدْيَانٌ আর قَيِّمَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত, সরল, সুশৃঙ্খল। আয়াতে সবগুলো অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মহানবী ﷺ আল্লাহর নিকট হতে যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন, তা সরল ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-বিধান। এতে বক্রতা ও জড়তার লেশমাত্র নেই। নেই কোনো বাতিল, মিথ্যা ও মনগড়া কথা এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত সরল–সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ জীবন-বিধান।

হযরত খলীল ইবনে আহমাদ (র.) বলেছেন قَائِمٌ، قَيِّمٌ، قَيِّمَةٌ তিনটি শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ এটি দীন তাদের, যারা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করে।

অথবা, এর অর্থ হলো كُتُبٌ قَيِّمَةٌ তথা এটি সে দীন, যা বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে কোনো প্রকার ভুলত্রুটি নেই।

আর কারো মতে এর অর্থ হলো, এটিই সত্য মিল্লাত, আর এটিই শরিয়তের সঠিক পথ। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٦. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَالٌ مُقَدَّرَةٌ اَيْ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اُولٰۤئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.

৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে আহলে কিতাবদের মধ্য হতে এবং মুশরিকগণ, জাহান্নামী হবে তথায় তারা চিরকাল থাকবে خَالِدِيْنَ শব্দটি এখানে حَال مُقَدَّرَه হয়েছে। অর্থাৎ তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামী হওয়া আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে এরাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا اُولٰۤئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ الْخَلِيْقَةِ.

৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকার্যে আত্মনিয়োগ করেছে, তারাই হলো উৎকৃষ্ট সৃষ্টি [শ্রেষ্ঠ] সৃষ্টি।

٨. جَزَاۤؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ اِقَامَةٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ بِطَاعَتِهٖ وَ رَضُوْا عَنْهُ ط بِثَوَابِهٖ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ خَافَ عِقَابَهٗ فَانْتَهٰى عَنْ مَعْصِيَتِهٖ تَعَالٰى.

৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রভুর নিকট জান্নাত-যা চিরস্থায়ী চিরকালীন আবাসস্থল প্রবহমান হবে যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ তথায় তারা চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট তাঁর আনুগত্য করার কারণে। আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট তাঁর প্রতিদান প্রদানের কারণে। এটা তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে আল্লাহর আজাবকে ভয় করত তাঁর নাফরমানি হতে বিরত থাকে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ الخ : اَلَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল, كَفَرُوْا তার সেলা, مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ বায়ান كَفَرُوْا-এর জন্য। এ পর্যন্ত ইসমে اِنَّ- فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ খবরে اِنَّ আর خٰلِدِيْنَ فِيْهَا উহ্য যুলহাল হতে حَال হয়েছে। অর্থাৎ مُقَدَّرًا خُلُوْدُهُمْ فِيْهَا مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى - اُولٰۤئِكَ মুবতাদা, هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ বাক্য হয়ে খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ .... الْبَرِيَّةِ : আহলে কিতাবগণের মধ্য হতে যারা কুফরি করেছে এবং যারা মুশরিক তারা চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে। তারা নিকৃষ্টতম জীব।

এখানে কুফর অর্থ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আল্লাহর শেষ নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করা। আল্লাহর সৃষ্টিতে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কোনো সৃষ্টি নেই। এমনকি জন্তু-জানোয়ার অপেক্ষাও তারা নিকৃষ্ট। কেননা বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হয়ে এ সত্য দীনকে অমান্য করেছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতসমূহে যে কাফেরদের কথা বলা হয়েছে, তারা দু' প্রকার–

১. আহলে কিতাব, তথা ইহুদি ও নাসারাদের মধ্যে যারা কাফের রয়েছে, কেননা তারা হযরত ওযায়ের (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে ধারণা করে।

২. মুশরিক, যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করে মূর্তিপূজা করে। কাফেরদের উভয় দলের জন্যই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। –[নূরুল কোরআন]

شَرُّ الْبَرِيَّةِ وَخَيْرُ الْبَرِيَّةِ-এর অর্থ : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফেরগণকে সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি নামে আখ্যায়িত করেছেন। এর তাৎপর্য হলো যে, মানুষ সৃষ্টিকুলের মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেকের দিক দিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত। কারণ অন্যান্য সৃষ্টিকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক দান করা হয়নি। আর তাদেরকে কর্মেও কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি; কিন্তু মানুষ এ সব অমূল্য রত্ন ও কর্মের স্বাধীনতা লাভ করেও তার সঠিক ব্যবহার করে না। আল্লাহর প্রদর্শিত পথে তার প্রয়োগ দেখায় না; বরং তার প্রদর্শিত পথের বিপরীত পথেই নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি পরিচালনা করেছে। সুতরাং এ মূল্যবান সম্পদের যথার্থ ব্যবহার না করার কারণেই তারা সৃষ্টিকুলের মধ্যে নিকৃষ্টতর সৃষ্টি প্রমাণিত হয়েছে। এটাই হলো شَرُّ الْبَرِيَّةِ-এর মর্ম।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকগণকে خَيْرُ الْبَرِيَّةِ বা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি নামে অভিহিত করেছেন। তারা আল্লাহর সৃষ্টিকুল এমনকি ফেরেশতাদের তুলনায়ও উত্তম মর্যাদার অধিকারী। কারণ অন্যান্য সৃষ্টিকে যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়নি, তেমনি ফেরেশতাগণকেও জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়নি। অথচ মানবকুলকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে। আর এর সদ্ব্যবহার করে যারা আল্লাহর প্রদর্শিত জীবনাদর্শে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে তারা অন্যান্য সৃষ্টি ছাড়া স্বয়ং ফেরেশতাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান ও উত্তম না হওয়ার কোনোই কারণ থাকতে পারে না। তাই মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যারা কুফরি ও শিরক করে, তারা আশরাফুল মাখলুকাত হয়েও সৃষ্টির নিকৃষ্টতর জীব। আর যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করে, তারা আশরাফুল মাখলুকাতের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং সৃষ্টির সেরা প্রাণীরূপে পরিগণিত হয়েছে।

মুশরিকদের পূর্বে আহলে কিতাবকে উল্লেখের কারণ : এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের পূর্বে আহলে কিতাবের উল্লেখ করেছেন। এর কারণ এই যে, আহলে কিতাবের অপরাধ মুশরিকদের হতেও জঘন্য ছিল। কেননা মুশরিকদের নিকট তো কোনো আসমানি কিতাব ছিল না। তারা নবী করীম ﷺ -কে চিনত না। দীন কি তা বুঝত না। এজন্য তথায় নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা করেছে। পক্ষান্তরে আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা জেনেশুনে নিছক বিদ্বেষবশত নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা করেছে। –[কাবীর]

كَفَرُوْا-কে ক্রিয়াপদে এবং اَلْمُشْرِكِيْنَ-কে ইসমে ফায়েল-এর শব্দে কেন উল্লেখ করা হয়েছে? : كَفَرُوْا শব্দটি এখানে اَهْلِ كِتَابٌ সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেহেতু তাদের কুফরি সাময়িক ছিল, স্থায়ী ছিল না, সেহেতু كَفَرُوْا-কে ক্রিয়াপদ নেওয়া হয়েছে, যা অস্থায়ীত্বকে প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, মুশরিকরা শিরকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার উপর স্থায়ী রয়েছে, সেহেতু তাদের ব্যাপারে اِسْم فَاعِلْ-এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা স্থায়ীত্বকে বুঝিয়ে থাকে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হতে বুঝা যায় যে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের আজাব সমান হবে। অথচ মুশরিকরা অতি পাপী : আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الخ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের আজাব সমান হবে। অথচ আহলে কিতাব অপেক্ষা মুশরিকদের পাপ জঘন্য। মুফাসসিরগণ এর জবাবে বলেছেন যে, অত্র আয়াত হতে এটা বুঝা যায় যে, আহলে কিতাবের কাফের ও মুশরিকদের জন্য পরকালে চিরকালীন জাহান্নাম হবে। কিন্তু জাহান্নামে যে তাদের উভয়ের আজাব সমান হবে তা তো বলা হয়নি।

জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকারের আজাব রয়েছে। সুতরাং হয়তো আহলে কিতাবকে লঘু আজাব দেওয়া হবে।

অথবা, এর জবাব এই যে, কাফের হওয়ার কারণে তাদের নেক আমলের কোনো মূল্যই আল্লাহর কাছে নেই। কাজেই মুশরিক ও কাফের সকলেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সমান দোষী।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

উভয় দলকে সমান শাস্তি প্রদানের কারণ : মুশরিকগণ একত্ববাদ, নবুয়াত এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করে। আর আহলে কিতাব এ সব কিছুকে স্বীকার করে। নবুয়তের ব্যাপারে শুধু মুহাম্মদ ﷺ -কে মানে না। এ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুশরিকদের চেয়ে আহলে কিতাবদের অবাধ্যতা কম। এতদসত্ত্বেও উভয়ের শাস্তি সমান হবে বলে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এর জবাবে বলা যায় যে, উভয় দলের শাস্তি হবে– তা উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায়, কিন্তু উভয়ের শাস্তি সমান হবে– বুঝা যায় না। শাস্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন, বিভিন্ন দোষের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি রয়েছে। জেনার শাস্তি 'রজম', চুরির শাস্তি 'হাত কাটা', হত্যার শাস্তি কেসাস ইত্যাদি। অতএব, কাফির-মুশরিকদের অবাধ্যতা যেমন প্রকট, শাস্তিও হবে প্রকট। –[কাবীর]

ধমক এবং পুরস্কার প্রদানের মধ্যে সৌন্দর্য : প্রথমে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে ধমক প্রদান করেছেন। তারপর إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا হতে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। এতে সুন্দর এক ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য রয়েছে। যেমন, ধমক হলো ঔষধ সমতুল্য আর অঙ্গীকার হলো খাদ্য সমতুল্য। প্রথমে ঔষধ প্রয়োগ করে শরীরকে সুস্থ করতে হয়, তারপর খাদ্য দিলে শরীরের লাভ হয়। ঔষধ ছাড়া খাদ্য দিলে ক্ষতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ধমক দিয়ে ঔষধের কাজ করেছেন।

অথবা, চর্ম সংস্কারের পর-ই তা দ্বারা বিভিন্ন বস্তু তৈরি করা সম্ভবপর হয়। সংস্কার ছাড়া কোনো বস্তু তৈরি করতে চাইলে সে চর্ম ক্ষতি ছাড়া কোনো কিছু বহন করে আনবে না। তেমনিভাবে আল্লাহ মানুষকে ধমকের মাধ্যমে সংস্কার করে পুরস্কার ঘোষণা করতে চাচ্ছেন। –[কাবীর]

'জান্নাতে আদন'-এর অর্থ : عَدْنٍ শব্দটি স্থায়িত্ব বুঝায়। যেমন বলা হয়েছে– وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ এবং لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا -বর্ণিত আছে যে, جَنَّاتُ عَدْنٍ দ্বারা وَسَطُ الْجَنَّةِ তথা বেহেশতের মধ্যভাগকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে عدن শব্দটি مَعْدِنٌ তথা খনি হতে গৃহীত اَلْجَنَّةُ مَعْدِنُ النَّعِيْمِ وَالْاَمْنِ وَالسَّلَامَةِ অর্থাৎ বেহেশত নিয়ামত, নিরাপত্তা এবং শান্তির খনি। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

'জান্নাত' নামকরণ : جَنَّةٌ শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি মত দেখা যায়। সেগুলো আলোচনা করলে জান্নাতের নামকরণ সুস্পষ্ট হয়ে যায়–

১. اَلْجِنُّ হতে উৎপত্তি। জিন জাতি যেমনিভাবে এক মুহূর্তে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করে থাকে, বেহেশতবাসীরাও তাদের প্রাপ্য জান্নাতের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

২. অথবা, جُنُوْنٌ থেকে উদ্ভূত, কেননা জান্নাতবাসীরা জান্নাতকে দেখার সাথে সাথে পাগলের মতো হয়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা পাগল হবে না।

৩. অথবা جَنَّةٌ [বাগান] থেকে উদ্ভূত, কেননা জান্নাত এমন গাছপালাযুক্ত আবাসস্থল হবে যেখানে কোনো রকম গরম এবং রৌদ্র পড়বে না।

৪. অথবা, جَنِيْنٌ থেকে উদ্ভূত, কেননা ব্যক্তি জান্নাতে চূড়ান্ত নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। তাকে না কোনো গরম স্পর্শ করবে, না কোনো ঠাণ্ডা। সে جَنِيْنٌ তথা মায়ের পেটের সন্তানের মতো নিরাপদে থাকে। لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا –[কাবীর]

رَضِيَ الرَّبُّ না বলে رَضِيَ اللّٰهُ **বলার কারণ :** আল্লাহ তা'আলার সকল গুণবাচক বিশেষ্য রেখে তাঁর মূল নাম اَللّٰهُ -কে উল্লেখ করার মধ্যে হিকমত হলো– اَللّٰهُ নামটি মানুষের মনে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করে তেমন তাঁর প্রতি সম্মানও সৃষ্টি করে কেননা এ নামটিই আল্লাহর 'যাত' তথা সত্তা এবং সকল গুণবাচক বিশেষ্যকে শামিল করে। যদি رَضِيَ الرَّبُّ বলা হতো, তাহলে বান্দার মধ্যে এতটুকু ভীতি এবং সম্মান সৃষ্টি হয় না, যা সৃষ্টি হয় رَضِيَ اللّٰهُ বললে। কেননা مُرَبِّيْ এমন একজন ব্যক্তি যে কম পেয়েও যথেষ্ট মনে করে; কিন্তু আল্লাহর সামান্য সম্মান যথেষ্ট নয়। সম্মান বলতে যা বুঝায় পূর্ণটাই তাঁর জন্য। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ : সূরা আয-যিলযাল

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতের زُلْزِلَتْ শব্দ হতে এর নামকরণ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ– প্রকম্পিত। এ সূরাতে কিয়ামত হওয়ার সময় সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৫টি বাক্য এবং ১০০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা নাজিলের স্থান ও সময়কাল নিয়ে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। ইবনে মাসউদ, আতা, জারীর ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখের মতে এটা মাক্কী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও এরূপ একটি শক্তিশালী অভিমত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা; কিন্তু এর বাচন-ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে কিয়ামত ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম তিনটি বাক্যে বলা হয়েছে– মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বারের জীবন কিভাবে হবে এবং কিভাবে মানুষের জন্য বিস্ময়ের উদ্রেককারী হবে? পরে দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে এই যে, জমিনের উপর থেকে নিশ্চিন্তভাবে সকল প্রকার কাজ করেছে এবং এ নিষ্প্রাণ-নির্জীব জিনিস কোনো এক সময় তার কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তা তার চিন্তায়ও কখনো আসেনি। অথচ তা-ই এক দিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলে উঠবে এবং কোন সময় কোথায় কি কাজ করে তাও বলে দিবে। সেদিন সকল মানুষ উত্থিত হবে এবং তাদের আমলের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ হবে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মা'আরেফুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ زُلْزِلَتْ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা যুলযিলাত মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

تِسْعُ اٰيٰتٍ : ৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ حُرِّكَتْ لِقِيَامِ السَّاعَةِ زِلْزَالَهَا تَحْرِيْكَهَا الشَّدِيْدَ الْمُنَاسِبَ لِعِظَمِهَا ـ

১. যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে কেঁপে উঠবে কিয়ামত সংঘটনের জন্য স্বীয় প্রকম্পনে প্রবলভাবে তার বিশালত্বের উপযোগী প্রকম্পন।

٢. وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا كُنُوْزَهَا وَمَوْتَاهَا فَاَلْقَتْهَا عَلٰى ظَهْرِهَا ـ

২. আর পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে তন্মধ্যস্থিত খনিজ পদার্থ ও মৃতদেহসমূহকে বের করে উপরিভাগে ছুঁড়ে দিবে।

٣. وَقَالَ الْاِنْسَانُ الْكَافِرُ بِالْبَعْثِ مَا لَهَا اِنْكَارًا لِتِلْكَ الْحَالَةِ ـ

৩. আর মানুষ বলবে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী কাফের এর কি হলো? সে অবস্থার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে।

٤. يَوْمَئِذٍ بَدَلٌ مِنْ اِذَا وَجَوَابُهَا تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا تُخْبِرُ بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ ـ

৪. সেদিন এটা اِذَا হতে بَدَلٌ আর তার জওয়াব হলো, পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে তার পৃষ্ঠে কৃত যাবতীয় ভালো-মন্দ কাজের বিবরণ দিবে।

٥. بِاَنَّ بِسَبَبِ اَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا اَىْ اَمَرَهَا بِذٰلِكَ وَفِى الْحَدِيْثِ تَشْهَدُ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ بِكُلِّ مَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا ـ

৫. কারণ এ জন্য যে, তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন। তাকে এ প্রশ্নে আদেশ দান করবেন। হাদীস শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সেদিন পৃথিবীর প্রত্যেক নর-নারী তার পৃষ্ঠে যা কিছু করেছে, সব কিছুরই সাক্ষ্য দান করবে।

٦. يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ مِنْ مَوْقِفِ الْحِسَابِ اَشْتَاتًا لَا مُتَفَرِّقِيْنَ فَاَخَذَ ذَاتُ الْيَمِيْنِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاَخَذَ ذَاتُ الشِّمَالِ اِلَى النَّارِ لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ اَىْ جَزَائَهَا مِنَ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ ـ

৬. সেদিন মানুষ বের হবে হিসাবের স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন দলে বিভক্তভাবে, সুতরাং ডানপন্থিগণ বেহেশতের দিকে অগ্রসর হবে, আর বামপন্থিগণ জাহান্নামের পথ ধরবে। কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে অর্থাৎ তার প্রতিফল বেহেশত বা জাহান্নাম।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ زِنَةَ نَمْلَةٍ صَغِيْرَةٍ خَيْرًا يَّرَهُ يَرَ ثَوَابَهُ ـ

৭. কেউ অণু পরিমাণ পুণ্য কর্ম করলে ক্ষুদ্র পিপড়ার সমান সে তা প্রত্যক্ষ করবে তার অধিকারী হবে।

٨. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ جَزَاءَهُ ـ

৮. আর কেউ অণু পরিমাণ পাপ করলে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে তার প্রতিফল ভোগ করবে।

তাহকীক ও তারকীব

يَوْمَئِذٍ ও إِذَا -এর মহল্লে ই'রাব : সূরার প্রথমে إِذَا এবং চতুর্থ আয়াতে يَوْمَئِذٍ -এর মহল্লে ই'রাব হলো মানসূব। কেননা, يَوْمَئِذٍ শব্দটি إِذَا হতে بَدَلٌ হয়েছে এবং إِذَا শব্দটি تُحَدِّثُ ক্রিয়ার মাফউলে ফীহ অর্থাৎ যরফ হয়েছে। অথবা زُلْزِلَتْ -এর মাফউলে ফীহ। –[কুরতুবী]

قَوْلُهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا : إِذَا শর্তিয়া, زُلْزِلَتْ ফে'য়েলে মাজহুল, اَلْأَرْضُ মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়িলুহু, زِلْزَالَ মাফউলে মুতলাক, هَا যমীর اَرْضُ -এর দিকে ধাবিত। وَاَخْرَجَتِ الخ জুমলায়ে মা'তূফা زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ -এর উপর। وَقَالَ الخ মা'তূফ হয়েছে زُلْزِلَتْ -এর উপর।

قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا : قَالَ ফে'ল, اِنْسَانُ ফা'য়েল, مَا ইস্তিফহামিয়া মুবতাদা, لَهَا খবর, আর জুমলায়ে ইস্তিফহামিয়া قَالَ -এর মাফউল। উল্লিখিত সকল বাক্যগুলো শর্তের অন্তর্ভুক্ত। এর জওয়াব يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ الخ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় নেক্কার ও বদকার লোকদের কর্মের বিবরণ স্থান পেয়েছে, আর এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, সৌভাগ্য তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে জীবন যাপন করে। আর এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কবে হবে? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে কে ভাগ্যবান আর কে হতভাগ্য। সেদিন সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে। সেদিন প্রত্যেকে তার আমল দেখতে পাবে। –[নূরুল কোরআন]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الخ -এর শানে নুযূল : হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াতদ্বয় দুই দল মুসলমানকে উপলক্ষ্য করে নাজিল হয়েছে। আয়াত يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ নাজিল হওয়ার পর একদল মুসলমানের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, অল্প-স্বল্প দান করা হলে তার পুরস্কার পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে অপর একদল মুসলমান মনে করতে লাগল যে, ছোট ছোট গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনোরূপ শাস্তি প্রদান করবেন না। কেবল কবীরা গুনাহকারীদেরকেই শাস্তি দেওয়া হবে। তখন তাদের ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য এ আয়াত দু'টি নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا : زَلْزَلَةٌ -এর অর্থ হলো– পর পর প্রবলভাবে নাড়া দেওয়া, প্রকম্পিত করা। সুতরাং زُلْزِلَتْ -এর অর্থ হবে– 'পৃথিবীকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে দেওয়া হইবে।' এখানে গোটা পৃথিবীকে আন্দোলিত করার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর উক্ত কম্পনের তীব্রতা প্রকাশ করার জন্য زِلْزَالَهَا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, পৃথিবীর ন্যায় এক বিরাট গোলককে যেমনভাবে কাঁপাতে হয় ঠিক সেভাবে তাকে প্রকম্পিত করা হবে। কতিপয় তাফসীরকারের মতে কিয়ামতের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হলে যে 'কম্পন' হবে এটা সে 'কম্পন'। তবে মুফাসসিরদের একটি বড় দলের মতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হলে যে কম্পন হবে, এটা সে কম্পন। অর্থাৎ এটা পুনরুত্থানের পরের ঘটনা। এ দ্বিতীয় মতটি অধিকতর সহীহ। কেননা, পরবর্তী সব কথাই এ পর্যায়কে বুঝায়।

এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমার বংশধরদের মধ্য হতে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

দোজখের অংশ প্রেরণ কর। তখন হযরত আদম (আ.) আরজ করবেন, দোজখের অংশ কি? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন, শুধু একজন অবশিষ্ট থাকবে, এ কথা শ্রবণ করে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, অন্তঃসত্ত্বার গর্ভপাত হয়ে যাবে। মানুষকে দেখা যাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাঁপছে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং আল্লাহর আজাবই হবে অত্যন্ত কঠিন। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا : আয়াত وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا [আর জমিন তার বোঝাসমূহ বের করে দিবে।] এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

১. মৃত মানুষ মাটির মধ্যে যেরূপে ও যে অবস্থায় পড়ে থাকুক না কেন, পৃথিবী তা সবই বের করে দিবে।

২. কেবল মৃত মানুষকে বাইরে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হবে না; তাদের পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত কাজকর্ম, কথাবার্তা ও গতিবিধির সাক্ষ্যের যে স্তূপ মাটির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে সে সবকেও তা বাইরে নিক্ষেপ করবে।

৩. স্বর্ণ, রৌপ্য, হিরা, জহরত ও মাটির বুকে গচ্ছিত অন্যান্য সমস্ত সম্পদ স্তূপে স্তূপে বাইরে বের করে দিবে। সেদিন মানুষ আফসোস করে বলবে যে, এ সব বস্তুর জন্য আমরা দুনিয়ার জীবনে কত-না কিছু করেছি। অথচ আজ তা আমাদের কোনো কাজেই আসছে না।

تُحَدِّثُ -এর দু'মাফউল : تُحَدِّثُ ক্রিয়ার প্রথম মাফউল উহ্য রয়েছে। তা হলো اَلْخَلْقَ আর দ্বিতীয় মাফউল হলো اَخْبَارَهَا মূলবাক্য এভাবে হবে– تُحَدِّثُ الْخَلْقَ اَخْبَارَهَا

জমিনের সংবাদ বর্ণনার অর্থ : জমিনের সংবাদ বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, মানুষ এ ভূ-পৃষ্ঠের উপর যা কিছু বলেছে ও করেছে, তা ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ইথার আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের নিকট এ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অজানাই ছিল। মানুষ এ দুনিয়াতে যা কিছু করে ও বলে, তা সবই অণু-পরমাণু ও বাতাসের ইথারের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে বেড়াচ্ছে। বর্তমান যুগের রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডের দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ কর্তৃক মানুষের কথা ও কার্যাবলি ভূমির মুখে বর্ণনা দেওয়া কোনো কষ্টকর ব্যাপার নয়। আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই টেপরেকর্ডের ন্যায় ব্যক্তির আমলের বিবরণ মানুষ ভূমির মুখে শুনতে পাবে। এমনকি, মানুষ যদি অতিশয় গোপন স্থানে গিয়ে কোনো কাজ করে, সে স্থানেরও ছবি তুলে রাখা আল্লাহর পক্ষে কষ্টকর নয়। বর্তমান যুগের শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মির তুলনায় অনেক শক্তিশালী রঞ্জনরশ্মি আল্লাহর নিকট বর্তমান। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিটি কাজের ছবি আল্লাহ তা'আলা তুলে রাখছেন, যেন আদালতের বিচারের সময় ছবি ও ভূমির টেপরেকর্ড দ্বারা আসামীর সম্মুখে তার আমল তুলে ধরা যায়। শুধু এটাই নয়, কিয়ামতের দিন স্বয়ং মানুষের হাত-পা যে তার আমলের সাক্ষ্য দিবে, তার বর্ণনাও সূরা ইয়াসীনসহ অনেক স্থানেই বিদ্যমান। অতএব, ভূমির মুখে মানুষের আমলের সংবাদ বর্ণনা হওয়া যে অদ্ভুত কোনো কথা নয়, তা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম ﷺ এ আয়াত يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا পাঠ করে বললেন– তোমরা কি জান, তার সংবাদ কি? সাহাবীগণ বললেন– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– সেদিন প্রত্যেক বান্দা ভূ-পৃষ্ঠের উপর থেকে যা কিছু বলেছে ও করেছে তা ভূমি নিজ মুখে বর্ণনা করবে যে, সে অমুক অমুক কাজ করেছে।

-[তিরমিযী, নাসায়ী, মুসনাদে আহমদ]

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে মানুষ বলে প্রত্যেকটি মানুষকেই বুঝানো হতে পারে। কেননা পুনরুজ্জীবিত হয়ে চেতনা লাভ করতেই প্রত্যেকটি মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে, এ সব কি হচ্ছে? তবে পরে জানতে পারবে যে, এটা হাশরের মাঠ, যাকে অসম্ভব মনে করত, তা-ই তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার কারণে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে। অবশ্য মু'মিনদের এমন অবস্থা হবে না। কেননা যা-ই ঘটতে যাবে, তা-ই তাদের বিশ্বাসের অনুকূলে হবে।

কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এখানে اَلْاِنْسَانُ দ্বারা কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তারা বিশ্বাস করত না যে, তাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে। এ জন্য তারা কবর থেকে উঠে এ কথা বলবে। আর মু'মিনগণ বলবে, এটি সে অবস্থা যার অঙ্গীকার করেছিলেন আল্লাহ, আর নবী-রাসূলগণ এর সত্যতার সংবাদ দিয়েছিলেন। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا : সেদিন জমিন মানুষের কার্যকলাপের বিবরণ পেশ করবে। এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে এর আদেশ প্রদান করবেন।

অথবা, এর ব্যাখ্যা হলো, মানুষ যখন প্রশ্ন করবে জমিনের কি হলো সে সব গোপন কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে? তারই জবাবে জমিন বলবে– আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন, তাই আমি এ কাজ করছি। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ "يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا" : -এর অর্থ : এ উক্তির দু'টি অর্থ হতে পারে–

১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী উপস্থিত হবে। যেমন, সূরা আনআমে বলা হয়েছে– 'এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে সম্পূর্ণ একাকী আমার সামনে উপস্থিত হয়েছ, যেমন আমি তোমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছি।'

২. যারা হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুবরণ করেছে, পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকা হতে তারা দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন, সূরায়ে নাবা-এ বলা হয়েছে– যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তোমরা দলে দলে উপস্থিত হবে।

এ ছাড়া আরও কয়েকটি অর্থ দেখা যায়। যেমন–

৩. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ হাশরের ময়দানে সুন্দর কাপড় পরে উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে উঠবে। তখন আওয়াজ আসতে থাকবে যে, এরা আল্লাহর ওলী। আরেকদল কালো-মলিন চেহারায় উলঙ্গ শরীর নিয়ে গলদেশে শিকল পরে উঠবে। তখন আওয়াজদাতা আওয়াজ দিবে যে, এরা আল্লাহর শত্রুদল।

৪. প্রত্যেক দল স্বজাতীয়দের সাথে উঠবে। যেমন - ইহুদি ইহুদিদের সাথে, খ্রিস্টান খ্রিস্টানদের সাথে। –[কাবীর]

لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ -এর অর্থ : উল্লিখিত ৬ নং আয়াতে হাশরের দিন মানুষকে তাদের কৃতকর্ম অবলোকনের কথা বলা হয়েছে। এর দু'টি তাৎপর্য হতে পারে। একটি এই যে, প্রত্যেক মানুষকে তাদের আমল দেখানো হবে এবং বলে দেওয়া হবে। এর দ্বারা আমলনামা প্রদানের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন, সূরা হাক্কাহ-এর ১৯ নং ও ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কাফের-মু'মিন সকলের হাতেই তাদের আমলনামা দেওয়া হবে। সূরা ইনশিক্বাক্বে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণকে ডান হস্তে আমলনামা দেওয়া হবে এবং কাফেরগণকে পিছন দিক হতে আমলনামা দেওয়া হবে। –[আয়াত ৭ – ২০]

দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, হাশরের দিন তাদেরকে নিজ নিজ আমলের প্রতিদান অবলোকন করানো হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

فَمَنْ يَعْمَلْ .... شَرًّا يَّرَهُ -এর মর্মার্থ : এ আয়াতের মর্মার্থ হিসাবে মুফাসসিরগণ নিম্নরূপ মত পেশ করেন–

১. আহমদ ইবনে কা'ব বলেন– فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَهُوَ كَافِرٌ فَاِنَّهُ يَرٰى ثَوَابَ ذٰلِكَ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى يَلْقَى الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ কোনো কাফের ব্যক্তি সামান্য ভালো কাজ করলে তার ছওয়াব মৃত্যু পর্যন্ত পেতে থাকবে। আখেরাতে কিছুই পাবে না। এ অর্থটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মু'মিন হোক আর কাফের হোক খারাপ করুক আর ভালো করুক, সবকিছু আল্লাহ তাদেরকে দেখাবেন। অতঃপর আল্লাহ মু'মিনের গুনাহ মাফ করে দিবেন, আর ভালো কাজের ছওয়াব দিবেন। আর কাফেরদের ছওয়াব ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং পাপের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. যদিও কাফেরদের ভালো কাজ কুফর কর্তৃক মিটিয়ে দেওয়া হবে; কিন্তু তুলনা করার জন্য পেশ করা হবে। এমনিভাবে মু'মিনদের পাপও পেশ করা হবে। যেন বুঝতে পারা যায় যে, আল্লাহ কতটুকু গুনাহের কারণে কাফেরকে পাকড়াও করেছেন এবং কতটুকু পাপ কাজ মু'মিনদের থেকে মিটিয়ে দিয়েছেন। –[কাবীর]

বস্তুত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, মহান আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ছোট পাপেরও শাস্তি প্রদান করতে পারেন। আর তাঁর মর্জি হলে বড় বড় পাপও ক্ষমা করে দিতে পারেন। এটা সম্পূর্ণই তাঁর ব্যাপার। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ : সূরা আল-'আদিয়াত

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম اَلْعٰدِيٰتُ [আল-'আদিয়াত] শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ৩৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা মক্কী কি মাদানী, এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

ক. হযরত ইবনে মাসউদ, জারীর, হাসান বসরী, ইকরামা ও আতা (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর এক মত অনুযায়ী এটা মাক্কী সূরা।

খ. হযরত আনাস (রা.), কাতাদাহ (র.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্য মত অনুযায়ী এটা মাদানী সূরা। তবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে এটা মাক্কী সূরা হওয়াই প্রতীয়মান হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে পরকাল অবিশ্বাসের পরিণাম যে কত ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে পারে এবং মহা-বিচারের দিন মানুষের আমল সহ মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হবে, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে।

এ আলোচনায় তদানীন্তন মরু আরবের মানুষের জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার এবং মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেকালে মানুষ সামাজিক জীবনে যে চরম দুর্ভোগ পোহাত, এক গোত্র অপর গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে চড়াও হয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ এবং তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে দাসী বানাত– এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তখন মানব জীবনের কোনোই নিরাপত্তা ছিল না। পারস্পরিক হানাহানি, লাঠালাঠি, লড়াই, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কার্যাবলি, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও অবিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি– তাই প্রকারান্তরে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একটি দৃশ্যের পটভূমিকায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ঘটিয়ে তাঁর না-শোকরী করছে। ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তির লোভে অন্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের জেনে রাখা উচিত ছিল যে, কবর হতে তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে। আর তাদের যাবতীয় কাজ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে। শুধু কার্যগুলোর রেকর্ডই উপস্থিত করা হবে না; বরং কার্যের কারণ ও মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়ামতসমূহের বাস্তব রেকর্ড উপস্থিত করে তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পরই তাদের জন্য রায় ঘোষণা করা হবে। কারো প্রতি বিচারের বেলায় পক্ষপাতিত্ব ও জুলুমের আশ্রয় নেওয়া হবে না। সকলের প্রতিই ন্যায় ও ইনসাফের নীতি কার্যকর থাকবে। সুতরাং মানুষের উচিত পরকালের মহাবিচার দিনের ভয়াবহতার কথাটি নিজেদের হৃদয়ে জাগ্রত রাখা এবং সে বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। অন্যথায় তাদের জীবনে কালো অমানিশা আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-আদিয়াত মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

اِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالْعٰدِيٰتِ اَلْخَيْلُ تَعْدُوْ فِى الْغَزْوِ وَتَضْبَحُ ضَبْحًا هُوَ صَوْتُ اَجْوَافِهَا اِذَا عَدَتْ ـ

১. শপথ ধাবমান অশ্বরাজির ঘোড়াসমূহ, যারা রণাঙ্গনে ছুটে চলে যখন সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে দৌড়ানোর সময় অশ্ব হতে যে হাঁপানোর শব্দ শুনা যায়, তাকে ضَبْح বলা হয়।

٢. فَالْمُوْرِيٰتِ اَلْخَيْلِ تُوْرِى النَّارَ قَدْحًا بِحَوَافِرِهَا اِذَا سَارَتْ فِى الْاَرْضِ ذَاتِ الْحِجَارَةِ بِاللَّيْلِ ـ

২. অনন্তর যারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। ঘোড়া যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে ক্ষুরাঘাত দ্বারা রাত্রিকালে প্রস্তরযুক্ত জমিনের উপর চলার সময় তার পায়ের খুরের আঘাতে আগুন ছুটে।

٣. فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا اَلْخَيْلُ تُغِيْرُ عَلَى الْعَدُوِّ وَقْتَ الصُّبْحِ بِاِغَارَةِ اَصْحَابِهَا ـ

৩. অতঃপর যারা অভিযানে বের হয়, প্রভাত কালে অশ্বারোহীগণসহ প্রত্যুষে ঘোড়া শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

٤. فَاَثَرْنَ هَيَّجْنَ بِهٖ بِمَكَانِ عَدْوِهِنَّ اَوْ بِذٰلِكَ الْوَقْتِ نَقْعًا غُبَارًا بِشِدَّةِ حَرَكَتِهِنَّ ـ

৪. তখন উৎক্ষিপ্ত হয় উড়ায় তা দ্বারা তাদের দৌড়ানোর স্থানে বা দৌড়ানোর সময় ধূলিকণা ঘোড়ার ক্ষীপ্রগতিতে ছুটার কারণে ধূলিকণা উড়ে।

٥. فَوَسَطْنَ بِهٖ بِالنَّقْعِ جَمْعًا مِنَ الْعَدُوِّ اَىْ صِرْنَ وَسْطَهٗ وَعَطَفَ الْفِعْلَ عَلَى الْاِسْمِ لِاَنَّهٗ فِىْ تَاْوِيْلِ الْفِعْلِ اَىْ وَاللَّاتِىْ عَدَوْنَ فَاَوْرَيْنَ فَاَغَرْنَ ـ

৫. অতঃপর তা সহ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে ধূলিকণা উড়িয়ে শত্রুদলের শত্রুবাহিনীর অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এখানে فِعْل-কে اِسْم-এর উপর عَطْف করা হয়েছে। কেননা, সে اِسْم টি فِعْل-এর تَاْوِيْل হয়েছে। অর্থাৎ وَاللَّاتِىْ عَدَوْنَ فَاَوْرَيْنَ فَاَغَرْنَ শপথ সে সকল অশ্বের যারা ক্ষীপ্রবেগে ছুটে চলে, অতঃপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে এবং অনন্তর শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করে।

٦. اِنَّ الْاِنْسَانَ اَىِ الْكَافِرَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ لَكَفُوْرٌ يَجْحَدُ نِعْمَتَهٗ تَعَالٰى ـ

৬. অবশ্যই মানুষ অর্থাৎ কাফের তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ অবাধ্যাচারী, সে আল্লাহর অনুগ্রহরাজিকে অস্বীকার করে।

٧. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ اَىْ كَنُوْدِهٖ لَشَهِيْدٌ يَشْهَدُ عَلٰى نَفْسِهٖ بِصُنْعِهٖ ـ

৭. এবং সে অবশ্যই তদুপর অর্থাৎ তার অকৃতজ্ঞতার উপর অবহিত স্বীয় কাজের দ্বারা সে নিজের উপর নিজেই সাক্ষী।

٨. وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ اَيِ الْمَالِ لَشَدِيْدٌ اَيْ لَشَدِيْدُ الْحُبِّ لَهٗ فَيَبْخَلُ بِهٖ .

৮. এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে সম্পদের অতিশয় প্রবল অর্থাৎ সম্পদের প্রতি তার অত্যাসক্তির কারণে সে কার্পণ্য করে।

٩. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ اُثِيْرَ وَاُخْرِجَ مَا فِي الْقُبُوْرِ مِنَ الْمَوْتٰى اَيْ بُعِثُوْا .

৯. তবে কি সে জানে না যে, যখন উত্থিত হবে উপড়িয়ে বের করা হবে যা কিছু কবরসমূহে রয়েছে অর্থাৎ মৃতগণ, তাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থান করা হবে।

١٠. وَحُصِّلَ بُيِّنَ وَاُفْرِزَ مَا فِي الصُّدُوْرِ الْقُلُوْبِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ .

১০. আর প্রকাশ করা হবে ব্যক্ত ও প্রকাশিত করা হবে যা কিছু অন্তরে রয়েছে অর্থাৎ অন্তরে কুফর ও ঈমান যা আছে।

١١. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ لَعَالِمٌ فَيُجَازِيْهِمْ عَلٰى كُفْرِهِمْ اُعِيْدَ الضَّمِيْرُ جَمْعًا نَظْرًا لِمَعْنَى الْاِنْسَانِ وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ دَلَّتْ عَلٰى مَفْعُوْلِ يَعْلَمُ اَيْ اِنَّا نُجَازِيْهِ وَقْتَ مَا ذُكِرَ وَتَعَلَّقَ خَبِيْرٌ بِيَوْمَئِذٍ وَهُوَ تَعَالٰى خَبِيْرٌ دَائِمًا لِاَنَّهٗ يَوْمُ الْمُجَازَاةِ .

১১. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে সেদিন সবিশেষ অবহিত অবশ্যই জ্ঞাত এবং তাদের কুফরির জন্য তাদেরকে শাস্তি দান করবেন। اِنْسَانَ-এর প্রতি ضَمِيْر جَمْع বা বহুবচনীয় সর্বনাম অর্থের দিক বিচারে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর এ বাক্যটি يَعْلَمُ-এর مَفْعُوْل নির্দেশ করছে অর্থাৎ اِنَّا نُجَازِيْهِ وَقْتَ مَا ذُكِرَ উল্লিখিত সময়ে আমি তাদেরকে প্রতিফল দান করবো। আর خَبِيْرٌ-এর সম্পর্ক يَوْمَئِذٍ-এর সাথে, কেননা সেদিন প্রতিফল দানের দিন। যদিও আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই অবহিত।

তাহকীক ও তারকীব

ضَبْحًا-এর মহল্লে ই'রাব : বসরীদের নিকট ضَبْحًا শব্দটি 'হাল' হিসাবে মানসূব হয়েছে। কারো মতে, এটা মাসদার তবে 'হাল' হিসেবে মানসূব হয়েছে। আবূ উবায়দা বলেন, মূলবাক্য ছিল- ضَبَحَتِ الْخَيْلُ ضَبْحًا -[কুরতুবী]

قَوْلُهٗ "فَاَثَرْنَ" : فَاَثَرْنَ এটা جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ মাযীর সীগাহ اِثَارَةٌ মাসদার। অর্থ- ধূলি উড়ানো, জোশ মারা, উত্তেজিত হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। اَثَرْنَ মূলে اَثْوَرْنَ (আছওয়ারনা) ছিল। وَاوْ-এর হরকত উচ্চারণ কষ্ট বিধায় পূর্ববর্তী সাকিন হরফে দেওয়া হয়েছে। আর و-কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর দু'টি সাকিন একত্র হওয়ায় আলিফটি বিলুপ্ত করা হয়েছে اَثَرْنَ হয়েছে। জিনসে اَجْوَف وَاوِىْ এ বাক্য اَلْعٰدِيٰتِ-এর উপর আতফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ এ জীবনে ভালো-মন্দ যে কাজই করুক না কেন আর তা যত সামান্যই হোক, তার পরিণতি পরকালে অবশ্যই দেখতে পাবে। আর অত্র সূরায় ইরশাদ হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ। কেননা সে অর্থ-সম্পদের মোহে মত্ত। এ কারণেই সে তার প্রতিপালককে ভুলে তাঁকে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অমনোযোগী থাকে। অথচ তাকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে তার এ জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। -[নূরুল কোরআন]

সূরাটি নাজিলের কারণ : নবী করীম ﷺ বনূ কেনানা গোত্রের বিরুদ্ধে কতিপয় সাহাবীকে পাঠালেন। তাঁদের আমীর ছিলেন মুনযির ইবনে আমর আনসারী। তাঁরা প্রত্যাবর্তন করতে বিলম্ব করেছিলেন। এ সুযোগে মুনাফিকগণ বলতে লাগল- তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তখন সাহাবীদের নিরাপদ থাকার খবর দিয়ে আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন। -[কুরতুবী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"قَوْلُهُ "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا : اَلْعَادِيَاتِ শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে– ধাবমান, দ্রুত গমনকারী। আর ضَبْحًا শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁপানো ও হ্রেষাধ্বনি। সুতরাং শব্দ দু'টির সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে– ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁপিয়ে ধাবমানকারী জন্তু। তাফসীরকারদের মধ্যে এ জন্তু দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এবং তার নামে শপথ করার কারণ কি এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। একদল তাফসীরকার মনে করেন, তা দ্বারা হজের সময় মিনা ও মুযদালিফার ধাবমানকারী উষ্ট্রের কথা বুঝানো হয়েছে। অপর অভিমতে পাওয়া যায় যে, তা দ্বারা ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা জীব-জন্তুর মধ্যে হাঁপিয়ে ও হ্রেষাশ্বাসে দ্রুত চলার অভ্যাস রয়েছে ঘোড়া, কুকুর ও গাধার। আর অন্য কোনো জন্তু এরূপ করে না। এ ছাড়া পরবর্তী আয়াতসমূহের বিবরণ ও আলোচনা হতেও প্রমাণিত হয় যে, তা দ্বারা ঘোড়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে দু'টি কঙ্করের সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে এবং ঘোড়ায় চড়েই শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হয়।

২ ও ৩নং আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে ঘোড়ার কথাই বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ অভিমতই পোষণ করেন। –[কুরতুবী]

* হযরত আলী (রা.) বলেছেন– اَلْعٰدِيٰتِ শব্দ দ্বারা হাজীদের সে উটগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা আরাফাহ থেকে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত দৌড়ে থাকে, তবে ঘোড়ার মতোই অধিক গ্রহণীয়। –[নূরুল কোরআন]

اَلْعٰدِيٰتِ দ্বারা কসম করার কারণ : উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়ার চলমান দৃশ্য এবং তা ব্যবহারের উদ্দেশ্যটির কথা প্রকাশ করে তার নামেই শপথ করেছেন। সুতরাং এ অবস্থাটি কি ছিল এ বিষয়েও তাফসীরকারগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেন– আল্লাহ তা'আলা এটা দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঘোড়ার সহায়তায় অভিযান পরিচালনের কথা বলেছেন, কিন্তু এ ব্যাখ্যা– শপথের জবাবে ৬ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার সাথে খাপ খায় না; বরং আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানুষ আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ। তারা ধন-সম্পদে বড়োই কৃপণ। এখানে জিহাদের জন্য আত্মত্যাগ করতে গিয়ে এবং ধন-সম্পদ ব্যয় করে মু'মিন লোক কিভাবে অকৃতজ্ঞ ও কৃপণ হতে পারে, এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয়; কিন্তু আরেকদল তাফসীরকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা দ্বারা শপথের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় এবং কোনো প্রশ্নেরও সৃষ্টি হয় না। জাহিলিয়া যুগের মারামারি, কাটাকাটি, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের রমণীকে দাসী বানিয়ে রাখার এবং প্রতিশোধ গ্রহণের, পারস্পরিক ঝগড়া-কলহের কথার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কেননা আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল প্রভাত হওয়ার পূর্বে শত্রুর উপর আঘাত হানা, যাতে শত্রু প্রতিরক্ষার কোনো সুযোগ না পায়। এটা মানুষের জন্য শক্তির অপচয় ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার, অকৃতজ্ঞতারই শামিল। অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে লুণ্ঠন করা, তাদের রমণীগণকে দাসী বানিয়ে রাখা নিতান্তই ন্যক্কারজনক কাজ। শপথের জবাবে এ কথাগুলো বলা হয়েছে।

اَلْمُوْرِيٰتِ-এর অর্থ : اَلْمُوْرِيٰتِ শব্দটি اَلْاِيْرَاءُ মাসদার হতে নির্গত। অর্থ– অগ্নি নির্গত হওয়া। যেমন, দিয়াশলাই হতে অগ্নি বের করা হয়। শব্দ দ্বারা ঘোড়াগুলোর রাত্রিকালীন দৌড়ের কথা-ই বুঝানো হয়েছে। কেননা পাথরের সাথে ক্ষুরের তীব্র ঘর্ষণে নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কেবল রাত্রি বেলাই পরিদৃশ্যমান হয়ে থাকে– দিনের বেলায় তা দেখা যায় না।

اَلْقَدْحُ-এর অর্থ : قَدْحٌ শব্দের মূল অর্থ– বের করা। যেমন বলা হয়– قَدَحْتُ الْعَيْنَ অর্থাৎ আমি চক্ষু বের করেছি। অর্থাৎ চক্ষু থেকে যখন দূষিত পানি বের করা হয় তখন উক্ত বাক্য বলা হয়। আর قِدَاحٌ বলা হয় সে পাথরকে, যে পাথর আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে। –[কুরতুবী]

فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا-এর অর্থ : اَلْمُغِيْرَاتِ শব্দটি اَلْاِغَارَةُ হতে নির্গত। اَلْاِغَارَةُ অর্থ– আক্রমণ করা। আর صُبْحٌ অর্থ– সকালবেলা, ভোরবেলা। আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোনো জনবসতির উপর আক্রমণ চালাতে হলে তারা রাতের অন্ধকারে লক্ষ্য স্থলের দিকে রওয়ানা হয়ে যেত। যেন শত্রুপক্ষ কিছুমাত্র টের পেতে না পারে এবং সাত সকালে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। যেন সকাল বেলার আলোর মধ্যে সকল কিছু দেখা যায়। আর দিনও যেন এতটা উদ্ভাসিত হয়ে না উঠে যে, শত্রুপক্ষ দূর হতেই তাদেরকে আসতে দেখতে পারে এবং প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। –[কুরতুবী, কাবীর]

নবী করীম ﷺ যে অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন, তিনি লক্ষ্য করতেন যে, এ জনবসতিতে ফজরের আজান হয় কিনা? যদি আজানের শব্দ হতো তবে অভিযান পরিচালিত হতো না। যদি আজানের শব্দ না হতো, তবে ভোর হওয়ার পর অভিযান পরিচালনা করা হতো। –[নূরুল কোরআন]

بِهٖ-এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল : فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا আয়াতের মধ্যে بِهٖ-এর সর্বনাম ইমাম ফাররা -এর নিকট مَوْضِعُ الْاِغَارَةِ তথা আক্রমণের স্থানের দিকে ফিরেছে। কারো মতে وَقْتُ الْاِغَارَةِ তথা আক্রমণের সময়ের দিকে ফিরেছে। ইমাম কিসাঈ-র মতে عَدُوٌّ বা শত্রুর দিকে ফিরেছে। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَقْعًا -এর অর্থ : আবূ উবায়দার মতে نَقْعٌ শব্দের অর্থ رَفْعُ الصَّوْتِ বা উচ্চৈঃস্বর। অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে نَقْع অর্থ- ধূলি-বালি। তবে আয়াতের এ অর্থটিই বেশি নিকটতম।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন, نَقْع হলো মুযদালিফা এবং মিনা-র মধ্যবর্তী স্থান। কারো মতে গিরিপথ, কারো মতে نَقْع হলো জলাশয়। –[ফাতহুল কাদীর]

فَوَسَطْنَ بِهٖ -এর মধ্যকার ، -এর মারজি' : ইমাম মুকাতিল (র.) বলেন, ، -এর মারজি' হলো اَلْعَدْوُ কেননা পূর্বের وَالْعَادِيَاتِ -এর মধ্যে عَدْو শব্দটি রয়েছে। কারো মতে, এর মারজি' হলো اَلنَّقْعُ –[কাবীর]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ : অর্থাৎ মানুষ তার প্রভুর বড়ো অকৃতজ্ঞ। আর এ কথা বলার জন্যই ঘোড়ার শপথ করা হয়েছে। বস্তুত সূরায় প্রাথমিক পাঁচটি আয়াতে যে শপথ করা হয়েছে তা দ্বারা তদানীন্তন আরব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত মারামারি ও লুটতরাজের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রাক-ইসলাম-জাহেলিয়াতের কালে রাত একটা ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হতো। এ সময় প্রত্যেক গোষ্ঠী ও জনবসতির লোকেরাই শত্রুর আক্রমণের ভয়ে সদা কম্পমান হয়ে থাকত। তখনকার আরব সমাজে গোত্রে গোত্রে কেবল প্রতিশোধমূলক যুদ্ধই হতো না, ধন-সম্পদ লুট, চতুষ্পদ জন্তু তাড়িয়ে নেওয়া, ধৃত নারী ও শিশুদের দাস বানাবার উদ্দেশ্যও এক গোত্র অপর গোত্রের উপর অতর্কিত হামলা করে বসত। এ জুলুম-পীড়ন ও লুটতরাজ সাধারণত ঘোড়ায় চড়েই করা হতো।

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মানুষ তার প্রভুর বড়ো অকৃতজ্ঞ। মানুষ পারস্পরিক মারামারি ও যুদ্ধ-লুণ্ঠনের কাজে যে শক্তি ব্যয় করছে, তা এ কাজে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করেননি। কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত এ সব উপায়-উপকরণ, শক্তি-সামর্থ্য ও সাহস-কৌশল আল্লাহর প্রিয় এ দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টির কাজে ব্যয় করা বাস্তবিকই অতি বড় অকৃতজ্ঞতার কাজ। এটা অপেক্ষা বড় অকৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে?

كَنُوْد -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : كَنُوْد -এর আভিধানিক অর্থ হলো– অকৃতজ্ঞ, কৃপণ ইত্যাদি। এখানে كَنُوْد দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, كَنُوْد -দ্বারা কাফের ও আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকারকারীকে বুঝানো হয়েছে।

খ. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাপী।

গ. অথবা, বিপদে পড়ে নিরাশাজনিত কারণে যারা আল্লাহর নিয়ামত বিস্মৃত হয়ে যায়–তাদের কথা বলা হয়েছে।

ঘ. অথবা, এর দ্বারা স্বল্প কল্যাণের কথা বুঝানো হয়েছে।

ঙ. অথবা, এর দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি সম্পর্কে যথাযথ পাত্রে ব্যবহার না করে এর অপব্যয় করে থাকে–যা চরম অকৃতজ্ঞতার শামিল।

اَلْاِنْسَانَ দ্বারা এখানে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? : আয়াত اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ -এর মধ্যে اَلْاِنْسَانَ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে– এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটা দ্বারা কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটাই জমহুরের মত।

খ. অন্য একদল মুফাসসিরের মতে, এটা দ্বারা সকল পাপীকেই বুঝানো হয়েছে। –[কুরতুবী]

اِنَّهٗ -এর যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থল : اِنَّهٗ -এর মধ্যকার সর্বনামটি পিছনে উল্লিখিত اَلْاِنْسَانَ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। তখন মূলবাক্য হবে وَاِنَّ الْاِنْسَانَ عَلٰى كَنُوْدِهٖ لَشَهِيْدٌ অর্থাৎ মানুষ তার সে কৃপণতার উপর অথবা অকৃতজ্ঞতার উপর নিজেই সাক্ষী।

অথবা, সর্বনামটি পিছনে উল্লিখিত لِرَبِّهٖ -এর رَبّ -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা رَبّ শব্দটি নিকটবর্তী। আর নিকটবর্তী বস্তুর প্রতি সর্বনামের প্রত্যাবর্তন বেশি যুক্তিযুক্ত। এমতাবস্থায় এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে وَعِيْد ব ধমক উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ "তিনি রব-ই তাদের অকৃতজ্ঞতার উপর সাক্ষী।" –[কাবীর]

অথবা, এর অর্থ হলো, মানুষ যে অকৃতজ্ঞ অবাধ্য সে নিজেই নিজের সাক্ষী। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.eilm.weebly.com

اَلْخَيْرُ -এর অর্থ : আরবি ভাষায় اَلْخَيْرُ শব্দটির অর্থ খুব ব্যাপক। বিভিন্ন স্থানে তার বিভিন্ন মর্ম গ্রহণ করা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো– কল্যাণ ও মঙ্গল; কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে তা দ্বারা ধন-সম্পদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষ কল্যাণ ও মঙ্গলের মহব্বতে খুব কঠিন।' কঠিন ও কৃপণ হওয়া কেবল ধন-সম্পদের ক্ষেত্রেই হয়– কল্যাণ ও মঙ্গলের বেলায় কঠিন ও কৃপণ কথাটি খাটে না। যেমন, সূরা বাক্বারার ১৮০ নম্বর আয়াতে خَيْر শব্দটি ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর]

قَوْلُهُ "وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ" : মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতের কয়েকটি অর্থ করেছেন।

১. اِنَّهُ لِاَجْلِ حُبِّ الْمَالِ لَبَخِيْلٌ مُمْسِكٌ অর্থাৎ সে মানুষ ধন-সম্পদকে বেশি পছন্দ করার কারণে অত্যন্ত কৃপণ সঞ্চয়কারী।

২. অথবা, "সে মাল-ধন তালাশে খুব-ই শক্ত এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও ইবাদতে অত্যন্ত দুর্বল।"

৩. ইমাম ফাররা (র.) বলেন, "সে ধন-মালকে পছন্দ করে। এটাও পছন্দ করে যে, সব সময় যেন সে মালকে পছন্দনীয় বস্তুর মধ্যে শামিল রেখেতে পারে।" –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

সম্পদকে خَيْر বলার কারণ : ইবনে যায়েদ বলেন– আল্লাহ সম্পদকে خَيْر বা কল্যাণ বলেছেন। সে যুগ বেশি দূরে নয় যে, এ সম্পদ অকল্যাণ হয়ে দাঁড়াবে; কিন্তু মানবসমাজ তাকে সকল কল্যাণের আধার মনে করে, এ কারণে তিনিও তাকে কল্যাণ বলে নাম রেখেছেন। –[ফাতহুল কাদীর]

مَا فِى الْقُبُوْرِ -এর মধ্যে مَنْ না বলে مَا বলার কারণ : আল্লাহ তা'আলা اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ বলেছেন, "مَنْ فِى الْقُبُوْرِ" বলেননি– মুফাস্‌সিরগণ এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. সংখ্যাধিক্যের দিক বিচার করে "مَنْ" -এর পরিবর্তে "مَا" ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা সেদিন ভূগর্ভস্থ হতে যারা বের হবে তাদের মধ্যে মানুষ অপেক্ষা অন্যান্য জীব-জন্তু ও বস্তুর সংখ্যা অধিক হবে।

২. অথবা, পুনরুত্থানের সময় মানুষও জ্ঞানহীন ও মৃত অবস্থায় উত্থিত হবে। এ জন্য "مَنْ" -এর পরিবর্তে "مَا" ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ" : লোকদের অন্তরে যে ইচ্ছা ও মনোভাব, উদ্দেশ্য ও প্রবণতা, যেসব চিন্তাধারা ও কল্পনা এবং বাহ্যিক কাজের পিছনে যেসব গোপন কার্যকারণ ও অভিপ্রায় লুক্কায়িত আছে তা সবই বের করে ও প্রকাশ করে দেওয়া হবে। এর যাচাই ও পরখ করে ভালোগুলো ও মন্দগুলোকে ছেটে পৃথক করা হবে। মানুষের প্রতিটি বাহ্যিক কাজের পিছনে কোনো উদ্দেশ্য ও মনোভাবটি লুকিয়ে আছে তা কেবল আল্লাহই জানতে পারেন, আল্লাহই তার যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। তা ছাড়া এ কাজের দরুন কি ধরনের শাস্তি বা শুভ প্রতিফলের যোগ্য হতে পারে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতাও কেবল তাঁরই রয়েছে।

حُصِّلَ শব্দটি تَحْصِيْل হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হলো– কোনো জিনিসকে বের করে আনা। যেমন– উপরের ছাল খুলে ফেলে তার ভিতরের জিনিস বের করা। বিভিন্ন জিনিস যাচাই-বাছাই করে পরস্পরকে আলাদা-আলাদা করে বুঝাবার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কাজেই মনের গোপন অবস্থা, তত্ত্ব ও তথ্য বের করা এবং তার যাচাই করে আলাদা আলাদা করা এ উভয় অর্থই তাতে শামিল রয়েছে। সূরা আত্‌-ত্বারিক্বে এ কথাটি বলা হয়েছে, এভাবে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেদিন গোপন তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই করা হবে।

قُلُوْب না বলে صُدُوْر উল্লেখ করার কারণ : কেননা قَلْب হলো রূহ ধারণকারী। আর তা মজ্জাগতভাবেই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। সৃষ্টিগতভাবে তার খেদমত করতে প্রস্তুত; কিন্তু বিপদ হলো নফস নিয়ে। যার স্থান হলো صَدْر বা বক্ষ। এ নফস-ই কয়েক ভাগে বিভক্ত। আম্মারাহ, লাউয়ামাহ এবং মুত্‌মাইন্নাহ। এ কারণেই বলা হয়েছে– يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ
–[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ" : সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কোনো কিছুই গোপন রাখার সাধ্য কারো নেই এবং কোনো কর্মকে গোপন করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফাঁকি দেওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে خَبِيْر শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি মানুষকে তার কর্মের বদলা দিবেন। এটা যুজাজ (র.)-এরও অভিমত।
–[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ : সূরা আল-ক্বারি'আহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَارِعَةٌ অর্থ- আঘাতকারী, বিধ্বস্তকারী, বিচূর্ণকারী, কিন্তু এখানে অর্থ হলো- কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। অত্র সূরার প্রথম আয়াতেই সে মহা-প্রলয়ের আরবি শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। সে শব্দকে কেন্দ্র করে সূরার নাম اَلْقَارِعَةُ রাখা হয়েছে। মূলত এটা কেবল নাম-ই নয়; বরং এর বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্যের শিরোনামও তা। কেননা এতে মহাপ্রলয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৩৩টি বাক্য এবং ১৫২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী। এর মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। তার বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, এটা মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও পরকালে পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মসমূহের হিসাব দেওয়া এবং প্রতিদান গ্রহণের জন্য মানুষের উপস্থিত হওয়া। সূরার প্রথমেই মানুষের মন যাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং থরথর করে কেঁপে উঠে, এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় কথায় বাঘ! বাঘ! বলা হলে যেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং প্রাণভয়ে মানুষ কাঁপতে থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলাও সূরার প্রথমে এমনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে সমস্ত মানুষ কেঁপে উঠে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়। অতঃপর মহাপ্রলয় কি? তার প্রশ্ন রেখে গুণগত দিকটি তুলে ধরে মূল ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ মহাপ্রলয় এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হবে যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। সেদিন মানুষ পতঙ্গকুলের ন্যায় দিক-বিদিক ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তাদের অবস্থা হবে তখন দিশাহারা ও পাগলপারা মানুষের ন্যায়। পাহাড়গুলো পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। এর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সে মহাপ্রলয়ের আকার ও রূপটি হবে কত ভয়ঙ্কর ও ভয়াল! পরিশেষে মানবকুলের বিচার অনুষ্ঠানের জন্য হাশর প্রান্তরে আল্লাহর আদালত বসবে। সে আদালতে মানুষের কার্যাবলির বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে তা পরিমাপ করা হবে। যাদের সৎকাজের পরিমাণ বেশি এবং ওজনে পাল্লা ভারি হবে, তাদের পরিণাম হবে শুভ। তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী সন্তোষজনক জীবন। মহা সুখ-শান্তি ও আনন্দে তারা জীবন কাটাবে। আর যাদের অসৎ কাজের পরিমাণ বেশি ও পাল্লা ভারি হবে তাদের পরিণাম হবে খুব দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। প্রজ্বলিত উত্তপ্ত অনল-গর্ত হবে তাদের স্থায়ী নিবাস। সেখানেই তারা অনাদি-অনন্ত চিরদুঃখ ও কষ্টজনক জীবন কালাতিপাত করতে থাকবে।

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-ক্বারি'আহ মক্কায় অবতীর্ণ

إِحْدٰى عَشَرَةَ اٰيَةً : ১১ আয়াতবিশিষ্ট

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلْقَارِعَةُ اَيِ الْقِيَامَةُ الَّتِىْ تَقْرَعُ الْقُلُوْبَ بِاَهْوَالِهَا .

১. করাঘাতকারী অর্থাৎ কিয়ামত যা তার বিভীষিকা দ্বারা অন্তরসমূহকে আঘাত করবে।

٢. مَا الْقَارِعَةُ تَهْوِيْلٌ لِشَاْنِهَا وَهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ خَبَرُ الْقَارِعَةِ .

২. কি সে করাঘাতকারী? এর দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহতা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে مَا মুবতাদা এবং اَلْقَارِعَةُ খবর। উভয় মিলে (جُمْلَه اِسْمِيَّه হয়ে) اَلْقَارِعَةُ -এর খবর হয়েছে।

٣. وَمَا اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ مَا الْقَارِعَةُ زِيَادَةُ تَهْوِيْلٍ لَهَا وَمَا الْاُوْلٰى مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهَا خَبَرُهُ وَمَا الثَّانِيَةُ وَخَبَرُهَا فِىْ مَحَلِّ الْمَفْعُوْلِ الثَّانِىْ لِاَدْرٰى .

৩. আপনি কি জানেন? আপনার কি জানা আছে? করাঘাতকারী কি? এটা দ্বারা এর বিভীষিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। প্রথমোক্ত "مَا" মুবতাদা। এর পরবর্তী অংশ مَا -এর খবর হয়েছে। আর দ্বিতীয় مَا ও তার খবর মিলে اَدْرٰى -এর দ্বিতীয় مَفْعُوْل -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

٤. يَوْمَ نَاصِبُهُ دَلَّ عَلَيْهِ الْقَارِعَةُ اَىْ تَقْرَعُ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ الْمُنْتَشِرِ يَمُوْجُ بَعْضُهُمْ فِىْ بَعْضٍ لِلْحَيْرَةِ اِلٰى اَنْ يُدْعَوْا لِلْحِسَابِ .

৪. সেদিন يَوْمَ -এর নসবদাতা উহ্য রয়েছে। তার প্রতি اَلْقَارِعَةُ শব্দটি নির্দেশ করছে অর্থাৎ تَقْرَعُ মানুষ বিক্ষিপ্ত পোকার ন্যায় ভয়-বিহ্বলতার কারণে তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় একজনের উপর অন্যজন গড়াগড়ি করবে এবং হিসাব-নিকাশের প্রতি আহূত হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে।

٥. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ كَالصُّوْفِ الْمَنْدُوْفِ فِىْ خِفَّةِ سَيْرِهَا حَتّٰى تَسْتَوِىَ مَعَ الْاَرْضِ .

৫. আর পর্বতসমূহ হবে রকমারি ধুনা পশমের ন্যায় ধুনিত পশমের ন্যায় ক্ষিপ্রগতি/ সম্পন্ন, এমনকি জমিনের সাথে মিশে যাবে।

٦. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ بِاَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلٰى سَيِّاٰتِهِ .

৬. সুতরাং পাল্লা ভারি হবে অর্থাৎ যার নেক আমল তার পাপের উপর প্রাধান্য পাবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٧. فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي الْجَنَّةِ اَيْ ذَاتَ رِضًا بِاَنْ يَّرْضَاهَا اَيْ مَرْضِيَّةٌ لَهُ .

৭. সে স্বাচ্ছন্দ্য জীবন লাভ করবে জান্নাতে অর্থাৎ যার সন্তোষপূর্ণ জীবন যাতে সে সন্তুষ্ট হবে তথা যা তার পছন্দ মতো হবে।

٨. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ بِاَنْ رَجَحَتْ سَيِّاٰتُهُ عَلٰى حَسَنَاتِهِ .

৮. পক্ষান্তরে যার আমলনামা হালকা হবে অর্থাৎ যার নেক আমলের উপর বদ আমল প্রাধান্য পাবে।

٩. فَاُمُّهُ فَمَسْكَنُهُ هَاوِيَةٌ .

৯. তার স্থান আবাস হবে হাবিয়া।

١٠. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ اَيْ مَا هَاوِيَةٌ هِيَ .

১০. আপনার কি জানা আছে এটা কি? অর্থাৎ হাবিয়া কি?

١١. نَارٌ حَامِيَةٌ شَدِيْدَةُ الْحَرَارَةِ وَهَاءُ هِيَهْ لِلسَّكْتِ تَثْبُتُ وَصْلًا وَ وَقْفًا وَفِيْ قِرَاءَةٍ تُحْذَفُ وَصْلًا .

১১. তা হলো উত্তপ্ত অগ্নি-অত্যন্ত উত্তপ্ত। আর "هِيَهْ" -এর "هَا" অক্ষরটি সাকতাহ এর জন্য হয়েছে। এটা মিলিয়ে পড়া ও পৃথক করে পড়া উভয় অবস্থায়ই বহাল থাকে। তবে এক কেরাত অনুযায়ী মিলে পড়ার সময় এটা হযফ হয়ে যায়।

তাহকীক ও তারকীব

اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ -এর মহল্লে ই'রাব : اَلْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ বাক্যটির কয়েকটি মহল্লে ই'রাব হতে পারে–

১. تَحْذِيْر হিসাবে مَرْفُوْع অথবা مَنْصُوْب উভয়টি হতে পারে। যেমন বলা হয়– اَلْاَسَدُ اَلْاَسَدُ [মারফূ' বা মানসূব]।

২. অথবা, উহ্য ক্রিয়ার ফায়েল হিসাবে মারফূ' হবে। মূলবাক্য এভাবে হবে যে, سَتَاْتِيْكُمُ الْقَارِعَةُ অর্থাৎ অতি শীঘ্র তোমাদের নিকট মহাপ্রলয় এসে পড়বে। যার খবর ইতঃপূর্বে اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ –এ দেওয়া হয়েছে।

৩. اَلْقَارِعَةُ মুবতাদা হিসাবে মারফূ' আর مَا الْقَارِعَةُ খবর হিসাবে মারফূ' হবে। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

يَوْمَ -এর মহল্লে ই'রাব কি? : আয়াত يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ الخ -এর মধ্যস্থিত يَوْمَ -এর মহল্লে ই'রাব -এর ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. এটা مَحَلًّا مَنْصُوْب হবে, এমতাবস্থায় তা উহ্য ক্রিয়া تَقْرَعُ অথবা اُذْكُرْ -এর مَفْعُوْل হবে। ২. অথবা, مَحَلًّا مَرْفُوْع হবে। তখন তা উহ্য মুবতাদার খবর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরায় মানুষের স্বভাবগত তিনটি নৈতিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে– ১. অকৃতজ্ঞতা, ২. অর্থ-সম্পদের লোভ ও ৩. পরকালের সম্পর্কে অমনোযোগিতা।

আর অত্র সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। যাতে করে মানুষের অমনোযোগিতা দূরীভূত হয় এবং সে আল্লাহর শোকরগুজার হয় এবং অন্তরের নিভৃত কোণে যে অর্থলোভ থাকে তা দূরীভূত হয়। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلْقَارِعَةُ" : اَلْقَارِعَةُ -এর শাব্দিক অর্থ হলো– ঠোকরকারী, আঘাতকারী। এটা قَرْعٌ ধাতু হতে নির্গত। قَرْعٌ -এর অর্থ হলো– একটি জিনিস দ্বারা অন্য একটি জিনিসের উপর শক্তভাবে আঘাত করা, যাতে প্রচণ্ড শব্দ হয়। এই শাব্দিক অর্থের মিলের কারণে قَارِعَةٌ শব্দটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও ভীষণতম বিপদ বুঝাবার জন্য বলা হয়। আরবি ভাষায় বলা হয়– قَرَعَتْهُمُ الْقَارِعَةُ অমুক গোত্র বা জাতির উপর কঠিন ও ভীষণ বিপদ এসেছে। সূরা রাআদ-এ বলা হয়েছে– وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ যেসব লোক কুফরি করেছে তাদের কীর্তি-কলাপের কারণে কোনো না কোনো বিপদ আসতেই থাকে। তবে এখানে "قَارِعَةٌ" শব্দটি কিয়ামত বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল-হাক্কাতেও কিয়ামতকে এ নামেই অভিহিত করা হয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে اَلْقَارِعَةُ -এর দ্বারা হযরত ইসরাফীল (আ.) -এর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

বস্তুত قَارِعَةٌ দ্বারা কিয়ামতই উদ্দেশ্য। হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই প্রকাশ করেন। যেমন– কিয়ামতের অপর নাম হচ্ছে اَلطَّامَّةُ ও اَلْحَاقَّةُ।

তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ (র.) ও বলেছেন, قَارِعَةٌ হলো কিয়ামত। –[তাবারী]

قَوْلُهُ "وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ" : অর্থাৎ ক্বারিআহ'র হাকিকত এবং মৌলত্ব সম্পর্কে আপনার কোনো ইলম নেই; কেননা তার কঠিনতা এত বেশি যে, তথায় কারো না ধারণা পৌছতে পারে, না কোনো চিন্তা পৌঁছতে পারে, এমনকি তা বুঝাও মুশকিল। যতটুকু-ই আপনি ধারণা করবেন না কেন– তা আপনার ধারণার চেয়েও কঠিনতর। এ আয়াত দ্বারা যেন আল্লাহ তা'আলা বলতে চাচ্ছেন যে, সে ক্বারিআহ'র তুলনায় দুনিয়ার ক্বারিআহ কিছুই নয়। পরকালের আগুনের তুলনায় ইহকালের আগুন কিছুই নয় –[কাবীর]

قَوْلُهُ "كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ" : اَلْفَرَاشُ এর বলা হয় সে ক্ষুদ্রকায় পাখিকুলকে, যেগুলো অগ্নির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে। আমাদের দেশে সেগুলোকে পঙ্গপাল বলা হয়। আর مَبْثُوْث অর্থ– বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। অর্থাৎ পঙ্গপাল কোনো একটি দিকে থাকে না, চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থাটিকে পতঙ্গকুলের অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন। কিয়ামতের দিনও মানুষ কঠিন বিপদ ও আত্মচিন্তায় দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তাদের এ অবস্থাটিকেই পতঙ্গকুলের অবস্থা দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ "كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ" : عِهْن অর্থ– পশম এবং مَنْفُوْش অর্থ– ধুনিত। পশম ধুনা হলে যেরূপ তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে চতুর্দিকে উড়তে থাকে, তদ্রূপ পর্বতগুলো খণ্ড বিখণ্ড হয়ে উড়তে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ধুনিত পশমের অবস্থা দ্বারা কিয়ামতের দিন পাহাড়গুলোর অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতএব, সেদিন পাহাড়ের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে মানুষের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। চরম ধ্বংস সে ব্যক্তিদের জন্য যারা এত সুন্দর করে বুঝানোর পরও সঠিক পথে আসছে না। –[কাবীর]

মহাপ্রলয়ের দিন পাহাড়ের বিভিন্ন অবস্থা : কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়ের দিনে পাহাড়ের বিভিন্ন অবস্থা এবং রূপ হবে।

ক. টুকরা টুকরা হবে। যেমন বলা হয়েছে– وَدُكَّتِ الْجِبَالُ دَكًّا

খ. বিক্ষিপ্ত বালুকাস্তূপের ন্যায়। যেমন বলা হয়েছে– كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَهِيْلًا -

গ. ধুনা পশমের ন্যায় হবে। যেমন كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ -

ঘ. মরীচিকায় পরিণত হবে। যেমন– وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا –[কাবীর]

مَوَازِيْنُ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَوَازِيْنُ শব্দ مَوْزُوْنٌ বা مِيْزَانٌ-এর বহুবচন। مَوْزُوْنٌ-এর বহুবচন ধরা হলে এর অর্থ হবে, আল্লাহর দৃষ্টিতে ওজনযোগ্য আমলসমূহ। আর مِيْزَانٌ-এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ হবে, সে পাল্লা যা দ্বারা আমল পরিমাপ করা হবে। সুতরাং প্রথম অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের মর্ম হবে– তাদের নেক আমলসমূহ বা বদ আমলসমূহ যা ওজনযোগ্য– তার পরিমাণ বেশি হোক বা কম হোক। আর দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে মর্ম হবে– নেক আমল বা বদ আমলসমূহের পাল্লাটি যদি ভারি ও হালকা হয়। যাদের নেক আমলের পাল্লা ভারি এবং বদ আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারা লাভ করবে সন্তোষজনক সুখী জীবন। আর যাদের নেক আমলের পাল্লা হালকা এবং বদ আমলের পাল্লা ভারি হবে তারা হবে, অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত। এ বিষয় সূরা আ'রাফের ৮৯ আয়াতে, সূরা কাহাফের ১০৪ – ১০৫ আয়াতে এবং সূরা আম্বিয়ার ৪৭ আয়াতেও বর্ণনা বিদ্যমান। আসল পরিণামের ব্যাপারটি কিরূপ হবে, তার সঠিক কোনো রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান না থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই পোষণ করা যায় না। কেননা আলো-বায়ু এর মতো আকার-আয়তনহীন বস্তুর পরিমাপ কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন আমল পরিমাপের ব্যাপারটি আল্লাহর মহা কুদরতের সম্মুখে কোনো অসুবিধারই বস্তু নয়।

ইমাম গাযালী (র.) লিখেছেন যে, সত্তর হাজার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের আমল পরিমাপের জন্য দাঁড়ি পাল্লার ব্যবস্থা থাকবে না। তাদের হাতে আমলনামা দেওয়া হবে না; বরং একটি নাজাতনামা দেওয়া হবে। যাতে এ কথা লিখা থাকবে যে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের নাজাতনামা। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যেভাবে মায়ের কোল শিশুর আবাসস্থল, ঠিক তেমনিভাবে কাফেরদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। এ কারণে اُمٌّ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

আর هَاوِيَةٌ একটি জাহান্নামের নাম। এটা মা'রেফা ও গায়রে মুনসারেফ, কোনো কোনো সময় এর উপর আলিফ-লাম সিফাতের দিক বিবেচনায় প্রবেশ করে هَوٰى - يَهْوِىْ উপর হতে নিচে পতিত হওয়া। এর ইসমে ফায়েল স্ত্রীলিঙ্গে هَاوِيَةٌ আর জাহান্নামের নাম এজন্য هَاوِيَةٌ রাখা হয়েছে, কিয়ামতের পর পাপিষ্ঠগণ এতে পতিত হবে।

قَوْلُهُ نَارٌ حَامِيَةٌ : বস্তুত যারা ঈমানের সম্পদ এবং নেক আমলের সম্বল নিয়ে দুনিয়া থেকে যাবে না; তাদের ঠিক নিবাস হবে জাহান্নাম। আর তা হবে অতি উত্তপ্ত অগ্নি। –[মাযহারী]

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে যে, দোজখের আগুনকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত প্রজ্বলিত রাখা হয়, তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে। এরপর আরো এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়; তখন তা সাদা বর্ণ ধারণ করে। এরপর আরো এক হাজার বছর পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হলে তা কালো বর্ণ ধারণ করে।

তাই এখন দোজখের আগুন সম্পূর্ণ কালো বর্ণের। সে কারণে তা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে আছে। –[ইবনে কাছীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ التَّكَاثُر : সূরা আত-তাকাছুর

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের اَلتَّكَاثُرُ শব্দটিকে নামকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ২৮টি বাক্য এবং ১২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : আবূ হাইয়ান ও শাওকানী বলেন, সব তাফসীরকারকদের মতেই এ সূরাটি মাক্কী। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, সবচাইতে বেশি পরিচিত কথা হলো– এটা মাক্কী সূরা; কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে এটা মাদানী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দুনিয়া পূজা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা এবং মানুষকে আখেরাতপন্থি ও পরকালমুখি করা। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের জাগতিক জীবনে অধিক মাত্রায় উপায়-উপকরণ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তোমরা বেশি বেশি লাভ করা এবং অপরের তুলনায় নিজে বেশি সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই জীবনের আসল উন্নতি ও যথাযর্থ সাফল্য ভেবে নিয়েছ। যার ফলশ্রুতিতে তোমরা জীবনের আসল মূল্যবোধ, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি হতে অনেক দূরে সরে পড়েছ। সেদিকে দৃষ্টিপাত করা ও মনোযোগ দেওয়ার কোনোই সুযোগ পাচ্ছে না এবং মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনও অনুভব কর না। অথচ জাগতিক উপায়-উপকরণের তুলনায় এদিকে মনোযোগ দেওয়াই ছিল তোমাদের আসল কর্তব্য। পরকালের হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার চিন্তা ভুলেও তোমাদের মনের কোণে জাগরিত হয় না। এরূপ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে থাকলে পরিণতিতে জাহান্নাম যে তোমাদের অবলোকন করতে হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। যেদিন চাক্ষুষ জাহান্নামকে অবলোকন করবে, সেদিনই তার আসল সত্যাসত্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ও অবদান বর্তমান। এ নিয়ামতসমূহ কোন পথে, কি নিয়মে ব্যবহার করলে, সে বিষয় তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সময় থাকতে তোমরা সাবধান হও, সতর্ক হও। পরকালমুখি গতি-চরিত্র গ্রহণ করো। এটাই তোমাদের জীবনে মহাসাফল্য এনে দিবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে প্রতিদিন কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তাঁরা বললেন– কার সাধ্য আছে যে, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করতে পারে না? [অর্থাৎ এ সূরা এক হাজার আয়াতের সমতুল্য]।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাতে এক হাজার আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। সাহাবীগণ অপারগতা প্রকাশ করলে নবী করীম ﷺ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে ইরশাদ করলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ সূরাটি এক হাজার আয়াতের সমান। –[রূহুল মা'আনী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আত-তাকাছুর মক্কায় অবতীর্ণ

ثَمَانُ اٰيَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلْهٰكُمْ شَغَلَكُمْ عَنْ طَاعَةِ اللّٰهِ التَّكَاثُرُ التَّفَاخُرُ بِالْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَالرِّجَالِ ـ

১. তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে আল্লাহর আনুগত্য হতে বিরত রেখেছে আধিক্য-সম্পদ, সন্তানসন্ততি ও জনবলের অহংকার।

٢. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ بِاَنْ مُتُّمْ فَدُفِنْتُمْ فِيْهَا اَوْ عَدَدْتُمُ الْمَوْتٰى تَكَاثُرًا ـ

২. যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে গিয়ে উপনীত হও। অর্থাৎ মৃত্যুর পর জমিনে সমাধিস্ত হও। অথবা সংখ্যাধিক্য প্রমাণের জন্য মৃতব্যক্তিদের (কবর)-কে গণনা কর।

٣. كَلَّا رَدْعٌ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ

৩. কখনো নয় এটা ধমকের জন্য হয়েছে। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

٤. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ سُوْءَ عَاقِبَةِ تَفَاخُرِكُمْ عِنْدَ النَّزْعِ ثُمَّ فِى الْقَبْرِ ـ

৪. পুনরায় বলবো অচিরেই তোমরা জ্ঞাত হবে তোমাদের অহংকারের পরিণতি জানতে পারবে মৃত্যু যন্ত্রণার সময় অতঃপর কবরে অবস্থানের সময়।

٥. كَلَّا حَقًّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ اَىْ عِلْمًا يَقِيْنًا عَاقِبَةَ التَّفَاخُرِ مَا اشْتَغَلْتُمْ بِهٖ ـ

৫. কখনো নয় অবশ্যই তোমরা যদি নিশ্চিতরূপে জানতে অর্থাৎ তোমাদের অহংকারের পরিণতি যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে পারতে, তাহলে তোমরা তাতে লিপ্ত হতে না।

٦. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ النَّارَ جَوَابُ الْقَسَمِ مَحْذُوْفٌ وَحُذِفَ مِنْهُ لَامُ الْفِعْلِ وَعَيْنُهُ وَاُلْقِىَ حَرَكَتُهَا عَلَى الرَّاءِ ـ

৬. অবশ্যই তোমরা প্রত্যক্ষ করবে জাহান্নাম-অগ্নি এটা উহ্য শপথের জওয়াব। আর لَتَرَوُنَّ -এর لَامِ كَلِمَه ও عَيْنِ كَلِمَه হযফ করা হয়েছে এবং এর হরকত رَا -এর উপর দেওয়া হয়েছে।

٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا تَاكِيْدٌ عَيْنَ الْيَقِيْنِ مَصْدَرٌ لِاَنَّ رَاٰى وَعَايَنَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ـ

৭. পুনরায় বলি অবশ্যই তোমরা প্রত্যক্ষ করবে দোজখ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ প্রথমোক্ত لَتَرَوُنَّ -এর তাকিদ হয়েছে। নিশ্চিতরূপে عَيْنٌ শব্দটি لَتَرَوُنَّ -এর مَصْدَرٌ (مَفْعُوْل مُطْلَقٌ) হয়েছে। কেননা رَاٰى ও عَايَنَ একই অর্থবোধক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ حُذِفَ مِنْهُ نُوْنُ الرَّفْعِ لِتَوَالِي النُّوْنَاتِ وَوَاوُ الضَّمِيْرِ الْجَمْعِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ رُؤْيَتِهَا عَنِ النَّعِيْمِ مَا يُلْتَذُّ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنَ الصِّحَّةِ وَالْفَرَاغِ وَالْاَمْنِ وَالْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ .

৮. তারপরও বলি অবশ্যই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে কয়েকটি نُوْن পর পর আসার কারণে রফার نُوْن -কে এটা হতে হযফ করা হয়েছে। যেদিন তারা জাহান্নামকে দেখবে নিয়ামত সম্পর্কে নিয়ামত হলো দুনিয়ার মানুষ যার স্বাদ গ্রহণ করে উপভোগ করে। যেমন সুস্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি।

তাহকীক ও তারকীব

عَيْنَ الْيَقِيْنِ-এর মধ্যস্থিত عَيْنَ শব্দটি তারকীবে কি হয়েছে? : আয়াত ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ-এর মধ্যস্থিত عَيْنَ শব্দটি لَتَرَوُنَّ-এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসাবে مَنْصُوْبٌ হয়েছে। কেননা عَيْنَ শব্দটি এখানে رُؤْيَةٌ-এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন তারা জাহান্নামকে নিজেদের চোখে দেখতে পাবে।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ তারকীবে কি হয়েছে? : আয়াতে لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ তারকীবে উহ্য শপথের জবাব হয়েছে। মূলত বাক্যটি ছিল- وَاللّٰهِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখতে পাবে।

سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْلٌ কি? : আল্লাহ তা'আলার বাণী– سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ-এর مَفْعُوْلٌ উহ্য রয়েছে। আর তা হলো سُوْءُ عَاقِبَةِ تَفَاخُرِكُمْ অর্থাৎ শীঘ্রই তোমরা তোমাদের পারস্পরিক অহংকারের অশুভ পরিণতি জানতে পারবে। [মৃত্যুর সময় এবং কবরে অবস্থানের সময়।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার উল্লেখ করে পরকালে হিসাব-নিকাশ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর অত্র সূরায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অথচ এগুলোর এক দিন হিসাব দিতে হবে। এগুলোর ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

শানে নুযূল : আলোচ্য সূরার শানে নুযূল প্রসঙ্গে একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা আবদে মানাফ গোত্র ও বনূ সাহম গোত্র পরস্পরের জন সংখ্যায় আধিক্যের গর্ব করেছিল। আবদে মানাফ গোত্র এ গর্বে বিজয়ী হলো। তখন বনূ সাহম গোত্র বলল, আমাদের বংশের বহু লোক জাহিলিয়া যুগে মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর জীবিত এবং মৃত সকলকে গণনা করে তারা বিজয়ী হলো। এ প্রসঙ্গে সূরাটি নাজিল হয়।

২. হযরত ইবনে বোরায়দাহ (রা.) হতে বর্ণিত, মদীনায় আনসারদের দু'টি গোত্র ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব নিয়ে পরস্পর খুব গর্ব প্রকাশ করত। এমনকি তারা স্বীয় জনবল প্রমাণের জন্য মৃতব্যক্তিদের গণনা করতে কবরস্থানে গমন করল এবং সমাধি গণনার মাধ্যমে নিজেদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণের প্রয়াস পেল। তাদের উপরিউক্ত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়।

قَوْلُهُ اَلْهٰكُمْ : এ শব্দটির মূলরূপ হলো اَلْهٰى - كُمْ হচ্ছে বহুবচনীয় সর্বনাম। এর অর্থ হচ্ছে– বেখেয়ালীপনা, আত্মভোলা, কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকা। আরবি ভাষায় এ শব্দটিকে সে আত্মভোলা ও বেখেয়ালীপনাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার হয়, যা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে বেখেয়ালী ও গাফেলতীতে নিমজ্জিত রয়েছে।

اَلتَّكَاثُرُ-এর অর্থ : এ শব্দটি كَثْرَتٌ ধাতু হতে নির্গত। বাবে تَفَاعُلٌ-এর মাসদার। এর অর্থ তিনটি– প্রথমত অতিমাত্রায় কোনো বস্তু পাওয়ার প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকা। দ্বিতীয়ত কোনো বস্তু বেশি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করা। তৃতীয়ত কোনো বস্তু অপরের তুলনায় বেশি লাভ করে অহঙ্কার ও গৌরব প্রকাশ করা।

সুতরাং এখানে উভয় শব্দের সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে– তোমাদের অধিক লাভের চিন্তা ও প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে গাফেল ও বেখেয়াল করে রেখেছে। অথবা, এটাও হয় যে, তোমাদের নিজেদের আধিক্য ও আত্মগর্ব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়াদি হতে গাফেল ও মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। কি কি বিষয়বস্তুর আধিক্য গাফেল ও মোহাচ্ছন্ন করেছে: । কুরআন মাজীদ সে বস্তুটির নাম বলেনি। এ জন্য তার মর্ম অনেক ব্যাপক। এটা দ্বারা ধন-সম্পদের প্রাচুর্য বুঝা যায়, এটা দ্বারা মান-মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-হেকমত, বুদ্ধি-কৌশল, জাগতিক জীবনের বিলাস-সামগ্রী ও উপায়-উপাদান সবই হতে পারে। সারকথা এই যে, যে বস্তুর অধিক পরিমাণে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতায় পড়ে মানুষ নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মতৎপর থেকে আল্লাহর ইবাদত, পরকাল ও হাশর-নশরের চিন্তা হতে সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে পড়ে; তাই বলা হয়েছে। চাই তা ধন-সম্পদ হোক বা মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হোক। অথবা, জীবনের বিলাস-সামগ্রী হোক বা অন্য কিছু হোক।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ -কে দ্বিরুক্ত করার কারণ :

১. এখানে উক্ত বাক্যকে দু'বার নেওয়া হয়েছে তাকিদের জন্য। তা দ্বারা وَعِيْد ধমকের পর ধমক দেওয়া হয়েছে। যেমন, বলা হয়– اَقُوْلُ لَكَ ثُمَّ اَقُوْلُ لَكَ لَا تَفْعَلْ অর্থাৎ আমি তোমাকে বলছি, তারপরও বলছি– তুমি করো না।

২. অথবা, প্রথমটি মৃত্যুর সময়, আর দ্বিতীয়টি কবরে প্রশ্ন করার সময়।

৩. ইমাম যাহহাক (র.) বলেন, প্রথম বাক্য দ্বারা কাফেরদেরকে এবং দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اَيُّهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ

৪. প্রথমটি وَعِيْد বা ধমক, দ্বিতীয়টি وَعْد বা পুরস্কারের ওয়াদা।

৫. অথবা, একটি হলো কবরের আজাব সম্পর্কে, আর অন্যটি কিয়ামতের আজাব সম্পর্কে। –[কাবীর]

৬. কারো মতে, প্রথমটি পরকাল সম্পর্কে সতর্কবাণী আর দ্বিতীয়টি এ সম্পর্কে পুনঃ তাকিদ।

৭. কারো মতে, প্রথমবার সতর্কবাণী মৃত্যুর সময়ের বা কবরের অভ্যন্তরের আজাবের ব্যাপারে আর দ্বিতীয়টি কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পরের আজাব সম্পর্কে। –[নূরুল কোরআন]

لَوْ -এর জবাব : لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ বাক্যে لَوْ হরফে শর্ত। শর্ত আসলে তার জাযা থাকা আবশ্যক; কিন্তু এখানে এর উল্লেখ নেই। এ কারণে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, জাযা এখানে উহ্য রয়েছে। কেননা যদি لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ -কে لَوْ -এর জবাব ধরা হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, যদি তোমরা জানতে তাহলে অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করতে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে না। অথচ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে তারা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে। অতএব, لَوْ -এর জবাব হবে لَمَا اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ অর্থাৎ অবশ্যই আধিক্যের বাসনা তোমাদেরকে অমনোযোগী করতে পারত না। –[কাবীর]

قَوْلُهٗ عِلْمَ الْيَقِيْنِ : বিদ্যার্জন ও জ্ঞান লাভের দ্বারা অন্তরে যে বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা হয় ইলমুল ইয়াকীন বা জ্ঞানলব্ধ প্রত্যয়। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সম্পর্কে আফসোস করে বলেছেন, তোমরা জাগতিক জীবনে অধিক মাত্রায় ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য, মান-মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের নেশায় মোহান্ধ হয়ে পড়েছ এবং একেও জীবনের উন্নতি ও সাফল্য ভাবছ; কিন্তু তা কখনই মানুষের জীবনের আসল উন্নতি ও সাফল্য হতে পারে না; বরং আল্লাহকে ভুলে এ সব ধান্দায় থাকার পরিণতি যে কত মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক, এ বিষয় যদি তোমরা জ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন করতে, তবে তা তোমাদের পক্ষেই ফলপ্রসূ হতো। আয়াতে ওহীলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও নেক আমল করার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম কাতাদাহ (র.) বলেছেন, আমরা এ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতাম যে, আলোচ্য আয়াতের عِلْمَ الْيَقِيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহ পুনর্জীবন দান করবেন এবং পুনরুত্থান করবেন।

আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথি (র.) লিখেছেন, ইলমুল ইয়াকীন হলো– অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। –[নূরুল কোরআন]

لَتَرَوُنَّ -কে দ্বিরুক্ত করার কারণ : لَتَرَوُنَّ শব্দটি اَلرُّؤْيَةُ থেকে নির্গত। এ اَلرُّؤْيَةُ বা প্রত্যক্ষ করাকে দ্বিরুক্ত করা হয়েছে। কেননা, এখানে وَعِيْد বা ধমকের তাকিদ করা হয়েছে। সম্ভবত জাতি ধমক শুনতে অপছন্দ করত। তাই وَعِيْد -কে বারবার উল্লেখ করে সতর্ক করা হয়েছে।

অথবা, প্রথম 'দেখা' হবে দূর থেকে, আর দ্বিতীয় 'দেখা' হবে একেবারে জাহান্নামের তীরে গিয়ে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

অথবা, প্রথম 'দেখা' হবে তীরে গিয়ে, আর দ্বিতীয় 'দেখা' হবে জাহান্নামে প্রবেশ করার সময়। -[কাতহুল কাদীর, কাবীর]

অথবা, এর কারণ হলো, প্রথমবার দেখার তাৎপর্য হলো মৃত্যুর পর আলমে বরযখ বা মধ্যালোকে দেখা। আর দ্বিতীয়বার দেখার তাৎপর্য হলো হাশরের দিন দেখা। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ عَيْنَ الْيَقِيْنِ : عَيْن অর্থ- চক্ষু এবং يَقِيْن অর্থ- বিশ্বাস। সুতরাং উভয় শব্দের সাম্মিলিত অর্থ হলো, কোনো বস্তু চক্ষু দ্বারা দর্শনের মাধ্যমে অন্তরে সে বিষয়ে যে বিশ্বাস জন্মলাভ করে, তাকেই বলা হয় عَيْنَ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যয়। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে- তোমরা জাহান্নামকে পরকালে চাক্ষুষ দর্শন করে, চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করতে পারবে; কিন্তু ওহীলব্ধ জ্ঞান দ্বারা পার্থিব জীবনে তার বাস্তবতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।

عِلْمُ الْيَقِيْنِ، عَيْنُ الْيَقِيْنِ ও حَقُّ الْيَقِيْنِ-এর পার্থক্য : কোনো জিনিস জানার তিনটি স্তর রয়েছে-

১. عِلْمُ الْيَقِيْنِ ২. عَيْنُ الْيَقِيْنِ এবং ৩. حَقُّ الْيَقِيْنِ যেমন- কেউ বিশ্বস্ত মাধ্যমে জানতে পারল যে, আঙ্গুর ফল মিষ্টি। একে বলে عِلْمُ الْيَقِيْنِ এরপর সে এটা চোখে দেখে বুঝতে পারল যে, এটা মিষ্টি হবে, তাকে বলে عَيْنُ الْيَقِيْنِ; অতঃপর সে তা ভক্ষণ করে তার স্বাদ গ্রহণ করল, তাকে বলে حَقُّ الْيَقِيْنِ।

নিয়ামত সম্পর্কে যারা জিজ্ঞাসিত হবে : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- এতে সম্বোধিত ব্যক্তিরা হবে কাফের; অর্থাৎ কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হবে- তোমাদেরকে আল্লাহ এরূপ নিয়ামত দিয়েছেন, তোমরা তার কি শোকর আদায় করেছ? কোনো কোনো তাফসীরকারের নিকট আয়াতের সম্বোধন সাধারণ কাফের ও মুসলমান। অর্থাৎ সকলকে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। -[কাবীর]

কিয়ামতের দিন কোন কোন বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ 'সে কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে النَّعِيْم (নিয়ামত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এখানে প্রশ্ন হলো, এ নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে? হাদীসের বর্ণনায় তার একাধিক জবাব পাওয়া যায়।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে نَعِيْم দ্বারা স্বাস্থ্য, সুস্থতা, চক্ষু ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

খ. কেউ কেউ বলেছেন, সহজ বিধান ও কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

গ. কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তা দ্বারা খেজুর, মিষ্টি পানি ও শীতল ছায়াকে বুঝানো হয়েছে।

ঘ. কোনো কোনো হাদীসে নিম্নোক্ত ৫টি বস্তুকে বুঝানো হয়েছে- ১. তৃপ্তি করে খাওয়া; ২. ঠাণ্ডা পানীয়; ৩. মজার ঘুম; ৪. ঘরের ছায়া ও ৫. ভারসাম্যপূর্ণ দেহ।

ঙ. বুখারী শরীফের একটি হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ব্যতীত হাশরের দিন কোনো মানুষ স্বীয় স্থান হতে নড়তে পারবে না। ১. সে নিজের জীবন কোন পথে ব্যয় করেছে? ২. যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছে? ৩. সম্পদ কিভাবে আর্জন করেছে? ৪. অর্জিত সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছে? ৫. ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কিনা?

চ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বান্দা যখন কোনো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলে?

ছ. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, বান্দার ভাষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কি উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিল?

জ. হযরত মা'আয (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন মু'মিন ব্যক্তিকে তার জীবনের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমনকি চোখে সুরমা লাগানো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হবে।

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে তাদেরকে এ সব প্রশ্ন করা হবে না। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْعَصْرِ : সূরা আল-‘আসর

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম اَلْعَصْرُ শব্দকেই এর নামরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১৪টি বাক্য এবং ৬৮ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটি কখন নাজিল হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

১. হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.) প্রমুখের মতে, এ সূরাটি মদীনায় নাজিল হয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। কেননা এতে ঈমান ও আমলের মৌলিক কথার উল্লেখ করা হয়েছে

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটি অতিশয় ক্ষুদ্র, অথচ এতে বক্তব্য ও ভাবের মহাসমুদ্র লুক্কায়িত রয়েছে। আল্লাহ এ ক্ষুদ্রকায় বাক্য কয়টিতে মানব জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মময় ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। এ সূরাটি ভাব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে এত ব্যাপক যে, গোটা ইসলামি জীবন চরিত্রটি একটি সংক্ষেপ অথচ বিরাট-বিশালকায় রূপ অংকন করা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন–কোনো লোক এ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে তা-ই তার হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, আল্লাহ এতে মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার চার দফা মূলনীতি উপস্থাপন করেছেন। ১. ঈমান ২. নেক আমল, ৩. সত্যের পারস্পরিক উপদেশ, ৪. ধৈর্যের পারস্পরিক নসিহত। এ চার দফা মূলনীতি হতে যারা সরে পড়বে তাদের ধ্বংস ইহকালে ও পরকালে অনিবার্য। সে ধ্বংস ও ক্ষতি হতে কেউই উদ্ধার পাবে না। আর তার ধারণা ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত উভয়কালের মুক্তি ও সাফল্য।

সূরাটির ফজিলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি ছিলেন, যখন তারা কোনো স্থানে একত্রিত হতেন, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের সামনে সূরা আল-‘আসর না পড়তেন ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথক হতেন না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– যে ব্যক্তি অত্র সূরা সম্পর্কে চিন্তা করে, তার জন্য অত্র সূরাটিই যথেষ্ট। –[ইবনে কাছীর]

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-আসর মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلَاثُ اٰيٰتٍ : ৩ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَالْعَصْرِ الدَّهْرِ اَوْ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ اِلَى الْغُرُوْبِ اَوْ صَلَاةِ الْعَصْرِ .

১. শপথ কালের যুগ অথবা মধ্যাহ্ন হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় কিংবা সালাতুল আসর।

٢. اِنَّ الْاِنْسَانَ الْجِنْسَ لَفِىْ خُسْرٍ فِىْ تِجَارَتِهٖ .

২. অবশ্যই মানুষ মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত তার ব্যবসায়।

٣. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَيْسُوْا فِىْ خُسْرَانٍ وَتَوَاصَوْا اَوْصٰى بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْحَقِّ اَىِ الْاِيْمَانِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعْصِيَةِ .

৩. তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। আর তারা পরস্পর উপদেশ দান করে একে অন্যকে উপদেশ প্রদান করে সত্যের প্রতি ঈমানের প্রতি আর পরস্পর উপদেশ দান করে ধৈর্যের প্রতি আনুগত্য এবং পাপ হতে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে বংশ গৌরবের দম্ভে অহঙ্কারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছিল, আর অত্র সূরাতে সকল প্রকার পাপীদের পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে। সাথে সাথে নেককার লোকদের সুফলের কথাও ঘোষণা করা হচ্ছে।

সূরার শানে নুযূল : জাহিলিয়া যুগে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর সাথে কালাদাহ ইবনে উসায়েদ -এর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। কালাদাহ প্রায়ই তাঁর নিকট যাতায়াত করত। হযরত আবূ বকর (রা.) ঈমান গ্রহণের পর একদিন সে তাঁর নিকট এসে বলল– হে আবূ বকর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ব্যবসা-বাণিজ্য তো ভাটা লেগেছে। আয়-রোজগারের পথ তো প্রায় বন্ধ। তুমি কোন্ ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছ। নিজেদের ধর্মকর্মও হারিয়েছ এবং দুনিয়াও হারিয়েছ। তুমি এখন উভয় দিক দিয়ে পূর্ণরূপে লোকসানে নিপতিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন– হে নির্বোধ! যে লোক আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের গোলাম হয়ে যায়, সে কখনো লোকসানে নিপতিত হয় না। যারা পরকাল সম্পর্কে কোনোই চিন্তা-ভাবনা করে না, মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, তারাই লোকসানে নিপতিত। যারা কেবল জাগতিক উন্নতি লাভের জন্যই সদা চিন্তামগ্ন ও ব্যস্ত থাকে, তারাই একূল-ওকূল উভয় কূলই হারায়। হযরত আবূ বকর (রা.) -এর কথার সত্যতা প্রমাণ এবং এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। -[আযীযী]

اَلْعَصْرُ -এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এখানে "اَلْعَصْرُ" শব্দটির তিনটি অর্থ হতে পারে : ১. কাল। ২. মধ্যাহ্ন হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় এবং ৩. আসরের নামাজ।

* ইবনে কাইসান (র.) বলেছেন, আসর শব্দ দ্বারা রাত ও দিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।
* হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে আছর বলা হয়।
* হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, দিনের শেষ ঘণ্টাকে আসর বলা হয়। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilmweebly.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে "اَلْعَصْر" দ্বারা কালকেই বুঝানো হয়েছে। কালের শপথ করার অর্থ হলো, সূরায় উক্ত চারটি গুণসম্পন্ন লোক ছাড়া অন্যান্য সকল মানুষই যে মহা ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন, কাল-সময়-স্রোত তার জ্বলন্ত সাক্ষী। মানুষের ইতিহাস দৃঢ়তা ও সন্দেহাতীতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, উক্ত চারটি গুণ যে সকল লোকের নেই তারা শেষ পর্যন্ত সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সময় বা কাল আসলে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য এক এক ব্যক্তি ও এক এক জাতিকে আল্লাহর দেওয়া সময় বা অবকাশ মাত্র। পরীক্ষাগারে যেমন পরীক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়, ঠিক মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তেমনিভাবে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

যা হোক এ তীক্ষ্ণ গতিশীল কালস্রোত সাক্ষ্য দেয় যে, উক্ত চারটি গুণ হারিয়ে যে সব কাজে নিজের আয়ুষ্কাল ক্ষয় করছে, তা সবই ক্ষতিকর। এ ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে শুধু সেসব লোক যারা উল্লিখিত চারটি গুণে গুণান্বিত হয়ে দুনিয়ায় কাজ করবে।

ইমাম রাযী (র.) এ পর্যায়ে একজন মনীষীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হলো– একজন বরফ বিক্রেতার কথা হতেই আমি সূরা আল-'আসর-এর অর্থ বুঝতে পেরেছি। বরফ বিক্রেতা বাজারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল, দয়া কর সে ব্যক্তির প্রতি যার মূলধন গলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অনুগ্রহ কর সে ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি হারিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যক্তির এ চিৎকার শুনে আমি বললাম– "وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ" -এর তো এটাই অর্থ। মানুষকে যতটা আয়ুষ্কাল দেওয়া হয়েছে তা বরফ গলার মতো দ্রুত গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাকে যদি অপচয় করা হয় কিংবা ভুল ও অন্যায় কাজে ব্যয় করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটাই হলো মানুষের ক্ষতি। এটা অপেক্ষা বড় ক্ষতি মানুষের আর কিছুই হতে পারে না।

اَلْاِنْسَانُ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে اَلْاِنْسَانُ – মানুষ বলতে মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে, অন্যথায় পরবর্তী اِسْتِثْنَاءٌ সহীহ হতো না। সমগ্র মানবজাতি সমানভাবে সকলেই এতে শামিল। কাজেই উক্ত চারটি গুণের যারা অধিকারী নয়, তারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কথাটি সর্বদিক দিয়েই সর্বাবস্থায় সত্য ও প্রমাণিত। উক্ত গুণাবলি হতে বঞ্চিত এক ব্যক্তি হোক, কোনো জাতি হোক অথবা হোক দুনিয়ার সকল মানুষ সকলের জন্যই তা প্রয়োজন। এটা আল্লাহ তা'আলার একটি অপরিবর্তনীয় মৌলনীতি। সারা দুনিয়ার মানুষও যদি কুফর, পাপকাজ ও পরস্পরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করেন এবং আত্মপূজায় নিমগ্ন হওয়ার শিক্ষা দানের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাহলেও ভিন্নতর কোনো পরিণাম দেখা দিবে না। কেননা মৌলনীতির প্রয়োগ সাধারণ, নিরপেক্ষ ও নির্বিশেষে হয়ে থাকে।

اَلْاِنْسَانَ -এর اَلْ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلْاِنْسَانَ -এর اَلْ দ্বারা 'ইনসান' -এর جِنْس বা জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আলিফ ও লাম জিন্সী হবে, এ কারণেই 'ইনসান' হতে اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে ইস্তিছনা করা হয়েছে।

অথবা اَلْ এখানে عَهْدِىْ হবে। তখন مَعْهُوْد হবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে মুশরিকদের একটি বিশেষ দল উদ্দেশ্য। যথা–ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল ও আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। হযরত মুকাতিল (র.) বলেন, এটা দ্বারা আবূ লাহাবকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, আবূ জাহ্‌ল উদ্দেশ্য। –[কাবীর]

خُسْرٌ -এর অর্থ : خُسْرٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– ধ্বংস, ক্ষতি, লোকসান ও কারবারে অকৃতকার্য হওয়া। উপরিউক্ত আয়াতেও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যখন ক্ষতি হয় তখনই আরবিতে বলা হয় তোমার লোকসান হয়েছে। গোটা ব্যবসাটি দেউলিয়ায় পরিণত হলেও দেউলিয়াত্ব বুঝাবার জন্য এ শব্দটির প্রয়োগ হয়। এ শব্দটি লাভ ও মুনাফার বিপরীত শব্দ। কুরআন মাজীদে যত স্থানে এ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, তা ফালাহ শব্দেরই বিপরীত অর্থে। ফালাহ শব্দের অর্থ হলো কল্যাণ বা সাফল্য। বস্তুত কুরআন মাজীদে ফালাহা ও খুসরুন শব্দদ্বয় উভয় জগতের কল্যাণ এবং ক্ষতি, লোকসান ও লাভের অর্থে ব্যবহার করেছে। কুরআন যখনই তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, মানুষ বড়োই ক্ষতিগ্রস্ত তখন তা দ্বারা উভয় জগতের ক্ষতিই বুঝায়। –[কাবীর]

خُسْرٌ -কে অনির্দিষ্ট নেওয়ার কারণ : আয়াতে কারীমায় لَفِىْ خُسْرٍ বলা হয়েছে, لَفِى الْخُسْرِ বলা হয়নি। কেননা অনির্দিষ্ট শব্দ কোনো সময় ভয়ানক বুঝায়, আবার কোনো সময় তাচ্ছিল্য বুঝায়। ভয়ানক বুঝালে আয়াতের অর্থ হবে–اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ عَظِيْمٍ لَا يَعْلَمُ كُنْهَهٗ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ নিশ্চয় মানুষ ভয়ানক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। আর যদি তাচ্ছিল্য বুঝায় তাহলে অর্থ হবে– নিশ্চয় শয়তানের ধ্বংস ছাড়া মানুষেরও ধ্বংস আছে। কেননা হে শয়তান! আমার সৃষ্টির মধ্যে তোমার চেয়েও বেশি নাফরমান বর্তমান রয়েছে। প্রথম অর্থটি-ই সঠিক। –[কাবীর]

Free @ www.e-ilmweebly.com

আয়াতে কতিপয় তাকিদ : إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ আয়াতে কয়েকটি তাকিদ রয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা خُسْرَانٌ কে চূড়ান্ত করে বুঝিয়েছেন–

১. فِيْ দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা ধ্বংসের মধ্যে ডুবে রয়েছে, চতুর্দিক থেকে ধ্বংস তাদেরকে বেষ্টন করে আছে।

২. إِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. لَفِيْ خُسْرٍ -এর মধ্যে لَامٌ ব্যবহৃত হয়েছে। –[কাবীর]

গুণ চতুষ্টয় : উপরিউক্ত সূরায় ক্ষতির ভাগ হতে নিষ্কৃতি লাভ করে সাফল্য লাভের যে চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই–

১. **ঈমান :** ঈমান হলো ইহকাল ও পরকালের মুক্তি লাভের প্রধান শর্ত। ঈমান ব্যতিরেকে যতই উত্তম ও কল্যাণজনক কাজ করা হোক না কেন, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না এবং পরকালেও তাতে মুক্তি ও সাফল্য আসবে না। এখানে ঈমান দ্বারা সংক্ষেপে আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, তাকদীর, পরকাল ও হিসাব-নিকাশ প্রভৃতির প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বলা হয়েছে।

২. **নেক আমল ও সৎকাজ :** এটাকেও আল্লাহ তা'আলা মুক্তির দ্বিতীয় শর্ত নিরূপণ করেছেন। কেননা ঈমানের পরিচয় দেয় আমল। বীজ ও চারার সাথে বৃক্ষের যে সম্পর্ক, ঈমান ও নেক আমলের মধ্যে সে সম্পর্ক। বীজ দ্বারা যদি চারা না গজায়, তবে বুঝতে হবে, বীজ মাটিতলায় চাপা পড়ে গেছে। অতএব, কারো ঈমানের ফলশ্রুতিরূপে নেক আমল জীবনে প্রতিফলিত না হলে বুঝতে হবে, তার গোড়ায় যে কোনো কারণ রয়েছে। সুতরাং মূল কারণ উদ্ঘাটন করে তা নিরসনের জন্য তৎপর হওয়া উচিত।

৩. **সত্যের পারস্পরিক উপদেশ :** এখানে হক শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর আভিধানিক অর্থ হলো– সত্য, স্বত্ব, অধিকার ইত্যাদি। আয়াতে সম্ভবতঃ মানুষের অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণে এবং তা আদায়করণেই পারস্পরিক উপদেশের কথা বলা হয়েছে।

৪. **ধৈর্যের পারস্পরিক নসিহত :** ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা যে মানব জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি, তা বলাই বাহুল্য। ধৈর্য অবলম্বনের কথা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতেই বর্তমান।

الصّٰلِحٰتِ **বলতে যা বুঝায় :** ঈমানের পর মানুষকে ক্ষতি হতে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য তা হলো নেক কাজ করা। আয়াতে صَالِحَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সকল প্রকার নেক ও ভালো কাজ এর মধ্যে শামিল; কিন্তু কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কোনো আমল-ই عَمَلٌ صَالِحٌ নয়, যদি তার মূলে ঈমান বর্তমান না থাকে এবং তা শরিয়ত অনুযায়ী সম্পাদিত না হয়।

এ কারণেই কুরআনে কারীমে عَمَلٌ صَالِحٌ -এর পূর্বে ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমানহীন আমলের কোনো শুভ ফল হওয়ার কথা কোথাও বলা হয়নি; অন্যদিকে ঐ ঈমান-ই গ্রহণযোগ্য যার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ আমল পেশ হয়ে থাকে। নতুবা 'আমলে সালেহ' ছাড়া ঈমান একটি মৌখিক দাবি মাত্র। আর ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য শুধু ঈমানকে উল্লেখ না করে আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরায় আমলকে শর্ত করে দিয়েছেন।

الْحَقُّ **বলতে যা বুঝায় :** وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ -এর মধ্যকার 'হক' শব্দটি বাতিলের বিপরীত সাধারণত এর দুটি অর্থ হয়ে থাকে:

১. সহীহ, ঠিক, নির্ভুল, পূর্ণ সত্য, ইনসাফ ও সুবিচার মোতাবেক ও প্রকৃত অবস্থার অনুরূপ কথা। তা ঈমান ও আকীদার কথা হোক, কিংবা বৈষয়িক কাজ সম্পর্কিত হোক।

২. হক অর্থ– অধিকার। এটা এমন অধিকার, যা যথাযথভাবে আদায় করা মানুষের উপর কর্তব্য। সে হক আল্লাহর হোক কি বান্দার, অথবা নিজের-ই অধিকার হোক না কেন, সব-ই এর মধ্যে শামিল।

৩. কারো মতে 'হক' বলতে তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ (র.) 'হক' -এর অর্থ আয়াতে 'কুরআন' হবে বলে উল্লেখ করেছেন, তবে সাধারণ অর্থ নেওয়াই উত্তম। –[ফাতহুল কাদীর]

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন– এখানে حَقٌّ দ্বারা কুরআনে কারীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর সবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ : সূরা আল-হুমাযাহ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের "هُمَزَةٌ" শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। هُمَزَة অর্থ- নিন্দুক। অত্র সূরায় নিন্দুকের ভয়াবহ পরিণতির উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। এতে ৯টি আয়াত ও ১৬১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য সূরাটি মাক্কী। বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : ইসলাম-পূর্ব যুগে জাহেলিয়াতের আরব সমাজের অর্থ পূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বিদ্যমান ছিল। এ সূরায় তার-ই বীভৎসতা ব্যক্ত করে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর কারণে মানুষ মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ-আস্বাদ, আরাম-আয়েশ ও মান-মর্যাদা অত্যধিক অর্জন করার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশি দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ও চেষ্টায় দিন-রাত তন্ময় হয়ে থাকে। সুতরাং তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে তোমাদেরকে যে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ অসৎ পথে উপার্জন এবং তার যথেচ্ছা ব্যয়ের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, জাহান্নামই হবে এ সব লোকদের চির আবাস। তাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেদিন জাহান্নামের আগুন হতে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দাহনকারী আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। কাজেই যারা ধন-সম্পদের অহমিকায় পড়ে পরনিন্দায় ও মানুষকে কটাক্ষ করার পেছনে পড়ে রয়েছে, তাদের এখন হতেই সাবধান হওয়া উচিত। এ সব অহঙ্কারী নিন্দুক ধনীদের আবাসস্থল হবে হুতামাহ নামক দোজখ।

Free@www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-হুমাযাহ মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

تِسْعُ اٰيَاتٍ : ৯ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. وَيْلٌ كَلِمَةُ عَذَابٍ اَوْ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ اَىْ كَثِيْرِ الْهَمْزِ وَاللَّمْزِ اَىِ الْغِيْبَةِ نَزَلَتْ فِيْمَنْ كَانَ يَغْتَابُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ كَاُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ وَغَيْرِهِمَا ن .

১. দুর্ভোগ অভিশাপমূলক শব্দ অথবা জাহান্নামের একটি উপত্যকা সে সকল লোকের জন্য, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে অর্থাৎ অধিক ছিদ্রান্বেষণ ও সমালোচনাকারী অর্থাৎ পরচর্চাকারী। এ আয়াতটি সে সমস্ত লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের দুর্নাম করে বেড়াত। যেমন– উমাইয়া ইবনে খালফ, অলীদ ইবনে মুগীরাহ প্রমুখ।

٢. الَّذِىْ جَمَعَ بِالتَّخْفِيْفِ وَالتَّشْدِيْدِ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ اَحْصَاهُ وَجَعَلَهٗ عُدَّةً لِحَوَادِثِ الدَّهْرِ .

২. যে সঞ্চয় করে শব্দটি তাশদীদ ও তাখফীফ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে, সম্পদ এবং একে বারংবার গণনা করে গণনা করে এবং বিপদকালীন সময় কাজে আসবে এ ধারণায় সংরক্ষণ করে।

٣. يَحْسَبُ لِجَهْلِهٖ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ جَعَلَهٗ خَالِدًا لَا يَمُوْتُ .

৩. সে ধারণা করে তার অজ্ঞতার কারণে যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে তাকে চিরস্থায়ী করে দিবে এবং সে মৃত্যুবরণ করবে না।

٤. كَلَّا رَدْعٌ لَيُنْبَذَنَّ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوْفٍ اَىْ لَيُطْرَحَنَّ فِى الْحُطَمَةِ الَّتِىْ تَحْطِمُ كُلَّ مَا اُلْقِىَ فِيْهَا .

৪. কখনো নয় এটা ভর্ৎসনা উদ্দেশ্যে সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে এটা উহ্য শপথের জবাব। অর্থাৎ সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে ভস্মকারী দোজখে যা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত সকল বস্তুকে ভস্ম করে ফেলবে।

٥. وَمَآ اَدْرٰكَ اَعْلَمَكَ مَا الْحُطَمَةُ .

৫. তুমি কি জান? তোমার কি জানা আছে? ভস্মকারী কি?

٦. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الْمُسَعَّرَةُ .

৬ এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি লেলিহান শিখাযুক্ত।

٧. الَّتِىْ تَطَّلِعُ تَشْرُفُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ الْقُلُوْبِ فَتُحْرِقُهَا وَاَلَمُهَا اَشَدُّ مِنْ اَلَمِ غَيْرِهَا لِلُطْفِهَا .

৭. যা গ্রাস করবে ভেদ করবে অন্তরসমূহ অন্তরসমূহে পর্যন্ত, তখন একে দাহন করবে। আর এর সূক্ষ্মতার কারণে তার পোড়ানোর কষ্ট অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অধিক কষ্টকর হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٨. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ جُمِعَ الضَّمِيْرُ رِعَايَةً لِمَعْنٰى كُلِّ مُؤْصَدَةٌ بِالْهَمْزَةِ وَبِالْوَاوِ بَدْلَهُ مُطْبَقَةٌ ـ

৮. নিশ্চয় এটা তাদেরকে كُلٌّ শব্দের অর্থগত দিক বিচারে বহুবচনীয় সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে, পরিবেষ্টিত করে রাখবে শব্দটি هَمْزَةٌ অথবা তদস্থলে وَاوْ দ্বারা অর্থাৎ مُطْبَقَةٌ

٩. فِيْ عَمَدٍ بِضَمِّ الْحَرْفَيْنِ وَبِفَتْحِهِمَا مُمَدَّدَةٍ صِفَةٌ لِمَا قَبْلَهُ فَتَكُوْنُ النَّارُ دَاخِلَةَ الْعَمَدِ ـ

৯. স্তম্ভসমূহে উভয় অক্ষরে পেশযোগে বা যবরযোগে শব্দটি উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। যা দীর্ঘায়িত এটা প্রথমোক্ত শব্দের صِفَتْ সুতরাং সে আগুন স্তম্ভসমূহের মধ্যে হবে।

তাহকীক ও তারকীব

اَلَّذِىْ جَمَعَ-এর মহল্লে ই'রাব : اَلَّذِىْ শব্দটি كُلٌّ হতে بَدَلٌ হয়েছে। তখন اِعْرَابٌ হবে جَرٌّ। অথবা ذَمٌّ হিসাবে মানসূব হবে। এ বাক্যটি এমন একটি গুণ যা 'কারণ'-এর স্থলাভিষিক্ত বা কাজ দেয়। -[কাবীর]

يَحْسَبُ اَنَّ الخ -এর মহল্লে ই'রাব : يَحْسَبُ اَنَّ الخ -এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. এটা جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এর কোনো মহল্লে ই'রাব নেই।

২. অথবা, جَمَعَ -এর যমীর হতে حَالٌ হয়ে এটা مَحَلاًّ مَنْصُوْبٌ হয়েছে।

"لَيُنْبَذَنَّ" তারকীবে কি হয়েছে : আল্লাহর বাণী "لَيُنْبَذَنَّ" তারকীবে উহ্য শপথের জবাব হয়েছে।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ -এর মহল্লে ই'রাব : "نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ" আয়াত উহ্য মুবতাদা "هِىَ" -এর খবর হিসাবে مَحَلاًّ مَرْفُوْعٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ : وَيْلٌ মুবতাদা, كُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ খবর। اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً الخ বদল كُلٌّ হতে। অথবা, তিরস্কারের স্থলে নসবের স্থানে, অথবা এর পূর্ববর্তীর তা'লীল বা কারণ।

يَحْسَبُ اَنَّ الخ জুমলায়ে মুস্তানাফা, পূর্ববর্তী বাক্যকে স্থিরকরণের জন্য। কেউ কেউ বলেন, جَمَعَ -এর ফায়েল হতে হাল হিসাবে নসবের স্থানে অবস্থিত।

لَيُنْبَذَنَّ الخ লাম উহ্য কসমের জবাব। অর্থাৎ وَاللّٰهِ لَا يُطْرَحَنَّ

حُطَمَةٌ পূর্বোক্ত لَيُنْبَذَنَّ -এর যরফ। এটা حَطْمٌ মূলবর্ণ হতে ইসমে ফায়েলে মুবালাগার সীগাহ। فِىْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ এটা عَلَيْهِمْ -এর যমীর হতে হাল হিসাবে নসবের স্থলে রয়েছে। অর্থাৎ كَائِنِيْنَ فِىْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ مُوْثَقِيْنَ فِيْهَا কেউ কেউ বলেন- এটা উহ্য মুবতাদার খবর। মুবতাদা হলো هُمْ অথবা مُؤْصَدَةٌ -এর সিফাত। نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ এটা উহ্য هِىَ মুবতাদার খবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে ইহকালীন ও পরকালীন কৃতকার্যতার জন্য চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর যারা এ গুণ চতুষ্টয়ের বাহক নয়, তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং অকৃতকার্য। অত্র সূরাতেও ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অকৃতকার্যতার শ্রেণি থেকে এক বিশেষ শ্রেণির উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলো, পরনিন্দুক ও অপবাদ প্রদানকারী।

শানে নুযূল : হযরত ওসমান ও ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমরা সর্বদা শুনে আসছি যে, সূরা আল-হুমাযাহ উবাই ইবনে খলফকে উপলক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা সুদ্দী বলেন, এ সূরা আখনাস ইবনে শোরায়েককে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে।

Free @ www.eilmweebly.com

ইবনে ইসহাক বলেন, উমাইয়া ইবনে খালফকে নবী করীম ﷺ এবং সাহাবীগণের নামে যখন সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে দুর্নাম ও নিন্দা করতে দেখতে পেলেন, তখন তাকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সূরাটিই অবতীর্ণ করেন। কতিপয় তাফসীরকারের মতে, এটা মুগীরা ইবনে ওলীদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আস ইবনে ওয়ায়েলকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে বলেও কোনো কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়। -[লোবাব, খাযেন, জালালাইন]

وَيْلٌ-এর অর্থ : মুফাসসিরগণ এখানে وَيْلٌ -এর দু'টি অর্থ উল্লেখ করেছেন।

১. وَيْلٌ এটা অভিসম্পাত দেওয়ার জন্য ও ধ্বংস কামনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. অথবা, এর দ্বারা জাহান্নামের একটি উপত্যকাকে বুঝানো হয়েছে।

প্রথমোক্ত মত অনুযায়ী শব্দটি মূলত ছিল وَيْ لِفُلَانٍ (অর্থাৎ অমুকের জন্য ধ্বংস বা আফসোস), و - ى ও لَامْ -কে যুক্ত করে পরবর্তী অংশকে হযফ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى 'هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ' : هُمَزَة ও لُمَزَة শব্দদ্বয় অর্থের দিক দিয়ে প্রায় সমার্থবোধক।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা পশ্চাতে দুর্নাম রটায়, অগোচরে কথা বলে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়- তাদেরকে هُمَزَة ও لُمَزَة দুই-ই বলে। অবশ্য কোনো কোনো মুফাসসির এদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন :

২. যারা পিছনে অপবাদ রটায় তাদেরকে هُمَزَة বলে এবং যারা সামনে অপবাদ রটায় তাদেরকে لُمَزَة বলে।

৩. মোকাতেল বলেন, যারা সামনে অপবাদ রটায় তাদেরকে هُمَزَة বলে, আর যারা পেছনে অপবাদ রটায় তাদেরকে لُمَزَة বলে।

৪. যারা হস্ত দ্বারা আক্রমণ করে তাদেরকে هُمَزَة বলে এবং যারা পিছনে অপবাদ রটায় তাদেরকে لُمَزَة বলে।

৫. হাসান বসরী (র.) বলেন, যে কারো সম্মুখে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে; তাকে লুমাযাহ বলা হয়; আর যে কারো পশ্চাতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে হুমাযাহ বলে।

৬. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কাতাদাহ (র.) বলেন, পরনিন্দাকারীকে 'হুমাযাহ' আর বিদ্রূপকারীকে 'লুমাযাহ' বল।

৭. হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, হাতের ইশারায় দোষ বর্ণনা ও দুঃখ দেওয়াকে হুমাযা আর জিহ্বা দ্বারা দোষ-ত্রুটি বর্ণনাকারীকে লুমাযাহ বলে।

৮. হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেন, 'হুমাযাহ' সে যে মানুষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে আর চোখের ইঙ্গিতে দোষ-ত্রুটি বর্ণনাকারীকে লুমাযাহ বলে।

৯. হযরত ইবনে কায়সান (র.) বলেন, 'হুমাযাহ' সে ব্যক্তি, যে নিজের সাথীকে কথা দ্বারা দুঃখ দেয়। আর 'লুমাযা' সে ব্যক্তি, যে চোখের বা মাথার ইশারা বা ভ্রুর ইঙ্গিতে মানুষের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে। -[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى 'اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ' : প্রথম কথাটির পর এ দ্বিতীয় কথাটি বলায় স্বতই এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে লোক অন্যদের অপমান-লাঞ্ছনার যে কাজ করে, তা তার ধনশীলতার অহমিকার কারণেই করে। جَمَعَ مَالًا -এর অর্থ হলো, সে বিপুল পরিমাণ মাল সঞ্চয় করে, আর গণনা করে রাখে- বলায় সে ব্যক্তির কার্পণ্য ও হীন মানসিকতা চোখের সামনে ভেসে উঠে।

مَالًا শব্দকে নাকেরা নেওয়ার কারণ : সম্ভাব্য দু'টি কারণে مَالٌ -কে نَكِرَة 'অনির্দিষ্ট' ব্যবহার করা হয়েছে।

১. 'মাল' এমন একটি বিশেষ্য বা নাম যা সারা দুনিয়ার সকল কিছুকে শামিল করে। অতএব, একজন মানুষের মাল দুনিয়ার সকল মালের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এ নগণ্য মাল নিয়ে মানুষ কিভাবে গৌরব এবং অহঙ্কার করে? এ কথা বুঝানোর জন্যই 'নাকেরাহ' ব্যবহার করা হয়েছে।

২. মালের অপকারিতা এবং ক্ষতিকে বিরাট করে দেখানোর জন্য 'নাকেরাহ' নেওয়া হয়েছে। মাল মানুষকে চরম অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম হাতিয়ার। অতএব, একজন জ্ঞানী এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কিভাবে মাল নিয়ে বড়াই ও অহঙ্কার করতে পারে? -[কাবীর]

وَعَدَّدَهٗ শব্দের বিভিন্ন দিক : عَدَّدَ -এর অর্থ নিরূপণে কয়েকটি দিক দেখা যায়। যেমন- ক. عَدَّدَ শব্দটি اَلْعُدَّة হতে নির্গত, অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূত করা, গুদামজাত করা। খ. عَدَّدَ অর্থ- اَحْصٰى গণনা করা। তাশদীদযুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে আধিক্য বুঝানোর জন্য গ. عَدَّدَ অর্থ كَثَّرَ অর্থাৎ অধিক করে এবং বাড়ায়। সবগুলো অর্থকে একসাথে আনলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, "যে মাল জমায় এবং পুঞ্জীভূত ও গুদামজাত করে, বারবার গণনা করে এবং অধিক মাল বাড়ানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।" -[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَخْلَدَهٗ -এর অর্থ : اَخْلَدَهٗ -এর অর্থ হচ্ছে তাকে চিরস্থায়ী করবে এবং চিরন্তন জীবন দান করবে অর্থাৎ তাকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখবে ও রক্ষা করবে। অপর অর্থ এ হতে পারে যে, তার এ সম্পদ কোনো দিন হাত ছাড়া হবে না; বরং চিরদিন তার কাছে থাকবে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় ও গুনে গুনে রাখার কাজে এতই নিমগ্ন ও তন্ময় হয়ে পড়েছে যে, সে লোক মৃত্যুর কথাই ভুলে গেছে। এ সব বিপুল অর্থ-সম্পদ ছেড়ে রিক্ত হস্তে একদিন যে মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হবে এবং আল্লাহর নিকট পৌঁছতে হবে, তা তার স্মৃতি হতে মুছে গেছে। ভুলেও তার মনে এর কথা জাগরিত হয় না। ভেবে নিয়েছে আমার সম্পদ নেয় কে? চিরদিনই তা আমার কাছে থাকবে। −[কাবীর]

لَيُنْبَذَنَّ -তে হিকমত : আল্লাহ তা'আলা نَبْذ হতে উদ্ভূত ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। কেননা, نَبْذ শব্দের মধ্যে নিক্ষেপণের অর্থের সাথে সাথে اِهَانَة বা অপমান ও ঘৃণা রয়েছে। যেহেতু কাফের দল শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে সেহেতু তাদের জন্য এমন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে অপমান এবং তিরস্কার রয়েছে। −[কাবীর]

حُطَمَة -এর অর্থ : حُطَمَة শব্দটির আভিধানিক অর্থ− ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা। জাহান্নামের বিভিন্ন প্রকার অগ্নির একটি প্রকার। যেমন− سَقَرْ ও لَظٰى দুই শ্রেণির আগুনের নাম। কেউ কেউ বলেন, হুতামা হচ্ছে জাহান্নামের দ্বিতীয় স্তরের নাম। এই আগুনকে হুতামা নামকরণের কারণ হলো, তা দেহের হাড় ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হবে− হে নিন্দুকগণ! তোমরা মানুষের মাংস আহার করছ এবং তাদের মান-সম্মানকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছ। তোমাদের পিছনেও বিরাট হুতামা নামে এক অনলকুণ্ড রয়েছে, যা তোমাদের মাংসকে পুড়িয়ে হাড়গুলো গুড়াগুড়া করবে। −[কাবীর, খাযেন]

আগুনকে 'আল্লাহর আগুন' বলার কারণ : উপরিউক্ত ছয় নম্বর আয়াতে হুতামাকে 'আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে জাহান্নামকে আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন আর কোথাও বলা হয়নি। এখন তাকে আল্লাহর আগুন বলায় যেমন তার ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে, অপরদিকে এটাও প্রকাশ পায় যে, জাগতিক জীবনে ধন-সম্পদের নাগাল পেয়ে যারা গর্ব করে এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে ও দুর্নাম করে বেড়ায়, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা খুব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। তিনি তাদেরকে হুতামা নামক অগ্নি দ্বারা শাস্তি দিবেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ" : সাত নম্বর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, হুতামা নামক আগুন তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। মূলে تَطَّلِعُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ উদয় হওয়া ও পৌঁছে যাওয়া, আর দ্বিতীয় অর্থ খবর পাওয়া, অবহিত হওয়া। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম হয়; হুতামা নামক অগ্নির দহন-ক্রিয়া তাদের হৃদয়কেও দহন করতে ছাড়বে না। এখানে দেহের অন্যান্য অঙ্গসমূহকে বাদ দিয়ে শুধু হৃদয় বা অন্তরের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো− হৃদয়ই হচ্ছে সমস্ত কিছুর মূল। কুফরি-বেঈমানী, বাতিল আকীদা ও চিন্তাধারা সর্বপ্রথম এ স্থানেই উদয় হয়। সুতরাং এ কারণেই আল্লাহ সে নির্দিষ্ট স্থানটির কথা উল্লেখ করে বুঝাচ্ছেন যে, যে স্থানটি কুফরি ও দুষ্ট চিন্তা-ধারার উৎসমূল, সে স্থানটিতে হুতামা নামক আগুন হানা দিবে। −[কাবীর]

قَوْلُهٗ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ : কাফেরদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পর চিরদিনের জন্য তার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে তারা তা হতে বের হতে পারবে না এবং দোজখের উত্তাপও বের হতে পারবে না।

হযরত শাহ আব্দুল আযীজ (র.) লিখেছেন, দোজখীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ আগুন পৌঁছে দেওয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যাদের জন্য দোজখের চিরস্থায়ী শাস্তির সিদ্ধান্ত হবে এবং যখন শুধু তারাই দোজখে থাকবে তখন দোজখীদেরকে লৌহ নির্মিত সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হবে। তারপর সে সিন্ধকগুলোকে বন্ধ করে দোজখের নিম্নদেশে নিক্ষেপ করা হবে। কেউ অন্যের আজাবকে দেখতে পাবে না। −[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهٗ تَعَالٰى "فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ" : এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তাদেরকে হুতামার অনল গর্তে নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর তাতে স্থাপিত স্তম্ভের সাথে তাদেরকে বেঁধে রাখবেন। তখন তারা গলদেশে লোহার জিঞ্জির পরিহিত থাকবে এবং অনলকুণ্ডের দরওয়াজাগুলো আবদ্ধ করে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন− عَمَد দ্বারা প্রকাণ্ড কীলকের কথা বলা হয়েছে, যা জাহান্নামীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়ে তার উপর লোহার কীলক বসানো হবে, যার ফলে তারা জাহান্নামের উত্তাপে বের হওয়ার চেষ্টা করে বের হতে পারবে না। এরূপ অভিমতও পাওয়া যায় যে, জাহান্নামের মধ্যে কতগুলো লম্বা স্তম্ভ হবে, যার সাথে জাহান্নামীগণকে বেঁধে রাখা হবে। −[খাযেন]

* তাফসীরকার হযরত কাতাদাহ (র.) বলেছেন, এ খুঁটিগুলো দ্বারা দোজখের মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।
* হযরত মোকাতেল (রা.) বলেছেন, দোজখীদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করার পর দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর কেউ তাদের নিকট যেতে পারবে না। −[নূরুল কোরআন]

سُوْرَةُ الْفِيْلِ : সূরা আল-ফীল

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে তার প্রথম আয়াতের اَلْفِيْل শব্দ অবলম্বনে। اَصْحَابُ الْفِيْلِ অর্থ– হস্তির অধিপতি। এটা দ্বারা একটি হস্তিসজ্জিত সেনাবাহিনীর কথা বুঝানো হয়েছে এবং তার পরাজয় কিভাবে হয়েছিল গোটা সূরায় তা-ই স্থান পেয়েছে। এ কারণেই সূরাটির নাম যথাযথ হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : তাফসীরকারকদের সর্বসম্মত মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুমিত হয় যে, এটা মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম।

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ : ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইয়েমেনের ইহুদি শাসক যুনাওয়াস তথাকার খ্রিস্টানদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে-ধ্বংসপ্রায় করে ফেলে। এতে পার্শ্ববর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসকগণ খুব ক্ষুব্ধ হয়। এরই প্রতিশোধে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনের উপর অভিযান চালিয়ে আবিসিনিয়ার শাসকগণ ইয়েমেনের হিময়ারী সরকারের পতন ঘটায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। এ অভিযানের প্রধান নায়ক ছিল এরিয়াত এবং তার সহকারী ছিল আবরাহা। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আবরাহা এরিয়াতকে হত্যা করে ইয়েমেনের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। আবিসিনিয়া শাসকদের ইয়েমেন দখল করার পিছনে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি কার্যকর থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তারা দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ধর্মীয় প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটি বাহানা মাত্র। আর সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো আরবের সাথে পূর্ব আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক জলপথ ও স্থলপথের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা শত শত বছর ধরে আরবগণ এ পথে যাতায়াত করে প্রভূত মুনাফা লাভ করে আসছিল। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। ইয়েমেন দখল করার পূর্বে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক পথটি তারা রোমানদের সহায়তায় দখল করে নিয়েছিল।

এখন লক্ষ্য হলো, শাতিল আরব হতে মিসর ও সিরিয়া গমনের স্থলপথ। পথটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল ইয়েমেনের আবরাহা সরকারের মূল উদ্দেশ্য– কিন্তু এ উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে আবরাহা নতুন এক ফন্দি করল। সে আরবদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান-মর্যাদা বিলীন করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের জন্য ইয়েমেনের সানয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের গীর্জা নির্মাণ করল এবং সেখানে হজের মৌসুমে দুনিয়ার সমস্ত লোককে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাল। কিন্তু ইয়ামেনের খ্রিস্টান লোক ব্যতীত হজের মৌসুমে অন্য কোনো এলাকার লোকের সমাগম না দেখতে পেয়ে সে ভাবল, মক্কার ঘরই হচ্ছে এর অন্তরায়। মক্কার কা'বা ঘরকে ধ্বংস করা ব্যতীত সানয়ায় এ আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সে সদর্পে ঘোষণা করল, আমি মক্কার হজ অনুষ্ঠান আগামী বৎসর হতে এ সানয়ায়ই করতে চাই। সুতরাং এ জন্য, আমার প্রথম কর্তব্য হবে–মক্কার কা'বা ঘরকে ধূলিসাৎ করে ফেলা। এ ঘোষণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। এ উদ্দেশ্যে সে ষাট হাজার দুর্ধর্ষ সেনার একটি বিরাট বাহিনী সাজাল। ঐ বাহিনীতে ১৩টি যুদ্ধ-হস্তিও ছিল। অতঃপর সে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল।

আবরাহার বাহিনী কা'বা ধ্বংসের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলল। পথে দু'টি গোত্র তাদেরকে বাধা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা এ বিশাল বাহিনীর শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে না পেরে পরাজয় বরণ করল। আবরাহা বাহিনী তায়েফে উপনীত হলে তথাকার লোকেরা নিজেদের 'লাৎ মন্দির' ভেঙ্গে ফেলার আশঙ্কা করল। কিন্তু তারা এত বড় বিরাট শক্তির মোকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকতে পারবে না, এ ধারণায় তাদের একটি প্রতিনিধি আবরাহার নিকট গিয়ে বলল– আপনার মূল লক্ষ্য হলো কা'বা-গৃহ। আপনি আমাদের লাত-মন্দির ধ্বংস করবেন না, আমরা আপনার মক্কায় পৌছার পথ প্রদর্শনের ভূমিকা পালন করবো, আবরাহা এতে সম্মত হলো। আবূ রিগাল নামে এক ব্যক্তিকে তার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করল; কিন্তু আল-মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌছলে– আবূ রিগাল মারা গেল।

সেখান হতে আবরাহা একটি অগ্রবর্তী দল পাঠাল। তারা তেহামা হতে কুরাইশদের অনেক পালিত পশু লুণ্ঠন করে নিয়ে আসল। তারা মহানবী ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবেরও দুইশত উষ্ট্র লুট করে নিয়ে আসে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

আবরাহা বাহিনী আস-সিফাহ (আরাফাহ পর্বতমালার নিকটবর্তী স্থান) নামক স্থানে পৌঁছে কুরাইশদের নিকট দূত পাঠায়। দূত বলল, আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, কা'বা ঘর ধ্বংস করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না আসলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো না। জবাবে কুরাইশ সরদার আব্দুল মুত্তালিব বললেন– তোমাদের সাথেও আমাদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা নেই। কা'বা ঘরের যে মালিক, তিনি তার ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলল, তবে আপনি আমার সাথে আমাদের সেনাপতি আবরাহার নিকট চলুন। আব্দুল মুত্তালিব তাঁর কথায় আবরাহার নিকট গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুব সুশ্রী বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তার পাশে বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার যেসব উট লুট করে আনা হয়েছে তা ফেরত দিন। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এ কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোনো মর্যাদা থাকল না। কেননা পিতৃ ধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার জন্য আপনি কোনো কথাই বললেন না। তিনি বললেন, আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট আবেদন করতে এসেছি। এ ঘরের ব্যাপার আলাদা। এর একজন রব আছেন, তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা বলল, সে আমার আঘাত হতে তা রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, ঐ ব্যাপারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তা আপনি জানেন, আর তিনি [এ ঘরের মালিক] জানেন। এ কথা বলে তিনি আবরাহার নিকট হতে ফিরে আসলেন। পরে সে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায়, আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বলেছেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের নিকট হতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। কিন্তু আবরাহা তাতে রাজি হলো না।

আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সেনানিবাস হতে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সাধারণ হত্যাকাণ্ড হতে বাঁচার জন্য বংশ-পরিবার নিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। পরে তিনি কুরাইশদের কতিপয় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে হারাম শরীফে উপস্থিত হন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর সেবকদের হেফাজত করেন। সেদিন কোনো দেব-দেবীর নিকট নয়; বরং একমাত্র আল্লাহর নিকটই তারা দোয়া করেছিলেন। ইবনে হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে আব্দুল মুত্তালিবের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা উল্লেখ করেছেন।

لَاهُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ * رِحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكَ
لَايَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ * وَمَجَالُهُمْ غَدًا وَمَجَالُكَ
اِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ * وَقِبْلَتَنَا فَامْرٌ مَا بَدَا لَكَ

হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে,
আপনিও রক্ষা করুন আপনার নিজের ঘর।
কাল যেন তাদের ক্রুশ এবং চেষ্টা-যত্ন আপনার ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় জয়ী হতে না পারে।
আপনি যদি তাদেরকে এবং আমাদের কেবলা ঘরকে এমনিই ছেড়ে দিতে চান, তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করুন। সুহাইলী 'রওজুল উনুফ' নামক গ্রন্থে এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কবিতাংশও উদ্ধৃত করেছেন–

وَانْصُرْنَا عَلٰى اٰلِ الصَّلِيْبِ * وَعَابِدِيْهِ الْيَوْمَ لَكَ

ক্রুশধারী ও তার পূজারীদের মোকাবিলায় আমি আপনাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোনো আশা রাখি না।
ইবনে জারীর আব্দুল মুত্তালিবের দোয়া প্রসঙ্গে পড়া নিম্নোক্ত ছত্র দু'টিরও উল্লেখ করেছেন।

يَا رَبِّ لَا اَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَا * يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا
اِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا * اِمْنَعْهُمْ اَنْ يُّخْرِبُوْا قِرَاكَا

"হে আমার প্রভু! তাদের মোকাবিলায় আমি তোমাকে ব্যতীত আর কারো নিকট কোনো কিছু আশা করি না। হে প্রভু! তুমি তোমার ঘরকে রক্ষা করো। এ ঘরের শত্রুগণ, তোমার শত্রু। তোমার জনবসতি তাদের আক্রমণ হতে মুক্ত রাখো।"

আব্দুল মুত্তালিব এ প্রার্থনা করার পর স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে পর্বতমালায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পরদিন আবরাহার বাহিনী মুহাসসির (মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী মুহাস্‌সাব উপত্যকার নিকবর্তী স্থান) নামক স্থান হতে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বাহিনীর অগ্রে আবরাহার হস্তিটিকে পরিচালনা করল। কিঞ্চিৎ দূরে যাওয়ার পরই হস্তিটি বসে পড়ল, কোনো ক্রমেই অগ্রসর হতে চাইল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

না। মারপিট দেওয়া হলো, তবুও হাতিটি নড়ল না। মুখ ফিরিয়ে চালনার চেষ্টা করা হলে সে দিকে চলল; কিন্তু যখনই কা'বা অভিমুখী হয়, তখনই হাতিটি বসে পড়ে। তারপর শুরু হলো আবরাহা বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব নাজিলের পালা। লোহিত সাগরের দিক হতে ঝাঁকে ঝাঁকে অপরিচিত নতুন পক্ষীকুল এসে তাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর বর্ষণ করতে লাগল। কঙ্করগুলো আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার তেজস্ক্রিয়া ছিল খুব বেশি। যার দেহে পড়ত, তার দেহেই জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি হতো। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত গোটা দেখা দিত। যেখানে পড়ত সেখান সরাসরি বিপরীত দিক দিয়ে বের হয়ে যেত। দৈহিক জ্বালা-পোড়া, বসন্ত গোটা উদ্গমন ও কঙ্কর বর্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল এবং সে স্থানেই অনেকে মৃত্যুবরণ করল। আর পথে পথেও অনেকে পড়ে রইল। আবরাহাও কঙ্কর আঘাতে জখম হয়ে কোনো মতে খাসয়াম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে ছিল। অতঃপর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এটাই আসহাবুল ফীলের ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এ ঘটনা সমগ্র আরবদেশে ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ দুনিয়ার বুকে স্বীয় অসীম কুদরতের যৎকিঞ্চিৎ নজির স্থাপন করলেন। মক্কার লোকগণ এ ঘটনায় আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। আরবগণ এ ঘটনার পর হতে দশ বছর পর্যন্ত প্রতিমা পূজা ছেড়ে নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করত। এ বছরটি আরবদের নিকট 'হস্তি বছর' নামে সুপরিচিত হয়ে গেল। আবরাহার হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার ঘটনাটি যে মাসে সংঘটিত হয়, তা ছিল মহররম মাস। মহানবী ﷺ-এর জন্মের দুই মাস পূর্বে। দুই মাস পরই ১২ই রবিউল আউয়াল কাবার প্রহরী ও বিশ্বমানবের মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ মুজতবা আহমদ মুস্তফা ﷺ ধরার বুকে তাশরীফ আনেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটিকে নিয়ে সেকালের বহু বিখ্যাত কবিও অনেক কবিতা-চরণ লিখে ঘটনাটিকে অমর করে রেখেছেন। পক্ষীকুলের নিক্ষিপ্ত কঙ্করগুলোও নিজেদের নিকট স্মৃতি স্বরূপ রেখে ছিল। তাদের বিপুল রণসম্ভার ও খাদ্য সামগ্রী কুরাইশদের হস্তগত হলো। এ সূরা নাজিল হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনার অনেক দর্শকই তখন বর্তমান ছিল। মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান। ঘটনাটি আরবের লোকদের মুখেমুখেই লেগে ছিল। এ কারণেই সূরায় বিস্তারিত ঘটনা আলোচিত না হয়ে যেটুকু মক্কাবাসীদের সম্মুখে আলোচনার প্রয়োজন ছিল, তা-ই আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শাস্তিদানের বিবরণটি। এ সূরা অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশসহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে ইসলামি দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বিরোধিতা হতে বিরত থাকবারই প্রকারান্তরে আহবান জানিয়েছেন। -[খাযেন, কাছীর, মু'আলিম, হোসাইনী]

সূরাটির সারকথা : সূরা আল-ফীলে সংক্ষিপ্তভাবে আবরাহার আক্রমণ এবং ধ্বংস আলোচিত হয়েছে। কেননা মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বর্নিতা সকলের নিকটই এ ঘটনা জানা ছিল। আরবের কোনো ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। সমগ্র আরববাসীদের ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হেফাজতের কার্যটি কোনো দেব-দেবী কর্তৃক হয়নি। এটা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহরই অবদান। এ কারণেই একাধারে কয়েকটি বছর পর্যন্ত কুরাইশের লোকেরা এ ঘটনার দ্বারা এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা এ সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। এ ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কুরাইশদের এবং সাধারণভাবে আরববাসীদের মনে চিন্তার খোরাক দেওয়া হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা অন্যান্য সব মা'বূদ পরিত্যাগ করার এবং একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগি করার দাওয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সাথে সাথে এ কথাও যেন বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর এ সত্য দীনের দাওয়াতকে যদি তারা জোরপূর্বক দমন করতে চেষ্টা করে, তাহলে যে আল্লাহ হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তারা সে আল্লাহর ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে পড়ে চিরতরে ভস্ম হয়ে যেতে পারে

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-ফীল মক্কায় অবতীর্ণ

خَمْسُ اٰيَاتٍ : ৫ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَلَمْ تَرَ اِسْتِفْهَامُ تَعْجِيْبٍ اَىْ اِعْجَبْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ هُوَ مَحْمُوْدٌ وَاَصْحَابُهُ اَبْرَهَةُ مَلِكُ الْيَمَنِ وَجَيْشُهُ بَنٰى بِصَنْعَاءَ كَنِيْسَةً لِيُصْرِفَ اِلَيْهَا الْحَاجَّ مِنْ مَكَّةَ فَاَحْدَثَ رَجُلٌ مِنْ كِنَانَةَ فِيْهَا وَلَطَخَ قِبْلَتَهَا بِالْعَذِرَةِ اِحْتِقَارًا بِهَا فَحَلَفَ اَبْرَهَةُ لَيَهْدِمَنَّ الْكَعْبَةَ فَجَاءَ مَكَّةَ بِجَيْشِهِ عَلٰى اَفْيَالٍ مُقَدَّمُهَا مَحْمُوْدٌ فَحِيْنَ تَوَجَّهُوْا لِهَدْمِ الْكَعْبَةِ اَرْسَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا قَصَّهُ فِىْ قَوْلِهِ .

১. আপনি কি দেখেননি? اِسْتِفْهَامْ টি এখানে বিস্ময় বুঝানোর জন্য হয়েছে। অর্থাৎ আপনি বিস্মিত হবেন কিরূপ আচরণ করেছেন আপনার প্রভু হস্তিওয়ালাদের সাথে। হস্তির নাম ছিল মাহমূদ। এর মালিক ছিল ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা এবং তার সৈন্যবাহিনী। আবরাহা সানয়ায় একটি গীর্জা নির্মাণ করেছিল। যাতে মক্কা হতে হাজীদেরকে সেদিকে ফিরাতে পারে [অর্থাৎ যাতে লোকজন মক্কায় হজ না করে তথায় গিয়ে হজ পালন করে]। তখন বনূ কেনানার এক ব্যক্তি একে অবমাননা করার জন্য তার ভিতরে ঢুকে পায়খানা করে এবং তাকে মলমূত্র দ্বারা কদর্য করে দেয়। এতে আবরাহা ক্ষুব্ধ হয়ে কা'বাকে ধ্বংস করার শপথ করে। সে তার সেনাবাহিনী ও কতিপয় হস্তিসহ মক্কায় আক্রমণ করে। সে বাহিনীর সম্মুখ ভাগে ছিল মাহমূদ [নামক হাতি]। সুতরাং যখন তারা কা'বা ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হলো তখন তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা [সে বাহিনী] প্রেরণ করেন যার উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

٢. اَلَمْ يَجْعَلْ اَىْ جَعَلَ كَيْدَهُمْ فِىْ هَدْمِ الْكَعْبَةِ فِىْ تَضْلِيْلٍ خَسَارٍ وَهَلَاكٍ .

২. তিনি কি করে দেননি? অর্থাৎ অবশ্যই করে দিয়েছেন। তাদের প্রচেষ্টাকে কা'বা ধ্বংসের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ব্যর্থ ও ধ্বংস।

٣. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ جَمَاعَاتٍ قِيْلَ لَا وَاحِدَ لَهُ وَقِيْلَ وَاحِدُهُ اِبُّوْلٌ اَوْ اِبَّالٌ اَوْ اِبِّيْلٌ كَعُجُّوْلٍ وَمِفْتَاحٍ وَسِكِّيْنٍ .

৩. আর তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাদের উপর পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে কেউ কেউ বলেছেন, اَبَابِيْلَ শব্দের একবচন নেই। কারো কারো মতে, এর একবচন اِبُّوْلٌ বা اِبَّالٌ অথবা اِبِّيْلٌ যেমন عَجُّوْلٌ ، مِفْتَاحٌ ও سِكِّيْنٌ -

٤. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ طِيْنٍ مَطْبُوْخٍ .

৪. যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল কঙ্কর পাকা মাটি।

Free @ www.eilm.weebly.com

৫. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولٍ كَوَرَقِ زَرْعٍ اَكَلَتْهُ الدَّوَابُّ وَدَاسَتْهُ وَاَفْنَتْهُ اَىْ اَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلَّ وَاحِدٍ بِحَجَرَةِ الْمَكْتُوْبِ عَلَيْهِ اِسْمُهُ وَهُوَ اَكْبَرُ مِنَ الْعَدَسَةِ وَاَصْغَرُ مِنَ الْحِمَّصَةِ يَخْرِقُ الْبَيْضَةَ وَالرَّجُلَ وَالْفِيْلَ وَيَصِلُ اِلَى الْاَرْضِ وَكَانَ هٰذَا عَامَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ.

৫. ফলে তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দিলেন, অর্থাৎ এমন শস্য পত্রে করে দিয়েছেন যা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করেছে, একে মেড়েছে ও ধ্বংস করে ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে সে কঙ্কর দ্বারা ধ্বংস করেছেন, যার মধ্যে তার নাম লিখিত ছিল। আর সে পাথরটির আকার ছিল ডাল অপেক্ষা বড় এবং চনা অপেক্ষা ছোট। এটা লোহার টুপী, ব্যক্তি ও হাতির শরীর ভেদ করে ভূমিতে পতিত হতো। আর এ ঘটনাটি নবী করীম ﷺ -এর জন্মের বছর সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মানুষের নৈতিক দুর্বলতার উল্লেখ রয়েছে। এই মর্মে যে, যারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করবে, মানুষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করবে, তাদের জন্য পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আর অত্র সূরায় এ কথা যোগ করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি করবে এবং দীন ইসলামের সাথে শত্রুতা করবে তাদের শাস্তি যে পরকালেই হবে তা নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর তাদের অন্যায় আচরণই হবে তাদের ধ্বংসের কারণ। যেমন ইয়েমেনের রাজা আবরাহাকে আল্লাহ তা'আলা তার বিরাট সৈন্য ও হস্তিবাহিনীসহ ক্ষণিকের মধ্যে ধ্বংস করেছিলেন। -[নূরুল কোরআন]

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ الخ আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে? : اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ الخ-এর মধ্যে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। মূলত শুধু নবী করীম ﷺ বা কুরাইশই নয়; বরং সমস্ত আরববাসীকে লক্ষ্য করেই, তুমি কি দেখনি? বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে ও পরবর্তী কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা তদানীন্তন আরবের সব লোকই এ ঘটনাটি জানত। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে "اَلَمْ تَرَ" 'তুমি কি দেখনি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর দ্বারা মূলত সাধারণ লোকদেরকে কিছু বলাই উদ্দেশ্য।

এ স্থলে 'দেখনি' কথাটির তাৎপর্য এই যে, সে সময় মক্কা, মক্কার আশপাশ ও আরবের বিশাল অঞ্চলে, মক্কা হতে ইয়েমেন পর্যন্ত এমন বহু সংখ্যক লোক জীবিত ছিল, যারা নিজেদের চোখে হস্তিবাহিনীর ঘটনাটি দেখেছিল। কেননা এ ঘটনাটি ঘটেছিল সে সময়ের মাত্র ৪০/৪৫ বছর পূর্বে। সারা আরব প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হতে এ ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে পেরেছিল। ফলে এটা সকলের নিকট নিজ চোখে দেখা ঘটনার মতোই সন্দেহাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

اَلَمْ تَعْلَمْ 'আপনি কি জানেননি' না বলে اَلَمْ تَرَ বলার কারণ : এখানে সম্বোধিত ব্যক্তি যদি বিশেষ করে নবী করীম ﷺ হন, আর দেখা দ্বারা অন্তরের সাথে দেখা উদ্দেশ্য হয় অথবা যদি সম্বোধিত ব্যক্তি ব্যাপক হয় আর দেখা দ্বারা অন্তরের সাথে দেখা বা বাহ্যিকভাবে দেখা- যা-ই উদ্দেশ্য হোক, তাহলে কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না; কিন্তু দেখা দ্বারা যদি বাহ্যিকভাবে দেখা উদ্দেশ্য হয়, আর সম্বোধিত ব্যক্তিও বিশেষ করে নবী করীম ﷺ হন, তাহলে অবশ্য প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নবী করীম ﷺ তো তখন বিদ্যমান ছিলেন না, কিভাবে তিনি দেখবেন? 'দেখা' না বলে 'জানা' শব্দ ব্যবহার করা দরকার ছিল। এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়-

ঘটনাটি অতীব নিকবর্তী হওয়ার কারণে তার অনেক নিদর্শন তখনও অবশিষ্ট রয়েছিল। যেসব ঘটনার নিদর্শন বর্তমান থাকে সে সকল ঘটনাকে উপস্থিত ঘটনার পর্যায়ে ফেলানো হয়ে থাকে।

অথবা, ব্যাপারটি খবরে মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছেছে। আর খবরে মুতাওয়াতিরের মাধ্যমে যে ইল্‌ম অর্জিত হয়, তা দেখার সমতুল্য হওয়ার কারণে 'দেখা' বলা হয়েছে। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

خَلَقَ - فَعَلَ এবং عَمِلَ-এর মধ্যে পার্থক্য : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ আয়াতে فَعَلَ ব্যবহার করা হয়েছে। عَمِلَ অথবা خَلَقَ বলা হয়নি। কেননা خَلَقَ কোনো কাজ শুরুতে সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। আর عَمِلَ শব্দটি তলবের পরে ব্যবহৃত হয়। فَعَلَ শব্দটি আম –সাধারণত উক্ত সব অর্থকে শামিল করে। অতএব, فَعَلَ-এর মধ্যে خَلَقَ-এর বৈশিষ্ট্য এভাবে পাওয়া গেছে যে, আল্লাহ নতুন করে আবাবীল পাখি সৃষ্টি করেছেন। আর عَمِلَ-এর অর্থও পাওয়া যায়। কেননা হস্তিদলকে তাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করিয়েছেন–কুরাইশদের দোয়ার মাধ্যমে।

এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহার না করে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা উক্ত তিনটি শব্দের অর্থকে শামিল করে। –[কাবীর]

আসহাবুল ফীলের পরিচয় : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে আগমনকারী ইয়েমেনের বিরাটকায় হস্তিবাহিনীকেই আসহাবুল ফীল নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো এই– ইয়েমেনের খ্রিস্টান শাসক আবরাহা কা'বা ঘরের অনুরূপ সানয়ায় একটি গীর্জা তৈরি করে তথায় লোকদেরকে প্রতিবছর জিলহজ মাসে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাল। আসল ইচ্ছা ছিল কা'বা-ঘরের বিকল্পরূপে খ্রিস্টানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠা করা; কিন্তু তার আহ্বানে আরবের লোকেরা সাড়া দিল না। ফলে সে কা'বা ঘরকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় ঘোষণা করল। অতঃপর ষাট হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী এবং তেরোটি যুদ্ধ-হস্তিসহ কা'বা ঘর আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলো। পথে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে কা'বার অনতিদূরে এসে শিবির স্থাপন করল। মক্কার লোকগণ এ বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস করল না। তাদের সর্দার আবদুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের দরজার কড়া ধরে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর ঘর এবং এর খাদেমগণকে আক্রমণকারীদের হাত হতে রক্ষার জন্য দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য এসে গেল এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে তাদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করল। আর তারা এর আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হলো। এটাই হচ্ছে সূরাটির সারকথা।

أَصْحَابِ الْفِيلِ বলার কারণ : এখানে أَصْحَابُ الْفِيلِ বলা হয়েছে أَرْبَابُ الْفِيلِ বা مِلَاكُ الْفِيلِ বলা হয়নি। কেননা أَصْحَابٌ শব্দটি صَاحِبٌ-এর বহুবচন, صَاحِبٌ শব্দটি একই জাতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা উক্ত শব্দটি এ জাতির ব্যাপারে ব্যবহার করে বুঝাচ্ছেন যে, তারা হাতির জাতি বৈ কিছু নয়। কেননা তাদের মধ্যে পশুত্ব, নির্বুদ্ধিতা এমন পর্যায়ে বর্তমান ছিল যে, তারা হাতিকেও ছাড়িয়ে গেছে। এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, যখন مُصَاحَبَةٌ বা সাথীত্ব দু' ব্যক্তির মধ্যে হয়ে থাকে, তখন তুলনামূলক মর্যাদায় যে কম হয় তাকে صَاحِبٌ বলা হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথীদেরকে صَحَابَةٌ বলা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে صَاحِبٌ বলা হয় না। এমনিভাবে ঐ জাতিকে হাতির সাথী বলা হয়েছে, যারা মানুষ হয়ে হাতির أَصْحَابٌ হয়েছে এবং তারা মর্যাদার দিক থেকে হাতির চেয়ে কম। –[কাবীর]

كَيْدَهُمْ-এর তাৎপর্য : كَيْدٌ শব্দের অর্থ হলো– কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে গোপনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একেই বলা হয় ষড়যন্ত্র বা কৌশল গ্রহণ; কিন্তু ইয়েমেনের শাসক আবরাহা তো গোপন কোনো কিছু করেনি। তার কা'বা ঘর ধ্বংস করার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ছিল ঘোষিত বিষয়। আর এ উদ্দেশ্যেই সে ষাট হাজার সেনার একটি বিরাট বাহিনীসহ রওয়ানা হয়েছিল; কিন্তু কা'বা ঘর ধ্বংস করার পাশাপাশি তার আর যে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ছিল, তা সে প্রকাশ করেনি বটে– তা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সে চেয়েছিল কা'বা বিধ্বস্ত করে মক্কা ও এর আশেপাশের লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার পর দক্ষিণ আরবের সিরিয়া ও মিসরগামী স্থল পথটিকে আবিসিনিয়ার করতলগত করা। এ পথটি তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলেই সমগ্র আরবের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হবে। আর কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলে এ গোপন উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণে যে কোনোই বাধা থাকত না, তা সন্দেহাতীত। উপরিউক্ত كَيْدٌ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের এ গোপন উদ্দেশ্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ "تَضْلِيلٍ" : تَضْلِيلٌ শব্দটি ضَلَّ ধাতু হতে নির্গত। বাবে تَفْعِيلٌ-এর সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে– বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যচ্যুত করা। আরবগণ তীর নিক্ষেপ স্থলে বলে তার তীরটি ভ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার তীরটি লক্ষ্যস্থানে আঘাত হানতে সক্ষম হয়নি–ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে। এখানেও ইয়েমেন শাসকের অভিযান ও ষড়যন্ত্রকে নিষ্ফল ও ব্যর্থকরণের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন, সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে– وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ অর্থাৎ কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। –[ফাতহুল কাদীর, কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى طَيْرًا اَبَابِيْلَ : "طَيْرًا" শব্দের অর্থ হলো– পাখি। আর اَبَابِيْلَ-এর অর্থ– جَمَاعَتٌ অর্থাৎ বহু সংখ্যক, বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দল। যা বিভিন্ন দিক হতে একই লক্ষ্য পানে ছুটে আসে, তা মানুষের দল হোক, অথবা জন্তু-জানোয়ারের। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, اَبَابِيْلَ এক ধরনের পাখির নাম। মুফাসসিরগণ হতে طَيْرًا اَبَابِيْلَ-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ক. ইকরামা ও কাতাদাহ (র.) বলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি লোহিত সাগরের দিক হতে এসেছিল। ইকরামাহ (র.) এটাও বলেছেন যে, শিকারি পাখির মাথার মতোই ছিল এ পাখিগুলোর মাথা।

খ. হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেন, এ ধরনের পাখি না পূর্বে কখনো দেখা গেছে, না পরে কখনো দেখা গেছে। এটা না নজদের পাখি ছিল, না হেজাজের, না তেহামার, তা কেউই বলতে পারে না।

গ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তাদের চক্ষু পাখির মতোই ছিল, আর পাঞ্জা ছিল কুকুরের মতো। মোটকথা, তাদের আকার ও রং যাই হোক না কেন, তারা যেদিক হতেই আসুক না কেন, তারা ছিল আল্লাহর সাহায্যেরই বহিঃপ্রকাশ। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالَى بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ : حِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ অর্থাৎ সিজ্জীল ধরনের পাথর। حِجَارَةٌ-এর অর্থ হলো- পাথর। তবে سِجِّيْل-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, سِجِّيْل শব্দটি سَنگ ও گِيل এ দু'টি ফারসি শব্দ মিলিয়ে আরবি বানানো হয়েছে। এটা দ্বারা সে পাথরকে বুঝানো হয়েছে- যা মাটির গাড়া হতে বানানো হয়েছে ও আগুনে জ্বালিয়ে শক্ত করা হয়েছে। খোদ কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াত হতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সূরা اَلذَّارِيَاتُ-এর ৩৩নং আয়াতে বলা হয়েছে حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ [অর্থাৎ তা] মাটির গাড়া হতে বানানো পাথর ছিল।

খ. জালাল উদ্দীন মহল্লী (র.) এর তাফসীর করেছেন طِيْن مَطْبُوْخ অর্থাৎ পাকা মাটি।

গ. কারো কারো মতে سِجِّيْل শব্দটি اَسْجَالٌ হতে নির্গত হয়েছে। এর দ্বারা সে ফলকের কথা বুঝানো হয়েছে, যাতে কাফেরদের শাস্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে- তাদের প্রতি সে পাথর নিক্ষিপ্ত হলো, যা সিজ্জীল ফলকে লিখিত ছিল।

ঘ. কেউ কেউ বলেছেন, মাটি ও পাথরের গুঁড়া মিশ্রিত করে পুড়িয়ে যে ঢিল বানানো হয়, তাকে سِجِّيْل বলে।

প্রায় সব বর্ণনাকারীই একমত হয়ে বলেছেন যে, প্রত্যকটি পাখির মুখে একটি ও পঞ্জায় দু'টি করে পাথর ছিল। মক্কার কোনো কোনো লোকের নিকট দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ পাথর কুচি নমুনাস্বরূপ রক্ষিত ছিল। আবূ নায়ীম নাওফল ইবনে আবূ মুয়াবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, হস্তি ওয়ালাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত পাথর কুচি আমি নিজ চক্ষে দেখেছি। এ পাথর কালচে লালবর্ণের মটরের ছোট দানার আকারের ছিল। আবূ নাঈম হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তা 'চিলগুজা' নামাক ফলের সমান ছিল। ইবনে মারদুবিয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে তা ছাগলের লাদের সমান ছিল।

মূলত সব পাথরকুচি এ আকারের ছিল না। তা বিভিন্ন আকারের ছিল বলেই বর্ণনায় এরূপ পার্থক্য পাওয়া যায়। -[খাযেন, মা'আলিম]

طَيْرًا-কে নাকেরাহ নেওয়ার কারণ : নিকৃষ্ট বুঝানোর জন্য طَيْرًا-কে নাকেরাহ নেওয়া হয়েছে। একদল নিকৃষ্ট পাখির দ্বারাই তাদেরকে বাধা ও ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহর কি হিকমত-তিনি এ ক্ষুদ্র এবং নিকৃষ্ট পাখি দ্বারা এত বড় কাজ করিয়েছেন।

অথবা, ছোট বস্তুকে বড় এবং গুরুত্ববহ বুঝানোর জন্য নাকেরাহ নেওয়া হয়েছে।-এমন কোন পাখি আছে যে, পাথর মারবে আর তার পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না? -[কাবীর]

عَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ-এর অর্থ : فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ আয়াতের عَصْف শব্দটির অর্থ হলো- ফসলের ঐ অবশিষ্ট অংশ যা শস্য কর্তন করার পর জমিনে পড়ে থাকে এবং জন্তুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অথবা, শস্য-দানার খোসা, যাকে আমাদের ভাষায় ভূষি বলা হয়। যেমন, ডালের ভূষি যা জীবজন্তুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। مَاْكُوْلٌ শব্দের অর্থ হলো যা ভক্ষণ করা হয়। সুতরাং আয়াতের মর্ম হলো, শস্যদানাকে মথিত করে যেভাবে ভূষি বের করা হয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা কা'বা ঘর আক্রমণকারী বাহিনীকে প্রস্তর আঘাতে নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

* হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, عَصْف শব্দের অর্থ হলো- গম গাছের পাতা।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গমের উপর গিলাফের ন্যায় যে আবরণ হয়, তাকে عَصْف বলা হয়। আর مَاْكُوْلٌ অর্থ- জীব-জন্তুর চিবানো ঘাষ-পাতা।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলার গজব আবরাহা ও তার বাহিনীকে চিবানো ঘাষ-পাতার ন্যায় করে দিয়েছিল। -[নূরুল কোরআন]

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ : সূরা আল-কুরাইশ

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের قُرَيْشٌ শব্দটি দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৪টি আয়াত, ১৭টি বাক্য এবং ৭৩টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। খুব কম সংখ্যক তাফসীরকার একে মাদানী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সূরাটি মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়। কারণ সূরার দু' নম্বর আয়াতে فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ দ্বারা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কথাই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাওয়াত দেওয়া।

মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির বহুকাল পূর্ব হতেই মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও অনৈসলামী আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং কা'বা ঘরকেই এ শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল। মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হতেই কা'বা ঘরে ৩৬০টি প্রতিমা রাখা হয়েছিল; কিন্তু কুরাইশগণ এদেরকে আল্লাহ মানত না। এদের অসিলায় তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে, এ আশায় তারা এদের পূজা করত। এদের নিকট অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন পুরা করার প্রার্থনা করত। অথচ কুরাইশগণের সমগ্র আরবের উপর বংশীয় কৌলিন্য-আভিজাত্য, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম যশ-লাভের একমাত্র কারণ ছিল কা'বা ঘর। কা'বা ঘরের কারণেই তারা আবরাহার আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর বহুবিধ বদান্যতা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন–হে কুরাইশগণ! তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরে। তোমরা দেশ হতে দেশান্তরে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে যাতায়াত করতে পারছ; এটা আল্লাহর ঘরের খেদমত ও সেবা করারই ফলশ্রুতি। সুতরাং তোমাদের উচিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে, এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগি করা; অভাব-অভিযোগ ও হাজত পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা– তিনিই তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করে সুখী-সমৃদ্ধিশালী করেছেন এবং তোমাদের জন্য ভিতর-বাইর সর্বত্র এবং বাণিজ্যিক পথগুলোকে নিরাপদ করেছেন। তোমরা যেখানেই যাও, সেখানেই আল্লাহর ঘরের খাদেম বলে সম্মান পাচ্ছ। এমনকি আরবের দুর্বৃত্ত ও ডাকাত দলও তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে না। তোমাদের প্রতি হামলা করে না, তোমরা আল্লাহর এ সব নিয়ামত কিরূপে বিস্মৃত হতে পার? তোমাদের উচিত, যে ঘরের দ্বারা লাভবান হচ্ছ সে ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা। অন্যথায় তোমাদের নিকট হতে এ নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হবে। তখন তোমরা পদে পদে অপমান ও অপদস্থ হবে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُورَةُ الْقُرَيْشِ مَكِّيَّةٌ وَ مَدَنِيَّةٌ
সূরা আল-কুরাইশ মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ
أَرْبَعُ اٰيٰتٍ : ৪ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ .

১. যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে।

٢. إِلٰفِهِمْ تَاكِيْدٌ وَهُوَ مَصْدَرُ أَلِفَ بِالْمَدِّ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ وَ رِحْلَةَ الصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ فِيْ كُلِّ عَامٍ يَسْتَعِيْنُوْنَ بِالرِّحْلَتَيْنِ لِلتِّجَارَةِ عَلَى الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِخِدْمَةِ الْبَيْتِ الَّذِيْ هُوَ فَخْرُهُمْ وَهُمْ وَلَدُ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ .

২. তাদের আসক্তি এটা (إِلٰفِهِمْ) তাকিদ হয়েছে। এটা أَلِفَ -এর মাসদার– যা মদ-এর সাথে পঠিত হয়েছে। শীতকালীন সফর ইয়েমেনের দিকে এবং সফর গ্রীষ্মকালীন সিরিয়ার দিকে প্রতি বছর তারা দু'টি বাণিজ্য সফর করত, মক্কায় নির্বিঘ্নে অবস্থান করার জন্য, যাতে [বাকি সময়] তারা সে ঘরের [অর্থাৎ কা'বার] খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে-যা তাদের গৌরবের বস্তু। আর তারা ছিল নযর ইবনে কেনানার বংশধর।

٣. فَلْيَعْبُدُوْا تَعَلَّقَ بِهِ لِإِيْلَافِ وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ .

৩. সেহেতু তাদের কর্তব্য হলো ইবাদত করা। এটা لِإِيْلَافِ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। এর فَاء অতিরিক্ত। এ ঘরের প্রভুর।

٤. الَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ لا أَيْ مِنْ أَجْلِهِ وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ أَيْ مِنْ أَجْلِهِ وَكَانَ يُصِيْبُهُمُ الْجُوْعُ لِعَدَمِ الزَّرْعِ بِمَكَّةَ وَخَافُوْا جَيْشَ الْفِيْلِ .

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন অর্থাৎ ক্ষুধার কারণে আর তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন, ভয়-ভীতি হতে অর্থাৎ ভয়ের কারণে। মক্কায় শস্য উৎপাদন না হওয়ার কারণে তারা ক্ষুধার শিকার হতো। আর তারা হস্তিবাহিনীর আক্রমণে ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

Free @ www.eilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ-এর মহল্লে ই'রাব : رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ-এর মহল্লে ই'রাবের ব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান :
১. এটা মহল্লান مَرْفُوْعٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা هُمَا সর্বনামের خَبَرٌ হয়েছে। মূলত বাক্যটি হবে- هُمَا رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
২. অথবা, তা মহল্লান مَنْصُوْبٌ হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা হয়তো-
ক. উহ্য فِعْلٌ-এর مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ হিসাবে হয়েছে। বাক্যটি হবে- يَرْتَحِلُوْنَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
খ. অথবা, اِيْلَافٌ মাসদারের مَفْعُوْلٌ হয়েছে।
গ. অথবা, যরফ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে যোগসূত্র : এ সূরার মূলকথা ও বক্তব্যের সাথে সূরা ফীল -এর বিষয়-বস্তুর গভীর মিল রয়েছে। যার ফলে কেউ কেউ উভয় সূরাকে একটি সূরা হিসাবে গণ্য করেছেন। কেননা পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরায়ও (কা'বার আশে-পাশে অবস্থিত) কুরইশদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা স্বতন্ত্র সূরা না পূর্ববর্তী সূরা আল-ফীল -এর অংশ এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়।

ক. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, এটা পূর্ববর্তী সূরা আল-ফীল-এর অংশ বিশেষ। কতিপয় হাদীসের বর্ণনা হতেও এ ধারণা বলিষ্ঠতা পেয়েছে। হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-এর নিকটে রক্ষিত মাসহাফে এ দু'টি সূরা এক সঙ্গে লিখিত রয়েছে। দু'টির মাঝে বিসমিল্লাহ লিখে পার্থক্য করা হয়নি। হযরত ওমর (রা.)ও একবার এ সূরা দু'টিকে মিলিয়ে পড়েছিলেন, এদের মধ্যে পার্থক্য করেননি।

খ. হযরত ওসমান (র.) যখন তার খেলাফতকালে কুরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূরাদ্বয় দু'টি স্বতন্ত্র সূরা হিসাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

قَوْلُهُ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ : اِيْلَافٌ শব্দটি اَلِفٌ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- আসক্ত হওয়া, অভ্যস্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিচ্ছেদের পর মিলিত হওয়া।

আখফাশ, কিসায়ী, ফাররা ও ইবনে জারীর প্রমুখ ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে, لِاِيْلَافِ-এর মধ্যস্থিত لَامٌ টি এখানে বিস্ময় প্রকাশের জন্য হয়েছে। এ দৃষ্টিতে اِيْلَافِ قُرَيْشٍ -এর অর্থ হবে- কুরাইশদের আচরণ বড়োই আশ্চর্যজনক। কেবল আল্লাহর অনুগ্রহেই তারা বিক্ষিপ্ত থাকার পর সংঘবদ্ধ হলো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তারা বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত হলো ও এর সাহায্যে আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করল, তা সত্ত্বেও তারা সে এক আল্লাহর ইবাদত হতে দূরে থাকছে।
খলীল ইবনে আহমদ, সীবওয়াইহ ও যামাখশারী প্রমুখ ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ বলেছেন- এ লাম (لَامٌ) টি কারণসূচক। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে- এমনি তো কুরাইশদের উপর আল্লাহর অসীম রহমতের-নিয়ামতের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই; কিন্তু অন্য কোনো নিয়ামতের জন্য না হলেও এ একটি নিয়ামতের কারণে তাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। আর সে নিয়ামতটি হলো, তারা এ ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে। কেননা এ অবাধ ও শঙ্কাহীন বিদেশ যাত্রার সুযোগটাই আল্লাহ তা'আলার অতি বড় নিয়ামত।
لِاِيْلَافِ -এর লাম-এর সম্পর্ক : لِاِيْلَافِ -এর লাম-এর ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে-
১. পিছনের সূরার সাথে [সংশ্লিষ্ট] مُتَعَلِّقٌ মূলবাক্য এভাবে হবে যে, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُوْلٍ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসহাবুল ফীলকে ধ্বংস করেছেন, যেন কুরাইশ অবশিষ্ট থাকতে পারে।

Free @ www.e-ilmweebly.com

২. অথবা, পূর্বোক্ত সূরার প্রথম অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট। মূলবাক্য হবে- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ যেন আল্লাহ তা'আলা বলছেন- আমি যত কিছু তাদের সাথে করেছি- সব কিছু কুরাইশদের আসক্তির জন্য করেছি।

৩. অথবা, لِاِيْلَافِ-এর লাম অর্থ اِلٰى তখন আয়াতের অর্থ হবে-

نَعَلْنَا كُلَّ مَا فَعَلْنَا فِى السُّوْرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ اِلٰى نِعْمَةٍ اُخْرٰى عَلَيْهِمْ وَهِىَ اِيْلَافُهُمْ.

অর্থাৎ পিছনের সূরায় বর্ণিত যা কিছু আমি করেছি তা অন্য একটি নিয়ামত প্রদানের উদ্দেশ্যে করেছি, তা হলো-তাদের মহব্বত, আসক্তি অথবা অভ্যস্ততা। -[কাবীর]

কুরাইশ কারা? : কুরাইশরা মূলত হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অধঃস্তন বংশধরে فِهْرٌ নামে এক লোক ছিল। তার উপাধি ছিল قُرَيْشٌ [কুরাইশ]। তার বংশধররাই কুরাইশ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। ফিহির ব্যবসা-বাণিজ্য করে বহু ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিল বিধায় তার উপাধি হয়েছিল কুরাইশ।

কুরাইশরা মক্কার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। নবী করীম ﷺ-এর প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কেলাব সর্বপ্রথম তাদের মক্কায় একত্র করেন। এ জন্য তার উপাধি হয়েছে 'একত্রকারী'।

জনৈক কুরাইশী বলেছেন- اَبُوْنَا قُصَىٌّ كَانَ يُدْعٰى مُجَمِّعًا * بِهٖ جَمَعَ اللّٰهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرٍ অর্থাৎ আমাদের পিতৃপুরুষ কুসাইকে একত্রকারী বলা হতো। তার অসিলায় ফিহিরের গোত্রসমূহকে আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় একত্র করেছেন। কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লীর পদ তাদের হাতে আসে। কা'বার খেদমতের কারণে সারা আরবে তাদের মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া কুরাইশরা অনুকূল পরিবেশের সুযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেও মনোনিবেশ করে। ক্রমে মক্কা একটি ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইতঃমধ্যে আবরাহার নেতৃত্বে মক্কার কা'বা ঘর আক্রমণ এবং তার ধ্বংসে গোটা আরবে- এমনকি আরবের বাইরেও কুরাইশদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ সব কারণে নবী করীম ﷺ বলেছেন- "قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ" কুরাইশ বংশের লোক অন্যসব লোকের নেতা। বায়হাকীতে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "كَانَ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ حِمْيَرٍ فَنَزَعَهُ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِىْ قُرَيْشٍ" আরবের সর্দারী ও নেতৃত্ব প্রথমে হেমইয়ার লোকদের মধ্যে ছিল। পরে আল্লাহ তাদের নিকট হতে তা কেড়ে নেন এবং কুরাইশকে দান করেন।

নিম্নে হযরত ইসমাঈল (আ.) পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর [ও কুরাইশদের] বংশধারা উল্লেখ করা হলো : মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কেলাব ইবনে মুররা ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহির (কুরাইশ) ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে মা'আদ ইবনে আদনান ইবনে ইসমাঈল (আ.)।

কুরাইশকে কুরাইশ নামকরণ করা হয়েছে কেন? : মুফাস্‌সিরগণ قُرَيْشٌ-কে কুরাইশ নামকরণের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. قُرَيْشٌ শব্দটি قَرْشٌ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- সঞ্চয় করা, উপার্জন করা। তাদের পিতৃপুরুষ বহু সম্পদ সঞ্চয় ও উপার্জন করেছেন বিধায় তার উপাধি হয়েছে কুরাইশ।

২. অথবা, এটি اَلتَّقَرُّشُ হতে নির্গত। যার অর্থ- একত্র হওয়া। কেননা কুরাইশরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার একত্র হয়েছিল।

৩. অথবা, اَلْقَرْشُ অর্থ- তালাশ করা, যেহেতু তারা নিঃস্ব হাজীদেরকে তালাশ করে তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করত, তাই তাদেরকে قُرَيْشٌ বলে।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরাইশ হলো এক বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী; যেদিকে সে যায় সেদিকে ছোট বড়, যা কিছু পায় সবই গিলে ফেলে। কিন্তু তাকে কেউ ভক্ষণ করতে পারে না। সবার উপর সে প্রাধান্য বিস্তার করে, এ কারণেই তাদেরকে قُرَيْشٌ বলা হয়।

৫. অথবা, নযর ইবনে কিনানা যখন তার পোশাক পরিধান করে বসেছিল তখন লোকেরা বলল 'তাকাররাশা' তাই এ নামকরণ করা হয়।

৬. অথবা, নযর ইবনে কিনানা যখন তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল তখন লোকেরা বলল, এই তো কুরাইশ উষ্ট্র, অর্থাৎ শক্তিশালী উষ্ট্র।

৭. অথবা, قَرَشَهٗ অর্থ- তাকে কেটেছে, যা কামূস গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তথা এদিক সেদিক থেকে একত্র করেছে। যেহেতু কুরাইশ বংশীয় লোকেরা ব্যবসায়িক মালপত্র চারদিক থেকে একত্র করত, তাই এ নামকরণ করা হয়েছে। -[নূরুল কোরআন]

"اِيْلَافٌ"-কে দ্বিরুক্ত করার কারণ : اِيْلَافٌ শব্দটিকে দ্বিরুক্ত করা হয়েছে, কেননা اِيْلَاف বা আসক্তি এবং অভ্যাস তাদের মাঝে প্রকট ছিল, দ্বিরুক্তির মাধ্যমে তাকে তাকিদ করা হয়েছে। প্রথম اِيْلَافٌ থেকে দ্বিতীয় اِيْلَافٌ 'বদল' হয়েছে। অথবা প্রথম اِيْلَافٌ দ্বারা عَامٌ বা সাধারণ اِيْلَافٌ উদ্দেশ্য, আর দ্বিতীয় اِيْلَافٌ দ্বারা خَاصٌ বা বিশেষ করে দু'সফর উদ্দেশ্য। -[কাবীর]

শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের কারণ : উপরিউক্ত দুই নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, কুরাইশগণ শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনসহ উত্তর আরবের বিভিন্ন শহরে বাণিজ্যে যেত। কেননা এ সময়ে সেসব দেশে ঠাণ্ডা থাকত। আর শীতের মৌসুমে দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন শহরে বাণিজ্যে যেত। কেননা এ সময় সেসব দেশে গরম আবহাওয়া থাকত। এ দু'মৌসুমে নিরাপদে কুরাইশদের সফর ছিল আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে নিয়ামতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। -[কুরতুবী]

رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ-এর অর্থ : উপরিউক্ত তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কার কুরাইশগণকে বলেছেন যে, হে কুরাইশগণ! এ ঘরের প্রতিপালকেরই তোমাদের ইবাদত করা উচিত। এ ঘর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কা'বা ঘরকে বুঝিয়েছেন। কেননা তারা এ জগতে মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও কৌলিন্য-মর্যাদা ইত্যাদি যা কিছু লাভ করেছে, তা এ ঘরেরই অবদান। এ ঘরের কারণেই তাদের এত কিছু লাভ। এ ঘরের মালিকই জালিম আবরাহার ষাট হাজার সৈন্যকে নাস্তনাবুদ করে তাদেরকে রক্ষা করেছেন। তারা যখন চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন ছিল তখন বংশগত সুনাম-সুখ্যাতি কিছুই ছিল না। এ ঘরের আশ্রয়ে আসার কারণেই দিক-দিগন্তে নিরাপত্তা ও সুনাম-সুখ্যাতি নিয়ে ভ্রমণ করতে পেরেছে। এ সব জাগতিক নিয়ামত এ ঘরের মালিকেরই অবদান- তাদের অবদান নয়। অতএব, তাদের ইবাদত সে মহা প্রতিপালক এ ঘরের মালিকই পেতে পারেন। -[কুরতুবী]

"فَلْيَعْبُدُوْا" -এর অর্থ :

১. কারো মতে, فَلْيَعْبُدُوْا অর্থ فَلْيُوَحِّدُوْا অর্থাৎ তারা যেন একত্ববাদী হয়। কেননা আল্লাহ এ ঘরের সংরক্ষণ করেছেন, প্রতিমাগুলো এটাকে সংরক্ষণ করেনি। আর একত্ববাদ হলো ইবাদতের চাবি।

২. কারো মতে, فَلْيَعْبُدُوْا অর্থ فَلْيَعْبُدُوْا الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِاَعْمَالِ الْجَوَارِحِ অর্থাৎ তারা যেন সে ইবাদতগুলো করে যেগুলো সরাসরি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত।

৩. তবে উত্তম হলো- উভয় অর্থকে একত্র করে আয়াতের অর্থ করা। কেননা আয়াতের শব্দ প্রয়োগের দ্বারা উভয় অর্থই বুঝা যায়। হ্যাঁ, যদি নির্দিষ্টকরণের কোনো দলিল এসে পড়ে, তাহলে অন্য কথা; কিন্তু এখানে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, একটি অর্থ করতে হবে।

এ আয়াতের তৃতীয় আরেকটি অর্থ পাওয়া যায়- فَلْيَتْرُكُوْا رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَلْيَشْتَغِلُوْا بِعِبَادَةِ رَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ অর্থাৎ তাদের উচিত হলো শীত এবং গ্রীষ্মকালীন সফর ছেড়ে দেওয়া এবং এ ঘরের ইবাদতে মনোনিবেশ করা।' -[কাবীর]

মূল নিয়ামত ছাড়া 'খাদ্যদান'-এর উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতে কত যে নিয়ামত দান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তবে এমন কতগুলো আছে যা মূল নিয়ামত; কিন্তু মূল নিয়ামতগুলো ছেড়ে খাদ্যদান বা اِطْعَامٌ-কে উল্লেখ করার কারণ হলো-

১. আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের উপর 'হস্তী প্রতিরোধ', 'পাখি প্রেরণ' এবং আবরাহা সরকারের ধ্বংসকে উল্লেখ করেছেন, আর তা তিনি তাদের اِيْلَافٌ-এর জন্য করেছেন, তারপর তিনি ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানেই কোনো প্রশ্নকারীর প্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা তো এখন রোজগারের মুখাপেক্ষী, ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়লে কে আমাদের রোজগারের ব্যবস্থা করবে? কে আমাদেরকে খাওয়াবে? তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, ইবাদত না করার কারণে যিনি ক্ষুধার সময় তোমাদেরকে খাইয়েছেন, ইবাদতের পর তিনি কি তোমাদের খাওয়াবেন না?

২. এত বড় বড় নিয়ামত দেওয়ার পরও বান্দার পক্ষ থেকে ভালো ব্যবহার হচ্ছে না। তথাপি আল্লাহ তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। যেন আল্লাহ তাদেরকে লজ্জা দিচ্ছেন যে, - বড় বড় নিয়ামত খাওয়ার পর লজ্জা করা দরকার ছিল; কিন্তু যখন খারাপ ব্যবহার করেছ, তখনো আমি খাওয়াচ্ছি। তাতে তোমাদের বেশি বেশি লজ্জা করা দরকার। -[কাবীর]

مِنْ جُوْعٍ উল্লেখ করার ফায়দা : এতে নিম্নলিখিত ফায়দা পরিলক্ষিত হচ্ছে-

১. এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ক্ষুধার জ্বালা-মহাজ্বালা, ক্ষুধার তাড়নায় তথা পেটের জ্বালায় মানুষ অনেক কিছু করে থাকে।

২. ক্ষুধা অবস্থায় যে মহাকষ্ট হয়, সাথে সাথে ক্ষুধা নিবারণের পর যে মহা শান্তি অনুভূত হয়, তা যে, আল্লাহর বিরাট নিয়ামত- তা বুঝানোর জন্য مِنْ جُوْعٍ বলা হয়েছে।

৩. এ কথার গুরুত্ব বুঝা যায় যে, উত্তম খাদ্য হলো তা, যা ক্ষুধা নিবারণ করে। -[কাবীর]

Free@www.Eilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ : আয়াতটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যা তাফসীরকারকগণ উল্লেখ করেছেন–

১. তারা নির্ভয়ে, অত্যন্ত নিরাপদে ভ্রমণ করত। কেউ তাদের বাধা দিত না, না তাদের উপর কেউ আক্রমণ করত, সফরে থাকুক আর বাড়িতে। অথচ অন্যরা আক্রমণ থেকে রেহাই পেত না, সফরে বের হোক আর বাড়িতে থাকুক, উভয় অবস্থায় তাদের উপর আক্রমণ চলত।

২. إِنَّ اللّٰهَ اٰمَنَهُمْ مِنْ زَحْمَةِ اَصْحَابِ الْفِيْلِ অর্থাৎ হস্তিবাহিনীর কষ্টদায়ক আঘাত থেকে আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন।

৩. দাহহাক বলেন, اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ الْجُذَامِ অর্থাৎ তিনি তাদেরকে কুষ্ঠরোগ থেকে নিরাপদে রেখেছেন।

৪. اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اَنْ تَكُوْنَ الْخِلَافَةُ فِىْ غَيْرِهِمْ অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এ ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন যে, খিলাফত অন্যের কাছে চলে যাবে।

৫. اٰمَنَهُمْ بِالْاِسْلَامِ অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের দ্বারা নিরাপত্তা দান করেছেন।

৬. اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ الضَّلَالِ بِبَيَانِ الْهُدٰى অর্থাৎ হেদায়েতের পথ-নির্দেশের মাধ্যমে ভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। ইতঃপূর্বে তারা ছিল جُهَّالُ الْعَرَبِ বা আরব মূর্খ। এখন তারা হচ্ছে আহলে কিতাব, আহলে কুরআন ও আহলে ইলম। আর আহলে কিতাব হয়ে গেছে– جُهَّالُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى তথা মূর্খ ইহুদি আর খ্রিস্টান। –[কাবীর]

সারকথা হলো :

১. তোমরা মক্কায় স্থায়ী বসতি করার পূর্বে খুবই দুঃখ-দুর্দশা ও অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় জীবন-যাপন করতে। মক্কায় অবস্থান করার পর হতে আমি তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটন দূর করেছি। এটা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সে দোয়ারই ফলশ্রুতি, যা তিনি পুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে করেছিলেন– [সূরা ইবরাহীম–৩৭ আয়াত]। আর এ ঘরের সেবা করার ফলে আরব জগতের সর্বত্র তোমরা সম্মানিত হয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথগুলো তোমাদের জন্য নির্ভয় ও নিরাপদ হয়েছে, তা এ ঘরেরই অবদান।

২. আল্লাহ তা'আলা হয়তো একথা দ্বারা নবী করীম ﷺ -এর দোয়ার কারণে ক্রমাগতভাবে ছয় বছর দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করেছিল। আবার নবী করীম ﷺ-এর দোয়ার ফলেই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়ে সমগ্র মক্কায় শস্য, ফলমূলের সমাহার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেমে এসেছিল। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় তোমাদেরকে আহার দিচ্ছি। আর হেরেমে অবস্থানের কারণে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, লুটতরাজ, যুদ্ধ-হাঙ্গামা ও ভয়-ভীতি হতে তোমাদেরকে নিরাপদ ও নির্ভয় করেছি।

মোটকথা, তোমাদের জীবনে এ সব অবদান আল্লাহ তা'আলারই নিয়ামত। সে আল্লাহকে ভুলে দেব-দেবীর কাছে পড়ে থাকা তোমাদের পক্ষে কোনোক্রমেই শোভা পায় না। তোমরা এ ঘরের প্রভুর ইবাদতে মশগুল হও, দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা ছেড়ে দাও।

খাদ্য দানের ধরন : কুরাইশদের বসবাসের স্থান মক্কা এরূপ ছিল যে, সেখানকার জমি খামার উপযোগী ছিল না। শস্য-শ্যামল ছিল না, গুল্ম-লতা উৎপাদন হতো না। অর্থাৎ তা এমন এটি স্থান ছিল, যাতে বসবাসকারীদের খাদ্যের অভাবে মৃত্যু ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে এরূপ করে দিলেন যে, বছরের বারো মাসই সেখানে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত। এরূপ ব্যবস্থা না হলে তারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করত। –[আযীযী]

কুরাইশদের বৈশিষ্ট্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশকে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মর্যাদা প্রদান করেছেন, যা ইতঃপূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি এবং পরেও কাউকে দান করা হবে না।

১. আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি।
২. নবুয়ত ও রিসালত তাদের মধ্যে দান করা হয়েছে।
৩. কা'বা শরীফের খেদমতের দায়িত্ব তাদেরকেই দান করা হয়েছে।
৪. হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্বও তাদের প্রতি অর্পিত হয়েছে।
৫. হস্তিবাহিনীর উপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেছেন।
৬. দশ বছর যাবৎ কুরাইশ বংশ ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করেনি, তথা নবুয়তের প্রথম দশ বছর।
৭. কুরাইশদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা একটি সূরা নাজিল করেছেন। এ সূরায় কুরাইশ ব্যতীত আর কারো উল্লেখ করা হয়নি।
–[হাকেম, তাবারানী, বুখারী]

Free @ www.e-ilmweebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ : সূরা আল-মাউন

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির শেষ আয়াতের শেষ শব্দ "اَلْمَاعُوْنُ" (আল-মাউন)-কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৭টি আয়াত, ২টি বাক্য এবং ১১১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়-কাল : আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইবনে জুবাইর, আতা ও জাবিরসহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের একটি দলের মতে, আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে।

২. হযরত কাতাদাহ ও যাহহাক সহ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অপর দলের মতে, এ সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য সূরায় নামাজে গাফিলতি করা ও লৌক দেখানো (আমল ও নামাজ)-এর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই তা দ্বারা মুনাফিকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের আবির্ভাব হয়েছে মদীনায়। কাজেই এ হতে বুঝা যায় যে, সূরাটি মদীনায় নাজিল হওয়ার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র কতদূর নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, তার একটি চিত্র অংকন করেছেন। সর্ব প্রথমেই বলা হয়েছে– পরকাল বা দীন ইসলামে যারা বিশ্বাসী হয় না; বরং অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে তোমরা কিছু জান কি? তাদের সামাজিক চরিত্র লেনদেন কতখানি নিম্নস্তরের হীন ও নীচ হতে পারে, তা শোন। তাদের প্রথম চরিত্র হলো এতিমদের হক ও অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে। তাদের ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করে তা হতে তাদেরকে বেদখল করে। তারা তা চাইতে আসলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো– নিজেরা তাদের খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও খাদ্য দিতে এবং সাহায্য-সহানুভূতি করতে বলে না। তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ আদায়ের জন্য কুফরিকে গোপন রেখে নামাজি সেজে জামাতে শামিল হয় এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, আমরা মুসলমান। রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধায় আমাদের অধিকার রয়েছে। এ সব কাফের নামাজিদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা নামাজের ক্ষেত্রে খুবই উদাসীন। নামাজের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে নামাজ পড়ে না। নামাজের প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা দেখায়। কেবল নামাজই নয় – সমস্ত কাজকর্মই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি সামাজিক জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও অন্যকে ধার দিতে চায় না। তারা কত স্বার্থপর ও আত্মপূজারী হয় যে, অপরের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট করা এবং সাধারণ একটু স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াকেও পছন্দ করতে পারে না। এটাই হলো পরকাল ও দীন ইসলাম অস্বীকারকারীদের জীবন চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ রূপ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُورَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ أَوْ مَدَنِيَّةٌ أَوْ نِصْفُهَا وَنِصْفُهَا

সূরা আল-মাউন মক্কা বা মদীনায় অথবা অর্ধেক মক্কায় অর্ধেক মদীনায় অবতীর্ণ

سِتٌّ أَوْ سَبْعُ آيَاتٍ : ৬/৭ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ بِالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ اَىْ هَلْ عَرَفْتَهُ اَوْ لَمْ تَعْرِفْهُ .

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফল দিবস অস্বীকার করে? হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দিবস, অর্থাৎ তুমি তাকে চিন, না চিন না?

٢. فَذٰلِكَ بِتَقْدِيْرِ هُوَ بَعْدَ الْفَاءِ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ اَىْ يَدْفَعُهُ بِعُنْفٍ عَنْ حَقِّهِ .

২. সে তো فَاء-এর পরে هُوَ সর্বনাম উহ্য আছে যে এতিমকে রূঢ়ভাবে বিতাড়িত করে অর্থাৎ তার হক দেওয়ার পরিবর্তে তাকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

٣. وَلَا يَحُضُّ نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ اَىْ اِطْعَامِهِ نَزَلَتْ فِى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ اَوِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ .

৩. আর সে উৎসাহিত করে না নিজেকে এবং অন্যকে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে অর্থাৎ তাকে খাদ্য সরবরাহ করতে, এ আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল অথবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে।

٤. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ .

৪. দুর্ভোগ সে নামাজির জন্য

٥. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ غَافِلُوْنَ يُؤَخِّرُوْنَهَا عَنْ وَقْتِهَا .

৫. যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন অমনোযোগী, তাকে যথাসময় হতে বিলম্বিত করে।

٦. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا .

৬. যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে নামাজ ইত্যাদি।

٧. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ كَالْاِبْرَةِ وَالْفَاسِ وَالْقِدْرِ وَالْقَصْعَةِ .

৭. আর গৃহস্থালীর ছোট-খাটো প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে বিরত থাকে যেমন সুঁই, কুড়াল, হাঁড়ি-পাতিল, পেয়ালা।

তাহকীক ও তারকীব

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ ....-এর هَمْزَة ইস্তিফহামের জন্য, অর্থাৎ বিস্ময় প্রকাশক। رَأَيْتَ ফে'ল এটা একটি মাফউলের দিকে মুতায়াদ্দী হয়েছে, তা হলো اَلَّذِىْ الخ কেউ কেউ বলেন, اَلرُّؤْيَةُ অর্থ- اَخْبِرْنِىْ তখন দুই মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হবে। দ্বিতীয় মাফউলটি উহ্য, مَنْ هُوَ خَذْلًا الخ ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

فَذٰلِكَ الخ -এর শর্তের জওয়াব। আর ف আতেফাও হতে পারে। তাই আতফ 'জাতের উপর জাতের' অথবা 'গুণের উপর গুণের' হতে পারে। প্রথম অবস্থায় ذٰلِكَ মুবতাদা, الَّذِىْ يَدُعُّ الخ এর খবর।

وَلَا يَحُضُّ الخ আতফ হয়েছে يَدُعُّ-এর উপর, দ্বিতীয় অবস্থায় নসবের স্থানে আতফ হবে মাওসূলের উপর, যা নসবের স্থানে অবস্থিত।

فَوَيْلٌ মুবতাদা, الْمُصَلِّيْنَ খবর। ف ক্রমধারা বর্ণনার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় কুরাইশদের উত্তম চরিত্রের কারণে তাদের উপর অনুগ্রহ অবতারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর বর্তমান সূরাতে মুনাফিকদের অসৎ ব্যবহার ও তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুনাফিকগণ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণ এবং নিজেরা মুসলমান এ কথা প্রমাণের জন্য মুসলমানদের নিকট থাকাকালে তাদের সাথে জামায়াতে শামিল হতো। আর তাদের নিকট হতে চলে যাওয়ার পর নামাজ পরিত্যাগ করত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় জিনিস অপরকে দেওয়া হতে বিরত থাকত। তাদের এ আচরণকে উপলক্ষ করেই এ সূরা অবতীর্ণ হয়। -[লোবাব]

অথবা, কতিপয় তাফসীরকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন-এ সূরার প্রথম তিন আয়াত মক্কায় আসিম ইবনে ওয়ায়েল কাফের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বাকি আয়াতসমূহ মদীনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী, খাযেন]

অথবা, কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, প্রথম তিন আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তার অভ্যাস ছিল, যখন কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি মুমূর্ষ হতো, তখন তার নিকট এসে বসত, আর বলত- আপনি আপনার এতিম সন্তানদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করুন, আর তাদের অংশের মালও আমার নিকট আমানত রাখুন, আমি তাদের দেখাশুনা করবো; কিন্তু যখন সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত, আর এতিম শিশুগণ তার নিকট গমন করত, তখন সে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দরজা হতে বের করে দিত। একদা এক এতিম শিশু রাসূল ﷺ-এর নিকট গমন করে বলল- আবূ জাহলের নিকট আমার মাল-সম্পদ রয়েছে- অথচ সে তা আমাকে দেয় না। রাসূল ﷺ সে এতিমের কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় দেখে আবূ জাহলের নিকট গিয়ে কিয়ামতের দিনের ভয় দেখান; কিন্তু সে পাপিষ্ঠ কাফের তাঁর উপদেশ গ্রহণ করল না। আর কিয়ামতের অস্তিত্ব অস্বীকার করল। এতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন, আর ঘরে ফিরে আসেন, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। -[আযীযী]

অথবা, হযরত মুকাতিল, সুদ্দী এবং ইবনে কাইসা (র.) -এর মতে, এ সূরা নাজিল হয়েছে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ সম্পর্কে।

অথবা, ইমাম যাহহাক (র.) -এর মতে, এ সূরা নাজিল হয়েছে আমর ইবনে আমের মাখযূমী সম্পর্কে। -[নূরুল কোরআন]

اَرَأَيْتَ-এর অর্থ কি? এর مُخَاطَبْ কে? : اَرَأَيْتَ -এর বাহ্যিক অর্থ- আপনি কি দেখেছেন? আর 'দেখা'-এর দ্বারা এখানে শুধু চোখে দেখাকেই বুঝানো হয়নি; বরং চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কথার তাৎপর্য অনুধাবন, জানা, বুঝা ও চিন্তা করাও এ দেখার মধ্যে শামিল আছে। প্রকৃত দেখা বলতে এ শেষোক্ত অর্থই বুঝতে হবে, নিছক চোখে দেখা নয়।

মোটকথা, আয়াতের মর্মার্থ হলো, আপনি কি জানেন, পরকালের বিচার ও প্রতিফলের কথা যে লোক অস্বীকার করে, সে কি রকমের লোক? অথবা, পরকালের কর্মফল দানের ব্যবস্থাকে যে লোক অসত্য মনে করে তার অবস্থাটা কি? তা কি আপনি চিন্তা ও বিবেচনা করেছেন?

এখানে اَرَأَيْتَ দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদে সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেকসম্পন্ন লোককেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

مَعْنَى الدِّيْنِ -এর অর্থ : কুরআন মাজীদে اَلدِّيْنُ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মুফাসসিরগণ এর দুটি অর্থ গ্রহণ করেছেন। ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ একদল মুফাসসিরের মতে এখানে اَلدِّيْنُ দ্বারা দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সূরাটির বক্তব্য হবে, দীন ইসলামের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ দীন-ইসলাম অমান্যকারীদের যা কিছু

স্বভাব-চরিত্র হয়ে থাকে, দীন ইসলামের প্রতি ঈমান এর বিপরীত স্বভাব-চরিত্র সৃষ্টি করে। ২. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে, এখানে اَلدِّيْنِ-এর অর্থ হবে–কর্মফল দান, বিচার। এ অবস্থায় সূরাটির বক্তব্য দাঁড়ায়–পরকাল অস্বীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে এরূপ স্বভাব-চরিত্র সৃষ্টি করে।

اَلَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? : اَلَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ দ্বারা এখানে কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১. একদল মুফাসসিরের মতে, এখানে নির্দিষ্টভাবে কাউকে বুঝানো হয়নি; বরং সাধারণভাবে দীন অস্বীকারকারী সকলকেই বুঝানো হয়েছে। ২. অপর একদল মুফাসসিরের মতে, এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। তাদের মধ্যে আবার এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে?

ক. কেউ কেউ বলেছেন, এটা দ্বারা আবূ জাহল উদ্দেশ্য। খ. কারো মতে, আবূ সুফিয়ানকে বুঝানো হয়েছে। গ. অথবা, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা উদ্দেশ্য। ঘ. অথবা, আস ইবনে ওয়ায়েল উদ্দেশ্য।

দীন অস্বীকারকারীদের চরিত্র : উল্লিখিত দুই ও তিন নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন অস্বীকারকারী অর্থাৎ দীন ইসলামকে অস্বীকারকারী লোকদের চরিত্রের কিছুটা রূপ তুলে ধরেছেন। এখানে তাদের জীবনের দু'টি কাজ উল্লেখ করে তাদের গোটা চরিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা দীন ইসলাম ও কর্মফল দিনকে অস্বীকার করে তাদের চরিত্র এত হীন-নীচু ও কুৎসিত হয় যে, পিতৃহীন বালকগণ যখন তাদের দরজায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকে, তখন তাদেরকে চোখ রাঙ্গিয়ে রূঢ় ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর দাঁড়িয়ে থাকলে তখন গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। তখন আশ্রয়হীন ও পিতৃহীন শিশুগণ অশ্রু ফেলে চলে যায়। এখানে يدع শব্দটির আরও কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তা হলো এতিমদের হক নষ্ট করা। তাদের ভূ-সম্পত্তি হতে বে-দখল করে তাড়িয়ে দেওয়া। সেকালে আরব সমাজে যারা পিতৃহীন বালকদের অভিভাবক হতো, তারা এতিমদের হক নষ্ট করত এবং তাদের বিষয়-সম্পত্তি হতে তাদেরকে উৎখাত করে তড়িয়ে দিত। এতিমগণ এসে নিজেদের অর্থ-সম্পদ চাইলে তখন গলা ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিত। তাদের হক ও অধিকার হতে বঞ্চিত করা হতো।

তাদের দ্বিতীয় যে চরিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো, পিতৃহীন বালকগণের প্রতি অনুগ্রহশীল ও দয়াবান না হওয়া। নিজেরা তো অন্ন দেয়ই না, উপরন্তু অন্য লোককেও অন্ন-বস্ত্র দানের জন্য উৎসাহিত করে না। এ দু'টি চরিত্র উল্লেখ করে মূলত তাদের প্রকৃত রূপটি কি তা-ই বলা হয়েছে। বিচার দিনের আকীদা-বিশ্বাস ধারণের যে নৈতিক ফল মানুষের জীবনে ফলে থাকে এবং তা দ্বারা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি কিভাবে গড়ে উঠতে পারে, এখানে একটি নেতিবাচক উদাহরণ উল্লেখ করে প্রকারান্তরে তা বুঝানো হয়েছে। পরকালে কৃতকর্মের হিসাব দানের আকীদা যারা অন্তরে পোষণ না করে তারা নিজেদেরকে যতই সমাজ-দরদি বলে প্রকাশ করুক না কেন, মূলত তারা হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন আত্মপূজারী স্বার্থপর। যে কোনো অন্যায়-অবিচার করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। দুনিয়ার সমস্ত পাপাচার-জুলুম ও অত্যাচার-অবিচার তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। এ কথাটি বুঝাবার জন্যই আল্লাহ তা'আলা দু'টি চরিত্র তুলে ধরেছেন। –[কাবীর]

এতিমকে তাড়ানোর অবস্থা : এতিমকে তাড়ানোর কয়েকটি দিক হতে পারে–১. তার পাওনা এবং সম্পদ থেকে অন্যায়ভাবে তাকে উচ্ছেদ করা। ২. তার দুঃখ-কষ্টে সমবেদনা প্রকাশ না করা, এগিয়ে না আসা। ৩. তাকে ধমক দেওয়া, পিটুনী দেওয়া এবং উপহাস করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–ঐ খাওয়ার টেবিল হতে উত্তম আর কোনো খাওয়ার টেবিল হতে পারে না, যেখানে এতিম রয়েছে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত চার নম্বর আয়াতে مُصَلِّيْنَ বলে প্রকৃত নামাজিদের কথা বলা হয়নি; বরং যারা মুসলিম সমাজে পরিগণিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে এবং জামাতে উপস্থিত হয়, তাদের কথা বলা হয়েছে। মূলত এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। কেননা মুনাফিকরা মূলত দীন ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখে না; কিন্তু মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্যের মোকাবিলায় দণ্ডায়মান হতে পারে না। বিরোধিতা করলেও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম হওয়ার চরিত্রটি গ্রহণ করে। নবী করীম ﷺ ও সাহাবীদের যুগে নামাজি হওয়াটাই ছিল মুসলমান হওয়ার লক্ষণ। কোনো লোক নামাজি না হয়ে শতবার ঈমানদার হওয়ার দাবি করলেও তার ঈমানের সত্যতা

Free @ www.e-ilmweebly.com

গ্রহণযোগ্য হতো না। তাই মুনাফিকগণ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় নামাজির সাজে সাজত। এ কারণেই আল্লাহ মুনাফিক সম্বোধন না করে 'নামাজ ওয়ালা' বলে সম্বোধন করেছেন এবং গুণগত দিকটি তুলে ধরে তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

নামাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন : উপরিউক্ত পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নামাজে উদাসীন হওয়া দ্বারা সঠিক সময় নামাজ না পড়া; নামাজে দণ্ডায়মান হলে অনাগ্রহতা প্রকাশ করা, বারবার আলস্য ভরে হাই তোলা, পড়িপড়ি করে শেষ ওয়াক্তে কয়েকটা কপাল ঠুকুনি দিয়ে দায় সারা, আল্লাহর দিকে ইচ্ছাপূর্বক মোতাওয়াজ্জো না হওয়া ইত্যাদি আচরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মুনাফিকগণ নামাজের ক্ষেত্রে এরূপই করত। এখানে নামাজের মধ্যে কেরাত ও রাকাতে ভুল হওয়া অথবা অলক্ষ্যে চিন্তাও খেয়াল অন্যদিকে চলে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা নামাজে ভুল হওয়া ও খেয়াল অন্যদিকে চলে যাওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বয়ং নবী করীম ﷺ -এরও নামাজে ভুল হয়েছে এবং তিনি সাহু সিজদা দিয়ে তার প্রতিবিধানের পথ দেখিয়েছেন। মু'মিনদের অলক্ষ্যে নামাজে নিজেদের চিন্তা-খেয়াল অন্যদিকে গেলেও মনে হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা নিজেদের চিন্তা ও খেয়ালকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যান। নামাজের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি ও খেয়াল অন্যদিকে চলে যাওয়ার কথা বুঝালে আল্লাহ عَنْ صَلَاتِهِمْ না বলে বরং فِىْ صَلَاتِهِمْ বলতেন। এ কারণেই আশআস ইবনে মালিক ও আতা ইবনে দীনার (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার শোকর যে, তিনি فِىْ صَلَاتِهِمْ না বলে عَنْ صَلَاتِهِمْ বলেছেন। কেননা আমরা নামাজের মধ্যে ভুল করে থাকি বটে; কিন্তু নামাজের প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহা প্রদর্শন করি না।

قَوْلُهُ تَعَالٰى عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ : মহান আল্লাহর বাণী– عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ -এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হলো– নামাজের সময় নষ্ট করা, তথা সঠিক সময়ে নামাজ আদায় না করা।
২. হযরত ইবনে জারীর ও আবূ আওয়া'লার মতে, سَاهُوْنَ শব্দ দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সঠিক সময়ের পর নামাজ আদায় করে।
৩. হযরত আবুল আলিয়া (র.) বলেছেন, তারা নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করে না এবং রুকু-সিজদাও ঠিক মতো আদায় করে না।
৪. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো– তারা নামাজ পড়ল কি পড়ল না, এ বিষয়ে কোনো পরোয়াই করে না।
৫. কারো মতে, এর অর্থ হলো, তারা নামাজ পড়ে কিন্তু ছওয়াবের আশা করে না। আর না পড়লেও আল্লাহর আজাবকে ভয় করে না।
৬. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, তারা নামাজে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে।
৭. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন– এর অর্থ হলো, যারা আল্লাহ তা'আলার জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে। আর যখন নামাজ পড়ে না তখন তাদের কোনো আক্ষেপ থাকে না। –[নূরুল কোরআন]

اَلْمِسْكِيْنِ-এর দিকে طَعَامٌ-এর নিসবতের উপকারিতা : طَعَامٌ শব্দকে اَلْمِسْكِيْنِ-এর দিকে اِضَافَةٌ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ খাদ্য মিসকিনের হক। তাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা দ্বারা তার চরম কৃপণতা, কঠিন অন্তর এবং বদ মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। –[কাবীর]

লোক দেখানো কাজ : উপরিউক্ত ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের দ্বিতীয় যে চরিত্রটি তুলে ধরেছেন, তা হলো কপটতা এবং লোক দেখানো কাজ। অর্থাৎ নিজের আসল উদ্দেশ্যটি গোপন করে কল্পিত মহৎ ও ভালো উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করা যা মূলতই তার উদ্দেশ্য নয়। কপটতা বা লোক দেখানো চরিত্রটি যেমন মুনাফিকদের মধ্যে থাকে, তেমনি মু'মিনদের মধ্যেও হতে পারে। মুনাফিকগণ বেঈমানী ও কুফরিকে অন্তরে গোপন রেখে মানুষের নিকট প্রকাশ করে বেড়ায় যে, আমি মুসলিম, আমি নামাজ পড়ি। আর মু'মিনগণের জীবনে এ চরিত্রটি খুব কমই প্রতিফলিত হয়। হলেও তা বেঈমানী ও কুফরি অন্তরে চাপা দিয়ে নয়; বরং নাম-কাম, সুখ্যাতি ও সুফল লাভের উদ্দেশ্যে অনেক সময় হয়তো হয়ে থাকে। মোটকথা, ভিতর ও বাহির একরূপ না হয়ে বিপরীত হওয়াকেই রিয়া ও কপটতা বলে। এটা মুনাফিকদের বেলায় মারাত্মক অপরাধ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেছেন– اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ মুনাফিক ও অধার্মিকগণের স্থান জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে হবে। আর মু'মিনদের ক্ষেত্রেও রিয়াকারী ও কপটতা একটি বিরাট অপরাধ। রিয়া মানুষের নেককে নষ্ট করে ফেলে। আয়াতের বক্তব্যটি যেহেতু পূর্বের সাথে সম্পৃক্ত, এ জন্য এখানে মুনাফিকদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই তুলে ধরা হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَاعُوْنَ বলতে যা বুঝায় : مَاعُوْنَ শব্দটির আসল অর্থ হলো, নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রকায় জিনিস। যেমন- দা, খন্তা, কুড়াল, ডেগ, পাতিল, কুলা, চালনি, দিয়াশলাই, চুলা ইত্যাদি। এটা মানুষের জীবনে অহরহ প্রয়োজন হয়। হযরত ওমর, হাসান, কাতাদাহ, যাহহাক (র.) প্রমুখ মনীষীগণের মতে, এখানে مَاعُوْنَ দ্বারা জাকাতের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে নামাজের পরপরই জাকাতের কথা বলেছেন। যেহেতু মুনাফিকগণ নামাজের বেলায় উদাসীন থাকে। অতএব তাদের মতে, এখানে مَاعُوْنَ দ্বারা জাকাত আদায় না করার কথাই বুঝানো হয়েছে। অপর দিকে হযরত ইবনে মাসউদ, আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা (র.) সহ অনেক তাফসীরকারের মতে এখানে মাউন দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও দ্রব্য-সামগ্রীর কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আববাস (রা.) বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর যুগে মাউন অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র মানুষকে ধার দিতাম (আবূ দাউদ)। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মাউন-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন- কুড়াল, ডুলি ও এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা (আবূ নাঈম)। মোটকথা, এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে বলতে হবে যে, উপরিউক্ত সাহাবী ও তাবেঈগণ নবী করীম ﷺ-এর এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। নতুবা নবী করীমের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তার বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদানের সাহস কোনো সাহাবী ও তাবেঈর থাকতে পারে না। মাউনের অর্থ যখন ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় বস্তু, তখন জাকাতকেও মাউন নামে এ দিক দিয়ে অভিহিত করা যায় যে, তা বিরাট কোনো সম্পদেরই ক্ষুদ্র একটি অংশ, যার প্রয়োজনীয়তা অভাবীদের জন্য অনস্বীকার্য। সারকথা, আল্লাহ তা'আলা মাউন শব্দের ব্যবহার করে এ কথাই বলতে চাচ্ছেন যে, পরকাল অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি যে কত নীচু হয় এবং তারা কতখানি স্বার্থপর হয়, অপরের জন্য সাধারণ একটু কষ্ট স্বীকার এবং সাধারণ একটু স্বার্থ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয় না- তা কত হীন প্রবৃত্তির পরিচায়ক। -[ফাতহুল কাদীর]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ .... اَلْمَاعُوْنَ আয়াতের ধমকের কারণ : তাফসীর বিশারদগণ এর কয়েকটি জবাব দিয়েছেন-

১. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ অর্থ- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ بِهٰذِهِ الْاَفْعَالِ অর্থাৎ 'মুনাফিকদের মধ্য হতে সে সমস্ত মুসল্লি বা নামাজিদের জন্য ধ্বংস যারা উক্ত তিনটি কাজ করে।' এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফেরদের জন্য আরও বেশি আজাব নির্ধারিত রয়েছে। কারণ সে নিষিদ্ধ কাজগুলো করে আর কর্তব্য কাজকে ছেড়ে দেয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- যদি আল্লাহ তা'আলা فِىْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ অর্থাৎ তারা নামাজের ভিতরে অবহেলা করে- বলতেন, তাহলে মু'মিনদের জন্য এ ধমক হত; কিন্তু عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ 'নামাজ হতে বিরত থাকে'- বলেছেন। অতএব, যে ধমক দেওয়া হয়েছে, তা নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে- নামাজ পড়ার কারণে নয়।

৩. অথবা, سَاهُوْنَ অর্থ এখানে لَا يَتَعَهَّدُوْنَ اَوْقَاتَ صَلَاتِهِمْ وَلَا شَرَائِطَهَا অর্থাৎ সে নামাজ আদায় করেছে কি করেনি, তার তোয়াক্কা বা পরোয়া করে না। এ কারণে এ ধমক দেওয়া হয়েছে। -[কাবীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ : সূরা আল-কাওছার

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার শুরুতে اَلْكَوْثَرَ শব্দ হতে তার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ। আর অত্র সূরায় حَوْض كَوْثَرْ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ রাখা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১০টি বাক্য এবং ৪২ টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আয়েশা (রা.) হতে সূরাটি মাক্কী বলে বর্ণিত হয়েছে। বেশির ভাগ মুফাসসিরদের মত এটাই।

হযরত ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) একে মাদানী বলেছেন। ইমাম সুয়ূতি (র.) একে সঠিক মত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেন, 'এই মাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাজিল হয়েছে। পরে তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাওসার পাঠ করলেন।' এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন মদীনায়। তিনি বলেন– এ সূরাটি আমাদের উপস্থিতিতে নাজিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরাটি নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল, তা সম্মুখে শানে নুযূলের আলোচনায় আমরা সামান্য উল্লেখ করেছি। অতি সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতে তিনটি বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথম আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ইহকাল-পরকাল ব্যাপী আল্লাহ তা'আলার অজস্র নিয়ামত, প্রাচুর্য, যশ-খ্যাতি, সুনাম ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– আমি আপনাকে ব্যাপক প্রাচুর্য ও নিয়ামত দান করেছি, যার কোনো সীমারেখা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে জীবনের সব কাজকর্ম বিশ্বপালনকর্তার উদ্দেশ্যে করার জন্য হেদায়েত করে বলেছেন– আপনি নামাজ ও কুরআনকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। তৃতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুগণ চিরতরে নির্মূল হওয়ার এবং উত্তরোত্তর ইসলাম ও মহানবীর শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি শিকড় কাটা ও নির্বংশ নন; বরং আপনার শত্রুরাই এ জগতের পাতা হতে চিরতরে মুছে যাবে। কোথাও তাদের নাম-ধাম ও বংশের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে আপনার পুত্র-সন্তান না থাকলেও আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম, বংশ পৃথিবীর বুকে চিরগৌরবময় হয়ে থাকবে। মানুষ আপনাকে মাথার তাজতুল্য স্মরণ করবে। এমনকি আপনার সঙ্গীগণের সাথে সম্পর্ক থাকাকেও গৌরব ও পরকালের নাজাতের বিষয় মনে করবে।

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আল-কাওছার মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلاثُ اٰيَاتٍ : ৩ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

১. إِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ يَا مُحَمَّدُ الْكَوْثَرَ هُوَ نَهْرٌ فِى الْجَنَّةِ اَوْ هُوَ حَوْضُهُ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتُهُ اَوِ الْكَوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيْرُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْقُرْاٰنِ وَالشَّفَاعَةِ وَنَحْوِهَا

১. আমি অবশ্যই তোমাকে দান করেছি হে মুহাম্মদ কাওছার তা একটি বেহেশতী নহর অথবা কূপ, যেখানে উম্মতে মুহাম্মদীকে সমবেত করা হবে। অথবা কাওছার দ্বারা নবুয়ত, কুরআন, শাফায়াত ইত্যাদি প্রভূত কল্যাণ উদ্দেশ্য।

২. فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ عِيْدِ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ .

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো কুরবানির ঈদের নামাজ এবং কুরবানি করো তোমার কুরবানির জন্তু।

৩. إِنَّ شَانِئَكَ اَىْ مُبْغِضَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ الْمُنْقَطِعُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ اَوِ الْمُنْقَطِعُ الْعَقْبِ نَزَلَتْ فِى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَمَّى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْتَرَ عِنْدَ مَوْتِ اِبْنِهِ الْقَاسِمِ .

৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী তোমার প্রতি শত্রুতাকারী। সে-ই নির্বংশ। সকল মঙ্গল হতে বিচ্ছিন্ন বা নির্বংশ। এ আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুত্র কাসেম (রা.)-এর ইন্তেকালের পর সে তাঁকে اَبْتَرْ বা নির্বংশ রূপে আখ্যায়িত করেছিল।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَلْكَوْثَرْ টি مَفْعُوْل হিসাবে مَنْصُوْب হয়েছে। وَانْحَرْ অংশটি فَصَلِّ -এর مَعْطُوْف হয়েছে। شَانِئَكَ অংশটুকু مُفْرَدْ হয়ে مُبْتَدَا হবে আর هُوَ الْاَبْتَرُ জুমলা হয়ে خَبَرْ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্বোক্ত সূরায় কাফির মুশরিকদের কয়েকটি মন্দ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর অত্র সূরায় আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, হে রাসূল ﷺ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি! প্রভূত কল্যাণ কাজেই আপনি অধিক পরিমাণে দান করুন এবং কার্পণ্য করবেন না।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.eelm.weebly.com

এমনিভাবে পূর্ববর্তী সূরায় বলা হয়েছে, মুনাফিকরা নামাজের ব্যাপারে গাফেলতি করে। আর আলোচ্য সূরায় আদেশ করা হয়েছে যে, হে রাসূল ﷺ! আপনি শুধু আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করতে থাকুন। কেনন নামাজ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। -[নূরুল কোরআন]

শানে নুযূল : এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ ও কারণ সম্পর্কে, তাফসীরকারকদের মধ্য হতে অনেকগুলো কারণ ও উপলক্ষ বর্ণিত পাওয়া যায়-

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মদীনার সর্দার কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় পদার্পণ করলে কুরাইশগণ তাকে বলল, আপনি মদীনার সর্দার। আপনি কি আমাদের সম্প্রদায়ের সেই শিকড়কাটা ও নির্বংশ লোকটিকে দেখেছেন, যে নিজেকে আমাদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মনে করে? অথচ আমরাই হাজীগণের পুরনো খাদেম, তাদেরকে পানি পান করিয়ে থাকি এবং আমরাই নেতৃস্থানীয় লোক। তখন আল্লাহ তা'আলা إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[খাযেন]

হযরত ইবনে মুনযারের বর্ণনা, ইকরামা (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা, নবী করীম ﷺ -এর নিকট ওহী প্রেরণ করে যখন তাওহীদের দাওয়াত দিতে আদেশ করলেন, তখন কুরাইশগণ বলল- بُتِرَ مِنَّا অর্থাৎ মুহাম্মদ আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আল্লামা সুদ্দী (র.) বলেন, কোনো লোকের পুত্র সন্তান মরে গেলে কুরাইশগণ বলত, بُتِرَ فُلَانٌ অর্থাৎ অমুক পুত্রহীন বা নির্বংশ হয়েছে। সুতরাং নবী করীম ﷺ -এর কোনো এক পুত্রের (কাসেমের) যখন ইন্তেকাল হয়, তখন আস ইবনে ওয়ায়েল বলল- মুহাম্মদ নির্বংশ হয়েছে। তখন আল্লাহ উপরিউক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন। -[রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর পুত্র ইবরাহীমের যখন ইন্তেকাল হয়, তখন মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, আমাদের এ ধর্মত্যাগী লোকটি রাতে নির্বংশ হয়েছে। তখন-ই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-কাওসার অবতীর্ণ করেন। -[লোবাব, রূহুল মা'আনী]

اَلْكَوْثَرُ -এর অর্থ : কাওছার শব্দটির অর্থ ও ভাবধারা খুবই ব্যাপক। দু'এক কথায় তা প্রকাশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। كَوْثَرٌ শব্দটি فَوْعَلٌ-এর ওযনে মুবালাগার সীগাহ। শব্দটি كَثْرَةٌ বা كَثُرَ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো- বিপুল, অধিক। এখানে শব্দটি সীমাহীন মঙ্গল ও অধিক কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হবে- হে নবী! আমি আপনাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে বিপুল ও সীমাহীন মঙ্গল দান করেছি, যার কোনো হিসাব নেই। অর্থাৎ আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি- কিতাব দিয়েছি। দুনিয়ার মানুষের নেতা, নবীদের সর্দার করেছি। আপনার প্রচারিত ধর্মকে সর্বশেষ ধর্ম ও মানুষের জন্য শাশ্বত জীবন-বিধান বানিয়েছি। আপনার অনুসারী কর্মীগণ ও আপনার উম্মতগণ আপনার গুণকীর্তন করতে থাকবে, তারা এবং ফেরেশতাকুল আপনার প্রতি কল্যাণ কামনায় সোচ্চার থাকবে, দরুদ পাঠ করবে। আপনার উম্মত দ্বারা আপনার প্রচারিত দীন জগতের প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছবে। আপনাকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিকের ক্ষমতা ও আধিপত্য দান করা হবে। সমস্ত বাতিল দীনের উপর আপনার দীন বিজয়ী হবে। পরকালে হাশরের ময়দানে আপনার কর্তৃত্বে হাউজে কাওছার দান করা হবে। আপনার পিপাসাকাতর উম্মতগণকে এর পানি পান করিয়ে তাদের তৃষ্ণা চিরতরে নিবারণ করা হবে। আপনাকে শাফায়াতের অধিকারী করা হবে। এমনকি জান্নাতে থাকবে আপনার জন্য নহরে কাওছার নামে একটি উন্নতমানের প্রস্রবণ। অতএব, কাফিরগণ যে বলে, আপনি শিকড়কাটা নির্বংশ, আপনার দীনি আন্দোলন ও আদর্শ বেশিদিন টিকবে না; তা তাদের ভুল ধারণা। তারাই নির্মূল-নির্বংশ হবে। দুনিয়ার ইতিহাসে তাদের নাম-নিশানও থাকবে না।

অনেক তাফসীরকার কাওছার দ্বারা 'হাউযে কাওছার' অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। পরকালে নবী করীম ﷺ -কে হাউযে কাওছারের কর্তৃত্ব দান সম্পর্কে বহু সাহাবী হতে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যার সত্যতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একে সত্য বলে গ্রহণ করা এবং এর প্রতি ঈমান রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। একে অস্বীকার করলে কাফির হতে হয়। -[রূহুল মা'আনী]

এ ছাড়াও এ সম্পর্কে আরো অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন-

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, পরকালে পবিত্র কুরআনের শারীরিক রূপই হবে হাওযে কাওছার, যারা পৃথিবীর এ জীবনে কুরআনে কারীমের অমৃত সুধা পান করেছে এবং যে ব্যক্তি যে পরিমাণ পান করেছে, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি ঐ অনুপাতেই হাওযে কাউছারের পানি পান করার সুযোগ লাভ করবে।
   ইবনে আবী হাতেম হযরত হাসান (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন, কাওছার হলো কুরআনে কারীম।
২. ইবনুল মুনজির যাহহাক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হাউযে কাওছার হলো জান্নাতের একটি নহর।
৩. ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- কাওছার হলো আখেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ।

Free @ www.eelm.weebly.com

তবে আল্লামা সুয়ূতী (র.) হাউজে কাওছার যে একটি জান্নাতের নহর যা রাসূল ﷺ -কে দান করা হয়েছে– এ প্রসঙ্গে সত্তর খানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। –[নূরুল কোরআন]

كَوْثَرْ -এর আকৃতি-প্রকৃতি ও অবস্থা : তাফসীরকারগণ বলেন, হাউযে কাওছারের প্রশস্ততা এক মাসের ভ্রমণের পথ হবে এবং তার পার্শ্ব দেশে এমনভাবে তাঁবু খাটানো রয়েছে যেন মণি-মুক্তার ভিতরের অংশকে সম্পূর্ণ খালি করে রাখা হয়েছে এবং স্বর্ণ রূপা ইত্যাদি দ্বারা তৈরিকৃত তারকারাশির মতো কারুকার্য রয়েছে। আর তার আশে-পাশে এমন কতগুলো বৃক্ষ রয়েছে, যেগুলোর শিকড় স্বর্ণের মতো, শাখাগুলো زَمَرَّدْ পাথরের রং এবং পাথর ও কঙ্করগুলো মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের রূপ রেখার মতো এবং সে স্বর্ণের মাটিগুলো মিশক আম্বর হতেও সুগন্ধযুক্ত। তার পানি মধু হতেও মিষ্টি, দুগ্ধ হতে ও সাদা, বরফ হতেও অধিক ঠাণ্ডা। যে কেউ একবার তা হতে এক ঢোক পানি পান করবে, সে কখনো আর পিপাসিত হবে না, কখনো তার কথা ভুলবে না। –[নূরুল কোরআন]

قَوْلُهُ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ : উক্ত আয়াতে فَصَلِّ বলে কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে।

১. কেউ কেউ এখানে صَلٰوة-এর অর্থ পাঁচ ওয়াক্তের সালাতকে বুঝাচ্ছেন।

২. কেউ কেউ عِيْدُ الْاَضْحٰى-এর সালাতকে বুঝিয়েছেন। কেননা তার সাথে সাথেই কুরবানি করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে– নামাজ ও কুরবানি করো।

৩. কারো কারো মতে, তা দ্বারা عَامٌ সাধারণভাবে যে কোনো নামাজ উদ্দেশ্য হতে পারে। 'আর নহর করো' এ কথাটি দ্বারা নামাজের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা এবং তাকে সিনার উপর ধারণ করা।

৪. কারো কারো মতে, তার অর্থ– নামাজ শুরু করার পূর্বে দু' হাত উপরে তুলে তাকবীর বলা।

৫. কেউ কেউ বলেন, রুকুর পর সোজা হয়ে رَفْعِ يَدَيْنِ করা।

আর وَانْحَرْ শব্দ বলে উটের নহর করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গরুর বেলায় জবাই এবং উটের বেলায় নহর করা উত্তম। অর্থাৎ উটের চার পা বেঁধে তার حُلْقُوْم-এর মধ্যে ছুরি অথবা ধারালো অন্য কোনো অস্ত্র বসিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া, তা উটের বেলায় সুন্নত। আর গরু-ছাগল, মহিষ, বকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে জবাই করা সুন্নত। অর্থাৎ উটের কুরবানিকে নহর এবং গরু ছাগলের কুরবানিকে জাবাই বলা হয়।

فَاشْكُرْ-এর স্থলে فَصَلِّ বলার কারণ : নিয়ামত প্রাপ্তির পর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। অতএব, নিয়ামত দান করার পর নামাজের নির্দেশ না দিয়ে শুকরিয়া করার নির্দেশ দেওয়া দরকার ছিল। তার উত্তর হচ্ছে–

১. মূলত শুকর সম্মানের বাস্তব ব্যাখ্যা। আর তার তিনটি মৌলিক দিক রয়েছে–

ক. অন্তর দ্বারা এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে, সে নিয়ামত একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে, অন্যের কাছ থেকে নয়,

খ. মুখে তাঁর স্বীকৃতি দেওয়া ও গ. বাস্তব কাজে কার্যত তাঁর খেদমত করা, তার সম্মুখে অবনত হওয়া। আর নামাজ উক্ত তিনটি বিষয়কে একই সাথে শামিল করে। অতএব, বুঝা যায় যে, শুধু শুকরিয়ার নির্দেশ নয়; বরং নামাজের নির্দেশ দ্বারা শুকরিয়ার সকল দিক ও বিভাগকে শামিল করা হয়েছে।

২. সম্ভবত ইতঃপূর্বে তিনি ওহীর মাধ্যমে নামাজের বিধানাবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, কিন্তু শুকরিয়া সম্পর্কে জানেননি।

৩. হযরত মুজাহিদ ও ইকরামা (র.)-এর মতে فَصَلِّ অর্থ এখানে فَاشْكُرْ।

৪. প্রথমে যখন নবী করীম ﷺ-কে নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেছেন– আমার তো অজু নেই, আমি কিভাবে নামাজ আদায় করবো? তখন আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর পাখা দ্বারা জমিনে আঘাত করলে কাওছারের পানি নির্গত হয়, তখন তিনি সে পানি দ্বারা অজু করেন। এ সময়ই তাঁকে বলা হয়েছে فَصَلِّ لِرَبِّكَ অর্থাৎ আপনি আপনার রবের শুকরিয়া আদায় করুন। –[কাবীর]

اِنْحَرْ শব্দের অর্থ : اِنْحَرْ শব্দের অর্থ নিরূপণে মুফাসসিরদের পক্ষ থেকে দু'টি মত দেখা যায়–

১. উট কুরবানি করা। এটা অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত।

২. اِنْحَرْ শব্দটি নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। এতে কয়েকটি দিক দেখা যায়, যেমন–

ক. ইমাম ফাররা বলেন, اِنْحَرْ অর্থ– اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ অর্থাৎ নামাজে কেবলামুখি হও

Free @ www.e-ilm.weebly.com

খ. হযরত আলী (রা.) বলেন, যখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.) -কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, এ কোন نَحْر, যার নির্দেশ আমাকে করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তা কোনো কুরবানি (نَحْر) নয়; বরং আপনাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, যখন আপনি তাকবীরে তাহরীমা করবেন তখন হাত তুলে তাকবীর দিবেন

গ. হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এ نَحْرٌ-এর ব্যাখ্যা– 'দু হাতকে নামাজে বক্ষের উপর রাখা' বলেছেন। তিনি বলতেন– নামাজের পূর্বে হাত উঠানো মহান সত্তার কাছে নিবেদিত প্রাণের কাজ, আর বক্ষের উপর হাত রাখা বিনয়ী ব্যক্তির কাজ।

ঘ. হযরত আতা (র.) বলেন– اُقْعُدْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى يَبْدُوَ نَحْرُكَ। দুই সিজদার মধ্যে বসবে, যেন তোমার বক্ষ প্রকাশিত হয় (দেখা যায়)।

ঙ. হযরত যাহহাক (র.) বলেন– اِرْفَعْ يَدَيْكَ عَقِيْبَ الدُّعَاءِ اِلٰى نَحْرِكَ। অর্থাৎ দোয়া শেষে তোমরা হাত বক্ষ পর্যন্ত উঠাও। –[কাবীর]

صَلَاةٌ-এর পর نَحْرٌ উল্লেখ করার কারণ : কুরআনে কারীমের বৈশিষ্ট্য হলো صَلَاةٌ -এর পর পর জাকাতের উল্লেখ করা; কিন্তু এখানে তার বিপরীত نَحْر-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। কেননা যদি এখানে صَلَاةٌ দ্বারা ঈদের নামাজ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ব্যাপারটি তো একেবারেই স্পষ্ট। কেননা ঈদের নামাজের পরই কুরবানি করার হুকুম। আর যদি সাধারণ নামাজ হয়, তাহলে কয়েকটি উত্তর হতে পারে–

ক. মুশরিকদের নামাজ আর কুরবানি ছিল মূর্তির জন্য, তাদের বিরোধিতার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো যে, উক্ত দু'টি কাজ আপনি আপনার রবের জন্য করুন।

খ. কারো মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এমন সম্পদ ছিল না যে, সম্পদের উপর জাকাত ওয়াজিব হতে পারে। আর তাঁর উপর কুরবানি ফরজ ছিল। যেমন, তিনি বলেছেন– ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلٰى اُمَّتِيْ اَلضُّحٰى وَالْاَضْحٰى وَالْوِتْرُ –[কাবীর]

قَوْلُهُ "اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ" : নিঃসন্দেহে,আপনার শত্রুগণ নির্বংশ, শিকড়কাটা। এখানে شَانِئَكَ শব্দটি شَنِئَ হতে নির্গত। এর অর্থ হলো, এমন ঘোরতর শত্রু, যারা বিদ্বেষ, ঘৃণা ও হিংসার কারণে বঞ্চিত ব্যক্তির সাথে নির্মম ব্যবহার করে। আর اَبْتَرُ শব্দটি بَتَرَ শব্দ হতে নির্গত। আরবি ভাষায় অনেক অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ– কেটে ফেলা। প্রচলিত অর্থে মাত্র এক রাকাত নামাজ পড়াকে بُتَيْرَ (বুতার) বলা হয়। একটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে– যে কাজের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয় না তা আবতার বা ব্যর্থ হয়। সুতরাং ব্যর্থকর্ম ব্যক্তিকে আবতার বলা হয়। আত্মীয়-স্বজন ও গোত্র হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে আবতার বলা হয়। পুত্রহীন ব্যক্তিকে আবতার বলা হয়। পুত্র মরে গেলে আবতার বলা হয়। সাহায্যকারী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে নিঃসম্পর্ক হয়ে পড়লেও আবতার বলা হয়। আয়াতে মক্কার কাফেরগণের নাম-নিশানা, যশ-খ্যাতি, ধর্ম-আদর্শ ইত্যাদি মুছে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মূলত এ কথাটি কাফেরদের উক্তির প্রতিবাদে বলা হয়নি; বরং তা ছিল নবী করীম ﷺ এবং তাঁর দলীয় কর্মীবাহিনীর জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ। আর বাস্তবেও এ ভবিষ্যদ্বাণীকে আমরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই। নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর হতে মক্কার কাফেরদের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ- দুর্গতির কালো অমানিশা। তারা নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে যা কিছু করার তা করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। বদর যুদ্ধে তারা ধর্ম ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে মার খাওয়ার পর চতুর্দিকে ইসলামের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছিল। একে পাপিষ্ঠরা সহ্য করতে না পেরে ওহুদ যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধ; রচনা করেছিল; কিন্তু তাতেও সফল হতে পারল না। কয়েক বছর পরই মক্কা নগরী মহানবীর পদানত হলো এবং তারপরই ছড়িয়ে পড়তে লাগল ইসলামের জয়জয়কার। মানুষ দলে দলে, গোত্রে গোত্রে এসে নবী করীম ﷺ -এর হাতে বাইয়াত হয়ে ইসলামে দীক্ষা নিতে লাগল। মহানবী ﷺ -এর পর খেলাফতে রাশেদার যুগে ইসলামের উন্নতির বিষয়টি সর্বজনবিদিত। মোটকথা, নবী করীম ﷺ অপুত্রক হয়েও তাঁর বংশাবলির প্রতি মানুষ আজ পর্যন্ত দরুদ পাঠ করে আসছে। তাঁর বংশের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে গৌরব ভাবছে। এমনকি তাঁর সাহাবীদের বংশের সাথে সম্পর্ককে এ জীবনের আভিজাত্য ও কৌলিন্য মনে করছে। সাইয়্যেদ, আলবী, হাশেমী, সিদ্দিকী, ফারুকী, ওসমানী, আনসারী প্রমুখ বংশধারা ও উপাধি দুনিয়ায় আজ মহত্ত্ব, গৌরব ও কৌলিন্যের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। পক্ষান্তরে সে যুগের সময় আরবের বিখ্যাত সর্দারগণের নাম-নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায় না, বংশাবলির কোনো পাত্তা নেই। উপরন্তু আবূ জাহেল, আবূ লাহাব, উতবা ও শায়বার বংশ পরিচয় তো দূরের কথা তাদের নাম মুখে উচ্চারণ করতে মানুষ ঘৃণা বোধ করে। এ সব হলো هُوَ الْاَبْتَرُ -এর মূল রহস্য। যারা জীবনকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে, তাদেরকে আল্লাহ ইহকালে এভাবে পুরস্কৃত করেন এবং পরকালেও করবেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ : সূরা আল-কাফিরূন

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম বাক্যের শব্দ اَلْكٰفِرُوْنَ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে- سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ [সূরাতুল কাফিরূন]।

অত্র সূরায় বিশেষভাবে কাফিরদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও মুসলমানদের সকল আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ অবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এ কারণেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল কাফিরূন। এতে ৬টি আয়াত, ২৬টি বাক্য এবং ৭৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইকরামাহ (রা.) এবং হাসান বসরী (র.) বলেন, এ সূরাটি মাক্কী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে দু'টি মত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি মতানুযায়ী তা মাক্কী এবং অপর একটি মতে তা মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরদের মতে, তা মাক্কী সূরা। আর এর বিষয়বস্তু হতেও তা মাক্কী বলে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মূলবক্তব্য : এক কথায় এর মূল বক্তব্য হলো, তাওহীদের শিক্ষা এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ঘোষণা। অর্থাৎ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে যে নিঃসম্পর্ক এ কথাটি অত্র সূরাহ দ্বারা জানিয়ে দেওয়া-ই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর এ সূরা দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কাফের অথবা মুশরিকদের সাথে মুসলমানরা যেন সর্বদা অনমনীয়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কুফরি ও দীন পূর্ণমাত্রায় পরস্পর বিরোধী, আর এ দু'টির মধ্যে কোনো একটি দিকও যে পরস্পরের সাথে হওয়ার মতো নেই, এ কথাটিও তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। বর্তমান সূরাটি এ বিষয়ের জন্য পরিপূরক।

কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করার কোনো প্রশ্নই হবে না। আর কুফর যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক না কেন মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে।

দীনের ব্যাপারে মুসলমানরা যে কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। তা কোনো রূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে। আর আগুন ও পানির ন্যায় ইসলাম ও কুফরি দু'টি বিপরীতমুখি আদর্শ। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদের ধর্ম, আর কুফরি মানব রচিত মানব মন গড়ানীতি, ইসলামের পরিপন্থি। মুসলমানদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। আর কাফেরদের উপাস্য তারা ধার্য করেছিল ৩৬০টি মূর্তিকে। অতএব, মুসলমান ও অমুসলমানদের নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। -[আশরাফী]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বহু ফজিলত রয়েছে-

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান মর্যাদাশীল সূরা। -[তিরমিযী]

২. শিরক হতে পরিত্রাণ দানকারী হিসাবে এ সূরাটি প্রসিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হযরত নওফাল (রা.) আরজ করেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন- যা আমি শয্যাগমনকালে রাত্রিতে পড়তে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা কাফিরূন পড়ো, কেননা তা শিরক হতে পবিত্রতা ঘোষণা করে।
-[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-কাফিরূন মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

سِتُّ اٰيَاتٍ : ৬ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

নَزَلَتْ لَمَّا قَالَ رَهْطٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ النَّبِيَّ ﷺ تَعْبُدُ اٰلِهَتَنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ اِلٰهَكَ سَنَةً

অনুবাদ :

এটা তখন অবতীর্ণ হয় যখন মুশরিকদের একটি দল নবী করীম ﷺ -কে প্রস্তাব দেয় যে, এক বছর আপনি আমাদের ইলাহদের উপাসনা করবেন। আর এক বছর আমরা আপনার ইলাহের উপাসনা করব।

١. قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ .

১. বলো, হে কাফেরগণ !

٢. لَآ اَعْبُدُ فِى الْحَالِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنَ الْاَصْنَامِ .

২. আমি উপাসনা করবো না বর্তমানে যা তোমরা উপাসনা কর। মূর্তিসমূহের।

٣. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ فِى الْحَالِ مَآ اَعْبُدُ وَهُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَحْدَهٗ .

৩. আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও বর্তমানে যাঁর ইবাদত আমি করি তিনি হলেন এক আল্লাহ।

٤. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ فِى الْاِسْتِقْبَالِ مَا عَبَدْتُّمْ .

৪. আর আমিও ইবাদতকারী নই ভবিষ্যতে তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছ।

٥. وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ فِى الْاِسْتِقْبَالِ مَآ اَعْبُدُ عَلِمَ اللّٰهُ مِنْهُمْ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَاِطْلَاقُ مَا عَلَى اللّٰهِ عَلٰى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ .

৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও ভবিষ্যতে যাঁর ইবাদত আমি করি আল্লাহ তা'আলা অবগত ছিলেন যে, এ কাফেরগণ ঈমান আনয়ন করবে না। আর আল্লাহ তা'আলার জন্য مَا অব্যয়টির ব্যবহার تَقَابُلْ -এর কারণে হয়েছে।

٦. لَكُمْ دِيْنُكُمْ الشِّرْكُ وَلِىَ دِيْنِ الْاِسْلَامُ وَهٰذَا قَبْلَ اَنْ يُؤْمَرَ بِالْحَرْبِ وَحَذَفَ يَاءَ الْاِضَافَةِ السَّبْعَةُ وَقْفًا وَ وَصْلًا وَ اَثْبَتَهَا يَعْقُوْبُ فِى الْحَالَيْنِ .

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম শিরক আর আমার জন্য আমার ধর্ম ইসলাম। আর তা যুদ্ধ সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তনের পূর্বেকার বিধান। কেরাতে সাবয়ায় وَقْف ও وَصْل উভয় অবস্থায়াই دِيْنِىْ শব্দের ى বিলুপ্ত। কিন্তু ইয়াকূব উভয় ক্ষেত্রেই ى-কে বহাল রাখার পক্ষপাতি।

Free @ www.ejilm.weebly.com

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ الخ : قُلْ ফে'ল يَا হরফে নেদা, اَلْكٰفِرُوْنَ মুনাদা, لَا اَعْبُدُ الخ জওয়াবে নেদা, বাক্যটি قُلْ-এর মাফউল। لَا اَعْبُدُ الخ এবং وَلَا اَنَا عَابِدٌ الخ তাতে দু'টি মত রয়েছে। ১. প্রথমটি দ্বিতীয়টির তাকিদ। ২. প্রথমটি মুস্তাকবেলের জন্য, দ্বিতীয়টি হালের জন্য। কেননা, لَا মুযারে'-এর উপর মোস্তাকবেল অর্থে ব্যবহৃত হয়। لَا اَعْبُدُ الخ-এর অর্থ– لَا اَعْبُدُ فِى الْمُسْتَقْبِلِ وَلَا اَنْتُمْ فَاعِلُوْنَ فِى الْمُسْتَقْبِلِ مَا اُرِيْدُ مِنْكُمْ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّىْ مَا تَطْلُبُوْنَ কেউ কেউ এর বিপরীতও বলেছেন।

دِيْنُكُمْ মুবতাদা মুয়াখখার আর لَكُمْ খবরে মুকাদ্দাম। دِيْنِ মূলে دِيْنِىْ ছিল। আয়াতসমূহের শেষ প্রান্তের সাথে সমতা বিধানের জন্য ى বিলোপ করা হয়েছে। আর তার চিহ্ন হিসাবে যের অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা আল-কাওছারের শেষ আয়াতে কাফিরদের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কাফিররাই নিঃসন্তান। বর্তমান সূরা পূর্ণটিই কাফিরদের ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে। এদিক দিয়ে উভয় সূরার মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান।

শানে নুযূল : ১. যখন একদল মুশরিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, আপনি এক বছর আমাদের উপাস্য [মূর্তিগুলোকে] দেবতাসমূহকে অর্চনা করুন, তবে আমরাও আপনার মা'বূদকে এক বৎসরকাল ইবাদত করবো। তখন উক্ত সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

আবূ জাহল ও আস ইবনে ওয়ায়েল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছ নামক কাফেরগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মাধ্যমে একদা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছাল যে, হে মুহাম্মদ ﷺ! আসুন, আমরা পরস্পর সন্ধি করে নিবো। এক বছর আমরা আপনার আল্লাহর পূজা করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের মাবূদগণের উপাসনা করবেন। এ অনুপাতে উভয় পক্ষই উভয়ই পক্ষের ধর্ম হতে কিছু কিছু হিসসা লাভ করতে সক্ষম হবে। তদুত্তরে হুযূর ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করা হতে পানাহ্ চাই।

অতঃপর তারা বলল, ঠিক আছে, আপনি আমাদের কিছু সংখ্যক উপাস্যকে সত্য বলে গ্রহণ করুন, তবে আমরাও আপনার প্রভুকে বিশ্বাস করবো এবং তাঁর পূজা করবো। এমতাবস্থায়ই উক্ত সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

১. ইবনে ইসহাক নামক প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা এবং ইবনে জারীর ও তাবারানী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করে বলেন, কুরাইশগণ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি যদি চান যে, আপনার সম্পদের প্রয়োজন আছে, তবে আমরা আপনাকে মক্কার সর্ববৃহৎ ধনী বানিয়ে দিবো। আর বিবাহ করতে চাইলেও আমাদের আরবের সর্বোচ্চ সুন্দরী রূপসী ও গুণবতী মহিলাটি আপনাকে বিবাহ করিয়ে দিব। তথাপিও আপনি আমাদের মা'বূদসমূহকে আর গালি দিবেন না। আর যদি এ কথায় একমত না হন, তবে আপনি আমাদের খোদাগুলোকে এক বছর পূজা করবেন, পরে আমরাও আপনার প্রভুকে এক বছর পূজা করবো। অতঃপর হুযূর ﷺ বললেন, একটু অপেক্ষা কর, দেখি আমার প্রভু তাতে কি বলেন। অতঃপরই অত্র সূরাটি নাজিল হয়।

قُلْ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তি : قُلْ 'বলে দিন'–এ নির্দেশ যদিও নবী করীম ﷺ -এর প্রতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী কথা হতে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, তা দ্বারা প্রত্যেক মু'মিনকে সম্বোধন করা হয়েছে। কাফেরদেরকে সামনের কথাগুলো বলে দেওয়া প্রত্যেক মু'মিনেরই কর্তব্য। এমনকি, যে ব্যক্তি তওবা করে ঈমান গ্রহণ করেছে, তার উপরো কর্তব্য যে, সে এ কথাগুলো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিবে। –[কাবীর]

Free @ www.eilm.weebly.com

قُلْ শব্দের উপকারিতাসমূহ : قُلْ ব্যবহারের মাধ্যমে ৪৩টি ফায়দা পরিলক্ষিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হলো-

১. নবী করীম ﷺ মানুষের জন্য নম্র, ভদ্র এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় যদি সরাসরি তাঁর পক্ষ হতে 'হে কাফেররা' বলা হয়, তাহলে ধারণা করা হবে বা তারা বলে বেড়াবে যে, এমন শক্ত শব্দ কোনো প্রকারেই নবীর পক্ষ থেকে হতে পারে না। তা আমার তথা কোমল চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমতাবস্থায় قُلْ শব্দ এ কথার ইঙ্গিত বহন করেছে যে, তা আমার পক্ষ থেকে নয়; স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে, তিনি-ই আমাকে 'বলো' বলেছেন।

২. যখন তাঁকে বলা হয়েছিল وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ তখন কিছু কড়া কথা বলতে তিনি দ্বিধা করছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ বলেন- [আপনার কোনো ভয় নেই] আপনি বলুন।

৩. قُلْ ছাড়া বললে কাফেররা ধারণা করতে বা বলতে পারে যে, তা মুহাম্মদের উক্তি, তাকে পাকড়াও করো। এমন মন্তব্য করতে তার আদৌ ভয় করেনি? এ সমস্ত কথা থেকে বাঁচার জন্য قُلْ বলা হয়েছে। কেননা এতে আল্লাহর কথা বুঝা যায়। -[কাবীর]

يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ-এর মুখাতাব কারা? : বিশেষ করে কাফেরগণ। আর এ শব্দটি মূলত কোনো গালি নয়। তাই তাদেরকে يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ বলে গালি দেওয়া হয়নি। তা আরবি ভাষায় নাস্তিকদের সম্বোধনসূচক শব্দ মাত্র। তার অর্থ হলো- অমান্যকারী বা অবিশ্বাসী। অতএব, يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ-এর অর্থ হবে, হে সে সকল লোকেরা! যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল ﷺ-এর রিসালাতকে অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। -[কাবীর, মাদারিক]

يَاَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ বলে সম্বোধন না করার কারণ : উক্ত আয়াতে يَاَيُّهَا الْمُشْرِكُوْنَ বলা হয়নি; বরং يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ বলা হয়েছে। কেননা আয়াতে কেবল মুশরিকদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং সকল অবিশ্বাসীর দল উদ্দেশ্য। এতে কাফের, মুশরিক, ইহুদি, নাসারা, অগ্নিপূজক, হিন্দু, বৌদ্ধ, অর্থাৎ সকল অমুসলমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যদি مُشْرِكُوْنَ বলা হতো, তবে এক জাতিকেই خَاصْ করা হতো বাকিরা বাদ পড়ে যেত।

এখানে আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার কুফরকে একই অবস্থায় মেপেছেন। কারণ, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ প্রত্যেক প্রকারের অমুসলমান একই স্তরে রয়েছে।

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ -এর তাৎপর্য : বায়যাবী গ্রন্থকার বলেন, لَا শব্দটি اِسْتِقْبَالْ অর্থে مُضَارِعْ-এর উপর প্রবিষ্ট হয় রূহুল বয়ান গ্রন্থকারও এ কথা বলেন। لَا টি مُضَارِعْ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে তেমন ব্যবহার হয় না। তদ্রূপ مَا অক্ষরটিও مُضَارِعْ بِمَعْنٰى حَالْ-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

কেউ কেউ বলেন, لَا এবং مَا প্রত্যেকটি حَالْ এবং اِسْتِقْبَالْ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে আমরা যে কোনো একটিকেই حَالْ -এর জন্য এবং অপরটিকে اِسْتِقْبَالْ-এর জন্য ব্যবহার করে থাকি।

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ-এর তাফসীরে ইমাম বুখারী (র.)ও এ কথাই বলেন যে, مَا ও لَا কালিমা দু'টি কখনো زَمَانَهْ حَالْ আবার কখনো زَمَانَهْ مُسْتَقْبِلْ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে এ অক্ষরগুলো تَكْرَارْ নেওয়া হয়েছে, এ কথা বলার প্রয়োজন থাকবে না। বড় বড় তাফসীরকারগণের অভিমতও তাই।

অতএব, আয়াতের তাফসীর হবে-কার্যত এমন হচ্ছে না যে, আমি তোমাদের মা'বূদগণের ইবাদত করবো, আর তোমরাও আমার মা'বূদের ইবাদত করবে। আর ভবিষ্যতেও কখনো এরূপ হতে পারে না। অর্থাৎ আমি আমার একত্ববাদের উপর বহাল থাকা অবস্থায় এবং তোমরা তোমাদের শিরকের উপর বহাল থেকে একে অপরের প্রভুর ইবাদত করবে, তা কখনো হতে পারে না।

মূলকথা হলো, তোমাদের এবং আমাদের মা'বূদের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই, ইবাদতের পদ্ধতিতেও মিল নেই।

এভাবেই مَا এবং لَا -এর تَكْرَارْ -এর বিষয়টি নিরসন করা হয়েছে। আর মুসলমানদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদতের নীতিমালাও একই। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহী-এর মাধ্যমে তা শিখিয়ে দিয়েছেন এবং মুশরিকদের নিয়মগুলো সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও স্বেচ্ছায় তৈরিকৃত, আল্লাহর কোনো বিধান মতে নয়। -[মা'রিফ]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ আয়াতকে দ্বিরুক্ত করার কারণ : আয়াতটি দ্বিরুক্তির ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে।

১. تَكْرَارْ নেই, এটা কয়েকটি কারণে :

ক. প্রথম আয়াতটি ভবিষ্যৎকালের আর দ্বিতীয় আয়াতটি বর্তমানের জন্য।

খ. প্রথমটি বর্তমানের আর দ্বিতীয়টি ভবিষ্যৎ কালের জন্য।

গ. উভয়টির ক্ষেত্র ভিন্ন– এভাবে যে, তোমরা যা কিছু পূজা করছ আমি তার পূজা করি না, এ আশায় যেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করছ না– এ আশায় যে, আমি তোমাদের মূর্তির পূজা করবো।

২. تَكْرَارْ আছে। তখন বলা হবে যে, ক. তাকিদের জন্য تَكْرَارْ নেওয়া হয়েছে। খ. কাফেরগণ তাদের প্রস্তাবকে দু'বার দিয়েছিল, এ কারণে জবাবও দু'বার দেওয়া হয়েছে। [তাদের প্রস্তাব ছিল যে, হে মুহাম্মদ, তুমি এক মাস বা এক বছর আমাদের মূর্তিকে পূজা কর আমরাও অনুরূপ তোমার আল্লাহকে পূজা করবো।] –[কাবীর]

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ বলার কারণ : অর্থাৎ তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার। এ আয়াতটির অর্থ অবলোকন করে অনেক লোক বিভ্রান্ত হয়। তারা বলে– তা দ্বারা ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের স্বীকৃতি দিয়েছে। যদি তাদের ধর্ম সত্যই না হবে তবে কুরআনে কেন এ কথা বলা হলো যে, তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার। এটা দ্বারা দুই ধর্মকেই পাশাপাশি অবস্থান করার এবং একে অপরের উপর হস্তক্ষেপ না করার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু দীন শব্দ দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে; তা চিন্তা না করার ফলেই তাদের মনে এ উদ্ভট চিন্তা গজিয়েছে। এখানে দীন শব্দটি কর্মফল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সূরা আল-ফাতিহায় আল্লাহকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ কর্মফল দিনের কর্তা বলা হয়েছে। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের মর্ম হবে– তোমাদের কর্মফল তোমরা ভোগ করবে, আমাদের কর্মফল আমরা ভোগ করবো। যেহেতু এ আয়াত ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তখন জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই কতিপয় তাফসীরকার বলেন– এ আয়াতের বিধান দ্বারা কাফেরদেরকে ইসলামের প্রথম যুগে ধর্ম পালনের যেটুকু অবকাশের কথা ভাবা যায়, তা জিহাদের বিধান দ্বারা রহিত করা হয়েছে। মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য লড়াইগুলোই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বস্তুত দীনকে ধর্ম অর্থ গ্রহণ করলে আমরা এ কথাও বলতে পারি, এটা ঠিক অনুরূপ কথার ন্যায়, যেমন আমরা ধিক্কার ও ভর্ৎসনাভাবে বলে থাকি– তোমার পথে তুমি, আমার পথে আমি। এ কথা দ্বারা আমরা যেমন তার পথের স্বীকৃতি দেই না এবং সহাবস্থানেরও অবকাশ বুঝাই না; বরং তা দ্বারা পথের ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়। আয়াতেও অনুরূপভাবে 'তোমার দীন তোমার আমার দীন আমার' বলে তাদের জীবনাদর্শ ও শিরকি কর্মপন্থার ভয়াবহ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের শিরকি জীবনাদর্শ ও মতবাদের স্বীকৃতি বা পাশাপাশি অবস্থানের কথা বলা হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ হলো তোমাদের জন্য তোমাদের কুফরি ও শিরক, আর আমার জন্য রয়েছে তাওহীদ ও ইখলাস। এতে কাফেরদের জন্য বিশেষ সতর্ক বাণী রয়েছে। এ কথার তাৎপর্য হলে, নবী করীম ﷺ কাফেরদেরকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেছেন তোমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করার জন্য। কিন্তু যদি তোমরা আমার আহবানে সাড়া না দাও, তবে তোমরা আমাকে শিরকের দিকে আহ্বান করো না। তোমরা তোমাদের কুফরি নিয়েই থাক। আর আমাকে আমার দীন নিয়ে থাকতে দাও। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilmweebly.com

سُوْرَةُ النَّصْرِ : সূরা আন-নাসর

সূরাটির নামকরণের কারণ : উক্ত সূরার প্রথম আয়াত হতেই তার নামকরণ করা হয়েছে। আর দলে দলে যখন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল তখন তাতে ইসলামের শক্তি ও সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হচ্ছিল। এ সূরায় সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে سُوْرَةُ النَّصْرِ। আর অত্র সূরাকে (سُوْرَةُ التَّوْدِيْعِ) বিদায় সূরাও বলা হয়। কেননা তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিদায় সম্পর্কীয় ইঙ্গিতও রয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এরপর আর কোনো সূরা নাজিল হয়নি; অর্থাৎ এটাই সর্বশেষ সূরা। -[মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী]

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি বিদায় হজকালে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে 'মিনা' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযূর ﷺ তাঁর উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বিদায় হজের ভাষণ দেন। -[তিরমিযী, বায়হাকী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। -[আহমদ]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন হুযূর ﷺ বলেন, এ বছর আমার ইন্তেকাল হবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে উঠেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তখন বলেন, আমার বংশধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) হেসে উঠলেন। -[ইবনে আবূ হাতেম ইবনে মারদুবিয়াহ]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অর্থাৎ এরপর কুরআনের পরিপূর্ণ কোনো সূরা নাজিল হয়নি।

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

অতঃপর হুযূর ﷺ ৮০ দিন জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে আয়াতে كَلَالَةً নাজিল হয়। তখন হুযূর ﷺ-এর বয়স মাত্র ৫০ দিন বাকি ছিল।

অতঃপর لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ নাজিল হয়, তখন হুযূর ﷺ-এর বয়স ৩৫ দিন মাত্র বাকি ছিল। অতঃপর وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الخ নাজিল হয়, তারপর হুযূর ﷺ-এর হায়াত ২১/৭ দিন বাকি ছিল। তবে اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الخ সূরাটি فَتْحِ مَكَّةَ-এর পূর্বে কি পরে নাজিল হয় এ মর্মে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীত হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়। তাতে বর্ণিত রয়েছে, এটা খায়বার হতে ফেরার পথে নাজিল হয়। আর খায়বারের যুদ্ধ فَتْحِ مَكَّةَ-এর পূর্বে হয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূলবক্তব্য হচ্ছে, আরবের বুকে ইসলাম একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আরব হতে পৌত্তলিকতা নির্বাসিত হওয়ার শুভ সংকেত দান এবং নবী করীম ﷺ-এর বিদায়কাল ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাষ। সুতরাং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মদদ ও বিজয় যখন সমাগত হবে, তখন দিকে দিকে তোমরা লক্ষ্য করবে ইসলামের জয়জয়কার অবস্থা, দেখতে পাবে যে, দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণের দিন শেষ হয়েছে। এখন ইসলাম আল্লাহর মদদে পুষ্ট হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের বিদায় হবে। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ভবিষ্যত বাণী। সর্বশেষে নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহর হামদ ও গুণগানসহ তাসবীহ পাঠের এবং ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে এ কথা বলা হয়েছে- ইসলাম আরবের বুকে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর একটি বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের এ বিজয় ডংকা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং নবীর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন তাঁর বিদায়ের দিন সমাগত। অতএব হে নবী! আপনার দ্বারা আল্লাহ যে এ মহৎ কাজ করালেন আপনি এ জন্য আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন এবং বিনীত মস্তকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দৃষ্টিতে নবী করীম ﷺ -এর ভুল-ত্রুটি বা দায়িত্ব পালনে গাফেলতি হয়নি; বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে বান্দা সর্বদাই অপরাধী। বান্দা কোনো সময়ই নিজেকে আল্লাহর নিকট নির্দোষ বলতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অতিশয় বিনয় প্রকাশের জন্যই ইস্তেগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আন-নাসর মদীনায় অবতীর্ণ

ثَلَاثُ اٰيَاتٍ : ৩ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ نَبِيَّهُ ﷺ عَلٰى اَعْدَائِهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ .

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য শত্রুর মোকাবিলায় স্বীয় নবীর প্রতি এবং বিজয় মক্কা বিজয়।

٢. وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَىِ الْاِسْلَامِ اَفْوَاجًا جَمَاعَاتٍ بَعْدَ مَا كَانَ يَدْخُلُ فِيْهِ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ الْعَرَبُ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ طَائِعِيْنَ .

২. আর তুমি লোকদেরকে দেখতে পাবে তারা আল্লাহর দীনে প্রবেশ করছে অর্থাৎ ইসলামে দলে দলে অথচ পূর্বে একজন একজন করে ইসলামে দীক্ষিত হতো। মক্কা বিজয়ে পর আরবের বিভিন্ন এলাকার লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে।

٣. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اَىْ مُتَلَبِّسًا بِحَمْدِهٖ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُوْلِ هٰذِهِ السُّوْرَةِ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ وَعَلِمَ بِهَا اَنَّهٗ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهٗ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتُوُفِّىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ .

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, মহিমা ঘোষণা করো প্রশংসার সাথে। আর তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী ।এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক পরিমাণে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করতে থাকেন। এ সূরার মাধ্যমে এটা অনুমিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইহজগত ত্যাগের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। অষ্টম হিজরির রমজান মাসে মক্কা বিজয় সূচিত হয়, আর দশম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী ﷺ ইন্তেকাল করেন।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ اِذَا جَاءَ نَصْرُ الخ : اِذَا মানসূব হয়েছে جَاءَ দ্বারা। কেউ কেউ বলেন– يُسَبِّحُ দ্বারা মানসূব হয়েছে। نَصْرُ মাসদার اللّٰه ফায়েল -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। আর মাফঊল উহ্য। অর্থাৎ نَصْرُهُ اِيَّاكَ اَوِ الْمُؤْمِنِيْنَ তা মিলিত হয়ে جَاءَ-এর ফায়েল হয়েছে। وَالْفَتْحُ আতফ হয়েছে نَصْرُ اللّٰهِ-এর উপর। وَ رَاَيْتَ আতফ হয়েছে جَاءَ-এর উপর। আর رَاَيْتَ-এর অর্থ যদি عِلْم হয়, তাহলে প্রথম মাফঊল হবে نَاسَ আর দ্বিতীয় মাফঊল হবে يَدْخُلُوْنَ আর যদি رَاَيْتَ-এর অর্থ عُبْرَةٌ হয়.

তখন يَدْخُلُوْنَ হাল হবে। উভয় অবস্থায় اَفْوَاجًا শব্দ يَدْخُلُوْنَ-এর ফায়েল হতে হাল হবে। فَسَبِّحْ الخ জওয়াবে শর্ত। بِحَمْدِ رَبِّكَ হাল হিসেবে নসবের স্থলে অবস্থিত। وَاسْتَغْفِرْهُ আতফ হয়েছে سَبِّحْ-এর উপর اِنَّهُ كَانَ الخ তা'লীল হলো اِسْتَغْفِرْهُ-এর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে কাফিরদের অপ-সন্ধির প্রস্তাবকে নাকচ করে ইসলামর স্বতন্ত্রতা ও স্বশক্তিতে নির্ভরতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বর্তমান সূরাতে কাফেরদের পরাজয় ও ইসলামের মহাবিজয় সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

শানে নুযূল : হযরত মুয়াম্মার ও যুহরী (র.)-এর উদ্ধৃতিসহ মুহাদ্দিস আবদুর রায্যাকের বর্ণনা। ইমাম যুহরী (র.) বলেন- মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন খালেদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী মক্কার নিম্নভূমিতে প্রেরণ করলেন। তিনি কুরাইশগণের দল অতিক্রম করে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন। অতঃপর অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিলে তিনি অস্ত্র সংবরণ করলেন। তখন মক্কার লোকগণ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। -[লোবাব]

এ বর্ণনাকে অধিকাংশ তাফসীরকার দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অধিকাংশের মতে এ সূরা বিদায় হজের সফরে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময় অবতীর্ণ হয়। এটাই হচ্ছে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ সূরারূপে সর্বশেষ সূরা। এ সূরা নাজিলের পর নবী করীম ﷺ সত্তর দিন অথবা তিনমাস ইহজগতে জীবিত ছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণে একে 'সূরাতুল বিদা'ও বলা হয়। সুতরাং এ দৃষ্টিতে বলা যায় যে, এ সূরাটি মূলত কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়নি। এটা হচ্ছে বিশ্বের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আরবের মাটি হতে শিরক ও পৌত্তলিকতা চিরতরে বিদায় হওয়ার পূর্বাভাষ এবং নবী করীম ﷺ এ জগৎ হতে চিরতরে বিদায় হওয়ার বিদায়ী সংকেত।

نَصْرٌ এবং فَتْحٌ-এর মাঝে পার্থক্য : نَصْرٌ এবং فَتْحٌ-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন-

১. نَصْرٌ হলো, লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য-সহযোগিতা। আর فَتْحٌ হলো, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া।

২. نَصْرٌ হলো, فَتْحٌ-এর জন্য কারণের মতো।

৩. نَصْرٌ হলো, দুনিয়ায় স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া, আর فَتْحٌ হলো জান্নাত লাভ হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া।-[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

ইযাফাতের সাথে نَصْرُ اللّٰهِ বলার কারণ : نَصْرٌ তো আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। যেমন, বলা হয়েছে وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ অতএব, نَصْرُ اللّٰهِ বা 'আল্লাহর সাহায্য' বলে সাহায্যকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ কি? এটার জবাব হলো, نَصْرُ اللّٰهِ-এর অর্থ হবে, এমন সাহায্য যা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। এ সাহায্য দুনিয়ার কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। অথবা, এমন সাহায্য যা আল্লাহর বিশেষ হিকমতের মাধ্যমে হয়ে থাকে অথবা সাহায্যকে বিরাট করে দেখানোর জন্য نَصْرُ اللّٰهِ বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহর সাহায্য আর অন্যের সাহায্যের মধ্যে তুলনাই চলে না। -[কাবীর]

আল্লাহর সাহায্য আগমনের পদ্ধতি : উক্ত আয়াতে আল্লাহর সাহায্য আগমনের যে কথা বলা হয়েছে তা স্বয়ং পায়ে হেঁটে অথবা পাখির মতো উড়ে আসার মতো কোনো কিছু নয়; বরং মুসলমানগণ যখন কাফেরদের সাথে জান বাজি রেখে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে থাকে। অথবা কাফেরদের সাথে ইসলামের সত্যতার দলিল পেশ করে থাকে। আর যখন মুনাফিক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং আল্লাহভীতি অর্জন করার জন্য শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় আত্মাসমূহের সাথে জিহাদ করে থাকে, তখনই তাদের জিহাদ এবং অসত্যের মোকাবিলা ও কাফেরদের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের নিকট আল্লাহর শক্তি বা সাহায্য আগমন করে থাকে এবং এ সাহায্যই আল্লাহর [পক্ষে] জয় বলা হয়।

আয়াতে نَصْرٌ এবং فَتْحٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত فَتْحٌ দ্বারা তাফসীরকারগণ বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য উদ্দেশ্য করেছেন।

১. এখানে فَتْحٌ দ্বারা মক্কা বিজয়কে লক্ষ্য করা হয়েছে। কেননা, মক্কা বিজয় হওয়ার পর আরবের কাফেরদের শক্তি শেষ হয়ে গেল এবং অধিকাংশ আরববাসীগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল।

২. অথবা, এটা দ্বারা সাধারণ বিজয় উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা তখন ইসলামের বিশেষত্ব সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ল, সারা বিশ্বেই মুসলমানদের বিজয় লাভ হতে লাগল। -[খোলাসাতুত্ তাফসীর]

৩. অথবা, فَتْحٌ দ্বারা আল্লাহর اَسْرَارْ وَمَعْرِفَتْ-এর বিজয় উদ্দেশ্য, আর نَصْر দ্বারা আল্লাহর 'তাওফীক' উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ আল্লাহর তাওফীক যখন আমাদেরকে সাহায্য করবে তখন نَفْس اَمَّارَهْ ও শয়তান আমাদের সম্মুখে পরাজিত হবে এবং আল্লাহর مَعَارِفْ وَحَقَائِقْ-এর দরজা খুলে যাবে, সকল দিকেই ইসলামের উন্নতি হতে থাকবে।

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

نَصْر দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য, আর فَتْح দ্বারা সাধারণ বিজয়। যে বিজয়ের পর আর বিজয় হতে পারে না, যা আল্লাহর ذَات এবং صِفَات-এর সম্বন্ধে كَشْف লাভ করা।

৪. অথবা, فَتْح দ্বারা فَتْح جَبَرُوْت উদ্দেশ্য অর্থাৎ রূহ জগৎ সম্পর্কে كَشْف হওয়া।

نُصْرَتْ হলো– কোনো লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, যাকে 'উপকরণ' বলা হয়। আর فَتْح হলো লক্ষ্যস্থলে পৌছে যাওয়া, যা সাহায্যের প্রতিফল স্বরূপ। আর فَتْح-এর জন্য نُصْرَتْ আবশ্যক, কিন্তু نُصْرَتْ-এর জন্য فَتْح হওয়া আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا : মক্কা বিজয়ের পূর্ব থেকেই বহুসংখ্যক লোক এমন হয়েছিল যে, যারা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর রিসালত এবং ইসলামের সত্যকে অন্তরের সাথে বিশ্বাস করেছিল। ইসলাম গ্রহণ করলে কুরাইশগণ আক্রমণ করবে– এ ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না।

অথবা, আরও বিভিন্ন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন তাদের সে সকল বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত হয়ে গেল এবং তখন থেকেই তারা দলে দলে ইসলামে দাখিল হতে শুরু করল এবং ইয়েমেন থেকে ৭০০ দল একযোগে মুসলমান হয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট আসছিল। তারা পথে আজান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে আসছিল। এতদ্ভিন্ন আরও বহু আরবীগণও এরূপ দলবদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। এ বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

অর্থাৎ তুমি দেখতে পাবে যে, লোকজন দলে দলে শান্তির ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে।

وَرَاَيْتَ النَّاسَ-এর اَلنَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য : বাহ্যিকভাবে اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা সকল মানুষ বুঝায়। আর এতে সকল মানুষ দীনে প্রবিষ্ট হওয়ার কথা। অথচ বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর জবাব দু'ভাবে দেওয়া যায়।

১. اَلنَّاسُ দ্বারা এখানে (اِنْسَانِيَّةٌ) মনুষ্যত্ববোধ উদ্দেশ্য। আর মনুষ্যত্ব বলতে দীন এবং ইবাদতকে বুঝায়। যার মধ্যে উক্ত মনুষ্যত্ব নেই, তাকে نَاسٌ বলাও ঠিক নয়। এ কারণেই বলা হয়েছে اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) একদা اَلنَّاسُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলেন, তখন তিনি বললেন– نَحْنُ النَّاسُ، اَشْيَاعُنَا اَشْبَاهُ النَّاسِ، وَاَعْدَاؤُنَا النَّسْنَاسُ অর্থাৎ আমরা হলাম اَلنَّاسُ এবং আমাদের অনুগামীরা হলো মানুষের মতো আর আমাদের শত্রুরা হলো ছোট বানর।" তা শুনে হযরত আলী (রা.) তাঁকে চুম্বন দিলেন এবং বললেন– اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

২. اَلنَّاسُ দ্বারা ইয়েমেনবাসীগণ উদ্দেশ্য। যখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَجَاءَ اَهْلُ الْيَمَنِ اَلْاِيْمَانُ يَمَانٌ .....

অর্থাৎ আল্লাহ আকবার, আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় এসেছে, আর ইয়েমেনবাসীরা এসেছেন। ঈমান তো ইয়েমেনীদের ঈমান .....। –[কাবীর]

দলে দলে দীন গ্রহণ : উপরিউক্ত দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মদদ ও বিজয় আগমনের পর আপনি দেখবেন যে, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। এখানে 'আপনি' দ্বারা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হলেও ভাষণের মূল লক্ষ্য হলো সমগ্র মুসলিম উম্মত। কুরআন মাজীদে এ ধরনের সম্বোধনের অনেক উদাহরণই পাওয়া যাবে যে, নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে সমগ্র মুসলিম উম্মতকে কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং আয়াতটির মর্ম এই হবে যে, এখন আর দুই একজন করে ইসলামে দীক্ষা নেওয়ার সময় নেই। এখন মানুষ গোত্র, অঞ্চল ও দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায়ই এরূপ অবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ﷺ তায়েফ ও হোনায়েন বিজয় করলেন। এটার পরই শুরু হয়েছিল গোত্রে-গোত্রে ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণের পালা। নবম হিজরির শুরুতেই আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে বিভিন্ন গোত্র এসে নবী করীম ﷺ -এর মুবাবরক হস্তে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। নানাদিক হতে প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি এসে মহানবীর আস্তানায় ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। পরিশেষে এমন অবস্থা হলো যে, নিকট আরবে কোথাও একজন মুশরিক খুঁজে পাওয়া যেত না। সারকথা এই যে, আল্লাহর মদদ যখন বিজয়রূপে মুসলমানদের কাছে সমাগত হবে তখনই মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করবে। এটাই হলো আয়াতের তাৎপর্য। সুতরাং এটা কোনো একটি দেশ, অঞ্চল ও যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অবহমানকাল ধরে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো দেশে, যে কোনো অঞ্চলে, যে কোনো যুগেই এটার রূপায়ন পরিলক্ষিত হতে পারে।

اَلنَّاسُ-কে مَعْرِفَة নেওয়ার কারণ : এর কারণ আনুষঙ্গিকভাবে প্রকাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ اَهْلُ يَمَن এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট কতগুলো গোত্র, যারা দল বেঁধে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদেরকে ভিন্নভাবে বুঝানোর জন্য اَلنَّاسُ-কে مَعْرِفَة নেওয়া হয়েছে।

Free @ www.eilm.weebly.com

অথবা, এটাও বলা যায় যে, اَلتَّعْرِيْفُ لِلتَّعْظِيْمِ অর্থাৎ সেই ইসলাম গ্রহণকারী দলকে অন্যান্যদের উপর বিশেষত্ব দানের লক্ষ্যে اَلِفْ لَامْ নিয়ে مَعْرِفَة ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ...... تَوَّابًا : আয়াতের অর্থ হলো, অতঃপর আপনার প্রভুর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর তাঁর দরবারে গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা তিনি গুনাহগারদের গুনাসমূহ ক্ষমা করে থাকেন। এ আয়াত দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَارِفْ بِاللّٰهِ গণ সাধারণভাবে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ করার পর একাগ্রতার সাথে كَمَالِيَّتْ-এর সর্বোচ্চ পন্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে থাকেন। যাতে সাধারণ মুসলমানগণ পৌছতে সক্ষম নয়। যেমন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ كَمَالِيَّتْ -এর সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছেন। এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, وَاسْتَغْفِرْهُ আপনি তাঁর ইস্তিগফার করুন।

ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়ার দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যখন عَارِفْ بِاللّٰهِ-এর দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং সর্বস্তরের মানুষ আপনার অনুসারী হয়েছে এবং তাদের اِسْتِعْدَادْ সমূহ আপনার অপেক্ষা কোনোভাবেই তুলনীয় নয়; বরং তারা বহু নিম্নে রয়ে গেছে।

তাই নাকেস উম্মতগণের كَمَالِيَّتْ -এর জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। যাতে আপনার অসিলায় তারা কিয়ামতের দিনের জন্য পূর্ণমাত্রায় ঈমানের নূর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যু সংবাদ : সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এ কথায় একমত যে, এ সূরাটি নবী করীম ﷺ -এর মৃত্যু সংবাদ বহন করে। বর্ণিত আছে যে, এটা হযরত আব্বাস (রা.) বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'কেন কাঁদছেন?' তিনি বললেন– আমার মনে হয় আপনার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, আসলেই তা।

কারো মতে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এরূপ বলেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ বালককে অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে।'

হযরত ওমর (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে সব সময় কাছে রাখতেন। বিশেষ বৈঠকে বদরী সাহাবীদের সাথে তাঁকে আসার অনুমতি দিতেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বললেন, এ বালককে আপনি কি অনুমতি দিচ্ছেন, অথচ আমাদেরও তো তার মতো ছেলে-সন্তান আছে? তিনি বললেন, তার ব্যাপারে আপনারা সবাই জেনেছেন যে, সে কেমন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ সম্পর্কে তাদের সাথে আমাকেও মন্তব্য করতে অনুমতি দিলেন। সম্ভবত এ প্রশ্ন তিনি আমার কারণেই সবার কাছে রেখেছেন।
তাদের মধ্য হতে কেউ বললেন, আল্লাহ তাঁর নবীকে বিজয়ের পর ক্ষমা প্রার্থনা এবং তওবার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আমি বললাম, ব্যাপারটি মূলত এরূপ নয়; বরং তার দ্বারা রাসূল ﷺ -এর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে। ওমর (রা.) বললেন, তুমি যা বললে তা-ই আমি জানি। তারপর বললেন– এমন বুদ্ধিমত্তার জবাবের পর কিভাবে আমাকে তোমরা ভৎর্সনা করতে পার?
–[কাবীর, কুরতুবী]

এ সূরা দ্বারা মৃত্যু সংবাদ বুঝার কারণ : কয়েকটি কারণে উক্ত সূরায় মৃত্যুর সংবাদ বুঝা যায়–
১. এ সূরা নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়া এবং তাঁর সাক্ষতের মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন, আর সে বান্দা তাঁর সাক্ষাৎকে গ্রহণ করেছে।' এ সাক্ষাৎ বলতে মৃত্যুর পর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে বুঝানো হয়েছে।
২. সাহায্য, বিজয় এবং দলে দলে দীনে প্রবেশের শুভ সংবাদ একথার প্রমাণ দেয় যে, পূর্ণতা অর্জন হয়ে গেছে। যার জন্য রাসূল ﷺ দুনিয়াতে এসেছিলেন। কার্য সম্পাদন হয়ে গেলে থাকার প্রয়োজন থাকে না।
৩. তাসবীহ, তাহমীদ এবং ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রচার এবং জনগণের সাথে সম্পর্কশীল সকল কাজ থেকে বিমুখ হতে হবে। কেননা এ কাজের দায়িত্বশীল তৈরি হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ জীবিত থাকলে রেসালাত থেকে অব্যাহতি নিয়ে বসে থাকতে হবে। আর এটা জায়েজ নয়।
৪. وَاسْتَغْفِرْهُ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিদায়ের সময় ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। তওবা হয় শেষ জীবনে। –[কাবীর]

قَوْلُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا : বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালক আমাকে অবহিত করেছেন যে, অচিরেই আপনি একটি নিদর্শন দেখবেন, যখন তা দেখবেন তখন سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ অধিক পরিমাণে পাঠ করবেন। আর সে নিদর্শন হলো সূরা নসর। –[মাযহারী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ اَبِىْ لَهَبٍ : সূরা আল-লাহাব

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আবী-লাহাব। সূরার প্রথম আয়াতের শব্দ تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِىْ لَهَبٍ হতে নামকরণ করা হয়েছে।

আর আবূ লাহাব-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্র সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এটাকে সূরা আবী-লাহাব নামকরণ করা স্বার্থক হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : উক্ত সূরাটি যে মাক্কী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং মতভেদেও নেই। তবে মাক্কী জীবনের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তা ঠিক কোন অধ্যায়ে নাজিল হয়েছে– এ কথাটি সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে নবী করীম ﷺ এবং তার ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আবূ লাহাবের যে ভূমিকা ছিল, সে দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় যে, যে সময়ে নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় সে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তার আচরণ ইসলামের অগ্রগতির পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এ সূরা নাজিল হয়েছে।

আর এটাও সম্ভব যে, কুরাইশের লোকেরা যখন নবী করীম ﷺ এবং তাঁর গোটা বংশ পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ করেছিল এবং আবূ লাহাবই কেবল এমন ব্যক্তি ছিল, যে নিজের বংশ পরিবারের লোকদের সংস্পর্শ পরিহার করে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, এ সূরাটি সে সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ইসলামের কোনো শত্রুর নাম উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কেবল এ সূরাটিকেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ সূরাটি আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রীকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর কারণ হলো যে, আবূ লাহাব ইসলামের শত্রুতায় আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ নবী করীম ﷺ তার শত্রুতার জবাবে কোনো দিনই কিছু বলেননি; বরং তার অত্যাচার-নিপীড়ন নীরবেই সহ্য করে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তার হীনতা-নীচতা, বিদ্বেষপরায়ণতা ও শত্রুতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার এবং তার স্ত্রীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। বলা হয়েছে– আবূ লাহাব সর্বাঙ্গীনভাবে তার স্ত্রীসহ ধ্বংস হোক, চরমভাবে তার বিনাশ ঘটুক। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, ইহকাল ও পরকাল কোথাও উপকারে আসবে না। সে তার কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার সেই স্ত্রীও, যে মহানবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল বহন করে তাঁর দুয়ারে ফেলে রাখে। পরকালে তার গলায় শৃঙ্খলের হাসুলী পড়িয়ে দেওয়া হবে। এ সূরা অবতীর্ণের পরও তারা ঈমান আনল না; বরং মহানবীর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে গেল এবং বকাবকি ও আবোল-তাবোল বলতে লাগল। তার কথার কোনো মূল্য নেই। তাই আস্তে আস্তে মহানবীর দিকেই মানুষের মন আকৃষ্ট হতে লাগল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ اَبِىْ لَهَبٍ مَدَنِيَّةٌ : সূরা আল-লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ
خَمْسُ اٰيَاتٍ : ৫ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. لَمَّا دَعَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَقَالَ اِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ عَمُّهُ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا دَعَوْتَنَا نَزَلَ تَبَّتْ خَسِرَتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ اَىْ جُمْلَتَهُ وَعُبِّرَ عَنْهَا بِالْيَدَيْنِ مَجَازًا لِاَنَّ اَكْثَرَ الْاَفْعَالِ تُزَاوَلُ بِهِمَا وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ دُعَاءٌ وَتَبَّ خَسِرَ هُوَ وَهٰذِهِ خَبَرٌ كَقَوْلِهِمْ اَهْلَكَهُ اللّٰهُ وَقَدْ هَلَكَ وَلَمَّا خَوَّفَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَذَابِ فَقَالَ اِنْ كَانَ مَا يَقُوْلُ ابْنُ اَخِىْ حَقًّا فَاِنِّىْ اَفْتَدِىْ مِنْهُ بِمَالِىْ وَ وَلَدِىْ نَزَلَ

১. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বলেন, আমি তেমাদেরকে কঠোর শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী তখন তাঁর চাচা আবূ লাহাব বলে উঠল, تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا دَعَوْتَنَا অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও! এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করেছ? তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। ধ্বংস হোক ক্ষতিগ্রস্ত হোক আবূ লাহাবের হস্তযুগল অর্থাৎ সর্বাঙ্গ রূপকার্থে হস্তযুগল দ্বারা সর্বাঙ্গ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা অধিকাংশ কাজ হাতের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এ বাক্য বদদোয়ার জন্য আর সে নিজেও ধ্বংস হোক এটা তার ধ্বংসের ব্যাপারে সংবাদ দান। যেমন, বলা হয় اَهْلَكَهُ اللّٰهُ وَقَدْ هَلَكَ আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, এ জন্য আবূ লাহাব বলেছিল, আমার ভাতিজার কথা যদি সত্যে পরিণত হয়, তবে আমি আমার সম্পদ ও সন্তান ফিদিয়া দিয়ে তা হতে অব্যাহতি লাভ করবো। তখন পরবর্তী আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

٢. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ وَكَسْبُهُ اَىْ وَلَدُهُ وَاَغْنٰى بِمَعْنٰى يُغْنِىْ

২. তার কোনো কাজে আসেনি– তার সম্পদ ও উপার্জন আর তার উপার্জন অর্থাৎ তার সন্তানরা اَغْنٰى শব্দটি يُغْنِىْ অর্থে ব্যবহৃত।

٣. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ لا اَىْ تَلَهُّبٍ وَتَوَقُّدٍ فَهِىَ مَالُ تَكْنِيَتِهِ لِتَلَهُّبِ وَجْهِهِ اِشْرَاقًا وَحُمْرَةً.

৩. অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে অর্থাৎ লেলিহান শিখা বিস্তারকারী ও প্রজ্বলিত। আর এটা তার উপনামের পরিণাম, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল চেহারার কারণে তার উপনাম اَبُوْ لَهَبٍ রাখা হয়েছিল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤. وَامْرَأَتُهُ ط عَطْفٌ عَلٰى ضَمِيْرِ يَصْلٰى سَوَّغَهُ الْفَصْلُ بِالْمَفْعُوْلِ وَصِفَتِهِ وَهِىَ اُمُّ جَمِيْلٍ حَمَّالَةَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ الْحَطَبِ الشَّوْكِ وَالسَّعْدَانِ تُلْقِيْهِ فِىْ طَرِيْقِ النَّبِىِّ ﷺ .

৪. আর তার স্ত্রীও যা يَصْلٰى-এর যমীরের প্রতি عطف ও صِفَتْ-এর মধ্যবর্তী مَفْعُوْل দ্বারা ব্যবধানের কারণে এ عَطْف-এর অবকাশ রয়েছে। আর সে হলো, উম্মে জামীল। যে বহনকারিণী শব্দটি পেশ ও যবরযোগে উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে ইন্ধন কণ্টক ও কাষ্ঠ, যা সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চলার পথে ছড়িয়ে দিত।

٥. فِىْ جِيْدِهَا عُنُقِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ اَىْ لِيْفٍ وَهٰذِهِ الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ الَّذِىْ هُوَ نَعْتٌ لِامْرَأَتِهِ اَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مُقَدَّرٍ .

৫. তার গলদেশে ঘাড়ে পাকানো রজ্জু অর্থাৎ শক্ত পাকানো। এ বাক্যটি حَمَّالَةَ الْحَطَبِ হতে حَالٌ যার امْرَأَتُهُ-এর صِفَتْ অথবা তা উহ্য مُبْتَدَأ-এর خَبَرْ।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ الخ : ফে'ল اَبِىْ لَهَبٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলিত হয়ে تَبَّتْ-এর ফায়েল। وَتَبَّ ফে'ল, যমীর ফায়েল, যা আবূ লাহাবের দিকে ধাবিত। একটি বাক্য অপর বাক্যের উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ : حَبْل মাওসূফ, مِنْ مَّسَدٍ সিফাত, مَوْصُوْف ও صِفَتْ মিলিত হয়ে মুবতাদা মুয়াখখার فِىْ جِيْدِهَا খবরে মুকাদ্দাম। আর বাক্যটি নসবের স্থানে حَمَّالَةَ-এর যমীর হতে হাল হিসাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : আল্লামা আলূসী (র.) লিখেছেন, সূরা আল-কাফিরূনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন দরবারে এলাহীতে আরজি পেশ করলেন, হে আল্লাহ! তবে আমার পুরস্কার কি? তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন যে, لَكَ النَّصْرُ وَالْفَتْحُ এরপর নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার সে চাচার কি পরিণতি হবে, যে সারা জীবন আমাকে কষ্ট দিয়েছে। মূর্তিপূজার দিকে আমাকে আহ্বান করেছে। আমি তাওহীদের দিকে আহ্বান করলে সে পাথর ছুড়ে মেরেছে, তখন আল্লাহ এ সূরায় ঘোষণা করেছেন যে, تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ -[রূহুল মা'আনী]

শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- যখন (الاية) اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হয়। নবী করীম ﷺ একদিন সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হায়! প্রাতঃকালীন বিপদ-বিপদ!! বলে ডাক দিলেন। তাঁর ডাক শুনে কুরাইশরা পাহাড়ের পাদদেশে জমায়েত হলো। যে আসতে পারল না, সে লোক পাঠিয়ে বৃত্তান্ত জানতে চাইল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ওগো! আমি যদি বলি যে, এ পাহাড়ের পিছনে একদল শত্রু তোমাদের উপর হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে বলল- হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছি। তোমরা প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করো। নতুবা তোমাদের উপর শাস্তি অনিবার্য। এটা শুনে নবী করীম ﷺ-এর চাচা আবূ লাহাব বলল, تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا ؟ অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও আমাদেরকে এ জন্য এখানে জমায়েত করেছ? কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আবূ লাহাব নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ওই সময় একটি প্রস্তরখণ্ডও নিক্ষেপ করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত সূরা অবতীর্ণ করেন। -[খাযেন, লোবাব, কাছীর]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ডেকে শাস্তির ভয় দেখান তখন আবূ লাহাব বলে, যখন শাস্তি আসবে তখন মাল এবং সন্তানসন্ততি ফেদিয়া হিসাবে দিয়ে মুক্তি পাবো। তখন مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ অবতীর্ণ হয়। -[খাযেন]

Free @ www.eilm.weebly.com

تَبَّتْ -এর অর্থ : تَبَّتْ ক্রিয়াটি تَبَابٌ মাসদার হতে গৃহীত। تَبَابٌ-এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যেমন–

১. التَّبَابُ অর্থ اَلْهَلَاكُ ধ্বংস। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ

২. تَبَابٌ অর্থ خُسْرَانٌ – خَسَارَةٌ ক্ষতি, অনিষ্ট। অর্থাৎ এমন ক্ষতি যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ বলেন– وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ এ تَتْبِيْبٌ-এর ব্যাখ্যা অন্যত্র এসেছে غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ।

৩. تَبَابٌ অর্থ خَيْبَةٌ -প্রার্থিত বস্তু অর্জন না হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– আবূ লাহাব মানুষকে এই বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিরত রাখত যে মুহাম্মদক জাদুকর। যেহেতু সে গোত্রের সর্দার ছিল, সেহেতু তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে যেত। সমাজে সে না ছিল দোষী না ছিল অভিযুক্ত। পিতার মতো সবাই তাকে সম্মান করত। যখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন সে শুনে রাগে, ক্ষোভে বিরোধিতা শুরু করল। তখন থেকে সে দোষী এবং অভিযুক্ত বলে সমাজে পরিচিত হলো। তারপর থেকে সে যে কোনো কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যাপারে বলত কেউই কান দিত না। অতএব, তার সকল আশা দুরাশায় পরিণত হলো। কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করতে পারল না।

৪. হযরত আতা (রা.) বলেন, تَبَّتْ অর্থ غَلَبَتْ পরাজিত হলো। কেননা তার ধারণা ছিল যে, তার হাত বিজয়ী, সে মুহাম্মদ ﷺ -কে মক্কা হতে বের করে দিবে; কিন্তু তা হয়নি; সে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, تَبَّتْ অর্থ صَفِرَتْ يَدَاهُ অর্থাৎ তার দুই হাত কল্যাণ থেকে খালি হয়ে গেছে।

–[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

আবূ লাহাবের পরিচয় : আবূ লাহাবের প্রকৃত নাম ছিল عَبْدُ الْعُزّٰى এ ব্যক্তি হুযূর ﷺ -এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব-এর বংশধরভুক্ত লোক ছিল। তার চেহারা ও শরীরের রং দুধে আলতা মিশানো রঙের মতো ছিল বলে তার كُنْيَتْ রাখা হয় আবূ লাহাব।

আবূ লাহাব একজন ইসলামের বিরাট শত্রু ছিল। স্বজাতির ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ইসলামকে অস্বীকার করেছিল। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ মনোরথ হলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লা'নত করলেন।

কারো কারো মতে, এ লোকটি তার নাম অনুসারে ওজ্জার সেবাদাস হিসাবেই পরিণত হয়েছিল। এ হিসাবে তার নামকরণ স্বার্থক হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনে তার প্রকৃত নাম উল্লেখ করা হয়নি। কারণ সে নামটিও মুশরিকের নাম ছিল। মুশরিকের নাম কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করার যোগ্যতা রাখে না। এ কারণে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। "لَهَبٌ" জাহান্নামের একটি সম্পর্কিত নাম।

يَدَا উল্লেখের ফায়দা : يَدٌ উল্লেখ করার মধ্যে কয়েকটি কারণ ও ফায়দা বর্ণিত আছে–

১. কেননা, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে পাথর নিক্ষেপের জন্য উদ্যত হয়েছিল। তারিকুল মুহারিবী বলেন, আমি বাজারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ, হে মানুষ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, সফলতা অর্জন করবে। একজন লোক তাঁর পিছনে পাথর নিক্ষেপ করছিল, এমতাবস্থায় তার পিছন দিক রক্তাক্ত হয়ে গেছে। সে বলছে– হে, তোমরা তাকে অনুসরণ করবে না– সে মিথ্যাবাদী। আমি বললাম– এ লোক কে? মানুষ বলল, মুহাম্মদ এবং তাঁর চাচা আবূ লাহাব।

২. দু' হাত বলে তার দীন এবং দুনিয়াকে বুঝানো হয়েছে। তার প্রথম এবং শেষকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা, দু' হাত দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, ডান হাত হলো অস্ত্র আর বাম হাত হলো ঢাল। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

৪. কারো মতে, দু হাত দ্বারা অর্থ-সম্পদ ও সমতাকে বুঝানো হয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

تَبَّ -কে দ্বিরুক্ত করার কারণ : تَبَّ-কে কয়েকটি কারণে দ্বিরুক্তি করা হয়েছে।

১. প্রথম تَبَّتْ বদ-দোয়ার জন্য আর পরের تَبَّ তার ধ্বংসের খবর পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২. উভয়টিই তার ধ্বংসের খবর বহন করে, এভাবে যে, প্রথমটি দ্বারা তার সকল কাজকর্ম এবং ভূমিকা আর পরের تَبَّ তার নাফস ধ্বংস হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে।

৩. প্রথম تَبَّ দ্বারা তার নাফস আর দ্বিতীয় تَبَّ দ্বারা তার ছেলে উতবা উদ্দেশ্য।

৪. প্রথম تَبَّ অর্থ হলো তার দুই হাত ধ্বংস হোক, কেননা সে আল্লাহর হক চিনেনি। আর পরের تَبَّ অর্থ ধ্বংস হোক, কেননা সে রাসূলের হক চিনেনি। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ -এর অর্থ : সূরার দুই নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, আবূ লাহাবের ধন-সম্পদ ও উপার্জন কোনো উপকারে আসল না। আবূ লাহাব ছিল কৃপণ লোক। সে কৃপণতার দ্বারা বহু ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিল। তৎকালীন মক্কায় চারজন লোক বিরাট ধনী ও সম্পদশালী বলে পরিচিত ছিল, আবূ লাহাব ছিল তাদের একজন। তার মওজুদ স্বর্ণের পরিমাণই ছিল আট সের দশ তোলা। সে বহু পশু সম্পদের মালিক ছিল। আর উপার্জন দ্বারা সম্ভবত তার ছেলেদের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা হাদীসে সন্তানকে উপার্জিত সম্পদ বলা হয়েছে। অতএব, আয়াতের মর্ম হবে- তার ধনসম্পদ এবং সন্তানগণ যেমন এ দুনিয়াতে তার কোনো কল্যাণে আসেনি; তেমনি পরকালেও আসবে না। একটি ঘটনা দ্বারাই তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও কাফেরদের চরম পরাজয়ের কথা শুনে আবূ লাহাব যার পর নাই শোকাভিভূত, মর্মাহত ও ব্যথিত হয়ে পড়েছিল। যে কারণে সে এমন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল যে, সে রোগ হতে আর নিষ্কৃতি লাভ করেনি। তার দেহে একপ্রকার ফুসকুড়ি যা বসন্ত গোটার ন্যায় ছিল, তা সাংঘাতিকভাবে দেখা দিল। আরবে এ ব্যধিকে সংক্রামক ব্যধি ভাবা হতো। এ ব্যাধি দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই তার আপনজন ও সন্তানগণ দূরে সরে পড়ে। কেউ তার ধারে কাছে আসল না। ফলে রোগযন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে নিজের ঘরেই মরে রইল। কয়েকদিন পর্যন্ত লাশ পড়ে থাকার দরুন যখন তা পচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলো, তখন প্রতিবেশী লোকগণ দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে তার এক ছেলের নিকট অভিযোগ করল। এ সময় এক ছেলে কয়েকজন হাবশী লোক ভাড়া করল। তারা নাকমুখ বন্ধ করে লাঠি দ্বারা লাশটি গড়িয়ে গড়িয়ে একটি কূয়া খনন করত তাতে ফেলে দিয়ে মাটি ও পাথর কুচা দ্বারা কূয়াটির মুখ বন্ধ করে দিল।

তাফসীরকারগণ হতে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ লাহাবের তিন পুত্র ছিল- ওতবা, ওতায়বা ও মাতয়াব। যখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়, আবূ লাহাব রাগান্বিত হয়ে আপন পুত্র ওতবা ও ওতায়বাকে বলে-তোমাদের বিবাহ বন্ধনে মুহাম্মদের যে দুই কন্যা রোকাইয়্যা ও উম্মে কুলছূম রয়েছে, তাদেরকে এক্ষণই তালাক দিয়ে দাও, অন্যথায় আমি তোমাদের মুখ দেখবো না। [তখনও কাফেরের সাথে বিবাহ সিদ্ধ ছিল।] তারা পিতার নির্দেশ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে গিয়ে তালাক প্রদান করে। ওতায়বা উম্মে কুলছূমকে তালাক প্রদান করে রাসূল ﷺ -কে অনেক গালাগালি করে; আর রাসূলের মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। কিন্তু রাসূলের মুখমণ্ডলে তা পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বদদোয়া করেন- اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্য হতে একটি কুকুরকে তার উপর বিজয়ী করে দাও।

ওতায়বা তালাক প্রদান করে ঘরে যায়, আর পিতার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফরে গমন করে। পথিমধ্যে রাত্রে একস্থানে যাত্রা বিরতি করে। সেখানে একজন পাদ্রী এসে তাদেরকে বলে- এখানে বন্য হিংস্র পশু থাকে, সাবধান! আবূ লাহাব সকলকে একত্র করে বলে-আমার এই সন্তানের হেফাজত করবে, কেননা আমার মুহাম্মদের বদ-দোয়ার ভয় হচ্ছে। কাজেই সকলে তার পুত্রকে মাঝে নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাত্রে জঙ্গল হতে একটি বাঘ আসে। আর শুঁকে শুঁকে ওতায়বাকে পেয়ে নিয়ে যায়, আর ফেড়ে ভক্ষণ করে। -[রূহুল মা'আনী]

ভবিষ্যদ্বাণী : এ সূরাতে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যেগুলো বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল-

১. আবূ লাহাবের ধ্বংস।

২. তার ধন-সম্পদ দ্বারা সে কোনো প্রকার উপকৃত হবে না।

৩. সে জাহান্নামী হবে। -[কাবীর]

আবূ লাহাবের স্ত্রী : এ সূরায় আবূ লাহাবের মারাত্মক পরিণতির সাথে তার স্ত্রীকেও জড়িত করা হয়েছে। তার স্ত্রীও ইসলাম এবং নবী করীম ﷺ -এর বিরোধিতায় কম পরিশ্রম করে নি। এ স্ত্রীলোকটির নাম ছিল আরওয়া। তার উপনাম ছিল উম্মে জামিল। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগ্নি। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন উম্মে জমিল তা শুনতে পেয়ে ক্রোধে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং সে নবী করীম ﷺ -এর কুৎসা গাঁথা গেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলো। এ সময় তার হস্তে ছিল এক মুষ্টি কঙ্কর শিলা। সে অগ্রসর হয়ে হারামে উপস্থিত হলো। এ সময় নবী করীম ﷺ ও আমার পিতা আবূ (রা.) বকর হারামেই বসা ছিলেন। আবূ বকর তা দেখে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! যে মহিলাটি আসছে, সে আপনার ক্ষতি করতে পারে বলে আমার মনে হয়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন- সে আমাকে দেখতেই পাবে না। উম্মে জামীল হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকটে এসে তাঁকে বলল, তোমার সাথী নাকি আমার নামে কুৎসা রটনা করছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, এ ঘরের মালিকের নামে কসম! তিনি তোমার নামে কোনোই কুৎসা রচনা করেননি। তা শুনে সে চলে গেল।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর অর্থ : এ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো– কাঠ বহনকারিণী। তাফসীরকারগণ এর কয়েকটি তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

১. আবূ লাহাবের স্ত্রী রাত্রি কালে কাঁটাযুক্ত গাছের ঢাল এনে হুযূর ﷺ -এর ঘরের দরজায় ফেলে রাখত, এ কারণে তাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। যাহ্হাক হযরত ইকরামা ও ইবনে মুনযির (র.) এ মত প্রকাশ করেন।

২. উম্মে জামীল পরস্পর মানুষের মাঝে কুটনাগিরী করে বেড়াত, আর একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে ক্ষেপিয়ে তুলত, এটাকে চোগোলখুরি বলা হয়। এটা পরস্পরের মধ্যে যেন আগুন লাগানোর মতো কাজ ছিল। তাই তাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য ছিল যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কষ্ট দেওয়া, তেমনি বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে বিবাদ লাগানো। তাই তাকে এ নাম দেওয়া হয়। এ মতের প্রবক্তা হলেন ইমাম সুদ্দী ও কাতাদাহ (র.)।

৩. আর হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, اَلْحَطَبُ অর্থ– গুনাহ। অর্থাৎ আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল গুনাহের বোঝা বহনকারিণী। –[নূরুল কোরআন]

جِيْدٌ ও مَسَدٌ-এর অর্থ : আরবি ভাষায় অলংকার পরিহিত গলাকে বুঝাবার জন্য جِيْدٌ বলা হয়। তাফসীরকারকগণ বলেছেন– আবূ লাহাবের স্ত্রীর গলায় একটি বহু মূল্যের কণ্ঠহার ছিল। সে বলত, আমি এটা বিক্রয় করে মুহাম্মদের শত্রুতায় ব্যয় করবো। এ কারণে এখানে جِيْدٌ শব্দটি বিদ্রূপ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আর مَسَدٌ শব্দের কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়–

১. খুব শক্ত পাকানো রশি। ২. খেজুর আঁশের পাকানো রশি। ৩. চামড়া বা পশম দ্বারা পাকানো রশি। ৪. লোহার তার জড়ানো রশি। সুতরাং সর্বশেষ আয়াতটির মর্ম হবে– তার গলায় খুব শক্ত পাকানো রশি হাসুলীর ন্যায় ঝুলতে থাকবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত– তার গলায় লোহার সত্তর হাত জিঞ্জির লাগানো হবে। কতিপয় তাফসীরকারক বলেছেন– শেষ দুই আয়াতে তার পার্থিব অবস্থা এবং পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে। সে সময় সে পাহাড় হতে রাসূল ﷺ -এর শত্রুতায় কাষ্ঠ বহন করে আনত। তার গলায় সোনা ও মুক্তার হারের পরিবর্তে খেজুর ছিলকার রশি থাকত যা দ্বারা কাষ্ঠ বহন করে আনত। সে রশি গলায় নিয়ে তার মৃত্যুও হবে।

যেমন তাফসীরকারগণ হতে বর্ণিত হয়েছে– সে একদিন একটি কাষ্ঠের বোঝা বহন করে আনার পথে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের উদ্দেশ্যে একটি পাথরের উপর বসে। সে সময় একজন ফেরেশতা পিছন হতে রশি লাগিয়ে টানে, আর সে পড়ে যায়। সে সময়ই তার মৃত্যু হয়। তাই সে যেন কবরে যাওয়ার সময় গলায় রশি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। –[খাযেন, মা'আলিম]

* আর হযরত আ'মাশ-মুজাহিদ (র.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, مَسَدٌ শব্দটির অর্থ হলো নির্মিত শৃঙ্খল।
হযরত শা'বী এবং মোকাতেল (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো– খেজুরের ছালের তৈরি মজবুত রশি। সে কাঠের বোঝা বহনের জন্যে এ রশি ব্যবহার করত। আর তা দিয়ে বেঁধেই তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

* হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) বলেছেন, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের গলায় সর্বদা একটি মূল্যবান হার থাকত, সে দম্ভ প্রকাশ করে বলত, মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরোধিতা এবং শত্রুতা সাধনে আমি এ মূল্যবান হার ব্যয় করবো, হয়তো এ কারণেই দোজখে তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হবে।

* আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপতী (র.) লিখেছেন, যদি مَسَدٌ শব্দটির অর্থ লৌহ নির্মিত জিঞ্জির হয়, তবে পরকালে এ শাস্তি হবে। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilmweebly.com

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ : সূরা আল-ইখলাস

সূরাটির নামকরণের কারণ : কুরআন মাজীদে সমস্ত সূরাসমূহের নামই সূরা হতে চয়নকৃত একটি শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু এ সূরাটি এর ব্যতিক্রম। সূরার কোনো শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়নি; বরং সূরার মূলবক্তব্য ও ভাবধারা হতে এটার নামকরণ করা হয়েছে 'আল-ইখলাস'। এর অর্থ হলো– নির্ভেজাল, নিরঙ্কুশ, একনিষ্ঠতা। কেননা এ সূরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও অন্যান্য তাওহীদের কথা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় অন্য কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ ও ভেজাল নেই। তাঁর ক্ষেত্রে কোনো কিছু মিশ্রিত হয়নি। তিনি নিরেট নির্ভেজাল খালেস একক সত্তা। কেউ কেউ তার নাম রেখেছেন– সূরাতুল আসাস বা মৌল সূরা। অর্থাৎ ইসলামি জীবন– বিধানটি আল্লাহ কেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। সে আল্লাহর মূল ও আসল পরিচয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে তাকে সূরাতুল আসাস বলা হয়। আবার কেউ কেউ সূরাটির প্রথম আয়াত দ্বারা তার নামকরণ করেছেন– سُوْرَةُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ । এতে ৪টি আয়াত, ১৫টি বাক্য এবং ৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী কিংবা মাদানী এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

১. অনেকের মতে, তা মাক্কী। যেমন, হযরত ইবনে মাসউদ (র.) বলেন– কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -কে বলল–আপনার রব-এর বংশতালিকা বলুন, তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ মতের সাথে উবাই ইবনে কা'বও একমত।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ইহুদিদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো, তাদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ, হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা বলল– হে মুহাম্মদ ﷺ ! আপনার সে রব কি রকম যি[illegible] আপনাকে পাঠিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি নাজিল করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মাদানী। ত[illegible] উভয় ধরনের হাদীসকে একত্র করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে তা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তারপর একই প্রশ্ন ইহুদিরা মদীনাতে করলে একই সূরা শুনিয়ে দেওয়া হয়।

মূলবক্তব্য : সূরাটির মূলবক্তব্য হলো, এক কথায় একত্ববাদ। রাসূলে কারীম ﷺ যখন একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন দেব-দেবী ও মূর্তিপূজকে জগৎ পরিপূর্ণ ছিল। মূর্তি পূজকরা কাষ্ঠ, পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি দ্বারা দেব-দেবীর আকার আকৃতি বানাত এবং সেগুলো পূজা করত। এগুলোই ছিল তাদের খোদা। তাদের খোদাগণের দেহ ছিল এবং সেগুলোর যথারীতি বংশ মর্যাদার ধারা ছিল। কোনো দেবতা স্ত্রীহারা ছিল না, আর কোনো দেবী স্বামীহারা ছিল না, তাদের পানাহারের প্রয়োজন ছিল। তাদের পূজারীগণ তাদের জন্য এগুলো ব্যবস্থা করে দিত। তখন মুশরিকদের অনেকেই বিশ্বাস করত যে, আল্লহ তা'আলারও মানবাকৃতি আছে, তিনিও সে আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

তখনকার খ্রিস্টানরা এক খোদাকে বিশ্বাস করত, কিন্তু সে খোদার একজন পুত্র তো অবশ্যই থাকতে হতো, আর সে পুত্রের মাতাও থাকতে হতো এবং শ্বশুর শাশুড়িও ছিল।

অনুরূপভাবে ইহুদিগণেরও এক খোদা এবং তার পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি থাকতে হতো। মোটকথা, সে খোদা মানবীয় গুণাবলির ঊর্ধ্বে ছিল না এবং তাদের সে খোদা ভ্রমণ করত, মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করত। কখনো বা যে কোনো সৃষ্টির সাথে লড়াই কুস্তি করত। এ সব অবস্থার বাইরে ছিল অগ্নিপূজক, তারকাপূজক অর্থাৎ মাজূসী, সাবী।

আর ইহুদিগণ হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলত এবং নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও মরিয়ম (আ.) -কে আল্লাহর স্ত্রী বলত।

তাদের এ সকল অশ্লীল ধারণা উৎখাত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একত্ববাদের পরিচয় দান করেন এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে একথা ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য বলেন যে, আল্লাহ এক, তিনি কোনো মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের সাথে অতুলনীয় অসাম স্যশীল এবং নিরাকার। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোনো সন্তান নেই, আর এরূপ ধারণা করা অশোভনীয়। তিনি স্বনির্ভর [illegible] নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই সকলের চেয়ে অতুলনীয়ভাবে মহান। অশেষ ক্ষমতাবান। তাঁর সমতুল্য কেউ [illegible] নেই। তাই সকলেই তাঁর একত্ববাদের উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।

সূরাটির ফজিলত : এ সূরাটির ফজিলত অনেক–

১. এ সূরাটি যদি কেউ একবার শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করে, তবে ১০ পারা কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে (অর্থাৎ শোবার সময়) এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে পারবে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, এটা কেমন করে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ কুলহুওয়াল্লাহু কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম আহমদ (র.) হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরাহ শুনাচ্ছি, যা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন সব কিতাবেই নাজিল হয়েছে এবং বলেন, রাতে قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এবং قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ না পড়ে শুবে না। হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন, আমি তখন থেকে আর এ সূরাগুলো পড়া ব্যতীত শুই না। –[ইবনে কাছীর]

২. কোনো একজন সাহাবী আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সূরা কুলহুওয়াল্লাহটি পড়তে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার এ ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। –(তিরমিযী) ইবনে কাছীর ইমাম আহমদ ও হযরত আনাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরাহ প্রতিদিন একশতবার পাঠ করবে, তবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবে না। –[তিরমিযী ও দারেমী]

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিদ্রাগমনের শয্যায় ডান হয়ে ১০০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাকে তার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিবেন। –[তিরমিযী]

৫. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পড়তে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়েছে! তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওয়াজিব হয়েছে? হুযূর ﷺ বলেন, জান্নাত।
–[ইবনে কাছীর, তিরমিযী, নাসায়ী]

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন, যে ব্যক্তি দশবার এ সূরা তেলাওয়াত করবে তার জন্য বেহেশতে একটি মহল এবং যে ব্যক্তি বিশবার পড়বে তার জন্য দু'টি, আর ত্রিশবার পড়লে তিনটি মহল তৈরি হবে। –[দারেমী]

৭. প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় খাঁটি মনে অন্তত একবার করে তেলাওয়াত করলে ঈমানের দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাবে এবং শিরক থেকে রক্ষা পাবে।

৮. খাঁটি মনে দুই শতবার করে তেলাওয়াত করলে একশত বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

৯. তিনবার পাঠ করলে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায়।

১০. এক হাজার বার পড়ে দোয়া করলে যে কোনো সৎ মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

১১. কবরস্থানে গিয়ে পড়লে মুর্দাদের কবর আজাব মাফ হয়। যে কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পড়ে দম করলে সে আরোগ্য হয়।

১২. হযরত আনাস (রা.) বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি কোবা মসজিদে নামাজ পড়ালেন। প্রত্যেক রাকাতে প্রথমে [ফাতিহার পর] সূরা ইখলাস পড়া তার নিয়ম ছিল। পরে অপর কোনো সূরা পাঠ করতেন। লোকেরা তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল– তুমি এটা কি করছ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পাঠের পর তাকে যথেষ্ট মনে না করে তার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করছ, এটা ঠিক নয়। হয় এ সূরাটি পড়ো অথবা তাকে বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়ো। তখন সে বলল, আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা চাইলে নামাজ পড়াবো, না হয় ইমামতি ছেড়ে দিবো; কিন্তু লোকগণ তার পরবর্তী অন্য কাউকে ইমাম বানাতে পছন্দ করল না। শেষ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ-এর সমীপে ব্যাপারটি পেশ হলো। তিনি সে লোককে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার সাথীগণ যা চায়, তা মানতে তুমি অপারগ কেন? তখন সে বলল– আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– এ সূরার প্রতি তোমার অগাধ ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতী বানাবে। –[বুখারী]

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফজিলতের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে।

তা'বীর : বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওহীদের প্রতি ঈমান নসীব করবেন। তার পরিবারবর্গের সংখ্যা কম হবে। সে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করবে এবং তার দোয়া কবুল করা হবে।
–[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আল-ইখলাস মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

اَرْبَعُ اَوْ خَمْسُ اٰيَاتٍ : ৪/৫ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ فَنَزَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاللّٰهُ خَبَرُ هُوَ وَ اَحَدٌ بَدَلٌ مِنْهُ اَوْ خَبَرٌ ثَانٍ .

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়। বলো, তিনিই একক আল্লাহ এখানে اَللّٰهُ শব্দটি هُوَ-এর خَبَرٌ আর اَحَدٌ শব্দটি اَللّٰهُ হতে بَدَلٌ কিংবা هُوَ-এর خَبَرٌ ثَانِيْ।

٢. اَللّٰهُ الصَّمَدُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ اَىِ الْمَقْصُوْدُ فِى الْحَوَائِجِ عَلَى الدَّوَامِ .

২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী তা مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ অর্থাৎ সকল প্রয়োজনে সর্বদা তিনিই লক্ষ্য।

٣. لَمْ يَلِدْ لِاِنْتِفَاءِ مُجَانَسَةٍ وَلَمْ يُوْلَدْ لِاِنْتِفَاءِ الْحُدُوْثِ عَنْهُ .

৩. তিনি কাউকেও জন্ম দেননি যেহেতু কেউই তাঁর সমশ্রেণির নয়। এবং তিনি কারো দ্বারা জাত নন আল্লাহ নশ্বর না হওয়ার কারণে।

٤. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَىْ مُكَافِيًا وَمُمَاثِلًا فَلَهُ مُتَعَلِّقٌ بِكُفُوًا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ لِاَنَّهُ مَحَطُّ الْقَصْدِ بِالنَّفْىِ وَاُخِّرَ اَحَدٌ وَهُوَ اِسْمُ يَكُنْ عَنْ خَبَرِهَا رِعَايَةً لِلْفَاصِلَةِ .

৪. আর কেউই তাঁর সমতুল্য নেই অর্থাৎ কেউ তাঁর সমকক্ষ ও সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়। لَهُ-এর সম্পর্ক كُفُوًا-এর সাথে আর نَفِىْ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে তাকে مُقَدَّمٌ করা হয়েছে। আর يَكُنْ-এর اِسْم অর্থাৎ اَحَدٌ-কে তার خَبَرٌ-এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে– আয়াতের ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ : এখানে هُوَ মুবতাদা اَللّٰهُ শব্দটি প্রথম খবর, আর اَحَدٌ শব্দটি দ্বিতীয় খবর বা বদল, আর اَللّٰهُ اَحَدٌ اَلصَّمَدُ টি مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ।

لَمْ يَلِدْ টি فِعْل ও فَاعِلْ আর এর مَفْعُوْلٌ হলো উহ্য।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এখানে اَحَدٌ টি لَمْ يَكُنْ-এর فَاعِلْ এবং كُفُوًا হলো مَفْعُوْلٌ।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পিছনে সূরা আদ্ব-দুহাসহ বিভিন্ন সূরায় মু'মিনদের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো তাওহীদ। বর্তমান সূরাতে সে তাওহীদের আলোচনা রয়েছে।

শানে নুযূল : এ সূরা নাজিলের উপলক্ষ সম্পর্কে হাদীসে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে মাত্র চারটি ঘটনা উল্লেখ করছি–

১. উবাই ইবনে কা'ব বলেন, মক্কার মুশরিকগণ নবী করীম ﷺ-এর নিকট বলল, তুমি আমাদেরকে যে প্রতিপালকের ইবাদত করতে বল, তার পরিচয় দানে বংশ তালিকাটি কি তা আমাদেরকে শুনাও। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজ পরিচয় দানে সূরাটি অবতীর্ণ করেন। –[তিরমিযী, হাকেম, লোবাব, কাছীর]

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদল ইহুদি নবী করীম ﷺ -এর নিকট আসল, যাদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ ও হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার যে প্রতিপালক তোমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছে, তাঁর গুণাবলি ও পরিচয় কি তা আমাদেরকে শুনাও। হয়তো আমরা তোমার প্রতি ঈমানও আনতে পারি। তখন আল্লাহ নিজ পরিচয় বর্ণনায় এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন– (লোবাব, খাযেন, ইবনে কাছীর) তাঁর মতে এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা ইহুদিরা মদীনায় ছিল। –[লোবাব]

৩. হযরত আনাস (রা.) বলেন, খায়বরের ইহুদিগণ মহানবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা, আদমকে মথিত মাটি দ্বারা, ইবলীসকে আগুন দ্বারা, আকাশকে ধূম্র দ্বারা, ভূমিকে পানির ফেনা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তোমার প্রতিপালক কিসের সৃষ্টি তা আমাদেরকে জানাও। নবী করীম ﷺ নিশ্চুপ থাকলেন। ইতোমধ্যে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এ সূরা নিয়ে অবতীর্ণ হন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে এ সূরা পাঠ করে শুনান। –[লোবাব, ইবনে কাছীর]

৪. হযরত আতা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, নাজরান থেকে একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে বলল যে, আপনি আপনার প্রতিপালকের বর্ণনা দিন। তিনি কি মূল্যবান জাফরান বা ইয়াকুত পাথরের নাকি স্বর্ণ বা রৌপ্যের? তখন প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেন, আমার প্রতিপালক কোনো বস্তুর সৃষ্টি নন; বরং তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। তখন উক্ত সূরাটি নাজিল হয়। –[নূরুল কোরআন]

মোটকথা,অনেকগুলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু যখন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় জানতে চাচ্ছে, তখনই আল্লাহর পক্ষ হতে এ সূরা পাঠ করে শুনানোর নির্দেশ হয়েছে। তাই নবী করীম ﷺ ও তাদেরকে পাঠ করে শুনাচ্ছেন। এ জন্যই সাহাবীগণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাকে তা নাজিলের উপলক্ষ বলে থাকেন।

اَللّٰهُ اَحَدٌ -এর অর্থ : কাফেরদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে শিখিয়ে দিলেন যে, তুমি বলো, আমার প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি একক, আল্লাহ সম্পর্কে সেকালের আরব সমাজের লোক পরিচিত ছিল। তারা সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করত। সূরা আল-ফীলে আমরা আলাচনা করেছি। যে, আবরাহার আক্রমণ হতে আল্লাহর ঘরকে রক্ষা করার জন্য একমাত্র তাঁরই নিকট প্রার্থনা করেছিল। ইহুদি-খ্রিস্টানগণও আল্লাহ সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখত। সেকালে আরব সামাজে আল্লাহ সম্পর্কে কি ধরনের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তা বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায় যে, তাঁদের আল্লাহ ও কুরআন মাজীদে উল্লিখিত আল্লাহর মধ্যে তফাৎ কি? খ্রিস্টানগণ আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা রাখত যে, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর পুত্র এবং মরিয়ম তার স্ত্রী। এ বিশ্বাস রাখার ফলে আল্লাহ সম্পর্কে অনিবার্যরূপে যে ধারণাগুলো জন্ম নেয়, তা হলো আল্লাহর আকার ও দেহ রয়েছে। তার সত্তায় মানুষ অংশীদার, মানুষের ন্যায় তারও যৌন ক্ষুধা আছে। মানুষের ন্যায় তিনি বস্তু, বস্তুর মুখাপেক্ষী এবং তিনি পানাহার করে থাকেন (না'উযু বিল্লাহ)। অপরদিকে ইহুদিদের আকীদাও এরূপ ছিল। তারা হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলত। আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে কুস্তি-লড়াইর আকীদায়ও তারা বিশ্বাসী ছিল। তা ছাড়া আরবের পৌত্তলিকগণ আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় অংশী সাব্যস্ত করত। কা'বা ঘরের ৩৬০টি প্রতিমাই তার সাক্ষী। অন্যদিকে একদল লোক গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। একদল ছিল অগ্নি উপাসক। যদিও অগ্নি উপাসকদের কোনো অস্তিত্ব আরবে ছিল না। তাই আল্লাহ তাদের প্রশ্নের জবাবে তাদের নিকট পরিচিত নামটিই উল্লেখ করে এমন একটি গুণ সংযোজন করে দিলেন, যাতে তাদের সমস্ত ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের

Free @ www.e-ilm.weebly.com

মূলে কুঠারাঘাত হানে এবং সেগুলো মূলোৎপাটিত হয়– তা হলো 'আহাদ'। এটার অর্থ এক নয়। কেননা, এক হলে দুই তিন ইত্যাদি সংখ্যা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আরবি এক وَاحِدٌ -কে বলা হয়। এখানে اَحَدٌ -এর অর্থ হলো– একক, অনন্য। অর্থাৎ তিনি স্বীয় সত্তায়, গুণে, ক্ষমতা এবং কর্মকুশলতায়, বুদ্ধি-জ্ঞানে একক ও অনন্য। এতে কেউ তাঁর শরিক নেই। তাঁর স্ত্রী-পুত্র নেই, পানাহার করেন না, কারো সাথে কুস্তি লড়েন না।

اَحَدٌ ও وَاحِدٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : اَحَدٌ এবং وَاحِدٌ -এর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য বিদ্যমান–

১. وَاحِدٌ -কে আহাদের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু اَحَدٌ -কে وَاحِدٌ -এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

২. যদি কেউ বলে فُلَانٌ لَايُقَاوِمُهُ وَاحِدٌ অর্থাৎ একজন অমুকের প্রতিযোগিতা করতে পারে না। তার জন্য এ কথা বলা বৈধ হবে যে, لٰكِنَّهُ يُقَاوِمُهُ اِثْنَانِ অর্থাৎ কিন্তু দু'জনে পারে। কিন্তু اَحَدٌ -এর ব্যাপারে এরূপ বলা জায়েজ হবে না। যদি বলা হয় فُلَانٌ لَايُقَاوِمُهُ اَحَدٌ لٰكِنَّهُ يُقَاوِمُهُ اِثْنَانِ তাহলে বলা বৈধ নয়।

৩. وَاحِدٌ শব্দটি হ্যাঁ-বোধক বাক্যে ব্যবহৃত হয়, আর اَحَدٌ শব্দটি না-বোধক نَفِىْ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলবে– رَاَيْتُ رَجُلًا وَاحِدًا . مَا رَاَيْتُ اَحَدًا . اَحَدٌ শব্দটি عُمُوْم -এর ফায়দা দেয়। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

اَلصَّمَدُ -এর অর্থ : اَلصَّمَدُ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ অনেক মতামত উল্লেখ করেছেন। আমরা তন্মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো নির্ভীক, যার কোনো ভয় নেই।
২. ইমাম শা'বী (র.) বলেন, সামাদ হলেন যিনি পানাহার করেন না।
৩. আবুল ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামা (রা.) বলেছেন, সামাদ হলেন তিনি, যার কর্তৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।
৪. ইবনে জোবায়ের (র.) বলেছেন, যিনি তার সকল গুণাবলি এবং কর্মে পরিপূর্ণ নিখুঁত– তিনি সামাদ।
৫. কারো মতে, সকল প্রয়োজনের সময় যার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়, তিনিই সামাদ।
৬. কারো মতে, সর্বাবস্থায় যাঁর নিকট চাওয়া হয় তিনিই হলেন সামাদ।
৭. হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হওয়ার পর যিনি থাকবেন তিনি হলেন সামাদ।
৮. ইকরামা (র.) বলেছেন, যার উপর কারো কোনো মর্যাদা নেই তিনিই হলেন সামাদ।
৯. ইমাম রাযী (র.) বলেছেন, সামাদ হলেন তিনি, যাঁর উপর কখনো কোনো বিপদাপদ আসে না।
১০. হযরত ইবনে হান্নান ও মোকাতেল (র.) বলেছেন, সামাদ হলেন তিনি, যিনি সম্পূর্ণ দোষত্রুটি মুক্ত।
১১. আল্লামা আলূসী (র.) صَمَدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেন–

هُوَ الْمُسْتَغْنِىْ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ اَلْمُحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ .

অর্থাৎ সামাদ সেই পবিত্র সত্তা, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অথচ প্রত্যেকেই তাঁর মুখাপেক্ষী। –[নূরুল কোরআন].

اَحَدٌ -কে নাকেরা এবং اَلصَّمَدُ -কে মা'রেফা নেওয়ার কারণ : اَحَدٌ এবং اَلصَّمَدُ উভয়টি এখানে আল্লাহর সিফাত, একটিকে نَكِرَةٌ বা (অনির্দিষ্ট), অন্যটিকে مَعْرِفَةٌ [নির্দিষ্ট] ব্যবহার করার কারণ হলো– আল্লাহর اَحَدِيَّةٌ বা এককত্ব অধিকাংশ আরবদের কাছে অপরিচিত এবং অজানা ছিল, এ কারণে অনির্দিষ্ট নেওয়া হয়েছে। আর صَمَدٌ বা অমুখাপেক্ষীতা সম্পর্কে সমস্ত মানুষেরই অবগতি রয়েছে, এ কারণেই নির্দিষ্ট শব্দ নেওয়া হয়েছে। –[কাবীর]

اَللّٰهُ শব্দকে দ্বিরুক্তিকরণের উপকারিতা : اَللّٰهُ اَحَدٌ এবং اَللّٰهُ الصَّمَدُ বাক্যদ্বয়ে اَللّٰهُ শব্দকে বারবার নেওয়া হয়েছে। কেননা যদি পরের اَللّٰهُ শব্দকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বাক্য এরূপ দাঁড়ায়– اَللّٰهُ اَحَدٌ اَلصَّمَدُ এরূপ বলা আরবি ব্যাকরণের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা একই শব্দের (اَللّٰهُ) দু'টি وَصْفٌ -এর একটি নাকেরা অন্যটি মারেফা হওয়া বৈধ নয়। বৈধ করার জন্যই পরে اَللّٰهُ যুক্ত করা হয়েছে। নচেৎ উভয় وَصْفٌ -কে نَكِرَةٌ (নাকেরা) অথবা مَعْرِفَةٌ (মা'রেফা) নেওয়া জরুরি হয়ে পড়বে। –[কাবীর, ফাতহুল কাদীর]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

"قَوْلُهُ "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ : অর্থাৎ আল্লাহ যেন বলছেন- হে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়! তোমরা আমার সম্পর্কে একটি মনগড়া মৌলিক বিশ্বাস রচনা করে রেখেছ যে, হযরত ঈসা (আ.) ও ওযায়ের (আ.) আমার পুত্র। তোমরা পরিষ্কার জেনে রেখো, আমি কাউকেও জন্মদান করিনি। তারা আমার পুত্র নয়। জন্ম দেওয়া আমার বৈশিষ্ট্য নয়। আমার কোনো দেহ ও আকার নেই- দেহ ও আকৃতির অনিবার্য দাবিগুলো হতে আমি মুক্ত ও পবিত্র। আমি কাউকেও পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করিনি। তার লয় নেই, ক্ষয় নেই। আমি চিরন্তন নিরাকার সত্তা। সুতরাং আমার বংশ রক্ষারও কোনো প্রয়োজন করে না। তোমরা বল ফেরেশতা আমার কন্যা, তাও তোমাদের ভুল ধারণা। মানুষ, ফেরেশতা, জিন এক কথায় সৃষ্টিলোকের সমস্ত সৃষ্টিই আমার বান্দা। আর তোমাদের মধ্যে যারা মনে করে যে, আমার পিতা-মাতা রয়েছে, তারাও আমার প্রতি এ ধারণা পোষণ করে জুলুম করে। আমি কোনো সত্তার দ্বারা জন্মগ্রহণ করিনি। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। আমার কোনো বংশ তালিকা নেই। যেমন, আরবের মুশরিকগণ দেবতার বংশাবলি নির্ণয় করে থাকে। আর যারা মনে করে যে, আমি যুগে যুগে মানুষের কাছে পূজা-অর্চনা পাওয়ার জন্য দেবতার আকারে আবির্ভূত হই, তাও আমার সম্পর্কে তাদের মারাত্মক ভুল ধারণা। আমার কোনোরূপ আবির্ভাব প্রতিভাব হয় না। আমার সত্তা এভাবে একই অবস্থায় সর্বত্র বিরাজমান।

لَمْ يَلِدْ-কে আগে আনার কারণ : দুনিয়ার নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে মানুষ নিজে জন্মগ্রহণ করে, তারপর বড় হয়ে জন্ম দেয়; কিন্তু আয়াতে প্রথমে জন্ম দেওয়ার ক্রিয়া তারপর জন্মগ্রহণ করার ক্রিয়াটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, আরবের পৌত্তলিকেরা আল্লাহর ব্যাপারে বলত যে, তিনি জন্ম দিয়েছেন, তাঁর ছেলে-মেয়ে আছে। এ আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রথমেই বলা হয়েছে- তিনি জন্ম দেননি। -[কাবীর]

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ : অর্থাৎ তাঁর مُمَاثِلٌ বা সমকক্ষ কেউই নেই এবং কেউই তাঁর অনুরূপ নয়। আকৃতি প্রকৃতিতেও অন্য যে কোনো অবস্থাতেই কেউই তাঁর সমান নয়। যেহেতু তিনি এমন। সুতরাং তিনি সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা আর তিনি عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -কেননা, خَالِقٌ হতে মাখলুকদের সকল বিষয়েই শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক। এতে এ কথাও ইশারা পাওয়া যায় যে, তিনি سَمِيْعٌ - بَصِيْرٌ - مُرِيْدٌ ও مُتَكَلِّمٌ শ্রবণকারী, দৃষ্টিকারী, ইচ্ছা পোষণকারী ও বক্তব্য পেশকারী। কারণ, যদি এ সকল গুণাবলিতে গুণান্বিত না হতেন তবে এর বিপরীত গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক হতো, তখন তিনি حَادِثٌ হওয়া বাঞ্ছনীয় হতো। তাই তা বাতিল ধারণা। অতএব, আল্লাহ তা'আলা অত্র সূরায় তার শেষ পরিচিতিতে এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তার ক্ষেত্রে জগৎবাসী যে সকল বিবেচনা করেছিল যে, তিনি মানব মর্যাদায় গুণান্বিত, তার উর্ধ্বে নয়, এ সকল ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। আর মানবীয় নয়; বরং সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে ক্ষমতাবান, সকল গুণে কুদরতীভাবে গুণান্বিত। কোনো গুণেই তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। তিনি কেমন, এ বিষয়ে মানবীয় জ্ঞান স্থির করতে সক্ষম হবে না যে, তিনি এমন। বরং সর্বশেষ তিনি যেমন আছেন তেমন, আমরাও তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করি।

সূরাটির ইখলাসের অন্যান্য নামসমূহ : সূরাটির গুরুত্ব সমধিক, আর এ কারণে এর নামও একাধিক, যা নিম্নরূপ-

১. সূরাতুত তাফরীদ, ২. সূরাতুত তাজরীদ, ৩. সূরাতুত তাওহীদ, ৪. সূরাতুল ইখলাস, ৫. সূরাতুন নাজাত ৬. সূরাতুল বেলায়েত, ৭. সূরাতুন নিসবত, ৮. সূরাতুল মা'রিফাত, ৯. সূরাতুল জামাল, ১০. সূরাতুল মোকাশকাশা, ১১. সূরাতুল মোয়াওওয়াজা, ১২. সূরাতুস সামাদ, ১৩. সূরাতুল আছাছ, ১৪. সূরাতুল মানেআ, ১৫. সূরাতুল মাহদর, ১৬. সূরাতুল মুনাফ্যিরাহ, ১৭. সূরাতুল বারাআত, ১৮. সূরাতুল মুযাক্কিরা, ১৯. সূরাতুন নূর, ২০. সূরাতুল আমান।

প্রত্যেকটি নামই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। ইমাম রাযী (র.) এ নামসমূহের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা এ সূরার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সহজেই আঁচ করা যায়। -[নূরুল কোরআন]

Free@www.e-ilmweebly.com

سُوْرَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ : সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরা আল-ফালাক্বের নামটি গ্রহণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের اَلْفَلَقِ শব্দ হতে। اَلْفَلَقُ শব্দের অর্থ হচ্ছে– বিদীর্ণ হওয়া। তা দ্বারা রাতের আঁধার ভেদ করে উষার উদয় হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। আর সূরা আন-নাস -এর নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের 'আন-নাস' শব্দ দ্বারা। এর অর্থ হলো মানবকুল। কতিপয় তাফসীরকার এ সূরা দু'টিকে سُوْرَةُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ নাম রেখেছেন। এ সূরা দু'টি পাঠ করে আল্লাহর নিকট সর্বপ্রকার অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া হয়।

সূরা আল-ফালাক্বে রয়েছে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৬৯টি অক্ষর।

আর সূরা আন-নাসে রয়েছে ৬টি আয়াত, ২০টি বাক্য এবং ৭৯টি অক্ষর।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়কাল নির্ধারণে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এক দলের অভিমত হলো, এটা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়। হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবির ইবনে যায়েদ (রা.) এ মতের সমর্থক। তাঁদের মতে, যখন মহানবী ﷺ চতুর্দিক দিয়ে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হন এবং বৈরীদল তাঁর জীবন, প্রদীপ নিভিয়ে ফেলার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন তা অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-ফালাক্বের 'রাতের অন্ধকারে অনিষ্টতা' কথাটি এ দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে বলে অনুমিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর ও কাতাদাহ (রা.)-এর মতে, সূরা দু'টি মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত। মদীনাবাসী ইহুদি লাবীদ ইবনে আসেম জাদুমন্ত্র দ্বারা মহানবী ﷺ -এর জীবন নাশের হীন ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হয় এবং জাদুর প্রভাব মহানবী ﷺ -এর পবিত্র বদনমণ্ডলের উপর নিপতিত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে মদীনাতে অবস্থানকালে উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর সূত্রে বলেছেন– মহানবী ﷺ -এর জাদুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ৭ম হিজরি সনের। এ সূত্র ধরে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) সূরা দু'টিকে মাদানী বলে মনে করেন। তবে সূরা দু'টি স্পষ্টত মক্কায় অবতীর্ণ বলে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা জোরালো বলে মনে হয়। পরে মদীনাতে মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র যখন প্রবল হয়ে উঠে, তখন তা পাঠ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হন নবী করীম ﷺ। সুতরাং শুধুমাত্র জাদু সংক্রান্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া সমীচীন নয়।

সূরা দু'টির বিষয়বস্তু : নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সমগ্র পৃথিবী, বিশেষ করে আরবের সমাজ ব্যবস্থা বাতিল শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। মানবিকতার সম্মানজনক অবস্থান থেকে মানবজাতি পাশবিকতার নিম্নস্তরে উপনীত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে তারা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর আসনে সমাসীন করেছিল নানা প্রকৃতির মূর্তি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি কল্পিত দেবতাদের। পুরোহিত শ্রেণি নানা ভেলকীবাজির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি লাভ করত। এক কথায় সমাজে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এমনি নৈরাজ্যকর পরিবেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থি আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অশান্তি ও পরিবারিক উৎপীড়ন দ্বারাও যখন তাঁর বৈপ্লবিক প্রচারণাকে স্তব্ধ করা গেল না, তখন দুনিয়ার কোল থেকে চিরতরে অপসারিত করে দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্রের লিপ্ত হতে আল্লাহদ্রোহী শক্তি কার্পণ্য করেনি। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক ও ভয়-ভীতিতে তথা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ও তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে– হে নবী! আপনি বলুন, উষা উদয়ের পরিচালক সর্বশক্তিমান সত্তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, কৃষ্টিকুলের সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে; গাঢ় তমসার রজনীর অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে– যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়.......।

সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মহানবী ﷺ প্রত্যহ এ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। মুসলিম জননী আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– 'রাসূলে কারীম ﷺ রাত্রিকালে বিছানায় শয়নকালে দু'হাত একত্রিত করে সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে সর্বাঙ্গে ফুঁক দিতেন। হাতদ্বয় দ্বারা মোছার কাজটি মাথা হতে আরম্ভ করতেন এবং দেহের সম্মুখভাগ তিনবার মুছে ফেলতেন।'

এ সূরাদ্বয়ের আলোকে ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। আবশ্য ঝাড়-ফুঁকের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও তা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে অলাভজনক। কেননা বিভিন্ন সূত্রের অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, 'যে লোক দাগানোর চিকিৎসা করাল এবং ঝাড়-ফুঁক করাল সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।' –[তিরমিযী]

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃষ্টিকুলের অনিষ্টকারিতা থেকে অব্যাহতি লাভ, আত্মরক্ষা ও একমাত্র আল্লাহকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ঝাড়-ফুঁককেই কেবল আরোগ্য লাভের মাধ্যম কল্পনা করা ইত্যাদি হচ্ছে আলোচ্য সূরাদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও মূলকথা।

এ সূরা দুটি কুরআনের অংশ : শুধু হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উক্ত সূরাদ্বয়কে কুরআনের সূরা হিসাবে মানতেন না। তাঁর নিকট রক্ষিত 'মাসহাফ' হতে তিনি নাকি এ সূরাদ্বয়কে মুছে ফেলেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন– 'কুরআনের অংশ নয় এমন সব জিনিস কুরআনের সাথে মিশাইও না। এ সূরাদ্বয় কুরআনে শামিল নয়। এটা তো নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি হুকুম মাত্র। তা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র।'

Free @ www.e-ilmweebly.com

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্ত অভিমতের জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন–

১. তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয় শুধু উল্লেখ করেননি।

২. নবী করীম ﷺ যে, এ সূরাদ্বয়কে কুরআনে শামিল করার অনুমতি দিয়েছেন, সে কথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) জানতে পারেননি।

৩. এটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত অভিমত। এ মত অন্য কারো নয়। অন্য কোনো সাহাবীও তাঁর এ মতকে সমর্থন করেননি।

৪. হযরত ওসমান (রা.) সমস্ত সাহাবীর সম্পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের যে অনুলিপি তৈরি করিয়েছেন, তাতে উক্ত সূরাদ্বয় শামিল ছিল।

৫. নবী করীম ﷺ উক্ত সূরাদ্বয় নামাজে পড়েছিলেন বলে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম কর্তৃক একদা জাদু করা হয়েছিল। এর প্রভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ বিষয়টি হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হুযূর ﷺ -কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর জাদু যে বস্তুর মাধ্যমে করা হয়েছিল তা ছিল হুযূর ﷺ-এর চিরুনির একটি টুকরা এবং মাথা মুবারকের এক গাছি চুল সংযোজনে বনূ জুরাইজের যী আরওয়ান নামক একটি কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে রাখা হয়েছিল।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ ﷺ লোক পাঠিয়ে ঐ সকল জাদুর বস্তুগুলো নিয়ে আসলেন এবং সূরা আন-নাস ও আল-ফালাক্বের এক একটি আয়াত পড়লেন এবং একটি গিরাহ খুলে ফেললেন, অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, হুযূর ﷺ -এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম জাদু করল, তাতে হুযূর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর নিকট বললেন যে, হে আয়েশা! আমার অসুস্থতা কি তা আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করিয়ে দিয়েছেন? অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি, আমার নিকট দু'জন লোক মানুষের আকৃতিতে (ফেরেশতা) এসেছেন। একজন আমার শিহরে বসল, অপরজন পায়ের দিকে বসল। মাথার দিকের ব্যক্তি পায়ের দিকস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল যে, এ মহামানবের অসুস্থতা কি? অপরজন বললেন, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করলেন, কে তাঁকে জাদু করেছে? বললেন, লবীদ ইবনে আসম যে ইহুদিদের সাহায্যকারী মুনাফিক ছিল। প্রশ্ন করলেন কিসের মধ্যে করা হয়েছে? বললেন, একটি চিরুনি ও দাঁতের মধ্যে। অতঃপর প্রশ্ন করলেন তা কোথায় রাখা হয়েছে? বললেন, তা খেজুরের ঐ গেলাপে রাখা হয়েছে যাতে খেজুর হয়। আর তা بئر ذوران -এর তলায় একটি পাথরের নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। হুযূর ﷺ স্বয়ং সে কূপে গমন করে তা বের করে আনলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তা প্রকাশ করেননি যে, অমুক ইহুদি এ বেয়াদবি করেছে? হুযূর ﷺ বললেন, আমাকে আল্লাহ শেফা দান করেছেন, আর কারো কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নয়।

ইমাম ছা'লাবী (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হুযূর ﷺ -এর খিদমতে একটি ছেলে ছিল, এক ইহুদি তাকে ফুসলিয়ে তার মাধ্যমে হুযূর ﷺ -এর দাঁত মোবারক ও চিরুনি মুবারক অর্জন করে এবং একটি দাঁতের সুতায় ১১টি গিরা সংযোগ করে জাদু করল। প্রত্যেকটি গিরায় একটি সুঁই লাগাল এবং চিরুনির সাথে এগুলো সংযোগ করে একত্রে খেজুর ফলের গেলাপে পাথরের চাপা দিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা سُوْرَةُ مُعَوِّذَتَيْنِ নাজিল করেছেন এবং এতে ১১টি আয়াত রয়েছে। এক এক আয়াত পড়ে হুযূর ﷺ এক একটি গিরা খুললেন এবং সুস্থতা অর্জন করেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

জাদুর বাস্তবতা : জাদুর বাস্তবতার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়– কারো মতে, এর কোনো ভিত্তি নেই। এটা নিছক কুসংস্কার মাত্র। আবার কারো মতে, এর বাস্তবতা রয়েছে।

প্রথম দলের মতে– জাদুর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কাজেই তাকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ার এমন বহু জিনিস আছে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যাবেক্ষণেই শুধু আসে; কিন্তু তা কিভাবে সংঘটিত হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোনো কথা নেই। জাদু মূলত একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। তা মন হতে সংক্রমিত হয়ে দেহকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন দৈহিক প্রভাব সংক্রমিত হয়ে মনকে প্রভাবিত করে। ভয় একটা মনস্তাত্ত্বিক জিনিস; কিন্তু তা দেহে সংক্রমিত হয়ে দেহে লোমহর্ষণ ঘটে। সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করে। জাদুর দ্বারা আসল ব্যাপারে পরিবির্তন ঘটে না বটে, কিন্তু তার কারণে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হয়। তখন আসল ব্যাপারই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে অনুভূত হয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বন্দুকের গুলী ও বিমান হতে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো জাদুর কার্যকারিতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অসম্ভব; কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিছক হঠকারিতা বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যেমন– ফিরআউনের যুগে যখন হযরত মূসা (আ.)-কে পাঠানো হয়েছিল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তারা জাদুকরদেরকে জমায়েত করেছে বলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়েছেন–

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ . وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ . لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ . فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ ..... الخ (اَيْضًا) سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ . وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ . فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

উভয় সূরার ফজিলত : হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাকে নবী করীম ﷺ আদেশ দিয়েছেন আমি যেন প্রত্যেক নামাজের পর সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস পাঠ করি। –[তিরমিযী]

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক্ব এবং সূরা আন-নাস তিনবার করে পাঠ করবে, তাহলে সব বিষয়ে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। –[তিরমিযী]

* হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ জিন ও ইনসানের দৃষ্টির ক্ষতি হতে পানাহ চেয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। যখন সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস নাজিল হয়। তখন তিনি এই দু'টি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন, আর অন্যান্য দোয়া পাঠ হতে বিরত থাকলেন।

* হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানায় বিশ্রাম করার সময় সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর হাত দ্বারা চেহারা মোবারক এবং শরীরে যেখানে হাত যায় সেখানে মাসাহ করতেন। আমি যদি কষ্ট অনুভব করতাম, তবে আমাকে এ আমল করার আদেশ প্রদান করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

* হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে দম করতেন। যখন তাঁর ব্যথা বেড়ে যেত তখন আমি নিজেই এই সূরাদ্বয় পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে মাসেহ করিয়ে নিতাম।

হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, যে রোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়, সে সময় ও তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন অসুস্থতা বেড়ে গেল তখন আমি ফুঁক দিতাম এবং তাঁর চেহারা মোবারক মুছে দিতাম। –[নূরুল কোরআন]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আল-ফালাক্ব মক্কায় বা মদীনায় অবতীর্ণ

خَمْسُ اٰيَاتٍ : ৫ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

نَزَلَتْ هٰذِهِ وَالَّتِىْ بَعْدَهَا لَمَّا سَحَرَ لَبِيْدُ الْيَهُوْدِىُّ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ وِتْرٍ بِهٖ اِحْدٰى عَشَرَةَ عُقْدَةً فَاَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ وَبِمَحَلِّهٖ فَاُحْضِرَ بَيْنَ يَدَيْهِ ﷺ وَاُمِرَ بِالتَّعَوُّذِ بِالسُّوْرَتَيْنِ فَكَانَ كُلَّمَا قَرَأَ اٰيَةً مِنْهُمَا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَ وَجَدَ خِفَّةً حَتّٰى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا وَقَامَ كَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ـ

অনুবাদ :
যখন লবীদ নামক ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করে, তখন এ সূরা ও পরবর্তী সূরা অবতীর্ণ হয়। উক্ত ইহুদি একটি সুতায় এগারোটি গিরা লাগিয়ে জাদু মন্ত্র ফুঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উক্ত জাদু সম্পর্কে এবং জাদুর স্থানটি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন জাদুর জিনিসগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে হাজির করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অত্র সূরা দু'টির মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ করেন। তিনি যখন সূরা দু'টি হতে একটি করে আয়াত পাঠ করতেন, তৎক্ষণাৎ একটি গিরা খুলে যেতে লাগল এবং তাঁর মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসতে লাগল। সম্পূর্ণ সূরা দু'টি পাঠ করার পর সমস্ত গিরাগুলো খুলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, যেন তাঁর বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে।

١. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الصُّبْحِ ـ

১. বলো, আমি আশ্রয় নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার প্রভাতের।

٢. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ حَيَوَانٍ مُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ وَجَمَادٍ كَالسَّمِّ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অপকারিতা হতে চাই শরিয়তের মুকাল্লাফ প্রাণী বা গায়রে মুকাল্লাফ কিংবা জড় পদার্থের অথবা বিষ ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

٣. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ اَىِ اللَّيْلِ اِذَا اَظْلَمَ اَوِ الْقَمَرِ اِذَا غَابَ

৩. আর অনিষ্ট হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় অর্থাৎ রাত্রি যখন অন্ধকার হয় কিংবা চন্দ্র যখন অস্তগমন করে।

٤. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ السَّوَاحِرِ تَنْفُثُ فِى الْعُقَدِ الَّتِىْ تَعْقِدُهَا فِى الْخَيْطِ تَنْفُخُ فِيْهَا بِشَىْءٍ تَقُوْلُهٗ مِنْ غَيْرِ رِيْقٍ وَقَالَ الزَّمَخْشَرِىُّ مَعَهٗ كَبَنَاتِ لَبِيْدِ الْمَذْكُوْرِ ـ

৪. আর সে সকল নারীদের অনিষ্ট হতে যারা ফুঁক দেয় জাদুকারিণীদের ঝাড়-ফুঁক গ্রন্থিসমূহে যা সুতায় গিরা দিয়ে কিছু পড়ে থুথু ছাড়া ফুঁক দেয়। আল্লামা যামাখশারী এতদসঙ্গে এটাও বলেছেন, যেমন- উল্লিখিত লবীদ ইহুদির কন্যাগণ।

Free @ www.eilm.weebly.com

৫. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ اَظْهَرَ حَسَدَهُ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ كَلَبِيْدِ الْمَذْكُوْرِ مِنَ الْيَهُوْدِ الْحَاسِدِيْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذِكْرُ الثَّلَاثَةِ الشَّامِلِ لَهَا مَاخَلَقَ بَعْدَهُ لِشِدَّةِ شَرِّهَا .

৫. এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে। স্বীয় হিংসা প্রকাশ করে এবং সে মতে কাজ করতে শুরু করে। যেমন হিংসুক ইহুদিগণের মধ্য হতে উক্ত লবীদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে করেছিল। এ শেষোক্ত তিনটি বস্তু যদিও مَا خَلَقَ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি এগুলো অধিকতর অনিষ্টকর হেতু পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ : بِرَبِّ الْفَلَقِ মুতা'আল্লিক হচ্ছে اَعُوْذُ-এর সাথে। مَا অর্থ اَلَّذِىْ ইসমে মাওসূল, তার প্রত্যাবর্তনকারী উহ্য। مَا মাসদারিয়াও হতে পারে, তখন خَلَقَ অর্থ- মাখলুক হবে। কেউ কেউ বলেন, مَا নাকেরা, তবে এ মতটি ভ্রান্ত।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ অংশটি اِذَا وَقَبَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হবে, অতঃপর اَعُوْذُ-এর مَفْعُوْلْ হবে। আর পরবর্তী বাক্যদ্বয়ও একই অবস্থায় হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরাতে একত্ববাদের ঘোষণা এবং আল্লাহকেই একমাত্র সবকিছুর অধিপতি ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি মানুষ সর্ব ব্যাপারে আল্লাহরই মুখাপেক্ষী, এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। অত্র সূরায় আল্লাহর আশ্রয়ে যাওয়ার এবং তাঁরই প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার এক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

শানে নুযূল : ইমাম বায়হাকী 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- মহানবী ﷺ কোনো এক সময় খুব কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে একজন পায়ের নিকট এবং অপরজন শিয়রের নিকট বসল। যিনি পায়ের নিকট বসা ছিলেন তিনি শিয়রের নিকট বসা ফেরেশতকে জিজ্ঞাসা করলেন- তার কি হয়েছে? তুমি কি দেখেছ। সে বলল- তার চিকিৎসার প্রয়োজন। সে আবার বলল- কি চিকিৎসার প্রয়োজন? জবাব দিল, জাদু চিকিৎসার প্রয়োজন। আবার জিজ্ঞাসা করল- কে জাদু করেছে? তখন বলল- লবীদ ইবনে আসেম ইহুদি। জিজ্ঞাসা করা হলো- সে কোথায় জাদু করেছে? তখন বলল- অবদান গোত্রের কূপের তলদেশে একখানা প্রস্তর খণ্ডের নিম্নে গিরা দেওয়া চুল রয়েছে- তা-ই জাদু। সুতরাং কূপের পানি সেচন করে সে পাথর ও গিরা দেওয়া চুল বের করে আনতে হবে। তাই রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর নবী করীম ﷺ আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে পানি সেচনের লোক সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি লোকের দ্বারা তার পানি সেচন করে প্রস্তর খণ্ড ও চুল বের করে আনলেন। ঐ চুলে এগারোটি গিরা ছিল। সুতরাং এ সময় আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস-এর এগারোটি আয়াত অবতীর্ণ করে তার এক একটি আয়াত পড়ে যখন গিরায় ফুঁক দেওয়া হলো, তখন এক একটি গিরা আপনা হতে খুলে গেল। অতঃপর চুলগুলো পুড়ে ফেলা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম ﷺ আরোগ্য লাভ করেন।

মানুষ জাহিলিয়া যুগে নানা প্রকার ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেব-দেবী, জিন-ভূত ইত্যাদির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত। তাদেরকে বড় শক্তিমান ভেবে তাদের নিকট বিপদ হতে মুক্তি ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করত। যেমন বর্তমান যুগেও মুশরিকগণ নানা দেব-দেবীর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। যেমন, হিন্দুগণ কলেরা মহামারী হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহাকালির পূজা করে ও আবেদন জানায়। এমনভাবে বহু দেব-দেবীর কাছে তারা আত্মরক্ষার জন্য শরণাপন্ন হতো। সূরা জিনে বলা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক মানুষ জিনদের শরণাপন্ন হয় [৬ নং আয়াত]।

আল্লাহ তা'আলা এ সূরায় এসব বাতিল মা'বূদ ও কল্পিত সত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা পরিহার করে একমাত্র তাঁরই শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

اَلْفَلَقُ-এর অর্থ : فَلَقٌ শব্দের আসল অর্থ– দীর্ণ করা, তাফসীরকারকদের অধিকাংশের মতে তার তাৎপর্য হলো– 'রাতের অন্ধকার দীর্ণ করে প্রভাত আলো ফুটে বের হওয়া'। আরবি ভাষায় فَلَقُ الصُّبْحِ অর্থাৎ প্রভাত-সূর্যের উদয় বাক্য খুব বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআনে فَالِقُ الْاِصْبَاحِ অর্থাৎ রাতের অন্ধকার দীর্ণ করে প্রভাত উদয়কারী বাক্যাংশ আল্লাহর পরিচয় স্বরূপই বলা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাখ্যাকারগণ এর অনেক ব্যাখ্যা করেছেন।

* ইবনে জারীর (র.) বলেছেন, এর অর্থ– প্রভাত। ইমাম বুখারী (র.) একে সঠিক মত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

* শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র.) বলেছেন, সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে পূর্বাকাশে যে আলো প্রত্যক্ষ করা যায় তাকেই فَلَقٌ বলে। হযরত জাবের ইবনুল হাসান, সাঈদ ইবনে জোবায়ের, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.)ও এ মত প্রকাশ করেছেন।

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি অভিমত হলো, ফালাক্ব হলো দোজখের একটি কয়েদখানা। যখন সে কয়েদখানার দরজা খোলা হবে, তখন দোজখের অধিবাসীরাও ভীত হবে।

* হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন فَلَقٌ হলো দোজখের অভ্যন্তরে ঢাকনি দেওয়া একটি কূপ।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তা খোলা হবে এবং তার অভ্যন্তর থেকে যে অগ্নি বের হবে, তার তীব্রতা দেখে দোজখ নিজেই চিৎকার শুরু করবে।

* ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে জারীর (র.) হযরত কা'ব (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, 'ফালাক্ব' হলো দোজখের একটি গৃহ যখন তা খোলা হবে। তখন দোজখের অধিবাসীরা তার উত্তাপের তীব্রতায় চিৎকার শুরু করবে। –[নূরুল কোরআন]

আশ্রয় প্রার্থনা : মানুষ কোথায় কার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কার রক্ষাবুহ্যে স্থান নিবে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত সূরায় তা শিক্ষা দিয়েছেন। বলা হয়েছে– ঊষা উদয়ের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো– তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট হতে। এখানে فَلَقٌ শব্দটির অর্থ হলো– বিদীর্ণ হওয়া, ভেদ করে উত্থিত হওয়া। সূর্য রাতের অন্ধকার ভেদ করে উদয় হয়। সুতরাং যার দ্বারা এ উদয় ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং যে তাকে প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করে তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এখানে 'ঊষা উদয়ের প্রতিপালক' বলার তাৎপর্য হলো যে, ঊষা জগতের বুকে সর্বত্র একই সময় উদয় হয় না, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় উদয় হয়। এমনকি এক গোলার্ধে যখন উদয় হয় অন্য গোলার্ধে তখন তার অস্তগমন হয়। তাই আল্লাহ বলেছেন– পৃথিবীর সব অঞ্চল, দেশ, স্থান ও গোলার্ধে যার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে, সে মহাশক্তিধর-যার উপর আর দ্বিতীয় কোনো শক্তি নেই, তোমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। তবেই তোমরা সর্বপ্রকার অনিষ্টের হাত হতে রক্ষা পেতে পারবে।

যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হবে : এ সূরাটিতে চার প্রকার ক্ষতি-অনিষ্টতার জন্য আশ্রয় প্রার্থনার কথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্টতা ও ক্ষতি হতে, মানুষ, জিন-পরী, ভূত-প্রেত, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী, আলো-বায়ু-পানি, মোটকথা, আল্লাহর সৃষ্টিলোকে যা কিছু আছে তার সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহাশক্তিধর আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হও। আর কোনো মানবীয় বা অমানবীয় সত্তার শরণাপন্ন হয়ো না। কেননা সেগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি।

৩ নং আয়াতে রাতের অন্ধকারে যেসব ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন– চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, আক্রমণ, সম্ভাব্য যা কিছুই হতে পারে তা হতে রক্ষার জন্য বলা হয়েছে। আর ৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কুফরি কালাম দ্বারা ছিন্ন চুলে ফুঁক দিয়ে গিরা দান করত তোমার যে অনিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হতে রক্ষার জন্য বলা হয়েছে। عُقَدٌ শব্দটি عُقْدَةٌ-এর বহুবচন। এটা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক ও হিংসুকের হিংসা হতে আত্মরক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

হিংসা বলা হয়– এমন স্বভাব, চরিত্রকে, যে অন্যের মঙ্গলামঙ্গল, ভালাই ও ধনাঢ্যতা দেখে মনে জ্বালা অনুভব করে এবং নিজে অনুরূপ না পেলে তা ধ্বংস হওয়ার কামনা করে, কিন্তু ধ্বংস ও বিলীন হওয়ার কামনা না করে অনুরূপভাবে নিজে পাওয়ার আশা পোষণ করাকে হিংসা বলা হয় না। এহেন চরিত্র হতে মানুষের রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন; কিন্তু আল্লাহর প্রতি যাদের অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা বিদ্যমান তাদের পক্ষে কোনোই কষ্টকর ব্যাপার নয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি সকল কিছুর ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধন হতে পানাহ চাওয়ার কথা। এটা বলা হয়নি যে, আল্লাহর সৃষ্টিকৃত অনিষ্টের ক্ষতি হতে পানা চাই। [যদিও আল্লাহ ভালোমন্দ সকল কিছুরই সৃষ্টিকর্তা] ক্ষতির সৃষ্টি মূলত ক্ষতি নয়। ক্ষতির অর্জন সাধনই ক্ষতির কারণ। অতএব, ক্ষতির সৃষ্টি করা আল্লাহর দোষ নয়।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

তাই আয়াতের মর্মার্থে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর প্রত্যেকটি কাজেই সামগ্রিক কল্যাণ ও নির্ভেজাল মঙ্গলের জন্য হয়েছে। অবশ্য সৃষ্টির মধ্যে যে সকল গুণ আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন, সেগুলোর সৃষ্টির লক্ষ্য পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তা হতে কোনো কোনো সময় ক্ষতির নমুনা যদিও বুঝা যায় তবে তা ক্ষতি নয়; বরং তাতেও মঙ্গলের কারণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং তাঁর সকল ব্যবস্থাই কল্যাণময়ী। অতএব, مَا অক্ষরটি مَوْصُوْلَة বা مَصْدَرِيَّة হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ : উক্ত আয়াত হতে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ততা হতে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। غَاسِقٌ অর্থ হলো– অন্ধকার প্রসার হয়ে যাওয়া, অন্ধকারে সব কিছু আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়া। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত হাসান বসরী (র.) এবং মুজাহিদ (র.) এখানে غَاسِقٌ-এর তাফসীর করেছেন রাতের অন্ধকার। আর وَقَبَ অর্থ– অন্ধকার পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ আমি রাত্রি হতে আল্লাহর সন্নিকটে আশ্রয় চাই, যখন রাতের অন্ধকার পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে চন্দ্রের দিকে ইশারা করে বলেন, তুমি এ চন্দ্রের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। এটা অবশ্যই غَاسِقٌ আচ্ছাদনকারী, যখন তা আচ্ছাদিত হয়। আর তার আচ্ছাদন হওয়ার অর্থ হলো তা সূর্যের কবলে পড়া।

রাত্রিকে غَاسِقٌ-এর জন্য খাস করার কারণ : এর কারণ হচ্ছে– রাতের বেলায় জিন ও শয়তানসমূহ এবং ক্ষতি সাধনকারী প্রাণীসমূহ চোর, ডাকাত ও জমিনের বহু কীটপতঙ্গ বেশির ভাগ চলাচল করে থাকে। এগুলো সুযোগ মতো মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। সকাল হলে এগুলো পালিয়ে যায়। হাদীস শরীফে এগুলোর বহু প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে غَاسِقٌ-এর সাথে রাতকে خُصُوْصِىْ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ : এখান থেকে ৩য় পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ততা হতে পানাহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আর গিরায় ফুঁকদানকারী মহিলাদের ক্ষতিগ্রস্ততা হতে আমি পানাহ চাই। আর গিরায় ফুঁক দান করার অর্থ– জাদু করা। কেননা যে কারো উপর জাদু করে সে মন্ত্র পড়ে কোনো রশির গিরায় ফুঁক দেয় এবং গিরা লাগায়।

اَلنَّفّٰثٰتِ শব্দের ব্যাখ্যা : اَلنَّفّٰثٰتِ শব্দের মওসূফ نُفُوْسٌ ও হতে পারে, যাতে পুরুষ ও মহিলা সকলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ অবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে, গিরায় ফুঁকদানকারী পুরুষ ও মহিলাগণের অনিষ্ট হতে আমি পানাহ চাই। আর আয়াতে কারীমায় نَفّٰثٰتٌ বলে মহিলাগণের কথা বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণত আরব দেশের প্রচলন ছিল, মহিলাগণই জাদুর কাজ করত। হ্যাঁ, পুরুষগণও এ কাজ করে থাকে। তবে পুরুষগণ অপেক্ষা মহিলাগণ সৃষ্টিগতভাবেই এ কার্যের অধিনায়ক বেশি হয়ে থাকে। এ কারণেই نَفّٰثٰتٌ শব্দটি مُؤَنَّثٌ ব্যবহার করা হয়েছে।

অথবা, نَفّٰثٰتٌ এ জন্য বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর যে জাদুর ঘটনা হয়েছিল এবং যে কারণে এ সূরা দু'টি নাজিল হয়েছে, সেই ঘটনায় জাদুকারিণী ছিল ওয়ালীদ ইবনুল আসিমের মেয়েগণ। তারা তাদের পিতার নির্দেশ পালন স্বরূপ এ কাজ করেছিল। এ কারণেই نَفّٰثٰتٌ বলে স্ত্রীলোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা, نَفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ-কে خُصُوْصِيَّتْ-এর সাথে এ জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত সূরা দু'টি নাজিল হওয়ার কারণ ছিল এ খাস প্রক্রিয়ার ঘটনা। এ কারণেই مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ-কে خَاصْ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঝাড়-ফুঁক ও দোয়া কালাম : এ সূরা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের মূল আকীদার ভিত্তিতে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন কালাম দ্বারা আরোগ্য, নিরাময় এবং বালা-মসিবত হতে রক্ষাকল্পে ঝাড়-ফুঁক করা জায়েজ। স্বয়ং নবী করীম ﷺ এবং সাহাবীদের জীবন হতে এরূপ ঝাড়-ফুঁকের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ নিম্নোক্ত কালাম পাঠ করে হাসান ও হোসাইনকে ফুঁক দিতেন।

اُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ .

অর্থাৎ আমি তোমাদের উভয়কে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালামের আশ্রয়ে দিচ্ছি, প্রত্যেক কষ্টদায়ক শয়তান হতে এবং খারাপ নফস হতে। কিন্তু ইসলামি আকীদার পরিপন্থি কোনো কুফরি কালাম দ্বারা তা করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়; বরং কুফরি। এরূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। –[লোবাব, তিরমিযী, নাসায়ী]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ اَوْ مَدَنِيَّةٌ

সূরা আন-নাস মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ

سِتُّ اٰيَاتٍ : ৬ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

অনুবাদ :

١. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَالِقِهِمْ وَمَالِكِهِمْ خَصُّوْا بِالذِّكْرِ تَشْرِيْفًا لَهُمْ وَمُنَاسَبَةً لِلْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْمُوَسْوِسِ فِيْ صُدُوْرِهِمْ

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রব-এর। তাদের সৃষ্টিকর্তা ও তাদের মালিকের। মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দানকারীর অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়ার উপযুক্ত এবং মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে মানুষদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢. مَلِكِ النَّاسِ .

২. মানুষের বাদশাহ।

٣. اِلٰهِ النَّاسِ بَدَلَانِ اَوْ صِفَتَانِ اَوْ عَطْفَا بَيَانٍ وَاَظْهَرَ الْمُضَافَ اِلَيْهِ فِيْهِمَا زِيَادَةً لِلْبَيَانِ .

৩. মানুষের ইলাহ-এর পানাহ চাচ্ছি। এরা উভয়ই দু'টি বদল অথবা সিফাত অথবা عَطْف بَيَانْ এবং এ দু'টির মধ্যে مُضَافْ اِلَيْهِ-কে প্রকাশ করা হয়েছে অধিকভাবে وَضَاحَتْ -এর জন্য।

٤. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الشَّيْطَانِ سُمِّيَ بِالْحَدَثِ لِكَثْرَةِ مُلَابَسَتِهِ لَهُ الْخَنَّاسِ لا لِاَنَّهُ يَخْنُسُ وَيَتَأَخَّرُ عَنِ الْقَلْبِ كُلَّمَا ذَكَرَ اللّٰهَ .

8. অনিষ্ট হতে কুমন্ত্রণাদানকারীর শয়তান, যার নাম حَدَثْ অধিক পরিমাণে কুমন্ত্রণা দানের কারণে। যে আত্ম গোপনকারী যেহেতু সে বারবার ঘুরে আসে এবং আল্লাহর স্মরণ করা হলে অন্তর হতে সরে পড়ে।

٥. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ لا قُلُوْبِهِمْ اِذَا غَفَلُوْا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে যখন তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল থাকে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

٦. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بَيَانٌ لِلشَّيْطَانِ الْمُوَسْوِسِ اَنَّهُ جِنِّيٌّ وَاِنْسِيٌّ كَقَوْلِهِ تَعَالٰى شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اَوْ مِنَ الْجِنَّةِ بَيَانٌ لَهُ وَالنَّاسِ عَطْفٌ عَلَى الْوَسْوَاسِ وَعَلٰى كُلٍّ يَشْمُلُ شَرَّ لَبِيْدٍ وَبَنَاتِهِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَاعْتُرِضَ الْاَوَّلُ بِاَنَّ النَّاسَ لَا يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِهِمُ النَّاسُ اِنَّمَا يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِهِمُ الْجِنُّ وَاُجِيْبَ بِاَنَّ النَّاسَ يُوَسْوِسُوْنَ اَيْضًا بِمَعْنًى يَلِيْقُ بِهِمْ فِى الظَّاهِرِ ثُمَّ تَصِلُ وَسْوَسَتُهُمْ اِلَى الْقَلْبِ وَتَثْبُتُ فِيْهِ بِالطَّرِيْقِ الْمُؤَدِّىْ اِلٰى ذٰلِكَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

অনুবাদ :

৬. জিনদের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে এটা কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তানের বিবরণ যে, চাই সে জিন হোক বা মানুষ হোক। যেমন, অন্য আয়াতে আছে شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ কিংবা শুধু مِنَ الْجِنَّةِ বয়ান হবে, আর النَّاسِ শব্দটি الْوَسْوَاسْ -এর প্রতি عَطْف হবে। সারকথা এটা উক্ত লবীদ ইহুদি ও তার কন্যাদেরকেও অন্তর্ভুক্তকারী। প্রথম تَرْكِيْب -এর প্রেক্ষিতে এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মানুষ তো মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় না; বরং জিনই মানুষর অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। তার উত্তর এই যে, মানুষও কুমন্ত্রণা দেয় তার জন্য উপযোগী পন্থায় এবং শেষাবধি সে কুমন্ত্রণা অন্তরে গিয়ে পৌছায়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

তাহকীক ও তারকীব

قَوْلُهُ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ : مَلِكِ النَّاسِ আতফে بِرَبِّ النَّاسِ শব্দদ্বয় اَعُوْذُ -এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। اِلٰهِ النَّاسِ ও আতফে বয়ান। مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ বাক্যটিও اَعُوْذُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক, اَلَّذِىْ الخ বাক্যটি خَنَّاسْ-এর বায়ান সিফাত হিসাবে জর-এর স্থলে, অথবা রফার স্থলে উহ্য هُوَ হতে। অথবা جِنَّةٌ (জিন্নাতুন) হতে ذَمٌّ (তিরস্কার)-এর স্থানে হওয়ার কারণে নসবের স্থলে অবস্থিত।

قَوْلُهُ اَلْخَنَّاسْ : এটা خَنَّاسْ-এর বয়ান অথবা وَسْوَاسْ-এর বয়ান। কেউ কেউ বলেন, তা يُوَسْوِسُ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, شَرٌّ হতে বদল হয়েছে– হরফে জার পুনঃ আগমনের কারণে। কেউ কেউ বলেন, তা يُوَسْوِسُ-এর যমীর হতে হাল হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্বোক্ত সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা فَلَقْ-এর মধ্যে ইহকালীন ও পরকালীন বালা-মসিবত হতে আশ্রয় প্রার্থনার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর অত্র সূরায় পরকালীন সমস্যাসমূহ হতে হেফাজত কামনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল-ফালাক্বের মধ্যে شَرٌّ-এর মাফহুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা দুঃখ-দুর্দশা এবং তার কারণসমূহকে শামিল করেছে। আর অত্র সূরায় ঐ সকল شَرٌّ হতে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা সকল পাপের কারণ। অর্থাৎ শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং এর প্রভাব যেহেতু পরকালের জন্য খুবই ক্ষতিকারক, এ জন্য শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার তাকিদ করে কুরআন খতম করা হয়েছে।

اَلرَّبُّ-কে اَلنَّاسُ-এর প্রতি اِضَافَتْ করার কারণ : رَبٌّ-এর অর্থ প্রতিপালক এবং সর্ববস্তুর সংশোধনকারী। এখানে رَبٌّ-এর اِضَافَتْ টি اَلنَّاسُ-এর প্রতি করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সূরা فَلَقٌ-এর প্রতি করা হয়েছে। এটার কারণ হচ্ছে- সূরা فَلَقٌ-এর মধ্যে প্রকাশ্য ও শারীরিক বিপদসমূহ থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলা উদ্দেশ্য এবং آفَاتْ جِسْمَانِى কেবল মানুষের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং অন্যান্য জীবজন্তুর সাথেও শারীরিক বালা-মসিবত সংযোজিত হতে পারে। তবে وَسْوَسَهْ شَيْطَانِى-এর বিপরীত। অর্থাৎ وَسْوَسَهْ شَيْطَانِى-এর ক্ষতিগ্রস্ততা মানুষের সাথে مَخْصُوْص রয়েছে। আর জিন জাতিও তাতে আনুষঙ্গিকভাবে শামিল রয়েছে।

এ কারণেই এখানে رَبٌّ-এর اِضَافَتْ টি نَاسْ-এর প্রতি করা হয়েছে।

আল্লাহর তিনটি গুণ : সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ শব্দটির সাথে স্বীয় তিনটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে- মানুষের প্রতিপালক, দ্বিতীয়টি মানুষের মালিক, তৃতীয়টি মানুষের উপাস্য বা মা'বূদ। এ তিনটি গুণ উল্লেখের তাৎপর্য হচ্ছে- মানুষের মূল প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত কেউই হতে পারে না। সে-ই তাদের আলো, বায়ু, আহার্য, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু ও উপায়-উপকরণের সংস্থান করে দেন। মানুষের মালিক এ দিক দিয়ে যে, তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। অতএব, যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং মানুষের প্রতি যার অজস্র ও অফুরন্ত অনুগ্রহ বিদ্যমান, সে মানুষের উপাস্য বা মা'বূদ হওয়ার যোগ্য। বস্তুত হে দুনিয়ার মানুষ! যিনি তোমাদের রব, মালিক ও মা'বূদ তাঁর তুলনায় আর কোনো সত্তাই বড় শক্তিধর হতে পারে না। সুতরাং জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হও। এমনকি মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান যারা অলক্ষ্যে মানুষের অন্তরে গিয়ে কুপ্ররোচনা দেয়; যা হতে উদ্ধার পাওয়া আল্লাহর মেহেরবানি ছাড়া খুবই কঠিন, তা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও মহাশক্তিধর আল্লাহর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা কর, তাঁর শরণাপন্ন হও। তবেই তোমরা এদের অনিষ্টতা ও ক্ষতি হতে রক্ষা পেতে পারবে।

وَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ-এর অর্থ : وَسْوَاسْ বলা হয়, কোনো খারাপ কথা, কাজ ও ভাবের বিষয় মনে এমনভাবে উদয় করে দেওয়া যে, যার অন্তরে উদয় করা হয়, সে আদৌ বুঝতেই পারে না। এ শব্দটির মধ্যে পৌনঃপুনিকতার ভাব বিদ্যমান। যেমন- ভূকম্পনের মধ্যে বারবার কম্পনটি বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি 'ওয়াসওয়াসার' মধ্যে বারবার কুমন্ত্রণা দেওয়া, বারবার খারাপ ভাব জাগরিত করার বিষয়টি বর্তমান। আর خَنَّاسْ শব্দটির অর্থ হলো, প্রকাশ পাওয়ার পর গোপন হওয়া; সম্মুখে আসার পর পিছনে হটে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, খান্নাস শব্দটির অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়ার পর গোপন হওয়া; সম্মুখে আসার পর পিছনে হটে যাওয়া। কেউ কেউ বলেন, খান্নাস শব্দটি দ্বারা নফসে আম্মারার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা বিশেষ একটি শয়তানের কথা বুঝানো হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কতিপয় তাফসীরকারের মতে, খান্নাস শব্দটি দ্বারা নফসে আম্মারাও মানুষের মনে খারাপ চিন্তা, ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা জাগিয়ে তোলে। সূরা ইউসুফে উল্লিখিত হয়েছে- اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ অর্থাৎ অন্তর খারাপের দিকে প্ররোচিত করে। নবী করীম ﷺ তার প্রখ্যাত মাসনুন ভাষণে نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا বলেছেন। তা দ্বারা নফসেরর প্ররোচনাও বুঝা যায়; কিন্তু সূরাটির পরবর্তী ভাষ্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে, খান্নাসের কুমন্ত্রণা দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণাকেই বুঝানো হয়েছে। আর শব্দটির অর্থ দ্বারা যে গুণটি প্রকাশ হয় তা জিন শ্রেণির পক্ষেই সম্ভবপর। সুতরাং এ বাক্যের মর্ম হবে যে, খান্নাস জিন শয়তান বারবার মানুষের মনে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে তোলে। এখানে আর একটি দিক আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় যে, মানুষের মনে কোনো খারাপ ভাব জাগরিত হলেই তা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? এ বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায়। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, মানুষের মনে কোনো খারাপভাব ও ইচ্ছার উদয় হলেই তা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাঞ্ছিত কাজটি করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ না হয়। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেই বাঞ্ছিত কাজটি করতে পারুক বা না পারুক তা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তা করার জন্য সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-এর অর্থ : সূরাটির শেষে উল্লেখ হয়েছে যে, যে খান্নাস মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দেয়, তা দুই শ্রেণির দুই জাতির মধ্য থেকে হতে পারে। জিন জাতির মধ্য হতে হওয়ার বিষয়টির আলোচনাই নিষ্প্রয়োজন। কেননা স্বয়ং ইবলীসই জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সে জাতির মধ্যে তার শাগরেদ, মুরিদ-মু'তাকেদ ও অনুসারী থাকাটা স্বাভাবিক; কিন্তু মানুষের

Free @ www.e-ilmweebly.com

মধ্যে হওয়ার কথাটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। মানুষের মধ্যে শয়তান হওয়ার তাৎপর্য হলো, যেসব মানুষ শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে চিরস্থায়ীভাবে কুফরি ও শিরকির পন্থা গ্রহণ করেছে তারাই শয়তানের শ্রেণিভুক্ত। তারা মানুষের মনে বিভিন্ন পন্থায় ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা ঢেলে থাকে। লেখা ও সাহিত্যের মাধ্যমে, বক্তৃতা ও কথা দ্বারা; অশালীন ও অশ্লীল ছায়াছবি, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মনটিকে কুফরি শিরকি ও খারাপ কাজের দিকে এমনভাবে ধাবিত করে যে, একজন পাকা ঈমানদার লোকও অনেক সময় তা অনুভব করতে পারে না। এ পর্যায়ে আমরা হযরত আবূ যর (রা.)-এর বর্ণিত একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন।

তিনি বললেন, আবূ যর নামাজ পড়েছ কি? আমি বললাম, না পড়িনি। তিনি বললেন, উঠ, নামাজ পড়। নির্দেশ মতো আমি নামাজ পড়ে তাঁর খেদমতে এসে বসলাম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে আবূ যর! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যেও শয়তান হয় নাকি? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, মানুষের মধ্যেও শয়তান হয়। -[মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী]

اَلنَّاسُ শব্দকে تَكْرَارٌ নেওয়ার কারণ : "اَلنَّاسُ" শব্দকে এখানে বারবার নেওয়া হয়েছে এ জন্য যে, তা দোয়া এবং حَمْد ও ثَنَاء-এর স্থান। সুতরাং দোয়ার ক্ষেত্রে حَمْد ও ثَنَاء-এর সাথে "اَلنَّاسُ" কে تَكْرَارٌ নেওয়া উত্তম। এ জন্য বারবার নেওয়া হয়েছে। আর কারো কারো মতে, এ সূরায় اَلنَّاسُ শব্দটি পাঁচবার আনয়ন করা হয়েছে। তার হিকমত হচ্ছে–

১. প্রথম اَلنَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য ছোট বাচ্চাগণ কেননা لَفْظ رَبٌّ এবং رُبُوبِيَّتٌ তার জন্য قَرِيْنَةٌ স্বরূপ, কারণ লালনপালনের আবশ্যকতা সর্বাধিক বাচ্চাদের জন্যই হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে رب الناس ।

২. দ্বিতীয় "اَلنَّاسُ" দ্বারা উদ্দেশ্য যুবকগণ لَفْظ مَلِكٌ তার قَرِيْنَةٌ স্বরূপ রয়েছে এবং مَلِكٌ প্রশাসনিক অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রশাসনিক বিষয় যুবকদের জন্যই শোভনীয় হয়ে থাকে। এ কারণেই দ্বিতীয়বার مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে।

৩. তৃতীয় "اَلنَّاسُ" দ্বারা বৃদ্ধগণ উদ্দেশ্য, যারা দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল হয়ে থাকেন, لَفْظ اِلٰهٌ তার জন্য قَرِيْنَةٌ স্বরূপ, যা ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিতবাহক। তাই বলা হয়েছে اِلٰهِ النَّاسِ ।

৪. চতুর্থ اَلنَّاسُ দ্বারা আল্লাহর নেক বান্দাগণ উদ্দেশ্য এবং لَفْظ وَسْوَسَةٌ তার জন্য قَرِيْنَةٌ স্বরূপ। কেননা শয়তান আল্লাহর নেক বান্দাগণের শত্রু স্বরূপ। নেক বান্দাগণের অন্তরে وَسْوَسَة সৃষ্টি করাই শয়তানের কার্য। তাই বলা হয়েছে اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ।

৫. পঞ্চম বারের اَلنَّاسُ দ্বারা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী লোকগণ উদ্দেশ্য। কেননা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের ক্ষতি সাধন হতে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। -[কাবীর, নূরুল কোরআন]

বস্তুত শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পরহেজগার, সকলকে মহান আল্লাহর রহমতের দিকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের ইবলীস শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

দীন ও ঈমানের হেফাজতের গুরুত্ব : ইমাম রাযী (র.) লিখেছেন, পূর্ববর্তী সূরা ফালাক্বে যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে তথা আল্লাহ তা'আলার শুধু একটি গুণের উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো رَبِّ الْفَلَقِ আর যে জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে তা একাধিক যেমন- ১. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ২. غَاسِقٍ ও ৩. نَفَّاثَاتٌ আর আলোচ্য সূরায় মহান আল্লাহর তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।

১. رَبِّ النَّاسِ ২. مَلِكِ النَّاسِ ও ৩. اِلٰهِ النَّاسِ অথচ এ সূরায় শুধু একটি জিনিসের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। প্রথমোক্ত সূরায় মানুষের দেহ এবং প্রাণের হেফাজত উদ্দেশ্য ছিল। আর অত্র সূরায় দীনের হেফাজত উদ্দেশ্য। এতে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দীন ও ঈমানের হেফাজতের গুরুত্ব দেহ ও প্রাণের হেফাজতের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ববহ।

-[কাবীর, নূরুল কোরআন]

Free @ www.eilm.weebly.com

Free @ www.eilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ : সূরাহ আল-ফাতিহা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার নাম আল-ফাতিহা। অর্থ– প্রারম্ভিকা, অবতারণিকা, উদ্বোধনী। বাংলা ভাষায় তাকে ভূমিকা ও মুখবন্ধ বলে। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মহিমান্বিত সূরাকে 'ফাতিহাতুল কিতাব' (গ্রন্থের সূচনা) বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ পবিত্রতম সূরা দিয়ে কুরআন শরীফ আরম্ভ করা হয়েছে।

এ সূরার অন্যান্য নামসমূহ : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র.) আল-ইতকান নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, আমি সূরা ফাতিহার (৫০০) পাঁচশত নাম অবগত হয়েছি, যা সূরা ফাতিহার শীর্ষ মর্যাদার পরিচায়ক। নিম্নে তার কতিপয় উল্লিখিত হচ্ছে–

১. فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ২. فَاتِحَةُ الْقُرْاٰنِ ৩. اُمُّ الْكِتَابِ ৪. اُمُّ الْقُرْاٰنِ ৫. اَلْقُرْاٰنُ عَظِيْم ৬. اَلْكَافِيَةُ ৭. اَلْوَافِيَةُ ৮. اَلسَّبْعُ
৯. اَلْمَثَانِى ১০. سُوْرَةُ الْحَمْدِ ১১. سُوْرَةُ الْحَمْدِ الْاُوْلٰى ১২. سُوْرَةُ الْحَمْدِ الْقَصْوٰى ১৩. سُوْرَةُ الْكَنْزِ اَسَاسُ الْقُرْاٰنِ
১৪. سُوْرَةُ الشُّكْرِ ১৫. سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ ১৬. سُوْرَةُ الدُّعَاءِ ১৭. سُوْرَةُ الصَّلٰوةِ ১৮. سُوْرَةُ الشِّفَاءِ ১৯. سُوْرَةُ الشَّافِيَةِ
২০. سُوْرَةُ النُّوْرِ ২১. سُوْرَةُ الرَّاقِيَةِ ২২. سُوْرَةُ التَّفْوِيْضِ ইত্যাদি। –[ইতকান]

সূরাটি অবতরণের সময়কাল : অবতরণের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এটিই প্রথম অবতীর্ণ হয়। তবে সূরা ইকরা, মুদ্দাছছির ও মুয্যাম্মিল -এর কয়টি আয়াত অবশ্য সূরা ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রা.) সূরা ফাতিহা সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের সে বক্তব্যের অর্থ এই যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর পূর্বে আর কোনো সূরা নাজিল হয়নি। এ কারণেই এ সূরার নাম فَاتِحَةُ الْكِتَابِ বা কুরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে। –[মা'আরেফুল কোরআন]

এটি মাক্কী না মাদানী এ বিষয়েও কিছুটা দ্বন্দ্ব রয়েছে।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, সূরা اَلْحَجَر-এর পূর্বে এটি মক্কা অবতীর্ণ হয়। তবে صَاحِبُ الْمَدَارِكِ বলেন, বিশুদ্ধ কথা হলো এটা মাক্কী মাদানী উভয়ই। অর্থাৎ নামাজ ফরজ হওয়ার পর এটি মক্কায় নাজিল হয়; এরপর কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তন যখন হয় তখন পুনরায় মদীনায় নাজিল হয়। অপর এক মতে এর অর্ধেক অবতীর্ণ হয় মক্কায় আর অবশিষ্ট অর্ধেক নাজিল হয় মদীনায়। –[হাশিয়াতুল ওয়াস্সাফ]

সূরটির বিষয়বস্তু : মূলত এ সূরা একটি প্রার্থনার পদ্ধতি মাত্র। এ সূরার প্রথমার্ধে আল্লাহর প্রশংসা এবং দ্বিতীয়ার্ধে বান্দার দোয়া বা প্রার্থনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর এ মহান কালাম অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলা এ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। এটাকে কুরআনের অগ্রভাগে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে– এ মহান গ্রন্থ হতে উপকৃত হতে হলে এবং সত্য পথের সন্ধান পেতে হলে সর্বপ্রথম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হয়। বস্তুত মানুষের মনে যে জিনিস লাভ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, মানুষ স্বভাবত তাঁরই প্রার্থনা করে এবং সে প্রার্থনা ঠিক তখনই করে, যখন যে নিঃসন্দেহে জানতে বুঝতে পারে যে, যাঁর নিকট প্রার্থনা করা হয়েছে উক্ত জিনিসটি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ, তাঁর মঞ্জুরি ছাড়া তা লাভ করা যেতে পারে না। অতএব, কুরআন মাজীদের প্রথমেই এ প্রার্থনার স্থান নির্দেশ করত লোকদের এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সত্যপথ লাভের উদ্দেশ্যে সত্যানুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে এ কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তাঁরই নিকট পথ নির্দেশের প্রার্থনা করে।

এ সূরায় প্রার্থনা করা হয়– হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র আপনার ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখান। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআন মানুষের সম্মুখে পেশ করে পরবর্তী সূরায় বলেন– এ কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, এটা সত্য অনুসন্ধানকারীদের জন্য একমাত্র জীবন বিধান। তা তোমাদের দান করা হলো।

সূরাটির মাহাত্ম্য : এ সূরার ফজিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে. তার মধ্য হতে কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– এ সূরার তুল্য তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে অন্য কোনো সূরা নেই। কুরআন শরীফ সমস্ত স্বর্গীয় গ্রন্থের মূল, আর সূরা ফাতিহা কুরআন শরীফের মূল। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল সে যেন সমগ্র তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআন শরীফ পাঠ করল এবং যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহার তাফসীর জানল, সে যেন সমগ্র কুরআন শরীফের তাফসীর অবগত হলো। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন– সূরা ফাতিহার কল্যাণে সর্ব প্রকার বিষ বিনষ্ট হয়ে যায়। উক্ত সূরা কুরআন শরীফের মূল এবং প্রত্যেক পীড়ার আরোগ্যকারী মহৌষধ। হযরত জা'ফর সাদিক (র.) বলেন– আল-হামদু শরীফ চল্লিশবার পড়ে পানিতে দম দিয়ে রোগীর মুখে ছিটিয়ে দাও, ইনশাআল্লাহ রোগ মুক্ত হবে।

২. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল-ফাতিহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম আয়াত তিনটি আল্লাহর জন্য, শেষ তিনটি বান্দার জন্য। আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয়াতটি আল্লাহ এবং বান্দা উভয়ের মধ্যে বণ্টনকৃত। অর্থাৎ إِيَّاكَ نَعْبُدُ আল্লাহর জন্য। আর إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বান্দার জন্য। কারণ সাহায্য প্রার্থনা করাটা হলো বান্দার জন্যই নির্ধারিত। এ সূরাটি দোয়া কবুল হওয়া এবং বিভিন্ন আজাব-মসিবত দূরীভূত হওয়ার জন্য অধিক কার্যকরী।

৩. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে হযরত আলী (রা.) সূরা আল-ফাতিহা পড়ে তাকে দম করে দেন, তার বরকতে লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

৪. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, যে কেউ সূরা আল-ফাতিহা সর্বদা তেলাওয়াত করবে সে দোজখ হতে রক্ষা পাবে।

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরের দিকে দরওয়াজা খোলার আওয়াজ শুনে মাথা উঠালেন। তখন হযরত জিবরাঈল ﷺ বললেন, আসমানের একটা দরওয়াজা আজই খোলা হলো, আজ ব্যতীত পূর্বে কখনো খোলা হয়নি। অতঃপর তা হতে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন ইনি একজন ফেরেশতা তিনি আজ ব্যতীত আর কখনো জমিনে অবতরণ করেননি। তারপর উক্ত ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনাকে দু'টি নূরের শুভ সংবাদ দিচ্ছে, যা আপনাকে দান করা হয়েছে পূর্ববর্তী কোনো নবীকেও তা দান করা হয়নি। তা হলো ফাতিহাতুল কিতাব ও সূরা আল-বাক্বারার শেষ অংশ। এ দু'টির প্রতিটি হরফ পাঠে ছওয়াব দান করা হবে। –[মুসলিম শরীফ]

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– সূরা আল-ফাতিহা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের মহৌষধ।

৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। –[বুখারী]

৮. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তুমি বিছানায় শুয়ে সূরা আল-ফাতিহা ও إِخْلَاصْ পাঠ করবে তখন তুমি মৃত্যু ব্যতীত সব কিছু হতে নিরাপদ থাকবে। –[বাযযায]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ : সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ

سَبْعُ اٰيَاتٍ : ৭ আয়াতবিশিষ্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ سَبْعُ اٰيَاتٍ بِالْبَسْمَلَةِ اِنْ كَانَتْ مِنْهَا وَالسَّابِعَةُ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اِلٰى اٰخِرِهَا وَاِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهَا فَالسَّابِعَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ اِلٰى اٰخِرِهَا وَيُقَدَّرُ فِىْ اَوَّلِهَا قُوْلُوْا لِيَكُوْنَ مَا قَبْلَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهٗ بِكَوْنِهٖ مِنْ مَقُوْلِ الْعِبَادِ .

অনুবাদ :

সূরা আল-ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে বিসমিল্লাহসহ। যদি তাসমিয়া ফাতিহার অংশ হয়, তখন صِرَاطَ الَّذِيْنَ হতে শেষ পর্যন্ত হবে সপ্তম আয়াত। আর যদি তাসমিয়া ফাতিহার অংশ না হয়ে থাকে, তবে সপ্তম আয়াত হবে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ হতে শেষ পর্যন্ত। তাসমিয়ার শুরুতে قُوْلُوْا ক্রিয়া উহ্য মানতে হবে, তাহলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর পূর্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধান হবে। কেননা, তা বান্দার বক্তব্য।

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ قُصِدَ بِهَا الثَّنَاءُ عَلَى اللّٰهِ بِمَضْمُوْنِهَا مِنْ اَنَّهٗ تَعَالٰى مَالِكٌ لِجَمِيْعِ الْحَمْدِ مِنَ الْخَلْقِ اَوْ مُسْتَحِقٌّ لِاَنْ يَّحْمَدُوْهُ وَاللّٰهُ عَلَمٌ عَلَى الْمَعْبُوْدِ بِحَقٍّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَىْ مَالِكِ جَمِيْعِ الْخَلْقِ مِنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهِمْ وَكُلٌّ مِنْهُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ يُقَالُ عَالَمُ الْاِنْسِ وَعَالَمُ الْجِنِّ اِلٰى غَيْرِ ذٰلِكَ وَغُلِّبَ فِىْ جَمْعِهٖ بِالْيَاءِ وَالنُّوْنِ اُوْلُوا الْعِلْمِ عَلٰى غَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ لِاَنَّهٗ عَلَامَةٌ عَلٰى مُوْجِدِهٖ .

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই এটা খবরিয়া বাক্য। এ বাক্যের সার-সংক্ষেপ দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করা উদ্দেশ্য। এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত প্রশংসার অধিকারী অথবা তিনিই তার যোগ্য যে, কেবল বান্দা তাঁরই প্রশংসা করবে। اَللّٰهُ শব্দটি প্রকৃত উপাস্যের নাম। যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক অর্থাৎ তিনি সমস্ত মাখলূকাতের তথা মানব, জিন, ফেরেশতা ও জীব-জন্তুর অধিপতি। উল্লিখিত প্রত্যেক প্রকারের উপর عَالَمٌ শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন- عَالَمُ الْاِنْسِ মানবজগৎ, عَالَمُ الْجِنِّ দানবজগৎ ইত্যাদি। عَالَمٌ শব্দটিকে 'ওয়াও' এবং নূন দ্বারা বহুবচন নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞানীদেরকে অন্যান্য মাখলুকাতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। عَالَمٌ শব্দটি عَلَامَةٌ থেকে গৃহীত। কেননা 'জগৎ' আল্লাহর অস্তিত্বের উপর আলামত বা নিদর্শন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٢. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَىْ ذِى الرَّحْمَةِ وَهِىَ اِرَادَةُ الْخَيْرِ لِاَهْلِهِ ـ

২. যিনি পরম করুণাময় দয়ালু অর্থাৎ করুণাওয়ালা। কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তির প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা হলো রহমত।

٣. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اَىِ الْجَزَاءِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَخُصَّ بِالذِّكْرِ لِاَنَّهُ لَا مُلْكَ ظَاهِرًا فِيْهِ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلّٰهِ تَعَالٰى بِدَلِيْلِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ وَمَنْ قَرَأَ مَالِكَ فَمَعْنَاهُ مَالِكُ الْاَمْرِ كُلِّهِ فِىْ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَىْ هُوَ مَوْصُوْفٌ بِذٰلِكَ دَائِمًا كَغَافِرِ الذَّنْبِ فَصَحَّ وُقُوْعُهُ صِفَةً لِلْمَعْرِفَةِ ـ

৩. যিনি প্রতিফল বিদসের মালিক يَوْمِ الدِّيْنِ হলো الْجَزَاءِ বা প্রতিফল দিবস। আর তা দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সেদিন আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কোনো আধিপত্য থাকবে না। এ কথার উপর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলবেন– لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ অর্থাৎ আজকের আধিপত্য কার? لِلّٰهِ একমাত্র আল্লাহর জন্য। কেউ مَالِكَ পড়েন। তখন অর্থ হবে তিনি কিয়ামতের দিবসে সমস্ত বিষয়ের অধিপতি। অর্থাৎ তিনি সর্বদা এ গুণে গুণান্বিত, যেমন– غَافِرِ الذَّنْبِ অতএব, তা মা'রেফার সিফাত হওয়া সঠিক হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : এ সূরা মক্কায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের প্রথম অধ্যায়েই অবতীর্ণ হয়। নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এটাই সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে নাজিল হয়। তার পূর্বে শুধু কয়েকটি খণ্ড আয়াতই নাজিল হয়েছিল– যা সূরা আলাক্ব, মুযযাম্মিল ও মুদ্দাছিরের অন্তর্ভুক্ত।

শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ বলেন– একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন– হে মুহাম্মদ! তিনি উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন আকাশ ও জমিনের মধ্যখানে একটি ঝুলানো চেয়ার, তার উপর উপবিষ্ট একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ। তা দেখে মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তখন তিনি ঘরে ফিরে যান। উপর্যুপরি কয়েকবার এরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তিনি তা হযরত খাদীজা (রা.)-এর নিকট প্রকাশ করেন। তখন হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন, আপনি আব্দুল্লাহ (আবূ বকর) (রা.)-কে নিয়ে বহু-শাস্ত্রবিদ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ওরাকা ইবনে নাওফালের নিকট গমন পূর্বক তাঁকে এ ব্যাপারে অবগত করুন। আমার বিশ্বাস, তিনি আপনাকে এর রহস্য বলে দিতে পারবেন। পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ারাকার নিকট গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলেন। তা শুনে ওয়ারাকা বলে উঠলেন– 'কুদ্দূসুন কুদ্দূসুন' [শুভ শুভ] তিনি যে নামূসুল 'আখবার' [স্বর্গীয় বাণীবাহক জিবরাঈল।]

অতঃপর তিনি বললেন, আবার সেরূপ অদৃশ্য বাণী কর্ণগোচর হলে আপনি ভীত না হয়ে সে আলোকোজ্জ্বল-জ্যোতির্ময় পুরুষ যা বলেন, তা স্থিরভাবে শুনবেন।

তদনুসারে হযরত পুনরায় প্রান্তর দিয়ে গমনকালে যখন 'ইয়া মোহাম্মদ'! ধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন তিনিও 'লাব্বায়েক' (উপস্থিত) বলে উত্তর দিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর নিকট প্রকাশ হয়ে বললেন– হে মুহাম্মদ, আপনি মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত নবী এবং আমি তাঁর প্রেরিত জিবরাঈল ফেরেশতা। তখন তিনি বললেন, বলুন– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সূরা আল-ফাতিহার শেষ পর্যন্ত। –[দালায়েলে বায়হাকী, ওয়াহেদী, এতকান, ফতেহ]

اَللّٰهُ -এর পরিচিতি : আল্লাহ সে মহান সত্তাকে বলা হয়, যিনি অতি পবিত্র– সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র ও পাক। আর যিনি সকল আকৃতি-প্রকৃতি এবং শরীর হতে মুক্ত। সকল মাখলুকাতের যাবতীয় অবস্থা হতে ব্যতিক্রম। আর তিনি কেমন? তাঁর কোনো রূপরেখা আছে কিনা? কোথায় বাস করেন? কোথা হতে এসেছেন? এ ধরনের সকল প্রশ্ন হতে পবিত্র।

অর্থাৎ আল্লাহ এমন জাত-পাক, যিনি স্থায়ী, থাকা আবশ্যক এবং সকল দিক থেকে কামালিয়াতের সমন্বয়ে বহাল রয়েছেন এবং সকলের সৃষ্টিকর্তা। আর لَفْظ (اَللّٰه) (اللّٰه) এবং إِلٰه একই অর্থ জ্ঞাপক। যেমন, বলা হয়েছে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এবং وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ আবার কখনো হয়তো اِلٰهٌ দ্বারা غَيْرُ اللّٰه-কে বুঝায়। কিন্তু اللّٰه বলতে একমাত্র اَللّٰه-কে বুঝায়, তাই اللّٰه শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহর পরিচিতি এভাবে দেয়া যায় যে,

هُوَ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ بِجَمِيْعِ الصِّفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَزَّهِ عَنْ شَرِيْكٍ.

رَبٌّ-এর অর্থ : رَبٌّ শব্দের বাংলা অর্থ করা হয়– প্রভু, লালনপালনকারী; কিন্তু কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত رب -এর অর্থ ও ভাব অত্যন্ত ব্যাপক। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রব শব্দের যেরূপ ব্যবহার এবং অর্থ বুঝানো হয়েছে, তা হতেই প্রমাণিত হয় যে, এ শব্দটির বহু ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে। কুরআনে কারীমের প্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয় যে, এ শব্দের অর্থ– সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন-বিধান দেওয়া, কোনো জিনিসের মালিক হওয়া, লালনপালন করা, রিজিক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। একসঙ্গে এ সব অর্থই তাতে নিহিত আছে এবং যে শক্তির মধ্যে একসঙ্গে এ সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে তিনি হচ্ছেন রব।

اَلشُّكْرُ لِلّٰهِ না বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কেন বলা হয়েছে? : حَمْد প্রকৃতপক্ষে شُكْر -এর একটি প্রকার মাত্র। এ অনুসারে বুঝা যায় شُكْر -এর উর্ধ্বে حَمْد এর স্থান। আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّٰهَ عَبْدٌ لَمْ يَحْمَدْهُ অর্থাৎ সকল শোকর -এর মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান হলো حَمْد এবং বান্দা যখন আল্লাহর শোকর করে, তখন حَمْد আদায় হয় না। অতএব, আল্লাহর প্রশংসা যেন অতি উত্তমভাবে আদায় হয় এ কারণে এখানে حَمْد বলা হয়েছে– شُكْر বলা হয়নি এবং আল্লাহর উপযুক্ত মতে যেন حَمْد আদায় হয়।

আর حَمْد -কে رَأْسُ الشُّكْرِ বলার কারণ হলো আল্লাহর নিয়ামতের কথা মুখে স্বীকার করা, অন্তরে স্বীকার করা হতে অতি উত্তম। আর কার্যত নিয়ামত স্বীকার করা হতেও উত্তম। কেননা অন্তরের স্বীকৃতি বা কার্যের স্বীকৃতি হতে মুখের স্বীকৃতি অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। –[মাদারেক]

حَمْد এর বিপরীত হলো ذَمٌّ [নিন্দা] আর شُكْر -এর বিপরীত হলো كُفْرَانٌ নাফরমানি করা। আবার কারো কারো মতে مَدْح বা প্রশংসা হলো এমন কার্যের উপর গুণ বর্ণনা করা যা صِفَتْ كَمَالٌ -এর অন্তর্ভুক্ত যেমন اَزَلٌ হতে থাকা, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব হওয়া ইত্যাদি।

اَلشُّكْرُ বলা হয়– এমন প্রশংসা যা তার উত্তম গুণাবলির কারণে সে পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সেই প্রশংসার কারণ সে নিজেই। কারো কারো মতে, حَمْد ও مَدْح এর মধ্যে عَامٌ وَخَاصٌ এর পার্থক্য। অর্থাৎ حَمْد (হামদ) হলো খাস এবং مَدْحٌ (মদাহ) হলো عَامٌ (আম)। কারো কারো মতে, কোনো অনুগ্রহের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, বা সম্মান প্রদর্শন করার নাম شُكْر চাই তা বক্তব্যের মাধ্যমে হোক অথবা কর্ম এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক। আর বিনা অনুগ্রহে সম্মান করা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলো- حَمْد আর ذَمٌّ বলা হয়, যে কোনো প্রকার নিন্দাজ্ঞাপক করা। চাই কথার দ্বারা বা কার্যের দ্বারা, অথবা যে কোনোভাবেই হোক। আল্লামা যামাখশরী (র.) বলেন, حَمْد ও مَدْح সমর্থক শব্দ। উভয়ের মধ্যে কোনো فَرْق নেই।

اَلْعَالَمِيْنَ-কে جَمْع ব্যবহার করার কারণ :

১. اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ-এর বহুবচন। যেহেতু عَالَمٌ-এর সমস্ত অংশসমূহের মধ্যে ইনসান জাতি বিশেষত তন্মধ্যে পুরুষ জাতিই উত্তম, এ কারণে اَلْعَالَمِيْنَ-কে جَمْعُ مُذَكَّرٌ-এর صِيْغَهْ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে।

আর যেহেতু এতে কেবল ইনসান জাতি উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর সৃষ্টিকুলের যত জাতি রয়েছে। যেমন– - عَالَمْ لَاهُوْت - عَالَمْ اِنْسَان - عَالَمْ مَلَكُوْت - عَالَمْ جَنَّات - عَالَمْ بَرْزَخْ - عَالَمْ اُخْرَةْ عَالَمْ ইত্যাদি সকল প্রকার সৃষ্টিকুল উদ্দেশ্য, এ হেতু اَلْعَالَمِيْنَ শব্দকে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

رَبُّ الْعَالَمِيْنَ বলে আল্লাহ তা'আলা জিন-ইনসান, পশুপক্ষী, জল ও স্থল ভাগের সকল প্রাণীজগৎ এবং গাছ-পালা, তরু-লতা, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি আঠারো হাজার মাখলুকাতের সকলেরই তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টিসকল এক একটি عَالَمٌ বা জগৎ। এ কারণে رَبُّ الْعَالَمِيْنَ বলা হয়েছে এবং اَلْعَالَمِيْنَ-কে جَمْع নেওয়া হয়েছে।

২. অথবা, عَالَمٌ অর্থ– নিশান, চিহ্ন বা নিদর্শন এবং اَلْعَالَمِيْنَ অর্থ– চিহ্নসমূহ। আল্লাহ তা'আলা যত জগৎ বা জাতি সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকটি জাতিই তাঁর কুদরতের এক একটি নিশান বা চিহ্ন। এগুলোর সংখ্যা অপরিসীম বিধায় اَلْعَالَمِيْنَ-কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। –[কাশ্‌শাফ, মাদারিক]

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

১. لَفْظ رَحْمٰنْ আল্লাহ তা'আলার সিফাতি নাম হওয়া সত্ত্বেও لَفْظ اَللّٰهُ-এর ন্যায় কেবল ذَاتْ بَارِيْ تَعَالٰى-এর জন্য সুনির্দিষ্ট। অতএব, এর অর্থ করা হয়েছে কোনো মেহনত বা পরিশ্রমের বিনিময় ব্যতীত দয়া বর্ষণকারী, আর رَحِيْم শব্দের অর্থ করা হয়েছে, اَعْمَالْ صَالِحَةْ সমূহের উত্তম প্রতিদানকারী ও বিশেষ দয়াবান এবং প্রকৃত পরিশ্রমের প্রতিদান বিশেষভাবে দানকারী।

২. কেউ কেউ বলেন, رَحْمٰنْ দুনিয়াতে সাধারণভাবে সকলের জন্য মেহেরবান, অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
আর رَحِيْم আখেরাতে বিশেষভাবে সকল নেক বান্দাদের জন্য দয়া বর্ষণকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ رَحْمٰنْ শব্দটি সাধারণ অর্থে এবং رَحِيْم শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। কেউ কেউ বলেন– এ শব্দদ্বয় مُبَالَغَةْ-এর অর্থের জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ অধিক রহমতের অধিকারী।

৩. (كَثْرَتْ رَحْمَتْ) কেননা رَحْمَتْ অর্থ হলো– رِقَّتُ الْقَلْبِ নরম অন্তঃকরণ হওয়া। আল্লাহ তা'আলা অন্তর হতে পাক। অতএব, এর অর্থ হবে অধিক দয়াবর্ষণকারী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্য অতি উত্তমভাবে দয়া বর্ষণকারী এবং নাফরমান বান্দাদের জন্যও খুব দয়া বর্ষণকারী।

৪. কেউ কেউ বলেন, رَحْمٰن رَحِيْم উভয় শব্দ رَحْم শব্দ থেকে নির্গত– তা আল্লাহর জন্য خَاصْ শব্দ, এটার লিঙ্গান্তরও হয় না। বাংলা ভাষায় এদের অর্থ– দয়াময় ও অধিক দয়াময় এবং رَحْمٰنْ শব্দটি ঈমানদার ও বেঈমান কাফের সকলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। আর رَحِيْم কেবল ঈমানদার ও আল্লাহর অনুগত লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, যারা ঈমান গ্রহণ করে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তবে, বেঈমানগণের প্রতি (رَحْمٰنْ) দয়াবান অস্থায়ী এবং ঈমানদারদের প্রতি (رَحِيْم) স্থায়ী দয়াবান হবেন ইহকালে ও পরকাল।

৫. কারো মতে, اَلرَّحْمٰنُ হলো চিন্তা-দুঃখ পেরেশানী দূরকারী আর اَلرَّحِيْمُ হলেন পাপসমূহ মার্জনাকারী।

৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) বলেন, প্রার্থনার পর যিনি দেন তিনি হলেন رَحْمٰنْ আর যিনি প্রার্থনা ব্যতীতই দান করেন এবং প্রার্থনা না করলে রাগন্বিত হন, তিনি হলেন رَحِيْم যেমন কবি বলেন–

وَاللّٰهُ يَغْضَبُ اِذَا تَرَكْتَ سُوَالَهُ * وَبَنُوْ اٰدَمَ يَغْضَبُ حِيْنَ يُسْئَلُ

৭. কারো মতে, اَلرَّحْمٰنْ হলেন পথ প্রদর্শনকারী আর اَلرَّحِيْم হলেন তৌফিকদানকারী– (مَارِبُ الطَّلَبَةِ)

قَوْلُهُ "مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ মালিক, স্বত্বাধিকারী, একচ্ছত্র অধিপতি। সাধারণত يَوْمْ সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বলে। শরিয়তের পরিভাষায়– সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বলে। আবার আরবি ভাষায় يَوْمْ শব্দটি সময় বা কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার পঞ্চাশ হাজার বছরকেও يَوْمْ বলা হয়। এখানে 'সময়' অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ. কারণ কর্মফলের সময়টা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় হতে আরম্ভ করে সমস্ত লোকের হিসাব হয়ে বেহেশত বা দোজখে প্রবেশ করার হুকুম পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

বস্তুত তিনিই সবকিছুর মালিক। প্রকাশ্য, গোপন, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার শুরু নেই শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার কোনো তুলনা নেই। মানুষের মালিকানা তো ক্ষণস্থায়ী। আর আল্লাহ তা'আলার মালিকানা এমন যে, পরকালেও একমাত্র তার মালিকানাই সাব্যস্ত হবে।

আর مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-এর অর্থ– কোনো বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাতে ব্যবহার রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধনসহ সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। আর دِيْن অর্থ– প্রতিদান। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ দ্বারা অর্থের ব্যাপকতার দিকে ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে, সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার অধিকারে থাকবে। –[মা'আরেফুল কোরআন]

مَالِكْ এবং مَلِكْ-এর মধ্যে পার্থক্য : শব্দটি মীমের পর আলিফ এবং আলিফ ছাড়া উভয়ভাবেই পড়া যায়। মক্কা ও মদীনার ক্বারীগণ আলিফ ছাড়া পড়েন। আবার অনেকের মতে আলিফ দিয়ে পড়া উত্তম। اَلْمَلِكُ বলতে বুঝায় اَلَّذِيْ يُدَبِّرُ اَعْمَالَ رَعِيَّتِهِ الْعَامَّةَ অর্থাৎ যে তারা প্রজা-সাধারণের সাধারণ কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে; কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত বিশেষ কাজ ও ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু মালিক (مَالِكْ) সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারীকে বলা হয়। তাতে একটি অক্ষর বেশি হওয়াতে তার অর্থ অধিকতর ব্যাপক ও সর্বাত্মক।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

Free @ www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদ :

٤. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اَىْ نَخُصُّكَ بِالْعِبَادَةِ مِنْ تَوْحِيْدٍ وَغَيْرِهِ وَنَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُوْنَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا .

৪. আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি অর্থাৎ তাওহীদ ইত্যাদিতে শুধু ইবাদতের জন্য আপনাকেই খাস করেছি এবং ইবাদত ইত্যাদির উপর আপনার থেকেই সাহায্য চাচ্ছি।

٥. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اَىْ اَرْشِدْنَا اِلَيْهِ وَيُبْدَلُ مِنْهُ .

৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন অর্থাৎ তার প্রতি চালিত করুন। সামনের আয়াত এটা থেকে বদল হয়েছে।

٦. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بِالْهِدَايَةِ وَيُبْدَلُ مِنَ الَّذِيْنَ بِصِلَتِهِ .

৬. তাদের পথে যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ সুপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে। সামনের বাক্যটি اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ থেকে 'বদল' হয়েছে।

٧. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَهُمُ الْيَهُوْدُ وَلَا وَغَيْرِ الضَّالِّيْنَ وَهُمُ النَّصَارٰى وَنُكْتَةُ الْبَدْلِ اِفَادَةُ اَنَّ الْمُهْتَدِيْنَ لَيْسُوْا يَهُوْدًا وَلَا نَصَارٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَاٰبُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ صَلٰوةً وَسَلَامًا دَائِمَيْنِ وَمُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৭. তাদের পথে নয় যাদের উপর অভিশাপ নাজিল করেছেন অভিশপ্ত গোষ্ঠি হচ্ছে ইহুদিরা। এবং যারা পথভ্রষ্ট নষ্ট, যারা পথভ্রষ্ট তারা হচ্ছে খ্রিস্টানগণ। 'বদল' বলার কারণ হলো এ কথা বুঝানো যে, ইহুদি এবং খ্রিস্টানগণ সুপথপ্রাপ্ত নয়। আল্লাহ সঠিক সম্পর্কে ভালো জানেন। তাঁর দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন এবং আশ্রয়স্থল। আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং পূত-পবিত্র সহচরবৃন্দের উপর আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ করুন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِيَّاكَ نَعْبُدُ তে مَفْعُوْل-কে فِعْل-এর পূর্বে নেওয়ার কারণ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ এবং إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর মধ্যে إِيَّاكَ মাফউলকে فِعْل -এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হলো ফে'ল পূর্বে নেওয়া, মাফউল পরে নেওয়া। এরূপ করা হয় ইখতেসাস-এর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ ক্রিয়াটিকে ঐ মাফউলের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। অতএব, অর্থ দাঁড়ায়–আমরা (হে আল্লাহ) তোমারই জন্য ইবাদত করি (ইবাদত একমাত্র তোমারই জন্য খাস) আর তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

اَلْعِبَادَةُ-এর অর্থ : ইবাদত শব্দটি 'عَبْدٌ' হতে নির্গত। 'عَبْدٌ' বলা হয় দাস ও বান্দাকে। এটা হতেই গঠিত হয়েছে ইবাদত অর্থাৎ বন্দেগি এবং দাসত্ব করা। কথাটি শ্রবণের সাথে সাথে কয়েকটি কথা জাগ্রত হয়।

ক. যে বন্দেগি স্বীকার করেছে সে বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা।

খ. এমন একজন আছেন যার বন্দেগি করা হয়েছে।

গ. যাঁর বন্দেগি করা হচ্ছে, তাঁর পক্ষ হতে নিয়ম ও আইন-বিধান নাজিল হচ্ছে এবং যে বন্দেগি করছে সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে।

ঘ. কাউকেও মা'বূদ বলে স্বীকার করা এবং তার দেওয়া আইন-কানূন পালন করে চলার একটি অনিবার্য পরিণতি রয়েছে, যে পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বন্দেগির কাজ করা হচ্ছে।

ইবাদাতকে عُبُوْدِيَّةٌ থেকে বলা যায়। এর অর্থ اَلذُّلُّ বা অবনতি স্বীকার করা, দলিত-মথিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। এর আরো অর্থ مَا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভালোবাসা, বিনয় ও ভীতি এ সব কয়টি ভাবধারা যাতে সমন্বিত তা-ই ইবাদত।

মানবের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত, মূলত আল্লাহ এ জন্য মানবকুলকে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু দুর্বল মানবের পক্ষে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চলা সবসময় সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই ইবাদত স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দার মুখ হতে বলানো হয়েছে- "হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এ কর্তব্য পালনের জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি।" তাতে আল্লাহর পক্ষ হতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা ইবাদতের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোক, নিজের সাধ্যমতো এ কর্তব্য পালন করে যাক, আর আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুক, আমি তাকে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করবো।

ইমাম গাযালী (র.) স্বীয় গ্রন্থ আরবাঈনে দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা- নামাজ, জাকাত, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা, প্রতিবেশী ও সাথীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা। মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া এবং রাসূলের সুন্নত পালন করা। -[মা'আরেফুল কোরআন]

اَلْاِسْتِعَانَةُ-এর অর্থ : اَلْاِسْتِعَانَةُ-এর অর্থ طَلَبُ الْمَعُوْنَةِ তথা সাহায্য প্রার্থনা করা। 'مَعُوْنَةٌ' দু' প্রকার ضَرُوْرِيَّةٌ এবং غَيْرُ ضَرُوْرِيَّةٍ যা ছাড়া কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না; তাকে ضَرُوْرِيَّةٌ বলা হয়। আর যা ছাড়া কাজ করা যায়; কিন্তু কষ্ট হয়, সহজভাবে করা যায় না, তাকে غَيْرُ ضَرُوْرِيَّةٍ বলে। এখানে اِسْتِعَانَةٌ বলে উভয় প্রকার مَعُوْنَةٌ-কে বুঝানো হয়েছে।

সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি আম, তথা কোনো কাজের সাহায্য চাই সে বিষয়টির উল্লেখ নেই। এ কারণে জমহুর মুফাসসিরীনের অভিমত হচ্ছে এখানে সাধারণ সাহায্যে প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্থিব কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্য কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। -[মা'আরেফুল কোরআন]

اَلْهِدَايَةُ-এর অর্থ : হিদায়াতের অর্থ- দু'টি।

১. اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ বা পথ দেখিয়ে দেওয়া।

২. اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ বা উদ্দেশ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া।

هِدَايَةٌ শব্দটি اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে সকলেই অবগত, আর اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া مَجَازٌ হিসাবে।

আল্লামা তাফতাযানী (র.) কাশশাফের হাশিয়াতে বলেন, যদি هِدَايَةٌ শব্দটি مُتَعَدِّىْ بِنَفْسِهٖ হয়, তখন اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ-এর অর্থ হবে।

আর যখন مُتَعَدِّىْ بِوَاسِطَةِ الْحَرْفِ হয়, তখন اِرَاءَةُ الطَّرِيْقِ-এর অর্থ হবে।

মূলত মানুষকে এ হেদায়েত চারটি দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম- স্বভাবজাত জ্ঞান হতে কার্জের পথ জেনে নেওয়ার সুব্যবস্থা। দ্বিতীয়-মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা ও ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে জীবন পথের জ্ঞান অর্জন। তৃতীয়- স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির পথ নির্দেশ। চতুর্থ- দীন হতে পথ প্রদর্শন লাভ।

Free @ www.eilm.weebly.com

প্রথমোক্ত তিন ধরনের হেদায়েত সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে; কিন্তু এ স্বভাবজাত হেদায়েত দ্বারা মানুষের জীবনের ব্যাপক, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহ কিছুতেই পূরণ হতে পারে না। জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে হলে দীনভিত্তিক হেদায়েত একান্তই আবশ্যক, যা মানুষের কাছে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে। যা বাস্তবায়ন করেন রাসূলগণ।

اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ-এর অর্থ : اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ-এর বিভিন্ন অর্থ দেখা যায়। ১. সিরাতুল মুস্তাকীম হলো– কিতাবুল্লাহ, ২. ইসলাম, ৩. আবুল আলিয়ার মতে, মুহাম্মদ ﷺ আবূ বকর ও ওমর (রা.) উদ্দেশ্য, ৪. ইমাম সাহল বলেন, সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবা উদ্দেশ্য, ৫. ইমাম মুযানী (র.) বলেন, রাসূলের তরীকাকে বুঝানো হয়েছে এবং ৬. আল্লামা যামাখশারী বলেন, সত্যপথ ও সত্যধর্ম ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْاِسْتِقَامَةُ-এর অর্থ : اِسْتِقَامَةٌ শব্দের অর্থ– সোজা হওয়া, সুদৃঢ় হওয়া, اِعْتِدَالٌ বা সরল-সোজা হওয়া। সূরা আল-ফাতিহায় اِسْتِقَامَةٌ বলতে সরল-সোজা পথকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ইসলাম সরল-সোজা পথ বা জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু তাকে সিরাতুল মুস্তাকীম বলা হয়েছে।

আল-ওয়াস্‌সাফের হাশিয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, اَلْمُسْتَقِيْمُ-এর অর্থ হলো– اَلْمُسْتَوِىْ مِنَ الْاِسْتِقَامَةِ তথা اَلْاِعْتِدَالُ বা সরল সহজ, অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– هُوَ طَرِيْقُ الْحَقِّ وَالدِّيْنِ لِاَنَّهُ مُعْتَدِلٌ بَيْنَ الْاِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيْطِ

যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . وَهٰذِهٖ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

আর এ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ দ্বারা আমাদের শরিয়তে মোহাম্মদীকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা অতি কঠোরতা ও অতি নম্রতার মাঝামাঝি।

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالُّوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য : مَغْضُوْب ও ضَالُّوْنَ দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যথা–

১. اَلضَّالُّوْنَ বলতে নাসারা বা খ্রিস্টানদের বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ তারা নিজেরা পূর্বেই ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেক লোককে ভ্রষ্ট করেছে।

   اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বলে ইহুদিদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন– وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তাদের উপর গজব এবং অভিশাপ অবতারণ করেছেন। –[ইবনে কাছীর]

২. অথবা, مَغْضُوْب এবং ضَالٌّ বলে মুনাফিক উদ্দেশ্য। অথবা, مَغْضُوْب দ্বারা ফাসিক বা যাদের আমল মন্দ, আর ضَالٌّ দ্বারা যারা মন্দ আকীদাসম্পন্ন তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৩. কারো মতে, مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা সকল বদ আমলকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, আর ضَالِّيْنَ দ্বারা সকল جَاهِلٌ-কে বুঝানো হয়েছে।

নিয়ামতপ্রাপ্ত কারা? : যারা আল্লাহর পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের বর্ণনা সূরা আন-নিসার ৯ম রুকূতে এসেছে–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

অর্থাৎ যারা পুরস্কারপ্রাপ্ত তারা হলেন– নবীগণ, সিদ্দীকগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। বর্ণনাকারী হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.) বলেন– পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্বারা নবীগণকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন– মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত অকী'(র.) বলেন– মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– ফেরেশতাগণ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণকে বুঝানো হয়েছে। [এ সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।]

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ اٰمِيْنَ : اٰمِيْنَ শব্দটি **اِسْمِ فِعْل**-এর অর্থ হলো **اِسْتَجِبْ** । যেমন– **رُوَيْد . حَيَّهَلْ** ও **هَلُمَّ** একে দু'ভাবে পড়া যায়। মদবিহীন। যথা– **اَمِيْن** যেমন কবি বলেন–

تَبَاعَدَ عَنِّىْ فَطَحَلَ اِذْ دَعَوْتُهُ * اَمِيْنَ فَزَادَ اللّٰهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدًا

আর মদসহ। যেমন– **اٰمِيْنَا** যেমন– **مَجْنُوْن**-এর কবিতায় আছে–

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبَنِّىْ حُبَّهَا اَبَدًا * وَيَرْحَمُ اللّٰهُ عَبْدًا قَالَ اٰمِيْنَا

তবে **اٰمِيْن** অংশটি **سُوْرَةُ فَاتِحَة**-এর কোনো অংশ নয়। কিন্তু সূরা আল-ফাতিহা সমাপ্ত করে আমীন বলা মোস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে **غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ** বলে 'আমীন' বলতে শুনেছি এবং তিনি তাতে শব্দ লম্বা করেছেন। আবূ দাউদে এসেছে তিনি শব্দ উচ্চৈঃস্বরে করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি বলেন– 'আয় আল্লাহ! তুমি করো।' জাওহারী বলেন– এরা অর্থ 'অনুরূপ' হোক। তিরমিযী বলেন– 'আমাদের নিরাশ করো না। অধিকাংশ ওলামা বলেন এর অর্থ– 'আয় আল্লাহ। তুমি আমাদের দোয়া কবুল করো।'

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) সূরা আল-ফাতিহা সমাপ্তের পর আমাকে 'اٰمِيْن' পড়া শিখিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, চিঠিপত্রে যেরূপ সীলমোহর লাগানো হয়, তদ্রূপ সূরা আল-ফাতিহার জন্য 'আমীন' সীলমোহর। যখন বান্দা সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করে 'আমীন' বলে, ফেরেশতাগণও আমীন বলে। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব-পরের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। –[বায়যাবী]

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এটা চিঠির মোহরের মতো। এটা কুরআনের কোনো অংশ নয়। কেননা পূর্বোক্ত **مَصَاحِفْ** সমূহে এ শব্দটির উল্লেখ নেই।

আর হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে, নামাজে ইমাম **اٰمِيْن** বলবে না। কেননা এটা দোয়া প্রার্থনাকারীর শব্দ। –[কাশশাফ]

তবে আমাদের মাযহাব মতে, নামাজের মধ্যে ইমাম মুক্তাদি সবার জন্য **اٰمِيْن** গোপনে পড়া সুন্নত। জামাত ছাড়া নামাজেও সুন্নত। –[হাশিয়ায়ে ওয়াস্‌সাফ]

—সমাপ্ত—

تفسير الجلالين

ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা